চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২. কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ... অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

মূল্য একটাকা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত

(১)   ওঁ   শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা ত কাল অনেক স্রোত ঠেলে সমস্ত দিন নদীর ধারার সঙ্গে লড়াই করে রাত্রে শিলাইদহে এসে পৌঁচেছি।

এখানে কাজকর্ম্মের ভিড় যথেষ্ট। কতদিন থাক্‌তে হবে এখনো ঠিক বল্‌তে পারিনে।

কিন্তু তোমার পড়ার পাছে ব্যাঘাত হয় এই উদ্বেগ আমার মনে আছে। তোমাকে পড়াবার জন্যে অজিতকে বলে এসেছিলুম সেইমত তোমার পড়া চল্‌চে ত? ইংরাজি পাঠ প্রথম ভাগ ত হয়ে গেছে—আর একটা বই তোমার জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলুম সেটা বেশ বুঝতে পারচ ত? সে বইটা ইংরাজিপাঠের চেয়ে ভারী নয় বরঞ্চ হালকা।

হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো। বানানটা যাতে ক্রমে বিশুদ্ধ হয় সেই চেষ্টা কোরো।

আর তোমাকে আমার একটি উপদেশ আছে প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ো।

অনেকদিন পরে আমি পদ্মায় এসেছি। আজ সকালে সুন্দর রৌদ্র উঠেছিল। নদী একেবারে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। আজ সকালবেলা যখন বোটের ছাদের উপর বসে উপাসনা করছিলুম আমার মনের ভিতরটি আলোকে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই জল স্থল আকাশের মাঝখানে বসে তাঁকে চিত্তের মধ্যে অনুভব করতে আমার খুব ভাল লাগ্‌চে। ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এই রকম এখানে শান্তি ও নির্ম্মলতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু যিনি প্রভু তিনি ছুটি না দিলে কিছুই হবে না—তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৩শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পতিসর
আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা কাল রাত্রে পতিসর পৌঁচেছি। এখানে এসেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোট বড় নানা বন্ধন চারদিকে ফাঁস লাগায়—নানা আবর্জ্জনা জমে ওঠে—দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে—তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যিনি অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, যিনি চির জীবনের প্রিয়তম, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্যে মনের মধ্যে এমন কান্না ওঠে যে ইচ্ছা করে বহু দূরে বহু দীর্ঘকালের জন্যে কোথাও চলে যাই। যতই নানাদিকে নানা কথায় নানা কাজে মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই গভীর বেদনার সঙ্গে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি ছাড়া আর কিছুতেই আমার স্থিতি নেই তৃপ্তি নেই—তাঁকে ছাড়া আমার একেবারেই চলবে না।

কবে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন জানিনে—কিন্তু জোড় হাত করে কোনো প্রশান্ত পবিত্র নির্জ্জন স্থানে তাঁর দিকে তাকিয়ে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে—কেবল বলি—মা মা হিংসীঃ—আমাকে আর আঘাত কোরো না—আর মেরো না, আর মেরো না—ভাল মন্দর দ্বন্দ্বের মাঝখানে রেখে আমাকে কেবলি চারদিক থেকে এমন ধাক্কা খেতে দিয়ো না। জীবন যখন দ্বিধাবর্জ্জিত বাসনা-মুক্ত পবিত্র হয়ে উঠ্‌বে—তখন লোকালয়েই থাকি আর নির্জ্জনেই থাকি সর্ব্বত্রই সেই পবিত্রতার সাগরের মধ্যে সেই প্রেমের অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাক্‌তে পারব। দুঃস্বপ্নজালজড়িত এই অন্ধকার রাত্রির অবসানে সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতের জন্যে মন অহরহ অপেক্ষা করচে—সকল সুখদুঃখ, সকল গোলমাল, সকল আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও তার সেই একটি মাত্র সত্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিরদিনই জীবনকে এত মায়ায় এত মিথ্যায় জড়াতে দিয়েছি যে, তার জাল কাটাতে আজ প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে। তা হোক্, তবু কাটাতেই হবে—সংসারের, বিষয়ের, বাসনার সমস্ত গ্রন্থি একটি একটি করে খুলে তবে যেন আমার এই জীবনের ব্রত সাঙ্গ হয়—স্নান করে ধৌত হয়ে নির্ম্মল বসন পরে শুচি ও সুন্দর হয়ে

যেন এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর কাছে যেতে পারি—ঈশ্বর সেই দয়া করুন—আর সমস্ত চাওয়া যেন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও আমার সংসারের মধ্যেও সেই পবিত্র পরম পুরুষের আবির্ভাব বাধামুক্ত হয়ে প্রকাশ পাক্ এই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। তোমার মনের মধ্যে সেই অমল সৌন্দর্যটি আছে—যখন তাঁর জ্যোতি সেখানে জ্বলে উঠ্‌বে—তখন তোমার প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে থেকে সেই আলো খুব উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবে আমার তাতে সন্দেহ নেই—তুমিই আমার ঘরে তোমার নির্ম্মল হস্তে পুণ্যপ্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ—আমার সংসারকে তুমি তোমার পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুল্‌বে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। ঈশ্বর তোমার ঘরকে তাঁরই ঘর করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)　　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম।

আমাদের অভিনয়ের দিন কাছে আস্চে অথচ আজ পর্য্যন্ত আমার ভাল মুখস্থ হয় নি বলে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। মুখস্থ হবে কি করে? দিন রাত নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই দিন কেটে যায়। কলকাতা থেকে লোক এখান পর্য্যন্ত এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্চে।

তোমার ইংরিজি বই নিয়ে অভিধান দেখে বাংলা করবার চেষ্টা করতে থেকো---যেখানে বুঝতে বিশেষ বাধবে তোমার বাবার কাছে বুঝিয়ে নিয়ো।

রথীর চিঠি পেয়েছি। সে বেশ মজা করে ষ্টীমলাঞ্চে চড়ে চলে গেল---আমার ভারি লোভ হচ্চে। যদি এই অভিনয়ের উৎপাত না থাক্তো তাহলে দিব্যি মনের আনন্দে চলে যেতুম। দেখি, শিলাইদহে গিয়ে তার পরে ষ্টীমারে করে যদি কোথাও বেরিয়ে পড়ার সুবিধা হয়।

এখানে খুব ঘনঘটা করে এসেছে। এক একবার এলোমেলো বাতাস দিচ্চে, বৃষ্টি হচ্ছে—থেকে থেকে ভীষণ রবে বজ্র ধ্বনিও শোনা যাচ্চে। ভাবছিলুম নদীতে যদি রথী এই দুর্য্যোগ পেয়ে থাকে তাহলে মুস্কিলে পড়বে—কিন্তু তা হয় নি—সে ত লিখ্‌চে বৃষ্টি পথে পায় নি।

প্রভাতের মার শরীর বড়ই খারাপ। তিনি শান্তিনিকেতনেই আছেন। তাঁকে নিয়ে দু তিন রাত জাগ্‌তে হয়েছে।

মেয়েদের অভিনয়ের উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে। তারা 'সতী' অভিনয় করবে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে তাদের দেখিয়ে দেওয়া ঘটে উঠ্‌চে না।

তোমাদের বাড়ির নম্বরটা দিলে না কেন? আমার ত মনে নেই।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি রবিবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্টোবর, ১৯১০]

(৪) ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। মিস্ বুর্ডেট্‌কে ত শুধ্ ভাল লাগ্‌লে হবে না, তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি যদি শেলাই জানেন হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শেলাই শিখে নিয়ো—কেবল সৌখীন শেলাই নয়—জামা কাপড় প্রভৃতি কাট্‌তে শেখা চাই। সেলাই শেখা উপলক্ষ্যে খানিকটা ইংরাজি কথা কওয়ার অভ্যাস সুরু হবে। তুমি যতটুকু পার ওঁর সঙ্গে কইতে বল্‌তে চেষ্টা কোরো, লজ্জা কোরো না। ওঁর খাওয়া দাওয়ার কি রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছ? দুপুর বেলায় কি খেতে দাও? দেখো ঠিক সময়মত খাওয়ার যেন ব্যাঘাত না হয়—ওরা সকল কাজেই সময় রক্ষা করে চলে আর আমরা ঠিক তার উল্টো। রথীকে বোলো ওঁকে অল্প অল্প করে বাংলা শেখানো যেন ধরিয়ে দেয়—আপাতত বাংলা অক্ষর ও তার উচ্চারণ শিখ্‌তে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মীরা ওঁকে বাংলা শেখাবার ভার নিতে

পারে। সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের কি রকম কাটে? ওঁর সঙ্গে তোমাদের খেলা চলে কি? আমি যখন যাব তখন দেখব তোমাদের খুব ইংরিজি কথা হুহুঃ শব্দে চলচে। Christmas এর দিনে আগে থাকতে মনে করে ওঁর জন্যে কিছু card আনিয়ে দিয়ো এবং সেদিন একটু বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ কোরো—বোটে করে নদীর চরে গিয়ে যা হয় একটা কিছু হুটোপাটি কোরো—রথীকে বোলো থ্যাকারের ওখান থেকে দুই একটা Christmas নম্বর ছবির কাগজটাগজ আনিয়ে দিতে এবং কলকাতা থেকে একটা সময়মত ক্রিষ্টমাস্ কেক্ আনাতে। উনি ভাল বাজাতে পারেন এবং বাজাতে ভাল বাসেন—রথীর কর্ত্তব্য হবে একটা পিয়ানো আনিয়ে নিতে—এই সময়টায় কলকাতায় Season, সুতরাং সুবিধা দামে পিয়ানো এখন পাওয়া শক্ত—আর তিনচার মাস পরে তবে দাম কমে যাবে। যা হোক্ উনি যখন ওখানে অমন একলা পড়েছেন তখন ওঁর চিত্তবিনোদনের একটা বিশেষ উপায় করে না দিলে কষ্ট দেওয়া হবে।

দ্বিপুকে পাটালি পাঠাতে রথীকে বলেছিলুম কই এ পর্য্যন্ত তার ত কোনো লক্ষণ দেখ্‌চিনে—দ্বিপু ঐ পাটালির পথ চেয়ে আছে।

রথীর বাগান চাষবাস কি রকম চল্‌চে ? মীরার মামাশ্বশুরের বাগানের কি খবর ? সেখান থেকে শালগম গাঁজরের আমদানি হচ্চে বোধ হয়।

নগেনের আসবার কোনো খবর পেয়েছ কি ?

রথীকে বোলো পিসিমাকে আমি অন্যত্র যেতে চিঠি লিখে দিয়েছি কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। তোমাদের শরীর ত ভাল আছে ?

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তুমি আমার নববর্ষের অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। যিনি সকলের বড় তাঁকে তুমি সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাও, এই আমার একান্ত মনের কামনা। মানব জীবনকে খুব মহৎ করে জান—নিজের সুখস্বার্থ সাধন কখনই তার লক্ষ্য নয় এ কথা সমস্ত ভোগসুখের মধ্যে মনে রেখো—সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে জেনো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদেও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখ—প্রতিদিনের সুখ দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো—প্রত্যহই যদি তাঁর কাছে যাবার পথ সহজ করে না রাখ তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেখানে যেতে পারবে না। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই যেন তোমার মনে পড়ে যে তিনিই আছেন তোমার চিরজীবনের সহায় সুহৃদ্ পিতামাতা—তাঁরি কর্ম্ম বলে সংসারের কর্ম্ম করবে—এবং এ জীবনে যাদের সঙ্গে তোমার স্নেহ প্রেমের সম্বন্ধ হয়েছে তাদের সেই সম্বন্ধ তাঁরই প্রেম উৎসের সুধারসে মধুর ও সুন্দর হয়ে রয়েছে এই কথাটি খুব গভীর করে মনের মধ্যে স্মরণ

করবে। তাঁর নাম স্মরণের মধ্যে তোমার মন প্রতিদিন স্নান করুক—সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের চিন্তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে মনকে ডুবিয়ে প্রতিদিনের সমস্ত ধূলা ও দাহ থেকে আপনাকে নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ করে তোলো। তিনি তোমার মনে আছেন, বাইরে আছেন, দিনরাত্রি তিনি তোমাকে স্পর্শ করে আছেন—তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অহরহ তোমার কাছে আছেন এমন আর কেউ না—খুব করে সেই কথাটি মনে জেনে তাঁকে প্রণাম করে সকলের এবং নিজের মঙ্গল তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো।

আমাদের এখানে কাল পূর্ণিমা রাত্রে মাঠের মধ্যে বর্ষশেষের এবং আজ খুব ভোর রাত্রে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল—সকলেই আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি।

তোমরা আবার শিলাইদহে কবে ফিরে যাবে? বড়দাদাকে নিয়ে হেমলতা বৌমা বোধ হয় পশু কলকাতা হয়ে পুরীতে চলে যাবেন। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখ্‌লে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করিনে বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁক্‌ড়ে থাকি। আমাদের বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে তবেই সংসারের ভার হাল্কা হয়ে যায়। আবার আমরা মৃত্যুকে যখন দেখি তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনে বলেই শোকের জ্বালা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহেই এগিয়ে চলচে এই কথাটিকে ভাল করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে জান্‌লেই আমাদের মোহ জন্মায়। সেই মোহ আমাদের বাঁধে,

সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। যত পাপ যত ভয় যত শোক ঐখানেই।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১১]

(৭)　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আচ্ছা বেশ—তোমরাও যদি ছুটিতে সিঙ্গাপুরে যাও তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আস্‌ব। দিনুও যাবার জন্যে ক্ষেপেছে— তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। …

এখন cycloneএর সময় কি নয়? যদি সমুদ্রের মাঝখানে ঝড়ের দর্শন পাওয়া যায় তাহলে সমুদ্রটাকে খুব মনোরম বলে মনে হবে না।

যদি East Coast Railway দিয়ে কলম্বো যাতায়াত করতে ইচ্ছা কর সে একটা মন্দ trip হয় না। পূজোর সময় concession পাওয়া যায়। সেখানে Candy শুনেছি চমৎকার জায়গা।

যাই হোক্ সিঙাপুরই যদি তোমাদের পছন্দ হয় আমার তাতে আপত্তি নেই। পাছে জলপথে সেই একই রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় তোমাদের বিরক্ত ধরে এই একটা আশঙ্কা আছে।

যেখানেই যাও রথীকে বোলো Cookদের সঙ্গে

সমস্ত হোটেল খরচপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যেন পরামর্শ করে রাখে।

মীরা ভাল আছে তাই আর কলকাতায় গেলুম না। যেতে হলে আমার কষ্ট হত। শরীর ত তেমন ভাল নেই ----এখানকার রেলে যাত্রার সময়টাও বড় বিশ্রী।

বড়দিদির বেশ ভাল লাগ্‌চে শুনে খুসি হলুম। তোমার পড়া শুনো এখন কি রকম চলচে? নগেন অনেকদিন অনুপস্থিত বলে বোধ হয় তোমার ক্লাস বন্ধ। সেই Astronomyর বই কি এখন রথী তোমাকে পড়ে শোনায়? জাহাজে যাবার সময় তোমাকে অনেক বই পড়ে শোনানো যাবে। ইতি

[১৯১১]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮)　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমরা ভয় করচ আমার বুঝি ভ্রমণে যাওয়ার মত উল্টে গেছে—একেবারেই না—ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বার আবেগ আমার আরো বেড়ে যাচ্ছে—আমি দুই এক মাসের জন্যে কোথাও খুচরো রকমের বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করিনে—পৃথিবীর কাছে বেশ ভাল রকমে বিদায় নেবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। কলকাতায় গিয়ে দেখব যদি বাধা কাটাতে পারি তাহলে আমি দূরেই বেরিয়ে পড়ব।

এখানে শারদোৎসব অভিনয়ের আয়োজন চলচে। আমাকে সবাই মিলে সন্ন্যাসী সাজাচ্চে। কলকাতা থেকে এবারেও মেয়েদের দল সব আসচেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১১]

(৯)　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা—তোমরা ত বেশ নদীতে বেড়িয়ে এলে—আমরা এখানে মাঠের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছি। আগে যখন কুঠি বাড়ি তৈরি হয় নি তখন আমি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বোটে কাটিয়ে দিতুম ভারি ভাল লাগ্‌ত। এখনো এক একবার সেই রকম করে নদীর চরে দিন কাটাতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে আর হয়ে উঠ্‌বে না।

আজকাল খুব করে Science পড়চ বুঝি। Story of the Heavens বইখানা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন মুগ্ধ হয়েছিলুম—ওটা খুব চমৎকার। এবার যখন তোমরা কোনো সময়ে বোলপুরে আস্‌বে তখন এখানকার বড় দূরবীন দিয়ে তোমাদের চন্দ্র ও গ্রহদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। রথীকে বলে এই রকম একটা দূরবীন কিনিয়ে নেও না কেন? আমাদের এখানে যেটা আছে তার দাম ২৫০ টাকা—কিন্তু পঞ্চাশ

ষাট টাকায় ওদের ওখানেই ছোট সাইজের দূরবীন পাওয়া যায় তাতেও বেশ কাজ চলে।

সন্তোষ আজকাল একলা। ওর মা এবং স্ত্রী কেউ এখানে নেই। ও গোরু মহিষ নিয়ে দিনযাপন করচে।

আমি নগেন্দ্র শ্যালকের দেশ থেকে একজন নাপিত চাকর আনিয়ে তাকে তৈরি করে নিচ্চি। তার বুদ্ধি বেশ আছে—হাঁতের কাজও বোধ হয় ভাল পারে, কামাতে জানে, শুনেছি ঘড়ি মেরামৎ করতে পারে। তোমাদের চাকরের অভাব আছে বলেই আমি একে আনিয়েছি। আমি যখন তোমাদের কাছে যাব একে নিয়ে গিয়ে রেখে আস্‌ব।

নগেনের সেই প্রিয়পাত্র পাড়ার ছেলেরা এক একদিন সন্ধ্যাবেলা এসে কি গান শুনিয়ে যায়? আমার এখানেও সে রকম গাইয়ে খুঁজ্‌লে পাওয়া যায়—তারা গলা ছেড়ে গান গাইতেও ছাড়ে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

[১৯১১]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১০) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রথীকে এই চিঠি দিয়ো। কিছু দিন থেকে মনে মনে ভাবছিলুম বুধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারাও সেখানে যাবার আয়োজন করচে তাই এক সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেছি। ওরা হয় ত দুচার দিনেই ফিরে আসবে। আমি কত দিন কোথায় থাকব এখনো ঠিক করিনি। হয় ত বা হরিদ্বারেও যেতে পারি। আপাতত ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করতে চলেছি।

ও জায়গাটি তোমাদের ভাল লেগেছে এবং তোমরা সকলে মিলে আনন্দে আছ এই শুনে আমি খুব খুসি হলুম। নগেন বলছিল তোমরা দুই চার দিনের মধ্যেই পুরীতে যাবে। যতদিন তোমরা যেখানে থাকতে ইচ্ছা কর বেশ ভাল করে দেখে শুনে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আনন্দ করে শরীর মনকে প্রফুল্ল করে তবে ফিরে এসো— কোনো কারণেই তাড়াতাড়ি কোরো না— ইস্কুলের ছুটি

ফুরিয়ে গেলেও ভাবনা নেই। চাই কি তোমরা East Coast Railway দিয়ে দক্ষিণে যতদূর পর্য্যন্ত যেতে ইচ্ছা কর যেতে পার। শুনেছি ত্রাবাঙ্কুর ভারতবর্ষের মধ্যে খুব একটি রমণীয় জায়গা। তোমরা সেই পর্য্যন্তই যাও না। সেতুবন্ধ পার হয়ে লঙ্কাতেও যেতে পার।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সেপ্টেম্বর, ১৯১৪]

(১১) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি তোমাদের সকলকে অনেক দুঃখ দিয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। আমার মনের মধ্যে কোথা থেকে একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাক্‌বে না। তোমরা যখন ফিরে আস্‌বে তখন দেখ্‌তে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি। আমার সেই স্থানটি হচ্ছে বিশ্বের বাতায়নে, সংসারের গুহার মধ্যে নয়। তোমাদের সংসারকে তোমরা নিজের জীবন দিয়ে এবং পূজা দিয়ে গড়ে তুল্‌বে—আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জ্জন বাতায়নে বসে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব।

আমাকে তোমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকবে না—ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। সংসার যাত্রার যা কিছু উপকরণ সে আমি সমস্ত তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের টানে

তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হয় ত আমি তোমাদের কাজে লাগ্‌ব।

তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না— প্রতিদিন তার নিত্য নূতন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে জাগ্রত করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি।

তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার গৃহস্থধর্ম্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনের লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। কিন্তু লোভকে যেমন করে হোক্ ত্যাগ করতেই হবে। এখন আর ফল আকাঙ্ক্ষা করবার দিন নেই—সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে তোমাদের কল্যাণ কামনা করব—সেই কল্যাণে আমার কোনো অংশ থাকবে একথা মনেও করতে নেই; এবং আমার রাস্তা দিয়ে যে তোমাদের জীবনের পথে তোমরা চলবে একথা মনে করা অন্যায় এবং এ সম্বন্ধে জোর করা দৌরাত্ম্য। তোমাদের সমস্যা তোমাদের, তোমাদের প্রকৃতি তোমাদের, তোমাদের পথ তোমাদের—তোমাদের সম্বন্ধে আমার স্নেহ এবং

আমার শুভ আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছু আমার নয়। সেই স্নেহকেও নির্লিপ্ত হতে হবে—সে যাতে তোমাদের প্রতি লেশমাত্র ভার স্বরূপ না হয় আমাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে—তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের আপনার জীবনের আলোকে তোমাদের আপনাদের সুখদুঃখ ও ভালমন্দের সংঘাতের ভিতর দিয়ে একদিন পাবে আমাকে সে জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না—সে জন্যে আমি তাকিয়ে থাকব না। তোমাদের কল্যাণ হোক।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯১৫-১৯১৮]

তোমাকে বেলার খবর দিতে বলেছিলুম। কিন্তু দরকার নেই। আমি দুর্ব্বলভাবে এ রকম করে চারদিকে আশ্রয় হাৎড়ে বেড়াব না—বেলা নিশ্চয় ভালই আছে ভালই থাকবে—আমার উদ্বেগের উপর তার ভালমন্দ কিছুই নির্ভর করচে না।

বৌমা

তোমার চিঠিতে মীরার খুকী হওয়ার খবর পেয়ে খুসি হলুম। খুকীর ছবিও বেশ লাগল। ওর জন্যে এখান থেকে কাপড় পাঠাচ্চি—আশা করি তার গায়ে হবে। খোকার জন্যেও একটা জাপানী কাপড় পাঠালুম। আজ বিকেলে আমাদের জাহাজ ছাড়বে তাই সকাল থেকে গোছাবার হাঙ্গাম পড়ে গেচে। মুকুলটা কোনোমতেই আমার সঙ্গ ছাড়ল না। সেও চলেচে। এখান থেকে যে কতকগুলো কাপড় চোপড় এবং জিনিষপত্র পাঠাচ্চি সে হয়ত বা এই চিঠির আগেই পৌঁছবে। রথীকে বোলো আমার জাপানী কিমোনোগুলো দেশে ফিরে গিয়ে পর্বতে চাই--ওগুলো ভারতবর্ষের পক্ষে খুব আরামের হবে। টুকিটাকি অনেক রকম জিনিষ জমেছিল সমস্তই রওনা করে দিলুম---তোমাদের কাজে লাগবে। এণ্ড্রুজের হাতে তোমার জন্যে একটা জাপানী তুলির বাক্স পাঠিয়েছি—গগন অবনের জন্যেও পাঠালুম।

আমি যে সব জিনিষপত্র পাঠিয়েচি তার মধ্যে থেকে বেছে সমরকে একটা কিছু দিয়ে দিয়ো।

বিচিত্রার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে শুনে দুঃখিত হলুম। এ সমস্ত কাজ ত কেবল সখের কাজ নয়; দেশের কাজ —সমস্ত প্রাণমন দিয়ে না করলে কোনোমতেই হবার নয়। এ সব দেশে এরকম ধরণের কত কাজই হচ্চে কিন্তু সে ত দিব্যি আরাম করে হচ্চে না। কত লোকের সত্যিকার শক্তি এবং প্রেম এদের দেশকে উপরে তুলে রেখেচে। আমাদের শক্তিহীন ভক্তিহীন দুর্ব্বল সৌখীনতার কথা স্মরণ করলে কোনো আশা থাকে না।

এণ্ড্রুজের কাছে খবর পেয়েছ ডিসেম্বর মাসে এখানকার একজন আর্টিষ্ট' তোমাদের ওখানে যাবে—তাকে বিচিত্রার একটি ঘরে বেশ যত্ন করে রেখো। তার কাছ থেকে তোমরা অনেক শিখ্‌তে পারবে। আমার সব চেয়ে ইচ্ছা করে এখান থেকে তোমাদের জন্যে একজন দাসী পাঠাই—কি সুন্দর করে এরা কাজ করতে জানে! তোমরা সকলে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ১৭ ভাদ্র ১৩২৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৩)   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, ঈশ্বর তোমার শোককে সফল করুন—মৃত্যুর বাণী তোমার জীবনের মধ্যে সুগভীর শান্তি ও কল্যাণ বহন করে আনুক এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে লিখেছিলে তোমরা কলকাতায় আসচ কিন্তু পর্শু পর্য্যন্ত খবর পেয়েচি তোমাদের কলকাতায় ফেরবার কোনো সংবাদ নেই।

আমি বহুকাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এখানকার নির্ম্মল শরতের আলোকে যেন স্নান করে বেঁচেচি। আমার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত এইই ভাল এখানকার খোলা মাঠ এবং গভীর শান্তি। কাজ কর্ম্ম করবার দিন আমার ফুরিয়েচে। ভিড়ের মধ্যে আমার আর চল্‌বে না। এখানকার সংসারটাও চিরদিনের নয়—এবার তার ধূলোমাটি ধুয়ে ফেলে বড় জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চাই।

রথীর শরীর কেমন আছে আমাকে লিখো। উপ্‌রি-উপরি যখন জ্বর এল তখন সম্ভবত ম্যালেরিয়া। ওটাকে সম্পূর্ণ না ঝেড়ে ফেললে বারবার কষ্ট দেবে। ওখান থেকে ফিরে এসে বরঞ্চ কোথাও সমুদ্রের ধারে

গেলে ভাল হয়। বেলার শরীরও, বোধ হয় কয়দিনের বাদলায়, খারাপ হয়ে উঠেছিল। তার জন্যে মন উদ্বিগ্ন আছে।

কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখে দিলুম—না থাকে শিলাইদহে পাঠিয়ে দেবে। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৫) ওঁ পিকিং

বৌমা

তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেয়েচি। সেদিন তোমার মা যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে এমন একটি গভীরতা দেখেছিলুম, সাধনার এমন একটি সহজ সুন্দর রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর এই যে ভাবটি দেখতে পেয়েছিলুম এই কথাটি মনে করে আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে। এইবার এই দিক থেকে বিনয়িনী আমার হৃদয়ের খুব কাছে এসেছিলেন। এক একদিন আমার কাছে এসে তিনি যখন তাঁর প্রাণের গভীর কথাগুলি বল্‌তেন আমার ভারি তৃপ্তি হত। অন্তরে তিনি এমন একটি মুক্তি পেয়েছিলেন যে, মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই নয়। ভিতরে ভিতরে তিনি সংসার পার হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি বলছিলেন, এবার শান্তিনিকেতনে আসবার সময় রেলগাড়িতে ভেদিয়ার কাছে যখন মাঠের উপর অপরাহ্ণের

সূর্য্যালোক দেখ্‌লেন তখন তিনি এক মুহূর্ত্তে তাঁর ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পেলেন। বল্লেন, এর আগে একদিনের জন্যেও পূজানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হলে তিনি দুঃখ পেতেন, কিন্তু এবার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর কাছে বাহ্য অনুষ্ঠান সব মিথ্যে হয়ে গেছে—আর দরকার নেই। তিনি যে একান্ত উপলব্ধির মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন হয়ে ছিলেন তাই দেখে আমার নিজের মনের মধ্যে ভারি শান্তি বোধ হত। আমার কেমন মনে হয় যে, জীবন বন্ধনের শেষ সূত্রগুলি ছিন্ন করবার জন্যেই এবার তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—সংসারের দায়িত্ব থেকে নিজেকে কিছুকালের জন্যেও বিচ্ছিন্ন করে যেন তিনি শেষ বিচ্ছেদের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করে তবে তিনি যে সুখ দুঃখের পারে চলে গেলেন এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

পুপের কথা লিখে আমাকে লোভ দেখাও কেন বৌমা? তুমি মনে মনে জান ঐ কন্যাটি আমাকে মোহপাশে বেঁধেচে। ঐ মায়াবিনী মরীচিকার মত আমাকে ভোলায় কিন্তু আমাকে ধরা দেয় না। এম্নি করে' ফাঁকি দিয়ে ও আমার কাছ থেকে কেবল গান

আদায় করে। এত অল্প বয়সে ওর এমন সর্ব্বনেশে বুদ্ধি হ'ল কি করে' ? ও কেমন করে জান্লে কবির কাছ থেকে গান আদায় করবার এই একমাত্র উপায়—দুঃখ না দিলে ফাঁকি না দিলে বাঁশি ডাক দিতে চায় না। তুমি লিখেচ, দাদার গান ছাড়া আর কারো গান ওর পছন্দ হয় না, ও আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করিনে। ও যদি স্বয়ম্বরা হয়, ওর দাদার গলায় মালা দেবে না সে আমি নিশ্চয় জানি। তা হোক্ না, মনে কোরো না তাই নিয়ে আমি হৃদয় বিদীর্ণ করব। আমার জন্যে মালা গাঁথাকে ভাগ্য মনে করে দেশে বিদেশে এমন সুন্দরী ঢের আছে।

আজ রাত্রে পিকিন ছেড়ে আর এক জায়গায় যাচ্চি। ৩১শে মে তারিখে সাঙহাই থেকে জাপানে যাত্রা করব। সেখানে ৪ঠা তারিখে পৌঁছব। জাপানে খুব আগ্রহ করে আমাকে ডাক্‌চে। হয়ত জুনের শেষের দিকে সেখান থেকে ছুটি পাব। তার পরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেই শান্তিনিকেতনের মাঠের ধারে গিয়ে সেই বারান্দায় আরাম কেদারায় গিয়ে বস্‌ব। কিন্তু আমার বাসাটি তৈরি শেষ হয়েছে ত ? এবার গিয়ে যেন আমার ঘরের মধ্যে গুছিয়ে বসতে পারি। আর খোলা ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি যেন তৈরি হয়। আর উত্তর দিকে

জিনিষপত্র রাখবার যে ঘরটা তৈরি হয়েচে সেটাতে এমন করে জানলা দরজা বসাতে বোলো যাতে আমার চীন দেশী চাকর সে ঘরে বাস করতে গিয়ে হাঁপিয়ে মারা না যায়। ইতি ২০ মে ১৯২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৬) ওঁ

বৌমা,

তোমরা ত আমাকে আটলাণ্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে লণ্ডনে চলে গেলে। আমি এবার খুব ভুগেচি। সমুদ্র আশ্চর্য শান্ত ছিল। কিন্তু এখানে পৌঁছবার দিন সাতেক আগে বোধ হয় আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছিল। বুকে এমন ব্যথা আর দুর্ব্বলতায় চেপে ধরেছিল যে, প্রায় মনে হত যে, এ যাত্রায় আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। এখানে পৌঁছলে পর এরা আমাকে খুব যত্ন করেচে। এখানকার খুব নামজাদা ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেচেন। বুকের দুর্ব্বলতার জন্যে আমাকে ডিজিটালিন্ খেতে হয়েছিল। পেরু যাওয়া ত বন্ধ হবার জো হয়েছিল। কিন্তু পেরুর লোকেরা ছাড়তে চাচ্চে না, তাই রেলপথ বাদ দিয়ে সমুদ্রপথে যাওয়া ঠিক করেচি। এখানকার একজন মহিলা আমাকে ঘরের লোকের মত যত্ন করচেন—তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েচেন। তিনি তাঁর একটা বাগানবাড়ি আমাদের ছেড়ে

দিয়েচেন। তিনি এখানকার খুব একজন বিখ্যাত লেখিকা—অনেকদিন থেকে আমার লেখা পড়ে আমাকে বিশেষ ভক্তি করেন। মোটের উপর এখানকার সবাই আমার ভক্ত। এরা যে আমাকে কতখানি জানে আর কত চায় তা আগে কল্পনা করতেও পারতুম না। আমাদের সেই নাটকের দল এখানে আন্‌লে খুবই আদর পেত। তাদের আনবার প্রস্তাব যখন তুলেছিলুম এরা লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিল। ছবির একজিবিশনের জন্যে এরা খুবই উৎসুক। বেশ দেখতে পাচ্চি দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের মস্ত একটা জায়গা আছে। যাতায়াতের পথ যদি দূর না হত তাহলে ভারি সুবিধা হত। তুমি ওখানে Pottery শিখচ শুনে খুব খুসি হলুম। রোটেন্‌স্টাইনের ইস্কুলে Wood Engraving শিখ্‌তে পার। কিন্তু পুপেকে নাচ শেখাবার বন্দোবস্ত কোরো। ওকে ভুলে যাবার জন্যে খুবই চেষ্টা করচি—আশা করি আরো মাস দুয়েক যদি উঠে পড়ে লাগি তাহলে কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হতে পারব। ওর মায়াজাল ছিন্ন করতে সাধনার জোর চাই, আর সময়ও লাগ্‌বে। ভয় হয় যখন দেখা হবে আবার পাছে মোহপাশে পড়ি—আমার মন যে বড় দুর্ব্বল।

নীতুকে আনিয়ে নিয়ে দেখ্‌তে ভুলো না—যদি নিতান্ত সে ছুটি না পায়, তোমরা গিয়ে দেখে এসো, আর ওকে যা হয় কিছু দিয়ো।··· ডিসেম্বর ২৯শে তারিখে পেরুতে রওনা হব। পেরু রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের কেয়ারে আমাকে চিঠি দিয়ো।

১৯১৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৭)

৩ ইউনিয়ন ষ্ট্রীট্
পেনাং

বৌমা,

ভেসে ভেসে চলেচি। জলে ঢেউ নেই, জাহাজে যাত্রী কম, গরম যথেষ্ট আছে। আজ পেনাঙে পৌঁচেছি। একজন মাদ্রাজীর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েচি। আমার দলের লোকেরা সবাই সহর দেখতে গেছে—আমি একলা, শরীর ক্লান্ত, আর তন্দ্রার আবেশে ভারাক্রান্ত। এক জানলা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্চে—আর এক জানলা দিয়ে আম নারকেল তেঁতুল বটের সবুজ সঙ্ঘ দেখ্‌তে পাচ্চি। অনেকদিন শুধু কেবল জলের নীল আর আকাশের নীলের মাঝখান দিয়ে আমার সময়স্রোত ভেসে গেচে। আজ এখানে পৃথিবীর নানা রঙের মেলার মধ্যে এসে আরাম পাচ্চি। কিন্তু ডাঙার এক মহা বিপদ অভ্যর্থনা। সে যে কি ব্যাপার না দেখ্‌লে বুঝতে পারবে না। আমার আবার এত বেশি অভ্যর্থনা সহ্য হয় না। ভেবেছিলুম পিনাঙ ছোট সহর, এখানে বেশি কিছু হাঙ্গাম হবে না—ঘাটে নেবেই ত চক্ষুস্থির। সমস্ত

সহরের লোক বোধ হয় ভেঙে পড়েছিল—বাজনদারের দল ঢাক ঢোল সানাইয়ের ধূম লাগিয়ে দিল—মালার স্তূপ আমার গলা ছাড়িয়ে মুখের অর্দ্ধেক ঢেকে দিলে; কোনো মতে নাকটা জেগে ছিল,—চষমাটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল। যা হোক, এ সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত বোধ করি, কালিদাসের চিঠি থেকে অনেকটা জানতে পারবে। চিঠি লিখতে আমার কুঁড়েমি ধরে। তাই বলে মনে কোরো না, আমি পেট ভরে কুঁড়েমি করতে পাই। চীনের জন্যে ছটা লেকচার লিখতে হবে—তার মধ্যে দুটো লিখে ফেলেচি। জাহাজের ক্যাবিনের কোণে বিছানার উপর বসে লেখা কি কম কথা! বিশেষত অপরাহ্ণের রৌদ্রে যখন ক্যাবিনের কাঠের দেয়াল তেতে উঠে দেহটাকে পাউরুটি সেঁকা করে তুলতে চায়। যাই হোক চীনে যাবার পূর্ব্বে আশা করি লেকচারগুলো চুকিয়ে দিতে পারব। না যদি পারি ত মুখে বলে কোনো-মতে গোঁজা মিলন দিয়ে কাজ সারতে পারব। বড্ড ঘুম পাচ্চে। গরমে দুরাত্রি ভাল ঘুমতে পারি নি। আজ সকালে জাহাজ এসেচে, আজ সন্ধ্যা আটটার সময় ছাড়ব। আবার পরশু দিন আর একটা বন্দরে থামবে, তারপর সিঙ্গাপুরে।—পুপের কথা মাঝে মাঝে ভাবি।

কিন্তু সে যে আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েচে এমন মনে হয় না। তাকে 'মানে না মানা' গান শোনাবার অনেক লোক জুটবে।

১৯২৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮) ওঁ

বৌমা,

পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থটা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থটা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক্। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাফা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর একটু ব্যাখ্যা করাও দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখ্‌লুম, পুপে, পুপু, পুপসি, মাডাম পাভ্লোভা দি সেকেণ্ড, রূপসী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ইত্যাদি, তার পরে যেমন

করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকা জোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েচি। এর মর্ম্ম হচ্চে এই, ঐ আদরের নামগুলো সমস্তই ভুল, আমার মন থেকে এর সমস্তই আমি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় আছি। ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি আলোচনা করেচি, সেটা কবিতায়— সেটাও তোমাদের কপি করে পাঠাব।

দ্বিতীয় বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেচি এমন সময় কাল ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্রপথে, না শৈল পথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে—আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল। জানুয়ারির ৩রা তারিখে। ইটালিয়ান জাহাজ, নাম Giulio Cesare। জেনোয়া বন্দরে পৌছব, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে।

ডাক্তার বল্‌চে আমার দেহযন্ত্র কোনোটা বিকল হয় নি, কিন্তু ফতুর হয়ে গেছে। আর বেশি খরচ সইবে না। চুপচাপ করে থাক্‌লে, পুঁজি যা আছে তা নিয়ে আরো কিছুকাল চলে যাবে। ডাক্তার বলে, আমার

মুস্কিল এই যে বাইরে থেকে আমাকে দেখলে বোঝা যায় না, আমার এমন দেউলে অবস্থা। আমি নিজে অনেকদিন থেকে এটা বুঝতে পারছিলুম কিন্তু বোঝাতে পারছিলুম না। যাহোক এবার দেশে ফিরে গিয়ে অকাজের সাধনায় উঠে পড়ে লাগতে হবে। সে সব কথা মোকাবিলায় আলোচনা করা যাবে।

এতদিন পরে ডিসেম্বরের পয়লা থেকে এখানে গরম পড়েচে। আজ মেঘ করে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্চে— আবার হয় ত কিছুদিন ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের ওখানে ঠাণ্ডার অভাব কিছুই নেই। লণ্ডনের নবেম্বর যে কি পদার্থ তা আমি খুব জানি। ডিসেম্বরে ক্রিস্টমাসের কাছাকাছি বরফ পড়া সুরু হবে।

[বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯)

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, প্রাগে এসে বক্তৃতাগুলো চুকিয়ে দিয়েছি। আজ চেক্‌দের থিয়েটারে পোষ্ট অফিস অভিনয় হবে, সেখানে গোটাকয়েক বাঙলা কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেছে। বুধবারে জর্ম্মান থিয়েটারে ঐ নাটকটাই অভিনয় করবে, সেখানে চুপ করে বসে শোনা ছাড়া আমার আর কোনো কর্ত্তব্য নেই। এখানে তেমন শীত পড়েনি; বেশ রোদ্দুরও ছিল, আজ সকাল থেকে মেঘ মেদল করচে। কবে কোথায় যাব আমি তার কোনো খবর রাখিনে। যেদিন যেখানে যেতে বলে ভালোমানুষের মত সেইখানেই চলে যাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে ভেবে উঠতে পারিনে—হঠাৎ উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণ তারপরে আবার ফিরে এসে পূর্ব থেকে পশ্চিম লম্বা পাড়ি—কখনো রাত্তিরে কখনো দিনে, কখনো ভোর বেলায়, কখনো ভর্ সন্ধ্যায়। অবশেষে পঞ্চম অঙ্কের শেষ অংশে অপেক্ষা করে আছে আমার

সেই লীলমণি আর সেই লম্বা কেদারা। এখানে কার্ল্‌স্‌বাডের সহরবাসীরা আমাকে নেমন্তন্ন করেছে—তিন চারদিন সেখানে বিশ্রাম করবার জন্যে অনুরোধ। সেই অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে হয় ত বুডাপেস্ট বাদ দেওয়া দরকার হবে—যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে রেলপথে বিষম ঘোরাঘুরি করতে হবে, বিশ্রামের মজুরী পোষাবে কি না সন্দেহ। তোমরা সেই কাইজারহোফে বেশ জমিয়ে বসে আছ, নড়বার সময় মনে কষ্ট পাবে। আমি নড়া দাঁতের মত দিনরাতই নড় নড় করচি সুতরাং সম্পূর্ণ উৎপাটিত হতে পারলেই তবে নিষ্কৃতি। ইতি ১২ অক্টোবর।

[১৯২৬]

(২০) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানকার পালা শেষ হল। আজ যাব ভিয়েনায় কাল হবে বক্তৃতা—তার পরে যাব বুডাপেস্টে, সেখানে হবে বক্তৃতা। তার পরে যাব এখানকার প্রেসিডেন্ট ম্যাসেরিকের বাড়িতে—না গেলে সবাই দুঃখিত হবে। আমার দুঃখ কেউ বোঝে না। পোলাণ্ডের বোঝা খসে গেছে— রাশিয়াটা গেলে বাঁচা যায়। একটুও ভাল লাগচে না—কোনো একটা সময় যখন কিছুই করতে হবে না মনে করলে শরীর মন পুলকিত হয়ে ওঠে। রথীর শরীরের উপর দিয়ে যে রকম আঘাত গেল তাতে আমার মনে হচ্চে রাশিয়ার মত জায়গায় লম্বা লম্বা পাল্লায় ঘোরাঘুরি করা তার পক্ষে কোনোমতেই সঙ্গত হবে না। তোমরা যদি না যেতে পার তাহলে রাশিয়ায় যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। এর চেয়ে তোমাদের নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে কিম্বা দক্ষিণ

ফ্রান্সে কিছুদিন বিশ্রাম করে দেশে পালানোই আমার পক্ষে শ্রেয় হবে—সেটা রথীর পক্ষেও ভালো হতে পারবে। ইতি ১৫ অক্টোবর

[প্রাগ, ১৯২৬] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২১)　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম কিন্তু কর্ম্মবন্ধন থেকে কিছুতেই ভদ্রভাবে নিষ্কৃতি পাবার উপায় দেখ্‌ছিলুম না। এমন সময় ভাগ্যের দয়ায় অল্প একটু জ্বর এল, শয্যা আশ্রয় করতে হল, ডাক্তার বল্‌লে, আর না, বাস্‌—তবে থাম্‌তে পারলুম। এখন যাক্ পোলাণ্ড, যাক্ রাশিয়া, যাক্ বক্তৃতা। ডাক্তার বল্‌চেন, ভারতবর্ষে যাত্রার আগে অন্তত তিন সপ্তাহ দক্ষিণ সুইজারলাণ্ড বা ফ্রান্সে খুব পেট ভরে বিশ্রাম করে নিতে। শুনে কান জুড়ালো। ভাবছি প্রথমে Villeneuveএ গিয়ে দুচার দিন থেকে অন্য কোনো সূর্য্যালোকের দেশে গিয়ে আড্ডা করব। কিন্তু রথী কি আসবে না? তার পক্ষেও ত এই রকম জায়গায় চুপচাপ থাকা ত ভালো। বর্লিনের মত জায়গায় এখন ত আবহাওয়া ভালো হবার কথা নয়। কানকে একটা চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলে হয় না যে

তার Mentone-এর বাড়ি পাওয়া যাবে কি না। তাহলে সেখানে সকলে মিলে কিছুদিন বিশ্রাম ভোগ করে নেওয়া যায়। তোমরা কি মনে কর শীঘ্র লিখো। ডাক্তার এ সপ্তাহ এখানে আমাকে তাঁর চিকিৎসাধীন রাখবেন। হয় ত আসচে হপ্তায় ছুটি পাব।

Miss Pott এসেচে—তাকে তো ভালোই লাগ্‌চে। শুনে হয় তো ঈষৎ হাস্য করতেও পারো—কিন্তু আমার চেয়েও মানবচরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তাঁরাও বোধ হচ্চে যেন সন্তোষ অনুভব করচেন। কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি হয় ত বল্‌বেন, এখনো বলা যায় না—আরো দীর্ঘকাল দেখলে তবে নির্ভরযোগ্য স্ট্যাটিস্টিক্স্‌ সংগ্রহ হতে পারে। কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক নই তাই মনে করচি ঠিক এমন মানুষ এত সহজে এত অল্পে পাওয়া যাবে না—অতএব আপাতত দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এ’কে কাজে লাগানো যাক্—তার পরে যখন পরিতাপের কারণ ও সময় উপস্থিত হবে তখন—তখন তোমরা যা বল্‌বে তাই শুনব।

বাড়ির চিঠিপত্র কি কিছু আসেনি। মীরার জন্যে মনটা খারাপ আছে। যদি আগেই জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে শীঘ্রই চলে যেতে ইচ্ছে করচে। এবারকার

মত য়ুরোপের পালা সাঙ্গ হল। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কোয়ালা লাম্‌পুর

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, গোলেমালে দিন কাট্‌চে—মনে হচ্চে যেন বছর পাঁচেক ধরে এই কাণ্ডটা চল্‌চে। এতদিন জয়রথ হাঁকিয়ে চলেছিলুম বক্তৃতার ঘোড়া ছুটিয়ে—সহর থেকে সহরে চলেছিল টপাটপ শব্দে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে উঠ্‌ছিল চটাপট হাততালি। সম্প্রতি রথের চাকাটা হঠাৎ একটু বেধে গিয়েচে,—আমার শনিগ্রহ জেগে উঠেচে। ভারতবর্ষের কাগজে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো নিয়ে কড়া মন্তব্য লিখেছিলুম—সেই লেখাটা আমেরিকা ও চীন ঘুরে হঠাৎ এখানকার হাওয়ায় এসে পৌচেছে—একজন ফিরিঙ্গি এডিটর এই নিয়ে মাতামাতি বাধিয়ে দিয়েছে—আসর বেশ সরগরম—আমরাও কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লেগে গেছি—মনে হচ্চে বেশি ক্ষতি হবে না!

আজ চলেচি ইপো বলে এক জায়গায়। তার পরে পিনাঙে গিয়ে এখানকার লীলা শেষ। এখানকার বর্ণনা

করে তোমাদের খুসি করব এমন কোনো আসবাব দেখিনে। এদেশে প্রাচীনকাল কোনো দিন আসে নি— তার ইতিহাসের ছেঁড়া ঝুলি ফেলে যায় নি। কলা লক্ষ্মীর নির্ম্মাল্য অনেক খুঁজেছি, পাওয়া যাচ্চে না। এখানে বর্ত্তমান শতাব্দী হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে বন কেটে রবার গাছ পুঁৎতে লেগেছে। দেশটা ঘন সবুজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই—সর্ব্বত্র ছায়ায় আলোয় যুগল মিলন— রাস্তা দিয়ে মোটর রথে যখন চলা যায় তখন দুই চোখের অঞ্জলি ভরে সবুজ অমৃত পান করা যায়। দেশটা নারকেল গাছের বাহু তুলে কবিকে অভ্যর্থনা করেছে—এখন যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষিণা দিয়ে যদি বিদায় করে তাহলে আমিও ভরা হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করব। যাই হোক্ না, শূন্য হাতে ফিরব বলে বোধ হচ্চে না। ইতিমধ্যে আমার দলবলের বেশ পেট ভরে আহার চল্‌চে—এ সম্বন্ধে সুনীতি সর্ব্বোচ্চ উপাধি পাবার যোগ্য, সুরেন সর্ব্বাধম। সুবিখ্যাত ডুরিয়ান ফল খেয়েছি, খুব বেশি লোভনীয়ও নয় খুব হেয়ও যে তাও বলা যায় না। এখানকার পালা শেষ হবে পনেরই তারিখে, তারপরে জাভা— সেখানে আমার কোন্ গ্রহগুলি অপেক্ষা করচেন দেখা যাবে।

তোমাদের কারো কোনো খবর পাইনি, কেবল দুই শিশি ওষুধ পেয়েছি। এখানে চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে সময়ের নিয়ম আমাদের দেশে বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার নিয়মের মতো—মধ্যাহ্ন ভোজন বেলা একটাতেও হতে পারে, কিম্বা সন্ধ্যা পাঁচটায় কিম্বা রাত্তির দুপুরে। এই কারণে তোমাদের চিঠির আশা ত্যাগ করেই চিঠি লিখ্‌চি। ইতি ৬ অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৩)   ওঁ

বৌমা

সেদিন বালিতে থাকতে থাকতে ভোর রাত্রে খুব স্পষ্ট একটা স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যেন জোড়াসাঁকোর বারান্দায় রথী গম্ভীরমুখে আমাকে এক কোণে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন, ভাবনার বিশেষ কোনো কারণ নেই কিন্তু ডাক্তারের মতে তোমার অসুখটা আসলে Chronic influenza, শিলাইদহে তোমাকে নিয়ে আমি যদি বোটে কাটিয়ে আস্‌তে পারি তাহলে তোমার উপকার হবে। আমি বল্‌লুম, নিশ্চয় নিয়ে যাব। বলে ডাক্তারের সঙ্গে কর্ত্তব্য আলোচনা করতে লাগ্‌লুম— ডাক্তারটি বাঙালী কিন্তু তাকে চিনিনে, জেগে উঠে মনটা বড়ো উদ্বিগ্ন হল। হিসাব করে দেখলুম, এটা ভাদ্র মাস, এই সময়েই তোমার হাঁপানি বাড়বার কথা। মনে হল তোমার হয় তো হাঁপানি এবার বেশি প্রবল হয়েচে তাই এই রকম স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যাই হোক্ এখন তো কিছু করবার নেই। ভাবচি ফিরে

গিয়ে সত্যিই তোমাকে কিছুদিন পদ্মাচরের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব— আমার বিশ্বাস তোমার তাতে উপকার হবে। এই সব নানা চিন্তায় মনটা দেশে ফিরতে চাচ্চে। ১ অক্টোবরে এখান থেকে জাহাজ ছাড়বে তার পরে শ্যাম বর্ম্মা হয়ে ফিরতে হয় ত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ হবে— অর্থাৎ এখনো এক মাসের উপর। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বাবামশায়

(২৪)　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ধীরেন এখান থেকে দেশে ফিরচে। এই সঙ্গে আমাদেরও ফেরবার কথা ছিল কিন্তু কপাল খারাপ। একেবারে ঘাটে এসে আবার চললুম অন্য মুখে। ভ্রমণের শেষ দিকটার ভার বড়ো বেশি, সেইজন্যেই দুঃখ বোধ হচ্চে।

কাল সকালে পিনাঙ থেকে রেলপথে রওনা হব। সেদিন সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, তার পর দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্ককে পৌঁছব। সেখানে আবার নতুন পর্ব্ব। অভ্যর্থনা, মাল্যগ্রহণ, স্তব শোনা, তার জবাব দেওয়া, বক্তৃতা করা, নিমন্ত্রণ খাওয়া, রাজদর্শন, স্কুল পরিদর্শন, ছাত্রদের হিতোপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানকার পালা শেষ হলে আবার এই সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম করে এই পিনাঙ ঘাটে এসে এখান থেকে পাড়ি দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু তখনো নিষ্কৃতি নেই। পথে আছে রেঙ্গুন, সেখানে সকলে

মালা গাঁথচে, সভা সাজাচ্চে, ডিন্নার চা প্রভৃতির জন্যে হাট করতে বেরিয়েচে। অন্তত তিন দিন চলবে আমাকে দলন মলন। তার পরে আমার যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে সেইটুকু একদা এসে উত্তীর্ণ হবে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মনে হচ্চে এক যুগ এখনো বাকি—যদি বলি তিন হপ্তা, তাহলে যেন কম করে বলা হয়, বলতে ইচ্ছে করে প্রায় বিশ লক্ষ সেকেণ্ড। এখান থেকে কোন্ জাহাজে ফেরা সম্ভবপর হবে সেই নিয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি চল্‌চে। যদি জাপানী জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে আরাম পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ জাহাজে আমার মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের কোনো সুবিধা হবে না। একটা কথা বলে রাখি, ধীরেনের মুখে সব গল্প শুনে পুরোনো করে ফেলো না। দেশে ফেরবার কল্পনার সঙ্গে গল্প করবার কল্পনা একান্ত জড়িত সে কথা মনে রেখো। ইতি ৬ অক্টোবর ১৯২৭

বাবামশায়

(২৫)　　ওঁ　　মাদ্রাজ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখনো তোমরা মধ্যধরণী সাগরের নীল জলে ভাসচ। আর হপ্তাখানেকের মধ্যে ডাঙায় নামবে। কথা ছিল ১৭ই তারিখে অর্থাৎ আগামী কাল আমিও জাপানী জাহাজে চড়ে কলম্বো থেকে ভেসে পড়ব। বাধা ঘটল। কলকাতা থেকে যে জাহাজে কলম্বোয় যাবার কথা তার ব্যবস্থা দেখে সেটাতে চড়তে সাহস হোলো না। এণ্ড্রুজ সেই জাহাজে উঠেছিল— আধমরা হয়ে মাদ্রাজেই তাকে নেবে পড়তে হল। ওর শরীর বেশ একটু খারাপ। রেলে করে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত আমার ক্লান্ত দেহটাকে টেনে এনে আপাতত আডিয়ারে আশ্রয় নিয়েছি। এখান থেকে কলম্বো পর্য্যন্ত যে গাড়ি যায় সেটাতে চড়তে বন্ধুরা পরামর্শ দিচ্চে না। বিশেষত এই সময়টা অসহ্য গরম। জুনের শেষ সপ্তাহের পূর্ব্বে কোনো জাহাজেই স্থান পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যে নীলগিরিতে পীঠাপুরমের রাজার আতিথ্যে

কুন্নুর নামক পাহাড়ে কাটাবার কথা আছে। রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। প্রশান্ত রাণী আমাকে সঙ্গে করে এনেছে—কুন্নুর পাহাড়েও তাদের যাবার ইচ্ছে আছে। কোডিতে যেতে পারতুম কিন্তু তার চেয়ে কুন্নুর হয়তো ভালো লাগ্‌বে। এর পরে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলে কলম্বো যাবার রাস্তাটা অসহ্য হবে না।

জন্মদিন খুব ঘটা করেই হয়েছিল— বিশ্বভারতী সম্মিলনী ছিল নিমন্ত্রণ কর্ত্তা। ভিড় হয়েছিল কম নয়। দিনুরা আছে কালিম্‌পং। শুনচি সঙ্গী অভাবে তারা উভয়েই পীড়িত। মীরাকে বলেছিলুম কলম্বো পর্য্যন্ত আস্‌তে কিন্তু সে তার গাছপালা ছেড়ে আসতে রাজি হোলো না— সে আছে শান্তিনিকেতনে।

য়ুরোপে তোমরা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে জানিনে। আমারই বা গতি কোথায় হবে ঠিক ভেবে পাচ্চিনে। সুইজারল্যাণ্ডে এক কোণে লুকিয়ে লিখতে বসাই ভালো হবে। এণ্ড্রুজ আরিয়াম দুজনেই আমার সঙ্গে যাবে। য়ুরোপে গিয়ে পৌঁছবার আগে তোমাদের ঠিক খবর পাওয়া যাবে না। সেখানে কোথাও গিয়ে তোমরা ভালো আছ খবর পেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। কি রকম আমরা অনিশ্চিত ভাবে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছি

ভালো লাগ্‌চে না। কবে যে আবার সমস্ত বেশ গুছিয়ে উঠ্‌বে তাই ভাবি। পুপু নিশ্চয় ভালোই আছে— এবার হয় তো তার শরীর মন দুইই দ্রুত বেড়ে উঠ্‌বে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি
১৬ মে ১৯২৮

বাবামশায়

(২৬)   ওঁ

বৌমা, এবার য়ুরোপ যাওয়া মঞ্জুর হোলো না বলেই বোধ হচ্চে। ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাক্‌ব। কারো সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না, কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া চিঠি পড়ব না। গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখ্‌ব— যদি য়ুরোপকে কিছু বলবার থাকে তো যথা সময়ে বলব--- তাড়াহুড়ো করে যা তা লিখে আপনাকে ও অন্যকে ঠকাব্‌ না।

তোমাদের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন থাকে। কিন্তু তোমরা দুজনেই এবার ভালো রকম চিকিৎসা না করে যেন ফিরে এসো না।

পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে আমার মনে এল আমারো কিছুদিন এই রকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমে ক্রমে কমে আস্‌বে। প্রতিদিন যা তা কাজ করে যা তা কথা বলে

মনটা বাজে আবর্জ্জনায় চাপা পড়ে যায় নিজেকে যেন দেখতেই পাইনে। কিছুকাল থেকে প্রতি রাত্রে একবার করে মনটা ভারি ছট্‌ফটিয়ে ওঠে— কে যেন কষে ঠেলা মারতে থাকে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসো। তার থেকেই ভাবছিলুম হয় তো তার মানে য়ুরোপে পালানো। এখন বুঝতে পারচি হাজার লক্ষ তুচ্ছতার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা।

পুপুমণি নিশ্চয় ভালই আছে। তোমরা ভালো আছ শুনলে নিশ্চিন্ত হব। ইতি ৩০মে ১৯২৮

বাবামশায়

(২৭)　　　　ওঁ　　　　শ্রাবস্তী

কলম্বো

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এবারে আর যাওয়া ঘটে উঠ্‌ল না। আগেকার মতো নড়ে চড়ে বেড়ানোর সামর্থ্য নেই। ঠিক করেচি শান্তিনিকেতনে অরবিন্দর মতো একেবারে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাস গ্রহণ করব--কেবল বুধবারে দর্শন দেব---বাজে চিঠিপত্র লেখা এবং খবরের [কাগজ] পড়া একেবারে বন্ধ। একমাত্র যার মুখ দেখে দিন কাটবে সে হচ্চে বনমালী। সুধীকেও বাদ দেওয়া চল্‌বে না---কারণ বনমালী দর্শন দেয় সুধীই কাজ করে।

আজ পাঁচই, আগামী এগারই এক ফরাসী জাহাজ ছাড়বে মাদ্রাজ অভিমুখে। সেই জাহাজে মাদ্রাজে গিয়ে কলকাতায় রওনা হব--- যদি দরকার বোধ করি পথের মধ্যে ওয়াল্‌টেয়রে দুচার দিন থেকে যাব।

তোমরা বৌমা, ভালো করে চিকিৎসা না করিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো না যেন। বারে বারে তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সে ভালো লাগে না। কোথায়

তোমরা আছো কেমন আছো সে সব বিস্তারিত খবর পেতে আরো আরো অনেকদিন লাগবে।

এখানে এসে পুপুমণির ফুল পেলুম— ভারি মিষ্টি লাগল। সে মিষ্টি ঐ ছোট্ট মেয়েটির হৃদয়ের মধ্যে নেই, সে মিষ্টি আমারি আপন মনে। তাকে বোলো দাদামশায় তার জন্যে পথ চেয়ে রইল। ফিরে এসে যেন বাংলা ভাষায় কথা কইতে না ভোলে। ইতি
৫ জুন ১৯২৮

বাবামশায়

(২৮)　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা এখানকার আর পাঁচ জনের কাছ থেকেই এখানকার খবর নিশ্চয়ই পাও তাই পুরোনো খবরগুলো দিতে ইচ্ছে করে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এখানে ও শ্রীনিকেতনে যে দুটো উৎসব হয়ে গেছে তার সমস্ত বিবরণ তোমরা পেয়েচ। এখানে হোলো বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হোলো হলচালন। বৃক্ষরোপণের ইতিহাসটা তোমাকে লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি---কিন্তু আমার বিশ্বাস মীরা সব কথা ফাঁস করে দিয়েচে। মীরা কাজটাকে অন্যায় বলেই আমাকে ভর্ৎসনা করেচে কিন্তু আমি ঠিক তার উল্‌টোই মনে করি। তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হোলো। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারো না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন---আমি একে

একে ছটা কবিতা পড়লুম—মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হোলো। এখন সে বেশ আছে, তোমার টব থেকে তাকে ধরায় অবতীর্ণ করানো হল বলে তার খেদের লক্ষণ দেখা যাচ্চে না। তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হোলো—আমি এই উপলক্ষ্যে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুসি হতে। একটা কালো রেশমের ধুতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরি দেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর। শ্রীনিকেতনের অনুষ্ঠানটাও সকলের খুব ভালো লেগেচে।

হাঙ্গেরি থেকে তোমাদের তারের খবর পেয়ে বুঝলুম আনন্দে আছ। আমার কপালে ফস্‌কে গেল। আমিও নানা জায়গায় ঘুরে এসেচি, তার মধ্যে কুন্নুরটা লেগেছিল ভালো। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫

বাবামশায়

(২৯) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তিনিকেতনে ছিলেম আনন্দে—কখনো বা ঘন ঘোর মেঘ আর বর্ষণ, কখনো বা বৃষ্টিধোওয়া আকাশে রৌদ্দুর ঝলমল করে। উপরের ঘরে সাসি নেই বলে আমি বসবার আর লেখবার ঘর করেছিলুম নীচে তোমাদের বড়ো ঘরে, আর শুতুম তোমাদের শোবার ঘরে। চমৎকার লাগত মেঘ বৃষ্টি রৌদ্দুরের লীলা দেখতে। এবার একটা আস্ত গল্প লিখে ফেলেচি, সে কথা বোধ হয় আগের চিঠিতে লিখেচি। সবাই বলচে আমার সব গল্পের সেরা হয়েছে। সেইটেই মাজাঘষা করচি। কিন্তু ইতিমধ্যে ডাক্তারের উপদ্রবে আমাকে টেনে আনলে কলকাতায়—দু দিন অন্তর তার বাড়িতে গিয়ে Diathermic উত্তাপ লাগাচ্চি। বলচে দেড় মাস ধরে এই দুঃখ পেতে হবে। প্রথমে উঠেছিলেম আমার তেতালার ঘরে। কিন্তু সেবকদের সংসর্গ থেকে দূরে পড়াতে সামান্য প্রয়োজনের জন্যেও নীচে নাবতে

হোতো। সেইজন্যে বিচিত্রার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। তোমার boudoir এ আমার লেখবার ঘর। কল্পনা করে দেখ যেখানে বসে তুমি ছবি আঁকতে সেই ঘরে বসে আমি লিখচি। তোমার টুকিটাকি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে একটা কিছু যদি হারায় আমাকে যেন দোষ দিয়ো না। আমি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিইনে, নিজের কাজেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব আসে প্রশান্ত আসে, বকাবকি করে। রাণী ২১০ নম্বরেই পড়ে থাকে, তাকে আবার নিরেনব্বুইয়ে ধরেচে। নানাবিধ ইন্‌জেকশন ও চিকিৎসাপত্র চল্‌চে। এ রকম ক্ষুদে ব্যামো শিগ্‌গির সারতে চায় না।

কলকাতায় খুব বৃষ্টি চল্‌চে। কাল থেকে বৃষ্টি নেমে আমাদের গলিটা দ্বিতীয় ভেনিস্‌ হয়ে উঠেচে—ওদিকে গলির একটা কোণের বাড়ি বৃষ্টিতে পড়ে গেছে, তারি রাবিশে কিছুকাল এ গলি দুর্গম ছিল।

আর যাই বলো, তোমার ঘরে মশা আছে, এমন কি, দিনের বেলাতেও—তাই নিয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়—এইমাত্র flytox ছিটিয়ে গেল—তাতে মশারা মিনিট দশেকের জন্যে কিছু দুঃখিত থাকে, তার পরে [illegible]মূলিয়ে নেয়। খবরের কাগজে পড়েছি,

হাঙ্গেরিতে উত্তাপের মাত্রা কয়েকদিনের জন্যে ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়টাই তোমরা ওখানে ছিলে—ফলাফলটা কী হল পরে খবর পাওয়া যাবে।

পুপুমণিকে তার বিরহী দাদামশায়ের কথাটা একটু স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ইতি ১ অগস্ট ১৯২৮

বাবামশায়

(৩০) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখনো তোমাদের চিঠিপত্র আসচে সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে যে সময়টা ছিল মুকুলের আমলের। তার আশ্রয়টা বেশ আরামের ছিল। চারদিকে বাগান, মস্ত একটা পুকুর, ঘরগুলো খুব উঁচু এবং তার জানলার সঙ্গে আকাশের কোন ব্যবধান ছিল না। কেবল একদিকে বারান্দা ছিল বলে অন্যদিকে আকাশের সঙ্গে পূরো মোকাবিলা চল্‌ত—আমার সেইটে খুব ভালো লাগে। বলা বাহুল্য এখন এসেছি শান্তিনিকেতনে— মোটের উপরে এখানে শরীরটা আগের চেয়ে ভালো আছে। তার কারণ, আবার আমি এখানকার বিদ্যালয় বিভাগের কাজটা নিজের হাতে নিয়েচি। তাতে করে মনটা থাকে ভালো। শরীর মন দুইয়ে মিলে যখন ক্লান্তির ডুয়েট চালাতে থাকে তখনি মুস্কিল।

প্রথমে খুব বৃষ্টি হয়ে এখানে বিস্তর ধান হয়েছিল। তারপরে কিছুদিন বন্ধ হয়ে ধানগুলো মারা যাবার জো হল, আবার হঠাৎ দিন দুই তিন বেশ বৃষ্টি হওয়াতে ফসলের আশা হচ্চে। মোটের উপরে বাংলা দেশে এবার ফসলের অবস্থা ভালোই।

ভেবেছিলুম ছুটির সময় বোটে বেড়াতে যাব—বোট মেরামতও হচ্চে। এমন সময় খবর পেলুম আমার সেই চাইনিজ বন্ধু স্যু—যার নামে চাচক্র খোলা হয়েচে—পাঁচই সেপ্টেম্বরে বোম্বাই আসবেন। তাহলে ঠিক ছুটির মুখেই তিনি এখানে উপস্থিত হবেন। তাহলে তাঁকে নিয়ে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কলকাতায় কাটাতে হবে। স্যু আসচেন বলে আমি ভারি খুসি হয়েছি— তাঁকে আমি খুব ভালোবাসি। তোমরা থাকলে বেশ হোত—ভারি ভালো লোক।

১৬ ডিসেম্বর এখানে ভাইস্‌রয় আসবেন সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও বোন। এখানে ডিনার খাবেন। তার পূর্ব্বেই তোমরা আসচ বলে আমি নিশ্চিন্ত আছি। ওঁদের একটা কিছু অভিনয় দেখাতে হবে। মনে করচি 'বসন্ত'টা তৈরি করে তোলা যাবে। সঙ্গে একটু নাচ থাকলে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হবে। পুপুমণিকে আমার ভালোবাসা

দিয়ো বোলো তার জন্যে আমি অনেক ছবি এঁকে রেখেচি। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

বাবামশায়

আন্দ্রেকে আমার ভালোবাসা দিয়ো— বোলো তারা এলে ভারি খুসি হব।

(৩১) ওঁ

বৌমা

এ কয় দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে ছিলুম। রাজা অভিনয়ের আয়োজন করতে কিছুদিন থেকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি এখানে এসেছিলেন— তাঁদের আতিথ্য নিয়েও আমার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেয়ে আটজন ও পুরুষ নয় দশ জন এসেছিলেন। মেয়েরা হেমলতা বৌমার বাড়িতে ছিলেন, পুরুষেরা শান্তিনিকেতনের দোতলায়। উমাচরণ নেই— ঘুরনকে দিয়ে এ সব কাজ ভাল চলেনা। যা হোক্ একরকম করে হয়ে গেল। পর্শু অভিনয় হতে রাত দুপুর হয়েছিল— তার পরে কাল রাত্রে মেয়েরা অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা ব্যাপার নিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল। আজ ভোর রাত্রে তাঁরা সব চলে গেলেন। আমাদের অভিনয়ে সুধীরঞ্জন সেজেছিল রাণী— বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল— অন্তত তার

চেহারাটা সকলের ভাল লেগেছিল— তার অভিনয়ও মন্দ হয় নি। মোটের উপর লোকদের ভালই লেগেছে। কিন্তু আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। তোমরা সব তোমাদের ঠাকুরঝি ঠাকুরজামাইদের নিয়ে বেশ আনন্দে আছ। আমি দেখ্‌ছি আমি চলে এসেছি তবু তোমার মামাশ্বশুরের নিষ্কৃতি নেই। ঐ বাঙালটিকে দেখ্‌লেই লোকের ঠাট্টা করবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। বেয়ান যে রকম আবীরটা খেলেছেন, আমি থাক্‌লে বড় সহজে ছাড়া পেতুম না দেখচি— কালী মাখাবার লোক তাঁর আরো একটি বাড়্‌ত।

এখানে জ্ঞান বেশ ভালই আছে। বোধ হচ্চে তার ভাল লেগে গেছে— সে এখন ছেলেদের মধ্যেই তার আড্ডা করে নিয়েছে।

তুমি Arabian Nights পড়চ— বেশ ভাল। ওটা পড়তে তোমার ভাল লাগ্‌বে— এই রকম পড়তে পড়তেই তোমার ইংরেজি শেখা হয়ে যাবে। মেমের জঞ্জাল ঘুচে গিয়ে বোধহয় আরাম পেয়েছ।

আমি সম্ভবত আস্‌চে রবি কিম্বা সোমবারে দু চার দিনের জন্যে কল্‌কাতায় যাব একটু কাজ আছে। তোমাদের আলু এবং টোমাটো আমাকে মিথ্যা পাঠিয়ে

দেবে— যখন ছুটির সময় তোমাদের কাছে যাব তখন খাওয়া যাবে।

শান্তির পড়াশুনা নিয়মমত চল্‌চে ত? তার শরীর ওখানে কেমন আছে? শান্তিকে বাড়িতে রেখে না পড়িয়ে এবার ছুটির পরে তাকে এখানেই পড়তে পাঠান উচিত হবে।

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানিয়ো।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩২)

P & O. S. N. Co.
S. S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে জলপাত্রের নমুনা আঁকছিলুম। আগে যেটা এঁকেছিলুম সেটা পাঠাই। কিন্তু দেখলুম সেটা গড়িয়ে পড়বে। তাই এই কাগজে অন্য রকম করে আঁকলুম। কোনটা তোমার পছন্দ? যদি এই নমুনায় তৈরি করাতে হয় তাহলে রূপোর গায়ে কালো মিনের দাগ লাগানো দরকার হবে। আমাকে হংকঙের ভারতীয়েরা একটা রূপোর বাক্সে ৮০০ টাকা উপহার দিয়েছে, সেই বাক্সটা একদা তোমার ঘরেই পৌঁছবে। যদিও টাকাটা বিশ্বভারতীর। সেই বাক্স পান সুপারি প্রভৃতি দেবার পক্ষে বেশ।

আজ সাংহাই পৌঁছব। খুব শীত। ভেবে দেখ আজ ৩রা চৈত্র, তোমাদের ওখানে নিশ্চয় গরমে জগৎ হাঁপিয়ে উঠচে। পুপের ভালো লাগচে না। তাকে যদি নিয়ে আসতে তার গাল লাল হয়ে উঠত। সমুদ্রও বরাবর খুব শান্ত ছিল, তোমাদের কোনো কষ্ট হত না।

পাঁজিতে দেখলুম ১১ই চৈত্রে দোলপূর্ণিমা। আর তো দেরি নেই—এবারে তোমাদের উৎসব থেকে বঞ্চিত হলুম। তোমরা কি কিছু অভিনয়ের চেষ্টা করচ? নতুন মেয়েদের নিয়ে নটীর পূজা যদি করতে পার ত বেশ ভালো হয়। রাজা ও রাণী অভিনয় কি তোমরা দেখেচ? আমার আপশোষ হচ্চে ওটা আমরা করতে পারলুম না। সংশোধিত বই এক কপি যদি পাই তাহলে তর্জ্জমা করে দিই, নিশ্চয় কাজে লাগ্‌বে।

শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দেখবার কর্ত্তৃত্ব তোমরা যদি নিতে পার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই। খুবই দরকার আছে। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

(৩৩) P & O. S. N. Co.

S. S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, কাল রাত্তিরে জাহাজ কোবে বন্দরে এসে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল আজ সকালে এইমাত্র ঘাটের অভিমুখে চলেচে। আর দেরি নেই, বিষম গোলমাল ভিড়ের মধ্যে পড়ব। অপূর্ব্ব তার করেচে সে কোবেতেই আছে— ঘাটে এলেই জাহাজে আসবে। তারপরে— যাই তৈরি হয়ে নিইগে। শীত যথেষ্ট— এরা একে বলে বসন্তকাল— আমাদের পৌষ মাসকে হারিয়ে দেয়। পুনর্জ্জন্ম যদি হয় বাঙলা দেশই ভালো—যদিও— থাক্ সে সব কথায় কাজ নেই। ইতি ১০ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

(৩৪)   ওঁ

বৌমা

সুমিত্রা সংশোধন পরিমার্জ্জন শেষ করে কাল পড়ে শোনালুম। লোকে ভালো বল্‌চে বলা বাহুল্য। কিন্তু ধাঁ করে অভিনয় হতে পারবে এ আশা করতে পারিনে। অজিন বিক্রমের পার্ট পারবে না। কে পারবে? লোক কোথায় পাব? এই তর্ক চল্‌চে।

আমাকে আরো দু চারদিন এখানে ধরে রাখবে। প্রথম অনুনয় হচ্চে রাণীর--দ্বিতীয়, আমার বই ছাপার ব্যবস্থা। মহুয়া এবং সহজ পাঠ। ইতিমধ্যে রথী এখানে আসবে এমন একটা কথা শুনচি। যদি অভিনয়ের কোনো সুব্যবস্থা সে করতে পারে চেষ্টা করে দেখুক।

সেই আমার কাঠের Seal গুলো—মহুয়ার এবং আমার bookplate এর, কালীর pad সুদ্ধ কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। ওকুরাকে বই পাঠাব তাতে ছাপ মারতে হবে।

আশা করি হারা-সান সিঙাড়া কচুরি খাজাগজার অনুশীলনে আমার অনুপস্থিতির দুঃখ ভুলেচে।

ভয়ঙ্কর মশা—দিনের বেলাও নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু তাদের কামড়ের জ্বালা বীরভূমের মশার চেয়ে অনেক কম।

আজ দিনুরা আসবে শুনচি। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৩৬

বাবামশায়

এই কাটা গানটিও আছে চিঠির এক পাশে :

দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে
ওগো বঁধু আমার সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ পরে।

(৩৫) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বক্তৃতা দিতে দিতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েচি রাজধানীতে। আছি আর্য্যভবনে। এতদিন ছিলুম আতিথ্য আদর অভ্যর্থনার ভিড়ের মধ্যে—সর্ব্বদাই ঘেঁষাঘেষি— নব পরিচিতের দৃষ্টির সম্মুখে। এখানে অসংখ্য অপরিচিতের নির্জ্জনতায় আরাম বোধ করচি। এ বাড়িটা বেশ রীতিমত ভালো, আরামের, কোনো নোংরামি বা বিশৃঙ্খলতা নেই। একমাত্র অসুবিধা এই যে এখানে অরবিন্দের আসবার কোনো বাধা নেই। আহারটা সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী দস্তুরের। উপকরণ খাঁটি, রান্নাও ভালো। লোকেরা ভদ্র ও আতিথেয়। কিছু কিছু নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের সূচনা হয়েচে। আজ রাত্রে আগা খাঁয়ের হোটেলে ডিনার। খুব আমিরী হোটেল, কেবলমাত্র ওমরাওদের অধিকার সেখানে। বামনজি এই কথাটা খুব জোরের সঙ্গে আমার কর্ণগোচর করেচে। আমি ভয়ে সম্ভ্রমে অভিভূত। এত বড়ো সম্মান জীবনে

ক'বারই ঘটে। কাল রাত্রে রোটেনস্টাইন গৃহিণীর আমন্ত্রণ। তারপরে অদৃষ্টে আরো কত সম্মান সমারোহ আছে জানিনে। ৩রা জুনে পেন্ ক্লাব। ৫ই জুনে বার্মিংহাম্ আর্টিষ্ট দরবারে আমার অভ্যর্থনা। তার পর দিনে লেনার্ডের ওখানে। তার পরে কোন্ নাগাদ তোমাদের বাসায় ভিড়তে পারব সেইখানেই সেটা স্থির হবে। মোট কথা একেবারে হয়রান হয়ে গেছি। কয়দিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম—আজো তার দুর্ব্বলতার বোঝা পিঠের উপর চেপে বসে আছে। কোথাও এক কোণে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারলে বাঁচি। জগতের হিত করতে আর ইচ্ছা করচে না। নীলমণির সাহচর্য্যে উদয়নের ঊর্দ্ধলোকে উত্তীর্ণ হবার বাসনা মনে বেদনা আনয়ন করচে। ইতি ১ জুন ১৯৩০

বাবামশায়

(৩৬)　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। দিনের পর দিন। সবাই বল্‌চে এমন কাণ্ড হয় না কখনো। আমি মনে মনে ভাবচি এটা আমারি কীর্ত্তি। আমি বর্ষার কবি। শ্রাবণমাসে বর্ষামঙ্গল আমার পিছনে পিছনে সমুদ্রপার হয়ে এসে হাজির। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তেই হবে, "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" এ কবিতাটা ঠিক খাটচে না। হৃদয় নাচ্‌চে না—দমে আছে। আরো দমেচে যেহেতু এণ্ড্রুজ এসে উৎপাত আরম্ভ করেচে। তার মতে চল্‌তে হবে। আমি প্রমাণ করতে চাচ্চি যে আমি নাবালক নই। যাকগে— আগামী মঙ্গলবারে যাব জেনিভায়। সেখানে আর এক পালা। শুনচি আয়োজন করেচে খুব বড়ো রকমের। আদর অভ্যর্থনার অভাব হবে না। কিন্তু সেখানে নানাবিধ শ্রেণীর মানুষ আছে—তার মধ্যে আছে আমার স্বদেশের লোক।

এখানকার ন্যাশনাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা

ছবি নিয়েচে শুনেচ। তার মানে তারা পৌঁচেচে ছবির অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্যে ভাবছিল—টাকা নেই কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি জর্ম্মানিকে দান করলুম দাম চাইনে। ভারি খুসি হয়েচে। আরো অনেক জায়গা থেকে একজিবিশনের জন্যে আবেদন আসচে। একটা এসেচে স্পেন থেকে— তারা চায় নবেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়চে কবি নামকে ছাপিয়ে। থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ — খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর, — জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুর বেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে—কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল পলাশ মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করচে— আমার জানলার কাছ পর্য্যন্ত উঠেচে চামেলি লতা।

নদীতে নেবেচে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম কেদারা—মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্য্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে লীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাক্‌বে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটীরে তার বাসা — যখন খুসি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুন্‌তে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ কালে সাহিত্য আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে ছুটি সাঁকো থাকবে—নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো—সেই সাঁকোর ছুই প্রান্ত বেয়ে, জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাস্‌চে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু, তার বাছুর

নিয়ে। শাকসবজির ক্ষেত আছে, বিঘে দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়া দাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট— রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্য্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে আছি বর্লিনে—বড়ো লোক সেজে—বড়ো কথা বল্‌তে হবে—বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চল্‌তে হবে দিনের পর দিন—জগৎ জোড়া সব সমস্যা রয়েচে তর্জ্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী—তার অনেক দাবী, অনেক দায়—ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কত দিনই বা বাঁচব— ইতিমধ্যে কর্ত্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক্—রেলে চড়ে, মোটরে চড়ে, জাহাজে চড়ে, ব্যোমযানে চড়ে—সভ্য ভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি ১৮ অগষ্ট ১৯৩০

বাবামশায়

(৩৭) ওঁ ১১৭২ পার্ক এভেনিউ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ রাত্রে একটা ভোজ আছে। পাঁচ শো লোক মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে। এটা যে আমার পক্ষে কত বড়ো পীড়া তা কেউ বুঝবে না। খ্যাতির আড়ম্বরে অনেকখানি মস্‌লা থাকে যা কেবলমাত্র ওজন বাড়াবার জন্যে কিন্তু সেইটের বোঝা বড়ো অসহ্য। এই দেশে সব জিনিষকেই আয়তনে বড়ো করে তোলবার একটা ভয়ঙ্কর নেশা আছে—যে কেউ যে কোনো কাজ করতে চায় আতিশয্যের যন্ত্র সঙ্গে রাখে—তাকে বলে পাব্লিসিটি। তাতে কেবলি আওয়াজ বড়ো করে, আকার বড়ো করে, চীৎকার ক'রে বল্‌তে থাকে আমার দিকে চেয়ে দেখো। হাজার হাজার লোকে এই রকম চীৎকার করচে। হায়রে, এর মাঝখানে আমি কেন? কি পাপ করেছিলুম? বিশ্বভারতী? প্রায়শ্চিত্ত করে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি। প্রতি পদে মনে হচ্ছে সত্যকে

মিথ্যে করে তুলচি—সেই মিথ্যের বোঝা কি ভয়ঙ্কর। নিজেকে অত্যন্ত সহজ করে বাজে সাজ সরঞ্জাম সব ফেলে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে বসব কবে সেই কথাটাই দিনরাত্রি ভাবচি। লিখব পড়ব ছবি আঁকব আমার কাঁকর-বিছানো বাগানে সকালে বিকালে একটু পায়চারি করে আসব—তার পরে জানলার ধারে একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে খোলা আকাশে রঙীন মেঘের সঙ্গে আমার রঙীন কল্পনাব মিলন ঘটাব—ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মস্ত বড়ো প্রফেট, ফিলজফার এই বাজে কথাটা সম্পূর্ণ লোপ করা আর সম্ভব নয়। সুতরাং দেশ বিদেশ থেকে চিঠি আসবে আগন্তুকের দল আসবে, নানা প্রশ্নের নানা জবাব দিতে হবে—তবু তার মধ্যে থেকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বাঁচাতে পারলে সেইখানে আমার চিত্রশালা খুলব—দর্শনার্থীর মধ্যে কখনো কখনো পুপু আসবে—তাকে বোধ হয় বাঘের গল্প বলে ভোলানো আর সম্ভব হবে না—গল্পের চেহারা বদল করব—সুবিধে এই যে সে আমার কাছ থেকে ফিলজফি দাবী করবে না।—২৭ তারিখে ব্রেমেন জাহাজে এখান থেকে দৌড় দেব। তার আগে একবার কানাডায় যাব। য়ুরোপ থেকে

জাপানী জাহাজে যাত্রা করবার চেষ্টায় রইলুম। ইতি
২৫ নবেম্বর ১৯৩০

বাবামশায়

অমিতার চিঠিখানা তাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

(৩৮) ওঁ

কল্যানীয়াসু

বৌমা, পাছে তোমরা ভয় পাও তাই আমি নিজের হাতে তোমাদের চিঠি লিখচি। আমার অবস্থা যে পূর্ব্বের চেয়ে খারাপ তা নয়। সেই রকমই। তবে কি না ডাক্তার বলচে এটা ভালোরকমের অবস্থা নয়। অর্থাৎ পূর্ব্বেও ভালো ছিল না এখনো ভালো নয়। এখানকার একজন সব-সেরা হৃদ্‌রোগতত্ত্বজ্ঞ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। উলটিয়ে পালটিয়ে নানা বকম ঠোকাঠুকি করে তিনি খুব জোর্‌সে বল্‌লেন, সব রকম এন্‌গেজমেণ্ট এখনি বন্ধ করে দিয়ে অন্তত নবেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ এদেশ থেকে দৌড় দিতে হবে। ডাক্তার রোজ দুবার করে আমাকে দেখ্‌তে আসেন। কিছু ওষুধ দিয়েচেন তাতে আমি উপকারও পেয়েছি। কিন্তু বক্তৃতাদি বন্ধ। তাঁর উপদেশ এই, দেশে ফিরে গিয়ে ভালোমানুষের মত অত্যন্ত চুপচাপ করে দিন কাটাতে হবে। আমিও তো দৌড়ধাপ করতে চাইনে—

বিশ্বভারতীর ভূতে আমাকে দৌড় করায়। সেই ভূতটাকে ঝাড়াবার জন্যেই এত কষ্ট করে এদেশে আমার আসা। এইমাত্র এখানকার কোয়েকার সমাজের প্রধানবর্গ এখানে এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের ভাষায় যাকে বলে মুক্তকণ্ঠ— অর্থাৎ সাদা ভাষায়, খুব দরাজ গলা করেই বল্‌লেন টাকার জন্যে এবার আমাকে ভাবতে হবে না। দৈন্য আমাদের দূর হবেই একথা পাকা। অতএব জীবনের বাকি কয়েকদিন আর পরের দ্বারে হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন ঘুচল। একটা ইজিচেয়ার, একটা ইজ্‌ল্‌ আর একটা স্টুডিয়ো এবং খানকয়েক বই—আর এ ছাড়া লীলমণি, এহলেই আমার দিন কাটবে—ময়ূরাক্ষী নদীটা বোধ হচ্চে যেন সম্ভবপরতার পরপারে।

তারপরে ছবির কথাটা বলে রাখি। আরিয়াম হলেন তার উদ্যোগী। বস্‌টনে কাজ সুরু হয়েচে। সেও দেখি মুক্তকণ্ঠ—অর্থাৎ সেও দরাজ গলায় বল্‌চে, ছবি কসে বিক্রি হবে। লোকে খুসি, এবং যাকে বলে বিস্মিত। তা ছাড়া বোধ হয় এও ভাবচে এ মানুষটার কি জানি কখন্‌ কি হয়, এর পরে ছবিগুলোর দাম বাড়বে। যাই হোক ভাবগতিক দেখে আরিয়াম ঠিক

করে রেখেচে বস্টনে এবং নিউইয়র্কে ছবি সমস্ত বিকিয়ে যাবে। আমারও সেটা অসম্ভব বোধ হচ্চে না—কারণ আমার সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা সত্য সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেচে।

যদি বিক্রি হয় তা হলে কিছু মোটা গোছের টাকা হাতে আসবে। এই টাকাটা সমস্তই যেন তোমাদের ধার শোধের জন্যেই ব্যবহার হয়। আর কিছুরই জন্যে নয়। তোমাদের ঋণের চিন্তা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত কাবু করে রেখেচে। তোমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে একটুও হাত দিতে চাইনে বলেই নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলুম। অথচ বুঝতে পারছিলুম রথীর শরীর ভেঙে যাবার অন্যতম কারণ এই দুশ্চিন্তা। আমার ছবি বিক্রি করে এই দায় ঘোচাব বলে একান্ত আশা করেছিলুম। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারটা ক্রমে আমার প্রত্যয়গোচর হয়েচে যে, আমার ছবির দাম আছে এবং সে দাম বাড়বে। আজ হোক কাল হোক এই ছবি থেকে ঋণ শোধ হবেই। তার পরে— তারপরে কি সে কথা বলি।

ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েচে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ

করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেকদিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়— আমরা যেন ট্রস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদেরি অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারী রথ সে রাস্তায় গেল না—তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সঙ্কল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেচি—কোনো কথা বলিনি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তাহলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান করেচি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ হোল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেচে। মৃত্যুর

আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না ?

আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করেচি আজ হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ভিৎ পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকি নি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হুহু করে এঁকে ফেল্‌লুম আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কি ? জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন। আমার Religion of Manও সেই পরিশিষ্টেরই অঙ্গ। জীবনে যা কিছু সুরু করেছি তা সারা করে যেতে হবে। কোনোটা বাকি থাকবে না।

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোষাক আমাদের ছাড়তে হবে নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য্য বিধান এই যে এখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন করতে পারব। এদেশ থেকে রঙীন কালী আর ছবির কাগজ নিয়ে যাব—তার পরে ভরসা করচি আমার ছবি আঁকা

নিরর্থক হবে না। দেশের লোকে আমাকে বিশেষ কিছু দেয় নি ভালোই হয়েচে—নিন্দা অনেক সয়েচি সেও ভালো হয়েচে। সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ দুঃখের পথ মনে হচ্চে যেন আজ সফলতায় উত্তীর্ণ হবে—স্বদেশের কাছে অনেক আশা করে বঞ্চিত হয়েচি, বন্ধুরাও পদে পদে প্রতিকূলতা করেচে—কিন্তু কিছু ক্ষতি হয় নি—বরঞ্চ তাদের আনুকূল্যই হয় তো আমার সইত না। ইতি

[১৯৩০] বাবামশায়

(৩৯)   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এরিয়ামের চিঠিতে সব খবর পাচ্চ জেনে লেখা সম্বন্ধে পরিপূর্ণমাত্রায় কুঁড়েমি করচি। বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি—যারা সমজদার তারা বলে এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু বুঝতে পারচি এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে— শুনে আশ্চর্য্য ঠেকচে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক্ মন্দই হোক কারো চোখ পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনিই ঘটে—অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠখড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য —আন্দ্রের পক্ষেও। খরচ কম হয়নি—তিন চারশো পাউণ্ড হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ছড়াচ্ছে। এখানকার

সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজ্ঞানীদের ও জানে—ডাক দিলেই তারা আসে। Comtesse de Noaillesও উৎসাহের সঙ্গে লেগেচে—এমনি করে দেখতে দেখতে চারদিক সরগরম করে তুলেচে। আজ বিকেলে প্রথমে দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে—তারপরে কি হয় সেইটেই দ্রষ্টব্য। যাই হোক্, এখানকার পালা সাঙ্গ হলে ছবিগুলো ঘাড়ে করে কী করতে হবে ভেবে পাইনে। ডাল বলচে জুনে স্টকহল্‌মে একবার যাচাই করা যাবে সেখানেও একটা সোরগোল হতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে? বার্লিনে কে দায় নেবে? দায় কম নয়। লণ্ডন ছবি দেখাবার পক্ষে খারাপ জায়গা নয় এই কথা সকলে বলচে—অতএব ছবিগুলো আমার সঙ্গে সেখানে নিয়ে যাওয়া মন্দ পরামর্শ নয়। প্যারিসে যদি ঠিক সুর লাগে তাহলে সব জায়গাতেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। ভিক্টোরিয়া ছবি বিক্রির কথা বলছিল—বোধ হয় এই উপলক্ষ্যে নিজে কিনে নেবার ইচ্ছে। আমি বলেচি এখন বেচবার কথা বন্ধ থাক্। আর যাই হোক আমার ছবি দেশে ফিরতে দেব না—অযোগ্য লোকের হাতে অবমাননা অসহ্য।

রথীর জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। ওখানে যদি যথেষ্ট

উপকার না হয় তাহলে কী করবে? একবার কি ভিয়েনাতে চেষ্টা দেখবে? আমার বোধ হচ্চে রথীকে কোনো ভালো জায়গায় প্রায় বছর খানেক রাখা দরকার হবে। সেই রকম বন্দোবস্ত করা ভালো। Kali Phos এবং Natrum Phos যদি ও অনেকদিন প্রত্যহ খায় তবে আমার বিশ্বাস উপকার পাবে। তোমার নিজের শরীর আশা করি ভালো। আমাকে নিরতিশয় ক্লান্ত করেচে। ভিক্টোরিয়া স্থির করেচে এখানকার একজন বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে আমার পরীক্ষা করাবেন। শরীর তো একরকম করে চল্‌চে কিন্তু যে পরিমাণে প্রত্যহ চুল উঠ্‌চে তাতে আন্দাজ দেশে ছবিও যদি না ফেরে চুলও ফিরবে [না]। এখানে আসবার সময় নারকেল তেলের শিশিটাকে [ফেলে এসে] ভালো করিনি ওটা চুলের পক্ষে ভালো।

ভিক্টোরিয়ার আমেরিকায় যাবার তাড়া। কেবল আমার এই ছবির জন্যেই আছে। কিন্তু আর বেশি দিন থাকবে না। এই মাসের ৭ই ৮ই যাবে। তার পরেই আমার ইংলণ্ডের পালা আরম্ভ হবে। সে আবার সম্পূর্ণ একটা নতুন অধ্যায়। এণ্ড্রুজের বিশ্বাস লেকচারটাতেও একটা রব উঠ্‌বে। কিন্তু ওতে আমার মন নেই।

পুপুকে আমার জোব্বার মধ্যে আচ্ছন্ন করবার যে কাজ পেয়েছিলুম সেটা বন্ধ হওয়াতে আমার জোব্বাগুলো হতাশ হয়ে ঝুলে পড়েচে। কিন্তু তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে, আমার অধিকাংশ জোব্বার বোতাম ও তার বন্ধনীতে সামঞ্জস্য নেই সুতরাং সেগুলো বহন করি বাক্সে, দেহে নয়। সুহৃৎ কেমন আছে— ওখানে ভালো পাঁউরুটি ও ফ্রোমাজের অভাব হবে না কিন্তু তার দ্বারাতেই কি সকল অভাব দূর হতে পাববে?

[১৯৩০] বাবামশায়

৪০) ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, পাড়া গাঁ আমার ভালো লাগে কিন্তু নিজের কোণটুকু আমার আরো ভালো লাগে। নিজের জগৎ নিজের হাতে বানিয়ে তার মধ্যেই বাস করা আমার বরাবরকার অভ্যাস সেইজন্যে সম্পূর্ণ অখণ্ড অবকাশ না পেলে দুই একদিনেই হাঁপিয়ে পড়ি। আদর যত্ন সেবা ভালো লাগে না তা নয়---কিন্তু তাতেও জায়গা জোড়ে, মন বাধা পায়। তাই শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে মন উতলা হয়ে উঠেচে। , কালই অপরাহ্ণ চারটের গাড়িতে দৌড় দেব। প্রতাপকে নিতান্তই দরকার আছে বলে মনে করিনে—বনমালীর সঙ্গে মোবারককে জুড়ে দিলে আমার সংসারে তো বিশেষ অভাব থাকে না। তোমাদের ওখানে প্রতাপকে না হলে তোমাদের কষ্ট হবে---ওকে সেখানে রেখে দিলে আমি খুসি হতুম এবং নিশ্চিন্ত হতুম। যদি ইচ্ছে করো ওকে পাঠিয়ে দিতে পারি— নিশ্চয় জেনো আমার শিকি পয়সার

অসুবিধা হবে না। আমি গরমকে ভয় করিনে, মশাকে ভয় করি—তাকে পরাস্ত করবার যতরকম পরীক্ষা সম্ভব, করে দেখব—তার ফলে হয় তো বিশ্বের একটা হিত-সাধন হতেও পারে। অমূল্যবাবু এসেছিলেন—আলো পাখার যন্ত্র রওনা হয়ে গেছে, দাম চুকিয়ে দিয়েছি। তাঁকে ধরেছি আমাদের জল দান করতে—শীঘ্র যাবেন বলেচেন। যতদিন পারো দার্জ্জিলিঙে থেকো, একেবারে অক্টোবরে এলে ভালো হয়। পুপুকে বোলো সে চলে যাবার পর থেকে পুষ্প আমার কাছেও ঘেঁষে না, তাই সম্পূর্ণ একলা পড়ে গেছি। আপাতত বনমালী ছাড়া আমার আর গতি নেই। ইতি ৩ এপ্রেল ১৯৩১

বাবামশায়

(৪১)   ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা— পারস্যকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু পারস্য কিছুতেই ছাড়ল না। মরিয়া হয়ে বললে শরীরে দুর্ব্বলতা যদি থাকে ভালো ডাক্তার সঙ্গে এনো সমস্ত খরচ রাজা দেবেন।

মঙ্গলবার অর্থাৎ পর্শু রাত্রে বর্দ্ধমান থেকে বেরোব। সঙ্গে সুরুলের ডাক্তার এবং অমিয়র বদলে ধীরেন। অমিয় এখন পুরীতে বিদায় নিতে গেছে। কিন্তু সে আমার দেখাশোনা করতে পারবে না— সেটা তার ধাতে নেই।…ধীরেনের বুদ্ধিও আছে পটুতাও আছে। যাই হোক সব ঠিক হয়ে গেছে।

পুপুমণির চিঠিতে একটা গল্পের ভূমিকা করেছিলুম এমন কি নায়কের এবং পাল্লারামের ছবিও এঁকেছি। ও যদি একটুও ঔৎসুক্য প্রকাশ করত তবে এতদিনে এ গল্প অনেকটা দূর এগোত।

তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছ। যতদিন পারো

থেকো— বর্ষার আরম্ভেই নেমে এসো না। এখানে এ বছর বৃষ্টিবাদল হয়ে ঠাণ্ডাই চলেচে— গাছপালা মাঠঘাট এখনো সরস সবুজ।

কাপড়চোপড় গোছানোগাছানোর ধূম চলচে।

খুটুদের বিয়ে দেখতে দেখতে পুরোনো হয়ে গেছে— এখন গোরার বিয়েটা না হলে ভালো লাগচে না। তারো ভূমিকা চলচে তোমরা নিশ্চয় উপসংহার ভাগ দেখতে পাবে।

জ্যৈষ্ঠমাসের সব কাগজেই দেখা গেল ফাল্গুন মাসের মুক্তধারা বেরিয়েচে— বর্ষার মুক্তধারাও এবার সেই ফাল্গুনেই দেখা দিয়েছিল তার পরে দীর্ঘকাল গেছে খরা। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বাবামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমাকে বিষম উদ্বেগে ফেলে তুমি তো চলে গেলে, তার পরে এখানে এসে দিনরাত গোলমাল চল্‌চে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই। এ পর্য্যন্ত অভিনয় থেকে ১৪০০০ টাকা পাওয়া গেছে। আরো কিছু পাব। তার পরে ভিক্ষের আয়োজনও চলচে— কিশোরী আর কালীমোহন এই নিয়ে আছে।

প্রথমে শাপমোচন দিয়ে আরম্ভ করা গেল। খুবই জমেছিল, এখানকার কাগজে যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে আমাদের দেশে কোনোদিন তেমন ঘটেনি। তার পর তৃতীয়দিন তাসের দেশ। থার্ম্মোমিটর একেবারে সাব্ নর্ম্মাল। দমে গেল মন। সকালে উঠেই নতুন নাচ গান ঢুকিয়ে তাসের দেশকে সম্পূর্ণ নতুন করে তোলা গেল। আশ্চর্য্য এই যে আয়ত্ত করতে মেয়েদের কিছুমাত্র বিলম্ব হোলো না। "সঙ্কোচের বিহ্বলতা" গানটাতে যে নাচ ওরা লাগিয়েচে সেটা নতুন ধরণের—

সেটাতে খুব encore পেয়েচে— বুড়ী আশ্চর্য্য করে দিয়েচে সবাইকে। আবার কাল হবে শাপমোচন। কিন্তু নতুন তাসের দেশটা শাপমোচনের চেয়ে ভালো হয়েছে। তাতে রোমান্স্ এবং রিয়ালিজ্‌ম্ পাশাপাশি থাকাতে আশ্চর্য্যরকম জমেচে।

পুপুর সঙ্গে তার বাপ ও দিদিদের দেখাশোনা হওয়াতে ওর ধাক্কাটা একেবারে কেটে গেছে— ভালো হোলো। পুপুর বড়ো বোন (তারা বাই নয়) অসাধারণ সুন্দর দেখতে।

… … …

বৌমা এবার মাঘ মাসে বোটে শিলাইদহে যাবার ব্যবস্থা নিশ্চয় কোরো। তোমার শরীরের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত আছি।

[বোম্বে, ৩০ নভেম্বর, ১৯৩৩] বাবামশায়

(৪৩) ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি চলে আসার পর তোমাদের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে আর এখানকার আকাশে নেমেছে ঘোরতর বাদল। এখানে এত বৃষ্টি সারাবৎসরের মধ্যে হয় নি। চাষীদের ক্ষেত শুকিয়ে এসেছিল ক'দিনের মধ্যে বেঁচে উঠেছে ওদের মরা ফসল। সত্যিকথা যদি বলতে হয় এখানে ভালই লাগচে। কালিম্পঙের মহিমা স্বীকার করব কিন্তু এখানকার মাধুর্যের সম্বন্ধে পুপুদিদির সঙ্গে আমার মতের মিল অনুভব করচি।

ছাত্রীর দল আসচে, তুমি নেই, কার হাতে তাদের সমর্পণ করা যায়। বুড়ি মেয়েদের স্বভাব জানে সেই জন্যে মেয়েদের দায়িত্ব নিতে নারাজ। সুরেন ভীতু মানুষ, যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায়।

হায়দ্রাবাদ থেকে প্রতিমা এসেছে, আছে তোমার

তেতালার কুঠরিতে। আমি আছি চুপচাপ, আহারের নিয়ম পূর্ব্ববৎ। কবিতার কাপি? ইতি ১০।৮।৩৪

বাবামশাই

(৪৪) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে আমার মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। তোমার কাছ থেকে বা শান্তিনিকেতন থেকে তোমার কোনো খবর পাইনে। আজ পর্য্যন্ত পুরীতে আছ কিনা বা পুরীতে কোথায় আছ তার কিছুই জানতে পারলুম না। অমিয়র মার কেয়ারে এই চিঠি পাঠাচ্ছি আশা করি পাবে।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিষটা এবার সব সুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েচে। কিন্তু এখানকার লোকের মন অসাড়। যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েচি বল্‌লে অত্যুক্তি হবে।

এখানে এসে অবধি ঘোরতর বাদলা বৃষ্টি চলছিল। কাল থেকে আকাশ পরিষ্কার। সেই কারণেই কাল খুব ভিড় হয়েছিল— অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। দুঃখ এই যে লোক ৬।৭ শর বেশি ধরেই না। সেটাকে সৌভাগ্যও বলা যেতে পারে। যদি দর্শকের

জায়গা বেশি বড়ো হোতো, তাহলে দর্শকদের অভাব অত্যন্ত কটুভাবে চোখে পড়ত।

৪ঠা পৌঁছব ওয়াল্‌টেয়ারে। আমি থাকব বিজয়নগ্রম্‌ মহারাণীর নিজ আতিথ্যে। মেয়েরা থাকবে বব্‌লির বাড়িতে। ছেলেরা কোথায় থাকবে জানিনে। ওখানে আমাদের কাজ শেষ হবে ৬ই।

তার পরে দুই একদিনের জন্যে তোমাকে দেখে যাবার জন্যে মনটা উৎসুক আছে। কিন্তু আমাকে নিয়ে পাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ো বা স্থানাভাব থাকে সেই ভয়ে মন স্থির করতে পারচিনে। কেবল তোমাকে দেখেই চলে যেতে চাই। ওয়াল্‌টেয়ারে যদি তোমার চিঠি পাই তাহলে যা হয় স্থির করব। পুপু মাঝে একটু অজীর্ণে ভুগেছিলো-- পথ্যের ব্যবস্থা করে সেরে গেছে।

আশার শিশুকে দেখলুম। সময়ের পূর্ব্বে জন্মেছে বলে খুব ছোট্ট হয়েচে। ওরা এই আডিয়ারেই একটা বাসা নিয়েচে। তুমি কেমন আছ ওয়াল্‌টেয়ারে গিয়ে যেন তার খবর পাই। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

[মাদ্রাজ] বাবামশায়

ওঁ

বৌমা

তোমাদের পথকষ্টের পালা শেষ হয়ে গেছে। অন্তত রেলপথের। ধুলো এবং গরম প্রচুর পরিমাণেই পাবে এই মনে করে উদ্বিগ্ন ছিলুম। যা হোক সে সমস্ত চুকিয়ে জাহাজে চড়ে বসেছ কল্পনা করে নিশ্চিন্ত বোধ করচি। জানি সমুদ্র এখন শান্ত, ধীরেন আছে, তোমাদের যথেষ্ট যত্ন নেবে।--- রথীর চিঠিতে জাপানে আমাদের পালাগানের প্রস্তাব শুনেচ। এ সম্বন্ধে তুমি কী চিন্তা করচ জানিয়ো। এ পালা তোমারি স্বকৃত, এখনো তোমারি অঞ্চলে বাঁধা। বিদেশে ওকে একলা রওনা করে দিলে আমরা ওকে সামলাতে পারব না। জানিয়ে রেখে দিলুম। ভারতে অগষ্ট মাস থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কষ্টকর সময়। সেই সময়টা জাপানে তোমাদের ভালোই লাগবে। সিংহলের বন্ধুরা যেমন সমস্ত দ্বীপ তোমাদের ঘুরিয়েছিল এরাও তাই করবে— এমন সকল দেশে নিয়ে যাবে যেখানে ভ্রমণ আধুনিক

বঙ্গনারীদেরও আয়ত্তের অতীত। তা ছাড়া জাপানে তোমার দেখবার জিনিষ বিস্তর আছে—এমন সমাদরে সহজে বিনাব্যয়ে সেখানকার দর্শনীয় দেখে বেড়ানো তোমাদের ভাগ্যে কখনো ঘটবে না।—সে কথা যাক্। যাদের হাতে তুমি আমাকে সমর্পণ করে দিয়ে গেছ—তাদের মধ্যে সেক্রেটারি ধরাছোঁওয়ার অতীত। সকালে ডাকের চিঠি আসে, প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। যে বয়সে পরের প্রতি নির্ভর অনিবার্য্য সে বয়সকে ধিক্। গাঙ্গুলি আছেন সদাসর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর শ্রুতিগোচর। কোথাও কিছু ত্রুটি হবার জো নেই। আহারের সময় পুপে এসে প্রায়ই দুঃখ জানিয়ে যায় যে আমি অত্যন্ত কম খাই। সুনন্দা পাখা হাতে মাছি তাড়ায়।

তোমার সেই বৈঠকখানা ঘরে বড়ো লেখবার টেবিল আনিয়ে লেখা পড়া করি। ছবি আঁকবার আসবাবেও ছোট ঘর ভরে উঠেছে—এখনো আঁকা আরম্ভ করিনি। সম্মুখে তোমার বাগানের দিকে চেয়ে দেখি গাছপালা সব প্রসন্ন।

আজ থেকে অনিলের আসবাব সরিয়ে আনবার কাজ আরম্ভ হবে। গাঙ্গুলি ভার নিয়েছে। তার পরে সেই কুটীরটা আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগব। আমার মেটে

কোঠার ছাদ আরম্ভ হয়েছে। নন্দলালরা রোজ একবার করে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে যান। জিনিষটা যথেষ্ট সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠবে এখন থেকে তার নিদর্শন পাচ্চি।

আন্দ্রেকে বোলো, কল্পনা করচি তোমরা তার ভালোবাসা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করচো—দূর থেকে আমি কেবল ঈর্ষা করে মরচি। কোনোদিন আমার অদৃষ্টেও যে এই সৌভাগ্য ঘটবে সে আশা করিনে—সময় পেরিয়ে গেছে। ইতি ২৮।৩।৩৫

বাবামশায়

আন্দ্রে দম্পতিকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ ও ভালোবাসা জানাবে। রঙীন কালী ?

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ পয়লা বৈশাখে মন্দিরের কাজ শেষ করে এসেই তোমাদের চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি না এসে তোমরা এলেই খুসি হতুম। সমুদ্রের হাওয়াতে তোমরা উপকার পেয়েছ খবর পেয়ে মনটা খুসি হোলো। আমার মনে হয় কিছু দিন ওদেশে থেকে তুমি যদি ভালো করে সেরে আসতে পারো তাহলে ভালো হয়। এখানকার ভাদ্র আশ্বিন কাটিয়ে যদি অক্টোবরের মাঝামাঝি এসো তাহলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। রথীরও তাই করা উচিত। কিন্তু কাজ কামাই করে রথী অতদিন থাকতে পারবে না। কিন্তু মুস্কিলের কথা আছে যদি জাপানে যাওয়া হয়। তুমি না থাকলে দল-বল নিয়ে কী ফল হবে। আর যাই হোক জাপানটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়—কিন্তু সেপ্টেম্বরে সেখানে আমাদের কাজ আরম্ভ হবার কথা। তার মানে অগষ্টমাসে যাত্রা। মন্‌সুনের সমুদ্রে বেরতে হবে।

অবশ্য ওদিকে মন্‌সুনের প্রভাব প্রবল নয়। যাই হোক কথাটা নানাদিক থেকে ভেবে দেখবার বিষয়। এদিকে আমার মাটির ঘর (শ্যামলী) প্রায় সম্পূর্ণ হোলো। জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারব এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু তোমরা থাকবে না আমি নতুন বাসায় যাব এটা ভালো লাগচে না। উপায় নেই।—আজ পর্য্যন্ত গরম বেশি পড়েনি। দুপুরে শুকনো গরম হাওয়া দেয় কিন্তু রাত্রির মাঝামাঝি থেকে রীতিমতো ঠাণ্ডা। এবারে হয়তো কোথাও যেতে হবে না। যদি দুঃসহ হয় তাহলে মৈত্রেয়ীর আশ্রয় নেব, সে খুব অনুনয় করচে। রাণীরা হয় তো সিমলের নীচের পাহাড় ধরমপুরে যাবে—প্রশান্ত আমাকে যেতে বল্‌চে—কিন্তু অতদূরে গরমের সময় রেলে করে যাবার সখ আমার নেই। খুব সম্ভব আমার শ্যামলীতেই চরম গতি। ওটাকে গোছাতে গাছাতে সময় লাগবে তো।—উদয়নে আছি—তোমার boudoirএ আমার শোবার ঘর—তার পাশের বড় ঘরটাতে লেখার টেবিল পড়েছে সেইখানে বসে লিখচি। গাঙুলি খুব খবরদারি করচে। শরীর মোটের উপর ভালোই। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

বাবামশায়

(৪৭) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বেছে বেছে এই বছর তোমরা বিলেতে গেছো যেহেতু তোমাদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। দীর্ঘকাল বৃষ্টি নেই, বাতাস শুকনো, গরম ক্রমেই চড়ে যাচ্চে--থেকে থেকে ঝড় আসচে, ধূলো উড়চে, মেঘও করে পূর্ব্বে পশ্চিমে, বৃষ্টি হয় না, বাড়ির চাল উড়ে যায়, গাছ পড়ে যায় রাস্তায়। আমি চিরদিন গরমকে উপেক্ষা করে এসেছি, এবার আমার অহঙ্কার টিকল না—কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল প্রাণপুরুষ, অনেক চিন্তা করে করে শেষকালে আশ্রয় নিয়েছি বোটে। প্রবীণ লোকেরা নানাপ্রকার ভয় দেখিয়েছিল, মানি নি। উত্তরপাড়ায় বোট বাঁধা ছিল, সেখান থেকে প্রথমে গেলুম শ্রীরামপুরে, কুণ্ডুদের বাড়ির ঘাটে, সেখানটা বাসের অযোগ্য। অবশেষে এসেছি ফরাসডাঙায়। প্রথম দিন ছিলুম স্ট্র্যাণ্ড রোডের সামনে, সেখানে দলে

দলে লোক সমাগম হতে লাগল। সেখান থেকে বোট হটিয়ে নিয়ে এখন যেখানে আছি ঠিক এর সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি। সে বাড়িটা অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়। তার পাশেই একটা একতলা বাড়ি আছে, সেখানে আপাতত আছেন মিসেস মিত্র—তোমরা তাঁকে এবার দেখেছ শান্তিনিকেতনে—বুড়ি তাঁকে জানে কোন্ একজনের রাঙাকাকী বলে। তিনি আর দিনকয়েক পরে চলে যাবেন তখন ঐ বাড়িটা ভাড়া নেব—জুন মাসটা ওটা হাতে রাখতে চাই—ভাড়া ৬০ টাকা। তোমাদের মামা বোধ হয় তাতে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না। বোটে ভালোই লাগচে—জলের উপর দিয়ে হাওয়া আসে অনেকটা তাপ বর্জ্জন ক'রে। এ পর্য্যন্ত লোকজনের উৎপাতও প্রবল হয় নি। তেলেনি পাড়ার বাঁড়ুজ্জে জমিদার আমাকে একটা পাথরের টেবিল ধার দিয়েছেন সেইটে অবলম্বন করে তোমাকে চিঠি লিখচি। এ বোটে শোওয়া বসা খাওয়া নাওয়ার সকলরকম ব্যবস্থাই আছে, কেবল লেখবার প্রয়োজনকে একান্তই উপেক্ষা করা হয়েছিল—যে টেবিলটা বসবার ঘরের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে বিরাজমান, সরস্বতীর চরণকমল

পেরিয়ে গিয়ে আরো অনেক নীচে তার পৃষ্ঠদেশ, কলমচালনার পক্ষে একটুও সুবিধাজনক নয়। ··· ···

[১৯৩৫] বাবামশায়

বৌমা,

নবীন ভালো রকম উৎরেচে শুনে খুসি হলুম। শাপমোচন সম্বন্ধে উদ্বেগ আছে। পড়বে কে? সাগর? তাহলে কি শাপের মোচন হবে, না সেটা আরো জড়িয়ে ধরবে। স্বর্গে তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই তো অভিশাপ, তোমরা মর্ত্ত্যে যদি সেই কীর্ত্তি কর তাহলে তো উদ্ধার নেই। একবার ভাবলুম স্বরেনের দ'লে জুটে স্বয়ং ওখানে অবতীর্ণ হই। এখানে নানা কাজ আছে বলে হয়ে উঠ্‌ল না। দালিয়াটা ভালো লাগল না। মায়াব খেলায় প্রথম দিন অনেক ত্রুটি ছিল দ্বিতীয় দিন নিখুঁৎ হয়েছিল—লোকের ভালো লেগেছে। তোমরা যেবার করেছিলে সেবারকার মতো অত ভালো হয়নি। আমি কলকাতায় এখনো নানা জালে জড়িয়ে আছি—ছাড়াতে পারচিনে। কথা আছে আগামী মঙ্গলবারে ফিরব—নিশ্চিত বলা কঠিন'। আগামী রবিবারে রানী প্রশান্তর বিবাহের সাম্বৎসরিক তিথি। একটু ধূম করে উৎসব

করবে। অসিতের বাড়িতে আদর যত্ন পাচ্চ তো। আমার শান্তিনিকেতনে যেতে মন সরে না—যত্ন করবে কে? একটা সুবিধা হয়েছে রথী যে মশা তাড়াবার পাউডার করেছে সেটাতে সত্যিই মশা নিবারণ করে। বরানগরের সন্ধে বেলাতে মশার ভিড়ের মধ্যে পরীক্ষা করেছি একটা মশাও রক্ত পায়নি—গন্ধেই দেয় দৌড়। কাল রাণুরা এসেছিল তারাও আশ্চর্য্য হয়েছে। পুপুমণির খবর কি।

[১৯৩৫] বাবামশায়

(৪৯) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ, পালিয়ে এলুম।

এখানে শরতের চেহারা ফুটে উঠেছে—হাওয়ায় একটুখানি হিমের ছোঁওয়া দিয়েছে, রোদ্দুর কাঁচা সোনার রঙের—গাছপালা চারদিকে ঝিলমিল করচে।

নতুন বাড়িতে মিস্ত্রির আক্রমণ। অবশেষে উদয়নে আশ্রয় নিতে হোলো—হয়তো আরো দিন পনেরো এইখানেই স্থিতি। বৃহৎ পুরী শূন্য। এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন প্রতি সন্ধ্যাবেলা তোমার সূর্য্যাস্ত প্রাঙ্গণ নূপুরে মুখরিত ছিল এখন "নীরব রবাববীণা মুরজ মুরলী।" কেবল মনে হচ্চে দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, ভুল করেছি। আমার নৃত্যসাধনা গীতচ্ছন্দে উর্ব্বশীদের মহলে কোনোদিন আসন পাব না। অতএব এখন থেকে তাঁদের সেলাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যে গানের আসর আমার আয়ত্তের মধ্যে, আন্দাজ করচি

সেখানে রসের অভাব ঘটেনি। সেইটুকুতে কিছু পরিমাণ খুসি করতে পেরেছিলেম। এইবার ছুটি। তোমার শরীরের জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। আমার বিশ্বাস, এখন ক্রমে শীতের হাওয়া পড়্‌কে এই সময়ে অন্তত মাসখানেক বোটে করে চরে যদি থাকতে পারো তাহলে সুস্থ হতে পারবে।

আমি কিছুদিন পতিসরের বোটে পদ্মায় ভাসব স্থির করেছি—সে বোটটা আমার ভালো লাগে। ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৪৩

বাবামশায়

(৫০)　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা তুমি পুরী যাচ্চ ভালোই হয়েছে। সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থেকে শরীরটা ভালো করে সেরে এসো।

আমি এখানে ভালোই আছি। বোধ হচ্চে অনতিবিলম্বে শীত পড়বে।

চিত্রাঙ্গদার রিহর্সল চলচে। এর নাচের অংশ সম্বন্ধে বিচার করা আমার পক্ষে শক্ত। শান্তি আছে সে একরকম ঠিক করে নেবে।

বুড়ি এখনো কলকাতায় আছে। ডাক্তার দেখাতে হবে বলে আটকা পড়ে গেছে। কী হোলো তার বুঝতে পারচিনে।

স্টেট্‌স্‌ম্যানে পরিশোধের যে বড়ো সমালোচনা করেছে সেটা পড়ে মন কতকটা আশ্বস্ত হোলো। সমস্ত খুঁটিনাটি সাধারণে দেখতে পায় না, মোটের উপর ভালো লাগলেই হোলো।

এখানে সবাই পরিশোধ দেখতে চাচ্ছিল। বুড়ি

ছুটির আগে এসে পৌঁছল না অতএব ওটা স্থগিত রইল

ইতি ২৯ আশ্বিন ১৯৩৬

বাবামশায়

(৫১)   ওঁ   শান্তিনিকেতন

বৌমা পুরীতে গিয়ে তোমার শরীর ভালো আছে শুনে খুসি হলুম। আমিও হাওয়া বদল করবার জন্যে কাল পরশুর মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। আমি যাচ্চি বাস্-এ চড়ে লেনর্ড্ রোড বেয়ে সুরুলে শ্রীনিকেতনের তেতালার ঘরে। সেখানে চারিদিকে পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে সবুজ রঙের সমুদ্র। পুরীর সমুদ্রের চেয়ে কম নয়। সেই তেতালার বাসা এককালে আমারি ছিল। জীবনে কতবার কত বাসাই বদল করেছি। নতুন বাড়িতে এখনো মিস্ত্রির উৎপাত লেগেই আছে, ধূলো উড়চে, দুমদাম শব্দ চলচে।

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। কাল আশ্রমের লোকেরা প্রণাম করতে এসেছিল। ১২০ জনকে জলযোগ করিয়েছি—অবশেষে তিন জনের খাবার কম পড়েছিল।

রথীরা এসেছে—মীরা এসেছে। বুড়ি ভালোই আছে।—বাতাসে ঈষৎ ঠাণ্ডার আভাস দিয়েছে। মিস্

বস্‌নেক্ থাকেন রাণীর বাড়িতে—ছুচারটি ছাত্রী এখনো আছে আশ্রমে। ফরাসী যুবকেরা আছে প্রান্তিকে। ইতি একাদশী ১৩৪৩

বাবামশায়

(৫২)　　　　ঔঁ

বৌমা

কাল তোমাকে চিঠি লিখেছি হেনকালে আজ তোমার চিঠি পেয়ে মনটা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমার সাম্প্রতিক খবর হচ্চে, সুরুলের বাড়িতে তেতলায় চড়ে বসেচি। ভালো লাগচে— আকাশ খুব কাছে এসেছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজন সর্বদা ঘাড়ের উপর এসে পড়চে না।

কাল থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, টিপটিপ্ করে বৃষ্টি পড়চে। বাদলা এমনি গট হয়ে বসেচে যে নড়বার মতো কোনো তাড়া নেই— বিদায় হলে বাঁচি।

এখানে এসে স্থির করেছি মাঝে মাঝে আকাশের সঙ্গে মিতালি করবার জন্যে শ্রীনিকেতনের প্রাসাদশিখরে আশ্রয় নেব। এরা একটা ভদ্র রকমের সিঁড়ি গেঁথে দেবে কথা দিয়েছে। ইতি ২৭।১০।৩৬

বাবামশায়

(৫৩) ওঁ

কল্যাণীয়াসু বৌমা

কোথায় এসেছি বুঝতে পারচিনে। কাল সকালে পৌচেছি আত্রাই স্টেশনে। ম্যানেজার ছিলেন, আর ছিল দুটো ডিঙি আর আমার বোট। তোমার মাতুল সেই মুহূর্ত্তে পাল্কী চড়ে মাতুলানীর অভিসারে রওনা হলেন। ভাবলেম আগে থাকতে গিয়ে আমার জন্যে যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবেন। রাত নটার সময় শূন্য নির্জ্জন নিরালোকিত ঘাটে বোট এল। আমি তখন একলা বসে হাত পা চালনা করচি। খবর দিলে এইটেই পতিসরের ঘাট—জানতেই পারিনি। মাতুল ক্ষণকালের জন্যে এসে তিরোহিত। বেচারা সুধাকান্ত ভাবলে সেখানে গেলে আহার আরামের সুবিধা হবে। কী দুর্ঘটনা হোলো তার কাছেই শুনতে পাবে। সুখের কথা এই যে মশা নেই, দুর্যোগ নেই, বিশেষ গরম নেই। তাই রাত কাটল ভালোই। সকালে বনমালীকে ডেকে কিঞ্চিৎ চা খেয়ে নিয়েছি। আটটা বেজে গেছে

লোকজন কেউ কোথাও নেই। ভাগ্যে আছে কালু আছে বনমালী এবং দুঃখরাত্রির অবসানে এসে পৌঁচেছে সুধোড়িয়া তাই বুঝতে পারচি এটা চন্দ্রলোক নয়, এখানে প্রাণীর চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যায়। 'পুনশ্চ' থেকে উদয়নে যাত্রা করলেও যেটুকু চাঞ্চল্য অনুভব করি এখানকার হাওয়ায় তাও নেই। এখানকার খবর এই পর্য্যন্ত। ক্রমশ আরো কিছু খবর জমবে কি না জানিনে। আজ শুনতে পাই পুণ্যাহ, যদি সত্য হয় তাহলে আজ বোধ হয় ছুটি পাব না। কাল বৃহস্পতিবারে উল্টোরথে হতভাগা জগন্নাথ স্বভবনে যাত্রা করবেন। শুক্রবারের গাড়ি ধরে শনিবারে কলকাতায় পৌঁছব। তার পরে স্বস্থানে। বর্ষামঙ্গলের আয়োজন আশা করি এগোচ্চে। সরাইখেলের নাচ আমরা চাইলেই নিজের খরচে পাঠিয়ে দেবে এমন সংবাদ পেয়েছি। সে চেষ্টা করতে দোষ কী। জিনিষটা মোটের উপর দর্শনীয়।

শুনচি প্রজারা বৃহস্পতিবারে দেখা করতে নারাজ। শুক্রবারে ধরে রাখবে, তাহলে রবিবারের পূর্ব্বে যাওয়া ঘটবে না।

[১৯৩৭] বাবামশায়

(৫৪)

বৌমা, বর্ষামঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। … সঙ্গীত বিভাগের এই কাজটা তোমার, দায়িত্ব তোমারই। গান, নাচ, এবং যন্ত্র সঙ্গীতের প্রোগ্রাম তোমাকেই তৈরি করতে হবে। ডিগ্রি নেওয়ার দুষ্কর কর্তব্য আমিই সেরেছি—সঙ্গীত বিভাগের দুঃসাধ্য কাজ তোমারই পরে নির্ভর করচে। তিন পক্ষকে তোমার সামনে একত্রে বসিয়ে কর্ম্মসূচি যদি বানিয়ে তোলো তাহলে জিনিষটা মানানসই হতে পারবে।

[১৯৩৭] বাবামশায়

(৫৫) ওঁ উত্তরায়ণ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানে বসন্ত উৎসবের জন্যে ধরেছে সবাই। সেটা হবার কথা ১৬ই তারিখে। সুতরাং এখন কলকাতায় গিয়ে আবার ফিরে আসার দুঃখ বাঁচাতে চাই। এইজন্যেই, বারে বারে যাতে জন্মের গোলকধাঁদায় আনাগোনা না করতে হয় আমাদের দেশের ভবভয়ভীরুরা শান্ত হয়ে বসে তার সাধনা করে থাকে। আমিও আপাতত শান্ত হয়ে রইলুম। বিশেষত শোনা গেল খুলনা থেকে ফিরতি যাত্রীদের সঙ্গে তুমিও এখানে দিন তিনেক কাটিয়ে যাবার সংকল্প করেছ। তাহলে তোমার সঙ্গে চণ্ডালিকা অভিনয়ের পরামর্শ করবার যথোচিত অবকাশ পাওয়া যাবে। এই সময়ে কলকাতা সহরে বা তার নিকটবর্ত্তী কোনো জায়গায় আমার অবস্থিতি লোকের কাছে এত শঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে

যে তাদের মনের শান্তি রক্ষার জন্যে এই নিরেনব্বই মাইল দূরে আমার থাকাই শ্রেয়।— গঙ্গাতীরের একটা বাসার সন্ধান নিতে ছেড়ো না। কুষ্ঠিতে আছে আমার মীন রাশি। জলের বাসার জন্যে মন কেমন করে।

কিছুদিন আগে তিনটে উড়ো টাকা আমার পকেটের মধ্যে ঢুকেছিল। সরস্বতীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে লক্ষ্মী আমার পকেটে বাসা বাঁধতে চিরদিনই আপত্তি করেন। সেই ঈর্ষাপরায়ণা দেবীর অপদৃষ্টির ভয়ে টাকা তিনটে দিয়েছিলেম আমাদের উপায়-সচিবের হাতে। বলেছিলুম চকোলেট কিনে দিতে—আমি মেয়েদের খুসি করব মাঝে মাঝে তাদের হাতে হাতে বিতরণ করে। সেই প্রতিশ্রুত চকোলেটের বাক্স যদি কোনো গতিকে আমার দখলে আসে তাহলে ওরা যখন এখানে আসবে ওদের পুরস্কার দেব এই মৎলব আমার রইল—দেখি শেষ পর্য্যন্ত সেই তিনটে টাকার কী রকম সৎকার হয়।

আর একটা কথা—খুকু যদি দোল উৎসবের সময় এখানে আসতে পারে তাহলে কাজে লাগবে—তার খবর পাবে কিশোরীর কাছ থেকে—যদি আসে তার ভাড়াটা তাকে দেওয়া উচিত হবে।

তোমার অনুপস্থিতিতেই চণ্ডালিকার অনেক কাটা-

ছাটা করতে হয়েছে—তোমার মঞ্জুরির অপেক্ষায় রইলুম। ইতি ৭।৩।৩৮

৭

বাবামশায়

বৌমা

আর চলল না, কাজের ক্ষতি হচ্চে। ভেবেছিলুম দলের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করব কিন্তু তাদের দিনক্ষণ কেবলি পিছতে থাকল। মহাভারত লেখার ভার স্বীকার করে নিয়েছি—অবিলম্বে শুরু করতে হবে। ৭ই তারিখে অর্থাৎ পর্শু সোমবারে শুভক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন জোড়াসাঁকোয় তোমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করে যাব বেলঘরিয়ায়। সুধোড়িয়াকে বোলো যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থেকে যথোচিত নিয়মে আমার অভ্যর্থনা করে।

সেদিন গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে চণ্ডালিকার অভিনয় দেখে বোঝা গেল ওর নাটকীয় নিবিড়তা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বাহুল্য নাচ গান বর্জন করা দরকার বোধ হোলো। সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে যতই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধাজনক। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।

আজ গরমের প্রচণ্ডতা দেখে একটা আসন্ন ঝড়ের প্রবলতার আশঙ্কা করচি। এই ঋতু পরিবর্ত্তনের মুখে পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা চিন্তার বিষয়।

মেয়েগুলোকে পথের মধ্যে রওনা করে দিয়ে মন আমার কিছুতে সুস্থির থাকবে না। উত্তর পশ্চিম কোণে আজ মেঘের ষড়যন্ত্র দেখা যাচ্চে। হঠাৎ হয়তো দিনাবসানে আকাশে কাল বৈশাখীর প্রথম রিহর্স্যল বসবে।

তোমার শরীরের খবর ভালো বলেই শুনতে পাই। আমি যাতে ছায়ার ছায়া না মাড়াই বিবি তাই নিয়ে দোহাই পাড়চে। আমার দেহ বিকার সম্বন্ধে লোকেরা একটা অপরাধী খাড়া করেছে, তাকে অস্পৃশ্য করে তুলে অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছে। ইতি ৫।৩।৩৮

বাবামশায়

(৫৭)　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, চমৎকার জায়গা, বাড়িটা তো রাজবাড়ি—স্পষ্ট বোঝা যায় ছিল ইংরেজের বসতি—তকতক করচে, কাঠের মেঝে, আসবাবগুলো পরিষ্কার, উপভোগ্য,—উপরে নিচে ঘর আছে বিস্তর, বিছানা আনবার দরকার ছিল না। মৈত্রেয়ী যখন বল্‌লে একটা কথা দিতে হবে, ছুটির শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে, কথা দিতে বিলম্ব হোলো না। তাহলে মাঝে মাঝে তোমাকে কিন্তু আসতে হবে। পরীক্ষা করে দেখো শরীর কী রকম থাকে। দুই একদিন থাকলে বোধ হয় খারাপ লাগবে না। এখানে সুরেন সুধাকান্ত সকলেরই অনায়াসে জায়গা হতে পারবে। কালিম্পঙের ঘরের দাবী আমি ছেড়ে দিচ্চি, ওখানে বরঞ্চ অমিতা কিম্বা তোমার কোনো সখীকে আনিয়ে নিতে পারো। তোমার শরীর কেমন আছে লিখো। কেলি সাল্‌ফ্‌ আর ম্যাগনেসিয়া ফস্‌ খেয়ো। তোমার খোকা কুকুরটাকে দিনে তিন চারবার

করে নেট্রম ফস চার বড়ি খাইয়ো। এখানে যত্নের ত্রুটি হচ্চে না। আরো কম হলে চল্‌ত। তোমার জন্যে ভিশি ওয়াটার এক গাড়ি বোঝাই আনিয়ে রেখেছে।

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

[স্থরেল, মংপু] বাবামশায়

(৫৮)

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

না বৌমা, এখানে তোমার এসে কাজ নেই। তোমার শরীরে সইবে না। এখানকার আকাশ বাতাস জলে ভরা— তোমার পক্ষে হয় তো স্বাস্থ্যকর নয়। আমার কোনো অসুখ বা অসুবিধা নেই—ব্যবস্থা ভালোই, সেবাও অক্লান্ত, লোকেরও ভিড় নেই। এখানে লেখার কাজটাও অবাধে চলবে বোধ হচ্চে। মাঝে মাঝে যখন রোদ্দুর ঝলমল করে ওঠে সেটাকে আশার অতীত বলে বোধ হয়। শোনা যায় এই বৃষ্টির উপদ্রব এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—তাই আশা করচি দুর্য্যোগটা সাময়িক। কাল রাত্রে মুষলধারে বর্ষণ হয়ে গেছে, সকালে ঘন কুয়াষায় চারদিক ঢাকা ছিল এখন মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ প্রসন্ন হয়েছে। তোমাদের ওখানেও নিঃসন্দেহ বৃষ্টি বাদল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছে। তোমরা সবাই, বিশেষত তুমি, ভালো আছ আশা করা যাক্। গ্যাণ্টকে যদি যাওয়া স্থির হয় বনমালীকে ভুলো

না। এখানে তার কোনো কাজ নেই, তবু তার মতে কালিম্পঙ এখানকার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। বোধ করি উমেশ ও হরিপদর বিচ্ছেদ মনে অবসাদ এনেছে। সুধাকান্ত যত বকচে তত খাচ্চে না। যদি তোমার দরকার না থাকে সেই হজমি চাটনিটুকু পাঠিয়ে দিয়ো। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

[মংপু] বাবামশায়

(৫৯)   ওঁ   শান্তিনিকেতন

বৌমা

আমাকে ওখানে যেতে লিখেছ। চিঠি আজই পেলুম। সেই ডাকেই খবরের কাগজে দেখা গেল কালিম্পঙের রাস্তা আর দার্জিলিঙের রাস্তায় গতিবিধি বন্ধ। গণৎকার বলেচে দুই এক মাসের মধ্যে আমাকে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করতে হবে। সন্দেহ হচ্চে কালিম্পং যাব উড়োজাহাজে করে। এদিকে বর্ষামঙ্গলের জন্যে পরিশোধের রিহর্সল চলচে, তুমি নেই, তাই চলচে না বলাই উচিত—চালাবার মতো তেজ আমার দেহে মনে নেই।— যথাসময়ে তোমার সেই লেখাটি পেয়েছিলুম। তার নাম দেওয়া যেতে পারে দিলীপী জিলিপী। ওর মধ্যে কিছু ঢাকাঢুকি নেই— বেরলে ডুয়েল লড়াইয়ের আশঙ্কা আছে।

রাস্তা যদি পাই তো নিশ্চয় যাব কালিম্পং—কিন্তু বর্ষামঙ্গলের দলকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারিনে।

মৃণালিনী সাজচে বজ্রসেন—একটুও স্থবিধে ঠেকচে না ভালো লাগচে না। ইতি ২৪।৮।৩৮

বাবামশাই

বৌমা

আজ গান্ধী জয়ন্তী হয়ে গেল। সকালে মন্দিরে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছে। এদিকে কিছু দিন থেকে যে প্রাত্যহিক ঝড় বৃষ্টির আয়োজন হয়েছিল সেটা নিঃশেষ হয়েছে। আজ সকাল থেকে উজ্জ্বল রোদ্দুর— চারদিকে আকাশে ছড়িয়ে পড়া শরতের সাদা সাড়ির আঁচলা ঝলমল করচে। এবার আবার একবার হাওয়ায় লাগবে গরমের ঝাঁজ, তবু তার উগ্রতা অসহ্য হবে না। খেয়ে এসে বসেচি, এখন বেলা এগারোটা—ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্চে—পাহাড়ে চড়ে বসে এখানকার শারদশ্রীর মাধুর্য্য বোধ হয় মনে আনতে পারচ না। আর কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা যখন স্থায়িত্ব নেবে তখন যাব গঙ্গার ধারে—আকাশের সাদা মেঘের সঙ্গে পাল তোলা নৌকোর পাল্লা দেওয়া দেখা যাবে। আমার মন অচল পাহাড়ের দিকে যায় না আমার মন নদীর ধারার সঙ্গে ছোটে—কাল হবে বর্ষামঙ্গল—শান্তির সঙ্গে

রফা করে নিয়েছি—ভালোই হবে।—সেই সিন্ধি মেয়েটি খুব ভালো নাচচে,—নাচে তার খুব উৎসাহ—অনতিকালের মধ্যে এ মেয়েটি রাজনটীর দলে ঢুকবে। এবার যখন অভিযানে বেরবে একে পাবে। এ কারো চেয়ে কম নয়।—মংপুতে যত্নে আদরে থাকবে। আমার ভাগ্যে আদর যত্নের কৃপণতা শোচনীয়। ও জিনিষটা এসিস্টেণ্ট পার্সোনাল সেক্রেটারীর হাত দিয়ে যদি পাবার উপক্রম দেখি তবে সকাতরে থামিয়ে দিতে হয়। ইতি ২১।৯।৩৮

বাবামশাই

(৬১)   ওঁ

বৌমা

তুমি যে কাজের ফরমাস করেচ তাতে মন লাগানো বড়ো শক্ত। পর্বত চূড়ায় বসে তুমি ঠিক কল্পনা করতে পারবে না কী রকম একটা অবসাদের মাকড়ষার জালে জড়িয়ে রেখেছে। কাজ করতে যাই, কেবলি গড়িমসি করতে থাকি। তা ছাড়া তোমার ফরমাসের সঙ্গে আমার সেক্রেটারি সাহেবের প্লানের মিল হচ্চে না। তিনি একটা খুব লম্বা সূচি বানিয়েছেন, টাকার বেড়া জাল ফেলবার উদ্দেশে। ডিসেম্বরের শেষ ভাগ থেকে সুরু করে হায়দ্রাবাদ মৈসোর জামসেদপুর ইত্যাদি ইত্যাদি সহর ঝেঁটাতে ঝেঁটাতে চলতে হবে। তাঁর লক্ষ্য চিত্রাঙ্গদার পরে— দাক্ষিণাত্যে ঐ নাট্যের কোনো পরিচয় হয় নি। নতুন রচনা নিয়ে নতুন জায়গায় পরীক্ষা করতে সাহস হয় না।

আশ্রম এখন শূন্য। অনিল অনিলানী দেশে গেছে।

সুধাকান্ত কলকাতায়। বুড়িকৃষ্ণ আর অমিয় আছে। ইতি ২৮।৯।৩৮

বাবামশাই

শুনচি মমতার শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে।

(৬২)　　　　　　　ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ডাক্তারি বইয়ে হাঁপানি রোগের অধ্যায়টা পড়ে দেখছিলুম। তার মধ্যে একটা কথা দেখলুম সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। লিখেচে পোষা জন্তু-জানোয়ারের সম্পর্ক পরিহার করা কর্ত্তব্য। শরীরের খাতিরে বোধ হয় তোমাকে বাঁদরের মায়া কাটাতে হবে। এ ছাড়া আরো অনেক আলোচনা আছে, typist থাকলে কপি করে তোমাকে পাঠাতুম। ওখানে গিয়ে বোধ হয় টেডি কুকুরের সঙ্গেও আবার তোমার পরিচয় আরম্ভ হয়েছে। এখানে বুড়ি এক কাঠবিড়ালি পুষেচে সে দিনরাত তার আঁচলের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে, মানুষের প্রতি কোনো ভয় নেই, বেশ মজা লাগে দেখতে।

এখানে এতদিনে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেচে। পাখা এখন আর চলে না। রোদ্দুরের রংটি কাঁচা সোনার মতো হয়ে এসেছে, হাওয়া দিচ্চে মৃদুমন্দ,

শিউলি ফুলে ছেয়ে যাচ্চে গাছের তলা। সমস্ত আশ্রম শূন্য প্রায়। তবু বাইরে থেকে ছুটি-সম্ভোগীদের দলের আনাগোনা চলচে।

মহাত্মাজী পুপুকে যে পোষ্টকার্ড লিখেচেন সেটা এই সঙ্গে পাঠাচ্চি। সে ওখানে কেমন আছে। যথেষ্ট বেড়াবার জায়গা না পেয়ে বোধ হয় কিছু বিমর্ষ আছে।

আমি ছোট একটা গল্প লিখেছি—উপার্জ্জন করবার লোভে। শুনে নিশ্চয় যোগাযোগের কথা তোমার মনে পড়বে। অত বড়ো লেখায় হাত দেবার মত সাহস ও সময় নেই। চাকরি নিয়েচি, এবারে তারি দায় বহন করতে হবে। বক্তৃতা লেখা সুরু করতে আর দেরি করা চলবে না—কিন্তু ভালো লাগচে না—ছেলেবেলায় যেরকম ইস্কুল পালাবার জন্যে ছটফট করতুম সেই রকম ভাবটা মনে জাগচে।

আমার অ্যাসিস্টাণ্ট ডাক্তারের পসার বাড়চে। হাতে অনেকগুলি রুগী আছে—এখনো একটাও মরে নি।

তোমাদের শরীর ভালো আছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। বিজয়া দশমী ১৩৩৯

বাবামশায়

(৬৩) ওঁ শান্তিনিকেতন

বৌমা

উদয়নে ডাকাত পড়েছে হাল আমলের দেবী চৌধুরাণী। আমার আশা ছেড়ে দাও। শুনলুম মংপু নামে জায়গায় কোনো বঙ্গ মহিলা হিটলারের অনুকরণ করে Concenttation Camp খুলেছে। আমাকে ভাবতে সময় দিল না—ছোঁ মেরে নিয়ে চল্‌ল—কালিম্পঙের নাম করলে আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দেয়। আমার হাতে এখন পনেরো আনা সম্বল ভদ্রমহিলা তাতেও দমলো না, সেটাও সেই থলিতে পড়বে যাব মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে গরীবের দেড় টাকা। আমার এখন নিঃসহায় অবস্থা, যা ভালো মনে করো কোরো। ইতি

[১৯৩৮] বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, জায়গাটা ঠাণ্ডা সন্দেহ নেই কিন্তু নিচে থেকে যে অবসাদ দেহ বোঝাই এনেছিলুম সেটা এখনো নামাতে পারিনি। এবার বোধ হয় মংপুর নাম রক্ষা হবে না। অন্যান্য বার পাহাড় প্রদেশে কলম চলত ভালোই— এবার সে কোনোমতে খুঁড়িয়ে চলচে। পালে হাওয়া লাগচে না—মন রয়েছে বিমুখ। গল্প এক আধটা লিখব প্রতিশ্রুত ছিলুম—তাই লিখ্‌তে বসেছি—থম্‌কে থম্‌কে লেখা—মাঝে মাঝে অনেকখানি না লেখা ধূসরতা। পাহাড় ডিঙিয়ে শরতের বাঁশির সুর এসে পৌঁছচ্চে শান্তিনিকেতনের নানা রঙের আলপনা দেওয়া দিগন্ত থেকে এখানকার শৈলমালার স্বপ্নে দেখা আবছায়া নীলিমায়। তোমাদের যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি তাতে আস্‌তে বল্‌তে পারিনে। যাক আরো কিছুকাল—যদি সুযোগ ঘটে এসো—স্থানাভাব ঘটবে না—রাত তিনটে পর্যন্ত বাক্যালাপ চলবে। মেয়েদের গৃহ নির্ম্মাণের কথা

লিখেছ, কিন্তু ফাউণ্ডর প্রেসিডেণ্টের বাসার কী খবর? লিখতে ঘাড় ব্যথা করে ক্লান্তি আসে অতএব আশীর্বাদ করে কেদারায় হেলান দিয়ে পড়িগে। ২১।৯।৩৯

[মংপু] বাবামশায়

(৬৫) ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পড়ে মন খুব খুসি এবং নিশ্চিন্ত হয়েছে। অবাধে তোমাদের সংকল্প সিদ্ধ হোক এই কামনা করি। উপসংহারে বিলম্ব না হয় এই ইচ্ছাটাই মনের মধ্যে ঘুরচে।

আমাদের এখানে শীত খুবই তীব্র হয়ে উঠচে—রৌদ্র হয়ে এসেছে বিরল, মেঘে কুয়াশায় আকাশ রয়েছে আচ্ছন্ন। সর্ব্বাঙ্গে এক রাশ কাপড় জড়িয়ে মনে হচ্চে যেন বারো আনা বিলুপ্ত হয়ে আছি। দেহটা মুক্তি কামনা করচে। মোটের উপর স্বাস্থ্য ভালই। এখানে এসে রথীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। এ জায়গায় আছি আর দিন দশেক। ৫ই নবেম্বরে দেব দৌড়। ততদিনে হেমন্তকাল সোনার ধান পাকিয়ে উপভোগ্য হবে। আমার নতুন বাড়ির গাঁথুনি চল্‌চে—তারজন্যে কৌতূহল আছে মনে। বনমালীর জন্যেও উৎসুক আছে মন।

আমার একটা নতুন গল্প শেষ হয়ে গেছে   পুপুকে আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি ২৫।১০।৩৯

বাবামশায়

বৌমা তোমাদের বাড়িটা দেখি। শূন্য হাঁ হাঁ করচে। না আছ তুমি, না আছে রথী—প্রধান ব্যক্তি যে আছে সে হচ্চে নাথু।

নিদারুণ শরতের তাপ আকাশে এসেছে। কৃপণ বর্ষণ কালো মেঘের ভিতর থেকে সমস্ত পৃথিবীকে অভিশাপ দিচ্চে। হংস বলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানস সরোবরের দিকে, মংপুতে মাগুর মাছের সরোবর তীরেও হয় ত শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম। গল্পটা শেষ হয়ে গেছে—এখন তাতে প্লাস্টার লাগাচ্চি।

আজ রাত্রে দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গল হবে। সকালে বৃক্ষরোপণ হয়ে গেছে।

আমার শরীরে ভালো মন্দর জোয়ার ভাঁটা চলছিল। সম্প্রতি ভালই আছি।

মংপুতে যাবার পূর্বে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আহার্যের খরচ সম্প্রতি বেড়ে গেছে।

শাকপাতা খাচ্ছিলুম অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে মাছ মাংস ধরতে হয়েছে। আমার সম্বলের মধ্যে শুনচি তোমার কাছে টাকা দশেক প্রচ্ছন্ন আছে। সেটাতে ক'দিন চলবে জানিয়ো—সেই অনুসারে ওখানকার মেয়াদ স্থির করতে হবে।

মংপবীকে আশীর্বাদ জানিয়ো

[১৯৩৯-১৯৪০] বাবামশায়

(৬৭) ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার কাছে ছেলেমানুষের মতো নালিশ করতে লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু আমাকে তোমরা চাপাচুপি দিয়ে ছেলেমানুষ করে রেখেছ, নিরুপায় ভাবে পরনির্ভরতা বহন করচি। একটা দৃষ্টান্ত দিই। পাহাড়ে আসব, জিনিষপত্রের ভার ছিল কানাইয়ের উপর, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও সতর্ক। হঠাৎ এক সময়ে আলু এসে আমার আসবাবের এক অংশ ঝড়ের মতো ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে গেল। তাই নিয়ে বনমালী নিষ্ফল উদ্বেগ প্রকাশ করছিল। ষ্টেশনে এসেও ও তাদের তাড়া দিয়ে বল্‌লে সব ঠিক আছে। তারপরে এখানে এসে পৌঁছে ক্লান্ত দেহে সমস্ত সকাল বেলা হারানো জিনিষের জন্যে খোঁজ করে আবিষ্কার করা গেল সেগুলো পৌঁছয়নি। তার মধ্যে ওষুধপত্র সাবান প্রভৃতি ছিল, সে জন্যে ভাবি নে, কিন্তু লোকশিক্ষা সংসদের জন্যে পশুপতি ডাক্তারের লিখিত manuscript এবং সুকুমার

সেনের রচিত দুখানা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে। সেই দুখানা বইয়ের মধ্যে একখানা সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হয় নি—আমি সুনীতিকে বারবার আশ্বাস দিয়েছি হারাবার ভয় নেই, এবং, আমি সে বই মন দিয়ে পড়ব।— দোহাই তোমাদের, আমার অভিভাবকের সংখ্যা কমিয়ে দাও; আমার জীবনযাত্রার প্রয়োজন খুব স্বল্প, একজনের উপর দায়িত্বভার দিলে এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে না। আপাতত অন্তত ঐ বই তিনখানা যদি উদ্ধার করে পাঠাতে পার, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। বাকি সমস্ত খবর সুধাসমুদ্রের কাছ থেকে পাবে। ইতি ২২।৪।৪০

বাবামশায়

পরিচয়

অজিত—অজিত কুমার চক্রবর্তী
অজিন—শ্রীঅজিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর
অনিল—শ্রীঅনিলকুমার চন্দ
অপূর্ব—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ
অবন—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমিতা—শ্রীঅজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
অমিয়—ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী
অমিয়র মা—অনিন্দিতা দেবী
অমূল্যবাবু—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বিশ্বাস
অরবিন্দ (পৃ: ৬০)—শ্রীঅরবিন্দ
অসিত—শ্রীঅসিতকুমার হালদার
আত্রাই—ঐ নামের নদীসংলগ্ন স্টেশন
আন্দ্রে—শ্রীমতী আন্দ্রে কার্‌পেলে, ফরাসী চিত্রশিল্পী
আরিয়াম—ই, এইচ, আর্যনায়কম্‌, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক
আলু—সচ্চিদানন্দ রায়
আশা—শ্রীমতী আশা দেবী
উদয়ন—উত্তরায়ণের মূল বসতবাটী
উমেশ—ভৃত্য
একজন মহিলা—ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (বিজয়া)
এসিস্টেন্ট পার্সোনাল সেক্রেটারী—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
ওকুরা—জাপানী বন্ধু
কানাই—ভৃত্য
কালীমোহন—কালীমোহন ঘোষ
কিশোরী—কিশোরীমোহন সাঁতরা

কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানী, মীরা দেবীর জামাতা
কুণ্ড—প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর বয়ন-কলেজের অধ্যক্ষ
খুকু—অমিতা সেন
খোকা—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মীরাদেবীর পুত্র
গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গাঙ্গুলি—প্রমোদলাল গাঙ্গুলি
গোরা—গৌরগোপাল ঘোষ
ঘুরন—ভৃত্য
ছায়া—ঐ নামের চলচ্চিত্রভবন
জ্যোতিদাদা—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
জ্ঞান—শ্রীজ্ঞান গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা
ডাল—হগম্যান, আন্দ্রে কার্পেলের স্বামী
তোমার মা—বিনয়িনী দেবী
তোমার মাতুল
তোমার মামাশ্বশুর } শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিপু—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধীরেন (পৃ: ৫৫)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দেববর্মা
ধীরেন (পৃ: ১০১)—ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন
নগেন (পৃ: ১০, ১৬, ২০)—কনিষ্ঠ জামাতা, ডক্টর নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
নীতু—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
নীলমণি—ভৃত্য বনমালী, রহস্যচ্ছলে উক্ত
নুটু—রমা দেবী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী
পতিসর—ঠাকুরবাবুদের জমিদারী কাছারি

পশুপতি ডাক্তার—ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য
পিসিমা—রাজলক্ষ্মী দেব্যা, যশোরের সম্পর্কে কবিপত্নীর পিসিমা
পুনশ্চ—শান্তিনিকেতনের অন্যতম বাসভবন
পুষ্প—পুপের কাল্পনিক বন্ধু
পুপে—শ্রীমতী নন্দিনী দেবী
প্রতাপ—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র তলাপাত্র, কর্মচারী
প্রতিমা—শ্রীমতী প্রতিমা গাঙ্গুলী, মীরা দেবীর জা
প্রভাত—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক
প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
ফাউণ্ডর প্রেসিডেণ্ট—কবি স্বয়ং
বঙ্গমহিলা—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
বড়দাদা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বড়দিদি—সৌদামিনী দেবী
বব্‌লি—মাদ্রাজের ববিলির রাজা
বসনেক, মিস্—শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনের প্রাক্তন ফরাসী পরিদর্শিকা
বামনজি—বোম্বাইয়ের এস. আর. বমনজী
বিচিত্রা—জোড়াসাঁকোর নিজস্ব বাসভবন
বিনয়িনী—বিনয়িনী দেবী, গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী
বিবি—শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
বুড়ী—শ্রীমতী নন্দিতা দেবী
বুর্ডেট, মিস্—মার্কিন মহিলা
বেলা—মাধুরীলতা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা
ভাইস্‌রয়—লর্ড আরুইন
ভিক্টোরিয়া—কুমারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো
মংপবী—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, মংপু-বাসিনী

মমতা—শ্রীমতী মমতা দেবী, জগদানন্দ রায়ের নাতিনী
মীরা—শ্রীমতী মীরা দেবী, কনিষ্ঠা কন্যা
মুকুল—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে
মোবারক—ভৃত্য
রাণী (পৃ: ৫৮)—শ্রীমতী রানী মহলানবিশ,
        শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী
রাণী (পৃ: ১২৪)—শ্রীমতী রানী চন্দ, শ্রীঅনিল কুমার চন্দের পত্নী
রাণু—স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ
রোটেনস্টাইন—উইলিয়ম রোটেনস্টাইন, বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী
লীলমণি—ভৃত্য বনমালী, রহস্যচ্ছলে উক্ত
লেনার্ড—এল. কে. এলমহর্স্ট
বনমালী—ভৃত্য
শান্তি (পৃ: ৭৩)—শ্রীশান্তি গঙ্গোপাধ্যায়,
        শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা
শান্তি (পৃ: ১২১)—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
শাস্ত্রীমশায়—মহামহোপাধ্যায শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
শিলাইদহ—কুষ্টিয়ায় ঠাকুরবাবুদের তদানীন্তন জমিদারী কাছারি
সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র,
        প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী
সমর—শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ঠাকুর
সুধাকান্ত—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুধাসমুদ্র—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুধী—ভৃত্য
সুধীরঞ্জন—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কলিকাতা
        হাইকোর্টের এডিশন্যাল জজ
সুধোড়িয়া—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী
সুনন্দা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা

সুনীতি—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
স্কুলের ডাক্তার—ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সুরেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
সুহৃৎ—ডাক্তার সুহৃৎনাথ চৌধুরী
সেক্রেটারি—শ্রীঅনিল কুমার চন্দ
হরিপদ—ভৃত্য
হারা-সান—প্রাক্তন জাপানী ছাত্রী
হেমলতা—শ্রীহেমলতা ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ

Barcode - 4990010051931

Title - Chithipatra Vol. 4

Subject - LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE

Author - Tagore, Rabindranath

Language - bengali
Pages - 260
Publication Year - 1943
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 051931

চিঠিপত্র

BURRABAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৫০

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
২১০০

জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত

মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত এই কয়খানি মাত্র চিঠির সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

BAGHBAZAR READING LIBRARY
Call No. ৭ ১৪৪
Accession No. ৩৪৭
Date of Accn. ২৮-১২-৫২

শিলাইদা
নদীয়া
[চৈত্র ১৩১৮

বেল্, শরীরটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল সেই সেবারে বিলাতে যাবার আগে একদিন হঠাৎ যেমন একেবারে ভেঙে পড়েছিলুম আবার তেমনিতর হবে—তাই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম গোছানো গাছানো সমস্ত ফেলে একেবারে এক দৌড়ে পদ্মার কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। যেমনি এসেছি অমনি আমার সেই ভয়ঙ্কর ক্লান্তি এক মুহূর্ত্তে কোথায় দূর হয়ে গেছে। পদ্মা আমাকে যেমন করে শুশ্রূষা করতে জানে এমন আর কেউ না। এতদিন চারদিকে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি না করে যদি এইখানে স্থির হয়ে পদ্মার কলধ্বনিতে কান পেতে চুপচাপ পড়ে থাক্‌তে পারতুম তাহলে ভারি উপকার পেতুম— এবারে এখানে এসে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারচি।

সেদিন আমাদের ওখানে রাত করে এবং নানা অনিয়ম করে তোর শরীর ত খারাপ হয় নি? আমার মনে সেদিন সেই উদ্বেগ ছিল। তোর জন্যে আমার একটা হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ মনে পড়চে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বি? Sulphur 200— এই চিঠির মধ্যে এক পুরিয়া পাঠাচ্চি। বিকেলে তোর যে হাত

পা জ্বালা করে জ্বর জ্বর বোধ হয় সেটা এতে সারবে বলে আমার বিশ্বাস। যদি খেয়ে উপকার বোধ করিস্ তবে আমাকে বলিস্ আবার ৮।১০ দিন পরে আর একবার দেব।

তুই যদি একবার কিছুদিনের জন্য এখানে বোটে এসে থাক্‌তে পারতিস্ তাহলে তোর বিশেষ উপকার হত—আর আমিও কত খুসি হতুম সে বল্‌তে পারিনে। কিন্তু তোর বোধ হয় কিছুতেই নড়া হয়ে উঠ্‌বে না। একবার ৫।৬ দিনের জন্যেও যদি আসতে পারিস তাহলে নিশ্চয়ই তোর শরীর ভাল হবে।

বাবা

[২]　　　　　　　　ওঁ　　　　　　　　[পোস্টমার্ক
Paris, 15 Juin '12]

বেল, কাল মার্সেল গিয়ে পৌঁছব। সমুদ্র যাত্রাটা নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেছে। কাল একটু ঝোড়ো ছিল— বৌমার একটু মাথা ঘুরেছিল আমার ত কোনো কষ্ট বোধ হয় নি। সোমেন্দ্রটা বরাবর খুব কসে boiled ham খেয়ে পর্শু থেকে সাগু খাচ্চে। সে জ্বর করে বসেছে। আজ ভাল হয়েই আবার টেবিলে গিয়ে boiled ham সুরু করেছে। এ'কেই বলে ক্ষত্রিয় বালক। কালই ট্রেনে চড়ে লণ্ডনে রওনা হব— পর্শু পৌঁছব।

বাবা

[৩] [পোস্টমার্ক

Hampstead, London

12 June '12]

বেল, লণ্ডনে এসে ত পৌঁচেচি। সমুদ্রে শেষ দুদিন খুব নাড়া খেয়ে নিয়েছি এখন ডাঙায় নাড়া খাবার পালা। বাসার সন্ধানে ঘোরা যাচ্চে। একটা ছোট বাড়ি নিয়ে নিজেদের ঘরকন্না পাতবার চেষ্টা চল্‌চে। কেদারকে পাকড়ানো গেছে, তাকে নিয়ে রথী ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি এখানে খুব লোকজনের পাকের মধ্যে পড়ে গেছি, যথেষ্ট টানাটানি চল্‌চে। শরীর নিতান্ত মন্দ নেই। একজন ভাল ডাক্তারকে দেখাতে হবে। তোদের খবর কি ?

বাবা

[৪] ওঁ 508 W. High Street
Urbana, Illinois
U. S. A.
[পোস্টমার্ক
Cambridge, Feb 19 1913]

বেল,

তোর শরীর তেমন ভাল নেই শুনে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। তোকে চিঠি লিখে ত উত্তর পাইনে আর কারো কাছ থেকেও খবর পাবার সুবিধা হয় না। মাঝে মাঝে এক একটা পোষ্টকার্ডে তোদের খবর দিস্। শরতের শরীর আজকাল কেমন আছে লিখিস্।

আমেরিকায় এসে অবধি আমি অনেকদিন আর্ব্বানা বলে একটি ছোট্ট সহরের এক কোণের ঘরে চুপচাপ করে পড়ে ছিলুম— কারো কাছে ধরা দিই নি। কিন্তু এ দেশের লোকের ভয়ানক বক্তৃতা শোনবার সখ। তাই এখানে এরা আমাকে ক্রমাগত বক্তৃতা করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে। প্রথম প্রথম অবিচলিত ছিলুম— কেননা, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করতে গেলে কোনোমতেই নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারব না— সেই জন্যে চাণক্যের উপদেশ স্মরণ করে একেবারে মুখ বন্ধ করে সুগম্ভীর হয়ে বসে ছিলুম। অবশেষে

আর্ব্বানায় Unity Club বলে একটি ক্লাবে কিছু বলবার অনুরোধ এড়াতে পারা গেল না। ক্লাবটি ছোটখাট— তেমন দুর্দ্ধর্ষ গোছের নয়, তার সভ্যসংখ্যা সামান্য সেইজন্যে কোনোমতে রাজি হওয়া গেল। তার পরে একটা প্রবন্ধ লিখে সেখানে গিয়ে দেখি লোকে হল ভরে গিয়েছে— তখন পালাবার পথ বন্ধ। প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে সকলেই বাহবা দিতে লাগ্‌ল। এতে আমার সাহস জন্মে গেল। একে একে পাঁচটা প্রবন্ধ তাদের সেই সভায় পাঠ করেছি। তার পর থেকে কেবলি বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পাওয়া যাচ্চে। শিকাগো য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতা করে আমার ভয় একেবারে ভেঙে গেছে। রচেষ্টারে Religious Liberals দের একটা বার্ষিক কন্‌গ্রেস সভা ছিল সেখানে কুড়ি মিনিট সময়ের মেয়াদে Race Conflict সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার ফরমাস পেয়েছিলুম। রচেস্টার বষ্টন সহরের কাছে। মনে করলুম যখন এতদূরেই আসা গেল তখন বষ্টনটা সেরে যাওয়া যাক। বষ্টনে এখানকার হার্ভার্ড্ য়ুনিভর্সিটি বলে সব চেয়ে বড় য়ুনিভর্সিটির স্থান। আপাতত এইখানে এসে পৌঁছন গেছে। কাল একটা বক্তৃতা দিয়েছি— আরো তিনটে দিতে হবে। তার পরে কোথায় যাব কি করব কিছুই ঠিকানা নেই।

আর যাই হোক্ এখানে একটা সুবিধা এই দেখা যাচ্চে শীতকালের দিনেও যথেষ্ট রোদ্দুর পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সেটি হবার জো ছিল না। সেখানে গরমির দিনেই যে কয়মাস ছিলুম

প্রায় রোজই বৃষ্টিবাদল গিয়েছে। কিন্তু এখানে শীত সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি— বরফে প্রায় সমস্ত ঢাকা পড়ে আছে— কিন্তু তার উপরে যখন রোদ্দুর পড়ে তখন সে দেখতে খুব ভাল লাগে। চার দিক একেবারে ঝলমল করতে থাকে। আর্ব্বানায় যখন ছিলুম তখন একদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়ে সেই বৃষ্টির জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল— রাস্তার ধারের গাছপালা যেন কাঁচ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল— সেই বরফের ভারে মাঝে মাঝে গাছের বড় বড় ডাল মড়মড় করে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। সমস্ত রাস্তার উপরে পুরু বরফ— তার উপর দিয়ে চলা শক্ত— পা পিছলে পড়ে যেতে হয়— অনেককেই পড়তে হয়েছিল। আমি পড়বার ভয়ে সাহস করে বাড়ি থেকে বেরতেই পারতুম না। শেষকালে দু তিন দিন বাড়িতে কয়েদির মত বন্ধ থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লুম। অল্প একটু দূর গিয়েই পতন। পথে লোক প্রায় ছিল না। কেবল এক জন মাত্র পথিক আমার পিছন পিছন আসছিল। নিজের দেহভার সামলাতেই তাকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হয়েছিল— কাজেই তার আর হাসবার সময় ছিল না। আর এক পা অগ্রসর হবার উৎসাহ আমার রইল না। সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরলুম— তার পরে যে পর্য্যন্ত না বরফের পাষাণ হৃদয় সম্পূর্ণ বিগলিত হল সে পর্য্যন্ত আর আমার কোণের থেকে বেরই নি।

এখানে আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে পড়বামাত্রই ধীরে ধীরে নানাবিধ বন্ধুবান্ধব জুটচে। এখানকার একজন সুবিখ্যাত

কবির বিধবা স্ত্রী Mrs. Moodyর বাড়িতে আমরা শিকাগো সহরে অতিথি ছিলুম। তিনি আমাদের খুব যত্ন করেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর এমনি জমে গিয়েছে যে তিনি আমাদের আর ছাড়তে চান না। হপ্তাখানেকের জন্যে আমরা নিউইয়র্কে এসেছিলুম, সেখানে তিনি আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে রেখেছিলেন। বষ্টনেও ত ন আসবেন। তাঁর মধ্যে ভারি একটি স্বাভাবিক মাতৃভাব আছে।

এখানে একটা জিনিষ খুব আমার মনে লাগে— এখানে, অন্তত পশ্চিম আমেরিকায়, প্রায় সকল অবস্থার মেয়েদেরই নিজের হাতে সমস্ত ঘরকরনার কাজ করতেই হয় কেননা এখানে চাকর দাসী পাওয়া অসম্ভব বল্লেই হয়। রাঁধা, বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসনমাজা সমস্তই প্রায় গৃহকর্ত্রীরা করেন— অনেক সময় গৃহকর্ত্তাদের তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়। কিন্তু কাজ করবার এত রকম সুবিধা আছে যে তাতে যথাসম্ভব ভার লাঘব করে। রান্না গ্যাসের উনুনে হয়— তাতে কষ্ট নেই— অনেক কাজ ইলেকট্রিসিটির সাহায্যেই চলে যায়। এ সমস্ত সুবিধা এখনকার দিনে আমাদের দেশে চালানো অসম্ভব নয়— যদি তা করা যায় তাহলে চাকরদের অধীনতা থেকে অনেক পরিমাণে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। বৌমাকেও দীর্ঘকাল সমস্ত কাজ করতে হয়েছিল—অবশেষে দুজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র বেতন এবং খোরাকি নিয়ে তাঁর এই সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করে দিচ্ছিল। এ দেশের গরীব ছাত্ররা এরকম সামান্য কাজে

কিছুমাত্র অপমান বা লজ্জা বোধ করেনা— তারা হোটেলে খানসামারও কাজ করচে পড়াশুনাও দিব্যি চালাচ্চে। অনেক সময় যে সব ছাত্রের সঙ্গে তারা একত্রে পড়ে তাদেরই সেবকতা করে তারা নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশে হলে মুখ দেখাতে পারত না। তোর সেবকদের খবর কি? সেই তোর বাবুর্চ্চি আছে ত? তার ছেলের খবর কি? দাসীর সুবিধা করতে পেরেছিস? এবারকার এগারই মাঘ কি রকম হল এখনো তার সংবাদ পাই নি— আর হপ্তাদুয়েক পরে ফাল্গুনের মাঝামাঝি তার সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাবে। এগারই মাঘের দিনে এবার আমরা পথের মধ্যেই ছিলুম। অনেকদিন পরে আমার এগারই মাঘ বাদ পড়ল। ৭ই পৌষের ভোরের বেলায় আমাদের আর্ব্বানার শোবার ঘরের একটি কোণে আমরা পাঁচটি বাঙালীতে উৎসব করেছিলুম। ভিড় ছিলনা— কিন্তু বেশ ভাল লেগেছিল।

বাবা

[৫] ওঁ

Hotel Earle
103, Waverly Place
New York [1]

[পোস্টমার্ক
March 3, '13]

বেল,

প্রায় এক মাসের উপর আমরা ঘোরাঘুরি করে বেড়ালুম। অনেক পাঠ বক্তৃতা আলাপ পরিচয় ইত্যাদি সেরে আজ বিকেলের ট্রেনে আবার আমাদের আর্ব্বানার কোটরের মধ্যে আশ্রয় নিতে চলেছি। সেখানকার মেয়াদও খুব লম্বা নয়। মনে করচি আগামী এপ্রেলের ১৭ই তারিখে আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি দেব। সেখানে আমার বই ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক নতুন তর্জ্জমা হাতে জমেছে। সেগুলো এখানকার লোকদের ভাল লাগ্‌চে— সুতরাং বই আকারে ছাপা হলে মন্দ হবে না। ইংলণ্ডের ম্যাকমিলান কম্পানি আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে বলে কথাবার্ত্তা চল্‌চে। এই সব বই ছাপার কাজ সারতে যে আমার কতদিন হবে তা বুঝতে পারচি নে। অন্তত

---

[1] চিঠির কাগজের উপরে মুদ্রিত ঠিকানা।

আগামী শরৎকাল পর্য্যন্ত হয় ত এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে লেগে থাকতে হবে। তারপরে সম্ভবত শীতের আরম্ভে আমি দেশে ফিরে যাবার আয়োজন করব। আমার খুব ইচ্ছা ছিল জাপান চীন জাভা ব্রহ্মদেশের পথ দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে ফিরব— ··· আবার [?] যে কোনোদিন এ পথে আস্‌তে পারব এমন আশা করিনে। কিন্তু এ যাত্রায় সে আর ঘটে উঠল না। যদি কোনোমতে সময়ের ও অর্থ-সামর্থ্যের সুবিধা করতে পারি তাহলে সাইবীরিয়ান রেলপথ দিয়ে জাপানে গিয়ে সেখান থেকে ভারতবর্ষে যাব এই রকম সংকল্প মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উদয় হচ্চে— কিন্তু এটাকে বেশ সম্ভবপর বলে ঠেকচে না অথচ প্রস্তাবটা আমার কাছে খুব লোভনীয় বোধ হচ্চে— যদি ঘটে ওঠে ত ভালই, যদি না ঘটে ত কল্পনা করতে আরাম আছে।

এ পর্য্যন্ত এখানে শীত খুব প্রবল হয় নি— বরাবর সূর্য্যালোক ভোগ করে এসেছি। মার্চ্চ মাস পড়েছে— এখন বসন্তের অভ্যুদয় হবার সময় এল— কিন্তু বিদায়ের সময় শীত আপনার তূণ নিঃশেষ করে শেষ ব্রহ্মাস্ত্র বর্ষণ করে যাবে এই রকম ভাবখানা দেখ্‌তে পাচ্চি। গত তিন চার দিন থেকে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে— প্রায় ক্রমাগতই বরফ পড়চে, আর কন্‌কনে বাতাস দিচ্চে। এমেরিকার সুবিধা এই যে বরফ পড়ুক আর শীতই হোক্, সূর্য্যালোকের অভাব হয় না— সেইজন্যে শীতটা এখানে কাটিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব আরামের হয়েছে। গত

গ্রীষ্মের দিনেও ইংলণ্ডে আমরা ক্রমাগত বৃষ্টি পেয়েছিলুম, আশা করচি এবারকার গ্রীষ্মে দেবতা আমাদের পক্ষে অনুকূল হবে। যদি চিঠি লিখিস্ এখানকার ঠিকানায় লিখিস্‌নে— ইংলণ্ডের ঠিকানা :—

C/o. W. Rothenstein Esq., 11 Oak Hill Park,
Hampstead, London N. W.

বাবা

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমীরা দেবীকে লিখিত

[১] ওঁ গিরিডি

মীরু

আমি বোধ হয় আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই কলকাতায় যাব। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেই দিন থেকেই একটা লেখা নিয়ে ঘাড়মোড় ভেঙে পড়েছি। আজ সেই লেখাটা শেষ করে ফেলে আজই দৌড় দিতে হচ্চে। আস্‌চে শনিবারে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদে এটা পড়তে হবে। ইতিমধ্যে এখানেও আমাকে একদিন মুখে মুখে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাছাড়া লোকজনের দেখাশুনার উৎপাত এখানেও নিতান্ত কম নয়। এদিকে কদিন ধরে খুবই দুর্যোগ চলচে— ঝড়বৃষ্টি বাদলা প্রায় লেগেই আছে। সেইজন্যে শীতও কিছু কম পড়ে আবার রীতিমত কনকনিয়ে উঠেছে। আজও আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। আমার যাবার সময় যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহলেই আমাকে মুস্কিলে ফেলবে। বল্‌তে বল্‌তেই খুব বাতাস দিয়ে বৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। শীতের সময় এ রকম বাদলা ভারি বিশ্রী লাগে। আশা করচি আমি যাত্রা করবার পূর্ব্বেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোদের প্রাইজের জিনিষপত্র কি ভাবে পৌঁছল জানবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। শৈলেশকে যে-সব বই পাঠাতে লিখেছি তা পাঠালে কিনা কে জানে? খেলনাগুলো কি ভাঙাচোরা

অবস্থাতেই পৌঁচেছে? সেখানকার কারো কাছ থেকে কিছু পেলিনে? শুনতে পাচ্চি মেজ বৌঠান কিছুদিনের জন্যে বোলপুরে যাবেন। খুশি বৌমাও তাঁর সঙ্গে যাবেন বলে আমাকে চিঠি লিখেচেন। বোলপুরেরও যদি এখানকার মত ঝোড়ো অবস্থা হয় তাহলে তাঁরা মুষ্কিলে পড়বেন। সেদিন বোলপুরে ঝড় বৃষ্টির সময় বিদ্যালয়ের কুয়োর কাছে একটা উঁচু খুঁটির উপরে বজ্র পড়েছিল। সে সময়ে পিসিমার না জানি কি রকম অবস্থা হয়েছিল। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ২২শে মাঘ ১৩১৩

বাবা

২।

[শান্তিনিকেতন
ফাল্গুন ১৩১৭]

মীরু

তোরা শিলাইদহে গিয়ে তোদের ঘরকন্না গুছিয়ে নিচ্চিস্ শুনে খুব খুসি হলুম। দূরে তোদের বাড়ি হলে সুবিধা হবে না। বিশেষত তোর পক্ষে যাতায়াত করা চলবে না—পাল্কী করে রোজ আনাগোনা করা ত সহজ ব্যাপার নয়। তোরা কাছাকাছি বাড়ি করে থাকলেই বেশ ভাল হবে। তোদের বাড়িটা কি রকম প্ল্যানে করবি জানতে ইচ্ছা করচে। এমন যেন না হয় যে বর্ষার সময় damp হয়ে তোদের অসুখ হয়। সেইজন্য গোড়াতেই ভিতটা যাতে damp-proof হয় সেই রকম করা কর্ত্তব্য। ভিত যদি ছাই বালি দিয়ে ভরাট করা যায় তাহলে damp কৈশিক আকর্ষণে উপরে উঠ্তে পারে না। তাছাড়া ইঁট গাঁথার সময়েও এমন উপায় নিতে হবে যাতে damp উপরে না উঠ্তে পারে।

রাজা অভিনয়ের রিহার্সল চলচে। কিন্তু শীঘ্র যে হয়ে উঠ্বে এমন আশা হচ্চে না। বড় শক্ত। শুনে হয় ত খুব এক চোট হাস্বি অজিত সুদর্শনা সাজবে। তাকে খুব করে মেজে ঘষে পরচুলো পরিয়ে ঢেকে ঢুকে কোনোমতে কাজ চালিয়ে

নিতে হবে। অন্ধকারের Sceneএ কোন মুস্কিল নেই—কিন্তু আলোর Sceneএ কি রকম effect হয় বলা যায় না। কিন্তু উপায় নেই। আর কোনো ছেলে সুদর্শনার part অভিনয় করতে পারবে না।

শৈল বৌমার সঙ্গে আমার প্রায় দেখা হয় না—সে নীচে বাংলায় থাকে আমার কাজ ফেলে যেতে পারিনে। সন্তোষের মা বুধবারে এসে শিশুবিভাগের দোতলা বাড়িতে থাকবেন—তখন বৌমার সঙ্গে দেখাশোনা চেনাপরিচয় হতে পারবে।

জ্ঞান এখানে বেশ ভালই আছে। সে আমাদের Science class পড়ায়। কিছুদিন এখানে থাকলে নিশ্চয়ই সে এখান থেকে আর যেতে চাইবে না।

তোরা একটু নিয়মিত পড়াশুনো করতে ভুলিসনে। নইলে মনের সুরটা ক্রমেই নেবে যাবে।

বেয়ানের আমাদের শিলাইদা কেমন লাগচে ? তাঁকে আমার নমস্কার জানাস্।

ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন।

বাবা

[৩] [শান্তিনিকেতন

চৈত্র ১৩১৭]

মীরু

তোর চিঠি এইমাত্র পেলুম। পয়লা বৈশাখের উৎসবের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হচ্চে। বোধ হচ্চে অনেকে আসবেন। রামানন্দ বাবুর মেয়েরা এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়ে বোধ করি এসে পড়বেন। আমাদের আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের এই যোগটি আমার খুব ভাল লাগে। এতে মেয়েদেরও বেশ উপকার হচ্চে বলে বোধ হয়। তোদের ওখানে যেমন কাব্যগ্রন্থের ক্লাস বসে গেছে আমাদের এখানেও তেমনি বসেছে। রোজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর অধ্যাপকেরা আসেন আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা [করে] তাঁদের শোনাই— দেখি তাঁদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন। অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে— কোনো দিন আমি সময় ঠিক মনে রাখতে পারিনে— আমার চিঠির তারিখের সঙ্গে পাঁজির তারিখের সর্ব্বদা কি রকম অনৈক্য হয় সে তো তোরা জানিস্—

ইস্কুলে ইতিহাসে কোনোদিন আমি খ্যাতিলাভ করতে পারিনি। আমার ত এই মুস্কিল অতএব আমার জীবনচরিত তারিখ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়েই প্রকাশ হবে।

উমাচরণ অনেক চেষ্টায় নিজের যোগ্য একটি পাত্রী জুটিয়েছিল— কিন্তু উপযুক্ত পণ জোটাতে পারেনি। পাত্রীর বয়স তিন বছর সুতরাং তিনশো টাকার কমে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়— আরো দুই এক বছর বয়স কম হলে বোধ করি সেই পরিমাণে দামও কম হতে পারত। কিন্তু উমাচরণ অনেকদিন ব্রাহ্ম বাড়িতে কাজ করচে বলে বাল্যবিবাহের প্রতি তার আন্তরিক বিদ্বেষ। এইজন্যে সে অতি কঠোর পণ করেচে যে তিন বছরের কম বয়সের মেয়েকে সে কোনো মতেই বিয়ে করবে না— মরে গেলেও না— তার এই সাধু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেচি— কত দুমাস তিন মাসের মেয়ে তাদের মার কোলে শুয়ে চীৎকার শব্দে কাঁদচে কিন্তু সে কান্নায় সে কিছুতেই কর্ণপাত করচে না— এমনি ওর হৃদয় পাষাণের মত অটল— কত সদ্যোজাত নবনীতকোমলা কুমারী দুই চক্ষু মুদ্রিত কোরে অহোরাত্রি ধ্যান করচে কিন্তু তাদের সেই তপস্যার প্রভাবও উমাচরণের হৃদয়কে লেশমাত্র বিচলিত করতে পারচে না— ওর এই চরিত্রবল দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেচে। তার এই সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ তোরা যদি আপনা আপনির মধ্যে তিনশো টাকা কোনোমতে চাঁদা করে তুলতে পারিস্ তাহলে এই একটি তিন বৎসরের বয়স্থা মেয়ের আইবড়দশা ঘুচে যায়—

বৌমাকে বলিস তাঁদের উচিত গয়না বিক্রি করেও এই সৎকার্য্যটি করা।

পর্শুদিন রথীকে লিখেছিলুম কোনো লোক দিয়ে ওখান থেকে পয়লা বৈশাখের জন্য ওখানকার তরমুজ খরমুজ ইত্যাদি পাঠাতে— অত্যন্ত সহজে ও সস্তায় কাজ সারবার এই অসামান্য দৃষ্টান্তে এখানকার লোকের আমার বুদ্ধির প্রতি এমন একটু শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েচে যে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছি। আমার এই অনুরোধটা রথী যদি কাজে পরিণত করে তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষত দেখ্‌তে পাচ্চি আমার জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে একটা আলোচনা চল্‌চে এই সময়ে যদি শিলাইদহ থেকে বোলপুরে তরমুজ ও ফুটি এসে পড়ে তাহলে সেই কীর্ত্তিটা হয়ত কারো অমর লেখনীর দ্বারা অবিনশ্বরভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব তোর দাদাকে লিখিস্ খবরদার যেন তরমুজ না পাঠায়।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হবে ২৬শে বৈশাখে। তখন তোদের ওখানে বোধ হয় রীতিমত গরম পড়বে। বড়দাদা হেমলতা ও কমল পুরীতে যাচ্চেন। কিন্তু ছুটির সময় দিনুকে আমার কাছে না রাখলে নিশ্চিন্ত হতে পারব না। তাই, যদি আমি সে সময় শিলাইদহে যাই তাহলে দিনুকেও সেখানে আমার সঙ্গে নেব। সেখানে তাকে স্থান দেবার কি বিশেষ অসুবিধা হবে? ইস্কুলের আর কোনো ছেলেকে আমি নিতে চাইনে।

পটল পুরীতেও যেতে পারে। কিন্তু অরবিন্দ এবার হয়ত আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইবে না। দিনুকে নীচে পশ্চিমের দিকের দক্ষিণের ঘরটাতে এবং অরবিন্দকে মাঝের হলে বোধ হয় রাখা চলবে। আমি ত তেতালায় থাকব। সেখানে যদি একটা bathroom ছোটখাট রকম তৈরি হয় তাহলে দিনুকেও আমার তেতালার ঘরে আর একটা খাট দিয়ে অনায়াসে রাখা যেতে পারবে। রথীর সঙ্গে এই বেলা পরামর্শ করে সমস্ত ঠিক করিস্। তোরা কে কোথায় আছিস্ আমি ত কিছুই জানিনে— কিন্তু তোরা নিজেদের কিছুমাত্র disturb করিস্‌নে যেন।

বাবা

বৌমাকে আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাস্ এবং তোরাও গ্রহণ করিস্।

[৪]

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩১৭]

মীরু

গোলেমালে অনেকদিন তোর চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। কিছুদিন থেকে নানা ব্যাপারে নানা প্রকারে ব্যস্ত হয়ে ছিলুম। এখনো চলচে। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে। আমার জন্মদিনে ছেলেরা উৎসব করবে বলে আর একটা হাঙ্গাম চলচে। সেদিন এরা “রাজা” আবার অভিনয় করবে। তাছাড়া আরো কি কি উৎপাত করবার মৎলব আছে— ওর পূর্ব্বে কোথাও পালাতে পারলে ভাল হত।

তোদের ওখানে লট্‌কানের গাছ আছে, রথীকে বলে এক প্যাকেট লট্‌কান পাঠিয়ে দিস্ তো। থিয়েটারের সময় ছেলেরা কাপড় রঙাতে চায়।

এখানে তো প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদল হয়ে এ পর্য্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা আছে। তোদের ওখানে কি রকম? তোরা কি বাগান করিস? আমরা যেরকম দেখে এসেছিলুম তার থেকে কিছু বদল হয়েছে কি? তোদের আলুর ক্ষেত থেকে আলু কত পেলি? চৈতালি ফসলই বা কি রকম হল? আমাদের আম বাগানে খুব আম ধরেছে। তোদের আমের অবস্থা কি রকম?

লিচু গাছে বিস্তর ছোট ছোট লিচু ধরেছিলো কিন্তু আমাদের একটা হরিণ আছে সে এসে লিচুগুলো প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেল্লে— সফেটা গাছের নীচু ডালে যত সফেটা হয়েছে সেও আর রাখা যাচ্চে না। হরিণটা খুব পোষা বলে ওকে বাঁধতে ইচ্ছা করে না। আজকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। তাঁরা আশ্রমে এসেছিলেন— এখানকার সঙ্গে তাঁদের খুব একটা শ্রদ্ধার যোগ হয়ে গেছে। এবার কলকাতায় গিয়ে উপরি উপরি তিন দিন তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলেছিল। বোধ হয় পয়লা বৈশাখে তাঁরা এখানে আসবেন।

তোদের পড়াশুনা কি রকম চলচে? তুই বুঝি Botany পড়তে আরম্ভ করেছিস্? কেমন লাগচে? বৌমার পড়া এগোচ্চে ত? তোর বন্ধু Miss Bourdatteও তোদের খুব নিন্দে করে দিব্যি তোদের টাকায় পেট ভরিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেছে। Yankeeদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো কেন?

তোরা মাঝে মাঝে কখনো নদীতে বেড়াতে যাসনে? উমাচরণ কলকাতায় ফিরেছে এই একটা সুসংবাদ— তার বিয়ে হয়নি এই আর একটা। আগামী সোমবারে শুনচি এখানে তার শুভাগমন হবে। কি রকম অভ্যর্থনা করা যাবে তাই ভাবছি।

বাবা

তোর মামা কিম্বা মামাশ্বশুরকে বলিস সেই বাউলদের গান আমাকে শীঘ্র সংগ্রহ করে পাঠাতে। দেরি না করে।

১৫

ওঁ

[পোস্টমার্ক
Santiniketan
1 Aug 11]

মীরু

অনেকদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। রথী তোদের Ball এর Astronomy পড়ে শোনাচ্চেন? ও বইটা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আমার আহারনিদ্রা ছিল না। বৌমারও বোধ হয় খুব ভাল লাগচে। Fairy Land of Science বইটা থেকে তাঁকে কিছু পড়ানো হচ্চে কি? সে বইটা থেকেও তিনি অনেক শিখ্‌তে পারবেন। তাঁর দেখলুম Science এর দিকে খুব একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাঁর মাষ্টার মশায় কালকায় দৌড় দেওয়াতে করে তাঁর পড়াশোনার কিছু ক্ষতি হচ্চে না ত? তুই তাঁকে পড়াস্‌নে কেন? তোর শরীর এখন ভাল আছে তো? তোর মেজমা তোকে তাঁর কাছে রাঁচিতে রাখবার প্রস্তাব আমাকে জানিয়েছেন। সে জায়গাটি খুব ভাল—তোর বেশ ভাল লাগবে—শরীরও ভাল থাক্‌বে। জ্যোতিদাদার কাছে স্বরলিপি এবং গান শিখতে পারবি। জানিনে নগেনের সঙ্গে তাঁর এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়েছে কিনা। নগেন নিশ্চয় এতদিনে শিলাইদহে

ফিরেচে। কিন্তু তোরা তো জলে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোদের নগেন ধরবে কোথায়? তোর মামার খবর কি? আমি চলে আসাতে বেচারার খুব কষ্ট হয়েছে— মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তার সদালাপ হত— এখন সে সকল প্রসঙ্গ তাকে শোনাবার লোক কাউকে পাবে না।

প্রবাসীতে তোর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বেরিয়েছে— দেখেছিস্ ত? এখন তোর কলম বোধ হয় বন্ধ আছে। বোটে এই বৃষ্টি-বাদলের দিন তোদের অসুবিধা হচ্চে না ত? অমাবস্যা পড়েছে— এইবার থেকে আবার বাদলা আরম্ভ হবে।

বাবা

[শান্তিনিকেতন]

মীরু

জগদানন্দ এবং সন্তোষ আজ ভোরে কলকাতায় গেছেন—অতএব তুই যে যন্ত্রটা চেয়েছিস্ সেটার সন্ধান করতে পারলুম না। যদি সেটাকে কোনোখানে আস্ত দেখতে পাই তাহলে তোদের পাঠিয়ে দেব। চাঁদের কলাগুলো সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা জন্মানো শক্ত এবং পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের অবস্থাগত সম্বন্ধ অনুসারে ঋতুর ভেদ কি রকম করে হয় সেটাও কেবল ছবি দেখে বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন।

নগেন কাল বুধবারে বড়দিদিকে নিয়ে তোদের ওখানে যাত্রা করবে লিখেছে। এ চিঠি পাবার পূর্ব্বেই তোদের সভা জমে উঠেছে সন্দেহ নেই। ও জায়গাটা বড়দিদির বোধ হয় ভালই লাগবে। আমার সেই ছাতের ঘরটা তাঁকে দিস্ তাহলে তিনি নিরিবিলি থাক্‌তে পারবেন।

ললিতাকে দেখবার জন্যে আজ হেমলতা বৌমা কলকাতায় রওনা হলেন। কমল অনেকদিন পরে তার সখী দুর্গাকে পেয়ে মনের আনন্দে আছে। কালিমোহনের স্ত্রী মনোরমাও তাদের সখি-সমিতির সভ্য, বিপিনের বৌও বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে। লাবণ্যের মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। বেচারা অসুখে

ভুগচে কিন্তু তবু তার প্রফুল্লতার অবসান নেই। তাকে নিয়ে আমার দাড়ি সামলানো ভারি শক্ত হয়েচে। লাবণ্য ভারি রোগা হয়ে গেচে। আমি যে নাপিত চাকরটিকে পেয়েছি সে বেশ ঘড়ি মেরামৎ করতে পারে, হাতের কাজে তার একটু দক্ষতা আছে। উমাচরণের কাছে সে রান্না প্রভৃতি শিখ্‌চে— এ চাকরটা সকল রকমে বেশ কাজের হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্চে। কিন্তু আমার ত দুজন চাকরের দরকার নেই। রথীকে জিজ্ঞেস করিস তার যদি দরকার থাকে একে তাহলে শিলাইদহে পাঠিয়ে দিতে পারি। একে তৈরি করে নিতে পারলে এ ল্যাবরেটারির কাজও করতে পারবে। দরকারের সময় মাথা খুঁড়লেও চাকর পাওয়া যায় না বলেই ছেড়ে দিতে কোনোমতে ইচ্ছা করচে না।

রথীকে বলিস্ যে মাদ্রাজি যুবকটির কথা তাকে বলেছিলুম তার সম্বন্ধে কি স্থির করলে আমাকে যেন লেখে। ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩১৮

বাবা

[শান্তিনিকেতন
ভাদ্র (?) ১৩১৮]

মীরু

তোর দাদা আর বৌমা আমাকে সুদ্ধ সিঙাপুরে সমুদ্র পথ ঘুরিয়ে আনবার প্রস্তাব করে এক চিঠি লিখেছে। আমার শরীরটা ভাল নয়— হয় ত কিছুদিনের মত এখানকার সমস্ত ভাবনা চিন্তার ঝঞ্ঝাট একেবারে ভুলে ঘুরে আসতে পারলে কতকটা শুধ্‌রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাবচি কেবল ২২ দিনের মত সমুদ্র ঘুরে আমার হবে কি? তাতে কেবল ঘোরাঘুরির কষ্ট এবং seasicknessএর ধাক্কাই খেয়ে আসা হবে। তাই তাকে আজ লিখেচি যদি তিন মাসের ছুটি নিয়ে জাপান বেড়িয়ে আসতে সে রাজি থাকে তাহলে আমি এই সুযোগে একটু ভাল রকম করে হাওয়া খেয়ে নিতে পারি। একবার কিছুদিনের মত সমস্ত বোঝা নামিয়ে ছুটোছুটি করে আস্‌তে পারলে একটু তাজা বোধ হবার সম্ভাবনা আছে। তোর মেজমাকে এই প্রস্তাবটা জানাস— দেখি তিনি কি পরামর্শ দেন। আশু আমাকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। কিন্তু পর্শু থেকে অর্শের রক্তপাত আরম্ভ হয়ে আমাকে কাহিল করে ফেলেছে এখন যদি রেলে করে কলকাতায় যাতায়াত করি

তাহলে আমাকে খুবই ভোগাবে— সেই ভয়ে ওদের সভায় যেতে পারলুম না। তাছাড়া সভাসমিতিতে যাওয়া ছেড়ে দেবার বয়স হয়েছে— লোকের টানাটানি আর সহ্য করতেই পারিনে। এখানে ৬ই আশ্বিনে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব চলচে। দিনু অধিকারী তার ছেলের দলকে নিয়ে তাদের খুব কষে নাচগান অভ্যাস করাচ্চে। ৭।৮ই আমরা এখান থেকে ছুটি পাবো।

এখানে শরতের হাওয়া দিয়েছে— শিউলি ফুলের গন্ধে আকাশ ভরে উঠেছে— টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের মধ্যে রোদ্দুরটি ভারি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। বেশ লাগচে। কাল জ্যোৎস্নারাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাঠের মধ্যে চৌকি নিয়ে বসেছিলুম।

বাবা

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

"S. S. City of Glasgow"
at আরব-সমুদ্র
৩১ মে, ১৯১২

মারু

জাহাজ তো ভেসে চলেছে। ভয় করেছিলুম খুব sea-sickness হবে কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখচিনে। সমুদ্র তেমন উতলা নয়। অথচ ঢেউ একেবারে নেই তা নয়। ঠিক আমাদের মুখের সামনে দিয়ে পশ্চিমে হাওয়া দিচ্চে তাই এক একদিন বেশ একটু দোলা লাগাচ্চে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সোমেন্দ্রটা মাঝে মাঝে মাথা ঘুরচে বলে ক্যাবিনে চিৎ হয়ে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নিচ্চে। আমার বিশ্বাস ওর মাথা ঘোরাটা একেবারেই ফাঁকি— কারণ, ঘুম খুব গভীর এবং আহারের পরিমাণও যথেষ্ট প্রচুর। একেবারে রাজকীয় চালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আহার চলচে— স্বয়ং ত্রিপুরার মহারাজকেও কোনো দিন এত আরাম করতে দেখিনি। বৌমা বেশ কাটিয়ে দিচ্চেন। ওঁর ভাবটি বেশ নিঃসঙ্কোচ। নতুন জায়গায় নতুন পথে নতুন লোকদের মধ্য দিয়ে যাচ্চেন বলে যে কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ আছে তা দেখচিনে। ইতিমধ্যে একদিন কেবল seasick হয়েছিলেন।

জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে আমাদের যে প্রাণের বন্ধুত্ব হয়েছে তা বলতে পারিনে। দূরে দূরে চুপচাপ থাকি। কেবল ওদের মধ্যে দুজন আমার সঙ্গে আলাপ করেছে। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার নামে একজন কবি আছেন শুনেছিলুম তিনি কে? আমি বল্লুম তিনিই হচ্চেন আমি। লোকটি সৈনিকদলের অধ্যক্ষ— সুতরাং কবিতা পড়ে শোনাবার জন্যে আমাকে একদিনো অনুরোধ করেনি। বুঝতেই পারছিস্ এতে আমি মনে মনে বেদনা বোধ করেছি।

তোরা কোথায় আছিস্ তাও জানিনে। কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি দেব। কারণ শিলাইদহে থাকলেও চিঠি কলকাতা হয়েই যাবে সুতরাং তোদের পেতে দেরি হবে না।

নিতাইয়ের খবর কি? তার বঙ্গভাষা শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হল? আর তার Sandow Practice আশা করি উত্তরোত্তর প্রবলতর বেগে চল্‌চে। মুখের মধ্যে পায়ের গোড়ালি পূরে দেওয়া প্রভৃতি ব্যায়াম সুরু হয়েছে কি? তার শরীর কেমন আছে? তাকে আমার হামি দিস্। বেয়ান এবার একলা তাঁর ক্ষুদ্র বন্ধুটির চিত্ত অধিকার করে নিচ্চেন— আমি যতদিনে ফিরব ততদিনে তাঁর দখল ভয়ঙ্কর পাকা হয়ে যাবে। বেয়ানকে বলিস্ শিলাইদহে একদিন আমাকে যে স্থান দিয়েছিলেন ফিরে গিয়ে যেন সেই আশ্রয়টি থেকে বঞ্চিত না হই।

শিলাইদহে তোদের কেমন চলচে লিখিস্। আশা করি বাদলা বৃষ্টি কেটে গিয়ে এখন সেখানটা স্বাস্থ্যকর হয়েছে।

যদি ডাঙায় তোদের শরীর তেমন ভাল না থাকে তাহলে এক একবার কিছুদিনের মত বেশ নিরাপদ নিরালা জায়গা দেখে গোরাইয়ের নির্জ্জন চরে বোটে গিয়ে থাকিস্। বোট আজকাল অনেকগুলো হয়েছে সুতরাং তোদের থাকবার কোনো কষ্ট হবে না। বর্ষার সময় একটু অসুবিধা হতেও পারে কিন্তু পর্দ্দার বন্দোবস্ত ভাল করে রাখতে পারলে কোনো ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া দুই একটা গোরু কুঠিবাড়ি থেকে চরে নিয়ে গিয়ে রাখলে কিছুই ভাবতে হবে না আর তোদের তো কুকারে দিব্যি রান্না হতে পারবে।

তোরা আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিস।

বাবা

[৯]

[লণ্ডন
শরৎ ১৯১২

মীরু

তোকে দীর্ঘকাল চিঠি লিখিনি কেন, এই সম্বন্ধে তুই মনে মনে আলোচনা করচিস্। আমি নিশ্চয় জানি বৌমা তোকে প্রতি সপ্তাহেই প্রায় চিঠি লিখ্চেন এবং তাতে ছোট বড় কোনো খবর বাদ যাচ্চে না— আমার চিঠিতে তারই পুনরুক্তি হবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীতে মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যে কর্ম্মের বিভাগ হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা— পুরুষরা দেশের কাজ করবে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে; পুরুষরা বই লিখ্বে, মেয়েরা চিঠি লিখ্বে। চিঠি লেখার নৈপুণ্য মেয়েদের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ— পুরুষদের ওটা নেই বল্লেই হয়। আমরা কাজের চিঠি লিখ্তে পারি— অকাজের চিঠিতে আমাদের কলম সরে

এই ত চিঠি লেখা সম্বন্ধে তোকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লিখলুম; ভাগ্যে এটা বৈজ্ঞানিক তাই এতখানি লেখবার সুবিধা হল। আমি তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীর একজন সুবিখ্যাত লেখক তা বোধ হয় তুই পরম্পরায় শুনেছিস্;— এখানকার লোক সমাজের লৌকিকতার দাবি মিটিয়ে যখনি সময় পাই প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগ দিতে হয়; কিন্তু বৌমা এখনো সাময়িক পত্রের হাতে পড়েননি এই জন্য অসাময়িক পত্র লেখা

তাঁর পক্ষে নিতান্তই সহজ। এই সকল কারণে স্বভাবতই আমাদের মধ্যে একটা কর্ত্তব্য বিভাগ হয়ে গেছে। আর একটা কথা আমার বলবার আছে; লোকে মনে করে যারা নূতন দেশে যায় বিস্তারিত খবর লেখা তাদের পক্ষেই সহজ। ঠিক তার উল্টো। যে খবর একেবারে নূতন সে ত অন্ধকার— পুরোণো খবরই খবর। একবার ভেবে দেখ আমরা গত সপ্তাহে ছিলুম South Kensingtonএ— এ সপ্তাহে এসেছি Worsely Roadএর একটা বাসায়— এ খবরটা তোদের কাছে একেবারেই ব্যর্থ। কিন্তু তোরা যে আমাকে খবর দিয়েছিস্— কুঠিবাড়ী থেকে তোরা বোটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিস্ সেটা আমার পক্ষে একটা যথার্থ খবর। যদি বিস্তারিত করে তন্ন তন্ন করে লিখ্‌তিস্ তাহলে এই Worsely Rd. এর অন্ধকার বাসায় বসে তোদের সেই পদ্মানিবাসের ছবি মনের মধ্যে অনেকক্ষণ উলটপালট করতে পারা যেত। তোদের ঘর দুয়োর, বাবুর্চ্চি, মালী, বছির, গোরুবাছুর, সজারু, ডোডো, পাটের ক্ষেত, অনঙ্গ, জমাদার, বৃষ্টিবাদল, রৌদ্র, আমগাছ, জামগাছ, পুকুর, রাস্তা, মাছি, মশা, গাঁদাপোকা, ডাক্তার, ডাক্তারের স্ত্রী, ওলাউঠো, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যা-কিছু তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে তার কথা তোলবামাত্র সেটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আমাদের এখানকার পনের আনা খবরই তোদের পক্ষে একেবারেই নিরর্থক। এই দেখ্ চিঠি লেখার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হোল।

কিন্তু সত্যি তোরা কোথায় আছিস্, কি ভাবে আছিস্, বোটে থাকার কি রকম ব্যবস্থা করেছিস্, সেখানে খোকা কি ভাবে দিন যাপন করচে, সেখানে তার আহার বিহারের কিরকম আয়োজন, আজকাল তার অনুপানের কি রকম বন্দোবস্ত, লোকজনের প্রতি তার ব্যবহার কি রকমের এ সমস্ত জানবার জন্যে মন উৎসুক আছে অথচ নগেন্দ্রের চিঠিতে একটা লাইনমাত্র পাওয়া গেল যে তোরা শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য বোটে গিয়ে বাস করচিস্। হয়ত বৌমাকে তুই বিস্তারিত খবর দিয়েছিস্ কিন্তু বৌমা আমাকে কেবল একটিমাত্র কথা বল্লেন ছোট্ ঠাকুরঝির চিঠি পেয়েছি, ছোট ঠাকুরঝি জানতে চেয়েছে বাবা অনেকদিন চিঠি লেখেননি কেন ? এখানে গরমিকালেও এ বছর সূর্য্য ফাঁকি দিয়ে সেরেছেন— শরৎকালে দিন দুই চার একটু আশা দিয়ে আবার আজ এমনি অন্ধকার করে এসেচে এবং রীতিমত শীতের হাওয়া দিয়েচে যে সুবিধা বোধ হচ্চে না। কালিদাসের একটা কাব্য আছে জানিস বোধ হয় তার নাম ঋতুসংহার। এখানে এবার সেই কাব্যটারই আধিপত্য দেখা যাচ্চে। গ্রীষ্ম ঋতুর সংহার ত হয়েইচে— আবার শরৎ-ঋতুরও তথৈবচ। অথচ এদেশে গোটা তিনেক বই ঋতুই নেই। যদি সংহার করতে হয় তাহলে আমার মতে ভারতবর্ষে গ্রীষ্মটাকে সংহার করতে পারলে ইলেক্‌ট্রিক পাখার খরচ বাঁচে।

তোরা কার্ত্তিক মাসে বোটে করে বরিশালে যাবার প্রস্তাব করেছিস। কিন্তু সেটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের সময়— আমি যত বড়

বড় ঝড় পেয়েছি সব ঐ সময়ে। তার উপরে ম্যালেরিয়ারও সময় ঐ। যদি তোরা অগ্রাণ মাসে যেতিস্ তাহলে চিন্তার কোনো কারণ থাকত না— কিন্তু আশ্বিন-কার্ত্তিকে বোটে করে দীর্ঘ নদী পথ বেয়ে যাওয়া কোনোমতেই সুযুক্তিসঙ্গত নয়। নদীতে আমি অনেকদিন কাটিয়েছি— নদীর ধাত আমি বুঝি।

বাবা

[১০] লণ্ডন

মীরু

এবার তোর কোনো চিঠিপত্র আসেনি। তোরা সবাই ভাল আছিস্ ত? আজ ত আশ্বিনের ১০ই তারিখ, তোদের ছুটির সময় কাছাকাছি হয়ে এসেছে। এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন তোরা খুব সম্ভব শিলাইদহে থাকবি নে। যদি বোটে করে বরিশালে যাওয়াই স্থির করে থাকিস্ তা হলেও এ চিঠি পেতে দেরী হবে। বরিশালে যাবার পথে দুই একজায়গায় খুব বড় বড় নদী পড়ে সেইজন্যে আমার মনে একটু ভয় আছে। যাই হোক্ এতদূরে বসে বৃথা ভয় করে কোনো লাভ নেই। এখানে গ্রীষ্মকালটা বৃষ্টি বাদলের মধ্যে কেটেছে সে কথা তোকে পূর্ব্বেই বলেছি। অবশ্য এরা যাকে গ্রীষ্ম বলে আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে তার অনেকটা অংশই বর্ষা—সুতরাং বর্ষায় বৃষ্টি ভোগ করলে সে সম্বন্ধে নালিশ করাটা আমাদের ঠিক শোভা পায় না। কিন্তু অন্যায়টা হচ্চে এই যে, এখানে শীতকালেই রীতিমত বৃষ্টির আড্ডা বসে—মানুষের সহিষ্ণুতার পক্ষে সেই যথেষ্ট—আর উপরি পাওনা কিছুতেই সহ্য হয় না কিন্তু এবারে সেপ্টেম্বরটি খুব ভদ্র ব্যবহার করচে। প্রায় প্রত্যহই রৌদ্র দেখা দিচ্চে—বহুকাল একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। আমাদের দেশের শরৎকালের মতই নির্ম্মল উজ্জ্বলতায় আকাশ

পূর্ণ হয়ে গেচে— জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌লে মন উতলা হয়ে যায়। আমার এই লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও বেরিয়ে পড়তে প্রতিদিনই ইচ্ছা করচে। কিন্তু বাঁধা পড়ে আছি আমার বইটা ছাপতে গেচে—১৪ই অক্টোবরের মধ্যে বের হবার কথা। বের হলেও নিষ্কৃতি নেই— কারণ, এঁরা বল্‌চেন, এ বইটা প্রকাশ হলেই এখানকার প্রকাশকেরা আমার অন্য লেখাগুলো ছাপাবার জন্য নিশ্চয় আগ্রহ প্রকাশ করে আস্‌বে— সেই শুভদিনের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। অর্থাৎ অন্তত নবেম্বরটা এখানকার কুয়াশা ভোগ করতে হবে। নবেম্বরটাই লণ্ডনে সকলের চেয়ে দুর্দ্দিন। চিত্রাঙ্গদা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জ্জমা করেছি সেইগুলো ছাপাবার জন্যে আমার বন্ধু রোটেনষ্টাইন খুব উৎসাহ করচেন। তা ছাড়া "শিশু" থেকে এবং অন্যান্য বই থেকেও অনেকগুলো তর্জ্জমা করেছি। সব শুদ্ধ নিতান্ত কম জমেনি।

এবার এদেশে বিস্তর চেনা বাঙালী আমদানী হয়েচে। কাল বিমলার ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর মেয়ে মায়ার বড় অসুখ করেছিল— তাই তাঁকে খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌তে হয়েছে। মায়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে— তার সম্বন্ধে খুবই আশঙ্কার কারণ হয়েছিল। বিমলাকে আমার বড় ভাল লাগে। কোনো রকম উগ্রতা নেই।

খোকাকে হামি দিস্‌। ইতি ১০ই আশ্বিন [১৩১৯]।

বাবা

৭৭]

মীরু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে এসে অবধি সহরে সহরে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চি। দেশে চিঠিপত্র লেখার কারবার তুলে দিতে হয়েচে। এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে, এক সহর থেকে আর এক সহরে এই হচ্চে আমার জীবনযাত্রা। যতদিন না দেশে ফিরি ততদিনের জন্যে দেশ আমার কাছে একরকম লুপ্ত হয়ে গেছে। এদেশের ঝোড়ো হাওয়ায় আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এদের কাছে আমার বলবার কথা আছে নইলে এখানে আমার আসা হতই না। আজকের দিনে পৃথিবীকে যদি সত্যের পথে জাগাতে হয়, তবে সে আমাদের দেশে হবে না। এরা এখনো বেঁচে আছে। এরা আজ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করচে সেইজন্যে এরাই সত্যের সঙ্গে সন্ধি করবে। আর আমরা চাকরী করব, ভিক্ষে করব, কুইনাইনের বড়ি গিলব আর পিলে বড় করে মরতে থাকব। অতএব যতই কষ্ট হোক্ এখানকার ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাকে জোর করে টেনে আনলেন শেষ বয়সে আমার জীবনের ফসল এইখানেই বুনে যেতে হবে। দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে— সকল

দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্ব্বদিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিমদিগন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে। নইলে জীবনের অর্দ্ধেকের বেশি সময় বাংলা গদ্য কাব্য লিখে আসচি— হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি লিখতে যাব কেন? খামকা একদিন আমার ঘরবাড়ি ইস্কুল ফেলে বিলেতে দৌড়তে যাবার জন্যে কেন এত বড় একটা তাগিদ এল। এর থেকেই বুঝচি আমার জীবনের পথ আমার ইচ্ছা এবং হিসাব অনুসারে তৈরি হবে না— আমাকে যিনি কাজে লাগাবার জন্যে এতদিন ধরে নানা সুখে দুঃখে গড়ে তুলেচেন তিনিই আমাকে নিজে চালনা করে কাজে খাটাবেন। আমার দেশের কাজ নয়— তাঁর জগতের কাজ। কাজেই কোণের মধ্যে বসে থাকা আমার কপালে লেখা নেই।

সুরুলের বাড়িটা তোদের দেবার জন্যে রথীকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েচি। ঐখানে তোদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরকন্না ফেঁদে বসবি, আমি গিয়ে দেখবো। পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ঘরের গরুর দুধ দিয়ে তোদের গৃহস্থ ঘরের দৈনিক প্রয়োজন বেশ আরামে চলে যাবে। আমার জন্যে তেতালার ঘরটা রেখে দিস, যখন দেশে ফিরে যাব ঐখানে তোদের সঙ্গে জমিয়ে বসে খোকা আর খুকিকে নিয়ে আমার দিন কাটবে। বেশ বুঝতে পারচি আমার এই শেষ বয়সে তোর

খুকীর প্রেমে গীতিকাব্যের ডুবজলে আমাকে আবার একবার ঝাঁপ দিতে হবে। তাকে দেখবার জন্যে আমার মনটা ব্যাকুল আছে। একটা কথা মনে রাখিস্ ভাদ্র মাস থেকে অঘ্রাণ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনে আমার সেই দোতলা ঘরে আশ্রয় নিস্ নইলে ম্যালেরিয়ার হাত এড়াতে পারবিনে। আমারও মনে হয় স্থরুলের বাড়িতে চাষবাস করে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যদি তোরা থাকিস তাহলে মোটের উপরে তোদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। আমি ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের বাড়ির আর তুই একটা ঘর বাড়িয়ে নিতে পারব— তোদের থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না। Mrs. Moodyর বাড়িতে এসে পৌঁচেছি— সেইখান থেকে তোদের চিঠি লিখচি। খোকা খুকিকে আমার হামু দিস্। ইতি ২২শে অক্টোবর [১৯১২]।

বাবা

১২ New York

মীরু

এবার সমুদ্র পার হতে যে দুঃখ পেয়েছি সে তোকে লিখে আর কি জানাব! শরীরটাকে অহোরাত্র কসে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে মহাসমুদ্র প্রাণটাকে অনেকটা আলগা করে এনেছিল— এখনো ডাঙায় উঠেও মনে হচ্চে সেটা নড় নড় করচে। সী সিক্‌নেস্‌ অনেকবার হয়েছে কিন্তু এমন কখনো হয়নি। আবার এই সমুদ্র ফিরে পার হতে হবে মনে করলে আমেরিকায় স্থায়ী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তার উপরে আবার জাহাজের যাত্রীগুলোও বড় লক্ষ্মীছাড়া ছিল। কারো সঙ্গে যে ক্ষণকাল আলাপ করে সুখ পাব এমন সম্ভাবনামাত্র ছিল না। অনেকে ছিল যাদের ভাষা আমরা জানিনে— আর যাদের ভাষা আমরা জানতুম তাদের সঙ্গে জানাশুনো করবার প্রবৃত্তি হয়নি। যাই হোক্ আমরা দলে ভারি ছিলুম। সঙ্গে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন— গল্প জমাতে তিনি খুব মজ্‌বুৎ, আর একটি বাঙালী সহযাত্রী ছিলেন, গল্প না বল্‌তে তাঁর অসাধারণ শক্তি, তিনি প্যাণ্টুলুনের দুই পকেটের মধ্যে দুই হাত গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে ডেকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পদচারণ করে কাটিয়েছেন। আর একজন মারাঠি ছিলেন, তিনি আকারে আয়তনে নিতান্ত ছোট্ট মানুষটি কিন্তু তিমি

মাছের সঙ্গে কেবল একটা বিষয়ে তাঁর মিল দেখা যায়— অহোরাত্রে কেবল তিনি ক্যাবিনের মধ্যেই থাকতেন কেবল ক্ষণে ক্ষণে মিনিট পাঁচেকের জন্যে ডেকে উঠে তিমিমাছের মত একবার হুস করে নিশ্বাস নিয়ে আবার পরক্ষণেই ক্যাবিনের মধ্যে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। সমুদ্র যতই শান্ত থাক, দিন যতই সুন্দর হোক্ তিনি তাঁর বিবর ছাড়তেন না। যাক্ শেষকালে কাল কূলে এসে পৌঁছন গেছে। ইংলণ্ডে বিদেশীদের সুবিধা এই যে, জাহাজ থেকে নাববার সময় কোনো উৎপাত নেই। এখানে মাশুল যাচাইয়ের ঘরে দুটি ঘণ্টা বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি কষ্টে গিয়েছে। এখন ত হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েচি। আজ একবার এখানকার কোনো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের খোঁজ নিতে যেতে হবে। তারপরে ওষুধপত্রের জোগাড় করে ইলিনয়ে রথীদের কলেজের দরজায় গিয়ে গট হয়ে বসে পড়ব এই রকম মনে করচি। কিছুদিন নিরালায় চক্ষু বুজে বিশ্রাম করবার জন্যে মনটা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছে। আমেরিকায় বিশ্রাম জিনিষটা শস্তায় পাওয়া যায় কিনা আমার সন্দেহ হচ্চে— যা হোক্ চেষ্টা করে দেখা যাক। ইলিনয়ের ঠিকানাতেই তোদের সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্। ইতি ২৯ অক্টোবর ১৯১২

বাবা

[১৩]

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

508 W. High Stree
Urbana. Illinois.
২৫শে পৌষ ১৩১৯

মীরু

আজ তোর চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা সূর্য্যের আলো প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভোগ করে এসেছি। এতদিন পরে এই জানুয়ারীর আরম্ভে দেবতার ভাবগতিকের একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্চে। একদিন বরফ পড়ে বেশ সাদা হয়ে গেল— তারপরে রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি সকালে উঠে দেখি সেই রাস্তার উপরে গাছের উপরে একেবারে কাঁচের মত জমে গিয়েছে। রাস্তা এমন ভয়ানক পিছল যে তার উপর দিয়ে চলা শক্ত। দুদিন ধরে তাই ঘরে বন্ধ হয়ে আছি। আজ রোদ্দুর উঠে ভারি চমৎকার দেখতে হয়েছিলো। গাছপালা সমস্ত একেবারে হীরের মত ঝক ঝক করছিল। বিকেলের দিকে আর থাকতে পারলুম না ভাবলুম একবার একটুখানি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করে আসি। দু পা যেতেই বরফের উপর এমনি পড়া পড়ে গেলুম যে কবিত্ব সুদ্ধ কবি ভেঙে যাবার জো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসেছি। বরফ না গল্‌লে আমার এই রকম বন্দীদশা।

তোর বৌঠানকে এখন আর নিজের হাতে কাজ করতে হয় না। চাঁদ বলে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র আমাদের রেঁধে দেয়, বঙ্কিম বাসন মাজা এবং ঘর ঝাঁটের কাজে নিযুক্ত বৌমা কেবল বিছানা করেন। আর সোমেন্দ্র আহার করে থাকে। এখানে ঘরকন্নার ব্যাপারটা তেমন অত্যন্ত গুরুতর কিছুই নয়— এখানে সমস্ত কাজই প্রায় কল টিপে চলে। বাজার করা টেলিফোনেই হয়ে যায়। দোকানদারেরাই সমস্ত জিনিষপত্র দরজায় পোঁছে দেয়— এ দেশী রান্নায় বাটনা বাটা কোটনা কোটার জুলুম অতি বৎসামান্য— তারপরে গ্যাসে ইলেকট্রিসিটিতে মিলে রাঁধাবাড়া অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব এখানকার ঘরকন্নার বিদ্যা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগবে এমন কথা মনে করিস নে। সেখানে আবার সেই বঁটি নিয়ে বসতে হবে— এবং মোচা ও থোড়ের মুণ্ডপাত করতে কুরুক্ষেত্র করতে হবে। এখানে পান সাজার বালাই একেবারেই নেই। দেশে তোদের সেই এক বিষম সাজা।

আমি New York-এর একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। কিছুদিন ঠিক ওষুধটা বের করতে অনেক হাৎড়াতে হবে— এখনো সেই হাৎড়াবার পালাই চলচে— আশা করচি একটা কোনো ওষুধ খেটে যেতে পারবে।

আমি এবারকার চিঠিতে খবর পেলুম যে আজ পর্য্যন্ত বোলপুরে আমার বইয়ের বাক্স যায়নি। এতে আমি যে কি পর্য্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছি সে বলে উঠতে পারিনে। আমি

তাদের বইগুলি পাঠালুম এবং ইচ্ছা করলুম যে সেখানে সেগুলি কাজে লাগে— অথচ তারা পেলই না, এ ত নিদারুণ অন্যায়! এ যে কার দোষে হোলো, আমি আজ পর্য্যন্ত খবরই পেলুম না। এ যদি গোপালের শৈথিল্য হয় তাহলে সে অমার্জ্জনীয় কেননা জগদানন্দরা তাকে তাগিদ দিতে ত্রুটি করেনি। এ যদি আর কারো কাজ হয় তবে সেও গুরুতর অন্যায়। আমি ত এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করতেই পারিনে। যাকে আমি যে জিনিষটা দেব সে সেটা পাবেই না, অন্যে সেটা অবরুদ্ধ করে রাখবে এমন অদ্ভুত অধিকারও আমি কাউকেই দিইনি। আমার কাছে এটা অপমানকর বলে মনে হয়। তোরা কলকাতায় আছিস এ সম্বন্ধে সন্ধান করে ঠিক খবরটা আমাকে জানাবি এবং যথোপযুক্ত প্রতিকার করতে একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করবিনে। আজ আমি দেড়মাস ধরে এইটে সম্বন্ধে প্রতি মেলেই নিরুপায় ভাবে বেদনা পাচ্চি— কিছু বুঝ্‌তেও পাচ্চিনে কিছু করতেও পারচিনে। খোকাকে হামি দিস্।

বাবা

পুঃ

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানাস্

[১৪]

2970 Groveland Avenue
Chicago

মীরু

আমরা কিছুদিনের জন্যে আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। রচেষ্টার বলে একটা সহরে আমার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে সেখানে যেতে হবে। নিতান্ত কাছে নয়। এ দেশটা এত প্রকাণ্ড বড় এবং ঢিলে যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া বিষম ব্যাপার। ভেবে দেখ না, আমাদের দেশে বম্বাই থেকে খামকা কলকাতার লোককে বক্তৃতা করতে নিমন্ত্রণ করা কারো মনেও আসে না। অবশ্য এরা আমাকে পথ খরচ দেবে। কিন্তু কুড়ি মিনিটের বেশি বলতেই দেবে না। কেননা আরো অনেক বক্তা আছে। কুড়ি মিনিটের বকুনির জন্যে দেড়শো দুশো টাকা দিয়ে মানুষকে হাজার মাইল দূর থেকে ডাক পাড়া পাগলামি বল্লেই হয়। প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলুম— কিন্তু তোরা ত জানিস শেষ পর্য্যন্ত আমার অস্বীকার টেঁকেনা। পীড়াপীড়ি এড়াতে পারিনে। বিশেষত এই সভায় Dr. Eucken বক্তৃতা করবেন, এবং তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। Dr. Eucken এবং Bergson এঁরা দুজনে এখন য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক। গীতাঞ্জলি পড়ে Eucken আমাকে

ভারি সুন্দর একটি চিঠি লিখেছেন। এখানে শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে Ideals of the Ancient Civilisation of India তে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেম সেটা এদের খুব ভাল লেগেচে। কাল আর এক জায়গায় Problems of Evil সম্বন্ধে বল্‌তে হবে। রচেষ্টার থেকে বষ্টন প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে হবে। তারপরে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আর্ব্বানায় ফেরবার কথা আছে। এখানে Mrs. Moodyর বাড়ীতে আছি। তিনি আমাদের খুব যত্ন করেন। এমন স্বাভাবিক মাতৃভাব অল্পই দেখতে পাই। তিনি আমাকে ধরে বসেছেন তাঁর সঙ্গে নিউইয়র্ক কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াই লোভ হচ্চে কিন্তু আমার পক্ষে শেষকালে ক্লান্তিকর হবে কিনা তাই ভাবছি। তিনি চান আমি নিউইয়র্কে গোটা কতক বক্তৃতা করি। দেখা যাক্ কি হয়। তুই নগেনকে বলিস আমি অগ্রাণ পৌষ দুই মাসেরই তত্ত্ববোধিনী পাইনি— গ্রাহক হলে বোধ হয় পেতুম, কিন্তু সম্পাদক হয়ে এমনিই কি গুরুতর অপরাধ করেছি? বলিস পত্রিকা পাঠাবার সময় মোড়কটা যেন মোটা রকমের হয়— মোড়কে ব্যয় সংক্ষেপ করলে সস্তা হয় না কারণ কাগজটাই খোওয়া যায়। ইতি ২২শে জানুয়ারী [১৯১৩]

বাবা

পুঃ নগেনকে নিশ্চয়ই ভাল জায়গায় কোথাও কিছুদিনের জন্যে changeএ পাঠানো দরকার হবে। আমাদের সেই শৈলধাম কি রকম?

[১৫]

[Urbana
মার্চ ১৯১৩]

মীরু

আমাদের এখান থেকে যাবার সময় আসন্ন হয়ে এল। এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি আমরা আটলাণ্টিকে পাড়ি দেব এবং হয় তো ২০শে নাগাদ লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছব। সেখানে আমার বই ছাপাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। বইয়ের খোরাক অনেক জমে উঠেছে— এক ভল্যুমের মধ্যে সব যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। দেখা যাক কি হয়। আপাতত রথী এইগুলো সমস্ত টাইপরাইটরে কপি করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। শীঘ্রই এখানকার লীলা সম্বরণ করতে হবে বলে রথী তার কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছে সুতরাং এখন তার হাতে সময় যথেষ্ট আছে।

বৌমা বেহালা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু বেহালা ত অল্প দিনের মামলা নয়— সুতরাং ফিরে এসে সেটাও ত্যাগ করতে হল। বৌমার শেখার মধ্যে একটা শনির দৃষ্টি আছে— যা কিছু আরম্ভ করেন খানিক দূরে গিয়ে বাধা পড়ে যায়। এখানে একজন মেয়ের কাছ থেকে ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন— তাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু শিকাগো, বস্টন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি ঘুরে আসা ওঁর পক্ষে একটা কম শিক্ষা নয়।

সেটাতে ওঁর যথেষ্ট উপকার হয়েছে বলে আশা করচি। অনেক বন্ধুলাভ হয়েছে। রথীর পক্ষে এইবারই যথার্থ আমেরিকায় আসা সার্থক হল। আর বারে ছাত্রের মত কেবলমাত্র এই কুণো সহরের মধ্যেই ওর দিন কেটেছে। এদেশে রথীর চেহারার প্রশংসা অনেকের কাছেই শুনতে পাই— সেদিন এখানকার একজন অধ্যাপকের স্ত্রী বলছিলেন most beautiful face. ইংলণ্ডেও ওর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি অনেক শুনেচি। আজ তোর সুরেনদাদার এক চিঠি পেলুম। তাতে লিখেছে মে মাসে সুরেন সম্ভবত ইংলণ্ডে আসবে। তাহলে আমি ত খুব খুসি হব। এদেশে এলে ওর কাজের হয় তো অনেক সুবিধা হতে পারবে। অন্নপ্রাশনে তোর খোকার বর্ণনা শুনে তাকে দেখবার জন্যে আমার খুব লোভ হচ্চে। ও কি বক্তৃতা করবার কোনো রকম আয়োজন এখনো সুরু করে দেয়নি? ওর রসনাটি কি কেবলমাত্র ভোজন ব্যাপারেই একাগ্রভাবে নিযুক্ত? নগেন্দ্রের শরীর যদি এখনো দুর্ব্বল থাকে তাহলে কিছুদিনের জন্যে কেন একবার রামগড়ে বেড়িয়ে আসে না? সেখানে বাড়ি তো পড়ে আছে। ম্যালেরিয়ার পক্ষে উঁচু পাহাড়ের হাওয়াই সব চেয়ে ভাল।

বাবা

১৬।

[লণ্ডন
এপ্রিল ১৯১৩]

মীরু

আমরা আটলান্টিক পার হয়ে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছি। যে জাহাজে আমরা এসেছি সেটা বোধ হয় আজকাল পৃথিবীর সকল জাহাজের চেয়ে বড়। যে ডেকে আমাদের ক্যাবিন ছিল সেটা হচ্চে পাঁচতলার ডেক— অর্থাৎ তার উপরের আরো চারতলার ডেক আছে— আবার আমাদের ডেকের নীচেও আরো অনেক ডেক। এর থেকে বুঝতে পারবি জাহাজটা উঁচুতে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির চেয়েও বেশি— আর লম্বায় এক মাইলের পঞ্চম ভাগ, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে বাঁধ পর্য্যন্ত হবে। তা ছাড়া এর মধ্যে আরামের আমোদের আহারের বিহারের যে কত বিচিত্র ও প্রচুর ব্যবস্থা আছে সে বলে শেষ করা যায় না। কেবলমাত্র ছদিনের জন্যে এত হাঙ্গামা করবার কি যে দরকার আছে আমরা ত তা ভেবেই পাই না। এবারে সমুদ্রে দোলা নিতান্ত কম দেয়নি— কিন্তু জাহাজটা প্রকাণ্ড বলে তাকে কাবু করতে পারেনি— আমার এবার এক দিনের জন্যেও সীসিক্‌নেস্ হয়নি। লণ্ডনে এসে পৌঁচে সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে— সে প্রায় রোজই আমাদের হোটেলে আসে।

আমেরিকায় থাক্‌তে সমস্ত শীতকালটাই প্রায় অবিচ্ছেদে আমরা রোদ্দুর পেয়েছি— এখানে এসে অবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং প্রায়ই কিছু না কিছু বৃষ্টি বাদ্‌লা চল্‌চেই— এইটেতে আমাকে বড় দমিয়ে দেয়। এবার আমাদের পয়লা বৈশাখ সমুদ্রের মাঝখানে দেখা দিয়েছে— সকাল বেলায় যখন সব যাত্রীরা ক্যাবিনে পড়ে ঘুমুচ্চে তখন আমরা তিনজনে সেলুনের এককোণে বসে নববর্ষের উপাসনা করলুম। যতদিন থেকে আমার ইস্কুল হয়েছে— পয়লা বৈশাখটা বরাবর সেইখানেই সম্পন্ন করেছি। —এগারো বৎসরের মধ্যে এইবার প্রথম বাদ পড়ল।

আমরা শিকাগো থেকে নিউইয়র্কে আস্‌বার পথে নায়েগ্রা ফল্‌স্‌ দেখে এসেছি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ঘোরতর মেঘ বৃষ্টি বরফপাত চলছিল—গত দু তিন হপ্তা দেশের কোনো চিঠি পাইনি। সব চিঠি বোধ হয় রোটেনস্টাইনের ওখানে জমেচে। তিনি কিছুদিন লণ্ডন থেকে অন্যত্র গেচেন বলে চিঠিগুলো আট্‌কা পড়ে আছে। আজ তাঁর ফিরে আস্‌বার কথা। খোকাকে আমার চুমো দিস্‌।

বাবা

[১৭] 16, More's Garden

Chegne Walk . S. W , London

[জুন ১৯১৩]

মীরু

অনেকদিন তোদের চিঠিপত্র পাইনি। এখন তোরা কোথায় আছিস্ কে জানে। এখনো কি Waltair এ আছিস্ না কি? Mrs. Moody আমেরিকা থেকে এসেছেন। লণ্ডনে Thames নদীর ধারে তাঁর একটি বাসা আছে সেইখানে আমরা তাঁর সঙ্গে আছি। সুরেন এতদিন লণ্ডনে ছিলেন তিনি এই মেলেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই দেশে গিয়ে পৌঁছবেন। আমি যদি তাঁর সঙ্গে ফিরতে পারতুম তাহলে খুশি হতুম— কিন্তু আমার এখানকার বন্ধন এখনো কাটেনি। প্রথমত এখনো আমার বইগুলো ছাপাবার ব্যবস্থা শেষ করতে পারিনি। আমার কবিতার manuscripts য়েট্‌সের হাতে আছে— আমার বক্তৃতাগুলোর কপি আর একজনের হাতে— সেগুলোর সংশোধন ও নির্ব্বাচন হয়ে গেলে প্রকাশকদের হাতে দিতে পারব। আগামী শরৎ ঋতুতে তারা ছাপাতে চায়। তারপরে জুলাই মাসের শেষাশেষি আমার ডাকঘর নাটকের তর্জ্জমাটা এখানকার ষ্টেজে অভিনয় হবে। তার রিহার্সালটা

আমাকে দেখে দিতে হবে। তারপরে আবার আর এক উৎপাত আছে— ডাক্তাররা আমার অর্শের জন্য অস্ত্রচিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছে। খুব সম্ভব আগামী সোমবারে operation হবে। তাহলে তারপরে অন্তত তিন সপ্তাহ আমাকে nursing home-এ পড়ে থাকতে হবে। এ কয়দিন আমার কোনো চিঠিপত্র পাবিনে। সেইজন্যে তার আগে এই চিঠি লিখে রাখচি। সমস্ত হিসাব করে দেখ্‌তে পাচ্চি অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে দেশে যাত্রা করা ঘটে উঠ্‌বে না। এখন বর্ষা এবং গরমের মধ্যে দেশে যাওয়াও আরামের হবে না। একবার কথা হচ্ছিল রথীরা আমার আগেই ফিরে যাবে— কিন্তু ওরা গেলে আমার এখানে কাজ চলা শক্ত সেইজন্যে এই তিন চার মাস তাদের রাখ্‌তে হল। বৌমা সেইজন্যে আবার একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশোনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। এখন তিনি এক রকম কাজ চালানো মত ইংরেজি চালিয়ে দিতে পারেন। এই দেড় বছরে তাঁর যেটুকু ইংরাজি সহজে আয়ত্ত হল— দেশে থেকে পাঁচ বছর পরিশ্রম করলেও তা হতে পারত না। এখানে ওঁর সেই tonsilটা কাটাবার কথা হচ্চে। খোকার খবর কি? তার সেই eczema কি কিছু সারবার দিকে গেছে? তার ছবি দেখে আমার ভারি মজা লাগে। তাকে আমার হামি দিস্।

বাবা

।১৮। [লণ্ডন

জুলাই (?) ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু

মারু, তোর খোকার হাঁ করা হাবলা ছবিটা mantle piece এর উপর আছে— সেটা প্রায়ই আমার নজরে পড়ে এবং ওকে দেখবার জন্যে আমার মনটা উতলা হয়। ওর Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস্। ডাক্তারি বই দেখলেই জানতে পারবি Eczema বসে গেলে শরীর ভারি অসুস্থ হয়— অল্পেতেই অসুখ বিসুখ করতে থাকে। এই জন্যে তাড়াতাড়ি Eczema সারানো ভাল নয়। Sulphur 260 আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস্। তারপরে আবার এক মাস অপেক্ষা করে আবার খাওয়াস্। Eczema যদি বসে গিয়ে থাকে তবে Sulphur এ সেই দোষ নিবারণ করবে।

আমার অপারেশন চুকে গেল। প্রথম কয়েকটা দিন খুব দুঃখ পেতে হয়েছিল। ব্যারামটা কষ্টকর বটে কিন্তু চিকিৎসাটাও বড় আরামের নয়। কিন্তু প্রথম সপ্তাহের পর থেকে nursing home এ নিতান্ত মন্দ ছিলুম না। লোকজনের নিয়ত উৎপাত থেকে ঐ কটা দিন রক্ষা পেয়ে বিশ্রাম করতে পেরেছিলুম। বিছানায় পড়ে পড়ে দুঘণ্টা অন্তর আহার করা যেত আর বই

পড়তুম এবং কিছু কিছু লেখাও চলত। সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা খুব ভালই। যাঁরা বিশেষ বন্ধু তাঁরা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। এখনো অল্প একটু উপসর্গ বাকি আছে। সেজন্যে আজ ডাক্তারের ওখানে গিয়েছিলুম। বিষম দুঃখ দিলে। অজ্ঞান অবস্থায় কাটাকাটি করেছিল সেটা টের পাইনি— কিন্তু সজ্ঞান অবস্থায় যখন উপদ্রব তখন বড় অসহ্য বোধ হয়। যাই হোক্ বোধ হচ্চে ত অর্শের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। চিরকালের মত কিনা তা নিশ্চয় বলা যায় না। কেননা অপারেশনের পরেও কারো কারো আবার হয়। কিন্তু অন্তত চার পাঁচ মাসের মত ছুটি পাওয়া গেল আশা করচি। তোদের খড়গপুরের রাস্তা দিয়ে একদিন যেতে হবে। কবে তা নিশ্চয় বলতে পারচি নে। বোধ হচ্চে অগ্রাণের মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছতে পারবো। কার্ত্তিকটা না কাটিয়ে যেতে সাহস হচ্চে না। সুতরাং আর তিন মাস মেয়াদ আছে। ইতিমধ্যে আমার বই ছাপানোর বন্দোবস্ত কতকটা গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারবো। একটা কবিতার বই এবং বক্তৃতাগুলো ছাপাখানায় দেওয়া গেছে। ও দুটো অক্টোবরে বের হবার কথা। তারপরে 'শিশু'র তর্জ্জমাটা Christmas Publication এর Seasonএ বেরবে।

বৌমার সেই tonsil এবং adenoid কাটানো হয়ে গেছে সে খবর নিশ্চয় পেয়েছিস্। এখন সে ভালই আছে।

বাবা

[১৯] C/o Messrs. Thomas Cook & Sons
Ludgate Circus
ওঁ London
[Aug (?) 1913]

মীরু

তোরা সমুদ্রের ধারে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে মনের আনন্দে এবং শরীরের স্ফূর্ত্তিতে আছিস্ শুনে খুব খুসী হলুম। কিছু দীর্ঘকাল সেখানে থেকে বেশ ভাল রকম করে শরীরটা সুস্থ করে গরমের দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেই ত ভাল হয়। তোর চিঠিতে খোকার কথা শুনে প্রত্যেকবারেই তাকে দেখ্বার জন্যে আমার মনটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঠিক কবে যে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে তা এখনো নিশ্চয় বল্তে পারিনে। কেননা এখনো আমার কাজ সম্পূর্ণ সমাধা হয়নি। হতে কর্তে হয়ত আরো মাসখানেক কেটে যাবে। এদিকে বর্ষা এসে পড়ল। সমুদ্র এখন অশান্ত এবং দেশে এখন গুমোটের পালা। তাই বোধ হচ্চে যেন নবেম্বরের পূর্ব্বে আমার যাত্রা ঘটে উঠ্বে না। কিন্তু কিছুই বলা যায় না। কারণ, যাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। এখানকার লোক সমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য

নিভৃত কোণটির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাক্‌তে পারি তাহলে হাড়গুলো জিরয়। কিন্তু আবার ভাবি সেখানে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়্‌তে হবে— তা ছাড়া এবার ফিরে গেলে সেখানে মানুষের ধাক্কা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাবে— তার থেকে নিজেকে বাঁচানো আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে— এর ওপরে আবার আমার সমালোচক বন্ধুদের দল আছে— তাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক উচ্চতর সপ্তকে চড়বে। মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার উপকরণ সেখানে যে কিছু কম আছে তা বল্‌তে পারিনে। তাহোক তবু সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— নিজের বাসা ছেড়ে কোথায় বা ঘুরে বেড়াব।— এবার আমার বক্তৃতাগুলো পুস্তকাকারে ছাপাবার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে— বোধ হয় আগামী শরৎকালের মধ্যে বেরিয়ে যাবে। এই বক্তৃতাগুলি এখানকার লোকের ভাল লেগে গেছে— এদেশে এবং আমেরিকায় বিক্রী হবার সম্ভাবনা আছে। আমার ডাকঘরের ইংরেজী তর্জ্জমাটা শীঘ্রই লণ্ডনে অভিনয় হবার আয়োজন হচ্চে। আইরিশ থিয়েটার ওয়ালারা এটার অভিনয় করবে। এরা খুব চমৎকার অভিনয় করতে পারে। বোধ হয় ভালই করবে। রাজার ইংরেজীটা এখানকার লোকের ভাল লাগ্‌চে কিন্তু এটা অভিনয় করা শক্ত।

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু, এবার কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুর ঘুরে কাল কলকাতায় ফিরে যাচ্চি। সেখানে দুই একদিন থেকেই বোলপুরে যাব— বোলপুরে এবার শারদোৎসব হবার কথা আছে— হয়ে উঠবে কিনা জানিনে। পিয়ার্সন এণ্ড্রুজের সঙ্গে ফিজি দ্বীপে কুলি-দাসত্ব তদন্ত করবার জন্যে যাচ্চে। তার ফিরে আসতে মাঘ মাসের কাছাকাছি হবে শুনতে পাচ্চি। পিয়ার্সন গেলে বিদ্যালয়ে মস্ত একটা ফাঁক পড়বে। যাহোক্ ইতিমধ্যে তার বাড়িটা তৈরি হয়ে যাবে। ফিরে এসে নিজের ঘরে সিংহাসন দখল করে বসতে পারবে। নিশিকান্তরা চলে গেলে কিছুদিন তোদের খুব একলা ঠেকবে। যাহোক Sweatenhamরা তোদের প্রতিবেশী আছেন এটা তোদের খুব সুবিধে হয়েচে। তুই কি পাহাড় ভেঙে তাদের ওখানে হেঁটে উঠতে পারিস?

তোর শরীর কেমন আছে? খোকাই বা কেমন আছে? এবারকার অতিরিক্ত বাদ্‌লাটা ধরে গেলে শরৎকাল বোধ হয় খুব রমণীয় হয়ে উঠবে।

আমাদের এদিকে বৃষ্টির পালা শেষ হয়ে গিয়ে শরতের রোদ্দুর বেশ ফুটে উঠেচে। গোরাই পদ্মা মিলে এক হয়ে

গেছে। মাঝখানের চরে পাড়ীগুলো কেবল ভাস্‌চে আর সমস্ত ডুবে গিয়েছে। ভেবেছিলুম বোট নিয়ে নদীতে কোথাও থাক্‌ব। কিন্তু বোট বেঁধে রাখবার ভালো জায়গা কোথাও নেই বল্লেই হয়। তাই শিলাইদহের সেই তেতালার ঘরটাতেই আশ্রয় নিয়েচি। আলু তোদের ওখানে কেমন আছে বল্‌ত? উৎপাত করে না ত? কাজকর্ম্মে কিছু সাহায্য করে? যদি গোলমাল করে তাকে ভালুক শিকারে পাঠিয়ে দিস্।

আমাদের বোটের তপ্‌সি মাঝি বেচারা মারা গিয়েচে খবর পেয়েছিস্ কি? তার লিভারে ফোড়া হয়েছিল। এখানকার ডাক্তারের অযত্নে যখন সে মর মর তখন তাকে কলকাতায় মেয়ো হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেইখানে সে মরেচে। আমাদের মুস্কিল হয়েচে। বোটের কাজে তপসিটাকে বরাবর এমনি অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে আর কাউকে তেমন পছন্দ হয় না। বিশ্বনাথ চামরু ফটিক তপ্‌সি একে একে সব কটা পুরোনো লোক গেছে। সোনা বুড়োটা এখনো টিকে আছে।

আমি এবার দুই পরগণা থেকে একশো টাকা নজর পেয়েছি— খোকাকে আমার হামু দিস্। ইতি ২৩শে ভাদ্র ১৩২২

বাবা

মীরু

তোর শরীর ভাল নেই, জ্বর হয়েচে শুনে মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কেমন থাকিস্ যেন খবর পাই।

আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার ত কিছুমাত্র ভাল লাগল না— আমি যেখানে যাই কেবলি গোলমাল— লোকজনের উৎপাত থেকে একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই। শ্রীনগরে নৌকোয় ছিলুম— কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাইনি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। এখন মনে হয় এর চেয়ে রামগড়ে গেলে শরীর মনের বিশ্রাম পাওয়া যেত। যা হোক্ কাশ্মীরটা না দেখলে মনে একটা আক্ষেপ থেকে যেত সেইটে কেটে গেল এইটুকুই যা লাভ। আসলে আমার পদ্মার বালির চরে বোটের কাছে কেউ লাগে না—সেখানে নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল নদী, নির্ম্মল নদীতীর, নির্ম্মল অবকাশ— সেই আমার ঠিক মনের মত। কেবল ওখানে বিষয় কর্ম্মের যে গন্ধ আছে সেইটেতে আমাকে তাড়া দেয়— নইলে সেই জলের ধারে চুপচাপ করে পড়ে থাকতুম। ভারতবর্ষে কোথাও আমাকে স্থির থাকতে দেবে না। মনে করচি আবার একবার সমুদ্র পাড়ি দেব— এখন য়ুরোপে যাওয়া মিথ্যা— প্যাসিফিক পাড়ি দিয়ে জাপান হয়ে

এমেরিকায় যাবার ইচ্ছা আছে। এমেরিকাটা ভারী গোলমালের জায়গা বটে কিন্তু সেখানে Mrs. Moody প্রভৃতি কোনো একজনের আশ্রয় নিলে সেই আর সবাইকে ঠেকিয়ে রাখবে। এবার আর রথীদের নিয়ে যাব না— ওদের ত সংসার স্থিতি চাই— আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে চল্‌বে কেন। আমার একজন সঙ্গী খুঁজে বের করবার চেষ্টায় আছি।

খোকার শরীর ওখানে ভাল আছে ত? দিল্লি সহরটা স্বাস্থ্যকর জায়গা নয় বলেই ভাবনা হয়। ওখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপাত যথেষ্ট আছে। নিশিকান্ত বাবুদের পরিবারে ত অনেকদিন থেকেই রোগ লেগে আছে— ওঁদের প্রতিবেশীদেরও ত সেই দশা। আমার বোধ হয় তুই একটু সেরে উঠ্‌লেই ওখান থেকে যদি একদম বোলপুরে চলে আসিস্‌ ত ভাল হয়। শীতকালটা বোলপুরে বেশ ভালই থাকবি।

এখানে এসে দেখি এখনো শীতের কোনো আভাসমাত্র নেই— এখনো পাখা চালাতে হচ্চে। আজ খুব মেঘ করে এসেচে— হয়ত দুই একদিনের মধ্যে একটা ঝড় ঝাপট হয়ে যেতে পারে— তারপরে শীত পড়তে আরম্ভ হবে।

এই আসন্ন বাদলার ঝোঁকটা কেটে গেলে পর মনে করচি একবার শিলাইদহে যাব। সেখান থেকে বোটে করে ধীরে ধীরে পতিসরে যাবারও ইচ্ছা আছে— অনেকদিন বোলপুরের মাঠে কেটেচে— বাংলা দেশের নদীপথে বেড়ানো হয়নি।

আজ অষ্ট্রেলিয়া থেকে পিয়ার্সন এণ্ড্রুজের চিঠি পেয়েচি।

পিয়ার্সন বেচারার একজন পরম বন্ধুর যুদ্ধে মৃত্যু হয়েচে। ওরা যে কবে ফিরবে সে খবর দেয়নি। বোধ হয় হতে করতে মাঘ-ফাল্গুন এসে পড়বে।

খোকাকে আমার হামি দিস্— তাকে দেখবার জন্যে আমার মন উৎসুক হয়ে আছে। ইতি ১৯শে কার্তিক ১৩২২

বাবা

শিলাইদহ

[অগ্রহায়ণ ১৩২২]

মারু

এবার কাশ্মীরে শরীর ভাল ছিল না— বড়ই ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি। তাই শিলাইদহে কিছুদিন বিশ্রাম করতে এলুম। শিলাইদহের মত এমন মনের মত জায়গা আর তো কোথাও দেখলুম না। আমার সেই ছাদের ঘরে একলাটি বসে উত্তর দিকের খোলা দরজার ভিতর দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে দূরে পদ্মার জলরেখা এবং চরের গাছের শ্রেণী দেখতে পাচ্চি— ভারি ভাল লাগচে। কলকাতায় গরম পেয়েছিলুম— এখানে অল্প অল্প শীতের হাওয়া দিচ্চে— কাঞ্চন ফুলে গাছ ভরে গিয়ে দূর পর্য্যন্ত তার গন্ধ আসচে— আকাশে আলোতে হাওয়াতে পাখীর গানে ফুলের গন্ধে আমার চারিদিক এবং আমার মগজের ভিতরটা পর্য্যন্ত ভরে গিয়েছে— এত শান্তি এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নেই।

তোর আর খোকার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। দুদিন তোদের কোনো খবর ছিল না— আসবার দিন টেলিগ্রাফ করে খবর পেয়েচি তোরা অপেক্ষাকৃত ভাল আছিস্। কিন্তু বোধ হয় ঠিক আরাম হতে পারিস্নি। রথী হয় ত এ সম্বন্ধে

চিঠি পেলে আমি জানতে পারব। কিন্তু ইতিমধ্যে তোরা আর বেশিদিন দিল্লিতে না থেকে একবার এলাহাবাদে সত্যদের ওখানে যানা কেন। তারপরে শীত একটু জমলে যদি বোলপুরে আসতে চাস ত সেত সোজা— নইলে আর যে-কোনো জায়গায় খুসি যেতে পারিস। দিল্লিতে কখনই তোদের শরীর ভাল থাকবে না।

বাবা

[২৩]

শান্তিনিকেতন
৯ই পৌষ ১৩২২

মীরু

তোদের জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। আবার বোম্বাই পুণা অঞ্চলে প্লেগের উপদ্রব আছে বলেও ভাবনা হয়। পুণা সহরটা ত বেশ সুন্দর জানি— আমরা কিছুদিন ওখানে ছিলুম। কিন্তু ওখানকার স্বাস্থ্য বোধ হয় তেমন ভাল নয়। যাহোক্ ভেবে কোনো লাভ নেই— ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন।

৭ই পৌষের উৎসব বেশ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারি এই উৎসবে আমাদের প্রয়োজন আছে— এতে সম্বৎসরের স্নান হয়। পুরোণো ছাত্র এবার অনেক জমেচে। দেবল বিলেত থেকে ফিরে এসেচে। সে এখন কলকাতায় আমাদের শিল্প বিদ্যালয়ে মূর্ত্তিগড়ার কাজ শেখাবার ভার নিয়েচে। এরা সবাই মিলে কাল ৮ই পৌষে আশ্রমসঙ্ঘের একটা উৎসব করলে। আজ সকালে পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের শ্রাদ্ধসভা ছাতিমতলায় হল। ভেবেছিলুম ৭ই পৌষ সেরেই পতিসরের কাজ দেখতে যাব। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বরে গবর্মেণ্ট হাউসে আমাকে নিমন্ত্রণ করেচে— কাটাতে অনেক চেষ্টা করেও হল না। তাই বোধ হচ্চে দিনদশেক এই রকম গোলেমালে

কেটে যাবে। ভাল লাগ্‌চে না। একটু বিশ্রাম করতে চাই; সে আমার কপালে নেই। দেশ না ছাড়লে দেশও আমাকে ছাড়বে না। সুকেশী বৌমা বলছিলেন তোরা যদি আসিস এখানে থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি কিছুদিন বোটে বেড়িয়ে মনে করচি দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করতে বেরব। যদি তোরা ততদিন ওখানে থাকিস্ তাহলে তোদের সঙ্গে সেইখানেই দেখা হতে পারে। কিন্তু খোকার শরীর যে রকম দেখচি তাতে বোধ হয় তাকে নিয়ে এখানে এসে পড়লে শান্তি ও স্বাস্থ্যলাভ করবি। এখানে তোদের জন্যে আরো দুই একটা ঘর বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বাবা

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

।২৪।

শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক Janu : 1916

মারু

ভেবেছিলুম বোটে কিছুদিন পদ্মায় ভেসে ভেসে বেড়াব। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে বিশ্রাম লেখে না। বাঁকুড়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে তারই সাহায্যের জন্য ১৬ই মাঘে আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের কলকাতায় ফাল্গুনী করাবার চেষ্টা চলচে— সেইজন্যে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে হয়েচে। তার পরে এখানে এসেই হিন্দু য়ুনিভার্সিটির তরফ থেকে এক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল— সেখানে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে 'সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ কিনা' এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ পেয়েচি। একবার ভাবলুম কাটিয়ে দেব কিন্তু এখানে সকলেই পীড়াপীড়ি করে ধরলেন যে, এই সুযোগে এই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে অনেক লোক জমা হবে তাঁদের অনেকের কানে উঠবে। আজ সকালে ধাঁ করে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসে আছি। অতএব এখন কিছুকাল ধরে এই সব হাঙ্গাম নিয়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে— ছুটি কবে পাব জানিনে।

এবার ফাল্গুনীর আয়োজনটা বোধ হয় বেশ ভালই হবে।

আমাদের উঠোনেই ষ্টেজ হবে। সাজসজ্জা আলো Scene প্রভৃতির ত্রুটি হবে না— তারপরে ছেলেদের গান প্রভৃতি ত আছেই। গোড়ায় 'বশীকরণ' বলে আমার একটি ছোট প্রহসন অভিনয় হবে। গগনরা তার ভার নিয়েছেন। যাতে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা ওঠে তার চেষ্টা করতে হবে। খোকা ভাল আছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। পুণা সহরটা মোটের উপর ত বেশ ভালই। কেবল মাঝে মাঝে ওখানে বড় প্লেগের উপদ্রব হয়। পুণায় যদি ভালো গাইয়ের সন্ধান পাস ত খবর দিস্। আমাদের সঙ্গীত শিক্ষকের দরকার আছে।

আমার কুষ্ঠিতে সমস্তই যেরকম গোলমেলে তাতে আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না। যদি হঠাৎ কোনো বাধা না ঘটে তাহলে কাশী থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাবার চেষ্টা করব।

ওখানকার লোকজনদের সঙ্গে তোদের আলাপ পরিচয় হচ্চে? কোনো বন্ধু জুটিয়ে নিতে পেরেচিস? পুণায় অনেক বাঙালী ছাত্র আছে শুনতে পাই— তারা নিশ্চয় তোদের ওখানে জুটেচে। খোকাকে আমার হামু দিস্।

বাবা

[২৫[

[শান্তিনিকেতন]
১লা বৈশাখ ১৩২৩

কল্যাণীয়াসু

মীরু, তোরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

এইমাত্র আমাদের এখানে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল— মনটা তাতেই পূর্ণ হয়ে আছে।

কোথাও যাব যাব করছিলুম। গতবার বিলেত যাবার আগে যেমন একটা ছটফটানিতে আমাকে পেয়েছিল এবারেও কতকটা সেই রকম চঞ্চলতা আমাকে দোলাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের উপদ্রবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ছিল। এমন সময় আমেরিকা থেকে যেই টেলিগ্রাম এল অমনি আমার মনে হল বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এসেচে। আমি বারবার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি আমাকে বিধাতা গৃহস্থ ঘরের জন্যে তৈরী করেননি। বোধ হয় সেইজন্যেই ছেলেবেলা থেকেই কেবল ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো জায়গায় ঘরকন্না ফাঁদতে পারিনি। বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েচে আমিও তাকে বরণ করে নেব। তোরা কিছু ভাবিসনে—আমার যা কাজ সে আমাকে করতেই হবে—আরাম করা বিশ্রাম করা লোক লৌকিকতা করা বিধাতা আমার জন্যে কিছুতেই মঞ্জুর করবেন না। অতএব পথিকের প্রশস্ত রাজপথে সর্ব্বলোকের মাঝখানে চললুম— তোদের জন্যে আমার আশীর্ব্বাদ রইল— সুখের আশীর্ব্বাদ নয় কল্যাণের আশীর্ব্বাদ।

বাবা

রেঙ্গুন

২৫ বৈশাখ ১৩২৩

মীরু,

বিষম ঝড় কাটিয়ে কাল রেঙ্গুনে এসে পৌঁচেচি। সন্ধ্যার সময়ে নদীর ঘাটে দেখি লোকারণ্য। আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরং জয় রবীন্দ্রনাথকি জয়, চেঁচাতে চেঁচাতে তিন মাইল রাস্তা তারা ছুটে এল, সহরের দুধারের দোকানে বাজারে সকল লোকে অবাক্, আমি লজ্জায় মরি।

আজ বিকেলে এখানকার জুবিলি হলে সকলে মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে— বিষম একটা হট্টগোল বাধাবে। কোনো উপায় নেই— চুপ করে সইতে হবে। চুপ করে সইতে হলেও বাঁচতুম— কিছু না বলেও চলবে না। সেদিন এত বড় একটা ঝড় গেল তারপরে আবার এই হাঙ্গাম— এ সাইক্লোনের বাড়া। কাল মঙ্গলবারে বিকেলে জাহাজে যাবার কথা। জাহাজটা বেশ— আমরা যা খুশি করি— কাপ্তেন খুব ভদ্র— আদরে ও আরামে আছি।

এখানে আছি P. C. Senদের বাড়ী। ধনীর সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হাসাহাসি চলচে। সকাল বেলায় একটা বুদ্ধ

মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। এ সমস্ত বৃত্তান্ত তোরা নানা লোকের চিঠি থেকে পাবি-- অতএব খোকাকে হামি দিয়ে এবং তোদের সকলকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একটু বিশ্রাম করতে যাই। কাল ভাল ঘুম হয়নি।

বাবা

[২৭] [হাকান

১৮ আষাঢ় ১৩২৩

কল্যাণীয়াসু

মীরু, খুব এক চোট বর্ষার পালা কেটে গিয়ে এখন রোদ উঠেচে। এই পাহাড়ের পাইন বনের ভিতর থেকে সমুদ্র বড় সুন্দর দেখাচ্চে। এদের জাপানী বাড়ি বড় সুন্দর। আমার ভারি ইচ্ছে এই রকম বাড়ি আমি তৈরি করাব। এমন পরিষ্কার, এমন আরাম, এমন সুবিধে! আমাদের গৃহস্বামী খুব ধনী, খুব চমৎকার লোক, তাঁর বাড়িতে চমৎকার সব ছবি আছে এ রকম জাপানের আর কারো বাড়িতে নেই। আজ ১৮ই আষাঢ়। ভারতবর্ষে এতদিনে বোধহয় ঝমাঝম বর্ষা আরম্ভ হয়েচে। এখানে বর্ষা অল্প দিন থাকে—বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। আজ এখনি তোকিয়োতে বক্তৃতা দিতে যাচ্চি। আজ সন্ধ্যার সময় সেখানে মেয়েদের কলেজে আমার খাবার নিমন্ত্রণ আছে। খোকাকে আমার হামু দিস। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন।

বাবা

মীরু

অনেকদিন তোর কোনো খবর না পেয়ে মনটা উদ্বিগ্ন আছে। আমেরিকায় যাবার আগে বোধ হয় তোদের কোনো চিঠিপত্র পাওয়া যাবে না। সেখানে যাবার সময় খুব কাছে এল। আসচে বৃহস্পতিবার [৭ সেপ্টেম্বর] বিকেলবেলায় জাহাজ ছাড়বে। আমেরিকায় পৌঁছতে প্রায় দশদিন লাগবে। তারপরে সেখানে প্রথম যে সহরে পৌঁছব সেইখান থেকেই আমাকে বক্তৃতা সুরু করতে হবে। এখানে মোটের উপরে আমার দিনগুলো এক রকম চুপচাপ করে কেটে গেছে। কিন্তু এখন যাবার মুখে মনটা ছট্‌ফট্‌ করে উঠেচে। যখন জাহাজের ডেকে ডেক্‌ চেয়ারের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আর একবার আরাম করে বসব, আর জাহাজ অকূলে ভাসবে তখন একবার হাঁফ ছাড়ব। এখানে এখন আমার কোনো কাজ নেই— লেকচারগুলো লেখা শেষ হয়ে গেল। এখন কেবল সেইগুলোকে নিয়ে মাজাঘষা করচি। তারপরে আবার এখানে বেশ রীতিমত গরম পড়েচে। আমাদেরই দেশের মত। মাঝে মাঝে খুব মেঘ করে দুই একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি চলে তারপরে গুমট। সেইসঙ্গে যথেষ্ট মশার উপদ্রব আছে। জাপানী মশাগুলো আমাদের বাঙালী মশার চেয়ে ঢের

বড়, ডাকে কম, কামড়ায় বেশি। এই রকম বাদলে গুমটে শরীর কেমন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে থাকে। এখানে কলকাতার মত ইলেকট্রিক পাখার চলন নেই— যদিচ ইলেকট্রিক আলো এখানে খুব শস্তা। পাখা নেই তার একটা কারণ বোধ হয় এখানকার ঘরের ছাদ অত্যন্ত নীচু। তারপরে এখানকার মশারি বেজায় মোটা— ঘর জুড়ে এক একটা যেন তাঁবু পড়ে যায়। বোধ হয় এখানকার বীর মশাদের আক্রমণের পক্ষে আমাদের সৌখীন নেটের মশারি যথেষ্ট নয়। এখন আমরা রেলগাড়ীতে, টোকিয়ো সহরের দিকে চলেচি। দুধারে পাহাড়, ধানের ক্ষেত, তুঁতের বন্ (রেশমের চাষের জন্যে) পাইনের অরণ্য, বর্ষার জলে ভরা ছোট ছোট নদী— সমস্ত জাপান দেশটা যেন আগাগোড়া ছবির পর ছবি—আর এখানকার লোকেরাও তেমনি সৌন্দর্য্য অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। আর মেয়ে পুরুষে পরিশ্রম করে কাজ করতে জানে—শুধু পরিশ্রম করে নয় পরিপাটি করে—তাই এদের সমস্ত দেশটা এমন শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেচে।

খোকাকে আমার হামু দিস্।

বাবা

২৯।

Palace Hotel
San Francisco

মীরু

এখানে এসে যে তোদের কারো চিঠি পাব সে আমি আশা করিনি। কেননা এখানে সহর থেকে সহরে বক্তৃতা দিয়ে হাততালি এবং টাকা কুড়িয়ে ঝড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্চি। হঠাৎ কাল তোর একখানি চিঠি পেয়ে খুব খুসী হলুম। এ চিঠি Mrs. Moodyর ঠিকানা থেকে সিয়াটল্ সহর হয়ে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে San Francisco তে এসে আমার নাগাল পেয়েচে। সোমেন্দ্র সিয়াটেলের বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল— সে সান্‌ফ্রান্সিস্কো পর্য্যন্ত এসেচে— এখান থেকে আর পাঁচদিন পরে দেশে রওনা হবে। জাপানে দিন পনেরো থেকে ভারতবর্ষে যাবে। ও যেমন ছিল তেমনিই আছে। সেই রকম ভোজন নিদ্রাপরায়ণ, সেইরকম অকর্ম্মণ্য অলস, সেই রকম অসম্বন্ধ প্রলাপী। দেশে গিয়ে ও যে পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগ্‌বে তা ত জানিনে। যা হোক্ ও গেলে আমাদের কিছু কিছু খবর পাবি। মুকুলটা অল্প অল্প করে ফুটে উঠ্‌চে। ওর বিদেশে আসা নেহাৎ ব্যর্থ হবে না। এখানে আমাদের ভারতবর্ষীয় ছবির Exhibition আজ থেকে আরম্ভ হবে। বোধ

হচ্ছে লোকদের ভালই লাগ্‌বে। আমি যত দেখ্‌লুম জাপানের ছবি এবং এখানকার, আমার ততই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েচে আমাদের বাংলা দেশে যে চিত্রকলার বিকাশ হচ্চে তার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এ যদি নিজের পথে পূরো উদ্যমে চল্‌তে পারে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে আপনার একটা খুব বড় জায়গা পাবে। দুঃখের বিষয় এই যে— বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট আছে কিন্তু উদ্যম ও চরিত্রবল কিছুই নেই। আমরা নিজের দেশকে এবং কাজকে একটা বৃহৎ দেশ এবং কালের উপর দাঁড় করিয়ে উদারভাবে দেখ্‌তে জানিনে। সেইজন্যে আমাদের যার যেটুকু শক্তি আছে সেইটুকু নিয়ে ছোট ছোট ভাবে কারবার করি— তারপরে একটু ফুঁ লাগ্‌লেই সেই শিখা নিবে যায় তারপর আবার যেমন অন্ধকার তেমনি অন্ধকার। জাপানে আধুনিক শিল্পীদের জন্যে ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ চল্‌চে তার ঠিক নেই। তার মানে এই কাজে ওরা যথার্থভাবে আত্ম-বিসর্জ্জন করেচে— কেবলমাত্র সৌখীনভাবে কুণোভাবে কাজ চল্‌চে না। সিয়াটেলে একটা স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখলুম সেখানে জন কয়েক আর্টিস্টে মিলে কাজ করতে লেগে গেছে। অর্থাৎ এ দেশে যে কোনো মানুষকে যে কোনো আইডিয়াতে পেয়ে বসে, সেই আইডিয়াকে বৃহৎ দেশ ও কালের সঙ্গে সংলগ্ন না করে সে থাক্‌তেই পারে না— এটাই হচ্চে এদের স্বভাব— সেইজন্যেই এরা বড় হয়ে উঠেচে। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, অলস, আমরা নিজের একাকীত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারিনে—

আমাদের আনন্দ সমস্ত মানুষটিকে নিয়ে নয়, নিজের কোণটুকুকে নিয়ে—আমাদের যা কিছু অর্থ এবং সামর্থ্য সমস্তই আমরা নিজের উপর খরচ করি— কৃপণতার অন্ত নেই। কিন্তু এ কথাটা বুঝিনে যে আমরা যেখানে নিজে একলা সেখানে আমরা ফুটো কলস, যা আমরা কেবল নিজের উপরে ঢালি তা সমস্তই নিকেশ হয়ে যায়। কবে আমরা সকলের হয়ে চিন্তা করতে এবং সকলের হয়ে বেদনা বোধ করতে পারব? কবে আমাদের শক্তি— সকলের যোগে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে? আমাদের দীনতা কৃপণতার অন্ত নেই যে— সেই দীনতার ভারেই আমাদের দেশ ডুবেচে

নইলে আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা কম নয়— সে শক্তির মহত্ত্ব বিদেশে আস্‌লে আমরা বেশি করে বুঝতে পারি। কিন্তু যে ঔদার্য্য যে মহদাশয়তা থাক্‌লে সেই শক্তি চিরন্তন হতে পারে, সর্ব্বদেশে ও নিত্যকালে সফল হয়ে উঠ্‌তে পারে আমাদের সেই তেজ, সেই আত্মোৎসর্জ্জন নেই। আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পার্‌লেনা। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ত প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম। যা হোক্ আর কোনো সময়ে আর কেউ উঠ্‌বে— এবং দেশের মধ্যে চিত্রকলার যে শক্তি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েচে তাকে

বিপুল বেগে চলবার জন্য পথ করে দেবে।…কিছুরই সৃষ্টি হোলনা কিছুই প্রাণ পেলে না কেবল কতগুলো তুচ্ছ মালমস্‌লা আমার মত হীনশক্তি গোরুর গাড়ীকে অবলম্বন করে আমারই বাড়ির পথ রোধ করে জমে রইল কিন্তু রাজমিস্ত্রি কোথায় যে গড়ে তুল্‌বে; সেই বেদনা কোথায় কল্পনা কোথায়, আত্মদান কোথায় যার জোরে বিধাতার অভিপ্রায়কে মানুষ সার্থক করে তোলে?

তোর খুকীকে দেখবার জন্যে আমার মন খুব ব্যগ্র হয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার ছবি আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। তার জন্যে জাপান থেকে যে কাপড় পাঠিয়েছি পেয়েছিস্? আমি নিতান্ত আনাড়ি— জানিনে তার পরবার মত হয়েচে কিনা। তাকে আমার হামু দিস্ আর খোকাকে। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন এই আমার একান্ত মনের প্রার্থনা। ইতি ১৭ই আশ্বিন ১৩২৩

বাবা

[৩০] [কলিকাতা]

মীরু

বেলা আগের চেয়ে একটু ভাল আছে, অর্থাৎ জ্বর কমেচে। ওকে আরো ভালো দেখলে তারপরে বোলপুরে যেতে পারব। কবিরাজ গণনাথ বলেন নৈরাশ্যের কারণ নেই।

আজ কমল দিনু যাচ্চে তাদের কাছে সমস্ত বিস্তারিত খবর পাবি। আমি দিনটা বেলার ওখানেই কাটাই তাই সময় পাইনে।

তোর খুকীর নাম অহনা কিম্বা ঊষসী রাখতে পারিস। দুইয়ের মানে ঊষা। এবারে গেলে ও বোধহয় আমাকে চিনতে পারবে না। ইতি ১৩ আষাঢ় [১৩২৪]

বাবা

[৩১]

[বোম্বাই]
১৫ই মে ১৯২০

কল্যাণীয়াসু

মীরু, আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জাহাজে চড়তে হবে। তাই খুব ব্যস্ত আছি। এণ্ড্রুজের টেলিগ্রামে জানা গেল তোরা এখনো কিছুদিন বোলপুরে থাকবি— কলকাতার বাড়ি প্রস্তুত হলে তারপরে যাবি। ওখানে রামানন্দ বাবুদের বাড়ির সামনেই তোদের বাসা ঠিক করেচে। যাই হোক্ আমরা বেশি দিন য়ুরোপে থাকব না— যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব। সুখ দুঃখ আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। কিন্তু ভাগ্যে যাই ঘটুক সেইটেকেই নিজের অন্তরের তেজে কল্যাণে পরিণত করবার সাধনা আমাদের নিজের হাতে। তোরা সুখী হবি এই কামনা করি কিন্তু এই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া সকলের ভাগ্যে কঠিন— আমি কেবল এই আশীর্ব্বাদ করি দুঃখকে মহত্ত্বের সঙ্গে বহন করবার এবং দুঃখকে আত্মার শক্তিতে অতিক্রম করবার সাধনা তোর প্রতি মুহূর্ত্তে সফল হতে থাক্। এই সংসার নিত্য সত্য নয় এর সঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া একটা মোহ— সেই আসক্তি থেকে মনকে যদি ছাড়িয়ে নিস্— প্রতিদিনের আপনকে যদি চিরদিনের আপন থেকে বাইরে রেখে দেখ্তে পারিস্—সংসারের

তলায় মনকে পিষ্ট করে না রেখে সংসারের উপরে যদি মনকে নির্লিপ্ত করে রাখ্‌তে পারিস্‌, তাহলেই সত্যের মধ্যে বিচরণ করতে পারবি, এবং সকল দুঃখ অবমাননা থেকে মুক্তি পাবি। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন।

বাবা

[৩২]

মীরু

জাহাজ ত চলেইচে। কাল এডেনে পৌঁছব। তাই আজ দলে দলে সবাই চিঠি লিখ্‌তে বসে গেচে। সমুদ্র খুবই শান্ত—এমন কি মঞ্জুরও sea-sickness এর কোনো উপসর্গ হয়নি। কিন্তু জাহাজে যাত্রী একেবারে ঠাসা। ভিড়ের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না, তাই ডেকে অন্য সকলের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসে থাকতে পারিনে—music saloon বলে একটা ঘর আছে সেই ঘরের এক কোণে চুপচাপ করে থাকি। এখানে বসে সমুদ্রের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশোনা হয় না—তবে কিনা তার কলধ্বনি শোনা যায়। বেশিদিন যে য়ুরোপে থাকবো না সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ভাল লাগচে না। আমার সেই উত্তরায়ণের কাঁটাবনে আমার মন নিয়ত বিচরণ করে। পাশ্চাত্য দেশে বাস করবার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে সর্ব্বদাই বেশভূষা করে জুতো মোজা পরে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই অপ্রস্তুত হয়ে থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে—সেই জন্যে বোতাম এঁটে থাকতে আমার বড় খারাপ লাগে। তোকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসবার প্রস্তাব মাঝে মাঝে আমার মনে জেগেছিল—কিন্তু আমি তোর স্বভাব যতটা বুঝি তাতে আমি নিশ্চয় বুঝি যে তোর পক্ষে

এই ভিড় ঠেলাঠেলি, এই সর্ব্বদা সিধে খাড়া হয়ে কাটানো প্রতিমুহূর্ত্তে অসহ্য হত।

সাধু যখন বোম্বাই থেকে ফিরে গেল তার সঙ্গে তোকে দেবার জন্যে, এক ঝুড়ি বোম্বাই আম পাঠিয়েছিলুম— পেয়েছিলি কি? আমার সন্দেহ আছে সে আমগুলো হয়তো সাধু সেবাতেই লেগে গেল। শেষ পর্য্যন্ত সাধুর ইচ্ছা ছিল এবং আশা ছিল যে তাকে আমাদের সঙ্গে বিলেতে নিয়ে আস্‌ব। আমরা জাহাজে চড়ে বসলেও সে প্রায় তিন চার ঘণ্টা dockএ বসে জাহাজের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে বসে ছিল। যদি ওকে নিয়ে আসতুম তাহলে ওর যে কি দুর্গতি হত সে কথা বোঝবার ক্ষমতা ওর নেই। আজ খুব গরম পড়েচে। কাল থেকে Red Seaর মধ্যে গরম আরো বেড়ে উঠ্‌বে। তারপরে Mediterraneanএ পৌঁছে তবে একটু ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আর ১১ দিন পরে জাহাজ মার্শেল্‌স্ বন্দরে পৌঁছবে। কিন্তু আমরা সেখানে না নেবে একেবারে সমুদ্র পথে ইংলণ্ডে যাবো। তাতে আরো ৭ দিন সময় লাগবে।

ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন। ইতি ১৯ মে ১৯২০

বাবা

[৩৩]

[লণ্ডন
১৮ জুন ১৯২০

মীরু

এখানে এসে অবধি আর সময় পাইনে। শুধু যে কেবল লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে দিন কাটচে তা নয়— নতুন জায়গায় নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজের মিল করে নিতে অনেক কাল লাগে। আমি কুণো মানুষ, ভিড়ের মধ্যে আমার জায়গা নয়। পিয়ার্সন আমার সঙ্গে আছে সেই আমার একটা মস্ত সুবিধে। প্রতিদিনই একবার কোরে ইচ্ছা করে দেশে ফিরে যাই, আবার এও মনে হয় এখানে আমার কাজ আছে। বিশেষত য়ুরোপের অন্য দেশ থেকে প্রায় চিঠি পাই, তারা আমাকে বারবার যেতে বলচে। এখানে না থেকে এবার সুইডেন নরোয়ে ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে আসবো মনে করচি। আজকাল পাসপোর্টের হাঙ্গামায় ধাঁ করে কোথাও যাওয়া চলে না। পাসপোর্টের চেষ্টা করচি। কাল অক্সফোর্ডে যাবার নিমন্ত্রণ আছে। তারপরে কেম্ব্রিজ যাব, তারপরে আর দুই এক জায়গায়। লণ্ডনে আর বেশিদিন থাকবো না, তোরা পিয়ার্সনের ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে C/o. Thomas Cook & Sons, Ludgate Hill, London এই ঠিকানায় দিলে চিঠি পেতে দেরি হত না— একবার ম্যাঞ্চেষ্টরে গিয়ে তারপরে ফিরে আস্তে অনেকটা সময় লাগে। কুকদের ঠিকানায় চিঠি দিলে তোদের চিঠি পাঁচ ছয় দিন আগে পাওয়া যেত। এদেশে আজকাল আসাও যেমন শক্ত বেরনও তেমনি। বহুদিন আগে থাকতে প্যাসেজ ঠিক না করলে জাহাজে জায়গা পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করলুম আর চলে গেলুম সে হবার জো নেই। মঞ্জু প্রথমটা এখানে এসে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল— এখন আবার বেশ প্রসন্ন হয়েচে। তাকে কোথায় পড়তে দিই তারই সন্ধান করচি। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানকার সব ইস্কুল বন্ধ। চেষ্টা করচি আপাতত কোনো পরিবারের মধ্যে ওকে স্থান দিতে পারি। বৌমা বেশ ভালই আছেন—কোনো আর্টিস্টের স্টুডিয়োতে মূর্তি গড়া শেখবার জন্যে প্ল্যান করচেন।—বুড়ির জ্বর হচ্চে শুনে উদ্বিগ্ন হয়েচি। হাতের কাছে কোনো হোমিওপ্যাথ নেই বলেই মুস্কিল হয়েচে। ক্ষিতিমোহনবাবু ওখানে থাকলে ভাবনা থাকত না। এতদিনে তোরা কোথায় আছিস কে জানে। কলকাতাতেই তোর বাসা চিরস্থায়ী হবে কেন মনে করচিস্? আমার ত বোধ হয় আমরা ফিরে গেলে বোলপুরেই তোদের পাকা রকম থাকবার ব্যবস্থা হতে পারবে।

এবার এখানে এখনো যথেষ্ট শীত আছে। এণ্ড্রুজ বলেছিল ঠাণ্ডা কাপড় পরতে হবে— তার কোনো লক্ষণ দেখচি নে। গরম কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্চি। সেটা আমার ভাল লাগে না।

দেশে ফিরে গিয়ে এই সব বোঝা ফেলে দিয়ে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বারান্দায় বসতে পারলেই আমি বাঁচি।

এণ্ড্রুজ লিখেচে খোকাকে সে ইংরেজি পড়াচ্চে— খোকা বেশ দ্রুত উন্নতি করচে। পিয়ার্সন খোকার কথা প্রায় জিজ্ঞাসা করে।

বাবা

৩৭।

[লণ্ডন

জুন ১৯২০

মীরু

ক'দিন থেকে কেবলি তোর কথা মনে হচ্চে। ভাবচি হয়ত তুই কষ্ট পাচ্চিস। আমাকে যদি কেউ কলকাতার বাড়ির খাঁচায় পূরে রাখ্‌ত আমার কি অসহ্য কষ্ট হত সে ত বুঝ্‌তে পারি। এমন কি এখানকার এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং লণ্ডনের ভিড় আমাকে যেন চেপে মারচে। প্রতিদিনই দেশে ফেরবার জন্যে চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠ্‌চে। বোলপুরের আকাশ আলোক মাঠ সেখানকার স্বাধীনতা তোর পক্ষে কতখানি সেত আমি জানি। কিন্তু জগতে যত জীবজন্তু আছে সব চেয়ে পরাধীন মানুষ। কেননা মানুষ স্বাধীনতার মূল্য জানে অথচ পদে পদে তার থেকে বঞ্চিত। বিশেষত মেয়েদের কথা যখন ভাবি তখন মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমরা পুরুষ, কত যুগ থেকে মেয়েদের জেলখানার দারোগাগিরি করে আস্‌চি— এর নিষ্ঠুরতা যে কতদূর যেতে পারে তা কল্পনা করবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়েচি। আমার জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে আমি তোকে সুখী করতে পারলুম না। আমার এইটুকুমাত্র আশা ছিল যে তোকে বোলপুরে ফাঁকায় রাখ্‌তে পারব।

কিন্তু সেও আমার সাধ্যের অতীত। তাই আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি তিনি তোকে ধৈর্য্য দিন, তোর অন্তরের মধ্যে তিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করুন। এই পরম দুঃখের আগুনে তিনি তোকে উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধ করে তুলুন। আজ এখানে এসে দেখতে পাচ্চি সমস্ত জগৎ জুড়ে বেদনার হোম হুতাশন জ্বলে উঠেচে। এই কষ্টের মূলে আছে দুই দলের সংঘর্ষ, একদল জবরদস্তি করে নিজেরই ইচ্ছাকে বলবান করে তুল্‌তে চাচ্চে, আর একদল সেই চাপে পিষ্ট হচ্চে, একদলের হাতে অস্ত্র আছে আর একদল নিরুপায় কিন্তু এই নিরুপায়ের দল জগতে জিৎবে ;— যারা চিরদিন কেবল জবরদস্তি করতে অভ্যস্ত তারা নিজের অস্ত্রের চাপে ভেঙে পড়বে। ইতিমধ্যে ব্যথা সইতে হবে— কিন্তু যারা ব্যথা পায় তারা যেন সেই ব্যথা বড় করে সইতে পারে। জীবনে এমন সব দুঃখ আসে যাকে এড়াবার কোনো জো নেই, কিন্তু সেই দুঃখের শিখায় আত্মদান করাটা যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়ার মতই পবিত্র করে তোলা মানুষের শক্তিতে আছে। তুই অন্তর্যামীকে বল্‌তে পারিস্ ‘এই বেদনার মধ্য দিয়ে আমাকে আমি তোমার হাতে দিচ্চি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।’

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ।

বাবা

১৭]

C/o Thomas Cook & Sons
Ludgate Circus, London
[July 1920]

মীরু

আজ তোর চিঠি পেলুম। এখানে এত লোকের ভিড় এবং গোলমাল যে, কিছুতে কোথাও মন বসাতে পারিনে। তার উপরে প্রায়ই বৃষ্টি বাদল মেঘ অন্ধকার। ভেবেছিলুম এখান থেকে হপ্তায় একটা করে বড় চিঠি লিখ্‌ব, সবাই আমার খবর পাবে। কিন্তু দুলাইন চিঠি লিখ্‌তেও ভাল লাগে না। তাই এখানে এসে অবধি কিছুই লিখিনি। তুই ভেবেছিস্ এখানে কোনো জায়গায় একটুও নিরিবিলি কোণ্ পাওয়া যায় যেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে আপন মনে কাটানো যেতে পারে— কোথাও না। বিশেষত আজকাল এখানকার জীবনযাত্রা কঠিন হওয়াতে জায়গার টানাটানি, আহারের টানাটানি, চাকর দাসীর টানাটানি। এ দেশে আমাদের মত কুণো লোকের পক্ষে কোথাও স্থান নেই।— ব্রিস্‌টলে দু তিনদিনের জন্য গিয়েছিলুম। সেখানে মেয়েদের স্কুলে মেয়েরা মিলে King of the Dark Chamber করেছিল। বেশ সুন্দর হয়েছিল। Crescent Moon থেকে কবিতা আবৃত্তি করেছিল, সেও বেশ

ভাল লেগেছিল। এদেশে একটা জিনিষ দেখে পদে পদে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমাকে এদের বিস্তর লোক সত্যি সত্যিই ভালবাসে— এদের ভক্তি খুব সত্য, খুব অকৃত্রিম ও নির্ভর যোগ্য। আমি নিজেই ভেবে পাইনে আমার কাছ থেকে এরা কি পেয়েচে যার জন্যে এরা এত বেশি কৃতজ্ঞ। আমার যা দেবার সে ত বাল্যকাল থেকে নিজের দেশকেই দিয়েচি, কিন্তু সেখানে আমার ভাগ্যে যে বক্‌শিস্ মেলে সে ত জানি। য়ুরোপের অন্য দেশ থেকে আমার কাছে এত সমাদরের চিঠি আস্‌চে যে সে কি বল্‌ব। আমাকে সকলে বল্‌চে সেখানে আমার আদর আরো অনেক বেশি। তাই মনে মনে ভাবি, যেখানে মানুষ আমাকে চাচ্চে এবং আমার কাছ থেকে কিছু পাচ্চে সেখানেই আমার সত্যকার জায়গা। পৃথিবীতে ত চিরদিন থাক্‌ব না, যতটা পারা যায় কিছু রেখে যেতে হবে— সেই রেখে যাবার পক্ষে এই জায়গাই প্রশস্ত, কেননা, এরা আমাকে আপন বলে স্বীকার করেচে, এরা আমার কাছে হাত পেতেচে। পর যখন আপন বলে মানে তখন সেই মানার মধ্যে খুব বড় সত্য থাকে—সেই সত্যকে কোনো কারণে অগ্রাহ্য করা চলে না। এই সব কথা মনে করেই এখানে আমার যা কাজ তাই করার চেষ্টা করচি। যারা আইডিয়া নিয়ে কাজ করে তাদের পক্ষে সেই দেশই দেশ যেখানে সেই সব আইডিয়ার বীজ ক্ষেত্র পায়, সফল হয়— চাষী যদি সমস্ত সাহারা মরুভূমির মালেক হয় তাহলে সে তার পক্ষে ফাঁকি। আমার পরে

ঈশ্বরের দয়া এই যে, তিনি আমাকে যা শক্তি দিয়েচেন তার এমন ক্ষেত্র দিয়েচেন সমস্ত পৃথিবীকে আমি আপন বলে বিদায় নিতে পারব— সমস্ত পৃথিবীতে আমার বাসা তৈরী হল। এণ্ড্রুজের কাছ থেকে নীতুর খবর প্রায় পাই। শান্তিনিকেতনে তার রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ হলে নিশ্চিন্ত হব। ওখানে ওকে প্রাইভেট পড়াবার জন্যে কোনো মাষ্টারের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে দিস্— তাকে মাসে কিছু বেতন দিলেই চল্‌বে।

বাবা

৩৬।

Boulogne (Seine)

[২০ অগস্ট ১৯২০]

মীরু

আমরা এখন প্যারিসে আছি। যাঁর আতিথ্যে আছি তিনি খুব ধনী কিন্তু ভাব-পাগলা। নিজে খুবই সামান্যভাবে থাকেন, নিতান্ত গরীবের মত খাওয়া দাওয়া বেশভূষা চালচলন। কিন্তু মানুষের উন্নতি ও উপকারের জন্যে নানারকম ভাব দিনরাত ওঁর মাথায় ঘুরচে, আর তাই নিয়ে মুক্তহস্তে টাকা খরচ করচেন। এই যে বাড়িতে আছি এখানে ইনি দেশবিদেশের লেখক ও ভাবুক লোকদের থাকতে দেন— প্যারিস থেকে একটু তফাতে, নিরিবিলি জায়গায়, সীন নদীর ধারে, এর সঙ্গে চমৎকার একটি বাগান আছে, মস্ত একটি লাইব্রেরী, কাছেই একটি ঘর আছে, সেখানে দেশবিদেশের নানা ছবি ম্যাজিক ল্যাণ্ঠনে দেখাবার বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছা করলে আমরা বন্ধু বান্ধবদের ডেকে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পারি— এজন্যে আমাদের কোনো খরচ নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে এর চমৎকার একটি জায়গা আছে, হপ্তা দুইতিন সেইখানে গিয়ে থাকবার জন্যে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েচি। সে রকম জায়গায় থাকা আমাদের নিজের সামর্থ্যে কিছুতেই কুলোত না। খুব ধনী লোকের পক্ষেও সেখানে বাড়ী পাওয়া কঠিন। সেই দক্ষিণ ফ্রান্সে

এখানকার চেয়ে অনেক বেশি গরম— ফলে ফুলে গাছে পালায় মনোরম। সেখানে অনেকটা আমাদের ভারতবর্ষের ভাব পাওয়া যাবে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেখানে কাটিয়ে তারপরে হল্যাণ্ডে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে প্রায় দু হপ্তা কাটবে, তারপরে অক্টোবরের আরম্ভে প্যারিসে এসে এক হপ্তা কাটিয়ে ৮ই অক্টোবরে জাহাজে চড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিতে হবে। এবারে আমেরিকায় গিয়ে চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে যেমন করে হোক্ শান্তিনিকেতনের জন্যে কিছু টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। সেজন্যে কোমর বেঁধে চলেছি— নইলে কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করচে না। এই বর্ষার দিনে আমার সেই উত্তরায়ণের বারান্দায় কাঁটাবনের সামনে বসে মেঘের লীলা দেখবার জন্যে মন যে কতবার ব্যাকুল হয়েচে সে আর কি বলবো। কিন্তু একবার বিলেতে এসে যেমন অর্শের ব্যামো ফেলে দিয়ে আয়ু বাড়িয়ে গেছি এবার তেমনি আমেরিকায় টাকার ভাবনা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গেলে আয়ুর কোঠায় আরো বছর কুড়ি সময় পাওয়া যাবে। দেখা যাক্ কপালে কি আছে।

পর্শুদিন আমরা এখানকার যুদ্ধে উচ্ছিন্ন জায়গা দেখতে গিয়েছিলুম। কতদূর পর্য্যন্ত একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে। গ্রাম সহরের চিহ্ন নেই— জমিও ক্ষত বিক্ষত। কতদিনে যে এই সমস্ত জায়গা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে তা বলতে পারিনে। কলকাতায় গিয়ে বুড়ি কেমন আছে লিখিস্নি কেন ?

বাবা

মীরু

এণ্ড্রুজের চিঠিতে খবর পেলুম তুই শান্তিনিকেতনে এসেচিস। সে চিঠি একমাস আগে লেখা এবং আমার এ চিঠি প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পৌঁছবে। অতএব তত দিনে তুই কোথায় থাকবি তা নিশ্চয় করে বল্‌তে পারিনে। তবু শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় পাঠাচ্চি। বর্ষার সময় ও জায়গা নিশ্চয় তোর খুব ভাল লাগ্‌চে। কিন্তু তোরা কোন্ বাড়ীতে আছিস বুঝতে পারচিনে তোর সাবেক আড্ডা ত সঙ্গীতশালা দখল করে বসেচে। তাহলে বোধ হয় তুই আছিস নেবুকুঞ্জে। সেখানে তোদের থাকবার কোনো অসুবিধা হচ্চে নাত? আমার উত্তরায়ণ ত পড়ে আছে কিন্তু সেটা বড় দূরে, সেখানে একলা বোধ হয় তোর থাকা পোষাবে না। যাই হোক একটা মনের মত ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েচে।

আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর ভারী সুন্দর একটা জায়গায় এসেচি। প্যারিসের একজন মস্ত ধনীর এই বাড়ি। রাজপ্রাসাদ বল্‌লে হয়। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে আমাদের কয়জনেরই তোরঙ্গ রেলের থেকে খোয়া গেছে। তাতে আমাদের সব কাপড় ছিল, বইও ছিল। যা পরে বেরিয়েছিলুম তাছাড়া আর কিছুই নেই। মহামুস্কিল। তাই এখানে তিন চারদিন মাত্র কাটিয়েই আজ আবার বিকেলের

গাড়ীতে প্যারিসে ফিরে যাচ্চি। সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি বোধ হয় কিছু কাপড় চোপড় কিনে এবং তৈরী করিয়ে নিতে হবে নইলে ভদ্রতা রক্ষা অসম্ভব হবে। সেখানে যে বাড়ীতে থাকব সেও খুব সুন্দর, সীন্ নদীর ধারেই— বাড়ীর সঙ্গেই একটি চমৎকার বাগান আছে কত যে ফলের গাছ কি বল্‌ব। বাগানের ফল রোজ চার বার করে খাচ্ছিলুম। সেখানে এক সপ্তাহ কাটিয়ে হল্যাণ্ডে যেতে হবে। হল্যাণ্ডেও সুন্দর একটি বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, তারা আমাদের ভ্রমণের জন্যে মোটর গাড়ি পর্য্যন্ত ঠিক করে রেখে দেবে। সেখানে নানা জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে— বক্তৃতা করতে হবে। তারপরে প্যারিসে আবার ফিরে এসে আমার বক্তৃতা আছে।

এণ্ড্রুজের মত এমন পাগল দেখিনি। সে আমাকে দুটো চিঠিতেই আশ্বাস দিয়ে লিখেচে যে তোর পা সেরে গেছে। কিন্তু পায়ে যে কি হয়েছিল তা কোনো চিঠিতেই লেখেনি। যাই হোক যখন সেরে গেছে তখন আর জান্‌বার দরকার নেই।

এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে বোধ হয় অনেক নূতন লোক এবং নতুন ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাচ্চিস্। আমরা যখন ফিরব তখন অনেক বদল দেখ্‌তে পাব। এবারে খুব চেষ্টা করব যাতে এত টাকা নিয়ে যেতে পারি যাতে আশ্রমের খরচপত্রের জন্যে আমাকে কোনোদিন আর না ভাবতে হয়। তারপর থেকে আর আমার কাঁটাবন থেকে কোনোদিন নড়ব না।

বাবা

[৩৮]

[নিউ ইয়র্ক

২৯ অক্টোবর ১৯২০

মীরু

জাহাজ কাল রাত্রে তীরে এসে পৌঁচেছে, আজ সকালে ডাঙায় উঠ্‌ব— এখন ভোর রাত্রি, অন্ধকার আছে, খুব শীত —আলো হলেই ডাক পড়বে, সকাল সকাল খেয়েই বেরিয়ে পড়্‌ব। তারপর থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত এত গোলমালের মধ্যে থাকতে হবে যে চিঠিপত্র লেখার সময় পাব না। আমাদের জাহাজ হল্যাণ্ডের, খুব মস্ত এবং ভাল। অত্যন্ত পরিষ্কার। জাহাজের লোকরা ভদ্র। এত বড় জাহাজ না হলে মাঝে মাঝে খুব বেশী দোলা লাগ্‌ত। এট্‌লাণ্টিকের মাঝদরিয়ায় যখন এসেছিলুম তখন কিছুদিন সমুদ্র খুব উতলা ছিল— মেঘ বাদলা অন্ধকার। কিন্তু শেষের দু'তিনদিন বেশ রোদ্দুর উঠে সুন্দর হয়েছিল— এ বছরের লক্ষ্মী পূর্ণিমা সমুদ্রের উপরেই দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্মী যে সমুদ্রমন্থনে প্রকাশ পেয়েছিলেন। তিনি কোজাগর রাত্রে আমাকে ভোলেননি— আমি প্রায় দুশো টাকা পেয়েছিলুম। যাত্রীরা আমাকে কিছু বক্তৃতা দিতে বলেছিল আমি বক্তৃতা দিয়েছিলুম সেই বক্তৃতা থেকে টাকা পেয়েছি। লক্ষ্মী যদি সমুদ্রের ওপারেও প্রসন্ন

হন তাহলে আমার যাত্রা সফল হবে। মনে হচ্চে এবার যেন আমার ভাগ্য অনুকূল— যেখানে গেছি সেখানেই অভ্যর্থনা পেয়েছি অর্থও পেয়েছি। এখন কিছু হাতে করে নিয়ে আস্‌বার ইচ্ছে আছে যাতে চিরদিনের মত আমাদের আশ্রমের অভাব মোচন হয়— তারপরে আমি ছুটি পাব। বৌমাদের খবর তুই বোধ হয় তাঁদের কাছ থেকেই পাস্। এতদিনে বৌমা Nursing Home থেকে নিশ্চয় বেরিয়েচেন কিন্তু এখানে তাঁর আসা হবে কিনা সন্দেহ— ঘোরাঘুরি করতে হবে তাঁকে নিয়ে অসুবিধে হতে পারে।

এখনো কার্ত্তিকমাস— তোদের ওখানে এখনো রীতিমত শীত দেখা দেয়নি— কেবল মাত্র শিশিরে হাওয়া একটুখানি ঝির্‌ঝির্ করচে। কিন্তু অসুখ বিসুখের সময় এল— কলকাতায় তোরা কি রকম থাকবি কে জানে। শান্তিনিকেতনেও বোধ হয় জ্বরের পালা পড়েচে। আমি থাক্‌তে যে রকম রোজ পাঁচন খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলুম এখন সেরকম আছে কিনা কে জানে।

একটু একটু আলো হয়ে আস্‌চে— ক্যাবিনে ক্যাবিনে সবাই জেগে উঠে প্রস্তুত হচ্চে। এখনো পিয়ার্সনের দেখা নেই— সে বেচারা বেশ একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোতে ভালবাসে। আজকে তার অকাল-বোধন হবে, সমস্ত দিন হাই তুল্‌তে থাকবে। তার শরীর এখনো তেমন বেশ সুস্থ হয়নি— পেটের অসুখের ভাব এখনো আছে।

এইমাত্র আমার চা এনে দিলে। আমার জন্যে ক্যাবিনে থেকে এক প্লেট ফল মজুদ থাকে—আপেল আঙুর কমলা লেবু— তারপরে ভোরেই আমাদের ষ্টুয়ার্ড আমাকে চা এনে দেয়— তখনো অধিকাংশ লোকের আর্দ্ধেক রাত্তির। আমি চা খেয়েই লিখ্‌তে বসি। একটা লেকচার লিখচি। আমার ক্যাবিনটা বেশ বড়— খুব আলো আছে— এখানে লেখার খুব সুবিধে, কিন্তু এর জন্যে আমাকে কম দাম দিতে হয়নি। এ রকম ক্যাবিন না হলে লিখ্‌তে পারতুম না— তাই ব্যয় স্বীকার করতে হল। এ খরচ এই বক্তৃতা থেকেই তুলে নিতে পারব।

এইবার ব্রেকফাষ্টের সময় হল— আজ খুব সকালেই খেতে যেতে হবে। এখনি ডাঙা থেকে ডাক্তার আস্‌বে- তার পরীক্ষা শেষ হলে নেমে যেতে হবে। আর সময় নেই।

বাবা

৩৯]

Hotel Algonquin
New York
[ডিসেম্বর ১৯২০]

মীরু

এক মুহূর্তের জন্যেও এদেশ আমার ভাল লাগ্‌চে না। রোজ সকালে উঠে জানলার কাছে বসে ভাবি কেন এ বিড়ম্বনা। বেশ ছিলুম তোদের সবাইকে নিয়ে, আমার সেই মরুভূমির মাঝখানে, উত্তরায়ণের খোলা বারান্দায় লম্বা কেদারার দুই হাতার উপরে দুই পা তুলে দিয়ে। কোথা থেকে বড় আইডিয়ার ভূত পেয়ে বসে, আর দেশে দেশান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এর থেকে জোর করে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন খাঁচার পাখীর মত ছটফট করতে থাকে, অথচ কর্ত্তব্য বুদ্ধির ধমকানি খেয়ে বেরুতে পারিনে। এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের সমস্ত অভ্যাসের এতই বিরুদ্ধ, যে দিনরাত্রি মনকে যেন উজানস্রোতে সাঁতার দিতে হয়— প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কেবলি মনে হচ্চে, শান্তিনিকেতনকে বড় করে তুললেই যে শান্তিনিকেতন সার্থক হবে এমন কি কথা আছে। হয়ত তাতে করে ওকে চেপে মারা হবে। কিন্তু এসব তর্কের দিন আর নেই। এখন মাঝদরিয়ায় এসে পড়েচি— শেষ পর্য্যন্ত

পাড়ি দিতেই হবে। যদি বিশেষ কিছু না হয় তাহলে বুঝব বিধাতা বঞ্চিত করেই আমাকে বাঁচালেন।

আজ নিয়ুইয়র্ক সহর ছেড়ে সপ্তাহখানেকের জন্যে একটা পাহাড়ে একটি নিরালা জায়গায় যাচ্চি। সেখানে এখানকার চেয়ে শীত পাব কিন্তু তেমনি শান্তিও পাব। বৌমা গেছেন চিকাগো Mrs. Moodyর বাড়ি। Pearson গেছেন আর এক জায়গায়। রথী আছে আমার সঙ্গে। এবৎসর এখানে বিশেষ শীত পড়েনি— প্রায় Christmas এল কিন্তু বরফের লক্ষণ নেই। খুব সম্ভব আমাদের ভাগ্যক্রমে এই রকমই কেটে যাবে। এণ্ড্রুজের চিঠি পেয়েছি। সে অনেক দিন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে শেষকালে আশ্রমে এসে পৌঁচেছে। ওরা আমাদের উল্টো—এক জায়গায় বেশিদিন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। পিয়ার্সনেরও সেই দশা। তুই কোথায় আছিস জানিনে। সাতই পৌষে আশ্রমে তোর যাবার কথা আছে। আশা করি কোনো বাধা ঘটেনি। তোর জন্যে আমার মন বড়ই ব্যথিত হয়ে আছে।

বাবা

[৭০]

[নিউ ইয়র্ক
৭ মার্চ '২১]

মীরু

অনেকদিন তোকে চিঠি লিখিনি— কেননা আমি জানি আমার সব খবর তুই এণ্ড্রুজের কাছ থেকে পাস্। এখানে চিঠি লেখ্বার সময় পাইনে— সময় পাইনে মানে ঘণ্টা হিসেবে নয়— কি এক রকম চারদিকে হিজিবিজি মনে হয় যেন আকাশটা পর্য্যন্ত ঠেলাঠেলি কর্চে— কোথাও একটুখানিও ফাঁকা নেই— এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্তে ইচ্ছা করে না। প্রতিদিনের বোঝা যে এমন ভয়ানক বোঝা আমার জীবনে তা আর কোনোদিন এমন করে অনুভব করিনি— যে চারমাস এখানে কেটেচে সে চারমাস ওজনে নিরেট চার বছরের সমান ভারি। জাহাজ যেদিন পূব মুখে পাড়ি দেবে সেদিন আবার একটু একটু করে আমার নাড়ীতে প্রাণ সঞ্চার হতে থাকবে। যা হোক্ আর বেশি দেরী নেই— আজ ৭ই মার্চ্চ, আগামী ১৯শে জাহাজে উঠ্ব— এ চিঠি যখন পাবি তখন আমরা খুব সম্ভব সুইডেনে। তারপরে আর খুব বড় জোর দুমাস বাদে দেশে ফিরব। স্কুলের ছুটি হবার আগে যদি কোনোমতে শান্তিনিকেতনে যেতে পারতুম তাহলে যে কত খুসি হতুম তা বল্তে পারিনে। অন্ততঃ আমার

এবারকার ৬০ বছর বয়সের জন্মদিনটা যদি দেশের মাটিতে ঘট্‌ত তাহলে ভারি তৃপ্তি বোধ করতুম। মনে হচ্ছে হয়ত জীবনে একটা নূতন অধ্যায় আস্‌চে। ১০ বছর আগে ৫০ এর কোঠায় যখন পড়েছিলুম তখন এর ভূমিকা আরম্ভ হয়েছিল। সেদিন হঠাৎ বলা নয় কওয়া নয় পশ্চিমের পালা আরম্ভ হল। আজ সমস্ত পৃথিবী আমার কাছাকাছি হয়ে এসেচে। আজ আমার নিজেকে কেবলমাত্র 'স্বদেশী' করে আমার পরিত্রাণ নেই। আমি সমস্ত দেশের সঙ্গে আমার দেশকে মেলাতে বসেচি, অথচ আজ আমার দেশের লোক ভারতবর্ষকে জেনেনার মধ্যে পাঁচিল তুলে রাখতে চাচ্চে, পর পুরুষের মুখ দেখা বন্ধ। সাম্‌নে এই আমার এক বিষম মুস্কিল—আমার সঙ্গে আমার দেশের লোকের বনিবনাও কিছুতে যেন হতে চায় না— শেষ পর্য্যন্ত কেবলি ঝটোপুটি চল্‌তে থাক্‌বে।

গোঁসাইয়ের মৃত্যু সংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত হয়েচি। ঠিক অমন মানুষ আমরা আর পাব না। গাইয়ে হিসাবেও লোকটি খুব উপযুক্ত ছিল। আর একজন লোকের সন্ধান নিতে হবে।

অসিত খোকার একটা ছবি এঁকেছিল এণ্ড্রুজ সেটা আমাকে পাঠিয়েচে। বোধ হচ্ছে সেটা ঠিক হয়নি— যদি হয়ে থাকে তাহলে ওর অনেকটা বদল হয়েচে বল্‌তে হবে। ফিরে গিয়ে বুড়িরও হয়ত অনেক বদল দেখ্‌তে পাব।

বাবা

মীরু

তোর চিঠি ঠিক আমার জন্মদিনে এসে পৌঁচেছে। আমরা সুইজারল্যাণ্ডে। এখান থেকে যাব ইটালি। এখানকার লোকে আমাকে কত ভালবাসে এবং ভক্তি করে তা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। এদের শ্রদ্ধা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অনেক গভীর এবং অকৃত্রিম। য়ুরোপের মহাদেশে আমি এর আগে কখনো আসিনি। এবারে এসে ভারি আনন্দ পেয়েচি।

তোরা এখন ছুটির আশ্রমে আছিস— সব চুপচাপ গাছের পেয়ারা গাছেই পাক্‌চে। দিনুরা কোথায় কে জানে। এণ্ড্রুজের শরীর খারাপ— শুনে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। এই গরমে কোথায় যে সে টোঁটোঁ করে বেড়াবে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু দেশের গরম এখানে কল্পনা করা শক্ত। কেননা এখানে এবার শীতের সময় বসন্তের আমেজ দিয়েছিল তাই গরমের সময় শীত এসে হাজির। মে মাসে জেনীভাতে বেশ একটু গরম পড়ে কিন্তু এবার বড় ঠাণ্ডা। হয়ত ইটালিতে এখানকার চেয়ে একটু গরম পাওয়া যাবে। ইতি ২৫ বৈশাখ [১৩২৮]

বাবা

[৪২] শিলাই

মীরু

সেই শিলাইদা সেই রকমই আছে। বেশ লাগচে। চারদিক সবুজ, দিনরাত পাখী ডাকচে, আর সিসু গাছের পাতা ঝরঝর সরসর করচেই। আমবাগানময় ছোট ছোট আম ধরেচে— আরো নানারকম ফল ফলবার চেষ্টায় আছে। আমি থাকি তেতালায় সেই সিঁড়ির ঘরে। অনেক রাত পর্য্যন্ত ছাদে বসে থাকি— আশ্চর্য্য এই যে একটিমাত্রও মশা নেই। কিন্তু পৃথিবী যে অমরাবতী নয় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এখানকার সমস্ত আসবাবেই ছারপোকার বসতি স্থাপন করিয়েচেন। সুতরাং এখানে বাস করবার জন্যে মাশুল স্বরূপ কিছু রক্ত খরচ করতে হয়। বন্ধুবর এণ্ড্রুজ আছেন নীচের তলার পূর্ব্ব মহলে— সেখানে নাবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটাই লেখবার-পড়বার জন্যে পছন্দ করে নিয়েচেন। অহরহ টেবিল আঁকড়ে ধরে দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখায় ভরতি করচেন আর দিগ্বিদিকে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাচ্চেন।

আমি একটা সোনার মেডেল পেয়েছি সেইটে তোকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে গোপালকে বলে এসেছিলুম। পেয়েছিস্ কিনা আমাকে খবর দিস্। আমি পয়লা বৈশাখের কিছু আগেই শান্তিনিকেতনে ফিরব। তোদের ওখানে আশা করি সব ভালই চল্‌চে। ইতি ১২ই চৈত্র ১৩২৮

বাবা

[৪৩]

[San Isidore,
Argentine
3 Dec. '24]

মীরু

যে চিঠি তুই ধীরেনের হাতে দিয়েছিলি এতদিনে সে আমার হাতে এসে পৌঁছল। অনেক দূরে আছি। তোরা আছিস্ Equatorএর উত্তরে, আমরা আছি দক্ষিণে। তাই যখন আমাদের শীত এদের তখন গর্ম্মিকাল। আজ ৩রা ডিসেম্বর— এখন বসন্তকাল কেটে গিয়ে পূরো গরম আসবার উপক্রম করচে। এবার দৈবাৎ সমস্ত নবেম্বর এখানে শীত ছিল, এমন কখনো হয় না। এবারকার যাত্রাটা বোধ হয় ভাল লগ্নে হয়নি, এখানে পৌঁছবার দিন সাতেক আগে জাহাজে শরীর খুব খারাপ হয়েছিল— বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় পেয়েছিল। এখানে এসে কিছুকাল ধরে ডাক্তারের হাতে ছিলুম। এখন আর কোনো উপদ্রব নেই, কিন্তু বক্তৃতা প্রভৃতি সব বন্ধ। সহরের বাইরে সুন্দর জায়গায় একটি বাড়ি আমাদেব জন্যে ঠিক করে দিয়েচে। মস্ত একটা নদীর ধারে। আমাকে খুব নিকট আত্মীয়ের মতন এরা যত্ন করে— আমার যা কিছু দরকার সমস্ত এরা জুগিয়ে দিচ্চে। আমি সমস্ত দিন খোলা জানলার কাছে বসে কুঁড়েমি করে কাটাচ্চি। আমার আসল নিমন্ত্রণ পেরুতে— এখন আছি

আর্জেন্টিনে। ভেবেছিলুম পেরু যাওয়া বন্ধ করতে হবে, কারণ তখন ডাক্তার আমাকে নিষেধ করেছিল। কিন্তু এখন বোধ হয় যাবার কোনো বাধা হবে না। আজ বিকেলে ডাক্তার আবার আমাকে পরীক্ষা করে দেখবে— যদি বলে কুছ পরোয়া নেই, তাহলে এই মাসের শেষে পেরুতে রওনা হব। শুনেছি পেরু এখানকার চেয়ে বেশি গরম— কিন্তু সেখানে দেখবার জিনিষ অনেক আছে। আমার যে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহ বেশি আছে [তা নয়] কিন্তু এখানে আসবার খরচ বাবদ পেরু গবর্মেণ্টের বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে। তার উপরে যদি না যাওয়া হয় তাহলে ভারি অন্যায় হবে। এখানকার সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে আমাদের যাবার পথ। আণ্ডেস্ পাহাড় উচ্চতায় হিমালয়ের পরেই। এ একটা দেখবার জিনিষ। তারপরে চিলিতে গিয়ে জাহাজে করে পেরু যেতে হবে, সমুদ্র পথে ছয় দিন লাগবে। তারপরে সেখানে আমাকে কতদিন আটক করে রাখবে কে জানে। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, এখানে ঘরে ঘরে সবাই আমার বই পড়েছে, আর আমাকে একান্ত শ্রদ্ধা করে। সেইজন্যে আমি এদেশে এসেচি এবং এখানে আছি বলেই এরা খুসি—আমার কাছে এর বেশি আর কিছু চায় না। এ পর্য্যন্ত আমি কোনো মটিংএ যাইনি, অনেকেই আমাকে এখন দেখতে পায়নি— চারিদিক থেকে কেবল চিঠি আসচে, ফুল আসচে, আর আমার নাম সই নেবার জন্যে বই আস্‌চে। তোরা যখন এই চিঠি পাবি তখন কোথায় যে আমি বলা শক্ত—হয় তো

মেক্সিকোয়। তোদের সাতই পৌষ আস্‌চে, এতদিনে নিশ্চয় তার আয়োজন আরম্ভ হয়েচে। আমার উত্তরায়ণের বাড়ি যদি শেষ না হয়ে থাকে তাহলে কষে তাড়া লাগাস্‌— এবার ফিরে গিয়ে যেন সমস্ত প্রস্তুত দেখ্‌তে পাই। আমার নীলমণি কোথায়? তার যত্ন নিস্‌।

বাবা

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

[৪৪]

মীরু

আমার সঙ্গে পুপের ভাব কতটা জমেচে নীচের কবিতা থেকে কতকটা আভাস পাবি। গদ্যে সব কথা খুলে বলা যায় না। পেরু যাওয়া হল না। পর্শু ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বারণ করেচে। তাই জানুয়ারীর ৩রা তারিখে এখান থেকে স্পেন ও ইটালীতে রওনা হব।

বাবা

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে। ইত্যাদি [১]

[সান ইসিডোর,
৪ ডিসেম্বর, '২৪]

---

[১] সমগ্র কবিতাটি 'তৃতীয়া' নামে 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মীরু

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। সমুদ্রের ধারেই কিছুদিন যদি থাকতে পারতিস তো বেশ হ'ত। আমেদাবাদ সহরটাতে দেখবার কিছুই নেই, আবহাওয়াও যে মনোরম তা বলতে পারিনে। ওখান থেকে যাবার বা আসবার পথে কোনো এক সময়ে সত্যর সঙ্গে দেখা করে আসিস।

আমি ভালোই আছি। অতি ধীরে ধীরে একটু একটু শীতের আমেজ দিচ্চে। কাল মেয়েরা লক্ষ্মীপূর্ণিমায় আমার কোণার্কের ছাতে গান গেয়ে উৎসব করেছিল।

পুপে হঠাৎ দেখি পর্শু দিন মাথাখানি একেবারে সম্পূর্ণ মুড়িয়ে ফেলেছে। শরতের আকাশে যেমন বর্ষার কালো মেঘ কেটে গিয়ে দিনগুলি নির্ম্মল হয়েছে তেমনি কালো চুল অন্তর্ধান করে ওর মুখখানি সবটাই শুভ্র দেখাচ্চে। দেখতে একটুও খারাপ হয়নি। ওর মাথাটি বেশ সুডোল গোলাকার। মাঝে মাঝে ওকে আবার বাঘের গল্প শোনার নেশা পেয়ে বস্চে। কিছুদিন সেটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। আজকাল জয়জির সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই দিন কাটাচ্চে।

গবা রামানন্দবাবুর ঘরে আশ্রয় নিয়ে বেশ আনন্দে আছে।

ওকে দিয়ে আমি অনেক কাজ পাই। এণ্ড্রুজ সেই অবধি অদৃশ্য। একটা পালাবার ছুতোয় ছিল— সুবিধে পেয়ে বেঁচে গেচে গুরুদয়াল আমার ইংরেজি চিঠি লেখা এবং অন্যান্য অনেক কাজ চালিয়ে দিচ্চে। তাতে ভারি সুবিধে হয়েচে। আমার নীলমণির কোনোপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়নি— নতুন কোনো চিন্তার বিষয় উপস্থিত হলেই সকরুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— অত্যন্ত শোকাবহ রকমের চেহারা হয়। সে তার মীরাদিদিকে বিজয়ার প্রণাম পাঠাচ্চে। ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৩

বাবা

মীরু

তুই হঠাৎ মনে করতে পারিস আমি বুঝি জাহাজে চড়ে বসেছি। এখনো সময় হয়নি। জাহাজের একটা চিঠির কাগজ হঠাৎ হাতে ঠেকল তাই এটার ব্যর্থতা দূর করবার জন্যে ব্যবহারে লাগাচ্চি।

আমেদাবাদে পৌঁচেছিস— সেখানে গুজরাটি খাবারের দিকে দৃষ্টি দিস্‌নে যেন। বুড়ি যদি তার প্রতি মনোযোগ দেয় তাহলে বেশ একটু ভারি হয়ে আসবে কেননা ওদের রান্নায় ঘিয়ের খুব প্রাদুর্ভাব আছে। আমাদের এখানে গরম আর নেই। তার উপরে মেঘ করে আজ খুব কষে পূবে হাওয়া লাগিয়েচে। কিছুদিন আকাশের শুকনো মূর্ত্তি দেখে আমি নিশ্চিন্ত মনে লেখবার পড়বার সরঞ্জাম টেনেটুনে গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। যদি বৃষ্টি নামে তাহলে আবার পাৎতাড়ি গুটিয়ে সেই কোণের ঘরটাতে দৌড় মারতে হবে। বেশ বুঝতে পারচি নতুন বারান্দায় বৃষ্টির ঝাপটা যথোচিত নিবারণ করতে পারবে না।

সত্যকে সুপ্রকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখ্‌লেই সে পাবে। সুপ্রকাশ হচ্চে Curator, Baroda Museum সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। স্কুল বন্ধ, বুড়ি নেই, পুপে

আজকাল একমাত্র জায়জিকে নিয়ে দিনযাপন করচে। আমার কাছে সকালে সন্ধ্যায় দুটো করে গল্প দাবী করে— সকালে বাঘের গল্প, রাত্রে শিউলি ফুলের। শ্রীমতীর মাকে আমার নমস্কার জানাস। আর শীতের সময় আশ্রমে আসবার জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ দিস— অভয় দিস দস্যুবৃত্তির চেষ্টা করব না। ইতি [আশ্বিন ?] ১৩৩২

বাবা

মীরু

ভেবেছিলুম পথের গরম ও কষ্টে ক্লান্তি বাড়বে। কিন্তু প্রথমত পথের অধিকাংশই মাঝারি গোছের ঠাণ্ডা ছিল, অনেকদূর পর্য্যন্ত মেঘ বৃষ্টি পেয়েছি। বম্বাইয়ের কাছাকাছি এসে খুব গরম হয়েছিল তাছাড়া ট্রেন এক ঘণ্টা হয়েচে লেট্। সমস্ত পথটাই একলা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। বোলপুরে যতটা ক্লান্তি ছিল সেটাও পথের মধ্যে কেটে গেছে— দুদিন সম্পূর্ণ চুপ করে পড়ে থাকা আমার পক্ষে চিকিৎসার মত কাজ করেচে। অথচ ওরই মধ্যে একটা কবিতাও লিখেছি— ট্রেনের ঝাঁকানিতে লেখা সহজ নয়।

আজ আর একটু পরেই জাহাজে উঠবো। লীলমণি এখান থেকে আমাদের বিছানাপত্র নিয়ে বোলপুরে ফিরবে— আশা করি পথের মধ্যে সে হারিয়ে যাবে না। আমার সেই মধুমালতী এতদিন আমার উচ্ছিষ্টে পুষ্ট হয়েছে এখন থেকে তোর স্নানের জলে তাকে ঠাণ্ডা করতে ভুলিসনে। দিনের মধ্যে চারবার করে তার জলপান বরাদ্দ ছিল। আমার ঘরের সামনের রাস্তার দুধারে বর্ষার সময়ে নীম শিরিষ প্রভৃতি গাছ লাগাতে বলিস, দুই একটা কাঁঠাল লাগালে দোষ নেই— তাছাড়া বাতাবি লেবু।

মন্দিরের যে লোহার চূড়ো ভেঙে ফেলা হয়েছে সেটা আমার বাগানের এক কোণে রেখে তার উপরে ঝুমকোলতা চড়িয়ে দিস্।

আশ্রম বোধ হয় আরো খালি হয়ে গেছে। যে কয়জন বাকি আছে আমার আশীর্ব্বাদ জানাস্। নুটু যেন ইতিমধ্যে আমার নতুন গানগুলো ভুলে না যায়। আমার বাড়ির ছাতের উপরে তোরা তোদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করিসনে কেন? পুপে ভয়ে ভয়ে রথী বৌমাকে আঁকড়ে আছে— পাছে তাকে ফেলে চলে যায় এ আশঙ্কা তার কিছুতে ঘোচে না। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

বাবা

BAGHBAZAR READING LIBRARY
Call No. ৯ ৭৪৪
Accession No
Date of Acc ২ ১২-৭৯

[৪৮]

মীরু,

আমার শরীর বেশ ভালোই আছে। পুপেরও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েচে।

কাল অর্দ্ধেক রাত্রে এডেনে পৌঁছব— সেখান থেকে এ চিঠি ডাকে রওনা হবে। সমুদ্র শান্ত আছে।

পশ্চিমদিকে আমার যে নতুন ঘর হয়েচে তাতে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেচে— বীরেনকে ডেকে বলে দিস্। ঘরে অকারণে দুটো সিঁড়ি করা হয়েচে। পশ্চিম দিকের সিঁড়ি রেখে অন্য সিঁড়িটা ভেঙে দিয়ে সেখানে একটা চ্যাপটা প্যারাপেট বানাতে হবে, যাতে তার উপরে বসা বা জিনিষপত্র রাখা যেতে পারে। বর্ষার সময়ে বাড়ির সামনে পূবদিকে যাতে বীথিকাটা সম্পূর্ণ হয় তা বলে দিস। অন্য গাছের সঙ্গে মহুয়া ও ছাতিম লাগালে ভাল হয়। বর্ষা ঘন হলে কাসাহারাকে দিয়ে আশ্রম থেকে গোটা কয়েক বড় গাছ তুলিয়ে আনলে খুসি হব। কলকাতায় কাসাহারা জগদীশের বাগানে এমনি বড় গাছ লাগিয়ে ছিল। প্রণালীটা ছেলেদের পক্ষে একটা শিক্ষার বিষয় হবে। আসবার সময় বীরেন বলেছিল শীঘ্রই তোর বাড়ি তৈরিতে হাত দেবে। হয় ত এতদিনে আরম্ভ হয়েচে—যদি শুনি হয়নি আশ্চর্য্য হব না।

পঞ্চবটির কাছাকাছি বর্ষার সময় বড় বড় গাছের বীজ বেশি করে যেখানে সেখানে পুঁতে দিস্। তার কিছু হবে কিছু মরবে। ভবিষ্যতে একদিন ঐ উত্তর পশ্চিম কোণে একটা বন হয়ে ওঠে এই আমার ইচ্ছা। আমার কোণার্ক বাড়ির সেই নীলমণি লতার বিপরীত দিক্ যে শ্বেতমণি লতাটা বেড়ে উঠে আশ্রয় খুঁজচে তার জন্যে জড়িয়ে ওঠবার একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিতে বলে দিস্—আর মধুমালতীর ঊর্দ্ধগতির জন্যে যে তিন তাল খাড়া হয়েছে তার তিনটে ঢালু চালের বাঁখারির জাফরি করে না দিলে তার উপর দিয়ে লতা উঠতে পারবে না। সুরেনকে ডেকে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিস।

সন্তোষ কি আশ্রমে আছে না পালিয়েচে? তাকে একটা লম্বা চিঠি লিখে দিলুম।

বুড়ির বন্ধুবান্ধবেরা সব চলে গিয়ে বোধ হয় একলা ঠেকচে। ওখানে খুব কি গরম পড়েচে। আমার মনে হচ্চে এবার সমস্ত গর্মি তোর মাঝে মাঝে বৃষ্টি পাবি— তেমনি বেশি গরম হবে না। সমুদ্রেও আমরা দুদিন বৃষ্টি পেয়েচি। রীতিমত গরম বটে কিন্তু দিনরাত হু হু করে হাওয়া দিচ্চে— বিশেষত আমার ক্যাবিনটা একেবারে জাহাজের সামনেই বলে কখনো হাওয়ার অভাব হয় না। মরিসের কি অবস্থা? এই অবকাশে সে যদি বাইসীক্‌ল্ চড়তে ভালো করে শিখে নেয় তাহলে অনেক কাজে লাগবে। সে আমার বাক্স বোঝাই করে একরাশ আমার সেই ফিলজফিকাল কনগ্রেসের বক্তৃতার চটি ঠেসে দিয়েচে—

না দিয়েচে চিঠির কাগজ, না দিয়েচে একটা ব্লটিংয়ের কিছু। কলমগুলো থেকে হঠাৎ মোটা মোটা ফোঁটা কালী পড়ে যাচ্ছে, হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকচি— অথচ তার হাতে স্বয়ং একটা ব্লটিং বুক দিয়েছিলুম। যারা নিজের কাজ নিজে করে না তাদের এই দুর্গতি। ঐ বক্তৃতার প্যাম্‌ফ্লেট্‌গুলো দেখি আর সমুদ্রে টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। ইতি ১৯ মে ১৯২৬

বাবা

[৪৯]

Marittima Italiana
Genova,
S/S Aquileja

মীরু

কাল ডাঙায় পৌঁছব। তার পর থেকে অনন্ত গোলমাল। এ কয়দিন চুপচাপ ছিলুম—যদিও লেখার অন্ত ছিল না— একটা লেকচার শেষ করেছি। পথে দিন দুই খুব গরম ছিল— এখন মধ্যধরণী সাগরে তেমনি রীতিমত ঠাণ্ডা। রোহিত সমুদ্রের গরমের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিলে বেশ উপভোগ্য হতে পারত। এখন জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি— আজ ঠিক ১৫ই। তোদের ওখানে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে আর তোরা গরমে ছটফট করছিস্— সে কথা কল্পনা করাও শক্ত। পর্শু লাবুর বিয়ের দিনে তাকে স্মরণ করে একটা কবিতা লিখেচি— কাল ডাকে দেব— সে খুব খুসি হবে। সে হয়ত তখন রেঙ্গুনে পাড়ি দিয়েচে।

আমার চিঠি পত্র আর পাবিনে। গোলমালের ভিতরে লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না। বৌমারা লিখ্‌তে পার্‌বেন— কারণ উপদ্রব সব আমার উপর দিয়েই যাবে— তাঁরা স্বচ্ছন্দ মনে আরামে থাক্‌বেন।

লালমণি (মরিস্) বোধ হয় আশ্রমে আছে। তার কাছ থেকে সব খবর পাওয়া যাবে। তাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে রাখিস্— আর খাবার হজম করবার জন্যে— বাইসিক্‌ল্ অভ্যেস্ কর্‌তে বলিস্। ইতি ২৯ মে ১৯২৬

বাবা

১৫

মীরু

পনের দিন রোমে কাটিয়েছি। আজ যাচ্চি ফ্লরেন্সে। খুব ধূমধাম আদর অভ্যর্থনা হয়েছে। তার বিস্তারিত বর্ণনা করবার সখ আমার নেই। সমাদরের সমুদ্রমন্থন বললেই হয়— হয়ত অন্য কারো চিঠি থেকে কিছু শুনতে পাবি। এতে বিশ্রাম পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই— আরো ৭।৮ দিন ইটালিতে কাটাতে হবে— সব জায়গাতেই এই রকম গোলমাল চল্‌বে তার পরে দিন আষ্টেক থাকব সুইজারল্যাণ্ডে। ১৫ সেপ্টেম্বরের জাহাজে ভারতবর্ষে ফেরা স্থির হয়ে গেছে— অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে পৌঁছব— ১ অক্টোবরের কাছাকাছি। তোদের ওখানে এতদিনে আষাঢ়ের বর্ষা নেবেচে। মনটা বলাকার মত সেইদিকে পাখা মেলেচে। কিন্তু পৌঁছব যখন, তখন শিউলি ফুলের পালা— মালতীরও পরিশিষ্ট দেখতে পাব। ইতিমধ্যে আমার মধুমঞ্জরীর হয়ত বর্ষাধারায় শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুই এখন হয়ত দার্জ্জিলিঙে। পুপে খুব ফূর্ত্তিতে আছে। সেই ডেনিশ মেয়েকে পাওয়া গেছে— তাকে ও ভারি ভালবাসে একমুহূর্ত্ত ছাড়তে চায় না। প্রশান্ত রাণীরাও এখানে এসে জুটেচে। গোরা রোমেই থেকে যাবে, এখানেই তার পড়াশুনা চল্‌তে পার্‌বে। ১৪ জুন ১৯২৬

বাবা

১১]

Hotel Bristol
Wien

ারু

তোদের অব্যবস্থার কথা শুনে অবধি দেশে যাবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেচে। সেপ্টেম্বরে যাত্রা করবার জন্যে জাহাজও ঠিক করেছিলুম। কিন্তু ভিয়েনার একজন বড় ডাক্তার আমার চিকিৎসার ভার নিতে চান— সমস্ত অক্টোবর মাসটা লাগবে চিকিৎসা শেষ হতে। যদি ঠিকমত লাগে তাহলে আমার শরীর সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠবে এই রকম এরা আশ্বাস দিচ্চে। এতদূরে যখন এসেইছি তখন এইটুকুর জন্যে পরীক্ষা শেষ না করে যাওয়া ঠিক নয়। অতএব নভেম্বরের মাঝামাঝি দেশে যেমন করে হোক পৌঁছনো যাবে। এখানে চারিদিকেই খুব আদর যত্ন পাচ্চি, এত অত্যন্ত বেশি যে, কারণ বুঝে ওঠা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু ব্যাপারটা যে অকৃত্রিম তার কোনো সন্দেহ নেই। এই সমস্ত দেখে শুনে মনে হয় যে যদি প্রতি বৎসরে গরমের ছটা মাস এখানে কাটিয়ে ঠাণ্ডার ছ'টা মাস দেশে থাকি তাহলে এখানে অনেক কাজও করতে পারি শরীরও ভাল থাকে।

পুপুকে নিয়ে বৌমা প্যারিসে আঁদ্রেদের বাড়িতে আছেন।

পুপে সেখানে খুব ফূর্ত্তিতেই আছে। ফরাসী ভাষায় আলাপ সুরু করে দিয়েছে। আমাদের দলের সঙ্গে রাণী আছে। ডাক্তার তাকে নানাবিধ পরীক্ষা করে কোথাও কোনো গলদ খুঁজে পাচ্চে না। আশা করচে কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডের মত স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকলে ওর শরীর শুধ্‌রে উঠতে পারবে। এবারে দেশের খবর যা পাচ্চি তাতে বোধ হচ্চে বৃষ্টির খুব অভাব, গরমের খুব প্রাদুর্ভাব, ওদিকে হিন্দুতে মুসলমানে খুব চোখ রাঙারাঙি চলচে। "আমার জন্মভূমি"তে মানুষের টেকা দায় হয়ে উঠলো। এদের দেশেও যে লোকে সুখে আছে তা নয়। নানা মতের নানা দলের লোক তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চে। যে যুদ্ধটা হয়ে গেল তার থেকে স্থায়ী কোনো শিক্ষা হয়েচে এমন তো বোঝা যায় না— আবার একটা যুদ্ধ বাধলে এরা আবার রক্তে ধরাতল রাঙা করে তুলতে রাজি আছে।

এখনকার মত কালই ভিয়েনার থেকে বিদায় নেব। আবার অক্টোবরের গোড়ায় ফিরে আসতে হবে। ইতিমধ্যে দিনগুলো একরকম করে কেটে যাবে। ইতি জুলাই ২১, ১৯২৬

বাবা

[৫২]

[শান্তিনিকেতন
মাঘ (?) ১৩৩৩]

মীরু

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। অসিতের বৃহৎ ঘরের এক প্রান্তে যদি তোর একটি কোণ ঠিক করে নিতে পারিস তাহলে বোধ হয় কিছুদিন চলে যেতে পারে। তারপরে আমি ফেব্রুয়ারী নাগাদ এক সময় গিয়ে তোদের সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে যথাকর্ত্তব্য স্থির করব। ভরতপুরের মহারাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি— ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে— যাওয়া স্থির— খুব সম্ভব লক্ষ্ণৌ যাওয়া সহজ হবে। এখানে নটীর পূজার তালিম চলচে। আজ গৌরী এবং সম্ভবত সুরূপা আসবে।

নুটুর জন্যে বড় উদ্বিগ্ন আছি। ওর যে রকম শরীর ওকে কিছুদিন লক্ষ্ণৌয়ে যদি তোর কাছে আনিয়ে নিতে পারিস তাহলে ভালো হয়। সেখানে ভাটখণ্ডের কাছ থেকে গানও শিখতে পারে। রেখার বিয়ে ২৩শে তার হাঙ্গামা চুকুক্— ফাল্গুনের গোড়াতেই যদি ওকে সেখানে ডাক দিস্ তো ছুটির ব্যবস্থা করে দেব। জয়ার বিবাহ ২৪শে। আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। এখানে কাজ সেরেই কলকাতায় দৌড়তে হবে। অসিতকে আশীর্ব্বাদ জানাস্।

বাবা

মীরু

তুই ঘুরে বেড়াচ্চিস সে খবর পেয়েচি। আমি তোকে দিল্লির ঠিকানায় চিঠি লিখেচি। আমার ভরতপুরে যাওয়া এবার ঘটল না।...ফাল্গুনী অভিনয়ের রিহার্সল বসিয়ে ছিলুম কিন্তু এখানকার বাঙালদের কাছে হার মানতে হল। একেবারে অচল। অতএব ওটা স্থগিত রইল।

ঝুণু তোর সেই কুটীরেই আছে। তার শরীর মোটের উপর অনেকটা ভাল হয়েচে— কিন্তু অল্প একটু জ্বরের উপসর্গ এখনো ছাড়েনি।

বিশ্রী বাদল পড়েচে— আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা পূবে হাওয়ায় শরীর কাঁপিয়ে তুলেচে। এবার জয়ার বিবাহের একটু আগেই হঠাৎ মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। বিবাহ সভা সাজানো হয়েছিল খোলা মাঠে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক বিয়ের সময়টাতে কোনো উৎপাত হয় নি। রেখা শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেচে। আবার দুতিন দিনের মধ্যেই ফিরবে। খুব ফূর্ত্তিতে আছে। শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে ষোলো আনা আগ্রহ। বেশ একটু মোটাসোটা হয়েচে।

নুটু মোটের উপর ভালোই আছে জ্বর নেই। এখন বোধ হয় ও কোথাও নড়বে না। গর্ম্মির ছুটীতে যদি পুরীতে যায় ত তার সুযোগ ঘটতেও পারে।

তোর চিঠিতে আবুর বর্ণনা শুনে লোভ হয়। দেখি যদি আমেদাবাদে অর্থ সংগ্রহের প্রত্যাশায় যাই তবে একবার ওদিকটা ঘুরে আসতেও পারি। কিন্তু ভিক্ষের ঝুলি হাতে আর ঘুরতে ইচ্ছে করে না। তুই যতদিন খুসি দেশ দেখে বেড়াস—তোর ভালো লাগচে জানলেই আমি খুসি থাকব। ইতি ১০ ফাল্গুন ১৩৩৩

বাবা

মীরু

তোর জন্যে আমার মন দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে আছে। রোজ ভাবি একখানা চিঠি আসবে, কোথায় আছিস্ কেমন আছিস্ জান্‌তে পাব। বৌমাদের জিজ্ঞাসা করেও কোনো সন্ধান পাইনে। তোরা নিজের ইচ্ছেমত থাকিস আমি সাধারণত কখনো জিজ্ঞাসা করিনে। যদি জানতুম একটা কোনো ব্যবস্থার মধ্যে স্থির হয়েছিস্ তাহলে আমার চুপ করে থাক্‌ত। সংসারে স্নেহ করলেও সুখী করবার ক্ষমতা কারো নেই। দুঃখ ভোগ সকলেরই ভাগ্যে আছে। মনকে সেই দুঃখের উপর নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়। কেন না সে তো ছায়া, আজ আছে কাল নেই— তার সুখ দুঃখের বোঝা নিয়ে ফেনার মত কালের স্রোতে ভেসে যায়, কিছুদিনের পরে তার চিহ্নও দেখা যায় না। নিজের গভীর অন্তরে ধ্রুব শান্তির জায়গা আছে সেইখানে আমাদের সত্তা আছে যা চিরকালের, যা সংসারের জন্ম মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদ,

লাভ ক্ষতি সকলেরই অতীত। সেইখানে আসন নিতে পারলেই মানুষ বাঁচে, সংসারের বাঁচা বাঁচাই নয়।

ভরতপুরে যাব না স্থির করেছিলুম। কিন্তু যখন কথা দিয়েছি তখন কোনোমতে কথা রক্ষা করা চাই। তাই স্থির করেছি ১৫ই মার্চ্চে রওনা হয়ে আগ্রা দিয়ে যাব। কাছাকাছি তুই কোথাও আছিস জানতে পারলে তোকে দেখে যেতে চাই। ভরতপুরের কাজ সেরে অর্থ সংগ্রহের জন্যে আমেদাবাদ প্রভৃতি দুই এক জায়গায় যেতে হবে। এ কাজটা আমার শরীর মনের পক্ষে অনুকূল নয়— কিন্তু এই দুঃখটাকে এড়াবার জো নেই।

কিছুদিন আগে আমার ডান হাতের আঙুলটায় আঘাত লেগে কিছুকাল আমার লেখা বন্ধ ছিল। কাল থেকে আঙুলটা মুক্তি পেয়েছে— তাই চিঠি লিখতে পারছি।

ফাল্গুনের শেষাশেষি, কিন্তু মেঘ করে এমন প্রবল শীতের হাওয়া চলচে যে ঘোর শীতের সময়েও এমন হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। গরম কাপড় জড়িয়ে ঘর বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। পশ্চিমে এখন কি রকম কে জানে, গরম কাপড় নিয়ে যেতে হবে কিনা ভেবে পাচ্চিনে। এবার আমার সঙ্গে প্রভাতকুমার যাবে, কারণ, ভিক্ষা করা সম্বন্ধে সে নির্লজ্জ।

মেয়েরা আগামী দোল পূর্ণিমায় কিছু নাচ গান করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। দিনু তাদের নিয়ে রিহার্সল চালাচ্চে। ঝুনু এখনো আছে। মোটের উপরে ভালোই ছিল— এই দুর্যোগে

ভিজে হাওয়ায় কেমন থাকে বলা যায় না। এপ্রিল মাসে পাহাড়ের দিকে যাবে কল্পনা করচে।

আন্দাজে দিল্লিতে তোকে চিঠি লিখে দিচ্চি। যদি নাও থাকিস্ আশা করি নিশিকান্ত তোর ঠিকানা জানে। ইতি ১১ মার্চ্চ ১৯২৭

বাবা

[৫৫]

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৩৩]

ভরতপুর থেকে টেলিগ্রাম এলো তাদের দিন পিছিয়েছে। ২৯শে মার্চ্চ। এখান থেকে ২৫শে ছেড়ে আগ্রায় ২৭শে পৌঁছব। সেখানে তুই যদি আসতে পারিস বেশ হবে। আর একবার ঠিকমত খবর দেব। ভরতপুরের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারচিনে। দোল পূর্ণিমার পরদিনে এখানে মেয়েরা বসন্ত উৎসব করবে। তারিজন্যে গান রচনা ও নাচ শেখানোর ব্যাপার চলচে। শ্রীমতীর খুব উৎসাহ। ফাল্গুনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এখানে রীতিমত শীত ছিল— এমন কি শীতকালের চেয়ে বেশি শীত। হঠাৎ বেশ গরম পড়েচে। চৈত্রে যদি গরম পড়ে দেবতাকে দোষ দেওয়া যায় না। বুনু এখানে এসে ভালোই আছে। মনে করচে লক্ষ্ণৌ যাবে— তারপরে সেখানে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ নিয়ে ভাওয়ালি যাবার সঙ্কল্প করেচে। পশ্চিমে এখন কতটা গরম পড়েচে তাই ভাবচি।

বাবা

[৫৬] [শান্তিনিকেতন

দোলপূর্ণিমা, চৈত্র, ১৩৩৩]

মীরু

আজ দোলের দিনে এখানকার ছেলে মেয়েরা গোলমাল করে বেড়াচ্চে। তুই নেই আমার একটুও ভালো লাগচে না—মনের মধ্যে যেন ভার চেপে আছে।

আজ কলকাতা থেকে অনেক লোক আস্‌বে কেউ বিদেশী কেউ স্বদেশী তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে—মনে করে ভয় হচ্চে। আমার ইচ্ছে করে কিছুকাল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নির্জ্জনে গিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে স্থিরভাবে আলাপ করি—নইলে যে সত্যের মধ্যে শান্তি, গোলেমালে তার স্পর্শ হারিয়ে ফেলি। যখনি একটু স্থির হয়ে বসবার সময় পাই তখনই মনের ভিতরে আশ্রয় মেলে। কথা আছে ২৫শে মার্চ্চ এখান থেকে রওনা হয়ে ২৭শে ভরতপুরে পৌঁছব— কিন্তু এখনো ওদের শেষ চিঠি হাতে পাইনি।

বাবা

[৫৭]

মীরু

অনেকদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। এখানে হাওয়া বদল হয়েচে সন্দেহ নেই কিন্তু তার ফল আনন্দজনক হয়নি। আমি পড়েছিলুম। সেরেচি। তারপর পুপে। দুতিনবার জ্বর হল। ডাক্তার ভাবচে কৃমি। যাই হোক হাওয়া বদল না করলে এর চেয়ে বিশেষ খারাপ হোত না। শান্তিনিকেতনে ঝড় বৃষ্টি থেকে থেকে হচ্চে শুনে অবধি বদল ভাঙতে ইচ্ছে করচে।

নুটু কি জয়পুরে চলে গেল? এই প্রচণ্ড গরমে সেখানে ওর কী উপকার হবে। হাওয়া বদল হবে, অর্থাৎ সহনীয় হাওয়া থেকে অসহনীয় হাওয়ার বদল। তাকে কেন ওয়াল্টারে নিয়ে গেলিনে? সেখানে সমুদ্রের হাওয়ায় নিশ্চয় ওর উপকার হত। জষ্টিমাসে রাজপুতানার মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে ওরিজিনালিটি আছে।

এখানে দিনু কমলরা লাবান খুব সরগরম রেখেচে। চেষ্টা করচে একদল ছেলে নিয়ে চিরকুমার সভা করবে— উপাদেয় হবে বলে বোধ হচ্চে না। ইতি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

বাবা

|৫৮|

পিনাঙ

[১৪ অগস্ট ১৯২৭]

মীরু

মালয় উপদ্বীপের শেষ বক্তৃতা আজ বিকেলে সমাধা হলে এখান থেকে ছুটি পাব—তারপরে কাল বিকেলে জাহাজে চড়ে চলব জাভায়। দেশটা বেজায় গরম— অথচ ইলেক্‌ট্রিক পাখা কেন যে চলে না আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না। গবর্ণরের বাড়িতে যখন ছিলুম একটা টেবিল পাখা চালিয়ে প্রাণরক্ষা করা যেত। এখানে সামনে সমুদ্র অথচ বাতাস প্রায়ই পাওয়া যায় না। সর্ব্বদা একটা হাত পাখা সঞ্চালন করা যাচ্চে। এদিকে একজন সামান্য লোকের বাড়িতেও অন্তত একটা মোটর গাড়ি আছে। বোধ হয় মোটর গাড়ী চালিয়ে এরা হাওয়া খায়—তার চেয়ে পাখা চালানো অনেক শস্তা। পাখা না থাকুক, এখানকার লোকেরা খুব উঠে পড়ে যত্ন করচে। গলায় মালা দিচ্চে, স্তুতিবাদ করচে, বক্তৃতা শুনচে, হাততালি চালাচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও দিচ্চে। মাঝে মাঝে এখানে তামিল কারি খেতে হয়েছে—স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে-দ্বীপে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল এরা তার খুব কাছেই থাকে। সৌভাগ্যক্রমে চীনেরা তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্যে ধরাধরি করেনি। তা না

হলে হাঙরের পাখনা, দুশো বছরের পুরোনো ডিম, পাখীর বাসা প্রভৃতি খেয়ে তারপরে সেগুলোকে অন্তত তখনকার মত পেটের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হত। আজ ১৪ই অগস্ট। বোধ হয় ভাদ্রমাসের সুরু, তোদের ওখানেও যথেষ্ট গুমোট পড়ে থাকবে। কিন্তু শিউলির গন্ধে বোধ হয় আকাশ ভরা— মালতীরও অভাব নেই। এখানে ফুল বড়ো একটা চোখে পড়ে না— গাছ অনেক, ফলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাখী কেন যে এত কম তা বোঝা যায় না। কদাচিৎ দোয়েল দেখা যায়। কাক নেই, কোকিল নেই। ডুরিয়ান বলে কাঁঠালের মত ফল আছে, তার দুর্গন্ধ জগদ্বিখ্যাত। সাহস করে খেয়ে দেখেচি। যারা এ ফল ভালোবাসে তারা বলে এই ফল ফলের রাজা। বিশ্বভুবনে আম থাকতে এমন কথা যারা বলে তাদের জেলে দেওয়া উচিত। এখানে একদল বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেচে। তারা বেশ ব্যবসা জমিয়েচে। সবাই বলে এদেশে টাকা করা খুব সহজ।

তুই এখন কোথায় আছিস ? তোর নতুন বাড়িতে কি গুছিয়ে নিয়েছিস ? এখন বর্ষায় মাটিতে রস আছে, বাড়ির চারদিকে বাগান করতে চাস তো গাছ লাগাবার এই সময়। আমার কোণার্কের গাছগুলোর অবস্থা কি রকম ? তাদের জন্যে মনটাতে টান পড়ে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি।

বাবা

[৫৯] কলিকাতা]

মীরু

আজ বিকেলে যাব। কদিন বড়ো লোকের ভিড়ে, কাজের ভিড়ে কেটেচে। জন্মদিনের দিন সমস্তক্ষণ গোলমাল গেছে। সভায় গান বাজনা প্রভৃতি নানা কাণ্ড হোলো। এখন পালাতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। রানী প্রশান্ত মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাবে। তারপর থেকে আরিয়াম আমার সঙ্গী। রানীদের বৃথা কষ্ট দিতে হোলো।

মেঘ করে আছে। তোদের ওখানে আশা করি একটু আধটু পাচ্ছিস্। রানীরা ফিরে এলে সব খবর পাবি বর্ষার ধারা নামলে তোর বাগানে ফলের গাছ লাগাস্। আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি— কুয়োর ধারে কলা। বড় ব্যস্ত আছি। আশীর্ব্বাদ ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৩৫

বাবা

Messageries
Maritimes.

মীরু

জাহাজ এসে পৌঁছল কলম্বোয়। Andrews যেদিন সকাল বেলায় এই জাহাজের ক্যাবিন্ প্রভৃতি দেখে এলেন আমাকে জড়িয়ে ধরিয়ে প্রায় নৃত্য আর কি। এমন চমৎকার ক্যাবিন মেলা ভার বলে খুব উৎসাহ দিলেন। নিজে গেলেন ট্রেনে চড়ে সিংহলে। আমরা উঠে এসে দেখি, ক্যাবিনের সঙ্গে প্রাইভেট বাথরুম প্রভৃতি নেইই। সরকারী জায়গা কেবলমাত্র একটি। প্রায়ই খোলা পাওয়া যায় না, তারপরে আবার নোংরা এ জাহাজে আর তিন হপ্তা কাটালে শরীর বলে কোনো বালাই অবশিষ্ট থাকবে না। কলম্বোতে নেবে এ জাহাজে ফিরব না। শুনচি হপ্তাখানেকের মধ্যে আর একটা ভালো জাহাজ পাওয়া যেতে পারে। যদি পাই তো পাড়ি দেব, যদি না পাই তবে এ যাত্রাটা এইখানেই সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এত বার বার বাধা পূর্ব্বে কখনো হয়নি। স্থির করেছি এবার ফিরে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের মতো সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করব— কেবল প্রতি বুধবারে সাধারণকে দর্শন দেব— বাকি ছয়দিন চুপচাপ নিজের নিঃশব্দ নির্জ্জন শান্তি অবলম্বন করে

গভীরের মধ্যে তলিয়ে থাকব। অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল— বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিক মত পাবার এই ঠিক উপায়। তোরা কোথায় আছিস্ কে জানে? শান্তিনিকেতনের বর্ত্তমান অবস্থা কি? তোর গাছপালার উন্নতি কতদূর হোলো। জাহাজ বন্দরে এসেচে। এখানে ঘাট নেই। অতএব ছোট ষ্টীম বোটে করে ডাঙার উঠ্‌তে হবে।

পণ্ডিচেরীতেও এই অবস্থা— আমাকে যে ভাবে জাহাজ থেকে ওঠা নানা করেছিল তাতে মর্য্যাদা রক্ষা হয় না— তার বিবরণ পরে দেব। ইতি ৩০ মে ১৯২৮

বাবা

৬১]

[Woodbrooke
Birmingham]

কল্যাণীয়াসু,

মীরু, বক্তৃতা ইত্যাদি নানা কাণ্ড কারখানা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছি। তার বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমার দ্বারা ঘটে ওঠে না। মোটের উপরে বলা যায় ছবি এবং বক্তৃতা দুটোই উৎরে গেছে। আমি আছি এই সব ব্যাপারে এখানে ওখানে— রথীরা আছে অন্যত্র স্থির হয়ে। তার শরীর ভালোই আছে।

জ্যৈষ্ঠমাসের খরা তোর ফুলবাগানে কি রকম দৌরাত্ম্য করচে এখানে তা আন্দাজ করা কঠিন। কেননা এখানে মাঠে ঘাটে অজস্র ফুল—ঠেসাঠেসি ভিড়। সমস্ত দেশের যেন ফুলশয্যা। এখানে প্রকৃতির লাবণ্য আর তোদের ওখানে পোলিটিকাল লাবণ্য দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।

হৈমন্তীর একটি মেয়ে হয়েচে নিশ্চয় খবর পেয়েছিস্। তার নাম রেখেচে সেমন্তী। অর্থাৎ সেঁওতি ফুল। কিন্তু সেঁওতিফুল যে কী পদার্থ তা জানিনে।

অক্সফোর্ডে শ্রীমতীর ভাইকে দেখলুম। শ্রীমতীর অসুখ হয়ে কোন্ এক জায়গায় আছে। তার মা তার কাছে এসেচে। কোথায় আছে ঠিক খবর পেলুম না।

এখানকার বসন্ত এবার বাতুলে অনেকদিন পরে আজ একটু ভদ্র রকমের রোদ্দুর উঠেচে।

তোদের ওখানে আষাঢ় তো আসন্ন। আকাশের ভাবগতিক কী রকম? আমার কঙ্কর কুঞ্জের প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করিস্ কি? ইতি ২৭ মে ১৯৩০

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু তোর চিঠি থেকে শান্তিনিকেতনের পাশ্চাত্য পাড়ার খবর কিছু কিছু পাওয়া গেল। ঐ পাড়ার উপর বিশ্বভারতীর ঝাঁটা বোলাবার প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে। কেননা এখন থেকে এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে ওখানে প্রতি বৎসর যাবে তার ব্যবস্থা হচ্চে অতএব আবর্জ্জনা যদি না এখনি সরানো যায় তাহলে ওদের সংসর্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌বে। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এসেছি জেনিভাতে। এখানে এসে প্রথম রৌদ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মনে হচ্চে যেন জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে পৌঁচেছে। আমাদের দেশের রোদ্দুর, অঘ্রাণ মাসের দুপুর বেলার মত— আকাশ নির্ম্মল নীল, গাওয়াতে গরমের অল্প একটু ছোঁয়াচ লেগেছে, গাছের পাতাগুলো ঝিলমিল করে উঠ্‌ছে। আমার জানালার ঠিক সাম্‌নে একটা বাঁশ বন আছে। বলরামের গদা তৈরী করবার বাঁশ নয়, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজাবার বাঁশ, সরু লম্বা চিকন শ্যামল, যাকে বলে মুরলী বাঁশ, এখানে এনেচে জাপান থেকে। ঐ বনের দিকে চোখ ফিরিয়ে হঠাৎ ভুলে যাই য়ুরোপে আছি। বনমালীর দেশ বলে ভুল হয়।

রাণীর চিঠিতে খবর পেলুম নীতুকে বম্বাই পাঠানো হয়েছে ছাপার কাজ শিখ্‌তে। ভালো লাগ্‌লো না, কারণ বম্বাই অস্বাস্থ্যকর। ওখানে এক জাতের ম্যালেরিয়া আছে যেটা খুব খারাপ। এখানে বিশেষ চেষ্টা করে ভালো ব্যবস্থা করেছি। এ রকম সুবিধা ভারতবর্ষীয়ের ভাগ্যে সহজে জোটে না। সব চেয়ে ভালো শিক্ষা পাবে সব চেয়ে আদর যত্নে এবং সব চেয়ে কম খরচে। ওকে আমি কাজে লাগিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চিন্ত হব। এই সুযোগটা ছাড়্‌লে নীতুর প্রতি নিতান্ত অন্যায় করা হবে। এখানে ও মানুষ হয়ে উঠ্‌বে কেবলমাত্র মজুর নয়।

রথীর খবর বোধ হচ্চে ভালোই। এতদিন নানা ডাক্তারকে নানা অর্ঘ্য জুগিয়েচে—চিকিৎসা চলেছিল ভুল রাস্তায়। এতদিন পরে আরোগ্যের পথ পেয়েচে একেবারে বিনামূল্যে। যেখানে আছে সেখানে সুখে আছে সস্তায় আছে। ইতি ২৫শে আগষ্ট ১৯৩০।

বাবা

[৬৩] [দার্জিলিং]

কল্যাণীয়াসু মীরু,

তোর চিঠি পেলুম। বৃষ্টি তো নাম্‌ল কিন্তু মাটিতে এতদিন যে তাপ সঞ্চিত ছিল তা বোধহয় ভাপ হয়ে উঠচে। মাটির তাপ মলে তবে আরাম পাবি। রৌদ্রের অত্যাচারে ধরণী অনেকদিন আকাশের পরে অভিমান করে থাকে—প্রসাদবারি বর্ষণের পরে প্রথমটা তার উষ্মা আরো বেড়ে ওঠে ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। এদিকে রানী মহলানবিশ তাঁর স্বামীটিকে সঙ্গে নিয়ে বিনা নোটিশে হঠাৎ আবির্ভূত। কলকাতায় যতদিন গরম অসহ্য ছিল ততদিন নড়বার কথা মনে উদয় হল না—যখন সেখানে ঠাণ্ডার আয়োজন জমে এল তখন তাঁরা এখানে উত্তীর্ণ। বেশিদিন থাকবে না। আমরা ঠিক করেছি জুলাইয়ের পয়লা কিম্বা তারি কাছাকাছি নীচে নাম্‌ব। ততদিনে ধরণীতল প্রসন্ন হবে।

পুপু এখন ভালো আছে। আমার টেবিলের উপর কাগজপত্র দোয়াত কলম যতই আমি এলোমেলো করি, সে এসে গুছিয়ে দেয়। বৌমাও ভালো আছেন—রথীর শরীরও ভালো। আমার শরীরটাও ভালো আছে মানতে হবে। কিন্তু দুঃসহ গরমে আমার কঙ্কর কুঞ্জ কঙ্কালসার হোলো কিনা সেই কথাটা ভাবি। এবার বর্ষায় সেঁউতি ফুলের খবর নিস্‌তো। হৈমন্তীর মেয়ের

নাম রেখেছি সেঁউতি কিন্তু পরিচয় জানিনে। আর একটা কবি-পরিচিত ফুল আছে বাঁধুলি কিন্তু সেও অচেনা। এইগুলো তোর মালঞ্চে আমদানি করে আমাদের চেনবার সুবিধে করে দিস। পিয়াল, পারুল এ দুটো গাছের সন্ধান করা উচিত। ভাঁটি ফুল বোলপুরের কাছে ঢের আছে, লাগাসনে কেন? ওটা বৈষ্ণব পদাবলীর ফুল, রূপে ও গন্ধে আদরের যোগ্য। ইতি

আষাঢ় ১৩৩৮

বাবা

[৬৪]

* Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.
২২ জুলাই ১৯৩২

মীরু এডেন থেকে তোদের কেব্‌ল্‌ পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। প্রথম যে কদিন দোলা খাচ্ছিলি আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। আজ বাইশে, এতদিনে প্রায় জেনোয়ার কাছে এসে পৌঁচেছিস। নীতুকে নতুন যে জায়গায় নিয়ে গেছে তার খবর নিশ্চয় তোদের কাছে পৌঁচেচে। হয় ত বা এণ্ড্রুজের সঙ্গে ঘাটে তোদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। নীতুর পক্ষে সব চেয়ে কোন্‌ জায়গা ভালো সে পরামর্শ ঠিক কোনো জর্ম্মান ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে কিনা আমার মনে সন্দেহ হয়। ওরা কোনোমতে জর্ম্মনীতে রাখতে চাইবে। এণ্ড্রুজ কিম্বা ধীরেন কোনো নিঃস্বার্থ লোকের কাছে পরামর্শ নেয় তো ভালো হয়। সৌম্যর সঙ্গে দেখা হলে এ সম্বন্ধে সে তোকে সাহায্য করতে পারবে।—Black Forestটা যথেষ্ট শুক্‌নো হবে না বলে আমার আশঙ্কা হয়। এডেন থেকে তোদের চিঠি এলে তোদের জাহাজের বিবরণটা পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

আমাদের এখানে ভালোই চল্‌চে। বুড়ির শরীর বেশ আছে। পড়াশুনো চল্‌চে, রথীর কাছে চামড়ার কাজ শিখ্‌চে। ভেবেছিলুম

কোণার্কে ওকে এনে রাখব, কিন্তু ওর এখানে খুব অসুবিধে হোত। এখন আছে উদয়নের কাঁচের ঘরে—সেখানে বেশ গুছিয়ে নিয়েচে—ওর মন বসে গেছে। রোজ দুবেলা মালঞ্চে তদারক করতে যায়, ওখানকার জীবজন্তুর খবর নিয়ে আসে।

শ্রাবণমাস পড়েচে তবু এবারকার বর্ষা এখনো যথোচিত রকম হয় নি। অর্থাৎ চাষের উপযুক্ত বর্ষণ নয়, ক্ষেতে জল দাঁড়াবার মতন বৃষ্টি হচ্চে না। এক একবার হঠাৎ খুব ঝমাঝম করে বাদল নামে, তার পরে আবার থেমে যায়—রোদ্দুর ওঠে। অনেকটা শরৎকালের মতো। কিন্তু গরম নেই। হুহু করে বাতাস দিচ্চে। গাছপালাগুলো দেখাচ্চে ভালো, মাঠ ঘাট খুব সবুজ। তোর মুরগী রোজই ডিম পাড়চে সেটা আমারি ভোগে লাগে। তোর বাগানে একটা আনারস পেকেছিল, সেটা আমাদের চেয়ে হুঁসিয়ার কোনো একজন অজানা লোকের দৃষ্টিগোচর ও হস্তগত হয়েচে।

অমিয়ারা তোর বাড়িতে আসবে কথা ছিল কিন্তু এখনো তাদের কোনো খবর পাইনি। মাঝের থেকে আশারা তোর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাসায় গেছে। বৌমাকে বলেছি ওদের চিঠি লিখে জানতে ওরা কবে আসবে অথবা আসবে কিনা। কমলের কাছে তোর বাছুরের খবর পাই,—সে আদরে আছে এবং ভালোই আছে। তার সহবাসী হরিণের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। তোর খরগোষ এবং ঘুঘুদের বংশোন্নতি হচ্চে। ···র মুর্গিমহলে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের পরিমাণ বেশি

দেখা যাচ্চে—তার ফল আমাকে ভোগ করতে হয়—আমার সামনের চাতালটার পরে তাদের নিত্য উপদ্রব। গাছের টব সার করে তাদের পথ রোধ করবার চেষ্টায় আছি। টবের বদলে কলসী আনিয়েছি, তাতে দেখতে ভালো হবে। কোণার্কের সামনেই সিমুল গাছে যে মালতীলতা উঠেছে বর্ষায় তাতে ফুল ধরেছে—গাছের তলায় টুপ্‌টুপ্‌ করে কেবলি ফুল ঝরে পড়চে—এইবার আমার লতাবিতানে চামেলি ফোটবার সময় হয়ে উঠ্‌ল। আমার কামিনী গাছে কামিনী মঞ্জরীও দেখা দিয়েছে। বুড়ি গর্ব্ব করে বল্‌লে, মালঞ্চেও কামিনী ধরেছে। তোদের ঘন পাপ্‌ড়িওয়ালা জুঁইগুলোরও পরিচয় পাচ্চি, মাঝে মাঝে বুড়ি তুলে এনে দেয়। ইতি

বাবা

৬৫]

[শান্তিনিকেতন

জুলাই-অগস্ট, ১৯৩২

মীরু,

পোর্ট সয়েদ থেকে তুই যে চিঠি লিখেছিস পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম। রেড্ সীতে তেমন গরম পাস নি, সে কম কথা নয়। তুই যতটা শয্যাগত হয়ে পড়বি ভয় করেছিলুম তা হয় নি। বোধ হয় কোনো ওষুধ খাওয়াও অনাবশ্যক হয়েছিল। Black Forest-এ এই Summer-এ মনে হচ্চে খুব সুন্দর হবে—গাছপালার মধ্যে থাকবি। ইতিমধ্যে নীতু বুড়িকে চিঠিতে লিখেছিল তার জ্বর ও কাশী বেড়েছে। স্যানাটেরিয়মে গিয়ে কোনো উপকার হোলো কিনা জানিনে। এণ্ড্রুজের কেব্‌ল্ পেয়ে জানলুম সে জেনোয়াতে গিয়ে তোকে জর্ম্মনীতে নিয়ে যাচ্চে—সেখানে তোকে গুছিয়ে দিয়ে তবে সে চলে যাবে। এত খুসি হয়েছি বল্‌তে পারিনে—জানি তাকে জাহাজঘাটে দেখে তোরও মন খুব নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এলা আর তার স্বামীও বোধ হয় ছিল। স্যানাটেরিয়মের আইন কানুন কী রকম জানিনে। সেখানে বায়োকেমিক চিকিৎসায় ওরা কি মত দেবে না আমার বিশ্বাস, যখন ঘনঘন কাশি বা অন্য কোনো উপদ্রব ঘটে তখন এই সব নিরীহ ওষুধে আশু

উপকার পাওয়া যায়। নিশ্চয় সহরে বায়োকেমিক ডাক্তার আছে—অন্তত হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসক। দূরে থেকে কিছু বলা যায় না—ভেবে চিন্তে দেখে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করিস।

এখানে বর্ষা এবার এখনো ভদ্ররকম নামল না। গাছপালার পক্ষে যথেষ্ট বর্ষণ হচ্চে কিন্তু ফসলের পক্ষে নয়। গরম আর নেই—বেশ বাতাস দিচ্চে। চারদিকের জঙ্গল সাফ করিয়ে মশা বিস্তর কমেছে।

অমিয়ারা এখনো আসেনি। তার ছেলের জ্বর—বল্‌চে কাল শুক্রবারে আসবে।

বুড়ি শরীরে মনে বেশ ভালোই আছে। তোদের এডেনের চিঠি বোধ হয় আসচে মেলে পাওয়া যাবে।

গ্রেচেনের চিঠি[১] তোকে পাঠাই। তাকে জবাব দিয়ে দিস্। সে যদি কাছাকাছি থাকত তাহলে বেশ হোত।

বাবা

---

[১] এই চিঠিখানি প্যারিস থেকে লেখা, তার তারিখ ১৭ জুলাই [১৯৩২]

মীরু

অন্ধকারে আমরা হাৎড়ে বেড়াই যাদের ভালোবাসি তাদের না জেনে ক্ষতি করি, না বুঝে কষ্ট পাই। কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়, সেই সমস্ত ভুল চুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে, আমরা ভালোবেসেচি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতরদিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তা হলে সে অভাব গভীর শূন্যতা। এসেচি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হবে—এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েচে, সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে। কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের

গত কাজ করচে। আর সেই জগৎ জোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি—শোকদুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক, প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক্।—নীতুকে খুব ভালবাসতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্ব্বলোকের সাম্‌নে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চল্‌চে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চল্‌ব। অনেকে বল্‌লে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্,—আমার শোকের খাতিরে—আমি বল্‌লুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব—বাইরের লোকে কি বুঝবে তার ঠিক মানেটা। অন্তত তাদের এইটুকু বোঝা উচিত, বাইরে থেকে কোনো রকম সান্ত্বনার চিহ্ন, কোনোরকম আনুষ্ঠানিক শোক একটুও দরকার নেই তাতে আমার অমর্য্যাদা হয়। ভয় হয়েছিল পাছে সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তাই কিছুদিনের জন্যে বারণ করেছিলুম সবাইকে আমার কাছে আস্‌তে। কিন্তু আমার সকল কাজকর্ম্মই আমি সহজভাবে করে গেছি। লোক দেখিয়ে কোনো কিছুই বাদ দিতে চাইনি। ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্য সব কিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সব চেয়ে আত্মাবমাননা। অনেকদিন ধরে একান্তমনে কামনা করেছিলুম যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি আমার 'বিশেষ বন্ধু কেউ থাকেন

তিনি আমাকে দয়া করুন। কিছু জানিনে, হয়ত দয়াই করেছেন। হয়ত আরো বেশি দুঃখের হাত থেকে রক্ষাই পেয়েছি। এমন তরো প্রার্থনা করাই দুর্ব্বলতা। আমার জন্যে বিশ্বনিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হবে এমনতরো আশা করি যখন মন অত্যন্ত মূঢ় হয়ে পড়ে। কষ্ট যখন সকলকেই পেতে হয় তখন আমিই যে প্রশ্রয় পাব এত বড়ো দাবী করবার মধ্যে লজ্জা আছে। যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল

তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে। এডেনে এ চিঠি পাঠালে তুই পাবি কিনা জানিনে, তাই বম্বাইয়েতেই পাঠাব মনে করচি। ইতি ২৮ আগষ্ট ১৯৩২

বাবা

BAGHBAZAR READING LIBRARY CALCUTTA

[৬৭] ওঁ খড়দহ

মীরু

তোরা কেমন আছিস। বুড়ির শরীর তেমন ভালো নেই ওকে নিয়ে একবার রাজগিরে গেলে ভালো হোত। সেখানে যে সব স্নানের কুণ্ড আছে বাতের পক্ষে সে ভালো, মোটের উপর শরীরের পক্ষে সেটা স্বাস্থ্যকর। কিছুদিন রোজ যদি সেখানে স্নান করা যায় এবং তার জল পান করা যায় তাহলে Constipationএর পক্ষে খুবই উপকার হয়। তাই বলে দু তিন দিন থাকার কোনো মানে নেই—অন্তত পনেরো দিন থাকা উচিত হবে। এখন সেখানে ভক্তি আছে বুড়ি তাকে সঙ্গিনীরূপে পেতে পারবে। অল্প অল্প শীত পড়েচে। প্রথমটা এসেই রীতিমত বাদলা পেয়েছিলুম। তোদের ওখানে কি রকম? এখন বোধ হয় সময়টা ভালো। এখানে আর কিছু না হোক্ যথেষ্ট নিরিবিলি। আমার লেখাপড়ার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। শান্তিনিকেতনে বড্ড বেশি মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আমার নতুন গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হোলো কি না জানিনে। প্রতাপ আজ যাচ্চে, সে গিয়ে ইঁটকাঠের জোগাড় সুরু করবে। পুপু এখানে পূর্ণিমাকে পেয়ে সহজে দিনযাপন করচে। রথী দুই একদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে যাবে। ইতি ১০ কার্ত্তিক ১৩৩৯

বাবা

মীরু

একজামিনেশন তো হয়ে গেলো এখন বুড়ির শরীর মনের অবস্থা কী রকম ? আর কত দিন কলকাতায় কাটাবি এখানে বেশ রীতিমতো ঠাণ্ডা। এখন বেলা দুপুর তবু ইচ্ছা করচে গায়ে একটা মোটা কাপড় চড়াতে। ওদিকে বেল ফুল ফুটতে সুরু করেছে—বৌমার বাগানে রজনীগন্ধা দেখা দিয়েছে — বাসন্তী ফুলে গাছ ছেয়ে গেল, বনপুলক ফুটতে আর দেরি নেই। শিমুলের ফুল ঝরে গিয়ে এখন নতুন পাতা ওঠবার আয়োজন দেখচি—শিলবৃষ্টি ও কুয়াশার উপদ্রবের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে অবশেষে আমার সেই আমের গাছটায় আর এক দফা বোল দেখা দিয়েচে। যখন ফল ধরবে তখন হয় তো আমরা কোথাও চলে যাব। সূর্য্যমুখীর দল কিছুদিন খুব ধুমধাম করে দেউলে হয়ে ঝাড়ে মূলে অন্তর্ধান করেচে। দু চার রকমের সীজ্‌ন্ ফুল আজো আমার দুয়োরে হাজরে দিচ্চে। আর সেই লাল রঙের লিলি, একেবারে সার বেঁধে রাস্তার ধারে বাহার দিয়েচে।

মণিপুরের নবকুমার এসেচে, ছুটিতে থাক্‌বে। নাচ শেখবার দুর্লভ সুবিধে হয়েচে— এটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিস্‌নে। বুড়ির যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাতেই তার যথার্থ আনন্দ ও

সার্থকতা। একটুও দেরি করিস্‌নে, চলে আয়। সেই মালাবারী নাচনিও আছে, কিন্তু নবকুমারের নাচ দেখে আরো ভালো লাগল।

আজকাল বৌমা, রথী দুজনেরই শরীর ভালোই আছে। ইতি
১৮ মার্চ্চ ১৯৩৪

বাবা

[৬৯] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

মারু

বুড়ির শরীরের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেম। কৃপালানি আজ গেলেন। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা কর্ত্তব্য হয় স্থির করে আমাকে জানাস। আমি সুরেনকে বলে দিয়েছি চিত্রাঙ্গদার দল নিয়ে বম্বে যাওয়া চলবে না। প্রথম থেকেই এতে আমার উৎসাহ ছিল না—আমি সঙ্গে থাকতুম না ওরা ঘুরে বেড়াত এ কল্পনা আমার একটুও ভালো লাগে নি। বুড়িকে হাওয়া বদলের জন্যে যদি কোথাও নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় সে কথাও ভেবে দেখিস।

এখানে গরম বিশেষ নেই। কয়েকদিন ধরে মেঘ করচে, বোধ হয় শীঘ্রই বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তার পরে পড়বে শীত।

ইতি ৩১ চৈত্র[1] ১৩৪৩

বাবা

---

[1] আশ্বিন হবে। পোস্টমার্ক—17 Oct. 36 = ৩১ আশ্বিন ১৩৪৩

[৭০]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

মীরু

বুড়ির স্থান পরিবর্ত্তনের জন্যে ডাক্তাররা যা পরামর্শ দেয় করিস। ইতিমধ্যে ওর টন্‌সিলের জন্যে Calcarea Sulph 6x বায়োকেমিক, দিনে তিনবার করে দিস। নিশ্চিত উপকার হবে। ভুলিস্‌নে। ওর সম্বন্ধে ডাক্তাররা যা স্থির করবে নিশ্চয় কৃষ্ণ তাতে আপত্তি করবে না। ওর জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। ইতি ১ কার্ত্তিক ১৩৪৩

বাবা

[৭১]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[পোস্ট মার্ক 17 Jan. 37]

কল্যাণীয়াসু

মীরু, বুড়ির চিঠিতে খবর পেলুম তোর শরীর খারাপ হয়েচে। বুঝতে পারচি শীতের ভয়ে তুই কেবলি রান্না নিয়ে আগুন পোয়াচ্ছিস। সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। তোদের পাড়ায় তো হোমিয়োপ্যাথ আছে, একবার দেখা না কেন। আমার কিছু দিন লিভারের দোষ ঘটে রোজ সন্ধের দিকে জ্বর আসছিল ক্ষিতিবাবুর কবিরাজি বিধানে সেটা সেরে গেছে। তোরা মায়ে ঝিয়ে একবার এখানে যদি আসিস্ তাহলে চিকিৎসার চেষ্টা দেখা যায়—উপকার হবে বলে খুবই আশা করচি। বুদ্ধি উজ্জ্বল রাখবার জন্যে আমি একটা কবিরাজি ওষুধ খাচ্চি। তোর বুদ্ধির দোষ ঘটেনি কিন্তু শরীরটাকে মাটি করবার একগুঁয়েমিকে কী নাম দেব।

বৌমা, রথী বোটে, আমি আছি একলা উদয়নের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়। সঙ্গদানের জন্য গাঙুলি আছেন কিন্তু সেটা অ্যালাপ্যাথি ডোজের সঙ্গ।

বাবা

[৭২]

* “Uttarayan”
Santiniketan, Bengal

মীরু

এখানে যদি আসিস নিশ্চয় তোর শরীর ভালো হবে, বিশ্রাম করতে পারবি। বুড়িদের জন্যে মোবারক আছে, সেখানকার রান্নাঘরের দায় পোয়াতে হবে না। আমার একটা প্ল্যান আছে— আমার নতুন বাড়িতে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে তুই থাকতে পারবি— আমি আছি উদয়নের তেতালায়। ১০ ফেব্রুয়ারি নাগাদ কলকাতায় যেতে হবে—ইচ্ছা করিস তো সেই সময়েই তুই দৌড় দিতে পারবি। শীত চলচে কিন্তু শুকনো শীত। ইতি ১২ মাঘ ১৩৪৩

বাবা

মীরু

……ছোট সংসারের মধ্যেই একান্ত আসক্ত হয়ে থাকলে প্রত্যেক ছোট ব্যথা কল্পনায় বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। জীবনে ত কম দুঃখ পাই নি কিন্তু জীবনের ভূমিকা যদি ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগার পরিধির মধ্যে সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকত তাহলে কেবল যে আমার দুঃখ বাড়ত তা নয় আমার মন অবিচারপরায়ণ হয়ে উঠ্‌ত। আমার সাহিত্যিক জীবনে এই দুর্গতি ঘটেছিল দেশের লোকের সম্বন্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছি—এই অত্যুক্তির মূল কারণ এই সম্বন্ধে আমার মনের অস্বাস্থ্য। এবার নববর্ষ থেকে চেষ্টা করছি মনকে প্রকৃতিস্থ করতে। বিরাট এই মানববিশ্ব, অতি বৃহৎ সুখে দুঃখে তার ইতিহাস বিক্ষুব্ধ; আমি যদি তার সঙ্গেই নিজের ইতিহাস মেলাতে না পারি তাহলে কোণে বসে কেবলি নিজেকে খোঁচা দেওয়া ও অন্যের বিরুদ্ধে কণ্টকিত হওয়ার মতো লজ্জা আর কিছুই নেই। ক দিনের জন্যেই বা জন্মেছি, এই কটা দিন যদি “sweetness and light” থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করে যাই তাহলে এ ক্ষতিপূরণ হবে কবে? প্রাণপণ সাধনায় চেষ্টা কোরব বাকি কটা দিন জীবনের পরে ক্ষমা ও ধৈর্য্য বিস্তীর্ণ করে যেতে। ইতিমধ্যে

যখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলুম তখন সকলের প্রতি নিজের অকারণ অধৈর্য্যে ও অবিচারে নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। আর যেন এমন না হয় এই আমার কামনা। ব্যক্তিগত সংসার থেকে বেরিয়ে চলতে চাই বিরাটের দিকে। ১লা বৈশাখ ১৩৪৪

বাবা

৭৪।　　ওঁ　　* “Uttarayan”

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

তোর শরীর ভালো নেই তা নিয়ে আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে। আমরা এপ্রিলের শেষ দিকে আলমোড়া পাহাড়ে যাচ্ছি। বুড়িকেও নিয়ে যাব। তুই যদি সেখানে যেতে রাজি হোস খুসি হব। সেখানে তোর ঘরকন্নার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারবি। আমারও বিশ্রামের দরকার আছে। ইতি ১৯।৪।৩৭

[৭৫] ওঁ [আলমোড়া]

মীরু

পথে বিষম কষ্ট পেয়েছি বিশেষত বেরিলি স্টেশনে। কিন্তু সে দুঃখ ভুলেছি এখানে পৌঁছিয়েই। হাওয়াটি ঠাণ্ডা, বেশি ঠাণ্ডা নয়, খুব শুকনো,— বাড়িটি বেশ বড়ো, বারান্দা প্রশস্ত, মেঘমুক্ত আকাশ, চারিদিক খোলা, ফুল ফুটেছে নানাবিধ, লোকের আনাগোনা নেই বল্‌লেই হয়। আর সকলেই ভালো আছে, ভালো থাকবে বলেই আশা করি। জ্যোৎস্নাকে কেমন দেখলি? তাকে আশীর্ব্বাদ জানাস। তোরা যাবি কোথায়? ২৫শে বৈশাখের উপদ্রব এড়িয়েছি বলে মন প্রসন্ন আছে। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪৪

বাবা

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়াসু

মীরু, এখানে দিন ভালোই যাচ্চে। তোরা আছিস গ্রীষ্মের অধিকারে, সেখানে আরাম কম বেয়ারাম বেশি, সেইজন্যে তোদের কথা চিন্তা করলেও ঐ পাহাড়ের উপরকার বরফ করুণায় বিগলিত হয়। এখানে পাহাড়ের শীতের কড়াক্কড় একটুও নেই, কর্ত্তব্যের বোধে গরম কাপড় পরি, খুলে ফেলবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনে থেকে যায়। এই মধ্যাহ্ণে খোলা বারান্দায় বসে আছি, আতপ্ত হাওয়া বইচে দেবদারু গাছের শাখা দুলিয়ে, পাইনবনের গন্ধ আসচে, পাখী ডাকচে অজানা ভাষায়। বুড়ি ভালোই আছে, কোনো উপসর্গ নেই। কাল সন্ধেবেলায় কৃষ্ণ এসেছে।— জ্যোৎস্নার খবর কী? বিকেলের জ্বরের পক্ষে Kali Sulph এবং Fer. Phos ব্যবস্থা। ১৭ মে, ১৯৩৭

বাবা

[৭৭] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

[পোস্টমার্ক 3 Oct. 37]

মীরু

আমার জন্যে একটুমাত্র ব্যস্ত হোস নে। আমি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে উঠেছি। সেবার শাসন থেকে ছুটি পাবার সময় এসেছে। পানাহারের তুই যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিস তিনজনে মিলে উঠে পড়ে সেটা চালাতে লেগে গেছে। আমার প্রাণপুরুষ সর্ব্বৎসাগরে হাবুডুবু খাচ্চে। ওষুধ পথ্য কিছুরই ত্রুটি হচ্চে না।— কিছুদিন পরেই তো কলকাতায় যেতে হবে— কেন তুই মিছিমিছি কষ্ট করে আসবি।

বাবা

[৭৮] ওঁ শান্তিনিকেতন

মীরু

আমার সংশোধিত তারিখের জন্মোৎসব আজ হয়ে গেল। তুই আসিসনি ভালো করেছিস। আমার সেক্রেটারি বলছে আজকের মতো এমন নিষ্ঠুর গরম অনেককাল হয়নি। আমি এ নিয়ে মুখে নালিশ জানাই নে কিন্তু বোধ হয় আমার দেহটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুই এ সময়ে সমুদ্রতীর ছেড়ে আসিস নে। আমরা দু চারদিনের মধ্যেই কালিম্পং যাচ্ছি। শুনেছি জায়গাটি ভালো, বাড়িটি খুবই ভালো। বৌমারা দুই একদিন আগে যাবেন— আমি যাব আগামী সপ্তাহে।

আমাদের চিত্রাঙ্গদার দল ফিরে এসেছে। সর্বত্রই তারা আদর পেয়েছে, আর পেয়েছে মাছের ঝোল এবং তজ্জাতীয় উপাদেয় জিনিস। বাঙাল দেশে মণিকার নাচের আদর অন্য সকলের কীর্তি ছাড়িয়ে গেছে— বাঙালদেশের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি— আমার সেক্রেটারি এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে রাজি নয়— বোধ হয় মতের মিল আছে। ইতি ২[১?] বৈশাখ ১৩৪৫

বাবা

[৭৯] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

মীরু

কাল রাত্রে বুড়ির কাছে তোর অসুখের কথা শুনে মনটা ভারি উদ্বিগ্ন আছে। আজ থেকে কয়েকদিন এখানে বিয়ের হাঙ্গাম— সেটা না চুকলে আমাকে ছেড়ে দেবেনা— এটা শেষ হলেই আমি কলকাতায় যাব। ইতিমধ্যে দিনে তিন বার পালা করে Kali Mur এবং Natrum Phos খাস— অবহেলা করিস নে। খুব সম্ভব সোমবারে যাবার চেষ্টা করব যদি না বিশেষ বাধা ঘটে। ইতি, শুক্রবার

বাবা

[৮০] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আজ রাণীর চিঠিতে তোর অসুখের খবর পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমার নিজের বিশ্বাস এ রকম লেগে থাকা জ্বর হোমিয়োপ্যাথিতেই শীঘ্র সারে।—আমার শরীর যাতায়াত করবার যোগ্য নয়—নইলে তোকে একবার দেখে আস্‌তুম। আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি সুধাকান্তকে। সে তোকে পরামর্শ আর আমাকে খবর পাঠাতে পারবে। একবার জীবনকে দেখালে ক্ষতি কী

বাবা

[৮১] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

মীরু

বিপদে পড়েছি। হঠাৎ সংবাদ পেয়েছি, একঝাঁক জাপানী আসচে আমাদের নাচের পরীক্ষার জন্যে। আগামী রবিবারেই পরীক্ষার দিন। নানা দুর্গ্রহে এখানকার নাচের দল ফোঁকলা হয়ে গেছে। শনি ও রবিবারের জন্যে বুড়িকে না পেলে এমন একটা লোকহাসানো হবে যা সমুদ্রপার হয়ে যাবে। বুড়ি আসুক শুক্রবারে, ফিরুক সোমবারে। উপযুক্ত সঙ্গী দেব। তুই এলে আরো খুসি হব, ... তোর জন্যে আমার কোণের ঘর সুসজ্জিত হয়ে আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। এই বার্তা বহন করে অনিল যাচ্চে দূত হয়ে, মাথা হেঁট করে যদি ফিরিয়ে দিস তবে তার অন্তরে চির বিষাদের সজল ম্যাঘ ঘনীভূত হয়ে থাকবে। ইতি বুধবার

বাবা

দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

[১]

C/o American Express Co
New York.

কল্যাণীয়েষু

নীতু তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। খবরের কাগজে এতদিনে পড়েচিস আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। এখনো আমাকে বিছানায় ধরে রেখেচে কিন্তু ভালো আছি, ভাবনার কোনো কারণ নেই।

জর্ম্মনীতে পৌঁছে অবধি আমি তোর জন্যে চেষ্টা করেছি। সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে···সেই বন্ধুদের চেষ্টায় ভালো বাবস্থা হতে পেরেচে। প্রথমে তোকে ম্যানিকে শিখতে হবে তার পরে লাইপ্‌জিকে। লাইপ্‌জিকে শুধু কেবল ছাপানো নয় Book Publishingও শিখ্‌তে পারবি—তা ছাড়া সেখানে অন্য সবরকম শেখবার আয়োজন আছে।

ইতিমধ্যে যতটা পারিস জর্ম্মন অভ্যাস করে নিস। Tourist Conversation বই একটা কিনে নিয়ে প্রতিদিন খানিকটা করে চোখ বুলিয়ে নিস্। শান্তিনিকেতনে যদি যেতে পারতিস তাহলে সেখানে জর্ম্মান শেখা সহজ হোত। কিন্তু Times of India প্রেসে তোর নিজের বাবসা যতদূর সম্ভব অভ্যাস করে নেওয়া ভালো—তাহলে জর্ম্মানিতে তোর কাজ অনেকটা সহজ হবে।

আমি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দেশে ফিরব—কিন্তু বম্বাই দিয়ে নয়—কলম্বো দিয়ে। সুতরাং পথে তোর সঙ্গে দেখা হবে না। যাই হোক জর্ম্মনিতে যাওয়া যখন তোর স্থির হয়েই গেছে তখন এইবার বর্লিনে আমার বন্ধুকে চিঠি লিখে কথাটা পাকা করে নেব। আমার খাতিরে ওরা তোকে খুব যত্ন করেই শেখাবে।

তোর মাকে এই চিঠি পাঠিয়ে দিস্ বলিস্ কোনো ভাবনা নেই। এর আগে যেমন একবার নীলরতনবাবু আমাকে শুইয়ে রেখেছিলেন এও তেমনি। এই কয়দিন বিশ্রাম করেই বেশ আবার সহজ মনে হচ্চে—কিন্তু সব ঘোরাঘুরি বকাবকি বন্ধ করে দিয়েচি। যখন দেশে ফিরব তখন নিশ্চয় দেখতে পাবি আগেকার চেয়ে শরীর অনেক ভালো হয়েচে। ইতি ২৪ অক্টোবর ১৯৩০

দাদামশায়

এ চিঠির জবাব দেবার সময় পাবিনে

[২] ।নকেতন

নীতু

মোলারের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিস তার থেকে ছবির কাগজ পাঠাস। Der Künst টা লাগ্‌ল ভালো। প্যারিস থেকে নানা রঙের কালী এনেছিলুম, ছবি আঁকতে সেগুলো খুব ভালো, তোদের ওখানে যদি তেমন ভালো কালী থাকে এক সেট পাঠাবার চেষ্টা করিস। ছবিগুলো দুশোটাকার ইনস্যোর করে পাঠাস্। বাকি টাকা তোর নিজের হাতে রেখে দিস্, যদি কখনো কিছু দরকার পড়ে ব্যবহার করতে পারিস। বুড়ি দিল্লি থেকে শান্তিনিকেতনে এসেচে। শরীর খুব রোগা দুর্ব্বল হয়ে গেছে। আমি এপ্রেলের গোড়ার দিকে বোধ হয় পারস্যে যাব, Air Mail-এ। আশা করি লাইপ্‌জিকে তোর কাজের একটা কিছু জোগাড় করতে পেরেছিস্। ওখানে তোর কত দিন লাগ্‌বে। ইতি ১৫ ফেব্রুয়ারি[১] ১৯৩৮

দাদামশায়

১৯৩১ হইবে।

৩ [দার্জিলিং]

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠিতে সব খবর পেলুম। তোর কাজ রীতিমত আরম্ভ হবার আগে তোকে যে আট মাস বসে থাকতে হবে শুনে ভালো লাগ্‌ল না। Anna Selig জর্ম্মনিতে আছে কিনা সেও সন্দেহস্থল। এই আট মাস যাতে ব্যর্থ না যায় সে চেষ্টা করিস্‌। বর্লিনে Mrs. Mendell বলে আমাদের একটি বন্ধু আছেন তাঁর ঠিকানা হচ্চে

Wannsee
Friedrich-Kart Str, 18, Berlin.

তাঁকে আমি তোর কথা লিখে দিয়েছি—হয়ত তিনি তোকে চিঠি লিখবেন।

২ বৎসর আট মাস তো তোর ম্যুনিকেই কাটবে তার পরে আরো এক বছর লাইপজিকে কাটানো সম্ভব হবেনা—হয়তো প্রয়োজনও হবে না। এই আট মাস তুই কোনো একটা ছাপাখানায় এপ্রেন্টিসি কাজের জোগাড় করতে পারবি নে কি? অবশ্য মাইনে দাবী করলে চলবেনা—বরঞ্চ তোকেই কিছু দিতে হবে। পরিবারের মধ্যে না থেকে ছেলেদের সঙ্গে থাকলে তোর খরচ বোধ হয় অনেক কম হতে পারবে—সে দিকে দৃষ্টি রাখিস। ইতি ৩০ মে ১৯৩১

দাদামশায়

কল্যাণীয়েসু

নীতু তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। আশা করি এতদিনে একটা কিছু ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। খবরের কাগজ থেকে যতটা আন্দাজ করি তাতে বোধ হচ্চে ব্যাভেরিয়ার ভাবগতিকটা সুবিধামত নয়। দূর থেকে কিছু পরামর্শ দেওয়া শক্ত—ওখানকার অবস্থা বুঝে তুই নিজে যেটা ভালো বোধ করবি তারই অনুসরণ করিস্। লাইপ্‌জিগ্ জায়গাটা ভালো সন্দেহ নেই—জর্ম্মনির একটা খুব বড়ো বিদ্যাকেন্দ্র। তোর ব্যবসা শেখার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বেশি শিখে নিতে পারলে তোর অনেক উপকার হবে। ম্যুনিকে আর্টের চর্চ্চা খুব বেশি—সঙ্গীতের এবং শিল্পের। তোর বেহালা শেখার ঝোঁক কি একেবারে কেটে গেছে? আঁকবার হাত দোরস্ত করতেই বা দোষ কি?

তোকে বাংলা কাগজ বই প্রভৃতি পাঠাবো। আগে শান্তিনিকেতনে ফিরি তার পরে। জুলাই মাসের গোড়ায় এখান থেকে নামব।

তোর মামা ভাল আছেন কিন্তু মামী কিছুদিন ধরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগচেন। আজ অনেকটা ভালো আছেন। তোর মায়ের খবর নিশ্চয় পাস্। ···কে শান্তিনিকেতনে আনবার কথা হয়েছিল

কিন্তু অর্থাভাব অত্যন্ত বিষম। দেশ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। নিয়মিত খরচ চালানোই কঠিন। তিনি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু একেবারেই উপায় নেই। তিনিও তোর জন্যে বিশেষ কিছু সুবিধে করে দেবেন বলে বোধ হয় না। নিজের পরেই যথাসম্ভব নির্ভর করিস। ইতি ২৮ জুন ১৯৩১

দাদামশায়

[৫]   ওঁ   [শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। জর্ম্মানিতে ব্যাভেরিয়ার ভাবগতিক ভালো লাগচে না। যেখানে দারিদ্র্যে মানুষ দুর্ব্বল সেইখানেই যেমন মারী মড়ক জোর পায় তেমনি আজকালকা য়ুরোপে দুর্ভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়চে ততই ফাসিজ্‌ম এব বল্‌শেভিজ্‌ম জোর পেয়ে উঠ্‌চে। দুটোই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। মানুষের স্বাধীনবুদ্ধিকে জোর করে মেরে তার উপকার কর যায় এ সব কথা সুস্থচিত্ত লোকে মনে ভাবতেই পারে না। পেটের জ্বালা বাড়লে তখনই যত দুর্ব্বুদ্ধি মানুষকে পেয়ে বসে। বল্‌শেভিজ্‌ম্ ভারতে ছড়াবে বলে আশঙ্কা হয়—কেননা অন্নকষ্ট অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে— মরণদশা যখন ঘনিয়ে আসে তখন এর যমের দূত হয়ে দেখা দেয়। মানুষের পক্ষে মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর তা দেখলে শরীর শিউরে ওঠে—মারের প্রতিযোগিতায় কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে সেই চেষ্টায় আজ সমস্ত পৃথিবী কোমর বেঁধেচে—মানুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই মানুষ কেবলি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌চে—এর আর শেষ নেই—খুনোখুনির ঘূর্ণিপাক চল্‌ল।

আর যাই করিস্ এই সব মানুষখেগো দলের সঙ্গে খবরদার মিশিস্ নে। য়ুরোপ আজ নিজের মহত্ত্বকে সব দিকেই প্রতিবা

করতে বসেচে। আমাদের দেশের লোক—বিশেষ বাঙালী—আর কিছু না পারুক, নকল করতে পারে—তাদের অনেকে আজ য়ুরোপের ব্যামোর নকল করতে লেগেচে। এই নকল মড়কের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলিস্। নিশ্চয় তোদের ওখানে এই সমস্ত দানোয়-পাওয়া ভারতবাসী অনেক আছে, তাদের কাছে ভিড়িস্ নে, আপনমনে কাজ করে যাস্।

বেহালা শেখা সম্বন্ধে আমারো উৎসাহ নেই। কিন্তু চেলো যন্ত্রটা আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় আমাদের দিশি সুর ওতে জমে ভালো। কিন্তু তুই যা বলেছিস্ সে কথা সত্যি—এ সব যন্ত্র শিখ্‌তে এত সময় দরকার যে অন্য সমস্ত শেখা চাপা পড়ে যায়। এখন এ সব থাক্। কিন্তু ডিজাইনে হাতপাকানো তোর নিজের কাজেই খুব দরকার। এখানে ফিরে এসে ওটাতে হাত দিতে পারবি।

এখানে বর্ষা চল্‌চে। চারদিক সবুজ হয়ে উঠেচে। দার্জ্জিলিঙে কিছুদিন কাটিয়ে এসে এখানে ভালোই লাগ্‌চে। এখানকার খবর নিশ্চয়ই সব পাস্। ইতি ৩১শে জুলাই ১৯৩১

দাদামশায়

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

কল্যাণীয়েষু

নীতু, নিজে খোঁজ করে চেষ্টা করে নিজের সুযোগ বের করচিস শুনে খুব খুসি হলুম। …… ম্যুনিকে তোর ব্যবস্থা করে দেবেন শুনেই আমি তোকে ম্যুনিকের কথা বলেছিলুম এখন বুঝতে পারচি তিনি বিশেষ কিছু জানেন না এবং তাঁর যে কোনো influence আছে তাও নয়। Mainz ছোট সহর বলেই মোটের উপর তোর কাজ শেখার সুবিধা হবে এবং লোকজনদের সঙ্গে আত্মীয়তা হতে পারবে।

পৃথিবীতে আজ সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের দশা আমাদের দেশেও তাই, বরঞ্চ বেশি। এই দারিদ্র্য বহুকাল থেকেই আছে, আজ আরো বেড়েচে। উত্তরবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে বন্যা হয়ে কত শত গ্রাম ভেসে গেছে। তাদের সাহায্যের জন্যে টাকা তুলতে হবে বলে কলকাতায় একটা অভিনয় করবার কথা হচ্চে—তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি।……

আমাদের এখানে ভাদ্রমাস, মাঝে মাঝে প্রায়ই বৃষ্টি চল্‌চে— মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। এই বৃষ্টিটা কেটে গেলেই শরৎকালের চেহারা বেরোবে, শিউলির গন্ধে আকাশ ভরে উঠবে। আমি এইখানেই শরৎকালটা উপভোগ করব স্থির করেচি।

এখানকার সব খবর নিশ্চয়ই তুই মায়ের কাছ থেকে পাস। শ্রীমতী কিছুদিন থেকে তাঁর কাছে আছে বলে বোধ হয় মীরা চিঠিপত্র লিখতে সময় পায় না। কেননা তোর cable থেকে জানলুম মাঝে অনেকদিন চিঠি পাস্‌নি। পোলিটিকাল্‌ সন্দেহ বশত এখানকার ডাকঘরের উপর ভরসা করা যায় না। আমাদের অনেক চিঠিই প্রায় দেরি হয়, এমন কি খোওয়া যায়। চিঠি পেতে দেরি হলে উদ্বিগ্ন হোস্‌নে। ইতি ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

দাদামশায়

[৭] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এই সঙ্গে World Goethe Honouring দলকে চিঠি লিখে দিলুম। জর্ম্মানীতে Art magazine যা বেরোয় তারই দুই একটার গ্রাহক হতে চাই কত দাম লাগে জানালে টাকা পাঠিয়ে দেব। কাল এখানকার বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হবে। তোর মামা মামী পুপু সব দার্জ্জিলিঙে। ······খুব গরম চলচে। মনে করচি আমিও দার্জ্জিলিং যাব। তোর মা নড়তে চায় না--- যদি রাজি হয় তাকেও নিয়ে যাবো। যারা তোর সহায়তা/করচে তাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাস। ইতি ১২ অক্টোবর ১৩৩৮ [১৯৩১]

দাদামশায়

[৮]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

নীতু, পারস্যে বেড়াতে গিয়েছিলুম সে কথা নিশ্চয় শুনেছিস। বেশ লাগল। তারপরে এই সেদিন ফিরে এসে খবর পেলুম তোর কাশি হয়েচে। নিশ্চয় শীতের সময় ঠিকমতো শরীরের যত্ন নিস্ নি। এখন অনেকটা ভাল আছিস্ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। যদি তুই ইচ্ছে করিস তাহলে আমরা কারো সঙ্গে তোর মাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। লিখে জানাস্।

এখানে মাঝে অসহ্য গরম পড়ে এতদিনে মন্‌সুনের আবির্ভাব হয়েছে। এইবার বৃষ্টির পালা চল্‌বে। চার দিক সবুজ হয়ে উঠেচে। এবার দেশে আম হয়েছে বিস্তর। দেশ যে রকম গরীব হয়ে গেচে তাতে আম খেয়ে মানুষ বাঁচবে।

এখন য়ুরোপে গরমি কাল—অর্থাৎ আমাদের দেশের বসন্তের মতো। পারস্যে ছিলুম এপ্রেল মে দুই মাস। গরম পাই নি। প্রায় আমাদের এখানকার শীতের মতো। তার কারণ ওদের দেশটা সমুদ্রের উপর থেকে চার পাঁচ হাজার ফিট উঁচু, আমাদের দেশের কার্সিয়ঙের মতো।

যা হোক শীঘ্‌ঘির সেরে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে যাস তাহলে শরীরে বল পাবি।

বুড়ি এখানে আছে— ভালোই আছে। ২১ জুন ১৯৩২

দাদামশায়

[৯] ওঁ জোড়াসাঁকো

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

নীতু, এই চিঠি তোর মায়ের হাতে দিচ্চি। তুই অনেকটা ভালো আছিস শোনা গেল— এইবার তোর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যাবি। হাওয়া বদলের জন্যে কোথায় তোকে নিয়ে যাবে এখনো খবর পাই নি। নিশ্চয় খুব সুন্দর জায়গা হবে, তোর লাইপজিকের চেয়ে অনেক ভালো। আমার যেতে ইচ্ছে করচে কিন্তু কাজকর্ম্ম ফেলে যাবার যো নেই। এর পরে আসচে বছরে কোনো এক সময়ে হয় তো দেখবি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হয়ে এল— কিন্তু বর্ষাকাল এখনো তেমন ভালো করে আসে নি— মেঘ করে কিন্তু বর্ষণ হয় না। যদি সমুদ্রেও বর্ষার উৎপাত না আসে তা হলে তোর মার পক্ষে ভালো। যাই হোক্ যখন এই চিঠি পাবি তখন তো সমুদ্রের পালা শেষ হয়ে গেছে।

আজ সন্ধেবেলায় তোর মা যাচ্চে বোম্বাইয়ে জাহাজ ধরবার জন্যে। আমরা কাল চলে যাব শান্তিনিকেতনে।

আমার দুই একটা বই তোকে পড়বার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম। এতদিনে জর্ম্মানের চাপে বাংলা ভাষা যদি না ভুলে গিয়ে থাকিস তাহলে যখন খুসি একটু আধটু করে পড়িস—কিন্তু কবিতা লেখবার চেষ্টা করিস নে। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩২

দাদামশায়

দৌহিত্রী শ্রীনন্দিতা দেবীকে লিখিত

[১]

[শান্তিনিকেতন
অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৪১]

কল্যাণীয়াসু

বুড়ি, তোরা সাতই পৌষে এখানে আসবি এটা নিশ্চিত ধরেই রেখেছিলেম। তখন ক্রিস্টমাসের ছুটি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ছুটিতে মনকে ও দেহকে যে আনন্দ ও বিশ্রাম দেয় সেটা কাজের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। যারা ফললোভী তারা মনে করে মনকে নিরবচ্ছিন্ন পীড়া দিয়ে যতই খাটানো যাবে ততই বেশী ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু মন তো জাঁতাকল নয় যে তাকে যতই ঘোরানো যাবে ততই তার থেকে আটা বের হবে। মাঝে মাঝে তার বিশ্রাম ও খুসির দরকার। যাই হোক ৭ই পৌষের পর হয়তো ক্রিস্টমাস কিম্বা তার পর দিনে আমি কলকাতায় যাব তখন তোদের সঙ্গে দেখা হবে। ২৬শে তারিখে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনীতে আমার কাজ আছে। তুই যদি বাংলায় কবিতা লিখে কিছুদিন প্রবাসীতে ছাপাতিস্ তাহলে তোকে সভাপত্নী করে দিতুম।

তোর জন্যে এক ঝুড়ি কাশীর আমলকি পাঠিয়েছি। পেয়েছিস তো? তোর পক্ষে ও জিনিষটা ভালো। সকালে উঠে গোটা আষ্টেক চিবিয়ে খেয়ে এক গ্লাস জল খাওয়া হচ্ছে

বিধি। পরীক্ষা করে দেখিস্। ফল না হলে ফলের সংখ্যা বাড়াস।

শীত রীতিমত জমেচে। পিঠের উপর মোটা কাপড়ের বোঝা বেড়ে উঠচে। ধোবার গাধার যে কি দুঃখ তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ইতি

দাদামশায়

[২] [শান্তিনিকেতন]

বৃন্দা

কবিতা লেখবার মতো মনের ভাব নেই— সে আশা কোরো না।

এইমাত্র ক্রিম দিয়ে গুলে চা খেয়ে এসে বসেছি। স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, ঘরের পর্দ্দা উড়চে, বাগানের গাছে পালায় দোলাদুলি। প্রাতঃকালে বসন্ত ঋতুরাজের মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, ক্রমশই তার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

সমুদ্রে তোমার কী রকম অবস্থা হয়েছিল সেটা শোনবার জন্যে কৌতূহল হচ্চে। যা কিছু আহার করেচ তাকে ধারণ করতে পেরেচ কিনা জানতে চাই।— রেল রথ থেকে তোমার শেষ খবর যা জান্‌তে পেরেছি তার থেকে বোঝা গেল তুমি Sugar of Milk খাচ্চ এবং কোনই ফল পাচ্চ না। গীতা বলেচেন কাজ করে যাবে কিন্তু ফলের লোভ করবে না— তুমিও তদনুসারে চলচ, কেবলি খেয়ে চলেচ সুগার অফ মিল্ক, কিন্তু ফলের অপেক্ষা করচ না, শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলল কিনা জানতে উৎসুক আছি।

এখানে নতুন সংবাদ কিছুই নেই— গাছ পালায় নতুন পাতা ধরচে— আমি এসেছি কোণার্ক ত্যাগ করে উদয়নের নতুন

বাসায়, বনমালীর রক্ত আমাশা হয়েছিল, খাবার টেবিলে কিছুদিন তার মুখ দেখতে না পেয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলুম। আজ থেকে আবার তার আবির্ভাব হয়েছে, তুই বেশি চিন্তিত হোস নে, আমি চিঠিতে মাঝে মাঝে তার সংবাদ পাঠাব। তোর মা এখনো কলকাতায় আছে। তার কারণ সেখানে ভালোই আছে। ইতি ২৭।৩।৩৫

দাদামশায়

[৩]

* Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal

মেম সাহেব

আজ পয়লা বৈশাখে তোর চিঠিতে তোর কুশলসংবাদ শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। এখন কেবল পরীক্ষায় তোর ফেল হবার সংবাদের অপেক্ষা করচি— নইলে আমার মতো ইস্কুল-পালানো পরীক্ষা-এড়ানো ছেলে তোর কাছে যে মাথা তুলতে পারবে না। ঠিক এখন কোথায় আছিস জানি নে— হয় তো আন্দ্রেদের বাড়িতে দক্ষিণ ফ্রান্সে। বোধ হয় রথী একলাই যাবে লণ্ডনে।

আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমবাগানে নববর্ষের নাচ গান হবে। আমি দুই একটা কবিতা আবৃত্তি করব। শুক্লপক্ষের নবমীর চাঁদ উঠবে আকাশে। লোভ হচ্চে না শুনে?

এবার মাঝে মাঝে বৃষ্টিবাদল হয়েছে— মোটের উপর গরম বেশি নেই— হয় তো এখানেই আমার ছুটি কাটবে। যদি জ্যৈষ্ঠ মাসটা অসহ্য হয়ে ওঠে তাহলে তোমার চিত্তবেদনা সত্ত্বেও আমি মৈত্রেয়ীর ওখানে নিশ্চয়ই যাব।

আমার মাটির ঘরের চেহারা দেখলে আশ্চর্য্য হতিস্। দেশে বিদেশে ওর খ্যাতি রটে গেছে। ভেবেছিলেম মাটির ঘরে নিরালায় থাকব— ঠিক তার উল্টো হবে— আমাকে দেখবার

চেয়ে মাটির ঘর দেখবার জন্যে ভিড় জমবে— ফলটা আমার পক্ষে সমানই হবে।

তোর মা এবার তার মামার দেশে ভ্রমণ শেষ করে সেখানকার পানাপুকুরের ধারের আস্‌সেওড়ার বন থেকে সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে এসেছে। মামার বাড়ির জন্যে খুব যে বেশি মন কেমন করচে তার কোনো লক্ষণ দেখচি নে।

পূর্ণিমার হাম হয়েছিল। সেরে উঠচে। আমার এখনো হয়নি। আর সব খবর ভালো। নব বর্ষের আশীর্ব্বাদ। ইতি
১ বৈশাখ ১৩৪২

দাদামশায়

৪। ওঁ [চন্দননগর]

মেম সাহেব

একটা সুখবর আছে। ফাঁকি দিয়ে শুনে নিবি, দূর থেকে কিছু প্রতিদান পাবার প্রত্যাশা করতে পারব না। গত কল্য অপরাহ্ণে চারু ভট্টাচার্য্যের কাছে থেকে একটা চিরকুট এসে পৌঁছল তাতে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্স্ট ডিবিশনে ম্যাট্রিক পাস করে তার মাতামহের লোকবিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার সেই পরীক্ষা খেয়ার কর্ণধার মুদ্রিতচক্ষু মাস্টার মশায়ের জয়জয়কার। এত বড়ো দুঃসাধ্য কাজ করতে পারে যে অধমতারণ, এই রজত জুবিলি উপলক্ষ্যে তার একটা বড়ো পদবী পাওয়া উচিত ছিল। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—মনে করচি তার শরণাগত হব, অন্তত ম্যাট্রিকটাও কোনো মতে যদি তরে যেতে পারি।

জাপানে নাচের দলবল নিয়ে যাবার একটা কথা উঠেছিল কিন্তু তোরা কেউ কোথাও নেই, এবং অত বড়ো অধ্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হবার মতো উপকরণেরও অভাব তাই সুরেন লিখে দিয়েছে এবার সেপ্টেম্বরে না গিয়ে আমরা তার পরবর্ত্তী এপ্রেল মে মাসের জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। জানিনে কি রকম জবাব পাওয়া যাবে। ওরা যদি রাজি হয় তাহলে এখন থেকে উপযুক্ত

গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে জোগাড় করে অভ্যেস করানো যেতে পারে। কেউ কেউ আমাদের পরামর্শ দিচ্চে য়ুরোপে চেষ্টা করতে। অনেকের বিশ্বাস ফল পাওয়া যাবে, বিশেষত আমি যদি সঙ্গে থাকি। আমি ভীতু মানুষ এ সমস্ত দুঃসাহসিক দায়িত্ব নেবার মতো আমার বুকের পাটা নেই। তোরা এতদিনে নিশ্চয় ডার্টিংটন হলে গিয়ে উঠেছিস্। জায়গাটা ভালোই। ওখানে বোধ হয় ওরা তোর নাচ দেখবার ফরমাস করবে— চীনের মেয়েদের চেয়ে ভালো নাচা চাই। কিন্তু বোধ হচ্চে ওদের পুরুষরাই মেয়ে সেজে নাচে সেই জন্যেই ওদের নাচ এত আশ্চর্য্য ভালো হয়। তোমার কর্ম্ম নয় ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া।— উঃ ছেলেমেয়েগুলো কী বিষম চেঁচাচ্চে— একটা ভাঙা ঘাট সেইখানে ওরা নাইতে এসেচে— নাওয়া আর শেষ হয় না। এখানে আর সব ভালো, হাওয়া দিচ্চে খুব মিষ্টি— ভাঙা ঘাটের ফাটলের মধ্যে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা বট গাছ উঠেছে, বোটটা ঠাণ্ডা থাকে তারি ছায়ায়। ডাঙাটা খুব জঙ্গল, যাতায়াতের পক্ষে সুবিধে নয় কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগে। ইতি ২২ মে ১৯৩৫

দাদামশায়

বৃদ্ধা

নিশিবাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র যখন এলো তখন আমি বিশেষভাবেই অসুস্থ ছিলুম। সেই অবস্থায় সেই চিঠির কী দশা হোলো মনেই নেই। সেদিন তাঁকে বরবধূকে নিয়ে এখানে আসতে নিমন্ত্রণ করেছি। প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ করতে পারব।

অপর্ণার পার্ট অভিনয় করতে তোর ভাবনা কী। যেমন করে করবি তাই ভালো হবে। যদি কেউ নিন্দা করে তুই আমার দোহাই দিয়ে বলিস্ দাদামশায়ের বই আমি যেমন খুসি অভিনয় করব— তোমরা বলবার কে!

এখানে বৃষ্টিতে গুমটে পর্য্যায়ক্রমে দিন চলে যাচ্চে। ভাদ্র মাসে ধরণীকে বাষ্পস্নানে ঘামিয়ে দেওয়া হয় সেই পালা চলচে আমাদেরও সর্ব্বাঙ্গ অশ্রুপ্লাবিত।

এলাহাবাদের Conference-এর সময় আমাদের এখানে ছুটির পূর্ব্বেকার উৎসব চলবে। শারদোৎসবের রিহার্সাল দিচ্চি— ছেড়ে কারো যাবার জো নেই। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। এখানে বা অন্যত্র আমাদের যে নাচ হয় তার আনুষঙ্গিক আলো ও শোভাশয্যায় তাকে সম্পূর্ণতা দেয়। বেনারসে আমি সঙ্গীত সম্মেলনের যে ব্যাপার দেখেছি সেই

বারোয়ারির হট্টগোলের মধ্যে আমাদের নাচ নিতান্ত অনুজ্জ্বল হয়ে পড়বে। ওতে লোকের ধারণা যথেষ্ট ভালো হবে না। মনে রাখিস মাঝে মাঝে নাচ দেখিয়ে আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে নাচলে এ নাচের মূল্য কমে যাবে। ওখানে দক্ষিণভারত প্রভৃতি জায়গা থেকে পেশাদার নাচিয়ে সব আসবে তাদের মধ্যে এদের নাচিয়ে আনার ব্যাপারে খুবই বিপদের আশঙ্কা এবং লজ্জার কারণ আছে। এ সব জায়গায় শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নিজেদের exhibit করানো ভালো নয়। আমাদের এখানকার exclusiveness কে বজায় রাখা খুব দরকার।

তোদের পাড়ায় যে মেয়ে ভুল সুরে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গায়— তাকে সুর শিখিয়ে দিয়ে আসিস্, বেতন দাবী করিস নে। বলিস নিজেরই কানের দুঃখমোচনের জন্যে এই দায়িত্ব নিতে হোলো। ইতি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

নিশিবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলিস্ আমার শরীরের বর্ত্তমান জীর্ণ অবস্থায় যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন কর্ত্তব্যের স্খলন হয়— তিনি যেন ক্ষমা করেন। তাঁর ৭৫ বছর বয়সে যখন তোর বিয়ের নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে পাঠাব তখন শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর যদি উত্তর দিতে ত্রুটি হয় আমিও তাঁকে ক্ষমা করব।

[৬] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

বৃদ্ধা

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এখানে কাজ—তার পূর্ব্বে তো কারো নড়বার জো নেই। সেই কথা তোর দিদিকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি। তা ছাড়া প্রধান আপত্তি এই এখানকার নাচকে অমন করে publicity দিতে আমরা নারাজ। হয় তো আর কিছুকাল পরেই পশ্চিম অঞ্চলে নাচের দল পাঠাতে হবে। তখন হয় তো বা এলাহাবাদেও এরা যেতে পারে। নূতনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আমাদের দায় খুব বেশি, দেশের লোকের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য পেতেও প্রাণ বেরিয়ে যায়—এইজন্যে নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে তার দাম কমিয়ে দিতে পারি নে। আমার মতো অসহায়ের প্রতি করুণা করে এ কথা সকলের বোঝা উচিত। কোনোমতে দেশের লোকের সাহায্য পাব না, অতএব নিজেদের উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত রাখতে হবে, নইলে চল্‌বে কী করে। ছেলেমানুষের মতো বুদ্ধি নিয়ে এ সব কথা যদি না বুঝিস্ তাহলে তোর বৃদ্ধা উপাধি সার্থক হবে কী করে। ব্যস্ত আছি। শারদোৎসবের উৎসব চলচে—তার উপরে কাল গ্রামের মেয়েদের জন্যে মেয়েরা বশীকরণ করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতি ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

[৮] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

বৃদ্ধা, তোর চেয়েও আমার বয়স বেশী হয়েছে এই কথাটার প্রমাণ প্রতিদিন পাচ্চি। কাজকর্ম্মে মন নেই, কলমও চলতে চায় না। চিঠিপত্র প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। কেদারাটা শরীরেরই একটা অংশের মতো হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ হয়ে থাকি শ্যামলীতে দর্শনপ্রার্থীর দল আসা যাওয়া করে— মাটির বাড়ী দেখে, আর দেখে যায় এই মাটির মানুষটিকে। ছুটি চলচে, ছাত্রীরা বেণী দুলিয়ে অটোগ্রাফ নিতে আসে না— বিদেশী ডাক এলে স্ট্যাম্পের কাঙালরাও ভিড় করে না। ইতিমধ্যে দিন কয়েকের জন্যে পারুল আর তার ছোটো বোন এসেছিল— তারা আমার বরানগরবাসিনী নূতন নাৎনী। তারা বুড়ি নয় সেই জন্যে নূতন আগ্রহের সঙ্গে সেবাযত্ন করে। প্রধান খবরের মধ্যে ডাকাতির খবর। এতদিনে সেটা বোধ হয় তোদের কাছে পুরোণো হয়ে গেছে— আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে··· এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল প্রমাণ পাওয়াতে তারা থানায় চালান হয়ে গেছে।

সুনীতের অসুখের খবরে মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এলোপ্যাথিতে টাইফয়েডের ওষুধ নেই বল্লেই হয়— ওরা গোড়া

থেকে হোমিওপ্যাথি দেখালে কখনো বাড়াবাড়ি হত না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সুনীত এখন কেমন আছে খবর দিস্। ঈষৎ শীত পড়তে আরম্ভ করেছে— শিউলি আর মধুমঞ্জরীর গন্ধে ভরে গেছে আমাদের এই পাড়া। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

দাদামশায়

বৃদ্ধা

সুরঙ্গমার part তত শক্ত নয়, সেটা তোকে শিখিয়ে নিতে পারব। ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিস। এখানে দুই একটি মেয়ে নিয়ে চেষ্টা করা গেল— যাকে বলে মিজারেব্ল্ ফেলিয়োর। তোকে নিয়ে কিছু দিন উঠে পড়ে লাগলে হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। ভালো মুস্কিলে পড়েচি। কতবার ভেবেছি আমি নিজেই সাজব সুরঙ্গমা— এ প্রস্তাবে অন্যেরা রাজি হচ্চে না— সবাই বল্‌চে আমার শরীর ভালো নয় অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না, নতুবা খুবই ভালো হোত।

কুইনীর চিঠি পেয়েছি, সে বলচে ডিসেম্বরের গোড়ায় তারা শিলঙ হয়ে সিলিটে ফিরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় আসবে। অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের অভিনয় সেই সময়ে তারা দর্শকের পার্ট নেবে। ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ায় এসে যদি সে ধরা দেয়, তাহলেও সময় পাওয়া শক্ত হবে।

বহুকষ্টে অমিতাকে সুদর্শনার পালায় নামাতে পেরেছি। শেষ পর্য্যন্ত টিঁক্‌লে হয়।

আমার শরীর কী রকম আছে তা নির্ণয় করবার সময়ই পাচ্চিনে। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় কটিদেশে নীলিম রশ্মি প্রক্ষেপ

করে থাকি, আশা করি মেরুদণ্ড মজবুৎ হয়ে উঠবে। যখন তুই এখানে আসবি এই রশ্মি তোর মাথায় লাগাব, হয় তো মস্তিষ্কে একটু আলো ঘোর অন্ধকার ভেদ করে প্রবেশ করতেও পারে—নিশ্চয় বলা যায় না। সমস্ত দিন রিহার্সল দেওয়াচ্চি— অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা চলচে। পরিণামে কী হবে বলা যায় না। ইতি ২৩ নবেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

[৯]

* Gauripur Lodge
Kalimpong.

বুড়ি

মালঞ্চে আছিস, না, মরুভূমির পথে চলেছিস আন্দাজ করতে পারচিনে। তবু বৃটিশ গবর্মেণ্টের কৃপায় চার পয়সা মজুরি দিয়ে ডাক পেয়াদাকে দৌড় করাব তোদের পিছনে পিছনে আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ নিয়ে— তরুতলেই হোক, মরুতলেই হোক ধরবেই তোদের—

'যায় যদি যাক্ সাগরতীরে
পাবেই দেখা পেয়াদাটিরে।'

তোকে চিঠি লিখতে গেলেই জানিনে কেন কোথা থেকে তাতে একটু না একটু কবিতার ছিটে লাগে। সময় থাকলে দুটো লাইনকে আরো লম্বা করতে পারতুম কিন্তু ইংরেজিতে বলে, স্বল্পতাই হচ্চে রসের আত্মা।

একবার লক্ষ্ণৌএ রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে পাহাড়ী শান্তিনিকেতনের পরামর্শে যাবার কথা আছে কৃষ্ণ ভোলে নি তো। কাল এখানে লোক ছিল অল্প, জমেছিল বেশি।

রেডিয়োতে আমার আবৃত্তি শুনেছিলি তো ?

জায়গাটা মন্দ লাগচে না

তোদের যুগলকে আমার আশীর্বাদ। এই উপলক্ষ্যে চকোলেট কিনে খাস্ দাম পরে দেবো, যদি মনে থাকে। ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

দাদামশায়

[১০] [মংপু]

কল্যাণীয়াসু,

নকল নাৎনিরা যদি আমাকে ঘিরে দাঁড়ায় সেটাতে তাদেরি রুচি প্রকাশ পায়। তারা নকল হতে পারে কিন্তু খাঁটি জিনিষের আদর তারা বোঝে— আর আসল নাৎনিরা এত বেশি নিশ্চিত স্বত্বের দাবী নিয়ে নিশ্চিন্ত যে উদাসীন বললেই হয়—সেই জন্যেই তো যে সে ঢুকে পড়ে ভাণ্ডারে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। সাবধান হয় সেই মানুষ যে দামী রত্নের দাম বোঝে।

কাশ্মীরে আছিস শুনে লোভ হচ্চে। দেহটা অচল হয়েছে নইলে একবার দৌড় মেরে তোদের খবর নিয়ে আসতুম। এ জীবনে আপন খুশির পথে চলাফেরা আমার বন্ধ, পরের স্বাধীনতা পদে পদে হরণ করে তবে আমাকে চলতে হয়— এ নিয়ে অসুবিধে ঘটলে পরকে দোষ দিতে লজ্জা করি। আমার সমস্যা হচ্চে এই, এ অবস্থায় তোমার একটি নতুন মাতামহী সংগ্রহের বয়স যদি থাকত তা হলে সংগ্রহের প্রয়োজনই থাকত না। তা ছাড়া এ বয়সে জীর্ণ পাকযন্ত্রে মাতামহী পদার্থটা বদহজমী— সাহস হয় না। সাহস হয় না আরও কারণ আছে সে সব কথা তোর কাছে তুলতে ভয় করি।

মংপুর জীবনযাত্রা কাশ্মীরের তুলনায় সঙ্কীর্ণ, পাহাড়গুলোর আভিজাত্য নেই— মাথায় নেই তুষারকিরীট— যে পাগড়িটা পরে সেটা ঘোলা রঙের মেঘের। চারিদিকটা অত্যন্ত বদ্ধ। আমি ভালোবাসি খোলা আকাশ,— এখানে আকাশে পাহারা বসে গেছে। এতদিনে পালাতুম কিন্তু ওদিকে খবর আসচে সমভূতলে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতাপ অসহ্য। কাল সুধাকান্তর চিঠিতে খবর পাওয়া গেল চিঠি লেখা দুঃসাধ্য কেননা লিখতে গেলে ঘামতে ঘামতে আঙুলগুলো ক্ষয়ে কিছুই বাকি থাকে না। প্রায় তো শেষ হয়ে এলো জ্যৈষ্ঠমাস— মনে মনে ভাবচি আষাঢ় পড়লেই নব বারিধারার সঙ্গে সঙ্গেই নেবে পড়ব নিম্নভূতলে, কোনো বাধা মানব না।

এ চিঠি তোরা পাবি কি না জানি নে নিতান্ত যদি না পাস দেখা হবে সশরীরে মালঞ্চে। তখন আকাশে দেখা দেবে শ্যামল মেঘ, আর নিকুঞ্জগৃহে শ্যামলবরণী— চোখ জুড়িয়ে যাবে।

এখানে আলু আর অনিল আমার সহচর। ওদের পেট ভরে ভোজন এবং পেট ভরে বিশ্রাম। এখানকার মেঘাচ্ছন্ন পাহাড়ের মতো ওরা তন্দ্রাবিষ্ট। কর্মের তাগিদে অনিলকে যেতে হবে বাইশে কিম্বা পঁচিশে— আমাকেও একটা জরুরী কর্মের অছিলা জোগাড় করতে হবে। কারণ আমার "মন বলে যাই যাই যাই গো"। জানিস্ তো বাবু changes his mind। কথা ছিল রথী এসে আমাকে কালিম্পঙে নিয়ে যাবে। সে তো নলকূপের নলকে গভীর থেকে গভীরতরে নিয়ে চলেছে— আর বউমা চড়ে

বসে আছেন কুমায়ুন গিরিশিখরে— আমি নিঃসহায়। চুপচাপ বসে অন্তর্ধানের চিন্তায় আছি। এ সম্বন্ধে একটা কথার আভাস দিলেই হাজারটা কথার উৎপত্তি হবে— ভালমানুষের মত নিঃশব্দে মনের মধ্যে পাঁচ কষচি।

মৃণালিনী আদর করে আমাকে যে চাদর পাঠিয়েছিল সেটা যথাসময়ে পেয়েছি। সিঙ্গাপুরে ওদের অভ্যর্থনা সভার খবর পেয়েছি— এখনো জাভায় পৌঁছসংবাদ পাই নি। নটরাজ পথিমধ্যে রেঙ্গুনে খুব ধুমধাম করেছে। ভদ্রলোক আস্ত ফিরলে হয়।

এ জায়গায় খবরের খুবই অভাব। সম্প্রতি খুব একটা বড়ো খবরের উদ্ভব হয়েছে—নলিনীরঞ্জনের কাল এখানে আগমন—আজ সকালে এখনি তাঁর তিরোভাব। আমার যাওয়া আসা যদি এ রকম অবাধ হোত তা হলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতুম। ওখানে তোরা পলিটিক্স্ নিয়ে আলোচনা করিস্ কি? হতভাগা বাংলাদেশে আলোচনার অভাব নেই; সমাধানেরই অভাব। ইতি ১১।৬।৩৯

দাদামশাই

পৌত্রী শ্রীনন্দিনী দেবীকে লিখিত

তৃতীয়া[১]

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কা'কে ?
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
বসন্ত তার দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান ;
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে পালিয়ে সে যায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক্, অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মাণিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলা,
হৃদয়টি ওর হোক্ না কঠোর, মিষ্টি ত ওর গলা ॥

আলো যেমন চম্‌কে বেড়ায় আম্‌লকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে এসে বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন বছরের দোল।
তবু, ক্ষণিক রঙ্গ-ভরে হৃদয় করি' লুট
নাচের পালা ভঙ্গ করে' কোন্‌খানে দেয় ছুট।

---

[১] পূরবীতে প্রকাশিত কবিতার পাঠান্তর। শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর উদ্দেশে লেখা।

আমি ভাবি, এইবা কি কম, প্রাণে ত ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হোক্ আমার ত মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলেম, মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা ত আছে॥

বন্দী হ'তে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে
শরৎ প্রভাত দিয়েছে ওর সর্ব্ব দেহে মেলে'
শিউলি ফুলের তিন বছরের পরশখানি ঢেলে'।
বুঝতে নারি তবু কেন আমার বেলায় ফাঁকি
ভরা নদীর জোয়ার জলে কলস ভরে না কি ?
তবু ভাবি, বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা, তার ত আছে দাম।
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে

কবি বলে' লোকসমাজে আছে আমার ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
যাই হোক মোর কীর্তিকলাপ ওর কাছে নাই মান,
আজ বসেছি তারি দিতে উচিত প্রতিদান।

কেমন যে ওর মনের গতিক জানবে বিশ্বজনে,
এই কবিতা বুঝবে যখন লাগ্‌বে সরম মনে।
ওর আছে এক বাঁদর ছানা, আর আছে এক পুসি,
ঝগ্‌ড়ু বোকার সঙ্গ পেলে হয় কি বিষম খুসি।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি'॥

বয়স হলে ইচ্ছা হবে আকাশ পানে চেয়ে,
আবার হতে কবির প্রিয়া, তিন বছরের মেয়ে।
ইচ্ছা হবে, কালো তাহার তরল চাহনীতে
শ্রাবণ মেঘের তিন বছরের সজল ছায়া নিতে।
ইচ্ছা হবে ছন্দে আমার গড়তে নাচের ছাঁদ,
জলের ঢেউয়ের তালে যেমন দোলায় ছায়ার চাঁদ।
সাঁওতালিনী, নেপালিনী, সঙ্গী তাহার নানা,
ছাগল বাছুর ভোঁদা কুকুর বাঁদর বেড়ালছানা,
ঝগ্‌ড়ু বোকা, বুড়ো মালী, বজায় রইবে সবে,—
কবির বিশ্বে ছোট বড় সবারি ঠাঁই হবে॥

দাদামশায়

[বুয়েনোস্ এ য়ারিস্
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪]

[১]　　ওঁ　　[পোস্টমার্ক

Paris, 3. V. 1930

পুপুমণি

বাবা লিখেচেন তোমাদের ওখানে বৃষ্টি মেঘ অন্ধকার। আমাদের এখানে রোদ্দুর আছে অনেক— যদি লেফাফায় মুড়ে খানিকটা পাঠিয়ে দিতে পারতুম তো বেশ হত। বাবাকে বোলো কাল এখানে আমার ছবি দেখানো হল— লোকে খুসি হয়েচে— সে অনেক কথা— লিখতে গেলে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে— আঁদ্রে খুব বড়ো করে লিখ্‌বে বলেছে।

আজকাল রোজ রোজ খুব লোকজন আসতে আরম্ভ করেচে। সবাই জানতে পেরেচে আমি এখানে এসেচি। পালাতে যদি পারতুম তো খুসি হতুম। তোমার পুতুলের বাক্সর মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখ্‌লে না কেন? তোমাদের ওখানে যে রকম ঠাণ্ডা তাতে বোধ হয় তোমার পুতুলের সর্দ্দি কাশি আরম্ভ হয়েচে— তাই এই রুমালটা পাঠিয়ে দিলুম।

দাদামশায়

* Geneve
7, Rue de l' Universite

পুপুমণি

দাদা মশায়ের অবস্থা খুব খারাপ। টেবিলে কাগজ পত্র ছড়াছড়ি যাচ্চে, রঙীন কালীর দোয়াতগুলো সমস্ত এলোমেলো ---কলম পেন্সিল কোথায় কি আছে তার ঠিকানা নেই। চষমা চোখে থাকে অথচ খুঁজে বেড়ায়। একটা মস্ত ঝোলা কাপড় পরে থাকে, তাতে লাল রং নীল রং হলদে রঙের দাগ। আঙুলে হাতে রঙের দাগ লেগে থাকে, সেই হাত দিয়ে টেবিলে খেতে যায় লোকেরা দেখে মনে মনে হাসে। রোজ রোজ তার সেই এক ঝোলা কাপড়খানা দেখেও তাদের হাসি পায়। ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠে বসে থাকে তখন আর কেউ ওঠে না। ক্রমে বেলা ছটা বাজে, সাতটা বাজে, আটটা বাজে— তখন আরিয়াম সাহেব শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কাল রাত্তিরে আপনার ঘুম হয়েছিল তো। দাদামশায় বলে, হাঁ, বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল। তার পরে ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে— খবর পায় পাশের ঘরে খাবার এসেচে। গিয়ে দেখতে পায়, একটা ডিম সিদ্ধ, রুটি টোষ্ট, মাখন আর চা। খেয়ে সেই টেবিলে এসে বসে। বসে বসে লেখে।

এণ্ড্রুজ সাহেব মাঝে মাঝে এসে গোলমাল করে যায়। লোকজন দেখা করতে আসে। বেলা দশটা এগারোটা হয়। তখন হঠাৎ মনে পড়ে এইবার স্নান করতে হবে। স্নান করে এসে কেদারায় বসে বিশ্রাম করে। তার পরে লাঞ্চ্। শাক সবজি আলু টোমাটো রুটিমাখন ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরে কিছু বিশ্রাম, কিছু কাজ, কিছু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা। এমনি করে দিন চলে যায়। সাড়ে চারটের সময় চা। সেই সঙ্গে পাঁচজনের সঙ্গে বকাবকি। তারপর আটটা বাজলে খাওয়া। সেই রকম শাক সবজি আলু টোমাটো রুটি মাখন। লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে রাত হয়ে যায়। তার পরে দাদামশায় শুয়ে পড়ে বিছানায়। তার পরে সমস্ত রাত্তির যে কি হয় তা সে জানতেও পারে না। আজ আর সময় নেই। ইতি ২১ অগস্ট ১৯৩০

দাদামশায়

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

৬]　　　　　　ওঁ　　　　　　মস্কৌ

পুপুমণি

আমি কোথায় সে তুমি মনে করতে পারবে না। একটা মস্ত বাড়ি, চমৎকার বাগান, যত দূর চেয়ে দেখা যায় বড় বড় গাছের বন। আকাশে মেঘ করে আছে, খুব শীত, বাতাসে লম্বা লম্বা গাছের মাথা দুল্‌চে। অমিয় বাবু আছেন মস্কৌ সহরে, আরিয়াম গেছেন আর এক জায়গায়, আমার সঙ্গে আছেন ডাক্তার টিম্বার্স। ঘড়ি কাছে নেই কিন্তু বোধ হয় এখন সকাল আটটা হবে। আমি যখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলুম তখন জানলার বাইরে দেখলুম অন্ধকার, আকাশভরা তারা। চুপ করে শুয়ে পড়ে রইলুম। তার পরে যখন অল্প একটু আলো হল বিছানা থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি। প্রথমে বাবাকে একটা বড় চিঠি লিখেচি তার পরে তোমাকে লিখচি। কিন্তু ক্ষিদে পেয়েচে। এখনি হয় তো এখানকার দাসী ডিম রুটি আর চা নিয়ে আসবে। তুমি হয় ত এতক্ষণে জেগেছ, তোমার কোকো খাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে বেড়াতে গেছ কি? কিন্তু তোমাদের ওখানে হয় ত মেঘ করে বৃষ্টি হচ্চে। আজ বিকেলে মোটর গাড়ি চড়ে এখান থেকে আবার মস্কৌ সহরে চলে যাব। সেখানে একটা

হোটেলে আমরা থাকি। এখানকার মতো এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি নয়, আর সেখানে যে খাবার জিনিষ দেয় সেও ভালো নয়। তাই ইচ্ছে করে শান্তিনিকেতনে চলে যাই। এবারে সেখানে ফিরে গিয়ে আর কিছুতেই নড়ব না। কেবল ছবি আঁকব। আর ভোরের বেলা বনমালী গরম কফি আর রুটি টোস্‌ট্‌ নিয়ে আসবে। তারপরে সেই কাঁকর বিছানো বাগানে বেড়াতে যাব, একটা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে। তার পরে— এখন থাক্‌। খাবার এসেছে। কি এসেছে বলি। কফি, রুটি, মাখন মাছের ডিম, দু রকমের চিজ্, ক্রিমের দই আর দুটো ডিম সিদ্ধ। তা ছাড়া, আঙুর, পিয়ার, আপেল। খাবার হয়ে গেলে পর গরম জলে স্নান করে এসে আবার লিখতে বসেচি। এখন মেঘ অনেকখানি কেটে গেচে— রোদ্দুর দেখা দিয়েচে— গাছের ডালগুলো বাতাসে নড়চে আর পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠ্‌চে, আর কত রকমের পাখী ডাক্‌চে তাদের চিনিনে। আজকে আর সময় নেই। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

দাদামশায়

পুপুমণি,

বেশি দেরী কোরো না। এইবার চলে এসো। কেননা পাণ্ডবদের এবার খুব মুস্কিল। বন থেকে ফিরে এল, তেরো মাস কেটে গেল। কিন্তু দুষ্ট দুর্যোধন বল্‌চে কোনোমতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। লড়াই করতে হবে। তাই বলচি তাড়াতাড়ি এসো, নইলে লড়াই বন্ধ হয়ে থাক্‌বে। ভীম তাহলে ছট্‌ফট্‌ করে মরবে— তার গদা দেয়ালের কোণে ঠেসান দিয়ে রেখেচে; সে থেকে থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে বলে উঠচে দুঃশাসনকে একবার পেলে হয়। অর্জ্জুনের ইচ্ছে, আর একটু দেরি না করে কর্ণের বুকে পিঠে তীর মেরে মেরে তিনশোটা ছেঁদা করে দেয়। তুমি এলেই তখনি লড়াই সুরু হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্রে হাজার হাজার তাঁবু পড়ে গেছে— কত হাতি কত ঘোড়া কত রথ তার ঠিক নেই।— ধীরেন কাকা থেকে থেকে পাল্লারামের পেটে ফাউণ্টেন্‌ পেনের খোঁচা মারচে, পাল্লারাম চেঁচিয়ে উঠ্‌চে; দিন্‌ দা থাকলে পাল্লারামের রক্ষা ছিল না। বনমালীর মাথায় সেই টুপিটা নেই, তার বুদ্ধিও অনেকটা কমে গেছে। ২০ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদামশায়

৫]　　ওঁ　　[শান্তিনিকেতন

পুপুদিদি

তুমি যখন দার্জ্জিলিং যেতে লিখেচ তখন নিশ্চয় যাব। কিন্তু মা যদি গরম কাপড় না দেয় তাহলে শীতে মরে যাব। তোমার ওভারকোট আমার গায়ে হবে না। ওদিকে সে[১] এসে আমার বালাপোষখানা গায়ে দিয়ে চলে গেচে। বৃষ্টিতে তার নিজের ছেঁড়া চাদরখানা ভিজে গিয়েছিল সেইটে ফেলে দিয়ে গেচে। বনমালীকে ঐ চাদরটা দিতে চাইলুম সে নিলে না। ওটাকে সরবৎ ছাঁকবার কাজে লাগাব মনে করচি। আমার হলদে রঙের ভালো চটি জোড়াটাও সে নিয়েচে।

ইলিষ মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে এলুম। ইলিষ মাছের ডিম ভাজা ছিল সে বললে আমি খাব। তাকেই দিলুম। তবু তার খিদে ভাঙে না। লাউ দিয়ে বড়ি দিয়ে ঘণ্ট তৈরি হয়েছিল সেটাও খেলে। তারপরে পায়েস খেলে দুবাটি, শেষকালে দুটো আতা। বলে গেল, চা খাবার সময় আসবে, তার জন্যে যেন নিমকি তৈরি থাকে। নিমকির সঙ্গে দই দিয়ে শসার চাটনি খাবে এই তার ফরমাস। ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদামশায়

---

[১] রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

ওঁ

* On Board
Houseboat "Padma"
[চন্দননগর]

পুপুদিদি

তুমি ভীষণ গরমে শুকিয়ে যাচ্চ খবর পেয়েচি তাড়াতাড়ি এখান থেকে দুই এক পসলা ভালো জাতের বৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েচি —পেয়েচ কিনা খবর দেবে। বোধ হয় মাঝে মাঝে আরো কিছু কিছু পাঠাতে পারব অতএব তোমার হংস পরিবারের জন্যে বেশি ভাবনা কোরো না। আমি এখানে নির্বাসনে আছি, শ্যামলী এখনো আমার আসন প্রস্তুত করে নি— যখন সে তৈরি হয়ে ডাক দেবে আমিও দেরি করবনা। হয় তো আরো দু হপ্তাখানেক দেরি হতে পারে। তোমাদের ঘাস তো সব শুকিয়ে গেল সকাল বেলায় হাঁস চরাবার জায়গা পাও কোথায়? প্রথম কিছুদিন বোটে ছিলুম— সামনের ঘাটে লোক জমা হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। লিখচি পড়চি খাচ্চি আঁকচি ঘুমোচ্চি সমস্তই তাদের দৃষ্টির সামনে। বাইরে এসে বসলে তারা নৌকোর পাশে এসে ভিড় করে— লুকিয়ে থাকতে হোত কামরার মধ্যে,— শেষকালে এই খাচার থেকে বেরিয়ে পড়তে হোলো। এখন আছি গঙ্গার ধারে এক বাড়িতে— চারিদিক খোলা, গঙ্গা

একেবারে গা ঘেঁষে চলেচে— আরামে আছি। লোকজনের সমাগম সম্পূর্ণ নেই তা বল্‌তে পারিনে। সদর দরজা বন্ধ করে তাদের কতকটা ঠেকানো যায়। আম এক ঝুড়ি বোধ করি পেয়েচ— কিছু খেয়ো কিছু বিতরণ কোরো। ইলিষ মাছ পাঠাবার চেষ্টায় আছি। ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

দাদামশায়

[৭]

ওঁ

পুপুদিদি

তোমার তিনটে কুকুরের গলা শুনতে না পেয়ে অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকচে। শুনলেম তুমি আরো একটা সংগ্রহ করেচ— আরো পশু সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করো তাহলে শান্তিনিকেতনে মনুষ্য সংখ্যা কমাতে হবে জায়গা হবে কোথায়— তাছাড়া সকালে আমার রুটি তোসের গুঁড়োও পাওয়া যাবে না। এখানে জায়গাটা ভালো— কিন্তু তোমাকে যে নিমন্ত্রণ করব সে সাহস আমার নেই। সোমবার

দাদামশায়

।৮। ওঁ [শান্তিনিকেতন]

পুপুদিদি

তুমি ভয় করেছ তোমার হাঁসগুলো আমার জানলার কাছে চেঁচামেচি করে আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে। এমন সন্দেহ কোরো না। তুমি ছড়ি হাতে ওদের যে রকম সাবধানে মানুষ করেছ অভদ্রতা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ওরা আমাকে যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে থাকে। তা ছাড়া তোমার গাঙুলি মশায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের কর্ম্ম নয়। তোমার সুনন্দা পিসি পূর্ণিমা পিসি প্রায় তোমার হাঁসেদের মতই ভদ্র,— মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কথাবার্ত্তা কয় না। হাঁসেদের চেয়ে এক হিসাবে ভালো— প্রায় কিছু না কিছু মিষ্টি তৈরি করে। খুব চেষ্টা করি খেতে, সব সময়ে পেরে উঠিনে। সেদিন একটা লাড্ডু বানিয়েছিল, ভেবেছিলুম অ্যাবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেব কামানের গোলা করবার জন্যে। কিন্তু সুধাকান্ত বাহাদুরি করে সেটা খেলে, প্রায় তার চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু ঘিয়ের ময়ান দিলে আমিও সাহস করে মুখে দিতে পারতুম—কিন্তু ও বৌমার খরচ বাঁচাচ্চে— তিনি ফিরে এসে দেখবেন ভাঁড়ারে তাঁর ঘিয়ের কিছু লোকসান হয় নি। তোমার বাবা ব্যস্ত

আছেন প্রতিদিন পিকনিক করতে এবং মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না ধরতে। আমি রোজই পিকনিক করি আমার খাবার ঘরটাতে— আর কাউকে যোগ দিতে ডাকি এমন আয়োজন নেই। ইতি ২২।১০।৩৫

দাদামশায়

[২]

ওঁ

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি
কলিকাতা

পুপু দিদি,

যে ছিল মোর ছেলেমানুষ হারিয়ে গেল কোথা,
পথের ভুলে পেরিয়েছিল মরা নদীর সোঁতা।
কোন্ বুড়োমির পাঁচিলে তায় রাখল আড়াল করে,
জড়িয়ে তাকে দিল স্বপন-ঘোরে।

হঠাৎ তোমার জন্মদিনের আঘাত লাগ্‌ল দ্বারে
ডাক দিল সে কোন্ সেকালের ক্ষ্যাপা বালকটারে।
সেই যে ছেলে-আমি
ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে হঠাৎ গেল থামি।

বল্‌লে, শোনো, ওগো কিশোরিকা,
রবীন্দ্রনাথ কুষ্ঠিতে যার লিখা
নামটা সত্য, সত্য শুধু তারিখটা মাত্তর,
তাই বলে তো বয়সটা তার নয়কো ছিয়াত্তর।
কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার জগৎটা তার কাঁচা
বাঁধে নি তায় বিষয়লোভের খাঁচা।
পায় যদি সে আশা
তোমার লীলার আঙিনাতে বাঁধবে সে তার বাসা।

এই ভুবনের ভোর বেলাকার গান
পূর্ণ করে রেখেছে তার প্রাণ,
সেই গানেরই সুর
তোমার নবীন জীবনখানি করবে সুমধুর ॥

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ দাদামশায়

[১০] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

পুপুদিদি

বাপরে কী গরম। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘে ঢাকা, যেন কম্বলঢাকা রুগির মত, আর হাঁপিয়ে ওঠে সমস্ত জগৎটা। পালিয়েছ খুব ভালো করেছ। ইতিপূর্বে কিছুদিন আগে প্রত্যহ ঝড় বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়েছিল— এমন কি, গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসেছিলুম। ভেবে ছিলুম গরমের দিন ফুরোলো। গরম লুকিয়েছিল কোথায় আকাশের কোণে— লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পৃথিবীর উপরে। হঠাৎ এক বার মেঘ জটলা করচে— আশা হচ্চে আর একবার জুড়িয়ে দেবে হাওয়া। কিন্তু বৃষ্টির দুতিন দিন পরেই আকাশের মেজাজ আরো বিগড়িয়ে যায়। আমাদের এই রকম অবস্থা। দাদামশাই।

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

দাদা

তোমার হাঁসের জন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি যেখানে বসে লিখচি তার জানলার সামনে রোজ তারা চরতে আসে, গুণে দেখিনি, কিন্তু দলের বহর দেখে বেশ বোঝা যায় তারা সুস্থ শরীরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করচে— ডানায় তাদের অতগুলো কুইল্ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তারা চিঠি লিখতে পারে না এই দুঃখ জানিয়ে তারা ক্যাঁ ক্যাঁ করে চেঁচায়— তাই তাদের হয়ে আমাকেই লিখতে হয়। কিন্তু তোমার হাঁসের ডিমগুলোর কোনো সাড়াশব্দ নেই--- তাদের খবর বলতে পারব না, এটুকু জানি রান্নাঘরে তাদের গতি হয় নি। কিন্তু তোমার বন্ধু গাঙ্গুলি মশায় হাঁসের ডিমের মতো নয়— তাঁর গলা এখানকার সব আওয়াজ ছাড়িয়ে শোনা যাচ্চে— তাঁকে ডাকাতে ধরে নি একথা নিশ্চয় জেনো। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৩৪৫।[১]

দাদামশাই

[১] ইং ১৯৩৮

[১২] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

দিদিমণি

আর দেরি নয়, ধাঁ করে চলে এস। নিতান্তই যদি গরম না যায় তাহলে গরমটাকে পাখার হাওয়া আর আইস্‌ক্রিম দিয়ে মিশোল করে নিয়ে দুজনে মিলে ভাগ করে নেব। একটু যেন তাপ নেমে আসচে, এবার আকাশের জ্বর ছাড়বে বলে আশা করচি। আজ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসচে বৃষ্টি হওয়ার ভাব দেখা যাচ্চে— বলতে বলতে ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্চি— এক পসলা বৃষ্টি নাম্‌ল বুঝি।

এবারে আমাদের দুঃখের দিন গেচে সন্দেহ নেই— মনটা উড়ত কালিম্পঙের দিকে, কিন্তু এখানে নানা দরকার ছিল— ঘেমেছি আর কাজ করেছি। অল্প কয়েকদিন ছবি আঁকতে পেরেছি— ঐ শোনো শিউলি গাছের পাতায় বৃষ্টি জলের পট্‌পট্ শব্দ। ইতি ৬ কার্তিক ১৩৪৫

দাদামশায়

[১৩] ওঁ মংপু

পুপুদিদি

পাহাড়ের ডগায় ভালো হোটেলে বাস করচ, চারদিকে বন্ধুবান্ধবের দল, বেশ আছ ভালো। এখানে কোণে বসে বসে আমি তোমাদের ঈর্ষা করি। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই বেরিলি স্টেশনের ছবি মনে আসে আর হাত জোড় করে বলি ও মুলুকে আর নয়। এখানে এসে অবধি আমার শরীর ঠিক পূর্ব্বের মতো নেই। কালিম্পঙে ছিলুম ভালো। কিন্তু সেখানে ঘর শূন্য — আমার সহায় কেউ নেই যে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটু অত্যুক্তি করচি— এখানে সেবা যত্নের অভাব নেই ঘর দুয়োরগুলোও ভালো— এখানকার নির্জ্জনতাও প্রায়ই আমার মনকে খুব জড়িয়ে ধরে— একেবারে কবির উপযুক্ত। কিন্তু পাহাড়গুলো বড়ো বেঁটে— দরোয়ানদের মতো কেবল আকাশ আটক করে ধরে পাহারা দিচ্চে। আরো বেশ একটু রাজকীয় চালে মাথা তুলে দাঁড়াত যদি তাহলে গিরিরাজের মহিমা তুষারমুকুট পরে সামনে বিরাজ করত— আর তাই যদি না হোলো বেশ অনেকটা মাথা হেঁট করে ধরণী মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যদি তাঁর দিগন্তকে করত অবারিত তাহলে আমার সমতলবাসী মন খুশি হোত।

জীবনে এমনি প্রচুর খুশি ভোগ করেছি অনেক কাল, যখন ছিলেম শিলাইদহের চরে পদ্মার উদার নির্মল নির্জনতায়। সেই নির্বাক নিস্তব্ধতার বাহুবেষ্টনের জন্যে প্রায়ই মন কেমন করে। কিন্তু কী জানি এখন হয় তো মনেরই বদল হয়ে গেছে— সেই শিলাইদহের সঙ্গে হয় তো আর খাপ খাবে না। এখন বাবু কেবলি changes his mind— কেবলি বাসা বদল করবার মেজাজ তার।— ছুটি ফুরোলে শান্তিনিকেতনে কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজব জানিনে, শ্যামলী না ধবলী না আর কোথাও। কিন্তু বৌমা হয় তো তখনো পাহাড়ে থাকবেন— তাঁর শরীরের পক্ষে হয় ত সেই ভালো। এমন অবস্থায় মনে করচি আমি পালাব গঙ্গাতীরে— কলকাতায়।— খাবার এসেচে— তাগিদ চলচে। ইতি ৭।৬।৩৯

দাদামশাই

[১৪] ওঁ মংপু

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

পুপুদিদি

তোমার চিঠি পড়ে খুব লোভ হচ্চে, বেশ আছ। আমার ভাগ্য ভালো নয়, মংপুতে এলুম, উন্নতি হোলো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি একটু হোলো না, বরঞ্চ খারাপ। পালাতে ইচ্ছে করচে— কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পাহারা দিচ্চে নিচের ভূতলে, সাহস হচ্চে না। একটা খবর ভালো— এবার কার্বলিক এসিড লাগিয়ে কেন্নুই তাড়ানো গিয়েছে। কেদারা আঁকড়ে আছি, দেখচি মেঘ রৌদ্রের খেলা, কাজকর্মে মন নেই— মনে ভাবচি মোটের উপরে শান্তিনিকেতনটা জায়গা ভালো।

দাদামশায়

[১৫] ওঁ মংপু

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি পাহাড়ের খবর নিতে চেয়েছ। অবস্থা ভালোই। প্রথম যখন এসেছিলুম তখন মনে হয়েছিল মংপুটাকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছে। সেটা এখন কেটে গেছে— রোদ্দুর দেখা দিচ্চে— মাঝে মাঝে কুয়াশাও বেরোয়, পকেট থেকে ভিজে রুমালের মতো। বেগ্‌নি পাহাড়ের কাঁধে সাদা মেঘের উত্তরীয় ঝুলচে— ঘন অরণ্য চলে গিয়েছে ঢালু উপত্যকা বেয়ে, সবুজ রঙের প্লাবনের মতো। আমার দিন প্রায় কাটে, খোলা বারান্দায়, আধো জাগা আধো ঘুমোনো অবস্থায়— কাজের তাগিদ দিলে এখনো শরীরটা বেঁকে দাঁড়ায়। মনে করি কিছু লিখব কিন্তু কলমটাকে জাগিয়ে তুলতে পারিনে।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি এখনো ঝাপসা হয় নি— মনটা সেই দিকেই ঝুঁকে আছে। আমি সমভূমির মানুষ— চোখের সামনে চাই অবারিত আকাশ, আর গায়ের উপরে চাই হাল্‌কা কাপড়— মোটা কাপড়ে জবড়জঙ্গ হয়ে পাথরের পাহারায় বন্দী হয়ে থাকতে মন যায় না। ইতি ১৯।৯।৩৯

দাদামশাই

[১৬] ॐ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি তুমি তো দৌড় দিলে বোম্বাই তার পর থেকে একদিনো আমার ছুটি নেই— একটা না একটা কাজের বন্ধন আমাকে বেঁধেছে। সামনে এখনো বাকি আছে অনেকগুলো। মহাত্মাজি এসেছিলেন, কাল চলে গেলেন। অতিথি প্রতিদিনই আসচেন— আজ প্রশান্তর সঙ্গে আসবেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী— কাল আমাকে যেতে হবে সিউড়ি, সেখানে মেলা উদ্ঘাটন করা চাই— সমস্ত দিন যাবে এই কাজে। তার পরে এক সময় যেতে হবে বাঁকুড়ায়— নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে দুটো চারটে দিনরাত্রি যাবে কেটে। এই রকম চলে যাবে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত। তার পরে খুব সম্ভব গরম পড়লে মংপুতে আমাকে টানবেন মৈত্রেয়ী। এখানে শীত চলচেই— ভালো লাগচে না— দিন রাত মোটা মোটা কাপড়ে বন্দী করে রেখেছে, বাইরে বসে বসন্তকাল ভোগ করবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। ওখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলে শুনে ভালো লাগল না। ওখানে তো বায়োকেমিক বড়ি জুটবে না— কুইনীন মিকশ্চার তোমার কপালে আছে।— মহাত্মাজিকে চণ্ডালিকা

দেখানো হোলো, খুশি হয়েছেন। তার পরে এখন থেকে চলবে চিত্রাঙ্গদার রিহার্সাল। ভেবেছিলুম ডাকঘর করব কিন্তু এত বেশি ক্লান্ত যে কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। চণ্ডালিকায় মা সেজেছিল মমতা— খুব ভালো অভিনয় করেছিল। বুড়ি দিদির অভিনয়ের তো কথাই নেই। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ জেনো, অজিতকে জানিয়ো। ইতি ২০।২।৪০

দাদামশাই

[১৭] ॐ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি তোমাদের বোম্বাইয়ের ডাকঘরের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই— বোধ হয় ভালো চিঠির সন্ধান পেলেই সেটা চুরি করে নেয়। পরের চিঠিতে ওদের ঝুলি ভরতি হয়ে আছে— সেগুলো ভালো করে ঝেড়ে ঝুড়ে দেখো তো।

বিষম ব্যস্ত হয়ে আছি। অক্স্‌ফোর্ড থেকে ডিগ্রি আসছে, ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেবে। খুব ভারি ভারি নামধারী লোকের সমাগম হবে কোথায় তাদের জায়গা দেওয়া যাবে ভাবনা পড়ে গেছে— তোমার বাবার ঘরে মীটিঙের পর মীটিঙ বসে গেছে— আমি তার কাছ দিয়ে ঘেঁষি নে— আমার দোতলার ঘরে বসে ঘোলের সরবৎ খাচ্ছি।

একটা অন্যায় কাজ হচ্ছে এই যে তোমাদের ওখানে আকাশ অনাবশ্যক বৃষ্টি ঢেলে দিচ্ছে আমাদের এখানে চাষীরা চাষের মাটি ভেজাচ্ছে চোখের জলে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পক্ষে এটা লজ্জার কথা। এখানে হাওয়াও উঠছে খুব গরম হয়ে— দেবতার উপরে এটা রাগের লক্ষণ— কিন্তু যতই রাগছে গরম ততই আরো বেড়ে উঠছে। তোমাদের তো সমুদ্র আছে

হাওয়াও কম দেয় না, আমাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নিলে দোষ কী।

. . . চোখটা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে— এর পরে মনে মনে চিঠিপত্র লেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। তাতে চোখটাও বাঁচবে ডাকের খরচও বাঁচবে। এর পরের বারের চিঠি তুমি মনে মনে পড়ে নিয়ো। ইতি ২।৮।৪০

দাদামশায়

[১৮]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

পুপুদিদি

আসচ শুনে খুশি। কিন্তু কলম আমার সরে না, বেশি লিখতে পারিনে। ভীমরাও শাস্ত্রীজিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো— বোলো এখানে তাঁর নিমন্ত্রণ রইল। খুব অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। যখন আসবে এখানে হীহী করবে শীতে। তোমার শাশুড়ির বোনা পশমের কাপড় পরচি। সবাই বলচে আমাকে দেখাচ্চে ভালো। বুড়ি দিদি মুগ্ধ হয়ে গেছে এক দণ্ড আমার কাছ ছাড়ে না।

আজ এই পর্যন্ত। আশীর্বাদ

৪।১২।৪০

দাদামশাই

[১৯] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

[মে, ১৯৪১]

পুপুদিদি

আঙুল যে চলে না কী করি বলো

তুমি আছ পাহাড়ে ঠাণ্ডায় আর আমাদের পোড়া কপাল কেবলি তেতে উঠচে— তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে মেঘ আসে জল আসে না। যদি আসে জল সে আসে চাষীদের চোখের কোণে।

ভাবতে কষ্ট লিখতেও কষ্ট অতএব এই পর্যন্ত।

আশীর্বাদ

দাদামশায়

পরিচয়

অজিত (পৃ. ১৭, ১৯)—অজিতকুমার চক্রবর্তী
অজিত (পৃ. ২৩৬)—শ্রীঅজিত সিং খাটাও, শ্রীনন্দিনী দেবীর স্বামী
অনিল, সেক্রেটারি—শ্রীঅনিলকুমার চন্দ
অমিতা—শ্রীঅমিতা ঠাকুর, শ্রীঅজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
অমিয়—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী
অমিয়া—শ্রীঅমিয়া ঠাকুর
অরবিন্দ (পৃ. ২২)—শ্রীঅরবিন্দ বসু, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র
অসিত—শ্রীঅসিতকুমার হালদার
আশা—শ্রীআশা অধিকারী
আশু—সার্ আশুতোষ চৌধুরী
আলু—সচ্চিদানন্দ রায়, জগদানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র
আঁদ্রে—ফরাসী চিত্রশিল্পী শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে
আরিয়াম—শ্রীআর্যনায়কম, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক
অ্যানা সেলিগ—জার্মান মহিলা
উমাচরণ—ভৃত্য
ওকাকুরা—ওকাকুরা কাকুজো, জাপানের সুবিখ্যাত মনীষী
কমল—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
কাসাহারা—শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন জাপানী কর্মী
কালিমোহন—কালিমোহন ঘোষ
কুইনী—শ্রীঅমলা দত্ত, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী
কৃপালানি, কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি, শ্রীনন্দিতা দেবীর স্বামী
এলা—সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্রী
কেদার—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গবা—শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গাঙ্গুলিমশায়—শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার ভূতপূর্ব পরিদর্শক
গুরুদয়াল—শ্রীগুরুদয়াল মল্লিক, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক
গোঁসাই—রাধিকা গোঁসাই, গায়ক
গোপাল—জোড়াসাঁকোর পুরাতন সরকার
গোরা—গৌরগোপাল ঘোষ, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী
গৌরী—শ্রীনন্দলাল বসুর কন্যা
চারু ভট্টাচার্য—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাধ্যক্ষ
জগদানন্দ—জগদানন্দ রায়
জগদীশ—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
জয়া—শ্রীজয়শ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
জায়জি—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীজাহাঙ্গীর ভকিলের কন্যা
জীবন—শ্রীজীবনময় রায়, চিকিৎসক ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক
জ্ঞান—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা
জ্যোৎস্না—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী
ঝগড়ু—ভৃত্য
ঝুনু—শ্রীসাহানা দেবী
টিম্বার্স—মার্কিন ডাক্তার, শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী
‘তোর দিদি’—শ্রীপূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ
‘তোর মেজমা’—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী
দিনু, ‘দিনদা’—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দুর্গা—জগদানন্দ রায়ের কন্যা
দেবল—শ্রীকাশীনাথ দেবল, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র
ধীরেন—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যক্ষ
নগেন্দ্র—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা
নবকুমার—মণিপুরের নৃত্যশিক্ষক
নলিনীরঞ্জন—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

নিতাই, নীতু, খোকা—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
নিশিকান্ত—নিশিকান্ত সেন, দিল্লী
নীলমণি, লীলমণি, বনমালী—ভৃত্য
নুটু—রমা কর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগিনী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী
নেবুকুঞ্জ—শান্তিনিকেতনের একটি বাড়ি
পারুল—শ্রীপারুল দেবী, বরানগর
পি. সি. সেন—রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার
পিসিমা—রাজলক্ষ্মী দেবী, যশোরের সম্পর্কে পিসিমা
পূর্ণিমা—রথীন্দ্রনাথের মাতুল-কন্যা
প্রতাপ—প্রতাপ তলাপাত্র, সরকার
প্রভাতকুমার—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক
প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
গ্রেচেন—মিস গ্রীন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী
বড়দিদি—সৌদামিনী দেবী
বিচিত্রা—রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত সম্মিলনী
বঙ্কিম—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক
বিপিন—ভৃত্য
বিমলা—ব্যারিস্টার সত্যরঞ্জন দাসের পত্নী
বীরেন—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র
বুড়ি, খুকি—শ্রীনন্দিতা দেবী
বুর্ডেট, মিস—মার্কিন মহিলা
ভক্তি—অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ অধিকারীর কনিষ্ঠা কন্যা
ভীমরাও শাস্ত্রী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন সংগীত-অধ্যাপক
মঞ্জু—শ্রীমঞ্জুশ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
মণিকা—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী
মমতা—জগদানন্দ রায়ের দৌহিত্রী
মরিস—এইচ. পি. মরিস, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

মালঞ্চ—শ্রীমীরা দেবীর শান্তিনিকেতনের বাড়ি
মায়া—সত্যরঞ্জন দাসের কন্যা, ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসুর পত্নী
মুকুল—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে
মোলার—অবনীন্দ্রনাথের সুইডিশ বন্ধু
মোবারক—ভৃত্য
মৃণালিনী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী
মেজ বৌঠান—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
মৈত্র, ডাক্তার—ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র
মৈত্রেয়ী—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, মংপু
রানী—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী
রামানন্দবাবু—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
রেখা—সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগিনী, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের পত্নী
রোটেনস্টাইন—সুপরিচিত শিল্পী, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু
ললিতা—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা
লাবণ্য—অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্নী
লাবণ্যের মেয়েটি—শ্রীঅমিতা ঠাকুর
লাবু—শ্রীমমতা দেবী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা
শমী—শমীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র
শরৎ—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা
শ্রীমতী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
শৈল বৌমা—সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পত্নী
শৈলেশ—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা; একসময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশক
সত্য—ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী
সাধু—ভৃত্য
সুকেশী বৌমা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী
সুশি বৌমা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

সুধাকান্ত—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী

সুনন্দা—রথীন্দ্রনাথের মাতুল-কন্যা

সুনীত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা

সুরূপা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা

সুরেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর (পৃ. ১১৮, ১৫৭, ১৯৫)

সুরেন (পৃ. ৫১, ৫৫)—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপ্রকাশ—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র

সোমেন্দ্র—সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

সৌম্য—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমলতা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী

হৈমন্তী—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর পত্নী

ক্ষিতিবাবু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সংশোধন

মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত ১ সংখ্যক পত্রের তারিখ,
[চৈত্র ১৩২১] হইবে বলিয়া অনুমান।

BAGHBAZAR READING LIBRARY CALCUTTA

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA-BHARATI
336583
LIBRARY

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০০

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীসৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত
সান্ লিথোগ্রাফিং কোম্পানি
১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড । কলিকাতা ১০

চিঠিপত্র

৫

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীইন্দিরা দেবী ও শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রাবলী চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হইল। প্রথমোক্ত তিনজনকে লিখিত এই কয়টি চিঠিই আমাদের গোচরে আসিয়াছে। শ্রীইন্দিরা দেবীকে ১৯১৮-১৯৪১ সালে লিখিত চিঠিপত্র এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল; ১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছেন সেগুলি ছিন্নপত্র গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। ঐ সময়ে লিখিত আরও যে-সব চিঠি বর্তমানে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে, সেগুলি ভবিষ্যতে ছিন্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

৬

পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন
১১ জানুয়ারি ১৯২২

ভাই মেজদাদা

এবার য়ুরোপ থেকে এসে অবধি বিশ্বভারতীর কাজের পাকে এমনি জড়িয়ে পড়েচি যে আমার কোথাও নড়বার জো নেই। বিশেষত এখানে Prof. Sylvain Levy কাজ করচেন তাঁকে ছেড়ে যাওয়া চলেনা। তিনি আমার আহ্বানে এসেচেন এবং আমার আকর্ষণেই এসেচেন— এত বড় পণ্ডিত অথচ এমন সহৃদয় লোক দেখা যায়না। যদি সুবিধা হয় তাঁদের বরঞ্চ একসময়ে রাঁচিতে আপনাদের ওখানে নিয়ে যাব। Gourlayকে জোড়াসাঁকোয় ডেকে এনে তাঁদের এখনকার দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেম। মেছুয়াবাজারে মসজিদের মধ্যে পুলিস প্রবেশ করে যেসব উৎপাত করেছিল তাতে সর্ব্বসাধারণের মনে ধারণা হয়েচে যে ওরা গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে N. C. O. পক্ষের অহিংসাব্রত ভাঙবার চেষ্টা করচে। আমি ওকে বলেচি এরকম ঘটতে আরম্ভ হলে আমাদের মত নিরপেক্ষ লোকদেরও দায়ে পড়ে অপরপক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। আপনি কৃষ্ণকুমার মিত্রকে যে message লিখে দিয়েচেন সেটা আমার ভাল লাগ্‌ল; আমিও কতকটা এইভাবেই মাঝে মাঝে দেশের লোককে বলেচি।— বিশ্বভারতীকে কতকটা খাড়া করে তোলা গেছে,— এটাকে এবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করা গেল,— তারই একটা Constitution গড়া গেছে, সেটা উকীলের দ্বারা সংশোধন

করিয়ে ছাপা হলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। জিনিষটা আর সবই একরকম গড়ে উঠেচে কেবল অর্থের অনটনে নিয়তই উদ্বেগ ভোগ করতে হচ্চে। সুবীর মঞ্জু এখানে ভর্ত্তি হয়েচে সে কথা জানেন বোধ হয়। আমার ত মনে হচ্চে এখানে ওদের বেশ মন বসে গেচে। লটি মেয়েবিভাগের তত্বাবধান করচেন, আর পিয়র্সনের হাতে সুবীরের ভার আছে। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৮

স্নেহের রবি

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত

ও

বোলপুর
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১১

ভাই মেজ বোঠান—

মীরা ভাল হয়ে গেছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার কিছুতেই মনে হয়না যে মীরার পক্ষে মাংস খাওয়া ভাল। তুমি ওর যে রকম পথ্য ঠিক করে দিয়েছ সেইটেই ওর পক্ষে উপযোগী। রথীদের ওখানে পথ্যটা ভাল নয় সে কথাটা ঠিক—সেইজন্যেই প্রতিমার প্রায়ই শরীর খারাপ হচ্চে…যশোরের রক্তের গুণে মীরা খুব সামাজিক—মেলামেশা গল্প সল্প হাসিতামাসা করতে পারলেই ও সব চেয়ে থাকে ভাল—আস্তে আস্তে তোমাদের বালিগঞ্জ অঞ্চলে ওর একটি সখীমণ্ডলী গড়ে উঠ্‌লেই ও বেশ আনন্দে থাকতে পারবে।

আমার একরকম চলে যাচ্চে ছুটির পরে তারপর আমার শরীর সম্বন্ধে যা হয় একটা কিছু চিন্তা করে দেখা যাবে। আটই আশ্বিন থেকে আমাদের ছুটি আরম্ভ হবে। ইতি রবিবার

তোমার স্নেহের
রবি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

[১]

ভাই জ্যোতিদাদা

আমরা পূর্ব্বে যে জায়গায় ছিলুম সেখানে খুব একটা বড় রকম ঝড় খেয়েছিলুম। বোটগুলো নিয়ে সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছিল। তীরে শক্ত মাটি ছিল না— বালিতে খোঁটা ও নোঙর তেমন আঁকড়ে বসে না তাই ঝড়ের টানে নোঙর সুদ্ধ বোট খানিক দূর ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। এদিকে ঝড়ের প্রথম ঝাপটায় বালি উড়ে দশদিক অন্ধকার করে দিলে— বাইরে বেরতেই চোখে বালি লেগে অন্ধপ্রায় এবং নিশ্বাস বন্ধ হবার জো হতে থাকে। ছোট ছেলেদের নিয়ে মনের ভাব কিরকম হয়েছিল তা বেশ বুঝতেই পারচেন। সেখান থেকে এবার একটি রীতিমত সঙ্কীর্ণ কোলের মধ্যে বোটগুলো নিয়ে এসেছি। এখানে আর আশঙ্কার কোন কারণ নেই। উত্তর পশ্চিমে উঁচু পাড়— সেদিক থেকে তেমন জোরে বাতাস আসবার সম্ভাবনা নেই— জল অল্প এবং সম্মুখের দিকে বন্ধ। নির্জ্জন জায়গা— মেয়েরা চরের উপর সঞ্চরণ করে বেশ মনের আনন্দে আছেন। শিলাইদহে ফেরবার নামে তাঁরা বিমর্ষ হয়ে যান।

মুদ্রারাক্ষস পড়ছি। মুদ্রারাক্ষসের শ্লোকগুলি ঠিক কবিত্বরসপূর্ণ নয় সেইজন্যে আমার বোধ হয়, ওগুলো অমিত্রাক্ষর ছন্দে করলে ওর গাম্ভীর্য্য এবং কঠিনতা বেশ পরিস্ফুট হত। অন্য নাটকের মত এর শ্লোকগুলি বেশ স্বচ্ছ এবং চেষ্টালক্ষণ-

হীন হয়নি। এর গদ্য অংশ বেশ লাগচে। সংস্কৃত মূলটা আনিয়ে নিয়ে অনুবাদের সাহায্যে সেটা পড়ব বলে অপেক্ষা করে আছি। পূর্ব্বে একবার পড়বার চেষ্টা করে খট্‌মটে বলে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আপনি ত সংস্কৃত নাটকশ্রেণী প্রায় শেষ করে ফেল্লেন। বড়গুলির মধ্যে কেবল বেণীসংহার বাকি আছে। চণ্ডকৌশিক, অনর্ঘরাঘব, পার্ব্বতী-পরিণয় নাগার্জ্জুন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত নাটক আছে— সেগুলো নিঃশেষ করতেও দেরি হবে না।

আমি "নৈবেদ্য" বলে এক শ খানেক কবিতা সমাজ প্রেসে ছাপতে দিয়েছি— হয়ত আগামী নববর্ষের আরম্ভে পেতে পারবেন। রোজ সকালে একটি দুটি করে লিখে লিখে এতগুলো জমে উঠেছে।

কলকাতায় প্লেগ ত খুব জেগে উঠ্‌চে। আপনারা বুঝি স্থানত্যাগ করতে সম্মত নন্?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[২]

ওঁ

508 High Street
Urbana
Illinois. U. S. A.
7 Nov. 1912

ভাই জ্যোতিদাদা

আমরা আমেরিকায় এসে পৌঁচেছি তাই আপনার চিঠি পেতে দেরি হল। আপনি যদি Mr. Rothenstein এর নামে একশো পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেন তাহলে তিনি ছবি বেছে ছাপাবার সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন। সুরেনের কাছ থেকে ১০০০ টাকা ধার নিয়ে মাসে মাসে একশো টাকা করে শোধ করবার ব্যবস্থা করলে বোধ হয় কোনো বিঘ্ন হবেনা। রোটেনস্টাইন বল্‌ছিলেন এরকম ছবির বই বেশি বিক্রি হবার যেন আশা না করা হয়— বিলাতের মত জায়গাতেও এর গ্রাহক অল্প। কেবল জিনিষটাকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করবার জন্যেই ওর থেকে বাছাই করে ছাপার বন্দোবস্ত করা উচিত। উনি নিজে একটা ভূমিকা লিখে দেবেন। রোটেনস্টাইন ইংলণ্ডের একজন খুব বিখ্যাত চিত্রকর— South Kensington Art Collegeএর ভাস্কর্য্য অধ্যাপক একজন নামজাদা ফরাসী গুণী, তিনি বল্‌ছিলেন Rothenstein is not an ordinary artist, he is a personality.। আমি ছবি ছাপানো সম্বন্ধে তাঁকে একটা চিঠি লিখে দেব।

আমরা এখন যে সহরে আছি এটি ছোটখাটো জায়গা— একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেষ্টন করে প্রধানতঃ অধ্যাপক ও ছাত্ররাই এখানে বাস করেন— সেইজন্যে বেশ নিরিবিলি— আমার ঠিক মনের মত জায়গা। আর একটি মস্ত সুবিধা

এই যে ইংলণ্ডে শীতকালটা যেরকম অন্ধকারে কুয়াশায় আচ্ছন্ন এখানে সেরকম নয়— যথেষ্ট শীত বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সূর্য্যের আলো— ভারি ভালো লাগে।

আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি— বৌমা তার গৃহিণীপনা করেন— অর্থাৎ তাঁকেই রাঁধ্‌তে ঘর সাফ করতে হয়— এদেশে সবাই মনিব; চাকর পাওয়া প্রায় অসম্ভব বল্লেই হয়— অধিকাংশ ভদ্রগৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষ ঘরের প্রায় সমস্ত কাজ নিজের হাতে করেন। আজ দেখে এলুম বিকেলে এখানকার একজন বড় অধ্যাপক নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাপড় কাচচেন। নইলে উপায় নেই। এখানকার গরীব ছাত্ররা বেতন কিম্বা খোরাকির পরিবর্ত্তে বাসনমাজা রাঁধা ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি ঘরের কাজ সেরে দেয়। আমাদের অনেক ভারতবর্ষীয় ছাত্র একাজে নিযুক্ত আছে। বৌমার এ একটা বেশ শিক্ষা হচ্চে। তাঁকে এখানকার সকলেই ভালবাসে। একজন অধ্যাপকের স্ত্রী তাঁকে ইংরেজি পড়াচ্চেন— খুব আদরযত্নে আছেন। এমনতর একবছর কাটিয়ে যেতে পারলে তাঁর খুব সুবিধা হবে। ইংলণ্ডে ঠিক এমন সুযোগটি পাওয়া যায়না। রথীকে অধ্যাপকরা প্রায় সবাই আন্তরিক ভালবাসেন বলে সকলের কাছ থেকে এমন একটা আত্মীয়তা পাওয়া যাচ্চে।

আপনার স্নেহের
রবি

[৩] ওঁ

আমেরিকার ঠিকানা—
C/o Prof. Seymour.
Urbana, Illinois,
U. S. A.

ভাই জ্যোতিদাদা

গত মেলে আপনার চিঠি পেয়েছি কিন্তু ছবির খাতা এসে পৌঁছতে বোধ হয় দু-এক মেল দেরি হতেও পারে। আমরা আবার পর্শু আমেরিকায় যাত্রা করচি। এখানে বলে দিয়ে যাব খাতা এসে পৌঁছলে Rothensteinএর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তাঁর সঙ্গে ঠিক করচি আপনার ছবি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ এখানকার Studio কাগজে এবং আমাদের Modern Reviewতে লিখ্‌তে। তাতে কিছু কিছু উদাহরণ আপনার খাতা থেকে সংগ্রহ করে দিতে পারেন। ছবির বই ছাপতে এত বেশি খরচ যে সে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস করিনে। একটা প্রস্তাব আছে এই যে India Society থেকে আপনার ছবির গোটাকতক Selection যদি ওরা ছাপায় তাহলে অনেকটা প্রচার হতে পারবে। আপনি কিছু খরচ দিলে ওরা বাকি খরচ দেবে। ওরা বছরে দুটো করে বই ছাপিয়ে সভ্যদের দেয়। এ বছরের বই হয়ে গেছে। আর বছরে আপনার এটা যদি ওরা ছাপিয়ে দিতে রাজী হয় তা হলে খুব ভাল হবে। আমি আজ ওদের কাছে সেই প্রস্তাব করব। আপনাকে তাহলে হয়ত ৫০।৬০ পাউণ্ড দিতে হতে পারে— কিন্তু সে এখনি নয়— আস্‌চে বছরে।

আমার বইখানা আর সপ্তাহখানেক পরে বের হবে। দেখে যেতে পারলুম না। এখানে নবেম্বরটা বড় বিশ্রী, তাই তাড়াতাড়ি পালাতে হচ্চে। বই বের হলে আপনারা পাবেন— এইখান থেকেই এরা পাঠিয়ে দেবে। এ বই এদের কেন এত অত্যন্ত ভাল লেগেছে তা ঠিক বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। বিশেষত তর্জ্জমা আমার নিজের ইংরেজিতে, এবং সেও সরল গদ্যে। যে কবিতাগুলি তর্জ্জমা করেছি সে সমস্তই আমার শেষ বয়সের— তার মধ্যে কবিত্বের কোনো নৈপুণ্য নেই— দেশে তার কোনো আদরও হয়নি— বরঞ্চ লোকে এই কথাই মনে করেছে এই কবিতায় আমার কবিত্বশক্তির ক্ষীণদশাই প্রমাণ করচে।

আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৯

স্নেহের রবি

[৪] ওঁ Hotel Earle
New York
13 Feb.1913

ভাই জ্যোতিদাদা

আর্ব্বানায় চুপচাপ ছিলুম বেশ আরামে ছিলুম। সম্প্রতি বেরিয়ে পড়েছি। শিকাগো য়ুনিভর্সিটিতে আমার এক বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে বক্তৃতা দিয়ে বষ্টনে হার্ভার্ড য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতার জন্যে চলেছি। সেখানে আমাকে

চারটে বক্তৃতা দিতে হবে। তারপরে উইস্‌কন্সিন য়ুনিভর্সিটিতে নিমন্ত্রণ আছে সেখানে কাজ সেরে আর্ব্বানায় ফিরে গিয়ে রথীদের ইলিনয় য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতা পাঠ করবার প্রস্তাব আছে। Michigan, Pardue, এবং Iowa University থেকেও নিমন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু আমার আর পোষাচ্চে না। মনে করচি আগামী এপ্রেল মাসেই ইংলণ্ডে ফিরব। ইতিমধ্যে রচেষ্টারে একটা Religious Liberalsদের এক কন্‌গ্রেস ছিল সেখানে Race Conflicts সম্বন্ধে আমাকে ছোট একটা প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল। শেষকালে আমাকে যে এদেশে এসে ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আপনার খাতাগুলো সমস্তই রটেনস্টাইনের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে। আমি লণ্ডনে ফিরে গেলে সেগুলো থেকে ছবি নির্বাচন করে কি ভাবে কি করা যেতে পারে তা স্থির করব। ইতিমধ্যে আপনি সেগুলো ছাপাবার খরচ কিছু সংগ্রহ করে রেখে দেবেন।

আমেরিকা সম্বন্ধে কিছু লেখবার সময় এ পর্য্যন্ত পাইনি। হয়ত ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে অবকাশ পাব। এই সমস্ত বক্তৃতা প্রভৃতির হাঙ্গামে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সেইজন্যেই মনটা পালাই পালাই করচে। বষ্টনে ওকাকুরার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কাল আবার সেখানেই যাচ্চি।

আপনার স্নেহের রবি

[৫]　　　　ওঁ　　　　বোলপুর

শুক্রবার

ভাই জ্যোতিদাদা

যদি প্রুফগুলি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে এই মেলেই রোটেনস্টাইনকে সে কথা জানাবেন। আমার ত মনে হয় বিবির দুটো ছবি দেবার দরকার নেই— যেটা মাথার উপরে ঝুঁটি বাঁধা সেটা বাদ দেওয়াই ভাল। রথী বলছিল এবার আমার যে ছবি তুলেছেন সেটা ভাল হয়েছে— রোটেনস্টাইন আপনার হাতে আঁকা আমার একখানা ছবি চান সেটা আপনি তাঁকে পাঠাতে পারেন তাহলে ওটাও বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করে দিতে পারেন।

জর্ম্মানিতে যাবার গুজব সম্পূর্ণ অমূলক— কেমন করে উঠল জানিনে। বার্লিন থেকে ইতিমধ্যেই আমার নিমন্ত্রণ আসতে আরম্ভ হয়েছে।

আপনার রবি

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

[১]

C/o. Messrs Thomas Cook & Sons.
Ludgate Circus, London.

৬ই মে ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু

বিবি, তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। সমুদ্র পেরিয়ে অবধি আত্মীয়স্বজনদের এরকম আনুপূর্ব্বিক খবর আর পাইনি। তার কারণ, প্রধানভাবে বোলপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গেই আমার চিঠির দেনাপাওনা চলে আসচে— তাছাড়া আপনার লোকেরা যারা মাঝে মাঝে লেখে তারা, আমার পক্ষে কোন্ খবরটা যে খবর, তা ভেবেই পায় না। সেইজন্যে আমি আছি এমন ভাবে, যেন দেশে সময়ের ঘড়িতে কেউ দম দেয় নি অথচ এখানে প্রত্যেক সেকেণ্ডটা দোলাদণ্ডের কাঁধে চড়ে টিক্‌টিক্ শব্দে ঘর মাতিয়ে রেখেছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমার কথা লিখেছিস্। ওটা যে কেমন করে লিখ্‌লুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখ্‌তে পারিনে এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনোদিন ছিল না। যদি আমাকে কেউ চা খাবার নিমন্ত্রণ করে ইংরেজিতে চিঠি লিখ্‌ত তাহলে তার জবাব দিতে আমার ভরসা হত না। তুই ভাবছিস আজকের বুঝি আমার সে মায়া কেটে গেছে— একেবারেই তা নয়— ইংরেজিতে

লিখেছি এইটেই আমার মায়া বলে মনে হয়। গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোলো আনা সবল না থাক্‌লে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্রমাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখীর ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বস্‌তে চায়— আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে চৈত্রমাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম— তার আলো তার হাওয়া তার গন্ধ তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না। কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না— হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠ্‌তে চায়, ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস, জানিস্ ত। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেই জন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস্ কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন— কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগি নি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে

উঠেছিল সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্‌খুস্‌ করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জ্জমা করতে বসব। ঘট্‌লও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল। রোটেনস্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিতমনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্‌সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন — তারপরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে। আমার কৈফিয়ৎ থেকে এটুকু বুঝতে পারবি আমার কোনো অপরাধ ছিল না— অনেকটা ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছে।

তার পরে যখন আমেরিকায় গেলুম, ভাবলুম কিছুদিন চুপচাপ করে বিশ্রাম করব। কিন্তু চুপ করে থাকবার জায়গা আমেরিকা নয়। ও দেশ মূকং করোতি বাচালং— বিদেশ থেকে যে কেউ গেলেই আমেরিকা তার কাছ থেকে বক্তৃতা দাবী করে বসে। আমি আর্ব্বানা সহরে একটু গুছিয়ে বসবামাত্রই বক্তৃতার জন্যে তাগিদ আসতে লাগল। আমি বল্লুম

আমি ইংরেজিভাষা জানিনে, কিন্তু সেটা ইংরেজি ভাষাতেই বল্‌তে হয় বলে কেউ বিশ্বাস করে না, বলে, তুমি ত বেশ খাসা ইংরেজি বলচ। অনুরোধ এড়ানোর বিদ্যাটা আজও আয়ত্ত হয়নি। বলতে পারব না একথা বারবার বলার চেয়ে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ। এমনি করে আমেরিকায় আমার টুঁটি চেপে ধরে বক্তৃতা বের করে নিলে। এসম্বন্ধে সেখানে খ্যাতিও লাভ করেছি—কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত আমার মনে হয় ওগুলো দৈবাৎ লেখা হয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষায় যে অনেকগুলো অত্যন্ত নড়নড়ে জিনিষ আছে—যেমন ওর articleগুলো, ওর prepositionগুলো, ওর shall এবং will— ওগুলো ত সহজজ্ঞান থেকে জোগান দেওয়া যায় না, ওর শিক্ষা থাকা চাই। এখন বুঝতে পারচি আমার মগ্ন চৈতন্য আমার subliminal consciousness এর মধ্যে ওগুলো মাটির তলার গর্ত্তের ভিতরকার কীট সম্প্রদায়ের মত বাসা বেঁধে রয়েছে—যখন হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে লিখ্‌তে বসি তখন অন্ধকারে ওরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসে অপনাদের কাজ সেরে দিয়ে যায় কিন্তু জাগ্রৎ চৈতন্যের আলো দেখ্‌লেই ওরা অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে দৌড় দিতে থাকে— সুতরাং ওদের সম্বন্ধে কোনোমতেই শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভরসা পাইনে—সুতরাং আজ পর্য্যন্ত একথাটা সত্য রয়ে গেল যে আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে। ঠিক জানিনে বল্লে একটু অত্যুক্তি করা হয়, কিন্তু নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। আমি তোকে সত্য কথাই বলচি, একয়টা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখতে পেরেছি

বলে আমার মনে একটা দুশ্চিন্তা জাগ্‌চে এই যে, এই নজিরের উপর বরাবর আমি চলব কি করে? কৃতকার্য্য হবার মত শিক্ষা যাদের নেই, যারা কেবলমাত্র নেহাৎ দৈবক্রমেই কৃতকার্য্য হয়ে ওঠে, তাদের সেই কৃতকার্য্যতাটা একটা বিষম বালাই।

আমরা আমেরিকা থেকে ফেরবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই সুরেন এখানে এসেছে। আমরা আমাদের একটা পুরাতন পরিচিত বাড়িতে বাসা নিয়েছি। এখানে সুরেনের জন্যে ঘর খালি পাওয়া গেল না। তাই সে রোজ সকালে তার হোটেল থেকে এসে আমাদের সঙ্গেই দিন কাটিয়ে যায়। তার কাজকর্ম্মের জোগাড় একরকম হয়ে উঠেছে, বোধ হয় হপ্তাদুয়েকের মধ্যেই ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে। রথী এবং বৌমা হয় ত বা সুরেনের সঙ্গেই ফিরবে, কিন্তু আমার এখন ফেরবার জো নেই। কারণ জুন মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে বক্তৃতার দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তারপরে Irish theatreএ আমার ডাকঘরের ইংরেজি তর্জ্জমাটা অভিনয় হবার আয়োজন চল্‌চে—ওটা য়েট্‌স্‌ এবং তাঁর দলের বিশেষ ভাল লেগেছে। তার পরে আমার আরো একটা বড় খাতা বোঝাই তর্জ্জমা সারা হয়েছে—সেগুলোও রোটেনস্টাইন প্রভৃতি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এগুলি ছাপবার বন্দোবস্ত করতে তাঁরা উৎসুক হয়েছেন। ম্যাকমিলানরা আমার প্রকাশক। গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণটা অল্প কালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এতে ম্যাকমিলানরা উৎসাহিত হয়েছে।

নতুন লেখাগুলো সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এই সব কাজে সময় লাগ্‌বে। ওদিকে আমেরিকায় হার্ভার্ড্‌ য়ুনিভর্সিটিতে আমি যে বক্তৃতাগুলি পাঠ করেছিলুম সেগুলি বই আকারে বের করবার জন্যে সেখানকার একজন অধ্যাপক আমাকে অনুরোধ করচেন। বই তাঁরা বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেবেন এবং তার সমস্ত মুনফা বোলপুর বিদ্যালয় পেতে পারবে। আমার এ লেখাগুলো এখানকার সমজদারদের কাছে একবার যাচাই না করে ছাপব না বলেই দেরি করচি। ওর মধ্যে একটা প্রবন্ধ Hibbert Journal-এর সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলুম তিনি সেটা সমাদর প্রকাশ করে গ্রহণ করেছেন, তাতে বোধ হচ্ছে এগুলো চলতে পারবে।

প্রমথর সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আমার মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা মনে পড়ল— এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ণশিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই— 'মধ্যে ক্ষামা', দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে 'চকিত হরিণী প্রেক্ষণা।' এ যেন চোদ্দনলী হার, একেবারে ঠাস গাঁথুনি আর ভাবটুকু এক একটি নিরেট মাণিকের বিন্দুর মত ঝকঝক করে জ্বলচে। কেবল আমি এই আশা করচি, কবিত্বের এই সুতীক্ষ্ণতা ক্রমে প্রশস্ত হয়ে আস্‌বে, এর ধারালো নবযৌবন পূর্ণযৌবনের রসভারে বিনম্র হয়ে পড়বে, এবং এখন পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে, তখন কবিতা এমন নির্ম্মমভাবে নিখুঁত

হবে না। বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্ত্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। ভাষায় ছন্দে ও ভাবের সংযমে এবং নৈপুণ্যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

নদিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জ্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখ্‌তেন তাহলে বুঝতে পারতেন এ সব জিনিষ এখানে কেন কোনোমতেই চল্‌তে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিষটা থাকা চাই। এই জিনিষের সঙ্গে আমাদের কারবার অত্যন্ত কম—সেইজন্যে এটা আমরা চিনিও নে এবং এর অভাবটা কি তা আমরা বুঝিও নে। আমার পক্ষে মুস্কিল এই যে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে লোকে ভুল বুঝবে কেননা আমার রচনাগুলোকে এরা গ্রহণ করেছে। যদি জিজ্ঞাসা করিস্ কেন করেছে তবে তার উত্তর এই যে, এই কবিতাগুলি আমি লিখ্‌ব বলে লিখিনি— এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিষ— এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন— এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে। এই জীবনের জিনিষ জীবনের ক্ষেত্রে আদর পায় একথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি কিন্তু একথা বোঝানো শক্ত। কেননা নিজের ফাঁকি মানুষ নিজে দেখ্‌তে পায় না;—কেননা ফাঁকি জিনিষটাতে পরিশ্রম বেশি, চেষ্টা বেশি এবং তার প্রতি মানুষের মমতাও বোধ হয় বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের কোনো একজন লেখক তাঁর কোনো বই তর্জ্জমা করে

এখানে কারো কাছে পাঠিয়েছিলেন। এঁরা তাঁকে বল্লেন এটাকে সম্পূর্ণ নূতন করে না লিখ্‌লে চল্‌বে না। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কেন, রবীন্দ্র ঠাকুরের ভাষা যদি চলে থাকে তাহলে আমার কেন চল্‌বে না। তিনি মস্ত ভুল এই করেছিলেন যে তিনি মনে করেছেন ভাষার উপরেই বুঝি এর নির্ভর। একথা খুবই সত্য ইংরেজি ভাষা নিয়ে অভিমান করতে পারি এমন আয়োজন আমার জীবনে করাই হয়নি—কিন্তু যে কারণেই হোক্ জগৎটাকে আমি যেমন করে উপলব্ধি করেছি সেটা আমার আন্তরিক সত্য জিনিষ—সেই সত্যটুকুকে তার নিজের তাগিদেই আমি প্রকাশ করবার চেষ্টা করে এসেছি—এইজন্যে ইস্কুল মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়েও আমি নিজের জীবনটাকে ফাঁকি দিইনি—ইংরেজি ব্যাকরণের কাছে আমার যত অপরাধই থাক্ সাহিত্যের কাছে অপমানিত হবার মত অপকর্ম্ম খুব বেশি করিনি। কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি ইংরেজিতে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক কাঁচা থাকা সত্বেও ইংরেজি সাহিত্যে আমি স্থানলাভ করতে পেরেছি এজন্য আমাকে ক্ষমা করা এবং ঘটনাটিকে সরল ও উদার ভাবে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে দুঃখকর হয়ে উঠ্‌বে।

মে মাস পড়েছে, আজ ২২শে বৈশাখ কিন্তু তবু এখানে আকাশ ঝাপসা, আলো ঘোলা এবং সূর্য্যদেবের সোনার ভাণ্ডারের দ্বার একেবারে এঁটে বন্ধ। মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ বৃষ্টিও হচ্চে, ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হাওয়ায় আজও ঘরে আগুন

জ্বালাতে হচ্চে। ভাল লাগ্‌চে না—কেননা আমি আলোর কাঙাল; আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ উপুড় করে ঢালা আলোর জন্যে হৃদয় পিপাসিত হয়ে আছে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুন্‌তে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি, তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছু দিন থাক্, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলী থেকে দূরে থাকি। কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলে না, তাকে ঠেলে চলাই হচ্চে প্রকৃষ্ট পন্থা—নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে নদী পার হওয়া যায় না, একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে তবেই পারের ডাঙায় ওঠা সম্ভব— যা ভাল লাগে না তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে ডরিয়ে ডরিয়ে চলব না, তাকে সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলা দিয়েই চলে যাব— এই প্রতিজ্ঞাটাকেই আঁকড়ে ধরে রাখা ভাল। অতএব বক্তৃতাগুলো হয়ে যাক্ এবং বই ছাপাবার ব্যবস্থাটা সমাধা হোক্ তার পরেই পূর্ব্বমুখে পাড়ি দেওয়া যাবে।

জ্যোৎস্নার সঙ্গে আজও দেখা হয় নি, সে লণ্ডনের বাইরে কোথায় থাকে। আজ মেব্‌ল্ তাদের বাসায় চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর এতদিন কেউ খবর পায় নি তাই চুপচাপভাবে চলছিল ক্রমে ভিড় হবার লক্ষণ দেখা দিচ্চে। এই টানাটানিটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে— নিমন্ত্রণ চিঠি পাবামাত্রই আগেভাগে

আমি ক্লান্ত হতে আরম্ভ করি—অনেক সময় বরঞ্চ সেখানে গিয়ে ক্লান্তি দূর হয়।

রাত হয়ে এল। বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে এইখানে চিঠি শেষ করি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ওঁ

* 6 Dwarkanath Tagore Street
Calcutta

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠি পাবার আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম আজ তোদের ওখানে যাব। কিন্তু এই দুদিনের বিষম উপদ্রবে আজ আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েচে। তাই আজই বিকেলের গাড়িতে পালাতে হচ্চে, নইলে বাঁচব না। দেশে ফিরে এসেই পুনর্মূষিকোভব হবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

রবিকাকা

কল্যাণীয়াসু

কাশী থেকে ফিরে এসে শরীর সুস্থ নেই। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার খানিকটা ছিন্ন অংশ এখনও শরীর থেকে বেরিয়ে পড়বার সুযোগ পাচ্চে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা অনেকটা অভিমন্যুরই মত, ও প্রবেশ করতেই জানে প্রস্থান করতে নয়। যাই হোক্ যতটা পারি চুপচাপ করে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্চি। কিন্তু তোদের আর্টিস্টের হাতে ধরা দিতে রাজি নই— ইনফ্লুয়েঞ্জাকে নেহাৎ ঠেকাতে পারিনি, আর সে অনুমতি না নিয়েই আক্রমণ করেছিল তাই আমার এই দুর্গতি, তাই বলে ইচ্ছা করে প্রতিদিন দু ঘণ্টা ধরে আর্টিস্টের সচল তুলির শাসনে নিশ্চল হয়ে থাক্‌বার দুর্ভোগ কেন স্বীকার করব— রোজ দুঘণ্টা করে যদি আমাকে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরত তাহলে ত আমাকে ডাক্তার ডাক্‌তে হত— আর এর বেলাতেই কেন বিনা প্রতিকারের চেষ্টায় দুঃখ বহন করতে হবে? যাই হোক্, আজকাল ছবি নেবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সময়, স্বাভাবিকতা একেবারেই নেই। প্রমথকে বলিস্, প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু flesh is weak. আশা করি তোরা সবাই ভাল আছিস। ইতি ২ বৈশাখ ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪]　　ওঁ　　পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মায়ার খেলার স্বরলিপি বদল করে হাল নিয়মানুগত করে লেখবার জন্যে দিনুর হাতে দিয়েচি। কিন্তু ওর হাত খুব সচল নয়। ওর কাছ থেকে কাজ আদায় করার মজুরি পোষাবে কিনা জানিনে। ও নিজে যে স্বরলিপি লেখে তাতে হাত চালিয়ে কাজ করে বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওর বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ এখনো দেখ্‌চিনে। আরো দুই একদিন দেখে পরে বিচার করা যাবে।

দিনু এখানকার ছেলেদের "বিশ্ববীণারবে" যে ধাঁচায় গাইতে শিখিয়েচে সেই ধাঁচা অনুসারে স্বরলিপি লিখেচে। ঠিক মূলের অনুবর্ত্তন করা দরকার মনে করেনি। মৈথিলি বিদ্যাপতি বাংলায় এসে যেমন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেচে এবং সেই স্বাতন্ত্র্যকে আমরা স্বীকার করেও নিয়েচি এই সমস্ত বিদেশী সুরেরও সেই রকম কিছু রূপ পরিবর্ত্তন হবেই— হলে দোষই বা কি? এই সব যুক্তি মনে এনে ওকে আমি বেকসুর খালাস দিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি এ সম্বন্ধে তোর আইন অত্যন্ত কড়া কিন্তু আমার মনে হয় পরদ্রব্য আত্মসাৎ করা সম্বন্ধে ঢিলেমি সাহিত্যে ললিতকলায় সকল অবস্থায় ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী আদালতের বিচার এলেকায় আসে না।

বিলাত যাত্রীর ডায়ারি বলে একদা একখানা বই বের

হয়েছিল সেইটুকুমাত্র খবর আমি রাখি, তার পরে এখনো সেটা বাজারে চলতি আছে কি না তা আমি বলতে পারিনে। আমার দশা অনেকটা কুলীন স্বামীর মত— খাতায় বিবাহের একটা ফর্দ্দ থাক্‌তেও পারে কিন্তু কোন্ স্ত্রী বেঁচে আছে আর কোন্ স্ত্রী মরেচে হলফ করে বলবার রাস্তা নেই।

এবারকার "সবুজপত্র" মোটের উপর উৎকৃষ্ট হয়েচে। প্রায় আগাগোড়া পড়ে ফেলবার যোগ্য। "গলি" বলে একটা কথিকা পাঠিয়েচি, সেটা কি ঠিকমত ঠিক জায়গায় পৌঁচেচে? মেরুদণ্ডের একটা অংশ ছাড়া শরীরের বাকি সমস্তই ভালো। দেহের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি না হলেও কাজ বেশ চল্‌চে। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

রবিকাকা

[৫]

ওঁ * Brahmacharya Ashram.
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

হাল আমলের বাঙালী মেয়েদের গৃহধর্ম শিক্ষা দেবার জন্যে আজকাল অনেক ভাল ভাল লোক অনেক ভাল ভাল দৃষ্টান্ত সংগ্রহের চেষ্টা করচেন। তোর চিঠিখানি পেলে ওর একটা হাফটোন ছাপ নিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় তাঁরা বসিয়ে দিতেন। এক-টিকিটে এক-কাগজে এক-লেফাফায় যুগল চিঠি চালিয়ে দেবার জন্যে প্রমথর চিঠি তুই চব্বিশঘণ্টা দাঁড়

করিয়ে রেখেছিস্, এ বুদ্ধি সকলের মাথায় জোগাত না। অভেদ্য দাম্পত্যে দুইকে এক করে দিয়ে চিঠিতে তুই যে অর্দ্ধনারীশ্বরের অক্ষরমূর্তি প্রকাশ করেচিস্ আমি তার তারিফ করচি নে, কিন্তু ডাকটিকিটের হিসাবের খাতায় তুই যে চারকে দুই করে সেরেচিস এই দুর্দ্দিনে সুগৃহিণীমাত্রেরই পক্ষে সেটা দৃষ্টান্তস্থল।

"বিশ্ববীণারবে"র বিকৃতি সম্বন্ধে তোর আপত্তি সমর্থন করে তুই যে একটি অমোঘ যুক্তি সব শেষে নিক্ষেপ করেছিস সে একেবারে শক্তিশেলের মত এসে আমার মন্তব্যটাকে এ-কোঁড় ও-ফোঁড় করেচে। মাসখানেক হল আমার নিজের গান অন্য লোকের মুখে শুনে এসেচি; মনের থেকে তার ব্যথা এখনো মরে নি, এমন সময়ে তুই যখন সেইখানেই দিলি খোঁচা তখন তাতে আমাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে দিলে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দয়ালু লোকের খেলা, কিন্তু আহতের উপর অস্ত্রাঘাত সেটাই হল মারাত্মক।

আসল কথা, একে অজ্ঞতা তার উপরে কুঁড়েমি। ও গানের সুরটা ত জানিই নে—(কোন্ গানেরই বা জানি—নিজেরই হোক পরেরই হোক) তারপরে ব্যবহার করার যখন দরকার হল তখন গোঁজামিলন চালিয়ে দেওয়া গেল। ঐ গোঁজামিলন বিদ্যাটা কুঁড়ে লোকেরই বিদ্যা; অবিদ্যার সঙ্গে ওর দহরম-মহরম যোগ। তারপরে যেটা একবার চলে গেছে সেইটেকেই ভালো বলে চালানো আমাদের দেশে চলিত। ওটা হচ্ছে অবিদ্যার অহঙ্কার। মনে আছে সক্রেটিস

বলেছিলেন আমি জানি যে আমি কিছুই জানিনে। ওকথা বল্‌লেই জানবার জন্যে দায় স্বীকার করতে হয়। আমার মতো ইস্কুল-পালানে ছেলের কাছে তা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্যে দিনু যখন ভুল করে 'বিশ্ববীণারবে' শেখালে, আমি বল্লুম বেশ হচ্চে, এই রকম হওয়াই উচিত। বুঝেচিস্ কেন? যদি বলি অন্য রকম হওয়া উচিত তাহলে হাঙ্গামা বাড়ে। তুই হয় ত রেগে মেগে শাপ দিয়ে বসবি, তোমার গান তাহলে সকলে যা-ইচ্ছে-তাই করে গাক্। সে শাপে আমার বেশি লোক্‌সান হবে না— কেননা বিধাতা তোর অনেক আগেই আমার উপরে সেই শাপ জারি করেচেন। রাহু যাকে গ্রাস করবেই, কেতুকে সে ডরিয়ে কি করবে? 'অন্যের প্রতি সেইরকম ব্যবহার কর, অন্যে তোমার প্রতি যেরকম ব্যবহার করলে তুমি খুসি হও।' গান সম্বন্ধে এই নীতিবাক্য আমি গ্রহণ করতে পারলুম না— কেননা গ্রহণ করতে গেলেই অন্যের গান মন দিয়ে শিখ্‌তে হয়। গান শেখা সম্বন্ধে আমার তৎপরতা কি রকম সে তুই জানিস্। যদি বলিস্ দিনু এমন কাজ করলে কেন? তার কারণ 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'। কুঁড়েমির মহৎ দৃষ্টান্তে অভিভূত করে না, এমন লোক কোটিকে গুটিক মেলে। মানুষকে ক্ষমা করতে গেলে মানুষকে বুঝতে হয়— সেই জন্যে এতক্ষণ ধরে তোকে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল— কিন্তু ক্ষমা করবি কিনা আমার সন্দেহ রয়ে গেল। ইতি ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

রবিকা

[৬] ওঁ পোস্টমার্ক
নিউ ইয়র্ক
২২ ডিসেম্বর, ১৯২০

কল্যাণীয়াসু

অনেক সমুদ্র পেরিয়ে তোর বিজয়ার প্রণাম এসে পৌঁচেছে। তোর পঞ্জিকার বিজয়া আমার পঞ্জিকার পৌষ মাসে এসে পড়েচে। বুঝতে পারচি কত দূরেই আছি। এক দেশে থেকেও হয় ত ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হয় না, কিন্তু ইচ্ছে করলেই দেখা হতে পারে এইটেই দেখা সাক্ষাতের প্রধান অঙ্গ। এখান থেকে দেশে যাব এই কথা কটির পেটের মধ্যে কত জাহাজ, কত রেলপথ কত বাক্সতোরঙ্গের বোঝা, কত পাসপোর্ট আপিসে ঘোরাঘুরি। মনে করলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এদেশে আমার এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছে করে না, তবুও ত আছি— মাসের পর মাস চলে যাচ্চে। যে ইচ্ছা আমাকে এখানে বেঁধে রেখেচে সে ইচ্ছায় কিছুমাত্র সুখ নেই অথচ তারই জয় চল্‌চে, অন্য ইচ্ছার চেয়ে এই ইচ্ছা পালন করা ঢের বেশি কঠিন অথচ এই ইচ্ছাই পালন করচি। তবু মানুষকে বলে বুদ্ধিমান জীব।

মান সম্মান অনেক পাওয়া গেছে, কিন্তু আর ভাল লাগ্‌চে না। ফিরতে ইচ্ছে করে খ্যাতিহীন শান্তির মধ্যে— সেই অতি শস্তা জিনিষ যা কাউকে দাম দিয়ে কিন্‌তে হয় না, কিন্তু যা আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে জগতে সব চেয়ে দুর্লভ।

আজ সাতই পৌষ। সকাল থেকে আমার মন এই প্রার্থনা করচে অসতোমা সদ্‌গময়।

রবিকাকা

[৭]

পোস্টমার্ক
জেনীভা
৭ মে, ১৯২১

তোর নববর্ষের প্রণাম ঠিক আমার জন্মদিনে এসে পৌঁচেছে। এখন আছি জেনীভাতে। এবার আমার জন্মদিন এখানেই হল। মনে হচ্চে, দেশে একদিন জন্মেছিলুম, সে জন্ম বহুদূরে পড়ে গেছে— তার পরে পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার পশ্চিম মহাদেশে জন্মলাভ করেচি। এরা আমাকে আপন করে নিয়েচে। এদের প্রীতি যে কত গভীর, এদেব আত্মীয়তা যে কত সত্য তা মনে করে' আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। য়ুরোপের মহাদেশে আমার ঘর যে এমন করে বাঁধা হয়ে গেচে তা আমি এখানে আসবার আগে কল্পনা করতে পারিনি। আমি বুঝতেই পারিনে এত শ্রদ্ধা ভালবাসা আমি কেন পেলুম। ৬০ বছর আগে একদিন যখন বাংলা দেশে জন্মেছিলুম তখন মর্ত্ত্যজন্মের যে অসীম সম্পদ লাভ করেছিলুম সেও কি হিসাব করে ঠিক বোঝা যায়— এও তেমনি, বিদেশীর কাছ থেকে এই যে অজস্র ভালবাসা পাচ্চি এর কি পুরো দাম কোনোদিন দিয়েছিলুম? দেনার সঙ্গে পাওনার হিসাব আমি ত মেলাতে পারিনে। আমার দ্বিতীয় জন্মের এই যে অজস্র দান পেলুম জননী ধরিত্রীর এই আশীর্ব্বাদ আমি নম্র হয়েই গ্রহণ করচি— এতে আমার কোনো অহঙ্কার নেই। এখনি যাচ্চি লোজানে, তারপরে লুসার্নে।

[৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

২০ অক্টোবর, ১৯২১

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ নিস্।

এবার দেশে ফিরে এসে অবধি আমার শান্তি নেই বিশ্রাম নেই। আজকাল তাই কেবলি ইচ্ছে করে চারদিকের বেড়া সমস্ত ভেঙেচুরে ফেলে সেই আমার অল্পবয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই— যখন জীবনে কোনো দায়িত্ব সাধ করে গ্রহণ করিনি— যখন ভাবতুম গল্প লেখা কাব্য লেখাই যথেষ্ট, আর সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। তখন কাঁচা ছিলুম বলেই যে ভুল বুঝেছিলুম, আর এখন বুদ্ধি পেকেচে বলেই যে ঠিক বুঝেচি তা নয়। আসলে জগদ্ব্যাপারটা খেলারই মত হাল্কা, গানেরই মত পাখাওয়ালা,— আমরা ওর পরে আমাদের ঘরগড়া চিন্তার বোঝা চাপিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে বিষম ভারী করে তুলেচি। বিষ্ণুর যেমন গরুড় এই জগৎটা তেমনিই আমাদের বাহন ছিল, ও আমাদের স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবারিত বিচরণ করিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারত কিন্তু আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে উঠে ওকে দিয়ে আমাদের মালগাড়ি টানাবার ব্যবস্থা করেচি। তাতে ক'রে মালগাড়ি চল্‌চে সন্দেহ নেই, আর লোকে ভাবচে খুব উন্নতি হচ্চে কিন্তু আকাশ পাতালে আমাদের বিচরণের অধিকার নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মাল যে আছেই, সেগুলোকে টানাতেও যে

হবেই, অতএব কেবল মুক্তি নিয়ে ত ঘর চল্‌বে না, দায়িত্বও যে মান্‌তে হবে। তা জানি, তাই যারা কলকব্‌জার তত্ত্ব বোঝে, যারা মালগাড়ি ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত, তাদের আমি ভালোই বলি। অথচ এ কথাও ত ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, মাল মানুষের, কিন্তু মানুষ নিজে মাল নয়। সেই নিজের জগৎটাকে কেবলি মালের জগৎ করে তুল্‌লে নিজেকে মানুষ চিন্‌বে কেমন করে? আজকাল তাই কেবলি ভাবচি, মাল বোঝাই করবার দায় আমি না নিলেও লোকসান বিশেষ হত না, কিন্তু দায় খোলসা করবার যে অধিকার আমার ছিল সেটাকে নষ্ট করে আমি নিজের ভালো করিনি পরেরও যে বিশেষ উপকার করেচি তা বল্‌তে পারিনে। অর্থাৎ তাদের উপকার করার চেয়েও আরো হয়ত কিছু করবার আছে, সেটা হয়ত বা আমার দ্বারা হতে পারত। নাইবা হতে পারত তাতেই বা কি। মনুষ্যলোকে দুই জাতের প্রাণী আছে,— কেজো আর অকেজো। এরা নিজের নিজের ধর্ম্মরক্ষা করে চল্‌বে এদের প্রতি বিধাতার এই অনুশাসন ছিল। কারণ, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। কিন্তু সংসারে কাজের দাবী এত বেশি যে বেকার লোকে আপন বেকার-ধর্ম্ম পালন করবার সুযোগ পায় না। কেজো লোকেরা সমস্ত পৃথিবীতে আপন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করে ভারি খুসি হয়— তারা জানে না অকাজের স্থান ও অবকাশ মারা গিয়ে তাদের কাজ বিগ্‌ড়ে যাচ্চে। কিন্তু আজ আমার এই সুবুদ্ধি কেবল পরিতাপ জন্মাতেই পারে, আমাকে উদ্ধার করতে পারে না।

আমি আমার ফেরবার পথের মাঝখানে দায়িত্বের দেয়াল তুলেচি, অতএব মাল বোঝাই করবার আপিস থেকে এ জন্মে আমার আর নিষ্কৃতি নেই। আবার, আমার কপাল এমনি যে, এ আপিসে আমার যত মাইনে মেলে জরিমানা তার ডবলেরও বেশি। জরিমানা শুধু বাইরে নয় অন্তরেও— যে-মাটিতে মজুরি করি সেখানে কাঁটা, আর যে-আকাশে আমার ছুটি সেও গেছে মারা। তাই এখন আমার এক ভরসা পরজন্মের উপর। কিন্তু সে জন্মে যদি খবরের কাগজের সম্পাদক হয়ে জন্মাই?

রবিকাকা

[৯] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। শিলাইদা ঘুরে এলুম— পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেচে— তাই মনে হল বীণা আছে, তা'র তার নেই। তার না থাকুক, তবু অনেককালের অনেক গানের স্মৃতি আছে। ভাল লাগ্‌ল, সেইসঙ্গে মনটা কেমন উদাস হল।

মেজদাদার শরীর ভালর দিকে যাচ্চে শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। পুরীতে যাচ্চিস্, কিন্তু সকলেইত বলে পুরীতে

হজমের ব্যাঘাত হয়। দুর্ব্বল শরীরে খাওয়া হজমটা একটা দরকারী জিনিষ।

আমার এখানে Benoit বলে একজন ফরাসী অধ্যাপক এসে আত্মোৎসর্গ করেচেন— লোকটি অত্যন্ত চমৎকার। ইনি এখানে ফরাসীসাহিত্য অধ্যাপনার ভার নেবেন। আপাতত দরকার, এই দারুণ রবিতাপের হাত থেকে তাঁকে আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা। পিয়ার্সন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোটগড় পাহাড়ে যাচ্চেন, সুতরাং এই দুই পাশ্চাত্যের সম্বন্ধে আপাতত নিশ্চিন্ত আছি। এণ্ড্রুজের সম্বন্ধে ভাবনা নেই— কারণ তার সঙ্গে ভারতবর্ষের মধ্যাহ্নরবি পেরে ওঠে না—অগ্নিবাণ রুদ্রবাণ কিছুতে তার কিছু হয় না। Elmhirst নৈনিতালে তার কোন্ আত্মীয়সদনে আশ্রয় নেবে— সেখানে কিছুকালের জন্যে তার হাড় জুড়বে। বাকি রইল মিস্ ক্র্যামরিশ্। গরমে সে বেচারা ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্চে। যদি তোরা পুরীতে একে তোদের সঙ্গিনীরূপে কিছুদিন রাখ্‌তে রাজি হোস্, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়। এ'কে তোদের ভালই লাগ্‌বে— কেননা এ কথাবার্ত্তা কইতে জানে এবং লোকটি প্রসন্নস্বভাবের; অল্পেই সন্তুষ্ট— একে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই— হয়ত এ'কে মেজদাদারও ভাল লাগবে। ভেবে দেখিস্। পুরীতে গেলে সেখানকার আর্ট সম্বন্ধে নিত্য তোর সঙ্গে রাত্রি দেড়টা দুটো পর্য্যন্ত তুমুল তর্ক হতে পারবে— তাতে তোর সময় হুহু করে কাট্‌তে পারবে। লেভি সাহেব এখন নেপালে আনন্দে

আছেন। আমি গ্রীষ্মাবকাশ এইখানেই যাপন করবার সঙ্কল্প করেছি— তার ফলে যেমন একদিকে গ্রীষ্ম পাব, তেমনি অন্যদিকে সান্ত্বনাস্বরূপে অবকাশ পাওয়া যাবে। বিশ্রামের জন্যে সর্ব্বদাই মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা আছে— তাতে কেবল ফল হয় সেই ব্যাকুলতা অবিশ্রাম-ব্যাকুলতারূপেই থেকে যায়। আমার এই অবস্থা। রীতিমত সুস্থ থাকা ভাল, রীতিমত অসুস্থ হওয়াতেও লাভ আছে কিন্তু দুয়ের মাঝখানে থাকার মত বালাই আর নেই। ২ বৈশাখ ১৩২৯।

রবিকাকা

[১০] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তুই যে চিঠিখানি লিখেছিস সেটি পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েচি। এবারে শিলাইদহে গিয়ে দেখ্‌লুম পদ্মা অনেক দূরে চলে গেছে— তেমনি দেখ্‌তে পাই তোদের জীবনের ক্ষেত্র থেকে আমার জন্মদিনের ধারা দূরে সরে এসেচে। মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়ে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন ছায়াময় হয়ে এসেচে— তার একটা কারণ, ছেলেবেলায় যাদের সঙ্গে আমার জীবনের পারিবারিক গ্রন্থি বাঁধা হয়েছিল তারা প্রায় সবাই কোথায় অপসারিত— পরলোকে এবং ইহলোকে; এখন

জোড়াসাঁকোর বাড়িটা নদীর সেই বালুময় পথের মত যাতে নদীর স্রোত আর চলে না। তা ছাড়া তোর সঙ্গে আমার একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে, মোটের উপর আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়, কোন মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে যে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়— অবশ্য, পরিবারের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি বিশেষ ভাল বাসি— কিন্তু সে তারা পরিবারের লোক বলে নয়। নিজের ছেলে মেয়েদের উপর একটা স্বাভাবিক স্নেহ সকলেরই আছে কিন্তু সে জিনিষটাকে পারিবারিক বলা চলে না। সেটা যথার্থ আত্মীয়তা, পারিবারিকতা নয়। দেবতার সঙ্গে অন্তরের বন্ধন, আর তাঁর সঙ্গে সম্প্রদায়ের বন্ধনে যে তফাৎ, এই দুইয়ে সেই তফাৎ। অনেকেরই কাছে নিজের ছেলের একটা মূল্য আছে সে ছেলে বলেই; কিন্তু তার উপরেও সেই ছেলের একটা পারিবারিক মূল্যকে সে বড় করে দেখে। সে কল্পনা করে তার ছেলে পরিবার নামক একটা পদার্থের বিশেষ একজন বাহন। রথীর সম্বন্ধে আমার সে ভাব কিছুমাত্রই নেই। বিশ্বভারতীর জন্যে আমার যা-কিছু সম্বল সমস্তই আমি খরচ করচি, এমন কি, তার চেয়ে বেশিই করচি। যখন দেখি রথী তাতে আপত্তি করে না, বরঞ্চ উৎসাহপূর্ব্বক যোগ দেয়— তাতে আমার ভারি আনন্দ হয়। সে আনন্দ কিসের? মুক্তির। কিসের থেকে মুক্তির? পরিবার নামক একটা abstraction-এর বন্ধন

থেকে। আমার যদি পারিবারিক বোধ প্রবল থাকত, তাহলে সেই পরিবার পদার্থের প্রতিমাটিকে তৈরি করা, সাজানো এবং তারি পূজা করবার জন্যেই আমার উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের অধিকাংশের উপরে টান পড়ত। আমার আনন্দ এই যে, রথী একদিকে আমার ছেলে আর একদিকে সে পরিবার নামক মায়াগণ্ডীর বাহিরের বাস্তব মানুষ—আমার আশ্রমে যে দেশ থেকে যে জাতের যে-কোনো ছেলে আসে রথী তারই রথী-দা',—ওর তরফ থেকে সকলের প্রতি ওর সেই রথী-দা'র দায়িত্ব আছে। তাদের জন্যে ও সর্ব্বদাই খাট্‌চে, ভাব্‌চে, প্লান করচে, খরচ করচে, তাতে ওর সুখ ছাড়া কিছুমাত্র বিরক্তি নেই। কখনো ও মনেও ভাবে না, যে প্রভূত টাকা এ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করেচি তাই দিয়ে কেন আমি, বিশেষ ভাবে না হোক্, প্রধানভাবে ওদেরই সংস্থান করে না দিচ্চি। সম্পত্তি জিনিষটাই ত হচ্চে পরিবার-পদার্থের বৃন্ত, তারই স্রোতকে ঘরের দিক থেকে বাইরের দিকে চালিয়ে দিলে পারিবারিক মানুষের পক্ষে সেটা কঠোর হয়ে ওঠে। আমার ঘরে সেই কঠোরতা স্বীকার করে নিতে কারো তেমন বাধ্‌ল না, তার কারণ আমার ঘরে পারিবারিক হাওয়া বয় না। যাই হোক পারিবারিক সত্তা আমার মধ্যে প্রবল নয় বটে, কিন্তু তাই বলে আমার মন যে কেবলমাত্র মানবসাধারণের আম-দরবারেই দিন কাটাতে ভালবাসে তা নয়— বিরাট মানবের মধ্যেই আমার আত্মা কৈবল্য লাভ করেচে তা বলতে

পারিনে— আমার মধ্যে খুবই একটা প্রবল ব্যক্তিগত সত্তা আছে। বিশেষ মানুষ এবং বিশ্বমানুষ দুটোই আমার কাছে সবচেয়ে সত্য— পারিবারিক মানুষ এই দুইয়ের মাঝখানের প্রদোষান্ধকারের একটা জিনিষ—আমার কাছে ও সুস্পষ্ট নয়— এইজন্যে ওর উদ্দেশে আমার ত্যাগের উৎসাহ জাগে না। একদিন সেক্রেটারির পদ পেয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম, যেই দেখ্‌লুম সেটা সম্ভবপর নয়, যে হেতুক ওটা আমাদের পারিবারিক জিনিষ, তখনি ওর জন্যে এক মুহূর্ত্ত বা এক পয়সাও খরচ করা আমার পক্ষে অপব্যয় বলে বোধ হল। কিন্তু আমার আশ্রমে ঐ জিনিষটাই— অর্থাৎ দেবতার অর্চ্চনা— বিশ্বমানুষের নয়, পারিবারিক মানুষের নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষের জিনিষ হয়েচে বলেই আমার হৃদয় আকর্ষণ করে নিয়েচে। আমি ছেলেদের ভালবাসি, সেই ভালবাসার সঙ্গে আমার পূজা মিশ্রিত হয়ে আমার কাছে বিশেষ রসের সামগ্রী হয়েচে, তাই এ'কে সময় দিতে সামর্থ্য দিতে আমার কিছুমাত্র বাধে না। যাই হোক্ আমার মধ্যে এই ব্যক্তিগত সত্তা অত্যন্ত সজীব আছে বলেই মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার দাবী জেগে ওঠে। সে বলে, আমি উপবাসী থেকে কাজ করতে আর পারিনে, সে বলে, একলা পথে শেষ পর্য্যন্ত চলে ওঠা বড় কঠিন। এই জন্যেই, এই বাহিরের সংসারে যতদূরেই চলে আসি না কেন, সে যত বৃহৎ অনুষ্ঠান হোক্, তার যত মহৎ গৌরব থাক্ তবু তোদের

সংসার থেকে যখন কোনো সাড়া পাই, তখন দেখি আমার জন্মদিনের সেই তারটিতে মরচে পড়েনি, এখনো তাতে সুর বেজে ওঠে।

তোর চিঠির পুনশ্চ প্রকরণে তুই মস্ত একটা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিস। প্রস্তাবটা ভাল তার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি এখন তিন-কুড়ি বছরের পরপারে, নিরতিশয় দূরঙ্গমিত হয়ে বসে আছি। এখন দেখেচি মনের ভিতরে একটা ক্লান্তি এসেচে, সহজে কোন নূতন দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে করে না। কিছুদিন আগে কতকগুলি ছেলেদের কবিতা লিখেছিলুম। লেখবার একমাত্র তাগিদ ছিল বয়স্ক লোকের দায়িত্ববোধের জীবনকে ক্ষণকালের জন্যে মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছায়। খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছি এই ঘটনাটির মধ্যে অস্তিত্বের মূলসত্যটি আমাদের জীবনের ভূমিকারূপে লিখিত হয়েচে, এই কথাটি কিছুকাল থেকে বারবার আমি ভাবচি এবং শিশুর কবিতায় এক-রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচি। দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে পাকা করে তোলে, সে অবস্থায় সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্যসাধন করচে বলে গৌরব বোধ করে। জানে না সে যা বলে তাতে জগৎকর্ত্তার নিন্দা করা হয়, কেন না খেলা ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই— তাঁর দায় নেই বলেই তিনি আনন্দময়। আজকাল আমার প্রায়ই সেদিনের কথা মনে পড়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল, যখন আমার কোনো দায় ছিল না। হাসিকান্না

খুব তীব্র ছিল, কিন্তু সে সমস্তই জীবনের লীলার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাতে যে কোনো ফুল ফোটেনি, ফল ফলেনি তা নয়— তার অনেক ফুল এখনো ম্লান হয়নি, তার অনেক ফল এখনো টিঁকে আছে। সেই ফুলে ফলেই পৃথিবীতে আমার পরিচয়। যে কাজ দায়িত্বের সে কাজ ক্ষণকালের— যে কাজ খেলার সৃষ্টি সেই কাজেই চিরকালের ছাপ। আমার ভয় হচ্চে বিশ্বভারতীতে খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে। এরকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অংশটা আইডিয়া সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দ— আর যে অংশটা নিয়ম ও ব্যবস্থা সেইটেই হচ্চে বিষম দায়— সেটা যদি আইডিয়াকে চাপা দিয়ে আটে ঘাটে আষ্টে পৃষ্টে পাকা হয়ে ওঠে তা হলেই পাকা বুদ্ধির লোকে খুসি হয়ে ওঠে, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার তাতে বিতৃষ্ণা হয়। মানুষ মুক্তি পেতে চায়, তার মানে সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ ও অধিকার পেতে চায়; অর্থাৎ কাজ পরিহার করে মুক্তি নয়, কিন্তু খেলাকেই কাজ করে তুলে তার মুক্তি। বৈষ্ণবের তত্ত্ব হচ্চে যুগল মিলনের তত্ত্ব— কাজের সঙ্গে খেলার একাত্ম মিলনই হচ্চে সেই যুগলমিলন। যাই হোক্ এই সুদীর্ঘ আলোচনা শুনে ভয় পাস নে। তোর মনে হতে পারে যে, যে-হেতু মৌনং সম্মতি লক্ষণং সেই কারণে বক্‌নি অসম্মতি লক্ষণং। তোর অনুরোধ মনে রইল, হঠাৎ হয়ত একসময়ে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে উঠ্‌বে। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩২৯

রবিকাকা

[১১] ওঁ Srabasti

Colombo

কল্যাণীয়াসু

তোর বিজয়ার প্রণাম সমুদ্র পার হয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছল। রথীরা এসে পৌঁছবে কাল সন্ধ্যাবেলায়। আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি— হাতে নিয়ে বল্‌লে ঠিক হয় না, কণ্ঠে নিয়ে। এ বিদ্যা আমার অভ্যস্ত নয়, তৃপ্তিকরও নয়। সুতরাং দিনগুলো যে সুখে কাটচে তা নয়। জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ সোনার স্বপন নিয়ে অতীত হয়েচে, জীবনের সায়াহ্ন সোনার সন্ধান নিয়ে ভীত হয়ে উঠল। যখন মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়— তখন বুঝতে পারি যখন কবিত্ব রচনা করেচি সেই ছিল আমার বাস্তব কাজ, আর আজ যখন শুভানুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেচি এই হচ্চে মায়া। এ কি টিঁকবে? আইডিয়া জিনিষটা সজীব, কিন্তু কোনো ইনষ্টিট্যুশনের লোহার সিন্ধুকে ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না— মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্ত্তে গেল। দেশের চিত্তের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই বিপুল কাঁটাবন— সেখানে খোঁচার আইডিয়ার মধ্যে ফসলের আইডিয়া কি জায়গা পাবে? যাই হোক আমাদের শাস্ত্র বলেচেন বপন করতে, ফলের হিসেব করতে নিষেধ করেচেন। অতএব এমনি করেই দিন কাট্‌বে, তার পরে দিন শেষ হয়ে গেলে আমার দায় যাবে চুকে।

গৃহস্বামীর চায়ের টেবিলে ডাক পড়েচে, চল্লুম। ইতি
৩০ আশ্বিন ১৩২৯

রবিকাকা

[১২] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এম্পায়ার একজিবিশনের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ রাখতে নারাজ, তার প্রধান কারণ যাঁদের এম্পায়ার তাঁরা আমাদের এম্পায়ারভুক্ত করে রেখেচেন যেহেতু আমরা না হলে তাঁদের তোষাখানা শূন্য হয়, সেটা ঐশ্বর্য্যহানির লক্ষণ। আমি তা নিয়ে নিজেদের অযোগ্যতাকেই দোষ দিই কিন্তু তবুও যথাসম্ভব মান বাঁচিয়ে চলবার খাতিরে, তাঁদের ভোজের পাত পাড়বার বেলায় আমাদের ডাক পড়লে, আমি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই। এম্পায়ার একজিবিশনে শান্তিনিকেতন থেকে ছবি গেলে আমাদের জাত যাবে।

আমি এখানে এসেও ব্যস্ত আছি। মনে মনে ছুটির জন্যে উপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত করচি, পথের মধ্যে শনিগ্রহ সে দরখাস্তগুলো গাপ্ করে দেয়। বোধ হয় জানিস্ আমার কর্ম্মস্থানে শনিগ্রহ— তার স্বভাব হচ্চে এই যে, সে বেদম কাজ করিয়ে নেয় আর দাম চাইলেই দাঁত খিঁচোয়। ঘরে বাইরে সবাই বিশ্বভারতীর নাম শুনলেই বলে, আগে ঘরের কাজ

সারো, তার পরে বাইরের দিকে মন দিয়ো— আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম। আমি তাদের দোষ দিইনে, এর মধ্যে শনিগ্রহের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই। বড় আইডিয়াকে "বড়" বদনাম দিয়েই লোকে গাল দিয়ে থাকে। আগে ছোট পরে বড় একথা যদি সত্য বলে মানি, তাহলে বল্‌তে হয়, আগে চাকা পরে গাড়ি। চাকার মধ্যে গাড়ি নেই, কিন্তু গাড়ির মধ্যে চাকা আছে। সমস্ত গাড়িকে যে মানুষ সত্য করে জানে সে-ই ত চাকাকেও সত্য বলে জানে। এই জন্যেই কথা আছে আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। আমরা ছোটর সঙ্গেই সত্য ব্যবহার করবার জন্যে বড়কে সত্যরূপে পেতে চাই। সেই লোকই ভাল গৃহী, যে লোক ভাল মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যত্বে যে লোক সত্য, গৃহিত্বে সেই লোকই সত্য। মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে গৃহিত্বকে সম্মান করা, গুরুর গালে চড় মেরে তার পায়ে তেল দেওয়া।

আজ এই পর্য্যন্ত, যেহেতু বিস্তর চিঠি লেখা বাকি আছে। ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৩০

রবিকাকা

[১৩] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এমন একদিন ছিল যখন আমার জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ক্রমে কখন

এক সময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মত। সেই আমার নব জন্মের জন্মদিন এতদিন চলে এসেচে। যেটাকে আমার জন্মান্তর বললুম তাকে আমার পরলোক বলাও চলে। অর্থাৎ যারা পর ছিল তাদের মধ্যেই একদিন আমার অভ্যর্থনা সুরু হয়েছিল। তোদের লোক থেকে এই লোকান্তরগতকে তোরা হয় ত তেমন স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাস্‌ নি। যে ঘাট থেকে জীবন যাত্রা প্রথম সুরু করেছিলুম, আমার কাছেও মাঝে মাঝে তা ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছিল।— কিন্তু এটা হল মধ্যাহ্ন কালের কথা। এখন অপরাহ্নের মূলতানী সুর হাওয়ায় বেজে উঠেচে। আলো কমে' এল। এখন দেখতে পাচ্চি ভোর বেলা আর গোধূলি বেলার একই গোত্র। অর্থাৎ প্রথম আলোয় যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়, শেষ আলোয় সেইখানেই যাত্রা শেষ হতে চায়। সেইটেই হল প্রাণের টানের জায়গা। সেখানকার অন্নপূর্ণা জীবনের প্রথম ক্ষুধার অন্ন খাইয়ে দিয়ে যাত্রাপথে এগিয়ে দেন— তিনি অপেক্ষা করেই বসে থাকেন ক্ষুধিতকে দিনশেষের ভোজে ডেকে আনবার জন্যে।

এবারে যখন থেকে শরীর অপটু হয়ে পড়ল, তখন থেকেই আমার কারখানা ঘরের দরজা যেন বন্ধ হয়ে আস্‌চে। বেরিয়ে এসেই দেখি যেখানে ভিড় নেই সেখানে আমার বালককাল। সেখানে যে বিশ্বপ্রকৃতি ভোর বেলায় আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে লালন করেছিল, সেই প্রকৃতিই সন্ধ্যাযূথীর মালা আমার জন্যে গেঁথে রেখেচে। পেয়েছি তার স্পর্শ, তার

ধূপছায়ারঙের আঁচলে আমার মনটাকে ঘিরেছে। আবার আমি ফেলে দিয়েছি আমার বই, আমার কাজ। আবার আমার মন পলাতক। সমস্ত দিন কিছুই করিনে কেবল সাম্‌নে চেয়ে আছি— দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে। শিলাইদহে একটি বৈষ্ণব গানে শুনেছিলুম, শ্যামের 'নি-কড়িয়া'-বাঁশির কথা, অর্থাৎ অকিঞ্চনের সঙ্গীত। তার দাম নেই, শুধু রস আছে। বালক বয়সে আমরা সত্যের সেই অকিঞ্চনতাকেই সহজে জানি— তখন খেলবার জন্যে সোনারূপোর দরকার হয় না। তখন জানি উপকরণটা লক্ষ্য নয়, খেলাটাই লক্ষ্য। খেলা যখন ভুলি তখনি খেলনার দাম নিয়ে মারামারি বেধে যায়। আজ বাইরে বসে খেলনার চেয়ে খেলার সাথীকেই বেশি করে দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মানে বালকটা লোকান্তরগত হয়নি। ৬৫ বছর বয়সের গেটের কাছে যেখানে সানাইয়ে পূরবী বাজ্‌চে সেখানে সেই অকিঞ্চনটা ধূলোয় বসে আছে— সে ভোলা তেম্‌নি ভুলেই রইল তার বুদ্ধি পাক্‌ল না; যাকে প্রবীণেরা মায়া বলে বর্জ্জন করে সেই অনিত্যের খেলাঘরে সে কোন্ আশ্চর্য্যকে দেখ্‌তে পেল? যা'কে দেখেছিল পূর্ব্বদিগন্তে উষার প্রদোষ আলোয়, তাকেই দেখ্‌লে পশ্চিম সিংহদ্বারে তারার প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত। যেতে যেতে বলে যেতে পারব, দেখেছি।

তোরা থাকলে এবারকার জন্মোৎসবের রস পূর্ণ হত।

শরীরের কথা আজ আমার ভাববার কোনো গরজ নেই— ছুটির সুধায় মন ভরে আছে। সেই ছুটির রসসম্ভোগে গায়ের

জোরের তেমন বেশি দরকার বোধ করচি নে— গায়ের জোরটা হয় ত উৎপাত করতে পারত।

তুই আমাকে বই পাঠিয়েছিস্। অনেকদিন থেকে বই পড়া বন্ধ আছে। বই পড়ার হাত এড়াবার জন্যে ছেলেবেলায় রোগ কামনা করতুম কিন্তু এমনি দুর্জ্জয় স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলুম যে কিছুতেই অসুখ করতে চাইত না। তখন যম-দূতেরাও বালকের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিয়েছিল। বালককালের সেই কামনা এতদিন পরে আজ সিদ্ধ হল। শরীরটা জবাব দিয়ে বসেছে— আমার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ। চিঠি লিখিনে বই পড়িনে, সভাপতিটা বিদায় হয়ে গেছে। এবারকার জন্মদিনে বই আমার ঠিক উপহার নয়। এবারে ঘাটে-ফেরা নৌকোর পক্ষে তীরের থেকে শুধু উলুধ্বনিই যথেষ্ট হত।

এ চিঠি থেকে হয়ত একটা কথা ভুল বুঝতেও পারিস্। প্রভাতের সঙ্গে সায়াহ্নের যেমন একটা মিল আছে তেমনি একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাহ্নের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গূঢ়ভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে। খেলাঘর থেকে খেলাঘরেই ফিরতে হবে কিন্তু মাঝখানের যাত্রাটা মহামূল্য। পড়ে'-পাওয়া খেলার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় যদি চাই তবে তাকে খুঁজে পাওয়া চাই। খুঁজ্‌তে গিয়ে খেলাটা ভুল্‌লেই ক্লান্তি। আশা করি আজ থেকে আমার খোঁজাও চল্‌বে খেলাও চল্‌বে, দুটো এক হয়ে যাবে।

তোদের শরীর সুস্থ হোক্, বর্ষাও নামুক তার পরে দুজনে একবার এখানে এসে দেখাশুনো করে যাস্।

কেউ কেউ প্রস্তাব করচেন জাপানযাত্রীর ডায়ারিটা তর্জ্জমা করবার। কোনোদিনই ও কাজটা আমার প্রিয় নয়, এখন ত মনে করলেও বিভীষিকা লাগে। ভয়ে ভয়ে বলচি যদি তোর হাত খালি থাকে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারিস। চরকা কাটার চেয়ে হয়ত রস পেতে পারবি। একবার খাড়া করে দিলে আমি সেটাকে রঙ করে দিয়ে প্রতিমাটাকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করতে পারি। বইখানা যদি না থাকে এবং যথেষ্ট অবসর ও শরীরের শক্তি যদি থাকে তবে প্রশান্তকে টেলিফোন্ করে দিলেই সে তৎক্ষণাৎ বই জুগিয়ে দেবে।

আজকাল চিঠি লিখ্‌তে একেবারেই গা লাগে না। সেই বুঝেই এত বড় লম্বা চিঠির মূল্য নিরূপণ করতে পারবি। প্রমথকে দ্বিতীয় চিঠি লিখ্‌লুম না, কারণ যেখানে দুইয়ে-এক সেখানে একে-দুই আপনিই হয়ে যায়। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩১

রবিকাকা

---

[১৪] ওঁ * 10. Cornwallis Street
Calcutta
পোস্টমার্ক
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

কল্যাণীয়াসু

কখন্ লিখ্‌ব বব্? আমি সমস্ত দিন এক মুহূর্ত্ত ফাঁক পাইনে। তার উপরে আবার আগামী সোমবারে অরূপ রতন অভিনয় করতে হবে— তার উপরে কলেজের ছাত্ররা টানাটানি

বাধিয়ে দিয়েচে। তবে যদি ইচ্ছে করিস শনিবারে মুখে মুখে অল্প কিছু বল্‌তে পারব। ভালো করে ভেবে বলবারও সময় নেই। তোর ওখানে ক'দিন ধরে যাবার চেষ্টা করচি কিছুতেই হয়ে উঠ্‌চেনা।

রবিকাকা

[১৫] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্। নাৎনীরা আমার গ্রহ; তা'রা আধুনিক জ্যোতিষের নিয়ম ছাড়িয়ে গেছে— তারাই রবিকে নিজের চারদিকে প্রদক্ষিণ করায়— অর্থাৎ আমার চেয়ে তাদের টানের জোর বেশি। রবিকে যে কলকাতার কক্ষ থেকে বিচলিত করেছে তুই তার হিসাব বের করেছিস্;— ঠিক করেছিস এখানে একটি গ্রহ বিরাজমান আছে— শুনেছি এই রকমের একটা হিসাব অনুসরণ করে নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। কিন্তু আমার গতিবিধির হিসাব খুব জটিল। আমার আকাশে একটা বড় নীহারিকামণ্ডল আছে— সে হচ্চে পরিণত ও অপরিণত জ্যোতিষ্কের একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণী— কোনো গ্রহের টান তা'র কাছে লাগে না— তারি আমন্ত্রণের আকর্ষণে এখানে এসেছি— তার আকর্ষণচক্রের পরিধি অতি বিপুল ও তার বেগ অতি

প্রবল। এর হিসাবটাকে তোরা গণ্য করতে চাস্‌নে বলে ভুল করিস্‌। এরই কেন্দ্রের থেকে যে-তলব আস্‌চে সে আমাকে অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা বা অশক্তি কোনো ছুতোতেই নিষ্কৃতি দেবে না। ডাক্তারের নিষেধ এ'কে ঠেকাবে কি করে'?

যাক্‌গে। মোটের উপর কলকাতার চেয়ে এখানে ভালোই আছি। ১ বৈশাখ ১৩৩২

রবিকাকা

---

[১৬] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন
২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। এখানে এসে খোলা আকাশের তলায় একটু আরাম পেয়েছি। যদি দেখি মনটা সুস্থ হতে পাচ্চে না তাহলে মনে করচি Waltairএ দৌড় মারব— সেখানে একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েচি। যাবার সময় চল্‌তি গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পথের থেকে ফিরে আসব না এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। প্রমথকে বলিস্‌ তার সম্পাদকীয় চিত্ত যেন উদ্বিগ্ন না হয়। আমি শেষবর্ষণের আর-একটা কপি নিয়ে সংশোধনের কাজ সেরে দিয়েচি— নুটু সেটা নকল করচে, হয়ে গেলেই তোদের পাঠাব— তোরা

দার্জ্জিলিং যাবার আগেই যদি পাস্ তবে নিশ্চিন্ত হব। আগামী সোমবারের আগে পাঠানো সম্ভব নয়, কারণ রেজেস্ট্রি আপিস কাল রবিবারে বন্ধ।

রবিকাকা

[১৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোর কেয়ারে কাল সুরেনকে একটা লেখা পাঠিয়েছিলুম সেটা তোর মারফৎ যথাস্থানে পৌঁচেছে ত? এখানে আজ ঘন মেঘ করে বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ। বেশ একটু ঠাণ্ডাও পড়েচে— চারদিকে শিউলিফুল বর্ষণ হচ্চে— কৃষ্ণপক্ষের রাত্ত প্রতিদিন চাঁদের অবগুণ্ঠন লম্বা করে দিচ্চে। ১৯ আশ্বিন ১৩৩২

রবিকাকা

[১৮] ওঁ পোস্টমার্ক

কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

অসুখ করে কলকাতায় পালিয়ে আসতে হয়েছে সে কথা সত্য। মীরা কিছুদিন হল তার বন্ধু শ্রীমতীর সঙ্গে আমেদাবাদ বেড়াতে গিয়েছে— কথা ছিল বৌমা এসে চার্জ্জ বুঝে নেবেন— ঠিক দিনে চিঠি পাওয়া গেল তিনি প্রশান্তদের

সঙ্গে রাজপুতানায় ভ্রমণ করতে যাত্রা করলেন। যখন মনে মনে বল্‌চি আমি স্বাধীন, আমি আত্মপর্য্যাপ্ত— এমন সময়ে বিধাতা আমার দর্পহরণ করবার জন্যে শরীর দিলেন ভেঙে। জাহাজভাঙা রবিনসন্‌ ক্রুসোর মত বেদনা-সমুদ্রে ঘেরা নির্জ্জনতার মধ্যে আট্‌কা পড়লুম। সেখানে গুড্‌ ফ্রাইডের অভাব ছিল না কিন্তু রোগের দিনে তাদের নিয়ে চলে না। এখন আছি তেতালার কোণের ঘরে— কমল হয়েছেন অভিভাবক — সুখে দুঃখে দিন চলে যাচ্চে। এরই মধ্যে রোগশয্যায় স···দূত পাঠিয়েছিল আমাকে ধরবার জন্যে। সে কালীপূজোর নূতন ব্যাখ্যা ক'রে হিন্দুসমাজের চমক লাগাবার আয়োজন করচে, তার ইচ্ছে আমি হই সভাপতি। এখন বুঝতে পারবি বিধির বিধানে রোগ জিনিষটাও নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে খালাস পেয়েছি।·· বেচারা কালীর জন্যে তোরা প্রার্থনা করিস্‌। আমারো প্রার্থনা করবার সময় হল— কারণ দেখা যাচ্চে আমার ফাউণ্টেন পেনের কালী ফুরিয়ে এসেচে। ৩১ আশ্বিন ১৩৩২

রবিকাকা

[১৯] ওঁ পোস্টমার্ক

কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

এবার আমার ব্যামোটা একটুও শ্রুতিসুখকর হয়নি। সাধারণত রোগ দুঃখ সম্বন্ধে আমি অনুদ্বিগ্নমনা হবার চেষ্টা

করে থাকি এবারে আমাকে তার উদ্বেগে শান্তিনিকেতন থেকে এখানে খেদিয়ে এনেছে। প্রথম প্রথম আমার পীড়া কর্ণ ধরে যেরকম ঝিঁকে মারছিল এখন আর ততটা বেগ নেই কিন্তু চেপে ধরে আছে। কানে শুন্‌চি খুব কম, ডাক্তার বলচে ভিতরের প্রদাহটা কমে গেলে আবার শুন্‌তে পাব। তুই চিঠিতে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিস, যে ডাক্তারের কথা আমি কানে তুলি নে সে কথা সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডাক্তার আমার কানে কথা প্রয়োগ বন্ধ করে অন্য রকম প্রয়োগবিধি সুরু করেছে— উপদেশের চেয়ে তাতে বেশি ফল পাওয়া যাবে বলে সকলে আশা করচে। আমার সেই তেতালার ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। মনটা উড়্‌ উড়্‌ করে কিন্তু কানটা রয়েছে ডাক্তারের হাতে। কতদিনে যে খালাস করে নিতে পারব তার কোনো ঠিকানা নেই। বোলপুর থেকে মরিসকে আনিয়ে নিয়েছি— সে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, ডাক্তার এলে তার সহকারিতা করে, যথাসময়ে ভোজ্য প্রস্তুত হলে তৎ-সম্বন্ধে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরাহ্ণে বায়ু সেবনের জন্যে মোটর-রথযাত্রা আমার পক্ষে উপাদেয় ব'লে দু'দিন থেকে কানের কাছে মুখ এনে উচ্চস্বরে পরামর্শ দিচ্চে— তার সেই হিতবাণী আমার চেয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্চে ওবাড়ির থেকে গগনরা।

এ রকম পীড়া হলে মন অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নিরস্ত হয়ে ঐ একটি বিষয়েই একাগ্র হয়ে ওঠে। আমার চৈতন্য এখন কানময় হয়ে বিশ্বকে বিস্মৃত হয়েছে। যোগশাস্ত্রে

এঁকেই ত সমাধিলাভ বলে। কৈবল্যলাভের আর সবই হয়েছে কেবল পরমানন্দ রসটার উপলব্ধি এখনো যেন বাকি আছে বলে বোধ হচ্চে।

তোদের বোধ হয় অবতরণের সময় হয়ে এল—শৈলবিহার-বিলাসীদের মৈস্সুম ফুরিয়ে এসেছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ। এবার যখন জোড়াসাঁকোয় আসবি তারস্বরে গলাটা সেধে আসিস, নইলে তোদের সঙ্গে আমার দেখাশুনোর শেষ অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩২

রবিকাকা

[২০] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

দিনরাত লোকজন, কথাবার্ত্তা, কাজ কর্ম, তার উপরে এক অভিভাষণ কাঁধে চেপেছে। মনটা ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ করচে। টাকা ছুঁলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের যেরকম সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ উপস্থিত হ'ত কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেই রকম হয়। শীতের মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আকাশের পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন আমার এই খোলা ঘরে দুই চক্ষু দিয়ে তাই পান করি আর কর্ত্তব্যকর্ম্ম টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বপ্নলোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। যখনি একটু সময়

পাই মনটা ছুটে ছুটে যায় সেই আমার খ্যাতিহীন উদ্দেশ্যহীন সাবেক দিনগুলোর ঠিকানা খুঁজে বের করতে। আজ তাদের ছায়ারূপ আর ধরা যায় না। কিন্তু লেখার তাগিদ মনের মধ্যে নেই। সে তাগিদ সম্পাদকদের কাছ থেকে আসে কিন্তু এখানকার সাহিত্যিক রাজ্যের হাওয়ার মধ্যে নেই। নিজের ভিতরকার গরজে লেখবার বয়স ও উৎসাহ চলে গেছে। তাই নানা রকম হিতকর কাজ করেই দিন বৃথা নষ্ট হচ্চে, বেশ রসিয়ে কুঁড়েমি করবারও সুযোগ পাচ্চিনে; অথচ তারি তাগিদ এই খোলা মাঠের মধ্যে এই শীতের বেলায় চারিদিকের মৃদুরৌদ্রতপ্ত বাতাসে। ইতি ২ ডিসেম্বর ১৯২৫

রবিকাকা

---

[২১]

* Autour du Monde
9. Quai du 4-Septembre,.9
Boulogne-Sur-Seine
পোস্টমার্ক এস. কেনসিংটন
৩১ জুলাই ১৯২৬

কল্যাণীয়াসু

বিবি, কাল আর্য্য এসেছিল, বাড়ি ফেরবার জন্যে ছট্‌ফট্ করচে। আমাকে বারবার করে তোদের জানাতে অনুরোধ করেচে। বল্লে শিবুকে অনুরোধ করে করে চিঠির জবাব পর্য্যন্ত পায় না। বোঝা গেল, শিবুর অবস্থা সম্প্রতি মোহাচ্ছন্ন। দাদা প্রভৃতি অনতি-আবশ্যক মানুষদের প্রতি তার মন নেই।

যাই হোক্ তার একটা গতি করে দিস্। কোনো কাজকর্ম্ম নেই, এমন করে প্যারিসে পড়ে থাকা তার পক্ষে স্বাস্থ্যকর হতেই পারে না।

এদেশে আমার অভিযানের ইতিহাস বহুবিস্তৃত। লেখবার মত তেজ ও উৎসাহ নেই, বরঞ্চ মনে একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রশান্তরা বোধ হচ্চে কাগজে ঢাক পিটোচ্চে— তোদের হঠাৎ মনে হতে পারে আমারি ঢাকা ঢাকে ও কেবল কাঠি লাগাচ্চে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ রকম আত্মপ্রচারে আমি নিরতিশয় লজ্জিত হই। ওরা সেইজন্যে আমাকে গোপন করেই এ কাজ করে। অর্থাৎ এই ব্যাপারের প্রকাশ্যতা কেবলমাত্র আমাকে বাদ দিয়ে।

বড় বড় ডাক্তার আমার দেহকে পরীক্ষা করে বলেচে, যন্ত্রটা সর্ব্বাংশেই মজ্‌বুৎ— কেবল পেট্রোল ফুরিয়েছে। সেইটের জোগান যাতে স্থায়ী হয় অক্টোবরে ভিয়েনায় তারি উদ্যোগ হবে। এদিকে মনটা খাঁচার পাখীর মত দেশের বাসাটার জন্যে ছট্‌ফট্ করে মরচে।

আজ আর খানিক বাদেই লণ্ডনে পাড়ি দেব। সেখানে অগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত মেয়াদ। তার পরে নরোয়ে স্ুইডেন জর্ম্মানি ইত্যাদি ইত্যাদি— তারপরে বহুদূরে নবেম্বরের উপসংহারে স্বদেশযাত্রার উত্তরকাণ্ড— মনে করলেও মন পুলকিত হয়ে ওঠে— সেই বোম্বাইয়ের তালীবনরাজিনীলা বেলাভূমি।

রবিকাকা

[২২] Prague

কল্যাণীয়াসু

তোর রাখী পেলুম। কিন্তু বিষম ঘোরে ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো বন্ধন কোথাও ধরে রাখচে না। অথচ এ'কে মুক্তি বলে না— মন নিষ্কৃতি চাচ্চে তবু গোলেমালে ছুটি কিছুতেই মেলে না। আদর অভ্যর্থনার বিরাম নেই— সংসারে তার মূল্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান, শান্তিতে স্থির প্রতিষ্ঠা। নিজের মধ্যে এই এক দ্বন্দ্ব— লোভী তারস্বরে বলচে যেটা পাচ্চ সেটা খুব করে নিয়ে নাও, কিন্তু তার উপরতলায় যে থাকে সে মন্দ্রস্বরে বল্‌চে, ফুটো কল্‌সিতে বারে বারে বৃথা জল ভরবার চেষ্টা না করে পূর্ণতার সমুদ্রে এক ডুবে তলিয়ে যাও। যে চক্র বাইরের পরিধিরেখায় ঘুরচে সে বল্‌চে, "আমার সঙ্গে ঘোরো, সেই হচ্চে মজা।" কিন্তু তার অন্তরের কেন্দ্রস্থলে যে আছে সে বল্‌চে "আমার মধ্যে স্তব্ধ হও তাহলে একই সঙ্গে গতি স্থিতি দুইয়েরই পূর্ণ সামঞ্জস্য পাবে।" বুঝি স্পষ্ট, কিন্তু অবুঝটাকে বাঁধতে পারে কার সাধ্য! কূলের খবর জানি, আজ দিনের শেষে সেইখানেই তরী ভিড়োবার কথা, কিন্তু যখন সব পাখী বাসায় ফিরচে তখনো সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় স্রোতের টানে হুহু করে চলেচি— বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুন্‌তে পাচ্চি, থাম্‌রে থাম্‌, আয়রে আয়। এই সব উপস্থিত বরমাল্যের লোভ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে চরম জয়মাল্যের জন্যে রাজদরবারে শেষ দাবী জানাবার জন্যে একান্ত ইচ্ছে করে। কিন্তু দুটো ইচ্ছের দ্বৈরাজ্যের উপদ্রবে স্বারাজ্য মেলে না। একটা ইচ্ছের সঙ্গে

রক্তের টান, সে বলে পদে পদে আমি নগদ মজুরি চাই— আর একটা ইচ্ছে বলে, আমি মজুরি চাইনে আমি হুজুরী চাই— কর্ত্তা হ'ব। মেয়ের বিয়েতে পণ নেবার প্রস্তাবে কর্ত্তায় গিন্নিতে মতভেদ হলে যেমন হয় এও তেমনি— কর্ত্তা মাথা উঁচু করে বল্‌চেন আমি এক পয়সা চাইনে— গিন্নি লুকিয়ে কর্ত্তাকে ভাঁড়িয়ে ফর্দ্দ পাঠাচ্চেন। এমন স্থলে প্রায় গিন্নিরই জিৎ হয়। যাই হোক্ মনের মধ্যে থেকে থেকে আশা হয় যে, একটা রাস্তা পাব।— কেননা বেদনা যে মরেনি, অসাড় হয়নি মন। সব সময়ে পথ দেখতে পাইনে বটে কিন্তু দূরের আলোটা দেখ্‌তে পাই তো— তাতেই রাত্রের কোনো একটা প্রহরে বাসায় ফেরাবে। এই গেল আমার বর্ত্তমানের মনের কথা। তার পরে সংসারের অনেক কথা আছে, তাতে মনটাকে কম পীড়া দেয়নি।… র কথা ভেবে কোনো কিনারা পাইনে, কেবল ভিতরে একটা নিরন্তর কান্না থেকে যায়। তার উপরে যে কাজ ঘাড়ে নিয়েচি, তার বোঝা কিছুতেই হাল্কা হতে চায় না— অথচ মন দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়েচে— শিথিল ক্লান্তহাতে দাঁড় ধরে গান গাচ্চি—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না॥

সবুজপত্রের জন্যে হাল আমলের গোটাকয়েক গান পাঠাই। তোরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ নিবি। ইতি
৯ অক্টোবর ১৯২৬

রবিকাকা

[২৩] ওঁ * 6 Dwarkanath Tagore Street

Calcutta

পোস্টমার্ক

শিলং

কল্যাণীয়াসু

একেবারে উল্টো। কলকাতার চেয়ে এখানে সময় আরো কম। প্রথম দফায় আমার বুকে ব্যথা হয়ে জ্বর গেল। দ্বিতীয় দফায় পুপের জ্বর। তৃতীয় আগন্তুকের সংখ্যা এখানেও কম নয়। চতুর্থ বিচিত্রার জন্যে একটা গল্প লেখা চাই। গল্প বিচিত্রার গরজে ততটা নয় যতটা আমার নিজের গরজে। অর্থাগমের আর কোনো রাস্তা জানিনে, কলমের জোরে যা পারি। গল্প লিখ্‌তে হলে একমনে লেখা দরকার। কলমটাকে নানা খুচরো কাজে খাটালে আসল কাজে সে এলিয়ে পড়ে।

যামিনীকান্ত সেন কলাসরস্বতীর একনিষ্ঠ উপাসক। এত বড় নিষ্ঠা কি নিষ্ফল হতে পারে? তিনি বর পেয়েছেন। সে বর হচ্চে ললিতকলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাশক্তি। মুস্কিল এই যে, সে বর ত অধিকাংশ লোকেই পায়নি, এই কারণেই জনসাধারণের কাছে তাঁর ব্যাখ্যার যথেষ্ট আদর হবার আশা বিরল। অতএব বাহিরে সিদ্ধির আশা না করে অন্তরে উপলব্ধির আনন্দ নিয়ে যদি তিনি খুসি থাক্‌তে পারেন তাহলেই তাঁর আর মার নেই।

তোর চিহ্নিত সবুজপত্রখানা নিশ্চয় জোড়াসাঁকোর কোথাও অজ্ঞাতবাস যাপন করচে।

আমরা চা বাগানে নেই— একটা উচ্চ শিখরে আছি— ঠাণ্ডা তার সন্দেহ কি— তবে কিনা হিমকলেবরের মতো না। ইতি ২০মে ১৯২৭।

রবিকাকা

[২৪]

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন
৭ নভেম্বর, ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

ফিরে এসেচি— সন্দেহ নেই। ঘাটে থেকে নেমেই আবার ইচ্ছে করচে একদৌড়ে পালাই। এত মিথ্যে কথা বাজে কথা অন্যায় কথা— মনকে ছোটো করে দেয়— মানব ইতিহাসের পার্সপেক্টিব ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে, নিজেকেও যেন স্পষ্ট করে প্রশস্ত করে দেখতে পাইনে— একেই বলে কারাবরোধ— নিজেকে বৃহতের মধ্যে পাওয়ার পথ বন্ধ হওয়াই বন্ধন। 'আমার জন্মভূমি'তে সেই বন্ধনটাই তুচ্ছতার জালে চারদিক থেকে জড়িয়ে থাকে। এখানে বাণী নেই, কেবলই খবরের কাগজের কুলোর হাওয়া সাঁ সাঁ করচে— একটুও ভালো লাগে না। প্রমথকে বলিস্ দেখা হলে সব কথা হবে।

রবিকাকা

[২৫]

শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক
৯ জুলাই, ১৯২৮

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসে বিশেষ ক্ষতি হয় নি। শরীর হয় ত বা অল্প একটু ভালো হয়েচে, সেটুকু কল্পনা হওয়াও অসম্ভব নয়। কাজকর্ম্মের দাবী স্বীকার করিনে— একমাত্র মহাসনে নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করি, কিছুতে তার থেকে বিচলিত হইনে।— যা উপসর্গ আছে তার উপরে আর বাড়াবার চেষ্টা মাত্র নেই— কিন্তু প্রতিদিনই বয়স এক একদিন বেড়ে চলেচে সেটাকে ঠেকাবার কোনো উপায় দেখ্‌তে পাইনে। বস্তুত জরাটাই হোলো ব্যাধি— সে ব্যাধির অবসান সমস্তর অবসানে— সেটার বিরুদ্ধে যত আয়োজন করি— ওষুধ খাই ডাক্তার ডাকি, তাতে কেবল যমকে হাসানো হয়। তার পরিহাস আমি সইতে পারিনে কারণ আমি তাকে ভয় করিনে। সেমিকোলনের উচিত হয় না দাঁড়িকে স্মরণ করে আঁৎকে ওঠা— সেটাতে কেবল ভীরুতা নয়, মূঢ়তাও বটে। ইতি
৯ জুন, ১৯২৮

রবিকাকা

---

[২৬] ওঁ [কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

বংশাবলীর নিয়মানুসারে তুইও বলতে ছাড়বিনে আমিও শুনব না— এটা একই স্বভাবের অন্তর্গত।

নীলরতনবাবু আমার সকল রকম পরীক্ষা নিঃশেষ করেচেন। রক্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশে অন্তত দুই আউন্স রক্ত দিয়েছি। এটা যদি দেশকে দিতে পারতুম তাহলে বীরপুরুষ বলে খ্যাতি থাকত। যাই হোক্ পরীক্ষার ফল ভালো— একেবারে ফুল মার্কা— নীলরতনবাবু বল্‌লেন রক্ত ও শরীরযন্ত্র প্রভৃতিতে ৬৭ বৎসরের কোনো দাগ পড়েনি। দেহটা ভিতরে ভিতরে এখনো তরুণ আছে। ক্লান্তির কারণ হচ্চে পূর্ব্বকৃত অতিশ্রম— কিন্তু এর উল্টোটাও ভালো নয় যাকে বলা যায় অশ্রম— অতএব মধ্যপথ হচ্চে আশ্রম— কাল সকালে নটার গাড়িতে সেই পথেই যাচ্চি। বাজে কাজেই মানুষের ক্ষতি করে— আসল কাজে কোনো অনিষ্ট হয় না। চিরদিন কাজ করে এসেচি— হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মনে হয় মরেই গেছি— তার চেয়ে সত্যিকার মরাটা ভালো— কেননা সেটা সত্যি।

রথীর ঠিকানা জান্‌তে চাস :—

C/o. American Express Co.
11 Rue Scribe
Paris

সেই মোটা ফ্রেঞ্চ বই আমার পূর্ব্বগামীরূপে বোলপুরে রওনা হয়ে গেছে। ইতি ভাদ্র তারিখ জানিনে, ১৩৩৫

রবিকাকা

[২৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নলিনীর কাছ থেকে বিজয়া দশমীর প্রণাম পেয়েছি নবমীর দিনে, তোর কাছ থেকে পেলেম একাদশীতে— গড়পরতা রক্ষা হয়েচে।

মণ্টুকে আমি বেশ ঠাণ্ডা রকম চিঠিই লিখেচি। তার কারণ মণ্টুকে আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। সব সময়ে ওর বুদ্ধি স্থির থাকে না,...কিন্তু ওর মনটি খুব সরল, এবং ওর মধ্যে যে ভালোটুকু আছে সে খুব অকৃত্রিম। ওকে যারা কথায় কথায় গালমন্দ দিয়ে থাকে ও তাদের চেয়ে অনেক উপরের লোক।

এবার শরতে বর্ষায় বেশ রীতিমত প্রণয় চলচে। কাল ছিল আকাশ নির্ম্মল, জ্যোৎস্না নিরাবিল, দিগন্ত বাষ্পবিরল; আজ সকাল থেকে প্রথমে মেঘের উঁকিঝুঁকি, তারপরে তার আনাগোনা, তার পরে এই খানিকক্ষণ হল সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি। আমি নিজে আছি নিশ্চল, বসে বসে বাইরের আকাশে ঋতুদূতগুলির চলাফেরা দেখচি। বেশ লাগচে। ইতি শুক্লা একাদশী ১৩৩৫

রবিকাকা

[২৮]　　　　　　　　ওঁ　　　　　　　　পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বব, তোর সব তর্জ্জমাগুলিই খুব ভালো হয়েচে। আর ভাঙা প্রতিমার উপর যে কবিতা লিখেছিস্ সেও সুন্দর। কবিতার তর্জ্জমাগুলি বিশ্বভারতীর জার্ণালের জন্যে সুরেনকে কপি করে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলে দিলুম। তুই যদি আর কোথাও প্রকাশ করতে চাস তাও করতে পারিস।

তোরা পদ্মাতীরে গিয়েছিস্ শুনে মনে মনে লোভ হচ্চে। পদ্মার আমন্ত্রণ আমার হৃদয়ের মধ্যে নিয়তই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের বোটের জন্যে উপযুক্ত মাঝি মাল্লা পেলুম না বলে এবারে এখানকার ডাঙার উপর পড়ে পড়েই রোদ পোহাতে হল। কথা ছিল বোটে করে পদ্মার চরে যাব। তোরা যাচ্চিস শুনলে মনটা আরো ছটফট করে উঠত।—…

এইমাত্র তোর তর্জ্জমাগুলি অপূর্ব্বকে দেখালুম—সে বল্লে আমার কবিতার এত ভালো তর্জ্জমা সে আগে আর দেখেনি।

শরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন যদি না করিস তাহলে মিথ্যে জবাবের দায় থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিবি। এ কথা জোর করে বল্‌তে পারি আমি আমাদের সম্রাটের চেয়েও ভালো আছি।

এতদিন পরে শীতের মতো শীত পড়েচে। বনমালী নিবেদন করে গেল, মধ্যাহ্নভোজন প্রস্তুত। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯২৯

রবিকাকা

[২৭]

ওঁ

· ✱ Uttarayan
Santiniketan
Bengal

বিজয়া দশমী, ১৩৩৬

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ নিস্। তোরা ঘর ছেড়ে ছুটির সন্ধান করতে যাস— আমি ঘরে বসে ছুটি বানাবার চেষ্টা করি। কাজের সময় চারদিক থেকে কাজের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়— সে উপাদানের অভাব নেই—আবার ছুটির সময় সেগুলি বাদ দিয়ে ছুটির সরঞ্জাম আহরণ করে তারি মাঝখানে আধখানা চোখ বুজে বসতে হয়— সে সরঞ্জামও আছে প্রচুর। এই রকম ছুটিটাই সবচেয়ে সস্তা বলেই বোধ হয় সব চেয়ে দুর্লভ। রথীরা শুনচি শীঘ্র তোদেরই বাসার মধ্যে আশ্রয় নিতে রাঁচি যাবার উদ্যোগ করচে। সবাই দেখেচি আমারই বয়েস আর আমারি শরীরটার প্রতি লক্ষ্য করে উদ্বেগ প্রকাশ করে। অবশ্য বয়েসে পাল্লা দিতে পারব না কিন্তু এই অঙ্গ-যষ্টিটার কথা যদি বলিস এটা অনেক ভর সয়, রথীর চেয়ে বেশি বই কম নয়। দেখতে পাই বিধাতা তাঁর একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই আমাকে মজবুৎ করে বানিয়েচেন কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের বাইরে আমি কাহিল— আমি গাণ্ডীব তুলতে পারি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, কিন্তু ডাকাত তাড়াবার সময় পাহারাওয়ালার কাজে নয়।

তপতীর ঝাঁজ মরবার পূর্ব্বেই দাবী আসচে রক্তকরবীকে স্টেজে চড়াবার জন্যে। আমার বিক্রমের আমলের প্রেয়সী

এইখানেই উপস্থিত আছেন বলে মনে ভাবচি আর এক মূর্ত্তিতে তাঁরই সাধনা করবার লীলাটা জাগিয়ে রাখ্‌তে দোষ কী?

কিন্তু একটা বাজে কাজের দায় আমার কাঁধে চেপেচে। বরোদায় গিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে এই আদেশ। বাঁধা আছি সেই রাজদ্বারে রূপোর শৃঙ্খলে— বিশ্বভারতীর খাতিরে মাথা বিকিয়ে বসেচি। তাই আজ সেই মাথা ঠুকচি একখানা বক্তৃতা বের করবার জন্যে। একটুও ভালো লাগচে না— এই শরৎ কালে ছুটির হাওয়ায় শিউলি বন বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন পাপে কবিকে লাগতে হোলো কথার ঘানি ঠেলে বক্তৃতার তেল বের করতে, সেই তেল রাজ পদ সেবার জন্যে।— থাকগে দুঃখের কথা— কবে তোরা এখানে এসে জমিয়ে বসবি? আজকাল সঙ্গীর অভাব সব চেয়ে অনুভব করি, যাদের অল্প বয়েস তারা মনে করে আমার বেশি বয়েস হয়ে গেছে, কাজেই বক্তৃতা করতে হয়, আর আধুনিকীদের যেটুকু স্পর্শ আদায় করতে পারি সে কেবল অভিনয়ের ছল করে।

রবিকাকা

তোদের লাইব্রেরি এসে পৌঁচেছে— সেটা বিজয়ার খুব বড়ো নমস্কার

[৩০] ওঁ কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

আজ সকালে সুধীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েচে। আমরা কেউই জানতে পারিনি যে তার সাংঘাতিক পীড়া হয়েচে। যে ডাক্তার ওকে দেখছিল সে নিশ্চয়ই ঠিক বুঝতে পারেনি। তিনদিন আগে খুব হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ খেয়ে সেটা সেরে যায়। তার পরেই আজ হঠাৎ এই বিপদ। নেপু ছেলেমানুষ, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

আমার জ্বর এখন আর নেই। রথীরাও এসে পৌঁচেছে। হারাসানের শরীর অনেকটা ভালো। আজ জ্বর এখনো দেখা দেয়নি। নীলরতনবাবু তাকে কষে কুইনীন খাওয়াচ্চেন।

আমার মনটা শান্তিনিকেতনের রাস্তায়। প্রমথর গল্পটা আমার হাতে পড়েনি। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে দেখতে পাব। চেষ্টা করব যাতে দুতিনদিনের মধ্যে সেখানে ফিরতে পারি। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯২৯

রবিকাকা

---

[৩১] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমি তো আজই দৌড় দিচ্চি বরোদা অভিমুখে। ফিরব বিলম্বে। ১১ মাঘের ভার কে গ্রহণ করবেন ঠিক ভেবে

উঠ্‌তে পারচিনে। দীনু থাকবে গানের অধিনায়ক—ক্ষিতিমোহন বাবুকে বলে রেখেছি বেদীর কাজ করবেন। রথী তো পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। বাড়িতে আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অনুষ্ঠানটাকে জমিয়ে তুলতে পারবে।…যে জিনিষে প্রাণশক্তির অভাব, ইঞ্জেক্‌শনের চোটে তাকে খড়্‌ফড়িয়ে তুলে মনে সান্ত্বনা পাইনে। আয়ু শেষ হলেও মানুষ বিদায় দিতে চায় না এইজন্যে বিস্তর প্রয়াস করতে হয় অথচ পরিণামে ব্যর্থতাই ঘটে। মৃতের ভার বহন করতে আমি উৎসাহ পাইনে— অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত কিন্তু যেন সে অতীত নয় তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করাটা অসঙ্গত। বেলুড়মঠে শুনেছি বিবেকানন্দের ছবির সামনে রোজ অম্বুরি তামাকের ভোগ দেওয়া হয়— এই খরচটা বাঁচালে বিবেকানন্দের অসম্মান হোত না। অত্যন্ত ব্যস্ত। উদ্যোগ পর্ব্বটা বিরাটপর্ব্ব হয়ে উঠেচে— জিনিষপত্র নিয়ে ঘোরতর ঘাঁটাঘাঁটি চলচে। ইতি ১০ জানুয়ারি ১৯৩০

রবিকাকা

---

[৩২] ওঁ পোস্টমার্ক

প্যারিস

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। ঘুরে ফিরে প্যারিসে এসেচি। রথীরা স্বাস্থ্য অন্বেষণে গেছে সুইজারল্যাণ্ডে। সঙ্গে আছেন ডাক্তার নলিনীরঞ্জন the first। আমার

বাহন আরিয়াম। এখন বৈশাখের মাঝামাঝি। কিন্তু বৈশাখ বলে পদার্থ এখানে কোথাও নেই— এখানে আছে এপ্রিল— তার চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মেঘ করে আছে, থেকে থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে, বাতাসকে শীতল বলা যায় কিন্তু সুশীতল বল্‌লে বাঙালী ভদ্রলোক যা বোঝে তার কাছ দিয়েও যায় না— দুঃশীতল বল্‌লে একটু বেশি বলা হয় কিন্তু নিতান্ত অন্যায় হয় না। আর মেঘ-শয্যায় যে সূর্য্যদেব লীনপ্রায় আছেন— তাঁকে মার্ত্তণ্ড বল্‌লে বেমানান শোনায়। এই তো গেল আকাশের খবর। ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫ বৈশাখে অবতীর্ণ হয়েচেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন— তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান— তার সম্পূর্ণ বিবরণ যখন পাবি তখন চমক লাগবে, কিন্তু নিজ মুখে এ সম্বন্ধে সত্য কথা বল্‌তে গেলে অহঙ্কার করা হয়। পরম্পরায় যখন শুনবি তখনকার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করাই ভালো। ২রা মে তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্মোচন। এইবার আমার চৈতালি— বর্ষশেষের ফসল সমুদ্রপারের ঘাটে সংগ্রহ হল। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে আমাদের নিজপারের ঘাট পেরিয়ে এসেচি। আমার এই শেষ কীর্ত্তি এই দেশেই রেখে যাব।

তোর উদ্বোধন পড়ে ভালো লাগল। কেবল একটি খুঁৎ আছে। 'বাধ্যতামূলক' কথাটা আমি সইতে পারিনে। ঐ দুঃশব্দ ব্যবহারে ভদ্রভাষারীতির প্রতি অবাধ্যতা করা হয়। Compulsory হল অবশ্যকৃত্য, voluntary হল স্বেচ্ছাকৃত্য।

কেবল প্রয়োগভেদে 'কৃত্য' শব্দের পরিবর্ত্তন করতে হবে, যথা অবশ্য পাঠ্য, অবশ্য দেয়, অবশ্য পেয়, ইত্যাদি। যদি একটি সাধারণ বিশেষণ দরকার বোধ করিস্ তাহলে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক এই দুটো কথা হাজির আছে। ঐচ্ছিক কথা সংস্কৃত অভিধানে পেয়েছি।

চিঠির ও পৃষ্ঠাটা এখনো খালি রইল— সেটা তোর সদ্দৃষ্টান্তের বিরোধী। কিন্তু বোধ হচ্ছে পত্র— পাত্র সম্পূর্ণ ভরবে না। তার কারণ অবকাশ নামক বিশুদ্ধ স্বদেশী মাল এদেশে পাওয়া যায় না— এখানকার শীতের আকাশের মতোই সেটা ঠাস— বোঝাই— রবি তার মধ্যে ভদ্র রকমের ফাঁক খুঁজে পান না। বিশেষত আগামী চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সর্ব্বদাই মন্ত্রী ও যন্ত্রীবর্গের সমাগম চল্‌চে।

অমিয় এবং অমিয়া ব্রিটিশখাড়ির ওপারে। মনের সুখে আছে। আদর অভ্যর্থনার মধুর উত্তাপে দক্ষিণ সমীরণের অভাব গণ্য করচেনা। আমার বক্তৃতার পালা মে মাসের ১৯শে তারিখ থেকে। জুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মেয়াদ। তার পরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের গোচরবর্ত্তী নয়— কিন্তু তার শেষ সীমায় যেন আটলান্টিকের পশ্চিমপ্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্চে। ভারত সাগরকূলের ছবি চোখে পড়্‌বেনা। পশ্চিমাচল পূর্ব্বাচলকে চাপা দিয়েচে। পাত্র ভরল— নামটা লিখলেই বাস্। ইতি ২৬ এপ্রিল ১৯৩০

রবিকাকা

[৩৩] ওঁ

* 15 Rawlinson Road
Oxford

May 27, 1930

কল্যাণীয়াসু

এখানে আমার কীর্ত্তি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না। কেন না বিশ্বাস করবি নে। ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে— কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সে কথা বিস্তারিত করে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি।

অক্সফোর্ডের বক্তৃতা কাল শেষ হয়ে গেল। সে সম্বন্ধেও নিজমুখে কিছু বলা শাস্ত্রবিহিত হবে না। তবে কেন যে লিখচি চিঠি, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিস। মণ্টু তোকে আমার চিঠির তর্জ্জমা করতে পাঠিয়েচে। ভালই করেছে। এইটুকু কেবল তোকে সাবধান করতে চাই ওতে এমন কিছু থাকতে পারে যা মফস্বলে চলে, সদরে নয়। জন সমাজে আমার দায়িত্ব আজকাল ব্যাপক হয়ে পড়েচে। সেই বিচার করে চিঠি সম্বন্ধে স্থানে স্থানে হয় তো বর্জ্জন নীতির দরকার হতে পারে— ঠিক মনে পড়চে না। বর্ত্তমানে জগতে অনেক সমস্যা নিরবগুণ্ঠিত হয়েচে একদা যা অন্দর মহলে অসূর্য্যম্পশ্য ছিল— তাদের সম্বন্ধে একেবারে বেপরোয়া হলে চল্‌বে না।

রথীরা ভালোই আছে। সুহৃদ শুনচি শীঘ্র দেশমুখো হবে। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি

রবিকাকা

[৩৪] ওঁ New Haven

কল্যাণীয়াসু

পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক দুর্ভাগা আছে যাদের গতিবিধি খবরের কাগজে (কালির ?) কালীর ছাপ দিতে দিতে চলে তাদের নিরালায় অসুস্থ হবারও জো নেই। অতএব তোদের কাছে ছাপা নেই যে আমার শরীর খারাপ। কাছে থাক্‌লে বুঝতে পারতিস্ খারাপ হলেও এমনীই কি খারাপ। অর্থাৎ কিছুদিনের মতো চুপচাপ করে পড়ে থাকবার মতো খারাপ তার বেশি নয়। ধরে নেওয়া যাক্ সপ্তমী তিথির পরিমাণে খারাপ, অমাবস্যা পরিমাণে নৈব নৈবচ, এমন কি একাদশীর কাছ দিয়েও যায় না। অতএব নিঃসংশয়ে জানিস্ হাওড়া ব্রিজ আরো একবার আমাকে পার হতে হবে। হিসাব করে যদি দেখিস্ তো দেখতে পাবি বয়স হোলো প্রায় সত্তর, অর্থাৎ বৈতরণীর ধার ঘেঁষে চলেচি। কিন্তু বোধ হচ্চে ভোগ যেন কিছু বাকি আছে, তাই যদিচ ঘাটে আসন পেতেছি তবু খেয়ায় এখনো জায়গা হোলো না। একটা অত্যন্ত নিশ্চিত সত্য আছে যেটা মানুষ তার সমস্ত জীবনে কেবল একবারমাত্র প্রমাণ করতে পারে— সে হচ্চে মানুষ অমর নয়। কিন্তু নাই বা হোলো— কিছুদিন বেঁচেছি, অত্যন্ত নিবিড় করে জেনেচি আমি হচ্চি আমি— অন্তহীন আমি-নয়-এর মাঝখানে এই একটিমাত্র আমি— অসীম জগতে এই পরমাশ্চর্য্য সত্য অসীম কালের অতি ক্ষুদ্রমাত্রায় আমার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে

আর কী চাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড়ো যে ভাবনা করতে হবে। সাধকেরা বলেচেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হওয়াটাকেই সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে— কিন্তু আমি বলি হওয়াটাই যদি মিটল তবে দুঃখটা গেল কি না গেল তাতে কি আসে যায়। রুগী বলচে, কব্‌রেজমশায়, জ্বর ছাড়াও— কবিরাজ নস্য নিয়ে বললেন দেহ ত্যাগ করলে জ্বরের উৎপাত একেবারে ঘুচবে। রুগীর বক্তব্য এই যে দেহটার জন্যেই জ্বরের অবসান কামনা করা, দেহটারই অবসান যদি একমাত্র উপায় হয় তাহলে জ্বরটা না হয় রইল। আমি আছি এইটে হোল শেষ কথা, এটাকেও শেষ করলে বাকি রইল কি? মৃত্যুতে ওটা শেষ হয় কি না হয় জানিনে, কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতেই যে সব সন্ন্যাসী ওটাকে কেবলি রগ্‌ড়ে মুছে ফেলবার চেষ্টায় লেগে থাকে তাদের সঙ্গে কোনোদিন আমার বনিবনাও হোলো না। জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখ। কিন্তু সেই দুঃখে আমার হওয়াটাকেই তীব্র করে প্রমাণ করেচে, অতএব তাকে নিন্দে করব না। বিছানায় পড়ে পড়ে এই সব কথা ভেবেচি।

আরো একটা কথা ভেবেচি। দেশের কাজ করব বলে একদিন কোমর বেঁধে লেগেছিলেম। দেহের দিকে তাকাইনি, তহবিলের দিকে তাকাইনি, আরামের দিকে না, অবকাশের দিকে না— নিজের ঘরকন্নাকে একরকম ছন্ন ছন্ন করেছি সে তোরা জানিস্। যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। স্বদেশে অতি সব অযোগ্য লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরেচি

মাথা হেঁট করে। যদি কিছু পেয়ে থাকি তাতে জাত গিয়েছে পেট ভরেনি। বিধাতার কৃপায় খুব মজবুৎ শরীর নিয়েই জন্মেছিলেম, তাই "আমার জন্মভূমি" আমাকে যত মার মেরেছে তাতেও টিঁকে আছি। বিশেষত বন্ধুদের হাতের গোপন ও প্রকাশ্য মার। এমন বন্ধুও বাকি আছে যারা মারেও না কিছু করেও না, শুধু কথা কয়; যারা সহায়তাচ্ছলে আমার কাজে হাত দেয় কিন্তু সে হাত শূন্য। এও যাক্, একটা দুঃখ মলেও ঘুচবে না, সে হচ্চে এই, বাংলাদেশে আমাকে অপমানিত করা যত নিরাপদ এমন আর কাউকেই না— মহাত্মাজি চিত্তরঞ্জনকে ছেড়েই দেওয়া যাক্— বঙ্কিম, শরৎ, হেম বাঁড়ুয্যে নবীন সেন কাউকে আমার মত গাল দিতে কেউ সাহসই করে না। যাদের ব্যবসা গাল দেওয়া তারা জানে আমাকে গাল দিলে তাদের ব্যবসার ক্ষতি হয় না বরঞ্চ তাতে লাভ আছে। অথচ বিদেশে এসে যখন সম্মান পাই তখন ওরা বল্‌তে ছাড়ে না যে, উনি কেবল বিদেশের লোকের কাছেই সম্মান কুড়োতে যান। কুড়োতে হয় না, অজস্র বর্ষণ হতে থাকে। তার প্রধান কারণ, দেশের লোকের মতো এরা আমাকে এত অত্যন্ত বেশি জানে না। তাই হোক্, যথালাভ। একথা সত্য সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘুরতে ঘুরতে আমার দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে এল— এখানকার সব ডাক্তারই বলে বাতির দুই প্রান্তে আলো জ্বালিয়ে আমি হুহু করে আয়ুক্ষয় করচি— উপায় নেই। ঘরের অন্ন থেকে যদি বঞ্চিত হতেই হয় তবে বনের ফল খুঁজে বেড়াতে হবে— সেটা আরামের নয়

বটে কিন্তু ফল দুর্লভ নয়। অবশেষে আমার শেষ বক্তব্য এই যে আমার মৃত্যুর পরে দেশের লোক আমার স্মৃতি নিয়ে যেন শোকসভাসৃষ্টির বিড়ম্বনা না করে। বেঁচে থাকৃতে থাকতে আমি যার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েচি তার জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ। একেবারে কিছু পাইনি একথা বলা অন্যায়। কিন্তু যারা দেবার মতো জিনিষ দিয়েচে তারা লোক ডেকে শোকসভা করবে না— যারা কিছুই করেনি, তারা সভা করবে, যারা গাল দিয়েচে তারা হাততালি দেবে— এটা কোনোমতে যাতে না হয় এই আমার একান্ত কামনা। আমার শ্রাদ্ধ যেন ছাতিমগাছের তলায় বিনা আড়ম্বরে বিনা জনতায় হয়— শান্তিনিকেতনের শালবনের মধ্যে আমার স্মরণের সভা মর্ম্মরিত হবে মঞ্জরিত হবে, যেখানে যেখানে আমার ভালোবাসা আছে সেইসেইখানেই আমার নাম থাকবে। ইতি
২৫ অক্টোবর ১৯৩০

রবিকাকা

---

[৩৫] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আজ প্রথম অবগত হলুম যে প্রমথর গ্রন্থাবলী পেয়ে আমি তার প্রাপ্তিস্বীকার করিনি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে মর্ত্ত্যলোকের সীমানায় এসে পৌচেছি। অর্থাৎ এখন মনে মনে কাজ করি সেটা যেন বিষয়ীকৃত হয়েচে বলেই ধারণা

হয়। তার মানে বিষয়জগৎ থেকে চিত্ত শিথিল হয়ে এসেচে। তাই বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভুল ঘটে— এমন কি আমার চিরাভ্যস্ত লেখাতে কেবলি স্খলন হতে থাকে। তাছাড়া খুবই সহজ এবং সাধারণ কাজেও ভারি একটা অনবধানতা এসেচে। তার মানে যেখানে আছি সেখানে নেই বল্লেই হয়। যদিও প্রমথর এই লেখাগুলি প্রায় সবই পূর্ব্বপঠিত তবু অনেকটা পড়েচি এবং মনে মনে তারিফ করেছি। লিখব বলে এতই নিশ্চয় স্থির ছিল যে লেখা হয়নি এ খেয়ালই ছিল না।

মেজবোঠান আজ এসে পৌঁছেচেন তাঁর ভালই লাগচে। বোধ হয় কিছুদিন এখানে থাকলে তাঁর শরীর ভালো হতে পারে। ইতিপূর্ব্বে খুব একটানা বাদলা চলেছিল— কাল মাথার খুলি ফাটাবার উপযুক্ত শিল পড়েচে। তাছাড়া বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসে উদ্দাম তাণ্ডব হয়ে গেল। মেজোবোঠানের সেই সময়ে আসবার কথা ছিল— এলে অস্থির হয়ে পড়তেন।

আমি এখন আছি গান নিয়ে— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেচি— কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেচে— সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।

চিঠির তর্জ্জমাগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। আমাকে হয় ত কলকাতায় কিছুদিনের মধ্যে যেতে হবে। ইতি

৭ মার্চ্চ ১৯৩১

রবিকাকা

[৩৬] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোরা দুজনে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্। সকালে মন্দিরের কাজ সেরে এসে লিখ্তে বসেছি। কলকাতা থেকে নববর্ষ বিদায় নিয়েছে। সেটা তেমন বেশি শোচনীয় নয় যেমন শোচনীয় মৃত পদার্থকে আঁকড়িয়ে পড়ে থাকা। শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। এ কথাটা অর্ঘ্য দেওয়া সম্বন্ধেও খাটে। অশ্রদ্ধার দানে অশ্রদ্ধাকেই মূল্য দেওয়া হয়। আজ যদি আশ্রমে থাকতিস তাহলে দেখতে পেতিস এখানে এটা বেঁচে আছে। তার মানে এই নববর্ষের দিনের সঙ্গে বাকি ৩৬৪টা দিনের নাড়ীর যোগ আছে। কলকাতার পাঁজিতে সে বৎসরটাই নেই যে-বৎসরের প্রথম দিনকে বিশেষ ভাবে গণ্য করা চলে। আসল কথা, একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদি ব্রাহ্ম সমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। আর কিছুকাল পরে স্বয়ং কটিটাই অন্তর্ধান করবে, আর যিনি বন্দী ছিলেন তাঁরও ঠিকানা পাওয়া যাবে না। কেবল শিকলটা ঝম্ঝম্ করবে। প্রথা জিনিষটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই। শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সঙ্কোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড় লজ্জা দেয়।

বৈশাখের প্রবাসীতে মন্ত্রচিত যে সোভিয়েট-নীতি বেরিয়েচে সেটা তোকে তর্জ্জমা করতে বল্‌তে অত্যন্ত করুণা এবং কুণ্ঠা বোধ করছি। যারা তোকে ভালোমানুষ পেয়ে উপদ্রব করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করে না। আমি রাগ করি অন্যদের বেলায়— নিজেকে এক্সেপ্‌শন বলে চালিয়ে দিতে তেমন বেশি বাধে না। একেই বলে অহমিকা, এটা ত্যাগ করব বলে পণ করেছি কিন্তু তার আগে নিজের কাজ যতটা পারি গুছিয়ে নিতে চাই। ১ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

---

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

প্রবাসীতে যে চিঠিটা বেরিয়েচে বিশেষ কারণে তার জরুরিত্ব আছে। আমার আমেরিকান ও জর্ম্মান বন্ধুরা আমার বলশেভিক-পক্ষপাত নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচে। আমার ঠিক মনের ভাবটিকে তাদের অবিলম্বে বোঝানো দরকার। এই চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। একবার ভেবেছিলুম ইংরেজিতেই লিখব। কিন্তু অত্যন্ত দায়ে না পড়লে ঐ ভাষায় লিখ্‌তে আমার মন সায় দেয় না।

ঐ ভাষাটা আমার পক্ষে দুর্গম দুঃসাধ্য এই সংস্কার বহু-দীর্ঘকাল মনের মধ্যে বহন করে এসেছি। কোনো বিরুদ্ধ

প্রমাণেও সেই সংস্কার তাড়াতে পারিনে— সেইজন্যে শেক্‌-জুড়ার বিলিতী কুঠরিতে ঢোকবার বেলা দরজা ভ্যাজানো দেখলেই মনে করি ওটা কুলুপ বন্ধ। ঠ্যালা মারলে খুলে যায় তাও জানা আছে কিন্তু এই জানাটা আজো মনের মধ্যে পাকা হয়নি। সেইজন্যে তোদের উপর ভর করতে পারলে আরাম পাই। কিন্তু এত লোক ওর উপর ভর দিয়েচে যে আর চাপ বাড়াতে ইচ্ছে হয় না অথচ সুযোগ পেলেও ছাড়িনে। এই আমার অবস্থা। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৩৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রবীন্দ্রপরিচয় পদার্থটি কি এবং কোথা থেকে তার উদ্ভব সে রহস্য আমার অগোচর। আন্দাজ করচি আমি উনসত্তর বছর বয়স পার হয়ে যে এক অভাবনীয় জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছি তাকেই বাহবা দেবার জন্যে নানা দিগ্‌দেশ থেকে এঁরা নানা আকারে জয়ধ্বনি সংগ্রহ করচেন। তোর এই লেখাটাও তারি অন্যতম। কোথায় এর গতি হবে এবং স্থিতি হবেই বা কি আকারে সে কথা জানিনে— নিরন্তর সঙ্কুচিত হয়ে আছি। মধুর সম্ভাষণের শরশয্যায় শয়ান আছি বল্‌লেই হয়। সেজন্যে সলজ্জে লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে,

দোহাই তোমাদের, আমি এর জন্যে দায়িক নই তবুও আমি মাপ চাই— ভবিষ্যতে আর কখনো সত্তর বছরে পড়বার দুর্গতি ঘটাব না। তোর লেখাটি অমিয়র হাতে সমর্পণ করলুম— তিনি নিশ্চয়ই এই চক্রান্তের একজন প্রধান ব্যক্তি। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

---

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

৯ মে, ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তুই আমার গান সম্বন্ধে লিখেছিস এতে আমার বলবার কথা কিছু কি থাকতে পারে? ছোট্ট একটি কথা বলা চলে— যে যে তালে আমি গান রচনা করেচি তার তালিকা দেব সেটা চিন্তা করে দেখিস :—

রূপক, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, একতালা, কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা, দুই একটা চৌতাল— দাদরা, যৎ, কাশ্মীরি খেমটা, একাদশী, নবমী।

এখানকার অনুষ্ঠান খুব ভালো হয়েছিল। লোকের ভিড় নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল। অনেক কষ্টে কোনোমতে চলনসই ব্যবস্থা করা গেছে। বড় শ্রান্ত করেচে।

রবিকাকা

[৪০]　　　　ওঁ　　　　পোস্টমার্ক
কলকাতা
৮ মে, ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

পারস্যে যাচ্ছি। পর্শু রাত্রে বর্দ্ধমান থেকে বম্বাইমুখে যাব তার পরে বোম্বাই থেকে বস্‌রা, বসরা থেকে টেহেরান।

তোরা হয় তো উদ্বিগ্ন হবি। এই সঙ্কটসঙ্কুল সংসারে একজায়গায় চুপ করে বসে থাকলেও উদ্বেগের চরম কারণ ঘটা অসম্ভব নয়। এমন অবস্থায় কর্ত্তব্যের ডাক এলে ভয়ে পিছিয়ে থাকা কিছু নয়।

তর্জ্জমাটা বোধ হচ্চে হয়নি। যখন ফিরব তখন খোঁজ করব। কবে ফিরবো তা জানিনে।

বৃষ্টিবাদল প্রায় চল্‌চে। বাতাসটা জ্যৈষ্ঠমাসোচিত নয়। আজ বড়ো শ্রান্ত এবং ব্যস্ত। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

রবিকাকা

---

[৪১]　　　　ওঁ　　　　* "Uttarayan"
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষ ও জন্মদিন মিলিয়ে ফরেন মিনিস্টারের জিম্মে করে যে প্রণাম পাঠিয়েছিলি সেটা আজ পাওয়া গেল। বিশ্বকবি আপাতত ভূলোকেই স্থির হয়ে বসল, নিজের নাম সার্থক

করবার জন্যে দ্যুলোকে উধাও হবার সম্বল তার নেই। তাড়াহুড়ো গোলমালের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যে তোকে দেখ্‌লুম— আসর জমিয়ে বসে গল্প করার সুযোগ হোলো না। এখানে যদি আসিস তাহলে রয়ে বসে বাক্যালাপের চেষ্টা করতে পারি। হয় সঙ্গহীনতা নয় সঙ্গাতিশয্য এই দুইয়ের সীমান্তদেশে আমার গতিবিধি। দাদা যাকে বলতেন মিড্‌লকোর্স্‌ সেটা আমার দুরধিগম্য। ইতি ১লা আষাঢ় ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪২] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলকাতায় পৌঁছব— শুক্রবার ভূপালে যাত্রা করব। যদি বৃহস্পতির বারবেলায় জোড়াসাঁকোয় দেখা করিস সকল কথার আলোচনা হবে। ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪৩] ওঁ পোস্টমার্ক
৭ অক্টোবর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তোর এই নাটকটি রঙ্গমঞ্চ অধিকার করবার স্বত্বলাভ করেচে। কেবল প্রথম দুইটি দৃশ্যকে দৃষ্টিগোচর না করে

আভাসে রেখে দিলেই ভালো হয়। তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যে সব কথাই রয়েচে। হাল আমলের গানগুলি মানাচ্ছে না। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী গান দিলে আপত্তির কারণ থাকে না। আমাদের গানগুলো বাদশাহী আমলের সঙ্গে কিছুতেই মিশ খায় না।

আশ্বিন সন্ধ্যাদীপের চারদিকে বিবিধ জাতীয় পতঙ্গের মতো আমার উপর খুচরো কাজের বর্ষণ হচ্চে। সামনের দিক থেকে যদিবা তাড়াই আমার পিঠের মধ্যে গিয়ে ঢোকে ঝাড়া দিলেও বেরয় না। প্রার্থনা করচি ক্ষুদে কর্ত্তব্যের হাত থেকে ত্রাহি মাং নিত্যং।

রবিকাকা

[৪৪] ওঁ পোস্টমার্ক

দার্জিলিং

২৩ অক্টোবর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিস। এবার দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত আমাকে ঠেলে তুলেচে। সাধারণত আমার এরকম উন্মার্গগামী স্বভাব নয়— সমতটের মানুষ, গিরিরাজের উত্তুঙ্গ দরবারে মন পালাই পালাই করে। শান্তিনিকেতনে মাঠের ধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকব বলেই পণ করেছিলুম কিন্তু দেখলুম দেহটাকে একবার কোথাও পাল্‌টিয়ে না আনলে দিন মুহূর্ত্তগুলোর বোঝা তার পক্ষে দুর্ব্বহ হয়ে উঠচে। তুই তো জানিস শরীরের নালিশ বেওজরে ডিস্‌মিস্ করে দেওয়াই

আমার অভ্যেস। এবারে সে রকম সরাসরি অবিচার আর চল্‌ল না। তাই রথী যখন পাহাড়ে ওঠার প্রস্তাব তুল্‌লে তখন সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারলুম না। এখানে সময়টা ভালো। মাঝে মাঝে মেঘগুলো এসে শিখরে শিখরে আড্ডা জমায় কিন্তু অত্যন্ত সাত্ত্বিকশুভ্রভাবে— শাদা জটাধারী পথিক সন্ন্যাসীর মতো।

অমল এখানে আছে, তোর কর্ম্মকুশলতার উপরে তার অসামান্য ভক্তি। অর্থাৎ সে আবিষ্কার করেচে যে, যে খুসি তোকে খাটাতে পারে যা তা নিয়ে, এবং সে খাটুনিতে কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটবে না। এ রকম শক্তি থাকাটা দৈবের অনুগ্রহ বলে গণ্য করা চলে না। কুঁড়েমির খ্যাতি আত্মরক্ষার প্রধান সহায়। ইতি বিজয়া দ্বাদশী ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪৫] ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

তোরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। দিনগুলি ম্লানভাবে চলচে, মন্দগমনে। জীবনের আকাশে আলোটা কমে আস্‌চে, তার কারণ দিন অবসান হয়ে এলো। ছুটির জন্যে মনটা কেবলি উৎসুক হয়, কর্ম্মের জাল কোথাও ফাঁক দিতে চায় না। সত্তর পেরিয়ে গেছে এই সহজ কথাটা

আমার অদৃষ্ট অস্বীকার করে— কেবলি কাজের দায় চাপায়, জীর্ণ কাঁধটাকে দয়া করে না। দেহ মনে উদ্যম গেছে কমে, অথচ বাইরে উদ্যোগ আছে ব্যাপক ভাবে। শক্তির সঙ্গে কর্ম্মের এই বিরুদ্ধতায় আছি পীড়িত। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৯

রবিকাকা

---

[৪৬] ওঁ * Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে ডিসেম্বর মাসে। ২২ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই পৌষের পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরতে হবে। তার পরে পুনর্ব্বার কলকাতায় যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হবে। যদি কোনো দুর্যোগে কলকাতায় আমাকে টেনে নিয়ে যায় তবে তোমাদের সভায় উপস্থিত থাকব নতুবা নয়।

'বাণীনন্দিনী' ও 'বীণাবাদিনী' উপাধি দুটি সঙ্গত হবে না। বাণী শব্দে গান বোঝায় না। সরস্বতী যে নামে বাণী সেখানে তিনি বাগ্‌বাদিনী। 'গীতকলিতা' উপাধি চলতে পারে। অর্থাৎ গীতকলাবিশিষ্টা। ওতে দাম্ভিকতাও প্রকাশ হবে না। মেয়েটি যদি বীণা না বাজিয়ে সেতার বা এসরাজ বাজায়, তাহলে তাকে বীণাবাদিনী বল্‌লে বেশি গৌরব দেওয়া হয়। বরঞ্চ তন্ত্রীবাদিনী বা তন্ত্রীকুশলা বলা যেতে পারে। তন্ত্রী

বীণার প্রতিশব্দ, কিন্তু যে কোনো তারের বাজনাকে তন্ত্রী বলা চলে। মেয়েটি যদি বাঁশি বাজায় তাহলে বেণুবাদিনী শোনায় ভালো। 'নিক্কণিকা' যদি পছন্দ হয় তো চলতে পারে। ইতি ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[৪৭] ওঁ

*Visva-Bharati
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়াসু বিবি,

তোরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। পৃথিবীটা এখন বাসযোগ্য নয়, অন্য কোনোখানেও বাসার সন্ধান মিলবে না। বেঁধে মার খেতে হবে। এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা এই যে বেঁধে মার খানেওয়ালার সংখ্যার অন্ত নেই। দুর্ভাগ্যের উপর দুশ্চিন্তা যোগ করে ফল কি, তাই ভুলে থাকবার চেষ্টা করি— ভাবনা চিন্তার ভিড়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে কলম চালাই— বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারিনে বলে কলম চলে ধিকিয়ে ধিকিয়ে। এর উপর আছে বিশ্বভারতীর দায়। এই আমার অবস্থা। নূতন বৎসরের জীবনযাত্রার পথ কোনো নতুন বাঁক নেবে কিনা জানিনে— না যদি নেয় তো মরার বাড়া গাল নেই। সঙ্গীত সম্মিলনী ইত্যাদি কম্পানিকে দূর থেকে নমস্কার। যে ভিক্ষের ঝুলি নিজের জন্যে বানিয়েছিলুম সেটা সুদ্ধ এরা কেড়ে নিতে

চায়— সেটাকে বারবার ব্যবহার করে ফুটো করে দিলে— শেষকালে হাঁড়িও চড়বে না ঝুলিও চলবে না, দশা হবে কি ? এরিয়মের পায়ে হলুদের বাঁশি বাজচে, এই যদি মিলনের ভূমিকার ম্যাজিক হয়, তাহলে এর পরে বাঁশী আমদানি করতে হবে মধ্য আফ্রিকা থেকে। বিয়ে করবে অপরে, আমরা কোনো দোষ করিনি, কিন্তু কান ঝালাপালা হোলো যে। যে দেশের দেবতার কানের কাছে কাঁসর বাজানো হয় সেই দেশেই এমনতর দুঃসহ বর্ব্বরতা সম্ভব। এখানকার কান্না দেবতার কাছে আপিল করে ফল পাব না। ইতি বৈশাখ ১৩৪০

রবিকাকা

[৪৮] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

বিবি, ছুটির অবকাশে অতিথি অভ্যাগতে আশ্রম পরিপূর্ণ। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত বাক্যালাপ চলচেই। ফাঁকে ফাঁকে জরুরি কাজও চালাতে হচ্চে। অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে ডিসেম্বরের গোড়াতেই, এই গোলমাল ও অনবকাশের মধ্যে সেটাকে খাড়া করতে হবে। এই কাজটার বোঝা অত্যন্ত ভারি। কেননা আমি যে ইংরেজি জানি এ বিশ্বাস আজও আমার মনে পাকা হতে পারেনি। এই সম্বন্ধে আত্মঅবিশ্বাসের একটা গাঁঠ শক্ত হয়ে আছে আমার মনে, ছাড়াতে পারিনে। লেখা আরম্ভের গোড়াতে তার

পীড়নটা প্রবল হয়ে ওঠে, লিখতে লিখতে ভুলে যাই। এ ছাড়া আরো বিস্তর দুশ্চিন্তা ও কাজ জমে আছে।

সুবীরের খবর এদিক ওদিক থেকে পাচ্চি— মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে— এক এক সময়ে দৈবদুর্য্যোগকে মানবার দিকে ঝোঁক যায়। হঠাৎ কেন দুঃখ দুর্বিপাক আসে ঝাঁক বেঁধে?

আমার আশীর্ব্বাদ নিস। ১৩ আশ্বিন ১৩৪০

রবিকাকা

---

[৪৯] ঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছি কি না মনেও নেই। কিছুকাল থেকে এত বেশি লোকের ভিড় কাজের ভিড় যে মাথার ঠিক থাকে না— তার উপরে, বাহাত্তর বছর বয়সের মাথাটাও নড়বড়ে হয়ে উঠেছে— ভুল হয় বিস্তর— কিন্তু লোকে বিচার করে সাবেক কালের আদর্শে।

সুবীরের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে— আশা করচি আরোগ্যের দিকে এগোচ্চে। তোরা সংসারের দুঃখজালে কী রকম জড়িয়ে পড়েছিস তা বেশ বুঝতে পারি— তাতে মনে কেবল দুঃখই পাওয়া যায়, প্রতিকার করবার শক্তি নেই কারো। এতকাল জীবনের দিনগুলো সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে নানা আঘাত পেয়ে চলেছিল, কিন্তু তবু আলো ছিল— এখন

ছায়া নেমেছে। তাই ছুটির জন্যে মন প্রায়ই ব্যাকুল হয়।

এণ্ড্রুজ এসেচে। কয়েকদিন থাকবে।

কাল পর্য্যন্ত বৃষ্টিবাদল চলেছিল, আজ মনে হচ্চে প্রসন্ন হয়েছে শরতের মুখশ্রী। ইতি ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

রবিকাকা

[৫০] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

১৩ই জানুয়ারিতে এখানে এসে সাতদিন থাকবার সঙ্কল্প করেছিস্। সঙ্কল্প যার সাধু তার একমাত্র সহায় বৌমা এমন সংস্কার কী করে তোকে পেয়ে বসল বুঝতে পারিনে। বৌমা কিছুকাল থেকে সংসার ছেড়ে জগন্নাথধাম আশ্রয় করেছেন তবুও তো আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ চলচে। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে তোর মন থেকে পৌত্তলিকতা এখনো দূর হয়নি, লক্ষ্মীর অশরীরী আবির্ভাবের 'পরে এখনো তোদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই। বৌমাকে এমন স্থূলভাবে দেখিস্‌নে— তাঁর সূক্ষ্ম সত্তা উত্তরায়ণের ভাঁড়ার ঘর থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে— তাঁর অভাব তোদের চোখে ঠেকবে কিন্তু অশনে আসনে আরামে বিরামে ঠেকবে না বলে বিশ্বাস করি নইলে তাঁর মাহাত্ম্য কিসের? নইলে এ কয়দিন আমাদেরও

তো ৺পুরীধামে জগন্নাথ দেবের শরণ নিতে হোতো।...ইতি ৭ জানুয়ারি ১৯৩৪।

রবিকাকা

---

[৫১] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি এইমাত্র প্রমথর চিঠি আমাকে চেতিয়ে দিয়ে গেল যে আমার কাছে তোর একটা উত্তর পাওনা বাকি আছে। আর একটা প্রমাণ, আমার বয়স হয়েচে। আমার মনের প্রথম দেউড়িতে বসে বসে দাড়ি পাকায় প্রবীণ কুঁড়েমি। সেটা কোনোমতে পেরিয়ে গেলে দেখা যাবে থানা দিয়ে বসেছে বিস্মৃতি। চিঠি হাতে এলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ মন বলে উত্তর দেব, তার পরে বলি কাল দিলেই হবে, সেই কাল-পরম্পরা এগোতে থাকে, অবশেষে সেটা উল্টিয়ে পড়ে বিস্মৃতির অন্ধকূপে।

মিস আঢ্যকে গান শেখানো আমার কর্ম্ম নয়, প্রথম কারণ সময় নেই (সম্পূর্ণ সত্য নয়), দ্বিতীয় কারণ নিজের কোনো গানই আমার জানা নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে দিনুই অগতির গতি। দিনু এখন কলকাতায়।

তার পরে এখানকার ছাত্রীবিভাগের অধিনায়িকা। তুই যে আধা-ডাক্তারনীর কথা লিখেছিলি খাপ খাবে কিনা বুঝতে

পারা গেল না— জানা লোকের জানাশোনা মানুষ যদি হোতো বিচার করা যেত— তার পরে বেতনের সমস্যা। অন্নে পেট ভরবে কি না সন্দেহ করি। আপাতত স্থির করেছি, সুধা— প্রভাতকুমারের স্ত্রী— সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা— তাঁকেই ঐ পদে অধিষ্ঠিত করব— রাতের বেলায় মেয়েদের আগলাবার জন্যে কিঞ্চিৎ সস্তা দামে কোনো ভদ্র মেয়েকে সুধার সহকারিণীরূপে রাখব। এই শেষোক্ত মহিলাকে কোনো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে সন্ধান করতে হবে— অর্থাৎ এমন কোনো বিধবা মানুষ, যিনি সংসারযাত্রা একদফা সেরে এসেছেন। ভদ্রঘরের মেয়ে দুঃখে পড়েচেন, লেখাপড়া জানেন, কাজেকর্ম্মে পটু এই দুর্দ্দিনে নিঃসন্দেহই এমন লোক অনেক আছেন।

কলকাতায় পৌঁছব বুধবারে, তার পরে মোকাবিলায় তোর সঙ্গে কাজের অকাজের সব কথা হবে। প্রমথকে বলিস আমার সেই চিঠি বিচিত্রাতে দিলে দোষ নেই— ওরা ভালোমানুষ লোক।

মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন অদূরবর্ত্তী ঘরে, তার গন্ধ আসচে— তার উপরে আমার নাৎনি এসেছেন তাগিদ করতে— অতএব অর্দ্ধ ভোজনের উপরে আরো কিছু এগিয়েচে— অতএব ইতি ১ এপ্রেল ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫২] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ। এদিক ওদিক থেকে বুবুর খবর পাচ্চি শুনচি এখন তার শরীর ভালোর দিকেই। কাল পুপু টেবিলে বসে খাচ্ছিল— হঠাৎ পাখাটা ঘুরতে ঘুরতে সেই টেবিলে পড়ে গেল, পুপু সময়মতো সরে যেতে পেরেছিল বলে বেঁচে গেছে। আমরা অসংখ্য প্রচ্ছন্ন অপঘাতের একচুল তফাৎ দিয়ে যাতায়াত করি— এক নিমেষের মধ্যেই হাঁ-এর ডাঙা থেকে না-এর গর্ত্তে পড়বার আশঙ্কা অহোরাত্রই আছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৪

রবিকাকা

[৫৩] ওঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, বর্ষামঙ্গলে হুড়মুড় করে বৃহৎ একদল লোক এসে পড়চে, তার মধ্যে ঠেকাবার মতো মানুষ প্রায় কেউ নেই। তোরা এলে স্থানাভাবের সমস্যা প্রবল হবে, এবং তোরা কষ্ট পাবি। এমনিতেই যাঁরা আসচেন তাঁদের আরামের

ব্যবস্থা ছশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। বাইরের লোককে রথীরা সহজে ঘরের মধ্যে ভিড় করতে দেয় না— কিন্তু সে নিয়ম অগত্যা ভাঙতে হয়েচে। কিন্তু তাই বলে এখানে তোদের আসাটা সম্পূর্ণ বাধা পাবে এ কথা মনে করতে একটুও ভালো লাগচে না। বারোই অগস্ট পর্য্যন্ত এখানে গোলমাল। তেরই থেকে শান্তিঃ শান্তিঃ। সেই শান্তিপর্ব্বে যদি আসতে পারিস তাহলে খুব খুসি হবো এবং দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তোদেরও ক্লিষ্ট হতে হবে না। সময়টা সুখসেব্য, এখানকার আকাশে প্রান্তরে বর্ষার পরিপূর্ণ সমারোহ— অথচ এ পর্য্যন্ত ধারাবর্ষণে অত্যাচার নেই, মিতাচারই দেখা যাচ্চে। ইতি ৭ অগস্ট ১৯৩৪

রবিকাকা

---

[৫৪] ঔ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমার শরীর অসুস্থ। হাওয়া বদলের জন্যে পশু´ যাবেন ওয়াল্‌টেয়ারে। গৃহনিরীশ্বরী ঘরে আতিথ্যের ক্রটি হবে। আমি যাত্রা করব ১৯শে তারিখে। ইতিমধ্যে রিহার্সালের তাগিদ প্রবল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। ফিরে

আসি তার পরে দেখা দিস্। মন্দিরাকে জানি। কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে। অল্প কয়দিনে সে শিখতে পারবে না। কাজ চালাবার মতো লোক এখান থেকেই সংগ্রহ হয়েচে। ইতি সোমবার

রবিকা

[৫৫] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মাদ্রাজ যাত্রার উপক্রমণিকা চল্‌চে। তার উপরে নানাবিধ খুচ্‌রো কাজ। চারিদিকেই ছুটি, কেবল পূজোর দালানের পথযাত্রী গলায় দড়িবাঁধা ছাগল এবং রবীন্দ্রনাথের ছুটি নেই। শরতের রৌদ্র দুচারদিনের জন্যে দেখা দিয়ে মন ভুলিয়ে মেঘের নেপথ্যে নিরুদ্দেশ হয়েচে। দুদিন উর্দ্ধশ্বাসে বৃষ্টি বাদল চলল, আজ তারি অবশেষরূপে অবসাদগ্রস্ত বর্ষণ-বিহীন মেঘের ছায়া।

আমি ১৯শে তারিখে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। বেলা আড়াইটায় পৌঁছব কলিকাতা মহানগরীতে। সেই দিনই গোধূলি লগ্নে যাত্রা করব দক্ষিণাপথে। তারপর অক্টোবর মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এন্‌গেজমেন্টের আবর্ত্ত। আয়ুর কোঠায় সাতটা দশক পেরিয়েছি কর্ম্মস্থানে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে না— আমার জন্মের লগ্নাধিপতিকে কর্ম্মের লগ্নাধিপতি স্পর্দ্ধার সঙ্গে প্রতিবাদ করচে। বারবার

মনে মনে সংকল্প করি এইবারে হাতিয়ারগুলোকে বর্জ্জনাগারে তালা-বন্ধ করে হাতটাকে খোলসা করব। কিন্তু কৌতুকপ্রিয় ভাগ্যের ফরমাস আরো যেন বেড়ে ওঠে। হার মেনেছি।

বৌমা ওয়ালটেয়রে— ভালোই আছেন। মাদ্রাজের দলে যোগ দেবেন কিনা নিশ্চিত জানিনে। রথীই বলো বৌমাও বলো এঁরা জীবন্মুক্ত, ইচ্ছাধীন এঁদের কর্ম্ম— আমারই কেবল মুক্তি নেই, তাঁরা অনায়াসেই বল্‌তে পারেন, যাব না, করব না বা মাঝ আসরে উঠে পালাব— আমার তা বলবার জো নেই, আমি বদ্ধ জীব। তোরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিস। ইতি ১৭ অক্টো ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫৬] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

…গান দেখলুম। কিছু বল্‌তে ভরসা হয় না, পাছে আমার বাক্য ওর গানেরই মতো অশ্রাব্য হয়ে ওঠে। ফলের মধ্যে যে শাঁস অংশ থাকে তারই মোরব্বা চলে, আঁঠির মোরব্বা অচল। কঠোর তত্ত্বকথা সুরের রসে পাক করলেই যদি গান হোত তাহলে Kantকে Beethoven তাঁর সিম্ফনিতে গালিয়ে নিতে পারতেন। যাই হোক্ একটা কথা মনে রাখিস, "সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম" এ মত আদি বা সাধারণ বা কোনো ব্রাহ্ম-সমাজেরই নয়। এ যদি এগারই মাঘে চালাস্ তাহলে শ্যামা

মাকে ব্রহ্মময়ী সম্বোধন করে রামপ্রসাদের গানও চালাতে পারিস। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমার এ সমস্ত কিছুতেই আপত্তি নেই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বুকে বসে দাড়ি উৎপাটন অমার্জ্জনীয়। "সর্ব্ব জীবে আছ ব্রহ্ম" বল্লে দোষ খণ্ডন হয়— হয়তো "সর্ব্বগত ব্রহ্ম" ছন্দে মিলতে পারে— মিলুক বা না মিলুক্ সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম কোনোমতেই যেন ব্যবহার না করা হয়— মনে রাখিস্ বাবামশায় থাকলে তিনি কিছুতে এ সহ্য করতেন না।

"যদি প্রেম না দিলে প্রাণে" ছোটমেয়েকে দিয়ে গাওয়াতে দোষ নেই। কণ্ঠের যোগ্যতা ছাড়া আন্তরিক যোগ্যতা বিচার করে গান গাওয়াতে গেলে অধিকাংশ গানই অধিকাংশ লোককে দিয়ে গাওয়ানো চলে না।

গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম নির্দ্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্চে বলবার কোনো দরকার নেই, কী গাওয়া হচ্চে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম, নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে। আর কিছু বক্তব্য নেই। ইতি ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

রবিকাকা

[৫৭]　　　　　　　　ওঁ　　　　　　　　পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমাদের এখানে একটি সঙ্গীত বিভাগ আছে, বলাবাহুল্য সেটা নীরব নয়। ভালোই চলচে। সেখান থেকে আমার কাছে আবেদন এসেছে নিম্নলিখিত বইগুলির জন্যে—

স্বরলিপি গীতিমালা।
জ্যোতিদাদার সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের ৬৮ গানের স্বরলিপি।
আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা।
শতগান।
কাঙালীচরণের ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরিলিপি।

পাই যদি তবে যথোচিত ব্যবহারে লাগবে। বইগুলি তোর অধিকারভুক্ত অথবা আয়ত্তগম্য কিনা জানিনে। পাই যদি খুসি হব, নইলে এ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করে জানাস।

মাঝে আমার গ্রহ আমাকে একবার ঘুরপাক খাইয়ে এনেছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা শরীরযন্ত্র বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অপরাধ নেই। যদি তাদের জেদ শেষ পর্য্যন্ত বহাল থাকত তাহলে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে ছুটি দাবী করতে পারতুম। ছুটির জন্যে মনটাও উৎসুক আছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমার শরীর যতই বিগড়ে যাক্ অনতিবিলম্বে সেরে উঠতেও ত্রুটি করে না। এতে করে অস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি লোকের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি সম্পূর্ণ হারিয়েছি। ইস্কুল-পালানে আমার ধাত,— ছেলে বেলায়

ক্লাস ফাঁকি দেবার চেষ্টায় শরীরকে যোগ দেবার জন্যে অনেক সাধনা করেছি, কিছুতে তাকে রাজি করতে পারিনি। এখন মাঝে মাঝে রোগের লক্ষণ দেখা দেয় কিন্তু আরোগ্যের শক্তির কাছে তারা টেঁকে না। অথচ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেশ উচ্চ শ্রেণীয় honest রকমের ব্যামো সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্চি। এর থেকে বেশ বুঝতে পারচি আমাকে খাটিয়ে মারবে শেষদিন পর্য্যন্ত, ব্যামোয় মারার চেয়ে সেটা কম কিসের ?

তোদের অনেক দিন দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে করে। তার কারণ, জীবন আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে— এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে— বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই— নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষপ্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ— এই প্রান্তটি সঙ্কীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করচি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে— সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।

নব বর্ষ আসন্ন। রথী বৌমারা সমুদ্র পারে। একটি নাবালক অভিভাবক আমার আছে— পুপে। পণ্ডু মীরাও এসেচে।

খুব গরম পড়ে আসচে তাই তোদের আসতে বলতে সঙ্কোচ বোধ করচি। আমি নিজে গরম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু নই। পঁচিশে বৈশাখের নিমন্ত্রণে এসেছি জগতে।

একটা মাটির ঘর বানাতে লেগেছি। জন্মদিনের মধ্যে সেটা শেষ হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করব, তার পরে শেষ পর্য্যন্ত আর বাসা বদল করব না এই আমার অভিপ্রায়। ইতি ৭ এপ্রেল ১৯৩৫

রবিকাকা

[৫৮] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কাল ভোরের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। তাই আর বেশি কিছু লিখব না— শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন।

গানের বই ও পত্রিকাগুলি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি— কাজে লাগবে।

ধুমধাম হয়ে গেল এক চোট। জনসাধারণের মাঝে মাঝে খেলা করবার সখ মেটাবার জন্যে জ্যান্ত পুতুলের দরকার করে এই সখের জোগান দিয়েছি আমি— কিন্তু বড়ো ক্লান্তিকর। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৪২

রবিকাকা

বিবি,

রাগিণী দেবীকে যদি সাহায্য করতে পারিস তো ভালো হয়। গোপীনাথের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। দুই একজন

বাঙালী মেয়েকে যদি এঁদের কাছে তৈরি করতে দিস তাদের খুবই উপকার হবে। এঁরা তাদের দেশে বিদেশে নিয়ে যেতে পারবেন। এঁরা ভদ্র।

রবিকাকা

---

[৫৯] ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal
পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

পূজার ছুটিতে কোথাও নড়িনি যেহেতু নড়বার শক্তি অজস্র নয়। বাগানে বেড়াবার ইচ্ছে আছে কিন্তু কটিদেশ হয় বিমুখ। দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিনীলিম রশ্মিপাত করে থাকি— কিছু ফল পেয়েছি। পত্রযোগে শরীর সম্বন্ধে আলোচনা করিনে বলে আক্ষেপ করেছিস। বুলেটিন বের করতুম, যদি তার দুঃখাণি চ সুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে হোত। ওর পতন চলেছে পরিণত বয়সের ঋজুরেখা ধরে, অত্যন্ত একঘেয়ে ভাবে। উদ্বেগের মধ্যেও উপাদেয়তা থাকে যদি সংবাদের মধ্যে উঁচুনিচুর বৈচিত্র্য মেলে। তোর পা-ফোলার খবর পেয়ে নিজের পায়ের কথা মনে পড়ে। প্রায়ই তো হোত— ওটা ছিল ক্লান্তির সহচর— রক্তপ্রবাহের ক্ষীণতায় ওর উদ্ভব। আজকাল প্রায়ই আরামকেদারায় উত্তানভাবে কাল কাটাই, পা দুখানার অধোগতি যথাসম্ভব বন্ধ আছে। সেটাতে কাজকর্ম্মেরও বহর কমে পায়েরও।

বৌমা চলে গেলে দিনগুলো শ্রীহীন হয়ে পড়ে, ভালো লাগেনা। তিনি থাকলেও দেখাশুনো বেশি হয় না, তবু তাঁর প্রভাবটা থাকে হাওয়ায়। স্টীমার যোগে গঙ্গা বেয়ে পশ্চিমে গেলে কেমন হয়? মনটা সেই পথে যাব যাব করছে— কিন্তু পথটা তো ধ্যানের পথ নয়— অতিক্রম করতে আয়োজন দরকার। অতএব—

শুক্ল দ্বাদশী আশ্বিন ১৩৪২

রবিকাকা

◆

[৬০] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন
২ জুন ১৯৩৬

কল্যাণীয়াসু

দিনুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে গীতসূচি সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চেয়েছিস। অক্ষম আমি। বাছাই করা যাচাই করা কাজে আমার বুদ্ধি খোলে না। আজকাল সকল বিষয়েই বুদ্ধিটা চাপাই আছে। তুই যে সূচি বানিয়েছিস সেইটে সম্পূর্ণ সমর্থন করাই আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আরামের। খুকু আছে অনাদি আছে তাদের মন্ত্রণা আমার পরামর্শের চেয়ে অনেক বেশি কাজের হবে। নিজের গান সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সব চেয়ে কম এ কথাটা জগদ্বিখ্যাত। এই নিয়ে আমার মুখের সামনেই সুকুমারমতি বালক বালিকারা হাস্য সম্বরণ করতে পারে না। আমার গানের

প্রসঙ্গ উঠলে আমি সঙ্কুচিত হয়ে থাকি। তাই তোর চিঠি পড়ে গর্ব্ব অনুভব করেছি। দেখতে পাচ্চি আমার পরে এখনো তোর শ্রদ্ধা আছে— তার কারণ আমার উত্তরকাণ্ডে তোর পরিচয় অল্পই— তুই জানিস্‌নে আমার মাথা থেকে গীতরূপিণী সীতা গেছেন বনবাসে।— আমার আধুনিক গানে রাগ তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তারপরে যদি নামেরও ভুল হয় তাহলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জ্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস।

ঝড় বৃষ্টি চলচে। জ্যৈষ্ঠমাসটা ঠাণ্ডা মেজাজেই আছে— ভাগ্যে শিলঙে যাইনি— কথা উঠেছিল। ইতি বোধ হয় ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

রবিকাকা

---

[৬১] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

গাইয়ে একজন না হলে লজ্জা রক্ষাও হয় না, কর্ত্তব্যপালনও বন্ধ। যখন বিপন্ন হয়ে তোর শরণাপন্ন হলুম তখন বড়ো আশা ছিল একটা কিনারা হবেই। কারণ দেখে আসচি যার যা কিছু প্রয়োজন তার উদ্ধার করবার ভার তোর উপরেই পড়ে, আর তুইও একটা গতি না করে ছাড়িস্‌নে। আমাদের

বেলাতেই তোর সঙ্কটতারিণী নামে যেন কলঙ্ক না পড়ে। একবার গোঁপেশ্বরকে নাড়া দিয়ে দেখলে কেমন হয়?

খুব উঁচুদরের লোক চাইনে। তারা হজমের যোগ্য নয়। সাধারণ জাতের মানুষ পেলেই আমাদের মতো অভাজনদের চলে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাব নেই। মা এবং ধা-এর প্রভেদ ধরতে পারে, রামকেলীর সঙ্গে খাম্বাজের পার্থক্য কী বুঝতে কষ্ট হয় না। এবং কণ্ঠস্বরটা ফৌজদারী মামলার বিষয় হয়ে না ওঠে— তা ছাড়া সঙ্গীতের মধ্যেই যে স্বাভাবিক মদিরতা আছে তার বাইরে আর কোনো-রকম মাদকতার প্রয়োজন যার নেই। চলনসই লোক পেলেই আমরা খুসি হব। দোহাই তোর, একবার চারদিকে হাৎড়ে দেখিস্— দিন চলে যাচ্ছে বৃথা।

বর্ষামঙ্গলের আয়োজনে ব্যস্ত আছি। যথাসময়ে পরিচয় পাবি। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৪৩

রবিকাকা

---

[৬২] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোর অন্তঃশীলার বিচার লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। ইংরেজি ভাষায় এই রকম লেখাকেই বলে সমুজ্জ্বল। এই

সংখ্যার চিত্রালিতেই কোনো তত্ত্বজ্ঞানী কোনো নভেলের যে সমালোচনা করেচেন, সেই লেখার আবিলতার সঙ্গে তোর রচনার দীপ্তির তুলনা করলে সেই পণ্ডিতের প্রতি কৃপা জেগে ওঠে মনে।

কল্যাণ এখানে এসেছিল। বৌমা ছিলেন না রথী ছিলেন না— আমি গৃহধর্ম্মপালনে অপটু, অন্যমনস্ক— ভাণ্ডার এবং পাকশালার রহস্যে আমার প্রবেশাধিকার নেই— জানিনে তোর কাছে কিরকম রিপোর্ট গিয়েছে। যত্ন করিনি এমন অপবাদ দিতে পারবে না— কিন্তু যত্ন করা এক, আর পরিতৃপ্তি সাধনা করা আর— শেষোক্তটার জন্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন করে, আমার সেটাতে অভাব আছে, এজন্যে আমি ক্ষমার্হ। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৪৩

রবিকাকা

---

[৬৩] ঔঁ

Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। বৌমা পুরীতে, রথী কলকাতায় বোটে, আমি শান্তিনিকেতনে। ছাত্র ছাত্রীরা যে যার আপন আপন বাড়িতে। কেবল এখানকার গাছপালাগুলি ছুটি নিয়ে হাওয়া বদলাতে যায়নি— দীর্ঘকাল ধারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল,

এখন হেমন্তের সূর্য্যকিরণে রোদ পোহাচ্চে। ওরা যে সৌন্দর্য্য বিকাশ করেছে তার জন্যে অভিমত দাবী করে না—ওদের পত্রগুলি foreword লেখবার জন্যে অনুরোধ পাঠায় না, ওদের মর্ম্মরধ্বনির প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা নেই কোনোখানে। ওরা ছুটির আয়োজন চারদিকেই সাজিয়ে রেখেছে, কাজেই গাড়ি ভাড়া দিয়ে রাঁচিতে যাবার জরুর বোধ করচিনে।
বিজয়া দশমী ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ভয় করিসনে। গোপাল মারা গেছে ১১ই মাঘ সহমরণে যায়নি। তোরা ওখানে সবাই মিলে গান ঠিক করে নিস্। ক্ষিতিবাবুকে পাঠিয়ে দেব বেদী অধিকার করবার জন্যে। নেপথ্য থেকে যা করবার রথী করবে। আমার এখানে ১১ই মাঘ উৎসব আছে, এখানকার অনুষ্ঠান আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়। ইতি ৮।১।৩৭

রবিকা

[৬৫] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। কিছুদিন থেকে আমার শরীর ভালো ছিল না। কিন্তু সেটা ঘোষণা করবার মতো সংবাদ নয় বিশেষত বয়সটা যখন আশির দিকে ভাঁটিয়ে চলেছে। যে কথাটা জানাবার সে হচ্ছে এই যে নববর্ষের দিন নানাদিক থেকে সুসম্পন্ন হয়েছে— ভাগ্যক্রমে অনুষ্ঠানের জন্যে শরীরে শক্তি ছিল। তোরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস, নলিনীকেও আশীর্ব্বাদ জানাস্। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪৪

রবিকাকা

---

[৬৬] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক আলমোরা

কল্যাণীয়াসু

দুঃখকর পথে জীবনীশক্তির অনেকখানিরই অপব্যয় হয়েছিল। এখানে আসার পর ক্ষতিপূরণ হয়েও কিছু উদ্বৃত্ত জমা হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। আমার সঙ্গে

ঋতুরঙ্গনাথের একটা যেন ঠাট্টার সম্পর্ক আছে। এখন শুকনোর সময়, তারই উপর বিশ্বাস রেখেছিলুম। শীতের সঙ্গে অল্প একটু গরম মিশোল থাকলে সেটা হয় আরামের— যেন উমার সঙ্গে মিলনে শিবের তপস্যার অবসান। আমি আসার পরেই বর্ষা নামলো অসময়ে— বর্ষামঙ্গলের উল্টো পালা গাইতে ইচ্ছে হচ্চে। আর যাই হোক সকলের শরীর আছে ভালো। বাড়িটা বড়ো, জায়গাটা নির্জ্জন, অভিনন্দনের বালাই নেই। জন্মদিনে রথীরা দিশি বিদেশী স্থানীয় লোকদের চা-পান সভায় মিষ্টান্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমার ইংরেজি কবিতা কিছু আবৃত্তি করতে হোলো। জন্মদিনের ফাঁড়া অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে। খবর বিশেষ কিছুই নেই সেইটেই ভালো খবর। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৪৪

রবিকাকা

[৬৭] ওঁ "St. Marks"
Almora, U. P.

কল্যাণীয়াসু

এখানে আমি যে শুধু বিশ্রাম করচি তা নয়। বস্তুত বিশ্রামের অংশটাই সব চেয়ে কম। নানাবিধ কাজ চেপে বসে যখন পাওয়া যায় অবসর, হাওয়া হাল্কা হলেই চারদিক থেকে ধেয়ে আসে ঝড়। বিদেশী গল্পের ভূমিকায় গীতিনাট্য লিখব সে রকম তাগিদ নেই মনের মধ্যে। লেখবার ফরমাস

অনেকগুলো আছে। সবগুলিই রয়েছে শিকেয় তোলা। অথচ লেখা চলচে পুরো দমে। এই কর্ত্তিকাগুলো জমিয়ে কেবল তুই জমা করবার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্চিস্— কাজে কি লাগবে। দিন চলচে ভালোই, মাঝে গিয়েছিল ঝড়বৃষ্টি, গেছে কেটে, আজ মুহূর্ত্তের জন্যে ভূমিকম্প অনুভব করেচি। ইতি ৩০ মে ১৯৩৭

রবিকাকা

---

[৬৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

স্বয়ং প্রোৎসাহক উৎসাহপ্রার্থী। গানগুলি সবই নতুন, এখানকার ছেলেরা মেয়েরা শিখেছে। ভাবনার কারণ হচ্চে এই যে, ছায়ার প্রেক্ষাশালা খুব বড়ো। পাছে যথেষ্ট বলবান কণ্ঠের অভাবে না জমে এই ভয় কেউ কেউ প্রকাশ করচেন— সেইজন্যে গলা খুঁজচি। শুধু গলা হলেই হবে না, শেখা চাই। নতুন গান খুব সহজ নয়— মেধা এবং অধ্যবসায়ের একত্র সম্মিলন হলে সবই সম্ভব। খুব বেশি লোক হলে শিখিয়ে তোলা শক্ত হবে। গানের হট্টগোল শ্রোতার কাছে সুখশ্রাব্য হবে না সে কথা বলা বাহুল্য। চার পাঁচটি বাছাবাছা গলা পেলেই সাম্প্রতিক অভাব মোচন হবে। বেবি একটি খুব সুকণ্ঠিনীর কথা বলেছে তাকে পাওয়া যাবে, তাকে দিয়ে একক গান চল্‌বে।

সেই শ্রেণীর আরো ছুটি একটিকে পাওয়া যেতে পারে। আমি যাচ্চি পর্শু অর্থাৎ ২৬শে তারিখে প্রাতের গাড়িতে। পৌঁছব অপরাহ্নে। সেইদিনই তোর সঙ্গে পরামর্শ করে দেশকালপাত্র পাকা করা যাবে। সময় এত অল্প যে হাংড়ে বেড়াবার মতো মার্জিন পাওয়া যাবে না। শেখবার স্থান জোড়াসাঁকো, সময় তোদের বিচার্য্য, পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়েরও ব্যবস্থা হয়ত করতে হবে— বিশেষত একক-কণ্ঠীদের স্বতন্ত্র সময় দেওয়াই চাই। যানবাহনের জোগান দেব। উৎসবের দিন স্থির হয়েছে ৪ঠা এবং ৫ই। ছায়া প্রেক্ষাগৃহ তোর বোধ হয় জানা আছে, এবারে রবির সম্মিলনে সেটা হবে রবিচ্ছায়া। লোকের মুখে তোর সহায়তা কামনা করেছিলুম তার প্রধান কারণ বয়োধর্ম্মসুলভ জড়তা। দিনে দিনে সেটা সুগভীর হয়ে উঠেছে। এই চিঠি লিখ্‌তে বসার পূর্বে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে পা ছুলিয়েছি। ২৬ শে পৌঁছব কলকাতায়, দিনান্তে চলে যাব প্রশান্ত নিকেতনে, তৎপূর্বে তোর সঙ্গে মন্ত্রণা আবশ্যক, এবং তার পরদিন থেকেই কাজ। ইতি ২৪।৮।৩৭

রবিকাকা

২৭ শে যাওয়াই স্থির ২৬ শে নয়। ইতিমধ্যে তুই খোঁজখবর নিয়ে প্রস্তুত থাকতে পারিস।

[৬৯] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলে নিরাশ হবি না। ছায়ায় চণ্ডালিকা অভিনয়স্থলে আমি উপস্থিত থাকব না প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু সমস্ত কলকাতা তো ছায়ারঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত নয়। রবির উপর ছায়াপাতকে বলে সূর্যগ্রহণ— আমার এবারকার পঞ্জিকায় সে লগ্ন নেই। আমি অক্ষুণ্ণ আয়ু নিয়েই স্বক্ষেত্রে বিরাজ করতে পারব।— প্রমথর অভিভাষণ প'ড়ে দেখেছি— ভালোই লেগেছে— ওর দুর্বল কণ্ঠের বাহন ওর প্রবল লেখনী— তাই ধ্বনির অবস্থা যেমনি হোক্— ওর বাণীর দৌড়ে বেগ কম হয়নি। গেল ১১ই মাঘের অন্তে…দুটি গানের মধ্যে একটি প'ড়ে নীলরতন ডাক্তারকে খবর দেবার দশা হয়েছিল।

রবিকাকা

---

[৭০] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার কলকাতায় যাওয়ার বিরুদ্ধে তোদের আগ্রহ দেখে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলুম। কিন্তু তার পরিবর্তে তোর কাছে আমার এই প্রস্তাব পাঠাচ্ছি যে তোরা কয়েকদিন এখানে কাটিয়ে যাবি। অনেকদিন তোদের কাছে পাইনি। এখানকার

হাওয়ার মেজাজ সম্প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল নয়। দোলের দিনে আমাদের বসন্ত উৎসব। ইতি

রবিকাকা

[৭১] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কী হোলো বুঝতে পারা গেল না। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে গত কাল গেছে মঙ্গলবার। সকালে উঠে ভাবলুম প্রতিশ্রুত পত্র যখন আগমন সংবাদ আনল না তখন হয়তো টেলিগ্রাম আসতে পারে, বার্তাহীন নিঃশব্দতায় মঙ্গলবারের অবসান হোলো। যথানিয়মে আজ এল বুধবার— সকালে ডাক এল, অনাগমনের জন্যে কোনো কৈফিয়তী লিপি পাওয়া গেল না। আজ দোলপূর্ণিমা, ছাত্রছাত্রীরা পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে গেল। আজ শুক্ল সন্ধ্যায় বসন্ত উৎসব হবে, তারি মন্ত্রণা এবং আয়োজন চলচে। আমাদের অভিনয়ের দল কাল চলে যাবে রঙ্গশালার অভিমুখে, আমার পথ রোধ করেছে ডাক্তারের দল, যে কারণ দেখিয়ে সেটা সম্পূর্ণ আজগবি। অজ্ঞতার অন্ধকার গর্ভ থেকে কাল্পনিক আশঙ্কার জন্ম, পুরাযুগে এই জন্যেই ডাইনি অপবাদ দিয়ে মানুষ হত্যাকাণ্ড করত— সেটা ছিল তখনকার ডাক্তারির একটা প্রথা, আমার পক্ষে এখনকার ডাক্তারির ডাইনী হচ্চে ছায়া নাট্যশালা। আসল কথা তারা কিছুই জানে না কি জন্যে আমার অকস্মাৎ এই ব্যাধির উপসর্গ— চিকিৎসা বিদ্যার মানরক্ষার জন্যে যা তা

এমন একটা হেতু খাড়া করে দিলে যার স্বপক্ষে বিপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই— একমাত্র প্রমাণ নামজাদা ডাক্তারদের নাম। পূর্বযুগে পীড়িতের দল ডাইনীর প্রভাব মেনে যেতে বাধ্য হয়েছিল— আমিও দশচক্রে মেনে গেছি, কিন্তু মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা, কলকাতায় যাব না। যাব এখান থেকে সুরুলে, শ্রীনিকেতনের প্রাচীন দালান বাড়িতে। ইতিমধ্যে চিন্তা করচি তুই যে মঙ্গলবারের উল্লেখ করেছিস সেটা কি কোনো একটা আগামী সপ্তাহের অন্তর্গত? ইতি দোলপূর্ণিমা ১৩৪৪

রবিকাকা

[৭২] ওঁ * Gouripur Lodge
Kalimpong
পোস্টমার্ক, কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু

কাল আমার জন্মদিন ছিল সেটা দশে মিলে তারস্বরে আমাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে। চারদিক থেকে স্তুতির স্বরবর্ষণ হয়েছিল— ভীষ্মের মতো মৃতকল্প হইনি কিন্তু লজ্জিত হয়েছিলুম। প্রশংসা বুক ফুলিয়ে নেবার মতো তাকদ্ আজো আমার হয়নি। নিজের গুণ সম্বন্ধে আমি যে একেবারে অচেতন এত বড়ো বোকা আমি নই, কিন্তু তার জয়পত্রকে চিবিয়ে জীর্ণ করার মতো পাকযন্ত্র আমার নেই। সেইজন্যে অভিনন্দনের ভিড়কে কোনোমতে পাশ কাটাতে পারলেই আমি বাঁচি—

কিন্তু খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— ঐ ভিড় ঠেলেই চলতে হয়েছে সমুদ্রের এক তীর থেকে অন্য তীর পর্যন্ত। যদিও এসে পড়লুম শেষ ঘাটে, তবু ঢাকীর দলের ঢাকপিটুনি আরো যেন মেতে উঠচে। তার আওয়াজটা অহঙ্কারের কোঠায় একেবারে পৌঁছয় না, তা বলতে পারি নে, কিন্তু কেমন যেন আরাম পাইনে, মনটা পালাই পালাই করে। ছেলেবেলায় নতুন বোঠান যথোচিত উৎসাহের সঙ্গে তাঁর দেওরের অভিমান খর্ব করে এসেছেন, সেটা আমি স্বাস্থ্য বরাদ্দের মতোই মাথা পেতে নিতে অভ্যস্ত হয়েছিলুম, কখনো ভাবতে পারতুম না বিহারী চক্রবর্তীর গৌরবের সীমা আমি কোনো দিন পেরোতে পারব। তিনি তাঁকে নিজের হাতে পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন, আমি নিশ্চয় জানতুম আমার আসন মাটিতে— আদরের এই উপবাস এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আজ তার প্রাচুর্য আমার পাওনার বেশি মনে না করলেও তাতে অস্বস্তি বোধ করি। জন্মদিনের ডাকের চিঠিগুলো দেখলে বিষম কুণ্ঠা বোধ হয়, ভালো করে পড়িই নে— এই তো আমার অবস্থা, অথচ— যাক্‌গে।

প্রমথ আমার প্রস্তাবটা নিয়ে কোমর বেঁধে বসেছে শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি, সম্পূর্ণতার জন্যে পথ চেয়ে রইলুম। বিষয়কে সহজ করা, উপাদেয় করা অথচ পুষ্টিকর অংশে কৃপণতা না করা, এ প্রমথ ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে না।

তোর তর্জমাও আমাদের কাজে লাগবে। একটু সময়

দিস্ কর্তব্য-বিশেষের একাগ্রতায়। পাঁচভূতের টানাটানিতে সর্বদাই সময়টাকে পাঁচমেশোলী করিস্‌নে। সৌখীন কুঁড়ে মানুষ অবকাশের যে অপব্যয় করে, হয়তো তার মূল্য কিছু ফিরে পায়, কিন্তু তোর মত শ্রমশীলা যখন অপব্যয় করে তখন সেটা নিছক লোকসানে দাঁড়ায়। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

রবিকাকা

[৭৩] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোর কবিতার যে পুনঃসংস্কার করেছিস সে ভালোই হয়েছে। কেবল cruel eyes-কে যেখানে brave হতে অনুরোধ করেছিস সেটা সংগত হয়নি— সুবিবেচক হওয়ার সঙ্গে সাহসিক হওয়ার যোগ নেই। করুণ হতে বল্‌লেই ভালো হয়। পূর্বে যেখানে কবিতাটি থেমেছিল তার পরে আর তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

রথী দুচারদিনের মধ্যে কলকাতা হয়ে কালিম্পং যাবে। আমি দৌড় দেব ছুটির পরে। তোদের লেখা শেষ হয়ে গেলে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব। পশু হবে বর্ষা মঙ্গল— সেজন্যে বর্ষা বিশেষ চিন্তিত নয়, বিনা কারণে যখন তখন বর্ষণ করচে। ইতি ১ অগস্ট ১৯৩৮

রবিকাকা

[৭৪] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোরা আসবি বৈ কি— যখন তোদের খুশি। বৌমা নেই তাতে ক্ষতি হবে না— গিন্নিপনার ভার পুপুর উপরে। যদি কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটে নিজে পূরণ করে নিতে পারবি। জলে স্থলে আকাশে এবার শ্রাবণের দরবার খুব জমে উঠেছে। ইতি ৫।৮।৩৮

রবিকাকা

[৭৫] ওঁ "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, এখানে লোকজনের গতিবিধি লেগেই রয়েছে কেবল তোদেরই আসা হোলো না। ৩রা সেপ্টেম্বর নাগাদ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে— ততদিনে তোরা আসতে পারবি আশা করচি। তার পরে আমি কালিম্পং চলে যাব স্থির হয়েছে। শরীরটা খুব ভালো চলচে বলতে পারচিনে— মাঝে কয়দিন জ্বর হয়েছিল। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একখানা বই মৃদুমন্দগতিতে লিখে চলেছি— আগেকার মতো কলমের দ্রুত চাল আর নেই। তোদের দোঁহাকার দুই লেখার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি।— বর্ষণ চলচে— এবারকার ভাদ্রমাসের

মেজাজ অনেকটা ভদ্র। প্রায় হাওয়া দিচ্চে, গরমটা কালোচিত নয়।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা জলমগ্ন, তহবিল ডুবচে নিঃস্বতার তলায়, উদ্ধার করবার জন্যে কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডস্ নেই। ২৪-৮-৩৮

রবিকাকা

[৭৬] ঐ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২৯ অগস্ট, ১৯৩৮

কল্যাণীয়াসু

বিবি তোর ইংরেজি কবিতাটি ভালো লাগল। কেবল সন্দেহ হয় আধুনিক কালে ভিক্টোরীয় যুগের ভাষার রীতি তরুণদের পছন্দ হবে কিনা যেমন

"Of lissome limbs and faces *debonair*"

"Of beauty's gifts and love's lavish riches wealth" চলে কি?

"What hidden meaning" ইত্যাদি lineটা বাহুল্য আর alone with pain লাইনটা "its faltering" lineএর চেয়ে ভালো।

তোদের এখানে আসার সম্বন্ধে চিঠিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলুম কিন্তু ভেবে দেখলুম, হর্ণিয়া নিয়ে কলকাতার

বাইরে আসা নিরাপদ নয়। রথীও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করলে। কিন্তু তোদের লেখা পাঠিয়ে দিস।

রবিকাকা

[৭৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিষম ব্যস্ত ছিলাম। ছুটি আরম্ভ হোলো। ভাব্‌চি এখন কোণে বসে ছবি আঁকায় মন দেব। কলম চালাতে ভালো লাগে না। কী যে ভালো লাগে বুঝতে পারিনে— কোনো দায়িত্বের ভার সহ্য হয় না। হিংসে হয় পাখীগুলোকে দেখে। বাড়ি এখন শূন্য— উদয়নবাসীরা সবাই এখন শৈলবিহারে।— তোর সেই ফরাসী বইয়ের তর্জমার পাণ্ডুলিপি দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল— খানিকটা কপি করিয়ে নিয়ে সেই কাটাকুটির জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা পাওয়া গেল। যেটুকু পড়লুম খুব ভালো লাগ্‌ল— বাকিটুকু কপি হয়ে গেলে সবটাকে নিয়ে পড়ব। মনে ভাবছি বৃহত্তর ভারতকেও ছাড়া কিছু নয়। জিনিষটা উপাদেয় হবে সন্দেহ নেই। ইতি ২৩।৯।৩৮

রবিকাকা

[৭৮]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আশা করেছিলুম যেহেতু আশা দিয়েছিলি যে কাল তোরা আসবি কিন্তু এলিনে— আজ সকালেও অপেক্ষা করেছি— বোধ হয় [আসা] ঘটবে না— পর্শু চলে যাব— অতএব তোদের সঙ্গে কাজের কথা চুকিয়ে দিতে হলে ইতিমধ্যে দেখা হওয়া চাই। তোদের ওখানে টেলিফোন নেই— তাই ডাকঘরের শরণ নিতে হোলো। আধমরা হয়ে আছি— একটুও সময় পাইনি— ঠাসা ভিড়— দেহতরী ক্লান্তিতে বোঝাই করা। ইতি

রবিকাকা

---

[৭৯]

ঔ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৪ অক্টোবর, ১৯৩৮

কল্যাণীয়াসু

যুগল করপুটে বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

তোর সেই তর্জমাটার নকল এখনো শেষ হয়নি। নকলকর্তা ছুটিতে বাড়ি গেছে। ফিরে এসে হাত দেবে। ভুল আছে যথেষ্ট— জিনিষটা বেচারীর বুদ্ধিবিদ্যার অনেকদূর তফাতে। এটাকে মেজে ঘষে তুলতে দেরি হবে। তারপরে

প্রতিশব্দের গ্রন্থিমোচন কাজটি সহজ হবে না। প্রমথর লেখাটি স্পষ্ট— কোনো কষ্ট দেবে না। ছাপাখানা বন্ধ, ছুটি অন্তে মুদ্রাযন্ত্রে চড়িয়ে দেব। নাম কি ভারতের ইতিহাস, না ভারতীয় সংস্কৃতি। ইতি বিজয়া দশমী

রবিকাকা

[৮০] ওঁ মংপু

কল্যাণীয়াসু

তোদের বিজয়ার প্রণাম না পেলে মনে হয় পাঁজির ভুল হয়েছে, এবারে তাই সন্দেহ হচ্ছিল এমন সময়ে তিথির পরিচয় নিয়ে জিনিষটা পৌঁছল আমার হাতে।

পাহাড়ের শুশ্রূষায় ভালো থাকবারই কথা এবারে ছিলুম না। এখানকার জল হাওয়ায় উপদ্রব ঘটেছিল, যাকে বলে হিটলারের ছোঁয়াচ। সময় হোলো বিদায় নেবার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। ৫ই নবেম্বরে অবতরণ করব নিম্নভূমিতে। দুচারদিন কলকাতায় যখন থাকব দেখা হবে। রথীর শরীর এখানে এসে ভালো হয়েছে। বৌমা পুপুসহ বোম্বাইয়ে। আশা করি যখন ফিরব তিনি আমার ভার গ্রহণ করতে আসবেন।

প্রমথর বই ছাপা চলচে। তোর লেখাটা পরিচয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে ছাপতে দেব।

জয়ার তিন সন্ততির নাম দিতে পারিস মঞ্জরী, গুঞ্জরী আর রঞ্জন।

আমার কোটরে ফিরে গিয়ে বেদগানে সুর দেবার চেষ্টা করব। ইতি ২৫।১০।৩৯

রবিকাকা

এ সংখ্যার অলকাটা ভালো লাগল।

[৮১] ও পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, সুরেনের জন্যে মন যে কী রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তা বলে উঠতে পারিনে। রথীকে বলে রেখেছি তার খবর নিয়ে আমাকে জানাতে। আমার নিজের শরীর একটুও ভালো নেই— প্রায়ই জ্বর হয়। আর অহোরাত্র থাকে সেই জ্বরের দুর্বলতা। কাজ করবার শক্তি কমেছে রুচিও নেই, অথচ এত কাজের আক্রমণ এর আগে আর কখনো মনে পড়ে না। বয়স যতই বাড়ছে মন যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে জরায়, নিরবকাশ ততই নীরন্ধ্র হয়ে উঠচে। আমার কাজের সঙ্গে এত লোকের দায়িত্ব জড়িত যে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখতে পারিনে।

কিন্তু আমারো তো যাবার সময় হয়ে এসেছে— কোনো কিছুর জন্যে পরিতাপ করবার সময় নেই জানি, তেমনি আর সময় নেই কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি নেবার। ব্যক্তিগত জীবনের

সুখদুঃখ লাভ ক্ষতি ঘটতে ঘটতেই চলেছে বিলুপ্তির দিকে। তাকে উপেক্ষা করতে না পারলে সার্থকতার যে স্বল্পমাত্র অবকাশ আছে তাকে হারাতে হবে। এইজন্যে দুর্বল স্বাস্থ্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনের অস্বচ্ছ আলোয় ঝুঁকে পড়ে কাজ করে চলেছি। যারা প্রতিদিনের আগন্তুক, তাদের অভ্যর্থনায় শক্তির ব্যয় কম হয় না। সেই অপব্যয়ের পরিমাণ আমার বিরামের পক্ষে যতই বেশি হোক তাদের সন্তুষ্টির পক্ষে কিছুতেই যথেষ্ট হতে চায় না। কিন্তু কী হবে নালিশ করে আর কতদিনকারই বা মেয়াদ। এতদিন পরে সুরেনকে যদি হারাতেই হয় তাহলে আমার পক্ষে সান্ত্বনা এই থাকবে যে তার বিচ্ছেদ বেশি জায়গা পাবে না নিজেকে বিস্তীর্ণ করবার জন্যে। ইতি বর্ষশেষ চৈত্র ১৩৪৬

রবিকাকা

[৮২] ওঁ

Visva-Bharati
Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়াসু

বিবি, কাল সুরেনকে দেখে অবধি মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। কিছু করবার নেই— ভালই হোক মন্দই হোক প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে।

৫০০ টাকা পাঠাচ্ছি— সুরেনের বইয়ের আগাম প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করিস। আজ চল্লুম। আমার ঠিকানা—

Mungpoo Darjeeling
C/o. Dr. M. Sen

রবিকাকা

[৮৩] মংপু

বিবি

তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসে ছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে এসেছে। ইতি ৬।৪।৪০

রবিকাকা

---

[৮৪] ঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[১৩ মে, ১৯৪১]

বিবি আমার জন্মদিনে তুই যে মূর্তিটা পাঠিয়েছিস সে আমার খুব সান্ত্বনাজনক। শেষ দশায় অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারেননি আমার সেই অবস্থা। আমার চিরদিনের কলম আজ পরের ঘাড়েই চাপাতে হচ্ছে কিন্তু বকলমে তোকে লিখতে ভাল লাগল না— খোঁড়া কলমকে চাবুক লাগিয়ে কোনো মতে ক লাইন লিখিয়েছি— এখন সে ফিরে চলল পিঁজরাপোলে। আশীর্বাদ

রবিকাকা

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

[১] ওঁ শান্তিনিকেতন

বোলপুর।

২১ মে, ১৮৯০

প্রমথ

আমি কিছু দিন থেকে তোমাকে লিখ্‌ব লিখ্‌ব করছিলুম। তুমি চুয়োডাঙ্গায় যাবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ভারি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেনার দায়ে একদিন সকাল বেলা হঠাৎ বাড়ির গ্যাস্‌-পাইপ্‌ এবং জলের পাইপ কেটে দিয়ে গেলে যেমন দশা হয় কতকটা সেই রকম। পৃথিবীতে বড় বড় মহাত্মাদের কল্যাণে অনেক বড় বড় সরোবর আছে এবং সেখানে স্নান করে পান করে ভাবের তৃষা সম্পূর্ণ নিবারণ করা যায়, কিন্তু একেবারে ঘরের ভিতরে হাতের কাছে কথোপকথনের নলের ভিতর দিয়ে যে জলের সঞ্চার হয় তার মধ্যে যদিও সাঁতার দেওয়া, ডুব দেওয়া বা আত্মহত্যা করা যায় না কিন্তু দৈনিক সহস্র সুবিধের পক্ষে সেটি বড় আবশ্যকীয় জিনিষ। কেবল কথোপকথন নয়, খবরের কাগজ, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রভৃতি ক্ষণিক সাহিত্য এই রকম জলের কলের কাজ করে; তারা পূর্ব্বোক্ত ভাবসরোবর থেকে জল আকর্ষণ ক'রে অল্পমূল্যে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে— এইজন্যে বোধ করি অনেক আধুনিক পাঠক সন্তরণ এবং নিমজ্জনসুখ একেবারে বিস্মৃত হয়েছে— কারণ নলের মধ্যে আর সব পাওয়া যায় কিন্তু সরোবরের উদারতা এবং অতলতা তার মধ্যে প্রবেশ করেনা। উপস্থিত প্রসঙ্গে এত কথা বলবার

কোন আবশ্যক ছিল না— কিন্তু উপমাটা নাকি এল সেইজন্যে সেটিকে নিঃশেষ করে চুকিয়ে দেওয়া গেল— অপ্রাসঙ্গিক হলেও "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।"

তোমার সম্বন্ধে যা' বলবার অলঙ্কার না দিয়ে ঠিক সেইটুকু বল্‌তে গেলে আধখানি পাতও পোরে না;— সংক্ষেপে— তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশ চল্‌ছিল ভাল হঠাৎ বন্ধ হয়ে একটু যেন বিপদে পড়েছিলুম। তোমার চিঠি পেয়ে আবার কলে জল এল। খানিকটা যা' তা' বকাবকি করে বাঁচা যাবে। কিন্তু মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বর-যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না, সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে; অবিশ্যি, সেগুলো সব যে টিঁকে যায় তা নয়— অধিকাংশ দ্রুত প্রকাশের স্বভাবই হচ্চে দ্রুত বিনাশ। কিন্তু এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয় সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও। অতএব দিনকতকের জন্যে যদি বোলপুরে আস্‌তে পার তাহলে মাঝে মাঝে নানা কথা বলা কওয়ার অবসর ঘট্‌তে পারবে। এখানে বই বহুবিধ আছে; এখানকার একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে, তা ছাড়া আমিও কিছু বই সঙ্গে এনেছি। এখেনে গদি দেওয়া চৌকি, নরম কৌচ, চিৎ হয়ে শোবার এবং ঠেসান দিয়ে বস্‌বার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। অতএব এখেনে শারীরিক এবং মানসিক স্বাধীনতার কোন-রকম ব্যাঘাত ঘট্‌বেনা। তুমি চুয়োডাঙ্গার যে রকম বর্ণনা

করেছ তার সঙ্গে বোলপুরের "প্রাকৃতিক ভূগোলে"র অনেক সাদৃশ্য আছে। চারদিকে মাঠ ধূধূ করচে— মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁধ, এবং তার উঁচু পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ তালবন— মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশ একেবারে অনাবৃত ভূমিতলকে স্পর্শ করে রয়েছে— মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ঘনবনের রেখা দেখা যায়। মধ্যেকার এই মরুক্ষেত্র অনশনশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তৃণে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে একএকটা নিতান্ত খর্ব্বাকার খেজুরের ঝোপ— মাঝে মাঝে মাটি দগ্ধ হয়ে কালো হয়ে কঠিন হয়ে পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বেরিয়ে রয়েছে। উত্তরদিকের মাঠ বর্ষার জলস্রোতে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে লিলিপট্‌দেশীয় ক্ষুদ্রকায় গিরিশ্রেণীর আকার ধারণ করেছে— সেই ছোট ছোট রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার স্তূপ নানা রকম পাথরের টুক্‌রো ও কাঁকরে আবৃত— তাতে ছোট ছোট বুনো জাম ; বেঁটে খেজুর এবং অখ্যাতনামা দুই এক রকমের গুল্ম অত্যন্ত বিরলভাবে শোভা পাচ্চে— তারি মধ্যে মধ্যে ঝরণা এবং জলস্রোতের শুষ্ক রেখা দেখা যায়— শরৎকালে সেইগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ছোট ছোট মাছ তাতে খেলা করে। এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের অন্তরাল হতে দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে নিভৃতমহিমায় বিরাজ করচে। এই বোলপুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে। ছেলেবেলায় আরো ভাল লাগ্‌ত। বোধ হয় এখনকার ভাললাগার মধ্যে তারি সেই "রেশ্" রয়ে গেছে।

আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্‌তে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জান্‌তুম না আমি কোথায় যাচ্চি 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিলনা। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়।

"উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন মুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।"

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো

আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝ্তে পারি সে নেশা এখনো একজায়গায় আছে— তবে কি না, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep delved heart

আমি সত্যি সত্যি বুঝ্তে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী ; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে Shelleyর Skylark আর একটা হচ্চে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্তসুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক— আর যে সৌন্দর্য্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাক্তে পারে) পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল কিছুতেই

তাদের আর অসন্তোষ ঘোচেনা। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেই ভাল হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না— ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে— নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে— কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ— "আর্ত্তস্বর" এবং "রাহুর প্রেম" "ছবি ও গানের" মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত— যথা "পোড়ো বাড়ি।"

সময় এবং স্থান সংক্ষেপ হয়ে আস্‌চে। আজ এইখানেই ইতি করা যাক্। আজকাল একটু আধ্‌টু লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি— কাছে থাকলে টাট্‌কা টাট্‌কা শোনাতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২]　　　　　ওঁ　　　　　পোস্টমার্ক, শিলাইদহ

৩ জুন, ১৮৯০

প্রমথ

তোমার চিঠিতে সুরেন বিবির পাশের খবর পেয়ে খুব খুসি হওয়া গেল। মন্মথ পাশ হয়েছে কি না কিছু লেখনি কেন? অবিশ্যি পাশ হয়েছে। কোন্ ডিবিজনে হল?

তোমার সঙ্গে যোগিনীর মিট্‌মাট্ হয়ে যাওয়া খুব আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে। বাস্তবিক হয়েচে কিনা আগামী সাহিত্য-সমিতিতে তার পরীক্ষা হবে। জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখ্‌লে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝ্‌তে পারচি নে। তার কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?

আমি বোধ হচ্চে এখেনে কিছু কাল থেকে যাব। একটা কিছু লিখ্‌তে চেষ্টা করা যাবে। আপাততঃ কাজকর্ম্মের ভিড়ে তেমন অবসর পাচ্চিনে। মাঝে মাঝে একটু আধ্‌টু পড়তে চেষ্টা করি— কিন্তু এখানকার জলবায়ুর গুণেই হোক কিম্বা কি কারণে বল্‌তে পারিনে, পড়তে চেষ্টা করলেই ঘুমিয়ে পড়তে হয়। জর্ম্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করচি। তুমি থাক্‌লে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ রকম পড়া দুজনে মিলে লাগ্‌লেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্ম্মান্ ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।— বোটটা যত

গরম হবে মনে করেছিলুম তা হয় নি— দিনে প্রায় মেঘ করে থাকে এবং রাত্রে অতি চমৎকার জ্যোৎস্না হয়। অতএব এ পর্য্যন্ত এখানকার প্রকৃতি জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে নি। অরু চলে গেলে খুব এক্‌লা হবে— কিন্তু আমার সেটা নেহাৎ অসহ্য বোধ হয় না। তোমাদের কারো যদি এখানে আসবার ইচ্ছে হয় তাহলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করে নেব— আতিথ্যের কোনপ্রকার ত্রুটি হবে না। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

২১ জুন, ১৮৯০

প্রমথ

আমার মস্তিষ্ক যে অবস্থায় আছে সে আর কি বল্‌ব। বর্ষাকালে যে কাঁচা রাস্তায় কেবল গরুর গাড়ি এবং মোষের পাল যাতায়াত করে তার যে রকম আকারপ্রকারহীন শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় আমার বুদ্ধিবৃত্তির সেই রকম দুরবস্থা ঘটেচে। এরই মাঝে মাঝে পাঁচ ছ মিনিট সময় চুরি করে একটা লেখা আরম্ভ করেছিলুম— সেটা ভাল হচ্চে কি মন্দ হচ্চে একটু স্থির হয়ে বোঝবারও সময় পাচ্চিনে— ক্ষণিক অবসরে একরকম শ্রান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই— লিখ্‌তে লিখ্‌তে

মাঝে মাঝে নিদ্রাকর্ষণও হয়— মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে জলের ঢেউ বা তীরের ঝাউবনের দিকে তাকিয়ে থাকি, এবং কখন্ অলক্ষিতভাবে মনের মধ্যে এমন্ সকল প্রসঙ্গ প্রবেশ লাভ করে যার সঙ্গে সরস্বতীদেবীর কোন সুদূর সম্পর্কও নেই। যেটা লিখ্‌চি আগে থাক্‌তেই তার নাম দিয়ে রেখেচি অনঙ্গ আশ্রম। নামটা অনেকের মনোরঞ্জক হবে বোধ হয়— কারণ উনবিংশ শতাব্দীর কলিতে বহুবিধ ফিলজাফির দৌরাত্ম্যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মগজ থেকে আর সমস্ত দেবতাই দৌড় দিয়েচেন "কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।" "রয়েছেন বাকি" বল্লে ঠিক বলা হয় না— উক্ত Non-Regulation Province-এর একাধিপত্য পেয়ে তিনি ক্রমশঃ দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠ্‌চেন— যদিও আজকাল তাঁর নিজনামে তাঁকে ডাক্‌লে রুচি-ব্যভিচার দোষে দণ্ডণীয় হতে হয়। হায় হায়, পূর্ব্বে দেবতাদের কাছে যে নামে তাঁর পরিচয় ছিল, এখন মানবসমাজে সে নাম তিনি লজ্জায় গোপন করতে চান— আমরা এত শিক্ষিত এত উন্নত হয়ে উঠেছি। বোধ হয় সভ্যতার উন্নতিসহকারে "প্রেম" শব্দটাও ক্রমে শ্রুতিলজ্জাজনক হয়ে উঠ্‌বে— তখনকার যুবকেরা আমাদের বইগুলো বালিষের নিচে লুকিয়ে রেখে গোপনে পড়বে, সেইজন্যে বোধ হয় এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ভাল লাগ্‌বে। আবার তখন যদি সাধারণ ব্রাহ্ম থাকে তবে তারা না জানি কি রকম প্রচণ্ড পবিত্রতা প্রচার করবে। সে কথা মনে করলে আমাদের মত কবিদের হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়।— এখানে নিতান্ত সময়াভাব এবং অতি শীঘ্র দেখা হবে সেই জন্যে বেশি লিখ্‌লুম না। তোমার জয়দেব প্রবন্ধটা পড়বার প্রত্যাশায় রইলুম। কুমুদকে আশ্বস্ত করে এক চিঠি লিখলুম। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

[৪]

প্রমথ

অনেকগুলি অপরিচিতাক্ষর পাতলা চিঠির মধ্যে চুয়োডাঙ্গা মুদ্রাঙ্কিত একখানি বেশ মোটা মজ্‌বুৎ ভারি গোছের চিঠি পেয়ে লাগ্‌ল ভাল। কাল সকালবেলায় একটা লেখা এবং রাত্তিরে একটা বই শেষ করে আজ প্রাতঃকালে নিতান্ত অকর্ম্মণ্যভাবে বসে ছিলুম— ঠিক সময়ে চিঠি পাওয়া গেল— এখন শরীর মন আবার একটু সচেতন হয়ে উঠেছে।

এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এজায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টিরই উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়— বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। বর্ষার অন্ধকার ছায়াটাকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড ভাবে বিস্তৃত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খুব দূর থেকে হুহুঃশব্দ করতে করতে, ধূলো, শুক্‌নো পাতা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্তূপাকার মেঘ

উড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ আমাদের এই বাগানের উপর মস্ত একটা ঝড় এসে পড়ে— তার পরে, বড় বড় গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যে নাড়া দিতে থাকে সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ফলে পরিপূর্ণ আমগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে— কেবল শালগাছগুলো বরাবর খাড়া দাঁড়িয়ে আগাগোড়া থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি— সুতরাং চতুর্দ্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে; সেদিন ত একটা দরজা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত— যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই এঁর উপযুক্ত স্থান— ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার মত সহবৎ শিক্ষা হয় নি; অবিশ্যি, কার্ড পাঠিয়ে ঢোকা প্রভৃতি নব্য রীতি এঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই যেতে পারেনা, কিন্তু ভিজে পায়ে ঢুকে গৃহস্থ ঘরের জিনিষপত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়াই কি সনাতন প্রথা? কিন্তু এরকম অশিষ্টাচরণ সত্ত্বেও লেগেছিল ভাল। বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখিনি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টিদুর্য্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে— কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে— অথচ সমস্ত

ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কিনা— এই জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী পর্ব্বত বন গ্রাম নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়— সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে— সেইখানে চরম বিশ্রাম— সেই একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাক্‌লে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই— রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতাসুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কোনটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে রীতিমত Oriental রাজমাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্ছে। যক্ষের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সেটা হয়ত ঠিক “ড্রামাটিক” হয় না— একটা দক্ষিণে' ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্‌ করে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধ হয় তার পক্ষে ঠিক হত কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বদ্ধ হয়ে আছি— মনটা উদাস হয়ে আছে, আমাদের একবার মেঘের মত মহাস্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কি তেমন ভাল লাগ্‌ত। আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কাজকর্ম্ম সমস্ত রহিত

হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্‌চে না— তবুও আমি বদ্ধ হয়ে আছি ছুটি পাচ্চি নে। আজ এই কর্ম্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘদিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়্‌লে বেশ হয়— আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই— সংসারের সহস্র ছোটখাট কর্ত্তব্য আজকের এই মহাদুর্য্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে— আজ তেমন সুযোগ থাক্‌লে কে ধরে রাখ্‌তে পারত? যে সকল নদীগিরি নগরীর সুন্দর বহুপ্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায় মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আস্‌তুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুন্‌লেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য্য আছে! রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্ব্বিন্ধ্যা;— চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপরে নববর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়চে এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্চে। এদের জম্বুকুঞ্জে ফল পেকে আকাশের মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে— দশার্ণ গ্রামের চতুর্দ্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে— সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুল্‌তে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থ ঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে— রাজপথের অন্ধকার এম্‌নি প্রগাঢ় যে সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল তাহলে এসব দেশ না দেখে কি

যাওয়া যায়? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত— যক্ষ যদি উনবিংশ শতাব্দীর হয় তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্নদর্শী ক্রিটিকসম্প্রদায় থাকৃত তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত— তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক্, ডেস্ক্রিপ্টিভ্, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি ক্রিটিকদের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক্ আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে— ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলচি, dramatic হয়নি, কিন্তু আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার আর একটা কথা মনে পড়চে— যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশদেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল— এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের Terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্তী স্টেশনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে সময়কার নানা বিরহকে নানাদেশবিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল— এজন্যে হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয়নি— কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি ত বলতে পারি এতে খুসি আছি। বর্ষাকালে সকল লোকেরই

কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়— এমন কি প্রণয়িনী কাছে থাক্‌লেও হয়— কবি নিজেই লিখেছেন—

> "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যনথাবৃত্তিচেতঃ
> কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িনিজনে, কিংপুনর্দূরসংস্থে !"

অর্থাৎ মেঘ্‌লা দিনে প্রণয়িনী গলায় লেগে থাক্‌লেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায় দূরে থাক্‌লে ত কথাই নেই! অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে কেবল ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে হবে— আজকের সমস্ত সংসার দুর্য্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে অন্ধকার হয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে!

মেঘদূত পড়তে পড়তে আর একটা চিন্তা মনে উদয় হয়। সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায় কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারিনে। পোষ্টঅফিস্ এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই— তাইজন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে আর্দ্রতন্ত্রীবীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকে-না। ডেস্কের সাম্‌নে বসে চিঠি লিখে মুড়ে টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দেয় তার পরে নিশ্চিন্তমনে স্নানাহার করে। এমন কি ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভালরূপ

রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিষের বন্দোবস্ত হয়নি তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিষ ছিল— তাই

"প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হলনা!"

কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল। তুমি মনে কোরো না আমি এতদূর নির্লজ্জ কৃতঘ্ন যে চিঠির মধ্যেই পোষ্ট্‌অফিসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করচি! আমি পোষ্ট্‌অফিসের বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করচি যে যখন মেঘদূত বা কোনো প্রাচীন কাব্যে বিরহিণীর কথা পড়ি— তখন মনের মধ্যে ইচ্ছে করে ঐরকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোন প্রবাসে বিরহ শয়ানে বিলীন হয়ে থাকে এবং আমি যদি জড় অথবা চেতন কোন দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে সেটা জান্‌তে পারি তাহলে বেশ হয়! স্বদেশেই থাক্ বিদেশেই থাক্ এবং ভালবাসা যেমনই থাক্ সকলেই বেশ comfortably কালযাপন করচে এটা কি রকম গদ্যোপযোগী শোনায়!— বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্চে— বাতাস বচ্চে এবং সন্ধের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আস্‌চে। বহুকষ্টে আমার অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি— দিনের আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বেই চিঠিটা শেষ করে ফেলবার জন্যে একেবারে হুহু করে লিখে চলেছি— চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার কিম্বা নূতন steam সঞ্চয় করবার অবসর পাচ্চে না— কিন্তু আজ বোধ হয় শেষ হল না— কাল সকালে শেষ করা যাবে।—

ভরসা করি এ চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন চুয়োডাঙ্গার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে এবং সমস্ত প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে। নইলে রোদ্দুরে যদি চারদিক ধুধু করতে থাকে, ঘাসগুলি যদি সমস্ত শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে এসে থাকে, এবং আকাশের কোন প্রান্তভাগে যদি মেঘের আশ্বাসমাত্র না থাকে, তাহলে এই বর্ষাজীবী চিঠিটা নিতান্ত অকালমৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়বে। বর্ষাকালটা কিনা প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার একটা ব্যতিক্রম-দশা। সূর্য্যনক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা নিত্যলক্ষণগুলি বিলুপ্ত, তার স্থানে ক্ষণিক মেঘের ক্ষণিক রাজত্ব,— প্রকৃতির দৈনন্দিন জগতের বিচিত্র জীবনকলরব মৌন— তারি স্থানে অবিশ্রাম একতান বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ— সবসুদ্ধ এই রকম ক্ষণস্থায়ী একটা বিপর্য্যয় ভাব। সুতরাং প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হবামাত্রই একটু রোদ্ উঠলেই বর্ষার কথা সমস্ত ভুলে যেতে হয়। বর্ষার সম্পূর্ণ ভাবটি আর মনের মধ্যে আনা যায় না— তাই আশঙ্কা হচ্ছে পাছে চিঠিটা জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নতাপের সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয়। চিঠির একটা মস্ত অভাব হচ্ছে ঐ— বৃষ্টির চিঠি রৌদ্রের সময় গিয়ে পৌঁছয়, সন্ধের চিঠি সকালে উপস্থিত হয়— উভয়পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমবেদনা থাকে না। ঘনীভূত অন্ধকার সায়াহ্নে বাতি জ্বেলে এক্‌লা বসে যে চিঠিটা লেখা হয় সেটা যদি তুমি প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক সপরিবারে চা-রুটি সেবন করতে করতে পাঠ কর তাহলে কি রকম পাপানুষ্ঠান হয় ভেবে দেখ দেখি—

চুরি করে লোকের ডায়ারি পড়লে যে পাপ হয় এটা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

তোমার এবারকার চিঠিতেও "ছবি ও গানে"র কথা আছে— বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে সকল কবিতা লিখ্‌চি তা' ছবি ও গান থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি, আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চল্‌বে তাই ভাবি। অবশেষে এক্‌টা জায়গা ত পাব যেটা বিশেষ-রূপে আমারি জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে ভয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম সেগুলো কিছুই হয়ত টিঁক্‌বে না— আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি সেটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এগুলো কেবল Tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে তবু মোটের উপরে মন থেকে এই আত্মবিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্টকাল বেঁচে থাকি তাহলে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছব যেখেন থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। কিন্তু এরকম আত্মবিশ্বাস আরো সহস্র সহস্র লোকের ছিল এবং আছে— এবং তাদের

ভ্রান্ত জীবন নিষ্ফল হয়েছে এবং হবে— অতএব এরকম আত্মবিশ্বাস কোন বিষয়ের প্রমাণ বলে ধ'রে লওয়া যায় না। এই দেখ, খুব এক চোট অহমিকার অবতারণা করা গেল— কিন্তু চারটে চিঠির কাগজ পোরাতে গেলে অবশেষে "অহং" বই আর গতি নেই— এতটা জায়গা জোড়া আর কারো সাধ্য নেই। আর সকল খবর সকল আলোচনাই ফুরিয়ে যায়— এর কথা আর শেষ হয় না— অতএব দীর্ঘ চিঠির প্রত্যাশা কর যদি, ত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই অহম্পুরুষকে বহুল পরিমাণে সহ্য করতে হবে।

কলকাতার খবর জান? শুনচি "রাজা ও রাণী" আগামী শনিবারে অভিনয় হবে— যদি সুবিধে হয় ত একবার দেখ্তে যাব।—সাহিত্যসমিতিতে যে অধিবেশনে রৈবতক সমালোচনা হয় সেবারে তুমি ছিলে না— সেজন্যে তোমার আপ্শোষ করবার কারণ কিছুই নেই। যে রকম মনে করেছিলুম সে রকম লোক তোমাদের সমিতিতে নেই— অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দম্ভটুকু আছে। ... অতখানি একটা সমালোচনা পড়ে গেলেন তার মধ্যে না আছে রচনাচাতুর্য্য, না আছে ভাবপ্রাচুর্য্য।... তত্ত্বজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু রসজ্ঞ কিছুমাত্র নন। অন্য যাঁরা বসে শুন্‌ছিলেন তাঁরাও কেউ বুদ্ধিলক্ষণযুক্ত দুটো কথা যুটিয়ে বল্‌তে পারলেন না।...... মস্তিষ্কগহ্বর নিতান্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন— অন্যান্য সভ্যদের এখনো ভালরূপ পরিচয় পাইনি— কিন্তু অনাথনাথ বাবুর বেশ একটি ভদ্র শোভনভাব আছে এবং তিনি মনে করেন না যে তিনি পৃথিবীতে এসে একটি প্রতিভার অগ্নিকাণ্ড করবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫] ওঁ Dariapur Katchari

Shazadpur

১৪ মাঘ [১২৯৭]

ভাই প্রমথ

এতদিন আমার ঠিকানার স্থিরতা ছিল না বলে তোমাকে লিখতে পারিনি। কালিগ্রামে ছিলুম কিন্তু কখন্ সেখান থেকে ছাড়তে হবে ঠিক জান্‌তুম না। এখন সাহাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি— এখানে নিদেন দিন দশেক থাক্‌তেই হবে। তোমরা কি এখন হরিপুরে আছ— যদি রেলপথে আস্‌তুম তাহলে নাটোর দিয়ে তোমাদের ওখানে একবার উঁকি মেরে যাবার ইচ্ছে ছিল— কিন্তু আত্রাই থেকে সাহাজাদপুর রেলে আসা এমনি অসুবিধে যে অবশেষে বোটে করেই এলুম। তোমরা কি বিরাহিমপুরে আমার সঙ্গ নিতে পারবে? তা হলে বেশ মজা হয়। একা একা কেবল রাজ্যশাসন করে আর পারা যায় না— জমিজমা এবং বাকিবকেয়া ব্যতীত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আর পাঁচ রকমের সদালাপ করবার ইচ্ছে হচ্চে। সঙ্গে দুটি চারটি বই আছে তাই বেঁচে আছি— তা ছাড়া এক্‌টু আধ্‌টু লেখাও চল্‌ছে— নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়বার বড় একটা সময় নেই। মানসী জন্মাবার পরে আমার ঘরে আর একটি শারীরী জন্মগ্রহণ করেচে সে খবর বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ— অতএব আমাকে যথানিয়মে congratulate করতে বিলম্ব করবে না। নবদম্পতির খবর কি? মেনা কি এখন পতিগৃহ অবলম্বন করেচেন? তোমাদের সেই

বিবাহরাত্রের গোলযোগ সমস্ত মিটে গেছে ত? ডাকের সময় অনেকটা নিকটবর্ত্তী হয়ে এল— অতএব এইখানেই ইতি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬] ওঁ পোস্টমার্ক, শাজাদপুর

ভাই প্রমথ

এই খানিকক্ষণ হল তোমার চিঠি পেলুম। সেদিন কলকাতার চিঠিতে তোমার কন্‌ভোকেশনে উপস্থিতির খবর পেয়ে আমি ঠাওরেছিলুম তবে বুঝি তুমি এখনো কলকাতায় আছ এবং আমার পত্রখণ্ড তোমাদের হরিপুরের মাঠে মারা গেল। কিন্তু তোমার চিঠিতে জানা গেল, আমার চিঠি রক্ষে পেয়েছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেখানকার মাঠে বাঘ বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলো মারা পড়চে। আমি এখানে আমার সাম্‌নের এই সব কটা জান্‌লা খুলে দিয়ে এখানকার দুপুরের রৌদ্রে বড়বড়গাছওয়ালা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে পাড়াগাঁয়ের অনতিব্যস্ত লোকচলাচলের প্রতি অনিমেষ নেত্র নিহিত রেখে এমনি অন্যমনস্ক উড়ো উড়ো ভাবে থাকি যে একটু মনঃসংযোগ করে একটা ভদ্ররকম প্রমাণসই চিঠি যে লিখ্‌ব তার সামর্থ্য নেই। এই ক্ষুদ্রায়তন কাগজে দুটো চারটে অসংলগ্ন কথা লিখে কোনমতে সাঙ্গ করে দিতে হয়। এখানকার বাতাসে এবং বাহ্যদৃশ্যে এমন একটা আলস্য, ঔদাস্য, বৈরাগ্য অথচ

এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আমার মন কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে আছে কি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু বুঝ্‌তে পারচি নে। মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তারমধ্যে একটা Despair এবং Resignationএর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাব্‌ছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখ্‌তে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই Despair এবং Resignationএর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে, আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন একএকবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্তপ্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে— সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আরএকদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আরএকদিকে

চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কিভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো— তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে objectively দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। নিজের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চেষ্টা করা দুরাশা— কারণ আমার প্রতিমুহূর্ত্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান যে, মোটের উপরে আমি যে কী তা দেখতে পাইনে। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য কখনো গর্ব্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমাণটা পাইনে। আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়;— তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পূর্ব্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখ্‌তে পার। Bashkirtsiffএর Journal আমিও পড়ছি— মন্দ লাগ্‌চেনা কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে। এর থেকে মাঝে মাঝে অনেকগুলো কথা মনে আসে— কিন্তু যেটুকু স্থান অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে আর সে সকল উত্থাপন করা যেতে পারে না— অতএব আজ বিদায়—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ মাঘ ১৮৯১

[৭] ওঁ

ভাই প্রমথ

হঠাৎ আজ প্রাতঃকালে আমার দক্ষিণ কাঁধে বাতের মত হয়েছে— মাথা এবং হাত নাড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে— এবং পৃষ্ঠদেশ— যাকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফেলে রেখেছি— যাকে চক্ষেও দেখিনে— বহুপরিশ্রমের পর চৌকিতে ঠেসান দেবার সময় ব্যতীত যার অস্তিত্ব কখনো অনুভব করা যায় না সেই সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠদেশই আপনাকে চেতনারাজ্যের একাধিপতি করে রেখেছে। তোমাকে এই যে ক'লাইন চিঠি লিখ্‌লুম এর মধ্যে অনেক মুখভঙ্গী এবং আর্ত্তনাদ অব্যক্তভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। বর্ত্তমান এই ব্যাধিটার তুলনায় মানসীর সমস্ত ঔদাস্য এবং নৈরাশ্য অত্যন্ত মিথ্যা এবং নিতান্ত সৌখীন বলে মনে হচ্চে। পিঠ এবং কাঁধকে হৃদয় এবং আত্মার চেয়ে অনেক বেশি মনে হচ্চে। অতএব আজ মানসী সম্বন্ধে ঠিক সমালোচনাটা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা— বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র— ওর আসল সত্যিকথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিচ্ছু জানে না— এক ঘটি জল চায়, কি আধখানা বেল চায়, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে পারেনা, আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করচি।

যখন জানি, সত্য একে নিতান্ত অসন্তোষজনক, তার উপরে আবার রূঢ়ভাবে মানবমনের মুখের উপর সর্ব্বদা জবাব করে— তাই ধ্যানভরে কল্পনা-সিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্ছে— কল্পনার কাছ থেকেও পুরো ফল [পাওয়া] যায় না— কিন্তু সত্যের চেয়ে সে ঢের বেশি আজ্ঞাবহ। তাই জন্যেই "সাধ যায় সত্য যদি হত কল্পনা"— আমি দুটো যদি এক করতে পারতুম। অর্থাৎ আমি যদি ঈশ্বর হতে পারতুম! মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই— কেউবা বল্‌চে, আছে— বলে বহির্জ্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে— কেউবা জানে, নেই— তাই আকাঙ্ক্ষারাজ্যে বসেই অর্দ্ধ-নিরাশ্বাসভাবে কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করচে। একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসবার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে— সে Artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?

রবিকা

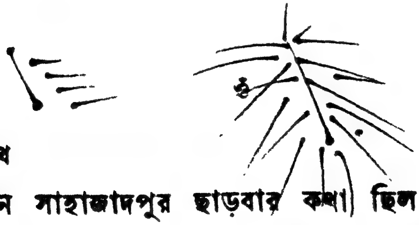

[৮] [শিলাইদা]

ভাই প্রমথ

যেদিন সাহাজাদপুর ছাড়বার কথা ছিল তার পরদিন ছাড়া গেল। মনে করেছিলুম আরো কিছুদিন দেরী হয়ে যেতে পারে কিন্তু তা আর হল না। এখন আমি শিলাইদহ

বোটে। এখানে এসে আমার শরীরের সমস্ত ব্যাধি একদিনে দূর হয়ে গেছে। জায়গাটা ভারি ভাল। এখন তুমি যখন আস্‌তে চাও আমাকে হাজির পাবে। কেবল একবার সময় থাক্‌তে জানালে যথাকালে বোট নিয়ে বাজিদ্‌পুর ঘাটে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্য অগ্রসর হয়ে থাক্‌তে পারি। অতএব সংবাদ দিতে শৈথিল্য করবে না। এখানে এসে আমার কাজ বিস্তর বেড়ে গেছে। লেখাটা আর বড় এগোচ্চে না। মৌলবী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। ক্রমাগত বক্‌চে— আমাকে ত পাগল করে তুল্লে। সাজাদপুরে বাত যেমন আমার কাঁধে চেপেছিল, এখানে মৌলবী তার চেয়ে কিছু কম নয়। সে মনে করে কালহরণের জন্যে অক্রুর পক্ষে সে যে রকম অত্যাবশ্যক ছিল আমার পক্ষেও বুঝি তাই— তাই নিতান্ত সাধু উদ্দেশ্য এবং প্রবল পরহিতৈষা থেকে সে ক্রমাগত দেশবিদেশের সম্ভব অসম্ভব গল্প জুড়ে দিয়েচে। আজ সকালবেলায় সে উপস্থিত নেই তাই ভারি আরাম বোধ হচ্চে। তোমরা এখানে এসে যদি বাঘ শিকার কর্ত্তে গিয়ে এ'কে দৈবক্রমে শিকার করে আন্‌তে পার তা হলে এ মুল্লুকে আমার কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে বাস করা সম্ভব হয়। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯] ওঁ ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১

ভাই প্রমথ

তুচ্ছ ঘাড়টার কথা লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না— কিন্তু তাকে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি না কেন, আজকাল আমার সমস্ত মনুষ্যত্বের মধ্যে ঐটেই সর্ব্বপ্রধান হয়ে উঠেছে ;— আমার মানসী যদি মূর্ত্তিমতী হয়ে, আমার কল্পনা যদি সত্য হয়ে এখনি আমার বামপাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে মাথাটা ফিরিয়ে যে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ব এমন সম্ভাবনা নেই— কিম্বা তার সঙ্গে যে দুদণ্ড "জীবনমরণব্যাপী সুগম্ভীর কথা" ক'ব তাও হয়ে' ওঠে না— বোধ হয় তাকে বলি "ভাই, আমার ঘাড়ে একটু Rhus Tox Liniment মালিশ করে দাও না !" সে যদি প্রীতির উচ্ছ্বাস ভরে গলা জড়িয়ে ধরে' আমাকে আলিঙ্গন করতে আসে তাহলে কাকুতি-মিনতি করে তাকে ক্ষান্ত করতে হয়। একবার ভেবে দেখ দেখি, অমর জীবাত্মার ঘাড়ে বাত হয়েছে ; এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কিছু আছে ! মাঝে মাঝে আবার কোমরটার কাছেও কামড়াচ্চে— মনে কিছু ভয় হয়েচে। যদি ষোলো আনা বাতের মত দেখা দেয় তা হলেই মরেচি আর কি। আগামী রবিবার রাত্রে আমি কোনমতে এখান থেকে প্রস্থান করব। সোমবার শিলাইদহ গিয়ে পেঁছব। তুমি হরিপুরে যেতে লিখেছ এখন আমার যেতে সাহস হচ্চে না— এবং যাবার অনেক বৈষয়িক বিঘ্ন আছে। কিন্তু তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ো না। তুমি কবে এবং কখন পাবনা পৌঁছতে পারবে আমাকে লিখো। কেননা আমি বোট নিয়ে

পাবনার নিকটবর্ত্তী বাজিদ্‌পুরের ঘাটে আগে থাক্‌তে প্রস্তুত থাক্‌তে পারব। নইলে তুমি মুস্কিলে পড়বে। শিলাইদহ এলে তুমি দুই একটি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। যা হোক, খুব বেশি বিলম্ব কোরোনা— কারণ আমার অধিকদিন থাকবার ইচ্ছে নয়। অধিক লেখবার ক্ষমতা নেই— আজ তবে ইতি

রবিকা

[১০] ওঁ

ভাই প্রমথ

আমি মধ্যে দিন তিনেকের জন্যে পাবনা গিয়েছিলুম— আজ সকালে ফিরে এসে দেখ্‌লুম তোমার চিঠি অপেক্ষা করচে।

খবরের কাগজের সমস্ত প্রসঙ্গ যখন তুমি বাদ দিতে লিখেচ তখন চিঠি লেখাই একরকম অসম্ভব। ঘি বাদ দিয়ে লুচি ভাজ্‌তে বল্‌লে হয় লুচি ভাজা বন্ধ করতে হয় নয় অনুরোধটা একটু পরিবর্ত্তন করতে হয়। বিশেষতঃ তোমার দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের কোন ঐক্য হয় নি। তোমার চিঠিতে কেবল কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের খবর দিয়েচ।— আমার চিঠিরও প্রধান খবর এই যে, দিনকতক আমরা জ্বলন্ত বাষ্পরাশির মত অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে পুনর্ব্বার সংহত পিণ্ডের আকারে আপনার নির্জ্জন কক্ষপথে ছিট্‌কে পড়েছি। এখন

তিনজনের মধ্যে আমরা কে কি অবস্থায় তা বল্‌তে পারিনে। আমি ত সুশীতল এবং কঠিন হয়ে আমার নিত্যজীবনের প্রদক্ষিণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি— লোকেনও বোধ হয় তথৈবচ। তুমি বোধ হয় বৃহস্পতি গ্রহের মত এখনও যথেষ্ট উত্তপ্ত এবং বাষ্পীয় অবস্থায় আছ। আজকাল তোমার স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত আমাকে জানাবে। আমি কতক জমিদারীর কাজ দেখ্‌চি, কতক সাধনার জন্যে লিখ্‌চি এবং চেষ্টা করচি এরই মধ্যে একটুখানি অবসর করে নিয়ে লিখ্‌তে। কিন্তু হয়ে উঠ্‌চে না। কেননা কবিতা অন্যান্য ললনার মত একাধিপত্য প্রয়াসিনী। "আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসরমত বাসিয়ো" এ ঠিক তার সেন্টিমেণ্ট নয়। এইজন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সব প্রথম প্রেয়সী—তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ আমার সহ্য হয় না। সুরেনের চিঠিতে দেখ্‌লুম কলকাতায় তোমরা খুব প্রমারা জমিয়েচ— শুনে খুসি হবে কালিগ্রামে একত্র নৌকাবাসকালীন্ লোকেনের কাছে আমিও দুই একটা lesson নিয়েছি— কিন্তু সম্পূর্ণ মনে আছে কিনা সন্দেহ। তিন চৌকির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আজকাল আমি নিয়মিত স্নানাহার করবার চেষ্টা করি— দন্তরোগে আহার করতে অক্ষম কিন্তু স্নানটা করি— স্নানের জল প্রস্তুত হয়েচে অতএব আজ উঠি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

[১১] ঔ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯২

ভাই প্রমথ

তুমি বোধ হয় আজ এতক্ষণে আমার চিঠি পেয়ে সমস্ত অবগত হয়েচ। তোমার পাগল চাকরেরও কোন দোষ নেই এবং তার মনিবেরও কোন অপরাধ হয় নি। সমস্তই অদৃষ্টের কুচক্র। তুমি কেন আশঙ্কা করেচ যে তোমার ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে তুমি এমন কোন গলদ করে থাকবে যাতে আমার রাগ করবার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে। প্রথমতঃ আমার রাগী স্বভাব নয়— দ্বিতীয়তঃ গলদ্ আমিও ঢের করে থাকি এবং আশা রাখি আমার আত্মীয় বন্ধুরা সে রকম দুঃসময়ে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। কবিত্বের অনবসর সম্বন্ধে দুঃখ করে কাল তোমাকে এক চিঠি লিখেচি— লিখে ভাবলুম বসে বসে দুঃখ করার চেয়ে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করা ভাল। অমনি আমার বোটের শয্যাতল আশ্রয় করে একখানি শ্লেট হাতে করে বসে গেলুম। বেশ যখন একটু জমিয়ে নিয়েচি এমন সময় কাজ এসে পড়ল। সাধনার লেখা এখনকার মত একরকম চুকিয়েছি— এখন সেই ভাঙ্গা কবিতাটা নিয়ে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দেব মনে করচি। আজ প্রবোধের চিঠিতে একটা খবর পেলুম তার কোন অর্থ বুঝতে পারলুম না— সে লিখেচে "তোমাকে গালি দিবার জন্য রাজসাহীতে যে ছাত্রসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহা এখানে Indian Daily News পত্রে পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি।" ব্যাপারটা কি বল

দেখি? এটা কি বন্ধুত্বের পরিহাস? বন্ধুরা অনেক সময় এমনতর পরিহাস করেন বটে যার ভিতরে হাস্যরস কিম্বা অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আজ তবে ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রিয়রা কি আস্‌চে?

[১২] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা
১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯২

ভাই প্রমথ

আমি কাল তোমার চিঠি পেয়েছি— কিন্তু একটা কবিতা নিয়ে পড়েছিলুম বলে কাল আর উত্তর দিতে পারিনি। রীতিমত ভাল চিঠি লেখা খুব একটা দুরূহ কাজ। প্রবন্ধ লেখা সহজ— একটা মোটা বিষয় নিয়ে অনর্গল কলম ছুটিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু চিঠিতে এমন সকল আভাস ইঙ্গিত নিয়ে ফলাতে হয়— কেবল ভাবের চিকিমিকিগুলি মাত্র— যে, সে প্রায় কবিতা লেখার সামিল বল্লেই হয়। কিন্তু সে রকম চিঠি লেখবার দিন কি আর আছে? এক সময় ছিল যখন চিঠি লেখাতেই একটা আনন্দ পেতুম এবং বোধ হয় চিঠি লিখে আনন্দ দিতেও পারতুম কিন্তু মনের সে কৈশোর অবসরটুকু চলে গেছে। এখন সমস্তই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়— বিস্তর জিনিষ মনের মধ্যে ভিড় করে রয়েছে; এমন সময় দৈবাৎ আসে যখন সমস্ত ভারমুক্ত হয়ে মনটা বেশ

হাল্‌কা ফুরফুরে হয়ে আছে, যখন বসে বসে সাবানের বুদ্বুদের মত রঙীন্ চিঠিগুলো উড়োনো যায়। সমস্ত দিন পৃথিবীর মোটা মোটা মজুরির কাজ করে' আঙুল এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোনরকম সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ নিতান্ত অবহেলাভরে করে উঠ্‌তে পারিনে— বেশ একটু সময় নিতে হয়। কবিতা লেখাটা নিতান্ত আমার আজন্মকালের নেশা— মাঝে মাঝে যখন মৌতাতের সময় আসে তখন না লিখ্‌তে পারলে সমস্ত মনটা যেন বিকল হয়ে যায় এবং জীবনটা দুর্ভর বোধ হয় কিন্তু তাই লিখ্‌তে সময় পাইনে। মনে করি তাড়াতাড়ি অনেকগুলি কাজ একদমে চুকিয়ে ফেলে তার পরে বেশ আরামে নিশ্চিন্ত এবং নিরিবিলি আমার কবিতা নিয়ে পড়ব— কিন্তু প্রতিদিন এবং প্রতিমাস আপনার নতুন নতুন কাজ নিয়ে এসে হাজির হয়— কেউ নেই, যে আমাকে দয়া করে' একটু সাহায্য করে— কাজেই হুহুঃ শব্দে সমস্ত কাজ সেরে যেতে হয়— বেশ একটু রসিয়ে রসিয়ে জিরিয়ে জিরিয়ে বেশ ধীরে ধীরে আস্বাদ করে যে সমস্ত কাজ করতে হয়— ঠিক কাজ নয়, মনের যে সমস্ত সখ মেটাবার ইচ্ছে হয় সে সমস্তই অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্যে একপাশে ঠেলে রেখে দিতে হয়। কত কর্ত্তব্য কাজই হয়ে ওঠে না— আত্মীয়দের কত অভিমান সহ্য করতে হয় এবং নিজের মনের মধ্যেও প্রতিদিন কত অতৃপ্তি বহন করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্চে, যখন যে কর্ত্তব্যটা স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা। যে অবস্থা-দ্বারা পরিবৃত হওয়া

যায় সেই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উপস্থিত কর্ত্তব্য সেগুলো পালন করা। তাই আমি প্রতিমাসে নতশিরে সাধনার লেখা লিখে যাচ্চি এবং প্রতিদিন জমিদারীর সমস্ত খুচ্‌রো কাজ মনোযোগপূর্ব্বক করচি। তুমি কি মনে কর এতে আমি কোন সুখ পাই? আজকাল আমি চিঠিও যা লিখি সেও আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় কষ্ট বোধ হয়— কিন্তু আমার মনে হয় মোটের উপর আমার পক্ষে এই সবচেয়ে ভাল। কল্পনা নামক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আমার মনের পক্ষে ভাল এক্সেসাইস্ নয়।

রবিকা

[১৩] ওঁ পোস্টমার্ক, সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

ভাই প্রমথ

তুমি তাহলে ইতিমধ্যে শৈলশৃঙ্গ থেকে নেবে এসেছ। আমি ত দেশ দেশান্তরে ঘুরচি। বক্তৃতার খবরটা পেয়েচ দেখচি। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছে করে না। তীর একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে আর তূণের মধ্যে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসাধ্য— আমি সেইরকম দুরদৃষ্টক্রমে পাব্লিকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এখন আর আমার কোথাও শান্তি নেই। আমার খুব ইচ্ছা ছিল বক্তৃতাটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময় কলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না। লোকেন তখন সমুদ্রপারে,

তুমি তখন শৈলশিখরে। আমি অসহায়ভাবে একলা বসে বসে ঐ লেখাটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা তর্ক পরিবর্ত্তন সংশোধন করেছিলুম— এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ লেখাটার ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলুম না। একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হয়েছিল— তাঁর প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। তুমি যদি অক্টোবর মাসে দেশ ছেড়ে বেরও আমি তার বহুপূর্ব্বেই কলকাতায় ফিরব। বোধ হয় আর পাঁচ ছ দিনের বেশি দেরি হবে না। আগামী সোম মঙ্গল বারের মধ্যেই রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছবার সম্ভাবনা। পেসিমিজ্‌ম্ অপ্টিমিজ্‌ম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে নেগেটিভ্ এবং পজিটিভ্ পোলের মত প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একসঙ্গে ঐ দুটো অংশ থাকে। কেউবা আচারে ব্যবহারে পেসিমিষ্ট্ লেখায় অপ্টিমিষ্ট্ কেউবা তার উল্টো। একেবারে দুই পোল্ জুড়ে আস্ত অপ্টিমিষ্ট্ বা পেসিমিষ্ট্ বোধ হয় পৃথিবীতে দুর্ল্ভ। আমার প্রকৃতিতে আমি যে অংশে চিন্তা করি সে অংশটা বোধ হয় পেসিমিষ্ট্, যে অংশে কাজ করি সেটা বোধ হয় অপ্টিমিষ্ট্। তোমার মধ্যেও ডুব দিয়ে দেখ্‌লে বোধ হয় দুটো জিনিষই পাওয়া যায়।— প্রিয়দের ইতিমধ্যে আসবার কথা ছিল তারা কি এসে পৌঁচেছে? বিশ্রী ঝড় বৃষ্টিবাদ্‌লার প্রাদুর্ভাব হয়েচে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কর্ম্মাটার
মঙ্গলবার

[১৪] ওঁ শনিবার

১৬ জুন ১৮৯৪

পোস্টমার্ক, কলকাতা

ভাই প্রমথ

বহুকাল পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুসী হলুম। ইতিমধ্যে এদিক ওদিক থেকে তোমার খবরাখবর পাচ্ছিলুম। চিত্তরঞ্জনের কাছে শুনলুম তুমি রীতিমত 'Varsity man হয়ে গেছ। ভার্সিটি ম্যানের কি কি লক্ষণ জানিনে কিন্তু শব্দটা শুনলেই আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়বিমুখ লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তুমি কি সেখানে বক্তৃতা দিচ্চ, বক্তৃতা শুনচ, দাঁড় টান্‌চ এবং বিচিত্র বেশ পরিধান করে কালেজের চত্বরে পদচারণা করচ? কি রকম ভাবে দিনযাপন করচ এবং সেখানকার জগৎসংসার তোমার কাছে কি রকম লাগ্‌চে ঠিক অনুমান করতে পারচি নে। আমার বিলাতের অভিজ্ঞতার মধ্যে য়ুনিবর্সিটি কালেজের কোন চিত্র নেই। অথচ যারা সেখানে অধ্যয়ন করে এসেচে তারা সকলেই খুব মুগ্ধভাব প্রকাশ করে। যাহোক্ এখন তোমার মনের ভাবটা কি রকম তার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু বর্ত্তমান মনের ভাবের চিত্র দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কোন কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে বোধ হয় না। তবু তুমি ত নূতন দৃশ্য এবং নূতন জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছ, আমাদের যেমনটি রেখে গিয়েছিলে দেখে গিয়েছিলে ঠিক সেই রকমই আছি। হয় ত ঠিক সেই রকমই নেই কিন্তু অল্পে অল্পে ছোট ছোট

পরিবর্ত্তনগুলো মনে থাকে না এবং তার ফর্দ্দ দেওয়াও সহজ নয়। ভিতরে ভিতরে অনুভব করচি যেন অনেকগুলো জিনিষ বদলের দিকে যাচ্চে, কিন্তু সম্পূর্ণ দিক্ নির্ণয় করতে পারচিনে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে যতই সময় যাচ্চে ততই বয়স বাড়চে।— ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান খবর হচ্চে, গতকল্য আষাঢ়স্য প্রথম দিবস গেছে। তার আগের দিন থেকেই রীতিমত ঘনঘটা করে বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে নববর্ষার আবির্ভাব হয়েছে। প্রাতঃকালে খিচুড়ি এবং অপরাহ্নে সাঁৎলা ভাজা প্রচলিত হয়েছে। দিনটা খুব সুদীর্ঘ এবং মেঘস্নিগ্ধ— সন্ধ্যাবেলাটি ঘন অন্ধকার এবং রিমঝিম্ বর্ষণে বেশ জমাট্। প্রায় সে সময়টা বহুবিধ আত্মীয়-বন্ধুমণ্ডলী-পরিবৃত হয়ে পঞ্চাশ নম্বর পার্কষ্ট্রীটেই যাপন করা যায়। ঠিক গাড়িতে উঠ্বার সময়সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বৃষ্টিশান্তির অপেক্ষা করতে হয়—তদবসরে সেই তাকিয়া-পরিবৃত নীচের বিছানায় তাসের মজ্লিষ জমে যায়— এবং গোল টেবিলটার কাছে আমাদের মত একদল অনভিজ্ঞ লোকের সভা বসে। গত দুদিন ধরে শারাড্ অভিনয় চল্‌চে, তাতেও আমাদের বর্ষার সভা খুব সরগরম হচ্চে। এর থেকেই কতকটা বুঝ্তে পারবে পঞ্চাশ নম্বরে উনপঞ্চাশ পবন পূর্ব্ববৎ প্রবল প্রতাপে প্রবহমান।

(অভাববশতঃ কাগজের আয়তন বদ্‌লে গেল।)—

গত সন্ধ্যাবেলার জনসংখ্যার একটা তালিকা দিলেই বুঝ্তে পারবে পঞ্চাশ নম্বরের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি।

কুমুদ, লোকেন, সতু, তারকবাবু, লিল্, সত্য, অরু, নরু, আমি, ছোট বউ, আমার সব কটি সন্তান (শেষটিকে তুমি দেখনি), বড়দিদি, বলু, সরলা, এবং এবাড়ির স্থায়ী অধিবাসীবর্গ। আজকাল দুই একটি করে ইংরাজেরও সমাগম হচ্চে। তন্মধ্যে, বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, Miss Valentine নাম্নী একটি কুমারী, এবং Miss Forbes নাম্নী অপর একটি ইংরাজকুমারী প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। তোমার ভায়া কুমুদের সঙ্গে এঁদের ক'জনেরই দিব্য জমে গেছে— তিনি এঁদের পক্ষ অবলম্বন করে টেনিস্ খেলচেন এবং সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করে রাত্রি দশটার সময় একাকিনী কুমারীকে ডগ্ কার্টে আপন বামপার্শ্বে আসীন করে তাঁদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্চেন— ইত্যাদি কারণে বিলাতবাসী তোমাদের প্রতি তাঁর কোন ঈর্ষার কারণ নেই।— লোকেন মাঝে মাঝে অকস্মাৎ মফস্বল থেকে ছিট্‌কে এসে রাজধানী সরগরম করে দিয়ে যান। সতুও যে তাঁর অনুকরণ করবেন এমন সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। লোকেন আজকাল রাজসাহীর জজ্‌পদে আসীন হয়েছে সে খবর শুনেছ বোধ হয়।—আমাদের বাড়িতে একটি নূতন লোকের সমাগম হয়েছে সেও সম্ভবতঃ তোমার অবিদিত নেই। সুধী দিনকতক সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে দিয়ে অন্তবিধ সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সিদ্ধও হয়েছেন। এখন আর সাহিত্যের প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ এবং মনোযোগ দেখা যাচ্চে না।— তোমাকে আমার ছোট গল্প প্রথম খণ্ড, রাজা ও রাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং সাধনা পাঠান যাচ্চে। রাজা

ও রাণী দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, একবার চোখ বুললেই দেখ্‌তে পাবে। যা ছিল, আয়তনে তার অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। ছোট গল্পগুলো সব হিতবাদী এবং সাধনায় বেরিয়েছিল, এগুলো বোধ হয় তোমার তেমন ভাল লাগেনি— কিন্তু দূরবিদেশে হয় ত কতকটা ভাল লাগ্‌তে পারে। বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলুম সেটা সাধনার মধ্যে দেখ্‌তে পাবে।—

আমি অবিলম্বে শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করচি। সেখানে বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে। কড়ি ও কোমলের একটা দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাখানায় আছে, তারও মূর্ত্তি অনেকটা বদল হয়ে যাবে।— আজ বৃষ্টিটা খুব জমে এসেছে—মেঘে অন্ধকার করেছে—কাছারির ঘরে মধ্যাহ্নে বসে তোমাকে লিখ্‌চি— যথেষ্ট আলো পাচ্চিনে। মনে করচি চিঠিটা শেষ করে একখানা গাড়ি আনিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

ভারতবর্ষে Tree daubing বলে একটা ব্যাপার চল্‌চে সে খবরটা নিশ্চয় পেয়েছ। সাহেবরা বেশ একটু ত্রস্তভাবে আছে। একটা কিছু ঘটে ওঠা নেহাৎ অসম্ভব বলে বোধ হয় [না]। ইংরাজগুলো যে রকম অসহ্য অহঙ্কারী এবং উদ্ধত হয়ে উঠেছে তাতে একটা কিছু হওয়া নিতান্ত উচিত—চুপচাপ করে পায়ের তলায় পড়ে পড়ে মার খাওয়াটা নিতান্তই অন্যায়।—আজ তবে এইখানেই ইতি করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২ক] ওঁ সাহজাদপুর

৮ শ্রাবণ [১৮৯৩]

ভাই প্রমথ

আমি বন্ধুবান্ধবদের থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্চি। কেন বলতে পারিনে। নিশ্চয় আমারই দোষ। স্বভাবটা বোধ হয় ক্রমশই কুণো এবং আত্মম্ভর হয়ে আসচে— ক্রমেই বিশ্বাস হচ্চে অন্যের সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করে সর্ব্বদা দোদুল্যমান হওয়ার চেয়ে নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে নিভৃত হয়ে থাকায় সুখ না হোক্ স্বস্তি আছে। তবু হাজার হোক্, মানুষ ত আর কাজ করবার যন্ত্র নয়, মানুষের হৃদয়টাই তার কাছে সব চেয়ে প্রার্থনীয়, সেই অন্য হৃদয়ের সংসর্গ উত্তাপের অভাবে আমি যে কাজে নিযুক্ত আছি তারও উৎসাহ অনেক কমে এসেছে। পৃথিবীর ছেঁড়া কাঁথা তালি দেবার ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে বেশি দিন চালানো ভারি কঠিন, বিশেষতঃ যদি একা একা বসে ঐ কাজটা করতে হয়— আবার এই বেগারের কাজে অদৃষ্টে পুরস্কারের চেয়ে তিরস্কারটাই বেশি মেলে। সত্য কথা স্বীকার করাই ভাল, আমার গণ্ডারের চামড়া নয়— নিন্দা এবং নিরুৎসাহ আমার বোধ হয় গড়পরতা লোকের চেয়ে বেশি বাজে— হাস্যমুখ, মিষ্টবাক্য এবং কিঞ্চিৎ বাহবামিশ্রিত আশ্বাসবচন আমার মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলদায়ক খাদ্যের কাজ করে। বোধ হয় সেইজন্যেই আজকাল ভিক্ষার আশা ত্যাগ করে কুত্তার হস্ত থেকে পরিত্রাণের ইচ্ছেয় কিছু আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছি। গায়ে পড়ে পৃথিবীর উন্নতি সাধন কার্য্যে শর্ম্মা বোধহয় শীঘ্রই অবসর নেবেন। পাব্লিক নামক অকৃতজ্ঞ জীবের চরণতলে যে তৈল যোগান যেত সেইটে নিজের নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করে কিছুকাল নিদ্রা দেবার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছা করচে। তার পর জেগে উঠে আবার বোধ হয় সেই পাদপদ্মের জন্যে লালায়িত

হয়ে উঠব।—এইত সমস্ত কথা একরকম খোলসা করে বল্লুম—কৃতকার্য্য হব মনে করেই বেরিয়েছিলুম, হইনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং হবার যোগ্যতাও নেই— অতএব হার মানলুম। কিন্তু তুমি এই রঙ্গভূমি থেকে এতদূরে আছ যে আমার এই জয় পরাজয় আশা নৈরাশ্য তোমার কাছে অত্যন্ত লঘুভাবে গিয়ে পৌঁছবে— চাই কি, তুমি ঈষৎ কৌতুক অনুভব করতেও পার। তোমরা তাহলে এখন গিরিবাসী। তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে আমার এক একবার ইচ্ছা করচে— কিন্তু তার গুটি দুয়েক বাধা আছে প্রথম, মাস খানেক বিদেশে থেকে এরি মধ্যে আত্মীয় পরিজনবর্গের জন্যে মনটা কিছু চঞ্চল হয়ে পড়েছে— এমন অবস্থায় কালিগ্রাম থেকে দক্ষিণাভিমুখী না হয়ে একেবারে উত্তরাভিমুখী হওয়া আমার পক্ষে কিছু দুঃসাধ্য হবে। দিনকতক বাড়ি গিয়ে তার পরে যাত্রা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আজকাল আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে দার্জ্জিলিং যাতায়াতের যে সামান্য ব্যয়ভার তাও আমার পক্ষে দুর্ব্বহ।

লোকেন ত আর দুই এক সপ্তাহের মধ্যে পাড়ি দেবে শুনচি। তুমি তাহলে এখনো আর কিছুদিন স্থায়ী। কিন্তু পর্ব্বত থেকে নাববে কবে ?

হাঁ— গৃহ অর্থে "কক্ষ" শব্দের ব্যবহার আমি কাদম্বরীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরো দুই একটা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া গেছে। কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েচে— আরো ততগুলো পাত বাকি আছে। অনেক রাত হয়ে এল এবং বকাবকিও বিস্তর করা গেছে এখন তবে বিদায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

† এই পত্রটি ১৩ নং পত্রের পুর্বে বসিবে

[১৫] ওঁ লণ্ডন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমার সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখি নি। এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই— এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি— তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয় নি— কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ। ইতি ২২শে এপ্রেল ১৯১৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৬] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, দার্জিলিংকে তুমি যে রকম নিভৃত এবং নিরাপদ বলে বর্ণনা করেছ তাতে আমার খুবই লোভ হচ্চে। কিন্তু অনেকদিন চাপা থেকে হঠাৎ এখানে এসেই মনের আনন্দে আমার মধ্যে গানের উৎসটি খুলে গেছে— সেইজন্যে কিছুতেই নড়াচড়া করতে ভরসা হচ্চে না। গুজব শুনচি ছুটির পরে আমাকে নিয়ে একটা উৎপাত করবার ষড়যন্ত্র হচ্চে— তাহলে আমাকে তার আগেই লণ্ডনের নবেম্বর-আকাশের রবির মত

একেবারে অদৃশ্য হতে হবে, সেই সময়ে কোথাও পালাব— কিন্তু ততদিন তোমরা বোধ হয় দার্জ্জিলিঙে থাকবে না। দেখি, যদি আমার আপনাআপনি গান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে একবার ছুট দেব। যতদিন পর্য্যন্ত সুরের নেশা আমার মগজে আছে ততদিন বোলপুরই কি আর অন্য কোনো জায়গাই কি, সমস্তই আমার পক্ষে সুরলোক, এখন আমার এই সুরসভার আসন ত্যাগ করে ওঠবার হুকুম নেই। ইতি ৩০শে আশ্বিন ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Autobiographyটা তোমাকে পাঠাবার জন্যে রথীকে লিখে দিচ্চি

[১৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৬ অক্টোবর, ১৮৯৩

কল্যাণীয়েষু

বোলপুরে আমার আসনটি এমন জমে গেছে যে এখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় না। এখানকার আকাশ আলো মাঠ এখানকার শালতরুশ্রেণী এবং আমলকীবনের সঙ্গে নানাসূত্রে আমার সমস্ত মনের একটা সংযোগ ঘটে গেছে— এইজন্যে এখানে থাকাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, কোথাও কিছুমাত্র বাধে না এবং সব জায়গাতেই আরাম পাই। এখানে আমার চারিদিকের দৃশ্যটি আমার কাছে

অত্যন্ত পরিচিত বলেই আমার কাছে প্রত্যহ নূতন বলে ঠেকে —যেমন চিরাভ্যাসের আরামটি পাই তেমনি নিয়ত বিস্ময়ের একটি আনন্দ আমার মনকে সর্ব্বদা জাগিয়ে রেখে দেয় এমন আর কোথাও পাবনা মনে হয়। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি— সেইজন্যে এইখানে আমি সকল তীর্থের ফললাভ করি— সেইজন্যে এইখানেই পড়ে থাকি এবং পড়ে থেকেই আমার ভ্রমণের কাজ হয়। এখানে আমার অনেক ব্যাঘাত, অভাব এবং অসুবিধাও আছে, সে সমস্তই শিরোধার্য্য করে নিয়েছি।

তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি— কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। এ গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়। আমাদের বেশে ভূষায় বাক্যে এবং চিন্তাতেও অনেকটা বাহুল্য থাকে— গরম দেশে অত্যন্ত নিরেটভাবে মনঃসংযোগ করাটা দুঃখকর। কেননা এখানে কাজের তুলনায় অবকাশটা একটু প্রচুর না হলে আমরা বাঁচিনে। অতএব যখন সময়ের টানাটানি নেই তখন ভাব ও বাক্যসমাবেশের ঠাসাঠাসিটা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। ওতে লেখকেরও সংযমের দরকার করে পাঠকেরও তাই— তাড়া থাক্‌লে সেটা করা যায় কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে গয়ংগচ্ছ চালটাই মানুষ স্বভাবত পছন্দ করে। এই সকল কারণেই, তোমার গদ্য রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের

পাঠকেরা তার পূরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্যলেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখিনি। যখন আমাদের পণ্ডিতমশায়রা কাদম্বরীর রীতিতে বাংলা গদ্য লিখ্‌তেন তখন তাঁরা আর যাই হোক্ এটা জান্‌তেন যে লেখাটা একটা চাষের ফসল, ওটা আগাছা নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের গদ্যলেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদের হয়েছে। আমাদের দেশে যে একটা হঠাৎ-ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে এখনো তার চালচলনে পাক ধরে নি—গদ্যসাহিত্যে তার প্রকাশটা অত্যন্ত শস্তাদামের শৈথিল্য প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নিজের পরিচয় দিচ্চে। পদ্যের একটা সুবিধা এই যে, যেমন করেই হোক তাকে একটা বাঁধন মানতেই হয়। আমার ত মনে হয় এইজন্যেই সাহিত্যের কাঁচাবয়সে পদ্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, প্রবীণ বয়সেই গদ্যের অধিকার পাকা হয়। আমার ত দেখেশুনে মনে হচ্চে বাংলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসচে এবং তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি।

ব্রজেন্দ্রবাবুর ইংরেজি কবিতা ইংলণ্ডে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে দেখা হলে সে সব কথা হবে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, দুই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এই চিঠিখানি।...ফরাসী গীতাঞ্জলিটা বোধ হচ্চে তোমার কাছে আছে কারণ আমার কাছে নাই।

সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে সুধু চিন্তা করলে হবেনা—কিছু লিখ্‌তে সুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি "কনিষ্ঠ" হয় ত কি রকম হয়। আকারে ছোট—বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, ভাবের হিসাবে।

বেশ আছি। যতই মনে করচি আবার অনতিকাল পরে রাজসাহি যাবার হাঙ্গাম করতে হবে ততই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১৯] ওঁ বোলপুর

পোস্টমার্ক, ৫ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্র উদ্গমের সময় হয়েছে— বসন্তের হাওয়ায় সে কথা ছাপা রইল না— অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখবার চেষ্টা করব। বিবিকে সুরেনকেও তাড়া দিয়ো।

বসুমতী হিতবাদীর কথাটা ভুলোনা। Indian Publishing Houseদের জন্যে যে একটা এগ্রিমেণ্টের আদর্শ খাড়া করতে চেয়েছিলে সেটার প্রয়োজন আছে।

নাটোর মানসীর জন্যে অত্যন্ত তাগিদ করচেন। জীবনের বাজে উপদ্রবের মধ্যে এই আর একটি উপসর্গ বাড়ল।··· নাটোরকে তাঁর এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার কি কোনো রাস্তা আছে? আমার আশঙ্কা আছে মানসীতে যদি মহারাজকে পেয়ে থাকে তাহলে হয়ত একদিন সবুজপত্রের সবুজে তাঁর চোখ না জুড়তেও পারে— সেটা আমাদের পক্ষে অসুখের কারণ হবে। অতএব এখন থেকে যদি পার তার প্রতিকার কোরো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১০ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

মাথাটা বেশ তাজা নেই। তাই চুপচাপ পড়ে আছি।

বসুমতী হিতবাদী সম্বন্ধে রথী ত কিছুই জানে না। বসুমতী শৈলেশের দ্বারায় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়েছিল— সে ছাড়া আর কেউ ওর কোনো তথ্য জানে না।

আমি আর কিছুদিন মাথাটাকে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা রেখে তার পরে ওটাকে আবার পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করবার চেষ্টা করব—

এখন যদি বেশি টানাটানি করি তাহলে সইবে না। এখন টলমল করচে, ঠেলাঠেলি করলেই কাৎ হয়ে পড়বে।

সত্যকুমারের স্ত্রীকে কিছু সাহায্য করবেনা? বেচারা বড় নিরুপায় হয়ে পড়েছে। সুরেনকে ওদের চিঠি পাঠিয়ে দিলুম।

একটা খবর পেলুম বার্লিনে আমি যাচ্চি— আমার বক্তৃতার জন্যে একটা প্রকাণ্ড হল ঠিক হয়ে গেছে। সেখানকার একজন মেয়ে এই উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৩ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা, রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে দুই একটা লেখা দিতে পারব। চারিদিকের নানাবিধ তাড়নায় মাথার মগজের মধ্যে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল— ক্ষণে ক্ষণে ঘুরপাক খেলত। এখন একটু ভাল আছি কিন্তু বুদ্ধির যন্ত্রটাকে বেশি খাটাতে সাহসও হয় না ইচ্ছাও হয় না— একটা মৌরসী ছুটির জন্যে মনটা মাঝে মাঝে দরখাস্ত লিখ্‌তে বসে। গাল পাড়বার বেলায় বৈরাগ্যকে রেয়াৎ করিনে কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে যেন বাঁশি বাজাতে থাকে— একেবারে ভিতরের দিক থেকে সে আমাকে উদাস

করে তোলে। যদি শুষ্ক বৈরাগ্য হত তাহলে এ'কে কাছে আস্‌তে দিতুম না কিন্তু এ যে বসন্তী রঙে রঙানো— আমের বোলের গন্ধে ভরা। "Deep-delved earth" এর মধ্যে যে মদে বহুবৎসরের পাক ধরেছে সেই মদের মত এ যেন আমার প্রকৃতির ভিতরে ভিতরে আপনার মাদকতাকে প্রবীণ করে তুলেছে। এই বৈরাগ্যের হাওয়াটা যখন হুহু করে বইতে থাকে তখন মাসিক পত্রটত্রগুলো মন থেকে কোথায় উড়ে চলে যায় তার ঠিকানা নেই, তখন দেশের হিতের দিকে খেয়ালও থাকেনা। যাই হোক্ lucid intervals একেবারে আস্‌বে না এমন হতে পারে না অতএব আশা আছে।

কিন্তু নাটোরের মহারাজের ভাল মন্ত্রীর দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৪ এপ্রিল, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

গল্প লেখার আয়োজন অনেকদিন ত মনের মধ্যে নেই— বেশ একটু বৈঠক-জমানো রকমের অবকাশ না পেলে গল্প লেখার সুবিধা হয় না। তবু চেষ্টা দেখা যাবে। তুমি নাটোরে গেছ কল্পনা করে তোমার কাছে না পাঠিয়ে মণিলালকে প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলুম সেটা কি এখনো সম্পাদকী ডেস্কের উপরে দাখিল হয়নি? তোমরা ১৫ই বৈশাখে কাগজ

ত বের করচ কিন্তু হাতে দুতিন মাসের সম্বল ত জমাও নি—Think not of tomorrowটা কি সদুপদেশ ?

বৈশাখের আরম্ভ থেকেই সুবোধ কাজে নিশ্চয় যোগ দেবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[২৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৬ এপ্রিল, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা বেশ। আর দুই একদিন পরেই গল্পটাতে হাত দেব— দেরি হবেনা। ভারতী পাইনি, পেলে তোমার লেখা পড়ব। মানসী এইমাত্র পেলুম— এখনো পড়িনি।

সুবোধ জয়পুরের মহারাজের কাছ থেকে ছুটি পেলেন না। কালিগ্রামে কোনো রকম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে একবার নগেন্দ্রকে লিখো সে যেন বিভাগস্থাপনের পূর্ব্ব ও পরের ইসমনবিশি ও আয়ব্যয় তুলনা করে একটা রিপোর্ট পাঠায়। নূতন ব্যবস্থায় খরচপত্র বাড়বে কি কম্‌বে এবং কি পরিমাণে বাড়বে কমবে সেটা বেশ পরিষ্কার জানা ভাল। আমার বোধ হয় আপাতত যদি ব্যাঙ্কের কাজের উপরে নগেন্দ্রকে পতিসর বিভাগের চার্জ্জ দেওয়া হয় তাহলে কাজ চলে যেতে পারে।

…আর সেই গানের বইয়ের কি করলে ?

অচলায়তনের রিহার্সাল চলচে— তারি কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছি, কি যে লিখচি তা বুঝতে পারছিনে।

নাটোর মানসীর জন্যে তাগিদ লাগিয়েছেন। আমি নানা কাগজে আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারিনে— আমার শক্তির এত প্রাচুর্য্য আর নেই। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[২৪] ওঁ পোস্টমার্ক

৬ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

তোমার কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগল। রসও যেমন, নৈপুণ্যও তেমনি, আর ভাষাটি সম্পূর্ণ তোমার নিজের। কেবল একটা লাইন আমার মনে হল যে একটু বদলালে ভাল হয়। সম্ভবত "পারদ" শব্দটার কোনো একটা বিশেষ অর্থ আছে— যদি তা থাকেও তবু সেটা সর্ব্বজনগম্য নয়— আর যদি তুমি থর্ম্মমিটরের পারার প্রতি লক্ষ্য করে থাক সেটা বেশ লাগসই হচ্চে না— কারণ পারা কোনো কিছুকে আক্রমণ করলে সেটা কেবল মারাত্মক হতে পারে মানুষের শরীর সম্বন্ধে— স্বর্গের দেয়ালের পরে তার ক্রিয়াটা অনুভব-গোচর না হবার কথা। যদি এই রকম কর ত কেমন হয়—

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙিয়া গারদ
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেয়াল ইত্যাদি।

তোমার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আমি "আষাঢ়" বলে একটা উড়ো রকমের প্রবন্ধ পাঠিয়েছি নিশ্চয় পেয়েছ। তুমি তাতে

প্রাচীন ভারতের যে ধরণের মেঘলা ছবি চেয়েছ তা হয়নি কিন্তু ওর মধ্যে পূবে হাওয়াটা আছে।

আমার মুস্কিল হয়েছে মনকে আর আমি কলম চালনার কাজে লাগাতে পারচিনে— এখন চতুর্থ আশ্রমের আয়োজনটাই তার কাছে একান্ত হয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু তোমরা এখন সুরার নেশায় সুরের খেয়াল দেখ্‌চ তোমরা আমার দরদ বুঝবেনা।

অন্যান্য মাসিকে যে সমস্ত আলোচ্য প্রবন্ধ বেরয় তার সম্বন্ধে সম্পাদকের বক্তব্য বের হলে উপকার হবে। প্রথমত যারা উৎসাহের যোগ্য সেইসব লেখকেরা পুরস্কৃত হবে দ্বিতীয়ত অন্যের লেখা সম্মুখে রেখে, বলবার কথাটাকে পরিষ্কার করে বলবার সুবিধা হয়। তা ছাড়া আধুনিক সাহিত্যের মাঝিগিরি করতে হলে সমালোচনার হাল ধরা চাই। প্রতিমাসে সমালোচনার যোগ্য বই পাবে না কিন্তু মাসিক পত্রের লেখাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে কিছু না কিছু বলবার জিনিস পাবে। বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে কি ভাবে বলা উচিত তার একটা আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৫] ওঁ রামগড়

কল্যাণীয়েষু

"যৌবনে দাও রাজটীকা" লেখাটি আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। খুব উজ্জ্বল এবং শাণিত। অবনের ভ্রমণকাহিনীটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আমার তো বোধ হচ্চে তোমার কাগজ এইরকমভাবে যদি বছরখানেক চলে তাহলে বাংলাসাহিত্যকে নতুন শক্তি, গতি, এবং রস দিতে পারবে। সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে ওর কথাগুলো মর্ম্মস্থানে গিয়ে লাগ্‌চে। মিথ্যার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাপুবাছা সম্বোধন করে আর চল্‌বে না। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই— বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ— কিন্তু যেখানে যথার্থ বীর্য্যের দরকার— যেখানে সয়তানের সঙ্গে লড়াই, যে সয়তানের হাজার কণ্ঠ এবং হাজার বাহু, সেখানে দেখ্‌তে পাই বড় বড় সব সাহিত্যিক গুণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়চে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্চে। তোমাদের এইসব লেখা পড়ে আমার উৎসাহ হয় কিন্তু দেখ সাহিত্যের এলাকায় আমার কাজের দিন ফুরিয়ে গেছে— সত্য মিথ্যা বিস্তর কথা জমিয়ে তুলেছি— সেগুলো এখন কালের ছাঁকুনির ভিতর দিয়ে ছাঁকা হতে থাক্, আর নতুন জঞ্জাল বাড়াতে ইচ্ছা হয় না— এখন নিজের জীবনটাকে কি করে সম্পূর্ণ সত্য করতে পারব এই বেদনায় আমাকে দিনরাত্রি জাগিয়ে রেখেছে। এর কাছে

আমার খ্যাতি কীর্ত্তি সমস্তই এত ছোট হয়ে গেছে লোকালয়ের তাগিদ আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে পৌঁচচ্ছে না। যাক এসব কথা আলোচনার বিষয় নয়— যে কথাটি বলবার জন্যে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি সেটি খুব দীর্ঘ কিছু নয়— সেটি হচ্চে— বাহবা, সাবাস্‌, সোভান আল্লা! ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৬] ওঁ শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

ক্ষিতিমোহনবাবু কিছুদিন থেকে জ্বরে পড়েছেন তাই তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করতে পারব বলে আশা করচি। শরীরটা তাঁর সুস্থ হয়ে উঠুক্‌।

আজ কিছুকাল থেকে মণিলালকে তাগিদ দিচ্চি এখানে রথী ও নগেনকে সবুজপত্র পাঠিয়ে দিতে। তারা স্কুলে থাকে এবং অজিত প্রভৃতির কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে পড়বার জন্যে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়। আজ পর্য্যন্ত তাগিদ দিয়ে কোনো ফল পাইনি। তুমি একটু সম্পাদকী ঠেলা দিয়ে যদি তাকে বিচলিত করতে পার ত ভাল হয়।

গল্প লিখ্‌তে বসেছি কিন্তু লেখার এত ব্যাঘাত যে কি লিখেছি ও কি লিখ্‌তে হবে সেটা বারবার করে ভোলবার

জো হয়েছে। গল্প এমনতর খাব্‌লা খাব্‌লা করে লিখ্‌লে তার জোড় মেলানো শক্ত হয় এবং তার ফাটলগুলো দিয়ে রস বেরিয়ে যায়। যাই হোক্ আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্ ঢক্ করে খাবার মত হচ্চে না— এগুলো গল্প না বল্লেই হয়। তুমি একবার এ লাইনে চেষ্টা করে দেখ। যদি হাত খুলে যায় তাহলে কিছুদিন চল্‌বে বেশ। বড় উপন্যাস লিখ্‌তে বসতে ভয় হয়— একেবারে মনের এপার ওপার জুড়ে সাহিত্যের বেড়-জাল ফেলবার মত উৎসাহ আমার আর নেই—এখন ডাঙার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষেপনা জাল ফেলি— ছুটো একটা যা ওঠে সেই যথেষ্ট। আমেরিকার বিবরণ পত্র আকারে লেখবার চেষ্টা করা যাবে— কিন্তু এ জায়গাটা লেখবার পক্ষে অনুকূল নয়। ইতি ৮ই জুলাই ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২৮ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

শিলাইদহে যাবার কথা ত মনে ভাবি নি— বিশেষত কাজের প্রসঙ্গে। সেখানে গেলে কাজ হয় সেকথা সত্য— কিন্তু সেটি সরস্বতীর তরফের কাজ। অন্য কাজ এখন আমার আর চল্‌বে না। আমি কাছারিতে বসে জমাবন্দী করতে লেগে গেছি এ কথা মনে করলে হাসি পায়। আশ্বিনের

আরম্ভে এবার ছুটি— সেই সময়ে ভাবচি ওখানে গিয়ে কিছুদিন চুপচাপ করে থাকব। অমনি সেই অবকাশে সবুজ পত্রের ঠোঙা ভরবার মত কিছু রচনা করা যেতে পারে।

সবুজপত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখা লেখে তবে লোকে বল্‌বে কি? এক ত সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌তে থাকবে— তারপরে হয় ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখ বোধ করতে পারে। অনিলা দেবীর খবর কি? ব-র সে কবিতাটি নেড়ে চেড়ে বিশেষ কিছু শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারিনি। ওর আর যদি কিছু থাকে পাঠিয়ে দিয়ো— হয়ত একটা লেগে যেতে পারে। কিন্তু কবিতা রচনায় ও যে যশস্বী হবে এমন আশ্বাস দিতে পারিনে— কিন্তু সেজন্যে খেদ করা উচিত নয়— কারণ কোনো দিন দলের লোকের অভাব হবে না। ইতি সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৩১ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র সবুজ পত্র পেয়েই তোমার পত্রটি পড়লুম। খুব চমৎকার লাগল— একেবারে আগাগোড়া ঝকঝক্ করচে। তোমার এরকম সব লেখা লোকে যে সত্যই পছন্দ করচে না এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। একরকম জাতের ভালো লেখা আছে যা পড়তে পড়তে পদে পদে এই কথাটা মনে

আসে যে এ আমি ভাবিনি, এ আমার মাথায় আসত না, এ আমার কলমে আসা সম্ভব নয়— সেইরকম ঐশ্বর্য্যশালী লেখাকে পাঠক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্বীকার করতে চেষ্টা করে— এইরকম লেখার কাছে পাঠকদের মন পরাভব মান্‌তে কষ্ট এবং লজ্জা বোধ করে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার লেখাগুলিতে একটা ঈর্ষ্যা জাগিয়ে তুলেছে— সেটা প্রশংসাফলেরই কাঁচা এবং টোকো অবস্থা— ঐটে নিশ্চয়ই ক্রমে আলোয় বাতাসে পাক্‌বে এবং মিষ্টতায় ভরে উঠ্‌বে।

অ…র লেখা প্রায় আগাগোড়াই তোমার হয়ে উঠেছে— ভালই হয়েছে— ওর হাতে কিছুতেই এরকম বাঁধুনি হত না। এবং সেই বাঁধুনির অভাবে ভিতরকার সার কথাটা কোনো জায়গাতেই মালুম দিত না।

আমি "আমার জগৎ" নামক একটা লেখা লিখে ভয়ে ভয়ে মণিলালের কাছে পাঠিয়েছি। ভয়ের কারণ এই, এরকম তত্ত্ব আলোচনা আমার অধিকারের মধ্যে নয়। পাছে আমার নামের জোরে তোমরা ওটাকে তরিয়ে দিতে চাও সেইজন্যে মণিলালকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছি যদি সেটা পড়বার সময় তোমার মুখে কোনোপ্রকার সম্পাদকী বিকার দেখা দেয় তা হলে ওটাকে ফস্‌ করে সরিয়ে নিতে। ওটা যদি শিশির বিন্দুর মত তোমাদের সবুজপত্রের উপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় তাহলে রবির তাপ তাতে বিশেষ বৃদ্ধি হবে না একথা আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি। ভেবেছিলুম

কথাটা তোমার কাছে ফাঁস করব না— কিন্তু সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের কোনোরকম লুকোচুরি না থাকাই ভাল।

নগেনের কাছে শোনা গেল এখানকার পাকশালা ও ভাণ্ডার থেকে বিশৃঙ্খলতা দৈত্যকে খেদিয়ে দেবার জন্যে তুমি মহেন্দ্রকে পাঠাতে রাজি হয়েছ। তা হলে বড় ভাল হয়। ঐ ব্যাপারে এখানকার সকলেই আনাড়ি— অথচ সুখাদ্যে রুচি এবং ক্ষুধা এদের সকলেরই অসামান্য। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৯] ঔঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২ অগস্ট, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, সবুজপত্র পেয়ে তোমাকে যে চিঠি লিখেছি সে বোধ হয় পেয়েছ। বি··· এবং বি···র পালকবর্গ যে তোমার সবুজ পত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবেন সে আমি জানতুম। আবার মজা হয়েছে এই যে, একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জনরব এই রটেছে যে, আমি বিশেষ চেষ্টা করে সন্তোষকে বলে বঙ্গদর্শনকে বি···র হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে কাগজটাকে উঠিয়ে দিয়েছি। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে আমি চিন্তাও করি নি, চেষ্টাও করি নি। তোমার মুস্কিল এই যে এক্ষেত্রে আমার পোড়াকপালের আঁচ

তোমাকে লেগেছে। সঙ্গদোষেই তুমি বিপদে পড়েছ নইলে তোমাকে এত দুঃখ পেতে হত না। যাই হোক্ আমি নিশ্চয় বলে দিচ্চি তোমার কাছে এদের হার মানতেই হবে। অনেকদিন পর্য্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুল্‌ছিল— বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন? দেশের কোনো জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা পাবেনা? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। রণক্ষেত্রে যখন দাঁড়িয়েছ তখন যদি একা লড়তে হয় তাও লড়তে হবে, পিছু হটলে চল্‌বে না।

বিবির লেখাটা কাল সোমবারে রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, সুরেনকে ভোলবার সময় দিয়ো না— আমাদের ব্যাঙ্কের একটা পাকা ভিত হওয়া ভারি দরকার। ছুটির আগেই ওটা পরিষ্কার করে ফেলো।

মহেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়ো— যদি তার মন টেঁকে এবং তাকে যদি মনে ধরে তবে তাকে রেখে দেবো। পূজার পরে মহেন্দ্রাণীকেও আশ্রয় দেবার একটা উপায় করা যাবে—

সেটা খুব সম্ভব বৌমার কাছে সুরুলেই হবে— কারণ শান্তিনিকেতনের শান্তির ব্যাঘাত করতে ইচ্ছে করিনে। মহেন্দ্রকে মাইনে কত দিতে হবে লিখো।

আজ ত ১৫ই। কাল বোধ হয় সবুজপত্র পাওয়া যাবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার লেখাটা পড়বার জন্যে উৎসুক আছি। ক'দিন ভরপুর গানের নেশায় আছি— তাই সমস্তদিন গুনগুন্ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারিনি।

আশ্বিনের জন্যে একটা গল্প শীঘ্র লিখে দেব— তাহলেই আশ্বিনের ছুটিটা পুরো পরিমাণ ভোগ করবার অবকাশ পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্ত্তিক মাসটা আশ্বিনের ঠিক পরেই পড়ে। কিন্তু তোমরা ত আশ্বিন কার্ত্তিকের যুগল সংখ্যা বের করবে? বড় লেখাগুলোকে পাস্ করবার জন্যে একটা বড় ফাঁক করার দরকার আছে ত?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

যুদ্ধের সম্বন্ধে তুমি যে প্রবন্ধটি লিখেছ সেটিতে কোনো কলাকৌশল না থাকাই উচিত। এ সব জিনিষ খুব স্বচ্ছ এবং সরল হওয়া উচিত— এ লেখাও তাই হয়েছে— বরঞ্চ দুই এক জায়গায় যেখানে একটুখানি ভাষাচাতুর্য্য এসে পড়েছে সেটা না থাকলে ভাল হত। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যাঁরা পড়েছেন

তাঁরা এর প্রশংসাই করেছেন— এ রকম একটা লেখার প্রয়োজন ছিল।

মহেন্দ্র এলে আমি মনে করচি তাকে প্রধানত আমারই খাষ কাজে লাগাব। আমি অধিকাংশ সময়েই আমার ঘর থেকে দূরে থাকি— তাই আমার অশন বসন আরাম বিরাম সকল বিষয়েই আমার ভৃত্য উমাচরণের উপরেই আমার নির্ভর। একরকম চলে যাচ্চে। তবু এক এক সময়ে সেবার অভাব অনুভব করি। যত বয়স বেড়ে যাচ্ছে ততই একলা হয়ে পড়চি অথচ সহায়তার প্রয়োজন বাড়চে, তাই কিছুকাল থেকে এমন একটি অনুচর খুঁজচি যে কতক পরিমাণে আমার ভার নিতে পারবে— নিজের চিন্তা ভাববার ঝঞ্ঝাট থেকে যে আমাকে বাঁচাতে পারবে। মহেন্দ্র যদি তদুপযুক্ত লোক হয় তাহলে আমার একটা মস্ত অভাব দূর হবে। মহেন্দ্রাণীকে স্কুলে রাখার কোনো অসুবিধাই হবেনা। হিঁদুয়ানির সম্বন্ধে তার বাছবিচার কি রকম? জান ত আমরা কি রকম ম্লেচ্ছ— অবশ্য, তোমরাও কম নও— কিন্তু কলকাতায় তোমাদের মত লোকের ঘরের এক প্রান্তে ভগবান মনুর অনুশাসন মেনে চলবার বন্দোবস্ত করা তেমন কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে বিবির পরামর্শ কি আমাকে জানিয়ো।

বেল্‌জিয়ামের কীর্ত্তি মনে খুব লেগেছে— সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেও ছিলুম— হয় ত দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে। এবার কি তোমাদের আশ্বিন কার্ত্তিকের যমজ সংখ্যা বের করবার ব্যবস্থা হয়েছে?

ব্যাঙ্কের লেখাপড়াটা করে ফেল— সুরেনকে কষে তাড়া লাগাও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

এ মাসের সবুজপত্র পেয়েছি। র…র লেখাটি যাকে বলে "সারবান"। নিন্দা করাও শক্ত, হজম করাও তাই। এ সব লেখা ভোগ করবার যোগ্য নয় অথচ জমিয়ে রাখবার যোগ্য। পত্রপুটে ফুল রাখা চলে, মিষ্টান্ন রাখাও চলে, কিন্তু খনিজপদার্থের ভার ত তার উপরে সয় না— সবুজপত্রপুটের পক্ষে এই প্রত্নতত্ত্ব রত্নবিশেষ হলেও বেশি গুরুতর হয়েছে।

ম…কুমার লোকটি কে তার ত ঠিকানা পাওয়া গেল না। লেখাটি সম্পূর্ণ মাঝারি রকমের। তাপও নেই শৈত্যও নেই। ভাষার বেগ নেই, ভাবের প্রভাব নেই— অথচ একটা গতি আছে— এই পর্য্যন্ত।

আসল কথাটা হচ্চে সবুজপত্রে তোমার লেখার অভাব অনুভব করা গেল। ডাকে যার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করা যাচ্চে যদি একদিন তার হাতের শিরোনামা-লেখা লেফাফা পাওয়া যায় এবং খুলে দেখা যায় যে চিঠিটা অন্য লোকের, তাহলে যে রকম মনের ভাব হয় এবারকার সবুজপত্র খুলে সেই রকম ভাবোদয় হল।

মোটের উপর আমি ভাল ছিলুমনা— ঠিক কবিতা লেখবার মত মনটা তাজা ছিলনা তাই কিছু লেখা হয় নি। এখন ভাবের স্রোত ভাঁটার মুখে আছে— আবার যদি স্রোত ফেরে ত দেখা যাবে। ইতিমধ্যে একটা গল্প লেখায় হাত দিয়েছি। একটা করে গল্প যে চাইই মণিলালের কড়া তাগিদ। তুমি এই ছুটিতে একটা গল্প লেখার চেষ্টা কোরো— কেবলি এক হাতের গল্প হওয়া ভাল নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৮ অক্টোবর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

চারুর কাছে শুনেছিলুম ··· বাবু আমার লেখার প্রতিবাদ করে একটা কি লিখেছেন আমি মণিলালকে লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম সেটা যেন ছাপানো হয়। ভালো হোক্‌ বা না হোক্‌ এটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তাহলে এই উপলক্ষ্যে আমারও নিজের কথা আর একবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

যে পর্য্যন্ত না লেখক দুটি একটি তৈরি হয়ে ওঠে সে পর্য্যন্ত সবুজ পত্র তোমার লেখা দিয়েই ভরতে হবে। আমি মনে মনে সেইটেই ইচ্ছা করি। আমি ত এই দীর্ঘকাল লিখে আস্‌চি— আমার বলবার কথা নানারকম করে বলা হয়ে গেছে— এখন যা বল্‌তে যাব তাতে কেবল পূর্ব্বকথিত কথাকে পুরোনো করে

তোলা হবে। এখন তুমি তোমার নিজের কক্ষে তোমার জ্যোতিষ্কটিকে চালিয়ে দাও, বাংলা দেশের বর্তমান যুগকে একবার সে তার আলোক দেখিয়ে প্রদক্ষিণ করে আসুক্। মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না— সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে— পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তা ছাড়া আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে— এখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখকমণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। এইজন্যই সবুজপত্রের প্রতি আমার যা-কিছু ঔৎসুক্য— আর তাই দেহমনের বিমুখতাসত্ত্বেও যতটুকু পারি লিখচি। কিন্তু তোমার জায়গা তুমি সম্পূর্ণ জুড়ে বস— আমার যাবার সময় হল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি কবিতাটি পাঠিয়ে দিয়েছি। "Crossing"টা আমাকে ফেরৎ দিয়ো— তার কোনো খসড়া খুঁজে পাচ্চি নে।

[৩৪] ঁ 41 George Town
Allahabad
পোস্টমার্ক, এলাহাবাদ
১১ ডিসেম্বর ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

কাল রাত্রে সবুজপত্র পাওয়া গেল। পেতে যে দেরি হল তার মূল কারণ আমি অতএব ওসম্বন্ধে বেশি কিছু আলোচনা করবনা। কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি— বের্গসঁর

ফিলজফির লাইনে— স্থিতি নেই বল্লেই হয়— যাকে বলে গড়ানে পাথর, রোলিং ষ্টোন্, সবুজ সামগ্রী কিছুই জমা করবার মত অবকাশ ঘটেনি। কোনোমতে টুক্‌রো সময়গুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে ফকিরের কাঁথার মত করে আমার এবারকার গল্পটা সেরেছি। সম্পূর্ণ ফাঁকি দিইনি সেজন্যে আমি সম্পাদকের আন্তরিক ধন্যবাদ দাবি করতে পারি। পাঠকদের কাছে আমার বিশেষ কিছু দাবি নেই। তারা বিনা দাবিতেই অযাচিত আমাকে যে দক্ষিণা দেবে সে আমার এত জমা হয়েছে যে এখন তার থেকে আমি বিনামূল্যে বিনা মাশুলে তাদের কিছু কিছু ফিরিয়ে দিতে পারি। যুদ্ধের সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার খুব ভালো লাগ্‌ল— ও সম্বন্ধে আমার মনে যে সমস্ত কথা এসেছে হয় ত ছোটখাটো আকারে লিপিবদ্ধ করে তোমার সম্পাদকী দপ্তরে রওনা করে দিতে পারি। এবারকার সবুজপত্রে আমদানি নেই রপ্তানিই সমস্ত— অর্থাৎ বাইরে থেকে কিছুই জমা হয়নি দেখ্‌তে পাচ্চি।

একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দিই— সেটা তোমাদের ভুল্‌লে কোনোমতেই চল্‌বে না। সেই কালিগ্রামের ব্যাঙ্কটাকে বিধিবদ্ধ করে তোলা। আর দেরি কোরো না। সুরেন যে সময় পাবে এমন আমি আশা করিনে— তাকে একবার জানিয়ে তুমি কোনো এটর্ণিকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পার। মুস্কিল এই যে এটর্ণি যে সুরেনের চেয়ে কোনো অংশে ভালো তা নয়। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বটে তাই বলে মানুষের

জীবিত কাল ত নিরবধি নয়— আমাদের এটর্ণিদের অমরাবতীর এটর্ণি হওয়া উচিত ছিল, তারা কোনোমতেই মর্ত্ত্যলোকের যোগ্য নয়। যে করে পার ও যত শীঘ্র পার এই কাজটা সেরে দিয়ো। ··এসকল বিষয়ে mobilisationএর সত্বরতাই হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র।

কোথায় কখন আছি তার কিছুই স্থিরতা নেই তবু যদি কিছু বলবার থাকে এলাহাবাদে সত্যর কেয়ারে চিঠি পাঠালে আমার কাছে কোনো রকম করে পৌঁছবে।

বাল্মীকিপ্রতিভা কি রকম হল?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৫] ওঁ পোস্টমার্ক, এলাহাবাদ

২০ ডিসেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

একদিন প্রাতঃকালে এলাহাবাদ থেকে দিল্লিতে যাবার বিষম ব্যস্ততার মধ্যে সেই লেখাটা তাড়াতাড়ি লিখে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তার পরে এ কথা আমার মনে হয়েছে যে ওটার মধ্যে দু চার জায়গায় একটু নরম তুলি বুলিয়ে কড়া রংগুলোকে কিছু কিছু ফিকে করে দিলে আর কোনো গোল থাকে না। তোমারও যখন সেই মত তখন এক কাজ কোরো লেখাটার যে যে অংশে কাঁটাখোঁচা আছে একটু চিহ্নিত করে শান্তিনিকেতন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো— আমি কিছু বাড়িয়ে কমিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—

তার পরেও যেটুকু অধিকমাত্রায় বেমোলায়েম ঠেকবে তার উপরে দুই এক দফা তোমার সম্পাদকী র‍্যাঁদা চালিয়ে দিয়ো।

সোমবার প্রাতে আমি বোলপুর পৌঁছব। ইতি শনিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"চঞ্চলা" নামক এক কবিতা মণিলালকে পাঠিয়েছি—যদি সেটা অচলা হয় তাহলে তাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা কোরো না।

সুরেনকে ব্যাঙ্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ো।

---

[৩৬] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার এবারকার দুটো লেখাই আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। আমার ভয় হয় পাছে সমালোচকদের ধাক্কায় তোমাকে বিচলিত করে। এতদিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে এদেশে সম্ভবত সাহিত্যরসজ্ঞ অনেক আছে কিন্তু তারা প্রায়ই কেউ "সাহিত্যিক" নয়— যেমন ময়রার মুখে সন্দেশ রোচে না তেমনি আমাদের সাহিত্যিকরা সাহিত্যের কারবার করে কিন্তু সাহিত্য ভালবাসে না— সে শক্তি তাদের নেই। আমি তাই ওদিকে একেবারেই কান দিইনে— কর্ণটা যদি ঢেউকে খাতির করে তাহলে ত নৌকাডুবি। সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যতই দৃঢ় হতে থাকবে ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশি পড়বে— যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই

যে তাদের মাথার অনেক উপর দিয়ে তুফান চলে যায়। আমি দেখেছি যত রাজ্যের বাজে লোকের কথায় তোমাকে উত্তেজিত করে— তুমি বাজে লোককে কিছু বেশি নাই দিয়েও থাক— তার একটা কারণ তুমি তাদের মধুর বচনের মায়া এখনো ছাড়াতে পারনি এবং তাদের দুর্ব্বাক্যকে এখনো ভয় কর। অথচ তোমার নিজের মধ্যে প্রভূত শক্তি আছে— সাহিত্যের যে সিংহাসন তুমি নিজের জোরে দখল করে নিয়েছ তাতে তোমার সরিক কেউ নেই এবং সংশয়মাত্র নেই বিধাতা তোমাকে আধিপত্যের অধিকার দিয়েছেন—যে কেউ তোমাকে গাল দিক আর উপহাস করুক সে আপনাকেই উপহসিত করচে।

তোমার আষাঢ়ের সুর আমার আষাঢ়ের সঙ্গে মেলে নি সে ত ভালই— ওতে ত কারো কোনো লাভ লোকসান নেই। এইটুকু হলেই হল যে ওতে রসের কম্‌তি না হয়;— তা হয়ও নি; আমি ত পড়ে খুসিই হয়েছিলুম। তোমার ভারতের ঐক্য প্রবন্ধের মধ্যে খুব নূতনতা ও গভীরতা এবং সেই সঙ্গে রচনারস আছে। এই রকম জিনিষ যদি বরাবর চলে তবে সবুজপত্র চিরসবুজ হয়ে অমর হয়ে থাকবে।

ছন্দতত্ত্ব পাঠালুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক, কলকাতা

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ তুমি যে এটর্ণিটিকে আমাদের বিদ্যালয়ের দেহে যোজনা করেছ সেটাতে কি কোনো উপকারের প্রত্যাশা করা যায়? বিদ্যালয়ের রক্ত অল্প; এরকম এটর্ণির পেট ভরাবার মত রস তার নেই। আমার ক্রমেই এই বিশ্বাস হচ্চে মকদ্দমায় জয়লাভের চেয়ে এটর্ণির হাত থেকে মুক্তিলাভ ঢের বেশি লাভজনক। আমার ভিক্ষায় কাজ নেই এখন কুত্তাটা একটু সরলে বাঁচি। খগেন বেচারার ক্ষুধা অল্প, তার দরদ বেশি এবং তার তৎপরতা যেমনি হোক্ এ পক্ষের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এখন এই সঙ্কট থেকে মাঝে মাঝে উদ্ধারের কি কোনো উপায় আছে? আমি খগেনকে আমার তরফের আইন-সচিব নিযুক্ত করলে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারব— অন্তত রক্তপাত ঢের কম হবে। আমি তাকে মাসিক বেতন দিয়ে বিদ্যালয়ে এবং ব্যাঙ্কে আমার যে বিষয়-ব্যবস্থা আছে আমার তরফে তার পরিদর্শক ও কার্য্যকর্ত্তা নিযুক্ত যদি করি তবে আমার মত অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বোধ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিরাপদে থাক্‌তে পারে। যতদূর দেখা গেল সর্ব্বাধিকারীর অধিকার আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্ম্মূল্য অথচ তার ফলও অনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে আমাকে সৎপরামর্শ দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৮] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

·· তোমার লেখাটা কলকাতায় ফেলে এসেছি। আমার একটা চামড়ার Mss. বাক্স আছে রথী সেটা ঘাঁট্‌লে তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি কারমাইকেলের হাঙ্গাম চুকে গেলেই তার একটু ছোট ভূমিকা পাঠিয়ে দেব। আমি রাজ-অভ্যর্থনার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে আছি।

Sylvain Levi আমার ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেছে দেখেছ? রথীকে তার Extract পাঠিয়েছি— সে বোধ হয় তোমাকে দেখিয়ে থাক্‌বে। ওর মত পড়ে ও লেখাটা শেষ করে ফেলবার জন্যে আবার উৎসাহ হচ্চে। দেখি যদি সময় পাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৯] ওঁ পোস্টমার্ক

২৩ এপ্রিল. ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

কোনো ভদ্রলেখকের পক্ষে বারো মাসে বারোটা করে গল্প লেখা কি সম্ভব, না উচিত? এ'তে একরকম স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে তুমি চুরি করে ব্যবসা চালাও— কিন্তু ঐ বিদ্যাটা লেখকদের জোয়ান বয়সে কতকটা মানায়, শেষ বয়সে না। এ রকম নিয়ত রচনা করে যাওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ— ফুল ফোটার এবং ফল ধরার ঋতু আছে— প্রকৃতির সবুজপত্রে বারোমেসে লিপিকর ক'টা আছে? যাই হোক্, মণিলালের

সঙ্গে তক্‌রার করে পেরে উঠবনা। একটা গল্প লিখ্‌তে লাগব।

কালিঘাটের হরিদাস হালদারকে জান? লোকটি লিখতে পারে সন্দেহ নেই। আমাকে তাঁর রচিত "গোবর গণেশের গবেষণা" বলে একখানা বই পাঠিয়েচেন— আমার ত পড়ে ভাল লাগ্‌ল। মনে হল অনেকটা সবুজপত্রের কায়দার লেখা— অর্থাৎ খুব হাল্কা এবং উজ্জ্বল— লোকটার সাহসও আছে। তোমরা এঁকে যদি পাকড়া কর ত মন্দ হয় না।

তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুসি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে— অবশ্য, সম্পূর্ণ তোমার নিজের ধাঁচার একটা জিনিষ হবে— অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া মূর্ত্তি হবে— ঝক্‌ঝক্ করবে অথচ কঠিন হবে— কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিষ।

তোমার সেই কাঠের পুতুলটাতে একবার হাত দিলে কেমন হয়?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪০] ওঁ বোলপুর

পোস্টমার্ক, ১৮ অগস্ট, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

নলিনী সদরে কোনো আবেদনপত্র না পাঠিয়ে একেবারে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। তোমাদের সেরেস্তায় সেটা না পাঠিয়ে আর দুই একটা বাজে চিঠি ভুলক্রমে পাঠিয়েছিলুম।

অথচ এইজন্যে কালোয়া বিভাগ পত্তনের সময় পিছিয়ে যাচ্চে। জমিদারী বৎসরের প্রথম হতেই কাজ আরম্ভ হলে সুব্যবস্থা হয়। তাই আজই আমি শিলাইদহের ম্যানেজারকে এ সম্বন্ধে তাড়া দিয়েছি। তোমরাও কালোয়ায় নলিনীকে নিযুক্ত করবার অনুমতি তাকে পাঠিয়ে দিতে দেরি কোরো না। আমিও শীঘ্রই আর একবার শিলাইদা ও পতিসরে গিয়ে বিভাগের কাজকর্ম পরিদর্শন ও আলোচনা করবার সংকল্প করেচি। বিভাগটাকে সচল ও সফল করবার দিকে আমার একটু বিশেষ ঝোঁক আছে।

এখানে এসে গল্পটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাব ভেবেছিলুম— সে হলনা। এখানে এলেই কাজের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে যাই— লেখায় মন দিতে পারি নে। গল্পটাকে ওর অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্য্যন্ত যতক্ষণ না পৌঁছে দিতে পারি ততক্ষণ মনটা ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। সংসারে বাস্তবের অভাব নেই তার উপরে আবার এই সব অবাস্তবের বোঝা।

এবারকার সবুজপত্রে আমি ত টীকাটিপ্পনি আরম্ভ করিয়ে দিয়েচি। এবার থেকে ওটাকে বরাবর চালিয়ে নিয়ে যেয়ো।

আমি খুব সম্ভব কাল কলকাতায় যাব। ইতি বুধবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪১] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিগ্রাম ও বিরাহিমপুরে যাতে বিভাগের কাজে কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা না থাকে আমি সেইজন্যে বিশেষভাবে লেগেছি। এ পর্য্যন্ত যে সব অনিয়ম ও নিষ্ফলতা ঘটেচে সে কেবল যোগ্য লোকের অভাবে। আমি কিছুতেই আর সে রকম ঘট্‌তে দেব না। বর্ত্তমানে যে দুটো জায়গা কাঁচা আছে সে হচ্চে রাতোয়াল আর কুমারখালি। আমি এবার কালিগ্রামে প্রত্যেক বিভাগে ঘুরেচি—রাতোয়ালের ম্যানেজার নিতান্তই অযোগ্য— তার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ নেই সমস্ত কাজ জমানবিশ করে। ওখানে আমি ওর বদলে এখানকার জমার পেস্কার মুনীন্দ্রকে রাখ্‌তে চাই আর মুনীন্দ্রর জায়গায় শাস্ত্রীমশায়ের জামাই যোগেশ সরস্বতীকে রাখব। এতে কোনো পক্ষের কোনো আপত্তি নেই। শিলাইদহের ম্যানেজার অক্ষয়ও সরস্বতীর প্রতি খুব প্রসন্ন।

কুমারখালির অ… ও অচল। জমিদারীর কাজ সে ত বোঝেই না— সেইজন্যে ভালো জমানবিশ খোঁজ করচে— অর্থাৎ তাহলে ওখানকার কাজকর্ম যা-কিছু সব জমানবিশই চালাবে নিজে কেবল উপরে উপরে কর্ত্তৃত্ব করে বেড়াবে।

কুমারখালি অঞ্চলে যদি অমৃত রায়কে পাওয়া যায় তাহলে কোনো ভাবনাই থাক্‌বেনা। ওখানকার কাজ সবরকমে শক্ত অথচ ওখানকার লোকটি যোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে

যা কিছু ব্যবস্থা ছুটির পূর্ব্বেই করা কর্ত্তব্য যাতে ছুটির পর থেকেই পুরোদমে কাজ আরম্ভ হতে পারে।

ছুটির মুখেই রাতোয়ালের এবং কুমারখালির বর্ত্তমান ম্যানেজারদ্বয়কে যদি নোটিস্ দাও তাহলে ছুটির মাসটা ওরা কাজের চেষ্টা দেখ্‌তে পারে। সেই মাসে বেতন ছাড়াও ওরা পার্ব্বনি পাবে— যদি ইচ্ছা কর আরো একমাসের বেতন যোগ করে দিতে পার।

কালিগ্রামে সাধারণবৃত্তি বৎসরে এগারো হাজার টাকা ওঠে। এ পর্য্যন্ত এতবড় মোটা টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হচ্ছিল— বিভাগে এর যে রকম হিসাব রাখা চলছিল সে দেখে আমি ভারি বিরক্ত হয়ে এসেচি। তার আমি পাকা নিয়ম করে দিয়েছি। এই সাধারণ বৃত্তির অন্তর্গত সমস্ত কাজ ও হিসাব যাতে রীতিমত সদরে যায় তার বন্দোবস্ত করেচি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে সব বলব।

ভাদ্র কিস্তির "ঘরে বাইরে" রেজিস্ট্রি ডাকযোগে কাল মণিলালের কাছে পাঠিয়েচি। তুমি এবার কিছু লিখচ? আমি এ যাত্রায় এখানে এসে কিছুমাত্র ছুটি পাইনি— দিনরাত টোঁটোঁ এবং বক্‌বক্ করতে হয়েচে।

বোধ হয় শনিবার যখন সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় আস্‌বে মোলাকাৎ হবে।

এবছর দুই পরগণাতেই ফসল খুবই ভালো— কিন্তু শাস্ত্রে বলে, শস্যঞ্চ গৃহমাগতং। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পতিসরের একজাইনবিশ যোগেশ সরস্বতীকে শিলাইদহের জমার পেষ্কার করে পাঠাচ্চ, যোগেশের জায়গায় হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করার প্রস্তাব আমি করচি। জমিদারীর জমা ও সুমার বিভাগে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে। নূতন লোককে নিযুক্ত করার চেয়ে এর দ্বারা কাজ ভাল পাবে।

এখানে এসে অবধি এণ্ড্রুজের হাতে পড়েচি কাল সে চলে যাবে তার পরে একটু লেখবার ছুটি পাওয়া যাবে। দেখি যদি কিছু মাথায় আসে। তোমার সেই টীকাটিপ্পনি ছাড়া আর কিছু কি হয়নি? সবুজপত্রের দু মাসের মত পেট ভরাবার জোগাড় হয়েছে কি? ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৩] ওঁ পোস্টমার্ক

২৪ অক্টোবর, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

অশোকগুচ্ছ ঘেঁটে ঘেঁটে দুটো কবিতা তর্জ্জমার মত পাওয়া গেল। দ্বিজুরায়ের মন্দ্রের কবিতা ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার মত শক্তি আমার নেই। অর্থাৎ ওতে যে রকম ইংরেজির দরকার আমার বিদ্যেয় তা কুলবে না। একটা একটু সুরু করেছিলুম কিন্তু এমন ঠেকে গেল যে ঠেলে তুলতে

পারলুম না। তাই দ্বিজুরায়ের“আলেখ্য”থেকে একটা কবিতা তর্জ্জমা করলুম, আরো অন্তত একটা করতে পারলে খুসি হতুম কিন্তু শক্তি নেই। আর দু চারজন আধুনিক কবির কাব্য পাঠালে না কেন? অন্তত আমার উচিত হবে তাদের কিছু তর্জ্জমা করা— নইলে তারা পীড়া বোধ করবে। কাশ্মীর দেশটা শুনেছি খুব সুন্দর কিন্তু এখনো তার পরিচয় পাওয়া গেল না।

যুবতীর হাসি। (অশোকগুচ্ছ ২৭ পৃ:)

Methinks, my love, in the dim daybreak of life, before you came to this shore, you had stood by some river-source of impetuous dreams, filling your blood with its liquid notes.

Or, perhaps, your path was through the shade of the garden of the gods, where the merry multitude of jasmines, lilies and white oleanders fell in your arms in heaps and entering your heart became boisterous.

Your laughter is a song whose words are drowned in the tune, an odour of flowers unseen.

It is like moonlight rushing through your lips' window when the midnight moon is high up in your heart.

I ask for no reason, I forget the cause, I only

know that your laughter is the tumult of insurgent life.

My offence (সোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান— অশোকগুচ্ছ ৭০ পৃ:)

When you smilingly held up to me, my sweet, your child of six months, and I said, "keep him in your arms," why did a sudden cloud pass over your face, a cloud of pent-up rain and hidden lightning?

Was my offence so great?

When the rose-bud, nestling in its branch, smiles to the bent face of the morning, is there any cause for anger if I refuse to steal it from its Cradle of leaves?

Or when the cuckoo fills the heart of the happy hours of the spring with love dreams, am I to blame if I cannot conspire to imprison it in a cage?

Dwijendralall Roy (নূতন মাতা, আলেখ্য ১১ পৃ)

"Come, moon, come down, kiss my darling in the forehead," cries the mother as she holds her baby girl in her lap while the autumn moon floats in the pale blue of the evening sky.

From the garden comes stealing in the dark the vague perfume of flowers into the room.

The boys laugh and shout in the street in loud merriment.

In the mango grove near by one solitary *papia* sings his heart out in an untiring tune, and from some distant peasant's hut come the shrill notes of a flute, soaring in the starry sky, spreading in the still air and then bursting down upon the earth like a shower of firework, while the young mother, sitting in the balcony, baby in her lap, croons sweetly, "Come, moon, come down, kiss my darling in the forehead."

Once she looks up at the moon in the sky and then down at the sweet loveliness in her arms, and I wonder that the moon could be deaf to her call and smile on in placid silence.

The baby laughs and repeats her mother's call, "Come, moon, come down."

The mother smiles and smiles the moon-lit night, and I, the poet, the husband of the baby's mother, saw this picture from behind unseen.

দ্বিজুরায়ের কবিতা তুমি নিজে তর্জ্জমা করবার চেষ্টা কোরো— তোমার কলমে হয়ত আস্‌তে পারে। এখানে চিঠির জবাব দিয়ো না— শীঘ্রই বেরতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৪]　　ওঁ　　কলিকাতা

পোস্টমার্ক, ৭ নভেম্বর, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

ফিরে এসেচি। কাশ্মীরে খুব যে আরামে ছিলুম তা নয়। একেবারে পেট ভরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি। এক লাইন লিখ্‌তে পারিনি, অথচ আজ হল ২০ কার্ত্তিক। দুই এক দিনের মধ্যেই শিলাইদহে যাবার ইচ্ছা আছে— নইলে লেখাও হবেনা, শ্রান্তিও শরীর মনে জড়িয়ে থাক্‌বে।

তোমাকে গোটাকয়েক ইংরেজি তর্জ্জমা পাঠিয়েচি। তোমার কাজে লাগ্‌বে কি না জানিনে। আমার নিজের লেখার manuscripts যা তোমার কাছে আছে তার উপরে চোখ বুলিয়ে আমাকে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো (কলকাতার ঠিকানায়)। যদি আর কোনো কবির কোন কবিতা তর্জ্জমা করাতে চাও তাহলে ফর্‌মাস কোরো। আমার যেটুকু পুঁজি তার দ্বারা সকল রকমের তর্জ্জমা আমার হাতে আসে না। যেগুলো Lyrical সেইগুলোই কতকটা পারি— কিন্তু জিনিষটা যথার্থ ভালো হলেই তর্জ্জমাও ভালো হয় সে কথা বলা বাহুল্য— নইলে অনেক মস্‌লা মেশাতে হয়। তুমি নিজে কতকগুলো তর্জ্জমা করবার চেষ্টা করে দেখো।

কার্ত্তিকের সবুজপত্র কি বেরবে? সম্পাদক পলাতক, প্রকাশক গরহাজির, যে দুটিমাত্র লেখক নিয়ে তার কারবার তার মধ্যে একটি লেখকের অবস্থা আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি, তার থলি শূন্য, তার মগজও প্রায় তথৈবচ,— অন্য

লেখকটির সম্বন্ধে আমার যতটা জানা আছে তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই বসে আছেন। এক্ষণে উপায়? আমার মুস্কিল, আমি এক গল্প কেঁদে বসে আছি, তাকে খামকা মাঝখানে ফেলে দিয়ে দৌড় মারবার জো নেই। ওর অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্য্যন্ত খাট বইতে হবে।

তোমার ইংরেজি লেখাটা কতদূর? শুন্‌চি এবার তোমাদের রাঁচি সরগরম, অনেক অতিথি অভ্যাগতের ভিড় হয়েচে। তাই আমার আশঙ্কা হচ্চে তোমার রসনা যত চল্‌চে তোমার কলম সে পরিমাণে চল্‌চেনা। কবে তোমরা ফিরচ? বিবির শরীর ভালো আছে ত?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৫] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, কুষ্টিয়ার মোক্তার শৈলেন্দ্র মারা গেছে। অম্বাচরণের ভাই অঘোর সেই পদের প্রার্থী। তার সম্বন্ধে তোমাকে এক লাইন লিখে দেবার জন্যে অম্বাচরণ আমাকে ধরেছে। আমার এই লেখা কেবলমাত্র লেখা— আমি জানিনে সে মানুষ কি রকম, জানিনে তোমাদের প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু লিখ্‌বনা বলার চেয়ে লেখা সহজ— কম সময় লাগে এবং মানুষ খুসি হয়।

কাল হঠাৎ এণ্ড্রুজ এসে উপস্থিত— আজ তাকে বিদায় করেছি কিন্তু সে আমার সমস্ত সূত্র ছিন্ন করে দিয়েছে। তার

উপরে ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, তাকে বিদায় করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার রচনা বিকশিত হবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আলোর অপেক্ষা রাখে। আমি আমার আকাশের মিতা সূর্য্যদেবের সহযোগেই লিখে থাকি— আমার সেই দোহার্কির অভাব ঘটাতে আসর জম্‌চে না— অপেক্ষা করচি এই মেঘটা কখন কেটে যায়। কিন্তু শীতের মেঘ জমতেও দেরি করে আর বিদায় নিতেও দেরি করে।

আমাদের মাসহারার পরিমাণটা ১২০০ টাকায় এসে ঠেকেছে— ঠিক যেন সমে এসে পৌঁছয় নি। ওটাকে ১৫০০ করে দিলে শুন্‌তেও ভাল হয় তা ছাড়া অন্য সুবিধাও আছে। ধার করে শেষকালে সেটা জমাখরচ করবার উৎপাত করার চেয়ে বেশ সরল অন্তঃকরণে মাসহারা বাড়িয়ে নিলে কাজ সহজ হয় মনটাও সুস্থির থাকে। অবশ্য ১৫০০ অঙ্কটা যদি পছন্দসই না হয় ওটাকে ২০০০ করলে কারো কোনো আপত্তির কারণ থাকে না। ভেবে দেখো।

আমার এটর্ণি যে বিলম্বের ফাঁদ পেতে খরচার অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে তার থেকে উদ্ধারের উপায় কি ?…শরীরটা এখানে অনেকটা ভালো হয়েছে। দেবতা প্রসন্ন হলে গল্প অন্তত একটা লিখে নিয়ে যাব— কিন্তু রোদ্দুর চাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৬] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলুম বলে পতিসরে না গিয়ে শিলাইদহে এসে পড়েচি। কয়েকদিন জিরিয়ে নিয়ে পতিসরে যাওয়া যাবে।

এখানে চুঁয়োপাড়ার প্রজারা বিষম কান্নাকাটি করচে। দূরে থাক্‌লে প্রজাদের দুঃখ আমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না— যেটা পৌঁছয় সে হচ্চে খাজনা। দূরে থাকার অন্যায় হচ্চে এই। যাই হোক ১৪৫ ধারায় এদের চাষের জমি, এদের ফসল প্রভৃতি আবদ্ধ হয়ে এরা যে কষ্টে পড়েচে তার কি উপায় হতে পারে ভেবে দেখো। অ···র মুস্কিল এই যে, সে লোক খাঁটি কিন্তু ডেপুটি প্রভৃতির সঙ্গে কিছুমাত্র সামাজিকতা করতে পারেনা— এইজন্যে যে চাকা অল্প একটু তেল পেলেই বেশ সহজে সরত সে ভয়ঙ্কর ক্যাঁচকোঁচ করে। চুঁয়োপাড়ার প্রজাদের নিয়ে আমার মনটা বড়ই ক্লিষ্ট হয়ে আছে। ডেপুটির এজলাসে যদি কোনো ভাল উকিল কৌসুলি পাঠিয়ে ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে চেষ্টা দেখা উচিত। তুমি ত সরস্বতী পূজোয় আস্‌চই সেই সময়ে এইসব ব্যাপার যথাসম্ভব যদি নিষ্পত্তি করে যেতে পার ত ভাল হয়।

আমি ক্লান্তদেহে কেবলি ঘুমোচ্চি। তুমি কখন আসবে শীঘ্র খবর দিয়ো। সব চেয়ে সুবিধের যাত্রা হচ্চে রাত্রের গাড়িতে এসে ষ্টীমারে করে পাবনায় যাওয়া— সেখান থেকে

মোটর বোটে সকালেই শিলাইদহে এসে পৌছন যায়। কুষ্টিয়ার সামনে নদী প্রায় শুকিয়ে গিয়ে পাল্কী যাতায়াত বড় অসুবিধের হয়েচে— দেরিও কম হয় না— আর এসে পৌছতে বেলা হয়ে গরম হয়ে ওঠে। শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৭] ওঁ পোস্টমার্ক, পতিসর

ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্রেই তোমার গল্পটি এক সংখ্যাতেই কেন বের হবেনা? আমার "ঘরে বাইরে" ফাল্গুনেই শেষ করে দিয়েছি। গত বছর চৈত্রে যেমন ফাল্গুনী বের হয়েছিল এবারে তেমনি কেবলমাত্র তোমার গল্প বের হোক্। আমার প্রস্তাব হচ্চে এই :— ফাল্গুনের সবুজপত্র বের করতে আর বেশি দেরি কোরোনা— তারপর চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই তোমার গল্পটি বেরিয়ে যাক্। তাহলে বেশি দেরি হবেনা। এ মাসের সবুজপত্রের কপি কি সব তৈরি হয়নি? ঘরে বাইরে ত দিয়েছি— সেটা ফর্ম্মা চারেক হবে। তোমারও কিছু কিছু লেখা নিশ্চয় আছে— যদি প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর কিছু থাকে দিয়ে দিয়ো। তারপরেই তোমার গল্পটি ছাপা হতে থাক্। তাহলে ১লা চৈত্রেই বেরতে পারবে।

বিবিকে বোলো এবারে আমার শরীর অত্যন্ত বেশি অবসন্ন ছিল। অন্যান্য বারে যেমন শিলাইদহে আসবামাত্র

আমার লেখার বাঁধ আপনি ভেঙে যায় এবারে তা হয়নি। অনেক ধীরে ধীরে কোনোমতে ঘরে বাইরে লিখে তার পরে জড়তার ভারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে আছি। এবার আমার সাহিত্যের শাখায় ভালো করে বসন্তের মুকুল ধরল না। ফিরে গিয়ে বোলপুরে বসে নিশ্চয় তার সঙ্গীতের বক্তৃতা লিখ্‌ব— সেজন্যে সে কিছুমাত্র যেন উদ্বিগ্ন না হয়। এখনি বোলপুরেই ফিরতুম কিন্তু পতিসরের সেই পল্লীসংস্কারের কাজটা আমাকে ভূতের মত পেয়ে বসেচে অন্তত তাকে একটা পিণ্ডি না দিয়ে ফিরতে পারচিনে। পিয়ার্সন সাহেব আমার সঙ্গে এসে জুটেচেন নইলে আরো শীঘ্র কাজ সারতে পারতুম। খুব সম্ভব আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই কলকাতায় গিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে তোমার গল্পটি মেজে ঘষে বাগিয়ে রেখে দিয়ো। তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা— এখন থেকে তোমার এই এক বন্ধু হবার পথে চল্‌ল। কিন্তু তুমি সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্চ কেন? ওটা আচম্‌কা বের করতে পারলেই ভালো হত। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৮]   ওঁ   পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

মার্চ, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করচি সাহিত্য-সতরঞ্চের বোড়ের দল তোমার কিস্তি মাৎ করবার জন্য ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেচে। আমাদের দেশের মুস্কিল ঐ। যার যা ক্ষমতা আছে সেটাকে আমরা অভ্যর্থনা করে নিতে জানিনে— যেখানেই শক্তির প্রকাশ দেখি সেখানেই শক্তিশেল হানবার জন্যে আমাদের হাত নিস্‌পিস্‌ করে। এই বিরুদ্ধতায় বিশেষ ক্ষতি হত না যদি অনুকূলতাও সমাজের মধ্যে থাক্‌ত। সেটা কোথাও নেই— লেখককে নিতান্তই নিজের তাগিদে কিম্বা সম্পাদকের তাড়ায় লিখ্‌তে হয়— অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়— তার উপরে মোষের গুঁতোটা উপরি-পাওনা।

এখন মনে হচ্চে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হত। তোমার শেষ গল্পটা সব চেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টান্‌ত— তার পরে অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দুটি নায়িকাই ফাঁকি— একটি পাগল, আর একটি চোর। কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে একটা স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গেই ত তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়— এইজন্যে তারা চটে

ওঠে। তাদের পেট ভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত। তুমি করালে কি না "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং"— কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়— বস্তুত, ঘ্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস। মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে এ কথা বল্‌তে পারেনা যে, ঠকেচি বটে কিন্তু চমৎকার!

ছাত্রশাসনটা ইংরেজি করা হয়েচে— Modern Reviewতে যাবে। Lord Carmichaelকে পাঠিয়েছিলুম— তাতে কিছু ফল হয়েচে বলে খবর পেয়েচি। কিন্তু শুনচি আ··· বিশেষ কারণে বিরুদ্ধপক্ষ নিয়েচেন— তা যদি সত্য হয় তাহলে শিশুপালবধ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবেনা— দ্বাপরযুগে কৃষ্ণভক্তিতে সেটা ঘটেছিল কলিযুগে ঘট্‌বে গোরার ভক্তিতে। দুঃখ করে কি করব? মরে তারাই যাদের মরণদশা। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

তোমার যে সব প্রবন্ধ ছাপতে চাও একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাবে।— প্রশ্নপত্রের বাংলা নমুনার টুক্‌রোটি কার আমি তাই ভাবছিলুম। অনেক চিন্তা করে শেষকালে ভাবলুম হয়ত বা "ছিন্নপত্রের" কোনো চিঠির মধ্যে ঐ কটা লাইন লিখেও বা থাকৃব। এত লিখেচি যে নিজের লেখার হিসেব রাখা শক্ত হয়ে উঠেচে।

মানসীতে তোমার লেখার বিরুদ্ধে যদি কিছু বেরিয়ে থাকে তার কারণ বোধ হয় তোমার ভাষাটার সঙ্গে নাটোরের ঝগড়া মিট্‌চে না। বৈশাখের মানসীতে কিছু লেখা দেবার জন্যে প্রভাতকুমার আমাকে বিষম পীড়াপীড়ি লাগিয়েচে।

তুমি বৈশাখে একটা কিছু শীতলভোগ দিলে হয়ত যুগল সম্পাদক প্রসন্ন হতে পারেন। পূর্ব্বে যখন ভোগ জোগাতে তখন ত তোমার দিন ভালই চলছিল!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[৪৯] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১২ এপ্রিল, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র মৈত্র কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভাস মিত্রের জন্যে আমার কাছ থেকে ভোটের প্রতিশ্রুতি আদায় করেচেন— অন্য কোনো candidateএর কথা আমি জানতুম না প্রভাস বাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলে আমি কোনো দ্বিধা করিনি। অতএব এবারকার মত আমার ভোট বাক্‌দত্ত।

আমি সমুদ্রপারের আয়োজন করচি। কিছুদিন থেকে মনটা একদিকে ক্লান্ত অন্যদিকে চঞ্চল— বোধ হয় একবার পারাপার করে এলে আবার কিছুকাল স্থির হয়ে বসতে পারব।

ইতিমধ্যে সবুজপত্রটাকে তোমরা তাজা রেখে দাও। যত পার নতুন লেখক টেনে নাও— লিখতে লিখতে তারা তৈরি হয়ে নেবে। কাগজের আদর্শের সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে। দেশে যে আসবাব আছে তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করলে বৈরাগী হওয়া ছাড়া গতি নেই—

এই নিয়েই যথাসম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করে ঘর করতে হবে— সাময়িক সাহিত্য অত্যন্ত বেশি যদি খুঁৎখুতে হয় তাহলে তাকে বিলেতের old maidএর মত যৌবন ব্যর্থ করে নিঃসন্তান শুকিয়ে মরতে হবে। চির সাময়িক সাহিত্যই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যাচাই ও বাছাই করে— সাময়িক সাহিত্যের আমদরবার; খাষ দরবার নয়। এই ত আমার বিশ্বাস।

২রা বৈশাখ যাচ্চি— মোকাবিলায় পরামর্শ হবে। এখন উড়ুক্ষু অবস্থায় আছি এই জন্যে মনের গ্রন্থি ঢিলে হয়ে গেছে কিছুতে আঁটতে পারচিনে।

বিবিকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ৩০ চৈত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[৫০] ॐ

কল্যাণীয়েষু

কাল harbour master-এর [হাত] দিয়ে একটুখানি লেখা পাঠিয়েছি— আজ পাইলটের হাত দিয়ে বাকিটুকু পাঠাচ্চি। এই দুটোয় মিলে তোমার বৈশাখের খোরাক চলে যাবে। রেঙ্গুনে গিয়ে পরের মাসের কিস্তি পাঠাতে পারব।

আমার এ লেখা ধারাবাহিক চিঠিও না প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসচে লিখে যাচ্চি একবার revise করবারও চেষ্টা করিনি। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন

কতখানি পড়বে বল্‌তে পারিনে— কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মত হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে।

এখনো মা গঙ্গার আঁচল ছাড়াতে পারিনি। আজ নদীর মোহানার কাছে Sandheadএ গিয়ে নোঙর করে রাত্রিযাপন করব।

আজ সন্ধ্যার দিকে একটা ঝড় পাওয়া যাবে বলে কাপ্তেন আশঙ্কা করচেন। সমুদ্রের রঙ্গভূমিতে ঝড়ের প্রবেশ, এবং রুদ্রতালে তাণ্ডবনৃত্য— এতে সন্ধ্যার আসরটা বোধ হয় জম্‌বে ভাল। দর্শকদের সুদ্ধ এই রঙ্গের মধ্যে না টান্‌লেই আমাদের নালিশ থাকবে না।

এ চিঠি যখন পাবে তখন অকূলে ভাসচি— তার পূর্ব্বে তোমাদের সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করি। বিবিকে বোলো যদি সুবিধা পায় এবং অবকাশ থাকে তাহলে আমার গানের ইংরেজি notation কিছু-কিছু যেন পাঠায়। দিনু এখন কলকাতায় আছে তার কাছে ওর গান শেখবার সুবিধা হবে। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫১] ওঁ পোস্টমার্ক, য়োকোহামা

২০ জুলাই, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এখানে এসে অবধি লেখবার সময় পাইনি। প্রথমত এখানকার জন্যে গোটা তিনেক লেকচার লিখ্‌তে হয়েচে— তার পরে আমেরিকার জন্যে লেকচার লিখতে বসেচি। আসচে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমেরিকার লেকচার সুরু হবে তার আগে যতগুলো পারি লিখে ফেলতে হবে। পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়েচি এখন পূবের দিকে মন দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হয়েচে। আমার উদয়কাল আমি পূবকে দিয়েচি, আমার অস্তকালটা পশ্চিমকে দেওয়া যাক্‌। জাপানে একরকম আসর জমেচে মন্দ নয়। এদের সঙ্গে ব্যবহারে মনে একটা খুব আনন্দ হয় যে এরা অন্তরের সঙ্গে আমার কাছে আসে। এদের সত্যি দরকার আছে বলে এরা চায় সেইজন্যে আমার যা কিছু সত্যি আছে সেটা এদের সামনে এনে দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। য়ুরোপেও তাই। আইডিয়া তাদের জীবনের খোরাক। তারা গভীর প্রয়োজন থেকে আইডিয়াকে চায় এইজন্যে গভীর উৎস থেকে আইডিয়া তাদের জন্যে উৎসারিত হয়। আমাদের অজীর্ণের দেশ, আইডিয়ার ক্ষুধা নেই— এইজন্যেই আইডিয়াকে খাদ্যরূপে চাইনে, চাট্‌নিরূপে চাই। কিন্তু চাট্‌নির ব্যবসা আর ভাল লাগে না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৩ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, অর্জ্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুলতে পারেনি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আস্‌বে না, মনে করচ? মাঝে মাঝে নোটিস্ পাই, বুঝতে পারি মানে মানে আসর ছেড়ে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। কিছুদিন থেকে আমার কানের মধ্যে কি একটা উৎপাত হয়েচে তাতে যে কেবল শোনা কমেচে তা নয় মগজের মধ্যে জড়তা এসেচে— কিছুতে লিখ্‌তে পড়তে গা লাগ্‌চে না। এই ত গেল প্রথম দফা। দ্বিতীয় হচ্চে এই যে, এতদিন যখন কলম সতেজ ছিল তখন অন্য সকল কাজ অবহেলা করে তার পিছনেই দিন কাটিয়েচি। এখন কলমের চঞ্চলতা আপনিই কমে গেছে বলে বিদ্যালয়ের কাজে সমস্ত মন ঝুঁকেচে। আমি যে-বয়সে এসে পৌঁচেছি, সে-বয়সের ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা আছে। এই মরুভূমির মাঝখানে স্থাণু হয়ে বসে থাকা, না সুখকর, না স্বাস্থ্যকর। তবু যতদিন লেখার আবেগ প্রবল ছিল ততদিন নিজের রচনালোকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যেত। এখন বুঝতে পারচি সেই লেখার উপর নিয়ত ভর করবার মত জোর তার নেই। তাই, নিতান্ত পথে বেরিয়ে না-পড়ে' আমার জীবনের একটা-কোনো আশ্রয় পাকা করে নিতে হবে। আমি ছেলেগুলোকে সত্যিই ভালোবাসি অথচ তাদের সঙ্গে আসক্তি

বা স্বার্থের যোগ নেই বলে মন মুক্ত থাকে— এইজন্যে ওদের সেবায় যদি পুরোপুরি লাগি তাহলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সের জীর্ণতার সমস্ত ফাঁকগুলো ভরে যাবে অথচ ছাড়াও থাক্‌ব। সব-শেষ দফার কথাটা কাউকে বলবার কথা নয়। মোটামুটি সে হচ্চে এই যে, জীবনটাকে ত ত্যাগ করতেই হবে— এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেনা। সেই ত্যাগটা যাতে নিছক লোকসান না হয় সে দিকে ভিতর থেকে বার বার তাগিদ আসে। তাই এখন পাঁচ কাজে আর মন লাগেনা। নিন্দা প্রশংসার উত্তেজনা এড়িয়ে চল্‌তে পারলে তবেই লক্ষ্যটা স্থির থাকে— নইলে মাতালের মত পা টলে টলে যায়। এই সব কারণেই, যে-জীবনটা এতদিন বহন করে এসেচি সেটাকে আর খাতির করতে পারিনে— তার বোঝা এইবার নামাব। তার মজুরি যা জুটেছে তা আমার যথেষ্ট হয়েচে, এখন সেইটেকে ট্যাঁকে নিয়ে অন্য কারবারে নাববার ইচ্ছা। তোমার কাছে সমস্তটা খোলসা করেই বল্লুম।

এ কথা বলা আমার তাৎপর্য্য নয় যে, লেখা আমি একেবারে ছেড়ে দেব। বল্লেও সেটা বাজে কথা হবে— কেননা কম্‌লি নেই ছোড়্‌তি হ্যায়। ওটা ম্যালেরিয়ার বিষ, কোনো নোটিস্ না দিয়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপন ধরাবে। কিন্তু সেটা তার নিজের অসাময়িক উত্তেজনায়, সাময়িক পত্রের বাঁধা মৌতাতের উত্তেজনায় নয়। এটুকু বলে রাখতে পারি — লেখবার কথাটা মনে রেখে দিলুম— এবং যখন লিখব তখন তোমাদের পেয়াদা পাঠাতে হবেনা। সুতরাং আমার

তরফ থেকে তোমাদের যেটা জুটবে সেটা উপ্‌রি-পাওনা। বাঁধাবরাদ্দর জন্যে অন্য পাকা বন্দোবস্ত রাখ্‌তেই হবে।

আমার মন অনেকদিন থেকেই ছুটির দরখাস্ত করচে—কিন্তু আপিসের কর্ত্তাদের কাছ থেকে কোনোমতেই ছুটি মঞ্জুর হচ্ছিল না। তাই এবার বিনা মঞ্জুরিতেই ছুটি নিয়ে দৌড় মারবার উদ্যোগ হচ্চে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জেরটাকে Gordian-গ্রন্থির মতই ছেদন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এইবার নতুন লেখকদের খুব কষে নাড়া দাও। আমরা যে এতদিন সাহিত্যের দরবার করে এসেচি সে ত নেহাৎ সৌখীন চালে করি নি। যখন তম্বুরা ধরবার হুকুম পেয়েছি তখন ভৈঁরো থেকে সুরু করে মালকোষে এসে শেষ করেচি। আবার যখন ঢালসড়কির পালা তখন নিজের বা অন্যের মাথার পরে দরদ রাখি নি। গালমন্দর তুফান বেয়ে পাড়ি লাগিয়েচি, হাল ছাড়িনি। দিন রাত যে মাথার পরে কোথা দিয়ে গেচে খবর রাখিনি। যাঁরা নবীন সাহিত্যিক তাঁরা একথা মনে রাখবেন। সাহিত্যের পেয়ালা একেবারে চুমুক মেরে উজাড় করতে হয় এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনো ফল হয় না। যাঁরা লাগবেন তাঁদের পুরোপুরি লাগ্‌তে হবে।

বিবিকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ক্লান্ত হয়ে আছি— আজ এইপর্য্যন্ত। ইতি ৩১ চৈত্র ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৯ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, গড়িয়ে গড়িয়ে দিন যাচ্চে, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। কানের দিক দিয়ে মগজের উপর একটা পর্দ্দা পড়ে আস্‌চে। এর আয়োজন কিছুকাল থেকেই চল্‌চে। তাই মনটা ভারি একলা হয়ে পড়েচে। শুধু কেবল লেখাতে এখন ফাঁক ভরবে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয় আমার সঙ্গী। ওখানে মানুষের সংসর্গ পাই, হৃদয়ের অন্ন জোটে— অথচ ঝগড়াঝাঁটি নেই। তাই আর সমস্ত ছেড়ে এই শিশু নরনারায়ণের মন্দিরে সেবায়েৎগিরির কাজেই লাগব মনে করচি। ঐ মন্দিরের পথটা নিষ্কণ্টক। আমাদের দেশে সাহিত্যব্যাপারটা এত বেশি মানবসঙ্গবর্জ্জিত, এত বেশি সৌখীন যে, ওতে হৃদয়টা উপবাসী থেকে যায়। অথচ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার গুঁতোগুলো ষোলো আনা খেতে হয়। সাহিত্য থেকে আমাদের দেশের সমাজ বহুদূরে। আমি স্বভাবতই নিছক বুদ্ধিব্যবসায়ী নই— এইজন্যে, যে তাস একলা বসে খেল্‌তে হয় সে তাস খেলায় আমার দিন আর কাটে না।

বিদ্যালয়ের ছুটি হবে ২৬শে বৈশাখে— তারপরে একবার কানের তদ্বির করা যাবে।

সেই যে বাংলা Home Library পর্য্যায়ের বই লেখাবার প্রস্তাব করেছিলে— সেটা ভুলোনা। ভারি দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৪]　　ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালে ভেবে দেখলুম সুখের চেয়ে যেমন সোয়াস্তি ভাল স্বাস্থ্যের চেয়ে শান্তি তেমনি। আমার পক্ষে ঠাণ্ডা হাওয়ার তত দরকার নেই যেমন দরকার বোলপুরের রিক্ত মাঠ, মুক্ত আকাশ এবং প্রখর আলো। যদি সেখানে কোনো উৎপাত এসে জোটে তাহলে গিরিরাজের বক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেব। আপাতত অন্তত কিছুদিন বোলপুরে চুপচাপ করে পড়ে থাকি। অতএব চল্লুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৫]　　ওঁ　　শান্তিনিকেতন

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

কল্যাণীয়েষু

চল্‌তি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেচি। এটা কি পড়া যায় কিম্বা বোঝা যায় কিম্বা ছাপানো যেতে পারে? নামরূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো। শেষকালে তিনধরিয়ায় যাত্রাটা বোধ হচ্চে কপালে আছে, এখানে কিছু কিছু বিঘ্ন আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে
দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো

যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝর্‌না স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার-ধারা
চল্‌চে বয়ে চতুর্দ্দিকে। কালের যোগে নয় ত মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাত্তির সাতনলী হার, নয় সে নিশাসবায়ু।
নানান্ প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর করে' পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দরসে পূরে :
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্ত্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই ত
যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্করেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাক্‌তে
দিনের আলো,—
বলে' নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো,
এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া
এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথরাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের
আশায়।"

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে—কিন্তু এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্য্যন্ত উঠেছে। ফার্ষ্ট ক্লাসের এক বেঞ্চিতে ছ জনের বেশি বসবার হুকুম নেই—কিন্তু থার্ড ক্লাসে ঠেসাঠেসি ভিড়— এ সেই রকম। কিন্তু যদি এটা ছাপাও তাহলে লাইন ভেঙোনা, তাহলে ছন্দ পড়া কঠিন হবে। স্মল পাইকায় মার্জ্জিন কম দিয়ে ছাপলে পঁচিশ অক্ষর ধরতে পারবে। ইতি

[৫৬] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ক'দিন ব্যামোয় এবং বিষম গোলমালে কেটে গেছে। আজ বক্তৃতা। এমনি জড়িয়ে পড়েচি যে ফাঁক পাচ্ছিনে। রথীরা বড় একটা বাড়িতে যাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয় একবার এসো। এখানে তোমাদের শরীরও ভালো থাক্‌বে। বিবিকে বোলো আমার তহবিল থেকে দিনুর কাপড়ের দামটা যেন শুধে দেয়। কিন্তু তোমাদের আসা চাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৭] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখানে একলা ছাতের উপর চুপ করে বসে থেকে আমার মনটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু দেখলুম শরীরের অবসাদ কিছুতেই ঘুচচে না। সেটা যেন সিন্ধ্‌বাদের বুড়ো মানুষটার মত ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে— যত দিন যাচ্চে ততই ভার যেন আরো বাড়চে। তাই ভাবচি একবার তিনধরিয়াটা পরখ করে দেখি। আমার এখানে আসবার একটা প্রধান কারণ ছিল দিনু।... যদি পাহাড়ে যাই ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। তোমরা যদি তিনধরিয়ায় যাও তাহলে আমার কোনো ভাবনাই থাকেনা। কবে যেতে পারবে আমাকে জানালেই আমি চলে যাব। একটা গাড়ি সেই বুঝে রিজার্ভ কোরো। শরীরটাকে বদল করতে পারলে ভাল হত মেরামৎ করে আর চল্‌চে না। তাকে একটু নাড়া দিতে গেলেই আজকাল এত বেশি গ্যাঁগোঁ করচে যে আমার নিজেরই রাগ হয়। বেচারার বেশি দোষ নেই— পঞ্চাশ বছরে ওকে সত্তর বছরের ওজনে খাটিয়ে নিয়েচি— যাকে বলে overtime খাটুনি— কিন্তু তার মজুরী কি পেলুম তাই ভাবি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি তোমাদের গুরুজন সে কথা মনে রেখো— অতএব যদি তিনধরিয়ায় তোমরা থাক তবে বাড়ির কর্ত্তা কে হবে সে কথা ভুল্লে চল্‌বে না। কিন্তু একটা বাবুর্চ্চি তোমরা নিয়ো, আমার উপর রসদের ভার রইল।

[৫৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৭ অগস্ট, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

গানের লেকচারটা লেখা হয়েচে। Exercise bookএর ২৭ পাতা ভরল। সেটাকে ফর্ম্মায় ঢাললে তার পরিমাণ কি দাঁড়ায় জানিনে। কিন্তু গজবহরে এ সব জিনিসের মাপ হয় না অতএব গুরুত্ব কত তা শুনলে বুঝতে পারবে। দুই তিন দিনের মধ্যেই যাব। শ্রাবণের সবুজপত্র কি বেরয় নি? ও ঋতুটা ত সবুজপত্রের পক্ষে অনুকূল বলেই জানি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৯] ওঁ শান্তিনিকেতন

বোলপুর

পোস্টমার্ক, ২৩ অক্টোবর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে একখানি ফরাসী বই পাঠাচ্চি। এখানি একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন—বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। কিন্তু এই কর্ত্তব্যটি পালন করা কেন আমার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই। সবুজপত্রে মাঝে মাঝে কাজের কথার আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি— বিশেষত যে সব কাজের মধ্যে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টার হাত আছে।

অর্থাৎ সবুজপত্রে কেবল ফুলের সূচনামাত্র করেনা তাতে ফলেরও আয়োজন আছে এইটে না প্রকাশ হলে জিনিসটা একটু সৌখীন হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষাতত্ত্বটাকে নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। সেই ভাববার প্রধান বাধা এই যে, আমরা পৃথিবীতে মনন ব্যাপারে যে solitary cellএর মধ্যে বন্দী আছি তার মধ্যে বসে আমাদের মনে হয় কেউ বুঝি কোথাও পুরোনো জিনিসকে নতুন করে ভাবচে না। সেইজন্যে আমাদের ভাবতেই ভয় হয়। নিজের দেশের শাস্ত্র সৃষ্টির গোড়াতেই একেবারে চতুর্ম্মুখের মগজে চিন্তিত হয়ে তাঁর মুখ থেকে সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে বেরিয়েচে বলে ঠিক করে বসে আছি— পরের দেশের শাস্ত্রকেও আমরা অচল ঠাটে বাঁধা অবস্থায় ধ্যান করি— ওটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেচে। ওটা আমাদের মজ্জাগত মনের কুঁড়েমি। কিন্তু কুঁড়ে লোকের প্রধান শিক্ষা হচ্চে তাকে জানানো যে, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই কুঁড়ে নয়— মানুষের মন ছয় দিন সৃষ্টি করে' সাতদিনের দিন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বল্‌চে না যে, তোফা হয়েচে— সৃষ্টির মধ্যে আরো-ভালোর ডাক কোনোদিন থামেনি এবং কোনোদিন থামবেনা! সবুজপত্রের সবুজত্বই এই নিয়ে। যে ডাকঘর দিয়ে এই পত্র আস্‌চে সেই ডাকঘরে তুলট কাগজ চলেনা— সেখানে হল্‌দের আমেজ দেখা দিলেই তাকে খসিয়ে দিয়ে সবুজ আপনার জয়পতাকা ওড়ায়। তাই সবুজের প্রেমিক আমার আবেদন এই যে, কাজের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যেখানে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টা দেখা দিয়েচে সেইখানকার বার্ত্তা

তোমার পত্র বহন করে প্রচার করুক। তার সবগুলোই যে আমরা গ্রাহ্য করে নেব তা নয়, কিন্তু নিতান্তপক্ষে তার ধাক্কাটা আমাদের জাগরণের পক্ষে দরকার হয়েচে। আমাদের দেশের ইস্কুলমাষ্টার আমাদের শিখিয়েচে যে মনের ধর্ম্ম মুখস্থ করা— আমাদের এমন দৃষ্টান্ত জরুর চাই যার থেকে বুঝতে পারি মনের ধর্ম্ম ভাবা। তাই বেলজিয়মে যে নূতন ইস্কুল হয়েচে তার খবর সবুজপত্র থেকে দাবী করচি। তুমি সম্প্রতি নানা লেখা, কিম্বা সম্ভবত না-লেখা, নিয়ে ব্যস্ত আছ—অতএব আমার পরামর্শ বিবিকে এই কাজের ভার দেও। মস্ত আশার কথা, জ্যোতিদাদা ওখানে আছেন। তিনি এটা পেলে হয়ত ফস্ করে এটাকে গৌড়ীয় ভাষায় ঢালাই করে নিতে পারেন। যাই হোক্ তোমাদের যে রকম মর্‌জি তাই কোরো কিন্তু আমার এটাতে গরজ আছে। এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়টা হচ্চে "Education Morale, Sociale et Artistique"— ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। তর্জ্জমা নয় কিন্তু এর ভাবার্থটা কি পাওয়া যাবেনা ?

কাল বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেচি সেটা, ইংরেজিতে যাকে গম্ভীর ভাব বলে, সেইভাবে ভেবে দেখো। যারা কাজ করচে তাদের বিনা দোষে বিদায় করতে কিছুতে ইচ্ছা হয় না—কিন্তু আমাদের দায়টা খুব কঠিন হয়েচে বলে আমার মনে হচ্চে। শতকরা দশটাকা সুদে হ্যাণ্ডনোট অনেকদিন লিখিনি— ন টাকা পর্য্যন্ত অভ্যাস আছে। শুনলুম মাসে

দেড় হাজার টাকা কেবল সুদই দিচ্চি—উটের পিঠে অনেক সয় কিন্তু তারো ত একটা শেষ খড় আছে—অথচ মেরুদণ্ড-হিসাবে আমরা উটও নই, আর বোঝা যা চাপ্‌চে তাকে খড় বলা চলে না। এমন অবস্থায় বিরাহিমপুরের সদর সেরেস্তার ভার কমাতে চাইলে অন্যায় হবেনা। সদরে একজন ইন্‌স্পেক্টর বাড়াতে হবে কিন্তু তার মাইনে অপেক্ষাকৃত কম হবে। ইস্‌মনবিশিকে ঝেড়ে দেখ্‌লে কমাবার উপায় পাওয়া যাবে। তুমি কলকাতায় থাক্‌তে থাক্‌তেই একাজটা সেরে নিতে পারলে ভাল হত—কিন্তু তখন অবস্থার শোচনীয়তাটা আমার এত স্পষ্ট জানা ছিলনা। জমাখরচের হিসেব কোনোকালেই আমার কাছে রমণীয় নয়—বিশেষত অবস্থা যখন সচ্ছল নয় তখন খরগোষের মত চোখ বুজে থাক্‌তে ইচ্ছে করে। এটর্নি পল্‌টু কর লিখন হাতে সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতেই চোখ খুল্‌তে হল।…"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" আমার হজম হয় না তাই কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েচি— অতএব তোমাকে এই পূজোর ছুটির সময়টাতেও গম্ভীরভাবে ভাবাতে চেষ্টা করচি। এ বছর বিরাহিমপুর থেকে মুনফা বেশি আশা করা চল্‌বে না— আর কালীগ্রামে "শস্যঞ্চ গৃহমাগতং" পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার জো নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা, সেই ভাল, আলোচনার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ duet লাগানো যাক্। তার একটা সুবিধা এই যে মূলধন ছাপিয়ে মুনফা উঠ্‌বে। তুমি তাহলে আর দেরি না করে তোমার খোলে চাঁটি লাগাও, তারপরে আমি এদিকে আছি। প্রবন্ধরচনায় তুমি যে এই যৌথ প্রণালীর উদ্ভাবন করলে এটাকে নানা দিকে চালিয়ে যাওয়া ভাল। অতুলবাবু প্রভৃতি আরো দুই একজন জুড়ি জুটিয়ে আসর জমাতে পার। Wells-এর ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও কোনো একজন ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গৎ লাগাও না। আমার মনে হয় Wells-এর বইয়ের যে জিনিসটা বিশেষ বিবেচ্য সেটা ওর বইয়ের তত্ত্ব নয়, ওর মনের গতি। ওরা একটা বড় আঘাত পেয়ে জেগে উঠেচে, যেটাকে চরম আশ্রয় বলে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল দেখেচে সেটা ভর সয় না। অথচ ওদের পুরাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থাটাও নানা জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। কঁৎ যে একটা পূজার সামগ্রী সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের পুরীর জগন্নাথের মতই তার হাত নেই— আমরা তাকে উদ্দেশ করে দিতে পারি কিন্তু সে নিতে পারে না। এরা এখন চাচ্চে এমন একটি Personality যে আমাদের অন্তরে বাহিরে সত্য, আমাদের আর সব চুরমার হয়ে গেলেও যে বাকি থাকে, এবং যে মৃত্যুর বিদীর্ণবক্ষ থেকে জীবনের উৎস উৎসারিত করে। সেই Personality আছে এই

উপলব্ধিটিই হচ্চে positive লাভ—কিন্তু তার স্বরূপটি কি এটার সম্বন্ধে পরিচয় পাকা হয় নি বলে নানা অদ্ভুত জল্পনার সৃষ্টি হচ্চে। সে জঞ্জালগুলো ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসবে কিন্তু একটি পরম গতি সম্মুখে আছে বলে মানুষ যাত্রা করে বেরতে প্রস্তুত হয়েছে ;—তার একটা আশ্রয় ভেঙেচে বলেই সে একটি বৃহৎ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামনে আর এক পরম আশ্রয়ের দিকে উৎসুক হয়ে উঠেচে এইটেই হচ্চে বড় কথা। নিশ্চয়ই Wells যে কথাটা তুলেচে সে ওর একলার কথা নয়— অনেকের মুখপাত্র হয়েই সে একটা ভাবকে রূপ দেবার চেষ্টা করচে। ওদের সেই মনস্তত্ত্বটাই আমাদের ভেবে দেখবার কথা। বস্তুত মানুষের ধর্ম্মের ইতিহাসে তার ধর্ম্মের রূপটার চেয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে তার মনস্তত্ত্বটাই মূল্যবান এবং সেইটেতেই সত্যের পথ নির্দ্দেশ করে। Wells-এর বই পড়লেও সেই পথটাকে Science-এর বহুদিনের আবর্জ্জনার ভিতর দিয়ে আবার দেখ্‌তে পাই— তাতে এইটুকু দেখা যায় Science-র মধ্যেই মানুষ বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে পারে না, কোনমতে তার পোড়া কয়লা, ছাই এবং ভাঙা সরঞ্জামের ভিতর দিয়ে রাস্তা করে সে একটা বাইরের দিকে ছুট্‌তে চায়। মানুষের ইতিহাসের নানা বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের এই যে একই চেষ্টা দেখ্‌তে পাই এইটেই কি ধর্ম্মসম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা নয় ?

জমিদারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতই ভাবচি ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্চে, ওটা অকারণে top heavy হয়েচে— ছুটো সদর

ওর পক্ষে অনাবশ্যক বোঝা। কলকাতার সদর এবং মফস্বল এবং তার মধ্যে একটি উভচর পরিদর্শক, অর্থাৎ যিনি Trinityর Holy Ghost, এই হলেই কাজ সহজ হয়। ভেবে দেখো কিন্তু মনস্থির করতে দেরি কোরো না। একবার সুরেন এবং তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় কথা হলে ভাল হত। ইতি ১৩ই কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মঞ্জু ভাল আছে ত?

---

[৬১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৩ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

ইতিমধ্যে অমিয়র আর কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তুমি কোনো খবর পেয়েচ কি? এখানে আমার কাছে এলে আমি তাকে কি উপায়ে বল দেব তাই ভাবচি। আমার নিজের জীবনের যেটুকু সম্বল সে এত ভিতরের দিকে যে, সে ত কারো হাতে তুলে দিতে সহজে পারিনে। জীবনকে ছাড়িয়ে যে কথা যায় সেই কথা নিয়ে আমি বেঁচে আছি কিন্তু অমিয়ের মত ছেলেমানুষকে সেখানকার খোরাক দিতে চাইলে সে তা নিতে পারবেনা—তার কাছে এ সমস্ত খুবই ফাঁকা ঠেকবে। আমি সন্ধ্যার

সময় ছাতের উপর একলা বসে কাটাই— ওর কাছে আমার নিস্তব্ধতা আরো বেশি বিষাদের ভার বাড়িয়ে তুল্‌বে। এইজন্যে ওর এই দায়িত্ব নিতে আমার ভারি ভাবনা হচ্চে। ওর সম্বন্ধে তুমিই বা কি ভাবচ আমাকে লিখো। বেলার শরীর— বোধহয় কয়দিনের নিরন্তর বাদলায়— খারাপ আছে খবর পেয়েচি। ১৭ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি দিন দশপনেরো পরে যদি কলকাতায় যাও তাহলে সেইসময়ে একবার রাজধানীতে হাজির হব। তখন একবার বিষয়কর্ম্মের কথাটা চুকিয়ে দিয়ে আসব। ওর আলোচনাটা আমার একেবারেই মনঃপূত নয় বলেই ওটা আমার মনের মধ্যে এমন তোলাপাড়া করচে— ওটাকে সম্পূর্ণ নিকেশ করে দিয়ে স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করতে চাই। আমার বিষয় ভোগের বয়স গেছে, যখন ছিল তখনও ভোগ করিনি। এখনও আমিরী সখ আমার একটিও নেই। সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে বনচ্ছায়াতলে একটি অতি মনোহর কুটীর বানিয়ে একটি আরাম কেদারা এবং তিন আলমারি বই নিয়ে নিভৃতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব এই রকমের একটা সখ অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে সময়ে

অসময়ে গুঞ্জন করে বেড়ায় বটে কিন্তু বুঝে নিয়েচি সে আমার কপালে নেই। টাকার যা সঙ্গতি হয়েছিল তাতে কিছুই অসম্ভব ছিল না কিন্তু আমার প্রকৃতির মধ্যে আরেক ব্যক্তি আছেন বসে, যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বল্‌তে হয় Thy need is greater than mine। অতএব অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমার অবস্থা কোনোদিনই সচ্ছল হবে না। এক-একবার ক্লান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক্, কিন্তু সে আমিরীটুকুও হিসাবে কুলয় না দেখতে পাই। কেননা রথীর সংসারেও দেখি অনাটন, আমার ইস্কুলেও দেখি তাই, অতএব ডাইনে বাঁয়ে হিসেবের নিষ্ঠুর খাতার দিক থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চক্ষু বুজে মনের শান্তি রাখ্‌তে চেষ্টা করি। ঠিক এমন সময়ে যখন ১০ পার্সেণ্ট সুদে হ্যাণ্ডনোটে সই করতে হয় তখন কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছি ঠাওর পাইনে। এদিকে জানি আমার কাছ থেকেই এস্টেট ৩৭০০০ হাজার টাকা ধার নিয়েচে— এখনো তার এক পয়সা সুদ পাইনি। সুদ দাবি করতে গেলে উচ্চহারে সুদ দিয়ে ধার করতে হবে। অতএব যত রকম সখ আছে সমস্ত থাক্ এখন কুত্তা বুলিয়ে নিলে বাঁচি।

ডাক্তারের কথা লিখেচ ওটা আলোচ্য বটে। কিন্তু যেহেতু ঐ একটা বড় খরচ যা আমরা নিজের স্বার্থে করিনে প্রজাদের জন্যে করি, এই কারণে ওটাতে হাত দিতে কিছুতে ইচ্ছা করেনা। এই ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারীর এবং তারও চতুষ্পার্শ্বের লোকের বিশেষ

উপকার হয়েচে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্য্যে সফল হয়েচি। লজ্জা এই যে হাঁসপাতালের চাঁদা আদায় করে' আজ পর্য্যন্ত তার একটি ইটও ভিতের উপর চড়েনি। আমাদের যা কিছু দেনা হয়েচে তা যদি আমাদের জমিদারীর এই রকম কাজের জন্য হত আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য শোক করতুম না— কেননা এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেণ্ট-পার্সেণ্ট্ সুদের উপরে শোধ হত যে হ্যাণ্ডনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার ত সবচেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রজাদের জন্যে লোকসান করবার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই তাহলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম— মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম। তাই অর্থ নষ্ট করবার যে সুবিধাটুকু এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেচি তাই নিয়ে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কেটে যাবে— তার পরে যারা বিষয় ভোগ করচে তারা তার দায়ও ভোগ করবে, তাতে এই বিশ্বজগতের কি আসে যায়, আর, আমারি বা কি মাথাব্যথা। ইতি ১৯ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই cuttingsগুলো সুরেনকে পাঠিয়ে দিয়ো।

[৬৩] ওঁ পোস্টমার্ক, ৯ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

পর্শু রবিবারে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় যাচ্চি। বেলাকে দেখে আসব— ডাক্তার সরকারের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে আসব তারপরে Self Government-এর scheme সম্বন্ধে কারো কারো সঙ্গে আলোচনা করব এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে হয়ত তোমরাও এসে পড়তে পার।

এবারকার সবুজপত্র খুব ঘন সবুজ হয়েচে— প্রায় সব লেখাতেই যথেষ্ট রস আছে। অন্নচিন্তা আবার পড়ে আবার ভাল লাগ্‌ল— তোমার নোটগুলি খুবই তীক্ষ্ণ ও ঝকঝকে হয়েচে এখানকার পাঠকেরা খুব তারিফ করচে। গীতিকাব্যও বেশ ভাল লেখা— বরদা বাবুর লেখাটিও বেশ সারালো ধারালো এবং রসালো হয়েচে। অতুল এবং বরদাবাবু তোমার সবুজপত্রের আসরে ওস্তাদের আসন নিয়েচেন— সাহিত্যের দ্যুলোকে ওঁরা নিজের আলোকে আলোকিত— এখন আশা হচ্চে সবুজের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের অবসান হল।

অমিয় সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত হয়েচি। ইতি ২৩ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৪] ঐ পোস্টমার্ক, বড়বাজার

১২ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

কলকাতায় এসেচি। মেরে কেটে ১৬ই পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে পিঠাপুরমের রাজার ওখানে যাবার কথা আছে। যদি তার মধ্যে এসে পড় তাহলে বিষয়কর্ম্মের আলোচনা হবে। নইলে ফিরে এসে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে সেই যে ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ করার কথা বলেচি সেটা ভেবে দেখো। ওটা না থাকাতে আমার বিশ্বাস যথেষ্ট শৈথিল্য এবং অনিয়ম ঘটে। আমি যে লোকের কথা বলেছিলুম সে হচ্চে সত্যেশ্বর নাগ। কালিগ্রামের বিভাগে ম্যানেজার ছিল— ৬ বছর কাঁকিনা স্টেটে নানাবিধ কাজ করেচে। লেখাপড়া ভালই জানে— এমন কি সাধারণ ইংরেজি বাংলায় ওর দখল বেশ নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ সবুজপত্রে যে রকম অসাধারণ রকমের বানান ভুল হয় সে ওর হাতে হতে পারত না— ওকে প্রুফ সংশোধন করতে দিলে সেটা বুঝতে পারবে। এবার সবুজপত্র ছেলেদের হাতে দিতে ভয় হয়— বানানভুলে পা ফেলবার জায়গা নেই।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের ছন্দের হাত মোটে দুরস্ত নয়— সবসুদ্ধ ওর কবিতা সেইজন্যে দুর্ব্বল হয়ে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৫] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

মহাজনের এবং উইলের দেনায় যে রকম জড়িয়ে আছি তাতে আমার অংশ বিক্রি হওয়া প্রায় অসম্ভব এ কথা তোমাকে চিঠি লেখার পর মনে হয়েচে। অতএব বিভাগ হওয়া ছাড়া আর গতি নেই। কি রকম ভাবে হতে পারে তুমি মধ্যস্থ হয়ে স্থির করে দিয়ো। সুরেন কোনোমতে কিছুমাত্র আঘাত পায় এ আমার কিছুতে ভাল লাগে না। দেনার ভার ওর সঙ্গে সমান করে বহন করতেও আমি কুণ্ঠিত হতুম না। কিন্তু কেবল পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে আমি জড়িয়ে থাকতে পারব না। এই দেনার বিপাকে পড়ে বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়েচে যে আমি আর উদাসীন থাক্‌তে পারিনে। একে যুদ্ধের জন্যে দাম চড়ে গেছে, তাতে আমাদের এস্টেট থেকে সুদ বন্ধ, শান্তিনিকেতন থেকে যে ২৫০টাকা পাওয়া যেত তাও বন্ধ, ছেলেদের অনেকেই দুর্দ্দশায় পড়ে বহুকাল বেতন মুল্‌তবি রেখেচে ইত্যাদি সমস্ত উৎপাত একসঙ্গে জড় হয়েচে। ভাগ্যে হঠাৎ ম্যাকমিলান হাজার টাকা পাঠিয়েছিল তাই উপস্থিতমত কাজ চল্‌চে। আমাদের নিজের ক্ষুধিত সংসারের গ্রাস থেকে এই হাজার টাকা ছিনিয়ে আনা আমার পক্ষে কম দুঃখকর নয়, কিন্তু সে কথা ভাববার সময় নেই। যাই হোক্‌ আমার নিজের দেনা শোধ করতে না পারলে আমার বিষয় এবং

আমার কাজ দুইই ডুববে। অতএব অবিলম্বে আমাকে কোমর বাঁধতেই হবে।

মনের ভিতরটা এমনি ক্লান্ত হয়ে আছে যে কোনো কাজই করতে ইচ্ছা করে না। অথচ সম্পূর্ণ নৈষ্কর্ম্য বিরামজনক নয় বলেই অত্যন্ত মন্থরভাবে শান্তিনিকেতন থেকে একটু একটু করে ইংরেজি তর্জ্জমা করি। দেখব এরি মধ্যে সবুজপত্রের যদি কিছু লিখ্‌তে পারি। কিন্তু বোধ হচ্চে আমার দম ফুরিয়ে এসেচে এখন আমি যদি কিছু জোগান দিতে পারি সে এখানকার শিশুদের ছোট মুঠো ভরবার মত— তোমাদের সদর হাটে ব্যাপার করবার মত সম্বল আমার আর নেই। উৎসাহও বোধ করচিনে। মনটা যে রাস্তায় ছুট্‌চে সেটা নির্জ্জনের রাস্তা। ইতি ২০ মাঘ ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অংশবিভাগের কথাটা ভুলো না। সুরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমরা যা ঠিক করবে আমার তাতে কোথাও বাধবে না। আমি মুনফার চেয়ে মুক্তি চাই। আগামী বৎসরের গোড়া থেকেই যেন খোলসার পথে যাত্রা করতে পারি।

[৬৬] ও শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রিয়বাবুর বইগুলো কেনবার জন্যে ইচ্ছা খুবই আছে। এগুলো ছড়িয়ে নষ্ট হলে দুঃখের বিষয় হবে। কি রকম

দামে পাওয়া যেতে পারে জানলে বুঝব আমার সামর্থ্যে কুলবে কিনা।

আচ্ছা, সেই শিক্ষা সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখ্‌ব। আজকাল কলম আর সরতে চায় না। এটা যে কেবলমাত্র অন্তঃকরণগত ক্লান্তি তা নয় সত্যিই কল বিগ্‌ড়ে গেচে।

প্রুফ আজ ত আসেনি। তাহলে বোধ হয় পর্শু মঙ্গলবারে আস্‌বে।

কাজের কথা পরিণামের দিকে এগচ্চে কি?

আমারো মনে হয় প্রবন্ধ লিখে তোমার সময় নষ্ট হচ্চে। সবুজ পাতার চেয়ে পরিপক্ক ফলটা বেশি দামী হবে। কেবলি প্রবন্ধ লেখায় মনের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। এতে কাজেরও ফল পাওয়া যায় না অবকাশেরও না। অধিকাংশ অল্পপ্রাণ লোক যারা ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য চর্চ্চার পুণ্য শস্তায় লাভ করতে চায় তাদের জন্যে মজুরি করে জীবন কাটাবার দৈন্য তোমাকে শোভা পায় না। আমি ত ইতিমধ্যেই হাঁফিয়ে উঠেচি— আমি স্ট্রায়িক্ করব। কারণ এই সাময়িক সাহিত্যের বারোয়ারি মজ্‌লিশে আমাকে নিয়ে এমনি টানাটানি চল্‌চে যে অস্থির হয়ে উঠেচি। বনের মধ্যে ভালুক জন্তুটারও একটা মর্য্যাদা আছে কিন্তু তাকে রাস্তার লোকের আমোদের জন্যে নাচ্‌তে হলে সেটা দুঃখের বিষয় হয়। ইতি ২৯ মাঘ ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৭] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

রথীকে লিখে দিয়েছি সুরেনের প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। যদিচ সুরেনের জন্যে আমার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ রইল। এক হাতে সমস্ত বিষয় থাকার সুবিধা আছে যদি সেই এক হাত সতর্ক হয়। নতুবা একাধিপত্যে দায়িত্ব চলে যায় বলেই তার বিপদও আছে। সুরেন যদি সম্পূর্ণ মন দিয়ে বিষয়কর্ম্ম দেখ্‌তে পারে তাহলে ত ভালই হয়। কিন্তু যদি ওদের ইন্‌স্যুরেন্স কম্পানিই ওর সুয়োরাণী হয় এবং জমিদারীটা হয় দুয়োরাণী তাহলে ফল ভাল হবেনা। জমিদারী সম্বন্ধে আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেটা আমাদের মনে থাকেনা বলেই এত দুর্গতি হয়েচে। আমি যদি নিঃসরিক কাজ করতে পারতুম তাহলে এইটেকেই মুখ্য কাজ করতুম। কিন্তু আমার ত কাজের বয়স চলে গেল। যাই হোক্ আগামী বৈশাখ থেকে নূতন নিয়ম যাতে চলে সেইরকম লেখাপড়া ইতিমধ্যে সেরে রেখে দিয়ো। দ্বিপুদের দলিলটা কপি করলেই ত হবে।

তুমি সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাকে খাতির করে চল শুনে আশ্চর্য্য হলুম। ছাপার অক্ষর জিনিসটার একটা জাদু আছে। সেই জাদুর আবরণ কাটিয়ে স্বয়ং সমালোচক পুরুষটিকে যদি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেতে তাহলে অধিকাংশ স্থলেই দেখ্‌তে পেতে তার সম্পত্তির মধ্যে আছে

মাত্র কলম। আক্কেল এবং এলেম বেশি নয়। আমাদের দেশের পনেরো আনা লেখার মধ্যে মন জিনিষটা নেই— আমাদের পাঠকদের পাকযন্ত্র সেইজন্যে ওটা এখনও হজম করতে শেখেনি। উপদেশ এবং অশ্রু এবং উত্তেজনা যতই জোগাবে তার অফুরান কাট্‌তি। কিন্তু মন জিনিসটা বড় বালাই। ওটাকে গালের মধ্যে দিলেই অমনি গলে না। ওটার সঙ্গে কারবার করতে হলে যে পরিণতির দরকার যে কারণেই হোক আমাদের দেশে সেটা দুর্লভ হয়েচে। আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি— যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই "আমার জন্মভূমি"তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয় নোটবই থেকে। এই রকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্দ্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়— এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক ডস্‌টেভ্‌স্কি বার্ণার্ড্‌শ কোট্ করে এবং ব্যাখ্যা করে ইস্কুলমাষ্টারি করতে পার তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্চে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর—এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চল্‌বেনা। অক্ষয় মজুমদার বল্‌তেন "অভিনয় করবার সময় দর্শকদের মনে করতুম বাঁদর তাতেই

অভিনয় করা সহজ হত।" কিন্তু অভিনয়ের বেলা যেটা খাটে সাহিত্যের বেলা সেটা খাটে না। সাহিত্যের বেলা মনে রাখ্‌তেই হবে যাদের জন্যে লিখ্‌চি তারা সকলেই মানুষ, তাদের সকলেরই মন আছে। আমাদের পাঠকদের মধ্যে সেই মনের যাচাইটা খাঁটি এবং কড়া নয় বলেই কতই যে বাজে লেখা লিখেচি তার ঠিকানাই নেই। বাহির থেকে আদায় করে নেবার লোকটি না থাক্‌লে ভিতরের দান করবার শক্তিতে বিকার ঘটে। কিন্তু এ সমস্ত মেনেও কোমর বেঁধে চল্‌তে হবে এবং জান্‌তে হবে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

প্রিয়বাবুর ইংরেজি বইগুলো কিনে রাখবার ইচ্ছা ত আছে। চেষ্টা করে দেখো যাতে আমার সাধ্যের মধ্যে কুলোয়। ইতি ২ ফাল্গুন ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমারি দোষ। শরৎ চাটুজ্জে একটা নতুন কাগজ বের করে তাতে আমাকে সমালোচনা লিখ্‌তে অনুরোধ করছিলেন। তার জবাবে আমি তাঁকে বলেছিলুম যে, আজকাল আমার লেখার উৎসাহ একেবারে ছুটে গেছে, এমন কি, সবুজ পত্রে

লেখাও আমার আর চল্‌চে না। এর থেকেই কথাটা নিশ্চয় উঠেচে। সত্যিই আমার কেমন লেখা সম্বন্ধে জড়তা এসেচে। বারে বারে এই কথাই কেবল মনে হয় আমাদের দেশের পাঠক লেখকদের উপর আজকাল অত্যন্ত বেশি মুরুব্বিয়ানা করে। আমাদের যখন বয়স অল্প ছিল বঙ্কিমবাবুদের প্রতি আমাদের মনের ভাব ঠিক উল্টো ছিল। এমনতর পাঠক-সমাজের কাছে লিখ্‌তে কোনোমতেই গা লাগে না। এর ফল হয় এই যে, নিজের ভিতরে যতটা পূর্ণতা আছে বাইরে তার প্রকাশের পথ অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা বাইরে থেকে আদায় করে নেবার ব্যবস্থা না থাক্‌লে ইচ্ছা থাক্‌লেও দেওয়া যায় না— মন ত আমাদের সম্পূর্ণ নিজের বশ নয়— আমাদের নিজের যা সম্পদ আছে তা দিতে গেলে ভিতর বাহিরের যোগে সেটা ঘট্‌তে পারে। এই সকল কারণে, এবং হয়ত অন্য নানা কারণও আছে, আমার কেবলি দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনে মনে কেবলি জিনিসপত্র প্যাক্ করচি, এবং টাইম টেব্‌ল দেখচি— এমন অবস্থায় মনটাকে কলমের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া ভারি শক্ত হয়। আজকাল কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলুম, তারও দেখচি ইস্টিম্ ফুরিয়ে আস্‌চে। এই রকম মানসিক উড়ুক্ষুতা রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্চে খুব ভরপুর বেগে একেবারে উড়ে যাওয়া। চেষ্টা ত কর্‌চি, কিন্তু আজকাল পথও চারদিকে বন্ধ, আবার পাথেয়ও তথৈবচ। সেইজন্য দিনরাত কেবল চলি-চলিই করচি অথচ চলা হচ্চে না,

সেইটেতে ক্ষতি হচ্চে। যাই হোক্ আপাতত তোমাকে একটা কবিতা পাঠাই তার পরে গল্প একটা লেখবার চেষ্টা করব। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৯] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৯ জুলাই, ১৯১৮

কল্যাণীয়েষু

এখানে এসে অবধি এক লাইন লিখিনি। মনটা ক্লান্ত হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে আজকাল মাষ্টারি করে থাকি। তাতে আমার প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগ্‌ড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময়ে থাকে না অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়েই চল্‌তে থাকে— এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে। লেখকরা অনেক সময়েই বেকার অবস্থায় এই আত্মপেষণের কাজে নিজেকে ক্ষয় করতেই থাকে— এ কাজ আমি অনেক করেচি সুতরাং জানি এটা প্রীতিকর নয়। এইজন্যে পঞ্চাশোর্দ্ধে ঐ অনিশ্চিত অনিয়মিত অসাময়িক কাজটা ছেড়ে দিয়ে গুরুমশায়গিরি ধরেচি। তাতে বেশ ভালই থাকি। এর কোনো একটা

ফাঁকে তোমাদের জন্যে কিছু একটা লেখবার চেষ্টা করব— কিন্তু মনের বেগটা লেখার দিক থেকে অন্য দিকে সরে গেছে। সুনীতি আমার কাছে আসবার আগেই অজিত আমার কাছ থেকে সার্টিফিকেট আদায় করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সুনীতিকে কিছু না দিয়ে পারলুমনা— কেননা ওঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[৭০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজ এই খানিকক্ষণ হল সবুজপত্র পেয়েছি। পেয়েই পড়ে ফেল্লুম। সবুজপত্রের গুণ হচ্চে পড়তে বেশিক্ষণ লাগে না— খুব ব্যস্ত লোকেরও ভয় করবার দরকার হয় না। আমার সকাল বেলাকার ক্লাস এবং বিকাল বেলাকার কাজ এই দুইয়ের মাঝখানের ফাঁকটি ঠিক ভর্ত্তি করেচে এবং তার উপরে একখানি চিঠি লেখবার সময়ও বাকি রেখেচে। এবারকার কাগজটি খুব ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠেচে। তোমার "বই পড়া" প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মাল আছে কিন্তু তারা এম্‌নি ভাণ করচে যেন তাদের কোনো গৌরব নেই, অর্থাৎ যেন তারা ভারাকর্ষণের কোনো ধার ধারেনা—কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক গুরুভক্ত এইজন্য সাহিত্য গুরুতর হয়ে না উঠ্‌লে তাদের মনে হয় যেন উপোষ করা হল। বাৎস্যায়ন থেকে

যে বর্ণনা তুলে দিয়েছ তার মধ্যে "পতৎগ্রহ" কথাটির মানে লিখেচ পিকদানি। কিন্তু তোমার মানে পড়্‌বার আগেই আমার মনে হয়েছিল ওটা হয়ত waste-paper basket-এর মত একটা জিনিস যার মধ্যে আবর্জ্জনা ফেলা যায়। কিন্তু ওর পিকদানি অর্থটা কি তোমার আন্দাজ, না ওটা পাকা কথা? গল্পটি কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ আমার জীবনবৃত্তান্ত থেকে চুরি করেচ— ঠিক গল্পটি নয় কিন্তু তার বৃত্তান্তটি। কিন্তু খুব উপাদেয় হয়েচে। এ'কে মারাত্মক গল্প বলা যেতে পারে কারণ, বুদ্ধকে মার যে-রকম প্রলুব্ধ করেছিল, তোমার গল্পের উপসংহারে সেই রকম একটি মারের প্রলোভন উদ্যত আছে— সুকুমারমতি পাঠকেরা নিশ্চয় নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌বে, আহা ঐ বিধবার সঙ্গে বিবাহ হলেই ত চুকে যায়— কিন্তু তাহলে গল্পের তপস্যা ঐখানেই মাটি। সুরেশের লেখার খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পড়ে মনে হচ্ছিল তোমার লেখা পড়চি— হঠাৎ পাতা উল্টে দেখলুম সুরেশের নাম। লেখাটি খুব ভাল লাগ্‌ল। এবারকার সব লেখাই বেশ চোখা চোখা,— তোমার টীকা-টিপ্পনির ত কথাই নেই। আমি ইস্কুলমাস্টারির মধ্যে তলিয়ে গেছি— ওতে মনটা বাঁধা পড়েচে। মনটাকে বাঁধা নিয়েই ত মানুষের যত তপস্যা, এক কথায়, ঐটেকেই বলে সুখ— ছাড়া মনটাই লক্ষ্মীছাড়া— অতএব যতদিন এই ভাবে চলে চলুক। ইতি ১ ভাদ্র ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেম্ব্রিজের এণ্ডার্সন সবুজপত্র পাননা বলে অভিযোগ

জানিয়েচেন। পেলে তিনি মাঝে মাঝে সেখানকার কাগজে তোমাদের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

[৭১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাকে কন্‌গ্রেসের সভাপতিমঞ্চে টেনে তোলবার জন্যে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ সকল দিক থেকেই জাল ফেলা হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে জালের টান দুই একবার অনুভব করেছিলুম তাই এবার সেয়ানা হয়েচি। চিরকাল ভাবরসের জলাশয়ে বাস করে এসেছি, পলিটিক্সের শুক্‌নো ডাঙায় বাঁচব কেমন করে? শুধু তাই নয়— মানুষের ললাটে একবার ভুল মার্কা পড়ে গেলে তার পরে নিজের সত্য পরিচয় দিতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। আর যাই হোক্, "কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালা"র ছাপ আমার পক্ষে অত্যন্ত মিথ্যা। যে স্থান আমার, সে জায়গায় ও মার্কা একেবারেই চলেনা। আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার ডাক পড়বার সময় নিকটবর্ত্তী হয়েচে— সেখানে হাজির হবার পূর্ব্বে কোনও কলঙ্ক নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি না।

এবারকার সবুজপত্রে দেখলুম, তুমি লিখেচ Mystic কথার প্রতিশব্দরূপে অতিবাদী শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। উপনিষদের একটা জায়গায় আমি যে "অতিবাদী" শব্দের ব্যবহার দেখেচি সে হচ্চে এই :—

"প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্
বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ

"এই যে প্রাণ সর্ব্বভূতস্থ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ইহাই জানিয়া জ্ঞানী অতিবাদী হন না।" এখানে অতিবাদী বলতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্চে, সত্যকে অতিক্রম করে' যে কথা কয়। তুমি কি অন্য অর্থে অতিবাদী দেখেচ?

আমি মাঝে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেছিলুম— ভুলে গিয়েছিলুম ভ্রমণ এবং অভ্যর্থনা আমার সয় না। দেখলুম দক্ষিণাপথে দুটোই খুব প্রবল এবং প্রচুর। আজ সাতান্ন বছর বাংলা দেশে বাস করে গালিগালাজ অবমাননায় এম্‌নি মৌতাত জমে গেছে যে অতিশয় সম্মান সহ্য করবার মত অভ্যাস চলে গিয়েচে। তাই পিঠাপুরম পর্য্যন্ত গিয়েই আর পুরোবর্ত্তী না হয়ে পিঠের দিকেই ফেরা গেল। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলুম মীরা আর তার ছেলে নিজামের হায়দ্রাবাদে সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত। "শান্তি" বলে তার ছোট দেবর এই ব্যামোতেই সেখানে মারা গেছে। আমি মনে ভাবলুম আমার যে রকম দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েচে তাতে এই আঘাতটা বোধ হয় কাট্‌বে না। টেলিগ্রামের গতিকও ভাল ঠেকছিল-না। ওখানে ডাক্তার ল্যাঙ্কেষ্টর আছেন, মীরাদের দেখ্‌বার জন্যে আমি তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিলুম। তিনি এবং ডাক্তার নাইডুতে মিলে একরকম করে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেচেন। কাল খবর পেয়েছি ডাক্তার বলেচে এখন আর কোনো ভাবনার কারণ নেই। এই সব নানা ছোট বড় আঘাতে ব্যাঘাতে আমার মন এখন আর কিছু লিখ্‌তে উৎসাহ পায় না। তাই ফের আর একবার ইস্কুল মাস্টারিতে

লাগব ভাবচি। মাঝে মাঝে দুটো একটা লেখবার বিষয় পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে দরজার কাছে এসে করুণনেত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে ঘুরে ফিরে চলে যায়। বোধ হয় খুব একটা পরিবর্ত্তনের পর আবার সাহিত্যের দক্ষিণ হাওয়া বইতে পারে— এখন কিন্তু শুক্‌নো ফুলেই মনের বনতল আকীর্ণ।

বিবিকে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[৭২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২১ ডিসেম্বর, ১৯১৮

কল্যাণীয়েষু

৭ই পৌষের হাঙ্গামে অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু না লিখে থাক্‌তে পারচিনে যে অনেকদিন পরে সবুজপত্র পড়ে খুব ভাল লাগ্‌ল। এবারে একটি লেখাও বাদ দেবার মত নয়— বীরেশ্বরের গল্পটিও ভাল হয়েচে। তোমার শেষ গল্পটি সুতীক্ষ্ণ— ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এরকম খরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই। বিবির লেখাটা পড়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম— শেষে ওর নাম পড়বার আগে ওর লেখা বলে মনেও করিনি— প্রবন্ধের বিষয়টির জন্যে বলচিনে, ওর স্টাইলের জন্যে। আমার বোধ হচ্চে ত্রৈমাসিক সবুজপত্র যদি বের কর তাহলে তোমরা হাত পা ছড়িয়ে লিখ্‌তে পার এবং সমস্ত লেখা বাছাই

করে নিতে পার। বাঙলা কোন্ বই পড়া উচিত প্রবন্ধটির নাম আমার কাছে ঠিক বোধ হয় না— ঐ নামের অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি তোমার বক্তব্য বিষয়টিকে কতকটা খর্ব্ব করেচ। ভারতচন্দ্রের সমালোচনাই তোমার মুখ্য বিষয়। যাই হোক্ তোমাদের এবারকার পত্রটি যাকে বলে সাক্‌সেস্। তোমাদের পত্রোদ্‌গমের সময়টা যদি বেশ নিয়মিত হয় তাহলে পাঠকদের পক্ষে ভাল হয়। সবুজপত্র যেন আমার দিশি বিবাহের নিমন্ত্রণের খাওয়া—বারোটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যাবে বলে শেষকালে পিত্তি পাড়িয়ে বেলা পাঁচটার সময় খাওয়ানো। আয়োজনটা খুব ভালো হলেও সময়টার দোষে তাল-কাটা গানের মত হয়ে পড়ে। আগামীবারে আমি একটা কিছু লেখা দেব মনে করচি— কিন্তু সেই আগামী বারটা কোন্‌বার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে— পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদপত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণমুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়— কিন্তু আপাতত তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া।

সবুজ পত্রকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই।— প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেল্‌তে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোতুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎসধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্‌। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক। আমার এই খোলা জানলাটার কাছে বিশ্রামশয্যায় শুয়ে আমি আমার ঐ সাম্‌নের মাঠের দিকে [চেয়ে] অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখ্‌তে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র উপদেশে ভরা অতিপুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেকদিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রখর— তা'তে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূর-বিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি মাত্র তালগাছ এতবড় সনাতন নির্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটুখানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের

সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমাদের সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্। জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ— সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরা-সন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে, যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে যা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই— জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজপত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেনি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ

করেছি বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্পপল্লবে নিজেকে বার বার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয়বট যে অক্ষয় তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চিরতারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতিবসন্তেই সে বারে বারে নূতনবেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকৃত তাহলে এর দ্বারা দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়েও সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সেদিন আমি সেই খোড়োদলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপনিবাসীরা এখনো সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করেনি। আমি তাদের ক্ষমার দাবীও করিনে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তিভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করিনি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রা-লোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেচি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্যসাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকাশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে।

সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবকমহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশুমহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি— মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছুডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেইজন্যে যৌবনমধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষকাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানিনি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাইনি। কিন্তু এখন দিনশেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেইজন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয়

হবে, বাধামুক্ত হবে, জড়তা, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…র কবিতার ছন্দটি এতই নিরতিশয় হাড়গোড়ভাঙা যে, এ'কে সংস্কার করার চেয়ে এ'কে নতুন করা অনেক সহজ। সে সাহস আমার নেই এবং সেটা ঠিক উচিতও হবেনা। যেমন আছে এম্‌নি ছাপিয়ো, লোকে ক্ষমা করে নেবে।

[৭৪] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিঠিখানা সবুজপত্রে ছাপ্‌তে চাও কিন্তু কোথাও ভাষা যদি আট-পৌরে এবং ভাব সর্ব্বজনপ্রকাশ্য না হয় তাহলে সেগুলো একটু সেরে সুরে নিয়ো। আজকাল সব মন দিয়ে এবং বেশিক্ষণ ধরে কিছু লিখ্‌তে পারিনে। দেহটা পৃথিবীর টানে মাটির দিকে ঝুঁক্‌চে— মনটাকে তার উল্টোদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যে যে-সব কাজে দেহটার দরকার হয় সেইগুলোকে কমিয়ে আনা যাচ্চে। এই উনষাট বছরের সেবকটাকে জবাব দেবার সময় হয়নি কিন্তু ছুটির দরবার করলেই সেটা তখনি মঞ্জুর করতে হয়। শরীর ত এই,

এর উপরে দেশের দুঃখে মন ভেঙে পড়েচে। ব্যথা পাবার শক্তি আছে অথচ প্রতিকারের শক্তি নেই— তাই কেবলি মনে হয় আমাদের পক্ষে মৃত্যুই সদ্গতি। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৫] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা মাঝে মাঝে তোমাদের কাগজে লিখব কিন্তু সে লেখা হবে বৈশাখের বালুতটবাহিনী মন্দস্রোত ক্ষীণ ধারাটির মত। অর্থাৎ তাতে পণ্যবোঝাই নৌকো চল্‌বার আশা নেই— অবগাহন স্নানও হবেনা— নিতান্ত স্বগত উক্তির মত— বর্ষার রাতে যখন সমস্ত তারা লুপ্ত তখনকার জোনাকি পোকার মত— কিম্বা যখন দিনের সমস্ত পাখী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখনকার ঝিল্লিধ্বনির মত— অর্থাৎ কর্ম্মের টঙ্কার নয়, উৎসবেরও ঝঙ্কার নয়, বিশ্রামের গুঞ্জনমাত্র।

তোমার প্রবন্ধগুলি পেলে বেশ রয়ে বসে পড়ে দেখ্‌তে পারব। আজকাল সময় ঢের আছে। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ শয্যাগত হয়ে না পড়লে বেশ চেখে চেখে বই পড়বার আর কোনো উপায় নেই— লাইব্রেরিদ্বারে শ্মশানে চ কাছাকাছি এসে ঠেকেচে। কিন্তু তাই বলে বিবি আমাকে বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের যে বই পাঠিয়েছে সেটা পড়বার মত

অবকাশ যমের দেউড়িতে গিয়েও মিল্‌বেনা। ও লোকটা বুজ্‌রুগ— ওর লেখা কখনো খাঁটি হতেই পারে না।

কাল সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা ধাঁ করে লিখে ফেলবার চেষ্টা করব। ধাঁ করে যদি না হয় তবে হবেই না— কুঁড়েমির লেখা হাউয়ের মত যদি ছুট্‌ল তবে সোঁ করে আর যদি গড়িমসি হতে লাগ্‌ল তবে বুঝলুম আগুন ধরলনা। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৬] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

একটা লেখা আজ লিখে রেজেস্ট্রি করে পাঠালুম। হাল্কা ছাঁদে হাল্কা কথা লিখব মনে করে কলম ধরেছিলুম— কিন্তু কলম কি সত্যই আমি ধরি? তাহলে এমন দশা হয়? যাই হোক্, একটা লেখা হয়েছে— সম্পাদকের দাবী মিট্‌ল। কুমোরের চাকে যখন বেগ পুরো মাত্রায় থাকে তখন সেই বেগের চোটে সূক্ষ্ম কাজ সহজেই আকার পায়। আজকাল আমার বুদ্ধিতে সেই বেগ নেই তাই জিনিষটা কিছু মোটা রকম হল। দেখচি এখনো কারখানা চলবার মত অবস্থা হয়নি। এখনো কাজ বন্ধ রাখাই উচিত। হঠাৎ এত ক্লান্তি কি করে যে একেবারে আমার মাথার উপরে চড়ে বস্‌ল তা বল্‌তে পারি নে। এই সামান্য একটুখানি লিখেই মনে হচ্চে

আমার মাথার দিকটা ঠিক যেন ঝড়ের পরে খড়ের চালের মত ভাব।

তোমরা কিন্তু সবুজপত্র যদি নিতান্তই যখন তখন বের কর তাহলে লেখকদের লেখবার উৎসাহ এবং পাঠকদের পড়বার আগ্রহ দুইই কমে যাবে। তা ছাড়া বানান সম্বন্ধেও একটু হুঁসিয়ার হলে কাগজটার একটু শ্রীবৃদ্ধি হবে। জ্যৈষ্ঠের আগে বোধ হচ্চে তোমরা কাগজ বের করবেনা— সেটা কিন্তু ক্ষতিজনক— এতে মন মিইয়ে যায়। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাগজের জন্য দুটো পত্র পরে পরে পাঠিয়েছি। আবার আজ আর একটা পাঠাচ্চি। কিন্তু তবু সম্পাদকী বৈঠকে তোমার টনক নড়্‌ল না দেখে আমি কিছু চিন্তিত আছি। হস্তগত হয়নি এমন আশঙ্কা করিনে, কিন্তু বুঝিবা দ্বিধায় পড়েচ। বড় ক্লান্তির মধ্যে লিখেচি কিন্তু বড় দুঃখে। মনে করি আর কিছু লিখব কিন্তু ঘুরে ফিরে একই কথা বেরিয়ে পড়ে। নিজের মনের বেদনা এবং লেখকের লেখনী এই দুইয়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক না থাকলে লেখা ভাল হয় না তা জানি— কিন্তু কি করা যাবে? সেই ফাঁকটা আজ নেই। এইজন্যে এগুলো সাহিত্যের হিসাবে কি রকম হল তা বিচার

করতে পারচিনে। তবে লিখে ফেলে নিজের মনটাকে খানিকটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার ছিল। যদি এগুলো সবুজপত্রে না চলে আমাকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিধামাত্র কোরো-না। আর যদি চলে তাহলে ছাপতে এবং প্রুফ পাঠাতে দেরি কোরো না। প্রুফের সঙ্গে মূল কপিগুলো পাঠিয়ো।

দেশের দুঃখের বোঝায় আমার শরীরকে যেন আরও দলিত করচে— বিশেষত প্রতিকারের সমস্ত দরজা যখন এমন ভয়ানক এঁটে বন্ধ। আমাদের দেশ অতীতে অনেক মহাপাপ করেচে, মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচে— তাই অন্যায়ের দুঃখ এমন নিরুপায়ভাবে সহ্য করচে। মানুষকে যে-অপমান করেচি চারদিক থেকে সেই অপমান ফিরে পাচ্চি। সকলের চেয়ে আমার এইটেই বুকে বাজে যে, আজ যদি হাতে ক্ষমতা পাই আবার এই কাজই করব। আমাদের মনের মধ্যে সেই পাপ তেমনিই জমে আছে। জাহাজের খোলটার ভিতরে যখন জল ঢোকে বাইরে জলের ঢেউ তখনি তাকে বড় মার মারতে থাকে। খোলের ভিতরকার জল নিঃশব্দ এবং নিশ্চল সেইজন্যে তাকে নিরীহ বলে মনে হয়, এবং যত রাগ হয় ঐ বাইরের চড়চাপড়ের উপরে। মোদ্দা কথা, মারের চোটে পাঁজর ভেঙে গেল। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

Still they come. কিন্তু বাস্। তুমি দুই সংখ্যা একসঙ্গে বের করচ অতএব এস্থলে অধিক দোষের হবে না। এই চারটেতে মিলে চতুর্দ্দোলার বেহারার মত একটা কথাকেই কাঁধে করে নিয়ে চলেচে। অতএব এ'কে ভাগ করতে গেলে সেটা শোকাবহ হবে। পাল্কীর সোয়ারিটার খাতিরে বেহারা চারটেকেও আঙিনায় ঢুক্‌তে দিতে হবে।

যাহোক নটে শাকটাকে মুড়িয়ে দেওয়া গেল বোধ হয়। পরের কিস্তিতে কোনো একটা নতুন কথা আসরে প্রবেশ করবার ফাঁকা পাবে।

লাহোরিণী একটা কি গল্প লিখেচেন এমন গুজব শুনচি। আমার বোধ হয় তাঁর লেখা তুমি নির্ভয়ে সবুজপত্রের জন্যে দাবী করতে পার। কিন্তু নবীন লেখক চাই। তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্চে না কেন? সবুজপত্রের সভার পনেরো আনা আসন আমরাই যদি জুড়ে থাকি তাহলে কাল-ব্যতিক্রম দোষ ঘটে। আমাকে যদি তোমরা দক্ষিণা দিয়ে বা না দিয়ে বিদায় করে দাও তাহলে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে এখনি সরে পড়ি। আমি এক একবার যাত্রা করে বেরই; তোমরা হঠাৎ পিছু ডাক, আবার রাম রাম বলে আমাকে ফিরে আস্‌তে হয়। এবারে কিন্তু বিধাতার কাছ থেকে আমার ছুটির মঞ্জুরী হুকুম বেরিয়েচে— আমার উপর বেশি

ভরসা রেখো না— হাওয়া বদলের জন্যে মনটা ব্যগ্র হয়ে আছে— Waiting room-এ গাড়ির জন্যে বসে আছি।

কাপি সমেত প্রুফ পাঠিয়ো। অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে লেখা— গলদ থাকবার সম্ভাবনা আছে। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৯]

ওঁ ✻ Brahmacharya-Ashram
Santiniketan, Birbhum

পোস্টমার্ক ৩০ জুলাই, ১৯১৯

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্র প'ড়ে খুব খুসি হলুম। কিন্তু আরো লেখক চাই। লেখাসৃষ্টির চেয়ে লেখকসৃষ্টির বেশি দরকার। লেখাসৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায় কিন্তু এখনো বেশি দূর পর্য্যন্ত সবুজপত্রের টান পৌঁচচ্চে না। নবীন লেখকেরা সবুজপত্রের আদর্শকে ভয় পায়— তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।

আমি ভয়ঙ্কর জোরে মাস্টারি করচি। তাতে অনেক ভাবনার কথা দুঃখের কথা অপমানের কথা ভুলে থাকা যায়।

কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব। রবিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভা বসবে সন্ধ্যা ছটার সময়— অতএব তোমাদের ওখানে শনিবারে যদি সভা কর তাহলে

কোনো বিঘ্ন হবে না। শুক্রবারে সরস্বতীর বিবাহ। সোমবারেই আমাকে ফিরতে হবে। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার লেখাটির কি নাম দেব ভেবে পাইনে। "পুরাণো শোক" বোধ হয় চল্‌তে পারে।

ছোট ছোট গল্পকে "কথাণু" না বলে "কথিকা" বলা যেতে পারে। "গল্পস্বল্প" বল্‌লে ক্ষতি কি?

তোমার আহুতি এখানে পৌঁছাবামাত্র এখানকার মেয়ের দলে সেটি অধিকার করেচেন— তাঁদের সংখ্যা কম নয় সুতরাং সেটি ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়াচ্চে। পরিণামে আমার হাতে এসে পৌঁছবে।—

সবুজপত্রে তোমার দু-ইয়ার্কি লোকের ভাল লেগেচে— আমি আজকাল অত্যন্ত কাজের ভিড়ে পড়ে এখনো পড়বার সুযোগ করতে পারিনি। ক্লান্তি এবং ব্যস্ততা দুই একসঙ্গে এসে মেলাতে আমার না হচ্চে ভাল করে কাজ, না হচ্চে ভাল করে বিশ্রাম। কিছুকাল থেকে বিদেশী অতিথির আনাগোনা বড় বেশি হয়েচে— তাতেও অনেক সময় যায়। সম্প্রতি এখানে একজন পার্সির আবির্ভাব হয়েচে— তাঁর ছেলে এখানে বেদান্ত শেখবার জন্যে ইচ্ছুক— অথচ তার

সংস্কৃত জানা নেই— দেবনাগরী অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না। বর্ণপরিচয় থেকে বেদান্ত পর্য্যন্ত বহুদূর পথ— এতদূর এ'কে বহন করে চলা সহজ হবেনা। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮১] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাব্যগ্রন্থটির জন্যে একটি নাম একরাত্রে স্বপ্নের মত এসে পরক্ষণে হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন মনে হয়েছিল সেটা ভাল কিন্তু মনে থাক্‌লে হয়ত তত ভাল লাগ্‌ত না— অতএব অনুশোচনা না করে আর একটা নতুন নাম ভেবে স্থির করলুম। "পদ-চারণ"— ওর সাদা অর্থ পায়চারী। কিন্তু কাব্যের পদ আর প্রাণীর পদ এক নয়। আমাদের দিশী troubadourদেরও চারণ বলে থাকে।

সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা পাঠালুম। যদি এটা পছন্দ না কর তাহলে প্রবাসীতে পাঠিয়ো।

আবার আমি ইস্কুলমাষ্টারীতে লেগে গেছি।

এণ্ড্রুজ আগুর ওখানে যাচ্চে তার হাতে পত্র ও প্রবন্ধ দুই দিলুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জেনো। এইসঙ্গে একটা ইংরেজি চিঠির খসড়া পাঠাচ্চি। রোমাঁ রোলাঁদের চিঠির উত্তর। যদি কোথাও আপত্তি বোধ কর বা বদল ইচ্ছা কর স্পষ্টভাষায় জানিয়ো। সুরেন ওখানে আছে কিনা জানিনে— যদি থাকে তাকে দেখিয়ো। এই চিঠি এবং রোমাঁ রোঁলাদের পত্রের তর্জ্জমা মডারন রিভিয়ুতে ছাপানর ইতিকর্ত্তব্যতা বিচার করে জানিয়ো। পত্রের উত্তর কলকাতায় দিয়ো, কারণ এখানে আমার ছুটিযাপন অনিশ্চিত। শিলঙ যাওয়া প্রায় স্থির। কাঞ্চি-কাহিনীর ইংরেজিটেও পাঠাই। ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের মন্তব্য চাই এবং এটা এখানকার কোনো কাগজে ছাপব কি না বোলো। ইংলণ্ডের Daily News বা Nationএ পাঠাতে পারি। তোমাদের সবুজপত্রের জন্যেও কিছু পার্ব্বণী পাঠাচ্চি— আশা করি, বর্ত্তমান বছরের পঞ্জিকার সঙ্গে সবুজপত্রের যে ঘোড়দৌড় চল্‌চে তাতে সে শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হবে না।

গুরুজনদের আমার প্রণাম জানিয়ো। ইতি বিজয়া ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি লেখা স্বতন্ত্র লেফাফায়
রেজেষ্ট্রিডাকে পাঠালুম।

পরপৃষ্ঠায়

[৮৩] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

"মায়ার খেলা"র স্বরলিপি পেয়েচ শুনে খুব খুসি হলুম। কলকাতায় গিয়ে ওর ছাপার ব্যবস্থা করা যাবে।

কাল আমি শিলঙ ছেড়ে গৌহাটি যাব— তার পরে সেখান থেকে আমাদের মণিপুরে যাবার কথা চল্‌চে। তাহলে আরো দিন দশেক পরে আমরা ফিরব।

এখানে ইংরেজি লেখায় হাত দিয়েচি। অস্ট্রেলিয়ায় বক্তৃতার কথা আছে তাই তৈরি হতে হচ্চে। কিছু ইংরেজি তর্জ্জমাও করেচি। দুই একটা ছোট কথিকা লিখেচি।

তোমরা জমিদারী সম্বন্ধে যে তিনটে প্রস্তাব পাঠিয়েচ, তার প্রথমটা ঠিক সঙ্গত নয়। কারণ বিরাহিমপুর এবং কালিগ্রাম এক হাতে থাক্‌লে তবে দৈবদুর্য্যোগ প্রভৃতি উপসর্গে কতক রক্ষা পাওয়া যায়— একটার ক্ষতি আরেকটায় পূরণ করে।

দ্বিতীয়টা সুরেনের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হবে।

আমার নিজের পছন্দ তৃতীয় প্রস্তাব।

কলকাতায় গিয়ে একটা ঠিক করা যাবে। এ বছরটা দুই পরগণার পক্ষেই ভাল এইজন্যে এই সুযোগেই যদি কোনো ব্যবস্থা হয় সুরেনের পক্ষে সেটা কষ্টকর হবেনা। যাই হোক্ না, আমার নিজের দিক আমি যেমন ভাবব সুরেনের দিকও আমি ঠিক তেমনি করেই ভাবব— ওকে

মুস্কিলের মধ্যে ফেলে আমি কোনো সুবিধেই চাইনে। আমার স্থির বিশ্বাস, সুরেন যদি আমার কাছ থেকে আমার অংশ সম্পূর্ণ নেয় তাহলে ও আমাকে যা মূল্য দেবে চেষ্টা করলে তার অনেকটাই ও তুলে নিতে পারবে ইতি ১৩ কার্ত্তিক ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৩ক] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

পশু রাত্রে বাড়ি ফিরে এসেই দেখি রোগীতে বাড়ি ভরা। পরদিন সকালেই চলে এসেচি। ইচ্ছা ছিল তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব সময় হলনা।

ফরাসী চিঠিগুলি আমাকে তর্জ্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরোনা।

বিবিকে বোলো মায়ার খেলা স্বরলিপি রেজেস্ট্রি করে যেন শীঘ্র পাঠিয়ে দেয় তাহলে ছাপার কাজ এখনি সুরু করে দিতে পারি।

এখানে মেঘলা করে আকাশ বিমর্ষ হয়ে আছে। শীতের দিনে বর্ষার নকল একেবারেই ভাল লাগেনা।

স্বাঃ— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৪] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

স্প্যানিশ ভাষায় তোমাদের দখল আছে কি না জানিনে তবে কিনা ওটা ফরাসী ভাষার প্রতিবেশী— তোমরা হয়ত কতক ইসারায় কতক অভিধানের সাহায্যে এর একটা মোটামুটি মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবে। সেইটে যদি আমাকে জানিয়ে দাও তাহলে জবাব লিখে পাঠাতে পারি। অল্পকাল হল বোধ হচ্চে Danish এ একখানা পত্র পেয়েছিলুম সেটা বুঝতেও পারিনি হারিয়েও গেছে— এমন ঘটনা বারম্বার ঘটচে। Ollendorff যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে আমার সেক্রেটারি রাখি।

ইংলণ্ডে Flame বলে একটা কাগজ বেরচ্চে। বোধ হচ্চে উচ্চ অঙ্গের জিনিষ হবে। আমি একটা কবিতা পাঠিয়েচি। এবং লিখেচি আমার বন্ধুরাও মাঝে মাঝে কিছু কিছু লেখা দেবেন। তোমার কথা মনে করে লিখেছিলুম। তার চিঠিটা পাঠাচ্ছি। পড়ে দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

আর্য্যর কাছ থেকে একখানি ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

স্বরলিপি প্রভৃতি কাল পাব— তার যথোচিত ব্যবস্থা করব। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রাবণের সবুজপত্র যদি অঘ্রাণে বেরয় তাহলে কি হলদে হয়ে যাবে না?

[৮৫] ওঁ পোস্টমার্ক. শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

Harvard Oriental Series এর কিছু কিছু বই রথীর হাত দিয়ে পাওয়া গেল। শাস্ত্রীমশায় খুব খুসি হবেন।

তুমি যে এতদিন সবুজপত্র চালিয়ে এসেচ এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। উজানস্রোতে সাহিত্যের লগি ঠেলা বারোমাস মানুষের ভাল লাগে না। আমার এমন হয়েচে, কোনো লেখা প্রকাশ করতে শিকি পয়সার উৎসাহ বোধ হয় না। যে মূঢ়তা সরল তারও একটা সৌন্দর্য্য আছে যেমন শিশুদের— কিন্তু যে মূঢ়তা কুটিল এবং উদ্ধত তাকে সহ্য করা যায় না। যে সব জিনিষের প্রতি দরদ আছে সজারুদের সভায় তাদের বর্ণন করতে কতদিন উৎসাহ থাকে বল? ওদের পিঠের কাঁটা এখনো পর্য্যন্ত নাম্‌ল না— থাক্‌ ওরা ঐ আকাশের দিকে কাঁটা উঁচিয়ে— ওরা ভাব্‌চে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে ওদের ঐ সহজাত সম্মার্জ্জনী দিয়ে ওরা ঝেঁটিয়ে দেবে। পারে ত তাই করুক। ওদের কাঁটার ঝাঁটারই জিৎ হোক্‌।

আচ্ছা, তাই সই, সবুজপত্রের যজ্ঞাবসানে পাঠকবিদায়-স্বরূপে আমার শেষ দেয় কিছু দেব—তার পরে গেট বন্ধ করে দিয়ো। ইতি ১৪ ফাল্গুন ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৬] ওঁ পোস্টমার্ক, কলকাতা

১৭ অগস্ট, ১৯২১

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দেখি আশ্রমে দুর্ভিক্ষ। মাসে প্রায় হাজার টাকার নাজাই, আমার সম্বল ত জান,— ভিক্ষাও মেলে না। বক্তৃতা তোমাকেই পাঠাব ঠিক করেছিলুম— কিন্তু বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা ধরে পড়লেন ছাপিয়ে বিক্রি করতে। দুই এক শো টাকা যা পাওয়া যায় তাই সই—কেননা সেখানে অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ— তাই প্যাম্ফলেট্ আকারে বেরিয়েচে— এর থেকে যদি তোমরা ছাপতে চাও ছাপিয়ো —কিন্তু এটা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়ে যাচ্চে— তবু অধিকন্তু ন দোষায়— তোমরা ছাপলে আমার আপত্তি নেই— তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে। গত বছরে আশ্রমে একলক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েচে— এবারে হয়ত তার বেশিই হবে— এমন দুই একটা ঢেউ লাগ্‌লেই নৌকো কাৎ হবে— সেইসঙ্গে আমিও। তাই অর্থচিন্তায় আছি। অর্থচিন্তায় শরীর মনকে শোষণ করে— করে'ও অর্থের সুযোগ ঘটায় না। আমার অবস্থা এই। তোমরা কেমন আছ? বিবির খবর কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, আমার মনটা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছে— সেই জন্যেই কোনো রীতিমত লেখায় হাত দিতে পারিনি। রামমোহন রায় লিখ্‌তে বসেছিলুম কিন্তু শেষ করিনি। মনে বলে যে, "পৃথিবীর উপকার করা তোমার কাজ নয়। ঐ কাজে বিস্তর লোক লেগেচে, আর ভিড় বাড়ালে বসুন্ধরার ভার হরণের জন্যে খুব মজবুৎ গোছের অবতারের দরকার হবে।" অত্যন্ত গম্ভীর কর্ত্তব্যগুলো দেখলে আজকাল কেবল যে ক্লান্তি আসে তা নয়, হাসি পায়। মনে হয় ওর বারো আনাই মুখোস্ পরা ফাঁকি। আমি এখানে যে মস্ত একটা কাজ ফেঁদে বসেচি তার মহিমা আমাকে আর দাবিয়ে রাখ্‌তে পারচে না। আমার পক্ষে এগুলো হচ্চে সময় নষ্ট করবার উপায়— কারণ, আমার জীবনটার শীর্ষদেশে বিধাতার শিলমোহর করা ছুটির মঞ্জুরি হুকুম ছিল। সেইজন্যেই বরাবর ইস্কুল পালিয়েচি অথচ সাজা পাইনি। এই ছুটি নষ্ট করতে বসেচি বলেই আজকাল ভিতরে ভিতরে সাজা পাচ্চি। জরুরি চিঠি জরুরি প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিষ নয়— মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্‌বুদের মত উঠেচে আর ফেটে গেছে— কিন্তু যে গানগুলোকে দেখ্‌তে বুদ্‌বুদের মত তা'রা

আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্ত্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠ্‌তে থাকে তখন কর্ত্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্ত্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আস্‌চে যে, "সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।" যদি তা করি তাহলে কর্ত্তারা খুসি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্ত্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্ত্তারা বলেন, "তিনি আবার কে? একত আছে বন্দেমাতরং।" তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বল্‌তে হচ্চে— "আমার বন্দেমাতরং ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মান্‌তে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডারা শুধু পাণ্ডা নয় তারা গুণ্ডা— অতএব মার খেতে হবে। তাই সই। মার সুরু হয়েচে। "মরার বাড়া গাল নেই" আমাদের ভাষায় বলে, সে কথা মিথ্যে। মরাটা গাল নয় মরার ভয় করাটাই গাল। মরার ভয়ে চাঁদ সদাগর শিবকে ছেড়ে সাপের দেবতার কাছে হার মেনেছিল, সেইখানে তার গাল রয়ে গেল। আমি কিন্তু শিবকে ছাড়ব না। আমার শিব সকল জগতের— কিন্তু সাপের দেবতার জায়গা হচ্চে গর্ত্তর ভিতরে। সেই গর্ত্তর মুখে দুধকলা জোগাবার বায়না যাঁরা নিয়েচেন তাঁরা যে-ফলের লোভ করেন আমি সেই ফলকে বড় মনে করিনে। আমার মন ম্যাপের গর্ত্তর মধ্যে আর

কোনোদিন দেবতা খুঁজ্‌বে না। বুঝতে পেরেছি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেছি, যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক্‌, আমি আর কথা কইব না।

তুমি হাবলুর সেই নোটগুলো নিয়ে ছাপতে দিতে চাও। কিন্তু আমার বক্তৃতার নোট নেওয়া শক্ত— আমি তড়বড় করে বলে যাই— তাছাড়া আমার ভাষা একটু বিশেষভাবে আমারই— যারা নোট নেয় তাদের পেন্সিলের ঠোকরে ওর চেহারা একেবারে বদ্‌লে যায়— বসন্তরোগের ঠোকর মারা মুখের চেয়েও বেশি। তা ছাড়া এসব বিচ্ছিন্ন বাক্যকে প্রবন্ধের রূপ দেবে কে? আমার ত আর প্রবৃত্তি হয় না। লিখ্‌তে বস্‌তে একটুও রুচি নেই। তার উপরে আবার তর্ক বিতর্কের ঘুরপাকের মধ্যেও ঢুকতে ঘোর অনিচ্ছা। তুমি যদি জোড়াতাড়া দিয়ে একটা কিছু খাড়া করে তুল্‌তে পার তাহলে চেষ্টা দেখো। রামমোহনরায়ের সম্বন্ধে এখানে ছেলেদের কিছু বলেছিলুম— তারও নোট আছে। কিন্তু সেই নোটের টুক্‌রো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালা লাগেনা বলে তাতে হাত দিইনি।

…কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ঘোরতর মিশনারিগিরি করে গেছে। নারী-মিশনারীরা কি পদার্থ তা ত জানই— তার পরে…আবার যে-সে নারী নয়। এখানকার মেয়েদের খুব ধিক্কার দিয়ে গেছে। আমাকে জানিয়েচে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্ত্তব্য এবং যে

মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েচে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,…নিজে চরকা কাটে না— সে মনে করে তার পক্ষে ওটা জরুরি নয়। চরকা যদি নাও কাটে তাহলে অন্তত ওর উচিত প্রতিদিন চরকা কেটে যে আয় হয় তাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করে' তার বেশি সমস্তই দেশকে দান করা। আমি আমার একটা কর্ত্তব্য স্থির করে বসেচি— অন্তত তার জন্যে আমি নিজের লোকসান করতে ছাড়িনি— শুধুই যদি বাক্যব্যয় করতুম তাহলে জীবনের হিসাবের খাতায় জমাখরচের কোন্ কোঠায় সেটা কি রকম অঙ্কপাত করত? যাঁরা বাংলা দেশের জমিদার তাঁরা যতক্ষণ সদর খাজনা জুগিয়ে নিজের জীবিকা ও আরামের সংস্থান করতে চান ততক্ষণ অন্যলোককে ত্যাগস্বীকার করতে বল্‌তেই পারেন না। আমি আমার এক চিঠিতে বড়দাদাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়েছিলেম। বাংলাদেশে জমিদারদের চেয়ে গবর্মেণ্টের বড় কর্ম্মচারী আর কে আছে?

বিবিকে বোলো সার্কিসের হাঙ্গামায় আমি জড়িত হতে চাইনে। সে নিজে যা ভাল বোঝে তাই যেন করে। আমি ইংরেজি সঙ্গীত ভাল বুঝিও নে, বোঝবার চেষ্টা করার মত উদ্যম একটুও নেই— তার উপরে বিশ্বভারতীর দুঃসাধ্য সাধনায় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। কলকাতায় যদি যাই মোকাবিলায় কথা হবে। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, বিশ্বভারতী ক্রমেই এর সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। এইবার ৭ই পৌষের সাম্বৎসরিকে এ'কে সাধারণের হাতে দেব। তার Constitution তৈরি হচ্চে। আমি নামে মাত্র Founder Presidentরূপে মাথায় বসে থাকব। কিন্তু একজন সত্যকার কর্ম্মকর্ত্তা চাই— ইংরেজিতে যাকে বলে Vice-Chancellor। অনেক ভেবে দেখ্‌লুম। শেষকালে এই স্থির করচি তুমি যদি রাজি হও তবে তোমাকে এই পদে বসাই। আশা করচি অর্থসম্বল হবে— কিন্তু আপাতত এই পদের বেতনস্বরূপে কোনোমতে মাসিক ৩০০ তিনশত টাকা বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। অবশ্য এখানেই থাক্‌তে হবে— প্রথম organise করবার যে মেহন্নত ও চিন্তা ও দায়িত্ব তার সমস্তটাই তোমার উপরে পড়্‌বে। চেষ্টা করব তোমাদের একটা বসতির সুবিধা করে দিতে। এই কথাটি বিশ্বাস কোরো যে এই institutionটার প্রসার সমস্ত সভ্যপৃথিবীতে— এর প্রতিষ্ঠা এর মধ্যেই হয়েচে, এখনো সকলে তা দেখ্‌তে পাচ্চে না— অতএব এর কর্ণধার হবার সম্মান কারো পক্ষেই অল্প নয়। সংক্ষেপে এইটুকু বল্‌লুম। যদি একবার আস্‌তে পার তাহলে আলোচনা করবার সুযোগ হবে— কিন্তু বেশি বিলম্ব করা চল্‌বে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৭]　ওঁ　পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

Clarté কাগজের নাম নিশ্চয় জানো। তারা ভারতবর্ষীয় লেখক পেতে চায়— এখানকার খবর এখানকার লোকের মুখে শোনবার ইচ্ছা। অধ্যাপক লেভির সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করেছি। তিনি বলেন সুরেশ যদি লেখা পাঠান ত ভাল হয়। এই সুযোগটি ছাড়া উচিত হবে না। কেননা আমাদের কথা য়ুরোপের কানে পৌঁছন চাই। অথচ অত্যুক্তি থাকাটা ঠিক নয়। তুমি যদি সুরেশের সঙ্গে মিলে Clartéর জন্যে সংবাদ ও সমালোচনার জোগান দাও ত ভাল হয়। সুরেশকে বোলো Barbusseকে এই চিঠির যেন উত্তর দেন— আমি যে তাঁর চিঠি পেয়েছি এবং সুরেশকে লিখতে অনুরোধ করেচি সেটা যেন তাঁকে লেখা হয়। Levi সাহেব ১৭।১৮ মার্চ্চে কলকাতায় যাবেন সেই সময়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা হতে পারবে। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার হাল ঠিকানা ভুলে গেছি তাই তোমার ব্যবসায়িক ঠিকানায় পাঠালুম।

[১০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

মার্চ, ১৯২২

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, যদি রেলের পথে বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে তবে লেভি সাহেবের সঙ্গে বুধবার প্রাতে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছব— একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কোরো— বিবিকেও এনো— আমার যানবাহন নেই জান ত। আঠারই তারিখে নেপাল রওনা হব। ইতি রবিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১১] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বিশ্বভারতীর Constitution রেজেষ্ট্রি হতে চলেচে। এর ট্রাষ্টিদের মধ্যে তোমার নাম আছে জানিয়ে রাখচি। সম্মতি জানিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ো। শীঘ্রই মুদ্রিত Constitution একখণ্ড তোমাকে পাঠাব।

মাঝে বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে বটে কিন্তু আজ আবার আকাশ তেতে উঠেচে, নালিশ করে কোনো লাভ নেই তাই সহ্য করচি। পদ্মপত্র চন্দনপঙ্ক প্রভৃতি কোনো উপকরণ হাতের কাছে নেই— ইলেক্‌ট্রিক পাখা বরফের ত কথাই নেই। মিস্ ক্রামরিশ ত পলাতক— এ জায়গা তার সইবে কিনা সন্দেহ

হচ্চে— ওর বয়স একে অল্প তাতে জাতিতে রমণী, ওর ধাতটা বোধহয় সহুরে। এখানে Benoit নামে একজন Swiss ফরাসী এসেচেন তিনি বড় চমৎকার লোক। দেখা হলে খুসি হবে। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার হাতে একটিও লেখা নেই। যে অসহ্য গরম, মাঠের ঘাস, গাছের পাতার মত মাথার ভিতরকার সমস্ত ভাব শুকিয়ে গেচে। লিখ্‌তে বসাই অসম্ভব। আমার জন্মদিনে নিজের খেয়ালে নিজেরই উদ্দেশে একটা কবিতা লিখেছিলুম। ভেবেছিলুম সেটাকে খাতার অন্তঃপুরেই রেখে দেব। কিন্তু তুমি লেখা দাবী করেচ বলে সেইটেই পাঠালুম। বিশেষ কিছুই নয়। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও পাতায়—

[১৩]   ওঁ   • Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রথম আষাঢ়ের বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শৈলশিখর থেকে নীচে নেমে এসেছ বোধ হয়। সবুজপত্র বের করতে চাচ্চ কিন্তু রস জুগিয়ে পত্রোদ্‌গমের সহায়তা করতে পারি আজকাল আমার মধ্যে শক্তির তেমন দাক্ষিণ্য নেই। মুস্কিল এই, তুমি স্বয়ং ছাড়া লেখবার লোক কেউ নেই। চারু বাঁড়ুয্যে সেদিন এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বল্‌লেন আমরা বঙ্গসাহিত্যের বড়াই করি বটে কিন্তু ওস্তাদ লেখকের দারুণ দুর্ভিক্ষ। তিনি একমাত্র তোমার নাম করলেন; আরো একব্যক্তির উল্লেখ করেছিলেন পাপমুখে তার কথা বল্‌তে পারচিনে। এমন অবস্থায় কাগজ খুলে বসে লেখার হাট জমাতে চাও কোন্ সাহসে? মাঝে-মাঝে যখন-তখন তোমার একলার লেখাঙ্কিত উড়ো কাগজ এক এক পসলা বর্ষণ করে দিতে দোষ কি? তাতে ইচ্ছেমত বজ্রবিদ্যুত শিলবৃষ্টি জলবৃষ্টি যা খুসি তাই চালাতে পার। ইন্দ্রদেব এ কাজ করে থাকেন, তাঁর সরিকের মধ্যে আছেন বায়ু, আর কেউ না। আমি যতদূর জানি তোমার উপর বায়ুর আনুকূল্য ত আছেই। অতএব দেবতার মত একলার কাজ একলাই চালিয়ে দাও। Count Keyserling ভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধে আমার কাছে একটা লেখা চেয়েছিলেন। ইংরেজিতে লিখ্‌তে দেরি হবে ভয় করে বাংলায় লিখেচি— পরে তর্জ্জমা করে তাকে পাঠাতে

হবে। সে লেখাটা মস্ত বড়। তোমার একমাসের সবুজপত্রপুট আগাগোড়া ভরে দিতে পারে। এরকম অত্যন্ত ভারিক্কি গোছের লেখা তোমার ঠিক চল্‌বে না—এ অনেকটা তোমাদের রাজসাহির সেই "পিপিসারে"র স্ত্রীর দেহসজ্জার মত— গা ভরাবার জন্যে "কিমিকাল্" চালাতে হয়েচে। দেখি, যদি এর মধ্যে ছোটখাটো কিছু লেখা কলমের মুখে এসে পড়ে তবে চালান করে দেব। ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৪] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৬ জুলাই, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, চরকার উপর একটা আমার মন্তব্য লিখেছি। তোমাকে দিতে পারি কিন্তু সবুজপত্রের পুনরুদ্গম হবে কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে এখনো তার কোনো খবর পাইনি। যেহেতু বিষয়টা সাময়িক এবং মহাত্মাজি অতি শীঘ্র আমার একটা অভিমত দাবী করচেন তোমার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে অগত্যা আর কোথাও ছাপতে দিতে হবে। লেখাটা কিন্তু সবুজপত্রেরই সবর্ণ। এটার একটা ইংরেজি করাও চাই— যদি তুমি বাংলাটা গ্রহণ কর তাহলে ইংরেজীকরণের ভার বিবিকে নিতে হবে। নইলে সুরেন আছে। শীঘ্র জবাব দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৫]　　ওঁ　　পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৪ জুলাই, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

লেখাটা হিন্দুস্থান ইন্‌সিয়ুরেন্স্‌ ঠিকানায় সুরেনকে রেজেস্ট্রিডাকে পাঠিয়েছি। ওর ইংরেজিটা আগামী Augustএ Modern Reviewতে ছাপানো চাই বলে সুরেনকে পাঠাতে হোলো। বিবি বলেছিল তাড়ার মুখে তর্জ্জমা করা তার দ্বারা হয়ে ওঠেনি। ও সম্বন্ধে সুরেনের অসামান্য ক্ষমতা। বাংলাটা তোমাদেরই প্রাপ্য। তর্জ্জমা হয়ে গেলেই ছাপতে দিতে পারবে। কলকাতায় যখন যাব তখন কোনো একটা ছোট গোছের সভায় ওটা পড়বার ইচ্ছে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাদ্রমাসের পূর্বেই আমি তো সমুদ্রে ভাসমান— কিন্তু লেখাটা ছাপতে তোমরা যেন বেশি দেরি কোরো না। তোমাদের সবুজপত্রের পঞ্জিকা প্রাচীন মতে চলে না বলে মনের মধ্যে উদ্বেগ আছে। আর একটি ভয় বানান ভুলের। প্রুফ দেখে যেতে পারবো না— যেটা ছাপা হয়ে বেরবে এমন সব পাপের বোঝা নিয়ে জন্মাবে যেটা আমার কৃত নয়, অথচ শাস্তিটা বিশুদ্ধ খৃষ্টানীমতে আমাকেই বহন করতে হবে। একটু দয়ামায়া করে দেখেশুনে দিয়ো।

[৯৬] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

আগামী কাল সোমবারে রথী কলকাতায় যাচ্চে। তার হাতে শেষবর্ষণের সংশোধিত কপি দিচ্চি। তাকে টেলিফোন করে জিনিষটা হস্তগত কোরো। তোমরা দার্জিলিং যাচ্চ, প্রুফের কি দশা হবে? কাপিটা বেশ পরিষ্কার করে লেখা হয়েচে— ঠিকমত মিলিয়ে গেলেই কোনো আশঙ্কার বিষয় থাকবে না। এক একবার ভাবচি Waltairএ গিয়ে কিছুদিন চুপ করে থাকব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১০ ডিসেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এইমাত্র দিলীপকে একখানি চিঠিতে আর্ট সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করে লিখেছি। যদি সে চিঠি সবুজ-পত্রে ছাপতে দিতে তার সম্মতি নিতে পারো তাহলে এই আলোচনাটির অনুবর্ত্তন করে তোমরাও কিছু বলতে পারবে। বড় কিছু লেখবার না পাচ্চি সময় না পাচ্চি শক্তি।

বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] ওঁ * Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, আলিপুরে টেবিলের উপর তোমার সেই ফর্ম্মার ফাইল ছিল— মরিস আমার লেখা প্রভৃতি প্যাক করবার সময় তার যে কি গতি করলে তা বুঝতে পারলুম না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার নিদর্শন পেলুম না। আরেকটা কপি পাঠিয়ো। তোমাকে লিখব ভেবেছিলুম কিন্তু তুমি রাঁচিতে ছিলে বলে লেখা হয় নি।

হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিষের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞান-শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের ৩৩ কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেবে, কে দেবে? ইতি ৬ এপ্রেল ১৯২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১৯] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার "রায়তের কথা" হস্তগত হয়েচে—শীঘ্র হস্তান্তরিত হবেনা। সম্প্রতি একটা দুর্যোগের মধ্যে আছি। একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেচে।

আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্চে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখ্‌তে সুরু করেছিলেম কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময়মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, চিঠির আমদানি সমানই চল্‌চে কিন্তু রপ্তানি নেই— পৃথিবীর উন্নতি-সাধনের দিকে একেবারেই ঔদাসীন্য। এই ধাকাটা কেটে গিয়ে প্রকৃতিস্থ হবা মাত্র সব প্রথমে রায়তের কথা নিয়ে পড়ব তার পরে সমাজের অন্য সব মুল্‌তবি কর্ত্তব্যের দিকে মন দেওয়া যাবে। তোমরা কি এবার গিরিব্রজে যাবার সঙ্কল্প করচ? শুনচি কলকাতায় আজকাল রক্ত বর্ষণ ছাড়া আর সব রকম বৃষ্টি বন্ধ— উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেচে। আমাদের এখানে দেবতা বা মানুষের প্রকোপ বিশেষ অসহ্য হয়নি— গরম অন্তবারের চেয়ে অনেক কম। ইতি ১৪ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০০] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

সময় অল্প, ক্লান্তিও প্রবল। তবু "রায়তের কথা" সম্বন্ধে কয়েক পাতা লিখেচি। কাল রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠাব। পূর্ব্বেই শুনেচ একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে…… সে খবর পায়। পেয়েই আমাকে একশো টাকার চেক্‌

ও আত্মীয়তা খেলাপের খোঁটা দিয়ে ঐ নাটকটা দাবী করে। লজ্জার সঙ্গে মান্‌তে হোলো যে অর্থের অভাব মেটাবার জন্যে নাটকটা সর্ব্বোচ্চ ডাকে অনাত্মীয় হাটে বেচবার চেষ্টায় আছি। ৪।৫ শো টাকা নগদ পাবার আশা আছে—পেলে নিজের ভোগে সে টাকার অপব্যয় হবে না। তহবিল শূন্য অথচ ভিক্ষা মেলে না বলেই আমাকে ব্যবসাদারী করতে হয়। চেক্‌টা ফেরৎ দিতে হয়েচে অথচ আত্মীয়তার সম্মান রাখবার জন্যে কথা দিয়েছিলেম অবিলম্বে একটা কোনো লেখা পাঠাব। ইতিমধ্যে "রায়তের কথা"র উপোদ্‌ঘাত লিখ্‌তে বসলুম— কথায় কথায় লেখা বেড়ে গেল, সময় গেল ফুরিয়ে। এখন আরো একটা কিছু লেখবার মতো শক্তিও নেই অবকাশও নেই। অতএব এই লেখাটা যদি ভারতী সম্পাদিকার হাতে উদারভাবে দিতে পারো তবে এবারকার মতো মাতুল-দায়িত্ব থেকে ছুটি পাই। তোমার বইয়ের ভূমিকারূপে তুমি তো এটাকে ব্যবহার করবেই তার উপরে ভারতীরও পেট ভরবে। এরকম দায়যুক্ত দান ভালো দান নয় জানি তবু নিরুপায় হয়ে একাজ করা গেল। তোমার টীকাসমেত তুমি এ লেখা সবুজপত্রেও ব্যবহার করলে হয় তো অপরপক্ষে অত্যন্ত আপত্তি না হতে পারে।

কয়েকদিন হল কলকাতা থেকে এখানে সাত আটশো মুসলমান গুণ্ডার সমাগম হয়েছিল। রক্তবৃষ্টির পূর্ব্বেই মেঘ গিয়েছে কেটে— সিউড়ি থেকে অবিলম্বে শস্ত্রধারী পুলিস

আসাতে চাপা পড়ে গেল। রক্তমোক্ষণের পরে কলকাতার বায়ুপ্রকোপের কিছু উপশম হয়েচে শুনচি। ইতি ১৮ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১০১]

* Hotel Bristol
Wien
পোস্টমার্ক, ২১ জুলাই, ১৯২৬

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, বৈশাখের পঞ্চাশবর্ষীয়সী ভারতী পড়ে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি।...তাই নিরতিশয় ক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও আমি যে লেখাটা লিখেছি সবুজপত্রের জন্যে পাঠাচ্চি। মনে জানি তোমরা আত্মীয়তার দায়িত্ব রক্ষার জন্যে হয়ত ছাপতে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু সে দায়িত্ব ত আমারো আছে— কিন্তু তার চেয়েও ন্যায়বিচারের দায়িত্ব বড়। আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই তোমরা ছাপাচ্চ একথা জানিয়ে যদি এটা তোমাদের কাগজে স্থান দাও তাহলে খুসি হব। কিন্তু যদি নিতান্তই অনিচ্ছুক হও তাহলে এটা প্রবাসীতে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিয়ো—...

দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। য়ুরোপের লোকেরা আমাকে যে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, কেবল শ্রদ্ধা নয় ভালোবাসে, এটা যতই আমি উপলব্ধি করি ততই আমি

বিস্মিত হই। ভালো বুঝতেই পারি নে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে থাকতে তাহলে স্পষ্ট বুঝতে জিনিষটা কতই প্রবল এবং সর্ব্বজনপ্রসারিত। তাই আমার কেবলি মনে হয় যদি যথেষ্ট সময় দিতে পারি তাহলে পশ্চিম মহাদেশে হয়ত স্থায়ীভাবে কিছু কাজ করতে পারি। পূর্ব্বদিগন্তে জীবনের অধিকাংশই ত ঢেলে দিয়েছি, অতি অল্পই এখন বাকী আছে, সেটুকু যদি এখানে রেখে যেতে পারি তাহলে নষ্ট হবেনা।

চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। এখন গরমে সেটা চল্‌বে না। ডাক্তার বল্‌চেন আগামী সমস্ত অক্টোবর মাসটা ভিয়েনায় কোনো শুশ্রূষাগারে থেকে দেহযন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ রকম মেরামত করলে আরো কিছুদিন এটাকে নিয়ে কাজ চালাতে পারব— সম্প্রতি অত্যন্ত বেশি নড়নড়ে হয়ে পড়েচে— এর উপর দিয়ে আঘাত অপঘাত ত কম যায় নি— যন্ত্রটা খুব পাকা করে গড়া হয়েছিল বলেই এখনো সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয় নি— ডাক্তাররা সকলেই দেহের রচনা কৌশলের বিশেষভাবে প্রশংসাই করেচেন।

বোধ হয় আগামী কাল পোলাণ্ডে, তার পর সুইজারল্যাণ্ড, তার পরে ফ্রান্স, তার পরে ইংলণ্ড নরোয়ে স্যুইডেন হয়ে জর্ম্মনীতে সেপ্টেম্বর মাস কাটিয়ে অক্টোবরে ভিয়েনাতে ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করব। তোমরা বোধ হয় জানো ভিয়েনার মত বিচক্ষণ ডাক্তার আর কোথাও নেই।— আশা করি অনুকূল বর্ষণের আবির্ভাব বাংলাদেশে হয়েচে—

আমার মনের মধ্যে সেই বাংলাদেশের প্রান্তরপ্রান্তের ধারাপাতের কলধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠ্‌চে। ২০ জুলাই ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০২] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কলকাতায় নানাজাতীয় উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আধমরা অবস্থায় পালিয়ে এসেছি। য়ুরোপের হাওয়ায় ও শুশ্রূষায় যে আরোগ্যটুকু লাভ করেছিলুম তা দুই এক দিনেই ফুঁকে নিঃশেষ করে দেবার গতিক দেখে আর ভরসা হোলো না। যেদিন সকালেই তোমাদের ওখানে যাবার সংকল্প ছিল সেইদিন প্রভাতে নিদ্রাহীন রাত্রের অবসানে নিজের আসন্ন দশম দশার আশঙ্কা করে দুপুরের গাড়িতেই চলে এলুম। এখানে এসে অনেকটা আরাম পাচ্চি— যদিও এখানেও লোকসমাগম থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব।

তোমার অভিভাষণটি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে সে কথা অমিয়র কাছ থেকেই খবর পেয়েছ। সবুজপত্রে গাছ সম্বন্ধে যে লেখা বের হচ্চে সেটা বড় উপাদেয় ঠেকচে। বিষয়টি এমন সরল সরস করে লেখা সহজ নয়। ওটা অবিলম্বে ছেলেদের জন্যে বই আকারে প্রকাশ করা উচিত,

যদিও ছেলেদের বাপদাদারাও যদি যথোচিত নম্র হয়ে ওটা পড়েন তাহলে বঞ্চিত হবেন না। সাধুমায়ের জীবনী বড়ো— বাংলায় কি বল্‌ব?— ইংরেজিতে যাকে বলে interesting (ঔৎসুক্যজনক?)। অতুলবাবুর প্রবন্ধগুলির কথা বলা বাহুল্য— ও হোলো পাকা মাথার চিন্তা পাকা হাতে লেখা,— বাংলায় মাথা ও হাতের এরকম ভাল রকে করে চলার দৃষ্টান্ত বিরল। আমার প্রগল্‌ভতা আজকাল লেখা ছেড়ে বকায় এসে ঠেকেছে— ওটা বোধহয় বয়সের ধর্ম্ম। মনের মধ্যে যা কিছু ফসল ফলে সে আর ভাণ্ডারে ওঠে না— পথিকরা যদি সংগ্রহ করে নিল ত ভালো, নইলে ঝরে পড়ে মাটি হয়। তা হোক কিছু একটা লেখবার চেষ্টা করব। তোমার পক্ষে মস্ত একজন মোক্তার আছে অমিয়। তোমরা অবসরমত এখানে কিছুকাল যাপন করে গেলে খুবই খুসি হব সেকথা নিশ্চয় জেনো। ইতি ২৮ পৌষ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১০৩]

* Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্রের জন্যে একটা কবিতা পাঠাই। "বিচিত্রা" নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চল্‌চে— যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা উৎসাহী ও ধনী। তাঁদের দলে তোমার ও

আমার পরিচিত কেউ কেউ আছেন। আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছি, অভাবের দায়ে, লোভের তাড়নায়। আমার দৈন্য যে কত কঠিন হয়ে উঠেচে সে তোমরা অনুমান করতে পারবেনা— সেই কারণে নিষ্কামভাবে লেখা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। নিজের কলমের জোরে ছাড়া, সাধুতা রক্ষা করে অর্থোপার্জ্জনের আর কোনো উপায় জানি নে। অথচ রচনার রাস্তায় তোমাদের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভালো লাগে না— কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা আছে। ইদানীং এই বাহ্য বিচ্ছেদ নিয়ে আমার মন অনেক সময় পীড়িত হয়েচে— কিন্তু লক্ষ্মীর প্রকোপে পড়ে বাণীর প্রসাদপদ্ম নিয়েও ব্যবসা ফাঁদতে হ'ল এই শেষ বয়সে। যাই হোক তুমি যদি সবুজপত্রের নাম ফিরিয়ে দিয়ে "বিচিত্রা"য় তোমার আসন নিতে পারো তাহলে তোমারও ক্ষতি নেই আমারও আনন্দ আছে। ধনীর অর্থের সঙ্গে গুণীর সামর্থ্য মিল্‌লে পরে জিনিষটা সকল দিকে দামী হয়ে উঠ্‌বে বলে বিশ্বাস করি। ইতি ১২ চৈত্র ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৪] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কতবার মনে মনে ইচ্ছে করেচি তোমরা এখানে বসবাস করো। কিন্তু সেটাকে মনের অনেক অসম্ভব আশার কোঠায় বন্ধ করেই রাখা হয়েচে। সম্ভব হতে পারবে শুনে খুব খুসি হয়েচি। একান্ত আশা করি এখানে তোমাদের শরীর ভালোই থাকবে— লোকসঙ্গ ও বাক্‌প্রসঙ্গ দুই যথেষ্ট পাবে— পড়বার বইয়েরও অভাব হবেনা। তুমি সাক্ষাৎভাবে এখানে কোনো বিশেষ কাজ করতে পারো বা না পারো এখানকার atmosphere জমিয়ে তুল্‌তে পারবে— সেটার দাম সব চেয়ে বেশি, কেননা সেটাকে হাটে কিন্‌তে পাওয়া যায় না। উত্তরায়ণে যে বাড়িটাকে কোণার্ক বলি সেটাতে তোমাদের অসুবিধে হবেনা— তার ঠিক পাশেই আছে অমিয়দম্পতি— নিষ্করুণ হয়ে তোমরা তাদের মিলনপালায় রসভঙ্গ করবেনা একথা ধরে নিতে পারি। রথীরা কলকাতায়— তাদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে দেখতে পারো, তারা খুসি হবে। সম্প্রতি শীতাগমের পর থেকে এখানে আন্তর্জাতিক সম্মিলনটা খুবই চল্‌চে— এই বাহিরের নিরন্তর সংঘাতে এখানকার ভিতরের কাজগুলোর ব্যাঘাত ঘটচে। কিন্তু এই সমাগমটা আমাদের কাজেরই অঙ্গ— তাই নালিশ করা চলেনা। ইতি ৭ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৫] ঔ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২০ জুলাই, ১৯২৯

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমরা যদি এক আধ দিনের জন্যে এখানে এসে দেখে যাও তোমাদের ঘর দুয়ারের কি রকমের প্রয়োজন তাহলে আমরা সারিয়ে বাড়িয়ে তোমাদের ভালোরকম বাসযোগ্য ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এই বেলা মিস্ত্রি লাগিয়ে দিলে যথাসময়ে প্রস্তুত হতে পারবে। এখন এখানে মিস্ত্রি খাটচে, ব্যবস্থা করা সহজ— বিবিকে সঙ্গে এনো, তারো মত জানা দরকার হবে।

রীতিমত বর্ষা। ৩ শ্রাবণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৬] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১১ ডিসেম্বর, ১৯২৯

কল্যাণীয়েষু

এই কদিন আমার মনে একটা ধারণা ছিল যে তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ মনে সন্দেহ হল যে সেটা সংকল্পিত হয়েছিল রচিত হয়নি। নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপে এই রকমের প্রমাদ ঘটে। তোমরা নিশ্চয়ই এসো খৃষ্টজন্মসপ্তাহে। আশা করেছিলুম আগামী বৎসর থেকে এইখানেই বাসা বাঁধবে, এখন সংশয় লাগচে। আমি

আগামী রবিবারে দুইএকদিনের জন্যে কলকাতায় যাব তখন মোকাবিলায় আলোচনা হবে। ইতি ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাদের শীঘ্র য়ুরোপে যাবার কথা আছে। যদি ঘটে ওঠে তবে কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

বাংলা অধ্যাপনার জন্যে লোকের বিশেষ দরকার হয়েচে। একবার সতীশ ঘটক এখানে আসতে রাজি ছিলেন। তাঁকে পেলে খুবই খুসি হই। একবার চেষ্টা করে দেখবে কি? বিবিকে একটা ফরাসী কাগজ থেকে আমার সম্বন্ধীয় একটা আলোচনা তর্জ্জমা করতে পাঠিয়েছি— সেটা সে পেয়েচে কি? তোমার সেই গল্পগুলোর কী হল? আজকাল তোমার নতুন লেখার স্রোত বন্ধ আছে বুঝি? আমিও কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে' কলম বন্ধ করে আছি। ইতি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৮]

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, কোথায় তোমার কোন্ লেখা বিক্ষিপ্ত হয়ে দেখা দেয় আজকাল আমার চোখে পড়ে না। কাগজ পড়া ছেড়েও দিয়েচি। এককালে যে বালকবয়সে লোকালয়ের জঞ্জাল ও জঙ্গলের বাইরে ছিলেম আজ আবার সেই ফাঁকায় আশ্রয় নেবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠেচে। সব দায়িত্ব কাটিয়ে সব তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে দিয়ে জীবনের অন্ত্যলীলাকে আদ্য-লীলার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠেচে মনে। ছেলেবেলায় বিশুদ্ধ খেলা নিয়ে কাটত এখন বিশুদ্ধ খেয়াল নিয়ে থাকতে ভালো লাগে। অর্থাৎ ইস্কুল-পালানো নিয়ে জীবনযাত্রা সুরু করেচি। সেই ইস্কুল-পালানো নিয়েই এটাকে সাঙ্গ ক'রে দৌড় মারবার মৎলব।

গরম পড়েচে বৈ কি। কিন্তু এই তপ্ত হাওয়ায় যেমন মাঝে মাঝে খড়কুটো শুক্‌নো পাতার ঘূর্ণিনাচ চলচে আমারও মনের অনাবশ্যক অকিঞ্চিৎকর উড়ো ভাবনাগুলো চিদাকাশে ধূসর ওড়না উড়িয়ে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্চে। ইতি

৩ বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[১০৯]　　　　ওঁ　　　　পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, নিশ্চয় কাজে লাগ্‌বে। ব্র্যাডলির বই পূর্ব্বেই পড়েছিলুম, সেটা মনে নেই। আর একবার দেখে নিতে হবে। মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা দিয়েই লেকচারগুলো ভর্ত্তি করে দিতে হবে। আপাতত কমলা লেকচার নিয়ে পড়েচি। বিষয়টা মানবের ধর্ম্ম। সহজ করে সরস করে গৌড়ীয় ভাষায় লেখা দুঃসাধ্য কাজ। কেননা ভাষার অস্পষ্টতাবশত হঠাৎ লোকের মনে হতে পারে এ সমস্তই জানা কথা। নতুন জিনিষকে নতুন বলে উপলব্ধি করানো বাংলা ভাষায় সহজ নয়। লোকে আধখানা মন নিয়ে শোনে এবং হাঁ হাঁ করে যায়। তা ছাড়া আজকাল কলমটাও কৃপণ হয়ে পড়েচে, সবকথাটা পূরোপূরি বলতে জানেনা। অর্থাৎ এমন একটি সেবক পেয়েছি যে আমার অতিথিদের পাতে হাতা ভরে দিতে জানেনা। মেঘ কেটে গিয়ে নির্ম্মল আকাশে হেমন্তের আসর জমেচে। ইতি
২৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ

[১১০] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিবির চিঠির উত্তর আমি পত্রপাঠ দিয়েছি। তখন ছিলুম দার্জ্জিলিং। হয়তো ডাকঘরে পৌছবার পূর্ব্বেই সেটার দুর্গতি ঘটে থাকবে।

তোমার বইগুলো আমার বিশেষ কাজে লাগবে। অনেকদিন থেকে বিলিতি আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব নেই। অথচ এখন বাংলা সাহিত্যে সকলেই সেই পাড়ায় গুরুকরণ করে বসেচে। তারা যখন সব মডারন মন্ত্র আওড়াতে থাকে বোকার মতো বসে থাকি। এই দুর্য্যোগে বইগুলি যদি পাই তবে মান বাঁচাবার উপায় ঘটে। আমরা আছি মিড্ভিক্টোরীয় যুগের মাঝদরিয়ার বালুচরে— খেয়ার সুবিধে পেলে পার হয়ে আসি এপারে। কাল্চার সম্বন্ধে আমার তো এই অবস্থা। তোমার বইগুলি দখল নেবার উপায় শীঘ্রই করব।

আর্থিক অবস্থার কথা বলবার প্রয়োজন নেই— অনুমান করতেই পারবে।

দার্জ্জিলিং থাকতে নিরবচ্ছিন্ন অস্বাস্থ্য ভোগ করেছি। সেই দুঃখের কথাই চিঠিতে বিবিকে লিখেছিলুম। পায় নি ভালোই হয়েচে। কেননা এসব খবরের নিত্যতা নেই। উদ্বেগটা নিতান্তই বিড়ম্বনা।

সম্প্রতি ভালো আছি। অর্থাৎ জরার অবসাদ আছে, তার বেশি উপদ্রব নেই।

তোমার শরীর মনের যে রকম বিবরণ পাচ্চি তাতে তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে কোনো ফল পাবার আশা নেই। আমিই হয় তো কোনো কর্ম্মফল বশত রাজধানীতে উপস্থিত হতে পারি— কিন্তু তার নিশ্চয়তা নেই, ইচ্ছাও নেই।

আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে আশীর্ব্বাদ বিবিকে চিঠিতে দিয়েছিলুম সেইটে আর একবার তার কাছে রওনা করে দিলুম, আশা করি ডাকঘরের ভিতরে কি বাইরে কোনো বিঘ্ন ঘটবেনা। ইতি ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, যোগেশের ছেলের মৃত্যুর খবরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিছুকাল থেকে আমি আছি মৃত্যুর ছায়ায় ডুবে। নীতুর বই তার কাপড় তার জিনিষপত্র এসে পৌঁচেছে। যে নিজে যায় চলে সে যা কিছু ফেলে রেখে যায় তাতে তার বিচ্ছেদকে আরো দুঃসহ করে তোলে— সংসারের সমস্ত আয়োজনকে কী ফাঁকি বলেই মনে হয়। ওর একটি ডায়ারি পেয়েছি, অতি অল্প কিছুই লিখেছে, সেটুকু লেখার মধ্যে এমন একটি পরিচয় আছে তাতে ও যে নেই সেটাকে একটা নিষ্ঠুর

অন্যায় বলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যে মৃত্যুর সমস্ত ব্যর্থতা নিজের ঘরেই দেখচি বুঝতে পারচিনে জীবলীলার চরম অভিপ্রায়— সেই মৃত্যুই তোমাদের ঘরে এসেচে। অনুভব করচি যে প্রাণ গেছে— ছোটোবড়ো তার কতগুলো শিকড় সংসারের অন্তরে অন্তরে আঁকড়ে রয়েছে, তারা ছিল বিচিত্র আনন্দের সম্বন্ধসূত্র আজ তারাই অসহ্য বেদনার জাল বিস্তার করেছে চারদিকে— সান্ত্বনা দেবার কোনো কথাই নেই, স্তম্ভিত হয়ে নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হয়। মৃত্যু আপন বেদনা মারবার জন্যে বৈরাগ্য আনে— একমাত্র সেই বৈরাগ্যই— যে গেছে এবং যে সংসারটা পড়ে আছে তাদের মধ্যে নীরব গম্ভীর বাণী বহন করতে থাকে। ইতি ১২ অগস্ট ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ তোমার বইগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকদিন ছিলুম নানা কাজে নানা অকাজে আপাদমস্তক জড়িয়ে, আধুনিক কালের বাণীলোকে প্রবেশের ছুটি পাইনি। লোভ হোলো অত্যন্ত। কাজকর্ম্ম সব ফেলে দিয়ে আর একবার সাহিত্যের ভোজে রাজবৎ আনন্দে বসে পড়্তে ইচ্ছে করছে— সমস্ত কর্ত্তব্যকে হাঁকিয়ে দরজার বার করে দিয়ে। এইজন্যে বইগুলি আমার ঘরেই রাখলুম। দুই

কারণে— প্রথম আমাদের uncharted লাইব্রেরি কলকাতার চেয়ে আমার পক্ষে দুর্গম। তোমার পূর্ব্বদত্ত বইগুলি আজ পর্য্যন্ত জেনেনায়— নাম পর্য্যন্ত জানবার সুযোগ হয়নি। এদের জন্যে সেই অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করবনা। দ্বিতীয়ত এই বইগুলি তোমার অনেকদিনের সুখদুঃখের সঙ্গিনী (পুস্তক-সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী ব্যাকরণকে পছন্দ করি) যদি কখনো কোনোদিন কোনোটি তোমার স্মৃতিপটে উদিত হয় তাকে নির্ব্বাসন থেকে উদ্ধার করে তোমার হাতে দিতে দুঃখ পেতে হবে না। তোমার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎই রইল।

আমি নানা খুচরো উৎপাতে আছি— সরস্বতীর ক্ষুদে চরগুলি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে।

হয় তো অনতিকাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোকরি উপলক্ষ্যে কলকাতায় যেতে হবে তখন দেখা হতে পারবে। ইতি ১ ভাদ্র ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, নাচ সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে খুসি হলুম। উদয়শঙ্করের নাচের প্রধান গুণ হচ্চে এ নাচে তার আত্মশক্তি ও তার শিক্ষা দুইই মিলেছে। আঙ্গিক দিকে উৎকর্ষপ্রাপ্ত এ জিনিষটা— ভাবিক দিকে ক্ষুণ্ণ। ওর য়ুরোপীয় নৃত্যসঙ্গিনী

সিমকি বাইজিদের যে ভাওবাৎলানোর নকল করেছে— সেই ভাওবাৎলানোতে ভাবের গভীরতা নেই— তাতে নারী অঙ্গে কামনার লহরীলীলা প্রকাশ পায়। কামনা উদ্রেকের দ্বারা মন ভোলানো আর্টের ইতর পন্থা। জাভাতে জাপানে এর লেশমাত্র আভাস পাইনি— এ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগলোলুপ চিত্তবিকার থেকে সম্ভূত। যে কল্পনাবৃত্তির উৎকর্ষ থেকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয় উদয়শঙ্করের নাচে এখনো তার অপেক্ষা আছে। প্রোগ্রামের আরম্ভেই সেদিন নৃত্যকলাকে বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ চালনার বাহাদুরী দেখিয়েছিল, কোনো যথার্থ আর্টিস্ট্ এ কাজ করতে লজ্জা পেত— উপাদানকে উপকরণকে রূপসৃষ্টি যদি না ভোলে তবে তা সৃষ্টিই হয় না। উদয়শঙ্কর এখনো তা ভোলে নি, তার কারণ নদীপথের নুড়িগুলোর উপরে কল্পনানির্ঝরিণীর ধারা পূরো আনন্দে বইতে পারেনি।

ছন্দ সম্বন্ধে আমি যে বক্তৃতা পাঠ করেছি স্থানে স্থানে তার সঙ্গে তোমার এই লেখার অনেক মিল আছে।

সেদিনকার ডাকাতি ব্যাপারটা অদ্ভুত। সে যেন ডাকাতির ভাও-বাৎলানো— তার বেশি কিছুই না, কেবল ভয়ানক রসের ভাবভঙ্গী— ঝোড়ো রাত্রিটা ছিল এর উপযুক্ত পটভূমিকা— কারো লোকসান করেনি, কেবল আলোচনার রস জমিয়ে গেছে।

ব্যস্ত আছি অন্ধ্র য়ুনিভর্সিটির বক্তৃতায়। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

[১১৪] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধের সময় হঠাৎ কুমুদের খবর শুনে মনটা অত্যন্ত ধাক্কা পেয়েছে। এ রকম অপঘাতের অকস্মাৎ সংবাদে মৃত্যুশোকের বেদনা দ্বিগুণ তীব্র হয়ে ওঠে। মৃত্যুকেই আমরা সকলের চেয়ে ভুলে থাকি, অথচ মৃত্যু যখন ঘরের মধ্যে দেখা দেয় তখন বুঝতে পারি আমরা কী অসহায়— একেবারে চরম আঘাত, কোথাও কোনো আপিল নেই। বুঝতে পারচি তোমাদের ওখানে শোকের আবর্ত্ত কী রকম প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত হয়ে উঠেচে— কিন্তু কারো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই— যে কাল হরণ করে নিয়ে গেছে একমাত্র সেই কালেরই পরে নির্ভর করতে হবে, শোক আর সান্ত্বনা এক হাতেই। ইতি ৪ এপ্রেল ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৫] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ,… পর্শু শনিবারে দিন তিনেকের মতো যাচ্ছি কলকাতায়, অর্থাৎ বরানগরে— জোড়াসাঁকো আমার পক্ষে দুর্গম। রবিবারে একটা গল্প পড়ে শোনাব, অপরাহ্নে কোনো এক সময়ে— সময়টার নিশ্চিত তথ্য বোধ করি পাবে প্রশান্তের

প্রমুখাৎ—যদি আসতে পারো খুসি হবো— কিন্তু বিবি যেন চুল বাঁধতে অযথা দেরি না করে, কারণ কিনা পাঠের মাঝখানে এসে আসন সন্ধান ও সহাস্যমুখে গৃহকর্ত্রীকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা গল্পটাকে আহত করে দেয়। আমার প্যালেস্‌টাইন যাত্রার একটা জনশ্রুতি উঠেছে— এখনো সেটা কল্পনার সুদূরপ্রান্তে আছে সঙ্কল্পরূপেও দানা বাঁধেনি। সিংহলযাত্রাটা অনেকপরিমাণে সার্থক হয়েছে—শুধু অর্থের দিকে নয়— সেখানকার লোকের মন পাওয়া গেছে সন্দেহ নেই।

সোমবারে য়ুনিভর্সিটিতে সাহিত্যের তাৎপর্য্য নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করব প্রস্তাব পাঠিয়েছি— এটা অন্নঋণ শোধ করবার উদ্দেশে— শুনেছি না করলেও কারো লোকসান হয় না। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১১৬] ॐ

"Uttarayan"
Santiniketan, Birbhum

কল্যাণীয়েষু

তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্ব্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত— পালিশকরা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা

দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।

বেকার অবস্থায় তুমি উত্যক্ত হয়ে উঠেচ— আমার কর্ম্মের বিরাম নেই— মন ছুটির দরবার করে। বানপ্রস্থ্যের ডাক আসে কিন্তু রাস্তা বন্ধ। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত কাজের প্রোগ্রাম। ইতি ২৫ অগস্ট ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৭] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা দীর্ঘকাল কলকাতার আবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে আছ এইজন্যেই বদ্ধ হাওয়ার বিষে তোমাদের মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে। সমস্ত পৃথিবী এখন অর্থাভাবের গ্রহণ লাগা— তার ছায়া এখানেও আছে— কিন্তু একটা সুবিধে এই যে, যে হেতু এ জায়গাটা উদ্ধত সহর নয় সেইজন্যে দারিদ্র্যটা অত্যন্ত বেমানান হয়ে মানুষকে প্রতিদিন অবমানিত করে না। অভাবটাকে এখানে স্বভাবের মতোই করে নেওয়া চলে।

বিবিকে বোলো সঙ্গীতের যা সে সংগ্রহ করতে পেরেছে সেগুলো তার কাছ থেকে আনবার জন্যে বাহনের ব্যবস্থা সুবিধে পেলেই করে দেব। যে সব বই দুর্লভ, সেগুলোকে যেখানে সেখানে বিতরণ করায় প্রত্যবায় আছে। এখানে

দানগুলো সকলের জন্যে রক্ষিত হবার উপায় আছে। শুধু তাই নয় ওগুলো আমরা নূতন সংস্করণ করে ছাপিয়ে নিতেও পারি। পৃথিবীতে যারা নষ্ট করবার জন্যে নেয়, তারাই পায়োনিয়র, যারা রক্ষা করবার জন্যে নেয় তারা পরে আসে, তখন অল্পই বাকি থাকে।

তোমাদের কাছে আর একটা দরবার আছে, এখানে যন্ত্রশিখিয়ে লোকের অভাব ঘটেছে। পাওয়া সম্ভব কি? সেতার এসরাজ বাজাতে পারলেই চলবে। খুব পয়লা নম্বরের দামী চীজ, আমাদের মতো বামনের পক্ষে প্রাংশুলভ্য ফল। যে লোকটি রুগ্ন হয়ে চলে গেল সে পেত পঞ্চাশের কাছাকাছি। তোমাদের সংঘ বা সাম্মলনের বাজারে সন্ধান নিলে কি জুটতে পারে? ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১১৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজকাল যেন আলো কমে এসেছে তাই পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ বিচিত্রায় তোমার নাম দেখে তোমার লেখা গল্পটি পড়লেম। পড়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম। এ লেখায় তোমার সবুজ পত্রী যুগের উজ্জ্বলতা দেখে খুব খুসি হয়েছি। আজকাল যে সব লেখা বেরোয় তার মাঝখানে এই আকস্মিক আগন্তুকটির চেহারা দেখে চমক

লাগে, এর জাতই আলাদা। অনেকদিন চুপচাপ ছিলে, ভয় হয়েছিল তোমার আলো-ওয়ালা কলমের দীপ্তি পাছে কমে গিয়ে থাকে, দেখচি তার আশঙ্কা নেই। তোমার চেয়ে বয়সে আমি এগিয়ে গেছি— শরীরে মনে আমার অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এসে পড়েছে— হয়তো চিত্তযন্ত্রের এঞ্জিনটা এখনো বিগড়োয় নি কিন্তু চাকাটা হয়ে পড়েছে ঢিলে, চালাতে চাইলে তেলের অভাবে আর্ত্তনাদ করতে থাকে। বাহিরমুখো গতিবেগটাকে ভিতরবাগে প্রতিসংহার করবার চেষ্টায় আছি। কিছু না করাটা নিশ্চেষ্টতা বলে বোধ হয় না— তার মধ্যে এক রকম অচঞ্চল ক্রিয়াশীলতা সমাহিত আছে সেটা ভালোই লাগ্‌চে— নানা তুচ্ছ উপলক্ষ্যে পাঁচ জনে মিলে সেটাকে নাড়া দিতে এলে পরিণতপ্রায় ফলের উপর শিলবৃষ্টির মতো অত্যন্ত কড়া ঠেকে। ইতি ১৩ ভাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৯] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিচিত্রা আনিয়ে নিয়ে তোমার "নিয়তিবাদের প্রতিবাদ" পড়লুম। খুব ভালোই লাগল। এর মধ্যে তোমার রচনার স্বাদ সম্পূর্ণ মাত্রায় আছে। পরিচয় সম্পাদক কী বিচার করে এ লেখা অগ্রাহ্য করেচেন আমি বুঝতেই পারলুম না। যে শুনচে সেই বিস্মিত হচ্চে। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২০] ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

সাময়িক নানাপ্রসঙ্গে ভরা তোমার ঘরে বাইরে বইখানি পেয়েছি। লিপিনৈপুণ্য আছে কিন্তু বিষয়বস্তুগুলি চলতি মুহূর্ত্তের বিলীয়মান কালি দিয়ে লেখা। ইচ্ছা করচি নদীপথে বেরিয়ে পড়তে, কিন্তু বদ্ধ হয়ে আছি কর্ম্মজালে। নিষ্কৃতির আশায় আছি— পদ্মার ডাক আমার রক্তে এসে পৌঁচেছে। সুহৃৎ এবার এখানে এসে ভালো ছিল না— কলিকে ধরেছিল। আমার ওষুধে সেরেচে বলে আমার বিশ্বাস, তার বিশ্বাস বোধ হয় অন্যরকম। ইতি ৩০।১২।৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২১] ওঁ

* Sriniketan

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৪ জুলাই ১৯৩৭

কল্যাণীয়েষু

পত্রে লিখেছিলে একখানি বই পাঠিয়েছ কিম্বা পাঠাবে— সে সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে আমার অভিমত পেতে ইচ্ছা করো। আমি রাজি আছি যদি বইখানি পাই। তিন রাত্রি কেটে গেছে বইয়ের কোনো লক্ষণ কোনো দিগন্তে দেখচি নে। না পড়েও আমি একরকম নিশ্চয় বলতে পারি বইখানি ভালই

হয়েছে— কথাটা মিথ্যে হবেনা— কিন্তু সেটা হয়তো তোমার সন্তোষজনক না হতে পারে। তোমার বিজ্ঞপ্তির জন্যে লিখলুম। অলমতি বিস্তরেণ

রবীন্দ্রনাথ

---

[১২২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পেয়েছি ভারতবর্ষ। সাবাস্‌। খুব ভালো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার শিলমোহরের ছাপ পড়েছে অতএব এর দাম কম নয়। এ ধরণের লেখা আর কারো কলমে ফুটতে পারে না। সাহিত্যে যারা জালিয়াতি করে দিন চালায় তারা হতাশ হবে। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১২৩] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই গোলমাল চলচে— চীন জাপানের যুদ্ধই যথেষ্ট নয়, তোমাদের উপরেও চলচে দুর্গ্রহের অভিযান। তোমরা এখানে আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম— খালি ছিলনা ঘর— তোমাদের বদলে এসেছিল

বিস্তর আগন্তুক। তোমার শরীরের খবরও সন্তোষজনক নয়। তোমার লেখাটার জন্যে তোমাকে লিখতে যাচ্ছিলুম— শেষ হয়ে গেছে শুনে খুশি হয়েছি। যদি নিতান্তই আসবার ব্যাঘাত হয় সেখানা পাঠিয়ে দিয়ো। ভালো নিশ্চয়ই লাগবে বলে ধরে রেখেছি। ইতি ২৪।৮।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

তোমার আর্য সভ্যতা ঠিক আমাদের কাজে লাগবে। এটা বিবির তর্জমার উপক্রমণিকার মতো হয়েছে। বিবির ওটা খুব ভালো হবে। সম্পূর্ণ করতে বোলো। অত্যন্ত গরম এবং অত্যন্ত ব্যস্ততায় মিলে ভবযন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলেছে। বাড়িতে আমি আছি সম্পূর্ণ একা। একটি নাৎনী আছে ব'লে রক্ষে। ইতি ১৩।৯।৩৮

রবীন্দ্রনাথ

[১২৫] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

একে চোখে কম দেখি মনের তেজও কমেছে তার উপরে ভাষাপরিচয়ের রচনা, তাসের দেশের রিহার্সাল, অন্তরে

বাহিরে তাড়া খেয়ে কিছু কিছু ইংরেজি লেখা, এই সব ব্যাপারে দিনরাত ধাঁদা লাগিয়ে রেখেছিল তাই তোমার চিঠির জবাব দিতে পারিনি। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসচে বলে পারতপক্ষে চিঠি লেখালেখি করি নে। চোখ মেলে দেখাটাই জীবনে আমার প্রধান শখ, ওরা আপন কাজে ঢিল দিলে সেটা আমার পক্ষে শোচনীয়। তুমি ইতিহাসে ভূগোলে মিলিয়ে যে বই লেখবার সংকল্প করেছ সেটা ভালো কথা। তোমার ইতিহাসের চটি পেট ভরাবার মতো হয়নি। আমার এই অত্যন্ত ব্যস্ততার দিনের অবসান হলেই বিবির বইখানা নিয়ে পড়ব। ওটার কপি হয়ে গেছে, আগেকার মতো দুর্গম নেই। ইতি ২০।১১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৬] ওঁ

"UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমার লেখাটি রথীর হাতে দিয়েছি, সে ব্যবস্থা করবে। রথী বিশেষ কাজে কলকাতায় গেছে। এখানে তোমাদের বাসস্থানের সুযোগ করবার উদ্দেশে ···কে একখানা চিঠি লিখেছি— তিনি এখানে একটা বাড়ি আশ্রয় করে থাকেন— প্রায় অনুপস্থিত থাকেন— তার একতলায় তোমাদের জায়গা হতে পারে— এককালে ওখানে আমি

ছিলুম। আমার বিশ্বাস …কে রাজি করা যেতে পারে। ইতি ১৫।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৭] ওঁ

"UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

প্রমথ

তোমার লেখাটি রথী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারীর জিম্মে করে দিয়েছেন— ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছবে কি না সংশয় আছে— ওঁদের দল আছে এবং ছাঁচ আছে। আমরা স্থির করেছি যদি বাধা পাই বিশ্বভারতীর তরফ থেকে ছাপতে দেব। অপেক্ষা করে দেখা যাক। আমাদের প্রস্তাবে তোমার সম্মতি থাকলে জানিয়ো।

খুব আশা করেছিলুম … তাঁর অধিকৃত বাড়িতে তোমাদের আশ্রয় দিতে আপত্তি করবেন না। ভুল করেছিলুম হোলো না। আশ্রমে বাসের টানাটানি নিয়ে আমরা প্রায়ই দুঃখ পাচ্চি। তোমরা থাকলে কাজে লাগাতে পারতুম। চেয়ে থাকব সেই সুযোগের জন্যে।— এপ্রিলের আরম্ভে কলকাতায় আমি যেতে বাধ্য সেই সময়ে মোকাবিলায় আলোচনা হবে। ইতি ২৩।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৮] ঔ পোস্টমার্ক, মংপু

১১ জুন, ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

তোমার ছোটো গল্প পড়ে চেকভের ছোট গল্প মনে পড়ল। যা মুখে এসেছে তাই বলে গেছ হাল্‌কা চালে। এতে আলবোলার ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এ রকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যে ভূরিভোজন ভালোবাসে— তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছ— কিম্বা ভাববে ঠাট্টা।

বিবি আমার শরীরের খবর চায়— বিশেষ করে বলবার মতো নয়। গ্রীষ্মকালের অজয় নদীর মতো দশা, স্রোত বয় না— এখানে ওখানে প্রয়োজনের মতো জল পাওয়া যায়। খেয়ালমতো লেখার জোগান দিই কিন্তু সে হাঁটুজলের জোগান। বেঁচে থাকলেই দাবীর অন্ত থাকে না— নাম রক্ষে করার মতো সম্বল কোথায়। আমার অবস্থাটা হয়েছে সেই রকম, যখন পাওনাদার ভিড় করে দাঁড়ায় আপিসে, খাতাঞ্চি মুখ লুকিয়ে থাকে বাসায়। সামান্য কাজ করতেও এত অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি বোধ হয় যে বেঁচে থাকাটা দুর্ভর হয়ে উঠেছে। এতদিন ধরে অনেক তো দিয়েছি—কিন্তু দেওয়া একটু বন্ধ হলেই পূর্বদানের উপরেও বদনাম আসে। দীর্ঘায়ুর বিপদ ঐ— সাবেক চালের ভূতটা কাঁধে চেপে থাকে তার পিণ্ডি জোটে না।

আষাঢ়ের আরম্ভে স্বস্থানে ফিরব।

রবীন্দ্র

[১২৯] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, ২৪ জুলাই, ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

পুস্তিকাখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দ হয়নি। আমরা নিয়েছি। ওর মধ্যে আমার হাত চালিয়েছি অনেকখানি। তার কারণ, ওটাকে আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের আদর্শে তৈরি করতে হোলো। ভয় আছে পাছে জিনিষটাকে না চিনতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ। যাই হোক, ওটা এইবার প্রেসে চড়বে—পূজোর পূর্বেই আট-আনা সংস্করণের মাপে বেরবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩০] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

বৌমার ছবি-আঁকা হাতের একটি লেখা তোমাকে পাঠাই। আমার তো মনে হোলো ভালো হয়েছে তোমারও যদি তাই মনে হয় অলকায় ছাপাতে পারো। ঘোমটার আবরণে ইতিপূর্বে ওঁর দুটো একটা লেখা প্রবাসীতে বেরিয়ে গেছে।— মংপু পাহাড়ের পথে আগামী বুধবারে রওনা হব কলকাতায়। আগেকার মতো কলমের ক্ষিপ্রবেগ নেই।

থাকলে অলকাকে করা যেতে পারত দ্বিতীয় সবুজ পত্র। এখন পাতায় হলদে রং ধরে আসচে। ইতি ১।৯।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১৩১] ওঁ পোস্টমার্ক, মংপু

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ বিশিকে একখানা পত্র লিখেছি। কিন্তু ঠিকানা পাচ্ছিনে। তুমি নিশ্চয় জানো। যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ো।

এখানে শরৎকালের দুর্গতির একশেষ— ঘোর শ্রাবণ হিটলরের মতো এর করিডর অধিকার করে বসে আছে— একেবারে সারেণ্ডার। আয়ু থেকে একটা শরতের আলো বাদ পড়লে ভালো লাগেনা, কটাই বা আছে। কবির জন্যে তাকিয়ে রয়েছে শান্তিনিকেতনের শিউলি বন, আর সূর্যাস্তের আকাশ। ইতি ২।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ

---

[১৩২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এতদিনে হিন্দুস্থান পেয়ে থাকবে। হয় তো তোমার কোথাও কোথাও খটকা লেগেছে, তোমার সঙ্গে কিছু কিছু অমিল থাকাও অসম্ভব নয়। তোমার মুখের কথাকে আমাদের

প্রয়োজনবশত কলমের কথায় বদল করতে হয়েছে— কিছু ছাঁটাও পড়েছে কিছু জোড়াও লেগেছে— তোমার কপিটা মিলিয়ে দেখলে দেখ্‌তে পাবে চলতি কথার ধর্মবশত তার মধ্যে নানারকম মিশোল ছিল— যাই হোক মাঝে মাঝে যে অল্পস্বল্প বদল হয়েছে, তাতে তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি— তোমারি লেখার রস এবং মালমসলা ওতে প্রভাবান্বিত হয়েই আছে।

বিবির একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আমার শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে। এখন যেটুকু বাকি আছে সে ফাটল ধরা ও কানাভাঙা। বিবি যদি সামনে উপস্থিত থেকে চেপে ধরত তাহলে হয় ত অগত্যা গুনগুন করতে করতে কিছু আর্তধ্বনি বেরত। আজকাল আমি গানের অন্তরা ভাঁজতে ভাঁজতে আস্থায়ীটা ভুলে যাই— কাউকে সামনে বসিয়ে সুর দিতে হয়। এ রকম কৃচ্ছসাধন ইচ্ছে ক'রে কি চালানো যায়। দিনের নানা খুচরো কাজ এসে পড়ে, তলিয়ে পড়ে সেইগুলোই যেগুলো ভারি এবং সহজ নয়।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের একটা বিবরণ সংগ্রহ করে লিখেছি যদি মর্জি হয় অলকায় দিতে পারো।

আগন্তুকের বিষম ভীড়, প্রাণ বেরিয়ে গেল। কাজকর্ম ক্ষতবিক্ষত, অকাজ ধরাশায়ী। ১০।১।৪০

রবীন্দ্রনাথ

[১৩৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, ফিনল্যাণ্ড তুমি পরিচয়েই পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিষটা সাময়িক কিন্তু অলকা পত্রটি অসাময়িক হয়ে পড়েছে পঞ্জিকার বিধান মানে না। তোমাকে খুশি করবার জন্যই ওটা পাঠিয়েছিলুম। পরিচয়ে প্রাচীন হিন্দুস্থানের সমালোচনার জন্যে হাবলকে তুমি অনুরোধ কোরো। আমি দূরে থাকাতে পাব্লিসিটি ক্ষেত্রের বাইরে পড়ে আছি অব্‌স্কুরিটির গহনে। ইতি ১৩।১।৪০

রবীন্দ্রনাথ

---

[১৩৪] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এবার পরিচয়ে তোমার গল্পটি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি, না লিখে থাকতে পারলুম না। বয়স হলে কলমকে বাতে ধরে, কিন্তু তোমার কলম এখনো যে রকম খাড়া চলতে পারে এমন তো আর কারো দেখিনি। এ একেবারে তোমার খাসদখলের লেখা, আর কারো হাত দিয়ে বেরবার জো নেই। আজ তোমার এই পরিচয়ের দরকার ছিল, কেননা বাজে লোকেরা উস্‌খুস্‌ করতে আরম্ভ করেছিল।

যারা জাত আনাড়ি তারা যখন ওস্তাদি ফলাবার সুযোগ পায় তখন সেটা শোকাবহ হয়ে ওঠে। সেইজন্যে খুব খুষি হয়েছি। খাঁটি জিনিষ একটা আধটাই যথেষ্ট, সেই কথাটা আমাদের দেশের বদরসিকদের বোঝানো শক্ত,—কালকেতুর ব্যাধের মতো তাদের গ্রাস—মাসে মাসে মুঠো মুঠো অপথ্যর জোগান দিতে না পারলে তাদের বাহবা মিইয়ে আসে। আজকালকার বাজারে বিলিতি ভেজালের গতিক দেখে মনের মধ্যে লেখবার তাগিদ পাইনে। এবার পাততাড়ি গুটিয়ে নেবার সময় এল। ইতি ৬ শ্রাবণ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়

অঘোর—অঘোরনাথ মৈত্র, মোক্তার
অজিত—অজিতকুমার চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক
অতুলবাবু—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক
অনাথবাবু—অনাথকৃষ্ণ দেব, শোভাবাজার
অনাদি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও সংগীতশিক্ষক
অনিলা দেবী—'যমুনা' পত্রিকায় একদা-ব্যবহৃত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।
অপূর্ব্ব—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছা
অমল—শ্রীঅমল হোম
অমিয়—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী
অমিয়া—শ্রীহৈমন্তী দেবী, অমিয় চক্রবর্তীর পত্নী
অমৃত রায়—অমৃতলাল রায়, নায়েব
অম্বাচরণ—অম্বাচরণ মৈত্র, জমিদারির সার্ভে আমিন
অরু—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র
আঢ্য, মিস্—শ্রীবীণা আঢ্য, বাঙালী খ্রীস্টান সুগায়িকা
"আর একজন ভারতবর্ষীয়" (পৃ ২১)—ভাই প্রমথলাল সেন, নববিধান সমাজের প্রচারক
আরিয়াম, এরিয়াম—শ্রীআর্যনায়কম এরিয়ম উইলিয়মস্, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন সিংহলী অধ্যাপক
আর্য্য—আর্যকুমার চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র
আশু—স্যর আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
"একটি শরীরী" (পৃ ১৪৮)—মধ্যমা কন্যা রেণুকা, জন্ম ইং ১৮৯০

এণ্ডার্সন—জে. ডি. এণ্ডার্সন, কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক

এণ্ড্রুজ—C. F. Andrews, সি. এফ. এণ্ড্রুজ

ওকাকুরা—কাকুজো ওকাকুরা, জাপানের সুবিখ্যাত মনীষী

কমল—কমলা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

কল্যাণ—শ্রীকল্যাণকুমার চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ কুমুদনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র

"কাঠের পুতুলটা" (পৃ ১৯৬)—দ্রষ্টব্য 'কাঠের রাজা', বীরবল ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ মাঘ, পৃ ৪৫৫-৫৭

"কারমাইকেলের হাঙ্গাম" (পৃ ১৯৫)—বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের শান্তিনিকেতন পরিদর্শন, ২০ মার্চ ১৯১৫

কুমুদ—কুমুদনাথ চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ

কৃষ্ণকুমার মিত্র—সুবিখ্যাত দেশনেতা ও সঞ্জীবনী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক

ক্র্যামরিশ—শ্রীমতী স্টেলা ক্র্যামরিশ, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত

ক্ষিতিমোহন বাবু, ক্ষিতিবাবু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

খগেন—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এটর্নি ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়

খুকু—অমিতা সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোপাল—গোপাল চট্টোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকোর প্রাক্তন সরকার

গোপীনাথ—দক্ষিণী নৃত্যশিল্পী, রাগিণী দেবীর তৎকালীন নৃত্যসঙ্গী

গোপেশ্বর—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু, চারু বাঁড়ুয্যে—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক

চিত্তরঞ্জন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

ছোট বউ—কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী

জয়া—শ্রীজয়শ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীকুলদাপ্রসাদ সেনগুপ্তের পত্নী

জ্যোৎস্না—স্বর জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র

ডাক্তার নাইডু—মেজর গোবিন্দরাজু নাইডু, শ্রীসরোজিনী নাইডুর স্বামী

ডাক্তার সরকার—নীলরতন সরকার

তারকবাবু—স্বর তারকনাথ পালিত

দাদা—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত অগ্রজ

দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র

দিলীপ—শ্রীদিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র

দ্বিজু রায়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সাহিত্যিক

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র—ডাঃ ডি. এন্. মৈত্র, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা

দ্বিপু—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র

ধূর্জটি—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নগেন—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা

নগেন্দ্র—কবিশ্যালক শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

নতুন বৌঠান—কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

নরু—নরেন্দ্রবালা দেবী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী

নলিনী—নলিনী দেবী, দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা

নলিনী (পৃ ১১৬)—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী, নায়েব

নলিনীরঞ্জন—শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা নলিনী দেবীর স্বামী

নাটোর—জগদিন্দ্রনাথ রায়, নাটোরের মহারাজা

নদিদি—স্বর্ণকুমারী দেবী

নাৎনি—শ্রীনন্দিনী দেবী, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

নীতু—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র

নীলরতনবাবু, নীলরতন ডাক্তার— ডাক্তার নীলরতন সরকার

নুটু—রমা দেবী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অন্যতম কনিষ্ঠা ভগিনী ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী

নেপু—শ্রীনরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র

পঞ্চাশ নম্বর পার্কষ্ট্রিট (পৃ ১৬৪)— সত্যেন্দ্রনাথের বাটী

পল্টু কর—প্রমথ কর, এটর্নি

পিয়ার্সন—উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইংরেজ অধ্যাপক

পুপু, পুপে— শ্রীনন্দিনী দেবী, 'নাৎনি' দ্রষ্টব্য

প্রতিমা— শ্রীপ্রতিমা দেবী, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

প্রবোধ— কবিসুহৃদ্ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক

প্রভাস মিত্র— স্যর পি. সি. মিত্র

প্রভাতকুমার (পৃ ৯৫)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক

প্রভাতকুমার—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক

প্রমথ— শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা

প্রমথ বিশি— শ্রীপ্রমথনাথ বিশি, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

প্রশান্ত— শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

প্রশান্তনিকেতন— শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাটী, বরাহনগর

প্রিয়— কবি প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রমথনাথের ভাগিনেয়ী

প্রিয়বাবু— প্রিয়নাথ সেন, কবিসুহৃদ্

"ফরেন মিনিস্টার" (পৃ ৮৫)— শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

বঙ্কিমবাবু— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বনমালী— রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের ভৃত্য

বরদাবাবু— শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, সাহিত্যিক

বলু— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের পুত্র

বড়দিদি— সৌদামিনী দেবী

বাড়ুয্যের পুত্রবধূ— গার্ট্রুড্ বোনার্জি, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডব্লিউ. সি. বোনার্জি) জ্যেষ্ঠপুত্র শেলী বোনার্জির পত্নী

বিবি— শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা

বিহারী চক্রবর্তী— বিহারীলাল চক্রবর্তী, 'সারদামঙ্গল'-এর কবি

বীরেশ্বর— শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার

বেবি— শ্রীনলিনী দেবী, অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী

বেলা— মাধুরীলতা দেবী, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা

বুবু— শ্রীপূর্ণিমা ঠাকুর, শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরীর কন্যা, ও সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

বৌমা— শ্রীপ্রতিমা দেবী, 'প্রতিমা' দ্রষ্টব্য

ব্রজেন্দ্রবাবু— ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মঞ্জু— শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী

মণ্টু— শ্রীদিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র

মন্দিরা— শ্রীমন্দিরা গুপ্ত, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

মন্মথ— মন্মথনাথ চৌধুরী, প্রমথনাথের অনুজ

মণিলাল— মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম জামাতা

মরিস— এইচ. পি. মরিস, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন পার্শী অধ্যাপক

মহেন্দ্র— মহেন্দ্রলাল রায়, প্রমথনাথের দেশস্থ কর্মী
মীরা— শ্রীমীরা দেবী, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা
মুনীন্দ্র— মুনীন্দ্র সর্বাধিকারী, জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী
মেজদাদা— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেজবৌঠান— জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী
মেনা—মৃণালিনী দেবী, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠা ভগিনী
মেব্‌ল্—লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্নী
যামিনীকান্ত সেন—সুপরিচিত শিল্পকলারসিক
যোগেশ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ
যোগিনী—যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ
জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ
য়েট্‌স—W. B. Yeats, আইরিশ কবি
রথী—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র
রাগিণী দেবী—ভারতীয়নৃত্যকুশলী য়ুরোপীয় মহিলা
রামেন্দ্রসুন্দর—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
রোটেনস্টাইন—উইলিয়ম রোটেনস্টাইন, সুবিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী
রোমাঁ রোলাঁ—Romain Rolland, ফরাসী সাহিত্যিক
লটি—শ্রীস্নেহলতা সেন, বিহারীলাল গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা
লাহোরিণী—শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী
লিল্—লিলিয়ান [বাসন্তী লগনা] পালিত, তারকনাথ পালিতের কন্যা
লেভি সাহেব—সিলভ্যাঁ লেভি, সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষী, একদা
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক
লোকেন—লোকেন্দ্রনাথ পালিত, তারকনাথ পালিতের তৃতীয় পুত্র
শাস্ত্রীমশাই—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক
শিবু—শ্রীশিবকুমার চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র

শৈলেন্দ্র—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, জমিদারির জুনিয়র উকিল

শৈলেশ—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুজ, একসময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশক

শ্রীমতী—শ্রীমতী হাথী সিং, বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন গুজরাটী ছাত্রী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

সতু—সত্যেন্দ্রনাথ পালিত, তারকনাথ পালিতের কনিষ্ঠ পুত্র

সত্য—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কবির বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর পুত্র

"সত্যকুমারের স্ত্রী"—শ্রীবিভাময়ী দেবী, শিলাইদহ সদর আফিসের সেক্রেটারি সত্যকুমার মজুমদারের পত্নী

সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ও কর্মী

সরলা—সরলাদেবী চৌধুরাণী, স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যমা কন্যা

সরস্বতী—শ্রীসরস্বতী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতমা দৌহিত্রী ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী

"সাকিসের হাঙ্গামা" (পৃ ২৭২)—সাকিস, কলিকাতাবাসী জনৈক আরমানী সংগীতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সংগীতের কয়েকটি ইংরেজি স্বরলিপিতে হার্মনি বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুধা—শ্রীসুধাময়ী দেবী, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্নী

সুধী—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র

সুনীতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুবীর—শ্রীসুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র

সুবোধ—সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র

সুরেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পণ্ডিচেরী

সুহৃদ—শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা

হাবলু—শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র

হাবল—শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

হারাসান—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন জাপানী ছাত্রী

Barbusse—Henri Barbusse, আঁরি বারবুস্, ফরাসী সাহিত্যিক

Clarté—উক্ত নামে খ্যাত ফরাসী নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মুখপত্র

Benoit—F. Benoit, এফ. বেনোয়া, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ফরাসী অধ্যাপক

Elmhirst—L.K. Elmhirst, এল্, কে, এল্ম্‌হার্স্ট্, বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের পূর্বতন ইংরেজ পরিচালক ও কর্মী

Gourlay—W. R. Gourlay, লর্ড কারমাইকেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি

N. C. O.—নন্‌-কো-অপারেশন

Ollendorff—সুবিখ্যাত জর্মান ভাষাবিদ্

Rothenstein—'রোটেনস্টাইন' দ্রষ্টব্য

Sylvain Levy—'লেভি সাহেব' দ্রষ্টব্য

Tree daubing (পৃ ১৬৬)—"The tree daubing mystery offered the widest grounds for speculation. This movement consisted in marking trees with daubs of mud....It slowly spread through the North-Gangetic districts...and was generally attributed to wandering gangs of *Sadhus*... The movement died out in a few months and the result seemed to show that it had no real political significance."—Buckland, Bengal under the Lieutenant Governors, Vol II, p. 954.

---

* পত্রের সর্বত্র তারকা চিহ্ন চিঠির কাগজে মুদ্রিত ঠিকানা নির্দেশক।

সঞ্চয়িতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত
পথে ও পথের প্রান্তে। রানী মহলানবীশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

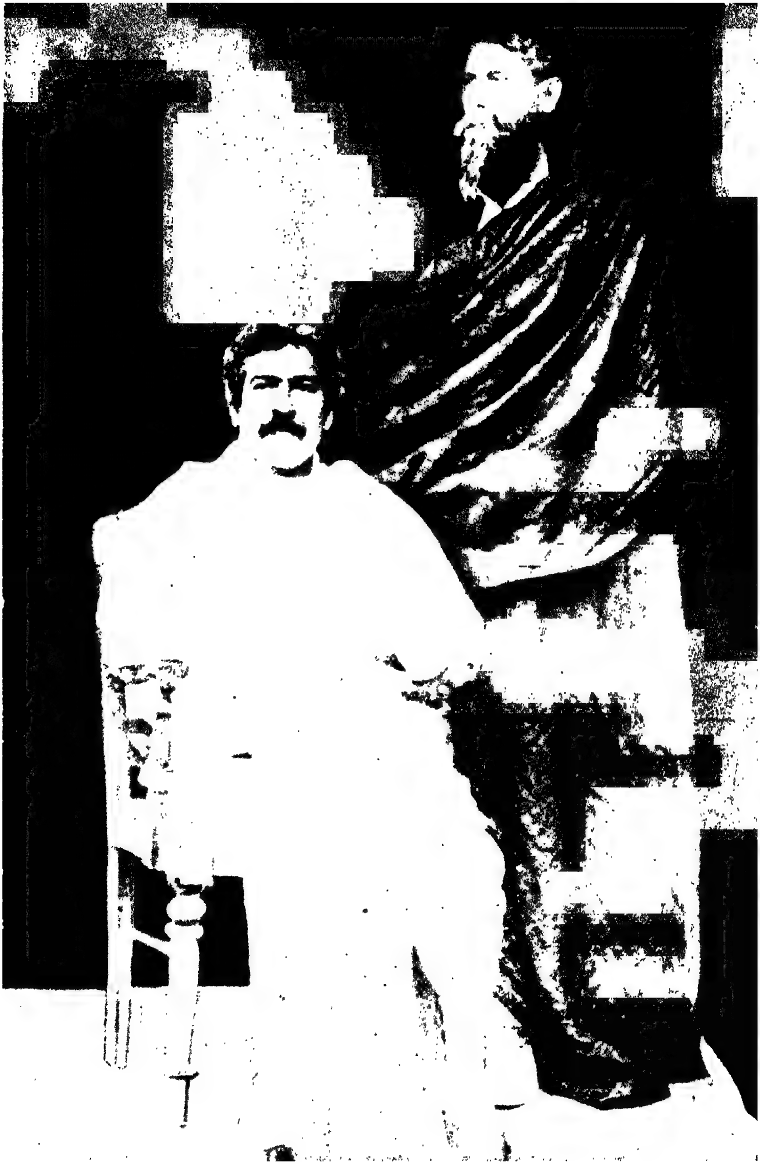

ষষ্ঠ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA-BHARATI
3365 85
LIBRARY

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ ষষ্ঠ খণ্ড

জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ বৈশাখ ১৮৭৯ : মে ১৯৫৭
সংস্করণ মাঘ ১৩৯৯ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক ম্যাসকট প্রেস
২৪৬এ/বি মানিকতলা মেন রোড । কলিকাতা ৫৪

সূচীপত্র

প্রবেশক : বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রাবলী ১
অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্রাবলী ৮১

সংযোজন

জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্র ৯৪গ
অবলা বসুকে লিখিত পত্র ৯৫ঘ

পরিশিষ্ট

১ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ৯৭
২ রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ ১০৫
৩ রবীন্দ্রনাথের পত্র ১২৯
৪ রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর ১৩৯
৫ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র ১৪৩
গ্রন্থপরিচয় ১৫৫

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র প্রবেশক
জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ৫৪
বিলাতে জগদীশচন্দ্র ৩৫

পাণ্ডুলিপি-চিত্র

১ সংবর্ধনা সংগীত : জয় হোক তব জয় ১০০
২ যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু ৭৪-৭৫
৩ আবাহন : মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন ৬৪
৪ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার -প্রাপ্তিতে জগদীশচন্দ্র ৬২
৫ জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৬

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে,
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে !
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিন্ধুপার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ !
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪
[19 July 1897]

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১

২৬ মে ১৮৯৯

ওঁ

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিচর্য্যার জন্য আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে— প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে— ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, শঙ্কা হয় পাছে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে ফাঁকি দিয়া বসেন। দার্জ্জিলিঙ্গেও যদি এখানকার অনুরূপ বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ঈর্ষা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কান্নার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনাদের শৈলনীড়ের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়— কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে দুরাশা মনে স্থান দিই না। রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে— সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি— এক একবার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে— জোর করিয়া মনটাকে

সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়— কিন্তু সেই জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে— যেমন করিয়া হৌক্ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে— তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত— পাব্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে— কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়— উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে। শরীর আজ পীড়িত আছে— এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry.

প্রিয়বরেষু

দার্জ্জিলিঙের ঠিকানায় আমি আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি না জানি না। আপনার পত্রে দার্জ্জিলিং ছাড়া আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেরূপ প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে এখন বোধ করি নদীনির্ঝর ও সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ভূখণ্ড শিলাখণ্ড পাহাড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে— আপনারা কি শিখরদেশেই অটল হইয়া থাকিবেন? যদি নামেন ত এই পদ্মা নদীর পথটা কি অনুসরণ করিতে পারেন না? এখন আকাশ মেঘে, নদী জলে, এবং পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু জানালা আছে কি করিতে? আপনাদের বাইসিক্‌ল্ চলিবার মত একটা পথ গড়িয়া লওয়া গেছে।

আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম— সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সেই অর্দ্ধশ্রুত

গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সায়াহ্নে আপনাদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব। ইতি ৪ঠা আষাঢ়! ১৩০৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২৪ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেষু—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তুতিনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য্য হইতে পারি না বলিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকি; কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দেওয়া চলে না; প্রেমদাসের একটা গানে আছে :—

বৃথা শোচ কুছ কাম ন আওয়ে—
ভোগ বিনা নাহি মিট্‌না।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হয় না— যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার যো নাই। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পরম সুখ এই যে বন্ধুদের সস্নেহ হৃদয় নিজের বেদনার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ বারোজন লোক অহর্নিশি

তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে— লরেন্স্ স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে— প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটী পাইলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমার চাষ-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম— তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।

আপনারা উভয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১৭ সেপ্টেম্বর [১৯০০]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্‌টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করচি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন্। কাউকে রেয়াৎ কর্‌বেন না— যে হতভাগ্য surrender না কর্‌বে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন— আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সৈন্য-সম্প্রদায় গেঁথে যে-রকম ব্যূহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্ট্‌মাস্ করতে পার্‌বেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয়গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব— আপনি কি কর্‌লেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ কর্‌তে হবে না, কেবল টাইম্‌স্ পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোন্‌বামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন

আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বল্‌বে, আমরা বড় কম লোক নই ; অন্য কাগজে বল্‌বে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার কর্‌চি ;— এদিকে আপনার জন্যে কারো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আন্‌বেন তখন আপনি আমাদের ;— চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই ; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি— আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী কর্‌চিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ কর্‌বার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে

হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্চে— অতএব মৃত র‍্যাফেল্ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাক্‌তে পারেন— আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিখরে টান্‌বার জন্যে চেষ্টা কর্‌চে— কিন্তু আমি নড়্‌চিনে। ঋষিরা যখন পর্ব্বত-শিখরে তপস্যা কর্‌তে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল— কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সে কথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি, দার্জ্জিলিঙের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বালুতটে শারদশ্রীর শুভ শুভ্র সমাগম প্রতীক্ষা কর্‌চি। বোধ করি, মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কাশ্মীরে হোক্, উড়িষ্যায় হোক্, ত্রিবাঙ্কুরে হোক্, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত কর্‌বেন না— সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাথেয় সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌চি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্যে অত্যন্ত তাগিদ কর্‌চেন— বেলাও হয়েচে। অতএব ক্ষণকালের জন্যে মার্জ্জনা কর্‌বেন— আমার অধিক দেরী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল

মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি। আমি ছবি আঁকৃচি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখ্‌তে ব'সে গেছে শুনে বোধহয় কম আশ্চর্য্য হবেন না। তার এতই দুরবস্থা হয়েচে! বেচারাকে শেষকালে কবিতা লেখালে। ওমার খায়েমের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ কর্‌চে। দুই-একটা নমুনা দেখ্‌লে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন :—

মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
থাকিস্‌ মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
সুদ পাবি ব'লে ফেলে রাখিস্‌ পাওনা,
ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে!

এই সমস্ত কবিতায় লোকেন মূলধন ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্‌ জারি করেচে— সুদ চায় না, লাভ চায় না, যা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়— আমি এ ব্যবসায়ে শেয়ার কিন্‌তে প্রস্তুত নই।

আপনার শ্যালকজায়া আর্য্যা সরলা, বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়্‌তে আরম্ভ করেচেন। শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ কর্‌চেন— পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুসীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত

ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চ্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চ্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনার জন্যে পুরীর জমীটি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব ব'লে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্ত্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েচে। জোর যার মুল্লুক তার যদি সত্য হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাকৃতে থাক্‌তেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পার্‌তেন তাহ'লে ও লোকটা দাবী কর্‌তে পার্‌ত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— মাঝে মাঝে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্চে— মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলাদরজাগুলো হুদ্দাড় ক'রে দিয়ে যাচ্চে। এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটীর ভাব এনেছে— সেই কর্ম্মপরায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ করিনে— তার পরে আবার যেদিন একটু বাদ্‌লা হয়, বা শরতের রৌদ্র ওঠে, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটী নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে ব'সে আছি— ঝর্‌ঝর শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়্‌চে।

পত্রোত্তর দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছা করেন তাহ'লে আর্য্যার শরণাপন্ন হবেন— তিনি যদি আপনার হ'য়ে উত্তর দেন তাহ'লে আমার কোন নালিশ থাক্‌বে না। তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুক্‌রো খবরটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে পরম উপাদেয়, এটুকু মনে রাখ্‌বেন। কে কি বল্‌চে, কি লিখ্‌চে, কি হচ্ছে সমস্ত আদ্যোপান্ত জান্‌বার জন্যে সতৃষ্ণ হ'য়ে আছি। ইতি ১লা আশ্বিন [১৩০৭]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০০]

বন্ধু

সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি— প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই— শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে :— পোষ্টমাষ্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি

পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বেই বলিয়াছি— আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২০ নভেম্বর ১৯০০

ওঁ কলিকাতা

বন্ধু

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বদ্ধ থাকতে হয়েচে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্ব্বে এখানে যখন আস্‌তুম তোমাদের ওখানেই সর্ব্বপ্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সে-রকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল— তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুঞ্জন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আস্‌তুম নিজেকে আজও সেই রকম পূর্ণ বোধ করচি। এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্ত্তব্যের গৌরব পুনর্ব্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি— সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চয় করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আমার সংসারবন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বল্‌ব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে

তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেচেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব— তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমার গল্প তর্জ্জমার জন্যে ধরেছি— কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্যে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারি নে। সে এখন আমার কাব্যনির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেছি— তার অনেকগুলি সখের কবিতা এই Selection থেকে নির্ব্বাসিত করে বইটাকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা গেছে— এখনো দুই এক জায়গায় একটু আধটু কণ্টক লুকিয়ে আছে—সে আর পারা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে “নৈবেদ্য” বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্ম্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-সুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল— তাঁর কাছে নির্জ্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে

যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীঘ্রই এগুলো ছাপ্‌তে দেব— বোধ হয় তুমি ইংলণ্ডে থাক্‌তে থাক্‌তেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নির্জ্জন দেবালয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজ্‌বে কি না জানি নে— এর আনন্দ এবং বিষাদ এবং শান্তি সেখানে কি রকম শোনাবে?

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম— তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম— তিনি ভারি খুসি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি— সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি— শিলাইদহের নীড়টির জন্যে প্রাণ কাঁদচে। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ডিসেম্বর [১৯০০]

ওঁ

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। যত পার তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে— তন্ন তন্ন বিবরণের জন্য আমি ক্ষুধাতুর— কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ো না। তোমার কীর্ত্তিকাহিনীর মহাভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন— এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুইখণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ— কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল—

ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ— জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গবর্ম্মেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।

আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না— তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।

বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে— অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ [ডিসেম্বর ১৯০০]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৮
[ডিসেম্বরের শেষ ১৯০০
বা জানুয়ারির প্রথম ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার "প্রকৃতি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন— সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না।

কিছু দিন রোগভোগে কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা লিখিতে হইল— তাহার পরে ভারতীর জন্য "চিরকুমার সভা" লিখিতে হইল— তাহার পরে সঙ্গীত-সমাজে বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয়ের রিহার্সাল দেওয়া গেল— আমাকে রঘুপতি সাজিতে হইয়াছিল —এই সমস্ত ঝঞ্ঝাটে বিব্রত ছিলাম।

বিসর্জ্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সমুদ্র পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে— আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিতওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই করিয়া লইতে চান— নিরুৎসাহজনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত হইও না। তাঁহার মতে ইহা কিছু জটিল ও বাহুল্যময় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নূতন পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে [সহজ] করিবার জন্য কোন [ইচ্ছা জ্ঞাপন] করেন তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।

এবার শিলাইদহে ফিরিয়া পদ্মার চরে বোটে আশ্রয় লইব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন শীতের দিনে পদ্মা তাহার তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ্র ফরাস বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছে— ফস্ করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া যাইতে পারিলে বেশ হইত।

তোমার রবি

পুঃ— বড়দাদার এই খাতার কোন নকল নাই।

৯

জানুয়ারি ১৯০১ ?

ওঁ

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্ম্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না। সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে। তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ—সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়ো না— আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ— আমার এই চিঠি যখন পৌঁছিবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার প্রদত্ত নূতন জ্ঞানালোকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

১০
মে ১৯০১

ওঁ

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে— আমি যে লিখি নাই তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি— কোন রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ায় মন দিতে চাই— কিন্তু কম্‌লি নেই ছোড়্‌তা।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ— কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুদ্-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই যাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্য বিকীর্ণ করিতে পার ? নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়ো।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি ; কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে— মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাঁহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জ্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজায়াকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে। শুনিলাম, তিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন— তাঁহার মাছের ঝোল এখনও ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ— মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন— তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন— তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন, বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয় তাহাও চলিতে পারিবে।

১১
২১ মে ১৯০১

ওঁ

শিলাইদহ
২১শে মে
১৯০১

বন্ধু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়েছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করি নে।

পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আস্‌ছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্‌টি কাট আর বিষ খাওয়াও— ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিমটি দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার

ওঁ

শিলাইদহ
২১শে মে
১৯০০

বন্ধু

অনেক দিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখনো তাগিদ করিনে।

পৃথিবীতে সর্ব্বত্র সিগ্নাল করবার যে উপায় তুমি বের করেচ সেইটে পড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। একদিন যাঁরা যথার্থ আমাদের বিধিমতে শিক্ষা দিয়ে আস্‌ছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের ওপর সিগ্নাল করব আর কিছু নাড়ানাড়ি — ওগুলোকে কোনমতে ছাড়বনা।

এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী [illegible] [illegible] বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের যথোচিত দণ্ড বিধান কর্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বছর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তবেই সম্যক প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের অস্বাস্থ্যের মধ্যে এসে কাল নষ্ট কোরোনা। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বছর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বছরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

লোকেরা যাত্রা করে বেরিয়ে যাচ্ছে, এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আমার ভারি ইচ্ছে করচে আমরা সব দুইজনে মিলে তোমার ওখানে মাঠের বেড়াতে গেলে আগুনের কাছে ঘরের কোণে [illegible] দুইজনের মধ্যে জমিয়ে দিই। আর একবার আমি লোকেদের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে ছিলুম — তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা — আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত বিরক্তির সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়ে ছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বছর থাকা হয় তাহলে কি একবারও সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করচি দেখা হবে। হয়ত কোনদিন তোমার দরজায় ঠক্‌ঠক্‌

সঙ্গে যা পড়বে।

চতুরঙ্গের প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারিনি - অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমাদের

কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

লোকেন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষ্যা হচ্চে। আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম— তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা— আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করচি দেখা হবে। হয় ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারি নি— অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

১২
৪ জুন [১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে— বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক্! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ। অনেক ঝঞ্চাটের মধ্যে পড়িয়াছিলাম—আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিলাম না।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাকে তোমার জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না। যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন স্মরণ করিয়া খুসী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি—
২১শে জ্যৈষ্ঠ। [১৩০৮]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৩
৩ জুলাই ১৯০১

ওঁ

৩রা জুলাই
১৯০১

বন্ধু

আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষর-সহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহদ্‌গুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেকৃট্রিশ্যান্ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে

দিয়াছিলাম— পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকার সম্ভাবনা আছে— দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই— তখন ইলেক্‌ট্রিশ্যান্‌ দেখিতে পাই নাই।

তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সেকথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অন্যান্য সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার জন্য আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জর্ম্মানি ও অ্যামেরিকায় যাইবার কোনপ্রকার সুযোগ করিতে পারিবে না কি? তুমি যদি দীর্ঘকাল য়ুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হোক্‌ একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব বর্ষা পড়িয়াছে।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৪
২৫ জুলাই [১৯০১]

ওঁ ২৫শে জুলাই [১৯০১]

বন্ধু,

তোমার কর্ম্ম কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। একথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থসঙ্কট, সাংসারিক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না— কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি যাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পরায়ণ সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। ... ... তুমি যদি ফার্লো না পাও তবে একবার এখানে আসিয়ো। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে বাহির হইবে। ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব— না

যদি পাই, তবু, তুমি তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্ত্তমান য়ুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না— তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে— সেদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিব।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জার্ম্মানি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।

তোমার রবি

১৫

[অগস্ট ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জন্য দেশে ফিরিয়া এসো— তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কাররূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি।

তোমার রবি

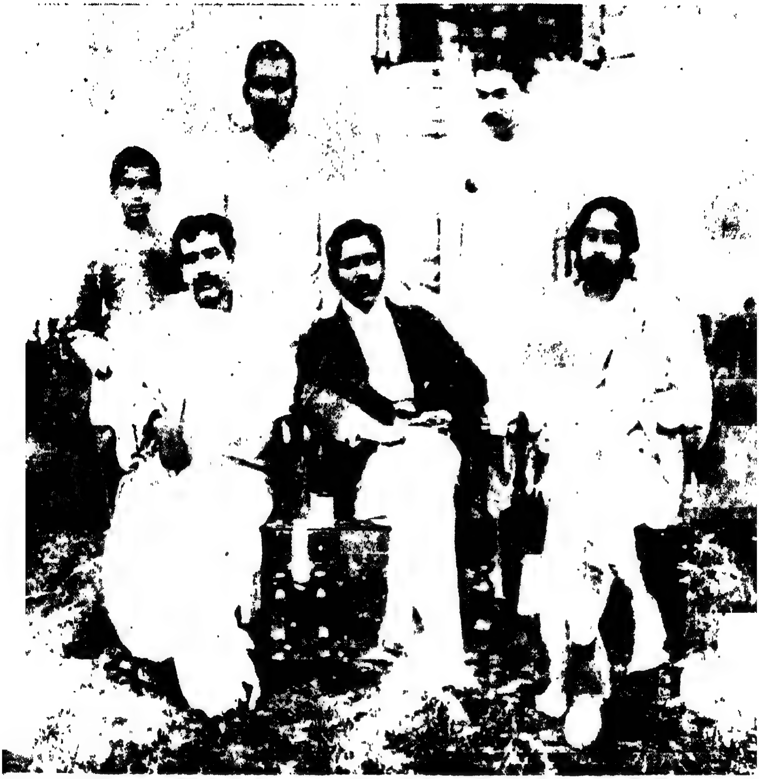

উপবিষ্ট : জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ
দণ্ডায়মান : রথীন্দ্রনাথ, মহিমচন্দ্র ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'শিলাইদহের গল্প'

বিলাতে জগদীশচন্দ্র। ১৯০১

১৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত

১৬

[অগস্ট ১৯০১]

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে— এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গ্রুপ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটেই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না— কারণ, চুরি করিতে অনেক ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামান্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে ? ধর্ম্ম, না, কর্ম্ম ; ধ্যান, না, জ্ঞান ; বিদ্যা, না, উদ্যম ?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না— ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত

হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জ্‌পে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে এস তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন— আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম,

আমার "মুক্তির উপায়" নামক ছোট গল্পটি তর্জ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল— রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে! একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব— আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য অ্যামেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই— তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার রবি

১৭

[সেপ্টেম্বর ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু

আজ মিস্ নোব্‌লের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার ফিরিবার সময় নিয়ত যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সরল। কলিকাতার আবর্ত্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভৃতে নির্জ্জনে ধ্যানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্ম্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা

করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই— কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্ক্যুলর রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জন্যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না।

তোমার রবি

১৮
[অক্টোবর বা নভেম্বর] ১৯০১

ওঁ আগরতলা
কার্ত্তিক ১৩০৮

বন্ধু

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই— সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন— স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্ব্বদাই ধৈর্য্য-

সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি— আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক্। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন!

তোমার
রবি

১৯

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না— তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল— নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে— তোমার সেই বক্তৃতাসভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো— তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়-তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে

দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে— তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না— তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে— বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না— মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই— তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে— সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্ম্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে

যে পরমা মুক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে— তাহা স্তব্ধ, তাহা নির্ব্বাক্, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত— তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্দ্ধা স্পর্শ করিতে পারে না— ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্তমনে সন্তোষের সহিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না— তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না— তাহার কাছ হইতে যে বর্ব্বর রংচং বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

২০
[মে ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন— তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ? যেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজেকেও ব্যর্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্ম্মকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে? সীজারের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক্। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমার মহৎ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুখস্থ করানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে— যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না— তাহা ভারতবর্ষের

হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে ; বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে— তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়— আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই— আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে— নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছায়ায় সেই বেদী-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

২১
২০ জুন ১৯০২

ওঁ　　　　৬ই আষাঢ় ১৩০৯

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

বন্ধু

আষাঢ় আসিয়াছে— কিন্তু আষাঢ়ের সেই চিরন্তন নব ঘনঘটা এবার এখনো দেখা দিল না। আমরা সেইজন্য হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। এখানে চারিদিকে অবারিত প্রান্তর— কোথাও দৃষ্টির কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাস্থল এমন আর নাই— এইখানেই জয়দেব বিপুলচ্ছন্দে তমালবনে বর্ষারাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবের জন্মভূমি ছয় ক্রোশ —চণ্ডীদাসের জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জায়গায় ঘন বর্ষার সময় একবার তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিলে চমৎকার হয়। এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যে সব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি— বক্তৃতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি— এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—

তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি! সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই। এমন করিয়া কে আমাদিগকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে? একএকবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি— সব কাজকর্ম্ম ফেলিয়া মুখামুখি করিয়া বসি— হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্মীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না— আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা পাক— কেবলি ঘুরিতেছে— ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম— মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায়? এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোনমতে বাহির হইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষঘূর্ণীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তোমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহতারায় ঝলকিয়া উঠিয়াছে— কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র— নক্ষত্রচক্র, সৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবচক্র— এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেইখানকার জন্য দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার

আভাস পাওয়া যায়। দুইটি হৃদয় মুখামুখি করিয়া বসিলে জগৎচক্রের ঘর্ঘরশব্দ কিছুক্ষণের জন্য যেন শোনা যায় না— তখন লাভক্ষতি সুখদুঃখ পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞান-দিগ্বিজয়যাত্রার সময় এই সকল কবির ক্রন্দন ঠিক নহে, এখন জয়ভেরীর বাদ্যই বাদ্য, এখন হৃদয়ের কথা হৃদয়ের মধ্যেই থাক্।

তুমি জর্ম্মনি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিয়ো। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব — তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস— তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাইবে।

আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনার লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার বন্ধু মীরা প্রত্যহ তাহাকে এক পেয়ালা ফুল দিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া জাপানী কথাও শিখিয়া লইতেছে। ইহা যদি তোমার আশঙ্কার বিষয় বলিয়া মনে হয় তবে ইহার যথাবিহিত প্রতিকার করিয়ো।

তোমার রবি

২২
৩০ জুন ১৯০৩

ওঁ Thomson House
১৫ই আষাঢ়
১৩১০

বন্ধু

রেণুকার সংশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এরূপ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোন মতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলাম সেদিন তাহারা রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া দিয়া হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে— কাশি কম, জ্বর কম, পেটের অসুখ কম— বিকারের প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে— বুকের ব্যথা নাই— বেশ সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে— আশা করিতেছি এই ধাক্কাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই। এখান হইতে তাহার সৎকার সদ্গতি করিব এমন উপায়মাত্র নাই— সমস্তই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে— কবে যাইতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর

বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও— ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিয়ো। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিঘ্ন হইতেছে — তোমরা আমার সঙ্গে যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। নূতন যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দাও— ছেলেদের খাওয়া দাওয়া এবং চরিত্র পরিদর্শনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও— অধ্যয়ন অধ্যাপনের নিয়ম বাঁধিয়া দাও— নহিলে এই সময়ে মাঝপথে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে আর শৃঙ্খলাস্থাপনা কঠিন হইবে— বিদ্যালয়ের বদনাম হইবে এবং বর্ত্তমান অরাজকতার অবস্থায় এমন সকল কুনীতি কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অনুতাপ করিয়া তাহার সংশোধন হইতে পারিবে না। কুঞ্জবাবু সপরিবারে আছেন দিনরাত্রি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে— অনেক নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কিরূপ ঠিক জানি না— তাহারা বিদ্যালয়ে যদি কোন কলুষ আনয়ন করে তবে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর লেশমাত্র বিলম্ব করিয়ো না। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে সত্বর ডাকাইয়া আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো। রেণুকাকে দিনরাত্রি সাবধানে সেবাশুশ্রূষা করিতে হইতেছে—

চিঠি লিখিবার সময় অত্যন্ত অল্প— এইজন্য মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না— তাঁহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরো অনেক খাটাইব। এ বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের করিতে হইবে। যতক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘুমানো উচিত ছিল কিন্তু বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব?

তোমার রবি

২৩

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০৫ ?]

ওঁ

বন্ধু,

আমি পলাতক। একদিন তুমি ছিলে কোণের মধ্যে, আমি ছিলাম জনতায়— আমি আজ কোণ খুঁজিতেছি, তুমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ। যে-কাজ তোমার মুলতবি ছিল সে তোমাকে সাধিয়া লইতে হইবে। আমার কাজ সারা হইয়াছে; তাই চোখ বুজিবার পূর্ব্বে বাতি নিবাইবার আয়োজন করিতেছি। এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের কাছ হইতে আমার মজুরি চুকাইয়া লইয়াছি— পূরা বেতন পাইলাম কি না সে-হিসাব করিবারও ইচ্ছা নাই— এখন ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিব, এইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। এই বিশ্রামের দাবী আমার অন্যায় নয়— এবং সেটা মঞ্জুর করিতে দেশের লোকের সিকি পয়সা খরচ নাই— সম্মান-সম্বর্দ্ধনার জন্য অনেক কাঠ-খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেহাৎ বিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বোলপুরে ফিরিতেছি। সেখানকার আকাশে এবং আলোয় কিছুমাত্র কৃপণতা নাই— ছেলেবেলা হইতে একান্ত মনে ঐ আকাশকে আলোকে ভালবাসিয়াছি— আমার স্বদেশের কাছ হইতে আর কিছু না

পাই ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছি— ক্ষুধা এখনো মেটে নাই।

বৌঠা'নকে নমস্কার দিবে।

তোমার রবি

২৪
৮ জানুয়ারি ১৯০৮

ওঁ শিলাইদহ

বন্ধু

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি যখনই আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনি আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছু দিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে

—এখন আর সিডিশনের সময় নাই— যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া "বন্দেমাতরম্‌" কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে— চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান— চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না— মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়— আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

শরৎ বহু দিনের পর তোমাদের ওখানে দিশি রান্না খাইয়া এবং বৌঠাকুরাণীর শাড়িপরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্ম্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে।

সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার Workshopএর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাইলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

রথীর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহারা সেখানে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য তুমি আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে— নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম। বৌঠাকরুণকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়ো— সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে হৃদয়ের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৪।

তোমার রবি

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১২
বা জানুয়ারি ১৯১৩]

508 W. High Street
Urbana. Illinois U. S. A.

ওঁ

বন্ধু

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুত্বের কোন্ সূত্র কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াশা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনিই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব একথা মনে করিয়া আসি নাই— যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলাম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে— বিশেষত ইংরেজি

ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে— তাহাতে আমার বিশেষভাবে এই আনন্দ যে যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহারা গৌরব অনুভব করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে— অনেকে বাংলা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে হয়ত তাহার একটা শুভফল আছে। এদেশে আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভর দিয়া ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল লাগিয়াছে, আরো আমন্ত্রণ পাইয়াছি। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে এতই ক্লান্তিকর যে কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে ফিরিবার কথা আছে। সেখানে ম্যাক্‌মিলানরা আমার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। আমার অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তর্জ্জমা করিয়াছি— সেগুলি এখানকার রসজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাল লাগিয়াছে— এবং সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে। এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে— যতই আদর অভ্যর্থনা পাই না কেন— মনের ভিতরটাতে একটা ক্লান্তির ভার অনুভব করিতেছি— দেশে ফিরিয়া গিয়া

সেখানকার অবারিত আকাশ অপর্য্যাপ্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে— সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অন্যায় হইবে তাই এই আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার
রবি

২৬
১৫ মে ১৯১৩

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.
Ludgate Circus, London.
15 May, 1913.

বন্ধু

তোমার বন্ধু Mrs. Booleএর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশি পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার বুদ্ধিশক্তির সজীবতা! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পারিতাম ত সুখের হইত। এদিকে আমার বোধ করি ফিরিবার সময় কাছে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার ঘূর্ণির টানে পাক খাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের চিন্তাও আমাকে পাইয়া বসিয়াছে— আর অধিক দিন দূরে থাকা হয়ত ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় "চিত্রা"র ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। আইরিশ থিয়েটারে আমার "ডাকঘর" নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

তবু এই খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন

টিঁকিতেছে না। একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি। হাতের কাজগুলা কোনোমতে শেষ করিতে পারিলেই দৌড় দিব।

গত বারে দেবেনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছি তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের দিক হইতে তোমার বাধাবিঘ্ন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাইব এই প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম।

তোমার রবি

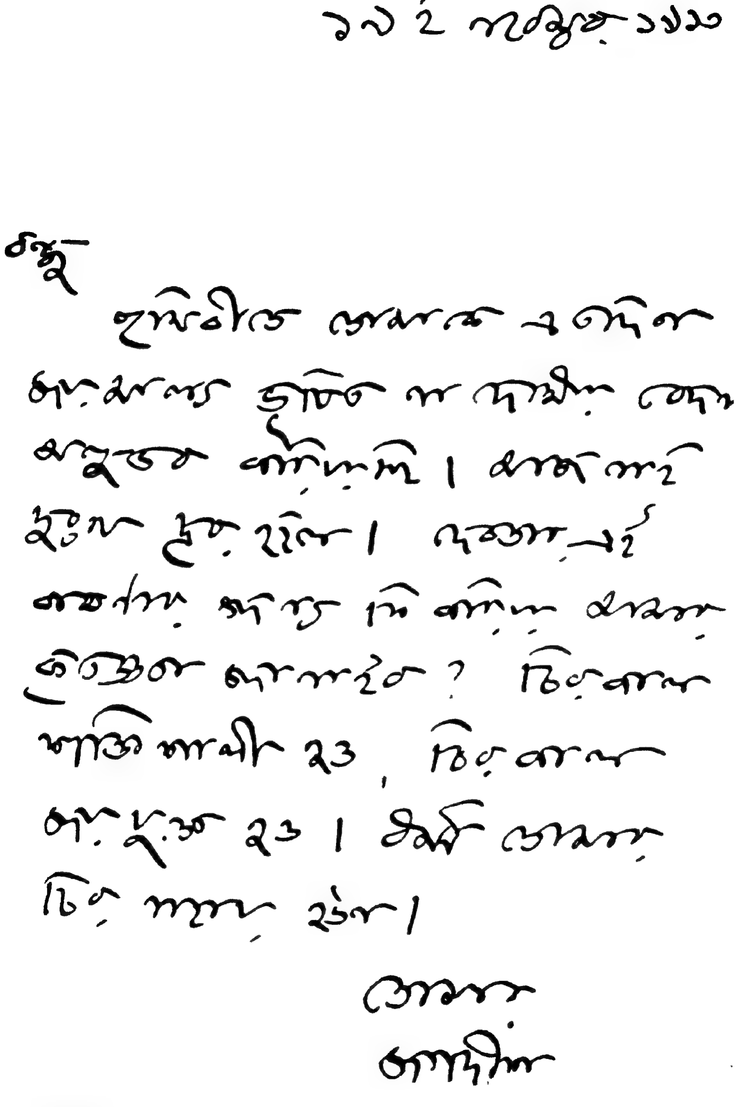

১৩ই নভেম্বর ১৯১৩

বন্ধু

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই হইতে দূর হইল। কেবল এই কথায় ভয় হয় কি করিয়া তোমার শান্তি রক্ষা হইবে? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ঈশ্বর তোমার চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি-উপলক্ষে

২৭
[১৪ এপ্রিল ১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
[১ বৈশাখ ১৩২১]

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—"শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।" আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মাল্য বহন ক'রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত কর্‌বে, তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই কর্‌চি—এতদিন ধ'রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুল্‌লে মহাকালের তরণী বোঝাই ক'রে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক'রে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেন্‌স্টাইনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসো। তিনি ত খুসি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌঁছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো।

বৌঠাকুরাণীকে আমার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।

তোমার রবি

২৮

[সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯১৬]

ওঁ

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে পেলে সুবিধা হ'ত, কেননা সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড ঘুরপাকের মধ্যে প'ড়ে গেছি যে, কিছুই ভাব্‌বার অবকাশ নেই— কেবলই আমাকে টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি ক'রে ঠেলে নিয়ে চলেচে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার জো নেই— বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতে হয়েচে। অন্তত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে সহর থেকে সহরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বস্‌বার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় কর্‌ব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাক্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!"

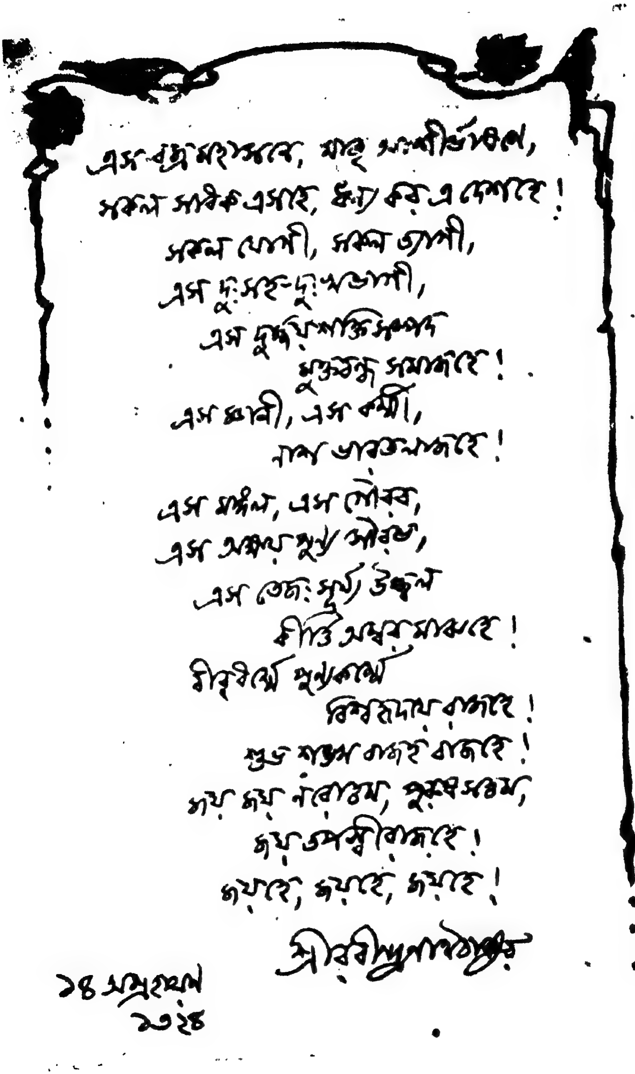

এস বজ্র মহাসনে, মাতৃ আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে!
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,
এস দুর্জ্জয়শক্তিসম্পদ
মুক্তবন্ধ সমাজ হে!
এস জ্ঞানী, এস কর্ম্মী,
নাশ ভারতলাজ হে!

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,
এস তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল
কীর্ত্তি অম্বর মাঝ হে!
বীরধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে
বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ অগ্রহায়ণ
১৩২৪

বসু-বিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে আবাহন-গীত

এর বিকাশ হ'তে চল্‌ল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়— তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে— তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চল্‌তে থাক্‌বে। কতবার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিষের সৃষ্টি করেচি— তার উপরে অজস্র টাকা বৃষ্টি ক'রেও তাদের বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারিনি। কেবল মাত্র অভিমান দিয়ে ত' কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন কর্‌তে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা— এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ— তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ কর্‌বার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিতা কর্‌চ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে— দেবী সেই আসনে অচলা হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান কর্‌তে থাক্‌বেন।

দেশে ফের্‌বার জন্যে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েচে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কতদিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম ঊর্দ্ধশ্বাসে লাটিমের মত ঘুরে' বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

২৯
[অক্টোবর ?, ১৯১৭]

ওঁ কলিকাতা

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টলমলে অবস্থায় ছিল— এখন ভাঙন ধরা সুরু হয়েছে। কানের উপরে এক পর্দ্দা প'ড়ে গেছে— ভাল ক'রে শুন্‌তে পাচ্চিনে। তার উপরে শরীর এমন ক্লান্ত যে, প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি কর্‌তে হয়। ডাক্তার বল্‌চে, একেবারে চুপচাপ ক'রে থাক্‌তে। তাই এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জন্যে একজন সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে— সর্ব্বদা নিজের কাছে কাছে এরকম একজন লোককে লাগিয়ে রাখতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু আর উপায় নেই। এদিকে কন্‌গ্রেসের সময় একটা কিছু বল্‌বার জন্যে আমার উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা কর্‌ব— এখনকার মত সুগভীর নিষ্কর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুব মার্‌ব। কোনো নূতন যায়গায় গেলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে, তাই শান্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক কর্‌চি— সেখানে বিদ্যালয়ের ছুটি— কেউ লোক-জন নেই। বেলাকে ছেড়ে বেশী দূরে যাতায়াত চল্‌বে না। কানটা আশা করি বিশ্রামের পরে আবার সতেজ হ'বে— না যদি হয় তা হ'লে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে স'রে পড়ব—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পার্‌লেম না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেষ্টতা নেই। তোমাদের লেক্‌চারের জন্যে কবে তৈরী হ'ব তা বল্‌তে পারিনে— বোধহয় এখন থেকে কর্ত্তব্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে এনে জীবনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ ক'রে নিতে হবে— এই সহজ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা কর্‌ব— যা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিনে।

তোমার রবি

৩০

১ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

বন্ধু,

বৌমার খুব কঠিন রকম ন্যুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই ক'রে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্চে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগচেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেচেন— কিন্তু সুকেশীর জন্যে ভাবনার কারণ আছে।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আস্‌চি। ছেলেদের অনেকেই ছুটীর মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যুশয্যা থেকে এসেচে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে— কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি, এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাঁসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে— এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণে হয়েচে।

অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল— সে সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ত।

ঠিক বর্ত্তমানে সে-রকম আর কোন বাংলা লেখক আমার ত মনে পড়চে না।

আমি নিজে কোন স্পষ্ট ব্যামোয় পড়িনি— কেবল মাঝে মাঝে খুব একটা ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে— সেই পুনঃ পুনঃ ক্লান্তিটাই আমার ছুটির দরবার। আমার দ্বারা যতটা হতে পারে নানা রকমে তা করেচি, এখন অন্যদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবার সময় এসেচে। নূতন লোক এসে নূতন ভাষায় নূতন কালের জন্যে কথা ক'বে এইটেই হচ্চে আবশ্যক— নিজের পালাটাকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে জোর ক'রে টেনে রাখাটাই ভুল। ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫

তোমার রবি

৩১
২৪ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

বন্ধু

তোমার "অব্যক্ত"র অনেক লেখাই আমার পূর্ব্ব-পরিচিত— এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত— কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

তোমার রবি

৩২
[১২ মে ১৯২২ ?]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বন্ধু

"বিশ্বভারতী"কে এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্চি। তোমাকে এর ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ো। বেশি কিছু দায়িত্ব নেই, কেবল তোমার সঙ্গে নামের যোগ না থাক্‌লে চল্‌বে না— সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘট্‌বে।

এখানে কিছুদিন বিপরীত গরম গিয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝে একএকদিন আকাশে বাতাসে অগ্নিবাণ ছুট্‌তে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে আমার মন বিচলিত হয়েছিল; ভেবেছিলুম দার্জ্জিলিঙে তোমাদের পাড়ায় ঘুরে আস্‌ব, অমনি তোমাকে বিশ্বভারতীর Constitution দেখিয়ে সভ্য করে আসব। কিন্তু এই মাঠের মধ্যেই আমার সমস্ত সময় এবং সম্বল খরচ করতে হচ্চে— আমার না আছে অবসর না আছে পাথেয়। সমুদ্র পার থেকে দুইএকজন আমার কাজে যোগ দিতে এসেচেন, তাঁদের ফেলে রেখে চলে যেতে পারচিনে।

Constitutionখানা ছাপা হয়েচে, রেজেস্ট্রি হয়ে গেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৫ [১৩২৯ ? 12 May 1922 ?]

তোমার রবি

৩৩
২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

শান্তিনিকেতন

বন্ধু

অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও বীভৎসতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ একটা perspective থেকে আর একটার ভিতরে এসে নিজে সুদ্ধ যেন খাটো হয়ে পড়ি। বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসার আনন্দ যখন ম্লান হয়ে এসেছিল এমন সময়ে আমার নামে উৎসর্গ করা তোমার যে বই আমার অনুপস্থিতিকালে এখানে এসেছিল সেইটি হাতে আসাতে তখনি বুঝতে পারলুম এইখানেই আমাদের সত্য, এই আলো, এই প্রাণ— এই ভারতের নিত্য পরিচয়। এই বইখানির মধ্যে তোমার বন্ধুত্বের বাণী পেয়ে ভারি আনন্দ হল— মনে যে অবসাদের ছায়া এসেছিল সেটা যেন কেটে গেল। মাঝে মাঝে সত্যের স্পর্শে যখন মায়ার কুয়াশা দূর হয়ে যায় তখন বুঝতে পারি যে আমাদের মনের তন্তুতে তন্তুতে অনেক আদিম অভ্যাস জড়িয়ে আছে— কথায় কথায় জুজু আমাদের পেয়ে বসে— সে যে বস্তুত কিছু না এটা বুঝেও বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

একেবারে ৭ই পৌষের মুখে এসে পৌঁচেছিলুম। কলকাতায় যে কয়ঘণ্টা ছিলুম অবকাশমাত্র ছিল না। তাড়াতাড়ি চলে

আসতে হোল— তাই তোমার সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারলুম না। কবে আবার সহরে ফিরব নিশ্চয় জানিনে— কিন্তু গেলেই দেখা হবে।

তোমার আশ্চর্য্য কীর্ত্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পেয়েছি— সে কীর্ত্তি আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়েছে। এতে মনে কত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি ব'লে শেষ করতে পারিনে। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

তোমার রবি

বৌঠাকুরাণীকে আমার সাদর নমস্কার।

৩৪
৮ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ　　　　　　　　　　　শান্তিনিকেতন

বন্ধু

এখানে এসে কিছু ভালো আছি। কিন্তু চলতে ফিরতে কষ্ট ও ক্লান্তি বোধ হয়। ডাক্তাররা অন্তরে বাইরে উল্টে পাল্টে আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখেচে। বলচে কোনও কল একটুও বিগড়োয় নি— নাড়ীতে রক্তস্রোতের ব্যবহার খুবই ভালো। নানা দুশ্চিন্তা ও কাজের তাড়ায় আমাকে জখম করেচে। এখানে সকালে বিকালে খুব অল্প অল্প করে একটু বেড়ানো অভ্যেস করচি— বেশি পারিনে। লিখ্‌তে পড়তে একটুও শ্রান্তি বোধ করিনে। নানা লোক এসে নানা বাজে কাজে আমার উপর উৎপাত করে সেইটেতে বড় পীড়ন করে।

রথীদের কাছে তোমার ভিয়েনার সমস্ত খবর শুনে খুব আনন্দ বোধ করেচি। যখন দেখা হবে সব কথা শুনব। আজ আমার একজন চীনদেশী বন্ধু আসচেন তাঁর জন্যে ব্যস্ত আছি। যখন তাঁদের দেশে গিয়েছিলুম ইনি আমাদের অজস্র আতিথ্য করেচেন। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯২৮

তোমার রবি

বৌঠাকরুণকে সাদর অভিবাদন।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
প্রিয়করকমলে

বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে

স্পন্দবেগে নিঃশব্দ সঙ্গীতগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারি ভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই;— হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানবমর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,

জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে

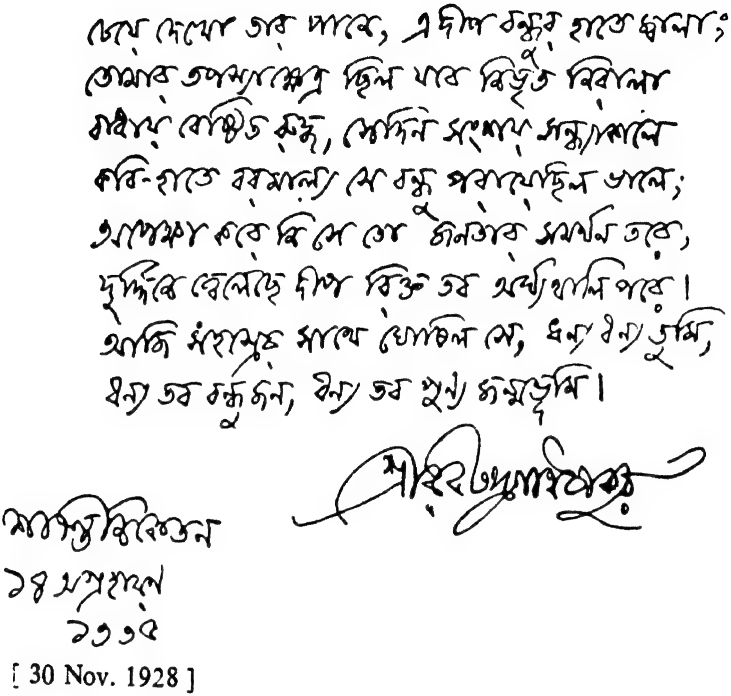

চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ
১৩৩৫
[30 Nov. 1928]

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব-উপলক্ষে

৩৫
২৪ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ

বন্ধু

তোমার এই বিষম উদ্বেগের দিনে কিছুই করবার উপায় নেই এই আমার দুঃখ। চলাফেরা আমার পক্ষে কঠিন হয়েচে —চুপ করে বসেই আমাকে কাজ চালাতে হয়। যতটুকু আমার নিজের যথার্থ কাজ তার বেশি কোনো ভার নেওয়া আমার উচিত নয়— কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা এসে পড়ে তাকে ঠেলে ফেলা যায় না। শীতকালে আগন্তুক অতিথির সমাগম বাড়তে থাকবে সেইটেতে আমাকে বড় ক্লান্ত করে।

রথীর চিঠিতে শুনেছিলুম সুইজারল্যাণ্ডে তোমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আশা করি সেটা এখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে।

আগামী গ্রীষ্মে য়ুরোপে গিয়ে আর কিছু না করে একবার শরীরটাকে সারিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব।

তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দনসভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।

বর্ত্তমান দুর্য্যোগ উত্তীর্ণ হয়ে তোমার শরীর মন সুস্থ সবল থাক এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৩৫ [৭ কার্ত্তিক]

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু

তোমার ছুটি যদি এখানে কাটিয়ে যাও তা হলে বোধ হয় তোমার উপকার হয়। আমি ত জ্বর প্রভৃতি নিয়ে এসে এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি— ওজনে প্রায় ৩ সের বেড়েছি। তুমি বৌঠাকরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে এস— তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। জিনিষপত্র কিছু আনবার চেষ্টা কোরো না। বিছানা যথেষ্ট আছে— কেবল গায়ে দেবার কম্বল এনো। তোমার জন্যে চা চুরুট তামাক প্রভৃতি সমস্ত নেশার জোগাড় করে রেখেছি। পড়বার বই এবং লেখবার অবকাশ এখানে যথেষ্ট পাবে— বেড়াবার মাঠ এবং সঙ্গীরও অভাব হবে না। আমি আজকাল সকালে তিন ঘণ্টা বেড়াই, এ-কথা চিঠি পড়ে তোমার বিশ্বাস হবে না— এখানে এলেই প্রমাণ হবে।

তুমি যদি সকালের ট্রেনে ছাড় তা হলে সন্ধ্যেবেলায় ঠাণ্ডা লাগ্‌বার আশঙ্কাটা থাকে না। সে গাড়িটা সাতটার সময় ষ্টেশন ছাড়ে। এখানে এসে প্রায় বারোটার সময় পৌঁছয়— বর্দ্ধমানে দশ মিনিট থামে— আগে থাকৃতে ব্রেকফাষ্ট টেলিগ্রাফ করে দিয়ে ওখান থেকে খাদ্যদ্রব্য গাড়িতে তুলে নিতে পার।

কবে ও কখন ছাড়বে সে-খবরটা আমার চিঠি পেয়েই আমাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়ো— তা হলে তোমাদের যান বাহন ঘর প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করে রেখে দেব। ইতি বুধবার।

তোমার রবি

অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত

১
৪ জুন ১৯০১

ওঁ

কলিকাতা
৪ জুন ১৯০১

মাননীয়াসু

আপনি ধন্য। আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য হইয়াছি। আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছি না— আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি।

বন্ধুকে তাঁহার কর্ম্মসমাধার পূর্ব্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাঁহার জীবন নিরর্থক হইবে। আমরা তাঁহাকে য়ুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব— তিনি যেন তাঁহার এই সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন।

আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিয়াছেন— সেইখানে, স্বদেশের হৃদয়-মণ্ডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক্!

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
১৬ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

মাননীয়াসু

ঠিক নববর্ষের প্রথম দিনের প্রভাতে আপনার চিঠি আনন্দসংবাদ বহন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এই প্রান্তরের মধ্যে আমার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা হইতে সেদিন অনেক কলেজের ছাত্র এবং মোহিতবাবু প্রভৃতি অধ্যাপকদল এখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আমরা আমাদের বিদ্যালয়গৃহে বসিয়া ছিলাম এমন সময় আপনার পত্রখানি আসিয়া আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ করিয়া দিল। আমাদের এই বাংলা দেশের নববর্ষের আনন্দ অভিবাদন আপনারা গ্রহণ করুন। অধ্যাপকমহাশয় জয়যুক্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র করি না— নিঃশব্দ ভারতবর্ষ তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিবে। ক্ষণে ক্ষণে আমার কেবলি ইচ্ছা হয় আপনাদের দেখিয়া আসি। নানা কারণে আমি তাহাতে অক্ষম। যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে—

অধ্যাপকমহাশয়কে তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছেন।

আমার এখানকার খবর আপনি নিশ্চয় জানেন। আমি এখন গুটিকয়েক বালক লইয়া এখানে নিভৃতে পড়াইতেছি। আশা করিতেছি এই অঙ্কুরটি ক্রমে বড় গাছ হইয়া ফলবান্ হইয়া উঠিবে। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩০৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[অক্টোবর ?, ১৯০৩]

ওঁ সোমবার

মাননীয়াসু

বিদ্যালয় আজ খুলিয়াছে। আমার কাজ আরম্ভ হইল। এ কয়দিন ছুটির সময় কয়েকটি ছেলে ছিল— তাহাদিগকে অল্পস্বল্প পড়াইতেছিলাম— আজ এখানকার শূন্যতা অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন হইতে এই কাজের মধ্যেই আমার বিশ্রাম— এই কাজের মধ্যেই আমার শরীর মনের চিকিৎসা। কাজ হইতে দূরে গিয়া কি আমার মন শান্ত হইবে ? আমার অবর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের যে যে অংশ বিকল হইয়া গিয়াছিল—সেই সমস্ত অংশ আমাকে সংস্কার করিতে হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অন্তরের মধ্যে ভস্ম হইতে আগুনকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে— সমস্ত উজ্জ্বল ও সজীব করিতে হইবে। এই সকল কাজের কথা স্মরণ করিলে আমার দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। আমার কাজ অসম্পন্ন থাকিবে না— আমি রণে ভঙ্গ দিব না।

ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য আমি সুবোধকে আবার দিল্লি হইতে টানিয়া আনিয়াছি। সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত। দিল্লিতে সে হেড্‌মাষ্টার হইয়া আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি তাহাকে জবরদস্তি করিয়া এখানে

ফিরাইয়াছি। অরবিন্দ সম্বন্ধে এখন হইতে আপনি আর কিছুই ভাবিবেন না।

আপনি কেন আমাকে লোভ দেখাইতেছেন! দার্জ্জিলিঙে আপনার ওখানে যাইতে পারিলে আমি আর কিছু চাহিতাম না। কিন্তু বালককালে ইস্কুল পালাইয়াছি এ বয়সে আর চলে না। আমার অনেক লেখাপড়ার কাজ মুল্‌তবি আছে— আপনার আশ্রয়ে যদি যাইতে পারিতাম তবে অধ্যাপক একদিকে আর এই সম্পাদক আর একদিকে নিঃশব্দে আপন আপন কাজে লাগিয়া থাকিতাম— ক্ষুধার সময় আপনার কাছে গিয়া পড়িতাম— কিন্তু নিরামিষ, তাহা বলিতেছি— আর কই মাছ নয়— দ্বিপদ চতুষ্পদের ত কথাই নাই। কলিকাতার চেয়ে শরীরটা অল্প একটু সারিয়াছে। যদি ছুটি লওয়া সঙ্গত ও আবশ্যক বোধ করি তবে অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে নড়িব না। আমার বোটে কি আপনাদের টানিতে পারিব না? আমাকে নিঃসহায় পদ্মায় বিসর্জ্জন দিবেন? আমাকে যদি এমন করিয়া অবহেলা করেন তবে একলা এই শরীরটাকে লইয়া কত করিব?

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
১৯ জুলাই ১৯০৬

ওঁ বোলপুর

মাননীয়াসু

অরবিন্দের জন্য কিছুমাত্র ভাববেন না। এবারে আসবামাত্র তাকে পিসিমার জিম্মা করে দেব— তিনি ওকে মাছ ভাত মাংস, সজ্‌নের ডাঁটা, কুম্‌ড়োর ফুল, লাউডগা-সিদ্ধ প্রভৃতি খাইয়ে তাজা করে তুলবেন।

আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে— আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি করা একেবারে ছেড়ে দেবেন। তার প্রধান কারণটা আপনাকে বলি। সম্প্রতি আমার বয়স যে যথেষ্ট হয়েছে সে ঢাকবার কোনো উপায় নেই— আমার দেহযন্ত্র এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মশায়ের চেয়ে ঢের বেশি সরল। আমার নিজের মাথার পাকা চুল আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় আপনারাও যদি আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাহলে আমার কি উপায় হবে। যদি স্নেহ করেন ত বাঁচি— তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম— তাঁকে হারানর পর আমার দ্রুতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান্ হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে এ রকম নৃশংসতা প্রত্যাশা করি নি। আপনার বয়স আমার চেয়ে কম

কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের স্নেহ করবার স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন—সেজন্যে আপনাদের বয়সের অপেক্ষা করতে হয় না—সকলের দাবী মিটিয়ে সকলের ভাগ চুকিয়ে আমার মত জরাজীর্ণের জন্যও কিঞ্চিৎ বরাদ্দ করে দিলে স্নেহের নিতান্ত অপব্যয় হবে না। আমাকে যদি "আপনি" বলা ছেড়ে দিয়ে "তুমি" বলবার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হতে পারেন ত উত্তম—যদি অসাধ্য বোধ করেন তবে পত্রে শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না। তার চেয়ে আমাকে আপনি "কবিবরেষু" বলে লিখবেন। আপনাদের কাছ থেকে এ রকম উৎসাহজনক সম্ভাষণ পেলে হয়ত আমার কলমের বেগ আরো বাড়তে পারে— সেটাকে যদি দুর্ঘটনা জ্ঞান না করেন তবে দ্বিধা করবেন না।

দ্বিতীয় নিবেদন, বোলপুরে আসবার জন্যে প্রস্তুত হোন। বিলম্ব করবেন না। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩১৩।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[অক্টোবর ১৯০৫ বা ১৯০৬]

ওঁ　　　　　　　　　　　　　বোলপুর

বৌঠাকুরাণী

আজ আপনার সস্নেহ পত্র পাইলাম। ইচ্ছা ছিল লিখি যে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ— কিন্তু দুই কারণে লিখিলাম না— এক, লিখিলেও আপনার দয়া উদ্রেক করিত না, দুই, সম্প্রতি আমার শরীর খারাপ নয়। শেষ কারণটা তেমন গুরুতর বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু প্রথমটা মারাত্মক— অতএব খুব উচ্চ কণ্ঠে সতেজে বলিতেছি বেশ আছি, ভাল আছি, রোগের কোনো চিহ্নও নাই।

নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না— আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েক দিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, সে পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিস্ না লন্। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্যপ্রত্যাশায় রহিলাম।

আমি বোলপুর বিদ্যালয় খোলার অন্তত দুই সপ্তাহ পরে শিলাইদহ অভিমুখে রওনা হইব অতএব আপনাদের সঙ্গে তৎপূর্ব্বে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যদি বোলপুরে পদার্পণ করেন তবে আরো সত্বর দেখা হইতে পারে বিশেষ আপনি

যখন অনেকবার— , থাক্, এ নিষ্ফল আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

বেলা ও তাহার স্বামী আসিয়াছিল দিন তিনেক হইল চলিয়া গেছে— মীরাও তাহাদের সঙ্গে মজঃফরপুর গেছে— তাই আমার এখানকার আশ্রম সম্প্রতি আমার পক্ষে অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেছে।

অরবিন্দর সহপাঠীরা সকলেই কার্ত্তিক মাসের জন্য বাড়ি গেছে— কেবল যোগেন আছে। সেও দুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবে। কেবল ছুটির জন ছয় সাতেক ছাত্র থাকিবে। অজিতও আজ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দিল্লি অভিমুখে রওনা হইল। অরবিন্দ ফিরিয়া আসিলে, যদি ইচ্ছা করেন, ত এখানে পাঠাইতে পারেন। তাহার অঙ্ক ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এখানে আছেন। ইতি। ৩১শে আশ্বিন ১৩ [১২ বা ১৩]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[এপ্রিল ১৯০৮]

ওঁ কলিকাতা

মাননীয়াসু

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। আপনারা চলে যাওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে-ব্যাপারটা কল্পনায় নিতান্তই দারুণ এবং অসঙ্গত বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমন ভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। সেই জন্যে সমস্ত আঘাত কাটিয়ে, জীবনযাত্রা যেমন চল্‌ছিল তেমনিই চল্‌ছে ;— হয়ত একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে— কিন্তু সে পরিবর্ত্তন উপর থেকে দেখা যায় না— সে পরিবর্ত্তন নিজের চোখেও হয়ত সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।

ভেবেছিলুম ছুটি নেব কিন্তু আমার কাজের ভার আরো বেড়ে গেছে। আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা

পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করচে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্চে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম, যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়— ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে এই সকল শব্দ ঘোষণা করেন তাঁরাই এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট। সুরেন্দ্রবাবুরা পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন— তাঁরা কলকাতায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন— পল্লীগ্রামেও লাগবেন বলে আশা দিয়েছেন। কিন্তু চরমপন্থীরা কেবল চরমের কথাই ভাবচেন, উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট। এ পর্য্যন্ত এঁদের দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজও হয় নি। অথচ এঁরাই মডারেট দলকে কর্ম্মহীন বাক্যবিশারদ বলে গাল দিয়ে এসেছেন। এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করচেন কাজেই আমার মত জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নাবতে হয়েছে। আমি সভাস্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্চি নে— কিন্তু সেই জন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা

যখন ফিরে আস্‌বেন— আশা করচি তত দিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।

আপনি লণ্ডনে যেভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করতে চান সেইটেই আপাতত অবলম্বনীয়। এমনি করে পর্য্যায়ক্রমে এক এক জনের বাড়িতে উপাসনাকার্য্য হতে হতে এর পরে স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হবে। ওখানে যে উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেচেন তার মধ্যে অন্তত গুটি দুই তিন উপনিষদের মন্ত্র রাখবেন— ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধটা সে দেশে এই রকম করে বিশেষ ভাবেই স্বীকার করা চাই। এতে ভারতবাসী প্রবাসীরও উপকার হবে, আর সে দেশের লোকের কাছেও ব্যাপারটা শ্রদ্ধেয় ও মনোহর হবে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

আমরা সবাই কলকাতায় ফিরে এসেছি। এদিকে নিদারুণ গ্রীষ্মে বিদ্যালয়ও বন্ধ করতে হ'ল— আবার কোথায় পালাব তাই ভাবছি— কলকাতায় বাস করা অসম্ভব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৭

২৪ নভেম্বর ১৯৩৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরাসু

মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন ফিরে এসেছি— তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, মনে কোনো আশঙ্কা নেই। শেষযাত্রারও দেরি নেই তা জানি। দুঃখ তাদেরই যারা পিছনে পড়ে থাকে। বাইরের কোনো সান্ত্বনাবাক্যেই তাদের বিচ্ছেদের অভাব লেশমাত্র পূরণ করতে পারে না। যে অসামান্য নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে আপনি তাঁর সেবা করেছেন তারই মহত্ত্ব আপনার অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যবান করবে, আপনার জীবনের অসামান্য অভিজ্ঞতা আপনার শোককে মহোচ্চতা দেবে এ ছাড়া আজ আর কিছু বলবার নেই। ইতি ২৪।১১। [১৯]৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংযোজন

১

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN
BENGAL

বন্ধু

তোমার সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকতে পারব আশা করেছিলুম কিন্তু এখনো চলতে ফিরতে কষ্ট হয়— প্রায় সমস্ত দিন কেদারা অবলম্বন করে থাকি। সকালে খুব অল্প একটুখানি হাঁটি, তাতেই হাঁপিয়ে পড়ি। রেলে যাতায়াত করতে ভয় পাই।

আমার মনের কথা একটি কবিতায় লিখে পাঠিয়েছি, আশা করি তোমার হাতে পৌঁচেছে— তোমার সেদিনকার অভিনন্দন সভায় এই আমার অর্ঘ্য। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো— কিন্তু সকলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমার সৌভাগ্য, তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই গৌরবের কথাটিকে স্থায়ী রূপ দিয়ে আমার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছি— ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাক্‌বে এই আমার আনন্দ। তোমার কর্ম্মে তোমার সহযোগিতা করি এমন শক্তি আমার নেই, কিন্তু বন্ধুর প্রীতি সংসারপথের পাথেয়, অন্তর থেকে তাই তোমাকে নিবেদন করতে পেরেছি এই কথা মনে রেখো। ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

তোমার রবি

২

ওঁ

সুহৃৎ,

আসিয়াছিলাম— চলিলাম।

সোমবারে শিলাইদহ যাইব। ইহার মধ্যে সে অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে কি, সার্কুলার রোডের বাড়িতেও গিয়াছিলাম, সেখানে দ্বার জানালা রুদ্ধ— এখানে দ্বার জানালা উন্মুক্ত, কিন্তু ফলে তফাৎ হইল না। কিন্তু চলুন পদ্মাতীরে— সেখানে চমৎকার ঝড়বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ চলিতেছে— এইরূপ দুর্য্যোগে ম্যাকবেথের তিন উইচ্ মাঠের মাঝখানে সম্মিলিত হইয়াছিল— অধিক আর কি বলিব। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩০৭

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবলা বসুকে লিখিত

আজ আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম।

অরবিন্দ সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু বল্‌বেন একথা আমি অনেকদিন থেকে প্রত্যাশা করে আছি। কারণ অরবিন্দকে যখন আমার হাতে মানুষ হবার জন্যে আপনি দিয়েছিলেন তখন তার সঙ্গে আমার চিরন্তন মঙ্গলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। এখন থেকে অরবিন্দকে নিয়ে যখন যাই করুন না কেন আমাদের এই সম্বন্ধটিকে হিসাবের মধ্যে আন্‌তেই হবে।

অনেক জিনিষ আছে যা ভাড়াটে গাড়ির মত— যতক্ষণ তার প্রয়োজন, ততক্ষণই তার ব্যবহার, ততক্ষণই তার সঙ্গে সম্বন্ধ। কিন্তু যেখান থেকে আমরা এমন কিছু পাই যা আমাদের মনুষ্যত্বের সম্বল, তার সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের চিরকালের গভীর যোগ জন্মে যায়। পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সেইরকম বড়, গভীর এবং নিত্য সম্বন্ধ জন্মে যায় তারা লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে আমাদের ক্ষুদ্রতা থেকে রক্ষা করে এবং সার্থকতার দিকে নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প মানুষেরই এমন সুযোগ ঘটে। পৃথিবীতে চিত্তকে সুদূর গভীরতার মধ্যে প্রেরণ করে' চিরদিন প্রাণরস মঙ্গলরস সঞ্চয় করবার মত জায়গা আমরা বেশি পাইনে— এবং আমাদের অনেকেরই এমন শক্তি নেই যে আমরা কোথাও চিরন্তন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি। যদি এ কথা সত্য হয় যে বোলপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গে অরবিন্দের একটি সত্যকার যোগ স্থাপনা হয়েছে তবে সে জন্যে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হবেন না, বরঞ্চ অরবিন্দের জন্যে আনন্দিত হবেন। আমি যে এ কথা বলচি তার কারণ এ নয় যে বোলপুর বিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ একটা শক্তি আছে— এ বিদ্যালয় কাউকে বিশেষ কিছু দিতে পারে না— কিন্তু যে ব্যক্তি তপস্যা করে নিতে পারে সে আপনার শক্তিতেই সমস্ত উপলক্ষ্য হতেই সার সংগ্রহ করতে পারে। সেই তপস্যাকে জাগ্রত করাই হচ্চে কথা। বারো আনা লোক অত্যন্ত লঘুভাবে পৃথিবীর উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়, বিপদ সেইখানেই। জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর সম্বন্ধে সত্যতা যদি জন্মে যায় তাহলেই

মানুষ সার্থক হয়। বোলপুরের বিদ্যালয়ে অরবিন্দ আর কিছু পাক্ বা না পাক্, সে জীবনকে সত্য বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ়রূপে উপলব্ধি করেছে। এই উপলব্ধিটি এমন একটি বড় জিনিষ যে, যেখান থেকে এটি আমরা পাই সেইখানেই আমাদের জীবনের গভীরতম শ্রদ্ধা জড়িত হয়ে পড়ে— না হয়ে উপায় নেই। যদি দেখ্‌তেন অরবিন্দের মনে সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়নি তাহলে নিশ্চয়ই জান্‌তেন তার চিত্তেও সে সেই পরিমাণ বড় জিনিষ পায় নি। এই জন্যে আমি আপনাকে বলচি অরবিন্দের জন্যে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

এ কথা নিশ্চয়, অনেক সময় নানা কারণে আমাদের মনে মোহ উৎপন্ন হয়— সেই মোহের বন্ধনও প্রচণ্ড প্রবল। আমাদের ছেলেরা অনেক সময় ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে আপনার মনপ্রাণ বিকিয়ে আসে সেটা তাদের পক্ষে কিছুতেই ভাল নয় এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু এখানে মোহের কোনো উপকরণই নেই। যাতে মনকে বাইরের দিক থেকে ভোলাতে পারে এমন কিছুই এখানে দেখতে পাবেন না— বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অরবিন্দের মন এখানে বসে নি। ও যেন একেবারে উদাসীন ছিল। কোনো শিক্ষা বা কোনো কথায় ও মন প্রয়োগ করতেই পারত না। ওর সম্বন্ধে আমি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। পড়াশুনোর দিকেও ওকে আমি অগ্রসর করতে পারছিলুম না, ভিতরের দিক থেকেও মহত্ত্বের প্রতি ওর চিত্তকে জাগ্রত করতে পারছিলুম না, ক্রমে এই

বিদ্যালয় যখন ওর অন্তঃকরণকে স্পর্শ করলে সে ত কোনো কৃত্রিম উপকরণ বা বাহ্য প্রলোভন দিয়ে নয়। সে নিঃসন্দেহ ক্রমশই আমাদের অগোচরে চিত্তের সামগ্রী কিছু পাচ্ছিল— যখন থেকে তাই পেতে আরম্ভ করলে তখন থেকে আপনিই আপনার মধ্যে ওর উদ্বোধন হতে লাগ্‌ল। এই উদ্বোধনের মত এমন গভীর এবং বড় জিনিষ জগতে আর কিছুই নেই— যে লোক তা উপলব্ধি করেছে সে তার আনন্দকে কোনোদিন ভুল্‌তে পারবেনা।

কিন্তু সত্য এমন একটি জিনিষ যাকে নিয়ে যেমন খুসি চলা যায় না। তাকে তার নিজের পথ খানিকটা ছেড়ে দিতেই হয়। যদি কোনো মানুষকে কোনো একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছার দ্বারা বেষ্টিত করে রাখতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে এই সত্য উপলব্ধির প্রবল বিকাশ থেকে দূরে রাখ্‌তেই হবে। শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণ যখন কর্ত্তৃত্ব করতে চেয়েছিল, যখন তাকে বিশেষ প্রয়োজনে লাগাতে চেয়েছিল তখন তাকে কেবল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি, তাকে সত্যলাভের সুযোগ থেকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করেছিল।

কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই এমন কথা বল্‌বেন না, যে মানুষের অন্তরাত্মার বিকাশ তার আর সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে বড় নয়। এই অন্তরাত্মার বিকাশ আপাতত সমাজে সংসারে যতই অসুবিধাকর হোক্ না, এর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠ জিনিষ আর কিছুই নেই। অরবিন্দের অন্তরের মানুষের জাগরণ হয়েছে— তার ক্ষুধা, তার কান্না, তার চাঞ্চল্যকে আপনি যদি আপদ মনে করেন তাহলে ভুল

করবেন। উপবাসের দ্বারা, শাসনের দ্বারা, বাধার দ্বারা একে নিঃশব্দ ও নির্জ্জীব করতে হয় ত কিছুতেই পারবেন না— যদি তা পারেন তবে তার চেয়ে এমন পরম দুঃখের জিনিষ আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু আমি হয় ত গোড়াতেই ভুল করছি। সম্ভবত অরবিন্দ জীবনের যে আদর্শ গ্রহণ করেছে সেটাকে আপনারা ভাল বলেই মনে করেন না। ও যে রকম হলে আপনারা খুসি হতেন ও তেমনটি হয় নি— এবং সেই জন্যে নিশ্চয়ই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা, প্রভাব ও বিধিব্যবস্থাকে মনে মনে দায়ী করচেন— এবং ভাবচেন, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন থেকে নূতন পথে ওর জীবনকে প্রবাহিত করে দেবেন।

এ সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কথা কিছুই থাক্‌তে পারে না। যা ওর পক্ষে মঙ্গল বলে আপনারা বিবেচনা করবেন নিশ্চয়ই সেদিকে ওকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে বিরক্ত হয়ে যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হন তবে ওকে প্রতি মুহূর্ত্তে কেবল পীড়িত করবেন, কোনো ফলই পাবেন না। মঙ্গলের পথ যন্ত্রের পথ নয়— সেখানে জোর খাটে না। ওকে আপনারা যদি না বোঝেন, তা হলে স্বভাবতই ও ক্রমেই আপনাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়বে, ক্রমেই আপনাদের বোঝার অতীত হয়ে উঠ্‌বে। ওর এখন এমন একটি বয়স এমন একটি অবস্থা যখন খুব বিবেচনার সহিত ওকে সকল দিক্ থেকে বুঝে ওর প্রতি একান্ত সহিষ্ণু হয়ে, ওর গভীরতম প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে' ওর বেদনায় বেদনা দিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর

মত ওকে হাতে ধরে নিয়ে চল্‌তে হবে— রাগ করে ওকে আঘাত করলে সেই আঘাতের দ্বারা ওর ক্ষতি করবেন এবং ওকে হারাতে থাক্‌বেন।

আমার পক্ষ থেকে আমি একটি মাত্র কথা আপনাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি। অরবিন্দকে যে আদর্শে তৈরি করলে আপনাদের মনের মত হত তা আমি হয় ত করি নি, কারণ করা হয় ত আমার পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু এ কথা মনে রাখ্‌বেন যে যদি বড়র দিকে সত্যের দিকে ওর জীবনের গতি অভিমুখ হয়ে থাকে সেও কম কথা নয়। ও নিজের জীবনকে বড় রকম করে সার্থক করতে চায় এইটেই সকলের চেয়ে বড় কথা— কোন্ বিশেষ পথ দিয়ে করতে চায় তা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফল নেই। আমার হাতে যা ছিল, আমি যেটুকু পারি তা আমি ওর সম্বন্ধে করেছি— সে জন্যে যেটুকু অপরাধ সে সম্পূর্ণই আমার— ও বেচারার উপায় ছিল না— কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দণ্ড ওকেই ভোগ করতে হবে। অরবিন্দ যদি ইস্কুলে পড়া কলেজে পাস করা সাধারণ বালকের মত হত— অর্থাৎ চিত্ত বলে কোনো পদার্থ না থাক্‌ত, এবং যখন যে যা বল্‌ত তাই আবৃত্তি করত, চারদিকে যা শুন্‌ত তাই নির্ব্বিচারে শুনে যেত, তাহলে আপনারা কি খুসি হতেন? সত্যকে পাবার চেষ্টা ওর মনে যে প্রবল হয়ে উঠেছে সে যদি ভুল করেও হয় এবং ভুল পথেও যায় তাতে কি আপনাদের আনন্দের কথা কিছু নেই? পথের সংশোধন হওয়া শক্ত নয় কিন্তু এই চেষ্টাটাই জগতে দুর্লভ।

এবারে আপনাকে বোলপুরে আসবার কথা বলি নি— তার

কারণ, কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করছিলুম এই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনার হৃদয় অনুকূল নেই। অথচ এই বিদ্যালয়টি আমার জীবনের সাধনার ক্ষেত্র— আমার দেবতা এইখানে, আমার মুক্তি এইখানে— এ সামান্য ইস্কুলমাত্র নয়— এখানে আপনি মনে লেশমাত্র বিমুখতা নিয়ে আস্‌বেন, এখানে এসে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করে যাবেন এ আমার পক্ষে অসহ্য। অনেক লোক তেমনভাবে এখানে আসে যায়— আমি পৃথিবীর সকল লোকের কাছেই সহানুভূতির কাঙালবৃত্তি করতে ত চাইনে— কিন্তু আপনাদের তেমন উদাসীনভাবে দেখ্‌তে পারিনে। যে জায়গায় আমি সকলের চেয়ে সার্থকতা লাভ করেছি সে জায়গায় আপনাদের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে সেখানে খেলাচ্ছলেও আমাদের মিলন হতে পারে না— আর সব জায়গাই রইল— কলকাতা আছে, আমাদের পদ্মার চর আছে, আর যেখানেই বলেন সেখানেই কোনো বাধা নেই।

আজ বর্ষশেষের দিন! আমরা যিনি যে পথেই চলি না কেন, ক্ষমা রাখ্‌বেন— ফাঁকি দিতে চাচ্চিনে, প্রাণপণে চলচি এবং আরামের পথ বেছে নিই নি এইটুকু মাত্র দাবীর জোর রাখি, তার পরে সত্য মিথ্যা ভালমন্দর বিচারক যিনি, তিনিই যথাসময়ে বিচার করবেন। ইতি ৩০শে চৈত্র ১৩১৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

১ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা
২ রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ
৩ রবীন্দ্রনাথের পত্র
৪ রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর
৫ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্ব্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান

'কথা'র উৎসর্গ

সত্যরত্ন তুমি দিলে,— পরিবর্ত্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে ?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি— এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষি-ধূলায় প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে ! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে,— যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে !
হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত ! নিবোধত !" ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে ! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে ! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—

একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া !
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,— বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে !

[১৩০৮]

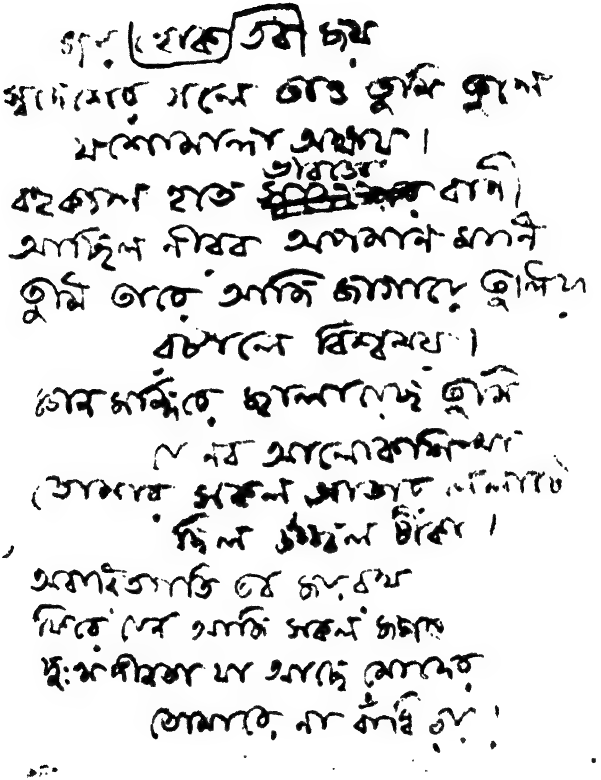

গান (খেকে) জয়ী জয়
স্বদেশের গলে আজ তুমি আনি
যশোমালা অক্ষয়।
বহুকাল হতে ~~[illegible]~~ ভারতের বাণী
আছিল নীরব অপমানমানী
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।
জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা।
অবারিত গতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ
দুঃখদীনতা যা আছে মোদের
তোমারে না বাঁধি তায়!

সংবর্ধনাসংগীত। ১৩০৯

সম্বর্ধনা-সঙ্গীত

ওঁ

জয় তব হোক জয় !
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয় !
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।

জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।
দুঃখ দীনতা যা' আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।

মাঘ
১৩০৯]

অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ। পাণ্ডুলিপি-চিত্র দ্রষ্টব্য

'খেয়া'র উৎসর্গ

বন্ধু,   এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কি পেয়েছে আকাশ হতে,
কি এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার   লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু,   সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা!
আমার   লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু,   আনো তোমার তড়িৎ পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্ম্মপানে চাও।
সারাদিনের গন্ধগীতি,
সারাদিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এযে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা।
আমার   লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু,   তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুনি এরি মাঝে
জীবন মৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার   লজ্জাবতী লতা।

কলিকাতা
১৮ আষাঢ় ১৩১৩

আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদিবা আমাদের সূর্য্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন একসূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলণ্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গরুর মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এসিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং তাঁহাদের দুগ্ধ যোগাইবার জন্য আছে, কিড্ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধসত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই একথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন্, কাল্ডিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইহারাই জগতে সভ্যতার

শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্সের অন্তর্গত, উষ্ণ সূর্য্যের করাধীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে পুনর্ব্বার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড় বড় জাতির উন্নতি ও অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে, তার্কিকের তর্কশৃঙ্খল তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্দ্ধাংশ মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবান্তর কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে। কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত য়ুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূভাগকে অংশ করিয়া লইবার জন্য খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজেদিগকে সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্য এবং অবজ্ঞা অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বসুর মত দৃষ্টান্ত আমাদিগকে পুনর্ব্বার আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকার-মধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমত জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[১৩০৫]

আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে উর্দ্ধে খাড়া করিয়া রাখে এবং কর্ম্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে; কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্মশ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতিধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণপণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। জীর্ণবস্ত্রকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বসিলে কাজে লাগে।

আমরা ভাল, এ কথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ

বস্তুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। আজ আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিয়াছে,— লজ্জিত ভারতকে যিনি সেই সুদিন দিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্য্যের জয়বার্ত্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নূতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক্ হইতে যে বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে; সত্যকেও সুদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হক্স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্য্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি ত ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীবশরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী শক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ-প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য্য জগদীশ রয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল— যান্ত্রিক ও ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া (The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোন বিদুষী ইংরাজ মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্ব-পশ্চাতে আচার্য্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙান রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,— এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে;— অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধপ্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে

উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলকসঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,—এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due tostimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ— শিষ্য-ভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল,— পদার্থতত্ত্ব-সন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্ব্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতিক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,— আমরা অদ্য যাহাকে "হিঁদুয়ানি" বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জনামাত্র; — তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের

অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্ব্বের উদয় হয়, কর্ম্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড়ত্ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মে কর্ম্মে, সেই পথ ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্য্যের নূতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেণ্ট্ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং একদল বণিক্‌সম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, এ কথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞানদ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুলকিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃষ্টান্ বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এজন্য অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারী, তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন,

বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত। ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অন্য কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় করি না। এখানে সর্বপ্রকার আনুকূল্যের অভাব। আচার্য্য জগদীশ কি করিতেছেন, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা-বশত আমরা বড়কে বড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক, আমাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নাই। ঈশ্বর যে সকল মহাত্মাকে এ দেশে কাজ করিতে পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্মেন্টের নোয়াখালি-জেলায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়। সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,— চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অনুকূল স্থান ;— এই ত স্বদেশের লোক— এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্ব্বদা বিজ্ঞানের আলোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে সুলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার কর্ম্ম

সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন! আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অনুনয় তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি। সে অনুনয় সমস্ত ক্ষতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদদুঃখ হইতেও বড়। তিনি সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য্য-প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম। অতএব এই প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্ব্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্ম্মে, এই হতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন, ইহাই আমরা একান্তমনে কামনা করি।

[১৩০৮]

জড় কি সজীব ?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু গতবারে বিলাতে গিয়া বিজ্ঞানের যে নূতন তথ্য প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিনে অল্পে অল্পে তাহার সংবাদ আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেই আবিষ্কার ঈথর-তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তারহীন টেলিগ্রাফযন্ত্রের কার্য্যোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে, এ খবর আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পুনর্ব্বার আচার্য্যবর য়ুরোপের পণ্ডিতসভায় নবতর তত্ত্ব উপহার লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াছি ব্যাপারটি অদ্ভুত। শুনিয়াছি জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়জীবের সাধর্ম্ম্য প্রমাণ করিয়াছেন।

সকল কথা আমরা এখনো স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিতরূপে জানিতে পারি নাই। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা হইতেই বিষয়টার মোট কথা আমরা কতকটা অনুমান করিতেছি।

অবৈজ্ঞানিক শ্রোতারা কি বুঝিয়াছেন, তাহা ইংরাজি 'গ্লোব'পত্রের নিম্নলিখিত পরিহাসবাক্যে জানা যায়। গ্লোব বলেন, ধাতুপদার্থের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিবার সময় অধ্যাপকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল। এ জন্য তাঁহাকে ধন্য বলি। কিন্তু আগুন উস্কাইবার লৌহদণ্ড যখন চুলার লৌহবেষ্টনের উপর পড়িয়া যাইবে, তখন তাহার আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া লইয়া আদর

করিতে বসিবে, বৃটিশ গৃহস্থর সে অবস্থা আসিতে বিলম্ব আছে।

বৃটিশ গৃহস্থর চিত্ত জড় কি সজীব, কি পরিমাণ তাহার বেদনাবোধ, কতটা আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরূহ পরীক্ষায় অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন না, তিনি লোহা-পিতলকে আঘাত করিয়া সাড়া পাইয়াছেন। গ্লোবের উক্তিতে ইহা বুঝা যায় যে, অধ্যাপকের মতে জড়ের জীবনধর্ম্ম আছে, অবৈজ্ঞানিক শ্রোতাদের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে।

জীবমাত্রই যে সচেতন, এ কথা মনে আনিবার প্রয়োজন নাই। অন্তত এখনো তাহার প্রমাণ হয় নাই। উদ্ভিদের চেতনা আছে কিনা, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার জীবন আছে, এ কথা সকলেই জানে।

লৌহদণ্ড পড়িয়া গেলে তাহার বেদনা বোধ হয়, এ কথা কেহ বলে না; কিন্তু সে যে আঘাত পায়, এ কথাও কেহ বলিত না। অর্থাৎ সজীব পদার্থ আছাড় খাইলে তাহাতে আঘাতের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, ধাতুপদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, ইহা জানা ছিল না। আচার্য্য জগদীশ পরীক্ষা দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণ শ্রোতার কথা উপরে লিখিলাম। এক্ষণে বিজ্ঞানবিদ্ বিশেষজ্ঞ কি বলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিষয়টার আভাস পাওয়া যাইবে। তড়িৎ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজী পত্র ইলেক্‌ট্রিশ্যানে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতার যে মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সজীব মাংসপেশীকে যদি চিমটি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ

যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন-রেখা আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গরেখা (curve) করাতের মত দন্তুর হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড় সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্ন রূপ।

দ্রব্যগুণে মাংসপেশীর সাড় বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড় প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আনে। অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দ্রব্য মাত্রাবিশেষে উত্তেজনা ও অন্যমাত্রায় অবসাদ আনয়ন করে।

সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সজীব স্নায়ুকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড় ও প্রকৃতি-লাভ দেখা যায়। কিন্তু স্নায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্যপ্রকার। ঘা লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুন আঘাত, শীতাতপের মাত্রাধিক্য, এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্যদ্বারা স্নায়ুতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশান্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র লওয়া হইয়াছে। মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদ্গণ বলেন, দেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়ই

জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃত পদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক-সূচির বিচলন দ্বারা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাড় ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ুমাংসপেশীর তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, তাহা দস্তুর— সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিকাশ পায় ;— ধাতুতারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রান্তরে অবসাদক; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায়।

এইরূপ নানা আঘাত-অপঘাতে ধাতুদ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার তরঙ্গচিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদ্‌গণ উভয় চিত্রকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

এই গেল আঘাতজনিত সাড়। আলোকজনিত সাড় সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি

কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যে সকল রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে। আলো লাগিলে সজীব চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ। সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থ-বিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে। এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্ত্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্ত্তাবহন-প্রণালী উলট্‌পালট্‌ করিয়া দিবে।

[১৩০৮]

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কালেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন-বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন।…

…এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া ;— অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা।

[১৩১১]

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধন্না দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বেড়াই— কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সে দিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত করিব না ?…

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন ?…

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী ছাত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন।

স্বদেশে বিজ্ঞানপ্রচার করিবার দ্বিতীয় সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্য্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

[১৩১২]

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্ম-প্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়চে; ধারা কোথায় গিয়ে মিশ্‌বে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়েনি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনো অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নূতন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্ব্বদা উৎসাহিত থাকৃত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয়নি; সেইজন্যে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেন নি। পূর্ব্ব উদয়াচলের ছায়ার দিক্‌টা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্ত্তি-সূর্য্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করৃছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবী করে বসে। তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে পারে তা'র মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে

ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভীড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চ্চনা সবই জুট্‌তে পারে; কিন্তু এখন পথযাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জ্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মত মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকৃতে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্ত্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সাম্‌নে প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ করবার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্ব্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠ্‌চে। সেই তাঁর ধর্ম্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জ্জন পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের ক'রেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্য্যোদয়ের মহিমা

চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্ব্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা ক'রে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্ত্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব্ব ক'রে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

২২ চৈত্র ১৩৩২

জগদীশচন্দ্র

তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছু দিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দ্দেশ করে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমার পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না। শোক দেশের হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যা অজর যা অমর তা রইল। শারীরিক বিচ্ছেদের আঘাতে সেই সম্পদের উপলব্ধি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি সত্য সেখানে তাঁকে বেশি করে পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। বন্ধুরূপে আমার যা কাজ সে আমার যখন শক্তি ছিল তখন করতে ত্রুটি করি নি। কবিরূপে আমার যা কর্ত্তব্য সেও আমার পূর্ণ সামর্থ্যের সময় প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছি— তাঁর স্মৃতি আমার রচনায় কীর্তিত হয়েই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ

দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল— কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত— "যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং", "এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।" সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।

তার পরে জগদীশ সরিয়ে আনলেন তাঁর পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলায় সংশয় নেই। অধ্যাপকের যন্ত্র-উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। উদ্ভিদের অন্দরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাজে সেই সব যন্ত্র আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে তাঁর সহযোগিতার উপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক, গম্যস্থানের উজান পথে

এগিয়ে দেবার কিছু না কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পূরো ভাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার এক জন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী

করবেন আমার জানবার দরকার নেই।" আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে। এই গৌরবের পথ সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদারচেতা বন্ধুর উদ্দেশে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তার পর থেকে জগদীশচন্দ্রের যশ ও সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে দূরে প্রসারিত হোতে লাগল, একথা সকলেরই জানা আছে। ইতিমধ্যে কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁর কীর্তিতে আকৃষ্ট হলেন, সহজেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁর পরীক্ষা-কাননের প্রতিষ্ঠা হোলো, এবং অবশেষে ঐশ্বর্য্যশালী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হোতে পারল। তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ-সাহায্য বোধ করি ভারতবর্ষে আর কখনো পায় নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষপর্যন্তই আপন লোকবিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্মীর পদ্মকে লোকে সোনার পদ্ম বলে থাকে। কিন্তু কাঠিন্য বিচার করলে তাকে লোহার পদ্ম বলাই সংগত। সেই লোহার আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি,

অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌, তারই গুণে।

এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হোলো বিশ্বভূমিকায়। এখানকার সার্থকতার ইতিহাস আমার আয়ত্তের অতীত। এদিকে আমার পক্ষে সময় এল যখন থেকে আমার নির্মম কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সীমায় রোদে বাদলে মাটিভাঙা আলবাঁধার কাজে আমি একলা ঠেকে গেলুম। তার সাধনকৃচ্ছ্রতায় আত্মীয়বন্ধুদের থেকে আমার চেষ্টাকে ও সময়কে নিল দূরে টেনে।

[১৩৪৪]

Years ago, when Jagadis Chandra, in his militant exuberance of youthfulness, was contemptuously defying all obstacles to the progress of his endeavour, I came into intimate contact with him, and became infected with his vigorous hopefulness. There was every chance of his frightening me away into a respectful distance, making me aware of the airy nothingness of my own imaginings. But to my relief, I found in him a dreamer, and it seemed to me, what surely was a half-truth, that it was more his magical instinct than the probing of his reason which startled out secrets of nature before sudden flashes of his imagination. In this I felt our mutual affinity but at the same time our difference, for to my mind he appeared to be the poet of the world of facts that waited to be proved by the scientist for their final triumph, whereas my own world of visions had their value, not in their absolute probability, but in their significance of delightfulness. All the same, I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality. I remember often having been assured by my friend that I only lacked the opportunity of training to be a scientist but not the temperament Thus in the prime of my youth I was strangely attracted by the personality of this remarkable man and found his mind sensitively alert in the poetical atmosphere of enjoyment which belonged to me.

At this time he was busy detecting in the behaviour of the non-living some hidden impulses of life. This aroused a keen enthusiasm in me who had ever been familiar with the utterance of the Upanishad which proclaims that whatever there is in this moving world vibrates with life. Afterwards he shifted his enquiries from the field of physics to the biological realm of plants. With the marvellously sensitive instruments which he invented he magnified the inaudible whisperings of vegetable life, which seemed to him somewhat similar in language to the message of our own nerves. My mind was overcome with joy at the idea of the unity of the heart-beats of the universe, and I felt sure that the pulsating light which palpitates in the stars has its electric kinship in the life that throbs in my own veins. I knew that this was not science, but my mind trembled with the hope that the opening message had already been declared and final evidences were in preparation.

At last when Jagadis Chandra sailed across the sea to place the results of his researches before the questioning scrutiny of the West, my heart expanded with an undoubting expectation of our country's claim to a world-recognition being accepted and at the prospect of a wide establishment of a wonderful truth which is native to our oriental attitude of mind. With what little lay in my power I helped him in his adventure but, fortunately, since then no more help was needed either in companionship or in other ways from a man like me who was too heavily burdened with his own responsibilities. His fame spread rapidly and material contributions from all sides showered upon his schemes, which centralized at last in the Bose Institute. I fervently hope that the Spirit of Science will find its lasting shrine in this place and the aspiration of the great master will remain a living force in its heart, making it a perpetual memorial worthy of him.

This tribute of mine to the memory of Jagadis will appear inadequately feeble, especially in contrast to the repeated magnification of his name in my writings both in prose and verse at the time when his fame was not luminously apparent above the horizon and when, I am sure, my fellowship and unfaltering faith in his genius did hearten and help him. But my struggling health, which has lately been wrenched back from the grip of death, is incompetent for most of my important tasks and also the singing hope that began its first soaring in immensity has completed its journey in its terminus.

JAGADISH CHANDRA BOSE

Memorial Address

When by some fortunate chance I came into an intimate contact with Sir Jagadish, he was in the prime of his youth and I was very nearly of his age. At that moment his mind seemed entranced with a vision of the living creatures' fundamental kinship with the world of the unconscious. He was busy in employing his marvellous inventiveness in coaxing mute Nature to yield her hidden language. The response which he received through skilful questionings revealed to him glimpses of the mystery of an existence that concealed its meaning underneath a contradiction of its appearance. I had the rare privilege of sharing the daily delight of his constant surprises. I believe, poets inherit the primeval age in their temperament when things in their infant simplicity revealed a common feature. Somehow these lovers of *Maya* feel the joy of their being spread all over the creation, which makes them indulge in seeking the analogy of the living in things that appear lifeless. Such an attitude of mind may not in all cases be based upon any definite belief, animistic or pantheistic; it may be merely a make-believe, as we notice in children's play, which owes its origin to the lurking tendency in our sub-conscious mind to ascribe life-energy to all activities in the natural world. I was made familiar from my boyhood with the Upanishad which, in its primitive intuition, proclaims that whatever there is in this world vibrates with life, the life that is one in the infinite.

This might have been the reason of the eager enthusiasm with which I expected that the idea of the boundless community of life in the world was on the verge of a final sanction from the logic of scientific verification. Being allowed to follow the Master's footsteps in the privacy of his pursuit, even though as a mere picker of his casual hints, I had my daily feast of wonders. At this early stage of his adventure when obstacles were powerfully numerous and jealousy largely predominated over appreciation, friendly companionship and sympathy must have had some needful value for him even from one who to maintain intellectual communion with him lacked special competency. Yet I can proudly claim to have helped him in some of his immediate needs and occasional hours of despondency in those days of an inadequate recognition and feeble support that he received from the public.

In the background of that distant memory of mine, I find not the slightest gleam of a vision of the enormous success that could before long combine scientific renown with a vast material means adequate enough to build this Institute, one of the very few richly endowed mediums in India for bestowing the benediction of science upon his countrymen. In fact, it makes me laugh at myself to-day to read, in some of my old letters, my effort to encourage him with the likelihood of filling the gaps in his funds when my own resources were precariously limited to persuading friends who were foolish enough to have faith in me.

Still it is comically sweet to think of the proud magnificence in my assurance fitfully accompanied by contribution absurdly poor compared to the ceaseless flow of tribute that, later on, he could attract by his own magnetic personality and also by the general confidence he widely aroused in his genius. But I repeat again, it was sweet to have dreamed impracticable dreams and to have done however little it was possible, as it proves a courage of joy in the faith in greatness which itself is a bounteous gift to one's own mind.

However ill-equipped as I was by the deficiency in my training and by the poet's idiosyncrasy to be a fit companion to a man of science at a luminous period of his self-revelation, I was still accepted as his close friend and, possibly because of the contrariety in our natural vocations, I was able to offer some stimulation to his urge of fulfilment. Not having the necessary amount of vanity in my constitution, it had been the subject of constant wonder in my mind.

Since then time passed quickly, maturing the fruits of our expectation. During this period of his fast-growing triumph, I was modest enough to feel less and less the urgency of my comradeship in his journey towards the goal, which was no longer arduous or beset with uncertainty. And yet I can rightfully claim the credit for strengthening in some measure his trust in his own destiny, by adding to it my own unwavering faith, at that painfully hesitant moment of fortune during the dubious dawn of his career, when even persons of meagre resources might have some important use.

Victory is the inalienable claim of all genuine power having the might of attraction that naturally exploits all kindred elements on its path and moulds them into an image of glory. And such an image is this Institute, which represents the Master's lifelong endeavour taking a permanent shape in the form of a centre for the inspiration of similar endeavours.

However, the early association of mine with the Master's first great challenge of genius to his fate, whose path at that time did not run smooth, belongs for me to a remote period of a history in which I feel myself hazily indistinct. And this made me seriously waver to accept the invitation for taking an honoured seat at a ceremonial meeting in this institution. The presumptuousness of youth made me absurdly proud to imagine that my companionship was growing into an organic part in the history that was being evolved before my eyes, and, in that belief I did try to hearten the hero, which was a part of my vanity. But foolish youth does not last for ever, and I have had time to come to realise my limitation. Anyhow it is quite obvious, that I am a mere poet carrying on my *sadhana* in the temple of language, the most capricious deity who is apt to ignore her responsibility to logic, often losing herself in the nebulous region of fantasy. Our oriental custom is to bring proper gifts to sacred shrines, but my gift of words for this occasion cannot but be out of place among the records of memorable proceedings of a learned society.

Fortunately there are some few men among us who can claim fellowship with the aristocracy in the realm of science, and can be expected to make splendid this ceremony with the wealth of their thoughts. I can only bless this institution from that obscure distance where the multitude of the uncared-for generations of this country have helplessly drifted to the pitiless toil of primitive land-tilling. I offer my salutation to the illustrious founder of this Institute, humbly sitting by those who are deprived of a sufficiency of that knowledge which only can save them from the desolating menace of scientific devilry and from the continual drainage of the resources of life, and I appeal to this Institute to bring our call to science herself to rescue the world from the clutches of the marauders who betray her noble mission into an unmitigated savagery.

১ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য-বাহাদুরকে লিখিত

…জগদীশবাবুর সেই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে আমি আনন্দসহকারে যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে দিন দুয়েকের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— সেখানে জগদীশবাবুর সহিত অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি বিলাতের পণ্ডিতদের নিকট হইতে মহোৎসাহপূর্ণ যে সমস্ত পত্র পাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন— 'আপনার নূতন আবিষ্কারগুলি পরমাশ্চর্যজনক।'… ২১ বৈশাখ ১৩০৭

২ ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত

…আমি ভাবিলাম তোমরা রাজপারিষদ। লোকের সাধু উদ্দেশ্যে তোমাদের বিশ্বাস নাই— সকলকেই তোমরা সন্দেহচক্ষে দেখ— মহারাজের স্বাভাবিক ঔদার্য্যকে তোমরা আচ্ছন্ন করিয়া আছ। বস্তুতঃ মহারাজের মত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলেই সাধারণ লোকে সন্দেহের চক্ষেই দেখে। সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে— আমি স্বার্থপর ভাবে ভিক্ষুভাবে মহারাজের দ্বারে গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। মহারাজ আমাকে মান্যবন্ধুভাবে দেখিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে নিজে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক কিন্তু শুনিতে পাই তোমরা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে সুদূরে রাখিতে চেষ্টা

কর— সুতরাং মহারাজের সহিত আমার প্রিয় সম্বন্ধ লোকচক্ষে হীন করিয়া তুলিতেছে। সেই সকল কারণে মহারাজের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ দূরে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টায় ছিলাম। কেবল জগদীশবাবুর কার্য্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না— লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব— ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসঙ্কোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব। আমি ধনীর পুত্র কিন্তু ধনী নহি— অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সঙ্কল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই— সুতরাং শুভকর্ম্মের অন্তরায়স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব। তাহার পরে যদি পারি তবে সংসারের সমস্ত স্তুতিনিন্দা হইতে নিজেকে দূরে লইয়া গিয়া শান্তচিত্তে স্বচেষ্টায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিব।··· [১৩০৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

···আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন তাতে বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উল্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত হবে— একবারে মূলতত্ত্বে ঘা দেবে— কেবল Physics নয়,

কেমিষ্ট্রি, ফিজিয়লজি এমন কি Psychology পর্য্যন্তে আঘাত করবে। যুদ্ধ ত আরম্ভ হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপের মধ্যে একজন মহারথী— জগদীশ বসুর মত বিশেষ রূপে তাঁরই মত খণ্ডন করেছে। সে জন্যে প্রথমে, প্রোফেসার যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলেন— কিন্তু জগদীশ বসুর প্রবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্রশংসাবাদ করে বসুজায়ার নিকট গিয়ে বল্লেন— Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তার পরে তাঁরা ওঁকে ধরে পড়েছেন যে, তুমি ইংলণ্ডে থেকে কাজ কর, ভারতবর্ষে তোমার বিস্তর ব্যাঘাত। ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভাসিটির অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন— তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি যে, জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণমনে প্রার্থনা করি তাঁর জয় হোক্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য-বাহাদুরকে লিখিত

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও, এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না— আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি— জগদীশবাবুর প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন:—

'তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও! আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল

করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে? তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, অন্যে যাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal lie, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ, নির্ম্মূল হইয়াছে—সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।"

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতিসাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বঙ্গদর্শনে তাহাই সম্যক্ আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে য়ুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইব না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হইব।

জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার

বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা-দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।… আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস্ দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী— আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গদ্বারা আমি প্রতিহত হইব না। মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব। মহারাজের নিকট পূর্ব্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আমাকে ব্যক্তিগত হিসাবে মার্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।… ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৮

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া?… মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে।… ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৯

অনুরক্ত ভক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

জোড়াসাঁকো

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

মহারাজের নিকট অধ্যাপক বসুর একটি প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি।

অধ্যাপক মহাশয় উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই বর্দ্ধনতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।

ত্রিপুরায় যে মুলী বাঁশ জন্মে— শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাঁহার পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সদ্য অঙ্কুরিত মুলী বাঁশের চারা মহারাজ যদি সত্বর তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে।

পথের মধ্যে অঙ্কুরাগ্র দলিত হইয়া গাছগুলি মরিয়া না যায় সে জন্য প্যাকবাক্সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহার উপরে খাঁচার আবরণ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আপাতত প্রায় ২০।২৫টি গাছ তাঁহার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার উপদ্রবে এগাছগুলি মারা গেলে অন্য তাজা গাছের পুনশ্চ প্রয়োজন হইবে— তখন মহারাজ পুনর্ব্বার আদেশ করিয়া দিবেন। কলিকাতার নিকটে এই গাছের সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে। ··· ইতি ২রা আষাঢ় ১৩১২

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

…বিধাতা দেশ থেকে আমাদের তাড়া করেছিলেন এই জন্যে যে, মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব। এই জন্যে যে, আমরা আরামে থাক্‌ব না আমরা আলোকে বাস করব—আমাদের জন্যে সম্পদ নয়, মুক্তি। যাই হোক্ আমি বেশ দেখতে পাচ্চি বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে— কোণের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে না। ঐ দেখনা, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোস্‌কে কেউ ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মন্ত্র কুণো বিজ্ঞানের মন্ত্র নয়— তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের মহাসঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্ব পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেচেন। এই যে তিনি দ্বার খুলে বেরিয়েচেন এ দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তাঁর দলের লোক আরো আসচে, পথে আর জায়গা হবে না। ইতিমধ্যে এক পয়সা দু পয়সার সাময়িক ও অসাময়িক পত্রগুলো কুণো-রাজ্যের দলাদলি নিয়ে কোঁদল করুক চীৎকার করুক, সে কারো কানে পৌছবে না— কেননা বাংলাদেশের অন্তরতম সাধন-লোকে সিদ্ধিদাতার আহ্বান এসে পৌচেছে।… ১০ই কার্ত্তিক ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত

…কোনো একটা জাতের সঙ্গে বৈষয়িক সম্বন্ধ থাকলেই তার বিকারে এইরকম অসত্য বুদ্ধি উগ্র হয়ে ওঠে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অবৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে মিলনের পথ উদ্‌ঘাটন করা। আমি য়ুরোপকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। আমি জানি ঐখানেই মানুষের মন সর্ব্বতোভাবে জেগেছে— এইজন্যে ঐখান থেকেই মানুষের সমস্ত কলুষ দূর হবে। যারা আধজাগা, আধমরা তারা নিজের অসাড়তার বোঝায় ধরণীকে ভারাক্রান্ত করে, এবং সজীব পদার্থকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। অথচ আমাদের সুপ্তির তলায় একটা চিত্ত আছে, আমরা বর্ব্বর নই। জাগ্রত জগতের সঙ্গে অন্তরের যোগ হলেই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হবে। তখন আমরা কেবল গ্রহণ করব না, দান করব। জগদীশ আজ বিশ্বকে যা দিচ্চেন তার মধ্যে ভারতের চিত্ত আছে, কিন্তু তার উদ্বোধন য়ুরোপের। তিনি যদি কূপমণ্ডূক হয়ে কেবল সাংখ্যদর্শন মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চর্চ্চা করতেন তাহলে কি হত সবাই জানি। সাংখ্যদর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্যে থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণশক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্রমাত্র হয়ে রয়েচে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে সজীবভাবে জানতে ও গ্রহণ করতে হলে য়ুরোপীয় বিদ্যার সঙ্গে তার সহযোগিতা ঘটাতেই হবে।… ২৮ ভাদ্র ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ভাণ্ডার-সম্পাদক

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ?

উত্তর : শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

শিক্ষার আদর্শ দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা সম্বন্ধে "ভাণ্ডারে" যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, আমি কেবল বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞান-চর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

এমন স্থলে এ দেশের য়ুনিভাসিটিকে এ দেশের অবস্থা ও অভাব বিশেষভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই :— অন্য দেশের অনুকরণ করিতে গেলে, সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা করিতে পারিতাম তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। যে ব্যক্তি চলিতে শিখিলেই আপাতত খুসি হওয়া যায়, তাহাকে একদমে লাফ দিতে শিখাইতে হইবে এমন পণ করিয়া বসিলে, লাফ দেওয়া ত হইবে না, মাঝে হইতে চলাই দুর্ঘট হইবে।

দেশে যাহারা একটা নূতন ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহারা কি উপায় গ্রহণ করে ? ভারতবাসীদের মধ্যে চায়ের ব্যবসা জাঁকাইয়া তুলিবার

জন্য কি করা হইয়াছে? দেশের যথাসম্ভব লোক যাহাতে চায়ের স্বাদ পায়, চা-পান করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার জন্য দেশ জুড়িয়া সস্তায় চা-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সেরা জাতের দামী চা চড়াদরে বাজারে বাহির করা, দেশে চা-প্রচলনের পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

দেশে নূতন বিদ্যা চালাইবারও এই একই উপায়। প্রথমপরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই;— যখন অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিদ্যার রস পাইতে থাকিবে, তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্য এখনকার চেয়ে কড়াক্কড়ি চলিতে পারিবে।

বিদেশী য়ুনিভার্সিটির চেয়ে আমাদের আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে, এই মিথ্যালজ্জার কোনো মূল্য নাই। সেখানকার আদর্শও চিরদিন একইভাবে ছিল না— জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

যাই হোক্ না কেন, রাজবাড়ীতে সকলে ক্ষীর খাইতেছে বলিয়া, দরিদ্র বেচারাকে সেই আদর্শে লজ্জার বশে দুধ খাওয়া ছাড়িতে কেহ পরামর্শ দিবে না— আপাতত যাহা আমাদের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সেই দিকে মন দিতে হইবে, গৌরবের কথা পরে ভাবা যাইবে।

তা ছাড়া, আর একটি কথা বলিবার আছে। বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিনসমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই, বিজ্ঞান-সাধকের মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞানপাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে।

আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই, এবং ছাত্ররা যাহাতে পুঁথিগতবিদ্যার শুষ্ককাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া, প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টিচালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

এরূপ শিক্ষা ভাগ্যদোষে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু দুরূহ নহে।

[১৩১২]

পরিশিষ্ট ৫

54 Parliament Street
London, S. W.
16 July 1901

My dear Robi,

I was glad to learn that some of our countrymen have been thinking of making arrangements to make Dr. Bose independent of the Government appointment which he holds, so that he may pursue his researches all his life to the credit and honour of our country. The idea is an excellent one, because the chance we have now will probably never return within a generation, if we lose it now. Dr. Bose has read startling papers and disclosed startling discoveries at the Royal Institution & the Royal Society, he has awakened the interest of the civilised and scientific world, and he is on the eve of revealing farther truths which will give our countrymen a position and a name. But to pursue his work to a successful termination against all opposition is a work of years,—and during these years we *must* support him and keep him in his work. The Indian Govt. *can't* do this and *won't* do this. They have refused his prayer for extention, and you know as well as I, they will not be sorry to see him withdrawn from his brilliant labours into the drudgery and obscurity of Calcutta. If ever there was an occasion for us to fight for our fame and honour,—this is the occasion!

I am sure you will be able to guess, as well as I, what his expenses here are likely to be. He has to keep an assistant on about £ 200 a year, his instruments and appliances will cost about as much, and living with his wife in this country & travelling from place to place,—to Germany or America sometimes,—will cost at least £ 600 a year.

Thus a thousand pounds a year,—(or 15,000 Rupees) is what is absolutely necessary for him ;— I believe Sir M. Bhownagree gets about three times as much for his political work ! Will our country fail to give our only scientist this support when so much is at stake, when a chance now lost may never come back to us ?

From past bitter experience, I would not depend on annual collections and contributions. As a friend, I would not advise Dr. Bose to give up his appointment,—miserable as it is,—depending on annual remittances. We must make him independent once for all, so that there may be no doubt as to his future, so that he may devote his whole time and energies to his work without any uncertainty in his prospects. I do not know how much money an Insurance Office would require in order to grant Dr. Bose an annuity of Rs 15,000 a year for the rest of his life. I imagine they would want two lakhs or so ;— and unless we can find this sum and pay it into an Insurance Office to assure an annuity to Dr. Bose during the rest of his life I see no other way of making him independent of that drudgery, humiliation and eternal worry which are certain to ruin his chances and our country's prospects for ever.

The suggestions I have made in this letter are all my own. I feel strongly in the matter, and have thought it out, and made my own calculations. And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make our one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country,— we shall lose our chance for ever and deserve to lose it. I know, Robi, you feel as strongly as I do ; you have immense influence in the country ; and I appeal therefore to you to try privately to raise this money & invest it in the manner proposed for the honour & the glory of our country.

Yours Ever Sincerely
Romesh Dutt

Bose Para Lane
Baghbazar.
Calcutta. Friday
June 16, 1899.

My dear Mr. Tagore,

You have heard long ago, I fancy, that I must go to England this summer & that therefore I shall not be able to accept that fascinating invitation to your river-house, towards wh. I had been steadily pressing for so long ! I was within a day or two of writing to you that, if you wd. allow me, I wd. come to Mrs. Tagore & yourself as soon as the Swami had started. Little did I think that before I shd. have written, my own fate wd. have been reversed !

I am really not at all happy to be going away from India— even for a little while— and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan. Besides, I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too !

But I hope that the greatest ends may be better served by my going than by my staying— & if that is so I know that you will feel with me that personal considerations simply do not count.

My Au Revoir includes a great many wishes for your good health & happiness until we meet again. Please give my kind regards and respects to Mrs. Tagore & my love to your charming children.

And believe me dear Mr. Tagore

Sincerely Yours,
Nivedita

9, Elysium Row,
Calcutta.
April 18th, 1903.

Dear Mr. Tagore,

You asked me to write you an account of the actual discoveries which Prof. Bose had made, & of the difficulties under which he had laboured in making them. But I imagine that you only want the kind of account that I can give you in a letter. I imagine, too, that in writing you a letter I am making a more or less confidential communication, so that I need not fear to use names occasionally knowing that I shall not be quoted in any public way.

When I came to Calcutta I first knew Prof. & Mrs. Bose, in the end of the year 1898. I was horrified to find the way in which a great worker could be subjected to continuous annoyances & petty difficulties—with the evident earnest desire of those who were about him to end his distinction which was personally galling to them. The college-routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence & flagrant misrepresentation.

These things may seem small in your eyes, but if you have the least idea (as you must have) of how impossible it is to do work requiring great insight or great & sustained emotion, unless there is freedom & peace, you will know how wonderful it is that our friend should have continued to work on & achieve, in spite of his surroundings at that time. If one could also realise, in a country situated as India is, the sacrifices that a free people, like the Americans or English, the French or the Germans wd. be willing to make in order to obtain such a worker as Dr. Bose —of their own blood— one wd. stand amazed, as I did, at the spectacle of a great scientific man working alone as he was. I had come, of course, from Europe, where Prof. Bose's name was well known as the discoverer of the Etheric Waves that penetrate minerals. His work was belated in reaching Europe. It was announced along with the Rontgen rays, & obviously went deeper— since that form of light was deterred by bone & metal, while *his* penetrated these substances. Already, early in the year 1895, I believe, he had demonstrated the existence of these invisible rays at the Town Hall, Calcutta— and it was not till two years after he had thus made the essential discovery— as some of the Italian scientific papers were the first to point out,— that Marconi began to work out & apply it on the large scale.

Of course you understand that men of the inventor & discoverer type— men like Marconi, Tesla, Mascine*, & so on,— rank in the world of science far below the investigator, the man of Sannyasin mind like Dr. Bose, who pursues knowledge for its own sake. Even Prof. ... jeopardises his great reputation, & certainly minimises his historic importance by taking patents & becoming involved in commercial schemes. But Dr. Bose not only demonstrated the existence of these particular etheric waves. He proved himself as great in constructive ability as in research itself, & his instrument, popularly known as the Artificial Eye, was considered a marvel of compactness & simplicity. Prince Kropotkin was talking of how Prof. Thomson the week before at the Royal Institn. had exhibited an apparatus some yards long, to act as a polariser of light— and Prof. Bose, the following week, to do the same thing, simply took up a book (it happened to be a Bradshaw) & showed how the rays wd. pass one way & not the other. "I said to myself", said Prince K, "that this was the simplicity of the highest genius." But of course Prof. Bose was only able to perform this great simplification of methods because *his* theory was so much more sound than those of his English & German competitors in this field.

---

* Mascart ?

He began to publish Papers through the Royal Society in, I think, the year 1894. From that date, working under all his difficulties as he was, he published 2 or 3 every year till he left for Paris in 1900. (One Paper in 2 years is considered a good record for a life that is surrounded by advantages.) And Prof. Bose's work was in each case completely original & in a special sense accurate & exhaustive. He was like a man haunted by the fear that if he failed at any point his people wd. be held to have no right to education. "Everyone knows that we have brilliant imagination" he told me, when he was fighting against death in

London in 1900, & still struggling to make a record of his latest discoveries, "but I have to prove that we have accuracy & dogged persistence besides." He did prove it. Lord Rayleigh & Sir Wm. Crookes both told him that while the perfection of his methods was unquestioned, no one had yet been able, in 1901, to repeat his experiments of 1895-6! His manipulation was beyond rivalry.

The work of '94 to 1900 had consisted of some dozen or more separate investigations on invisible light-polarisation. The existence of a dark cross— &c. &c.— these were valuable pieces of work, full of suggestions to some of the advanced workers in Europe, who were not slow to take hints from his instruments & theories. It was apparently in the year 1900, however, that all these separated tasks began to combine in a series of great generalisations which have not yet been given to the world in their completeness, and which are to prove of wider & wider philosophic interest as time goes on.

I allude to the great Theory of Stress & Strain— which, if only he can command time & strength to work it out in publication, will be held as epoch-making as Newton's Law of Gravitation— a tribute worthy of India's contributing to world-knowledge.

It is the minor applications of this generalisation that have hitherto attracted so much attention— one of the first discoveries to which it led was that of the Binocular Alternation of Vision.

Another was of a more practical (i.e. commercial) nature— leading to the improvement of the coherer in Wireless Signalling, & Lodge's collaborator, Dr. Muirhead, freely confessed that in the development of the system lately adopted for India, they had owed most important suggestions to Dr. Bose's Papers & conversation. The largest applications of the theory are however purely scientific. It gives an immediate clue to whole classes of apparent anomalies in photography, in chemistry, & in Molecular Physics generally. Amongst other things it led to the immediate discovery & formulation of the phenomenon known as Vegetable Response. In realms like these it has disproved the contentions of many would-be theorists of a smaller scale, & there is therefore a strong opposition to Prof. Bose's work amongst those physiologists who have tried to prove the unique character of life. This opposition is of course perfectly normal. It is usually in fighting against it, that a scientific man proves his greatness, & conquers those who disagree with him. But in this case, there is a strong race-feeling of jealousy to combine with the natural & necessary scientific opposition, & I have no doubt that it was through the efforts of these men at the India Office that the opportunity was taken to refuse Dr. Bose any extension of deputation, at the moment when his opinions began to be known, & before his book had yet come out.

It was the very man of whom I have this suspicion who in November, believing Prof. Bose to be in India, (to have been forced back to India indeed) stole some of his results & published them as his own. Fortunately Prof. Bose's position in the world of Science was too well assured for him to touch it, & though he has been able to organise a small party, we may regard it as easily discredited if the work can only be continued in an adequate way.

The book on Response in Living & Non-Living is now triumphant. I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,— a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanishads & pronounced it one, shall again survey the vast accumulations of physical phenomena which the 19th Century has observed & collected, & demonstrated to the empirical, machine-worshipping, gold-seeking mind of the West that these also are One— appearing as Many.

But I recognise that under present conditions one cannot even ask for the beginning of such a work. The petty daily persecution where perfect sympathy & every facility are absolutely necessary : the distracting routine of a paid servant who is never allowed to feel independent of daily bread, the constant difficulties thrown in the way by minor officials who have power enough to impede, but not enough to be raised above jealousy,— are these things not enough ? And then we ask him to undertake great work— but what are *we* willing to do for *him* ? Can we supply him with companions in learning who will stimulate & encourage the arduous work ? Does it trouble us that he is the one man in India doing work of the first rank, & that to this day he is paid less than *any* Englishman, even the commonest, wd. receive in his place ?

Dr. Garnett of London told me of the splendour of the great College of Sciences at Vienna, and how, when he exclaimed as to its cost, the government representative replied proudly that if *one* scientific man shd. be produced in a century there, it wd. be more than worth their while. Which of us feels like this ?

Ah India ! India ! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,— not to sit at ease, but— to go out & fight your battles where the fire is hottest & the labour most intense, and the contest raging thickest ? And if you cannot do this— if you cannot even bless your own child & send him out equipped, then,— is it worthwhile that the doom should be averted, & the hand of ruin stayed, from this unhappy & so-beloved land ?

This is all very inadequate, dear Mr. Tagore. But I have used many sheets of note-paper I see— & I must draw my letter to a close.

Ever yours faithfully
Nivedita
of Ramakrishna-V.

জগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালে লণ্ডন-প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (২ নভেম্বর ১৯০০)—

'তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।'[1]

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও জগদীশচন্দ্রের (১৮৫৮-১৯৩৭) সৌহার্দ্যের বিষয় আলোচনাপ্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস লিখিয়াছেন[2]—

Turning now to Bose's friendships among men, foremost and greatest... has been that with the poet Rabindranath Tagore. On the occasion of Bose's return [April, 1897[3]] from his successful visit to Europe in 1896, Tagore called to congratulate him and, not finding him at home, left on his work-table a great blossom of magnolia, as a fitting and characteristic message of regard. Since that time the two have been increasingly together, each complementing and thereby widening and deepening the other's characteristic outlook on nature and life...

রবীন্দ্র-জগদীশ-সৌহৃদ্যের এই সূচনাকালের কোনো চিহ্ন পত্রাকারে

---

[1] প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ৪১২

[2] Patrick Geddes, *The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose* (1920), p. 222

[3] '১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে বসু মহাশয় ভারতে প্রত্যাগত হন।' —জগদানন্দ রায়, 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' [১৩১৯], পৃ ৫

রক্ষিত হয় নাই; একমাত্র নিদর্শন 'কল্পনা' গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'জগদীশচন্দ্র বসু' ('বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে') কবিতা। বর্তমান গ্রন্থের সূচনায় পুনর্মুদ্রিত এই কবিতাটি মাঘ ১৩০৪ সংখ্যা প্রদীপ পত্রে 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়; রচনাশেষে তারিখ আছে ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪ (১৯ জুলাই ১৮৯৭)।

১৮৯৯ সাল হইতে উভয়েরই অনেকগুলি পত্র রক্ষা পাইয়াছে; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। জগদীশচন্দ্রের অধিকাংশ চিঠি প্রবাসী পত্রে[১] প্রকাশিত হইয়াছিল; অপ্রকাশিত কয়েকখানি পত্র রবীন্দ্রসদনে আছে। উভয় পত্রগুচ্ছের সংখ্যার তুলনা করিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি রক্ষা পায় নাই বা আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রবাসীতে জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর প্রকাশ সমাপ্ত হইলে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়।[২]

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকখানি চিঠি প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩] এইসকল পত্র 'চিঠিপত্র' গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি চিঠিও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল; উহার প্রথম ছয়খানি ইতিপূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত।[৪] রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অবলা বসু মহোদয়ার চিঠিপত্রও প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।[৫]

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ-পৌষ, ১৩৩৩

২ প্রবাসী, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৩

৩ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪ - আষাঢ় ১৩৪৫

৪ প্রবাসী; চৈত্র ১৩৪৪, শ্রাবণ ১৩৪৫

৫ প্রবাসী, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, বৈশাখ ১৩৩৪

পত্র ১। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। 'কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'কথা' (প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬— ইহার অনেক-গুলি কবিতা ১৩০৬ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যে রচিত হয়) এবং 'কাহিনী' (প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬)। কথা কাব্য জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত।

তুলনীয় জগদীশচন্দ্রের পত্র (২০ মে ১৮৯৯, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)—

'আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? ·· মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।' [1]

জগদীশচন্দ্র কর্ণ-চরিত্রের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এই পত্রেই তিনি লিখিতেছেন—

'একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্ব্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা

---

[1] 'বাল্যকালে এবং পরবর্ত্তী জীবনে কোন্ কোন্ বই·· মনে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে' এই প্রশ্নের উত্তরে জগদীশচন্দ্র ৭. ৯. ৩৩. তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্ত্তমান কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।'— বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪০

হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।'

এই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" রচনা করেন (১৫ ফাল্গুন ১৩০৬)।

পত্র ২। 'সেই অর্দ্ধশ্রুত গল্পটি…আস্তে আস্তে লিখি'

এই গল্পটি 'চোখের বালি' হইলেও হইতে পারে। ২৬ শ্রাবণ ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে[১] 'চোখের বালি'র ('বিনোদিনী'র) যেরূপ উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমশ লিখিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে 'চিরকুমার সভা'ও ঐরূপে লিখিত ও ভারতী পত্রে ১৩০৭ বৈশাখ হইতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়; তবে এই ক্ষেত্রে 'মাসিক পত্রের তাড়া' যথেষ্টই ছিল।

পত্র ৩। ১০ আষাঢ় ১৩০৬ (২৪ জুন ১৮৯৯)। 'আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।'

দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রের পত্র, ২১ জুন ১৮৯৯ (৭ আষাঢ় ১৩০৬)—

'আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে বন্ধুভাবে স্মরণ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখী হইয়াছি। আপনার সুখ ও উৎফুল্লতার সময় সহভাগী করিয়া যেরূপ সুখী করেন, অন্ত সময়ে স্মরণ করিলে বন্ধুতার নিদর্শন দেখি।

'আপনি যে গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদককে এতৎসম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। তবে এরূপ বিষয়ে একান্ত উপেক্ষা করাই

---

[১] প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৮৩

সমুচিত কিনা মনে করিয়া ইতস্তত: করিতেছিলাম। আমি লিখিব কিন্তু অধিক importance দিতে চাহি না। আপনি অনেক উচ্চে আছেন; এসব কর্দ্দম আপনাকে স্পর্শ করিবে না।

'আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি, যাঁহারা কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা অনেকের ভালবাসা দ্বারা উন্নীত না হইলে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার ভক্তের অভাব নাই। যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বচন কি আপনার নিকট পৌছে না? আমি ত কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই।... বৃহত্তর জীবন আপনার জীবনকে পরাস্ত ও অধিকার করিয়াছে।'[1]

এই প্রসঙ্গে তুলনীয়, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৭ আষাঢ় ১৩০৬, ২১ জুন ১৮৯৯)—

'কুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।'[2]

প্রিয়নাথ সেন ও জগদীশচন্দ্রের উত্তর পাইয়া, রবীন্দ্রনাথ যেদিন জগদীশচন্দ্রকে আলোচ্য চিঠিখানি লিখিয়াছেন সেইদিন (১০ আষাঢ় ১৩০৬) প্রিয়নাথ সেনকেও লিখিতেছেন—

---

[1] রবীন্দ্রনাথ যে পত্রে 'গল্পের কথা' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পাওয়া যায় নাই। ৪ আষাঢ় ১৩০৬ তারিখের পত্রেই এই গল্পের প্রসঙ্গ ছিল, প্রবাসীতে মুদ্রণকালে ঐ প্রসঙ্গ বর্জিত হইয়াছে, এরূপও হইতে পারে। মূল পত্রখানি এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই।

[2] প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৫

'আমি সাহিত্য পড়ি নাই। কিন্তু তুমি যে নিন্দুক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইলাম। তোমরা আমার হইয়া রাগ করিলে, মনে হয়, আমার আর রাগ করিবার বা দুঃখ পাইবার দরকার করে না— আমি শান্তিলাভ করি।— মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না— সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি— কিন্তু সংসারে কাঁটার উপরে পা না ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে ফোটে ; — দুঃখ বেদনার পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই— আছে নিজের মনে— তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহুদূরে।'[১]

জগদীশচন্দ্রের চিঠি উল্লেখ করিয়া ঐ পত্রেই লিখিতেছেন—

'ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন— তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি ;— বন্ধুহৃদয়ের সমবেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিধারার মত— তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।'

পত্র ৩। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল ; ইহার ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণা সঞ্চার করেন 'ইতিহাস' গ্রন্থে তাহার প্রভূত নিদর্শন সংকলিত আছে। অক্ষয়কুমার রেশমশিল্পে বিশেষজ্ঞ এবং দেশে ঐ শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্‌যোগী ছিলেন—

---

[১] প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৫-৭৬

রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়েও তাঁহার আলোচনা চলিত।[১] অক্ষয়কুমার রাজসাহী শিল্পবিদ্যালয়ের একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন, এই বিদ্যালয় হইতে রেশমের কাপড় কিনিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করিতেন, বন্ধুদেরও উপহার দিতেন— 'বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার।'[২]

রবীন্দ্রনাথও এই সময় পল্লীর উন্নতিকল্পে নানা কল্পনায় ও পরীক্ষায় উৎসুক, সেই সূত্রেই 'রেশমের গুটি'র অভ্যাগম।

পত্র ৩। লরেন্স্।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক[৩], পরে শান্তিনিকেতনেও অধ্যাপক ছিলেন। 'এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না।'[৪]

রেশমের চাষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন—

'লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের

---

[১] রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের পত্র, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩, পৃ ২৬৭

[২] মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ৩০ চৈত্র ১৩০৫। রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা [১৩৪৮], পৃ ১০৭

[৩] 'আমাদের শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলার ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরাজি অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখনও ছাড়িতে চায় না কিন্তু উপায় দেখি না।… ১৮ই ভাদ্র ১৩০৮' —মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা', পৃ ১০৮

[৪] রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ৭ পৌষ ১৩৪৮ সংস্করণ, পৃ ৪০

নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন।···

'লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; ···চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা— সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে

জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে।'[১]

দেশীয় শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের এই চেষ্টায় "প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়" রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে কী পরিমাণ যুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা এই বিবরণে উল্লিখিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের পত্রে দেখা যায়, তিনিও, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই, এই সময় রেশমের কীট -পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পত্র ৩। 'চাষ-বাসের কাজ।'

এই পত্র লিখিবার কিছুকাল পূর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পৈতৃক জমিদারিতে বাস করিতেছিলেন। ইহারও পূর্বে, জমিদারি-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া, 'দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের' 'যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক' বলিয়া তিনি অনুভব করিতেছিলেন, 'এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভর-পর সরল চাষাভুষোদের' অক্ষম অবস্থা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতেছিল।[১] —রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বারংবার বিফলকাম

---

[১] পূর্বোক্ত— আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৪১-৪৩।

[১] ছিন্নপত্র গ্রন্থে ২১ আগস্ট ১৮৯৩ তারিখের পত্র। অপিচ ১০ মে ১৮৯৩ তারিখের পত্রে দ্রষ্টব্য—

'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখ্‌লে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মত নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না

হইয়াও পল্লীমঙ্গলের যে উদ্‌যোগ ও আয়োজন করিয়াছেন আলোচ্য সময়ে ‘চাষ-বাসের কাজ’ তাহার একরূপ সূচনা বলা যাইতে পারে—

‘শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল্‌ কলেজে পাশ করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুন্ন রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও … পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন।’[১]

পত্র ৩। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন; ১৩০৪ সালে (১৮৯৭) তিনি তাঁহার ‘বিরহ’ নাটিকা ‘কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে’ এইভাবে উৎসর্গ করেন— ‘বন্ধুবর! আপনি আমার রহস্যগীতির

দিলে এদের আর গতি নেই।… সোশিয়ালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড় নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগা! কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্ কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে!’

[১] পূর্বোক্ত— আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৩৯-৪০

পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল'। রবীন্দ্রনাথ এই কালে দ্বিজেন্দ্রলালের নিম্নোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রশস্তি রচনা করেন— আর্যগাথা, দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩), ১৩০১ অগ্রহায়ণ সাধনা পত্রে; আষাঢ়ে (১৮৯৯), ১৩০৫ অগ্রহায়ণ ভারতী পত্রে; এবং মন্দ্র (১৯০২), ১৩০৯ কার্তিক বঙ্গদর্শন পত্রে। এই রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধনা-সম্পাদকরূপে 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগেও, মাসিক পত্রে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উভয়ের মধ্যে বিরোধের প্রকাশ্য সূচনা 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় প্রকাশের পর। এই সৌহৃদ্য ও বিচ্ছেদের বিবরণ দেবকুমার রায় চৌধুরী -প্রণীত দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থে ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -লিখিত রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

'শস্যক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছিলেন।

পত্র ৪। এই পত্রে সাল লিখিত নাই, তারিখ ও মাস (১ আশ্বিন) উল্লিখিত আছে; ১৩০৭ সালে লিখিত বলিয়া অনুমিত। এই পত্রে লোকেন্দ্রনাথ পালিত -কৃত ওমর খৈয়ামের একটি রুবাই'এর অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহা ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে মুদ্রিত হয়, রচনার তারিখ দেওয়া আছে ভাদ্র ১৩০৭।

১৯০০ সালে প্যারিস প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত ইন্‌টার্‌ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট্‌স্'এ আমন্ত্রিত হইয়া জগদীশচন্দ্র বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে তাহাতে যোগ দেন (আগস্ট্ মাসে) ও Response of Inorganic and Living Matter সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ

করেন।[১] তথা হইতে লণ্ডনে গিয়া জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন (৩১ আগস্ট ১৯০০) তাহাতে তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্যারিস ও লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের মনোভাবের বিবরণ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের এই পত্রের উত্তরেই লিখিত—

'একদিন [প্যারিস] Congressএর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর Congressএর Secretary··· আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন— But, monsieur, this is very beautiful (butএর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই।) তারপর আরও তিন দিন এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited— শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congressএর অন্যান্য Secretary এবং Presidentএর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।···

'এই গেল প্যারিসের পালা। তাহার পর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন, যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic ! this is magic ! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার

---

[১] গেডিস, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৮৮

নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন-কোন physicists, কোন-কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন-কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন…

‘কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে, যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপাততঃ রহিয়াছে।’

পত্র ৪। ‘লর্ড রবার্টসের মত… প্রিটোরিয়ায় ক্রিস্‌মাস করতে পারবেন।’

১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে; ইংরেজ সেনাপতি লর্ড রবার্ট্‌স্‌ বিশাল বাহিনী লইয়া রাজধানী প্রিটোরিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৯০০ সালের ৫ জুন প্রিটোরিয়া অধিকৃত হয়।

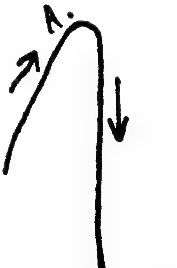

পত্র ৪। ‘আপনি ‘ক’ বিন্দুতে কম্পমান, আমি ‘খ’ বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট’

জগদীশচন্দ্রের যে পত্রের (৩১ আগস্ট ১৯০০) উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি, তাহাতে জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কার-প্রসঙ্গে কোনো বিজ্ঞানীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন ‘এত Surprise একেবারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না— it is human nature, A বিন্দু পর্যান্ত উঠিতে পারে, তারপর হঠাৎ মন ভাঙ্গিয়া B বিন্দুতে নামিয়া যায়'— এই পতন-অভ্যুদয় জগদীশচন্দ্র চিঠিতে চিত্রিত করিয়াও দেখাইয়াছিলেন। তাহারই অনুবর্তনে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে, জগদীশচন্দ্র বিদেশে উদ্যম-উদ্দীপনার উচ্চবিন্দুতে, রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামে 'নিশ্চেষ্ট'তার নিম্নবিন্দুতে।

পত্র ৪। 'Sketch Book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি।'

রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন প্রাচীন বয়সে (১৩৩৫); কিন্তু প্রথমজীবনেও চিত্রবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন, একান্তে কখনো কখনো এ বিষয়ে চর্চাও করিয়াছেন। আলোচ্য পত্র লিখিবার সাত বৎসর পূর্বে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লিখিতেছেন—

'আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ।··· লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যিকথা যদি বল্‌তে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্ব্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মত তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ— তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান্ না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' ছিন্নপত্র, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩ [১৩০০]

ইহারও পূর্বে চিত্রচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায় জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ে—

'মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-

মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।'

এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত গানগুলির প্রকাশ-তারিখ হইতে মনে হয় যে, সম্ভব ইহা ১৮৮৫ (১২৯২) বা তাহার কাছাকাছি সময়ের কথা।

পত্র ৪। 'আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত'

এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় চার বৎসর পরে। ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র সুহৃদ্‌বর্গসহ বুদ্ধগয়া যান। ভগিনী নিবেদিতাও এই সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ("Sister Nivedita as I knew her", Hindusthan Standard, Puja Annual, 1952) এই ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

Early in the month of October, 1904, Nivedita, Dr. Jagadish C. Bose, Rabindranath Tagore, Swami Sadanand (Gupta Maharaj), Brahmachari Amulya (now Swami Shankaranand) went to pass a week at Bodh Gaya. I was invited and joined them from Patna. We were lodged in the *mahant's* guest-house.

There were daily readings from Warren's *Buddhism in Translations* and occasionally Edwin Arnold's *Light of Asia* ; some songs and recitations by the Poet, too. In the daytime we strolled through the temple enclosure, or visited the neighbouring villages. In the evening twilight we went to the Bodhi tree and sat in the gloom in silent meditation. There we found a remarkable character. Fuji, a poor Japanese fisherman had

by hard austerity for many years, saved money to gratify his life's dream of making a pilgrimage to the spot where the Blessed One had attained to Enlightenment. He had at last come here and lived frugally in a room of the pilgrim house. Every evening he would come and sit under the Bodhi Tree praying and chanting the hymn—

Namo namo Buddha Divakaraya,
Namo namo Gotama-Chandimaya,
Namo namo Nanta-Gunannabaya,
Namo namo Sakya-Nandanaya.

In the silence and gloaming the Sanskrit (Prakrit) words uttered with a Japanese accent, rose like the tolling of a low bell, which made us feel as if overpowered by the spirit of the place. Words were not uttered ; it was beyond speech.

It interests me to think that Rabindranath remembered this hymn,[১] and when he wrote his play *Natir Puja* he took care to insert it as Shrimati's prayer. Fuji had given the hint.

পত্র ৪। 'লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল··· নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি।'

সম্ভবতঃ লোকেন্দ্রনাথের উদ্যোগ কার্যে পরিণত হয় নাই, এই কাব্য-

---

[১] এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই জাপানী ভক্তের কথা রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরেও স্মরণ করিয়াছেন, ১৩৪২ বৈশাখী পূর্ণিমায় কলিকাতা শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণে। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত বুদ্ধদেব (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) পৃ ২০-৩

চয়ন প্রকাশিত হয় নাই ; 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয় অনেক পরে (১৯০৯), কবির তরুণ অনুরাগীগণ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভবত এ বিষয়ে উদ্‌যোগী ছিলেন। সম্প্রতি একখানি 'কাব্য-গ্রন্থে' (১৮৯৬) কবির হাতের নানা সম্পাদনা লক্ষ্য করিয়াও মনে হয়, তিনি 'নিজেই এ কাজে হাত' দিয়াছিলেন, যদিও তাহা সমাধা হয় নাই। এই সম্পর্কে ৬-সংখ্যক পত্রও দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪। 'আর্যা।' তুলনীয় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের চিঠি— 'Mrs কথাটা বাংলাতে অতি বীভৎসজনক। আপনি একটি নূতন কথা বাহির করিবেন।'

পত্র ৪। 'শ্যালকজায়া আর্যা সরলা' সতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা।

পত্র ৪। 'শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত।··· আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তা'হলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে।'—

'ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

'এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

'তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সম্পাদকের নিবেদন', [শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত] সংস্কৃত প্রবেশ, প্রথম ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত 'সংস্কৃত পাঠ', দুই খণ্ডে, ১৮৯৬ সালে 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (অচলিতসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্র ৪। 'আপনার জন্যে পুরীর জমীটি'

পুরীতে রবীন্দ্রনাথের 'জমি ও গোটাকতক ঘর' ছিল। জগদীশচন্দ্রকে এই জমি রবীন্দ্রনাথ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (১৮ আগস্ট ১৯০৩)—

'তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ! তুমি কি মনে কর আমার কোন স্থানের উপর কোনমাত্র টান আছে? কেবল একসময় মনে করিয়াছিলাম যে, দুজনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব।··· তুমি যদি এরূপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, আমার পক্ষে ওরূপ নির্জ্জনবাস অসহ্য হইবে।'

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ঋণমোচনের জন্য অবশেষে তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।[১] এই প্রসঙ্গে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'বিদ্যালয়ের fund হইতে এই বাড়িটা করিয়া দিলে কিরূপ হয়? তা যদি না হয় তবে সেখানকার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট বলিতেছিলেন ··· পুরীতে জমি কিনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। যদি হাজার তিন চার টাকা পাওয়া যায়, তবে তাঁহাকে বেচিয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে জমা করা যাইতে পারে। তুমি কাহাকে দিয়া ··· নিকট যাচাই করিতে পার?'

---

[১] 'সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল।' —আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬৪

পুরী এক সময় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে; জগদীশচন্দ্রকেও পুরীতে সঙ্গীরূপে পাইবার জন্য তাঁহাকে এখানে গৃহ-নির্মাণে তিনি উৎসাহিত করেন। জগদীশচন্দ্র এক চিঠিতে (২১ জুন ১৯০০) রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

'পুরীর বর্ণনা শুনিয়া আমার মন সেখানে আছে। সমুদ্রগর্জ্জন ও বাতাস ও ঢেউ আমাকে ঘেরিয়া আছে। এই সংকীর্ণ নগর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজকে হারাইতে চাহি।'[1]

পত্র ৫। 'সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে?'

একাধিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-অর্জন প্রসঙ্গে সীজারের কীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ২০-সংখ্যক পত্রেও লিখিয়াছেন 'সীজারের নৌকা কখন ডুবে না'। সীজারের বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে যেরূপ নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত, 'উষ্ণমণ্ডলবাসী' জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তাও সেকালে সেইরূপ অলোকসামান্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল— 'ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন', 'ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে।' 'সীজারের নৌকা' প্রসঙ্গে বোধ করি নিম্নলিখিত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিতেছিল[1]—

At Apollonia, since the force which he had with him was not a match for the enemy and the delay of his troops on the other side caused him perplexity and distress, Caesar conceived the dangerous plan of embarking in a twelve-oared boat, without any

---

[1] ইংরেজি উদ্ধৃতি শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

one's knowledge, and going over to Brundisium, though the sea was encompassed by such large armaments of the enemy. At night, accordingly, after disguising himself in the dress of a slave he went on board, threw himself down as one of no account, and kept quiet. While the river, Aous was carrying the boat down towards the sea, the early morning breeze, which at that time usually made the mouth of the river calm by driving back the waves, was quelled by a strong wind which blew from the sea during the night; and the river therefore chafed against the inflow of the sea and the opposition of the billows, and was rough, being beaten back with a great din and violent eddies, so that it was impossible for the master of the boat to force his way along. He therefore ordered the sailors to come about in order to retrace his course. But Caesar, perceiving this, disclosed himself, took the master of the boat by the hand, who was terrified at sight of him, and said: "Come, good man, *be bold and fear naught*; *thou carryest Caesar and Caesar's fortune in thy boat.*" The sailors forgot the storm and laying to their oars, tried with all alacrity to force their way down the river...

পত্র ৫ । 'আমার সমস্ত ছোটগল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে ।'

ইহাই প্রথমসংস্করণ গল্পগুচ্ছ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত ; প্রথম খণ্ড ১ আশ্বিন ১৩০৭ (বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী ১১ অক্টোবর ১৯০০) তারিখে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০৭ [১৯০১] সালে প্রকাশিত ।

পত্র ৫। 'আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে'

জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রচারে উদযোগী হইলেও সে চেষ্টা তখন সার্থক হয় নাই। ১৯০০ সালের ২ নভেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, **আমি** তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তারপর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।'

জগদীশচন্দ্র পুনরায় এ বিষয়ে ১৯০০ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে লিখিতেছেন—

'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। publisherরা ফাঁকি দিতে চায়।

সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?[১] আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

'এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই।'

১৯০১, ১৬ জানুয়ারি তারিখে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৬টি গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে-সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই। এদেশে এমন লোক আজকাল অধিকমাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের কিপ্লিংই গুরু, সুতরাং popular হইবে কি না জানি না। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি :—

'প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান্ মহিলা— সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। "ছুটী" শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

'দ্বিতীয়— Typical John Bull। "ছুটী" শুনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না— ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে,

---

[১] জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র [১২ ডিসেম্বর ১৯০০]—'আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না— তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।'

এরূপ দু-একজনকে আমি জানি— true to life। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।

'তৃতীয়। আমার এই বন্ধুটির[১] সম্বন্ধে দেখা হইলে বলিব; ইহার জীবন অতি আশ্চর্য। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়— ইয়োরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত। He has not seen such a fine touch in any European Literature.

'সুতরাং সাধারণের নিকট কিরূপ লাগিবে জানি না।

'কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এখানকার একজন publisherএর নিকট পাঠাইতে চাই। এদেশীয় publisher চোর। অনেক দর-দস্তুর করিতে হইবে। প্রথমে লোকসান পূরণের জন্য টাকা চাহিবে।

'অথবা কোন Magazineএ পাঠাইতে পারি।'

পুনরায় ঐ বৎসর ২২ মে তারিখে লিখিতেছেন—

'তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন ম্যাগাজিনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, গল্প অতি সুন্দর; কিন্তু original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না। তোমার নাম জাল করিতে যদি অধিকার দাও, তাহা হইলে অনুবাদের কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল ?'[২]

কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে বাসকালে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার সন্দর্শনে যাইতেন তখন এই কড়ার থাকিত যে, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ

---

[১] সম্ভবতঃ Prince Kropotkin

[২] বর্তমান প্রসঙ্গে প্যাট্রিক গেডিস পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ ২২৩) লিখিয়াছেন—

Tagore, though occupying the foremost literary position in India, was not at that time known in Europe, and Bose felt keenly that the West had not the opportunity of realising his friend's

একটি গল্প রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্রের চিত্তবিনোদন করিবেন।[1] জগদীশচন্দ্রের একখানি চিঠিতে দেখি (১৮ এপ্রিল ১৯০০), তিনি শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া তাঁহার 'পাওনা' আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন—

'আপনার লেখা গল্প মাঝে-মাঝে পাঠাইবেন। প্রথম কয়টা দিন আপনি ফাঁকি দিয়াছেন। অন্ততঃ সে কয়টা গল্প আমার পাওনা আছে।'

জগদীশচন্দ্রের অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সকৌতুক উল্লেখ অনুপ্রবিষ্ট— 'আমি এ কয়দিন "মেঘ ও রৌদ্রের" মধ্য দিয়া গিয়াছি। মেঘের মধ্যে রজতরেখা কখন কখন দেখা দিয়াছে' (৬ মার্চ ১৯০০)। 'দেখিবেন সদরের অনুগ্রহে যেন আমি অন্দরের বিরাগভাজন না হই' (১৬ মার্চ ১৯০০)। 'তোমার মিনির বিবাহ হইল। কাবুলীওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে' (১১ জুলাই ১৯০১)।

greatness. So during his second visit to England, in 1900, he had one of his stories, 'The Kabuliwalla', translated into English. Prince Kropotkin— a good critic in letters as well as science— declared it to be the most pathetic story he had ever heard, reminding him of the greatest writers among his countrymen; and Bose submitted it to *Harper's Magazine*. It was declined, because the West was not sufficiently interested in Oriental life! The time had not yet come: but Bose during his last visit to America in 1915, when Tagore's fame was reaching its meridian, did not fail to utilise the opportunity to rub this in when Harper was publishing one of his own articles.

[1] Once, on receiving an invitation from the poet to stay with him at his house at Silaida on the river Padma, Bose accepted it with the demand of the fullest and highest hospitality his friend could render him— that of a new story to be written every day, and read to him every evening!— গেডিস, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২২২

রবীন্দ্রনাথের ‘জয়পরাজয়’ গল্প জগদীশচন্দ্রকে কিরূপ উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল জগদীশচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি চিঠিতে (৩০ আগস্ট ১৯০১) তাহার উল্লেখ আছে—

‘তোমার ‘জয়পরাজয়’ গল্পটি আমাকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে, বলিতে পারি না। রয়্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুসনের বক্তৃতার দিন যেন তাহারই অভিনয় হইতেছিল। যদি ভক্তের পূজা ভারতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে জয় পরাজয় আমার নিকট একই।’

এই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই জগদীশচন্দ্র বসুবিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে (৩০ নভেম্বর ১৯১৭) ‘নিবেদন’এর পরিসমাপ্তিতে বলিলেন—

‘যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপে পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।’[১]

পত্র ৫। ‘ত্রিপুরার মহারাজ…পূর্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।’

৬, ১৭, ১৮ -সংখ্যক পত্রেও এই প্রসঙ্গ আলোচিত; বর্তমান খণ্ডে সংগৃহীত অন্য কোনো কোনো পত্রে এবং প্রবন্ধেও এই প্রসঙ্গ আছে। ত্রিপুরার মহারাজার নিকট হইতে জগদীশচন্দ্র যে আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে জগদীশচন্দ্র একটি বক্তৃতায়[২] সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রাধাকিশোরের এই যোগাযোগ সাধন

---

[১] জগদীশচন্দ্র বসু, ‘অব্যক্ত’

[২] মহিমচন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক তাঁহার ‘দেশীয় রাজ্য’ গ্রন্থে “ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধে The Englishman পত্রিকা হইতে উদ্‌ধৃত।

করিয়াছিলেন প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ; জগদীশচন্দ্রের প্রতি আনুকূল্যবিধানের জন্য মহারাজকে রবীন্দ্রনাথ যেরূপ বারংবার প্রবর্তিত করিয়াছেন সে কথা, রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিগুলি এইখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেই প্রকাশ। ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'একবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনো রাধাকিশোরের সহিত জগদীশবাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ...১৯০০ খৃঃ অব্দের বিষয়।... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে জানিতে দিয়াছিলেন, "...যদি তুমি পার উপস্থিত হইও।"... মহারাজ এ খবর পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।... রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।...

'তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্য্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০৲ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০৲ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর রাজ দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসিতে দেখিয়া

বলেন, “এ বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব।…” তখন যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। মহারাজ বলিলেন—“বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দুএক পদ অলঙ্কার নাই বা… হইল”… [১]

‘…তৎপর জগদীশবাবু বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীয় গবেষণা প্রচারের বাসনায় বিলাত যাত্রা করেন। তথায় নানা কারণে তাঁহার আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হইতে লাগিল। অথচ ছুটী ফুরাইয়া আসায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইত, এমনি অবস্থায় রাধাকিশোরের ঐকান্তিক উৎসাহ বাণী এবং ২০,০০০৲ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যলাভে, বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাজের জয়মাল্য লইয়া দেশে ফিরিলেন। সে কাহিনী স্বয়ং আচার্য্য জগদীশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাষণে[২] সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।’[৩]

পত্র ৫। ‘বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন?’

ইহার কিছুকাল পূর্বে জগদীশচন্দ্র ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ব্রাড্‌ফোর্ড্‌ সভায় প্রবন্ধপাঠ (সেপ্টেম্বর ১৯০০) করিলে বৈজ্ঞানিক শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হন, এবং তাঁহার গবেষণা যাহাতে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে এজন্য তাঁহাদের কেহ কেহ জগদীশচন্দ্রকে ইংলণ্ডেই অধ্যাপনাকর্মে ব্রতী হইতে আহ্বান করেন। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে লিখিতেছেন—

‘বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার stereoscopeএ

---

[১] তুলনীয় “জগদীশচন্দ্র”, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ১২৬

[২] পূর্বে উল্লিখিত বক্তৃতা

[৩] মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা, “ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ”, দেশীয় রাজ্য; ওই গ্রন্থের “ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ” প্রবন্ধেরও কোনো কোনো বাক্য এই উদ্‌ধৃতির অন্তর্গত।

MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "You have a very fine research in hand, go on with it"। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others— all very important"। আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

'তার পরের দিন Prof. Barret আমাকে বলিলেন, "We had a talk last night (Lodge was one of us). We thought your time is being wasted in India and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a very good appointment (কোন সুপ্রসিদ্ধ Universityর নূতন Professorship) and should you care to accept it, no one else will get it."

'এখন বলুন কি করি? এক দিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি— যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্য দিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspirationএর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?'

জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনীর সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা

জানেন, প্রথমজীবনে কর্মক্ষেত্রে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বহু অনাবশ্যক বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন থাকিতে হইয়াছে। বিদেশে যখন তাঁহার আবিষ্কার বিজ্ঞানীসমাজে গভীর ঔৎসুক্য ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে, তখনও পাশ্চাত্ত্যদেশে অনুকূল পরিবেশে তাঁহার গবেষণাকে পরীক্ষা করিয়া লইবার ও তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ ও অবসর সামান্য পরিমাণে লাভ করিতেও তাঁহাকে প্রভূত বেগ পাইতে হইয়াছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত বহু পত্রে জগদীশচন্দ্রের দ্বিধান্দোলিত চিত্তের উদ্‌বেগ প্রকাশিত হইয়াছে—

৫ অক্টোবর ১৯০০। 'জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না, যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধপরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি, যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সে দিকেই অনন্ত আলোক-রেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।'

২ নভেম্বর ১৯০০। ‘আজ প্রায় দু মাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

‘ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?…

‘তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

‘সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।…

‘আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।

‘…এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে Easterএর পূর্ব্বেই আমার ছুটী ফুরাইয়া আসিবে। ছুটী চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ।

‘…এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiological Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে।

আর এই সময়ে লোকের interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত।'

২৩ নভেম্বর ১৯০০। 'সকলে বলিতেছেন, যে, আমার কার্য্য শেষ না করিয়া যেন না যাই। ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছি; জানি না পাইব কি না।'

১০ ডিসেম্বর ১৯০০। 'আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, লিখিও।... আমার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, লিখিও।'

'ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে', 'বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের অমর বাণী উচ্চারণ করিবার সময় উপস্থিত'— এই কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের মন এই সময় উৎফুল্ল, জগদীশচন্দ্রের চরিত্রে তিনি 'সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি' সকল বাধা ও দ্বিধাকে অতিক্রম করিয়া উদ্‌ভাসিত দেখিয়াছিলেন তাহা প্রবলভাবে তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল— জগদীশচন্দ্র 'নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত' করিবেন, তাঁহার সাধনায় ভারতবর্ষ আর-একবার 'গুরুর বেদীতে আরোহণ' করিবে, এই ভাবনা এই সময় রবীন্দ্রনাথের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিল— 'ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে।'

অসময়ে জগদীশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে এই যজ্ঞ পাছে অসম্পূর্ণ থাকে, এই কথা মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের যাত্রাপথ অনুকূল করিবার জন্য স্বীয় শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাধনা সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশায় রবীন্দ্রনাথ এই সময় জগদীশচন্দ্রকে

নিরন্তর উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিয়া এক দিকে তাঁহার মনকে অবসাদ ও দ্বিধা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টিত, অপর দিকে তাঁহার কর্মের আর্থিক ও আনুষঙ্গিক বাধা যাহাতে প্রবল হইয়া না উঠে সেজন্যও তিনি উদ্‌যোগী। তাঁহার নিজের অর্থসম্বল এ সময়ে ক্ষীণ, কিন্তু ‘জগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না— লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব’।[1] ‘ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য’[1] এই কথা মনে করিয়া ‘অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন’[1] দিয়া তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্রতী হইলেন; জগদীশচন্দ্রকে লিখিলেন, ‘তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।’[2] ইহাও লিখিলেন, ‘তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি?’[3]

এই ব্রতোদ্‌যাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা, তাঁহার প্রসঙ্গে সে কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তৎকালে ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র কিরূপ বাধাসংকুল, রবীন্দ্রনাথ পূর্বাবধিই সে কথা জ্ঞাত ছিলেন; জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক বুঝিতে পারিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, জগদীশচন্দ্র এ দেশে থাকিয়াই স্বাধীনভাবে কাজ করুন— ‘কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমাদের ধিক্’।[4] এ প্রস্তাব নানা কারণে জগদীশচন্দ্রের

---

[1] দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৩০

[2] বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৯   [3] বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪১   [4] বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৭

পক্ষে স্বীকারযোগ্য হয় নাই[১] ; অপর পক্ষে ছুটি পাইতে বাধা হইবার সম্ভাবনায়, বিলাতে থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ অকালে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ, ১২ ডিসেম্বর [১৯০০] তারিখের পত্রে, বিনা বেতনে জগদীশচন্দ্রের ছুটি লইবার প্রস্তাব করিতেছেন— 'যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি।'

৩ মে ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তোমার নিকট পরামর্শ চাই। অন্ততঃ আরও ৫ বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে এই কার্য্য কোনরূপে সমাধা হইতে পারে, দেশে ফিরিলে (যতদূর বুঝিতে পারিতেছি) সব কার্য্যের বিরাম। এদেশে আর কিছুকাল থাকিব কি? আরও ইচ্ছা হয় যে জার্মেণী, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এবিষয় প্রচার করি। কি মনে কর?'

উত্তরে ২১ মে ১৯০১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো। …তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাক্‌তে গেলে ঠিক কী পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে।… যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্তচিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

১৭ মে ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'কি করিব বল? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী

---

[১] জগদীশচন্দ্রের পত্র, ৩ জানুয়ারি ১৯০১, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৩

September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য্য করিতে পারি, তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটী দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় না।'

উত্তরে ৪ জুন ১৯০১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিব।'

২২ মে ১৯০১ তারিখে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'যদি আমার এদেশে অধিক দিন থাকা আবশ্যক মনে কর তবে তোমাকে আসিতে হইবে।'

ইহার পূর্বদিনই (২১ মে ১৯০১) রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছিলেন—

'আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি।'

জগদীশচন্দ্রের ২২ মে ১৯০১ তারিখের পত্র পাইবার পর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন (৩ জুলাই ১৯০১)—

'তুমি যদি দীর্ঘকাল য়ুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হোক্ একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।'

১৭ সংখ্যক পত্রে [সেপ্টেম্বর ১৯০১] রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই— কিন্তু একবার

তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্ম মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে।'

পত্র ৬। 'লোকেনকে … পাৱা গেল না।'

বর্তমান প্রসঙ্গে ৫-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পের অনুবাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতার তাঁহার কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল— Fruitless Cry ('নিষ্ফল কামনা') এবং The Death of a Star ('তারকার আত্মহত্যা') নামে এই দুইটি অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রে যথাক্রমে ১৯১১ সালের মে ও আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'কণিকা'-অনুবাদ প্রভৃতি ইহার পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া মনে হয়।[১]

পত্র ৭। 'বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব।'

পরবর্তী পত্রেও এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত। অভিনয়পত্রী-অনুযায়ী ভারত সঙ্গীত সমাজে এই অভিনয়ের তারিখ ১ পৌষ ১৩০৭ (১৬ ডিসেম্বর ১৯০০); পাত্রগণ—

রাজা গোবিন্দমাণিক্য	শ্রীঅটল কুমার সেন।
নক্ষত্র রায়	শ্রীঅমর নাথ বসু।
রঘুপতি	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
জয়সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র বসু মল্লিক।

---

[১] দ্রষ্টব্য, Ramananda Chatterjee, Foreword, *The Golden Book of Tagore*.

মন্ত্রী	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ।
চাঁদপাল	শ্রীভূত নাথ মিত্র।
নয়নরায়	শ্রীবেণীমাধব দত্ত।
গুণবতী	শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

এই অভিনয়ের তারিখ হইতেও ৭ ও ৮ -সংখ্যক চিঠিদুটির তারিখ অনুমানের সুবিধা হয়।

পত্র ৮। 'আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ?'

এ বিষয় জগদীশচন্দ্রের ৩০ নভেম্বর ১৯০০ তারিখের নিম্নোদ্‌ধৃত পত্রে উল্লিখিত; তাঁহার ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখের পত্রেও এ প্রসঙ্গ আছে। এরূপ ও অন্যান্য তথ্য -অনুযায়ী ৮-সংখ্যক পত্রের তারিখ অনুমিত। ৩০ নভেম্বরের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'আমাকে Society of Arts বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষীয় পুরাতন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলি। অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চা আধুনিক ব্যাপার নহে। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা কিছু পার সংগ্রহ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবে।'[১]

পত্র ৮। 'শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা'

'শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত' 'ব্রহ্ম মন্ত্র' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় '৮ মাঘ ১৩০৭' তারিখে— অচলিতসংগ্রহ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

---

[১] চিঠিখানির এক অংশ প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় নাই, উদ্‌ধৃতি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূলপত্রানুযায়ী।

পত্র ৮। 'চিরকুমার সভা।'

'চিরকুমার সভা' প্রথমে ভারতী পত্রে ১৩০৭ (বৈশাখ-কার্তিক, পৌষ-চৈত্র) ও ১৩০৮ সালে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয়— প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত বিভিন্ন পত্রে[1] দেখা যায় বইখানি বিভিন্ন দফায় লিখিত; ১১ চৈত্র ১৩০৭ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন, 'কাল চিরকুমার সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি'।

পত্র ৮। 'বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি'[2]

জ্যামিতিচর্চা আযৌবন দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যসনস্বরূপ ছিল— সম্ভবতঃ এই বিষয়ের পাণ্ডুলিপি। এই চিঠির কিছুকাল পূর্বে (১৮৯৯) তাঁহার "দ্বাদশস্বীকার্য্য বর্জ্জিত জ্যামিতি" প্রবন্ধ ১৩০৬ সালের ভারতী পত্রের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়— সম্ভবতঃ ইহাই বিদেশে 'যাচাই' করিতে পাঠাইয়াছিলেন। জ্যামিতি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ আরও প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পত্রে (১১ অক্টোবর ১৯০১) জানা যায়—

'তোমার দাদার পুস্তক এখানকার এক Mathematical Societyর Secretaryকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ingenuityর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে

---

[1] পূর্বোল্লিখিত প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

[2] মূলপত্র পাওয়া যায় নাই। ইহাতে বন্ধনীমধ্যস্থ শব্দ দুইটি, প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় অর্থবোধ-সৌকর্যার্থ বন্ধনীমধ্যে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন বা জীর্ণ পত্রের শব্দ অনুমান করিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন এইরূপ মনে হয়। প্রবাসীতে 'বড় দাদা তাঁহার'-এর পর বন্ধনীমধ্যে 'পুস্তকের' এবং 'তাঁহার মতে ইহা'র পর বন্ধনীমধ্যে 'লেখাটা' এই শব্দ ছিল, ইহাও সম্পাদকীয় যোগ বলিয়া বোধ হয়; অর্থবোধের জন্য শব্দ দুইটি তেমন আবশ্যক বোধ হয় নাই বলিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। বন্ধনীভুক্ত astronomy শব্দটিও এইরূপ সম্পাদকীয় যোগ হইতে পারে।

নূতন notation বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার চিঠি পাঠাই। এখানে Conservation সব দিকেই বেশী, যদি একজন অনেক কাল ধরিয়া নূতন সংজ্ঞা প্রচলিত করিতে না পারেন, তবে তাহা সর্ব্বসাধারণে দেখিতে চাহে না।…'

পত্র ৯। এই পত্র সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত। জগদীশচন্দ্র ১০ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্রে 'আগামী কল্য Operation হইবে' এই সংবাদ দিয়া ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখে লিখিতেছেন, 'আরও চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে হইবে, পরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব।' রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ— আমার এই চিঠি যখন পৌঁছিবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ।' রবীন্দ্রনাথ যে এই পত্রে লিখিয়াছেন 'তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ— সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়', এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা জগদীশচন্দ্রের ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখের পত্রে আছে।

পত্র ১০। 'মহারাজের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছি।'

ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) ১৪ বৈশাখ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখিতেছেন—

'আপনার পত্র পাঠে আপনি দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছুক আছেন জানিতে পারিয়া বড় সুখী হইলাম।… হিমালয়ের মহান্ সৌন্দর্য্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও

দুচারখানা সঙ্গে আনিতেছি।... ২৩শে তারিখ সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিব। মঙ্গলবার বিকাল বেলা অনুমান ৪॥টার সময় কুষ্টিয়া ষ্টেশনে পৌছিব। তথা হইতে আমরা একত্রে যাইতে পারি।'[১]

এই ব্যবস্থানুযায়ী নির্দিষ্ট দিবসে রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় দার্জিলিং গিয়াছিলেন ধরিয়া লইয়া এই চিঠির তারিখ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ১০। 'বেলার বিবাহ'

এই বিবাহের তারিখ ১ আষাঢ় ১৩০৮; দ্রষ্টব্য শ্রীঅনুরূপা দেবী, "মাধুরীলতা", প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৮। শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবীও যতদূর স্মরণ করিতে পারেন, এই বিবাহের তারিখ ১ আষাঢ়। ১৩০৮ সালে ১ আষাঢ় বিবাহের শুভদিনও ছিল।

পত্র ১০। 'তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুদ্‌-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই?'

জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁহার বহু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বা গল্পের চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ তাঁহার চিঠিতে কখনো কখনো জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-সাহায্যে জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথম বিনা তারে বার্তাপ্রেরণের সূচনা করেন— রবীন্দ্রনাথ তাহারই কথা এখানে ইঙ্গিত করিতেছেন।

পত্র ১০। 'বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে।'

১৩০৮ বৈশাখ হইতে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়; রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮-১২ এই পাঁচ বৎসর কাল ইহার সম্পাদনা করেন।

পত্র ১০। 'মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।'

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য পূর্বোক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথকে

---

[১] এই পত্র রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

লিখিতেছেন—

'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ।...আমার মতে আপনি অগৌণে ও অবিচারিত চিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্ব্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।'

রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন।[১]

পত্র ১১। 'পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায়... বের করেছ'

কৃত্রিম চক্ষুর উপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পড়িলে তাহাতে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিতে থাকে তাহার মূলে আছে এই চক্ষুর ভিতরকার পদার্থের আণবিক পরিবর্তন; জগদীশচন্দ্রের এই মত যখন জয়যুক্ত হইল তখন তিনি স্থির করিলেন যে, আণবিক পরিবর্তন অন্য রকম উত্তেজনায়ও হইতে পারে, আর তাহাও সাড়ারূপে দেখা দিবে।

তিনি জড়ের উপর মাদকদ্রব্য, ক্লোরোফর্‌ম্ প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিলেন, তজ্জনিত সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। জড়কে 'চিমটি' কাটিলেন, অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে; চিমটির পরিমাণ ও তীব্রতা মাপিবারও ব্যবস্থা করিলেন— অনুরূপ সাড়া পাইলেন। এমন সব যন্ত্র তিনি নির্মাণ করিলেন যাহা চালাইলে জড় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাড়ালিপি আপনা হইতে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। তিনি দেখাইলেন যে, একখণ্ড টিন, একটি গাছের ডগা, ব্যাঙের একটি পেশী বাহিরের

---

[১] বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৩২-৩৩

উত্তেজনায় একই ভাবে সাড়া দেয়।[1] এই-সকল পরীক্ষার কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।[2]

পত্র ১১। 'আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম …ছুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কারসহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম।' 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' দ্বিতীয় খণ্ডে এই যাত্রার দিনলিপি আছে। ২২ আগস্ট ১৮৯০ বোম্বাই হইতে যাত্রা করেন, ১০ সেপ্টেম্বর লণ্ডন পৌঁছান, ৯ অক্টোবর লণ্ডন ত্যাগ করেন।

পত্র ১১। 'বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে।' নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যা। প্রকাশ-তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী ১৫ মে ১৯০১, অর্থাৎ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮।

পত্র ১২। এই পত্র জগদীশচন্দ্রের ১৭ মে ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত, এইরূপ অনুমান স্বচ্ছন্দেই করা যাইতে পারে। ১৯০১ সালের ১০ মে রয়াল ইন্‌স্টিট্যুশনে জড় ও জীবে সাড়া (On the response of inorganic matter to stimulus) সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করেন; বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট উহা বিশেষ সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করে। এই বক্তৃতায় 'জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়জীবের সাধর্ম্য প্রমাণ করিয়াছেন।'[2]

---

[1] এই প্রসঙ্গে, পরিশিষ্টে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "জড় কি সজীব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—ইহাতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাত। অপিচ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ৩ মে ১৯০১ তারিখের চিঠি।

[2] রবীন্দ্রনাথ, জড় কি সজীব, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১১৩

এইদিন (৪ জুন ১৯০১) রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণীকেও অভিনন্দনজ্ঞাপনপূর্বক পত্র লিখিয়াছিলেন।

পত্র ১২। 'আমার সত্তার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ।'

জগদীশচন্দ্র যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহা আলোকের সমধর্মী অথচ দৃশ্য নয়, সেই অদৃশ্য আলোকের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিতেছেন।[১]

পত্র ১৩। 'আমার কন্যার প্রতি তোমার উপহার।'

সম্ভবতঃ Joan of Arc-এর জীবনী।[২]

পত্র ১৩। 'আমি সাহসে ভর করিয়া··· তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি'

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে কেবল উৎসাহবাণী প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-রূপে স্বয়ং তাঁহার বিজ্ঞানসাধনার বিবরণ বাঙালী পাঠকসমাজে প্রচারে উদ্‌যোগী হন। এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা দুইটি ("আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা",[৩] বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮; "জড় কি সজীব ?", বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮) বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়িয়া জগদীশচন্দ্র ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'তুমি যে গত মাসে আমার কার্য্যের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলে

---

[১] এই টীকা এবং ১০ ও ১২ -সংখ্যক পত্রে যথাক্রমে তারহীন বিদ্যুদ্-যান ও অদৃশ্য কিরণ সম্বন্ধে টীকা, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -লিখিত।

[২] দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র, ১৪ জুন ১৯০১, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৩

[৩] ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'জগদীশচন্দ্র বসু' মুদ্রিত হইয়াছিল।

তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি, যে, বাঙ্গলা কোন মাসিক পত্রে আমার এই নূতন কার্য্যসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়া সে-ইচ্ছা মনেই রহিয়াছে। যদি তুমি সেগুলি কোনদিন প্রস্ফুটিত করিতে পার, তাহা হইলে সুখী হইব।'

বন্ধু ও আত্মীয় -মণ্ডলীকেও রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তা -প্রচারে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী জগদানন্দ রায় এই সময় ধারাবাহিকভাবে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা "অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার", ভারতী ১৩০৭, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক।[১] রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা ভারতী পত্রে "বিলাতে অধ্যাপক বসু" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ১৩০৮ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার" রচনা মুদ্রিত হয়; রামেন্দ্রসুন্দরের অপর একটি রচনা, "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার", ১৩০৮ ভাদ্র সংখ্যা সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্র ১৪। ইহা জগদীশচন্দ্রের ৬ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত, এরূপ মনে হয়। জগদীশচন্দ্র এই চিঠিতে লিখিতেছেন—'তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে

---

[১] আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে জগদানন্দ রায়ের রচনাবলী ১৩১৯ সালে "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন—'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশে যে উৎসাহ দিয়াছেন' ইত্যাদি।

পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাতরাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত, কখনও একটু আলোক পাই তাহার সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই— সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান্। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত। আমি আর নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিব না; কি করিতে হইবে বলিও। তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ, আমি যে একাকী নই, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি যে কার্য্যভারে ও নিরাশায় অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ি, একথা মনে রাখিও, মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহবাক্যে আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিও।

'আর-একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী। আমি আমার সন্ধানের কার্য্য ভিন্ন অন্য কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কি উচিত বুঝিতে পারি না। আমার কি শ্রেয়ঃ তুমিই তাহা আমার হইয়া স্থির করিও। তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভাল তাহা স্থির করিও।...

'আমি দুই বৎসরের Extentionএর জন্য India Officeএ আবেদন করিয়াছিলাম।... হঠাৎ খবর পাইলাম, যে, যদিও আমার scientific work is very important, yet the Secretary of State regrets, ইত্যাদি।...

'ইতিমধ্যে British Association ইত্যাদি স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। আস্তে আস্তে আমার মত যে গৃহীত হইল তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এই সংবাদে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধু, তুমি কি আমার মনের কষ্ট বুঝিতে পার ?

'আমি কি করিব জানি না। কার্যোর জন্য আবেদন করিব, কিন্তু যদি আমার এদেশে থাকা তাহাদের অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে ছুটী পাইব মনে হয় না।

'তুমি তপস্যার কথা লিখিয়াছ; বল ত আমি কি করিয়া মনস্থির করিতে পারি। ··

'যদি তুমি বল তাহা হইলে একবার দেশে থাকিয়া সমস্ত ছাড়িয়া এদেশে থাকিব।'

পত্র ১৪। 'কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম।'

রবীন্দ্রনাথ আষাঢ় মাসে মজঃফরপুর গিয়া থাকিবেন; ১ শ্রাবণ ১৩০৮ (জুলাই ১৯০১) তথায় তাঁহার সংবর্ধনা।[১] এই পত্রের কাল এই সংবাদেও অনুমান করা যায়।

পত্র ১৪। 'শান্তিনিকেতনে··· একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি।'

এই পত্র লিখিবার কয়েক মাস পরে, ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। যে কল্পনা-দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরবর্তী কয়েকখানি চিঠিতে তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন।

---

[১] প্রবাসী ভাদ্র ১৩০৮, পৃ. ২০৫

পত্র ১৫। 'আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।'

পঞ্চম পরিশিষ্টে এই চিঠিখানি মুদ্রিত হইল; মূল পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। রমেশচন্দ্রের চিঠির তারিখ (১৬ জুলাই ১৯০১) হইতেই রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ অনুমিত হইয়াছে।

২০ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত -প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'রমেশবাবুর সহিত সেদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার কথায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। একবার এইভাবে বাধা পাইলে যে আর ফিরিয়া যাইব না, তাহা বুঝিতে পারি। এদিকে দেশের মায়ার বন্ধনও সম্পূর্ণ কাটাইতে পারি নাই। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। তোমার পত্র পাইলে স্থির করিব।'

পত্র ১৫। 'তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি··· বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।'

১৩০৮ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার" প্রবন্ধে এই রেখাচিত্রগুলিই মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

৩০ আগস্ট ১৯০১ তারিখের পত্রে, রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান চিঠির প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তুমি আমাকে কয়মাসের জন্য আসিতে লিখিয়াছ, "সকল কথা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করিয়া লইতে।" তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, যাহা ভাল মনে কর, আমার হইয়া কর। আমি কেবল এক কাজ বুঝি, আর বাকী সব তোমরা আমার হইয়া কর। আমি এখন ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছি। তাহা যদি কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দেই, তবে সূত্র পুনরায় ধরিতে পারিব কি না এই ভয় হয়। এই দেখ, এইমাত্র একটি

আশ্চর্য্য Experiment করিয়া আসিলাম, জন্তু এবং অ-জীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান, তাই সেতু বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন-রেখা আছে কি না তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফল পাইলাম— এক! এক! সব এক! ··· বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহার চিন্তা করিতে পারিব না— আমি সব দেখিতেছি— কেবল সময়াভাব। আমি কি করিয়া এসব ফেলিয়া একদিনের জন্যও চলিয়া আসি? এজন্য আমাকে একেবারে ছাড়িয়া দাও। কেবল তুমি কয়মাসের জন্য এখানে আইস।'

পত্র ১৬। 'তোমার ছবি আজ পাইয়া'

এই চিঠি জগদীশচন্দ্রের ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের চিঠির উত্তর; জগদীশচন্দ্রের এই চিঠির তারিখ হইতে রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ অনুমিত। জগদীশচন্দ্রের এই পত্রে ছবি পাঠাইবার উল্লেখ আছে। এই ফোটোগ্রাফ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে সুরক্ষিত; বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রে যে 'শিলাইদহের গ্রুপ' ছবির উল্লেখ আছে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ হইতে তাহাও মুদ্রিত হইল।

পত্র ১৬। 'তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানি।'

জগদীশচন্দ্র এই ছবির প্রতিলিপি পাঠাইয়া উক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'আর একখানা ছবি তোমার বসিবার ঘরে রাখিও। ওয়াটের[1] "আশা" অন্ধ-বালিকা— যন্ত্রের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাই বাজাইতে চেষ্টা করিতেছে।

'আমাদের আশাও এই ভগ্নতন্ত্রীর মত।'

---

[1] জি. এফ. ওয়াট্‌স্ (১৮১৭-১৯০৪)

পত্র ১৬। 'মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জ্‌পে আছে'

লোকমান্য তিলক এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ জি. জি. আগরকর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করিবার পর স্থির করেন যে তাঁহারা সরকারি চাকুরি গ্রহণ না করিয়া দেশে স্বল্পব্যয়ে শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাদের সঙ্গে যোগ দেন বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপালংকার। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে ইহাদের চেষ্টায় পুনা ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্যালয় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। তিলক ও তাঁহার সহকর্মীগণ মহারাষ্ট্রে সুপরিকল্পিত প্রণালীতে শিক্ষা-প্রসারের জন্য একটি সমিতি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন; ফলে ১৮৮৪ সালে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল 'to facilitate and cheapen education by starting, affiliating and incorporating at different places, as circumstances permit, schools and colleges under private management or by any other ways best adapted to the wants of the people.'

এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ডেকান এডুকেশন সোসাইটি সুবিখ্যাত ফার্‌গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। টিলক এই কলেজে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত গণিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়াছেন। রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জ্‌পেও বিশেষ ত্যাগস্বীকার-পূর্বক এই কলেজে (১৯০২-২৪ সাল) যোগ দেন। মহারাষ্ট্রের অনেক সুসন্তান এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, পত্রে যাঁহাদের নাম উক্ত আছে তাঁহাদের কথাই উল্লিখিত হইল। ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ফার্‌গুসন কলেজ ব্যতীত আরও অনেকগুলি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন।[১]

---

[১] এই তথ্য শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংকলিত।

পত্র ১৬ । ‘বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা’

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার *Twentieth Century* পত্রের (প্রকাশ ১৯০১) ৩১ জুলাই ১৯০১ তারিখের সংখ্যায় নরহরি দাস এই ছদ্মনামে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের (আষাঢ় ১৩০৮) সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; ঐ পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া, রচনার নিদর্শন-রূপে কয়েক ছত্র উদ্‌ধৃত হইল—

‘Naivedya is a natural offering of the human heart to the Divine—an offering of joy and sorrow, of struggle and fruition, of all-embracing love, of national aspiration and desire for union with the Unrelated....In all places of worship, be they Christian, Muhamedan or Hindu, the hundred sonnets can be recited or sung without scruple...The poet has sung again the old song of the Upanishads in a new strain and let it rise as a cry of our people to heaven, as a memorial for Divine grace...*Naivedya* is the essence of *Bhakti* made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship is changed into light. The sonnets are like so many brilliant pearls illuminated with Divine grace...’

এই সমালোচনাসূত্রেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় ; জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার কথা বারবার স্মরণ করিয়াছেন। ‘আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা’ প্রবন্ধে (১৩৪০) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

পত্র ১৩

'এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই।'[১]

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছেন, এই উদ্‌যোগে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে প্রধান সহযোগী-রূপে লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।··· তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে।'[২]

পত্র ১৬। 'আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে।'

---

[১] আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬০-৬১

[২] আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬১-৬২

বিবাহের তারিখ ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮।[1]

'একটি ডাক্তার', সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

'তোমার বন্ধু', রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা।

পত্র ১৭। 'মিস নোব্‌ল'

মার্গারেট নোব্‌ল্‌, ভগিনী নিবেদিতা (জন্ম ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭, মৃত্যু ১৩ অক্টোবর ১৯১১)। ইনি জগদীশচন্দ্রের একজন প্রধান উৎসাহদাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।'[2] রবীন্দ্রনাথের সহিতও এই সূত্রে নিবেদিতার সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। নিবেদিতার ভাষায়— 'You are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too!'[3]

জগদীশচন্দ্রের বিলাতপ্রবাসকালে তাঁহার জয়বার্তা ভগিনী নিবেদিতাও অনেকসময় রবীন্দ্রনাথকে জানাইয়াছেন। এই পত্রে উল্লিখিত চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই; রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ভগিনী নিবেদিতার অপর দুইখানি চিঠির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম পরিশিষ্টে সেগুলি মুদ্রিত হইল; মূলপত্র শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল; তিনি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যও স্বীকার করিয়া-

---

[1] দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৯, রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮, 'আজ আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ। পাত্রটি মনের মত হওয়ায় দুই তিন দিনের মধ্যেই বিবাহ স্থির করিয়াছি।'

[2] দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১২৮

[3] দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৪৬

ছেন। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের তিনি ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন ; নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাহা প্রকাশিত হয়।[১]

নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' চরিত্রের যোগাযোগের বিষয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী[২] গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ গোরা'র ইংরেজি অনুবাদক উইলিয়াম উইন্‌স্ট্যান্‌লি পিয়ার্সন্‌কে এক পত্রে (১৯২২) লেখেন[৩]—

> You ask me what connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of *Gora*. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in *Gora* as it stands now— but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.

নিবেদিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধে[৪] এই 'লোকমাতা'র 'অমর জীবন'এর কথা— 'আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম' তাহার স্বরূপ— বিবৃত করিয়াছেন।

---

[১] *The Modern Review*, January 1912

[২] দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ২১৬-১৮

[৩] Rabindranath Tagore, "Letters to W. W. Pearson", *The Visva-Bharati Quarterly*, August-October 1943, p. 179

[৪] 'ভগিনী নিবেদিতা' (১৩১৮). পরিচয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড। এই প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ ভগিনী নিবেদিতার *Studies from an Eastern Home* (1913) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা' প্রবন্ধে যে 'বিদুষী ইংরাজ মহিলা'-প্রেরিত বিবরণ অনূদিত হইয়াছে[1] তাহাও সম্ভবতঃ ভগিনী নিবেদিতা-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত।

পত্র ১৭। 'তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে··· জানিতাম না।'

এই উক্তি প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ১৫ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন—

'তুমি লিখিয়াছ, আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতে না। হয়ত জান না যে, আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহার কারণ এই যে হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। নিরাশার মধ্যে কে মন বাঁধিতে পারে? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে,— প্রথম মিথ্যা-অভিমানী স্বজাতিবৎসল, আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী, বিশ্বাসী, ধৈর্য্যশালী স্বজাতিপ্রেমিকের সংখ্যা দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ[2] তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২।৪টি পুরুষও যদি এই ভাবে প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।

---

[1] বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১০৯-১১২

[2] রবীন্দ্রনাথ পূর্ব চিঠিতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় 'পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে' এই সংবাদ দিয়াছিলেন।

পত্র ১৮

'তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিঘ্ন তাহা তুমি মনেও করিতে পার না। আমি কখন কখন একেবারে নিরাশ্বাস হই।'

১৭-সংখ্যক পত্রের উত্তরেই জগদীশচন্দ্রের এই চিঠি লিখিত এইরূপ মনে করিয়া ১৭-সংখ্যক পত্রের তারিখ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ১৮। 'বর্ত্তমান সঙ্কট।'

ইতিপূর্বে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন (৬ সেপ্টেম্বর ১৯০১)—

'আমার deputationএর extension পাইলাম না। ফার্লোই দিয়াছে। তজ্জন্য বিবিধ গোলমাল সহ্য করিতে হইবে। এ কয়মাস যাহা করিয়াছি এখন তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে। ইহাতে কতদিন থাকিতে পারিব জানি না। আর জার্ম্মেণী ও আমেরিকা যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

'তোমরা যদি পার তবে আমার মুক্তির সংবাদ শীঘ্র দিবে। আমার মন দিতে পারিতেছি না। যদি আমার কার্য্য নিরুপদ্রবে কয়বৎসর পর্য্যন্ত না করিতে পারি তবে হাত দিয়া কোন লাভ নাই।

'আমি যাহা করিতেছি তাহা অনেক প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ।...এইজন্য এই কার্য্যে হাত দিতে হইলে বদ্ধ সংস্কারের সহিত অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।... আমি প্রস্তুত আছি ... আমাকে যদি নিশ্চিন্ত করিতে পার যে, আমার কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না, তবে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।'

সম্ভবতঃ এই সংকটের কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। ১১ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রেও জগদীশচন্দ্র এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের আর-একখানি পত্র (২৯ নভেম্বর ১৯০১) বিশেষ ভাবে উদ্ধারযোগ্য—

'গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল ?— কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখ-দুঃখের অংশী, সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।'

পত্র ১৯। 'আজ তোমার জয় সংবাদ পাইয়া'

জড়, উদ্ভিদ, জীবের সাড়া ('Electric Response of Metal and of Ordinary Plants') সম্বন্ধে ১৯০১ সালের জুন মাসে রয়াল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের আপত্তির ফলে সোসাইটি তাহা প্রকাশ করেন নাই। ১৯০২ সালের মার্চ মাসে জগদীশচন্দ্র "Biology সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান Society" Linnean Societyতে পুনরায় ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার আবিষ্কার প্রচার করেন ; এই সভায় কোনো বৈজ্ঞানিক আর তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই। এই সভার বিবরণ দিয়া জগদীশচন্দ্র ২১ মার্চ [১৯০২] তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে, কারণ

এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয়-সংবাদে সুখী হইবে।··· সমবেত Physiologist-Biologist-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষকুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে।·· এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছি।’

১৯-সংখ্যক পত্র জগদীশচন্দ্রের এই চিঠি পাইয়া লিখিত, এই অনুমানে তাহার তারিখ এপ্রিল ১৯০২ নির্দেশ করা হইয়াছে। ‘গতকাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল’ ইহাও ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসের কথা; জগদীশচন্দ্র ৪ এপ্রিল ১৯০২ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে প্যারিস হইতে লিখিতেছেন— ‘এখানে ৪ স্থানে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছি।’

পত্র ২০। ‘তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ?’

১ মে ১৯০২ তারিখের চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে কথা পরিস্ফুট হয় না। উৎসাহ কিম্বা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশ সময়েই ত অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিন তোমার কতগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তর, ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?

'তুমি ত এতদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সর্ব্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।'

২০-সংখ্যক পত্র এই চিঠির উত্তরে লিখিত হইতেও পারে এই অনুমানে উহার তারিখ কল্পিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের পূর্বপত্রের (৮ এপ্রিল ১৯০২) উত্তরেও ২০-সংখ্যক চিঠি লিখিত হইয়া থাকিতে পারে। উহাতে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'তুমি মনে কর যে আমি সর্ব্বদাই কর্ম্ম-সাধনে উন্মুখ। তুমি যদি জানিতে যে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে নিজের সহিত কত সংগ্রাম করিতে হয়। আমার মন সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতে চাহে, এই অবিরাম যুঝিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি। স্বভাবের ক্রোড়ে, যেখানে সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত শান্তিময়, সেখানে মন ছুটিয়া যায়। তোমরা যদি নিরাশ্বাস হও তবে আমি একা যুঝিয়া কি করিব?'

রবীন্দ্রনাথের রচনায় জগদীশচন্দ্র এই সময় কিরূপ আবিষ্ট হইয়া ছিলেন তাহার নিদর্শন-স্বরূপ জগদীশচন্দ্রের ৩০ মে ১৯০২ তারিখের পত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

'এতকাল কেবল কর্ম্মসংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর-সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর হউক দুঃখের কথা— মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিস আছে। সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে,

অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ,[1] মনে হয় যেন পূর্ব্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি, এরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, এরূপ সুখ, এরূপ কল্যাণ, অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে— সে কথা কল্যাণী[2]— তুমি ঠিকই বলিয়াছ একথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।'

স্বীয় আবিষ্কার-বর্ণন-সূত্রে ঐ পত্রেই জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

'আগামী সপ্তাহে Photographic Societyতে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি— দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে-ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একেবারে অপরিবর্ত্তিতরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য experimentএ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল, তুমি আমার আবিষ্কার চুরী করিয়া ইতিপূর্ব্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছ।[3] সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির-অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।'

---

[1] জগদীশচন্দ্র সম্ভবতঃ এই কবিতার কথা উল্লেখ করিতেছেন— 'সেকাল', 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে', ক্ষণিকা (১৯০০)।

[2] সম্ভবতঃ ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'কল্যাণী' কবিতার স্মরণে।

[3] জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মানসী গ্রন্থের (১৮৯০) 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার উল্লেখ করিতেছেন।

পত্র ২১। 'আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব— তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।'

বর্তমান গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৪ শ্রাবণ ১৩০৯ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ২১। 'আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে।'

ইহার নাম হোরি সান। 'ওকাকুরার ব্যবস্থায় নব-প্রতিষ্ঠিত শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আসেন হোরি সান সংস্কৃত পড়িতে ... সম্ভ্রান্ত সামুরাই বংশে তাঁহার জন্ম— ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বিদেশী ছাত্র তিনি। হোরি না জানিতেন ইংরেজি, না জানিতেন অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। কিন্তু কী নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জন শুরু করেন। অকালে পঞ্জাব ভ্রমণে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি [এই ছাত্রের আগমন] অতি সামান্য— এত সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নহে; কিন্তু ভারতের ও পূর্ব-এসিয়ার বিস্মৃত আধ্যাত্মিক যোগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে জাপানের ইহাই প্রথম প্রয়াস।'[1]

পরবর্তীকালে চীন-জাপানের সহিত ভারতের যোগ পুনঃস্থাপনকল্পে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগ বহুবিদিত। আলোচ্য পর্বেও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এ বিষয়ে যে-সকল কল্পনা চলিতেছিল রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের নিম্নোদ্‌ধৃত চিঠিখানি (১ জানুয়ারি ১৯০৩) হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়—

'তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে

---

[1] শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ৪২৬

তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।··· তবে একটা বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটি সহজসাধ্য— পরে বৃহৎ আকারে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

'নবদ্বীপ ত সতীশ[1] যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কাপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

'একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করা এখনও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে। তাহার বলে কঠিনগুলি সহজ হইবে।

'আমার plan এই—

'এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরেজীবিদ্ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে Tibetএর Mss. ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr. Horyকে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পুঁথির কাপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্য্যে হোরীর সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীনদেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।

'এই প্রথম exploration হইতে অনেক তত্ত্ব বাহির হইবে, তাহার পর আরও systematic রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে।'

পত্র ২৩। 'আমি পলাতক··· এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন?'

---

[1] সম্ভবতঃ 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়।

এই চিঠিখানি সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের নিম্নমুদ্রিত পত্রখানির উত্তরে লিখিত, তদনুযায়ী ইহার তারিখ অনুমিত হইয়াছে। (যদিও 'সম্মান-সম্বর্দ্ধনা'-প্রসঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ -কর্তৃক ১৩১৮ মাঘে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার কথাও সূচিত হইয়া থাকিতে পারে, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন)—

'২৩ এ অক্টোবর ১৯০৫

'তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। একটি মূর্ত্তিমান এবং বর্দ্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থানে কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আরম্ভ হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল যেন নির্ম্মিত হয়। সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের[1] বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপ দেওয়া হইবে।...

'তারপর জাতীয় ভবনে তোমার [পল্লী] সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা বিভাগে শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির জায়গা থাকিবে।

'...এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

---

[1] এই পত্র লিখিবার পূর্ব্বদিন, 'কার্লাইল সার্কুলার'-এর বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়— ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করিবার কারণে যে সার্কুলারের প্রতিবাদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয় বলা যায়—'২০শে [অক্টোবর] তারিখেই জানা যায় সরকার... এক ইস্তাহার জারি করিয়া ছাত্রদিগকে রাজনীতিক অনুষ্ঠানে সভাসমিতিতে যোগ দিতে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।'— শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'কংগ্রেস', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১১৬

'এখানে রামমোহন রায়, বঙ্কিম, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে, ইত্যাদি।

'তুমি এবিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানা স্থানে পঠিত হইবে।

'এসময় আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।'

ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩১২), 'ফেডারেশন হল' 'মিলনমন্দির' বা 'অখণ্ডবঙ্গভবন' -প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়, জগদীশচন্দ্রের ভগিনীপতি আনন্দমোহন বসু এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘোষণাপত্রে'র বঙ্গানুবাদ সভাস্থলে পাঠ করেন। সেই ফেডারেশন হলের পরিকল্পনা লইয়াই জগদীশচন্দ্রের এই পত্র। উক্ত 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রতিষ্ঠা-উদ্‌যোগেও রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন।[১] কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন যে পথে পরিচালিত হইতেছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-অনুযায়ী ও আদর্শের অনুকূল হয় নাই ; এই

---

[১] দ্রষ্টব্য কেদারনাথ দাসগুপ্ত -কর্তৃক প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত ভূমিকা -সহিত শিক্ষার আন্দোলন [১৩১২] পুস্তিকা এবং *Calendar* 1906-1908, National Council of Education, Bengal, 1908। কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় ছাত্র ও ছাত্রহিতৈষীদের এই সময় যেসকল সভা হয় তাহার অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যথা—১০ কার্তিক ১৩১২, পটলডাঙায় মল্লিকবাড়িতে ছাত্রসভা ; ১৬ কার্তিক, ফিল্ড অ্যাণ্ড্‌ অ্যাকাডেমি ভবনে মেম্বর ও ছাত্রগণের সান্ধ্যসম্মিলন ; ১৯ কার্তিক, ডন সোসাইটিতে ছাত্রসভা ; ৩০ কার্তিক, ল্যাণ্ড্‌হোল্ডার্স্‌ অ্যাসোসিয়েশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নেতৃগণের মন্ত্রণাসভা ; ১ অগ্রহায়ণ, ফিল্ড্‌ অ্যাণ্ড্‌ অ্যাকাডেমিতে জাতীয় শিক্ষা-সমাজ -প্রতিষ্ঠার ঘোষণাসভা। ৩০ কার্তিকের সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় -প্রতিষ্ঠার্থ যে

সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব সুব্যক্ত হইয়াছে—

'ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধাপ্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্দ্ধাপ্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্ত্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই "লীডার" বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাটমাত্র —যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব কিন্তু

প্রভিসনাল এডুকেশন কমিটি নিযুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২৪ অগ্রহায়ণ, ল্যাণ্ড্‌হোল্ডার্স্ অ্যাসোসিয়শনে নেতৃবর্গের দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন কি না আমাদের জানা নাই, তবে এই সভায় জাতীয় শিক্ষাসমাজের গঠনপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইবে স্থির হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার সদস্য মনোনীত হন।

“নেতা” হইবার দুরাশা আমার মনে নাই— যাঁহারা “নেতা” বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি— ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২।’[1]

পত্র ২৪। ‘নিজের শোক··· নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি’

১৩১৪ সালের ৭ অগ্রহায়ণ (২৩ নভেম্বর ১৯০৭)[2] রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের (জন্ম ১৮৯৪) মৃত্যু হয়; শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয়গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেইখানে রোগাক্রান্ত হন। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল -লিখিত বিবরণে[3] আছে—

‘যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই শমীর জীবন প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই রহিয়াছেন, এ ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতে যাইবার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন— “এ সময়ের যাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম, এখন অবশেষ যাহা কর্তব্য আপনি করুন” ·· আমরা দাহান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। কোমলপ্রাণ শ্রীশবাবু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমি ও শ্রীশবাবু তখন রবীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্রীশবাবু অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, চক্ষে তাঁহার ধারা আর থামে না, আমারও

---

[1] বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৩

[2] শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -কর্তৃক রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত তারিখ

[3] শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, “রবীন্দ্র প্রসঙ্গ”, দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯

চক্ষে ধারা বহিতেছিল, এই সময় রবীন্দ্রনাথেরও চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। আমি তাঁহার অশ্রুপাত দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহার সেই নিশ্চল গম্ভীর ভাব ও শোকপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া মনে বড় আতঙ্ক জন্মিতেছিল। সেইদিনই গাড়িতে বোলপুর চলিয়া যাওয়া স্থির হইল।... গাড়ি সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌছিতেই মাতুল মহাশয় ট্রেনের নিকট খাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন।... তিনি [রবীন্দ্রনাথ] মাতুল মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব হইতেই জানা শুনা ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি মাতুল মহাশয়কে চুপে চুপে মুঙ্গেরের সমস্ত দুর্ঘটনার কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময় তিনি কিছুই টের পান নাই যে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক স্মিতমুখেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন।... [শান্তিনিকেতনে] পরদিন বেলা হইলে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।... একটু কথা কহিতে গিয়াই তাঁহার নেত্র আর্দ্র হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বরও যেন বাহির হইতেছিল না।... দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল তাঁহার পিঠটিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মধ্যে মধ্যে 'রবি', 'রবি' এই শব্দ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্যটি বড় করুণাপূর্ণ।'[১]

এই সময়ে শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুইখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এরূপ লিখিয়াছিলেন—

'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা [শ্রীশচন্দ্রের

---

[১] অপিচ দ্রষ্টব্য শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -রচিত "রবীন্দ্র স্মৃতি" প্রবন্ধের কবিপুত্র শমীন্দ্র অধ্যায়, দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯

পুত্র সরোজচন্দ্র] মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল— তাহার পরে আর ফিরিল না।… ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪।'

'ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি; আরো দুঃখ যদি দেন ত তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া লইব— আমি পরাভূত হইব না।… ২৪শে মাঘ ১৩১৪।' —দ্র. চিঠিপত্র ১৩, পৃ ৬৬-৬৭

অগ্রহায়ণ মাসে শিলাইদহে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কয়েক মাস থাকেন— এই সময়ের মধ্যে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির কার্য, জমিদারিতে "পল্লীসমাজ" স্থাপন, 'গোরা' রচনা প্রভৃতি দেশহিতকর্ম ও সাহিত্যকর্ম অব্যাহত চলিতে থাকে[1]; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত বহু পত্রে[2] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। মৃত্যুশোক তাঁহার অন্তর্জীবনকে এ সময় কোন্ পথে প্রধাবিত করিতেছিল তাহার পরিচয় পাই এই কালে রচিত গানে (যথা, 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতম হে', ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪), ১৩১৪ সালের 'মাঘোৎসবে'র ভাষণে[3], এবং ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত কোনো কোনো চিঠিতে, যেমন—

---

[1] 'রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল [১৩১৪ ভাদ্র - ১৩১৬ ফাল্গুন] ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম… তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।' —রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র", 'শান্তিনিকেতন', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। এই 'শোক' শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোক; দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৪৬০

[2] "রবীন্দ্রনাথের চিঠি", দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৩৯

[3] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "দুঃখ", ধর্ম। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -কর্তৃক তাঁহার "কবি-কথা" প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

'আমাকে এখনো কিছুদিন ক্ষমা করিবেন। আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছি— তাহার একটা কিনারা না করিয়া আমি কিছুতে মন দিতে পারিব না। আমার বাহিরের সমস্ত কাজকর্ম্মের ভিতর হইতে অত্যন্ত একটা বেদনার তাগিদ আসিতেছে— আমাকে আমার অন্তরাত্মা ভারি একটা তাড়া লাগাইতেছে। অতএব দয়া করিয়া আপনারা আমার ছুটি বাড়াইয়া দিবেন।

'কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে যাহা কিছু আলোচ্য বিষয় আছে তাহা লিখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।··· ১লা ফাল্গুন ১৩১৪।'

'বিদ্যালয়ে আমাকে শীঘ্র টানিবেন না। আমার দুই একটা কর্ত্তব্যে হাত দিয়াছি— তা ছাড়া অন্তর্যামীর সঙ্গেও আমার বোঝাপড়া দরকার। অন্য কোন কাজে আমার মন যাইতেছে না। ৫ই ফাল্গুন ১৩১৪।'[১]

এই 'ব্যাকুলতা' ও 'অন্তর্যামী'র সঙ্গে এই 'বোঝাপড়া'ই গীতাঞ্জলি'র সমকালীন গানে কবিতায় উৎসারিত হইয়াছে বলা চলে।

পঁচিশ বৎসর পরে, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁহার মাতৃদেবী শ্রীমতী মীরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহাতেও, শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বারংবার পরমাত্মীয়দিগের বিয়োগদুঃখকে তিনি কিভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে কথা বিবৃত হইয়াছে—

'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা

---

[১] "রবীন্দ্রনাথের চিঠি", দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯

যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্‌। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়— নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন ? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। ...২৮ আগস্ট ১৯৩২।"[1]

২২-সংখ্যক পত্রে মধ্যমা কন্যা রেণুকার, এবং ২৯-সংখ্যক পত্রে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার পীড়ার উল্লেখ আছে। পত্র লিখিবার স্বল্প-কাল-মধ্যেই ইঁহাদের[2] মৃত্যু হয়। এই শোক রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করেন সে বিষয়ে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন—

'১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। বড়ো মেয়ে বেলা রোগশয্যায়। জোড়া-গির্জার কাছে স্বামী শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। কবি জোড়াসাঁকোয়। মেয়েকে দেখবার জন্য রোজ সকালে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাই। কবি দোতলায় চলে যান। আমি নিচে অপেক্ষা করি। রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। রোজ যেমন যাই একদিন সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌঁছলুম। সেদিন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি।

---

[1] রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৪, পৃ ১৫২

[2] রেণুকা, মৃত্যু ১৯০৩। বেলা, মৃত্যু ১৬ মে ১৯১৮

কবি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, "আমি পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি।"

'গাড়িতে আর কিছু বললেন না। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছিয়ে অন্যদিনের মতো আমাকে বললেন, "উপরে চলো।"··· খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে ও চলে যাবে।[1] তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বসে থাকতুম।··· ছেলেবেলার মতো বলত, বাবা গল্প বলো। যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হ'ল।" এই বলে চুপ করে বসে রইলেন। শান্ত সমাহিত।

'সেদিন বিকালে ওঁর একটা কাজ ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে।" বললেন, "না, বদলাবে কেন? তার কোনো দরকার নেই।"

---

[1] দ্রষ্টব্য— বেলা দেবীর মৃত্যু -প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি [১৯১৮], চিঠিপত্র ২, পৃ ৬৮

শ্রীমতী সীতা দেবীও তাঁহার পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে বেলা দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন—

'প্রণাম করাতে, অন্যদিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, "বোসো।" মুখের চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, যেন অনেকদিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন।··· কয়েকবার কথা বলিলেন তবে মধ্যে মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। কি কথায় একবার একটু হাস্য করিলেন, হাসিটা তাঁহার মুখে কি নিদারুণ করুণ দেখাইয়াছিল তাহা এই চব্বিশ বৎসর পরেও মনে আছে।··· যে শক্তিশেল তাঁহার বুকে আসিয়া বাজিল কথাবার্তায় তাহার আর উল্লেখ মাত্র করিতেন না।' —পৃ ৩৫২-৫৫

এই প্রবন্ধেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু[1] রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

‘সে সময়··· দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা পরামর্শ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অসুখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আজ কেমন আছে ?’ কবি শুধু বললেন, ‘সে মারা গিয়েছে।’ শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় সেদিন কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।’[2]

পত্র ২৪। ‘কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গ’— ‘চরমপন্থী’ ও ‘মধ্যমপন্থী’দের বিসংবাদে সুরাটে কংগ্রেস-অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯০৭) পণ্ড হইবার প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধও (“যজ্ঞভঙ্গ”[3]) লিখিয়াছিলেন— ‘বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্‌গ্রেস ভাঙিয়াছে···দুই দিকেরই এই জিদ যে বরং কন্‌গ্রেস ভাঙিয়া যায় সেও ভালো তবু হার মানিব না।’

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে বেলা দেবীর মৃত্যুর সহিত ‘পলাতকা’র (অক্টোবর ১৯১৮) “শেষ প্রতিষ্ঠা” কবিতাটি যুক্ত করিয়াছেন। বেলা দেবীর বিবাহের পর তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া (১৯০১) আসিয়া রবীন্দ্রনাথ পত্নীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন (চিঠিপত্র ১, পৃ ৯১-৯২) তাহাও দ্রষ্টব্য।

[1] মাতৃহীন পীড়িতা কন্যা রেণুকাকে রবীন্দ্রনাথ কিরূপভাবে পরিচর্যা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জবানিতে তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন শ্রীমতী রানী মহলানবীশ, “ওঁ পিতা নোঽসি”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০

[2] শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ; ‘কবি-কথা’, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

[3] প্রবাসী, মাঘ ১৩১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডে প্রথম গ্রন্থভুক্ত।

এই সময় দেশে 'অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি' দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ 'গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন'এর চিন্তায়'[1] ও নিজের সাধ্যমত তাহার উদ্‌যোগে ব্রতী[2]— 'সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি'[1]— "যজ্ঞভঙ্গ" প্রবন্ধেও তিনি সেই কথা বলিলেন— 'মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন— দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন··· এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কন্‌গ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।··· সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কন্‌গ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে।··· কন্‌গ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থীর হউক।'

ইহার স্বল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনে[3] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার অভিভাষণেও[4] তিনি

---

[1] দ্রষ্টব্য অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (২৯ পৌষ ১৩১৪), প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৬৮৫

[2] বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত (পৃ ৯০) অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

[3] ১৯০৮, ১১ ফেব্রুয়ারি ; দিন ও মাস শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত কংগ্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৫২) হইতে গৃহীত।

[4] সমূহ গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

"দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া" তুলিবার প্রণালী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রে পল্লীসমাজ-গঠনের স্বয়ং যে উদ্‌যোগ এই সময় করেন তাহার কিছু বিবরণ আছে অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্রে[১]। 'পল্লীসমাজ'এর একটি বিস্তৃত কর্মসূচীও মুদ্রিত আকারে প্রচারিত হয়।[২]

পত্র ২৪। 'বন্দে মাতরম্ কাগজে··· কলহ চলিতেছে।'

বন্দে মাতরম্ পত্রিকা ১৯০৬ আগস্টে প্রকাশিত হয়, ১৯০৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলিয়াছিল; প্রথমে প্রায় দুই মাস কাল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রধান সম্পাদক ছিলেন, পরে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় প্রধানতঃ ইহার সম্পাদনা করেন; ১৯০৮ সালের মে মাসে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে বিপিনচন্দ্র পুনরায় ইহার ভার লইয়াছিলেন।[৩] রবীন্দ্রনাথ এই কাগজের অনুরাগী পাঠক ছিলেন; ৯ ভাদ্র ১৩১৪ তারিখে আমেরিকাপ্রবাসী পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখিতেছেন—'Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দে মাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে।'[৪] এই পত্র লিখিবার দুইদিন পূর্বেই

---

[১] চিঠিপত্র, বর্তমান খণ্ড, পৃ ৯০

[২] এটি ঠিক কোন্ সময়ে প্রচারিত হয় জানা যায় নাই; কয়েক বৎসর পূর্বে স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের রচনাকালে (১৯০৪) হইতে পারে, অথবা আলোচ্য কালেও হইতে পারে। ইহা শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত কংগ্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৬৫-৬৬) গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

[৩] বন্দেমাতরম্ পত্রের প্রকাশ সম্পাদন ইত্যাদি সম্বন্ধে এই তথ্য শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী -প্রণীত শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

[৪] চিঠিপত্র ২, পৃ ৫-৬

রবীন্দ্রনাথ, বন্দেমাতরম্ পত্রে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের উদ্দেশে 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটি[১] রচনা করেন।

পত্র ২৫। 'গীতাঞ্জলি··· ইংরেজি গদ্যে তর্জমা'

'ওটা যে কেমন করে লিখলুম' সে বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ৬ মে ১৯১৩ তারিখের পত্রে[২] রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

পত্র ২৫। 'শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে··· বক্তৃতা'

বিষয় "Ideals of the Ancient Civilisation of India"। এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে[৩]— আলোচ্য পত্রের তারিখও সম্ভবতঃ তাহাই হইবে।

পত্র ২৬। 'Mrs Boole'

এই প্রসঙ্গে জগদানন্দ রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৯শে বৈশাখ ১৩২০ তারিখের পত্র[৪] দ্রষ্টব্য—

'কাল আমরা Mrs Boole নামক একজন বিখ্যাত আঙ্কিকের বাড়ি গিয়েছিলুম। তাঁর বয়স ৮২ বছর। কিন্তু কি সুতীক্ষ্ণ তাঁর মানসিক শক্তি। ইনি বিধবা, এঁর স্বামী একজন বিখ্যাত গণিতবেত্তা

---

[১] প্রকাশ: নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৪। ১৩৪০ সাল হইতে সঞ্চয়িতায় সংকলিত।

[২] চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৯-২১

[৩] এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৩০ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখের পত্র, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২, পৃ ৩০৪, এবং শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত ২২ জানুয়ারি [১৯১৩] তারিখের পত্র, চিঠিপত্র ৪, পৃ ৪৯

[৪] বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃ ২৯০

ছিলেন। খুব ছোট ছেলেদের মনে সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে জ্যামিতির বোধ সঞ্চার করে দেবার যে উপায় ইনি উদ্ভাবন করেছেন তাই দেখে আমরা ভারি বিস্মিত হয়েছি। এঁর প্রণালী এবং তার সমস্ত উপকরণ আমরা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় আছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

পত্র ২৬। 'একদিন এখানকার সভায় 'চিত্রা'র [চিত্রাঙ্গদার] ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভালো লাগিয়াছে।'

এই পাঠ-সভার একটি বিবরণ[১] উদ্‌ধৃত হইল—

An Indian Drama. A Reading By Mr. Rabindra Nath Tagore...The Indian Art, Dramatic and Friendly Society[২] .. has already made several serious efforts to fulfil its pofessed intention of bringing the East and the West into closer touch...The latest of these efforts took the form of a meeting yesterday afternoon, at which Mr. Rabindra Nath Tagore, who is described as India's "World Poet"... read his own translation of one of his own plays.

Before a large and deeply interested gathering that included many Anglo-Indians and many well-known men of letters Mr. Tagore lent over his reading-desk— a tall, slim figure dressed in tight-

---

[১] Westminster Gazette, রবীন্দ্রসদনের কর্তিকা-সংগ্রহে প্রাপ্ত; কাগজটির তারিখ রক্ষিত হয় নাই।

[২] পত্রান্তরে লিখিত হইয়াছে India Society; এই সোসাইটিই Gitanjali, Chitra ও One Hundred Poems of Kabir প্রথমে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ (ও অবনীন্দ্রনাথ) এই সোসাইটির সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

fitting garments of black ; a face with finely chiselled features and with the deep-set eyes and the high brow of the thinker ; long hair and a flowing beard in which grey is taking the place of black, and a strangely thin, but musical, voice. In the dusk of late afternoon the shaded light that was directed upon his manuscript was reflected in a copper glow upon his face ; and he read with hardly a gesture, without a break, and in the accents of a refined Englishman from the beginning of his short prose-poem to the end...

The reading was received with enthusiasm by the audience ; and the poet, a quiet, almost a shy man— was overwhelmed with compliments by the many admirers who crowded round him before he could escape from the room.

পত্র ২৬। 'আইরিশ থিয়েটারে আমার ডাকঘর নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।' এই প্রসঙ্গে বিদেশে ডাকঘর অভিনয়ের একটি বিবরণ[১] মুদ্রিত হইল—

The Abbey Theatre. First Performance Of A Tagore Play. On Saturday evening last [May 1913] a performance was given in the Abbey Theatre in aid of the Building Fund of St. Enda's College, when two plays were presented to a well filled but not overcrowded house. One was "The Post Office", by Rabindranath Tagore, the great modern Bengali

---

[১] *Daily Express*, 19 May, 1913। কর্তিকা-সংগ্রহ, রবীন্দ্রসদন

poet...A large amount of interest was displayed in connection with the first production in Dublin of "The Post Office", especially as an appreciative lecture delivered a couple of months ago by Mr. W. B. Yeats introduced us to this striking Eastern personality, and a recently published translation of "Song-offerings" brought many readers into closer touch with his method and genius. The company must be congratulated on the minuteness with which they "made up" for the parts...The scenes were composed of Gordon Craig screens, and were arranged by Mr. J. F. Barlow...Too much praise cannot be given to Miss Lilian Jago for her impersonation of the pathetic part of Amal...Mr. Farrell Pelly was very good as the Dairyman, and Mr. Michael Conniffe as Gaffer. Mr. H. F. Hutchinson as the Watchman and Mr Philip Guiry as Madhav showed a very fine grasp of an unusual but apparently none the less congenial task. The other characters were ably represented by Miss Nell Stewart (Sudha), Mr. Charles Power (Doctor), Mr. James Duffy (Headman), Mr. Thomas Barrett (King's Herald), and Mr. Sean Connolly (King's Physician), while the "Boys" parts were taken by Desmond Murphy, Owen Clarke, and Horace Jennings.

পত্র ২৭। এই পত্রখানি ১৩২১ (১৯১৪) সালের ১ বৈশাখে লিখিত; রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে রোটেনস্টাইনকে লিখিত তাঁহার যে পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহার তারিখ ১ মার্চ ১৯১৪, *Arts and Letters*

(London) পত্রের ১৯৫১ সালের প্রথম সংখ্যায় (পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) তাহা ছাপা হইয়াছে—

Dr. J. C. Bose will be in England some time next May and I have been wishing I could accompany him there.

১৯১৪ সালের এই 'জয়যাত্রা'য় জগদীশচন্দ্র অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, রয়াল কলেজ অব সায়ান্স্, রয়াল ইনস্টিট্যুশন প্রভৃতিতে বক্তৃতা দিয়া বিশেষ সমাদৃত হন ; ভিয়েনা, প্যারিস, আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন।

পত্র ২৮। ১৯১৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ জাপান গিয়াছিলেন ; তথা হইতে সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যান ; এই চিঠি আমেরিকা হইতে লিখিত। আমেরিকা-প্রবাসের প্রথম ভাগে এই পত্র লিখিয়া থাকিবেন এই অনুমানে পত্রের মাস নির্দিষ্ট হইয়াছে ; তবে আমেরিকায় ছিলেন জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত। আমেরিকায় এইবার তাঁহাকে বিভিন্ন শহরে বহু বক্তৃতাদি করিতে হইয়াছিল[1], পত্রে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

পত্র ২৮। 'তোমার গান।'

জগদীশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের (প্রতিষ্ঠা ৩০ নভেম্বর ১৯১৭) উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে রচিত "মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে"।[2] উদ্‌বোধন-উৎসব-পত্রী হইতে কবির হস্তাক্ষরে গানটি মুদ্রিত হইল।

---

[1] দ্রষ্টব্য, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), "আমেরিকায় বক্তৃতা" অধ্যায়।

[2] গানটির প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত (১৯৫৬), পৃ ২২৯-৩০

পত্র ২৯। 'কন্‌গ্রেসের সময় একটা কিছু বলবার জন্যে'

১৯১৭ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌গ্রেসের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ India's Prayer বা "Thou hast given us to live" এবং "Our voyage is begun, Captain" এই কবিতা দুটি পাঠ করিয়া প্রথম দিনের সভায় (২৬ ডিসেম্বর) উদ্‌বোধন করেন। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং এই বেদমন্ত্র, ও বন্দেমাতরম্‌ গীত হইবার পর, সভার সাফল্য কামনা করিয়া প্রেরিত পত্রাদি বিপিনচন্দ্র পাল -কর্তৃক পঠিত হইলে—

The Chairman of the Reception Committee [Baikuntha Nath Sen] then called upon Sir Rabindra Nath Tagore to read out his opening invocation. Sir Rabindra, who received a tremendous ovation, then recited the following verses in a voice, which, reaching the farthest corners of the pandal, hushed the vast audience with its heartfelt eloquence—

Thou hast given us to live...
Our voyage is begun, Captain...[১]

শ্রীমতী সীতা দেবী তাঁহার পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে আলোচিত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত, তাঁহাকে যেন ধূম্র-আবরণে বেষ্টিত জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত দেখাইতেছিল। তখন ভাবিয়াছিলাম আমি

---

[১] এই বিবরণ নিম্নোক্ত প্রতিবেদনগ্রন্থ হইতে গৃহীত— *Report of the XXXII Session of the Indian National Congress held at Calcutta on 26th, 28th, and 29th December 1917* (1918)।

রবীন্দ্রনাথের *Poems* (1942) গ্রন্থে কবিতা দুইটি পুনর্মুদ্রিত।

যদি চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে তাঁহার এই মূর্ত্তি আঁকিয়া রাখিতাম। পরে দেখিয়াছি যে সে ইচ্ছা দেশবিখ্যাত চিত্রকরের মনেও জাগিয়াছিল, এবং সে ছবি তিনি আঁকিয়াওছিলেন।[১]…

'…কবির কণ্ঠস্বর মধুর অথচ তীব্র তূর্য্যনাদের মত সভার প্রত্যেক অংশ হইতেই শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই জনতার ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে যাইবামাত্রই সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির ও নীরব হইয়া গেল।'[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাজদ্রোহের পাত্রী মিসেস অ্যানি বেসান্ট্‌কে কন্‌গ্রেসের এই অধিবেশনে সভানেত্রী-নির্বাচনের প্রস্তাব লইয়া চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থীদের মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্ব হয় সেই সূত্রে, 'সঙ্কটকালে লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

---

[১] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত ; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড

[২] শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ২৯৮-৩০০

১৯১৭ সালের কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি চিত্র লিখিয়াছেন জেম্‌স্ কাসিন্‌স্—

As political leaders were recognised on entering the great platform, they were uproariously greeted, with special emphasis for the President - elect [Mrs Annie Besant], and an immense climax for Sir Rabindranath Tagore, then at the peak of his fame. . .For the opening of the session he ascended a high pulpit with slow dignity, and recited the invocation...His descent to the platform was one of the unrehearsed scenes that make history. Mrs Besant rose quickly from her chair, met the poet, offered her hands to him and touched his hands with her forehead. Then Rabindranath offered his hands to Mrs Besant and bent from his height and touched her hands with his forehead.

—James H. Cousins in *We Two Together* (1950), pp 316-17

হইতে স্বীকার করিলেন।'[1] মধ্যমপন্থীগণ মিসেস বেসাণ্টের সভানেত্রী-পদে নির্বাচনে স্বীকৃত হইলে, 'রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে বিপদনিবারণের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে— গোল মিটিয়া গেলে সে পদ ত্যাগ করিলেন।'[1]

'এই দলাদলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যাঁহাকে বাস্তবিক সম্মানার্হ করিয়াছেন, তিনি লোকের কাছে সম্মান পাইতেছেন কি না, সে চিন্তা কেন মনে স্থান দিবেন? নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে তাঁহার বিরোধীরাও বুঝিতে পারিবেন যে তিনি বরাবর কর্ত্তব্যবুদ্ধি-ও-সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনাসক্তভাবে কাজ করিয়াছেন।'[2]

পূর্বকথারূপে এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি তথ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে—

১৯১৭ সালের জুন মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তন-চেষ্টার ফলে, 'নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট ও তাঁহার দুইজন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত'[3] হয়। 'কথা হয় যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে,

---

[1] শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৩১০

[2] [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়], "রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪

[3] "প্রতিবাদের অধিকার", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪

এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভার কয়েকজন উদ্যোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট টাউন হলে এই সভা হইতে দিবেন না; কেবল মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সভা হইতে দিতে পারেন না; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না[1], কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন।'[2] এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া [৪ অগস্ট ১৯১৭] রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

'যখন বঙ্গের গবর্ণর টাউনহলে শ্রীমতী বেসাণ্টের স্বাধীনতা-লোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারী করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি "রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষানবীস" ("novice in politics") রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরীতে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।'[3]

সরকারী আদেশে অন্তরায়িতা শ্রীমতী বেসাণ্টকে সমবেদনা-জ্ঞাপন-পূর্বক চিঠি লিখিয়াছেন এই সংবাদে বিচলিত কোনো ইংরেজ

---

[1] "এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব?" —রবীন্দ্রনাথ, পরে উল্লিখিত "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধ।

[2] "প্রতিবাদের অধিকার", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪

[3] [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়], "রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪

বন্ধুকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন তাহাতেও সরকারী নিপীড়নব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।[১]

কংগ্রেসের সময় দেশকে যে-সকল কথা বলিবার জন্য "অন্তরে বাহিরে তাগিদ" অনুভব করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত হইয়াছে এই সময়ে রচিত "ছোট ও বড়"[২] "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ"[৩] প্রভৃতি প্রবন্ধে—

'ভিক্ষার দানে[৪] আমরা স্বাধীন হইব না— কিছুতেই না।...বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব একথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না।... ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না।'[৫]

পত্র ২৯। 'নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা'

এই ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন— বইখানির নাম *The Web of Indian Life*। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত ইহার নবসংস্করণে এই ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়, ভূমিকার তারিখ ২১ অক্টোবর ১৯১৭।

---

[১] "The Internments and Mrs Besant। Sir Rabindranath Tagore's Letter", *Bengalee*, September 7, 1917

[২] প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪ [৩] প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪

[৪] ভারতসচিব মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ অগস্ট, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট দায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন, সেই কথাই উল্লিখিত।

[৫] "স্বাধিকার-প্রমত্তঃ", প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪. পৃ ৩৩০

পত্র ২৯। 'তোমাদের লেকচারের জন্যে'

'ভবিষ্যতে এই [বসু-বিজ্ঞান-] মন্দিরে আরও অনেক নূতন নূতন বক্তৃতা হইবে। বিজ্ঞান ছাড়া বিদ্যার অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও বক্তৃতা হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বক্তৃতা করিবেন।'[1]

পত্র ৩০। 'অজিতের অকালমৃত্যু'[2]

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে ত্যাগব্রতী শিক্ষকরূপে যোগ দেন; তরুণ বয়সেই তিনি সাহিত্যসমালোচক ও জীবনীকার -রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; বিপিনচন্দ্র পাল ১৩১৮ চৈত্র -সংখ্যা বঙ্গদর্শনে "চরিত-চিত্র। রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে, রবীন্দ্রসাহিত্য যে বস্তুতন্ত্রতাহীন এই মতবাদের প্রচার করেন; তাহার প্রতিবাদ করেন অজিতকুমার ১৩১৯ আষাঢ় -সংখ্যা প্রবাসীতে, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন" এই প্রবন্ধে। ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে অজিতকুমার "বৈষ্ণব কবিতা" নামে একটি প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিতার যে ব্যাখ্যা দেন তাহার ফলে নারায়ণ, উপাসনা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রে তাঁহাকে তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়— ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের ("একখানি পত্র", নারায়ণ, মাঘ ১৩২৪) ন্যায় 'প্রবল পক্ষ'ও ছিলেন। ১৩২৫ শ্রাবণের প্রবাসী পত্রে অজিতকুমার

---

[1] "বসু-বিজ্ঞান-মন্দির", বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪

[2] অজিতকুমারের দুরারোগ্য পীড়ার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিয়াছিলেন—

'...অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল— ও যদি চলে যায় ত একটা ফাঁক রেখে যাবে।'

ইহাদের সকলেরই বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দেন।

পত্র ৩১। জগদীশচন্দ্র বাংলায় যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহারই সংকলন 'অব্যক্ত' নামে ১৩২৮ সালে বাহির হয়। নিম্নপত্র[১]-সহ জগদীশচন্দ্র উহা রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়াছিলেন—

কলিকাতা
৩রা অগ্রহায়ণ
১৩২৮

বন্ধু

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার
জগদীশ

এই পত্র ও গ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকারে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি লিখিত।

পত্র ৩২। এই চিঠিখানিতে বন্ধনীমধ্যে অপর যে তারিখ অনুমান করা হইয়াছে তাহার কারণ, পত্রের শেষে বিশ্বভারতীর কনস্টিট্যুশন-রেজেস্ট্রির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তারিখ ১৬ মে ১৯২২; মুদ্রিত কনস্টিট্যুশনে এই তারিখ দেওয়া আছে।[২]— জগদীশচন্দ্র. বিশ্বভারতীর

---

[১] শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে ১৩৩৫ পৌষের প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত।

[২] বিশ্বভারতীর প্রথম যুগ্ম-কর্মসচিব শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ চিঠিখানির এই অনুমিত তারিখ সমর্থন করেন।

'প্রধান' (ভাইস-প্রেসিডেণ্ট) -পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

পত্র ৩৩। 'অবশেষে দেশে এসে পৌছলুম।'

এই বৎসর (১৯২৬) মে মাস হইতে কবি বিদেশভ্রমণে রত ছিলেন, ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হন।

পত্র ৩৩। 'আমার নামে উৎসর্গ-করা তোমার যে বই'

জগদীশচন্দ্র ১৯২৬ সনের ২১ এপ্রিলে লিখিতেছেন[1]—'Nervous Mechanism in Plants তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার *Sacrifice and other plays* (1917) -এর অন্তর্গত *Sannyasi or the Ascetic* (প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর অনুবাদ) জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। পূর্বে, কথা (১৩০৬) ও খেয়া (১৩১৩) উৎসর্গ করিয়াছিলেন—উৎসর্গ-কবিতা দুইটি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত।

পত্র ৩৫। 'তোমার এই বিষম উদ্বেগের দিনে'

এই সময় জগদীশচন্দ্র নিকটাত্মীয়ের কঠিন পীড়ায় উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের ২২ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত।[1]

পত্র ৩৫। 'তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দনসভায়'[2]

---

[1] এই পত্র মুদ্রিত হয় নাই, রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে আছে।

[2] On the 30th November, 1928, Sir Jagadis completed the seventieth year of his life. A movement to celebrate the event was inaugurated by Sir Jagadis's life-long friend and admirer, the poet Rabindra Nath Tagore, with whom were associated some of the foremost of the great savant's pupils.

—*The Calcutta Municipal Gazette*
Sir J. C. Bose Supplement, 27 November, 1937

পত্র ৩৫

জগদীশচন্দ্র ২২ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখের পূর্বোক্ত পত্রে[1] লিখিয়াছিলেন—

'১লা ডিসেম্বরে আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে।'

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে কবিতা রচনা করেন তাহা বনবাণী গ্রন্থে সংকলিত; বর্তমান গ্রন্থেও কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইল।

জগদীশচন্দ্রের উক্ত পত্রের অপর অংশও উদ্ধৃতিযোগ্য—

'তুমি যে মনের কষ্টে আছ তাহাতে আমি তোমার বিষয় সর্ব্বদা ভাবিতেছি। ত্রিশ বৎসর হইতে আমরা সহযোগী এবং সহকর্ম্মী। তোমার কষ্ট আমাকে আঘাত করে। যদি কোন রকমে তোমার অভীষ্ট সাধনে সহায় হইতে পারি, তাহা হইলে আমি সফলকাম হইব।

'তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বর রহিবে। আর যে বেশী তোমার দান তাহা অযাচিত। সে কার্য্যে আমি তোমার চিরসহায় মনে করিও।

'আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মধ্যেও বড় কাজ হইয়াছে এবং হইবে। এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।…

---

[1] এই পত্র মুদ্রিত হয় নাই, রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে আছে।

‘শেষদিন পর্যন্তও যে সাধনা আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতেই জীবন অবসান করিব। ম্রিয়মাণ হইব না। অন্তত আমরা দুজন একে অন্যের ভার বহন করিব।’

পত্র ৩৬। পত্রখানির সাল ইত্যাদি অনুমান করা যায় নাই বলিয়া ইহা সর্বশেষে বসানো হইয়াছে। তবে চিঠিখানি শান্তিনিকেতন হইতে বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে লিখিত এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্র

পত্র ১। দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ৪ জুন [১৯০১] তারিখের পত্র, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ২৮

পত্র ২। ‘নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে।’

এই জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজো— বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় নবজাগরণে ইহার উৎসাহবাণী কতদূর ফলবতী হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ জাপানে একটি বক্তৃতায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—

The voice of the East came from him to our young men... one of the influences which acted towards the awakening of spirit in Bengal flowed from the heart of that great man, Okakura...[১]

---

[১] Rabindranath Tagore, *On Oriental Culture and Japan's Mission*, Lecture delivered at the Industrial Club, Tokyo, May 15, 1929, pp. 1-12.

পত্র ৩। 'আমার দুর্ব্বলতা চলিয়া যায় ·· আমি রণে ভঙ্গ দিব না।'

ইহার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কন্যা রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র ৩। 'আর কই মাছ নয়।'

'বৌঠাকুরাণী' অবলা বসুর মৎস্যরন্ধনকলায় পটুতার সপ্রীতি উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্রে আছে; সম্ভবতঃ পত্নী ও কন্যা -বিয়োগে, এ সময় রবীন্দ্রনাথ নিরামিষাশী।

পত্র ৪। 'আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী (মৃত্যু ১২৯১)। দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতির "মৃত্যুশোক" অধ্যায়, ও ছেলেবেলা গ্রন্থ।

পত্র ৫[১]। এই পত্রে ভগিনী নিবেদিতার পীড়ার উল্লেখ অনুসরণ করিয়া নিবেদিতার জীবনকথা হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখি যে, তিনি ১৯০৫ (১৩১২) ও ১৯০৬ (১৩১৩) সালে দুইবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, দুইবারই তিনি জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্মিণীর তত্ত্বাবধানে ছিলেন— ১৯০৫ সালে অগস্ট মাসে পীড়িত হইয়া কয়েক মাস অসুস্থ ছিলেন, অক্টোবরে জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর শুশ্রূষায় দার্জিলিঙে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমীরা দেবীর মজঃফরপুরে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহে যাইবার কথা এই পত্রে আছে; অপর একটি উল্লেখ পাওয়া যায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে— 'মীরা, বেলার কাছে মজঃফরপুরে গেছে··· ২৭শে কার্ত্তিক ১৩১৩।'[২]

---

[১] প্রবাসীতে চিঠিখানির তারিখ এইরূপ মুদ্রিত হয়— '১৩ [কীটদষ্ট]'।

[২] স্মৃতি, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলির সংগ্রহ (১৩৪৮), পৃ ৫৯।

এই উভয় বিবেচনায়, পত্রের তারিখ ১৩১২ বা ১৩১৩ হইতে পারে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ৬। দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ২৬-সংখ্যক পত্র, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৫৫, এবং তৎসংক্রান্ত গ্রন্থপরিচয়।

অবলা বসু -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ২০ মার্চ ১৯০৮ তারিখের পত্রের[১] উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র ; তদনুযায়ী ইহার তারিখ অনুমিত হইয়াছে। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা জানিয়া অবলা বসু মহোদয়া উক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—

‘চিঠিপত্র না লিখিলেও জানিবেন, আমাদের হৃদয় আপনার সমুদয় শোকদুঃখে আন্দোলিত ও ব্যথিত। আপনার বিপদে আমরা যেরূপ কষ্ট পাই, আপনার ধৈর্য্য ও ঈশ্বর-প্রীতি দেখিয়া আমরা সেইরূপ আশ্বস্ত হই। আপনি যে-সব গুরুতর আঘাত পাইতেছেন তাহা সামলাইয়া প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিকের মত আরও গভীরতমভাবে সাধু কার্য্যে ও চিন্তাতে মনোনিবেশ করিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত ঋষিভাব বলা যায়। আপনার অসামান্য সহ্যগুণ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। সেবার বড় দিনের ছুটীর সময় অশান্তিপূর্ণ চঞ্চল হৃদয় লইয়া শিলাইদহে গিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দুটি কথা বলিয়াই নবজীবন লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম। সে-কথা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

‘যাহাকে এত যত্নে ও স্নেহে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন সে সব আশা চূর্ণ করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া মায়ের কোলে গেল। আপনি মনকে শান্ত সমাহিত করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে সমুদয় শক্তি ও চিন্তা

---

[১] প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৪

দেশের কাজে অর্পণ করিতেছেন, ইহার উপরে আমাদের বাক্য ব্যর্থ। আপনাকে আর কি বলিতে পারি— আপনার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হই, জন্মভূমি ধন্য হোক্। [পাবনায়] প্রাদেশিক [সম্মিলনীর] অধিবেশনে আপনার বক্তৃতা পড়িয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আপনি এই সঙ্কটের সময় দেশবাসী সকলকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশকে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন।'

পত্র ৬। 'আমাদের ব্রাহ্মধর্ম'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মঃ' গ্রন্থ।

পত্র ৭। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর (২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) পর এই পত্র লিখিত।

পত্র ৭। 'মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন ফিরে এসেছি।'

এই পত্র লিখিবার কিছুকাল পূর্বে, সেপ্টেম্বর মাসে, রবীন্দ্রনাথ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই রোগমুক্তির পর 'প্রান্তিক' কাব্য লেখেন।

'সত্যের মন্দিরে তুমি।'

এই কবিতা কোন্ সময়ে রচিত তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ, ১৯০০-০২ সালে জগদীশচন্দ্রের বিলাতপ্রবাসকালে রচিত ও তাঁহার নিকট প্রেরিত। ১৩৪৪ চৈত্র -সংখ্যা প্রবাসীতে কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

'সত্যরত্ন তুমি দিলে'

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথের ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ তারিখের পত্র ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থপরিচয়।

'জগদীশচন্দ্র বসু' : ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি

এই কবিতা ১৩০৮ আষাঢ় -সংখ্যা বঙ্গদর্শন পত্রে, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্তা' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরে, মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিতাটি 'উৎসর্গ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৬ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র সম্ভবতঃ এই কবিতারই প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছেন—

'তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে পারি না। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই…'

প্রখ্যাত কবি মনোমোহন ঘোষ এই কবিতাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন— Theodore Douglas Dunn -কর্তৃক সম্পাদিত *The Bengali Book of English Verse* (1928) গ্রন্থে সংকলিত।

পরিশিষ্ট ১

'সম্বর্ধনা-সঙ্গীত' : জয় তব হোক জয়

১৯০২ সালে সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসে[1] জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপনের জন্য একটি 'সারস্বত সম্মিলন'এর আয়োজন করেন (১৯ মাঘ ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ তারিখে); 'সেই সম্বর্ধনানুষ্ঠানের সভাপতি— কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর। অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :—

জয় তব হোক জয়।'[2]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না যে, সরলা দেবীর রচিত সুবিখ্যাত সংগীত "বন্দি তোমায় ভারতজননি বিদ্যামুকুটধারিণি" গানটিও এই সময় জগদীশচন্দ্রের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে রচিত।[3]

'বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা'

উদ্ভিদে জীবনের সাড়া সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার বিশেষ একটি

---

[1] দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রের ১৯০২, ১৯ সেপ্টেম্বরের পত্র, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

[2] শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'সঙ্গীত সমাজ' প্রবন্ধে এই সম্মিলনের বিবরণ লিখিয়াছেন; অনুষ্ঠানের তারিখ, উদ্ধৃতাংশ ও রবীন্দ্রনাথের গানটি ঐ প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। এই সম্বর্ধনা সম্বন্ধে আরো বিবরণ ও 'সঙ্গীত সমাজ'এর পরিচয় ঐ প্রবন্ধে আছে। গানটি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই। শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের নিকট রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের একটি খাতায় গানটির পাণ্ডুলিপি আছে, তাহার প্রতিরূপ মুদ্রিত হইল। হস্তাক্ষরের প্রতিরূপে ও মুদ্রিত পাঠে কিছু পার্থক্য আছে।

[3] এই গানটি 'বন্দনা' নামে, ১৩০৯ ফাল্গুন -সংখ্যা ভারতী পত্রে, নিম্নমুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য -সহ প্রকাশিত হয়—

'এই বৎসর সারস্বত-উৎসবকালে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতায় বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় হইতে সম্মান ও অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়াছে। এই সঙ্গীতটি তদুপলক্ষ্যে বিরচিত।'

বাহন ছিল লজ্জাবতী লতা, ইহা সুবিদিত[1]; এই কবিতায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহাও লক্ষগোচর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ করি অবান্তর হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তির পর শান্তিনিকেতনে সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দনসভা হয় তাহার সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি এই উপলক্ষ্যে, সম্ভবতঃ স্বীয় সাধনার প্রতীকস্বরূপ, 'ছোট মাটির টবে বসানো একটি লজ্জাবতী লতা তাঁহাকে [রবীন্দ্রনাথকে] উপহার দিলেন।'[2]

পরিশিষ্ট ২

'আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে'

ইহা ১৩০৫ পৌষ -সংখ্যা প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'মন্দিরাভিমুখে' প্রবন্ধের একাংশ। 'মাত্রে নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি দরিদ্র ছাত্র প্যারিস-প্লাষ্টারের এক নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম দিয়াছেন মন্দিরাভিমুখে।' এই মূর্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি লিখিত; সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি এ যাবৎ কোনো-গ্রন্থ-ভুক্ত হয় নাই। প্রদীপে, রচনার সহিত লেখক-রূপে রবীন্দ্রনাথের নাম নাই, তবে সূচীতে আছে।

স্বীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে আলোচনা ও প্রচার -পূর্বক বিলাতপ্রবাস ('First Scientific Deputation',

---

[1] দ্রষ্টব্য, জগদীশচন্দ্র বসু, "আহত উদ্ভিদ্", অব্যক্ত গ্রন্থ

[2] শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ ১২৪

১৮৯৬-৯৭) হইতে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর, এই প্রবন্ধ রচিত ; ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন, রয়াল ইনস্টিটিউশন প্রভৃতিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা এ সময় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

'আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা।'

'জড় কি সজীব ?'

রবীন্দ্রনাথের ৩ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে এই দুটি প্রবন্ধ উল্লিখিত— রচনা দুইটি ১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শন পত্রে যথাক্রমে আষাঢ় ও শ্রাবণ -সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সময় জগদীশচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয় বিজ্ঞান-যাত্রায় (১৯০০-০২) বিদেশে সুধীসমাজে আপনার আবিষ্কার -প্রচারে প্রবৃত্ত। বঙ্গদর্শনে রচনা দুটির শেষে বা সূচীতে রবীন্দ্রনাথের নাম নাই, তবে এ সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তাঁহার সকল রচনা বিনা স্বাক্ষরেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। ৩ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্র -দ্বারাও রচনা দুইটি যে তাঁহার, এ কথা সমর্থিত।

'এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে'

১৩১১ আষাঢ় বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত। উক্ত প্রবন্ধ পরে 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে সংকলিত। চতুর্থ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

'আমাদের যাহা নাই'

১৩১২ জ্যৈষ্ঠের ভাণ্ডার পত্রে মুদ্রিত 'বিজ্ঞানসভা' প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত। অধুনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত আছে।

'পত্র-পরিচয়'

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 'জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী'র প্রকাশ প্রবাসী

পত্রে ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় আরম্ভ হইয়া পৌষ-সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। উহার ভূমিকাস্বরূপ এই 'পত্র-পরিচয়' প্রথম কিস্তির প্রারম্ভে (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) মুদ্রিত হইয়াছিল।

'জগদীশচন্দ্র'

জগদীশচন্দ্রের পরলোকগমনের (২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) পর রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রে (পৌষ ১৩৪৪) প্রকাশিত হয়।

রচনাটির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি রূপ ১৯৩৮ জানুয়ারি -সংখ্যা মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

১৯৩৭ ডিসেম্বর -সংখ্যা বিশ্বভারতী-নিউজ পত্রে এবং মডার্ন রিভিউ পত্রে জগদীশচন্দ্রের স্মরণে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্রের পরলোক-গমনের পর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁহার জন্মদিনের তথা বসু-বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসবে (৩০ নভেম্বর) প্রতি বৎসর 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু -স্মৃতি' বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। প্রথম বক্তা নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার লিখিত ভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] 'তিনি [রবীন্দ্রনাথ] আসিতে না পারায় উহা আচার্য্য মহাশয়ের এক বৃদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র[৩] কর্তৃক পঠিত হয়।'[৪] ইহা বিশ্বভারতী

---

[১] ঐ প্রবন্ধের শেষে টীকা আছে যে, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের যাহা বলিয়াছিলেন উহা তাহারই অনুমোদিত অনুবাদ।

[২] Sir Jagadish Chandra Bose । Memorial Address । By । Dr. Rabindra Nath Tagore । 30th November 1938 । Bose Institute

[৩] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[৪] প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪১১

কোয়ার্টালি পত্রে (নভেম্বর ১৯৩৮) এবং মডার্ন রিভিউ পত্রেও (ডিসেম্বর ১৯৩৮) মুদ্রিত হইয়াছিল।

শেষোক্ত ইংরাজি রচনা দুটিও 'জগদীশচন্দ্র' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরে এই গ্রন্থে সংকলিত হইল।

পরিশিষ্ট ৩

১. এই চিঠির প্রতিলিপি আগরতলার শ্রীসত্যরঞ্জন বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ১৩৫৯ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় (পৃ ১৪) মুদ্রিত।

২. এই পত্র রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশায় [১৩৪৮] প্রকাশিত (পৃ ১১০-১১)।

৩. চিঠিখানি ১৩৫০ বৈশাখ-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ ৬০০) মুদ্রিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্র বসুর ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্র পাইয়া এই চিঠি লিখিত— জগদীশচন্দ্রের উক্ত পত্রের ভাষাও অংশতঃ এই পত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী এই চিঠি এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত পূর্ববর্তী পত্রের আগে বসিবে। বিশ্বভারতী পত্রিকায় চিঠিখানির পোস্ট্‌মার্ক্‌ উল্লিখিত হইয়াছে— Shelidah 2 Oct [1900]। মূল পত্র রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত।

৪. এই চিঠিখানি ১৩৪৯ আশ্বিন-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের যে পত্র উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহার তারিখ ২০ জুলাই ১৯০১।

৫. এই পত্র ১৩৫৯ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। আগরতলার শ্রীশৈলেশ দেববর্মার উদ্‌যোগে প্রাপ্ত।

৬. পত্রখানির প্রতিলিপি আগরতলার শ্রীসত্যরঞ্জন বসুর সৌজন্যে

প্রাপ্ত। শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার সৌজন্যে চিঠিখানি ১৩৬০ শারদীয় সংখ্যা ত্রিপুরার কথা (আগরতলা) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭. এই পত্র রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

৮. এই চিঠিখানি ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ -সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ ৩৩৩) প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট ৪

‘প্রশ্নোত্তর’

ভাণ্ডার (১৩১২-১৪) পত্রিকার সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রে একটি ‘প্রশ্নোত্তর’ বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; সাধারণতঃ দেশের প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইত, এবং দেশের অনেক মনীষী উত্তরে সে সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিতেন। ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যা ভাণ্ডার হইতে এই প্রশ্নোত্তর উদ্‌ধৃত হইয়াছে।

এই রচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের নিম্নমুদ্রিত পত্রখানি অনুধাবনযোগ্য—

‘16-5-1905
[২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২]

‘…ভাণ্ডারের লেখা বেশ হইয়াছে। তবে মেষচর্ম্মে আবৃত সিংহনাদ লোকে বুঝিতে পারিবে। এরূপ লেখা হইলে আমার বইখানা সহজেই বোধগম্য হইবে।’

সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার -বিষয়ে বাংলায় বই লিখিবার বা সম্পাদন করিবার কল্পনা এ সময় রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল ; তুলনীয় জগদীশচন্দ্রের ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের চিঠি।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য বাঙালী মনীষীপ্রধানদের লইয়া যে সমিতি গঠিত হয় জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন, এবং দেশবাসীর প্রতি সমিতির নিবেদনপত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব ("রবীন্দ্র-জয়ন্তী") উপলক্ষ্য করিয়া 'সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান'-এর ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় যে 'পরামর্শ সভা' বা 'উদ্বোধন সভা' (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয় তাহার আহ্বান-পত্রে (২৫ বৈশাখ ১৩৩৮) প্রথম স্বাক্ষর জগদীশচন্দ্রের— তিনিই জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে যে *Golden Book of Tagore* (১৯৩১) প্রকাশিত হয় তাহার অন্যতম উদ্‌যোক্তা বা sponsor ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু[২]।

জগদীশচন্দ্র গোল্ডেন বুক অব টাগোর গ্রন্থে যে নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' (১৩৩৮) পুস্তকে তাহার অনুবাদ মুদ্রিত হয়; তাহাতে জগদীশচন্দ্র বলেন, 'জীবনের বহুবিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে-তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য্য দান করিয়াছেন।'

---

[১] *The Calcutta Municipal Gazette*, Tagore Memorial Special Supplement, 13 September 1941, p. lvii

[২] অন্যান্য sponsor ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, রম্যাঁ রলাঁ, আলবার্ট্‌ আইন্‌স্টাইন, কস্টেস পালামাস।

উৎসবানুষ্ঠানে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) জগদীশচন্দ্র উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথকে নিম্নমুদ্রিত পত্রে[১] শুভকামনা জ্ঞাপন করেন—

গিরিধি
২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১

বন্ধু—

তুমি জয়যুক্ত হও।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

অবলা বসু মহোদয়া রবীন্দ্র-জগদীশ-সৌহৃদ্য-প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

‘জীবনের শেষ বৎসরও উনি [জগদীশচন্দ্র] প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর,

আজি হতে শতবর্ষ পরে

শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।’[২]

---

[১] *The Calcutta Municipal Gazette,* Tagore Memorial Special Supplement, 13 September 1941, p. lxiii

[২] প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪৭২

যাঁহাদের সম্পর্কে গ্রন্থপরিচয়ে বিশদ আলোচনা আছে, বর্তমান তালিকায় তাঁহাদের নাম তারকাচিহ্নিত ; অপিচ গ্রন্থপরিচয়ের পৃষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে।

* অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। দ্রষ্টব্য পৃ ১৬০-৬১।

* অজিত। দ্রষ্টব্য পৃ ২৩৭।

অধ্যাপক (পৃ ৮৫), অধ্যাপকমহাশয় (পৃ ৮৩)। জগদীশচন্দ্র বসু।

অরবিন্দ। জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় শ্রীঅরবিন্দমোহন বসু, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। ইহার কৃত বলাকাকাব্যের ইংরেজি অনুবাদ : *A Flight of Swans*।

'আমার জামাতা।' শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

'আর্য্যা', পৃ ১২। জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু।

* আর্য্যা সরলা। দ্রষ্টব্য পৃ ১৭১।

* 'একটি জাপানী'। ওকাকুরা কাকুজো। দ্রষ্টব্য পৃ ২৪১-৪২।

* 'একটি জাপানী ছাত্র'। হোরি সান। দ্রষ্টব্য পৃ ২১৩-১৪।

'কুচবিহার'। কুচবিহার-মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।

কুঞ্জবাবু। কুঞ্জলাল ঘোষ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা, এক সময়ে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন।

'চীনদেশী বন্ধু।' ইনি চীনদেশীয় কবি Tsemon-Hsu। ১৯২৪ সালে চীনভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইহার অন্তরঙ্গতা হয়, এই সময়ে অধিকাংশ কাল তিনি কবির সঙ্গী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ *Talks in China* গ্রন্থ (১৯২৫) ইহাকে উৎসর্গ করেন—"to whose kind offices I owe my introduction to the great people of China."

জগদানন্দ। জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতনের পরলোকগত অধ্যাপক, 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১৩১৯) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের লেখক। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ সরল সুবোধ্য ভাবে রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধাবলী অন্যত্র উল্লিখিত।

* তিলক। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। দ্রষ্টব্য পৃ ২০২।

'তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরা', 'তোমার বন্ধু মীরা' বা 'তোমার বন্ধুটি'। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা (জন্ম ১৮৯২)।

ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধ অন্যত্র উল্লিখিত।

* দ্বিজেন্দ্রলালবাবু। দ্রষ্টব্য পৃ ১৬৪-৬৫।

দেবেন। জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু, বর্তমান বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ।

ধর্ম্মপাল। অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩), মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

'নাটোর'। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। পঞ্চভূত গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

* পরঞ্জপে। দ্রষ্টব্য পৃ ২০২।

পিসিমা। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী। 'শান্তিনিকেতনে কবির নূতন বাড়িতে সংসারের ভার লইয়া তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি।'— শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "মৃণালিনী দেবী", কবির কথা গ্রন্থ, পৃ ২৩।

বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সাহিত্য-শিষ্য।

বিদ্যার্ণব। শিবধন বিদ্যার্ণব। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সংস্কৃত শিক্ষক, পরে শান্তিনিকেতনেও শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য "রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব," কবিপ্রণাম গ্রন্থ।

বেলা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী (১৮৮৬-১৯১৮)।

বৌঠাকুরাণী, বৌঠাকরুণ। অবলা বসু।

বৌমা। জ্যেষ্ঠপুত্র-বধূ শ্রীপ্রতিমা দেবী।

মহারাজ (পৃ ১৩, ১৭, ২৩-২৫)। ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর দেবমাণিক্য।

* মিস নোব্‌ল, নিবেদিতা। মার্গারেট নোবল, ভগিনী নিবেদিতা। দ্রষ্টব্য পৃ ২০৫-০৭।

Miss Macleod। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-শীলা মার্কিন মহিলা।

Mrs Knight। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পসংকলন প্রভৃতির অনুবাদিকা।

মীরা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা (জন্ম ১৮৯২)

মোহিতবাবু। মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)। এক কালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে (১৯১৭) বন্ধুস্মৃতি অধ্যায়ে ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ ইহার স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

যোগেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র যোগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

রথী। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৮৮)।

রমণী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

(১৮৫৯-১৯১৯); শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম তিনজন ন্যাসরক্ষকের অন্যতম। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রারম্ভ হইতে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনকার্যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে তিনি ত্রিপুরারাজ্যের মন্ত্রীপদেও বৃত হইয়াছিলেন।

রমেশবাবু। প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। জগদীশচন্দ্র-প্রসঙ্গে ইঁহার পত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

রেণুকা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা (১৮৯০-১৯০৩)।

রোটেন্‌স্টাইন। খ্যাতনামা ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোটেন্‌স্টাইন — এই 'স্বভাববন্ধু'র যোগে রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে 'ইংলণ্ডের ভাবুক-সমাজে' প্রথম সুপরিচিত হন। পথের সঞ্চয় গ্রন্থে "বন্ধু" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন। রোটেন্‌স্টাইন রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় ও যোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার *Men and Memories* গ্রন্থে।

* লরেন্স। দ্রষ্টব্য পৃ ১৬১-৬৩।

লোকেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিত। তারকনাথ পালিতের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক বন্ধু। দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি গ্রন্থের "লোকেন পালিত" অধ্যায়।

শরৎ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

সমাজপতি। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ১৩০৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার" প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়।

সম্পাদক (পৃ ৮৫)। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন -সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

সুকেশী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী।

সুবোধ। সুবোধচন্দ্র মজুমদার, এককালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।

সুরেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধ অন্যত্র উল্লিখিত।

সুরেন্দ্রবাবু। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্বে, দেশনায়ক প্রবন্ধে (পঠিত ১৫ বৈশাখ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ "কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার" করিবার প্রস্তাব করেন, এবং সুরেন্দ্রনাথকে "সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য" সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬৫২-৫৬।

সুরেশ। সুরেশচন্দ্র নাগ।

হেমলতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী।

বর্তমান খণ্ড চিঠিপত্র পুস্তকে মুদ্রিত জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ১, ১১, ১৩, ১৮, ৩১-৩৩ এবং অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত ১-৩ -সংখ্যক মূল পত্র, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসু ও তাঁহার সহধর্মিণী নলিনী বসু অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ২১, ২২, ৩৪ ও ৩৫ এবং অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত ৪ ও ৬ -সংখ্যক মূল পত্র, অবলা বসু মহোদয়া বিশ্বভারতীকে দিয়াছিলেন, সেগুলি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। বর্তমান গ্রন্থ -প্রকাশে এই চিঠিগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

চিঠিপত্র গ্রন্থমালার পূর্বানুসৃত রীতি অনুযায়ী মূল পত্রের, তদভাবে সাময়িক পত্রে প্রথম মুদ্রণের, পাঠ বানান ইত্যাদি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এইজন্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বানানপদ্ধতির তারতম্য লক্ষিত হইবে।

গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত কোনো কোনো আনুষঙ্গিক বিষয়, যথা কোনো কোনো ঘটনার তারিখ ও ব্যক্তিপরিচয় -প্রসঙ্গে, অমল হোম, কুলপ্রসাদ সেনগুপ্ত, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রমোহন বসু, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় ও রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর পত্রোত্তর তথ্যনির্ণয়ে সহায়ক হইয়াছে। তথ্যনির্বাচন-পদ্ধতিতে শ্রীকানাই সামন্ত ও প্রবোধচন্দ্র সেনের পরামর্শ পাওয়া গিয়াছে। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কোনো কোনো উপকরণ ও তথ্য নির্দেশ করিয়া প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। অমল হোম কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রখানি শ্রীপ্রণবেশ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আরও অনেকে অনেক বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে উল্লিখিত

হইয়াছে। সম্পাদক ও প্রকাশক ইঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতে ইচ্ছা করেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠিতে তারিখ নাই; পত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা হইতে, বা রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর সাহায্যে তারিখ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এই-সকল অনুমিত তারিখ [ ] বন্ধনী -মধ্যে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যার নিম্নে ছোটো অক্ষরে যে তারিখ ছাপা হইয়াছে তাহা পত্রের অংশ নহে— পত্রপারম্পর্য সহজে লক্ষগোচর করিবার উদ্দেশ্যে, পত্রে মুদ্রিত বা অনুমিত তারিখ ঐভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

মে ১৯৫৭

বর্তমান সংস্করণে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের দুইখানি এবং অবলা বসুকে লিখিত একখানি পত্র সংযোজিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রটি 'সংযোগ' পত্রিকায়, বর্ষ ১, সংখ্যা ২ : আশ্বিন ১৩৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শ্রাবণ ১৩৯৯

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

T4
41
v.7
338221

চিত্রাঙ্গদা

চিঠিপত্র ১ । পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২ । রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩ । প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪ । মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫ । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬ । জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

ছিন্নপত্র । শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

পথে ও পথের প্রান্তে । রানী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী । শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

সপ্তম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ সপ্তম খণ্ড

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭
সংস্করণ : ২২ শ্রাবণ ১৩৯৯

পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীজয়ন্ত বাকৃচি
পি. এম. বাকৃচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন। কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্র ১
নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্র ১৩৫

পাণ্ডুলিপিচিত্র

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্র ১০৬
নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্র ১৩৬

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু—

তোমাকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইল— সেইজন্য যদি চ তোমার নাম জানিনা মা, তথাপি আশাকরি, যে ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে এ পত্র তোমার হস্তে পড়িবে।

ভগবান অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আছেন— তাঁহারই আলোক আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে তাঁহারই বায়ু প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্বাসরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছ; তাঁহারই সঙ্গে তোমার একান্ত যোগ ত এক মুহূর্ত্তকালও বিচ্ছিন্ন নাই— যিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন সেই অন্তর্যামীকে যে কেমন করিয়া পাওয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তিনি কাহার কাছে কখন কেমন করিয়া যে দেখা দেন তাহা তিনিই জানেন— কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ জানিয়ো তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই এবং করিবেন না। উপনিষদে ঋষি একটি কথা বলিয়াছেন— স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা— ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদের বন্ধু— কারণ বন্ধুই যদি না হইবেন তবে সৃষ্টি করিলেন কেন? তিনি এই নিমেষেই আমাদিগকে লুপ্ত করিতে পারেন। সেই যে আমাদের জনিতা অর্থাৎ পিতা এবং বন্ধু— স বিধাতা— তিনিই আমাদের

বিধাতা— অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রত্যেক সুখ দুঃখ তাঁহারই বিধানে ঘটিতেছে। যখন একথা নিশ্চয় যে আমার বন্ধুর বিধান ছাড়া জগতে আর কোনো বিধান নাই তখন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি ধন্য— সুখ দুঃখ আমার সকলি শিরোধার্য্য— সকল কর্ম্মে সকল স্থানেই তিনি আমাকে আমার সার্থকতার দিকেই লইয়া যাইতেছেন ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই। আমিই কি কেবল তাঁহাকে চাই তিনি কি আমাকে চান না? যদি না চাহিবেন তবে আমার মত ক্ষুদ্রটুকুর জন্য জগৎ জুড়িয়া এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন কেন? শুধু কেবল আমিই যদি তাঁহাকে চাহিতাম তবে কোনকালে তাঁহাকে পাইতাম না— কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর ভাবনা কিসের? তাঁহার কাল অনন্ত তাঁহার পথ বিচিত্র এবং এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমাদের শেষ নহে। অতএব প্রত্যহই তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাক— ইহা নিশ্চয় মনে রাখ তিনি তোমাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়েন নাই।

আমি গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবার অধিকারী নহি— আমি হিতৈষীর ন্যায় তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে জীবনে প্রত্যহ একটা কোনো মঙ্গল কর্ম্ম করিয়ো যাহা নিতান্তই তাঁহারই উদ্দেশে করা হইবে। যাহার জন্য যশ চাহিবেনা; যাহার প্রতিদান পাইবেনা, যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে গোপনে সম্পন্ন করিবে। তখন মনে মনে এই বলিয়ো, "ভগবান এই কাজটি সম্পূর্ণ তোমাকেই দিলাম— ইহা তুমিই জানিলে আর আমিই জানিলাম।" যদিও সংসারের সকল কাজই তাঁহারই কাজ, কারণ এ সংসার তাঁহারই সংসার—

তথাপি সে সকল কাজের সঙ্গে আমাদের নানা স্বার্থ নানা বাধ্য-বাধকতা জড়িত থাকে। দিনের মধ্যে অন্তত একটা কোনো কাজ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক, বাধ্য না হইয়া, সমস্ত ফলকামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পার তবে সেই কর্ম্মের মধ্যে তোমার পূজা সমাধা হইবে তোমার জীবন কৃতার্থ হইবে। ভগবানের কাজে ছোট বড় নাই, তিনি ভাব গ্রহণ করেন— তুমি তোমার সাধ্য বুঝিয়া সামান্য যাহা কিছু পার তাহাই করিয়ো। কর্ম্মে ভগবানের যে পূজা তাহাই শ্রেষ্ঠ।

মাতঃ আমার এই আশীর্ব্বাদ পত্র তোমার কোনো কাজে লাগিবে কিনা জানিনা কারণ, আশীর্ব্বাদ সার্থকভাবে করিবার শক্তি সকলের নাই— আমিও ফলকামনা নিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ করিয়া এই পত্রখানি তোমাকে প্রেরণ করিলাম— তাঁহারই জয় হউক্।

২

২২ অক্টোবর ১৯০৩

ওঁ

"শান্তিনিকেতন"
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল হইতে আমার শরীর অসুস্থ হইবার অনেক কারণ ঘটিয়াছে— আশা করিতেছি আবার শীঘ্র বললাভ করিয়া কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিব।

আমার কোন কোন রচনা তোমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়াছে শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। নরনারীর চিত্তে ভগবানের অমৃতধারা প্রবাহিত করাইয়া দেওয়া— কোন লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

যে সংসারে তুমি প্রবেশ করিয়াছ সেই সংসারকে তুমি ধৈর্য্যে ক্ষমায়, মঙ্গলে ও মাধুর্য্যে অভিষিক্ত কর। এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিয়ো, ভগবান আমাদের সেবার অপেক্ষা রাখেন না— মানুষের সেবার মধ্যেই তাঁহার সেবা। তিনিই স্বামিরূপে আমাদের প্রীতি, পুত্ররূপে আমাদের স্নেহ, দীনরূপে আমাদের দয়া গ্রহণ করেন। যাহার সেবা করিবে মঙ্গল করিবে পূজারূপে তাহা ঈশ্বরের চরণেই পৌঁছিবে। শোকদুঃখকে তাঁহার হস্তের দান বলিয়া নতশিরে ধারণ করিলে জীবনের সমস্ত বেদনাও সার্থক হইয়া উঠিবে। সংসারকেই ঈশ্বরের পবিত্র পাদপীঠ জানিয়া সেই সংসার-মন্দিরেই তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে— এবং প্রসন্নচিত্তে

প্রফুল্লমুখে প্রতিদিন সংসারের কল্যাণসাধনদ্বারা ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিবে।

সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদবিবাদ করিতে চাহি না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে কর্ম্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার ত আমাদের রচনা নহে, আকার ত তাঁহারই।

তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ যে, ভগবানের প্রতি ভক্তি তোমার চিত্তে যে অমৃতরস বর্ষণ করিবে তাহা যেন নিয়ত তোমার চারিদিকের সংসারকে মধুময় করিয়া রাখে। ইতি ৫ই কার্ত্তিক ১৩১০

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৯ মে ১৯০৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় জানিয়ো সুখ দুঃখ বাহিরের ঘটনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না— বাহিরের ঘটনা অতি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র— ঈশ্বর যাহার অন্তঃকরণে সুখী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে জগৎ হইতে সুখ লাভ করিতে পারে। আমি অনেক লোককে জানি যাহারা সুখকর সমস্ত উপকরণদ্বারা বেষ্টিত কিন্তু চিরজীবন সুখ অনুভব করিল না। দূর হইতে উপদেশ দেওয়া সহজ— কিন্তু আমি জানি অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে জীবন যখন সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তখন জগৎ হইতে রস আকর্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু জীবন যখন পাইয়াছ, বাঁচিতেই যখন হইবে তখন নিজের সঙ্কীর্ণ অবস্থার উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের মধ্যে মাথা তুলিতেই হইবে— আলো পাইতেই হইবে, মুক্তবায়ুর মধ্যে আত্মাকে বিস্তৃত করিতেই হইবে। বাহিরের প্রতিকূলতা যতই কঠিন অন্তরের শক্তিকে ততই প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত করিতে হইবে। তোমার চারিদিকে যেটুকু লেশমাত্র সুখ যেটুকু কণামাত্র আনন্দ আছে তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখ— বল "আনন্দং পরমানন্দম্।" পরাভূত হইয়ো না— দুঃখকে সর্ব্বদা দুঃখ

বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিলেই তাহার জাল ছিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে— সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারম্বার মনকে বুঝাইয়ো। আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া আছি ইহার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ব্যয় হইতেছে, সেই শক্তির কণামাত্র হ্রাস হইলেই আমি তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম; এই যে এতবড় শক্তির দ্বারা বিধৃত আমি, এই যে এত বড় প্রেমের দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি— আমার খেদ কি লইয়া? কে আমাকে কি বলিল— কে আমাকে কি বুঝিল ইহাই কি জগতে সকলের চেয়ে বড়? আমার যে এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিশক্তি একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার —আমার যে একবার মাত্র নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা— আমার মত এই পরমাশ্চর্য্য সত্তাকে কোনো দুঃখই মলিন করিতে এবং কোনো পীড়নই ক্ষুদ্র করিতে পারে না। মন যখনই অপ্রসন্ন হইতে চাহিবে তখনি তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তিতে উর্দ্ধের দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্.
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা—

সুখই হউক্ দুঃখই হউক্, প্রিয়ই হউক্ অপ্রিয়ই হউক্ যাহাই প্রাপ্ত হইবে তাহাকেই অপরাজিত চিত্তে উপাসনা করিবে। ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩১৩

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ভবানীপুর
১৭ এপ্রিল ১৯০৭*

ওঁ

মাতঃ

ঈশ্বর যদি আমার মধ্যে আশীর্ব্বাদ করিবার যথার্থ শক্তি দিতেন তবে আমার আন্তরিক মঙ্গল কামনা তোমার জীবনকে এই মুহূর্ত্তেই নবপ্রভাতের আলোকের ন্যায় স্পর্শ করিত। যে জীবন শান্তির জন্য প্রার্থী, পরিপূর্ণতার জন্য ব্যাকুল, উপর হইতে তাহার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে পারি ঈশ্বর যদি কোনোদিন আমাকে এমন অধিকার দান করেন তবে আমি ধন্য হইব। আমিও যাত্রী— তীর্থ কতদূরে তাহা তীর্থের অধীশ্বরই জানেন, দুর্গম পথের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করিয়া আমাকে চলিতে হইবে,— আমারই কি আনন্দের সম্বল জমিয়াছে? নববর্ষের দিনে আমি ঈশ্বরের কাছে এই কথাই জানাইয়াছি যে সুখে দুঃখে আমার জীবনকে লইয়া প্রতিদিনই তুমি ত মঙ্গলসঙ্গীত রচনা করিয়া চলিয়াছই— আমার প্রার্থনা কেবল এই যে তোমার সেই মঙ্গলে আমারও অন্তঃকরণ যেন যোগ দিয়া চলে— আমি যেন তোমার হাতের সমস্ত দানকেই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। ঈশ্বর না জানি আরো কি দাবী করিবেন সে কথা মনে করিতে ভয়ও হয়, সেটুকু দুর্ব্বলতা ছাড়িতে পারি নাই— কিন্তু তবু আমার মন যেন একান্তভাবে বলিতে পারে, আমার কাছে তোমার যত দাবী

তুমি সমস্তই মিটাইয়া লও— তুমি কিছুই ছাড়িয়ো না— আমি সহিতে পারিব— আমি আনন্দিত হইব। ঈশ্বর তাঁহার পরম দানগুলিকে দুঃখের ভিতর দিয়াই সম্পূর্ণ করেন— তিনি বেদনার মধ্য দিয়া জননীকে সন্তান দেন— সেই বেদনার মূল্যেই সন্তান জননীর এত অত্যন্তই আপন। সেই কথা মনে রাখিয়া, যখন ঈশ্বরের কাছে সত্য চাই, আলোক চাই, অমৃত চাই তখন অনেক বেদনা অনেক ত্যাগের জন্য নিজেকে সবলে প্রস্তুত করিতে হইবে। মা, ঈশ্বর যদি তোমাকে বেদনা দেন তবে নিজের দোষে সেই বেদনাকে ব্যর্থ করিয়ো না— তাহাকে সফল করিবার জন্য সমস্ত হৃদয়মনকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া জাগ্রত হও। সংসারের সমস্ত আচ্ছাদন আবরণের উর্দ্ধে জাগ্রত হও। মনে মনে বল, আমি দুর্ব্বল নই— বল আমি পরাস্ত হইব না— বল আমার ক্ষণিক জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবনের সম্বল রহিয়াছে, এ জীবনের সমস্ত জালই একে একে কাটিয়া যাইবেই কিন্তু সে সম্বল কোনোকালেই ফুরাইবে না, তাহা সূর্য্যের আলোর মত অক্ষয়। ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে মহিমা স্থাপন করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া দেখ— নিজেকে দীন বলিয়া দুর্ব্বল বলিয়া ছোট বলিয়া অপমান করিয়োনা, কারণ, তাহা কখনই সত্য নহে। তোমার অন্তরাত্মার মধ্যেই বিজয়লক্ষ্মী বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিলেই তোমার আর কোনো ভয় থাকিবে না— তুমি যে কি মহৎ তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবে— তুমি ঈশ্বরের আনন্দের ধন— এই বার্ত্তা নিজেকে শুনাইয়া দাও! যাহাই ঘটুক, ঘটনা সমস্তই তোমার

আত্মার কাছে অতি তুচ্ছ— তোমার চেয়ে বড় কেহই নাই সেই জন্যই সকলের মধ্যেই তুমিও আছ। তোমার কিছুতে ভয় নাই, কিছুতেই ক্ষতি নাই, ঈশ্বর তোমার।

৫

৫ ডিসেম্বর ১৯০৭

ওঁ　　　　　　　　　　কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, ঈশ্বর আমাকে বেদনা দিয়াছেন কিন্তু তিনি ত আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই— তিনি হরণও করিয়াছেন পূরণও করিবেন। আমি শোক করিব না— আমার জন্যও শোক করিয়ো না।

আমার শরীর ভালই আছে। আমার কন্যাদুইটিকে লইয়া কিছু দিনের জন্য শিলাইদহে পদ্মার বক্ষে বাস করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

ঈশ্বর তোমাকে মঙ্গলে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[জুন ?, ১৯০৮]

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তুমি যে মেয়েটির কথা লিখিয়াছ তাহাকে আমি আশ্রয় দিতে পারি। যদি তুমি তাহাকে স্থিরবুদ্ধি ও সৎস্বভাব বলিয়া জান তবে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইতে পার। এখানে আমার মেয়েরা আছে, তাহার কোনো কষ্ট হইবে না। এমন কি, আমার বড় মেয়ের কাছে তাহার ইংরেজি পড়ার অনেকটা সাহায্য হইতে পারে। ইন্দু যদি ছোট ছেলে পড়াইবার ভার লইতে সক্ষম হয় তবে তাহাকে রীতিমত কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারিব— তদ্দ্বারা তাহার ক্রমশঃ কিছু সঞ্চয়ের সুযোগ হইতেও পারে। এ সম্বন্ধে, তাহার পরিচয় না পাইয়া কোনো কথা বলিতে পারি না।

এই বৎসরের আরম্ভ হইতেই বাড়িতে ব্যামো লইয়া আমাকে কেবলি উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে। আমার বর্ত্তমান দুই কন্যার স্বামীই বিলাতে— মেয়েরা আমার কাছে আছে। আজ পর্য্যন্ত তাহাদের শরীর সুস্থ হইয়া উঠে নাই— এই কারণে তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আমাকে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ইহার উপরে অন্যান্য নানা কাজের ভার আমার উপর থাকাতে আমাকে কিছু ক্লিষ্ট করিয়াছে।

রাজা প্রজা নামক আমার বই নূতন বাহির হইয়াছে হাতে

আসিয়া পৌঁছিলেই তোমাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব। গদ্য-গ্রন্থাবলীর অন্য বইগুলিও তুমি শীঘ্র পাইবে।

ঈশ্বর তোমার চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করুন এই আমার আশীর্ব্বাদ।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২২ জুলাই ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি ও সেই সঙ্গে ইন্দু তোমাকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছে তাহা পাইলাম।

এ পত্র হইতে ঠিক তাহার পরিচয় হয় না। তাহার বয়স অল্প, এবং তাহার অবস্থাও সঙ্কীর্ণ ; এমন স্থলে নিজের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে তাহার কল্পনা যে সর্ব্বদাই উত্তেজিত হইয়া থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। বয়স হইলে আশা করি এটুকু বুঝিতে পারিবে যে, নিজেকে দুঃখী বলিয়া চিন্তা করিতে থাকিলে দুঃখের কালিমা বাড়িয়াই উঠে। আমরা চিন্তা দ্বারা নিজেকে অনেক পরিমাণে সৃষ্টি করিয়া থাকি— আমাদের সেই স্বরচিত সৃষ্টি সকল সময়ে মঙ্গলকর হয় না। নিজের সুখ দুঃখ ও অবস্থার প্রতি সর্ব্বদাই করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক। উহাতে নিজেকে প্রশ্রয় দিয়া কেবলি দুর্ব্বল করিয়া তোলাই হয়। নিজেকে ভুলিবার সাধনাই জীবনের প্রধান সাধনা— এবং আমার যেটুকু নাই তাহার চেয়ে আমার যাহা আছে তাহা যে অনেক বেশি এই কথা স্বীকার করিতে পারাই সত্যকে স্বীকার করা।

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এই দুর্ব্বলতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেই আছে অতএব বালিকার সম্বন্ধে এই ত্রুটি

লইয়া অধিক কিছু বলিলে কঠোরতা করা হয়। কিন্তু আমার নিজের মেয়েকেও আমি এই আত্মধ্যান এবং আত্মকরুণার অনিষ্টকরতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে সঙ্কোচ করিনা অতএব আমার বাক্যগুলিকে অনাবশ্যক নির্ম্মম বলিয়া মনে করিও না।

আমি সম্ভবত ভাদ্রমাসের আরম্ভে অথবা মাঝামাঝি বোলপুরে ফিরিব। সেই সময়ে ইন্দুকে বোলপুরের কাজে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিব। সে যদি উপযুক্ত কাজের মধ্যে ব্যাপৃত হইতে পারে তাহা হইলে নিঃসন্দেহই নিজেকে দীনাত্মা বলিয়া মনে করিবে না— প্রত্যেক মানুষকেই ঈশ্বর যে মাহাত্ম্য দান করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিয়া সে নিজের পীড়ন হইতে নিজে মুক্ত হইতে পারিবে। বোলপুরের কাজে ইন্দু যে বিশেষ বল এবং শান্তি পাইবে আমার তাহাতে সন্দেহ নাই।

তোমাকে আমার গ্রন্থাবলীর যে কয়খানি বই বাহির হইয়াছে পাঠাইবার জন্য প্রকাশককে লিখিয়া দিলাম। তোমার ভবানীপুরের ঠিকানাতেই যাইবে। একখানি "রাজাপ্রজা" আজ এখান হইতে পাঠাইলাম।

কাব্যগ্রন্থাবলী কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া পাঠাইব।

ঈশ্বর তোমার সমস্ত অন্তঃকরণকে অধিকার করুন। ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ মেয়েরা এখন ভালই আছে। তাহারা বোলপুর বিদ্যালয়ে

ছোট ছেলেদের তত্ত্বাবধান ও অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছে। কয়েকদিন হইল আমার ছোট মেয়ের শ্বশুর মারা যাওয়াতে উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। রথীর খবর নিয়মিত পাইয়া থাকি। তাহার পড়াশোনায় বেশ উন্নতি হইতেছে।

৮

২৪ অক্টোবর ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তোমার পত্র কয়দিন হইল পাইয়াছি। এবার শিলাইদহে আসিয়া অবধি শরীর অসুস্থ যাইতেছে।

বোলপুরে আমি যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি তাহার শিশুবিভাগে আমি স্ত্রীলোক কর্ত্রী রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। একটি বিধবা ব্রাহ্ম বালিকা আমার কাছে থাকিয়া এই কার্য্যে যোগ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন— তিনি আজই আমার এখানে আসিতেছেন। তিনি আমার কন্যার ন্যায় কন্যাদের সঙ্গেই থাকিবেন।

ইন্দু যদি এইরূপ কার্য্যে যোগ দিবার জন্য যথার্থ ই মনকে প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনিও ইঁহার এক সঙ্গে থাকিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু এ সকল কাজে তাঁর মন বসিবে কি না— তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইবেন কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। বিধবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, কুমারীর পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। সমস্তই ইন্দুর প্রকৃতি ও মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমার ঘরে গৃহিণী নাই, আমার মেয়েরা অল্পবয়স্কা— সুতরাং তুমি যদি মনে কর ইন্দু নিজের দায়িত্ব নিজে বহন করিবার উপযুক্ত, এবং বোলপুরের শিশু পাঠন

ও পালন কার্য্যে অনিচ্ছুক নহেন তাহা হইলে তাঁহাকে এই কাজে নিযুক্ত করিলে তিনি আত্মীয়ের অভাব ও কর্ম্মের অভাব অনুভব করিবেন না— তাঁহার কর্ম্মশিক্ষা ও মনের উন্নতিও হইতে পারিবে। আমরা অগ্রহায়ণের আরম্ভে বিদ্যালয়ে যাইব— যদি কোনো ছুটি বা অন্য উপলক্ষ্যে ইন্দু বোলপুরে গিয়া সেখানকার কাজকর্ম্ম দেখিয়া মন স্থির করিতে পারেন তাহা হইলে সেরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না— তাঁহারা আমাকে পূরা ব্রাহ্ম বলিয়াই গণ্য করেননা, অতএব ইন্দুর হিতৈষীরা যে এই প্রস্তাবে উৎসাহ বোধ করিবেন এরূপ আশা করি না। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

২৮ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন পরে তোমার সংবাদ পাইয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

আমার এখানে একটি ছোটখাট বালিকা বিদ্যালয়ও জমিয়া উঠিতেছে। এখন ৬টি মেয়ে পড়ে— ছুটির পরে আষাঢ় মাসে আরো কয়টি আসিবে কথা আছে। মোহিত বাবুর স্ত্রী এবং আর দুই একটি বয়স্কা মহিলা এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। ইঁহাদের মধ্যে ইন্দুর ঠিক স্থান হইতে পারিত কি না সন্দেহ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চিত্ত আমার প্রতি অনুকূল নহে। এইজন্য তুমি যখন ইন্দুকে এখানে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলে তখনি ইহার সম্ভবপরতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ ছিল। তুমি এ বিষয়ে আর কোনোরূপ চেষ্টা করিয়ো না। কারণ, দায়িত্বভার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত না হইলে তাহা বহন করা কঠিন হয়।

আমার শরীর বিশেষ সুস্থ নহে। বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে। স্থির ছিল আমার কন্যাকে লইয়া পশ্চিমে যাইব। ইতিমধ্যে সে জ্বরে পড়িয়াছে— সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে আমি যাত্রা করিতে পারিবনা।

তুমি আমার গ্রন্থাবলীর কোন্ খণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছ জানিতে পারিলে বাকি গুলি পাঠাইতে বলিয়া দিব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ১৫ই বৈশাখ ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১২ জুলাই ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমার শরীর বিশেষ ভাল ছিলনা। বিদ্যালয় লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বোলপুরে বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছি। গ্রীষ্মাবকাশের পর তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে আজ শিলাইদহে আসিয়া পদ্মার উপরে আশ্রয় লইয়াছি।

তুমি নানাবিধ সাংসারিক দুশ্চিন্তাজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। সমস্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে তুমি চিত্তকে তাঁহার অসীম মাধুর্য্যে নিবিষ্ট করিতে পারিবে আমি এই আশা করিতেছি। সংসারের অভিঘাতে যিনি তোমাকে দোলায়িত করিতেছেন তিনিই তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমাকে নিবিড় এবং নিশ্চল আশ্রয় দান করুন এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২৮শে আষাঢ় ১৩১৬

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২৬ জুলাই ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

উপনিষদে আছে— ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ অর্থাৎ— জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করিয়া জানিবে। আমরা তাহাই করি না বলিয়া সংসার একেবারেই আমাদের মর্ম্মস্থানের উপরে চাপিয়া পড়িয়া আমাদিগকে বেদনা দেয়।

আমাদের অন্তর বাহির সমস্তই যখন তাঁহার দ্বারা আবৃত বলিয়া জানি তখন মাঝখানে তিনি থাকেন— বোঝা একেবারে আমাদের মাথায় চাপিয়া পড়েনা আঘাত একেবারে আমাদের বুকে আসিয়া বাজে না। সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও তাঁহাকে চারিদিকে আবির্ভূত বলিয়া অনুভব করিবার সাধনা করিলে তাঁহার সম্মুখে আর সমস্তই মাথা নত করে— যাহা ছোট তাহা ছোট হইয়াই থাকে, যাহা যথার্থ অন্তরের সামগ্রী নহে তাহা বাহিরেই পড়িয়া থাকে। জগতে যিনি সকলের বড় তিনিই আমাদের জীবনে সকলের চেয়ে বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকুন— তাঁহাকেই সংসারের চেয়ে ছোট করিয়া ফেলি বলিয়া এত দুঃখ পাই।

"শান্তিনিকেতন" নামক আমার ধর্ম্মোপদেশের বইগুলি

তোমাকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব। এখানে আমার কাছে নাই— দুই চারি দিনের মধ্যে পাইব তখন তোমাকে পাঠাইতে পারিব।

এখানে আসিয়া আমার শরীর পূর্ব্বের চেয়ে একটু ভাল আছে। ইতি ১০ই শ্রাবণ ১৩১৬

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

২২ নভেম্বর ১৯০৯

ওঁ

পতিসর
আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমার শরীরের সম্বন্ধে মনে কোনো উৎকণ্ঠা রাখিও না —মোটের উপর আমি ভালই আছি।

আজ কিছুদিন নানা নদীর মধ্য দিয়া বোটে করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। অনেকদিন পরে কাল এখানকার কাছারিতে আসিয়া পৌঁছিয়া তোমার পত্র পাইলাম।

শান্তিনিকেতন পড়িয়া তুমি কিছু উপকার বোধ করিতেছ ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম। জীবনে এমন কোনো সিদ্ধিলাভ করি নাই যাহাতে পরম সত্যকে তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করিয়া দিতে পারি— তবে যদি ঈশ্বর আমাকে ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকেন, এবং সেই উপায়ে তিনি আমাকে দিয়া যদি তিনি তাঁহার কোনো কাজ উদ্ধার করিয়া লন তবে আমার এই পৃথিবীতে জন্মলাভ সার্থক হইবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২৬ নভেম্বর ১৯০৯

ওঁ আত্রাই নদী

কল্যাণীয়াসু—

মাতঃ আমার চিঠি সম্ভবত তুমি পূর্ব্বেই পাইয়াছ। নানা কারণে তোমার পূর্ব্বপত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল সেজন্য উদ্বিগ্ন হইয়ো না। আমি এখনো বোটে করিয়া নদীপথে ভ্রমণ করিতেছি। ১৫ই অগ্রহায়ণের পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিবার কথা।

ঈশ্বর তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ হইয়া তোমার জীবনকে পরিপূর্ণ করুন। ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

২৪ এপ্রিল ১৯১০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ মাঝে আমার শরীর ভাল ছিলনা— এখন মোটের উপর ভালই চলিতেছে। এখন গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইবে এইবার এখানকার বিদ্যালয়ের কাজ হইতে মাস দেড়েকের মত ছুটি পাইব —মনে করিতেছি কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইব।

বর্ষারম্ভের দিনে বিদ্যালয়ে আমাদের উপাসনা ছিল— তাহার পর হইতে নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল সেই কারণেই তোমার শেষ চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই।

কলিকাতায় যখন যাইব তোমাকে বই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

আমি মনের আনন্দে আছি জানিবে— আমার জন্য কোনো উদ্বেগ রাখিবেনা। ইতি ১১ই বৈশাখ ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

৪ জুলাই ১৯১০

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর দিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করচি।

একটি কথা তুমি নিশ্চয় জেনো ব্রাহ্ম পরিবারে যদিও আমার জন্ম তবু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে আমার মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয় নি। তার একটা কারণ, অতি শিশুকালেই আমার মধ্যে কবি প্রকৃতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল— আমি আমার কল্পনা নিয়েই সর্ব্বদা ভোর হয়ে ছিলুম— ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি।

তার পরে আমার বয়স যখন ১৩।১৪ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি —তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।

এই বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেকবয়স পর্য্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এমন কি, আমাদের সমাজের ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে আমি বিশেষ যুক্ত ছিলুম না— সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলুম। তার পরে আমার স্বদেশ অভিমানও বাল্যকাল

থেকে অত্যন্ত প্রবল। সেজন্যও, যা কিছু আমাদের দেশের তাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলুম— বরঞ্চ প্রতিকূল কিছু শুনলে জোর করে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদ করা আমার স্বভাব ছিল।

এই সকল নানাকারণে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেন নি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেন নি।

এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক। কারণ, তোমার এটুকু জানা আবশ্যক কোনো সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশত অন্ধভাবে আমি কোনো কথা বলচিনে। যখন থেকে আমি আমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে আমার অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা তা বর্জ্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি।

অর্থাৎ যখন মানুষের সত্যকে না হলে নিতান্ত চলেনা তখন সে দেশের খাতিরে বা সংস্কারের টানে কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে আর ভুলিয়ে বেড়াতে কোনোমতে পারে না— এমন কি, সে রকম ফাঁকিতে তার অত্যন্ত একটা ধিক্কার বোধ হয়। যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারি নে।

এই রকম অবস্থায় আমি আমাদের দেশপ্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি তা

নিশ্চয়ই আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনের লেখাগুলির ভিতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

সে সমস্ত এই চিঠির মধ্যে ঠিকমত বিবৃত করা অসম্ভব। কারণ, তার অনেকগুলি দিক্ আছে। যাঁরা বলেন প্রতিমাপূজার আবশ্যক আছে তাঁরা নানা ভিন্ন দিক্ থেকে বলেন— কেউ বলেন আমাদের মন সীমাবদ্ধ এই জন্যে মানুষ মাত্রেরই পক্ষে প্রতিমাপূজা ছাড়া গতি নেই— কেউ বলেন যাঁরা দুর্ব্বলচিত্ত, কনিষ্ঠ অধিকারী তাঁদেরই এই সোপান দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই অতএব তাঁদের খাতিরে এ সমস্তকে সহ্য করে চল্‌তে হয়— আবার আজকাল অনেকে বলেন, এই প্রতিমাপূজাই সকল উপাসনার শ্রেষ্ঠ— এইটেই হচ্চে আধ্যাত্মিকতার চরম।

এঁরা যে যে হেতু দেখান্ তা নিয়ে যদি তর্ক করতে যাই তবে তাতে কেবল তার্কিকতাই করা হবে। ধর্ম্মবিষয়ে তার্কিকতায় কোনো ফল হয় না বরঞ্চ অনিষ্ট হয়— অতএব সে থাক্।

আমি এইটুকু বল্‌তে চাই যে, মানুষ যখন ভগবানকে চায় তখন ঠিক কি চায় তা যদি পরিষ্কার করে বোঝে তাহলে অনেক জঞ্জাল কেটে যায়।

আমরা অনেক সময়ে যখন ঈশ্বরকে চাই বলি এবং বিশ্বাস করি তখন বস্তুত অন্যান্য বিষয়েরই মত আর একটা বিষয়কে চাই। যাদের চাওয়ার ঝোঁক ঘোচে নি তারা তাদের প্রার্থনার ফর্দ্দের মধ্যে ঈশ্বরের নামটাও রাখে। হয় ত খুব বড় করে রাখে —কিন্তু ঐ তালিকাটার মধ্যেই তার স্থান।

তারা কেউ বা তাঁকে "শান্তি" বলে চায়, কেউবা তাঁকে "সান্ত্বনা" বলে চায়, কেউবা তাঁকে "শক্তি" বলে চায়, কেউবা তাঁকে অন্যের অনুকরণে চায় কেউবা এই বলে চায় যে যখন ঋষিতপস্বীরা তাঁকে চেয়েছে তখন নিশ্চয় তাঁকে পাওয়াটা খুব গৌরবের।

আমরা ব্যামোর সময় ওষুধ চাই, অভাবের সময় টাকা চাই ঈশ্বরকে তেমন করেও চাই— সেটা যে একেবারে অন্যায় অসঙ্গত আমি তা বল্‌তে পারি নে— কিন্তু সেইরকম চাওয়া নিতান্তই গৌণ চাওয়া— মুখ্য চাওয়া নয়।

যে চাওয়া আধ্যাত্মিক চাওয়া সে তাঁকে পেতে চাওয়া নয়— তাঁর সঙ্গে মিল্‌তে চাওয়া।

পৃথিবীতে কিছুর সঙ্গে আমরা মিল্‌তে পারিনে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বেদনা। আংশিক ভাবে একটুমাত্র মিলি বাকি সব জায়গায় বাধে। তার প্রধান কারণই হচ্চে সকলেই নিজের সীমা দিয়ে আমাদের বাধা দেয়— তার সঙ্গে আপনাকে সবদিক দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। স্বামীর স্বামিত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পিতার পিতৃত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব সর্ব্বত্রই অল্প কিছু দূর গিয়ে ঠেকে যায়— তার মধ্যে আত্মা আপনাকে পরিপূর্ণরূপে খুঁজে পায় না।

যিনি জগৎ জুড়ে আমার পিতামাতা স্বামীবন্ধু সব হয়ে আছেন তাঁর মধ্যেই দেহে মনে আত্মায় কোথাও আমাদের আর ঠেকেনা।

যাঁর মধ্যে আমি সমস্তকেই চাই তাঁকে যতই বিশেষের মধ্যে গণ্ডী দিয়ে বাঁধব ততই তিনি আমার আত্মাকে কোথাও না কোথাও এমন বাধা দেবেন যে অবশেষে তিনিও দশের মধ্যে একজন হয়ে উঠ্‌বেন।

একটি কথা ভেবে দেখো আমাদের দেশে দেবতা কেবলমাত্র মূর্ত্তি নন— অর্থাৎ কেবল যে আমরা আমাদের ধ্যানকে বাইরে আকৃতি দিয়েছি তা নয়— তাঁরা জন্মমৃত্যু বিবাহ সন্তান-সন্ততি ক্রোধ দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ— সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে গেলে নিজের বুদ্ধিকে একেবারেই অন্ধ করতে হয় এবং সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভগবানের সার্ব্বভৌমিকতা একেবারে চলে যায়— তিনি নিতান্ত আমাদের দেশের ও গ্রামের মানুষটি হয়ে পড়েন— সেইরকম বেশভূষা স্নানাহার আচারব্যবহার।

অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র যাঁকে অবলম্বন করে, আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতিগত সমস্ত সঙ্কোচ অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবে— তাঁকে অবলম্বন করে আমাদের সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করচি— এবং সকল প্রকার

বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে। আমরা ধর্ম্মের নামেই অপরিচিত মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে মরে যেতে দিই পাছে জাত যায় (এ আমার জানা)— অপরিচিত মৃতদেহকে সৎকার করিনে— মানুষের স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করি। কেন এমন হয়েছে? আমরা ধর্ম্মকে আমাদের নিজের চেয়ে নেবে যেতে দিয়েছি। আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারি নে, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্যে নয়। অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত মুগ্ধ কল্পনাই ভাল। এমনি ধর্ম্মকে সহজ করতে গিয়ে যে তাকে কেবলি নীচু করেছে তার আর উদ্ধারের উপায় নেই। ধর্ম্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম্ম তাকে উপরে টেনেছে— হিন্দু তা করে না। হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে সর্ব্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্ম্মই দরকার— এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক্ সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চল্‌বে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্ম্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে— তাকে কোনো কারণেই কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখ্‌তে হবে না। আমি নিজের জন্যে এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। মনে কোরো না সেই মুক্তি জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি— সে প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তুমি মনে কোরো না প্রতিমা পূজা ছাড়া প্রেম হতেই

পারে না— যদি সূফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখ্‌বে তাঁরা কি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিষ নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জ্জনা নেই। এ সমস্ত কথা এমন করে চিঠির মধ্যে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা অসম্ভব। তুমি অনুরোধ করেছ বলে আমি যেমনতেমন করে এই প্রসঙ্গের অতি অল্পমাত্রই আভাস দিলুম। এর থেকে কোনো উপকার পাবে বলে আশা করি নে। ইতি ২০শে আষাঢ় [১৩১৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

১৩ জুলাই ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি তোমাকে গত পত্রে কিছু না কিছু বেদনা দিয়েছি। কেননা অনেক কথা আছে যা সংক্ষেপে একটা চিঠির মধ্যে লিখ্‌তে গেলে কঠোর হয়েই পড়ে। গভীরতর সত্যকে কেবলমাত্র ভাষার ভিতর দিয়ে ঠিক ব্যক্ত করা চলেনা। তুমি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও নিশ্চয়ই আমাকে অনেকটা পরিমাণে জান— তার থেকে এটুকু তুমি বুঝ্‌তে পারবে আমাদের সমাজে যদি চ এমন অনেক জিনিষ আছে যাকে আমার বুদ্ধি সমর্থন করতে পারেনা কিন্তু তার প্রতি আমার হৃদয়ের বেদনা যথেষ্ট আছে। তুমি যেখানে বেদনা পেয়েছ আমি যে সেখানে কোনো বেদনা অনুভব করিনে তা মনেও কোরোনা। আমাদের দেশে প্রচলিত পূজার্চ্চনাবিধির মধ্যে এমন সুগভীর তত্ত্ব আছে যা বহুমূল্য। আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ সমস্তই আমি মানি কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়। আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে এত মূঢ়তা! নিজের শক্তিকে এমন চার-

দিক থেকে পঙ্গু করা, নিজের বুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে অন্ধ করা! যে ধর্ম্ম আমাদের উপরের জিনিষ, উপনিষৎ যার পথকে “ক্ষুরধারনিশিত” দুর্গম বলেছেন, যাকে লাভ করবার জন্যে আমাদের **সমস্ত** শক্তিকে সচেষ্ট রাখা আবশ্যক, তাকে আমরা যথেচ্ছামত **সস্তা** করে নিয়েছি— এবং ক্রমাগত বলে এসেছি আমরা পারি নে, এ সব ধারণা আমাদের সাধ্যের অতীত, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমাদের পক্ষে সত্যের বিকারই একমাত্র অবলম্বনীয়। নিজেকে দুর্ব্বল বলে স্বীকার করে নিজের ধর্ম্মকে যদি খাটো করি তবে কে আমাদের বল দেবে? ধর্ম্মকেই যদি নীচে রাখি তবে আমাদের উপরে তুল্‌বে কিসে? কিছুতেই তুল্‌চেনা, কিছুতেই জাগ্‌চিনে, আমরা প্রতিদিন মরচি তবু প্রতিকারের ইচ্ছামাত্রও নেই। এখন আমাদের এমন সময় এসেছে যখন এই সমস্ত মোহজঞ্জালকে চিরাভ্যস্ত মমত্ববুদ্ধিবশত স্বদেশের মর্ম্মস্থানে গুরুভার পর্ব্বতের মত স্তূপাকার জমিয়ে রাখা আর চল্‌বেনা।

আমি জানি সত্যের পথ সহজ নয়— পিছনে টেনে রাখবার যে কত বন্ধন আছে তার ঠিকানা নেই— যদি মনে করি একে একে একটু একটু করে সে সমস্ত শিথিল হতে থাক্‌বে তাহলে নৈরাশ্য আসে কিন্তু ঈশ্বর যখন রুদ্রবেশে দয়া করেন তখন তিনি এক আঘাতেই অকস্মাৎ অনেক বন্ধন ছেদন করে দেন— তখন তিনি অসহ্য বেদনা দেন কিন্তু সেই বেদনাকে সার্থক করেন। আমাদের দেশ তাঁর সেই বিশ্ব-উদ্বোধন প্রচণ্ড আঘাতের সৌভাগ্য

থেকে বঞ্চিত হবে না তা আমি বেশ অনুভব করচি এবং সেই দুঃখময় শুভদিনের জন্য নম্রশিরে প্রতীক্ষা করে আছি। ইতি ২৯শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

২৫ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ এতদিন শিলাইদহে ছিলাম। সেখানে আমার শরীর ভালই ছিল। কাল বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। বিদ্যালয় খুলিয়াছে এখানকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে— এখন কিছুদিন আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

ঈশ্বর সকল অবস্থায় তোমার মনকে তাঁহার আপন করিয়া লউন, সুখে দুঃখে তুমি তাঁহারি হও এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

বাগবাজার
২৭ জানুয়ারি ১৯১১*

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনি বোলপুরে যাইতেছি। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

তোমার চিত্ত শান্তি লাভ করুক্, ঈশ্বরের মধ্যে আশ্রয় লাভ করুক এই আমি প্রার্থনা করি। সম্প্রদায় হৃদয়কে আশ্রয় দিতে পারেনা। যিনি পারেন তাঁহার কাছেই যাইতে হইবে।

যদি প্রয়োজন বোধ কর তবে অনাথা মেয়েটিকে আমাদের কাছে পাঠাইলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৮ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মনের মধ্যে অবসাদ আসিতে দিয়োনা। "নাত্মানমবসাদয়েৎ" আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবেনা শাস্ত্রের এই অনুশাসন আছে। আপনাকে যে আমরা দুর্ব্বল বলিয়া কল্পনা করি সে আমাদের একটা মোহ— নিজেকে সংসারের সমস্ত বাধা হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বরূপটি কি দেখিতে পার না? তোমার চারিদিকে যাহাকিছু জমিয়াছে তাহা ত চিরদিনের নহে। নিজেকে তাহারই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করিয়া দেখিতেছ কেন? নিজেকে অনন্ত সত্যস্বরূপের মধ্যে দেখ— সংসারের মধ্যে দেখিয়োনা।

তোমাকে কিছুকাল হইল "রাজা" নামক একখানি আমার ছোট নাটক নিজের হাতে ঠিকানা লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিয়াছি —সেখানিও কি পাও নাই? যদি না পাইয়া থাক তবে কি উপায়ে তোমাকে পোষ্ট করিলে তুমি পাইবে আমাকে লিখিয়া জানাইবে। যদি দরোয়ানের হাত দিয়া পাঠাইলে ক্ষতি না থাকে লিখিয়ো অথবা যদি রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠাইলে তোমারই হাতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা থাকে তাহাও আমাকে জানাইয়ো।

ঈশ্বর তোমার চিত্তকে স্থির করুন, দৃঢ় করুন, তাহাকে ভারমুক্ত করিয়া দিন। ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১১ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়াসু

হোক্ না সংসার প্রতিকূল, সমস্ত সংসারের চেয়ে তোমার আত্মা অনেক বেশি বড়— আজ যাহার কাছে হার মানিয়া কান্নাকাটি করিতেছ হঠাৎ দেখিবে তাহা স্বপ্নের মত মিথ্যা। সে ধোঁয়ার মত তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে— এই ধোঁয়া বাহির হইতে দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু তোমার মধ্যে যে মৃত্যুহীন শিখাটি রহিয়াছে তাহা চোখে দেখিতে ছোট হইলেও পর্ব্বতপ্রমাণ ধোঁয়ার চেয়ে বড়। আমি পুনশ্চ বলিতেছি তোমার দুঃখ অবসাদ যতই প্রবল হৌক্ না কেন, তোমাকে তাহা যতই পীড়া দিক্ না কেন তবু আমি তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াই মানিব। তাহার দ্বারা তুমি নিজেকে ছোট করিয়া দেখিয়োনা— অন্তরের মধ্যে নিজের মহত্ত্বকে ধ্রুব রূপে অনুভব কর এবং ঈশ্বরের সঙ্গেই তোমার নিত্য সম্বন্ধকে অন্য সকলের চেয়ে সত্য করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা কর। হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তুমি জয়ী হইবেই, তীরে উত্তীর্ণ হইবেই, রক্ষা পাইবেই ইহা ধ্রুবনিশ্চয় করিয়া জানিয়ো। তোমার জীবনের ইতিহাস একলা তোমার ইতিহাস নহে— ইহার মধ্যে সমস্ত জগতের মঙ্গলের ইতিহাস আছে— অতএব বিশ্বেশ্বর তোমাকে নষ্ট হইতে দিতে পারেন না— তোমার অদ্যকার ব্যর্থতার বেদনা সমস্ত বিশ্বের তপস্যার অগ্নিকে ইন্ধন জোগাইতেছে। তুমি

কেবলমাত্র একটি অন্তঃপুরের গৃহকর্ম্মরতা অখ্যাত রমণী নহ—তুমি বিশ্বের মানুষ, তুমি ঈশ্বরের আপন।

তোমাকে বই পাঠাইতে লিখিয়া দিলাম। ইতি ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

২৩ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

আমার প্রকাশকদের কাছ হইতে সেদিন এক পত্র পাইলাম যে তোমাকে তাঁহারা রেজেষ্ট্রি ডাকে বই পাঠাইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের চিঠি পাইবার দুইদিন আগে কয়েকখণ্ড শান্তিনিকেতন এখানে আমার ঠিকানায় অকারণে আসিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে তাঁহারা তোমাকে পাঠাইতে গিয়া ভুলিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজই সেগুলি তোমার নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

তোমার জীবনের মধ্যে কি কাজ চলিতেছে তাহা তুমি জান না— তিনিই জানেন। তুমি মনে করিতেছ তোমার নৈরাশ্য তোমার ব্যর্থতা তোমার দুর্ব্বলতাই বুঝি চিরসত্য— তাহা তোমার একটা দুঃস্বপ্নমাত্র— হঠাৎ যেদিন তিনি তোমাকে জাগাইয়া দিবেন তখন দেখিবে অবসাদের আর লেশমাত্র নাই। ইতিমধ্যে যথার্থ আপনার উপর আস্থা স্থাপন কর, অবস্থা যেরূপই হউক্, সংসার সংগ্রামে তুমি যতবারই পরাভূত হও তবু জানিয়ো তাহাই চরম নহে— তাহা ভেদ করিয়াও তুমি পরম চরিতার্থতা-লোকে প্রকাশিত হইবে— তোমার সকল বেদনার মধ্যে নিত্যই তুমি সেই দিকে চলিয়াছ। মাটির মধ্যে হইতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেও

আকাশের আলোকে বাহির হইবার মুখে সে কাজ করিতেছে তাহা সে জানেনা— সে আপন অন্ধকারকেই প্রবল এবং চিরন্তন বলিয়া ভুল করে। এই অকারণ দুঃখ হইতে তুমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া আনন্দিতচিত্তে সফলতার জন্য প্রতীক্ষা কর। ইতি
৮ই আষাঢ় ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১৭ অক্টোবর ১৯১১

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

দূর দেশে আমার যাত্রার মেয়াদ আপাতত কিছুকাল পিছাইয়া গেল। বোধ করি ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে যাওয়া ঘটিবেনা। সম্প্রতি আমার শরীর অসুস্থ আছে— সে জন্য বোটে করিয়া গঙ্গা উজাইয়া যত দূর ইচ্ছা চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। যদি তাও না ঘটে তবে কোনো এক জায়গায় পদ্মার নির্জ্জন চরে বোট বাঁধিয়া মাস খানেক কাটাইয়া আসিব মনে করিতেছি।

আমি অন্তরের সহিত তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইতি

৯ কার্ত্তিক ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

৩০ জানুয়ারি ১৯১২

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, কিছুকাল হইতে প্রত্যহই আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল— সেইজন্য আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আছি। কিন্তু শীঘ্র আর সময় পাইবনা বলিয়া তোমাকে আজই পত্র লিখিতে বসিলাম।

তুমি যে লেখাটি পাঠাইয়াছ তাহাতে তোমার হৃদয়ের একটি বেদনা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, সেইজন্য এই লেখা আমার বড় ভাল লাগিল। জাতীয় দুর্গতির দিনে আমাদের যিনি বিধাতা তিনি প্রলয়ের বিধাতা— তিনি আমাদের কখনই সুখে রাখিবেননা ও স্থির রাখিবেন না— আমাদিগকে তিনি নানা দিকেই আঘাত করিবেন— অনেক পরিচিতকে বিদায় করিতে হইবে এবং অনেক অপরিচিতকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। তাহার যে দুঃখ সে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে— কেননা সমস্ত জাতিকে জড়তার মধ্যে ডুবিয়া মরিতে দিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের উপরেই নবযুগের পরম দায়িত্ব রহিয়াছে— আসক্তির বন্ধন কাটিতেই হইবে, মুক্তির জন্য জাগিতেই হইবে— তোমরা দেশের মা, তোমরা দেশকে পিছনের দিকে টানিয়ো না— নূতনের মধ্যে অনেক আশঙ্কা অনেক বিপদ আছে তবু সেই যুগবিধাতার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তোমাদের সন্তানদিগকে যাত্রার পথেই অগ্রসর

করিয়া দিতে হইবে। আজ আমাদের সম্মুখের সমুদ্রে ঢেউ উঠিতেছে দেখিয়া মনকে অভিভূত হইতে দিয়ো না— মনে করিয়ো-না আমাদের তরীর কর্ণধার কেহই নাই— কর্ণধার তখনি থাকেন না, নৌকা যখন কেবলি পুরাতন ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে— তখন তাহার পাল গুটানো, তাহার হাল নিশ্চল, তাহার সমস্তই ব্যর্থ —তখনি তাহার মাঝিকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু চির-উন্নতিশীল মনুষ্যত্বের পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেই মাঝি তাঁহার হালের কাছে আসিয়া বসেন— তখন আর ঝড়তুফানকে ভয় কিসের? অবসাদকে পোষণ করিবনা, মাটির উপর মুখ দিয়া বুক দিয়া পড়িয়া থাকিবনা, অতি পুরাতন অতীতের মধ্যে সমস্ত আশা-ভরসাকে চিরদিনের মত বদ্ধ করিয়া রাখিবনা এই আমাদের পণ হউক! ইতি ১৬ই মাঘ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

এখনো বিলাতে যাত্রা করি নাই কিন্তু যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আগামী ৬ই চৈত্রে জাহাজ ছাড়িবে। এতদিন কলিকাতায় বিস্তর গোলেমালে আমার দিন কাটিয়াছে তাই ভারতবর্ষ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে কিছু দিন এখানকার নির্জ্জন নদীতীরে শান্তি উপভোগ করিয়া লইবার জন্য আসিয়াছি। বোধ হয় চৈত্রমাসের আরম্ভে কলিকাতায় যাইব। পৃথিবী প্রদক্ষিণ সারিয়া কবে দেশে ফিরিব তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। অনেকদিন যে সকল বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছি তাহার সমস্ত অভ্যাস ও সংস্কার হইতে নিজেকে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্যই আমার এই তীর্থযাত্রা। যখন পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় আসিবে তখন যেন সমস্ত আবরণ কাটিয়া যায় এই আমার ইচ্ছা।

ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিন, নিষ্ঠা দিন, শান্তি দিন এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ১০ই ফাল্গুন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫
৫ মার্চ ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

যে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি সেখানে একটা প্রবেশাধিকার পাওয়া দরকার। এখান হইতেই ত পাথেয় সঞ্চয় করিতে হইবে। পালা শেষ না করিতে পারিলে ত ছুটি নাই— মনুষ্যত্বের পালাটা সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহাকে সকল দিকেই পূর্ণ করিয়া যাইতে হইবে। অদ্যকার যুগে পৃথিবীর একটা মস্ত শক্তির ক্ষেত্র য়ুরোপ— সেখানে এমন একটি বিরাটের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা সমস্ত জগৎটাকে টলাইতেছে— যাহা বিদ্যুৎকে বাঁধিতেছে, পৃথিবীকে দোহন করিতেছে, মানুষের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করিতেছে— তাহাকে যদি ভাল করিয়া দেখিয়া ও চিনিয়া না যাই তবে পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের কাছ হইতে ঠিকমত বিদায় লওয়া হইবে না। কেন তবে আমি এ যুগে জন্মিয়াছিলাম? কলসি আনিলাম কিন্তু ভরিয়া লইবার জন্য ঝরনার ধারে গেলাম না। এখনকার কালে যে ঝরনা ঝরিতেছে তাহার ধারা কি এ জীবনে ব্যর্থ করিতে দিব? তুমি মনে যে আশঙ্কা করিতেছ এক একবার সে আশঙ্কা আমার মনেও উঠিয়াছে— কিন্তু আবার ভাবি মরিবার দিনে ঘরই কি আর বাহিরই কি— বরঞ্চ ঘরের চেয়ে বাহিরই ভাল— বাধা যেখানে নাই সেইখান হইতেই যাত্রা শুভযাত্রা— বিদায় লইবার

দিনে ঘরের কোণ হইতে বিদায় লইবনা, পৃথিবী হইতেই বিদায় লইব। গৃহবন্ধন হইতে বাহির হইয়া যাওয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেকার সেই ভূমিকা। তাই মনটাকে মুক্ত করিতে চাই— আত্মীয় স্বজন ঘর দুয়ার ও স্বদেশ সমাজের লক্ষ লক্ষ স্থূল সূক্ষ্ম অভ্যাসের জাল কাটিয়া একবার সমস্ত মানুষের দলে আপনাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে চাই। তাহা হইলেই বলিতে পারিব মানুষের পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম ও মানুষের পৃথিবী হইতে বিদায় লইলাম। আমি বাঙালী হইয়া ঠাকুরবাড়িতে জন্মিয়াছি এই ত আমার শেষ পরিচয় নহে।

ফাল্গুনের শেষে কলিকাতায় যাইব। তখন আমাকে স্মরণ করাইয়া পত্র দিয়ো যে বইগুলি পাও নাই সেখান হইতে পাঠাইয়া দিব। কোন্‌গুলি নাই লিখিয়ো। ইতি ২২শে ফাল্গুন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

১৮ মার্চ ১৯১২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, আমার সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। কাল ভোরে উঠে যাত্রা করতে হবে।

প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্ত্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনো মুস্কিল থাকে না। তাঁকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে এ কথা আমি মনে করি নে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে। ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরানো, ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা। ঠাকুরকে খাওয়াতে পরাতে হয় বটে কিন্তু সে হচ্চে যেখানে তিনি খান পরেন— সে কেবল মানুষেরই মধ্যে, জীবের মধ্যে। তাঁর সেবা তিনি সেইখান থেকেই সত্যভাবে গ্রহণ করেন— অন্য কোনো রকম করে দিতে গেলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হয়। যাই হোক্ আজ আর এ সব কথা নিয়ে তর্ক করব না।

যদি চ তোমাকে কখনো দেখি নি তবু তোমাকে আমি আত্মীয় বলেই অনুভব করেছি। তুমি আমার মন থেকে আমার আশীর্ব্বাদ আমার মঙ্গলকামনা স্বভাবতই আকর্ষণ করে নিয়েছ। তোমার

পত্রে তোমার চিত্তশক্তির পরিচয় পেয়ে আমি কতবার বিস্ময় অনুভব করেছি। ঈশ্বর তোমার অন্তরে যে স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তির অনুসরণ করেই তুমি তোমার কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারবে সন্দেহ নেই। যিনি তোমার ধীশক্তিকে এমন অসামান্য করেছেন তিনি আপনাকে দিয়েই তাকে সার্থক করে তুল্‌বেন। কোনো নিকট পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমি যেন তোমার স্নেহময় মাতৃহৃদয়ের আভাস পেয়েছি— সে আমি ঈশ্বরেরই কল্যাণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে মনে করি। তুমি যে দূরে থেকেও আমার মঙ্গল কামনায় উদ্বেগ অনুভব কর সে আমার প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদ। আজ তবে তোমাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি ৫ই চৈত্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

২৫ মার্চ ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

মাতঃ, বাধা পড়িল— যাত্রার দিন প্রাতে এমন মাথা ঘুরিয়া শয্যাগত করিল যে কোনোমতেই উঠিবার শক্তি রহিলনা। তাহার পূর্ব্বে কয়দিন অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল— তাহার সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাতের উপসর্গ থাকাতে হঠাৎ এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। এখনো মাথার পরিশ্রম নিষেধ। শিলাইদহে নির্জ্জনে পালাইয়া আসিয়াছি। আজ আর অধিক নহে। ইতি সোমবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

৭ এপ্রিল ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

শরীরের জন্যই আবার একবার বিলাতে যাওয়ার চেষ্টা করিতে হয় কারণ সেখানে ভালরূপ চিকিৎসার উপায় আছে। কিছুদিন এখানে আসিয়া ভাল ছিলাম কিন্তু পুনশ্চ দেখা যাইতেছে এখনো সুস্থ হইতে পারি নাই এবং রোগের দুর্ব্বলতা এখনো শরীরের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। এই জন্য প্রবাস যাত্রার প্রস্তাব এখনো ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বোধ হয় আর দুই একমাসের মধ্যেই বিদায় গ্রহণ করিব। ইতি ২৫শে চৈত্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

১৩ মে ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

আগামী ১৪ই জ্যৈষ্ঠে বম্বাই বন্দর হইতে আমাদের জাহাজ ছাড়িবে। ১০ই কলিকাতা হইতে যাত্রা করিব।

সম্প্রতি শিলাইদহে আছি। এখান হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠে কলিকাতায় যাইব।

এখন যাত্রা করিবার মত শরীরের অবস্থা হইয়াছে কিন্তু শরীর সুস্থ হয় নাই। জাহাজে সমুদ্রের হাওয়ায় উপকার হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

একটা নবজীবনের পালা সুরু করিতে পারিব এই প্রত্যাশা করিয়াই এবারে যাত্রা করিতেছি— তোমরাও সকলে আমার সেই কল্যাণ কামনা করিয়া আমাকে বিদায় দাও— অসত্য হইতে সত্যের পথে আমার এই যাত্রা হউক্।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

২২ মে ১৯১২

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মা তোমার স্নিগ্ধ পত্রখানি পাইয়া বড় তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। দেবপূজার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছ সে সম্বন্ধে আমার একটি কথা আছে।

হৃদয় আপনার কাজ আপনার নিয়মে করে তাহার সঙ্গে বুদ্ধির নিয়ম মেলেনা এবং না মিলিলে কোনোই দোষ নাই। কিন্তু সে স্থলে সত্যভাবেই হৃদয়টি থাকা চাই নহিলে তেমন মূঢ়তা আর কিছুই হইতে পারে না। মা ছেলেকে আদর করিবার সময় আধ আধ করিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকে— কিন্তু তাহা মিষ্ট এবং সত্য। কিন্তু মাতৃস্নেহ হইতে বাদ দিলে তেমন অদ্ভুত অসঙ্গত আর কি আছে! মাতাকে শিশুর আদর করার প্রণালী শিখাইতে হয় না— শিশুকে ভুলাইবার যে সমস্ত প্রচলিত অর্থহীন ছড়া আছে তাহাও মা যখন স্নেহের স্বরে ব্যবহার করে তখন তাহা নূতন ও সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু যদি কেহ শাসনের দ্বারা এই প্রণালীকে কৃত্রিম করিয়া ইহাকে নির্ব্বিচারে সর্ব্বজনের ব্যবহার্য্য করিয়া তুলে তাহা হইলে মূঢ়তায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কারণ ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি দুর্লভ অথচ কেবলমাত্র স্বভাবভক্তই যে পদ্ধতিতে সত্যভাবে চলিয়া তাহার সফলতা সহজে লাভ করিতে পারে তাহাকেই সর্ব্বসাধারণের একমাত্র পন্থা করিলে জ্ঞানের পথ ত

রুদ্ধ হয়ই, হৃদয়ের কার্য্যও বিকৃত হইতে থাকে। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানের বিষয়ে নকল চলে, এমনকি নকল করিয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয় কিন্তু হৃদয়ের বিষয়ে নকল চলে না, নকল করিলেই তাহা অসহ্য ভার হইয়া পীড়ার সৃষ্টি করে। এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তির যে প্রণালী তাহা হৃদয়বান সাধকের পক্ষেই উপযোগী কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর— তাহারা তাহার মধ্য হইতে যেটুকু রস পায় তাহার চেয়ে মূঢ়তাই বেশি সঞ্চয় করে। ইহাতে কেবল অল্প কয়জনের উপকার হয় কিন্তু সমস্ত জাতিকে অন্ধ ও স্বাধীনবুদ্ধিবিচারহীন করিয়া নষ্ট করে। সেই দুর্গতি কি সমস্ত দেশের মধ্যে দেখিতেছ না? ইহারা যে কোনোমতেই কোনো মঙ্গলকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেনা কেবল সমাজশাসনের দ্বারা বলপূর্ব্বক চালিত হইয়া স্বজাতিকে জড়ত্বে ও চিরদাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছে তাহার মূলে কি এই পূজার্চ্চনাবিধি নাই? তাহারা দেবতাকে যে ভাবে গ্রহণ করে, দেবকাহিনীসকলকে যেরূপ অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে বিশ্বাস করে এবং ধর্ম্মের নামে যেরূপে মনুষ্যত্ব-বিরুদ্ধ দুর্নীতিকেও বরণ করিয়া লয় তাহাতে কি সমস্ত জাতির মর্ম্মস্থলে মৃত্যুবাণ বাজে নাই? দেশের মানুষকে কি এইরূপ অন্ধতার মধ্যেই ফেলিয়া রাখিব?

কিন্তু মা, যেখানে হৃদয় আপন স্বভাবের পথে চলে সেখানে সে সত্য পরিণামেই যায়— কিন্তু সেই স্বভাবের পথ অল্প লোকেরই। সে লোকেরা জ্ঞানী না হইতে পারেন পণ্ডিত না হইতে পারেন

কিন্তু তাঁহারাই সত্যের অধিকারী— তাঁহারা নিরক্ষর চাষা বা *সরলপ্রাণ স্ত্রীলোক* হইলেও আমাদের সমালোচনার বাহিরে। আমরা যখন এ সম্বন্ধে বিচার করি তখন জাতির দিক দিয়া করি।

মা, শেষকালে আমার কথা এই তুমি আমাকে যে ভক্তি দিয়াছ আমি কখনই তাহার অধিকারী নহি তাই তোমার ভক্তিকেই তোমার আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আজ আমি বিদায় লইলাম। আগামী শুক্রবারে আমি এখান হইতে যাত্রা করিব। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

ওঁ

16, More's Garden,
Cheyne Walk, S. W.

মা, তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে কালই আমি ভারতবর্ষ যাত্রা করিতেছি এবং আমার প্রবাসের শেষদিনে তোমার পত্রে আমি যেন মাতৃভূমির আহ্বান লাভ করিলাম।

এদেশে আমি সমাদর পাইয়াছি কিন্তু সেইটেকেই আমি সকলের চেয়ে বড় লাভ মনে করিনা। কিন্তু ভগবান যে জন্য এদেশে আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন তাহার সন্ধান পাইয়াছি। তিনি আমার কাছে বিদেশীর ভিতর দিয়া আত্মীয়ের মূর্ত্তি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

আমি শুধু বাহবা পাই নাই আমি হৃদয় পাইয়াছি। মানুষ যে মানুষের কত কাছে তাহা দেখিয়াছি। ভাষা, ধর্ম্ম, ইতিহাস, আচার ও গিরি নদী সমুদ্রের ব্যবধান কতই তুচ্ছ— যেখানে সত্য মানুষটি বাস করে সেখানে কোনো ভেদ নাই। সেই ভেদবুদ্ধির হাত হইতে মুক্তি না পাইলে তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, মানুষের কাছে তাঁহার অখণ্ড প্রকাশই মানুষের পক্ষে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সেই প্রকাশকে আমরা বর্ণভেদ বিজাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি সহস্র আকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি— সেই আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিতে হইবে— নহিলে এই

পৃথিবীর মহাতীর্থে মানুষের হৃদয়মন্দিরে দাঁড়াইয়া মানুষের হৃদয়েশ্বরের পূজা সমাধা হইবেনা, বৃথা দ্বারের বাহির হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

আমার কোন্ বই তোমার কাছে নাই আমাকে জানাইয়ো —দেশে গিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব। এ চিঠি যখন পৌঁছিবে সম্ভবত তাহার সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমাদের জাহাজ ভারতবর্ষের বন্দরে গিয়া লাগিবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

৬ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমি আসিয়া অবধি নানা কাজে এবং উৎপাতে ব্যস্ত হইয়া আছি। বিলাতে আমার খ্যাতি হওয়াতে এ দেশে আমার শান্তির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এখন হইতে অধিকাংশ সময়েই আমাকে লোকের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে হইবে। আমাদের দেশে মেয়েরা ভয় করেন পাছে তাঁহাদের সন্তানদের প্রতি অশুভ দৃষ্টি পড়ে। জনতার সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি আমার মত মানুষের পক্ষে অশুভ দৃষ্টি— আশা করি ইহা হইতে আমার জননী আমাকে আবৃত করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন।

আমার শরীর ভালই আছে। বিলাতে থাকিতে আমার রোগের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছি— বহুদিনের সেই উপসর্গ হইতে এখন মুক্তি পাওয়া গেছে। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

নানা উৎপাতে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া আছি। কাজও করিতে পারিতেছি না, বিশ্রামও দুর্লভ হইয়াছে। এ সমস্ত জাল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

আমি বিষয় কর্ম্ম দেখি না— যাঁহারা দেখেন, শুনিয়াছি তাঁহারা পাবনার উকীল মনোনীত করিয়াছেন। তবু একবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব। যাহাই হউক্, এ সম্বন্ধে আমি নিজের হাতে কোনো কর্ত্তৃত্ব রাখি নাই।

যাহাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন তিনি আমার চারিদিকে লোক জমা করিয়া লুকাইয়া আছেন। ইহাতে সর্ব্বদা মনে আঘাত পাইতেছি। এই ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে হইবে। সর্ব্বদা যে সমস্ত অপমানের আঘাত পাইতেছি তাহাই আমার যথার্থ পুরস্কার— এই অপমানের অন্ধকারময় আড়াল হইতেই তিনি তাঁহার আলোটি লইয়া হাসিমুখে দেখা দিবেন আমি তোমাদের সকলের কাছে এই আশীর্ব্বাদটিই চাই। ইতি ২০ মাঘ ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

৪ মার্চ ১৯১৪

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার সঙ্গে দেখা হইলে হয়ত কথা বুঝাইয়া বলা সহজ হইত কিম্বা হয়ত হইত না। ঈশ্বর ত আমাকে গুরুর আসনে বসান নাই— আমি ত কাহাকেও পথ দেখাইবার শক্তি রাখি না— কেন না আমি কবি মাত্র— আমি পথ চলিতে চলিতে গান গাহি— গম্যস্থানের খবর লইও না কাহাকেও দিই না। কেহ যখন জিজ্ঞাসা করে কেমন করিয়া সাধনা করিব আমি বলি আমি ত সাধনা করি নাই।— আমাকে ঈশ্বর যে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন সেখানে যে আমি নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইয়াছি তাহা নহে— প্রথম হইতেই বিস্তর আঘাত সহিয়াছি— কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই এই পৃথিবীর আলো এবং আকাশ, এখানকার প্রাণের লীলা এবং শক্তির তরঙ্গবেগ আমার মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে। জগতের মাঝখান দিয়া আমি অচেতনভাবে চলিয়া যাই নাই— ইহার স্পর্শাভিঘাতে আমার চিত্তবীণার সমস্ত তার অহরহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ঝঙ্কারই আমাকে মন্ত্র দিয়াছে। আমার প্রাণের রাস্তা দিয়া আমার গানের সুরের ভিতর দিয়াই আমি যাহাকিছু লাভ করিয়াছি। আমার সমস্ত জীবনব্যাপী সুতীব্র সুখদুঃখের পরিণতিই আজ একটি নমস্কাররূপে মাটি স্পর্শ করিল। এই জীবনের ব্যাপার যে কেমন করিয়া ঘটে সে রহস্য ত আমার জানা নাই— সেই জন্যই আমি

কাহাকেও উপদেশ দিতে পারি না— এবং যাহারা আমাকে গুরু বলিয়া ভক্তি করে তাহাদের সে ভক্তি আমি কখনই মনের মধ্যে গ্রহণ করি না। মাতঃ, তোমার মধ্যে একটি বেদনা আছে একটি শক্তি আছে— তোমার চিত্ত সাধারণ সংসারী লোকের মত অসাড় নয়— তোমার সেই বেদনার ভিতর দিয়া তোমার অন্তর্যামী কি তোমাকে কাছে টানিয়া লইতেছেন না? ব্যবধান সমস্ত ঘুচাইয়া দিয়া তবে তিনি ছাড়িবেন। নহিলে তিনি তোমাকে কাঁদাইবেন কেন? হাত জোড় করিয়া মাথা নত করিয়া পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া আপনাকে প্রতিদিন বারবার তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া দাও— তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন— তিনিও যে তোমার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

২৮ ডিসেম্বর ১৯১৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমি কিছুকাল ধরিয়া ভ্রমণে ফিরিতেছিলাম— এখানকার কেহই আমার ঠিকানা জানিতেন না। সেই জন্য তোমাঁর দুইখানি পত্র আমি বহুদিন পরে পাইয়াছি। আবার আমি ঘুরিতে চলিব। বসিয়া থাকার কাজ আমি ত একরকম সারিয়া লইয়াছি —এখন আর আপিস চলেনা— দিনের শেষে বাহির হইয়া পড়িবার সময় আসিয়াছে। বসিয়া থাকিলেই বোঝা বাড়িয়া ওঠে— চলিয়া চলিয়া সে সমস্ত ক্ষয় করিয়া ফেলিতে হয়। অনেক-দিনের অনেক বোঝা এবার ক্ষয় করিয়া তবে ত খালাস পাইব।

সংসারের পথ চলায় তোমাদের আমি কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার আছে কি, মা? ভগবান আমার হাতে একটা খঞ্জনী দিয়াছিলেন সেইটে বাজাইয়া বাজাইয়া এতদিন গান গাহিয়া ফিরিয়াছি— ভিক্ষাই ত ছিল আমার সম্বল। এবার ভিক্ষাপাত্র ভাঙিবার চেষ্টায় আছি— গানও বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে, তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া এমন সত্য হইয়া ওঠ যে ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিতে কোনো বাধা না পান। ১৩ পৌষ ১৩২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

১ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ　　　　　　　　　　　　শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি তোমাকে কয়েকদিন হইল যে চিঠি লিখিয়াছি তাহা এতদিনে বোধ করি পাইয়াছ। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম— কাহারো চিঠি পাই নাই কাহাকেও চিঠি লিখি নাই। কিছুদিনের জন্য এখানে আছি আবার ঘুরিতে বাহির হইব এই আমার ইচ্ছা।

আমার বাক্যের দ্বারা তোমার চিত্তকে আমি ধ্রুব আশ্রয় দিতে পারি এমন ভগবৎ-প্রভাব আমার নাই এ কথা তুমি নিশ্চয় জানিয়ো। কিন্তু এ কথাও সত্য যে তোমার প্রতি আমি গভীর স্নেহ অনুভব করিয়াছি। তোমাকে দেখি নাই কিন্তু কেমন করিয়া তোমাকে এমন আত্মীয় বলিয়া জানি তাহা আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। নানা লেখায় নানা কাজে লোকসমাজে নানাভাবে আমি আমার পরিচয় দিয়াছি। কেহ ভাল বলে কেহ মন্দ বলে, পুরস্কারও পাই দণ্ডও পাই। কিন্তু যে জায়গায় কোনো সাংসারিক বন্ধন কোনো প্রয়োজনের সম্বন্ধ কোনো দেখাসাক্ষাৎ নাই সেখানে কোনো একজন লোককে আপনার করিয়া পাওয়া হাজার লোকের বাহবা পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। তাহাতে বুঝিতে পারি জীবনের সাধনার মধ্যে কোথাও কিছু সত্যের রং ধরিয়াছে,

সেই সত্য সমস্ত অপরিচয় অতিক্রম করিয়া কাহারো কিছু কাজে লাগিল। তোমার চিঠিতে যে সরল শ্রদ্ধা তুমি আমাকে অজস্র দিয়াছ তাহা এমন স্নিগ্ধ যে অনেক প্রবল সন্তাপের মধ্যেও তাহা আমার হৃদয় জুড়াইয়াছে। জান ত চারিদিক হইতে অবমাননা আমি অনেক পাইয়া থাকি; সে জন্য কাহাকেও দোষ দিই না। তপস্যাও করিব অথচ তাপ সহিব না এমন সৌখীন তপস্যার কোনো অর্থ নাই। কিন্তু তবুও তাপ ত তাপই বটে। তাই এই সমস্ত লাঞ্ছনার ভিতরে তোমার স্নিগ্ধ চিঠিগুলি যখন পাই তখন আমার তপ্তললাটে আমি আমার দেশ-মাতার সেবাহস্ত অনুভব করি। আমার কাছে তুমি শান্তির সম্বল চাহিতে আসিয়াছিলে কিন্তু আমাকে তুমি অনেক সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছ।

তোমাকে দিবার মত কিছু শক্তি বা সঞ্চয় আমার নাই— অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিলাম। তোমার জীবনের সমস্ত অভাবকে ভগবান তাঁর প্রেমের অমৃতরসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখুন। তোমার ব্যথার প্রদীপে তাঁর পূজার আলোকশিখা জ্বলিয়া উঠুক।

আমার জন্য মা তুমি মনে কোনো উদ্বেগ রাখিয়ো না। এখন ত পান্থশালায় আমার বসিয়া থাকার দিন নয়— এখন আমি চলার পথে। দীর্ঘ কাল আমার কোনো খবর পাও বা না পাও তোমার প্রতি আমার স্নেহ ম্লান হইবে না— সেই স্নেহই যদি তোমার অন্তরে সান্ত্বনা দিতে পারে তবে তাহা সফল হইল—

তাহার অধিক কোনো সম্পদ আমার নাই। ইতি ১৭ই পৌষ ১৩২১

একান্ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

ওঁ　　　　　　　　শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, এখনো যাওয়া হয় নাই। বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে পদ্মায় নিভৃতে বিশ্রামের আশায় গিয়াছিলাম। আবার কাজের পাকে ও বিপাকে পড়িয়া কলিকাতার সভায় বক্তৃতা দিতে আসিয়াছিলাম। তার পরে আবার কাজের চক্রে এখানে টানিয়াছে। ছুটি পাইলে আর একবার ইচ্ছা আছে শিলাইদহে গিয়া কিছুকাল ছুটি ভোগ করিব। সঙ্গে আমার ছেলে ও বৌমা যাইবেন। যদি সম্ভবপর হয় একবার বৌমাকে দেখিয়া যাইতে পার। আমি কিছু বল লাভ করিলে তার পরে জাপানে যাইব। বছর দুই তিন প্রবাসে কাটাইবার সঙ্কল্প আছে।

মা, পত্রের মধ্য দিয়া তোমার যেটুকু পরিচয় ও তোমার কাছ হইতে যে স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাটুকু পাইয়াছি সে আমার বিশেষ সমাদরের ও আনন্দের সামগ্রী তাহা নিশ্চিত জানিয়ো। সংসারের পথে চলিবার সময় যাহা আমাদের গভীর প্রয়োজনের সামগ্রী তাহা আকারে ও পরিমাণে বৃহৎ নহে। তৃষ্ণার স্নিগ্ধ জল এতটুকু হইলেই চলে কিন্তু যখন রৌদ্র প্রখর হয় তখন তাও দুর্লভ— অথচ তপ্ত বালির অভাব নাই।

এখানে আমার কাছে যে দুখানি বই আছে তাই পাঠাইলাম।

কলিকাতায় গিয়া আরো কিছু পাঠাইব।

তোমার জীবনে যদি অতৃপ্তি ও দুঃখ থাকে তবে সেও মূল্যবান। কেননা তোমার প্রকৃতিতে যে গভীরতা আছে তাহা কখনই অপূর্ণ থাকিতে পারেনা। ঈশ্বর তোমার জীবনে তোমার বেদনাকে সার্থক করিতেছেন— নিশ্চয় একদিন তাহা স্পষ্ট বুঝিবে। ইতি ৬ ফাল্গুন ১৩২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

১৮ এপ্রিল ১৯১৫

ওঁ　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মা, এই জগৎসংসারে সুন্দর, মঙ্গল এবং সত্য যে কতদিকে কত পূর্ণ হইয়া আছে একবার সমস্ত মন দিয়া তাহা গ্রহণ কর তাহা হইলেই নিজের মধ্যে যাহা ক্ষুদ্র যাহা কুশ্রী তাহা মিলাইয়া যাইবে। অতি বিরাট সঙ্গীতে আকাশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে— জীবনের আবরণ মোচন করিয়া একবার সেই সঙ্গীতে দেহমনকে মগ্ন করিয়া ধৌত করিয়া নববর্ষে নূতন জন্ম লাভ কর। পুরাতনকে বারবার ত্যাগ করিয়া তবে আমরা অমৃতলোকের যাত্রায় অগ্রসর হইতে পারিব। যে পুরাতন মলিন, যাহা নির্জ্জীব, যাহা জীবনের উপর ভারের মত, তাহাকে প্রাণপণে এই জগদ্ব্যাপী আনন্দসাগরে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিসর্জ্জন দাও— নিজের ভিতরকার মৃত্যুহীন পবিত্র অমৃত রূপটি দেখ— দেখ একবার জীবন কি মহৎ, জগৎ কি আশ্চর্য্য, যিনি চিরদিনের সঙ্গী তিনি কি অন্তরতম— দুঃখগ্লানির ছায়ার খেলা কি তুচ্ছ, মানুষের আত্মার শক্তি মানুষের সংসারের অভিঘাতের চেয়ে কত বড়! এই নববর্ষ তোমার জীবনে সার্থক হউক্।

৫ই বৈশাখ ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

৮ অক্টোবর ১৯১৫

ওঁ

শ্রীনগর
কাশ্মীর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই বলিয়া ত মনে হয় না। কিছুকাল হইতে আমি ঘুরিতেছি, আমার কোনো নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নাই, সেই জন্যই হয়ত ডাকের গোলমাল ঘটিয়া থাকিবে।

এখন আমি কাশ্মীরে। দেড়মাস এখানে কাটাইয়া হয়ত দেশে ফিরিব। বিতস্তা নদীতে বোটে করিয়া কিছুদিন ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা আছে।

তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছি এমন কথা কল্পনা করিয়ো না। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ২১ আশ্বিন ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

২৮ ডিসেম্বর ১৯১৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম— এখনো চোকে নাই— শেষ পর্য্যন্তই চুকিবেনা— শরীর মন বড় ক্লান্ত — তাই কয় দিন তোমার চিঠিখানির উত্তর দিতে পারি নাই। কাল কলিকাতায় যাইব— সেখানে গোলমালের মাত্রা বেশি — তাই আজ একটু সময় করিয়া তোমাকে লিখিতে বসিলাম। কাজ করিবার ক্ষমতা এখনো আছে অথচ কাজ করিবার উপকরণগুলো অনেকটা জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে সেইজন্যে ফুটো নৌকো বাহিবার কাজটা বেশি ক্লান্তিকর হইয়াছে— অথচ সকলেরই দাবী মিটাইতে হয়, কেননা এখনো একেবারে ফতুর হই নাই —তাই আমার অবস্থা সেই ধনীর মত যার একদিকে কিছু ধন আছে আর একদিকে ঋণও প্রচুর— তার পক্ষে হাল ছাড়িয়া দেওয়াও শক্ত, হাল ধরিয়া থাকাও সহজ নয়। এই সকল কারণেই এক-একবার মনে করি বহু দূরে চলিয়া যাইব— কিন্তু সে সব চেষ্টা মিথ্যা। মনিবের কাছে ছুটি মঞ্জুর না হইলে ঘরেও ছুটি নাই বাহিরেও ছুটি নাই।

আমি যে অনাদর ও আঘাত পাই তাহার মধ্যে আমার কল্যাণ আছে কিন্তু তোমাদের কাছ হইতে মাঝে মাঝে যে স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাটুকু পাইয়া থাকি তাহার মধ্যে ঈশ্বরের দয়া অনুভব করি।

এ তাঁহারই প্রসাদ— সেবকের ক্লান্তির সময় তাহাকে পুরস্কারের স্বরূপ পাঠাইয়া থাকেন।

ঈশ্বর তোমার জীবনকে কল্যাণে পূর্ণ করুন সেই কল্যাণ তুমি সংসারে বিতরণ কর। ইতি ১২ই পৌষ ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

পতিসর
আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

এবারে নানা উপদ্রবে আমার শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছে বলে কিছুদিনের জন্যে শিলাইদহে পদ্মার চরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে একটি ছোট নদীর ধারে এই ছোট গ্রামটিতে এসে পৌঁচেছি। এখানে আমার কিছু কাজ আছে সেইটে শেষ করেই কলকাতায় যাব। বোধ হয় আসচে সপ্তাহের গোড়াতেই গিয়ে পৌঁছব।

১১ই মাঘে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছিলে— দেখা হতে পারলে খুব খুসি হতুম।

তুমি কখন কোথায় থাক জান্‌তে পারি নে বলেই আমার বই তোমাকে পাঠাতে পারি নে। এবারে কলকাতায় ফিরে গেলে আমাকে একটু মনে করিয়ে দিয়ো— কোন্ কোন্ বই চাও তাও লিখো। অনেকদিন থেকে আমার বিশেষ কোনো বই বেরয় নি— সবুজ পত্র বলে একটা কাগজে প্রায় লিখে থাকি।

অবসাদটাকে কাটিয়ে ফেলবার জন্যে এবার ইচ্ছা করচি দেশ ছেড়ে কোথাও সমুদ্রতীরে বেরিয়ে পড়ব। চিরকাল আমি এমনি করে ঘুরে বেড়িয়েছি ঘুরতে ঘুরতেই একেবারে

বেরিয়ে পড়ব।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ১১ ফাল্গুন ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

১৫ এপ্রিল ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

তোমার চিঠি পড়ে অনেকবার আমার এই কথা মনে হয়েচে যে, মুক্তিকে তুমি ভয় কর এবং বন্ধনকে তুমি আশ্রয় মনে করেচ। এই জন্যেই একটা আবরণের থেকে আর একটা আবরণের মধ্যে যাবার জন্যে তোমার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। নির্ম্মুক্ত মনে সত্যকে তার নির্ম্মল স্বরূপে গ্রহণ করবার সাধনাতেই মানুষ যথার্থ শক্তি পায়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই সেই শক্তি সত্য যে সত্য নিজের আলোকেই আত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার পরমাত্মার অবাধ যোগ উপলব্ধি করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। নিজের মনকে এবং অন্যের মনকে দুর্ব্বল করবার অভ্যাস কোরোনা। সাহস করে নিজের মহৎ অধিকারকে স্বীকার কর। চৈতন্যকে আবৃত করে বুদ্ধিকে খণ্ডিত করে আত্মাকে চিরদিন বঞ্চিত কোরোনা।

আমি কাল রবিবারে কলকাতায় যাব। সেখান থেকে শীঘ্রই সিংহলের পথে জাপান হয়ে আমেরিকায় যাবার আয়োজন করচি।

ছোট ছেলেকে শিক্ষার প্রণালী কোনো বই থেকে পাবে না। আমি ছেলেদের বই দেখে শেখাই নে। মুখে বলে', বলিয়ে

নিয়ে, এবং লিখে লিখিয়ে তাদের গ্রহণ করবার এবং প্রকাশ করবার শক্তিকে জাগিয়ে তুলি। সে প্রণালী অত্যন্ত সহজ বলেই শক্ত।

দুই বৎসরের পূর্ব্বে আমার ফেরা হবেনা এই রকম মনে করচি। তোমাদের মঙ্গলকামনা এবং শ্রদ্ধা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে আমি যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে চল্লুম। ইতি ২রা বৈশাখ ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

২৯ এপ্রিল ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী সোমবার রাত্রে জাহাজে উঠ্‌ব। প্রথমে জাপানে যাব তার পরে কোথায় সে পরে স্থির হবে।

এ দেশ ছেড়ে সহজে দূরে যেতে ইচ্ছা হয় না— ঘুরে বেড়াবার বয়সও নয়। কিন্তু আমি ঘরের মানুষ নই অতএব আমি স্থির হয়ে ঘরে বসব এ কথা হাজার ইচ্ছা করলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেনা। যেখানে আমার ডাক পড়ে সেখানে আমাকে যেতেই হবে। আমাকে যদি দরকার না থাকত তাহলে কখনই আমার যাওয়া ঘটত না। আমি যাবনা যাবনা করেই এতদিন কাটিয়েছি। নানা ছুতোয় এইখানেই রয়ে গেছি কিন্তু শেষকালে টেনে নিয়ে চল্ল। আমি পথিক এ কথা আমাকে মান্‌তেই হবে। আজ বুঝেছি পথই আমার স্বদেশ— এই পথই গ্রহ নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে— অতএব কোথাও গুছিয়ে বসবার জন্যে আসবাব জড় করা আমার পক্ষে মিথ্যা।

অতএব তোমাদের কাছে আমার আশীর্ব্বাদ রেখে আমি যাত্রা করচি। ইতি ১৬ বৈশাখ ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

২২ মার্চ ১৯১৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

পরমকল্যাণীয়াসু

মাতঃ তোমার পত্র পাইয়া খুসি হইলাম।

শরীর আমার ভালই আছে। আপাতত এইখানেই স্থির হইয়া বসিলাম। কিন্তু আবার কখন তলব আসে কিছুই বলা যায় না। আমার গণ্ডি ঘুচিয়াছে কাজেই দেশে দেশে আমাকে ফিরিতে হইবে— ঘরে আমার বাসা রহিলনা। কাজ যদি আমারই হইত তবে অনেকদিন পূর্ব্বেই কাজ শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রভুর কাজ— তাহার শেষের খবর কিছুই জানিনা।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৯ চৈত্র ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

১৮ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বর্ষারম্ভে অন্তরের সহিত আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি।

আমার পক্ষে বিশ্রামের বিশেষ দরকার হয়েচে। সেইজন্যে কিছুদিন থেকে লেখা ছেড়ে দিয়েচি— লিখ্‌তে ইচ্ছাই হয় না। কিন্তু আমার শরীরের জন্য উদ্বেগের বিশেষ কোনো কারণ নেই। এই মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের বিদ্যালয়ের অবকাশের সময়ে কোনো একটি নিভৃত জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেব এই রকমের ইচ্ছা আছে। ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

২৪ জুন ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু দিন দার্জ্জিলিঙে ছিলাম। শরীর ভাল ছিল না। আমার বড় মেয়ে মাধুরীলতাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। সেই জন্য উদ্বিগ্ন আছি। বোধ করি কিছুকাল কলিকাতায় থাকিতে হইবে অথবা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে লইয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হইবে। ইতি ১০ আষাঢ় ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

বড়োবাজার

* ৩ জুলাই ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি যদি আসতে পার তবে আনন্দিত হব। আমি দিনের বেলাটা আমার মেয়ের বাড়িতেই থাকি। সন্ধ্যা ছটার পরে আমার সময়। কিন্তু কাল বুধবারে অন্যত্র কাজ আছে। বৃহস্পতিবারে কিছুদিনের জন্য বোলপুরে যাব। কাল সকাল বেলায় বাড়ি থাকব— বেলা একটার পর বেরব। অতএব যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে সেই সময়ে আস্‌তে পার। ইতি মঙ্গলবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

হ্যারিসন রোড

৩০ জুলাই ১৯১৭ *

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি কিছুকাল থেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আছি অথচ কর্ম্মের ব্যস্ততা কিছু কমে নি, তা ছাড়া আমার মেয়ের অসুখে মন উদ্বিগ্ন আছে। এই কারণেই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। মাঝে কয়েক দিন শিলাইদহে ছিলাম সেখানেও বিশ্রামের সুযোগ পাই নি। ইতি ১৪ই শ্রাবণ [১৩২৪]

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

বড়োবাজার

* ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ কর্ম্মের জাল জটিল ও কঠোর হয়ে আমাকে ঘিরেচে, তার উপরে মনের উদ্বেগ আছে তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে সময় পাই নি। সোমবারে সন্ধ্যা ছটার পর কোনো একসময়ে যদি আমাদের এখানে এস তাহলে আমাকে বাড়িতে পাবে। ইতি রবিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

২৭ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখন শান্তিনিকেতনে আছি। কলকাতায় গেলে সেই ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিয়ো। এখানে এলে অসুবিধা হবে। ব্যস্ত আছি। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। ১০ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

৩ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

হেমন্তকে যে জমি দিবার কথা বলিয়াছিলে এখান হইতে তাহার কোনো ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। কারণ বিষয়কর্ম্মের ভার আমার হাতে নাই, তাহা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। শিলাইদহে গেলে সেখানে জমির তদন্ত করিয়া সদরে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিয়া চেষ্টা দেখিতে পারি। ইতি ১৭ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

২২ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর কিছুকাল থেকে ভেঙ্গে পড়েচে অথচ কর্ম্মের ভারও বেশি হয়েচে এই জন্য চিঠিপত্র লিখ্‌তেও ত্রুটি হচ্চে। ডাক্তার আমাকে অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে এবং কাজ ছেড়ে পালাতে বলেচেন কিন্তু আবদ্ধ হয়ে আছি— এখনো নড়তে পারচি নে। যত শীঘ্র পারি শান্তিনিকেতনে চলে যাব কিন্তু কবে ঘট্‌বে এখনো জানি নে। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

৩০ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্লান্তির বোঝা লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি। আশা করিতেছি কিছুদিন এখানে পড়িয়া থাকিলে সুস্থ হইয়া উঠিব। ইতি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

৯ জানুয়ারি ১৯১৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সুখদুঃখের ঢেউ কাটিয়েই ত আমাদের জীবন বেয়ে নিয়ে চল্‌তে হবে। এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে সেই ঘটনাগুলোই চরম সত্য নয়। ব্যথা এড়াব এমন সাধ্য আমাদের নেই কিন্তু তাকে সত্যরূপে গ্রহণ করব এটা আমাদের সাধনার অঙ্গ। যিনি চিরন্তন তাঁকে যদি দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে মনের মধ্যে রাখ্‌তে পারি তাহলে যা চঞ্চল সে আমাদের আর আঘাত করতে পারে না। আমরা নিজেকে যখনই বড় করে দেখি তখনি নিজের ভার অত্যন্ত বেড়ে ওঠে— তখনি দুঃখসুখের ঢেউ জীবনকে বড় বেশি তোলপাড় করে তোলে।— নিজেকে এবং প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতাকে নিজের সত্য-আপন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দূরে রেখে দেখ্‌লে জীবনযাত্রা সহজ হয়। যে দুঃখে আমরা মরি সে আমাদের নিজের হাতের মার। তার মানে এ নয় যে সেই দুঃখের ঘটনা আমাদের নিজের সৃষ্টি, তার মানে এই যে, সেই ঘটনাকে আঘাতস্বরূপে নেওয়া আমাদের নিজেরই কাজ।

আমি বোধ হয় জানুয়ারি মাসের শেষ তারিখে কলকাতায় যাব। ইতি ২৫ পৌষ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

ওঁ   শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত আছে। কলিকাতায় শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করি না। সেখানকার ভিড় এবং নানা প্রকার দায় আমাকে অত্যন্ত বেশি ক্লিষ্ট করে। যদি ইতিমধ্যে যাইতে হয় তোমাকে সংবাদ জানাইব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২২ মাঘ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

শান্তিনিকেতন

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর ভাল নেই। আমার পক্ষে ভালই হয়েচে— ছুটি মিলেচে। তবু এখনো কাজের এবং লোকের ভিড় যথেষ্ট আছে। যাই হোক্ এমনি করে ছাড়া বোঝা হাল্‌কা হবে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

১৩ মার্চ ১৯১৮

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

আমার কন্যার পীড়া বাড়িয়া উঠাতে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইয়াছে। আমার শরীর এখনো ক্লান্তিভারে পীড়িত আছে। ইতি ২৯ ফাল্গুন ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮

বড়োবাজার

* ২১ মার্চ ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি সন্ধ্যার পর প্রায়ই বাড়িতে থাকি। তুমি যেদিন খুসি আস্‌তে পার। কাল শুক্রবারে যদি আস ত দেখা হবে। ইতি বৃহস্পতিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

বড়োবাজার

* ২০ এপ্রিল ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাবার উদ্যোগে ব্যস্ত আছি। আমাদের জাহাজ আগামী ২১শে বৈশাখে ছাড়বে। কিন্তু এ জাহাজ কেবল সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যাবে। তার পরে কবে জাহাজ পাওয়া যাবে এবং সে জাহাজ কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছবে কিছুই ঠিকানা নেই। আপাতত আর কিছু নয়, সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারলেই আরাম পাই। শনিবার

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

হ্যারিসন রোড

২৫ এপ্রিল ১৯১৮ *

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর আসিলে দেখা হইতে পারিবে। ইতি বুধবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

১২ মে ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হবার পর বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাতে আমার আর যাওয়া হল না। যদি পথ খোলসা পাই ও জাহাজে জায়গা থাকে তবে সম্ভবত অগস্ট মাসে যাওয়া হতে পারে। কিন্তু আপাতত সমস্ত অনিশ্চিত। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

বড়োবাজার

* ১৮ মে ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমার প্রকাশকের নিকট সংবাদ লইয়াছিলাম তিনি তোমাকে অনেক দিন হইল্ আমার আদেশ পাইয়াই অনেকগুলি বই পাঠাইয়া দিয়াছেন— আমি তখন বোলপুরে ছিলাম। তোমাদের বাড়িতে ভাল করিয়া খবর লইয়া দেখিবে। যদি সেখানে কাহারো হস্তগত হইয়া না থাকে তবে নিশ্চয়ই ডাকের লোকে ডাকাতি করিয়াছে। যাহা হউক আমাকে সংবাদ্ দিয়ো।

নির্ঝরিণী তাহার স্বামীগৃহে চিত্তের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। তাহাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইয়ো। সে সংসারকে কল্যাণে পূর্ণ করিয়া জীবনকে সার্থক করুক, সকলের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠুক্! সংসারযাত্রায় তাহার মঙ্গল সংবাদ যখনি পাইব তখনি আমি আনন্দ লাভ করিব।

শিলাইদহে ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার পরশ্ব বোলপুরে যাইব। কলিকাতার গোলেমালে মনটা ব্যস্ত হইয়া আছে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩

১৬ জুলাই ১৯১৮

ওঁ　　　　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমি ভালই আছি। কিন্তু আজকাল বিদ্যালয়ের কাজে আমাকে সমস্ত দিনই নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেইজন্য অন্য কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আমেরিকায় যাইবার জন্য টিকিট কিনিয়াছিলাম। সে টিকিট ফিরাইয়া দিয়াছি। কেননা আমি দেখিলাম, ছেলেদের যে কাজ লইয়াছি সে কাজ ফেলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হইবেনা। জাহাজে যখন পা বাড়াইতে যাইতেছিলাম এমন সময় এইখানেই ডাক পড়িল। এখন হুকুম মিলিলনা। ইতি ৩২ আষাঢ় ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৪

বড়োবাজার
* ১০ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলিকাতায় এসেছি। সম্ভবত পশু শনিবারে মাদ্রাজের দিকে যাব। ছুটির সময় আশ্রমে থাক্‌তে পারলুম না— দরকার পড়েচে তাই যেতে হচ্চে। যদি সময় পাও কোনো সময়ে এসে দেখা করে যেয়ো। কাল সন্ধ্যার সময়ে বাড়িতে থাক্‌ব। মধ্যাহ্নেও কোথাও বেরবার সম্ভাবনা নেই। ইতি বৃহস্পতিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

১৯ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মীরা এবং তার ছেলের কঠিন পীড়া হয়েছিল। কিছুদিন হল রোগমুক্ত হয়েচে। রথীর সামান্যরকম ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, এখন সুস্থ হয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এসেচে। এখানকার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালই। ভজু ভাল আছে। সন্তোষ স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেওঘরে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মা বোনরা মুঙ্গেরে। সন্তোষ সস্ত্রীক সপুত্র রোগ নিয়ে এসে বহু দুঃখ ভোগ করে সম্প্রতি সেরে উঠেচেন। তাঁর মা বোনেরা সকলেই মুঙ্গেরে গিয়ে পীড়িত হয়েছিলেন। এখন সেরে উঠেচেন। যাঁরা আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন সকলেই রীতিমত রোগ ভোগ করেচেন। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯

কল্যাণীয়াসু

আমি গেল দুই মাস ধরে দক্ষিণ ভারতে ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা ছিলনা বলে তোমাদের কোনো চিঠি এতদিন পাই নি। অনেকদিন পরে আজ এক তাড়া চিঠির মধ্যে তোমার চিঠি পেলুম। মাঝে মাদুরায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় কিছুদিন শয্যাগত ছিলুম— এখন একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম করচি। আবার পর্শু মাদ্রাজের অভিমুখে যাত্রা করব। সেখান থেকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে করতে কলকাতার দিকে রওনা হব। দেশে পৌঁছতে বোধ হয় ফাল্গুন শেষ হবে। আমার জন্যে মনে কোনো উদ্বেগ রেখো না। এখন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেচি। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

১৬ এপ্রিল ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাঝে কাশীতে গিয়াছিলাম। এখনও আমার শরীর সুস্থ হয় নাই। কিছুকাল বিশ্রামের আবশ্যক আছে। আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ভূমার মধ্যে তোমার চিত্ত শান্তি এবং স্থিতি লাভ করুক। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

৯ মে ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনও আমার শরীরের সেই ক্লান্তি যায় নি— তাই ছুটিতেও এখানেই পড়ে আছি। আমার এই শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হয় নি। আমি কর্ম্মের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে খোলা জানলার ভিতর দিয়ে আকাশ দেখবার অবকাশ পেয়েচি। আমাদের হাজার রকমের কর্ম্মের প্রয়াস, নিখিলের নিকট-স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে— এই বিপুল জগতের মাঝখানে কর্ম্মের পরদা খাটিয়ে অন্ধ হয়ে থাকি। যদি শরীর অসুস্থ না হত তবে এই পর্দ্দা ওঠাবার অবসর কেউ আমাকে সহজে দিত না। তাই আজকাল আমার এই ক্লান্তি আমার অবকাশটি পূর্ণ করে মুক্তির অমৃত পরিবেষণ করচে। আজ থেকে বিদ্যালয়ের ছুটি হল— এ'তে করে আমার ঘরের আরও একটা দরজা খুলে গেল— এখন আমার সমস্ত মনের উপর হাওয়া এসে লাগুক, আলো এসে পড়ুক এই চাই।

ইংরেজি বই সংগ্রহের চেষ্টা করব— ছেলেরা চলে গেছে তাই পুরানো বই ঠিক এখনি পাওয়া শক্ত হবে। তবু খোঁজ করতে বলে দেব। তুমি যদি ছুটির সময় আশ্রমে এসে থাক্‌তে

চাও তোমার কোনো অসুবিধা হবে না—এখন সমস্ত ঘরই খালি। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

৮ জুন ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি দু তিনদিনের মধ্যে বোলপুরে চলে যাব। যদি এর মধ্যে এখানে আস্‌তে চাও দুপুর বেলায় এসো— কেননা অন্য সময়ে সর্ব্বদা লোকের ভিড় থাকে। ইতি ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

২১ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। কিন্তু কাজ চলে যাচ্চে। কাজের ভারও সম্প্রতি বেড়ে উঠেচে— সে আমার ভালই লাগ্‌চে।

আগামী ১৫ই শ্রাবণে কলকাতায় গিয়ে তার পরের সোমবারে ফিরে আসব। ইতি ৫ শ্রাবণ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

শান্তিনিকেতন

*** ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৯**

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন থেকে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য নানা কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম তাই চিঠি লিখতে অবকাশও পাই নি, মনও ব্যাপৃত ছিল। শরীর আজকাল পূর্ব্বের চেয়ে ভাল আছে। তাই এবারে কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তনে যাবার চেষ্টা করবনা। এইখানেই নির্জ্জনে ছুটি কাটাবার চেষ্টা করব। আজ আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেল। ইতি বুধবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

বড়োবাজার

*** ২৬ জুলাই ১৯২১** ওঁ সোমবার

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। কালই শান্তিনিকেতনে ফিরতে হবে। পুনর্ব্বার যখন কলকাতায় আসব তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এই কয়দিন নিতান্ত ব্যস্ত ও ক্লান্ত ছিলাম। শান্তি ও বিশ্রামের জন্যে সহর ছেড়ে পালাচ্চি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

জুলাই ?, ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার কাপড়খানি পেয়ে আমি খুব খুসি হলুম, নিশ্চয় ব্যবহার করব। বিদেশ থেকে সম্মান পেয়েচি সত্য কিন্তু টাকা নিয়ে এসেচি কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সম্মান যা পেয়েচি তা আমার দেশেরই জন্যে— নোবেল প্রাইজে টাকা যা পেয়েচি দেশকেই দিয়েচি। আমি দেশের জন্যে কি রকম কাজ করতে চাই তার চিহ্ন বিশ্বভারতীতে কিছু রেখে যাব আশা আছে— তা কোন তর্কের দ্বারা পরিস্ফুট হবে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যেদিন তোমাকে চিঠি লিখেছিলেম তার পরদিনেই আমার শান্তিনিকেতনে আসবার দিন স্থির ছিল— এমন সময় লোকের অনুরোধে পড়ে কাজে জড়িয়ে পড়লুম। তাই এবার কিছুকাল কলকাতায় থাকতে হয়েছিল। যে কয়দিন ছিলুম অত্যন্ত ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েছিল কিছুমাত্র অবসর পাই নি— তাতে শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তোমাদের কাউকে যে কোনো একসময় আসতে বলব এমন সময়ও আমার ছিলনা। তুমি যেদিন বর্ষামঙ্গল দেখতে গিয়েছিলে সেদিন যদি কোনোমতে আমাকে খবর দিতে পারতে তাহলে আমি যেমন করে হোক তোমার সঙ্গে দেখা করতুম। বিশ্রাম করবার প্রয়োজন খুবই অনুভব করচি, কাজ করতে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ হচ্চে কিন্তু কাজের আর অন্ত নেই। চিঠি লেখার কাজও আগেকার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এবার যখন কলকাতায় যাব তখন আশা করচি তোমার সঙ্গে দেখা করবার সময় পাব। ইতি
১৯ ভাদ্র ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

৪ঠা তারিখে বিদ্যালয় বন্ধ হবে তার পরে যখন তোমার সুবিধা হয় এখানে এলে তোমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। আমার অসুখ সেরেচে কিন্তু কাজের অন্ত নেই বলে শরীর ক্লান্ত আছে। ইতি ১৪ আশ্বিন ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

১৩ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার লেখা ছাপ্‌তে আজকাল একটুও ইচ্ছা করেনা। মণিলাল অত্যন্ত ধরে পড়েছিল বলেই মৌচাকে একেবারে কতকগুলো কবিতা পাঠিয়েছিলুম। তার ফল হয়েচে এই যে, চারদিক থেকে সম্পাদকেরা লেখার জন্যে আমাকে টানাটানি করতে আরম্ভ করেচে। নিজেকে পাঠকসমাজে বা অন্যত্র আমি প্রকাশ করতে চাই নে— আমার এই আশ্রমের কোণে যথাসাধ্য চুপচাপ করে থাকতে চাই— ছেলেদের মধ্যে কাজ করি তাতেই আমি আনন্দ পাই। ইতি ২৭ কার্ত্তিক ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেনা এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজি বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা "religiously wrong" অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলিনে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোনো একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না। দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূল পত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না — তার সাধনা তার চেয়ে কঠিন ও বিচিত্র — তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির চালনা ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক আত্মস্বীকার চাই সে কাজে [illegible] আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখিনে যখন দেখি তারা বিদ্যুৎ-তীব্র উদ্দীপনার নেশায় মেতে থাকতে চায় "তর ন সহে বিলম্বায়, সত্বর।" — বিশ্বভারতীতে মেয়েদের সকল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে — সব বয়সেরই মেয়েরা যোগ দিতে পারে। ইতি ২২ মাঘ ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেনা এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজি বলেচেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাক্‌ব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা "religiously wrong" অর্থাৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘট্‌লে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না— তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র— তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখি নে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় "তদা ন সংশে বিজয়ায়, সঞ্জয়।"— বিশ্বভারতীতে মেয়েদের সকল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েচে— সব বয়সেরই মেয়েরা যোগ দিতে পারে। ইতি ২২ মাঘ ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

বড়োবাজার

* ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি বিলম্বে পেলুম। আজ আর কিছুক্ষণ পরেই সকালের গাড়িতেই বোলপুরে ফিরে যাচ্চি। আবার কিছুদিন পরেই হয় ত আস্‌তে হবে তখন তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারবে। আর যদি ইতিমধ্যে একবার আশ্রমে যেতে পার তাহলে সেখানে তোমার অসুবিধা হবেনা— কারণ মেয়েদের শিক্ষাবিভাগ খুলেচে, দেখে আস্‌তে পারবে। ইতি শনিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে ভুল বুঝেচ। দেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই এ কথা আমি কখনই বলি নে। কিন্তু উন্মত্ত হয়ে কিছু একটা করাই কর্ত্তব্য এ আমি মানতে পারি নে। সেই মাতামাতির একটা সুখ আছে তা জানি কিন্তু ফল না থাকতে পারে। এখানে একটা গ্রামে আগুন লেগেছিল। অবশ্য, আগুন লাগ্‌লে জল দিয়েই নেবাতে হয়, সকলেই তা জানে, কিন্তু গ্রামে জলাশয় ছিল না। তবু জল জল রবে চেঁচামেচি পড়ে গেল, সেই চিৎকারে আগুন নিব্‌লনা— এবং লোকে অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করতেও ভুলে গেল। একজন বিদেশী লোক ছিল সে বল্‌লে যে সব ঘরে আগুন লেগেচে তার চারদিকের ঘরগুলোকে ভেঙে ফেল যাতে আগুন পাড়ায় ছড়িয়ে না পড়ে। গ্রামের লোক এ পরামর্শ শুন্‌তে চাইল না তখন সেই বিদেশী লোক বেত হাতে তাদের জোর করে ঘর ভাঙিয়ে আগুনকে দমন করলে। এখন যেখানে আছি এই ঘটনাটি তার নিকটের পাড়াতেই ঘটেছিল।

অন্য ইতিহাসের নকল করে নিজের দেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না।— মনের আক্ষেপ, উত্তেজনা এবং হাঁক ডাক

ব্যাপারটা খুব প্রচণ্ড হতে পারে কিন্তু দেশের অবস্থার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য সাধন সে উপায়ে সিদ্ধ হয় না। "দেশে আগুন লেগেচে অতএব ইত্যাদি" এ কথা কিছুকাল থেকে শুন্‌চি— এ আগুন বহু বহু শতাব্দী থেকেই লেগেচে— কিন্তু "আড়ি, আড়ি, আড়ি, আড়ি" বলে চীৎকার করবার জন্যে ছেলেরা লেখাপড়া এবং বুড়োরা কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিলেই এ আগুন নিব্‌বে এ কথা বিশ্বাস করি নে। চরকা চালিয়ে খদর পরে' এই আগুন নিব্‌বে এটা এতবড় একটা ছেলেভোলানো কথা যে, এ কথায় দেশসুদ্ধ লোক ভুলেচে দেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হতে হয়। সন্ন্যাসী বলচে তামাকে সোনা করবার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি, আমি বল্‌চি সোনা যথানিয়মে উপার্জ্জন করতে হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই— তখন তুমি যদি আমার উপর রাগ কর তাতে এই প্রমাণ হয় যে, উপার্জ্জন করবার মত উদ্যম তোমার নেই অথচ সোনা পাবার লোভ তোমার পুরো মাত্রায়—এমন মানুষকে বিধাতা পুরস্কার দেন না। চরকা চালিয়ে কোনো ফল হয় না এ কথা কেউ বলে না, তার যেটুকু ফল তাই হয় তার বেশি হয় না। কুইনিন্ খেলে ম্যালেরিয়া সারে, ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে, কিন্তু কুইনিন খেলে স্বরাজ হয় এ কথা কুইনীন বিক্রির মহাজনও বলে না।

মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে অবসরমত কোন এক সময়ে আলোচনা করব। ইতি ১৬ ফাল্গুন ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

বড়োবাজার
* ২১ মার্চ ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কয়েকদিন কলকাতায় এসেচি। বৃহস্পতিবার রাত্রে শিলাইদহে যাব। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেছিলে। বুধবার বা বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে যদি আসতে পার দেখা হতে পারবে। ইতি মঙ্গলবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

শান্তিনিকেতন

* ২৮ এপ্রিল ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্রমে আমার কাজও বাড়চে বয়সও বাড়চে— সেই জন্যে যেদিকে কাজ সংক্ষেপ করা চলে সেদিকে যথাসাধ্য অবকাশ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে থাকি। তোমরা যে সব প্রশ্নের উত্তর চিঠিতে আমার কাছ থেকে আদায় করতে চাও সে সব প্রশ্নের জবাব মিল্‌বে না। আগে প্রায় সকল চিঠিরই উত্তর সকলকেই দিতুম এখন আর তা চলে না। কারণ চিঠির সংখ্যা বেড়েচে, শক্তির পরিমাণ কমেচে, এখন আমার ছুটির সময় এসেচে। এই কারণেই চিঠিতে তোমাকে সব কথা বড় করে লিখ্‌তে পারি নে। সে জন্যে কিছু মনে কোরোনা। বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হয়েচে —বোধ হয় আমার ছুটি এইখানেই কাটবে। ইতি শুক্রবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

বড়োবাজার

* ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় যথেষ্ট বড় হল না থাকাতে স্থানাভাবে মেম্বর নেওয়া বন্ধ করতে হয়েচে। আমার যেবার বক্তৃতা করবার থাকবে আমাকে জানালে আমি তোমার টিকিটের ব্যবস্থা করে দেব। আমি শারদোৎসব অভিনয়ের পরে বম্বাই ও মাদ্রাজ হয়ে সিংহলে যাবার ব্যবস্থা করেছি। বিশ্বভারতীর নানা কাজে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকাতে ক্লান্ত আছি। ইতি শনিবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩

২৮ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল আমি সিন্ধু, কাঠিয়াবাড়, বম্বাই প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করছিলুম। খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেচি। এখন শিলং পাহাড়ে কিছুকাল বিশ্রামের জন্যে যাব ঠিক করেচি।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠমাসে যদি সেখানে কিছুদিন গিয়ে থাকতে চাও তাহলে স্থানের অভাব হবে না। তুমি সন্তোষ মজুমদারকে জান, তাঁকে চিঠি লিখ্‌লেই জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসে শান্তিনিকেতনে অসহ্য গরম হয়, প্রায় পশ্চিম প্রদেশের গরমের মত।

তুমি শান্তি লাভ কর, আনন্দ লাভ কর এই আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। সংসারের অতি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে একান্ত বদ্ধ আছ বলে আপনার ভিতরকার সান্ত্বনার পথ খুঁজে পাও না। যে বৃহৎ ক্ষেত্রে মানুষ পূর্ণভাবে আপনাকে দিয়ে ফেলতে পারে সেইখানেই মানুষ বাঁচে। যেখানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের বাধা সেইখানেই মানুষ বন্দী। ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

৮ অগস্ট ১৯২৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার অসুখ সেরে গেছে। কিন্তু দুর্ব্বলতা এখনো যেন সমস্ত দেহ আঁকড়ে আছে। দেহমনের এই অবসাদ দূর হতে বোধ হয় কিছুদিন যাবে। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

২৬ অক্টোবর ১৯২৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। আমি দুই মাসের জন্য ভিক্ষাব্রত লইয়া বোম্বাই গুজরাট কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বাহির হইতেছি। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

২৩ এপ্রিল ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল থেকে আমার শরীর একটু বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েচে তাই নড়াচড়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছি। আর একটু বল পেলে য়ুরোপে যাবার কথা আছে— সেখানকার জলবাতাস ও চিকিৎসায় হয় ত আরোগ্যলাভ করতে পারি।

শরীরের অস্বাস্থ্য উপলক্ষ্যে যে ছুটি পেয়েছি সেই ছুটি আমার অনেক কাজে লেগেচে। অনেকদিন পরে বিশ্বের অন্তঃপুরে মন আপন আসন পেতে বস্‌তে পেরেচে।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১০ বৈশাখ ১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

৪ নভেম্বর ১৯২৫

ওঁ　　　　　　　　কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

দীর্ঘকাল থেকে আমি পীড়া ভোগ করচি। কবে নিষ্কৃতি পাব জানি নে। একটা সুবিধা এই যে, কর্ম্মের ভীড় থেকে খানিকটা ছুটি পাই, তাতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সুবিধে হয়— তা ছাড়া, বাহিরের বিশ্বেও মনটাকে মুক্তভাবে ছাড়া দেবার অবকাশ ঘটে। অন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া হচ্চে পরিণত বয়সের ধর্ম্ম, আর বাইরের আকাশে ছুট্ দেওয়া হচ্চে ছেলেবয়সের ধর্ম্ম— এই দু দিকের দরজাই আমার খুলে গেছে সেই জন্যে কোনোরকম কাজ করতে এখন আর ভালো লাগে না, অথচ কাজেরও সম্পূর্ণ বিরাম নেই। ডাক্তারের শাসন থেকে যদি ছাড় পাই তাহলে আর দু চার দিন পরেই শান্তিনিকেতনে চলে যাব। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮

১৭ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে আমার মনে বড় বাজল। তুমি মনে করেছিলে তোমার আত্মাকে তৃপ্ত করবার মত কোনো সম্পদ আমার আছে। কিন্তু আমি পথের পথিক, গম্যস্থানের ডাক শুনি ; ঠিকানায় পৌঁছে কাউকে জোর করে ডাক দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। আমার আছে বলবার ক্ষমতা, তাই বিধাতা আমাকে দিয়ে নানা কথাই বলিয়ে নেন— কোনো একটি বাণীতে আমার সকল বাণী সংহত করে সাধনার মন্দিরে আলো জ্বালবার কাজে আমার তলব পড়ে নি। আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না,— আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানাছন্দে গড়া খেলনা জোগাব, এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ সেইটুকুতেই আমার সার্থকতা। এই আমার স্বধর্ম্ম, আর সেই স্বধর্ম্মরক্ষার দায়িত্বই আমার। আমার কাছ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধি, কর্ম্মনৈতিক নৈপুণ্য যারা আশা করেছে তারা নিজে ভুল করেছে, অথচ আশাভঙ্গের দুঃখের জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে। একদিন তুমি যখন আমাকে নানা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে তখন আমার মনের ভিতর থেকে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি, কেননা সেটা আমার কাজ। সেই জন্যে এ কাজে ডাক পড়লে আমাকে সাড়া দিতেই হয়। কিন্তু শুধু

কথার মধ্যে যেটুকু বুদ্ধি, যেটুকু ভাব থাকে তাতে আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের কিছু তৃপ্তি হতে পারে, আত্মার আশ্রয় তাতে সম্পূর্ণ হয় না। সেই আশ্রয় যাঁরা দেন তাঁরা আর একশ্রেণীর মানুষ— যে বিধাতা খেলা করেন সেই বিধাতার সাথী তাঁরা নন্, যে বিধাতা বিধান করেন সেই বিধাতার দৌত্য তাঁদের হাতে।

তোমার যে চিঠিগুলি সেদিন আমি পেয়েছিলুম, তার মধ্যে তোমার একটি সহজ বুদ্ধি ও ভাবের গভীরতা দেখে আমি আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলুম। সেই কারণেই আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গেই তোমাকে উত্তর লিখেছি। এখনকার চেয়ে তখন আমার হাতে সময় বেশি ছিল— শরীরও সুস্থ ছিল— তোমার কথা বিশেষভাবে মনে রেখে তোমাকে আমার চিন্তার দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করায় আমার আনন্দ ছিল। আমি খুব অল্প মেয়েকেই জানি, যে তোমার মত এমন সংযতভাবে সুস্পষ্ট ভাবে ও একাগ্রভাবে চিন্তা করতে ও চিন্তা গ্রহণ করতে পারে। আমি জানি আমার অনেক কথাই তোমার আজন্ম-সংস্কারের প্রতিকূল ছিল। অন্য কেউ হলে ক্ষোভে, এমন কি, অবজ্ঞায় সে সব কথা প্রত্যাখ্যান করত। কিন্তু তুমি ব্যথিত হয়েও আমার কথা স্থিরভাবে বোঝবার সহিষ্ণুতা কখনো হারাও নি। কোনোদিন তোমাকে আমার মতে আনব একথা কখনই ভাবি নি— সব দিক থেকে সকল কথা ভেবে নেবার পক্ষে তোমার মনে কোনো বাধা না থাকে এইটেই আমার ইচ্ছা ছিল। যাঁরা গুরু তাঁরা নিজের বিশ্বাসের জোরে নিজের মতে সবাইকে প্রবর্ত্তিত করতে

চান— যে কবি সে কেবল মনের ভাবকে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়, গতিয়ে দেবার গরজ তার নেই। পথিক তার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিজের পথেই চলে যায়, যদি একটুখানি খুসি হয়ে যায় তাহলেই হোলো। তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্চে, তোমাকে কিছু আনন্দ দিয়ে থাকব— সেটাতে হয় ত ধরে রাখবার মত কিছুই নেই— সে যেন এক পসলা বৃষ্টির মত, পান করবার পাত্রভরা তৃষ্ণার জলের মত নয়। তোমার প্রয়োজনের স্থায়ী সম্বল যদি তোমাকে দিতে পারতুম তবে আজ তোমার শক্তির অবসানের মুখে তাই তোমার পাথেয় হতে পারত— কিন্তু খেলা নিয়েই যার চির জীবনের কারবার তার হাতে কেবল রঙের জিনিষই থাকে, মূল্যের জিনিষ কিছুই থাকে না।— তবু আমি জানি তোমার নিজের ভিতরেই যে শক্তি আছে, অনেকদিন থেকে সেই শক্তিই তোমার পথ ভিতরে ভিতরে কেটে আস্‌চে, সুখে দুঃখে আশায় নৈরাশ্যে। তোমার সেই শক্তি আজ পরম সার্থক হোক এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হলুম। আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি তোমার ভাববার ও ভাব প্রকাশের শক্তি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণেই, যখন আমার সময় ছিল, তোমাকে যত্ন করে অনেক চিঠি লিখেছি— জানতেম তুমি তা বুঝবে এবং তাতে তোমার নিজের চিন্তার উদ্যম উদ্বুদ্ধ হবে। এখন আমার জীবনের সায়াহ্ন; আমার ভাবনা কল্পনা যা কিছু একদিন বাইরে সঞ্চরণ করতে বেরিয়েছিল তারা সব ভিতরে ফিরে এসেছে— তাই চিঠির গণ্ডূষও ভরতে চায় না।

তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে তুমি নিরুদ্ধ করে কেন রাখ? অন্তত তাকে নিজের কাছে প্রকাশ করতে পারলেও তোমার উপকার হবে। প্রকাশের দ্বারাই নিজের কাছ থেকে নিজে আমরা লাভ করি— আমাদের পক্ষে সেই লাভ সকলের চেয়ে সত্য। গাছ আপনার ফলফুলপল্লব বিকাশের দ্বারাই আপন সম্পদ পায়— বাইরে থেকে তার ডালে বহুমূল্য জিনিষ ঝুলিয়ে দিলে সে তার পক্ষে ভার হয় মাত্র।

আত্মীয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে আজ কলকাতায় এসেছি কাল বোলপুরে ফিরে যাব। ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

১৬ এপ্রিল ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে সুখী হলুম, সেই সঙ্গে মনে উদ্বেগ বোধ করচি। তোমার শরীর নিশ্চয় ক্লান্ত, তাই প্রাণশক্তির ম্লানতায় তোমার মনের মধ্যে অবসাদ আসচে। এই ম্লানতায় মাকড়ষার জালের মতো আমাদের জড়িয়ে ফেলে— বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অনেকখানি বিচ্ছিন্ন করে দেয়— সবটা আলো আমাদের দৃষ্টিতে পৌঁছয় না, সবটা হাওয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে নিঃশ্বসিত হতে পারে না। ক্ষীণ জীবনের জীর্ণ শিকড়গুলো অস্তিত্বের সব রস পূরোপূরি শুষে নিতে জোর পায় না। তোমার সঙ্কল্পের আবেগের সঙ্গে তোনার প্রাণশক্তি-দৈন্যের অসামঞ্জস্য ঘটেচে সেই জন্যে এত বেশি কষ্ট পাচ্চ। তোমার অন্তরে বাহিরে ভালো রকম মিল হতে পারচেনা। ন্যূনাধিক পরিমাণে এই অসামঞ্জস্য সকলেরই জীবনে আছে। এই অসামঞ্জস্যের আঘাতের প্রয়োজনও গুরুতর। মাটি উঁচু নীচু, এবং ভিন্ন স্থানে তাপমাত্রার ভিন্নতা বশতই পৃথিবীতে জলের ধারা চলে, বাতাস বয়। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অসাম্য আছে বলেই আমাদের চিত্তপ্রবাহ আঘাতে অভিঘাতে সর্ব্বদা জাগরিত। অথচ এই অসাম্য অতিশয় অতিরিক্ত হলে তাতে আমাদের শক্তিকে নিরস্ত করে, উদ্দীপিত করেনা। এ

কথা এত করে এই জন্যে বলচি, যে, সম্প্রতি কিছুদিন থেকে অবস্থার দৈন্য, কর্ম্মের বাধা, শরীরের দুর্ব্বলতায় আমার জীবনেও একটা ঔদাস্যের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটাকে চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারিনে। সেটা মায়া-জাল, তার থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চাই। ছায়াকে সত্য বলে জানা ভূতের ভয় পাওয়ার মত— যেই বল্‌তে পারব সেটা মিথ্যে, অম্‌নি তার জোর চলে যাবে। অবসাদের উপছায়াটাকে বার বার বোলো, মিথ্যা, মিথ্যা— তোমার যে-আত্মা সত্য তাকে নিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে নিশ্চিত জানো, প্রতিদিনের আঘাত জর্জ্জরতা কেটে যাক্‌। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১

২৯ মে ১৯২৭

ওঁ

Uplands
Shillong

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। সরসীবাবু কবিতাকে যেদিক থেকে যাচাই করতে চান সেদিক দিয়ে সজীব কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বন্ধুকে যদি শরীরতত্ত্বরূপে বিচার করি তবে শরীরতত্ত্ব মিলতেও পারে কিন্তু বন্ধু থাকেন কোথায় ? কবিতার পরিচয় তার রসে, সেটাকে পাই স্বাদের দ্বারা, বিশ্লেষণের দ্বারা নয়। প্রথমে তাল, তার পরে গান, তার পরে গতি, কবিতার এ পর্য্যায়ের কোনো মানেই নেই। সমস্তটা জড়িয়ে ও একটা অখণ্ড জিনিষ। একটা নদী চল্‌চে তাকে আমরা ভাগ ভাগ করে বল্‌তে পারি নে, আগে তার ঢেউ, তার পরে তার জল, তার পরে তার ধারা— ওর একসঙ্গেই সব।

আমাদের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো, তার উপকরণও সীমাবদ্ধ —সেই ক'টিকে নিয়ে সেইটুকুর মধ্যে একটি মূর্ত্তি সাজিয়ে তুল্‌তে হবে। সুখ দুঃখ জিনিষটা চরম জিনিষ নয়, তারা উপাদানমাত্র, তাদের নিয়ে একটি সুসঙ্গতির মধ্যে গুছিয়ে তুলে জীবনটাকে রূপ দিতে হবে। নিজের জীবন রচনায় আমরা আর্টিস্‌ট্। যদি তাকে একটি সুষমা দিতে পারি

তাহলেই যিনি নিত্য আমাদের জীবনে তাঁর প্রকাশ হয়। রেখা রঙ নিয়ে এলোমেলো আঁক কাট্‌লেই ছবি হয় না— তাদের মিলিয়ে নিয়ে যখন রূপ ফুটে ওঠে তখন সেই রূপ নিত্যতা লাভ করে। ছবি আঁকতে হলে এমন কোনো ভাবকে গ্রহণ করতে হয়, যে ভাবের মধ্যে পূর্ণতার রস আছে, সেই মূল ভাবের অনুগত করে রেখা ও রঙের বিন্যাস সাধন করা চাই। নিজের জীবনের সম্বন্ধেও তাই, সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত চাওয়া পাওয়া যদি এলোমেলোভাবে থাকে তাহলে সৃষ্টি হল না— কোনো একটি চিরন্তন ভাবের সঙ্গে সঙ্গত করে তাদের শান্তি সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতা দিতে হবে— জীবনের অর্থ হল এই। ইতি ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। প্রত্যেক বীজ আপনার বিকাশের খাদ্য আপনার মধ্যেই ধরে রাখে— সেই খাদ্যটুকুর মধ্যেই তার ভাবীকালের প্রাণসঞ্চয়। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেই সে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আমাদের আত্মার অমৃত অন্ন আত্মারই গভীর কেন্দ্রে নিহিত— আত্মসমাহিত শান্তির মধ্যে তাকে পাওয়া যায়। এখন তুমি যে শান্তির মধ্যে মগ্ন হবার অবকাশ পেয়েচ সেই শান্তির গভীরতাতেই তুমি আপনার বাণী আপনি পাবে। মঙ্গলকর্ম্মের মধ্যেও এই শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মকে সম্পূর্ণ অহংমুক্ত করা বড় কঠিন। কর্ম্মশালার জালনা দরজা যত বড়ই হোক্ তবু তার মধ্যে বদ্ধতা থেকে যায় এইজন্যে কর্ম্মশালার বাইরে খোলা বাগানের দরকার হয়, যাঁরা কর্ম্মসন্ন্যাসী কর্ম্মের চক্রবাত্যায় আত্মার বাণীকে হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা তাঁদের যথেষ্ট আছে —এইজন্যে তাঁদের পক্ষেও কর্ম্মের চারিদিকে বড় অবকাশকে প্রসারিত রাখা খুবই আবশ্যক— নইলে ভালো কর্ম্মও নেশা হয়ে উঠে অহংকে উগ্র ও আত্মাকে আবিষ্ট করে দেয়। কর্ম্মের সংসার থেকে তুমি ছুটি পেয়েচ এখন তুমি আদেশের জন্যে বাইরের দিকে তাকিয়ো না। অন্তরতম নিজের কাছে

এসো— তার কাছ থেকে এখন সাড়া পাবে। যে গুরু নিজেকে ভোলান না বলেই অন্যকে ভোলান না সে রকম গুরু নিতান্তই দুর্লভ, অথচ যদি তাঁদের দর্শন মেলে তাঁদের মত সুলভ কেউ না। যার দরকার আছে তাকে না দিয়ে তাঁরা থাকতেই পারেন না, নইলে তাঁরা অকৃতার্থ হন,— ভরা মেঘ মরুভূমিতেও জলবর্ষণ না করে থাক্‌তে পারে না। সেইরকম গুরুই কতবার পৃথিবীতে এসেচেন, আর তাঁদের যা দেবার তা দিয়ে চলে গেছেন— না দিয়ে যাবার জো ছিল না। ভেবে দেখ, ভারতে এমন দিন ছিল যখন লিপি ছিলনা, গ্রন্থ আকারে ভাবপ্রকাশ করবার উপায় ছিল না— তবু যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা না দিয়ে যেতে পারেননি। আমি ত তাঁদেরই এক একটি বাণীর মধ্যে গুরুর স্পর্শ পাই। আর কিছুনা, সেই বাণী শান্ত হয়ে শুন্‌তে হয়— নিজের আত্মার বাণীর সঙ্গে তার সুর মিল করে তবে তাকে পাওয়া যায়। মন যখন শান্ত তখন একটিমাত্র শব্দই যথেষ্ট, “সত্যং”— বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে,— শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং— কোথাও কিছু আর ফাঁক থাকেনা— কেননা কোলাহল-মুক্ত হলে এই ধ্বনি আপনার মধ্যেই শোনা যায়। আনন্দরূপমমৃতং —অনন্ত দেশকাল আনন্দের অমৃতে নিবিড়, নিজের নিভৃত আত্মার মধ্যেই তার চরম সাক্ষ্য। সে সাক্ষ্য না পেলে বাইরের কথার কোনো মূল্য নেই। আমরা যখন গুরুকে মানি তখন গুরুকেই মানি সত্যকে না,— সত্যকে তখনি যথার্থ মানি যখন

আত্মার কাছে তাকে পাই।

তোমাকে লেখা আমার যে চিঠিগুলি প্রবাসীতে বেরিয়েচে তা পড়ে অনেকে আনন্দ পেয়েচেন। এই সম্বন্ধে আমি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ খুব সুন্দর পত্র পেয়েচি— সেটা আমার পক্ষে বড় সান্ত্বনার। নিজের ভিতরকার ঠিক কথাটি লেখা একেবারেই সহজ নয়,— তুমি আমাকে লিখিয়েচ বলেই লিখেচি— কোমর বেঁধে সাধারণকে উপদেশ দেবার জন্যে যদি লিখ্‌তুম তা হলে বানানো কথা হত— অন্তরের সহজ কথা বল্‌তে পারতুম না।

বাকি চিঠিগুলি শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় আমাকেই যদি পাঠাও আমি বাছাই ও কপি করিয়ে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেব। ইতি ২০ মাঘ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিগুলি পেয়ে তার থেকে কিছু কিছু কপি করিয়ে নিয়েছি। প্রবাসীতে পাঠাব।

ইতিপূর্ব্বে দুই সংখ্যা প্রবাসীতে তোমার চিঠিগুলি বেরিয়েচে। তার মধ্যে এক সংখ্যা বোধ হচ্চে তুমি পাও নি।

দেবার মতো জিনিষ আমরা কিছুই দিতে পারি নে যদি নেবার শক্তি জাগ্রত না থাকে। মেঘ বারবার আকাশে আসে তার পরে ভেসে চলে যায়, যেবার পৃথিবীর গ্রহণশক্তি অনুকূল হয় মেঘের বৃষ্টিশক্তি সেইবারই সার্থক হয়। চিঠি তোমাকে অনেকগুলি লিখেচি সে তুমিই আমাকে লিখিয়েচ। এতে আমারই নিজের উপকার। কেননা নিজের সব কথা সব সময়ে নিজে শুন্‌তে পাইনে, শ্রোতা যখন শোনে তখনি নিজে শুন্‌তে পাই। যারা বলিয়ে নিতে পারে এমন শ্রোতা সংসারে খুবই কম। এ কথা নিশ্চয় জেনো পৃথিবীতে অনেক বাণীই অকথিত রয়ে গেছে— বক্তার অভাবে নয়, শ্রোতার অভাবে। যিনি বল্‌তে পারতেন তাঁকে বলানো হল না বলে তিনি বঞ্চিত হয়েচেন।

কিছুদিন পরে আবার আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে। য়ুরোপে যাওয়া নিয়ে অনেকবার তুমি আমাকে প্রশ্ন করেচ। এটা মনে রেখো সেখানে আমি যা বল্‌তে পারি

এখানে তা পারি নে— সেখানে নিজের বাণীসম্পদ নিজে আবিষ্কার করি— যারা শোনে তারাই সাহায্য করে। ইতি ৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালকের রেজেস্ট্রিডাকে তোমার
চিঠি ফেরৎ পাঠাবো।

৯৪

১৬ অক্টোবর ১৯২৯

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

চিত্ত যখন উদ্ভ্রান্ত হয় তখন মানুষ বাইরে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় কিন্তু মানুষের উপর আদেশ আছে তাকে আপনার আশ্রয় আপনি সৃষ্টি করে নিতে হবে। নিজের অন্তরের মধ্যে যতক্ষণ না ফিরিয়ে আনতে পারি ততক্ষণ সংসারের দীর্ঘ ও জটিল পথের আর অন্ত পাইনে। সব ভ্রমণ ও সব সন্ধানের শেষ নিজের মধ্যেই এইটে বুঝতে আমাদের অনেক সময় লাগে। নিজের মধ্যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই বলে পরিত্রাণ, বাইরে তাকে হাৎড়ে বেড়াই কোথায়? কিন্তু এ সব কথা কথা মাত্র— বলে বিশেষ ফল নেই— অন্তরের মধ্যে সত্যে ধ্রুব হওয়া বল্‌তে কী বোঝায় সেইটে ঠিক মতো বুঝতে পারলেই রক্ষা পাই। মানুষের জন্মকাল থেকে হাজার পথে বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াই তার মনের অভ্যাস— কোন্ শক্তির দ্বারা সেই অভ্যাসকে দমন করা যেতে পারে এইটেই দুরূহ প্রশ্ন। এ সব বিষয়ে যেটা লক্ষ্য সেটাই উপায়। আর্থিক ব্যবসায়ে টাকা দিয়ে টাকা পেতে হয়— এও সেই রকম— নিজের মধ্যে পাথেয়রূপে যদি আনন্দ থাকে তবে সেইটেই গম্যস্থানের আনন্দনিকেতনে নিয়ে যায়। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৩০ আশ্বিন ১৩৩৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

১০ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। সংসার থেকে সরে এসে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছ এই মুক্তির মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে নিজের অন্তর থেকে নিজের শান্তিকে উদ্ভাবন করতে পারবে। কর্ম্মজাল কাটিয়ে বেরিয়ে পড়বার পথ আমার নেই, যদিও ছুটি চাই। আমার শরীর মোটের উপর ভালোই আছে কিন্তু কাজকর্ম্ম করবার যোগ্যতা অনেক কমে গেছে। আমার বয়সে শক্তির এই খর্ব্বতা ভালোই— বাহিরের দাবী তাতে কমে যায়। কিন্তু এককালে যে ধনী ছিল সে নির্ধন হলেও চাল কমানো সহজ হয় না, ফলে এই হয় লোকের প্রত্যাশা সমানই থাকে অথচ তহবিলে টানাটানি।

তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

১

৬ মে ১৯০৮

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের, বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। বিধাতার এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। দেশের যে দুর্গতি-দুঃখ আমরা আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে— গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে।

এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেনা— কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড— ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন— কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারেনা— সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে— এবং ধর্ম্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে। পাপের পথে পথ-সংক্ষেপ হয় বলিয়া আমরা ভ্রম করি সেইজন্যই অধৈর্য্য হইয়া আমরা সেইদিকে ধাবিত হই কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়াই সফলতাকে বিসর্জ্জন

দিই। আজ আমাদের পথ পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল— এখন আবার আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক বাধা অনেক বিলম্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে— যত কষ্ট হউক্, যত দূরপথ হউক্ অবিচলিত চিত্তে যেন ধর্ম্মেরই অনুসরণ করি। সমস্ত দুর্ঘটনা সমস্ত চিত্তক্ষোভের মধ্যে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে সেই শুভবুদ্ধি দান করেন। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩১৫

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ   জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছি তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া [illegible] প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্ত্তব্য বোধ কর তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পার। উদার দৃষ্টিদ্বারা জাত্যাভিমানকে

হইতে করিয়া দেখিতে থাকে—
সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি ও দুর্গতির
দুঃখতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের
মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাসকে স্থির
করিয়া তোমার করুণাপূর্ণ ব্যথিত
চিত্ত সান্ত্বনালাভ করুক এই
আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৫ মে ১৯০৮

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছি তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্ত্তব্য বোধ করি তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পারি। উদার দৃষ্টি দ্বারা জগদ্ব্যাপারকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে থাক— সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ও দুর্ব্বিষহ দুঃখতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাসকে স্থির করিয়া তোমার করুণাপূর্ণ ব্যথিত চিত্ত সান্ত্বনা লাভ করুক এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৩০ মে ১৯০৮

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দিকে মনকে ফিরিয়ে রাখা, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, এবং সমস্ত কর্ত্তব্যকে তাঁর কাজ মনে করে ধৈর্য্যের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করে যাওয়া এ ছাড়া সংসারে শান্তির আর কি উপায় আছে আমি ত জানি নে। কোনো কোনো লোক, ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন— রামমোহন রায় সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন— যখনি তাঁর মন কোনো কারণে চঞ্চল হত তখনি তিনি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ করতেন এবং ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত বন্ধন এড়িয়ে মুক্তিক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হতেন। আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এই রকম একএকটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।

আমার প্রবন্ধ সভাস্থলে পড়া হয়ে গেছে। পুস্তিকা আকারে ছাপা হচ্চে— তোমাকে-দুই একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব। এই কথা মনে রেখো, নিজের জন্যেই কি, আর দেশের জন্যেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য তাই একমাত্র সত্য। কোনো উপস্থিত ক্রোধে লোভে বা কোনো ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ধর্ম্মকে খর্ব্ব

করতে গেলে কখনো মঙ্গল হতে পারে না। নিজের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ না করে মরুভূমির পথে ধ্রুবতারার মত একাগ্রলক্ষ্যে তার দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে দুঃখ পাই আর যাই পাই পথ হারিয়ে বিনাশের মধ্যে পড়তে হবেনা।

ইতি ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

৯ জুন ১৯০৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার উপর রাগ করিব এমন কোন কারণ ত ঘটে নাই। ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখুন এই আমি কামনা করি— তাহা হইলে কোনো সাময়িক ক্ষোভে তোমার অন্তঃকরণ সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারিবেনা।

তোমাকে "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছি। "সমস্যা" নামক আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি ছাপা হইলে তাহাও পাঠাইয়া দিব। ইতি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২৫ জুলাই ১৯০৮ ওঁ শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমি কিছুদিন শিলাইদহে পদ্মানদীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। এ জায়গাটি সুন্দর নির্জ্জন এবং স্বাস্থ্যকর— সেইজন্য সুযোগ পাইলেই আমি এইখানে আসিয়া জলে বাস করি।

ঈশ্বর যখন দুঃখ দেন তখন সে দুঃখকে মঙ্গল বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নহে। তথাপি সেই সাধনাই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, সুখ ও স্বার্থের সম্বন্ধ নহে। যদি তাঁহাকে ভক্তি করি তবে দুঃখ আমাদের দুঃখই দিতে পারে না— মন যখন মোহে অভিভূত থাকে, সংসারের সকল জিনিষকেই যখন অত্যন্ত অসঙ্গতরূপে বড় বলিয়া মনে হয় তখনই কথায় কথায় আমরা অকারণে দুঃখে জড়িত হইয়া পড়ি। সকলের চেয়ে তিনিই সত্য, তিনিই বড়, তিনিই চরম— আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনাগুলি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া ওঠা আমাদের মূঢ়তা। ঈশ্বর তোমাকে শান্তি দিন, শক্তি দিন, তাঁহার প্রতিই তোমার অন্তরের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট এবং তোমার জীবনের নির্ভরকে জাগ্রত করুন। ইতি ১০ই শ্রাবণ ১৩১৫

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

১৩ অগস্ট ১৯০৮

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম এবং নানাস্থানে ঘুরিতে হইতেছিল সেইজন্য পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটিল। আগামী কল্য বোলপুরে গমন করিব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন এবং তোমার চিত্তকে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করুন। ইতি ২৯শে শ্রাবণ ১৩১৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

১৫ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমি কিছুকাল পদ্মায় বোটে ছিলাম— শরীর ভাল ছিলনা। এখনো বিশেষ ভাল নাই। নানা কর্ম্মজালেও জড়িত আছি এই জন্যই পত্র লিখিতে পারি নাই। বোধ করি শরীরের একটা চিরন্তন ক্লান্তিবশতই পত্র লিখিতে জড়তা উপস্থিত হয়।

এখন আমার বয়স হইয়া গেছে— অনেক ঘটনা, অনেক চিন্তা, অনেক সুখদুঃখের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। তোমাদের এখন অল্প বয়স— তোমাদের সমস্ত মন এখন যে ক্ষেত্রে আছে সেখান হইতে আমাদের চিন্তার বিষয়গুলি বেশ সুস্পষ্ট ও সত্যরূপে তোমাদের গোচর হয় না— এই জন্যই আমার কথা তুমি ঠিক বুঝিতেছ না। কথা ত কেবল কথার মানে দিয়া বোঝা যায় না— সমস্ত প্রকৃতি দিয়া জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিতে হয়। এই জন্যই, আমার লেখা পড়িয়া তোমার কাছে তাহার অর্থ যদি অস্পষ্ট ঠেকে তবে মনে কোনো ক্ষোভ করিয়ো না। পথ অসংখ্য আছে — তোমার কাছে যে পথ সহজ সেই পথ দিয়াই একদিন তুমি সত্যে গিয়া উপনীত হইবে— আমার পথেরই যে অনুসরণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কেবল এই কথা মনে রাখিয়ো— ঈশ্বরই সত্য স্বরূপ— সেই পূর্ণ সত্যের অভিমুখেই চলিতে হইবে — অনেক ক্ষুদ্র জিনিষ আমাদিগকে পথের মধ্যে

ভুলাইতে আসে— তাহারা বড় বড় নাম ধরিয়া আসিলেও তাহাদিগকে সেই সর্ব্বোত্তম সত্যের সিংহাসনে বসাইতে যাইয়ো না— যাহা ভূমা, তাহার পরিবর্ত্তে আর কোনো বিড়ম্বনাকেই বড় এবং শ্রেয় মনে করিয়ো না। ধর্ম্ম নিজের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থের চেয়েও বড়— য়ুরোপ এই কথা ভোলে বলিয়া যে তাহাদের নকল করিয়া আমাদিগকেও ভুলিতে হইবে এমন দুর্ভাগ্য যেন আমাদের না হয়। ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

১৯ জানুয়ারি ১৯০৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমি প্রায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি বলে তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে পারি না— আমার সময় নিতান্তই কম।

আমি জানিনে আমি তোমাকে এমন কি উপদেশ লিখে পাঠাতে পারি যা গ্রহণ করে তোমার মন আশ্রয় লাভ করতে পারে। বাইরে থেকে বেশি কিছু দেওয়া যায় না— ভিতরের জিনিষকে ভিতরেই লাভ করতে হয়। তোমার মধ্যে যে অন্তর্যামী রয়েছেন তিনি ত কেবল তোমার পৃথিবীর সামগ্রী নন, তিনি তোমার চিরজীবনের সঙ্গী। তিনিই তোমাকে লোকে লোকান্তরে নব নব জীবনের পথে নিয়ে যাবেন। সমস্ত সুখ দুঃখের ঊর্দ্ধে তাঁকে অনুভব কর— তাঁর পায়ে সমস্ত চিত্তকে অবনত করে সমর্পণ কর— দুঃখকে তাঁর দান বলে গ্রহণ কর— সেই চিরবন্ধুর দিকে চাও। এ ছাড়া আমি তোমাকে আর কি বল্‌তে পারি! হৃদয় যখন চঞ্চল সংসারে যখন তরঙ্গ তখনো মনে রেখো সেই কাণ্ডারী হাল ধরে রয়েছেন— সমস্ত তুফানের উপর দিয়ে তিনি বন্দরে নিয়ে চলেছেন।

তোমার জীবনের সমস্ত দুঃখ চাঞ্চল্য তাঁর দিকেই তোমাকে প্রবলভাবে নিয়ে গিয়ে একান্তভাবে তাঁর প্রতিই তোমাকে সমর্পণ

করে তোমাকে ধন্য করুক এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ৬ই মাঘ ১৩১৫

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

১৬ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ ঈশ্বর তোমার চিত্তকে শান্ত করিয়া মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করুন। তোমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক্। পৃথিবীতে সুখের সঙ্গে কেন দুঃখ জড়িত হইয়া থাকে সে তত্ত্ব তুমি বুঝিবে না— সে সংশয় হইতে মনকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া থাক— নত শিরে তাঁহার সমস্ত বিধান বিনা বিদ্রোহে গ্রহণ কর। মনকে অবসাদে দুর্ব্বল করিয়ো না— উৎসাহপূর্ণ শক্তির সঙ্গে সংসারের সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও— তোমার মানবজন্ম কল্যাণের দ্বারা সার্থক হউক্! ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩১৬

শুভকামী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কয় দিন ধরিয়া অনেকগুলি সভায় অনেক বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। আজ ছুটি পাইয়াছি কাল বোলপুরে যাইব।

মা তুমি মনকে খুব নম্র করিয়া প্রতিদিন তাঁর শরণাপন্ন হও। নিজেকে না ভুলিতে পারিলে যথার্থভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। প্রতিদিনই তাঁহার আত্মনিবেদন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অহঙ্কারের বন্ধন নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া আসিতে থাকিবে। হৃদয় যখন নিরহঙ্কার হয় তখনই ক্রোধ প্রভৃতি রিপু আশ্রয় না পাইয়া বিদায় লইতে থাকে। নিজেকে সংসারে সকলের চেয়ে নীচে রাখ সুখ পাইবে— সেই তোমার দীনতার আসনে ভগবান তোমাকে সঙ্গ দিবেন। এ সকল উপদেশ মুখে বলা সহজ— কাজে অত্যন্ত শক্ত। আমার মনে অহঙ্কার কতদিকে কত মোটা ও সূক্ষ্ম শিকড় বিস্তার করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই— সেইজন্যই কথায় কথায় কত অসহিষ্ণু হই— ভিতরে ভিতরে কত রাগ করি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন আমি এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি আমাকে এই সকল বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দিন। প্রার্থনায় ফল লাভ হাতে হাতে হয় না— কিন্তু মনে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবেনা। তুমিও হতাশ হইয়োনা—

নিশ্চয় জানিয়ো যদি প্রত্যহ তুমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও ক্রমে তোমার মন নরম এবং তোমার বন্ধন আলগা হইবেই ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ঈশ্বরকে মন দিতে দিতে ঈশ্বর তোমার অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিবেন ইহা নিশ্চয় জানিবে। ইতি ১৫ই আশ্বিন ১৩১৬

শুভকামী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

৪ ডিসেম্বর ১৯০৯

ওঁ বোলপুর

পরমকল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি যখন পাইয়াছিলাম বড় ব্যস্ত ছিলাম তাই জবাব দিতে পারি নাই। আমার শরীর মোটের উপর ভালই আছে। প্রতিদিন তুমি ঈশ্বরের কাছে আপনাকে সমর্পণ কর তিনি ধীরে ধীরে তোমার চিত্তকে শান্তি ও কল্যাণে বিকশিত করিয়া তুলিবেন। মনকে নিজের দিকে বা সংসারের দিকে না রাখিয়া যদি তাঁহার দিকে রাখিবার সাধনা কর তবে হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন ও জীবনের সমস্ত জটিলতা দিনে দিনে দূর হইয়া যাইবে। ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

২৫ এপ্রিল ১৯১০

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। জীবনে সকল অবস্থাতেই এবং সংসারের সকল সম্বন্ধের মধ্যেই তোমার চিত্ত নম্রভাবে এবং আনন্দে তাঁহার বিধানকে স্বীকার করিয়া লইবার বল লাভ করুক্। তোমার সরল হৃদয়টি সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক্ এবং বাহিরে যে কোনো অভাব থাক্ তোমার অন্তরের পূর্ণতাদ্বারা সমস্তকেই তুমি মঙ্গলে ও মাধুর্য্যে আনন্দময় করিয়া তোলো।

আমাদের এখানে নববর্ষের দিনে উৎসব হইয়াছিল। তাহার পর হইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। আজ বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে আজ হইতে কিছুদিনের জন্য অবকাশ পাইব। বোধহয় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও যাইব। কবে এবং কোথায় যাওয়া হইবে এখনো স্থির করিতে পারি নাই।

মা, তোমার যখন ইচ্ছা হয় আমাকে চিঠি লিখিয়ো। এক এক সময় আমি ব্যস্ত থাকি, তা ছাড়া আজ কাল ক্লান্তি ও আলস্যে সব সময় পত্রাদি লিখিতে পারি না— যদি কখনো উত্তর না পাও বা বিলম্ব ঘটে কিছু মনে করিয়ো না। তুমি নিশ্চয় জানিয়ো তোমার মঙ্গল হয় এই আমার অন্তরের কামনা। সংসারের কল্যাণরূপিণী হইয়া থাক— তোমার চরিত্রের দীপ্তিতে

চতুর্দ্দিককে জ্যোতির্ম্ময় এবং হৃদয়ের মাধুর্য্যে সকলকে আনন্দিত করিয়া গৃহের মধ্যে পুণ্যপ্রতিমা হইয়া বিরাজ কর এই আমি মনের সঙ্গে প্রার্থনা করি।

আমাকে যদি চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ কর তবে ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতার ঠিকানায় লিখিয়ো। তোমার ঠিকানা পত্রের মধ্যে দাও নাই— বোধ করি ১২১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটেই আছ— সেই ঠিকানাতেই পত্র পাঠাইতেছি। ইতি ১২ই বৈশাখ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

৮ মে ১৯১০

ওঁ　　　　　　শান্তিনিকেতন
　　　　　　　　　　বোলপুর

পরম কল্যাণীয়াসু

মা, আজ আমার জন্মদিন। তাই এখানে আমাদের আশ্রমের বালকেরা আমাকে নিয়ে উৎসব করচে। আজ তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

তাঁকে প্রতিদিন বারম্বার ডাক্‌তে ডাকতেই মনের সমস্ত বাধা কাট্‌তে থাকে। তাঁর নাম ক্রমে ক্রমে আমাদের সমস্ত শরীর মনের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনকে পবিত্র করে তোলে। তুমি তাঁর নামের ধারা দিয়ে মনের সমস্ত ধুলো ধুয়ে ফেল। আপনাকে ভুলে গিয়ে তাঁকেই সব চেয়ে বড় করে সত্য করে জান্‌তে হবে। কিন্তু সংসারে আমরা দিনরাত্রি কেবল আপনাকেই দেখি বলে সেই আমাদের অহংই প্রবল হয়ে ওঠে। এই জন্যই বারবার তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তাঁকেই সত্য বলে জানবার অবকাশ ও অভ্যাস হয়— তা হলেই ধীরে ধীরে প্রবৃত্তির বাধা কেটে যেতে থাকে।

নিরাশ হোয়ো না— যতই বিলম্ব হোক্ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর নাম নেবার সাধনা কর তোমার জীবন আপনি ভিতরে ভিতরে কখন্ যে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে তা জান্‌তেও পাবেনা।

ঈশ্বর তোমার মনকে সর্ব্বত্র পূর্ণ করে তোমার জীবনকে সার্থক করুন। ইতি ২৫শে বৈশাখ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

২ জুলাই ১৯১০

ওঁ　　　　　　　　　　　　　　　　　　বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়েছি।

মাঝে আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ হয়েছিল। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছি। আমার শরীরের জন্যে কিছু মাত্র চিন্তা কোরো না— যতদিন এখানে আমার কাজ আছে ততদিন ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন। আমি অনেকদিন থেকেই অল্প আহার করে থাকি তাতে আমার শরীরের কোনো অনিষ্ট হয় না এবং আমার সমস্ত কাজকর্ম্মও সম্পূর্ণ বলের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারি।

তোমার সংসারের প্রতিদিনের কর্ম্মই তোমার ভগবানের উপাসনা হোক্। তোমার জীবন সুন্দর হোক্ তোমার চিত্ত নির্ম্মল হোক্— সকলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ সত্যে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ হোক্— তাহলেই তোমার সরল হৃদয়টি বিশেষভাবে তাঁকে স্মরণ না করলেও তিনি আপনি এসে তোমার অগোচরেও প্রতিদিন হাত বাড়িয়ে তোমার পূজা গ্রহণ করবেন। ইতি ১৮ই আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

৬ অগস্ট ১৯১০

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, সংসারের নানা গোলমালের মাঝখানে মনকে শান্ত ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত শক্ত সে কি আমি জানি নে? বিশেষত মেয়েদের সর্ব্বদাই অত্যন্ত ছোটখাট খুঁটিনাটির মধ্যেই দিন কাটাতে হয়— মনকে উদার ভাবের ক্ষেত্রে রাখবার উপায় ও অবকাশ মেয়েদের নেই। কিন্তু কি করবে মা? যা কঠিন তাই সাধন করতে হবে। এমন কোনো একটি মন্ত্রকে মনের মধ্যে অভ্যাস করে নেবে যেটি স্মরণ হবামাত্র মন একমুহূর্ত্তে সেই সবচেয়ে বড় জায়গায় গিয়ে ঠেক্‌বে। মনকে ঈশ্বরের মধ্যে স্থির করবার জন্যে রোজ খানিকটা করে সময় দিতে হয়— তাঁকে মনের মধ্যে অত্যন্ত কাছে করে একবার অনুভব করে নিতে হয়— তার পরে সমস্ত দিন সংসারের কাজকে তাঁর কাজ বলে জেনে তার সকল ঝঞ্ঝাট মাথায় করে নেবার জন্যে নম্রভাবে প্রস্তুত হতে হয়। যখনি মন উত্ত্যক্ত হয়ে উঠবে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌বে, আঘাত করতে ও আঘাত পেতে উদ্যত হবে তখনি মনকে টেনে ধরে এই কথাটি তাকে শোনাতে হবে যে, তোমার এ সমস্তই মিথ্যা, মায়া, তুমি আনন্দময়ের উপলব্ধি থেকে দূরে পড়চ বলেই এই রকম শুকিয়ে তপ্ত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌চ। শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌— যিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে অন্তরে বাহিরে চিরদিন আছেন, তাঁকেই

চরম সত্য বলে জানলে সংসারের সমস্ত ক্ষোভের কারণগুলো মুহূর্ত্তের মধ্যে অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়।

যাই হোক্ প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে মনকে শান্তিতে ও মাধুর্য্যে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তোলো— এ ছাড়া তোমাকে আর কি বল্‌তে পারি। সমস্তই নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে— সেই শক্তি তোমার নেই এ কথা কল্পনাও কোরো না— আছে শক্তি, তাকে অবিশ্বাস করে দুর্ব্বল হয়ে থেকোনা। ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে প্রেমে ও জীবনকে মঙ্গলে পূর্ণ করে তুলুন। ইতি ২১শে শ্রাবণ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ১৬

২০ জানুয়ারি ১৯১১

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি আজ পেয়েছি। শরীর আমার ভালই আছে। কিছু দিন পদ্মাতীরে বাস করে এসেছি। মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কয়েক দিন হল কলকাতায় ফিরে এসেছি।

তাঁর প্রেম তোমার চিত্তে অবতীর্ণ হয়ে তোমার অভাব অপূর্ণতা একেবারে ঘুচিয়ে দিক্ এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। সেই আনন্দময়ের এই সংসারকে সর্ব্বত্র তুমি আনন্দময় করে দেখতে থাক। এখানকার সুখে দুঃখে মানে অপমানে তাঁরই প্রকাশ এই কথা নিশ্চয় জেনে সমস্তই আনন্দের সঙ্গে বহন কর— প্রতিদিন যা কিছু পাবে সমস্তই শক্তির সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ কর। মনে মনে যখন-তখন বারম্বার তাঁর নাম নিতে থাক— তিনিই যে চিরন্তন সত্য এই কথাটা স্মরণ করে রাখবার এই একমাত্র উপায়। জীবনকে ছোট হতে দিয়োনা— আপনাকে সেই অনন্ত সত্যের মধ্যে বড় করে জান— জীবনে মরণে তোমার হৃদয়টি তাঁর মধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে এই কথাটি অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে পূজার ফুলের মত নির্ম্মল পবিত্র হয়ে, পুণ্যের সৌন্দর্য্যে সৌগন্ধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ— পাপের কালিমা অন্তরে বাহিরে কোথাও তোমাকে স্পর্শ না করুক। আপনাকে তাঁর কাছে নিবেদন করে দাও— তাহলে সংসারকে নূতন করে সুন্দর

করে পাবে— তোমার মানবজন্ম সার্থক হয়ে উঠ্‌বে। ইতি ৬ই মাঘ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৪ জুলাই ১৯১১

ওঁ　　　　　　　　　　　　বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, আমার পক্ষে চিঠি লেখা বড় কঠিন। সময় পাই না— শরীরও অপটু। চিঠি লিখি বা না লিখি তুমি মনকে উদ্বিগ্ন করিয়োনা। আমার এখন সকল কাজ হইতে ছুটি লইবার সময়— এইজন্য যতদূর সম্ভব কর্ম্মভার বাড়িতে দিই না।

মা তোমার অল্প বয়স— সম্মুখে দীর্ঘ সংসারের পথ— সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া আনন্দের সহিত অকুণ্ঠিত শক্তির সহিত যাত্রা করিয়া চল একদিন শান্তি পাইবে সার্থকতা পাইবে। বারম্বার কেন তুমি নিজের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া ধিক্কার দিতেছ? আমরা কে, যে, তোমাকে দূরে বসিয়া পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিব! তোমার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

আমার শরীর ক্লান্ত আছে বলিয়া তোমাকে আর লিখিতে পারিলাম না। ইতি ১৯শে আষাঢ় ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

১১ অগস্ট ১৯১১

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, পূর্ব্বের চেয়ে এখন আমি অনেকটা ভাল আছি।

তোমার মাতার "প্রবাহ" বইখানি আমি গিরিডি থাকিতে দেখিয়াছিলাম। কবিতাগুলির মধ্যে একটি স্নিগ্ধতা আছে—তোমার মার যে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্বশক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গণ্ডিটুকুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসরতা লাভ করিতে পারেনা। তাহা ছাড়া নানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরচনার সহিত পরিচয়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সে সুযোগও অতি অল্প। এই জন্য আমাদের লেখিকাদের কবিতা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দুর্ব্বলভাবে বিচরণ করে— তাহার মধ্যে সরলতা ও কোমলতা থাকে কিন্তু যথেষ্ট শক্তি থাকেনা। এই জন্য সাহিত্যে এইরূপ কবিতা কোনোমতেই নিত্যস্থান লাভ করে না। তাহা জুঁইফুলের মত এক সন্ধ্যার মধ্যেই ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে। কবির কবিত্বশক্তির অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে— জগতের সঙ্গে মানবজীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ অতি সামান্য বলিয়াই তাঁহাদের কবিত্ব কিছুদূর পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইয়া আর বেশি

বাড়িতে পায় না।

আমি আগামী কাল শনিবারে কলিকাতায় যাইব। তুমি যে ছেলেটির কথা লিখিয়াছ তাহাকে আমার কাছে একবার পাঠাইয়া দিয়ো। আমাদের বিদ্যালয়ে অনেকগুলি ফ্রি ছাত্র আছে— আর ত স্থান নাই। বিশেষত বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থার ভার আমার হাতে নাই— কারণ আমি সে সম্বন্ধে নিতান্তই অপটু। আমার হাতেই যখন সে ভার ছিল তখন বিদ্যালয় দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এইজন্য বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থায় আমি কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করি না। তবু যদি কিছু করিতে পারি আমি চেষ্টা করিব। ছেলেটির বয়স কত এবং তাহার স্বভাব কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক। আমাদের এখানে অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে এই জন্য আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। নূতন ছেলে লইবার সময় আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

ঈশ্বরের প্রেমে হৃদয়কে সরস করিয়া প্রফুল্লমুখে প্রসন্নমনে তুমি সংসারের সেবায় নিযুক্ত থাক এই আমি প্রার্থনা করি। ইতি ২৬শে শ্রাবণ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৯ অক্টোবর ১৯১১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্চি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নেই— কেবল কিছু দিন থেকে আমার মন এই কথা বল্‌চে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর ত সময় হবেনা। সমস্ত পৃথিবীর নদীগিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্চে— আমার চারদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম্ম ও সংস্কারের আবর্জ্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চির জীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকিনে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়— বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্ব্বে এই একটি ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্চি— এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।

তুমি জীবনকে কল্যাণময় ও সংসারকে পবিত্র ও মধুর করে

তোলো— তুমি চারিদিকে প্রসন্নতা বিকীর্ণ করে সুখদুঃখের উপর দিয়ে সহজে ও আনন্দে চলে যাও তোমাকে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১৬ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার উপর রাগ করবার ত কোনো কারণ হয় নি। ইতিমধ্যে আমি বোটে পদ্মার চরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। সেখানে নির্জ্জনে যখন থাকি তখন চিঠিপত্র লেখা আমার আর হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে আমার এই রকম সম্পূর্ণ ছুটি নেবার দরকার হয়। যখন আমি কলকাতায় কিম্বা কাজকর্ম্মের মাঝখানে থাকি তখন চিঠিপত্র লিখ্‌তে পারি কিন্তু যখন পূর্ণ অবকাশের মধ্যে বাস করি তখন সে অবকাশ ভাঙতে ইচ্ছা করি নে। আজকাল চিঠি অতি অল্পই লিখি।

আমি এই প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার মনকে শান্ত স্নিগ্ধ কর্তব্যরত করুন— প্রসন্ন চিত্তে তুমি আপনার জীবনকে গ্রহণ কর, সন্তুষ্ট মনে সংসারের কল্যাণ সাধন কর— তোমার চারিদিকের সঙ্গে সকল বিষয়েই তোমার সুন্দর যোগ হোক্, ইচ্ছা যেন বিদ্রোহী ও বিভ্রান্ত না হয়, নত শিরে নম্র মনে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন কর— পূজার অঞ্জলির মত নিজেকে সুন্দর ও পবিত্র করে তাঁর কাছে উৎসর্গ কর— কেবলি আপনার দিকে তাকিয়ে থেকোনা, আপনার কথা ভেবো না— যেখানে তিনি তোমাকে কাজ দিয়েছেন সেইখানেই তাঁর

আদেশ বহন করে চিরকাল তুমি তাঁর সেবিকা হয়ে থাক।
ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

২৯ জানুয়ারি ১৯১২

ওঁ　　　　　　　　　　　　　　　　কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি ভালই আছি। কিছু দিন একলা বোটে করে নদীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। কাল রবিবারে টাউনহলে আমার সংবর্দ্ধনা হয়ে গেছে সেই উপলক্ষ্যে কলকাতায় আস্‌তে হয়েছে। মা, তুমি অকারণে মনকে বিচলিত হতে দিয়ো না— নিজেকে একেবারে ভুলে যেতে অভ্যাস কোরো— নিজের দিকেই সর্ব্বদা তাকিয়োনা— তোমার অন্তর্যামীকে নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ জেনে পবিত্র মনে শান্ত চিত্তে নিজের কর্ত্তব্যসাধন করে যেয়ো। আপনার প্রবৃত্তি আপনার ইচ্ছাকেই বড় হয়ে উঠ্‌তে দিয়ো না— আপনার মনের কোনো উদ্দাম কল্পনাকে কোনোমতেই কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিয়ো না— ভালো ভাব, ভালো কর, ভালো হও। ইতি ১৫ই মাঘ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মা, আমার বিলাতে যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছে। একমাস আছে। আগামী ৬ই চৈত্রে জাহাজ ছাড়বে। আমার বোলপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। য়ুরোপে যাবার পূর্ব্বে কিছুদিন নির্জ্জনে একটু শান্তি ভোগ করবার জন্যে এখানে পদ্মার তীরে এসেছি। অনেকদিন থেকে অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে দিন কাট্‌ছিল— এই একটা মাস চুপচাপ করে পড়ে থাকব।

ভারতবর্ষ হতে বিদায়ের পূর্ব্বে তোমাকেও আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে যাচ্চি। তুমি মনের মধ্যে বল লাভ কর— অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারের মঙ্গলব্রত পালন কর— অম্লান পবিত্রতার দ্বারা গৃহের মধ্যে পুণ্যদীপটি জ্বালিয়ে রাখ— তোমার নির্ম্মল প্রীতির মাধুর্য্যে তোমার চারিদিক মধুময় হয়ে উঠুক। ইতি ৭ই ফাল্গুন ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

৮ মে ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। কিছু দিন হতে নানা কারণে উদ্বিগ্ন আছি। আমেরিকায় যাবার আয়োজন করেছিলুম কিন্তু বাধা পড়াতে আপাতত যাওয়া হলনা।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৫ বৈশাখ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

১৫ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় কিছুদিন থাকবার সংকল্প ছিল, প্রয়োজনও ছিল। জনতার উৎপীড়নে অসুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে হোলো— তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারলনা।

মনে আছে তোমাকে পত্র লিখেছিলুম, কি লিখেছিলুম মনে নেই। তখন পত্র লেখা আমার পক্ষে সহজ ছিল— কাউকেই বঞ্চিত করি নি, এখন জীর্ণ দেহের খাঁচার মধ্যে মন হয়েছে কৃপণ, এখন সব লেখাই বন্ধ করার সময় নিকটে আসচে।

আবার কোনো এক সময়ে কোনো না কোনো তাগিদে কলকাতায় যাওয়া ঘটবে— তখন সুযোগ পাও তো দেখা কোরো, খুসি হব। শান্তিনিকেতন দুর্গম নয় দূরবর্ত্তীও নয়, এখানে কখনো আসতে পারো তো এসো। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৪৩

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংযোজন

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত

১৯ জুন ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা ভাল আছে— এখন আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয় না!

ইণ্ডিয়ান প্রেস আমার বাংলা বইয়ের প্রকাশক। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হৌস তাহাদের একমাত্র এজেণ্ট। আমরা কমিশন সেলে বিক্রয়ের অধিকার পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোনোমতেই রাজি করিতে পারি নাই। আর কাহাকেও বেচিতে দিলে উহাদের এজেণ্টের যে অল্প ক্ষতি হয় তাহা উহারা স্বীকার করিতে রাজি হয় না।

মীরা ভালই আছে। ইতি ৪ আষাঢ় ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থপরিচয়

কাদম্বিনী দত্ত (১২৮৫ ?-১৩৫০) লোকসমাজে সুপরিচিতা ছিলেন না, বা প্রচলিত অর্থে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরজিজ্ঞাসা ও "অসামান্য ধীশক্তি" রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল— প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল উভয়ের মধ্যে পত্রযোগে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। কাদম্বিনী দেবী মহিমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা, কুষ্টিয়ার অন্তর্গত রূপিয়াট গ্রামের প্রাণগোপাল দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের অনতিকাল পরেই স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনায় এই শোকের শান্তির সন্ধানে উৎসুক হইয়া রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে বিশেষ আশ্রয় লাভ করেন এবং ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের সহিত পত্রব্যবহারেও প্রবৃত্ত হন।

কাদম্বিনী দেবী রবীন্দ্র-রচনা দ্বারা অল্প বয়সেই কতদূর প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চায় তাঁহার সঙ্গিনী ও উৎসাহদাত্রী **সরলাবালা** সরকার তাহার একটি নিদর্শন দিয়াছেন ; 'রাজর্ষি' পড়িয়া তিনি এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, মালঞ্চী গ্রামে পিত্রালয়ে দুর্গোৎসবে পশুবলি রহিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আহার ত্যাগ করেন, তিনদিন পরে, বলি বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বালিকাকে আহারে সম্মত করানো যায়। বনলতা দেবী -সম্পাদিত, 'কেবল মহিলাদিগের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত' 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রে (প্রকাশ ১৩০৪ মাঘ) কাদম্বিনী দেবীর কোনো কোনো রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সরলা দেবী চৌধুরানী -প্রতিষ্ঠিত ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলে তিনি কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন।

কাদম্বিনী দেবীর ভ্রাতা 'মৌচাক'-সম্পাদক **সুধীরচন্দ্র** সরকার রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রগুলি রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে অনুগ্রহপূর্বক দান করিয়াছেন।

সরলাবালা সরকারের কন্যা, আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের পত্নী নির্ঝরিণী সরকার রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পত্রব্যবহারের বিবরণ ২২ বৈশাখ ১৩৬৩ সংখ্যা দেশ পত্রে 'কবি-পরিচিতি' প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন— নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।— এই প্রবন্ধে উল্লিখিত পিসিমা, কাদম্বিনী দত্ত।

খুব অল্প বয়সেই আমার কবির লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হয়তো সব কিছু বুঝবার মতো জ্ঞান তখনও হয় নি কিন্তু তবু তাঁর লেখা যে কী ভালো লাগত! আমার মা আর আমার পিসিমা সর্বদাই কবির লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন। এমনভাবে কবির সম্বন্ধে তাঁরা কথাবার্তা বলতেন যেন কবি তাঁদের একজন ঘরের লোক, একজন পরমাত্মীয়। তাঁদের মুখে শুনে শুনে সেই অতি অল্প বয়সেই আমারও কবির প্রতি মনে মনে একটা গভীর আত্মীয়তা-বোধ জন্মেছিল। যদিও তাঁকে তখনও দেখি নি এবং তাঁর সঙ্গে যে কোনোদিন দেখা হবে সে সম্ভাবনাও ছিল না, তবুও মনে হত তিনি যেন নিতান্ত আপনার জন।

ছেলেবেলা থেকেই দেশের উপর একটা অনুরাগও মনের ভিতর ছিল। তাই যে ছেলেরা দেশের জন্য জীবনপণ করেছিল তাদের উপরও ছিল একান্ত আত্মীয়তা-বোধ। তাই মানিকতলার বোমার মামলা ও তাহার ফলাফলে আমার মন একেবারে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মনের সেই অবস্থায় একজন আশ্রয়দাতা, একজন সান্ত্বনা দেবার পাত্রের জন্য মন যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তখনই আমি কবিকে পত্র লিখি। বয়স আমার তখন ষোলো-সতেরো বৎসরের বেশি নয়। আমি তাঁকে চিঠি লিখছি এ কথা ভাবতে নিজেই নিজের এই সাহসে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কবিকে আমি চিঠি লিখছি? তিনি এই চিঠি পেয়ে কি

ভাববেন? তিনি কি এই চিঠির, আমার এই পাগলামির জবাব দেবেন? এও কি সম্ভব হবে?

কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, চিঠি পেয়েই তিনি জবাব দিলেন। কি মিষ্টি তাঁর সেই জবাব। শুনেছি তিনি নাকি চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'বড়ো সরল এই মেয়েটি।'

তার পর কবিকে আমি আরো চিঠি লিখেছিলাম এবং প্রতিবারই উত্তর পেয়েছিলাম খুবই শীঘ্র শীঘ্র। তাঁর উত্তরে তাঁর হাতের লেখা পত্র, সে যেন দেবতার আশীর্বাদী নির্মাল্যের মতোই আমার অতি যত্নের ধন।

তার পর অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল, কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং কেবল একবার নয় তিনবার আমি তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। সেসব স্মৃতি আজিও আমার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

আমার সেই সঞ্চিত মহামূল্য সম্পদ সেই পত্রগুলি যে কোনোদিন লোকের কাছে বাহির করব সে কল্পনা আমার ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেগুলি প্রকাশ করতে দিতে হয়েছে। সেগুলি দেশ-পত্রিকার কোনো একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবির হাতের ঠিকানা লেখা খামটিও আমি প্রকাশ করতে দিয়েছিলাম।

কবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি যে বাংলাদেশে জন্মেছেন বাংলার এ কি কম সৌভাগ্য! কিন্তু সে সৌভাগ্য অনুভব করবার ও সমস্ত জীবনযাপনে গ্রহণ করবার মতো অনুভূতি ও সাধনা আমাদের আছে কি? আজ তাঁর পুণ্য জন্মতিথিতে এই কথাই বার বার মনে হচ্ছে।

তাঁর রচনায় যে কি অমৃতের আস্বাদ ছিল, আমি তা লিখে বুঝাতে পারব না। অতি অল্প বয়সে আমি 'রাজর্ষি' পড়েছি আর তখন আমার

শিশুমনে কি একটা অনুভূতি হত যে, অনবরত চোখের জল পড়ত। তরুণ জয়সিংহের মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের সম্বন্ধে যে মনের ভাবের বর্ণনা আছে, কবির সম্বন্ধে আমার সেইরকম মনোভাব ছিল। যেন আকাশের চাঁদের উপর শিশুর আসক্তি।

তাঁর কাছে যখন প্রথম যাই তখন কি যে মনের অবস্থা হয়েছিল আজ তা বলে বুঝানো অসম্ভব। তাঁকে প্রণাম করেছি, তিনি সস্নেহে আমার সেই প্রণাম গ্রহণ করেছেন, মাথায় তাঁর আশীর্বাদী হাতের ছোঁয়া পাচ্ছি; এ কি স্বপ্ন, না সত্য? বোধহয় এই রকমই মনে হয়েছিল।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, নিয়ত কত লোক তাঁর দর্শনার্থী হয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছে, তাঁর প্রিয়জন সব সময় তাঁকে ঘিরে রয়েছেন, আমার সঙ্গে তাঁর কতটুকুই বা দেখা হয়েছে, তবু কোনোদিন তিনি আমাকে ভুলে যান নি। যখনি দেখা হয়েছে তাঁর চোখে সেই অতি পরিচিতের সঙ্গে মিলনের সস্নেহ ভাবটি ফুটে উঠেছে। আর মনে হয়েছে আমি যেন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে যাই নি; সেই ছোটো মেয়েটিই আছি।

তাঁর বর্ষামঙ্গল প্রভৃতিতে এবং যখন তিনি কোনো সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন অথবা নটীর পূজা প্রভৃতি অভিনয় করিয়েছেন, সব জায়গাতেই তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং সেইসব ছবি এখনও মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে। আজ তাঁর পুণ্য আবির্ভাব-দিনে সেইসব কথাই মনে পড়ছে।

ছেলেবেলাতেই তাঁর অনেক রচনা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আর সে লেখায় যে কি রস পেতাম তা তাঁরই এক ছত্র দিয়ে বলতে পারি, 'না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে কেমনে কিছু না জানি।'

নির্ঝরিণী দেবী রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের মূল-পত্রগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে অনুগ্রহপূর্বক দান করিয়াছেন।

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত অধিকাংশ পত্র বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, নীচে তাহার সূচী প্রকাশিত হইল—

সাময়িক পত্র	পত্র-সংখ্যা
বিশ্বভারতী পত্রিকা	
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪	১-৪
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪	১১, ১৯, ২৪, ৩৫, ৩৮, ৪৪ ৫৪, ৯৪, ৯৫
প্রবাসী	
পৌষ ১৩৩৪	১৫-১৬, ২০-২১, ২৩
মাঘ ১৩৩৪	২৫-২৬, ৩০-৩২, ৩৪ ৩৬-৩৭
চৈত্র ১৩৩৪	৪০, ৪২, ৬৮, ৭৭, ৭৯, ৮৭
বৈশাখ ১৩৩৫	৪৩, ৮৮-৯১
বর্তমান	
বৈশাখ ১৩৫৪	৯২
নবমঞ্জরী	
১৯৪৫ (?)	৯৩

৩৪, ৪৩ ও ৯১ -সংখ্যক পত্র, শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় -সম্পাদিত রচনাসংগ্রহ নবমঞ্জরীতে (১৯৪৫ ?) পুনর্মুদ্রিত হয়; ৯৩-সংখ্যক পত্রও ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৬-সংখ্যক পত্র ১৩৫৩ শারদীয় সংখ্যা হিন্দুস্থান

পত্রে এবং ৯৪-সংখ্যক পত্র ১৩৫৫ শারদীয় সংখ্যা হিন্দু পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। অধিকাংশ মূলপত্র রক্ষিত হইয়াছে, তদনুযায়ী মুদ্রিত; ১, ৩০, ৩১, ৯২ ও ৯৪ -সংখ্যক পত্র সুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক রক্ষিত প্রতিলিপি অনুযায়ী মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যে চিঠিগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তাহার কোনো-কোনোটিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, কোনো-কোনোটির অংশবিশেষ পরিবর্জিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থে সেগুলি মূলানুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে।

নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্রাবলী ১৩৪৮ সালের শারদীয় সংখ্যা দেশ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল চিঠি সবগুলিই রক্ষিত হইয়াছে ও তদনুযায়ী এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্রাবলী

পত্র ২। পৃ ৫। 'সাকার নিরাকার…লইয়া বাদবিবাদ করিতে চাহি না।'

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত ১৫-সংখ্যক ৪ জুলাই ১৯১০ তারিখের পত্রে (পৃ ২৭-৩৩) ও ৩০-সংখ্যক ২২ মে ১৯১২ তারিখের পত্রে (পৃ ৫৬-৫৮) এ বিষয়ে আরও আলোচনা আছে। কৌতূহলী পাঠক রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিও পড়িতে পারেন: 'সাকার ও নিরাকার', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯; 'নিরাকার উপাসনা', আধুনিক সাহিত্য, পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯; গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৫৫৯-৬০; 'রূপ ও অরূপ', সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮।

পত্র ৫। পৃ ১১। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪) প্রসঙ্গ এই পত্রে উল্লিখিত।

পত্র ৫। পৃ ১১। ‘কন্যাদুইটি’। পত্র ৬। পৃ ১২। ‘বর্ত্তমান দুই কন্যা’। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরা। ইতিপূর্বে মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু (১৯০৩) হয়।

পত্র ৯। পৃ ১৯। মোহিত বাবু=মোহিতচন্দ্র সেন।

পত্র ১০। পৃ ২১। ‘বোলপুরে বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছি।’ ১৩১৫ (১৯০৮) সালের পূজাবকাশের পর অল্প কয়েকজন ছাত্রী লইয়া বালিকা-বিভাগ প্রবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩১ চৈত্র ১৩১৫ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেক দিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগইনি— ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।[1] এই বালিকা-বিভাগ এ সময়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, দুই বৎসর চলিয়াছিল।

পত্র ১৫। পৃ ৩২। ২-৫ ছত্রে বর্ণিত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে এরূপ বিদ্ধ করিয়াছিল যে দীর্ঘকাল পরেও ইহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন; ১৩৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষ উৎসবে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ের উল্লেখ করেন—

আমি এক সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্ণ হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক

---

[1] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংগ্রহ, ‘স্মৃতি’, পৃ ৭৬।

পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে।…

একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয় রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে **শিলাবৃষ্টি** হল; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এতবড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে।[১]

—৭ পৌষ ১৩৩৯

পত্র ২২, ২৪-৩০। ১৩১৮ (১৯১১) সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার কয়েকবার প্রস্তাব হয়, নানা কারণে কয়েকবার সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে, অবশেষে ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৯১২ মে) তিনি বিলাতযাত্রা করেন। এই প্রসঙ্গ এই কয়খানি চিঠিতে উল্লিখিত।

পত্র ৩৭। পৃ ৬৯। ‘কলিকাতার সভায় বক্তৃতা’। বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্‌বোধন-সভায় বক্তৃতা, ‘কর্মযজ্ঞ’, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪।

পত্র ৬২। পৃ ৯৩। নির্ঝরিণী=নির্ঝরিণী সরকার।

পত্র ৭৬। পৃ ১০৬। মণিলাল=মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

---

[১] কালান্তর, ‘নবযুগ’।

পত্র ৭৭, ৭৯। ১৯২১ জুলাইতে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ-ভ্রমণান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধী -প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন দেশের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন নাই,[১] ফলে তাঁহার অনেক অনুরাগীর মনও বিচলিত হয়। এই কালে কবি দেশচর্যা সম্বন্ধে যে-সকল মতামত প্রকাশ করেন, কাদম্বিনী দেবী সেই প্রসঙ্গে কবির সহিত পত্রব্যবহার করিয়া থাকিবেন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে মৌলানা হজরত মোহানী, স্বরাজের অর্থ 'বিদেশীর নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা'[২] ("complete independence free from all foreign control") এইরূপে ব্যাখ্যাত হউক, এই প্রস্তাব করেন। ইহা গৃহীত হয় নাই, মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পরে *Young India* পত্রে তিনি লেখেন—

Maulana Hasrat Mohani put up a plucky fight for independence on the Congress platform and then as President of the Muslim League and was happily each time defeated. There is no mistake about the meaning of the Maulana. He wants to sever all connection with

---

[১] দ্রষ্টব্য, কালান্তর, 'সত্যের আহ্বান' ও 'শিক্ষার মিলন'।

[২] অবশেষে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) কংগ্রেসের 'ক্রীড' পরিবর্তিত হইয়া 'পূর্ণ স্বাধীনতা' কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

the British people even as partners and equals and even though the Khilafat question be satisfactorily solved. It will not do to urge that the Khilafat question can never be solved without complete independence. We are discussing merely the theory. It is common cause that if the Khilafat question cannot be solved without complete independence, i.e., if the British people retain hostile attitude towards the aspirations of the Islamic world, there is nothing left for us to do but to insist upon complete independence. India cannot afford to give Britain even her moral support and must do without Britain's support, moral and material, if she cannot be induced to be friendly to the Islamic world.

But assuming that Great Britain alters her attitude, as I know she will when India is strong, it will be religiously unlawful for us to insist on independence. For it will be vindictive and petulant. It would amount to a denial of God, for the refusal will then be based upon the assumption that the British people are not capable of response to the God in man. Such a position is untenable for both a believing Musalman and a believing Hindu.

India's greatest glory will consist not in regarding Englishmen as her implacable enemies fit only to be turned out of India at the first opportunity but in turning

them into friends and partners in a new commonwealth of nations in the place of an Empire based upon exploitation of the weaker or undeveloped nations and races of the earth and therefore finally upon force.[১]

—*Young India*, Volume iv, No. i, January 5, 1922 ; p. 4.

পত্র ৮২ । পৃ ১১৩ । বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও বিশ্বভারতীর সুহৃদ্‌বর্গের সহিত যোগরক্ষার জন্য ১৩২৯ সালে কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়, এই পত্রের প্রথমে সেই বিষয় উল্লিখিত। এই সম্মিলনীর অনেক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় রচনা পাঠ করিয়াছেন।

পত্র ৯১ । পৃ ১২৪ । 'সরসীবাবু কবিতাকে যেদিক থেকে যাচাই করতে চান'।

অল-ইণ্ডিয়া সায়ান্স কংগ্রেসে পঠিত “A Peculiarity in the Imagery in Dr Rabindranath Tagore's Poems” প্রবন্ধে[২] রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষত্বের আলোচনা করেন—“সে বিশেষত্বটি এই যে, তাঁহার অনেক কবিতাতেই প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত পর পর আছে।”[৩] এই প্রসঙ্গে বর্তমান পত্র লিখিত।

সরসীলাল সরকার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে অপিচ লিখিয়াছিলেন—“যে বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার ভিতর তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে এক অখণ্ড তাৎপর্য-গ্রন্থনের সূত্রস্বরূপে রহিয়াছে, সে বাণী

[১] নির্মলকুমার বসুর সৌজন্যে

[২] *The Calcutta Review*, 1928

[৩] সরসীলাল সরকার, 'রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা'।

শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।···এই মন্ত্র···অবচেতনার ভিতর দিয়া কবির রচনায় তাল, গান ও গতির ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে··· ।

এই প্রসঙ্গে কবির সহিত লেখকের সাক্ষাতে যে আলোচনা হয়, ১৩৩৫ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে অনিলকুমার বসু "রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ" নামে তাহা লিপিবদ্ধ করেন।[১] নিম্নে তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—

সরসীবাবু॥ আর একটা জিনিস আছে যাকে symbolism বলে। উপনিষদের শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্র আপনার লেখার মধ্যে যেন symbolism হয়েছে এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন ? Symbolism অর্থে যেমন মনে করুন যুদ্ধক্ষেত্রের flag (নিশান)। নিশান একটা কাষ্ঠফলকে জড়ানো বস্ত্রখণ্ড মাত্র। কিন্তু যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে তারা তো একে সেভাবে নেয় না। তারা মনে করে এটাই তাদের দেশের সম্মান ও স্বাধীনতার প্রতীক। সেইজন্য মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তারা পতাকা ধরে রাখতে ভীত হয় না। মহাত্মা গান্ধীর চরকা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যেতে পারে। চরকার যে কোনো economic value নেই একথা আপনি সবুজ পত্রে লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্মুখে এই চরকা তাঁর economic সমস্যা সমাধান হিসাবে উপস্থাপিত করেন নি ; বিদেশী বর্জন ক'রে দেশী দ্রব্য ব্যবহার করব, দেশের দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাব, এই সকলের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাল গান ও গতি, যাহা

---

[১] সাইকো অ্যানালিসিস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এই আলোচনায়, ও সরসীলাল সরকারকে লিখিত ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮ তারিখের একখানি পত্রে ('সাইকো-এনালিসিস', বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮) লিপিবদ্ধ আছে।

'মানসী'তে[১] প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের বক্তব্য, সেগুলি কি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্রের প্রতীক (symbol) স্বরূপ আপনার মনের মধ্যে নাই ?

কবি॥ তোমার ব্যাখ্যা যে সম্ভব হতে পারে তা আমি অস্বীকার করি না। উপনিষদের এই মন্ত্র আমারও জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র নিয়ে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় বহুবার অনেক কথাই লিখেছি। সুতরাং ইহার আভাস যে আমার কবিতাগুলির মধ্যেও থাকবে তা কিছুই বিচিত্র নয়। তবে আমি যে সর্বদাই এই মন্ত্র স্মরণ করে লিখে গেছি, এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে। Symbolsএর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে একটা-কিছু লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য ঠিক করে রাখে, যাকে সে উপলব্ধি করবে। যাহাতে আমরা এই লক্ষ্য ভুলে না যাই, তাকেই সহজভাবে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা রয়েছে এই symbol সৃষ্টির মধ্যে। জাপানে কচি গাছের ডালকে স্বর্গের symbol স্বরূপ ব্যবহৃত হতে দেখেছি। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যেই যদি আমরা এই symbol দেখবার চেষ্টা করি, তা হলে ভুল হবে। symbolকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; এবং সেগুলির মধ্যে symbolকে হয়তো ঠিকভাবে নাও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা বলে সেগুলিকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দেব না, কারণ তা হলে জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে ভুলে যাওয়া হবে।

পত্র ১। ইহা অনুলিপি হইতে মুদ্রিত; মূল চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই, তাহাতে তারিখ ও স্বাক্ষর ছিল কি না জানা যায় না। এই গ্রন্থে মুদ্রিত

---

[১] 'রবীন্দ্রকাব্যে পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব', মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে ইহাই প্রথম, এই অনুমানে এটিকে প্রথমে বসানো হইয়াছে।

পত্র ১২। মূল পত্রে তারিখ ১৩১৫ কি ১৩১৬ স্পষ্ট বোঝা যায় না, ১৩১৫ হইতে পারে। পূর্বপত্রে (১৩১৬) 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের যেরূপ উল্লেখ আছে তাহাতে এই চিঠিটি ১৩১৬ সালের হইতে পারে, এই অনুমানে ১৩১৬ তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

পত্র ২২। ইংরেজি তারিখ ১৭ অক্টোবর স্থলে ২৬ অক্টোবর হইবে।

পত্র ২৭ ও ৩১। ইংরেজি তারিখ পোস্টমার্ক হইতে গৃহীত।

নির্ঝরিণী দেবীকে লিখিত পত্রাবলী

পত্র ১। পৃ ১৩৫। 'ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের, বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না।'

পত্র ২। পৃ ১৩৭। 'তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ…।'

পত্র ৩। পৃ ১৩৮। 'এই কথা মনে রেখো, নিজের জন্যেই কি, আর দেশের জন্যেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য তাই একমাত্র সত্য।'

১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা-নিক্ষেপে দুইজন ইংরেজ মহিলার মৃত্যু ও মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার প্রসঙ্গ এই পত্রগুলিতে উল্লিখিত। এইসকল ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' এবং 'সমস্যা' প্রবন্ধে 'ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিত-ব্যাপারটা কি' এবং 'সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া' এই বিষয় আলোচনা করেন, পত্রে 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের অন্তর্গত এই দুইটি প্রবন্ধ উল্লিখিত।

পত্র ৩। পৃ ১৩৮। 'আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি।'

পত্র ১৫। পৃ ১৫৬। 'এমন কোনো একটি মন্ত্রকে মনের মধ্যে অভ্যাস করে নেবে যেটি স্মরণ হবামাত্র মন একমুহূর্তে সেই সবচেয়ে বড় জায়গায় গিয়ে ঠেক্‌বে।'

এই প্রসঙ্গে, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এইসকল পত্র উল্লেখযোগ্য—

আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও 'পিতা নোঽসি' এবং 'অসতো মা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি— করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে— কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনোপ্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো আমি গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান করিয়া থাকি। …ইতি ১৮ই পৌষ ১৩১৭

—প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮

…মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়— মন্ত্রসাধন ছাড়া তার অন্য কোনো পথ আমি ত জানি নে। যখন একটু অবকাশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— শান্তম্ শিবমদ্বৈতং এই মন্ত্রটাকে মনের একেবারে তলা পর্যন্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো— ঐ কথাগুলো যেন তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। ইতি ৯ই ফাল্গুন ১৩১৭

—প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮

বিভিন্ন ভাষণে এইসকল মন্ত্র ব্যাখ্যান করিয়াছেন— বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ধর্ম, ও শান্তিনিকেতন ১-১৭ খণ্ড।

বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র মুদ্রিত, কাদম্বিনী দত্তকে লিখিত ৯১-সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ ১৮৩-৮৫) এবং ৯২-সংখ্যক পত্রও (পৃ ১২৭) দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৮। পৃ ১৬১। ‘তোমার মাতার “প্রবাহ” বইখানি।’ শ্রীসরলাবালা সরকার -লিখিত কাব্যগ্রন্থ।

পত্র ১৯। পৃ ১৬৩-৬৪। তৃতীয়বার বিদেশযাত্রার (১৯১২) প্রাক্‌কালে লিখিত পত্র। ডাকঘর রচনার (১৯১১) সময়েও যে এই সুদূরের আহ্বান কবির মনকে ব্যগ্র করিয়াছিল, তাঁহার ডাকঘর-ব্যাখ্যানের (১৩২২) কালীমোহন ঘোষ -কৃত একটি বিবরণে[1] সে কথা বিশেষ করিয়া জানা যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ‘পথের সঞ্চয়’ গ্রন্থ-ভুক্ত বিলাত-“যাত্রার পূর্বপত্র”।

পত্র ২১। পৃ ১৬৭। ‘কাল রবিবারে টাউন হলে আমার সংবর্দ্ধনা’। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা। শ্রীসীতা দেবী -প্রণীত ‘পুণ্যস্মৃতি’ গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে।

---

[1] শ্রীশান্তিদেব ঘোষ -প্রণীত রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে ‘কয়েকটি তথ্য’ অধ্যায়ে মুদ্রিত। ‘ডাকঘর’ প্রসঙ্গে অপিচ দ্রষ্টব্য *Letters To a Friend* গ্রন্থে মুদ্রিত সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৪ জুন ১৯২১)। তাহার অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হইল—

I remember, at the time when I wrote it [*The Post Office*], my own feeling which inspired me to write it. Amal represents the man whose soul has received the call of the open road— he seeks freedom from the enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable.

চিঠিপত্র গ্রন্থমালার পূর্বানুসৃত রীতি অনুযায়ী মূল পত্রের, তদভাবে সাময়িক পত্রের প্রথম মুদ্রণের, পাঠ বানান ইত্যাদি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বানানপদ্ধতির তারতম্য লক্ষিত হইবে।

চিঠির শীর্ষদেশে বাম দিকে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ইংরেজি তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিঠিতে প্রদত্ত বাংলা তারিখের অনুযায়ী; কতক ক্ষেত্রে পোস্টমার্ক হইতে ঐ তারিখ লওয়া হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তারিখটি তারকাচিহ্নিত। ঐ চিহ্ন যে স্থলে তারিখের পরে আছে, সে ক্ষেত্রে চিঠি বিলির তারিখ বুঝিতে হইবে; যে ডাকঘর হইতে বিলি হইয়াছে তাহার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে তারিখের পূর্বে তারকাচিহ্ন আছে সে ক্ষেত্রে চিঠি ডাকে দিবার তারিখ বুঝিতে হইবে; ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬১

বর্তমান সংস্করণে সংযোজন: শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত কাদম্বিনী দেবীকে রবীন্দ্রনাথের ১৯ জুন ১৯১৯ তারিখে লিখিত অপ্রকাশিত পত্র। ৭২-সংখ্যক পত্রের তারিখ: বড়োবাজার ২৬ জুলাই ১৯২১।

এ ছাড়াও কতকগুলি মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে।

১৯৯২

মূল্য ৩৩·০০ টাকা

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

T4

41 (8)

336785

বিচিত্রা

চিঠিপত্র ১ । পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২ । জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩ । পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪ । কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫ । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬ । জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭ । কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

ছিন্নপত্র । শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী । ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী । শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

অষ্টম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ অষ্টম খণ্ড
প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭০
সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৩৯৯

পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীসৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত
সান্ লিথোগ্রাফিং কোম্পানি
১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড। কলিকাতা ১০

সূচীপত্র

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রাবলী ১-২১৫

সংযোজন ॥ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রাবলী ২১৭-২২৬

পরিশিষ্ট ॥ প্রিয়নাথ সেনের পত্রাবলী ২২৯-২৭৮

গ্রন্থপরিচয় ২৮১-৩২৮

- ভূমিকা ২৮১
- পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ২৮৯
- পত্রে-উল্লিখিত বিদেশী গ্রন্থ ৩১৯
- ব্যক্তি-পরিচিতি ৩২৩
- বিজ্ঞপ্তি ৩২৬
- সংকেত ৩২৮

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ মুখপাত
বান্ধবমণ্ডলীতে প্রিয়নাথ সেন ১

পাণ্ডুলিপিচিত্র

প্রিয় বাবু— আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ ৮
ভাই, জলে বাসা বেঁধেছিলেম ২২
ভাই, Nobel prize সম্বন্ধে ২৭৬
এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু ২৮০

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

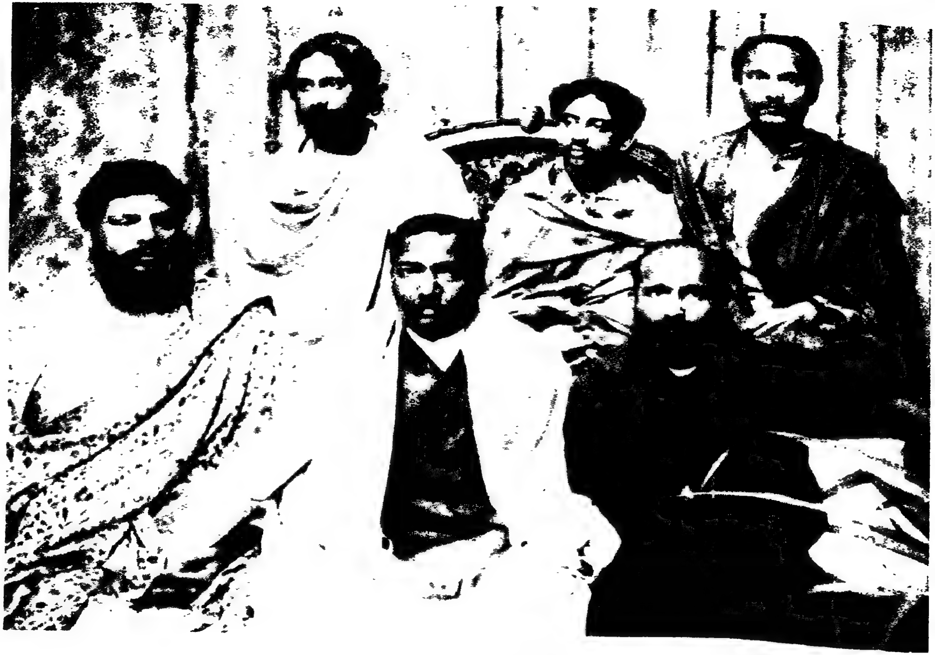

সম্মুখে : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । প্রিয়নাথ সেন । বৈকুণ্ঠনাথ দাস
পশ্চাতে : রবীন্দ্রনাথ । প্রমথনাথ রায়চৌধুরী । জগদিন্দ্রনাথ রায়

১

[? ১৮৮১]

প্রিয় বাবু—

আগামী ভারতীতে আপনার “পাতার কুটীরে” পাঠাইলেই হইবে— অন্যটি আমার ভাল মনে পড়িতেছে না। এখন আমি আমাদের অপেরার রিহর্সলে নিতান্ত ব্যস্ত আছি। তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি লিখিতেছি। আপনি এখানে যেদিন ইচ্ছা একদিন দুপর বেলা আসিলেই হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৮২]

প্রিয় বাবু—

আমি কিছুদিন থেকে সারস্বত সমাজের হ্যাঙ্গামা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম— এখনো অল্প অল্প চল্‌চে— তাই আর আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রভৃতি হয়ে ওঠে নি। আপনার চিঠি যখন এখেনে এসেছিল, আমি তখন মেজদাদাদের ওখেনে ছিলুম। কাল সন্ধের সময় এসে পেলুম।

নগেন বাবুর কবিতা পেলুম, খুব ভাল হয়েছে, দেখা হলে এ বিষয়ে কথা কওয়া যাবে। ভারতী বেরিয়েছে। এবারকার কবিতাটি তেমন ভাল লাগ্‌বে না। একখানা ভারতী আপনাকে পাঠাই।

কালমৃগয়া এখনো ছাপা হয় নি। প্রেসে দেওয়া হয়েছে বটে।

একখানা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র আপনাকে পাঠাই।

শ্রীশ বাবুর স্ত্রীর Clairvoyance-ব্যাপারটা আমার দেখ্‌বার খুবই ইচ্ছে আছে— আপনাদের সুবিধে অনুসারে একদিন নিয়ে গেলে বড় ভাল হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[১৮৮০]

প্রিয় বাবু—

কাল আপনাদের ওখানে যাই-যাই করিয়া বিশেষ কারণে যাওয়া ঘটিল না। আপনি বোধ করি— বিহারীবাবুর কাছে, আমাদের সমালোচনী সভার বিশেষ বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন। আপনাকে সেই সভায় যোগ দিতেই হইবে। কি বলেন। আজ আমাদের প্রথম দিন। ২টার সময়ে আরম্ভ হইবে। আপনি যদি আহার করিয়াই আমাদের এখানে আসেন, তবে আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

কাল যখন মেজদাদাদের ['ওখানে'] তখন আপনার এক চিঠি পেলুম, লিখেচেন "কাল" আস্‌তে। আপনার চিঠি কবেকার লেখা ঠাহর করতে পারি নি— তাই জিজ্ঞাসা করচি— সে কাল কি আজ? যদি আজ হয় ত যাব— জবাবটা লিখে দিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

সোমবারের দিন আসিবেন, আমি বাড়ি থাকিব। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট পাঠাই। আমি এখন এগারই মাঘের গান লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত আছি। চিঠি সংক্ষিপ্ত হইল—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

আমাকে মাপ করিতে হইবে— আমি কখন সোমবারের দিনে বাড়িতে অনুপস্থিত থাকি না, তাই আপনাকে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিশেষ কারণবশতঃ সোমবারে কোনক্রমে বাড়িতে ফিরিতে পারি নাই। আজ আপনার বাড়িতে আসিয়া আপনার দেখা পাইলাম না, চিঠি লিখিয়া চলিলাম— কখন্ আপনার অবসর লিখিবেন, আমি দেখা করিতে পুনশ্চ আসিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

আমি এখন ১৪নং South Circular Road মেজদাদাদের বাড়িতে আছি— এ জায়গাটা যোড়াসাঁকোর দিক থেকে এত দূরে যে মনে হয় যেন নির্ব্বাসনে আছি— তাই জন্যে আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রভৃতি আর হয়ে ওঠে না। ভারতী এখান থেকে পাঠাচ্ছি। যদি কখনো কাছাকাছি কোথাও আসেন ত এদিকে একবার উঁকি মেরে যাবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

[১৮৮৩]

বৃহস্পতিবার

প্রিয় বাবু—

কাল আমাদের এখানে অর্থাৎ (১৪নং সর্কুলর রোডে) একটা ছোট পার্টি আছে, তাতে ঋষি ও হালদার আস্‌বেন, আপনি এলে বড়ই খুসি হই। মেজদাদার সেই অবসরে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। আস্‌বেন। কাল দিনের মধ্যে যখন খুসী আস্‌বেন— সন্ধ্যের সময় খেয়ে গান শুনে বাড়ি যাবেন। এবার ভারতীতে যে কবিতা যাবে সেইটে সঙ্গে আন্‌বেন। মেজদাদার Mademoiselle De Maupin খুবই ভাল লাগ্‌চে— কাল এসে সমস্ত শুন্‌বেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু

আজ ১৫ই— এই জন্য ভারতীর কাজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি— এই জন্য, যদিও আপনাদের ওখানে যাইবার কথা ছিল, পারিয়া উঠিলাম না — মাপ করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

আমি কিছুদিন বাড়িতে না থাকাতে আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। আপনার বই দুখানি পেয়েছি।

Forman's Shelley আপনাকে পাঠাই। ভারতী বোধ করি পেয়েছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু

জোড়াসাঁকোয় এসেছি। এবার বাইরে থেকে বিস্তর ভাল ভাল কবিতা পাওয়া গেছে। একে একে দেব। নগেন্দ্র গুপ্তের ঠিকানা আমি জানি না, তাঁর নামে একখানা চিঠি ও বই পাঠাচ্ছি —ঠিকানাটা লিখে দেবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[১৮৮৩, ডিসেম্বর ?]

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
আমার motto নহে।

প্রিয় বাবু—

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তত্‌পলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

প্রিয় বাবু —

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভ-লগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবে। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬ নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

[১৮৮৩, ডিসেম্বর ?]

প্রিয়বাবু—

Honeymoon কি কোনোকালে একেবারে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে— তবে কি না moon-এর হ্রাস বৃদ্ধি পূর্ণিমা অমাবস্যা আছে বটে। অতএব আপনি Honeymoon-এর কোনো খাতির না রেখে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন। আমি তো বহুকাল বিহারীবাবুর ওখেনে যাইনি— মাঝে মাঝে যাব যাব মনে করি কিন্তু কিছুতেই জড়তা ত্যাগ করে যেতে পারিনে— নগেন্দ্রবাবু একদিন আহ্বান করেছিলেন, গিয়েছিলেম। তাঁকে আমার কাব্যখানাও শুনিয়েছিলেম। সেটা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এক ফর্মা ছাপাও হয়ে গেছে। সোম মঙ্গলবারে আমি বাড়িতে থাক্‌ব এবং প্রায় থাকি। আপনি যদি আসেন ত আরও থাক্‌ব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

[১৮৮৩ ?]

প্রিয় বাবু—

আমার নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, আজ নানা কারণে আপনার দর্শন প্রার্থনীয়— নিরাশ করিবেন না।

শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

১৫

[১৮৮৩ ?]

প্রিয় বাবু—

আমরা মাঝে যশোরে বেড়াতে গিয়েছিলেম। সম্প্রতি যশোর থেকে এসেছি— আপনি যে নগেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে করে একদিন এখানে আস্‌তে চেয়েছিলেন, তার কি হল ? কবে আস্‌বেন ? আপনার যে দিন সুবিধে হবে, আমাকে লিখে পাঠাবেন। এবারকার ভারতী বোধ হয় বেরোবামাত্র পেয়েছিলেন— আমি বলে গিয়েছিলুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আপনাকে দত্তরা, তাঁদের club-এর অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার জন্যে একটি নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন। আমি সেটি হারিয়ে ফেলেছি। আজ ৫টার সময় অধিবেশন। যদি যেতে ইচ্ছে করেন, ৪৷৷৹টার মধ্যে এখেনে উপস্থিত হলে একত্রে যাওয়া যেতে পারবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আজ বিকালে আপনি একবার এ দিকে আস্‌বেন ? নগেন্দ্র বাবু আজ এখানে আস্‌চেন। আজ আপনার যদি কোন বাধা না থাকে তবে আমাদের এখেনে সন্ধে বেলায় আহারের নিমন্ত্রণ রইল। শুভ উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আপনার বইগুলি পাইয়া বড় আপ্যায়িত হওয়া গেল। যা যা বলেচেন চেষ্টা করা যাবে। সময় সংক্ষেপ Au Revoir.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

কাল দুপর বেলায় যদি আপনি ও নগেন্দ্র বাবু আসেন ত বেশ হয়। কাল আমার ছুটি। দেখা হলে অন্যান্য কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আপনার সহৃদয় চিঠিখানি পাইলাম। আপনার যখন ইচ্ছে আস্‌বেন, আমার সঙ্গে দেখা হবে— আমি পারতপক্ষে এখন ঘর থেকে বেরই নে। নইলে আমিই আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতুম। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি দু তিন-বার উপ্‌রি-উপ্‌রি আপনাদের বাড়ি গিয়েছি, একবারো আপনার দেখা পাই নি। দেখা হলে অনেক কথা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

কাল সমস্ত দুপুর বেলা আমার সময় আছে— যখন ইচ্ছা হয় আসিবেন।

Italian বইগুলি ও Rossetti's Review of Swinburne's Poems and Ballads খুঁজে রেখে দেব। তা ছাড়া আপনাকে একটি কবিতা শুনাইবার আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আমার কুষ্ঠিখানা এই লোকের হাতে একবার পাঠাতে পারেন ?

রবি

[১৮৮৪ ?]

ওঁ

প্রিয় বাবু—

Grierson-এর বিদ্যাপতি আপনার যদি পড়া হয়ে থাকে ত আমাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন? আমার একটু বিশেষ দরকার পড়েছে। কতদিন আপনার ওখেনে যাই যাই করে, ব্যামোয় স্যামোয় এবং প্রবাসভ্রমণে এবং কাজ কর্ম্মের অসম্ভব ভিড়ে যেতে পারি নি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

[১৮৮৫ ?]

ওঁ

Au Revoir

ভাই প্রিয় বাবু—

আমি আজই মেলট্রেণে রওনা হচ্চি। আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ভয়ানক ঝঞ্ঝাটে কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। আপনি যখন আপনার কবিতার সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন তার বহুপূর্ব্বে সেটা ছাপা হয়ে গিয়েছিল।

আবার তিন মাস পরে দেখা হবে, unless কোন সুযোগে আজ দেখা হয়।

Scripta Urbana আজ পাঠাতে পারবেন? আপনার German Popular Stories আজ পাঠাচ্ছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

[১৮৮৪]

ওঁ

ভাই—

তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত উৎপীড়িত হয়েই লিখেছিলুম— তাতে যতটা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলুম তার কতকটা আমার নিজের উপরে, এবং সংসারের উপরে— এবং সেই সঙ্গে তোমার উপরেও। আমি মধ্যে জমিদারীতে গিয়েছিলুম— তাই শীঘ্র তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নি। অর্থাভাবে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হচ্চে— সেই জন্যে চিঠির ভাবটা যদি কিছু রুক্ষ হয়ে থাকে ত আমাকে মাপ কোরো—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—

Mademoiselle de Maupin মেজদাদার পড়া হয়ে গেছে। তাঁর খুব ভাল লেগেছে। আমার ওপরে, তিনি আপনাকে সহস্র thanks দেবার বরাত চিঠি দিয়েছেন গ্রহণ করবেন। আর বলেচেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে ত কোন সুপাঠ্য ফরাসী গ্রন্থ তাঁকে পাঠিয়ে দিলে তিনি বাধিত হন

R. T.

২৬

[১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

এখেনে এসে অব্‌ধি রোজই তোমাকে মনে করি কিন্তু চিঠি লেখা হয় না— মনে মনে লিখি কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল নেই। এখানে এসে অব্‌ধি এম্‌নি ছুটির হাঙ্গামে পড়েছি যে ঠিক চিঠি লেখ্‌বার অবসরটুকু খুঁজে পাইনে। এখেনে চারিদিকে শরতের রৌদ্র, অশোকের গাছ, ছায়াময় পথ, তরঙ্গিত মাঠ, সুমধুর বাতাস— সমস্ত দিন এক্‌টা গড়িমসি ভাব— কখন লিখি বল ? চিঠি এতদিন না লেখ্‌বার আরেক্‌টা কারণ আছে— তোমাকে চিঠি না লিখ্‌লে কোন রকম হিসেবের দায়ে পড়্‌তে হবে না এটা আমি নিশ্চয় জানি তুমি আমার অবস্থা ঠিক্‌ বুঝ্‌তে পারবে— আর তুমি যদি আমার এ চিঠির উত্তর দিতে দেরী কর কিম্বা না দাও— আমিও তোমার অবস্থা ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌ব। দরকার কি ? আমাদের মধ্যে একটা মস্ত চিঠি লেখা আছে— তা'তে সমস্ত বোঝাপড়া হয়ে আছে — তোমার আমার উত্তর প্রত্যুত্তর তার মধ্যেই সমস্ত ধরাবাঁধা আছে। আমরা দুজনেই মুখচোরা সশঙ্কিত লোক— আঁচা-আঁচির চেয়ে বেশি দূরে যাই নে, কিন্তু মনে মনে কি এক্‌টা বোঝাপড়া হয় নি ? আমার ত বোধ হয় আমাদের একরকম গভীর চেনাশুনো হয়ে গেছে তাই জন্যে আমাদের বেশি

কথাবার্ত্তার দরকার হয় না। আমরা বোধ হয় এখন দুজনে এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পারি। জানিনে আমাকে তুমি কিরকম মনে কর— কিন্তু আমি তোমার কথা বেশ বুঝ্‌তে পারি— তোমাকে অত্যন্ত প্রতিবেশী বলে বোধ হয়— দুজনের এক ভাষা। আমার মনে হয় আমি ছাড়া তোমার অনেক কথা আর কেউ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝ্‌তে পারে না। তর্ক সকলেরই সঙ্গে করা যায়— কিন্তু সকলের সঙ্গে কল্পনা করা যায় না। তাই সংসারের মধ্যে সকলে কল্পনার উপরে অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়— কল্পনাকে কেবল নিতান্ত আমারই খেয়াল বলে মনে হয় — তার পরে তোমার সঙ্গে যখন কল্পনার মিলন হয় তখন তাকে আবার সত্য বলে বিশ্বাস হয়— তার পক্ষে একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

তোমার সেই রাস্তার ধারের ঘরের positionটি কিছু নিতান্ত poetical নয় কিন্তু অনেক সময়ে সেই ঘরে গিয়ে আমার মনে হয়েচে আমি যেন বাগানে গিয়েচি। তোমার ওখেনে সমুদ্র-পারের মাঠ থেকে বনফুল-দোলান' বাতাস বয়। আমার মনে হয় যেন তোমার ও ঘরের সঙ্গে কলকাতার Municipalityর কোন সংশ্রব নেই। আমি যেন কল্‌কাতা থেকে তোমার ওখানে যাই, তোমার ওখেন থেকে কলকাতায় ফিরি। তোমার ওখেনে খানিকক্ষণ থাক্‌লে আমার একরকম বিষাদ জন্মায় আমার মনে হয় আমি যেন এক্‌টা-কিছু কর্‌তে পারি কিন্তু কর্‌তে পার্‌চিনে। আমি যা'-কিছু লিখেছি যা'-

কিছু গেয়েছি মনে হয় সেগুলো আগাগোড়া অসম্পূর্ণ। বসন্তের বাতাস লেগে আমার সহসা যেন চৈতন্য হয় যে, আমার গান বন্ধ হয়ে গেছে। সেই জন্যে আমার কলকাতা ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে।

এখেনে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে একরকম অস্থিরতা জন্মেছে। একটা কি আমার কাজ বাকী আছে মনে হচ্চে। একটা মহত্ত্বের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌চে। মনে হচ্চে আমি নিষ্ফল। কি কর্‌ব ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে একটা কিছু কর্‌বই এইটে আমার মনে হচ্চে। নিজের লেখা নিয়ে ভারি খুঁৎখুঁৎ করচি কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হচ্চেনা। তোমাকে খুলে বল্‌চি নিজের লেখার উপর আমার ভারি সন্দেহ জন্মায়— তাই যোগ্য ব্যক্তির কাছে আমার লেখার নিন্দে শুন্‌লে আমি ভারি দ'মে যাই— আমার মনে হয় আমি তবে সত্য সত্যই অকর্ম্মণ্য। তোমাদের যে আমার কোন কোন লেখা ভাল লাগে আমার মনে হয় আমি তোমাদের ফাঁকি দিচ্চি— দুই চার বার তোমাদের চখে পড়লেই সমস্ত ধরা পড়বে। এক এক সময়ে মনে হয় কিছু না লেখা ভাল। অপমানিত হয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিতে ভারি কষ্ট হয়। তাই জন্যে আমার মনে হয়, আমি যে ঠকাচ্ছি আমি তার মূল্য একদিন নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব। তাই জন্যে আমি যখন তোমার কাছে যাই বা কলকাতা ছেড়ে আসি তখন আমার এই ঋণদায়ের কথা মনে পড়ে। আমার রচনাই যা'দের কাছে

ঢের— তাদের মধ্যে আমি একরকম থাকি ভাল— একরকম ভুলে থাকি— কিন্তু তোমার কাছে গেলে আমার মনে হয় এখেনে জারিজুরি খাট্‌বে না, তুমি জহর চেন— আমার নিজেকে নিজের অনুপযুক্ত বলে বোধ হয়।— এই চিঠিতে যা লিখ্‌লুম তা' তোমার একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে— কিন্তু তা' ঠিক নয়। তোমার কাছে আমি চুপ করে থাকি— চিঠিতে আমি খুলে লিখ্‌লুম— এ চিঠি লেখবার উদ্দেশ্যই তাই। কাল আমরা কল্‌কাতামুখে যাচ্চি সুতরাং বিদেশ থেকে এই শেষ চিঠি। বোধ করি আগামী শুক্রবারের ডাকে First deliveryতেই আমরা কলকাতায় গিয়ে পৌঁছব— এই জন্যে দেখা হবার আগে আমি আমার এই বিদেশের Introduction letter তোমার কাছে পাঠালুম— এর থেকে আমার ঘরের সন্ধান কতক জান্‌তে পারবে।

রবি

পুঃ— দূর হোক্‌গে। তোমার ঠিকানা জানি নে। সুতরাং এ চিঠি আমি কলকাতায় গিয়ে তোমাকে পাঠাব।

২৭

[১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

আবার, তোমার ঠিকানা জানি নে বলে চিঠি লেখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু দায়ে পড়ে কোন উপায়ে চিঠি লিখ্‌তে হল। আমাকে এখেনে সেই পঞ্চাশ টাকাটা যদি কোনমতে পাঠিয়ে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। তোমাকে বার বার টাকার জন্যে বিরক্ত করচি কিছু মনে কোরো না— কিন্তু আমার টাকার নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলেই বই বেচ্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম। একটু শীঘ্র পাঠিয়ে দিতে পারবে? আমি এখন বান্দোরায় সমুদ্রতীরে বাবামশায়ের সঙ্গে আছি। নির্জ্জনে আমি ভাল আছি আপনার উন্নতির চেষ্টা করচি। একলা বসে আপনাকে সংযত করচি। কখন কখন দুয়েকটা কবিতা লিখ্‌চি — নিতান্ত চুপচাপ করে আছি। সংক্ষেপে এই আমার সমস্ত খবর। সংক্ষেপ কেন— এর চেয়ে বিস্তারিত আর কি করা যেতে পারে? বাবামশায় এখন অনেকটা ভাল আছেন— তাঁর শরীরের জন্য যেরকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল এখেনে এসে সে আশঙ্কা অনেক কমে গেছে। তোমার এবং তোমাদের ওদিককার খবর সমস্ত আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। ডাকের সময় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী। আজ আর বেশী কিছু লিখ্‌লেম না।

তোমার রবি

আমার ঠিকানা—

Rabindranath Tagore
C/o Babu Debendranath Tagore
Bandra
Bombay.

২৮

[১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

আমরা এখন দিনকতক জলের উপর আছি। আমাদের ষ্টীমারের নাম "রাজহংস।" হাওড়া তেলকল ঘাটের উপরেই নোঙর করা। কলকাতা কয়লাঘাটের ঠিক পরপারে। খুঁজে বের করতে কোন কষ্ট হবে না।

আমাদের ঠিকানা দিলুম— এখন একদিন অবসরমত এই-খেনে এসে উপস্থিত হলে ভাল হয়।

রবি

ওঁ

১

জোড়াসাঁকো।
পৌষ।
১৩৩৪

ভাই,

এসে বাসা বেঁধেছিলেম,
চামেলির রঙ ঝিকিমিকি।
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিল মাঝে
ডাক দিলে সে খালি পিটোয় —
ভদ্র লোকের গায়ে পড়ে
কলম দিয়ে কালি ছিটোয়।
এখেনেও বাস করা দায়
ভন্‌ভনানির ধাক্কারে
প্রাণের মধ্যে গুমরিয়ে উঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে,
কোথায় পালাই কোথায় পালাই
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।

২৯

[১৮৮৪]

ওঁ

যোড়াসাঁকো।

পৌষ।

১৮৮৫

ভাই,

জলে বাসা বেঁধেছিলেম,
ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে
ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়—
ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে
কলম নিয়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে ত বাস করা দায়
ভন্‌ভনানির বাজারে
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই কোথায় পালাই
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।

গঙ্গাপ্রাপ্তি আশা ক'রে
গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম—
তোমাদের না ব'লে ক'য়ে
আস্তে আস্তে সরেছিলেম

দুনিয়ার এ মজ্‌লিষেতে
এসেছিলেম গান শুন্‌তে—
আপনমনে গুন্‌গুনিয়ে
রাগ রাগিণীর জাল বুন্‌তে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি,
ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে
থাকে তারা তুলো ভুন্‌তে।
ডেকে বলে হেঁকে বলে
ভঙ্গী কোরে বেঁকে বলে
"আমার কথা শোন সবাই
গান শোন আর নাই শোন,
গান যে কাকে বলে সেইটে
বুঝিয়ে দেব— তাই শোন !"

টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন,
জেঁকে ওঠে বক্তিমে—
কে দেখে তাঁর হাত-পা নাড়া
চক্ষু দুটোর রক্তিমে !
চন্দ্র সূর্য্য জ্বল্‌চে মিছে
আকাশখানার চালাতে—
তিনি বলেন “আমিই আছি
জ্বলতে এবং জ্বালাতে !”
কুঞ্জবনের তানপুরোতে
সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ
হয় নাক তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক্‌না বিশ্ব
টপ্পা খেয়াল ধুর্‌বোদ্‌,
গায় না যে কেউ, আসল কথা
নাইক কারো সুর বোধ !
কাগজওয়ালা সারি সারি
নাড়্‌চে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙ্গলা থেকে শান্তি বিদায়
তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে।
কাগজ দিয়ে নৌকো বানায়
বেকার যত ছেলেপিলে।

কর্ণ ধ'রে পার করবেন
এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে
যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দিকে
তাই উড়ছে এত ধুলো।
ক্ষুদে ক্ষুদে "আর্য্য" যত
ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা
কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন "আমিই কল্কি"
গাঁজার কল্কি হবে বুঝি—
অবতারে ভরে গেল
যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি!

পাড়ায় এমন কত আছে
কত কব তা'র!
বঙ্গদেশে মেলাই এল
বরা'-অবতার!
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র
তুল্‌বে তারা পাঁকের থেকে,

দাঁত-কপাটি লাগে তাদের
দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গী দেখে!
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা,
মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব্ নাচিয়ে বেড়ায় যত
জিহ্বা-ওয়ালা সঙের দল!
বাক্য-বন্যে ফেনিয়ে আসে
ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে—
কোনমতে রক্ষে পেলেম
মা গঙ্গার ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা
কুলুকুলু তান!
সাগরপানে ব'হে নে যায়
গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয়
জলের গায়ে কাঁটা—
আকাশেতে আলো আঁধার
খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে স্তরে স্তরে
পল্লবেরি ঢেউ,

সারাদিন হেলে দোলে
দেখে না ত কেউ।
পূর্ব তীরে তরুশিরে
অরুণ হেসে চায়
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে
সন্ধ্যা নেমে যায়।
দ্বাদশ মন্দিরে দূরে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে
আকাশের মাঝে।
ঝাউবনের আড়ালেতে
চাঁদ ওঠে ধীরে—
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি
অন্ধকার তীরে।
এই শান্তিসলিলেতে
দিয়েছিলেম ডুব।
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম
সুখে ছিলেম খুব।

জান ত ভাই আমি হচ্চি
জলচরের জাত-

আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই
ভাসি দিনরাত।
রোদ্ পোহাতে ডাঙ্গায় উঠি
হাওয়াটি খাই চোখ্ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই
তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখ্‌লে, আবার
ডুবি অগাধ জলে—
এম্‌নি করে দিন্‌টা কাটাই
লুকোচুরির ছলে।

তুমি কেন ছিপ ফেলেছ
শুক্‌নো ডাঙ্গায় ব'সে !
বুকের কাছে বিদ্ধ করে
টান মেরেচ ক'সে।
আমি তোমায় জলে টানি
তুমি ডাঙ্গায় টান',
অটল হয়ে বসে আছ
হার ত নাহি মান !
মর্‌ব কত ধড়ফড়িয়ে
তোমারি শেষ জিৎ,

খাবি খাচ্চি ডাঙ্গায় প'ড়ে
হয়ে পড়েচি চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চল
ছিপ গুটিয়ে নাও,
রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে
ঢাক পিটিয়ে দাও!

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন
স্থলচর মহাশয়
সমীপেষু

৩০

[১৮৮৬ জানুয়ারি]

ওঁ

ভাই—

আজ ৩৷৷০ বেলায় রেমিনির বেহালা-বাদন হবে। যাঁরা রেমিনির বেহালা শুনেচেন তাঁরা বলেন একবার এই বেহালা শুন্‌লে চিরজীবন সার্থক হয়— এমন মধুর সঙ্গীত তাঁরা জন্মে কখনও শোনেন নি। আমি ছেলেদের নিয়ে আজ শুন্‌তে যাব— তোমারও যাওয়া অত্যন্ত উচিত— এমন সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্যায়। আজ যদি ভাই ভাল ছেলের মত আপিস পালাও ও যথাসময়ে কোরিন্থিয়ন্‌ রঙ্গভূমিতে হাজির হও ত বড় ভাল হয়। আমরা চারটাকা দিয়ে এক-একটা seat engage করেচি— তোমার যেখানে খুসী যেয়ো— কিন্তু যাওয়াটা নিতান্তই চাই। আমার যদি নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ থাক্‌ত তা হোলে আমি সশরীরে উপস্থিত হয়ে জবরদস্তি করে তোমার সম্মতি নিয়ে আস্‌তুম্‌ সন্দেহমাত্র নেই— কিন্তু আমার এই অনবসরের সুবিধা পেয়ে ফাঁকি দিও না।

তার পরে ১১ই মাঘ— সেদিন দু বেলা নিমন্ত্রণ— সেদিন সকালে যদি ধরা দেও ত সমস্ত দিন ধরে রাখ্‌ব। ইতিমধ্যে আর-একটা কারখানা আছে— তিন সমাজের একত্র উপাসনা হবে— ৯ই মাঘ অর্থাৎ কাল প্রাতে অত্রভবনে তিন সমাজের

মহারথীরা একত্র হবেন। আপনি এলে— আবার আপনি বল্‌চি— তুমি এলে বড় আনন্দ হয়।

একটা সংবাদ আছে। মেজদাদা এসেছেন।

আমি ভারি ব্যস্ত —

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

[? ১৮৮৬ জানুয়ারি]

ওঁ

ভাই

১১ই মাঘের আবর্ত্তের মধ্যে অহোরাত্র ঘূর্ণিত। তুমি এসে দেখা না করলে আমার পক্ষে নড়া বড় কঠিন। কবে দেখা হবে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই—

অল্প টাকা হাতে পেয়েছিলুম কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ ধার শুধ্‌তে উড়ে গেছে। প্রতিদিনের খুচ্‌রা খরচ প্রায় ধার করে চালাতে হয়। জমিদারী থেকে এবারে অল্প টাকা এসেছে— আর দশ পনেরো দিনে বাকি টাকা আস্‌বার কথা আছে। যা হোক্‌ আমি দ্বিপুর কাছে ঐ তিনশ টাকা ধার করবার চেষ্টা দেখ্‌ব যদি পাওয়া যায়।

মাঝে কোমরে অত্যন্ত ব্যথা হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম একেবারে নড়বার শক্তি ছিল না। এখন সে অবস্থা গেছে। একটু-আধ্‌টি নড়চি। German চলচে Mademoiselle সম্বন্ধে দেখা হলে বলব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

ওঁ

ভাই

আজ রাত্রে আমার শিলাইদহে যাওয়ার কথা সমস্ত স্থির ছিল —আপনার কাছে খবর না পেয়ে ইতস্ততঃ করচি।— যদি কোন ব্যাঘাত ঘটে তা হলে এই বেলা সেখানে টেলিগ্রাফ করে দিন পিছিয়ে দিতে হয়। আজ সকালে কি তুমি এখানে আসচ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

ওঁ

ভাই—

Stories Revised আমি কোনমতে খুঁজে পাই নি বলে তোমাকে দিতে পারি নি। হঠাৎ অক্ষয়বাবুর কাছে পেয়ে তোমাকে পাঠাচ্ছি।

অর্থাভাবে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই বইয়ের টাকা কি অল্প দিনের মধ্যে দিতে পারবে? তা হলে বেঁচে যাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

আমার সম্প্রতি টাকার নিতান্ত দরকার হয়েছে, যদি সুবিধে করে দিতে পার ত বেঁচে যাই। অনেকদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বাগানে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করচি কিন্তু একেবারে রিক্তহস্ত।

“ইচ্ছা সম্যক্‌ উপবনভ্রমণে কিন্তু পাথেয় নাস্তি!
পায়ে শিক্লী, মন উড়ু উড়ু, এ কি দৈবের শাস্তি!”

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বুধবার

ভাই

আজ আমি বাড়ি থাক্‌তে পারব না। কাল যদি টাকাটা নিয়ে আহারাদির পর আস্‌তে পার ত সুবিধে হয়। আমার উত্তমর্ণরা সব হাত পেতে বসে রয়েছে টাকাটা পেলেই যথামত বিলি করে দিয়ে বাঁচি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

ওঁ

ভাই

সেই "প্রয়াস" এবং "লালমোহন বিদ্যানিধি"টা জল্‌দি পাঠিয়ে দিতে পার ?

তোমার

৩৮

ওঁ

ভাই

আজ মধ্যাহ্নে কাজে বাহির হইব— অত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন মিতি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

ওঁ

ভাই

আজ বিকালে ৪টার সময় গেলে যদি দেখা পাই ত যাব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

ওঁ

ভাই

ঋষির টেলিগ্রাম পাইলাম তাহারা শনিবারে কলিকাতায় আসিবে। মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম।

তো ম া ...

৪১

ওঁ

ভাই

বুধবার প্রাতে আস্‌বে বলে গিয়েছিলে— তার পরে দর্শন নেই একটি ছত্র খবরও নেই— Show cause why.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

ওঁ

ভাই—

তোমার যে ছুটি হয় না। সেদিন তুমি আস্‌বে মনে করে চিঠির জবাব দিই নি। এখন তোমার আগমনাশা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লুম।

আমার বইগুলো সব এয়েচে এই খবর হয়ত তোমাকে টেনে আন্‌বার একটা উপায় হতে পারে। তোমার ফরাসী বহি পাঠাই সঙ্গে২ ব্রাহ্মধর্ম্ম এক খণ্ড পাঠালুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

ওঁ

ভাই

Thackerএর ওখান থেকে যদি বই পেয়ে থাক ত এই লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি এখনি বেরচ্চি। বিকেলে যদি পার্কষ্ট্রীটে যাও আমাদের সঙ্গে দেখা হবে

রবি

৪৪

ওঁ

ভ্রাতঃ

দোকানে গময়িষ্যামি থ্যাকারস্য স্পিঙ্কস্য চ।
কখনং যাইতে হৈবে টাইমমবধারয় ॥

ইতি
শ্রীরবিঃ

৪৫

ওঁ

ভাই

ঘরে আছ? কখন্ কোথায় কি উপায়ে সাক্ষাৎ হবে।
মঙ্গলবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

ওঁ

ভাই

জ্বরে পড়ে আছি। অবকাশ হলে এস।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

ভাই

চিকিৎসা ব্যাপারে বাহির হইয়া ছিলাম— এইমাত্র আসিয়া পত্র পাইলাম। আজ মধ্যাহ্নে আসিলে বড় খুসী হইব।

রবি

৪৮

ওঁ

ভাই—

তোমার অবস্থা আমি সম্পূর্ণ অনুভব কর্ত্তে পারচি— কিন্তু কি করব বল? এতে যদি কেবল আমার হাত থাকৃত তা হলে তুমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতে। আমি এসে অবধি বিষয়কর্ম্মের ভার নিয়ে নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি তাই তোমার ওখেনে এ পর্য্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আজ বিকেলের দিকে এস। কিন্তু আমার লেখাটা এমন দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যে একদিনে শোনান হয়ে উঠ্‌বে কিনা সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

Dover's Lodge এবং Dover Hall কার হাতে আছে— তার কত দাম হতে পারে, তার কত জমি ইত্যাদি অনুসন্ধান করে যদি আমাকে খবর দিতে পার ত বড় উপকার হয়। যদি বেশ সুবিধামত terms হয় ত কেন্‌বার চেষ্টা করা যেতে পারে। একবার Dover সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে এইটে স্থির জেনে নিয়ো।

যাবার তেমন সুবিধে নেই বলে আজ আমি সশরীরে তোমার ওখেনে যেতে পারলেম না— যাব মনে করেছিলেম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

ওঁ

ভাই— রবিবারে যাওয়া একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। অতএব টাকাটা আজই কিম্বা কাল বেলা দুটোর মধ্যে পেলে বড়ই সুবিধে হয়। কোনমতে জোগাড় করে দিতে পার না? কাপড় চোপড় কর্ত্তে অনেক ধার হয়ে গেছে এই সময়ে না পেলে বিদেশে বড় মুস্কিল হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৫১

ওঁ

ভাই

আজ হঠাৎ নদিদির নিকট হইতে সন্ধ্যার মধ্যে জরুরি তলব আসিয়াছে। কাল সকালে তোমার ওখানে যাইব। আজ বোধ হয় যোড়াসাঁকোয় আসিয়া তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে সেজন্য ক্ষমা করিবে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

ওঁ

ভাই

তোমার অন্ন এখনো হজম হইল না।

তুলসীরামকে পাঠাই। টাকা এর হাতে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই। সোমবারে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি অতএব আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

আজ রাত্রে এখানে এসে খেয়ো তার পরে কাল রাত্রিকার শোধ দেব। কাল বেশ ভিজেছি। আজ তোমাকে আর্দ্র করে দিতে পারলে মনের খেদ মেটে।

তোমার রবি

৫৩

ওঁ

ভাই

কই, কাল ত কোনও খবর দিলে না। বোধ হয় বর্ষার উপদ্রবে বাধা ঘটিয়া থাকিবে। খবর থাকিলে এই লোকহস্তে এক লাইন লিখিয়া দিয়ো। ইতি শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

ওঁ

ভাই

সেই খবরটার জন্য উৎকণ্ঠিত।

লোকেনের তাড়নায় বালিগঞ্জে গিয়াছিলাম ইতিমধ্যে তোমরা আসিয়া ফিরিয়া গেছ। আমার দুরদৃষ্ট।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

ওঁ

ভাই

খবর না পাইয়া উৎকণ্ঠিত আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

ওঁ

ভাই

সংবাদ কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

ওঁ

ভাই

যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি ইত্যাদি। ঋণ ব্যাপারের আদ্যোপান্ত বিঘ্নে বিজড়িত— সে জন্যে ক্ষোভ করে কি হবে?

আমার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে আছে। তবু একরকম করে জীর্ণ শ্রান্ত শরীরে কাজ চালিয়ে যাচ্চি। ইচ্ছা করচে শুয়ে পড়ি কিন্তু শোবার সময় নেই। শোবার সময় না থাকাই ভাল।

তোমার রবি

৫৮

ওঁ

ভাই

একজন গণক এসেচেন তাই বাড়ির লোকেরা আমার কুষ্ঠি তাঁকে দেখাতে চান— কুষ্ঠিটা এই লোকের হাতে এখনি পাঠিয়ে দিও।

এই প্রুফটাও দেখে দিও।

রবি

৫৯

ওঁ

ভাই

তুমি ত আজ আসচ। অমনি এই লোকের হাতে আমার কুষ্ঠিটা পাঠিয়ে দিয়ো। আমার একজন বন্ধু এসেচেন— তিনি দেখতে চাচ্চেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

ওঁ

ভাই

সেই গণনার বইখানা পাঠিয়ে দিয়ো।—
কাল মধ্যাহ্নভোজনের কথাটা ভুলোনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

ওঁ

ভাই

তোমার ছেলের কঠিন পীড়া শুনে চিন্তিত হলুম। অস্ত্রাঘাতের কথা শুন্‌লে ভয় হয়। তুমি তা হলে এখন অশান্তি ভোগ করচ। পুরোণো বই বিক্রি করা বিষম হাঙ্গাম আমি জানি। থাক্— ও বইগুলো আর বিক্রি করে কাজ নেই— আমি অন্য কোন উপায়ে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা দেখ্‌ব। ও বইগুলো তোমাকেই আমি উপহার দিলুম— ওর মধ্যে কেবল গোটাকতক বই আমি নেব (সেগুলো যদি বিক্রি না হয়ে থাকে)। বলা বাহুল্য, নাসিকে এই মাঠের মধ্যে আমি আছি ভাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে মাঝে মাঝে রৌদ্র হচ্চে— আমি আমাদের একটা দীর্ঘ ঢাকা বারান্দায় বাসা বেঁধেছি— সেখেন থেকে মাঠের পরপারবর্ত্তী দূরের নীল পাহাড়গুলো এবং তার উপরকার শাদা মেঘগুলো স্পষ্ট দেখা যায় — আমাদের এই বাড়ির পাশের ক্ষেত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ দুপুরবেলা চাষারা চাষ করতে করতে এ দেশের একপ্রকার অদ্ভুত মেঠো সুরে গান করচে। আমার পিতা এখন চুঁচ্‌ড়োয় ফিরে গিয়েচেন— আমি তাঁর কাছে দিনকতক থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের শান্তিলাভ করেছি— আমরা সমুদ্রতীরে থাক্‌তুম এবং তাঁকে সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত বোধ হত। আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীরে থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে

বই লিখেচেন সেটা পড়ে আশ্চর্য্য হতে হয়। সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল। আজ আমি বিদায় হই বিকেল হয়ে এল। তোমার ছেলে কেমন থাকে আমাকে লিখো—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

ওঁ

ভাই

.. ..

ফোটোগ্রাফ পাঠাই। বেলার অন্নপ্রাশনের দিন সকালে এলে হানি কি? সমস্ত দিনটাই গোলমাল করা যাবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

গাজিপুর
২ বৈশাখ [১২৯৫]

ভাই—

নববর্ষের কোলাকুলি গ্রহণ কর। বর্ষারম্ভে বিদেশের বন্ধুকে স্মরণ কোরো। যদি কোন সুযোগে একবার এদিকে আস্‌তে পার তা হলে দিনকতক সম্মিলনরস সম্ভোগ করা যায়। কিন্তু তোমাকে মথুর সেনের কুঞ্জপথ থেকে নড়ান কোন্ শক্তির দ্বারা সাধিত হতে পারে তা ত জানি নে। সুদূরস্থ সখ্যশক্তি দ্বারা ত নয়ই— নিতান্ত বাহুবলের দ্বারা হতে পারে। সংসারে বোধ করি যৌগিক অথবা চুম্বকাকর্ষণের অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণ বা কৈশিকাকর্ষণের বল বেশি। কিন্তু তুমি শেষোক্ত দুই আকর্ষণের বাহিরে চমৎকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। অতএব ডাক-যোগে কেবল ডাক দিয়ে অপেক্ষা করে রইলুম— দেখি কোন রকম ফল হয় কি না। এখানে বই, বিজনতা এবং বন্ধু আছে— এর মধ্যে কোনটা যদি লোভনীয় জ্ঞান কর ত বিলম্ব করবার আবশ্যক নেই। আমাদের বাসস্থানটি গঙ্গাতীর, বৃহৎ কানন এবং ক্ষুদ্র কুটীর। গাছে পাখী ডাক্‌ছে এবং পাশে Civil Surgeon-এর বাড়ি।

তোমার অবস্থা কি রকম আমাকে লিখো— হয়ত এমন অলস অবস্থায় আছো যে লেখবার সুবিধা হবে না। তোমার

চিঠিপত্র না পেলে আমি এই রকম একটা-কিছু কল্পনা করে নেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৪

ওঁ

ভাই,

এখন যদি টাকা দেবার সুবিধা না হয় ত থাক্। গাজিপুর থেকে আমার জিনিষ বিক্রির দরুণ কিছু টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে সেটা পেতে যদি বিলম্ব হয় তা হলে আর একবার তাগাদা করব। নইলে এ কটা দিনের তোমরা একরকম নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আহারাদির পর তাহলে আস্‌চ! সত্যকে তোমার প্রস্তাব জানালুম। সত্যর সমস্ত টাকা invested! নগদ হাতে কিছু নেই।

ওঁ

ভাই—

আগামী শুক্রবার রাত্রে George Yule ও Nortonএর honourএ আমাদের এখানে একটা Party হবে তারই বন্দোবস্ত কর্ত্তে এ কদিন ব্যস্ত ছিলুম এবং আছি। আস্‌চে-শনিবারে তুমি যদি আস্‌তে পার তা হলে সদালাপে দিনযাপন করা যাবে।

দেখা হলে অন্য কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৬৬

[১৮৮৯]

ওঁ

সোলাপুর।

ভাই—

কাজের কথাটা পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে না বলে গোড়াতেই বলা ভাল, তার পরে অন্য কথা হবে। বাকি টাকাটার জন্যে সত্য আমাকে বারবার চিঠি লিখ্‌চে, অত্যন্ত আবশ্যক হয়েছে— আর বিলম্ব না করে সেটা দিয়ে ফেল। তুমি ত আমার বর্ত্তমান অবস্থা সমস্ত জান। খবর পেলুম আষাঢ় মাসের পূর্ব্বে আমাদের মাসহারার টাকা বেরোবে না। অতএব তোমার উপরে একান্ত নির্ভর করে রইলুম— সত্যকে শীঘ্র টাকাটা পাঠিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে আমার একখানা নাটক শেষ হয়ে গেছে। এখনো নামকরণ করে উঠ্‌তে পারি নি। আমার নিজের ভাল লাগ্‌চে— মনে হচ্চে একটা কাজ করেছি— কিন্তু জানই ত

আপরিতোষাদ্বিদূষাং ইত্যাদি—

তোমাদের কাছ থেকে বাহবা পেলে তবে বোঝা যাবে। এ নাটকের গল্পটা তোমাদের কাছে কখনো করেছি কি না মনে নেই— যা হোক্ গোপনে রাখ্‌লুম নইলে কৌতূহল অনেকটা চলে যাবার সম্ভাবনা। যদি ইতিমধ্যে কোন বিশেষ ব্যাঘাত না ঘটে তা হলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে এখেন থেকে ছাড়া হচ্চে না।

এ জায়গাটা যে খুব মনোরম তা নয়— জমিতে ঘাস নেই— গাছে পাতা নেই— জলাশয়ে জল নেই— লোকালয়েও অধিক লোক নেই— চারিদিক মরুভূমির মত ধূ ধূ করচে। আমার এই লেখবার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কেবল প্রখর রৌদ্র ও তপ্ত বাতাস আসে, কোন সুন্দর বা বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায় না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দোয়াতের কালী শুকিয়ে জমে আসে— শরীরের ঘর্ম্ম সজলাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই শুকিয়ে যায়— বোধ করি শোকের সময় অশ্রুজল একান্ত দুর্লভ হয়ে ওঠে। রচনা করবার সময় আমার কাব্যরস শুকিয়ে আসে কিনা জানিনে কিন্তু আমার কালী শুকিয়ে বাস্তবিক লেখবার বড়ই ব্যাঘাত করে। সম্প্রতি একদা সন্ধেবেলায় এখানকার ইংরেজমণ্ডলীর সঙ্গে খেলবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে বসে আছি। আজকালের মধ্যে শীঘ্রই পুনশ্চ উত্থান করবার সঙ্কল্প করচি।

রাজধানীর সংবাদ কি ? দিনকতক কলকাতায় এক বেলুন-বাহনের পূজো চল্‌ছিল— এখন কি রকম অবস্থা ? সাহিত্য-আকাশে কি কোন বায়ুবিহারী ওড়বার চেষ্টা করচে ? তোমার পুঁথি-দুর্গের নতুন খবর কিছু আছে কি ? এমন আরো সহস্র প্রশ্ন তোমাকে করা যায় কিন্তু জানি এর উত্তর পাবার সম্ভাবনা বিরল— অতএব ক্ষান্ত থাকা গেল। উত্তর দাও বা না দাও চিঠির প্রারম্ভে যে কাজের উল্লেখ করা গেছে সেটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ কোরো। নগেন্দ্র বোসের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় কি ? আমি তাঁর দুখানা চিঠি পেয়েছি— এবং তার

উত্তরও দিয়েছি। বেশ বোঝা যাচ্চে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি একটা কোন কাজের চেষ্টায় আছেন— কিন্তু তাঁর মত লোকের কাজ পাওয়া দুর্লভ— এবং কাজ না পেলেও চরিত্রসংশোধন ও কলঙ্কক্ষালন হওয়া দুষ্কর। এ বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর। কি করলে তাঁর কোন সুবিধে হতে পারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

[১৮৯২]

ওঁ

ভাই,

কাল, অর্থাৎ শনিবার প্রাতঃকালে আমাদের এখানে এসে মধ্যাহ্নভোজন করবে কি? কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দেবার ইচ্ছা আছে।—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

ওঁ

ভাই

তোমার ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমি মনে করচি সোম বারেই শিলাইদহে যাব— এখানে বিনা কারণে চুপচাপ পড়ে থাকতে ভাল লাগ্‌চে না— সেখান থেকে তাগিদও আসচে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

ওঁ

ভাই

শিলাইদহে আমার পরিবারের মধ্যে রোগ দেখা দিয়েছে —অতি সত্বর আমার যাওয়া দরকার— যা-হয় একটা নিশ্চিত খবর পেলে মন স্থির করতে পারি।

তোমার বই দুটি পাঠালুম। আজ কি এ দিকে আসচ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

খবর কি ?

এখন থেকে আমার ঠিকানা :—

C/o The Postmaster
Pabna

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

[জুন, ১৮৯৯ ?]

ওঁ

ভাই,

তোমার জন্য কুষ্টিয়ার বাজারের খবর লইতে বলিয়াছিলাম। যতটুকু পাওয়া গেছে এই সঙ্গে পাঠাই। যদি তোমার এমন লোক কেহ থাকেন যিনি এ কার্য্য বুঝেন তাঁহাকে এই ফর্দ্দ দেখাইবে এবং এ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রশ্ন জ্ঞাতব্য আছে লিখিয়া পাঠাইলে জবাব দিব। কুষ্টিয়ায় কাপড় এবং সুতার কাট্‌তিই বেশি।

তিনহাজার বাদে সেই বাকী টাকাটা কবে পাওয়া যাইবে বলিতে পার? সেই টাকাটার অপেক্ষায় কোনপ্রকার সংশোধনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না।

এখানে ঘনবর্ষা নামিয়াছে— এরূপ বর্ষা কলিকাতায় বিরক্তিজনক হইত কিন্তু এখানে ঠিক থাপ খাইয়া গেছে।

তোমাদের খবর যদি কিছু থাকে জানাইয়ো ইতি মঙ্গলবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

১৮ জুন [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

ভাই

কুষ্টিয়ায় প্রধানতঃ সুতা এবং কাপড়ের খুব কাট্‌তি। কিন্তু হাতে হাতে দাম পাওয়া এখানকার কোন কারবারের প্রথাই নহে। কতকটা পরিমাণ সর্ব্বদাই পড়িয়াই থাকে এবং প্রতারণার জন্য কিঞ্চিৎ মার্জ্জিন রাখিতেই হয়। পাইকড় সকলেই আমাদের প্রজা ও পরিচিত নহে— তবে কেহ কেহ প্রজা থাকাই সম্ভব— যাহারা আমাদের এলাকার মধ্যে বিক্রয় করে তাহাদের উপর আমাদের দৃষ্টি থাকিতে পারে— কিন্তু পাইকড় বহু দূর দূরান্তর হইতে আসে এবং নানা হাটে বাজারে বিক্রয় করে। এখানে দুর্গাচরণ সাহারা গ্র্যাহামের নিকট হইতে কেরোসিন্ লইয়া বিক্রয় করে— মাসে দুতিন গাড়ি কেরোসিন্ বিক্রয় হওয়া শক্ত নহে— কিন্তু নগদ মূল্য পায় না ও নগদ টাকা হাতে নাই বলিয়া তাহারা মাসে এক গাড়ির বেশি আনিতেই পারে না— এবং পাইকড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাবনা পর্য্যন্ত তাহাদের লোক গিয়া টাকা আদায় করিয়া তবে দ্বিতীয় গাড়ি আনাইতে পারে। কলিকাতাতেও এরূপ ভাবে কাজ হইয়া থাকে বোধ করি সন্ধান লইলে জানিতে পারিবে। এখানে একটি কাজ ভালরূপ হইতে

পারে। এখানকার জোলাদিগকে সুতা দাদন দিয়া তোয়ালে, ন্যাপকিন্, বিছানার চাদর, কোটের কাপড়, টেবিলক্লথ্ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করান যাইতে পারে। কুষ্টিয়ার এই সকল কাপড় ঢাকা গোয়ালন্দ প্রভৃতি নানা স্থানে প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয়। এখানে কি কি কাপড় কি মূল্যে বিক্রয় হয় এবং কলিকাতায় তাহার কিরূপ কাট্‌তি হইতে পারে তাহা এখানে আসিয়া যদি কোন অভিজ্ঞ লোক সন্ধান লইয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। তাঁতি ও জোলাদিগকে সূতা দাদন দিবার সুবিধা এই যে, প্রথমতঃ সূতার দরের উপরে যে লাভ তাহা পাওয়া যায় তাহার পরে কাপড়ের উপরকার লাভটাও পাওনা হয়— এবং দাদন পাইলে জোলারা সম্ভবতঃ কাপড়ের দরেও একটু বিশেষ লাভ দিয়া থাকে। এই কাজটা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বিস্তৃত করিলে লাভজনক হইতে পারে এইরূপ আমার বিশ্বাস। কুষ্টিয়ার সুতার ব্যাপার শীতের সময় অজস্র পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে— সেই মার্কেট্, দাদন প্রভৃতি দ্বারা নিজে হস্তগত করিলে মস্ত কারবার হইতে পারে।

আজ সুরেন লিখিয়াছেন— ঘোষকররা ২০০০০্ টাকা সাত পার্সেন্ট্ সুদে আমার বাড়ি রাখিয়া ধার দিতে প্রস্তুত— ৬ মাসের করারে দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? ইতিমধ্যে এ টাকাটা লইয়া, পরে তোমার প্রস্তাবিত সেই টাকায় তাহা উদ্ধার করিয়া লওয়া কি শ্রেয় বিবেচনা কর? এ স্থলে

অন্য কোন বিবেচ্য বিষয় নাই— কেবল ধ্রুব versus অধ্রুব— নিকট versus দূর। আর কোন বিষয়ে তোমার সে প্রস্তাবের কাছে এ প্রস্তাব লাগে না— এবং আমারও মন ইহাতে প্রসন্ন নহে। চিঠিটা অত্যন্ত কাজের হইল— বাজে কথা একটিও নাই। ৪ঠা আষাঢ় [১৩০৬]

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৭৩

২১ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry.

ভাই

সকল কাজেরই মুস্কিল এই যে কাজে হাত না দিয়া তাহার সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপ আদায় করা যায় না— যেমন আগে সাঁতার শিখিয়া জলে নামা অসাধ্য। আমাদের কাজ সম্বন্ধে প্রথমে যাহা সন্ধান লইয়াছিলাম এখন তাহার বিস্তর বিপরীত দেখা যায়। তোমাকেও এই পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে তাহা ছাড়া উপায় নাই। পাইকড়দের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, কাজের কিরূপ প্রণালী, আদায়ের কিরূপ সুবিধা, লাভের কিরূপ সম্ভাবনা সমস্তই কিছুদিন কাজ করা ব্যতীত সম্পূর্ণ ও সত্যরূপে জানা অসম্ভব। সেইজন্যে প্রথমটা সাবধানে ও অল্প পরিমাণে কাজ আরম্ভ করা উচিত তাহার পর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ফলাও করিলে পরিতাপের বিষয় কিছুই থাকে না। মফস্বলের যাহা কিছু অবশ্যব্যবহার্য্য সামগ্রী তাহার কারবার ধীরভাবে করিলে লোকসান হইবে না ইহা common senseএ বলে— কিন্তু সেই ধীরতা সেই বিবেচনা কর্ম্মচারীদের সেই সততা দুর্লভ বলিয়াই অনেক সময় ঠকিতে

হয়। আমি বারবার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি— লাভ লোকসান লোকের উপরেই নির্ভর করিবে— সৎ অথচ কর্ম্মকুশল লোক সংসারে বিরল— যদি জোটাইতে পার তাহা হইলে তোমার ভাবনার কারণ নাই— এবং আমাদের দ্বারা যে কিছু সাহায্য সম্ভব তাহা পাইবে। আমাদের সরকারে যে কিছু কাগজ পত্র কেরোসিন ইত্যাদি খরিদ হইয়া থাকে তাহার অর্ডার পাইতে পারিবে এবং আমাদের অধীনস্থ পাইকড়দের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে পারিব।

আমরা যে পক্ষ হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছি তাঁহাদের সেই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার আর বিলম্ব কত? সে সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট খবর পাওয়া গেছে কি? যেরূপ গোলমালের মধ্যে আছি তাহাতে স্বাক্ষরের স্থলে তোমার নাম লিখিয়া ঠিকানায় যে আমার নাম লিখি নাই ইহাই আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪

২৪ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry

ভাই

আমি সাহিত্য পড়ি নাই। কিন্তু তুমি যে, নিন্দুক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইলাম। তোমরা আমার হইয়া রাগ করিলে, মনে হয়, আমার আর রাগ করিবার বা দুঃখ পাইবার দরকার করে না— আমি শান্তিলাভ করি।— মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না— সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলপ্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি— কিন্তু সংসারে কাঁটার উপরে পা না ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে ফোটে ;— দুঃখবেদনার পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই— আছে নিজের মনে— তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহু দূরে। ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন— তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি ;— বন্ধুহৃদয়ের সম-

বেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিধারার মত— তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।

কাজের কথাটা এবারকার চিঠিতে লিখিয়ো। একবার তুমি এখানে আসিতে পারিলে সুবিধা হইত। ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

২ জুলাই [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry

ভাই

তুমি সাহিত্য সম্পাদকের উদ্দেশে যে পত্রখানি রচনা করিয়াছ— আমি তাহার সম্বন্ধে কি আর বলিব। তুমি তোমার অন্তরের আক্ষেপ যেরূপ আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছ তাহার মধ্যে বন্ধুবাৎসল্য ও কর্ত্তব্যবোধ দুইই ব্যথিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে— সেই উদার বন্ধুপ্রীতিটি আমি আমার অংশ বলিয়া প্রেমানন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম— বাকিটা সম্পাদকের হস্তে এবং সেই সূত্রে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা সঙ্গত হইতেছে কি না বিচার্য্য। অবশ্য প্রাইভেট ভাবে সম্পাদকের নিকট গেলে ক্ষতি দেখি না— কিন্তু ইহা লইয়া কাগজে পত্রে বিচার বিতর্ক উত্থাপিত করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল কথার প্রকাশ্য আলোচনায় যে একটি অসম্ভ্রম আছে তাহা সহ্য করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। ও দূর করিয়া ফেলিয়া দাও— যেমন করিয়া মাছি তাড়াইয়া দিতে হয় তেমনি করিয়া বাম হস্তের একটা আঘাতে মন থেকে ওটাকে অপসৃত করিয়া দিলেই ঠিক হয়— তবু যদিচ ক্ষুদ্র উৎপাত মাঝে মাঝে

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে— কিন্তু মাছির অপেক্ষা বৃহৎ আকারে এবং গুঞ্জনের অপেক্ষা প্রবলতর শব্দে না আসিলেই হইল। “সকলেরি আছে অবসান,—

শুকায় সমুদ্রজল, নিবে যায় দাবানল—”

আর নিন্দুকের মিথ্যাবাক্যের দাহই কি চিরকাল থাকিবে!

তোমার মনে আছে মানসীর এক সমালোচনা লিখিয়া তুমি আমার নিকট পাঠাইয়াছিলে। সেই লেখাটি সুরেনদের কাছে ছিল— কোন সম্পাদক সন্ধান পাইয়া ছাপাইবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপের উপক্রম করিয়াছেন। সুরেন তাই সে সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য আমাকে লিখিয়ো। সুরেন এখন আমাদের কার্য্যোপলক্ষ্যে এখানেই কিছুদিন আছে।

অনেক দিন অবিশ্রাম বৃষ্টিবাদলের পর আজ নির্ম্মল রৌদ্রে আমার চারিদিকের নবীন ধান্যক্ষেত্রগুলি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে — আ[জ ··· ···] হীনের হীনতা অযোগ্যের অব[মান]না সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে চেষ্টা করিব— নতুবা মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশ হইতে [এই] অজস্র অযাচিত দানের সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিব না— আজ আমি আমার মনের প্রান্তে কোন কাঁটা যদি রাখি তবে আজিকার এমন স্নাতশুভ্র অখণ্ড সুন্দর দিনকে ··· হৃদয়ের মধ্যে অসঙ্কোচে প্রশস্ত আসন পাতিয়া দিতে পারিব না। ইতি
১৮ই আষাঢ় [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ তুমি এখানে আসিলে তোমার এবং আমার যেটুকু অসুবিধা হইতে পারে সেটুকু অসহ্য হইবে না ইহা নিশ্চিত। অতএব দিনস্থির করিয়া পূর্ব্ব হইতে বলিয়া পাঠাইবে।

৭৬

ওঁ

ভাই

তোমার চঞ্চল ত কলিকাতায় অচঞ্চল হইয়া বসিয়াছেন আমি ত আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। একটু সত্বর এবং একটু নিশ্চিত একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া দাও। বর্ষাকালে দীর্ঘ বিরহ শাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে। ধনপতি বিমুখ হইয়া যক্ষের যে দশা করিয়াছিলেন একালের ধনপতি আমাকে তেমন করিয়া দগ্ধান্ কেন ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

[৫] জুলাই ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B S. Ry

ভাই

আজ তোমার দুখানি চিঠি একসঙ্গে পেলুম। আমি পর্শু দিন আমাদের কালিগ্রাম পরগনার পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে এখান থেকে রওনা হয়ে সেই দেশে যাত্রা করব। তার পর ২৬।২৭শে নাগাদ কলকাতা অঞ্চলে দুই একদিনের জন্য পদার্পণ করবার সঙ্কল্প আছে তুমি সেই সময়ে সেজে গুজে প্রস্তুত হয়ে থেকো— আমি তোমাকে অকস্মাৎ অপহরণ করে রেলগাড়িতে চাপিয়ে এই পদ্মাতীরে এনে ফেল্‌ব, কোন প্রকার বিলাপ পরিতাপ ওজর আপত্তিতে কর্ণপাত করব না। তোমার সঙ্গে যদি আর কোন সহায় তুমি নিয়ে এস, সেই সান্ত্বনা এবং আশ্রয়টুকু থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত করতে চাই নে। যদি এই উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া মোকামে কাজকর্ম্মের কোন সূত্রপাত করে যেতে চাও তাহলে তোমার চেয়ে আর একটি বিচক্ষণ ব্যবসায়জ্ঞ লোক এলেই ভাল হয়। তাতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। যাই হোক্ এই ক'টা দিন মুল্‌তবি হল বলে তোমার এখানে আসা যেন কেঁচে না যায়। সঙ্গসুখ সম্বন্ধে কোনপ্রকার

লোভনীয় কথা আমি বল্‌তে চাই নে— কিন্তু স্থানটি যে লোভনীয় ঠেক্‌বে সে সম্বন্ধে আমি আমার সমস্ত খাতাপত্র ও গ্রন্থাবলী-সুদ্ধ জামিন থাক্‌তে প্রস্তুত আছি।

চঞ্চলের রাজার অপেক্ষায় না থেকে আর এক পক্ষের নিকট হতে তুমি ৭।৷০ পার্সেণ্টে টাকা তোলার যে প্রস্তাব করেছ সেটা আমার কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ঠেক্‌চে— কারণ, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শাস্ত্রে আছে এবং যবনেরাও বলে "দুটো পাখী ঝোপে থাকার চেয়ে একটা পাখী হাতে থাকা ভাল"— বিশেষতঃ আমরা আমাদের কুষ্টিয়ার সমস্ত জঞ্জাল যথাসম্ভব সত্বর চুকিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব হতে চাই। সুরেন কলকাতায় গেছে-– তাকে তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে এ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় করতে বল্‌ব।

মানসী সমালোচনার কথাটা মনে পড়ল। প্রদীপের কোন হিতৈষী সেটা প্রদীপের জন্য সংগ্রহ করবার উদ্যোগে ছিলেন। আমাকে যদি না জানিয়ে ওটা ছাপিয়ে ফেল্‌তেন তা হলে বিপদেই পড়্‌তেন।

তুমি যখন আস্‌বে এখানকার নদীর কূলগ্রাসিনী চণ্ডীমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে। এবারে জল অত্যন্ত বেড়েছে— তীরের সঙ্গে এরই মধ্যে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। দুই দিকের উপকূল স্রোতের বেগ আর সাম্‌লাতে পারচে না— মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়চে। ইতি [২১] শে আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

২৭ জুলাই [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry.

ভাই

আজ পর্য্যন্ত কোন খবরাদি না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। চঞ্চলের টাকাটা যদি পাওয়া যায় কোন্ সময়ের মধ্যে পাব তার কি একটা ঠিক খবর জানা যাবে? সুরেনও উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে।

এখানকার খবর ভাল। ভাগ্যক্রমে আমার ছোট ছেলেটি জ্বর থেকে উঠেছে। গ্রামে চতুর্দ্দিকেই খুব জ্বর চল্‌চে। বর্ষণের বিরাম নেই — মাঝে মাঝে রৌদ্র না দেখা দিলে মনে হয় যেন সংসারের সমস্ত কল বিগ্‌ড়ে গেছে— মনে হয় কোন কাজে কোন কালেই সফলতা নেই।

গোরাইয়ের জল কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নদীযাত্রীর পক্ষে একটা সুখবর এই যে কাল থেকে ষ্টীমার চলা আরম্ভ হয়েছে,— শিলাইদহ এখন থেকে সুগম হল— এখন আমার বন্ধুবর্গের প্রতি অনুরোধ এই যে ষ্টীমার কোম্পানির যত্ন ও উদ্যম তাঁরা সার্থক করুন। ইতি ১২ই শ্রাবণ [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

৩১ জুলাই [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry

ভাই

…   …   …   …

কলকাতায় আমাদের একটা গুরুতর বৈষয়িক ব্যাপার চল্‌চে— সেজন্যে হঠাৎ কখন্‌ আমার কলকাতায় ডাক পড়ে তার ঠিকানা নেই— তাই এবারে তোমাকে এখানে টেনে আনবার চেষ্টাও করি নি— কলকাতার সেই কাজটি সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে নিয়ে আস্‌ব— এখন ষ্টীমার হয়ে যাতায়াতের খুব সুবিধা হয়েছে। তাতে এখান থেকে পাবনা পর্য্যন্ত বেড়াবারও সুবিধা হয়েছে।

বিনোদিনীর খবর ভাল। গোলেমালে দিনকতক তার কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছিল গত কল্য থেকে আবার নিয়মিত হাজ্‌রি দিচ্চি। পত্রের এই অংশটুকু যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ কর তাহলে আমার সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি উপন্যাসের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। ইতি ১৬ই শ্রাবণ [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

[অগস্ট, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

খবর কিছু আছে? বলুর অসুখ বলে নড়তে পারি নে— নইলে কাল তোমার ওখানে যেতুম—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

[অগস্ট, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

বলুর মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী শিলাইদহে অত্যন্ত শোক অনুভব করিতেছেন, বলুর প্রতি তাঁহার একান্ত স্নেহ ছিল। ওদিকে বেলার অসুখের খবর পাইয়াছি।

এখন বিষয়জালের কর্ম্মফাঁসটি আমার কণ্ঠ হইতে সত্বর নামিলে আমি একবার সহর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইতে চাই। এ সম্বন্ধে একবার দেখা করিবে? যদি না পার ত পত্রে ভাল মন্দ যাহা হয় লিখিয়া পাঠাইয়ো— সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

[অগস্ট, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তুমি যে রূপ সঙ্গত বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। যদি টাকাটা আরও কিছু বাড়াইয়া লইতে পার চেষ্টা করিয়ো। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে আমাকে এখনো আরও ৮।৯ দিন থাকিতেই হইবে। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩

[অগস্ট ?, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

ভারতী সম্পাদক তাগিদ করিতেছেন। দুই এক দিনের মধ্যেই চাই। তুমি কি সংক্ষেপে গুটিকতক ছত্রে বলুর সম্বন্ধে সাধারণভাবে ও বন্ধুভাবে শোক প্রকাশ করিয়া সত্বর লিখিয়া পাঠাইতে পার? আজ বলেন্দ্রের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S Ry.

ভাই

সেই ৪০,০০০ টাকার ঋণপত্রের যে কাপি পাইয়াছি তাহার মধ্যে যে নিয়মে টাকাটা শোধ করিবার প্রস্তাব ছিল তাহার কোনও উল্লেখ না দেখিয়া কিছু ভীত হইয়াছি। মূল দলিলে কি এরূপ লেখা ছিল না ?

আমি যথাসময়ে যথাক্রমে কুষ্টিয়া ও শিলাইদহে আসিয়া দেখিলাম আপনার জন্য বিবিধ আহারাদি ও যানবাহনের আয়োজন রহিয়াছে।

আমার কপালক্রমে মিস্ ক্লারা সেদিন যথাসময়ে কুষ্টিয়া আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। বোধ করি বা তিনি তোমারই সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন। তুমি শুক্রবারে আসিবে কিনা বোধ হয় তাহা কাল বৃহস্পতিবারে ডাকের সময় নিশ্চয় জানা যাইবে। ইতি বুধবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

[১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তুমি বোধ হয় জান রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে—তিনি মহদাশয় ব্যক্তি এবং আমাদের পরম-সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন শিক্ষা ও স্বভাবে পিতার উপযুক্ত। তাঁহার পত্রখানি অত্রসহ পাঠাইলাম— ইহা হইতেই সমস্ত অবস্থা অবগত হইবে। আমার ক্ষমতা তোমার অগোচর নাই। তুমি যদি কোন কিনারা করিয়া দিতে পার ত বড় খুসি হই। দেওঘরের মত জায়গায় ভাল বাড়ির যথেষ্ট demand আছে সুতরাং যিনি টাকা invest করিতে চান তাঁহার টাকা জলে না পড়িবারই সম্ভাবনা। একটু চেষ্টা দেখিবে? আমি ছেলেদের সংস্কৃত পড়া লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া বিনোদিনীর প্রতি হস্তক্ষেপ মাত্র করিতে পারি নাই। তোমার আরব্ধ গল্পটি কতদূর অগ্রসর হইল? প্রদীপ ত এখনো হস্তগত হয় নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

২২ সেপ্টেম্বর [১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

এতদিনে আমার পূর্ব্বপত্র নিশ্চয় পাইয়াছ। বিল এবং বই যাহার প্রাপ্য তাহারই নিকট পাঠাইয়া দিবে। তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। Thacker অথবা Newmanএর ওখানে যদি Mrs Meynellএর Colour of Life এবং Children নামক দুইখানা বই থাকে তবে আমাকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া দিবে? যদি না থাকে ত order দিতে হইবে। প্রকাশক John Lane. The Bodley Head।

যোগীন্ সেই ঋণের প্রস্তাব সম্বন্ধে উন্মুখ হইয়া আছে। কত সুদে কি নিয়মে কিরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে যদি তাহাকে লিখিয়া পাঠাও ত বড় ভাল হয়। তাহার ঠিকানা

Babu Jogindranath Bose
Late Babu Rajnarain Boses House
Deoghar Baidyanath

খবরাদি পূর্ব্ববৎ— কেবল আকাশ পূর্ব্বের চেয়ে পরিষ্কার এবং রৌদ্রের বর্ণে সোনার আভা। আমন ধানের শীষ দেখা দিয়াছে এবং চাষারা শর্ষে বুনিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইতি ৬ই আশ্বিন [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

[১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

যোগীন্‌কে তোমার পরামর্শমত প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলাম। ধরিয়া লইতে পার যে রাজনারায়ণ বাবুর নামেই বাঙ্গলাটা আছে ও ইঁহারা যথাবিধি তাহাতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার ব্যবসার কথা ভুলি নাই— তোমার আগমন প্রতীক্ষায় তাহা আছে— এদিকে আমাদের কুষ্টিয়ার কার্য্যকারক ছুটিতে বাড়ি গেছেন— কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে ফিরিবেন।

আমার স্কন্ধে কবিতার পুরাতন জ্বর হঠাৎ চাপিয়াছে তাই বিনোদিনী উপেক্ষিতা।

তোমার খবর কি ? তোমার সংকল্প কি ? ম্যাক্স্‌মুলারের সে বইখানা কবে পাওয়া যাইবে ? ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮

২৬ সেপ্টেম্বর [১৮৯৯]

ওঁ

ভাই—

আপাততঃ পুলিপিনাং হইতে [? যদি] রক্ষা পাইয়া থাকো তবে [? কবে] এখানে আসিতে পারিবে একটা নিশ্চিত খবর দিয়ো। ইতিপূর্ব্বে তোমার প্রত্যাশায় তিনবার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে ; ইহার পরে কথামালার The Wolf গল্পের বিভ্রাট ঘটিলে নিজের কর্ম্মফল ছাড়া আর কাহাকেও দোষ দিতে পারিবে না। সুরেনকে বলিয়া দিয়াছি আমার কোষাধ্যক্ষ যদু চাটুয্যেকে দিয়া মহাজনটির নিকট সুদ পাঠাইয়া তাহার রসিদ লইয়া জমা করিবে। যদি এ বন্দোবস্তে কোন বিঘ্নের কারণ থাকে তবে সুরেনকে সত্বর একটা পত্র লিখিয়া দিয়ো। তাহার ঠিকানা

1 Rainey Park
62 Baligunj Circ. Rd.

আর আর খবর মোকাবিলায় আলোচ্য। ১০ই আশ্বিন [১৩০৬]—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

কাল ঢের হয়ে গেছে— আজ আর ঝগড়া করচি নে। তুমি নিশ্চয় এসো কিন্তু রবিবারে এসোনা ; কারণ ষ্টীমার নেই, মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদলাও হচ্চে এ সময়ে তোমাকে নৌকায় করে শিলাইদহে আনার প্রস্তাব করতে চাই নে। শনিবারে এলেই ভাল করতে কিন্তু এখন সে নিয়ে আক্ষেপ করা মিথ্যা। সোমবারে এসে মঙ্গলবারে যেতে পার। সব চেয়ে ভাল হয়, যদি রবিবার রাত্রের গাড়িতে গোয়ালন্দ মেলে আস্‌তে পার— তাহলে সোমবারে সকালে ছটার সময় এখানে পৌঁছবে— সমস্তদিন আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। নইলে সোমবারে ছাড়লে এখানে আস্‌তে সেই বেলা ৪টে পাঁচটা হয়ে যাবে। সোমবার ভোরে কুষ্টিয়া পৌঁছবে— তখন আমার শ্যালক দলবল-সহ তোমাকে অভ্যর্থনা করে ষ্টীমারে তুলে শিলাইদহে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যাবে— কোন চিন্তার কারণ থাক্‌বে না। তুমি যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রা কর রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হবেনা— তোমাকে ষ্টেশনে নগেন্দ্র জাগিয়ে টেনে বের করবে। আমার পত্র পেয়েই যদি উত্তর দাও রবিবারে পাব, সোমবারে তোমার জন্যে বন্দোবস্ত করা সহজ হবে। [ত্রিপুরা ?] সম্বন্ধে মোকাবিলায় সমস্ত পরামর্শ করব। শ্যাল [কের] সঙ্গে কারবার সম্বন্ধে পরামর্শও হতে পারবে। কি [বল ?] ইতি

তোমার রবি

৯০

ওঁ

ভাই

তুমি যে সময় এখানে এসে কিছু কাল নিশ্চিন্তমনে থাক্‌তে পার সেই সময়েই এসো। পূজার পরে এখানে সময়টাও বোধ হয় ভাল। তখন নদীচরে কাশস্তবক এবং ক্ষেতের মধ্যে শালীমঞ্জরী দেখা দেবে— আকাশ নির্ম্মল এবং বাতাস সুখসেব্য হয়ে উঠ্‌বে।

তোমার জন্য আমার যে ব্যয় ও আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে তা এত গুরুতর নয় যে সেটা বন্ধুর সঙ্গে বিবাদের উপলক্ষ্যস্বরূপে গণ্য হতে পারে।

বিনোদিনীর সঙ্গে আমার দীর্ঘবিচ্ছেদ চল্‌চে। ছোটখাট নানা ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। এখানকার খবর সমস্ত ভাল।

এখানে তুমি যখন আস্‌বে রাত্রের গোয়ালন্দ মেল যোগেই এসো— তাহলে ষ্টীমার পাবে— নইলে বড় অসুবিধা। নৌকায় এত দীর্ঘকাল লাগে, যে, তার চেয়ে ট্রেনে রাত্রি-জাগরণের দুঃখ অনেক সংক্ষিপ্ত।

"প্রদীপ" লিখেছে যে তুমি সমস্ত প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছ। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১

[* ২০ অক্টোবর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

ম্যাক্সমূলরের বই ও বিল তুই এখানে বুক পোষ্টে পাঠাতে বোলো।

প্রদীপ পেয়েছি। নীরা পড়িনি— ছবিগুলো দেখেই ভয় পেয়ে গেছি। অন্য লেখাগুলো কাজের নয়। ভারতী আশ্বিন কার্ত্তিক বেরিয়ে গেছে। পাও নি কেন?

শরৎকাল নির্ম্মল রৌদ্রে নিজ মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২

[অক্টোবর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

বিজয়ার প্রেমাভিবাদন গ্রহণ কর।

ঝড় বৃষ্টি চল্‌চে। আমি চতুর্দ্দিকে সাসি বন্ধ করে গরম হয়ে বসে লেখবার চেষ্টায় আছি। এবারে যখন আস্‌বে তোমাকে শোনাবার মত কিছু সংগ্রহ থাক্‌বে। কিন্তু খুব বেশি আশা কোরো না— কারণ ব্লেসেড্ আর্ দোজ্ হ্যাট্ এক্স্পেক্ট্ নাথিং, ফর্— ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবী সরস্বতীর দ্বারে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুষ্টিভিক্ষা করচি মাত্র— এবং তিনি যখন অনুগ্রহ করে যা দেন আমি সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি মাত্র না করে ঝুলিটির মধ্যে পূরি। আর কিছু না হোক্ ঝুলিটি উত্তরোত্তর ভরে উঠ্‌চে। এত অধিক বোঝা নিয়ে অমরতার পথে অধিকদূর যাওয়া যায় কি না সে একটা বিবেচ্য বিষয়। এক এক সময় নৌকা বাঁচাবার জন্যে মালের বস্তা দুটো চারটে, জলের মধ্যে টেনে ফেলে দিতে হয়— আমারো অনেক বস্তা ফেলা দরকার। ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে— বৃষ্টিধারারও বিরাম নেই। আজ ভোগের জন্য খিচুড়ি প্রস্তুত— অদূরবর্ত্তী ভোজনশালা থেকে এই মাত্র তার উষ্ণগন্ধ এসে পৌঁচেছে— এখন তোমার অনুমতি নিয়ে গাত্রোত্থান করি— তোমাকেও আমন্ত্রণ করি। ইতি রবিবার [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩

১৭ নভেম্বর [১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

আজ হঠাৎ অ্যাটর্নি অমরনাথ ঘোষের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়ে অবাক্ হয়ে গেছি— নিম্নে কপি করে পাঠাই :—

The document in favour of my client Babu Moti Chand Nakhat requires registration : as three months have expired, the document must at once be registered or a fresh one executed so that you will have 4 months within which the 2nd document may be registered. An early reply will oblige.

এর অর্থ কি ? কি জবাব দেওয়া যাবে ? এরা যেরকম party দেখচি তাতে আমাকে হঠাৎ বিপদে ফেলবার চেষ্টা করা অসম্ভব নয়। এক বৎসরের কড়ার আছে। তার পরে বেঁকে দাঁড়ালে এক দম মুস্কিলে পড়ব। কি উপায়ে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার হওয়া যায় আমাকে শীঘ্র লিখে পাঠিয়ো। মনটা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৪

[† ২০ নভেম্বর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তোমার চিঠিমত অমরনাথ ঘোষকে লিখে দিলুম। যদি রেজেষ্ট্রি করতেই হয় তা হলেও আর কারো কাছ থেকে টাকা এই লোকটাকে শোধ করে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এ রকম লোকের হাতে বদ্ধ হয়ে থাকা ভয়ঙ্কর।… … কি আয়ত্তাতীত? যদি রেজেষ্ট্রি করাও যায়— এবং আমার সঙ্গে সুরেনেরও নাম জড়িয়ে কোন সুবিধে থাকে তাতেও প্রস্তুত আছি কিন্তু নিরাপদ হওয়া চাই— এবং যদি সুদ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমানো যায়। কিন্তু খরচাতেই বধ করে। আমি হিসাব করে দেখেছি যে টাকাটা এক বৎসরের কড়ারে আমরা নিয়েছি তার খরচা ধরতে গেলে ১৪ পার্সেন্ট্ পড়ে। যাই হোক্ তুমি যেটা সুপরামর্শ বোধ কর তাই কোরো। সুরেন তোমার সঙ্গে বোধ হয় দেখা করতে যাবে।

“কণিকা” প্রায় ছাপা হয়ে এল। এবার আর একটা কাব্যগ্রন্থ ছাপ্‌তে দেব। দুশ্চিন্তায় কোন লেখা এগতে পারচে না। আমাদের কুষ্টিয়া মোকামের সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারী পূজার সময় দেশে গিয়ে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তাই তোমাকে সুতোর নমুনা পাঠাতে পারিনি। আগামী সোমবারে একজন সেখানে হাজির হবে— তাকে বলে দেব।

বহুকাল তোমার কোন খবর পাইনি। বোধ হয় তোমার কলকাতা ছাড়বার অনেক বাধা আছে তাই তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে সঙ্কোচে ফেল্‌তে চাইনে। কিন্তু যদি কখনো সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন সুবিধা পাও তাহলে তুমি এখানে এলে খুব খুসি হই সে কথা বলা বাহুল্য। মেজদাদা অল্পদিনের মধ্যে এখানে আস্‌বেন। মাঝে লোকেন দিন দুই তিন এখানে থেকে রাত তিনটে পর্য্যন্ত সাহিত্যচর্চ্চা করে গেছে। সে কটা দিন বৈষয়িক বিভ্রাট সমস্ত ভুলে একরকম ছিলুম ভাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

[† ২৩ নভেম্বর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। আমি ক' দিন চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। এবার তুমি যাহোক্ একটা সদ্গতি করে দিয়ো যাতে ভবিষ্যতে হঠাৎ অসময়ে নাড়া খেয়ে নাড়ী চম্‌কে না ওঠে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গেলে পাছে সেটা শুষ্ক লৌকিকতার শূন্যগর্ভ কথার মত শোনায় সেই জন্যে নীরব আছি— কিন্তু এটুকু বল্‌তে দোষ নেই যে তুমি আমার আয়ুবৃদ্ধি করে দিয়েছ— কিছু কাল থেকে অহরহ চিন্তার জ্বলুনিতে আমার তেল ফুরিয়ে আস্‌ছিল। জুরির আহ্বানে আমাকে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে কলকাতায় ছুট্‌তে হবে সেই সময়ে তোমাকে এখানকার আবশ্যক এবং অনাবশ্যক সমস্ত খবর দিতে পারব। শৈলেশ কয়েক দিন এখানে যাপন করচে— কাল সে চলে যাবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬

ওঁ

ভাই

আবার কলকাতায় এসে পড়েছি— স্থিতি অধিকক্ষণ নয়। তোমার History of the Ottoman Poetry বইখানির প্রথম খণ্ড দরকার পড়েছে— একটা লেখার জন্যে। এই লোক মারফৎ পাঠাতে পারবে ?

রবি

৯৭

ওঁ

ভাই

আমি জুরিতে আবদ্ধ হয়ে অস্থিরভাবে আছি। তোমার সঙ্গে সেইজন্যে দেখা হয় নি। আদালতে দেখা হবে ভেবেছিলুম কিন্তু কই ? কবে ছুটি পাব জানি নে। আজ সন্ধের সময় যদি পার ত এস— বইগুলো নিয়ে যেয়ো এবং Herbert Spencer ও নতুন গল্পের বইটা এনো।

রবি

১৮

ওঁ

ভাই

সকালে জনতার মধ্যে পড়িয়া যথাসময়ে লোক পাঠাইতে পারি নাই। তোমার বই ফেরৎ পাঠাইলাম। Herbert Spencer এবং Henry Harland নিশ্চয় পাঠাইয়ো।

শ্রীরবীন্দ্র

১৯

ওঁ

ভাই

শ্রীশ মজুমদার মশায় বিদেশ থেকে সম্প্রতি এখেনে এসেচেন। আজ দুপুর বেলা এই দিকে আস্‌বেন। তুমি যদি আপিষ পালাতে পার ত আজ আমার সেই ঘরের কোণে খুব মজলিষ্‌ জম্‌বে। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

১১ মে [১৯০০]

শিলাইদহ

ভাই—

তাই ত! অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কোন অভিমান কোন কালেই নেই— কিন্তু চোদ্দটা লাইনের মধ্যে যেটুকু গণিতশাস্ত্র আছে তাতেও যে আমার স্খলন হবে এ আমি কল্পনা করি নি। সনেট্‌টিতে অজ্ঞাতসারে একটি লাইন ফাঁকি দিয়েছিলেম। সেটুকু অদ্য এইমাত্র পরিশোধ করতে বসে আগাগোড়া কতক কতক বদ্‌লে গেল। আর কিছু না, একটা লাইন লিখে শেষকালে লেখবার নেশা জেগে উঠ্‌ল— খুন চড়ে যাওয়ার মত— একেবারে কলম হাতে ভীষণবেগে ran amuck। যদি ভাল লাগে ত এই পাঠান্তর রেখো নইলে নূতন লাইনটুকু যোগ করে পুরানো পাঠ চালিয়ে দিতে পার। যথাভিরুচি। ক্ষণিকার জন্য তাড়া লাগিয়ে হয়রান্ হলুম— নেপথ্যবিধানেই বসন্তের রাত্রি কেটে গেল— আমার নটী যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করবেন, তখন বাদলের দৌরাত্ম্যে তার বসন্তী রঙের অতি-ফুর্‌ফুরে উত্তরীটির বাহার থাকে কি না থাকে! দক্ষিণে বাতাসের মধ্যে এঁকে না বের করতে পারলে অন্যায় হবে। ইতি ২৯শে বৈশাখ [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরপৃষ্ঠায়

প্রত্যুপহার।

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে',
এবার কিছু কি কবি করিলে সঞ্চয় ?
পরালে কি কল্পনারে করুণ কৌশলে
বসন্তী সোনার বর্ণ নবীন বলয়,
রচিয়া নিপুণ ছন্দে চম্পকের দলে,
লুণ্ঠিয়া ফাল্গুনরাতে নিকুঞ্জ-নিলয় ?
আঁকিলে অলক্তরাগ পাদপদ্মতলে
তুলি লয়ে কিংশুকের রক্ত কিশলয় ?

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা-নিশীথে
নব-মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে ?
সে কি গেছে চ্যুতপুষ্প-সৌরভের দেশে ?

১০১

[শিলাইদহ * ১৪ জুন ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আমিই তোমার তূষ্ণীম্ভাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলুম— দুচার কথায় আমার বক্তব্য লিখ্‌তেও যাচ্ছিলুম এমন সময় তোমার পত্র পাওয়া গেল— কেবলমাত্র দীর্ঘসূত্রিতা করে হারা গেল— কারণ এ রকম বিবাদ যে সুরু করতে পারে তারই জিত।

কলকাতায় তোমরা গরমে হাঁসফাঁস করছিলে আমরা তখন নবধান্যাঙ্কুরশ্যামল উন্মুক্ত মাঠের উদার বাতাসে উত্তরীয় হিল্লোলিত করে পল্লিপথে সান্ধ্যমেঘের স্বর্ণচ্ছটায় অভিষিক্ত মস্তকে গৌরীনদীর সিকতাশুভ্র নির্জন তটভূমিতে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিলুম। তোমারও সে সুখভোগে কোন বাধা ছিল না— আমন্ত্রণও ছিল— নিজদোষে কষ্ট পাচ্চ, অতএব এ সম্বন্ধে আমার সহানুভূতি প্রত্যাশা কোরো না।

ক্ষণিকার চতুর্থ ফর্ম্মার প্রথম প্রুফ আজ দেখে দিলুম— বোধ হয় পঞ্চম ফর্ম্মায় সমাপ্ত হবে— কবিতার সংখ্যা গোটা ৫৫।

তুমি মোটা জাতের গোটাকতক সুতার নমুনো সঙ্গে এনো — অর্থাৎ খবর নিয়ো মফস্বলে কি রকম সুতো সাধারণতঃ প্রচলিত। আখের কল সম্বন্ধে মোকাবিলায় তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে— যদি ভাল বোঝো যোগ দিয়ো। সুতা, পাথুরে কয়লা প্রভৃতির কারবার তার চেয়ে অনেক ভাল।

তোমাকে এখানে কারবারে বদ্ধ করতে [পারলে] আমিও সুখী হই। কিন্তু একবার আসা দরকার।

অলীকপ্রকাশের সমালোচনা বেশ লেগেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

২০ জুন [১৯০০]

ওঁ

ভাই

এ কয় দিন পর্য্যায়ক্রমে কাজ এবং আলস্যে বিজড়িত হয়েছিলুম— এদিকে আকাশে এক বার মেঘ একবার রৌদ্রের আবির্ভাব তিরোভাব চলছিল।

প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষ্যে কাব্য এবং নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং আচরণের সৌন্দর্য্য সবই ললিতকলাবিধির অধিকারভুক্ত কিন্তু সৌন্দর্য্যের হিসাবে না গিয়ে কোন প্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মনীতির সৌন্দর্য্য যে সৌন্দর্য্য নয় এ কথা যে বলে সে অন্ধ। গোলাপের সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর, সুন্দর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তেমনি সুন্দর— কেবল তা অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর এই যা তফাৎ। গান কর্ণগোচর সুন্দর, রূপ চক্ষুগোচর সুন্দর, সাধুহৃদয় মনোগোচর সুন্দর। তোমার প্রবন্ধের অপরাংশের জন্যে উৎসুক আছি।

“সাহিত্যে” কবিতায় এবং আলেখ্যে আমি চিত্র-বিচিত্রিত হয়ে উঠেছি— তাতে তোমারি প্রণয়চেষ্টা প্রস্ফুটিত হয়েছে— আমি সে সম্বন্ধে নীরব।

আগামী ১৬ই আষাঢ়ে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বাড়িতে ১৭ই বড়দাদার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ।

ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পড়চি। ৪ ফর্ম্মা গেলি প্রুফ হয়েছে— অদ্য কেবল দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডর প্রুফ পাওয়া গেল।

আষাঢ়ের ভারতী আজ পেয়েছি। তুমিও বোধ হয় পেয়ে থাক্‌বে।

বম্বে থেকে আম আনাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। ইতি ৬ই আষাঢ় [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[† ২২ জুন ১৯০০]

ওঁ

ভাই

প্রভাতটা ঠিকমত চল্‌চে না। ওর মধ্যে না আছে ঝাঁজ, না আছে রস, না আছে উজ্জ্বলতা না আছে নূতনত্ব। আমি ত প্রায়ই একটা করে লিখ্‌চি। কেবল গেলবারে লিখিনি। কিন্তু আমার কাছ থেকে কত আদায় করতে চাও? আমি প্রদীপ ওস্কাব, প্রভাতকে উজ্জ্বল করব, ভারতীকে অর্ঘ্য জোগাব, নিজের কাব্যলক্ষ্মীকে মাল্যচন্দন পরাব— এদিকে গৃহস্থাশ্রমও রক্ষা করতে হবে, জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করব, এবং বাণিজ্যে যে অলক্ষ্মী বাস করেন তাঁকে নানা কৌশলে শান্ত করে রাখব। তা ছাড়া মাঝে মাঝে মনোযন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। এক এক সময়ে বুদ্ধি ও ভাব কচ্ছপের মুণ্ডের মত মস্তিষ্কের মধ্যে একেবারে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে— যতই তাড়না করা যায় ততই সে আরো সঙ্কুচিত হয়। এসবগুলো কি একবারো হিসাবের মধ্যে আন্‌বে না?

নগেন্দ্রবাবু গল্প চান কিন্তু আমি প্রভাতের নানাজাতীয় পাঠকের কাছে শুন্‌লুম যে খবরের কাগজের স্তম্ভে যে গল্প বেরয় গল্পানুরাগ সত্ত্বেও তা তাঁরা পড়েন না;— খবরের সঙ্গে Politicsএর সঙ্গে গল্প অস[ঙ্গত] লাগে। এ অবস্থায় লেখককে খবরসাগরে তাঁর সাধে[র] রচনাগুলিকে বিসর্জ্জন দিতে বলা,

গঙ্গাসাগরে ছেলে দিতে মা'কে অনুরোধ করার মত। গল্পগুলো ভারতী সম্পাদক সম্পূর্ণ আদায় করে নিয়ে বসে আছেন।

আজ ৮ই, আমি ১৫ই কলকাতায় যাচ্চি— সেখানে দু চার দিন থেকে পুণ্যাহ করতে কালিগ্রামে যাব— সেখান থেকে ফিরব ২৬।২৭শে নাগাদ। এখানে এসে পেঁাছতে প্রায় আষাঢ় শেষ।

আজ ক্ষণিকার ৩য় ফর্ম্মার প্রুফ দেখে দিলুম।

ধানভাঙা কল ইত্যাদি নিয়ে তুমি কবে আস্‌চ? সুরেন এখন এখানে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪

[৫ জুলাই ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আজ প্রাতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম। এলে না। ক্ষণিকার প্রুফ আসবার কথা ছিল বলে তোমার ওখানে যেতে পারি নি— প্রুফও আসেনি।

পর্শু অর্থাৎ শনিবারে কালিগ্রাম যাচ্চি। কাল প্রাতে কিম্বা সায়াহ্নে আস্‌তে পার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫

[১৪ জুলাই ১৯০০]

ওঁ

ভাই

তোমার স্বপ্নলোক এবং কর্ম্মচক্র থেকে শীঘ্র নেমে এস। কাল ত রবিবার আছে কাল কখন্ আস্‌বে লিখে পাঠিয়ো। তুমি যদি না নড়তে পার মহম্মদকে নড়তে হবে— কিন্তু মহম্মদও নড়েচেন ওদিকে পর্ব্বতও সরেচেন এমন ঘটনা ইচ্ছা করি নে। তুমি আস্‌বে, কি আমি যাব ঠিক করে বল। এবং কখন? কাল সকালে নিশ্চয়ই একখণ্ড ক্ষণিকা পাবে। আষাঢ়স্য শেষদিবসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬

[১৯০০]

[ওঁ]

ভাই,

চিঠি লেখা হয়েছে? কোন খবর আছে? আজ কি আস্‌চ? আমার কাল সকালে যাওয়াই স্থির। ক্ষণিকা শেষ করলে? সুরেশবাবুকে ও নগেন্দ্রবাবুকে দিয়েছ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭

ওঁ

ভাই

সেই শাণ্ডিল্য গোত্রটিকে ছাড়লে চল্‌চে না। কারণ সত্যর মেয়ে শান্তার জন্যে একটি পাত্রের দরকার। শান্তা দেখতে শুনতে ও পড়াশুনায় দিব্যি। এ সম্বন্ধে তুমি যদি সত্যর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাও ত ভাল হয়। সত্য বোধ হয় কাল সকালে তোমার ওখানে যাবে। আমি ত অদ্যই চল্‌চি। নগেন্দ্র তোমার কাজটার জন্যে আলোচনা করতে গিয়েছিল কিন্তু সুরেশবাবু থাকাতে সকল কথা বল্‌তে পারি নি— তাকে বলে দিয়েছি তোমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা করে যা যা বলবার আছে বলে আসে। সুতা পাট এবং আখের কল যেটা তোমার পছন্দ হয় ঠিক কোরো। Molie re ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮

ওঁ

ভাই

কাল তুমি যার কথা বলেছিলে তার গোত্র জানা আবশ্যক কারণ বারেন্দ্র শ্রেণী হলেও স্থল বিশেষে গোত্রে বাধে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাল আছি

১০৯

[কলিকাতা * ২২ জুলাই ১৯০০]

ওঁ

কুষ্টিয়া

স্বস্থানে আসিয়াছি

শ্রীর

১১০

[জুলাই ১৯০০]

ওঁ

ভাই

সাধু! সাধু! তুমি যে আমার বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে নিজের বুদ্ধি চালনা করেছ সে জন্য তোমাকে ধন্য!

এখন, তার পর?

এমন সুন্দর দিন হয়েছে যে সে আর বর্ণনা করবার যো নেই। আশঙ্কা হচ্চে পুনর্ব্বার বর্ষণ আরম্ভ না হলে তুমি এখানে পদকর্দ্দম দেবে না।

কবি দেবেন্দ্র সেন আমার আতিথ্য নিতে আস্‌চেন— আশা করি শিলাইদহ তাঁকে পর মনে করে মেঘের ঘোমটা টেনে বস্‌বেনা।

কিন্তু দিন যতই সুন্দর হোক্ আজ আর অন্য কথা কিছু লিখ্‌ব না।

এইবার কথাটাকে তার শুভ পরিণামের দিকে সত্বর অগ্রসর করিয়ে দাও। এজন্য আমার কি কলকাতায় যাওয়া আবশ্যক হবে?

শরৎ কবে কলকাতায় আস্‌বেন জান কি?

কিন্তু কি সুন্দর আলো, কি সুন্দর সবুজ, কি সুন্দর হাওয়া, কি অপর্য্যাপ্ত নির্ম্মলতা এবং উজ্জ্বলতা, জলস্থল আকাশের কি শুচিস্নাত পরিপূর্ণ শ্রী! সমস্তই উদার অজস্র অপরিমেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১

[জুলাই ১৯০০]

ওঁ

অচলাটলনির্ব্বাণ্বরেষু

কোন্ সময় চুপ করিয়া থাকিতে হয় সে বিদ্যাটা তুমি বেশ জান।

আমি এখানে একাগ্রমনে ছিপ্ ফেলিয়া বসিয়া আছি—তোমার মস্ত খবরটা একবার কেবল ঠোকর মারিয়া গেল—হে অতলস্পর্শ সংবাদ-অম্বুনিধি, এই তীরবাসীকে আর বিড়ম্বিত করিয়ো না।

কবি দেবেন্দ্র সেন শিলাইদহে আসিবেন আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিলেন তার পরে আজ তিন দিন তাঁর আর কোন সংবাদ নাই।

বায়ু গর্জ্জন করিতেছে, আকাশে ক্রমাগত মেঘ ও রৌদ্রের গতায়াত চলিতেছে—এবং I am aweary aweary—he cometh not.

লোকেন বহুকাল পরে দেশে ফিরিল—এক লাইন খবর নাই। শ্রাবণ মাসে কি মীনরাশির সংবাদভাগ্যে কোন গোল আছে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২

২ অগস্ট [১৯০০]

ওঁ

ভাই

যেমন ওষ্ঠ এবং পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঘাত থাকে তেমনি পাত্র এবং পাত্রীর মধ্যেও। সেই জন্য খুব বেশি আশা করিয়া থাকা ভাল নয়। প্রজাপতির পথও never runs smooth।

মার কাছ হইতে তাঁহার ছেলেটিকে দরবার করিয়া লইবার উপযুক্ত উকীল কে? সে কাজ ছেলে নিজে করিতে পারিতেন— তদভাবে অবিনাশ ছাড়া ত লোক দেখি না।

কিন্তু বুদ্ধিসম্বন্ধে আমার কাছে বেশি সাহায্য পাইবেনা। অতএব তোমাকে একক লড়িতে হইবে।

কিন্তু তুমি দমিয়া আছ কেন? যদি ঘট্‌কালি সম্বন্ধে আশু কোন উপায় না দেখিতে পাও বা কর্ত্তব্য কিছু না থাকে তবে চট্ করিয়া এখানে চলিয়া আইস— আমি তোমার ভূত ঝাড়াইয়া দিব। কলিকাতার হাওয়ায় প্রফুল্লতা রক্ষা করা শক্ত।

কবি দেবেন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ আসন্ন— সেই জন্য তিনি ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহের পূর্ব্বে এখানে আসিতে পারিবেন না। বিবাহের পণ লইয়া বেচারা সঙ্কটে পড়িয়াছে— কিছুমাত্র যদি সঙ্গতি থাকিত ত উদ্ধারের চেষ্টা করিতাম— কিন্তু আমার অবস্থা তোমার অগোচর নাই। ইতি ১৮ই শ্রাবণ [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৩

[অগস্ট ১৯০০]

ওঁ

ভাই

চলে এস— আর নয়। বৃথা চেষ্টা নিয়ে বৃথা কষ্ট ভোগ করবার দরকার কি? এক কাজ কর— এক দম সোজা অবিনাশের কাছে গিয়ে পরিষ্কার প্রস্তাবটা করে ফেল— যদি হয় ত হবে না হয় ত চুকে যাক্। না হবার দিকেই যখন সাড়ে পনেরো আনা সম্ভাবনা তখন ভয় কিসের— দু পয়সা সম্ভাবনার জন্যে অত কসাকসি করতে পারা যায় না।

তোমার নম্বর দুই পাত্রটির কথা শোনাচ্চে মন্দ নয়— বয়স ঠিক উপযুক্ত, শিক্ষারও অভাব নেই, সম্পত্তিও যথেষ্ট কিন্তু ভাবে বোধ হচ্চে তুমি গোত্র সম্বন্ধে কোনও সংবাদ নেও নি। যদি শাণ্ডিল্য হয় তাহলে সত্যকে স্মরণ কোরো— শাণ্ডিল্য নম্বর ১ বোধ হয় সত্যর তেমন মনঃপূত হয় নি। যদি শাণ্ডিল্য না হয় তা হলে তার মার মতটা সম্বন্ধে কি রকম বিবেচনা কর। একটা কথা বোধ হয় জান না, পাত্রটিকে বিবাহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়— তাতে প্রতিজ্ঞা করতে হয় পরব্রহ্মজ্ঞানে কোনও সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করব না।

তোমার ছেলেটির ভাল খবর শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

কিন্তু মনটা কিছুতেই বিগ্‌ড়োতে দিয়ো না— ওটা একটা দামী জিনিষ। যদি শীঘ্র আরোগ্যের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সকল কাজ ছেড়ে এখানে এসে পড়।

একটা কাজের ভার দেব? আমার বাড়ি তৈরি বাবদ্ লোকেনের কাছে আমি ৫০০০৲ টাকা ঋণী ঐ সম্বন্ধে খুচ্‌রো ঋণ আরো কিছু আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যের Copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০৲ টাকায় কেনাতে পার? শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে সে আমি শিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব— গ্রন্থাবলী যা আছে সে এক তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব (কারণ এটাতে সত্যর অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই) আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে লোক কিন্‌বে সে ঠকবে না। লোকেন ঋণশোধের জন্যে আমাকে কখনো তাড়া দেবে না আমি সেই জন্যেই নিজের তাড়ায় তার ঋণশোধের জন্যে মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। সে অত্যন্ত অসময়ে আমাকে এই টাকাটা দিয়ে নানা বিপত্তি হতে রক্ষা করেচে— তার পর থেকে এই টাকাটা সম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্যই করে না। আমার প্রস্তাবটা কি তোমার কাছে দুঃসাধ্য বলে ঠেক্‌চে? যদি মনে কর ছোটগল্প এবং বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি কাব্য গ্রন্থাবলীর চেয়ে খরিদ্দারের কাছে বেশি সুবিধাজনক বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাব্যগ্রন্থগুলোই লাভজনক।

এখানে ভাল ভাল দিন বয়ে যাচ্চে— সোনালিমণ্ডিত, সমীরকম্পিত, শ্রাবণসিঞ্চিত, তপনচুম্বিত সুদীর্ঘ স্বপ্নাবিষ্ট দিন। ঐসা দিন নেহি রহেগা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৪

[অগস্ট ১৯০০]

ওঁ

ভাই

শাণ্ডিল্য গোত্রের আনুপূর্ব্বিক খবর পেয়ে খুসি হলুম। প্রজাপতি খুব ব্যস্ত আছেন— আমিও ততোধিক।

আজ দিন দুই বাদ্‌লা কেটে গিয়ে বড় সুন্দর দিন হয়েছে। কোন কাজ করবার যো নেই। কাল আগামী কিস্তি চিরকুমার-সভা শেষ করে আমার সমস্ত মনখানা নির্ম্মল রৌদ্রে মেলে দিয়ে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ শয্যার উপর অলসভাবে মানসিক রোদ পোহানর কাজে নিযুক্ত আছি। সকাল থেকে একটা কেদারায় পড়ে ছিলুম—১০॥-টার সময় ডাকের চিঠিগুলো পেয়ে ওরি মধ্যে একটুখানি চঞ্চল হয়ে ওঠা গেল। এই জবাবখানা সেরে স্নানাহারের পরে আবার সেই চৌকিটা আশ্রয় করে উন্মুক্ত দক্ষিণ দ্বারের কাছে নীরবে দিনযাপন করব— অতএব আজকের দিবসের কর্ম্মতালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

প্রভাতের জন্যে গতকল্য "তৈলাক্ত শীর্ষে তৈলসেক" নামক একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি।

তোমার লেখনীর সংবাদ কি? ক্ষণিকা বেচারা জন্মাবামাত্র শত্রুপক্ষের লক্ষ্যস্থল হল? ভগবান বাসুদেবেরও এই দশা হয়েছিল— আশা করি আমার সন্তানটিও সমালোচক কংসের হাত এড়িয়ে তাঁর ব্রজলীলায় প্রবৃত্ত হবেন। এই শেষজাতটির

প্রতি আমার কিছু অধিক মমতা জন্মেছে। এখানে আস্‌বার জন্যে ত্বরয়। এমন দিন আর পাবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—

গল্পের বইয়ের প্রুফ আমি কালই পাঠিয়ে বসে আছি। যদি সুরেশ বাবু নিতান্ত নিতে ইচ্ছা করেন তবে একটু শীঘ্র তাঁর মতটা জান্‌তে পারলে ভাল হয়—বিস্তারিত বিবরণ এই :—

বইটা আন্দাজ ৭৫ ফর্ম্মা হবে— দুই খণ্ড করব— প্রত্যেক খণ্ডের দাম ১৸৹।

কাগজ বিলাতী ২২ পাউণ্ড্‌। অর্থাৎ প্রায় চার টাকা দাম। ছাপার খরচ তিন টাকা ফর্ম্মা। তাহলে সবসুদ্ধ খরচ ৫০০৲। হাজার বইয়ের মূল্য ৩৫০০।

গুরুদাসকে বিক্রয় করলে সে আমাকে শিকি মূল্য ৮৭৫৲ টাকা দেবে— ৫০০৲ খরচ বাদ দিলে ৩৭৫৲ টাকা আমার থাকে।

কিন্তু এক টাকা বারো আনা দাম যদি অধিক মনে হয় ত দেড় টাকার কম দাম কিছুতেই করব না। কিন্তু প্রায় ৫০০ পাতার বইয়ের দাম ১৸৹ আনা হওয়া অন্যায় নয়।

সুরেশ বাবু যদি আমাকে ৩০০৲ টাকা মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে আমার বক্তব্য আর কিছুই থাকে না। অবশ্য বই কাউকে বিতরণ করব না।

বলা আবশ্যক খণ্ড আকারে এই গল্পের বইগুলোর Edition

এখনো শেষ হয় নি। যেমন গ্রন্থাবলী যখন বাহির হয়েছিল তখন তার অন্তর্ভূত অনেকগুলো বই বাজারে ছিল এরও সেই দশা হবে।

কিন্তু অনেকগুলো নূতন গল্প এর মধ্যে স্থান পাবে। হাতে একখানা বড় বইয়ের উপযুক্ত গল্প আছে যা গ্রন্থ আকারে বাহির হয় নি।

শ্রীঃ

১১৫

[অগস্ট্ ?, ১৯০০]

ওঁ

ভাই—

অধীর স্বভাবের জন্য আমি নিজেকে অনেক অনুযোগ করিয়া থাকি— কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়াইয়াছ। বেলার জন্য যে পাত্রের সন্ধান করিতেছিলে সেটিকে সংগ্রহ করিতে পারিলে পূর্ণমনোরথ হইতাম কিন্তু তবু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের প্রতি নির্ভর করিয়া মনকে শান্ত রাখিয়াছি ; তুমি সে জন্য নিজেকে অকারণ ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়ো না— যদি অবিনাশ অনুকূল ভাব ধারণ করিয়া তাহার মাকে সম্মত করিতে পারে ত ভাল, না পারে ত কি করা যাইবে ? এখন, তুমি তোমার ছেলেটি আরাম হইবামাত্র এখানে চলিয়া এস— ঘট্‌কালির ঘূর্ণীর মধ্যে নিজেকে আবর্ত্তিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়ো না। আমারও ছোট ছেলে কয়েক দিন জ্বর ও কাশীতে ভুগিতেছিল— আমি তাহাকে অ্যাকোনাইট ৩০ ও বেলেডোনা ৩০ পর্য্যায়ক্রমে দিয়া শীঘ্রই আরাম করিয়া তুলিয়াছি— এখনো কাশী আছে কিন্তু বেশি নয়।

সুখংবা যদিবা দুঃখং প্রিয়ংবা যদিবাপ্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা

এই মন্ত্রটি আমি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে চেষ্টা করি— কোনও ফল পাই নাই তাহা বলিতে পারি না। সংসারে যখন সুখ পাই

তখন দুঃখের আবির্ভাবে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। যত রকম দুঃখ ও অপ্রিয় সংসারে সম্ভবপর আমি সমস্তই মাঝে মাঝে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়া মনকে সকল অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখিতে চেষ্টা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৬

[অগস্ট, ১৯০০]

ভাই

তবে বৃহস্পতিবার নাগাদ দর্শন পাবার আশা আছে। কিন্তু অনেক ঠেকে ঠেকে আজকাল আমি মনকে এমনি সায়েস্তা করে নিয়েছি যে, আশার কারণ থাক্‌লেও তাকে আশা করতে দিই নে— যদি বৃহস্পতিবারের মধ্যে তুমি না এস তাহলে আমি প্রাজ্ঞজনোচিত সুগম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলব— সংসারের এই রকমই নিয়ম— যা অভিলষিত তা সকল সময়ে সুলভ নয় বলে দ্বিগুণ অভিলষিত— যা অত্যন্ত সম্ভবপর তারও স্থির-নিশ্চয়তা না থাকাতে সংসার চিরদিন বিচিত্র হয়ে আছে এবং অধিকাংশ জিনিষ আমাদের প্ল্যান্ অনুসারে ঘটে না বলেই যা ঘটে তা আমাদের চিত্তের ঔৎসুক্যকে অহরহ জাগ্রত করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তোমার না আস্‌বার কোনও ওজর আমি সহজে গ্রাহ্য করব না তাও বলে রাখ্‌চি।

আমার কাপিরাইট্ বিক্রি করার কথাটা চিন্তা কোরো এবং পার ত চেষ্টাও কোরো। গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিসর্জ্জন ও রাজা ও রাণী স্বতন্ত্র আকারে বাজারে আছে এবং বর্ত্তমান সংস্করণ গুরুদাসকে বিক্রয় করেছি— তেমনি কণিকা থেকে ক্ষণিকা পর্য্যন্ত পাঁচখানি সম্পূর্ণ নূতন বই আমার হাতেই আছে এবং ব্যবস্থা করে বিক্রি করতে পারলে পূজার কাছাকাছি কিছু ঘরে

আস্‌বার সম্ভব। In fact গুরুদাস ঐ বইগুলির জন্যে বারম্বার দূত প্রেরণ করচে কিন্তু লোভ সম্বরণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

তোমার দ্বিতীয় পাত্রটির সংবাদ আমার মন্দ লাগ্‌চেনা। তার খবরটা বোধহয় কাল পর্শু পাওয়া যাবে। কি বল?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রদীপ কি নির্ব্বাপিত? প্রভাতের জন্যে কাল একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি— নাম "চুম্বকশৈল।"

১১৭

[অগষ্ট, ১৯০০]

ওঁ

ভাই—

তোমাদের ঘরের সমস্ত খবর ভাল ত ?

পর্শু বৃহস্পতিবার।

আর একটা কাজের কথা। তুমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র Chander Brothersদের একটা অনুরোধ করবে ? ইংরাজি ২৪ পাউণ্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ১০ রীম, সমাজ প্রেসে আমার অ্যাকাউণ্টে তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন ? এবং যে রকম কাগজে ক্ষণিকা ছাপা হয়েছে, সেই রকমের ৩৫ পাউণ্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ২ রীম তৎসহ ঐ ঠিকানাতেই পাঠাতে পারবেন ? দাম পেতে বিলম্ব হবে না— অর্থাৎ আগামী বাঙ্গলা মাসের আরম্ভেই পাবেন। আমার গল্পাবলী ছাপতে সবসুদ্ধ বোধহয় ৭০।৭৫ রীম ২৪ পাউণ্ড ও আট রীম ৩৫ পাউণ্ড দরকার হবে। আশা করি Chunder Brotherদের কাছে পেতে কোন ব্যাঘাত হবে না। আমি এই সঙ্গে সমাজ প্রেস্ ওয়ালাদেরও লিখে দিচ্চি যে তারা Chunder ব্রাদার্সের ওখানে গেলে আমার অ্যাকাউণ্টে কাগজ পাবে। আপাততঃ ৭০ রীম পর্য্যন্ত ক্রমশঃ আবশ্যকমত সমাজের লোকের হাতে তাঁরা কাগজ দিতে পারেন— তার পরে আরো আবশ্যক হলে আমার অর্ডর দেখে তাঁরা যেন দেন।

এটা একটু জরুরী— ছাপা বন্ধ হয়ে আছে। তুমি সত্বর এর বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

অন্যান্য খবরের প্রত্যাশায় আছি।

খবর যদি না থাকে ত খবরদাতাটিকে পেলেও চল্‌বে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৮

৮ অগস্ট ১৯০০

ওঁ

শিলাইদহ

ভাই

তোমার সঙ্গে কাজের কথা না কয়ে থাকবার যো নেই অতএব সে কথা সেরে রাখাই ভাল। ২০,০০০ যদি ৮ পার্সেণ্টে এবং অন্ততঃ বছর তিনেকের মেয়াদে এবং অত্যধিক খরচা ব্যতিরেকে পাওয়া যায় তাহলে মাড়োয়ারীকে শুধে দিয়ে ভার লাঘব করা যায়। কি বল? যদি সুবিধা থাকে ত কিংকর্ত্তব্য লিখো। লোকেনের দেনা শুধ্‌তে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেই জন্যে আমি কাপিরাইট্ বেচ্‌তে প্রস্তুত হয়েছি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই— বই কেন্‌বার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। কোন ছাপাখানা-ওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তাহলে ঠকে না এটা নিশ্চয়।

সুরেন ইতিমধ্যে Newmanদের ওখানে মোলিয়েরের অর্ডর দিয়ে এসেছে তারা পাঁচ ছ দিনের মধ্যে পাঠাবে এমন আশ্বাস দিয়েছে। বেলাকে Nursing সম্বন্ধে দুই একটা বই পড়াতে ইচ্ছা করি— যদি সে সম্বন্ধে কোন ভাল বই চক্ষে পড়ে তাহলে

আমার হয়ে অর্ডর দিয়ো— একটা Nursingএর বই সে পড়েছে — একটু বড়সড় গোছের রীতিমত শিক্ষার উপযোগী বই যদি পাও তাহলে ভাল হয়।

Chunder Brothersদের কাগজের কথাটা বলেচ বোধ হয়। কাগজের নৌকা বোঝাই করে আমার গল্পগুলিকে কাল-সাগরে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি— অতএব ২৪ পাউণ্ড্ ডিমাই কাগজের বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

কবির আশ্রমে আস্‌তে গেলে যে পণ্ডিতের সহায়তা নিতান্তই আবশ্যক আমি তা বোধ করি নে— অতএব বিদ্যার্ণবের যদি বিলম্ব থাকে তুমি তাঁর অপেক্ষায় থেকো না— পথ অত্যন্ত সুগম সরল।

তুমি ক্ষণিকা সমালোচনা করচ শুনে আমি খুসি হলুম, সে কথা গোপন করতে চাইনে। তার একটু বিশেষ কারণও আছে;— ওর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে, যারা স্বাধীনরসগ্রাহী লোক নয় তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চে-না এটা তাদের ভাল লাগা উচিত কি না— সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্ততঃ করচে— আর যদি অধিককাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চটে'মটে' বইটাকে গাল দিতে আরম্ভ করবে— একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে। আমি লোকেনকে লিখেছি ক্ষণিকায় আমার মনের ভাবগুলিকে এক ঝাঁক বনের পাখীর মত নানা খোপখাপের ভিতর থেকে ছেড়ে দিয়েছি, তারা গানও গাচ্চে এবং

উড়চেও। তাদের কণ্ঠে সুর এবং ডানায় লঘুতা দিয়ে দিয়েছি। ঐ লঘুতাটার জন্যে একদলের বিরাগভাজন হব; যারা আকাশের পাখীর স্বাভাবিক গানের চেয়ে খাঁচার পাখীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম তক্তপোষে বসে শুন্‌তে চায়— আমার ছাড়া পাখীগুলি অত্যন্ত লঘুতাবশতঃ তাদের দাঁড়ের উপর ধরা দিবে না বলেই তারা চট্‌বে এক একটি সমালোচকের নিজের নিজের এক একটি দাঁড় আছে— সেই দাঁড়ের উপরে শিক্‌লি দিয়ে কবিতাকে না বাঁধ্‌তে পারলে তারা তীর এবং বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ক্ষণিকার ভাগ্যে সেই রকম অপঘাত মৃত্যুর আয়োজন ঘটার সম্ভব বলে তোমার সমালোচনার সংকল্পে আমি একটু বিশেষ খুসি হয়েছি।

আজকের সুনির্ম্মল দিনটি যেন শ্রাবণের ঘনপল্লবিত লতায় একটি ভরা গুচ্ছ আঙুরের মত আকাশ থেকে দোতুল্যমান হয়েছে, পুঞ্জীকৃত সৌন্দর্য্যে এবং রসে পরিপূর্ণ। দেখ্‌লে আশঙ্কা হয় এমন দিন আর পাব না।

প্রভাতকুমারের কাছ থেকে আশ্বিনের চিরকুমার সভার তাগিদ্‌ এসেছে— ভাদ্রেরটা পাঠিয়ে দিয়েছি। অতএব ইতি

২৪শে শ্রাবণ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৯

১০ অগস্ট ১৯০০

ওঁ

শিলাইদহ

ভাই—

তুমি ত কাল বৃহস্পতিবারে এলে না— আমি অত্যন্ত চটে' বোটে করে একেবারে কুষ্টিয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির। তোমার নামে নালিশ দায়ের কর্ত্তে নয়— তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কুষ্টিয়ায় একটা হাইস্কুল হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করতে তাঁর সঙ্গে এবং মুন্সেফ বাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ করা আবশ্যক হয়েছিল। এর থেকেই বুঝ্‌তে পারবে আমি কতবড় পাব্লিক্-স্পিরিটেড্ লোক— রায়বাহাদুর হবার যোগ্য! কেবল ক্ষণিকা লিখি বলে তোমরা আমাকে অবজ্ঞা কর কিন্তু যেদিন কুষ্টিয়ার ছাত্রবৃন্দ আমাকে অভিনন্দনপত্র দেবে সেদিন আমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারবে। তাতে আমার জগদ্-বিখ্যাত দয়াদাক্ষিণ্য শৌর্য্য বীর্য্য বদান্যতার উল্লেখ থাক্‌বে— ধনমান রূপগুণ কুলশীল কোনটাই বাদ যাবেনা। তখন মোলিয়েরের যশস্বী জুর্দ্দাঁ্যার মহাবাক্য স্মরণ করে বল্‌বে প্রায় ৪০ বৎসর লোকটাকে দেখে আসচি কিন্তু জান্‌তুম না ইনি এত বড় ইনি!

কাল কুষ্টিয়ায় যাতায়াতে সমস্ত দিন বোটে কেটেছে— সেটা মহা লাভ। প্রাতে বেরিয়েছি যখন, তখনো পথের তৃণে প্রভাতের

শিশির লেগে আছে— শিলাইদহের ঘাটে যখন ফিরলেম তখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ মধ্যগগনে। আমার সেই জ্যোৎস্নাজড়িত নদীটি স্মিত বিষণ্ণ হাস্যে বল্লেন, আমাদের সেই কলহংসমুখর নির্জ্জন বালুতটে বহু শরতের মৌন মিলনসুখ একেবারে বিস্মৃত হয়ে তুমি এখন ডাঙার মথুরায় রাজত্ব করতে গেছ! আমি তার একটি অক্ষর জবাব দিতে পারলুম না— একেবারে নির্ব্বোধের মত নিঃশব্দে চৌকিটিতে বসে রইলুম।

রাত্রে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। আজ প্রাতে উন্মুক্ত বাতায়নে দুরন্ত দক্ষিণ বাতাসে উত্তর দিতে বসেছি— বৃষ্টিধারা-স্নাত কিশোর আলোকটি পূর্ণমঞ্জরিত ধান্যের ক্ষেত্রে তরঙ্গে তরঙ্গে দোলায়মান।

তুমি ত আধিব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গলির ধারে পড়ে আছ, এ সময়ে তুমি কোন প্রলোভনের আকর্ষণে শেয়ালদহের অভিমুখে দৌড়বে বলে বোধ হচ্চে না। বাঁশি বাজ্‌লে গোপাঙ্গনারা ছুটোছুটি করে যমুনাতটে উপস্থিত হত বটে কিন্তু তোমার মত তাদের কারো পায়ে ফোড়া হয় নি— বৃন্দাবনে দশ প্রকারের দশা এবং স্বেদ পুলক বেপথু স্তম্ভ মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ ছিল কিন্তু কারো পায়ে ফোড়া হত না এবং একা কৃষ্ণ সকল ঘটকালির পথ রোধ করে ত্রিভঙ্গমূরতি ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন।

যাহোক্‌ তুমি আর যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন কর ঘটকের কাজে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। অতএব বৃথা চেষ্টায় নিজেকে ক্ষুব্ধ কোরো না— নদী যেমন চল্‌তে চল্‌তে এক-

সময়ে সাগরে গিয়ে পড়েই, সেই রকম "বেলা" যথাসময়ে তার স্বামীকুলে গিয়ে উপনীত হবে।

রাস্কিন্ শেষ করে ফেল! এবং আমার ক্ষুদ্র ক্ষণিকাটিকেও ভুলো না! লেখা সম্বন্ধে নদীর উপমা খাটে না— যদি খাট্‌ত তাহলে আমার সেই বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি এতদিনে খাতার মধ্যে শেষ হয়ে থাক্‌ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে না লিখ্‌লে লেখা অগ্রসর হয় না— জগতের এম্‌নি কঠোর নিয়ম! অতএব লিখে ফেল।

প্রবোধের Arthurian legends আর কতদিন চল্‌বে? তুমি তার লেখার উপরে হস্তক্ষেপ না করে' মাথার উপরে মধ্যমনারায়ণ তৈলক্ষেপ কর। আর্থার সাহেব ও বেচারার মাথায় সইল না।

বেলার জন্যে একটা রোগশুশ্রূষার বই দেখে রেখো। Sanitation সম্বন্ধে একটা বই তাকে পড়াচ্ছিলুম, শেষ অধ্যায়ে এসে ঠেকেছে। ইতি ২৬শে শ্রাবণ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০

১২ অগস্ট্‌ [১৯০০]

ওঁ

ভাই

আমি এই পুণ্যতোয়া পদ্মার দিকে মুখ করে ডাকযোগে তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করে বল্‌তে পারি যে তুমি যদি এস তাহলে আমি খুলনায় যাই নে— কিন্তু এই হপ্তার মধ্যে তুমি যদি না এস তা হলে যদি আমি না যাই ত আমার নাম নেই— অতএব তোমার ভৃত্যটিকে হাঁক দাও, পোর্ট্‌ম্যাণ্টো বোঝাই কর, অশ্রুমুখী গৃহিণীর কাছে বিদায় লও, এবং কোনপ্রকার কৌশলে ট্রেন্‌ মিস্‌ করবার চেষ্টা কোরো না। এই আমার Ultimatum। এর পরেই লড়াই সুরু হবে। শেষকালে হয়ত এক দিন লাঞ্ছিত পরাজিত বন্দীভাবে নতশিরে এখানে এসে ধরা দিতেই হবে।

সম্প্রতি মেঘ এবং রৌদ্র উভয়ে মিলে যেন কৃষ্ণ রাধার অফুরান্‌ লুকাচুরি খেলা চল্‌চে। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারচেন না। শেষকালে একপক্ষে কৌতুকহাস্য এবং অপর পক্ষে অশ্রুবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত গড়াচ্চে।

আমি নানাপ্রকার ছুতোয় নানাপ্রকার কুঁড়েমি করে অবশেষে কাল বৈকালে চিরকুমার সভায় হস্তক্ষেপ করেছি— আজ বৈকালে সমাধা করার আশা করচি। অবশ্য চিরসমাধা নয়— কেবল আশ্বিনের কিস্তি।

কিন্তু তুমি বড্ড ফাঁকি দিচ্চ। ফোড়া হলে পা চলে না কিন্তু

কলম চলবার বাধা হয় না। আমি নিজে লেখা-ব্যবসায়ী অতএব আমার কাছে বাজে ওজর কোরো না— এই মুহূর্ত্তেই বসে যাও। প্রবোধ এবং তার পাগ্‌লামি, এবং পত্রগুলিকে জাহান্নম নামক একটা ভূগোলবহির্ভূত জায়গায় যেতে পরামর্শ দাও— বোধ হয় সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ অমন লোকের খবর পেলে নিজের থেকে রাহাখরচ দিয়ে তাকে সেখানে পত্তন করতে পারে।

আমি প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিজেকে অযথা বাড়িয়ে তুল্‌তে ভূয়সী চেষ্টা করচি এ সংবাদ আমার কাছে নূতন। এ বিষয়ে আমার কোন উৎসাহ বা উদ্যোগ নেই— এবং এ সম্বন্ধে কোনরকম অপব্যয় করতে আমি অসম্মত। অথচ Enlargement সম্বন্ধে যতদূর জানা আছে তাতে বল্‌তে পারি ছবি গোকুলে আপনি বাড়ে না, হয় ত আমার অজ্ঞাতসারে আর কেউ তাকে বাড়াচ্চে।

গল্পাবলীর কাগজ সম্বন্ধে গত কল্য সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ অবগত হয়েছ। হাতের দশ রিম কাগজ ফুরিয়ে গেলে চন্দ্র-ব্রাদার্সদের কাছ থেকে আমদানি সুরু করতে বলেছি। যথাসম্ভব নগদ দাম দেবারই বন্দোবস্ত করা হবে— সুতরাং তাতে তাঁদের অসুবিধা হবে না।

Mark Twainএর Selection যদি তোমার কাছে থাকে এখানে আগমনকালে সঙ্গে এনো— পরিজনবর্গকে সায়াহ্নে আমি পড়ে শোনাই।

সন্তোষের প্রমথবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? তাঁর

হল কি বল দেখি? হঠাৎ যেন দূরে চলে গেছেন— সে জন্যে আমি আন্তরিক ক্ষুণ্ণ। তাঁর প্রতি আমার বিশেষ একটি স্নেহ জন্মেছে— আমার আত্মীয়তাচক্র থেকে তাঁর তিরোধান আমি কোনমতেই ইচ্ছা করি নে। যদি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁকে একবার নাড়া দিয়ে দিয়ো।

অবিনাশের কোন উল্লেখ নেই যে? শরতের আশা শরৎকালের রৌদ্রের মত ক্ষণে ক্ষণে মেঘাচ্ছন্ন হয়েও আবার দীপ্তি পাচ্চে। বৃদ্ধ প্রজাপতিকে এরকম লীলাচাঞ্চল্য কোনমতেই শোভা পায় না। ইতি ২৮শে শ্রাবণ [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১

১৫ অগষ্ট্ [১৯০০]

ওঁ

ভাই

আবার চুপচাপ ? কিন্তু তোমার গতিবিধিটা আমার জানা দরকার। যদি এখানে আস তাহলে আর নড়িনে— এবং লোকেনের কাছে সময়মত একটা দরখাস্ত দাখিল করে মুলতবি মঞ্জুর করে নিই। যদি না আস তাহলে খুলনায় যাবার আয়োজন করতে হয়। তুমি ত শুক্লপক্ষ থেকে আস্‌বার বন্দোবস্ত করচ, কৃষ্ণপক্ষ এল-- তখন্‌ ধানের গাছে সবেমাত্র শিষ ধরেছে, এখন পাকা ধান কেটে আঁটি বেঁধে বেঁধে গোলায় নিয়ে যাচ্চে, করচ কি ? ক্ষেত ক্রমে শূন্য, রাত্রি ক্রমে অন্ধকার, দিন ক্রমে মেঘচ্ছায়াবিবর্জ্জিত হয়ে আস্‌চে। শিলাইদহ যখন রিক্তপ্রায় তখন অতিথি তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হবে।

তার পরে অন্যান্য খবর কি ? উল্লাসজনক কিছু থাক্‌লে নিশ্চয় পত্র পাওয়া যেত, এই মনে করে শান্ত হয়ে বসে আছি।

আজ চন্দ্রনাথ বাবুর একখানি চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করলুম— সেইটে তোমাকে কাপি করে পাঠালে তুমিও বোধ হয় খুসি হবে।

"তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুৎবৎ ! তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই— উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার

প্রতিভার নিকট অভিভূত। কণিকা কথা কল্পনা ক্ষণিকা—বলিতে গেলে চারি মাসের মধ্যে চারিখানা— পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। "কণিকা" ছাড়িতে না ছাড়িতে "কথা" আসিল,— "কথা" দিয়া তুমি আমার হাত হইতে কণিকা কাড়িয়া লইলে— কণিকার ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া কল্পনা দিয়া কথা কাড়িয়া লইয়াছিলে— আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে। এবার ক্ষণিকায় চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র— সুতরাং আমার গতি বড় ধীর— আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি— কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি— ও গতি যথার্থ ই বিদ্যুতের গতি — যেমন দ্রুত তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্দ্ধদেশের, মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থ ই এমন শক্তি আমার নাই।

যে চারিখানির নাম করিলাম সকলগুলিই মিষ্ট হৃদয়-স্পর্শী সুগভীর সুললিত, (অনেক স্থলে) সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের, পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্ব্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি— পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে— মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধহয় এ সৌরভ শিলাইদহজনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোন্‌টার কথা বলিব? অনেকগুলাতে ঐ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু, কি জানি কেন,

"বিরহের" সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।

ক্ষণিকায় একটা বড় গুণপনা দেখিলাম। উহার আকৃতিও ক্ষণিকার ন্যায়। ক্ষণিকার প্রতি পৃষ্ঠায় দেখি ক্ষণিকা আঁকা রহিয়াছে। তাই বলি তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।

—০—

এই চিঠিখানি পড়ে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করছিলুম। প্রাপ্যর চেয়ে অধিক পেয়েছি সে বিষয়ে আমার নিজের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।— "বিরহ" কবিতাটা আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়— সেইটে উনি বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করাতে আমিও একটু বিশেষ খুসি হয়েছি। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু কি "কাহিনী"খানা পান নি? না, ওঁর সেটা মনে কোনরূপ রেখা অঙ্কিত করে নি? যেন সন্দেহ হচ্চে ওটা কোন কারণে তাঁর হস্তগত হয় নি।

কিন্তু তোমাকে আর অধিক লেখা উচিত নয়। এ পাতাটা খালি থাক্। বিনা প্রত্যুত্তরে পত্র লিখ্লে তোমাকে spoil করা হবে। অতএব ইতি। ৩১শে শ্রাবণ। (ভাদ্র মাসে বাড়ি ছাড়তে নাই অতএব ৩২শে তারিখেই তোমাকে বেরতে হচ্চে— সংক্রান্তি মান্লে চল্বে না)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২২

১৭ অগষ্ট [১৯০০]

ওঁ

শিলাইদহ

১লা ভাদ্র [১৩০৭]

ভাই—

অনেক কাল পরে চিঠি পেলুম। আমি আশঙ্কা করেছিলেম, হয় তুমি, নয় তোমার পুত্র কলত্রের কেউ পীড়িত। আজ সেই সংবাদটা নেবার জন্যে দোয়াত কলম গুছিয়ে বসেছিলুম এমন সময় ডাক এসে উপস্থিত।

শরতের আশা তুমি এখনো ছাড় নি? আমি ত সে অনেকদিন উৎপাটিত করে ফেলেছি। হৃদয়ের মধ্যেও একটা ইকনমির দরকার— অনেক জিনিষকে সেখানে সযত্নে পোষণ করতে হয়— বাজে জিনিষকে খোরাক যোগাবার মত এমন অপরিমিত রক্তভাণ্ডার কোথায়? অল্প বয়সে যখন রক্ত বেশি থাকে এবং ভিড় কম থাকে তখন বাজে খরচ পোষায়; কিন্তু আজকাল বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু বিশেষ সাবধানী হতে হয়েছে— এখন আশা আত্মীয়তা চিন্তা চেষ্টা সমস্ত বেছে বুঝে ছেঁটে ছুঁটে নিজের সাধ্য এবং সহ্যের মধ্যে আনা দরকার। যেমন পাকা ব্যবসায়ী [দাগী] মাল গোড়াতেই বেছে ফেলে দেয় আমি তেমনি নিষ্ফলতার আশঙ্কামাত্র থাকলে আশাকে হৃদয় থেকে দূর করতে চেষ্টা করি কিন্তু সকল সময়ে যে কৃতকার্য্য হই এমন গর্ব্ব করতে পারি নে।

সুরেন বোধ হয় আস্‌চে সোমবারে এখানে উপস্থিত হবে। তার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবে লিখেছে।

সমস্ত আধিব্যাধিজাল থেকে তুমি কবে মুক্ত হবে? তোমাকে উদ্ধার করবার শক্তি যদি আমার হাতে থাকে তবে তার উপরে তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার। কিন্তু হায়, নিজের ক্ষমতার কথা যখন আলোচনা করে দেখি তখন অন্যকে আশ্বাস দেবার ভরসা থাকে না। কেবল এইটুকুমাত্র আশা করি যে কোন [এক] সময়ে বন্ধুকৃত্য করবার উপযোগী সামর্থ্য [ঘট]তেও পারে।

যদি বন্ধন থেকে খালাস পেয়ে বুধবারে আস্‌তে পার তাহলে আর দ্বিধামাত্র কোরো না।

পণ্ডিতমহাশয় তোমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়েছেন— তিনি তোমার গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরলতা চরিত্র-মাধুরী, সদাশয়তা, রসজ্ঞতা ইত্যাদি অনেকপ্রকার গুণের মিশ্রণ দেখে তোমার সঙ্গসুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েচেন।

কাল প্রমথবাবুর একখানি পত্র পাওয়া গেল। তিনি তোমার সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করতে যাবেন লিখেচেন। তোমার নিজের নানা প্রকার দুশ্চিন্তা ও কাজের ভিড়ের মধ্যেও তুমি বিচিত্র লোককে কেমন করে আকর্ষণ করে আন্‌তে পার আমি ত বুঝতে পারি নে। চিত্তকে নীরস করে শুষে ফেলবার পক্ষে বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটের মত এমন জিনিষ আর কিছু নেই।

Molière রচিত L'Avare নামক একটি নাটক Fasnach

দ্বারা Edited বেলার পড়ার জন্যে চাই— Thackerএর ওখান থেকে আমার হয়ে অর্ডর দিয়ে দেবে? ভাল Nursingএর বই যদি না পাও ত আপাতত না হলেও চলে।

বেলা অনেক হল। এখন নাইতে খেতে যাওয়া যাক্— নইলে নির্দ্দোষী নিরপরাধী তুমি সুদ্ধ গৃহিণীর বিদ্বেষের ভাগী হবে। তুমি এতক্ষণে আপিসের বর্ম্মচর্ম্ম পরে আদালতের রণাঙ্গনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৩

২০ অগষ্ট [১৯০০]

ওঁ

ভাই

চন্দ্র ব্রাদার্সদের যদি অর্ডরই দাও তাহলে অমনি নিম্নলিখিত বইগুলিও আনিয়ে নিয়ো :—

Choice Works of Mark Twain

Mark Twain's Library of Humour

Chatto & Windus হচ্চেন publisher.

সায়াহ্নে পরিজনমণ্ডলীকে চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট করে দীপালোকে একটা কিছু পড়ে শোনাতে হয়। পরীক্ষা করে দেখ্‌লুম মার্ক টোয়েনের হাস্যরস আমার অপত্যকলত্রের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক বোধ হয়— বিশেষত বেলা এবং বেলার মা অত্যন্ত আমোদ পান। আমার কাছে Tramps Abroad এবং Innocents Abroad আছে সেদুটোর হাস্যকর অংশ প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছি। ছেলেদের পড়ে শোনাবার যোগ্য ছোট ছোট হাস্যকর অথবা সকরুণ গল্পাবলী যদি তোমার জানা থাকে তাহলে রপ্তানি করে দিয়ো। ছোট ছোট দু তিন দৃশ্যের চটি ইংরাজি প্রহসন Thackerদের ওখানে বহুকাল পূর্ব্বে অনেক দেখেছিলুম— তারি এক ঝুড়ি চালান করে দিতে পার? আমি তার থেকে বেছে বেছে পড়ে শোনাব। সেই চটিগুলোর দামও খুব সস্তা। আমার রসদ ফুরিয়ে এসেছে, আর দু তিন দিনের মত

আছে অতএব শীঘ্র কিছু খোরাক না পাঠিয়ে দিলে— Pekin legationএর দশা হবে, তখন সন্তানসন্ততিবর্গের আক্রমণ কিছুতেই ঠেকাতে পারব না। তুমি ত প্রত্যহ আপিসে যাও, এবং Thacker তোমার আনাগোনার পথেই— এবং ডাকে এই পত্র পাবার অনতিপরেই তোমাকে আপিস-যাত্রা করতে হবে অতএব অসুবিধা অথবা বিস্মৃতির আশঙ্কা করিনে।

বিদ্যার্ণব যখন এখানে ছিলেন তখন তাঁর কাছে তোমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বন্ধুগর্ব প্রকাশ করে থাক্‌ব তার মধ্যে এমন কিছু অত্যুক্তিবাদ ছিল না যার জন্যে অনুযোগ বা অনুশোচনার ভাগী হতে পারি— অতএব সে সম্বন্ধে তুমি যতটা বাক্যব্যয় করেছ তৎপ্রতি আমি কর্ণপাতমাত্র করলুম না।

প্রমথবাবু চন্দ্রনাথবাবুর সমালোচনা সবিস্তারে শুন্‌তে চান কিন্তু আর আমি কপি করতে পারি নে। একটু দয়া করবে? তোমার চিঠির মধ্যেকার সেই উদ্ধৃতাংশ প্রমথবাবুকে দেখাবে? যদি তাঁকে কপি করে পাঠাতে পার তাহলে ত ভালই হয়— তুমি ত ছেলেদের এই কাজে পরিপক্ক করিয়ে তুলেছ। যাই হোক তোমার উপরেই বরাত চিঠি দিলুম, সেটা dishonour কোরো না।

আমার চিঠিধৃত তারিখের উপর তুমি যতটা আস্থা স্থাপন করেছ আর কেউ ততটা করে না। তার চেয়ে পঞ্জিকার উপরে বেশি নির্ভর কোরো।

মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে এল। আসন্ন বৃষ্টিপাতের লক্ষণ। আবার, এখনি সুরেনের আসবার কথা আছে। চিঠিখানি এই-বেলা রওনা করে দিই। ইতি ৪ঠা ভাদ্র [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪

[১৯০০]

ওঁ

ভাই

আজ সুরেনের চিঠি পেলুম। শুনলুম সে তোমার সঙ্গে দেখা করেছে। সে লিখেছে, ৯ পার্সেণ্টে সহজে বন্দোবস্ত হতে পারে তুমি তাকে বলেচ— এই জন্যে আমার প্রতি তার পরামর্শ এই যে, ৯ পার্সেণ্টেই প্রস্তাব খতম করে ফেলা। কেবল খরচাটা যাতে দুঃসহ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। কি বল? তাই নাহয় ঠিক করে ফেল! সে জন্যে কি আমার কলকাতায় যাওয়া দরকার হবে— সুরেনের প্রতি আমার Power of Attorney আছে— সকল প্রকার ক্ষমতাই দিয়েছি— যদি সেটাতে কাজ চলে তা হলে আর নড়তে চাইনে।

কাগজ সম্বন্ধে সমাজওয়ালারা কেন চন্দ্র ব্রাদার্সের ওখানে যায় নি প্রশ্ন করে সেই "উদ্যোগ" ব্রাহ্মণটিকে পত্র লিখেছি— আগামী কল্য-নাগাদ উত্তর পেলে সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া যাবে।

এখানে কৃষ্ণ পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সমাগম হয়েছে— পূর্ণচন্দ্রাননা গৌরী হঠাৎ একদিনেই নীলনীরদবরণী শ্যামামূর্ত্তি ধারণ করেচেন। তোমাকে যে দেবী কোন্ মূর্ত্তিতে দর্শন দেবেন কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু ক্ষণিকা সমালোচনার জন্যে তুমি চিন্তা করচ কেন?

লোককে বোঝাবার চেষ্টামাত্র কোরোনা— ভাল লাগা আবার বোঝাবে কি? কেবল যেখানটা তোমার ভাল লাগ্‌চে সেই জায়গাটাতে গলা ছেড়ে বলে উঠো— বাঃ বেশ লাগ্‌চে! অমনি পাঠকেরাও বল্‌বে— বেশ লাগ্‌চে। আগুনটা একবার ধরিয়ে দিলেই কাঠ খড় অঙ্গার সমস্ত আপনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, নইলে তর্কশাস্ত্রের সহস্র লগুড়াঘাতে তাদের চিরান্ধকার ঘোচে না। তুমি আমার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে চক্ষু বুজে লিখে যেয়ো।

শরতের শেষ চিঠি কি আশাপ্রদ? অবিনাশের ভাবটা কি রকম? শরৎ নিজে যদি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করে তাহলে কি তার মা সহজে সম্মত হবেন? কিন্তু শরতই বা বেলার কোনপ্রকার পরিচয় না পেয়ে কিসের জোরে মার কাছে প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করবে? এই সমস্ত নানা কারণে বিশেষ আশা করবার কোন হেতু দেখা যায় না। লোকেন আমাকে দিনকতকের জন্যে খুলনায় যেতে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছে— সে যেরকম কড়া হাকিম, হয় ত না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না।

কাপিরাইট?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৫

[১৯০০]

ওঁ

ভাই

তোমার বই দুটির সঙ্গে সাধুবাদ প্রেরণ করচি। W. Harlandএর বইখানিতে যৌবন এবং বসন্ত টগ্‌বগ্‌ করচে— H. Spencerএর গ্রন্থে বার্দ্ধক্য পরিপক্ক পরিণত। দুটোই যে আমি একসঙ্গে পড়তে পারলুম তার থেকে প্রমাণ হচ্চে আমি এমন একটি বয়সে এসে পেঁচেছি— যার এক সীমানায় যৌবনের রেখা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে এবং আর এক সীমানায় বার্দ্ধক্য ক্রমশ শুভ্র রেখায় স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌চে।

দীনেশবাবু এসেছিলেন তাঁরি হাতে বই দুটি দিলুম।

আমি সন্তোষের ওখানে নিমন্ত্রিত বটে কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখানে আমি কর্ম্ম এবং বিশ্রাম উভয়ের দ্বারাই বদ্ধ।

যাবার ইচ্ছা ছিল, কেবল নিমন্ত্রণের প্রলোভনে নয়— তোমার কাছ থেকে পাঠ্য বই দুই একখানা উদ্ধার করে আনবার জন্যে। যা হোক্ বিলম্বে বা অবিলম্বে কোন না কোন কর্ম্মদায়ে কলকাতায় যেতেই হবে তখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করবার অবসর হবে।

এখন এখানে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর।

তোমার রবি

১২৬

[১৯০০]

ওঁ

ভাই

আমি তোমাকে সত্যি বল্‌চি এখন আমাদের কারো হাতে এক পয়সা নেই। আমার একমাত্র মহাজন হচ্চেন সত্য— তাঁর কাছ থেকে ইতিমধ্যে ২০০৲ টাকা ধার নিয়ে সংসার চালিয়েচি— তাঁর বাকি যা টাকা হাতে ছিল মেজবৌঠানকে দিয়েচেন। পূজো কাছে আস্‌চে কি না, এই সময়ে সমস্ত দেনা শোধ করবার জন্যে সকলেই ব্যস্ত। আমাদের পরিবারে আজকাল এমনি দুর্ভিক্ষ বিরাজ করচে যে সে দূর থেকে তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। আমি নিজের জন্যে কাল দুপুর বেলা কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলুম কিছু সুবিধা করতে পারলুম না। দেনা যে ক্রমে কত বেড়ে যাচ্চে সে বল্‌তে পারি নে। এ দিকে আমাদের মাসহারা বহুকাল থেকে আর্দ্ধেক বন্ধ হয়ে আছে, কি করে যে শুধ্‌ব ভেবে পাই নে। আমার বয়সে আমি কখনো এমন ঋণগ্রস্ত এবং বিপদ্‌গ্রস্ত হই নি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৭

[শিলাইদহ * ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আঃ কি দুর্য্যোগ! ক'দিন অবিশ্রাম ঝড় ও বৃষ্টি চল্‌চে— খুব ভাল লাগ্‌তে পারত কিন্তু তোমার রাস্কিন প্রবন্ধে ত দেখিয়েছ যে, সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে যখন ধর্ম্মবোধের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন সৌন্দর্য্যভোগকে অবসর দিতে হয়। এই অবিশ্রাম দুর্য্যোগে চারিদিকের লোক্‌সান আর ত দেখা যায় না! বড় বড় আখের ক্ষেত ভূমিশায়ী, শস্যক্ষেত্র প্লাবিত, কূলপ্লাবিনী নদী পুরাতন পল্লী এবং বৃদ্ধ ছায়াতরুগুলিকে গ্রাস করে চলেছে। কোনো দরবারে এর নালিশ নেই, কোনো কোতোয়ালিতে এর প্রতিকার নেই, অন্ধ হাওয়া হাঁ হাঁ করে ছুটে আস্‌চে, অন্ধ স্রোত নৃত্য করতে করতে কি করচে কিছুই জানেনা— আকাশের জলধারা নির্ব্বিচারে অনাবশ্যক ঝরে পড়চে; আমি চুপ করে চোখ বুজে মনকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করচি যে, আমার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি সমস্ত বিশ্বব্যাপার দেখ্‌তে পাচ্চিনে বলেই প্রত্যক্ষ এবং স্থানীয় এবং ক্ষণকালের লোকসানে এত ব্যথিত হচ্চি; কিন্তু এ ব্যাপারটি যে কি কারণে না হলেই নয় এবং না হলে দূরদূরান্তর এবং কালকালান্তর পর্য্যন্ত তার কি ফল ফল্‌ত তা আমি কিছুই জানিনে— অতএব যতই ব্যথিত হই পীড়িত হই কারো নামে

কোন নালিশ আন্‌ব না— এটা বল্‌বনা যে, আমরা যেটা চাচ্চি সেটা কেন হচ্চে না! আমি এই ঝড়বৃষ্টি দুঃখক্ষতির ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি দেশকালাতীত নির্ব্বিকার শান্তির অন্বেষণ করচি— একাগ্রমনের দ্বারা এই ঝঞ্ঝাবর্ত্ত ভেদ করে ঠিক এর অন্তরতম স্থানে যেখানে অনন্ত স্তব্ধ পরিপূর্ণতা বিপুল নিঃশব্দে নিত্যকাল বিরাজ করচে সেইখানে প্রবেশ করতে চেষ্টা করচি— সেইখানে যেমনি প্রবেশ করা অমনি, আখের ক্ষেত থাক্‌লেই বা ততঃ কিং এবং আখের ক্ষেত গেলেই বা ততঃ কিং! সকল কাজ এবং সকল সুখদুঃখের মধ্যে মনকে সেই জায়গাটাতে বসিয়ে রাখ্‌তে চাই, একদিন হয়ত সফল হব বলে আশা করচি। তখন আমার সমস্ত নালিশ এক মুহূর্ত্তে ডিস্‌মিস্‌ হয়ে যাবে।

তুমি কর্ম্মজালে জড়িত জেনেই তোমাকে আমি আর কোনপ্রকার তাগিদ দিয়ে ব্যস্ত করে তুলিনি। যথাসময়ে যথাবকাশে তুমি আস্‌বে আমি নিশ্চয় জানি— না যদি আস তাহলেও আমার কোন সংশয় নেই— জীবনের এই প্রৌঢ়বয়সে যেখানে স্থিতিলাভ করা গেছে সেখানে আর চ্যুতির আশঙ্কা করিনে।

তোমার রস্কিন প্রবন্ধ কলাতত্ত্বে জীবনবৃত্তান্তে এবং রসসমালোচনায় ক্রমশই সম্পূর্ণতর হয়ে উঠ্‌চে; এইবার এর যথাবিহিত পরিণামের অপেক্ষা করচি।

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল্‌ আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারাণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্ম্মলাও তথৈবচ— এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা

আছে বটে। কিন্তু কোন রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে রকম প্রতীয়মান সেরকম ভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল্ মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপর বিরোধী ভাবে না দেখে উপায় পাইনে— কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং কাব্যে যদিচ কোন কোন রিয়াল লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্ম্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে— কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিষ আছে যা তাঁদের কারোই নয়।

দুর্য্যোগবশতঃ এ চিঠি আজ ডাকে যাবার সম্ভাবনা নেই। অপরাহ্ন ঘনান্ধকার হয়ে এসেছে, আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৮

[শিলাইদহ *] ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০০

ওঁ

ভাই

আধিব্যাধিতে যখন তুমি আক্রান্ত এ সময়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ছাড়া তোমার প্রতি কোন বিরুদ্ধভাব আমার মনে থাক্‌তেই পারে না— সে সম্বন্ধে তুমি আমার প্রতি নিশ্চিত আস্থা রাখ্‌তে পার। এই সমস্ত দুর্দ্দৈবজাল থেকে মুক্ত হয়ে এখানকার নির্ম্মল শারদশান্তির মধ্যে তুমি আস্‌তে পারলে আমি খুসি হতুম কিন্তু কি করা যাবে বল? আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। এক একবার কথা হচ্চে সপরিজনে বোটে করে পদ্মার চরে যাব— সেই প্রস্তাবটা চল্‌চে বলে কবি দেবেন্দ্রসেনকে এখানে আস্‌তে নিরস্ত করা গেছে। কিন্তু তুমি যদি আস্‌তে পার তাহলে আমি অন্যরূপ বন্দোবস্ত করি। আমাদের বিদ্যার্ণব মহাশয় আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে শিলাইদহে আসবেন লিখেছেন— সে সময়ে তুমি যদি নিষ্কৃতি পাও তাহলে তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করে নির্ভয়ে যাত্রা করতে পার।

দেশ ছেড়ে না পলায়ন করলে প্রবোধচন্দ্রের কাছ থেকে তোমার মুক্তি নেই এ কথা নিশ্চয়।

কুষ্টিয়ায় কোনো ব্যবসায় ফাঁদবার জন্যে তোমার যে ঔৎসুক্য ছিল সেটা কি এখনো আছে? আজ নগেন্দ্র এখানে এসেছে— এই বিষয়ে সে আলোচনা করছিল।

আমি ইতিমধ্যে কেবল একটি মাঝারি সাইজের গল্প লিখেছি আর কিছু করিনি।

গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে— দেখেছ বোধ হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ হয়নি।

তোমার লেখনী থেকে "রেণু" গ্রন্থের সমালোচনা পাবার জন্যে তার লেখিকা আগ্রহ প্রকাশ করেচেন— এর থেকে বুঝ্‌তে পারবে তোমার সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র যদিবা কখনো তোমার স্কন্ধ পরিত্যাগ করেন, এবার থেকে লেখকদের হাত এড়াতে পারবে না।

নগেন্দ্র গুপ্তর তপস্বিনী পড়ে দেখ্‌লুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realismএর অবতারণা করতে চাচ্চেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্ব্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষপর্য্যন্ত বল্‌তে পারেননি, সেইজন্য তাঁর self-conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্ব্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্চে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেচেন। ফর্‌ ইন্‌ষ্ট্যান্স্‌, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন

ছোক্‌রার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎসমূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এসব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল করে গোপন করতেও পারেন নি।

অশোকগুচ্ছ বেরিয়েছে নাকি? আমি এখনো পাইনি।

তুমি তোমার সমস্ত বিঘ্নবিপদ কেটে বেরিয়ে এস এই আমি প্রার্থনা করি। ১২ই আশ্বিন ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০০

শিলাইদহ
কুমারখালি

ভাই

গল্পগুচ্ছ তুমি পাওনি কেন ? শৈলেশরা ত সব বাড়ি চলে গেল— তাহলে ওরা ফেরার পূর্ব্বে বই পাবেনা। শৈলেশ ২০।২২শের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবে এবং তার পরে শিলাইদহে আসবে লিখেছে। চাই কি, তুমি তাকে সহায় করে চলে আসতে পার। Budget জিনিষটা সুখকর নয় আমি জানি, বিশেষতঃ cash জিনিষটা যখন দুর্লভ। অতএব তোমার কোষবিভাগের যা হয় একটা গতি করে পদ্মাপারে দৌড় মেরে এস, প্রবোধচন্দ্র এণ্ড্ কোম্পানি পদ্মার ওপারে দাঁড়িয়ে হতাশচিত্তে দলিল আন্দোলন করতে থাকুন।

কার্ত্তিকের ভারতী পাই নি। বোধ হয় এখনো বেরোয় নি। হয় ত কার্ত্তিক মাসেই বাহির হবে।

আজ এই মধ্যাহ্নে শারদরৌদ্রে এবং নিস্তব্ধ শান্তিতে আমার মাঠ ও পল্লী প্লাবিত হয়ে গেছে— আমাকে নেশায় ধরেছে— মাথার মধ্যে রৌদ্রের আমেজ্ মদের মত প্রবেশ করেছে— চোখ অর্দ্ধ নিমীলিত করে সমস্ত পৃথিবীটাকে সোনার স্বপ্নের মত দেখ্‌চি— শস্যক্ষেত্রের সুকোমল সবুজ রংটি আমার মোহাবিষ্ট নয়নপল্লব চুম্বন করচে। আকাশে আজ বিশ্বব্যাপী শারদীয়া

পূজার উদ্বোধন দেখ্‌চি— আগমনীর করুণামিশ্রিত রাগিণীতে অনন্ত শূন্য বাষ্পবিজড়িত হয়ে রয়েছে— তোমাদের সহরে এমন নিঃশব্দ নিস্তব্ধ এমন অপরূপ সমারোহের পূজার আয়োজন কোথাও নেই। আমার মনে হচ্চে যেন, আমি বিদেশী সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করে আজ বাড়িতে ফিরে এসেছি— তাই এমন আকাশপূর্ণ প্রসন্নতা, এমন জগদ্ব্যাপী স্মিতহাস্য। তাই এমন ছুটি, এমন পরিপূর্ণ অপর্য্যাপ্ত রৌদ্ররঞ্জিত অবকাশ।

আজ "রেণু" রচয়িত্রীর একখানি চিঠি পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন তাঁর লেখা তোমার কেমন লাগ্‌ল। আমি উত্তর দিয়েছি তোমার ভাল লাগ্‌বে— এ সংবাদটা আমি কোথা থেকে পেলুম সে প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বে বোধ হয় তোমার একটা অভিমত তাঁকে জানাতে পারব। ইতি ১৪ই আশ্বিন [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০

[শিলাইদহ * ২ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

ভাল মন্দ এবং মাঝারি বলে কিছু নেই বুঝি? তোমাদের হ্যাপায় পড়ে আমাকে কি কেবল খুব ভালই লিখ্‌তে হবে? তুমি লিখেছ এবারকার লেখা গল্পটা নিশ্চয় খুব ভালই হয়েছে। তোমরা যদি আমার কাছে কেবলি খুব ভালই আশা করতে থাক তাহলে চলবে না— আশাটাকে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে রেখে দেবে।

আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন তাতে বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উল্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত হবে— একবারে মূলতত্ত্বে ঘা দেবে— কেবল Physics নয়, কেমিস্ট্রি, ফিজিয়লজি, এমন কি Psychology পর্য্যন্তে আঘাত করবে। যুদ্ধ তো আরম্ভ হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপের মধ্যে একজন মহারথী— জগদীশ বসুর মত বিশেষ রূপে তাঁরই মত খণ্ডন করেছে। সেজন্যে প্রথমে, প্রফেসার যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলেন— কিন্তু জগদীশ বসুর প্রবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্রশংসাবাদ করে বসুজায়ার নিকট গিয়ে বল্লেন— Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তার পরে তাঁরা ওঁকে ধরে পড়েছেন যে, তুমি ইংলণ্ডে থেকে কাজ কর, ভারতবর্ষে তোমার বিস্তর ব্যাঘাত। ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন— তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি, যে জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণমনে প্রার্থনা করি তাঁর জয় হৌক্!

ডাক্তারটি যদি ২০ টাকা বেতন নিয়ে এবং আমার এখানে থেকে আহার করে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে অগ্রহায়ণের আরম্ভ থেকে তাঁকে রাখতে পারি। এখন কার্ত্তিকের অনেকদিন পর্য্যন্ত পূজার ছুটি। আর যদি কুষ্টিয়ায় Practice set up করতে চান ত নগেন্দ্র তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করবে। তুমি এখানে এলে সে সমস্ত আলোচনা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১

[শিলাইদহ * ৫ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আলো ও ছায়ার "মহাশ্বেতা" আমার ভাল লেগেছিল বেশ মনে আছে। আসল কথা আলো ও ছায়া লেখিকার ভাব, কল্পনা এবং শিক্ষা আছে কিন্তু তাঁর লেখনীতে ইন্দ্রজাল নেই, তাঁর ভাষায় সঙ্গীতের অভাব, আমার এই রকম মনে হয়েছিল, কিন্তু আর একবার পড়ে না দেখলে বলতে পারচিনে। পৌরাণিকী বলে একটা কাব্য কামিনী দেবী লিখেচেন, দেখেছ? সেটাও ঐ রকম, ভাল করে জ্বলে ওঠেনি। সেই অনির্ব্বচনীয় জিনিষটার অভাব সমালোচনায় বোঝান শক্ত। ভাবটা চিন্তাটা ওজন করে মাপ করে ভাষা থেকে ভাষান্তরে নিয়ে গিয়ে দেখান যেতে পারে, কিন্তু রসটাকে প্রত্যক্ষগম্য করা ভারি শক্ত। সেটা যদি শক্ত না হত তাহলে রসগ্রাহিতার এত আদর হত না। তুমি যখন আসবে আলো ও ছায়াখানি সঙ্গে করে এনো।

আসতে পারবে ত? আমি বোটে যাওয়ার কল্পনাটা পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু তোমার আগমনপ্রত্যাশায় দেবেন্দ্র সেনকে পুনর্নিমন্ত্রণ স্থগিত রেখেছি— কারণ, তোমাকে আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে চাইনে— আতিথ্যের কর্ত্তব্যপালনের হাঙ্গামার ভিতরে বেশ নিভৃতভাবে গুছিয়ে বসতে পারব না— অন্য লোক থাকলে তুমি এখানে এসে গৃহের স্বাদ পাবে না—

তোমাকে অতিথিশালায় স্থান না দিয়ে গৃহে রাখতে ইচ্ছা করি।

কই? প্রদীপ ত আমার হস্তগত হয়নি। তুমি কি গীতিকার সমালোচনা করেছ? দেখবার জন্যে উৎসুক রইলুম— কিন্তু পূজার ছুটি উত্তীর্ণ না হলে পাব বলে আশা করচিনে। প্রদীপে কি তোমার রাস্কিনের উপসংহারটা বেরিয়েছে?

Tolstoyএর What is Art নামক একখানি বই পড়বার জন্যে সুরেন আমাকে পাঠিয়েচেন। আজ হস্তগত হল— এখনো পড়িনি। বোধ হচ্চে Art সম্বন্ধে তিনি একটা কোন নূতন পথে গেছেন। কিন্তু সমস্ত বড় বড় বিষয়ে পথ একটা বই নেই এবং সে পথ অতি পুরাতন— অপথের অন্ত নেই। তুমি আসবার সময় ভেবে চিন্তে চুচার রকম পড়বার বই নিয়ে এস। Le crime de Sylvestre Bonard নামক Anatole Franceএর ফরাসী বই যদি তোমার কাছে বা কোন দোকানে থাকে আমাকে পাঠাতে পার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২

[* ৫ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

শিলাইদহ
৫ই [?১৯] আশ্বিন ১৩০৭

ভাই

এতদিন পরে আজ একটুখানি businesslike চিঠি লিখেছ — রোস, তাহলে পথঘাটের কথা বিস্তারিতরূপে বলা যাক্ :—

সকালে (কলকাতা টাইম্) সাড়ে ছটার সময় যে গাড়ি শিয়ালদহ ষ্টেশন ছাড়ে সেটাকে বলে চাঁদপুর মেল, বনাম চিটাগং এক্স্প্রেস। সেইটে সব চেয়ে দ্রুতগামী এবং সুবিধার গাড়ি। সেটা কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁছয় সকাল ৯৷৹/১০টার মধ্যে। অর্থাৎ ঠিক স্নানের সময়। কুষ্টিয়ায় নেমে আমাদের বাড়িতে স্নানাহার করে বোটে করেও যাওয়া যেতে পারে, ষ্টীমারে করেও যাওয়া যায়। তুমি যদি এই গাড়িতে এস তা হলে ভোরে উঠে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য ভোরের বেলায় বিদায় লওয়ার ব্যাপারটা একটু করুণরসাত্মক হয় এবং সে রস যদি হতে-করতে একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে পড়ে তাহলে ট্রেন মিস্ করার সম্ভাবনা আছে— সেইটে যদি বাঁচিয়ে কোন গতিকে ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়তে পার তাহলে যাত্রার অবশিষ্ট অধ্যায়-গুলো হুহুঃ শব্দে এগিয়ে যাবে। তোমার নিশ্চয় আসার খবর পেলে আমি কুষ্টিয়ায় উপস্থিত থাক্‌ব— নদীপথটা একত্রে ভোগ করা যাবে। যদি কোন কারণে এ গাড়িটা না পাওয়া যায় তবে

কলকাতা টাইম্ সাড়ে সাতটার সময় যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ শেয়ালদহ ছাড়ে সেইটেতে অধিরোহণপূর্ব্বক বেলা ১॥০/২টার সময় কুষ্টিয়ায় অবরোহণ করতে পারবে— এবং গাড়ি থেকে নেমেই বাক্যব্যয় না করে একেবারেই ষ্টীমারে উঠ্‌তে হবে —এবং ষ্টীমার তোমাকে বেলা ৪/৫টার সময় শিলাইদহের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে পাবনায় চলে যাবে। এ গাড়িটাও যদি ধরতে না পার তবে তুমি দুর্ভাগ্য— তাহলে রাত্রের গোয়ালন্দ মেল্ বই আর গতি নেই-— সেটা ছাড়ে সাড়ে দশটা রাতে এবং পৌঁছয় রাত ২॥০টায়— অতএব এই গাড়িটাকে দুর্জ্জনবৎ পরিহার করবে। ভালমানুষের মত চাটগাঁ মেলেই প্রত্যূষে চড়ে বোস। কিন্তু পত্রখানি যেদিন পাবে সেই দিনই উত্তরে জানিয়ো সোমবারে কোন্ ট্রেনে তুমি ছাড়বে অথবা ছাড়বেনা। নতুবা কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত বৃথা যাত্রা করে ফিরে আসা আমি কিছুতেই উল্লাসজনক বলে বিবেচনা করিনে। চিঠি লেখার পরেও যদি কোন কারণে তোমার না আসা হয় তাহলে যথাসম্ভব সত্বর নিম্নঠিকানায় টেলিগ্রাফ করে দিয়ো :—

Babu Nagendranath Roy Chaudhuri
C/o Messrs Tagore & Co.
Kushtea.

আমি শৈলেশকে লিখে দিয়েছি যে, সে যদি ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে ফেরে এবং শিলাইদা আসা সংকল্প করে তাহলে তোমার কাছে গিয়ে যেন বিজ্ঞাপন করে।

ষ্টীমার থেকে ওঠানামা সম্বন্ধে তোমার যদি কোন সংশয় থাকে তাহলে না হয় বোটে করেই যাওয়া যাবে— একটু সময়-ব্যয় ছাড়া তাতে আর কোন অসুবিধা নেই— কিন্তু সময় যখন অত্যন্ত মহার্ঘ্য নয় তখন সে জন্যে ভাববার দরকার নেই।

বিজয়ার প্রীতি অভিভাষণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩

[শিলাইদহ * ৯ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আজ এইমাত্র প্রদীপ পাওয়া গেল কিন্তু এখনো পড়িনি। সকাল বেলায় Tolstoyর বইখানা দেখছিলুম ওর সঙ্গে মতে মিলিনে কিন্তু খুব suggestive। আমার ইচ্ছে করচে ওর বিস্তৃত সমালোচনা করে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি— তার মধ্যে আমার মতটা বেশ বিস্তৃত করে বল্‌তে পারি। তুমি রস্কিনে যে তর্ক তুলেচ এতেও তর্কটা তাই— তবে অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে ইস্তক নাগাদ যত মতামতের সৃষ্টি হয়েছে টলষ্টোয় তার একটা চুম্বক দিয়ে তার উপরে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেচেন। এ বইটা যদি না পড়ে থাক ত পড়া আবশ্যক।

ব্যাকরণ ঘেঁটে ফরাসী শেখা আমার কর্ম্ম নয়— একটা বই দিয়ো। আমার লাইব্রেরীতে যে যে ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে তারই কোন একটার original পেলে সুবিধা হয়। Gautierএর Capitane Fiacase, Daudetএর Jack, Maupassantএর Pierre & Jean, No Relation, Goncourtএর Sister Philomene, ইত্যাদি।

চমৎকার শরতের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সে আর কতবার বলব। রথী এবং আমার শ্যালক বোটে করে পদ্মায়

বেড়াতে গেল। আমি আমার এই দক্ষিণের উন্মুক্ত দরজার কাছে স্থির নিস্তব্ধভাবে বসে বসে ভ্রমণ করব এই প্রকার সংকল্প করেছি।

কিন্তু তুমি করচ কি? লিখচ না পড়চ না পরের দলিল তৈরি করচ না চুপচাপ বসে আছ। পূজার গোলমাল ত চুকল— এখন তোমার শ্রম, না, শান্তি, না ক্লান্তি?

আমার ছোট গল্প আর অনেকগুলো মাথায় আছে। কিন্তু এখনো আমার পূজোর ছুটি ফুরোয়নি— তাই লেখায় হাত দিতে পারিনি। ছুটি শেষ হলেই একদিন তলব হবে তখন খাতাপত্র হাতে ডেস্কে বসে যেতে হবে। তুমি যে একটা গল্প লিখবে বলে গোপন গুজব তুলেছিলে তার কি হল বল দেখি? গুজবটাই গল্প হয়ে পড়ল নাকি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪

১৬ ফেব্রুয়ারি [১৯০১]

ওঁ

৪ঠা ফাল্গুন [১৩০৭]
শিলাইদহ

ভাই

বাঁচা গেল ! আমার টাকার দরকার বারো হাজার। কিন্তু শুন্‌চি মহাজন ৬০০০ হাজারেই ক্ষান্ত থাকবে— সেটা জনশ্রুতি মাত্র। যদি ১২০০০ বা ১০,০০০ পার যোগাড় কোরো, নইলে ৬০০০ই সই। কিন্তু তুমি এতদিন আমাকে বিধিমতে পরীক্ষা করে দেখ্‌লে, তবু কি করে জান্‌লে যে, প্রমিসারী নোট্ কি ভাষায় লিখ্‌তে হয় তা আমার মনে আছে? একটা খস্‌ড়া লিখে পাঠালেই ত ভাল করতে! অন্ততঃ টাকাটা নিয়ে অবিলম্বে চলে এস— দ্বিধামাত্র কোরো না। ডিস্‌কাউণ্ট্ যদি দিতে হয় ত হবে— কি করা যায় বল। আমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব— কারণ, পরিজনবর্গকে পদ্মায় ভাসিয়ে দিয়ে আমার কোথাও নড়া অসম্ভব। তোমার গৃহিণীকে বোলো ঝড়ঝাপটের বিরুদ্ধে আমি তোমার জামিন হতে রাজি আছি। যেখানে এবার আড্ডা নিয়েছি এখানে ঝড়ের প্রবেশাধিকার strictly prohibited। স্থানটি দেখ্‌লে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর প্রতি আর তোমার কখনো ঈর্ষ্যার উদয় হবে না। ইতস্ততঃ করে আস্‌তে বিলম্ব কোরো না। এই চিঠির উত্তরেই দিনস্থির করে লিখো—

কারণ আমাকে কুষ্টিয়ায় গিয়ে তোমাকে বহন করে আন্‌তে হবে। নিশ্চয়, বিলম্ব কোরো না।

তোমার চিঠিতে অন্য সুখসমাচারের আভাস পেয়ে মনটা পুলকিত আছে— তার বিস্তারিত বিবরণ তুমি একেবারে দেবেনা বলেই বোধ হচ্চে— কৃপণের মত এক এক কড়ি করে বের করবে! যদি এলাকার মধ্যে তোমাকে হাতে পাই তাহলে দস্যুবৃত্তি করে একদমে আদায় করে নেব।

আমি এখন আর শীঘ্র পদ্মার কোল ছাড়চি নে। অন্ততঃ বর্ষা পর্য্যন্ত এখানে কাটাব বলে মন স্থির করে নোঙর ফেলে শিকল বেঁধে ঘরকন্না ফেঁদে বসেছি। অতএব

এস এস বঁধু এস, অর্দ্ধেক চরে বস,
নৌকা ভরিয়া তোমায় রাখি।

সঙ্গিনী পড়েছি— খাঁটি সোনা নয়, বিস্তর খাদ আছে— দেখা হলে আলোচনা হবে। প্রমথবাবু এখন বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী সপ্তম স্বর্গে আছেন— তাঁহার শ্যালিকাপতি গর্দ্দভটা কোন্ মাঠে ঘাস খাইয়া চোখ্ বুজিয়া জাওর কাট্‌চে (গাধা বুঝি জাওর কাটে না— ভুল হল) আমি তাই ভাবি! সে লোকটার উপরে আমার উত্তরোত্তর অশ্রদ্ধা হচ্চে। আমি আজ প্রমথবাবুর সুখালসগদ্‌গদ একখানি চিঠি পেয়েছি।

এখান থেকে পোষ্টাপিস্ দূরে পরপারে— অতএব শীঘ্র শেষ করি। তুমি অবিলম্বে আসবার ব্যবস্থা কোরো!

বিবাহের দিন কবে ?

তোমার

শ্রী

যদি তোমার আস্‌তে নিতান্তই দেরি হয় পত্রোত্তরে প্রমিসারি নোটের একটা আদর্শ লিখে পাঠিয়ো।

১৩৫

[পাবনা * ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই

কিছুদিন থেকে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রাতঃকাল থেকে রাত দেড়টা পর্য্যন্ত লেশমাত্র অবসর পাইনে— গৃহিণীর অবস্থা ততোধিক। তোমাকে অনেক দিন থেকে চিঠি লেখবার সঙ্কল্প করচি কিন্তু কোন মতেই হয়ে উঠ্‌চে না। অবশেষে ভারতী থেকে চিরকুমারসভার তাগিদ আসাতে নিতান্ত বিব্রত হয়ে আজ সকালে কোনমতে একটা নিভৃত কোণ খুঁজে নিয়ে একটা বড় কেদারায় বসে তারি হাতার উপর কাগজ রেখে রচনায় মন দিয়েছিলুম— এমন সময় বহুকাল পরে ডাকযোগে তোমার পরিচিত হস্তাক্ষর লেফাফার উপর থেকেই আমাকে সাদর অভিবাদন দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম হতে মুহূর্ত্তের মধ্যে আহ্বান করে নিলে। কিন্তু চিঠির মধ্যে যে অবসাদ ক্লান্তি এবং উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে তাই দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলুম। তোমাকে তোমার সমস্ত সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে কি উপায়ে যে একটা নিরাপদ বন্দরের মধ্যে আকর্ষণ করে আনব আমি ত কোনমতেই তা ভেবে পাইনে। অল্প মূলধনে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতির আশঙ্কা বর্জ্জন করে কি করে এমন ব্যবসায় চালান যেতে পারে যাতে তোমার চলতে পারে? সম্প্রতি কলকাতার একজন মাড়োয়ারী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরাজ আমাদের

সঙ্গে অর্দ্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়— যা কিছু খরিদ হবে তার অর্দ্ধেক খরচ আমাদের অর্দ্ধেক তাদের— তারা নিজব্যয়ে কলকাতার Establishment চালাবে আমরা নিজব্যয়ে কুষ্টিয়া চালাব— আমরা খরিদ করব তারা বিক্রি করবে— লোকসানের সম্ভাবনা দেখলে অল্পের উপর দিয়েই কাজ বন্ধ করে দেব -- এই রকম একটা প্রস্তাব চলচে— তুমি কি এ রকম কাজে হাত দিতে ভরসা পাবে? মূলধন পাঁচ হাজার এমন কি তার কম দিলেও চলে— লাভ যদি হয় যথেষ্ট হতে পারে— লোকসান হলে যাতে যথেষ্ট লোকসানের চেয়ে কম হয় সে জন্যে সতর্ক হওয়া যেতে পারে— কিন্তু লোকসানের লেশমাত্র আশঙ্কা থাকলেও কি তোমার কাজ করা পোষাবে? এ বৎসর কালিগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি— কেবল আখের কল পূর্ব্ববৎ চলচে। তুমি যদি আখের কলে টাকা ফেলতে চাও আমাদের আপত্তি নেই— কিন্তু আখের কল সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তার কারণ আছে— তোমাকে আমাদের কোন বিপদের মধ্যে জড়াতে ইচ্ছা করে না। কুষ্টিয়ায় আর একটা কাজ হতে পারে— নদীর ধারে খানিকটা জমি নিয়ে গোলাপের ক্ষেত করে কলকাতা market-এ ফুল supply করা। তাতে হাজার দুয়েক টাকা মূলধন লাগবার কথা— নগেন্দ্র সেই কাজে প্রবৃত্ত হবার সঙ্কল্প করচে— তুমি যদি ইচ্ছা কর তার সঙ্গে যোগ দিতে পার— কাজটা লাভজনক বলে অনেকে ভরসা দেয়। তুমি ফুলের market-এ খবর নিলেই

জানতে পারবে গোলাপ তারা কি মূল্যে খরিদ ও বিক্রি করে। এ অঞ্চলের নদীতীরের বেলে জমি গোলাপের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল soil। টাকাটা ফেলে এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে— কিন্তু অল্প টাকা এক বৎসর পড়ে থাকলে বোধ হয় বেশি কষ্টকর না হতে পারে। তুমি যদি একবার এদিকে এসে পড়তে পার তাহলে এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করা যেতে পারে। গোলাপের ব্যবসায় তোমার মত সৌন্দর্য্যপিপাসুর উপযুক্ত হতে পারে— এতে তোমার কোন এক ছেলে লেগে থাকতে পারে। ভেবে দেখো। তোমাকে কেবল কাজের চিঠি লিখলুম— কিন্তু সেটা আমার আন্তরিক উদ্বেগবশতঃ।

গোলমালের মধ্যেও গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেচি। এখন অতিথির প্রতি মন দিতে চাই।

-তোমার রবি

১৩৬

[ফেব্রুয়ারি ?, ১৯০১]

ওঁ

ভাই

আমার অতিথি পালিয়েছেন— কিন্তু তবু আমি ভালরকম অবসর পাইনি। কারণ চৈত্রের চিরকুমার আতিথ্যের হাঙ্গামে মুলতুবি পড়েছিল— সেটা শেষ করে ফেল্‌তে হল— মনে করচি এবারে না থেমে একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে একটানা উপসংহারে গিয়ে উপস্থিত হব। নাটোরকে সেই বিনোদিনীর গল্পাংশ একদিন শোনান গেল – তাঁর খুব ভাল লাগল। শোনাতে গিয়ে সেটা লিখে ফেলবার জন্যে আমারও একটু উৎসাহ হয়েছে— কিন্তু অন্য সমস্ত খুচরো লেখা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটায় হাত দিতে ইচ্ছা আছে। এদিকে খুচ্‌রো লেখা রক্তবীজের ঝাড়, একটা যেতে না যেতে আর দশটা এসে উপস্থিত হয়— অথচ সেগুলো মাথা থেকে ঝেটিয়ে না ফেল্লে মনটা কোন বড় লেখা লেখবার মত শান্তি ও অবসর পায় না। নাটোর না এসে পড়লে এতদিনে আমি চিরকুমার শেষ করে ফেলতে পারতুম। তোমাকে গোলাপের ব্যবসার যে প্রস্তাব করেছিলুম তাতে তোমার সম্মতি আছে কি ? ৫০০ টাকার বেশি দিতে হবেনা। কিন্তু টাকাটা বছরখানেক শূন্য পড়ে থাক্‌বে। নগেন্দ্রকে তোমার কথা বলেছি— তাতে তার যথেষ্ট উৎসাহ হয়েছে। যদি তুমি ফুলের দাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বাজারে একবার সন্ধান করে দেখ ত ভাল

হয়। Amateur Rose Gardener বলে একটা বই আছে— তোমার অবকাশমত Newmanদের সেটা আমার শিলাইদহ ঠিকানায় পাঠাতে বলে দেবে? তুমি ইতিমধ্যে একবার এ অঞ্চলে আস্‌তে পারলে ভাল হয়। এখন ত পথঘাট পরিচিত, তাছাড়া নগেন্দ্র তোমার পাণ্ডা আছে— একেবারে কুষ্টিয়ার ঘাট থেকে আমাদের বোটের ঘাটে এসে উপস্থিত হবে— তার পরে এখানকার সুবিস্তীর্ণ নির্জ্জনতায় পৃথিবীর সমস্ত অশান্তি বিস্মৃত হতে পারবে— সংসারকে তখন খুব প্রকাণ্ড এবং প্রবল বলে মনে হবেনা। এরকম বিজনবাসের অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে বোধহয় কখনো হয়নি— যদি চেষ্টা করে দেখ এর মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিষ মিলবে। ডাক্তার কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? এখন থেকে পাবনার ঠিকানায় না লিখে পূর্ব্ববৎ শিলাইদহের ঠিকানায় পত্রাদি পাঠিয়ো।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্র

[১৩ ?, মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই

ভাবিয়াছিলাম বৈষয়িক চিঠি লিখিব না। কানে ধরিয়া লেখাইল। আজ আমলার সাহা বাবুরা তাঁহাদের টাকাটা তুলিয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। ১২,০০০ টাকা, দশ টাকা হারে সুদ। ওদিকে সুরেন এখন বায়ুপরিবর্ত্তনে কটকে গেছে— মহাজন টাকাটা ৯।১০ দিনের মধ্যেই চায়। অবস্থা এইরূপ! কি পরামর্শ দাও? আপাততঃ আপনা-আপনি কারো কাছ হইতে (যথা চন্দ্র ব্রাদার্স্) যোগাড় করিয়া দিতে পার? লেখাপড়ার হাঙ্গামা করিতে গেলে সুরেনকে পাইব না— আমার পক্ষেও বিষম অসুবিধা। সুরেন কটক হইতে ফিরিলে যাহা হয় একটা গতি করা যাইবে। তোমার নিজের দায় যথেষ্ট আছে তাহার উপরে পরের ঝঞ্ঝাটও তোমারি ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। যদি সুযোগ ঘটাইতে পার ধন্যবাদ দাবী করিতে পারিবে, না পারিলেও কৃতজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

তোমাকে খবর দিয়াছিলাম ঝড়ের ভয়ে তটস্থ হইবার উপক্রম করিতেছি— কিন্তু পরাভব স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। পদ্মার প্রান্তে একটি বেশ নিরাপদ স্থান পাইয়াছি— সেইখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি— সে জায়গাটা ঝড়ের এলাকা-বহির্ভূত। অতএব তুমি আসিলে জলের মধ্যে নির্ভয় আশ্রয় পাইতে পারিবে।

শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন— সে জন্যে আমাকেও যথেষ্ট ঠেলাঠেলি লাগাইয়াছেন। এখন দিবাবসানে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে— এখন কি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে? এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে এখন সকল রকমেরই দোকানপাট বন্ধ করিয়া বাড়ি পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি— সেখানকার সন্ধ্যাদীপশিখা কেবলি চোখে পড়িতেছে— এমন সময়ে দেনা-পাওনায় টানাটানি করিতে থাকিলে কি প্রাণ বাঁচে?

আজ রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখিতেছি— আশা করি এত ক্ষণে তুমি শান্তিশয্যায় শয়ান— কোন দুশ্চিন্তা তোমার সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত করিতেছে না।

প্রমথবাবুর খবর কি? সঙ্গিনী পড়িয়াছ?

তোমার শ্রী
রবীন্দ্রনাথ

আমাদের কুষ্ঠিগুলা লইয়া করিতেছ কি? এদিকে পরমায়ু যে অবসান হইতেছে।

১৩৮

১৪ মার্চ [১৯০১]

ওঁ

ভাই

কাল রাত্রে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছি আজ তার একটা পরিশিষ্ট দিচ্চি দুটোই এক সঙ্গে পাবে।

আমলার সাহাবাবুরা বোধ হয় পূরা টাকা না পেলেও ৫/৬ হাজার পেলেই আপাততঃ ঠাণ্ডা থাক্‌বেন তাঁদের কর্ম্মচারী আমাদের অ্যাসিস্টাণ্ট্ নায়েবের কাছে এমনতর আভাস দিয়েছেন। তা যদি হয় তবে অন্ততঃ ঐ রকম পরিমাণ টাকাটা সংগ্রহ করে দিলে একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পাই। দোহাই তোমার সুদটা যাতে ১০ পার্সেন্টের বেশি না হয় সেই চেষ্টা কোরো। নইলে বহু দুঃখজালে জড়িত হতে হবে। নিতান্তই অসম্ভব হলে ১২ পার্সেন্টই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে— কিন্তু এ টাকাটা একটু চেষ্টা করে তোমাকে সংগ্রহ করতেই হবে— কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

কাল আমরা পদ্মার আর এক কোলে যাব। ঝড়ের তাড়নায় পদ্মার এক কোল থেকে অন্য কোলে আশ্রয় নিতে হচ্চে— দেনার বিপ্লবে এক মহাজনের হাত থেকে অন্য মহাজনের হাতে যাওয়ার মত। আশা করচি নৌকাডুবি হবেনা।

এই কাজটি সমাধা করে conquering heroর মত তুমি এখানে চলে এস— অন্য কোন বাধার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র কোরো না। ইতি ১লা চৈত্র।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্র

১৮ মার্চ্ ১৯০১

ওঁ

ভাই

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন কিছুদিন সুনিদ্রার প্রত্যাশা করি। টাকাটা তুমি যদু চাটুয্যের হাতে দিলে সে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। তোমার চিঠি পেলেই আমি তাকে তোমার ওখানে যেতে বল্‌ব।

সাহিত্যারণ্যে দীর্ঘকাল বনবাস যাপন করেছি— এখন কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের খুব দরকার ছিল— তার পরে রাজত্বলাভের দাবী করতে পারতুম— কিন্তু বঙ্গদর্শন ভারতী আবার আমাকে টানাটানি আরম্ভ করেছে— এ সময়ে আমার কিছুতেই বেরতে ইচ্ছা করচেনা। কি করা যায় বল ত? কোথায় পালাই?

আমার নৈবেদ্য ১০০ পেরিয়ে গেছে। ওদিকে আদি সমাজ প্রেসে ছাপাও আরম্ভ হয়েছে। ভেবেছিলুম ৫০টার বেশি হবে না— হতে হতে জম্‌তে জম্‌তে দ্বিসংখ্যক অঙ্ক থেকে ত্রিসংখ্যক অঙ্কে এসে পৌঁচেছি।

রামানন্দবাবু প্রবাসী বলে একখানা পত্র বের করচেন— আরম্ভ সংখ্যায় একটা কবিতা লিখে দেবার জন্যে আমাকে খুব চেপে ধরেছিলেন— খান চারেক চিঠি উপ্‌রি উপ্‌রি লিখেচেন —আমার নৈবেদ্যের শেষ কবিতাটি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেটা সনেট নয়— একটি বড় সড় ব্যাপার— তার নামও

"প্রবাসী"। ওদিকে ভারতী বৈশাখে একটি মাঙ্গলিক চান্— কিন্তু ফরমাসমত আমার মাথায় কিছুই আস্‌চে না। ইতিমধ্যে চিরকুমারটা বৈশাখেই নিশ্চয়ই শেষ করতে হবে। বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসতে পারচি নে।

বঙ্গদর্শন যদি বের হয়, তোমাকে ত আসরে নাব্‌তেই হবে— হাল্ বঙ্গদর্শন বৈঠকে তোমার একটা গদি ত পড়বেই— কিন্তু তোমার ঝঞ্ঝাটের যেরকম লম্বা ফর্দ্দ দেখা গেল তাতে সে গদি দীর্ঘকাল শূন্য থাকবার আশঙ্কা দেখ্‌চি। তার চেয়ে পালাও পালাও— পালিয়ে এখানে ডুব দাও— আফিস্ এবং তোমার দলবলগুলি সুদূরে মাথা চাপ্‌ড়ে মরুক্! এখানে Extradition Treatyর জোর নেই— তোমাকে কেউ টেনে বের করতে পারবে না।

গরম পড়তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু রাত্রি ও সকাল বেশ রীতিমত ঠাণ্ডা! অলমতি বিস্তরেণ। ইতি ৫ই চৈত্র ১৩০৭

তোমার শ্রীরবীন্দ্র

১৪০

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই

আজ তোমার চিঠি পেলুম। আমরা এতদিন বহুদূরে খোলা পদ্মার মধ্যে বাস করছিলুম এখন শিলাইদহের অনতিদূরে পদ্মার একটি কোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। এখানে ঝড়ে ঝঞ্ঝায় নিরাপদে থাকা যাবে। ক্রমে গরম পড়ে আস্‌বে, বালি উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌বে, দিনান্তরম্য গ্রীষ্মকাল এসে উপস্থিত হবে, কিন্তু আমি পদ্মার কোল সহজে ছাড়চি নে। অতএব আরও দিন দশ পনেরো বাদে যদি তুমি এসো তবে আমাদের কাছ থেকে এবং এখানকার বালুতটবাসিনী নিদাঘশ্রীর কাছ থেকে খুব Warm reception পাবে। তোমার মাছের ব্যবসায়ের প্রস্তাবটা আমার কাছে মন্দ লাগ্‌চে না— শ্যালার কাছে লিখে এর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ফুলের ব্যবসায়ের যতটা খবর নিতে পেরেছি তাতে ওটাকে নেহাৎ আকাশকুসুমের ব্যবসা বলে বোধ হচ্চে— মাণিকতলার মালী-সম্প্রদায় বল্‌চে আমাদের পুঁজি অল্প, নইলে আমরা এরকম সুযোগ পেলে বেঁচে যেতুম। যাই হোক্ এখনো হাতে সময় আছে। বৈশাখ মাস থেকে কাজ সুরু করতে হবে, তার পূর্ব্বে জমি খালি পাওয়াই যাবে না। কুষ্টিয়ায় বিঘা পাঁচ ছয় জমি আমাদের হাতে আছে।

তুমি আসার পূর্ব্বেই চিরকুমার সভাটা লিখে শেষ করে ফেল্‌ব। তার পরে ভয়ানক নিশ্চিন্ত— মনের সাধে দেদার কুঁড়েমি করতে পারব।

তোমার রবীন্দ্রনাথ

১৪১

[মার্চ, ১৯০১]

ওঁ

ভাই

তুমি ত আমাকে কলকাতায় যাবার জন্যে লিখেছ— আমিও অনেকদিন থেকে যাব-যাব করচি— কিন্তু প্লেগের ভয়ে গৃহিণী যেতে দিচ্চেন না। আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়িতেই দুজন মেথরের প্লেগ হয়েছে এ অবস্থায় কোন জরুরী কাজের ওজর দেখিয়ে যে আমি ছুটি পাব এমন আশামাত্র নেই। চেষ্টা করে অবশেষে ক্ষান্ত হয়েছি। পত্রদ্বারা যতদূর হতে পারে সেই উদ্যোগেই আছি। বোধ হয় কাল অথবা পরশু একটা উত্তর পাব। সময় খুব খারাপ যাচ্চে।

প্লেগটাকে কোনমতে ঘরে ঢুক্‌তে দিয়ো না— তোমার সভায় বেগার কার্জের উমেদার আনাগোনা করে— সেই সঙ্গে ইনিও যেন গিয়ে উপস্থিত না হন। যোড়াসাঁকোর মত সুরক্ষিত জায়গায় যদি এর গতিবিধি ঘটে তাহলে তোমার বাড়ির জন্যে বিশেষরূপ আশঙ্কার কারণ মনে উদয় হয়।

আজ তবে স্নান করতে যাই। বেলা হয়ে যাচ্চে।

তোমার র

১৪২

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই

আজ শনিবার। তুমি যদি সোমবার নিশ্চয় এস তাহলে আশা করি আগামী কাল খবর পাবই। কারণ, তোমাকে কুষ্টিয়ায় ভোজন করিয়ে সেখান থেকে আনাতে চাই।

সেই পুরাতন শিলাইদহের ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি। আজ সকালে চলে এসেছি। সেখানে সকলের শরীর মন পীড়িত হতে আরম্ভ করেছিল। গরমটাও ক্রমে হঠাৎ বেড়ে উঠ্‌তে লাগল— ঝড়ের আশঙ্কাও আকাশের এ কোণে ও কোণে দেখা দিতে লাগল— আম্‌লাবৃন্দ এবং প্রজাবর্গও অনুনয় আরম্ভ করে দিলে— দস্যুভয়েরও অল্পস্বল্প সূচনা হল— অতএব আর অপেক্ষা করতে পারলেম না।

শুক্লপক্ষ অবসান হবার পূর্ব্বেই শিলাইদহে তোমার অভ্যুদয় হবে এই রকম আশা করা যাচ্চে।

বেলার যৌতুক সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। মোটের উপর ১০,০০০ পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করতে পারি। সেও সম্ভবতঃ কতক নগদ এবং কতক instalmentএ। অবশ্য instalmentএর ব্যবস্থা আমার পক্ষে হিতকর নয়— কিন্তু নিতান্তই যদি অনটন হয় তবে উপায় নেই। সম্ভবতঃ এখন cashএ অতি অল্প টাকাই আছে— বাবামশায় কখনো ঋণের প্রস্তাবে সম্মত হবেননা— অতএব এত কাল পরে এই দুঃসময়ে কোনমতে আমি বড়

যৌতুকের কথা তুল্‌তে পারিনে। সাধারণতঃ বাবামহাশয় বিবাহের পর দিন ৪।৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে থাকেন— সেজন্যে কাউকে কিছু বল্‌তে হয় না। বিশ হাজার টাকার প্রস্তাব আমি তাঁর কাছে উত্থাপন করতেই পারব না।

আমাদের যোড়াসাঁকোর গলিতেই দুজন লোক প্লেগে মারা গেছে এবং দুজন মুমূর্ষু— সে জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। তোমাদের পাড়ার কিরকম অবস্থা?

চিরকুমার সভাটা, মনে করচি, আজই লিখে একেবারে ইতি করে দেব। তাহলে একটা বড় ভূত আমার কাঁধ থেকে নেবে যাবে। চৈত্রের ভারতী পেয়েছ বোধ হয়।

শ্রীশ বাবু পালামৌ থেকে বঙ্গদর্শনের তাগিদ লাগিয়েছেন— আমি কোথায় পালামু? দুই ভাইয়ে মিলে নিকটে এবং দূরে থেকে আক্রমণ করবে— এবারে বোধহয় মরণং ধ্রুবং!

তোমার

১৪৩

২৪ মার্চ ১৯০১

ওঁ

ভাই

এখনো অন্যত্র টাকা পাইবার আশা আছে তাই তোমাকে কিছু লিখিতে পারিতেছি না। যদি ফস্কিয়া যায় তবে শুক্রবারেই তোমার টাকাটা লইব।

যৌতুক সম্বন্ধে কাল তোমাকে খোলসা লিখিয়াছি। যাহা অসাধ্য জানি তাহার জন্য চেষ্টা করা অনর্থক। বাবামশায়কে বিরক্ত ও পরিবার-সুদ্ধ সকলকে অসন্তুষ্ট করিয়া আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নই। এ সময়ে তাঁহাকে উৎপীড়ন করা আমি কিছুতেই পারিবনা। বারম্বার পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে কৃতকার্য্য হইতে পারি কিন্তু তাহা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব— এবং আমার পিতার কোন পুত্রই বিশেষ প্রয়োজনের স্থলেও এমনতর করিয়া নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

তোমার আজিকার পত্রে সোমবারে যাত্রার কোন উল্লেখ নাই। চৌঠা এপ্রিলেরও কোনও প্রসঙ্গ দেখিলাম না— আশা করি তোমার যাত্রার তারিখ ক্রমাগতই পিছু হঠিতে থাকিবে না।

কাল চিরকুমারসভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি— এমন সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য শ্রীশ শৈলেশ দুই ভাইয়ের নিকট হইতে বন্দুকের দুই চোঙ ভরা

অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে— কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই। তোমাকে সম্পাদক পাকড়াও করিবার জন্য শৈলেশকে উত্তেজিত করিয়া পত্র লিখিয়াছি। বেগার খাটুনির তাগিদে নানা লোক তোমার দ্বারে ধন্না দেয়— আরেকটা ধন্না বাড়িলে বোঝার উপর শাকের আঁটি পড়িবে। পরের অনুরোধে লক্ষ্মীর দলিলপত্র ফসাফস্ লেখ, আর সরস্বতীর মৌরসী দলিল কেন না লিখিবে? পত্র প্রাপ্তিমাত্র Show cause why।

কাল রাত্রেই একটা ঝড়ের বাচ্ছা নদীতীরে শিকার সন্ধানে গিয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া আমাদের কুঠিবাড়ির চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছিল। অতএব ঠিক দিনেই আসিয়াছি।

১১ই চৈত্র ১৩০৭

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৪৪

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই—

অল্পদিনের মধ্যে শোধ দিতে হবে শুনে এবং ডিস্কাউন্টের আশঙ্কায় আমি অন্য স্থানে চেষ্টা করে ৯ পার্সেণ্টে কৃতকার্য্য হয়েছি। যদি দীর্ঘকালের মেয়াদে হাজার দশেক যোগাড় করে দিতে পার তা হলে সুবিধা হয়— কিন্তু খরচায় এত বেশি পড়ে যায় যে ভেবে দেখ্‌তে গেলে তাতে আমাদের বিশেষ সাহায্য হয় না— বরঞ্চ একটু ক্ষতিই হয়। সেই জন্যে ইতস্ততঃ করতে হয়। যাই হোক্, আসন্ন সঙ্কটটা হয় ত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব। যদি নিতান্ত ঠেকে, তাহলে হাজার পাঁচ ছয় সংগ্রহ করতে কি তোমার ক্লেশ হবে?

পদ্মার এ প্রান্ত থেকেও তাড়ালে। মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত বালু উড়ে আচ্ছন্ন করে দিচ্চে— এবং এখানকার স্রোতহীন বদ্ধ ['জল'] ক্রমে দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হবার উপক্রম করচে। আমি তোমাকে আহারান্তে লিখ্‌তে বসেছি— ধূলিধ্বজা উড়িয়ে অগ্নিশ্বাস বাতাস গর্জ্জন করে ছুটে আস্‌চে— জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রজারা, পদ্মা থেকে তীরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যে আজ প্রাতে বহুল অনুনয় করে গেছে। উঠ্‌তে হল। চৈত্রের মাঝামাঝি হয়ে এল— এখন আর এই বালুতটে বাস সহ্য হবে না। তুমি কেবল দেরি করে করে পদ্মার আতিথ্য থেকে বঞ্চিত হলে—

অন্ততঃ আর পনেরো দিন আগে তোমার আসা উচিত ছিল। যতদিন সম্ভব ততদিন টেনেটুনে আমরা পদ্মার আশ্রয় ছাড়িনি— এখন নিতান্তই বিদায়ের সময় এসেছে। সেজন্যে তুমি রাগ করে এখানে আসবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে বোসো না। শিলাইদহে বসন্ত শুক্লরজনীর শোভাটা একবার দেখে যেয়ো ?

তোমার শ্রী

[পত্রাংশ]

১৪৫

[মার্চ ১৯০১]

আমি যথাসময়ে যথাবিহিত উদ্যোগ করতে পারিনে— সুসময় উত্তীর্ণ হয়ে না গেলে আমার কর্ম্মদেবতা সচেতন হন না। যা হোক্, আশাকে খর্ব্ব করে ধৈর্য্য ধরে থাকা যাবে— প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সময় নিশ্চয় আপনি এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু তুমি এরই জন্যে যদি কলকাতায় অপেক্ষা করে থাক তাহলে তোমার আশাও বোধ হয় আমাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। কারণ, ঋণ এবং জামাতা লাভ কখনো সহজে এবং সত্বর হতে দেখি নি— তাঁহাদের যখন শুভাগমন হয় হবে, তাই বলে তোমার আসা সুদ্ধ স্থগিত করা সঙ্গত নয়। এ দিকে প্রতিদিনই গরম বেড়ে যাচ্চে— নদীতীরে যেটা যথার্থ আরামের সময় সেটা ক্রমেই দগ্ধ তপ্ত হয়ে যাবার দাখিল হয়ে আস্‌চে— মাঝে মাঝে ঝোড়ো মেঘ আকাশের ঈশান কোণে ভ্রূকুটি করে কয়খানি ক্ষুদ্র বোটের উপর বিদ্যুৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ করচে— অতএব ত্বরয়।

আর নয়! আহার প্রস্তুত— ঘন ঘন দূত আস্‌চে— এখনো আমার স্নান হয় নি বলে আমার সহধর্ম্মিণী উত্তপ্ত হচ্চেন— সহানুভূতির এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব! বেলা একটা বাজে— তীরের তপ্ত বালুকা থেকে উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস আস্‌চে।

তোমার রবি

১৫৮

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই—

পর্শু খুব একটা ঝড় হয়ে গেছে। কিন্তু ডুবি নি। ডোবা অসম্ভব ছিল না। যাই হোক্, ডোববার ইচ্ছা নেই— তাই সুমতি কানে কানে বলচে, মূঢ়, শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে ফিরে যা!— সুমতির কথার অনুমোদন করবার অন্য প্রবল লোকও আছে— সুতরাং পদ্মাচরচারণ পরিহার পূর্ব্বক কুঠিবাড়িতে উঠিতে হইবে— অতএব বিদায় হে নিষ্ঠুরা হে ভীষণা হে মোহিনী হে প্রেয়সী পদ্মা!

কিন্তু তাই বলে তোমার আসবার ব্যাঘাত না হয় যেন! যখন যাত্রাই স্থির করেছ এবং সম্ভবতঃ যথাস্থান থেকে যথোচিত-ভাবে বিদায় গ্রহণ করেচ,— তখন এতটা প্রভূত উদ্যম ব্যর্থ না হয়!

চিরকুমার সম্বন্ধে সাক্ষাতে আলোচনা হবে— ব্যবসার কথাও ভুলবনা। আমার শাশুড়ি এবং শ্যালকজায়া আমার অতিথি, অতএব ব্যস্ত আছি।

পুনর্দর্শনায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৪৭

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই

Life Policy নিতে রাজি আছি— কত টাকার নেওয়া আবশ্যক এবং তার ব্যয় কি রকম একটু আভাস দিয়ো। বয়স, ৪১শে পড়ব।

Easter ছুটিতে লোকেনকে ডেকেছি— আস্‌তে পারবে কি না জানিনে— কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে তোমরা দুজনে একত্র হলে বেশ জমে উঠ্‌বে আশা করচি। তোমরা পরস্পরের কাছে সুপরিচিত হও এই আমার ইচ্ছা।

অতুলচন্দ্র (ছদ্মনাম বীরেশ্বর গোস্বামী) তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসি হয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন— যেন, তুমি কাউকে খুসী করলে তার কৃতজ্ঞতার অংশে আমারও দাবী আছে।

বিনোদিনী লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি— কিন্তু তার উপরে ভারতী এবং বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন, ভারতী প্রত্যহই তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি আমার দ্বারে ফেরাচ্চেন। এমন করলে আমি ত আর বাঁচি নে।

আকের গুড় তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্চি— মূল্য এখন ফস্ করে নিচ্চি নে— যতটা সাধ্য তোমাকে ঋণী করে রাখা যাক্— মিষ্টের ঋণ, সুবিধা পেলে, কোন এক সময় মধুরেণ শোধ করে নেওয়া যাবে।

বাচা মাছ এখন পাওয়া দুঃসাধ্য। তা ছাড়া সে মাছ গরমে অতি শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। পাঠাবার তর সবে কিনা সন্দেহ। যদি লোভ থাকে ত ঈষ্টরের মধ্যে এসে খেয়ে যেয়ো। এখানকার সব ভাল জিনিষ যদি তোমাকে পাঠিয়ে দিই তাহলে সশরীরে আসবার তাগিদ্ থাক্‌বে কেন? ডাক্তার মাঝে মাঝে তোমার শুভাগমনের তথ্য নিয়ে যান— উত্তরোত্তর তিনি হতাশ হয়ে পড়্‌চেন বলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে

তোমার রবি

১৪৮

[মার্চ, ৯০১]

ওঁ

ভাই

চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল— ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম— যেমন করে হোক্ শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুন্‌লুম শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আস্‌চে— তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে। সকল সময়ে কি মেজাজ ঠিক থাকে? চৈত্রের কুমারসভা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেচ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শমতে ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্ত্তন করে দেবার চেষ্টা করব। বৈশাখে কুমারসভার উপসংহারটা পড়ে তোমাদের কি রকম লাগে জান্‌বার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে। নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবল মাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি— মনের সে অবস্থায় কখনো রস নিঃসারণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েচে কি না নিজে বুঝ্‌তে পারচি নে। একবার সমস্ত জিনিষটা একসঙ্গে ধরে দেখ্‌তে পারলে তবে ওর পরিমাণ-সামঞ্জস্য বিচার করা যায়— সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।

আজ এখানে শৈলেশের আসবার কথা আছে। বিনোদিনী সম্বন্ধে একটা সুবিধা এই যে অন্ততঃ মাস তিনেকের মত লেখা সংশোধন করে ঠিক করে লিখে রেখেছি— সুতরাং কতকটা রয়ে বসে ওটা সমাধা করতে পারব। কিন্তু তবু খণ্ড খণ্ড করে এ রকম গল্প বেরলে জিনিষটা অসমান হয়ে পড়ে। সব জায়গা ত সমান সরস ও কৌতুকাবহ হতেই পারে না — সুতরাং মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে হতাশ হতোদ্যম হতে হবেই। এ রকম বই সবটা একসঙ্গে না পড়লে এর উত্তরোত্তর বিকাশ এবং ঘনায়মান পরিণাম পাঠকের মনে দৃঢ় করে বসে না। এ গল্পে ঘটনাবাহুল্য একেবারেই নেই, সেই জন্যে এটা ক্রমশঃ প্রকাশের যোগ্য নয়— কিন্তু মাসিক পত্রিকার করাল কবল থেকে এ'কে যে বাঁচাতে পারব এমন আশা করিনে! সেকালের দৈত্যকে যেমন পালা-ক্রমে এক একটি নর-খাদ্য দিতে হত— এ কালে মাসিক পত্রকেও সেই রকম এক একটি সাধের রচনা পর্য্যায়-ক্রমে দিয়ে শোক করতে হয়। ভারতীর জন্যে আজকালের মধ্যেই একটা লেখা সুরু করতে হবে— আজ খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন এসেছে। গুড় পেয়েছ ?

তোমার র

১৪৯

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই

এই মাত্র সত্যর কাছ থেকে পত্র পেলুম। সে লিখ্‌চে এখন বাবামশায়ের কাছে দরবার করার অনেক বিঘ্ন— বৈশাখের আরম্ভে বিঘ্ন দূর হলে কথাটা উত্থাপন করা তার মত— আমিও তাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করলুম। অতএব আপাততঃ ন যযৌ ন তস্থৌ থাকা যাক্‌। আমি স্বভাবতঃ তোমার চেয়ে কিছুমাত্র কম অধীর নই— কিন্তু আজকাল অনিবার্য্য বাধা বা অকৃতার্থতার কাছে ধৈর্য্যাবলম্বন করে থাকতে চেষ্টা করি— কখন কখন কতক কতক সফল হয়ে থাকি— অকারণ দাহ সৃষ্টি করে জীবনের তেল অনাবশ্যক পুড়িয়ে ফেল্‌তে আর প্রবৃত্তি হয় না— তেল অনেকটা নেবে এসেছে, পল্‌তেও অনেকটা পুড়ে এসেছে— এখন তেলের সঙ্গে অনেকটা পরিমাণে জল মিশিয়ে ঠাণ্ডা না রাখলে আর বাঁচাও নেই।

আজ শৈলেশ আসবার কথা আছে— তাকে সবিনয়ে বঙ্গদর্শন থেকে বিরত করবার ['জন্যে'] ডেকে পাঠিয়েছি— হতভাগ্য দেশে প্লেগ বাড়চে এর উপর কাগজ বাড়তে দেওয়া গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং। এখন দুর্ভিক্ষ এবং মারীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার কাল— এখন কে বসে বসে মাথামুণ্ডু রচনা করবে— আর কেই বা বসে বসে মাথামুণ্ড পড়বে?

তোমার আসবার আশা ছেড়ে বসে আছি। বসন্তশুক্ল-রজনী উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্চে। ইতি কঁয়ই চৈত্র?

তোমার রবি

১৫০

[† ৩ এপ্রিল ১৯০১]

ওঁ

ভাই

ভারতীও তাড়া লাগিয়েছে— সুতরাং আমাকে দুটো কলে একসঙ্গে দম লাগাতে হয়েছে। ভারতীর জন্যেও একটা লিখ্‌চি —বিনোদিনীকেও অবহেলা করতে পারচি নে। আজ কাল বেশ একটু গরম পড়ে এসেছে বলে আমার মগজের এঞ্জিনটা বেশ সহজে চল্‌চে, সেই জন্যে এখন আমি ভাবি নে। কিন্তু যা বসন্তের সময় আরম্ভ করা গেল তা শীতের সময় পর্য্যন্ত যদি চলে তাহলেই মুস্কিলে পড়তে হয়— বর্ষার স্রোতে দুটো নৌকো ভাসানো গেল প্রবাহের বেগে আপনি ছুটে যাবে আমাকে লগি ঠেলতে হবে না— কিন্তু ঘাটে পৌঁছবার পূর্ব্বেই যদি জল শুকিয়ে যায় তাহলেই ঠেলাঠেলি করতে করতে ছাতি ফাটে। চিরকুমার গরমের সময় আরম্ভ করেছিলুম ভেবেছিলুম এই ভাবেই তোড়ের মুখে লিখে যাব— কিন্তু ক্রমে যখন হেমন্তের হিম এবং শীতের কুয়াশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ধরল তখন কল্পনার ডানা প্রতিদিনই জড়িয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল— তখন নিজের উপর এবং লেখার উপর নিতান্তই জুলুম চালাতে হল। ফি বারেই অনিচ্ছা এবং জড়ত্বের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে করতে লেখা সারতে হল। আমার কল্পনা গ্রীষ্ম ঋতুতে ফোটে, বর্ষা এবং শরৎ পর্য্যন্ত থাকে তার পর ঝরতে থাকে। সেই জন্যে সম্বৎসর নিয়মিত যোগান্

দেবার কোন ভার গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসঙ্গত— সেই জন্যেই সম্পাদক হওয়াটা আমার লাইনে নয়— কারণ পঞ্জিকার মাস আমার কল্পনাবিকাশের জন্যে অপেক্ষা করে না এবং ষ্টুপিড্ মাসিক পত্র পঞ্জিকার মাস অনুসারেই চল্‌তে চায় সম্পাদকের সুযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কাকে ঠিক করলে এখনো খবর পাইনি। তার আসবার কথা ছিল— আসেনি, এবং কেন আসেনি তারও কোন কৈফিয়ৎ দেয় নি। তুমি, নগেন্দ্র গুপ্ত, এবং চন্দ্রশেখর মুখুয্যের মধ্যে তারা দোদুল্যমান। তোমার নিত্য অব্যবস্থিত ব্যস্ততার জন্যে তারা শঙ্কিত— নগেন্দ্র গুপ্তকে শৈলেশ ভয় করে এবং চন্দ্রশেখরের উপরেও বড় ভরসা নেই— অতএব আপাততঃ বঙ্গদর্শনের রাজসিংহাসন শূন্য আছে বলেই বোধ হচ্চে-- তুমি টপ্ করে চড়ে' বস না।

তোমার কবিতাটি বেশ লাগ্‌ল— কিন্তু গোড়ার দুই stanzaর মিলগুলো চলনসই হয় নি বলে বিশেষ আপত্তি। সংশোধন করা কাজটা নিরতিশয় দুরূহ— তবু আমি মিলগুলোকে উদ্ধার করবার জন্যে একটু আধ্‌টু উলট পালট্ করেছি— এর উপরে তুমিও একবার হাত বুললেই হয়ে যাবে। এই ছোট কবিতার মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের যে সঙ্গীতটুকু আছে আশা করি সেটা নষ্ট করি নি। যাই হোক্, প্রদীপে কেন দেবেনা ? আচ্ছা, আমিও তাকে একটা কবিতা দেবার চেষ্টা করব।

তোমার রবি

১৫১

[১৯০১]

ওঁ

ভাই

বিনোদিনীকে লইয়াই ত পড়িয়াছি। তাহার একটা সদ্গতি না করিতে পারিলে আমার ত নিষ্কৃতি নাই। এই অপরিণত অবস্থায় ঐ গল্পটাকে কোন কাগজে দিতে আমার একেবারে ইচ্ছা নয়। গ্রন্থ আকারে সম্পূর্ণভাবে বাহির হইলেই আমার মনঃপূত হয়। কিন্তু একদিকে শৈলেশের তাড়না অপর দিকে অর্থাভাবেরও তাড়া আছে— তাই অপেক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা সাতেক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছি— বিনোদিনী সবে রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিতেছে মাত্র। এটা যদি শৈলেশকে দিতে হয় তবে সেই সঙ্গে আরেকটা গল্প ভারতীকে দিতেই হইবে— সে আমার একটা উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। গল্পের প্লট অনেকগুলাই মাথায় আছে। তাহার মধ্যে দুই একটা ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে মাথার খুলির মধ্যে ঠোকর মারিতেছে— কিন্তু সময় নাই— মনের শান্তি নাই। লোকেনের চিঠি পাই নাই— সে যে কলিকাতার মায়া কাটাইয়া এখানে আসিবে এমন আশা হয় না— তবে যদি দু দিনের মত উঁকি দিয়া যাইতে পারে। তোমার গুড় সংগ্রহ হইয়াছে। এখানকার নায়েব বোধহয় কাল কলিকাতায় যাইবে— তাহার হাত দিয়াই পাঠাইয়া দিব।

আজকাল তোমাদের সংবাদটা ঘনঘনই প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

তোমার রঃ

১৫২

[১৯০১]

ওঁ

ভাই

শৈলেশ এসেছে। অতএব চিঠিপত্র লেখা কঠিন।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি হব এমন আশঙ্কামাত্র নেই। তবে—

বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
কাঁচা আমগুলো রহে গো পাড়িতে—

শৈলেশ সেই রকম তাগিদের চোটে মাঝে মাঝে আমার কাঁচা লেখাগুলো পেড়ে নিতে ছাড়বে না বলেই বোধ হচ্চে।

ভারতীতে সেই নষ্টনীড়টাকে একটুখানি বাড়িয়ে পাঠান যাচ্চে। কবিতার জন্যে শৈলেশ ধরে পড়েছে— থলি ঝেড়ে ঝুড়ে কিছু দিতেই হবে।

বৈশাখের আরম্ভে কলিকাতায় হাজির হতে চেষ্টা করব। দেখি অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু সেই সময়টা আমার লেখার হিসাবে অত্যন্ত নষ্ট হবে।

স্নানাদির সময় অতীত হয়ে গেছে। আমার স্নানের বিলম্বে জানিনে কোন্ অতিপ্রাকৃত নিয়ম অনুসারে আমার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। অতএব আজ আর বিলম্ব করতে সাহস হচ্চে না।

বিনোদিনীকে তুমি প্রশংসার দ্বারা অধিক প্রশ্রয় দিয়ো না —যদি বিগ্‌ড়ে যায়?

তোমার রবি

১৫৩

[এপ্রিল ১৯০১]

ওঁ

ভাই

তোমারি জিত। কলকাতায় চল্লুম। ৩১শে চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণে পৌঁছব। রবিবার প্রাতে নববর্ষের উপাসনা— যোড়াসাঁকোয় তোমার সঙ্গে সেদিন সকালে দেখা হবে ত ?

তোমার

১৫৪

[এপ্রিল ?, ১৯০১]

ওঁ

ভাই

মনে করেছিলুম সেই ছ হাজার টাকার জন্যে তোমাকে আর বিরক্ত করতে হবে না— কিন্তু আবার দরকার হয়েছে। তুমি চন্দ্র ব্রাদার্সের কাছ থেকে টাকাটার বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে ? আমি সোমবারে সকালের গাড়িতে শিলাইদহে রওনা হতে চাই তুমি রবিবারের মধ্যেই টাকাটা দিলে আমার সুবিধা হয়।

কাল অনেক রাত্রে সেই নিমন্ত্রণ সভা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি

তোমার রবি

১৫৫

[শিলাইদহ + ১ মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

বল কি? ক্রমাগত পিছিয়ে পিছিয়ে এতদিন পরে যদি লোকেনকে টাকা না দিই তাহলে আমি ইহজন্ম আর মাথা তুল্‌তে পারব না। আমার হৃদয় এ কথায় কোনমতেই সায় দিতে চাচ্চে না। সে তার এখানকার সমস্ত বাজারদেনা প্রভৃতি শোধ করে যাবার জন্যেই এ টাকাটা শীঘ্র চেয়েছে— বিলেত রওনা হয়ে গেলে পর টাকা দিয়ে কি করব? সুরেনের সঙ্গে তোমার ত দেখা হয়েছে— কোন রকম পরামর্শ হল কি? টাকাটার জন্যে সমস্ত বিষয় ভারি খিচুড়ি পাকিয়ে আছে— শীঘ্র এর সুব্যবস্থা হলে বাঁচা যায়। কিন্তু যতই তাড়াহুড়ো করা যাক্ না, ১৩ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে বিবাহের আয়োজন করা অসাধ্য হবে বোধ হচ্চে।

তোমার রবি

১৫৬

[মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কাল তোমাকে যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দিয়ো। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ত হওয়া অসম্ভব, অন্য কোন্ তারিখে হতে পারে তুমিই সেটা পাঁজি পুঁথি মিলিয়ে আমাকে ঠিক করে লিখে দাও না। আষাঢ়ে বোধ হয় কোন লগ্ন নেই। শ্রাবণের ১০ই কি বল? শুক্লা দশমী। সে সময়ে টাকাও হাতে আসবে। বিলম্বে আশঙ্কার কারণ আছে যদি মনে কর তাহলে জ্যৈষ্ঠের ২৮শে তারিখ কৃষ্ণানবমী স্থির করতে হয়।

আমার চিঠির উত্তর এইখানেই দিয়ো। দার্জ্জিলিঙে আমার ঠিকানা কি এখনো তা জানিনে। ইচ্ছা ছিল দীর্ঘকাল দার্জ্জিলিঙে কাটাব কিন্তু বেলার এই বিবাহের উদ্যোগে চট্‌পট্ চলে আস্‌তে হবে।

তুমি ফস্ করে দার্জ্জিলিঙে এসে পড় না। স্যানিটেরিয়মে উঠে পড়তে পার। বোধ হয় মহিমের প্রসাদে রাজাশ্রয়ও পেতে পারবে। তাহলে পরিচয়েরও সুবিধা হবে। এ প্রস্তাব যদি সমীচীন বোধ কর তাহলে যেদিন চিঠি পাবে সেই দিনই ছাড়লে একত্রে দার্জ্জিলিং যাওয়া যেতে পারবে। নচেৎ তার পরদিন ছেড়ো। কারণ আমি হয়ত দিন চারেক থাক্‌ব। কিন্তু

বিবাহের দিন যখন নিশ্চয়ই পিছবে তখন তাড়াতাড়ি ফেরবার কি দরকার আছে? ৬ মাসের রিটার্ণ টিকিট্‌ই নিই তার পরে যা থাকে অদৃষ্টে।

বাঁকা করে ধরার দরুন চিঠিখানা বেঁকে গেল নইলে [স্বভ]াবত আমার বাঁকা চাল নয় সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

তোমার রবি

১৫৭

[দার্জিলিং * ৯ মে ১৯০১]

ওঁ

দার্জ্জিলিঙে। খবরাদি পেতে নিতান্ত উৎসুক। ঠিকানা :—C/o H. H. The Maharaja of Tippera। অবিলম্বে চিন্তা দূর করবে।

শ্রী

১৫৮

[† ১৮ মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

এইমাত্র দার্জ্জিলিং থেকে কুষ্টিয়ায় ফিরে এলুম। হয়ত শিলাইদহে গিয়েই তোমার চিঠিতে সমস্ত অবগত হব। যদি চিঠি না গিয়ে থাকে ত আর বিলম্ব কোরো না। কারণ, ২৮শে যদি দিন স্থির হয়, তবে এখনি আমাদের রওনা হতে হবে— নইলে কিছুই গুছিয়ে উঠ্‌তে পারব না। সুরেনকে লিখে দিয়েছি সেই যৌতুকের টাকাটা কিভাবে কখন্ কার হাতে দিলে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ হবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ও স্থির করে আমাকে জানাতে— তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি ?

এর মধ্যে বঙ্গদর্শনের দরখাস্তও পেশ করি। লেখা না পেলে মারা যাব— কারণ, আমি বিচিত্র টানাটানিতে লেখবার সময় করে উঠ্‌তে পারচিনে।

তোমার রবি

অন্যান্য কাজ ও অকাজের কথা সাক্ষাতে নিবেদন করব। তোমার সঙ্গে আমার একটা প্রকাণ্ড বড় ঝগড়া আছে।

১৫৯

[† ২০ মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

ভেবেছিলুম আজ তোমার কাছ থেকে হ্যাণ্ড্‌নোট রচনার একটা নমুনা পাওয়া যাবে। কই?

আমার পক্ষে কলকাতায় যাওয়া ভারি অসুবিধা। কারণ ঝড়ঝঞ্ঝার সময় পরিজনবর্গকে পদ্মার হাতে সমর্পণ করে কোন মতে যাওয়া যায় না। আর কোন বয়স্ক অভিভাবকও এখানে নেই। নগেন্দ্র বরিশালে। অতএব দূরে থেকেই যাতে দেনা পাওনা হতে পারে এমন ব্যবস্থা করে দিয়ো। ব্যস্ত।

তোমার শ্রী

১৬০

[১৯০১ ?]

ওঁ

ভাই

সেই ৬০০০ টাকা শুধিয়া ফেলিতে চাই— যদি হ্যাণ্ড্‌নোট সুদ্ধ একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইতে পার তবে সুবিধা হয় অথবা আর কি করা কর্ত্তব্য লিখিবে। শরীর ভাল নাই। নীতুর অসুখ সেই জন্য উদ্বিগ্ন আছি।

তোমার—

[২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২]

ওঁ

ভ্রাতঃ

…কলকাতায় গিয়ে আমি দুই একটা কাজে যোগ দিই সত্য এবং গতবারে লোকেনের নববধূকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম সেও ঠিক কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ আর বন্ধুত্বচর্চ্চার অবসর পাইনে। আমি যে কাজ মাথায় নিয়েছি সেই কাজই আমার সমস্ত মন অধিকার করেছে।… আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ যশ অপযশকে আমি আর লালন করতে চাইনে— আমি বহুল পরিমাণে নির্জ্জন অবকাশ এবং মঙ্গলকর্ম্মের বৃহৎ ক্ষেত্র চাই— এখন প্রধানত এই কর্ম্মসূত্রেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে আমার যোগ— এখন আমার নিজের জন্যে কাউকে আমি বিশেষ করে চাইনে। আমার মঙ্গলব্রতে যাঁরা আমাকে প্রবৃত্ত করেচেন ও সাহায্য করেচেন তাঁরাই সব চেয়ে আমার কাছে আছেন। আর সবাই যেন দূরে গিয়ে perspectiveএ ঝাপসা হয়ে এসেছেন। লোকেন প্রভৃতিরাও এই আমার দূরত্ব অনুভব করেচেন। উপায় নেই। এখন আমি নিজের হৃদয়ের বিলাসবিহারের চর্চ্চায় মন দিতে পারিনে— আমি নিজের কাছ থেকে প্রত্যহ দূরে যাচ্ছি— বন্ধুরাও আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না।…

তোমার—

১৩২

[† ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯ ২]

ওঁ

ভ্রাতঃ

আমাকে তুমি আদর্শ চরিত্র কল্পনা করিয়াছিলে— এরূপ অসঙ্গত কল্পনা আঘাত পাইতে বাধ্য। আমি বিনয়ের আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু আমার চরিত্রে নানা ছিদ্র আছে তাহা কোন কালে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। উন্নত আদর্শের প্রতি হৃদয়ের যতটা আকর্ষণ আছে ততটা বল নাই এ কথা আমাকে যে জানে সেই বুঝিতে পারে। ঈশ্বরের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এইটুকু-মাত্র বলিতে পারি— কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝিতে ও অন্যকে ভুল বুঝাইতে চাই না। এখন আমি নিজেকে নিভৃতে রাখিতে ইচ্ছা করি। যদি যথাস্থানে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বল লাভ করিতে পারি তবে সংসার কোলাহলের মাঝখানে নিজের চরিত্রের দ্বারা এবং ঈশ্বরের আদর্শ-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া শান্তি প্রীতি ও মঙ্গলের মধ্যে সহজে বাস করিতে পারিব। এখন আমি আত্মরক্ষা এবং আত্মস্থিতি সাধনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন আমি যত্ন করিয়া সাংসারিক সমস্ত ক্ষোভ মনের চতুঃসীমা হইতে দূর করিতে বসিয়াছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আমার যেটুকু বিচ্ছেদ তাহা বিরোধাত্মক বিচ্ছেদ নহে। মনুষ্যচরিত্রে ইকনমির আবশ্যকতা আছে— সময়বিশেষে

নিজেকে যথাসম্ভব নানা দিক হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া এক দিকে সংহৃত করিতে হয়— লেখাপড়া শিল্পচর্চ্চায়ও এই নিয়ম পালন না করিলে চলে না— জীবনের গভীরতর সাধনাতেও এই নিয়মের প্রয়োজন আছে। যাহা কিছু আমার এখনকার প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল আমি কেবল তাহাই চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করি— আর সকলকে ইহাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতেই হইবে। তুমি আমাকে বড় মনে করিয়ো না— মহৎ মনে করিয়ো না— আমাকে যাহা বলিয়া মনে হইতেছে যদি বা ঠিক তাহা নাই হই তবু আমি সেই রকমেরই একটা কিছু। ভুলও করি, অবিচারও করি, অভিমানও করি— আবার হৃদয়কে মার্জ্জনা করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভেরও চেষ্টা করিয়া থাকি।

তোমার

১৬৩

৩ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

ভ্রাতঃ

… ‥র পত্রের কাপি পাঠাই :—

"I beg to remind you that you agreed to pay up my money within a year but the year is past and I am sorry to say, you have done nothing towards liquidation so I request you to pay off within the 15th of the current month".

টাকাটা শোধ করিয়া দেওয়া বোধহয় কঠিন হইবে না। কিন্তু এরূপ স্বল্প মেয়াদ দেওয়াতে আমাদিগকে হঠাৎ বিপদে ফেলিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়। এইজন্যই পাঁচ বৎসরের মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা ছিল। যাহা হউক্ এই আকস্মিক বিপৎপাত হইতে বোধ হয় উদ্ধার হইতে পারিব। সুরেনকে … … …র পত্র পাঠাইয়া চিঠি লিখিয়া দিলাম। ইতি ২০শে চৈত্র ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬৪

[† ৬ এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

ভাই

পর্শু তোমাকে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতে হইয়াছিল। তাহার একটা কারণ, বিদ্যালয়ে আমাকে ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে হয়— বাকি সময়টায় আগামী নববর্ষের জন্য একটা লেখা লিখিতে হইতেছে— সে লেখা আজকালের মধ্যে শেষ করা চাইই। দ্বিতীয় এই বিষয়টা লইয়া অধিক আলোচনা করিয়া পাছে আমার উপস্থিত কর্ম্মে আমি অক্ষম হই— পাছে দিনের কর্ত্তব্যের ভিতরে চিত্তচাঞ্চল্য আমাকে পরিত্যাগ না করে এই আশঙ্কায় আমি তোমাকে এবং সুরেনকে অতি সংক্ষেপেই এই খবরটা দিয়াছি। দুশ্চিন্তা আমাকে পরাভূত না করে এই আমার একান্ত চেষ্টা ছিল।

তুমি যদি অন্যত্র হইতে সহজে ৪০ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পার তাহা হইলে মুক্তি পাই। আজ সুরেনের পত্রে আর এক জায়গা হইতে টাকা পাইবার আশ্বাস পাইয়াছি— কিন্তু যিনি দিতে রাজি হইয়াছেন তাঁহার হাতে পুরা টাকা না থাকাতে তাঁহাকে কাগজ ভাঙান প্রভৃতির হাঙ্গামে যাইতে হইবে— এবং তাহা হইলে অনেক টাকা লোকসান দিতে হইবে বলিয়া যদি অন্যত্র সহজে পাওয়া যায় ত ভাল হয় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমি সুরেনকে তোমার সহিত দেখা করিতে চিঠি লিখিয়া দিব।

বর্ষশেষের দিন যদি শান্তিনিকেতনে আসিয়া বর্ষারম্ভের দিন এখানে যাপন করিতে পার তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন নববর্ষের উৎসব হইবে। যদি বিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল থাকে তবে তাহা মিটাইবার এই উপযুক্ত সময়— তোমার সঙ্গে আলোচনা করিবারও এই অবকাশ।

তোমার রবি

১৬৫

[৬ এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

ভাই

আমি সুরেনকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে লিখে দিয়েছি। বর্ত্তমানে কি করা কর্ত্তব্য সুরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক কোরো। কিছুদিন থেকে আমার শরীর বড় খারাপ যাচ্চে নইলে আমি কলকাতায় যেতুম। অসুস্থ দেহে কাল রাত্রে ভাল ঘুমতে পারিনি— আজ মাথাটা ঘুলিয়ে আছে— আজ রবিবার সুতরাং সকালেই একটু ঘুমিয়ে নিতে পারব— আজ স্কুলের ছুটি আছে। ইতি রবিবার

তোমার রবি

১৬৬

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

ভাই

শৈলেশ কিম্বা তাদের কেউ নববর্ষ উপলক্ষ্যে নিশ্চয় এখানে আস্‌বে— তুমি তাদের আশ্রয় করে অনায়াসে যাত্রা করতে পার। শৈলেশকে আমিও লিখে দেব। কলকাতায় গাড়িতে কোন গতিকে যদি চড়ে বস, যদি লুপ মেলের গাড়িতেই চড়তে পার তাহলে বোলপুরে সন্ধ্যা ৭৷৷৹টার সময় না এসে পৌঁছে তোমার গতি নেই। বোলপুরে নাবলেই হয় আমাকে নয় আমার দূতবৃন্দকে দেখতে পাবেই। অতএব চিন্তা কোরো না। যদি প্রাণপণ চেষ্টায় প্রমথবাবুকে ধরে আন্‌তে পার তাহলে বেশ হয়। কিন্তু তাঁকে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করতে হবে তাতে কুণ্ঠিত হলে চল্‌বেনা।

সুরেনের সঙ্গে কি তোমার ইতিমধ্যে দেখা হয় নি?

তোমার রবি

১৬৭

২১ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

ভাই

আমার শরীর অসুস্থ ছিল— তা ছাড়া বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ছুটিতে অনুপস্থিত— তাঁদের কাজ আমি চালাচ্চি বলে সময় পাইনে— তাছাড়া বিষয়কর্ম্মের কথা স্মরণ হলেই মনটা কর্ম্মের অযোগ্য হয়ে পড়ে বলে আমি সুরেনের উপর ভার দিয়ে চুপ করে ব'সে আছি। তুমি যে নিয়মে যে যে প্রস্তাব করেচ তা ত আমার কাছে বেশ ভালই লাগ্‌ল— এতে কোন আপত্তিই হতে পারে না। উকিলখরচাটা সম্বন্ধে একটু টানাটানি কোরো। অন্যত্র যেখান থেকে আমাদের টাকা পাবার কথা হচ্চে সেখানে কোম্পানি কাগজ ভাঙাবার discountএ প্রায় হাজার টাকা দিতে হচ্চে আর কিছু লাগ্‌চে না। তুমি সুরেনের সঙ্গে কথা কোয়ো কিম্বা চিঠি লিখো।

এত বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট ও বিঘ্নের মধ্যেও ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বদাই শান্তি প্রেরণ করচেন— অবসাদে আমাকে অভিভূত করে ফেলে নি— সকলপ্রকার সম্ভবপর দুঃখ দৈন্য বিপদ নৈরাশ্যের জন্যে আমাকে অনেকটা সবল ও শান্তভাবে প্রস্তুত করে রাখ্‌চেন এজন্যে আমি আমার বর্ত্তমান সময়কে দুঃসময় বলে জ্ঞান করিনে।

আমার নববর্ষের প্রীতি অভিবাদন গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমার এই নূতন বর্ষকে কল্যাণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে সফল করুন।

এ অঞ্চলে কবে আস্‌তে পারবে? লেখাপড়া সম্পন্ন করবার জন্যে আমার যাওয়া কি নিতান্ত দরকার হবে? আমার এখানে কোন কোন ভদ্রলোক কাজ করবার জন্যে আসবেন, তাঁরা আমার বিদ্যালয়কে তাঁদের এক মাসের সময় দান করবেন—তাঁদের উপস্থিতকালে আমি অবর্ত্তমান থাকলে আতিথ্য ও শিষ্টতার ব্যাঘাত ঘটে। সুরেনকে আমার পূরো আমমোক্তার-নামা দেওয়া আছে— সে ইচ্ছা করলে আমার বাড়ি বিক্রি এবং দান করতেও পারে। ইতি ৮ই বৈঃ ১৩০৯

তোমার

১৬৮

২৭ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

ভাই

তোমার এবং সুরেনের কারো কোন পত্র পাই নি। ক' দিন ধরে আমার শরীরও অসুস্থ যাচ্চে— মাথা ঘোরার একটা উপসর্গ জুটে সকল কাজেই ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এখানে থেকে থেকে খুব ঝড় দেখা দিচ্চে— আজ বিপরীত গুমট করে রয়েছে — লাফ দেবার পূর্ব্বে ব্যাঘ্রী যেরকম গুটি মেরে থাকে প্রকৃতিকে ঠিক সেইরকম দেখাচ্চে। আজ একটা রীতিমত ঝড় হবে বলে আশঙ্কা করচি। আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে দুই একটি অতিথি আস্‌বেন— যদি ঝড়ের মধ্যে পড়েন সেই ভয় করচি। তুমি কবে আস্‌চ?

পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে ধূলো উড়চে দেখ্‌তে পাচ্চি— ঝড়ের নৃত্য বোধ হয় নেপথ্যেই সুরু হয়েছে— এখনি তার ধূসর আঁচল উড়িয়ে সম্মুখে উপস্থিত হবে। এখানে মেঘ ঝড় বৃষ্টির কোন আব্রু নেই— উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে তার আনাগোনা সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিশে ডাকাত যেমন আগে থাক্‌তে খবর দিয়ে ডাকাতী করতে আস্‌ত এখানকার ঝড়ও সেইরকম আস্‌বার অনেক পূর্ব্বে দিগন্তে তার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। ইতি ১৪ই বৈঃ ১৩০৯

তোমার রবি

১৬৯

[† ৩০ মে ১৯০২]

ওঁ

ভাই

আমি যে তিন চার দিন কলকাতায় ছিলুম এক মুহূর্ত্ত অবসর পাই নি। সেই মোতিচাঁদের টাকার বন্দোবস্ত করতে আমাকে ক্রমাগতই যোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জে আনাগোনা করতে হয়েছে। তোমার ওখানে যাব বলে নিশ্চয় স্থির করেছিলুম কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। শরীরটা অত্যন্ত ভেঙে পড়াতে কিছুদিন বিশ্রাম করবার জন্যে শিলাইদহে এসেছি কিন্তু এখানে এসেও শরীরটা শুধ্‌রে ওঠ্‌বার লক্ষণ দেখ্‌চি নে। তার উপরে এখানকার জমিদারী কাজেও জড়িয়ে পড়েছি।

যাই হোক্ সেই টাকাটার একটা গতি করতে পেরে আপাততঃ একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। দেখা যাক্ সঙ্কট আবার কখন্ আর কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে বঙ্গদর্শন এক মুহূর্ত্ত স্কন্ধ ছাড়ে নি। এই অল্প দিন হল চোখের বালি সমস্তটা শেষ করে শৈলেশের হাতে দিয়েছি। কিন্তু রক্তবীজকে বধ করাই সম্পাদকের কাজ— একটা চুকিয়ে আর একটাকে আক্রমণ করতে হয়— ফের আর একটা গল্প লিখ্‌তে হবে। যাই হোক্ আপাতত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চোখের বালিই আসর অধিকার করে থাক্‌বে।

এখানে প্রত্যহই বৃষ্টি চলচে। এই বৃষ্টিধৌত শ্যামলতার মধ্যে দুপুরবেলাকার রৌদ্রকিরণটি বেশ মধুর লাগে।

তোমার রবি

১৭০
[১৯০৩]

ওঁ

ভাই—

আমরা যেখান থেকে টাকা ধার নিয়েছি সেখানে আমাদের কোন আশঙ্কা বা তাগিদ্ নেই। নূতন জায়গায় নূতন বন্দোবস্ত করবার খরচপত্র আপাতত অনাবশ্যক।

রেণুকার অসুখ নিয়ে আমি আজকাল ব্যস্ত হয়ে আছি। দীর্ঘকাল থেকে তার জ্বর কিছুতেই উপশম হচ্চেনা— সঙ্গে কাশিও আছে। বোলপুরে তার কোন উপকার হল না— এখন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ু পরিবর্ত্তনের উপযোগী একটা বাড়ির সন্ধানে আছি। আজকাল পশ্চিমে প্লেগের দৌরাত্ম্য— সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে বাড়ি খুঁজচি— এখনো পাইনি — যাই হোক্ শীঘ্রই কোথাও যেতেই হবে।

এ ছাড়া বিদ্যালয় ত আছেই। তাতেও আমার অনেক সময় ও চিন্তা দিতে হয়— এই সকলেরই মধ্যেই সমাহিত হয়ে আছি। তোমার কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে আনবার বিশেষ লোভ ছিল কিন্তু রেণুকার অসুখ নিয়ে তোমার ওখানে যাবার সুবিধা করে উঠতে পারি নি।

রথী পরীক্ষা দিতে কলকাতায় গেছে। রেণুকাকে কোথাও নিয়ে যাবার উপলক্ষ্যে আমাকেও বোধ হয় এর মধ্যে যেতে হবে। তখন দেখা হবে। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭১

[১৯০৩]

ওঁ

ভাই

তোমার প্রস্তাব সুরেনের কাছে লিখে পাঠালুম। বোধহয় কুষ্টিয়ার কারখানা বন্ধক রাখবার আর কোনও আপত্তি নেই কেবল পাছে বাজারে discredit হয় এই ভয়। যদি জানাজানি না হয়ে গোপনে কাজটা হয়ে যায় তাহলে কোন আশঙ্কা বা আপত্তি নেই।

Pharmaco-Dynamics বইখানা রাধারমণ বাবুর হাত দিয়ে শৈলেশকে পাঠাব— শৈলেশ তোমাকে দেবেন— রাধারমণ বাবু বোধ হয় কালই কলকাতায় যাচ্চেন। বইখানা তুমি ফেরৎ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি কোরো না— আপাতত এটা আমার কোনো দরকারে লাগ্‌বেনা— এবং ভবিষ্যতে একটা Enlarged নতুন Edition কিনে নেওয়া যাবে। তাও বোধ হয় অনাবশ্যক হবে— কারণ আমার কাছে Materia Medica দুতিনখানা আছে— তাতেই আমার রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ের কাজ চল্‌চে। অতএব এটা তোমার ছেলেকে খুব কসে দাগ দিয়ে note করে পড়ে হজম করে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে দিয়ো।

হাজারিবাগে যাবার পূর্ব্বে খবর পাবে।

সুরেনকে একখানা চিঠি লিখে ধার নেওয়া ব্যাপার সম্বন্ধে একটা interview ঘটিয়ো। আজকাল তার উপরেই ভার নিক্ষেপ করে আমি যথাসাধ্য অবসর পাবার চেষ্টা করচি।

কৃতকার্য্য হতে পারচিনে তবু চেষ্টা ছাড়চিনে। সে যেরকম বলে তাতেই আমার মত জান্‌বে।

রবি

১৭২

[১৯০৩]

ওঁ

ভাই

সুরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কি রকম স্থির হল আমাকে জানাবে।

ইতিমধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আমার বিদ্যালয়ে হাজার টাকা দান করিয়াছেন— ইহাতে আমার কি উপকার হইয়াছে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এই একটি মাত্র ঘটনায় ঈশ্বরকে আমি আরো যেন নিকটে পাইয়াছি। বুঝিয়াছি তাঁহার কার্য্য আপন গৌরবেই সফলতা আকর্ষণ করিয়া আনে— আমরা নিতান্ত সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র। ঈশ্বর আমার হৃদয় জানিতেছেন আমি আর অধিক কি বলিব? যিনি দান করিয়াছেন তিনি বারম্বার তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন— তাই তাঁর নাম আমার হৃদয়েই অঙ্কিত হইয়া রহিল।

বোধ হয় বৃহস্পতিবারে হাজারিবাগ যাইব। রেণুকা ভালই ছিল— আজ আবার হঠাৎ তাহার জ্বর বাড়িয়াছে।

তোমার

[† ৩০ মে ১৯০৩]

ওঁ

Thomson House
Almora

ভাই

সংসারের তরণীটি নানাপ্রকার তুফানের উপর ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি— কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানি নে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে কেউ আর একদিকে, আমার বিদ্যালয় একদিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছে। সেদিন প্ল্যাঞ্চেটে হাত দেবামাত্র লেখা বেরল, "বাবামশায়ের অসুখ।" জিজ্ঞাসা করলুম আলমোড়া থেকে আমাকে কোথায় গিয়ে স্থিতি করতে হবে— বল্লে কলকাতায়। বোলপুরে গিয়ে থাক্‌তে পারব না শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি চিঠিতে যে কথা লিখেছ তাতে বোঝা যাচ্চে কলকাতায় গিয়ে থাকবার কারণ কি হতে পারে। উপরি উপ্‌রি আমার এই রকম ঘাত প্রতিঘাত কতদিন আর চলবে আমাকে বল্‌তে পার? আমার কোষ্ঠীতে কি বলে? বিঘ্নবিপত্তি যদি এতই উত্তাল হয়ে উঠ্‌বে তাহলে ভাগ্য এতগুলো কাজ এই সময়ে আমার ঘাড়ে চাপালে কেন? বোধ হয় ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজেকে স্থির রাখবার জন্যেই এই সমস্ত অবলম্বন। এই শিকলগুলো না থাক্‌লে নৌকাডুবি হতে পারত।

রেণুকার শরীর এখানে কি রকম থাক্‌বে এখনো বলা যায় না। ব্যামো কখনো বাড়ে কখনো কমে— কমবার সময় আশা জন্মে বাড়বার সময় আশঙ্কা। স্থানের গুণ এখনো সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। প্রতীক্ষা করে রয়েছি।

তোমার "চোখের বালি" ছাপা সম্বন্ধে যে দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়েছে শৈলেশকে আমি সেজন্যে নিরপরাধ গণ্য করতে পারিনে। প্রত্যেক ফর্ম্মাটি ছাপা হলে তার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক্ ছাপাখানাই এজন্য দণ্ডনীয়। শৈলেশ যে তাদের তাগিদ করে এখনো কেন ছাপিয়ে নিচ্চে না বুঝতে পারচিনে। ... কাজের লোক নয় এটা বেশ বুঝেছি।

আমার ঝড় তুফানের মধ্যে তোমার বইখানি মারা গেছে। যখন রেণুকা ও দলবল নিয়ে হাজারিবাগের পথে চলেছিলুম তখনই বোধ হচ্চে মধুপুর ষ্টেশনের ভোজনাগারে বা স্নানাগারে কিম্বা আর কোথাও সেখানি হারিয়েছে। পথক্লেশ নিবারণের জন্য সেই একখানি মাত্র বই আমার সম্বল ছিল। বালক-বালিকা দাসদাসী সিন্ধুক বাক্স পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি নিয়ে নানা পথ দিয়ে বিচিত্র যানবাহনযোগে যাওয়ার যে কি দুঃখ এবার তা পেট ভরে বুঝে নিয়েছি। সাম্‌নে অন্তত আর একবার সেই বিপত্তি আছে বলে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। তাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি "কোথা এই যাত্রা হবে শেষ?" ইতি শনিবার

রবি

[৩০ মে ১৯০৩ শনিবার]

১৭৪

[বোলপুর † ১৬ অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

ভাই

আমি এখনো বিশেষ বল লাভ কর্ত্তে পারি নি— অথচ কাজ এসে পড়েছে। বিদ্যালয় খুলেছে। অনেকদিন অনুপস্থিত ছিলাম তাই সমস্ত ব্যবস্থা করতে আমাকে বিশেষ প্রয়াস পেতে হবে। মাস দেড়েক এখানকার কাজ ভালরূপে দেখেশুনে ঠিক করে দিয়ে মনে করচি কিছু দিনের জন্য পদ্মায় বোটে গিয়ে থাক্‌ব।

আমার কুষ্টিটা একবার শৈলেশের কাছে দিয়ো— আমার প্রয়োজন আছে। সুসময় দুঃসময় জানবার জন্যে কোন কৌতূহল আর রাখি নে— যা ঘটে তা ঘটুক্— ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপনার কাজ করে যেতে চাই।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৭৫

৭ ডিসেম্বর ১৯০৩

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

ভাই

কলিকাতায় পা দিলেই এমনি একটা গোলমালের মধ্যে পড়িতে হয় যে মনে যা থাকে তা কিছুই করিয়া উঠিতে পাই না। শেষ কালে সময় ফুরাইয়া যায়। কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের জন্য মনটা উৎসুক আছে— তাই সমস্ত কর্ম্মের জাল কাটিয়া পদ্মায় ভাসিয়া পড়িয়াছি। কিছুকালের মত ডাকঘরের হাত এড়াইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইবার ইচ্ছা আছে। সেইজন্য আজ পত্রযোগে বিদায় লইলাম। ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগ দিতে পিতৃদেব আদেশ করিয়াছেন অতএব সেই সময়টাতে একবার ফিরিব। হয় ত ৫ই কিম্বা ৬ই প্রাতে কলিকাতায় যাইতে হইবে। সেই অবকাশে যদি একবার দেখা হয় ত চেষ্টা করিব। তুমি নানারূপে পীড়িত আছ শুনিয়া ক্ষোভ পাইলাম— ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন এই প্রার্থনা করিলাম। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[? এপ্রিল ১৯০৪]

ওঁ

ভাই

সেই ঔষধটায় উপকার হয়েছে— বটব্যালের কাছ থেকে আর একটা বড় শিশিতে সেই ঔষধ তৈরি করে আমাকে পাঠিয়ো। আমি কালই মজঃফরপুরে রওনা হব অতএব সত্বর পেলে ভাল হয়।

Idle days in Patagonia যদি পড়ে থাক আমাকে পাঠিয়ো, আমি ওটা আমার Idle days in Mazaffarpurএর জন্যে সংগ্রহ করে এনেছিলুম— যদি ঐ জাতের আর কোনো বই থাকে প্রবাসের জন্যে আমাকে পাঠাতে পার?

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি আস্‌তে পার
একটা কথা
আছে

১৭৭

[মজঃফরপুর] ২৮ এপ্রিল ১৯০৪

ওঁ

ভাই

এখানে আসিয়া ভাল আছি। তাহার একটা কারণ কুঁড়েমি — আর একটা সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদ। ঔষধগুলার নাম করিতে পারিলাম না পাছে বৃদ্ধ বয়সে জনসমাজে কলঙ্ক রটনা হয়।

বেলা এবং ছেলেরা ভালই আছে। গরম পড়িয়াছে— তা পড়ুক্। আম লিচুর প্রত্যাশায় আছি— এখনো বিলম্ব আছে। যথাসময়ে এখনো বৃষ্টি না হওয়ায় লিচুর সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে, দরিদ্রের মনোরথের মত তাহারা প্রত্যহই ধূলাতেই লীয়ন্তে।

তোমাদের খবর সব ভাল ত? ইতি ১৬ই বৈঃ ১৩১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৮

২৮ জুন ১৯০৪

ওঁ

মজঃফরপুর

ভাই

একবার একটা কাজকর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে পড়িয়া অল্প দিনের মধ্যে বোলপুর হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে

বোলপুর এবং বোলপুর হইতে মজঃফরপুরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। এই ঘুরপাকের মধ্যে তোমাদের খবর দেওয়া হয় নাই। কলিকাতায় গিয়া এমন ভিড় এবং অস্থিরতার মধ্যে থাকিতে হয় যে সত্যই তোমাদের ডাকিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিনা। এখানে আসিয়া একটু স্থির হইয়া শ্রাবণ সংখ্যার নৌকাডুবি কাল লিখিয়া ফেলিতে পারিয়াছি। সমস্ত গোলমালের ভিতরে যেখানেই থাকি ঐ গল্পটার জের টানিয়া বেড়াইতে হয়। কত দিনে নিষ্কৃতি পাইব এখনো নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি খুব সম্ভব আষাঢ়ের শেষাশেষি কলিকাতায় যাইব—সেই সময়ে তোমার কাছ হইতে Literary History of Persia বইখানি আদায় করিয়া লইব।

রথী কেদারনাথ তীর্থ ঘুরিয়া কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমি বোধ হয় জান কেদারনাথ হিমালয়ের একটি দুর্গমতম তীর্থ। সেখানে রথী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত গিয়া সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখন আর সে কোথাও ভ্রমণ করিতে ভয় করিবেনা। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩১১

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৯

* ২৫ জানুয়ারি ১৯১৪

ওঁ

জোড়াসাঁকো

বিষম ব্যস্ত ছিলুম এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাই নি।
আরো চার পাঁচ দিন আছি
যেদিন যখন আসতে পার আমাকে খবর দিয়ো।
ক্লান্ত হয়ে রয়েছি।

১৮০

[১-২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪]

চিত্রা যদি এই মেলে
বোলপুরে এসে থাকে
তাহলে এক কপি পাঠাব
কলকাতার ঠিকানায়
আজ ত আসে নি।
বিলাতের কাগজের জন্য এখান
থেকে সমালোচনা লিখে কোনো লাভ নেই— প্রকাশের
সম্ভাবনা নিতান্তই বিরল

১৮১

[? ১৯১৫]

ওঁ

ভাই

আমার উপর কারো তোমাদের দয়া নেই। সৌভাগ্যের জাঁতায় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে ঘোরাচ্চে সেই জন্যেই আমি বন্ধুকৃত্য করে উঠ্‌তে পারি নে— আমার দিনগুলো নানা ঝঞ্ঝাটে চাপা পড়ে গেছে। তার উপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম ও শান্তির দরকার বেড়ে গিয়েছে— তাই একটুখানি সময় পেলে এবং কোথাও একটু পিঠ ঠেসান দিয়ে বসবার জায়গা পেলেই চুপচাপ করে পড়ে থাকি।

আর কৃপণতার কথা যা বলেছ সেটা সত্য। ওটা ভিতরে আছে। তার একটু কারণও বেড়েছে। অল্প বয়সে নিজের প্রয়োজন ছাড়া আর প্রয়োজনই ছিলনা— এই জন্যে বই কিনেছি আর টাকা ছড়িয়েছি। তার ফলে কিছু হাতে থাকত না আর থাকবার দরকারই ছিল না। এখন আমার উপর দুশো ছেলের ভার পড়েছে, তাদের কথা ভাবে এমন সহায় প্রায় কাউকে পাই নি। পাবার দাবিও সঙ্গত নয়— কারণ আমার যা আছে তাতে চলে যায়— আজ চোদ্দ বছর চলে গেছে— কত বই বেচেছি, কত ধার করেছি, এখনো তা শোধ হয় নি— কিন্তু সেও বেশি কথা নয় কারণ ধার করবার সঙ্গতি আমার আছে। কিন্তু থ্যাকারের দোকানের সংঘাত যতদূর সম্ভব

বাঁচিয়ে চল্‌তে হয় এবং খয়রাতের কথা উঠ্‌লেই রথীর উপর বরাৎ দিই— এক এক সময় ভয় হয় তার রথ বুঝি অসম্ভব রকমে ভারি হয়ে উঠেছে। কারণ তার হিসাব আমি দেখিনে, সুতরাং তার তহবিলের অবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে। তবু তার কাছে দশটা টাকা চাইলে যে পাওয়া যাবে না তা নয় এবং বোঝার উপর শাকের আঁটিও সইবে। কিন্তু নিতান্তই গোলেমালে ভুলে বসেছিলুম। এবার কলকাতায় গেলে স্মরণ করিয়ে দিয়ো বোধ হয় এবারে তোমাকে বিড়ম্বিত হতে হবে না।

গানের কবিত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছ সবই মানি। কেবল একটা কথা ঠিক নয়। মাথায় কবিতা সম্বন্ধে কোনো থিওরিই নেই। গান লিখি, তাতে সুর বসিয়ে গান গাই— ঐটুকুই আমার আশু দরকার— আমার আর কবিত্বের দিন নেই। পূর্ব্বেই বলেছি ফুল চিরদিন ফোটে না— যদি ফুটত ত ফুট্‌তই, তাগিদের কোনো দরকার হত না। এখন যা গান লিখি তা ভাল কি মন্দ সে কথা ভাববার সময়ই নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন, তার কারণ হচ্চে ওগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা— অতএব কারো না কারো অন্তরের কোনো প্রয়োজন ওতে মিট্‌তে পারে— ও গান যার গা[বা]র দরকার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিে[ল]ও ক্ষতি নেই কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে। যিনি গোপনে অপূর্ণ প্রয়াসের পূর্ণতা সাধন করে দেন তাঁরই পাদপীঠের তলায় এগুলি যদি বিছিয়ে দিতে পারি এ

জন্মের মত তাহলেই আমার বকশিস্ মিলে গেল ;— এর বেশি এখন আমার আর শক্তি নেই। এখন মূল্য আদায় করব এমন আয়োজন করব কি দিয়ে, এখন প্রসাদ পাব সেই প্রত্যাশায় বসে আছি। তোমরা সেই আশীর্ব্বাদই আমাকে কোরো— হাটের ব্যাপারী এখন দ্বারের ভিখারী হয়ে যেন দিন কাটাতে পারে।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

সংযোজন

১

ছিন্ন

ওঁ

ভাই

আমাকে এখান থেকে শীঘ্র উঠ্‌তে হবে— আমরা Park Street-এ একটা বাড়িতে যাচ্চি। কাল সেইখানে গিয়েছিলুম। আজ ... ...

শেষাংশ

তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ওঠা অদৃষ্টে নেই দেখ্‌চি। ভারি ঘুরে বেড়াচ্চি। আজও বেরোতে হবে।

শ্রীরবি

২

ছিন্ন

ভাই—

এগারই মাঘের হাঙ্গামে আমি নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে আছি। আমরা এখন আর 49 Park Stটে নেই— ১০ নম্বর Wood Stটে উঠে এসেছি। বহুকাল কোন বন্ধু বান্ধবের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। মেজদাদা চলে গেছেন। বড় দাদা আজকাল চলে বেড়াচ্চেন— এবং আমরা সাধারণতঃ আছি ভাল। … …

… … … দেখা হলে অনেক কথা বলবার আছে কিন্তু এগারই মাঘের মধ্যে বোধ হয় তেমন সময় পাব না। আজ এই পর্য্যন্ত— সন্ধের সময় আবার যোড়াসাঁকোয় গান শেখাতে যেতে হয়। সন্ধে প্রায় আগত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[? ১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

... ... আশুর ওখেনে যেতে হবে। আমি এই কাগজের অন্য half sheet-এ উপাসক সম্প্রদায়ের জন্য সমাজের কর্ম্মচারীকে লিখে দিলুম।

শ্রীরবীন্দ্র

ওঁ

রুক্মিণী—

এই লোকের হাত দিয়ে অক্ষয় কুমার দত্তের উপাসক সম্প্রদায় ২ খণ্ড পাঠাইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

ভাই

তোমার আফিস কোথায় তাহা ত জানি না। অতএব ৫টার সময় এখানে আসিয়া কার্য্য সমাধা করিবেন। ইতি শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[কলিকাতা। ১৮৮৮]

ওঁ

ভাই—

সখিসমিতির হাঙ্গামে আমাকে আগামী সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত বড় ব্যস্ত থাক্‌তে হবে তাই ইতিমধ্যে আর কোন appointment করলুম না— তার পরে একদিন তোমাদের ওখানে যাব—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

ভাই— আজ কাল বিষয়কর্ম্মের ভার নিয়ে দুপুর বেলা আমার আর সময় থাকে না— যদি পার ত অপরাহ্ণে আড়াইটে তিনটের ['সময়'] এস। কিম্বা আজ থাক— আজ বিকেলে আমাকে Park Streetএ যেতে হবে। তুমি কাল ঐ রকম সময়ে যদি আস ত ঠিক হবে। আজ কাল আমার সময়ের ভারি অপ্রতুল হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ছিন্ন

ওঁ

ভাই—

তুমি যে অংশের কথা বলেচ, সেটা ছাপা হয়ে গেছে। তুমি যে ভাবে আপত্তি করচ তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বে ওতে আর হাত দেবার সুবিধে নেই। ওটুকু বদ্‌লে দিতে বেশি হাঙ্গাম করতে হত না— এখন কেবল ছাপা হয়ে গেছে বলে ব্যয়বাহুল্য এবং বিলম্ব হবার ভয়ে ক্ষান্ত থাকৃতে হল।

৮

ওঁ

ভাই

আমাকে বোধ হচ্চে কালই যেতে হবে। ইতিমধ্যে তুমি একবার হাটখোলার ··· ··· দের সেই সম্বন্ধে কোন রকমে approach করতে পার? তারা বোধ হয় অনেকটা বিশ্বস্ত চিত্তে এবং গোপনে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সুরেনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে হবে— তার ঠিকানা

1 Rainey Park
Ballygunj Circ. Rd

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কলিকাতা। ১১ অগস্ট ১৯০০]

ওঁ

ভাই

বোম্বাইর গোলমালে গল্পাবলীর কাগজ ঠিক আমার অভিপ্রায়মত হয় নি— যা হোক্ যে রকম কাগজাদির দরকার এই চিঠি থেকে বুঝতে পারবে— এবং সেই অনুসারে চন্দ্রব্রাদার্সদের বলে দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[কলিকাতা। ডিসেম্বর ১৯০০]

ভাই আজ সকালে আটটার সময় Codicil সই করবার ব্যাপার আছে— হয়ে গেলেই যাব— একটু অপেক্ষা কোরো

রবি

১১

ওঁ

ভাই—

সুরেনের অসুখ— আজ সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে দেখিতে যাইব— অতএব আজ আসিয়ো না। নূতন খবর কিছু আছে? আজ সকালেই একটা পত্র লিখিবে এমন একটা কথা ছিল।

বঙ্গদর্শনের লেখা?

তোমারি

১২

ছিন্ন

[১৯০১ ?]

… … … …

হাঁ, আমাদের কোষ্ঠীগুলার কি করিতেছ ? ছোটবৌ মাঝে মাঝে তাহার জন্য তাগিদ করেন। দৈবাৎ নষ্ট হইলে ছেলেদের জন্মপত্রিকা আর নাই। তুমি চক্রগুলা কপি করিয়া লইয়া কুষ্ঠিগুলা যদি রেজেষ্ট্রী ডাকে ফেরৎ পাঠাও তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। আমাকে বার বার তিনি স্মরণ করাইয়া দেন আমি বারবার ভুলি। সেদিন একজন দৈবজ্ঞ নলডাঙ্গা হইতে আসিয়াছিল তাহাকে ছেলেদের কুষ্ঠী দেখাইবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য হয়— কিন্তু কুষ্ঠীগুলা না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

কাল চিরকুমারটাকে আদ্যোপান্ত সংশোধন ও সংক্ষেপ করিয়া ছাপিতে দিবার আকারে তৈয়ার করিয়া তুলিয়াছি। অপব্যয়ের ভয়ে ছাপাখানায় দিতে সাহস হইতেছে না।

এইবার বিনোদিনীর ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কাগজের উপদ্রব আমার আদবেই ভাল লাগিতেছে না— একটা আধটা ত নয়— একেবারে শকুনির পাল পড়িয়াছে। পাঠক ও লেখকদের আর ঠাণ্ডা হইতে দিল না দেখিতেছি।

তোমার রবীন্দ্রনাথ

১৩

[শিলাইদহ। ১৯০১]

ওঁ

ভাই

তুমি যদি ওদের সঙ্গে প্রাইভেট্ কোন বন্দোবস্ত কর এবং বর্ত্তমান সঙ্কট কাটাতে পার সে কথা আমার জানবার কি কোন দরকার আছে? তুমি যদি ওদের ধার দাও এবং ঋণ শোধ করে নাও তাতে আমার আপত্তি করবার কোন অধিকারমাত্র নেই। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার সংশ্রব না থাক্‌লেই হল। কি বল? শরৎকে চিঠি লিখে আমি সুবুদ্ধির পরিচয় দিই নি—কিন্তু একটা শেষ কথা আসল লোকের কাছে না পেলে মনের আশাকে সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়া যায় না। আমার একটা কেবল আশঙ্কা হচ্চে যে, যে দশহাজার টাকা দেওয়া হবে সেটা হয় ত সম্পূর্ণ শরতের ভোগে আস্‌বেনা। যা হোক্ সে নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। তোমার পত্রের উত্তর পেলে গহনা এবং অন্য সকল ব্যাপারের ব্যবস্থা করতে হবে— তার জন্যে সময়ের আবশ্যক।

বুধবারে সুরেনকে সেই টাকাটা দিয়ো।

ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের ছেলে জিতেন্দ্র মজুমদার আমাদের এখানে এখন অতিথি আছেন।

তোমার ডাক্তারটি তাঁর ছেলের অসুখ নিয়ে স্বগ্রামে পলাতক। আমি lumbagoর আক্রমণে অচল হয়ে পড়েছি। ঠিক সময়ে

ডাক্তার অতিথিকে আমার বাড়িতে পাওয়া গেছে।

অতিথি সৎকারে মন দিতে হচ্চে। ইতি ১৫ই বৈশাখ

তোমার—

১৪

[১৯০১]

ওঁ

ভাই

আজ শরতের পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি সুন্দর কিন্তু strictly private বলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। শরৎ ভাইদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চায় না এবং বাবামশায়ও বিবাহের পূর্ব্বে যৌতুক দিবেন না স্থির-প্রতিজ্ঞ— অতএব তুমি এই সঙ্কটের যদি কোন সুপথ থাকে অবলম্বন করিয়ো— আমাদের পক্ষ হইতে আমি ত কোন সুযোগ ভাবিয়া পাই না। কোন পক্ষের দোষ, তাহা বিচার করিতে বসা নিষ্ফল— সকল দিক রক্ষা করিয়া যদি কোন সুবিধা করিতে পার তবে নিতান্ত খুসি হইব না যদি পার তবে শান্তচিত্তে নৈরাশ্য বহনের চেষ্টা করিব। বাবামশায় যৌতুক বিবাহের পূর্ব্বে দিতে কোন মতেই রাজি হইবেন না ইহা স্থির নিশ্চয়— সত্যও আমাকে তাই লিখিয়াছেন।

তোমার রবি

১৫

[১৯০১]

ওঁ

ভাই

গোলেমালে এবং অসুবিধাবশতঃ কাল টাকা পাঠাতে পারি নি— ক্ষমা কোরো। আজ পাঠালুম।

কাল শরৎরা সন্ধ্যার সময় এসেছিল— দেখাশুনার কাজ হয়ে গেছে।

তোমার

১৬

[? ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]

ওঁ

ভাই—

আমি আজই বিকেলের ট্রেণে বোলপুরে যাচ্চি। অতএব শীঘ্র আর দেখাশুনো হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে আমার অনেক দেনা রেখে গেলুম তোমার সেই টাকাটা এই লোকের হাতে যদি বিনাবিলম্বে দেও তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমার বক্তৃতার প্যাম্ফ্‌লেট ২খানা পাঠাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংযোজন

ওঁ

[অক্টোবর ১৮৯৯]

ভাই

যোগীন্দ্রের পত্র তোমার দৃষ্টিজন্য পাঠাইলাম। খোলসা বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে কিছু বেশী আশান্বিত হইয়াছে বোধ হয়।

আমার পূর্ব্বপত্র এতদিনে পাইয়াছ [।]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

প্রিয়নাথ সেনের পত্রাবলী

১

[এপ্রিল ১৮৮৪]

রবিবাবু

সেদিন ঋষিবরের মুখে আপনার জ্যোতিদাদার স্ত্রীবিয়োগের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি এবং সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছি বলিয়াই আপনাকে বা আপনার জ্যোতিদাদাকে এ পর্য্যন্ত কোন পত্র লিখি নাই বা দেখা সাক্ষাৎ করি নাই। অপর কেহ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে জানিলে জ্যোতিবাবুর এ দুঃখ লাঘব হইবে এমন নয়। সুতরাং তাঁহাকে এ পত্রের কথা কিছুই বলিবেন না। তবে যদিও আমার দুঃখ আপনার দুঃখের কাছেও দাঁড়াইতে পারে না— তবুও আমরা উভয়েই আপনার জ্যোতিদাদার দুঃখে দুঃখী এবং পরস্পরের দুঃখ পরস্পরকে জানাইলে কষ্ট অল্প মাত্রায়ও নিবারণ হইতে পারে— এই বুঝিয়া

আপনাকে পত্র লিখিলাম— এবং যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয় তাহা হইলে আজ বিকালে আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসি।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

একটা প্রথা আছে যে যখনই যাহার যে রকম কেন ভয়ানক সাংসারিক বিপদ ঘটুক না অমনি চারিধার হইতে শোকসূচক … আসিতে থাকে— সভ্য জগতের এই … … আমার চক্ষে বড়ই হৃদয়-বিহীন বলিয়া বোধ হয়।

২

[১৮৮৫]

ভাই,

তোমার অপরাপর সকল চিঠির উত্তর লিখি না লিখি তাহাদের একটা উত্তর লেখা যাইতে পারে। কিন্তু এ চিঠির কি উত্তর দিব— কেমন করিয়া— কোন ভাষায়— কি কথায় উহার উত্তর লিখিব? তোমার চিঠি পড়িতে পড়িতে আমি যেরূপ বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে— আনন্দের পর আনন্দে— ব্যাকুলতার পর ব্যাকুলতায় চালিত এবং আন্দোলিত হইয়াছি— তাহাই ত' তার যথার্থ উত্তর। কিন্তু বিস্ময়ের ভাষা ও বিস্ফারিত লোচন— আনন্দের ভাষা ও পুলকিত হাস্যরঞ্জিত কপোল এবং অধর যুগল কি বলিবে কি করিবে না জানিয়াই ব্যাকুল— এ সব

কি করিয়া আমি তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব। ভাই তোমার সুন্দর কাব্যগুলির আমি দুটি মৌলিক গুণ দেখিতে পাই— তাহাদের ঔদার্য্য এবং মাধুর্য্য। তাহাদের প্রাণের ভিতর কে যেন আকাশ আর প্রান্তরের মহাপ্রাণ মিশাইয়া দিয়াছে এবং তারই সঙ্গে যেন বসন্ত বায়ু খেলিতেছে— জ্যোৎস্না হাঁসিতেছে আর বাঁশী বাজিতেছে— কিন্তু ভাই সেই দুটি গুণেই— সেই ঔদার্য্য এবং মধুরতায় তোমার এই চিঠিখানি তোমার সকল কাব্যকে পরাজিত করিয়াছে। "মুখচোরা" বলিয়াই এখনও প্রাণের সমস্ত কথাটা বলিতে পারিতেছি না— কিন্তু না বলিয়াও যে থাকিতে পারি না— বলি তবে! কবি, তোমার কাব্যগুলি বড়ই সুন্দর! কিন্তু তোমার মন তা অপেক্ষাও সুন্দর! তোমার কাব্যসৌন্দর্য্যে অনেক দিনাবধি মুগ্ধ আমি— কিন্তু আজ যে দূর হইতে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া তোমার যে সুন্দর কবির মন দেখাইলে তাহাতে আমি পরাজিত হইয়াছি— বিস্মিত হইয়াছি — কথা কহিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে কোথায়— কোন সমুদ্রের ধারে— কোন জ্যোতিষ্কের সম্মুখে— অনন্তের মাঝখানে আনিয়া ফেলিলে?

তুমি তোমার লেখা লইয়া যে সকল কথা বলিয়াছ— তাদের সম্বন্ধে তোমার যে সন্দেহ ব্যক্ত করিয়াছ সে সমস্তই আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তা নইলে ভাই তুমি কবি কেন? ফুলের পর ফুল— তারার পর তারা— আলোর পর আলো – সুষমার পর সুষমা— স্বর্গের পর স্বর্গ— কাব্যের পর

কাব্য চিরদিনই— নিয়ত— তোমার জীবনপথে ফুটিতে এবং হাঁসিতে থাকিবে। যাহা লিখিয়াছ তাহাত' তোমার পক্ষে সত্যই ভাল নয়— কারণ যাহা লিখিবে তাহা যে আরো ভাল। আমার এ দীন ভাষায় আর তোমাকে কি বলিব? তোমার দাদার সাহায্য লইয়াই তোমাকে বলি ভাই—

— ধন্য সুখী তুমি দুঃখের এ ধামে
চিরজীবী হ'য়ে থাক ধরণী পুরুক তব নামে
চূড়া হও দেশের— কুলের হও জ্বলন্ত মানিক
ধর্ম্ম-অর্থ-মহত্ত্বের আলোকে উজল দশদিক

* * *

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী— থাকিবেও সদা
চিরকাল। বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা
যে অরণ্যে বাতাসের সনে মুখোমুখী কথা ক'য়ে
মরে না ঝড়ে ঝাপটে— দিগন্ত প্রাচীরে বদ্ধ নয়

১৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫

ভাই

কই আজও ত তোমাদের Steamerএ যেতে পাল্লেম না। যাবার বড় সাধ— আর প্রতিদিনই ত যাব যাব করি, কিন্তু যেতে পারি কই? যেতে পারব কি? কাজটা আমার এক

রকম দুর্দ্ধর্ষ (বানান আর প্রয়োগটা দেখ) বলে বোধ হচ্চে। তা নয় কলকেতা Tramway কোম্পানীর প্রসাদে কয়লঘাট অবধি গেলেম্। তার পর ? তার পর বুঝি নৌক কর্ত্তে হবে— সে আবার কেমন করে করে ? "নৌকো-ও-ও নৌকো-ও-ও" বলে কি ডাকতে হয়— না ঘাটে দাঁড়াবামাত্র নৌক আপনি এসে উপস্থিত হয় ? ভগবান জানেন, আমিত কখন নৌকা করি নি— অর্থাৎ নিজে। আচ্ছা যেন নৌক হল, তার পর তাদের (এখানে idiomএর জোরে nounকে একবারেই অনুপস্থিত রেখে, Pronounকে কি খাড়া করা যেতে পারে না ?) তার পর তাদের বলব কি ? কোন্ Steamerএ লাগাবে ? Steamer কে চিন্‌বে ? রাজহংস কে পড়্‌বে ? আমার দূরপিন যে হারিয়ে গেচে। আচ্ছা তাও যেন হল— Steamer পাওয়া গেল। এখন নৌকা থেকে Steamerএ কি করে উট্‌বো ? যদি নৌকর চালের উপর দাঁড়িয়ে কোন রকম বাঁস-বাজি খেল্‌তে হয় তা হলে "মু অবধড় ত পারিবিনি' অবধড় ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্চে না ? সুতরাং দশজনা বহুদর্শী লোকের পরামর্শ চাইলেম্। তা তাঁরা সকলেই বাড়ী ছেলেন। আমি নিতান্ত গরীব— বেচারী— আহাম্মুখ্— না-বালক ভাল মানুষটির মত দাঁড়িয়ে আমার কাহিনী বল্লেম। আর তাঁরা খুবই পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ ফুরায় না— তার শেষ নাই— বিরাম নাই। আমি ঘাড় হেঁট করে এক মনে শুনলেম— বল্লেম ঢের হয়েচে, আপনাদের আর বিরক্ত করব না। তবু ছাড়ে নাই। শুধু পরামর্শ দিয়ে তাঁরা ছাড়েন কই ?

তাঁরা রোজ রোজ তাগাদা করেচেন— জিজ্ঞাসা করেচেন আমি Steamerএ গিয়েছিলেম কি না— আর তাঁরা যেমন যেমন বলেছেলেন তেমন তেমন ঘটেছিল কি না। শুধু তা—ই নয়— সেই অবধি তাঁরা আমার বিষয় অনেক অনুসন্ধান করেচেন— আমার কথা অনেক নাড়াচাড়া করেচেন্। আমার নিতান্ত নিতান্ত আত্মীয়েরাও আমার এত তত্ত্ব লন না। আর জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি Thacker Spinkর বাড়ী থেকে এত বই কিনে কি করি— আর এ কথার সদুত্তর তাঁহাদের নিজের মধ্যে না পাওয়াতে তাঁরা আর দশ জনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে অভয় প্রদান করে বলেন— "ভয় কি! Steamerএ সিঁড়ি আছে। আর একজন অতি বিজ্ঞতার সহিত এমনি সংক্রামক ভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন— যে তা দেখে অবধি আমি এখনও সময়ে সময়ে সেই ভাবে ঘাড় নাড়ি। তা যাই হোক এখন কথা হোচ্চে সিঁড়ি ত নানান রকমের। কতক্গুলি সিঁড়ি উট্বার জন্যে। কতকগুলি নাবার জন্যে আর কতকগুলি যে নাববার উঠবার দুয়েরই জন্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু কতকগুলি যে গড়াবার জন্য তার মশাই করেচেন কি?

সুতরাং সাত পাঁচ ভাবচি— অর্থাৎ ৭ও ভাবি নি, ৫ও ভাবি নি— ৫ পা এগোচ্চি আর ৭ পা পেচোচ্চি— কখন বা vice versa এমন সময়ে উপস্থিত— আচার্য্য মহাশয়! আর কি, খোল্ কুষ্টি— পাড়্ খড়ি হরি হরি। ঠাকুর ঘাড় নাড়লেন—

ফাঁড়া আচে। তা এখন তেরিজ জমা খরচে সঙ্কলন ব্যবকলনে সকলেরই ভুল হতে পারে— বিশেষ আপনার— না, না, শুধু আমার। তা ঠাকুরেরই যেন ভুল হল। খনন আমার মেজ ভায়া যে আমার হাত দেখে হাত ধরে বসে রইল। শ্রীমান বল্লেন আর কথাটা যে নিতান্ত নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নির্ভুল ভাবে বলেছিলেন তা শুনলেই জানতে পারবেন। শ্রীমান বল্লেন— 'দাদা এই বৎসরের মধ্যে আমাদের একটি সারিকানের তিরোধান দেখ্‌চি"। আমিও সেই নিঃস্বার্থ— অকপট— অনির্ব্বচনীয় ভ্রাতৃপ্রেমে গলিয়া গিয়া ভায়াদের গুজরান করিবার এমন সুন্দর অবসর— এমন দুর্লভ— এমন রাজকীয় (ওরফে royal) সুবিধা না ছাড়িবারই প্রতিজ্ঞা কল্লেম। কিন্তু বুঝি বা একটু বিলম্ব হয়। এই আমার একজামিনটা দিয়ে গেলে হয় না? একজামিন্‌টা না দিয়ে আমি হঠাৎ অমন কোন ঘোর নিঃস্বার্থ কার্য্য কচ্চি নে সে বিষয়ে আপনি নির্ভয়ে জামিন থাকতে পারেন। মনে করুন আর দু বছর হলেই তিন পাঁচা পনের বছর হয়। কেউ কেউ আমার এ জন্মে এক্‌জামিন্‌টা দেওয়া প্রশস্ত মনে করেন না— পর জন্মের উপর সে ভারটা [বরাৎ] দিতে বলেন।

আমি জানি— আর আমিও যে নাজায় তা নয়— এই অতিবুদ্ধিদের ফাঁকীতে পড়ে অনেকেই চিরকালের জন্য বাকী পড়ে থাকে কিন্তু শর্ম্মা ঠকিবার পাত্র নয়। সুতরাং কেঁচে Black stone ধরিচি।

তাই বলে কি তুমি আমাদের এখানে একদিন আসবে না।

না— না এখন এসে কাজ নাই। এখন আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা Public worksএ খুব মনোযোগ দিয়েচেন, চারিদিকে মেরামৎ নূতন সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদির হাঙ্গাম পড়ে গেচে। সত্য সত্যই চোকে ধূলো দিয়ে— খালি চোকে নয়— Engineer মহাশয় অনেক টাকা ফাকি দিচ্চেন। আর তারের (tar) গন্ধে ওলাউঠা—আঃ বিবি— যিনি আমাদের বাড়ীর সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে তিনটিকে আজ ক দিন হল সরিয়েচেন— তারের গন্ধে ১লাটি [?] নাপালা আমাদের জীবাগ্নি অনেক দিন ছুটি পেয়ে ছুট্—

সুতরাং করা যায় কি— নিরামিষের রকম কমিয়ে পাঁঠার বাজারে struggle for existence অনেকটা লাঘব করে এনিচি— এবং এ বিষয়ে আরো liberal measures contemplate কচ্চি। তুমি কি জলে থাকিয়া এই শীতকালের তপস্যা-মৎস্যদের অকালমৃত্যুর সম্বন্ধে কিছু কচ্চ? বিধান না প্রতি-বিধান? মনে থাকে যেন একের বিধানে অপরের প্রতিবিধান হতে পারে।

১৮।১২।৮৫

১৯ জুলাই [১৮৮৬]

৪ঠা শ্রাবণ [১২৯৩]

ভাই,

তোমার স্নেহ-মমতা-পূর্ণ ক্ষুদ্র পত্রখানি আজ দিন চার হ'ল পেয়েছি— তুমি শুনে সুখী হবে আমার ছেলেটি বেশ আরাম হ'য়েছে— এক মাসেরও অধিক কাল পরে সবেমাত্র কাল সে বাঙ্গালী-জীবনের একমাত্র সম্বল দুটি বালাম চালের ভাত পেয়েছে— তাতেই তার আর আনন্দ রাখবার জায়গা নাই— এ থেকে যেটুকু moralize করা যেতে পারে তা' তুমি করে নিও।

আমি কিন্তু নিজে— খোদ বা স্বয়ং বড় ভাল নাই। যদিও ডাক্তারি শাস্ত্রের তপসিলের লিখিত কোন দফার রোগ আমার দফা সার্ত্তে আমাকে আক্রমণ করে নাই, আমার মনটা কিন্তু এমনি ম্রিয়মাণ— নিস্তেজ ও আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা এমনি অলস— দুর্ব্বল ও স্ফূর্ত্তিহীন হয়েছে যে সত্যি সত্যি আমার সাধ যায় কেবল চোখ বুঁজে প'ড়ে থেকে ভবলীলাটা সাঙ্গ ক'রে ফেলি। তামাসা ছেড়ে বাস্তবিক বলচি আমার আজ কাল কিছুই ভাল লাগে না।— জীবনটা যেন নিতান্ত পুরাতন খেলা ব'লে বোধ হয় যেন এর ভেতর আর কোন মজাই নাই— সবই সেই পুরাণ একঘেয়ে ব্যাপার— সেই পুরাণ একঘেয়ে হাঁসি আর সেই পুরাণ একঘেয়ে কান্না

একটানা স্রোতে চলেচে— তাতে তরঙ্গ নাই— বৈচিত্র্য নাই— এক একবার মনে হয় যেন জীবনের ঠিক পথে যেতে পারি নাই— যেন ঠিক দর্জ্জায় ঘা মার্ত্তে পারি নাই— যেন কোন পোড়ো জলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্চি। আমার প্রাণ চায় আলো-আকাশ-পরিসর— আর দেখি না কোথা থেকে ৪টা বড় বড় দেয়াল এসে আমাকে ক্রমেই ঘেরে ফেলচে— দিগ্‌গজ দেয়ালগুলো আমাকে এমনিই আটকে ফেল্‌চে যে আমার আর হাত পা নাড়বার জায়গা নাই— তোমার এটা ভারি morbid রকম কিছু বোধ হ'তে পারে— আর সত্যিই বা তা হবে— কারণ আমার মনটা নিতান্তই বেফুর্ত্তি হ'য়ে পড়েছে তার ভিতরকার স্বভাব যেন বিগড়ে গেচে— যেন হঠাৎ কোন দিক থেকে একটা বাতাস এসে আমাকে এক রকম করে তুলেচে— আমার জিবে আর তার নাই আমার চোখে আর আলো যায় না। আমার মত কেতাবী লোকের আর এর চেয়ে কি দুর্দ্দশা হ'তে পারে যে, কোন বইই আর আমার ভাল লাগে না। মনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য এই ত' কত নতুন বই কিনলেম তার একখানাও কিন্তু প'ড়ে উঠ্‌তে পাল্লেম না। এমন যে Swinburneএর নতুন Miscellany প'ড়লেম তাতেও সে পূর্ব্বেকার মত আনন্দ পেলেম না। Guy de Maupassantর একখানা নতুন বই পেয়েছি কিন্তু কই তার সেই সুন্দর জীবন্ত উদার তরঙ্গময়ী ভাষা আগেকার মত ত' প্রাণে একটা উৎসাহের স্রোত— একটা জীবনের তরঙ্গ এনে দিতে পাল্লে না? অন্যে পরে

কা কথা— এমন যে মহাকবি শ্রীপ্রিয়নাথ সেন— তাঁরই রচিত এবং অরচিত কাব্যগুলি— সেই আসমানি— সেই এলনাসকারী (Alnascharil) স্বপ্ন আনে না। কিছুই ভাল লাগে না— কিছুতে মন বসে না। কেবল মাজে মাজে এই বর্ষাকালের মেঘ-বিচিত্র আকাশ দেখতে একবার একবার ভাল লাগে। ঘরে বেশ একলা নিঝুম (আবকারি revenue না বাড়িয়ে) ব'সে আছি— সামনের একটা জানলা খোলা— খানিকটা নীল আকাশ দেখা যাচ্চে— কোথা থেকে একখানা মেঘ— অতি ধীরে— অতি মন্থর —অতি অলস গতিতে চ'লে যাচ্চে। দেখি আর ভাবি কোথা থেকেই বা আসে আর কোথাই বা চলে যায়— কোন দূর থেকে— কোন গ্রাম-নদী-প্রান্তর দেখে শুনে— এমনি আমার মত কত আনমোনা অলস চাহনি পেয়ে— কোথায় আবার কোন দূরে ভেসে যাচ্চে— আর আমরাই বা কোথা থেকে এসেচি— আর কোথায় ভেসে চলেচি। দেখচি তুমি ভয় পেয়েচ— তুমি মনে ক'চ্চ দ্বিতীয় একখানা মেঘদূত কাব্যের অবতারণা বুঝি আরম্ভ হয়। মা ভৈঃ— আমি হলপ করে বলতে পারি— আমার দ্বারা ও রকম কুকার্য্য কখনই হবে না— তুমি অবশ্য হলপের কোন আবশ্যকতা দেখচ' না— তা যাই হ'ক কথাটা হ'চ্চে এই আমার দেহখানি আর তার অধিষ্ঠাতৃ-দেব বা অসুর মন নিতান্ত খারাপ থাকার দরুণ তোমাকে এত বিলম্বে তোমার পত্রের উত্তর লিখচি। আর যদি বল আজই বা লিখচি কেন— সামাজিক ভদ্রতা শীলতা বা শালীনতার (এই তিনটে কি এক না তিন

বিভিন্ন, পদার্থ বা অপদার্থ) অনুরোধে যে আজ লিখতে বসিনি তা নিশ্চয় জেন। আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান এসব বিষয়ে এমনই সজাগ যে এইসকল ব্যাপার নিয়ে আমার উপর অনেক বন্ধুবরের অনুরাগ রাগে পরিণত হয়েচে। তাছাড়া এমন সময় কি কারো কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগে? তুমিই মনে কর দেখি ভাই— আমি আজ আপিস পালিয়ে আমার সেই ছেঁড়া শতরঞ্চবিছান ঘরের এক কোণে লুকিয়ে ব'সে আছি। আমার দেহটাও নিতান্ত ছেঁড়া গোছের— এলিয়ে প'ড়চে। প্রাণটা কিছুই চায় না— তার কোন সাধ কর্ব্বার সাধও নাই— সাধ্যও নাই— আকাশে এই নিঝুম দুপুর বেলায় কে পাতলা মেঘের মশারি খাটিয়ে দিয়েছে— বৃষ্টি পড়চে কি না পড়চে— ঘরের প্রায় সব দরজা জানলা বন্ধ— তাতে বেশ একরকম অকাল সন্ধ্যা ক'রে আছে— কেবল পাশের একটি জানলার আধখানা খোলা আছে— আর তারই ভেতর দিয়ে ভিজে বাতাস দুষ্টু ছেলের মত তার নিজের গায়ের জল আমার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্চে— এমন সময়ে কি কারো কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে? এ নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ব্বার সময়। কে বলবে এ সময়ে চাণক্য প্রভৃতি "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং"। আমি কিন্তু ভাই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছুই না ক'রে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে শুয়ে থেকে বৃষ্টির রিম ঝিম শুনচি— আর তারই মাঝ থেকে এই মৃদু-বৃষ্টির মৃদু-কোমল-সম্পাত-ময় শব্দে— প্রাণের ভিতর হঠাৎ কেমন তোমার সেই কোমল সহৃদয় পত্রখানি জেগে উঠল— তাতেই— আর stationeryগুলি নিতান্ত হাতের কাছে থাকার দরুণ এই

লিপিপ্রবরের অবতারণা এবং তোমার উপর দারুণ অত্যাচার —ইত্যলং।

তুমি সেই সমুদ্র-উপকূলে থাকিয়া সমুদ্রের গানগুলি শুনিতে শুনিতে যে আর এক মহাসাগরের জীবনকাহিনী শুনিয়াছ তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আমি বেশ উঁপলব্ধি ক'র্ত্তে পারি। তোমার পিতার জীবন ইতিহাস যে একখানি পরিণত এবং সারগর্ভ গ্রন্থ হবে তাহাও বেশ বুঝি। তুমি যে সেদিন তোমাদের বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর যে পত্রখানি দেখিয়েছেলে সেখানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল— তাহার সুন্দর অকপট স্নেহময় ভাষায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমি ভাই ছেলেবেলা থেকে — যখন থেকে মাটির উপর কাদার আলিপনা কাটি— তখন থেকে মনে মনে বড় বড় লোকের ছবি আঁকি। এই রকম কল্পনার খেলায় তোমার বাপের যে ছবিখাঁনি এঁকেছিনু, তারই যেন আদরা সেই চিঠিখানির ভেতর প'ড়ে রয়েছে— চিঠিখানি দেখবার কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি কথা শুনেছিনু তাতে সেই আমার আশৈশব কল্পিত ছবিখানির গায়ে দুই একটি লম্বা গোছের আঁচড় প'ড়েছিল কিন্তু সেই চিঠির বিমল দর্পণে যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম তাহাতে সে সব দাগ মুছে গেল আর প্রতীয়মান হ'ল আমার সেই শৈশব কল্পনাটি সত্যের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি!

তোমার

প্রিয়নাথ

৫

[? ১৮৯৯]

ভাই

তোমার ফর্দ্দ সম্বলিত চিঠি পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম।

ফর্দ্দ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য দুই একজন কারবারী লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরে জানাইব। ফর্দ্দলেখক বলিয়াছেন "বাঁকী কারবারই বেশী ফলাইতে হয়" — ইহার অর্থ ঠিক বুঝতে পারিতেছি না— এবং একটু ভয়ও পাইতেছি— যদি এমন হয় কিস্তিবিশেষের কিছু টাকা বাকী রহিল— তাহা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে ততটা ভয় দেখি না — কিন্তু যদি প্রতি ক্ষেপই কতক টাকাও বাকী থাকিয়া যায় এবং কোন ক্ষেপের সকল টাকাই বাকী থাকে তাহা হইলে আমার লাঞ্ছনার বাকী থাকিবে না। "মু তা পারিমু না অবধড়"। ফলকথা যদি পাইকর তোমাদের প্রজা হয় বা তোমাদের লোক প্রভৃতিরা পরিচিত হয়— সংক্ষেপে আদায়ের পক্ষে যদি তোমাদের সাহায্য থাকে তাহা হইলে "আমি কি ডরাই সখি" সুতরাং এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া লিপিযোগে সমাচার — সমস্ত নাই হোক— পাঠাইলে আমি অর্থযোগের শুভলগ্ন দেখি।

তারপর "এখানে ঘন বর্ষা নামিয়াছে" তোমার এই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত সম্বাদে বিপুলানন্দে তরঙ্গায়িত হইয়াছি— এই বর্ষারই

কদম্ব ফুলের ন্যায় আমি পুলকে রোমাঞ্চ-দেহ। নিবিড়কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম জীবনতীরে। বর্ষার মত আমি কোন ঋতুই ভোগ করি না— আমি এত ভিজিতে পারি। বৃষ্টির জলে ভিজিতে আমার যে কি আনন্দ তোমাকে বলিতে পারি না— তাহার স্পর্শে আমার দেহ মন কিশলয়িত হইয়া উঠে। সুখস্বপ্নের মধ্যে আমার একটি এই :— বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কোন গ্রাম্য পল্লীর বৃক্ষলতাশোভিত নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়া অন্তরের কোন অন্তহীন অনির্দ্দেশ মাধুরীর জল্পনার অলস নিরুদ্দেশ ভ্রমণ।— আঃ আমি কি বকিতেছি।

মাঝে মাঝে চিত্রা পড়িতেছি এখনও কিন্তু তোমার ···কে খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইতি আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৬

১৯ অগস্ট, ১৮৯৯

শনিবার

19 Augt 99

ভাই,

তোমার অশ্রুপ্রবাহের সঙ্গে আমারও শোকাশ্রু গ্রহণ কর। তোমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, এমন রত্নও অঙ্কচ্যুত হল। বলুর মতন বিনয়-মধুর চরিত্র কখন কোথাও দেখি নাই। পথে ঘাটে যেখানে যখনই দেখা হইত তোমার পুরাতন···

···তুমিও জান প্রথম হইতেই আমি তাহার অসাধারণ রচনাশক্তি চিনিয়া লইয়াছিলাম এবং তাহার বিকাশোন্মুখ প্রতিভার পূর্ণ আবির্ভাবের অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখন সকল আশা সেই সুন্দর বপুর সঙ্গে চিতার আগুণে ভস্মসাৎ হইল! ভগবান তাহার শোকদগ্ধ আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৭

৭ এপ্রিল ১৯০০

২৫ চৈত্র ১৩০৬

ভাই,

তোমার পত্রের জন্য আমি অত্যন্ত উন্মুখ হ'য়ে আশা পথ চেয়েছিলাম— আজ প্রাতে ১০টার সময় পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। অক্ষয়বাবু জীবিত আছেন— আমি জানিনা কি লিখিতে কি লিখিয়াছিলাম। নগেনবাবু এবং বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার মরণ-সম্বাদ দিয়াছিলেন— কিন্তু পরে শুনিলাম তিনি ডাক্তারি চিকিৎসায় কিন্তু কবিরাজী ঔষধে (সূচিকাভরণ) আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু অক্ষয়জীবন লাভ করুন। যে ফটোগ্রাফখানা তোমার কাছে আছে সেইখানাই সত্বর পাঠাইয়া দাও— আমাকে। আমি প্রাপ্তিমাত্র সমাজপতিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দিব। চৈত্র সংখ্যার সাহিত্যে প্রকাশ করিতে তিনি বড়ই ইচ্ছুক। উপেন্দ্রবাবুর নিকট যে ছবি আছে তাহাতে কার্য্য হইবে না। সুতরাং তোমার হস্তস্থিত ছবিখানাই অবিলম্বে পাঠাইও।

আজ প্রাতে 'কাহিনী'র সাধারণ সংস্করণ পাইলাম। ইহাতেও সূচী নাই। দেখিলাম ৯ই তারিখে বিতরণ আরম্ভ হয়— আর আজ ২৫ তারিখে আমি পাইলাম। যা'হোক ইতিপূর্ব্বে আমাদের বিশেষ সংস্করণ পাইয়া পুস্তক পাঠের আনন্দ উপভোগ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি।

'কল্পনা' চৈত্র সংক্রান্তি নাগাদ বাহির হইলে বড় ভাল হয়। তাহা হইলে ১৩০৬ সাল ইতিহাসে তোমার চারিখানি কাব্য-গ্রন্থের চারি-হারা আলোকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। 'কল্পনা' ত অনেক কালই ছাপিতে দিয়াছ— এতদিনে ৪ ফর্ম্মা মাত্র হইল! ইহার অর্থ কি? তুমি তাগাদা দাও— তাহা হইলেই আমরা বর্ষশেষের পূর্ব্বেই পাইব।

'ক্ষণিকা'র উল্লেখে বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। তুমি এমন সুন্দর নামকরণ করিতে জান। তোমার অমর প্রতিভার অক্ষয় ভাণ্ডারে আর কত অসংখ্য মণি-মাণিক্য আছে তাহা কোন বৈজ্ঞানিকও বলিতে পারে না— তুমিও পার না। তবে আমি তোমার নিতান্ত অনুরক্ত ভক্ত আমি জানি যে তোমার possibilities অশেষ। তোমার কবিজীবনের প্রাক্কালে আমি তোমার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে তোমাকে পত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছিলাম —তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে— আবার দেখি যে এখন যাহা বলিতেছি তাহা সেইরূপই মিলিবে। আমি বিষয়কর্ম্মে কি সামান্য উপকার করিয়াছি বা না করিয়াছি তাহার জন্য তুমি কৃতজ্ঞতাপীড়িত। বল দেখি আমি তবে তোমার কাছে এত ঋণে ঋণী হইয়া তোমার নিকট এত বিমল অক্ষয় আনন্দ পাইয়া —দাঁড়াই কোথায়? তজ্জন্য আমি সাধারণ্যেও সম্যক্ কৃতজ্ঞতাও জানিতে পারি নাই। কৃতজ্ঞতাও জানাইতেও পারি নাই— তোমার বন্ধুত্ব-গৌরবের উপযুক্ত কোন কার্য্যও করিতে পারি নাই— একথা যখন ভাবি তখন আমি আমার দারিদ্র্যের কিনারা

পাই না। আমি বেদনায় আত্ম-গ্লানিতে অভিভূত হইয়া পড়ি। তুমি বুঝিবে বলিয়াই আমার অন্তরের কথা তোমাকে জানাইতেছি —প্রকাশ করিয়া হৃদয়-বেদনা লাঘব করিবার চেষ্টা পাইতেছি, তোমাকে প্রিয়বাক্য শুনাইবার জন্য নয়। যে সকল হীন চেতা প্রতিভার মর্য্যাদা বুঝে না, তাহারাই আমাকে ভুল বুঝিবে— অন্যে নয়। তোমাকে অনৃত প্রিয়বাক্য শুনাইবার আমার প্রয়োজন নাই— তুমি যে আমার বন্ধু!

এখানে বড়ই তাপ পড়িয়াছে— আজ দুই রাত্রি বিছানায় প্রবেশ করিতে পারি নাই। ঘরের মেজের উপর শুইয়া রাত কাটাইয়াছি তাপে জ্বরবোধ হইতেছে— আহারাদি কম পড়িয়াছে এবং দুর্ব্বলবোধ হইতেছে। চৈত্র সংখ্যা ভারতী বেশ হইয়াছে— 'বসন্ত' খুব ভাল লাগিল— গত বর্ষের এই সংখ্যা ভারতীতে তোমার শেষ কবিতাটির ন্যায় ইহাতে একটি সুন্দর ভূমার ভাব আছে। 'চৈত্র পূর্ণিমা শশী' তত ভাল লাগিল না— নিতান্ত ছিটা ফোঁটা এবং ফাঁকা ফাঁকা।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৮

৬ মে ১৯০০

রবিবার ২৪ বৈশাখ ১৩০৭

ভাই,

আঃ বাঁচলেম— পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে আর যেতে হ'ল না। তুমি আসবে না— তবে আর আকর্ষণ কি— অন্ততঃ আমার পক্ষে? আজ এই গুমুটে গর্ম্মীতে সেই লোক-সমাকুল সভাগৃহে উপস্থিত হ'তে হ'লে মনটা অন্ধ-কূপ-হত্যার ব্যাপার স্মরণ করে নিয়তই থম্‌কে উঠ্‌ত। তবে তুমি থাক্‌লে, সে আর এক কথা— ত্বদনুস্মৃতিঃ সুখায় বৈ।

বাঃ ভারতীতে কি চমৎকার গল্পই আরম্ভ করচ— এর জন্য আবার তোমার ভাবনা হয়েছে!— মরি আর কি? অন্য লোক হলে বলতেম এবং বলত (কেমন conceit!) 'ন্যাকামি'! তোমার কিছুতেই হাত আটকায় না দেখছি মিষ্টিকথা— মিষ্টিছবি— মিঠে প্রাণ! এবং হে শ্যালিকা-হীন, তুমি এত শ্যালিকা-রস কোথা হইতে সংগ্রহ কল্লে? তোমার এক তিনিই দুই নাকি? তা' ত' তুমি নিজ মুখেই বলেছ তোমার মেয়ের মা' তোমার শ্যালিকা। আর আমরা এই ত' জানি যা'র যা' নাই তার কাছে সে পদার্থের কোনই আদর নাই— সেই লাঙ্গুলহীন মহাজনের পথ তুমি অনুসরণ না ক'রে এই 'শ্যালিকা-মঙ্গল' লিখিতে আরম্ভ কল্লে। পরজন্মে দেখছি তুমি শ্যালী-মোহন হয়ে জন্মাবে।

সত্য বল্‌ছি, আমি তোমার গল্পের মুখ-পাতেই মুগ্ধ। কিন্তু সমুদয় জমিটা কি মুখপাতের নমুনার মত ওৎরাবে। তুমি বড় সঙ্কট ব্যাপারেই হাত দিয়েছ— আমার ভয় হ'চ্চে। এই মধুচক্রের পরিণাম কি? তোমার বিধবা শ্যালীটি দেখ্‌ছি রমণীরত্ন— ভারি স্বাভাবিক মধুর আর bright (আমি উজ্জ্বল বলতে পার্ব্ব না) করেই তাকে সাজিয়েছ। তোমার মনের কোনখানে এত রস লুকান ছিল— গল্পটি বলিবার ধরণ সমস্ত হাব ভাব Gautierএর উপযুক্ত। তোমার ফরাসীভাষা জানা থাকলে অনেক মহাত্মা তোমার মৌলিকতায় সন্দেহ কর্ত্ত। আমাদের বাঙ্গালী মহাশয়েরা এসব বিষয়ে বড়ই উদার। যা হোক আমি তোমার ঐ কয়টির বড় ভক্ত— কিন্তু বেল্‌ পাক্‌লে কাকের কি?

রাস্কিন-প্রবন্ধ তোমার ভাল লেগেছে শুনে লেখা সফল হ'য়েছে ভাব্‌ছি। অনেকেই প্রশংসা করেছে— কিন্তু তোমাকে সত্যি বল্‌ছি— কানে তুলিনি। বাস্তবিক লেখাটা আমার আদর্শানুরূপ হয় নাই। বরং অলীকবাবুর সমালোচনাটা অন্ততঃ ভাষা সম্বন্ধে ইচ্ছানুরূপ হইয়াছে। তুমি কি 'সাহিত্য' দেখিতে পাও? না আমি একখানা পাঠিয়ে দেব?

কল্পনা ত দপ্তরীর দপ্তরে বন্ধ। 'ক্ষণিকা' কোথায়? তোমার মুখে ক্ষণিকার পরিচয় পেয়ে আমি এই চতুর্দশীটি লিখেছিলেম— তোমার কোকিলকুঞ্জে এই বায়সকণ্ঠের অত্যাচার কি ভয়াবহ তা বুঝতে পারি।

'ক্ষণিকা'

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়বরেষু

অচির বসন্ত হায়, এল— গেল চলে।
নিবে গেল কোকিলের দীপক পঞ্চম—
ভঙ্গুর কুসুমশোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে—
প্রভঞ্জনে পরিণত— উৎপাত বিষম—
অলস-পরশ-মধু মলয়ার বায়।
যায় যদি— যাক্ চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরাণ ফুলবীথি, কোথা তাহা হায়—
এ যে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ!

যে মদিরা পান-তরে প্রাণ তৃষ্ণাতুর
কোথা তাহা?— কোথা জ্বলন্তযৌবনা তব
মোহিনী প্রতিভা কবি?— বিশাল চিকুর
বিথারে আবরে যার তনুর বিভব।
নগ্নদেহ— কম্প্রকর— মদির নয়ন
ঢালুক অশেষ নেশা— পুলক দহন।

কাল তোমার জন্মতিথি— সুদীর্ঘ জীবন এবং সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ কামনা করিয়া আজ বিদায় লই।

পুঃ এখনও আঙ্গুল সারে নাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৮ মে [১৯০০]

মঙ্গলবার

(হাতের কাছে পাঁজি আছে)

২৬ বৈশাখ [১৩০৭]

ভাই,

গত রবিবার তোমাকে যে কবিতাটি আমার পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাই সেটি আগামী সংখ্যার ‘প্রদীপে’র জন্য বৈকুণ্ঠবাবু অত্যন্ত জেদের সহিত চাহিয়াছেন— প্রায় কাড়িয়া লইয়া যাইতে উদ্যত ছিলেন— আমি কোন প্রকারে সেটিকে বাঁচাইয়াছি— তবে তাঁহার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি তোমার সম্মতি পাইলে সেটি তাঁহাকে প্রকাশের জন্য দিব। ফরাসী লেখকদিগের মধ্যে একটি রীতি আছে (বড় মন্দ বলিয়া বোধ হয় না) কোন কবিতা বা গল্প প্রথম প্রকাশেই কোন বন্ধু বা বিখ্যাত লেখককে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে— এবং সে উৎসর্গ লেখার শিরোদেশেই সংযুক্ত হয়। কবিতাটির “বসন্ত-অন্তে” এই নাম দিয়া তোমার নামে উৎসর্গ করিলে তোমার কি তাহাতে কিছু আপত্তি আছে।

কবিতাটিতে আমি কিছু এমন বিশেষ কোন গুণ দেখি না— বরং ষষ্টকে (Sestet) আমার মনের ভাব বিশদরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই বলিয়া বোধ হয়। যখন পত্র-মধ্যে তোমার জন্য সেটি লিখি তখন প্রায় সন্ধ্যা— অন্যান্য লোকের সহিত কথা কহিতেছিলাম— এবং খাতাও সামনে ছিল না— বোধ

হয় ঠিক যেরূপ খাতায় আছে তেমনটি পাঠাইতে পারি নাই— সেজন্য পর পৃষ্ঠায় খাতা হইতে অবিকল নকল পাঠাই—

একটা সামান্য কবিতা লইয়া তোমাকে বিরক্ত করিলাম— অপরাধ মার্জ্জনা করিবে।

সেদিনকার পরিষদে যাই নাই— শুনিলাম ঝড়বৃষ্টিতে সব মাটী হইয়াছিল— আরও মাটী হইয়াছিল তোমার অনুপস্থিতির জন্য।

অচির বসন্ত হায় এল— গেল চলে
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুমশোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে
প্রভঞ্জনে পরিণত— বিকৃতি বিষম—
অলস পরশ-মধু মলয়ার বায় !
যাবে যদি, যাক্ চলে ক্ষণিকের স্নেহ !
অফুরাণ ফুল-বীথি, কোথা তাহা হায় ?
এযে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ !

যে মদিরা-পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা ? কোথা জ্বলন্ত-যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি ? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্নদেহ— কম্প্র-বক্ষ— মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা— পুলক-দহন !

তোমার নাম সম্বলিত না করিয়াও ইহা প্রকাশ করা যাইতে পারে— কিন্তু যে সূত্রে ইহা রচিত হইয়াছিল সেটি কবিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহি না। ‘কল্পনা’ কোথায়? ‘ক্ষণিকা’ কোথায়? আর “মধুরমাসাংদর্শনং” সে ভগিনী চতুষ্টয় কোথায়? এবার ‘ভারতী’ পাইতে কি নিষ্ঠুর বিলম্ব! আজ হইতে ৫, ৬ দিন মাত্র পাইয়াছি। এবং চিঠি লিখিতেও হইয়াছিল বিলম্বের কোনও কারণও জানিতে পারিলাম [না]। অথচ শর্ম্মা ভারতীর জন্ম মাত্রেই তাঁর মুখ দেখিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর জন্মতিথি উপলক্ষে মুখ-দর্শনীর স্বরূপ রজতমুদ্রাও দিয়া আসিতেছেন। তোমার পরিবারবর্গ কেমন আছে! এবং কিমারব্ধ ভবান্? দেখ একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি আমাদের বাড়ীর যত ছোট ছেলেপুলেদের একবার করে খুব গলা ফুলিয়া জ্বর হইয়া গেল— এবং দুচার দিনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যও হইল। অনেক বাড়ীতেই শুনিতেছি এরূপ হইয়াছে বা হইতেছে — পড়িয়াছিলাম কোন স্থানে প্লেগ আসিবার প্রাক্কালে এরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১১ মে ১৯০০

বৃহস্পতিবার [?] ২৯ বৈশাখ
১৩০৭

ভাই,

তোমার ২৭শে বৈশাখের পত্র এই মাত্র পাইলাম— আনন্দে অধীর হইয়া তাই সদ্য উত্তর লিখিতে বসিয়াছি— ইতিমধ্যে আমার সনেট সম্বন্ধে তোমাকে আর একখানি চিঠি লিখিয়াছি পাইয়া থাকিবে।

তোমার চতুর্দশীটির ষষ্ঠকে একটি ছত্রের অভাব অর্থাৎ ইহা চতুর্দ্দশী না হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে— এ ব্যবকলন ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়? বোধ হয় একটি ছত্র তুলিতে ভুলিয়াছ— যদি আমার অনুমান ঠিক হয় তাহা হইলে ষষ্ঠকটির ছত্র-মাত্রা পূর্ণ করিয়া আবার লিখিয়া পাঠাইও।

'কল্পনা' কাল অপরাহ্নে পাইয়াছি— এবার দেখছি আমিই তোমার এই অমূল্য উপহার সর্ব্বাগ্রে পাইলাম, তজ্জন্য আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর— এই কটা দিনে তুমি যে এই কবিতার দান-সাগর করিলে আমাদের দেশের দুর্ভাগারা কি তার আদর জানিবে? তোমার মুক্ত-প্রাণ, অবচ্ছল, দানভারানন্দ-পীড়িত আমি— এই কয়টি কথা লিখিতে, আমার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিতেছে।

তারপর এবার সমালোচনার পালা। আমার ত নিস্তার

নাই— ইচ্ছায়— আনন্দে সমালোচনা করিতে হইবে— এবং বহুজনের উপরোধেও করিতে হইবে। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি — এবার কেমন একটু ভয় হইতেছে— আমি কি তোমার বর্ত্তমান পূর্ণ পরিণত প্রতিভার উপযুক্ত পূজা করিতে পারিব? কত সৌন্দর্য্যই যে আমার দ্বারা উপেক্ষিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে। যা হোক তাড়াতাড়ি কিছু করিতেছি না। গ্রন্থচতুষ্টয় বার বার পড়িয়াও এখন তৃপ্ত হই নাই— সে কারণে ত' পড়িবই — এবং সমালোচনার জন্য আরও পড়িব।

তোমার পত্রের সঙ্গেই একই ডাকযোগে প্রমথবাবুর একখানি পত্র পাইলাম— তিনিও চান যে আমি তোমার কাব্য চারখানির সমালোচনা লিখি— তাঁরও রাস্কিন-প্রবন্ধ বড় ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীশবাবুকে 'কল্পনা' উৎসর্গ করিয়াছ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম— আর কাহাকেও উৎসর্গ করিলে এমন আহ্লাদ হইত না— বেচারীর অতিমিষ্ট প্রাণ— কর্ম্মযোগে সুদূর প্রবাসে পড়িয়া আছে— কতদিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। তুমি তাঁকে বল যে এই উৎসর্গে তারই মতন আমি আনন্দ পাইয়াছি।

সমাজপতির সঙ্গে সেদিন "চিরকৌমার সভা" সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল— তাঁর কতকগুলি 'কিন্তু' ছিল— কিন্তু জেরায় দাঁড়াল এই যে, তোমার শৈলবালাকে নিয়ে তুমি বিভ্রাটে পড়িবে— তাঁর মতে হয় তাঁকে সভায় লইয়া যাইও না— নয় তাঁকে সরাইয়া দাও— এমন কি জীবন হইতে— কিন্তু এ দুটির একটিও কর্ত্তে পারবে না। সহজ-সাধ্য দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন কল্লে আমি

তার সঙ্গে সহমরণে যাব— নিশ্চয় জেনো। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেম যে যে অবধি তুমি লিখেছ— তাতে আমাদের বাঙ্গালী সংসারের ভাবের কোথাও কোন ত্রুটি হয় নাই— এবং পরেও হইবে না এবং বাঙ্গালী ভাব বজায় রাখিয়া তোমার কৌতকচতুরা কল্পনা যে খেলাই খেলিবে তাহা ভাল বই মন্দ হইবে না। আজ অবধি দুইটি গল্পের প্রথমাংশ পড়িয়া উত্তরাংশে তাহাদের উপযুক্ত পরিণাম দেখিবার জন্য আমার তীব্র চিন্তা কৌতূহল জন্মিয়াছিল — একটি 'Mademoiselle de Maupin' আর একটি 'The Prisoner of Zenda'— ঠিক সেই ভাব আবার মনে উদয় হ'য়েছে তোমার এই "চিরকৌমার সভা"র কৌতূহলোদ্দীপক প্রারম্ভে তুমিই যে আমাদের মধ্যে এমন সুন্দর কল্পনার অবতারণা করিতে এবং তাহাকে অশেষ শোভায় মণ্ডিত বিকশিত করিয়া তুলিতে সক্ষম —সে বিষয়ে আমার দ্বিধামাত্র নাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১১

৬ অগস্ট ১৯০০

২২ শ্রাবণ ১৩০৭

মঙ্গলবার [?]

ভাই,

আজ দুই দিন তোমাকে পত্র লিখি নাই। সম্বাদ বড় একটা নাই।

২য় পাত্রের এখনও পরিষ্কার মনোভাব জানিতে পারি নাই। গোত্রের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি।

অবিনাশের সঙ্গে রবিবার দেখা হয় নাই। তাহার কোন যজমানের ঘরে সেদিন বিবাহ ছিল— কাল তাহার আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল— কিন্তু দেখা করে নাই— আজ আফিস যাই নাই— পায়ে একটা ফোঁড়া হইয়াছে— চলিতে ফিরিতে ভারি কষ্ট হয়— অবিনাশকে আজ ডাকিয়া পাঠাইতেছি।

তোমার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে যাহা করিতে বলিয়াছ তাহার জন্য চেষ্টা পাইতেছি— দু একটি গ্রন্থবিক্রেতাকে জানি যাহারা Copy right কিনিতে পারে। দু' একদিনের মধ্যে সম্বাদ দিব।

তুমি ৫০০০ বা ৬০০০ টাকা পাইলেই কি খুচরা ঋণ হ'তে অব্যাহতি পাও? তোমার সেই মাড়োয়ারি ব্যাঙ্কের দেনা কি শোধ করিয়াছ? একথা জিজ্ঞাসা করিবার অর্থ এই যে সেদিন পাঁচুবাবু বলছিলেন এক ব্যক্তি ২০,০০০ টাকা নোটের উপর ৮

বা ৯ পারসেণ্ট স্থদে দিতে পারে। তুমি যদি বল ত এ বিষয়ে চেষ্টা পাইতে পারি।

Molierএর অনুবাদ পাইয়াছ কি ? তুমি যেদিন এখান হইতে রওনা হইলে সেইদিনই আমি Thacker Spinkএর দোকানে গিয়াছিলাম— কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তুমি যে কি বই চাহিয়াছিলে মনে করিতে পারিলাম না। যদি Molier না পাইয়া থাক আমি Chunder Brothersদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত স্বল্পদামে পাঠাইতে পারি।

কাল তোমার সেই পণ্ডিত মহাশয়টি আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছিল তিনি শীঘ্রই শিলাইদহ যাইবেন— আমি তাঁহাকে, তাহা হইলে, সহযাত্রীস্বরূপ পাইতে পারি এবং তাহাতে আমার বেশ স্থবিধা হইবে। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ পর্শু বোধ হয় যাওয়া হইবে না। একে ফোড়া তাহাতে পাত্রদিগের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিবার সময় উপস্থিত।

আমি ঠিক ক্ষণিকার সমালোচনা লিখিবার জন্য কাগজকলম টানিয়া আঁচড় দিয়াছি এমন সময় পণ্ডিতমশাই আসিলেন— তাঁহাকে সে কথা বলিতে তিনি যাইতে উদ্যত কিন্তু আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম।

দুদিন তোমাকে পত্র লিখি নাই— আজ পত্র পাই নাই— ইহাতেই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে। তোমার কবিতা যেমন মধুর— তোমার 'সঙ্গও তেমনই মধুর— বরং কাব্যের

চাইতেও মধুর— তোষামোদ ভাবিও না— জানিও সে বিদ্যাটা আমার বড় আসে না— তবে বিরহ-কাতর-হৃদয় হইতে সদ্য উত্থিত এই কথাটা তোমাকে জানাইয়া বিরহ-ব্যথা যেন লাঘব হইল তাই জানাইলাম। ঈশ্বর তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন—

তুমি যেমন মধুর, বিশ্বজগৎ তোমাকে সেইরূপ মধুর চক্ষে দেখুক।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১২

[৮ অগস্ট ১৯০০]

ভাই,

Chunder Brothersদিগকে তোমার লিখিত মত কাগজ সরবরাহ করিতে বলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে নমুনার স্বরূপ 'ক্ষণিকা' খানি তাহারা লইয়া গিয়াছে— তার জন্য ভাবনায় পড়িয়াছি— কবে ফিরিয়া পাইব?

তোমার Copyright বিক্রয় সম্বন্ধে আজ দুই ব্যক্তি আমার এখানে আসিয়াছিল— একজন অস্বীকার করিয়াছে— অপর জন তাহার কারবারের অপর শরিকানদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানাইবে বলিয়া গিয়াছে— ২য় পক্ষ অর্থশালী— এবং Copyright কিনিলে ভাল হয়।

আমি ফোড়ায় খোঁড়া হইয়া বাটীর মধ্যে আবদ্ধ আছি

বলিয়া ঘটকালীর কার্য্য স্থগিত আছে— সকলের সব ব্যবসায় সয় না— ঘটকালীতে না নামিতে নামিতে খঞ্জ হইলাম। অবিনাশ সোমবার তুপুরবেলা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল— আমি তখন আফিসে— এবং আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিয়াই খোঁড়া হইয়া বসিয়াছি— আজ তাহাকে এখনই ডাকিয়া পাঠাইব।

দেবেন্দ্র সেন আজ প্রাতে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন — তাঁর কন্যার বিবাহ পর্শু— অর্থাৎ শুক্রবারে— আমি যে যাইতে পারি বোধ হয় না।

বৈকুণ্ঠ দাস দেশ হইতে ফিরিয়াই আমাকে পূর্ব্ব-পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিয়াছে— রাস্কিন শেষ করিয়া দিতে হইবে— তু চারি দিনের ভিতর।

এদিকে তোমার প্রবোধবাবু তাঁর কয়েকখানি ইংরাজীতে লিখিত চিঠিপত্র দেখিয়া দিতে রাখিয়া গিয়াছেন গত mailএ ছিল Arthur সাহেব এবার Yule— শেষোক্ত মহোদয়কে অনুরোধ তাঁর Bank যেন তাঁহাকে ৪০,০০০ হাজার টাকা অবধি credit দেন।

এই সব ফরমায়েস খাটিতে খাটিতে কখনও আপনার কাজ করিতে পারি নাই— এখন যে একটু সাহিত্য লইয়া পড়িয়া থাকিব তাহারও যো নাই।

তোমার গল্পের বহির যদি কোন বিশেষ সংস্করণ হয়— আমাকে এক কপির গ্রাহক বলিয়া লিখিয়া রাখিও।

অধুনা কিমারব্ধো ভবান্ ?

এই রাস্কিন প্রবন্ধ শেষ হইলে— আর ক্ষণিকার সমালোচনাটা লিখিয়া ফেলিলে আমি দু একটা বহুদিনের বাঞ্ছিত রচনায় হাত দি।

লিখিবার ইচ্ছা আমার কখনও বড় বলবতী নয়— যাহা লিখিয়াছি তাহার অধিকাংশই তাগাদা তাড়নায়— এখন লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছে— তুমি তাহাতে প্রীত হও বলিয়া। সেই চারটি ভগিনীর খপর কি— আগামী ভাদ্রে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ত ? উহাদের মানস-জনকের বিরহ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে— তাহাদের দেখা পাইলেও বাঁচি।

বিপাকে পড়িয়া বৃহস্পতিবার যাওয়া হইল না— কিন্তু ফোড়া সারিলেই যাইব এবং শীঘ্র নড়িব না— Trespass or ejectmentএর মোকদ্দমা আনিতে হইবে— এতদিন থাকিব যে তোমার চাকরেরা গালি পাড়িবে— এবং তোমার গৃহিণী উত্যক্ত হইয়া রন্ধনে প্রখর লবণ এবং তীক্ষ্ণ ঝালের ব্যবস্থা করিবেন—

—তাই ত মাঝে মাঝে ক্ষণিকাখানা দেখছিলেম— তাহাও আবার হাতছাড়া হইল !

‘চিত্রা’ এবং A digit of the moon ভুলিও না !

বিবাহ সম্বন্ধে নূতন খপর পাইলে কাল আবার আপনার দরবারে হাজির হইব— আজ বিদায়—

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৩

১৯ অগস্ট ১৯০০

৩রা ভাদ্র ১৩০৭

রবিবার

ভাই,

তোমার ১লা ভাদ্রের পত্র আজ এখনই পাইলাম— কাল পাওয়া উচিত ছিল। এক দিনের দেরি হ'ল কেন?

তুমি যে হৃদয়ের 'ইকনমি'র কথা বলিয়াছ তাহা বড়ই সত্য এবং তোমার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সঙ্গে বেশ গুছাইয়াই বলিয়াছ। জীবনের শিক্ষাই এই। আমিও অনেক আশা ত্যাগ করিয়াছি— কিন্তু তাহাতে সুখ বই দুঃখ পাই নাই— অধিক আশা দুরাশা— তাহাতে একটু স্বার্থপরতাও আছে আমার যে দিকে বেশী ঝোঁক— যাহাতে আমার বেশী সুখ-- সেই দিকেই আশার দৌড়— জীবন আমাদের এই শিক্ষা দেয়— আমাকে লইয়াই সংসার বা সৃষ্টি চলচে না— আমার মত আর সকলেই— তাহাদেরও নিজপ্রকৃতি এবং তদনুরূপ আশার আবর্ত্ত আছে— তাই একটা সামঞ্জস্য করিয়া পরস্পরে চলিতে হইবে। যে গাছের শাখা পল্লব বাড়িয়া যাইতেছে তাহার ফুল ফল বিলম্বিত হয়— তাই মালী ডালপালা কাটিয়া দেয়— আমাদেরও জীবনকে সার্থক ও সফল করিতে হইলে আশার ঝাড়কে ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়।

শরতের সম্বন্ধে বাস্তবিকই আমি একেবারে আশা ছাড়ি

নাই। তাহার এ বিবাহে বিশেষ ইচ্ছা আছে তাহার মাতার অনুমতি পাইলে সে সুস্থচিত্তে এ কার্য্য সমাধা করে— মা'কে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ অর্জ্জন করিতে চায় না। দেখা যা'ক ফলে কি দাঁড়ায়।

তুমি আমাতে কি গুণ দেখিয়াছ বলিতে পারি না। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, তুমি আমাকে অশেষ পাণ্ডিত্যের আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ— ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। তোমার চক্ষে আমি যেরূপ বাস্তবিক আমি তেমন নই— কিন্তু স্নেহের চক্ষে স্নেহ-পাত্র বাস্তবিক গুণহীন হইলেও যদি অসামান্য গুণী বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাতে বড় একটা আসিয়া যায় না। ইহাতে যদি কাহারও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে ত সে যে স্নেহ করে তারই— সে মুগ্ধ-হৃদয়ের কাছে যখন সত্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে তখন তারই ভারি দরদ লাগ্‌বে। তোমার সেই সুন্দর "আপদ" নামক গল্পটি মনে কর। কিন্তু অপর সকলে যখন সেই সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের খাঁটি গর্দ্দভত্ব জানিতে পারিবে, তখন কি লজ্জা! কি ধিক্কার!

আমার যে গুণ নাই অপরে আমাতে তাহা আরোপ করিলে বড়ই লজ্জিত হই— এবং তাহার সেই ভ্রম যাহাতে শীঘ্র দূর হয় তন্নিমিত্ত ব্যস্ত হই। তবে তোমার প্রশংসা আমার পক্ষে এক হিসাবে বড়ই হিতকরী। তুমি আমাকে যেমনটি ভাব, তেমনটি হবার জন্য প্রয়াস পাই— তোমার উপযুক্ত বন্ধু হইতে চেষ্টা

করি। আমি যে মনের কথাই বলিলাম তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে।

বেলার জন্য পুস্তক পাঠাইয়া দিব— Chunder Brothers-দের দ্বারা আনাইয়া লইব কি?

প্রমথবাবু একদিন আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন— তখন আমি রাজমোহন দাসের দপ্তরে— সুতরাং দেখা হয় নাই।

রাস্কিন লিখিবার অবসর আজ পাইয়াছি— কিন্তু ক্ষণিকার সমালোচনা লিখিবার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে— তাই রাস্কিনে তেমন মন দিতে পারিতেছি না।

২০,০০০ টাকাটার কথা এখনও চলিতেছে— শীঘ্রই সম্বাদ দিব।

তুমি কেমন আছ— এবং ছেলেপুলেরা কেমন আছে জানাইও। বিনোদিনীর কি কিছু সম্বাদ লইলে?

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

পুঃ— ‘প্রদীপ’কে একটু তেল সলিতা দাও। তোমার ত স্নেহের ‘প্রদীপ’।

১৪

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০

৩ আশ্বিন ১৩০৭

বুধবার

ভাই,

অনেক দিন পত্র লিখি নাই— পত্র পাইও নাই। লিখিবারও বিশেষ কিছু ছিল না।

তোমার প্রেরিত 'রেণু' পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা পাঠ করিবার খুব ইচ্ছা ছিল। বইখানি পাইয়া সে ইচ্ছা মিটিবে— মিটিবে বলিবার অর্থ এই যে এখনও পড়িবার অবসর পাই নাই। মিছে কাজে— অপরের বেগারে জীবনটা বাজে খরচ হয়ে গেল। এবার 'ভারতী' ১লা আশ্বিনেই পাইয়াছি— নিশ্চয়ই তোমার স্নেহ-চেষ্টায়। আমার সাধের 'চিরকুমার সভা' ত বেশ চলচে। বেশ মিষ্টি করে সব লিখচ ত। ভাব ও ভাষা দিব্য যেন মাধুর্য্যে পুষ্ট।

"মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং"। সকলই যেন প্রভাত-আলোকের প্রশান্ত-প্রীতি-বিচ্ছুরিত। যা কিছু দেখিয়েছ— যা' কিছু বলিয়েছ— যাহাকেই সামনে আনিয়েছ— সকলই উদার প্রসন্নতায় মণ্ডিত। বোধ হয় তোমার প্রৌঢ় ও তৎপরবর্ত্তী রচনা সার্ব্বজনীন প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে— তোমার বর্দ্ধনশীল মর্ম্মগত সৌজন্যে ও উদারতায় বিকশিত হইয়া উঠিবে। 'বিনোদিনী'র ভাষা ও চিত্রসকলের মধ্যে একটা লেলিহ রুক্ষ

জ্বালা, তীব্র নেশার দাহিকা আছে কিন্তু কুমার-সভার সকলই অমৃতময় এবং পাঠকালে হৃদয়কে— অন্ততঃ আমার হৃদয়কে অমৃতায়মান করিয়া তোলে। মামা আর ভাগিনীকে কোথা হতে সংগ্রহ কল্লে। মামা তোমরা কেউ— বোধ হয় তোমার মেজদাদা। আর সরলতার কথা যতটা তোমার ঠেন শুনেছি তা থেকে অনুমান করি— সরলাই ভাগিনী! আমার সমস্যা পাঠ ঠিক হল কিনা বোলো। তোমার কবিতাটিও বেশ লাগল— তোমার কবিতা বেশ না লাগাই আশ্চর্য্য!

আজ কয়দিন দিন রাত অবিশ্রান্ত বর্ষণ হচ্ছে— মহাপুরুষদের নিকট হাস্যজনক হইলেও তোমাতে আমাতে বল্‌ব, "হৃদয় আমার ময়ূরের মত নাচে রে।" কিন্তু গত-প্রায় বর্ষার বিদায়-সম্ভাষণ শুনিবার অবসর কই— আসন্নপ্রায় পূজার ব্যয়সঙ্কটে হৃদয় চিন্তাকুল— তাই এমন বর্ষায়ও আফিস অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। টাকা আদায় করার চেয়ে আর শক্ত কাজ আমি ত দেখি না। কিছু সংস্থান কত্তে পাল্লেই তোমার কাছে ছুটিতেছি।

এবারকার 'প্রদীপে' রাস্কিন প্রবন্ধ কি দেখেছ?

ক্ষণিকার সমালোচনা অর্দ্ধেক লিখিত হইয়া স্থগিত আছে— কাল থেকে আবার হাত দেবার অবসর করে নিতে হবে।

তোমাদের সকলের সংবাদ লিখিও। দুপুর বাজিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিপাতও একটু কম হইয়া আসিয়াছে। আমিও আফিস চলি।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৫

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০

শনিবার

১৩ আশ্বিন ১৩০৭

ভাই,

তোমার পত্র পাঠে হৃদয়ে শান্তি লাভ কল্লেম। কাল সকল দুশ্চিন্তা হ'তে ছুটি নিয়েছি— মনে করেছিলেম আজ থেকে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বসে সাহিত্যালোচনা কর্ব্ব— কিন্তু পূজার Budget ঠিক কত্তে হচ্ছে— তাতে অল্প পুঁজি নিয়ে সকলের প্রীতি সাধন করা বড় সহজ নয়— সুতরাং Budget ব্যাপারটা যে শান্তির অনুকূল নয় তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ।

বাজে কাজ বাজে লেখার হাত থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি নিজেকে রক্ষা কর্ব্ব— কিন্তু যাই মনে মনে ঠিক করা অমনি একটি আত্মীয় আসিয়া একখানি দলিল লিখিবার প্রার্থনা— আদেশ — অনুরোধ যা বল' জানালেন। আমি এবার "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই নীতির অনুসরণ করে লুকোচুরি খেলছি —আর পারি নে— আর পারি নে।

গ্রহ-সকল বোধ হয় এখন আমার বড়ই প্রতিকূল— তা না হলে এখনও তোমার গল্পগুচ্ছ কেন পেলেম না। শ্রীমান প্রবোধচন্দ্রকে বিশেষ করে দুটা সংস্করণেরই কথা বলে দিয়েছি —শ্রীমানও অঙ্গীকার করে গিয়েছিল— এই গত রবিবারে— যে সর্ব্বাগ্রে আমি পাব— শৈলেশচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া তাহাতে

খুব জোরে সায় দিয়াছিল— পণ্ডিত মহাশয় (অর্থাৎ বিদ্যার্ণব ঠাকুর) তাঁহাদের-না-তোমার সমাজের সেই কাদের বলে দিয়েছিল কিন্তু কই এত লোকের পুচ্ছ মলিয়াও গল্পগুচ্ছ আজও পেলেম না। ভাই হে যার টান সেই বোজে— তুমি এখানে থাকলে 'ক্ষণিকা'র মত এই গল্পগুচ্ছেরও ১ম কপিখানাই আমি পেতেম।

কার্ত্তিকের ভারতী কবে পাব ?

আজিও 'রেণু' দেখিতে পারি নাই— যে কয়দিন 'ভূতে-ধরা' হয়েছিলেম সে ক'দিন পড়বার কোন আশা ছিল না বলে প্রমথবাবুর অভিলাষ মত তাঁকে বইখানা পড়িতে দিয়াছি— পাইবামাত্র পুস্তকের দুচারি স্থান যাহা দেখিয়াছি তাহাতে নিজেরই সমালোচনা লিখবার ইচ্ছা হয়েছিল এবং মনে করেছিলেম তোমাকে কিছু না জানিয়ে agreeably surprise কর্ব্ব।

আমার রাস্কিন-প্রবন্ধে কলা-বিদ্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তাহা লইয়া অনেকেই রাস্কিনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার মতের বিরুদ্ধে জিহ্বা আস্ফালন কচ্চেন— সেদিন কবি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার আর একটি বন্ধু আসিয়া খাণিকক্ষণ খুব দ্বন্দ্ব করে গেছেন— Sophiaরও সম্পাদক বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট জানাইয়াছেন আমি রাস্কিনকে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছি— সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রাস্কিনেরই মত সমীচীন। দেবেন্দ্র সেন এবং তদ্বন্ধু কিন্তু স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে রাস্কিনই ভ্রান্ত

আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই প্রকৃত কথা।

'তমস্বিনী' সম্বন্ধে তোমার সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়টি ঠিক বলিয়াই বোধ হয়। নগেনবাবু যখন আমাকে বইখানি দিতে আসেন তখন তিনি একটু গর্ব্বের সহিতই যেন বলিয়াছিলেন যে এই উপন্যাসে তিনি অনেক বিষয় খুব freely deal করেচেন— দৃষ্টান্তের স্বরূপ বলেন উহার ভিতর বারাঙ্গনা প্রভৃতির অনেক কথা আছে। কিন্তু কোন গ্রন্থে কি আছে না আছে তাহাতে কি আসিয়া যায়— যাহা আছে তাহা বেশ স্বভাব-সঙ্গত এবং কলা সৌন্দর্য্যে উদ্ভিন্ন কিনা তাহাই বিবেচ্য। তুমি গ্রন্থের যে দোষের উল্লেখ করিয়াছ তাহা ছাড়া ইহাতে একসূত্রতার বিলক্ষণ অভাব আছে— যেন কয়টা গল্প পরস্পরের অধ্যায়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া এক নামে অভিহিত হইয়াছে। তা' ছাড়া ঘটনা অনেক আছে— কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক পরিণামও নাই আবর্ত্তও নাই। সুতরাং পাঠশেষে কেমন নিরাশ হইতে হয়— তৃপ্তি আদবেই হয় না।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৬

১ অক্টোবর ১৯০০

সোমবার

১৫ আশ্বিন ১৩০৭

সপ্তমী-পূজা

ভাই,

তোমার পত্র পেলেম— অপরাহ্ণে। প্রাতঃকাল হইতে আশা করিয়া বসিয়াছিলাম। এই বেলা ৩টার পর হস্ত-গত এবং পরে হৃদয়-গত হইল।

তুমি যে সুন্দর বিশ্বব্যাপী শারদীয়া পূজা নীলাম্বরে এবং রৌদ্র-প্রফুল্ল ধরা-অঙ্কে দেখিতেছ তাহাই প্রকৃত পূজা এবং ইহা হইতে নিশ্চয় জেন তোমার ধর্ম্ম-জীবন অলক্ষ্যে গড়িতেছে। প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী এবং অসীমতার মধ্যে যখন আমরা বিভোর হইয়া আমাদের সমস্ত প্রাণখানি ঢালিয়া দি তখনই প্রকৃত পূজা— তখন আমরা ভগবানের বিশ্বরূপ— বিরাট মূর্তি দেখিতে পাই। আমাদের প্রাণ তখন নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে বন্দী না থাকিয়া আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রসৃপ্ত। তখন প্রত্যেক চেতনার সহিত আমাদের চেতনা মিশ্রিত— জীবনের সমস্ত বিকাশের সঙ্গে আমাদেরও জীবন যেন সমভাবে বিকশিত হইয়া উঠে— সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখি— আগে আমি মনে করিতাম এই সৃষ্টি-ব্যাপিনী সম-প্রাণতা কবিত্বেরই বিকাশমাত্র— পরে বুঝিয়াছি ইহাতে জীবনকে পবিত্র করিয়া তোলে।

"রেণু" সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ্য সমালোচনায় বলিবার ইচ্ছা আছে— কিন্তু তোমাকে যখন লেখিকা আমার মত জানিবার জন্য উত্যক্ত করিয়াছেন, তখন মনের কথা আর চাপিয়া রাখিতে পারি না। তোমাকে সত্য বলিতে কি? আমাদের কোন স্ত্রী-কবিরই লেখায় আমি কবিত্বের সুস্থ সুন্দর বিকাশ দেখি নাই— মৌলিকতা ত নাই-ই। কেহই ঠিক সুরটি লাগাইতে পারেন নাই— কাঁচা ভাষা— অপরিণত ভাব— কাব্যকলার মধ্যে আমরা যে পূর্ণতা— উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যে সংযম দেখিতে চাই তাহা কাহারও নাই। আর সংযম বা কিসে আশা করা যাইতে পারে যাহার দুরন্ত উচ্ছ্বাস আছে তাহারই ত সংযম চাই— এদের কাহারও ভিতর আমি ভাব বা অনুভূতির গভীরতা— আবেগ বা আবর্ত্ত দেখি নাই— নিজের করিয়া কিছু দেখিবার ক্ষমতা নাই— সুতরাং কাহারও কিছু বিশেষত্ব নাই— সবই দরিদ্র— সুতরাং সংযমের পরিবর্ত্তে ভাব-দরিদ্র কবিত্ব-হীন ভাষা কেবল চীৎকার করিয়া মরিতেছে— 'রেণু'র লেখিকা কেবলমাত্র একজন স্ত্রী কবি যাঁহার দেখিবার চক্ষু আছে— বলিবার কথা আছে— সুতরাং তিনি আমাদের যাহা দিতেছেন তাহা উচ্চদরের হৌক বা না হৌক— তিনিই কেবল তাহা দিতে পারেন— অপরে পারে না। তাঁর ভাষাটি বড়ই সুন্দর— এবং বেশ পরিণত। তিনি পরে আমাদের আরও বিচিত্র এবং উচ্চশ্রেণীর কবিতা দিতে পারেন— কিন্তু তাঁহার ভাষার ভবিষ্যতে আর যে কি উৎকর্ষ হইতে পারে আমি বুঝিতে

পারিতেছি না। 'চিরবিস্ময়' নামক sonnetটি আমার মতে যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত। 'রেণু' সমালোচনার জন্য আমি অপর স্ত্রীকবিদের কবিতা পাঠ করিতেছি প্রমথবাবুর কাছ থেকে "আলো ও ছায়া" আনিয়াছি— কিন্তু নিজেকে আর শাস্তি দিতে পারি না— বইখানা পড়ে ওঠা আমার অসাধ্য! 'রেণু'র লেখিকা বাস্তবিক কবি— অনেক বঙ্গীয় পুরুষকবির উপরে তাঁহার আসন— স্ত্রীকবিদের ত কথাই নাই— তিনি ছাড়া আর প্রকৃত স্ত্রীকবিই বা কই? কিন্তু হে পুরুষসিংহ, এ কথাটা আমার সমালোচনায় প্রকাশ্যে বলিলে আমার জীবন সংশয় হ'য়ে উঠ্‌বে। বাঘের হাত থেকে পরিত্রাণ আছে কিন্তু বাঘিনী?— সমস্ত বিদূষী সীমন্তিনীরা আমাকে তাঁহাদের খর-লোচনের শরাঘাতে— এবং খরতর বচন-বাণে ধরা-ছাড়া করিয়া দিবে— তখন তোমার কবিতা পাঠেও সান্ত্বনা পাব না এবং তুমি বোধ হয় একটা farceএর মস্‌লা সংগ্রহ হল দেখে বন্ধুর নির্য্যাতনে বেশ এক হাত হেঁসে নেবে।

শৈলেশ প্রবোধ Coর তুমি জরিমানা না কল্লে আমি 'গল্পগুচ্ছ' দেখিব না। পূজাটা মাটী হ'ল।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৭

২ অক্টোবর ১৯০০

মঙ্গলবার

১ আশ্বিন ১৩০৭

অষ্টমী পূজা

ভাই,

কাল তোমাকে চিঠি লেখ্‌বার পর 'আলো ও ছায়ার' স্থানে স্থানে পড়ে দেখ্‌লেম, ইহার ভিতর দু একটি সুন্দর রচনা আছে— 'মহাশ্বেতা'য় যদিও উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব নাই— এবং কাদম্বরী-অবলম্বনে লিখিত— তবু গল্পটি বেশ সরল সহজ ভাবে লিখিত। হাঁক ডাক নাই— কথা-স্রোত বেশ একটি ক্ষুদ্র অনাবিল নদীর জলের ন্যায় ধীরে চলিয়াছে। ইহার ভিতর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কাঁচা লেখক আড়ম্বর করিয়া লিখিবার প্রলোভন এড়াইতে পারিত না— কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীর শিক্ষা এবং রুচি তাঁহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তবে বিষয়টি প্রকৃত কবির হাতে যেরূপ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত তাহার কিছুই হয় নাই। ভাবে টলমল করিয়াছে— কিন্তু রসোচ্ছ্বাসে প্রকম্পিত নয়। বইখানা আরো দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে।

এবারকার 'প্রদীপে' তোমার "শুভদৃষ্টি" দেখিলাম। সংশ্লিষ্ট ছবিখানি পটুয়ার অপটুত্বের চূড়ান্ত।

'গীতিকা'র সমালোচনা তোমাকে কেমন লাগ্‌ল জানিতে

উৎসুক রহিলাম। শিবনাথ শাস্ত্রীর "কবি ও কবিত্ব" জমিয়াও জমে নাই— শেষের দিকটা নিতান্ত ফাঁকা ঠেকিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতাটি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

ভাই আজ এখনও তোমার কোন পত্র পাইলাম না— তুমি কি এখন পদ্মার চরে বিচরণ কর্চ্চ?

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৮

[অক্টোবর ?, ১৯০২]

বঙ্গদর্শনে তোমার "মন্দ্র" সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। কিন্তু আগে "চোখের বালি"র কথা পাড়িব। সংখ্যায় সংখ্যায় বিচ্ছিন্নভাবে পড়িবার দরুণ সমগ্র পুস্তকের ঘটনাসঙ্ঘাত হৃদয়ে জমিতে পারে নাই। সুতরাং উপসংহারটি পূর্ব্বার্দ্ধের অসামান্য উৎকর্ষের অনুরূপ হইয়াছে কিনা আর একবার সমস্ত গল্প না পড়িলে বলিতে পারি না। তবে এ সংখ্যায় যে কয়েকটি অধ্যায়ে গল্প শেষ করিয়াছ তাহা অকৃত্রিম রস-প্রাচুর্য্যে এবং ঘটনাবলীর নৈসর্গিক বিকাশে হৃদয়কে অভিভূত করে। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে অপরাধী পাত্রপাত্রীকে আনিয়া এবং মর্ম্মাহত বন্ধু ও পাত্রীকে দাঁড় করাইয়া পাপতাপক্ষুব্ধ ঘটনাসঙ্ঘের ক্ষিপ্ত আবর্ত্তকে নাট্য প্রধানের চতুর কলাকৌশলে বেশ শান্তি এবং সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছ। পড়িতে পড়িতে অনেকবার চক্ষুজল মুছিতে

হইয়াছে এবং সমাপ্তি সত্যসত্যই একটি উদার শান্তিতে স্নিগ্ধ। মানব-জীবন সম্বন্ধে তোমারও বেশ একটি অজানিতপূর্ব্ব ঔদার্য্য এবং গভীর অভিজ্ঞতা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

মন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য অপর পত্রে মন্দ্রিত হইবে।

১৯

[এপ্রিল ?, ১৯০৪]

ভাই

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই খুসী হইলাম। তুমি ভাল আছ বর্ত্তমানে আমার পক্ষে এর চেয়ে আর ভাল সম্বাদ কি হতে পারে? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্র আরোগ্য হও।

বেলার কাছে তুমি ভালই থাকবে। শীঘ্র সেখান থেকে পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়িও না। তোমার সেখানে যাওয়া অবধি আমার মনে নিয়ত এই চিত্র জাগছে যেন হিমালয় উমার ঘরে এসেছে— তাই বলছি তুমি সেখানে থাকবে ভাল। এবং ঠিক বয়সেই তোমার পাকা হাত থেকে কন্যার স্নেহভক্তি- মিশ্রিত কোমল আদর ও যত্নে যে অনাবিল স্বর্গীয় মাধুর্য্য আছে তাহাদের আস্বাদন কর্ব্বার আশা মনে জেগে উঠেছে। এই দেখ স্বার্থপর আমি তোমার হৃদয়ে আবার লেখবার ব্যস্ততা এনে দিচ্ছি। কিন্তু এখন কলম চালিও না - যখন চলে আসবে তখন স্মৃতি

মধুরকে মধুরতর ক'রে তুলবে এবং ছন্দে ঝঙ্কার আপনি আসিয়া ফুটিবে। না— আর নয়। আমরা আছি ভাল— তুমি মাঝে মাঝে 'কুড়েমি' বজায় রেখে তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু'এক ছত্র লিখে চিন্তা দূর কর এবং যখন আম লিচু পাকবে এই বৃদ্ধ বালকটিকে স্মরণ ক'র।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

২০

১৯১৩

৮ মথুর সেনের গার্ডেন লেন

৩০ কার্ত্তিক ১৩২০

ভাই,

Nobel prize সম্বন্ধে আমি কাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলেম আজকের খপরের কাগজে দেখ্‌লেম সে সম্বাদ ঠিক।

কালকের চিঠি পাঠাবার পরই আমি তোমার ২৭ তারিখের পত্র পেলেম May Sinclair লেখা আমার ভাল লাগে—তাতে শুনেছি তোমার কাব্যের সমালোচনায় তিনি আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে তার একটু বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়েছেন— তার উপর তোমার পুস্তকের সমালোচনা— সুতরাং উহা পড়্‌বার জন্য আমার আগ্রহ অপরের চেয়ে তিন গুণ অধিক। আশা করি

[illegible]
২০ [illegible] ১৩২০

ওঁ

Nobel Prize সম্বন্ধে [illegible]
[illegible] তোমার [illegible]
[illegible]
[illegible] সম্বন্ধে [illegible]।

[illegible]
[illegible] তোমার ২৭ [illegible]
May Sinclair [illegible]
[illegible] — [illegible] তোমার
[illegible]
[illegible]
[illegible] — [illegible]
তোমার [illegible]
[illegible]
[illegible]। [illegible]
তোমার [illegible]

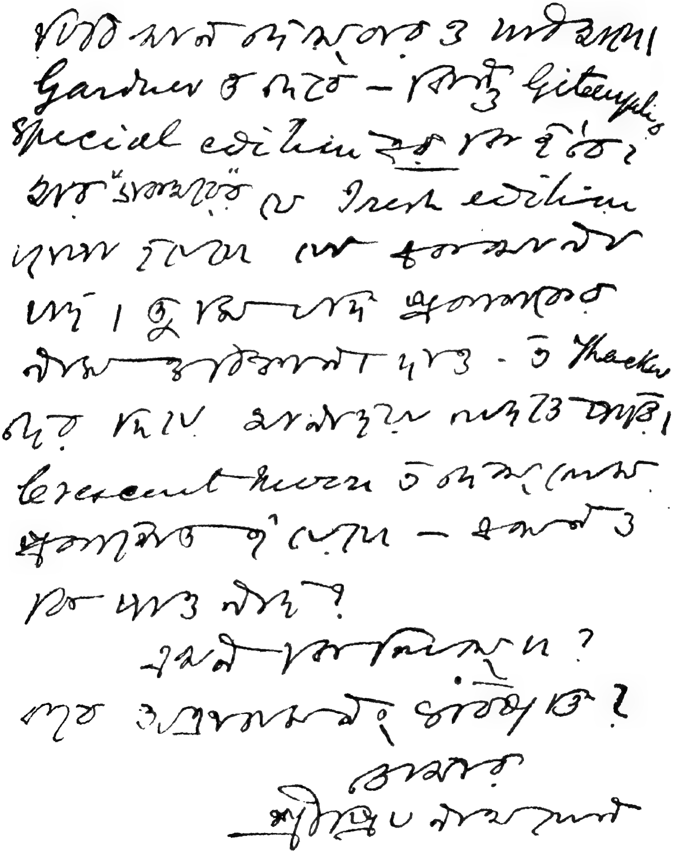

চিঠি এবং [illegible] ও পাইলাম।
Gardener ও [illegible] — কিন্তু Gitanjaliর
Special edition [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] এ Irish edition
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] — ও Thacker
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
Crescent Moon এর [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] ও
[illegible] [illegible] [illegible]?
[illegible] [illegible]?
[illegible] [illegible] [illegible]?
তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বন্ধুর সাধ মিটাইবে। তাঁর চিঠিখান দেখ্‌বারও সাধ আছে। Gardenerও দেবে— কিন্তু Gitanjaliর Special editionএর কি হ'বে?

আর "ডাকঘরে"র যে Irish edition ছাপা হয়েছে সে একখানা চাই। তুমি যদি প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা দাও ত Thackerদের দিয়ে আনাইয়া লইতে পারি। Crescent Moon ত দেখ্‌লেম প্রকাশিত হ'য়েছে— এখনও কি পাও নাই?

এখন কি লিখ্‌ছ? কবে অত্রাগমনং ভবিষ্যতি?

তোমার
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

২১

৩ জুন ১৯১৫

ভাই,

তুমি আজ নিশ্চয়ই অগুন্তি congratulation পত্রে জ্বালাতন হইতেছ। আমার এ পত্রখানা congratulationএর পত্র নয়ও বটে। আমি খেলাৎ দাতাদিগকে congratulate করি যে তাহাদের খেলাৎ তোমার নামের সহিত জড়িত হইয়া অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার Nobel prize লাভে এখনকার ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইতে পারে— তোমার অধিকন্তু

গৌরব কিছুই হয় নাই—তবে তাহাতে শস্যঞ্চ গৃহমাগতং—যথালাভ। আর তুমি Knight হওয়াতে তোমার বন্ধুদের একটা শাস্তি হইয়াছে তোমাকে লিখিত পত্রের খামের উপর তোমার নামের পূর্ব্বে একটি কথা শ্রীযুক্ত বা Babu লিখার স্থানে ২টা কথা Sir Dr. লিখিবার শাস্তি পাইয়াছে। মানসী চিত্রা কাহিনী খেয়া প্রভৃতি অমর প্রতিভা প্রসূনে তুমি দেদীপ্যমান তাহাদের সমান বা উচ্চতর অলঙ্কার কোথা? এখনও last fruits from an old tree ফলিতেছে। তাহারও জন্য ······ congratulate করে— সব চেয়ে congratulate করে তোমার সেই চেষ্টার জন্য যাহাতে মানুষ রবি কবি রবির সদৃশ হয়।

গ্রন্থপরিচয়

এই সন্ধ্যাসংগীত ~~[illegible]~~ রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল ~~[illegible]~~ আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার ~~[illegible]~~ করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়োরাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষআবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

খ্রীস্টীয় ১৮৯৪ সালে (১২ অগস্ট্) ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

‘গেটের জীবনীটা তোর ভালো লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি— গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল তবু সে মানুষের সংশ্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল— হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্ট্ শিলার কাণ্ট্ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি— আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়।··· গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল, তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব? আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক— নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।’[১]

এই "যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ" রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) প্রথমযৌবনে বিশেষভাবে পাইয়াছেন প্রিয়নাথ সেনের (১৮৫৪-১৯১৬) মধ্যে। পূর্বোদ্ধৃত চিঠি লিখিবার কয়েক দিন পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে আর-একখানি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন—

'২ অগস্ট্ ১৮৯৪। প্রি[য়] বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিষ বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়— তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি— সুখে আছি। সমস্ত বড়ো চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাস্ট্রনমি প'ড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংশ্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না— নিজের মনের আদর্শ

অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।'২

বৎসরাধিক পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত আর-একখানি চিঠিতেও অনুকূল সঙ্গের জন্য আক্ষেপ ও প্রিয়নাথ সেনের প্রসঙ্গ আছে—

'৬ এপ্রিল ১৮৯৩। ··· এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে— কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করছে। কে বা জীবন ধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়— কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে— কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কেউ বা আমোদ করছে, কেউ বা আলস্য করছে, কেউ বা আপিসে যাচ্ছে— মানুষের মন বলে যে একটি প্রাণী আছে, সেটা যে শুকিয়ে শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই। আমি আজ সকালে প্রি[য়] বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।'৩

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের সাহিত্যসঙ্গীদের মধ্যে আত্মীয়গোষ্ঠীর বাহিরে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম প্রিয়নাথ সেনের। রবীন্দ্রনাথের সহিত কখন তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না; সম্ভবতঃ ১৮৮০ সালে প্রথমবার বিলাতবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রিয়নাথ সেনের প্রতিবেশী বিহারীলাল চক্রবর্তী, বিহারীলাল ঠাকুরবাড়িতেও বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন, পরিচয়ের সূত্র সম্ভবতঃ তিনিই। এই গ্রন্থে যে পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হইল তাহাতে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি ১৮৮২ সালের, প্রিয়নাথ সেনের প্রথম চিঠি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তারিখ ১৮৮৪। সাহিত্য-সাধনার এই প্রারম্ভযুগের কথা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১২) 'প্রিয়বাবু' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

‘এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮১] পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন,[৪] সন্ধ্যাসংগীতে [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮২] তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারী কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন; তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। এক দিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্য দিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস— এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।’[৫]

সাহিত্যের আকর্ষণে এই-যে সৌহার্দ্যের সূচনা, ক্রমশ তাহা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে কেবল যে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণসম্ভাবনার পথে যাত্রার প্রেরণা দিয়াছে তাহা নয়, সাংসারিক বহু তাপ

হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে— এই গ্রন্থে মুদ্রিত পত্রাবলীতে তাহার সাক্ষ্য বিকীর্ণ। এই চিঠিগুলিতে দেখি, প্রিয়নাথ সেন কেবল সাহিত্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহদাতা নন, বৈষয়িক ব্যাপারেও, ঋণমুক্তির চেষ্টায় তাঁহার অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা ; কবির জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে প্রধান উদ্‌যোক্তা। অপর পক্ষে দেখি, রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্য তিনি বহুমানের সহিত গ্রহণ করেন ; স্বীয় রচনাকর্মে তাঁহাকে উদাসীন কল্পনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বারংবার তাঁহাকে অনুযোগ করেন— সৌভাগ্যের দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সান্নিধ্যকামী, দুঃখের দিনে তাঁহার বাক্যে রবীন্দ্রনাথের পরম সান্ত্বনা।[৬]

প্রিয়নাথ সেন কেবল যে 'আনন্দের দ্বারা' রবীন্দ্ররচনার 'অভিষেক' করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা নহে, নিজে রচনাকুণ্ঠ হইলেও পাঠকের কাছে রবীন্দ্রকাব্যের প্রচার করিয়াছেন, নানা অভিঘাত হইতে রবীন্দ্ররচনাকে রক্ষা করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রথম রচনা মানসী কাব্যের আলোচনা, ১৩০০ পৌষ সংখ্যা 'সাহিত্যে' ইহা প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'চিত্রাঙ্গদা'কে 'দুর্নীতি-মূলক' ও 'অস্বাভাবিক' বলিয়া আক্রমণ করেন ('কাব্যে নীতি', সাহিত্য, ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ) তখন প্রিয়নাথ সেন দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগের বিস্তারিত উত্তর দেন ('চিত্রাঙ্গদা', সাহিত্য, ১৩১৬ কার্তিক)। কয়েক বৎসর পরে যখন শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধ (প্রবাসী, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ) উপলক্ষে বিতর্ক উপস্থিত হয়[৭] তখন প্রিয়নাথ সেন 'কাব্য-কথা' প্রবন্ধে (মানসী, ভাদ্র ১৩২২) 'কাব্যের উদ্দেশ্য' -আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মতের সমর্থন করেন।

প্রিয়নাথ সেনের এই-সকল প্রবন্ধ[৮] তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন -কর্তৃক সংকলিত "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি" (১৩৪০) গ্রন্থে সংগৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' লিখিয়া দিয়াছিলেন—

'প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকটসম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর যে-সব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে। আমি জানি তার কারণটি কত স্বাভাবিক। বাংলাসাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। তার পর অনেক দিন গেল কেটে, বাংলাসাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটল— পাঠকদের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সাহিত্যসমাজে, শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোরবয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্ব্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্ত্তী সামনের জিনিষ পিছিয়ে পড়ছে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের

স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহু কালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল; তবু তিনি যে কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্ত্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস। শান্তিনিকেতন ২৯ আষাঢ়, ১৩৪০'

---

১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৪৩

২ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৩৭

৩ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯০

৪ Among his [Preo Nath Sen's] constant visitors were Rabindranath Tagore, Behari Lal Chakravarti, Devendranath Sen and many others. It was in deference to his unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been reprinted.

—Nagendranath Gupta, 'Some Celebrities', *The Modern Review*, May 1927.

উক্ত 'early work' সম্ভবতঃ 'ভগ্নহৃদয়'।

৫ সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। ইঁহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় আমি বল লাভ করিয়াছিলাম— ইঁহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল।

—জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি, জীবনস্মৃতি (তৃতীয়-চতুর্থ সংস্করণ) পৃ ১৯৯

৬ এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে এরূপ চিঠিও গ্রন্থভুক্ত করা হইয়াছে, রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ বা কোনো-না-কোনো তথ্যের ইঙ্গিতবাহী বলিয়া। 'চিঠিপত্রে'র পূর্বানুসৃত নীতি-অনুসারে কোনো-কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অবশ্য বর্জিত হইয়াছে।

৭ এই প্রবন্ধে শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই।' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ, 'বাস্তব', সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২১ ; শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১ ; প্রমথ চৌধুরী, 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?', সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১।

৮ 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধেও প্রিয়নাথ সেন একটি প্রবন্ধ লেখা প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। ১১৮-১৯ পত্রের টীকায় (পরবর্তী পৃ ৩০৮) তাহার একটি অংশ মুদ্রিত হইল।

পত্র ১। ‘পাতার কুটীরে’— ১২৮৯ পৌষ-সংখ্যা ভারতী পত্রে প্রকাশিত প্রিয়নাথ সেনের কবিতা ‘গাথা’; ইহার সূচনা—

পাতার কুটীরে সরসীর ধারে ছিল গো তাহার বাস,
উজল নয়ন, ভুরু-ধনু বাঁকা আঁধার কেশের রাশ।

এই পত্রের তারিখ ১৮৮২ হইবে; যেহেতু পত্রে উল্লিখিত ‘অপেরা’ ‘কালমৃগয়া’, অভিনয়-তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২। বাল্মীকিপ্রতিভাও হইতে পারে এই অনুমানে পত্রশীর্ষে [? ১৮৮১] তারিখ মুদ্রিত হইয়াছে; তখনও ‘পাতার কুটীরে’র সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পত্র ২। সারস্বত সমাজ— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত পরিষৎ— প্রথম অধিবেশন, শ্রাবণ ১২৮৯; অপর একটি অধিবেশন, ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

‘বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।’

—জীবনস্মৃতি, ‘রাজেন্দ্রলাল মিত্র’ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ এই ‘সমাজে’র অন্যতর সম্পাদক ছিলেন; ইহার দুইটি অধিবেশনের বিবরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চান তাঁহাদের দ্রষ্টব্য— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কলিকাতা

সারস্বত সম্মিলন', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ ; রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' অধ্যায় ; মন্মথনাথ ঘোষ -প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', 'সারস্বত সমাজ' অধ্যায় ; শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। এই তালিকার সর্বশেষে উল্লিখিত রচনায় সারস্বত সমাজের পূর্বোল্লিখিত দুইটি অধিবেশনের বিবরণই উদ্ধৃত আছে— বিবরণ দুইটি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত।

পত্র ২, ১১, ১৩, ১৫, ১৯, ১০৩, ১০৬, ১৩৮। এই-সকল পত্রে উল্লিখিত নগেনবাবু রবীন্দ্রনাথের স্বল্পসংখ্যক যৌবনসুহৃদ্‌দের অন্যতম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১ ? - ডিসেম্বর ১৯৪০) ; প্রিয়নাথ সেনের সহিতও ইহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—

> Rabindranath Tagore was just twenty years old when I first met him and we have been friends ever since··· At that time he was a tall, slender young man with finely chiselled features. He wore his hair long, curled down his back and had a short beard.··· Two of his early lyrical works, *Sandhya Sangit* and *Prabhat Sangit*, had just been published. He was doing all the editorial work of the Bengali magazine *Bharati*, though the name of his eldest brother, Dwijendranath Tagore, appeared as Editor. I met Rabindranath frequently at the house of Preo Nath Sen, at his own house in Jorasanko and at our house in Grey Street. When Surendranath Banarjea came out of jail a meeting to welcome him was held in the grounds of

Free Church College as it was then called, on Nimtola Ghat Street. One of the speakers was Asutosh Mukerji, at that time a student in the Presidency College and afterwards famous as a Judge of the Calcutta High Court and Vice-Chancellor of the Calcutta University. With the enthusiasm which is becoming in a student, Asutosh spoke of Surendranath as "our illustrious leader". Rabindranath was also present by invitation and after the speech-making was over had to sing a song in response to persitstent calls.…

Rabindranath frequently read out his freshly composed poems to me. Once he brought one of his best known dramas, which he had just written, and we read it together. The final incident in the play did not seem to me to be in keeping with the spirit of the drama and I told him so. He said his Bara Dada was of the same opinion and he changed the concluding part before sending the book to the press. We had a sort of a friendly Literary Society which met occasionally at the houses of friends. We met once at Akrur Dutt Street in the house in which the Savitri Library was located and there was another meeting at Rabindranath's house. We used to have animated discussions on literary subjects, but the inner man was not neglected and ample refreshments were always provided.

Rabindranath was very generous, though at this time he had no independent income of his own and only received an allowance from his father.…

Men of genius have their eccentricities, but Rabindranath, brought up in an atmosphere of an admirable discipline, was free from all vagaries. His abstemiousness was almost Spartan. He has been all his life a very small eater and has never smoked. The ways of Bohemia had no attractions for him. For some months he would not wear a shirt and came several times to my house wearing only a dhuti and covering himself with a *chadur* of long cloth. He wore shoes very rarely and mostly went about in slippers, which he liked the better the quainter they were. I remember having sent him some Sindhi slippers from Karachi, but these proved to be so attractive that some one else deprived him of them.

Only once Bohemia tugged at him fiercely. Rabindranath conceived an idea of walking all the way from Calcutta to Peshwar by the Grand Trunk Road. He was quite excited and earnest about it. He said two or three friends would join him, they would travel very light, carry very little money with them and would march all day and take their chance for a resting place at night. The idea never actually materialised and gradually fizzled out, and the proposed great hike remained an unwritten epic.…

I was present as Rabindranath's marriage. He sent me a characteristic invitation in which he wrote that his intimate relative Rabindranath Tagore was to be married— "আমার পরম আত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবে।" The marriage took place in Rabindranath's

own house and was a very quiet affair, only a few friends being present.

—*The Modern Review*, May 1927

১৮৮৪ সালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ফিনিক্স' পত্রের সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করিয়া করাচীর অধিবাসী হন। ১২৯২ (১৮৮৫) সালে রবীন্দ্রনাথের 'কার্য্যাধ্যক্ষ'তায় 'বালক' নামে যে মাসিক পত্র এক বৎসরের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ মুদ্রিত হইয়াছিল— রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার চিঠি'র (বালক, শ্রাবণ ১২৯২) উত্তরে তাঁহার 'প্রবাসের চিঠি' (বালক, ভাদ্র ১২৯২)[১] ও 'করাচির চিঠি' (বালক, মাঘ ১২৯২)।

পত্র ১০৩, ১১৪, ১১৬। ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'প্রভাত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন (১৩০৭)। কাগজটি দীর্ঘায়ু হয় নাই ; এই পত্রিকার ফাইল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা নাই ; উল্লিখিত চিঠিগুলি হইতে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ রচনার দ্বারা কাগজটির যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়াছিলেন ; তাঁহার কয়েকটি ছোটোগল্প সম্ভবতঃ এই পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংবাদিক কর্মোপলক্ষ্যে পুনরায় কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং অতঃপর তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল বাংলার বাহিরেই অতিবাহিত হয়। এই সময় হইতে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সহিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সাক্ষাৎ সংযোগ ক্ষীণ হইয়া আসে ; কিন্তু কবি-প্রতিভার প্রতি, মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তিনি নানা রচনায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৩৩৯, বৈশাখ-সংখ্যা প্রবাসীতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

'স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য লিখিতে পরামর্শ দিয়া-

ছিলেন। মহাকাব্য রচনা করা রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু তিনি মহাকবি কিনা জগতের সকল সাহিত্যে সকল ভাষায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।’

রবীন্দ্রনাথের ৮৮টি কবিতা অনুবাদ করিয়া নগেন্দ্রনাথ *Sheaves* নামে ভারতবর্ষে (১৯২৯) ও আমেরিকায় (১৯৩২) প্রকাশ করেন ; তাহার ভূমিকায় তিনি মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে কবির প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা দেদীপ্যমান—

> Since at the moment we are concerned more with the man than with the poet, it may be fittingly asked whether apart from his great gifts Rabindranath has any claim to greatness. The answer is, strip him of his God-given dower of song, even as he himself has laid aside his man-made title of distinction, take away from him the treasure of wisdom garnered during the years and still he is great— great in his lofty character, great in the blameless purity of his life, great in his unquenchable love for the land of his birth, undeniably great in his deep and earnest religiousness and the faith that rises as an incense to his Maker. As a mere man he is an exemplar whom his countrymen, in all reverence and all humility, may well endeavour to follow.
>
> —*Sheaves*, 1929

পত্র ২, ৯৯, ১৪২ ১৪৩। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮), রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যৌবনসুহৃদ। ছিন্নপত্রের প্রথমেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত যে আটখানি চিঠি (১৮৮৫-৮৭) মুদ্রিত আছে তাহাতেই

উভয়ের অন্তরঙ্গতার পরিচয় সুপরিস্ফুট।[২] শ্রীশচন্দ্রর আগ্রহাতিশয়েই রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার (১৩০৮-১২) গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০৮) নিবেদনে লিখিয়াছেন—

'বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম।··· সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ 'মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্রসংগ্রহ' 'পদরত্নাবলী' (বৈশাখ ১২৯২) সম্পাদনপূর্বক প্রকাশ করেন।[৩] ১৩০১ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের ফুলজানি উপন্যাসের সুদীর্ঘ সমালোচনা -পূর্বক শ্রীশচন্দ্রের রচনার গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ করেন; প্রবন্ধটি পরে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়। ছিন্নপত্রে প্রকাশিত ৩০ এপ্রিল ১৮৮৬ তারিখের পত্রেও রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের রচনার গুণ বিচার করিয়াছেন —'আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত করে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি।' রবীন্দ্রনাথ কল্পনা (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যটি শ্রীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য উত্তরপুরুষেও প্রবহমাণ ছিল —শ্রীশচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণ রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে সন্তানস্নেহে বর্ধিত হইয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের প্রযত্নে বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মনিয়োগ

করেন ও আমৃত্যু সেই কর্মেই নিযুক্ত ছিলেন ; কন্যা রমা দেবী রবীন্দ্রসংগীতের একজন প্রধান ধারকরূপে শান্তিনিকেতনে সংগীতশিক্ষাদানে রত ছিলেন ; ইঁহাদের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সন্তানবিয়োগের বেদনার তুল্য হয়।

পত্র ৩। 'আমাদের সমালোচনী সভা'। পূর্বসংকলিত স্মৃতিকথায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'a friendly literary society'র বিবরণ দিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহা সেই সভা।

পত্র ৮-১১। রবীন্দ্রনাথের নাম 'ভারতী'র সম্পাদকরূপে প্রচারিত না হইলেও সম্পাদনভার প্রারম্ভপর্বে বহুলাংশে তাঁহাকেই বহন করিতে হইত ; দ্রষ্টব্য— নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত স্মৃতিকথা এবং শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'ভারতীর ভিটা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১।

পত্র ১২। তুলনীয় পূর্বোদ্ধৃত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথা।

পত্র ১৩। 'আমার কাব্যখানা'— সম্ভবতঃ 'ছবি ও গান'।

পত্র ১৬। 'দত্তরা, তাঁদের club-এর'— এই প্রসঙ্গে উক্ত 'দত্ত'দের ১৮ অক্রুর দত্তের গলির সাবিত্রী লাইব্রেরির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত -উল্লিখিত 'a friendly literary society'র কথাও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ এই লাইব্রেরির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে (১১ চৈত্র ১২৯০। ১৮৮৪) 'অকালকুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধ ও ষষ্ঠ অধিবেশনে (১১ ভাদ্র ১২৯১। ১৮৮৪) 'হাতে কলমে' প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪]

পত্র ২০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর মৃত্যুতে প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন (পৃ ২২৯), এই চিঠিখানি তাহার উত্তর, এইরূপ অনুমিত।

পত্র ২২। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠিতেই

'কুষ্ঠি'র প্রসঙ্গ আছে। প্রিয়নাথ সেন ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি প্রবন্ধে ফলিত জ্যোতিষের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন ; 'ফলিত জ্যোতিষ' নামে একটি প্রবন্ধে (প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে সংকলিত) প্রিয়নাথ সেন তদুত্তরে লেখেন— 'যদি কোন একখানি কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে পারি যে, তাহা জাতকের প্রকৃতি এবং জীবনের ঘটনাদির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিতেছে' 'তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিবেন, ফলিত জ্যোতিষকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর সঙ্গত।' অতঃপর রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমেই উল্লেখ না করিয়া তিনি এই প্রবন্ধে তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করেন—

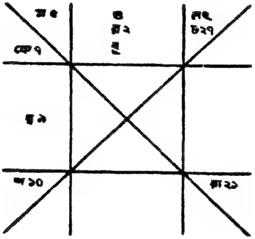

জাতকের লগ্ন মীন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতির গৃহ। মীন রাশি স্বচ্ছবর্ণ। সুতরাং জাতকের বর্ণ গৌর। সেখানে আবার গ্রহদিগের মধ্যে যে দুটি গ্রহ গৌরবর্ণ, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি, তাহাদের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। চন্দ্র মীনরাশিতেই অবস্থিত এবং স্বামীগ্রহ বৃহস্পতি লগ্নকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। তাহাতে বর্ণকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। রূপ এবং আকৃতি কান্ত, মনোহর এবং শোভন। স্বাস্থ্য এবং বল সম্বন্ধে ঐ কথাই খাটে। তিনি সুস্থদেহ এবং বলশালী।

তাঁহার বংশ সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং উজ্জ্বল আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত। নৈসর্গিক তেজে সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময় গ্রহরাজ সূর্য্য, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শুভগ্রহ বৃহস্পতি, উভয়েই তুঙ্গী হইয়া জাতককে অপর দিক হইতে উচ্চবংশ গৌরব এবং সুস্থ সুন্দর দেহ, উন্নত মানসিক বৃত্তিসকল দিয়াছে। লগ্ন সম্বন্ধে জাতকের এই বিশেষত্ব!

২য় স্থান বা ধনসম্বন্ধে জাতকের এই অসামান্য সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। তবে জাতক ধনহীন নহে। তিনি ধনী। তুঙ্গগ্রহ রবি দ্বিতীয়স্থ বলিয়া তাঁহাকে ধন দিয়াছে, কিন্তু ঐ রবি শত্রু ভাবের অধিপতি বলিয়া মাঝে মাঝে ধনের হানি হইয়া থাকে। ধনভাবস্থ বুধ ও শুক্র দুইটি সৌম্যগ্রহও তাঁহাকে ধন দিয়াছে, শুক্রগ্রহ উত্তরাধিকারীসূত্রে। কিন্তু তাহারা অস্তগত বলিয়া ধনের হানি করিয়াছে। পরন্তু ধনসম্বন্ধে জাতকের বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্র দ্বিতীয়স্থ থাকায় তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবলে ধন উপার্জ্জন হইবে।

৩য় বা ভ্রাতৃস্থান অশুভগ্রহ মঙ্গলযুক্ত এবং শনি কর্ত্তৃক পূর্ণ বীক্ষিত; তজ্জন্য অনুজ না হইবার সম্ভাবনা,— হইলেও তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবিত; অন্ততঃ জাতকের অব্যবহিত অগ্রজ এবং কনিষ্ঠের অমঙ্গল স্পষ্টতঃ সূচিত।

৪র্থ অর্থাৎ মাতৃস্থান কেতুযুক্ত। রাহু কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। স্বামীগ্রহ বুধ অস্তগত এবং ষষ্ঠাধিপতি রবি এবং মরণাধিপতি শুক্রযুক্ত সুতরাং জাতক অল্প বয়সেই মাতৃস্নেহ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। তাঁহার বন্ধুত্ব-সৌভাগ্যও স্থায়ী নয়। একাধিক বন্ধুর সহিত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বা অপ্রীতি ঘটিতে পারে।

৫ম স্থানে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়। "বুদ্ধি প্রবন্ধাত্মজ মন্ত্রবিদ্যা। মুনিঋষিগণ মানসপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের কল্পনা একই স্থানে

করিয়াছেন। এই ভাবে জাতকের অসামান্য সৌভাগ্য। ৫ম স্থান কর্কটরাশি, সৌম্যগ্রহ চন্দ্রের গৃহ এবং চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত। সুতরাং ৫ম স্থান "সৌম্য স্বামী যুতেক্ষিত" বলিয়া জাতকের বিদ্যাবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কর্কটরাশি বৃহস্পতির তুঙ্গ বা সর্ব্বোচ্চস্থান। সে কারণে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গরীয়সী। সেই বৃহস্পতি আবার লগ্নাধিপতি হইয়া পঞ্চমে অবস্থিত; সুতরাং আজন্ম বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানচর্চ্চায় রত এবং তাহাতে অসীম এবং অসামান্য সৌভাগ্যশালী। এখনও শুভপ্রভাবের শেষ হয় নাই। পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র লগ্নগত। একেত' "লগ্ন-চাঁদা বেদ বাখানে", তাহাতে এ স্থানে লগ্ন এবং পঞ্চম ভাবে বিনিময়। ইহা একটি অত্যন্ত **দুর্লভ** এবং অমৃততুল্য যোগ। পঞ্চমভাবে এতগুলি শুভযোগ হাজার, দশহাজার বা লক্ষেও ঘটে না। জাতকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একটি কথায় এবং কেবলমাত্র একটিমাত্র কথায় দেওয়া যাইতে পারে; তাহা প্রতিভা—অসাধারণ প্রতিভা। এবং লগ্নস্থ চন্দ্র তাঁহাকে সুন্দর এবং অনন্য সাধারণ কল্পনাশক্তি দিয়াছে।

৭ম অর্থাৎ জায়াভাবে তাদৃক্ সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। জায়াভাব গ্রহশূন্য— স্বামীদৃষ্টি বর্জ্জিত। এবং সৌম্য গ্রহদিগের মধ্যে কেবলমাত্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পাদ দৃষ্ট। যেমন জায়াভাব জায়াধিপতির দৃষ্টি রহিত — জায়াকারক গ্রহ শুক্রেরও দৃষ্টিরহিত। এবং জায়াধিপতি এবং জায়াকারক গ্রহ, উভয়েই অস্তগত। অধিকন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থানহেতু জায়া-হানি সূচিত। এবং শুক্র মরণাধিপতি হইয়া জায়াপতি বুধের সহিত যুক্ত। এই সকল প্রবল কারণে জাতক দাম্পত্যসুখ বহুদিন ভোগ করিতে পারেন নাই।

৯ম বা ভাগ্যস্থান উৎকৃষ্ট। স্বামীগ্রহ মঙ্গল এবং সৌম্যগ্রহ বৃহস্পতি

কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। সুতরাং জাতক ভাগ্যবান। অধিকন্তু ভাগ্যস্থান সর্ব্বগ্রহ বীক্ষিত বলিয়া জাতকের ভাগ্যের পরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে।

১০ম, কর্ম্ম এবং যশের স্থান। ইহা পরীক্ষা করিয়াই এই কোষ্ঠীর সাধারণ বিচার শেষ করিব। ১০ম স্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্র, ধনুরাশি এবং যদিও উহা স্বামীগ্রহের দৃষ্টি বঞ্চিত— কিন্তু অপর সমস্ত গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার কারণ শুভ-ফল-সূচক। পরন্তু ১০ম ভবননাথ বৃহস্পতি তুঙ্গী এবং ত্রিকোণস্থিত বলিয়া জাতক প্রসিদ্ধ "ক্ষেত্রসিংহাসন" যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতকের বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ করিবার কথা। তবে সে স্থানে রাহু অবস্থিত এবং বৃহস্পতির দৃষ্টি নাই বলিয়া সময়ে সময়ে জাতকের অপযশ এবং অখ্যাতি ঘটে।

এই ১০ম স্থানে পিতৃ-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। জাতকের পিতা পরম ধার্ম্মিক উন্নত এবং সাধুচরিত্র। এবং যে যে কারণে মধ্যে মধ্যে জাতকের যশের হানি হয়, সেই সেই কারণে তাঁহার পিতারও সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং শারীরিক এবং মানসিক কষ্টও পান।

এখন উপরে দর্শিত কোষ্ঠীবিচারে জাতকের যে জীবন স্থিরীকৃত, চিত্রিত, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলে কি না? আমি বলি, অত্যাশ্চর্য্য রূপে মিলে এবং ফলিত জ্যোতিষে আমার বিশ্বাসস্থাপন করিবার নানা প্রমাণের মধ্যে ঐ কোষ্ঠী তাহাদের অন্যতম।

এক্ষণে পাঠকের স্বভাবতঃই কৌতূহল হইতেছে যে, ঐ কোষ্ঠী-কল্পিত পুরুষ কে? কে সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সুন্দর, উচ্চবংশজাত, আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভার কিরীট মণ্ডিত, বরেণ্য পিতার পুত্র এবং বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি?— তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐ পিতৃদত্ত অনুপম সুন্দর নামের পূর্ব্বে রাজদত্ত গৌরবের কুৎসিত উপসর্গ-অত্যাচার "Sir Doctor" বসাইতে লেখনী সরে না।

পরিশেষে যখন ব্যক্তি ব্যক্ত হইল, তখন পাঠক সহজেই কোষ্ঠী-লিখিত নির্দ্দেশসকল জাতকের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

—প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি (১৩৪০) পৃ ২৩৭-৪৪

পত্র ২৫। 'অর্থাভাবে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হচ্চে'। তরুণ বয়স হইতে প্রবীণ বয়স পর্যন্ত প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিতেই অর্থাভাবের কথা, ঋণের ব্যবস্থার প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন 'আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না', তাহা অন্তত এই পরিমাণে সত্য যে, পিতার নির্দেশানুযায়ী পুত্রদিগকে নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তির মধ্যেই চলিতে হইত।[৫] রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত গ্রন্থাদিও সাধারণতঃ ঐ বৃত্তি হইতে নিজ ব্যয়েই প্রকাশ করিতে হইত, এরূপ অনুমান হয়। বলা বাহুল্য সেকালে তাঁহার গ্রন্থের বিক্রয় যথেষ্ট ছিল না। এই বৃত্তি সব সময় নিয়মিত কালে পাওয়া যাইত না বলিয়া বোধ হয়।[৬] রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বহু বই কিনিতেন, অনেক সময় অর্থাভাবে পাঠান্তে তাহা বন্ধুদের নিকট বিক্রয় করিতেন এরূপ জানা যায়।[৭] তিনি জোড়াসাঁকোতে নিজের যে স্বতন্ত্র বাড়ি তৈরি করান— পরবর্তীকালে যাহা 'লাল বাড়ি' নামে পরিচিত হয়— সেজন্য লোকেন্দ্রনাথ পালিতের নিকট ঋণ করিতে হইয়াছিল, ১১৩-সংখ্যক পত্র হইতে তাহা জানা যায়। জমিদারি-পরিচালনার ভার লইয়া তাহার সাময়িক নানা ব্যবস্থার জন্যও রবীন্দ্রনাথ অর্থচিন্তায় বিব্রত হইয়া থাকিতেন। প্রভূত ঋণের প্রয়োজন হইবার প্রধান কারণ বোধ করি কুষ্ঠিয়ার ব্যবসায়। ১৩০২ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে জমিদারি হইতে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'তুমি বোধ হয় জান, সম্প্রতি আমি লক্ষ্মীর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী— আমিও বাণিজ্য অবলম্বন করেছি। অতএব সম্প্রতি আমার কোথাও নড়বার উপায় নেই।'[৮]

এই ব্যবসায়ে বলেন্দ্রনাথ প্রধানভাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন— তাঁহার জীবিতকালেই 'বিষয়কার্য্য তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল'[৯], ১৩০৬ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিষয়কর্মের ব্যবস্থাপনার ভার রবীন্দ্রনাথের উপরেই বর্তিয়াছিল। 'বিষয়জালের কর্মফাঁসটি' 'কণ্ঠ হইতে সত্বর'[১০] নামাইবার আশা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই,[১১] দীর্ঘকাল ইহার জের চলিয়াছিল, বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিপত্র হইতেও তাহা জানা যায়— সেজন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্যও অর্থের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।

লোকেন্দ্রনাথ পালিতের ঋণ -পরিশোধ প্রসঙ্গে কয়েকখানি চিঠিতে বইয়ের কপিরাইট -বিক্রয়ের প্রস্তাব আছে। এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ' প্রবন্ধে আছে।

পত্র ২৬। এই পত্র সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবাস হইতে অক্টোবর মাসে লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। তুলনীয় ছিন্নপত্র, পত্র ২, সোলাপুর, অক্টোবর ১৮৮৫— 'এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব।' প্রিয়নাথ সেনের ২-সংখ্যক পত্র এই চিঠির উত্তরে লিখিত এইরূপ অনুমান হয়।

পত্র ২৭। বান্দোরা হইতে লিখিত। এই সময় মহর্ষি অসুস্থ হইয়া এখানে ছিলেন। দ্রষ্টব্য: অজিতকুমার চক্রবর্তী -প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ৬১৬-১৭।

পত্র ২৮। প্রিয়নাথ সেনের ৩-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৯। 'নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত' এই কবিতাটি

কড়ি ও কোমল কাব্যে কিছু পরিবর্তন-সহ মুদ্রিত আছে।

পত্র ৩০। 'তিন সমাজের একত্র উপাসনা'— ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধা বিভক্ত হইবার পরেও 'প্রধান আচার্য্য' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে সম্মিলিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য—

'ব্রাহ্মসম্মিলন। গত ৯ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। ঐ দিন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কয়জন বেদির আসন গ্রহণ করেন।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন।

পত্র ৩৫। উদ্ধৃত কবিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর -বিরচিত।

পত্র ৩৭। লালমোহন বিদ্যানিধির (১৮৪৫-১৯১৬) কাব্যনির্ণয় হইতে পারে।

পত্র ৪২। ব্রাহ্মধর্ম— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম্মঃ গ্রন্থ।

পত্র ৬১। নাসিক হইতে লিখিত এই পত্রের তারিখ ১৩ জুলাই ১৮৮৬, চিঠিতে এই তারিখ কেহ লিখিয়া রাখিয়াছেন, সম্ভবতঃ পোস্ট্ মার্ক্ হইতে। 'তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেচেন'— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত। প্রিয়নাথ সেনের ৪-সংখ্যক পত্র এই চিঠির উত্তরে লিখিত।

পত্র ৬২। জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৮৮৬।

পত্র ৬৩। 'মথুর সেনের কুঞ্জপথ'— প্রিয়নাথ সেনের পূর্বপুরুষ সুবিখ্যাত মথুরামোহন সেনের স্মৃতি -চিহ্নিত মথুর সেন গার্ডন লেন। এই গলিতে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি। এই প্রসঙ্গে ২৬-সংখ্যক পত্র (পৃ ১৮) দ্রষ্টব্য।

পত্র ৬৭। ‘দক্ষিণা’— নবরচিত লেখা পড়িয়া শোনানো।

পত্র ৭১। এই চিঠির উত্তরে প্রিয়নাথ সেনের ৫-সংখ্যক পত্র লিখিত।

পত্র ৭২। ভ্রমক্রমে পত্রখানিতে রবীন্দ্রনাথ ‘শ্রীপ্রিয়নাথ সেন’ স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেইরূপই ছাপা হইল। এই প্রসঙ্গে ৭৩-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৭৩, ৭৪, ৭৫। ‘সাহিত্যে’র কোন গল্পে’— এই-সকল উল্লেখের উপলক্ষ্য: ১৩০৬ বৈশাখ-সংখ্যা সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -রচিত গল্প ‘প্রণয়ের পরিণাম’। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ডে পত্র ৩ এবং তৎসংক্রান্ত গ্রন্থপরিচয়।

পত্র ৭৬। ‘চঞ্চল’— চাঁচলের জমিদার।

পত্র ৭৯, ৮৫, ৮৭, ৯০, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৬৯, ১৭৩। ‘বিনোদিনী’, চোখের বালি— দেখা যায় উপন্যাসখানি লেখা বৎসর-দুই ধরিয়া চলে, অবশেষে ১৩০৮-১৩০৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নভেম্বর ১৮৭০ - অগস্ট ১৯০৬)— এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ‘চিঠিপত্র’, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩; ‘বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা’, প্রদীপ, আশ্বিন-কাতিক ১৩০৬ এবং তৎসহ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য (বিশ্বভারতী পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় উদ্‌ধৃত)।

পত্র ৮৩। বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের প্রবন্ধ ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা প্রদীপ পত্রে মুদ্রিত ও প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে সংকলিত। প্রিয়নাথ সেনের ৬-সংখ্যক পত্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষ্যে লিখিত।

পত্র ৮৫। ‘ছেলেদের সংস্কৃত পড়া লইয়া ব্যস্ত আছি।’ তুলনীয় শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত প্রথমভাগ ‘সংস্কৃতপ্রবেশ’ গ্রন্থের সূচনায়—

‘ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইয়া পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

‘এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

‘তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।’[১৩]

—রবীন্দ্রনাথ, ‘সম্পাদকের নিবেদন’

পত্র ৯৫, ১২৯, ১৩২, ১৩৭। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুজ, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের ইনিই ব্যবস্থাপক ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে সম্পাদকও হন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ‘মজুমদার লাইব্রেরি’ বহু বৎসর রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রকাশক-রূপে ইঁহার পুত্র সুহাসচন্দ্র মজুমদারের নাম মুদ্রিত হইত।

পত্র ১০০। এই পত্রখানি ও সংলগ্ন কবিতা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : প্রিয়নাথ সেনের ৮, ৯ ও ১০-সংখ্যক পত্র, এবং ৮ ও ৯-সংখ্যক পত্র-ভুক্ত প্রিয়নাথ সেন-লিখিত কবিতা। ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রদীপ পত্রে প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুইটি যথাক্রমে ‘বসন্ত অন্তে’ ও ‘প্রত্যুপহার’ নামে পাশাপাশি মুদ্রিত হয়, এই সংখ্যার মুখপাতে রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতিও মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির এটি হয়তো ‘পুরানো পাঠ’, উৎসর্গ কাব্যের সংযোজনে এটি মুদ্রিত আছে; পত্রের সহিত প্রেরিত পাঠ

হইতে উহার অঙ্ক বহুশঃ স্বতন্ত্র।

পত্র ১০০, ১০২। 'ক্ষণিকার জন্য তাড়া লাগিয়ে হয়রান্ হলুম' 'ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পড়চি'— যাঁহারা ক্ষণিকার মুদ্রণ-পর্ব অথবা গ্রন্থমুদ্রণ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও রুচি সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের 'অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮।

পত্র ১০১। 'অলীকপ্রকাশের সমালোচনা'— প্রিয়নাথ সেন -লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু'র সমালোচনা, সাহিত্য, চৈত্র ১৩০৬। এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেনের ৮-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০২। 'প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা' ১৩০৭ সালের বৈশাখ আষাঢ় ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পরে প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে সংকলিত। এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেনের ৮-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০২। 'সাহিত্যে কবিতায় এবং আলেখ্যে[১৪] আমি চিত্র-বিচিত্রিত হয়ে উঠেছি'— বৈশাখ ১৩০৭ -সংখ্যা সাহিত্য পত্রের মুখপাতরূপে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের চারিখানি ছবি একত্র ছাপা হয়, ঐ সংখ্যায় প্রিয়নাথ সেন -রচিত[১৫] 'রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৩০৬ সালে প্রকাশিত/রচিত কাব্যচতুষ্টয় প্রসঙ্গে এই কবিতা।

পত্র ১০৭। এই চিঠি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকগুলি চিঠিতেই কন্যা বেলা বা মাধুরীলতা দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচিত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়; প্রিয়নাথ সেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিবেশী ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি এ বিবাহে উভয়পক্ষেরই বন্ধুকৃত্য করেন। নানা পারিবারিক বাধা-বিপত্তির আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই বিবাহ স্থির হয়; ১৩০৮ সালের ১ আষাঢ় এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

পত্র ১১০, ১১১, ১১২। দেবেন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের গাজিপুর-বাসকালে (১৮৮৮) কিভাবে তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ সেনের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়, সে কথা দেবেন্দ্রনাথ ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যা ভারতী পত্রে 'স্মৃতি' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' (১৩০০) দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন— 'কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কর-কমলে তদীয় ভক্তের এই প্রীতি-উপহার'। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যুপহার দেন 'গোলাপ-গুচ্ছ' (১৩১৯)— 'যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ঊষার আলোক-বন্যার মত চিত্তহারিণী, যাঁহার বাসন্তী-কবিতা গোলাপ ফুলের মত সৌরভ ও গৌরবময়ী, যিনি শ্রীহরির মোক্ষ-মন্দিরের পথে অপূর্ব্ব যাত্রী, ও ভক্তি-দেবী যাঁহার পথপ্রদর্শিকা, সেই সাহিত্য-সম্রাট, বন্ধুশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর-কমলে'।

দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কয়েকটি কবিতাও লিখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।

পত্র ১১১, ১১৩, ১২১, ১২৪। লোকেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'জীবনস্মৃতি'র 'লোকেন পালিত' অধ্যায়। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ও 'ক্ষণিকা' লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গীকৃত।

পত্র ১১৪। চিরকুমার সভা। এই পত্রে এবং অন্য অনেকগুলি চিঠিতে, প্রিয়নাথ সেনেরও অনেক চিঠিতে, ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহা প্রথমে ভারতী পত্রে ১৩০৭ সালের বৈশাখ-কার্তিক, পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় ও ১৩০৮ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

পত্র ১১৭। 'সমাজ প্রেস্ ওয়ালা'— আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস -পরিচালক। এক কালে এই প্রেসে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই ছাপা হইয়াছে।

পত্র ১১৮। ‘তুমি ক্ষণিকা সমালোচনা করচ শুনে আমি খুসি হলুম’ এবং
পত্র ১১৯। ‘আমার ক্ষুদ্র ক্ষণিকাটিকেও ভুলো না!’ প্রিয়নাথ সেনের ১১-সংখ্যক পত্রে এই সমালোচনার কথা উল্লিখিত এবং ১৪-সংখ্যক পত্রেও লিখিতেছেন— ‘ক্ষণিকার সমালোচনা অর্দ্ধেক লিখিত হইয়া স্থগিত আছে’। লেখাটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই মনে হয়; অসম্পূর্ণ জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে একাংশ উদ্‌ধৃত হইল[১৬]—

‘বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি— কবিতার দানসাগর করিতে বসিয়াছেন। এই কয় মাসের মধ্যে রবীন্দ্রবাবু ৫খানি কবিতাপুস্তক বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট যে বাঙ্গালী ছাড়া পৃথিবীর অপর জাতি সকলে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বই পড়ে না এবং এই বঙ্গীয় কবির অসাধারণ প্রতিভার [পরিচয় পায় না]··· তাহা হইলে এই বঙ্গীয় কবির গ্রন্থাবলী পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিত। এবং বাঙ্গালা ভাষা ধন্য ধন্য হইত।··· রোস্তাঁ নামক ফরাসী কবি একখানি নাটক লিখিয়া পৃথিবীর [চারি] মহাদেশে আপনার নাম জাহির করিলেন। কারণ ফরাসী ভাষা···। তাঁহারা এই বাঙ্গালী কবির মহীয়সী প্রতিভা এবং তাঁহার [অমর-] ভোগ্য কবিতার পরিচয় পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য ধন্য মনে করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা একদিন বাঙ্গালাদেশ ছাড়া অন্যত্র আদৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ভাষার সাহিত্য রবিবাবুর [ন্যায়] প্রতিভার দ্বারা পুষ্ট ও অলঙ্কৃত সে ভাষার গৌরব কেবল স্বদেশে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে কারণে আমরা ফরাসী ভাষা শিক্ষা করি সে কারণেই ফরাসী জাতি একদিন আমাদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবে।’

প্রিয়নাথ সেন জীবিতকালেই তাঁহার আশা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল

হইবার সূচনা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। ‘ক্ষণিকা’-প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে তাঁহার ৮-সংখ্যক পত্রের অন্তর্গত।

পত্র ১১৮। ‘প্রভাতকুমারের কাছ থেকে … তাগিদ এসেছে’। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এক সময় ‘ভারতী’র সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন— দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিত-মালার অন্তর্গত ‘প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়’ গ্রন্থে ‘বিলাত-যাত্রা’ অধ্যায়।

পত্র ১১৯। ‘প্রবোধের **Arthurian Legends**’— প্রিয়নাথ সেনের ১২-সংখ্যক পত্রে এই প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

পত্র ১২০, ১২৩, ১৩৪, ১৬৬। ‘সন্তোষের প্রমথবাবু’ ‘প্রমথবাবু’। কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর (১৮৭২-১৯৪৯) সহিত আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সৌহার্দ জন্মিয়াছিল। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী তাঁহার ‘পদ্মা’ (১৩০৫) কাব্য ‘মাতৃভূমির প্রিয় কবি, বরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়’কে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ ‘কণিকা’ কাব্য (১৩০৬) তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৩০৮ বৈশাখ -সংখ্যা প্রদীপে প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে ‘কবি-সম্ভাষণ’ নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন।

পত্র ১২১। চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকের নিকট সামাজিক বিষয়ে ও ধর্মমতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ রূপেই পরিচিত ; এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাও নহে। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নানা মতামতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বারংবার লেখনী ধারণ করিয়াছেন (‘হিন্দুবিবাহ’, ভারতী ও বালক, ১২৯৪ আশ্বিন ; ‘আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত’, সাধনা, ১২৯৮ পৌষ ; ‘সাময়িক

সাহিত্য সমালোচনা', সাধনা, ১২৯৮ ফাল্গুন ; 'কড়ায়-কড়া কাহন-কানা', সাধনা, ১২৯৯ পৌষ ; 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব', সাধনা, ১২৯৯ আষাঢ় ; 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা', সাধনা, ১২৯৯ ভাদ্র আশ্বিন —ইত্যাদি)— এই-সকল বিতর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'চন্দ্রনাথ বাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে, নিতান্ত কর্তব্য জ্ঞান না করিলে, ও তাঁহাকে বর্তমান কালের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোনো প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথ বাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্তব্য পালন করিয়াছি।'

এই-সকল বাদবিতণ্ডা সত্ত্বেও, চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটি গভীর বন্ধন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথ বসুর চিঠিপত্র[১৭] হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

পত্র ১২৮, ১২৯। ' 'রেণু' গ্রন্থের ··· লেখিকা', 'রেণু-রচয়িত্রী'— প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)। 'রেণু' কাব্যগ্রন্থ ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'লেখন' প্রবন্ধে (চতুর্দশখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী, পৃ ৫২৭-৩২) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে 'প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতার' সাধুবাদ দিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল—

'প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং যে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

আর, সেই ফুলটি যুথী মালতী জাতের, পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায়, সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্য ঘোষণাচ্ছলে বাংলা ভাষার মর্যাদা কোথাও অতিক্রম করে নি ; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।

'বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম।'

—রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা : চম্পা ও পাটল

'রেণু' সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার ১৬-সংখ্যক পত্রে (পৃ ২৭০-৭২) ব্যক্ত হইয়াছে।

পত্র ১৩০। জগদীশ বসু। আলোচ্য বিষয় এবং রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রসঙ্গ 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পত্র ১৩১। 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯), পৌরাণিকী (১৮৯৭)—কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) কবিতা সম্বন্ধে ১৮৯৩ সালে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন ছিন্নপত্রাবলীর ৮০-সংখ্যক পত্রে তাহা মুদ্রিত আছে। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার ১৬ ও ১৭ -সংখ্যক পত্রে বিবৃত।

পত্র ১৩৯। এই পত্রে উল্লিখিত 'প্রবাসী' কবিতা ('সব ঠাঁই মোর ঘর আছে' ইত্যাদি) প্রবাসী পত্রের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০৮)

প্রকাশিত হয়, রচনাশেষে তারিখ ছিল ৩ ফাল্গুন ১৩০৭। পরে উৎসর্গ কাব্যে সংকলিত।

পত্র ১৫০। 'তোমার কবিতাটি'— দ্রষ্টব্য প্রিয়নাথ সেনের 'কত দিন', প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৮।

পত্র ১৬১, ১৬২। এই সময় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পত্র ১৭২। 'একজন দরিদ্র ব্যক্তি'— মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)। মোহিতচন্দ্র পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও যোগদান করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধানিবেদন করেন 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৩১৪) গ্রন্থে তাহা সংকলিত হয়। ১৯০৩-০৪ সালে ইঁহার সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী নূতন ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। ইঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ শ্রাবণ মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্র -সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৭৪। 'সুসময় দুঃসময় জানবার জন্যে কোন কৌতূহল আর রাখি নে'— যে মধ্যমা কন্যার পীড়ার আরোগ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগ আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন (পত্র ১৭০-৭৩) এই সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র ১৮০। চিত্রা— *Chitra* (1913), চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ।

সংযোজন

পত্র ৫। সখিসমিতি— স্বর্ণকুমারী দেবী -কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহিলাসভা। 'সখীসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে' রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' (১২৯৫) গ্রন্থ 'উক্ত সমিতি-কর্তৃক মুদ্রিত' হয়।

প্রিয়নাথ সেনের লেখা অধিকাংশ পত্রের প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র-পত্রাবলীর পরিচয়ক্রমেই উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে।—

পত্র ১৭। ১৩০৭ আশ্বিন-সংখ্যা প্রদীপ পত্রের এই-সকল রচনা এই পত্রে উল্লিখিত—

শুভদৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ছোটোগল্প; প্রমথনাথ রায় চৌধুরী -লিখিত গীতিকা কাব্যগ্রন্থের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -লিখিত সমালোচনা; শিবনাথ শাস্ত্রীর 'কবি ও কাব্য' প্রবন্ধ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কুসুমে কণ্টক' কবিতা।

পত্র ১৮। 'তোমার 'মন্দ্র' সমালোচনা'— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মন্দ্র কাব্য-গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রশস্তি, বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯। পুর্বোল্লিখিত 'কুসুমে কণ্টক' কবিতা সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন— 'শেষ করিবার পুর্ব্বে "কুসুমে কণ্টক" কবিতাটি সম্বন্ধে আমরা আপত্তি জানাইয়া রাখিতে চাই। ইহা বিশুদ্ধ কণ্টকমাত্র, ইহার মধ্য হইতে সুকোমল সুন্দর কুসুমটিকে কই দেখা যাইতেছে! কবির নিকট হইতে আমরা এরূপ সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশা করি নাই।'

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলনকালে এই অংশ ও অপর কোনো-কোনো অংশ বর্জিত।

পত্র ১৯। রবীন্দ্রনাথের ২৮ এপ্রিল ১৯০৪ তারিখের ১৭৭-সংখ্যক পত্রের উত্তর— মে মাসেও লেখা হইতে পারে।

পত্র ২০। কার্তিক ১৩২০। এই পত্রে May Sinclair[১৮]-এর 'The Gitanjali: or Song-offerings of Rabindra Nath Tagore' প্রবন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ The North American

Review পত্রের ১৯১৩ মে সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যে সিন্‌ক্লেয়ারের যে চিঠিখানি এই পত্রে উল্লিখিত নিম্নে তাহা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত *On the Edges of Time* গ্রন্থ হইতে অংশতঃ পুনর্মুদ্রিত হইল—

July 8, 1912.

Dear Mr. Tagore,

It was impossible for me to say anything to you about your poems last night, because they are of a kind not easily spoken about. May I say now that as long as I live, even if I were never to hear them again, I shall never forget the impression that they made. It is not only that they have an absolute beauty, a perfection as poetry, but that they have made present for me forever the divine thing that I can only find by flashes and with an agonizing uncertainty. I don't know whether it is possible to *see* through another's eyes, I am afraid it is not ; but I am sure that it is possible to believe through another's certainty.

There is nothing to compare with what you have done except the poem of St. John of the Cross : 'The Dark Night of the Soul' and you surpass him and all Christian poets of mysticism that I know by that sense of the Absolute, that metaphysical insight. It, to my mind, Christian mysticism almost completely lacks. It deals too much in sensual imagery, it is not sufficiently austere and subtle— it has not really *seen through* the illusion of the world. And therefore its passion is not and cannot be entirely pure.

At least so it has always seemed to me, and that is why finding this imperfection in it, it sends me away still unsatisfied.

Now it is satisfaction— this flawless satisfaction— you gave me last night, you have put into English which is absolutely transparent in its perfection things it is despaired of ever seeing written in English at all or in any Western language.…

With kind regards,

Sincerely yours
May Sinclair.

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সহিত 'আলাপ-আলোচনা'য়, উত্থাপিত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'বাংলা গীতাঞ্জলির কবিতা ইংরেজিতে আপন মনেই তরজমা করেছিলুম। শরীর অসুস্থ ছিল, আর কিছু করবার ছিল না। কোনোদিন এগুলি ছাপা হবে এমন স্পর্ধার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। তার কারণ, প্রকাশযোগ্য ইংরেজি লেখবার শক্তি আমার নেই— এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।

'খাতাখানা যখন কবি য়েট্‌সের হাতে পড়ল তিনি একদিন রোদেন্‌স্টাইনের বাড়িতে অনেকগুলি ইংরেজ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসজ্ঞকে তার থেকে কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাবেন ব'লে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি মনের মধ্যে ভারি সংকুচিত হলেম। তার দুটি কারণ ছিল। নিতান্ত সাদাসিধে দশবারো লাইনের কবিতা শুনিয়ে কোনোদিন আমি কোনো বাঙালী শ্রোতাকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখি নি। এমন কি, অনেকেই আয়তনের খর্বতাকে কবিত্বের রিক্ততা

ব'লেই স্থির করেন। একদিন আমার পাঠকেরা দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, ইদানীং আমি কেবল গানই লিখচি ; বলেছিলেন— আমার কাব্যকলায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব, রচনা তাই ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে বচনের দিকে ছোটো হয়েই আসচে।

'তার পরে আমার ইংরেজি তরজমাও আমি সসংকোচে কোনো কোনো ইংরেজি-জানা বাঙালী সাহিত্যিককে শুনিয়েছিলেম, তাঁরা ধীর গম্ভীর শান্তভাবে বলেছিলেন মন্দ হয় নি, আর ইংরেজি যে অবিশুদ্ধ তাও নয়। সে-সময়ে এণ্ডরুজের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

'য়েট্‌স সেদিনকার সভায় পাঁচ সাতটি মাত্র কবিতা একটির পর আর একটি শুনিয়ে পড়া শেষ করলেন। ইংরেজ-শ্রোতারা নীরবে শুনলেন, নীরবে চ'লে গেলেন— দস্তুর পালনের উপযুক্ত ধন্যবাদ পর্যন্ত আমাকে দিলেন না। সে-রাত্রে নিতান্ত লজ্জিত হয়েই বাসায় ফিরে এলাম।

'পরের দিন চিঠি আসতে লাগল। দেশান্তরে যে-খ্যাতি লাভ করেছি তার অভাবনীয়তার বিস্ময় সেই দিনই সম্পূর্ণভাবে আমাকে অভিভূত করেচে।'

—'আলাপ-আলোচনা', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪

Gitanjaliর Special Edition— লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি -কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ (১৯১২)। ইহা মাত্র ৭৫০ কপি মুদ্রিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শুধু ২৫০ কপি বিক্রয়ার্থ ছিল।

ডাকঘরের Irish Edition, ইহাও বিশেষ সংস্করণ ; মোট ৪০০ কপি ছাপা হয়, প্রত্যেকটি কপি ক্রমিক-সংখ্যা-যুক্ত। Gitanjali'র ন্যায় কবি য়েট্‌সের ভূমিকা-সংবলিত।

The Gardener, The Crescent Moon— ১৯১৩ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নানা বাংলা কাব্যগ্রন্থ হইতে নানা কবিতার অনুবাদ -সংগ্রহ।

পত্র ২১। রবীন্দ্রনাথের নাইট্‌হুড-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এই পত্র লিখিত।

১ এই চিঠি দুটি 'দেশ' পত্রের ২৪ শ্রাবণ ১৩৬৫ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়, ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২ অপিচ দ্রষ্টব্য শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্র— বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯, তিনখানি চিঠি; বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮, চারিখানি চিঠি।

৩ ইহার অংশতঃ বর্জিত ও বহুশঃ পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণের 'কপি' রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে (৩ ভাদ্র ১৩১০) জানা যায়। দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮, পৃ ৫।

৪ দ্রষ্টব্য : 'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত-প্রবন্ধাবলী'। শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত -কর্তৃক প্রকাশিত। আশ্বিন ১২৯৩।

৫ দ্রষ্টব্য : নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পূর্বোদ্‌ধৃত স্মৃতিকথা।

৬ দ্রষ্টব্য : বর্তমান গ্রন্থের ৬৬-সংখ্যক পত্র।

৭ দ্রষ্টব্য : বর্তমান গ্রন্থের ৬১-সংখ্যাক পত্র।

৮ 'চিঠিপত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮।

৯ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা', প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬।

১০ এই গ্রন্থের ৮১-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

১১ ব্যবসায়ের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ ৪৫১-৫৩।

১২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮০৭ শক। এই সম্মিলনের বিশদ বিবরণও আছে।

১৩ দ্রষ্টব্য : শ্রীকানাই সামন্ত -লিখিত ‘ভাষাশিক্ষা ও ব্যাকরণ’, বিশ্বভারতী পত্রিকা. শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ শক।

১৪ আলেখ্যপ্রকাশ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেনের ৭-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

১৫ রচনাশেষে স্বাক্ষর নাই, সূচীপত্রে রচয়িতার নাম আছে।

১৬ পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ক্লেশসাধ্য। অনুমিত পাঠ, [ ] বন্ধনীমধ্যে নিবিষ্ট। কয়েক স্থলে পড়া যায় নাই।

১৭ চন্দ্রনাথ বসুর রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ‘চিঠিপত্র’, সবুজপত্র (আশ্বিন ১৩২৫) ও বিশ্বভারতী পত্রিকা। চন্দ্রনাথ বাবুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ -সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান-রূপে চন্দ্রনাথ বসু বাংলা বই সম্বন্ধে রিপোর্টে (১৮৮১-৮৪) রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অনেকগুলি গ্রন্থের আলোচনা করেন। দ্রষ্টব্য : শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় -সংকলিত ‘সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা’, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯।

১৮ Sinclair, May (1870 ? - 1947). Distinguished and popular English novelist, a keen psychologist and experimenter in method.... Also successful in the writing of uncanny stories. Her *The Dark Night* (1924) is a novel in verse.

—Reader's Encyclopedia.

পত্র ৮ ॥ *Mademoiselle de Maupin* (1835), Theophile Gautier -লিখিত। ২৫ ও ৩২ -সংখ্যক পত্রেও এই গ্রন্থ উল্লিখিত।

১৩৩-সংখ্যক পত্রে ইঁহার *Capitane Fiacase* (1861-63) গ্রন্থ উল্লিখিত।

সাধনা পত্রে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা লইয়া যে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় (সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮ - ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯) তাহার কোনো কোনো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। দ্রষ্টব্য : সাহিত্য গ্রন্থে (প্রচলিত সংস্করণ) 'সাহিত্য (পত্রোত্তর)' ও 'সাহিত্যের প্রাণ'।

পত্র ১০ ॥ 'Forman's Shelley'— H. B. Forman (1842-1917) -কর্তৃক সম্পাদিত শেলির গ্রন্থাবলী।

পত্র ২১ ॥ 'Rossetti's Review of Swinburne's Poems and Ballads'— *Swinburne's Poems and Ballads : a Criticism* (1866), W. M. Rosetti (1829-1919) -কর্তৃক সম্পাদিত।

পত্র ২৩ ॥ 'Grierson-এর বিদ্যাপতি'— G. A. Grierson (1851-1941) -লিখিত *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy and Vocabulary* (1882)

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন— তাঁহার ব্যবহৃত, তাঁহার কৃত ও বহু-টীকাদি-সম্বলিত গ্রন্থখানি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। 'রবীন্দ্রনাথ ··· এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙ্‌লায় গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সকল স্থলে সম্পূর্ণ পদ্যে নাই—

কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অনুবাদ আছে।' পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদগুলি প্রবাসী পত্রে (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৪৮) প্রকাশ করেন।

পত্র ৮৬ ॥ 'Mrs. Meynell-এর Colour of Life এবং Childern'—*Colour of Life* (1896) এবং *Children* (1896), Mrs. Alice Meynell -লিখিত গ্রন্থদ্বয়।

পত্র ৮৭ ॥ 'ম্যাক্‌স্‌মুলারের সে বইখানা'।

কোন্ বইয়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা চলে না। তবে এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ম্যাক্‌স্‌মুলর তাঁহার গ্রন্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য : অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ৬১২।

পত্র ৯৬ ॥ *A History of the Ottoman Poetry*, 6 vols. (1900-09), E. J. Wilkinson Gibb (1857-1901) -লিখিত।

পত্র ৯৭, ৯৮ ॥ Herbert Spencer (1820-1903)

হার্বার্ট স্পেন্সরের রচনা এক সময় রবীন্দ্রনাথ অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন ; তাহার প্রথম ফল 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (হর্ব্বার্ট স্পেন্সরের মত)', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক হার্বার্ট স্পেন্সরের বিভিন্ন গ্রন্থ -পাঠের উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ও 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পত্র ৯৮, ১২৫ ॥ Henry Harland (1861-1905)— এই আমেরিকান লেখকের *The Cardinal's Snuffbox* (1900) ও অন্য কতকগুলি গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত।

পত্র ৯৯, ১০৭, ১১৯, ১২২ ॥ Moliere : Jean-Baptiste Poquelin

(1622-73), মোলিয়েরর ছদ্মনামেই বিখ্যাত।

১১৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'যশস্বী জুর্দ্দ্যা' (Jourdain) তাঁহার *Le Bourgeois Gentilhomme* গ্রন্থের চরিত্র। ১২২-সংখ্যক পত্রে মোলিয়েরের অপর একখানি গ্রন্থ *L' Avare* (1668) উল্লিখিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমোক্ত গ্রন্থখানির অনুবাদ করিয়াছিলেন 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) নামে। তিনি মোলিয়ের-কৃত অন্যান্য কোনো কোনো নাটকেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। মোলিয়েরের জন্মত্রৈশাতাব্দিক উৎসব (১৯২২) উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে একটি সভা হয়। সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্র ১২০, ১২৩॥ Mark Twain -এর (1835-1910) প্রকৃত নাম Langhorne Clemens। ইঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লিখিত— *Innocents Abroad* (1869), *The Choice Humorous Works of Mark Twain* (1873), *A Tramp Abroad* (1880), *Mark Twain's Library of Humour.*

পত্র ১৩১, ১৩৩। *What is Art* (1897-98), Leo Tolostoy (1829-1910) -লিখিত।

এই প্রসঙ্গে টলস্টয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কোনো উক্তির নির্দেশ করা হইল— ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৮০ : *Anna Karenina* প্রসঙ্গ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃ ৩৬ : *Confession* প্রসঙ্গ। শিক্ষা গ্রন্থের 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে শিক্ষানীতি ও সরকার প্রসঙ্গ।

পত্র ১৩১॥ *Le Crime de Sylvestre Bonnard* (1881) Anatole France (1844-1924) -লিখিত। আনাতোল ফ্রাঁসের

প্রকৃত নাম Jacques Anatole Francois Thibault.

পত্র ১৩৩ ॥ *Jack* (1876) গ্রন্থ Alphonse Daudet (1840-97) -লিখিত।

পত্র ১৩৩ ॥ *Sister Philomene* (1861), Edmond de Goncourt (1822-96) ও Jules de Goncourt (1830 1870) -লিখিত।

পত্র ১৩৩ ॥ *Pierre and Jean* (1888), Guy de Maupassant (1850-93) -লিখিত।

পত্র ১৩৩ ॥ *No Relation*। উল্লেখ দেখিয়া মনে হইতে পারে এখানিও মোপাসাঁ-রচিত। Henri Hector Malot (1830-1907)- লিখিত *No Relations* গ্রন্থ (১৮৮০) হওয়াই সম্ভব।

পত্র ১৩৬ ॥ 'Amateur Rose Gardener' সম্ভবতঃ Landolicus -লিখিত *Indian Amateur Rose Gardener* (1881) গ্রন্থ।

পত্র ১৭৬ ॥ *Idle Days in Patagonia* (1893), W. H. Hudson (1841-1922) -লিখিত।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার *On the Edges of Time* (1958) গ্রন্থে (পৃ ১২০-২১) হাড্‌সনের লেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ, বিলাতে হাড্‌সনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। হাড্‌সনের *Men, Books and Birds* (1925) গ্রন্থে (পৃ ২৩৮) রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকার ও কবির সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উল্লিখিত আছে।

পত্র ১৭৮ ॥ *A Literary History of Persia*, 2 vols. (1902-06), E G Browne (1862-96) -লিখিত।

ব্যক্তি-পরিচিতি

যাঁহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণপ্রায় উল্লেখ আছে তাঁহাদের নাম এই তালিকাভুক্ত করা হয় নাই ; যেমন, কবি দেবেন্দ্র সেন, জগদীশ বসু ইত্যাদি। এই তালিকায় উল্লিখিত অনেকের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো-কোনো ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহ করা যায় নাই।

অক্ষয়বাবু— অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ?

অবিনাশ— অবিনাশ চক্রবর্তী, বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র, জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

আশু— আশুতোষ চৌধুরী

উপেন্দ্রবাবু— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ঋষি, ঋষিবর— ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

কামিনী দেবী— কবি কামিনী রায়

গুরুদাস— গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ পুস্তক- প্রকাশক ও বিক্রেতা

চঞ্চল— চাঁচলের রাজা

চন্দ্রনাথবাবু— চন্দ্রনাথ বসু

ছোটবৌ— পত্নী মৃণালিনী দেবী

জর্জ ইউল— ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি

দীনেশবাবু— দীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিপু— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ

নদিদি— স্বর্ণকুমারী দেবী

নগেনবাবু— নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্র (পৃ ৭৭), 'আমার শ্যালক'— নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

নর্টন, ইয়ার্ডলে নর্টন— প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী

নাটোর— নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়

নীতু— নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পণ্ডিতমহাশয়— শিবধন বিদ্যার্ণব

প্রবোধ, প্রবোধচন্দ্র— প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক

প্রভাতকুমার— ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রমথবাবু, 'সন্তোষের প্রমথবাবু'— প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ময়মনসিং
জেলায় সন্তোষের জমিদার ও কবি

বড়দাদা— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলু— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যার্ণব— শিবধন বিদ্যার্ণব

বিহারীবাবু— বিহারীলাল চক্রবর্তী

বেলা— জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা

বৈকুণ্ঠবাবু— বৈকুণ্ঠনাথ দাস, প্রদীপ মাসিক পত্রের প্রকাশক

মহিম— ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর

মেজদাদা— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদু চাটুয্যে— জমিদারির কর্মচারী

রথী— জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজনারায়ণবাবু— রাজনারায়ণ বসু

রাধারমণবাবু— রাধারমণ কর

রামানন্দবাবু— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রেণুকা — রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা

রেমিনি— **Edward Remenyi,** বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় বেহালাবাদক

লোকেন— লোকেন্দ্রনাথ পালিত
শরৎ— শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠ জামাতা
শৈলেশ— শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীশবাবু— শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সত্য— ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সমাজপতি— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সরলা— ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণী
সাহিত্যসম্পাদক— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সুরেন— সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরেশবাবু— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
Sophiaর সম্পাদক— ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

সংযোজন। পূর্ববর্তী পৃ ৩০৩-০৪

পত্র ৬৬। 'আমার একখানা নাটক'— রাজা ও রানী। 'এক মাসের অনধিক কালে সোলাপুরে রচিত' : ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ ২।

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্র-পত্রাবলীর অধিকাংশই প্রিয়নাথ সেনের পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছে। কয়েকখানি মূল পত্র শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। শ্রীপ্রমোদনাথ সেন অনুমান করেন রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি রক্ষিত হয় নাই।

গ্রন্থ বহুদূর মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর যে চিঠিগুলি সংগৃহীত হয়, তাহা 'সংযোজন' অংশে প্রকাশিত হইল।

প্রিয়নাথ সেন -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত যে কয়খানি চিঠি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে সেগুলিও ছাপা হইল। এইগুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অনুধাবন করিবার সহায়তা হইবে, আশা করা যায়। ইহার কয়েকখানি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। অপর চিঠিগুলির খসড়া বা প্রতিলিপি শ্রীপ্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত। উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নাথ সেনের সর্বশেষ চিঠিখানি অসম্পূর্ণ খসড়া মাত্র।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র পূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে— যেমন, প্রিয়নাথ সেনের রচনাসংগ্রহ 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের (১৩৪০) পরিশিষ্ট; শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮; বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০; 'পূর্ণিমা' পত্র, আশ্বিন ১৩৫০, বহরমপুর; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২; পূর্বাচল; শারদীয় যুগান্তর ১৩৬৫। ভারতবর্ষ পত্রের ১৩৬৮ আষাঢ় ও শ্রাবণ -সংখ্যায় শ্রীপ্রমোদনাথ সেন -লিখিত 'প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে কতকগুলি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়নাথ সেন -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্র ইতিপূর্বে 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল।

চিঠিগুলি রচনাকাল-অনুযায়ী সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ; তাহার প্রধান বাধা— অনেকগুলি চিঠিতে কোনো তারিখ নাই, অনেকগুলি পত্রের বিষয়বস্তুও এমন নয় যাহা হইতে তারিখ অনুমান করা যায়। কতকগুলি চিঠিতে কোনো অনুমিত তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি নানা কারণে আশা করা যায় যে— যে পর্যায়ে পত্রগুলি বসানো হইয়াছে রচনাকাল তাহা হইতে বহুদূরবর্তী নহে।

পত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে তারিখের অনুমান-বিষয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকানাই সামন্ত সংকলয়িতাকে একান্তভাবে সহায়তা করিয়াছেন। বিভিন্ন পত্রে সংক্ষেপে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ-অধীত বিদেশী লেখকের গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম ও প্রকাশ-কাল, গ্রন্থকারদের নাম ও জন্ম-মৃত্যু-সময় শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় বিশেষ সন্ধান-পূর্বক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত কতকগুলি তথ্যের আহরণে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্যের বিশেষ আনুকূল্য পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতেও বহু সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সাহিত্যসাধকচরিতমালা হইতে, গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত কোনো কোনো সাহিত্যিকের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ লওয়া হইয়াছে এবং অন্য কোনো কোনো তথ্যও পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা দেখিতে দিয়াছেন।

১৯৬৩

বর্তমান সংস্করণে সংযোজন : শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র [১৮৯৯]।

বর্জিত পাঠের পুনরুদ্ধার এবং কিছু মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত।

১৯৯২

সংকেত

চিঠির সংখ্যা এবং চিঠির শীর্ষদেশে ডান দিকে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ইংরেজি তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা পত্রের অংশ নহে ; ইংরেজি তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিঠির বাংলা তারিখ -অনুযায়ী। কতক ক্ষেত্রে পোস্ট্‌মার্ক্‌ হইতে ঐ তারিখ লওয়া হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তারিখটি তারকাচিহ্নিত। তারকাচিহ্ন যে স্থলে তারিখের পরে আছে, সে ক্ষেত্রে চিঠি বিলির তারিখ বুঝিতে হইবে ; যে ডাকঘর হইতে বিলি হইয়াছে তাহার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। তারিখের পূর্বে তারকাচিহ্ন থাকিলে চিঠি ডাকে দিবার তারিখ বুঝিতে হইবে ; ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

৵-চিহ্নিত তারিখও পোস্ট্‌মার্ক হইতে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল পোস্ট্‌-মার্কের তারিখ কেহ লিখিয়া রাখেন, তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে— খামগুলি দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

ডাকঘরের ছাপের পাঠোদ্ধার না হইয়া থাকিলে বা ৵-চিহ্নিত তারিখের সহিত উহার উল্লেখ পূর্বাবধি না থাকিলে, কেবল তারিখই সংকলিত হইয়াছে।

‘তৃতীয়-বন্ধনী-বেষ্টিত ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত তারিখ অনুমান-প্রসূত। অনুমান সংশয়াতীত না হইলে জিজ্ঞাসাচিহ্ন-যুক্ত।

পত্রমধ্যে মুদ্রিত তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত শব্দ বা শব্দাবলী, জীর্ণতা-হেতু পত্রের যে অংশ দুষ্পাঠ্য, তাহা হইতে অনুমিত। যে-সকল ক্ষেত্রে পত্র অচ্ছিন্ন এবং স্পষ্ট, অথচ অর্থবোধের জন্য কোনো শব্দের প্রয়োজন, বিবেচনামত উপযোগী শব্দ তৃতীয় বন্ধনী-মধ্যে, অধিকন্তু উদ্ধৃতিচিহ্ন-যোগে, মুদ্রিত হইয়াছে।

—

মূল্য ৮০·০০ টাকা

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

T4
73

243730

চিত্রাঙ্গদা

চিঠিপত্র ১ ॥ পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২ ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩ ॥ পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪ ॥ কন্যা মাধুরীলতা দেবী, শ্রীমতী মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫ ॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬ ॥ জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭ ॥ কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮ ॥ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

ছিন্নপত্র ॥ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী ॥ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে ॥ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী ॥ শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ

পারস্য। তেহেরান। ১৯৩২

নবম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ নবম খণ্ড

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী
এবং তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৭১

শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

© বিশ্বভারতী ১৯৬৪

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

২'১

সূচীপত্র

শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীকে লিখিত পত্রাবলী ১-৩৭২

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্রাবলী ৩৭৫-৩৮৬

শ্রীমতী বাসন্তীদেবী ও শ্রীনিখিল বাগচীকে লিখিত পত্রাবলী ৩৮৯-৪১৭

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র

কবির আশীর্বাদ ও শ্রীমান্ কিশোরকান্ত -সহ পত্রালাপ ৪২১-৪৩০

পরিশিষ্ট ১

পূর্বপত্রের পাঠান্তর ও রূপান্তর : আত্মীয়-বিরোধ ৪৩৩-৪৩৫

পরিশিষ্ট ২

শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীর তিনখানি পত্র ৪৩৯-৪৫২

গ্রন্থপরিচয়

‘পরিচয়লাভ ও পত্রবিনিময়’ ৪৫৬

‘রবীন্দ্র-সমীক্ষা’ ৪৬১

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ৪৬৮

সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী ৫১৩

বিজ্ঞপ্তি ৫১৭

সংকেত ৫১৯

সংযোজন-সংশোধন ৫২০

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি

সম্মুখে

পারস্যে রবীন্দ্রনাথ : তেহেরান ১৯৩২ আখ্যাপত্র

খড়দহে রবীন্দ্রনাথ : ১৯৩২ ১৮০

পাণ্ডুলিপিচিত্র

তোমার প্রথম জন্মদিন ১২০

কল্যাণীয়াসু আমি তো মৃত্তিকাবিলাসী ২০৬

কল্যাণীয়াসু তোমার বয়সের নিশ্চিত ২১২

কল্যাণীয়াসু তোমার পরে কত গভীর ২৮৮

কল্যাণীয়েষু তোমার চিঠিখানি পড়ে ৩৮৪

কল্যাণীয়াসু বৎসে, তোমার চিঠিখানি পেয়ে ৩৯২

শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীকে লিখিত

পত্রসংখ্যা ২৬৪

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়া "জোনাকি"

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১২ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমাকে অনেকে ভুল বুঝে থাকেন, তুমিও বোধ হয় ভুল বুঝেচ। প্রথম কথা, আমি মস্ত কেউ একজন নই। তাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা যে কেউ আমাকে যা মনে কর তার সঙ্গেই আমার কিছু না কিছু মিশ খেয়ে যায়। তার কারণ, কিশোর বয়স থেকে আমার মনকে নানাখানা করে আমি নানা কথাই বলেচি— এ ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। আমার উপর যদি কেবল এক-সুরের ফরমাস থাকত তাহলে সহজে দিন কেটে যেত। যেই কোনো সমজদার আমাকে চিনে নিয়েচে বলে হাঁফ ছাড়ে অমনি উল্‌টো তরফের কথাটা বলে বসি, লোকে সহ্য করতে পারে না।

আমি নির্‌গুণ নিরঞ্জন নির্ব্বিশেষের সাধক এমন একটা আভাস তোমার চিঠিতে পাওয়া গেল। কোনো একদিক থেকে সেটা হয় তো সত্য হতেও পারে— যেখানে সমস্তই শূন্য সেখানেও সমস্তই পূর্ণ-যিনি তিনি আছেন এটাও উপলব্ধি না করব কেন? আবার এর উল্টো কথাটাও আমারি মনের কথা। যেখানে সব-কিছু আছে সেখানেই সবার অতীত সব হয়ে বিরাজ করেন এটাও যদি না জানি তাহলে সেও বিষম ফাঁকি।

আজ এই প্রৌঢ় বসন্তের হাওয়ায় বেলফুলের গন্ধসিঞ্চিত প্রভাতের আকাশে একটা রামকেলী রাগিণীর গান থাকে

ব্যাপ্ত হয়ে— স্তব্ধ হয়ে একা একা বেড়াই যখন, তখন সেই অনাহত বীণার আলাপে মন ওঠে ভরে। এই হোলো গানের অন্তর্লীন গভীরতা। তার পরে হয় তো ঘরে এসে দেখি গান শোনবার লোক বসে আছে— তখন গান ধরি, "প্যালা ভর ভর লায়ীরি।" সেই ধ্বনিলোকে দেহমন সুরে সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে, যা-কিছুকে সেই সুর স্পর্শ করে তাই হয় অপূর্ব্ব। এও তো ছাড়বার জো নেই। সুরের গান, না-সুরের গান, কাকে ছেড়ে কাকে বাছব? আমি দুইকেই সমান স্বীকার করে নিয়েছি।

এক জায়গায় কেবল আমার বাধে। খেলনা নিয়ে নিজেকে ভোলাতে আমি কিছুতেই পারি নে। এটা পারে নিতান্তই শিশু বধূ। সাথী আছেন কাছে বসে তাঁর দিকে পিছন ফিরে খেলনার বাক্স খুলে বসা একেবারেই সময় নষ্ট করা। এতে করে সত্য অনুভূতির রস যায় ফিকে হয়ে। ফুল দিতে চাও দাও না, এমন কাউকে দাও যে-মানুষ ফুল হাতে নিয়ে বল্‌বে বাঃ— তার সেই সত্য খুসি সত্য আনন্দে গিয়ে পৌঁছয়। শিলাইদহের বোষ্টমী আমার হাতে আম দিয়ে বল্‌লে, তাঁকে দিলুম। এই তো সত্যকার দেওয়া— আমারই ভোগের মধ্যে তিনি আমটিকে পান। পূজারী ব্রাহ্মণ সকালবেলায় গোলক চাঁপার গাছে বাড়ি মেরে ফুল সংগ্রহ করে ঠাকুরঘরে যেত— তার নামে পুলিশে নালিষ করতে ইচ্ছা করত— ঠাকুরকে ফাঁকি দিচ্চে বলে। সেই ফুল আমার মধ্যে দিয়েই ঠাকুর গ্রহণ করবেন বলেই গাছে ফুল ফুটিয়েছেন আর আমার মধ্যে ফুলে আনন্দ

আছে। ঠাকুরঘরে যে মূর্ত্তি প্রতিদিন এই চোরাই মাল গ্রহণ করে সে তো সমস্ত বিশ্বকে ফাঁকি দিলে— মূঢ়তার ঝুলির মধ্যে ঢেকে তার চুরি। কত মানুষকেই বঞ্চিত করে তবে আমরা এই দেবতার খেলা খেলি। ঠাকুরঘরের নৈবেদ্যের মধ্যে আমরা ঠাকুরের সত্যকার প্রাপ্যকে প্রত্যহ নষ্ট করি।

এর থেকে একটা কথা বুঝতে পারবে, আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্চে বলে' আমি ঠাকুরঘর থেকে দূরে থাকি এ কথা সত্য নয়— মানুষ বঞ্চিত হচ্চে বলেই আমার নালিষ। যে সেবা যে প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্চে ধর্ম্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্চি। এই জন্যেই আমাদের দেশে ধার্ম্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজ্ঞাত। মানুষের রোগ তাপ উপবাস মিট্‌তে চায় না, কেননা এই চিরশিশুর দেশে খেলার রাস্তা দিয়ে সেটা মেটাবার ভার নিয়েচি। মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হোলো তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। খেলার দেবতা এই সব সোনা জহরাৎকে ব্যর্থ করে বসে থাকুন— এ দিকে সত্যকার দেবতা সত্যকার মানুষের কঙ্কালশীর্ণ হাতের মুষ্টি প্রসারিত করে ঐ মন্দিরের বাহিরে পথে পথে ফিরচেন। তবু আমাকে বলবে আমি নিরঞ্জনের পূজারি? ঐ ঠাকুরঘরের মধ্যে যে পূজা পড়চে সমস্ত ক্ষুধিতের ক্ষুধাকে অবজ্ঞা

করে সে আজ কোন্ শূন্যে গিয়ে জমা হচ্চে ?

হয় তো বল্‌বে এই খেলার পূজাটা সহজ। কিন্তু সত্যের সাধনাকে সহজ কোরো না। আমরা মানুষ, আমাদের এতে গৌরব নষ্ট হয়। দেবতার পূজা কঠিন দুঃখেরই সাধনা— মানুষের দুঃখভার পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেচে সেইখানেই দেবতার আহ্বান শোনো— সেই দুঃসাধ্য তপস্যাকে ফাঁকি দেবার জন্যে মোহের গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না। আমি মানুষকে ভালোবাসি বলেই এই খেলার দেবতার সঙ্গে আমার ঝগড়া। দরকার নেই এই খেলার, কেননা প্রেম দাবী করচেন সত্যকার ত্যাগের, সত্যকার পাত্রে।

তোমাকে বোধ হয় কিছু কষ্ট দিলুম। কিন্তু সেও ভালো। যদি তোমাকে অবজ্ঞা করতুম তাহলে এ কষ্টটুকু দিতুম না।

রিলিজন্ অফ্ ম্যান্ বলে একটা ইংরেজি বই লিখেছি সেটা পড়লে বুঝতে পারবে আমার মতে

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

ইতি ২৯ চৈত্র ১৩৩৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৭ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

প্রথমেই বলে রাখি আমার সব কথা বলবার অধিকার নেই। যেখানে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব সেখানে যুক্তিদ্বারা তর্ক করে বোঝা ছাড়া উপায় নেই। তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারি তুমি একটা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছ সেটাকে আমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যখন চেষ্টা করি তখন মনে সংশয় থেকে যায়। তবুও আমার দিক থেকে যেটা বলবার আছে সেটা বলা চাই।

বাংলা দেশে আমরা শাক্ত কিম্বা বৈষ্ণব ধর্ম্মে মুখ্যত রস সম্ভোগ করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা মনে করি। এ'কে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। সব রকম বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে।

গ্রামে যখন বাস করতুম একজন বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে আমার প্রায় আলাপ হোত। আমি তাঁকে একদিন বল্লুম ব্রাহ্মণপাড়ায় দুর্নীতি দুর্গতি ও দুঃখের অন্ত নেই। আপনি কেন তাদের মাঝখানে থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন না। শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন— এ সব লোকদের সহবাস দূরে পরিহার করাই তিনি সাধনার পন্থা বলে জানেন, এতে রস ভোগ চর্চ্চায় ব্যাঘাত করে। দেবতা যদি নিতান্তই

অতিমানুষ হন তাহলে তাঁকে নিয়ে কেবল হৃদয়াবেগের খেলা খেল্‌লেই চলে, আমাদের কর্ম্মে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই— বুদ্ধি চাই নে, শক্তি চাই নে, চরিত্র চাই নে, কেবল নিরন্তর ভাবে ডুবুডুবু হয়ে থাকলেই হোলো। অর্থাৎ তাঁকে দিয়ে হৃদয়ের সখ মেটাবার ব্যাপার। যেহেতু খেলার পুতুল সত্যকার মানুষ নয় এই জন্যে তাকে নিয়ে বালিকা আপন হৃদয়বৃত্তিকে দৌড় করায়— আর কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু সন্তানের মার দায় আছে, শুধু কেবল হৃদয় নয়— তাকে বুদ্ধি খাটাতে হয়, শক্তি খাটাতে হয়, সন্তানের সেবা পরিপূর্ণ মাত্রায় সত্য করে না তুললে চলে না। মানুষের মধ্যে যে দেবতার আবির্ভাব তাঁকে পুতুল সাজিয়ে ফাঁকির নৈবেদ্য দিয়ে ভোলাবে কে? সেখানে তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে পূর্ণ মানুষ হতে হবে। খেলার দেবতা মানুষের দেবতাকে বঞ্চিত করে— মাদুরার দেবতা মানুষেরই গায়ের অলঙ্কার হরণ করে নিয়ে। ঠাকুরকে এই রকম অলঙ্কার দিতে হৃদয়ের তৃপ্তি হয় মানি, কিন্তু ঠাকুরকে কেবলমাত্র হৃদয়তৃপ্তির উপলক্ষ্য করলে তাঁকে ছোট করা হয়, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধকে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ করা হয়। তুমি মনে করো ঠাকুরের ভাণ্ডারে এই যে প্রভূত ধন অলঙ্কার নিষ্ফলভাবে সঞ্চিত হচ্চে এ কোনো এক সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনে কাজে লাগ্‌বে না। কখনো না, এ পর্য্যন্ত তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিষয়ী লোকের ধনসঞ্চয়ের যে দুর্নিবার লালসা সেই লালসার তৃপ্তিই দেবতার নামে আমরা করি— নিজেদের বৈষয়িকতাকেই আমরা মঠে মন্দিরে পুঞ্জীভূত করে তুলি— এর আর সীমা থাকে না— তার প্রধান কারণ

দেবতার প্রতি আমাদের মানবদায়িত্ব নেই। জগন্নাথকে পুরোহিত স্নান করায়, কাপড় পরায়, পাখার হাওয়া করে, ওষুধ খাওয়ায়— যদি তার অর্থ এই হয়, যে, মানুষের মধ্যে জগন্নাথেরই স্নানের, কাপড় পরার ওষুধ খাওয়ার সত্যই প্রয়োজন আছে তাহলে কি এমনতরো খেলা করে নিজের দায় সেরে নিতে প্রবৃত্তি হয়? তাহলে সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি নিয়ে মানব-ভগবানের অন্নবস্ত্র পানীয় পথ্যের আয়োজন করতে হয়। যুগে যুগে আমরা তাতে অবহেলা করেছি বলেই মন্দিরের ভগবান পাণ্ডা পুরুতের মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌চেন লোকালয়ে তাঁর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়ল, তাঁর পরনে ট্যানা জোটে না।

দুঃখবেদনার অনুভূতি থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েচ। ভক্তি বা হৃদয়াবেগের নেশা দিয়ে ফল পাবে না। তোমার ভালোবাসা যেখানে জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে তপস্যায় ষোলো আনা পূর্ণ সেইখানেই তোমার পরিত্রাণ। যে সেবা সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সত্য এবং যে সেবায় তোমার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে সেইখানেই আনন্দ— সে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে, তাকে এড়িয়ে নয়। মানুষের দেবতার কাছে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করে দাও— তিনি যদি তোমাকে দুঃখের মালা পরিয়ে দেন তবে সেই মালা দিয়েই তিনি তোমাকে বরণ করে আপন করে নেবেন —তার চেয়ে আর কি চাই?

তোমার চিঠিতে তোমার কবিতার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি বিস্মিত হয়েচি। অত্যন্ত খাঁটি কবিতা, বানানো নয়, পরিণত লেখনীর সৃষ্টি। তুমি বাংলাদেশে অনেককে আবিষ্কার করেচ লিখেচ

—বোধ হয় নিজেকেও আবিষ্কার করেচ কিন্তু প্রকাশ করেচ কি না জানি নে। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি প্রতীকের কথা লিখেচ, সত্য আছেন দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে, দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করচেন, যদি থাকি দ্বার বন্ধ করে প্রতীককে নিয়ে তার চেয়ে বিড়ম্বনা নেই। সব চেয়ে বিপদ হচ্চে প্রতীক অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সত্যই হয় পর। সত্যের দাবী কঠিন, প্রতীকের দাবী যৎসামান্য— সত্য বলে অকল্যাণকে অন্তরে ঠেকাতে হবে প্রাণপণ শক্তিতে, প্রতীক বলে পাঁচশিকের পূজো দিয়েই ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ সত্য মানুষকে মানুষ হতে বলে আর প্রতীক তাকে চিরদিন ছেলে-মানুষ হতে বলে। প্রতীক মিথ্যা চোখরাঙানীতে ভারতের কোটি কোটি দুর্ব্বল চিত্তকে কাপুরুষ করে তুল্‌চে, সত্য তাকে যতরকম মিথ্যা ভয়ের মোহ থেকে উদ্বোধিত করতে চায়। প্রতীক দুশ্চরিত্র পাণ্ডার পায়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায় সত্য যথার্থ ভক্তির আলোয় মানুষের ললাটকে মহিমান্বিত করে। তার্কিক বলে এই প্রতীক কেবল একটা ক্ষণিক অবস্থার জন্যে, তার পরে কেটে যায়। কোনোদিন কাটে না— মূঢ়তা মানুষকে দুর্ব্বল করে, তার চিত্তকে মোহেই দীক্ষিত করে। ফোটোগ্রাফের সঙ্গে প্রতীকের তুলনা কোরো না। যে-বন্ধুকে তুমি সত্য করে জানো তারই ফোটোগ্রাফ তোমার কাছে সত্য— যাকে অন্তরে সত্যরূপে জানো না তার ফোটোগ্রাফকেই সত্যরূপে জানা বিষম

বিপদ। তা ছাড়া যে সত্য সকল জীবের মধ্যে তাকে অজীবের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করা আর শাখার ফুলকে শিকড়ে খুঁজে বেড়ানো একই কথা। তুমি তোমার যে-গুরুর মধ্যে পূর্ণ মানুষকে উপলব্ধি করেচ তিনি তো ফাঁকি নন, তাঁকে পেতে হলে তোমার সমস্ত মানবধর্ম্ম দিয়ে পেতে হবে, ছেলেখেলা করে হবে না। বিরাট মানুষকে আমরা কোনো মানুষের মধ্যে দেখেচি তার সত্য প্রমাণ দেওয়া চাই যে— কী নৈবেদ্য তাঁকে দিলে? কেবল হৃদয়াবেগ? তাকে উদ্দেশ করে তুমি মানুষের জন্যে কি করেচ—আপনাকে কতখানি বিশুদ্ধ করে তুলতে পেরেচ? তুমি যে মানুষকে সমস্ত মন দিয়ে উপলব্ধি করেচ তিনি কি প্রতীক? মন্তর পড়ে সারবে? বিরাট যে তাঁর মধ্যেই দেখা দিয়েচেন—কিন্তু সেই বিরাটের সেবা কোথায়? তুমি তৃপ্তি পাচ্চ না আজ, তার মানে তুমি তাঁকে ব্যবহার করতে চাচ্চ আপনার তৃপ্তির জন্যে— তাঁর তৃপ্তির জন্যে যখন আপনাকে সত্যভাবে ত্যাগ করবে, মানুষের দ্বারে, স্মৃতিমন্দিরের প্রাঙ্গণে নয়, তখনই জীবনে তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন সার্থক হবে।

আমার সময় বড়ো কম। আমাকে অনেকে বাজে চিঠি লেখে—তার উত্তর দিতে গেলে আমার সময়ের অপব্যয় হয়। তুমি তোমার সত্য প্রয়োজনেই আমাকে লিখেচ বলেই আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে লিখ্‌তে কৃপণতা করি নে। তা ছাড়া তুমি লিখ্‌তে জানো তাই লেখা আদায় করা তোমার পক্ষে সহজ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২১ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পড়ে আমি বিরক্ত হচ্চি এমন কল্পনা কোরো না। যে গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তুমি গিয়েচ সেটা আমার জানতে ভালোই লাগচে। আমার মনে পড়চে আমিও এক সময়ে স্বভাবতই যে সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান— সংসার থেকে হৃদয়ের যে তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায় নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মথন করে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। বৈষ্ণব কবিরা আমার এই আত্মভোগের নৈবেদ্য ভরে তোলবার সহায়তা করেছিলেন। কিছুদিন এই রসস্রোতে গা-ঢালান দিয়েছি। কিন্তু সত্য তো কেবলি রসো বৈ সঃ নন তাই একসময় আমার ধিক্কার এলো— সেই নিমজ্জনদশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি বলে বুঝলুম। ভাবের মধ্যে সম্ভোগ, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে তপস্যা। এই তপস্যায় সেই মহাপুরুষের আহ্বান যাঁকে ঋষি বলেচেন "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা।" কেবল তিনি বিশ্বরস এবং বিশ্বরূপ নন কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মে যোগ দিতে গেলেই বিশুদ্ধ হতে হয়, বীর্য্যবান হতে হয় জ্ঞানী হতে হয়। বিশুদ্ধ কর্ম্মে সত্য সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হন— জ্ঞানে, রসে, তেজে— পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সত্যকর্ম্মে, বিশ্বকর্ম্মে। একদা ছেলেবেলায় যখন দুধে বিতৃষ্ণা ছিল তখন ভৃত্যকে বলে দিয়েছিলুম ফেনায়

পাত্র ভরিয়ে আনতে যাতে পিতা ফাঁকি না ধরতে পারেন। একদিন অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলুম, রসের সাধনার অনেকটাই সেই ফেনা, বাষ্পোচ্ছ্বাস— যাঁর সামনে ধরি তাঁকেও ফাঁকি দিই, নিজেকেও। কর্ম্মের সাধনাতেও যথেষ্ট প্রবঞ্চনা চলে— অর্থাৎ দুধে ফেনা না মিশিয়ে জল মেশাবার পদ্ধতিও আছে— এমন ব্যবসায়ে অনেকেই পসার জমিয়ে থাকেন। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভোলাবার প্রলোভন এসে পড়ে— ষোলো আনা খাঁটি হওয়া সহজ নয়— কিন্তু তবু মনে জানি ভেজাল বাদ দিয়েও যেটুকু বাকি থাকে সেটা উবে যাবার জিনিষ নয়। অন্তত আজ এটুকু বুঝেছি কর্ম্মের মধ্যে যে উপলব্ধি তাতে মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করা হয়— তাতে বাইরে ব্যর্থতা ঘটলেও অন্তরে গৌরবহানি ঘটে না।

ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২৩ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে খুবই ভুল বুঝেছ তাই আমাকে লিখতে হোলো। আমি কখনো কাউকে আদেশ করিনে, তার কারণ আমি গুরু নই আমি কবি। তোমার সঙ্গে আমি কয়েকটা

বিষয় নিয়ে আলোচনা করেচি, কদাচ সেটাকে অনুশাসন বলে গ্রহণ কোরো না।— সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমাদের নিজেদের স্বভাবের পথে। তোমার স্বভাবের অনুগত হয়ে তুমি যে উপলব্ধি সংগ্রহ করেচ আমার কাছে সে জিনিষটি নেই সুতরাং তোমাকে কখনোই বলতে পারব না যে আমি যে সাধনায় যে অনুভূতিতে এসেচি সেইটি তুমি যদি গ্রহণ না করো তবে আমি রাগ করব। এরকম অদ্ভুত জবরদস্তি একেবারেই আমার স্বভাববিরুদ্ধ। অবশ্য যেখানে ধর্ম্মের নামে স্পষ্টতই অন্যায় অত্যাচার এবং অধর্ম্ম চল্‌চে সেখানে তাকে আমি কোনো কারণেই স্বীকার করে নিতে পারি নে। কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক রসসম্ভোগে কোন ক্ষতি নেই সেখানে জোর করে প্রতিবাদ করা গোঁয়ারের কাজ।

আমি কেবল নিজের কথাই বল্‌তে পারি— আমার মন কোনো প্রতীককে আশ্রয় করতে স্বভাবতই অক্ষম। সহসা মনে হতে পারে এটা কবিজনোচিত নয়। ভাবকে রূপ দেওয়া আমার কাজ— আমার সেই সৃষ্টিতে আমার আনন্দ। সেখানে রূপ আগে নয়, ভাব আগে, রূপের সঙ্গে ভাব নিজেকে বাইরে থেকে মেলায় না— নিজের রূপ-দেহ সে নিজেই সৃষ্টি করে— আবার তাকে অনায়াসে ত্যাগ করে' নতুন রূপের মধ্যে প্রকাশ খোঁজে। কোনো ধর্ম্মগত প্রথা যে সব রূপকে বাহির থেকে বদ্ধ করে রেখেচে, আমার চিত্তের ধ্যান তার মধ্যে বাধা পায়। শুধু তো মূর্ত্তি নয়, তার সঙ্গে আছে কাহিনী— তাকে রূপক জোর করে বলি— অভ্যস্তভাবে তাকে গ্রহণ করি, ভাবকে যেখানে

প্রতিবাদ করে সেখানেও। আমার বুদ্ধি আমার কল্পনা আমার রসবোধ সবই আঘাত পায়। যদি বলো ভগবান যখন অসীম তখন সকল রূপেই সকল কাহিনীতেই তাঁকে খাপ খাওয়ায়। এক হিসাবে এ কথা সত্য— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভালো মন্দ সুশ্রী কুশ্রী সবই আছে অতএব কেবল ভালো কেবল সুন্দরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে দেখলে তাঁর অসীমতার উপর দোষারোপ করা হয়। ঠগীরা মানুষ খুন করাকে ধর্ম্মসাধনা বলে গ্রহণ করেছিল— ভগবান তো নানারকম করেই মানুষকে মারেন— সেই খুনী ভগবানকেই বা পূজা করতে দোষ কি ?

কিন্তু আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন। মানুষের নরকও আছে— সেইখানে মূঢ়তা সেইখানে অত্যাচার সেইখানে অসত্য। সেই নরকও আছে কিন্তু সেই থাকাটা না-এর দিকে, হাঁ-এর দিকে নয়। সে কেবলি হাঁ-কে অস্বীকার করে কিন্তু কিছুতে তাকে বিলুপ্ত করতে পারে না। অস্বীকার করার দ্বারাই সে সেই চিরন্তন ওঁ-কে প্রমাণ করতে থাকে। এই জন্যেই, ভগবান অসীম বলেই তাঁকে সব কিছুতেই আরোপ করলে চলে এ কথা আমি মানতে রাজি নই। যেখানে জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই তাঁকে উপলব্ধি না করলে ঠকতে হবে।

কিন্তু তুমি যে করচ না একথা বলিনে— তোমার অভিজ্ঞতা আমার অভিজ্ঞতা নয় অতএব আমার পক্ষে কোনো উপদেশকে বেদবাক্য করে তোলবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। এই কথাটুকু বোধ হয় বলা যায়, দুই রকম চিত্তবৃত্তি আছে— এক রকম মন

প্রতীককে আশ্রয় করে আর-একরকম মন করে না। অনেক মহাপুরুষ প্রতীককে অবলম্বন করে' মনে মনে তাকে ছাড়িয়ে গেছেন আবার অনেকে— যেমন কবীর দাদু নানক— প্রতীকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও নিজের ধ্যানের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিতে আত্মানন্দের রসেই পরম সত্যকে পূর্ণ করে ভোগ করেন— অন্য পথ তাঁদের পক্ষে অসাধ্য।

গুরুকে আমি প্রতীক শ্রেণীতে ফেলি নে। মানবের মধ্যে যেখানে পূর্ণতা মানবের দেবতার সেখানে প্রত্যক্ষ আবির্ভাব একথা আমি মানি।

রচনা করবার অসামান্য শক্তি তোমার আছে এই জন্যেই তোমার চিঠি পড়ার আনন্দ আমাকে চিঠি লেখায় প্রবৃত্ত করে।

ইতি ১০ বৈশাখ ১৩৩৮
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
২৮ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির উত্তরে যা আমার বলবার ছিল তা বোধ হয় বলে শেষ করেছি। একটা কথা পূর্ব্বেও বলেচি পুনরায় বলা দরকার, আমাকে কোনো অংশেই গুরু বলে গণ্য করলে ভুল করা হবে। তোমার অন্তরতম প্রয়োজন যে কি তা নিশ্চিত

নির্ণয় করে দেবার অধিকার আমার নেই। আমি আমার নিজের পথে চলি— সে পথে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও পৌঁছব কি না তাও জানি নে। আমার চিত্তের স্বভাবই হচ্চে নদীর মতো চলা, চল্‌তে চল্‌তে বলা— সে ধারা একটানা চলে না— নানা বাঁকে বাঁকে চলে। আমি জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে বাণী জোগাব এই ফরমাস নিয়ে সংসারে এসেচি— কোথাও এসে স্তব্ধ হলেই আমার কাজ ফুরোবে। যাঁরা গুরু তাঁরা সমুদ্রের মতো আপনার মধ্যে আপনি এসে থেমেচেন, তাঁদের বাণী তরঙ্গিত হয় তাঁদের গভীরতা থেকে। আমার ধ্বনি ওঠে জীবনের বিচিত্র সংঘাত হতে, তাঁদের বাণী জাগে অন্তরাত্মার স্বকীয় আন্দোলনে। তুমি তোমার গুরুর কাছ থেকে এমন কিছু যদি পেয়ে থাকো যা কেবলমাত্র আলাপ নয় যা আদেশ যা নির্দ্দেশ, যা তোমার আত্মাকে গতি দিয়েচে তাহলে তার উপরে আর কথা চলে না। কেননা আমি তো কেবলমাত্র কথাই দিতে পারি, গতি জোগাতে পারিনে তো। আজ পর্য্যন্ত কাউকে তো আমি কোনো ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিই নি। সঙ্গে সঙ্গে পথ চল্‌তে চলতে অনেককে খুসি করেচি এই পর্য্যন্ত। আবার অনেকে আমাকে পছন্দই করে না— কেননা তারা আন্দাজ করতে পারে যে, আমার নগদ তহবিল নেই— যদি বা কোনোমতে ভোজের আয়োজন করতে পারি দক্ষিণা পর্য্যন্ত পৌঁছয় না।

তুমি একটি রসলোকে প্রবেশ করেচ— সেখানে তুমি নানা উপকরণে আনন্দমন্দিরের ভিৎ গাঁথচ। বিশ্ববিধাতা যেমন, মানুষও তেমনি, আপন স্বকীয় সৃষ্টিতেই তার যথার্থ বাস— অন্য

জীবেরা থাকে বাসাবাড়িতে, কেবল ভাড়া দেয়। ভাড়াটে বাসার মানুষও অনেক আছে কিন্তু মানুষের আনন্দ হচ্চে স্বকীয় ধামে— সত্যকে সে নিজের জীবনে নিজের চিত্তে মূর্ত্ত করে তোলে— তখন সে স্থায়ী আশ্রয় পায়। কিন্তু যখন সে এমন কিছু গড়তে থাকে যার মধ্যে উপকরণ অনেক আছে কিন্তু সত্য যথেষ্ট নেই তখন সে পীড়িত হয়, তখন তার আশ্রয় হয় তার বোঝা। এই দুর্ম্মূল্য ব্যর্থতার সঙ্গে অনেক লড়তে হয়েচে— উপকরণ জমাতে লেগেচি সদর দরজা দিয়ে, খিড়কি দরজা দিয়ে সত্য দিয়েচেন দৌড়।

তুমি থেকে থেকে আশঙ্কা করেচ আমার মতের সঙ্গে তোমার মিল হচ্চে না বলে আমি রাগ করচি। লেশমাত্র না। মত নিয়ে যারা অন্যের পরে জবরদস্তি করে আমি সে জাতের মানুষ নই। তোমার উপলব্ধির পরে আমার মনে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। জীবনে তুমি একদা যে আনন্দধারায় আত্মনিবেদন করেচ সেই আনন্দ শেষ পর্য্যন্ত পরম সার্থকতায় নিয়ে যাক এই আমি একান্তমনে কামনা করি। ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

৩০ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি নিজেকে অকারণ পরিতাপে কেন পীড়িত করচ আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে। তোমার প্রতি বিরক্তির লেশমাত্র কারণ আমার ঘটে নি, তোমার চিঠি পড়তে আমার বিশেষ ভালো লাগে। তোমার জীবনের যা গভীরতম উপলব্ধি তার সৌন্দর্য্য ও সত্যতা আমি মনে বেশ বুঝতে পারি। আমার নিজের পথ তোমার থেকে পৃথক বলেই তোমার অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনতে আমি এত ঔৎসুক্য অনুভব করি। আমি চিন্তা করি, তর্ক করি আলাপ করি বলেই নিজেকে তোমার চেয়ে সাধনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি নে— কেননা সাধনার চেয়ে আমার ভাবনা ও কল্পনাই বেশি। আমি অনুভব করব, প্রকাশ করব এই কাজের জন্যেই আমাকে গড়া হয়েচে। আমি বলে যাব, গেয়ে যাব, তোমাদের ভালো লাগবে এইটুকু হলেই আমার কাজ সারা হোলো। আমার কাছে কোন্‌টা ভালো কোনটা মন্দ বোধ হয়, তা নিয়ে তর্কও করব— কিন্তু সেটা উপরের বেদীতে চড়ে বসে নয়। তোমাদের ভাবিয়ে দিতে পারলেই আমার আর কিছু দরকার নেই। আমার কাছে আদেশ উপদেশের দাবী করলেই বুঝতে পারি আমাকে ভুল বুঝেচ। যখন মনে করো আমার কথা না শুনলে রাগ করি তখনো জানি আমাকে চেনো নি। চিরদিন আমি গুরুমশায়কে এড়িয়ে

এসেচি, ইস্কুল পালানো আমার অভ্যাস— অবশেষে আমি নিজেই গুরুমশায় সেজে বসব এর চেয়ে প্রহসন কিছু হতে পারে না। বলা বাহুল্য গুরুমশায় আর গুরু এক জাতের নয়। গুরু যাঁরা তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ গুরু— আর গুরুমশায় সেই, যে চোখ রাঙিয়ে টঙে চড়ে' গুরুগিরি করে। আমি উক্ত দুই জাতেরি বার।

যাই হোক্ তুমি মনে নিশ্চিত জেনো তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলেচ বলে আমি তিলার্দ্ধ ক্ষুব্ধ হই নি। আমি কথার যাচনদার, কথা যেখানে অকৃত্রিম ও সুন্দর সেখানে আমি মত বিচার করি নে— সেখানে আমি প্রকাশের রূপটিকে রসটিকে সম্ভোগ করতে জানি। তুমি অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার সাধনায় প্রবৃত্ত থাকো— তাতেই তুমি চরিতার্থতা লাভ করবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

২ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমাকে তুমি মনে মনে অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে নিজের পছন্দসই করবার চেষ্টা করচ। কিন্তু আমি তো রচনার উপাদান মাত্র নই আমি যে রচিত। তুমি লিখেচ এখন থেকে আমার বই

খুব করে পড়বে— এমন কাজ কোরো না— অত্যন্ত বেশি করে পড়তে গেলে কম করে পাবে। হঠাৎ মাঝে মাঝে একখানা বই তুলে নিয়ে সাতের পাতা কি সতেরোর পাতা কি সাতাশের পাতা থেকে যদি পড়তে স্বুরু করে দাও হয় তো তোমার মন বলে উঠ্‌বে বাঃ বেশ লিখেচে তো। রীতিমত পড়া অভ্যাস করো যদি তাহলে স্বাদ নষ্ট হতে থাকবে— কিছুদিন বাদে মনে হবে এমনিই কি। আমাদের সৃষ্টির একটা সীমানা আছে সেইখানে বারে বারে যদি তোমার মনোরথ এসে ঠেকে যায় তবে মন বিগ্‌ড়ে যাবে। মানুষের একটা রোগ আছে যা পায় তার চেয়ে বেশি পেতে চায়— সেটা যখন সম্ভব হয় না তখন চেক বইয়ে নিজের হাতে বড়ো অঙ্ক লেখে তার পরে যখন ভাঙানো চলে না তখন ব্যাঙ্কের উপর রাগ করে। তোমার প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি দিতে পারে আমার রচনা থেকে এমন প্রত্যাশা কোরো না। কিছু তোমার ভালো লাগ্‌বে কিছু অন্যের ভালো লাগ্‌বে — কিছু তোমার মনের সঙ্গে মিলবে না কিন্তু আর একজন ভাববে সেটা তারি মনের কথা। নানা ভাবে নানা সুরে নানা কথাই বলেছি— যেটুকু তোমার পছন্দ হয় বাছাই করে নিয়ো। পাঠকেরো রসগ্রহণ করবার একটা সীমা আছে; তোমার মন অনুভূতির একটা বিশেষ অভ্যাসে প্রবলভাবে অভ্যস্ত, সেই অভ্যাস সব কিছু থেকে নিজের জোগান খোঁজে। কিন্তু কবিতায় কোনো একটা বিশেষ ভাব বড়ো জিনিষ নয়, এমন কি খুব বড়ো অঙ্গের ভাব। কবিতার মুখ্য জিনিষ হচ্চে সৃষ্টি— অর্থাৎ রূপ-ভাবন। বিশ্বকাব্যেও যেমন, কবির কাব্যেও তেমনি,— রূপ

বিচিত্র— কোনোটা তোমার চোখে পড়ে কোনোটা আর কারো। তুমি খুঁজচ তোমার মনের একটি বিশেষ ভাবকে তৃপ্তি দিতে পারে এমন কোনো একটি রূপ— অন্যগুলোও রূপের মূল্যে মূল্যবান হলেও হয় তো তুমি গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু কাব্যের যারা যথার্থ রসজ্ঞ, তারা নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না— তারা যে কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেচে তাতেই আনন্দ পায়। তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েচে একটা বিশেষ খাদে তোমার চিত্তধারা প্রবাহিত— সেইটেই তোমার সাধনা। আমরা কবিরা কেবল সাধকদের জন্যে লিখি নে, বিশেষ রসের রসিকদের জন্যেও না। আমরা লিখি রূপদ্রষ্টার জন্যে— তিনি বিচার করেন সৃষ্টির দিক থেকে— যাচাই করে দেখেন রূপের আবির্ভাব হোলো কিনা। আমার রূপকার বিধাতা সেই জন্যে আমাকে নানা রসের নানা ভাবের নানা উপলব্ধির মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান— নিজের মনকে নানান্‌খানা করে নানা চেহারাই গড়তে হয়। যে-ই একটা কিছু চেহারা জাগে ওস্তাদজি তখন আমাকে চেলা বলে মানেন। আমি যে সব কর্ম্ম হাতে নিয়েচি তার মধ্যেও সেই চেহারা গড়ে তোলবার ব্যবসায়। উপদেশ দেওয়া উপকার করা গৌণ, রচনা করাই মুখ্য। সেই জন্যেই আমি সবাইকে বারবার করে বলি, দোহাই তোমাদের, হঠাৎ আমাকে গুরু বলে ভুল কোরো না। আমি কর্ম্মীও বটে— কিন্তু যার অন্তর্‌দৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে আমি কারুকর্ম্মের কর্ম্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি, নাচি নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি, হাসাই, একান্তে

কোনো একটামাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখি নে। যারা আমাকে ভক্তি করতে চায় তাদের পদে পদে খট্‌কা লাগে। আমার এই চঞ্চলতা যদি না থাক্‌ত তবে কোন্‌দিন হয় তো হাল আমলের একজন অবতার হয়ে উঠে ভক্তব্যূহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়তুম। অবতার শিকারে যাদের সখ তারা কাছাকাছি এসে নাক শিট্‌কে চলে যায়। তুমি আমার লেখা পড়তে চেয়েচ পোড়ো— কিন্তু কবির লেখা বলেই পোড়ো। অর্থাৎ আমি সকলেরই বন্ধু, সকলেরই সমবয়সী, সকলেরই সহযাত্রী। আমি কিন্তু পণ্ডিত নই। পথ চল্‌তে চলতে আমার যা কিছু সংগ্রহ। যা কিছু জানি তার অনেকখানি আন্দাজ। যতখানি পড়ি তার চেয়ে গড়ি অনেক বেশি।

এইমাত্র তোমার একটা চিঠিতে দেখলুম আমার চিঠি পাও নি বলে আক্ষেপ করেচ। বোধ করি তোমার পত্রের বাহন তোমাকে চিঠি পাঠাতে দেরি করেচে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমার চিঠি না পেলে মনে করে বোসো না যে আমি রাগ করেচি। চিঠি লেখা আজকাল আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। হয় তো দীর্ঘকাল চিঠি পাবে না। তোমার মনে আমার ভুল পরিচয় ছিল তাই [এত]গুলো চিঠি এত করে লিখেচি। তাও লেখবার দরকার ছিল না— কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে খুসি হয়েছিলুম বলেই লিখেচি। তুমি কে তা আমি জানি নে— কিন্তু তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে, অর্থাৎ আমাদেরি দলের লোক তাই তোমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব হোলো না। কিন্তু নিয়মিত চিঠি আমার কাছ থেকে চেয়ো না।

আমি শ্রান্ত অথচ ব্যস্ত। ইতি ১৯ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

৫ মে ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠি না পেলে আর কোনো দুর্য্যোগ কল্পনা কোরো না কেবল এইটে মনে কোরো আমার সময়ও কম, বয়সও বেশি, শক্তিও পূর্ব্বের মতো নেই। এখন মনিবের কাছে আমার ছুটির দরবার চল্‌চে। মঞ্জুর হয় নি— তাই ভাঙাশরীরে কাজ চালাতে হচ্চে— এই জন্যে সব কাজেই কৃপণতা করতে হোলো। মনে নিশ্চয় জেনো আমি একান্ত মনে কামনা করি তোমার অন্তরে যে আনন্দের সঞ্চয় আছে তা অক্ষয় হোক এবং রচনাসম্পদের যে প্রাচুর্য্য তোমার লেখনীতে তাও অক্ষুণ্ণ থাক্।

তোমার খাতা পেয়েছি। আমার টেবিলের উপর নানা বস্তুর সমাবেশে যে বিরাট অব্যবস্থার বিস্তার হয়েচে তার মাঝখানে কোনো রক্ষণীয় জিনিষকে রক্ষা করতে ভয় করি। একবার ইতস্তত এ পাতে ও পাতে চোখ বুলিয়েছি— এর মধ্যে কাঁচা পাকা অনেক রকমের জিনিষ দেখা গেল। কিন্তু আমার জিম্মা করে

দিয়ো না— জিনিষ হারানো সম্বন্ধে আমার অসাধারণতা আছে —সেটা নিজের জিনিষে মার্জ্জনীয় কিন্তু ন্যস্ত ধনে অপরাধ। ইতি

২২ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

৯ মে ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

জন্মদিনের কাণ্ড নিয়ে নিরতিশয় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আজ ছাব্বিশে, তবু পরিশিষ্ট ভাগ যথেষ্ট ব্যাপক। তাই নিয়ে প্রত্যূষ থেকে নিরন্তর লোকসমাগম আলাপ অভ্যর্থনা চল্‌চে। তার উপরে পত্রের উত্তর দেওয়া আছে তারও পরিমাণ একটুও সংক্ষিপ্ত নয়।

যখন সুস্থ হয়ে বসতে পারব তোমাকে চিঠি লিখব। ইতি-মধ্যে সংক্ষেপে এইটুকু বলে রাখি তোমার উপহৃত গরদের জোড় পেয়ে খুব খুসি হয়েচি। কাজে লাগ্‌বে। যদি কখনো দেখা হয় তবে মোকাবিলায় আনন্দ জ্ঞাপন করব। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

১৩ মে ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কলাণীয়াসু,

রঙীন ভাবরসবাষ্পের মেঘমণ্ডলে নিবিড় করে ঘেরা একটি জগতে তুমি বাস করো— তোমার চিন্তা চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা অভিরুচি সেইখানকারই রঙে রঙানো রসে রসানো, সেইখানকারই উপাদানে তৈরি। তোমার চিঠিগুলি থেকে সেইখানকার বার্ত্তা পাই; সেইখানকার ভাষারও পরিচয় পেতে থাকি। বুঝতে পারি নে তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বুঝি আমি ও জায়গার মানুষ নই। তোমাদের জীবনের লক্ষ্যকে একটি বিশেষ রূপে মূর্ত্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেচ, একটি সুনির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে বিবিধ উপচারসহ তাকে প্রদক্ষিণ করচ। ওখানে বাসা বাঁধবার মতো প্রকৃতিই আমার নয়। তুমি মনে করতে পারো যে, তার কারণ আমার মন ব্রাহ্মসংস্কারে চালিত— একেবারেই নয়, নূতন বা পুরাতন কোনো প্রচলিত সংস্কারে আমাকে কোনোদিন বাঁধে নি। মাঝে মাঝে ধরা দিতে গিয়ে ছিন্ন করে বেরিয়ে চলে এসেচি— আমার জায়গা হয় নি। কোনো সনাতন বা অধুনাতন ছাঁচে-ঢালা উপজগতের মধ্যে নিজেকে ধরাতে পারলুম না। আমি কেবলি চল্‌তে চল্‌তে পাই এবং পেতে পেতে চলি, এমনি করেই এতদিন কেটেচে। তুমি যে পাকা ইঁটের প্রাচীর-তোলা রসলোকে বাস করচ আমার পথের এক অংশে একদা আমি তার মধ্যেও প্রবেশ করেছিলুম— চৈতন্য-

ভাগবতে আমিও একদিন ডুব মেরেছি— কিন্তু আমার যে-পথ আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই পথই আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়েও এল— যদি ওখানে আমাকে কোনো কারণে থাকতেই হোত বাসিন্দা হয়ে থাকতে পারতুম না বন্দী হয়ে থাকতুম। আমি যাঁকে পাই বা পেতে চাই কেবলি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পেতে হয়, আড্ডা গেড়ে বস্‌লেই গ্রন্থিটাকে পাই সোনাটাকে ফেলে দিয়ে। নানা রকম চিহ্ন দিয়ে চেহারা দিয়ে কাহিনী দিয়ে সদরের গেট ও খিড়কির প্রাচীর দিয়ে তোমাদের পাওয়াটাকে খুব পাকা করে নিয়ে তোমরা ভোগ করতে চাও— আমি দেখি আমার যিনি পাওয়ার ধন ঐ সমস্ত পাকা প্রাচীরই তাঁর পালাবার বড়ো রাস্তা। মন্দির থেকে দৌড় মারবার জন্যেই তাঁর রথযাত্রা। আমার সম্পদকে সুনির্দ্দিষ্ট সুরক্ষিত করবার জন্যে আমি আমার পিতামহদের লোহার সিন্ধুকটাকে কাজে লাগাতে চাইনে, ওজনদরে সে সিন্ধুক যতই ভারী ও কারিগরিতে যতই দামী হোক্ না। আমার সম্পদ রয়ে গেল আকাশে আলোতে বাতাসে আর আমার অন্তরাকাশে। আর তাঁর পরিচয় রইল পৃথিবীর সকল কবির কাব্যে, কলারসিকের চিত্রে নৃত্যে গানে, মনীষীর মননে, কর্ম্মীর কর্ম্মে, পৃথিবীর সকল বীরের বীর্য্যে, ত্যাগীর ত্যাগে। এরা যে চলেচে তাঁরই সঙ্গে যুগে যুগে তাঁরই পথে পথে। কোনো বাঁধা বাক্যে তারা ধরা দেয় না, বাঁধা মতে আটক পড়ে না, বাঁধা রূপের শিকল পরে না। একজন যদি বা পথ রোধ করে' হাঁকতে থাকে চরমে এসেচি, আর একজন অট্টহাস্যে সে বাধা চূরমার করে

দেয়। এটা অত্যুক্তি হবে যদি বলি কোনো বাঁধা মতে আমাকে পেয়ে বসে না— কিন্তু সে সব বাঁধনের গ্রন্থি আলগা— যখন টান পড়ে তখন আপনিই খোলে, গলায় ফাঁস লাগায় না।

এত করে তোমাকে এ সব কথা বলচি তার কারণ এই, যে, তুমি মনে করেচ আমি তোমার চিত্তকে আশ্রয় দিতেও পারি। কিন্তু আমার মনে হয়, যে অন্নে তোমার অভ্যাস সে অন্ন আমার ঘরে নেই— তুমি আমাকে যে ভাবে কল্পনা করচ আমি হয় তো সে ভাবের মানুষ নই— আমাকে কাছে দেখ্‌লে সে কথাটা ধরা পড়ে হয় তো তুমি কষ্ট পাবে।

তুমি লিখেচ আমার সম্বন্ধে এক সময়ে তোমার এবং তোমাদের অনেকের একটা বিরুদ্ধতা ছিল। এই বিরুদ্ধতা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে আমার দেশের ভিতরেই আছে। আমার স্বভাব দেশের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারে নি। যাদের আমি বন্ধুভাবে গণ্য করেছি, হঠাৎ দেখি আমার সম্বন্ধে তাদের প্রতিকূলতা নিদারুণভাবে তীব্র হয়ে উঠেচে। বুঝতে পারি আমি যেখানকার লোক সেখানকার সঙ্গে আমি বেখাপ। এক জায়গায় এরা আমার কাছাকাছি এসে হুঁচট খেয়ে পড়ে— সেটা আমার স্বভাবের দোষে না তাদের চলনের ত্রুটিতে সে তর্ক করে কোনো লাভ নেই— এবং তর্কে জিতলেও কোনো সান্ত্বনা নেই।

বাল্যকাল থেকে তুমি যে সব বাংলা বই পড়েচ তোমার চিত্ত এবং রুচি যে সাহিত্যরসে সাড়া দিতে অভ্যস্ত তোমার চিঠিতে তারও বিবরণ দেখলুম। তুমি নিশ্চয় এটা দেখেচ

আমাদের সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার সমালোচনার আমি লক্ষ্য— কিন্তু আমি নিজে পারতপক্ষে সমালোচনার আসরে কলম হাতে নিয়ে নামি নে। আমার দেশের প্রচলিত সাহিত্যের সীমানার মধ্যে আমার চিত্ত পদে পদে বাধা পায়। তার প্রাদেশিকতা, অগভীরতা, অপটুতা আমার আদর্শের সঙ্গে মেলে না। এই সব নানা কারণে আমি খুব কোণে এসে বসেচি। নিজেকে একঘরে' করে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে আরামের ও নিরাপদ। নিশ্চয়ই দেখবে সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার সঙ্গে আমার সুরের মিল হবে না। তার কারণ, আমার দেশে আমি বেগানা— আমাকে যখন তোমাদের ভালোও লাগে সেও হয়ত একটা কোনো আকস্মিক কারণে। অথচ এ কথা নিশ্চয় জেনো, সাহিত্যের দিক থেকে তোমার লেখায় বারে বারে আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেচে। কিন্তু সাহিত্যবিচারবুদ্ধিতে তুমি যে প্রশস্ত আদর্শ পেয়েছ তা আমি মনে করি নে। না পাবার প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্যকে তুমি বাংলা সাহিত্যের বাহির থেকে দেখ্‌তে পাও নি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রকাশ আছে ঘটনাক্রমে তার পরিচয় তোমার কাছে নেই। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে ভিতের উপর তার বাসা ফাঁদচে সে ভিৎটা য়ুরোপীয়। তার গল্প, তার কাব্য, তার নাটক, প্রাচীন রীতির আশ্রয়ে তৈরি হয় নি— সেই কারণেই য়ুরোপীয় সাহিত্যবিচারের আদর্শে তাকে বিচার করা ছাড়া অন্য পন্থা নেই। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দ্দেশ এখানে একেবারেই খাটবে না।

যখন কলকাতায় যাব কোনো সুযোগে হয়ত দেখা হতে পারে। সম্প্রতি আমার বৌমা তাঁর সংসার নিয়ে দার্জ্জিলিঙে আছেন— সেই জন্য কলকাতায় গেলে জোড়াসাঁকোর শূন্য বাড়িতে না থেকে স্নেহাস্পদ প্রশান্তকুমারের বরাহনগরের বাগান-বাড়িতে দুই চার দিন থেকে আবার এখানে পালিয়ে আসি। সেখানে তুমি হয়ত যেতে সঙ্কোচ বোধ করবে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যদি আসতে পারো বড়োমানুষির বাধা পাবে না। আগে থাকতে যদি জানতে পারি তবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু কবে কলকাতায় যাব জানি নে— যাবার একটুও ইচ্ছে নেই এইটুকু বলতে পারিনে। এতবড়ো চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কিন্তু যে আমাকে সত্যই বুঝতে চায় সে আমাকে পাছে একটুও ভুল বুঝে অস্থানে অর্ঘ্য আহরণ করে এটাতে আমার একান্ত অনভিরুচি বলেই এতটা লিখ্‌তে হোলো। হয়তো কিছু অহঙ্কারের মত শোনাচ্চে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণা যদি অহঙ্কৃত ধারণাই হয় সেটাও প্রকাশ হওয়াই ভালো ইতি

৩০ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার নিরতিশয় ব্যস্ততার মধ্যে আমি নতুন কবিতা স্বহস্তে লিখে শ্রীপতি বসুকে পাঠিয়েছি সেটা কোথায় অন্তর্দ্ধান করল? তার পরিবর্ত্তে শ্রীপতির এক অভিমানক্ষুব্ধ পত্র পেলুম— এ পত্র পোষ্টবিভাগের কর্ত্তাদের প্রাপ্য। তোমরা কোন্ চিঠি পাও কোন্‌টা পাও না তাও নির্ণয় করা অসাধ্য

১২

১৫ মে ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রোসো, সব প্রথমে তোমাকে গুটিকতক কাজের কথা বলি। ভয় পেয়ো না।

হঠাৎ কিছুদিন পূর্ব্বে পারস্যরাজ আমাকে তাঁর রাজ্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নিজের দেহ দারিদ্র্য ভুলে গিয়ে স্বীকার করেছি। সেখানকার গোলাপবাগানের বুল্‌বুলের গীতপত্রী মনে এসে পৌঁছিল। সব প্রস্তুত। সেই সময়ে আমার অনুভব হোলো যে-রসের আসরে এ জন্মে আমার ডাক পড়েচে সেখানকার পরিভাষায় সব ভাষাই মেলে। তাই তোমাকে একখানা পত্রে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম কোনো বিশেষ কুলুপে আমার ভাণ্ডারদ্বার খোলে না। বস্তুত বিশেষ কুলুপের জটিল চেহারা দেখ্‌লেই আমাকে ব্যস্ত করে তোলে। হয়ত আমার সে লেখায় কিছু স্পর্দ্ধার সুর ছিল— সেটা একেবারেই ভালো নয়— তোমার আনন্দের উৎস যদি কোনো বিশেষ আকারের ফোয়ারা দিয়ে উচ্ছলিত হয় তার রূপ ও ভঙ্গী শুধু কেবল রসমাধুর্য্যে নয় তোমার মমত্বের অফুরান ইন্দ্রজালে মূল্যবান। তোমার চিত্ত গভীরভাবে তার মধ্যে আবিষ্ট হোক্‌না কেন!

সেই ও পারের গোলাপবাগানে বুলবুলের আসরের পথে ডানা মেলচি এমন সময়ে জ্বর এল। বুঝলুম আমার মনিব দ্বার

আগ্‌লে দাঁড়ালেন। জ্বর আমার প্রায়ই হয় না। এবারকার মতো চুকে গেল।

আর একটা কথার উপর তোমার মন হুঁচট্ খেয়েছে। সে হচ্চে শ্রীযুক্তা। ও বিশেষণটা ভীমের তূণেই মানায়— আমি সব্যসাচীর চেলা। যিনি খামের যোগে তোমার প্রতি এই সংজ্ঞা প্রয়োগ করেছিলেন তিনি আমার সহকারী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র— তাঁর সুকুমার নামকে শ্রীমান পদবীতে ভূষিত করলুম না। শিক্ষার জন্যে ভ্রমরস্য পেলবং পদং সরিয়ে দিয়ে পতত্রীকে বসানো গেল।

আরো একটা বিষয়ে তিনি স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে পরের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছেন। শ্রীপতির নামে যে কবিতা আমি বিশেষ করে রওনা করেছিলুম তার উপর তিনি দক্ষবালার স্বত্ব স্থাপন করেছেন। এ কথা বলে রাখি, নাম্নীর প্রতি যাই হোক ঐ নামের প্রতি আমার লেশমাত্র পক্ষপাত নেই।

যিনি প্রমাদ ঘটিয়েছেন তিনি এই আশু অপরাধের পূর্ব্বেই কিছুকাল থেকেই কান্তাবিরহগুরুণা শাপেনাস্তংগমিতমহিমা। অতএব তাঁর ভ্রম সংশোধন করে তাঁকে ক্ষমার্হ করে নিয়ো।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা আছে। তোমার পরে আমার কোনো শাপ লাগে নি। তোমার জীবনের যন্ত্র এবং আমার যন্ত্রে তারের কিছু তফাৎ আছে। তবুও এক ওস্তাদ আর এক ওস্তাদকে চেনে এবং বাহবা দেয়। আমার বাহবা পেয়েছ।

কিন্তু জ্বরতাপ চড়ে যাচ্চে। তুমি অকারণে নিজেকে পীড়ন কোরো না। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২০ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যদিও জ্বর ভোগ করছিলুম তবুও পারস্যযাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলুম। যাত্রার পূর্ব্বদিনে অসুখ বেড়ে উঠল— ডাক্তার পথরোধ করে দাঁড়াল। তাই পারস্যের বদলে শয্যার শরণ নিয়েছি।

তোমার লেখা যখন যা খুসি পাঠিয়ে দিয়ো। নিশ্চয়ই পড়বো এবং ভাল লাগবারই আশা করি। আমার তরফ থেকে চিঠি লেখা অনেক সময়েই দুঃসাধ্য হবে। কবিপরিচিতি নামক একখানি বই তোমাকে পাঠাতে বলেছি। ইতি ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

[মে ১৯৩১]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এতটুকু একটুখানি জ্বর রক্তের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্চে —ডাক্তার তাকে চিনে উঠ্‌তে পারে না। দার্জ্জিলিঙের হাওয়ায় তাকে ঝাড়িয়ে নেবার জন্যে পরামর্শ দিচ্চে। অবশেষে হার

মেনে সেই দিকে পা বাড়িয়েছি। কাল রবিবারে কলিকাতায় যাত্রা করব। তারপরে দুই একদিন ডাক্তাররা নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা সওয়াল জবাব করে দেহটার কাছ থেকে তার গোপন অপরাধের বিষয় ও আশ্রয়টার কথাটা কবুল করিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। জানি পারবে না। অবশেষে হিমাচলের উপরে ভার পড়বে শুশ্রূষার।

আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব,— ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে নটরাজের নৃত্যও হয়— যমুনায় নৌকা ভাসান দিয়ে শেষকালে পড়ি গিয়ে সেই গঙ্গায় যে গঙ্গা গৈরিক পরে চলেছেন সমুদ্রে। ইতি

শয্যাগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

দার্জিলিং * ৩০ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্ষুদে জ্বরে পেয়ে বসেছিল, তার বহর নিরেনব্বইয়ের বেশি নয়, কিন্তু সেই জন্যেই ঝুঁটি ধরে তাকে বিদায় করা শক্ত হয়ে উঠেছিল। সংসারের সমস্ত ক্ষুদে শত্রুদের জোর ঐখানেই— চেপে ধরতে গেলেই এড়িয়ে যায়। কিছুই নয় বলে যতই অবজ্ঞা করতে চেষ্টা করেছি ততই সে পাকা করে বাসা বাঁধতে

লেগে গেল। অবশেষে দেবতাত্মা নগাধিরাজের শরণ নিয়েছি। নিরেনব্বইয়ের ধাক্কাটা এখানে এসে কেটেচে। আমার শরীরের জন্যে মনে কোনো উদ্বেগ রেখো না। ঘোরতর কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেচে— কুঁড়েমির দুর্গে আছি বল্‌লেই হয়— এমন কি ছবি আঁকার দুর্নিবার নেশাও আমাকে নাগাল পাচ্চে না। আমার খবর যদি পেতে চাও তবে দৈনিক সংবাদপত্র চলবে না— সাপ্তাহিক সম্ভবপর হতে পারবে। যাই হোক দেহটা সম্বন্ধে দুঃসংবাদের আশঙ্কা নেই।

দাদা

ঠিকানা **Asantuli**. দার্জ্জিলিং

১৬

২ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

এখানকার পাহাড়ে এই জ্যৈষ্ঠ মাসেও যেমন অকস্মাৎ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে উঠে চারদিক অকারণে আচ্ছন্ন করে দেয় তোমার মনের মধ্যেও দেখি সেই দশা। কোথাও কিচ্ছু নেই দুঃখের কুয়াশা ঘন করে জমিয়ে তোলো। তোমার পত্রে আমার প্রতি সৌজন্যের কোনো স্খলন হয়েচে এ আমি লক্ষ্যও করি নি তার একটা কারণ বিশ্বাস করতে পারিনে, আর একটা কারণ, দেবতার যে অর্ঘ্যের বর্ণনা নিয়ে তোমার ভাষায় চ্যুতি হয়েচে বলে কল্পনা

করচ সে সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। আমাদের দেবতার যে কি প্রাপ্য আর কি প্রাপ্য নয় সে আমার অগোচর— কেবল মাঝে মাঝে এই কথাটা মনে হয় যাঁদের বন্দনায় কাঁসরের ধ্বনি চলে তাঁদের ভোগের জন্যে কী না চল্‌তে পারে।

শরীরটা এখানে এসে ভালোই আছে সে সংবাদ পূর্ব্বেই জানিয়েছি। দেহটা এখন অপরিমিত আলস্যসাধনায় নিযুক্ত আছে।

তুমি যে-ভাষায় চিঠি লেখ সেই ভাষায় যদি গল্প লেখ নিশ্চয়ই সেটা উপাদেয় হবে। সাজিয়ে লিখ্‌তে গেলেই ঠক্‌বে। তোমার জানা কথা ঘরের কথাকে গল্পে ফুটিয়ে তুল্‌লে সাহিত্যে তা আদর পাবে কেননা তোমার লেখায় সহজ রস আছে। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৪ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি থেকে তোমার লেখা কিছু কিছু আমার চুরি করতে ইচ্ছে করে। হয়ত কোন্‌দিন করব। তোমার মধ্যে দেখবার দৃষ্টি, ভাববার মন, লেখবার কলম ও হৃদয়ের আবেগ একসঙ্গে মিলেচে। তোমার লেখায় অনায়াসে তুমি রস সঞ্চার করতে পারো। লেখক হিসাবে আমার একটা অভাব আছে।

আমি আমাদের দেশের সমাজকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানি নে। তাই গল্প যখন লিখি ছবিতে ফাঁক থাকে, পাশ কাটিয়ে চলতে হয়। তোমার চিঠিগুলিতে খাঁটি বাঙালীঘরের হাওয়া পাই। বিদেশে থাকবার সময় এক একদিন হোটেলের কেদারায় ঠেসান দিয়ে মুলতান সুরে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাই, "মনে রইল সই মনের বেদনা", অম্‌নি বাংলা দেশের মেয়ের করুণ হৃদয়ের স্পর্শ মনে এসে লাগে। তোমার চিঠির বিচিত্র আলোচনায় বাঙালী মেয়ের অন্তরের সুরটি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে— আমার ভালো লাগে। হাসি পায় যখন তোমার চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করো যে আমার রাগ হচ্চে। তুমি কি মনে করো মতামতের গদাযুদ্ধ করা আমার স্বভাব? যেখানে আমি রস পাই, সেখানে তর্কের বিষয়টা আমার কাছে গা-ঢাকা দেয়, সেখানে কিছুই আমার পক্ষে বেগানা নয়। বৈষ্ণব যেখানে বোষ্টম নয় সেখানে আমিও বৈষ্ণব, খৃষ্টান যেখানে খেষ্টান্‌ নয় সেখানে আমিও খৃষ্টান। আমাদের দেবপূজায় বিদেশী ফুলের স্থান নেই, কিন্তু আমার মনের কাছে সব ফুলই ফুল, সোলার ফুল ছাড়া। নিজের মধ্যে যা খাঁটি বিশ্বের সত্যকে তা স্পর্শ করে।

ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং— রাজসাহী জেলার রান্নার যে গন্ধ তোমার চিঠি থেকে পাওয়া গেল সেটা লোভনীয়, সুক্তনিতে এসেই থামবার দরকার নেই। আমার মুস্কিল এই, আমার এ বয়সে উপাদেয় ভোজ্যের সমাদর রসনা পর্য্যন্ত, পাকযন্ত্র পর্য্যন্ত নয়। এত কম খাই যে, যদি তার বিবরণ প্রচার করি তবে আমাদের দেশের লোকে আমাকে মহাপুরুষ বলে মনে

করতে পারে। একদা আমি ভাত না খেয়ে রুটি খেতুম— সেটাকে উপবাস শ্রেণীতে গণ্য করে' আমার প্রজাদের মনে প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। অবশেষে নিতান্ত দৈন্যের জ্বালায় যদি অবতারের ব্যবসা ধরা দরকার হয় তবে এই পরিমাণে তার শিক্ষা এগিয়ে আছে।

ঘন মেঘ করে বৃষ্টি এল, এইবার চিঠি বন্ধ করা যাক্। ইতি

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

৭ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

বাহির থেকে যতটা পীড়া পাও তাই যথেষ্ট কিন্তু অন্তর থেকে স্বরচিত পীড়া তার সঙ্গে যোগ কোরো না। বিধাতা যেখানে দাঁড়ি টেনে দেন তোমার মনকে বোলো তার পিছনে মোটা কলমে আরো একটা দাঁড়ি টেনে খতম করে দিতে। আমাদের দেশে অন্ত্যেষ্টিসৎকারের তত্ত্বটা ঐ— মৃত্যু যখন দেহটাকে সংহার করে তখন সেটাকে কবরে জমাবার চেষ্টা না করে আগুন জ্বালিয়ে সেটার উপসংহার করাই শান্তির পথ। সংসার আমাদের অনেক কিছু দিয়ে থাকে কিন্তু তার চরম দান হচ্চে বঞ্চিত হবার শিক্ষাদান। যা পাওয়া যায় তার উপরে

একান্ত নির্ভর করার অভ্যাসেই আমাদের সাংঘাতিক ফাঁকি দেয়, যা হারায় বা না পাওয়া যায় সে ফাঁকির মধ্যে প্রবঞ্চনা নেই,—সেটার উপলক্ষ্য সংসারে পদে পদেই ঘটে তবু তাকে সহজে গ্রহণ করবার শিক্ষাটা কিছুতেই পাকা হতে চায় না। যেখানে আপিল খাটে না সেখানে নালিশ করার মতো অপব্যয় কিছুই নেই। অন্তরের মধ্যে একটা ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার আছে— কিন্তু আমরা সেই ভাণ্ডারের কুলুপে মরচে ধরিয়ে ফেলি তাই সান্ত্বনার সম্পদকে অন্তরে আবদ্ধ রেখে তাকে পাই নে। আমাদের উৎস আছে তার মুখে পাথর চাপানো, ডোবা আছে তার জল পদে পদে শুকিয়ে যায়— সংসারের নিষ্ঠুরতা বারবার কঠোর কণ্ঠে এই কথাই বলে, ঐ পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দাও। বাহিরটা বিশ্বাসঘাতক, তাকে জোরে আশ্রয় করতে গেলেই আশ্রয় ভাঙে— সেই ভাঙনেই যদি অন্তরের পথ দেখিয়ে না দেয় তবে দুদিক থেকেই ঠকতে হয়। আমার মুখে উপদেশ শুনে মনে কোরো না যে আমিই বুঝি বাহিরের মর্ত্ত্যলোক ডিঙিয়ে অন্তরের অমরাবতীতে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। যখন সংসার থেকে তাড়া খাই তখন সংসার পেরোবার রাস্তা সাফ করতে লেগে যাই— ফাঁড়া কেটে গেলে আবার কুঁড়েমিও ধরে। অতএব উপদেষ্টাকে অযথা ভক্তি করবার কারণ নেই।

সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

১৪ জুন ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার জীবনটা তিন ভাগে বিভক্ত— কাজে, বাজে কাজে এবং অকাজে। কাজের দিকে আছে ইস্কুলমাস্টারী, লেখা, বিশ্বভারতী ইত্যাদি, এইটে হোলো কর্ত্তব্য বিভাগ। তার পরে আছে অনাবশ্যক বিভাগ। এইখেনে যতকিছু নেশার সরঞ্জাম। কাব্য, গান এবং ছবি। নেশার মাত্রা পরে পরে তীব্রতর হয়ে উঠেচে। একদা প্রথম বয়সে কবিতা ছিলেন একেশ্বরী — ধরণীর আদিযুগে যেমন সমস্তই ছিল জল। মনের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত তারি কলকল্লোলে ছিল মুখরিত। নিছক ভাবরসের লীলা, স্বপ্নলোকের উৎসব। তার পরে দ্বিতীয় বয়সে এল কাজের তাগিদ। সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে কাছাকাছি মিলতে হোলো। তখনি এল কর্ত্তব্যের আহ্বান। জলের ভিতর থেকে স্থল মাথা তুলল। সেখানে জলের ঢেউয়ে আর ঊনপঞ্চাশ পবনের ধাক্কায় টলে' টলে' কেবল ভেসে ভেসে বেড়ানো নয়, বাসা বাঁধার পালা, বিচিত্র তার উদ্যোগ। মানুষকে মানতে হোলো, রঙীন প্রদোষের আবছায়ায় নয়, সে তার সুখ দুঃখ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল বাস্তব লোকে। সেই মানব অতিথি যখন মনের দ্বারে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে, অয়মহং ভোঃ, সেই সময়ে ঐ কবিতাটা লিখেছিলুম, এবার ফিরাও মোরে। শুধু আমার কল্পনাকে নয়, কলাকৌশলকে নয়, দাবী করলে

আমার বুদ্ধিকে চিন্তাকে সেবাকে আমার সমগ্র শক্তিকে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বকে। তখন থেকে জীবনে আর এক পর্ব্ব সুরু হোলো। একটা আরেকটাকে প্রতিহত করলে না— মহাসাগরে পরিবেষ্টিত মহাদেশের পালা এলো। মাতামাতি ঐ রসসাগরের দিকে, আর ত্যাগ ও তপস্যা ঐ মহাদেশের ক্ষেত্রে। কাজেও টানে, নেশাতেও ছাড়ে না। বহুদিন আমার নেশার দুই মহল ছিল বাণী এবং গান, শেষ বয়সে তার সঙ্গে আর একটা এসে যোগ দিয়েছে— ছবি। মাতনের মাত্রা অনুসারে বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশি, গানের চেয়ে ছবির। যাই হোক্ এই লীলাসমুদ্রেই আরম্ভ হয়েচে আমার জীবনের আদি মহাযুগ— এইখানেই ধ্বনি এবং নৃত্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, এইখানেই নটরাজের আত্মবিস্মৃত তাণ্ডব। তার পরে মধ্যযুগে নটরাজ এলেন তপস্বীবেশে ভিক্ষুরূপে। দাবীর আর শেষ নেই। ভিক্ষার ঝুলি ভরতে হবে— ত্যাগের সাধনা কঠিন সাধনা।

এই লীলা এবং কর্ম্মের মাঝে মাঝে নৈষ্কর্ম্ম্যের অবকাশ পাওয়া যায়। ওটাকে আকাশ বলা যেতে পারে, মনটাকে শূন্যে উড়িয়ে দেবার সুযোগ ঐখানে— না আছে বাঁধা রাস্তা, না আছে গম্যস্থান, না আছে কর্ম্মক্ষেত্র। শরীর মন যখন হাল ছেড়ে দেয় তখনি আছে এই শূন্য। সম্প্রতি কিছুদিন এই অবকাশের মধ্যে ছিলুম— আপিসও ছিল বন্ধ, আমার খেলাঘরেও পড়েছিল চাবা। এই ফাঁকের মধ্যেই তোমার চিঠি এল আমার হাতে, পড়তে ভালো লাগ্‌ল,— ভালো লাগবার প্রধান কারণ, এই চিঠির মধ্যে তোমার একটি সহজ আত্মপ্রকাশ আছে, এই

সহজ প্রকাশের শক্তি একেবারেই সহজ নয়। অধিকাংশ লোক আছে যারা প্রায় বোবা, আর একদল আছে যারা কথা কয় পরের ভাষায়, যারা নিজের চেহারা দাঁড় করাতে চায় পরের চেহারার ছাঁচে। তোমার সমস্ত প্রকৃতি কথা কয়, ঝরনা যেমন কথা কয় তার সমস্ত ধারাটাকে নিয়ে। আমি বুঝতে পারি আমাকে চিঠি লেখায় তোমার আন্তরিক প্রয়োজন আছে। প্রকাশ করবার আবেগ তোমার মধ্যে আছে, তার উপলক্ষ্য চাই। আমি স্নেহের সঙ্গে শুনচি জেনে তুমি মনের আনন্দে অবাধে কয়ে যাচ্চ। আমাকে তুমি দেখো নি, স্পষ্ট করে জানো না, সেও একটা সুযোগ। কেননা তোমার শ্রোতাকে তুমি নিজের মনে গড়ে নিয়েচ। তার অনতিস্ফুট পরিচয়ই একটা আবরণ, তার অন্তরালে অসঙ্কোচে আপন মনে কথা বলে যেতে পারো।

ছুটি ছিল,— না টেনেছিল আসল কাজে, না জমেছিল বাজে কাজ। তাই আমিও তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পেরেছি। কিন্তু যখন নামবে বর্ষা, কাজের বাদল, তখন আর সময় দিতে পারব না। আর বেশি দেরি নেই। ইতিমধ্যে দুই একদিন ছবি আঁকার পাকের মধ্যে পড়েছিলুম, ভুলেছিলুম পৃথিবীতে এর চেয়ে গুরুতর কিছু আছে। যদি পূরোপূরি আমাকে পেয়ে বসত তাহলে আর কিছুতেই মন থাকত না। ওদিকে কাজের দিনও এলো বলে, তখন সময়ের মধ্যে ফাঁক প্রায় থাকবে না। কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখচি, কারণ, আমার চিঠি পাওয়া তোমার অভ্যাস হয়ে আসচে, বন্ধ যখন হয়ে যাবে তখন মনে কোরো না তার কারণ উপেক্ষা। আমার সময়ের উপর

আমার ব্যক্তিগত অধিকার খুব কম, অবকাশের তহবিল সম্পূর্ণ আমার জিম্মায় নেই, তাকে যেমন খুসি ব্যয় করতে পারি নে।

তোমাদের পূজার্চ্চনার সঙ্গে বিজড়িত দিনকৃত্যের যে ছবি দিয়েছ, তার থেকে নারীপ্রকৃতির একটি সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পেলুম। তোমরা মায়ের জাত, প্রাণের পরে তোমাদের দরদ স্বাভাবিক ও প্রবল। জীবদেহকে খাইয়ে পরিয়ে নাইয়ে সাজিয়ে তোমাদের আনন্দ। এর জন্যে তোমাদের একটা বুভুক্ষা আছে। শিশুবেলাতেও পুতুল খেলাতে তোমাদের সেই সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। তোমার বোন যে তোমাকে প্রাণপণে সেবা করত সে তার স্বভাবের গরজে ; না করতে পারলেই তার চিত্ত বঞ্চিত হোতো। ঠাকুরের সেবার যে বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই সেই মাতৃহৃদয়েরই সেবার আকাঙ্ক্ষাকে বড়ো করে পরিতৃপ্তি দেবার এই উপায়। ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলা, কাপড় পরানো, পাছে তাঁর পিত্তি পড়ে এই ভয়ে যথাসময়ে আদর করে খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারের বাস্তবতা আমার মতো লোকের কাছে নেই, তোমাদের কাছে আছে তোমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির নিরতিশয় প্রয়োজনের মধ্যে— যেমন করে হোক্ সেই প্রকৃতিকে চরিতার্থতা দেবার মধ্যে। প্রাণের বেদনা যে আমার প্রাণেও বাজে না, তা নয়, কিন্তু সে বেদনা যথাস্থানেই কাজ খোঁজে, কাল্পনিক সেবায় নিজেকে তৃপ্ত করবার চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,— আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে— সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—

যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়। ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করেচেন, সেইখানে নারীর পূজা সত্য হয়েচে। মানুষের মধ্যে যে দেবতা ক্ষুধিত তৃষিত রোগার্ত্ত শোকাতুর, তাঁর জন্যে মহাপুরুষেরা সর্ব্বস্ব দেন, প্রাণ নিবেদন করেন, সেবাকে ভাববিলাসিতায় সমাপ্ত না করে তাকে বুদ্ধিতে বীর্য্যে ত্যাগে মহৎ করে তোলেন। তোমার লেখায় তোমাদের পূজার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয় এ সমস্তই অবরুদ্ধ অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা। আমার মানুষ-রূপী ভগবানের পূজাকে এত সহজ করে তুলে তাঁকে যারা প্রত্যহ বঞ্চিত করে তারা প্রত্যহ নিজে বঞ্চিত হয়। তাদের দেশের মানুষ একান্ত উপেক্ষিত, সেই উপেক্ষিত মানুষের দৈন্যে ও দুঃখে সে দেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে সকল দেশের পিছনে পড়ে আছে। এ সব কথা বলে' তোমাকে ব্যথা দিতে আমার সহজে ইচ্ছা করে না— কিন্তু যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না। গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলেম তখন পশ্চিমের কোন্ এক পূজামুগ্ধা রানী পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন— ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি। দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ-সামর্থ্য সময় প্রীতি ভক্তি সমস্ত দিচ্চে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্চে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোনো দেশেই নেই, এর প্রধান

কারণ এই যে, এ দেশে হতভাগা মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা নিচ্চেন হরণ করে।

রানী মহলানবিশ, প্রশান্ত মহলানবিশের স্ত্রী। প্রশান্ত মহলানবিশ বিশ্বভারতীর প্রধান পাণ্ডা। কিন্তু পাণ্ডা নানা কর্ত্তব্য নিয়ে অন্যমনস্ক, সেই জন্যে তোমাকে বই পাঠাবার আবেদন আমি পুরুষ দেবতাকে লঙ্ঘন করে নারী দেবতাকে জানিয়েছিলুম সেই জন্যেই তার ফল এত দ্রুত পাওয়া গেল। ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

দাদা

একটা কথা মনে রেখো তোমার উজ্জ্বল রচনায় যে ছবি আমার কাছে প্রকাশ পায় আমার কাছে সে অত্যন্ত ঔৎসুক্য-জনক। তোমার লেখার রস আমাকে গভীর আনন্দ দেয় মতের অনৈক্য স্বতন্ত্র কথা। তোমার লেখা অত্যন্ত সত্য সেইখানে তার মূল্য অনেক। দার্জ্জিলিং

২০

১৮ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

রাগ করতে যাব কেন? তুমি আমার নামে যে কয় দফা নালিশ তুলেছ প্রায় সবগুলোই যে সত্যি। অস্বীকার করতে পারব না যে আমি অনেক কথাই বলেছি যা দেশের লোকের

কানে মধুর ঠেকে নি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন করতে গিয়ে সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, প্রজারা জয় জয় করেছিল, সোনার সীতা দিয়ে তিনি ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিলেন। দশের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে যদি সত্যকে নির্ব্বাসন দিতে পারতুম, তাহলে সান্ত্বনার প্রয়োজনে সোনার অভাব ঘটত না। আমার চেয়ে ঢের বড়ো বড়ো লোকেরাও যে-কালে ও যে-সমাজে এসেছেন সেখানে তাঁরা তিরস্কৃত হয়েচেন— নইলে বিধাতা তাঁদের পাঠাবেন কেন? দশের ভিড়ে একাদশ দ্বাদশ সর্ব্বদাই আসে, কোম্পানির কাগজ জমিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে বিষম মুস্কিলটা, হিসাবী লোকের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার জন্যে। প্রতিধ্বনির সম্প্রদায়, প্রথার প্রাচীর তুলে অচল দুর্গ বানিয়েচে, তাদের কণ্ঠে কণ্ঠে পুঁথির প্রতিধ্বনি এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে হাজার হাজার বৎসর ধরে একটানা চলেইচে— মহাকালের শৃঙ্গধ্বনি মাঝে মাঝে জাগে সেই ফাঁকা আওয়াজের শূন্যতা ভরিয়ে দেবে বলে। পানাপুকুর স্তব্ধ হয়ে থাকে আপন পাড়ির বাঁধনে— হঠাৎ এক এক বছর বর্ষার প্লাবন আসে তার কূল ছাপিয়ে দিতে— সেটা দেখায় যেন বিরুদ্ধতার মতো, কিন্তু তাতেই রক্ষে। আমি গোড়া থেকেই একঘরের দলে ভিড়েছি, ঘরের কোণ-বিহারীদের মাঝখানে যারা বেগানা আমি সেই হা-ঘরেদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লুম— ঘোরো যারা তারা মারতে আসবে, মারতে এসেই বেরোতে শিখবে!

তুমি লিখেচ আমি পুরাতন ভারতের প্রতিকূল। রঘুনন্দনের ভারতটাই বুঝি পুরাতন ভারত? দেবীদাসের কৌলীন্যই বুঝি

সনাতন কৌলীন্য? মহাভারত পড়েছ ত— পৌরাণিক যুগের আচার আচমনে উপবাসে বুকের হাড় বের করা পুরাতন ভারতের সঙ্গে কোন্‌খানে তার মিল? যে পুরাতন ভারত চিরন্তন ভারত আমি তাকেই প্রণাম করে মেনে নিয়েছি, তার বাইরে যাই নি। আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে-উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ-বর্জ্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা,— যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়, পাণ্ডাপুরোহিতের পদসেবায় নয়। যে-য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কার-মুক্ত করে কর্ম্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য জানুক বা না জানুক। যে-য়ুরোপ শক্তি-পূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খর্পরে নররক্তের অর্ঘ্য রচনা করচে সেই য়ুরোপ পৌরাণিক— সেই য়ুরোপ জানে না বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্য তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আমরাও যেমন অন্তরের পাপকে বাহিরের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ করতে চেয়েছি— তারাও তেমনি অন্তরের অকৃতার্থতাকে বাহিরের আয়োজনে পূর্ণ করবার দুরাশা রাখে, এইখানেই যাকে আমরা পুরাতন ভারত বলি তার সঙ্গে এদের মেলে। মেলে না সেই উপনিষদের সঙ্গে যিনি বলেচেন,

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

যে দেবতা সকল জনানাং হৃদয়ে, যাঁর কর্ম্ম আচারবিচারের নিরর্থক ক্রিয়াকর্ম্ম নয় সকল বিশ্বের কর্ম্ম, সকল আত্মার মধ্যে যে মহাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় তিনিই উপনিষদের দেবতা, তাঁকেই দেউলের মধ্যে সরিয়ে রেখেছে যাকে বলি পুরাতন ভারত— আর সোনার শিকলে বাঁধতে চেয়েচে স্বর্ণলঙ্কাপুরীর য়ুরোপ। এই উভয়ে পরস্পরের সতীন বলেই এদের পরস্পরের প্রতি এত বিরাগ। মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্ম্মে যিনি বিশ্বকর্ম্মা, আমি জেনে না জেনে সেই দেবতাকেই মেনেচি— তিনি যেখানে উপবাসী পীড়িত সেখান থেকে আমার ঠাকুরের ভোগ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারিনে। খৃষ্ট বলেচেন, বিবস্ত্রকে যে কাপড় পরায় সেই আমাকেই কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সে আমাকেই অন্ন দেয় —এই কথাটাই ব্রহ্মভাষ্য। এই কথাটাকেই "দরিদ্রনারায়ণ" নাম দিয়ে হালে আমরা বানিয়েছি— দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণকে উপলব্ধি ও সেবা করার কথাটা ভারতের জালস্বাক্ষর করা— আমাদের উপলব্ধি প্রধানত গো-ব্রাহ্মণের মধ্যে। কিন্তু যথার্থ পুরাতন ভারত, যে-ভারত চির-নূতন— যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি— তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার সব লেখা যদি ভালো করে পড়তে তাহলে বুঝতে আমার চিত্ত মহা-ভারতের অধিবাসী— এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।

যদি সময় পাই তোমার অন্য নালিশের কথা অন্য কোনো চিঠিতে বলবার চেষ্টা করব। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২১

২৩ জুন ১৯৩১

ওঁ দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

আমার কল্পরূপকে আশ্রয় করে যাঁকে তুমি হৃদয়ে উপলব্ধি করেচ আমি তাঁকেই পূজা করে থাকি, তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই— তিনি পরমমানব। নিজেকে বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়ে যখন আমি ধ্যান করি তখনি নিজেকে আমি সত্যরূপে জানি, আমার ছোটো-আমির যত কিছু ক্ষুদ্রতা সব বিলীন হয়ে যায়— তখন আমি সত্য আধারে নিত্য আধারে থাকি। তাঁরই আহ্বানে রাজপুত্র ছিন্নকন্থা পরে' পথে বেরিয়েছেন। বীরের বীর্য্য, গুণীর গুণ, প্রেমিকের প্রেম তাঁরি মধ্যে চিরন্তন। তুমিও হৃদয় দিয়ে তাঁকেই গভীরের মধ্যে স্পর্শ কর, যেখানে তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার সত্যকার আত্মনিবেদন। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ— তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে। আমি সহরের মানুষ, একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুন্‌লুম, "আমি

কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।" আমি যেন চম্‌কে উঠ্‌লুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, "হৃদা মনীষা"— হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে। সেই মহান্ আত্মার অমরাবতী হচ্চে, "সদা জনানাং হৃদয়ে।" কত লোক দেখেচি যারা নিজেকে নাস্তিক বলেই কল্পনা করে, অথচ সর্ব্বজনের উদ্দেশে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করচে, আবার এও প্রায় ই দেখা যায় যারা নিজেকে ধার্ম্মিক বলেই মনে করে তারা সর্ব্বজনের সেবায় পরম কৃপণ, মানুষকে তারা নানা উপলক্ষ্যেই পীড়িত করে বঞ্চিত করে। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কর্ম্মের মিল আছে মহান্ আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ আছে কত নাস্তিকের,— তাদের সত্য পূজা জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে, কত বিচিত্র কীর্ত্তিতে জগতে নিত্য হয়ে গেছে, তাদের নৈবেদ্যের ডালি কোনোদিন রিক্ত হবে না। মনের মানুষের শাশ্বত রূপ তারা অন্তরে দেখেচে, তাই তারা অনায়াসে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত পণ করতে পারে।— তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ— সেই বেদনীয় পুরুষকে আপনার মধ্যে জানো, মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক্। য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি— কারণ তারা বেঁচে থাকে সকল কালের সকল লোকের মধ্যে, যাঁর উপলব্ধির মধ্যে তাদের আত্মোপলব্ধি তাঁর বিরাট আয়ু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সকল সত্তাকে নিয়ে। মানুষকে অন্নবস্ত্রবিদ্যা, আরোগ্য, শক্তি সাহস দিতে হবে এই সাধনায় যারা আত্মনিবেদন করেচে তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা মানুক্

বা না মানুক তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেচে, সেই মহান্ আত্মাকে, সেই বিশ্বকর্ম্মাকে, যাঁকে জান্‌লে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে থেকে বাঁধা অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁরা পূজাকে নিঃশেষিত করে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না, কেননা, তাঁরা মনের মানুষকে দেখেচেন মনের মধ্যে, মানুষের মধ্যে নিত্যকালের বেদীতে। দেশ বিদেশের সেই সব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্ম্মভাই বলেই জানি। সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাঁদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তাঁরা যে দেশে থাকেন সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক্ এই আমার কামনা। তোমার চিঠিতে বারবার তুমি লিখেচ, নিজের দেশের কাছ থেকেই নিতে হবে। সত্য কথা, কিন্তু নিজের দেশ সকল দেশেই আছে, অন্য দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সকল দেশের— যদি অভিমানে বা অশক্তিতে তা না নিই তবে নিজের সম্পত্তিকে অস্বীকার করা হয়,— বিশ্বমানবের বেদীতে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, জ্ঞানের প্রেমের কর্ম্মের, তাতে সকল মানুষেরই ভোগের অধিকার,— তাকে নিয়েও যদি জাত মান্‌তে হয় তবে সঙ্কীর্ণভাবে হিঁদু হয়েই মরব মানুষ হয়ে বাঁচব না। যদি বলো নকল, তা নিজের দেশের নকলও নকল, পরের দেশের নকলও নকল— যে কর্ম্ম খাঁটি তা নকল নয়, যা মেকি তাই নকল, তার উপর স্বদেশেরই ছাপ থাক্ আর বিদেশের।

তোমাকে সম্প্রতি আমার লেখা যে বই পাঠিয়েছি তার মধ্যে আমার বিশেষ কোনো উপদেশ আছে বলেই তোমাকে পাঠিয়েছি

তা নয়— মনে করেছিলুম এই বইগুলি সম্ভবত তোমার কাছে নেই। এগুলি সাহিত্যের বই, এদের মূল্য ভাবরসের। আমার যে সব বইয়ে সমাজ ধর্ম্ম স্বদেশ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করেচি সে তোমাকে দিই নি, সেগুলোতে মতামতের তর্ক বিতর্ক। ইচ্ছা কর পাঠিয়ে দিতে পারি। ১লা জুলাই পাহাড় থেকে নামব চার পাঁচ দিন কলকাতায় থাকব— তার পর শান্তিনিকেতন। ইতি ৮ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২২

২৪ জুন ১৯৩১

ওঁ দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

আমের প্রতি আমার প্রবল লোভ। তোমাদের উত্তর বঙ্গের চাপড় ঘণ্ট এবং বেতের শুক্তনি আমার রুচির পক্ষে বেশি তীব্র ; তাদের সম্বন্ধে আমার রসনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু নাম শুন্‌লে গুরুমশায়ের পাঠশালা মনে পড়ে। যাই হোক এই ফলের অর্ঘ্যযোগে তোমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেবা আমাকে আনন্দ দিয়েচে। এই পর্য্যন্ত যেই লিখেচি সেই মুহূর্ত্তেই আমার সেবক তোমার দানের ডালি থেকে কয়েকটি ফল একটি পাত্রে সাজিয়ে আমার সামনে ধরল। আমার মন সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েচে। ফল ভোগ সমাধা হোলো

আমার। কিন্তু অবকাশ নেই। আজ সার জগদীশচন্দ্র মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন। কোথাও বেরই নে, এ রকম ভোজেও আমার রুচি নেই, কিন্তু জগদীশের আহ্বান এড়াতে পারিনে। সাজসজ্জা করে বেরতে হবে। এদিকে অম্বুবাচীর আকাশ অম্বুবাচনে মুখর হয়ে উঠেচে। কিন্তু গিরিরাজের প্রকাশ বাষ্পে আচ্ছন্ন।

চিঠির মধ্য দিয়ে তোমার লেখা যতই পড়ি যেমন আনন্দিত ও বিস্মিত হই তেমনি মনে বেদনাও বোধ করি। তোমার মধ্যে যে সংরাগ যে আবেগ যে প্রবল প্রকাশের শক্তি তা প্রতিহত হয়ে তোমাকে পীড়িত করচে। বিধাতা তোমাকে শক্তি দিয়েছেন অথচ ক্ষেত্র দেন নি এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছু হতে পারে না।

আজ আর সময় নেই। ইতি ৯ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৩

২৭ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যে মত, চিন্তাপ্রণালী দিয়ে তার সঙ্গে তোমার হয় তো মিল হবে না, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে মিল হবে। তোমার হৃদয় যে গন্ধে আনন্দ পেল, হয় তো ঠিক জানল না সে গন্ধ রজনীগন্ধার বন থেকে আসচে, কিন্তু আনন্দটি সত্য। যদি ঐখানেই শেষ হোত তাহলে কথা ছিল না, আনন্দ যদি আমার

নিজের মধ্যেই এসে অবসান হোত তাহলে চুকে যেত। ওকে যে আবার কোনো একটা আকারে ফিরিয়ে দিতে হয়, পূজায়, সেবায়। কিন্তু ঠিকানা ভুল হলে আপ্‌শোষের কথা। আনন্দ যখন পাই তখন সেটা কোথা থেকে পাই স্পষ্ট নাই বা জানলুম, পেলেই হোলো। কিন্তু সেবা যখন দিই তখন কোথায় গেল না জানলে লোকসান। পোষ্ট্‌বাক্সে চিঠি ফেলে দিলুম সেটা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছল এটা কি সেই রকম ব্যাপার? ঠাকুরকে কাপড় পরালুম, সে কাপড় কি পৌঁছবে বস্ত্রহীনের কাছে, ঠাকুরকে স্নান করালুম সেই স্নানের জল কি পৌঁছবে যে-মানুষ জলের অভাবে তৃষিত তাপিত? তা যদি না হোল তাহলে এ সেবা কোন্ কাজে লাগ্‌ল? কেবল নিজেকে ভোলাবার কাজে? নিজের ছেলেকে যখন কাপড় পরাই তখন তার মধ্যে দুটো কথা থাকে, এক হচ্চে, সে কাপড় যথার্থই ছেলের প্রয়োজনের কাপড়, দুই হচ্চে ছেলের প্রতি আমার স্নেহ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করে নিজেকে সার্থক করে। খেলার সামগ্রীকে যখন কাপড় পরাই তখন কেবলমাত্র আমার তৃপ্তিই হোলো, বাকিটুকু ব্যর্থ। তুমি লিখেচ ঠাকুরের সেবা এবং জীবের সেবা দুইই আমাদের পূজার অঙ্গ কিন্তু দুর্ম্মতিবশত, যে-সেবাটা জগতের দুঃখনিবারণের জন্য সত্যকার কাজে লাগে বর্ত্তমান কালে সেইটেকে আমরা উপেক্ষা করেছি। ভালো করে ভেবে দেখো কালক্রমে এ মোহ এলো কেন? তার কারণ, এই বিশ্বাস মনে আছে যে ঠাকুরকে অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে একটা সত্যকার কাজ করা হোলো। তা ছাড়া ঠাকুরের স্থান সর্ব্বাগ্রে, জীবের স্থান

তার পরে, অতএব বড়ো কর্ত্তব্যটাকে সস্তায় সেরে বড়ো পুণ্যটা লাভ করা হয়ে গেলে বাকিটা বাদ দিতে ভয় হয় না, দুঃখ হয় না— বিশেষত বাকিটাই যেখানে দুষ্কর। জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ, লোকে তাই করে,— সে ভক্তি অধিকাংশ স্থলেই অস্থানে পড়ে' নিষ্ফল হয় ; যথার্থ ব্রহ্মণ্যগুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হোন্, তাঁকে ভক্তির দ্বারা ভক্তির সত্যফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয় এই জন্যই অস্থানে ভক্তির দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েচে। কালের ধর্ম্ম বলে' কোনো পদার্থ নেই, মানবচরিত্রের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা যদি থাকে তবে সেটাকে ঠেকানো যায় না। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই মানুষ বঞ্চিত উপেক্ষিত, মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে আছে আচারে নেই ; তার প্রধান কারণ, ধর্ম্মসাধনায় মানুষ গৌণ। শস্তায় পাপমোচন ও পুণ্যফল পাবার হাজার হাজার কৃত্রিম উপায় যে দেশের পঞ্জিকায় ও ভাটপাড়ার বিধানে অজস্র মেলে সে দেশে বীর্য্যসাধ্য সত্যসাধ্য ত্যাগসাধ্য বুদ্ধিসাধ্য ধর্ম্মসাধনা বিকৃত না হয়ে থাকতেই পারে না। যদি গঙ্গাস্নান করলেই, যদি বিশেষ তিথিতে যে-কোনো ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেই পাপ যায় তাহলে সযত্নে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক পাপ না করাটা স্বভাবতই পিছিয়ে পড়ে। যেটা অন্তরের জিনিষ, যেটা চৈতন্যের জিনিষ সেটাকে জড়ের অনুগত করে' যদি নিয়ত তার অসম্মান করা হয় তবে আমাদের অন্তরপ্রকৃতি জড়ত্বে ভারগ্রস্ত হতে বাধ্য। দেবপ্রতিমার কাছে পাঁঠা বলিদানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

যখন করি তখন বলে থাকি পাঁঠাটা প্রতীকমাত্র আসল জিনিষটা হচ্চে মনের পাপ। কিন্তু ব্যাখ্যাটা মুখের কথা, কর্ম্মটাই বাস্তব, তাই পাপটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায় বরঞ্চ কিছু বেড়ে ওঠে মাঝের থেকে হতভাগা প্রতীকটা পায় দুঃখ। প্রতীকের উপর দিয়েই যত ফাঁকি চালিয়ে দিয়ে মানুষ আপন বুদ্ধিকে আপন মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে, আপন সাধনাকে দুর্ব্বল ও লঘু করে দেয়। পুনশ্চ ব্যাখ্যা করবার সময় বলা হয়, যারা অজ্ঞান তাদের পক্ষেই এই বিধি। কিন্তু যারা অজ্ঞান তাদের অজ্ঞানকেই প্রশ্রয় দিয়ে চিরস্থায়ী করার দ্বারাই মুক্তির পন্থা সুগম করা হয় এ কথা মানতেই পারি নে। চিরজীবন পাঁঠাবলি দিয়ে এবং বলির সংখ্যা ভীষণভাবে বাড়িয়ে তোলার রক্তসিক্ত পথ দিয়ে কয়জন পূজক অবশেষে বাহিরের ঐ পাঁঠা থেকে অন্তরের পাপের ঠিকানায় পৌঁছেছে? যারা জ্ঞানী তাদের তো কোনো ভাবনাই নেই, তারা সকল ক্ষেত্রেই স্বতই ঠিক পথ বেয়ে চলে, যারা অজ্ঞান তাদের মুগ্ধ করে রাখলে মোহের অন্ত তারা পাবে না। এই কারণেই এ দেশে বহুযুগ থেকেই পুণ্যলুব্ধ মানুষ পাণ্ডার পায়ে মোহর ঢেলে আসচে, দেশের লোকের গভীর দুঃখ যেখানে সেখানকার জন্যে, না মন, না ধন কিছুই রইল বাকি। এ সম্বন্ধে দোষ দেবার বেলা আমরা আর এক প্রতীককে পাকড়াও করেছি, সে হচ্চে ঐ বিদেশী। সন্দেহ নেই বিদেশীর হাত দিয়ে মার খেয়ে থাকি কিন্তু সেই বিদেশীকে দিয়ে আমাদেরকে আঘাত করাচ্চে কে? আমাদের ভিতরকার সেই পাপ সেই কলি যে চিরদিন দেশের মানুষকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করে এসেচে—

তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার মতো কৌতূহলও যার নেই। যে মারের জমি বহুকাল থেকে আমরা নিজের হাতে তৈরি করেচি সেইখানেই আজ শত শতাব্দীর বেশি কাল ধরে বিদেশী মারের ফসল বুনে আসচে। আমাদের ধর্ম্মকে যদি সত্য করতে পারতুম, পূজার মধ্যে যথার্থ বীর্য্য, সেবার মধ্যে যথার্থ ত্যাগ থাকত, আমাদের সাধনা যদি যথার্থ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ আত্মীয়তার সঙ্গে স্বীকার করতে পারত তাহলে কখনোই দেশকে এত যুগ ধরে এত দৈন্য এত অপমান সইতে হত না, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত দুর্ভর অজ্ঞানের চাপে সমস্ত দেশের লোক এমন অসহায় ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে মরত না।

তুমি মনে কোরো না, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মানুষ আমার সাধনার লক্ষ্য। চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আপনার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি— নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তাঁর মধ্যে, অনুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা কিছু, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোটো আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়ো আমি, মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধির যোগে আমার পূজা আমার সেবা সত্য হয়, আত্মাভিমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়। কর্ম্মই বন্ধন হয়ে ওঠে এই উপলব্ধির সঙ্গে যদি যুক্ত না হয়। য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের

কর্ম্মকে মহৎ করে তোলেন,— তাঁরা দূর কালের জন্যে প্রাণপণ করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত। যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারা জীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তো নিজেরই পূজা করলেন— তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি বলে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ। তাঁদের দেবতা রইলেন কোথায়, পেলেন কি, কেবল চাল কলা, শাঁক ঘণ্টা, ফুল পাতা, ধূপ ধুনো?

আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার-করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই, বোঝে না; নিজের দেশ আরো কম বোঝে। অতএব আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না। আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশ স্বজাতির উপরে। আমার এই অপরাধে যদি আমি স্বদেশের লোকের অস্পৃশ্য, সনাতনীদের চক্ষুশূল হই তবে এই আঘাত আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

১লা জুলাই বুধবারে এখান থেকে ছেড়ে বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় পৌঁছব। তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে আমাদের বাড়িতে এলে কোনো বিঘ্ন হবে না। চিঠি লিখে যদি জানাও কোন্‌দিন কোন্ সময় আসতে পারো তাহলে যাতে তোমার কোনো

সঙ্কোচের কারণ না হয় সেই রকম ব্যবস্থা করব। নিজেকে আত্মীয়দের কাছে বিপন্ন করে নিজের দুঃসাধ্য কিছু চেষ্টা কোরো না, আমার সঙ্গে পরিচয় তোমার দুঃখ বা সঙ্কটের কারণ হ'লে তাতে আমি বেদনা বোধ করব।— আমি ধর্ম্ম কাকে বলি তার ব্যাখ্যা তোমাকে শোনাই— কারণ সত্য আলোচনাও ধর্ম্ম— কখনো ভেবো না, মিশনরির মতো তোমাকে দলে টানবার লোভ আমার আছে। মনের কথা ব্যক্ত করাই আমার স্বভাব, দল বাঁধা আমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। ইতি ১২ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৪

২৮ জুন ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এক এক দিন তোমাকে চিঠি লেখার পর আমার মনে অত্যন্ত অনুতাপ বোধ হয়। যেখানে তোমার সব চেয়ে ব্যথা বাজে সেইখানে আমি তোমাকে বারে বারে আঘাত দিই। অথচ কখনোই সেটা আমি ইচ্ছা করে করিনে। তোমার চিঠিতে যে-ঠাকুরের কথা তুমি এমন গভীর আবেগের সঙ্গে বলো তাঁকে আমি চিনি— তোমার উপলব্ধির সঙ্গে আমার মিল আছে— বোধ হয় সেই জন্যেই অনেকটা যেন অজ্ঞাতসারেই তোমার মনকে নাড়া না দিয়ে থাকতে পারি নে। আমার ঠাকুরকে আমি সেই মন্দিরে দেখতে চাই যেখানে কোনো বানানো

লোকাচারের দেয়াল তুলে কোনো সম্প্রদায় তাঁকে সঙ্কীর্ণভাবে আত্মসাৎ করবার উদ্যোগ না করে— যেখানে সবাই অনায়াসে মিলতে পারে, তাঁকে পেতে পারে, বিশেষ দেশের পণ্ডিতের কাছে বিশেষ ভাষার শাস্ত্র ঘেঁটে বিশেষ রীতির পূজাপদ্ধতির মধ্যে মন আটকা না পড়ে। তুমি যাঁকে ভালোবাসো আমি তাঁকেই ভালোবাসি, সেইজন্যেই আমি তাঁর দ্বার অবারিত করতে ইচ্ছা করি, তাঁর ভালোবাসায় সকল দেশের সকল জাতকেই আপন করে দেখতে চাই। য়ুরোপে যে অংশে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছেন সেখানে আমি আনন্দ করি, আমাদের দেশে যে অংশে তিনি মুগ্ধ আচারে অসত্যে আচ্ছন্ন সেখানে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত। আমি জানি তাঁকে অবগুণ্ঠিত করার অপরাধেই আমার দেশ এতদিন ধরে ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে বঞ্চিত। তাঁর মধ্যে মানুষকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে আমার দেশ পদে পদে বাধা দিয়েছে— দেশের অপমানিত মানুষ তাই ক্ষুদ্র হয়েচে দেশ তাই মুক্তি পায় নি। এই জন্যেই থাকতে পারি নে— রুদ্ধদ্বার মুক্ত করতে কঠোর আঘাত করি, নিজেও আহত হই। যিনি আমার সব চেয়ে সম্মানিত তাঁর জন্যেই দেশের লোকের কাছে অপমান স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েচি, তাঁকে প্রতারণা করে দেশের লোকের আদর আমি চাইনে। তিনি কে?

জানি না কে, চিনি নাই তা'রে,—
শুধু এইটুকু জানি— তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে

অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জ্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি', মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তা'রে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন ;
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্যউপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি'
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
মাধুর্য্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,—
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,

তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়ে বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি'
[জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি', বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,]
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি'
সুখী করি সর্ব্বজনে।

খুব সম্ভব এ কবিতা তুমি পূর্ব্বেই পড়েচ তবু আমার ঠাকুরের ধ্যান তোমার কাছে রাখলুম সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মাঝখানে, সকল বীরের সকল তপস্যায়, সকল প্রেমিকের সকল ত্যাগে। এসব লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়, তার গভীরতম মর্ম্মস্থানে যে কবি আছে তারই, সে কবির আসন সকল দেশেই, সকল্ মানুষেরই অন্তরে— (য়ুরোপেও)।

যাই হোক তুমি যেখানে আশ্রয় পেয়েছ সেইখানেই উদার ভাবে মুক্তভাবে বিরাজ করো, সেইখানেই তোমার চিত্তের বাতায়ন খুলে যাক যেখান থেকে তুমি সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের মনের মানুষকে আপন বলে দেখতে পাও, যিনি য়ুরোপেরও, যিনি অস্পৃশ্য নমশূদ্রেরও, যিনি পণ্ডিত পুরোহিতের বেড়া দেওয়া

কৃত্রিম শুচিতার নিষেধ লঙ্ঘন করে তাঁরই বুকে আসবার জন্যে দিকে দিকে আহ্বান পাঠিয়ে দিয়েচেন।

তুমি যখন খুসি আমাকে লিখো, যদি বাধা থাকে তো লিখো না— যদি দেখা করতে চাও কোরো, যদি বিঘ্ন বা দুঃখের কারণ থাকে তবে চেষ্টা কোরো না। নিশ্চয় জেনো তোমাকে আমি নিকটের বলেই জেনেছি দূরে থেকে— তুমি আনন্দিত হও শান্তি লাভ করো সকল ব্যাঘাত সকল অভাবের মধ্যেও। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে তোমাকে চিঠি লেখার অবকাশ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হবে— তাতে ক্ষোভ কোরো না। ইতি ১৩ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৫

১ জুলাই ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

আমার যাওয়া পিছিয়ে গেল।

নীচে এখনো যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ে নি ও বৃষ্টি নামে নি বলে আমার আত্মীয়েরা আমাকে নিষেধ করলেন। অথচ আমার মনটা নেমেচে শান্তিনিকেতনের দিকে। চেষ্টা করব দু তিন দিনের মধ্যে দৌড় দিতে। ইতি ১৬ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৬

৬ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হিমালয়-শিখরে অধিষ্ঠিত নির্ম্মল অবকাশ থেকে নেমে এসেছি সহরে— এখানে নিরন্তর লোকের ভিড়, কাজের ভিড় —চিত্তবিক্ষেপের হাওয়া এলোমেলো হয়ে বইচে চার দিকে। এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— অতএব কাজ সারা হলেই যত শীঘ্র পারি পালাব শান্তিনিকেতনে— তার পূর্ব্বে হয় তো এক আধ দিন বরানগরে শশিভূষণ ভিলায় অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। এখন থেকে আমার পত্র শীতকালের রিক্ত অরণ্যের মতো বিরল হবে। এখন থেকে নানা লোকের নানা দাবী মেটাবার কাজে আমার সময়টাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। কাল এসেচি— কিন্তু সময় পাই নি— আজও সময়ের দৈন্য ঘোচে নি। ইতি ২১ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৭

৭ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাহিরের বাধাকে বড়ো কোরো না। অন্তরে তুমি যাঁকে গ্রহণ করেচ তাঁরি ভাবরূপ যদি আমার মধ্যে কল্পিত করে থাক তবে কিছুতেই ক্ষতি হবে না।

দেশের লোকের দ্বারে আমি অতিথি হয়েছিলুম, দ্বার ভালো করে খোলা হয় নি।— যদি সত্যের দূত হয়ে কোনো অমৃতবাণী নিয়ে এসে থাকি তবে দ্বারের বাইরে রেখেই বিদায় গ্রহণ করব। গৃহীরা যদি বা উপেক্ষা করে পথিকেরা তা দেশে দেশে নিয়ে যাবে, এমন আশ্বাস পেয়েছি। মানুষের কাছ থেকে মমত্ব মানুষ আকাঙ্ক্ষা না করে থাকতে পারে না— অতএব তোমরা যারা আমাকে প্রসন্ন মনের অর্ঘ্য দিতে পেরেচ তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অন্তরতম শান্তি ও সার্থকতা তোমার জীবনকে পূর্ণ করুক এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২২ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৮

১৫ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন তোমার চিঠি না পেয়ে ভয় হয়েছিল যে হয়ত বা আমার সঙ্গে দেখা করার দুঃসাহসিকতা তোমার অপরাধ বলে গণ্য হয়েচে এবং সে জন্যে তোমাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। আমি চিঠি লিখে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকে আরও গুরুতর করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলুম। আজ তোমার চিঠি পেয়ে মন নিরুদ্বিগ্ন হল।

"লেখন" নামক বইটা নিঃশেষিত। সংগ্রহ করে তোমার ছেলেকে দেব প্রতিশ্রুত ছিলুম। একখানা জীর্ণ মলিন বই পেয়েছি। অগত্যা এইটেই পাঠাতে হবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তোমার চিঠিপত্র থেকে তোমার ছেলের নাম পাইনি। নামটা জানিয়ে দিয়ো। আমি আগামী কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে কলকাতায় যাব—অপরাহ্নে। তার পরদিন শুক্রবারে যাত্রা করব ভূপাল রাজভবনে। তার পরে কবে ফিরব নিশ্চিত জানিনে। বইখানি কলকাতায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি যদি তোমার ছেলে সেখানি উদ্ধার করবার জন্যে দূত পাঠায় তাহলে সহজ হয়।

সেদিন তোমাকে দেখে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তোমার মুখশ্রী, ভক্তিতে সরস মধুর তোমার বাণী আমার মনে রইল। আমার যেটুকু শক্তি আছে সেই শক্তিতে তোমাকে কিছু যদি দিতে পারতুম খুসি হতুম কিন্তু তেমন গভীর

অবকাশ পাবার সম্ভাবনা নেই, তাই কেবল চিঠিতে তর্কই করেচি। সে তর্ক যে পরিমাণে আঘাত করে সে পরিমাণে তৃপ্তি দেয় না। লেখার ভাষায় বাদপ্রতিবাদগুলো কঠোর হয়ে পড়ে— বাক্যের পশ্চাতে যে মন থাকে সে মনের সবটা প্রকাশ পায় না। ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৯

[ভূপাল] ২০ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

পয়লা নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে তোমাকে যে চিঠি লিখে এসেচি সেটা তুমি পাও নি বলে আশঙ্কা করচি। না যদি পেয়ে থাক সেটা আমার ত্রুটিবশত হতে পারে। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, তোমার ঠিকানায় হেমন্তবালা না লিখে হেমন্তকুমারী লিখেছিলুম —এটাকে অপরিশোধনীয় ভ্রম বলা যায় না তবু কর্ম্মচারীদের পক্ষে যথেষ্ট বাধাজনক বলে ঠেকতে পারে। তোমার শেষ চিঠিখানি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে রেলগাড়িতে বর্দ্ধমানে আমার হস্তগত হয়েচে। রাজভবনে আছি, অপরিচিত ঘর, অনভ্যস্ত আসবাব, সময় যে নেই তা নয় কিন্তু সে যেন অন্যের দেওয়া মোটর গাড়ির মতো, কতটা তাকে খাটাতে পারব, কখন্ বল্‌তে হবে, বাস্ আর নয় ঠিক জানি নে— মন তাই আপনার

গাঁঠরি খুলে গুছিয়ে গাছিয়ে বসতে পারে নি। অতএব সংক্ষেপে সারতে হবে। কেবল তোমার দুই একটা কথার উত্তর দিয়ে ছুটি নেব।

জিজ্ঞাসা করেচ তোমাকে যে চিঠি লিখেচি তার কোনো কোনো অংশ কোনো পত্রিকায় ছাপতে হবে কি না। পত্রিকায় আমার চিঠি প্রায় ছাপা হয়ে থাকে। যাঁদের আমি লিখেচি সেটা তাঁদের ইচ্ছায় ঘটে। বোধ করি সম্পাদকেরা সংবাদ পেলে সংগ্রহের চেষ্টা করে। চিঠির উপরে লেখকের স্বত্ব থাকে না। সাধারণ পাঠকেরও দাবী নেই। সর্ব্বজনের পাঠযোগ্য যদি কিছু থাকে তবে কোনো এক সময়ে সেটা সর্ব্বজনের ভোজে গিয়ে পৌঁছয়— কিন্তু তার পরিবেষণকর্ত্তা আমি নই।

যাঁর ধ্যান আমার চিত্তের অবলম্বন শাস্ত্রমতে তাঁকে কি সংজ্ঞা দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেচ। সহজে বোঝাতে পারব না, উপলব্ধির জিনিষকে ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না। তোমার প্রশ্ন এই তিনি কি সর্ব্বমানবের সমষ্টি। সমষ্টি কথাটায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। এক বস্তা আলুকে আলুর সমষ্টি যদি বল তবে সে হল আর এক কথা। মানুষের সজীব দেহ লক্ষকোটি জীবকোষের সমষ্টি, কিন্তু সমগ্র মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আত্মানুভূতিতে জীবকোষসমষ্টির চেয়ে অসীমগুণে বড়। ব্যক্তিগত মানব মহামানব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারি মধ্যেই তার জন্ম ও বিলয় কিন্তু তাই বলে সে তাঁর সমান হতে পারে না। ব্যক্তিগত মানব মহামানবকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়, মহিমালাভ করে যখন সে নিজের ভোগ নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত

হয়, যখন তার কর্ম্ম তার চিন্তা মরণধর্ম্মী জীবলীলাকে পেরিয়ে যায়, যখন তার ত্যাগ তার প্রয়াস সুদূর দেশ সুদূর কালকে আশ্রয় করে, তার আত্মীয়তার বোধ সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে থাকে না। এই বোধের দ্বারা আমরা এমন একটি সত্তাকে অন্তরতমরূপে অনুভব করি যা আমার ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ করে পরিব্যাপ্ত। তখন সেই মহাপ্রাণের জন্যে মহাত্মার জন্যে নিজের প্রাণ ও আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করতে পারি। অর্থাৎ তখন আমি যে জীবনে জীবিত সে জীবন আমার আয়ুর দ্বারা পরিমিত নয়। এই জীবন কার? সেই পুরুষের, যিনি সকলের মধ্যে ও সকলকে অতিক্রম করে, উপনিষদ যাঁর কথা বলেছেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"। কেবলমাত্র জপতপ পূজার্চ্চনা করে তাঁর উপলব্ধি নয়, মানুষের যে-কোনো প্রকাশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে ; অর্থাৎ যাতে সে এমন কিছুকে প্রকাশ করে যার মধ্যে পূর্ণতার সাধনা আছে। এ সমস্তই মানুষের সম্পদ, ক্ষণজীবী পশুমানুষের নয়, কিন্তু সেই চিরমানবের,— ইতিহাস যাঁর মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই বর্ব্বরতার প্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সর্ব্বজনীন সত্যরূপকে উদ্‌ঘাটিত করচে। সকল ধর্ম্মেই যাঁকে সর্ব্বোচ্চ বলে ঘোষণা করে তাঁর মধ্যে মানবধর্ম্মেরই পূর্ণতা,— মানুষ যা-কিছুকে কল্যাণের মহৎ আদর্শ বলে মানে তারই উৎস যাঁর মধ্যে। নক্ষত্রলোকে মানবের রূপ নেই মানবের গুণ নেই, সেখানে কেবল বিশ্বশক্তির নৈর্ব্যক্তিক বিকাশ, বিজ্ঞান তাকে

সন্ধান করে, কিন্তু মানুষের প্রেম ভক্তির স্থান সেখানে নেই। মহাপুরুষেরা সেই নিত্যমানবকেই একান্ত আনন্দের সঙ্গেই অন্তরে দেখেচেন, কিন্তু বারে বারে তাঁকে নানা নামে, নানা আখ্যানে, নানা রূপ কল্পনায় দূরে ফেলা হয়েছে, এমন কি অনেক সময় মানুষ তাঁকে নিজের চেয়েও ছোট করেচে— এবং ভূমার সাধনাকে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ভোগবিলাসের সামগ্রী করে তুলেচে। তুমি প্রশ্ন করেচ বলেই এত কথা বল্‌লুম, নতুবা তর্ক করে তোমাকে পীড়া দিতে আমি ইচ্ছা করি নে। সত্য যদি নিতান্তই আত্মতৃপ্তির উপকরণমাত্র হোত তবে যে অভ্যাসের মধ্যে যে সুখ পায় তাই নিয়েই তাকে থাকতে বলা যেত। সত্যের সঙ্গে ব্যবহারে তৃপ্তি গৌণ, মুক্তি মুখ্য— যে ক্ষুদ্রতার আবরণ থেকে মুক্তি হলে নিজেদের স্পষ্ট করে জানি অমৃতস্য পুত্রাঃ সেই মুক্তি— তার সাধনায় দুঃখ আছে। আমরা দ্বিজ, একটা জন্ম পশুলোকে, আর একটা জন্ম মানবলোকে, এই দ্বিতীয় জন্মের জন্যেই প্রার্থনা করি অসতো মা সদ্‌গময়। ইতি ২০ জুলাই ১৯৩১

দাদা

৩০

২৬ জুলাই ১৯৩১

ওঁ　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ভূপাল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেচি। ফেরবার জন্যে মনটা উৎসুক হয়ে ছিল। যদিও আমার নামের সঙ্গে বেমিল হয় তবু এ কথা মানতে হবে আমি বর্ষাঋতুর কবি। আমার মনের পেয়ালায় এই ঋতুর সাকি যে রস ঢেলে দেন তার নাম দেওয়া যেতে পারে কাদম্বরী। রাজপ্রাসাদে ছিলুম দুটো দিন মাত্র। আরো দুই এক জায়গায় যাবার সঙ্কল্প ছিল, আমার সৌভাগ্যক্রমে, যাঁদের লক্ষ্য করে যাওয়া, তাঁরা কেউ স্বস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। সেটা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে ক্ষতিজনক কিন্তু মনের শান্তির পক্ষে অনুকূল।

আমার বর্ত্তমান ঠিকানাটা জানাবার জন্যেই লিখ্‌তে বসেচি। আর একটি কথা আছে— নিজের মনকে নিয়ে খুব বেশি টানাটানি কোরো না। অপরাধ হয়েছে বলে সর্ব্বদা কল্পনা করাটা কল্যাণকর নয়। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর বিরোধ করে চিত্তকে মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়া তার প্রতি অবিচার করা। বেশ সহজভাবে থাকতে চেষ্টা কর তাতে তোমার অন্তর্য্যামী প্রসন্নই হবেন। যে জিনিষটিকে আশ্রয় করলে তোমার তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হ'ত বলে নিজেকে দুঃখ দিচ্চ খুব সম্ভব সেটি তোমার স্থায়ী অবলম্বনের পক্ষে সঙ্কীর্ণ। তার প্রতি তোমার নিষ্ঠা সুদৃঢ় নয় বলে নিজের বুদ্ধিকে আজ নিন্দা করচ,

তাই বলে নিজের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করে যেখানে তোমাকে ধরে না সেইখানেই নিজেকে কোনোমতেই ধরানোকে তুমি অবশ্য-কর্ত্তব্য মনে কোরো না। আমি যে গৃহে জন্মেচি সেখানকার ধর্ম্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্ম্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না। তবু আমি এ নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে বেশ সহজভাবেই আপন প্রকৃতির পথে চলেছিলুম। সেই পথ ধরেই আজ আমি নিজের উপযোগী গম্যস্থানে পৌঁচেছি। এটাকে অপরাধ বলে মাথা খুঁড়ে মরি নে। দেবতা আমাদের সঙ্গে কেবলি লড়াই করবার জন্যেই লক্ষ্য করে আছেন এটা সত্য নয়, অতএব একাদশীর দিনে অনর্থক নিজেকে পীড়ন না করলে ভক্তবৎসলের নির্দ্দয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি হবে না এটা মনে করা তাঁর প্রতি অন্যায় অবিচার। তোমার পালে একদা আপনি বাতাস এসে লাগবে, যদি বিশ্বাস করে পালটা মেলে রাখ। অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মলেই যে পারে পৌঁছন যায় তা নয়, তলায় যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

ছোট্ট চিঠি লিখ্‌ব মনে করেছিলুম, তর্ক করব না এও ছিল সঙ্কল্প, দুটোই লঙ্ঘন করলুম। কিন্তু তা নিয়ে পরিতাপ করব না। ইতি ১০ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩১

২৭ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার সাধনা সম্বন্ধে তোমার সুন্দর ভাষায় যা লিখেচ সেটি সত্য। মানবের পরিপূর্ণতার শাশ্বত আদর্শ শাশ্বত মানবের মধ্যে আছে,— যে অংশে সেই পরিপূর্ণতা আমরা লাভ করি সেই অংশে সেই পরিপূর্ণের সঙ্গে আমাদের মিলন হয়। সেই মিলনে এত গভীর আনন্দ যে তার জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে পারে। এমনি করেই যুগে যুগে কত সাধকের ত্যাগের উপরেই মানবসভ্যতা প্রশস্ততর প্রতিষ্ঠা লাভ করচে। পূর্ণ মানুষের ডাক না শুন্‌তে পেলে মানুষ বর্ব্বরতার অন্ধকূপে চিরদিনই পশুর মতো পড়ে থাকত। আজো অনেক বধির আছে, কিন্তু যাদের মর্ম্মের মধ্যে পূর্ণের বাণী প্রবেশ করে এমন অল্পসংখ্যক লোকও যদি থাকে তাহলেই যথেষ্ট। বস্তুত তারাই অতি কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেচে। আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের সমস্ত ইতিহাসই হচ্চে সেই অভিসার। নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার রাত্রের এই অভিসারে মানুষ বারেবারেই পথ হারিয়েছে, পিছিয়ে গেছে, কিন্তু এ কথাটা কখনোই সে ভুল্‌তে পারে নি যে তাকে চল্‌তেই হবে, যেখানে আছে সেইখানেই তার চরম আশ্রয় এমন কথা বল্‌লেই মানুষ মরে— এমন কি, যখন সে পিছিয়ে চলে তখনো চলার উপরে তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

আমি যাকে মানুষের সাধনার বিষয় বলি তার একটা বিশেষ দিক হয় তো তোমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। মানুষের পূর্ণতা শতদল পদ্মের মতো, তার বিকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব করে' কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের প্রবল উৎকর্ষসাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ বলে আমি স্বীকার করি নে। অনেক সময় দেখা যায় দৃষ্টি যখন অন্ধ হয় তখন স্পর্শশক্তি অদ্ভুত রকমে বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও বলতে হবে দৃষ্টি ও স্পর্শের যোগেই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ সার্থকতা। মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সঙ্কীর্ণ করে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দেব সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে। পৃথিবীতে যাঁরা বিজ্ঞানের সাধনা করেন তাঁরাও মোহমুক্তির দিকে মানুষের একটা জানলা খুলে দিচ্চেন। কিন্তু যদি তাঁরা বলেন অন্য জানলাগুলি বুজিয়ে দাও দেওয়াল গেঁথে, তাহলে সেই এক জানলার পথে বিজ্ঞানের অতি তীব্র উপলব্ধি জন্মাতে পারে তবু পূর্ণতার ঐশ্বর্য্যে মানুষ বঞ্চিত হবে। পেটুক বল্‌তে পারে জল খেয়ে কেন পেট ভরাব, জঠরের সমস্ত গহ্বর সন্দেশ দিয়ে ঠাসাই ভোজের চরম আনন্দ, তেমনি মাতাল বলে খাবার খেতে শক্তির যে অপচয় হয় সেটা বন্ধ করে একমাত্র মদ খেয়েই তৃপ্তির পূর্ণতা ঘটানো চাই। আপাতত যাই হোক্ পরিণামে উভয়েই বঞ্চিত হয়। সাধারণত যাকে আধ্যাত্মিক সাধন বলা হয় তাকে যখন আমরা লোভের সামগ্রী করে তুলি তখন আলো পাবার জন্যে একটি জানলা ছাড়া অন্য সব জানলায়

দেয়াল গাঁথবার উৎসাহ জাগে। এইরকম গুহাবাসের সন্ন্যাসকে আমি মানি নে; গুহার বাইরের বিরাট জগৎকে আমি গুহার চেয়ে বেশি সত্য বলেই জানি। সেই জন্যেই, কোনো আধ্যাত্মিক নামধারী গুহার মধ্যে ঢুকলেই আমার পরমার্থ লাভ হবে এমন লোভ যদি কোনো খেয়ালে আমাকে পেয়ে বসে তবে ক্ষণকালের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে তার থেকে বেরিয়ে আসব সন্দেহ নেই। যদি বলো অনেকে ত নিজেকে অবরুদ্ধ করার সাধনায় শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে যায়। আমার উত্তর এই, মাড়োয়ারি মহাজন তো রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত আড়তের গদিতে রুদ্ধ থাকে, মুনফাও জমে। কোনো একটি জাতের মুনফাকেই একান্ত করে সেইটেকেই চরম লাভ বলা লোভের কথা। চলমান জগতে যা কিছু চল্‌চে সমস্তকেই অধিকার করে পূর্ণস্বরূপ আছেন অতএব, মা গৃধঃ, লোভ কোরো না —এই হোলো ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। পূর্ণকে উপলব্ধি করতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়-সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি। এই হোল আমার নিজের কথা। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন লোকসেবা সব দিকেই নিজেকে মুক্তি দেওয়ার দ্বারাই পূর্ণকে উপলব্ধি করব— চিত্তে তাঁর বিচিত্র প্রকাশের পথকে সব জানলার যোগেই খুলে রেখে দেব তবেই আমার মনুষ্যত্ব সার্থক হবে। য়ুরোপের সাধকেরা যে মুক্তির পথে অসীম অধ্যবসায়ে মানুষের সহায়তা করচে তাকে আমি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছি, আবার ভারতীয় সাধকেরা আপনার মধ্যে আত্মজ্যোতিদর্শনের যে সাধনাকে গ্রহণ

করেচেন তাকেও আমি প্রণাম করে মেনে নিই। এই উভয়ের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়ে যদি পংক্তিবিভাগ করি, এবং এক পাশ ঘেঁষে সমস্ত জীবন কেবল শুচিবায়ুর চর্চ্চা করি তাহলে কৃপণের গতি লাভ করব।

কিন্তু একটি কথা মনে রেখো, চতুষ্পথে আমার চলা; সম্প্রদায়ের দুর্গে রুদ্ধদ্বারের মধ্যে আমি বাঁচিনে। এই জন্যে যদিও আমি নিজের মত গোপন করিনে, তবু কাউকে ডাকাডাকি করে কোনোদিন বলিনে আমার মত গ্রহণ করো। তুমি নিজের পথে নিজের মতে চল্‌লে তোমার প্রতি আমার স্নেহ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে এমন শঙ্কা কোনোদিন কোরো না। স্বভাবতই তোমার চিত্তশক্তির একটি প্রসারতা আছে, এইরকম বেগবান চিত্তকে খোঁটায় বেঁধে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো সহজ নয়। তোমার কঠিন দুঃখ হচ্চে এই দ্বিধা নিয়ে। তোমার সংস্কার এই যে, চিত্তকে পীড়িত করে খর্ব্ব করে তাকে বিশ্বের অধিকার থেকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করে তবে সার্থকতা, অথচ তোমার প্রকৃতিতে যে বুদ্ধিশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য আছে, সে অবারিত আকাশে আলো চায় হাওয়া চায় গতি চায়। সেই চাওয়াটাকে তুমি অপরাধ বলে ভয় পাও। পাখীকে খাঁচায় বন্দী করে তাকে আকাশভীরু করে তোলা হয়েচে। কিন্তু এই আকাশভীরুতা তার স্বভাব নয়, সে তার ডানা দেখেই টের পাওয়া যায়।

যাই হোক, আমাকে তোমার গুরু বলে গণ্য কোরো না, আপনার লোক বলেই জেনো। বাইরের দিক থেকে তোমার পরিচয় অল্পই পেয়েচি তবুও তোমাকে স্নেহ করা আমার পক্ষে

অত্যন্ত সহজ হয়েচে। তার কারণ তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে কোনোরকমের সংস্কারের বাধায় তাকে ছায়াবৃত করতে পারে নি, তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সকল রকম বাধার মধ্যেও তোমাকে মুক্ত রেখেচে। আমার সম্বন্ধে কঠোর বিরুদ্ধতা থাকাই তোমার পক্ষে স্বভাবসঙ্গত ছিল, আমার দেশের লোকের অনেকেরই তাই আছে। কিন্তু অভ্যাসের আচারের মতের নানাপ্রকার বাধা সত্ত্বেও সে সমস্ত পার হয়েও তুমি আমার কাছে আসতে পেরেচ সে তোমার বুদ্ধির অসামান্য উদারতাবশত। প্রকৃত আত্মীয়তার মিলনক্ষেত্র এই উদারতায়, মতের মিল প্রভৃতিতে নয়। চিঠিতে তোমাদের সাধনার কথা তুমি যে রকম করে প্রকাশ করেচ তাতে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি,— তোমার নিজেকে সুনিপুণ ভাষায় সুস্পষ্ট করে আমার গোচর করতে পেরেচ। মানুষের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য সেইখানেই যেখানে সে আমাদের কাছে অস্পষ্ট। যে হয়েচে সুপ্রত্যক্ষ তাকে আমরা অন্তরের মধ্যে অনায়াসে গ্রহণ করি। তুমি যে পথেই চলো না কেন, সে পথ আমার নির্দ্দিষ্ট না হলেও আমি লেশমাত্র ক্ষোভ করব না এ কথা নিশ্চিত জেনো। কিন্তু সে পথ তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ না হয়, সে পথে তোমার সম্যক চরিতার্থতা ঘটে, তুমি শান্তি পাও এই আশা করি। আমাকে চিঠি লিখতে যদি তোমার বাধা ঘটে বা অবকাশ না পাও আমি কিছুই মনে করব না। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে সহজে নিজের জীবনকে গ্রন্থিমুক্ত করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হও এই ইচ্ছামাত্র আমার মনে রইল। ইতি ১১ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩২

৩১ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শেষ চিঠিতে তোমাকে কি লিখেছিলুম মনে নেই কিন্তু তোমার চিঠি থেকে বোধ হল তোমাকে ক্ষুব্ধ করেচে। তুমি নিশ্চয় জেনো তোমাকে কোনো বিশেষ পথে প্রবর্ত্তন করবার জন্যে আমার মনে একটুও তাগিদ নেই। সত্য বলে অন্তরে যা আমি উপলব্ধি করি তা আমি সকলকে বলিনে—এখানে সত্য বলচি তাকে যা সকল সত্যের গোড়ায়। আমার ভিতরকার দরজা যে চাবিতে খোলে, সে চাবি সকলের কুলুপে লাগবে না। তা ছাড়া গুরুর পদ আমার নয় সে আমি নিশ্চিত জানি। আমি অনুভব করি, আমি কথা কই এইটেই আমার স্বধর্ম্ম। তোমার চিঠিতে আমি কথা কয়ে গেছি সেটা শুনিয়েচে অনুশাসনের মতো। কিন্তু প্রকাশ করা যদিও আমার স্বভাবসঙ্গত, প্রচার করা একেবারেই নয়। যে উপলব্ধিতে তুমি গভীর আনন্দ পেয়েচ সে তোমার আপনারই জিনিষ। ধার করা জিনিষ নিয়ে তোমার চলবে না, এমন কি সে যদি দামী জিনিষ হয় তবুও না। প্রচার করতে যাদের অত্যন্ত উৎসাহ তারা এই কথাটা বুঝতে পারে না, এই জন্যে তারা সংসারে কেবলি বাহ্যিকতার আবর্জ্জনা জমায়। সত্য অন্তরের হলে তবেই খাটি হয় তবেই তাতে শান্তি তাতে স্বাস্থ্য তাতে সৌন্দর্য্য তাতে আনন্দ, অন্ন পাকযন্ত্রে এসে তবেই প্রাণের সামগ্রী হয়ে

ওঠে, তাকে গায়ে মাথায় মাখলেই সেটা অশুচি হয়ে পড়ে। যারা প্রচারে উৎসাহী তারা কোনোমতে ভিতরের জিনিষকে বাইরে চাপিয়ে দিয়ে খুসি হয়— এই জন্যে তারা দল গড়ে তোলে মন গড়ে তোলে না। যারা স্বভাবতই দলচর লোক তারাও দলের চাপরাস পরে সগর্ব্বে খুসি হয়ে বেড়ায়। সকল ধর্ম্মসমাজেই দলের অত্যাচার আছে। কেননা, অধিকাংশ লোকেরই অন্তরের আবরণ শেষ পর্য্যন্ত খোলে না। এই কারণে তারা বাইরের দিক থেকে চালিত হবার ঔৎসুক্যে বাহ্যিকতাকেই চিরদিনের মতো আঁকড়ে ধরে এবং তারাই এই বাহ্যিকতার জবরদস্তি নিয়ে অন্যের উপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। ধর্ম্মের নামে যত উন্মত্ততা যত রক্তপাত সে তো এই বাহ্যিককে নিয়েই। ধর্ম্মের অভিমান এই নিয়েই, মূঢ়তা এইখানে।

তোমার চিঠি পড়ে এ কথা বুঝি যে, একটি আন্তরিক উপলব্ধি সোনার কাঠির মতো তোমার চিত্তকে জাগিয়েছে। সব সময়েই তার স্পর্শ পাও বা না পাও একবার পেলেই তার সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। এর উপরে বাইরে থেকে তর্ক একেবারেই মিথ্যে। তুমি প্রদীপ দেখেচ কি না তা নিয়ে নানা সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করা চলে কিন্তু যখন তুমি বলো আমি আলো দেখলুম তখন সেই আলোর সাক্ষী তুমি নিজেই। সেই আলো আমিও যদি দেখে থাকি তাহলে তোমার সঙ্গে প্রদীপের ঝগড়াটা থামিয়ে দেওয়াই ভালো, কেননা সেটা সামান্য কথা।

একটা জায়গায় আমাকে তুমি সম্পূর্ণ বোঝনি। বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেচ পাছে আমার কথা মানতে পারচ না বলে

আমি তোমার উপর রাগ করি। এই আশ্রমেই এমন অনেক লোক আছে যারা আমাকে মানে না, [নানা বিষয়ে] যারা আমার বিরুদ্ধ। আমি তাদের বর্জ্জন করিনি, তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সহজ। আমার এই স্বস্থানেও স্টিম রোলার চালিয়ে মতভেদের পার্থক্যকে গুঁড়িয়ে একাকার করে দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নিজের কথা তুমি যা বল তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি তাতে আমি আনন্দও পাই, কিন্তু তাই বলে সব সুদ্ধ তাকে গ্রহণ করতে গেলে আমার পক্ষে সেটা একেবারেই বেমানান হবে। বাহিরের জিনিষ সীমাবদ্ধ, তোমার সীমায় আমার সীমায় মিল হতেই পারে না— অন্তরের জিনিষ সীমার অতীত, সেখানে মিল্‌তে কোথাও বাধা নেই। ইতি ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩৩

৩১ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অন্তরে বাহিরে কোনো বাধা থাকলে কিছুতেই নিজের প্রতি তুমি জবরদস্তি কোরো না। চিঠি না লিখতে যদি পার আমি তোমাকে ভুল বুঝব না। আমি জানি তুমি আমাকে কখনই বিরুদ্ধভাবে বা উদাসীনভাবে দেখতে পার না। তুমিও আমার আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য পেয়েছ। আমি নানা চিন্তায় নানা কর্ম্মে

প্রবৃত্ত, তা ছাড়া অবকাশ পেলেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা চিন্তাকে নিজের মধ্যে প্রতিসংহরণ করে পূর্ণতার আনন্দ পাবার চেষ্টাও ভুলি নে। বাহিরের কোনো ক্ষতিকে আমি অন্তরে গ্রহণ সহজে করি নে। সংসারে অনেক পেয়েছি সংসারেই তাদের সব কিছু ধরে রাখতে পারি নি— কিন্তু হৃদয়ে তারা সার্থক হয়েচে। সেই সার্থকতার ডালি হাতে নিয়েই একদিন সংসার থেকে বিদায় নেব— রিক্তহস্তে যাব না। ইতি ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩৪

৩ অগষ্ট্ ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার আশঙ্কা হচ্চে অতি দীর্ঘকাল যে ব্যবস্থার মধ্যে তোমার সমস্ত মন নিবিষ্ট হয়ে ছিল তার থেকে তোমাকে বিচলিত করে কষ্টের কারণ ঘটিয়েছি। চিঠিতে যে সব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করেচি সে কেবল আমার কথাটি তোমার কাছে স্পষ্ট করে বলবার জন্যে। যা আমার বলবার আছে তাকে হৃদয়ঙ্গম করানোই আমার স্বভাব— এই কাজ করতেই এসেচি। আমাকে কবি বলে' সাহিত্যিক বলে' লোকে গ্রহণ করে। বাহবা দেয়, বলে, আমি বেশ বলেচি— আমার রচনার প্রশংসা করে, কেউ বা করেও না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। দীর্ঘকাল এই কাজ করে

এসেচি— দেশের লোকের কাউকে কিছু বোঝাতে পেরেচি বলে বিশ্বাস করি নে— কথায় বুঝিয়েচি কিন্তু অন্তরে নয়। সেই জন্যে আমার স্বদেশে আমি একা। প্রথম প্রথম তা নিয়ে মনে খেদ করেচি— এখন বুঝেচি আমার যা কর্ম্ম তা করেচি, তার পরেকার উপসংহার আমার হাতে নয়। গাছের কাজ হচ্চে বীজকে পোষণ করা, তার পরে মাটির পালা। সেখানকার হিসাব তলব করবার দায় গাছের নয়। আজকাল এই কথা ভেবে শান্তি অবলম্বন করি। যদি দুর্ব্বলতাবশত কখনো নালিষের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পরক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত হই। তোমার মনে যে কঠিন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েচে এ আমি একটুও প্রত্যাশা করি নি। করলে হয় তো চিন্তা করতুম— হয় তো ভাবতুম, তোমার আশ্রয়কে দুর্ব্বল করে' তার পরিবর্ত্তে কোনো অবলম্বন তোমাকে দেওয়ার অবকাশ হয় তো ঘটবে না— এমন অবস্থায় তোমার মনে দ্বিধা জন্মিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তোমার বুদ্ধির পরে আমার আস্থা আছে। তুমি নিজের আলোকেই নিজের যথার্থ পথ খুঁজে পাবে— সে পথের সঙ্গে তোমার প্রকৃতির বিরোধ ঘটবে না।

চিঠি লিখতে যদি না পারি কিছু মনে কোরো না— তোমার প্রতি আমার ঔদাসীন্য কল্পনা করে নিজেকে পীড়া দিয়ো না। ইতি ১৮ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩৫

২১ অগস্ট, ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার সম্বন্ধে আমার ক্ষোভের কারণ কিছুই ঘটে নি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো। কোনো কারণে যখন তোমার মন বিচলিত বা পীড়িত হয় তখন তুমি অসঙ্কোচে আমার কাছে যেমন খুসি লেখ না কেন তাতে কোনো অন্যায় হয় না। এমনি করে তুমি নিজের সঙ্গেই বিচার করতে থাক। বাতাসের চলাচলের মতো চিন্তার চলাচল স্বাস্থ্যকর। বদ্ধ মত ও রুদ্ধদ্বার মন নিয়ে যারা থাকে তারা জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু এ’কে যত বড়ো নামই দাও না এর আসল নাম মানসিক তামসিকতা। এর চেয়ে চিন্তার আলোড়ন নিয়ে দুঃখ পাওয়া ভালো। সৃষ্টির সঙ্গে দুঃখ আছে, তাই উপনিষদে আছে, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ— তিনি তাপে তপ্ত হয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেচেন। তোমার মন সৃষ্টিপ্রবণ, তাই আত্মসৃষ্টি কার্য্যে তোমার চিন্তার বিরাম নেই— অচল সংস্কারের মধ্যে চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত থাকা তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। চিন্তার দ্বন্দ্বে তোমার মন তাপিত। এই তাপের অগ্নিশিখায় তোমার চিত্ত নিজেকে উজ্জ্বল করে’ চিন্‌তে চাচ্চে— যা তোমার মধ্যে অস্পষ্ট অসমাপ্ত তা এই আলোড়নে পরিস্ফুট পরিণত হয়ে উঠচে। তোমার এই বেদনাকে কোনো একটা বাঁধা মত ও নির্ব্বিচার অভ্যাসের তলায় চেপে তাকে শান্ত করা তোমার অনিষ্ট

করা। বিশেষত যখন জড় চিত্তের মূঢ় শান্তি তোমার স্বভাবসঙ্গত নয়। আমার জীবনে নিরন্তর আমার মন নিজের ও চারদিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে চলেচে, কোনো একটা অন্ধকূপের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায় নি। তোমার মধ্যে চিত্তের এই সচলতা সাধারণ স্ত্রীজনসুলভ নয় এই জন্যেই নারীস্বভাবের রীতি-নিষ্ঠতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধচে। এই সমস্যার সমাধান তোমার নিজের মধ্যেই হতে থাক্‌বে।

সময়াভাবে তোমাকে চিঠি লিখি নি— শরীরও সুস্থ নয়। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৩৬

২৪ অগস্ট্ ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বীরেন্দ্রকিশোরকে পত্রে জানিয়েছিলুম যে তোমাকে যে সব চিঠি লিখেচি তার থেকে উদ্ধার করে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতটাকে প্রকাশ করব। কিন্তু থাক্। আপাতত তোমার পত্রের মধ্যেই নিহিত রইল। যদি ওর প্রাণশক্তি থাকে তবে কোনো এক সময়ে আপনি আবরণ ভেদ করে আবিষ্কৃত হবে— ওর জন্যে আমাকে চেষ্টা করতে হবে না।

বীরেন্দ্রকে লিখেছিলুম সেপ্টেম্বরের আরম্ভে কলকাতায়

যাব। কিন্তু শরীর চলিষ্ণু অবস্থায় নেই অতএব কবে যাওয়া হবে জানি নে।

তোমরা ভালো আছ এই আশা করি। ইতি ৭ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৩৭

২৭ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠি যে তারিখে পাওয়া উচিত তার চেয়ে দেরীতে পাচ্চ লিখেচ। তার কারণ হচ্চে এই যে আমাদের এখানে যে পোষ্টমাষ্টার আছে সে একাধারে ডাক-হরকরা এবং গুপ্ত চর। আমাদের চিঠি চলাচলে দেরি করে; খোওয়া যায়। এমন কি, একজনের খামের মধ্যে আরেকজনের চিঠি অসতর্কতাবশত ঢুকে পড়েচে এমন ঘটনাও একবার ঘটেছিল। উপরওয়ালাদের কাছে বারবার দুঃখ জানিয়েচি— মনে মনে হাসতে হাসতে পরিদর্শক গম্ভীরমুখে পরিদর্শন করেও গেছে। এখন নালিশ করা ছেড়ে দিয়েচি। চোরাই-সন্ধানের বাহনটি নিশ্চয় জানে আমার চিঠি-যোগে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গোপনে বাক্য-বোমা চালাই নে— আমার যা-কিছু বলবার প্রকাশ্যেই বলে থাকি। কিন্তু আমার চিঠি গোপনে পড়বার এমন সুযোগ ছাড়বে কেন, বিশেষত যখন কোনো জবাবদিহী নেই। এরা সরকার বাহাদুরের নোংরা কাজের ময়লা-গাড়ি।

তোমার কাছ থেকে চিঠিগুলি পেয়েছি। হয় তো ব্যবহার করব না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যখন কলকাতায় যাব সেই সময়ে ফেরৎ পাবে।

আমি নিজের ডাক্তারি নিজেই করে থাকি। রোগের দুঃখটা আমাকেই ভোগ করতে হয় অথচ তার সুযোগটা অন্যে ভোগ করবে কেন? এক সময়ে বহু যত্নে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চ্চা করেছিলুম। কিন্তু রোগের লক্ষণ এবং বহুবিস্তৃত ওষুধের ফর্দ্দের মধ্যে এত বেশি হাৎড়াতে হয় যে বইগুলো এবং ওষুধের বাক্সটা বিদায় করে দিয়েছি। এখন বাইয়োকেমিকের আশ্রয় নিয়েছি— ফল পাই ভালো; মানসিক ক্লান্তিতে আমাকে ভুগতে হয়, তার সব চেয়ে ভালো ওষুধ Kali Phos 6x। তুমি যে স্নায়বিক অবসাদের কথা লিখেচ তাতে ঐ ওষুধটা খাটবে। সুবিধা এই যে উপকার যদিবা নাও করে অপকার করবে না। দিনে দশ গ্রেন পরিমাণে চারবার করে খেয়ে দেখতে পারো। কবি ধরেচেন কবিরাজী এতে যদি হাসি পায় তো হেসো এবং হাসতে হাসতেই ওষুধ খেয়ে দেখো— বিশেষত যখন ওষুধটা বিস্বাদ নয়। পর্য্যায়ক্রমে আরও একটা ওষুধ ব্যবহার কোরো তার নাম Kali Mur 6x। অর্থাৎ একবার প্রথমোক্ত ওষুধ, তার দু ঘণ্টা পরে দ্বিতীয়টা। আমাকে ফী দিতে হবে না। আমার নিকটবর্ত্তীদের উপরে চিকিৎসা চালাই— কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৩৮

২৮ অগস্ট, ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার কোনো পত্রে তোমার কোনো কথায় তোমার গুরুদেবের লাঘবতা ঘটে নি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার বর্ণনা থেকে তোমার গুরুদেবের যে চিত্র আমার মনে জেগেছে সে অতি সরস গম্ভীর এবং সুন্দর। তোমার গুরুর মধ্যে তুমি মানবচরিত্রের যে উৎকর্ষ উপলব্ধি করেচ আমার কাছে তা লেশমাত্র অশ্রদ্ধেয় নয়।

আমার শরীর কেমন থাকে জানতে চাও। দিন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে আলো কমে' আসতে থাকে এটাকে বিশেষ খবর বলে দেওয়া চলে না। এখন আমার কাজ করবার বয়স নয় অথচ কাজ করতেই হয় সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে ক্লান্তি অনিবার্য্য। সেই ক্লান্তির দোহাই দিয়ে কাজ বন্ধ করি সে সাহস নেই। কাজের সঙ্গে জড়িত একটা অভিমান আছে— অর্থাৎ আমারই কাজ বলে একটা মমতা। সেটাই তো ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে চাবুকের মতো। মনকে ভোলাই কর্ত্তব্যের নাম নিয়ে। কিন্তু গোড়াকার কথাটা অহঙ্কার।

লোকসাহিত্য বলে একটা ছোট বই এইমাত্র হাতের কাছে এসে পড়ল— তোমাকে পাঠাই, পড়ে দেখো।

১০ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় বন্যার দুঃখ দূর কল্লে

একটা অভিনয় করব স্থির করেছি। তার দু চার দিন আগেই যেতে হবে। ইতি ১১ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

একখণ্ড মানসী পাওয়া গেল সেটাও পাঠাচ্চি

৩৯

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাজের ঝঞ্ঝাট বেড়ে উঠেচে— নানা রকমের ফরমাস খাটতে হয় তবু সে আমার বহুদিনের অভ্যাসে অনেকটা সহ্য হয়ে এসেচে। কিন্তু নিরতিশয় পীড়িত করে তোলে অত্যাচারের কথা। আমার বেদনাবহ নাড়ি এই রকম কোনো সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে তখন সে যেন আর থামতে চায় না। সম্প্রতি দেহমনের উপর সেই উপদ্রব দেখা দিয়েচে। দেশে বন্যাপ্লাবনের দুঃখ মনের উপর ভার চাপিয়ে এতদিন বসে ছিল তার উপরে চট্টগ্রামের বিবরণটা আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েচে। আমাদের নিজের দেশের লোক নির্ম্মম হয়ে যখন এরকম দানবিক কাণ্ড করে তখন কোথাও কোনো সান্ত্বনা দেখি নে। তার উপরে আর একটা জ্বালার যোগ হয়ে অশান্ত করে তুলচে— মনে নিশ্চয় জানি এর পিছনে আমাদের মর্ত্ত্যলোকের বিধাতাপুরুষেরা রয়েচেন। এই রকম ব্যাপারের দ্বারা দুটো গুরুতর অনিষ্ট হচ্চে।

প্রথম এই— সমস্ত মুসলমান জাতের উপর হিন্দুর ঘৃণা জন্মে যাচ্চে। অথচ এ কথা নিশ্চিত সত্য তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা ভালো লোক,ঠিকমত পরিচয় পেলে যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে কোথাও বাধত না। ইংরেজের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই সমস্ত দুর্য্যোগে যে তীব্র বিদ্বেষবুদ্ধি ব্যাপক হয়ে আমাদের মনকে অধিকার করে সেটাতে আমাদের গভীরভাবে ক্ষতি হয়। মুসলমানেরা যদি সম্পূর্ণভাবে পর হোতো তাহলে এ ক্ষতি আমাদের পক্ষে তেমন সর্ব্বনেশে হোতো না— কিন্তু দেশের দিক দিয়ে তারা আমাদের আপন এ কথাটা কোনো উৎপাতেই অস্বীকৃত হতে পারে না। তাই এটা তো বাইরের শেল নয়, এটা যে মর্ম্মস্থানের ভিতরকার বিস্ফোটক— এর মার কে সামলাবে? যারা আমাদের আপন লোকদের এরকম সাংঘাতিকভাবে পর করে দিচ্চে তারা করচে স্বার্থের জন্য। ভারতবর্ষ তাদের অন্নের থালি, এটাতে টান পড়লে তাদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত যদি হয় তবে সেটা পরমার্থের দিকে না হোক অর্থের দিক থেকে বোঝা যায়। কিন্তু আপনার লোকদের কৃত অন্ধ অন্যায় তাদের নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধ। তারা চিরদিনের জন্যে দেশের চিত্তে যে অবিশ্বাস যে ঘৃণা আবিল করে তুল্‌চে তাতে চিরদিনের মতোই তাদের নিজের ক্ষতি। ইংরেজ যখন সমস্ত চীনদেশের কণ্ঠের মধ্যে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আফিমের গোলা ঠেসে দিলে তখন এ পাপ থেকে অন্তত বৈষয়িক পুরস্কার পেয়েচে। কিন্তু মনে করো দক্ষিণ চীন যদি উত্তর চীনের মুখে বিষ ঢালতে থাকে তাহলে তাতে চীনের অঙ্গে যে মৃত্যুর সঞ্চার হবে তাতে

দক্ষিণ তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এ ক্ষেত্রে হারলেও মৃত্যু জিৎলেও মৃত্যু। আমাদের মধ্যে যে-কোনো সম্প্রদায় জাতীয় সত্তার মূলে যদি কুঠার চালায় আর এই মনে করে খুসি হয় যে সে আছে উপরের শাখায় তাহলে তার সে আনন্দ কখনো টিঁকতে পারে না। কিন্তু এ কথা বলে গলা ভাঙলেও বিশেষ ফল হবে না— কারণ মানুষের রিপু যখন যে কোনো উপলক্ষ্যেই উত্তেজিত হয় তখন আত্মীয়কে আঘাতের দ্বারা আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইতিহাসে যত কিছু শোচনীয় ঘটনা ঘটে তা এমনি করেই ঘটে, মানুষ আপনি মরবে জেনেও অন্যকে মারে। আমাদের সাধনা আজ কঠিন হয়ে উঠল— অসহ্য আঘাতেও আত্মসম্বরণ করতে যদি না পারি তাহলে আমাদের তরফেও আত্মহত্যার আয়োজন করা হবে— শত্রুগ্রহের হবে জয়। মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আছে বলেই তোমাকে এসব কথা লিখলুম— কথাটা এস্থলে প্রাসঙ্গিক নয় কিন্তু মর্ম্মান্তিক।— এই চিঠি থেকে কথাগুলো নিয়ে চিঠির আকারেই প্রবাসীতে পাঠাব স্থির করেচি।

তোমার রোগের যে ফর্দ্দ পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেল তোমার দেহে এক হাঁসপাতাল-ভরা ব্যামো। তার অনেকগুলোই তোমার স্বরচিত বলেই আমার বিশ্বাস। দীর্ঘকাল ধরে তাদের বাসা দিয়েছ, তাদের যদি নোটিশ দিয়ে বিদায় করো তাহলে আবার নতুন বাসাড়ে জুটিয়ে আনবে। নিজের হাতে দুঃখ রচনা করবার অসাধারণ ক্ষমতা তোমার আছে তাই সন্দেহ করচি অন্তত অনেকগুলো ব্যামোই তোমার হাতগড়া। রোগসৃষ্টিকার্যে

বিধাতার সঙ্গে তুমি টক্কর দিচ্চ, ওঝার কর্ম্ম নয় তোমাকে মুক্তি দেওয়া।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে এখান থেকে কলকাতায় যাবার কথা। সেই সময়ে তোমার চিঠিগুলি নিয়ে যাব— ওখানে গিয়ে তোমাকে দিলেই হবে। ইতি ২০ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৪০

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শেষ দীর্ঘ চিঠিখানা পেয়েচ কি না জানিনে। না পাওয়া অসম্ভব নয়। রাজকীয় রজকের নোংরা কাপড়ের বাহন যারা তারা সেটাকে আছড়ানো নেংড়ানো ডিপার্টমেণ্টে হয় তো পৌঁছে দিয়েচে। এ চিঠিখানার কি গতি হবে জানিনে। এ চিঠি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভূমিকম্প ঘটবার আশঙ্কা নেই তাই হয় ত দু চার দিনের মধ্যে তোমার হাতে পৌঁছতে পারে।

আমি আজ শুক্রবারে সায়াহ্নে কলকাতায় উপস্থিত হব।

তুমি দুর্গতদের সাহায্যকল্পে অল্প কিছু সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েচ। তোমার পক্ষে যদি দুঃসাধ্য হয় কুণ্ঠিত হোয়ো না। তোমার শুভ ইচ্ছারও যথেষ্ট মূল্য আছে। ইতি ২৫ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৪১

[১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

ওঁ রবিবার

কল্যাণীয়াসু

এসে অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। তোমার প্রেরিত কাপড় পেলুম কাজে লাগবে। তোমাদের লোক টাকা নিয়ে এসেছিল আমি অনুপস্থিত ছিলুম বলে আমাদের নির্ব্বোধ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল। এ রকম করে লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান আমার ভাগ্যেই ঘটে। কিছু কিছু টাকা আসচে। কাজ আরম্ভ হয়েচে।

এই চটিখানা দেখে স্টেজে ব্যাপারটা কি রকম হবে বুঝতে পারবে না।

তোমার চিঠিগুলি ফিরিয়ে দেব। যদি আস কিম্বা লোক পাঠাও তাহলে সহজ হবে।

তোমার শরীর ভালো আছে ত ?

দাদা

৪২

[১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

আজ যদি নটার সময় আসতে পারো তাহলে দেখার বিঘ্ন হবে না। আমি স্টেজে যাবার পূর্ব্বেই খেয়ে নিই।

দাদা

৪৩

[১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে ভুল বলেছিলেম। বুধবার সন্ধ্যার সময় ম্যাডানের সিনেমায় আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেদিনকার আয় আমাদের। আমাদের অভিনয় আজ শেষ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আটটার পূর্ব্বেই। তুমি কি সওয়া আটটা বা পৌনে আটটায় আমাদের এখানে আসতে পারবে। সেদিন তুমি এখানে এসে ফিরে গেছ শুনে দুঃখ পেয়েছি। খবর পাঠালে আমি নিশ্চয় সুবিধা করে দেখা করতুম। যদি আজ আসতে পার লিখে পাঠিয়ো। তোমার দুখানি রুলির জন্যে একজন কুড়ি টাকা দাম দিয়েচে। তোমার ২০ টাকা পেয়েচি।

দাদা

৪৪

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

নানা খুচরো লেখার দায় পড়েচে আমার উপরে— তাতে সময় যায়, আনন্দ পাইনে। তার উপরে শ্রান্তি, এবং মনটা উদ্বিগ্ন। জোড়াসাঁকোয় দরবারী লোকের ভিড়ে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে এখানে আশ্রয় নিয়েচি। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে কাজগুলোও এসেচে। তাই তোমাকে অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি। তার উপরে কাল

যখন শুনলুম তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে ফিরে গেছ আমার মনে বড়ো আঘাত লাগল। আগে যদি জানতুম তাহলে নিশ্চয়ই এখান থেকে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতুম।

আমি কাল বৃহস্পতিবারে বিকালে জোড়াসাঁকোয় যাব— তার পরদিন সকালে পালাব শান্তিনিকেতনে। হয়ত বৃহস্পতিবারে তোমার আসা সম্ভব হবে না। না হোক্, কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত জেনো, তোমার পরে আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা সুগভীর। যদি আমি তোমার অন্তরের অভাব দ্বন্দ্ব বেদনা কোনো উপায়ে লাঘব করতে পারতুম বড়ো খুসি হতুম। কিন্তু আমার সে শক্তি নেই। আমি নিজে যদি বা কোনো সত্য উপলব্ধি করি সেটা আর কাউকে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। লেখবার ক্ষমতা হয় তো আছে, কিন্তু লেখা এবং দেওয়া একই নয়। পরশ পাথর যার শক্তির মধ্যে আছে মানুষকে সেই তো সত্যকার দানে ধনী করে। অন্তরকে সোনা করতে যাঁরা পারেন তাঁদের দেখা পাওয়া দুর্লভ। সেই জন্যে আমার মতো ভাষানিপুণ লোকও হয় তো অল্প কিছু উপকার করতে পারে। ভাষার সাহায্যে হয় তো আমরা বুদ্ধিতে বুঝি কিন্তু অন্তরে পাইনে। সত্য জানা বড়ো কথা নয়, সত্য হওয়াই হচ্চে চরম সিদ্ধি। সেই সত্যকরণের শক্তি যাঁর কাছে পাওয়া সম্ভব তাঁকেই প্রণাম করি। আমার কি প্রণাম প্রাপ্য? কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহদানের যদি কোনো মূল্য থাকে সে মূল্য তুমি পেয়েছ। ইতি ৬ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদা

৪৫

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি চিঠি লিখ্‌তে ত্রুটি করিনে, কিন্তু আনমনা মানুষ, উত্তর দিতে ভুলে যাই। আজ আরম্ভেই তোমার প্রশ্ন ক'টির জবাব দেব।

একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফোটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে দ্বিতীয়বার পঞ্চত্ব পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।

১। গোরা ও নৌকাডুবির কল্পনা সম্পূর্ণই আমার মাথার থেকে বেরিয়েচে। এমন ঘটনা ঘটেচে বলে জানিনে কিন্তু ঘটলে কী হতে পারত সেইটে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেচি।

২। দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যেটুকু আছে সে আছে গল্পের বহিঃপ্রাঙ্গণে— অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই নিয়েচে ছুটি। আসল গল্পটা ষোলো আনাই গল্প।

৩। কেশরলালের গল্পটা পেয়েচি মগজ থেকে। চতুর্ম্মুখের মগজ আছে কিনা জানিনে কিন্তু তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যে ভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেককাল পূর্ব্বে একবার যখন দার্জ্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারাণী। তিনি আমাকে গল্প বল্‌তে কেবলি জেদ করতেন। এই গল্পটা তাঁর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে

বলেছিলুম। মাস্টারমশায় গল্পের ভূমিকা অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি করে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।

৪। ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্পলোক থেকে আমদানি।

৫। বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় অল্প কিছু বদল করেচি। বোষ্টমী যে, গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়— সংসারত্যাগ করেছিল বটে। একদিন আমাকে এসে বল্‌লে, কাল রাত্রে স্বপ্নে তোমার পা দুখানি বুকের উপর পেয়েছিলুম— মোজা ছিল না— ঠাণ্ডা। এই তো দূরে থেকেও তোমাকে পেয়েছি। কাছে আসবার এই আকাঙ্ক্ষা, এ তো মোহ।— এই বলে সে চলে গেল, আর তাকে দেখিনি।

৬। কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি আমার বড়ো মেয়ের আদর্শে রচিত।

৭। বিদেশের উপাদান নিয়ে আমি কখনো কিছু লিখিনি। বাইরে থেকে মালমসলা ধার নিয়ে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

—০—

কাল বৌমাকে দেখতে গিয়েছিলুম— অনেকটা সেরেচেন মীরা আছে শান্তিনিকেতনে।

—০—

নরদেবতা সম্বন্ধে ভাবের দিক থেকে তুমি যে কথা সুন্দর

করে বলেচ সে মেনে নিতে আমার বাধে না। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যেখানে তাঁকে জড়িত করো সেখানে দেখতে পাই তোমাদের ব্যক্তিগত অভ্যাস। সেখানে সকল দেশের সব মানুষ মিলতে পারে না। তোমাদের দেবতত্ত্ব গ্রহণ করা সহজ, কিন্তু দেব-কাহিনী অত্যন্ত বেশি প্রাদেশিক, তার বিচিত্র বিবরণ মূল ভাবকে বাধা দেয়। যেমন তোমার হাঁপানির ওষুধের কথা। শিকড়টা মানতে পারি যদি প্রমাণ পাই। কিন্তু ১৭ বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান সহ সেটা তুলে আনলে তবেই তার শক্তি জাগবে এ কথা মানতে গেলে নিজের বিধিদত্ত বুদ্ধির পরে অবিচার করা হয়। তত্ত্বটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং সেটা দেশকালপাত্রনির্ব্বিচারেই সত্য। কিন্তু তার আনুষঙ্গিক বিবরণ জনশ্রুতিমাত্র, এবং সে জনশ্রুতিও বিচারবুদ্ধিসমর্থিত জনশ্রুতি যদি না হয়, এবং যদি তাতে এমন কিছু থাকে যা আমাদের অপ্রমত্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে তাহলে দশজন বলে বলেই তাকে স্বীকার করে নিতে পারবো না। যে দেশে সকল কথাই এই রকম অন্ধভাবে স্বীকার করে নেওয়াই মানুষের অভ্যস্ত সে দেশের দুর্গতি কখনোই কাটে না। অযৌক্তিক কথাকে সন্দেহ করতেই হবে, তার পরেও যদি সেটা সপ্রমাণ হয় তাহলে কথা নেই। আমি নরদেবতাকে বিশ্বাস করি বুদ্ধের মধ্যে, কেননা বুদ্ধ অনৈতিহাসিক গালগল্পমাত্র নয়, বিশ্বাস করি ভগবদ্গীতার কৃষ্ণের মধ্যে, সে কৃষ্ণও মর্ত্ত্য মানুষের ঘরের লোক। বৃন্দাবনকে যদি বলো আনন্দধামের রূপক তাহলে কোনো কথা নেই, যদি বৃন্দাবনকে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক

বলো, তাহলে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দাবী করব, শাস্ত্রবাক্যমাত্রকেই শিরোধার্য্য করব না। তোমার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। যখন ব্যাখ্যা করো তখন তত্ত্বব্যাখ্যা করো, যখন ব্যবহার করো তখন সংস্কারকে চোখ বুজে মেনে নাও। এ পথে আমি যেতে পারিনে। অথচ তোমার আশ্রয় থেকে তোমার মুগ্ধ মনকে নড়াতে ইচ্ছা যায় না। যেখানে তোমার আনন্দ সেখানে তুমি মজ্জিত হয়ে থাক তাতে দোষ নেই। তার বদলে তোমাকে কিছু দিতে পারি এমন শক্তি আমার কোথায়! আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয় তত্ত্বকে যখন সত্য বলে অন্তরে উপলব্ধি করি— বাইরেকার কল্পিত রূপে তাকে বন্দী করে অতিবিশেষ করে দেখতে গেলে আমার চিত্ত নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে, সে রকম আত্মবঞ্চনায় আমার কোনোদিন প্রয়োজনবোধ হয় না। যদি বলো এ তো আত্মবঞ্চনা নয়, এ বাস্তব সত্য, তাহলেই কথা ওঠে বাস্তব সত্যকে বিশ্বাসের জন্য যৌক্তিক প্রমাণ না হলে নয়। ইতিহাস শ্রদ্ধা লাভ করে একমাত্র ঐতিহাসিক বিচারের পরে। কিন্তু তোমাকে এ সব কথা বলতে গেলে আমার ব্যথা লাগে। যে বিশ্বাস তোমার প্রেমের মধ্যে রক্ষিত তাকে আঘাত করা তোমাকেই আঘাত দেওয়া। কি হবে এমন পীড়ন করে?

তোমাদের সম্প্রদায়ে যে ব্যবহারটাকে আমার অন্যায় বলে মনে হয় সে সম্বন্ধে আপত্তি না করে থাকতে পারিনে। তোমার চিত্তকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা না দেওয়া মানব অধিকারকে পীড়ন করা, সুতরাং সেটা বস্তুত অধার্ম্মিকতা। আমার কাছে এসে আমার কথা শুনলে যদি সেটাকে কোনো

সম্প্রদায় অপরাধ বলে গণ্য করে তবে সে সম্প্রদায়ের অন্তরে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ নিহিত আছে। মানুষের চিত্তকে খাঁচায় বাঁধবার ধর্ম্ম যতই ভাবৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হোক্ তবু সে সোনার খাঁচার বাইরে এগবে না। সেই সোনার খাঁচাই তার স্বর্গের আদর্শ। কিছু মনে কোরোনা তুমি— মানুষের বিরুদ্ধে ধর্ম্মগত কর্ম্মগত ভাবগত কোনো অত্যাচার আমি সইতে পারিনে। ইতি বৃহস্পতিবার ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদা

৪৬

[২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যাচ্চি। তোমাকে কতকগুলি বই পাঠাতে বলে গেলুম ১ সুকিয়া স্ট্রীটে। পাবে আশা করি এবং কেউ তাতে অপরাধ নেবেন না। পৌষের পূর্ব্বে কলকাতায় ফিরব না। নিরতিশয় ব্যস্ত ও ক্লান্ত। কাল ভিড়ে প্রাণ কণ্ঠে উঠেছিল। আজ সকাল থেকে লোকারণ্য। ইতি রবিবার

দাদা

৪৭

[শান্তিনিকেতন। সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি বোধ হয় খবর পাওনি— হিজলি হত্যা নিয়ে আমি কি রকম ভীষণ ভিড়ের মধ্যে টাউন হল থেকে মন্যুমেণ্ট পর্য্যন্ত পাক খেয়েছি। তার পরের দিনও সকাল সাতটা থেকে আমার বাড়িতেও ঠেলাঠেলি ভিড়। আমার শরীরে আর সইছিল না। এক মুহূর্ত্তও সময় ছিল না যে এক লাইন লিখে তোমাকে আমার অবস্থা জানাব। রেলগাড়িতেও দুই মাদ্রাজি আমাকে অর্দ্ধেক পথ অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করে সাংঘাতিক অত্যাচার করেছিল। এখানে আধমরা হয়ে পৌঁচেছি। অনেক দিনের অনুপস্থিতিতে এখানেও কাজ জমা হয়ে আছে— যখন বিছানায় উত্তান হয়ে পড়া উচিত ছিল তখনো ডেস্ক আঁকড়ে পড়ে আছি। সামনে স্তূপাকার আধুনিক বাংলা গল্পের বই আমার অভিমতের অপেক্ষায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গেছে। নীরবেই তাদের সৎকার হবে— আমার শক্তি নেই। লেখকরা মনে করে তাদের প্রতি আমি উদাসীন— এ কথা ভাবে না তারা প্রত্যেকে একজন কিন্তু আমার ঘরে তারা অসংখ্য— তা ছাড়া আমার সময় নিরবধি নয় আমার শক্তিও পরিমিত।

তোমাকে কিছু বই পাঠাবার জন্যে লিখেছি। এ চিঠি পাবার আগেই বোধ করি পেয়েচ।

এখন থেকে পৌষ মাস পর্য্যন্ত এইখানেই আমার অবস্থিতি। তুমি শান্ত ও সুস্থ আছ সংবাদ পেলে আমি খুসি হব। ইতি—

দাদা

৪৮

[শান্তিনিকেতন] ১০ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সঙ্কল্প করেছিলুম পূজোর ছুটি আশ্রমেই কাটাব। কিন্তু শরীরের ক্লান্তি এখনো বুকে পিঠে চেপে বসে আছে, তা ছাড়া আমি এখানে থাকব শুনে আমাকে সঙ্গদান করবে বলে অনেকে পণ করেচেন। কোন্ কোন্ বিপদ থেকে কত হাত দূরে পালাতে হবে চাণক্য তাঁর শ্লোকে তা মেপে দিয়েছেন কিন্তু সেকালে বিশ্রামঘাতক আগন্তুকদের সম্বন্ধে কোনো বিধিবিধান ছিল না কেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। স্থির করেছি দার্জ্জিলিং পালাব। সেখানেও জনতার অভাব হবে এমন আশা নেই কিন্তু অন্তত ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। ওখানে যাবার মুখে কলকাতা হয়ে যেতে হবে তখন যদি ইচ্ছা কর একবার দেখা করে যেতে পারো। কবে যাব তোমাকে পূর্ব্বেই জানাব।

সমাজকে যে ভাবে সংশোধন করতে চাও সেটা আমার দ্বারা ঘটাতে পারবে এমন আশা কোরো না। আমি একটু আধটু ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখতে পারি, তারও উৎসাহ আজকাল অনেকটা

কমে গেছে। সমাজ নিয়ে ভাঙাগড়া করবার সখ আমার একটুকুও নেই, তবে এটা জানি যে, এই অচল জড় সমাজ গলায় বেঁধে আমরা দুর্গতির তলায় নেবেছি। বিদেশী শত্রুকে ভয় করিনে কিন্তু এই সাংঘাতিক সমাজকে ভয় করি, মারের বীজ পুঁতে রেখেচে আমাদের মজ্জায়। ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাম সই দেখে বুঝবে ক্লান্ত মন— অবধান দুর্ব্বল।

৪৯

[অক্টোবর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির ভাষা কী সুন্দর। সহজ, গভীর, অকৃত্রিম। তোমার মন তোমার ভাষায় কোথাও বাধা পায় নি, ভাবনার ভঙ্গীর সঙ্গে ভাষার ভঙ্গী লীলায়িত হয়ে চলেচে। এরকম লেখা সহজ নয়। অনেকবার ভাবি তোমার এই শক্তি কেবল চিঠি লেখার খিড়কির রাস্তা দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া আসা করে কেন? চিঠি লেখার ভঙ্গী দিয়েই সদরের জন্যে কিছু কেন লেখ না? কোনো একটা সহজ বিষয় নিয়ে। তোমার এক একটি চিঠি আমাকে বিস্মিত করে, আমার মনকে দুলিয়ে দেয়।

দার্জ্জিলিং যাব বলে এসেচি। পূজোর ভিড়ে গাড়ি পাওয়া দুঃসাধ্য বলে অপেক্ষা করতে হচ্চে। বোধ হয় দুচার দিনের

মধ্যে চলে যাব। যদি কখনো আসতে পার তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করব।

দাদা

৫০

[১৬ অক্টোবর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার ফলগুলি পেয়ে আনন্দ হোলো।

বাধা ভেদ করে আসবার চেষ্টা কোরো না। আমি রবিবার সন্ধ্যার গাড়িতে দার্জ্জিলিং যাব।

… … র দল আমাকে তাদের এক বাজারে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করছিল। আমার শরীরের প্রতি তাদের দয়া মায়া নেই, জোর করেই বলতে হোলো তাদের বাজারে পদার্পণ করবার মহদুদ্দেশে আমি আয়ুক্ষয় করতে পারব না।

আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁটোয়ারা করে নিতে চায়— আমি আত্মরক্ষার জন্যে নির্লিপ্ত থাকতে চাই— নইলে আমার কাজ বন্ধ হয়। সব দলকেই বিরক্ত করি। যদি না করতুম তবে এই সব ক্ষুদে দলদের তলায় দলিত হয়ে জীবন ব্যর্থ হোত। এত ক্ষুদ্রতা বাংলা দেশের বাইরে আর কোথাও নেই। পালাতে ইচ্ছা করে। পালাবার সময় হোলো। তখন স্মরণসভার ধূম লাগ্‌বে। আজ তবে আসি। ইতি শুক্রবার

দাদা

৫১

[অক্টোবর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাবার আয়োজন করচি। এ দিকে সকাল থেকে ঘর ভর্ত্তি। কোনোমতে অবকাশ করে নিয়ে স্নানাহারটা সম্পন্ন করতে পেরেচি।

আমাকে তুমি জগদ্বিখ্যাত একটা মহা উপদ্রব বলে উচ্চাসনে চড়িয়ে রেখে দিলে খুসি হব না। যে সমতলক্ষেত্রে তুমি সহজেই আমার কাছে আসতে পার তার উর্দ্ধে আমাকে নির্ব্বাসিত কোরোনা। দূরের থেকে প্রভুত্ব প্রয়োগ করা, শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ভোগ করা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়। সরল প্রীতির সম্বন্ধ নিয়ে মানুষের সাহচর্য্য যখন করতে পারি তখন খুসি থাকি। কাল তুমি যেমন কাছের মানুষ হয়ে আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কয়েছিলে সেইটেই আমার বিশেষ ভালো লেগেছিল। ভক্তি করতে পার এত বড়ো গাম্ভীর্য্য আমার নেই কিন্তু সখ্যের উপযুক্ত গুণ হয়ত কিছু কিছু আছে— যার নিজগুণে আবিষ্কার করবার শক্তি আছে তার কাছে এটা ধরা পড়ে।— এবার কাপড়ের বাক্স বোঝাই করার কাজে লাগতে হবে। ইতি রবিবার

দাদা

৫২

২১ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে আমাকে বর দিয়েছ আমি যেন আমার মনের মানুষ খুঁজে পাই। এর থেকে বোঝা গেল এতদিন তোমাকে যা বলে এসেচি তা তুমি বোঝো নি। আমার মনের মানুষের উপলব্ধি আমার অন্তরে পূর্ণতা পাবে এই আমি কামনা করি।" হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" এই মনের মানুষ কেবলমাত্র রসভোগের নেশায় মাতিয়ে রাখবার জন্যে নয়, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উদ্বোধনের জন্যে। এই মনের মানুষই তো আমাকে একদিন আত্মনিবিষ্ট সাহিত্যসাধনার গণ্ডী থেকে শান্তিনিকেতনের কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। সে কি সঙ্গ পাবার জন্যে, সুখ পাবার জন্যে। এই ত্রিশ বৎসর যে কঠিন দুঃখের পথে আমাকে চলতে হয়েচে তার ইতিহাস কেউ জানবে না— এই দুঃখেই আমার মনের মানুষের সঙ্গে আমার যোগ।

তোমার চিঠিতে তোমাদের বাচিক পূজার দীর্ঘ বর্ণনা করেছ। এই রসতৃপ্তির সমারোহে আমার মন সায় দেয় না। আমি যাকে পূজা বলি, সে কঠিন কর্ম্মে, সত্যের সাধনায়। লোকহিতে আত্মোৎসর্গের যে আয়োজন সেই আয়োজনেই মনের মানুষের পূজা,— যে দেশে এই পূজা সত্য হয় সেই দেশেই শ্রী সম্মান স্বাস্থ্য, সেই দেশেই জ্ঞানবীর কর্ম্মবীরদের যজ্ঞশালা।— আমার মনের মানুষ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন এ কথা নিশ্চয় জেনো।

তাঁর আভাস পেয়েছি ইতিহাসে নরোত্তমদের মধ্যে। যেমন ভগবান বুদ্ধ। তিনি সকল মানুষের মুক্তির জন্যে আত্মদান করেছিলেন— তাঁর ভক্তেরা শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে ভক্তিকে ভোগের জিনিষ করেন নি— ভক্তি তাঁদের বীর্য্য দিয়েছিল, দুর্গম সমুদ্র পর্ব্বত লঙ্ঘন করে তাঁরা মানুষকে সত্য বিতরণ করবার জন্যে দেশে বিদেশে প্রাণ দিয়ে এসেচেন। কাদের দেশে? যাদের তোমরা ম্লেচ্ছ বল, যারা তোমাদের দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে মার খেয়ে মরে।— তোমার পূর্ব্বপত্রে একটা প্রশ্ন ছিল, নিজের খ্যাতি বিস্তার করবার জন্যে আমি মাইনে দিয়ে লোক রেখেচি কিনা। এ রকম সন্দেহ কেবল বাংলাদেশেই সম্ভব। এই দেশেই লোকে কানাকানি করে, যে, কোনো বিশেষ কৌশলে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি এবং আমার যে ইংরেজি রচনা খ্যাতি পেয়েচে সেগুলো কোনো ইংরেজকে দিয়ে লেখা।— তথাপি এ দেশেও আমার ভক্ত আছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি পূজা চাইনে। যদি সত্যিই চাইতুম তাহলে এই ধর্ম্মমুগ্ধ দেশে অবতার হয়ে ওঠা আমার পক্ষে শক্ত হত না। আমি যাঁর পূজায় প্রবৃত্ত অন্যদের কাছে তাঁর পূজাই চেয়েচি। তুমি আবিষ্কার করেচ আমি ঈশ্বর নই। শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি কাকে ঈশ্বর বল আমি জানিনে— ঈশোপনিষদে এক ঈশ্বরের কথা আছে— তিনি সর্ব্বভূতকে অনন্তকাল ব্যাপ্ত করে আছেন, আমি যে সে ঈশ্বর নই সে কথা মুখে উচ্চারণ করবারও দরকার ছিল না। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৮

দাদা

৫৩

[দার্জিলিং] ২৬ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসে অবধি শয্যাগত হয়েই আছি। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা আবর্ত্ত শরীরের মধ্যে ঘুরপাক দিয়ে বেড়াচ্চে। আজ সকালে ক্ষণকালের জন্যে উঠে বসেছি এমন সময় কাচের প্রাচীরের আড়াল থেকে শ্রীপতি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে। ভিতরে এসে তোমার চিঠিখানি আমাকে দিল। এ কথা পূর্ব্বেও বলেচি আমার অনুরোধে তোমার আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস কিছুরই পরিবর্ত্তন কোরো না। তোমার যুক্তি তোমার শ্রেয়োবুদ্ধি আপনা থেকে যাতে সায় না দেবে তা কখনো তোমার আপন জিনিষ হতে পারবে না। আমার বলবার কথা এই, তুমি গভীরভাবে নিজে চিন্তা কোরো, এবং এই কথাটা মনে জেনো, ধর্ম্ম মানেই মনুষ্যত্ব— যেমন আগুনের ধর্ম্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম্ম মানুষের পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতাকে কোনো এক অংশে বিশেষভাবে খণ্ডিত করে তাকে ধর্ম্ম নাম দিয়ে আমরা মনুষ্যত্বকে আঘাত করি। এই জন্যেই ধর্ম্মের নাম দিয়ে পৃথিবীতে যত নিদারুণ উপদ্রব ঘটেচে এমন বৈষয়িক লোভের তাগিদেও নয়। ধর্ম্মের আক্রোশে যদি বা উপদ্রব নাও করি তবে ধর্ম্মের মোহে মানুষকে নির্জ্জীব করে রাখি তার বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে মজ্জাতে নিষ্পিষ্ট করে ফেলি— দৈবের প্রতি দুর্ব্বল ভাবে

আসক্ত করে', নানা কাল্পনিক বিভীষিকার বাধায় পদে পদে প্রতিহত করে তাকে লোকযাত্রায় অকৃতার্থ ও পরাভূত করে তুলি। বুদ্ধি যেখানে শৃঙ্খলিত, পুরুষকার যেখানে গুরুভারগ্রস্ত, সেই হতভাগ্য দেশে সর্ব্বপ্রকার দৈহিক মানসিক রাষ্ট্রিক অমঙ্গল অব্যাঘাতে অচল হয়ে ওঠে। মানুষের পরিপূর্ণতার যে ধর্ম্ম তার মধ্যে ত্যাগ আছে, ভোগ আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, কর্ম্ম আছে, চিন্তা আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কঠোরতা আছে — এই সমস্ত কিছুর শ্রেয়স্করতা হচ্চে তার সর্ব্বজনীনতায়, তার নিত্যতায়— অর্থাৎ এই সকলের মধ্য দিয়ে আমরা মহামানবের শ্বাশ্বত অভিপ্রায়কে নিজের মধ্যে সার্থক করি। আমার সার্থকতা যদি সকল মানুষের সার্থকতা না হয় তবে সে ধর্ম্মের ক্ষেত্রের বাইরে পড়ে, বিষয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়ায়। এর কারণ এই যে, বাঘ আপন একান্ত ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যেও আপন ব্যাঘ্রত্ব রক্ষা করতে পারে,— কিন্তু মানুষ যে পরিমাণে একলা সেই পরিমাণেই সে অমানুষ। আমি যে কবিতা লিখি সে যদি নিতান্তই আপনার খেয়ালেই চলে সমস্ত মানুষের খেয়ালের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে মানুষের সাহিত্যে সে টিঁকবে না। তেমনি মানুষের বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা মানুষের মুক্তি —এ সব কিছুই সমস্ত মানুষকে জড়িয়ে। এই যে একজন মানুষ সকল মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি শ্রেয়ের সঙ্গে সম্মিলিত, দূরকালে দূরদেশে তার মানবসম্বন্ধ প্রসারিত এইটেই মানুষের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে যে তপস্যা পূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে যায় আমি তাকেই ধর্ম্ম বলি। এই সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতাকে যা কিছু পঙ্গু করে তাকে

যত বড়ো নামই দাও তাকে আমি ধর্ম্ম বলে শ্রদ্ধা করি নে। অতএব তুমি আমাকে যোগী বৈরাগী অনাসক্ত বলে মনে কোরো না। অচলায়তনে আমার একটি গান আছে

‘আমি সব কিছু চাইরে,
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

ইতি ৯ কার্তিক ১৩৩৮

দাদা

৫৪

[দার্জিলিং] ২৬ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে আঘাত দিই, অবশেষে অনুতাপও হয়। কিন্তু আমার উপায় নেই। আমাদের দেশের ভক্তির সঙ্গে পূজার সঙ্গে সর্ব্বমানবের এমন বিচ্ছেদ, তার প্রতি এত ঔদাসীন্য যে সে আমি সইতে পারিনে। আচার বিচারের মূঢ়তায় সমস্ত দেশের বুক যে কি জোরে চেপে ধরেছে তা একখানা পাঁজি পড়লেই বোঝা যায়। অথচ এই পাঁজি তার নির্ব্বুদ্ধির স্তূপাকার বোঝাই নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরে বেড়াচ্চে— আমার তো লজ্জা বোধ হয়। অল্পদিন আগে আমাদের আশ্রমের কাছে একটি বিবাহ দেখেছি— তার স্ত্রীআচার বারো আনা বিশুদ্ধ বর্ব্বরতা। এই আচারের বর্ব্বরতায় সমস্ত দেশে

আমাদের মনুষ্যত্বকে অবমানিত করচে। বিধাতার দত্ত বুদ্ধির সম্মান একেবারে ঘুচে গেছে, আমাদের স্বরচিত চোখে ঠুলি দেওয়া অন্ধতাকে আমরা ধর্ম্মের নামে পূজা করি। এইখানে আমাদের পরাভব হতেই হবে। মানুষের দুঃখ আজ জগদ্ব্যাপী— তার মাঝখানে আমাদের সমাজ জুড়ে নিরর্থকতার বিপুল আয়োজন আমাকে লজ্জিত ও দুঃখিত করে। সে কথা তোমার কাছে লুকোতে পারিনে। তুমি মনে করতে পার এটা আমার মজ্জাগত বৈদেশিকতা, তা যদি সত্য হয় তাহলে স্বাদেশিকতা অশ্রদ্ধেয়। সম্প্রতি এখানে জগজ্জননীর নামে জীবরক্তের স্রোত বয়ে গেছে আর তাই নিয়ে যে উন্মত্ততা সে অনার্য্যের উন্মত্ততা— অথচ সেও ধর্ম্ম এবং মেয়েরাও এই রক্ত নিয়ে ছেলের কপালে ফোঁটা দিয়ে দেয়, মনে করে মাএর আশীর্ব্বাদ পেলে। ইতি

৯ কার্ত্তিক ১৩৩৮

দাদা

৫৫

৩০ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

Glen Eden
দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

নিরন্তর অপরাধভীরুতা তোমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেচে — মানুষের কাছে অপরাধ, দেবতার কাছে অপরাধ, গ্রহ উপগ্রহের কাছে অপরাধ। প্রায়ই এই অপরাধকল্পনাটা অনুষ্ঠানের ত্রুটি নিয়ে। নিজের চারদিকে এই বিভীষিকা কেন তুমি সৃষ্টি করে তুলেচ? এতে মানুষকে শক্তি দেয় না, দুর্ব্বলই করে রাখে। সামান্য আচারে ব্যবহারে দেবতা কেবলি আমাদের ছল ধরবার জন্যেই বসে আছেন— তাঁর C. I. Dর দল দিনরাত আনাচে কানাচে ঘুরে পদে পদে আমাদের চলাফেরা নোট করে রাখচে এ যদি সত্য হয় তবে এমন দেবতার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহই শ্রেয়। আর যাই হোক আমার সম্বন্ধে তুমি কোনো অপরাধ কল্পনা কোরো না। আমি সি, আই, ডির চরওয়ালার দেবতা নই আমি কবি। আমি ভুলচুকের উপর দিয়েও মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করি। তুমি যখন ভয় করো যে আমি বুঝি বা রাগ করচি, ক্ষমা করচিনে— তখন বুঝতে পারি এই রকমের ঘর-গড়া ভয়ের চর্চ্চায় আমাদের দেশ অভ্যস্ত— তাতে দুঃখ বোধ করি।

বেশি লেখবার মতো শরীর নয় তবু না লিখে পারলুম না। ইতি ১৩ কার্ত্তিক ১৩৩৮

দাদা

৫৬

১ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কথাটা এই যে, লক্ষ যোজন দূরে কোন গ্রহ উপগ্রহ কোথাও বিশেষভাবে পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে আছে বলেই সকাল বেলা উঠেই তোমার হাঁচি আরম্ভ হোলো, দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে সেটা গেল পুড়ে, চোখের ডান পাতা কাঁপতে সুরু করল, বুঝতে পারলে আজ বাজার করতে পাঠালে বাজারদর যাবে চড়ে, কেননা রাহু দৃষ্টি দিচ্চে তোমার বাজারের স্থানে, ওদিকে তোমার গ্রাম সম্পর্কে মাসতুতো বোনের ভাসুরপোকে তোমার দেওরের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছ বলে আত্মীয়বিচ্ছেদ হয়ে গেল, কেননা শনি ছিল তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দ্দের উপরে চেপে —এসব কথা তোমার মন থেকে সরিয়ে দাও। কেন মনকে দুর্ব্বল করো? সংসারে ছোটো বড়ো অনেক অমঙ্গল আছে— বুদ্ধি নিয়ে বীর্য্য নিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করতেই হয়, কখনো হারি কখনো জিতি সংসারের এই নিয়ম। বিশেষ কারণে যখন অন্যমনস্ক থাকি তখন ডালে নুন দিতে পানে চুন দিতে ভুল হয়ে যায়— কেতু নামক পদার্থের উপর এর মূল দায়িত্ব চাপিয়ে কপালে করাঘাত করার মতো এত বড়ো দুর্ব্বলতা আর কী হতে পারে! অথচ এ দিকে সামান্য বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে দেবতার কাছে অপরাধ হচ্চে বলে মনকে পদে পদে পীড়িত করতে থাকো। গ্রহই যদি অপরাধ ঘটায় তবে দেবতার

সঙ্গে অপদেবতার লড়াই হোক্ না কেন, মাঝের থেকে মানুষ কেন পায় শাস্তি ? যদি বলো পুরুষকারের জোরে গ্রহফল খণ্ডন হয় তাহলে গ্রহটাকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখলেই তো পুরুষকার পূরো পরিমাণে জোর পেতে পারে। বিমানচারী অনধিগম্য শত্রুর বিভীষিকার ছায়ায় মনকে পদে পদে আচ্ছন্ন করে কেউ কি কখনো জীবযাত্রায় জয়লাভ করতে পারে ? দেশে চারদিকে তোমার শত্রু আছে ম্যালেরিয়া, মূর্খতা, গোঁড়ামি, নিরুদ্যম, পরস্পর ঈর্ষ্যা কলহ নিন্দুকতা মূঢ়ের আত্মাভিমান, আরো কত কি— এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের যুদ্ধ করতে হবে বুদ্ধির দ্বারা সুবিবেচনার দ্বারা চারিত্রবলের দ্বারা— এর উপরে পঞ্জিকা-বিহারী শত্রুভয় আর বাড়াও কেন ? যে দেশের হাড়ে মজ্জায় নানা আকারে ভয় ঢুকে চিত্তকে ঘুণে খাওয়া করে দিয়েচে,— এমন সব ভয় যার অস্ত্র নেই, যেখানে যুক্তি পৌঁছয় না, সে দেশকে বাঁচাবে কে ? আমাদের দেশে গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে শুভলগ্নে তো সকলেরই বিবাহ হয়— লগ্ন যে পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার হাজার প্রমাণ চারদিকেই— কিন্তু মূঢ়তার জোর কমে না। তর্ক করবার সময় বলে লগ্নফলের উপর স্ত্রীপুরুষের ভাগ্যফল আছে। শুধু স্ত্রীপুরুষ কেন, ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ি, ভাবী সন্তান সকলেরই ভাগ্যফল পরস্পর বিজড়িত। তাই যদি হয় পাড়াপ্রতিবেশী এবং দেশ বিদেশের লোককে বাদ দেওয়া চলবে না। যে ইংরেজের ছেলে বাঁদর ভ্রম করে শিকার করতে গিয়ে বাঙালীর ছেলেকে মেরেচে শুধু সেই নিহত ও হন্তারকের ভাগ্যফল গণনা করলে তো হবে না, ধরে নিতে হবে

যে, সমস্ত ইংরেজ জাতি ও বাঙালী জাতির ভাগ্যফলে এবং যেদিন প্রথম বন্দুক সৃষ্টি হয়েছিল সেইদিনকার নক্ষত্রগুলি পরস্পরের প্রতি যা ভঙ্গী করেছিল তারি গুণে ব্যাপারটা ঘটতে পেরেছিল। তা ছাড়া ভৃগুমুনি সব নক্ষত্র ও সব গ্রহ তাঁর হিসাবের মধ্যে আনেন নি— সম্ভবও নয় জানাও ছিল না। তারা কি বেকার বসে আছে? অতগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টি হিন্দুসন্তানের ভাগ্যকে এড়িয়ে গেল কী করে? আর কেন? এসব জঞ্জাল নিয়ে মনকে হতবুদ্ধি অবসাদগ্রস্ত করে কী হবে!

আমি মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখেচি দেখে আমাকে প্রশ্ন করেচ আমি মৃত্যুকে ভয় করি কি না। সাধারণভাবে করি নে। জীবন আর মরণ তো একই সত্তার দুই দিক— চৈতন্যে ঘুম ও জাগরণ যেমন। অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা ঘুমের আবেশ এলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, মুখ আঁচড়ে’ ছটফট করে’ নিজেকে জাগিয়ে রাখতে চায়— তা দেখে বড়োরা উৎকণ্ঠিত হয় না। জানে যে ঘুম যদি না হয় তাহলে জাগরণটাই পীড়িত হয়ে ওঠে। মৃত্যুও তেমনি— যদি না আসত তাহলে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণটাকে নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি করতে হোত। জীবনের সঙ্গে যেটা অবর্জ্জনীয়ভাবে যুক্ত তাকে সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করাই উচিত। মৃত্যু যদি জীবনের একান্ত বিলুপ্তিই হয় তাহলেও সেই ক্ষতিটা কার? যে মরেচে তার কিছুতেই লোকসান নেই। যখন বেঁচে আছি তখন তো মরি নি। আগেভাগে ভয় করে’ ভাবনা করে’ কী হবে? বিনষ্ট যদি হই তবে কোনো দুঃখ কোথাও রইল না, কোনোভাবে যদি বেঁচে থাকি তাহলে আজও যেমন

তখনো তেমনি— অর্থাৎ বেঁচে থাকার সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি প্রিয় অপ্রিয় এই মতোই আবর্ত্তিত হয়ে চলবে। বর্ত্তমান জীবনকে যদি তার সমস্ত দায় নিয়ে ছাড়তে অনিচ্ছা হয় তবে ঠিক তখনকার জীবনেও তেমনিই হবে। এই জীবনেই কতবার মরেচি ভেবে দেখ। শিশুকালে আমার দাইকে অসম্ভব ভালোবাসতুম। তখনকার যে জীবন সেটা তাকেই কেন্দ্র করে ছিল। এক ঘণ্টার মতো তার তিরোধানের কথা সেদিন বিনা অশ্রুপাতে প্রসন্নমনে চিন্তা করতে পারতুম না। কিন্তু সে আজ ছায়া হয়ে গেল, কোনো ব্যথার দাগ নেই। তার পরে অন্য কেন্দ্র নিয়ে যে জীবন সৃষ্ট হয়েচে সেটার দাম সমস্ত সুখদুঃখ নিয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অবশেষে এ সমস্ত গিয়েও জীবনান্তরে আর একটা সত্তা যখন জমে উঠবে তখন তাকে নিয়েই এত ব্যাপৃত হব যে গতস্য শোচনা বলে পদার্থই থাকবে না। অতএব মৃত্যু সম্বন্ধে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাই তো ভালো। কোনো কোনো বিশেষ আকারের মৃত্যু আমার অনভিপ্রেত। বাঘে আমাকে খাদ্যবস্তুরূপে গিলে গিলে খাবে এটা আমি পছন্দ করি নে। কিন্তু সেই না-পছন্দ জিনিষটা বাঘে খাওয়া,— মৃত্যু নয়। বস্তুত বাঘে খাওয়া উপসর্গটার মধ্যে মৃত্যুটাই সব চেয়ে বাঞ্ছনীয়। বছর পঞ্চাশ ধরে যদি বাঘেই খেত তাহলে প্রাণরক্ষার স্বস্ত্যয়ন করতে গ্রহাচার্য্যকে দক্ষিণা নিশ্চয়ই দিতুম না।

মীরা যদি তোমাকে পিসিমা বলে ফেলে তাহলে সে সম্বন্ধটা মানাবে না। অনেক দিন ধরে তুমি বহুতর দলিলপত্রে যে সম্বন্ধ পাকা করে ফেলেচ, আমার তরফেও যার কবুলতি পেয়েচ, মীরা

আজ সেটাকে অপ্রমাণ করতে পারবে না। মুখে সে যাই বলুক আসলে তারই হার হবে। আমিই হচ্চি আপিল কোর্টের জজ, তোমার দিকেই রায় দিলুম। ইতি ১৫ কার্ত্তিক ১৩৩৮

দাদা

৫৭

৫ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্রে যে বাচিক ভোজ দিয়েচ সেটা উপাদেয় বলে মনে হোলো। তোমার মীরা মাসীর রান্নায় হাত আছে তাকে দিয়ে বাচিকটাকে কায়িক করে নেব। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা ছিল প্রতিদিন তাঁকে একটা কিছু সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ খাওয়াব। মীরার মা ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যে— তিনি খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। কিন্তু নতুন খাদ্য উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি। সেই সকল অপূর্ব্ব ভোজ্যের বিবরণসহ তালিকা আমার স্ত্রীর খাতায় ছিল। সেই খাতা আমার বড় মেয়ের হাতে পড়ে। এখন তারা দুজনেই অন্তর্হিত। আমার একটা মহৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হ'ল। রূপকার রবীন্দ্রনাথের নাম টিকতেও পারে, সূপকার রবীন্দ্রনাথকে কেউ জানবে না।

তোমার চিঠির সঙ্গে এক টুকরো রূপকথা পাঠিয়েছ। সম্পূর্ণ

করো না কেন? ছেলেদের পাঠ্য বই আমাদের দেশে নেই বললেই হয়। এই কাজে তুমি হাত দাও না কেন? যত পার রূপকথা সংগ্রহ করে একখানা বই যদি বের কর, খুব কাজে লাগবে। আর্থিক দিক থেকেও তাতে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

আগামী ১০ই নভেম্বর তারিখে কলকাতায় যাব। চার পাঁচ দিন সেখানে কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাব। ইতি
৫ নভেম্বর ১৯৩১

দাদা

৫৮

৮ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার গ্রহ উপগ্রহের অপমানে তুমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছো। তুমি স্থির করেছো আমি হিন্দুধর্ম্মকেই অস্বীকার করতে বসেছি। মুস্কিল এই, আকাশে পাতালে যা-কিছু আছে সমস্তকেই যদি মানতে হয় তাহলে সমস্তকেই সম্মান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। উপনিষদ বলেন "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" তোমরা উপনিষদকে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু বলে স্বীকার করো কি না জানি নে, আমি উপনিষদকে সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি বলে মানি। উপনিষদে ঈশ্বরকে বলচেন বন্ধু, তাঁকেই বলচেন বিধানকর্ত্তা।

তোমরা যদি এক কাল্পনিক ভৃগুমুনির দোহাই দিয়ে বলো যে পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতিই হচ্চেন বন্ধু, আর আকাশময় গ্রহতারা মিলে আমাদের ছোটো বড়ো ভালোমন্দ সমস্তই বিধান করচেন, তাহলে ঈশ্বরকে কী বলে মানব? আর যদি নাই মানি তাহলে অপরাধ হবে কোন্ যুক্তিতে? কেননা আমার না মানার হেতুই হচ্চে আমার কোষ্ঠীর আকাশে কোনো এক জায়গায় কেতু বসে আছেন তাঁরই প্রভাব। বহুদূর আকাশে কোনো একটা দুষ্ট চক্রান্ত অনিবার্য্যশক্তিতে আমার বুদ্ধিকে যদি বিপথে নিয়ে যায় তাকে যদি অপরাধ বলো, তাহলে ভূমিকম্পের ধাক্কায় কারো ঘাড়ের উপর পড়ে তাকে জখম করলে সেও হবে অপরাধ। হিন্দুধর্ম্ম যদি বলে অপরাধ বাইরেকার জিনিষ, এই জন্যেই তিথিনক্ষত্রের হিসাব মিলিয়ে বিশেষ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণকে পেট ভরে খেতে দিলে বা গঙ্গাস্নান করলে চুরি ডাকাতি নরহত্যার পাপ নির্ম্মল হয়ে যাবে তবে এমন অনুশাসন আমি যদি অন্যায় বলেই বোধ করি, এমন কি একে যদি নাস্তিকতা বলি তাহলে আমার ধর্ম্মস্থানে যে গ্রহের দৃষ্টি আছে তাঁর প্রতি তাকিয়ে আমাকে ক্ষমা করতেই হবে। নাস্তিকতা কেন বলচি সেটা বুঝিয়ে বলি। অন্ন বস্ত্র ধন স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাইরের পদার্থকে বাইরের নিয়মে অর্জ্জন বা তার ত্রুটি দূর করতে হয়— সেই সব অমোঘ নিয়ম বিজ্ঞান শাস্ত্র আবিষ্কার করচে— এ সম্বন্ধে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর হয় ততই আমরা সফলতা লাভ করি। তুমি বোধ হয় বইয়ে পড়েচ, যে, আমেরিকার কটিদেশ ছিন্ন করে যে খাল কাটা হয়েচে সেই খাল কাটবার চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ করে

দিয়েছিল সেখানকার নিদারুণ ম্যালেরিয়া। তার পরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও উদ্যমের সাহায্যে সেখান থেকে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে যত অধিবাসী আছে তাদের সকলের কুষ্টি থেকে ম্যালেরিয়াবিধায়ক কুটিল গ্রহ সরে দাঁড়িয়েচে। তার কারণ এই যে, ঈশ্বর আমাদের যে-বুদ্ধি দিয়েচেন তাকে স্বীকার করার দ্বারাই প্যানামা প্রদেশের ব্যাধি দূর হয়ে গেছে। অথচ আমাদের দেশে আমরা ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে মানিনে আমাদের আয়ত্তের অতীত গ্রহকে মানি ম্যালেরিয়াও নড়তে চায় না। যদি কখনো তুমি পাশ্চাত্য মহাদেশে যেতে তাহলে সেখানকার লোকদের দৈহিক মানসিক শক্তি স্বাস্থ্য সম্পদ দেখলে বিস্মিত হতে। তার প্রধান কারণ অন্ন বস্ত্র আরোগ্য সমস্তই তারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করচে, তারা গ্রহ-মুখাপেক্ষীদের উপরে জয়ী হচ্চে। বসন্ত প্রভৃতি অনেক মারীকেই তারা তাড়িয়েচে। এখনো ক্যান্সার ও যক্ষ্মার উপরে জোর খাটচে না— কিন্তু তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট আত্ম-বুদ্ধির পথে অধ্যবসায় চালনা করলে একদিন তারা ও দুটি রোগকেও আয়ত্তে আনতে পারবে। ইতিমধ্যে আমরা যে কেবল মঙ্গল গ্রহের দিকেই সভয়ে তাকিয়ে আছি তা নয় শীতলা আছেন, ওলাবিবি আছেন আরও কত কি আমার জানা নেই। বিধিদত্ত নিজের বুদ্ধিকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের ভয়ের আর অন্ত নেই। তারা মা শীতলাকেও ছাড়বে না ডাক্তারকেও না, গ্রহকেও মানবে এদিকে আপিসের বড়ো বাবুরও পায়ে তেল দেবে। এমন দেশে বিধাতার দান বুদ্ধিটাই কি যত অপরাধ

করলে! সে ছাড়া আর সব কিছুর জন্যেই পূজো মিলবে! এই তো গেল বাহ্যিক, ভৌতিক— মানুষের আর একটা দিক যেটা তার আন্তরিক তার আত্মিক— সেইখানে তার পাপ পুণ্য। সেই সব রিপুকেই আমরা পাপ বলি যাতে করে বিশ্বাত্মার সঙ্গে আমাদের জীবাত্মার সম্বন্ধ বিকৃত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুর দ্বারা আমরা নিজের অহংসীমার মধ্যে বদ্ধ হই। আত্মা তাতে আপন ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়। কেননা আত্মার ধর্ম্মই হচ্চে নিজের সত্যকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা। ভৌতিক জগতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের শক্তিকে যোগযুক্ত করে, বিশ্বনিয়মের দ্বারা আমাদের সকল কর্ম্মকে নিয়মিত করে, খেয়ালের দ্বারা নয়, অন্ধ সংস্কারের দ্বারা নয়— তেমনি আমাদের অন্তরাত্মায় যে কল্যাণবৃত্তি আছে সে করুণার দ্বারা মৈত্রীর দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্মত লোকহিতৈষিতার দ্বারা আপনাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করে। স্বার্থ তখন পরমার্থে উত্তীর্ণ হয়— অর্থাৎ তখন সকলের হিতে নিজের হিত জানি। যে শুভবুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগ-সাধন হয়, উপনিষদে তারই জন্যে প্রার্থনা আছে— বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ— বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যিনি পরিব্যাপ্ত তিনিই দেবতা,— স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু— তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন। অশুভবুদ্ধি আমাদের অহংকে আশ্রয় করে— সে যে-সমস্ত পাপ ঘটায় সে তো গায়ে লেগে থাকে না, বাইরের অনুষ্ঠানে তাকে তাড়াবার কথা যখন মনে করি তখন গ্রহ মানি, পাণ্ডা মানি, পুরুৎ মানি,

অন্তর্যামীকে মানিনে, মানিনে তাঁকে যিনি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ," যিনি "বিশ্বকর্ম্মা" যিনি "মহাত্মা" যিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। যে সাধনায় পাপের মূল ক্ষয় হয়, সে আত্মিক সত্যের সাধনা, শুভবুদ্ধির সাধনা। সেই সাধনায় আত্মাকে মানি, এবং সেই আত্মার আশ্রয় বিশ্বাত্মাকে মানি। সেই মানা থেকে ভ্রষ্ট করে আর যে-কোনো স্থূল পদার্থকে মানতে বলো তাকে আমি ধর্ম্ম বলিনে। তুমি যখন দেবতাকে ভক্তির কথা ভালোবাসার কথা বলো তখন সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু যখন তুমি বিচারের চেয়ে আচারকে, বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারকে, পুরুষকারের চেয়ে গ্রহকে প্রাধান্য দিতে চাও, এবং দিয়ে বলো সেইটেই হিন্দুধর্ম্ম তখন মন অত্যন্ত পীড়িত হয়— একা তোমার জন্যে নয় এই শক্তিহীন বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্ন দেশের জন্যে।

১০ই নবেম্বরে পাহাড় থেকে নামব বলেছিলুম। সে ঘটে উঠ্‌ল না। ১৫ই তারিখে যাত্রার দিন স্থির হয়েচে। তার পরে তুই একদিনের বেশি কলকাতায় থাকা হবে না। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯৩১

দাদা

১০. ১১. ১৯৩১

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্ত্যের ঘাটে যে-প্রাণ নবীন,
চিরন্তন মানবের মহাসত্তামাঝে
এলো কোন্ কাজে?
এক আমি-কেন্দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্তের দল অগণন
সৃষ্টির বিদ্যুৎ বাষ্প করিয়া বহন
দিন রাতি
কী মায়াখানি তুলিতেছে গাঁথি
আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে কম্পিত কায়ায়
দুলে রূপে রসে নৃত্যে গন্ধে গানে বাঞ্ছিত মায়ায়।

যে খুশী চক্ষের মাঝে, যেই খুশী কানে,
সকালের যে খুশী নিয়ে দিকে দিকে বিহঙ্গর আহ্বান,
উৎসবের খুশী ~~[illegible]~~ কাঙাল প্রাণের,
~~[illegible]~~,
ইতি ~~[illegible]~~ তোর বন্ধু সত্যাবর,

মনের যে মুক্তি চাহে ভাষার,
সঙ্গীতের যে মুক্তি নিত্য পথ খোঁজ ক'রে তার ভাষা,
যে মুক্তি উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তর লোকের দ্বার ভাঙি'
সব তারা মিলি' নিতি নিতি
নানা আবর্তন বেগে গড়ি' তোলে মরম-আকৃতি।
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কতনা সংশয় তর্ক, কত না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—
মন-গড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
কঠিন অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসে [illegible] কত না আদেশ,
দেহহীন তর্জনী-নির্দেশ,
ইহাদের গূঢ় অভিরুচি
কত সূক্ষ্ম মূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি',

কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত না অসাধ্যসাধ্য কল্পনা-অমর্ত্যতরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
কত জয়, কত পরাভব
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালোমন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথা হয়ে কর্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
প্রারব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কত,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাধ
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে, শেষে
কবে দিন পূর্ণ করি' কোথা দিবে দেখা।

যে চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে, অকস্মাৎ হবে গতি-হারা,

সে দিনের নাট্য,—
নিয়েছে আমার কণ্ঠ, পেয়েছে তা বাণী।
অশ্রুতে ও আনন্দের আকারের ছাঁদি' দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।
অসংখ্য এ রচনায় উদ্ঘাটিত হল ইতিহাস,—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস॥

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অকুণ্ঠিত সত্য-পরিচয়ে।
আছে আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ যে সত্তাখানি
আপনার সম্মান জানি
পারে না করিতে গ্রাস, অশান্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
তীব্র লোভ প্রকাশ্য আগ্রহে,
মরণযাত্রে ঘোর দায় মৃত্যুর সমারোহে।
তোমার যে মনুষ্যত্ব
বাহিরেতে দেখেছিলে বিশ্বলোকে দিক পর্যায়
ইহার কি ঘটিবে বিলয়,
কোথাও কি নাই তার কোনো সার্থকতা।

তবে কেন মনুষ্যসৃষ্টি, ঘটিত এ অস্তিত্বের ভার।

অপূর্ণতা[illegible] আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন?
ক্ষুদ্র কীট মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অন্ধ কি' উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
[illegible]
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়॥
শুধু প্রাণরক্ষা আর ধনরক্ষা লাগে
তোমার চিত্তের শক্তি সত্য হয় নাই আত্মমাঝে,
যে চাহিল ডাকি
খুলি তার আঁখি দিবে না কি।
সে চিত্ত অসীম পানে বাতায়ন দিয়েছিল খুলি;
প্রত্যহের আপনারে ভুলি'
নিত্যের নৈবেদ্য থালে
আপনার শ্রেষ্ঠদান তার দিয়াছিল কালে কালে।

অসীম প্রাণের অর্ঘ্য যবে এসেছিল কাছে
মর-প্রাণ তুচ্ছ করেছিলে আত্মদানে,
অর্ঘ্য তব কোথাও কি হবেনা সম্মানী,
মৃত্যু তারে দিবে বাণী,
ধূলায় হবে কি ধূলি
মহাক্ষণ ভুলি।

জন্মদিনে এই বাণী
দিনু তব চিত্তে আনি, —
— মর্ত্যের জরায়ু
অকস্মাতে রুদ্ধ করি লুপ্ত করিবেনা তব আয়ু, —
অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ —
এ গর্ভজন্মে তার নহে অবসান —
আরবার নবজন্ম লবে
দ্যুলোকের উৎসবে ॥

২৪ কার্তিক
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

দার্জিলিং। ১৫ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠি বোধ হয় যথাসময়ে তোমার পৌঁছয় না কেননা এখনো যে আমি দার্জ্জিলিঙে আছি সে খবরটা তোমার কাছে যেন ঝাপসা হয়ে আছে। এতদিন পরে এখানকার মেয়াদ ফুরোলো— আজ রওনা হয়ে কাল সোমবার প্রাতে কলকাতায় পৌঁছব। দু তিনদিনের বেশি থাকা সম্ভব হবে না।— লিখেচ সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীত ছবি ও গান পড়চ। অঙ্কুর যদিও উদ্ভিদ জাতীয় তবু তাকে গাছ বলা চলে না, ঐ লেখাগুলিও তেমনি কাকূতি কিন্তু কাব্য নয়। ওতে এই অতি সহজ কথাটার প্রমাণ হয় যে এক সময়ে আমি বালক ছিলুম। অমৃতং বালভাষিতং বলে একটা কথা আছে— কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হলে সেই বালভাষিতকে কেউ রক্ষা করে না— করলেও সেই অমৃত ভদ্র লোকের পাতে দেবার যোগ্য থাকে না। ছবি ও গানে তুমি আমার ভাঙা ছন্দ দেখে হেসেচ— ভেবেচ ছেলেরা হাঁটতে গিয়ে যেমন পড়ে, ওর ছন্দঃপতনও তেমনি। ঠিক তা নয়— আমি আজন্মকাল বিদ্রোহী— বালকবয়সেও স্পর্দ্ধার সঙ্গে বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবি-লীলা সুরু করেচি— বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করি নে যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে। ঘরে বাস করতে হয় বলেই যদি বাগানে বেরোলেই লোকে চারদিক থেকে তেড়ে আসে তাহলে সেটা তো হোলো

জেলখানা। বস্তুত কাব্যে দেয়াল-ছাঁদা ঘরও কবির, নির্দেয়াল বাগানও তার। আমার কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দের দেয়াল দেওয়া নেই বলে মনে কোরো না ইঁটের পাঁজা পোড়ে নি, মিস্ত্রির মজুরীর অভাব। ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯৩১

দাদা

৬০

[কলিকাতা। নভেম্বর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কি করে তুমি আপনার কাছ থেকে আপনি দূরে গিয়ে শান্তি ও সার্থকতা পেতে পারো সে তো আমি বল্‌তে পারি নে। তোমার প্রকৃতি ও বাইরের অনুকূল প্রতিকূল নানা অবস্থায় তোমাকে একটা বিশেষভাবে গড়ে তুলেচে তারি ভিতর থেকে ধ্রুব আশ্রয় তোমাকে নিজেই বুঝি সৃষ্টি করতে হবে। তার কারণ তোমার স্বভাবের মধ্যে একটা প্রবল স্বকীয়তা আছে— সে যদি বাধাগ্রস্ত জীবনের পথকে নিজের সহজ প্রতিভার দিকে মুক্ত করতে পারে তাহলেই তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারো। তুমি স্ত্রীলোক, নানা শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস সংস্কারে তোমাকে ঘিরেচে— তোমার আন্তরিক শক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় নি— তাই কষ্ট পাচ্চ— অথচ তোমার আর কোনো গতি নেই। নূতন যে কোনো পথ খুঁজতে যাবে, খুঁজে পাবে না কষ্ট পাবে। যদি অবস্থা অনুকূল

হোত, যদি যথেষ্ট শিক্ষা ও চর্চ্চা থাকত তাহলে তুমি রচনায় আত্মপ্রকাশে পূর্ণতা পেতে— সুযোগ হয় নি— এ দুঃখ কে মেটাবে? তোমার অন্তর্যামী, তোমার গুরু তোমাকে এই নিয়ত দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করুন— এই কামনা করা ছাড়া আর কি করতে পারি?

কাল সকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে যাব। তোমাকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি নিশ্চয় জেনো।

দাদা

৬১

[শনিবার ২১ নভেম্বর ?, ১৯৩১]

কল্যাণীয়াসু

এক্ষণি শান্তিনিকেতনে যেতে হচ্চে। শনির কোপে আইসক্রিম মুখের কাছে এসে ফিরে গেল।

জ্যোতিষের বইগুলি পেলুম।

তোমার চিঠি পরে পড়্ব

সময় একটুও নেই

দাদা

৬২

[শান্তিনিকেতন] ২৪ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি কি আমাকে বৈরাগী মনে করে বসে আছো ? নানা রাগে নানা রসে আমার মন বিচিত্র। কিন্তু তা সম্ভবপর হোতো না যদি না আমি বাঁধনছাড়া হতুম। আকাশে মেঘে মেঘে, ঋতুতে ঋতুতে ফুলে পল্লবে রঙের রসের অন্তহীন খেলা— এই খেলা ভেঙে যেত যদি বাঁধনের জালে আট্‌কা পড়ত। বিশ্বব্যাপারকে আমরা লীলা বলে জানি— সেই লীলার মানেই এই যে তার মধ্যে সবই আছে কিন্তু কিছুই বাঁধা নেই। রসের ঝরনা পূর্ণ থাকচে কেননা সে কোথাও বদ্ধ থাকচে না। কুমারসম্ভবে শুনি দৈত্যরা স্বর্গকে অধিকার করেছে। তার মানে, যে-আনন্দ ছিল মুক্ত তাকে তারা বন্দী করতে চেয়েছিল। তখন সেটা হয়ে গেল ভোগ— ভোগে ক্লান্তি, ভোগে ম্লানতা, ভোগ নিজেকে নিঃশেষ করে দেউলে হয়ে যায়। সেই জন্যেই মন বলে লোভ কোরো না। লোভে আমরা আপনাকেই বন্দী করি কিন্তু যা পাই তাকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁধতে পারি নে। তুমি নিশ্চয় জানো আজ জগৎ জুড়ে একটা আর্থিক দুর্গতি ঘনিয়ে উঠ্‌চে। বিষয়ী লোকেরা ব্যাকুল হয়ে তার কারণ খুঁজচে। তার কারণ এই যে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে আপন আপন সম্পদকে কড়াক্কড় করে আটে-ঘাটে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা— অর্থাৎ ধন কোনো একজায়গায় একান্ত বাঁধা থাকবে এটা বিশ্বনিয়মের

বিরুদ্ধ। রাশিয়ায় সোভিয়েট এ কথাটা বুঝেচে। তারা ব্যক্তিগত লোভের থেকে ধনকে মুক্ত করতে চায়। যদি পারে তাহলেই চঞ্চলা লক্ষ্মীকে তারা সত্য করে পাবে। বিষয়লুব্ধ দৈত্যেরা লক্ষ্মীকে আপন ব্যাঙ্কের দুর্গে কড়া পাহারায় বন্দী করেছিল। তাই লক্ষ্মী আজ তাঁর অদৃশ্য রাস্তা দিয়ে পালাচ্চেন। জীবনের সব দুর্ম্মূল্য আনন্দই হচ্চে এই রকমের মুক্ত সম্পদ। তাকে বাঁধতে গেলেই নিজেকে বাঁধি। আমি তাই বলি মুক্তি মানে ত্যাগ নয় বৈরাগ্য নয়, আপন অনুরাগের হাতকড়ি খসিয়ে দেওয়া, তাকে নিরাসক্তির সিংহাসনে রাজা করা— তাকে পাওয়া কিন্তু ধরা নয়। আমার লেখা সম্বন্ধে আজকাল কেউ কেউ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে বলে তাতে প্যাশান্ নেই— অর্থাৎ প্রেম আছে কিন্তু তার শিকল নেই— ঝমঝমানি শুন্তে পায় না বলে মনে করে বুঝি সব শূন্য, কিন্তু অনেক সময়েই আঁচলে বাঁধা সোনার গিরেটাই থাকে, সোনা পড়ে খসে। ইতি ২৪ নবেম্বর ১৯৩১

দাদা

৬৩

৩ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। তাতে তোমার নারীহৃদয়ের গভীরতম বেদনার স্পষ্ট পরিচয় পাই। বুঝতে পারি স্নেহ প্রেম ভক্তির আধার পাবার প্রয়োজন তোমাদের পক্ষে কত একান্ত প্রবল। যেখানে তোমাদের হৃদয়ের নৈবেদ্য পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে সার্থক হতে পারে, তোমাদের ত্যাগের শক্তি সমস্ত বাধা ভেদ করে উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রবাহিত হতে পারে তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাধনার পথ সেই অভিমুখেই। নারীর সেই আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা তোমার চিঠিতে অকৃত্রিম মাধুর্য্যে প্রকাশ পায়। বুঝতে পারি যে-বৈষ্ণবধর্ম্ম তোমাকে আকর্ষণ করেচে তুমিও তাকে আকর্ষণ করেচ— পৃথিবী যেমন, যত ছোটো হোক্, তবুও সূর্য্যকে টানে। তুমি অকারণেই সন্দেহ করো যে আমি হয়ত তোমার মনের ভাবটি ঠিক বুঝি নে। একটা কথা মনে রেখো আমরা সকলেই এক হিসাবে অর্দ্ধনারীশ্বর। কারো মধ্যে বা আধাআধি মিশোল, কারো মধ্যে বা ভাগের কমি বেশি আছে। একান্ত নারী এবং একান্ত পুরুষে যদি সংসার বিভক্ত হোত তাহলে তারা মিলতেই পারত না। তাই পরস্পরকে বুঝতে বাধে না, অথচ নিজের নিজের অধিকারের মধ্যে নিজের যে বিশেষত্ব তাকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। অর্থাৎ পুরুষের

প্রকৃতিতে পুরুষ মুখ্য, মেয়ে গৌণ, এবং মেয়েদের প্রকৃতিতে তার উল্টো, এইটেই সাধারণত হয়ে থাকে, না হলে সেটাতে সংসারের ওজন ঠিক থাকে না। মেয়েরা অজস্র স্নেহ প্রেম ভক্তি দিয়ে নিজেকে এবং নিজের সংসারকে পূর্ণ করে তুলবে এইটেই চাই, এইটে হোলো তার রসের দিক,— এর সঙ্গে তার শক্তির দিক আছে যে দিকে তার নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ত্যাগের দৃঢ়তা, যে-শক্তির দ্বারা সে আপন আশ্রয়কেও আশ্রয় দেয়, পালন করে, প্রতিষ্ঠিত রাখে, তার বিকারকে শোধন করে তার বেদনার আরোগ্য আনে, অর্থাৎ যাতে-করে সে নির্ভরের দ্বারা দুর্ব্বল করে না, চরিতার্থ করে। কিন্তু ঐ রসের ধর্ম্ম যদি পুরুষও আশ্রয় করে তাহলে নিজের উপরে পুরুষকে নারীভাব আরোপ করতে হয়, অর্থাৎ সেটা হয় তার স্বভাবের বিরুদ্ধ। পুরুষ নিজেরই স্বভাবকে দ্রঢ়িষ্ঠ করে তবেই সার্থকতা লাভ করে, উজানে গেলে দুর্ব্বল হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় নিয়ে যায়। বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে বীর্য্য দিয়ে অপ্রতিহত অধ্যবসায় দিয়ে আমাদের সৃষ্টিকে কেবলি উৎকর্ষের দিকে নিয়ে চল্‌ব, সমস্ত বাধাকে পরাস্ত করব, প্রতিকূলতাকে ভাগ্যের অমোঘ লিখন বলে স্বীকার করে নেব না, এই হলেই সত্যকার পুরুষের দ্বারা সংসারে স্বাস্থ্য শান্তি সম্পদ আত্মসম্মান বজায় থাকতে পারে, এই হলেই মেয়েরাও নিরাপদ নির্ভর ও গৌরব লাভ করে। নইলে পুরুষরাও যেখানে রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়াকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে, — সেই পৌরুষবর্জ্জিত দেশ সকল দিক থেকে পরাভবের বন্যায় যায় ডুবে। সেই জন্যে তোমার চিঠিতে তোমার হৃদয়ের মাধুর্য্যে

আমি যতই পরিতৃপ্তি পাই না কেন আমার তরফে পুরুষোচিত যে বীর্য্যের আনন্দ, যে মুক্তির আদর্শ, যে সৃষ্টির তপস্যা, যে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রাণপণ বিদ্রোহ, যে আত্মত্যাগী কর্ম্মের কঠোরতা তার বিজয়বাণী না শুনিয়ে থাকতে পারি নে। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে পুরুষও নারীর আদর্শে বিমুগ্ধ, সেই জন্যেই তার সৃষ্টিশক্তির এমন বিকার ঘটেছে— সেই জন্যেই কেবলি পরের কুৎসায় পরশ্রীকাতরতায় পরস্পরকে ব্যর্থ করচে, কোনো বড়ো কর্ম্মকে স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে তুল্‌তে পারচে না— তাই তপস্যা ভঙ্গ করতে, সাধু চেষ্টাকে অশ্রদ্ধা করতে, আরব্ধ কর্ম্মকে ভেঙে ফেলতে, শ্রেষ্ঠতাকে অস্বীকার করতে, যে-কোনো উপলক্ষ্যেই একত্র হবামাত্র খুঁৎ ধরে, ছোটো ছোটো ছুতো নিয়ে, মিথ্যা বলে', অত্যুক্তি করে সব কিছু পণ্ড করে দিতে, অকথ্য ভাষায় কোঁদল করতে তার এমন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ। চরিত্রের ভিত্তি দুর্ব্বল, মাটিতে অত্যন্ত বেশি রস, পাথুরে কঠিনতার অভাব— তাই আমাদের মিলনে আঁট নেই, অনুষ্ঠানে স্থায়িত্ব নেই, কেবলি তর্ক বিতর্ক দলাদলি, তালকে তিল ও তিলকে তাল করা।

গ্রহগণনায় জ্যোতির্ভূষণের কী দাবী আমাকে জানিয়ো, মিথ্যে জরিমানা দিয়ো না। জয়ন্তীর প্রবেশিকা তুমি যদি আমার কাছ থেকে দাবী করে নাও তবে আমি খুসি হব। তার বদলে তোমার কাছ থেকে আমি না হয় তোমাদের কোনো একটা উত্তরবঙ্গীয় সুক্তনি কিম্বা চাপড়ঘণ্ট কিম্বা শশা বা কুম্‌ড়োবীচির মিষ্টান্ন অথবা পৌষপার্ব্বণের পিঠের প্রত্যাশা জানাব। কিন্তু

অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে লঙ্কাদাহ উৎপাদন যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখো। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

দাদা

৬৪

[শান্তিনিকেতন *] ৪ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

খুচরো কাজের ভিড় প্রতিদিনই অত্যন্ত বেশি করে ঘনিয়ে আসচে। এ যেন রথের ভিড়ের মত— এক জনের সঙ্গে আর এক জনের সম্পর্ক নেই, অথচ ঠেসাঠেসিতে ফাঁক পাওয়া যায় না। আজ তোমাকে চিঠি লিখব না বলেই স্থির ছিল। কাল একটা চিঠি লিখেচি, অতএব কিছুদিনের ছুটির মেয়াদ দাবি করতে পারি। কিছুদিনের পূর্ব্বের পত্রে আভাস পেয়েচি পত্রোত্তরের বিলম্বে রাগ করবার অভ্যাসটুকু তোমার আছে। বোধ হচ্চে তোমাদের উত্তরবঙ্গীয় মেজাজ তোমাদের লঙ্কারসিত চাপড়ঘণ্টর মতোই ঝাঁঝালো। দক্ষিণ বঙ্গের পলিমাটিতে আমরা মানুষ, আমরা ভীতু স্বভাবের— একান্ত ভালোমানুষির সাহায্যেই আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি। "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর" এই পদ্ধতিটা অন্তত আজকের দিনে নিরাপদে অনুসরণ করতে পারতুম। কিন্তু তোমার চিঠিতে দেখলুম শ্রীপতি তার চিঠির জবাব আজও প্রত্যাশা করচে। যেদিন তার চিঠি পেয়েছি সেই দিনই উত্তরে তাকে জানিয়েছিলুম যে, তার রচিত

আইস্‌ক্রীম পৌঁছবার পূর্ব্বেই যে জোড়াসাঁকো থেকে অকস্মাৎ আমার তিরোভাব ঘটল নিশ্চিত এর মধ্যে মধুসূদনের হাত আছে। শ্রীপতি ম্লেচ্ছজনসেবিত উক্ত ভোজ্য পদার্থের রচনানৈপুণ্য নিয়ে দর্প প্রকাশ করেছিল, দর্পহারী আমাকে তাড়াতাড়ি তাই বিকেলের ট্রেণেই বোলপুরে রওনা করে দিলেন— অতএব এক্ষণে মধুসূদনের সঙ্গেই শ্রীপতি নিষ্পত্তি করে নিক্। চিঠি শ্রীপতি যদি না পেয়ে থাকে তাহলে পুলিসে হয়ত তার বদনাম আছে— চিঠি বিলুপ্তি আজকালকার দিনের ইতিহাসেরই একটা অঙ্গ।

কে বলে তুমি আমাকে ঘরের কথা লেখ? ঘরের লোক ছাড়া কাউকে ঘরের কথা লেখাই যায় না। আমি যে-ঘরকে কিছুই জানি নে সে ঘরে তো আমার দরোজা বন্ধ। তোমার ভাষা দিয়ে তৈরি ঘরে তো পর্দ্দা খাটানো নেই, তার ফোটোগ্রাফ নেওয়া যদি চল্‌ত তাহলে দেখতে ও একটা স্বতন্ত্র জিনিষ। কেননা ও ঘর তো আমিই মনে মনে তৈরি করে নিই, কোনো সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে ঠিকমতো ওর মিল হতেই পারে না। তুমি যে নামগুলি ব্যবহার কর সে তোমার চেনা, কিন্তু নামের পিছনকার রূপ তো আমারই তৈরি। তুমি ডাকঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে যা-খুসি গল্প বলে যেয়ো, তাতে কারো এতটুকু আব্রু নষ্ট হবে না — আমার মন খুসি হবে। চিঠিতে এরকম বকে যাওয়া একটা বিশেষ বিদ্যা, সবাই পারে না, তুমি পারো। সহজ কথা সহজে বলার শক্তি খুবই দুর্লভ। আপন ভাষা সকলের আপন আয়ত্তে নেই। ইতি ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

দাদা

৬৫

[শান্তিনিকেতন *] ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাজের ঘূর্ণীপাকের টান অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে। কিছু দিনের মতো এবার তলিয়ে যাব। চিঠিপত্র লেখা অসম্ভব হবে আগে থাক্‌তে খবর দিয়ে রাখলুম। রাগ যদি করতেই হয় তবে কোনো একটা গ্রহের উপর কোরো, যে গ্রহ এমন করে আমাকে খাটিয়ে মারে।

তোমাদের পাড়াতেই দেখচি রাগের একটা সংক্রামক রোগ-বীজ আছে। শ্রীপতিকে লক্ষ্য করে কিছু পরিহাস করেছিলুম, ভেবেছিলুম সেও ঈষৎ হাস্য করবে— কিন্তু তুমি লিখেচ তার মন বিগ্‌ড়ে গেচে। এ ব্যাপারটাও দেখচি আর একটা কোনো গ্রহের দ্বারা সংঘটিত হয়েচে। সে গ্রহ বোধ করি আমার হাসি সইতে পারে না। শ্রীপতির চিঠিতে কলকাতা থেকে হঠাৎ তিরোভাবের অপরাধ আমি নিজে না নিয়ে মধুসূদনের উপর দোষারোপ করেছিলুম— নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল মধুসূদন ঠাট্টা বোঝেন অতএব তিনি অবিচলিত থাকবেন— কিন্তু শ্রীপতির দ্বারা তাঁর বিচলিত ভাবটা প্রকাশ হয়েচে। এবার থেকে মধুসূদনকে সাম্‌লিয়ে চলব— গম্ভীর হয়ে সাবধানে কথা কব। কিন্তু স্বভাব খারাপ, পণরক্ষা হবে না।

রাজার হাতে রাজদণ্ড আছে সেটা নির্ব্বিচার বিভীষিকা হয়ে উঠলে তাকে ঠেকাবার জন্যে প্রজার হাতেও একটা ঢাল না

থাকলে অত্যাচারের সীমা থাকে না। যে প্রজা অতিসহিষ্ণু, রাজাকে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট করে। সেই অন্যায়ের দায়িত্ব প্রজার নিজের দুর্ব্বলতায়। দুর্ব্বল নিজে দুঃখ পায় পাক্, কিন্তু দুর্ব্বলতা অপরাধ হয়ে ওঠে যখন সে সবলের চরিত্রকে বিকৃত করে দেয়। এই জন্যেই অন্যায়কে নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য করাও অন্যায়। রাজার হাতে অস্ত্রের অন্ত নেই প্রজার হাতে একটিমাত্র প্রতিরোধের উপায় আছে সে হচ্চে বয়কট্। যদি অভ্যস্ত আরাম থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী এই বয়কট পদ্ধতির ভিতর দিয়ে অত্যাচারের প্রতি ধর্ম্মরাজের অপ্রসন্নতাকে প্রকাশ না করে তাহলে যে পর্য্যন্ত না দৈন্যে দুঃখে ম্যালেরিয়ায় পুলিশের গুঁতোয় সে ভবযন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় ততদিন বিদেশের আমদানি মোটামোটা কানমলাই তার পুরুষানুক্রমে নিরবচ্ছিন্ন পথ্য। তাই, আমাদের শাসনকর্ত্তাদের প্রতি লয়াল্‌টিবশতই তাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের উদ্দেশে আমি বয়কটের সমর্থন করি। রাজধর্ম্ম অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখ্‌তে সুরু করেচে— তার রচিত লাইনের মিল আমাদের লাইনে যদি জোগাতে পারি তাহলেই অমিত্রতা ঘুচে গিয়ে মিত্রাক্ষরের চলন হবে— কর্ণপীড়া বেঁচে যাবে। এই কর্ণপীড়নের উদ্যোগটা রাজার দিক থেকে বিরাট মাত্রায় ঘনিয়ে আসচে— ধর্ম্মের দোহাই মানবে না— মান্‌বে দুঃখের দোহাই। অতএব নিজেরা দুঃখ স্বীকার করেও যথাস্থানে দুঃখপ্রয়োগ করতে হবে। সব চেয়ে সাধুভাবে এ কাজ করবার উপায় হচ্চে বয়কট।—

সময় নেই। অতএব চল্‌লুম। ইতি ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১

দাদা

৬৬

কলিকাতা [ডিসেম্বর ?, ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার অন্তরের শুভকামনা গ্রহণ কর।

এইমাত্র কলকাতায় পৌঁছলুম। এতদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। ক্লান্তির বোঝা নিয়ে এসেচি। সামনে আছে আমার কবিমেধ— ভয়ে আছি।

দাদা

৬৭

[ডিসেম্বর ?, ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বড়ই ব্যস্ত। নানা আকারে অজস্র দক্ষিণা তোমাদের কাছ থেকে পাচ্চি। যতটা পারি আন্তরিক ভাবে আত্মসাৎ করচি। আমারও কিছু পাঠাই— সেও কিছু কিছু অন্তরের মধ্যে গ্রহণ কোরো।

তোমার পিসিমা জ্যাঠাইমাকে জানিয়ো— কত তৃপ্তি পেয়েছি। কোনো একদিন সাক্ষাৎ যদি হয় মুখে জানাব।

দাদা

৬৮

[ডিসেম্বর ?, ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার ব্যাকুলতায় আমাকে বড়ো ব্যথা দেয়। তোমাকে ক্ষমা করব না কেন? কোনো অপরাধ তোমার মধ্যে নেই। তোমাকে আমি গভীরভাবেই স্নেহ করি— সেই স্নেহে আঘাত কখনোই পাই নে। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে যদি পারতুম খুসি হতুম— কি করতে পারি বলো। বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা দিয়েচ— এই তোমার দান আমার মনে বড়ো বাজচে। তুমি একটুও কষ্ট করে নিজেকে বঞ্চিত করে আমাকে কিছু দাও এ কি আমার ভালো লাগে? তোমার ত্যাগের ইচ্ছাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ফিরে পাঠিয়ে তোমাকে আঘাত করতে চাই নে। কিন্তু আর একদিন এসে তুমি আপনিই ফিরে নিয়ে যেয়ো।

দাদা

৬৯

৬ জানুয়ারি ১৯৩২

কল্যাণীয়াসু

ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত। এ কয়দিনের সম্মানের অভিঘাতে অভিভূত।

তুমি গৃহের ও সম্প্রদায়ের কঠোর বন্ধনে শৃঙ্খলিত। এ রকম

বন্দিদশা আমার অভিজ্ঞতার বাহিরে। কৃত্রিম ও সঙ্কীর্ণ নিয়মের নাগপাশে মানবাত্মাকে এমন করে সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করাকে আমি অধর্ম্ম বলেই জানি। এ বন্ধনকে তুমি যখন নিজেই স্বীকার করে নিয়েছ, এ'কেই তুমি যখন মুক্তি বলে কল্পনা কর তখন উপায় নেই। এ অবস্থায় বন্ধনে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেওয়াতেই তুমি আরাম পাবে। যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ দ্বিধার টানাটানিতে তোমাকে বেশি দুঃখ দেবে।

আমার প্রকৃতি অত্যন্ত নিরাসক্ত। আমার মধ্যে স্নেহ প্রেম ভক্তির প্রবলতা নেই তা নয় কিন্তু তা আমাকে বাঁধে না। আমার নেশা নেই। সমস্তই আমি সহজে স্বীকার করি। আমাকে কিছুতে ক্ষুব্ধ করবে এমন কথা তুমি কখনোই মনে কোরো না। আমি নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র। আমি যাকে যা দিই তার থেকে নিজের জন্য কোনো অংশ ফিরিয়ে নিই নে। কিছুতে তোমাকে আমি ভুল বুঝব এমন আশঙ্কা নেই। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৭০

[জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার স্নেহমধুর ভক্তি আমার অন্তঃকরণকে স্নিগ্ধ করে। হৃদয়ের এই মাধুর্য্যই তো সেবা— কর্ম্মের সেবা এরই অনুবর্ত্তী-মাত্র— সেই প্রত্যক্ষ সেবা না হলেও চলে। তুমি দূরে থাক বা

নিকটে থাক, পত্র লেখ বা না লেখ তাতে তোমার পরে আমার স্নেহ বা বিশ্বাস ক্ষীণ হবে না এ কথা নিশ্চিত জেনো। অকারণ সংশয়ে তুমি নিজেকে পীড়া দিয়ো না।

কিছুকাল ডাকঘরের আয়বৃদ্ধি করব না— যদি চিঠি লিখি সে পোস্ট্‌কার্ডে। দুর্গ্রহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ইতি

দাদা

৭১

[জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর এখনো দুর্ব্বল।

তোমার সমস্ত অন্তরের তৃপ্তি দেবার মতো আমার শক্তি নেই— যদি থাকত খুসি হতুম। তুমি যে-সুধার পিয়াসী সে সুধা তোমার স্মৃতিতেই রয়েছে— আর কোথাও পাবে না। বর্ত্তমানের সঙ্গে তোমার অতীতের দ্বন্দ্ব বেধে গিয়ে তোমাকে এত কষ্ট দিচ্চে।

মহাত্মাজির পত্র পেয়েছি। মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

দাদা

৭২

[জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ পোষ্ট আপিস

Khardah

কল্যাণীয়াসু

মিষ্টান্ন পেয়ে পরিতুষ্ট হলুম। গঙ্গাতীরে আশ্রয় নিয়েছি। নির্জ্জনে শান্তিতে আছি। বোধ হয় শরীরও সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে— যদিও বল পাওয়ার আশা রাখি নে। ইতি

দাদা

৭৩

২১ জানুয়ারি ১৯৩২

ওঁ খড়দহ

কল্যাণীয়াসু

চুপচাপ করে আছি এখানে। জায়গাটি ভালো, বাড়িটি মস্ত— ভূতের বসতি বলে অপবাদ আছে।— সেই ভূত আমাদের উপকার করেছে— বাড়ির ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া সে যে আমাদের সহবাসী এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জ্যোতি বাচস্পতি কৃত আমার বর্ষফল পাওয়া গেছে। তাকে পারিশ্রমিক পাঁচ টাকা দিতে বলেছিলে— পাঠিয়ে দেব।

যথাসম্ভব সমস্ত কর্ম্ম থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে আলস্যচর্চ্চা করচি। প্রয়োজন ছিল। মনের শক্তি ম্লান হয়ে এসেচে—

তাই কর্ম্মে রুচি নেই। কিন্তু সংসারের দাবী কমে নি। দূরাগত আগন্তুকেরও দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সম্পাদকদেরও দর্শন মেলে।

মনে তুমি শান্তি ও শক্তি পাও এই আমি একান্তমনে কামনা করি। ইতি ২১ জানুয়ারি ১৯৩২

দাদা

বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো

৭৪

[খড়দহ] ২৩ জানুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মিষ্টান্ন পেয়েছি— সকলে মিলে তার সমাদর চল্‌চে।

তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। সঞ্চয়িতা এখনো বেরোলো না— ভুল সংশোধন করতে গিয়ে দেরি হোলো— বেরোলে একখানা পাঠিয়ে দেব— কোন্ ঠিকানায় পাঠাতে হবে জানিয়ে দিয়ো।

সকল রকম কর্ম্মবিমুখ চিত্ত নিয়ে একটা লম্বা চৌকিতে পড়ে দিন কাটাই। গঙ্গার ধারের দিকে প্রশস্ত একটা বারান্দা আছে সকাল বেলাটা সেইখানে আমার আশ্রয়। পশ্চিমতীরে বাড়ি বলে রৌদ্র ক্রমে প্রখর হয়ে আক্রমণ করে— তখন ঘরে ঢুক্‌তে হয়। শুয়ে শুয়ে কখনো কখনো আপন মনে কবিতা

লিখি। গদ্য লেখার মতো শক্তি ও উৎসাহ নেই। লোক যে একেবারে আসে না তা নয়— কলকাতা থেকে দর্শনার্থীর সমাগম হয়— তা ছাড়া প্রতিবেশীও আছে।

সন্ধ্যাবেলায় বাতাস নিস্তব্ধ হয়, তখন মশকের পালা। কলকাতার কীটগুলোর চেয়ে তাদের ক্ষুধা ও অধ্যবসায় বেশি— বোধ হয় গঙ্গার হাওয়ায়।

তোমার খাদ্যবাহন পাত্রটাকে ফিরে পাঠাচ্চি। ইতি ২৩ জানুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৭৫

[খড়দহ] ২৪-২৫ জানুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার প্রেরিত মিষ্টান্ন পেয়েছি এবং সম্ভোগ করচি।

তুমি আমার ব্যবহার-করা পাদুকা চেয়েছ— মনে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ হয়েচে তবু পাঠাই। ইতি ১০ মাঘ ১৩৩৮

দাদা

যদি খড়দহে তোমাদের তীর্থ সন্দর্শনে আসতে পার ত খুসি হব। এখানে গঙ্গার ধারে আমার এই বাসাখানি নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। কাল বিমল এসেছিলেন— কিন্তু ঠিক সেই

সময়ে খুব ভিড় জমে গেল। তোমাদেরই আত্মীয় সুসঙ্গের সুহৃদ ও তাঁর স্ত্রী তা ছাড়া অমল ও তার পরিজনবর্গ এসে উপস্থিত। বউমা ছিলেন না। এই গোলেমালে বিমলের সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হোলো না। এখানে রাস্তা এত ভালো যে টায়ার ফাটার আশঙ্কা নেই। আমরা থাকি ঠিক শ্যামসুন্দর ঘাটের পাশেই।

আজ মাঘোৎসবে জোড়াসাঁকোয় যাচ্চি। ফিরতে হয় তো রাত হবে।

যদি সুবিধা হয় তো এসো— এখানে চারিদিক শ্যামল, নির্ম্মল আকাশ ও অনাবিল সহজ অবকাশ। ১১ মাঘ ১৩৩৮

দাদা

৭৬

[খড়দহ। জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ বৃহস্পতিবার

কল্যাণীয়াসু

আগামী কাল শান্তিনিকেতনে যাবার ব্যবস্থা করচি। অল্প কয়দিনের জন্যে। যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব। এখানে শরীর ভালো থাকে। তার পরে যদি কোনো একদিন এখানে আসা সহজে সম্ভবপর হয় তবে চেষ্টা কোরো।

দাদা

৭৭

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

গত সোমবারে বোলপুরে যাবার কথা ছিল। বাধা পড়ে গেল। বুধবারে যাব।

এতদিন তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেচি। কিন্তু আমি যে জাতে তার্কিক নই দলিলসমেত তার প্রমাণ করে দেবার জন্যে সঞ্চয়িতা এক খণ্ড তোমার কাছে পাঠালুম। সংসারে তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন আছে, যেমন এই ধরাধামে পদক্ষেপ করে না চল্‌লে চলে না। কিন্তু মানুষের পিঠে পাখা নেই বটে মনে আছে। সে ওড়ার সুখেই উড়তে চায় অর্থাৎ সে প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। কবিতায় যে সঙ্গীত আছে, তার মধ্যেই আছে মুক্তিআকাশে পক্ষচালনের ছন্দ। সঙ্গীতের সুরে অর্থশাস্ত্রের সমস্যা আলোচন ও সমাধান করা চাই এমন কথা আজকাল কেউ কেউ বলে থাকেন। তাঁরা লোকহিতৈষী, তাঁদের কাছে সঙ্গীতটা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন মুক্তির কথা বলেন তখন তিনি বন্ধন ছেদনের পরামর্শ দেন— কিন্তু কাব্যে বন্ধনকেই অবন্ধিত করে— রূপকে ত্যাগ করে না, তার অরূপতাকে উদ্ভাবিত করে। সুন্দরের বাঁশির সুরে টানে বিশ্বের দিকে, কিন্তু টেনে বাঁধে না— টেনে নিয়ে চলে অসীমে, ক্ষণিকের দীনতা থেকে অনির্ব্বচনীয়ের পূর্ণতায়। তখন অপরূপকে ভালোবাসি, নিজেকেই ভালবাসবার নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ পাই।

বদ্ধপ্রাচীর ঘরের চারিদিকে যেমন বাগান, সাহিত্য তেমনি সংসারক্ষেত্রের সংলগ্ন করেই আনন্দের মুক্তিক্ষেত্র রচনা করে। যে পরিমাণে তা সত্য হয় সেই পরিমাণেই সাহিত্যের নিত্যতা।

আজ আর সময় নেই। ইতি ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৭৮

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

যে বেদনায় এত করে তোমাকে অশান্ত করচে তোমার চিঠিতে তার প্রকাশ দেখে আমি ব্যথা পাই। তুমি বাতাসের সঙ্গে লড়াই করচ, তুমি নিজের হাতে গ্রন্থি রচনা করে তাই নিয়ে নিরন্তর টানাটানি করতে প্রবৃত্ত। স্বভাবের মধ্যে নিজে দ্বিধা ঘটিয়ে একটা দারুণ আবর্ত্ত সৃষ্টি করেচ। সহজ হও, প্রকৃতির সহজধারাকে যদি জবরদস্তি করে অবরুদ্ধ না করো তা হলে সে আপনিই আপন সমুদ্রপথ খুঁজে নেবে। মাটির বাধায় নদীর যাত্রাপথ বেঁকে বেঁকে যায় কিন্তু সে যদি পথের ভয়ে চলা বন্ধ না করে তাহলে তার স্রোতের প্রেরণা তাকে চরমেরই দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই চরম সম্বন্ধে যদি একটা কাল্পনিক ভূগোল-বৃত্তান্ত খাড়া করে তোলো তাহলে খাল-খোঁড়াখুড়ির আর অন্ত থাকে না, তাহলে বাহিরের বাঁধা দস্তুরের অবরোধে তোমার

আত্মপ্রকাশ পীড়িত হতে থাকবে। ভুবন ভরে আছে সৌন্দর্য্যসুধা, জীবনের মূলে আছে অমৃতরস, নানা কৃত্রিমতার ধাক্কার মধ্যে পড়ে আমরা যা পেয়েছি তাকেই পাই নে। যিনি আপন সৃষ্টিতে আনন্দরূপ বিস্তার করেচেন তাঁকে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করো ; কেন কেবলি ভাব তিনি জেলখানার কর্ত্তা, তাঁর অর্ডিনান্সের কালো উর্দ্দি-পরা পেয়াদাগুলো তোমার খুঁৎ ধরবার জন্যে কেবলি উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্চে। যে দেবতার রাজত্বে এত ভয়, এত সংশয়, যিনি মানুষের আত্মপীড়ন দিয়েই নিজের ট্যাক্সো আদায় করেন, যিনি ভোজের পূরো আয়োজন সাম্‌নে রেখে পিছন থেকে সেটা হরণ করতে কথায় কথায় শাস্ত্রবুলির দোহাই দিয়ে হাত বাড়ান তাঁর সম্বন্ধে আন্‌সিভিল ডিসোবীডিয়ান্সই তো বিধি। পৃথিবী জুড়ে তাঁর ভক্তদের হৃৎকম্প আর থাম্‌তে চায় না— তাদের এ রাস্তা বন্ধ, ও রাস্তা বন্ধ, এখানে অশুচিতা, ওখানে নিষেধ। এমন জগতে হতভাগাদের হাতকড়া দিয়ে বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে চাবুকের ব্যবস্থা করে সৃষ্টিকর্ত্তার এ কী নিষ্ঠুর খেলা! ইংরাজের দেশে ধনী লোকেরা একটা করে অরণ্য নিজের অধিকারে রাখে সেখানে সেই সীমানার মধ্যে বন্যজন্তু ছাড়া থাকে— তাদের আহার বিহারের বাধা নেই। সাধারণ লোকেরা তাদের শিকার করলে দণ্ড পায়, কারণ সেটা অবৈধ। কর্ত্তা তাদের স্বয়ং শিকার করবেন বলেই তাদের পালন করেন। আমরা কি সেই রকম শিকারের পশু। দেবতা অর্থহীন বিধিনিষেধে জর্জ্জর করে মারলে দোষ নেই— অথচ সে রকম নিষ্ঠুরতা মানুষ যদি করে তবে সেটা অবৈধ হয়। তাই যখন দেবতার নামে মানুষ নিজেকে

বঞ্চিত করে, শেলে শূলে বেঁধে, উপবাসে ক্লিষ্ট করে অকারণ বাধায় জীবনের পথ সঙ্কীর্ণ করে তখন তাঁর নামে কত বড় অপবাদ দেয় তা বুঝতেও পারে না, অথচ সেই অত্যাচার মানুষের পক্ষে কলঙ্ক। যে দেবতা বুদ্ধির দোহাই মানেন না দয়ার দোহাইও না তাঁকে যে মানুষ ভয়ে ভয়ে মানে সে নিজেকে অমানুষ করে। সে দেবতা নেই, মানুষই নিজের প্রবৃত্তিকে মুখোষ পরিয়ে দেবতা তৈরি করেচে, তার পরে মানুষই মরে তার হাতে। আমি বোধ হয় ১৫ই তারিখে কলকাতায় যাব— থাকব এবার চৌরঙ্গি আর্ট স্কুলে, প্রিন্সিপাল মুকুলচন্দ্র দের আতিথ্যে। ইতি ২৯ মাঘ ১৩৩৮

দাদা

৭৯

[২৮ চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা]

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

কল্যাণীয়াসু

ছবির একজিবিশনে চৌরঙ্গী আর্ট স্কুলেই আছি। শরীর দুর্ব্বল আছে। শ্রীমান বিমলাকান্তকে যদি এখানে পাঠাতে পার খুসি হব— সে আমার ছবিও দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে বাসন্তীর আসা যদি সম্ভব হতে পারে তাহলে কথাই নেই। ইতি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৮০

[কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী শনিবারে বেলা দুটো তিনটে থেকে সন্ধ্যা আটটা নটা পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোয় থাকব। ইতিমধ্যে ছবির তদারকে আমাকে এখানে থাকতে হচ্চে। এ জায়গাটি খুব সুন্দর— একটি বড়ো পুকুর, বড়ো বড়ো গাছ, চাঁপা ফুলের গন্ধ, আর নিরন্তর পাখীর ডাকে কলকাতার সমস্ত অপরাধ চাপা দিয়ে রেখেচে। সহরের পাথুরে রাস্তা বেয়ে এইখানে এসে বসন্ত ঋতু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেচে, আমিও ঋতুরাজের সহচর। ইতি

দাদা

৮১

[শান্তিনিকেতন *] ১৪ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দিনের অনেকটা অংশ ব্যস্ত থাকি বাকি অংশ থাকি ক্লান্ত। তাই চিঠি লেখা ঘটে না। আজকাল ডাকঘরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় বন্ধ। নিজের পদবীগুলোকে মনেও রাখি নে, অন্য কেউ রাখে এমন ইচ্ছাও হয় না। ভারমুক্ত মনে সহজ চালে চল্‌তে ইচ্ছা করি। উপাধির বোঝা নিয়ে সর্ব্বত্র প্রবেশ চলে না।

আমি কবি, সেই জোরে সকলের বন্ধু, সকলের সমক্ষেত্রে আমার বিচরণ।— পারস্যে রওনা হব ৪ এপ্রেলে। এখান থেকে বেরোব মার্চ মাসের শেষ দিকে। দিন সাত আট কলকাতা অঞ্চলে অবস্থিতি। সম্ভবত খড়দহে। ইতি ৩০ ফাল্গুন[১] ১৩৩৮

দাদা

৮২

[মার্চ-এপ্রিল ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

পারস্যের পথে কলকাতায় এসেচি। হয় তো কাল পরশুর মধ্যেই কয়েক দিনের জন্যে খড়দহে গিয়ে আশ্রয় নেব। যদি দেখা করতে আসার বাধা না থাকে এসো কিন্তু নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। একটা কথা নিশ্চয় মনে রেখো মানুষকে আমি সহজ ভাবে বুঝি, সেই জন্যে আমি কোনো কারণেই অবিচার করি নে। দুঃখ দেখলে দুঃখ পাই কিন্তু কৃত্রিম আইন মিলিয়ে অপরাধী করি নে। ইতি বুধবার

দাদা

---

[১] বস্তুতঃ ১ চৈত্র। ২৯ দিনে ফাল্গুন সমাপ্ত।

৮৩

৯ এপ্রিল ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি উদ্বেগ আশঙ্কার জালে নিজেকে অত্যন্ত বিজড়িত করে সর্ব্বদাই পীড়িত হয়ে আছ। ভয় যার নিজের মধ্যেই বাইরে সে ভয়কে সৃষ্টি করে। এমন করে আত্মপীড়নের কারান্ধকারে তুমি কেমন করে বাঁচবে। এমন কি ধর্ম্মের নামে যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করা কর্ত্তব্য মনে করে এবং সেই কর্ত্তব্যকল্পনার দ্বারা বিধাতাকেই খর্ব্ব করতে কুণ্ঠিত হয় না তাদের কাছেও তুমি সঙ্কুচিত। কেন তুমি তোমার মনুষ্যত্বের অধিকারের উপর দৃঢ় হয়ে সগৌরবে দাঁড়াতে পার না ?

আমি পরশু সোমবার প্রত্যুষে আকাশপথে যাত্রা করব—চেষ্টা করব এক মাসের মধ্যে যাতে ফেরা হয়। নিশ্চিত বলতে পারি নে।

বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো আর বিমলাকে।

... ...সুহৃদ শ্রেণীভুক্ত করে জানি নে। এই জন্যে তাঁকে স্বাক্ষরিত করে আমার বই উপহার দেওয়া চলবে না। জনতা থেকে সরবার দিন আমার এসেচে— জনতা আর বৃথা বাড়াতে ইচ্ছে করি নে। তোমার ছেলে মেয়ে ছাড়া তোমার অন্য সুহৃদ্বর্গকে স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। আমার শঙ্কা হয় তারা তোমার ক্ষতি করতেও পারে। ইতি ৯ এপ্রেল ১৯৩২

দাদা

৮৪

[৩ জুন ১৯৩২]

ওঁ

শ্রীপতির চিঠি পেয়েছি·—
বোলো আর একটু সুস্থ হয়ে
খবর নেব।

কল্যাণীয়াসু

বিদেশ থেকে সম্মান নিয়ে এসেছি। দেশে এসে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ধরল। দুর্ব্বলতায় ভারাক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছি—নীলরতন বাবু দেখচেন। তোমার চিঠি ও আম পেয়ে খুসি হয়েছি। তোমার মন যে পন্থায় চিরাভ্যস্ত, সেই পন্থায় তুমি শান্তি ও স্থিতি লাভ করো এই আমি কামনা করি। আমি যে পন্থায় দাঁড়িয়েছি সে পন্থায় সুখশান্তি খোঁজবার অবকাশ আমার নেই, শেষ পর্য্যন্ত হুকুম মেনে চল্‌তে হবে। আমার জন্যে না আছে ঘরের কোণ, না আছে স্বজনের সেবা, আমাকে ঘুরতে হবে সর্ব্বজনের জনতায়। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ [১৩৩৯]

দাদা

ও পৃষ্ঠা বাসন্তীর জন্যে —

৮৫

[খড়দহ *] ৭ জুন ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করব। সেখানে আশা করচি সুস্থ হতে পারব। অনেক কাজ এবং অনেক চিন্তার বিষয় জমেচে, নিষ্কৃতি পেতে দেরি হবে। অমিয় এখনো এসে পৌঁছন নি সেই জন্যে আমার কর্ম্মের বোঝা কিছুদিন পর্য্যন্ত যথেষ্ট ভারি হয়ে থাকবে। ইতি ৭ জুন ১৯৩২

দাদা

৮৬

[শান্তিনিকেতন * ১০ জুন ১৯৩২]

১১ জুন ১৯৩২ ?

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার বিশ্বাস আমার সব চিঠি তোমার হাতে পৌঁছয় নি। তখন চিঠিগুলির নকল রেখেছিল ধীরেন সেন। তাই অবলম্বন করে প্রবাসীতে পত্রধারা বেরিয়েচে— তুমি কোন্‌গুলি পাও নি তা আমি জানিও নে। এখানে ঘন ঘোর মেঘ, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও চলেছে— জয়দেবের দেশে মেঘমেদুর বর্ষাকাল রমণীয়। এখানে এসে শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। এখনো গ্রীষ্মের ছুটি ফুরোয় নি তাই কিছু পরিমাণে বিশ্রামের অবকাশ আছে।

কিন্তু পারস্যভ্রমণ লেখায় সেই অবকাশটুকু সম্পূর্ণ হরণ করেছে। আজকাল লিখ্‌তে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। সমস্ত পৃথিবী-জোড়া দুঃসময়ের ছায়া আমাদের সকলেরই ভাগ্যকে নিরালোক করে তুল্‌চে— তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু অন্তরাত্মা তো আমাদের নিজের হাতে। বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ [১৩৩৯]

দাদা

৮৭

২২ জুলাই ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। দুরবস্থাগ্রস্ত শরীর মন নিয়ে কর্ম্মসংক্ষেপ করবার চেষ্টা করি কিন্তু কর্ম্ম বেড়েই চলে।

চিঠিতে তুমি যে আশ্রমের বর্ণনা করেছ তার মধ্যে রসের যে উদ্ভাবনা আছে আমার কল্পনাকে তা যে স্পর্শ করে না এমন কথা মনে কোরো না। কিন্তু মানবসংসারের সমস্ত দায়িত্বকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখে বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্ধ করে নিরন্তর ভাবরস-সম্ভোগে আত্মবিস্মৃত হওয়ার মধ্যে যতই সুখ বা শান্তি থাক, তাকে আমি কোনোমতেই শ্রেয় বলে মনে করতে পারি নে। এই ধর্ম্মবিলাসিতায় আমাদের দেশকে মর্ম্মে মর্ম্মে মেরেছে। সম্প্রতি নবজাগ্রত পারস্য ও আরব্যকে দেখে এসেছি, পূর্ব্বে

দেখেছি জাপানকে, তারা ধর্ম্মমোহ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই রাষ্ট্রীয় মুক্তি পাবার অধিকারী হয়েছে— হতভাগ্য ভারতবর্ষ এই মোহের কুহেলিকায় আবৃত— সে অন্ধ, সে পঙ্গু, সে আপনার দেবতাকে নিয়ে খেলা করচে সেই অপরাধে দেবতা তাকে সকল প্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করচেন অপমানের আর অন্ত নেই। তবু কর্ত্তব্যবিমুখ মূঢ় ভক্তি নিয়ে ঠাকুরঘরের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাকেই যারা পরমার্থ বলে জানে— তারা যে কত বড়ো অকৃতার্থ তা বোঝবার শক্তিও তাদের নেই কেননা তারা ভাবমদে অপ্রকৃতিস্থ।

কঠিন দুঃখের দিন এসেছে কিন্তু নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাই নে— কণ্টকিত পথের উপর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজের লক্ষ্য অভিমুখে চল্‌তে হবে। এক এক সময়ে ক্লান্তি আসে, তখন পালাতে ইচ্ছা করে যেমন করে একদিন ইস্কুল পালাতুম। তখন আবার ধিক্কার আসে মনে, লজ্জা পাই। ইস্কুলমাস্টার তো নেই, নিজেকেই নিজে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিই। অতএব ফাঁকি দেব কাকে, পশ্চাতে নিজের চৌকিদার নিজেই আছি। মনকে এক একবার বোঝাতে চাই, কর্ম্ম আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে কাব্য। কিন্তু মন যে বোকা নয়, তাকে কথায় ভোলানো শক্ত। অতএব শেষ পর্য্যন্তই আছে খাটুনি। চিঠি বেশি লিখব এমন আশঙ্কা কোরো না— তুমিও তো নিষ্কৃতি নিয়েছ। ইতি ৬ শ্রাবণ ১৩৩৯

দাদা

৮৮

২৮ জুলাই ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ভারতবর্ষে দ্রাবিড়জাতীয়দের সমাজ মাতৃতন্ত্র, অর্থাৎ সে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য। এটা যে হতে পেরেছে তার প্রধান কারণ, তাদের ভাবপ্রবল স্বভাব। সর্ব্বদা ভাবরসে তাদের মন আর্দ্র। যাদের এই রকমের প্রকৃতি নিজের মধ্যে এই ভাবরসকে উদ্বেল করে তোলাই তাদের ধর্ম্মসাধনার চরম লক্ষ্য। তারা আপন হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থতা দেবার জন্যেই নিজের দেবতাকে ব্যবহার করে। এই রসোন্মত্ততায় বিশ্বসংসারকে ভুলে থাকাকেই তারা ধার্ম্মিকতা বলে মনে করে। এই পানগোষ্ঠীর বাইরে তাদের পক্ষে সমস্তই অশুচি, সমস্তই পরিত্যাজ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন তৈরি হয়েছিল, এ ভুল করেছিল কে? ভোজ্যআয়োজনে নিরন্তর ব্যাপৃত, ধূপে দীপে মাল্যে মণ্ডিত, কীর্ত্তনে ভজনে নিত্য মুখরিত, আত্মবিস্মৃত এই এক একটি সঙ্কীর্ণ রসমণ্ডলীর বাইরে যে বিপুল সংসার পড়ে আছে, ভক্তিভাবাকুলদের পক্ষে সেখানে যেন দেবতার অরাজকতা,— সেখানে বিশ্ববিধাতার কোনো দাবী নেই, কোনো আহ্বান নেই। এইরকম মনোভাবটি মেয়েলি — সেই চিত্তবৃত্তির মধ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য নেই, বুদ্ধির সর্ব্বদা গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা। এই প্রেমভক্তি নিজের মধ্যেই নিজে আবর্ত্তিত। এ'কে স্বার্থপরতা যদি বা না বলি তবু এ'কে বলা যায় আত্মপরতা। বাঙালী অনেক অংশে দ্রাবিড়, এই জন্যে

তার এত বেশি ভাবাকুলতা। বাঙালী অত্যন্ত বেশি মেয়েলি। তার মানসক্ষেত্রের এই অতিরিক্ত আর্দ্রতা যদি না ঘোচে তাহলে সে ভাবোদ্বেগে মরীয়া হতে পারবে কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। একদিকে তার আছে কোনো একটা সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রকে ঘিরে ভাবাবিষ্ট অন্ধ আত্মনিবেদন, আর একদিকে নিজের চক্রের বাইরে ঈর্ষা বিদ্বেষ কলহপরতা। কী জানি আমার প্রকৃতির কাছে এই মাতামাতি, এই হৃদয়াবেগে আবর্ত্তিত বিচিত্র নিরর্থকতা একান্ত অরুচিকর। অন্তত পুরুষের পক্ষে এটা একান্ত অমর্য্যাদাকর এবং দেশের পক্ষে এটা সাংঘাতিক দুর্ব্বলতাজনক বলে মনে হয়। ভারতবর্ষে একরকম সন্ন্যাসী আছে যারা শুষ্কতার মরুভূমির মধ্যে নিরুদ্দেশ, আর একরকম ভক্ত বৈরাগী আছে যারা সিক্ততার তারল্যের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। এদের কাছে যারা দীক্ষা নিচ্চে মানুষের বিধাতা তাদের হারালেন। তবে তারা মানুষের ঘরে জন্মালো কেন? মানুষের কাছে জ্ঞানে ভাবে ভোগে তাদের যে অপরিসীম ঋণ তার কী শোধ করলে? আমি তো বলি, থাক্ ভক্তি থাক্ পূজা, মানুষের সেবায় দেবতার যথার্থ প্রসন্নতা যেন লাভ করি।

আমার এমনি স্বভাব যে প্রথম থেকেই তোমাকে কেবল পীড়া দিচ্চি। ধর্ম্মকে অবলম্বন করে রসসম্ভোগ করাকেই তুমি যদি চরম শ্লাঘনীয় না বলতে তাহলে আমি চুপ করে থাকতুম। কিন্তু তুমি যে তোমার পূজার উপলক্ষ্য করে আমার মানব-দেবতাকে উপেক্ষা করতে চাও, তার মধ্যে কাল্পনিক অশুচিতা মূঢ়ভাবে আরোপ করে তাকে অবমানিত করতে চাও সে আমি

সহ্য করতে পারি নে। তুমি আমাকে অনুনয় করে বলেছ দেবতাকে আমি যেন অবজ্ঞা না করি— কেন করব অবজ্ঞা— যে জীবনবেদীতে তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠা, যেখান থেকে তিনি আমাদের কঠোর তপস্যা ও আত্মত্যাগ চান সেখানেই তাঁকে আমার সমস্ত সম্মান দিতে চাই— পারি নে বলেই আমার দুঃখ। আশা করি আমার সাধনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নি।

চিঠি লিখতে পারব না বলেও লিখ্‌তে হোলো। কাজ ফেলেই লিখেচি। তোমাকে স্নেহ করেই লিখি। তবুও লেখা সংক্ষেপ করতে হবে।

মীরার চিঠি পথ থেকে পেয়েছি। এতদিনে তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে— খবর পাবার সময় হয় নি।

বিমলাকে বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ১২ই শ্রাবণ ১৩৩৯

দাদা

৮৯

[শান্তিনিকেতন] ৪ অগস্ট্‌ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী শনিবারে কলকাতায় যেতে হবে কিছুদিন থাকাও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের বাড়ি এসে আমার সঙ্গে দেখা করা তোমার পক্ষে অসাধ্য বলে লিখেচ। আমিও তার প্রত্যাশা

করি নি, সুতরাং তুমি কুণ্ঠিত হোয়ো না। কিন্তু অসাধ্যতার অন্যতম কারণ তোমার পারমার্থিক ক্ষতি এ কথা শুনে চিন্তিত হলুম। পরমার্থ শব্দের অর্থ আমি যতদূর জানি তাতে এই বুঝেছি যে ওটা স্বার্থ ও সমাজবিধির উপরে। যাঁরা পরমার্থ সাধন করেন তাঁদের কাছে স্বার্থ নেই সামাজিক বিধি বিধান নেই। কোনো মানুষকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন না ঘৃণা করেন না অস্পৃশ্য বলে বর্জ্জন করেন না। তাঁদের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাধনার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র কৃত্রিম প্রাচীরে ঘেরা নয়। তাঁরা নির্বিচারে সকল মানুষের আপন। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। তোমার পরমার্থ ছোঁওয়া খাওয়া নিয়ে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের জাতবিচার নিয়ে। তুমি সর্ব্বদাই যে হিন্দুয়ানির কথা বলে থাকো সেই হিন্দুর অধ্যাত্মশাস্ত্রেও পরমার্থ শব্দের এমন কোনো ব্যাখ্যা শুনি নি যাতে জোড়াসাঁকোর দেউড়িতে এসে তাকে ঠোকর খেয়ে পড়তে হয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে শাস্ত্রবিহিত আচারের ব্যত্যয় সত্ত্বেও পারমার্থিক উৎকর্ষ লাভ করেছেন এমন সাধককে আমরা জানি। তার পরে প্রাচীন কালের কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, তপোবনে ভোজ্য সম্বন্ধে ঋষিদের যে রুচি ছিল তৎসত্ত্বেও তখনকার কালে যদি পরমার্থসাধন সম্ভব হোত তবে এখন হবে না কেন? কালের গায়ে তো জাতের ছোঁয়াচ লাগে না। ভবভূতির উত্তরচরিতে তপোবনের আহার্য্যের উল্লেখ আছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষে আরো অনেক দেশ আছে। যে দেবতাকে আমরা ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণদের আঁচলধরা করে শুচি করে রেখেছি, আশা করি সেই

সব দেশও এই দেবতারই সৃষ্টি। সে সব দেশেও এমন সকল ভক্ত ও সাধকদের জন্ম হয়েছে স্মৃতিরত্নরা যাঁদের পায়ের ধূলো নেবারও যোগ্য নন। আজ তোমার ঘরে তাঁরা প্রবেশ করলে তোমার ঘর গোবর গঙ্গাজল দিয়ে তুমি শোধন করে নিতে, কিন্তু তাই বলেই তুমি তাঁদের চেয়ে শুচিতর যেহেতু তুমি ছুঁৎমার্গে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছ, পরমার্থের খাতিরে এমন অহঙ্কার মনে পালন কোরো না। পৃথিবী সেই সব ম্লেচ্ছদের পদক্ষেপে পবিত্র হয়েছে, তাঁদের চরিত স্মরণ করলে অনুসরণ করলে পরমার্থের পথ বাধাহীন হয়। যথার্থ পরমার্থের আদর্শে বিচার করলে আমি অশুচি তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ এ নয় যে আমি খাওয়া ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলি নে— তার কারণ আমার মন নিষ্পাপ নয়। দিনে দশবার গঙ্গাস্নান করে সকল প্রকার শকড়ি বাঁচিয়ে আতপ তণ্ডুল খেলেও আমি অশুচি। কিন্তু তবু বিধাতা আমাকে ত্যাগ করেন নি, মানুষও যে করবে এমন অমানুষিকতা আমি প্রত্যাশা করি নে। তুমি যেসব অতিসাবধানী সাধকদের কথা লেখো, বিশ্ববিধাতার অধিকাংশ সৃষ্টি যাঁদের কাছে বর্জ্জনীয়, তাঁরা বিশ্বদেবকেও অশুচি বলে জেনেছেন ও সেইভাবে ব্যবহার করেছেন এতবড়ো পারমার্থিক অশুচিতা কিছু কি কল্পনা করা যেতে পারে।

আমার সময় নেই অথচ এসব প্রশ্ন উঠ্‌লে চুপ করে থাকা আমি অকর্ত্তব্য বলে মনে করি। তোমাকে পীড়া দিতে দুঃখ পাই তবুও সত্যের অপমান চুপ করে স্বীকার করতে পারি নে।

তীর্থসংস্কার সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছ তা আমি মানি। কিন্তু

দেশের লোকের অন্তরে যে তামসিকতা যে মলিনতা আছে তীর্থে তাই ব্যক্ত না হয়ে থাকতে পারে না। আমরা সংস্কার মানি সত্যকে মানিনে বলেই সর্ব্বত্র এত বাহ্য আচার এবং আন্তরিক নোংরামি। আমাদের পৌরুষহীন কর্ম্মহীন ভাবরসাবেশে সর্ব্বদা বাষ্পাচ্ছন্ন ভক্তি কেবল আপনার ভাববিলাসিতাপরিতৃপ্তির জন্যে নিজেকে বিহ্বল করেছে, সে মানুষকে চেয়ে দেখে না, ঠেকিয়ে রাখে; মানুষের মূঢ়তা মলিনতা দূর করবে কি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অশ্রুবর্ষণ করে। নিজের শুচিতারক্ষার আগ্রহে তারা যদি মানুষকে দূরে রাখে তবে সেই সব মানুষের কলঙ্কগুলো জমে উঠ্‌বে না কেন? যখন তা চোখে পড়ে তখন তারা নিজের পবিত্রতাবোধের খাতিরেই নাসাকুঞ্চন করে কিন্তু সেই সব মানুষের পরিত্রাণের কথা ভাবে কি?

আমার আর সময় নেই। ইতি ৪ অগষ্ট ১৯৩২

দাদা

৯০

[৫ অগস্ট্ ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু মনে কোরো না। আমরা কবিরা খামখেয়ালি মেজাজের মানুষ— হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠি কিন্তু সেটা অত্যন্ত অস্থায়ী। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি সেটা আমার একটুও ভালো

লাগচে না। যদি সান্ত্বনা দেবার শক্তি থাকত তো দিতুম। তুমি নিশ্চয় জেনো আমি যদি তোমার প্রতি নির্দ্দয়তা করে থাকি সেটা বিবেচনা না করে ঝোঁকের মাথায়। এই আঘাত এখন আমাকে ফিরে লাগচে।

কাল সন্ধের সময় ইউনিভর্সিটি থেকে নিমন্ত্রণ সেরে বরানগরে মহলানবিশদের বাড়িতে যাব দুই তিন ['দিন'] থাকব। তার পরে ১১ই অগষ্ট তারিখে জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসব। বোধ হয় ১৩ই চলে যাব শান্তিনিকেতনে।

তোমার মন থেকে বেদনা দূর হয়েচে জানলে আমি নিরুদ্বিগ্ন হব।

দাদা

৯১

৩১ অগস্ট ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন চিঠি লিখিনি। শরীর মন ও সংসারের উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত গেছে। সে জন্যে বিলাপ পরিতাপ করা আমার অভ্যাস নয়, করিও নি। কিন্তু সাধারণত, মনকে বাইরের নানা কর্ত্তব্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করতে এখন আর একটুও ইচ্ছা করে না। যে কর্ম্মসাধনার মধ্যে অনেকদিন মন কেন্দ্রীভূত তাকে কোনো কারণেই বর্জ্জন করা দুর্ব্বলতা এবং সেটা লজ্জাজনক— তার মধ্যে নিবিষ্ট থাকতে হয়েচে, অথচ তার সঙ্গে

নিঃসংসক্ত আছি। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে তার কোনো অভাব কল্পনা কোরো না। নানা মতামত নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেচি, সেও তোমাকে স্নেহ করি বলেই। তোমার চিঠি থেকে আমার দেশের অনেক কথা জানতে পেরেচি— তার কোনো অংশ সুন্দর, কোনো অংশ নিরালোক এবং অনার্য্য— সেটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সম্ভব নয় উচিতও নয়। সেই জন্যে তা নিয়ে আলোচনা করেচি, তোমাকে দলে টানবার জন্যে নয় কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে। আঘাত অনেক পেয়েছ, সে আমার ভালো লাগেনি। এ সব তর্ক এখানেই শেষ হোলো। ক্লান্ত লেখনীকে আর খাটিয়ে মারতে ইচ্ছা করে না। আমার সঙ্গে কোনো ব্যবহার করার মধ্যে ঐহিক ও পারত্রিক সঙ্কোচের কারণ তোমার মনে আছে। আমি তার উপলক্ষ্য হতে ইচ্ছা করি নে— তোমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করি বলেই। আমার চিন্তার, আমার সাধনার, আমার জীবনযাত্রার পথ তোমার থেকে অনেক দূরে। তুমি সম্পূর্ণ তাকে বুঝতে পারবে না। তা নিয়ে আক্ষেপ করা মূঢ়তা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুমি আমাকে যদি শ্রদ্ধা করতে পারো সে কম কথা নয়। পরলোকগত ত্রিবেদীমশায় আমার সেই রকম বন্ধু ছিলেন। আমার মতের জন্যে নয়, সকল তর্কবিতর্কের বহির্ভূত মনুষ্যত্বেরই জন্যে। সেই অকৃত্রিম মৈত্রীর স্বাদ আমি তাঁর প্রীতি থেকে অনুভব করেছিলুম। অতএব জানি সংসারে সেটা দুর্লভ হলেও অলভ্য নয়। তোমার ছেলেমেয়েকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ইতি ৩১ অগষ্ট ১৯৩২

দাদা

৯২

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হয়েচি। কিন্তু বড়ো চিঠি লেখবার মতো অবকাশ ও মনের স্বচ্ছন্দতা আমার এখন নেই। তাই সংক্ষেপে দু কথা লিখে দিচ্চি। "পরিশেষ" নামে একখানা কবিতার বই তোমাকে দু দিন হোলো পাঠিয়েছি, পেয়েছ বোধ হয়। তুমি পড়বে বা আলোচনা করবে বলে পাঠানো নয়, আমার স্নেহের দান বলে এ'কে তুমি গ্রহণ কোরো। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় যাব। আমাদের এখানকার সঙ্গীতবিভাগের ব্যয় বহনের মত কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েচে তাই গান ও অভিনয়ের সাহায্যে সঙ্কল্পসিদ্ধির আশা করচি।

তোমরা আমার সর্ব্বান্তঃকরণের শুভকামনা গ্রহণ করো। ইতি ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

দাদা

৯৩

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ হোমিয়োপ্যাথির ল্যাকেসিসের সঙ্গে বায়োকেমিক ওষুধের বিরোধ আছে কিনা। বায়োকেমিক পক্ষের নেই, কিন্তু হোমিয়োপ্যাথি অন্যপন্থী ওষুধের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। সেই কারণে, আমি বোধ করি যতদিন হোমিয়োপ্যাথি খাচ্চ ততদিন অন্য সব ওষুধ বন্ধ রাখাই ভালো।

... ...

... ... আমি চেষ্টা করি মনকে তার সম্বন্ধে সহজ করে রাখি। কারো প্রতি মনের মধ্যে বিরোধ জমিয়ে রাখতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি— আমি জানি সেটা আত্মাবমাননা। কিন্তু মানুষের অহমিকা প্রবল, সেখানে নিরন্তর আঘাত লাগ্‌লে মনকে শান্ত রাখা কঠিন, সেই জন্যে এই সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ থেকে মনকে সরিয়ে রেখে দিই। যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় সেটা এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায়ে জীবিকা ভালো চলে, বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্র বিদ্বেষ কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমার দেশে। আমার প্রতি আঘাত, আমাকে অবমাননা দেশের লোককে কতই কম বেদনা দেয়। তা যদি না হোত তাহলে আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হোত না। এটাকে জেনে নিয়ে শান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমাকে আঘাত করা দেশের লোকের পক্ষে এত

নির্ম্মমভাবে সহজ হয়েচে সেটা হয়তো আমার পক্ষে গৌরবেরই বিষয়। আমি সত্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি করেচি লোকের মনরক্ষার দিকে নয়। বিধাতা আমাকে যত প্রশ্রয় দিয়েচেন এমন অতি অল্প লোককেই দিয়েচেন, অতএব আমার পক্ষে নালিশ শোভা পায় না। এসব কথার আলোচনা ভালো নয়, এতে আত্মলাঘব ঘটে।

আমাকে তুমি যদি সর্ব্বদা জানবার অবকাশ পেতে তাহলে আমাকে কঠোরগম্ভীর মানুষ বলে ভয় করতে না, এবং পাছে আমি কিছু মনে করি বলে এত বেশি সাবধান হতে না। আমাকে দূর থেকে নানা লোকে নানা রকম মনে করে নেয়, তার একটা কারণ, আমার নানা অংশকে মিলিয়ে সমগ্র করে দেখবার অবকাশ সকলের ঘটে না। আর যাই হোক আমি ভয়ঙ্কর নই। ইতি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

দাদা

৯৪

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পড়ে বিস্মিত হলুম। এত অত্যন্ত উদ্বেজিত হবার কী কারণ ঘটেচে বুঝতে পারলুম না। তোমার সম্বন্ধে কোনো কঠোরতা কোনো নিষেধ আমার মনে নেই, আমার ভাষায় কি করে তা প্রকাশ পেতে পারে ভেবে পাচ্চি নে।

আমার সন্দেহ হয় তোমার শরীরের অস্বাস্থ্য তোমার মনকে বিকল করেচে। অথবা হয় তো তোমার প্রতিবেশীর ছোঁয়াচ লেগে থাকবে। সহজ সম্বন্ধের বিপর্য্যয় আমার জীবনে বারবার অকারণেই ঘটেচে— পুনশ্চ ঘটা অসম্ভব নয়। আমার এ বয়সে সে জন্য মনকে উদ্বিগ্ন করা কিছু নয়। স্বভাবতই আমার প্রতি তুমি যে রকম ব্যবহার রক্ষা করতে ইচ্ছা করো, তাই কোরো, যেখানে তোমার বাধা সেখানে টানাটানি কোরো না। যাই করো, আমার সম্বন্ধে কোনো কাল্পনিক অভিযোগ মনে পোষণ কোরো না। আমার মধ্যে এমন কিছু সুর থাক্‌তে পারে যেটা স্বতই তোমাকে পীড়ন করে, সেটা অবশ্যই দুঃখের কারণ, কিন্তু তা অনিবার্য্য। তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে বলেই সেটুকু স্বীকার করে নিয়েও ধৈর্য্য রক্ষা করা চলে। যাই হোক এ সকল কথা যুক্তির কথা নয়, অভিরুচির কথা, সুতরাং এ নিয়ে বোঝা-পড়ার চেষ্টা করা বৃথা। ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩৩৯

দাদা

৯৫

[২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

… … … সঙ্গে তোমাদের মেলামেশা আছে বলে আমি বিরক্তি বোধ করি এমন সন্দেহমাত্র আমার পক্ষে অগৌরবের কথা। তোমার পূর্ব্ব চিঠিতে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনা

দেখেই মনে করেছিলুম, আমার সম্বন্ধে লোকের অকারণ দ্রোহভাব পূর্ব্বেও বারম্বার দেখেছি আবার বুঝি তারই লক্ষণ দেখা গেল সেই কথাই বলেছিলুম। আমার বন্ধু ··· ··· ··· ··· ··· ···রও ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন কি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ··· ··· ··· ···কে তিনি আমার বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করতে সহায়তা করেন। ও তাতে আনন্দ বোধও করে থাকেন। সে জন্যে আমি যদি ··· ···র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করতুম— তা হলে তার চেয়ে লজ্জার কথা আমার পক্ষে কিছু হতে পারত না। ······ র সমাজমতের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আমি হিন্দুসমাজের শত্রু অতএব কঠিন শাস্তির যোগ্য— অতএব সেই শাস্তির ব্যবস্থা করা তিনি কর্ত্তব্য বলেই মনে করেন। শাস্তির প্রণালী ও রুচি সম্বন্ধে মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা দায়িক— সে সম্বন্ধেও আমার আদর্শের সঙ্গে তাঁদের মিল না থাকতে পারে কিন্তু তাই নিয়ে যদি আমি বিবাদ করতে পারি তবে সেইটেই যথার্থ গ্লানির বিষয় হোতো। ··· ··· কল্পনা করচেন তাঁর লেখনী দেশের লোকের মনে আমার বিরুদ্ধে স্থায়ী অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে। যদি তা যথার্থই সম্ভব হয় তবে সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বুঝে রাখা ভালো আমার দেশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। সেটাতে আমার যথার্থ কোনো লাঘবতা নেই। আমার রচনায় যদি কোনো গুণ থাকে সেটা ··· ··· বা আর কারো মতামতের উপর নির্ভর করে না সেটা আমি নিশ্চিত জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। এ কথাও আমি নিশ্চিত জানি যে

বলাকা পূরবী প্রভৃতি আমার আধুনিক রচনা ··· ··· যে সত্যই ভালোবাসেন না তা নয়— তিনি যে চক্রান্তের মধ্যে আছেন তাতে সহজ মনে আমার এখনকার কিছুই ভালো লাগবার আন্তরিক স্বাধীনতা নেই। আমি তা নিয়ে যদি রাগারাগি করি তবে সেইটেই আমার শাস্তি।

কলকাতায় শীঘ্র যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতি ৪ আশ্বিন [১৩৩৯]

দাদা

৯৬

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাদের তোমরা অন্ত্যজ বলো তাদের নির্ম্মল ও শুচি হবার উপদেশ দিতে আমাকে অনুরোধ করেচ। করতে পারি যদি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো যে অন্ত্যজাতীয় যারা ঠাকুরের দর্শন স্পর্শন ও সেবার অধিকারী তারা সকলেই নির্ম্মল নিরাময়, তারা অন্ত্যজগমন করে না, তাদের কারো দুষ্ট ব্যাধি নেই, অন্তরে বাহিরে তারা সকলেই বা অধিকাংশই শুচি— তারা মিথ্যা মকদ্দমা করে না, তারা অকপট। তারা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতা যদি অশুচি না হন, শত শত বৎসর তাদের সংস্রবেও যদি তাঁদের দেবত্বে কোনো সঙ্কোচ না ঘটে থাকে,

তবে কেবল জন্মগত হীনতাই কি তাঁদের অসহ্য। দেবতা কি কেবল তোমাদেরই দেবতা, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির মতো। দেবতা সম্বন্ধে এমন ধারণার মতো দেবতার অপমান আর কিছুই হতে পারে না— ভারতবর্ষে দেবতা অপমানিত এবং মানুষ অপমানিত। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৩৯

দাদা

৯৭

১ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি প'ড়ে আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করি। তোমার বুদ্ধিকে আমি কেবলি পীড়ন করচি। তোমার স্বভাবে তুমি স্বচ্ছন্দে বর্ত্তমান থাক, তাতে আমি লেশমাত্র আপত্তি বোধ করব না। তোমার মন ক্লিষ্ট হয়েচে বলেই তুমি আমাকে অসম্ভব রকম ভুল বুঝচ। শিবারামের গল্প লেখবার সময় তোমার কথা আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না— পরিচয় পত্রে কোন্ কবিতার মধ্যে তোমার প্রতি আঘাত প্রচ্ছন্ন আছে বহু চিন্তা করেও বুঝতে পারলুম না। কালের যাত্রায় তোমার বর্ণিত ব্রাহ্মণকন্যার ওষুধের গুণের কথাটা ব্যবহার করেচি কিন্তু সে তো তোমাকে পীড়া দেবার জন্যে নয়, আমাদের দেশের বিশ্বাস-মোহের দৃষ্টান্ত দেবার জন্যে। কিন্তু তাতে যদি তোমাকে দুঃখ

দিয়ে থাকে তবে আমাকে ক্ষমা কোরো। এ কথা নিশ্চিত জেনো যে তোমাকে ইচ্ছা করে বেদনা দেব বা বিদ্রূপ করব এ আমার দ্বারা হতেই পারে না। পরিচয়ের কোন্ কবিতায় তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ আমাকে জানালে আমি বুঝতে পারব কি ভাবে আমাকে সতর্ক হতে হবে।

শরীর ক্লান্ত এবং নানা চিন্তায় মন ভারগ্রস্ত। ১ অক্টোবর ১৯৩২

দাদা

৯৮

২ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার কয়েকটি চিঠি পড়ে দেখ্‌লুম। আমার সঙ্গে মতান্তর নিয়ে তোমার মন অত্যন্ত অশান্ত হয়েচে। কোনো উপায় নেই, কারণ মত তো গায়ের চাদর নয় যে, কাউকে খুসি করবার জন্যে বদল করা চলে। বুঝতে পেরেছি তোমার মন এমন অবস্থায় এসেছে, আমার সম্বন্ধে তোমার সহিষ্ণুতা বেশিক্ষণ টি কবে না,— ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছ শেষকালে সম্পূর্ণ উল্‌টো বুঝবে, তার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ স্তব্ধ হওয়াই ভালো। স্নেহের বন্ধনকে বিরক্তিতে নিয়ে যাওয়া শ্রেয় নয়।— দুই একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই, আর কেউ হলে কোনো কথাই বলতেম না।—

তুমি সাম্যতত্ত্ব নিয়ে আমাকে খোঁটা দিয়েচ। আমি সাম্যনীতির চূড়ান্তে উঠেচি এমন অহঙ্কার কখনো করি নে, কিন্তু তাই বলেই যতটা পারি তাও ত্যাগ করতে হবে এ'কে সুযুক্তি বলে না। আমি মানুষটা স্বল্পাশী, জানি ভূরিভোজন মনের শক্তি হ্রাস করে; জনরব এই যে কোনো একজন পওহারী বাবা না খেয়ে সাধনা করেন। তুমি যদি বলো, আপনি যখন পবন আহার করে থাকতে পারেন না তখন স্বল্পাহারের বড়াই করেন কেন— এমন খোঁচা চুপ করে স্বীকার করে নিলেও অগৌরব হবে না।

… … পরিবারের সঙ্গে তোমাদের সখ্য হয়েছে বলে তুমি যখন আমার অপ্রীতি কল্পনা করেছিলে তখন বলেছিলেম, আমার মনের এমন বিকার যদি হোত তাহলে লজ্জিত হতুম। আমি কখনো বলিনে যে বিনা কারণে বিনা আমন্ত্রণে অতিশয় ঔদার্য্যের গরিমা দেখাবার জন্যে তার বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে পড়বার জন্যে আমার ব্যগ্রতা আছে। যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করত তবে নিশ্চয় যেতুম— না করলেও অকস্মাৎ তার ওখানে না যাওয়াকে যদি তুমি আমার দুর্ব্বলতা বল তবে নিঃসন্দেহ স্বীকার করব সে দুর্ব্বলতা আমার আছে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্প্রীতি ঘটেচে বলে তোমাদের প্রতি বিমুখ হব সে দুর্ব্বলতা আমার নেই। পূর্ব্বটা আছে বলেই এটাও আমার থাকা উচিত ছিল এই যদি তোমার মত হয় তাহলে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না এর বেশি আর কি বলব।

কিন্তু এর চেয়ে আরো আশ্চর্য্যের কথা তোমার চিঠিতে

আছে। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে তোমাদের বাড়িতে কেমন বেড়িয়ে আসতে পারি তাই তুমি দেখ্‌তে চাও। আমার বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অতি অল্পই আছে। যাঁদের বাড়িতে আমি অবাধে যাই তাঁরা ধনে মানে তোমাদের সঙ্গে তুলনীয় নন। আর যাঁরা অবাধে যখন তখন আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন তাঁদের মধ্যে নগণ্যের সংখ্যা কম নয়— আমার সময় নষ্ট হয়, কাজের ক্ষতি হয় স্বাস্থ্য পীড়িত হয় নিতান্ত অসাধ্য না হলে পদের অভিমানে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করিনে। এটা খুব বেশি কথা নয় এবং এই নিয়ে আমি যশোলাভ করবার দাবী রাখি তা মনে কোরো না। সাম্যতত্ত্ব প্রচারের খাতিরে অকস্মাৎ তোমাদের বাড়িতে উঠে সবাইকে সচকিত করে দেব এমন আশঙ্কা মনে রেখো না।

আর একটা খোঁটা ইঙ্গিতে দিয়েছ সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা আমার পক্ষে আরো কঠিন। তুমি লিখেচ দরিদ্র ও অস্পৃশ্যদের আর্থিক সহায়তার জন্য যাঁরা স্বার্থত্যাগ করেচেন তাঁরা সাহিত্যিক নন, তাঁরা ধনী নন, তাঁরা অমুক অমুক অমুক। আমি কিছু করেছি কিনা তার হিসাব তোমার কাছে দিতে চাই নে কিন্তু যদি এক পয়সা ব্যয় নাও করে থাকি তাই বলেই কি যেটা উচিত সেটাকে উক্ত করতেও পারব না? আমি পাড়ায় পাড়ায় আগুন নিবিয়ে বেড়াই নে, চেষ্টা করতে গেলে পারিও নে, তাই বলে কি তুমি আমাকে লিখ্‌তে দেবে না যে লোকের ঘরে আগুন দেওয়া অন্যায়। আমি যে সকল কাজ করে থাকি যারা তার কোনো খোঁজ রাখে না, তারা আমার

কাজের খোঁটা দিয়ে থাকে, বাঙালীর মধ্যে জন্মেছি বলে আমার এই তুর্ভাগ্য। তুমিও খোঁটা দিতে যদি সুখ পাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তবুও মনের মধ্যে এইটুকু সংশয় রেখো যে, সব খবর হয় তো তোমার জানা নেই, এবং জানবার সম্ভাবনামাত্র নেই। বস্তুতই আমি তোমার অপরিচিত অতএব বিচার করবে কেমন করে— কিন্তু তাই বলেই যে অবিচার করবে সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে কেন কারো সম্বন্ধেই ভালো নয়। তোমার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হওয়াকে যদি অপরাধ বলে গণ্য করো তবে সেই সূত্রে আমার প্রতি কাল্পনিক অপরাধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

মহাত্মাজি সম্বন্ধেও তুমি কিছুই জানো না, আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি— তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তোমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর মতের মিল নেই বলেই তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা শ্রদ্ধেয় নয়। এ ক্ষেত্রেও তোমাকে বলি মনকে এই বলে নম্র কোরো, "আমি হয় তো তাঁকে জানি নে, জানা আমার সাধ্যের মধ্যে নয়, অতএব নীরব থাকব।"

আর আমি কৈফিয়ৎ দেব না। তোমার মন উদ্বেজিত হয়েছে, এ অবস্থায় বাদপ্রতিবাদে সুফল ফলে না। আমারও অবকাশের একান্ত অভাব। অতএব তর্কবিতর্ক না করে সম্পূর্ণ নীরব হওয়াই নিরাপদ। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩২

দাদা

৯৯

১৩ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যারা নিজেকে ধর্ম্মকর্ম্মের পুতুল করে তোলে তারাই আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের প্রতিদিন পুনরাবর্ত্তনের দ্বারা নিজের শূন্যতাকে ভরাট করে মনে করে জীবন সার্থক হোলো। যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মে বুদ্ধির অন্ধতা এবং হৃদয়ের জড়তা, সেই সমস্ত নিরর্থকতার জালে নিজেকে নিয়ত জড়িয়ে রাখা ভুলিয়ে রাখার মত দুর্গতি আর নেই। এই সমস্ত চিত্তহীন আচারে জীবন অসাড় হয়ে যায়। এই অসাড়তায় সুখ দুঃখের বোধকে কমিয়ে দেয় বলে অনেকে একে শান্তি বলে ভ্রম করে। কী হবে এই নির্জ্জীবতার শান্তি নিয়ে।

তুমি তোমার অতৃপ্ত হৃদয়কে পূর্ণতা দেবে বলে ঘুরে বেড়িয়েছ, আজও শান্তি পাও নি। যার মন সজীব, যে চিন্তা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে, সে কি দিনের পর দিন অনুষ্ঠানের কলের চাকা ঘুরিয়ে বাঁচে। মনুষ্যত্বের বিচিত্র প্রবর্ত্তনাকে অন্ধ অভ্যাসে সঙ্কীর্ণ করে আনাকে অনেকে ধর্ম্মসাধনা বলে, মানবস্বভাবকে খর্ব্ব করা পঙ্গু করাকেই মনে করে সাধুতা। জীবনকে এমন অকৃতার্থ করাই যদি বিধাতার অভিপ্রেত হোত তবে তাঁর সৃষ্টিতে এত আয়োজন কেন? জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে বড়ো করে পাওয়ার মধ্যেই মুক্তি। জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের পরিধিকে ছেঁটে ছোটো করে আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রকে

অপ্রশস্ত করা আত্মহত্যার রূপান্তর। সংসারের খাঁচায় যারা কষ্ট পাচ্চে ধর্ম্মের খাঁচা বানিয়ে তারা নিষ্কৃতি পাবে এ কখনো হয় না— মাদকসেবীর মতো তারা অচেতনতার মধ্যে পালিয়ে রক্ষা পেতে চায়, অর্থাৎ তারা মরে' বাঁচতে ইচ্ছা করে। এক রকম আধমরা স্বভাব আছে তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব, কিন্তু যাদের হৃদয় বুদ্ধি সজীব সচল, নিজেকে বলপূর্ব্বক আড়ষ্ট করে' তারা কখনোই সুখী হতে পারে না। একদিন আশ্রমে তুমি আনন্দ পেয়েছিলে,— নিজেকে কৃত্রিম নিয়মশৃঙ্খলে বেঁধেছিলে বলে' সে আনন্দ নয় তোমার হৃদয় পূর্ণতার তৃপ্তি পেয়েছিল বলে'ই সে আনন্দ— সে একটা সত্য পদার্থ, সে বানানো জিনিষ নয়। তোমার সেই তৃপ্তির উৎসটাই আজ পাথরচাপা পড়েছে, তাই বলেই সেই পাথর নিয়েই তুমি বাঁচবে কি? যারা সেই রুদ্ধ উৎসকে ভুলে কেবল পাথরকে সিঁদুর মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে সময় কাটাতে অন্তরে বাধা পায় না, তারা তোমার অসন্তোষের চাঞ্চল্য দেখে তোমাকে অবজ্ঞা করে, বস্তুত তাদেরই সন্তোষের স্থাবরতা অবজ্ঞার বিষয়।

তোমার প্রশ্ন এই, কি করে জীবন সার্থক হবে। কি উত্তর দেব ভেবে পাই নে। আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনক্ষেত্র বেড়া দিয়ে খাটো করা, তার মধ্যে মানুষের চিত্ত সব খোরাক পায় না, উপবাসী থাকে। সুবিধা এই, অধিকাংশ মানুষ সঙ্কীর্ণ সীমার উপযুক্ত হয়েই জন্মায়, যাদের ডানা নেই আকাশের অধিকার হারালেও তাদের চলে। ঘরকন্নার সঙ্কীর্ণতা বা ধর্ম্মাচরণের সঙ্কীর্ণতা সে সব মেয়েদের মনকে বঞ্চিত করে না। বরঞ্চ তারা

এই নিয়ে খেলাচ্ছলে একরকম আরাম পায়— তাদের কোনো নালিষ নেই। তোমার হৃদয় মনকে অত সহজে শিকল পরিয়ে তুমি দমিয়ে রাখতে পারচ না, তাই কষ্ট পাচ্চ। তোমার এই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় থেকেও তুমি মুক্তির আস্বাদ পেতে পারতে যথেষ্ট পড়াশোনায়, এবং রচনার মধ্যে। বহির্জগতের স্বাধীনতা, যা তোমার নিজের ছেলের আছে, তা তোমার নেই,— মানুষের এই মস্ত অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। কাজেই অন্তর্জগতের মধ্যে সঞ্চরণের স্থান প্রশস্ত করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে' সেটাকে সত্য করে তুলতে পারো যদি তবে তাতেই পাবে আনন্দ। নইলে খাঁচার শলাগুলোতে কেবলি ডানা ঝাপটা মেরে কী লাভ। —আমার কথা যদি বলো, সংসারে আমার দুঃখ শোক অভাব অতৃপ্তি কম নয়— কিন্তু জগতে চারদিক থেকে আমি খোরাক সংগ্রহের রাস্তা রেখেছি, আমার চিত্তের ঔৎসুক্য কোনোদিকেই বাধাগ্রস্ত হয় নি।—

তুমি একটি বিশেষ পথ দিয়ে হৃদয়ের চর্চ্চা করেছ —সেই পথটিই তোমার পক্ষে সহজ। সেই পথে তোমার প্রধান আশ্রয়কে হারিয়েচ। অন্য পথ তোমার অনভ্যস্ত, দুর্গম, হয়তো বা তোমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই মনে হয় যে সব বৈষ্ণবশাস্ত্রে তোমার মন রস পেতে পারে তার মধ্যে একান্তভাবে মগ্ন হতে পার কি ?

বারবার বলেচি গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি, নানাভাবে নানা দিকে আমার মন সঞ্চরণ করে— আমার স্বভাবের বৈচিত্র্যবশত নিজেকেও নিজে বুঝি নে, অন্যেও

আমাকে বোঝে না। আমার প্রধান সার্থকতা সব কিছু প্রকাশ করা— বাণীর দ্বারা করেচি, কর্ম্মের দ্বারাও করচি। মনে কোরো না, আরামে করতে পেরেছি, দিতে হয়েচে অনেক, কষ্ট ও অপমান সয়েচি যথেষ্ট, নিজেকে প্রায় নিঃস্ব করেছি— কিন্তু ছুটি পাব না কোনোদিন, কেননা এই আমার স্বভাব। ইতি
২৭ আশ্বিন ১৩৩৯

দাদা

১০০

১৮ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এবারকার ছুটি আমার জন্যে অবকাশ নিয়ে আসে নি। নানা কাজে ও অকাজে দিনগুলো ঠাসা। তার উপরে, অনেক লোক যারা অন্যত্র ছুটি পেয়েচে তারা আমার ছুটির উপর এসে ভিড় করচে। এখান থেকে পালাব স্থির করেছি। কিন্তু প্রবাদ আছে ঢেঁকির স্বর্গপ্রাপ্তি হলেও তার ধান ভানারও গতি হয় তার সঙ্গে এক লোকে। জরুরি কাজ আছে অতএব একটু ফাঁকা কোথায় পাওয়া যায় খুঁজে বের করতেই হবে। এ চিঠিতে বলিদান কিম্বা অন্য কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নিয়ে তর্ক করতে চাই নে, কারণ সময় নেই। সংক্ষেপে কেবল এই কথা বলে রাখি মানুষ অনাচার করে বলেই দেবতার পরেও অনাচার আরোপ তার পক্ষে অন্যায় নয় এই যদি প্রশস্ত মত হয় তবে দেবতার পূজায় নিজেকেই পূজা করবার রূপান্তর করা হয়। মানুষের চেয়ে

দেবতা যদি বড়ো না হন, তাহলে দেবতায় কাজ নেই, মানুষই যথেষ্ট। থাক্ ও সব কথা।

যদি খড়দয় গিয়ে কিছুদিন আশ্রয় নিই তাহলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তো অসম্ভব হবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার আচারের মিল নেই বলেই অন্তরের মিল হতে পারে না এমন আশঙ্কা করি নে। নিশ্চয় তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে যদি আচার দিয়ে আমার যাচাই না করে হৃদয়ের দিকে আমার মূল্য নিরূপণ করো। বাইরের দিককার কৃত্রিম অভ্যাস ও ব্যবহারকেই প্রধান করে' যদি আমরা সত্যকার মনুষ্যত্বের মূল্য খর্ব্ব করি তাহলে কোনোদিন আমাদের বিরোধ মিট্‌বে না। মানুষ আচারের চেয়ে বড়ো, মুখোষের চেয়ে মুখ যেমন বড়ো, সংহিতাকারের চেয়ে বিধাতা যেমন বড়ো। ইতি ১ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০১

২১ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে এসেচি বলেই আমার দেশ আমাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারচে না এই কথাই তোমার চিঠি থেকে বুঝতে পারি। পাঁচজনে আমাকে যে রকমটি হতে

বলে আমি যদি ঠিক সেই প্যাটার্ণে নিজেকে গড়তে পারি তবেই তারা আমাকে ধন্য বল্‌বে এ কথাটা একদিক থেকে এতই সহজ যে আমি তা বুঝতে পারি, আর একদিক থেকে তা এতই কঠিন যে আমি তা মানতে পারি নে। আমার বয়স যখন আঠারো, তখন আমি প্রচলিত পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামতো ছন্দে কবিতা লিখতে স্থুরু করেছিলুম। আমার সেই ছন্দের কাব্যকে তৎকালীন সাহিত্যের প্রবীণ মুরুব্বিরা "কাব্যি" বলে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছিলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই অবজ্ঞা চলেছিল। তখন আমি যদি

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে—
অথবা কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ

এই ছাঁদকে সামনে রেখে নিজের কবিতাকে ভদ্ররীতি দিতে পারতুম তাহলে নিজেকে আমি তখনকার সাধুসমাজে পছন্দসই করতে পারতুম। ভাগ্যক্রমে ইচ্ছে করলেও আমার দ্বারা সেটা সম্ভবপর হতেই পারত না। আমি যখন "স্বদেশী সমাজ" লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কন্‌গ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। বিদেশী গবর্মেণ্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রফানিষ্পত্তির কাজকেই তাঁরা ভারতবাসীর মোক্ষসাধন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেছিলেন বেন্থাম প্রভৃতি পণ্ডিতরা স্টেট্ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন আমি অশিক্ষাবশত সেসব কিছুই জানিনে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছি যে প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে। আমি যদি ভালোমানুষের মতো দেশের জন-

সাধারণকে বাদ দিয়ে ইংরেজিশিক্ষিত এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের যুগলমিলন ঘটিয়ে তাই নিয়ে কন্‌গ্রেসের মঞ্চের উপর স্বেদ কম্প পুলক প্রভৃতি দশ দশার শাস্ত্রবিহিত লক্ষণ প্রকাশ করতে পারতুম, তাহলে তখনকার দিনে উঁচু চৌকিই পেতুম। সে সুযোগ গেল। কিন্তু আমার সেদিনকার কথার টুক্‌রো নিয়ে পরবর্ত্তী অনেক দেশাত্মবোধী তাঁদের বাণীরূপে ব্যবহার করেছেন এবং দেশে ধন্য হয়েছেন। বেঁচে থাক্‌তে থাকতে এও দেখেচি। তার পর যখন জালিয়ানবাগ ব্যাপারে আমি ছাড়া আর সকলেই নীরব ছিলেন,— দেশবন্ধু এবং মহাত্মাজিও— সে ঘটনাটাকে আমার সম্বন্ধে বিচার করবার হিসেব থেকে দেশের লোক বর্জ্জন করে বসে আছেন— বহুকাল থেকে এ কথা বলতে তারা কুন্ঠিত হয় নি যে দেশের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আমি কেবল বিদেশের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের জন্যে ব্যস্ত। তারা জানে অথবা জেনেও জানে না যে বিদেশের জনসভায় বিদেশী সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা বলে থাকি তা একেবারেই শ্রুতিসুখকর নয়। দেশের যথার্থ কাজ বল্‌তে আমি যা বুঝি তার জন্যে আমি নিজের প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করেছি, কিন্তু যেহেতু দশজনের ফরমাস-মতো সে কাজ গড়া হয় নি, দেশাত্মবোধীরা কেউ তার ত্রিসীমানায় না এসেও দূর থেকে নিরন্তর তাকে নিন্দা করেছে অবজ্ঞা করেছে, বাধা দিয়েচে। তবুও আমার উপায় নেই। তাদের ছাঁচে ঢালাইকরা পুতুল বিক্রি করে বাজারে নাম করতে ইচ্ছা থাকলেও সেটা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার কাজ আমাকে করতেই হবে। সাহিত্যে আজও

আমার কাব্যতরণী চালাবার জন্য আমারি মনের উনপঞ্চাশ বায়ুর উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়, তার কোনো দমকা এসে আমার রচনাকে প্রচলিত ধারার বাইরে নতুন বাঁকে যদি নিয়ে যায় তো জানি তোমরা পাড়িতে দাঁড়িয়ে হয়তো কর্ণধারকে গাল পাড়বে। কিন্তু এরকম গাল অনেক খেয়েছি, ভালো লাগে নি, কিন্তু বাঁক বদল করি নি— আজও অন্য পন্থা আমার সামনে নেই তাতে বকশিষ পাই আর না পাই।

আমাকে তোমরা তোমাদের পছন্দসই হতে বলেচ, আর বলেচ তাতে বকশিষ মিল্‌বে। চেষ্টা হয়তো করতেও পারতুম যদি নিশ্চিত জানতুম তোমাদের পছন্দটাই ট্যাঁকসই, তাতে আমাকে কোনোদিন ঠক্‌তে হবে না। কি করে এত নিঃসংশয় হব বলো। অতএব নগদ বিদায়ের প্রত্যাশা ছেড়ে দিলুম। এমনি করেই সত্তর বছর যদি কেটে গেল তাহলে বাকি ক'টা দিনও কাটবে। আমি যা দিতে পারি তাই দেশকে দেব, তার পরে রাগ করে যদি ভাঙা কুলোয় আমার নামটা তোমরা বিদায় করো মৃত্যুর পরে সে আমাকে বাজবে না।

… … যদি আমাকে চিঠি লিখ্‌তে চান নির্ভয়ে লিখ্‌তে বোলো আমি কখনো তাঁকে অসম্মান করব না। যাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল বা মনের মিল নেই তাঁদের সঙ্গে সেই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক কারণবশত আমার ব্যবহারকে কলুষিত করতে আমি অক্ষম। অনেক সময় দেখ্‌তে পাই আমার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যের অভাব অহৈতুক, আমার অবাধ দাক্ষিণ্যসত্ত্বেও তা দূর হয় না। যেহেতু আমি অতিমানব নই সেই জন্যে সেটা

আমাকে বেদনা দেয় কিন্তু তাই বলে আমিও বেদনা দিয়ে তার শোধ নিতে গ্লানিবোধ করি। দৈবাৎ কখনো যদি আত্মবিস্মৃত হই তবে লজ্জা পাই।

কাজের ক্ষতি করেই তোমাকে এত বড়ো চিঠি লিখ্‌তে হোলো কেননা আমাকে ভুল বোঝা নিতান্তই সহজ। ইতি
৪ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০২
২৮ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেয়ে দুঃখ বোধ করচি। তুমি কোনো অন্যায় করো নি অথচ তোমাকে অপমানিত হতে হোলো এ জন্য কাকে দায়ী করব জানি নে। কিন্তু এই সংশয় জালকে আর জটিল করে তুলো না। আমার অনেক কাজ আছে, অবকাশও অল্প। তোমাদের মত বিশ্বাস নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করতে পারি নে। তাতে তুমি এ পর্য্যন্ত দুঃখই পেয়েছ সান্ত্বনা পাও নি। অতএব এ রকম প্রশ্নোত্তর ক্ষান্ত করাই শ্রেয়।

তুমি যদি তোমার অবকাশকাল সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত করো তাহলে তোমার মন ভালো থাকবে, আর তোমার

স্বাভাবিক রচনাশক্তির যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যেও তার ফল ফলবে।

তোমরা আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১১ই কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০৩

৮ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

খড়দহ

কল্যাণীয়াসু

বিমলাকান্তর চিঠিখানি পড়ে সুখী হয়েছি, তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। তোমার মা আমাকে ভুল বুঝেচেন। অবশ্য ধর্ম্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি নে। তোমার মা আশঙ্কা করেছিলেন, খৃষ্টান মিশনারির মতো ব্রাহ্ম সমাজের আড়কাটির কাজে বুঝি আমার উৎসাহ। মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কেননা দল পুষ্টি করার ইচ্ছা মানুষের মনে প্রবল, তোমার মায়ের মনেও সে ইচ্ছা প্রবল বলেই তিনি সাম্প্রদায়িক লোকসানের ভয়েই এত অত্যন্ত বেশি উত্তেজিত হয়েছেন— অন্যায় শাসনের দ্বারাও তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে কুণ্ঠিত হন নি। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ধর্ম্মই এই। ধর্ম্মের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই সকল কালেই দেখতে পাই সম্প্রদায় থেকে নির্গমনপথে নির্যাতনের

কাঁটার বেড়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সাম্প্রদায়িক অধিকার বৈষয়িক অধিকারেরই মতো— রাজার চেষ্টা প্রজাকে আপন শাসনে যেমন করে হোক ধরে রাখা, কেননা প্রজা যে রাজ্যের সম্পত্তি— সম্প্রদায়েরও তেমনি সম্পত্তির বোধ তীব্র। মানুষ সংসারআশ্রম থেকে মুক্তি কামনা করে সাম্প্রদায়িক আশ্রমে প্রবেশ করে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যে সাধুনামধারী বিষয়বুদ্ধি জাল পেতে আছে তার থেকে উদ্ধার করবে কে? ভূত ঝাড়াতে যে ওঝার শরণ নেয় তাকে যে আরো বড়ো ভূতে পেয়ে বসেচে।— যাই হোক্ আমি তোমার আর কোন্ অনিষ্ট করতে পারি জানি নে কিন্তু কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা আমি নিজেই যূথভ্রষ্ট, আমি ধর্ম্মসমাজের তক্‌মাপরা ছাপ-মারাদের মধ্যে কেউ নই,— রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি সম্প্রদায়েয় দত্ত উপাধিও আমার নেই।

আগামী বৃহস্পতিবার সকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাচ্চি। ইতি ১২ কার্ত্তিক [১৩৩৯]

দাদা

১০৪

[শান্তিনিকেতন] ১৩ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কমলা লেকচারে নিযুক্ত হয়েছি। গাফিলি করবার জো নেই। বিষয়টা বিশেষ মনোযোগ করে লেখবার যোগ্য। সেই জন্যেই সম্প্রতি আর সমস্ত কর্ত্তব্য পিছনে পড়ে গেছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, জোলো বাতাস বেগে বইচে পূব দিক থেকে, পাখীগুলো বিমর্ষ হয়ে আছে, সামনের ঐ শিউলি এবং টগর গাছে টুনটুনি পাখীদের লীলা দেখি রোজ, আজ তারা অনুপস্থিত— আমার উত্তর দিকের জানলার বাইরে পরিপুষ্ট ভ্যারেণ্ডা গাছটার শাখায় শাখায় খুব দোলাদুলি চল্‌চে, আর দোলা লেগেছে মালতীবেষ্টিত শিমুলগাছে, বিলিতি নিমগাছ থেকে শাদা শাদা ফুলগুলো ঝরে পড়চে রাস্তায়,আর টুপটাপ করে পড়চে গোলকচাঁপা, আমার ঘরের সামনে অদূরে লাল মাটির রাস্তা চলে গেছে বোলপুর সহরে— আজ রবিবার হাটবার, গোরুর গাড়ি চলেছে মন্থর গমনে,খড়ের আঁঠি মাথায় নিয়ে চলেছে সাঁওতাল মেয়েরা, গোয়ালপাড়া গ্রামের দু চার জন গৃহস্থ মোটা চাদর গায়ে হাট করতে যাচ্চে ছাতা হাতে। ঐ এল অকস্মাৎ এক পসলা বৃষ্টি, মর্ম্মরিত হয়ে উঠল আমার মধুমঞ্জরীর লতামণ্ডপ— বৃষ্টিটা দ্রুত চলে গেল সাদা শাড়িতে ঢাকা প্রেতিনীর মতো মাঠের উপর দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে। আজ প্রোফেসারি করবার দিন নয়-- কিন্তু দায় চেপেছে ঘাড়ে— আজ কলমের ভার গুরুভার মনে হচ্চে তবু

টেনে চল্‌তে হবে।— আমার গান তোমার ভালো লাগে শুনে খুসি হয়েছি। আমার নিজের মন সব চেয়ে আনন্দ করে আমার গানগুলো নিয়ে।

সজনীকান্ত তোমার জন্মদিনে যে কবিতা তোমাকে দিয়েচে সেটা পড়ে ভালো লাগল। আজ আর সময় নেই। ইতি ২৭ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০৫

[শান্তিনিকেতন] ১৪ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি কি আজ পর্য্যন্ত কাউকে ভিতর থেকে আলো দিতে পেরেছি? আমি কি রকম জানো, যেন সূর্য্যরশ্মিতে উদ্দীপ্ত অগ্নিবর্ণ সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। সে আলো চোখে দেখতে পাবে, ভালো লাগ্‌বেও হয়তো,— কিন্তু রাত্রের অন্ধকার পথে চলবার জন্যে তার থেকে কেউ কি আলো সঞ্চয় করতে পারবে, কেউ কি জ্বালাতে পারবে আপন ঘরের প্রদীপ? বাহির থেকে দেখে মনে হতে পারে আমার কাছে চেয়ে নেবার জিনিষ কিছু আছে, যদি বা থাকে দেবার যোগ্যতা কই। যারা দেবার মানুষ তারা চুপ করে থাকেনা, তারা মানুষকে ডাক দিয়ে বলে, এসো আমার কাছে, নাও আমার হাত থেকে, না দিয়ে তাদের জো নেই। তারা সেই শ্রাবণের মেঘ, অজস্র বর্ষণ করেই যার মুক্তি।

আমার চিন্তাও হয়তো তাদের মতো কখনো কখনো আকাশে সঞ্চরণ করে, কিন্তু সে যেন শরতের মেঘ, কখনো কখনো দিগন্তে করে আনাগোনা— নানা রঙ লাগে তাতে, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তকে সে অভিনন্দন করে নানা সমারোহে, কিন্তু চাতক যখন বলে জল দাও তখন সে লজ্জিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। আমাকে আমার বিধাতা এই ফরমাসই করেচেন, তাঁর বিশ্বোৎসবে শোভাযাত্রায় সাজসজ্জার কাজে লাগব, শানাই বাজাব, পতাকা দোলাব, কখনো কখনো জগঝম্পও হয়তো বাজাতে পারি, কিন্তু দানদক্ষিণার ভার তাঁর যে বিভাগে সেখানে আমার অনধিকার। আমার উজ্জ্বল তক্‌মা দেখে লোকে হঠাৎ অনেক আশা করে আসে তার পরে যখন ফিরে যায় তখন তারা ভাবে আমি কৃপণ, গাল পাড়তে থাকে। আমি কৃপণ বলে দিই নে তা নয় আমার হাতে তহবিল নেই বলে দেওয়া অসম্ভব। যারা দেয় তাদের চারদিকে দলবল থাকে, দলবলের অভাবে আমি সকল কাজে অকৃতার্থ। ডাকব তাদের কী দিয়ে, খোরাক দেব কোথা থেকে ? যে রঙে চোখ ভোলে তাতে তো পেট ভরে না। এই জন্যেই আমার দেশে আমি প্রায় একাই কাটিয়ে দিলুম জীবনের শেষ বেলা পর্য্যন্ত। আমার কাজ আমার হোলো বোঝা। তবু কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে।

একটা কথা বলি তোমার কাছে, সেটা আশ্চর্য্য ঠেকে। পাশ্চাত্য দেশে এমন কথা অনেকের কাছেই শুনেচি, আমার বাণীতে আমি কেবল যে তাদের খুসি করেছি তা নয়, তারা জীবনের অন্ন পেয়েছে তার থেকে, যাত্রাপথের পাথেয়রূপে তারা

তার থেকে কিছু সংগ্রহ করেছে। এ কথা শুনে মনে হয়েছে আমার রচনার সাধনা সার্থক হোলো। সেই সঙ্গে এও ভেবেছি যে-ভাষায় দেশের লোককে কিছু পথ্য দিতে পারতুম সে ভাষা এবং উপযুক্ত ভঙ্গী আমার জানা নেই। মূককে বাচাল করে এমন শক্তি আছে, আবার বাচালকে মূক করে এমন বাধা আছে। আমার অনেক বাক্য আমার দেশে মূক হয়ে আছে আমার যে-ক্ষমতার অভাবে তার উপরে কি রাগ করা চলবে, সে কি আমার ইচ্ছাকৃত। তুমি অনেকবার আমাকে বলেচ, "তোমার নিজের মতো কথা না বলে আমাদের মতো কথা বলো তাহলে আদর পাবে।" চেষ্টা করতে গেলে আমার কথাও নষ্ট হোতো তোমাদের কথাও। অতএব এ যাত্রায় বেশি আশা করব না। তোমার অন্তর যে শান্তি যে সান্ত্বনা চায় আমি কেমন করে তা দিতে পারি? মনে বেদনা পাই, রোগী আত্মীয়কে দেখে আত্মীয় যেমন বেদনা পায়, কিন্তু হাতুড়ে হয়ে ডাক্তারি করব কোন্ সাহসে? তাই তোমাকে বলি আমার স্নেহ যদি গ্রহণযোগ্য হয় তো গ্রহণ কোরো কিন্তু শিক্ষা যদি চাও তবে মূক আমি।— তোমার নিজের মধ্যেই কল্পনাশক্তি আছে। যে গুরুকে ভৌতিকরাজ্য থেকে হারিয়েছ সেই গুরুকেই ভাবের রাজ্যে অমর করে পাবে, সেইখানেই তোমার শান্তি। তর্ক করে কি কখনো শান্তি দেওয়া যায়? ইতি ২৮ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০৬

২৩ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যে অনুভূতির মধ্যে কোনো একদিন তোমার আত্মা মগ্ন হয়েছিল, পরম আনন্দ পেয়েছিল, তার স্মৃতির প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা জন্মাতে ইচ্ছাও করি নে। অহঙ্কারের যে বন্ধনে আমরা নিজের ছোটো গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থেকে সংসারের প্রত্যেক তুচ্ছ জিনিষকে বড়ো করে তুলি, মানুষের স্তুতি নিন্দাকে একান্ত সত্য বলে কল্পনা করি তার থেকে যা তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে তাই তোমার পক্ষে শ্রেয়। অনেক সময় সংসার থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে ভোলাই যে নিষ্কৃতি পেয়েছি। সেই প্রমাদ যেন না ঘটে। সংসারের জাল থেকে মুক্তি পেয়েছি তার একমাত্র প্রমাণ হতে পারে সংসারেই। বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণের পথে উপদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি তার সত্যকে নির্দ্দেশ করেছিলেন বিশ্বপ্রেমে। চরম সত্য যদি থাকেন সকলকে ব্যাপ্ত করে, তবে তাঁকে পাবার পন্থা সকলকে ত্যাগ করে নয়। সেই সত্যে যথার্থই অগ্রসর হয়েছি কিনা একদিকে তার প্রমাণ মন থেকে কলুষ কেটে যেতে থাকে যদি। আর দিকে প্রমাণ সকলের প্রতি প্রেম পূর্ণ হয়ে উঠল কিনা। কলুষ কেটে যদি থাকে তার প্রমাণ এই সংসারেই। আর প্রেম অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে তারও প্রমাণ এই সংসারে। কেননা মানুষের মধ্যে হাজার রকম বাধা আছে বলেই সেই

বাধা এবং তার কঠোর আঘাতকে অতিক্রম করতে পারলেই প্রেমের সার্থকতা। এই প্রেমের আনুষঙ্গিক যে সেবা সংসারেই তার বিশুদ্ধিতা প্রমাণ হয় শুধু তাই নয় সেই সেবায় সংসারেরই প্রয়োজন দেবতার নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেচেন দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রয়চ্ছেশ্বরে ধনং— দেবতা তো দরিদ্র নন, দরিদ্র যে মানুষ। মানুষকে সত্য বস্তু দিতে পারলেই দেবতা স্বয়ং তা আদরে গ্রহণ করেন। তাই তোমাকে আমি বলি যে-সাধনায় তোমার চিত্তের পরিতৃপ্তি তাই তুমি একান্ত নিষ্ঠায় অনুসরণ কর— কিন্তু সেই সাধনার সার্থকতা যদি মানুষকে না দিতে পারো তাহলে তুমি যাই কল্পনা করো না দেবতা তা গ্রহণ করেন না। পৃথিবীতে মহাপুরুষ যে কেউ জন্মেছেন মানুষের কাছ থেকে দেবতা তাঁদের কেড়ে নেন নি— মানুষের কাছেই দেবতা তাঁদের প্রেরণ করেছেন। দেবতা আপন ভক্তকে পাঠান মানুষের কাছে। তাঁকে ভক্তি করেই ভক্তি ফুরিয়ে যায় না, সেই ভক্তি সত্য যদি হয় তবে তা প্রেমে অফুরান হয়ে মানুষের সংসারে দেবতার কৃপা নিয়ে আসে। তা যদি না হয় তাহলে দেবতাকে নিন্দা করব কৃপণ বলে। তিনি মানুষের ধনকে একলা নিজেই ভোগ করবেন মানুষকে কিছুই দেবেন না এতে তো তাঁর ঐশ্বর্য্য প্রমাণ হয় না। আমাদের কৃপণতা দেবতায় আরোপ করে তাঁকে ছোটো করি কেন? ইতি ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দাদা

১০৭

[শান্তিনিকেতন] ৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সেই কমলা লেকচার লিখতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েচে। মানবের ধর্ম্ম বিষয়টা নিয়ে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিয়েছিলুম, সেটা বই আকারে বেরিয়েচে। বাংলাভাষায় বক্তব্যটা সহজ করে তোলা সহজ নয়, চেষ্টা করতে হচ্চে খুব বেশি করে। অন্য কিছুতে মন বিক্ষিপ্ত করতে সাহস হচ্চে না। অথচ ইতিমধ্যে অনেক রকম অভ্যাঘাত ঘটেচে। এই শীতের সময় এখানে নানা দেশের নানা অতিথি সমাগম হয়। কয়েকজন জাপানী এসেছিলেন তাঁরা সারনাথে বুদ্ধমন্দির চিত্রালঙ্কৃত করতে চলেছিলেন। মালব্যজি এসেছিলেন তাঁকে নিয়ে দুদিন কাটল। তা ছাড়া এখানকার কর্ম্মের ধারা আছে।

কলকাতার কাজে আমাকে যেতে হবে আগামী দশই ডিসেম্বরে। প্রফুল্লজয়ন্তীর ······ তারিখ এগারই। বারোই তারিখে স্বদেশী ভাণ্ডারের আরম্ভকর্ম্ম। সেইদিনই অপরাহ্নে জাপানীদের এক সভায় আমার আমন্ত্রণ। তার পরে কবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এখনো নিশ্চিত জানি নে। এটা কমলা লেকচার নয়। আমার প্রোফেসারি পদের প্রথম অভিভাষণ। তার পরে আরো বক্তৃতা পর্য্যায়ক্রমে চালাতে হবে। মনে করতে পীড়া বোধ হয়, ছুটির জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ এ কথাও সত্য যে নিতান্ত দায়ে না পড়লে আমার কুঁড়েমির তালা ভাঙে না।

অক্সফোর্ডেও যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তা বিস্তর পীড়াপীড়ির পরে। না দিলে আমার বলবার কথা অনুক্ত থাক্‌ত। কমলা লেকচারেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে লিখতে হোলো, অথচ দায়ে পড়ে যদি না লিখতুম তাহলে সেটা আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য হোত। বারে বারে আমার এই রকমই ঘটে থাকে। আমার অবস্থাটা ব্যস্ত, আমার স্বভাবটা কুঁড়ে— কেবলি দ্বন্দ্ব বাধে কিন্তু অবস্থারই জিৎ হয়। ছেলেবেলা থেকে আমি স্বভাবতই কুণো অথচ আমি যত দেশে-বিদেশে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েছি এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আজ সমস্ত পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। বিশ্রামের জন্যে ছুটির জন্যে আমার অকর্ম্মণ্য মন নিরতিশয় উৎসুক অথচ আমাকে যত প্রভূত পরিমাণে কাজ করতে হয়েচে, এমন ঘোরতর কেজো লোককেও না। সাধ্যমতে স্বদেশকে নানা-প্রকারে সেবা থেকে আমি বঞ্চিত করি নি অথচ আনন্দের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে অব্যাঘাতে নির্ম্মমভাবে দেশের লোক আমাকে যত গাল দিয়েচে বাংলাদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেউ নেই। এই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আমার জীবনে।

তোমার ইংরেজি লেখা দেখলুম। প্রকাশ করবার শক্তি তোমার স্বভাবতই আছে। বাল্যকাল থেকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজির চর্চ্চা করতে তাহলে ভালো লিখ্‌তে পারতে। তাতে লাভ কি হোত। যে লেখা শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা সরস্বতী অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন সে লেখা বাঙালীর কলমের মুখে প্রসন্ন হয়ে বিকাশ পায় না। বই পড়ার রাস্তায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগসাধনটাই প্রশস্ত। সে কম লাভ নয়।

তুমি যদি দুই তিন বছর এই অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকো তাহলে তোমার বাধা কেটে যাবে। তাতে তোমার প্রকাশের উপকরণও অনেক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া সাহিত্যের বিচারশক্তিও প্রাদেশিকতা কাটিয়ে উদার হয়ে উঠবে। আমাদের মন আমাদের স্বদেশের, কিন্তু আমাদের কাল স্বদেশের নয়। দুইয়ের মিল করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হবে। কালকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা কালোহি বলবত্তরঃ— তোমার চেয়ে তার জোর বেশি— তার সঙ্গে রফা করতেই হবে। ইতি
৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

দাদা

১০৮

[শান্তিনিকেতন] ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দেহ মন ক্লান্ত। ভিতরের আলো যেন নিবে আসচে বলে মনে হয়। সমস্ত অন্তঃকরণ কর্ম্ম থেকে বিরত হয়ে বিশ্রাম চায় কিন্তু আমার প্রতি কারো করুণা নেই, নিজের নিজের অতি ছোটো ছোটো কাজও আমার কাছ থেকে আদায় করবার দাবী করে। কাল বুধবারে পরের দায়ে কলকাতায় যেতে হবে। যাওয়াটা আমার শরীরের পক্ষে কত ক্লান্তিকর কেউ অনুমান করতে পারেনা। করলেও কেউ যে নিষ্কৃতি দেবে তার আশা ছেড়ে দিয়েচি অতএব শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলবে। আমার

জন্যে উদ্বেগ মনে রাখা বৃথা। আমার বয়সে দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন শেষ করবার সময় এসেচে। যৌবনে যে নৌকো মাঝদরিয়ায় তারই জন্যে ভাবনা করলে সেটা মানায়— যে এসে পৌঁছল ঘাটের কাছে তার তলায় ফুটো হলেই বা কি আসে যায়। ইতি ২ ফাল্গুন ১৩৩৯

দাদা

১০৯

২৯ মার্চ্ ১৯৩৩

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

পাছে বিনা অপরাধে তোমাকে লাঞ্ছিত হতে হয় সেই জন্য চিঠি লিখি নে। আমার স্নেহ থেকে তুমি যে বঞ্চিত এমন আশঙ্কা কোরোনা।

শাপমোচন-এর পালা নিয়ে কলকাতায় এসেছি, অর্থের সন্ধানে। দুঃসময়। বিশেষ ফল পাব মনে করি নে তবু যা পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট।

"দুই বোন" বইখানি তোমাকে পাঠাব। এই অভিনয় থেকে ছুটি পাওয়ার অপেক্ষা করচি।

আজ এখনি রঙ্গমঞ্চ অভিমুখে রওনা হব। তোমার ছেলে মেয়েকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২৯ মার্চ্চ ১৯৩৩

দাদা

তোমার চিঠি পড়তে আমার ভালো লাগে, তুমি জানো।

১১০

[শান্তিনিকেতন] ১৪ এপ্রিল ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আগে কাজের কথাটা শেষ করি। তোমার সেই মাতৃমূর্ত্তি-রচনার সঙ্কল্প জানিয়ে চিঠি যখন লিখেছিলে তখন ছিলেম বরানগরে, ভেবেছিলেম অবনের সঙ্গে দেখা হলে প্রস্তাবটা তাঁকে জানাব। দেখা হয় নি। যথাসময়ে যদি স্মরণ করিয়ে দাও কলকাতায় গিয়ে ওটাকে পুনরুত্থাপন করব।

আজ প্রাতে এখানে নববর্ষের উপাসনা হয়ে গেল। আশ্রমে এটা একটা বিশেষ দিন। সম্বৎসরে আমাদের ব্রতপালন-পথের পাথেয়সঞ্চয়ে যা ক্ষয় হয়েছে ক্ষতি হয়েছে আজ তাই পূরণ করে নেবার চেষ্টা করি।

ঘোর ঘনঘটা করে এলো বৃষ্টি। মাঠ ভেসে গেল জলে। নিবিড় ধারাবর্ষণের আবরণে আমার ঘরের সামনেকার গাছগুলি অবগুণ্ঠিত, আর্দ্র বাতাস বইচে বেগে, বৃষ্টির আঘাতে গোলকচাঁপাগুলি ঝরে পড়চে মাটিতে, তালগাছের ছাঁটা ডালে কাক বসে আছে পাতার নীচে, অনতিদূরে কোথা থেকে ডেকে উঠ্চে একটা গোরু, বোধ করি বন্ধনমোচনের আবেদন জানিয়ে; আমার নিভৃত ঘর ছায়াচ্ছন্ন, আসর জমাবার মতো লোক নেই। আগেকার মতো দায়িত্ববিহীন অবকাশ যদি থাক্‌ত তাহলে বাদ্‌লে সুর দিয়ে গান তৈরি করতুম, কিম্বা লিখতুম ছোটো গল্প।

আজ এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে একটা বিয়ে আছে। সকালে গায়ে হলুদ হয়ে গেল— অত্যন্ত বেসুরো গ্রাম্য সানাই বর্ব্বর তারস্বরে আজ প্রাতঃকালের মেঘমেদুর আকাশকে যেন ক্ষতবিক্ষত করেছে এতক্ষণে ধারাপতনের তরল কল্লোলে তার শুশ্রূষা সমাধা হোলো।

নববর্ষের শুভকামনা জানিয়ে শেষ করি এই পত্র। ইতি
১ বৈশাখ ১৩৪০

দাদা

১১১
১৩ মে ১৯৩৩

ওঁ

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

আশ্রয় নিয়েছি শৈলশৃঙ্গে। কিন্তু নিয়তি এখানেও এসে পোঁছয়, তাঁর গাড়িভাড়া লাগে না। নানা কাজের দাবি, নানা লোকের নানা অনুরোধ, পূর্ব্বারব্ধ কর্ম্মের অনুস্মৃতি সমস্তই আমার দরজা পর্য্যন্ত পথ করে নিয়েছে। মাঝখানে এই ভিড় জমে উঠেছে, বিশ্রামের প্রত্যাশা রইল পড়ে তার পরপারে। কলকাতার মতো জায়গায় তার অসঙ্গতি হয় না কিন্তু এখানে তার পক্ষে অস্থান বলেই পীড়নটা লাগে বেশি।

আমাকে উপহার দেবার জন্যে উদ্বিগ্ন হোয়ো না। তোমার

আন্তরিক অভিনন্দন অনায়াসেই পৌঁছয় আমার অন্তরে। তার মূল্য তো কোনো প্রত্যক্ষ সামগ্রীর চেয়ে কম নয়। আমার জন্যে রঙীন মাটির হাঁড়ি আর শিকে কিনে রেখেচ। কাজে লাগবে। একদা আমার ঘরে কড়ি থেকে শিকেয় বদ্ধ হাঁড়ি আমার ডেস্কের উপর ঝোলানো থাকত— তার মধ্যে থাকত কালী কলম ইত্যাদি লেখ্যসামগ্রী। সন্দেশ যদি দাও আগে তার যথোচিত সৎকার করে তার পরে তাকে সাহিত্যিক ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা দেখতে পারি।

এখানে বাজারে ফুলকফি যথেষ্ট আছে, কমলানেবুর আমদানি এখনো সুরু হয় নি— চেষ্টা করলে আম পাওয়া যায়। কিন্তু এ বৎসর দৈবদুর্য্যোগে আমবাগানের উপর অত্যাচার হয়ে গেছে, তাই ফলাহারের আশা সঙ্কীর্ণ। এখানে শাকসবজির অভাব নেই। এ বৎসরটা এখানে শীতটা আশাতীত, মাঝে মাঝে শিলবৃষ্টির সহায়তায় তার স্পর্দ্ধা বেড়ে উঠচে। রৌদ্র বিরল-দর্শন, ঘন সজল মেঘে আস্তীর্ণ আকাশের প্রাঙ্গণ।

২৫শে বৈশাখে সব প্রথমে সৌরভী ফুলের গুচ্ছ পেয়েছিলুম ইংরেজিতে যাকে বলে "সুইট্‌ পীজ্‌", সেটাকে যদি তোমার দান বলে স্বীকার করো তবে আমিও তাই স্বীকার করে নেবো।

অনেক পত্র উত্তর প্রত্যাশায় জমা হয়ে রয়েচে। তার মধ্যে একটা আছে তোমার কচির। অতএব এই উপলক্ষ্যে বাসন্তীকে আশীর্ব্বাদ করে ছুটি নিলেম। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪০

দাদা

১১২

[দার্জিলিং] ১৭ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর ভালো না থাকাতে এখান থেকে নেমে যাচ্চি। সোমবারে হয় তো গাড়ি পাওয়া যাবে। তাহলে মঙ্গলবারে জোড়াসাঁকোয় পৌঁছবার কথা।

তুমি আমার কাছে কাপড় প্রভৃতি যা প্রার্থনা করে নিয়েছ তাতে যদি তোমার প্রয়োজন না ছিল, যদি সেগুলো এত দেশ থাকতে তোমার প্রতিবেশীকেই দিয়ে ফেলা স্থির করলে তাহলে নিলে কেন আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারলুম না। তুমি যখন আমার চিঠিগুলি ··· ··· ··· ···কে দেখাতে ও দিতে আরম্ভ করেছিলে তখনি আমার মনে সঙ্কোচ বোধ হয়েচে— তার পরে আমার দান বলে যা তুমি গ্রহণ করলে তাও যখন তারই হাতে গিয়ে পৌঁছল তখন স্বভাবতই আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হোলো। যা হোক এখন আর ফিরে তাকাব না— কিন্তু কেন তুমি আমার অমর্য্যাদা করতে সঙ্কোচ বোধ করলে না জানিনে। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৪০

দাদা

১১৩

[দার্জিলিং] ১৯ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা পিছিয়ে গেল। আপাতত আগামী শুক্রবারে কলকাতায় রওনা হবার কথা চলচে— অর্থাৎ গাড়ি প্রভৃতির জোগাড় হলে শনিবারে জোড়াসাঁকোয় আমার আবির্ভাব হবে।

··· ··· দেবী পুরুষবিদ্বেষী। তিনি যত কিছু প্রবন্ধ লিখেচেন তাতে পুরুষের বিরুদ্ধে অন্তহীন নালিশ দেখতে পাই। তাই তিনি যত দোষ চাপিয়েছেন শশাঙ্কের স্কন্ধে। দোষ প্রকৃতি মায়াবিনীর— মানুষের চলবার পথে তিনি চোরা ফাঁদ পেতে রাখেন— বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে হঠাৎ সে পড়ে যায় গর্ত্তে। শশাঙ্কের সংসারযাত্রার রাস্তাটা পাকা রাস্তা ছিল না, হতভাগা একদিন ঘাড়মোড় ভেঙে পড়বার পূর্ব্বে সে কথাটা সকলেরই অগোচর ছিল— দিন চলছিল ভালোই কিন্তু তলায় ছিল ফাঁকা। নিশ্চিন্ত মনে হাসতে হাসতে এক মুহূর্ত্তে হাসি গেল থেমে। শশাঙ্কে শর্ম্মিলায় জোড় মেলে নি — হঠাৎ একদিন বাইরে থেকে চাড় লাগবার আগে সে কথা কি সবাই জান্‌তে পায়— যখন জানা গেছে তখন তো কপাল ভেঙেচে। নীতিবিদরা বলবে, ফাটা কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ভালোমানুষের মতো আবার সাবেক রাস্তায় উঁচোট খেতে খেতে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে চলা কর্ত্তব্য। তাই সে চল্‌ত। কিন্তু শর্ম্মিলা বললে তেমন চলায় কোনো পক্ষেই সুখ নেই। সে তাই কোনো

একরকম করে স্বহস্তে ভাগ্যকে সংশোধন করবার প্রস্তাব করলে। কিন্তু ভাগ্যের উপর কলম চালানো এত সহজ নয়। সেটা বুঝেছিল ঊর্ম্মিমালা— ভূমিকম্পের কেন্দ্রের উপরে কাঁচা মসলায় তৈরি নড়নড়ে বাসায় সে আশ্রয় নিতে নারাজ হোলো — দিলে দৌড়। ঠিক তার পরে কী ঘটলো তা কে বলবে। কালক্রমে কাটার দাগটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু ব্যথা? ব্যথা যারা পায় তাদেরই আমরা বিচার করি— কিন্তু সব সময়ে ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি তারাই? বজ্রাঘাতে মোলো মানুষটা, তুমি বললে কিনা ওরি পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। ওটাতে কেবল দোষ দেবার অন্ধ ইচ্ছের প্রমাণ হয় দোষের প্রমাণ হয় না। ইতি ১৯ জুন ১৯৩৩

দাদা

১১৪

[দার্জিলিং। ২৩ জুন ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। ⋯ ⋯র সঙ্গে তোমাদের আলাপ পরিচয় হওয়াতে আমি লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নি। যে ঘটনাতে আমাকে হঠাৎ বিস্মিত করেচে সেটা এই— আমি কোনো কোনো লোকের চিঠিতে এই প্রশ্ন পেলুম যে, ⋯ ⋯কে আমি আমার একখানি বহির্ব্বাস ও কলম উপহার দিয়েছি এ কথা সত্য কি না? অন্তত সে এই কথা অনেককে বলেচে ও

জিনিষগুলো প্রমাণস্বরূপ দেখিয়েচে।— শুনে ভাবলুম সেই জিনিষগুলো অনাদরে তুমি তাকে দান করেচ এবং এই রকম গুজোব রটাবার অবকাশ দিয়েচ। ··· ··· কে কলম প্রভৃতি দান করা আমার দ্বারা অসম্ভব হোত না, চাইলেই আমি নিঃসঙ্কোচে দিতে পারতুম। কিন্তু কথাটা অসত্য— এবং তুমি যে আমার কোনো দান তার কাছে ফেলে রাখবে এইটেই আমার কাছে অসঙ্গত লেগেছিল। তোমার চিঠি পেয়ে বোঝা গেল আমার দান তুমি তাকে দান করো নি— বাস্ কথাটা শেষ হোলো। কিন্তু তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, ··· ··· র সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে অপ্রিয় এমন কথা কল্পনা কোরো না— যদি করো তবে সেটা আমার প্রতি অশ্রদ্ধার নিদর্শন হবে। আজ সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব। ব্যস্ত আছি। ইতি শুক্রবার

দাদা

কচির সমস্ত খবর পেয়ে খুসি হলুম।

১১৫

[কলিকাতা] ২৪ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একটা কথা মনে রেখো— আমার উপর যে যতই অত্যাচার করুক কারো উপর রাগ পোষণ করে থাকা আমার ধাতে নেই।

আমি তাতে লজ্জা পাই। অতএব …… সম্বন্ধে কোনো সঙ্কোচ কোরো না— তার সঙ্গে তোমাদের যে সম্বন্ধ হয়েচে সেটা রক্ষা কোরো তাতে আমি কোনোই অপরাধ নেব না। … র চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো লোক আমাকে নিরন্তর আঘাত করেচে — যথা … … … … … … … … … … … … …

তারা যে আমার চেয়ে হিন্দুসমাজের দরদ বেশি বাঁচিয়ে চলত তা নয়, তাদের আহার বিহারের খবর সকলেরই জানা আছে— … …ও নিজের আচারে হিন্দুসমাজের মান রক্ষা করে চলে তারও কোনো প্রমাণ নেই। অতএব এই কথাটা মানতে হবে যে অহৈতুক অনুরাগের মতোই অহৈতুক বিদ্বেষও আছে— ওটা প্রকৃতিসিদ্ধ। আমি কোনোদিন এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করি নি— এবং ভোলবারই চেষ্টা করেছি।

তোমার উপরে রাগ করেচি এই আশঙ্কা সকলের চেয়ে অসঙ্গত। যখন এই সংশয় মনে এল যে আমার দান তুমি অনাদরে বর্জ্জন করেচ তখন ক্ষণকালের জন্যে বিস্ময়ের ব্যথা অনুভব করেছি। যদি ব্যাপারটা সত্যই হোত তাহলে মনে করতুম, তুমি নিরাসক্ত,— সঞ্চয় করতে চাও না কিছুই। তাতেই বা দোষ কী।

আজ এসেছি কলকাতায়। ক্লান্ত। ও দিকে অমিয় অসুস্থ হয়ে দূরে আছে। কাজের বোঝা একা আমারই ঘাড়ে। চিঠি-পত্র লেখার সম্বন্ধে এবার সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দেবার সময় এলো। মাঝিকে তো প্রায়ই ডেকে বলি— "তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।" চেঁচিয়ে গলা ভাঙল—

কিন্তু মাঝি থাকে কোন্ পাড়ায়? সাড়া তো মিলল না। ইতি
১০ আষাঢ় ১৩৪০

দাদা

১১৬

২৫ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার ঘরে তোমার আমসন্দেশের ভোগ চলচে। হাঁড়িগুলি বড়ো সুন্দর— আমার গৃহসজ্জায় কাজে লাগবে। আমাদের সাধারণ লোকের রঙের দৃষ্টি অনিন্দনীয়— পৃথিবীতে তার খ্যাতি আছে। আমাদের দেশে— লেখাপড়া করে যেই, সে হতভাগা গাড়িঘোড়াতেও চড়ে না, তার উপরে তার স্বাভাবিক শিল্পরুচিতেও ঘুণ ধরে যায়। শান্তিনিকেতনে আমরা পটারি অর্থাৎ পাত্র-শিল্পের প্রবর্ত্তন করেছি। তোমার এই হাঁড়িসরাগুলি কাজে লাগবে।

আমার মেজাজ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো। আমি রাগী স্বভাবের লোক নই— বরঞ্চ কিছু পরিমাণে বিরাগী হতে পারি। নিবিড় আসক্তিপ্রবণতা সাহিত্যের ক্ষতি করে। কাছে থেকেও দূরত্ব না রাখতে পারলে স্পষ্টদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। সকল সাধনাতেই এই কথা খাটে। ইতি রথযাত্রা
[১১ আষাঢ়] ১৩৪০

দাদা

১১৭

[জুন ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সম্প্রতি নির্জ্জীবকুমারের আখ্যা আমাতেই খাটে। মন ও দেহ উভয়েই কর্ম্মের প্রতি বিমুখ। ছুটির কামনা করচি। কিছুদিনের মতো কলকাতায় আবদ্ধ আছি— সেটা আমার পক্ষে প্রীতিকর নয়। ইতি

দাদা

১১৮

১৩ জুলাই ১৯৩৩

ওঁ

কলাণীয়াসু

নিতান্তই চুপচাপ করে থাকব পণ করে ছিলুম। চারদিকের ছোটোখাটো দাবী চারদিক থেকে ঠেলা মেরে আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি সানুনয়ে সবার কাছ থেকে ছুটি চেয়েছি। অনেক কাল দশের ফরমাস জুগিয়ে হয়রান হলুম, যে কয়টা দিন বাকি আছে নিজের খেয়ালের রাজ্যে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করে সময় কাটাব এইটে দাবী করবার অধিকার আমি অর্জ্জন করেছি। কিন্তু ভিড়ের ধাক্কা এখনো ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। একটু ফাঁকা পেলে বাঁচি, পাই নে। প্রথম বয়সে জীবনে এই

ফাঁকা ছিল, সেই ছিল বাল্যলীলার ক্ষেত্র ; মাঝবয়সে ডাক পড়ল কর্ম্মশালায়, ফাঁকি দিই নি। আজ দিনাবসানে তারার আলোয় বড়ো করে আসন বিছিয়ে বসতে হবে,— কিছুই না করবার সেই আয়োজনও প্রশস্ত জায়গা চায়। ঠেলাঠেলির মধ্যে খেলাও হয় না বিরামও হয় না।

কলকাতায় একদিন আমার অনুপস্থিতিকালে তোমার প্রেরিত মিষ্টান্ন পেয়েছিলুম— এখানে এসে তার ভোগ সমাধা হোলো। তোমার সেই মেলায় কেনা চিত্রিত হাঁড়িগুলো আমার টেবিলের উপর নৈষ্কর্ম্ম্যে বিরাজমান। আমার চেয়ে তাদের ভাগ্য ভালো— রান্নাঘরে কেউ তাদের টানাটানি করবে না, রঙীন অবকাশ ভোগ করচে তারা। ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩৪০

দাদা

১১৯

২৪ জুলাই ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

… … …র চিঠি ফেরৎ পাঠাই। “তুই বোন” নিয়ে তাঁরই সঙ্গে যে তোমার পত্রালাপ ঘটেছিল সে কথা কাউকে বলি নি বলবার সুদূর আশঙ্কাও নেই।

সমাজ যেখানে সম্পূর্ণ অকারণে অন্যায় উৎপীড়ন করবার অধিকার কোনো এক পক্ষকে দিয়ে থাকে তখন সেটাকে বিনা

বিদ্রোহে সহ্য করা দুঃসহ। কিন্তু বিদ্রোহের দ্বারা যেখানে আত্মসম্মানের লাঘব হয় এবং অন্যায়ের প্রতিকার না করে তাকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয় সেখানে সহিষ্ণু হয়ে যে স্থির থাকতে পারে আসলে তারই জয় হয়। তুমি শান্তভাবে সেই জয়ই লাভ করো। তোমার স্নায়ু পীড়িত বলেই তোমার পক্ষে এই শান্তি দুরূহ। তবু দুঃসাধ্য সাধনই করতে হবে, কারণ অন্য রকম বিপ্লবে তোমার সেই পীড়িত স্নায়ুকে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলবে। তোমার সমস্ত সম্পদকে অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত করে তাকে তোমাকে আধ্যাত্মিক আনন্দের সহায় করে তুলো। ইতি

২৪ জুলাই ১৯৩৩

দাদা

১২০

[সেপ্টেম্বর ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দুঃসহ ক্লান্তিতে অভিভূত। এখনি চলেচি বরানগরে। দুচার দিন থাকতে হবে— একটা কাজ আছে।

আয়া ও হলা মালি সম্বন্ধে যা লিখেচ আমারো মনের কথা তাই। হলামালীর স্বদেশীয় একটি সেবক আমার আছে— সে যদি উড়ে মিশোলো ভাঙা বাংলায় কথা কইতো, তার কাছ থেকে আমার শিক্ষা হোতো— কিন্তু সে কথা কয় বিশুদ্ধ গৌড়ীয়

রীতিতে। পুরোণো আয়ার পরিচয় আছে— তার নাম ভজিয়া, আমার ছেলেমেয়েদের কাছে ছিল। তার ভাষায় খোট্টাই ছিলো না, ছিলো সুরে— সেটা বইয়ে প্রকাশ করা যায় না। অসংশোধিত কোনো আয়াকে চিনি নে— সম্প্রতি একজন ছিল আমার ঘরে তার ভাষা হিন্দুস্থানী— ব্যবহার করতে হলে সঙ্গে ব্যাখ্যাপুস্তকের প্রয়োজন হোত। তবু মালী ও আয়ার ভাষা গল্পের বইয়ে বাঁকা করতে পারলে মানানসই হোত। যখন খুসি চিঠি লিখো— দেখা যদি করো খুসিই হব।

দাদা

১২১

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।

ডাকাতকে ভয় করবার মতো অবস্থা আমার এখন নেই। যদি ভ্রমক্রমে কেউ ঘরে পদার্পণ করে তবে চাঁদা তুলে তাকে নৈরাশ্য দুঃখ থেকে রক্ষা করতে হবে।

তোমার খাতাখানি শেষ করেছি। যেখানে বর্ণনা করেছ গল্প করেচ বেশ লাগল পড়তে। যেখানে তর্ক করেচ সেখানটা আমার কাছে ব্যর্থ হয়েছে। মনের প্রবল আক্ষেপে তুমি আমার অনেক কথা ভুল বোঝো। তোমাদের হিঁদুয়ানিতে অত্যন্ত

বেশি আধুনিক ঝাঁজ — তাতে সাবেক কালের পরিণতির মোলায়েম রঙ লাগেনি। মিশনারিদের মতোই ভঙ্গী তোমাদের। যেন হিঁদুয়ানির মোল্লা মৌলবী। গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড়-বেরকরা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ— আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ— সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্যদ্বারাই চিরশুচি,— সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।— তোমাকে কিছু বই দিতে চাই— রেজেষ্ট্রি না করলে পূজোর বাজারে বই গিয়ে পৌঁছয় ডাকবিভাগের অন্তঃপুরে— কোন্ ঠিকানায় পাঠানো চলবে জানিয়ো। বিজয়াদশমী [১২ আশ্বিন] ১৩৪০

দাদা

১২২

৪ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শরৎকালের আলোয় ছুটির আমন্ত্রণ আকাশে আকাশে। কোনো কাজ না করবার মতো মেজাজে আছি, অথচ কাজ এসেচে ভিড় করে। মন ক্লান্ত হয়ে আছে অথচ কলমের বিশ্রাম নেই।

আমি মাটির মানুষ, তার মানে এ নয় যে ভালোমানুষ আমি। তার মানে এই যে ধরণীর মাটির পাত্র থেকেই আমি অমৃত পান করি— জলস্থল আকাশে আমার মনের খেলাঘর। মেয়েরা শ্বশুরঘরের উপর বিরক্ত হলেই বাপের ঘরে চলে যায়। তেমনিতরো মনের ভাব নিয়েই মানুষ দৌড় মারতে চায় বৈকুণ্ঠের দিকে— এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর উপর আমার যদি তেমন বিতৃষ্ণা হোতো আমিও তাহলে বৈকুণ্ঠের প্রতি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতুম। দরকার হয়নি বলে কল্পনাও করি নে। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি— আমার কাছে এই মর্ত্ত্যের রূপই আনন্দরূপ অমৃতরূপ— একে অবজ্ঞা করি এত বড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। এর চেয়ে আরো কিছু উঁচু আছে বলে যে মনে করে, তার নিজের চোখে দোষ আছে! আমার এই উত্তরের দিকের জানলা দিয়ে নীল আকাশ ঢেলে দিচ্চে তার আলোকসুধা, পূর্ব্বদিকের খোলা দরজার সামনে উদার পৃথিবী তার শ্যামল আমন্ত্রণ প্রসারিত করে ধরেছে— আমি এই সোনার ধারা সবুজ ধারার মোহানায় বসে দুই চক্ষুকে ছাড়া দিয়েচি, বেলা যাচ্চে কেটে— আর কি চাই আমার— বুঝতেই পারি নে যতসব হযবরল মন্ত্র। এতবড়ো সুস্পষ্টতার মধ্যেও উপলব্ধি যদি না হয় তবে কিছুতেই হবে না। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩৩

ভজনপূজনহীন দাদা

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি তো মৃত্তিকাবিলাসী মানুষ পৌত্তলিক নই। মন্ত্রের মধ্যে আত্মমন্ত্রকে যদি না উপলব্ধি করতুম তাহলে গতকামী ভিক্ষাবৃত্তি করে কি বাঁচতুম? জগৎ মায়ামূর্তি, তাই বলেই কি একেবারে অম্বুর দিয়ে সাতুয়া খেতে হবে? শীতকালের তরু পিঞ্জর তো বাঁশী হয় কি, তাই বলেই কি পাখিদের শীতের শোক করতে হবে? যারা তাই করে তারা সুর বাঁশীর পবিত্রতা বোঝে না। এই মন্ত্রহীনতাতেই শুদ্ধ সুরের আদর্শ আছে সেই জন্যেই এত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে সুর গেয়ে গেছেন — যথার্থ আদর্শ তাতেই। বৈকুণ্ঠপুরী যদি সত্যই কোথাও থাকে তাহলে সেখানে মন্ত্রের মানুষ টিঁকতে পারে না। এই পৃথিবীর মাটি দিয়েই আমাদের নিজের বৈকুণ্ঠ নিজেদেরই সৃষ্টি করতে হবে। সেই জন্যেই মানবসংসারে দুঃখ আছে — যেমন আছে অপূর্ণতা তেমনিই আছে পূর্ণতার আদর্শ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

এই বস্তুগত জগতেই আত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়েও সমৃদ্ধির দাবীই জয় করে নিতে হবে — দারিদ্র্যের সঙ্গ নিয়ে, স্বর্গপ্রাপ্তির আশা করো না। ভীরুভোগ্যা বসুন্ধরা নয়, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। এই বসুন্ধরাকে নিজের বীর্য দিয়েই উদ্ধার করতে হবে। তোমরা আলস্যে বসে লক্ষ্মীকে ডাকলে লক্ষ্মী আসবে না — যাঁরা বীর্যের সহায়ে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবে আজকের পৃথিবীতে তাঁরাই তো লক্ষ্মীকে পাবে। —

তোমাকে বিচিত্রার পাঠিয়েছিলুম — [illegible] দারোয়ানের স্বাক্ষরিত রসীদ এসেছে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পাই নি। ইতি ১১ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

১২৩

১১ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি তো মৃত্তিকাবিলাসী মাটির পৌত্তলিক নই। মর্ত্ত্যের মধ্যেই অতিমর্ত্ত্যকে যদি না উপলব্ধি করতুম তাহলে গর্ত্তবাসী কীটবৃত্তি করে কি বাঁচতুম? জগৎ অসম্পূর্ণ, তাই বলেই কি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সান্ত্বনা পেতে হবে? বীণাটার তার ঠিকমতো বাঁধা হয় নি, তাই বলেই কি নারদের বীণার ধ্যান করতে হবে? যারা তাই করে তারা সুর বাঁধবার দায়িত্ব নেয় না। এই মর্ত্ত্যবীণাতেই শুদ্ধসুরের আদর্শ আছে সেই জন্যেই এত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে সুর বাঁধতে লেগেছেন— যথার্থ আনন্দ তাতেই। বৈকুণ্ঠপুরী যদি সত্যই কোথাও থাকে তাহলে সেখানে মর্ত্ত্যের মানুষ টিঁকতে পারে না। এই পৃথিবীর মাটি নিয়েই আমাদের নিজের বৈকুণ্ঠ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে। সেই জন্যেই মানবসংসারে দ্বৈত আছে— যেমন আছে অপূর্ণতা তেমনিই আছে পূর্ণতার আদর্শ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ এই বস্তুগত জগতেই আত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিজের শক্তির দ্বারাই জয় করে নিতে হবে— পাণ্ডার শরণ নিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির আশা করব না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা নয় বীরযোগ্যা বসুন্ধরা। এই বসুন্ধরাকে নিজের বীর্য্য দিয়েই উদ্ধার করতে হবে। তোমরা আল্পনা কেটে লক্ষ্মীকে ডাকো লক্ষ্মী আসেন না— যাঁরা বীর্য্যের সহায়ে লক্ষ্মীকে আহ্বান করেন আজকের পৃথিবীতে তাঁরাই তো লক্ষ্মীকে পান।—

তোমাকে বিচিত্রিতা পাঠিয়েছিলুম— কালুঘোষের দরোয়ানের স্বাক্ষরিত রসিদ আছে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পাই নি। ইতি ১১ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

১২৪

১৬ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি নিজেকে অত্যন্ত মিথ্যা পীড়ন কর। তোমার প্রতি আমার লেশমাত্র রোষ বা অবজ্ঞার ভাব নেই সে তুমি নিশ্চয় জানো তবু থেকে থেকে নিজের মধ্যে একটা বিপ্লব বাধিয়ে তোলো। তোমাকে উপলক্ষ্য করে আমি অনেক কথা বলি কিন্তু তোমাকে বলি নে। দেশের অসীম দুর্গতির কথায় মন যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তখন চুপ করে থাকতে পারি নে। ধর্ম্মে ও নিরর্থক আচারে হিন্দুকে শতধা বিভক্ত করে রেখেচে, বিদেশীর হাতে তাই পরাভবের পর পরাভব ভোগ করে আসচি। অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রুর হাতে মার খেয়ে খেয়ে আমাদের হাড় জীর্ণ। মুসলমান, ধর্ম্মে এক, আচারে এক, বাংলার মুসলমান, মাদ্রাজের মুসলমান, পাঞ্জাবের মুসলমান এবং ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমান সমাজে সবাই এক, বিপদে আপদে সবাই এক হয়ে দাঁড়াতে পারে এদের সঙ্গে ভাঙাচুরো হিন্দুজাত পারবে না। আরো একবার আফগানিস্থানের পাঠানদের হাতে কানমলা

খাবার দিন ঘনিয়ে আসচে। পি, সি, রায় অরণ্যে রোদন করচেন, বলচেন বাঙালীর অন্ন পরের হাতে যাচ্চে। কিন্তু বাংলার মুসলমানরা পিছয় নি— দেশে বিদেশে তাদের দেখেচি জীবিকা উপার্জ্জনে— কেননা বিধিনিষেধের নাগপাশ তাদের হাজার পাকে জড়িয়ে রাখে নি। মজ্জাগত অনৈক্যজনিত দুর্ব্বলতা এবং সহস্রবিধ বিধিনিষেধের বোঝা ঘাড়ে করে এই জাত বাঁচবে কী করে? সামাজিক অসম্মান থেকে বাঁচবার জন্যে প্রতিদিন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান এবং খৃষ্টান হতে চলেচে— কিন্তু ভাটপাড়ার চৈতন্য নেই। একদা ঐ তর্করত্নদের প্রপৌত্রমণ্ডলীকে মুসলমান যখন জোর করে কলমা পড়াবে তখন পরিতাপ করবারও সময় থাকবে না।

এই সব মনের দুঃখ তোমার কাছে মাঝে মাঝে ভাষায় প্রকাশ করি তাতে ক্ষতি হয়েচে কি? দেশের কথা চিন্তা করে যে কঠিন আঘাত আমাকে বাজচে সেটা তুমি ভেবে দেখ না কেন? দেশের জন্যে আমি তোমাকেও ভাবাতে চাই— তুমি কি দেশের মেয়ে নও? ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে বেদনা দিতে আমার একটুও ভালো লাগে না— কিন্তু বিধাতার অভিসম্পাতে যে বেদনা প্রায় বিশকোটি হিন্দুর প্রাপ্য চোখ বুজে নিজেকে ভুলিয়ে তুমি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে কী করে? এ সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক নয়— এ সমস্ত দুর্ভাবনা চতুর্দ্দিকব্যাপী সুকঠোর বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রিক অধিকারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আলোচনা চল্‌চে আজকাল— যেন লঙ্কাভাগ করতে বসেচি অথচ সমস্ত লঙ্কাই যাচ্চে তলিয়ে। তুমি তো সন্তানের জননী,

হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ তোমার ছেলেমেয়েদের তুর্ব্বল স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে একদিন তুমি চলে যাবে। কিন্তু সে কী ভবিষ্যৎ, ভেবে দেখো।

আমার এই সমস্ত কথা শুনে কখনো মনে কোরো না তোমার প্রতি আমি নির্ম্মম। তোমার আচার বিচার যেমনি হোক্ না কেন তোমাকে আমি স্নেহ করতে পারব না আমার হৃদয় এত কৃপণ নয়। আমার প্রতি বিশ্বাস রেখো এবং ভুল বুঝে নিজেকে পীড়ন কোরো না। ইতি ১৬ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

১২৫

২২ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা ভালো নেই। ভাবচি বোটে করে গঙ্গাযাত্রা করব। খড়দহের সামনে বোট বাঁধা আছে। যদি যাওয়া নিশ্চিত স্থির করি কলকাতা হয়ে যেতে হবে তখন তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। মতামত নিয়ে তোমার সঙ্গে আর বাদানুবাদ করব না মনে করি, স্বভাবদোষে হঠাৎ বকুনির উদ্ভব হয়। তুমিও চুপ করে সহ্য করবার মেয়ে নও, তাই দ্বন্দ্ব বাধে। ওর চেয়ে, তুমি যে খিচুড়ি রাঁধবার প্রণালী লিখে পাঠিয়েছ সেটা অনেক বেশি উপাদেয়। আমাদের এখানে একজন রন্ধনপটু ভোজনবিলাসী মানুষ আছে সে তোমার ডাল ও খিচুড়ির স্বাদ গন্ধ কল্পনা করে

পুলকিত, আমাকে যথাবিধি রেঁধে খাওয়াতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। এমনি করে পরোক্ষে তোমার ভোজের নিমন্ত্রণ মাঝে মাঝে আমার ভাগ্যে জুটবে এমন একটা পন্থা পাওয়া গেল। সেই মানুষটা কিছুদিন থেকে নূতন প্রণালীর মোচার ঘণ্ট কোথা থেকে আবিষ্কার করে উত্তেজিত হয়ে আছে। একদা পদ্মার চরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র কিছুকাল আমার অতিথি ছিলেন — প্রতিদিন তাঁর জন্যে নূতন একটা করে ভোজ্য আমি উদ্ভাবন করেছি— সেটা প্রস্তুত করবার ভার ছিল যাঁর পরে তাঁরও কিছু কৃতিত্ব তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এসব তিনি লিখে রেখেছিলেন খাতায়, সেই খাতা দখল করেছিল আমার বড়ো মেয়ে— সেও নেই, খাতাও অদৃশ্য— গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ খাদ্য নিরবধি, তার উপায় রইল না, অথচ রইল কতকগুলো কবিতা। ইতি ২২ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

১২৬

৫ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার বয়সের নিশ্চিত খবর আমার কাছে জানতে চেয়েচ। আমি ত্রিকালজ্ঞ নই তবু ধ্যানযোগে যেটুকু জানলুম তাতে বোধ হচ্চে তোমার বয়স একশো দেড়শোর কম হবে না— দাশরথী রায়ের চেয়ে বোধ করি কিছু ছোটো হবে। ষাট বছর পূর্ব্বে

আধুনিক কালের প্রথম যুগে রবি ঠাকুর যে সব ছড়া রচনা করত সেগুলো স্বভাবতই তোমার প্রাচীন বয়সের মনঃপূত ছিল। বর্ত্তমান যুগের নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা রচনা করে তার অর্থ বোঝবার মতো বয়স তোমার অনেককাল হোলো পেরিয়ে গেছে— বোধ করি রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার পূর্ব্বেই। তোমার আগামী জন্মদিনে তোমাকে শিবায়ন মনসামঙ্গল কিনে পাঠিয়ে দেব— পড়ে খুসি হবে, ভূষণের মাকেও পড়ে শোনাতে পারবে— কিন্তু খুকুকে শোনাবার চেষ্টা করলে অশান্তির কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা করি।

আমার এখানে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী নামে একটি ভদ্রলোক আছে রন্ধন ব্যাপারেই তার সব চেয়ে উৎসাহ। তোমার পূর্ব্ব পত্রের এক অংশ শুনে তার ঔৎসুক্য প্রবল হয়েছিল। তোমার এবারকার চিঠির ত্রয়োদশপদী মোচার ঘণ্টর তালিকা দেখিয়ে তার উল্লাসবর্দ্ধন করব এই আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সেটা মীরা নিয়ে গেল বলপূর্ব্বক। তারও রাঁধবার শক্তিও আছে অনুরাগও আছে। তার সকলের চেয়ে বড়ো সখ বাগানে। তার বাড়িটি ঘিরে যে বাগান বানিয়েছে যে দেখে সেই বিস্মিত হয়।

তোমাকে পূরো বহরের চিঠি লিখ্‌তে পারব না। দুর্ব্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলুম বোটে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংগ্রহ করে দুর্ব্বলতর অবস্থায় ফিরে এসেছি— কিছুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন।

সেই যে পথিক ভদ্রলোকটির মাথায় বৃক্ষবৃষ্টির দ্বারা

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার বয়সের বিস্মিত স্বর আমার কাছে সঙ্গত ঠেকেছে। আমি ত্রিকালজ্ঞ নই তবু হাবভাবে যেটুকু জানলুম তাতে বোধ হচ্ছে তোমার বয়স একেবারে দেড়শো কম হবে না — দাশরথী রায়ের চেয়ে বোধ করি কিছু ছোট হবে। তার বহুর পরে আধুনিক কালের প্রথম যুগে রবি ঠাকুর যে সব ছড়া রচনা করত সেগুলো স্বভাবতই তোমার প্রাচীন বয়সের মনঃপূত ছিল। [illegible] বর্তমান যুগের নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা রচনা করে তার অর্থ বোঝবার মতো বয়স তোমার অনেককাল হোলো পেরিয়ে গেছে — বোধ করি রবীন্দ্রনাথ সম্মানার্হ প্রাচীন। তোমার আগামী জন্মদিনে তোমাকে শিবায়ন মনসামঙ্গল কিনে পাঠিয়ে দেব — পড়ে খুসি হবে, ছেলের মাকেও পড়ে শোনাতে পারবে — কিন্তু খুকুকে শোনাবার চেষ্টা করলে

অপরাধিত্বর কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা করি।

আমার এখানে সুধীকান্ত রায় চৌধুরী নামে একটি ভদ্রলোক আছেন [illegible] ব্যাপারেই ওর সব চেয়ে উৎসাহ। তোমার পূর্বপত্রের এক অংশ শুনে তাঁর ঔৎসুক্য প্রবল হয়েছিল। তোমার এবারকার চিঠির প্রত্যাশী আমার ঘরের ... দেখিয়ে ওর উল্লাসবর্ধন করব এই আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সেটা মীরা নিয়ে গেল বোলপুরে। ওরও উঁচুদরের শক্তিও আছে অনুরাগও আছে। ওর সকলের চেয়ে বড়ো সখ বাগানে। ওর ডাঙাটি ঘিরে যে বাগান বানিয়েছে যে দেখে সেই বিস্মিত হয়।

তোমাকে পুরো ওজনের চিঠি লিখতে পারব না। দুর্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলুম কাশী, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংগ্রহ করে দুর্বলতর অবস্থায় ফিরে এসেছি — কিছুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন।

সেই যে পথিক ভদ্রলোকটির মাথায় ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারা তরোবারির সাহায্যে সাহিত্যের সুযোগ ঘটিয়েছিলে তাঁর হাল অবস্থা জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত আছি। তাঁর গৃহিণী অনিন্দিতার উদ্দেশে কী রকম বাক্যবৃষ্টি করছেন সেটাও জানবার যোগ্য। ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩

দাদা

তরোরিব সহিষ্ণুতা সাধনার সুযোগ ঘটিয়েছিলে তাঁর হাল অবস্থা জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত আছি। তাঁর বাড়ির গৃহিণী অনির্দ্দিষ্টার উদ্দেশে কী রকম বাক্যবৃষ্টি করচেন সেটাও জানবার যোগ্য। ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩

দাদা

১২৭

[নভেম্বর ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার প্রাচীনতা নিয়ে উপহাস করেছিলুম। সেটা ফেরৎ নিতে চাই। এবারকার চিঠির সঙ্গে যে কবিতা পাঠিয়েছ সেইটেই যথোচিত উত্তর হয়েছে। দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক আধুনিক তরুণ কবির কাব্যরস অন্তরে ও লেখনীমুখে গ্রহণ করতে পেরেছ। যদি তোমার সম্মতি পাই তবে ওটা কোনো একটা কাগজে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি। তোমার নাম প্রকাশ করা হয়তো তোমার অভিপ্রেত হবে না— অনাম্নীভাবেই চালানো যেতে পারে।

শরীর ভালো নেই। আগামী ২১ নবেম্বর বোম্বাই যাত্রা করতে বাধ্য। কর্ম্মবন্ধনের ফাঁস লাগিয়ে অনিচ্ছুককে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে। বোলপুর থেকেই যাত্রা করব। ফিরতে বোধ করি ১৫ ডিসেম্বর।

তোমার চিঠিতে মাঝে মাঝে তোমার ইচ্ছাময়ী কন্যার

যে ছবি পাই আমার খুব ভালো লাগে। তোমার প্ল্যানমতো ওর মনটাকে ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা কোরো না— ও নিজের ভিতর থেকে আপনাকে আপনি ঠিকমতোই উদ্ভাবিত করে তুলবে সেইটেতেই ওকে রমণীয় করবে সন্দেহ নেই। ওর যে স্বাতন্ত্র্য আছে সেটা মূল্যবান জিনিষ।

আজ আর আমার কলম চলচে না— ছুটি নিই। ইতি

দাদা

১২৮

[বোম্বাই] ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ে এসেছি বোধহয় খবরের কাগজে পড়ে থাকবে। ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। বাংলাদেশের লোকের মতো এরা আমাকে অত্যন্ত বেশি জানে না, তাই আমাকে অত্যন্ত বেশি শ্রদ্ধা করে। তাই অভ্যর্থনার বিরাট পর্ব্বের পালা চলচে। এতটা আমার সয় না। এখান থেকে কাল যাত্রা করব ওয়াল্‌টেয়রে, সুদীর্ঘ পথ। সেখানে পৌঁছিয়েই বক্তৃতার পর্য্যায় আরম্ভ হবে। তার সঙ্গে অভিনন্দন ইত্যাদি। তার পরে খুব সম্ভব ১২ কিম্বা ১৩ই ডিসেম্বরে সেখান থেকে যাত্রা করে কলকাতায় গিয়ে হাজির হব ১৪ই কিম্বা ১৫ই। সেখানেও কিছু কাজ আছে— জোড়াসাঁকোয় দুই একদিন থেকেই বরানগরে আশ্রয় নিতে হবে— কলকাতায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

অবশেষে শান্তিনিকেতন। এখানকার লোকদের খুসি করতে পেরেচি কারণ বাঙালীর মতো এরা নিরতিশয় বুদ্ধিমান নয়।

অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছিলুম এখানে ভালো আছি। ইতি
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩

দাদা

১২৯

৪ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অকস্মাৎ তোমার চিঠিতে অত্যন্ত ক্ষোভের ভাষা দেখে আমি কারণ কিছুই ভেবে পেলুম না। তুমি লিখেছ সাহিত্য আশ্রয় করে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছি— কোথায় করেছি অনেক ভেবে স্থির করতে পারি নি— অর্থাৎ আমার কোন্ লেখার কোন্ অংশে এমন কিছু আছে যার থেকে তুমি কল্পনাও করতে পারো যে আমি তোমাকেই লক্ষ্য করে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছি আমি তা অনুমান করতে পারলুম না। এমনতরো প্রচ্ছন্ন আঘাত আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করতে পারি এও তুমি কী করে চিন্তামাত্র করতে পারো এই আমার কাছে নিরতিশয় বিস্ময়কর মনে হচ্চে। আমার স্বভাবে এ রকম হীনতা নেই এ তুমি নিশ্চয় জেনো। এর থেকে এইটুকুই ধরে নিচ্চি যে আমার স্বভাব তুমি কিছুই জানো না।

আমি কোনো দিন তোমাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করি নি।

ধর্ম্ম এবং আচার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মূলগত প্রভেদ আছে সেই দিক থেকে তোমাকে যদি পীড়া দিয়ে থাকি সে অনিবার্য্য— সে তোমার প্রতি নির্মমতাবশতঃ নয়। যাই হোক তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

আশঙ্কা করেছ তোমার চিঠিপত্রে চাপল্য প্রকাশ করে তুমি আমার গৌরবহানি করেছ। গৌরবের প্রতি আমার লেশমাত্র লোভ নেই। আমাকে তোমাদের সমান ক্ষেত্রে আপন বলে স্বীকার করে নিয়েছ, আমার সঙ্গে সাধারণভাবে গল্প করতে হাস্যালাপ করতে সঙ্কোচ বোধ কর না এতে আমি খুসি থাকি— তোমার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা শুনতে আমার ভালোই লাগে। তোমাকে গাম্ভীর্য্যের দ্বারা অভিভূত করা আমার স্বভাবসিদ্ধ নয়।

কচিকে অনেক দিন পরে দেখে ভালো লাগল। তোমাকে নিয়ে একদিন আসবে বলেছিল— বোধ হয় সুযোগ হয় নি। ইতি ৪ জানুয়ারি ১৯৩৪

দাদা

১৩০

৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর খারাপ, ভালো করে লিখতে পারবনা। তোমার চিঠি পড়ে মনে বেদনা পেলুম। আমি যদি তোমার

দুঃখের কোনো কারণ ঘটিয়ে থাকি সে আমার জ্ঞানকৃত নয়— ইচ্ছাকৃত হতেই পারে না।

তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেচ তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি যা কিছু আলোচনা করেচি সে তোমার বুদ্ধিকে স্পর্শ করে থাকবে কিন্তু তোমার সংস্কারকে পরাভূত করতে পারে নি। যে পথে তোমার পূজাবৃত্তি এতকাল তৃপ্তি পেয়েছে সেই পথেই তোমার হৃদয় স্বভাবতই ছুটতে চায়। তোমার বুদ্ধিশক্তি আজ তাকে বাধা দিয়েছে কিন্তু বিমুখ করতে পারে নি। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে তোমার স্বভাব আজ পীড়িত। এই ব্যথা তোমাকে আমি দিয়েচি— গভীরতর ভাবে তাতে তোমার ক্ষতি হয়েচে বলে মনে করি নে। ভক্তিকে বুদ্ধি থেকে ভ্রষ্ট করলে তার মূল্যহানি করা হয়— তাতে নিজের মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটে।

যাই হোক সম্প্রতি তুমি নিজেকে যে কাল্পনিক দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত করেছ সেটাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। আর যাই হোক আমার প্রতি অবিচার করা তোমার উচিত হয় না। আমি তোমার প্রতি কোনো নির্ম্মমতা করি নি— করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইতি ৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

দাদা

১৩১

[শান্তিনিকেতন] ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় যেতে বোধ করি আরো কিছুকাল দেরি হবে। পনেরোই মাঘ নাগাদ সেখানে আমার যাবার সম্ভাবনা।

গেলবার কলকাতায় থাকতে তোমরা আমাকে মিষ্টান্নের ডালি পাঠিয়েছিলে। তার প্রাপ্তিসংবাদ দিতে কেন ভুল হোলো সে কথাটা খুলে বলি। যেদিন উপহার পাওয়া গেল তার পরদিনেই আমার বোলপুরযাত্রা ছিল স্থির। তাই সেই ভোজ্যগুলি পূর্ব্বেই পাঠিয়ে দিয়ে বসেছিলুম। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল অনেকগুলি পরদেশিনী মেয়ে সেই ট্রেনেই চলেচেন শান্তিনিকেতন দেখতে। এঁরা ভারতের নানা প্রদেশ থেকে এসেছিলেন নিখিলভারত নারীসম্মেলন সভায়। আমার তখন মন ক্লান্ত ছিল তাই ভয় পেয়ে গিয়ে যাত্রা পিছিয়ে দিলুম। আমার মিষ্টালাপের পরিবর্ত্তে মিষ্টান্নগুলি সেই অতিথিদের ভোগে লেগেছিল। শুনেছি তাঁরা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই সেগুলি নিঃশেষে সমাধা করেচেন। এই পুণ্যের ভাগী কে হবে সে প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তাঁদের প্রতি এ আমার ইচ্ছাকৃত আতিথ্য ছিল না, তাঁদের প্রতি তোমারও এ ইচ্ছাকৃত দান নয়। যা হোক এখন অন্তত নিজের মনের লোভ ও দাবী দূর করে দিয়ে তাঁদের ভুক্ত দ্রব্য মনে মনে তাঁদেরই কাছে উৎসর্গ করি। তোমার পুণ্য এই, তুমি অজ্ঞানত আমার অতিথিসেবায় সহায়তা

করেছ, এখন তাতে তোমার সজ্ঞান সম্মতির যোগ দিয়ো। রথী এখানে ছিলেন তিনি অংশ পেয়েছেন এবং আয়োজনের উপাদেয়তাসম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসা করেচেন। ইতি ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪

দাদা

১৩২

২২ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পিঠে রচনাপ্রণালীর তালিকা বৌমাকে দিয়েছি— আশা করি দেওয়াটা সার্থক হবে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে রবিঠাকুর পিঠের নৈবেদ্য মাঝে মাঝে পেয়েছেন।

সেদিন ভূমিকম্প যখন ঘটল সেই সময় চৌকিতে বসে আমার ডেস্কটাকে আবর্জ্জনামুক্ত করছিলুম। ডেস্ক এবং চৌকি একসঙ্গেই মাথা নাড়লে, সেটাকে আমি দৈবসঙ্কেত বলে মনে করি নি। প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্যে মানুষের পাপপুণ্যকে দায়ী করবার মতো মনোভাব আমার নয়, অন্ধ নির্ম্মম প্রকৃতি আমাদের কৃত্য অকৃত্যের হিসাব রাখে না, তার হিসাব জড়শক্তির ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে।

এখানে আমার কাজ আছে ২৩শে মাঘ পর্য্যন্ত। তার পরে কলকাতার প্রতি মনোযোগ করবার অবকাশ হবে। হয়তো ২৫

তারিখে কলকাতায় যাব। সেখানে আমাদের ঘরকন্নার ব্যবস্থা যথোচিত নেই তাই আশ্রয় নিতে হবে বরানগরে। বরানগরের ঘাটে আমাদের বোট আছে সেখানেও কদাচিৎ দিনযাপন করব। কচিকে বোলো কোনো এক সময়ে তোমাকে নিয়ে আসবে তাহলে দেখা হতে পারবে। শীত খুব প্রবল সেটাও আমার বিশ্বাস সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোনো একটা বোঝাপড়া নিয়ে— পূর্ব্বজন্মে তুমি দর্জ্জির দেনা শোধ করতে ভুলেছিলে বলে নিশ্চয়ই নয়। ইতি ৮ মাঘ ১৩৪০

দাদা

১৩৩

২৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে যখন তুমি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করো তখন বুঝতে পারি সেটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার শিক্ষা আমার হয় নি, কিন্তু তোমার পিঠে প্রস্তুতের প্রকরণ পড়লে পরীক্ষার পূর্ব্বেই বুঝতে পারি সেগুলো শ্রদ্ধার যোগ্য। এমন কি বৌমা তোমার রচিত পৈষ্টকী সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন— শাস্ত্র অনুসারে তোমার এই লেখাগুলিকে কাব্য বলা যেতে পারে কেননা সাহিত্যদর্পণ বলেচেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।— তোমার চিঠিতে ভূমিকম্পকে

আমাদের পাপের ফল বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলে। মনে আছে এর আগে বাংলাদেশে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তারি কিছুকাল পরে জাহাজে করে কটকে যাচ্ছিলুম। শুন্‌তে পেলুম আমার চৌকির কাছাকাছি বসে একটি বাঙালি মেয়ে তার সঙ্গিনীকে কানে কানে বলছিল, হবে না ভাই? দেখলি তো আমাদের পাড়ায় অমুক ইত্যাদি।— তোমার মুখেও ঐ ধরণের কথা শুনেচি। তার পরে কাল খবরের কাগজে পড়ে দেখলুম মহাত্মাজিও ঐ ধরণের কথা বলেছেন, জানিয়েচেন অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচারের ফলে ভূমিকম্প ঘটচে। তার থেকে বুঝলুম যে … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

এর পরে ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মন্ত্র তোমার কাছেই আমাকে নিতে হবে দেখ্‌চি। বিধাতা তাঁর পুণ্যের জোরে সৃষ্টি করেন, আমরা পাপের জোরে তা ভেঙে চুরে দিতে পারি এ তো কম অহঙ্কারের কথা নয়। জীবনে অনাচার অত্যাচার অনেক করেচি ভয় হচ্চে কোন্ দিন সকালে উঠেই দেখব সূর্য্য গেছে নিবে আর রান্না চড়িয়ে দেখা যাবে উনন থেকে জলের ফোয়ারা উঠচে। যতদূর পারি ভালো ছেলে হবার চেষ্টা করব। ১৩ মাঘ ১৩৪০

দাদা

১৩৪

[শান্তিনিকেতন] ১ মার্চ ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইতিমধ্যে তোমাকে চিঠি লেখার ব্যাঘাত কেন ঘটেচে তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলি। যেদিন তোমার চিঠি পাই সেই দিনই শান্তিনিকেতনে ফিরতে হোলো এখানে বসন্ত উৎসবের আয়োজন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এখানে পৌঁছবার পরদিনই হিন্দুস্থান কোঅপরেটিভ ইন্‌সুরেন্স্ আমাকে বারে বারে টেলিগ্রাম বর্ষণ করতে সুরু করলে— ওদের পঁচিশ বৎসরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে গার্ডন্ পার্টি, আমি না গেলে নয়। প্রথমে করলুম অস্বীকার— কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে ভালো মানুষদের হার হয়। এখান থেকে বর্দ্ধমান, তার পরে বর্দ্ধমান থেকে তাদের মোটরে করে কলকাতায় গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলুম আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে। তার পর দিনে কলকাতায় আর এক নিমন্ত্রণে জড়িয়ে পড়লুম, কোনো আত্মীয়ের বিবাহসাম্বৎসরিক। এড়ানো অসম্ভব হোলো। পরদিন প্রাতেই ইন্‌সুরেন্সের মোটরে চড়ে বর্দ্ধমান, এবং বর্দ্ধমান থেকে এখানে পৌঁছলুম অপরাহ্ণে। তার পর থেকে উৎসবের ব্যবস্থা। আজ উৎসবের দিন। সকাল বেলার পালা সেরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। চার দিকে আজ অভ্যাগত আগন্তুকের ভিড়। কোনোমতে সময় করে নিয়ে তোমাকে এই আশ্বাসবাণী জানাচ্চি, এখনো বেঁচে আছি। আজকের দিনের কাজ শেষ করে কালও বোধ হয় টিঁকে থাকব। তুমি নিরুদ্বিগ্ন

চিত্তে নিজের চিকিৎসায় মন দিয়ো, ওষুধ এবং পথ্য সম্বন্ধে নিয়মপালনে ঔদাসীন্য কোরো না। তোমার শরীরে কোনো রোগ নেই সে আমি পূর্ব্বেই নিশ্চিত জানতুম— নিজের মনের প্রতি তুমি নির্ম্মম, কল্পনার যোগে তাকে কারণে অকারণে নিয়তই পীড়ন করা তোমার অভ্যস্ত হয়ে এসেচে। তোমার কল্পনাকাশে ঊনপঞ্চাশ বায়ু এলোমেলো ভাবে বইতে থাকে, সোজা জিনিষকে বাঁকিয়ে দেয়, আস্ত জিনিষকে ভেঙে ফেলে। সেই বায়ুকে শান্ত করবার কোনো ওষুধ যদি কবিরাজের ঝুলিতে থাকে তাহলেই তুমি শান্তি পাবে। আমার কাছ থেকে যদি চিঠি না পাও তাহলে নিশ্চয় জেনো তার কারণটা নিতান্ত বাহ্যিক এবং উপেক্ষার যোগ্য— কখনো থাকি ক্লান্ত, কখনো থাকি ব্যস্ত, কখনো থাকি অন্যমনস্ক, তাছাড়া আলস্য আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমার মজ্জায় সঞ্চার করে দিয়েছেন— তাঁর অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে হার মানতেই হয়। ইতি দোলপূর্ণিমা [১৭ ফাল্গুন] ১৩৪০

দাদা

১৩৫

৮ মার্চ ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাসন্তী ফুলের খবর জানতে চেয়েছ। ভাষায় বর্ণনা করে জানাবার উপায় নেই। একটি ফুল চিঠির মধ্যে পাঠালুম— কিন্তু ডাকঘরের দলনে পিষ্ট হয়ে যখন তোমার হাতে পৌঁছবে

তখন নিষ্ঠুর শাশুড়ীর পীড়নে অবসন্ন নববধূর মতো ওর পরিচয় ক্লিষ্ট হয়ে যথার্থ আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। বসন্তের প্রথম সমাগমের আমন্ত্রণে এই ফুল আমার বাগানে গাছ ভরে ফুটে উঠেছে— এর কচি পাতাগুলি সিঁদূরে বরণ, তারি স্তরে স্তরে সোনার রঙের অজস্র ফুল যেন বসন্তের বীণায় বাহার রাগিণীর ঝঙ্কার লাগিয়েছে, বাতাসে দিয়েছে সুগন্ধের মীড়। এই সময়-টাতেই আর এক জাতের শাদা ফুল গোল গোল মঞ্জরীতে শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এখানকার লোকের কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলে বুনো ফুল নাম জানা নেই। আমরা সেই অনাদৃত জঙ্গল থেকে আনিয়ে কিছুকাল আগে বাগানে লাগিয়েছিলুম এখন তার পুরস্কার পাচ্চি। সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতা বিস্তার করেছে। আমি এর নাম দিয়েছি বনপুলক। এর গুচ্ছ কতকটা রঙন ফুলের মতো, কিন্তু এ অন্য জাতের— এর গন্ধ কোমল অথচ ব্যাপক। এরা বসন্তের প্রথম দূতী, ঋতুরাজের আগমন ঘোষণা করেই রঙ্গভূমি ত্যাগ করে নেপথ্যে চলে যায়। এরা যেন নাটকের নান্দীর মতো— দুটি একটি শ্লোকেই কাজ সেরে এরা বিদায় গ্রহণ করে। এদের আর একটি সহচরী আছে, সে মাধবী। দেখা দেয় শাখায় শাখায় মঞ্জরিত হয়ে, বেশি দিন থাকে না, বধূ যেন শ্বশুর বাড়িতে এসেই বাপের বাড়িতে ফেরবার জন্যে উতলা হয়ে ওঠে। আর একটি ফুল শীত ফুরোতে না ফুরোতে আমার বাগানে দেখা দিয়েছে, সে কাঞ্চন। তার প্রগল্‌ভতার অন্ত নেই, সমস্ত গাছ যেন মুখরিত করে সে খিল্-

খিল্ করে হেসে উঠেছে। বনভূমিতে সকলের আগে সেই চোখে পড়ে। আমাদের শালবীথিকা দেয় বসন্তের শেষ বিদায় অঞ্জলি, তরুতল বিকীর্ণ করে দেয় ঝরা পাপড়িতে, দক্ষিণ বাতাসের পথে প্রসারিত করে দেয় সৌরভের আস্তরণ। আর এই সঙ্গে আছে আমের মুকুল, তার তর সয় না, মাঘের সুরু থেকেই সে অভিসার আরম্ভ করে। এবারে শিলবৃষ্টিতে আর কুয়াশায় সে মুহ্যমান হয়ে গেছে, মৌমাছিদের নিমন্ত্রণের আসর জম্‌ল না।

রথী ও বৌমা ভুবনেশ্বর থেকে ফিরেছেন। সেখানে ভালো ছিলেন। আমিও যাব সঙ্কল্প করেছিলুম, হয়ে উঠল না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার গিয়েছিলুম, খুব ভালো লেগেছিল— পুরীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। ইতি ৮ মার্চ্চ ১৯৩৪

দাদা

রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার লোক পেয়েছ শুনে ভীত হলুম— সেরকম লোক কলকাতায় আছে বলে জানিনে। বিকৃত করে শেখাবে। তোমার মেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দাও, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ওস্তাদ করে দেব। কিন্তু নজরুলের গান আমরা জানিনে।

১৩৬

২৯ মার্চ ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেকখানি কুঁড়েমি এবং কিয়ৎপরিমাণ কাজ নিয়ে আমার সমস্ত সময় জোড়া ছিল। বসন্তের আসর বেশ সরগরম হয়ে

উঠেছে— এখন সামনের ঐ দোলায়মান পুষ্পিত লতামণ্ডপের দিকে তাকিয়ে যা ইচ্ছে তাই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে কেদারা জুড়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। লেখবার ডেস্ক থেকে দূরে থাকি— উঠে গিয়ে কর্ত্তব্য সমাধা করি শরীরে মনে এতটা উদ্যম নেই। অলস মনটা পায়চারি করে বেড়ায় দূর অতীত কালে যখন বয়সের সঙ্গে বসন্তের সহযোগিতা ছিল।

সম্ভবত আগামী সোম কিম্বা মঙ্গলবারে কলকাতা অভিমুখে যাব। সেখানে আমার আত্মীয়বর্গ রক্তকরবী অভিনয়ে প্রবৃত্ত, তাদেরি আহ্বানে আমাকে যেতে হচ্চে। কর্ত্তব্য সমাধা হলেই ফিরে আসতে হবে। কলকাতায় থাকবার উপযুক্ত সময় এখন নয়। ইতি ২৯ মার্চ্চ ১৯৩৪

দাদা

১৩৭

২ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী বুধবার সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় পৌঁছব। এবার জোড়াসাঁকোতেই অল্প কয়েকদিন কাটাবার সম্ভাবনা আছে। যদি পারো, দেখা করতে এসো, খুসি হব। বসন্তের প্রতাপ ক্রমশ কিছু উগ্র হয়ে উঠচে— নিদাঘকে এরই মধ্যে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হোলো বলেই অনুভব করচি। গ্রীষ্ম আমার

জন্মঋতু, তার বিরুদ্ধে কখনো নালিশ করি নে। আমার অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল গরমের দিনে, এবং বর্ষায়। শীতের মাসগুলো কর্ম্মের মাস— যত দায়িত্বের বোঝা তখন কাঁধে এসে চাপে। আমার মনের স্বরাজ হচ্চে গরমের দিনে। আমার কাব্যে রুদ্রদেবের এত বেশি অবতারণা দেখতে পাও তার কারণ রৌদ্রেই আমার চিত্তের অভিষেক— রুদ্রের তাপতপ্ত ললাটের তৃতীয় নেত্ররই দীপ্তি বিগলিত করেছে আমার কাব্যধারাকে। ইতি ২ এপ্রেল ১৯৩৪

দাদা

১৩৮

[কলিকাতা] ৭ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল রক্তকরবী অভিনয় থেকে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে জোড়াসাঁকোয় ফিরে তোমার প্রেরিত ফল ও মিষ্টান্নের অর্ঘ্য দেখে খুসি হয়েছি— আজ প্রাতঃকাল থেকে একাধিকবার ওগুলি আমার ভোগে লেগেছে— আরো একাধিকবার লাগবে এমন সম্বল এখনো অবশিষ্ট আছে। ভালো না লাগলে ভোজের এমন পুনরাবৃত্তি ঘটত না। তোমার চিঠিখানি থেকে অনেকদিন পরে একটা রহস্যের উদ্ভেদ হোলো। একটা টিফিনবাহিনী হঠাৎ আমার তৈজসপত্রের অন্তর্গত হয়ে বিরাজ করচে দেখা গেল, যাকেই জিজ্ঞাসা করি কেউ তার মালেকের খবর বল্‌তে পারে না—

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আছি ; কী করে দায়মুক্ত হতে পারব সে চিন্তা অনেক করেছি কিন্তু কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভবপর না হওয়াতে এই টিফিনবাহিনী সম্বন্ধে পর-জন্মের একটা দুর্গতির কারণ সৃষ্টি করে বসে আছি। এবার দায়মোচনের উপায় হোলো। যদি বলো কালুঘোষের লেনে লোক মারফৎ পাঠাতে পারি— অথবা তুমি স্বয়ং যদি কোনো সদুপায়ে তোমার সম্পত্তি উদ্ধারের পথ করতে পারো, আমার পক্ষ থেকে বাধা পাবে না।

আগামী কল্য প্রাতে এখান থেকে বরানগরে প্রস্থান করব। দুচারদিন পরেই ফিরব শান্তিনিকেতনে। তার পরে হপ্তাকয়েক বাদে যাত্রা করব সিংহলে। তুমি মেয়েকে নিয়ে যাবে গৌরীপুরে — খুকুর কথা চিন্তা করে আমি মনে বেদনা বোধ করি। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ৭ এপ্রেল ১৯৩৪

দাদা

১৩৯

১১ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

চলে এসেছি স্বস্থানে। পথে বৃষ্টিধারা আমার অনুসরণ করেছে। এখানে এসে দেখি গাছে গাছে কবির অভ্যর্থনা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, ঝল্‌মল্‌ করচে পাতাগুলি। বৃষ্টির আশা এখনো দিগন্তে পুঞ্জিত হয়ে আছে।

আমরা সিংহল বিজয়ে যাত্রা করব ২২।২৩শে বৈশাখে। এবারে আমার জন্মদিন দেখা দেবে সমুদ্রে। চিরদিনই আমি পারের যাত্রী, কোনো শান-বাঁধানো ঘাটে আমি কখনো নৌকা বেঁধে দিন কাটাই নি, অতএব সমুদ্রপথেই আমার জন্মদিন সার্থক। বার বার পথে পথে আমার জন্মদিনের আবির্ভাব হয়েছে, কোনো একটা পথপ্রান্তেই বোধ করি তার সমাপন হবে।

মালঞ্চ এখনো হাতে পাই নি, পেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর দেশের দুর্গতি মোচনের ভারার্পণ করে যে ফর্দ্দ পাঠিয়েছ, দেখে আমার হৃৎকম্প হোলো। আমি সামান্য কবি মাত্র, সংস্কারক নই। স্বদেশের উপকার করবার যোগ্যতা থাকলে লাইন মিলিয়ে ছড়া লিখে বয়স কাটিয়ে দিতুম না। ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতার বই লিখেছি, তার সময় পেতেম কোথায়। আশা করি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে ক্ষমা করবেন— কারণ আমাকে তিনি তাঁর নিজেরই মতো দায়িত্ববিহীন কাজে নিযুক্ত করেছেন। ইতি ১১ এপ্রেল ১৯৩৪

দাদা

তোমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ হোক এই প্রার্থনা করি। খুকুকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।

১৪০

১৭ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে "পুনশ্চ" বইখানি আমি দিই নি তার কারণ মনে ভয় ছিল পাছে এর সৃষ্টিছাড়া আধুনিকতায় তোমার মন বিগড়িয়ে যায়। অনেক গণ্যমান্য লোকও এটাকে নিয়ে হাস্য পরিহাস করেছে এবং বলেছে তারা তাদের প্রতিদিনের বাক্যালাপে আজন্মকাল এই "পুনশ্চ" কাব্যই রচনা করে আসচে। অথচ একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইদানীং আমার অন্য বইয়ের চেয়ে "পুনশ্চ"র কাটতি বেশি। এরই মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হচ্চে।

Sabot একরকম কাঠের তলা দেওয়া জুতো— য়ুরোপের অনেক দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে চলিত আছে। এ কথাটা তোমার ডিক্‌সনারিতে পাও নি সে জন্যে সঙ্কলনকারীকে দণ্ডনীয় করা চলবে না— কেননা ও কথাটার প্রয়োগ ইংরেজি সাহিত্যে বিরল। "অনুবাদচর্চ্চা" বলে আমার দুখণ্ড বই আছে, একটা ইংরেজি একটা বাংলা, সেই দুটো অবলম্বন করে তুমি এবং খুকু প্রত্যহ যদি তর্জ্জমা অভ্যাস করে যাও তাহলে ইংরেজি শেখার কাজে লাগবে। বইখানা হাতের কাছে থাকলে তোমাকে পাঠিয়ে দিতুম। মূল্য সামান্য কিন্তু তার উপযোগিতা তার চেয়ে অনেক বেশি— দোষ নিয়োনা, নিজের কীর্ত্তি ঘোষণা করার প্রয়োজন হলে সেটা করা কর্ত্তব্য।— কৃষ্ণপক্ষের অবসান কালে ঝড়বৃষ্টি

হয়ে গেছে, শুক্লপক্ষে রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠল— অতএব এখন দ্বীপান্তর শ্রেয়, চল্‌লুম সিংহলে— তোমরা গৌরীপুরে পল্লিলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হস্তের শুশ্রূষা ভোগ করোগে। ৪ বৈশাখ ১৩৪১

দাদা

এইখানে আর একটা কথা বলে নিই। বঙ্গশ্রীতে তুমি আমার লেখা দেখে বিস্মিত হয়েছ। ওর কারণটা এই, এখন অন্নাভাব। লেখা বিক্রয় করা ছাড়া জীবিকার অন্য সাধু উপায় জানি নে। শ্রুত ছিলেম যে উদয়ন ও বঙ্গশ্রী কাগজের মালেকরা ধনশালী, লেখার মূল্য দাবী করলে সেটা ব্যর্থ হয় না। তাই সজনীকে লেখা হয়েছিল ১০০ টাকার পরিবর্ত্তে আমার একটা প্রবন্ধ যদি ইচ্ছা করে তবে পেতে পারে। উদয়ন অনুরূপ প্রস্তাবে দ্বিধামাত্র করে নি। সজনীর সঙ্গে যখন দেখা হোলো তখন সে বল্‌লে কর্ত্তারা আশা করেছিলেন, দু তিন সংখ্যার মতো খোরাক তাঁরা পাবেন— অতএব অন্তত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার জন্যে আর একটা কিছু দিলে মনিব অর্থহানির জন্যে সান্ত্বনা পেতে পারেন। হায়রে রবীন্দ্রনাথ— বাজারে কোন্ দরে তোমার মূল্য যাচাই হচ্চে সেটা জেনে দর্পহারী মধুসূদনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে "আমার বঙ্গভূমি" থেকে এবার বিদায় গ্রহণ করো। এ নিয়ে তকরার করলে মর্য্যাদাহানি হয়, বল্‌লুম জ্যৈষ্ঠের জন্যে একটা কবিতা লিখে দেব। ঐখানেই শেষ। উদয়ন উৎসাহিত হয়ে আছে এক সংখ্যার প্রবন্ধর জন্যে একশো টাকাটাকে অপব্যয় বলে গণ্য করে নি। রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পরে তার স্মরণ

সাংবাৎসরিকে যখন তোমরা কবিসম্রাটের গুণকীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠবে সেই অবসরে বিধাতার দরবারে সকরুণ দরখাস্ত পেশ করব অন্য কোনো ভূখণ্ডে জন্মান্তর মঞ্জুর করে নেবার জন্যে।

দাদা

১৪১

২৪ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল সন্ধ্যার সময় একলা অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছি: আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; দক্ষিণের বাতাস বইচে বেগে। হেনকালে নানাবিধ অর্ঘ্যভার বহন করে ঝগড়ু বেহারার অপ্রত্যাশিত অভ্যাগমে বিস্মিত হয়ে উঠলুম। তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই বুঝলেম এ তোমার কাছ থেকেই আসচে। আসন্ন বিদায়কালে তোমার হাত থেকে এই সব ভোজ্য সামগ্রীর উপহার আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল, ইচ্ছা করতে লাগল সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে কিছু দিই যাকে তুমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারো। মনে পড়ল পুনশ্চ বইখানা। কেননা ও বই তোমার ভালো লেগেছে। সেটাকে পুনশ্চ দিতে গেলে তোমার মনে হতে পারে অলমতি বিস্তরেণ। সে কথাটা বর্ত্তমানে কেন সম্পূর্ণ খাটে না, তা বুঝিয়ে বলি। এই দ্বিতীয় সংস্করণে কতকগুলি নতুন লেখা যোগ করা হয়েছে। তা ছাড়া কতকগুলি মিলহীন

কবিতা পরিশেষ থেকে খসিয়ে নিয়ে এর মধ্যে ভর্ত্তি করেছি। যথোপযুক্ত কবিতা দিয়ে পরিশেষ-এর ক্ষতিপূরণ করে দেব। তার বিলম্ব আছে, কেননা পরিশেষের পরিশেষ হবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমি একান্ত ইচ্ছা করচি এবং আশা করচি গৌরীপুরে গিয়ে তুমি আনন্দে থাকবে। দেখবার ক্ষুধা তোমার দুই চক্ষু পূর্ণ করে আছে, তুমি দেখতে জানো। পল্লিশ্রীর আহ্বান তোমার মনকে উৎসুক করে তুলবে। নিশ্চয় তোমার আসন পড়বে কোনো একটা খোলা জানলার কাছে। সেখান থেকে কী দেখতে পাবে সে আমার কল্পনাদৃষ্টির সামনে নেই। পুঞ্জীভূত শ্যামলতার একটা আভাস আমার মনে আসে। কোনো গাছে নতুন পাতা ওঠবার সময় এখনো আছে কোনো গাছের পরিণত পাতায় গাঢ় রং ধরেছে। আমার মনে পড়ে আমাদের শিলাইদহের কুঠি-বাড়ি। আমি থাকতুম তেতলার ঘরে। দূরপ্রসারিত তরঙ্গায়িত সবুজের মাথা পেরিয়ে দেখা যেত দূর পদ্মার একটি ক্ষীণ রেখা ; নৌকোগুলো তটের তলায় প্রচ্ছন্ন থাকত, কেবল মাস্তুলের চূড়া-সংলগ্ন স্ফীত পালের কিয়দংশ শরতের বৃষ্টিরিক্ত অলস মেঘের মতো নীল আকাশের গায়ে গায়ে চলত ভেসে। আর কখনো বা উজানের মুখে ডাঙা বেয়ে চলত গুণ কাঁধে নিয়ে নতদেহ মাল্লার দল। সেই নদীরেখার ও পারে দেখা যেত পাণ্ডুবর্ণ বালু-চরের বিস্তার, আকাশের নীলিমার সঙ্গে আপন গৌরিমার যুগলতা প্রকাশ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। বৈশাখে শস্যশূন্য মাঠের ধূসরতার মাঝে মাঝে তরুচ্ছায়ায় আবিষ্ট এক একটি গ্রাম— পিণ্ডীকৃত গাছগুলোর নিবিড় আবেষ্টন ভেদ করে এক

একটা তালজাতীয় গাছ আপন স্বাতন্ত্র্য উচ্ছ্রিত করেচে মেঘলোকে। আমাদের বাগানে বিলম্বে ফলবার আমগাছে তখন বোল ধরেচে, দখিন বাতাসের বেগে দূরের থেকে তার গন্ধ মৃদু হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করচে। হঠাৎ কখনো ব্যর্থ সন্ধানে কোনো একটা ভ্রমর ভন্ ভন্ করতে করতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। নদীর ধার দিয়ে একটা বাঁকাচোরা পথ গ্রামগুলির সামনে দিয়ে কোনো একটা বড়ো রাস্তার সঙ্গে মিলন লক্ষ্য করে চলেচে। এই গ্রামের রাস্তার দুই ধারে আম জাম কাঁঠাল আমার আমলে আমার হুকুমে লাগানো হয়েচে। রাস্তার বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঁকা ভঙ্গী উপর থেকে দেখতে পেতুম। বাংলা দেশের এই সুকোমল শুশ্রূষার পরিবেষ্টনের মধ্যে থেকে আমি তখন সাধনার জন্যে গল্প লিখচি প্রবন্ধ লিখচি, লিখচি ক্ষণিকা চিত্রা আরো কত কি। তারি ফাঁকে ফাঁকে বাংলা পল্লিগ্রামের যে স্পর্শ আছে তা আমার পাঠকেরা ঠিক বুঝতে পারবে না। আমার সেই সেদিনকার কল্পনা তোমাদের গৌরীপুরের উপরে আরোপ করচি। ঠিক মিলবে না বোধ করি। ওখানকার পল্লী বোধ করি ঐশ্বর্য্যের সোনার শৃঙ্খলে বন্দিনী। তা হোক্ মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়বার অবকাশ আছে হয়তো। বুঝতেই পারিনে অর্থহীন সংস্কার নিজে সৃষ্টি করে কঠিন উৎপীড়নের জাল বিস্তার করাকে মানুষ কেন যে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা বলে কল্পনা করে। নিজেকে নানা বিচিত্র বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করতে যারা অভ্যস্ত, তারা কোনো কালে কোনো বন্ধন

থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার অধ্যবসায়কে উদ্‌বুদ্ধ করবে কোন্ বুদ্ধিতে ? আপনার লোককে যারা বেঁধেছে পরের হাতের বাঁধন তাদের খুল্‌বে না। থাক্‌গে ওসব তর্ক। আপাতত নিজের শরীরটাকে সুস্থ করে তোলবার সাধনা সম্পূর্ণ মন দিয়ে গ্রহণ কোরো। যে শরীরটাকে অযাচিত দানরূপে পেয়েছ সেটার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে তোমার দায়িত্ব আছে।

তোমার পত্রোত্তরে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, খ্যাতি অর্জ্জন করবার জন্যে কোনো দিন আমি কোনো রকম উদ্যোগ করি নি। জয়ন্তী প্রভৃতি ব্যাপারে আমি আরাম বোধ করি নি এ কথা নিশ্চিত জেনো। আমি জনতার সমাদর কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি বলেই আমি জনপ্রিয় হতে পারি নে। মানুষকে খুসি করতে পেরেচি এবং তারা আমাকে খুসি করতে চায় এর প্রমাণ পেলে নিঃসন্দেহ আমার আনন্দ হয়। কিন্তু সেটা চেষ্টাকৃত যদি হয় যদি অকৃত্রিম না হয় তবে তার চেয়ে বিতৃষ্ণাজনক কিছু হতে পারে না। কবির সত্যকার দণ্ড পুরস্কার কালের হাতে। মৃত্যুর ওপার পর্য্যন্ত তার জন্যে সবুর করতে হয়— অসময়ে সেটাকে ছিনিয়ে নেবার মতো বেহায়াগিরি আর কিছু নেই। বিধাতার দান অমনিই অনেক পেয়েছি, আরো নাই বা পেলুম। ইতি ১১ বৈশাখ ১৩৪১

দাদা

১৪২

২১ মে ১৯৩৪

ওঁ　　　　　　　　　　　　　　　　পানাদোরা

কল্যাণীয়াসু

সিংহলে এসেছি সে খবর তোমাদের জানা। কিছু কাজ করতে পেরেছি— সে জন্যে ওরা খুসি এবং কৃতজ্ঞ। অনেক দিন থেকে য়ুরোপের সংসর্গে ওরা আপনার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল। আধুনিকদের মধ্যে একদল সে জন্যে পীড়া বোধ করতে আরম্ভ করেছে। এরাই আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। যা ফল পেয়েছে তা ওদের প্রত্যাশাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। স্বাজাত্যকে ফিরে পাবার প্রেরণা এদের মনে ইংরেজি শিক্ষা থেকেই এসেছে। এরা বৌদ্ধ অথচ অনেককাল থেকেই এদের শিক্ষিত সম্প্রদায় সে ধর্ম্মকে ভুলে বসেছিল। Leadbeater নামে একজন ইংরেজ এ সম্বন্ধে এদের সব প্রথমে জাগিয়ে তোলে। শিল্পকলা নিয়ে আমাদের দেশে ঠিক সেই দশা ঘটেছিল। স্বদেশীয় শিল্পরীতি নিয়ে দেশের লোকে যখন হয় উদাসীন নয় অট্টহাস্যমুখর তখন হ্যাভেল উড্রফ প্রভৃতি কয়জন ইংরেজ তাকে শ্রদ্ধা ও উৎসাহের দ্বারা উদ্বোধিত করেন। মনে রেখো আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে একদা আমাদের মূঢ়তা যখন অগাধ ছিল তখন ম্যাক্সমূলর এবং জর্ম্মানীর পণ্ডিতেরা সেই শাস্ত্রের বিচিত্র দুর্গম পথ আলোকিত করেছিলেন। আজও এ শাস্ত্র তাঁরা যেমন জানেন আমরা তেমন জানি নে।—

তুমি ব্যাকরণের বন্ধুর পথে ইংরেজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত। আমি

এ পথ কোনোদিন পেরোই নি। আমি প্রায় প্রথম থেকেই সাহিত্যের পথেই ইংরেজি ভাষার পরিচয় পেয়েছিলুম। আমি কোনো কোনো মেয়েকে ইংরেজি শিখিয়েছি— একেবারে গোড়া থেকেই বই পড়াতে সুরু করেছিলুম। প্রথম প্রথম চার পাঁচ লাইনের বেশি এগোতো না ছ মাসের পর অভিধান মিলিয়ে নিজেরা তাঁরা গল্পের বই পড়েছেন।

কলম্বো সহর থেকে ১৬ মাইল দূরে এসেছি। জানলা থেকে চেয়ে দেখচি সম্মুখে নারিকেলের ছায়া বিছানো তীর পেরিয়ে সমুদ্র ফেনিল তরঙ্গে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করচে। বাতাস বইচে স্নিগ্ধ সুমন্দ— নারিকেলের চঞ্চল শাখা মর্ম্মর শব্দে আন্দোলিত।— বাসন্তীকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২১ মে ১৯৩৪

দাদা

১৪৩

৫ জুলাই ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি হাত দেখিয়ে গ্রহবিচার করিয়ে আমার চরিত্র এবং জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে অনেক খবর পেয়ে থাকো, কেন এ সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারলে না যে আমি কিছুকাল থেকে নানাবিধ কর্ম্মে, রচনায়, আতিথ্যসংকারে, দুশ্চিন্তায়, দৈহিক দুর্ব্বলতায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছি। এই জন্যে অনেককাল কাজের চিঠি ছাড়া অন্য সকল চিঠি লেখাই বন্ধ হয়ে আছে। শুধু কাজের

ভিড়ের কৈফিয়ৎই যথেষ্ট নয়, বস্তুত আমার দেহ এখন কর্ম্মবিমুখ হয়ে উঠেছে, সামান্য কর্ত্তব্যকেও গুরুভার বলে মনে হয়। সম্পূর্ণ ছুটির জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। আমি চতুরাশ্রমে জীবনের ভাগকে বিশ্বাস করি— আমার বানপ্রস্থ্যের বয়স হয়েচে— কিন্তু এ যুগে তার ব্যবস্থা নেই। ঘরের মধ্যেই যথাসম্ভব বানপ্রস্থ্য রচনা করতে হয়। আমার বানপ্রস্থ্য দায়িত্ববিহীন অকাজের মধ্যে— যে কাজে কোনো কৈফিয়ৎ নেই— যাতে বিশ্বের বা নিজের হিতও হবে না অহিতও হবে না— যাতে হৃৎপিণ্ডেও ধাক্কা লাগে না, মস্তিষ্কেও আলোড়ন চলে না— অর্থাৎ যা প্রাচীন বয়সের শৈশবতা। সাহিত্যে একটা খ্যাতি পেয়েছি তার কাছে আমার দায় আছে, সে দায় বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়— কিন্তু যদি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একটা ছবি আঁকতে থাকি— তাহলে যা তা আঁকতে দ্বিধা করি নে। লোকে যদি বলে আমি ছবি আঁকতে পারি নে, তবে তাতে সঞ্চিত যশের অপচয় ঘটে না। তাই যখন কর্ত্তব্যের দায়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন মানুষের কাছ থেকে অকারণ বৈরিতায় মন ব্যথিত হয়ে থাকে, তখন সেই অবসাদের সময় চিঠিপত্র লিখতে চেষ্টা করলে লেখনীকে গুরুভার বলে মনে হয়। তখন যেমন তেমন করে ছবি আঁকতে আমার বাধে না। তাই আমার জীবযাত্রাপথের শেষ প্রান্তে যখন আলো ম্লান হয়ে এসেছে তখন ইচ্ছা করে ছবি এঁকে সময় নষ্ট করি। সময় নষ্ট করবার অধিকার আমার হয়েচে। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাদ্দের অনেক বেশি কাজ করেছি— এখন যদি কর্ম্মশালার দ্বার বন্ধ করি তাহলে বেতন কাটা যাবে না।

তোমার কোনো একটা পত্রে জনশ্রুতির কথা লিখেচ যে, আমি সীতার নিন্দা করেচি। এমন অদ্ভুত অপবাদ বাংলা দেশেই সম্ভব। “ঘরে বাইরে” উপন্যাসে সন্দীব বলে একটা মানুষ খাড়া করেছিলুম তার চরিত্রে ভদ্রতার আদর্শ নেই। সীতার সম্বন্ধে সে যদি এমন কিছু বলে থাকে যা সীতার পক্ষে সম্মানকর নয় তাহলে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী বলা মূঢ়তা। দ্রৌপদীকে কীচক নিঃসন্দেহ অপমান করেছিল, দুঃশাসন সভাস্থলে তাঁর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিল এ কথাও মহাভারতে পড়েছি, বেদব্যাসকে সে জন্যে বাঙালী সমালোচকও নিন্দা করে নি, আমার বেলাতেই তাদের বুদ্ধি যে যায় বিগড়ে তার কারণ তুমি জিজ্ঞাসা কোরো আমার জন্মনক্ষত্রকে। আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেচি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অন্তিম নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলা দেশে আমার জন্ম না হয়— এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন— আমি ব্রাত্য, আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্ম্মসম্মত।

সিংহলে লোকেরা আমাকে পেয়ে খুসি হয়েছিল। আনন্দ দিয়েছি আনন্দ পেয়েছি। কবির পুরস্কার এইটুকুই। বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো, বোলো অলিখিত পত্রোত্তরের জন্যে তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাকে কিছুমাত্র যেন পীড়ন না করে। আমি জানি এই তার ত্রুটি ঔদাস্যবশত নয়, চিঠি লেখায় তার হাত পাকা হয় নি সেই সঙ্কোচেই। জীবনে অনেক চিঠি লিখেচি। কিন্তু আমার চিঠি লেখার শক্তি প্রায় বাসন্তীর কাছাকাছি এসে

পৌঁচেছে— এই জন্যেই চিঠি লেখা সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যবোধ প্রতিদিন শিথিল হয়ে আসছে। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৪১

দাদা

১৪৪

১২ জুলাই ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠির ভাষার থেকে মাঝে মাঝে তুমি কল্পনা করে বসো যে তোমার উপর আমি রাগ করেচি। কিন্তু কখনোই তোমার উপর রাগ করতে পারি নে। আমাদের দেশাচারের বিরুদ্ধে অনেক সময় ধিক্কার হয়, কিন্তু তুমিই যে তার প্রতীক তা তো নয়, তুমি তার দ্বারা আহত। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে পীড়া দিয়েছি, সে জন্যে মনে অনুশোচনা জন্মেচে। তোমার প্রতি আমার করুণা সুগভীর সে কথা নিশ্চিত জেনো। তোমার স্বভাবে অসামান্যতা আছে যা নানা বাহ্য আঘাতে পরিণতি লাভ করতে পারে নি ; যা মিশিয়ে রয়েছে এমন সব অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে যা তোমার মনকে মুক্তি দেবার প্রতিবন্ধকতা করেছে। তোমার মধ্যে তোমার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি ও অভ্যাসগত নিরর্থকতার একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। সকল বিষয়েই চোখ বুজে বশ মানবার মতো মন তোমার নয় সেই জন্যেই তুমি আপনাকে আপনি পীড়ন করো, আমার বিশ্বাস এই পীড়ন থেকে তুমি

বাঁচতে যদি যথেষ্ট বিদ্যালোচনার দ্বারা তোমার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির সমর্থন পাবার সুযোগ তোমার ঘটত। তা হোক, মতে ও আচারে আমার সঙ্গে তোমার যতই পার্থক্য থাক তবু কখনো তোমাকে অশ্রদ্ধা করি নে। সেই পার্থক্যের পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে তুমি তোমার মত ও বিশ্বাস নিয়ে তোমার চিঠিতে যে সব আলোচনা করো, এবং যে সব ভাষাচিত্র পাঠাও সে আমার বিশেষ ভালো লাগে। তার একটা কারণ আমি অনেক কথা জানতে পারি যা আমার জানবার উপায় নেই— কিন্তু তার চেয়ে আর বড়ো কথা, তোমার লেখার মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিকতা ও উজ্জ্বলতা আছে যা দুর্লভ— স্বত-উৎসারিত সাহিত্যরসে সে আমাকে আনন্দ দেয়। সুসংলগ্ন করে বিস্তারিত করে লেখবার সাধনা যদি তোমার পাকা হোতো তাহলে সাহিত্যে তুমি কৃতিত্ব লাভ করতে পারতে। বিশেষত মেয়েরা বাংলা ভাষায় যে সব লেখা আজকাল লেখে তা এমনি দুর্ব্বল, বানানো, নকল করা জিনিষ যে তোমার লেখবার স্বাভাবিক শক্তি ও সাহস দেখে দুঃখ হয় তুমি সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারো নি। প্রবেশ করলে তোমার প্রতিভার সাহসিকতা দেখে অনেকেই তোমাকে অজস্র গাল দিত; কিন্তু অযোগ্য নিন্দুকদের গালের দ্বারাই তোমার যথার্থ বিচার হোতো। তোমার বুদ্ধি ও শক্তি ভূমিকম্পে বিদীর্ণ উর্ব্বরা ভূমি— জোড়া লাগবার সুযোগ পেল না। যা হোক তোমার চিঠি থেকে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি— সে চিঠি প্রকাশ হতে পারবে না এইটেই আক্ষেপের বিষয়।

কিছুদিন হোলো তোমার চিঠিতে অত্যন্ত অদ্ভুত যে সংশয়

প্রকাশ করেছিলে যে তোমাকেই লক্ষ্য করে বাঁশরীতে আমি কিছু বক্রোক্তি করেছি সেইটেতে আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল— আমার দ্বারা এমন অন্যায় যে সম্ভব হতে পারে এ কথা তুমি মনে করলে কী করে। এর থেকে তোমার পীড়িত বিকল চিত্তের লক্ষণ দেখতে পাই।

আমি যেমন ছবি আঁকি তুমি তেমনি গান লেখো সে ভালোই। কোনোটা ভাল হবে কোনোটা হবে না— কারো কাছে সে জন্যে জবাবদিহী নেই। আমাকে যদি পাঠাতে চাও পাঠিয়ো— চুপ করে থাকি যদি কিছু মনে কোরো না। কিন্তু গানের প্রধান অংশ সুর— সে জন্যে খুকুর শরণ নিয়ো। তার বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুন্‌লুম। পাত্রটির নাম জানি, তার বেশি পরিচয় জানি নে। সকল পাত্রেই নিজেকে মিশিয়ে নেবার শক্তি মেয়েদের স্বভাবে প্রচুর পরিমাণে আছে। না যদি থাকত তাহলে স্ত্রীহত্যা-পাতকে প্রতিদিন বিধাতাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোতো। ইতি
২৭ শ্রাবণ [আষাঢ়] ১৩৪১

দাদা

পর্শু অর্থাৎ ২৯শে তারিখে কলকাতায় যাব, পয়লা শ্রাবণ তারিখে ফিরব।

১৪৫

১৮ জুলাই ১৯৩৪

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় কাজে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দায় ছিল— বিষয়টা "সাহিত্যের তাৎপর্য্য"। তোমার চিঠিতেও দেখি তুমি সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা করেছ। আমার লেখাটা যখন বের হবে তোমার মতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবে। সাহিত্য জিনিষটা বুদ্‌বুদ নয় অর্থাৎ শূন্যগর্ভ গোলকের উপর সূর্য্যরশ্মির সাত রঙের খেলামাত্র নয়। তেমনতরো বাক্যের বুদ্‌বুদ একেবারে হয় না তা বলতে পারি নে কিন্তু সেগুলোর দাম নেই। ভিতরটাতে হৃদয় থাকলে তবে তার নিবিড় আস্বাদ পাওয়া যায়। তোমার চিঠিতে যদি সাহিত্যরস থাকে তবে সেটা হৃদয়সম্পর্কশূন্য নয় বলেই উপভোগ্য হয়ে থাকে।

আজ সন্ধ্যার দিকে মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই কর্ত্তব্যটা সমাধা করেই কাল শান্তিনিকেতনে ফিরব।··· আমি বোধ হয় পাঁচ দশ মিনিটের মত দু চার কথা বলেই ছুটি নেব।

শ্রাবণ এলো— বর্ষা এবার যথোচিত সমারোহে দেখা দিয়েছে। আশ্রমে গিয়ে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করতে হবে। কিন্তু মনের মধ্যে তেমন উৎসাহ বোধ করচি নে। জগৎ জুড়ে দুঃখ দারিদ্র্য নানা আকারেই দেখা দিয়েচে। এমন দেশ নেই যেখানে মানুষ নানা রকমে মার না খাচ্চে। মনে হয় যেন একটা যুগান্তের পরে যুগান্তরের সূচনা। নূতনের অভ্যুদয় যখন হয়

তখন নাড়িছেঁড়া দুঃখই আনে তাকে আবাহন করে। পূর্ব্ব যুগের ভুল চুক ত্রুটি আপন ভাঙনের বিদারণরেখার উপর দিয়েই নবযুগের রথযাত্রার পথ রচনা করে। সেই পথ রচনার কাজে মানুষ ঢেলে দিচ্চে তার হৃদয়শোণিত। আমি মনে মনে ভাবচি আমার এ জন্মের প্রান্তভাগটা মিলে গেছে এই যুগেরই রক্তরশ্মিদীপ্ত দিগন্তরেখায়। সমস্ত যুগাবসানের বেদনা আমার মনের মধ্যে আজ ছায়াপাত করেচে। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩৪১

দাদা

১৪৬

৭ অগস্ট্ ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। বিবিধ রকম কাজে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলুম, তার মধ্যে সাহিত্যিক কাজও কিছু ছিল —কিছু ছিল এখানকার ছাত্রদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন, কিছু ছিল নানা লোকের নানা খুচ্‌রো দাবী মেটানো, সেগুলো যেন গাছের মধ্যে আগাছার জঙ্গল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তৃণশ্যামল বিস্তীর্ণ প্রান্তরসীমায় ঘন বনশ্রেণীর নীল রেখা, আমার অলিন্দের তিন কোণে তিনটি রাধাচূড়ার গাছ পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে বাতাসে আন্দোলিত, তার পিছনে বড়ো শিমূলগাছকে বিজড়িত করে উঠেছে মালতীলতা, দিনরাত কাঁকরবিছানো পথে টুপ্ টুপ্ করে মালতী ঝরে পড়চে, কদম্বকেশর ঝরার দিন শেষ হয়ে

গেল, ছুটি একটি অসময়ের বেল ফুল দেখা দেয় তারা ক্লান্ত হয়ে এল বলে। আমার সামনেই পলাশ সোঁদাল হিমঝুরি সোনাঝুরি কদম জারুলের বীথিকা সোজা চলে গিয়ে সদর রাস্তায় উত্তীর্ণ হয়েচে। তাদের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে রাঙামাটির পথের এক টুক্‌রো দেখা যায়।— আমার ইচ্ছে করে সব দায়িত্ব ফেলে দিয়ে এই ছায়াবৃত দিনে সামনে তাকিয়ে বসে ভাবি আপন মনে। এই দানটুকু শুনতে সুলভ কিন্তু ভাগ্যে খুব অল্পই জোটে — বন্দী আমি কর্ত্তব্যের সশ্রম কারাবাসে।

তোমার চিঠি পড়ি, তোমার কথা ভাবি। একটা কথা বার বার মনে আসে তোমার চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মমত ও আচার থেকে আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করি নি বিক্ষিপ্ত করেছি। তাই নিয়ে তোমার নিরন্তর দ্বন্দ্ব চল্‌চে— অথচ এ দুঃখ আমি কোনোদিন তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি নি। কারো মত নিয়ে আমার কোনো জেদ নেই, ধর্ম্মবিশ্বাসের পার্থক্য নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কারো প্রতি আমার মনের বিরুদ্ধতা জাগে না। কেবল গোঁড়া মুসলমানদের মতো যারা ধর্ম্মান্ধ তাদের প্রতি মনকে শান্ত রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয়। তোমার নিষ্ঠাভক্তির মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে সেটাকে আমি যে কেবলমাত্র শ্রদ্ধা করতে পারি তা নয় তার সৌন্দর্য্যে আনন্দিত হতে পারি। আমার বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল হতে পারে না, এমন কি তার মধ্যে হয়তো অনেক কিছু থাকতে পারে যেটা আমার মতে আমাদের দেশের কল্যাণের অন্তরায়। কিন্তু মতের সঙ্গে মতান্তরের সংঘাত যতই হোক তাতে মানুষের প্রতি আমার সৌহার্দ্দ্যকে ক্ষুণ্ণ করে

না। আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় এটা আমি দেখলুম, আমার রচনায় বা কর্ম্মে দেশের জন্যে যা কিছু করে থাকি নে কেন, আমার শক্তিকে স্বীকার করেও দেশ আমাকে ভালোবাস্‌তে পারে নি। এই জন্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আমাকে কুৎসিত নিন্দা করতে নিন্দুক শুধু যে সাহস পায় তা নয় সে নিন্দা নিয়ে লাভের ব্যবসা সম্ভব হতে পারে। তাতে সাধারণের মনে সে পরিমাণে আঘাত লাগে না বলেই এমনটা হতে বাধা পেল না। তোমাদের গভীর অন্তরে এর বিরুদ্ধে তোমাদের ঘৃণা নেই করুণা নেই— হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেও তোমাদের মনের অবচেতন রাজ্যে এর সমর্থন এমন কি আনন্দ আছে। এ কথাটা আমি বুঝে নিয়েছি, স্বীকার করে নিয়েছি, দেশের কাছ থেকে এর বেশি আশা করি নে। প্রতিবাদস্বরূপে অনেকে বলেন দুই এক জনের অপরাধ সকলের পরে আরোপ করা উচিত হয় না— আমার উত্তর এই, যে-হিংস্রতাকে সকলেই বিনা আপত্তিতে মেনে নেয় সে হিংস্রতায় সকলেরই ভাগ আছে। ব্যবসায়ে একজাতীয় ভাগীদার আছে যাকে ইংরেজিতে বলে Sleeping partner— অর্থাৎ ঘুমন্ত সরিক, তারা ব্যবসায়ের পরিচালনায় হাত দেয় না, লাভের অংশ অক্রিয়ভাবে পায়। দেশে আমার নিন্দাব্যবসায়ের ঘুমন্ত সরিক তোমরা সবাই। একদিন এ কথা আমার মনে সুস্পষ্ট হয়েছিল যখন তুমি আমার ব্যবহারসামগ্রী সহজেই এমন কাউকে দান করতে পারলে যাঁর লেখনী আমার প্রতি কটূক্তিতে সর্ব্বদা বিষাক্ত। মনে কোরো না এই ঘটনায় তোমার থেকে আমার

স্নেহ স্খলিত হয়েছে। আমি কেবল এইটুকু বুঝে নিয়েছি অন্তরতর ভাবে তোমরা আমাকে আপন করে নিতে পারো না। আমার গুণের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ব্যক্তির প্রতি মমতা নেই। তাই নিন্দার শরবিদ্ধ হয়ে আজ ৩৪ বৎসর দেশের জন্যেই নিজেকে প্রায় দেউলে করে দিয়ে দেশের কাজ একলা করেছি— অহৈতুক বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে নিঃসহায় চলতে হয়েচে। দেশের বড়ো ছোটো অনেকেই তাঁদের নিজের কাজের প্রয়োজন হলে আমার কাছ থেকে সাহায্য আদায় করতে কুণ্ঠিত হন নি কিন্তু এক দিনের জন্যেও মনে করেন নি আমারো সাহায্যের প্রয়োজন আছে, সাহায্যের না হোক্ অনুকম্পারও দাবী করতে পারি। কঠোর সত্যকে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করে নিতে একান্ত ইচ্ছা করি, এক এক সময়ে বেদনা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই অসহিষ্ণুতার জন্যে লজ্জিত হই। ইতি ৭ অগস্ট ১৯৩৪

দাদা

১৪৭

১৭ অগস্ট ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার যথার্থ পরিচয় কখনো তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না। সেই জন্যেই এত বড়ো ধিক্কারের কথা মনে করতে পারলে যে ... ... র সঙ্গে তোমার সৌহৃদ্য ভেঙে দেবার জন্যে

আমার দরবার আছে। এমনতরো ভাঙাভাঙির চেষ্টাকে আমি পুরুষোচিত মনে করি নে— এটা লজ্জাকর। ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণের উপর সব সময়ে বন্ধুত্ব নির্ভর করে না। ভালোবাসতে পারি কারো স্বভাবের ত্রুটি সত্ত্বেও। এ নিয়ে লেশমাত্র আপত্তি করা আমার অযোগ্য। দেশের অধিকাংশ লোকে আমাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না, এবং আমার আঘাতে অপমানে যথেষ্ট ব্যথিত হয় না, এই সত্যকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি— বুঝেছি দেশের মধ্যে তার স্বাভাবিক কারণ রয়েচে। যদি দেখা যায় সকল চেষ্টা সত্ত্বেও আমার বাগানের মাটিতে আমের মধ্যে কীট জন্মায় তবে মনে আক্ষেপ হতে পারে কিন্তু আবহাওয়ার সঙ্গে রাগারাগি করতে গেলে ছেলেমানুষি হবে। তোমাকে আমি দোষ দিই নে। মনের অনেক ক্রিয়া স্বভাবের গূঢ় প্রবর্ত্তনায় আমাদের অগোচরেই ঘটে, তার উপরে সচেতন চিত্তের কর্ত্তৃত্ব খাটে না। আমি কখনো তোমার কাছে কোনো দাবী করি নি যা তুমি নিজের থেকে স্বীকার না করেচ। তোমার কাছে আমার পরিচয় ও স্বীকৃতি তোমার নানা গভীর সংস্কার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের দ্বারা অনুরঞ্জিত হতে বাধ্য। তার অনেক মাল মসলা তোমার স্বকৃত। এক দিকে তোমার আপন হাতে গড়া এই মূর্ত্তিকে যেটুকু পরিমাণে সম্মান দাও তার মধ্যে হয়তো অতিশয়তা আছে— অন্য দিকে তাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে পরিমাণে খর্ব্ব করো তাও হয়তো বিধাতার আপন মাপের সঙ্গে মেলে না। দেশের যে মনোবৃত্তির সঙ্গে সহজেই তোমার মন মেলে তার অনেকাংশ আমার বিরুদ্ধ এটা অপরি-

হার্য্য। দোহাই তোমার আমার সন্তোষ কল্পনা করে ··· ··· ··· র সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের লেশমাত্র ব্যত্যয় ঘটতে দিয়ো না, যদি দাও তবে তাতেই তুমি আমাকে খাটো করবে। তোমাদের সমাজের দিক থেকে আমি ব্রাত্য, আমি একঘরে, আমি অস্পৃশ্য। এই বর্জ্জন আমার জীবনে দেবতার বরের মতো কাজ করেছে, এতে মানুষের অভিশাপ যদি লাগে, তবে তাতে সাপের নিঃশ্বাস লাগবে মাত্র বিষ লাগবে না। যে বিধাতা আমাকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার বন্ধু। এই সামাজিক অস্পৃশ্যতা পার হবার সময় কিছু পরিমাণ ঘৃণা মনে না নিয়ে আসতে পারো না। সেটাকে অতিক্রম করেও যদি আমাকে শ্রদ্ধা করে থাক সেটা কম কথা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে এমন অসম্ভব আবদার করব কোন্ দাবীতে। তুমি লিখেচ আমার কতকগুলো বইয়ের কতকগুলো কবিতা বাদ দিয়ে তোমার কোনো কোনো কবিতা ভালো লাগে। এ কথা বলবার কি কোনো প্রয়োজন আছে। আমার কবিতা বুঝতে পারে না এমন পুরুষ ও মেয়ে সংসারে অনেক আছে তাদের আমি খুবই ভালোবাসি— আমি তাদের কবি নাই হলুম আমি তাদের প্রিয়জন। আমার কবিতার কথাটা তোমাদের মুখে একেবারেই অবান্তর। তোমার মেয়ে হয়তো আমার কবিতার চেয়ে নজরুলের কবিতা ঢের বেশি পছন্দ করে সে কারণে আমি তাকে কিছুমাত্র কম স্নেহ করিনে।

স্বদেশের বাইরে আমার জন্যে সুপ্রশস্ত ও স্থায়ী আসন আছে— যখন জীবলোক থেকে বিদায় নিয়ে যাব তখন আমার ভাগ্যবিধাতাকে অক্ষুণ্ণ প্রণাম নিবেদন করে যেতে পারব— তিনি

আমাকে অনেক দিয়েচেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মিনতি জানিয়ে যাব যে বাংলাদেশে আর নয়। ইতি ৩২ শ্রাবণ ১৩৪১

দাদা

১৪৮

২৩ অগস্ট ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে পরামর্শ দিয়েচ আমি যেন ঝগড়া না করি। তোমার কথা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব যেহেতু আমি ঝগড়া করিই নে। বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করে অবধি গালি ও নিন্দা আমি নিরন্তর পেয়েছি কিন্তু একবারও তার প্রত্যুত্তর দিই নি, প্রতিবাদ করি নি। আমার যে প্রবন্ধ নিয়ে ··· ··· ও ··· ··· ছেঁড়াছেঁড়ি করেচেন সেটা তাঁদের কোনো রচনার বিরুদ্ধে লিখিত নয়। তার কারণ এই, ··· ··· র রচনা ভালো লাগে না বলে দু চার পাতা ছাড়া তাঁর কোনো বই আমি পড়তে পারি নি! ··· ··· গোড়াকার বই পড়ে আনন্দ পেয়েছি তাঁর ··· ··· বই ভালো লাগল না বলে তাঁর হাল আমলের কোনো বই আমি পড়ি নি। তাঁরা গায়ে পড়ে ধরে নিয়েছেন যে তাঁদেরই লক্ষ্য করে আমি লিখেছি। ঝগড়া তাঁরাই করেছেন তাল ঠুকে, আমি চুপ করে আছি। এই চুপ করে থাকার চেয়ে আরো বেশি কী করতে পারি সেই পরামর্শ আমাকে

দিয়ো। যদি বলো কোনো লেখাই না লিখে নীরবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়, সেটা আমি স্বীকার করে নেব। কিন্তু এই পরামর্শ আরো ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে পেলেই সুখের হোতো— এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। যদি বলো কেবলমাত্র সেই লেখাই যেন লিখি যাতে কোনো মানুষের সঙ্গে মতের ভেদ না হয়, তবে সেই কোনো মানুষরা কারা জানতে চাই। এমন মানুষেরও সন্ধান মেলে যারা আমার মতকে শ্রদ্ধা করে। তুমি কি বল্‌বে কেবল তাদেরই সঙ্গে যেন আমার ঝগড়া বাধে এদের সঙ্গে নয়? তোমাকে আমার এই অনুরোধ, ... থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ... ... ও ... ... পর্য্যন্ত কার সঙ্গে ঝগড়া করে আমি একটা লাইনও লিখেচি, সেটা আবিষ্কার করে আমাকে দেখিয়ে দিয়ো, তাহলে স্বভাব সংশোধন করবার চেষ্টা করব। একতরফা গাল খাওয়াকে যদি ঝগড়াটের লক্ষণ বলো তাহলে সে সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য কী, আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ো। তুমি লিখেছ অল্প যে কটা দিন আমার মেয়াদ আছে বিবাদে যেন প্রবৃত্ত না হই। এ অনুরোধ রাখা কঠিন হবে না। প্রায় বছর পঞ্চাশেক যা না করেছি আরো দু চার বছর তা না করে থাকতে পারব। তোমারই প্রশ্নের উত্তরে একদা আমাদের দেশাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলুম। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করচি বলে সন্দেহ করি নি। সম্প্রতি তাও ছেড়ে দিয়েছি। আমার মতো লেখকের পক্ষে সম্পূর্ণ মৌনব্রতই যদি একমাত্র সাধুপথ হয় তবে সে পথ আসন্ন হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হতে

পারো— যে চতুরানন একদিন আমার মুখে ভাষা দিয়েছিলেন, তিনিই সে ভাষা সংহরণ করে নেবার জন্যে দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩৪১

দাদা

১৪৯

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

গোটাকতক ইংরেজি লেখার দায় আমার কাঁধে চেপেছে। তাই ছুটি পাচ্চি নে। আমার পক্ষে ইংরেজি সরস্বতীর মহল বিমাতার মহল। তবু সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা আছে। হলেও ও মহলে সহজে চলাফেরার অভ্যাস এখনো হয় নি। ইংরেজি কেন, আজকাল বাংলা লেখাতেও কলম কুঁড়েমি করে। চিরপরিচিত পথেও পা বেধে যায়— সে পথের দোষ নয়, পায়েরই দুর্ব্বলতা। এমন অবস্থায় আঙিনার বাইরে পা বাড়ানোই ভালো নয়। কিন্তু ওজর খাটে না— এত দীর্ঘকাল আমারই পদক্ষেপের চাপে যে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে, তাকে পরিহারের উপযুক্ত কোনো কৈফিয়ৎই কেউ মঞ্জুর করতে চায় না।

তোমার চিঠি পড়ে আমার বিস্ময় বোধ হয়। সব কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি তোমার মধ্যে যেমন প্রবল আমাদের দেশে এমন অল্প লোকেরই মধ্যে দেখেচি। তোমার

ইন্দ্রিয়বোধের খোলা জানলায় তোমার মন সর্ব্বদা উৎসুক হয়েই আছে। এই উদাসীন আধেক কাণা আধেক কালার দেশে বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে এমন জাগরূক চৈতন্য কোথা থেকে পেলে? আমাদের দেশের হাল আমলের ধর্ম্মসাধনা এই জিনিষটাকে কম্বল চাপা দিয়ে রাখে, বিশ্ববিষয়ের প্রতি এই উপেক্ষাকেই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে স্থির করে রেখেছে। এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টির ক্ষীণতা যে মানসিক জড়ত্বের লক্ষণ তা তারা মানতে চায় না। তোমার মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক উৎসাহ আছে— তুমি সব জিনিষকে স্পষ্ট দেখ্‌তে চাও— তোমার নিজেকেও তুমি খুব স্পষ্ট করে দেখে থাকো, তুমি আপনার কাছে আপনাকে ভোলাও না। এইখানেই তোমার প্রকৃতিগত আধুনিকতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অদৃষ্টক্রমে তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ— শুধু যে কেবল সামাজিক আবরণ তোমাকে বেষ্টন করে রেখেছে তা নয়, আজন্মকাল শিক্ষার অভাবও কঠিন জেনেনা, তার দেয়ালে ফাঁক অল্পই। তোমার বুদ্ধি তোমার অশিক্ষার অন্তরাল ভেদ ক'রে কিছু কিছু দেখে শুনে নেয়— কিন্তু জানা ও না-জানার মিশ্রণে তোমার অনেক ধারণা উপছায়ার আশ্রয় হয়ে উঠেছে। তোমার স্বাভাবিক শক্তি বাধাগ্রস্ত হয়ে যে এমনতরো ব্যর্থ হয়ে রইল এ কথা মনে করে দুঃখ বোধ করি।

ক'দিন দুঃসহ গরম গিয়েছে— অদৃশ্য বাষ্পের আস্তরণের নীচে পৃথিবী দিনরাত হাঁপিয়ে ঘেমে মরছিল। কাল হঠাৎ ঘনঘোর মেঘ এসে সমস্ত আকাশ থেকে জ্বরের তাপ সরিয়ে

দিয়েছে। বাতাসে প্রফুল্লতা, আলোকে প্রসন্নতা; গাছের কম্পিত ডালপালা ঝলমল করচে, শরতের আশ্বাসবাণী জলস্থল আকাশে মন্দ্রিত হোলো। ইতি ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫০

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ত ছিলুম, এখনো ব্যস্ত আছি। অন্য নানা কাজ তো আছেই তার উপরে আমার বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব এসেচেন— তাঁর আতিথ্যে ও আলাপ আলোচনায় অনেকটা সময় দিতে হচ্চে। তাঁর মত বন্ধু আমার দ্বিতীয় আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর বন্ধুত্ব বলিষ্ঠ প্রকৃতির বন্ধুত্ব— শুধু ভাবাকুল বন্ধুত্ব নয় ত্যাগপ্রবণ বন্ধুত্ব, আমার জন্যে সব করতে পারেন তিনি। এ রকম ভালোবাসা দুর্লভ।

মুখভারকরা চাপা নিবিড় রাগ হঠাৎ কান্নাকাটি বকাবকিতে আলোড়িত হয়ে উঠ্‌লে যেমন হয় তেমনি হয়েছে এখানকার আকাশের ভাবখানা। গুমটের আবরণ ছিন্ন করে ঝোড়ো বাদলা প্রবল হয়ে উঠেচে। আমার সামনের গাছগুলো খুব মাথা-ঝাঁকানি দিচ্চে আর সেই সঙ্গে মুখর মর্ম্মরে ডাল নাড়ানাড়ি। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে পাণ্ডুর আকাশের ভ্রূকুটি দেখা যাচ্চে দিগন্তে

পরিস্ফীত মেঘস্তূপে। উত্তাপ নেই, আন্দোলন আছে আমাদের দেশের মধ্যমপন্থী রাষ্ট্রনায়কদের নকল দেখা যাচ্চে আজ দেবসভায়। মেঘের গর্জ্জন নেই বিদ্যুৎ নেই, কেবল অজস্র অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের পালা। চাষীরা তাকিয়ে ছিল এই বৃষ্টির আশায়। কচি ধানগুলো শুকিয়ে আসছিল সেই সঙ্গে চাষীদের মুখ। মর্ত্ত্যলোকে ওদের আছে মহাজন, আকাশে আছেন পর্জ্জন্য দেব, — উপরওয়ালা বর্ষণ না করলে নিচেরওয়ালাও বর্ষণ বন্ধ করে। আর ওরাই বহন করচে কূর্ম্মের মতো আমাদের সবাইকে, জমিদারকে উকিলকে ডাক্তারকে পণ্ডিতমশায়কে। অথচ ওরাই অস্পৃশ্য উপেক্ষিত অশিক্ষিত, আধপেটা, আধমরা।

কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যেতে হচ্চে। দিন চার পাঁচ রাজধানীতে কাটবে। ইতি ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫১

[বরানগর] ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল থেকে নির্ব্বাসনে আছি। আমার শান্তিনিকেতনের নীড় ছেড়ে চলে এসেচি রাজধানীপাড়ায়। শরৎশ্রী সেখানে দেখা দিয়েছে তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে। শিউলি ফুলে বিছিয়ে দিয়েচে বনতল— কচিধানের ক্ষেতের আলের কাছে বিকশিত হয়েছে কাশের গুচ্ছ, বৃষ্টিধৌত কাঞ্চনের চঞ্চল পাতা থেকে

বিচ্ছুরিত হচ্চে প্রভাতের সূর্য্যকিরণ, চেয়ে চেয়ে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। সেখানে আকাশ অবারিত, দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টির অধিকার— আমার চোখের ছুটি মনের ছুটি দ্যুলোকে ভূলোকে। বরানগরের যে কোণে আশ্রয় নিয়েছি এখানেও বিশ্বপ্রকৃতির আতিথ্য পাওয়া যায়। চোখ মেলে দেখতে পাই বাংলা পল্লী-শ্রীকে। জানলা থেকে সামনে দেখা যায় পুকুরের একটা প্রান্ত কলমি শাকে ঢাকা, নারকেল সুপুরি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সব গাছকে ছাড়িয়ে— আম কাঁঠাল জামরুল বাতাবিলেবুর ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছে গাছে আকাশকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করেছে। কিছু দূরে আল্‌সেহীন দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে সাড়ি ঝুলচে— গাছপালার অন্তরালে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে গ্রামোফোনের খেলো সুর শোনা যাচ্চে, বাড়ির পিছন থেকে লিচুগাছের কোন্ প্রচ্ছন্ন ডালের থেকে ডাকচে "চোখ গেল"। প্রথম শরতের ঈষৎ স্নিগ্ধ বাতাস দিয়েছে রৌদ্রে ঝিলমিল করতে করতে দুলচে নারকেলের ডালগুলি। ইতি ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫২

৯ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার প্রেরিত ফলের ঝুড়ি এই মাত্র এসে পৌঁছল। তার ভোগও আরম্ভ হয়েছে। রেলযাত্রায় ও পরস্পরের পেষণে

ফলগুলি বেশি ক্লিষ্ট হয় নি। প্রায় সবগুলিই প্রসন্ন আছে। শীতলপাটিও ব্যবহারে লাগ্‌বে। আজ থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের এই প্রান্তরের বাসা শূন্য হতে আরম্ভ হোলো। পর্শু দিনের মধ্যে মানবজাতীয় নানা পক্ষীর প্রায় সকলেই দশদিকেতে অন্তর্ধান করবে। বাকি থাকবে আমাদের গাছপালা আর ডানাওয়ালা পাখীগুলি। এই সময়টি এখানে অত্যন্ত মনোরম— এক মুহূর্ত্তের জন্যে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, এবং কাজকর্ম্ম করতেও মন যায় না। দেবতারা যে আলস্যপাত্র পূর্ণ করে নন্দনবনে সুধাপান করে থাকেন সেই পাত্রটি চুরি করে আনতে ইচ্ছে করে। তাঁদের কারো কাছে কোনো জবাবদিহি নেই। আমরা কর্তব্যবিরত হলেই নীতিজ্ঞ সাধুজনেরা তর্জ্জনী তুলে ভৎসনা করতে আসেন। বিপদ এই, সেই নীতিজ্ঞ যে কেবল বাইরেই আছেন তা নয়, তিনি ভিতরেও কোথাও এক কোণে বাসা নিয়েছেন— অন্যমনস্ক হলেই তাঁর সাড়া পাওয়া যায়, ধড়ফড় করে চমকে উঠতে হয়। অতএব এখানকার পালা শেষ করে দেবলোকে যদি আমার গতি হয় তবেই স্বর্গীয় অবকাশের অধিকার নিঃসঙ্কোচে দাবী করতে পারব— অমরাবতীতে কবির প্রয়োজন থাকতেও পারে এই আমার একমাত্র আশা। আমি বাসন্তীর জন্যে আমাদের বর্ষামঙ্গলের একটা প্রোগ্রাম পাঠাচ্ছি। গান শুন্‌লে নাচ দেখলে নিশ্চয় সে খুসি হোতো— কল্পনায় প্রত্যক্ষতার অভাব যতটা পারে পূরণ করে নিতে বোলো। সঞ্চয়িতার ২য় সংস্করণ তোমার জন্যে পাঠাই— ওতে অনেক বেশি কবিতা আছে। ১৯ অক্টোবরে এখান থেকে

মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করব। ফিরতে ঐ মাসের শেষ। ইতি
৯ অক্টোবর ১৯৩৪

দাদা

১৫৩

১৬ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সঙ্গীয় চিঠিখানি কিছু কাল পূর্ব্বে তোমাকে লিখেচি। কর্ম্মচারীকে বলে দিয়েছিলুম লেফাফায় তোমার ঠিকানা লিখে পাঠাতে। সে গৌরীপুর আসাম লেখাতে অমিয়র বাবার ঠিকানায় পোঁছয়। তিনি আমার ভাষা দেখে চিঠিখানি নিশ্চয়ই আমার লেখা ঠাউরে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই সঙ্গে দুখানা বই পাঠিয়েছিলুম তার কী গতি হোলো জানি নে। পারি তো উদ্ধার করে পাঠাব।

আজ দু দিন থেকে ঝড় বৃষ্টি চল্‌চে। মনে আছে বাল্যকালে সপ্তমী পূজোর দিন একবার প্রচণ্ড ঝড় নেমেছিল। এবারে আকাশের মুখখানা সেই রকমের অপ্রসন্ন। থেকে থেকে কালো, থেকে থেকে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠচে— চঞ্চল গাছপালার উপর একটা আভা পড়েচে সে যেন উদ্বেগের আভা। ছেঁড়া ছেঁড়া বৃষ্টি প্রবল পূবে হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্চে। আজ পূজোর সকালে পাখীগুলোর উপোষ। দুটো একটা শালিখ ভোরের দিকে আহারের চেষ্টায় বেরিয়েছিল, ঝড়ের প্রকোপে অনতিকালের

মধ্যে মন খারাপ করে চলে গেছে। মাদ্রাজ যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত আছি। ইতি ১৬ অক্টোবর ১৯৩৪

দাদা

১৫৪

৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বই দুখানা পেয়েছ খবর পেয়ে খুসি হয়েছি। আর যাই করো অযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে দান কোরো না।

আমাদের এখানে আজ শাপমোচনের পালার শেষ দিন। ফেরবার পথে ওয়াল্‌টেয়রে বিজিয়নগ্রামের মহারাণীর কাছে নিমন্ত্রণ পেয়েছি— সেখানে অভিনয়টা শেষ করে তার পরে ছুটি পাব।

প্রবল বৃষ্টিতে এখানকার সহরটা উভচর হয়ে উঠেছিল। রাজপথ জলপথ হলে সেটাতে পথের কাজ চলে না। সেইজন্যে অভিনয়ের প্রথম দুদিন আমাদের পক্ষে ফাঁড়া গেছে। কাল বৃষ্টি ছিল না— থিয়েটরে ফাঁকা জায়গা ছিল না অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল— আজও ভিড় হবে।

আশ্রমে শরৎশ্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। একটা শুক্ল পক্ষ কেটে গেল— লক্ষ্মীপূর্ণিমার আবির্ভাব হয়েছিল এই মাদ্রাজে, কিন্তু মুখ ঢেকে।

যে জায়গায় আতিথ্য পেয়েছি এখানটা খুব সুন্দর। অদূরে

সমুদ্র, চারি দিকে বড়ো বড়ো প্রাচীন বনস্পতির ছায়া। ছায়ালোকখচিত অরণ্যবীথিকার স্নিগ্ধ শান্তি গিয়ে পৌঁচেছে তরঙ্গমুখর সমুদ্রের চঞ্চলতায়। এ বাড়ি সহর থেকে দশ মাইল দূরে। নইলে দর্শনার্থীর সংখ্যা দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ত।

সময় সঙ্কীর্ণ। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

দাদা

১৫৫

৮ নভেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার নামে অসংখ্য অসত্যের প্রচার হয়ে থাকে তার মধ্যে আরো একটা তোমার কাছে শোনা গেল। সে হচ্চে আমার ব্লাড প্রেশরের জনশ্রুতি। মৃত্যুর সহস্র দ্বার খোলা রয়েছে কিন্তু রক্তের উত্তেজনায় আমি মরব না সে সংবাদ আমার ভালো করেই জানা আছে। য়ুরোপে এবং এ দেশে বড় বড় ডাক্তার আমার রক্তবেগ পরীক্ষা করে দেখেচেন, তাঁরা বলেন আমার নাড়ী চৌত্রিশ বছর বয়সের নাড়ী। এমন কি, তাঁদের মতে আমার কোনো দেহযন্ত্রেই ক্ষয় বা বিকৃতি ঘটে নি। আমার শরীরের একমাত্র অপরাধ তার দুর্ব্বলতা। তাকে অতিপরিমাণে ক্লান্ত করা হয়েছে। তার প্রতিকার, যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম। কিন্তু চারদিকের সকলের সম্মতি না থাকলে বিশ্রাম অসম্ভব। দায় দাবীর অন্ত নেই— বাজে কাজের মহাকায় দানব প্রত্যহই

কাঁধে চড়ে মেরুদণ্ডের উপর তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে। বাঙালী অভিমানী জাত— বড়ো ছোটো সকলেরই সকল প্রকার অনুরোধই সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাই মরণের উপরেই অন্তিম ভার, তিনিই আছেন আমার বিশ্রামের আয়োজন সাজিয়ে।

মাদ্রাজের পালা শেষ করে এলেম। ফেরবার পথে ওয়ালটেয়রে ভিজিয়নগ্রমের মহারাণীর অতিথি ছিলুম। কিন্তু সে তো আতিথ্য নয়, ষোড়শোপচারে পূজা। এরোপ্লেনে করে মাদ্রাজ বাঙ্গালোর থেকে প্রতিদিন ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল আসত— আমার চলবার পথ ঢাকা পড়ত গোলাপের স্তূপে। দেবতার নৈবেদ্য অসঙ্কোচে গ্রহণ করবার মতো স্পর্দ্ধা আমার নেই— কিন্তু মহারাণীর অকৃত্রিম ও সুমধুর ভক্তিই আমার লজ্জা দূর করে দিত। মনে জানতুম এর মূল্য আমার নয়, সে ঐ ভক্তিরই। প্রস্রবণ যেমন পাথরের মধ্যে দিয়ে আপনার পথ আপনিই খনন করে চলে, নারীহৃদয়ের পূজাউৎসও তেমনি আপন গতিবেগেই আপন তটের সৃষ্টি করে— তার মধ্যে প্রবাহিত সেই ধারারই জয়। মহারাণীর একটি মেয়ে আছে, সুন্দর দেখতে, তার নাম উর্ম্মিলা। স্টেশনে আমাকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। প্রথমেই আমাকে পরিচয় দিলে আমি আপনার নাৎনী। ওরা দাদামশায়কে বলে নানা। বস্তুত আমার দাদামশায়ের পদটা "নানা" বিশেষণ পাবারই উপযুক্ত হয়েছে।

অনেকদিন পরে স্বস্থানে ফিরে এসে ভালো লাগচে। ইতিমধ্যে শরৎকে ঠেলে দিয়ে শীত চড়ে বসেচে সিংহাসনে। শিউলিশাখায় বীজ ধরে গেছে— চামেলি দুটো একটা ফুটচে কিন্তু মালতী চলে

গেছে নেপথ্যে। এখন আসর জমিয়েছে হিমঝুরি ফুল। ও নামটা আমারই দেওয়া নাম, ফুল তোমার চেনা কিনা জানি নে। পশ্চিমে এ গাছের খুব প্রাদুর্ভাব। লম্বাবৃন্তওয়ালা শাদা শাদা ফুল— কেবলি ঝরে ঝরে পড়চে গাছতলায়। দীর্ঘ উঁচু গাছ, নিমের মত পাতা, ফুলে শাদা হয়ে গেছে তার শিখর, আমার মাথার মতো। গন্ধটি সুমিষ্ট। উত্তর দিক থেকে হাওয়া দিচ্চে, কোনো কোনো গাছের পাতা ঝরে পড়তে সুরু হোলো। দিন যত এগোতে থাকে মর্ম্মরিত বনভূমির মধ্যে রৌদ্রের লীলা ততই লাগে ভালো। এই অবারিত প্রান্তরের মধ্যে শীতের মধ্যাহ্ন আমার কাজ ভুলিয়ে দেয়— দিকপ্রান্তের নীলিমার মধ্যে আমার মুগ্ধদৃষ্টি হারিয়ে যায়। ইতি ২২ কার্ত্তিক ১৩৪১

দাদা

১৫৬

২১ নভেম্বর ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার সঙ্গে অনেকদিন তর্ক করি নি আজ করব। আমাকে বিজয়নগ্রমের মহারাণী ভক্তি নিবেদন করেছিলেন, সেই ভক্তির সঙ্গে পাণ্ডার পা পূজোর সমমূল্যতা অবধারণ করেছ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কী সেটা বলা আবশ্যক। আমাকে ভক্তি করার মধ্যে ঐহিক বা পারত্রিক কোনো ফললাভের প্রলোভন নেই। বোধ করি মহারাণী আমার মধ্যে ভক্তিযোগ্য কোনো মহত্ত্ব

কল্পনা করেছিলেন, সেটা তাঁর ভুল হতে পারে কিন্তু মহত্ত্বকে ভক্তি করা অহৈতুক, সেটা বিশুদ্ধ ভক্তি। কিন্তু তোমাদের যে সব মেয়েরা স্বর্গফলের লোভে ঘটা করে দেবতার পূজো দেন এবং সেই ফলকে সমাপ্তি দেবার জন্যে পাণ্ডার পা দেন মোহরে ঢেকে তাঁদের এই মনোবৃত্তিকে যদি ভক্তি নাম দাও, তাহলে বৈষয়িক ফৌজদারী মকদ্দমার অনুকূলে দারোগাকে যে ঘুষ দেওয়া হয় সেও তো ভক্তি বলে গণ্য হতে পারে। এমনতরো বিকৃতিকেও তোমরা ভক্তি নাম দিতে পারো সে আমাদের দেশের আব-হাওয়ারই দোষে। এই মনোভাবের থেকেই তোমাদের পণ্ডিত তর্ক করেন যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন অক্ষৌহিণী সৈন্য নাশ করতে পেরেছেন তখন পূজা উপলক্ষ্যে শত সহস্র পাঁঠা মহিষ বলি দিতে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ভগবানকে বারে বারে জন্ম নিতে হয় এই কথা গীতায় আছে। ধর্ম্মযুদ্ধে অনিবার্য্য নিধনকার্য্য নিরাসক্ত মনেই করা যেতে পারে কিন্তু দেবী যে প্রত্যহ পাঁঠার রক্ত পান করে থাকেন তারা কি দুষ্কৃতের দলে— যারা তাদের বধ করে তাদের চেয়েও কি তারা দুষ্কৃত। মহাভারতের বকাসুর রোজ একটা করে মানুষ খেত— ভারতের পূজামন্দিরে দেবীও মহামাংস-নৈবেদ্যকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য বলে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ আছে, উক্ত অসুরের লোভের সঙ্গে এই লোভের প্রভেদ কি? পাঁঠার রক্তলোভও সেই জাতেরই। পুরাণ কাহিনীতে আছে চণ্ডী কোনো এক যুগে মহিষ নামধারী দানবকে বধ করেছিলেন— দানব যদি দুষ্টস্বভাব হয় তবে দেবী ভালোই

করেছিলেন, কিন্তু হতভাগা মহিষ পশুটা কী দোষ করেছে? কিন্তু মহিষের রক্তে দেবী প্রসন্ন হন এই কল্পনা করে যারা পূজা করে তাদের পূজা কি পূজা, না দেবতার অবমাননা? বোলপুরের কাছে কঙ্কালীতলা বলে এক তীর্থে বৎসরে একবার বিশেষ পরবে নানা ভক্তের মানৎরূপে বহু শত পাঁঠার বলিদান হয়, নিকটের জলাশয় রক্তে লাল হয়ে ওঠে। এই লুব্ধ হিংস্রতাকে যদি পূজা নাম দিতে কুণ্ঠা না হয় তাহলে পাণ্ডার পা পূজাকেও ভক্তি নাম দিতে পার। ভক্তিকে রিপুর দলে ফেলো না। এমন কি ভক্তি দেখিয়ে দেবতার প্রসন্নতা লাভ করা যায় এ মনে করাতেও ভক্তির খর্ব্বতা করা হয়। ভক্তি যে করে ভক্তিতে তারই চরিতার্থতা।

আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্য হয় এও আধ্যাত্মিকতার নামে স্থূল বৈষয়িকতা। পুণ্য অন্তরের সামগ্রী, এবং সে পুণ্যে পারত্রিক সদ্গতির কথাও স্থূল বস্তুতন্ত্রতা। আমাদের দেশে পুণ্যকে পণ্য-সামগ্রী করে তুলেছে— দেশ পায়ের ধূলো বিক্রি করে লোভীদের কাছে।— আচারের অনর্থক উপকরণ বাহ্য পদার্থ, হাটে নানা নামে তাদের বেচাকেনা চলে; একদা মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নানের পরে আমাকে তিলকচর্চ্চিত করে যে মানুষ মূল্য নিয়েছিল পুণ্যকে এতদূর শস্তা করার দ্বারা সে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা করে থাকে সেই দুর্গতির ভারেই ভারতবর্ষের মাথা আজ হেঁট হয়ে গেছে।— এই পর্য্যন্তই থাক্। তর্ক করে কোনো লাভ নেই। ইতি ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪১

দাদা

১৫৭

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি আজন্ম ব্রাত্য। মর্ত্তধরণীর বুকের কাছে আমার বাসা — এখানকার মাটির ভাঁড়ে যে অমৃত পাই তাই আমার যথেষ্ট। পারত্রিকের ঠিকানা জানি নে, যারা সেখানকার বিবরণ জটিল ভাষায় বিস্তারিত করে বল্‌তে আসে তাদের কথা বুঝতেও পারি নে বিশ্বাসও করি নে। সকল জাতির সকল শাস্ত্রই দৈবদত্ত নিখুঁৎ সত্যের অহঙ্কার করে অথচ তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আদায় কাঁচকলায়। মধ্য আফ্রিকার বর্ব্বরও তাদের নিরর্থক আচারকে ধর্ম্মের পদবী দিয়ে তার শুচিতার অভিমানে রোমাঞ্চিত, আমাদেরও সেই একই দশা। এই পরস্পর প্রতিযুধ্যমান শাস্ত্রকে আমি দূর থেকে নমস্কার করি— শ্রেয়োবোধের অনুমোদিত শুচিতাকেই পালন করতে আমার প্রয়াস,— যে বাহ্য আচার মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে প্রাচীর তুলে বেড়ায় মানবপ্রেমকে, ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে শাস্ত্রের অক্ষর বাঁচাবার জন্যে খুনোখুনি করতেও অগ্রসর হয় তাকে বর্জ্জন করে নাস্তিক অধার্ম্মিক পদবী নিতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই। পাণ্ডার পা পূজো করে যে আত্মাবমাননা হয় তার দ্বারাও ভক্তির সার্থকতা ব্যাখ্যা করবার মতো শাস্ত্রিক সূক্ষ্ম তর্ক আমার বুদ্ধির অতীত। অতএব আমাকে ভিন্ন জাতের মানুষ বলেই জেনো, আমি তোমাদের ত্যাজ্য। আমার গতি হবে কোথায় সে জন্যে

আমি ভাবিই নে— খামকা যমদূত আমার ঝুঁটি ধরে যদি কুম্ভীপাকের দিকে টানাটানি করে তবে তার সেই রূঢ় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করব, বলব তার যে মনিবের এমনতরো বুদ্ধিহীন হৃদয়হীন বিধিবিধান তার বিরুদ্ধে আমার চিরকালের বিদ্রোহ— তাকে ঘুষ দিয়ে স্বর্গে যেতে চাই নে— কেননা সেখানে গিয়ে শাস্ত্রীয় ভাষায় নিয়ত যার খোষামোদ করে আত্মরক্ষা করতে হবে তাকে আমি সম্মান করতে অক্ষম। যে বিধাতা আমাকে বুদ্ধি দিয়েচেন, মানুষভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা দিয়েছেন, মানবপ্রেমের ত্যাগপরায়ণ দুঃসাধ্য সাধনার দিকে আহ্বান করেছেন, তাঁকে ভক্তি করেই আমার ভক্তিবৃত্তিকে ধন্য বলে মানি— তাঁরই বিধান আমার যুক্তিতে আমার শুভবুদ্ধিতে সহজ বলে বোধ হয়, তাই আমার শিরোধার্য্য।

… … … আমাকে শ্রদ্ধা করতে করুণা করতে স্বভাবতই অক্ষম সে জন্যে আমি তাঁকে দোষ দিই নে। আমার রচনায় বা ব্যবহারে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা তাঁকে এতই উদ্বেজিত করে যে তিনি আমাকে অপমান না করে থাকতে পারেন না। নিষ্কাম সাহিত্যসমালোচনার সঙ্গে তার প্রভেদ আছে। যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি তার ত্রুটিকে নির্দ্দেশ করা আমাদের কর্ত্তব্য হলেও তাকে অসম্মান করতে আমরা সহজেই কুণ্ঠিত হই। আমি জানি তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অপরাধ সম্বন্ধেও নিঃশব্দে ধৈর্য্য প্রকাশ করে থাকেন। সাহিত্যে তাঁর আদর্শই যদি একমাত্র আদর্শ হয় এবং সেই আদর্শের সঙ্গে আমরা মিলিয়ে না চললেই আমরা যদি সৌজন্যের অধিকার

থেকে বঞ্চিত হই তবে তাঁর সেই দুর্জ্জয় অভিমানকে মেনে চলে চলে মান রক্ষা করতে হবে এমন আশা কী করে করবে!— কিন্তু নিশ্চিত জেনো তাঁর প্রতি তোমার বন্ধুভাবকে আমি মনের এক কোণেও বাধা দিতে ইচ্ছা করি নে। আমার খাতিরে যদি তাঁর প্রতি তোমার সৌহার্দ্দ্যের কিছু খর্ব্বতা ঘটাও সেটা আমার প্রতিই তোমার অসম্মান হবে। আমি নিজে তাঁর অশ্রদ্ধার আবেষ্টন থেকে দূরে থাকতে চাই কিন্তু তাঁকে দণ্ড দেবার ইচ্ছা আমার মনে যদি জাগে তবে সেইটেই আমারই সব চেয়ে বড়ো দণ্ড। আর ক'দিনই বা বেঁচে থাকব— যেখানে স্নেহ পেয়েছি শ্রদ্ধা পেয়েছি করুণা পেয়েছি সেখানেই আসন পেতে আনন্দে কাটাতে চাই, বিরোধ বিদ্বেষের প্রতিবেশে মনকে কলুষিত পীড়িত করতে যাব কেন? ইতি ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫৮

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। এখনো ব্যস্ততার অবসান হয় নি— জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কবে হবে তাও জানি নে। নিষ্কৃতি চাই যে তাও সত্যি, চাই নে এও সত্যি। আমার মধ্যে নিভৃতচারী অবকাশবিলাসী ধ্যানপরায়ণ মানুষও আছে আবার আছে

কর্ম্মের মধ্যে যে আপন সার্থকতা সন্ধান করে। কর্ত্তব্যের পরিকল্পনা মনের মধ্যে যখন জেগে ওঠে তখন তাকে রূপ দেবার জন্যে মন আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ তো কাব্য মহাকাব্য লেখা নয়, ভাব নিয়ে শব্দ নিয়ে ছন্দ নিয়ে সাধনা নয়, বহুতর মানুষকে নিয়ে কাজ,— অনেক বিষয়েই আমার স্বভাব ও ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র স্বভাব ও ইচ্ছা তাদের। আমি রাষ্ট্রনায়ক নই, শাসননিপুণ নই, মানুষকে ভেঙেচুরে পিটিয়ে পিণ্ড করে কুমোরের মতো তাই নিয়ে মূর্ত্তি গড়ব আমার সে শক্তিও নেই প্রবৃত্তিও নেই। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহৎ আদর্শের চারদিকে আকৃষ্ট হবে, তার সাধনায় আপনাকে উৎসর্গ করবে এই প্রত্যাশা করি। কিন্তু এমন প্রত্যাশা কবির যোগ্য। বস্তুত নানা মানুষ আসে নানা আকর্ষণে, কেউবা অর্থের কেউবা খ্যাতির কেউবা কর্ত্তৃত্বের, তাদের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নানা রকমের, তাদের মধ্যে বিরুদ্ধতাও থাক্‌তে পারে— তাদের সবাইকে এক-শাসনে অভিভূত করে না আনতে পারলে এক-ফললাভের আশা থাকে না। সেই শাসনকার্য্যে আমার আনন্দ নেই। অথচ যে কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা আমি করেচি সে কর্ম্মকে বড়ো বলেই জানি, এও জানি যাদের মনে কল্পনা নেই, বুদ্ধিতে কাঠিন্য ও তীক্ষ্ণতা থাকলেও দীপ্তি নেই এ কাজ তাদের নয়— কাজেই এই কর্ত্তব্যভার আমি ইচ্ছে করেই বহন করেছি। শুধু সাহিত্য নিয়েই জীবনযাপন যদি আমার পক্ষে স্বাভাবিক হোতো তাহলে মনের আনন্দে সেই পথেই চলতুম। সে আর হোলো না। অতএব নালিশ করা আমাকে শোভা পায় না। আমার কাব্য

আমার দেশের লোক অনেক পরিমাণে স্বীকার করেচে— আমার কাজকে যদি স্বীকার না করে তবে দোষ দেব কাকে? বাঙালী দেশের কোন্ কাজকেই বা শ্রদ্ধা করে মেনে নেয়, কোন্ কাজকেই বা সাতখানা করে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা না করে? বাঙালীর অপরিসীম অহঙ্কারের কাছে কোনো কাজই তার সম্মতির যোগ্য বলে গণ্য হয় না। অহৈতুক প্রতিকূলতায় কণ্টকিত এই দেশে যে হতভাগ্য কোনো দুরূহ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় সে বঙ্গভূমির ভাগ্যগগনে নিত্যজাগ্রত দুর্গ্রহের অভিসম্পাতগ্রস্ত।

তুমি এক্‌জিমার ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করেছ। একটা ভালো ওষুধ আছে। জানি নে সে গাছের পরিচয় তোমাদের কাছে কোন্ নামে? এখানে তাকে বলে বন-টেপারি। তার ফল দেখতে ঠিক ট্যাপারির মতো, পোষাকপরা। বেঁটে নিয়ে তারি রস লাগাতে হয়। একবারের বেশি লাগাবার দরকারই হয় না, বড়ো জোর দুবার। তার পরে আর প্রয়োগ না করে অপেক্ষা করে দেখ্‌তে হবে।

কাল কলকাতায় যাচ্চি— প্রবাসীসাহিত্যসম্মেলনে। ইতি
৯ পৌষ ১৩৪১

দাদা

১৫৯

১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার মানসপটে আমার মুখচ্ছবিতে তুমি একটি নিষ্ঠুর কৌতুকহাস্যরেখা দেখতে পাচ্চ।— এতদ্দ্বারা আমি তোমাকে জ্ঞাপন করচি যে সেটা তোমারি কল্পনাতুলিকাদ্বারা আরোপ করা— বিধাতার রচনার মধ্যে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না— সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে তাঁরই উপর তোমার চেয়ে বেশি নির্ভর করা যেতে পারে।

অনতিকালের মধ্যে আমাকে বাংলাদেশের বাহিরে চার জায়গায় যেতে হবে— অন্তত আটটা ইংরেজি বক্তৃতা না হলে মান রক্ষা হবে না। সময়াভাব কাকে বলে সেটা তোমরা অনুভব বা অনুমান করতে পারো না। বেকারশ্রেণীয় অভিজাত-মণ্ডলীর মধ্যেই তুমি জীবনযাপন করো তাই আমাদের মতো কর্ম্মভারগ্রস্ত মানুষের অবস্থা তোমার মনোগোচর হতে পারে না। বর্ত্তমানে আমার কী দশা, কর্ম্মস্থানে কোন্ গ্রহের দৃষ্টি সন্ধান করে দেখলে প্রকৃত খবর সমস্তই জানতে পারবে।

কাল রাত্রে এখানে আটজন জাপানী অতিথি এসেছেন। তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হবে। স্বভাবতই আমি কুণো অথচ বিরাট বহিঃসংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটিয়েছে আমার ভাগ্য। আমার অন্তরের বিরুদ্ধে বাহিরের এই প্রতিবাদ নিয়তই চলেছে। অতএব ইতি ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

দাদা

১৬০

২২ জানুয়ারি ১৯৩৫

কল্যাণীয়াসু

আমার সমস্ত দিনের ভোজনের তালিকা তোমাকে পাঠাতে বাধ্য হলুম— নইলে মনে মনে কাল্পনিক অর্দ্ধভোজনের বিবমিষা তোমাকে পীড়িত করবে।

প্রাতে ৬টা :— মাখন দিয়ে তোস্-করা রুটি দুই খণ্ড। তৎসহযোগে বিলিতি বেগুনের জ্যাম, গৃহজাত। অনেক পরিমাণে দুগ্ধসংযোগে চৈনিক চা। দুটি কদলী। বেগুনটা বিলিতি, তথাপি নিরামিষ।

মধ্যাহ্নে :— পালং, রাইশর্ষের শাক, ফুলকোফি, সেলারি (এক প্রকার বিলিতি সবজি) ট্যাঁড়স,— সমস্তই কাঁচা, খণ্ড খণ্ড করে মিশিয়ে তাতে আদা ও নেবুর রস দিয়ে তৎসহ পুদিনা শুল্‌ফ শাক মিশিয়ে কিঞ্চিৎ শর্করাযোগে সেবন করে থাকি। যেটাকে সেলারি বলচি এটা বিলিতি বটে কিন্তু দ্বিপদ বা চতুষ্পদ নয়, মাটি ফুঁড়ে ওঠে বটে কিন্তু শিং দিয়ে গুঁতিয়ে নয়। কালীঘাটে মানৎ করবার মতো এর মধ্যে ব্যথা, ভয় বা রক্তও কিছু নেই। তার পরে তোস রুটি, দুটো লবণস্পৃষ্ট, বাকি দুটো মিষ্টপ্রলেপযুক্ত। ক্বচিৎ সন্দেশ দিয়ে সমাপন করি।

অপরাহ্নে : ছাগদুগ্ধযোগে চা।

সায়াহ্নে : পূর্ব্বোক্তবৎ সবজির মিশ্রণ। পরিণামে যদৃচ্ছাকৃত মিষ্টান্ন, সেটা মাছ বা মাংস দিয়ে রচিত নয়।

প্রাতে মধ্যাহ্নভোজনের পূর্ব্বে আধপোয়া আন্দাজ ছাগদুগ্ধ খেয়ে থাকি, কিন্তু তার পূর্ব্বে জগন্মাতার প্রসাদী ছাগের পিতৃ বা ভ্রাতৃপুরুষকে ভক্ষণ করি নে।

আর অধিক লেখবার সময় নেই। কাজের তাড়া আতিথ্যের কর্ত্তব্য শারীরিক পীড়া সব একত্র মিশেচে। ইতি ৮ মাঘ ১৩৪১

দাদা

১৬১

কল্যাণীয়াসু

কাল অর্থাৎ রবিবারে যাত্রা করে সোমবার সকালে কলকাতা পৌঁছব। হয় তো দু তিন দিন থাকতে পারি। জোড়াসাঁকোয় এসে নামব তার পরে স্নানাহার সমাপন করে যাব বরানগরে। হয় তো বোটে থাকতেও পারি। ইতি

দাদা

১৬২

৫ মার্চ্ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

লক্ষ্ণৌ থেকে যখন যাত্রা করলুম কলকাতায় আসাই তখন সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু শরীরটা আপত্তি জানালো। এবারে আমার ভ্রমণের গোড়া থেকেই শরীর বিগড়ে ছিল। ঘোরাঘুরিতে ক্রমেই সেটা বেড়ে চল্‌ল। তাই অবশেষে শান্তিনিকেতনে

আমার কুলায়ের কোণে এসে আশ্রয় নিতে হোলো। এখানে আমাদের বসন্ত উৎসবের জন্যে ছেলে মেয়েরা প্রস্তুত হচ্চে। নৃত্যগীতবাদ্যের আয়োজনে আমার সহায়তার দাবী করে তারা, আমি তো ওদেরই পোয়েট্ লরিয়েট্। এই পালাটা শেষ হলে পর একবার কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় যাব। সেই সময়ে রথী বৌমা বিলেতে যাত্রা করবেন। ওঁরা গেলে আমার এখানকার বাড়ি অত্যন্ত শূন্য হয়ে পড়ে। মন টেঁকে না।

নানা স্থানে ঘুরে এলুম। লাহোরে এই আমার প্রথম আবির্ভাব। আমাকে নিয়ে খুব ধূমধাম করেছে। তার সমারোহ অংশটা ক্লান্তিকর। আমার ঐ জিনিষটাতে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। কিন্তু এখানকার মানুষ অত্যন্ত সরল, তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা খুব অকৃত্রিম, সেটা অজস্র পেয়েছি। ইতি ৫।৩।৩৫

দাদা

১৬৩

৭ মার্চ ১৯৩৫

কল্যাণীয়াসু

তোমার ফল উপহার পেয়েছি। ভোগ আরম্ভ হয়েছে। আমার শরীরের জন্যে ভেবো না। আমার দেহে রোগের আঘাত প্রতিঘাত অনেক হয়েছে— কিছুতে আমাকে একান্ত পরাভূত করে না। এই কারণেই আমার সম্বন্ধে কেউ দয়া করতে পারে না। শয্যাগত হলেও অনতিকালের মধ্যেই এমনি খাড়া হয়ে উঠি এবং পূরো অধ্যবসায়ে কাজ করতে বসি যে কেউ অনুভব

করে না যে আমার শুশ্রূষা বা আমার বিশ্রামের দরকার আছে। তাদের দোষ দেব কেন? তাদেরই দরকারের অন্ত নেই, শেষ পর্য্যন্ত যত দিন পারি তাদের সে দরকার মিটিয়ে যাব। আমি কৃতজ্ঞতার দাবী করা ছেড়ে দিয়েছি কেননা জানি আশার অন্ত নেই, পূরণ করার শক্তি সীমাবদ্ধ। আমার উপরে লোকে এই জন্যেই রাগ করে— কিছু দিই বলেই মনে করে আরো দিতে পারতুম, যারা কিছুই দেয় না তারা নিরাপদ। বঙ্কিমের সময় তাঁদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আলাপ করতে সাহস করত না। তাই তাঁদের সম্মানে কেউ আঘাত করে নি। তাই বলে নালিশ করব না। বিধাতার কাছে প্রচুর বর পেয়েছি কোনো দানে কিছু অভাব পড়লেই দুঃখ করা অকৃতজ্ঞতা। তোমাদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা যে সমবেদনা পেয়েছি সে কি কম কথা? এ তো অপ্রত্যাশিত।— এখানকার উৎসব সমাধা হলেই যাব কলকাতায়। তখন দেখা হবে। ইতি ৭।৩।৩৫

দাদা

১৬৪

১৬ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলুম। এখনো আছি। এবারে দোলপূর্ণিমার আগেই ইদের একটা ছুটি পড়েচে। তার সঙ্গে শনি রবি যোগ দিয়ে সেটা তিন দিনে স্ফীত হয়ে উঠেছে। তাই

কলকাতা থেকে আগন্তুকরা এই ছুটিতেই ভিড় করে আসচে। কাল সন্ধে থেকে তাদের আবির্ভাব সুরু হয়েছে। আজ রাত্রে তাদের চিত্তবিনোদনার্থে চণ্ডালিকা অভিনয় হবে। নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী চণ্ডালিকার ভূমিকা নেবে। সে চমৎকার অভিনয় করতে পারে। বোধ হচ্চে খুব ভালো হবে।

ঋতুরাজের অভ্যর্থনার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর একবার কলকাতা অভিমুখে যাব। তোমার জন্যে সুরুলের তাঁতের পাঁচ জোড়া সাড়ি আনিয়ে রেখেছি। ভেবেছিলুম হাতে করে নিয়ে তোমাকে দেব— কিন্তু কী জানি কোনো কারণে যদি দেরি হয়। আজ কালের মধ্যে কেউ এখান থেকে কলকাতায় যদি যায় তবে তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব— সেখান থেকে আমাদের দরোয়ান তোমার দ্বারে পৌঁছিয়ে দেবে। সাড়ি কয় জোড়ার দাম সম্বন্ধে তোমার মনে বিতর্ক উঠতে পারে। আগে থাকতে জানিয়ে রাখা ভালো— হাজার পাঁচেকের কম তো হবেই না। কারণ, আমি স্বয়ং তোমাকে দিচ্চি তার মূল্য তো বাজার দরের সঙ্গে মিলবে না। এই দানের মূল্যকে বাদ দেবার চেষ্টা কোরো না। তোমাকে দেবার এই উপলক্ষ্যটা আমার কাছেও অভিলষিত এই কথা মনে রেখো। আমার পরিতাপ এই যে অত্যন্ত শস্তায় পুণ্যলাভের চেষ্টা করচি— কিন্তু দানের মূল্য আর্থিক দামে নয়— এটা পেয়ে যদি খুসি হও তবে ব্রাহ্মণকন্যার সেই খুসিতেই আমার পুণ্যের পরিমাপ। আজ আর সময় নেই। ইতি ১৬।৩।৩৫

দাদা

১৬৫

২১ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার কন্যা তোমারি সম্মানের দিকে তাকিয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করেচে, আমার মানরক্ষার কথা ভাবে নি। একটু বুঝিয়ে বলি, চিঠিটা তাকে শুনিয়ো।— তুমি আমার কাছ থেকে কিছু চেয়েছিলে, এতে আমি খুসি হয়েছি। প্রমাণ হয়েছে তুমি আমাকে আপন করে অনুভব করেছো, তোমার মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, তাই সে সঙ্কোচ বোধ করলে। তোমাকে কিছু দেবার সুযোগ পেলুম এ'তে আমার আনন্দ। খুকু তর্ক করতে পারত সে সুযোগ আমি নিজেই অযাচিতভাবে নিলুম না কেন। উত্তর এই, যদি তেমন করে দিতে হোতো তাহলে দামী জিনিষ না দিলে মান রক্ষা হোতো না। তাতে দেওয়ার আনন্দ ছাপিয়ে উঠত দেওয়ার কৃচ্ছ্রসাধন। কারণ সময় এখন এত খারাপ যে ধনীরাও আপন দারিদ্র্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্চে না। তুমি বিশেষভাবে সামান্য কিছু দাবী করেচ, তাতে দেওয়ার আনন্দ পেয়েছি, দেওয়ার দুঃখ কিছুই গায়ে বাজে নি, আর খুসি হয়েছি সঙ্কোচ করো নি বলেই। সঙ্কোচ করো নি বল্‌লে অত্যুক্তি হয়, তুমি বলেছিলে স্রুরুল থেকে পাঠিয়ে দিলে দাম দেবে। ঐটুকুর মধ্যে যে ছলনা ছিল বোধ হয় তারি জন্যে তোমার মেয়ের কাছে কথা শুন্‌তে হোলো। কেন স্পষ্ট করে বলতে পারলে না যে আমি যদি তোমাকে আমাদের এখানকার তৈরি জিনিষ তোমাকে

দিই তাহলে আমি দিচ্চি বলেই তুমি খুসি হবে, দামী জিনিষ গায়ে পড়ে দিচ্চি ব'লে না। খুকু যখন বিয়ে করে গিন্নিপনার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করবে তখন যদি যেচে কোনোদিন আমাকে লেখে, মামা, তোমার বই আমাকে দিতে হবে, তাহলে আমি কখনোই মনে করব না, নতুন গিন্নি খরচ বাঁচাবার জন্যে এই কৌশল করেচে। আবদার করতে যদি সে সঙ্কোচ করে তাহলে আমার মামাপদ তখনি রিজাইন্ করব। তাকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখচি সে নিজে না চাইলে তাকে একখানা বইও আমি দেব না। চাইতে যদি পারে সে, তাহলেই জানব পাবার অধিকার তার হয়েছে— স্বাতন্ত্র্যের গৌরবই যদি বড়ো হয় তাহলে কিনুক আমার বই। আর যাই করো পাঁচ জোড়া সাড়ির থেকে আধখানাও তুমি তোমার গরবিণী মেয়েকে দিতে পারবে না। স্কুলের সাড়ি পরতে আপত্তি যদি না থাকে তাহলে মামার কাছে চাইতে হবে মিষ্টি গলায়— এমন কি যদি আমি সত্ত্ব না দিই তাহলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে। আমি হয় তো বলব আমার জমিদারী নিলেম হতে বসেছে, কিন্তু সে যেন ফস করে বিশ্বাস করে না বসে। এমন কি আমার দারিদ্র্যকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে উলটে আমারি জন্যে এক ডজন খদ্দরের পাঞ্জাবী ফরমাস যেন না দেয়। এই রইল কথা।

কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যাব। রথীরা বিলেত যাবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকব। তিন চার দিনের মধ্যেই আবার ফিরতে হবে কাজ আছে। কাল আমার কোনো আত্মীয় সাড়ির গাঁঠ্রি ৯।১।A কালু ঘোষের লেনে

পৌঁছিয়ে দেবে, উদ্ধার করে নিয়ো। হয় তো এই চিঠিখানিও উক্ত গাঁঠরির সঙ্গে তারি হাতে দিতে পারি। ইতি ২১।৩।৩৫

দাদা

১৬৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

খুব ব্যস্ততার মধ্যে তোমার চিঠি পেলুম। রথী বৌমা আজ সন্ধ্যার ট্রেনে য়ুরোপ অভিমুখে যাত্রা করবেন। চলে গেলে পর আর এই শূন্য বাড়িতে থাকব না— যাব বরানগরে। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মেয়াদ।

দাদা

১৬৭

২৪ মার্চ, ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

খুব খুসি হলুম।

আমার সকল মনের আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৪।৩।৩৫

দাদা

১৬৮

১ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ত আছি এখানে এসে অবধি। প্রুফ দেখতে হচ্চে, লিখ্‌তে হচ্চে, লেখা সংশোধন করতে হচ্চে, দর্শনার্থীদের ভিড় হচ্চে, সময়ের বাকি দুই একটা টুক্‌রো অংশ বিশ্রামের কাজে লাগাচ্চি।

ক দিন থেকে মেঘের দল হাওয়ায় সওয়ার হয়ে দিগন্তে দিগন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ধূলো উড়িয়ে হৈ হৈ করাই ছিল তাদের কাজ। এরা কন্‌গ্রেসের দলের মতো, এদের কাছ থেকে সার্থকতার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। এমন সময় কাল সন্ধ্যার দিকে ওরা মন স্থির করলে, হাওয়া বইল বেগে, ধড়াধ্বড় পড়তে লাগল দরজা, ওদের লম্বা ফৰ্দ্দ মাফিক বৃষ্টি এলো না, ধূলোর বৈরাগ্য শান্ত করবার মতো কিছু বর্ষণও হোলো। বহিরাকাশের নিমন্ত্রণে বাধা পড়ল বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়লুম। অনতি-কাল পরেই দেখলুম দুই একবার পা দুটো কেঁপে উঠল। ভূমিকম্প বলেই অনুমান করচি, কিম্বা বাতাসের বেগে খাট বিচলিত হয়েছিল তাও হতে পারে। আকাশে এখনো কিছু কিছু মেঘের ষড়যন্ত্রের অবশেষ আছে, হয়তো সন্ধ্যার অন্ধকারে আর একবার তাদের পরাক্রম দেখা দেবে।

হৈমন্তীকে তোমার চিঠি দেব। কিন্তু ··· কিছুকাল হোলো সভর্ত্তৃক অন্তর্ধান করেছে। ওরা আমার সমস্ত কাজের মাঝখানেই

হঠাৎ দৌড় দিয়েছে মাদ্রাজে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে বয়েস অল্প— সব দায়কে হাল্‌কা করেই দেখে। কিন্তু আমার বয়স অল্প নয়, দায় বিস্তর, মোচন করবার শক্তি ক্ষীণ, বাহনদের পরেই নির্ভর— বিনা কারণে তাদের ডানা যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে, অদৃশ্য হয় মেঘের মধ্যে, আমার বোঝা নামাবার উপায় দেখি নে। দুঃখ করব না, নালিশ করব না, সব বোঝা যিনি নামিয়ে নেবেন তাঁর রথের শব্দ অদূরে শোনা যায়।

আর যাই হোক্ ক্লান্তি ছাড়া আমার দেহে আর কোনো বালাই নেই— অতএব চিন্তা কোরো না। নানা দেশের নানা ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেচে, তারা বলে আমার দেহের কোনো যন্ত্রই শিথিল হয় নি, কেবল হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশী অযথা পরিশ্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। ইতি ১৮ চৈত্র ১৩৪১

দাদা

১৬৯

১৪ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ নববর্ষের দিনে তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আজ উৎসবের ব্যাপারে এবং অতিথিকৃত্য নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। এখন কিছু দিন এই রকম চলবে। কারণ এই ছুটির সময় সুযোগ পেয়ে চারদিক থেকে এখানে লোকের আমদানি হয়। তাছাড়া অন্য কাজ আছে।

রাণীকে ও হৈমন্তীকে তোমার চিঠি দিয়েছি। তাদের কাছ থেকে আমার সংবাদ জানতে পারবে। সংবাদ বিশেষ কিছুই নেই। আজ সায়াহ্নে শুক্লনবমীর জ্যোৎস্নায় নৃত্যগীত হবে। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

দাদা

১৭০

২৬-২৭ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দিনের বেলায় লিখি। লেখায় শ্রান্তি এলে অপরাহ্নে কখনো ছবি আঁকতে বসি। দিন ফুরিয়ে গেলে বাইরে গিয়ে বসি সেই সময়টাতে দর্শনার্থীর সমাগম হয়। সন্ধ্যা হয়ে আসে যখন, তখন কোনো কোনো দিন এখানকার ছেলেমেয়েরা ধরে তাদের কিছু একটা পড়ে শোনাতে, কবিতা, বা নাটক, বা গল্প। গল্পগুচ্ছ থেকে সুপরিচিত পুরোনো গল্প শোনবার জন্যেও ওদের আগ্রহ আছে। পর্শু শুনিয়েছি রাজটীকা, কাল শুনিয়েছি ক্ষুধিত পাষাণ। আজ ছিল ছুটি। সমস্ত দিন চলে তপ্ত হাওয়া, উড়তে থাকে ধূলো, সন্ধ্যার দিকে হাওয়ার বেগ বাড়ে, তাপ কমে, রাত্রে পড়ে ঠাণ্ডা।

এই দুরন্ত হাওয়ায় যখন চুল উড়ে পড়চে চোখে, টেবিলের উপর কাগজ পত্র সামলানো শক্ত হচ্চে এমন সময়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসলুম। এ মুল্লুকে খবর বলে কোনো বালাই নেই— এ তো কলকাতা সহর নয়— দিনগুলো জপমালার গুটির মতো,

অভাবিতপূর্ব্ব উপহারগুলিও এই বাণী বহন করত। তখনকার সেই জন্মদিনের ধারা এখন আর নেই। কিছু উৎসর্গ যে আসে না তা নয়— কিন্তু সে আসে দূরের দান পায়ের কাছে, কণ্ঠে আসে না হাতে আসে না— উপহার আসে না অঞ্জলি থেকে অঞ্জলিতে। দেবতারা কি খুসি হন তাঁদের পূজায়, মর্ত্ত্য যখন স্বর্গের দ্বারের প্রান্তে উদ্দেশে রেখে আসে তার নৈবেদ্য। সেই আমার অল্প বয়সের পঁচিশে বৈশাখের স্নিগ্ধ ভোরবেলাটা মনে পড়চে— শোবার ঘরে নিঃশব্দচরণে ফুল রেখে গিয়েছিল কারা, প্রত্যুষের শেষ ঘুম ভরে গিয়েছিল তারি গন্ধে— তার পরে হেসেছি ভালোবাসার এই সমস্ত সুমধুর কৌশলে, তারাও হেসেছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ।

আজ সকালে বসে বসে ছবি আঁকছিলেম— বেলা তখন নটা। এমন সময় তোমার উপহারগুলি এসে পৌঁছল। খুসি হয়েই হাসলুম। চিঠিতে সেটা পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। তোমার গরদের জোড় পরব আমার জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে। তোমার পাথরের থালায় বোধ হয় এরা চন্দনের বাটি রাখবে। দুটি যে সুন্দর গড়নের বাটি দিয়েচ তার একটা লাগবে আমার ছবি আঁকার কাজে, আর একটা প্রাত্যহিক জলযোগের উপকরণ-রূপে। তোমার রাখীও সেদিন পরব।

অপরাহ্ণ এখন রৌদ্রতাপে ক্লান্ত, মাঝে মাঝে একটা কোকিল ডাকচে বোধ হয় য়ুকলিপ্‌টস্ গাছের ডালে বসে— এতে করে কোকিলের আধুনিকতার প্রমাণ হয়, উচিত ছিল ওর বকুলের

ডালে আশ্রয়গ্রহণ। কিন্তু ওর দোষ নেই— সে গাছটা কাছাকাছি নেই। পূর্ব্ব আকাশে মেঘের প্রলেপ লেগেছে— কিন্তু বর্ষণের আশা বারবার প্রতিহত হয়ে চলে যাচ্চে। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪২

দাদা

১৭২

১৫ মে ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল তুমি আসতে পেরেছিলে খুসি হয়েছি। আগামী শনিবারে এখানকার কাজ সেরে আমাকে যেতে হবে বোলপুরে। এইবার আমার সেই মাটির ঘরে প্রবেশ করব— আর একটা নূতন পর্ব্ব আরম্ভ করতে হবে— পুরাতনের যত কিছু উদ্‌বৃত্ত বোঝা হয়ে সামনেকার অবকাশকে আচ্ছন্ন করে আছে তাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে দিয়ে যাত্রাপথকে অবারিত করে দেব এই মনে করে আছি। তোমাদের কাছ থেকে অযাচিত অর্ঘ্য পেয়েছি— তোমরা আমার জীবনের অনেক অসম্মান দূর করে দিয়েছ— আমার জীবনের কাজকে হাটের পণ্যের মতো বিচার করে দর কষাকষি করো নি— তাকে আমার দান বলে আনন্দিত মনে গ্রহণ করেছ— তোমাদের সেই আনন্দই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ইতি ১৫ মে ১৯৩৫

দাদা

১৭৩

২৪ মে ১৯৩৫

ওঁ চন্দননগর

কল্যাণীয়াসু

আমাদের পদ্মা বোটে আশ্রয় নিয়েছি। এই বোটেই যৌবনকালে লিখেছি সোনার তরীর কবিতা— কতকাল বাস করেছি পদ্মার চরে সম্পূর্ণ একলা। এমন হয়েছে মাসের পর মাস একটি শব্দও উচ্চারণ করি নি, নিঃশব্দ বাক্য বিস্তার করেছি লেখায়। ছোট গল্পের অধিকাংশই এই বোটে লেখা। তারও আগেকার দিনে যখন আমার বয়স ছিল আঠারো, এই চন্দননগরে গঙ্গার ধারে দীর্ঘকাল কেটেছে। ঐ সামনে দেখা যাচ্চে দোতলা বাড়ি, ঐখানে ছিলেম জ্যোতিদাদার সঙ্গে। মনে পড়চে কোন্ এক বাদলের দিনে ঘন মেঘে ছায়াচ্ছন্ন নদী, নিবিড় বৃষ্টিধারায় দিগন্ত অবগুণ্ঠিত, দীর্ঘ অপরাহ্নের কর্ম্মহীন প্রহরে অকারণ বেদনায় মন বিরহাতুর, তখন একলা বসে বিদ্যাপতির গানটিকে সুরে বসিয়েছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

জানি নে আমার দেওয়া সুরে এ গান কখনো শুনেছ কিনা। অনেকেই জানে। আমার নিজের বিশ্বাস সুরটা ভালো হয়েছে। আজ ঐ বাড়িটা অনাদরে জীর্ণ হয়ে পড়েছে নইলে ঐখানেই থাকতুম।

আমার মনে হয় তুমি যদি গৌরীপুরে গিয়ে থাক তোমার

দেহ মন সুস্থ থাকবে। তোমার সেই বাল্যকালের কুলায়ে তোমার মন আপন অভ্যস্ত আশ্রয় সহজে পাবে। পরিচিত গাছপালাগুলির আত্মীয়তা চারদিককে স্নিগ্ধ করে রাখে, তাদের নিরন্তর শুশ্রূষায় তুমি আরাম পাবে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সেখানে বই পড়ে সময় কাটাবার উপায় যথেষ্ট আছে— দায়িত্বভারবিহীন বিশ্রামকাল পড়াশুনার প্রবাহে ভরে উঠবে। যদি সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় এবং মন দিতে পারো তাহলে ইংরেজি শেখবার চেষ্টা কোরো। ব্যাকরণের দুর্গমতা পরিহার করে কোনো একটা হাল্‌কা বই নিয়ে যদি দ্রুত বেগে পড়ে যাও তাহলে ক্রমশই এই ভাষাটা মনে বসে যাবে। আমার ইংরেজি ও সংস্কৃত বিদ্যা এই প্রণালীতেই। তুমি দেশ বিদেশের কথা শুনতে ভালোবাসো— ইংরেজিতে ছবিওয়ালা জিওগ্র্যাফিক্যাল রীডার আছে, চেষ্টা দেখ্‌তে পারো। এমনি করে হাৎড়ে হাৎড়ে দশখানা বই যদি শেষ করতে পারো দেখবে ভাষাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অত্যন্ত তন্ন তন্ন করে পড়বার দরকার নেই— কোনোমতে মানে বুঝে হূহু করে পড়ে যেয়ো। এমনি করে যত বেশি সংখ্যার বই পড়বে ততই আপনি পথ সুগম হয়ে উঠবে।

গ্রামবাসীদের জন্যে তুমি কী করতে পারো জিজ্ঞাসা করেছ। এ কাজের অভিজ্ঞতা তোমার নেই এবং আমার বিশ্বাস তোমার মনোবৃত্তিও এ কাজের অনুকূল নয়। তোমার স্নায়ুর দুর্ব্বলতায় তোমার মনকে ক্লান্ত ও বিক্ষিপ্ত করে দেবে। তখন অক্ষমতার ধিক্কারে তোমার মন পীড়িত হবে। যদি তুমি এমন কোনো

সঙ্গী পাও যিনি মাঝে মাঝে একটু একটু ব্যাখ্যা করে দ্রুতবেগে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি পড়ে যেতে পারেন তাহলে তুমি ফল পাবে। ইংলণ্ডে যে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম, সেখানে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত দুঘণ্টা বই পড়ে যেতুম, সমস্তটাই যে সম্পূর্ণ বুঝতুম তা নয় কিন্তু কেবলমাত্র আবৃত্তির বেগে ভাষাটা দিনে দিনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

অনেকদিন পরে জনতা ও কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পড়াশুনো করতে আরম্ভ করেছি। অনেকদিন এমন বিশ্রাম পাই নি। বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছিলুম কিন্তু ইস্কুল আমার স্বভাবের মধ্যেই ছিল। মাস্টার মশায়কে ফাঁকি দিয়েছি কিন্তু কোনোদিন পড়া ফাঁকি দিই নি— রাত জেগে পড়েছি যে সব বই ভালো করে বোঝবার শক্তি ছিল না তাও পড়তে ছাড়ি নি। সম্প্রতি আমার সেই পড়ার ধারা নানাবিধ বিঘ্নে অবরুদ্ধ হয়েছে— পড়বার সেই অভ্যাসটাও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে — নানা চিন্তা এসে মনোযোগকে পরাভূত করে দেয়— তা ছাড়া শারীরিক দুর্ব্বলতাও মনকে অভিভূত করে। এখানে এসে চারদিকে নানাবিধ বই জড়ো করেছি— যখন যেটা খুসি টেনে নিয়ে পড়তে বসি— লিখতে এখন আর মন যায় না।

জুন মাসের শেষকাল পর্য্যন্ত এখানে থাকব স্থির করেছি। ইতি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

দাদা

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্রে একটা গভীর আঘাত দিল এবং এমন যে তুমি হয়তো উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার চিন্তা এবং বোধের দিক থেকে সত্যকে তোমার সামনে ধরবার [illegible] জন্য সেই কারণেই আমি এত চেষ্টা করেছি। তোমাকে তাতে দুঃখ দেওয়া হয়েছে। যে সংস্কার তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাতে হয়তো তুমি আরাম পেতে — তোমার ভক্তি-স্বভাব তার মধ্যে আপন সেবাপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পেরেছিল, আমাদের প্রকৃতি বুদ্ধি স্বভাব, ধ্যানের দ্বারা সত্যকে আপনার চিত্তের সঙ্গে মেলাতে পারলে সে সার্থকতা পায় — আমার লেখার উদ্দেশ্য ছিল সে পথে তোমাকে যদি নাও আনতে পারি তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ কথা মনে রেখো তোমাকে স্নেহ করেছি শ্রদ্ধা করেছি বলেই আমি এত কথা বলেছিলুম তোমাকে। তোমার চিঠি ও লেখা দেখে যে সব আলোচনা আমি অনেক দিন রেখে দিয়েছি — ইচ্ছা করেছি যেমন করে হোক তুমি শান্তি পাও। যে বিশ্বাসে মানুষের ক্ষতি ঘটায়, পরস্পরে ভেদ আনে, সমাজের মধ্যে মূঢ়তাকে অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেয়

তুমি ভেবে অবাক হয়ে থাকো এখন আমি স্নেহ মনে করি কি – তোমার সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতে পারিনি বলেই এই সব আলোচনায় তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। সে সম্বন্ধে তর্কে আমি নিরস্ত হয়েছি কিন্তু এ তুমি মনে রেখো তুমি আমার স্নেহ পেয়েছ – যখন তুমি দুঃখ পাও তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে আমি খুসি হই। আমার মধ্যে একটা সকলের চেয়ে [illegible] বেশি আত্মীয়স্বজনতার অভাব। সবাই আক্ষেপ করেন – কিন্তু সেটার কারণ উদাসীনতা নয়, ইহা বিশিষ্ট সম্বন্ধের মধ্যেই আমার বিশেষত্ব স্বরূপ – সেই সম্বন্ধের মধ্যে থেকেই আমার ভালোবাসা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে; মানুষের সম্বন্ধকে সংকীর্ণ অবকাশেই সীমিত করলে ~~[illegible]~~ সেই ভালোবাসা খর্বিত হয়।

সেই ভাব আছে কিন্তু আমি তীরের বাড়িতে উঠেছি – এই জায়গাটি খোলা, বেশ ভালো লাগছে – জলস্থলআকাশের সঙ্গীতে আমার আসর পাতছে।

ইতি ৭ ~~[illegible]~~ জুন ১৯৩৫

দাদা

১৭৪

[চন্দননগর] ৭ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পরে কত গভীর আমার স্নেহ এবং করুণা তা তুমি হয়তো উপলব্ধি করতে পার না। আমার চিন্তা এবং বোধের দিক থেকে সত্যকে তোমার সামনে আনবার জন্যে সেইজন্যেই আমি এত চেষ্টা করেছি। তোমাকে তাতে দুঃখ দেওয়া হয়েছে। যে সংস্কার তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাতে হয় তো তুমি আরাম পেয়েচ— তোমার নারীস্বভাব তার মধ্যে আপন সেবাপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পেরেছিল। আমাদের প্রকৃতি বুদ্ধিপ্রধান, ধ্যানের দ্বারা সত্যকে আপনার চিত্তের সঙ্গে মেলাতে পারলে সে আনন্দ পায়— আমার বোঝা উচিত ছিল সে পথে তোমাকে যদি নাও আনতে পারি তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ কথা মনে রেখো তোমাকে স্নেহ করেছি শ্রদ্ধা করেছি বলেই আমি এত কথা বলেছিলুম তোমাকে। তোমার দ্বিধা ও বেদনা দেখে সে সব আলোচনা আমি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি— ইচ্ছা করেছি যেমন করে হোক তুমি শান্তি পাও। যে বিশ্বাসে মানুষের ক্ষতি ঘটায়, পরস্পরে ভেদ আনে, সমাজের মধ্যে মূঢ়তাকে অন্ধতাকে প্রশ্রয় দেয় তুমি তাতে আবদ্ধ হয়ে থাকো এটা আমি শ্রেয় মনে করি নি— তোমার সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতে পারি নি বলেই এই সব আলোচনাদ্বারা তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। সে সমস্ত তর্কে আমি নিরস্ত হয়েছি কিন্তু এ তুমি মনে

জেনো তুমি আমার স্নেহ পেয়েছ— যখন তুমি দুঃখ পাও তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে আমি খুসি হতুম। আমার মধ্যে একটা সকলের থেকে দূরত্ব আছে বলে আত্মীয়স্বজনেরা অনেক সময়ে আক্ষেপ করেন— কিন্তু সেটার কারণ উপেক্ষা নয়, বৃহৎ নির্লিপ্ত অবকাশের মধ্যেই আমার বিধাতাদত্ত স্থান— সেই অবকাশের মধ্যে থেকেই আমার ভালোবাসা আপনাকে অব্যাহতভাবে প্রকাশ করে ; মানুষের সম্বন্ধকে সঙ্কীর্ণ অবরোধে পরিণত করলে সেই ভালোবাসার খর্ব্বতা ঘটে।—

বোট ঘাটে আছে কিন্তু আমি তীরের একটি বাড়িতে উঠেছি— এই জায়গাটি খোলা, বেশ ভালো লাগচে— জলস্থল-আকাশের সঙ্গমে আমার আসন পড়েছে। ইতি ৭ জুন ১৯৩৫

দাদা

১৭৫

[চন্দননগর] ১২ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার মনকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব এমন কথা তুমি কখনোই কল্পনা কোরো না। হৃদয়ের অকৃত্রিম অর্ঘ্য দুর্লভ দান, তাকে অবজ্ঞা করায় অপরাধ আছে। বিধাতা তাঁর অরণ্যে আমাদের সামনে ফুল দিয়েছেন ফল দিয়েছেন ধরে— তার সৌন্দর্য্য তার মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়, যে সন্ন্যাসী আপন ঔদাসীন্যের অহঙ্কারে তাকে উপেক্ষা করে সে বিধাতার অযাচিত

দানকে নিন্দা করার দ্বারাই নিন্দনীয় হয়। মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তার চেয়ে বড়ো তার চেয়ে মূল্যবান, বিধাতা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর আর কী দিয়েচেন ? আমি একদিন লিখেছিলেম--

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়—

আজও আমি সেই কথাই বলি— বিধাতার দানকে গ্রহণ না করে মুক্তি নয়, তাকে সত্য করে গ্রহণ করাতেই মুক্তি— সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করায় মুক্তি নয়, সৌন্দর্য্যকে বরণ করে নেওয়াতেই মুক্তি। কতদিন আমি বাইরের দিকে যখন তাকিয়ে থাকি আমার মনের মধ্যে সুধার ঝরনা ঝরে পড়ে— আমার অহঙ্কারের বাধা সরিয়ে রাখি বলেই তারা অন্তরে প্রবেশ করে— তোমাদের কাছ থেকে যখন সেবা পাই শ্রদ্ধা পাই, তখন আমি একান্ত খুসি হই, সে খুসিতে অহঙ্কার মিশ্রিত হলে তার প্রশস্ত পথটা রুদ্ধ হোতো।

এখানে আমি জুন মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে যাব কলকাতায়— দুই একদিন থেকে বরানগরে যাব। কলকাতা বড় শুষ্ক কঠোর, বেশি দিন টিঁকতে পারি নে। যতদিন থাকতে বাধ্য হই বাইরে গাছপালার মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়। রথী বৌমা ১০ই জুলাইয়ে আসবে দেশে ফিরে— কদিন তাদের জন্যে অপেক্ষা করে তাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব। তুমি যখনি আসবে খুসি হব নিশ্চয় জেনো। তুমি আমাকে কোনো জিনিষ দেবার চেষ্টা কোরো না— তোমার অন্তঃকরণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আপন সম্পূর্ণ রূপেই আমাকে স্পর্শ করে, আর কিছুই আমার দরকার হয় না।

এখান থেকে চিঠিপত্র যথাসময়ে আসাযাওয়া করতে বোধ হয় বাধা পায়। আজ জোড়াসাঁকো থেকে একজন কর্ম্মচারী তোমার দেওয়া বাটি দুটি নিয়ে এসেছিল তার হাতে এই চিঠি পাঠাই। ইতি ১২ জুন ১৯৩৫

দাদা

১৭৬

[চন্দননগর] ১৯ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার দেওয়া সব জিনিষগুলিই পেয়েছি। পেয়ে যতই খুসি হই মনে মনে লজ্জা বোধ না করে থাকতে পারি নে। আমার জন্যে তুমি নিজেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করো এ কথা মনে করতে আমি দুঃখ পাই। অন্তর থেকে তুমি যা নিবেদন করো তা আমি অন্তরেই গ্রহণ করি। বস্তুত বাইরে থেকে আমার দাবী খুব ক্ষীণ। ছেলেবেলা থেকেই বাইরের দিকে নিঃসক্ত থাকা আমার স্বভাব। অনেক সময়ে আমার আত্মীয়েরা এতে দুঃখ পেয়েছেন। কেননা আমি জানি, যাদের কাছে আমি প্রিয়জন বলে গণ্য তারা আমাকে স্বভাবতই সেবার দ্বারা নির্ভর দিতে ইচ্ছা করে। আমি অধিকাংশ সময়ে এই অধিকার থেকে আমার নিকট আত্মীয়দেরও বঞ্চিত করেছি— এমন কি রোগের সময়েও আমি শুশ্রূষা যথাসম্ভব গ্রহণ করি নি, এখনো করি

নে। বাইরের দিকে আমার এই দূরত্ব অন্তরের দিকে কিছুমাত্র কৃপণ নয় এ কথা নিশ্চিত জেনো।

এখানে আমি জুন মাসের ৩০শে পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে দুই একদিনের জন্যে জোড়াসাঁকোয় কাটাব— যদি তার সুবিধে না হয় তাহলে বরানগরে ৪।৫ দিন থাকবার কথা। বরানগরে তোমার আসা যদি দুঃসাধ্য হয় তাহলে আমাকে জানালে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। ইতি
৪ আষাঢ় ১৩৪২

দাদা

১৭৭

[চন্দননগর] ২৩ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে ক'টি জিনিষ পাঠিয়েছ সবগুলিই আমার কাজে লাগবে। এইবার আমার নতুন কুটীরে উঠব— সেখানে নতুন উপকরণের দরকার— তোমার কাছ থেকে তার কিছু সাহায্য পেয়েছি। তুমি আমাকে যে মনে করে এগুলি দিয়েছ সে কথা স্মরণ করে খুব খুসি হয়েছি। তোমার এই ত্যাগের প্রবর্ত্তনার মূল্য আমার কাছে উপেক্ষিত হয় নি। অন্তরের দানকে মন বাইরে রূপ দিতে চায়, তার মাধুর্য্যে আনন্দিত হই, কেবল সঙ্কোচ হয় পাছে তুমি নিজেকে অতিমাত্র বঞ্চিত করো।

আমি এখানে আরো সপ্তাহখানেক থাকব। ১লা জুলাই যাব জোড়াসাঁকোয়— ২রাও থাকব সেখানে— তার পরে বরানগরে। ৫।৬ই তারিখে চলে যাব শান্তিনিকেতনে— এখনো নিশ্চিত স্থির করি নি। এখানকার জমিদাররা আমাকে ত্রিশে তারিখে নিমন্ত্রণ করেছে, নইলে আগেই বেরিয়ে পড়তুম।

গঙ্গার উপর আষাঢ়ের সমারোহ ভাল লাগচে— শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে তার মহিমা আরো অবারিত। ইতি ৮ই আষাঢ় ১৩৪২

দাদা

১৭৮

[চন্দননগর] ২৭ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এইমাত্র খবর এল জোড়াসাঁকো বাড়ির এক অংশ …… কিছুদিনের জন্য মাড়োয়াড়িদের ভাড়া দিয়েছে। তাদের বিয়ে চল্‌চে— সুতরাং যাদের বিয়ে নয় তাদের পক্ষে ওখানে দিনযাপন আরামের হবে না। তাই ঠিক করেছি সোমবার অপরাহ্ণে যাব বরানগরে। বৃহস্পতিবার প্রাতে দৌড় দেব শান্তিনিকেতনে। বরানগর বোধ করি তোমার পক্ষে দুর্গম হবে। তবু যদি আসা সম্ভব হয় তবে খুসি হব।

আমাকে তুমি যত দূরস্থ করে কল্পনা করো সেটা সঙ্গত নয়। আমি স্বভাবত নির্জ্জনচর— কিন্তু তোমার মধ্যে আত্মোৎসর্গের

যে দাক্ষিণ্য আছে তাকে আমার কবিপ্রকৃতি কখনই উপেক্ষা করে না। আমি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেছি কিন্তু সেটাকে আমি অনুভব করি নে— সেই কারণে তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক ব্যবধান নেই বলেই তোমাদের হৃদয়ের দান আমি হৃদয়ের সঙ্গেই সহজে গ্রহণ করতে পারি। ইতি ২৭ জুন ১৯৩৫

দাদা

১৭৯

১২ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একখানি সাড়ি এবং চামড়ার পোর্টফোলিয়ো তোমাকে পাঠাচ্ছি, গ্রহণ কোরো। বিশ্বভারতী পাড়টা অন্য পাড় দিয়ে ঢেকে নিয়ো— ওটা ব্যবহার্য্য নয়। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩৫

দাদা

১৮০

[শান্তিনিকেতন] ১৭ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্ষিতিমোহনবাবু দাদূ-চরিতের যে উপক্রমণিকা লিখেচেন সেটি আমার ভালো লেগেছে বলেই তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছি। ভারতের মধ্যযুগে এই যে সব বড়ো বড়ো সাধকদের

আবির্ভাব হয়েছিল এঁরা সমাজ ও শাস্ত্রের প্রাচীর তোলা দুর্গের বাইরে বাস করতেন বলেই এঁদের প্রতিভার স্বচ্ছতায় আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ এমন বিশুদ্ধ ও সার্ব্বভৌমিক হয়েছিল। এই সকল ধর্ম্মসাধকদের প্রায় সকলেরই উৎপত্তি অন্ত্যজ জাতির থেকে। সমাজ তাঁদের বাইরে বসিয়ে রেখেছিল,— সেই অনাদর অবজ্ঞাতেই তাঁদের মুক্তির সহায়তা করেছিল। ঐ বই বাজারে বের হবার পূর্ব্বে আমাকে দেখতে দেবার জন্যে যে কপি পাঠানো হয়েছিল সেই কপিই তোমাকে দিয়েছি। ঐ মলাটে যে আঁকাজোখা আছে সে আমার নয়, কার তাও জানি নে।

শ্যামলীতে প্রবেশ করার পর থেকেই কাজ সংক্ষেপ করার চেষ্টায় আছি— এখনো কৃতকার্য্য হতে পারি নি। ইতি ১৭ জুলাই ১৯৩৫

দাদা

১৮১

১২ অগস্ট, ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন চিঠি লিখতে পারি নি। দেহে মনে উদ্যমের অভাব— জীবনের দিবসান্তে যেন প্রদোষের ছায়া ঘনীভূত। মন অত্যন্ত কর্ম্মবিমুখ অথচ কর্ম্মের অভাব নেই।

বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন চলচে। আগামী বৃহস্পতি-

বারে দিন স্থির হয়েছে। খুকু যদি আসতে পারত নাচ গানে সে নিশ্চয় খুসি হয়ে যেত। গোটা কয়েক নতুন গানও তৈরি করতে হোলো, নইলে এরা ছাড়ে না।

যেমনি বর্ষামঙ্গলের গান সুরু করেছি অমনি বৃষ্টি অজস্রধারে নেমেছে। অথচ অনেক দিন থেকেই অনাবৃষ্টিতে এ প্রদেশে চোখের জল ছাড়া আর সবকিছু শুকিয়ে গিয়েছিল। এমন আরো অনেকবার ঘটেচে। এই দৃষ্টান্তে কবিত্বের মন্ত্রশক্তি দাবী করতে পারি।

তোমার চিঠিতে বোধ হচ্চে ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ করেছ। তিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু সে সব ব্যয় হয়ে গেছে। অনেক খরচ করে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার উপায় করে দিয়েছিলেন— সেই উপলক্ষ্যে প্রচুর অনাবশ্যক ব্যয় করেছেন। প্যারিসে আমার চিত্রপ্রদর্শনীর সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে নিয়েছিলেন— তার পরিমাণ অল্প নয়। তিনি আমার জাহাজযাত্রার জন্যে যে একটি আরামকেদারা দিয়েছিলেন সেইটেই কেবল তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সাক্ষ্যস্বরূপে রয়েছে। ইতি ১২ অগস্ট ১৯৩৫

দাদা

১৮২

২১ অগস্ট্ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন শরীর অসুস্থ ছিল— কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণই বন্ধ করতে হয়েছিল। আমার শরীরে দুর্ব্বলতা যতই থাক প্রায় সে অসুস্থ হয় না— তার কারণ শরীরযন্ত্রগুলি জীর্ণ হয় নি। এবারকার অসুখে মনে হোলো কোথাও যন্ত্র বিকল হয়েছে। সেটা কাটিয়ে উঠ্‌তে কিছু সময় লেগেছে কিন্তু এখন সে নিষ্কৃতি দিয়েছে। যাই হোক নোটিস পাচ্চি যে বহুকালের এই দেহটাকে নিয়ে সামান্য পরিমাণেও টানাটানি আর চলবে না। কাজ তো কম করি নি— এত বেশি জমা হয়েচে যে অনেকবার মনে হয় এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়। কেননা উৎপত্তি যদি পরিমিত না হয় তাহলে তার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। অন্তত তার মধ্যে অনেক বর্জ্জনীয় জিনিষ থেকে যায়— তারই প্রভাবে রক্ষণীয় জিনিষেরও মূল্য কমবার কথা। এ নিয়ে মনে আন্দোলন করে লাভ নেই। কারণ, মহাকাল স্বয়ং হচ্চেন ভাণ্ডারী, তিনি নিজের গরজেই যাচাই করতে ভুল করেন না। আজ পর্য্যন্ত যা তিনি জমা করেচেন তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন ঝাঁটিয়ে। সেই যারা নিষ্কৃত হয়েচে তাদের বেদনা কোথাও নেই— কারো ভ্রম-ক্রমে তারা যদি থেকে যেত তাহলেই সৃষ্টির মধ্যে ব্যথা দিয়ে থাকত।

কাল থেকে অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি চলেছে। আজ অপরাহ্ণে পশ্চিম

দিগন্তে কালো মেঘের আসর জমে উঠ্‌ল— হঠাৎ সুদূর প্রান্তর পেরিয়ে গর্জ্জন করে প্রবলবেগে ছুটে এল ঝড়ের হাওয়া, একটু পরেই তার পিছন পিছন এল মূষলধারে বর্ষণ— দেখতে দেখতে ভেসে গেল মাঠ বাট— তার পর থেকে রিম্‌ঝিম্ ধারাপতন চলেইচে। এখন নিকষকালো অন্ধকার— ঝিল্লিধ্বনিতে আকাশের নাড়ীতে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ভিজে হাওয়ায় গায়ে বালাপোষ জড়িয়ে বসে আছি। ইচ্ছে করচে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারের গভীর তলায় চোখটাকে মনটাকে অবগাহন স্নান করিয়ে নিই। এখনি তাই করব। এখানকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ভারি একটি গম্ভীর মহিমা আছে। আকাশ নির্ম্মল থাকলে মনে হয় তারাগুলো যেন খুব কাছে এসেছে, তার অপরিসীম রহস্যে মন অভিভূত হয়।

আজকাল মাঝে মাঝে অনেকদিন যদি আমার চিঠি বন্ধ থাকে তবে উদ্বিগ্ন হোয়ো না। আমার বয়সে সংসারের ছোটো-বড়ো সমস্ত দায়িত্বকে অস্বীকার করবার সময় এসেছে— কর্ত্তব্যে মন না দেওয়াই আমার এখনকার প্রধান কর্ত্তব্য। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৪২

দাদা

১৮৩

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বড়ো চিঠি লেখার মতো শক্তি ও উৎসাহ আমার নেই, সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলি। জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেইজন্যে শ্রেয়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্ম্মসাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মানুষের পরিত্রাণের উপায়। নিজেদের আচরণের হেয়তার দোহাই দিয়ে সেই সর্ব্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শকে যদি দূষিত করা যায় তাহলে তার চেয়ে অপরাধ আর কি কিছু হতে পারে? ঠগীরা দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্ম্মেরি অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিংস্র প্রবৃত্তিকে, চরিত্রবিকারকে, দেবদেবীর প্রতি আরোপ করে তাকে পুণ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করাকে কি দেবনিন্দা ও পাপ বল্‌বে না? যারা নিজে লোভী রক্তলোলুপ, তাদের নিন্দা করো, কিন্তু দেবীকে রক্তলোলুপ প্রমাণ করার মতো বীভৎস নিন্দনীয়তা আর কী হতে পারে? এই কুৎসিত আদর্শবিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্ম্মের জন্যেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্মের উদ্দেশেই প্রাণ দিতে ও নিতে স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশই তো রামচন্দ্রশর্ম্মা পালন করচেন, ধর্ম্মের নামকে কলঙ্কিত করে অনিচ্ছুক অশক্ত প্রাণীকে বলি দেওয়ার সঙ্গে রামশর্ম্মার ধর্ম্মোদ্দেশে ইচ্ছাকৃত আত্মবলিকে

তুমি এক কোঠায় ফেলে নিন্দা করলে কী মনে ক'রে, আমি বুঝতে পারলুম না। সাধারণ মানুষের হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার অন্ত নেই— স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ রোধ করতে পারেন নি— কিন্তু পাপচিত্তে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ধর্ম্মকর্ম্মে হিংস্রতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গের মতো দুষ্কর পুণ্যকর্ম্ম আর কিছু হতে পারে না; তাতে আশুফল কিছু হতে পারে কি না জানি নে কিন্তু সেই প্রাণউৎসর্গই একটি মহৎ ফল। তিনি আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণঘাতক ধর্ম্মলোভী স্বজাতির কলঙ্কক্ষালন করতে বসেচেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি। তিনি মহাপ্রাণ বলেই এমন কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

হঠাৎ খবর পেলুম আমাদেরি ··· ··· কোনো লোক সজনীকান্তকে নিন্দা করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। কিছুদিন আগে সজনীকান্ত রজতজুবিলির অভিনন্দনসূচক পত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে আমার কাছ থেকে লেখা চাইবার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। আমি দিতে পারি নি, তাঁকে উপেক্ষা করা তার কারণ নয়। এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর ভাষায় বা ব্যবহারে আত্মলাঘবজনক কিছুই প্রকাশ পায় নি। লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ জানান নি বাংলাদেশে এমন সম্পাদক অল্পই আছে, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে সম্মান করেচেন কিন্তু আত্মসম্মানের হানি করেচেন এমন কথা বলা অসঙ্গত। যা হোক আমাকে জড়িত করে এই রকম অন্যায় কুৎসাবাদের সৃষ্টি করায় আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ ও দুঃখ বোধ করেচি।

আমার শরীর ভালো নেই কিন্তু আমার এ বয়সে সেটাকে

বিশেষ সংবাদ বলে গণ্য করা চলবে না। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩৪২

দাদা

১৮৪

৬ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার হাত থেকে ছুটির পার্ব্বণী পেয়ে খুব খুসি হয়েছি— ভোগ করেছি যথাসাধ্য— কাল বিজয়ার দিনে পরব তোমার দেওয়া কাপড়খানি। আজকাল তলিয়ে গেছি নৈষ্কর্ম্ম্যে— কর্ত্তব্য-সাধনা এখন আমার সাধনার অন্তর্গত হয় [? নয়]— মানব-সংসারের সমস্ত দায়িত্ব থেকে ছুটির আবেদন করচি— পূর্ব্ব কর্ম্মবেগ এখনো আমাকে ধাক্কা দিয়ে চালায় কিন্তু সেটা ক্ষীণ হয়ে আসচে। দিন ম্লান হয়ে এসেছে সায়াহ্নে, সায়াহ্ন নিঃশব্দে বিলীন হবে রাত্রির মধ্যে। এই শান্তির পথে যাত্রা প্রতিদিন সহজ হয়ে আসুক এই আমি কামনা করচি— অভ্যাসের গোপনে থেকে যায় ক্ষোভের কারণ, হয়তো তার মূল শিথিল হয়ে আসচে।

শরৎকাল দিনে দিনে রমণীয় হয়ে আসচে। মনে হচ্চে এই আমার কাল— এই শিশিরধোয়া ঘাসে শিউলি ঝরার কাল। এই যে শুভ্রতার স্তব্ধ ফোয়ারা দেখি কাশের বনে— এই ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হবে আমার মনের প্রান্তরে সেই খবরের

যেন আভাস পাই ঐ নির্ম্মল নীলাকাশে। ইতি শুক্লানবমী আশ্বিন ১৩৪২

দাদা

১৮৫

৮ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কার্ডখানা যে রমণীয় তা নয়— হাতের কাছে বিনা চেষ্টায় পেয়েছি— পড়ে আছে সামনে, লিখে দিচ্চি দু চার কথা। কলকাতায় আমার যাওয়া সহজে আর ঘটবে না— জরার জড়িমা তাকে পেয়ে বসেছে। যদি দেখি কোনো কারণে এই ছুটিতে অন্যত্র কোথাও যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে— তাহলে কলকাতা রাস্তায় পড়তে পারে— তখন তোমাকে নিশ্চয় খবর দেব। এখানে শরতের স্নিগ্ধ শুভ্র সৌরভের উৎস উদ্ঘারিত— পরিবর্ত্তনের দুরাশায় এখান থেকে কোথাও যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। বস্তুত ঠাঁইবদল বা হাওয়াবদল তেমন প্রয়োজনীয় নয়, আসল দরকার মানুষবদল। এখানকার মানুষ অত্যন্ত পরিচিত, তাদের ঠেকানো যায় না— পলায়ন ছাড়া ভদ্রভাবে নিষ্কৃতির উপায় নেই। তোমার দেওয়া ধূতিটি পরে এখানে কাল বিজয়ার অভ্যর্থনা সম্পন্ন করেছি। মালপোয়া নানা আকৃতির ছিল বটে কিন্তু তার প্রকৃতিতে একই রকমের মিষ্টতা। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩৫

দাদা

১৮৬

৯ অক্টোবর ১৯৩৫

কল্যাণীয়া শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী
বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আশ্বিন
১৩৪২

১৮৭

১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বন্দ্বের কথা যখন বলো সেটা আমি বুঝতে পারি নে বলে মনে কোরো না। যে তুরীয় ধামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছ বলে তুমি পীড়া বোধ করো তার সত্যতাকে আমি মনে মনে লাঘব করি নে। তোমার ধর্ম্মদীক্ষা তোমার সংসারকে এবং উপাস্যকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী করে দিয়েছে— একটাকে ত্যাগ না করলে তুমি স্থিতির আশা করতে পার না। আমি দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য করতে চাই আপন স্বভাবেরই প্রবর্ত্তনায়। এই আমার চারদিকেই সকল সম্বন্ধের মধ্যেই যেখানেই সুন্দরকে দেখি, যেখানেই কল্যাণের সাধনা করি সেখানেই আমার মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য এক হয়ে যায়। সত্যের

মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নেই, সত্য সব নিয়ে এক। মর্ত্ত্যজগৎ সয়তানের সৃষ্টি নয়, আমারও ঘরের বানানো নয়, সে সেই মহাসত্যেরই অন্তর্গত যার মধ্যে তুমি সংসারাতীতকে খুঁজে বেড়াচ্চ। পরমার্থসাধনাকে অশুচি করা হয় যখন সত্যের কোনো অঙ্গকে অশুচি কল্পনা করে ঘৃণার অন্ধ সংস্কার রচনা করো। অশুচিতা আমাদের নিজের বিকৃতিতে। পরমার্থ-চিন্তাকেও আমরা অশুচি করি যখন তার মধ্যে অহঙ্কার আসে, অন্ধতা আসে, ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়। সংসারও পবিত্র, স্বয়ং পরমাত্মার আনন্দরূপ, যখন তাকে সেই ভাবে দেখতে পারি। শুচিতা জলে মাটিতে অশনে বসনে মন্ত্রে তন্ত্রে নেই— শুচিতা অন্তরপ্রকৃতিতে— যেহেতু মানুষ মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক। যিশুখৃষ্ট এই কথাই বলেছেন, ভগবান বুদ্ধেরও এই উপদেশ। ভগবদ্‌-গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেন যখন যজ্ঞকে তিনি বাহ্য উপকরণগত না বলে বলেছেন আন্তরিক। সত্যই যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, জীবে দয়া যজ্ঞ, সর্ব্ব মানুষে মৈত্রী যজ্ঞ। যেখানে সত্য নেই, দয়া নেই, চিত্তের নির্ম্মলতা নেই আছে পূজা অর্চ্চনা, আছে ভক্তিরসের সম্ভোগ সেখানে আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রবঞ্চনা। বিধাতার জগৎকে অবিশ্বাস কোরো না, ঘৃণা কোরো না, তিনি পৃথক একটা স্বর্গ সৃষ্টি করে নিজের পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধান নি। সব কিছুতে আনন্দিত হও, সবাইকে আনন্দিত করার সাধনা করো, এতেই মুক্তির স্বাদ। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

দাদা

১৮৮

৩ নভেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখি নি, তার কারণ কুঁড়েমি। যথাসম্ভব কাজ সংক্ষেপ করে চলেছি। মনের বায়ুমণ্ডলকে স্বচ্ছ করে তোলার প্রয়োজন আছে।— সাকার নিরাকার উপাসনা-ভেদ নিয়ে আমার মনে কোনো তর্ক নেই। যে মূঢ়তায় মানুষের মনকে নিরালোক করে, যে ভেদবুদ্ধিতে পরস্পরের সম্বন্ধকে অপমানিত করে, যে পূজাবিধি বাহ্যানুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মাকে খর্ব্ব করে, ধর্ম্মের নামে যে সকল নিরর্থক প্রথা সুদীর্ঘকাল হিন্দুকে দুর্ব্বল ও পরাভূত করে রেখেছে তাকে নিন্দা না করে থাকতে পারি নে।

তোমার চিঠিতে মুসোলিনিকে আমার পুরাতন বন্ধু বলে উল্লেখ করেছ। একদিন প্রকাশ্যভাবে আমার বন্ধুর অত্যাচারের নিন্দা করেছি— সেই অবধি তাঁর রাজ্যে আমার প্রবেশ করা নিরাপদ নয়, তাঁর প্রজারা আমাকে সম্মান দেখাতে ভয় পায়, ইটালিতে আমার ছবি অনেককে গোপন করতে হয়েছে। এই বন্ধুর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য করে আমি প্রিয়বাক্য বলি নি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্যে ধর্ম্মপত্নীকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সেই পথ অনুসরণ করে লোকরঞ্জনের খাতিরে যদি সত্যকে বর্জ্জন করতে পারতুম, তাহলে দেশের জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হতে বাধা থাকত না, এবং রাজদত্ত সম্মানের শিরোপা আজও আমার

ললাটকে ভূষিত করত।— দেশের কাছে অনেক আপিল অনেকদিন করেছি, কখনো কোনো ফল পাই নি। নিষ্ফল প্রয়াসের উৎসাহ এখন আর নেই। যাঁদের বয়স অল্প সংসারের ভার তাঁদেরই পরে। ইতি ৩ নবেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৮৯

১৪ নভেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যদি অ্যাবিসীনিয়ার রেড ক্রস সোসাইটি ফণ্ডে টাকা পাঠাতে ইচ্ছা করো তাহলে সোজা দিল্লির ঠিকানাতেই পাঠানো ভালো। যথাস্থানে পৌঁছবে সন্দেহ নেই।

রাজা নাটকটি অভিনয় করা যাবে এই রকম সঙ্কল্প হয়েছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি— আমাকেও নামতে হবে ঠাকুর্দ্দার পালায়। কিছুদিন আগে এখানে শারদোৎসব অভিনয় হয়ে গেছে তাতে আমি ঠাকুর্দ্দা সেজেছিলুম— ঠাকুর্দ্দার বাহ্য সাজ বিধাতা স্বহস্তে রচনা করেচেন— পরচুলোর খরচ বেঁচে গিয়েছিল।

খুকুর বিয়ে নিয়ে তোমরা ব্যাপৃত আছ। বিয়ের পরে ওদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ করবার সুযোগ হয় তো পাওয়া যাবে। ইতি ১৪ নবেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৯০

[কলিকাতা] ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫

কল্যাণীয়াসু

এই মাত্র অভিনয় শেষ করে আসচি। নিরতিশয় ক্লান্ত। তোমরা দেখতে এলে খুসি হতে।

আগামী কাল বরানগরে যাচ্চি— এখানে ভিড়ের চাপ আর সইচে না। বোধ হয় ১৬ তারিখে কটকে যাবো। ৭ই পৌষ উপলক্ষ্যে ফিরতে হবে তার আগে নয়। ইতি ১২।১২।৩৫

দাদা

১৯১

[কলিকাতা] ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি। শয্যাতল* থেকে এখনো নিষ্কৃতি পাই নি। তোমার মিষ্টান্ন অর্ঘ্য পেয়ে আনন্দিত হলুম খেয়ে আনন্দবর্দ্ধনের উপায় নেই। তোমরা দ্বারে এসে চলে গিয়েছিলে সেজন্যে দুঃখিত হয়েছি। ইতি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৯২

[কলিকাতা । ডিসেম্বর ১৯৩৫]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনো ছুটি মেলেনি। দুর্ব্বল। চিকিৎসকের শাসনে আছি। যখনই চলৎশক্তি ফিরে পাব যাব শান্তিনিকেতনে। তোমার ফুল পেয়ে খুব খুসি হলুম।

দাদা

১৯৩

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কন্‌গ্রেসের বিরুদ্ধে তুমি যে অভিযোগ করেচ তার মর্ম্ম বুঝতে পারলুম না। কনগ্রেস মুসলমান খ্রীষ্টান শিখ ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে কেবল সনাতনী হিন্দুদের প্রতি নয় আমি তো তার কোনো প্রমাণই পাই নি। কন্‌গ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক সমাজ তার উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। যদি পড়ত তাহলে একই কালে শিখ ও মুসলমানকে সে গ্রহণ করতে পারত না। কনগ্রেসের যাঁরা নেতা তাঁরা ভারতের সকল সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করে বললাভ ও জয়লাভ করতে স্বভাবতই ইচ্ছা

করেন। সনাতনীদের ধর্ম্মই ভারতীয় সমাজকে চিরবিচ্ছিন্ন করবার পন্থা আশ্রয় করেছে— এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে ইচ্ছা করেন তাঁদের সঙ্গে সনাতনী-দের মত ও আচারের মিল না থাকাই সম্ভব— কিন্তু তাই বলে কনগ্রেসের কার্য্যবিধির মধ্যে বিশেষ করে সনাতনীদেরই ঠেকিয়ে রাখা হয়েচে এমন অপবাদ আমি তো আর কখনো শুনি নি। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই ভগবানকে পূজার ক্ষেত্রে জাতের বেড়ায় বিভক্ত করা হয়েছে— অর্থাৎ যেখানে শত্রুরাও মেলবার অধিকার রাখে হিন্দুরা সেখানেও মিলতে পারে না। এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদে হিন্দুরা পদে পদে পরাভূত। তারা সর্ব্বজনের ঈশ্বরকে খর্ব্ব করে নিজেদেরই পঙ্গু করেছে— তাদের এই নিত্যধর্ম্মবিরোধী আত্মঘাতী আচরণকে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীরা কখনোই শ্রেয় বলে স্বীকার করতে পারে না। বাংলাদেশে আজ যে মুসলমানের সংখ্যা এত অত্যন্ত বেশি, তার কারণ ঘটিয়েছে সনাতনীরা, আমি যখন জমিদারী পরিদর্শনে মফস্বলে যেতুম প্রতিদিন তার প্রমাণ পেয়েছি। মানুষকে হিন্দুসমাজ অবমাননার দ্বারা দূর করে দিয়েছে, সকলের চেয়ে লজ্জার বিষয় এই যে সেই অবমাননা ধর্ম্মের নামেই। সনাতনীরা নিত্যধর্ম্মবিদ্রোহী বলেই দেশবিদ্রোহী। মুসলমানের কাছে একদিন তারা হেরেছে আবার হারবে। মুসলমানের আর যত দোষ থাক তারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করে নি, তাদের ধর্ম্মের বিধানেই তাদের ঐক্য। আমাদের ধর্ম্মের বিধানেই আমাদের অনৈক্য। এই অনৈক্যের ফাটল দিয়েই বহুশতাব্দী ধরে আমাদের

শক্তি গেল বহিঃস্কৃত হয়ে। সনাতনীরা যদি এই অন্ধ সংস্কারের ভেদবুদ্ধিকেই, এই নরনারায়ণের অবমাননাকেই ধর্ম্মের অনুশাসন ব’লে আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে স্বদেশের মুক্তির সাধকেরা কদাচ তাদের এই আত্মবিনাশের পন্থাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। বিদেশী যারা বাহির থেকে আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছে, ভিতর থেকে হিন্দুরা নিজের হাতে তাদের চেয়ে আরও বেশি কড়া শিকল এঁটে দিয়ে সেই শিকলকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করচে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে কন্‌গ্রেস সাহস করে সমালোচনা করে নি— মহাত্মাজি প্রভৃতি দুই একজন ব্যক্তিগত ভাবে করে থাক্‌বেন। কন্‌গ্রেসের এই ভীরুতা তার কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ— কিন্তু তবু কেন তুমি সনাতনীদের পক্ষ থেকে কন্‌গ্রেসের নামে নালিশ এনেছ তা আমি বুঝতে পারলুম না। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৯৪

৮ জানুয়ারি ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পীড়িত হয়ে পড়ে আছি। পত্রাদি লেখা দুঃসাধ্য। এই ধাক্কায় দেহের ভাঙনের কাজ আরো কিছুদূর এগিয়ে দেবে।

তোমার মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব চল্‌চে— কেবলি নিজেকে দুঃখ দিচ্চ। তোমার অভ্যস্ত সংস্কার এবং তোমার বুদ্ধির মধ্যে কিছুতেই মিল হচ্চে না। মেয়েরা স্বভাবতই বিচারবুদ্ধির চেয়ে প্রথার প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত। আমাদের দেশে বারো আনা পুরুষ স্ত্রীস্বভাবাপন্ন— ভীরুতা এবং মূঢ়তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কিন্তু ধাক্কা লেগেচে। জাগতেই হবে।

সুজিতকুমার বেদজ্ঞ পণ্ডিত, কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর বইখানি তোমাকে পাঠালুম। পড়ে দেখো। ইতি ৮ জানুয়ারি ১৯৩৬

দাদা

তোমার নামের লেব্‌ল্ নিয়ে একটিন মধু আমার কাছে আজ এসে পৌঁছল।

১৯২

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কন্যার সঙ্গে এতদিন পরে প্রথম বিচ্ছেদের দুঃখ তোমাকে অত্যন্ত বাজবে সে তো ধরা কথা। কিন্তু তার উপরে কাল্পনিক আশঙ্কা ও উদ্বেগের বোঝা চাপিয়ে নিজেকে অতিরিক্ত পীড়িত কোরো না। যেমন অবস্থাতেই থাক্ বাসন্তী স্বামীর ঘরে নিশ্চয়ই সুখে থাকবে, কেননা সে ঘর যে ওর নিজেরই ঘর— তোমাদের

কাছে ও ছিল আশ্রিত, সেখানে ও হোলো কর্ত্রী— আপন সংসার আপন জাবন দিয়ে সেখানে সৃষ্টি করতে হবে— এই সৃষ্টিকার্য্যে মেয়েদের যেমন সুখ এবং কল্যাণ এমন আর কিছুতেই নয়— তোমার বিয়োগদুঃখদ্বারা কল্পনায় তাকে ক্ষুণ্ণ কোরে দেখো না। তার সংসারে তোমাদের মনের মতো স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে— তাতে কী আসে যায়। বাসন্তীর স্বামী নিজের পৌরুষের জোরেই নিজের উন্নতি সাধন করবে। তোমরা প্রশ্রয়দ্বারা ওকে যদি দুর্ব্বল ও নির্ভরপরায়ণ করো তাহলে পরিণামে ওর ক্ষতিই হবে। আমাদের দেশে শ্বশুরনির্ভরী পুরুষের দুর্গতি অনেক দেখেছি। কিছু পরিমাণে সাংসারিক অভাব মারাত্মক নয়, তাতে করে উদ্যমকে চেতিয়ে তোলে। তাছাড়া সাধারণ গৃহস্থালির আদর্শে অভ্যস্ত হওয়া তোমার মেয়ের পক্ষে ভালো শিক্ষা। যারা ভালো গিন্নি হয় তারা অতি-স্বচ্ছলতার মধ্যে মানুষ নয়। বস্তুত স্নেহের আতিশয্যে তোমরা যা নিয়ে আহাউহু করো সেটা তোমাদের নিজেরই মানসিক আরামের জন্যে— সেটা মেয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অবস্থার অনতিধনশালিতা অসম্মানের নয়, অসম্মান বাইরের সাহায্যের প্রতি নির্ভর। তোমার মেয়েকে প্রথম থেকে এই অপমানে দীক্ষিত কোরো না, তার নিজের চেষ্টাকে অবকাশ দিয়ো। ইতি

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

দাদা

৪ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বহু দেশ ঘুরে অবশেষে শ্যামলীর আশ্রয়ে এসে ফিরেছি। বিশ্রামের জন্যে মন উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে— কিন্তু আমার গ্রহ বিশ্রাম করেন না, আমাকেও করতে দেন না। দিল্লিতে বাঙালীদের অভ্যর্থনার আতিশয্যে আমাকে শয্যা আশ্রয় করতে হয়েছিল। ডাক্তার ডিজিটলিন খাইয়ে আমার ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত করেছিলেন।

চিত্রাঙ্গদার অভিনয় দেখে পশ্চিমপ্রদেশের সকলেই প্রশংসায় মুখরিত। সেখানকার গুণগ্রাহীরা বলেছেন সৌন্দর্য্যের এমন চরম উৎকর্ষ তাঁরা কখনো দেখেন নি— ও অঞ্চলের শ্বেত-দ্বৈপায়নেরাও বিস্ময়বিমুগ্ধ। আমার দুর্গ্রহের চক্রান্তে আমি বাংলাদেশে জন্মেছি— সেখানকার মানুষ মন খুলে ভালো বলবার অসহ্য দুঃখ সইতে পারে না, সেখানে সকলেই সকলের চেয়ে প্রখর বুদ্ধিমান— প্রখর বুদ্ধির লক্ষণ এই যে খাটো বাট-খারায় ভালো জিনিষের গৌরব পরিমাপ করা— যেমন করে হাটে সুচতুর মহাজন পাট কেনবার সময় চাষীকে ঠকিয়ে ওজন চড়ায়। পূরো প্রশংসা পেয়েছি আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্রই, কেবল পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ ছাড়া। আমি বলি ভাগ্যের হাতে বঞ্চিত হওয়াই ভালো— তাতে বিধাতাকে ঋণী করে রাখা যায়।

নন্দিতার বিবাহ আশ্রমেই হবার কথা। এখন বিদ্যালয়ের

লম্বা ছুটি। যাদের নিয়ে এখানে সমারোহ, তারা অনুপস্থিত থাকবে— কাজটা শান্ত ভাবেই সম্পন্ন হবে। আমার পক্ষে সেটা ভালো।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসে পৌঁছন গেল সেই দিনই দেবতার বর্ষণ আমাদের অভিনন্দিত করেছে। এখনো ঠাণ্ডা আছে হাওয়া। পশ্চিমে ভ্রমণের সময় যে ধূলো অন্তর্গত হয়েছে তাতে বোধ করি আমার ওজন সের চার পাঁচ বেড়ে গিয়ে থাকবে।

একটা কথা মনে রেখো, তোমার চিঠিগুলি আমার কাছে আসে অর্ঘ্যের মতো— আমি তাকে কিছুমাত্র অনাদর করি নে।

কলকাতায় কী উপলক্ষ্যে কবে যাওয়া হবে তা কিছুই বলতে পারি নে। তোমার জ্যোতির্ভূষণকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ো। ইতি ৪।৪।৩৬

দাদা

১৯৭

[শান্তিনিকেতন] ৩০ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বিবাহের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম— কাজটা সুসম্পন্ন হয়ে গেল, এখন আমার ছুটি। এখানকার বাগানের ফল তোমাকে পাঠাবার সঙ্কল্প ছিল কিন্তু ফলের আশা ত্যাগ করতে

হোলো। অনাবৃষ্টিতে ধরণীর রসসঞ্চয় নিঃশেষপ্রায়। পেঁপেগুলো বালখিল্য মুনিদের মতো গাছে ঝুলচে উপবাসে জীর্ণ, যে কয়টা লেবু ফলেছে তাদের অবস্থা দেখে আমার বাগান লজ্জিত। কাঁচা আমগুলো দুদিন বাদেই শুকিয়ে ঝরে পড়বে এমন তাদের ক্লিষ্ট দশা। অপরিণত ফলসা এখনো গাছে আছে কিন্তু তাদের ফল বলে গণ্য করা চলবে না। গাছভরা ছিল বেল, আমার চেয়ে সতর্ক লোকেরা সেগুলো গাছে রাখে নি, সরবতী লেবুগুলো আমাদের অগোচরে যাদের ভোগে লেগেছে তারা আমার অপরিচিত। লিচুগুলো চুরির যোগ্য অবস্থা হবার পূর্ব্বেই ধরাশয্যাশায়ী।

এই দুর্গতির দিনে অনন্যগতি হয়ে আমার সাহিত্যবৃক্ষের ফল তোমাকে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু সেও নূতন গাছ থেকে পাড়া নয়। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে বিনয় আমি করব না। ছাপবার সময় প্রুফ দেখতে হয়েছিল, তখন অনুভব করেছিলুম এর মধ্যে জীর্ণতার কোনো লক্ষণ নেই। আমি তরুণের কবি, আমার লেখায় তার প্রমাণ কখনো ক্ষীণ হবে না। চিত্রাঙ্গদা বাসন্তীকে লক্ষ্য করেই পাঠিয়েছিলুম, কেননা ছাপার অক্ষরের অন্তরালে নৃত্যের রূপ প্রচ্ছন্ন। তুমি নাচ দেখ নি অতএব এটা তোমার কাছে নিরর্থক। অন্য বই দুটি তরুণদের হাতে পৌঁচেছে এতে আমি যথার্থই খুসি হয়েছি। আমার বিশ্বাস ওরাই এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। এর মধ্যে তথ্য নেই, ঘটনার বিবরণ নেই, পুরাণ কথার ব্যাখ্যা নেই। এর মধ্যে যে চিন্তার ও রসের ধারা আছে সে তাদেরই উপভোগ্য যাদের বুদ্ধি ও হৃদয় তাজা,

স্বাদগ্রহণের শক্তি যাদের ক্লান্ত ও ক্ষীণ হয় নি— তাদের কাছে এ বইগুলির সকল সংস্করণই প্রথম সংস্করণ। আমার রচনা যে জাতীয় ফল, জীর্ণ রসনা ও নির্জ্জীব মস্তিষ্কের কাছে তা পথ্য নয় এ কথা স্পর্দ্ধা করেই বলতে পারি। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৪৩

দাদা

১২৮

[জোড়াসাঁকো] ১৩ মে ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর মন আজকাল একান্ত কর্ম্মবিমুখ হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সময়ই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। এইবার মনে করচি ছুটি নেব। বহুকাল পড়বার সময় পাই নি। বাল্যে ইস্কুল পালিয়েছি বটে কিন্তু পড়ায় ফাঁকি দিই নি। এমন বিষয় ছিল না যা নিয়ে নাড়াচাড়া করি নি। এখন আরএকবার সেই পর্ব্বে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। সেদিনকার বালকের মতোই মনটা পড়তে চাচ্চে। বয়স্কযুগের কঠিন কাজের দায় কিছুতেই ছাড়ে না— অবকাশের আকাশটা তাই স্বচ্ছ হতে পারচে না, কোনো একটা দুর্গমে দৌড় দিয়ে পালাতে ইচ্ছা করে। অল্পদিন আগে ভুবনেশ্বরের একজন পাণ্ডা এসেছিল। বৌমা সেখানে থাকতে তাঁকে এই ব্যক্তি যত্ন করেছিল। ভুবনেশ্বর যদি সম্বৎসর আরামে

থাকবার জায়গা হোত তাহলে সেখানে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর কুটীর বানাতুম। তার সুযোগও ঘটেছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে আশ্রয় নেবার জায়গা ও নয়। সে হিসাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আর কোনো স্থানের তুলনা হয় না।

আমার ভোগের সামগ্রী ইতিমধ্যে তুমি আমাকে অনেক পাঠিয়েছ। সেই দানের মধ্যে তোমার হৃদয়ের যে স্নিগ্ধতা প্রকাশ পায় সে আমার কাছে রমণীয়। আজ সকালে জোড়াসাঁকোয় এসেছি। আর কিছুক্ষণ পরে আবার বরানগরে ফিরে যাব। সেখানে মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪৩

দাদা

১৯৯

১৫ মে ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার জীবনের একটা দিক তোমার ভালো করে জানা নেই। প্রথম বয়সে বৈষ্ণবসাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্য্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্ত্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করচে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেচে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের— কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে এ'কে আমি সঙ্কীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারি নি— আজও পারি নে নিক্‌সন্ সাহেবের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও। আমি মানি রস-স্বরূপকে, যাঁর পরমানন্দের মাত্রা জীবে জীবে। আমি সেই আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাই বিশ্বের সর্ব্বত্র— বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্বমানবে। সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখবার সাধনা আমার, রূপককে সত্য বলে কল্পনা করা কেবল যে আমার পক্ষে অনাবশ্যক তা নয় কিন্তু তা বাধাজনক। তবু বুঝতে পারি আমার পুরুষের স্বভাবে যেটা যথেষ্ট, মেয়েদের স্বভাবে তা নয়। তোমাদের উপাসনা পালন করা সেবা করা, অর্থাৎ ঈশ্বরকেও তোমাদের নারীপ্রকৃতির কাছে নির্ভরশীল করে তবে তোমরা আনন্দ পাও। ক্ষতি নেই। যেখানে তার সত্য প্রয়োজন আছে সেখানে তার উপায় থাকা ভালো। কিন্তু তবু আমার মনে হয় তোমাদের এই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার স্থান থাকা উচিত মানবলোকে, জানা উচিত মানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের সেবা। শিলাইদহের বৈষ্ণবীর আচরণে এই সত্যের আভাস পেয়েছিলুম। কিন্তু যে পথ তোমার চিরাভ্যস্ত আনন্দের পথ তার গভীরে সত্য নেই এমন কথা বলি নে— তুমি নিঃসন্দেহ জেনে বা না জেনে সেই

সত্যকে স্পর্শ করেছ— সুস্পষ্টভাবে যথার্থভাবে তাকে লাভ কর এই আমি কামনা করি। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দাদা

২০০

৪ জুন ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু কাল হোল তোমাকে একখানি চিঠি লিখেছি তাতে জানিয়েছিলেম যে ভ্রমক্রমে, আমার চিঠির মধ্যে তোমার বৈবাহিককে লেখা একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলে, সেখানি আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। এ চিঠি কেন তুমি পাও নি বুঝতে পারলেম না। তদনুসারে এ চিঠিও না পেতে পার। অতএব বাহুল্য লিখে কোনো ফল নেই।

ঝড় বৃষ্টি চলচে, ঠাণ্ডা পড়েচে। ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দাদা

২০১

[শান্তিনিকেতন] ২৫ অক্টোবর ১৯৩৬

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। তোমার নতুন বাসায় ঠাকুরঘরের সৌষ্ঠব সাধনে ব্যস্ত আছ। আমিও উঠেছি নতুন

বাসায়— আমার ঠাকুরঘর সাজাবার ভার আমার উপর নেই — আমার আকাশের মিতা এই কাজে লেগেছেন— চারদিকে শিশিরে ঝলমল করচে পত্রপুঞ্জ, হেমন্তের আলোয় লেগেছে কাঁচা সোনার রঙ, পাখীরা আনন্দে চঞ্চল। গাছের ছায়ায় বসে দিন কাটে— ঠাকুরকে সাজাবার স্পর্দ্ধা রাখি নে— তিনি তাতে আপত্তি করেন না— আমাকেই খুসি করবার জন্যে তাঁর আয়োজন। বিজয়দশমী [৮ কার্ত্তিক] ১৩৪৩

দাদা

২০২

২৮ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার আজন্মকালের অভ্যাসবশত এক জায়গায় তুমি আমাকে ঠিকমত বুঝতে পারবে না। আমার কবিপ্রকৃতি, সুতরাং আমি সীমার মধ্যেই অসীমকে উপলব্ধি করি, সে সীমায় তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন— কোনো দেশবিশেষের সম্প্রদায়বিশেষের আপন খেয়ালে গড়া এমন সীমা নয় যা সেই সম্প্রদায়ের বাইরে বিশ্বভুবনে আর কোথাও কোনো সাক্ষ্য রাখে না। যদি বল, নিজসৃষ্ট সীমার মধ্যে তাঁর যে প্রকাশ-রূপ, তাঁর ইচ্ছা তাকেও আমরা আপন ঐশ্বর্য্যে সাজাই। সে কাজ তো করেই আসচি, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে আনন্দ দিয়ে—

ঠাকুরঘরের সেই শাশ্বত সেবাই ত কবিদের হাতে। আমাদের এই সাজের ফুল তোমরাও ব্যবহার করতে পার— যেমন করে ব্যবহার করো বাগানের ফুল।— পূজারি ঠাকুরের পথ তাকিয়ে তোমার ঠাকুরের অপমান করো কোন্ সাহসে ভেবে পাই নে। তার হাতের পূজার বিশেষ মূল্য আছে না কি তাঁর কাছে? তাহলে আমি ম্লেচ্ছ যে ঠাকুরঘরের দ্বার খোলা পাই দিন রাত্র, সেখানে কেবলমাত্র তাঁরই দ্বার রুদ্ধ।

ভুল কোরো না, আমি খুবই বেঁচে আছি, গভীর আনন্দে আছি। সে আনন্দের প্রকাশ তোমার অভ্যস্ত পথে নয় বলেই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমার আনন্দ আজও নব নব ভাষার ভঙ্গীতে রূপ নিচ্চে, সে রসে যাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে তারা চিনতে পারবে। যারা কেবলি এক অভ্যাস থেকে আর এক অভ্যাসের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে— তারা তাদের অভ্যাসের বাইরেকার রসউৎসে পৌঁছতে পারবে না। ক্ষতি কী, স্বভাবদত্ত তাদের বরাদ্দ থেকে তারা বঞ্চিত হয় নি।

যে জনসাধারণকে গণমহারাজবর্গের মধ্যে ফেলেছ, তাদেরই ভিতরে একটি স্বচিহ্নিত সীমা এঁকে যত বীভৎসতা দেখতে পাও সেইখানেই— আর মনে কর সেইটে এড়িয়েই তোমার শুচিতা বাঁচিয়ে চলচ। আর তার বাইরে যেখানে তোমার প্রত্যহ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ, যেখান থেকে তাড়কেশ্বরের পাণ্ডা ও পূজারি-ঠাকুরদের আমদানি, সেখানকার সকল কলুষ সকল বীভৎসতা অভ্যাসের অন্ধতাবশত নির্ব্বিচারে সয়ে যাও। এ কথা মনে আনতে পারো না পাপের ঘৃণ্যতা জাতিবর্ণের মধ্যে বদ্ধ নয়,

প্রত্যহ সহস্র প্রমাণ সত্বেও। এই গণমহারাজবর্গের মধ্যেই তোমরাও আছ, আমরাও আছি, তারাও আছে— পাপপুণ্যের গতায়াত এর সর্ব্বত্রই;— বিশেষ অভ্যস্ত আচারের কৃত্রিম সিলমোহরের ছাপ মেরে কলুষের গায়েও জাতের তিলক কেটে দিয়ো না। মানবলোকে যদি তার স্পর্শ বাঁচিয়ে নির্ম্মল থাকতে চাও তাহলে ঘরে বাইরে কোথাও পা ফেলতে পাবে না। নিজেকে ঘরগড়া নিয়মে একান্ত সাবধানে শুচি রাখবার সাধনা না করে যথাসাধ্য সকলকে ক্ষমা করবার করুণা করবার আপন করবার সাধনা কোরো। আমাদের দেশে পাপকে তেমন নিন্দা করে নি যেমন নিন্দা করেছে কৃত্রিম আচারের ত্রুটিকে। বিধাতা এই অপরাধকে ক্ষমা করেন নি— বহু শতাব্দী ধরে মার খেয়ে আসচি এই দোষে, মরব এরই হাতে।

একটা ভুল ধারণা তোমার চিঠি থেকে বুঝলুম। নব্যারা আমাকে উপেক্ষা করে কি না নিশ্চিত জানি নে। আসল কথা, কেউ বা করে, কেউ বা করেও না, তার বেশি আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রাচীনাদের এবং প্রাচীনদেরও কথা না তোলাই ভালো। কবিধর্ম্মের অনুবর্ত্তী আমি নব্যাদের উপেক্ষা করি নে। যদি প্রাচীনকালে জন্মে থাকি তবে নিঃসন্দেহ তখনকার নব্যাদের প্রতিও আমার হৃদয় সকরুণ ছিল, প্রপৌত্রদের যুগে যদি জন্মাই তবে তখনো থাকবে। আমি যখন নবীন ছিলুম, বাংলাদেশের নব্যারা তখন ছিলেন অদৃশ্য। যদি এত বেশি দৃশ্যমান থাকতেন তাহলে আমার তখনকার ইতিবৃত্তান্তে ভাগ্যলিপি কোন্ রঙের কালীতে কোন্ রসের লিখন প্রকাশ করত জানি নে। এখন

যেখান দিয়ে তারুণ্যের প্রবাহ বয়ে চলেছে তার তীরে আছি বটে কিন্তু আছি শিখরচূড়ায়। প্রবাহিণীর কলধ্বনি শুন্‌তে পাই, চলচাঞ্চল্যও চোখে পড়ে। কিন্তু থাকি নিরাসক্ত। সেই নিরাসক্তির ভূমিকাতেই প্রশস্ত আকাশে গানের স্বরবৈচিত্র্য ছন্দোবৈচিত্র্যে খেলবার জায়গা পায়। গিরিশৃঙ্গ যেমন ফাল্গুনের সূর্য্যতাপে তুষারবিগলিত নির্ঝরধারা দান করে যায় দূর দেশ দেশান্তরকে, আমিও তেমনি দূর থেকেই দান করে যাব নব নব কালকে নবীন নবীনাদের গান। যদি অত্যন্ত নিকটে তাদের সমভূমিতে থাকতুম তাহলে এই ধারায় থাকত না এত অবাধ দাক্ষিণ্য, পদে পদে অনেক ধুলো বালি এ'কে নিকটের সীমায় অবরুদ্ধ করত। ইতি ২৮।১০।৩৬

দাদা

২০৩

[শ্রীনিকেতন] ১৯ নভেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার সেক্রেটরি কলকাতায়। আমার কাজের ভার দুর্ব্বহ। শান্তিনিকেতন ছেড়ে পালিয়ে এসেছি শ্রীনিকেতনের বাড়িতে। এই জায়গাটাতে শ্রীর চেয়ে শান্তিই বেশি। তেতালার নির্জ্জন ঘরে হেমন্তের স্বর্ণালোকপ্লাবিত উন্মুক্ত আকাশের মধ্যে দেহ মন নিমগ্ন। শীতকাল অতিথি সমাগমের সময়। দূর দেশ

থেকে দর্শনার্থী আসচে— শ্রদ্ধা জানিয়েই চলে যায়, আমার অবকাশকে ভারগ্রস্ত করে না। ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

দাদা

২০৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে এসেছি। সেখানে নির্জ্জনে তেতালার ঘরে খোলা আকাশের মাঝখানে একটা মুক্তির অবকাশ ছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বচ্ছ গভীর অন্ধকারে আমি যেন নক্ষত্রলোকের নীরব সভাকবির মতো বিরাজ করতুম। বামে সূর্য্যোদয় এবং দক্ষিণে সূর্য্যাস্তের মাঝখান দিয়ে বইত আমার চিন্তাধারা। এখানে জনতা এবং কর্ম্মজালে আবৃত করে রাখে মনকে— খাঁচার পাখীর মতো সে কেবলি পালাবার ফাঁক খুঁজতে থাকে। ইচ্ছা আছে এখান থেকে ছুটি পেলেই পদ্মাতটে শিলাইদহের চরে গিয়ে আশ্রয় নেব। নিজের কাছ থেকে দৌড় দেবার মতো সেখানে যেমন খোলা দরজা এমন আর কোথাও নেই।

দাদা

২০৫

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। আমি নানা কাজে নিবিষ্ট আছি, অথচ কাজে আমার আগ্রহ নেই। জীবনের সায়াহ্নকাল কাজ করবার নয় সেটা প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করচি। মানুষ কর্ম্মের দাস, সায়ংসন্ধ্যাকে মানে না; সূর্য্য যখন ছুটি ঘোষণা করে দিয়ে অস্তে যান, মানুষ তখন আলো জ্বালিয়ে দিনকে টেনে রাখে। — বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দায় নিয়েছি, ছাত্রদের সমাবর্ত্তনের দিন বক্তৃতা করতে হবে, আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে। বোধ হয় ১১ই তারিখে কলকাতায় যাব। হয় তো বেলুড়েও আমাকে টানবে। বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি যেমন অসঙ্গত, বেলুড়েও তেমনি। আমার নামটাকে নিয়ে সবাই আপন আপন ঢাক বানাতে চায়, কাঠি পড়ে আমারি পৃষ্ঠে। শরীরটা মাঝে মাঝে জবাব দিতে চায়, তাকে দোষ দিতে পারি নে, তার সহিষ্ণুতার অন্ত নেই। ইতি ২০ মাঘ ১৩৪৩

দাদা

২০৬

[কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এ চিঠি যদি ঠিক সময়ে ডাকে পাও তবে জানবে কলকাতায় সবেমাত্র এসেছি।

তোমাকে সুরুলের তাঁতের কাপড় দু জোড়া পাঠিয়েছি। জানি নে ভালো কি না। গুণের মধ্যে এখানকার পল্লীর জিনিষ।

হয়ত ১৫ই পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোয় থেকে চন্দননগরে যাব। সেখানে কিছুদিন গঙ্গার হাওয়া খাবার ইচ্ছে। তার পরে বক্তৃতাদি শেষ করে যাব কালিগ্রাম পরগণায়, প্রজাদের আমন্ত্রণে — তোমাদের জমিদারীর সান্নিধ্যে।

দাদা

২০৭

[শান্তিনিকেতন] ৫ মার্চ ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন তোমার চিঠি পাই নি, পেয়ে খুসি হলুম। কিছুদিন থেকে নানা কর্ত্তব্যে বিজড়িত হয়ে পড়েছি তার উপরে শরীরটা অবসাদগ্রস্ত হয়েছে— তার সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদের সময় আসন্ন হোলো তাতে আর সন্দেহ থাকচে না। আগামী ১লা বৈশাখে এখানে একটা উৎসব আছে— জনতার আশঙ্কা করি—

আগন্তুকদের যথোচিত অভ্যর্থনা করবার মতো উত্তম দেহে মনে নেই। চীনরাষ্ট্রপতিরা অনেক টাকা খরচ করে ভারতের সঙ্গে যোগরক্ষার উদ্দেশে এখানে একটি গৃহনির্ম্মাণ করেচেন— অনুষ্ঠানটা তাই নিয়ে। ইতি ৫।৩।৩৭

দাদা

২০৮

১৯ এপ্রিল ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই আমি বেশি পড়ে থাকি। আমার রচনায় যদি এ অনুরাগ রূপ ধারণ করে তোমরা তার সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪৪

দাদা

২০৯

৬ মে ১৯৩৭

ওঁ

আলমোড়া
Almorah

কল্যাণীয়াসু

তোমার কাছ থেকে আমার জন্মদিনের অভিবাদন পেয়ে আনন্দিত হলুম। এখানে এসে ভালো আছি, ভালো লাগচে।

জায়গাটি স্নিগ্ধ সুন্দর নির্জ্জন। বাড়িটি বড়ো, ঘরগুলি আলোয় উজ্জ্বল, বারান্দা প্রশস্ত, চারদিক খোলা, আকাশ মেঘমুক্ত, ঢালু পাহাড়ে শ্যামল বনস্পতির দল রোদ পোহাচ্ছে, সামনের পাহাড় নীলিম বাষ্পে অপরিস্ফুট। ২৫ বৈশাখ এত উর্দ্ধে দলে বলে আমাকে আক্রমণ করতে আসবে না মনে করে শান্তিতে আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪৪

দাদা

২১০

[মে ১৯৩৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমরা যা লিখি সে তো বেদবাক্য নয়। যে সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে বিধিদত্ত বুদ্ধি খাটাতে নিষেধ করে,হাজার বছর পূর্ব্বকার বিধিনিষেধের বোঝা নির্ব্বিচারে কাঁধে নিয়ে চলতে বলে, না চল্‌লে চাবুক তোলে আমি তার বিরুদ্ধে যা বলি সে তো কেবল মানুষকে ভাববার [?ভাবাবার] জন্যে। আমি তো কাউকে জাতে ঠেলতে পারি নে, কারো মেয়ের বিয়ে বন্ধ করা আমার সাধ্যে নেই, আমি কেবলমাত্র যুক্তি দিতে পারি। যুক্তি যারা মানতে অক্ষম, বুদ্ধিকে যারা স্বীকার করতে অনভ্যস্ত, তাদের উপর তো বিধাতার দণ্ড উদ্যত হয়েই আছে— বহু শতাব্দীর পরাভবে অপমানে তাদের মাথা হেঁট হয়ে রইল, এখনো শুচিতার বড়াই

করে ব্যর্থতার পথে যদি তারা চলতে চায় তাহলে তার শাস্তি কালেরই হাতে। আজ পর্য্যন্ত শাস্তি অন্য পক্ষেই দিয়ে এসেছে, দলে বলে করে এসেছে জোরজবরদস্তি, এত পীড়ন অন্য কোনো সমাজেই নেই, সেই জন্যেই এত দুর্ব্বলতা অন্য কোনো সমাজকে জীর্ণ করে নি। ভাবিয়ে তুলে তোমার মনকে আমি অস্থির করেছি— অস্থির করতেই এসেছি আমি, বিচারবুদ্ধিকে যারা পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে তাদের মনকে আমি কথার ধাক্কা দেব, এর বেশি আর কিছু করতে পারব না। তারাও আমাকে ধাক্কা দিতে থাকবে। এতে মনোরাজ্যে একটা নড়াচড়ার সৃষ্টি হবে— সেটা ভালোই।

দাদা

২১১

[আলমোড়া] ২০ মে ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসেও জয়ন্তীর হাত এড়াতে পারি নি। অল্পস্বল্পের উপর দিয়েই গেছে, অসহ্য গোছের কিছু হয় নি। বিদেশী লোক, আমাকে দিয়ে আমার ইংরেজি কবিতা পড়িয়ে নিলে। ফুলে ভরে গিয়েছিল ঘর— জলযোগটা লোকের রুচিকর হয়েছিল। বাসন্তী যে সেদিন শূন্য সভায় গান গাইতে রাজি হয় নি তার থেকে বোঝা গেল সে আধুনিক মেয়ে। আনুষ্ঠানিক সমারোহ করতে তার সঙ্কোচ বোধ হতেই পারে সে তোমার মত সেকেলে

নয়। আমাকে নানা উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান করতে হয় কিন্তু ওটা আমার স্বাভাবিক নয়।

ইতিমধ্যে এখানে দারুণ শিলবৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অকাল বর্ষণও হচ্চে। বোধ হয় বাতাসে বর্ষামঙ্গলের কবির ছোঁয়াচ লেগেচে।

দিন ভালোই যাচ্চে। ইতি ২০ মে ১৯৩৭

দাদা

বাসন্তীকে বোলো আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সে যে কোলাহল বাড়িয়ে তুলতে অসম্মত হয়েছিল সে জন্যে আমার কোনো নালিশ নেই।

২১২

[আলমোড়া। ২৯ মে ১৯৩৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর ভাল নেই এ ওজর চলবে না। কিন্তু ভালো থাকলে এবং ভালো জায়গায় থাকলে কুঁড়েমি পেয়ে বসে— কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা জন্মে এমন কি খেতে শুতেও গড়িমসি করি। অর্দ্ধেক রাত্রি চৌকিতে হেলান দিয়ে কাটে, আর দিনটা কাটে দিবাস্বপ্নে বারান্দায় বসে। নীল আকাশে বেগ্‌নি কুহেলীর চাদর জড়িয়ে পাহাড়গুলো যেন তন্দ্রাবিষ্ট— সুগম্ভীর নৈষ্কর্ম্ম্য-সাধনায় ওদেরি অনুসরণ করতে ইচ্ছে করে।

এখন বেজেছে সাড়ে দুপুর, বাতাসে যে তাপ ও চাঞ্চল্য

দেখা দিয়েছে সেটা গিরিরাজের খ্যাতির যোগ্য নয়। এ আমাদের নিম্নধরাতলের শীতমধ্যাহ্নের আতপ্ত নিশ্বাসেরই মতো। গরম কাপড়টা আচারপালন মাত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে মীরার শরীর খারাপ হয়েছিল, মহারাণী সেই সময়কার সংবাদটা এখনো তাজা রেখেছেন। ইতি ২৯ মে ১৯৩৯ [?১৯৩৭]

দাদা

২১৩

[আলমোড়া] ৩০ মে ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি ভুল কোরো না। বাদ প্রতিবাদে উত্তেজিত হবার মতো মেজাজ আমার নয়। আমি যা বলা উচিত মনে করি ['বলি'], কিন্তু আমার কথা না মানলেই মনে মনে বা বাইরে কাউকে শাস্তি দিতে হবে সে রকম চিন্তা করাও আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তোমার চিরাভ্যস্ত আচার তুমি পালন করবে এ নিয়ে আমার মাথা গরম হবে কেন? আমার শান্তিনিকেতনেই অনেকে আছেন যাঁরা আমার মতানুবর্ত্তী নন, এমন কি আমার মতবিরোধী, আমি তাঁদের তেড়েও যাই নে, তাড়িয়েও দিই না। আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী, আচারের স্বাধীনতা থাক্ অন্যের, বিচারের স্বাধীনতা থাক আমার, এ জন্যে ঝগড়া করার দুঃখ পোষণ করা মূঢ়তা। ইতি ৩০ মে ১৯৩৭

দাদা

২১৪

[আলমোড়া] ১১ জুন ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমি কতকগুলি লেখা নিয়ে দিন রাত ব্যাপৃত আছি। এখানে যে অবকাশ পেয়েছি সে আর কোথাও পাব না তাই এর অল্প অংশও নষ্ট করতে ইচ্ছা করচে না।

তোমার শেষ দুই একটি চিঠি খুব ভালো লাগল। তোমার রচনার শক্তি যখন তোমার মানসিক অবসাদ বা বিরক্তি ভেদ করে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তখন তার অসামান্যতা আমাকে বিস্মিত করে। মনে দুঃখ হয় যে বাহ্যিক ও আন্তরিক নানা বাধার ভিতর দিয়ে তুমি মানুষ হয়েছ, অন্তরে বাহিরে প্রতিহত হয়েছে তোমার সহজ শক্তি।

বাংলাদেশে গল্পগুচ্ছ পড়বার যুগের অবসান হয় নি কি? অল্পবয়সে বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলঙ্কৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দবিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই। বাংলা পল্লীর সেই অন্তরঙ্গ আতিথ্য থেকে সরে এসেছি তাই সাহিত্যের সেই শ্যামচ্ছায়াশীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্ত্তমান মোটরচলা কলম আর কোনো দিন চলতেই পারবে না।

আবার যদি শিলাইদহে বাসা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে মন হয় তো আবার সেই স্নিগ্ধ সরলতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু আর সময় নেই। অতএব ইতি ১১।৬।৩৭

দাদা

২১৫

১৭ জুলাই ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা নিঃসন্দেহভাবেই অসুস্থ। কিছুতে মন লাগাতে বা হাত লাগাতে পারচি নে।

তোমার কবিতা ইতিপূর্ব্বে কখনো কখনো যা পেয়েছিলুম সেগুলি ছিল বেশ তাজা— এখন যে কবিতা পাঠিয়েছ সে যেন সাবেক কালের দাগ ধরা। বোধ হচ্চে তোমার দেহ মনে অবসাদ নেমেচে তাই পুরানো কালের গুঞ্জনধ্বনিই চলচে। জোর করে লিখে কোনো লাভ নেই— খাঁটি লেখা খাঁটি হীরের মতো খনির মধ্যে হঠাৎ হাতে ঠেকে।

শ্রাবণের শ্যামমূর্ত্তি দ্যুলোকে ভূলোকে প্রকাশ পেয়েছে। নিরন্তর ধারাবর্ষণ চলেছে— ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে রোদ্‌দুর নেমে এসে দিকে দিকে সবুজের উপর সোনালির তুলি বুলিয়ে দিচ্চে— পাখীগুলো ডাকচে আর লাফাচ্চে, তারা খুসি হয়েছে এই কথাটা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো জরুরি

কাজ তাদের হাতে নেই। বেলা যাচ্চে শরৎশেষের স্বল্পজল নদীটির মতো, মন্থর স্রোতে। দক্ষিণের বারান্দায় বাগানের সামনে চুপ করে বসে আছি— কাজ করবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু উৎসাহ নেই।

Calcaria Fluor 6x (বায়োকেমিক, অর্শের একটা ভালো ওষুধ। রাত্রে হোমিয়োপ্যাথী নাক্‌স্ ভমিকা ৩০x এবং প্রাতে সালফর ৩০x উপকারে লাগতে পারে।

বাংলায় বায়োকেমিক বই আছে এই পর্য্যন্ত জানি এর বেশি আর জানা নেই। মহেশ ভট্টাচার্য্যের দোকানে খোঁজ করলেই পাবে। ইতি ১ শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২১৬

২০ [? ১৯] জুলাই ১৯৩৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাল মঙ্গলবারে কলকাতার উপকণ্ঠে যাত্রা করচি। প্রশান্ত তাঁর পূর্ব্বের বাসা পরিহার করে তার থেকে আরো কিছু দূরে বেলঘরিয়ায় একটা বাগানবাড়িতে উঠেছেন। তার নাম গুপ্ত-নিবাস। সন্ধান করে সেখানে আসা হয় তো তোমার অসাধ্য হবে— অতএব আশা করব না। জ্বরনাশক দ্বারিক গুপ্তদের বাড়ি— ভাড়া দিয়েছেন। দিন তিন চার থাকব, কাজ আছে—

কাজ এখানেও আছে— তাই শীঘ্র চলে আসতে হবে। ইতি
৪ [? ৩] শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২১৭

বেলঘরিয়া
গুপ্তনিবাস

কল্যাণীয়াসু

আচ্ছা, শনিবারে জোড়াসাঁকোয় যাব। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে অপরাহ্ণের দিকে ফিরে আসব। ইতি বৃহস্পতিবার

দাদা

২১৮
৪ অগস্ট্ ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এসেছি আমার নিভৃত কুলায়ে। সহরে চারদিকে জাল পাতা— পালাবার জো নেই। বেলঘরিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম কিন্তু জনসমাগমের বাধা হচ্ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবকাশ নীরন্ধ্র হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে টাউনহলে বক্তৃতাও দিতে হোলো, উপলক্ষ্যটি এমন যে না বলতে পারলুম না।

এখানে বৃষ্টিবিহীন শ্রাবণ আকাশে মেঘ বিছিয়ে বসে আছে। ক্ষণে ক্ষণে অত্যন্ত কৃপণ ধনীর ঘরে কাঙালি বিদায়ের মতো ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে যাচ্চে। চাষীদের আশা দিচ্চে কিন্তু আশা পূর্ণ করচে না। ইতি ১৯ শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২১৯

১৩ অগস্ট্‌ ১৯৩৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমার পতিসর ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনতে চেয়েছ। আমার কলম অলস এবং নানা কাজে ব্যস্ত। আমার যে অনুচর ছিল সে বিস্তারিত বিবরণ লিখবে এমন জনশ্রুতি শুনতে পাই। আমার লেখবার একটা মস্ত বাধা আমার অসাধারণ বিস্মরণ-শক্তি এবং নিজের কথা আলোচনা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা। মোটের উপর বলবার বিষয় এই যে খুব ভালো লেগেছিল— প্রথম থেকেই আমার প্রজাদের ভালোবেসেছি তারা তা ভুলতে পারে না, আমার প্রতিও তাদের ভালোবাসা অকৃত্রিম ও গভীর। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর তারি প্রচুর পরিচয় পেয়ে যত খুশি হয়েছি এমন খুশি আমার রচনা সম্বন্ধে সমালোচকদের স্তুতিবাদে হই নে।

শ্রাবণ এবার তার আদিপর্ব্বে কৃপণতা করেছিল, বিদায়

কালের কাছাকাছি পূর্ব্বত্রুটি পূরণের চেষ্টা করচে। আগামী রবিবারে এখানে বর্ষামঙ্গলের দিন স্থির করেছি কিন্তু উপরওয়ালারা যদি ঐরাবতে চড়ে বর্ষামঙ্গলে লেগে যান তাহলে আমাদের হার মানতে হবে। ব্যস্ত আছি। ইতি ২৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২২০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এবার তুমি যথারীতি আরোগ্যচর্চায় মন দিয়েছ শুনে খুশি হলুম। শরীরটা বিধাতার দুর্লভ দান, ওটাকে অবহেলা করবার অধিকার কারো নেই— লক্ষ টাকা দাম দিয়ে যদি ওকে কিনতে হোত তবু ওর উপযুক্ত মূল্য হোতো না। বিশ্বজগতের সঙ্গে ঐ তো যোগের সেতু, যতদিন বেঁচে আছো ওটাকে মেরামতে রাখবে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এই সর্ত আছে।— আমি কাল সকালের গাড়িতে জোড়াসাঁকোয় যাচ্চি দিনটা কাটিয়ে রাত্রে অন্তর্ধান করব বেলঘরিয়াতে। তোমার রুগ্ন দেহ এবং অন্যান্য অসুবিধা নিয়ে আসবার চেষ্টা কোরো না। এবারে আমি ৮।৯ দিন থাকব। ব্যস্ত থাকতে হবে। ইতি

দাদা

২২১

৬ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। বোধ হচ্চে পাও নি না পাবার কারণ তোমাদের ঠিকানা বদলের খবর বিশ্বভারতী আপিসে জানাও নি। সে দুটো বই পুরোনো ঠিকানা থেকে উদ্ধার করতে ['না'] পারো তাহলে যথাস্থানে আর দুখানা দাবী করে আনিয়ে নিয়ো।

শরীরে এখন বিশেষ কোনো উপদ্রব নেই— শান্ত হয়ে বসে আছি। ইতি ৬।১০।৩৭

দাদা

২২২

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সুস্থ হয়েছি কিন্তু দেহ নিশ্চেষ্টপ্রায়। আশীর্বাদ। ইতি

দাদা

২২৩

৯ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বারান্দায় বসে সন্ধ্যার সময় সুনন্দা সুধাকান্ত ও ক্ষিতিমোহন বাবুর স্ত্রীকে মুখে মুখে বানিয়ে একটা দীর্ঘ গল্প শুনিয়ে তার পরে বাদলা বাতাস ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে ঘরে গিয়ে কেদারাতে বসেছিলুম, শরীরে কোনো প্রকার কষ্ট বোধ করি নি, অন্তত মনে নেই ; কখন মূর্চ্ছা এসে আক্রমণ করল কিছুই জানি নে। রাত নটার সময় সুধাকান্ত আমার খবর নিতে এসে আবিষ্কার করলে আমার অচেতন দশা। পঞ্চাশ ঘণ্টা কেটেছে অজ্ঞান অবস্থায়, কোনো রকম কষ্টের স্মৃতি মনে নেই। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে রক্ত নিয়েছে, গ্লুকোজ শরীরে চালনা করেছে, কিন্তু আমার কোনো ক্লেশবোধ ছিল না। জ্ঞান যখন ফিরে আসছিল তখন চৈতন্যের আবিল অবস্থায় ডাক্তারদের কৃত উপদ্রবের কোনো অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। দীর্ঘকাল পরে মন মোহমুক্ত হোলো। তোমরা দূরে বসে আমার রোগের যেসব বিভীষিকা কল্পনা করছিলে তার সমস্তই অমূলক। রোগের আকস্মিক আবির্ভাব হয় তো সাংঘাতিক, কিন্তু তার আদি অন্তে মধ্যে লেশমাত্র দুঃখ আমি পাই নি।

একটা সুবিধা এই হয়েছে সংসারের হাজার রকম দাবী থেকে নিষ্কৃতি নিতে পেরেছি। প্রতিদিন চিঠি আসচে ঝাঁকে ঝাঁকে, কেউ চায় প্রবন্ধ, কেউ চায় তাদের কোনো অধ্যবসায়ের

জন্যে আশীর্বাণী, কেউ চায় তার মেয়ের জন্যে নাম, কেউ চায় কোনো দার্শনিক বা সাহিত্যিক সমস্যার সদুত্তর— তা ছাড়া রচনার অভিমত,— কারো আর ত্বর সয় না। আগে হলে নিরুত্তরে বসে থাকতে দুঃখ বোধ হত, এখন কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে পীড়া দেয় না, কিছুকালের জন্যে মৃত্যুদূত এসে আমার ছুটির পাওনা পাকা করে গিয়েছে। মনে করচি আমার ভীষ্মপর্ব শেষ হোলো— অনবরত তুচ্ছ দাবীর শরবর্ষণ আজ থেকে ব্যর্থ হবে— স্বর্গারোহণ পর্ব পর্য্যন্ত এই রকমই যেন চলে এই আমি কামনা করচি।

তুমি বৃথা কল্পনায় মনকে পীড়িত করেছিলে সেই জন্যে আসল খবরটা তোমাকে জানালুম। ইতি ৯।১০।৩৭

দাদা

২২৪

[১৩ অক্টোবর ১৯৩৭]

ওঁ

“গুপ্তনিবাস”
বেলঘরিয়া
২৪ পরগণা

কল্যাণীয়াসু

শরীরটার আরো মেরামৎ দরকার আছে তাই টেনে এনেছে কলকাতার দিকে। আছি সেই বেলঘরিয়ার বাগানে— গৃহস্বামীরা তাঁদের বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছেন গিরিডিতে। মাস-

খানেক লাগবে নিষ্কৃতি পেতে। ইতিমধ্যে কাল তোমার কাছ থেকে পরিধেয় উপহার পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। ঘনঘোর ঘটা করে বাদল চলচে— এখানে চারদিকের গাছপালার সঙ্গে তার সুসঙ্গতি আছে— কলকাতার ইঁট কাঠের দেয়ালগুলোর মধ্যে তার সুর নষ্ট হয়, তাল কেটে যায়। ইতি নবমী [২৭] আশ্বিন ১৩৪৪

দাদা

২২৫

২৪ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ বেলঘরিয়া

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর সমান ভাবেই আছে। চিকিৎসা চলচে। চিকিৎসার মেয়াদ নবেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। জওহরলাল কাল দেখা করতে আসবেন মহাত্মাজি কবে আসবেন জানি নে। তোমাদের দুঃসময় চলচে এখন বোধ হয় এখানে তাঁদের দেখতে আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইতি ২৪।১০।৩৭

দাদা

২২৬

২৮ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শ্রীনিকেতনের তাঁতের কাপড় তিনখানি তোমাকে পাঠালুম। ব্যবহার্য্য বলে গণ্য হলে খুশি হব।

তোমার যেদিন সুবিধা হয় আসতে পার। আমি তো তোমাকে নিষেধ করি নি। ২৮।১০।৩৭

দাদা

২২৭

৫ নভেম্বর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আশীর্বাদীস্বরূপ সামান্য কিছু দক্ষিণা তোমাকে দিতে ইচ্ছা হোলো। যেমন খুশী ব্যবহার করলে আনন্দিত হব।

এখনি চলেছি শান্তিনিকেতন অভিমুখে। ইতি ৫।১১।৩৭

দাদা

২২৮

১৪ নভেম্বর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আশীর্বাদের স্বরূপ তোমাকে সামান্য কিছু পাঠিয়েছিলুম, তাতে তোমার অভাব মোচন হবে এমন অদ্ভুত কথা মনে করে দিই নি— তুমি খুশি হবে এই ছিল তার উদ্দেশ্য। কোনো আকারে তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা কোরো না আমার শরীরে কোনো উৎপাত উপসর্গ নেই, কিন্তু জড়তা আছে। মনটা কাজের ক্ষেত্র থেকে পলাতকা। সামান্য কোনো দায় উপস্থিত হলেই ভয় লাগে। অথচ সম্পূর্ণ নিরর্থক দিনযাপনও অবসাদজনক। ইতি ১৪।১১।৩৭

দাদা

২২৯

[২৮ নভেম্বর ১৯৩৭]

ওঁ বেলঘরিয়া

কল্যাণীয়াসু

চিকিৎসার জালে আবার আমাকে টেনে এনেছে। শান্তিনিকেতনের আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্র, আমার ঘরের কাছের বাগানে এখনো সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে দু চারটে করে শিউলি ফুটছে, হিমঝুরি-বীথিকায় পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রাঙ্গণে আমার প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করে শালিখগুলো চঞ্চল হয়ে

লাফিয়ে বেড়াচ্চে, একটি পাটলবর্ণ গ্রাম্য কুকুর সেও আসে প্রসাদপ্রত্যাশায়, থেকে থেকে ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে, পূর্বদিগন্তে রেলগাড়ি ধূমকেতু উড়িয়ে চলে যায়— যথেচ্ছ অবকাশের মধ্যে আমার আরামকেদারা আশ্রয় করে পড়ে থাকি— ভালো লাগে না ওখান থেকে সরে আস্‌তে। এখানে দেহে এক্‌স্‌রে প্রয়োগ করবে তিনদিন— আজ থেকে আরম্ভ মঙ্গলবারে সমাধা,— বুধবারে ফিরে যাব যদি কোনো বিঘ্ন না ঘটে। ইতি রবিবার
[২৮ নভেম্বর ১৯৩৭]

দাদা

২৩০

২৯ নভেম্বর ১৯৩৭

কল্যাণীয়াসু

তোমার পাঠানো ভোগের দ্রব্য পেলুম— যথাসাধ্য ভোগে লাগাব— সাধ্যের সীমা বেশিদূর নয়।

আজ আর খানিক বাদে যেতে হবে ডাক্তারের দরজায়— আলোকবাণ বর্ষণ হবে। কাল এই চিকিৎসার পালা শেষ হবে— কালই সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরব। এখানে মন বসচে না— শরীরও বিকল আছে— কিন্তু বিশেষ কোনো উপসর্গ নেই। আসলে এখানে আমার সর্বপ্রধান ব্যাধি হচ্চে নানা দাবী নিয়ে সমস্ত দিন লোকের ভিড়। আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এখন তিনটে— এর মধ্যে ফাঁক ছিল না— এখন হেলান দিয়ে পড়েছি লম্বা কেদারায়।

আমার পূর্বের চিঠি হয় তো ইতিমধ্যে পেয়ে থাকবে। ইতি
২৯।১১।৩৭

দাদা

২৩১
৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

অবসাদের ছায়াচ্ছন্ন তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি দুঃখবোধ করেছি। আমার বিশ্বাস তোমার এই মানসিক গ্লানি তোমার শারীরিক অস্বাস্থ্যেরই অনুবর্ত্তী। সংসারে সকলেরই ভাগ্যে মাঝে মাঝে দুর্যোগ ঘটে, অনেক সময়ে অবিবেচনাবশত কর্ম্মজালে গ্রন্থি পাকিয়ে তুলি— নানা কষ্টের কারণ নিজের ভিতরে এবং নিজের বাইরে আছে, এক এক সময়ে সমস্তটা মিলে ব্যাপারখানা জটিল হয়ে ওঠে— এ সমস্তকেই স্বীকার করে নিয়ে নিজের জোরেই নিজেকে সাংসারিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে হয়— উদ্ধার বল্‌তে বাইরেকার সমস্যাকে সহজ করা নয়, নিজের ভিতরে সমস্যার সমাধান করা, অন্তরে দুঃখের ঠোকাঠুকিতেই আলোককে জ্বালিয়ে তোলা। নিজেকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে এ সমস্তই ক্ষণস্থায়ী কুহেলিকা, চিরকালের জ্যোতিষ্ক আছে দিগন্তে। যদি বলো আমার জোর নেই, দৃষ্টি নেই, আমি দুঃখকেই মান্‌তে পারি, দুঃখের অতীতকে মানবার মতো বীর্য্য

পাই নে— তাহলে কী আর বলব ! বলব দুঃখ পাবেই, নালিশ করে তার অবসান হবে না।

আমি কোনো রোগের অধিকারে নেই, যে শারীরিক অপটুতা সেটা জরাজনিত। তাতে চলাফেরার পথ রোধ করেছে, মনের গতি বন্ধ করে নি— কখনো বই পড়ি, কখনো লিখি, কখনো পরিপূর্ণ নৈষ্কর্ম্ম্য উপভোগ করি। তোমার চিঠি থেকে মনে হয় তুমি কল্পনা করচ আমি কবিত্বলোকে চিরযৌবনধামে মধুপগুঞ্জন্মুখর নববসন্তের দক্ষিণ সমীরণে পুলকিতদেহে স্বপ্ন-বিহ্বল হয়ে থাকি। চারিদিকে তার আভাসও দেখতে পাই নে। তোমার এই কল্পনার সত্যরূপ দেখবার জন্যে জন্মান্তরের অপেক্ষা করতে হবে,— জীবনসায়াহ্নে স্তিমিত দীপালোকে আপনার সঙ্গ নিয়ে আপনি আছি একা। ভালোই আছি, কোনো দায়িত্ব নেই, রসাভিষিক্ত চতুর্দশপদী কবিতা লেখবার দাবীও আসচে না কোনোখান থেকে— এ'কেই তো বলে মুক্তি।

আজ মাঘের আকাশ শ্রাবণের মুখোস প'রে আছে। বৃষ্টি নেই, কেবল নিবিড় ছায়া, আর ভিজে হাওয়া বইচে চারদিক থেকে। সূর্য্যালোকপিপাসু আমার মন ['।'] স্বাধিকারপ্রমত্ত ঋতুর এই অন্যায় ব্যবহার সইতে পারচি নে।

মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যাচ্চে— জানলার ধারে আমার কেদারাটা আশ্রয় করি গে। ইতি ৮।২।৩৮

দাদা

২৩২

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাজে কর্মে চিন্তায় জড়িত আছি। কলকাতা অভিমুখে যেতে হবে পয়লা মার্চে। আশ্রয় নেব বেলঘরিয়ায়। চিকিৎসার কিছু অবশেষ আছে। উৎপাত হয় তো চলবে কয়েক সপ্তাহ ধরে। তার পরে কিছু দিনের জন্যে আর কোনো নিভৃতে আশ্রয় খুঁজে নেব। ইতি ২৩।২।৩৮

দাদা

২৩৩

৬ মার্চ ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

৮ই তারিখে এখান থেকে যাত্রা করব। বেলঘরিয়ায় আশ্রয় নেব স্থির করেছি। চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে। দেহখানা বেমেরামৎ হয়ে পড়েচে— চোখে কম দেখচি, কানে কম শুনচি, কলম চলচে খুঁড়িয়ে, স্মৃতিশক্তির উপরে প্রদোষের ছায়া পড়েছে। ইতি ৬।৩।৩৮

দাদা

২৩৪

৯ মার্চ ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলকাতার দিকে আমার যাওয়ার বিঘ্ন ঘটেছে। কবে যেতে পারব তার নিশ্চয়তা নেই। যাতায়াতের ক্লান্তি স্বীকার করতে মন এখন অনিচ্ছুক। শান্ত হয়ে বসে নিভৃতে কিছু কাজ করতে ইচ্ছা করি। ডাক্তারের চিকিৎসার চেয়ে বিশ্রাম বেশি ফলদায়ক। ইতি ৯।৩।৩৮

দাদা

২৩৫

৪ এপ্রিল ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হঠাৎ আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ঘটেছে— পড়তে এবং লিখতে কষ্ট হয়। এবার সর্বসম্মতিক্রমে আমার জন্মোৎসবের দিনস্থির হয়েছে ১লা বৈশাখে। বীরেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে ওঁদের কালিম্পঙের বাড়িটা ব্যবহার করবার সম্মতি নিয়েছি— জীর্ণ দেহ সংস্কারের জন্যে হিমগিরির আতিথ্যের প্রয়োজন ঘটেছে। ইতি ৪।৪।৩৮

দাদা

২৩৬

[এপ্রিল ১৯৩৮]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দৈবাৎ তোমার চিঠিতে এইমাত্র তোমার ঠিকানা পাওয়া গেল। তোমার জামাতাকে বোলো তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার একটা সম্পূর্ণ তালিকা জোড়াসাঁকোয় শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন— যথাস্থানে সে পাঠিয়ে দেবে। কাল রাত্রে কালিম্পঙ রওনা হব। কয়দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম।

দাদা

২৩৭

[কালিম্পঙ] ৩০ এপ্রিল ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনো পর্যন্ত কালিম্পঙের দুর্নামের যোগ্য কোনো লক্ষণ দেখি নি। দার্জ্জিলিঙের চেয়ে ভালো যেহেতু শুক্‌নো, তাছাড়া ফ্যাসানের ফরমাসে যাদের বেশভূষা চলাফেরা তাদের ভিড় এখানে বন্ধ শিলঙের মতো এখানে কেরাণী ও কেরাণীদের প্রভুদের আবহাওয়া নেই। ভারতশাসনকর্ত্তাদের রথচক্রের ঘর্ঘর এখানে কানে আসে না। যাকিছু সমস্ত বেশ পরিমিত

মাত্রার, অশন বসন মেলে না যে তা নয় কিন্তু বড়ো দরের বাবুগিরির মাপে নয়। সব চেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য সে হচ্চে এখানকার এই বাড়ি, ঘরে ঘরে প্রচুর আলোর সংস্থান, বড়ো বড়ো দরজা জানলা আকাশের বিরুদ্ধে দরোয়ানি করে না— বাইরে তাকালেই দেখতে পাই গিরিরাজের সঙ্গে মেঘমালার নিরন্তর মিলনলীলা চল্‌চে। এ রকম উদার ব্যবস্থার বাড়ি পাহাড়ে সচরাচর মেলে না। আমার মতো শান্তিপ্রিয় আলোক-পিপাসু মানুষের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত, দুর্লভ বললেই হয়। বিশেষত এখানে গৃহস্বামীদের আগমনের বিশেষ তাগিদ নেই শুনেছি অতএব তাঁদের ভোগের অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করচি নে জেনে মন স্বস্তিতে আছে। কেসরবাইয়ের সম্বন্ধে অত্যন্ত অত্যুক্তি শুনেছিলুম বলে সেদিন সঙ্গীত উপভোগের কিছু ব্যাঘাত হয়েছিল। তুমি যদি নেপথ্যে সেখানে থেকে যেতে তাহলে তোমার বা অন্য কারো পরিতাপের কোনোই কারণ ঘটত না। তুমি মনে মনে কাল্পনিক বিঘ্ন রচনা করে অকারণে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ো বলে অনাবশ্যক দুঃখ বোধ করো। সেদিন গৃহস্বামিনী অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তুমি তো তাঁর তিলমাত্র পথ রোধ কর নি। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৪৫

দাদা

২৩৮

[মংপু] ২২ মে ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কালিম্পঙের কাছাকাছি এক জায়গায় সিন্‌কোনা চাষের ক্ষেত্র। সেখানে মৈত্রেয়ীর স্বামী কাজ করেন। মৈত্রেয়ীর সনির্বন্ধ অনুরোধে এখানে এসেছি— ফেরবার পথ সে আটক করে আছে। বিধাতাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন— অকালে ঘোর বৃষ্টি নেমেছে— এ অবস্থায় পাহাড়িয়া পথে চলনের চেয়ে পতনের আশাঙ্কাই বেশি। তবে কিনা জায়গাটি ভালো, বাড়িটি প্রাসাদবৎ, তা ছাড়া যত্নের সীমা নেই। উচ্চতায় এ জায়গাটা দার্জ্জিলিঙের কাছে মাথা হেঁট করবার নয়। কালিম্পঙ কিছু রুক্ষ, তার বাইরের পাহাড় শ্রেণী পর্জন্যদেবের পথ আটকে আছে।

...

৮।২।৪৫

দাদা

ভ্রমক্রমে দুটো কার্ডের দু পিঠে এই ছোটো লিপিখানি লিখিত হয়েছে। রিক্তস্থান ভরাট করে দেবার মতো ঐশ্বর্য কলমের নেই।

বৌমা এখানে নেই— আমার সংসারের অধিকাংশই আছে কালিম্পঙে। আমার শরীর পূর্বের চেয়ে ভালোই।

২৩৯

[কালিম্পঙ] ৯ জুন ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কয়েকদিন মংপু পাহাড়ে ছিলুম। আজ ফিরচি কালিম্পং।

জায়গাটি মনোরম— সম্মুখের পাহাড়গুলির ব্যবহার অন্তরঙ্গের মত— অর্থাৎ তারা দূর আকাশের থেকে নিম্নতলবাসীদের প্রতি ভ্রূকুটিবিক্ষেপ করে না— তাদের উদার নীল বক্ষ প্রসারিত করে কাছাকাছি ঘিরে এসেছে— স্বীকার করচে তারাও পৃথিবীতে আমাদের প্রতিবেশী। এখানে ফুলের অভ্যর্থনাও চারদিকে অজস্র। দৃষ্টির ভোজ পেতে দেওয়া হয়েছে চারদিকে— দুঃখ এই দৃষ্টির উপর আবরণ নামচে। এটা বিধাতার অকৃতজ্ঞতা কেননা আমার চক্ষু সেই শিশুকাল থেকে তাঁর সৃষ্টিকে যে রকম বাহবা দিয়ে এসেছে এমন কোনো রূপকার কারো কাছ থেকে পায় নি— তাঁর রসরচনার এমন রসজ্ঞ সহজে মিলবে না সে আমি গর্ব করেই বলতে পারি। বোধ হচ্চে সব চেয়ে বড়ো পর্দাখানা পড়বার আগে সইয়ে নিচ্চেন। চোখের কুয়াষা ঠেলে কিছু কিছু লিখতে হচ্চে, কেননা কলমের অপযশ সইতে পারব না— অনেকদিন সে আমার ভাবের বাহনগিরি করে আসচে এখনো প্রস্তুত আছে— কিন্তু যে মন চালনা করেন সেই সারথির তেমন উৎসাহ নেই— তিনি বলেন ওস্তাদরা ঠিক সময় যেমন চলতে জানে ঠিক জায়গায় তেমনি থামতেও ভোলে না— এই

যথোচিত থামাটাও সৃষ্টিরও অঙ্গ। আজ এই পর্যন্ত ইতি ৯।৬।৩৮

দাদা

চিঠিতে ঠিকানা কেন লেখনা— আমার স্মৃতিশক্তি কি আমার দৃষ্টিশক্তির চেয়ে প্রবল।

২৪০

২ জুলাই ১৯৩৮

ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়াসু

কাগজে পড়েছ যে সর্বসাধারণের কাছে আমি বিশ্রাম কামনায় ছুটি চেয়েছি— তার থেকে তুমি কল্পনা করেছ যে এই সাধারণের মধ্যে তুমিও আছ। তুমি জানো তোমার চিঠি পড়তে আমার ভালই লাগে, যদিও আজকাল চিঠি লিখতে আমার কলম সরে না— সেটা আমার দুর্বলতা। যাই হোক কাল্পনিক আশঙ্কায় আমার প্রতি অন্যায় বিচার করে আমাকে দুঃখ দিয়ো না, এবং নিজের মনকে বৃথা পীড়িত কোরো না— আমার প্রতি বিশ্বাস রেখো। ইতি ২।৭।৩৮

দাদা

২৪১

[শান্তিনিকেতন] ৮ জুলাই ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

নাৎনী না হয়ে নাতির জন্মসংবাদে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হবার কারণ ঘটল কিন্তু নাতবৌয়ের সমাগমপ্রত্যাশায় মনকে সান্ত্বনা দেব। নবাগত এবং প্রসূতির পরে আমার আশীর্বাদ রইল।

অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দেখি সবুজ সমুদ্রের ঢেউগুলি মেঘমেদুর আকাশের দিকে সকৃতজ্ঞ জয়ধ্বনি বিস্তার করে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। চোখ জুড়িয়ে গেল। কর্তব্য থেকে ছুটি নিয়েছি— এখানকার বনভূমির সঙ্গে নিভৃতে মোকাবিলার কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

জুলাই মাসের অন্তে নগাধিরাজের অতিথিশালায় আমার নিমন্ত্রণ রয়েছে, সেখানে শরৎ ঋতু যাপন করব। পারি যদি, সপুত্রক বাসন্তীকে যাবার সময় সশরীরে আশীর্বাদ জানিয়ে যাব। ইতি ৮।৭।৩৮

দাদা

২৪২

[* শান্তিনিকেতন] ৮ অগস্ট, ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ভালই আছি কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত আছি— একটুও বিশ্রামের সময় পাই নে। যে বিষয়টা লেখার ভার নিয়েছি সেটা কঠিন— ও দিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার জন্যে তাগিদ আসচে। তা ছাড়া এখানকারও অনেক দায়িত্ব আছে। অথচ মনটা ছুটি পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। কিশোরকান্ত নামটা আমি ময়মনসিংহ আভিজাত্যের মাপেই কল্পনা করেছিলুম— ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলুম। কবিতাটি আমার নিজেরই শুভকামনার ছাঁদে রচিত। ইতি ৮।৮।৩৮

দাদা

২৪৩

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

চিঠিপত্র কখনো লিখি কখনো লিখি নে। যখন লিখি সেটা দৈবাৎপাওয়া অবকাশে দৈবাতের খেয়ালে। ছুটি নিয়েছি— কিন্তু ছুটির মধ্যেও কখনো কখনো ফাঁক এসে পড়ে। তবু মোটের উপরে মনটা বিমুখ, কলমটা সত্যাগ্রহের ভয় দেখায়।

দেহযন্ত্রে যে তন্তুগুলোকে বলে nerves, সেতারের আল্‌গা তারের মতো তারা বাজতে চায় না, যদি বাজে সুরে বাজে না। অল্প কোনো ধাক্কাতেই আমার মনটাকে সরিয়ে দেয় আমার কর্মশালা থেকে। জানালার বাইরে ফুটেছে দোলনচাঁপা তার গন্ধে যখন ভরে ওঠে ঘরের আকাশ, তখন সেটা একটা ছুতো হয় মনকে বাইরে দৌড় করাতে। ইস্পাহানি গোলাপের গুচ্ছ এনে মালী সাজিয়ে দেয় ফুলদানিতে,— তখনি আধখানা লেখা লাইনের দায়িত্ব কাটিয়ে কলম ফেলে দিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে করে, তবে থাক্‌। আমার ছায়াদেহী দলবল জুটেছে শরতের শিশির-ভেজা ঘাসের উপরে, ছেঁড়া মেঘের আলো ঢালা আকাশে ;— আমার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেওয়া সামাজিক মানুষটাকে কোনোমতে ফেলে দিয়ে এই ফুরফুরে হাওয়ায় মেঠো রাস্তা বেয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে পালামৌ কিম্বা দুম্‌কা জেলার দিকে। কিন্তু এ সমস্তই নিছক কবিত্ব। ছেলেবেলায় আমাকে গণ্ডি এঁকে জানালার কাছে বসিয়ে রাখত— আজও সেই গণ্ডি— জানলা একটা আছে, তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাই অগমকে অধরাকে— মনে মনে ভাবি গণ্ডি ভাঙবার সময় আসচে, তার পরে ?— জানি নে। ইতি ১৫।৯।৩৮

দাদা

২৪৪

৬ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এবার কালিম্পঙ অভিমুখে চল্‌লুম। গরমে তাড়া করেছে। শনিবারে কলকাতায় পৌঁছব— সোমবারে যাত্রা করব। নড়বার ইচ্ছা ছিল না— কিন্তু স্থির থাকতে দিল না। ইতি ৬।১০।৩৮

দাদা

২৪৫

৫ নভেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পুরাতন জন্মতিথির অন্তর হতে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠুক নব জন্ম, নব সফলতার প্রত্যাশা বহন করে নিয়ে এই কামনা করি। ইতি ৫।১১।৩৮

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৬

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩৮]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির একটা উত্তর দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম সম্বন্ধে তুমি যেমন ইচ্ছা আলোচনা করতে পার— তাতে ক্ষতি নেই। সম্পাদক প্রেমানন্দ সজ্জন সচ্চরিত্র এবং ধর্মনিষ্ঠ। ইতি

দাদা

আমার কাছে নাচনের চিঠি এসেছিল সজনীর দৌত্যে— উত্তর গেছে তাঁরই হাত দিয়ে— ... ... —শনিবারের চিঠিতে ওটা বের হবে ভাবিনি— মনে করেছিলুম ওটা অলকায় বেরবে।

২৪৭

১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সমস্ত পৃথিবীর হাওয়া আবর্তিত আবিল। মানবজাতির উপরে একটা অভিশাপ নেবেছে। এর মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও যদি অশান্তির ঘূর্ণিপাক দেখা দেয় তবে সেটাকে মেনে

নিতে হয়। তুমি বলচ সম্প্রতি তোমার জীবনে প্রশংসাও চলচে গালমন্দও জাগচে, এটা খুব খারাপ লক্ষণ নয়, এই অভিজ্ঞতার মধ্যেই আটাত্তর বছর কাটিয়ে দিয়েছি— শেষ পর্যন্তই কাটবে— নিরবচ্ছিন্ন সমাদর সত্য হয় না। ··· ···র হাতে আমার লাঞ্ছনা কম হয় নি— আবার কিছু দিনের জন্যে বাঁক ফিরেছে, সম্মানের আশা হয়েছে— কিন্তু তাকে স্থায়ী বলে নিশ্চিন্ত হওয়া মূঢ়তা। নাই বা হোলো স্থায়ী। ভিতরের সত্য যদি মুখের কথার একটু গরম হাওয়া লাগলেই শুকিয়ে পড়ে, তাহলে সে সত্যই নয়, তার মরাই সদ্গতি। সংসার আমাদের প্রশ্রয় দেবে না আমরাও পদে পদে মাথা হেঁট করে তাকে সেলাম ঠুকব না। দেখচ তো ইংলণ্ড আজকাল শান্তিলাভের দুরাশায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কী রকম ল্যাজ নাড়চে— এই অপমানিত শান্তি টিঁকতে পারে না অথচ অপমানটা টিকবে। ভীরুর মত অসম্মানের সঙ্গে রফা করতে চাইব না, তাকে অগ্রাহ্য করলেই সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে।— এই মাত্র দেখা গেল যাকে বিশ্বাস করেছি আদর করেছি সে বিনা কারণে ফণা ধরে উঠেছে তাই বলে মনসার পূজো দিতে ছুটব না আমি যে শিবের পূজারি তাঁর জটার পাকে পাকে সাপ থাকে বাঁধা, কণ্ঠে মিলিয়ে যায় বিষ। ইতি ১৬।১২।৩৮

দাদা

২৪৮

২০ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সংসারে যাকে আমরা চেয়ে পাই নে সেও আমাদের ব্যর্থ করে না। না চাইতে পারাই হচ্চে মরুভূমির ধর্ম। সে মেঘের কাছ থেকে বর্ষণ চাইতে জানে নি, সে ভূমিমাতার কাছ থেকে কোনো বর প্রার্থনা করলে না— এতেই তার যথার্থ অকিঞ্চনতা, বেদনাহীন তার দৈন্য। জীবনে আমরা অনেক জিনিষ পাই আর অনেক জিনিষ চাই— দুইয়েতেই রক্ষা করে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্রের সরসতা। নিজের অতীতের দিকে চেয়ে দেখলে দেখতে পাই কত প্রতিহত আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র বেদনা। বুঝতে পারি চাইবার প্রবল শক্তিতে প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করেছে— আত্মসৃষ্টির মধ্যে এই অভিজ্ঞতার আগুন একটা প্রধান উপকরণ। তোমার প্রাণের বীণায় তোমার ভাগ্য যদি মীড় দিয়ে থাকে কঠিন টানে, তাতে সমগ্র রাগিণীকেই পূর্ণতা দিয়েছে। আসলে ভাগ্যহীন সে-ই ভাগ্য যাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্রয় দিয়ে অসম্মান করে। তারা অদৃষ্টের পুতুলনাচের পুতুল, যেমন সব আমাদের রাজাবাহাদুরের দল। আমি তো জানি কতবার আমি প্রাণান্তিক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু সেই আমার সৌভাগ্য। বিধাতা আমাকে অনেক দিয়েছেন কিন্তু আদর দেন নি ইতি ২০।১২।৩৮

দাদা

২৪৯

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুই একদিনের জন্যে শরীরটা বিগড়িয়ে ছিল সেই খবরটা অতিকৃত হয়ে খবরের কাগজে প্রচারিত হয়েছিল। এখন ভাল আছি। কিন্তু কলকাতায় যাবার মতো অবস্থা নয়। বসন্তকাল এইখানেই কাটবে— গাছপালার মধ্যে সেই অভ্যর্থনারই আয়োজন চলচে। ইতি ৪।২।৩৯

দাদা

২৫০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে ভয় কোরো না। মানুষের মনের সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি আছে। আমি নির্মমভাবে অবিচার করতে পারি নে। ভালোমন্দ নিয়ে সমাজে অনেক কৃত্রিম বুলির চলন আছে আমার কাছে তার মূল্য নেই। যা সত্য আমি তাকে স্বীকার করি।

দাদা

২৫১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু কাল থেকে হাটে হাটে তোমার সাঁওতালি সাজের অলঙ্কার খোঁজাখুজি করচি— এখনো ফল পাই নি। ৭ই পৌষের মেলার সময় এই গয়নার আমদানি হয়। যাই হোক সন্ধান ছাড়ি নি।— বসন্ত উৎসব কাছে এসেছে— তাই নিয়ে সুরতরঙ্গে খেয়া দিতে হচ্চে— কাজটা ভালো লাগে বলে অবকাশ খোওয়ানোর অভিযোগে নালিশ করচি নে।

আমাকে উড়িষ্যার বর্তমান শাসন দরবার নিমন্ত্রণ করেছে। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তদুপলক্ষ্যে পুরীতে যাব স্থির হয়েছে।

দাদা

২৫২

২৩ মার্চ ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার ধারাবাহিক ব্যস্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তির ভার বেড়েই চলেছে। আগামী ১লা এপ্রেলে যাব কলকাতায়। থাকব দু চার দিন— হয় তো তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। ইতি ২৩৷৩৷৩৯

দাদা

২৫৩

২৭ এপ্রিল ১৯৩৯

ওঁ পুরী

কল্যাণীয়াসু

জ্বর নিয়ে এসেছিলুম তার আক্রমণ ছেড়েছে। কিন্তু অকর্মণ্য হয়ে পড়ে আছি কেদারায়, দেখচি ঢেউয়ের লুটোপুটি, শুনচি তার কলধ্বনি, প্রবল হাওয়া দিন রাত্রিকে দিচ্চে নাড়া। মাঝে মাঝে ঘুমের আবেশ দেহটার উপরে গড়িয়ে যাচ্চে। কর্তব্যের দিগন্তসীমা বহুদূরে ফিকে হয়ে দেখা যাচ্চে। এখান থেকে নড়ব কবে জানি নে। ২৭।৪।৩৯

দাদা

২৫৪

১৮ মে ১৯৩৯

Mungpoo
Darjeeling
C/o Dr M. Sen

কল্যাণীয়াসু

তোমার পীড়িত কল্পনা তোমাকে বহুল পরিমাণে অনাবশ্যক কষ্ট দেয়। তোমার সম্বন্ধে আমি যদি উদাসীন হতে পারতুম তাহলে আমি তোমার এই বেদনাকে উপেক্ষা করতুম— কিন্তু জানি আমার সংসর্গে এসে তোমার জীবনের পুরাতন আশ্রয়

বিচলিত হয়ে গেছে তাতেই তোমাকে দোলায়িত করে দুঃখ দিচ্চে। তোমার সংস্কার তোমাকে আঁকড়ে আছে অথচ তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারচে না। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিকে অন্ধ করে রাখায় শ্রেয় নেই। বুদ্ধি যিনি দিয়েছেন তাঁকে অমান্য করলেই তবে ধর্মপালন সম্ভব হবে এমন বিশ্বাস মনুষ্যোচিত নয়। তাই তোমার দ্বিধান্দোলিত মনের পীড়ায় দুঃখ বোধ করি কিন্তু পরিতাপ করি নে। অন্যান্য অনেক মেয়ের মতো তোমার চরিত্রে মূঢ়তাই যদি মুখ্য হোত তাহলে তারি গর্তে চোখ বুজে থেকে সংশয়ের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে— কিন্তু তোমার দীর্ঘকালের অন্ধ অভ্যাস সত্ত্বেও ধর্মমূঢ়তা তোমাকে অভিভূত করতে পারে নি এই দেখেই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আমার চিন্তা থেকে তোমাকে দূরে রাখতে পারি নি। পৃথিবীতে অনেক লোকেরই সংস্রবে আসতে হয় কিন্তু যথার্থ পরিচয় হয় অল্প লোকেরই সঙ্গে। তুমি এসেছ আমার পরিচয়মণ্ডলের মধ্যে— তাতে তুমি সুখ না পেতে পারো কিন্তু সে তোমার আত্মসম্মানের কারণ হয়েছে।— আমার শরীর পাহাড়ে এসে ভালোই হয়েছে। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

দাদা

২৫৫

২৯ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ত এবং ক্লান্ত আছি। মাঝে কলকাতায় যাবার সম্ভাবনা ঘটেছিল কিন্তু ফাঁড়া কেটে গেল। শীঘ্র যাবার আশঙ্কা নেই। বর্ষামঙ্গলের তালিম দিতে হচ্চে— তাছাড়া ডাকঘরের রিহর্সল। আজ শ্রাবণের দিন ঘন মেঘে অন্ধকার— সকাল থেকে নিরন্তর বৃষ্টি পড়চে— কোনো কাজের দায়িত্ব না থাক্‌লে এই রকম দিন অত্যন্ত মনোরম। ইতি ২৯।৭।৩৯

দাদা

২৫৬

২ অগস্ট্‌ ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার ফলের অর্ঘ্য পেয়ে ভোগে লাগিয়েছি।

আকাশে শ্রাবণের ধারা অবারিত— এখানকার ডাঙা জমি পর্যন্ত জলে থৈ থৈ করচে— পুকুরের মাছ পালিয়েছে ধানের ক্ষেতে, সেখানেও মানুষের হাতে কৈ মাগুর মাছের নিষ্কৃতি নেই। জোর হাওয়া দিয়েছে। গাছে গাছে মহা দোলাদুলি— কোপাই নদী দুই তীর ডুবিয়ে দিয়ে খরধারায় ছুটে চলেচে।

বর্ষামঙ্গল অভ্যাসের পালা চলেচে। তুই একটা করে নতুন গানের সৃষ্টি এগোচ্ছে।

কলকাতায় হয় তো ২০শে নাগাদ একবার যেতে বাধ্য হব। এখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না। ইতি ২।৮।৩৯

দাদা

২৫৭

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার রচনাবলী আমি প্রকাশ করচি নে। বিশ্বভারতীর প্রকাশকসংঘ এর উদ্যোক্তা, সম্পূর্ণ এর কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে। এই বই যদি তুমি রাখ্‌তে ইচ্ছা করো রেখো— রাখবার পক্ষে যদি তোমার মনে কোনো দ্বিধা থাকে আমি তা জানতেও পারব না। ইতি ৪।৯।৩৯

দাদা

২৫৮

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সাহিত্যের ছেলেখেলার সময় উত্তীর্ণ হলে সেটাকে চিরস্মরণীয় করে রাখা শোভন নয়, যেমন শোভন হবে না বিশ

পঁচিশ বছর বয়সে তোমার নাচনের চোখের কাজল আর পায়ের ঘুঙুর লোপ করে না দেওয়া। বয়স হোলে ছেলেবেলা নেপথ্যে পড়ে যায় এইটেই নিয়ম— খোকার পরিচয়ে বয়স্ককে লাঞ্ছিত করা তার প্রতি সদ্ব্যবহার নয়। তুমি যাকে আদি রচনা বলো তার পিছনেও আদি আছে যেমন

কয়ে আকার কা
খয়ে আকার খা
গয়ে ইকার গি
ঘয়ে ইকার ঘি

এর ছন্দ ঠিক আছে অর্থেও দোষ হয় নি— কিন্তু এর প্রতিভাবান লেখক শিশুকে সাহিত্যসভায় কলরব করতে দেখলে মা সরস্বতীরও নারীহৃদয় বিগলিত হবে না, আমি তো এই রকম অনুমান করি। ইতি ৯।৯।৩৯

দাদা

২৫৯

২৪ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। এখানকার দিন এখন মেঘাচ্ছন্ন কুহেলিকাবগুণ্ঠিত নিবিড় শীতে আড়ষ্টপ্রায়। অসূর্যম্পশ্য হয়ে নিষ্কর্মা বসে আছি। ইতি ২৪।১০।৩৯

দাদা

২৬০

[? ডিসেম্বর ১৯৩৯]

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

জ্বরে পড়েছিলুম সেরে উঠেছি।

তোমার লেখার যে অংশ আমাকে পাঠিয়েছিলে তা প্রধানত বর্ণনা। তার মধ্যে আখ্যানের ঠিক আরম্ভ হয় নি। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে কোনো ব্যক্তি কিম্বা কোনো শ্রেণী আঘাত পেতে পারে।

আমাকে মেদিনীপুরে অপহরণ করে নিয়ে যাবার চক্রান্ত হচ্ছে সে জন্যে চিন্তিত আছি। টানাটানি সহ্য করার যোগ্য বয়স পেরিয়ে গেছি— কিন্তু দোহাই পেড়ে লাভ নেই। ইতি

দাদা

২৬১

১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ততায় জীর্ণতায় মিলে আমার সমস্ত অবকাশ অবরুদ্ধ করে রেখেছে— উদ্‌বৃত্ত সময়ের ছোটো বড়ো কাজগুলি সব স্থগিদ আছে। কর্তব্যের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। সাধারণ-ভাবে স্বাস্থ্যের কোনো হানি হয় নি কিন্তু বার্দ্ধক্যের ভার

নিয়তই বহন করতে হয় এই অবস্থায় আমার প্রধান আশ্রয় ঘরের কোণ ও পা ছড়ানো কেদারা, এবং যথাসম্ভব নৈষ্কর্ম্য আমাকে একটু নড়ালেই বোঝা যায় আমার রথের স্প্রিঙ ভাঙা। ইতি ১ মাঘ ১৩৪৬

দাদা

২৬২

১৫ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যে ক্লান্তি ও কর্মজালে জড়িত হয়ে আছি সেটা স্থায়ী হয়েই রইল এর মধ্যে কোনো পরিবর্তনের বৈচিত্র্য আশা করতে পারিনে। পা চলেছে অন্তিমের ঢালু রাস্তায় সমস্তটাই গড়ানে।

প্রমথর অনুরোধ রক্ষা করতে পারো যদি ভালোই হবে— গল্প একটা লিখো— কিন্তু ময়মনসিংহের যে ভাষার নমুনা দিয়েছ সে ভাষা অবলম্বন করলে সাংঘাতিক হবে। তোমার যে গদ্‌গদ-ভাষী প্রণয়ীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে বিরহাবস্থায় আছো তাকে তোমার গল্পের প্রধান নায়ক করলে লেখা সরস ও করুণ হতে পারবে। ইতি ১৫।৩।৪০

দাদা

২৬৩

২১ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার চোখের অবস্থা এখন এমন যে তোমার গল্পটি তুমি যে লিপিতে লিখেছ সে পড়ে ওঠা আমায় পক্ষে অসাধ্য না হোক্ দুঃসাধ্য বটেই। তবু আধা অন্ধের মতো হাৎড়ে হাৎড়ে যতটা পড়েছি তাতে বুঝতে পারলুম যে রকম লেখায় তোমার সহজ দক্ষতা আছে এই গল্পে সেটা প্রকাশ পেয়েছে, ভালোই হবে।

ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট অসুস্থ হয়েছিলুম, তবু কাজ চালিয়ে চলেছি, কাউকে জানতে দিই নে কলমটা ধুঁকচে। ইতি ২১।৩।৪০

দাদা

২৬৪

১০ মে ১৯৪১

কল্যাণীয়াসু।

জরার প্রান্তসীমায় আমি আজ শয্যাগত। তোমরা যে অর্ঘ্য আজ আমাকে পাঠিয়েছ মুখে উপযুক্ত সমাদর প্রকাশ করতে পারলেম না। আনন্দ অন্তরে অব্যক্ত রইল। নিশ্চিত জানি তোমার কাছে তা অগোচর থাকবে না। তুমি আমার আশীর্বাদপূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করো। ইতি ১০।৫।৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লিখিত

পত্রসংখ্যা ১২

১৩ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে দেখ্‌তে চাও তার তো কোনো বাধা নেই— এক বাধা আমি প্রায়ই কলকাতায় থাকি নে— কখন যাব তাও নিশ্চিত বলতে পারি নে। তা হোক্ কলকাতায় গেলে হয় ত খবর পাবে— তখন অসঙ্কোচে আমার কাছে এসো। ইতি ২৭ কার্ত্তিক ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২৩ জুন ১৯৩২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ক্লান্তির বেড়া দেওয়া কাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। একটু ফাঁক পাচ্চি নে। যদি পেতুম তাহলে আর কিছু না হোক,

এখানকার আকাশের সঙ্গে আর প্রান্তরের যে দিগন্তে দিগন্তে শ্যামল সরসতার সম্ভাষণ চল্‌চে সেই দিকে মন দিতে পারতুম। সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তোমার তীর্থদর্শন সার্থক হোক। একদিন ঐ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে পুরীর বেলাতটে লিখেছিলুম "হে আদিজননী সিন্ধু।" তখন বয়স অল্প ছিল। তোমার কবিত্ব চলচে তোমার সেতারে। তোমরা ভালো আছ শুনে খুসি হলুম। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৯ আষাঢ় ১৩৩৯

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৩০ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ খড়দহ

কল্যাণীয়েষু

তোমার তোলা ফোটোগ্রাফটি ভালোই হয়েছে। সই করে দিলেম।

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১৩ কার্ত্তিক ১৩৩৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১৩ মে ১৯৩৩

ওঁ Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

একটা কথা তোমাকে বলি, যেখানে আমার চরিত্রের সীমা তাকে অতিক্রম করে আমাকে যদি বাড়িয়ে দেখো তাতে ফল পাবে না। দুধে জল ঢেলে তার পরিমাণ বাড়িয়ে তুল্‌লে যে তার থেকে পুষ্টি বেশি পাওয়া যায় তা নয়। আমার যা কিছু পরিচয় তা নিঃশেষ হয়েছে আমার লেখায়। তার চেয়ে বেশি কিছু খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাদের দেশে প্রায় দেখ্‌তে পাই আমাদের একান্ত ইচ্ছার তাগিদে আমরা মানুষকে বাড়িয়ে বানিয়ে তুলি। আমাদের দেশে অনেক গুরুর উদ্ভব এই তাড়নায়। একান্ত প্রয়োজন বোধ করি বলেই চোখ বুজে নিজেকে ঠকাই। কোনোমতে একজন কাউকে আশ্রয় করতে পারলে বেঁচে যাই এই জন্যে বাংলাদেশে গুরুর বাজারদর এত বেশি বেড়ে গেছে।

আমি মানুষটা স্বভাবতই একা। নিজে নিজে চিন্তা করি, চেষ্টা করি, লেখায় প্রকাশ করি কিন্তু কাউকে চালনা করতে পারি নে। ছেলেবেলা থেকে সমাজ থেকে দূরস্থ বাড়িতে বাস করে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার আমার পক্ষে যথেষ্ট সহজ হয় নি। লোকে মনে করে সে আমার অহঙ্কার। কিন্তু আমার উপায় নেই।

যদি নিজগুণে তুমি আমার কাছে আস্‌তে পার, তবে আমার যতটুকু দেবার আছে সে হয় তো দিতে পারি। জানি নে সে তোমার প্রয়োজনের পক্ষে ঠিক জিনিষ কিম্বা যথেষ্ট কিনা। কিন্তু অগ্রসর হয়ে কিছু দিতে পারি এমন শক্তিই আমার নেই। আমার উপর নির্ভর কোরো না, আমি তোমার অগ্রবর্ত্তী নই, আমি তোমাদের সমান পথের পথিক।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি
৩০ বৈশাখ ১৩৪০

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[শান্তিনিকেতন] ১২ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম— আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। কলকাতার আবর্ত্ত থেকে দূরে গিয়ে নিশ্চয় শান্তিতে আছ। আমাদের এখানে অনেক কাল পরে এতদিনে শরতের প্রসন্ন শ্রী প্রকাশ পেয়েছে। বাতাসে শিশিরের আভাস এবং আলোতে কাঁচা সোনার রঙ লেগেচে। মেঘের দল আকাশে ঘোরাফেরা করে কিন্তু শ্রাবণের কালো উর্দ্দি খুলে ফেলেছে— দিগন্তের ধারে

ধারে জড় হয়ে অলসভাবে রোদ পোয়াচ্চে। ওদের এই নৈষ্কর্ম্ম্যে যোগ দিতে ইচ্ছে করে— ছুটি মঞ্জুর হয় না।

আমার ঘরের প্রাঙ্গণে শিউলি মালতী এবং চামেলির উৎসব জমে উঠেছে— এখানে যেন শাদা আবিরের হোলি খেলা। এখনো পথের ধারে ও প্রান্তরে কাশগুচ্ছ দেখা দেয় নি— অকাল বর্ষার আড়ম্বরে চিনতে পারে নি তাদের সময় এসেছে।

এণ্ড্রুজ সাহেব এসেচেন—চিঠি বন্ধ করি। ইতি ১২ অক্টোবর ১৯৩৩

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২১ মে ১৯৩৪

ওঁ

পানাদৌরা
সিংহল

কল্যাণীয়েষু

রবীন্দ্রজয়ন্তীর বিবরণ পেলুম। আমার পরে তোমাদের শ্রদ্ধা অকৃত্রিম, তার পরিচয় পেলে খুসি না হয়ে থাকতে পারি নে, কিন্তু মনে মনে, এই রকম প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে, আমি সঙ্কোচ বোধ করি। বোধ হয় তার একটা কারণ, আমি স্বভাবত আনুষ্ঠানিক নই, আমি আপনার মধ্যে অত্যন্ত একলা। ছেলেবেলা আমি সঙ্গ পাই নি, সেই অভ্যাস আমার মর্ম্মগত হয়ে

গেছে, সেই জন্যে আমি স্বয়ং সশরীরে অনুপস্থিত থাকলেও আমাকে কোনো উপলক্ষ্যে জনতার মধ্যে আলোচনার বিষয় করলে কুণ্ঠিত হই। বোধ হয় আর একটা কারণ এই যে এ রকম অনুষ্ঠানকে অনেকখানি অবাস্তব দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। আমাকে শ্রদ্ধা যাঁরা করেন তাদের সংখ্যা পরিমিত, যাঁরা করেন না বহুল পরিমাণে তাঁদের দিয়ে সভা ভরাট করতে না পারলে আসর জমে না।

বয়স আমার ৭৩ পেরোলো। এত দিন ধরে বাহির থেকে নিজের সম্বন্ধে ভালো মন্দ অনেক শুনেচি— নিজের মধ্যেও ভালো মন্দর দ্বন্দ্ব যথেষ্ট আছে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন স্বভাবতই নিজের সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য ছিল, এখন ক্লান্তি এসেচে, এখন নিজেকে নিয়ে তোলাপাড়া করতে আর ভালো লাগে না— এখন চুপচাপ করে ছায়ালোকখচিত তরুবীথিকায় মৃণ্ময়ী পৃথিবীর আতিথ্য ভোগ করতে ইচ্ছে করে। আমি কবি কি অকবি ভালোলোক কি মন্দলোক কী হবে সেই বিচার বিতর্কের উত্তেজনায়— নানা ভুলের মধ্যে ভালোর মধ্যে দিয়ে আমার কাজ তো শেষ করেছি— এখন চল্‌লুম নেপথ্যে— হাততালির শব্দটা অনাবশ্যক বোধ হয়। কর্ম্মের শেষ দণ্ড পুরস্কার দেবে ভাবীকাল, তখন তো উপস্থিত থাকবো না— তার পূর্ব্বে থেকেই যত দূর সম্ভব নিরাসক্ত হতে পারাই ভালো। আমার কাজের মধ্যে যেটুকু অংশ মহাকাল দক্ষিণ হাতে তুলে নেবেন সে তাঁরি মর্‌জি, তা নিয়ে আমার আর কোনো কর্ত্তব্য নেই, ভিড়ের লোকের নিন্দা প্রশংসারই বা মূল্য কতটুকু? বেঁচে থাক্‌তে যে কয়জনের

কাছ থেকে সত্যকার শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়েছি তাদেরই দান নিলেম বুকে তুলে বাকি থাক্ পড়ে। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ২১ মে ১৯৩৪

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ আডিয়ার
মাদ্রাজ

কল্যাণীয়েষু

আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। মাদ্রাজে এসে অবধি অভিবাদন প্রত্যভিবাদন বক্তৃতা প্রভৃতি চলচে। লোকের ভিড়ে পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। অভিমন্যুর মনের ভাব কতকটা আন্দাজ করতে পারি। অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত এখানকার পালা চল্‌বে। এখন পূজোর ছুটি, কিন্তু আমার ছুটি সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে এই আবর্ত্তের মধ্যে। ইতি ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

৯ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ　　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। তোমার মামা এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে— খুব আসর জমিয়েছিলেন— তাঁর বক্তৃতা সকলের ভালো লেগেছিল।

তুমি আমি উভয়েই যখন কলকাতায় সম্মিলিত হব সেই সুযোগে তোমার সেতার শুনতে পাব এই আশা রইল।

যন্ত্রসঙ্গীত শেখাতে পারে এমন কোনো লোকের সন্ধান তোমার আছে? যন্ত্রের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মাদকের অভ্যাস থাকলে চলবে না।

আমার শরীর প্রায় অচল অবস্থায় আছে। ইতি ২২ আশ্বিন ১৩৪২

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

২৬ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমরা উভয়ে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো, বাসন্তীকেও জানিয়ো।

শরীর অত্যন্ত উৎপীড়িত হওয়াতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি। নানা লোকের নানাবিধ দাবী আমাকে আক্রমণ করেছিল। তোমার সেতার শোনবার জন্যে সবুর করতে পারলুম না। কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ —ভবিষ্যতের সীমা নেই। ইতি ২৬ অক্টোবর ১৯৩৬

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুশি হলুম। ধর্ম্মের যে দিকটা বিশুদ্ধভাবে আধ্যাত্মিক, সেখানে ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠ। যে দিক প্রাকৃতিক সে দিকে ইতিহাস বা বিজ্ঞানের বিচার চলবেই। যেখানে খৃষ্ট ভক্তের খৃষ্ট সেখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়ান, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নেই— কিন্তু যেখানে জেরুসালেমে তাঁর জন্মকথা কীর্ত্তিত হয়েছে সেখানে তাঁর জন্মবিবরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিচার মানব, মান্‌লেও তাঁকে খর্ব্ব করা হয় না। বুদ্ধ সম্বন্ধেও সেই একই কথা ; বুদ্ধ যে পূজনীয় তার কারণ এ নয় যে তাঁর ইতিহাস অতিপ্রাকৃত, তার কারণ তাঁর চরিত্রমহিমা অলোকসামান্য। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী মহীয়সী, ইতিহাস যদি বলে ব্যাধের হাতে তাঁর

মৃত্যু হয়েছিল তাতে কিছু আসে যায় না। আধ্যাত্মিক গৌরব আত্মায়, আধিদৈহিকে নয়। খৃষ্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন বিজ্ঞান এ কথা অস্বীকার করলেই যদি ভক্তের ভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় তবে সে ভক্তি ছেলেমানুষী। আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভক্তেরা ভগবানের অবতার বলে ধরে নিয়েছেন, তাই বলে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুঘটনা এবং তাঁর প্রতিদিনের দেহযাত্রায় অলৌকিকত্ব আরোপ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ভক্তের আবদার রক্ষা করতে বা বিপদ থেকে রক্ষা করতে হঠাৎ বারো ঘণ্টার দিনকে আঠারো ঘণ্টা করেছেন বা করতে পারেন বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে ঈশ্বরকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয় না। ছেলে ভুলিয়ে যে সব ভক্তের ভক্তি উদ্রেক করতে হয় তাদের ভক্তির কোনো মূল্য নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে মান্‌লে ভক্তিকে খর্ব্ব করা হয় না তার কারণ এই যে সেখানে বিজ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রকাশ— সর্বশক্তিমান আপনার প্রকাশের আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন না, যেমন আত্মহত্যা করা তাঁর সাধ্যের অতীত। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যাথার্থ্য মানা তাঁরই যাথার্থ্য মানার অঙ্গ— বিজ্ঞানবিরোধিতা নাস্তিকতা, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক— বিজ্ঞানেই তাঁর লীলা, অবৈজ্ঞানিক ছেলেমানুষীতে নয়। ইতি

৮ পৌষ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হলুম। ধর্মের যে দিকটা বিশুদ্ধভাবে আধ্যাত্মিক, সেখানে ধর্ম স্বপ্রতিষ্ঠ। যে দিক প্রাকৃতিক সেদিকে ইতিহাস বা বিজ্ঞানের বিচার চলবেই। যেখানে খৃষ্ট ভক্তের খৃষ্ট সেখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়ান, [illegible] বিজ্ঞানের অধিকার নেই — কিন্তু যেখানে জেরুসালেমে তাঁর জন্মকথা কীর্তিত হয়েছে সেখানে তাঁর জন্মবিবরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিচার মানব, মানলেও তাঁকে খর্ব করা হয় না। বুদ্ধ সম্বন্ধেও সেই একই কথা; বুদ্ধ যে পূজনীয় তার কারণ এ নয় যে তাঁর ইতিহাস অতিপ্রাকৃত, তার বিজ্ঞান বিরোধিতা নাস্তিকতা, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক — বিজ্ঞানেই তাঁর লীলা, অতিপ্রাকৃত ছেলেমানুষীতে নয়। ইতি ৮ পৌষ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কারণ তাঁর চরিত্র মহিমা অলোক সামান্য। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী মহীয়সী, ইতিহাস যদি বলে ব্যাধের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তাতে কিছু আসে যায় না। আধ্যাত্মিক গৌরব অম্লান, আধিদৈহিক নয়। যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন বিজ্ঞান এ কথা অস্বীকার করলেই যদি ভক্তের ভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় তবে সে ভক্তি ছেলেমানুষী। আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভক্তেরা ভগবানের অবতার বলে ধরে নিয়েছেন, তাই বলে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ঘটনা এবং তাঁর প্রতিদিনের দেহযাত্রায় অলৌকিকত্ব আরোপ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করতে বা বিপদ থেকে রক্ষা করতে হঠাৎ বারো ঘণ্টার দিনকে আঠারো ঘণ্টার করেছেন বা করতে পারেন বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে ঈশ্বরকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয় না। ছেলে ভুলিয়ে যে সব ভক্তের ভক্তি উদ্রেক করতে হয়, তাদের ভক্তির কোনো মূল্য নেই। বিজ্ঞানের যোগে বিশ্বাত্মাকে মানলে ভক্তিকে খর্ব করা হয় না তার কারণ এই যে সেখানে বিজ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রকাশ — সর্বশক্তিমান আপনার প্রকাশের একেবারে প্রতিবাদ করতে পারেন না, যেমন আত্মহত্যা করা তাঁর সাধ্যের অতীত। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যাথার্থ্য মানা তাঁরই যাথার্থ্য মানার অঙ্গ —

১১

৩০ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত অসময়ে এসেছিলে। কেবল যে আঘাটায় উত্তীর্ণ হয়েছিলে বলেই সেটা পরিতাপের বিষয় হয়েছিল তা নয়। দেশের যত সব পোলিটিকাল জনতার আবর্জনা স্তূপাকার হয়ে জমেছিল— শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাদের দরদের কোন যোগ নেই তারা ছুটির কন্‌সেশনের ধূলিআবর্তে এখানকার আকাশ আবিল করে জুটেছিল, শস্তায় কৌতূহল মেটাবার জন্যে।

আজকাল মাঝে মাঝে বৈকালিক দুর্গ্রহ আমার দেহ আশ্রয় করে। সেদিন ঘটল তাই— ব্যাপারটা গুরুতর নয়। রক্তের তাপ একশোর প্রান্তে এসে উঁকি মেরে যায় কিন্তু দুর্বলতা চাপিয়ে রাখে। এই সব উপদ্রবে কাজে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ধরে যায়। তাই ভাবচি পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান চুকিয়ে দিয়ে গিরিরাজের আশ্রয় নেব।

তোমাদের সঙ্গে একটা কথা নিষ্পত্তি করে নিতে চাই— কোনো একটা শান্ত সময়ে শান্তিনিকেতনের পরিচয় নিয়ে যেয়ো।

ইতিমধ্যে একজন মুসলমান অতিথি এখানে এসেছিলেন তিনি এখানকার সম্বন্ধে তন্ন তন্ন আলোচনা করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন। পড়ে খুশি হয়েছি। কখন তিনি এমন সর্বাঙ্গীণ পরিচয় নেবার অবকাশ পেলেন জানি নে।

তোমরা উভয়ে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি
৩০।৩।৪০

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[১০ মে ১৯৪০]

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

শরীর ক্লান্ত, মন ক্লিষ্ট। তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১৭ [২৭] বৈশাখ ১৩৪৭

স্নেহাবদ্ধ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী বাসন্তীদেবীকে ও
শ্রীনিখিলচন্দ্র বাগচীকে লিখিত

পত্রসংখ্যা ৩২ ও ১

২৭ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়া বাসন্তী

"জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি গো জানি তাও হয় নি হারা"—

গানটি আমার তাতে সন্দেহ নেই। এর স্বরলিপি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে এখান থেকে নিশ্চিত বল্‌তে পারচি নে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে সন্ধান করে তোমাকে জানাব। আমি সুর রচনা করি, সুর ভুলি, স্বরলিপি করতে জানি নে। আমার জীবনে যত সুর বেঁধেচি তার অনেকগুলিই হয়েচে হারা— যারা শিখেচে এবং লিখেচে, আমার প্রয়োজন ঘটলে তাদের কাছ থেকেই আমার নিজের গান পুনরায় সংগ্রহ করে নিতে হয়। তোমার অনুরোধ শুনে বোধ হচ্চে, স্বরলিপি থেকে তুমি আপন কণ্ঠে গান তুলে নিতে পারো, সকলে ঠিকমতো পারে না। সুরটা পাওয়া যায় কিন্তু লয়টা ঠিক ধরা অনেকের পক্ষে কঠিন।

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১২ আষাঢ় ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৫ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার মা আমাকে দাদা বলেন অতএব তুমি যদি মামা বলো তাহলে অসঙ্গত হবে না। একদা তোমার বয়সী একটি বালিকা আমার পিতৃদত্ত নাম বদলিয়ে দিয়ে নূতন নামকরণ করেছিল কিন্তু আমি যদিও খ্যাতনামা হবার উপদ্রব সহ্য করতে বাধ্য হয়েচি তবু বহুনামা হবার ইচ্ছে করি নে। তথাপি বিশেষ কোনো ডাকনাম তুমি যদি নিজে পছন্দ করে নিতে পারো আমি বিনা আপত্তিতে সেটা স্বীকার করে নেব— কিন্তু শ্রুতিকটু হয় না যেন। যে নাম নিয়ে সংসারযাত্রা সুরু করেছিলেম ধরাতলে সেটা একমাত্র আমারি ছিল, আজ ও নামটা অত্যন্ত সুলভ হয়ে গেছে— নামধারীরাও সকলেই যে স্বনামধন্য হয়েছেন তা নয়। সেই জন্য আমার আকাশের মিতার অনুসরণ করে রবিঠাকুর নামটা স্বীকার করে নিয়েছি, আমার স্পর্দ্ধা দেখে আকাশের রবিঠাকুর প্রচুর হাস্য করেন কিন্তু তাতে প্রসন্নতার অভাব লক্ষিত হয় না। আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। চিঠি লিখতে পারেন না বলে তোমার মা যেন কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা বোধ না করেন। সাধনের পথ সম্বন্ধে আমি অনেক কথা ভেবেছি এবং নিজের মনে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করেচি। কিন্তু তোমার মা যে পথ আশ্রয় করে শান্তি ও আনন্দ পান তার থেকে তাঁকে বিচলিত করার ইচ্ছা আমার মনেও হয় না। সত্যকে যে ভাবে স্বীকার করে নিয়েচেন সেটাতে তাঁর স্বভাবের সম্মতি আছে; তার থেকে স্খলনে তাঁর অপরাধ আছে বলে আশঙ্কা করেন। অতএব সত্যকে সেই বিশেষ সীমার মধ্যেই তিনি গ্রহণ করুন, তার বাইরে আসতে গেলে হয় তো তাঁর ক্ষতি হতে পারে। যে কোনো দিকেই মানবচিত্তের উৎকর্ষ, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, সব দিকেই আমাদের মন্দিরের দ্বার; সব দিক দিয়েই আমাদের অর্ঘ্য পৌঁছিয়ে দিতে হবে, নইলে আমাদের মানবাত্মার যিনি অধীশ্বর তাঁকে বঞ্চিত করা হবে— সুতরাং সেই সাধনার সঙ্কীর্ণতায় নিজেরাই দুর্গতিগ্রস্ত হব। জ্ঞানকে যদি খর্ব্ব করি, কর্ম্মকে যদি পঙ্গু করি, তবে একমাত্র ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলে আমাদের পরিত্রাণ নেই এ কথা আমি নিশ্চিত জেনেচি, সুতরাং এ কথা আমাকে জানাতেও হবে— কিন্তু গুরু হয়ে উঠে কাউকে মানাতেই হবে এমন আমার স্বভাব নয়। এক এক সময়ে আমার মনে হয় যে আমি পুরুষ বলেই এই সমগ্রমানবচিত্তের

সম্পূর্ণ পূজাকেই সত্য বলে সহজে উপলব্ধি করি। হৃদয়বৃত্তিই মেয়েদের স্বভাবে একান্ত প্রবল, এই জন্যে যে সাধনায় আর সমস্তকেই তিরস্কৃত করে একমাত্র ভক্তিবৃত্তিরই পরিতৃপ্তিকে বড়ো করে তোলা হয় মেয়েদের পক্ষে সেটাই হয় তো সহজ। তাই ভাবি মেয়েদের পূজা আরাধনায় ভক্তি ছাড়া মানবপ্রকৃতির অন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্যই যদি বর্জ্জিত হয় তবে সেটা অগত্যা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া হয়ত উপায় নেই। কিন্তু মানুষের এই সব ঐশ্বর্য্য কার দেওয়া? যিনি দিয়েচেন তাঁর কাছেও কি এর আদর নেই? আমাদের দেশে পূজায় বিদেশী ফুল অব্যবহার্য্য, কিন্তু সে ফুল ফুটিয়েছেন কে? ভক্তরা যদি তাকে অবমাননা করে তবে সেটা পৌঁছয় কোথা? ঠাকুরকে আমরা যে অলঙ্কার দিই তার রত্নগুলি ঠাকুরেরই সৃষ্টি; আমাদের পূজা তাঁকে ভূষণ পরায়,— সেই ভূষণের রত্নগুলি আমাদের মনে, সে তো একটি রত্ন নয়। যত রত্ন সাজাতে পারব ভূষণের মূল্য ত ততই বেশি হবে— অর্থাৎ পূজার ষোড়শোপচার ত ততই পূর্ণ হবে। রামচন্দ্রের পূজায় একশো পদ্ম থেকে একটি পদ্ম কম পড়েছিল বলে বিপত্তি ঘটেছিল। মানবপ্রকৃতিতেও একশো পদ্মই আছে, সবগুলিই পূজায় লাগে। কে বলবে তার নিরেনব্বইটাকে বাদ দিলেই ভগবানকে খুসি করা হবে? তবে তিনি এত অপব্যয়ের আয়োজন করেচেন কেন?— চিঠি লেখার সময় করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয় সেই জন্যে বলে রাখচি চিঠি লিখ্‌তে পারি বা না পারি তোমার জন্য আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩৩৮

মামা

ওঁ

৩

কল্যাণীয়েষু

বৎস, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। চিঠি লিখতে আরম্ভ না হলে তোমার মা বেশ কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা বোধ না করবে। সাধনের পথ সম্বন্ধে আমি অনেক কথা ভেবেছি এবং নিজের মতে নিজের কর্তব্য স্থির করেছি। কিন্তু তোমার মা যে পথ আশ্রয় করে শান্তি ও আনন্দ পান তার থেকে তাঁকে বিচলিত করবার ইচ্ছা আমার মনেও হয় না। সত্যকে যে ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন সেইখানে তাঁর স্বভাবের সম্মতি আছে; তার থেকে স্খলনে তাঁর অকল্যাণ আছে বলে আশঙ্কা করব। অতএব সত্যকে সেই বিশেষ সীমার মধ্যেই তিনি গ্রহণ করুন, তার বাইরে আসতে গেলে হয়তো তাঁর ক্ষতি হতে পারে। যে কোনো দিকেই মানবচিত্তের উৎকর্ষ, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, সব দিকেই আমাদের সাধনার দ্বার; সব দিক দিয়েই আমাদের অর্ঘ্য পৌঁছিয়ে দিতে হবে, নইলে আমাদের মানবাত্মার নিত্য অধীশ্বর তাঁকে খণ্ডিত করা হবে — সুতরাং সেই সাধনার সংকীর্ণতায় নিজেরাই দুর্গতিগ্রস্ত হব। জ্ঞানকে যদি খর্ব করি, কর্মকে যদি পঙ্গু করি, তবে একমাত্র ভক্তিকে আঁকড়ে ধরে আমাদের পরিত্রাণ নেই এ কথা আমি নিশ্চিত জেনেছি, সুতরাং এ কথা আমাকে বলতেও হবে — কিন্তু তুমি হয়ে উঠে সকলকে মানাতেই হবে এমন আমার স্বভাব নয়। এক এক সময়ে আমার মনে হয় যে আমি

পুরুষ বলেই এই সমস্ত মানবচিত্তের সম্পূর্ণ পূজাকেই সত্য বলে সহজে উপলব্ধি করি। হৃদয়বৃত্তিই মেয়েদের স্বভাবে একান্ত প্রবল, এই জন্যে যে সাধনায় আর সমস্তকেই তিরস্কৃত করে একমাত্র ভক্তিবৃত্তিরই পরিতৃপ্তিকে বড়ো করে তোলা হয় মেয়েদের পক্ষে সেইটেই হয়তো সহজ। তাই ভাবি মেয়েদের পূজা সাধনায় ভক্তি ছাড়া মানবপ্রকৃতির অন্য সমস্ত ঐশ্বর্য যদি লাঞ্ছিত হয় তবে সেটা অগত্যা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া হয়তো উপায় নেই। কিন্তু মানুষের এই সব ঐশ্বর্য কার দেওয়া? যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছেও কি এর আদর নেই? আমাদের দেশে পূজায় বিদেশী ফুল অব্যবহার্য, কিন্তু সে ফুল ফুটিয়েছেন কে? ভক্তরা যদি তাকে অবমাননা করে তবে সেটার দৈন্য কোথায়? ঠাকুরকে আমরা যে অলংকার দিই তার উপকরণ ঠাকুরেরই সৃষ্টি; আমাদের পূজা তাঁকে ভূষণ পরায় — সেই ভূষণের রত্নগুলি আমাদের মনে, সে তো একটি রত্ন নয়। যত রত্ন সংগ্রহ করতে পারব ভূষণের মূল্যও ততই বেশি হবে — অর্থাৎ পূজার ষোড়শোপচারও ততই পূর্ণ হবে। রামচন্দ্রের পূজায় একশো পদ্ম থেকে একটি পদ্ম কম পড়েছিল বলে বিপত্তি ঘটেছিল। মানবপ্রকৃতিতেও একশো পদ্মই আছে, সবগুলিই পূজায় লাগে। কে বলবে তার বিবেকবুদ্ধিটাকে বাদ দিলেই ভগবানকে খুসি করা হবে? তবে তিনি এত ঐশ্বর্যের আয়োজন করেছেন কেন? — চিঠি লেখবার সময় করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়, সেই জন্যে বলে রাখছি চিঠি লিখতে পারি বা না পারি তোমার জন্যে আশীর্বাদ রইল। ইতি ১৬ [illegible] ১৩৩৮

দাদা

৪

১১ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, শরীর যে ভালো আছে এমন কথা বল্‌তে পারি নে। অথচ কাজকর্ম্ম করতে হয়। শরীরের উপর জবরদস্তি করেই করি। সময়ও পাইনে বিশ্রামও পাই না। তাই স্থির করেচি দার্জ্জিলিং যাব। সেখানে আমার বৌমা আছেন এবং নন্দিনী নামে একটি নাৎনি আছে। তাকে পুপে বলে সবাই ডাকে। তার বয়স দশ। আমাকে গল্প বলিয়ে খুব খাটিয়ে নেয়। কাল তার একখানি চিঠি পেয়েছি— আমাকে ডেকে পাঠিয়েচে। সুতরাং যেতেই হবে। ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮

মামা

৫

১৯ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার মা যে অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে লেখেন সে আমি জানি। তোমার সম্বন্ধে অত্যুক্তিগুলি আমি বাদসাদ দিয়েই নেব। আমার কথাও তিনি কম বানিয়ে তোলেন নি। সে জন্যে মাঝে মাঝে ক্ষমাও চান। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন

নেই— কেননা যাদের সাহিত্যিক ধাত, বানিয়ে বলাই তাদের ব্যবসা— আমিও এ কাজ অনেক করেছি। আমার মুষ্কিল এই, তোমার মায়ের হাতে যত সময় তার এক অংশও আমার নেই, যদি থাকত তাহলে ঐ বানিয়ে তোলবার কাজে তাঁর উপরে আমিও শোধ তুলতুম। হয় তো কোনো এক সময়ে আমারও দিন আসবে।

অসম্ভব রকম ব্যস্ত আছি। তুমি বলেই চিঠি লিখলাম। তোমার মাকে তো কিছুদিনের মতো নিষ্কৃতি জানিয়ে রেখেচি।

তোমার মাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে জানিয়ো, আমার জন্মমুহূর্ত্তটা কি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজন য়ুরোপীয় গণক আমাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে। তোমার মা নাড়ী নক্ষত্রের খোঁজ খবর রাখেন বলেই এই প্রশ্ন।

তোমার মাকে একটা খবর জানিয়ো— আমার এক প্রদৌহিত্রী তাঁর নিজের সৃষ্ট পদ্ধতিমতো চাপড়ঘণ্ট রেঁধে আমাকে খাইয়েচে তার অধিক আর কিছু বল্‌তে ইচ্ছে করি নে। আমার ভোজনস্থানে নিশ্চয় শনির দৃষ্টি পড়েচে। ইতি
৩ পৌষ ১৩৩৮

স্নেহাশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৩১-৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, পিঠে পেয়ে খুসি হলুম। আমার জ্বর কাল থেকে ছেড়েচে। দুর্ব্বলতা দেহের উপর চেপে বসেচে। বোধ হয় পর্শু দিন খড়দহে গঙ্গার ধারের বাগানে যাব। তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি পৌষ ১৩৩৮

মামা

৭

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে তুমি যে দুটি গান পাঠিয়েছ সে দুটোই বড়ো এলোমেলো— তার মধ্যে অর্থসঙ্গতি নেই। তুমি যদি আমার সামনে থাকতে তোমাকে, লাইন ধরে ধরে বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করতুম। পারতে না। হয় তো সুরে শুনতে ভালো লাগে। তেলেনা গানও তো মন্দ লাগে না, অথচ তোম্ তানানানার কোনো মানে নেই।— আমি হয় ত আর দু' তিন দিনের মধ্যেই কলকাতার দিকে যাব। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

মামা

৮

১১ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি হয়ত আমার দেওয়া সেই কলমেই আমাকে লিখেচ। তাহলে আমার লক্ষ্মীছাড়া কলমটা তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেচে, কৃপণতা করেনি— খুসি হলুম। কিন্তু ওর অবস্থাটা কতকটা আমারই মতো— খানিকটা কাজ করতে পারে তার পরেই ওর শক্তি ফুরিয়ে যায়। স্মৃতিচিহ্নরূপে বাক্সতে তুলে রাখবার কাজই ওকে সব চেয়ে মানায়— লেখার চেয়ে বিশ্রাম করার দিকেই ওর ঝোঁক। ওর আরো একটি গুণ আছে, তোমার দাদার কলমের সঙ্গে যদি ভুল করে বদল করো তাতে তোমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই। পরীক্ষা করে দেখতে পার। এখানে এসে চুপচাপ আছি— রবিঠাকুরের পাঁচালি একেবারে বন্ধ। ইতি ২৭ ফাল্গুন ১৩৩৮

মামা

৯

[শান্তিনিকেতন] ২০ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যস্ত তাই তোমাদের চিঠি লিখ্‌তে পারি নে। যেখানে তোমার মন প্রসন্ন থাকে

নিশ্চয়ই সেখানেই তুমি থাকবে— তোমার মা তো একলাই যেতে পারেন। নিজের ইচ্ছের বন্ধনে অন্যকে বাঁধা কিছুতেই ভালো নয়। যেখানে কর্ত্তব্যের দাবী অপরিহার্য্য সেখানকার কথা আলাদা। অনিচ্ছুক সঙ্গিনীকে হরণ করে না নিয়ে গেলে তোমার মা আরো আরামে থাকতে পারবেন।

বিশেষ কারণে আমার পারস্যে যাওয়া আরো এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। কলকাতায় থাকতে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার করকোষ্ঠী দেখতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন অনতিকালের মধ্যে আমার ভ্রমণ আছে কিন্তু যেদিন যাবার কথা তার পরে আরো সময় পিছিয়ে যাবে। তাই ঘটল। কিন্তু তোমার মা যে বর্ষফল তৈরি করিয়েচেন তার মধ্যে ভ্রমণের উল্লেখমাত্র নেই, আর আর যা আছে তাও কিছু মেলে না। তোমার মাকে বোলো তাঁর এক্‌জিমার ওষুধ কেলি সাল্‌ফ্‌ ও নেট্রম ম্যুর, ৬-এর পর্য্যায়ে। Kali Sulf, 6x Natrum Mur 6x। এখানে এসে আমার অনেকগুলি রোগী জুটে গেছে। তা ছাড়া একজন ভদ্রলোক গ্রামোফোনে সুর ধরাবার বিদ্যা য়ুরোপে শিখে এসেছেন। তিনি এখানে এসেছেন আমার কণ্ঠ থেকে কিছু আদায় করবার প্রস্তাব নিয়ে। এই রকম সব নানাবিধ নিত্য ও নৈমিত্তিক কাজ চারদিকে ভিড় করেচে। দোলের সময় বসন্ত-উৎসব হবে সেও একটা দায়। ইতি ৭ চৈত্র ১৩৩৮

মামা

[৩ জুন ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে

শরীরটাকে দূর দূরান্তরে ঘুরিয়ে নিলুম ঠিক ঘরের দুয়ারের কাছটায় এসে সে হর্‌তাল করে বসল। এখন তাকে নড়ায় কার সাধ্য। ডাক্তার লাগিয়ে দিয়েছি তার পিছনে— আশা করচি দু চার দিনে শায়েস্তা হবে। ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনবার জন্যে তোমার ইচ্ছা— চিঠিতে কুলোবে না, ভাঙা শরীরেও নয়— কোনো এক সময়ে দেখা হলে গল্প করব। আপাতত চল্‌লুম বিছানায়। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ [১৩৩৯]

মামা

১১

২৮ অগস্ট্‌ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ভালোই আছি আমার জন্যে ভেবো না।

এখনো মীরার ফেরবার সময় হয় নি।

তোমাদের চিঠি লিখে কোনো সঙ্কট বাধাতে ইচ্ছে করে না।

আমারও শরীর ক্লান্ত, সময়ও অত্যন্ত অল্প। বিশ্রামের দরকার।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩৯

মামা

১২

১৩ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। তোমার মাকে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি চিঠি দিয়েছিলুম, বোধ হচ্চে সেটা তিনি পান নি। গুরুতর কাজের ভিড় পড়েচে— চিঠি লেখবার অবকাশ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো। কিন্তু তা নিয়ে তোমরা আক্ষেপ কোরো না। তোমরা আমার হৃদয়ে স্নেহের আসন অধিকার করেচ সে সম্বন্ধে মনে সংশয় রেখো না। যদি শান্তিনিকেতনে আসা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হোত তাহলে দেখতে পেতে এখানে শরৎকাল কি সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েচে। চার দিকে খোলা আকাশ, অপর্য্যাপ্ত শিউলি ফুলের নিঃশ্বাসে সুগন্ধ বাতাস, গাছে গাছে প্রজাপতির দল মেতে উঠেচে, দিনগুলি সোনার আলোর পাল তুলে চলেচে ভেসে, আর রাতগুলি এখন শারদজ্যোৎস্নায় মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু তোমাদের মন

কলকাতার ইঁটকাঠের খাঁচায় আট্‌কা পড়ে আছে, এখানকার নিভৃত শান্তি হয়তো তোমাদের ভালোই লাগত না— অন্তত বেশিদিনের জন্যে না। আমার মনটা এখানে আছে সমুদ্রের মাছের মতো— কলকাতায় যখন যাই তখন মনে হয় পথ হারিয়ে ঘোলা জলের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি। শীঘ্র কলকাতায় যাব সে আশঙ্কা নেই। পূজোর ছুটির পরে ইউনিভর্সিটিতে লেকচার দিতে একবার যেতে হবে— সে কথা মনে করলেই মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে। পূজোর কয়দিন তোমাদের ওখানে বোধ হয় খুব আমোদে গেছে। এখানকার কাছাকাছি গ্রামে পূজোর ধূম ছিল, কলকাতা থেকে যাত্রাও এসেছে। আমার এ জায়গাটি ছিল নিস্তব্ধ— শুক্লসন্ধ্যার আলোতে শান্ত নিঃশব্দ নির্ম্মল উৎসব হোতো সাম্‌নেকার ঐ বীথিকায়, লাল রঙন ফুলের মঞ্জরী ছাড়া আর কিছুতে রক্তের চিহ্ন ছিল না। ইতি ১৭শে আশ্বিন ১৩৩৯

মামা

১৩

১৪ এপ্রিল ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ নববর্ষের আরম্ভদিন। তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪০

মামা

১৪

২৫ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাসন্তী, নির্জ্জীবকুমারের বিবাহের সমারোহ আমার কাছ পর্য্যন্ত এসে পৌঁচেছে— আমরা নির্জ্জীব নই তার প্রমাণ হবে। আয়োজন দেখে ইচ্ছা করচে আশীর্ব্বাদ করি কিন্তু শক্তির অভাব ঘটেচে। দেহ এবং কলম কিছুই সচল অবস্থায় নেই। তা ছাড়া আশীর্ব্বাদ করে যাদের লেশমাত্র বিচলিত করতে পারব না তাদের প্রতি ও জিনিষটার অপব্যয় করে কী হবে? তার চেয়ে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তুমিই গ্রহণ করো। ১১ আষাঢ় ১৩৪০

মামা

১৫

৫ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার মা এতকাল ধর্ম্মমত নিয়ে দুর্দ্দাম উৎসাহে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেচেন। আমি চুপ করে গেছি তাই তিনি বেকার। এখন তোমাকে খাড়া করে সেই ধামাচাপা ঝগড়া আবার জাগাবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হবেন

না, তোমার সঙ্গে আমি কিছুতেই ঝগড়া করব না। মতের মিল না হলেও আমি চুপচাপ থাকব।

শুনে আশ্চর্য্য হবে তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম্মের অমিল নেই। আমি দীক্ষা নিই নি, নেবও না। আমার ভগবান কোনো সম্প্রদায়ের ছাঁচে ঢালা ভগবান নন। তিনি নিরাকার তাই অন্তহীন আকার তাঁর— তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর আকার ছাড়া আকার আসবে কোথা থেকে। কারো হাতগড়া মনগড়া আকার নয় তাঁর— কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে বিশেষ রূপে সীমাবদ্ধ নন তিনি।

যে সব প্রচলিত আচারের কোনোই অর্থ নেই— যেমন গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নান করা— তাকে মান্‌তে গেলে নিজের বুদ্ধিকে অপমানিত করা হয়— এই বুদ্ধি ভগবানেরই দান। যারা অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম্মের মূঢ়তায় ভারগ্রস্ত তাদের মন শেওলায় বাধাগ্রস্ত জলের মতো গতিহীন, অন্ধ, অস্বাস্থ্যময়— তারা শত শত বৎসর পরের কানমলা খেয়ে অপমানে নত হয়ে থাকে, তারা অসংখ্য ব্যর্থতা দ্বারা শতধাবিভক্ত। জীবহত্যা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত— অনিচ্ছাক্রমে কখনো কখনো মাছ মাংস খেয়ে থাকি, সেটাকে আমি অপরাধ বলেই গণ্য করি। এক সময়ে সুদীর্ঘকাল নিরামিষাশী ছিলেম— এখনো আমিষভোজন ক্বচিৎ হয়।

মিলিয়ে দেখো, তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম্মমতের প্রভেদ নেই। তার কারণ তোমারও তরুণ মন, আমারও তাই। অন্যান্য রোগের মতোই মূঢ়তা দুর্ব্বল মনকেই অধিকার করে, এই

দুর্ব্বলতা মানসিক জরার লক্ষণ, সেই জরা ১৪।১৫ বছরেরই হোক্ আর ৮০।৮৫ বছরেরই হোক্। এই জরা চিরজীবন তোমাকে স্পর্শ না করুক, স্বচ্ছ থাক তোমার বুদ্ধি, প্রশস্ত হোক্ তোমার হৃদয়, উদার হোক্ মানুষের সঙ্গে তোমার ব্যবহার,— একদিন যাঁর সঙ্গে তোমার মিলন হবে তিনি যেন নির্ম্মল মুক্তির পথেই তোমাকে অগ্রসর করে দেন এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি

৫ নবেম্বর ১৯৩৩

মামা

১৬

২৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। তোমাদের করুণার মধ্য দিয়েই তো বিধাতার করুণা পীড়িত পৃথিবীর উপরে অবতীর্ণ হয়। তুমি অসংশয়ে কল্যাণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছ তোমার এই কর্ম্মের যোগেই তুমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করচ। লোকহিতের আগ্রহ, এই তো জীবনের সার্থকতা। অনেক আছে বিদ্বান অনেক আছে ধনী তাদের হৃদয় পাথরের মতো, তাদের মতো হতভাগ্য আর কে হতে পারে?

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি কলকাতায় যাব, যদি তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় খুসী হব, নইলে দূরের থেকে মনে মনে কল্যাণ কামনা করব। ইতি ১৩ মাঘ ১৩৪০

মামা

১৭

১৬ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৎসে নববর্ষ প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। নানা অতিথি, নানা কাজ, নানা চিন্তা। এই মাসের শেষভাগে আমার গ্রহ সিংহলযাত্রার তাগিদ করেছে— এখন থেকে তার ব্যবস্থা করতে হচ্চে। খুব সম্ভব আমার জন্মদিন পড়বে সমুদ্রে কিম্বা বিভীষণের রাজত্বে। তাই আমার আশ্রমের বন্ধু ও ছাত্ররা এ বছর আমার জন্মদিন এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রে এবার দিনটা পড়ল পয়লা বৈশাখে। গ্রহদের কথা জানি নে কিন্তু দিনটি ছিল স্নিগ্ধ, আকাশ ছিল বৃষ্টিধারাবিধৌত, রবির প্রতাপ ছিল অপ্রখর— এর থেকে মনে করা যেতে পারে বর্ষফল কষ্টদায়ক হবে না। কী বল? তোমার মায়ের মত কী জানিয়ো। গৌরীপুরে যাচ্ছ, সেখানে তোমার দাদামশায়ের আদরে থাক্‌বে সন্দেহ নেই— যদি কোনো ত্রুটি দেখো তবে সেই উপলক্ষ্যে নাৎনীর দৌরাত্ম্য করবার অধিকার আছে এ কথা ভুলো না। তোমরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধার পত্রের উত্তর এই সঙ্গে পাঠাই।

১৮

১৭ জুন ১৯৩৪

ওঁ

জাফনা
সিংহল

কল্যাণীয়াসু

বৎসে তোমাকে চিঠি লিখিনি বলে রাগ করেচ। তোমার দাদামশায়ের আদরের নিবিড় পরিবেষ্টনের মধ্যে ফাঁক পাওয়া যাবে না আশঙ্কা করে নীরব ছিলুম। কিছু বানিয়ে এবং বাড়িয়ে বলা গেল। আসল কথা আমি নিজে আছি নিয়ত সমাদরের ব্যূহবেষ্টিত হয়ে, তার উপরে কাজ আছে যথেষ্ট— বক্তৃতা দিতে দিতে নিজের কণ্ঠস্বরের উপর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে— এখানকার এরা সরল ভাবুক স্বভাবের মানুষ, স্নিগ্ধ এদের মন— এদের খুসি করা দুঃসাধ্য নয়— বাঙালীদের মতো এরা সর্ব্বদা খুঁৎ-ধরা দুঃসহ বুদ্ধিমান নয়— এদের আনন্দ দিয়ে আনন্দিত হয়েচি।

কাল যাত্রা করব স্বদেশের অভিমুখে— দীর্ঘ পথ অতিবাহন করে কলকাতায় পৌঁছব বোধ করি ইংরেজি চব্বিশে তারিখে। ততদিনে দেশে বর্ষা নেমেছে, বর্ষার কবি পাবে আকাশের অভিনন্দন অভিষেক, সজল মেঘের নববারিধারায়।

আমার আশীর্ব্বাদ। ১৭ জুন ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

মাদ্রাজ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে বর্ষামঙ্গলের যে সূচনা পাঠিয়েছিলুম এতদিনে সেটা নিশ্চয় পেয়েছ। আসাম গৌরীপুরের দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে তার খোঁজ করতে বলেছিলুম। তিনি লিখেছেন বই দুটো সেখানকার পোষ্ট অফিসে অপেক্ষা করছিল তিনি ময়মনসিঙের ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

এখানে আমার বক্তৃতা চল্‌চে। পর্শু দিন থেকে অভিনয় সুরু হবে— অক্টোবর মাসটা এই রকম কাটবে। শাপমোচন যদি দেখতে, নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগত। তোমাদের ওখানে যে অভিনয়গুলি হয়ে গেছে তার চেয়ে মন্দ নিশ্চয়ই নয়। অনেক নতুন গান আছে।

তোমার গানের ছাত্রদের উন্নতির খবর পেয়ে আশান্বিত হয়েছি। ময়মনসিং জেলায় তুমিই আমার গানের প্রতিষ্ঠা করলে— আশা করি উচ্চারণ এবং সুর কিছুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকবে। ইতি ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১৪ এপ্রিল ১৯৩৫

বৎসে,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।

আমাদের ভারতীয় গানের কোনো কোনো সুরের হার্ম্মোনিয়মের বাঁধা সুরের সঙ্গে ঈষৎ অনৈক্য হয়। তারের যন্ত্রে কোনো অসুবিধে হয় না। সে স্থলে হয় শুদ্ধ নয় কোমল লাগালেই চলে— তোমার নিজের কান তার পথ নির্দ্দেশ করে দেবে। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩৪২

মামা

শান্তিনিকেতনের ফটো আমার কাছে নেই
যদি পাই তোমাকে পাঠাব।

২১

২৮ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে আমাদের এখানকার চামড়ার কাজ কিছু পাঠাচ্চি। একটি হচ্চে অটোগ্রাফ বইয়ের মলাট— এই মাপের খাতা এর মধ্যে ভর্ত্তি করে নিলে এটা সম্পূর্ণ হবে। আর একটি

পোর্টফোলিয়ো। এটা আমার নিজের ব্যবহারে এতকাল নিযুক্ত ছিল— সেই বিশিষ্টতার জন্যেই এই পুরোনো জিনিষটা তোমাকে দিলুম— অন্য ঘরে যখন কুলান্তরিত হবে তখনো আমার স্নেহ তোমার স্মরণে থাকবে এই আশা করেই তোমাকে পাঠাচ্চি।

আজ প্রভাতে আকাশ নির্ম্মল, শরতের দাক্ষিণ্যে এখানকার বনশ্রেণী আনন্দোজ্জ্বল— রবির আশীর্ব্বাদের জন্য আজকের দিনই প্রশস্ত। ইতি ১১ ভাদ্র ১৩৪২

মামা

২২

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়া বাসন্তী

আমি চিঠিপত্র লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার বিশ্রাম নেবার সময়— এতদিন ধরে কাজ কর্ম্ম অনেক করেছি। শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

কিছুদিন হোলো তোমার মামা এখানে এসেছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে আসবেন এমন আশা রইল। সঙ্গে যদি ভাগ্নীটিকে নিয়ে আসেন তাহলে আরো ভালো হয়।

তোমার মার চিঠিতে খবর পেলুম তুমি স্বহস্তে নানাবিধ ভোজ্য তৈরি করে আত্মীয়স্বজনের পরিতোষ বিধান করচ।

শুনে লোভ হয়— দূরে আছি অতএব ভাগ পাবার আশা করতে পারি নে। আমাকে পেটুক বলে যদি কল্পনা করো তাহলে ভুল করবে। আমি যতটা খাই তার চেয়ে গুণ গাই বেশি। যখন কলকাতায় যাব তখনকার জন্যে দাবী রইল। কাছের লোকদের পেটভরা মাপের পরিবেষণ করেও যেটুকু উদ্‌বৃত্ত থাকবে তাতেই আমার চলে যাবে। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

মামা

২৩

৯ অক্টোবর ১৯৩৫

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী
কল্যাণীয়াসু
সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আশ্বিন
১৩৪২

২৪

৫ জানুয়ারি ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। কিছুকাল থেকে নানা কাজ এবং অতিথিসমাগম নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম শরীরও বিশেষ ভালো ছিল না। কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দিয়ে কোথাও পালাবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। কিন্তু যেখানেই যাই উপদ্রব সঙ্গে সঙ্গেই চলে— তাই চিরপরিচিত আরাম কেদারাটা আঁকড়ে পড়ে থাকি।

পরিশোধ গল্পটি ঐতিহাসিক নয়, বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকে নেওয়া।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৫ জানুয়ারি ১৯৩৬

মামা

২৫

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নূতন সংসার সৃষ্টি করিবে আপন প্রতিভায়,
হে কল্যাণি, তব নারী-জীবনের চরিতার্থতায়
ধন্য হবে তুমি, বৎসে, ধন্য হবে বান্ধব আত্মীয়,
তোমার প্রীতির রসে নিত্য হবে সবাকার প্রিয়
আপন জগৎ তব ; হবে সত্য-প্রভায় উজ্জ্বল ;
অক্লান্ত সেবায় ত্যাগে পুণ্যে হবে শুভ্র সুনির্ম্মল।
জীবনযাত্রার পথে কল্যাণনিষ্ঠার ধ্রুবতারা
মোহকুহেলিকাজালে কখনো না হয় যেন হারা।
ভক্তির মাধুর্য্যে পাও অন্তরের কান্তি নিরুপমা,
বিশ্বেরে করিয়া ক্ষমা লভ' বিশ্ববিধাতার ক্ষমা।
বাহিরের আক্রমণ জয় তুমি কর' আত্মজয়ে,
এই মম আশীর্ব্বাদ তোমাদের শুভ পরিণয়ে॥

২রা ফাল্‌গুন
১৩৪২

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

৫ জুলাই ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। আমাদের এখানে চল্‌চে কখনো বৃষ্টি কখনো গুমট, এতক্ষণ পরে আজ দিয়েচে একটু হাওয়া— হয়তো সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ আস্‌বে খুব ঘটা করে বর্ষণ। জানো তো এবার এদেশে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি গেছে, ক্ষেতে ফসল নেই, লোকের পেটে নেই অন্ন, গায়ের বস্ত্র জীর্ণ। এসব দেখে সংসারের উপর ধিক্কার জন্মে। কিছু কিছু চেষ্টা করচি এদের বাঁচিয়ে রাখতে, কিন্তু আমাদের সাধ্যের অতীত। এখানে একটা সাবেক কালের দীঘি ছিল, সেটা প্রায় বুজে এসেছিল— খোঁড়াবার ব্যবস্থা করেছি, তাতে গেল দুই মাস ধরে পাঁচশো লোক খেটে খেতে পাচ্চে। যে পর্য্যন্ত না অঘ্রাণ মাসে ফসল ওঠে সে পর্য্যন্ত এদেশের লোকের অনাহার চলবে।

হয়তো শ্রাবণ মাসের মধ্যে কোনো এক সময়ে কলকাতায় যাওয়া ঘটবে— তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারবে।

তোমরা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২১ আষাঢ় ১৩৪৩

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

৩০ অগস্ট ১৯৩৬

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। নানা কাজ নিয়ে আজকাল অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছি। তার উপরে শরীরটা যে খুব ভালো আছে তা বলতে পারিনে। কিন্তু আমার এই ভাঙা শরীরে কাজ কামাই হয় না। এখানে বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল। কথা ছিল কলকাতায় গিয়ে করব কিন্তু সুবিধে হোলো না। তবু হয়ত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে একবার কলকাতায় যাব। তুমি তো জানই যখন যাই বরানগরে গিয়ে থাকি, এবারেও সেখানেই হবে আমার বাসা। যদি পারো তো দেখা করতে এলে খুসি হব।

তোমার মা আর কতদিন পুরীতে থাকবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ৩০ অগস্ট ১৯৩৬

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

[শ্রীনিকেতন] ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা বাসা বদল করেছ— বোধ হয় ভালোই লাগচে। আমিও কিছুদিনের জন্যে বাসা বদলিয়েছি, এসেছি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে। এখানে তেতলা বাড়ির তেতলার ঘরে নির্জ্জনে আরামে আছি। যতদূর দৃষ্টি যায় ধানক্ষেতে সবুজ রঙের সমুদ্র। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬

মামা

২৯

১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ডিব্রুগড় থেকে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। সুন্দর জায়গাতেই গেছ, সুখে থাকবে। অনেকবার ইচ্ছা করেছি ষ্টীমারে করে ব্রহ্মপুত্র বেয়ে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসব— এ পর্য্যন্ত ঘটে ওঠে নি। হয় তো যাব কোনো সময়ে, তখন তোমাদের ঘরকন্নার আস্বাদ পাওয়া যাবে। খবরের কাগজে পড়েছিলুম যে আমি কলকাতায় যাব, কিন্তু আমি নিজে তার কিছুই জানি

নে। এখনো এখানেই আছি, ৭ই পৌষের জন্য প্রস্তুত হচ্চি। ইতি ১৪।১২।৩৬

আশীর্ব্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

২২ এপ্রিল ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ডিব্রুগড় থেকে কলকাতায় ফিরে যে চিঠিখানি লিখেচ পেয়ে খুসি হলুম। তোমরা আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। আমরা আলমোড়া পাহাড়ে যাবার সঙ্কল্প করেছি। আগামী ২৬শে রাত্রে কলকাতায় পৌঁছব, ২৯শে সন্ধ্যাবেলায় যাত্রা করব পাহাড়ে। আমি সহজে নড়তে ইচ্ছে করি নে এবার শরীর বিশেষ ক্লান্ত বলেই তল্পি বাঁধচি। কিন্তু কাজ আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরবে, এবং ভিড় জমতেও বোধহয় দেরি হবেনা। ইতি ২২।৪।৩৭

মামা

৩১

২৬ অগস্ট ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় ক্ষণকালের জন্যে দেখা হয়েছিল খুশি হয়েছিলুম। পরের দিনেই পালিয়ে এসেছি। কলকাতা

আমার জন্মস্থান কিন্তু আমার আবাস্য নয়। শরৎকালে আর্দ্রতাপ দুঃসহ হয়ে উঠচে— যত শীঘ্র পারি গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় নেব। পথের মধ্যে কলকাতায় চোখের চিকিৎসা উপলক্ষ্যে থাকতে হবে। তখন হয় তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারবে। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৬।৮।৩৯

স্নেহরত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

২৯ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু

তোমরা দুজনে মিলে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

আমার এখানকার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। আগামী ৫ই নবেম্বরে এখান থেকে অবতরণ করব। চোখের চিকিৎসার জন্যে দু চার দিন কলকাতায় থাকতে হবে। তার পরে যাব আশ্রমে। এখানে যে কতটা শীত তোমাদের ওখান থেকে তা কল্পনা করতে পারবে না। ইতি ২৯।১০।৩৯

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যাত্রা করে বেরিয়েছিলুম কালিম্পঙের দিকে— কিন্তু দুর্বল দেহের প্রতি ভরসা করতে পারলুম না। ক্লান্তির ভয়ে কলকাতা থেকেই পালিয়ে এলুম। তোমাদের দেশের বর্ণনা শুনে লোভ হয়— কিন্তু পথের লীলা এবার থেকে সাঙ্গ হোলো।

সেদিন সন্তানসহ বাসন্তীকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। এখানে এখন বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব। আপাতত হাওয়ার মেজাজ ঠাণ্ডা -- আবার খেয়াল বদলাতে পারে। আশীর্বাদ জেনো। ইতি ১২।১০।৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রখানি শ্রীনিখিলচন্দ্র বাগচীকে লিখিত

—

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র

কবির আশীর্বাদ ও শ্রীমান্ কিশোরকান্ত -সহ পত্রালাপ

১৯ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে ওস্তাদের কথা লিখেচ তাঁকে পেলে আমাদের ভালোই হয়। কেবল একটিমাত্র ভাবনার কথা, আমাদের আশ্রম আর্থিক দুর্গতিগ্রস্ত। কি পরিমাণ বেতন পেলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন সেটা আমাকে জানিয়ো।

তোমার কন্যার অসুখের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলুম।

আজ দিলীপকুমারের পত্র পেলুম। তাতে সে জানিয়েচে যে শ্রীঅরবিন্দ কবে সর্ব্বসাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন তা নির্দ্দিষ্ট করে বলেন নি— হয় তো আমি ভুল বুঝেছি কিম্বা আর কারো কাছ থেকে এ কথা শুনে থাকব। ইতি ২ ভাদ্র ১৩৩৮

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত

২৩ অগস্ট, ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাকে হয় তো আর দিন দশেকের মধ্যে কলকাতায় যেতে হবে। বন্যাপীড়িত বাংলার সাহায্যের জন্যে কিছু চেষ্টা না করে স্থির থাকা অসম্ভব। বন্যায় আমাদেরও উপজীবিকা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এর আগে যে বন্যা হয়েছিল তাতে ঋণ করে প্রজাদের সাহায্য করেছি— দ্বিতীয় বার ঋণ বাড়াতে সাহস হয় না। তাই স্থির করেছি কলকাতায় বর্ষামঙ্গল দেখিয়ে বর্ষাজনিত অমঙ্গল কথঞ্চিৎ দূর করতে চেষ্টা করব। আট দশ দিনের পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হবে না— তার চেয়ে বিলম্ব করলে উৎসবের নামটাকে ব্যর্থ করা হবে। শরীর পীড়িত কিন্তু দেহের দোহাই মেনে কর্ত্তব্য মুলতবি রাখবার অবকাশ আমার আর নেই।

ডাক্তার সরসীলাল সরকার আমার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাবী করে পত্র লিখেচেন। প্রবন্ধ যদি কোমর বেঁধে লিখি পনেরো আনা লোক তার তাৎপর্য্য বুঝতে পারবে না অথবা ভুল বুঝবে। তোমার দিদিকে যে চিঠিগুলি লিখেচি তাতে আমার কথা যত সহজে ব্যক্ত হয়েচে কোনো প্রবন্ধে তা সম্ভব হবে না। যদি তার ব্যক্তিগত ও অবান্তর অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ঐ পত্রগুলি থেকে সার উদ্ধার করে গেঁথে দিই তাতে তোমাদের কি কোনো আপত্তির কারণ হবে? শুনেছি এ চিঠিগুলি এখনি ছাপানো সম্বন্ধে তোমার বাবার সম্মতি নেই। কিন্তু আমি যে ভাবে

ছাপতে ইচ্ছা করচি তাতে কারো সঙ্কোচের কোনো কারণ থাকবে না। একবার তাঁকে ও তোমার দিদিকে জানিয়ে আমাকে লিখো। এই ক্লান্ত জীর্ণ দেহে নতুন করে কিছু লিখতে উৎসাহ হয় না— অথচ আমার যা শেষ কথা তা আমাকে বলে যেতেই হবে। রচনাটি সঙ্কলিত হলে পর ছাপবার পূর্ব্বে তার এক কপি তোমাদের সম্মতির জন্যে পাঠিয়ে দিতে পারি। ইতি

৬ ভাদ্র ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত

দ্রষ্টব্য : শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীকে লিখিত ২৪ অগস্ট্ ১৯৩১ তারিখের চিঠি, পৃ ৮৩

আশীর্বাদ

শ্রীমান কিশোরকান্ত

নবীন আগন্তুক,
নবযুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি।
জীবন-রঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে?
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামতরে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয় তো রচিবে মিলনতীর্থ শান্তির বাঁধ বেঁধে।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম আমরা বেড়াই খুঁজি
আগামী প্রাতের শুকতারাসম নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো এই বুঝি দিল আনি॥

৩০।৭।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ অক্টোবর ১৯৩৮

শ্রীচরণেষু,

দাদু, আপনি আমার প্রণাম জানবেন। আমাকে চেনেন কি? আমি 'নাচন', ভালো নাম 'কিশোরকান্ত'— আমি আপনার সারা জীবনের স্বপ্ন, চিরনবীন, চিরসুন্দর নটরাজ। কিন্তু নটরাজ তো ভাঙ্গনের দেবতা, আমি তা নই। আমি গড়নের ও স্থাপনের দেবতা, আমি তাই নাচন বা নটশেখর।

দাদু, আপনি মাকে, মামাকে, দিদিমাকে অনেক ভালো-ভালো বই দিয়েছেন, চিঠি লিখেছেন, সে সব চিঠি দিয়ে আবার বই তৈরী হবে। কিন্তু আমাকে আপনি, যদিও কবিতা দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করেছেন, নিজের প্রিয় নামটিই দান করেছেন আমাকে, কিন্তু আমাকে কোনো বই দেন নি। তাই আমিও ভেবেছি যে আপনাদের ভাষার কোনো বই আমি পড়বই না। আমি নিজেই কত ভালো ভালো বই রচনা করতে পারি, কত নতুন সুরে নতুন নতুন গান রচনা করতে পারি, সে সব রচনা আপনার মত লোহার কাঠি দিয়ে বাঁশ কাঠের মাড়ের সরের ওপর কালো রঙের আঁচড় কেটে বানাতে হয় না, আর রূপো কিংবা তামার চাক্‌তির সঙ্গে বদলাবদলি ক'রেও নিতে হয় না। আমার বই আমার গান প্রভাতী আলোয় পাখীর সুরের মত হাওয়ায় ভেসে ওঠে, হাওয়ায় ভেসে ভেসে চ'লে যায় দূর দূরান্তরে, আমার ভাষা বুঝতে পারে কেবল তারাই, যারা হাওয়ার ভাষা, গাছের পাতার ভাষা, আর পাখীর ভাষা পড়তে শিখেছে।

আমি নাচন কি না, তাই আমার সুরের লহর নাচতে নাচতে চ'লে যায় ওই গাছের পাতাকে মর্ম্মরিত দোলা দিয়ে দিয়ে নীল আকাশের শেষ পারে। সুরপরীরা আমার কাছেই সুর শিখতে আসে, নাচের তালে মঞ্জীরা বাজিয়ে তারা আমার কাছে শেখা গান গাইতে যায় আবার হয়তো ওই আপনারি কাছে। তাদের গান শুনে আপনি ভাবেন, ওরা বুঝি আপনিই শিখেছে। তা নয় গো মশায়···

১৮।১০।৩৮ নিবেদন ইতি

শ্রীমান নাচনবাবু

পুনশ্চ নিবেদন, বলেইছি, ও লোহার কাঁটা দিয়ে আঁচড় কাটা আর নকল বুলি দিয়ে কথা বানানো আমার আসে না। ভালোও লাগে না। তাই এ কাজের ভার দিদিমাকে দিলাম। নইলে আবার আপনি হয়তো বুঝতেই পারবেন না, আমি কি বলতে চাচ্ছি।

২০ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

নাচনবাবু,

একেবারে খাঁটি আধুনিক তুমি। পাঁজিও সেই কথা বলে, তোমার ভাষার থেকেও তার প্রমাণ পাই। এ ভাষায় শব্দ আছে যথেষ্ট কিন্তু অর্থ খুঁজে পাইনে। ভাষা যে কিছু বোঝাবার জন্যে সে দায়িত্ব বুঝি একেবারে অস্বীকার করেছ। আমি সেকেলে লোক আমার কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, যা বলব সেটা যেন পাঁচজনে বুঝতে পারে। যেন না ভাবতে বসে আমি পাগল হয়েছি, না, তারা পাগল হয়েছে। পাঁচজনের সম্বন্ধে তোমার মনের এই দীনতা নেই— তার থেকে প্রমাণ হয় তুমি আধুনিক। যারা সাধারণ ব্যক্তি তারা অন্যকে লক্ষ্য ক'রে যা বলে তা বোঝা যায়— তুমি অসাধারণ, তুমি আধুনিক, তুমি কা'কে লক্ষ্য ক'রে কী যে বলো তা যারা বোঝে তারাও তোমার মতোই অদ্বিতীয়। আমার শব্দের মধ্যে অর্থ ঢুকে পড়েছে— ওটা বয়সের দোষ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর থেকেই এই বিভ্রাট ঘটেছে। তোমার মতোই আধুনিকতার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলুম কিন্তু লজ্জা এসে গেছে। তোমার অজস্র ক্ষমতা আছে লজ্জা না পাবার। এর থেকে বুঝি তুমি খাঁটি। তোমার অসংলগ্ন বাক্যাবলীতে ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যায়। আমার সাহস নেই। আজ কিছু কালের মতো তোমারি জিৎ রইল নাচনচন্দ্র— কিন্তু কাল! বলা যায় না, যদি জাতশ্মশ্রু আধুনিকতার ছোঁয়াচ তোমার ভাষায় লাগে তাহলে আমাকে

লক্ষ্য ক'রে যা বলবে সেই শব্দভেদী বাণ গিয়ে পৌঁছবে একেবারে বৈতরণীতীরে। দোহাই তোমার আমার কথার মধ্যে সহজ অর্থ খুঁজে পেয়ে তোমার মনে যদি অত্যন্ত ধিক্কার জন্মে তাহলে কথাগুলোকে উলটে পালটে দিয়ো— তোমাদের কাজ চলবে। একটা নমুনা দেখাই—

কূলে গরজে। গগনে বসে আছি।
মেঘ একা, ভরসা নাহি
ঘন বরষা।

মনে হচ্ছে না কি, কিছু যেন বলা হোলো, কিন্তু কী যে তা বোঝবার দরকারই নেই। তোমার অভিনন্দনপত্রে বীর হও এ আশা জানিয়েছি কিন্তু কবি হও এ কামনা করি নি। হোতে হোতে হয়তো তোমার ভাষা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বলা যায় না, কোন্ অকথনীয়ে কোন্ অচিন্তনীয়ে, বাক্যকলেবরের কোন্ অসংযুক্ত[১] অপঘাতে, তখন তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, যে হেতু বুঝিয়ে বলার চির-প্রচলিত সংস্কারে আমি অভ্যস্ত। যে হেতু এ কালের পরে আমার বিশ্বাস ছিল না, আমার বিশ্বাস চিরকালের পরে।

পুনশ্চ নিবেদন :— আর বিশ বছর পরের তারিখের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমার এ চিঠি লেখা। ইতিমধ্যে তোমার কাকলীপর্ব শেষ হোক। তোমার এখনকার কলালাপ তর্জমা করবার ভার নিয়েছেন দিদিমা। কিন্তু ভুল করেছেন সন্দেহ নেই, কেননা তিনি যা ব্যাখ্যা করেছেন তার আগাগোড়া বোঝা গেল। হে অভাষিক, হে আধুনিক, এই আমার বুঝতে-পারা-ভাষার সহজ

সীমানা থেকেই আজ তোমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলুম— এর পরে সেদিন যে-কোনো ভাষায় ইচ্ছা তুমি উত্তর দিয়ো, আমার আর[২] প্রয়োজন হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে, বিনা ভাষায় নীরব চোখ মুখের আলাপ থেকে যারা প্রলাপ মথিত ক'রে তুলতে পারে, তারা নাচন নয়, তারা নাচনীর দল, তারই একটির জন্যে আবেদন জানিয়ে রাখলুম তোমার মায়ের দরবারে। হায় রে, বারবার ভুলে যাই— নাচনী আসবে, কিন্তু (একটা দীর্ঘনিশ্বাস) — ইতি ২০।১০।৩৮

সপ্তকপারবর্তী
কবি

[মন্তব্য]

আপন সম্বলের প্রতি যে শিশু-ভোলানাথের কোনো আসক্তি নেই, আনন্দমত্ত প্রলয়লীলায় যিনি তাঁর প্রতি মুহূর্তের নৈবেদ্য প্রতি মুহূর্তেই সগর্জনে ধূলিসাৎ ক'রে দেন তাঁর সেই বিলুপ্তি-ভাণ্ডের সদ্য ভাঙন নেশার প্রতি ভরসা রেখে সেই অবুঝ দেবতার অবোধ্য ভাষা সম্বন্ধে গোপনে একখানি পত্র লিখেছিলেম। শনিগ্রহের চক্রান্তে পত্রখানি ধূলির ঠিকানা এড়িয়ে পড়েছে সম্পাদকের ঝুলির ঠিকানায়। মনে আছে সংস্কৃত ভাষার একটি শ্লোকে পড়েছিলুম— চোখে যে কাজল ভূষণ, সেই কাজলই দূষণ মুখের উপরে। আমার কাজল ঠিকানাভ্রষ্ট হয়েছে

আমার দোষে নয়। চোখের কালিমা যে শিশুর মুখে লাগলেও মানায়, আমার লেখা তাকেই লক্ষ্য ক'রে। আর কেউ যেন আত্মাভিমানে এর প্রতি দাবী না করেন।

নাচনচন্দ্রের দাদু

* * *

আশীর্বাদ কবিতাটি মূল পাণ্ডুলিপি -অনুযায়ী এবং 'নাচনবাবু' কিশোরকান্তকে 'দাদু' রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্দ্রসদনের অনুলিপির অনুসরণে মুদ্রিত। নাচনচন্দ্রের চিঠি ও কবির 'মন্তব্য' -সহ উভয়ই 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'অতি-আধুনিক ভাষা' এই শিরোনামে ও ভিন্নরূপ পারম্পর্যে মুদ্রিত। সে স্থলে কবির পত্রের তারিখ আছে ২১।১০।৩৮। 'শনিবারের চিঠি'তে উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর—

১ অসংশ্লিষ্ট

২ 'আর' স্থলে : বোঝবার আর

পরিশিষ্ট ১

পূর্বপত্রের পাঠান্তর ও রূপান্তর

আত্মীয়-বিরোধ

কল্যাণীয়াসু

কাজের ঝঞ্ঝাট বেড়ে উঠেচে। নানা লোকের নানা রকমের ফরমাস খাটতে হয়; তবু সে আমার বহুদিনের অভ্যাসে কতকটা সহ্য হয়ে এসেচে।

কিন্তু নিরতিশয় পীড়িত ক'রে তোলে অত্যাচারের কথা। আমার বেদনাবহ নাড়ী এই রকম কোনও সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে, তখন সে যেন কিছুতে থামতে চায় না। সম্প্রতি দেহমনের উপর সেই উপদ্রব দেখা দিয়েচে।

এতদিন বন্যাপ্লাবনের দুঃখ দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে ছিল; তার উপরে চট্টগ্রামের বিবরণটা সাইক্লোনের মত এসে তার সমস্ত বাসাটা যেন নাড়া দিয়েচে।

আমাদের আপন লোক যখন নির্মম হয়, তখন কোথাও কোন সান্ত্বনা দেখিনে। এর পিছনে আর কোনো দুর্‌গ্রহের যদি দৃষ্টি থাকে, তবে তা নিয়ে আক্ষেপ ক'রে কোনো লাভ নেই। বল্‌তে হবে— 'এহ বাহ্য।' সকলের চেয়ে আমাদের সংঘাতিক ক্ষতি এই যে, হিন্দুরা পাছে সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ কথা বলাই বাহুল্য, এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে এ আমি নিশ্চিত জানি মোটের উপরে ভালমত পরিচয়ের অভাব থেকেই আমাদের পরস্পর আত্মীয়তার ব্যাঘাত ঘটে। কোনো জাতের একদল মাত্র যখন অপরাধ করে, তখন সেই জাতের সকলের উপরেই কলঙ্ক লাগে এটা অনিবার্য— কিন্তু এ রকম ব্যাপক অবিচার কঠিন দুঃখেও আপন লোকের উপর করা চলবে না।

দেশের দিক দিয়ে মুসলমান আমাদের একান্ত আপন, এ কথা কোনো উৎপাতেই অস্বীকৃত হ'তে পারে না। একদিন আমার একজন

মুসলমান প্রজা অকারণে আমাকে একটাকা সেলামী দিয়েছিল। আমি বললুম, আমি তো কিছু দাবি করিনি। সে বল্‌লে, আমি না দিলে তুই খাবি কি। কথাটা সত্য। মুসলমান প্রজার অন্ন এতকাল ভোগ করেছি। তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা ভালবাসার যোগ্য। আজ যদি তারা হঠাৎ আমাকে আঘাত করতে আসে, তা হ'লে পরম দুঃখে আমাকে এই কথাই ভাবতে হবে, কোনো আকস্মিক উত্তেজনায় তাদের মতিভ্রম ঘটেচে— এটা কখনোই তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি নয়। দুর্দ্দিনে এমন ক'রে যদি আমি ভাবতে পারি, তা হলেই এই ক্ষণকালের চিত্তবিকার দূর হতে পারবে। আমিও যদি রাগে অধীর হয়ে তাদেরই অস্ত্র কেড়ে তাদের উপর চালাই, তা হলেই এ বিকার চিরদিনের মত স্থায়ী হবে— শেষকালে আসবে বিনাশ।

মুসলমান যদি কোনোরকম প্রবর্ত্তনায় হিন্দুকে নিপীড়ন করতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হ'লে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ শেল বাইরের নয়, এ মর্ম্মস্থানের বিস্ফোটক— এ নিয়ে রাগারাগি লড়াই করতে গেলে ক্ষত বেড়ে উঠ্‌তে থাকবে। বুদ্ধি স্থির রেখে এর মূলগত চিকিৎসায় লাগা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিলম্ব হলেও সে-ই একমাত্র পন্থা।

যে পরজাতির পক্ষে ভারতবর্ষ অন্নের থালি, তারা যদি সেই অন্ন হ্রাস বা নাশের আশঙ্কায় আমাদের 'পরে কঠোর হয়ে ওঠে, তা হ'লে বুঝতে হবে সেটা স্বাভাবিক, এবং সেটা স্বার্থের জন্যে। এস্থলে তাদের শ্রেয়োবুদ্ধি বিচলিত হ'লে পরমার্থের দিকে না হোক, অর্থের দিকে একটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু আপন লোকের কৃত অন্ধ অন্যায় তাদের নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধ। তারা চিরদিনের মত দেশের চিত্তে অবিশ্বাসকে আবিল ক'রে তোলে; তাতে চিরদিনের জন্যই তাদের নিজের ক্ষতি। যে নৌকোয় সবাই পাড়ি দিচ্চি, দাঁড় মাঝি বা কোনো আরোহীর 'পরে রাগ ক'রে তার তলা ফুটো ক'রে দেওয়াকে জিৎ হওয়া মনে করা চলে

না। ইংরেজ যখন একদা সমস্ত চীনদেশের কণ্ঠের মধ্যে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আফিমের গোলা ঠেসে দিয়ে তাদের আরাধ্য দেবতাকে চিরদিনের মত অপমানিত করলে, তখন এ পাপ থেকে অন্তত তারা বৈষয়িক পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু কল্পনা কর, দক্ষিণ-চীন যদি রাগের মাথায় উত্তর-চীনের মুখে বিষ ঢালতে থাকে, তাতে চীনের যে মৃত্যুর সঞ্চার হবে, তাতে দক্ষিণ তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। আত্মীয়দের শত্রুতাস্থলে জিৎলেও মৃত্যু, হারলেও মৃত্যু। আমাদের মধ্যে যে-কোনো সম্প্রদায় উগ্র উৎসাহে স্বাজাতিক সত্তার মূলে যদি কুঠার চালায়, তবে নিজে উচ্চ শাখায় নিরাপদে আছে মনে ক'রে খুসি হওয়াটা অধিকদিন টেঁকে না। দুঃখ এই, এই সব কথা দুঃখের দিনেই কানে সহজে পৌছয় না। যখন মানুষের রিপু যে-কোনো কারণেই উত্তেজিত হয়, তখন আত্মীয়কে আঘাতের দ্বারা মানুষ আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইতিহাসে শোচনীয়তম ঘটনা যা ঘটে, তা এমনি করেই ঘটে। মরবার বুদ্ধি পেয়ে বসলে মানুষ আপনিই মরবে জেনেও অন্যকে মারে। আমাদের সাধনা আজ কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। আজ অসহ্য আঘাতেও আত্মসম্বরণ করতে যদি না পারি, তবে আমাদের তরফেও আত্মহত্যার আয়োজন করা হবে; শত্রুগ্রহের হবে জয়।

মন ক্ষুব্ধ আছে বলেই তোমার চিঠির মধ্যে এ-সব কথা লিখ্‌লুম। কথাটা এ-স্থলে প্রাসঙ্গিক না হ'তে পারে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩৩৮। [৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীকে লিখিত ৩৯-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত
শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীর তিনখানি পত্র

আপনার ব্যথা ভুলবার
সঙ্কেতটি আমি পরীক্ষা করে'
দেখব।

শ্রীশ্রীহরি

শুক্রবার

শ্রীচরণেষু— দাদা, আপনাকে দেখলে আমি সকল দুঃখ ভুলে' যাই, কোনো কথাই মনে থাকে না। মনে হয়, এক শান্ত নিস্তব্ধ গভীর মহাশূন্যে এসে পড়েছি। এখানে অনাহত প্রণবের ভাষায় শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। বৈষ্ণব-দর্শন বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত "মহাকালপুর" নামক জ্যোতির্ম্ময় কারণলোকে ব্রহ্মানন্দমগ্ন আত্মারাম ঋষিগণের চরম গতিস্থান। আপনাকে দেখলে সেই ব্রহ্মবাদী বেদজ্ঞ ঋষিগণের সত্তারই উপলব্ধি করি।··· দাদা, আপনি যে আমাকে মার সঙ্গে (আপনার বৌমা) পরিচিত করে' দেবেন বলেছেন, আমার ভারি লজ্জা করছে। মা কি তাঁর অযোগ্য সন্তানকে দয়া করবেন? কেন যে সঙ্কোচ করি দাদা, তার কারণ এই, আমি মূর্খ, তার উপর স্পর্দ্ধা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পার নেই। দাদা, আপনি মহান্, উদার, আপনি আমার দেবতা, আপনি এ বিশ্বের আপন জন, আমি মায়ার অঞ্জন চোখে দিয়ে আপনাকে দেখি, যেন আপনি আমার কল্পলোকের রাজা। আপনি সর্ব্বগুণাকর, আমি দোষের আধার, তবুও আপনার স্নেহের ডাকে আমি মায়ামুগ্ধ হয়ে আসি, নিজের ওজন ভুলে যাই, মনে থাকে না, যে, আমাদের মধ্যে বৈষম্য কতখানি! আপনি অভয় দিয়েছেন, সেই সাহসে যা' তা' লিখি, যা' তা' বলি, (আপনি আবার সেই সব চিঠিগুলো রেখে দিয়েছেন,

ছি, ছি) আপনি মহৎ অন্তঃকরণ নিয়ে আমাকে এতটা প্রশ্রয় দেন, তাই আপনার কাছে আমার কোনো লজ্জা— কোনো আবরণ নেই। যে চোখে একবার দেখে ফেলেছি, তা তো আর বদলায় না, সেইজন্যে এখন সম্পূর্ণরূপেই ঐ চরণে আত্মনিবেদন করেছি, আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে'। কিন্তু, কল্পলোক ছেড়ে একবার বাস্তবরাজ্যে নেমে এলে তখন এই পার্থক্যটা বিশেষভাবেই পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। তখন কি আর আপনার সামনেই দাঁড়াতে পারি ? কিন্তু, একমাত্র ভরসা, আপনার দয়া এবং স্নেহ। তাই বলছিলাম, মা তাঁর মূর্খ মেয়েকে আপনার মত করুণার চোখে দেখবেন কি ? মা যদি দয়া করে' আমার সব ত্রুটি মার্জ্জনা করেন, তা' হলে সেটা আশাতীত সৌভাগ্য মনে করব। আর একদিন আপনার চরণদর্শন করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু, পরাধীন অবস্থা, কাজেই ঠিক করে' কিছু বলতে পারছি না। দাদা, দর্শন পাই আর না পাই, আপনার চরণপ্রান্তে যেন আমার বাসা থাকে, যখন আসি, আশ্রয় পাই যেন। দাদা আমার, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক পান্থপাদপের গাত্র-নির্ঝর হ'তে জল খেতে চেয়েছিল, পেল না। তার ঘরের জলসত্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, আর কেন, সুখের অভিলাষ সর্ব্বত্রই বর্জ্জনীয়। সুতরাং ওই রাতুল চরণ দু'খানি আমার প্রণম্য হয়েই রইলেন। খেলায় কাজ নেই আর। হে ঋষি,— আমার কবি আমার ইষ্টদেবতার অঙ্গে লীন হয়ে রয়েছেন, যখন তাঁকে প্রণাম করব, সেই প্রণামেই কবিকে প্রণাম করা হবে। যখন সেই চিরকিশোরের সুন্দর চরণকমল আমার লীলাস্পদ হয়ে শিরে, নেত্রে, ললাটে, কপোলে পেলব-স্পর্শ দান করবেন, তখন আমি আমার কবির স্নেহস্পর্শ যুগপৎ অনুভব করব।

প্রণাম। নিবেদন ইতি সেবিকা

শ্রীশ্রীহরি

ভরসা—

শ্রীচরণেষু— দাদা, আপনি ভেবেছেন, আমি বিরক্ত হয়েছি, এটা সম্ভব ? ঠাট্টা করি বলে', চঞ্চলতা ও দুষ্টুমি করি বলে', আপনার উপর বিরক্ত হতে পারি ?··· আপনি জানবেন, আপনার সঙ্গে যে তর্ক করি, সে আপনাকে হারাবার দুরাশায় নয়, সত্যআবিষ্কারের জন্য। আমার গ্রহে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ভক্তি করার কথা হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করি না যে নবগ্রহস্তোত্র পড়লেই গ্রহের গতি ফিরবে। কারণ, আমার মতে গ্রহ প্রাকৃতিক শক্তি, গ্রহের দেবতা থাকেন তো থাকুন, যেমন রাগ রাগিণীর দেবতা আছেন। সরস্বতীপূজার বেলায় তাঁদের পূজা হয় কিনা, জানি না। আমরা কেউ রাগ রাগিণীর পূজা করি না এটা সত্যি। তেমনি গ্রহও হয়ত কোনো কারণে কারো কারো পূজনীয় হতে পারেন, আমি নিজে সে পূজায় দীক্ষিত হইনি। আমার মতে চন্দ্রসূর্য্য যেমন প্রত্যক্ষ, বাকিগুলিও তাই। পূর্ণিমা অমাবস্যার ভরণের মতন সব গ্রহের শক্তিই এই পৃথিবীতে কাজ করে। রাষ্ট্রিক, সামাজিক, প্রাদেশিক, ব্যক্তিগত, সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টিই গ্রহের আছে। গ্রহসংস্থান দ্বারা ম্যালেরিয়া দূর হবে কিনা তারও বিচার হয়। ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প, যুদ্ধবিগ্রহ, আকস্মিক দুর্ঘটনার বিচারও হয়। আপনি পরীক্ষা করে' দেখুন, এইমাত্র আমার নিবেদন। আপনি ভক্তি না করুন, ভক্তি চাই না। পুরুষকার দ্বারা গ্রহখণ্ডন হয় কিনা, জানি না। আমার মতে হয় না। যার কোষ্ঠীতে ঐ খণ্ডনের ব্যাপারও আছে অন্য গ্রহের যোগে, তারই গ্রহখণ্ডন হয়, অন্যের হয় না। বিশ্ববিধাতা আমাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত করে' দিয়েছেন, জন্মের ষষ্ঠ দিনে নয়, মাতৃগর্ভে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। সেইটেই সুব্যক্ত হয় ভূমিষ্ঠকালে। গ্রহ যেন

ঘড়ি। ঘড়ির হুকুমে সময় চলে না, সময়ের তালেই ঘড়ি চলে। তবুও, ঘড়ি দেখেই সময় ঠিক করতে হয়। তেমনি গ্রহ বিধাতার উপর টেক্কা দেয় না, বিধাতার ইচ্ছাকেই গ্রহ প্রকাশ করে। কোষ্ঠী দেখে সেটা আমরা বুঝতে পারি। আমার এই বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়, সেটা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিন। গ্রহের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সম্পর্ক নেই। গ্রহ সকলের নিয়ামক। তবে হিন্দুরা এই শাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে' তাই জ্যোতিষ হিন্দুয়ানির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। আমি তর্ক করছি না, জানতে চাই যে, গ্রহ সত্যই বুজরুকির ব্যাপার কিনা? আপনার ন্যায় ব্যক্তি যে জিনিষটি উড়িয়ে দেন, সেটি অন্য পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান লোক কোন্ সাহসে আঁকড়ে আছেন? আমি সেইজন্য কোষ্ঠী বিচার করে' জানতে চাই যে, জ্যোতিষ সত্য কিনা? গোবর যে শুচি, এর প্রমাণ দেওয়া শক্ত, ওটা অভ্যস্ত সংস্কার মাত্র। কিন্তু, গ্রহ যে সত্য, এর প্রমাণ দেওয়া খুবই সোজা— বিচার করে' দেখলেই হ'ল। তবে কি পুরুষকার মান্‌ব না? মান্‌ব। সে এইভাবে, যেমন মুমূর্ষু রোগীরও চিকিৎসা করা হয়, সে মরবে জেনেও। আমার এত দৃঢ় করে' বলা স্পর্দ্ধা, কিন্তু স্পর্দ্ধা করছি না দাদা, আমার বিশ্বাসটা নিবেদন করছি মাত্র। আমার মনে হয়, যাচাই করে' দেখা ভাল যে সত্যি কিনা। ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই এতে।

আপনি ঠিক জানবেন, আপনার প্রতি আমার ভক্তি আছে। কেবল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে', আশ্রমের মুখ চেয়েই আমি নিজের বিশ্বাস নিয়ে আছি। নইলে, আপনি কি বিশ্বাস করেন দাদা, আপনার ডাক শুনবার পরও আমি নিজের গণ্ডীতে পড়ে' থাকতাম? যেদিন শ্রীগুরুদেবের ডাক শুনি, সেদিন কি আমার সংসার সমাজ আমাকে আট্‌কাতে পেরেছিল? সে সময়ে তখনকার অভ্যস্ত সংস্কার ও অভ্যাস কি আমি ছাড়িনি? আজকের এ দিনকে তার চেয়ে কম বলে' আমি

মনে করি না। আপনাকে আমি কারুর চেয়ে কম ভাবতে পারি না। তবে যে তর্ক করি, সেটা সত্যের সন্ধান পাবার জন্যে এবং আচারকে যে আঁকড়ে আছি, সে কেবল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার জন্যে। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার পূর্ণ পূজা আপনার চরণে দিতে পারছি না। আপনি কি আমার মন দেখতে পাচ্ছেন না দাদা? এই আচার নিয়মের দরুন আমার ইচ্ছামত অনেক কাজই হয় না— আমি অলস, আমার এই আচারের জন্য আমার ইচ্ছামত খাওয়া দাওয়া হয় না। এইজন্যে আচার আছে যে, হয়ত কোন না কোন দিন আমি আশ্রমে যেতে পারব। আশ্রমে আমার শ্রীগুরুদেবের স্মরণতীর্থে যেতে পারলে সেখানকার পাঁচজনের একজন বলে' গণ্য হ'তে পারলে— শ্রীগুরুদেবের শেষ ইচ্ছা সার্থক হবে। তবে যে ওঁদের আজ্ঞা অমান্য করে' আপনার কাছে এসেছি, এটা ওঁদের মতে অপরাধ, এবং আমার মতে আমার প্রাণের টান। আমি এ অপরাধ মেনে নিলাম। আমি যদি আচার ত্যাগ না করি, তবে ওঁদের এ ক্রোধ চিরদিন থাকবে না— অন্ততঃ বাইরে থেকেও আমার পূজা নিবেদন করা চলবে। এইজন্য আচার করি। আপনার সঙ্গে তর্ক করি এই বলে' যে, এগুলি সত্য নয় তা' আপনি কি প্রমাণে সাব্যস্ত করলেন? স্ত্রীআচার দেশাচার লোকাচারে গলদ্ আছে হয়ত। কিন্তু, স্মৃতির আচারের দোষগুণ বিচারসাপেক্ষ। আমি চাই, এর দোষগুণের সম্যক বিচার হোক। ভারতকে প্রকৃতিদেবী পর্ব্বত ও সমুদ্র দিয়ে অন্য দেশের থেকে পৃথক করেছেন। অন্যান্য দেশের বিশেষত্ব মরু, সাগর, পর্ব্বত, তুষার, শ্যামলতা, একা ভারতে সবই আছে। ভারতের রীতি নীতি অন্য দেশের থেকে পৃথক। শাস্ত্রও তাই। এক্ষেত্রে ভারত কেন তার স্বকীয় রীতি নীতি নিয়েই উন্নতির চেষ্টা করবে না, আমার এই অভিযোগ। যদি সে অশক্ত হয়ে থাকে, স্পষ্ট জবাব দিক, আমি এই চাই। তাই আপনার চিঠি আমি

রক্ষণশীলদিগকে পড়তে বলি এবং আপনাকে বারংবার খোঁচা দিয়ে দিয়ে চিঠি আদায় করি। আমি চাই যে, প্রাচীন ও নব্য ভারত তর্ক দ্বারাই হোক বা যেরূপেই হোক, একটা মীমাংসায় আসুক। পণ্ডিতেরা যা' বলবেন তারি অনুমান করে' আমি আপনাকে বলি। কিন্তু, দাম্ভিক পণ্ডিত যাঁরা তাঁরা তর্কই করবেন না, বলবেন, "স্মৃতির বাইরের কারু সঙ্গে স্মৃতির বিচার কেন করব ?" কিন্তু, এ দম্ভ অসার। আমি প্রাচীন ভারত বলতে মাত্র স্মার্ত্ত ভারতকে লক্ষ্য করে বলছি— কলির পূর্ব্ব যুগের ভারতকে নয়। যদি উপায় থাক্‌ত, আমার কাছে যে সব চিঠি আপনি লেখেন, তা' আশ্রমকে দেখাতাম। কিন্তু, নিরুপায়। তাঁরা গণ্ডীর বাইরের কোনো জিনিষ চোখে দেখতেও চাইবেন না।

আমি যে ঘরে বাইরে দোষী হয়েও এ সব চিঠি লিখছি আর চিঠি আদায় করছি, নব্য ভারত এর থেকে তার পথ চিনে নেবে। আমার উপকার না হোক, আমার দেশের আর সকলে উপকৃত হতে পারবে। সুতরাং আমার তর্ক দেখে আপনি আর কিছু মনে করবেন না। যদি আমি পণ্ডিত হ'তাম, বুদ্ধি করে' তর্ক করতাম।

আমার ক্ষুদ্র মাথায় যা' আসছে, তাই বলছি মাত্র। আমি স্মৃতি-শাস্ত্র মোটেই আলোচনা করি নি— মা ছেলেবেলায় ঊনবিংশতি সংহিতা প্রভৃতি একবার পড়তে দিয়েছিলেন, সে মনেও নেই। এটুকু মনে আছে যে, স্মৃতিসংহিতার বিধান আমাদের দেশাচার লোকাচারের নীচে চাপা পড়ে গেছে— আমরা ঠিক মনুর শিষ্য নই।... ...

আমি আপনাকে মানি, তাই আপনার সঙ্গে এত তর্ক করি। আপনি আমাদের হিন্দুসমাজের নাড়ীনক্ষত্র জানেন, আপনার কথার দাম আছে— এবং আপনার বিধান মেনেই বাংলার ছেলেরা চলছে— অবশ্য আপনার সদুপদেশগুলো বাদ দিয়ে। কেননা, আপনি পরমাত্মা মানেন, উপনিষদ মানেন, সাধনা মানেন, সংযম মানেন, ওরা তার ধার দিয়েও যায় না।

গ্রহ সম্বন্ধে দু'খানা বই,— আপনি দয়া করে' একটু চোখ বুলিয়ে দেখবেন এবং অন্ততঃ একজনের জন্মসময় আমাকে জানালে আমি সমস্ত ফলাফল এনে দেব, মিলিয়ে দেখে যদি ঠিক না হয়, আমি গ্রহকে আর মান্‌ব না। আমার মঙ্গলের জন্যই আশা করি আপনি এটা করবেন।

আপনার স্নেহের ওপর নির্ভর করেই আমি এত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করছি দাদা— রাগ বা বিরক্তির কথা মনে আনবেন না— দুটি পায়ে পড়ি।

প্রণাম নিবেদন ইতি

আপনার

সেবিকা

৩

শ্রীশ্রীহরি

বুধবার রাত্রি ও

বৃহস্পতি সকাল

শ্রীচরণেষু— শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন,

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণেও বলিয়াছেন,

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
"যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"

ইত্যাদি-

এগুলি আমার জীবনে আসা অসম্ভব বলিয়াই আমার চিরদিনের ধারণা। কিন্তু, এমন মানুষ তো চোখে দেখিতে পাইলাম। যেদিন শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করি, তখন জ্ঞানবুদ্ধি বেশী ছিল না। পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ছিল না, আনন্দে মাতিয়া আত্মহারা ভাবে দিন কাটিত। যখন তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, তখন আমি তো সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছি। তিনি ২৫।২৬ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর ৩৩ বৎসর বয়সে আমি চলিয়া আসি। তাঁহাকে এসব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখি নাই কখনো। তিনি গম্ভীর, সরস, সুন্দর, আনন্দময়, সরল ও করুণার্দ্র ছিলেন, কিন্তু, প্রয়োজনমত উগ্র কঠোরও হইতে জানিতেন। শক্ত শক্ত কথা বলিয়া মানুষের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিতে জানিতেন—কাঁদাইতে জানিতেন। তখন একটুও দয়ামায়া আসিত না। রাশভারি ছিলেন, কণ্ঠধ্বনি ছিল গম্ভীর।··· এগুলি দেখিয়াছি, কিন্তু, অত বিচার করিয়া কখনো দেখি নাই।

আমার মনে হয়, আপনার প্রকৃতি অধিকতর দৃঢ়, স্থির, আত্মনির্ভর, ও সহিষ্ণু। আপনি প্রশান্ত, আপনার করুণার—স্নেহের অন্ত নাই, কিন্তু, তাহার আবেগ প্রচ্ছন্ন। আপনার বল এত বেশী যে, সে বল-প্রয়োগের জন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন হয় না। না মিনতি, না দণ্ডপ্রয়োগ। আপনার কঠোর আদেশেরও প্রয়োজন নাই। মুখের অতি সাধারণ কথাই যথেষ্ট। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থা আছে বলিয়াই আপনি তার অপপ্রয়োগ দূরের কথা, প্রয়োগ করিতেও ইতস্ততঃ করেন। পাশুপত অস্ত্র ছিল বলিয়াই অর্জ্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছু হইয়াছিলেন, যাঁদের সে অস্ত্র ছিল না, যুদ্ধোৎসাহ তাঁদেরই ছিল বেশী। আপনার ধর্ম্ম আমি হয়ত গ্রহণ করিব না। আপনার চেয়ে আপনার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আমার অনুভবে আসে না। আপনি স্বয়ংই পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থ। আপনি নিজের চেয়ে বড় কোনো ইষ্টদেবতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন কিনা, জানি না। তাই,

আপনার চেয়ে আমার নিজের কল্পনাই ধর্ম্ম বিষয়ে আমার ভাল লাগে। আমি নিজের ইষ্টদেবতাকে নিজের চেয়ে বড় দেখি, নিজেকে দেখি হীন। আর, আপনার ইষ্টদেবতা যেন আপনার সম্মুখে প্রভাহীন হইয়া পড়েন। আমার তাই মনে হয়।··· আপনি আমার জননীর মতই ভোগবিরক্ত উদাসীন। প্রয়োজনীয় ভোগ্য বিষয় অনাসক্তভাবে গ্রহণ করেন। আপনার হৃদয় তাঁহারই মত কারুণ্য ও মমতায় বিগলিত। কিন্তু, তাঁর মত অসহিষ্ণু হঠাৎক্রোধী আপনি নহেন। আপনি বুদ্ধদেবের মত বলিতে শিখিয়াছেন, "আসক্তি ও প্রেম হইতেই শোক হয়, ভয় হয়। উহা হইতে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক নাই, ভয়ই বা কোথায় ?" আপনি আপনার প্রিয় দেবতা নটরাজের মতই সন্ন্যাসী ত্যাগী, অথচ অর্দ্ধনারীশ্বর। সে নারী আপনার অন্তরলোকবাসিনী। আপনি তাঁহার মতনই জ্ঞানী, ধ্যানী, যোগী, আবার সঙ্গীতকলারসিক, নটনাথ। আপনি কখনও মুসলমান ফকির, কখনও হিন্দু আর্য্য ঋষি, কখনও বা খৃষ্টান বিশপ। আপনি বলেন, আপনি গুরু নন, গুরুমশাই নন, পণ্ডিত নন,— কিন্তু, আপনিই যথার্থ আচার্য্য, শিক্ষক, অধ্যাপক। আপনিই পৃথিবীর দৈহিক মানসিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল রোগের চিকিৎসক। আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। শূদ্রও আপনি। যখন আপনি জ্ঞানদাতা, তখন ব্রাহ্মণ। যখন পালক ও শাসক, তখন আপনি ক্ষত্রিয়, চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম, সম্রাট। যখন কৃষিশিল্পের উদ্ভাবক তখন বৈশ্য, যখন সেবাধর্ম্মশিক্ষক তখন শূদ্র। আপনি এত নিরাসক্ত অথচ এমন স্নেহকরুণ! আপনার টেলিফোনের কথাগুলি এমন স্নেহ ও করুণার অমৃতমাখা! কি সৌভাগ্যে আপনাকে আশাতীত কল্পনাতীত রূপে পাইলাম, কি দুর্ভাগ্যের দুর্ভোগে হারাইতেছি ? আমার শৈশবে আপনি একজন সাধারণ লেখক বলিয়া গণ্য হইতেন, কিন্তু, তখনি চিরসুন্দর বলিয়া আপনার খ্যাতি ছিল। আপনি সৌন্দর্য্যের জনক, লক্ষ্মীর জনক। আমি আপনার বিরুদ্ধ পক্ষের কথাই চিরদিন শুনিয়া

আসিয়াছি, স্বপক্ষের কথা শুনিতে পাই নাই। কি মায়ামন্ত্রে আমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিলেন! আজ আপনি লেখক নন, হয়ত কবি, কিন্তু সে কোন্ কবি? কালিদাস কি? কদাচ নয়। কলিদাসের সঙ্গে আপনার তুলনা আপনার পক্ষে অবমাননাকর। আপনি কবি-সার্ব্বভৌম। এ উপাধি দিয়াছেন যিনি, তাঁর বুদ্ধিকে আমি বিস্ময়ভরে নমস্কার করি। সৌন্দর্য্যের, রসের, আনন্দের, প্রেমের, জ্ঞানের, কর্ম্মের, বুদ্ধিমত্তার, প্রাণের যেদিক দিয়াই হউক, আপনি প্রত্যেক ভূমিরই রাজা। আপনি কবির বিশেষ শক্তি দিয়া সব কিছু সৃজন করেন, রক্ষা করেন, আবার বিনাশও করেন (যিনি বন্ধমোক্ষরত, তিনিই কবি।) আপনি অনন্ত-কর্ম্মা, অনন্তরূপ। আপনি যে কি, কি যে নন, তা' তো বুঝিতে পারি না। এতদিন আপনি আমার অদেখা হইয়া কোথায় লুকাইয়া ছিলেন?··· আমার শ্রীগুরুর যে সকল সদ্‌গুণে আমি আকৃষ্ট, তাহার অনেকটাই আপনার হৃদয়-প্রসূত। এ কথা আশ্রম হয়ত স্বীকার করিবেন না—আমাকে দোষ দিবেন।···

আপনি নরদেহে ভগবৎবিভূতি, তাই আপনি বিশ্বের পরমাত্মীয়। আপনাকে কেহ স্বীকার করুন আর না'ই করুন, আপনি নিজমহিমায় চিরবিরাজিত। আপনি যদি হিন্দু আচারনিষ্ঠ হইতেন, বিশ্ব বঞ্চিত থাকিত। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মনিষ্ঠ হইতেন, নটরাজের বন্দনাগান হইত না—মানবরূপী ভগবান আপনাকে ধরা দিতেন না। সেদিন যখন আপনার অমৃতকণ্ঠে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র শুনিলাম, মনে হইল, কলির অতীত কোনও যুগে আসিয়াছি, মহর্ষির দর্শন পাইয়াছি। সেই পুণ্য মন্ত্রের সুমধুর ধ্বনি আমার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন তাহা বিস্মৃত না হই।···

আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, তাই আশঙ্কা হয়, আপনাকে বুঝি বা ভুলিয়া যাইব। কিন্তু,আমার লেখাগুলি জাগ্রত থাকিয়া সাক্ষ্য দিবে

যে, জীবনের কোনো এক অবসরে, আমি সারা জীবন যে রসের পিপাসু, তার উৎস খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম, খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। আমার শ্রীগুরুকে আমি আপনার হৃদয়নন্দনেরই অমূল্য পারিজাত বলি, অথবা আপনার হৃদয়কুঞ্জের মঞ্জুতুলসী। তিনি যখন তাঁহার হৃদয়দয়িতের কণ্ঠলগ্ন হইলেন, তখন তাঁহার জন্মস্থান হইতে ছাড়াছাড়ি হইল। তাঁর নবজীবন-ধারা নূতন খাতে বহিল, তথাপি তাঁর চলন বলন, সৌন্দর্য্যজ্ঞান কবিত্ব, ভাবুকতা, প্রেম, রস, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া তুলিলেও এ কথা ভুলিতে দিল না— যে, অমুক কাননকুঞ্জে তাঁহার জন্ম। তাঁর শৈশবের— বাল্যের কুলাচরিত প্রথায় সংপ্রাপ্ত শ্রীগৌরগোবিন্দ-উপাসনা সেদিন নবভাবে নবরূপে সুন্দর হইয়া উঠিল, যেদিন তিনি আপনার কাব্যরস পান করিলেন। আপনার "অন্তর্যামী" "জীবনদেবতা" আর তাঁর হৃদয়দয়িত ও প্রাণেশ্বরী সেদিন এক হইলেন। তাহার বহুকাল পরে, সংসারের নানা দুর্ব্ব্যবহারে তিনি যখন কাব্যের পুষ্পহার খুলিয়া ফেলিয়া কঠোর কর্ম্মের স্বর্ণশৃঙ্খল পরিলেন, তাঁর তখনকার রূপ আমার কাছে সুস্পষ্ট না হইতেই আমি চলিয়া আসিয়াছি। সেই চিরকিশোরের কৈশোর যৌবনকে না ছুঁইতেই প্রৌঢ়ত্ব তাকে গ্রাস করিল।··· ··· আজ সেই কাব্যের উৎসকে অকস্মাৎ অভাবনীয় রূপে পাইয়া আমি যত্ন করি নাই, জড়ত্বের তামসিকতার আয়েসে চক্ষু মুদিয়া চণ্ডু টানিতেছিলাম, ইত্যবসরে কোন্ কঠোর হস্তের টানে আমার ধন চলিয়া যায়! এ জন্মে আর আপনাকে দেখা, আপনার কথা শোনা, আপনাকে জানা চেনা আমার হইল না। আমার জীবন অসমাপ্ত সৌভাগ্যে, সুসমাপ্ত দুর্ভাগ্যে পূর্ণ রহিয়া গেল।— তবুও মনে রাখিবেন, আমি যতই কেননা অধম হই, আমি আপনার। কারণ, আমি আমার শ্রীগুরুর যে আনন্দসৌরভে মত্ত হইয়াছিলাম, তাহা শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গ-বাহিত হইলেও তাহার মূল বনিয়াদের অনেকখানি আপনারই হৃদরণ্য-প্রসূত। সেই গন্ধ ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আপনাকে পাইয়া গিয়াছিলাম,

রাখিতে পারিলাম না— নিজের কর্ম্মদোষে। আপনি আমার নন, আপনি বরঞ্চ ঐ য়ুরোপীয়দেরই। কিন্তু, আপনার বুকের অন্তস্তলে সেই কৃষ্ণতুলসীর শিকড় এখনো বর্ত্তমান— যার মঞ্জুরী একদিন শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের বনমালাবৈজয়ন্তীর স্তবকে দুলিয়াছিল, আর শোভিত হইয়াছিল কনক-কিশোরীর দুটি চারুকর্ণে। আপনার মর্ম্মের সেই তুলসীমূলটুকু যেন বিল্ব বট অশ্বত্থ সহকারের শিকড়ের চাপে মরিয়া না যায়, এই আপনার সেবিকার শেষ নিবেদন।...

আপনি বিশ্বাস করুন, ব্রজের প্রেম কামনাদুষ্ট নহে। যাঁহারা তার নিতান্ত স্থূল দিকটা খুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে প্রণতি নিবেদন করিয়াও আমি আপনাকে জানাই, ব্রজের প্রেম কিরূপ। তাহা জানিতে হইলে পূর্ণব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপকিশোরের জীবনী যেন আলোচনা করেন। অর্থাৎ তাঁহার ভক্তভাবগত জীবনী নয়, স্বকীয় আনন্দময় জীবনী। শ্রীগৌরাঙ্গ যে অংশে পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, ভক্ত, যে অংশে তিনি শ্রীকৃষ্ণোপাসনামগ্ন, সে অংশে নয়,— যে অংশে তিনি প্রিয়মণ্ডলীকে লইয়া ব্রজের লীলানুকরণ করিতেছেন, রাসে, দোলে, ঝুলনে, শারদীয় রাসে,— সেইখানে দেখিবেন, তিনি পূর্ণ সংযমী, অথচ প্রেমের অফুরাণ অক্ষয় মানসসরোবর। আপনি আমার ঠাকুরকে এ দিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বাস্তবিক লালসাদুষ্ট নহে। নিরুপাধি প্রেমই তাহার বিশেষত্ব। সে প্রেম নিষ্কাম। ব্রজকিশোরকিশোরীদের চঞ্চলতা ছিল গৌণতম, প্রেমই ছিল মুখ্য। সেই যে প্রেম, তাহা অনাদি অনন্ত নিত্য সত্য সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মেরই অনুকরণ। সেই পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, হিরণ্ময় পরম পুরুষ। তিনি একাধারে নারী ও নর। তিনি আত্মারাম। তিনি রস ও আনন্দের নিত্য উৎস। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, কিন্তু "কর্ম্মকার" নহেন— তাঁর কর্ম্মও কাব্যেরই রূপান্তর। আমার এ কথার সাক্ষ্য পাইবেন শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতের এই শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলেই।

“রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ
একাত্মানৌ অপি, ভুবি পুরা দেহভেদৌ গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্‌দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥”

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি, অতএব উভয়ে একাত্মা। একাত্মা হইয়াও ভূমণ্ডলে অবতরণকালে দেহভেদে দ্বিধা হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ দুই এক হইয়া চৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন। সেই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকে প্রণাম করি।......

আমি আপনাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করার স্পর্দ্ধা রাখি না। আমি শুধু বলি, আপনি যেন অনুকূলনেত্রেই ইঁহাকে দেখেন— প্রতিকূল না হন। আপনি যেন বিশ্বাস করেন, যে, আসল বৈষ্ণবধর্ম্ম যাহা, তাহা প্রকৃতপক্ষে কামনাকলুষিত নয়। তাহার অনুশীলনে নির্ম্মল ভগবৎপ্রেমানন্দ প্রাপ্তি হয়। আপনার অন্তরও তাহাই চায়, ভাবিয়া দেখিবেন। আমি নিজদোষে বঞ্চিত বলিয়া ধর্ম্ম দোষী নন। আমার ইচ্ছা করে, আমার সতীর্থগণ যাঁরা প্রকৃত নির্ম্মল ভক্তিমান্— তাঁহারা দেশে দেশে এই মঙ্গলবার্ত্তা প্রচার করুন। কিন্তু, তাঁহারা “প্রচার” ভালবাসেন না। যাক্।··· আমি একে দীনহীন মলিন, অলস জড় অকর্ম্মণ্য ও কামনাকলুষিত, তাহাতে আবার বন্দী। আমার বন্ধন কেহ দয়া করিয়া যদি খুলিয়া দেয়, তবে আমিও প্রাণস্পর্শে নির্ম্মল হইব, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য। আমাকে ছাড়িয়া দিক, আমি একবার দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া আসি। কিন্তু, যতদিন বাঁচিব, আমার নিত্য কারাদশা ঘুচিবে না। আমি মুক্তি পাইব না।

“গৌরনামের জয়পতাকা
উড়াইব দেশ বিদেশে”

এ বাসনা সফল হইল না। যাঁহারা এ কাজ করিতেছেন, সেই শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণ, তাঁহাদিগকে আমি বন্দনা করি, তবুও বলি, আসল জিনিষের সন্ধান তাঁহারাও পান নাই। তাঁহারাও বাহ্য অনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত,—প্রকৃত সন্ন্যাসীর বাহ্য অনুষ্ঠান স্বল্প, ভাবই বেশী।

"প্রতি পুষ্প ধ্যানে করেন
কৃষ্ণে সমর্পণ।"

দিল্লীর বাজারের জিলাপীগুলি ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণসাৎ করিয়া দিলেন। বিশ্বের সর্ব্বত্র— "বন দেখি মনে হয়
এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে পড়ে
এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা
মানয়ে কালিন্দী।"

এই দৃষ্টি লইয়া, এই ভাব লইয়া যিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রজলীলা দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। তাঁর বাহ্যানুষ্ঠান কমিয়া যায়। পরিব্রাজক হইবার বাধা তাঁহার থাকে না। আনন্দ তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে সহজ। আজ তবে আসি।—

... ... ১

প্রণাম।

নিবেদন ইতি

আপনার সেবিকা

---

১ শেষাংশ বর্জিত। তিনখানি পত্রের অন্য কোনো অংশ বর্জিত হয় নাই।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের সহিত পত্রব্যবহার প্রসঙ্গে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী (জন্ম ১৩০১ বঙ্গাব্দ) এক স্থানে লিখিয়াছেন—

'আমি যে ঘরে বাইরে দোষী হয়েও এ সব চিঠি লিখছি আর চিঠি আদায় করছি, নব্য ভারত এর থেকে তার পথ চিনে নেবে। আমার উপকার না হোক, আমার দেশের আর সকলে উপকৃত হতে পারবে।'

বস্তুতঃ শেষ জীবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রধারার মধ্যে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী কেবল যে সংখ্যাগৌরবেই বিশিষ্ট এমন নয়, রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ও আত্মপরিচয়ের ব্যাখ্যানের দিক দিয়াও একটি স্বতন্ত্র স্থান ও মর্যাদা অধিকার করিয়া আছে।

'আমার যা শেষ কথা তা আমাকে বলে যেতেই হবে'— মতে স্বতন্ত্র কিন্তু শ্রদ্ধায় অনুগত পত্রলেখিকার সহিত বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের সেই 'শেষ কথা' বিশেষ একটি দীপ্তি ও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইয়াছিল। জানা যায়— 'আচার বিচার' নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই ইহার অনেকগুলি পত্র গ্রন্থাকারে সংকলনের কথা হয়, সেজন্য কবি-কর্তৃক সম্পাদিতও হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, তবে প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১]

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পত্রব্যবহারের ও সাক্ষাৎ-পরিচয়ের যে বিবরণ, আমাদের নিকট প্রেরিত তাঁহার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রচনায় লিখিয়া দিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ অতঃপর মুদ্রিত হইল।—

আমি যখন কলিকাতায় পতিগৃহে তখন পারিবারিক ও অন্যবিধ অশান্তিতে কাতর হয়ে সাহিত্যের আশ্রয় নিই। আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলাম আমাদের পরিবারের মতের বিরুদ্ধে। এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে যাবার অনুমতি পাবার জন্য বহু চেষ্টা করেও অনুমতি পেলাম না। সেই উপলক্ষ্যে একটা দারুণ বিক্ষোভ ও অশান্তি চলছিল। বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করবার জন্য আমি অন্য পথ ধরলাম।

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও সঞ্চয় পড়ি, তাঁর কবিতা ও গান কিছু কিছু পড়া ছিল— অকস্মাৎ তাঁর একটি নূতন পরিচয় আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং আমার মানসিক অশান্তির সময় আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় উদ্‌বেল হয়ে তাঁকে একখানি পোস্টকার্ড্ লিখি— 'যোগাযোগের গ্রন্থকারকে অজস্র নমস্কার'— নিজের নামঠিকানাহীন পত্র।— তার পর তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, নিজের ছদ্মনাম 'জোনাকি' নামে, অন্য একটা ঠিকানা দিই। এ চিঠির উত্তরে[২] তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়ে খুশি হই। তার পর একটি কবিতা প্রার্থনা করি, এবং জানতে চাই, তিনি কার উদ্দেশে কবিতা লেখেন, ভগবান্ না মানুষ। উত্তরে কবিতাটিই পাই শুধু, কবিতাটির নাম 'নীহারিকা'।[৩]

এর পর থেকে নানা প্রশ্ন করে করে চিঠি লিখতে থাকি এবং উত্তরও পাই।

'আপনি এমন কবি ও ভাবুক হয়েও বৈষ্ণবধর্ম্মকে কেন সমর্থন করেন নি, এবং সাকার-উপাসনার বিরুদ্ধে বলেন কেন?' —এই একটি প্রশ্ন।

কবিগুরুর সঙ্গে আমার প্রথম পত্রালাপের সময় আমার একটি উপনাম 'জোনাকি' ও আমার রাশিনাম 'দক্ষবালা' এই নাম দুটির অন্তরালে আমার পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়, আমার

মনে তখন পরিতাপের উদয় হল, এই প্রাচীন প্রবীণ পূজনীয় ব্যক্তিটির সঙ্গে কপট ব্যবহার করেছি বলে', অভিভাবকদের ভয়েই[৪] অবশ্য আত্মপরিচয় দিই নি তখন। কিন্তু এখন সমস্ত ভয়-সংকোচের বাধা ঠেলে ফেলে একদিন তাঁকে নিজের পরিচয় আর প্রচলিত নামটি জানিয়ে দিলাম পত্রযোগে।

কবি আষাঢ় মাসে কলকাতায় এলেন। আমার ভাই[৫] গিয়েছিলেন দেখা করতে। কবি বললেন, 'বীরেন্দ্রকিশোর, তোমার দিদি ইস্কুল-কলেজে পড়েন নি, কিন্তু তাঁর লেখা দেখে তা বোঝা যায় না' ইত্যাদি, আমাকে একবার দেখতে চাইলেন। আমার ছেলে, বাড়ির অন্য সকলের প্রতিকূলতায় পাছে বিঘ্ন ঘটে এজন্য অন্য সকলের অগোচরে, ২৪ আষাঢ় ১৩৩৮ [৯ জুলাই ১৯৩১] আমাকে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় যান, সেই প্রথম দর্শন। সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমার জীবনে একটি স্মরণীয় পরিবর্ত্তন আসে। নানা কথা, সব মনে নেই; আমি জপ করে থাকি শুনে স্মিতমুখে বললেন, 'আমিও জপ করি'— তার পর কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক এমন করে আবৃত্তি করলেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

প্রণাম করে যখন উঠে আসি, মনে হয়েছিল, আমি তীর্থস্নান করে উঠলাম।

১ প্রবাসীর 'পত্রধারা' সংগ্রহ করে বই ছাপাবার চেষ্টাও হয়েছিল কবি বেঁচে থাকতেই। কিন্তু বিরুদ্ধ অনেক কথা সাধারণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে ব'লে সে চেষ্টা তখন স্থগিত রাখা হয়।

—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। কবি-কথা (১৯৫১) পৃ ১৮

অপিচ উক্ত গ্রন্থে বর্তমান 'পত্রধারা' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পৃ ৪৭-৪৮

২ বর্তমান সংকলনের প্রথম পত্র।

৩ এই কবিতাটি ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত ও পরে 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে সংকলিত। রচনা: ১ এপ্রিল ১৯৩১।

৪ আমার অশিক্ষিত মনের স্পর্দ্ধায় তাঁরা অসন্তুষ্ট হতে পারতেন, কেননা, আমাদের বাড়ির কর্তৃপক্ষ এবং আমার মামাশ্বশুরবাড়ির সকলেই পূজনীয় কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিধিনিষেধ ছিল না তাঁদের মধ্যে। কিন্তু আমার মত মূঢ় গ্রাম্যবধূর অসম্ভব ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধা তাঁরা সইবেন কি করে, এই ভয় আমার মনে ছিল।

—লেখিকা

৫ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ময়মনসিংহ গৌরীপুরের সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী দেশপ্রেমিক ব্রজেন্দ্রকিশোরের পুত্র ও শ্রীহেমন্তবালা দেবীর অনুজ।

২

শ্রীগুরুদেব বহুদিন পূর্ব্বে অন্তর্হিত। তাঁর স্মৃতি শোকস্মৃতি। এবংবিধ মনের অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়া কবিগুরুর কাছে আসি। কবিগুরু আমার নিকট হইতে কিছুই পান নাই বা প্রত্যাশাও করেন নাই, তিনি আমার ক্ষুধিত পিপাসিত বঞ্চিত চিত্তকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছিলেন; কিছু সৌহার্দ্দ্যের, কিছু করুণার, কিছু স্নেহের আস্বাদ দিয়াছিলেন। আমি শ্রীরাণী মহলানবিশ, শ্রীরাণী চন্দ, শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী এবং অন্যান্যদের মত উঁহার সেবাযত্ন শুশ্রূষা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করি নাই।... আমি বাহিরের লোক, মাঝে মাঝে আসিয়া চোখের দেখা দেখিতাম ও বিশ্রামভঙ্গ করিয়া বিরক্ত করিতাম, তাঁর কোনো কাজেই আসি নাই।

উঁহার সংস্পর্শে আমি মুক্তির আনন্দ পাইতাম। তাই নানা কৌশলে পত্র আদায় করিতাম। জোড়াসাঁকোয়, বরানগরে, খড়দহে, বেলঘরিয়ায় মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা করিয়াছি। পুত্রকন্যা বধূজামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে করিয়াও আসিয়াছি। আমার মত ঘোর বিরুদ্ধপক্ষীয়া, অশিক্ষিতা, শিষ্টাচারে অনভিজ্ঞা, মূর্খ স্ত্রীলোককে তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া যাবতীয় দোষত্রুটি-সমেত সহ্য করিয়াছেন, আজ সে কথা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিতা হই।

দেশ কাল পাত্র, শিক্ষা ও মতামত, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মমত ও বয়স—প্রত্যেক বিষয়েই আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল। তবু তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষা কখনোই বাধাগ্রস্ত হয় নাই। বুদ্ধির দোষে কত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তাহাও সহ্য করিয়াছেন। আমার সন্তানদের কথা ভাবিয়াছেন, আমার কন্যাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিয়াছেন। এত বেশী ব্যবধানের দূরত্ব অক্লেশে অতিক্রম করিয়া তিনি আমাদের পরিবারের পরমাত্মীয় সমব্যথী দরদী বান্ধব হইয়াছিলেন, কত সময়

কথালাপে বিক্ষুব্ধ মনকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিতেন। কত হাস্য পরিহাস করিয়াছেন, সদুপদেশ দিয়াছেন, এমন-কি অর্থসাহায্য পর্য্যন্ত করিয়াছেন, তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা অবহেলা কখনো করেন নাই। আমার কোনো দিনলিপি রাখার সুবিধা ছিল না বলিয়া যথাযথ বিবরণ অবিকল দিতে পারিব না মনে করিয়া আমি বিশেষ কিছু লিখিতে সংকোচ বোধ করি।

যে ধর্ম্মনিষ্ঠা লইয়া তর্কবিতর্ক ছিল, তাহার পরিণামে এক সময়ে আধ্যাত্মিক অভিভাবকেরা আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া সাময়িক বিচ্ছেদ আনয়ন করেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে নিজের ধর্ম্ম নিজেই আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। সে ভবিষ্যদ্‌বাণী কিছুটা ফলিয়াছে, আমি এক রকম করিয়া মনের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু তিনি এখন তাহা জানিলেন না।

—শ্রীহেমন্তবালা দেবী

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হেমন্তবালা দেবীর নিকটে যেভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অপ্রকাশিত নানা রচনায় তাহারও আভাস পাওয়া যায়। বর্তমান পত্রধারার পরিপ্রেক্ষিতে সেরূপ একটি রচনা বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ও অনুধাবনযোগ্য মনে হয়, এজন্য পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় উহা সংকলিত হইল।—

আজ সমস্ত সভ্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কোন্ রবীন্দ্রনাথ? মানুষ দোষে গুণে সংগঠিত। তাঁহার মধ্যে সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক, মিশ্র, নির্‌গুণ ও বিশুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট এই সমুদয় সত্তাই বর্ত্তমান। কিছু বা জাগ্রত, কিছু বা সুপ্ত। মানুষের আচরণে, বচনে, চিন্তায় এবং কর্ম্মে তাহার আপন বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে এবং কিছু পরিমাণে বৈশিষ্ট্য সে স্বেচ্ছায় অপ্রকাশিত রাখে, আর কিছু পরিমাণ বৈশিষ্ট্য তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। আমার জ্ঞানে কৌতুকপরায়ণ, মজলিসি স্বভাব -বিশিষ্ট, আপনাকে অতিরঞ্জনে প্রকাশশীল, এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। তিনি অহেতুক পরচর্চ্চাকেও অনুপম বৈদগ্ধ্যের স্তরে উন্নীত করিয়া সভারঞ্জনে সমর্থ। আপাতদৃষ্টিতে (কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখিয়া প্রবঞ্চিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনাও আছে) তিনি বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি বৈষয়িক, তিনি কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন, তিনি বিপক্ষ জনকে সহজে অব্যাহতি দেন না। তর্ক-বিতর্কস্থলে তিনি বাক্যকৌশলে সূক্ষ্মরূপে মানুষকে আহত করিতেও জানেন। তিনি আপনাকে গোপন করিয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপে অভিব্যক্ত করিতেও পারেন— তিনি অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে, কিছুই তাঁহার পছন্দ হয় না, তিনি মানী এবং আত্মগৌরবে পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের চক্ষে তাঁহার নিজের সমস্তই যেন ভাল। তিনি গর্ব্বিত, অত্যন্ত অভিমানী, আবদার-পরায়ণ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু। তিনি অভিজাতসন্তান, সুতরাং সমাজের উচ্চস্তরে আসীন থাকিয়া নিম্নস্তর সমূহকে বুঝিবা অবজ্ঞা করিতেও পারেন।

দ্বিতীয় এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। তিনি সারগ্রাহী, গুণগ্রাহী, দোষবর্জ্জন ও গুণঅর্জ্জনে যত্নশীল, তিনি সতত আত্মসংশোধনে ও সাধনায়

তৎপর, তিনি পরোপকারী অনলস কর্ম্মযোগী, তিনি স্বার্থত্যাগী, তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য ক্ষমা দয়া সাম্য প্রভৃতি গুণ -বিশিষ্ট, তিনি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, তিনি আত্মবিচারপরায়ণ, আত্মসংযমী, তিনি আত্মবিশ্লেষণকারী, আত্মশাসকও বটে। তিনি নিরাসক্ত গৃহী, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতা পতি বন্ধু প্রভু ভূস্বামী প্রভৃতি। এক কথায় ইঁহাকে কর্ম্মযোগী বলা যায়। ইনি পরোপকারিতাকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় এক রবীন্দ্রনাথ। যিনি সুকোমল ও সুকুমার, স্পর্শকাতর, অকৃত্রিম সরল প্রীতিস্নেহানুরক্ত, বিশ্বপ্রেমিক, প্রকৃতিপ্রেমিক, পুষ্পপ্রেমিক, যিনি মাতৃস্নেহলাভে বঞ্চিত তাই অতৃপ্ত, যিনি বন্ধুপ্রীতি ও আত্মীয়প্রীতির আদান প্রদানে কৃতার্থ হইয়াও অধিকতর আকাঙ্ক্ষা -পরায়ণ, যিনি সুশীল, সুরুচিসম্পন্ন, বিদগ্ধ, বিদ্বান, পণ্ডিত, মেধাবী, বাগ্মী, গুণী, যিনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, নিজে সুন্দর, অপরকেও রুচিরসুন্দর দেখিতে চাহেন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, সুগায়ক, রচয়িতা, সভামণ্ডনকারী, সুসভ্য, সুসংস্কৃত, সুন্দরস্বভাব, সুস্বর ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি রূপে গুণে সমসাময়িক সকলের হৃদয়রঞ্জনকারী প্রিয় সুহৃদ।

চতুর্থ এক রবীন্দ্রনাথ। যিনি অদ্ভুতস্বভাব, কখনো আত্মকেন্দ্রিক, বর্ম্মাবৃতচিত্ত। এ ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে গুটাইতেই ভালবাসেন, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের সহিত মনোভাববিনিময়ে অনিচ্ছুক, সাম্যমৈত্রীবিহীন, যার তার সহিত সর্ব্বদাই দহরম-মহরম করিতেও অসমর্থ। অথচ দরিদ্র অবহেলিত পীড়িত শোকার্ত্ত কোনো অতিতুচ্ছ জনেরও সেবা শুশ্রূষায় নিজমর্য্যাদা ভুলিয়া স্বহস্তে সকল প্রকার ক্ষুদ্রকর্ম্ম তুচ্ছকর্ম্ম -সম্পাদনেও তৎপর। তাহাদের দুঃখে তিনি অশ্রুল, অথচ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-শোকেও শোকপ্রকাশে কুণ্ঠিত ; আপনার ব্যথা অপরকে জানিতে দিতে চান না— এই ভাব। এক দিকে তিনি অতিতুচ্ছ জনেরও আপন, অন্য দিকে তিনি বিখ্যাত মহাজনেরও কেহই নহেন। এবম্বিধ অদ্ভুত স্বভাবকে সহজে

কেহই সম্যক্‌রূপে চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে, আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ নহে। কেননা কখন যে তিনি আকর্ষক এবং কখন যে বিকর্ষক হইবেন তাহা সহসা উপলব্ধি করা সহজ নহে। সুতরাং তাঁহার চরিত্র কাহারও বোধগম্য হইতে পারে না। কৌতুকচ্ছলেও এই ভাবে তিনি আপনাকে রহস্যময় করিয়া রাখেন। প্রসাদ বা অপ্রসাদ, সংশয় থাকিয়া যায়।

পঞ্চম এক রবীন্দ্রনাথ। তিনি ভাবুক, শিল্পী, কবি। তাঁহার কর্মও কবিত্ব, রচনাও কবিত্ব, জীবনও কবিত্বপূর্ণ। তিনি বহুবল্লভ, তাহাও কবিত্বের জন্য— তিনি ঐকান্তিক, একনিষ্ঠ, তাহাও কবিত্বের জন্য। তাঁহার হাস্য রোদন কবিত্বের জন্য। কবিতাই তাঁহার জীবনের সারাৎসার। তাঁহার সঙ্গীত এই কবিতাকোরকেরই পুষ্পিত পরিণতি। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ আপনাকে অন্তরালে রাখিয়াছেন, কিন্তু কবিতায় ও সঙ্গীতে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে, তাঁহার সঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র জীবন প্রস্ফুটিত বিকশিত হইয়া সুপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার ভাবনা কল্পনা ও পরিবেশ-রচনায় তাঁহাকে কাব্য-বিলাসী, পদ্মমধুপায়ী, শৌখীন, ভাবুক বলিয়াই যেন মনে হয়।

ষষ্ঠ এক রবীন্দ্রনাথ। নিতান্তই পারিবারিক, স্নেহার্দ্রহৃদয়, শোক-দুঃখ-কাতর, স্নেহপাত্রের কল্যাণকামী, বিধুরহৃদয়, অতিপেলবস্বভাব। আত্মীয়স্বরূপে তিনি সকলেরই সুহৃদ্‌, হিতাকাঙ্ক্ষী, পরম বান্ধব।

সপ্তম এক রবীন্দ্রনাথ। ইনি আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন-পন্থী সাধকগণের সাধনার সার সংগ্রহ করিয়া এক অভিনব ভাবের প্রবৃত্তিতে শান্ত দাস্য সখ্য ও মাধুর্য্য রস -সাধনায় ব্রহ্মের একান্ত উপাসক। ব্রহ্ম তাঁহাকে জগজ্জনক, জগজ্জননী, বিশ্বরাজ, গুরু, প্রভু, প্রতিপালক, দণ্ডদাতা শিবরুদ্ররূপে— অথবা সুন্দর, বিদগ্ধ, সুকুমার, বন্ধু, প্রেমিক হৃদয়-বল্লভ রূপে দেখা দিয়াছেন। এই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রূপে, আপন হৃদয়ের অন্তর্য্যামী রূপে এবং সর্বত্র প্রকাশিত অসংখ্য সীমাবদ্ধ

বস্তুরূপসমূহের মধ্যে অসীম অব্যক্ত অথচ সুসঙ্গত সুষম সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূপে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বাস্তববাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি -সম্পন্ন ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে সংশয়ী হইয়াও ভাবনেত্রে শ্রীভগবানকে সমস্ত মানুষের মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, সহসা বিজলীচমকে ক্বচিৎ উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন। গুণীর গুণের মধ্যে তাঁহার গুণগরিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কর্ম্মীর কর্ম্মে, ত্যাগীর ত্যাগে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, প্রেমিকের প্রেমে, সকলের সমস্ত সদ্‌গুণের মধ্যে, তিনি তাঁহারই সদ্‌গুণের বিকাশ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন। আবার মানুষের ও প্রকৃতির অধর্ম্মাত্মক প্রলয়াত্মক বিভীষিকাময় বীভৎসরূপের মধ্যেও তিনি ব্রহ্মেরই প্রলয়ঙ্কর ভীষণ রুদ্ররূপ দেখিয়াছেন। এখানে তিনি সাধক, তপস্বী, মরমিয়া ভক্ত। তাঁহার ব্রহ্ম সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মা, ভীষণ ও মধুর।

অষ্টম এক রবীন্দ্রনাথ। যিনি তুষ্ণীম্ভূত, নিমীলিতনেত্র, মৌনী, বিবিক্ত, চিন্তাশীল, একক। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি আছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। তিনি কি ভাবে নিমগ্ন, তিনিই জানেন।

আর এই-সমস্ত রূপেরই যথাযথ সংমিশ্রণে এক রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি, যিনি অতিথি অভ্যাগত আগন্তুকের প্রতি গৃহকর্ত্তা রূপে অথবা সমাজনেতা রূপে, কিংবা পরিব্রাজক অবস্থায় আপনিই অন্যের গৃহে সম্মানিত অতিথি অভ্যাগত আগন্তুক রূপে, সাধারণভাবেই মানুষের সহিত সামাজিকতা শিষ্টাচার ভদ্রতা ও সৌজন্যের আদান প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে তিনি সকল সময়ে অকৃত্রিম হইতে পারেন না। দেশকালপাত্রানুসারে তাঁহাকে আত্মরচনা ও আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ একাধারে বাস্তববাদী, দেশকালপাত্রজ্ঞ, এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক অনুভবী।

এবং আমি মনে করি এই সমস্ত বর্ণনার পরেও আরও অনেকবিধ রবীন্দ্রনাথ আছেন, যাঁহাদের কথা এখন আমার স্মরণে তেমন করিয়া আসিতেছে না, যেমন— রোষদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ, মৌনী, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ক্রোধের ঈষৎ উপক্রমে তাঁহার অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নৈর্ব্ব্যক্তিক তিরস্কার।

ফলকথা রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে যুগপুরুষ— তিনি আন্তর্জ্জাতিক, আন্তর্দ্দেশীয়, নিরপেক্ষ, ন্যায়ের এবং অন্যায়ের নবীন ভাষ্যকার, নূতন-দৃষ্টি-ভঙ্গী-সম্পন্ন পরমবিস্ময়জনক তিনি, বিশ্বের সকলের তিনি আপনজন। তিনি ব্রাত্য, অনাচারী হইতে কার্য্যতঃ বাধ্য, কেননা তাঁহাকে সকলেই আত্মীয়রূপে লাভ করিতে চায়— তিনি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধ্য। তাঁহার খাদ্যাখাদ্যবিচার থাকা সম্ভব নহে, কেননা পৃথিবীবাসী জনগণের গৃহে তিনি অতিথি। তাঁহার ইষ্টদেবতাকে বিশেষ স্থান কাল পাত্র গুণ অবস্থায় আবদ্ধ করিয়া বিশেষ নামে রূপে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের উপাস্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গণ্ডীবদ্ধ রাখাও তাঁহার সাধ্যাতীত। কেননা তিনি যে সকলেরই আত্মীয়। পৃথিবীর সকল ভাষায় ঈশ্বরকে অসংখ্য নাম গুণাদি দান করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পৃথিবীর মানুষ দেশ-কাল-পাত্র-স্বভাব-ভেদে বহুরূপী। তিনি যদি বিশেষ একটি গণ্ডীতেই আপনার ধর্ম্মকে ও আপনাকে আবদ্ধ রাখেন, তবে অন্য সকলের আপনজন হইবেন কিরূপে? যাহারা সেই বিশেষ ধর্ম্মের লোক নহে, তাহারা তাঁহাকে কি মনে করিবে? কাজেই তাঁহার ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষধর্ম্ম। এজন্য তিনি গৃহী হইয়াও ঠিক গৃহস্থ নহেন। তিনি কোনও দেশ কাল জাতি ধর্ম্মের ক্ষুদ্র সীমানায় আপনাকে চিররুদ্ধ রাখিতে পারেন না। তিনি অনন্ত অসীম বিশ্বদেবতার অন্তর্য্যামী পরমাত্মস্বরূপেরই উপাসক। অন্য রূপে তাঁহাকে দেখেন নাই। বাহিরে তিনি আত্মমর্য্যাদারক্ষায় তৎপর, আত্মকেন্দ্রিক, নিরাসক্ত, একক, আপনার চতুর্দ্দিকে আত্মগৌরবের গণ্ডী

রচনা করিয়া বর্ম্মাবৃত, কিন্তু এই বর্ম্মাবৃত অবস্থায়ই তিনি সকলের সহিত আদান-প্রদান-পরায়ণ। তিনি কৌতুকী সখা, তিনি সেবাব্রতী গৃহস্থ, তিনি পরোপকারী সুহৃদ্, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মযোগী। এ ক্ষেত্রে আপনাকে অভিনেতার ন্যায় সাধনা-দ্বারাই, নানা ভাবে ভাবনায় ভাবিতবৎ করিয়া, নানা জনের মনোরঞ্জনে অথবা মানভঞ্জনে তিনি অভিনিবিষ্ট। ইহার মধ্যে যে আন্তরিকতা নাই এ কথাও বলা যায় না। বরং ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, এমতাবস্থাতেও তিনি আন্তরিক সহৃদয় পুরুষ। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের মতে রবীন্দ্রনাথ মহাসমুদ্র-বিশেষ। তাঁহাকে আয়ত্ত করা সহজ নহে। তাঁহার তত্ত্ব-নির্দ্দেশ অভিজ্ঞ অন্তরঙ্গ জনের পক্ষেও সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। কেননা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বহুভাব-সম্বলিত বহু রূপেই আপনাকে তিনি দেশ কাল পাত্র-অনুসারে, অবস্থা-অনুসারে, বিভিন্ন আকারে প্রকারে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুধা প্রকাশিত করিয়াছেন। যদি পৌরাণিক তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনো হিন্দু তাঁহার চরিত্রের বিচার করেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাধারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক অথচ বিশ্বপ্রকৃতিতে-বিহরণ-শীল সেই নটরাজের ছায়াই দেখিতে পাইবেন। এমন অদ্ভুত চরিত্র অন্য কোনো দেবতার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, ব্রাহ্ম, বাউল, সুফী, বৌদ্ধ, ক্রীশ্চান সকল ধর্ম্মের সত্তাই তাঁহার ধর্ম্মের মধ্যে নিহিত। আজ ধরিত্রী পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ভয়ে শঙ্কিতা। আজ মহাকাশযাত্রীরা গ্রহান্তরে গমনে উদ্যত। আজ যদি মানুষ তাহার অন্তঃকরণকে রিপুমুক্ত ও নির্দ্দোষ না করে, তবে মানুষই আজ বিশ্বসংহার করিয়া বসিবে। এখন মানুষের নিজের অন্তঃকরণকেই ভয় করা উচিত। পৃথিবীর এই দুর্দ্দিনে এই মহা-অশান্তি-শঙ্কিত সময়ে অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের বাণীকে আশ্রয় না করিলে পৃথিবীর জনগণের চিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মভাব, পাপ-

ভয়, মানবোচিত সদ্‌গুণ-সকল— সাম্য, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ্য, স্বার্থত্যাগ, পরোপকারপ্রবৃত্তি সহজে জাগরিত হইবে না। মহাত্মা গান্ধীও সাধক, কিন্তু তাঁহার সাধনা কঠিনতর— সাধারণ সংসারীজন সে সাধনা গ্রহণে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথের ঔদার্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা সকলকেই আলিঙ্গন করিয়াছে। তিনি পাপী তাপী দুষ্ট লোককেও অবজ্ঞা করেন নাই। তাঁহার মতে—

দুর্ল্লভ এ ধরণীর তুচ্ছতম স্থান।
দুর্ল্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ॥

তিনি মানুষের চরিত্রের প্রতি আস্থা হারান নাই। অবশ্য মহাত্মাজীও আস্থাবান, নতুবা তিনি সত্যাগ্রহ করেন কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি কঠোরকর্ম্মা, তাঁহাকে জগৎ শ্রদ্ধা করে এবং রবীন্দ্রনাথকে জগৎ ভালবাসে। রবীন্দ্রনাথকে তাহারা গান্ধী অপেক্ষাও আপনজন বলিয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে পারে। গান্ধী প্রণম্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তদপেক্ষা অধিকতর নিকটস্থ। শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, ইঁহারা রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম্মনীতির যে-সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বস্তরে রবীন্দ্রনাথের সহিত মতৈক্য দেখা যায় না। তাঁহারা কোনো না কোনো গণ্ডীতে জীবনকে আবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গণ্ডীবন্ধনের পক্ষপাতী নহেন।

রবীন্দ্রনাথ বিমুক্তচিত্ত বিশ্বপথিক। তাহার দাঁড়াইবার স্থান বা সময় নাই। ক্রমাগত নব নব ভাবে জীবনকে বিভাবিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে করিতেই এই বহুরূপধারী একদা অনন্তে, অসীমে, মহাকাশের অন্তরে হারাইয়া যাইবেন। ঐ অনন্ত আকাশই বহুবিচিত্ররূপ রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্ত প্রতীক। আকাশই রবীন্দ্রনাথ।

—শ্রীহেমন্তবালা দেবী

পত্র ১। "জোনাকি"। প্রথমে এই ছদ্মনামে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন; কখনো বা রাশিনাম 'দক্ষবালা' স্বাক্ষরেও লেখেন। এ বিষয়ে শ্রীহেমন্তবালা দেবী -লিখিত বিবরণ গ্রন্থপরিচয়ের সূচনায় মুদ্রিত।

পত্র ২। 'শিলাইদহের বোষ্টমী'। এই প্রসঙ্গে ৪৫-সংখ্যক পত্রে দ্রষ্টব্য— 'বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্প প্রসঙ্গে ঐ উক্তি। বোষ্টমী বা সর্বখেপীর বিষয় শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁহার 'রবীন্দ্রমানসের উৎসসন্ধানে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। গল্পগুচ্ছ ৪ (১৩৬৯ ও পরবর্তী সংস্করণ) গ্রন্থপরিচয়ের 'বিভিন্ন ছোটোগল্প' অধ্যায়ে 'বোষ্টমী' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ১৯৯-সংখ্যক পত্রেও এই বৈষ্ণবী উল্লিখিত।

পত্র ৫। 'আমি গুরু নই আমি কবি।'

পত্র ৬। 'আমাকে··· গুরু বলে গণ্য করলে ভুল করা হবে।'

পত্র ৭। 'গুরুমশায় আর গুরু ··· আমি উক্ত দুই জাতেরি বার।'

পত্র ৮। 'হঠাৎ আমাকে গুরু বলে ভুল কোরো না।'

—এই একটি কথা বর্তমান গ্রন্থে ধৃত অনেকগুলি পত্রেই রবীন্দ্রনাথ বারবার নানাভাবে বলিয়াছেন, যেমন ৩১, ৩২, ৯৯ ও ১০৫ -সংখ্যক পত্রে। ৮-সংখ্যক পত্র (১৯ বৈশাখ ১৩৩৮) লিখিবার কয়েক দিন পরেই, অর্থাৎ ২৫ বৈশাখের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে, রবীন্দ্রনাথ 'নিজের সত্য পরিচয়' দিতে গিয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে যাহা বলেন[১] তাহা ঐ পত্রেরই একাংশের রূপান্তর বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বদিন কবিতা রচনা করিয়াছেন—

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।[২]

বস্তুতঃ, 'আমি গুরু নই আমি কবি' রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি দীর্ঘজীবনে নানা সূত্রেই বলিয়াছেন ; এই প্রসঙ্গে, অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত একটি পুরাতন চিঠি (১৯১২) এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল ; ১০৫-সংখ্যক পত্রের অনুসঙ্গে, অজিতকুমারকে লিখিত আরও পুরাতন একটি চিঠি (১৯১০) অন্যত্র মুদ্রিত হইবে।—

[লণ্ডন ১৯১২]

…আমি এ পৃথিবীতে প্রণাম বাঁচিয়ে চলতে চাই ; যদি পাই তবে সেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি নে— কেননা, ওটা কিছুতেই আমার পাওনা নয়। পৃথিবীতে কবির দাবির উচ্চ সীমা কোলাকুলি পর্য্যন্ত— প্রণামের দ্বারা তার জাত যায়— আমি কবি ছাড়া যে আর কিছু নই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। আমি তোমাদের হৃদয়ের সমভূমিতেই দাঁড়াতে চাই— সেইখানেই আমার যথার্থ স্থান— উচ্চ ভূমিতে আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমি তোমাদের বারবার বলেছি আবার বলচি— আমাকে ভুল আসনে তোমরা বসিয়ো না— সেটা হয়ত সম্মানের জায়গা হতেও পারে কিন্তু তেমন অসুখের জায়গা আর কিছু নয়— যে পাগড়ি মাথায় হয় না সেই পাগড়ি পরার মত— সর্ব্বদা মনে হয় পড়ে যাবে এবং মাথা ধরে ওঠে। আমি তোমাদের বন্ধু, কিছু দেব কিছু নেব। যদি আমার ভাগ্যক্রমে দেওয়া-বিষয়ে আমার জিত হয় তবু সে বন্ধুত্বেরই দান, সুতরাং তার জন্যে ফিরে আমি কিছু দাবি করব না। গুরুর পদ আমার নয়, নয়, নয়। আমি নিজে কিছু শিখি নি

এবং কাউকে শেখাতেও পারব না ;— আমি পৃথিবীতে সব জিনিষ যেমন করে নিয়েছি তেমনি করেই দিয়েছি অর্থাৎ নিতান্ত পড়ে-পাওয়া ভাবে— তার যদি কিছু দাম থাকে সে দামের পাওনা আমার নয়।

—রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আলোচ্য পত্রগুলির সমকালীন, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতেও অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—

…আমার আশঙ্কা হয় পাছে আমাকে কেউ ভ্রমক্রমে গুরু ব'লে গ্রহণ করেন— আমার সে পদ নয়। …র কাছে আমি যে সঙ্কোচ জানিয়েছিলুম তার কারণই এই। তুমি যে সাধনার কথা লিখেচ আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সেই সঙ্গে আমার একটি কথা বলবার আছে এই যে, অন্তরের সাধনার পরিণতি বাইরে— সঞ্চয়ের সার্থকতা দানে। একদিন আমি নিজের আত্মিক নির্জ্জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দকে সংহতভাবে লাভ করবার জন্যে সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলুম। যে কারণেই হোক সেই নিঃসঙ্গতা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। অতিশয় একান্তভাবে নিজের সত্তার নিগূঢ় মূলে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া আমার চল্‌ল না, যে বিচিত্র সংসারে আমি এসেচি আপনাকে ভুলে সহজভাবে সেখানে আপনাকে লাভ করতে হবে এই দিকেই আমাকে ভিতর দিক থেকে ঠেলে পাঠালে। আমি স্বভাবতই সর্ব্বাস্তিবাদী— অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে— আমি সমগ্রকেই মানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ ক'রে মাটির তলা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্য্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ ক'রে তবেই সফল হয়ে ওঠে— আমি মনে করি আমারও ধর্ম্ম তেমনি— সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ ক'রে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে

সার্থক হ'তে পারবে। এই যে বিচিত্ররূপী সমগ্র, এর সঙ্গে ব্যবহার রক্ষা করতে হ'লে একটি ছন্দ রেখে চল্‌তে হয়, একটি সুষমা,— যদি তাল কেটে যায় তবেই সমগ্রকে আঘাত করি এবং তার থেকে দুঃখ পাই। বস্তুত যখনই কিছুতে উত্তেজনার উগ্রতা আনে তার থেকে এই বুঝি, ছন্দ রাখতে পারলুম না,— তাই সমগ্রর সঙ্গে সহজ যোগসূত্রে জটা পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ ক'রে জটা খোলবার সময় আসে। এমন প্রায়ই ঘট্‌তে থাকে সন্দেহ নেই কিন্তু তাই ব'লে জীবনের সহজ সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ ক'রে নিজেকে নিরাপদ করা আমার দ্বারা ঘটল না। বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি তাকে কোনো আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে বঞ্চিত করা হবে এই আমার বিশ্বাস। যদি এই বিরাট সমগ্রের মধ্যে সহজ বিহার রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারি তবে নিজের অগোচরে স্বতই পরিণতির পথে এগোতে পারব— ফল যেমন রৌদ্রে বৃষ্টিতে হাওয়ায় আপনিই তার বীজকে পরিণত ক'রে তোলে। আমি তাই নানা কিছুকেই নিয়ে আছি— নানা ভাবেই নানা দিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, আমি তা অনুভব করি নে। আমি নাকি গাই, লিখি, আঁকি, ছেলে পড়াই— গাছপালা আকাশ আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই। কঠিন বাধা আসে লোকালয় থেকে— এত জটিলতা এত বিরোধ বিশ্বে আর কোথাও নেই। সেই বিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার এই চেষ্টার অবসান হবে না। আমার নিজের ভিতর থেকে আশ্রমে যদি কোন আদর্শ কিছুমাত্র জেগে থাকে তবে সে আদর্শ বিশ্বসত্যের অবারিত বৈচিত্র্য নিয়ে। এই কারণেই কোনো একটা সঙ্কীর্ণ ফল হাতে হাতে দেখিয়ে লোকের

মন ভোলাতে পারব না— এই কারণেই লোকের আনুকূল্য এতই দুর্লভ হয়েচে এবং এই কারণেই আমার পথ এত বাধাসঙ্কুল। এক-দিকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে সুরুলের দরিদ্র চাষী পর্য্যন্ত সকলেরই জন্যে আমাদের সাধনক্ষেত্রে স্থান ক'রে দিতে হয়েছে— সকলেই যদি আপনাকে প্রকাশ করতে পায় তবেই এই আশ্রমের প্রকাশ সম্পূর্ণ হ'তে পারবে— তিব্বতী লামা এবং নাচের শিক্ষক, কাউকে বাদ দিতে পারলুম না।

মনে কোরো না যে, তোমার সাধনপ্রণালী ও সাধনফলের প্রতি আমার কিছুমাত্র সংশয় আছে। তোমার প্রকৃতি নিজের পথ যদি খুঁজে পেয়ে থাকে তবে আমার পন্থা তার প্রতিবাদ করবে এমন স্পর্দ্ধা তার নেই। সত্যকে তুমি যে-ভাবে যে-রসে পাচ্চ আমার প্রকৃতিতে যদি তা সম্ভব না হয় তবে সেজন্য পরিতাপ করা মূঢ়তা। ফলের গাছ তার রসের সার্থকতা প্রকাশ করে আপন ফলে, ইক্ষু করে আপন দণ্ডের মধ্যে, কেউ কারও প্রতিযোগী নয়,— বৃহৎ ক্ষেত্রে এক জায়গায় উভয়েই মিলে যায়। ইতি ১১ মার্চ্চ ১৯৩১

—সাধনার রূপ। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮

'আমার এই চঞ্চলতা যদি না থাকৃত তবে কোন্‌দিন হয় তো হাল আমলের একজন অবতার হয়ে উঠে ভক্তব্যূহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়তুম'[৩] —বর্তমান পত্রের এই উক্তির অপ্রত্যাশিত কদর্থ কেহ কেহ করিয়াছিলেন মনে হয়, তাহারই আভাস পাওয়া যায় এবং খণ্ডন দেখা যায় শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্র-নাথের একখানি চিঠিতে—

···তোমার লিপির প্রথম ছত্র পড়েই চম্‌কে উঠেছিলুম।··· শেষে প্রবাসীতে আমার "পত্রধারা" পড়ে বুঝলুম কোন লেখা থেকে তুমি আমার অপরাধ নিয়েছ।[৩]··· তুমি জানো শ্রীঅরবিন্দকে আমি অকৃত্রিম

ভক্তি করি। তাঁকে আমি আধুনিক কালের ব্যবসায়ী অবতারের দলে গণ্য করতে পারি এমন কথা তুমি কল্পনাও করবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। এ কথা সকলেরই জানা আছে বাংলাদেশে অবতারের এপিডেমিক দেখা দিয়েছে তার কারণ সস্তায় মুক্তি পাবার জন্যে একদল লুব্ধ। এরা মোহবিস্তার করে এই মুগ্ধ দেশকে আরো আবিষ্ট করছে একথা তুমিও স্বীকার করবে। দেশে মেকি কবিত্ব অনেক চলছে, তার কাটতিও আছে— তার উপরে যদি শ্লেষকটাক্ষপাত কেউ করে তবে কি আমি বলব এটা আমারি উপরে লক্ষ্য করা হোলো ? যাঁদের মহিমা ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করে তাঁদের ভক্তরা তাঁদের সম্বন্ধে যেন নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁরা স্বতই নিরাপদ। অন্তত তাঁরা আমার মতো লোকের অবজ্ঞার লক্ষ্য হতেই পারেন না একথা যদি না বোঝো তবে তাতে আমার প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে, তাঁদের প্রতিও। ভালো জিনিষের কৃত্রিমতা সকলের চেয়ে হেয়— তাকে প্রশ্রয় দিলে বড়ো জিনিষেরই মূল্য কমানো হয়।

—তীর্থঙ্কর (১৩৪৬)। 'ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২'এর পত্র

পত্র ১২, ১৩। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ পারস্যভ্রমণে গিয়াছিলেন ; পূর্ব বৎসরেই যাইবার আয়োজন হইয়াছিল, অসুস্থতার জন্য সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই।

১৯৩২ সালে পারস্যভ্রমণের কথা ৮১-৮৪ ও ৮৬ -সংখ্যক পত্রে ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত ৯-১০ -সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত। রবীন্দ্রনাথের লেখা পারস্যভ্রমণ-বৃত্তান্ত সমকালীন 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে মুদ্রিত ও সম্প্রতি 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ২৮-৩০। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সময় রবীন্দ্রনাথ ভূপালে গিয়াছিলেন।

পত্র ৩৬। 'বীরেন্দ্রকিশোরকে পত্রে জানিয়েছিলুম'— বীরেন্দ্রকিশোরকে

লিখিত পত্রটিও (২৩ অগস্ট্ ১৯৩১) এই গ্রন্থভুক্ত (পৃ ৪২২)। ১৩৩৮ কার্তিক সংখ্যা হইতে প্রবাসীতে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী 'পত্রধারা' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে থাকে। ৮৬-সংখ্যক পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। এই সময় (আশ্বিন ১৩৩৮) প্রবাসী পত্রে 'নরদেবতা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়— 'আমার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা'র প্রসঙ্গে উহাও দ্রষ্টব্য।

পত্র ৩৮। 'কলকাতায় বন্যার দুঃখ দূর কল্পে একটা অভিনয়'— 'বিশ্বভারতী দুর্গত সহায়ক সঙ্ঘ কর্তৃক প্রবর্তিত' 'গীতোৎসব', 'অভিনয়রাত্রি ২৮শে, ২৯শে, ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন ১৩৩৮।' ৪১-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'চটি' বা অভিনয়পত্রী হইতে উপরি-উদ্ধৃত তথ্যগুলি দেওয়া হইল। ৪২ ও ৪৩ -সংখ্যক পত্রেও এই গীতোৎসব উল্লিখিত। এই উৎসবের দ্বিতীয় ভাগে ছিল তৎকালে-লিখিত শিশুতীর্থের নৃত্যাভিনয়।

পত্র ৩৯। 'দেশে বন্যাপ্লাবনের দুঃখ'। ইহার কিছুকাল পূর্বে প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে সহস্র সহস্র লোক নিরাশ্রয় নিরন্ন হইয়াছিল —ইহাদেরই আনুকূল্যার্থ অভিনয়ের উল্লেখ পূর্ব পত্রেই আছে।

তদেব। 'চট্টগ্রামের বিবরণটা'। ইহার কিছুকাল পূর্বে চট্টগ্রামে একজন মুসলমান পুলিস ইন্‌স্পেক্টর একজন হিন্দু তরুণ বিপ্লবী -কর্তৃক নিহত হইলে চট্টগ্রামের মুসলমান-ধর্মাবলম্বী অনেকে দাঙ্গা লুণ্ঠন প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়। পুলিশ-কর্মচারী অবশ্য সাম্প্রদায়িক কারণে নিহত হয় নাই, অত্যাচারী বলিয়া রাজনৈতিক কারণে নিহত।—

চট্টগ্রামে সম্প্রতি যে লুণ্ঠন, গৃহদাহ, সম্পত্তিনাশ হইয়াছে, তাহাতে এক কোটি টাকার অধিক সম্পত্তি অপহৃত বা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া হিসাব বাহির হইয়াছে। বহুসংখ্যক হিন্দু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। ক্ষতি অপমান কেবলমাত্র হিন্দুদেরই হইয়াছে।

—বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮

'এর পিছনে আমাদের মর্ত্তালোকের বিধাতা পুরুষেরা রয়েচেন' —এ সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লেখেন—

> …শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত মহাশয় টাউনহলের সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার কেম্-এর বিরুদ্ধে অতিশয় গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বার-বার বলিয়াছেন—মিষ্টার কেম্ ইচ্ছা করিয়া কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, এবং তাঁহার আচরণ হইতে প্রমাণিত হয়, যে, তিনি জানিয়া শুনিয়া চট্টগ্রামের নিরপরাধ শহরবাসীদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুঠ করিবার জন্য (গুণ্ডাদের) প্ররোচনা দিয়াছেন।…
>
> কলিকাতা টাউন হলের সভায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে… যে, চাটগাঁয়ে লুটেরারা যাহা করিয়াছে, তাহা সরকারী কোন কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্ররোচনা বা প্রশ্রয়েই করিয়া থাকিবে ; নতুবা এমন নির্ভয়ে বিনা বাধায় এমন ভয়ানক বে-আইনী এত কাজ তাহারা কেমন করিয়া করিতে পারিল ?
>
> —বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮

পত্র ৩৯। 'এই চিঠি থেকে কথাগুলো নিয়ে চিঠির আকারেই প্রবাসীতে পাঠাব স্থির করেছি।' ১৩৩৮ আশ্বিনের প্রবাসী পত্রে 'আত্মীয়বিরোধ' নামে ইহা প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে সংকলিত। ১৩৩৮ শ্রাবণের প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত ও কালান্তর গ্রন্থে সংকলিত 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য। সর্ববঙ্গ মুসলিম্ ছাত্রসম্মিলনীর উদ্দেশে প্রেরিত লেখা নিম্নে মুদ্রিত হইল—

সর্ব্ববঙ্গ মুসলিম্ ছাত্রসম্মিলনীর প্রতি সম্বেদন

আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েচে। তাই অবুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গ'ড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে

পড়ে। আমাদের শুভ চেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হ'য়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্ব্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে-শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্যদোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হ'য়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তা'র নিঃশ্বাস রোধ ক'রতে প্রবৃত্ত এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্দ্ধক্য যাবার সময় হ'ল। তা'র প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্য্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখ পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হ'য়ে যাক্ নিঃশেষে ভস্মসাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে তখন তা'র দুঃখ অতি কঠোর,— এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি এই দুঃসহ পরিচয়ের কাল যেন এখনি শেষ হয়, দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্বজগতের কাছে বার-বার যেন উপহসিত না হ'ই।

আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক্ তরুণদের নবজীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্ম্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হ'য়ে তা'রা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক্। যে দুর্ব্বল সেই ক্ষমা ক'রতে পারে না, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত ক'রে দিক্, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্ব্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।

—রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৮

পত্র ৪৭। 'হিজলি হত্যা নিয়ে … পাক খেয়েছি।' হিজলী বন্দীশালায় দুইজন রাজবন্দী -হত্যার প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখের

জনসভা ও তথায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের কথা সুবিদিত। এই সভা প্রথমে টাউন হলে হইবার কথা ছিল; জনতা এরূপ বিশাল হয় যে, অবশেষে মনুমেণ্টের পাদদেশে সভার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এ প্রসঙ্গে ১৩৩৮ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাসীতে মুদ্রিত, প্রচলিত কালান্তর গ্রন্থে সংকলিত, 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধ এবং চতুর্বিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপরিচয়-অংশ দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫৭।[৪] 'নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন।' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে ইহার কিছু বিবরণ দিয়াছেন—

> With the arrival of Maharaja Jagadindranath of Natore our rustic camp on the sands of the river-bank took on a lively appearance. … While father would be entertaining the Maharaja, Mother with the help of Amaladidi, who was an expert in the cooking of East Bengal delicacies, would be busy preparing the meals. Father knew that the Maharaja was a connoisseur in the matter of food and she was determined to satisfy his palate.
>
> —On the edges of time, p. 31

'কিন্তু নতুন খাদ্য উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি।' ১২৫-সংখ্যক পত্রেও এই প্রসঙ্গ পুনশ্চ উল্লিখিত। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ ও দ্বিপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী শ্রীহেমলতা দেবীর 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' (প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬) প্রবন্ধ হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত হইল—

> কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার।… নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা

এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক-বার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মাল মসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।' তিনি চটে গিয়ে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে ? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।'

—শ্রীহেমলতা দেবী। সংসারী রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬

'অপূর্ণ' কবিতাটি° (১২০ ও ১২১ পৃষ্ঠার অন্তর্বর্তী) সম্পর্কে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী আমাদের জানাইয়াছেন—

২৪ কার্ত্তিক আমার জন্মদিন। আমি পরিহাসচ্ছলেই আবেদন জানালাম যে, কবিগুরুর জন্মদিনে তিনি তো কত কবিতা উপহার পেয়ে থাকেন, কিন্তু আমার জন্মদিনে কেউ কবিতা লেখে না। তিনি যদি আমার জন্মদিনে একটী কবিতা লিখে আশীর্ব্বাদ করেন, তো আমি বিশেষ খুশি হই। সেই প্রার্থনা পূরণের জন্য ১৩৩৮ সালে (সম্ভবতঃ) কার্ত্তিক মাসে এই কবিতাটি লিখে পাঠান আমাকে। আমি নূতন বিস্ময়ে আনন্দে অধীর হই।··· আমার জীবনের একখানি ফোটো-চিত্র ঐ কবিতায় তোলা আছে।··· কবিগুরু কি করে অন্তর্য্যামীরূপে অত কথা লিখলেন তাই ভাবি।

—শ্রীহেমন্তবালা দেবী। শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র

পত্র ৬৩। 'জয়ন্তীর প্রবেশিকা'—কলিকাতায় ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সপ্ততিপূর্তি-উৎসব বা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সদস্যপদের দক্ষিণা ছিল পাঁচ টাকা।

পত্র ৭১। 'মহাত্মাজির পত্র পেয়েছি।' ১৯৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক-অন্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত

হন। এই সময় দেশের নানা স্থানে যে অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতেছিল তাহার ফলে অবিলম্বেই তাঁহাকে পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে উদ্যোগী হইতে হয়; ফলে ১৯৩২ সনের ৪ জানুয়ারি তারিখে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাহার পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিম্ন-মুদ্রিত চিঠিখানি[৩] লেখেন—

Laburnum Road,
Bombay,
3 Jan '32

Dear Gurudev

I am just streching my tired limbs on the mattress and as I try to steal a wink of sleep I think of you. I want you to give your best to the sacrificial fire that is being lighted.

With love
M K Gandhi

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে লণ্ডনের Spectator পত্রে যে বিবৃতি দেন, তাহার মুখ্যাংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

Mahatmaji has been arrested without having been given a chance of coming to a mutual understanding with the Government. It only shows that of the two partners in the building of the history of India the people of India can be superciliously ignored, according to our rulers. However, the fact has to be accepted as a fact, and we must prove to the world that we are important, more important than the other factor which is merely an accident But if we lose our head and give vent to a sudden fit of political

insanity, blindly suicidal, a great opportunity will be missed. The despair itself should give us the profound calmness of strength, the grim determination which silently works its own fulfilment without wasting its resources in puerile emotionalism and self-thwarting destructiveness. This is the moment when it should be easy for us to forget all our accumulated prejudices against our kindred, when we must do our best to combine our hands in brotherly love even with those who have roughly rejected our call of comradeship, when we must claim of ourselves an intense urge of co-operation with all different parts of our Nation. This is the kind of catastrophe which rarely comes to a people, with a shock that brings to a focus our scattered forces and shortens the difficulties of our creative endeavour in the building of its freedom

The primitive lawlessness of the law-makers should forcibly awaken us to our own ultimate salvation in a love undaunted by the menace of a power which baricades itself with an indiscriminate suspicion that its blind panic cannot define. This is the time when we must never forget our responsibility to prove ourselves morally superior to those who are physically powerful in a measure that can defy their own humanity.

—from Modern Review, Feb. 1932

রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের নিকটেও এই তার-বার্তা প্রেরণ করেন—

> The sensational policy of indiscriminate repression being followed by Indian Government starting with imprisonment of Mahatmaji is most unfortunate in causing permanent alienation of our people from yours making it extremely difficult for us to co-operate with your representatives for peaceful political adjustment.
>
> —Modern Review, Feb. 1932

পত্র ৭৯, ৮০। এই সময় কলিকাতার গভর্মেণ্ট্ আর্ট্ স্কুলে তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমুকুলচন্দ্র দের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। ৮০-সংখ্যক পত্র উক্ত আর্ট্ স্কুল হইতে লিখিত।

পত্র ৮১। 'নিজের পদবীগুলোকে মনেও রাখি নে'। উল্লিখিত প্রদর্শনী-সংক্রান্ত কাগজপত্রে, রবীন্দ্রনাথ Sir Rabindranath Tagore বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয় নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল[৭]—

> ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাইয়াছেন যে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে তাঁহার চিত্রসমূহের যে প্রদর্শনী হয় তাহার আমন্ত্রণীপত্রে এবং ক্যাটালগে তাঁহার সম্মতি কিংবা অনুমতি না লইয়া তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'সার' উপাধি ব্যবহার করা হইয়াছিল। যে উপাধি তিনি স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়াছেন তাহা পুনরায় গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।
>
> —২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। আনন্দবাজার পত্রিকা

এই প্রসঙ্গে, ইহার কয়েক বৎসর পূর্বের অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।—

রবীন্দ্রনাথের ‘চরকা’ প্রবন্ধের (সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩৩২) অনুবাদ ‘The cult of the Charkha’ ১৯২৫ সেপ্টেম্বরের মডার্ণ্ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইলে, মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে তাহার উত্তর দেন। এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে Sir Rabindranath বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৯২৫ ডিসেম্বর ও ১৯২৬ জানুয়ারি -সংখ্যা মডার্ণ্ রিভিউ পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে এ বিষয়ের কিছু আলোচনা হয়। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মডার্ণ্ রিভিউ’এর নিম্নসংকলিত প্রবন্ধে (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) প্রকাশ পায়—

Rabindranath Tagore and Knighthood

Being aware that a discussion has been raised in regard to my knighthood, I feel it right to put clearly my own view of it before the public. It is obvious that it was solely to give utmost emphasis to the expression of my indignation at the Jallianwalla Bagh massacre and other deeds of inhumanity that followed it that I asked Lord Chelmsford to take it back from me. If I had not fully realised the value of this title, it would have been impertinent on my part to offer it as a sacrifice when such was needed in order to give strength to my voice I have not the overweening conceit discourteously to display an insincere attitude of contempt for a title of honour which was conferred on me in recognition of my literary work. I greatly abhor to make any public gesture which may have the least suggestion of a theatrical character. But in this particular

case, I was driven to it when I hopelessly failed to persuade our political leaders to launch an adequate protest against what was happening at that time in the Punjab

A title of personal distinction for some merit that has a universal value is never a reward of favour. To show honour where it is truly due is the responsibility of the party who does it and any token of it should not be thrown away, unless for an exceptional occasion or purpose which is painfully imperative. I am not callously insensitive to the approbation which I have been fortunate enough to gain from outside my own country, and for the same reason, I also feel proud that men like Jagadish Chandra Bose and Prafulla Chandra Ray have won a title valuable like any other real recognition which our country may rightfully claim The only complaint that can be made is that this title is fast losing its distinction through its heterogeneous association and that the above-named illustrious countrymen of ours are made to put up with too many strange bedfellows in their career of glory. While concluding, I confess to an idiosyncrasy, which has already been pointed out by the Editor of this journal, that I do not like any addition to my name,— Babu or Sriyut, Sir or Doctor, or Mr., and, the least of all, Esquire.

A psycho-analyst may trace this to a sense of pride in the depth of my being and he may not be wrong.

Rabindranath Tagore

পত্র ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬। ১৯৩২ সালের ১১ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ পারস্যযাত্রা করেন, ৩ জুন তারিখে দেশে ফেরেন। এই চিঠি কয়খানিতে ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত ১০-সংখ্যক চিঠিতে তাহারই প্রসঙ্গ আছে।

পত্র ৯০। 'ইউনিভর্সিটি থেকে নিমন্ত্রণ'। ১৯৩২ সালের ৬ অগস্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন, পারস্যযাত্রী (১৯৬৩) গ্রন্থে (পৃ ১৬৮-৬৯) মুদ্রিত আছে।

পত্র ৯৭। 'শিবারামের গল্প'— দ্রষ্টব্য 'সে' গ্রন্থ। 'কালের যাত্রায় তোমার বর্ণিত ব্রাহ্মণকন্যা'— 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে 'রথের রশি' নাটিকা দ্রষ্টব্য। বর্তমান প্রসঙ্গে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে এক পত্রে লিখিয়াছেন— 'কৌতুককর ইতিহাস এই যে, পূজনীয় কবিগুরু যেন আমার কাছে পত্র লেখাটা কমিয়ে দিতে চান, এই আশঙ্কা মনে আসায় পত্র আদায়ের ফন্দীরূপে আমি ঐ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করি··· যেন আমাকে বিদ্রূপ করেই ঐ সব লিখিয়াছেন।'

পত্র ৯৯। চিঠি লেখার তারিখ ২২ আশ্বিন— 'প্রবাসী' পত্রে ছাপা হয়, মূল পত্রেও দেখা যায়। (মূল পত্রেই তারিখটি কেহ বদল করিয়া থাকিবেন।) কবির স্বহস্তের '২২ আশ্বিন'ই ঠিক হইলে, উহা খৃষ্টীয় হিসাবে ৮ অক্টোবর ১৯৩২ হইবে।

পত্র ১০১। 'আমি যখন "স্বদেশী সমাজ" লিখেছিলুম'। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সম্প্রতি 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে (১৩৬৯) সংকলিত হইয়াছে।

পত্র ১০১। 'তারা জানে···শ্রুতিসুখকর নয়' (পৃ ১৭৭)। ১৯১৬ সালে জাপানে গিয়া জাপানের পাশ্চাত্যানুকরণ সম্বন্ধে কবি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন Nationalism গ্রন্থে এবং জাপান-যাত্রীর (১৩৬৯ সংস্করণ) গ্রন্থপরিচয়ে তাহা মুদ্রিত আছে। জাপানীদের অনেকে এসকল উক্তি অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন নাই। আমেরিকায় মার্কিনী সভ্যতা সম্বন্ধে প্রতিকূল উক্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ মার্কিন পত্রিকাদির কিরূপ অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, অধ্যাপক স্টিফেন হে সম্প্রতি সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

তদেব। 'যখন জালিয়ানবাগ ব্যাপারে আমি ছাড়া আর সকলেই নীরব ছিলেন'। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -লিখিত একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হইল—

১৯১৯ সাল। গরমের ছুটি হয়ে গিয়েছে। কলেজ বন্ধ। বাইরে যাইনি। পাঞ্জাবের কথা অল্প অল্প করে আসছে লোকমুখে। কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কিছু খবরের কাগজে, কিছু চিঠিতে, জালিয়ানালা-বাগের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। রুচিরাম সাহ্‌নির কাছ থেকে অনেক কথা একদিন বনোয়ারিলাল চৌধুরী কবিকে এসে শুনিয়ে গেলেন। কবি সেই সব শুনে ক্রমেই এমন অস্থির হয়ে পড়লেন যে আমাদের ভাবিয়ে দিলে। রথীবাবুরা বাইরে। আমি মেজোমামাকে (সার নীলরতন সরকার) ডেকে আনলুম। কবির শরীর তখন এমন দুর্বল যে দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। সারাদিন একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে। লেখা বন্ধ। কথাবার্তা কম বলেন। হাসি-গল্প তো নেই-ই। মেজোমামা দেখে complete rest-এর হুকুম দিয়ে গেলেন। শুয়ে থেকে কবি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। Andrews সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটছে, তা নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন লোকও প্রতিবাদ করবে না, এটা কবির পক্ষে অসহ্য।

Andrews সাহেবকে মহাত্মাজির কাছে পাঠালেন এক প্রস্তাব নিয়ে। তখন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে লোক প্রবেশ করা নিষেধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা যে মহাত্মাজি যদি রাজী থাকেন, তবে মহাত্মাজি আর কবি দুজনে দিল্লীতে গিয়ে মিলবেন। সেখান থেকে দুজনে একসঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তা হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। Andrews সাহেব মহাত্মাজির কাছে চলে গেলেন।

এদিকে কবির দিন কাটে না। Andrews সাহেবের পথ চেয়ে বসে আছেন।··· ইতিমধ্যে Andrews সাহেব গান্ধিজির কাছ থেকে ফিরে এলেন।··· Andrews সাহেব আসতেই অন্য সব কথা ফেলে [কবি] জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হোলো? কবে যাবেন?" Andrews সাহেব একটু আস্তে আস্তে বললেন, বলছি সব— গুরুদেব কেমন আছেন এই সব কথা পাড়ছেন; কবি আবার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী হোলো? তখন Andrews সাহেব বললেন যে, গান্ধিজি এখন পাঞ্জাব যেতে রাজি নন্— I do not want to embarrass the Government now— শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বললেন না।

···বিকালবেলা··· জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শুনি কবি একটু আগে একটা ঠিকে গাড়ি ডাকিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় কেউ জানে না। কবি যখন যেখানে যান আমিই ব্যবস্থা করি— আমাকে কোনো খবর দেন নি।

···বেশ যখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে— সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা হবে— কবি একটা ঠিকে গাড়িতে ফিরে এলেন। ·· দেখলুম কবি খুব বিচলিত। ··

···রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয় নি— হয়তো চারটে

হবে— উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের সমাজপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে সরকার লেনের রাস্তায়। গলিতে তখনো গ্যাসের আলো জ্বলছে। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন, দরোয়ানরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানলা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে বসে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ করে বসে আছেন। পাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো ? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন পড়ো। বড়লাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। আমি পড়লুম।

কবি তখন বললেন— সারারাত ঘুমাতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার, তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে ? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে— বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সব চেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা-ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ

আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

—'লিপিকা'-র সূচনা। শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৬৭

এই প্রবন্ধ কবির জীবদ্দশায় লিখিত; বক্তব্য অনুমোদন-পূর্বক ৬ জুলাই ১৯৪১ তারিখে তিনি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন; ঐ স্বাক্ষর-সংবলিত অংশের প্রতিলিপিও ঐ প্রবন্ধের সহিত দেশ পত্রে মুদ্রিত। প্রবন্ধটির নাম ''লিপিকা'-র সূচনা' দিবার কী তাৎপর্য, প্রবন্ধের শেষ অংশে ব্যাখ্যাত—

আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়ো লাটকে তার পাঠানো— খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দ বাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এই সব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। দুপুরের দিকে আর জোড়াসাঁকোয় যাইনি। বিকালে গিয়ে শুনি কবি দোতলা থেকে তিনতলায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি একটা ছোটো বাঁধানো খাতা, লাল মলাট দেওয়া। তাতে কী লিখছেন। আমি যেতেই বললেন, এই শোনো আরেকটা লেখা, লিপিকার প্রথম যেটা লেখা হয় "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এল"। তখন পাঞ্জাব কোথায়, জালিয়ানালা-বাগ কবির মন থেকে মুছে গিয়েছে। দিনের পর দিন এক একটা করে "লিপিকা"র লেখা চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি, সমস্ত অসুখ তখন একদিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছে।

—'লিপিকা'-র সূচনা। শারদীয় দেশ, ১৩৬৭

‘নাইট’পদবী-ত্যাগ-পত্র প্রেরণের পর রবীন্দ্রনাথের ধীরভাবে নিত্য-নৈমত্তিক সকল কর্তব্য করিবার বিবরণ আরও কেহ কেহ লিখিয়াছেন ; অথচ ঐ পত্রের জন্য রাজরোষভাজন হইবার সম্ভাবনা সেদিন প্রভূতভাবেই ছিল—

অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব লিখে গিয়েছেন— মনে রাখতে হবে যে, তখন ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বলবৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, যে তিনি তাঁর এই চিঠির জন্য গ্রেপ্তার, সরাসরি-বিচার ও জেল-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক সেই সময়েই পাঞ্জাবে অনেকেই এর চেয়ে অনেক কম গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী কাজের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তিবাজেয়াপ্ত শাস্তি পেয়েছেন।

—শ্রীঅমল হোম। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথ -প্রসঙ্গে বহু তথ্য ও বিবরণ শ্রীঅমল হোম -প্রণীত ‘পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ’ পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও দ্রষ্টব্য।

‘পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে (১৩৬৪ মুদ্রণ, পৃ ৭৬-৭৭) গান্ধীজি কেন তখন পঞ্জাবে আসিতে চাহেন নাই, সে সম্বন্ধে মহাত্মাজির সহিত গ্রন্থকারের আলোচনার নির্যাস এবং দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের বক্তব্যও মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিবাদে সভার আয়োজন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব ১৯২৭ সালে একটি প্রবন্ধে তাহা লিখিয়াছিলেন ; ‘পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে (পৃ ৭৬) ঐ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে।

‘নাইট’-উপাধি ত্যাগ করিবার উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ রাজপ্রতিনিধি চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌কে যে চিঠিখানি ইংরেজিতে[৮] লেখেন তাহাও এ স্থলে সংকলন-যোগ্য ; পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—

6, Dwarkanath Tagore Lane,
Calcutta, May 30, 1919.

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have, in some cases, gone to the brutal length of making fun of our sufferings without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain, and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor,

for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours, faithfully,
Rabindranath Tagore

পত্র ১০১। সংশোধন: ১৭৬ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে 'মতো' না হইয়া, মূলানুযায়ী 'মত' হইবে।

পত্র ১০৫। 'আমি কি আজ পর্য্যন্ত কাউকে··· আলো দিতে পেরেছি?' অনুরূপ প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের অংশ পূর্বে উদ্‌ধৃত হইয়াছে (পৃ ৪৬৯-৭০), এ স্থলে অপর একখানি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হইল—

···তুমি লিখেছ আমি তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু দিতে পারি নি। সে কথাটা ঠিক— আমি কাউকেই সেরকম ভাবে কিছু দিতে পারিনে— কারণ আমার জীবনে কোনো বড় জিনিষ সচেষ্ট সাধনার ভিতর দিয়ে পাইনে। যখনি আমার কল্পনাদৃষ্টির সামনে কোনো বিশেষ আঘাতে কোনো বিশেষ আবরণ ছিন্ন হয়ে সত্যের কোনো একটি মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছে তখনি আমি তাকে প্রথম দেখেছি— মনে হয়েছে জগতে এই যেন তার প্রথম প্রকাশ— তাকে আবাহন করে আনবার জন্যে আমি কোনো আয়োজন করিনি— আমি একবারেই না জেনে তার মধ্যে এসে পড়েছি। আমার জীবনে বরাবর এমনি করে চলে আস্‌চে।

এমন যার অবস্থা সে অন্যকে কোনো মতে চালনা করতে পারে না। ভিতর থেকে প্রকাশ করাই তার কাজ; বাইরে থেকে বিকাশ করানো তার ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতীত।

অর্থাৎ জগতে যদি আমার কোনো সত্যকার স্থান থাকে তবে সে কবি হিসাবে— গুরু হিসাবে একেবারেই না। অথচ কেমন একটা দুর্বিপাকে আমাকে তোমরা পাঁচজনে মিলে একটা গুরুর আসন দিয়েছ

—এটাকে আমি কোনো মতেই ঠিকভাবে অধিকার করতে পারচিনে— আমি মনে মনে তোমাদের ভক্তির প্রণাম গ্রহণ করিনে— বার বার কুণ্ঠিত হই— আপত্তি করেও কোনো ফল পাইনে।

এটা কারো পক্ষেই ঠিক ভাল হচ্চে বলে মনে হয় না। এতে এক দিকে যেমন অন্যায় প্রত্যাশা জন্মে তেমনি অন্য দিকে সেই প্রত্যাশাকে মেটাবার জন্যে একটা অধিকার বহির্ভূত ব্যর্থ চেষ্টার উৎপত্তি হতে পারে। সে রকম চেষ্টা অন্যের পক্ষে যেমনি হোক্ আমার পক্ষে ভাল নয়। কারণ, আমার প্রকৃতিতে চেষ্টা জিনিষটা সত্য পাবার উপায় নয়, বরঞ্চ ব্যাঘাত।

কেবল একজন লোককে মনে পড়ে যে আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করতে পারত। সে হচ্চে সতীশ। তার কারণ, তারও গ্রহণ করবার ইন্দ্রিয় আমার সঙ্গে এক। যিনি ওস্তাদ তিনি সকল তারকেই বাজিয়ে তুল্‌তে পারেন— কিন্তু যে শুদ্ধমাত্র তার, সে নিজে বেজে উঠে' কেবলমাত্র এমন তারকেই বাজাতে পারে, যে তা'র সঙ্গে সমান স্বরে বাঁধা। সতীশের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ এ সেই তারের সঙ্গে তারের সম্বন্ধ, কবির সঙ্গে কবির সম্বন্ধ— সাধকের সঙ্গে সাধকের নয়।

আমি অনেক দিন থেকেই ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা করে আস্‌চি তিনি যেন আবুহোসেনের মত আমাকে এমন সিংহাসনে না বসান যেখানে আমার অধিকার নেই। সকলের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর মন্দিরের সোপান ঝাঁড় দিতে যদি পারি তাহলেই বেঁচে যাই— কিন্তু দশ জনে পড়ে যদি একটা কাজ সেরে নেবার জন্যে মন্দিরের বেদীর উপরে অযোগ্যকে চড়িয়ে দেয়— তাহলে নীচে দাঁড়িয়ে ঝাঁড় দিয়ে যে সেবা করা, সে কাজটা জীবনে আর হয়ে ওঠে না— অথচ তারই মধ্যে গভীর একটি রস আছে— কারণ সে রসের মূল্য মানুষে দেয়

না, তিনিই দেন। আমি সত্যই তোমাকে বলচি কোনো উচ্চ আসনে বসবার জন্যে আমার অন্তরতম আত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা নেই— কিন্তু এই আসনটাকে যদি অনেকে মিলে অভ্যস্ত করিয়ে তোলে তা হলে বাইরের দিক থেকে সে মানুষকে পেয়ে বসে। বাইরের সঙ্গে অন্তরের এই অসামঞ্জস্য এ ক্ষেত্রে কোনো মতেই কল্যাণকর নয়।

এইজন্যেই মাঝে মাঝে আমার এক একবার বিদ্যালয় থেকে দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করে। এবার এই হিমালয়ে এসে আমার মনে হচ্চে, সকলের সব দাবি কাটিয়ে কিছুকাল একলা এইরকম জায়গায় থেকে গেলে আমার যা আবশ্যক তা অনেকটা পূরণ হতে পারে। দৃষ্টিকে সর্ব্বতোভাবে নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সত্য দৃষ্টি পাওয়া যায়— অনন্তের আনন্দরূপ অমৃতরূপ তখনি চারিদিকে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সেই রূপটিকে আমি চোখ মেলে দেখে যাব— এরই জন্যে আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ক্রন্দন। এই কথাটাকেই সুস্পষ্টভাবে না বুঝেও কৌতুকের ছন্দে আমি লিখেছিলুম—

আমি চাইনে হতে নবযুগে
নব বঙ্গের চালক
যদি পরজন্মে পাই রে হ’তে
ব্রজের রাখালবালক।

ব্রজের বালকের সেই সরল দৃষ্টিটি আছে যাতে না বুঝে না জেনেও সমস্ত সুন্দর করে দেখতে পাওয়া যায়— যে দৃষ্টির কাছে অনন্ত আপনিই দিনে রাতে কাজে খেলায় অতি সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দেন।

কিন্তু রাখাল বালকটাকে গুরুমশায়ের আসনে কে বসালে! এ কৌতুক তার সঙ্গে কে করচে! এ কৌতুক চিরদিন কখনই চল্‌তে পারে না— সে যে রাখাল এ কথাটা কখনই চিরদিন চাপা থাক্‌বে না— ধরা পড়বেই— তার গুরুগিরি একদিন সমস্ত ভেঙে যাবে। এ গুরুগিরি

তার ভালও লাগ্চে না। বাঁশের বাঁশিই তার পক্ষে, আর ভাল যমুনার ধার। ঈশ্বর কবে তার সব অহঙ্কার ভেঙে দিয়ে সব আসবাব কেড়ে নিয়ে তাকে তাঁর সেই বনের ছায়ায় ডাক দিয়ে নিয়ে যাবেন! সেইখানেই তো তাকে নিয়ে তিনি বরাবর খেলা করেছেন— এ আবার তাকে কোন্ মুল্লুকে এনে ফেলেছেন! সেই ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু ডাক কি আস্‌বে না? তিনি তাঁর খেলার সাথীকে ভোলেন নি— সেই ধূলোখেলার ক্ষেত্রেই তিনি তাকে ডাক দিচ্চেন। কিছুই তাই ভাল লাগ্চে না— মন চার দিকে পথ খুঁজে বেড়াচ্চে। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

—রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

পত্র ১০৫। 'পাশ্চাত্য দেশে এমন কথা অনেকের কাছেই শুনেচি, আমার বাণীতে আমি যে কেবল তাদের খুসি করেছি তা নয়, তারা জীবনের অন্ন পেয়েছে তার থেকে'। প্রথম-বিশ্বমহাযুদ্ধে-নিহত কবি Wilfred Owen-এর জননীর লেখা একখানি চিঠিতে ইহার এক মর্মস্পর্শী আভাস পাওয়া যায়। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের On the edges of time (pp. 127 28) গ্রন্থ (1958) হইতে ঐ পত্রের কিয়দংশ সংকলন করা গেল—

Shrewsbury.
August 1st, 1920.

…It is nearly two years ago, that my dear eldest son went out to the War for the last time and the day he said Goodbye to me— we were looking together across the sun-glorified sea— looking towards France, with breaking hearts— when he, my poet son, said those wonderful words of yours – beginning at 'When I go from hence, let this be my parting word'— and when

his pocket book came back to me—I found these words written in his dear writing— with your name beneath. Would it be asking too much of you, to tell me what book I should find the whole poem in?

My precious boy was killed one week before the awful fighting was over— the news came to us on Armistice day. A small book of my son's War Poems will be published very soon— his heart was torn with sorrow at the suffering he saw "out there" and the *callousness* of the majority at home —the futility of War— he speaks not of his own sufferings but any one who loved him can tell from his poems what he had passed through, to be *able* to write as he did. He was only 25. Wilfred loved all that was beautiful, his life was beautiful and of great influence for good. Our God knew but when he took him "hence"— and I must not murmur— for I *know* He is a God of love — and would have answered my constant prayers — if, to come back to me, would have been *best*.···

With great respect and admiration···

Susan H. Owen.

পত্র ১০৭। 'কমলা লেকচার ··· প্রোফেসারি পদের প্রথম অভিভাষণ'। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে এই সময় 'মানুষের ধর্ম্ম' বিষয়ে কমলা বক্তৃতা দিবার ও বাংলার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

পত্র ১০৭। ‘প্রফুল্লজয়ন্তী’। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ (‘আমরা দুজনে সহযাত্রী’ ইত্যাদি) বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (৪০৬ পৃষ্ঠার পরে) তাঁহার হস্তাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত আছে। কবি Mahatmaji and the Depressed Humanity পুস্তিকাও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

পত্র ১১৭। ‘নির্জ্জীবকুমার’। শ্রীবাসন্তী দেবীর পুতুল-জামাতা। কন্যার নাম ‘অচেতনা’। ইহাদের ‘বিবাহ’-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ শ্রীবাসন্তী দেবীকে লিখিত ১৪-সংখ্যক পত্রে দ্রষ্টব্য।

পত্র ১২১। ‘ডাকাতকে ভয় করবার’—এই সময়ে শান্তিনিকেতনে একবার ডাকাতি হইয়াছিল।

পত্র ১৩২, ১৩৩। ১৩৩-সংখ্যক পত্রে মহাত্মা গান্ধীর যে মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন, উহা অতঃপর মুদ্রিত হইল—

It has caused me a painful surprise to find Mahatma Gandhi accusing those who blindly follow their own social custom of untouchability for having brought down God's vengeance upon certain parts of Bihar, evidently specially selected for his desolating displeasure. It is all the more unfortunate because this kind of unscientific and materialistic views of things are too readily accepted by large sections of our countrymen.

I keenly feel the indignity of it when I am compelled to utter the truism in asserting that physical catastrophes have their inevitable and exclusive origin in a certain combination of physical facts. Unless we believe

in the inexorableness of universal laws in the working of which God himself never interferes, imperilling thereby the integrity of His own creation, we find it impossible to justify his ways on occasions like the one which has sorely stricken us in an overwhelming manner and scale.

If we associate the ethical principles with cosmic phenomena we shall have to admit that human nature is morally superior to Providence that preaches its lessons in good behaviour in orgies of the worst behaviour possible. For we can never imagine any civilised ruler of men making indiscriminate examples of casual victims including children and members of the untouchable community in order to impress others dwelling at a safe distance who possibly deserve severer condemnation. Though we cannot point out any period of human history that is free from iniquities of the darkest kind, we still find citadels of malevolence yet remain unshaken, that factories that cruelly thrive upon the abject poverty and ignorance of famished cultivators, or prison houses in all parts of the world where the penal system is pursued, which most often is a special form of licensed criminality, still stand firm. It only shows the law of gravitation does not in the least respond to the stupendous load of callousness that accumulates till the moral foundation of our society begins to show dangerous cracks and civilisations are undermined.

What is truly tragic about it is the fact that the kind of argument that Mahatmaji used by exploiting an event of cosmic disturbances, far better suits the psychology of his opponents than his own and it would not have surprised me at all if they had taken this opportunity of holding him and his followers responsible for the visitation of divine anger. As for us we feel perfectly secure in the faith that our own sins and errors, however enormous, have not got enough force to drag down the structure of creation to ruins. We can depend upon it, sinners and saints, bigots and breakers of conventions. We who are immensely grateful to Mahatmaji for inducing, by his wonderful inspiration, freedom from fear and feebleness in the minds of his countrymen, feel profoundly hurt when any words from his mouth may emphasise elements of unreason in those very minds, unreason which is the fundamental source of all blind powers that drive us against freedom and self-respect,

Rabindranath Tagore

এই বিবৃতির উত্তরেও মহাত্মা গান্ধী **Harijan** পত্রে (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) স্বীয় মন্তব্যে তাঁহার গভীর বিশ্বাস দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন।

পত্র ১৪৩। 'আমি সীতার নিন্দা করেচি' এই অপবাদ 'ঘরে বাইরে' প্রকাশের সমকালীন; এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে 'ঘরে বাইরে'র গ্রন্থপরিচয়ে, ১৩২৬ চৈত্রের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন-কি আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না।'

পত্র ১৫০। দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের পরলোকগমনে (৫ এপ্রিল ১৯৪০) শান্তিনিকেতন-মন্দিরে উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহার অনুলিখন ('দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ') ১৩৪৭ বৈশাখের প্রবাসীতে মুদ্রিত। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতনে যোগ দিলে ১৯১৪ সালে তাঁহার সংবর্ধনা-উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লেখেন, এ স্থলে সংকলিত হইল—

চার্ল্‌স্ এণ্ড্রুজের প্রতি

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

Letters to a Friend গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে লিখিত অনেকগুলি পত্র মুদ্রিত আছে।

পত্র ১৫২। 'তোমার প্রেরিত ফলের ঝুড়ি এই মাত্র এসে পৌঁছল।...

শীতলপাটিও ব্যবহারে লাগ্‌বে।' এ বিষয় সম্পর্কে শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েক দিন পূর্বের চিঠিখানি দ্রষ্টব্য—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমার কোনো লোক এখন থাকে না। আমাদের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী প্রতাপচন্দ্র তলাপাত্রকে লিখে দিয়েছি তিনি ফল পাঠাবার ভার নিতে পারবেন। কাল অর্থাৎ শনিবারে যে কোনো সময়ে সেখানে জয়নারাণ দরোয়ানের কাছে ঝুড়ি রেখে গেলে প্রতাপ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। হেমন্তবালাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্ষয়বাবু ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও পরিবারের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। ৯।১ এ, কালু ঘোষ লেনের ঠিকানা হইতে ৭ অক্টোবর রবিবারে ১ খানি শীতলপাটী ও নানাপ্রকার ফল প্রেরিত হয় জোড়াসাঁকোর বাটীতে।

পত্র ১৮১। 'ভিক্টোরিয়া'— ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, 'বিজয়া' নামে ইঁহাকে পুরবী গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত। (বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : শ্রীমতী প্রতিমা দেবী -প্রণীত 'নির্বাণ'।) সাহিত্য আকাদেমি -কর্তৃক রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত Rabindranath Tagore : 1861-1961 গ্রন্থে 'Tagore on the Banks of the River Plate' প্রবন্ধে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্র-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পত্র ১৮৩। এই পত্র লিখিবার কিছু কাল পূর্বে কালীঘাটে পশুবলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র শর্মা অনশনব্রত আরম্ভ করিলে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন—

প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।
হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার
ক্ষালন করিবে তুমি সংকল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার॥
মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দিরপ্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশমাতার,
তোমারে জানাই নমস্কার॥
নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী
নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে জীবেরে হানি’,
তারে তুমি প্রাণমুল্য দিয়ে আপনার
ধর্ম্মলোভী হাত হতে করিবে উদ্ধার—
তোমারে জানাই নমস্কার॥

১৫ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

—প্রবাসী, কাত্তিক ১৩৪২

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানিতে চাহিলে তিনি উত্তরে লেখেন—

…সম্প্রতি একটি পত্রের উত্তরে এ সম্বন্ধে যা লিখেছি[৯] আপনাকে পাঠাই। শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনও কখনও ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশুহত্যাও রহিত হবে এই আশা করা যায়। ইতি ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

—রবীন্দ্রনাথের পত্র। প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৪২

পত্র ২০৮। 'সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই আমি বেশি পড়ে থাকি।' এই প্রসঙ্গে, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর 'The Poet at Work' প্রবন্ধের অংশবিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইতে পারে—

It is said that a man's library betrays the intimacies of his mind. Certainly the Poet's peregrinations in the world of printed matter have left their mark in the Visvabharati Library…Browsing in its cool chambers… we have stumbled upon strange data,…We have discovered, to mention only a few items, that the Poet in his tendencies is not only a farmer but a philologist; historian as well as physician; a keen student of astrophysics, geology, bio-chemistry, entomology. We find him actively engaged in co-operative banking, experimenting with sericulture, indoor decoration, production of hides, manures, sugar-cane and oil; organizing local pottery, weaving-looms, lacquer-work; introducing tractors, formulating new schemes of village economics, and new recipes for cooking. Books on lighting and drainage system, calligraphy, plant-grafting and meteorology show unmistakable signs of pencilled perusal; synthetic dyes, parlour games, not to speak of whole encyclopaedias and comparative dictionaries have been probed by his lance-like intellect. Egyptology, road-making, incubators, wood-blocks, elocution and Jiu-jitsu have competed with printing presses and stall-feeding for equal claims on his attention.

—**The Golden Book of Tagore (1981), p 45**

পত্র ২১৮। টাউনহলে বক্তৃতার উপলক্ষ্য— দেশে ফিরাইয়া আনিবার দাবিতে আন্দামানে রাজবন্দীদের স্বেচ্ছায় অন্নগ্রহণ ত্যাগ।

‘আন্দামানের ১৮৭ জন বন্দী প্রায়োপবেশন করায় সর্ব্বত্র জনগণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহা প্রথম প্রকাশ পায় কলিকাতার টাউনহলের বহুজনাকীর্ণ সভায় [২ অগস্ট্ ১৯৩৭] যাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মন্তব্য পাঠ করেন।’[১০] রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সারাংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

It is more than a week since about 200 political prisoners have gone on hunger-strike in the Andamans. The news of the hunger-strike was withheld from us for a long time. This callous indifference to public sentiment is a sad reminder of our national helplessness. In England or in any other democratic country government would not dare keep a fact of such national importance as this hunger-strike secret for such a long time.

The political prisoners have demanded repatriation to India from the Andamans. Their demand is just and modest. When the power is not responsible to the people of this country, it is only natural that the people will be apprehensive of the treatment that is meted out to political prisoners exiled in an island thousands of miles away from India and demand that these political prisoners should be kept in India where at least some kind of popular control can be exercised to soften the inhuman rigour of prison life in India.

It appears that the Government of India have shifted their own responsibilities regarding the question of repatriation of the Andaman prisoners on to the shoulders of the Bengal Government. Moreover, the Government of India have rejected the petition of the political prisoners on the plea of their inability to consider the collective petition of all prisoners.

Once again the heartless inflexibility of the Government machinery has triumphed over its sense of humanity and justice.

In those Provinces of India where the representatives of the people have taken up the reins of administration, political prisoners have been unconditionally released and all encroachment on the civil liberty of the people has been removed.

It is only in the Province of Bengal that hundreds of boys are detained without trial. The Press is now and then gagged to remind us of the power that is not answerable to the will of the people of this country, and the civil liberty that the people of Bengal enjoy has become as unreal as a mirage in the desert.

We all know that once before in the past, during another hunger strike amongst the political prisoners in the Andamans, three young lives were lost. Two of them were the direct victims of the cruel system of forced feeding. Shall we or the Bengal Government allow the same tragedy to occur in a larger number this time once again ?

I appeal to the Bengal Government to line up with the Governments of Bombay, Madras and the Central Provinces and to treat with broad-minded sympathy and humanity the case of political prisoners and detenus.

The pitiless method of punishment that still persists in most parts of the world in their penal system is enough to condemn human civilisation, but of late an aggravated spirit of vindictiveness has suddenly grown in virulence in some of the Western countries in their dealings with political victims. India has not altogether escaped in her government from manifesting in some degree such Fascistic infection which has scant respect for the law and for the legitimate claim of human freedom.

And, the gloom of despair has spread from hundreds of stricken homes over this unfortunate province when men and women of tender age are made to suffer an indefinite period of detention without trial, undergoing various modes of penalty, physical and psychological.

On this present occasion I am requested by my countrymen to lend my voice in asking our rulers, not for any radical change in the administration of the law, which no doubt is sorely needed, but for some mitigation in its severity.

—Madras Mail, August 3, 1937

অতঃপর শান্তিনিকেতনে আন্দামান-দিবসে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' নামে তাহা কালান্তর গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্র ২০৯। '২৫ বৈশাখ এত ঊর্ধ্বে আমাকে··· আক্রমণ করতে আসবে না'।

পত্র ২১১। 'এখানে এসেও জয়ন্তীর হাত এড়াতে পারি নি।'

রবীন্দ্রনাথ এই বৎসর ২৯ এপ্রিল আলমোড়া যাত্রা করেন; ২৯ জুন পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়কার বিবরণ A.K.C. [শ্রী অনিলকুমার চন্দ] -লিখিত 'With Rabindranath in Almora' প্রবন্ধে মুদ্রিত আছে। তাহা হইতে এই বৎসরের জন্মোৎসবের বিবরণ পরপৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত হইল।—

On the 8th of May we had the pleasant function of a small afternoon party in honour of Gurudeva's 77th birthday. Just about 30 local representative residents, Indian and European, came in the afternoon with their greetings and we entertained them to tea. It must have been one of the quietest birthdays of his life ; we were too shy even to put a garland round his neck, but the day did not pass off entirely barren for him. A very young child came to tea with his father and he had thoughtfully brought a garland for him.

—Visva-Bharati News, June, 1937

এই বৎসর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলমোড়ায় রচিত কবিতা (‘জন্মদিন’ ২২ বৈশাখ ১৩৪৪) সেঁজুতি গ্রন্থে সংকলিত আছে।

পত্র ২১৯। ‘আমার যে অনুচর ছিল সে বিস্তারিত বিবরণ লিখবে’। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ‘পতিসরে রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৯৩৭ সালের ২৬ অগস্ট্ রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে পতিসরের জমিদারিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে লিখিয়াছেন ‘আমার প্রতিও তাদের [প্রজাদের] ভালোবাসা অকৃত্রিম ও গভীর’, শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রবন্ধে তাহাই সুপরিস্ফুট—

> …নরজগতে হঠাৎ দেবতার আবির্ভাব হ’লে মানুষ যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং দেবতাকে কি দিয়ে খুশী করবে সেই কথাই ভাবে, প্রজারাও (শতকরা ৯৯ জনের চেয়েও বেশী মুসলমান) রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে সেই রকম খুশী হয়ে উঠল। তারা কবির কাছে কোন রকমের আর্থিক উপকারের প্রার্থী নয়। তারা কবিকে অনেক দিনের পরে নিজেদের মধ্যে পেয়ে পরমানন্দিত, এ যেন হারাধন ফিরে পাওয়া।… এঁদের কথা-

বার্ত্তার ভিতর দিয়ে বার বার একটি প্রার্থনাই বেজে উঠছিল, সেটি তাঁদেরই ভাষায় বলি—

"আমরা ত হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে, আপনিও চলতি পথে, বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।…" এঁদেরি মধ্যে একজন সাশ্রুনয়নে ব'লে উঠলেন, "হুজুর, আমরা হিন্দুদের মত জন্মান্তরবাদ মানি না,— মান্‌লে খোদার কাছে এই প্রার্থনাই জানাতাম, বার বার যেন হুজুরের রাজ্যেই প্রজা হয়ে জন্ম নিই।" এই সব প্রজাদের অবস্থা ভাল, এঁরা কেউ কবিকে এসব কথা খোসামোদ-ছলে বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্ত্তা থেকেও বুঝেছি যে, তিনিও তাদের কোন দিন অবজ্ঞা করেন নি,— তাদের নিজের অন্নদাতা হিসেবে মনে করেন। অতীতের পুরনো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে আনন্দের অশ্রুবাষ্পে।

—পতিসরে রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

পত্র ২২৩। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ গুরুতর-ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন, এই পত্রে তাহারই উল্লেখ আছে। গল্পটি গল্পসল্পের অন্তর্গত 'চন্দনী'; তাহার সূচনায় ও শেষে সেই সন্ধ্যার কাহিনী বর্ণিত আছে। গল্পের অন্যতম শ্রোত্রী 'ক্ষিতিমোহন বাবুর স্ত্রী' শ্রীকিরণবালা সেন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

…১৯৩৭ সালে গুরুদেব হঠাৎ যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেদিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। সেই গল্পটা তিনি গল্পসল্প বইতে 'চন্দনী' নামে লিখেছেন।…

…হঠাৎ গুরুদেব বাইরের চেতনা হারিয়েছিলেন। আড়াই দিনের উপর অচেতন ছিলেন। সেদিনের কথা মনে আছে। তখন তিনি উত্তরায়ণের নীচের তলায় দক্ষিণের ঘরে থাকতেন। বিকেলে

সেই ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় এসে বসতেন। অনেকে তাঁর কাছে সন্ধ্যায় গিয়ে বসতেন। সেদিন বাদলার জন্য পুবদিকের বারান্দায় এসে বসেছিলেন। কেউ কেউ গিয়েছিলেন কিন্তু বেশি সেদিন কেউ যান নাই।

কথা হচ্ছিল, তিনি আগে কারো কারো অনুরোধে তখন তখনই বানিয়ে মুখে গল্প বলেছেন কত। এখন আর সে শক্তি নাই। মুখে মুখে তৈরি করে তখনই গল্প বলতে পারেন না এখন। বলেছিলাম কেন পারবেন না। একটা গল্প বলুন। আমরা শুনতে চাই।

তারপর একটি গল্প আরম্ভ করলেন। বেশ খানিকটা বলে শেষের দিকে বললেন আজ এই পর্যন্ত থাক।[১১] গল্পের শেষের দিকটা কাল আবার বলব। তারপর তিনি শুতে যাবার জন্য ঘরে গেলেন। সুধাকান্ত-বাবু সঙ্গে রইলেন। আমরা চলে এলাম। অল্প পরেই খবর এল যে গুরুদেব অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। অদ্ভুত কথা। সেন মশায় হোমিওপ্যাথী আর বায়োকেমিক ওষুধ নিয়ে ছুটলেন উত্তরায়ণের দিকে।

…বড়ো গল্পই ফেঁদেছিলেন মনে হয়। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর গল্পটা ওঁকে লিখতে বলেছি আমরা। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন আমি তো বলেছি এখন তোমরা লিখে দিও। যাই হোক তিনি লিখেছেন 'চন্দনী' নামে গল্পটা।[১২]

—শ্রীকিরণবালা সেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র

পৃ ২৪০। 'সর্বসাধারণের কাছে আমি বিশ্রাম কামনায় ছুটি চেয়েছি'। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ২ (১৩৪৯), পৃ ১১৩ ও তৎসহ ২৫ জুন ১৯৩৮ তারিখের ইংরেজি বিবৃতির খসড়া।

পত্র ২। 'একদা তোমার বয়সী একটি বালিকা'— 'রাণু অধিকারী', বর্তমানে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১৯,২১।

পত্র ৮। 'রবিঠাকুরের পাঁচালি'। শ্রীহেমন্তবালা দেবী জানাইয়াছেন— 'আমার পরিচারিকা নিরক্ষরা নলিনী পর্য্যন্ত উঁহার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সে 'রবিঠাকুরের পাঁচালী' শুনিতে ভালবাসিত।'

পৃষ্ঠা ৪১১। ডাক্তার শ্রীনিখিলচন্দ্র বাগচীর সহিত 'শ্রীমতী বাসন্তী দেবী'র বিবাহোপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী কবিতা।

পত্র ২৬। 'এখানে একটা সাবেক কালের দীঘি ছিল'। 'এখানে' অর্থে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে 'জলোৎসর্গ' ও 'প্রসঙ্গপরিচয়'।

১ আত্মপরিচয়, ৪-সংখ্যক প্রবন্ধ।

২ ‘পান্থ’, পরিশেষ। সমকালীন ‘প্রবাসী’ ও পঞ্চদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

৩ দ্রষ্টব্য প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮,পৃ ৪৬৭

৪ পত্রখানি ছাপা হইবার পরে মূল পত্র পাওয়া গিয়াছে, তদনুযায়ী পত্রের চতুর্থ ছত্রে ‘বহুদিন’ স্থলে ‘বহুকাল’, অষ্টম ছত্রে ‘ভালো’, একাদশ ছত্রে ‘বড়ো’, দ্বাদশ ছত্রে ‘হোলো’ এবং ত্রয়োদশ ছত্রে ‘টিঁকতেও’ পাঠ হইবে। শেষ ছত্রে‘ টুক্‌রো’। পরবর্তী ১১৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছত্রে ‘বল্‌লেই’ এবং ‘পারো’, তৃতীয় ছত্রে ‘করো খুব’, ষষ্ঠ এবং অষ্টম ছত্রে ‘নবেম্বর’ হইবে। মূল চিঠির শীর্ষে ‘দার্জ্জিলিং’ নাই এবং তারিখও ১৯৩৮, অথচ উহা ১৯৩১ হইবে মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে।

৫ এই কবিতাই প্রথম ও শেষ দুই স্তবক বাদ দিয়া ‘অপূর্ণ’ নামে পরিশেষ কাব্যে মুদ্রিত।

৬ প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য— D. G. Tendulkar, *Mahatma*, Vol. III (1952)

৭ বিজ্ঞপ্তিতে ‘রবীন্দ্রনাথ ইহাও জানাইয়াছেন যে, ক্যাটালগে তাঁহার চিত্রগুলির যে নাম দেওয়া হইয়াছে এগুলি তাঁহার প্রদত্ত নাম নহে। তাঁহার কোন চিত্রের নাম নাই।’

৮ শারদীয় দেশ পত্রে (১৩৬৭) রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-রূপে ইহার খসড়া মুদ্রিত। সমকালীন মডার্ণ্ রিভিউ (জুলাই ১৯১৯, পৃ ১০৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীঅমল হোম -প্রণীত ‘পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে ইহার সমকালীন বাংলা অনুবাদও সংকলিত। শুনা যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই তর্জমা করেন, কিন্তু অনুবাদের ভাষাভঙ্গী দেখিয়া তাহা মানিয়া লওয়া কঠিন।

৯ শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত ১৮৩-সংখ্যাক পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ।

১০ দ্রষ্টব্য—‘বিবিধ প্রসঙ্গ’. প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ ৭৩৭। এই সভানুষ্ঠানের ইতিহাস ও সভার বিবরণ, ১৩৬৮ বৈশাখ সংখ্যা ‘সমকালীন’ পত্রে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ‘রবীন্দ্রনাথ ও আন্দামান রাজবন্দী-মুক্তি-আন্দোলন’ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১১ গল্পসল্প দ্রষ্টব্য। ‘দস্যুকন্যাটি এদের [ডাকাতদের] গোপন করে ছেলেটিকে ঐ ঘনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করে দিল। এই পর্যন্তই বলেছিলেন।’

—শ্রীকিরণবালা সেন

১২ দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৭ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় মুখে-মুখে বলা অসম্পূর্ণ কাহিনী, দীর্ঘকাল পরে ‘গল্পসল্প’ গ্রন্থে সংকলনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়; রচনাকাল : ২ মার্চ্ ১৯৪১।

সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী

এই গ্রন্থে সংগৃহীত অনেকগুলি পত্র ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা যতদূর সন্ধান পাইয়াছি তদনুযায়ী প্রকাশ-সূচী মুদ্রিত হইল।

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত কতকগুলি চিঠি 'পত্রধারা' নামে প্রবাসী পত্রে ১৩৩৮-৪০ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সূচীতে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীবাসন্তী দেবীকে লিখিত একখানি চিঠিও (পত্র ৩) উক্ত পত্রধারার অন্তর্গত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবাসীতে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক কতকগুলি চিঠিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত এবং কোনো-কোনোটির অংশবিশেষ পরিবর্জিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে পূর্বানুসৃত রীতিতে প্রত্যেক পত্রই যথাসাধ্য মূলানুযায়ী মুদ্রিত, তবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অনেক স্থলেই বর্জিত।

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী

প্রবাসী[১]—

	পত্রসংখ্যা
আশ্বিন ১৩৩৮	৩৯[২]
কার্তিক ১৩৩৮	২
অগ্রহায়ণ ১৩৩৮	৩,৪
পৌষ ১৩৩৮	৫,৬,৭
মাঘ ১৩৩৮	৮,১১
ফাল্গুন ১৩৩৮	১৪,১৭,১৮,১৯
চৈত্র ১৩৩৮	২০,২১,২৪
বৈশাখ ১৩৩৯	২৩
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯	১৫,২৬,৩১
শ্রাবণ ১৩৩৯	৩২,৪৫

প্রবাসী—

ভাদ্র ১৩৩৯	৩৫,৫২,৫৩,৫৫
আশ্বিন ১৩৩৯	২৯,৩০
কার্তিক ১৩৩৯	৫৬,৫৮
অগ্রহায়ণ ১৩৩৯	৫৯,৬২,৬৩
পৌষ ১৩৩৯	৭৭,৭৮
মাঘ ১৩৩৯	৮৭,৮৮,৮৯
ফাল্গুন ১৩৩৯	৯১,৯৮,৯৯
চৈত্র ১৩৩৯	১০১,১০৪,১০৫,১০৬
বৈশাখ ১৩৪০	৯৬,১০৭,১০৮

উত্তরা—

আশ্বিন ১৩৪৮	১৬৫,১৯৫,২৫৮
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮	৮৪,১২৭,১৩৮,১৬৯,২১১,২২৩,২৩৬,২৪১,২৪৬

গীতবিতান বার্ষিকী—

মাঘ ১৩৫০	পত্রাংশ : ১৮১,১৮৯,২০২

গীতবিতান পত্রিকা : রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা—

১৬৪,১৭২,২০১,২২৯

পূর্বাচল—

আশ্বিন ১৩৫৫	১৯৩,২১০
ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫৫	২০২
বৈশাখ ১৩৫৬	২৪৮

লোকসেবক—

৮ মে ১৯৫০	হস্তাক্ষরের প্রতিরূপ : ১৮৪

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্যসম্মেলন স্মারকপুস্তিকা—

১৩৬০	৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা[৩]—

মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১	২২,৫৭,৬৯,১১০,১১৮,১২৬,১৩২ ১৩৩
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০	২৭,২৮ (অংশ), ৩৪,৪৪,৫৪,৬৪ ১১৩,১২১,১২৩,১২৫
বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮১	১৪১,১৪৩

সৃজনী : শতবার্ষিক উৎসবে রচনাসংগ্রহ—

১৩৬৮	হস্তাক্ষরের প্রতিরূপ : ১৮,১৯

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লিখিত

সাহিত্য পত্র—

মাঘ-চৈত্র ১৩৬০	২,৪,৫,১০,১১

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্যসম্মেলন স্মারকপুস্তিকা—

১৩৬০	৬

শ্রীবাসন্তী দেবীকে লিখিত

উত্তরা—

আশ্বিন ১৩৪৮	৩,১৫,১৬,১৭,১৮,২০,২১,২২,২৫
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮	১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১৪,১৯,২৪,২৬,২৭ ২৮,২৯,৩০,৩১,৩২

প্রবাসী—

শ্রাবণ ১৩৩৮	৩ (অংশ)

গীতবিতান বার্ষিকী—

মাঘ ১৩৫০	১,২০

পরিক্রমা—

শরৎ ১৩৫৩ ২৬

শ্রীকিশোরকান্তি বাগচীকে লিখিত

শনিবারের চিঠি—

অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ আশীর্বাদ ও পত্রোত্তর[4]

---

[1] প্রবাসীতে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রই কবি-কর্তৃক অল্পাধিক পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত। বর্তমান গ্রন্থে মুলানুযায়ী মুদ্রিত।

[2] ‘আত্মীয়-বিরোধ’ শিরোনামে, ৩৯-সংখ্যক পত্রের রূপান্তর। দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ১

[3] শকাব্দ ১৮৮০-৮১ বুঝিতে হইবে।

[4] ‘নাচনচন্দ্র’ কিশোরকান্তের পত্র এবং কবির ‘মন্তব্য’ -সহ একত্র সংকলিত। ৪৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত অধিকাংশ পত্র তাঁহার পুত্র শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর সংগ্রহভুক্ত আছে ; এই চিঠিগুলি ও তাঁহাকে লিখিত পত্রাবলী তিনি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত অনেকগুলি চিঠি তাঁহার কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সংগ্রহভুক্ত ছিল ; তিনি এগুলি এবং তাঁহাকে লিখিত অধিকাংশ পত্র শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রসদনে উপহার দিয়া বিশ্বভারতীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থ-ভুক্ত অনেকগুলি চিঠি পূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ; গ্রন্থের অন্যত্র তাহার বিস্তারিত সূচী মুদ্রিত হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত কয়েকখানি চিঠি (পত্র ৮, ১৯, ১২২, ১৭১), অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত আকারে, ইতিপূর্বে ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ গ্রন্থের চৈত্র ১৩৪২ সংস্করণে ‘চিঠির টুকরি’র অন্তর্গত হইয়াছিল। শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত অধিকাংশ পত্রের মূল শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর নিকট রক্ষিত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; গ্রন্থমুদ্রণকালে সেগুলি তিনি সদা-সর্বদা ব্যবহার করিতে দিয়া বিশ্বভারতীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত নিম্নোক্ত পত্রগুলির মূল শ্রীমতী বাসন্তী দেবী শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে উপহার দিয়াছেন — পত্র ৮৪, ১২৭, ১৩৫, ১৩৮, ১৬৫, ১৬৯, ১৯৫, ২১১, ২২৩, ২৩৬, ২৪১, ২৪৬, ২৫৮

শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত এই পত্রগুলিও তিনি অনুগ্রহপূর্বক শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে উপহার দিয়াছেন— পত্র ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

এই পত্রগুলি এখন শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সংগ্রহে আছে— পত্র ৩, ১৫, ১৮

শ্রীকিশোরকান্ত বাগচীর উদ্দেশে লিখিত আশীর্বাদ-কবিতার পাণ্ডুলিপিও তাঁহার নিকট আছে।

শ্রীনিখিলচন্দ্র বাগচীকে লিখিত চিঠিখানি রবীন্দ্রসদনে উপহৃত হইয়াছে।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অধিকাংশ চিঠি শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে ; নির্বাচিত কয়েকখানি পত্র এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। এইগুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অনুধাবন করিবার সহায়তা হইবে, আশা করা যায়।

এই গ্রন্থসংকলনে শ্রীকানাই সামন্ত শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে ঐকান্তিক সহায়তা করিয়াছেন ; বস্তুতঃ তাঁহার আনুকূল্য ব্যতীত কোনো-কোনো অসম্পূর্ণতার ত্রুটি মোচন হইত না। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীপার্থ বসুর নিকট হইতেও প্রভূত সহায়তা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ও কোনো-কোনো বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -রচিত রবীন্দ্রজীবনী হইতে গ্রন্থপরিচয়ভুক্ত কোনো-কোনো তথ্য সম্বন্ধে জানা গিয়াছে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত দুইখানি চিঠি তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে ও তাঁহার বিশেষ সৌজন্যে এই গ্রন্থে (পৃ ৪২১-২৩) সংকলিত হইয়াছে।

চিঠির সংখ্যা এবং চিঠির শীর্ষদেশে বাম দিকে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ইংরেজি তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা পত্রের অংশ নহে ; ইংরেজি তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিঠির বাংলা তারিখ-অনুযায়ী নির্ধারিত। কতক ক্ষেত্রে পোস্ট্‌মার্ক্‌ হইতে ঐ তারিখ লওয়া হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তারিখটি তারকাচিহ্নিত। তারকাচিহ্ন যে স্থলে তারিখের পরে আছে, সে ক্ষেত্রে চিঠি বিলির তারিখ বুঝিতে হইবে ; যে ডাকঘর হইতে বিলি হইয়াছে তাহার নামও উল্লিখিত। তারিখের পূর্বে তারকাচিহ্ন থাকিলে চিঠি ডাকে দিবার তারিখ বুঝিতে হইবে ; ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

†-চিহ্নিত তারিখও পোস্ট্‌মার্ক হইতে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল পোস্ট্‌মার্কের তারিখ কেহ লিখিয়া রাখেন, তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে— খামগুলি দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

ডাকঘরের ছাপের পাঠোদ্ধার না হইয়া থাকিলে বা †-চিহ্নিত তারিখের সহিত উহার উল্লেখ পূর্বাবধি না থাকিলে, কেবল তারিখই সংকলিত হইয়াছে।

তৃতীয়-বন্ধনী-বেষ্টিত ক্ষুদ্রাক্ষর তারিখ অনুমানপ্রসূত। অনুমান সংশয়াতীত না হইলে জিজ্ঞাসাচিহ্ন-যুক্ত।

পত্রমধ্যে মুদ্রিত তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত শব্দ বা শব্দাবলী, জীর্ণতাহেতু পত্রের যে অংশ দুষ্পাঠ্য, তাহা হইতে অনুমিত মাত্র। যে-সকল ক্ষেত্রে পত্র অচ্ছিন্ন এবং স্পষ্ট, অথচ অর্থবোধের জন্য কোনো শব্দের প্রয়োজন, বিবেচনামত উপযোগী শব্দ তৃতীয় বন্ধনী -মধ্যে, অধিকন্তু উদ্ধৃতিচিহ্ন-যোগে, মুদ্রিত হইয়াছে।

সংযোজন-সংশোধন

পৃষ্ঠা	
১০৫	বিজয়াদশমী ১৩৩৮ : ৪ কার্তিক তারিখ
১০৭	দশম ছত্রে : শাশ্বত
১৪৯	৮৬-সংখ্যক পত্রে ১০ জুন শান্তিনিকেতনের ছাপ থাকায়, উহা ২৮ জ্যৈষ্ঠ (১১ জুন) তারিখে লেখা বলিয়া মনে হয় না।
১৭১	৯৯-সংখ্যক পত্র সম্ভবতঃ ৮ অক্টোবর বা ২২ আশ্বিন তারিখে লেখা। পৃ ৪৮৪ দ্রষ্টব্য।
২৩৯	তৃতীয় ছত্রে ‘সঞ্জীব’ বলিতে ‘সন্দীপ’ই বুঝিতে হইবে।
৩৩৫	২১৬-সংখ্যক পত্র ৪ শ্রাবণ তারিখ- অনুযায়ী ২০ জুলাইয়ের হইতে পারে, সেদিনই মঙ্গলবার। ‘কাল মঙ্গলবার ··· যাত্রা করচি’ ঠিক হইলে, এ চিঠি সম্ভবতঃ ১৯ জুলাই বা ৩ শ্রাবণ তারিখে লেখা।
৩৭২	২৬৪-সংখ্যক শেষ পত্রখানি, রবীন্দ্রনাথের উক্তির শ্রুতিলিখন, তাঁহার স্বাক্ষর -সংযুক্ত।
৩৯০	নীচে হইতে অষ্টম ছত্রে : স্বনামধন্য

চিঠিপত্রের বর্তমান খণ্ডে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় তাঁহাদের উল্লেখের প্রসঙ্গক্রমেই সহজে বুঝা যায়, এজন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখযোগ্য—

‘কচি’ শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর পুত্রের ডাক নাম এবং ‘নাচনচন্দ্র’ তাঁহারই দৌহিত্রের শৈশবের আদরের নাম।

৪০৪ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে ‘সুধা’ বলিতে, স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের পত্নীর উল্লেখ আছে এরূপ জানা গিয়াছে।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দশম খণ্ড

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৭৪ : ১৮৮৯ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৬৭

প্রকাশক বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

২·১

রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেনের মধ্যে যে-সকল পত্রবিনিময় হয়, দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তা সংকলিত ও প্রকাশিত হল। অধিকাংশ মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

১

[জুন ১৮৯৮]

ওঁ

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

দীর্ঘকাল হইল ত্রিপুরায় পত্র লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত যখন কোন উত্তর পাওয়া গেলনা তখন সেখানকার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? বিষয় কর্ম্মোপলক্ষ্যে আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই মফস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়— এবং বিচিত্র কর্ম্মের দায়ে আমার উদ্বেগের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে— নতুবা আমি কিছুকাল কলিকাতায় স্থির নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলে ইতস্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিতাম।

// "পুত্রযজ্ঞ" গল্পটি সম্পূর্ণ আমার নহে। ইহা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সমরেন্দ্রের রচনা, তবে উহাতে আমারো কিছু হাত আছে। "শিক্ষা-প্রণালী" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখা। "ঢাকা" লিখিয়াছেন "সিরাজদ্দৌলা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ভারতী যাহাতে আপনাদের সমালোচনার যোগ্য হয় তৎসম্বন্ধে আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না— কেবল আশঙ্কা এই যে, নানা কাজের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাছে সম্পাদকের মনের মত আদর্শ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। // ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩০৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

[সেপ্টেম্বর ১৯০০]

ওঁ

সহৃদয়েষু

ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা গোলেমালে দীর্ঘকাল পরে আমার হস্তগত হইল।

আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরেও যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— যখন আপনার খবর পাইলাম তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিলনা। আশা করি আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার বন্দোবস্ত হইয়া গেছে।

শিলাইদহে আপনার সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিতেছি। আশা করি শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে দেখা পাইব। ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩০৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[মার্চ ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, চৈত্রের পর্য্যন্ত চোখের বালি লেখা ছিল তাহার পরে আর আলস্যের ভিড়ে এবং নানা অকাজের তাড়নায় লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। আর বিলম্ব করিতে সাহস

হয় না। আজই লিখিতে বসিয়াছিলাম— ঠিক দুটি লাইন যখন লিখিয়াছি এমন সময় আপনার চিঠি পাইলাম। কিন্তু আপনার কথা আমার স্মরণ নাই এমন মনে করিবেন না। গতকল্য অপরাহ্নে আপনার বইখানি পাঠিকা সম্প্রদায়ের লুব্ধ হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছি— সেখান হইতে সে আমার প্রতি মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা কটাক্ষপাত করিতেছে— কিন্তু অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের অঙ্কুশাঘাতে আমার লেখনীকে অন্য পথে ছুটিতে হইতেছে। একটু অপেক্ষা করুন। গল্পটিকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে লইয়া পড়িব ইহাতে সংশয় করিবেন না।

তর্কবিতর্কের আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইবেননা। সাহিত্য ক্ষেত্রে নামিয়া কোন প্রকার কুশের কাঁটা পায়ে ফোটে নাই এমন সৌভাগ্যবান্ কে আছে? শত্রুরা নিন্দাবাক্যে হাসেন এবং বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হন কিন্তু কুয়াশা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায় কাহারো মনেও থাকেনা। পাছে কলহের তুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপিয়া বসে সেইজন্য শরৎ শাস্ত্রীর লেখা আমি পড়িই নাই। তাহা ছাড়া আমি জানি হীরেন্দ্রবাবু যখন গাণ্ডীব ধরিয়াছেন তখন পরাজয়ের আশঙ্কামাত্র নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হইতেছে। তিনি যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বাংলা ব্যাকরণের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন আমি সেরূপ কখনই পারিব না এই জন্য তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমি নেপথ্যে সরিয়া আসিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছি। দীর্ঘকাল আমি জনকোলাহলের মাঝখানে যাপন করিয়াছি— যুদ্ধের সংবাদে আমাকে আর প্রলুব্ধ করিবেন না— এখন আমার ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিন।

আপনার শরীর কেমন আছে? একবার এদিকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া যান না। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩০৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

আগামী ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নববর্ষের উৎসব হইবে— আপনার ছেলেটিকে লইয়া যদি সংক্রান্তি অথবা তাহার পূর্ব্বদিনে আসেন এবং উৎসবে যোগদান করেন ত আনন্দিত হইব। ছেলে লওয়া সম্বন্ধে আমাদের নিয়ম এই যে, দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলেদের আমরা বিদ্যালয়ে লই না। কারণ ছোট ছেলেদের সহিত বড় ছেলেদের মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। আপনার ছেলেটির বয়স যদি অধিক না হয় তবে তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনি এখানে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া যান। আপনার শরীর ভাল হইবে—কাজ করিতে পারিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রণালীও দেখিয়া লইতে পারিবেন—আমাকে তাগিদ দিয়া সমালোচনা লিখাইয়া লইবারও অবসর পাইবেন। অতএব এমন সুবিধা ছাড়িবেন না। শৈলেশের দল বোধ হয় আসিতে পারে— আপনি তাহাকে পাণ্ডা স্বরূপে বরণ করিয়া লইবেন। পাথেয়ের ভার সম্পূর্ণ আমার উপর দিবেন— আহূতের পাথেয় আহ্বানকর্ত্তার দেয় ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা— অতএব এ সম্বন্ধে আপনি যদি বিলাতী কায়দার অনুসরণ করেন তবে দুঃখিত হইব। রিক্ত হস্তে আসিবেন। কেবল যদি লেখাপড়া করিতে চান তবে আপনার অর্দ্ধসমাপ্ত ও সদ্য আরব্ধ প্রবন্ধগুলি সঙ্গে করিয়া আনিবেন। অবকাশের সময় আপনার বইখানি আপনার সঙ্গে বসিয়া পড়িবার ইচ্ছা করি— তাহা হইলে আলোচনার অনেক খোরাক পাওয়া যাইবে। শিলাইদহে

আসিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে আপনাকে সেই সত্য হইতে মুক্তি দিব— অতএব ইহকাল পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি আর কালবিলম্ব করিবেন না। ইতি ২৬শে চৈত্র ১৩০৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

অতি সাধু প্রস্তাব। স্টেশনের নিকটে, শান্তিনিকেতন হইতে মাইল খানেক তফাতে ১০।১২ টাকা ভাড়ায় একটি বাসা পাওয়া যাইতে পারে। যদি ইচ্ছা করেন তবে সেই বাসাটি আপনার জন্য অধিকার করিবার চেষ্টা করা যায়। এখানে মারীভয় হইতে দূরে নিশ্চিন্ত চিত্তে বন্ধুত্ব ও বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারিবেন। আর একবার শিলাইদহে উপস্থিত হইবার প্রস্তাবটিকে যেভাবে সম্পূর্ণ মাটি করিয়াছিলেন এবারে তাহার আশঙ্কা নাই ত? একবার না হয় আপনি আপনার ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া এখানকার বাসাটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যান— তাহার পরে আপনার কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পুত্র কলত্রগণকে এখানে আনিয়া ফেলিবেন। কি বলেন? মহাপ্রাজ্ঞ চাণক্য পরামর্শ দিয়াছেন যে এক পা আগে দিয়া অন্য পা-টা পরে টানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

আপনি একবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই

বলিয়া বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদকধর্ম্মসঙ্গত হইবে কিনা তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক্ আর বিলম্ব করিবেন না।—পুঁথিপত্রসহ লুপমেলের গাড়ীতে চড়িয়া বসুন তাহার পরে আর আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে? ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩০৯।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[মে ১৯০২]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম এখন সাক্ষাৎকারের আনন্দ প্রত্যাশা করিয়া আছি। আমার পিতৃদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে ১লা জ্যৈষ্ঠ নাগাদ একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে। ফিরিবার সময় আপনাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনিলে কিরূপ হয়? আপনার ছেলেটিকে সস্নেহে গ্রহণ ও সযত্নে শিক্ষাদান করিব সে সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করিবেন না— পনেরো দিনের মধ্যেই সে এখানে এমনি জমিয়া যাইবে যে বাড়ি যাইবার নাম করিবে না। এখান হইতে যে সকল ছাত্র ঘরে ফেরে তাহারা অশ্রুজল না ফেলিয়া যায় না।

পত্রে আপনি যে কথার আভাসমাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটি আমি পড়ি নাই— আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধও করিয়াছি, কারণ, লেখকজাতির

অভিমান অল্পেই আঘাত পায়— অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকে সেই গ্লানিজনক অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোনো সুখ নাই কোন শ্লাঘা নাই, এইজন্য বিদ্বেষ্টার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে আমি তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকি। জীবনপ্রদীপের তেল ত খুব বেশি নয় সবই যদি রোষে দ্বেষে হূহুঃ শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব? বিশেষতঃ আমার ছুটি লইবার সময় হইয়া আসিয়াছে— এখন বাজে কলহে কাজের ক্ষতি করিলে বিপক্ষের কিছুই হয় না নিজেরই বিপক্ষতা করা হয়।

অধ্যাপনা এবং "চোখের বালি"র উপসংহারেই আমার দিন কাটিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে আপনার বইখানি আর একবার পড়িয়া ফেলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে যদি সমালোচনা না যায় তবে আপনি আমাকে ছুয়ো দিবেন।

আপনি সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ হইতে উদ্ধার পান এই আমার প্রার্থনা।

ইতি ২০শে বৈশাখ ১৩০৯

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

[মে ১৯০২]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার শরীরটা ভাল নাই। আপনার চোখের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম। একান্তমনে কামনা করি রোগ এবং চিকিৎসকের হাত হইতে চোখ দুটিকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

আপনার ছেলেটির জন্য যেমন করিয়া হউক জায়গা রাখিব আপনি ভাবিবেন না। সংখ্যা পূর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে— তাহা হইলেও আপনার পুত্রের স্থান হইবে।

বিদ্যালয়ের কাজে চলিলাম— অতএব সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি শুক্রবার। [১৩০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[জোড়াসাঁকো। মে ১৯০২]

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

আজ এইমাত্র পত্র পাইলাম। কাল সমস্ত দিন বালিগঞ্জে এক আত্মীয় হইতে আর এক আত্মীয়ের ঘরে কাটিবে। পরশু প্রত্যূষে পদ্মাতীর অভিমুখে দৌড় মারিব। ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয় আপনার সঙ্গে দেখা করিব, ইতিমধ্যে আপনার বইখানি যতটা পারি পড়িয়া লইব। [জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

[মে ১৯০২]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে" ইত্যাদি শ্লোক মনে আছে? সজ্জনের বাক্য লঙ্ঘন হয় নাই— সূর্য্যও পূর্ব্বদিকে উঠিতেছে আপনার সমালোচনাও শেষ করিয়াছি, মস্ত হইয়াছে— বঙ্গদর্শনের এক ফর্ম্মারও অধিক হইবে। এটা আলোচনা সমিতিতে পড়িবার ইচ্ছা করিতেছি ইহাতে আলোচনাযোগ্য অনেক কথার অবতারণ করিয়াছি।

ছেলেটিকে আমার সঙ্গেই পাঠাইবেন— তাড়া নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চোখ দুটি সারাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি নানা শাস্ত্র হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে চক্ষু অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী। একটা পরামর্শ দিই— অন্ততঃ কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখুন। একজন ভাল হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান। বাছিয়া বাছিয়া হাতুড়ে ডাক্তার বাহির করিবেননা। যদি সম্পূর্ণ নির্জ্জন ঘরে কিছুদিন চোখ বুজিয়া থাকিতে চান তবে এখানে আসিবেন— আপনাকে অন্ধকারায় বন্দী করিয়া রাখিয়া দিব।

আজ এই পর্য্যন্ত ১২ই জ্যৈঃ ১৩০৯।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[নভেম্বর ১৯০২]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

অরুণ আমার সঙ্গে নিরাপদে এসে পৌঁচেছে। কলকাতার চেয়ে এ জায়গা ঠাণ্ডা— অরুণের সঙ্গে গরম কাপড় দিয়েছেন ত ?

সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক বেশি শিক্ষক সঞ্চিত হয়েছে। অতএব এখন আপনি এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হবেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে আপনাকে জানাব।

বঙ্গবাবু তাঁর দুটি ছেলেকে এনেছেন। তিনি নিজে কাল কলকাতায় যাবেন। ইতি বুধবার। [অগ্রহায়ণ ১৩০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[ডিসেম্বর ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্ম্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।

ভুবনডাঙ্গার পরশুরাম পণ্ডিতের বাড়িটি আমি আপনার জন্য

চাহিয়া লইয়াছি। আজ বিকালে দেখিতে যাইবার কথা আছে। সে বাড়িটি হিন্দুস্থানীর রচিত সুতরাং জানলার বাহুল্য নাই— দক্ষিণে দরজা আছে, উত্তরে দেয়াল। শীতকালে তাহাতে বিশেষ কষ্ট না হইতে পারে। একটি কূপ আছে— আঙিনা আছে। ঘর দ্বারের কিরূপ পরিমাণ ও অবস্থা আজ দেখিয়া আসিয়া আপনাকে লিখিব। পত্র পাইলেই আসিতে পারিবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে আপনার উপকার হইবে বলিয়া আশা করি। এখন আমার জামাতা এখানে আছেন তিনি L.M.S. ডাক্তার— সুতরাং চিকিৎসার জন্য আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না।

অরুণ বেশ ভালই আছে। সে আপনার প্রেরিত গরম কাপড় ব্যবহার করিতেছে। ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[জানুয়ারি ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চোখের অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। একান্ত মনে কামনা করিতেছি আপনার চক্ষু দুটি নিরাময় হউক্।

আমি আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব। এগারই মাঘের কাজ সারিয়া আবার ফিরিব— সেই সময়েই হয় ত আপনার ও কবিরাজ মহাশয়ের এখানে আসা সুবিধাকর হইবে। গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনেকদিন হইতে আশা করিতেছি এখানে আপনি সপরিবারে আসিবেন, দেখিতে দেখিতে শীতকাল বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিল— গ্রীষ্ম পড়িলে এস্থান আপনাদের সুখকর বোধ

হইবেনা হয় ত বেশিদিন থাকিতে পারিবেননা। অরুণ বেশ ভালই আছে— তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না। শীঘ্র সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা বিস্তারিত আলোচনা হইবে। রথী ও সন্তোষ জগদানন্দ এবং মনোরঞ্জনবাবুকে লইয়া কৃষ্ণনগরে Test Examination দিতে গেছেন। তাঁহারাও সম্ভবত বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে ফিরিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩
[এপ্রিল ১৯০৩]

ওঁ

হাজারীবাগ

বন্ধুবরেষু

পত্রে আপনার চোখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি। আশা করি আপনার দর্শন শক্তির কোন স্থায়ী ব্যাঘাত হইবেনা।

আমি এখানে আসিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। এখন এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে একে একে আমাদের সকলকেই শয্যাশায়ী করিয়াছে। ঐ রোগটার দোষ এই যে উহার লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষা উত্তর কাণ্ডই বেশি নিদারুণ। কাশি দুর্ব্বলতা অরুচি মন্দাগ্নি, প্রভৃতি উপসর্গ কিছুতেই দখল ছাড়িতে চায় না।

বিদ্যালয়ে ফিরিবার জন্য আমার চিত্ত উৎসুক হইয়াছে— আধি ব্যাধির হাত হইতে কোনমতে একটুখানি ছুটি পাইলেই আমি আমার বালখিল্যগুলির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইব। সেখানে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য একজন ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়াছি কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া আসিতে পারি নাই সেজন্য মন উদ্বিগ্ন আছে। শীঘ্র সেখানে একটি কারখানা খুলিবার সংকল্প আছে সেজন্যও আমার

উপস্থিতি আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া, আমার কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমি সমস্ত ভারই নির্ব্বিচারে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তিনি ক্রমশই ইহাকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন তাহা প্রত্যহ উপলব্ধি করিতেছি।

কলিকাতায় প্লেগের যেরূপ উপদ্রব তাহাতে গ্রীষ্মের অবকাশে শ্রীমান অরুণকে সেখানে পাঠানো কোনমতেই সঙ্গত হইবেনা। যদি আপত্তি না করেন, ছুটির সময় তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই তাহার পুরাতন পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইব। সে সময় যদি কোন সুযোগ করিতে পারি তবে আপনাদিগকেও আনাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। আমি সম্ভবত আর দিন পনেরোর মধ্যে বোলপুরে যাইব—কোন বাধা মানিবনা। ছুটির পূর্ব্বে আমি না গেলে নয়।

যতদিন বাঁচিয়া আছি আপনারা আমাকে আপনাদেরই কাজে এবং আপনাদেরই নিকটে পাইবেন; বাল্যকালে স্কুল পালাইয়াছি—প্রৌঢ় বয়সে আমার বিদ্যালয় হইতে পলাতক হইবনা।

সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আর আমার চিন্তা ও চেষ্টাকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবনা। কর্ত্তব্য সঙ্কোচ না করিলে কর্ত্তব্য পালন করা যায়না কেবল বৃথা ভ্রাম্যমাণ হইতে হয়। নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিয়া হীরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাবুকে পত্র লিখিয়াছি। Easterএর ছুটির সময় হীরেন্দ্রবাবু বোলপুরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি থাকি বা না থাকি তিনি গেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব একথা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানাইবেন এবং আপনিও তাঁহার সাথী হইবার চেষ্টা করিবেন। আপনাদের নিরাময় সংবাদ দিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৯শে চৈত্র ১৩০৯।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

[অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শ্রীশবাবু আসিয়াছিলেন। নহিলে এতদিনে আপনার প্রশ্নের উত্তর পৌঁছিত। যাহা হউক আপনি আসিয়া পড়ুন— দ্বিধামাত্র করিবেন না। দুর্য্যোগ চলিতেছে। সঙ্গে সূর্য্যালোক আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইতি ১৯শে আশ্বিন ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

[অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

আপনার লেখাগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া আমার পেন্সিলে লেখা মন্তব্যসহ আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছি। আজ দ্বিপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন তাঁহারই হাতে দিলাম— আশা করি যথাসময়ে হস্তগত হইতে কোন বিলম্ব হয় নাই।

লক্ষ্মণ ভরত কৌশল্যা, প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বোত্তম হইয়াছে। [তাহার] পরে যথাক্রমে সীতা ও [রাম] এবং দশরথ ক্লাসের মধ্যে [সর্ব্ব] নিম্নে।

লক্ষ্মণ, ভরত কৌশল্যা পাঠকের চিত্তকে অভূতপূর্ব্বভাবে আঘাত করিতেছে। পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি আমাদের যে ভাবটি ছিল তাহা ঘনীভূত এবং অনেকাংশে নবীভূত হইয়াছে। সীতা ও রাম সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। সীতা ও রামচরিত্রের যে বিশেষত্ব গভীর ভাবে কাব্যে নিহিত আছে তাহাকে আপনার লেখনী অগ্রে নূতন আলোকে

ধরিয়া দেখান দরকার হইয়াছে। রাম সীতার চরিত্র সর্ব্বজনের অতিশয় সুপরিচিত বলিয়াই ইহাদের বিশেষ একটি নব পরিচয় অত্যাবশ্যক। দশরথ কৈকেয়ীর মধ্যে দাম্পত্যবিকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই কালিমাকে পশ্চাতে রাখিয়া রাম-সীতা দাম্পত্যের উষালোকের ন্যায় রামায়ণে উদ্ভাসিত। এই দাম্পত্য নির্ব্বাসনকে সুমধুর করিয়াছে। সিংহাসনে অভিষেক অপেক্ষা অরণ্যচারণ কোন অংশে হেয় হয় নাই— বরঞ্চ তাহা এই প্রেমকে নিবিড়ভাবেই দোহন করিয়াছে— দাম্পত্যকে পরিস্ফুট করিবার এমন উপায় আর ছিল না— সীতাহরণও এই প্রীতিকে বীর্য্যের দ্বারা উজ্জ্বল করিয়াছে। দাম্পত্যর এই মাধুর্য্য ও বীর্য্য দশরথ কৈকেয়ীর কাম-[···]আসক্তির মসীলেপের উপর কেমন করিয়া চিরন্তন দীপ্তিলাভ করিয়া উঠিয়াছে তাহাই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হওয়া চাই। দশরথের পক্ষাবলম্বন করিতে গিয়া আপনি সেই রসটিকে কিছু ভাঙিয়াছেন। একটু ভাবিয়া দেখিবেন। রাম সীতার কাহিনী অংশ কিছু কমাইয়া আপনার মন্তব্য কিছু ফলিত করিয়া বলিলে আমার বোধ হয় ঐ দুটি রচনাও বিশেষ উপাদেয় হইবে। একটু সময় পাইলেই আমি ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইব। বিদ্যালয়ের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়াছে— সময় পাইনা। ইতি ২৮শে আশ্বিন—[১৩১০]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

[অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

তাই করিবেন—আমার মন্তব্য হইতে কোন স্থান যদি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারেনা। একটু নিশ্চিন্ত না হইলে ভূমিকা লেখায় হাত দিতে পারিতেছিনা। বিদ্যালয়টি ছুটির পরে অধ্যাপকে ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া হঠাৎ কোটালের বানের মত আমার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—উক্ত ঘাড় অপটু আছে বলিয়া তাহার প্রতি লেশমাত্র অনুকম্পা করে নাই—আমিও হার মানিতে চাইনা—কাজেই আমাকে বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

আপনি যে পঞ্চাননবাবুর কথা বলিয়াছিলেন তাঁহাকে কি অল্প বেতনে বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইবে? তাঁহাকে পাইলে বিশেষ সুবিধা হয়। বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় লইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অম্বুবাহ মেঘের জন্য চাতকের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠ বিদ্যালয় আর কয়েকজন বেতনবর্ষী ছাত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আপনার মাথার অসুখ ভাল করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবেন না।

বড় ব্যস্ত আছি। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

[নভেম্বর ১৯০৩]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

শীতের জন্য চিন্তা করিবেন না। অরুণকে গরম রাখিব। ইতিমধ্যে সংস্কৃত পড়াইবার লোক পাওয়া গেছে অতএব পঞ্চাননবাবু নারাজ হওয়ায় সুবিধাই বিবেচনা করিতেছি— তিনি এখানকার যোগ্যলোক হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে মিলাইয়া দিতেন। বোটে গিয়া আপনার ভূমিকা লিখিব। অগ্রহায়ণের আরম্ভেই বোটে যাইবার সংকল্প আছে। তাহার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে। শৈলেশের গতিক কি রকম বুঝিতেছেন? সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগরণ এই তিন অবস্থার মধ্যে সে কোন্ অবস্থায় আছে? ছাপাখানার করাল কবলের ভিতর হইতে গ্রন্থাবলী ত সাড়া দিতেছে না— হতভাগ্যের কথা মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়— আজকাল হতাশ হইয়া মনে না করিবারই চেষ্টা করি। ইতি ২৪শে কার্ত্তিক [১৩১০]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৮

[জানুয়ারি ১৯০৪]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

শরীর অপটু। মনও বিদ্যালয়ের অর্থচিন্তায় উৎকণ্ঠিত। রামায়ণের ভূমিকা যথেষ্ট মনোযোগের সহিত লিখিতে পারি নাই। সে ক্ষমতা এখন নাই। কবে হইবে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আপনার ক্ষতি হইবে। অতএব অসময়ের এই সামান্য উপহারটুকু লইয়া আমাকে স্মরণে রাখিবেন। প্রাপ্তি সংবাদটুকু দিবেন। ইতি ২০শে পৌষ [১৩১০]।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

[ফেব্রুয়ারি ১৯০৪]

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

অরুণ যখন ছুটির পরে বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই অবধি তাহার চিকিৎসা ও পথ্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। এখন সে অনেক সুস্থ হইয়াছে। তাহার মাথা ঘোরা সারিয়া গেছে— তাহার গায়ের পাঁচড়া প্রভৃতি শুকাইতেছে এবং সে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্লতার সহিত অধ্যয়নে ও খেলায় মন দিতে পারিতেছে। তাহার জন্য আপনি লেশমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

পত্রে আপনার অর্থের অভাব ও শরীর মনের অবসাদের কথা পড়িয়া কষ্ট বোধ করিলাম। ঈশ্বর আপনার এ দুর্য্যোগ দূর করুন।

মোহিতবাবু আসিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

[মার্চ ১৯০৪]

ওঁ

শিলাইদহ

প্রীতিভাজনেষু

আমার শরীর সুস্থ নহে। এখানকার আর সমস্ত খবর ভাল। অরুণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ কিন্তু নীরোগ নহে— তাহার জন্য আমার উদ্বেগ দূর হয়না— এবারে ছুটির সময় তাহাকে আমার কাছেই রাখিব।

"আমার জীবন" পুস্তকখানি উপাদেয়। শরীর তাজা থাকিলে সমালোচনা করিতাম। সমালোচনার ভার আপনিই গ্রহণ করিবেন। এরূপ গ্রন্থ গোপনে থাকিবার কোন কারণ দেখিনা।

বঙ্গদর্শন ত পাই নাই— আপনি কি সম্পাদকীয় নেপথ্যগৃহেই নৌকাডুবি পড়িয়া লইয়াছেন?

মোহিতবাবু বি, এ, পরীক্ষার কাগজ সংগ্রহের জন্য দিনদুয়েকের মত কলিকাতায় গিয়াছেন— বৃহস্পতিবারে ফিরিবার কথা। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

[শিলাইদহ] মার্চ ১৯০৪]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

মোহিতবাবু হয় ত সোমবারে আসিবেন। তাঁহার ওখানে গিয়া খবর লইবেন। একসঙ্গে আসিলেই সুবিধা হয়—কারণ এখান হইতে কুষ্টিয়ায় বন্দোবস্ত করা কিঞ্চিৎ চেষ্টাসাধ্য—মোহিতবাবুর জন্য ব্যবস্থা করিতেই হইবে—একসঙ্গে আসিলে আমাদের পক্ষে সুতরাং আপনাদের পক্ষে সুবিধা হইবে। নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় ষ্টীমার একবার বই চলে না। সুতরাং ষ্টীমার খোয়াইলে, হয় সমস্ত দিনরাত্রি কুষ্টিয়ায় যাপন করিতে হয়, নতুবা নৌকাযোগে আসিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নৌকাপথে অন্তত ৬।৭ ঘণ্টা লাগিতে পারে। এই সমস্ত বিবেচ্য।

অরুণকে যদি হোমিয়োপ্যাথি দেখাইতে পারিতেন ভাল করিতেন।

ছাত্রগুলিকে লইয়া নূতন ব্যবস্থা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি শুক্রবার, [চৈত্র ১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

[এপ্রিল ১৯০৪]

ওঁ

১১ই বৈশাখ, ১৩১১

প্রিয় সম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশ বলে তাহার liability প্রায় ১২।১৩ হাজার হইবে। Assets অন্তত হাজার পনেরো টাকার আছে। যে দেনার সুদ খাটিতেছে অর্থাৎ যাহা আশু পরিশোধ করা কর্ত্তব্য তাহার পরিমাণ ৬।৬॥ হাজার। বাকি টাকা ক্রমশঃ শুধিলে চলিবে ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন সমিতির কথা বলিয়াছি। যতীও উপস্থিত ছিলেন। আগামী রবিবারেই প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবেন— আপনি সেক্রেটারি।

মহারাজ আজ লিখিয়াছেন— "বঙ্গদর্শন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য কতক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বর্তমান বৈশাখ হইতে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে…৫০ টাকা আপনার কর্ম্মচারীর নামে মানি অর্ডার করা হইবে"।

অতএব নিশ্চিত হইবেন।

শৈলেশের নিকট হইতে কাগজপত্র সমস্ত লইবেন— যতী আপনাকে Review of Reviews পত্রিকা দিবে— আরো দুই একটা ইংরাজি মাসিকের জোগাড় করিতে পারিলে ইংরাজি বাংলা সাহিত্যে মিলাইয়া আপনার সাহিত্য প্রসঙ্গকে উপাদেয় করিতে পারিবেন।

এখনি mail ধরিতে যাইতে হইবে। অতএব বিদায়ের নমস্কার। অরুণকে সুস্থ রাখিবেন ও পড়ায় প্রবৃত্ত রাখিবেন। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

[এপ্রিল ১৯০৪]

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশকে অবশ্য হিসাব দেখাইতে হইবে। ব্যবসায়ের দস্তুর না মানিলে চলিবে কেন? আমি তাহার যে কয়টি দেনার কথা জানি তাহা এই :— মহিম ২॥০ হাজার, আর একব্যক্তি ২ হাজার, আমি ১ হাজার— এই সাড়ে পাঁচ হাজার তা ছাড়া উহাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে দেনা করিয়াছে তাহা আমি জানি— নিজের সম্বলও কিছু দিয়াছে তথাপি আমার বিশ্বাস ১০ হাজার টাকার উপরে দেনা হইবার কথা নহে। যাহা হউক্ দেনার হিসাব দূরে রাখিয়া দেখা যাইতে পারে assets কত আছে। তাহা এবং চল্‌তি কারবারের goodwill লইয়া তাহাকে কত দেওয়া যাইতে পারে ইহাই বিবেচ্য। অবশ্য নগেন্দ্রবাবু যদি এই কারবার গ্রহণ করেন তবে এই কোম্পানির সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ থাকিবে— আমার সমস্ত গ্রন্থ ইঁহাদেরই হাতে রাখিব এবং সুবিধামত terms এই রাখিব। আপনি বোধহয় জানেন আমার সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুর বিদ্যালয়কে দিয়াছি— অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি— কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দ্দশা হইত না এই জন্য এবং দুর্ভাগা শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

এখানে আমার শরীর ভালই আছে— ইতিমধ্যে আর জ্বর আসে নাই। চুপচাপ করিয়া কেদারা হেলান্ দিয়া পড়িয়া আছি— অল্প-স্বল্প লিখিতেছি, যথাসাধ্য খাইতেছি— ইহাতে জ্বর আসিবার কথা নয়।

আমি "বঙ্গবিভাগ" লইয়া বঙ্গদর্শনে একটা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি। আপনি "সাহিত্যপ্রসঙ্গ" লিখিবেন। পথের মধ্যে এক খণ্ড "হিন্দুস্থান রিভিয়ু" কিনিয়াছিলাম সেটা আপনাকে পাঠাইয়া দিব— তাহাতে সামাজিক প্রবন্ধ লইয়া আলোচ্য বিষয় আছে।

আপনার গল্পটি কি করিলেন? আপনাকে কিছুদিন কাছে পাইলে আপনাকে দিয়া আমি গল্প লিখাইয়া লইতে পারিতাম— Collaborationএ দুইজনে মিলিয়া গল্প লেখাও মন্দ নয়, ফ্রান্সে খুব চলিত আছে— একবার এই প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। অরুণ ভাল আছে ত? তাহাকে পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখিবেন। ইতি ১৬ই বৈঃ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪
[মে ১৯০৪]

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

নগেন্দ্রবাবুর পত্রের উত্তর দিয়াছি দেখিয়া থাকিবেন। সমস্ত হিসাবপত্র দেখিয়া একটা সঙ্গত দর স্থির করাই business like হইবে।✓এই মজুমদার লাইব্রেরির জাল ছিন্ন করিতে পারিলে আমি কতকটা সুস্থ হইতে পারিব। আপনি আমার এই যে উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হউন্ বা না হউন্ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।✓

আপনাকে Hindustan Review পাঠাইয়া দিলাম। যতীকে লিখিয়া দিলাম আপনাকে Review of Reviews খানা পাঠাইয়া

দিতে। যদি Spectator কাগজ খানা জোগাড় করিতে পারা যায় তাহা হইতে লেখ্য বিষয় অনেক পাওয়া যায়।

আমি য়ুনিভার্সিটি বিল লইয়া আষাঢ়ের সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি এবং আষাঢ়ের নৌকাডুবিও আজ শেষ করা গেল।

শৈলেশ Renal Colic লইয়া ভুগিতেছে— বোধহয় সেই জন্য সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠাইতে পারে নাই— যদিও, আমার বিশ্বাস এই Colic ধরিবার পূর্ব্বেই সে পাঠাইতে পারিত কিন্তু শৈলেশকে ত চেনেন। সে পিতৃদত্ত নাম সার্থক করিয়াছে— শৈলেশের মতই সে অচল।

বঙ্গদর্শনের বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া এখানকার পাঠকগণ বিস্তর ধিক্কার দিয়াছে— আপনারা যদি পারেন বঙ্গদর্শনের এই ম্লানিমা দূর করিয়া দিবেন— আমার আর সাধ্য নাই।

আপনার গল্পের বই পাইবার জন্য উৎসুক রহিলাম। ইতি
২১ বৈশাখ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

[মে ১৯০৪]

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

মধ্যে কাশী ভ্রমণ করিতে গিয়া ভাল করি নাই— শরীরটা আবার কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু কলম ছাড়ি নাই একটু আধটু লেখা চলিতেছে— আষাঢ় মাসের নৌকাডুবি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি। আজ প্রার্থনা বলিয়া একটা প্রবন্ধ পাঠানো গেল। ইহাতে আষাঢ় মাসের খোরাক চলিবে।

আপনিও আষাঢ়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ত? যতী লিখিয়াছে আপনাকে Review of Reviews দিয়াছে। Academy Spectator প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজে অনেক আলোচ্য বিষয় থাকে। হেমবাবু (হেম মল্লিক) Academy প্রভৃতি অনেকগুলি কাগজ লইয়া থাকেন [য]দি যথাসময়ে ফেরৎ দিবার আশা [দি]য়া এই কাগজগুলি আপনি দেখিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন [ত] কেমন হয়?

সমিতির অধিবেশনটা নিয়মমত চালাইবেন।

নগেনবাবুর সঙ্গে বাঁকিপুর ষ্টেশনে চকিতের মত আমার দেখা হইয়াছিল। যদি তিনি হিসাব দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে— আমি আপনার পত্র পাইলে শৈলেশকে হিসাব দেখাইতে লিখিব।

ত্রিপুরা হইতে নিয়মমত টাকা আসা দেখিতেছি সন্দেহস্থল। একবার মহিম ঠাকুরকে আপনি দুঃখ নিবেদন করিবেন। যদি দুই চারিদিনের মধ্যে আসিয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় খবর লইয়া জানিবেন। আমাদের কর্ম্মচারী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে আসিবার কথা। গগনদের বলিলে তাঁহারা যদুকে ডাকাইয়া খবর লইতে পারিবেন।

অরুণকে মোহিতবাবুর কাছে রাখিয়া দিন না— তাহার পড়াশুনাও হইবে— শারীরিক অযত্নও হইবে না। ইতি ২৯শে বৈঃ ১৩১১।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

[বোলপুর। জুন-জুলাই ১৯০৪]

ওঁ

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

বিদ্যালয়ের কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন আছি। পলায়ন ব্যতীত উপায় দেখিনা— অতএব কাল সোমবারে কন্যাগৃহে দৌড়িব। নিয়মাবলী মহারাজকুমারকে পাঠান গেল। এখানে আসিয়া সতীশের "গুরুদক্ষিণা" গ্রন্থের একটা সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াচি— আর কিছু লিখিবার সময় পাই নাই।

অরুণ ভাল আছে— ওজনে বাড়িতেছে। সাহিত্য প্রসঙ্গের কথা ভাবিতেছেন ত? ইতি রবিবার

[আষাঢ় ১৩১১]
আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ

"তিন বন্ধু" সম্বন্ধে আপনাকে যিনি যতই উৎসাহিত করুন আপনার এই বর্তমান পত্রলেখক বন্ধুটি সায় দিতে পারিতেছেন না— আর একখানা ভাল বই আপনাকে লিখিতে হইবে— আপনার ছেলেবেলার কথা, গ্রামের কথা, ঘরের কথা লইয়া একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন— তাহা হইলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

শ্রী

২৭

[অগস্ট ১৯০৪]

ওঁ

শুক্রবার

প্রিয়বরেষু.

বুধবার ত কাটিয়া গেল। আছেন কেমন? আমার শরীর অসুস্থ। আগামী রবিবারে সকালে গিরিধি রওনা হইব।

শমী মীরাকে পড়ান ও শেলাই শেখানোর জন্য মেম ঠিক করিতে পারিলেন? যদি স্থির হইয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় সত্যকে জানাইবেন।

এখানে "গগনে গরজে মেঘ
ঘন বরষা।"

অরুণ বেশ ভাল আছে। এরূপ সুস্থ তাহাকে অনেক কাল দেখি নাই। /ভারতী বা বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা আমার পক্ষে সম্প্রতি অসাধ্য হইয়াছে/ [২৮ শ্রাবণ ১৩১১]

শ্রীরবীন্দ্র

২৮

[বোলপুর। অগস্ট ১৯০৪]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সম্ভবত আপনি আজ বোলপুরে রওনা হবেন না— না হলেই ভাল, কারণ জুরির আকর্ষণে কাল রবিবারে আমাকে কলকাতায় যেতেই হচ্চে। যদি এ পত্র সেখানে পান অপরাহ্ণে দেখা করবেন। ইতি শনিবার [২৯শে শ্রাবণ ১৩১১]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

[অগস্ট ১৯০৪]

ওঁ

গিরিধি

প্রিয়বরেষু

বাদ প্রতিবাদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহাতে আপনি মনকে লেশমাত্র ক্ষুব্ধ করিবেন না। আমার রচনায় যে শত্রুমিত্র সকলকেই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে ইহা ভাল লক্ষণ জানিবেন। আমাকে কে আক্রমণ করিতেছে বা সমর্থন করিতেছে তাহা চিন্তার বিষয় নহে— আমার প্রবন্ধ যে দেশের মধ্যে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়।— বিরোধ এবং প্রতিবাদও একটা সত্যকে ব্যাপ্ত ও সুদৃঢ় করিয়া দিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিবেন— অতএব আমার অবমাননায় আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। আমি এমন অনেকবার অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি— আমাকে লইয়া অনেক তোলপাড় হইয়া গেছে আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই অথচ আমি যেখানে ছিলাম সেইখানেই টিকিয়া আছি। অতএব ধৈর্য্য ধরিয়া বর্ত্তমান বাগ্‌বিতণ্ডার পরিণাম অপেক্ষা করিবেন।

আজ দেউস্কর মহাশয়ের বৈদ্যুত তাড়নায় শিবাজিউৎসব সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি সুবিধা পান তবে তাহার এক কপি শৈলেশের কাছ হইতে লইয়া দেখিবেন।

এখানে আসিয়া অবধি রচনাকার্য্য যে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে তাহা বলিতে পারিনা। এখনো আমার কল্পনাশক্তি প্রসুপ্ত আছে।

ভাদ্রমাসের ভারতী আমার হস্তগত হয় নাই। পাঠাইয়া দিতে বলিবেন।

মীরার পাত্রসম্বন্ধে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে আলোচনা করিব। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সেপ্টেম্বর ১৯০৪]

ওঁ

গিরিডি

প্রিয়বরেষু

অরুণের জ্বর অল্পের উপর দিয়া গেছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হই নাই। ছুটি দিবার জন্যও তাড়াতাড়ি করি নাই। মোহিতবাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া একেবারে হাল-ছাড়া গোছের এক চিঠি আমাকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে যদি ভাল করিয়া আশ্বস্ত করিতে পারেন ত ভাল হয়।

অক্ষয় সরকার মহাশয় চিন্তিত স্বরে আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন আজ তাহার জবাব দিয়া দিলাম। আমার বিদ্যালয় বলিয়া বোলপুরের এই বিদ্যালয়টিকে আমি মুগ্ধ মমত্বের দ্বারা আবিষ্ট করিয়া ধরিতে সর্ব্বদাই নিজেকে বাধা দিই। মঙ্গলের পথে অবিচলিত থাকিয়া এ বিদ্যালয়ের যাহা হয় তাহাই হইবে—খ্যাতিও চাই না, আড়ম্বরও চাই না—কোনোমতেই ইহাকে আমি লোক-দেখানে করিয়া তুলিতে চাই না।

মনোরঞ্জনবাবু এখানেই আছেন—তাঁহার সঙ্গে প্রত্যহই আমার দেখা হয়। যোগরঞ্জনের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি আমাদের বিদ্যালয়কে লেশমাত্র দায়ী করেন না। এমন কি, ছুটির পরে দেবরঞ্জনকেও তিনি সেখানে দিতে প্রস্তুত।

এবারে "নৌকাডুবি" লেখা শেষ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের লেখা শৈলেশের কাছে পাঠাইয়াছি। অগ্রাণেরটাতে হাত দিয়াছি। মনে হইতেছে মাঘ ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিতেও পারে—হয়ত বা এ বৎসরটা কাটিয়া যাইবে। অগ্রাণের সংখ্যায় রমেশের সাক্ষাৎ পাইবেন।

রথীর শরীর এখনো সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই। আমি মোটের উপরে ভালই আছি। আপনার সমস্ত খবর দিবেন। ইতি ২০শে ভাদ্র ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১
[এপ্রিল ১৯০৫]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

দুই একদিনের মধ্যেই যাইতেছি। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২
[নভেম্বর ১৯০৫]

ওঁ

বোলপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র :—

প্রথম ইংরেজি শিক্ষার মত্ততায় বাঙালী ছাত্রদের মনে স্বদেশী-বিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী দেশের শিল্প সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জাবোধ করিতেছিল এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্ত্য অনুকরণই উন্নত culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খৃষ্টান-ঘেঁষা হইয়া পড়িতেছিলেন।

সেই সময়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মব্যাকুলতা

অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। যদিচ প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই দেশের ধর্ম্মোন্নতির ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলা ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী ধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে ও বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন।

কেশববাবুরা যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হিন্দুসমাজের বিচ্ছেদ-সাধনের উপক্রম করিলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে ত্যাগ করিলেন না—ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু-সমাজেরই অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিলেন। আধুনিক শিক্ষিত চিত্তকে স্বদেশের অভিমুখী করিবার এই প্রয়াস।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আধুনিক শিক্ষার সহিত স্বদেশী ভাবের সমন্বয় চেষ্টা বরাবর কাজ করিতে লাগিল। হিন্দুমেলা এই স্বদেশী ভাবের আর একটি অভ্যুত্থান। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্রকে সাহায্য করিয়া এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্বদেশী শিল্পের, স্বদেশী মল্লবিদ্যার, স্বদেশী games এর প্রদর্শনী হইত—স্বদেশী গান গীত ও স্বদেশী কবিতা আবৃত্ত হইত।

তাহার পর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকভাবে পরিপুষ্ট করিয়া দেশের শিক্ষিতগণকে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার কিছুকাল পরে শশধরের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া আমাদের পরিবারে সাধারণের অগোচরে স্বদেশীভাবের বিশেষরূপ চর্চ্চা হইতেছিল। গোপনে স্বদেশী দেশালাই ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত তাঁত প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বদেশী

ভাবের উত্তেজনাতেই খুলনা হইতে বরিশালে ষ্টীমার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজ-কোম্পানির সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন— তৎকালে বরিশালে স্বদেশীর দল তাঁহার সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে যাত্রী সংগ্রহ ও যাত্রী ভাঙানর-কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এরূপ Fuller-এর আমলে ঘটিলে কি বিপদ হইত অনুমান করিবেন।

কন্‌গ্রেস গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের দিকেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করাইল।

‘সাধনা পত্রে ও তাহার পরে অন্যত্র এইরূপ আবেদন নীতি ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি চালনার দিকে মন দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলেন্দ্রনাথ এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে’

এই স্বদেশী ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের উপরে Indian Stores এর অভ্যুদয়।

ইহার অনতিকাল পরেই Provincial Conference এ যাহাতে বাংলা ভাষায় দেশের আপামর সাধারণের নিকট স্বদেশের অভাব আলোচনা করা যায়— যাহাতে ইংরেজি ভাষায় কেবল রাজার নিকট আবেদনেই আমাদের কর্ত্তব্য নিঃশেষিত না হয় রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে সত্যেন্দ্রনাথের নায়কতায় প্রথম সেই চেষ্টা করা হইয়াছিল, পর বৎসর ঢাকাতেও সেই চেষ্টা করা যায়।

স্বদেশী movement এর সঙ্গে এই সকল চেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে মনকে টানিয়াছিলেন Politics সম্বন্ধেও সেইরূপ কিছুদিন হইতে দেশের লোককে দেশের দিকেই টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তৎকালে শিক্ষিত লোকেরা যেমন সহজে শাস্ত্রের দিকে স্বদেশী ধর্ম্ম ও স্ব সমাজের দিকে ফিরিতে চাহেন নাই এখনকার দিনেও সেইরূপ

শিক্ষিত agitation ওয়ালা সহজে আবেদনের পালা বন্ধ করিয়া স্বদেশের জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হন নাই।

নূতন পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে এই আত্মশক্তি-চর্চ্চা ও স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের চিত্ত আকর্ষণের জন্য উপদেশের প্রবর্ত্তন করা হয় এবং বোলপুরের বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার ভার নিজের হাতে ও স্বদেশী ভাবে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী। তিনি ইংরেজি ধরনের বিদ্যালয় দেশীয় লোকের দ্বারা চালাইতে সুরু করেন— আমার চেষ্টা যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ যথাসম্ভব স্বদেশী রকম হয়।

এইরূপ আন্দোলন যখন দেশে ভিতরে ২ চলিতেছে, তখন যোগেশ চৌধুরী কংগ্রেসে শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়া কংগ্রেসের আবেদন-প্রধান ভাবকে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন— তাহার পর হইতে এই প্রদর্শনী বৎসরে ২ চলিতেছে।

ইতিমধ্যে আশু চৌধুরী বর্দ্ধমান কন্‌ফারেন্সে পোলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া গালি খান। কিন্তু দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আর কাজের কথা তুলিবেন না— আমার এখন ছুটি। প্রবন্ধ লিখিবার কথা আমার মনেও নাই— দেশ যে আমার কোনো কথার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এমন আমার ধারণা হইতেছেনা। এখানে খোলা মাঠের বিপুল রৌদ্রের মধ্যে মনটাকে একেবারে মুক্তি দিয়া চুপ করিয়া তপ্ত হাওয়ায় পড়িয়া আছি। কখনো বা নিতান্ত আলস্য ভরে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় দুটো একটা বাজে কবিতা লিখিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি [মহা]শয় আমি আমার অন্তরের অন্তরে জাতীয়তা স্বদেশিতা প্রভৃতি কথার···হইতে মুক্ত। যখনি অবকাশ পাই তখনি নিজের এই পরিচয় আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা অনেক মিথ্যায় বিজড়িত— তাহার মধ্যে শেখা বুলির ভাগই বিস্তর। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা নাই— আমরা নূতন বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া ভ্রম করি। আমি এ সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাইনা— আগে বেশ একটু নিরালায় ভাল করিয়া নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লই— আগে নির্ম্মল অন্তঃকরণে সমস্ত জিনিসটাকে তলাইয়া দেখি— তার পরে যদি কথা বলার আবশ্যক থাকে ত কথা বলিব। আমি এখন লোকলোচনের অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা করি— আমার আর যশোমানে কাজ নাই। ভিড়ের মধ্যেই যদি দিন কাটাই তবে ঘরের কাজ কখন করিব? অতএব এবারে আমি সরিয়া পড়িলাম।

মহিমকে আজই একটা তাগিদ পত্র পাঠাইব। আপনি আমার বৎসর ফল গণনার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

পরীক্ষার কাজ শেষ হইয়া গেলে একবার না হয় বোলপুরে বেড়াইয়া যাইবেন। জায়গাটা দার্জ্জিলিং নয় সে কথা সত্য কিন্তু আমি দেখিয়াছি মানুষ গরম গরম বলিতে বলিতে অত্যুক্তি দ্বারা নিজেকে অধীর করিয়া তুলে। বোলপুরের গরম আমার কাছে একদিনও অসহ্য বোধ হয় নাই।

আশা করি আপনাদের সমস্ত মঙ্গল। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট

৩৪

[জুন ১৯০৬]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

ক্লাসের ক্ষতি হইবে শুনিয়া অধ্যাপকদের এবং অরুণের অমতে অরুণকে পাঠাইতে দ্বিধা করিতেছিলাম—লোকেরও অভাব—কাহার সঙ্গে পাঠাই? আপনি আসিয়া যদি লইয়া যান তবে অল্পকালের জন্য তাহাকে ছুটি দেওয়া যায়।

বঙ্গভাষার অনতিবৃহৎ ইতিহাস যদি লেখেন তবে নিশ্চয় তাহা পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হইবে। আমার বিশ্বাস জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এ গ্রন্থ ছাপিবার খরচ দিতে কার্পণ্য করিবেন না। গ্রন্থ প্রকাশের কোনো ফণ্ড যে সঞ্চিত হইয়াছিল বা হওয়া সম্ভব এমন ত আমার মনে হয় না।

নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁটসাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক

সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বাগান সাজাইতে হইলে আবশ্যক মত অনেক ভাল গাছও ছাঁটিয়া ফেলিতে *হয়— এ সকল কাজ নিপুণভাবে* করিতে হইলে নিষ্ঠুর ভাবেই করিতে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধে সুবিচার করা শক্ত— তাহার কারণ, অন্ধ মমত্ব বাধা দেয়— কিন্তু ছাঁটিবার বেলায় সেই মমত্ব অতি ছেদনের হাত হইতে রক্ষা করে। আমি যদি লেখক না হইয়া সমালোচক হইতাম হয়ত আরো অনেক বেশি কাটিতাম।

এখানে আসিয়া শরীরটা কলিকাতার চেয়ে অনেক ভাল আছে। আপনাদের খবর ভাল ত? ইতি ১লা আষাঢ় ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

[অক্টোবর ১৯০৬]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

সাময়িক সমস্ত প্রসঙ্গ বর্জ্জন করিলেও এবং গল্প উপন্যাস বাদ দিলেও গদ্য গ্রন্থাবলী নিতান্ত ছোট হইবে না। বোধ হয় ষোলো পেজি ফর্ম্মার অন্ততঃ ১০০ ফর্ম্মা হইবে। সমালোচকের সুতীক্ষ্ণ কুঠার হাতে লইয়া সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত আছি— বোধ হয় জঙ্গল আগাছা অধিক দেখিতে পাইবেন না— প্রত্যেক লেখাটিই পাঠ্য হইবে এইরূপ আশা করি।

প্রাচীন কবিতাসংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি তাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে। স্থির করিয়াছিলাম কয়েকমাস আমিই আপনাকে

সাহায্য করিব— কিন্তু এখানে নূতন ছাত্র ও রোগীদের জন্য ইমারত ঘর তৈরি করিতে হইতেছে— তাহাতে বিস্তর খরচ পড়িবে— অতএব এখন কিছুকাল আমার সম্বল কিছুই থাকিবেনা— তাহার উপরে বহু ব্যয়ে বই ছাপাই এমন শক্তি আমার নাই। ত্রিপুরা হইতে অর্থসাহায্য সম্প্রতি কোনোমতেই প্রত্যাশা করা যায় না— নাটোরকে টাকার কথা বলিতে আমি কুণ্ঠিত। যদি গগনরা এই ভার লইতেন ত বড় সুখের বিষয় হইত। আমার মত অক্ষমের কেবলমাত্র সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নাই।

আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিষকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মনের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে তাহার সমালোচনাও তথৈবচ। তা ছাড়া, সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে না কি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগেনা কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই ত জিতিয়াছি— আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।

অরুণ কিঞ্চিৎ অসুস্থভাবেই এখানে আসিয়াছে— সৌভাগ্যক্রমে জ্বর দেখা দেয় নাই। আজ সকাল হইতে বৃষ্টির সহিত ঝোড়ো হাওয়া দিতেছে— আশা করি এই বাদলায় অরুণের অনিষ্ট করিবেনা। কলিকাতাতেও নিশ্চয় এইরূপ দুর্যোগ চলিতেছে।

ভূপেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় বর্দ্ধমানে পড়িয়া আছেন— কাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার অবস্থা একান্ত উদ্বেগজনক।

আমি অগ্রহায়ণে বিদ্যালয় [···] দিন পনেরো কাজকর্ম্ম চালাইয়া

দিয়া বোটে যাইবার সংকল্প করিতেছি— আমার শরীর মন্দ নাই কিন্তু মনের ভিতরটা নির্জ্জনবাস ও বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ইতি ১৩ই কার্তিক ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

[মার্চ ১৯০৭]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কোন্ তারিখে কখন আপনারা বহরমপুরে রওনা হইবেন জানিবার জন্য উৎসুক আছি কারণ সেই বুঝিয়া আমাকে এখান হইতে কলিকাতায় রওনা [হইতে] হইবে। হীরেন্দ্রবাবুর কাছ হইতে খবর লইয়া একথা আমাকে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না।

· · কাছে ৫০০ টাকা গত আশ্বিনে পাইবার ওয়াদা ছিল— আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। আমি স্বয়ং · · বাবুকে পত্র লিখিয়া তাহার উত্তরও পাই নাই। এদিকে এখানে আমাকে রোগী ছাত্রদের জন্য একটা চার কুঠরির পাকা ঘর তৈরি করিতে অনেকটাকা খরচ করিতে হইতেছে আপনি যদি দয়া করিয়া · · বাবুর দয়া আকর্ষণ করিতে পারেন তবে আমার ভার লাঘব হয়। তিনি কেন আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন? ভবিষ্যতে কখনো কি আমাকে তাঁহার কোনো প্রয়োজন হইবেনা? না হইলেও আমি কি তাঁহার নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার পাইবার যোগ্য!

অরুণের খবর নিশ্চয় দিবেন। সে কেমন আছে কি করিতেছে

এবং তাহার সম্বন্ধে আপনাদের অভিপ্রায় আমাকে জানাইবেন—কারণ, আমার তাহা জানিবার অধিকার আছে। ইতি
৬ই চৈত্র ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭
[১৯০৭]

ওঁ

শিলাইদহ

প্রিয়বরেষু

এইমাত্র আপনার বেহুলা ও ফুল্লরা পড়িয়া শেষ করিলাম।

আমি মনসার ভাসান পূর্ব্বে পড়ি নাই। সুতরাং আপনার বেহুলার সঙ্গে প্রচলিত গল্পের তুলনা করিতে আমি অক্ষম। কিন্তু তুলনা নাই হইল আপনার বইখানি পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের বালক বালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত করিয়া পুরাণ কথা রচনা করিবার জন্য আমি অনেকদিন হইতে অনেককে [উৎসা]হ দিয়াছি। সেই উৎসাহের…পরলোকগত সতীশের "গুরুদক্ষিণা" বইখানি রচিত হইয়াছে। সেই বইখানি আমার বিশেষ প্রিয়, আপনিও সেখানি পড়িয়া দেখিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শৈলেশ এই গ্রন্থ প্রকাশ করাতে এটা যেন জগদ্দল পাথর চাপা পড়িয়াছে।

ফুল্লরা বইখানাকে যথোচিত বড় করিয়া তুলিবার জন্য আপনি অনেকটা বাহুল্য টানাবোনা করিয়াছেন। খুব শাদাসিধা না হইলে এ রকম গল্পের রস রক্ষা হয় না। একপ্রকার আত্মবিস্মৃত গ্রাম্য ভাবই ইহার…আপনি যেন সভ্যতার খাতিরে…

চিঠির বাকি অংশ লুপ্ত

৩৮

[সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনি নানা কাজে ব্যস্ত আছেন তবু আপনাকে আর একবার বিরক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনার প্রতি বোলপুর বিদ্যালয়ের কোনো দাবী নাই এমন কথা বলা চলেনা— সেই জন্যই এই বিদ্যালয় যদি কোনো বিষয়ে বঞ্চিত হইতে পারে— এমন আশঙ্কা ঘটে তবে তাহা দূর করিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়া নিষ্ফল হইবনা এরূপ আশা করিতে পারি। দুই সহস্র খণ্ড চারিত্রপূজা গ্রন্থ দুইবারকার বি এ পরীক্ষার্থী এবং অন্যান্য পাঠকদের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া যদি আপনার নিকট সম্ভবপর বোধ হয় এবং যদি দেখেন যে এখনো অনেক বই ভট্টাচার্য্যদের দোকানে বাকি আছে তবে আমাদের বঞ্চিত বিদ্যালয়ের দিকে তাকাইয়া সামান্য কিছুও যদি চেষ্টা করেন তবে আমি তৃপ্তিলাভ করিব। আপনি এমন কথা মনেও করিবেন না যে অরুণকে আমি কিছুদিন বিদ্যালয়ে রাখিয়া পড়াইয়াছিলাম বলিয়া আপনার প্রতি উৎপাত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। অরুণ বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধাদ্বারা আমাদের গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করিয়াছে তাহার চেয়ে অধিক আমরা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু আপনি নাকি ভট্টাচার্য্যদিগকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এই কারণে এই ঘটনায় আপনার কিছু দায়িত্ব আছেই। আমি সেইটুকুর প্রতি নির্ভর করিব। যদি প্রমাণ হয় যে ভট্টাচার্য্যরা আমাদের সম্বন্ধে ঠিক সাধুব্যবহার করেন নাই তবে আপনাকে কদাচ দোষী করিব এমন মনে করিবেন না—আমি আপনাকে কোনো প্রকারে অন্যায় দোষ

বা দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিনা। কেবল আপনার সহায়তা প্রার্থনা করি মাত্র। এবং আপনিও বই কাটতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিরূপ অনুমান করেন তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে বোঝেন ভাল—এ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে— সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইয়াছি ইহাতে আমার প্রতি বিরক্তিবোধ করিবেন না। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯
[নভেম্বর ১৯০৮]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার প্রেরিত চেকটি অনাবৃষ্টির কালে মেঘোদয়ের মত দেখা দিয়েছে—ওকে শীঘ্র ভাঙিয়ে নিয়ে বর্ষণে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি এই দুঃখ স্বীকার করে আমাদের কতটা দুঃখ লাঘব করেছেন তা জান্‌লে আপনি পুণ্যকর্ম্মসাধনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন।

আমার পিতা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সে সংবাদ আপনার কাছে এই প্রথম পাওয়া গেল। এই বইখানি সন্ধান করতে হবে। আপনি গগনদেরও একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আমার পিতার সমস্ত রচনা ছাপাবার যে প্রস্তাব করেচেন সেটা আলোচনা করে দেখব। এবার কলকাতায় গিয়ে সে সম্বন্ধে সন্ধান করা যাবে।

আশু মুখুজ্জে মশায়কে প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে পাঠাব।

আপনার নূতন রচনাটির জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আপনি Y, M, C, A,তে কি এরই কোনো অধ্যায় সম্প্রতি পাঠ করেচেন?

অরুণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

[জানুয়ারি ১৯১০]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল আপনার ওখানে নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু নানা স্থান ঘুরিয়া কোনোমতেই সময় পাইলাম না—শরীরও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১১ই মাঘের পূর্ব্বে সময়মাত্রই ছিলনা—এখন এত অল্প সময় বাকী যে ইহার মধ্যে বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সশরীরে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে পারিলামনা বলিয়া অপরাধ [গ্রহণ] করিবেন না—আপনিও সম্ভবত সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু অরুণের ত কোনো বাধা নাই। বিবাহ ১৪ই মাঘ রাত্রি ৯টার সময়। বউ ভাত ১৭ই মাঘ রবিবারে মধ্যাহ্নে।

এখন আপনার শরীর ত ভাল আছে?

[মাঘ ১৩১৬]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

[জানুয়ারি ১৯১৩]

508 W. High Street
Urbana, Illinois
১৯ পৌষ ১৩১৯

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠিখানি পাইয়া খুসী হইলাম কিন্তু শরীর ভাল নাই জানিয়া ভাল লাগিল না।

সতীর তর্জ্জমার প্রুফ পাঠাইলেন লিখিয়াছেন, কিন্তু পাই নাই, বোধ হয় ভুলিয়াছেন। Paul Carus যে ধরণের বহি বাহির করেন তাহাতে মনে হয়না তিনি সতীর ইংরেজি অনুবাদ ছাপিতে প্রস্তুত হইবেন। আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ, সেখানে আপনার ইংরেজি গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য্য এবং ছাপার ভুল অপর্য্যাপ্ত। যাহাই হউক সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে তখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে। আমার বোধহয় Everyman's Library Series এর মধ্যে যদি আপনার বই চালাইতে পারেন তবে খ্যাতি অর্থ দুইই জুটিতে পারে। তাহা[দের কাছে manuscript] পাঠাইয়া দিবেন। Ernest Rhys ঐ Series এর Editor। আমাদের কালীমোহনের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব হইয়াছে।

ম্যাকমিলানেরা আমার লেখাগুলি ছাপাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। তাহার লেখাপড়া চলিতেছে। কথার কবিতা আমি এখানে বসিয়া নিজেই অনেকগুলা করিয়া ফেলিয়াছি। আমি

দেখিলাম, নিজে না করিলে কোনমতেই সুবিধা হয় না। কারণ, বাংলার ভাষা ও ছন্দের সঙ্গীত ইংরেজিতে যখন আনা সম্ভব নয় তখন কেবল ভাবমাত্রটিকে অত্যন্ত সরল ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিলে তবে তাহার ভিতরকার সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া উঠে। এই কাজটি আমার দ্বারা সহজেই হয়—কারণ সরল ইংরেজি ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নহে, তার পরে নিজের ভাবটুকু অন্তত নিজে যথাসম্ভব বুঝি। সেদিকে ভুল হওয়ার আশঙ্কা নাই। ভাষাটাকে অত্যন্ত না জানার একটু সুবিধা আছে। অল্প জমি একজোড়া গোরু জুতিয়াও খুব ভাল রকম চাষ দেওয়া যায়—তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে যেটুকু পারা যায় সেইটুকুর মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া বারবার করিয়া সেটাকে মাজাঘষা সহজ। যাহা ক্ষমতায় কুলায় না তাহা ছাড়িয়া দিই, যেখানে বাধা পাই সেখানে ঘুরিয়া যাই—নিজের জিনিষ বলিয়াই সেটা করা সম্ভব। এমন করিয়াও যে চলনসই কিছু খাড়া করিতে পারিব তাহা মনেও করি নাই—যাহা হউক চলিয়া ত গেছে। এখন লজ্জা ভাঙিয়াছে সাহস বাড়িয়াছে। তাই অনুবাদ জমিয়া উঠিতেছে। আজ এইমাত্র শারদোৎসব শেষ করিলাম—বোধ হইতেছে এটাও চলিবে। যাহাই হউক ভাল করিয়া পারি আর না পারি নিজের কবিতা নিজে তর্জ্জমা করা ছাড়া উপায় নাই।

আপনার সেই Selection ছাপা কতদূর হইল জানিবার জন্য উৎসুক আছি।

অরুণকে এবং বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইমাত্র সতী পাইলাম। যদি বাহুল্য অংশ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মাজাঘষা

করা যায় তবে এ জিনিষ চলিতে পারিবে। মুস্কিল এই এদেশের লোকের সময় এত অল্প যে এরূপ কাজে কাহারো রীতিমত সাহায্য পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদি কোনো প্রকাশক ইহা গ্রহণ করে তবে তাহারা সম্ভবত কাহাকেও দিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে পারে। আজ রোটেনস্টাইনকে লিখিয়া দিলাম যদি তিনি Wisdom of the East অথবা Everyman's Library ওয়ালাদের দ্বারা আপনার এ বই মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন। আগামী বসন্তে ইংলণ্ডে গিয়া আমি চেষ্টা দেখিব। আমেরিকার লোকেরা আমাদের দেশের মত—ইহারা ইংরেজ সমালোচকদের মুখ তাকাইয়া থাকে, ভালমন্দ নিজেরা বিচার করিতে সাহস করেনা—অতএব সেখান হইতে আদর না পাইলে এখানে প্রকাশক পাওয়া কঠিন।

৪২

[মার্চ ১৯১৪]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার পন্থা অনুসরণের চেষ্টায় আছি। কিছুদিন হইতে মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। বিশ্রাম করিতে না পারিলে একদা ক্ষতিপূরণ একেবারেই অসম্ভব হইবে। তাই সকলপ্রকার অনুরোধ এবং আমন্ত্রণ দূরে রাখিতে হইয়াছে।

ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েকদিনের ছুটি লইয়া রাজসাহিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন বোধহয় আর ৩।৪ দিন মধ্যেই ফিরিবেন তখন

আপনার প্রশ্নের উত্তর মেলা সহজ হইবে।

এখানে ব্যবস্থাবিভাগের কাজ এখন ত খালি নাই।

চিঠি সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি ২৭ ফাল্গুন ১৩২০।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আজ আপনার পত্রখানি পাইয়া আমার মনের একটি ভার নামিয়া গেল। আমার প্রতি আপনার চিত্ত প্রতিকূল এতদিন এই কথাই মনে জানিতাম। এরূপ বিশ্বাস কেবল যে পীড়াজনক তাহা নহে ইহা অনিষ্টজনক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকার হইতে আপনি মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমাকেও মুক্তি দিয়াছেন— সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার সহিত পরিচয়ের আরম্ভ হইতেই আমি সর্বপ্রযত্নে আপনার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কেমন করিয়া যে বিপরীত ফল ঘটিয়াছিল তাহা আমার দুর্গ্রহই জানে— আমি এই জানি আমি কখনই স্বেচ্ছাপূর্বক আপনার ক্ষতি বা বিরুদ্ধতা করি নাই। কিন্তু এ সকল কথা বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই। জীবনের অনেক গ্লানি একে একে মুছিবার আছে, অথচ সময় আছে অল্প— এই যে একটা দাগ মন হইতে মিটিল সে বড় কম কথা নহে।

কয়েকদিন হইল আপনার নূতন বইখানি পাইয়াছি। কিছুকাল

হইতে এখানকার ছাত্রদের জন্য পাঠ্য রচনায় আমাকে এমন অধিকার করিয়াছে যে সমস্ত দিনে স্নানাহারের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই এই কাজে খাটাইতে হইয়াছে। লেখাপড়া সব বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে আপনার বইখানি এখানকার লাইব্রেরিতে চালান হইয়া হাতে হাতে ফিরিতেছে এইবার তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পড়িব এবং কেমন লাগিল আপনাকে লিখিব।

এবারে কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম, এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আপনি শরীরে মনে স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভ করুন অন্তরের সহিত এই কামনা করি। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

[ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

নন্দলাল এখনো কলকাতায়। ফিরে এলে বৃহৎবঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ নিশ্চয় করব।

শরীর যে ক্ষণভঙ্গুর আমার দেহ প্রতিদিন তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হচ্চে। এতদিন মন তাকে বহন করে জীবনযাত্রায় সারথ্য করছিল, কিন্তু বাহন এখন পিছনের দিকে ঘন ঘন লাথি ছুঁড়তে সুরু করেছে— পিঁজরাপোলের অভিমুখে তাঁর সমস্ত ঝোঁক, বোঝা যাচ্চে লাগামটা ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় যদি না নেমে পড়ি

তাহোলে ঝাঁকানি দিয়ে নামিয়ে ফেলবে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে। এ অবস্থায় আমার কাছে যদি কিছু প্রত্যাশা করো তা হোলে তা পূরণের চেষ্টায় আমার নিঃস্বতা প্রকাশ পাবে। পূর্বকালের তহবিলের মাপে এখনকার দাবী অসঙ্গত হবে। ইতি ২৭।২।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

[এপ্রিল ১৯৩৬]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণ

দীর্ঘকাল ব্যস্ত ছিলুম এবং স্বস্থানে ছিলুম না। ফিরে এসেছি, কিঞ্চিৎ অবকাশও পেয়েছি। আয়ু অল্পই অবশিষ্ট আছে, অবকাশও যে পরিমাণে দুর্লভ সেই পরিমাণেই স্পৃহনীয়, এ অবকাশ স্বল্প পরিমাণেও নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না। গ্রন্থ সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়, কাজটা অপ্রিয়। অভিমত প্রকাশ করতে লেশমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিনে। এখন আমার একান্ত প্রয়োজন বিশ্রাম। বৃহত্তর বঙ্গ বইখানি অত্যন্ত বৃহৎ। ঐ রচনা বিচার করবার শক্তি আমার অল্প। অতএব স্তব্ধ থাকাই শ্রেয়। ইতি ৪।৪।৩৬— বাং ২০ চৈত্র ১৩৪২।

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

[সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৯৩৯]

ওঁ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন

কল্যাণ নিলয়েষু

বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী; কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৪৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্রাবলী

শ্রীহরি শরণং

১

৮।১।৯৬

কুমিল্লা

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

বহুদিনের ইচ্ছা ছিল, আপনার নিকট একখানা পত্র লিখি; যেদিন "সাধনা আর বাহির হইবে না" এই দুঃখকর সংবাদ পড়িলাম, সেই দিন পত্র লিখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল—কিন্তু লিখি নাই; মনের নিভৃতে যে পূজা দিবার প্রবৃত্তি হয়, সাধক তাহা গোপন করেন, আমিও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা লিখিতে কুণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু সাধনার লোপে মনে যে একটী অভাব হইয়াছে, তাহা পূরণ হইতেছে না, বাড়ীর চিঠির আশায় যেরূপ প্রীতিকম্পিত উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে ডাকঘরের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, সাধনার জন্যও কতকটা সেই ভাবের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। শুনিয়াছি সারসপক্ষীর মৃত্যুকালের সংগীতটিই মধুরতম হয় সাধনারও শেষ "বিদ্যাসাগর"-কথা বড়ই মিষ্ট হইয়াছিল; উন্নত চরিত্রকে উন্নত মনে ধারণা করিবার শক্তি বাঙ্গলা সমালোচনায় সেই প্রথম পড়িয়াছিলাম; আলো ও ছায়ার যথাযথ সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া বিশাল শাল্মলীতরুর ন্যায় ছবিখানিকে ফুলপল্লবের ফ্রেমে বাঁধিয়া দেখাইবার পরিণত কৌশল, সেই প্রবন্ধে ঠিক চিত্রকরের তুলির যোগ্যই হইয়াছিল।

পূর্ণ লীলা দেখাইতে দেখাইতে সাধনার অবসান হইল; ক্রমে মন্দীভূত তেজে যাহা নিবিয়া যায়, তাহার শেষ দেখিতে মন অলক্ষিত ভাবে প্রস্তুত হয়; সাধনার শেষ দেখিতে আমরা সেরূপ প্রস্তুত হইতে

পারি নাই। 'সাধনা' গিয়াছে, সাধনার লেখক বর্তমান, ঈশ্বর তাহার আয়ু যশঃ লেখনী অক্ষয় করুন।

শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
ঠিকানা—হেডমাস্টার, ভিক্টোরিয়া স্কুল, কুমিল্লা

শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯৯
[ফরিদপুর]

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার কণিকা নামক সুন্দর নীতিকাব্য উপহার পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। পুস্তকের অপূর্ব কবিত্ব হইতে কবির স্বহস্ত লিখিত প্রীতিসূচক ছত্রটি পর্য্যন্ত সকলই আমার চক্ষে সম্মানযোগ্য। এই কাব্য প্রকৃত ধনবানের হস্তের দান,—কণিকা হইলেও বিশেষ মূল্যবান; গল্পের পরিচ্ছদে নীতিকথা এরূপ মনোজ্ঞভাবে এদেশে আর গ্রন্থিত হয় নাই; ছোট ছোট সন্দর্ভগুলি ছোট ছোট বনফুলের ন্যায় এক এক প্রকার রূপ ও সুরভির পরিচয় দিতেছে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর এবং পাঠকহৃদয়ে এক একটি সমগ্র ভাবের চিত্র মুদ্রণ করিতে সক্ষম; এই নীতিকথা প্রসঙ্গে আমাদের অধঃপতিত জাতি সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তার উদয় হইয়াছে; অনেকগুলি গল্পে কবির স্বজাতির উন্নতি নির্দ্দেশক সহানুভূতি কাতর উপদেশ অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই মহামূল্য উপহার দ্বারা সম্মানিত করার জন্য আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ভবদীয় গুণানুরক্ত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা
৯ই মাঘ, ১৩০৬।

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার নব কাব্যখানি কল্য পাইয়া সাগ্রহে আদ্যন্ত পড়িয়াছি; এই সুন্দর উপহার প্রাপ্তির সঙ্গে আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া কণিকার "উদারচরিতানাম্" কবিতার "সূর্য্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই" প্রভৃতি ছত্র মনে পড়িল।

"কথা" কাব্যের মধ্যে যে নৈতিক মাধুর্য্য আছে, তাহাতে কবির কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। কোশল রাজের শত্রু শিবিরে মহান আত্মসমর্পণ, একটি পূজার প্রদীপের ন্যায় শ্রীমতী দাসীর বৌদ্ধস্তূপ মূলে জীবন নির্ব্বাণ, বিগত সৌন্দর্য্য অনাথিনীর গৃহে উপগুপ্তের অপরূপ প্রতিশ্রুতি পালন, প্রজা দুঃখকাতর রাজার অভিনব প্রণালীর দণ্ড দ্বারা মহিষীকে দুঃখীর দুঃখ বুঝাইবার চেষ্টা, ভক্ত কবীরের পাপী রমণী ও তাহার চক্রান্তজনিত লোক-নিগ্রহকে প্রকৃত মাহাত্ম্য দ্বারা পরাজয় করা প্রভৃতি ভাবের সমস্ত গল্পই নৈতিক জগতের সুন্দর ও অদ্ভুত কথা। নির্ম্মম স্বার্থান্ধ সংসারে এই সন্দর্ভগুলি আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় আশ্চর্য্য, অথচ উহা বাস্তব জগতেরই কথা, কল্পনা নহে; গল্পগুলির অনুষ্ঠান জীবন্ত মাহাত্ম্য মনুষ্যত্বের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিতেছে। অনেকগুলি গল্পই কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে হইয়াছে, এই অশ্রুতে ক্ষণেকের তরে যেন মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে ও কামনাহীন সততার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমার দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনে এরূপ সুখপ্রাপ্তি বড় বিরল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব উপাখ্যানগুলি প্রাচীন ভাষায় নানারূপ অলৌকিক ঘটনা ও আবর্জ্জনায় জড়িত ও তাহা সাধারণ পাঠকের

অনধিগম্য, আপনি সেগুলি নূতন কবিত্ব মন্ত্রপূতঃ করিয়া সরল বাঙ্গলা পদ্যে করুণ রসের উৎস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি আমাদের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হইতে দেখিলে সুখী হইব, কিন্তু ইহার উন্নত ও নির্ম্মল নৈতিকতত্ত্ব বালকগণের অভিভাবকগণের পাঠের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। আপনার অনুপমেয় শব্দলালিত্য, শিল্পীর ন্যায় গল্পের চারুগ্রন্থন, ও উৎকৃষ্ট কবিত্ব এই কাব্যের সর্ব্বত্র সুলভ, তাহা সমালোচকগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন; কিন্তু সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের উর্দ্ধে এক মহানৈতিক ব্রত উদ্‌যাপন চেষ্টায়ই বোধ হয় কবির জীবনেরও প্রকৃত সফলতা; সেই নীতি সূত্রগুলি সরস কবিত্ব কৌশলে "কণিকা"য় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাদের অনুষ্ঠান ও দৃষ্টান্ত এই নূতন কাব্যখানিতে সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের নাম কবি বিনয়সহকারে "কথা" রাখিয়াছেন, পাঠকগণ ইহা "কথামৃত" বলিয়া বুঝিতেছেন। বসন্তের প্রাক্কালে এই নির্ম্মল অধ্যাত্মরাজ্যের নূতন রাগিণী বাঙ্গলা কাব্যের সচরাচর লব্ধ সুরের এক গ্রাম ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, এই কাব্যখানি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান এক শ্রেণী উর্দ্ধে উন্নীত হইল, সন্দেহ নাই।

আপনার সদয় ও বহুমূল্য উপহারের জন্য আমার সসম্মান কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

বিনীত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ফরিদপুর
তারাকুমার রায়ের বাসা
২৯শে মার্চ্চ, ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

‘কাহিনী’ সাগ্রহে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি; “কুন্তী-সংবাদ” ও “নরকবাস” দুইটি কবিতা করুণার প্রস্রবণ, উহাদের মর্ম্মান্তিক ছন্দ মনকে একান্ত দ্রব করিয়া ফেলে, এত অশ্রু উপহার আমি জীবনে অল্প কাব্যের উদ্দেশেই দিয়াছি। ‘গান্ধারীর আবেদনে’ দুর্য্যোধনের চিন্তাশীল দর্পকথায় রাজনীতির বিশ্লেষণ-কৌশল উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; কবি এই কবিতায় রাজদ্রোহ নিবারক বিধি প্রভৃতি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রতি আভাসে কটাক্ষ করিয়া মহাভারতীয় বীর চরিত্রের স্বরূপ বজায় রাখিয়াছেন এবং গান্ধারী চরিত্রে মাতৃস্নেহের উর্দ্ধে রমণী হৃদয়ের উদারতা প্রদর্শন করিয়া উহা মহামহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ আমি ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার পড়িয়াছিলাম। উহা অনেকদিন যাবৎ আমার ক্লান্তিকর অবসরের সঙ্গী, ইহাতে রাণী কল্যাণীর চরিত্রের নৈতিক মাধুরীতে মন পবিত্র হইয়া যায়; যাঁহারা ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই পৌরাণিক হিন্দুগণও দয়ার এমন একখানি মানসী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র কবিতাব্যাপী এক অনুপম শুভ্ররহস্যের অভ্রালোকে এই দেব প্রতিমা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন; সরলতাময়ী কল্যাণী কুটিলতাকে কুৎসিত প্রতিপন্ন করিয়া, অভিসন্ধিকে ঔদার্য্যগুণে ব্যর্থ করিয়া নিন্দা ও যশঃ উভয়কে নির্ম্মল দেব হাস্যে উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর কল্যাণ ব্রত অব্যাহত রাখিয়াছেন। যে দাতার গৃহ বিচার-আলয়ের ন্যায় সঙ্কীর্ণ, “ফাঁকি দিয়া তারা

ঘোচায় অভাব, আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।" এই উদারনীতি-উজ্জ্বলিত কল্যাণীর গৃহের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না, সে যেন কাচ, এ যেন কাঞ্চন। অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পড়িয়া সেই "ক্ষীরো" একরূপই আছে পরিচারিকা অবস্থায় তাহার ইচ্ছা প্রতিরুদ্ধ হইত, রাণী হইয়া তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রলয়ংকরী হইয়াছিল। প্রভুত্বের স্বপ্নভঙ্গে সে নিজের পরিচয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল এবং রাণী কল্যাণীর পদধূলি লইয়া নিজের অবনতি স্বীকার করিল, তাঁহার চরিত্র যেরূপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ নিপুণ প্রণালী আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খণ্ডকাব্যখানি পাঠ করিয়া কেবল 'কি সুন্দর'! 'কি সুন্দর'! বলিয়া হর্ষের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

আমার একটি দুঃখের কথা আছে, আপনাকে দেখি নাই; শিলাইদহ যাইবার পথ অসুবিধাজনক না হইলে ৫।৭ দিনের জন্য আপনার ওখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, আমার শরীর কাতর কিন্তু গাড়ীতে এখন বোধ হয় কতকটা দূর যাইতে পারিব, আপনার সুবিধানুসারে ও শরীর কতক পরিমাণে ভাল থাকিলে আপনার চিরানুরক্ত ভক্ত তাহার কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। শিলাইদহ, ষ্টেশন হইতে কতদূর?

অনুগত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

২৮ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৬শে আগষ্ট ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুদিন হয় মহাশয়ের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য ক্ষণিকা উপহার পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু নিতান্ত পীড়িত থাকায় এ পর্য্যন্ত ক্ষণিকার দৈব প্রতিভাশালী কবির প্রতি চিত্তের ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। আমার স্নায়ব দুর্ব্বলতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একখানি সামান্য পত্র লিখিলেও অবসন্ন হইয়া পড়ি।

ক্ষণিকা সামাজিক হিসাবে একটুকু উচ্ছৃঙ্খল এবং বোধ হয় তজ্জন্যই উহা বিশেষরূপ উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের মায়াবাদী সমাজ, রূপ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা প্রভৃতি সংস্কারাধীন হইয়া বাগ্দেবীর প্রবেশ একরূপ রোধ করিয়া রাখিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে স্থানে সংসারের সকলই মিথ্যা, সেখানে কবি কোন্ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন! আপনার দৈব কবিত্ব পৃথিবীর প্রতি সৌন্দর্য্যটুকুর আস্বাদ অঙ্গীকার করিয়া এই তত্ত্বকণ্টকসংকুল সংসারকে ক্ষণেকের জন্য আবাস যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কবির সুখের হাস্যে আমাদের 'নশ্বর' 'অসার' সংসার মুখরিত হইয়া নবশ্রী লাভ করিয়াছে এবং মায়াবাদ যেন আপনা হইতে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কবির উচ্ছৃঙ্খলতায় নব জীবনের আনন্দ সূচিত হইয়াছে এবং উষর দুঃখময় ক্ষেত্রে গঙ্গাধারার ন্যায় একটি পুণ্য প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। কবি অশ্লেষাতে যাত্রা করিয়া অসময়ে অপথে চলিয়াছেন, শপথ করিয়া বিপথ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, মাতাল হইয়া গান গাহিয়াছেন, শুষ্ক ঋষির চিত্তে ও জ্যামিতির সূত্রে সত্যের আলয়

নির্দ্দেশ করিয়া "মিথ্যা যদি মধুর রূপে, আসত কাছে চুপে চুপে, তাহা হ'লে কাহার হত ক্ষতি। স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি।" বলিয়া কল্পনার সৌন্দর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, পুষ্প পল্লব শোভিত, আলোক চূর্ণ বিক্ষেপে উজ্জ্বল বনের সৌন্দর্য্য সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়া যৌবনের জন্য বানপ্রস্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কবি কলঙ্ক ও নিন্দাপঙ্কে তিলক টানিয়া হাসিতে হাসিতে প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, গীতিগুলির সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও সৌন্দর্য্য। এই অসংযতবাক্ অথচ সুন্দর কবিকে সামাজিকগণ কি বলিবেন? ইঁহার রমণীয়তা প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। ইনি হাসিয়া গাহিয়া চিত্ত অধিকার করিবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রাচীন পুঁথি ছিঁড়িয়া তাঁহাদের টিকি ধরিয়া টানা হেঁচড়া করিবেন, ইঁহাকে কে কি বলিবে? ইনি অতৃপ্তির চক্ষু তৃপ্তির ফুলশার দ্বারা বিঁধাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন অতীত ও ভবিষ্যত হইতে বর্ত্তমানই শ্রেষ্ঠ। এই মুহূর্ত্তের শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপনী লইয়া ক্ষণিকা আমাদের নিকট আসিয়াছে। কিন্তু ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি কটাক্ষক্ষেপী আপাতচপল কবি মধ্যে মধ্যে যে সুগভীর রাগিণী জাগাইয়াছেন, তাহা ক্ষণিকায় ক্ষণ স্বপ্নকে গূঢ় তত্ত্ব-সমাবেশে মহান করিয়া তুলিয়াছে। "অন্তরতম" শীর্ষক কবিতার গুরুত্ব অনেক বিপুলকায় কাব্যও বহন করে না।

আমার শরীর অসুস্থ। লিখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের আনন্দ কিছুই ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলাম না।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র পুনর্মুদ্রণের জন্য কলিকাতা আসিয়াছি। আশা করি মহাশয় কুশলে আছেন,—আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

২রা আশ্বিন, ১৩০৭
২৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

মহাশয়ের কৃপালিপি খানি পাইয়া প্রীত ও সম্মানিত হইয়াছি। এখানে আসা অবধি আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণিকার ক্ষণজন্মা কবি যে আমার প্রীতিজ্ঞাপক পত্রখানির আদর করিয়াছেন, ইহা আমার বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। যিনি পুস্তকখানির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন, সুতরাং এখন আমার জনৈক বিশ্বাসযোগ্য প্রকাশক খুঁজিতে হইতেছে।

মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ আমার হৃদয়পোষিত চিরদিনের কামনা পরিতৃপ্তি স্বরূপ হইবে। শিলাইদহ যাইবার চেষ্টা করিয়া নানা কারণে বিফলকাম হইয়াছি। ফরিদপুর হইতে আসিবার সময় রেলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পরিবারবর্গের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলাম, এ অবস্থায় রেলপথে ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। মহাশয় যখন কলিকাতায় পুনরায় আসিবেন, তখন দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে আমি মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব। শৈশবকাল হইতে মহাশয় আমার হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তির অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন, মহাশয়ের দর্শন লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

মহাশয়ের ভক্তদীন
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভক্তিভাজনেষু,

আমার এখন হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। আপনার কাছে আজ উপস্থিত হওয়ার তাহাও অন্যতম কারণ।

পারিবারিক কথা লইয়া যদি কোন সময়ে আমার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকে, অবশ্যই এতদিনে সে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। বিশেষ যেদিন আপনি লিখিয়াছেন "যে কেহ মোরে দিয়েছে দুঃখ, চিনিয়েছে পথ তাঁর, তাহারে নমি আমি" সে দিনই আপনার শক্ররা আপনার নিকট হার মানিয়াছে এবং নিতান্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। আমি কোন সময়ে যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তজ্জন্য অনুতপ্ত আছি। তবে আমি যদি কিছু বলিয়া থাকি, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে, সাময়িক উত্তেজনার ফলে এবং আমি কখনও আপনার নিন্দুকের দলে মিশি নাই। যাহা হউক আমি আপনাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় নিবেদন করিতেছি যে আমার ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

আমার 'নীলমাণিক' নামক একখানা ছোট বই কয়েকদিন হয় আপনার নিকট পাঠান হইয়াছে। এই বইখানি সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগে নাই। কিন্তু আমি আপনার নিকট শিক্ষার্থী এবং চিরদিনই উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখেন, তবে তাহার কোন অংশ পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিব না, এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিব এবং শোধরাইবার চেষ্টা করিব।

আপনি বাংলায় এম, এ পরীক্ষার সম্বন্ধে "মডার্ণ রিভিউ"তে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা আমরা পড়িয়াছি এবং আশুবাবু অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িয়াছেন। তিনি বলেন ভাষার মুখে প্রাচীন আবর্জ্জনা ফেলিয়া তিনি তাহার প্রবাহ রোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত উপদেষ্টা কেহ নাই। আপনি

এম-এ পরীক্ষার বোর্ডে যদি থাকিতে সম্মত হন, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী অনেক কাজ হইবে। আশুবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি ইউনিভার্সিটির কমিশনের কার্য্যে সারাদিন এত ব্যাপৃত যে বোলপুরে যাইতে পারিতেছেন না। আপনি এখানে আসিলে খবর পাইলে দেখা করিতে চেষ্টা পাইবেন।

সুচনায় হিসাব নিকাশের কথা লিখিয়াছি, ইহা কথার কথা নহে। আমি ৩½ মাস যাবত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছি, রোজ সন্ধ্যার পরে জ্বর হয় এবং সারারাত্রি প্রবল জ্বর অনুভব করি। আত্মীয় ও ডাক্তাররা ভয় পাইয়াছেন, কারণ এখন আমার বয়স ৫০ এর উপরে। কিন্তু সংসারের হিসাব নিকাশ লইয়া চিরকালই গোল করিয়া মরিব, আমার স্রষ্টার এ উদ্দেশ্য নহে বোধ হয়।

আমার শরীর দিনের বেলায় কখনও কখনও ভাল থাকিলে গাড়ীতে কতকটা যাইতে পারি, কিন্তু সে শক্তিও বোধ হয় বেশী দিন থাকিবে না। আপনি এখানে আসিলে একবার আমাকে দেখিতে আসিবেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব। আপনার পায়ের ধূলা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে পড়িয়াছে, এই ভরসায় এই অনুরোধ করিলাম।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা যদি ছেঁড়া কাগজের দামেই বিকায়, তজ্জন্য আমার কোন দুঃখ নাই, কারণ এখন আমার নিকট প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠা দুইই সমান। আমি কলিকাতায় যে ঠিকানায় আছি তাহা নীচে দিলাম।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

৪৯।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট প্রণত
বাগবাজার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি

৪৯।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা
৬।১২।১৮

ভক্তিভাজনেষু

আজ আপনার পত্রখানি পড়িয়া কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে। আপনি দুর্দ্দিনে আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, আপনার কথায় গগনবাবু আমাকে বাড়ী তৈরী করিবার খরচের অনেকাংশ বহন করিয়াছিলেন, আপনার কথায় আমার ত্রিপুরার বৃত্তি হইয়াছে, আমার আর্থিক কষ্টের সময় আপনি চিঠি পত্র দিয়া নানাভাবে আমার উপকার করিয়াছেন; আমার পুত্র অরুণচন্দ্রকে লইয়া যে সকল মনঃকষ্ট আমি পাইয়াছি, তাহার জন্য আপনাকে আমি কোন অনুযোগ দিতে পারি না, আপনি সদয় চিত্তে তাহাকে আশ্রয় দিয়া সেই সময়ে আমার হিত সাধন করিয়াছিলেন— শুধু তাহাই নহে, দরিদ্রের যে সকল পরিণাম চক্ষের উপর সর্ব্বদা দেখিতে পাই, হয়ত অরুণের রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া সেই দুর্গতি অনিবার্য্য হইত, আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। এজন্য আমার ও তাহার উভয়েরই আপনার নিকট অসীম কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে।

আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনার নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার দিন আসিয়াছে। পৃথিবীতে আসিয়া যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া চিনিলাম, যাঁহার কথায় ও ব্যবহারে আদর্শ পুরুষের অনেক গুণ দেখিলাম, তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা না দেখাইতে পারিলে আমার অসহণীয় ক্ষুদ্রত্ব আমার নিজকে পীড়ন করিবে। আজ যুক্তকরে আপনাকে নমস্কার জানাইতেছি।

আশুবাবু বাঙ্গলাভাষাকে কিরূপে ইউনিভার্সিটিতে চালাইতে হইবে, তাহার উপদেশ আপনার নিকট চান। তিনি যাঁহাদিগকে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করেন, তাহাদিগের উপর সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন; আপনার মতন এই বিষয়ে কে তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারিবে? তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে আপনার প্রত্যেক পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"নীলমাণিক" সাতদিনে লিখিত হইয়াছে, উহা আপনার পড়িবার যোগ্য হয় নাই; পুরাতন জিনিষের উপর আমার একটা ঝোঁক আছে, সে ঝোঁকটা বোধহয় রোগে পরিণত হইয়াছে। আপনার বিচার প্রতিকূল হইলেও অবনত মস্তকে মানিয়া লইব।

আমার দুই দিন জ্বর হয় নাই, এজন্য এই চিঠি নিজ হাতে লিখিতে পারিলাম। আপনার ক্ষমার মোহরাঙ্কিত পত্রখানি পাইয়া কত সুখী হইয়াছি, তাহা আর কি লিখিব উহা দুর্ল্লভবস্তুর মত রাখিয়া দিলাম।

চিরাশ্রিত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৯

শ্রীহরি

7, Biswakosh Lane,
Baghbazar,
Calcutta

ভক্তিভাজনেষু,

অরুণ বলিতেছে, আপনি পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ চিঠি লিখিয়া পাঠাইবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন একজনে করেন, আর একজনে দেখিয়া দেন, ইহাই সাধারণ

রীতি। সে অনুসারে আপনার কাজ আপনি করিয়াছেন, প্রত্যেকটি প্রশ্ন দেখিয়া দিয়াছেন। এবং আপনার অনুমোদন লইয়া আমি আশুবাবুকে বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং ব্যাপারটা একবারে সমাধা হইয়া গিয়াছে। এখন যদি অন্যরূপ করেন, তবে কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিবেন, আমি আপনার কোনরূপ বিরক্তির কারণ দিয়াছি— ইহা আমার পক্ষে বড়ই খারাপ হইবে। আশুবাবু আমাকে গালমন্দ দিবেন, যেহেতু সব হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে জানাইয়াছি। যে প্রশ্নটি বাদ দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বাদ দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ যদি এখন আপনি অস্বীকার করেন, তবে আর একজন যোগ্য পরীক্ষককে নিযুক্ত করিতে হয়, কারণ প্রত্যেক Paperএ দুইজন করিয়া পরীক্ষক থাকেন। আপনি না করিলে আর একজন হইবেন। আমার আবার তাঁহার কাছে যাইয়া প্রশ্ন দেখাইয়া অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। আমি অতিশয় অসুস্থ, আমার কাজ তাহা হইলে আরও বাড়িয়া যাইবে ও বড় ঝঞ্ঝাটে পড়িব। মহাশয় দয়া করিয়া যাহা অনুমোদন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বহাল রাখিবেন। বরং কাগজ দেখা সম্বন্ধে অসুবিধা বোধ করিলে সেই কাজ অস্বীকার করিয়া চিঠি দিতে পারেন। যাহা শেষ করিয়া দিয়াছেন এবং আমি তদনুসারে জানাইয়াছি, তাহা বহাল রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। আমি বড়ই অসুস্থ, তাহা না হইলে প্রণতিপূর্ব্বক এই নিবেদন জানাইতে নিজেই যাইতাম আমার অসুস্থ অবস্থায় আমার দুঃখের মাত্রা বাড়াইবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন।

[১৯১৯ ?]

প্রণত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১০

শ্রীহরি শরণং

7. Biswakosh Lane
Baghbazar, Calcutta
২১শে মার্চ্চ, ১৯২৩

ভক্তি ভাজনেষু,

এবার মৃত্যু আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি ভাবিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে। আমি নিদারুণ রোগের শয্যায় ভগবানের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর আনিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল একদিন আমার শ্যামপুকুরের ছোট বাড়ীখানির দরজায় আমার পাঁচ বৎসরের ছেলে বিনয় তাহার মাথার এক বোঝা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল লইয়া আপনার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বোলপুরে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আবদার জানাইয়াছিল, আপনি তাহাকে নিবেন এই ভরসা দিয়াছিলেন।

আজ তাহার সেই দিন আসিয়াছে যখন আপনি তাহাকে বোলপুরে স্থান দিতে পারেন। আমার কৃত শত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যে সৌহার্দ্যগুণে আপনি আমার ছেলেদের প্রতি করুণা দেখাইয়া আসিয়াছেন, আপনার সেই উদারতার উপর নির্ভর করিয়া আজ এই চিঠিখানি লিখিতেছি।

বিনয় ১৯২০ সনে ইতিহাসে ফার্ষ্টক্লাস বি, এ অনারসে ফার্ষ্ট হইয়া স্বর্ণ পদক ও উচ্চ বৃত্তি লাভ করে, ঐ বি, এ পরীক্ষায় সে ইংরাজির রচনায় সর্ব্বপ্রথম হয়। যিনি দ্বিতীয় হন, তিনিও ফার্ষ্টক্লাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অপেক্ষা শ্রীমান বিনয় ২৬ নম্বর বেশী পাইয়াছে।

১৯২২ সনের Indian Historyতে এম, এ পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার বিষয় ছিল Archaeology, সে

বিষয়ে তো সে প্রথম হইয়াছেই, অপর পাঁচটি বিষয় জড়াইয়াও সে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে। দ্বিতীয় যিনি হইয়াছেন, তিনিও প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন, তাঁহার সহিত বিনয়ের ৪০ নম্বরের তফাৎ।

প্রেসিডেন্সি কলেজে বিনয় প্রায় সমস্ত ক্লাসের পরীক্ষা, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা ও বাৎসরিক পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে ও ইংরেজীতেও অতি উচ্চ নম্বর পাইয়াছে। এই দুই বিষয়েই সে খুব ভাল।

সে ছয়বৎসর চেষ্টা করিয়া একখানি বাংলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিবে, তজ্জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছে। গত বৎসর সে চেষ্টা করিলে আশুবাবুর সাহায্যে ডিপুটি হইতে পারিত, কিন্তু সে কিছুতেই ডিপুটিগিরি করিবে না, আজীবন সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চা করিবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি শোচনীয় অবস্থা। বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আজীবন কাজ করিতে অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেছে, আপনি আমার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন, কিন্তু আমার ছেলেদের হৃদয়ের উপর আপনি যে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন, তাহাতে সন্দিহান হইবেন না। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম, আপনি শ্রীমানকে আপনার আশ্রমে জায়গা দিলে সে অন্য কোথায়ও যাইবে না।

প্রণত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১১

শ্রীহরি

৩০।৩।৩৬

ভক্তিভাজনেষু,

নন্দলালবাবুর সঙ্গে আপনার জন্য এক সেট "বৃহৎ বঙ্গ" (দুই খণ্ড) পাঠাইয়াছিলাম, তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে তাহা দাখিল করার দরকার হইয়াছে।

এই পুস্তক দশ বার বৎসর খাটিয়া লিখিয়াছি, সুতরাং আপনার মত ব্যক্তির নিকট তাহার একটা সমালোচনা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, যদি আপনার স্বাস্থ্য ও অনবকাশ বশত আপনি তাহা না লিখিতে পারেন, তবে ক্ষুদ্র একটি মন্তব্যের সহজ সৌজন্য হইতে কেন বঞ্চিত হইব, তাহা বুঝিতে পারি না, এই পুস্তকের অনেক স্থলে আপনার কথা বহু সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছি। যিনি সমস্ত জগৎ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত, আমার মত ব্যক্তির সেইরূপ লেখা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন। আমি যাহা চাহিয়াছি তাহা দাবী নহে, অনুগ্রহ, সুতরাং অনুগ্রহ-প্রার্থীর কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার অধিকার নাই।

বিনীত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি শরণং

Phone South 1123,
"Rupeswar House"
Behala, P. O.
Calcutta

১৭।১০।৩৯

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

পূজার সংখ্যা বাতায়নে আপনি অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ সমালোচনা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না, আপনার অন্তর্দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রিত যে তাহাতে যে কোন বিষয়ের জটিলতা ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ উজ্জ্বল করিয়া দেখায়। আপনি বৃদ্ধ, কিন্তু মনের জগতে আপনার চিরযৌবন ; তাহা বয়স এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আপনার মন্তব্য ক্ষুদ্র একটি মণির ন্যায় বহুমূল্য ও উজ্জ্বল। আপনি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করুন।

বহুদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখিলাম, আমি আপনার অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের ছোট, তথাপি আপনার মত স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারি নাই। অনেক সময় বিছানায় মৃতের মত পড়িয়া থাকি এবং বিগত জীবনের সেই অধ্যায়টি বিশেষ করিয়া স্মরণ করি যখন আপনার দুর্লভ সঙ্গ ও সৌহার্দ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। আপনার স্মৃতিতে যদি সেই অধ্যায়ে কোন দাগ কাটিয়া থাকে, তবে হয়ত বুঝিবেন, আপনার প্রীতি ও সহৃদয়তা বঞ্চিত হইয়া আমি কতটা রিক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

চিরানুরক্ত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র-প্রসঙ্গ

দীনেশচন্দ্র সেন

৩ নভেম্বর ১৮৬৬ - ২০ নভেম্বর ১৯৩৯

আমি আমার যমজ ভগিনী মগ্নময়ী দেবীকে সঙ্গে লইয়া মাতুলালয় [ঢাকা জেলার] বগজুড়ী গ্রামে এক আম্রবৃক্ষতলে আতুড় ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কার্তিক মাসের ১৭ই, শক ১৭৮৮ শুক্রবার রাত্রি তখন ৪ দণ্ড বাকি আছে।

আমার পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সুয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

…ইংরেজি শিক্ষার ফলে যাহা হইত তাঁহার তাহাই হইল, তিনি নব ব্রাহ্মমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

…ঢাকা জেলা কোর্টের সরকারী উকিল গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় তাঁহার কন্যা রূপলতা দেবীকে ইঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন ; তখন আমার পিতার বয়স ১৫।১৬।

…পাঁচ বছর বয়সে যথারীতি হাতে খড়ি হওয়ার পর আমি সুয়াপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে সুরু করিয়া দেই।…

বিশ্বম্ভরের পাঠশালায় চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়া শেষ করিয়া আমি মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে ভর্তি হইলাম।…[হেডমাষ্টার পূর্ণচন্দ্র সেনের] কাছে ইংরেজি প্রথম শিখিয়াছিলাম।…আমি তাঁহার কাছে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা প্রথম শুনিয়াছিলাম।

…আমার সাহিত্য-জীবন অতি শৈশবেই আরব্ধ হইয়াছিল। যখন আমার সাত বৎসর বয়স, তখন আমি পয়ার ছন্দে সরস্বতীর এক স্তব লিখিয়াছিলাম। তৎপর কত যে কবিতা লিখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

…দিদি মুক্তালতাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। মুক্তা না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ মায়াপুরী নির্মাণ করিয়া বিরহী রাধার স্পর্ধা ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্ণবেত্র হস্তে রাধার অপেক্ষা রূপলাবণ্যশীলা রাজকুমারীরা নিথর রাত্রিতে তাঁহাকে গঞ্জনা ও ঠাট্টা করিয়া অনুতাপ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি দিদি এমনই

করুণ কণ্ঠে সুর করিয়া পড়িতেন যেন আমার চক্ষে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিত। রাধার দুঃখে শিশুহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। সেই স্মৃতি হইতে ৪২ বৎসর পরে আমি গত বৎসর 'মুক্তাচুরি' [প্রথম প্রকাশ ১৪ এপ্রিল ১৯২০] বহি লিখিয়াছিলাম।

তার পর মাইনর ক্লাসে উঠিয়া আমি বাইরণের 'চাইল্ড হেরল্ড' ও 'ডন জুয়ান' প্রভৃতি পাঠ করি। সকলাংশ না বুঝিলেও যেটুকু বুঝিতাম তাহাতে আমার কল্পনা আমাকে অনেক দূর লইয়া যাইত। আমি খাতার পর খাতা পূর্ণ করিয়া কবিতা লিখিয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম।

…যখন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ি তখন একটা নোটবুকে এই মর্মে লিখিয়াছিলাম "বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব— যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলোয়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?"

…কাব্যানুরাগ দিদি দিগ্বসনী দেবী আমায় দান করিয়াছিলেন। তিনি যখন বৈষ্ণবপদ মৃদু স্বরে গাহিতে থাকিতেন, তখন আমার মনে যে আনন্দ হইত তাহা শুধু অশ্রুজলপ্লাবিত হইয়া ভাসিয়া যাইত না, তাহা আমার কল্পনার ঘরে আরতির ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া দিত।

…ক্লাসে এবং পরীক্ষার ফল সম্পর্কে আমার খ্যাতি যে রূপই থাকুক, ঢাকা ছাত্রসমাজে শীঘ্রই সকলে জানিতে পারিল—আমি ইংরেজি কবিতা ও বৈষ্ণব-পদ ইত্যাদি এত পড়িয়া ফেলিয়াছি যে কেহই আমার সঙ্গে এই সকল বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

…ঢাকার বাসায় আমাদের পড়িবার আড্ডাটা কম জমকালো ছিল না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আমরা যেরূপ চর্চা করিয়াছি সেকালের ছাত্রদের মধ্যে কেউ সেরূপ করে নাই।

…আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়। সে বোধ হয় ১৮৮৩ [১৮৮৪] সন হইবে। সেই বৎসরই আমার একটা কবিতা 'পূজার কুসুম' নবজীবনে প্রকাশিত হয়।

…ইংরেজি সাহিত্যের একখানি ইতিহাস ভারতীয় আদর্শের মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে শুরু করিব, এই সংকল্প করিতেছিলাম,

এমন সময় কলিকাতায় পিস্ এসোসিয়েশনের নোটিশ পড়িলাম, ‘বঙ্গভাষা ও ও সাহিত্য’ সম্বন্ধে গবেষণামূলক সর্বোত্তম প্রবন্ধের পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিচারক হইবেন চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

আমি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া একদিন ঘাঁটাঘাটি করিয়াছিলাম, সুতরাং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইলাম।…পিস্ এসোসিয়েশন ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য মনে করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।

…কুমিল্লায় ১৮৯৬ সনে যখন আমি উৎকট রোগশয্যায় [মস্তিষ্ক পীড়ায়] পড়িয়াছিলাম, এবং যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রথম প্রকাশিত হয় [১ম ভাগ ২ ডিসেম্বর, ১৮৯৬] সেই সময়…আমি রবীন্দ্রবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেকদিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দো-ভাঁজ করিয়া মুক্তার মতো হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মতো মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর-সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া একটি বছর ছিলাম, তখন আমি শয্যাগত—রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। ফরিদপুরে থাকা কালে তিনি তাঁহার ‘ক্ষণিকা’ (প্রথম প্রকাশ ১৯০০) আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন আমার মন্তব্যসম্বলিত চিঠির উত্তরে বাং ১৩০৭ সনের ৩০শে ভাদ্র তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন—“আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরে [ও] যে এই পত্রখানি[১] লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন।”[২]…

এই সময় হইতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি।

---

[১] দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্রাবলী ৫

[২] দ্র° রবীন্দ্রনাথ -লিখিত পত্র ২

…তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ ছায়ার ন্যায় মন হইতে চলিয়া যায়, এবং ছবির মতো তিনি সমগ্র মনটি দখল করিয়া বসেন। কতদিন আমার ন্যায় শ্রোতার সম্মুখে সারাটিদিন বীণা-নিন্দিত স্বরে তিনি গান গাহিয়া কাটাইয়াছেন— কতদিন সাহিত্যধর্মসমাজ-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে— তিনি নিত্যই নূতন হইয়া দেখা দিয়াছেন।

…আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি 'চোখের বালি' লিখিতে শুরু করেন।[১]

একবার তিনি আমাকে বোলপুরে যাইতে সাদর আহ্বান পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন "আপনি একবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদকধর্ম্মসঙ্গত হইবে কি না তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"[২]

কিন্তু চোখের বালি তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। 'গোরা'রও অনেকটা ছাপা হইবার পূর্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম।

…আমি নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা পড়ি নাই, রবিবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন আগ্রহে ইহার পূর্বে কোনো বই শুনি নাই।

…রবীন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ তাঁহার ভগবৎপ্রীতি। ইহাই তাঁহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, খেয়া প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতি তাঁহাকে মনুষ্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্যসমাজ, এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরসসিক্ত করিয়া দিয়াছে— ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভার স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে— ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা। তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমার নিকট আছে; এই পত্রগুলিতে অনেকের মধ্যেই সেই সাধকের তপস্যা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার

---

[১] বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮ : গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩০৯

[২] দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ৫

বিরুদ্ধে একবার কোনো লোক বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি অন্যপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন "পত্রে আপনি যে কথার আভাসমাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে।…বিদ্বেষে কোনো সুখ নাই কোনো শ্লাঘা নাই, এইজন্য বিদ্বেষটার [বিদ্বেষ্টার] প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা [যত্ন] করিয়া থাকি।"[১]

…আমি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্য সমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করিব এই জন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন "প্রাচীন কবিতা সংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি, তাহা একান্তই [নিতান্তই] প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে।"[২]

…যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরেজিতে লিখিতে আরম্ভ করি তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন।

…প্রদীপে কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন পরিচালনার গুরুভার আমার উপর ছিল— অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিলাতী ও দেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সঙ্কলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

তাঁহার পত্রগুলির পাতা উল্টাইয়া সেই প্রীতি-সম্বন্ধের পূর্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে।

দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' হইতে উদ্‌ধৃত।

---

১ দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ৬

২ দ্র° রবীন্দ্রনাথ -লিখিত পত্র ৩৫

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র

পত্রসংখ্যা

১

“পুত্রযজ্ঞ গল্পটি সম্পূর্ণ আমার নহে” : এ বিষয়ে বিশদ তথ্য গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে আছে। গল্পটি গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত।

২

ক্ষণিকা : প্রথম প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯০০।

“ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন” : দ্র° দীনেশচন্দ্র-লিখিত পত্র ৫।

“আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার” : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে। দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯০১ সনে।

৩

চোখের বালি : বঙ্গদর্শন পত্রে (১৩০৮ বৈশাখ-১৩০৯ কার্তিক) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

“আপনার বইখানি পাঠিকা সম্প্রদায়ের লুব্ধ হস্ত হইতে” : সম্ভবত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ দ্বিতীয় সংস্করণ বইখানির কথা বলা হইয়াছে।

৪

আপনার ছেলেটিকে : অরুণ—দীনেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। ইঁহার প্রসঙ্গ পত্রান্তরেও আছে।

“আমার ছেলে অরুণকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম”।

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

“তাগিদ দিয়া সমালোচনা লিখাইয়া লইবার” : ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ দ্বিতীয় সংস্করণের সমালোচনা বলিয়া অনুমিত।

৫

“বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে” : চোখের বালি ১৩০৭ সালের গোড়ার দিকে ‘বিনোদিনী’ নামে কবির খাতার মধ্যে খসড়া করা অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

প্রিয়নাথ সেনকে লেখা অনেকগুলি পত্রে (চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড) 'বিনোদিনী'র প্রসঙ্গ আছে।—

"বিনোদিনীর খবর ভাল্। গোলেমালে দিনকতক তার কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছিল গতকল্য থেকে আবার নিয়মিত হাজ্‌রি দিচ্চি। পত্রের এই অংশটুকু যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ কর তাহলে আমার সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি উপন্যাসের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।"

১৬ শ্রাবণ [১৩০৬] পত্র ৭৯

"আমার স্কন্ধে কবিতার পুরাতন জ্বর হঠাৎ চাপিয়াছে তাই বিনোদিনী উপেক্ষিতা।"

[১৮৯৯] পত্র ৮৭

"বিনোদিনীর সঙ্গে আমার দীর্ঘবিচ্ছেদ চল্‌চে। ছোটখাট নানা ব্যাপারে ব্যস্ত আছি।"

পত্র ৯০

"নাটোরকে সেই বিনোদিনীর গল্পাংশ একদিন শোনান গেল— তাঁর খুব ভাল লাগল। শোনাতে গিয়ে সেটা লিখে ফেলবার জন্যে আমারও একটু উৎসাহ হয়েছে— কিন্তু অন্য সমস্ত খুচরো লেখা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটায় হাত দিতে ইচ্ছা আছে।"

[ফেব্রুয়ারি? ১৯০১] পত্র ১৩৬

"বিনোদিনী লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি— কিন্তু তার উপরে ভারতী ও বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন।"

[মার্চ ১৯০১] পত্র ১৪৭

"বিনোদিনীকে লইয়াই ত পড়িয়াছি। তাহার একটা সদ্গতি না করিতে পারিলে আমার ত নিষ্কৃতি নাই। এই অপরিণত অবস্থায় ঐ গল্পটাকে কোন কাগজে দিতে আমার একেবারে ইচ্ছা নয়। গ্রন্থ আকারে সম্পূর্ণভাবে বাহির হইলেই আমার মনঃপূত হয়। কিন্তু একদিকে শৈলেশের তাড়না অপরদিকে অর্থাভাবেরও তাড়া আছে— তাই অপেক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা সাতেক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছি— বিনোদিনী সবে রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিতেছে মাত্র।"

[১৯০১] পত্র ১৫১

"বিনোদিনীকে তুমি প্রশংসার দ্বারা অধিক প্রশ্রয় দিয়ো না— যদি বিগ্‌ড়ে যায় ?"

[১৯০১] পত্র ১৫২

আলোচ্য পত্র -প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখিতেছেন—
"কিন্তু চোখের বালি তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

৮

"আপনার বইখানি" : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ।

৯

পত্রে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনার কথা বলা হইয়াছে। সমালোচনাটি বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।
আলোচনা সমিতি : "রবিবাবুর উদ্যোগে বঙ্গদর্শন চালাইবার জন্য ও সাহিত্যিক চর্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

"মজুমদার এজেন্সীর (পরে মজুমদার লাইব্রেরি)··· অন্তর্গত 'আলোচনা সভা' বিলাতী সাহিত্যিক ক্লাবের অনুকরণে গড়া হয়; রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ এখানে পঠিত হয়; তৎকালীন একদল সাহিত্যিকের এইটি ছিল মিলনকেন্দ্র ও মজলিশ।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড

১১

"ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন" : মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯)।

জামাতা : মধ্যমা কন্যা রেণুকার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

১৫

পত্রে দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত 'রামায়ণী কথা'র আলোচনা করা হইয়াছে।

"কিছুকাল হইতে অনুরোধ আসিতেছে বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট হইতে, তাঁহার 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকার জন্য। দীনেশচন্দ্র রামায়ণের অনেকগুলি চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গদর্শনে (১৩১০) প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সেগুলি এখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতেছে ; তজ্জন্য একটি ভূমিকার প্রয়োজন।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড

এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্রবাবু··· রামায়ণী কথার শুধু ভূমিকা নহে তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছিলেন।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

১৬

পত্রে 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে। এই ভূমিকার কথা পরবর্তী পত্রেও উল্লেখিত। ভূমিকাটি 'রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ রূপে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত।

"আপনার মাথার অসুখ" : ১৮৯৬ সনে কুমিল্লায় অবস্থান কালে দীনেশচন্দ্র উৎকট শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। এই রোগভোগ দীর্ঘকাল চলে।

১৭

গ্রন্থাবলী : কাব্যগ্রন্থ [১৯০৩-১৯০৪]। ইহা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ।

মোহিতচন্দ্র সেনকে এক পত্রে লিখিতেছেন—"গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে জানি না কেন তাড়া আসিতেছে। তাহা ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি।"

—পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংগ্রহ—'কাব্যগ্রন্থাবলী' সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩০৩ সালে প্রকাশ করেন।

১৮

রামায়ণের ভূমিকা : রামায়ণী কথার ভূমিকা।

২০

"আমার জীবন": রাসসুন্দরী দাসী -লিখিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার ভূমিকা এবং দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থপরিচয় লিখিয়াছিলেন।

"আপনি কি সম্পাদকীয় নেপথ্যগৃহেই নৌকাডুবি পড়িয়া লইয়াছেন?" : 'চোখের বালি' রচনার প্রায় আড়াই বছর পর 'নৌকাডুবি' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে শুরু হয় (১৩১০ বৈশাখ-১৩১২ আষাঢ়)।

২২

মহারাজ : ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য। এই বৎসর (১৯০১) কবি দার্জিলিঙে ত্রিপুরার মহারাজের অতিথিরূপে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' পরিচালনার সমস্যা লইয়া আলোচনা কালে মহারাজ পত্রিকাটিকে আশ্রয়দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

২৩

আলোচ্য পত্রে শৈলেশ [শৈলেশচন্দ্র মজুমদার] সম্বন্ধে যে মন্তব্য রহিয়াছে সেই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যও উদ্ধারযোগ্য।—

"এই ব্যক্তি [শৈলেশচন্দ্র] অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানি না, হিসাব-সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁহার মত মুক্ত-হস্ত ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল, নিজের হউক, পরের হউক টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

বঙ্গবিভাগ : দ্র° সাময়িক প্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড।

২৪

য়ুনিভার্সিটি বিল : দ্র° বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১১। আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড।

২৫

প্রার্থনা : দ্র° বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১১। ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড।

২৬

গুরুদক্ষিণা : বোলপুর বিদ্যালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত। সমালোচনা ; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১১।

তিনবন্ধু : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত উপন্যাস (১৫ জুলাই ১৯০৪)।

“একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন” : সম্ভবত কবির এই প্রেরণাতেই পরবর্তীকালে ‘ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য’ (১৩২৯) রচিত হয়।

২৯

“বাদ প্রতিবাদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে” :

রবীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ লইয়া এই সময়ে যে বাদ-প্রতিবাদ হয় পত্রে সম্ভবত তাহারই কথা বলা হইয়াছে।

“স্বদেশী সমাজ -শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন-রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি [৭ শ্রাবণ ১৩১১, ১৬ শ্রাবণ ১৩১১] তৎসম্বন্ধে আমার পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।” তাহারই উত্তরে “সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে লিখিত” ‘স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট’ মুদ্রিত হয় বঙ্গদর্শনের আশ্বিন ১৩১১ সংখ্যায়।

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া লিখিত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের ‘স্বদেশী সমাজের ব্যাধি ও চিকিৎসা’ প্রকাশিত হয় প্রবাসী ১৩১১ শ্রাবণ সংখ্যায়।

পৃথ্বীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন ‘আবেদন-না আত্মচেষ্টা ?’ ভারতী ১৩১১ আশ্বিনে।

শিবাজিউৎসব : “শিবাজিউৎসব এতদিন মারাঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সময় সখারাম গণেশ দেউস্কর ইহাকে বাংলাদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি ‘শিবাজির দীক্ষা’ নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ উহারই ভূমিকাস্বরূপ ‘শিবাজিউৎসব’ নামে কবিতা লিখিয়া দেন।”

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড

কবিতাটি ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে যুগপৎ ভারতী ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। সঞ্চয়িতায় সংকলিত।

৩২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ

কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ : ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ

হিন্দুমেলা : ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ
বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন : প্রথম প্রকাশ ১৮৭২
‘শশধরের প্রাদুর্ভাব’ : শশধর তর্কচূড়ামণি। ১৮৮৫
সাধনা : প্রথম প্রকাশ ১৮৯১
রাজসাহী কন্‌ফারেন্স : নাটোর ১৮৯৭
বঙ্গদর্শন নূতন পর্যায় : ১৯০১
বর্ধমান কন্‌ফারেন্স : ১৯০৪

৩৫

গদ্যগ্রন্থাবলী : ১৩১৩ সালের শেষ দিকে কবি গদ্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনে মন দিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) সম্পাদিত হইয়াছে। গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ১৩১৪ সালে প্রকাশিত। মজুমদার লাইব্রেরি ইহার প্রকাশক।

৩৭

বেহুলা ও ফুল্লরা : দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত গ্রন্থদ্বয়। বেহুলা (প্রকাশ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭), ফুল্লরা (প্রকাশ ৯ মার্চ ১৯০৭)

৪০

পত্রে রথীন্দ্রনাথের বিবাহের কথা বলা হইয়াছে

৪১

সতীর তর্জমা : Sati (10 Oct. 1916) ‘গ্রন্থকার-কৃত সতীর ইংরেজি অনুবাদ’।

ইংরেজি গ্রন্থটি : History of Bengali Language and Literature (1911)

“আমি ১৯০৭ সনে ইংরেজীতে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’র ইতিহাস রচনা করি। যাঁহারা এই বই দেখেন নাই, তাঁহাদের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ইহা আমার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ নামক বাঙ্গলা গ্রন্থের ইংরাজি তর্জমা। এই ধারণা একেবারে ভুল। দুই পুস্তকের বিষয়গত সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, কিন্তু ইংরেজী বই সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লেখা।…তাহা ছাড়া অনেক নূতন কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইয়াছে যাহা ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ নাই।…এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর য়ুরোপের বিখ্যাত

পত্রিকা সমূহে যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয়—তাহা আমার পক্ষে খুব শ্লাঘনীয় হইয়াছিল।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

৪৪

নূতন বইখানি : 'নীলমাণিক', প্রকাশ ভাদ্র ১৩২৫। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৭

৪৫

বৃহৎ বঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থ (সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ১১

৪৬

বৃহত্তর বঙ্গ : বৃহৎ বঙ্গ

৪৭

ময়মনসিংহ গীতিকা : দীনেশচন্দ্র সেন -"কর্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত।"

দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্রাবলী

১

সাধনা : সাধনা পত্রিকা (১২৯৮ অগ্রহায়ণ-১৩০২ কার্তিক)

বিদ্যাসাগর কথা : বিদ্যাসাগরচরিত, সাধনা ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

২

কণিকা : প্রকাশ ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

৩

কথা : প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬

৪

কাহিনী : প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬

কুন্তী-সংবাদ : কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

ক্ষণিকা : প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯০০

“মহাশয়ের কৃপালিপিখানি পাইয়া” : দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ২

৭

“যে কেহ মোরে দিয়েছে দুঃখ” ছত্রটি নিম্নলিখিতভাবে পড়িতে হইবে—

যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।

—দ্র° গীতবিতান

বঙ্গদর্শনে (শ্রাবণ ১৩১১) ‘নমস্কার’ শিরোনামে প্রথম প্রকাশকালে ছত্রটি এইরূপ ছিল—

যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ,
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।

‘নীলমাণিক’ : দ্র° রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্র ৪৪

“আপনি বাংলায় এম. এ. পরীক্ষার সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউতে যে চিঠি লিখিয়াছেন” : এই সঙ্গে মডার্ণ রিভিউ হইতে পত্রখানি সংকলিত হইল।—

VERNACULARS FOR THE M.A. DEGREE

The following letter was written by Sir Rabindranath Tagore to a correspondent, and is published with the latter's permission. Ed., M.R.

Dear—,

It is needless to say that it has given me great delight to learn of Sir Ashutosh's proposal for introducing Indian vernaculars in the university for the M. A. But at the same time I must frankly admit the misgivings I feel owing to my natural distrust of the spirit of teaching that dominates our university education. Vernacular literature, at least in Bengal, has flourished in spite of its being ignored by the higher branches of our educational organisation. It carried no prospect of reward for its votaries from the Government, nor, in its first stages, any acknowledgment even from our own people. This neglect has been a blessing in disguise, for thus our language and literature have had the opportunity of natural growth, unhampered by worldly temptation, or imposition of outside authority. Our literary language is still in a fluid stage, it is continually trying to adapt itself to new accessions of thought and emotion and to the constant progress in our national life. Necessarily the changes in our life and ideas are more rapid than they are in the countries whose influences are contributing to build the modern epoch of our renaissance. And, therefore, our language, the principal instrument for shaping and storing our ideals, should be allowed to remain much more plastic than it need be in the future when standards have already been formed which can afford a surer basis for our progress.

But I have found that the direct influence which the

Calcutta University wields over our language is not strengthening and vitalising, but pedantic and narrow. It tries to purpetuate the anachronism of preserving the Pundit-made Bengali swathed in grammer-wrappings borrowed from a dead language. It is every day becoming a more formidable obstacle in the way of our boys' acquiring that mastery of their mother tongue which is of life and literature. The artificial language of a learned mediocrity, inert and formal, ponderous and didactic, devoid of the least breath of creative vitality, is forced upon our boys at the most receptive period of their life. I know this, because I have to connive, myself, at a kind of intellectual infanticide when my own students try to drown the natural spontaneity of their expression under some stagnant formalism. It is the old man of the sea keeping his fatal hold upon the youth of our country. And this makes me apprehensive lest the stamping of death's seal upon our living language should be performed on a magnified scale by our university as its final act of tyranny at the last hour of its direct authority.

In the modern European universities the medium of instruction being the vernacular, the students in receiving, recording and communicating their lessons perpetually come into intimate touch with it, making its acquaintance where it is not slavishly domineered over by one particular sect of academicians. The personalities of various authors, the individualities of their styles, the revelation of the living power of their language are constantly and closely brought to their minds and therefore all that they need for their final degrees is a knowledge of the history and morphology of their mother-tongues. But our students have not the same opportunity, excepting in their private studies and according to their private tastes. And therefore their minds are more liable to come under the influence of some inflexible standard of language manufactured by pedagogues and not given birth to by the genius of artists. I assert once again that those who, from their position of authority, have the power and the wish to help our language in the unfolding of its possibilities, must know that in its present stage freedom of movement is of more vital necessity than fixedness of forms.

Being an outsider I feel reluctant to make any suggestions, knowing that they may prove unpractical. But as that will not cause an additional injury to my reputation, I make bold to offer you at least one suggestion. The candidates for the M.A. degree in the vernaculars should not be compelled to attend classes, because in the first place, that would be an insuperable obstacle to a great number of students, including ladies who have entered the married state ; secondly, the facility of studying Bengali under the most favourable conditions cannot be limited to one particular institution, and the research work which should comprehend different dialects and folk literature can best be carried out outside the class ; and lastly, if such freedom be given to the students, the danger of imposing upon their minds the dead uniformity of some artificial standard will be obviated. For the same reason, the university should not make any attempt, by prescribing definite text-books, to impose or even authoritatively suggest any particular line of thought to the students, leaving each to take up the study of any prescribed subject,—grammar, philology, or whatever it may be, along the line best suited to his individual temperament, judging of the result according to the quantity of conscientious work done and the quality of the thought-processes employed.

Yours sincerely
RABINDRANATH TAGORE

ব্যক্তিপরিচয়

অরুণ : দীনেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র

আশু মুখুজ্জে : সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কালীমোহন : কালীমোহন ঘোষ

ক্ষিতিমোহনবাবু : ক্ষিতিমোহন সেন

গগন : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগদানন্দ : জগদানন্দ রায়, আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক

দ্বিপেন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র

নন্দলালবাবু : নন্দলাল বসু।

বঙ্গবাবু : বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য

বলেন্দ্রনাথ : কবির ভ্রাতুষ্পুত্র

ভূপেন্দ্রবাবু : ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

মনোরঞ্জন : মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক

মহিম ঠাকুর : কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর

মীরা : কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা বা অতসী

মোহিতবাবু : মোহিতচন্দ্র সেন

যতীন্দ্রবাবু : যতীন্দ্রনাথ বসু। ইনি এক সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শমী : কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র

শৈলেশ : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শ্রীশবাবু : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সতীশ : সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০) ইনি "বি. এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।"

সত্যেন্দ্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্তোষ : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

হীরেন্দ্রবাবু : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

চিত্রা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯। শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

একাদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ একাদশ খণ্ড

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর মাতৃদেবী অনিন্দিতা দেবী ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে
লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৮১ : ১৮৯৬ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৭৪

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক শ্রীকুনাল কুমার রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

২'১

সূচীপত্র

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর মাতৃদেবী অনিন্দিতা দেবীকে লিখিত পত্র ৩
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র ৭

পরিশিষ্ট

১. শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী ৩৪৯
২. রবীন্দ্রনাথ-কৃত শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা ৩৫৭

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। প্রতিকৃতি
তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে। পাণ্ডুলিপিচিত্র
হে বন্ধু, নূতন করে। পাণ্ডুলিপিচিত্র

পত্রাবলীর এই খণ্ডে শ্যামল নিত্যোজ্জ্বল রবীন্দ্রমানসের প্রকাশ তাঁর শত পাঠকের মতো আমার কাছে লিপিসাহিত্যে নতুন বিস্মিত ঘটনা, বিশেষ অর্থে তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহের এই দান আমার কাছে পারমিক। এবং সেই কারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যগত আলোচনা আজও আমার পুণ্যতম স্মৃতির বিরুদ্ধে বলে জেনেছি; কোনোদিনই জীবনে সেই দূরত্ব ঘটল না যাতে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধের আশ্চর্য বহু অধ্যায় পেরিয়ে বিশিষ্ট যোগাযোগের বিষয়ে কিছু লিখতে পারি।

ষোলো বছর বয়সের অজ্ঞাত কিশোরকে লেখা ১৯১৭ সালের পত্র এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ— শোকে অনুকম্পায়ী নিবিড় বিশ্বাস তিনি কোন্ দূর আসামের পত্রলেখককে পাঠিয়েছিলেন, তাকে উদ্ধার করেছিলেন— তার পরে প্রায় চব্বিশ বছর ধরে চিন্তায় চিত্রণে সমৃদ্ধ, ঘরোয়া নানা উল্লেখে স্নিগ্ধ তাঁর পত্রলিপি দেশে বিদেশে আমাকে ধন্য করেছে। প্রত্যেক চিঠি তাঁর মুক্তাক্ষরে রচিত একটি অভাবনীয় উপহার, ভাষায় ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর, যোগ্যতার কথা ভুলে গিয়ে গ্রহণের অধিকার মেনেছি। দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম বলে চিঠির অবকাশ ঘটে নি কিন্তু সহকারীরূপে তাঁর সদ্যরচিত বহু পত্রাবলীর পরিচয়ে বঞ্চিত হই নি, আশ্চর্য হয়েছি সামান্যতম চিঠির চকিত আলোয়, অজস্রত্ব এবং বৈচিত্র্যে, দ্রুতশিল্পের বিশ্বজনীন রূপে।

১৯১৭ সালের চিঠি পাবার কিছু পরেই কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় শান্তিনিকেতনে, শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী আমাকে নিয়ে যান। ১৯২১-এ বিশ্বভারতীর অনুশীলন ছাত্ররূপে এবং স্বল্প অধ্যাপনার দায়িত্বে আবদ্ধ হলাম; ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-সহকারী ও মধ্যে মধ্যে সহযাত্রীর পালা। ইংলণ্ডে, য়ুরোপে, মার্কিনদেশে ইরানে এবং স্বদেশের নানা স্থানে তাঁর সঙ্গে

ছিলাম ; এই চিঠিপত্রে এবং অন্য গ্রন্থে তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বাকি আট বছর অক্সফোর্ডে, লাহোরে এবং কলকাতায় দূরে দূরে কর্মে জড়িয়েছি, কিন্তু প্রায়ই ফিরেছি তাঁর কাছে। করুণায় মহীয়ান তাঁর প্রীতির ঘনিষ্ঠতা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, বহু পত্রে তার পরিচয় রয়ে গেল।

অমিয় চক্রবর্তী

অনিন্দিতা দেবীকে লিখিত

১

৩০ জুন ১৯২২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার খাতাগুলি আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সবগুলি পড়িয়া দেখিলাম। লেখাগুলি খুব পাকা হইয়াছে, ছাপাইলে দেশের অধিকাংশ পাঠক তোমার উপরে বিষম বিরক্ত হইবে। কিন্তু সেইজন্যই ছাপানো কর্ত্তব্য বোধ করি। আমার গল্পসপ্তক প্রভৃতি দুইএকখানি বই আজ পর্য্যন্ত প্রথম সংস্করণের চৌকাঠ পার হইতে পারে নাই— বিবাহিত বাঙালী পুরুষের ভয়, পাছে এইগুলি পড়িয়া যথাসময়ে স্বামীর লুচি-ভাজা সম্বন্ধে স্ত্রীর উৎসাহ লেশমাত্র ম্লান হয়। কোনো কোনো বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার তর্ক করিবার ছিল কিন্তু সময় একেবারেই নাই। যদি কোন দিন দেখা হয় মোকাবিলায় বাদপ্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা রহিল। যদি কোনো অবসরে আশ্রমে আসিতে পার তবে মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে এখানকার ব্যবস্থা দেখিতে পাইবে। আর কয়েকদিন পরে তোমার খাতাগুলি ফিরিয়া পাঠাইব। ইতি ১৬ আষাঢ় ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২২ জানুয়ারি ১৯২৭

ওঁ　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি বোধ হয় জানো মেয়েদের দুঃখ ও অবমাননায় চিরদিন আমি বেদনা ও লজ্জা বোধ করি। আমার অনেক লেখার মধ্যে অনেকবার তা প্রকাশও হয়েচে। কিন্তু এই দুর্গতির যথার্থ প্রতিকার মেয়েদেরই হাতে। তারা যেদিন নিজের অধিকারের মর্য্যাদা সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করবে সেদিন সে মর্য্যাদা কেউ খর্ব্ব করতে পারবেনা। তাই মনে করি যে তোমার লেখা আগমনী আমাদের দেশের মেয়েদের মনে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কাজ করবে। ইতি ৮ মাঘ ১৩৩৩

শুভাকাজ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

১

১২ মার্চ ১৯১৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আমার "ঘরে বাইরে" গল্পটি আপনাদের ভাল লেগেচে এতে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করেচি। প্রমথ চৌধুরী এই গল্পটিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করেচেন কিন্তু সে বোধহয় কতকটা লীলাচ্ছলেই করে থাক্‌বেন— এর মধ্যে কোনো জ্ঞানকৃত রূপকের চেষ্টা নেই, এ কেবলমাত্রই গল্প। মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের, এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাত প্রতি-ঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে তারি বর্ণনা আছে। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে সেটা অবান্তর এবং আকস্মিক। ইতি ২৯ ফাল্গুন ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২২ জুন ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি মনে খুব বেদনা বোধ করচি। তার কারণ, এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখ্‌লে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের রথ চলেচে, মানুষের ইতিহাসের রথ চলেচে— বাধাবিঘ্ন বিপদ সম্পদের মধ্যে দিয়ে সে আপনার গতিবেগে আপনার পথ কাটচে—

সেই পথই সৃষ্টির পথ। আমার জীবাত্মার যে যাত্রা সেও অম্‌নিতর বিরাট,— সেও ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে আপনাকে এবং আপনার পথকে সৃষ্টি করচে— লোকে লোকান্তরে, যুগে যুগান্তরে। কোনো শোকদুঃখের খুঁটিতে আমরা কেউই বাঁধা থাকব না। আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা— আমরা অনন্ত উৎসের মত সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই নিজেকে নিত্য উৎসারিত করব, কোনো ঘটনাই পাথরের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ্‌বেনা। এই কথা মনে রেখে যাত্রীর গান ধর— বিশ্বযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে নিরাসক্ত চিত্তে চিরজীবনের পথে অবাধে চলে যাও। শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেচে তার চেয়ে বড় করে পূরণ করুক। নিজেকে তুমি দীন বলে অপমানিত কোরো না, বেদনার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক্! ইতি ৮ই আষাঢ় ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৬ অগস্ট ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই লিখিব তাহাতে তোমার অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। অন্য সকল ব্যাপারেও যেমন, গানেও তেমনি, আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী। যা সজীব তা সচল।

আমার গানের স্বরলিপি বই আকারে ছাপানো চলিতেছে তাহাতে আমার নূতন পুরানো অধিকাংশ ভালো সুরগুলি পাইবে।

আমি যেমন ব্যস্ত তেমনিই শ্রান্ত— অধিক লিখিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই। ইতি ৩১ শ্রাবণ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২০ অগস্ট ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সংসারে যারা কেবলি হার মানে এবং হাল ছাড়ে তুমি তাদের দলে যেয়োনা। পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখই হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে। অন্ধকারে প্রত্যেক ছায়াটাকেই ভূত

বলে মনে হয়— মনটা অন্ধকার করে থাকলে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অকারণে বা অল্পকারণেই অপদেবতা বলে কেবলি ভ্রম হতে থাকে। খুব জোরে হাস্‌তে শিখ্‌লে তারই আলোয় অন্তত সংসারের মিথ্যে ভূতগুলো দৌড় মারে। খুব গলা ছেড়ে ঐ হাস্‌তে পারাটা পৌরুষ।

রথীকে লিখে দিচ্চি তোমার খাতাখানি প্রমথকে পাঠিয়ে দেবে। ইতি ৪ঠা ভাদ্র ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

৩১ অক্টোবর ১৯১৭

তুমি শান্তিনিকেতনে এসে আমার কাছে কিছুদিন থাক। নিজের মনটাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ো না। সুখ দুঃখের খুব কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এ পর্য্যন্ত চলে এসেচি— কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়েচে। কিন্তু এইটেকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে, বেদনার ভিতর দিয়েই জীবনটাকে নিবিড়ভাবে পেয়েচি। জীবনটা যদি নিতান্ত ছায়ায় লালিত, পেলব এবং সৌখীন হত তাহলে তার কোনো মূল্য থাক্‌ত না। যদি তুমি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর তবে একদিন এই প্রাণপরিপূর্ণ পৃথিবীর রৌদ্রালোকিত কলধ্বনি-মুখর প্রভাতে জেগে উঠে দেখ্‌বে তুমি যে অবসাদে

আবিষ্ট হয়েছিলে সে দুঃস্বপ্নমাত্র, তার মধ্যে সত্য নেই। জীবনে কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত উদ্যোগ, কত সৃষ্টি— জীবনের সেই বিচিত্ররূপী সত্যের দুর্লভ উপলব্ধি থেকে নিজেকে বঞ্চিত কোরো না। বাঁচবার পথে যাত্রা কর কোমর বেঁধে— দুর্জ্জয় তেজে, অসীম আশায়, অটল বিশ্বাসে— অশ্রদ্ধা কোরো না নিজেকে, এবং এই বিপুল সংসারকে— এই অপরিসীম রহস্যময় জীবলীলাকে। আপনার দীর্ঘ ছায়াটাকে আপনার চেয়ে সত্য মনে করে তুমি ব্যাকুল হয়ে পড়েচ, এই কুহেলিকা থেকে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, এই আমি কামনা করি। ইতি ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৪

৬

৯ নবেম্বর ১৯১৭

শান্তিনিকেতন

তোমার এবারকার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি ও নিশ্চিন্ত হয়েচি। তোমাদের যে বয়স, জীবনের আনন্দ কলগান ত আমরা তোমাদের কণ্ঠ থেকেই শুনব— আমাদের কণ্ঠ কি আর তাজা আছে? সত্যি বলচি, যখন তুমি জীবনের উৎসাহরসে তোমার পেয়ালা ভরে নেবার জন্যে আমার কাছে আসতে চেয়েছিলে তখন আমার বড় ভাবনা হয়েছিল। কেননা উৎসের কাছে গিয়ে দেখি তার ধারা ভিতরের দিকেই চলে গেচে, বাইরের দিকে আর উছলে ওঠে না। সেই আমার

অন্তর্হিত প্রবাহের শুষ্কতা তোমাকে হয়ত আরো ক্লিষ্ট করবে এই আমার ভয় ছিল। তুমি ঠিক জায়গাতেই গেছ—প্রকৃতি জীবনের ক্ষতস্থানে হাসপাতালের মত ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবাঁধির উৎপাত করে না; সে মন্ত্র পড়ে চুম্বন করে দেয়। তার আদরের অ্যান্টিসেপ্টিকে না আছে জ্বালা, না আছে কড়া গন্ধ। ২৩ কার্ত্তিক ১৩২৪

৭

[১০ জানুয়ারি ১৯১৮ ?]

শান্তিনিকেতন

✓প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা সন্ধিস্থল আছে যখন তার মধ্যে আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব বেধে যায়। আমি যখন তোমার বয়সে ছিলুম তখন সেই প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলুম। এই অবস্থায় নিজের সঙ্গে নিজের এবং নিজের সঙ্গে বাহিরের সামঞ্জস্য থাকে না। তখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর বিকশিত হবার উদ্যম আছে অথচ তাদের বিকাশ নেই— তখন বাইরের ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্তরের আকাঙ্ক্ষার মিল ঘটে না— তখন ভিতরে বাইরে পদে পদে ঠোকাঠুকি চলে।✓আর একটা সন্ধিস্থল হচ্চে আমি যে বয়সে আছি এইটে। এখন এতদিনকার সংসারটা আলগা হয়ে আমার কাছ থেকে পিছিয়ে পড়েচে অথচ সংসারের অতীত যে একটি আত্মার আশ্রয় আছে সেটাকেও সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরা

যাচ্চে না। নিজের প্রকৃতির মধ্যে এই দ্বিধা বিচ্ছিন্নতার ব্যথা খুব অসহ্য করেই অনুভব করচি কিন্তু তাই বলে তার কাছে হার মানব কেন? পেরিয়ে যাবই। শক্তি আছে বলেই ব্যথা পাচ্চি— এবং শক্তি আছে বলেই সে ব্যথা অতিক্রম করেই যাব। তুমিও সেই কথা মনে রেখো। বিধাতা আমাদের মনের মধ্যে ধারালো যা কিছু অস্ত্র দিয়েছেন সে কেবল আমাদের জাল কাটাবার জন্যে— নিজেকে কেটেকুটে টুকরো-টুকরো করবার জন্যে নয়। তুমি তোমার শক্তির অস্ত্রকে উল্টো করে ধরেচ, তার তীক্ষ্ণ ধারটা কেবলি তোমার নিজেকে বিঁধচে। আপনাকে যতই তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করতে থাকবে ততই সেই চিন্তার চাপে তোমার নিজের দিকের ভারটা বেড়ে গিয়ে তোমাকে ঝুঁকিয়ে ফেল্‌বে। ভুলে যাও নিজের কথা— অমনি দেখ্‌বে বাইরের সঙ্গে তোমার ভারসামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। আশ্চর্য্য এই জগৎ, আশ্চর্য্য এই জীবন। সমস্ত প্রাণমন পুলকিত হয়ে ওঠে যখনি নিজের থেকে নিজের চেতনাকে সম্পূর্ণ বেগে বাইরে প্রসারিত করে দিই। সেই তোমার ক্ষুদ্র নিজেকে ভোলো, মুক্ত চৈতন্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত জগৎ তোমার কাছে আনন্দনিকেতনরূপে প্রকাশিত হোক্ এই আমি কামনা করি। ইতি ২৬ পৌষ [১৩২৪ ?]

৮

১৬ এপ্রিল ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শীঘ্র আমেরিকায় যাত্রা করচি। পৃথিবীর চারদিকে প্রলয় বহ্নি জ্বলে উঠেচে। ইতিহাস আবার নূতন করে গড়ে উঠ্‌বে— এই সময় আমারও কিছু কাজ আছে বলে মনে হয়— এখন ঘরের কোণে বসে থাক্‌তে পারলুম না। তুমি তোমার মনের কোণে কেন অন্ধকার সৃজন করে তার মধ্যে আবৃত হয়ে আছ? চিত্তকে আজ বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত কর। নিজের ব্যক্তিগত অবসাদের গ্লানি থেকে ছুটে বেরিয়ে এস— আজ সমস্ত মানুষের এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের দিনে নিজের কল্পনা বিজড়িত সমস্ত অনর্থকতার মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখার বিষম একটা লজ্জা আছে। কোনমতেই এই আত্মাবমাননাকে প্রশ্রয় দিয়োনা। নিজের জীবনকে বিশ্বের জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের সত্যস্বরূপ, নিজের বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি কর। ঈশ্বর তোমাকে তোমার আত্ম-গুহান্ধকারশায়ী ব্যর্থতার মোহাবরণ থেকে উদ্ধার করে বিশ্বের উদার আলোকে মুক্তি দান করুন এই আমি প্রার্থনা করি। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

খুব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে তোমার চিঠি আমার হাতে এল। তখন জবাবও দিতে পারলুমনা, চিঠি হারিয়েও ফেল্‌লুম। আজ ছুটির দিনে বাড়ি যাবার জন্যে বাক্স গোছাচ্চি এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। তখন ছিলুম কাজের ব্যবস্থায় ব্যস্ত, আজ আছি ছুটির আয়োজনে ব্যস্ত, তবু এরি মধ্যে তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে তোমার চিঠিখানি পড়ে আমি বড় খুসি হয়েচি— আর তোমার গানগুলিও আমার মনে লেগেচে। তুমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলে, মাঝি তোমাকে নৌকোয় তুলে নিয়েচেন, এখন নির্ভয়ে তুফান কাটিয়ে পারের মুখে চলে যেতে থাক। এখনো মাঝে মাঝে পালের হাওয়ার বদলে ঝড়ের হাওয়া বইবে কিন্তু তাতে ভয় কোরো না।

তোমার গানগুলি ছাপিয়ে ফেলো।

আমি এখন চল্লুম পাততাড়ি বাঁধতে। ৯ই আশ্বিন ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১১ নবেম্বর ১৯১৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

তুমি এখানেই এস— আমাদের বা কারো কোনও অসুবিধা হবেনা। এখন বিদ্যালয়েরও ছুটি আছে। আস্তে আস্তে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। কবে কখন আস্‌বে একটা খবর দিয়ো তাহলে স্টেশনে গাড়ি পাঠাব। রাত্রের গাড়িতে এসোনা। ইতি ২৫ কার্ত্তিক ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২০ নবেম্বর ১৯১৮

তোমার বড় মামার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েচি। আমি তাঁকে দুই একবার মাত্র দেখেচি কিন্তু সেই অল্প কালেই তাঁর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানীর সরলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম।

আবার এই মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে তোমার মন যেন দিশাহারা না হয়। এই পৃথিবীকে এবং পৃথিবীতে বিচিত্র প্রাণের প্রকাশকে তুমি সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসতে পার এই আমি কামনা করি। মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে

সংহরণ করে রেখো না, তাকে বিকীর্ণ করে দাও— তুমি যে আপনার ভারে আপনি পীড়িত সেই ভারটা কেটে যাক। ইতি ৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

১২

২৫ জুন ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি হলেম। আমি অনেকদিন থেকেই তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেম— উদ্বেগের কারণ ছিল এই যে, তোমার মন, তোমার শক্তি নিজেকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও উপযুক্ত উপায়ে প্রকাশ করবার পথ পাচ্ছিলনা। এইজন্যে ক্রমাগত নিজেকে নিজে আঘাত করছিল— সেই আত্মপীড়ন থেকে তুমি রক্ষা পাও এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। আমাদের কত যে দুঃখ কত যে দায়িত্ব তার সীমা নেই— অথচ আমরা কেবল দুঃখটাকেই বহন করে চলেছি দায়িত্বকে গ্রহণ করচি নে এইটেতেই আমরা কেবলি নেবে যাচ্চি। সকল বড় বড় দেশেই এমন সকল বীর আছে যারা দুর্গতিকে চরম বলে কিছুতেই স্বীকার করে না— যারা নিজের প্রাণ দিয়েও তাকে উপহাস করে। আমরা আলস্য ঔদাস্য বশত দুর্গতির সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে বসে আছি— এমন কি, তার পক্ষসমর্থন করে তার প্রশংসা করে তার বলবৃদ্ধি করচি। সেইজন্যে এতদিন আমি বড় দুঃখ পাচ্ছিলুম যে,

আমাদের দেশের যুবকেরাও এই ভীরুতা এই কপটতাকেও আত্মশ্লাঘায় পরিণত করে আস্ফালন করে বেড়াচ্চে। এতদিন এই নিয়ে কেবলি লড়াই করেছি এবং দেশের লোকের কাছ থেকে নিয়ত মার খেয়েচি। শেষ পর্য্যন্তই মার খেতে রাজি আছি কিন্তু মিথ্যা কথা বল্‌তে পারব না। যাই হোক আমার লেখাতে তোমার মন যে নিজের দিক থেকে সংসারের দিকে ফিরেচে— যে অস্ত্রে সে নিজেকে হনন করছিল সেই অস্ত্রকে মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েচে এতে আমি বড় আনন্দ পেয়েচি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি জয়ী হও, তুমি সার্থক হও এবং দুর্গমপথে তিনিই তোমার চিরসঙ্গী হোন্ যাঁর অভয় সিংহাসন মানুষের অমর আত্মায়। ১০ই আষাঢ় ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২৭ নবেম্বর ১৯১৯

তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম— তোমার কবিতাগুলি পড়েও আনন্দলাভ করেচি। এগুলি কিছু কিছু কাগজে ছাপতে দাও না কেন? বিশেষত গানগুলি।

শিলঙ থেকে ফিরে এসেচি। সেখানে বেশ ভালো ছিলুম। শরীরও সুস্থ হয়েছিল। স্থানটি রমণীয়। শান্তিনিকেতনে আমার বাসা বদল হয়েচে। এখন আছি মাঠের মধ্যে একা

—এ একটা নতুন দেশ বললেই হয়। বড় ইচ্ছা করে কিছু না করে চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকি। সে আমার ভাগ্যে এ যাত্রায় ঘটলো না। ছেলেবেলা থেকে কাজ ফাঁকি দেওয়াই আমার স্বভাব অথচ আমাকে যত কাজ করতে হয় এমন কোনো কর্ম্মনিষ্ঠ মানুষকে করতে হয় না। দিনের একটা উল্টো পিঠ যেটা রাত্রি— কাজের তেমনি একটা উল্টো পিঠ আছে— সেটা না থাকলে কাজটা যেন বিপত্নীক হয়ে পড়ে— অর্থাৎ নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া হয়। সেই কারণেই আমার কাজের জন্যে শ্রীমতী ছুটির সন্ধান মনে মনে সর্ব্বদাই করচি। অবশেষে যখন শ্রীমতী আসবেন তখন আমার কাজের আয়ু শেষ হয়ে আস্‌বে। সুতরাং কাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে তখন ছুটি হয়ে থাকবেন বিধবা— সেটাও দুর্গতি। ইতি ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

১৪
২৮ অগস্ট ১৯২০

ওঁ দক্ষিণ ফ্রান্স
Cap Martin,
Alpes Maritimes

কল্যাণীয়েষু

য়ুরোপে ঘুরে বেড়াচ্চি, অক্টোবরে আমেরিকায় পাড়ি দেব। Mary Pickford এর বিষয়ে Daily News এ আমার যে interview বেরিয়েছিল সে সম্বন্ধে Statesman, Englishman আমাকে গাল দিয়ে প্রবন্ধ লিখেচে তোমার

চিঠিতে জান্‌তে পারলুম। ভারতবর্ষ থেকে তোমরা একটা কথা ঠিক বুঝতে পার না যে ঐ সব কাগজের অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীর কাছে কতই অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষের মশার ডাক যেমন এখান থেকে একেবারেই শোনা যায় না ঐ সব কাগজের গুঞ্জনধ্বনিও তেমনি। মেরি পিক্‌ফোর্ড্‌ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিয়ে এখানকার লোকে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা করে নি, বরঞ্চ প্রশংসা করেছিল।

এখানকার যে সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তিলাভ করে। কেননা মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র— সেইখানে স্বার্থলোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়— সেইখানে মানুষ নিজের সুখদুঃখের, নিজের ভোগসম্ভোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে— সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখতে পারেনা, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবীকালবিহারী তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্ত্তমান, এইখানেই পদে পদে ক্ষয়, এইখানেই যত আঘাত যত নৈরাশ্য —এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়— কেননা মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রঃ" মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের

মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়— সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে। সেই হচ্চে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘরমাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই।

আধুনিক ভারতবর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পূরাপূরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চেনা, ঋণের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল স্বল্প সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়— আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতছি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবীকাল বাধাগ্রস্ত, এইজন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে পারচেনা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সকল পরিবার

থেকে এই সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম্ম করতে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বদ্ধ হয় তাহলে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "কালোঽয়ং নিরবধিঃ" আমাদের পক্ষে সত্য নয়, "বিপুলা চ পৃথ্বীঃ" সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা।

মানুষ যখন তার কীর্ত্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতেই পারে না, সে আপন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এই অভাব এবং দুঃখ দুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চলে যায়— পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষ্যাপরতায় সেই শ্রদ্ধাহীনতা মানুষের আত্মাবমাননাকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বারবার জানাতে হবে যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" আমরা দিব্যধামবাসী। কি করে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তন কালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে সেই ত আনন্দের সঙ্গে বর্ত্তমান কালকে ত্যাগ করতে পারে— এবং সেই চিরন্তন কালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে, অর্থ সংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহু লোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে, ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ কর্‌চে যে তার সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখেচি। যতই দেখ্‌চি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের সেই

আত্মদানের দ্বারা— ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈব চ। কোনো রিফর্ম্ বিল্ আমাদের দুঃখসমুদ্র পার করাতে পারবে না— আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না— ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর— মণ্টেগ্যু সাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

ইতি ২৮ অগষ্ট ১৯২০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

[অগস্ট ১৯২১]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। তুমি যদি বিশ্বভারতীতে এসে যোগ দাও তাহলে আমার বড় আনন্দ হবে। কলকাতায় ১৫ই অগষ্ট তারিখে আমার এক বক্তৃতা আছে সেই জন্যে যত না লিখচি তার বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। অতএব ইতি।

কবে আস্তে পারবে?

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

*২ সেপ্টেম্বর ১৯২১

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

তুমি এম্-এ দেবে বলে তোমার বিশ্বভারতীতে যোগ দেবার কোনো বাধাই হবেনা। বরঞ্চ এখানে তুমি যে-কোনো সুবিধা চাও তা পাবে।

দেশে ফিরে এসে অবধি আমার বিশ্রাম নেই। বক্তৃতার ধারা চলেচে। আজ কাল দুদিন সঙ্গীত সভা আছে। তাই যেমন ব্যস্ত তেমনি ক্লান্ত আছি। তুমি এ অঞ্চলে কবে আস্‌বে?

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

তুমি এলে এখানে যে জায়গা হবেনা তা নয়। তোমার যখন ইচ্ছা আসতে পার।

Wellsকে যে চিঠি লিখেচ পড়ে দেখ্‌লুম। বেশ হয়েচে। আমার ইচ্ছা আছে একসময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করব। সম্প্রতি আমাদের দেশের লোক বিদেশের লোকের প্রতি যে রকম

বিমুখ হয়ে আছে ঠিক এই সময়ে কারো এসে কোনো ফল হবে বলে মনে করি নে।

গান্ধি বলেন, পৃথিবীর লোক scienceএর নাম করে অনেক পাপ করচে। কিন্তু ধর্ম্মের নাম করে তার চেয়ে অনেক বেশি পাপ করে। আমাদের দেশে যে-untouchability নিয়ে তিনি কিছুদিন লড়েছিলেন সেও ত ধর্ম্মের উপরে টিঁকে আছে— আরো এমন হাজার হাজার পাপ আছে। সতীদাহও ত ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তাই বলে ধর্ম্মটাকে ত কেউ— অন্তত মহাত্মা— ঝাড়েমূলে উপ্‌ড়ে ফেলতে পরামর্শ দেন না। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
৩০ মার্চ ১৯২২

ওঁ [শিলাইদহ]

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তুমি যে-লেখাটির উপর অগ্নিবাণ বর্ষণ করেচ সে লেখা কোন এক কর্ম্মহীন মুহূর্ত্তে আমার চোখে পড়েছিল। মনে হয় নি এ লেখাটির জন্যে সমালোচনার স্মৃতিমন্দির রচনা করবার প্রয়োজন আছে। জগতে অনেক দুষ্কার্য্য ঘটে যা তার বিপুলত্ব ও প্রচণ্ডত্ব দ্বারা আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে দখল

দাবী করে— যেমন জালিয়ানবাগ। মহাত্মা এই ভীষণ অপকর্ম্মকে চিরস্মরণীয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তাতেও আপত্তি করেছিলুম। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে ক্ষুদ্র উৎপাতটি ঘটেচে তাতে সাহিত্যিক machine gun দাগা হয়েছে বটে কিন্তু যেহেতু তার gunত্ব নেই machineত্বই আছে, এই কারণে তাতে কোন শোকবহ অপঘাত ঘটে নি— সুতরাং এই জিনিষটিকে স্মরণীয় এবং শোচনীয় করে তোলবার কোনও গুরুতর কারণ দেখিনে। এ পর্য্যন্ত আমি অনেক মার খেয়েছি কিন্তু মরি নি অতএব এই মারগুলিতে আমার গৌরব বৃদ্ধি করেচে— বাংলা সাহিত্যে আমি অভিমন্যু, অথচ অভিমন্যুর শেষ দশা আমার ঘটে নি। অতএব সপ্তরথী-গুলিকে আমি সাদর অভিবাদন করে সজ্ঞানে বিদায় নিতে পারব। এই গেল আমার দিকের কথা। তোমার তরফে বলতে পারি তুমি জোর কলমের পরিচয় দিয়েছ বটে। জোর মানে গদাঘাত নয়। তোমার মারের মধ্যে সূক্ষ্মতা, ক্ষিপ্রতা এবং কলানৈপুণ্য আছে— তাই পড়ে খুসি হলুম। সাহিত্যে তোমার অজ্ঞাতবাসের পালা শেষ হয়েচে এবারে প্রকাশবান হও। অর্জ্জুনও গোড়ায় যখন তীর অভ্যাস করেছিলেন নিশ্চয়ই মাটির পুতুলের উপর শরবর্ষণ করে হাত পাকিয়ে-ছিলেন— এবার তুমিও মাটির পুতুলটিকে যে রকম নাস্তানাবুদ করেচ তাই দেখে আমি তোমাকে খেলার ক্ষেত্র থেকে রণক্ষেত্রে নামতে অনুরোধ করচি।

অনেকদিন পরে শিলাইদার মায়াজালে আত্মসমর্পণ করে

দিয়েছি। এর প্রথম ধাক্কাটা না কাটিয়ে গেলে কোনো কাজে হাত দেওয়া চলে না। দক্ষিণ হাওয়া যখন প্রথম বনভূমিতে প্রবেশ করেন তখন খানিকক্ষণ কেবল পুরানো পাতা ঝরাবার পালা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, বড় বড় বনস্পতি একেবারে ন্যাড়া হয়ে যায়— তার পরে একটু সবুর করতে পারলেই যবনিকার অন্তরাল থেকে নতুন পত্র পুষ্পের দল অরণ্যের রঙ্গভূমিতে নাট্যলীলা সুরু করে দেয়। সেই যবনিকা ওঠা পর্য্যন্ত আমার এখানে থাকা হবে বলে আশা করিনে। অতএব সম্প্রতি কেবল রিক্ততার আলস্যেই দিন কেটে যাবে। পটভূমিকার প্রলেপ হবে চিত্র আঁকার সময় হবে না। পয়লা বৈশাখের পূর্ব্বেই আমাকে ফিরতে হবে। ইতি ১৬ চৈত্র ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯
৬ এপ্রিল ১৯২২

ওঁ [শিলাইদহ]

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার কবিতাটি বেশ লাগল— কোনো মাসিকে পাঠিয়ে দিয়ো। আমার এখানকার পালা সাঙ্গ হল। পুরানো শিলাইদহে সবই তেমনি আছে— বাড়ির দক্ষিণদিকে সিসু-

বীথিকায় অবিশ্রাম মর্ম্মরধ্বনি চল্‌চে, পূবদিকের আমবাগানে দুই কোকিলে সমস্ত দিন কুহু ধ্বনির কবির লড়াই চলেইচে, চষামাঠের মাঝে মাঝে গ্রামগুলি অবগুণ্ঠিতা গ্রামবধূর মত বেণুবনের ছায়ায় ঢাকা দাঁড়িয়ে আছে, পুকুরপাড়ে দুটো একটা গোরু আলস্যমন্থর ভাবে চরে বেড়াচ্চে, বাগানের পাঁচিলের ধারে নারকেল আর সুপুরি গাছ ঠিক যেন শিশুর মত আকাশের দিকে কেবলি হাত নাড়চে,— আকাশের নীল স্তব্ধ আর পৃথিবীর সবুজ চঞ্চল, এই উভয়ের মধ্যে দিনরাত কেবলি রঙের ইসারা চল্‌চে, দিনগুলো খেলার নৌকোর মত কেবলমাত্র পাখীর গান, কনকচাঁপার গন্ধ, বেণুবনের মর্ম্মর আর আলোছায়ার ঝিকিমিকি বোঝাই হয়ে আকাশের পূবঘাট থেকে পশ্চিমঘাটে পারাপার করচে— সবই তেমনি আছে কেবল আমার চিরপরিচিত পদ্মা শিলাইদা ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেছে তার আর নাগাল পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এই বিচ্ছেদটি সামান্য নয়— যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই— সোনার নূপুরগুলি রয়েচে পড়ে, মুরজমুরলী মৃদঙ্গ কিছুরই অভাব নেই, কেবল যে পা দুখানি নিরন্তর নৃত্য করে বেড়াত তারাই গেছে কোথায় চলে। যেখান থেকে কিছুদিনের জন্যেও চলে যাই ঠিক সেখানটিতে কিছুতেই আর পৌঁছতে পারিনে— রেলের ষ্টেশন ঠিক আছে, রেলগাড়িও চল্‌চে কিন্তু আসল জায়গাটি লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যে সরে যায় তার ঠিকানা পাবার জো থাকেনা।

আজ সন্ধের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। তার পরে ছু চারদিন বাদেই তোমাদের ওখানে উপস্থিত হব। ইতি ২৩ চৈত্র ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০
২৫ মে ১৯২২

নানা প্রকার কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে আছি। তার সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়েমিরও যোগ আছে। লোকের কাছে এবং নিজের মনে মনে এইসব বাজে কাজের ব্যস্ততা নিয়ে নালিশ করে থাকি। কিন্তু যদি পরামর্শ নিয়ে কোনো ফল পাওয়া যেত তাহলে তোমাকে পরামর্শ দিতুম যে কোনোমতে একটা ঝঞ্ঝাট খুঁজে বের করে তার মাঝখানে ঢুকে পড়। বাছা'-জগৎ এবং বাজে জগৎ, জগতের এই ছুই ভাগ আছে। কিন্তু বাছা জগতে কাজ না করতেই সময় যায়— এটা পছন্দসই নয়, ওটা তুচ্ছ, সেটা মোটা, এই রকম বিচার করতেই দিন কাটে। বাজে জগতে বাছ বিচার নেই, যা-তা নিয়ে হুড়োহুড়ি ক'রে হু হু শব্দে সময় চলে যায়। সময়টা স্রোতের মত যদি মনের উপর দিয়ে খুব জোর্‌সে বয়ে যেতে পারে তাহলে মনের উপরে অবসাদ জম্‌তে পারে না। খুব ফুর্ত্তি করে বাজে জগৎটার সঙ্গে ষোলো আনা-বেগে কারবার করতে শেখ। জানি তখন থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠে বল্‌বে "আর ত পারা যায় না।"

কিন্তু এই রকম নালিশ করাটা মানুষের সুখেরই একটা অঙ্গ। এই বাজে জগৎটা জগতের পনেরো আনা অংশ। বাকি জগৎটাতে আর্টিষ্টের দল নির্ব্বাসিত। তারা মাঝে মাঝে তুলি চালায়, গান গায়, আর বাকি সময়টা হায় হায় করে, কি-জানি-কি খোঁজে আর তাদের এই এক-আনী জগতের বদ্ধ দরজায় মাথা ঠুকে মরতে থাকে। তোমাকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে— তাতে তুমি যে ঘষড়ানি পাবে তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালই হবে— মজবুৎ হয়ে উঠবে। আজ আর বেশি সময় নেই— অন্যদিন যখন সময় পাব তখন কুঁড়েমিতে পেয়ে বসবে সে আরো মুস্কিল— সেইজন্যে কাজের সমূহতার ভিতরেই ঠেলে-ঠুলে একটু ফাঁক করে নিয়ে তোমাকে এই কয় লাইন লিখে দিলুম। ক্ষিতীশ সেনের তর্জ্জমাটি আমার ভালই লাগল। ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

২১

[ফেব্রুয়ারি ১৯২৩]

কল্যাণীয়েষু

১৬ই তারিখে প্রাতে শান্তিনিকেতন থেকে যাত্রা করে বিকেলে কলকাতায় পৌঁছব— ১৭ই তারিখে সন্ধ্যার সময় কাশীধামে যাত্রা করব। ইতিমধ্যে দেখা কোরো। ১৬ই বিকেলের দিকে এসো।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১১ মে ১৯২৩

Jitbhumi
Shillong, Assam

তোমার চিঠি পড়ে বিস্মিত হলুম। তোমার উপরেও পুলিসের হস্তক্ষেপ হল? আমার গোরার গল্প মনে পড়চে। তোমাকে রাস্তা দিয়ে ওরা যে অপমান করে থানায় নিয়ে গেছে সেই অপমানের দৃশ্য আমি অনেকবার দেখেচি— সেই অপমান সকল মানুষেরই। এমনি ক'রে মানুষের ভিতরকার রিপু সমস্ত মানুষের পিঠেই দাগা দিয়ে দিচ্ছে। যতদিন এই রিপুর শাসন মানুষের মনে থাক্‌বে, ততক্ষণ আমাদের সকলকেই এই অপমান বহন করতে হবে। তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য হচ্চে গোড়া ঘেঁষে ঐ রিপুটাকে আক্রমণ করতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা নানা আকারেই আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ করে। ঘরে ঘরে তার প্রকাশ— সেই প্রকাশেরই ছোট ছোট ধারা সম্মিলিত হয়ে সমাজব্যাপারে রাষ্ট্রব্যাপারে আপিসে আদালতে নানা বড় আয়তনে বড় নাম নিয়ে মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করচে। মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, তিনি ক্লাসের মধ্যে এই রিপুটিকে বহন করে নিয়ে আসেন— বড় বড় ধর্ম্মোপদেশককে যদি চেন তবে চিন্‌বে মানুষের প্রতি তাদের গভীর অবজ্ঞা— তাই ধর্ম্মের নামে মানুষের প্রতি অত্যাচার এমন সর্ব্বনেশে মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই অবজ্ঞার অপমান তুমি যে প্রকাশ্যভাবে কিছু বহন করেচ

ভালই হয়েচে— যে দুঃখ অনেকেই পায় তার অংশ না নিলে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হয় না।

তুমি এবার শিলঙে এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটা লেখা শেষ করেচি। একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। তুমি কি ছুটিটা কলকাতাতেই কাটাবে? যদি আমার কোনো লেখা তর্জ্জমা করে দাও সেটাকে সংস্কার করে বিশ্বভারতী পত্রিকার কাজে লাগানো যেতে পারবে। তুমি যে আমারই বই আমাকে উপহার দিয়েছ এ তোমার নূতন পদ্ধতি। সম্পূর্ণ নূতন নয়। এর আগে য়ুরোপ থেকে একজন নিজের হাতে আমার কবিতার এক চয়ন কপি করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৩০

২৩

৪ জুলাই ১৯২৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বর্ষার মেঘ শান্তিনিকেতনের দিগন্তে নেমে এল তোমার দেখা নেই কেন? শীঘ্রই আসবে আশা করে তোমার দু'খানা চিঠির জবাব দিই নি। তার উপর একখানা নাটক লেখায় ও আর একখানা নাটক অভিনয় ব্যাপারে ঘোরতর ব্যস্ত ছিলুম। তার উপরে চিঠি লেখা সম্বন্ধে আমার

আলস্য প্রতিদিনই আমার প্রাপ্ত চিঠিপত্রের মতই আয়তনে বৃহৎ হয়ে উঠ্‌চে। আশ্রমে দুই একটি বিদেশী অতিথি আসচেন, তুমি থাকলে তাদের জন্যে ভাবতে হ'ত না। আমার নূতন নাটকটি পড়া হয়ে গেল। ক্ষিতীশের তর্জ্জমাগুলি বেশ হচ্চে। সমস্ত বলাকাটাই দেখচি একরকম হয়ে এল। যাই হোক ওখানকার জলসমুদ্রের ধার থেকে এখানকার মৃৎসমুদ্রের ধারে আসবার জন্যে একবার পাড়ি দেও দেখি। এই বর্ষার সময়ে পুরী কি ভালো? ইতি ১৯ আষাঢ় ১৩৩০

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪
৮ অগস্ট ১৯২৩

[কলিকাতা]

অভিনয়ের পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটিয়ে আসব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু যাতায়াতের উপদ্রব এড়াবার জন্যে এই কদিন এখানে রয়ে গেলুম। শরীরটা এখনো ক্লান্ত এবং মনটা অবসন্ন আছে, তাকে আর নাড়া দিতে ভালো লাগ্‌চে না। বাদলা কেটে গিয়ে আজ পরিষ্কার রোদ্দর উঠেচে। তেতালার ঘরে আমি একলা। আমার সেই সব ছেলেবেলাকার নির্জ্জন মধ্যাহ্ন মনে পড়চে। আবার একবার আমার সেদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ফিরে গিয়ে

কল্পলোকের রহস্যনিকেতনে তেমনি ক'রে পথ হারিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। তখন পৃথিবীর কোনো দায়িত্ব আমার উপর ছিল না— শুধু কেবল কবিতা লিখেচি— সে সব কবিতা জগতের লোকের কাছে জাহির করবার কোনো গরজ মনের মধ্যে ছিল না। হায়রে, সে দিনের মধ্যে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে গেচে— কেবলি জনতাবর্ত্তে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে হয়রান হলুম। তোমার সনেটগুলি বেশ ভাল লাগল। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০

২৫

[অগস্ট ? ১৯২৩]

ওঁ [কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

নাটকটার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেচ সেটি বেশ হয়েচে। কেবল ওর মধ্যে আপত্তির কথা আছে এই যে তুমি বলেচ এ নাটক বিশেষভাবে পশ্চিমের পক্ষে উপযোগী। সাহিত্যের পক্ষে ভৌগোলিক বিভাগ থাক্‌তে পারে না। স্বরচিত যন্ত্রের হাতে মানুষ পীড়িত হচ্চে এই তথ্যটি ন্যূনাধিক পরিমাণে সব দেশেরই— কিন্তু তথ্য পদার্থটিই ত সাহিত্য নয়। মানুষের বেদনা— তার কারণ যাই থাক্— যখন সাহিত্যের আকার ধারণ করে তখন তার আর দেশভেদ থাকে না।

রিহার্সালের জালে জড়িয়ে আছি। নিষ্কৃতি পেলেই শান্তিনিকেতনে দৌড় মারব। চীনে যাত্রা কিছুদিনের মত পিছিয়ে গেছে। অভিনয়ের সময় আস্‌বে ত?

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬
১১ অক্টোবর ১৯২৩

কল্যাণীয়েষু

ভিক্ষাবৃত্তির তাগিদে আরও দুই একদিন আমার যাওয়া পিছিয়ে গেল। আইডিয়ালের যে দিকটা বৈষয়িক সেদিক থেকে আমার মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তার একটা কারণ সে কাজে আমার লেশমাত্র দক্ষতা নেই বলে তা'তে পেট ভরে না দ্বিতীয় কারণ তাতে আমার জাতও যায়। ভিক্ষার ঝুলির ফাঁক অল্পই ভরে— তার শূন্যতার বোঝাটাই আমাকে প্রতিদিন জরাজীর্ণ করে তুল্‌চে।

আমি বোধ হয় শনিবারে আশ্রমে পৌঁছব। নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলচ্চি— তাতে তার রং ফুটচে বলেই বোধ হচ্চে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানে পড়ে' গেলে বুঝতে পারব কোথাও ওর ওজনের বেঠিক আছে কি না। এই নাটকটা ক্ষিতীশকে দিয়ে

তর্জ্জমা করিয়ে নিলে কি রকম হয়? ইতিমধ্যে তুমিও চেষ্টা ছেড় না।

"সমস্যা" বক্তৃতাটাকে বহুল পরিমাণে মেজে ঘষে জনসভায় একদিন পড়েছিলুম। অধিকাংশ লোক বল্‌চে কিছু বোঝা গেলনা— সেটা একেবারে বাজে কথা— আসলে, ওদের বুঝতে ভাল লাগ্‌চেনা। কেউ কেউ বলে আমার কথাগুলো কবির মত, শুন্‌তে ভাল, কাজে ভাল নয়। আর কিছুদিন পরে এই কথাগুলো সকলেই আওড়াবে— অম্লান বদনে বল্‌বে ওগুলো তাদেরই চিরদিনের নিজের ভাবা কথা।

Oath নেওয়া সম্বন্ধে আমার সম্মতি ছিল এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে তা আমি ভাবি নি। দিশি সত্যাগ্রহ, বিলিতি সত্যাগ্রহ, মহাত্মাজির সত্যাগ্রহ, Scoutmasterএর সত্যাগ্রহ সবই আমি বর্জ্জনীয় বলে জানি। সত্যকে প্রতিজ্ঞার বাঁধনে বেঁধে তার গৌরব নষ্ট করে' যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় কোনো দিন আমি তাদের দলে নই এই কথাটা মেয়েদের আমার হয়ে বুঝিয়ে বোলো। ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩০

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

[অক্টোবর ? ১৯২৩]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মেয়েরা যে oath নিতে রাজি হয়নি তাতে খুব খুসি হয়েচি। এই oath সম্বন্ধে আমার কি মত এণ্ড্রুজকে লিখেচি—তুমি তার কাছ থেকে সেটা কপি করে নিয়ে রেখো।

তোমার ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসে ছেলেমেয়ে কেউ যায় নি সেটাতে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের চিত্তশূন্য অহঙ্কার প্রকাশ পায়। এদেরই জন্যে আমি আমার রক্ত জল করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্চি, নিজের আসল কাজ মাটি করচি এই কথা মনে করে পরিতাপ হয়। আমার সমস্তই ঢেলে দিলুম অথচ এদের কিছুই দিতে পারলুম না—এদের দীনতা ঘোচাবে কে ?

শীঘ্র শান্তিনিকেতনে ফিরব তখন সেই কবিতাটা নিয়ে গিয়ে তোমাকে দেব।

অসিতের যে প্যারাগ্রাফগুলি তর্জ্জমা করেচ সেগুলি পড়তে বেশ হয়েচে—কিন্তু বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে ঠিক খাপ খাবে না।

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

[১৯২৪ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার শরীর অসুস্থ শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। নিশ্চয় জেনো তোমার শরীরে রোগের মূল নয়, তোমার কল্পনায়। তোমার অন্তরতম গভীরতায় যেখানে আরোগ্যের সহজ প্রস্রবণ আছে সেইখানে প্রত্যহ অন্তরকে নিবিষ্ট করে নিজেকে জানিয়ো যে তোমার কোনো রোগ নেই— বনের ফুল যেমন সুস্থ তুমি তেমনি সুস্থ। তোমার বাহিরের আবরণ তোমার আত্মাকে পীড়িত করবে কেন ? তোমার বিজয়ী আত্মা তোমার জীবনকে নিরাময় করুক জ্যোতির্ম্ময় করুক।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। তুমি সুস্থ হয়ে যখনি এখানে আসবে তখনি তোমার স্থান ফিরে পাবে। আমি মার্চ্চের মাঝামাঝি চীনে যাত্রা করব। ফিরে আসব সম্ভবত অক্টোবরে, তখন তোমাকে

যেন সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখতে পাই। তুমি এখানে অতিথিশালার দ্বারে বাস করতে— দূরদেশ থেকে আগন্তুকরা আসত— তুমি ছিলে সেই প্রবাসীদের বন্ধু— তুমি তাদের যত্নের ত্রুটি করনি, তারাও সকলে তোমাকে ভাল বেসেচে। শান্তিনিকেতনের যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে তার অতিথিশালা— তুমি জান আমরা বেদ থেকে যে বাক্যটি মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেচি: "যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ং"— শান্তিনিকেতনের সেই বিশ্বনীড়ে তুমিই অভ্যর্থনার ভার নিয়েছিলে। আবার যখন শীতের আরম্ভে অতিথিরা আসতে সুরু করবে তখন তোমার স্থান তুমি আবার গ্রহণ করতে পারবে এই প্রত্যাশা করে রইলুম।— প্রবাসীতে আমার কবিতা বোধ হয় এতদিনে পড়েচ। অনেককাল পরে বড় কবিতা লিখেচি। ইতি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০
২৮ অগস্ট ১৯২৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বঙ্গবাণী আজও পাইনি বলে' তথ্য ও সত্য বক্তৃতাটা পড়তে পারিনি। যা হোক তুমি যদি ওটা তর্জ্জমা করতে চাও ত রাজি আছি। আমি অভিনয়ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। কলকাতায় গেলে দেখা হবে। তুমি কি সমুদ্র পাড়ি দেবে বলে প্রস্তুত

হচ্চ? আমাদের জাহাজে জায়গা করেচ কি? ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩১

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১
২৮ মার্চ ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলি। এখন আমরা যাকে সায়ান্স্ বলি মানুষের মধ্যে চিরকালই তা আছে। এখন তাকে জীবনের অন্য অঙ্গ থেকে আমরা পৃথক করে বিশেষ নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। তার কারণ, বর্ত্তমান কালে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে খাটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে; এতে করে তার খুবই সুবিধা হচ্চে। তাই আজকাল এই সুবিধার চর্চ্চাটা মানুষের অন্য সমস্ত প্রয়াসের তুলনায় বড় হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মানুষ যখনি হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙেছে, লোহার শলা দিয়ে মাটি খুঁড়েচে, তাঁত বসিয়ে কাপড় বুনেছে তখনি সে সুবিধা-ঘটাবার বুদ্ধিকে জাগিয়েছে। তাতে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কখনো সে আপন হাতিয়ারকে নিয়ে গান গায় নি। তলোয়ার নিয়ে গেয়েছে, হাতিয়ার বলে নয়, তাতে বধ করবার সুবিধা হয়

বলে নয়— তার সঙ্গে বীরত্ব প্রকাশের প্রসঙ্গ আছে বলে’। এই বীরত্ব প্রকাশটার একটা চরমমূল্য আছে, কোনো একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র বলে’ নয়। এর থেকে বুঝতে হবে, মানুষের চেষ্টা যেখানে চরমকে, ultimateকে, স্পর্শ করেছে সেইখানেই তার গান জেগেছে। একটা সুন্দর ঘট ব্যবহারযোগ্যতার মূল্যে মূল্যবান নয়, সে অমূল্য বলেই মূল্যবান, সে সুষমার গৌরবে প্রয়োজনের দরদস্তুরকে পেরিয়ে গেছে। এইজন্যে Grecian Urnএর উপর কবিতা লেখা চলেছে কিন্তু Grecian হাতুড়ির উপর চলে নি। Efficiency যতই বিস্ময়জনক হোক্ কোনোদিন মানুষের মনে সুর জাগায় নি ; implements মানুষকে সম্পদশালী করেছে কিন্তু inspire করে নি। যেখানে কোনো উৎকর্ষ, perfection, আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, অর্থাৎ যেখানে সে অসীমে পৌঁছিয়েছে সেইখানেই সে মানুষকে কবি করেছে, রূপকার করেছে। প্রেয়সীর হাতের কাছে মানুষ সম্পূর্ণ হার মান্‌তে রাজি কিন্তু কারিগরের হাতিয়ারের কাছে নয়। আজকালকার দিনে সুবিধার বিশ্বজোড়া হাটে মানুষ বড় বড় হাতিয়ার সব তৈরি করচে, প্লেটোর আমলে এস্কিলসের আমলে তা ছিল না, সেই অভাববশত মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র খাটো ছিল না। বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারের যোগে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বড় ও সংখ্যায় বহুল হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ হয়েচে Giant, কিন্তু স্বয়ং মানুষ তাতে বড় হয় নি। মানুষের personalityর মহত্ত্বর চেয়ে তার সাংসারিক সুবিধাসাধনের সুযোগ বড় নয়। এইজন্যেই

কলকারখানা নিয়ে কোনো আধুনিক দান্তে *Vita Nuova* লিখ্‌চে না— কারণ ওতে নূতন থাকতে পারে কিন্তু Vita নেই। মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল সেদিন স্তবগান করে-ছিল; আগুনে তার রান্নার সুবিধা হয়েছিল বলে নয়, আগুনের নিজের মধ্যেই একটি চরম রহস্য আছে বলে। মানুষের কুড়ালের মধ্যে কোদালের মধ্যে সেই চরম রহস্য নেই। বিজ্ঞান যেখানে পরমাণুর পরমতত্ত্বের সাম্‌নে আমাদের বিস্মিত মনকে দাঁড় করায় সেখানে চরমকে দেখি— আমি সেই চরমের বন্দনা করেছি। কিন্তু বাষ্পের যোগে যেখানে রেলগাড়ি চলে, সেখানে cleverকে দেখি perfectকে দেখিনে, সেখানে Vulcanকে দেখি Apolloকে দেখিনে। সেখানে কারখানাঘরে প্রবেশ করি, সৃষ্টির রহস্যমন্দিরে নয়। সেখানে কুশ্রীতার লজ্জা নেই, সেখানে অসম্পূর্ণতা নগ্ন। সেখানে মাংসপেশি ফুলে উঠেছে কিন্তু লাবণ্য কোথায়? সেখানে স্থূলকে দেখি অনির্ব্বচনীয়কে দেখিনে ত। তাই বাহবা দিই, কিন্তু সে বাহবায় ছন্দ আসেনা। আজকের কালের বিরাট কারখানাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জগৎসুদ্ধ লোক ভয়ে বিস্ময়ে লোভে সমস্বরে বাহবা দিল, কিন্তু জানু নত হল না, প্রণাম করলে না, কেননা এ তো মন্দির নয়। পুরাতন দেবমন্দির মানুষ ভেঙে দিচ্চে, কিন্তু নূতন দেবমন্দির এখনো তো গড়া হ'ল না, তাই বলেই কি পূজার অর্ঘ্য নিয়ে যেতে হবে তার হাটের আড়ৎ ঘরে? ইতি ২৮ মার্চ্চ ১৯২৫

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

[১৯২৫]

কল্যাণীয়েষু

শুনচি বৃষ্টির চিহ্ন নেই। আমার দ্বারের কাছে যে গাছপালাগুলি অতিথি আছে তাদের অন্নজলের একান্ত অনটন যেন না ঘটে। তোমার নিজের অবস্থা কি রকম?

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

১৮ নবেম্বর ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

বহুকাল তোমার কোনো খবর না পেয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলুম। চিঠি পেয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু বুঝচি তোমার শরীর তেমন ভালো নেই। মাঝে মাঝে খবর দিয়ো।

আমার শরীরের অবস্থা ভাঙন্ ধরা— আমার বয়সের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে। অনেকদিন ধরে খুব পূরো দমে দেহযন্ত্রটা চালিয়ে এসেছি, আজ তার স্ক্রু আলগা হয়ে গেছে। আমার দমও বেশি বাকি নেই। অতএব দেহটাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন চাকা খড়্‌খড়্ ঝনঝন করতে করতে আরো কিছু দিন চল্‌বে। কিন্তু ঝাঁকানির চোটে অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

এদিকে কাঁধের উপরে এক মস্ত দায় চেপেছে— সর্ব্ব-ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে বসেছি কতকটা আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেনের গতিক। ইংরেজিতে একখানা বক্তৃতা লিখ্‌তে বসেছি— যতক্ষণ সভায় পড়া না হবে সেই বিলিতী ভূতটার পিণ্ডদান শেষ হবে না, মগজের মধ্যে তার উৎপাত চল্‌তে থাকবে। এ সমস্তর উপরে সম্পাদক-বর্গের দাবী বহুধা হয়ে আমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে।

কাল পালাচ্চি শান্তিনিকেতনে। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩২

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

ওঁ আগরতলা

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। এতদিন তোমার জন্যে মন উদ্বিগ্ন ছিল। মহাকালের হাতে তোমার শুশ্রূষা চল্‌চে, তাঁরই ভাণ্ডারে আরোগ্যের অমৃত আছে।

আমি নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে আছি। এখানে এসে কতকটা বিশ্রাম ভোগ করতে পারচি। বসন্তে এখানে বনশ্রী যৌবনে প্রফুল্ল হয়ে উঠেচে— আমার ঘরের বাতায়নের কোণটি থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছি।

আগামী রবি কিম্বা সোমবারে কলকাতায় পৌঁছব। ইতি
১২ ফাল্গুন ১৩৩২

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

৩০ জুন ১৯২৬

ওঁ

Villeneuve

কল্যাণীয়েষু

··· ইটালীতে খুব হট্টগোলের মধ্যে কেটেচে। এখন এতটা আমার সহ্য হয় না। তাই ট্যুরিনে আবার আমার বুকের অসুখটা বেড়ে উঠেছিল। এখানে এসে ভাল আছি।

ভারি সুন্দর জায়গা। লোকের ভিড়ও নেই। রোমাঁ রলাঁ আমাদের প্রতিবেশী। রোজই তাঁর সঙ্গে দেখা ও আলাপ আলোচনা চলচে।

চিঠি লিখতে ভারি একটা বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সব সুদ্ধ ভয়ঙ্কর একটা কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেছে। অথচ কাজ যথেষ্ট করতে হচ্চে। যারা স্বভাবতই কুঁড়ে তাদেরই অস্বাভাবিক রকম খাটতে হয়, পৃথিবীর এই নিয়ম। যারা কাজের লোক তাদের জন্যে দশটা চারটে, আর যারা অকাজের তাদের জন্যে ঘণ্টা গণনা আর চলে না।···

আজ রাত হল অনেক, শরীর ক্লান্ত, ঘুম পাচ্চে। ইতি
৩০ জুন ১৯২৬

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬
১৯২৬

ওঁ

অমিয়,

এইরকম দুটো লাইন যোগ করলে কী রকম হয়?

হে উদার, কর সবার অহঙ্কার মুক্ত,
স্মরণে তব চরণে হ'ব ত্যাগ-যোগযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭
৩১ মার্চ ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

কবিতাটিতে পাঠান্তর হবে। আছে—

"আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে,
তব নীল লাবণ্যের বাঁশিখানি দূর হ'তে বাজে।"

কিন্তু হবে—

“আমি আজ কোথা আছি প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে,
তব নীল লাবণ্যের বংশিধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।”

ইতি

ভরতপুর, ১৭ চৈত্র [১৩৩৩]
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

১ জুন ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যদি এমন কোনো পুরোনো চিঠি পাও যা প্রকাশযোগ্য, তাহলে প্রবাসীতে পাঠিয়ো। বিচিত্রায় ভানুসিংহের পত্রাবলী যাচ্চে— আর বেশি ভালো নয়।

গল্পটা অল্প অল্প করে লিখচি। কি রকম হচ্চে জানিনে। পূর্ব্বেকার স্টাইল থেকে তফাৎ হবে মনে হচ্চে। বিষয়টা কঠিন।

কখনো কখনো সময়ের একটু আধটু ফাটল দিয়ে বুনো-লতার মতো দুই একটা কবিতাও বেরোচ্চে। তারি একটা তোমাকে পাঠাই। একজন মেয়ে লিখ্‌তে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে পাঠিয়েছি।

তোমার খাওয়াদাওয়া আশা করি ঠিকমতো চল্‌চে। শরীর ভালো আছে তো। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পাচ্চ বোধ হয়।

যে বইগুলো বিদেশ থেকে আসে না পাঠালে চিঠির জবাব দিতে পারিনে। ইতি ১৮ জ্যৈঃ ১৩৩৪

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখন

“দাও লেখা দাও” দেয় কতজন তাড়া,
চারদিকে চাই, না পাই বাণীর সাড়া।
চায় তা’রা যেই, সংশয়ে সেই ধরে—
“এ নয় যে-জন লেখন-সৃজন করে,”
লক্ষ্মী-ছাড়ার মিথ্যে দুয়ার নাড়া॥

চাবার মানুষ চায় না যখন কেহ—
“তীখন্ কথার লিখন-ভিখন দেহ”—
হাটের পথিক নাই যবে কেউ বাকি,
একলাটি গায় বউ-কথা-কও পাখী,
হরিণ-শিশুর নাই মনে সন্দেহ,—

ক্লান্ত সমীর শান্ত কোমল শ্বাসে
অস্ফুট সুর লাগায় যখন ঘাসে,
তখন হঠাৎ আল্‌গা দুয়ার খোলা,
স্বপন-মগন-নয়ন, আপন-ভোলা
লেখক যে-জন বাহির ভুবনে আসে॥

১১।৪

যখন-তখন লুকিয়ে তাহার আসা,
প্রদোষ আলোয় পথ-হারা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
নাই জানা কোন্ শাখায় সে ফুল তোলে,
চক্ষে তাহার কোন্ ইসারার ভাষা॥

বৈশাখী ঝড় যখন আঘাত হানে
সন্ধ্যা-সোনার ভাণ্ডারদ্বারপানে,
মেঘের উপর দারুণ তাহার দাবী,
কুণ্ঠিত মেঘ লুকায় সোনার চাবী,
গগন আপন অবগুণ্ঠন টানে॥

তারপরে যেই শিউলি-ফুলের বাসে
শরৎ-লক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দ-কলির স্নিগ্ধ শীতল কথা,
আকাশ সে কোন্ স্বপন-আভায় হাসে,

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ ক্ষেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোক ছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে,—

হঠাৎ তখন সূর্য্য-ডোবার কালে
দীপ্তি জাগায় দিক্‌ললনার ভালে,
    মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দ্দা আঁধার কালো,
    কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,—
পরম আশার চরম প্রদীপ জ্বালে॥

১৮ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

৪ জুন ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

আমি আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কলকাতায় যাব। জাভা যাওয়া স্থির। ১৬ই জুন জাহাজ মাদ্রাজ থেকে ছাড়বে। অতএব আর চিঠিপত্র এখানে পাঠিয়োনা। সেই যে-লেকচারগুলো ম্যাকমিলানরা ফিরে পাঠিয়েচে জাভায় দরকার হবে। যদি শান্তিনিকেতনে না যাই তাহলে সেগুলো নিয়ে কলকাতায় এসো। যথাসময়ে খবর পাবে। আমি বোধ হয় ১০ই কলকাতায় পৌঁছব। গল্প ধীরে ধীরে চলবে—আমার যত বয়স ততগুলো পাতা এগিয়েচে। ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

*৮ জুন ১৯২৭ [শিলং]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শুক্রবারে কলকাতায় পৌঁছব। তুমি রাণুর চিঠির খাতা ও আমার সেই Lecturesগুলো নিয়ে কলকাতায় চলে এসো। সময় নেই। ২।৩ দিনের মধ্যেই জাভায় রওনা হব— শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সময় পাবো না। ইতি বুধবার

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

১২ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ ইপো

কল্যাণীয়েষু

এবারে দেশ থেকে বেরিয়ে অবধি পরিশ্রমের আর অন্ত নেই। জাহাজে ছিলেম দিনছয়েক— সমুদ্র খুব শান্ত ছিল— মনসুন ঠেলা মেরে তাকে জাগিয়ে তোলে নি। জাহাজওয়ালারা আমাকে লেখবার পড়বার জন্যে খুব ভালো ঘর দিয়েছিল। রাণীকে চিঠি লেখবার উপলক্ষ্য করে কিছু লিখেছিলুম— ভেবেছিলুম চিঠির রাস্তা ধরলে কলম তুল্‌কি চালে চল্‌বে— কিন্তু যে বাণী অন্তর্যামিনী তাকে ফাঁকি দিয়ে ভোলানো যায় না— তার কাছে যেই ধরা পড়ল চিঠি যাচ্চে

সম্পাদকের দরবারে, তার বাহন রাণী, অমনি কলমের মুখে কাঁঠালিচাঁপা হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল এক একটা কাঁঠাল, অত্যন্ত সারবান, অত্যন্ত ভারবান— যাকে বলে প্রবন্ধ,— সে হাওয়ায় দোলেনা, মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে··· সেই আলাপ আলোচনার সংস্কার সাধনে লাগ্‌তে হল— এই কাজটা বড়ো দুঃখের। এ যেন পুরোনো কাপড় রিফু করবার সরঞ্জাম নিয়ে নতুন কাপড় বুনে যাওয়ার মতো।··· প্রতিলেখন পড়তে পড়তে দেখা গেল যে, মানুষ শুধু কান দিয়ে শোনে না; কথা তার "কানের ভিতর দিয়া মরমে" পশে। তার কানে-শোনা কথাগুলো মরমের হাতে পড়ে যে মূর্ত্তি ধরে তাকে বক্তার নামে চালাবে না শ্রোতার নামে? সেটা ব্যক্তিবিশেষের মরমের উপর নির্ভর করে। কারো কারো মরম অন্যের কথা শোনবার সময় নিজের কথা থামিয়ে দিতে পারে না, অর্থাৎ একজন যখন এক সুরে বীণা বাজাচ্চে তখন আর একজন আর এক সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলে— যেন ধনীর বাড়ির বিয়েতে শানাই আর গড়ের বাত্তি একই সময়ে আওয়াজ দিতে থাকে।··· জীবনে যা বৃষ্টি আকারে বর্ষণ হয় তাকে শিলবৃষ্টি আকারে প্রকাশ করলে সেটা অসত্য হয়ে ওঠে এ কথা বোঝা উচিত। সব কথা প্রকাশ করবার নয় কেননা সব কথা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভূমিকা নেই— বৈঠকখানার বিশ্রব্ধ আলাপ চিৎপুর রোডের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে মেগাফোনে ঘোষণা করলে তার সত্যতা থাকে না। তা ছাড়া এই যে প্রকাশ করবার নেশা এটা সকল অবস্থায় শোভন নয়— হৃদয়হীন পাব্লিকের

কৌতূহল মেটাবার জন্যে দরদ-ওয়ালা কথার ফেরি করা অন্যায়— এতে ইতিহাস রক্ষাও হয় না, কেননা নির্বিচারে সবরকম কথাকে একত্র পুঞ্জীভূত করাকে ইতিহাস বলে না— মুহূর্ত্তের জিনিষকে চিরদিনের আসনে বসালে ইতিহাসকে নষ্ট করাই হয়।···

এই তো গেল লেখার হাঙ্গামা। তারপর, আদর অভ্যর্থনা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বক্তৃতা মোটর যাত্রা রেলযাত্রা প্রভৃতিতে অতিমাত্রায় ঠাসা হয়ে আমার দিনগুলো নানা আকারে ফুলে উঠেচে— ঠিক যেন আমাদের সুনীতির ঝুলিটার মতো— তার মধ্যে ময়লা কাপড় থেকে আরম্ভ করে পিতলের তৈজসপত্র পর্য্যন্ত সকল প্রকার অসঙ্গত জিনিষের সঙ্গতি— বাহকেরা যখন বহন করে, দেখি, তাদের পিঠ বেঁকে যায়। আমারো পিঠ বেঁকে এসেচে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয়, আর পেরে উঠ্‌চিনে। আমার দিনের ঝুলি সুনীতির ঝুলির মতোই প্রত্যহ তার বোঝাই বাড়িয়েই চলেচে— এখন কেবলি মনে হচ্চে আর ওটাকে টেনে বেড়ানো চলেনা। আশার কথা এই যে এখানকার পথের প্রায় প্রান্তে এসেচি। আজ ১২ই তারিখ— ১৬ই তারিখে জাভার মুখে পাড়ি দেব। তখন আর একটা ঝুলি ভর্ত্তি করা সুরু হবে।

শান্তিনিকেতনের শ্রাবণীমূর্ত্তির আভাস তোমার চিঠিতে পেয়ে ক্ষণকালের জন্যে মনটা ব্যাকুল হোলো। আমাদের সাম্‌নে এখনো অন্তত দুটো মাস আছে। অর্থাৎ আশ্রমে যখন শিউলিফুলের দিন ফুরিয়ে আস্‌বে তখন সেখানে ফিরব।

বিচিত্রায় সাহিত্যধর্ম্মে দুই একটা ভুল দেখলুম— এক-জায়গায় "রাজপুত্র" হবে সেখানে "রাজকন্যা" হয়েচে— সংসারে উভয়ের মধ্যে মিলন হয়ে থাকে, তাই বলে পার্থক্য লুপ্ত হয় না। আর এক জায়গায় "পাপড়ি" আছে সেখানে "পাখ্না" হবে।

তিন সপ্তাহ হয়ে গেল এ পর্য্যন্ত তোমার চিঠি ছাড়া আর কোনো চিঠি পাই নি— তোমাদের সব খবর জানতে চাই— মনে হচ্চে যেন দ্বীপান্তরে এক যুগ হয়ে গেল। ইতি ১২ অগস্ট ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২
২৩ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চিঠি লেখার সময় পাই নে। গোলমালে দিন কাটচে। দেশটা সুন্দর। আজ বালি অভিমুখে যাচ্চি— সেখানে আরো সুন্দর। দেশে ফেরবার পূর্ব্বে বিস্তারিত খবর কিছুই পাবে না। তোমাদেরও খবর বিশেষ কিছু পাই নে। স্রোতের শেওলার মত ভাসচি। কোথাও কোনো মাটির সঙ্গে যোগ আছে মনে হ'চ্চে না। ২৩শে অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আজ বালিদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি। এটা বালির পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে। পশ্চিম অংশে এতদিন ঘুরেছি— সমস্তই চাষ-করা বাস-করা জায়গা,— লোকালয়গুলি নারকেল সুপারি আম তেঁতুল সজনে গাছের ঘনশ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এতদিন পরে এখানে পাহাড়ের গা-জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলঙ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের ক্ষেত, পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ। এখানকার পুরনো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়, যে ভাষা খুব ভালো করে জানি নে যেন সেই রকম তার জ্যোৎস্নাটি। সে ভাষা ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে কানে আসে, ষোলো আনা প্রাণে এসে পৌঁছয় না।

এতদিন এ দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহূত রবাহূত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফ-ওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক পরিব্রাজকের দল।

পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধূলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া-জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে ফিরবে, তাই প্রতিবর্ত্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথ বিপথ দিয়ে চঞ্চল হয়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পার।

বালির লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্ম্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা যথানিয়মে মৃতের সংকার হলে তার আত্মা কুয়াশা হয়ে পৃথিবীতে এসে পুনর্জ্জন্ম নেয়, তারপরে বারে বারে সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তার উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন ব'লে আত্মীয়েরা স্থির করেছে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয় নি, আর কখনো হবে কিনা সকলে সন্দেহ করচে। কেননা, আধুনিক কাল তার কাটারি হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্চে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব্ব করবার জন্যে, তার একমাত্র উৎসাহ উপকরণ-বাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে বল্‌চে, সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকায় প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি বলেই ঠেকচে। আমাদের দেশের বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হচ্চে, আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা করবার জন্যে নয় যেমন পুণ্য করবার জন্যে। তার প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত

আত্মার কল্যাণকামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য্য দান যে নেই তা নয়, কিন্তু এর সবচেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা, সে সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট করে ফেল্‌তে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই, সেটা সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্ত্তি, তার পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন বহন করে নিয়ে যায়, তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম, অর্থাৎ যে-ধর্ম্ম বাইরে থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হল জিত, দেহ হল ছাই।

উবুদ ব'লে জায়গার রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব'লে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এদেশে পুনর্ব্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল অতএব এই অনুষ্ঠানে তিনি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে রাজা তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে "মধুবাতা ঋতায়ন্তে" এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ ক'রে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন বেদমন্ত্রগানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, বহুশত বৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হ'ল। মাঝখানে কত বিস্মৃতি, কত বিকৃতি। রাজা

সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্যে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীতি বলেছিলেন, এই কাজের জন্যে অর্থগ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম্ম-অন্তে বালির তৈরি মহার্ঘ্য বস্ত্র ও আসন দান করেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন কারো যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্ত্তমান তা হলে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হলে এর আর সংকার হবার জো নেই। এইজন্যে বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

সংকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরো একটা কারণ, সংকারের উপকরণ ও ব্যয়বাহুল্য। তার জন্যে প্রস্তুত হতে দেরি হয়ে যায়। তাই শুনেচি, এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখী যেমন ময়ূরের মূর্ত্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ; তার দুই ধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর করে তৈরি। শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত হতে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। যেটা সবচেয়ে দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ

করে সে হচ্চে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহু দূর ও নানা দিক থেকে মেয়েরা মাথায় কত রকমের অর্ঘ্য বহন ক'রে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেচে। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য মাথায় বাহকেরা যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান বাজিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উৎসব চল্‌চে। সর্ব্বসাধারণে মিলে দলে-দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা করে দিচ্চে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন করে আনা নয়, সমস্ত বহু যত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম, ইয়াং-ইয়াং ব'লে এক শহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা, কি শোভা, কি সজ্জা, কি আভিজাত্যের বিনয়সৌন্দর্য্য! এমনি করে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণ বিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয়, এইরকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কি কল্যাণময়। এই মিলন কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে, নানা ঘরে, এই উৎসবমূর্ত্তিকে অনেক দিন থেকে নানা মানুষে বসে বসে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ করে তুলেচে। এ হচ্চে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি, যেমন করে এরা নানা লোক বসে নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে সুর মিলিয়ে একটা সচল ধ্বনিমূর্ত্তি তৈরি করে তুল্‌তে থাকে। কোথাও অনাদর

নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয় নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্য্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি; তিনি রেলগাড়িতে চড়ে বেড়ান না, টেলিগ্রামের ডাণ্ডাটার উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন না। সুন্দরের সঙ্গে কল্যাণ যেখানে এক, সেইখানেই তিনি। যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্যে পুলিসবিভাগের লাল পাগ্‌ড়ি সেখানে নয়, যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল যে নিরাময় নিরাপদ তা নয়, আপ্‌না-আপ্‌নি ভিতরের থেকে সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ,— সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিষটিকে এমনিই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা করি নিজের দেশে। কিন্তু এই ছোটো দ্বীপের রাস্তার ধারে যে ব্যাপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা! কত কালের সাধনায় ভিতরের কত গ্রন্থি-মোচন করে তবে এইটুকু জিনিষ সহজ হয়। জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত, সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সুন্দর করে তোলা কতই শক্তিসাধ্য। আমরা যেখানেই যে কোনো কাজেই কয়েকজন মিল্‌তে চেষ্টা করেচি সেখানে কত ঔদাসীন্য, কত অহমিকা, কত বিরোধ ভেতর থেকে নানা মূর্ত্তিতে বেরিয়ে পড়তে থাকে। এইসব গ্লানি দূর করবার জন্যে আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে

নানা মূর্ত্তিতে নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন আপন ইচ্ছার আপন আপন শক্তির যোগদান করতে থাক্‌লে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়,— ঝরনার জল ক্রমাগত বইতে থাক্‌লে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হয়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন, সাধনায় জ্ঞান ও কর্ম্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েচেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনি প্রাণ আসে, তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্য্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আটটা বাজ্‌ল। বারান্দার সাম্‌নে গোটা দুই তিন মোটরগাড়ি জমা হয়েচে। সুরেনে সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই করচেন। তাঁরা একদল আগে থাকতেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘনসবুজ অরণ্যের পরে রৌদ্র পড়েচে, দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিঃশ্বাসের ভাপ লাগা আয়নার মতো ম্লান। ঐ কাছেই গিরিবক্ষ-সংলগ্ন পল্লীটির বনবেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুল্‌চে। ঝরনা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল বয়ে আনচে। নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে সাম্‌নের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের

অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেলগাছগুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধরে সূর্য্যালোক পান করচে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত্তে মনে মনে ভাবচি দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পেঁীচচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েচি বলেই যে এমন হয় তা নয়,—ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে নদীতে প্রান্তরে প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেচি, চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেচে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্ত্তি চার দিকে— তবু সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদিকালের যে কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আশ্বাস পাই। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা যত বেশি এমন আর কোথাও দেখি নি তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। অতি দূরকালের তপোবনের ওঙ্কার ধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিস্বসিত। তাই আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত করে রয়েচে। ইতি ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ। দ্রুত চল্‌তে চল্‌তে উপরে উপরে যে ছবি চোখে জাগ্‌ল, যে ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল তাই লিখে দিয়েছি, কিন্তু তাই বলে এটাকে বালির প্রকৃত বিবরণ বলে গণ্য করা চল্‌বে না। এই ছবিটিকে হয়তো আবরণ বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে তো। অতএব আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় বলে উপেক্ষা করা যায় না। যে আবরণটিকে কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো উপর থেকে চাপা দেওয়া হয় সেইটেতেই প্রতারণা করে,— কিন্তু যে আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের ওঠায় পড়ায় বাঁকায় চোরায় দোলায় কাঁপনে আপ্‌না আপ্‌নি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে বেশে ভূষায় উৎসবে অনুষ্ঠানে সব প্রথমেই যেটা খুব করে মনে আসে সেটা হচ্চে সমস্ত জাতটার মনে শিল্পরচনার স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিস্ট এখানে তিন বছর আছেন, তিনি বলেন এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেচে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটা আপনি ক্ষয়ে আসচে, বালির চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে বসেচে। তার কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে যে, আধুনিক যে দুই একটি মূর্ত্তি তিনি দেখেছেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্প প্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চম্‌কে উঠ্‌বে এই

তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেল রূপ উদ্‌ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তার পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্ত্তি দিচ্চে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিষ আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে মেয়ে বন্ধ্যা প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয় এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে, এক পুত্র এক কন্যা, তাহলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন করে সে শ্মশানে যায়, পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন পিছন বহন করে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনোরকম করে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধরে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চ্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়, সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকল রকম ব্যবহার বন্ধ। এই সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করচে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে করে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা

মানুষকে বাঁচায়, যেখানে তার চর্চ্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে? তবুও এইগুলোকেই প্রধান করে দেখবার নয়। জ্যোতির্ব্বিদের কাছে সূর্য্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তার আলোটাই যথেষ্ট। সূর্য্যকে কলঙ্কী বল্‌লে মিথ্যে বলা হয় না তবুও সূর্য্যকে জ্যোতির্ম্ময় বল্‌লেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ্দ লম্বা করা যে সব বৈজ্ঞানিকের কাজ, তাঁরা পশুসংসারে হিংস্র দাঁত নখের ভীষণতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয় পশুদের জীবনযাত্রা কেবল ভয়েরই বাহন। কিন্তু এই সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হচ্ছে সেই প্রাণ যা আপনার সদাসক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও চেষ্টা, সেও এই আনন্দিত প্রাণক্রিয়ারই অংশ। Inter-Ocean নামক যে মাসিকপত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালির মেয়েদের দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল সেই কাগজেই আর একজন লেখক সেখানকার শিল্পকুশল, উৎসববিলাসী, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায় গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হলেও সত্য নয়। এই দ্বীপে আমরা অনেক ঘুরেচি, গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দিরদ্বারে উৎসবভূমিতে ঝরনাতলায় বালির মেয়েদের অনেক দেখেচি, সব জায়গাতেই তাদের দেখ্‌লুম সুস্থ সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন— তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো

চেহারা তো দেখলুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে— কিন্তু খুঁটিয়ে-পাওয়া ময়লা কথাগুলো সুতো দিয়ে একসঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে এ কথা বিশ্বাস করবার নয়। ইতি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সুরবায়া, জাভা।

৪৪

১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, অমিয়, এই কবিতাটি এতদিন অন্য কোনো সূত্রে দেখে থাকবে, তবু তোমাকে পাঠালুম।

আজ বিকালে আমার বক্তৃতা আছে। কাল সকালে অন্যত্র যেতে হবে। দেখবার জিনিষের অন্ত নেই কিন্তু এমন করে ঘুরে বেড়াবার শক্তি আমার কই। শুধু দেহ নয়, মন ক্লান্ত হয়ে যায়— কেননা আমার মন আপনাতে নিবিষ্ট হয়ে ভাবতে ভালোবাসে। যে পাখী ডিমে তা দিতে চায় বাইরে থেকে তাকে কেবলি তাড়া দিতে থাকলে তার যে দশা হয় আমার মনের সেই দশা।

চিঠিতে নানা বকুনি বকেচি,— সেগুলো পত্রযোগে দেশে পাঠানো হয়েচে। মালয় উপদ্বীপে বাইরে দৃষ্টি দেবার যোগ্য কোনো প্রলোভন না থাকায় আপন মনের এই সকল যা’-তা’-বহুল কথাগুলো জমে উঠ্‌ছিল। এখানে তার জো নেই— বাইরের জগৎ সর্ব্বদা ডাক পাড়চে।

অক্টোবরের শেষ অংশে দেশে পৌঁছব বলে আশা করি। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হয়ে এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হয়েচে। রামায়ণ মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কি রকম প্রাণবান হয়ে রয়েচে সে কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। প্রাণবান বলেই এ জিনিষটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হয়ে গেচে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেচে। সংসারের কর্ত্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায় নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্ত্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই সব চরিত্রে। এই জন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেকরকম বদল হয়েচে। কালে কালে বাঙালী গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েচে এও তেমনি। কাল আমরা যে ছায়াভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলেম তার গল্পাংশটা টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল। সেটা পাঠিয়ে দিচ্চি, পড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জ্জমা করে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে "কেন্‌বর্দ্দি" নাম গ্রহণ করেচে। কীচক এ'কে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাবানি মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা এ'কে বধ করে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

আমি মঙ্কুনগরো উপাধিধারী যে রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখ্‌চি চারদিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্ম্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীর বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন করে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূবিবরণের গিরিনদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যেই গ্রহণ করেচেন। বস্তুত সেটাতে কোনো অপরাধ নেই কেননা রামায়ণ মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্ত্তিতে এঁদের দেশেই বিচরণ করচেন, আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্ব্বজনব্যাপী পরিচয় নেই— সেখানে ক্রিয়াকর্ম্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন করে বিরাজ করেন না। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ রাত্রে রাজসভায় জাবানি শ্রোতাদের কাছে আমার কথা ও কাহিনী থেকে কয়েকটি গল্প আবৃত্তি করে শোনাব। একজন জাবানি সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জ্জমা করে ব্যাখ্যা করবেন। কাল সুনীতি ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। আজ আবার তাঁকে সেইটে বল্‌তে রাজা অনুরোধ করেচেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জানতে এঁদের বিশেষ আগ্রহ।

৪৬

২ অক্টোবর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অক্টোবর সুরু হল— বোধ হচ্চে এখন তোমাদের পূজোর ছুটি। আন্দাজ করচি তুমি আশ্রমেই আছ। শরৎকালের আয়োজন তোমাকে টেনে রাখ্‌বে। পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেচে যে ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই। ভ্রমণ জিনিষটা উঞ্ছবৃত্তির মত, একটু একটু করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলা। নিজের ভরা ক্ষেত থেকে সেই আঁটি বাধা ফসলের জন্যে মনটা কেবলি হায় হায় করে। যাক্‌গে, নির্ব্বাসনের শেষ মাসটিতে এসে পৌঁচেছি— খুব জোরের সঙ্গে আশা করচি এ মাসটা পেরতে দেব না। ছুটির থেকে ছেলেরা ইস্কুলে এসে পৌঁছবে আমিও তাদের সঙ্গে গিয়ে জুটব।

এবারকার যাত্রায় দেশের খবর বিশেষ কিছু পাই নি বলে মনে হচ্চে যেন জন্মান্তর গ্রহণ করেচি। এ জন্মের প্রত্যেক দিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি সাবেক জন্মের অন্তত দশদিনের তুল্য। মনে হচ্চে ওপারে কত কি বদল হয়েচে তার ঠিক নেই, চারাগাছগুলো এতদিনে বনস্পতি হয়ে উঠ্‌ল বুঝি। তার কারণ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের কেবলি বদল হয়ে চল্‌চে। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন ঘটনার চলমান প্রবাহ হূহু করে এগচ্চে। আমাদের এই চলার মাপে মন তোমাদেরও সময়ের বিচার করচে— তোমরা যে অপেক্ষাকৃত স্থির হয়ে আছ এ কথা মনেই হয় না। রেলগাড়ির আরোহী যেমন মনে করে তার গাড়ির বাইরে নদী গিরিবন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়েচে,— তেমনি এই দ্রুতবেগবান সময়ের কাঁধে চড়ে আমারো মনে হচ্চে তোমাদের ওখানেও সময়ের বেগ বুঝি এই পরিমাণেই,— বুঝি সেখানেও আজকের সঙ্গে কালকের সাদৃশ্য নেই, মুকুলের সঙ্গে ফলের বয়সের ভেদ বুঝি অনেক কমে গেছে। দূরে বসে যখন বোরোবুদর বালি প্রভৃতির কথা ভেবেচি তখন তাকে একটা বিস্তৃত কালের উপর মেলে দিয়ে দেখেচি, নইলে যেন অতখানি ধরে না। সে সমস্তই আয়ত্ত করা হয়ে গেল,— যা স্বপ্নবৎ অস্পষ্ট হয়ে ছিল তা প্রত্যক্ষ হল। দেখাশুনো চুকিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্চি। দূরের কল্পনায় যে সময়টা অস্ফুটতার মধ্যে সুদীর্ঘ হয়ে ছিল নিকটের প্রত্যক্ষে সেই সময়টাই ঘন হয়ে উঠল,— অল্পকালের মধ্যেই অনেকটা কাল ঠেসে পাওয়া গেল। হিসেব করে দেখ্‌লে সেই পরিমাণে আমার

আয়ু বেড়েচে। চণ্ডীমণ্ডপে মন্দগমনে যার দিন চলে তার বয়স থেকে অনেকটা বাদ দিলে তবে তার যথার্থ আয়ু পাওয়া যায়। আমি বলিনে যে বাইরের পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যে ছুটে চল্‌লেই আয়ু সেই অনুসারে কালকে ব্যাপ্ত করে। শাস্ত্রীমশায় কোণে বসে আছেন কিন্তু কালকে তিনি যেরকম ব্যাপকভাবে অধিকার করচেন অন্য লোকের সঙ্গে নব্বই বছরের চেয়ে সে অনেক বেশি। মনে পড়ে এই তো সেদিন এলেন আশ্রমে "মিত্রগোষ্ঠী"র সম্পাদক পদ থেকে নেমে। এসেই তাঁর মন দৌড় দিল পালিশাস্ত্রের মহারণ্যের মধ্যে— দ্রুতবেগে পার হয়ে চলেছেন কোথায় তিব্বতী কোথায় চৈনিক— নাগাল পাবার জো নেই। সময়ের মাপ পঞ্জিকায় নয় চিত্তে। খাঁটি দুধের সঙ্গে জোলো দুধের ওজন মিলিয়ে মাপতে গেলে ঠক্‌তে হয়।

সে যা হোক্, যাচ্ছিলুম কুলের দিকে, হঠাৎ শ্যামের বাঁশি বাজল। আরিয়াম তারযোগে সেই বাঁশির ডাক পাঠিয়েচেন। কিন্তু আমার মনের ভাব একেবারেই রাধিকার সঙ্গে মিল্‌চেনা। স্বদেশে হয়তো জটিলা কুটিলার অভাব নেই কিন্তু তবু সকল গঞ্জনা স্বীকার করেও সেইদিকেই হৃদয়টা ঝুঁকেছিল। এখন সজোরে তাকে নিয়ে হেঁচকা টান লাগাচ্চি কিন্তু সে আমার প্রতি প্রসন্ন হচ্চে না। আমি বলচি কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে, সে বল্‌চে ওটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তার মতে, বিধাতা কর্ত্তব্য সৃষ্টি করেচেন সে কেবল জীব সেটাকে লঙ্ঘন করে মুক্তির আনন্দ লাভ করবে বলেই।

জাহাজে বসে একটা কবিতা লিখেচি। বউমাকে তার

একটা কপি পাঠিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার কিছু পাঠান্তর হয়েচে, তার প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নূতন পাঠ তোমাকে পৃষ্ঠান্তরে পাঠাই। ইতি ২ অক্টোবর ১৯২৭

মায়র জাহাজ স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোরের বেলা সেদিন শুভখনে
অরুণ আলো ঝলিতেছিল নারিকেলের বনে।
সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
বক্ষ ছাড়ি লুটাতেছিল তোমার চারিপাশ।
মকর-চূড় মুকুটখানি ছিল আমার মাথে
ধনুকবান ছিল দখিন হাতে।
দাঁড়ানু রাজবেশী,
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী।"

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতি, তুলিনু চাঁপা ফুল।

দুজনে মিলি সাজানু ডালা, বসিনু একাসনে,
দুজনে মিলি নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি জাল বাতাসে গেল ভাসি
আকাশ ছেয়ে উঠিল ফুটি পার্ব্বতীর হাসি॥

সন্ধ্যা তারা উঠিল যবে গিরিশিখর পরে
একেলা ছিলে ঘরে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি," কহিনু দ্বারে আসি।
বাহির পথে দাঁড়ালে তুমি প্রদীপখানি জ্বেলে,—
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তোমারে আমি সাজাতে চাহি আপন আভরণে।"
চাহিলে হাসিমুখে
আধো-চাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
মধুর হ'ল মুখর হ'ল সেদিন নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিরিনি।
পূর্ণ চাঁদ আকাশে ওঠে হাসি,
সাগরে দোলে আলো-ছায়ার নৃত্য রাশি রাশি।

ফুরালো দিন কখন নাহি জানি।
সন্ধ্যাবেলা আবার জলে ভাসিল তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে
প্রলয় এল সাগরতলে প্রবল ঢেউ তুলে।
লবণ জলে ভরি'
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতন ভরা তরী।

এবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীনবেশে।
দেখিনু আসি নটরাজের দেউল দ্বার খুলি
তেমনি ক'রে সাজানো আছে পূজার ফুলগুলি।
উৎসবের তরল কলরবে
পূর্ণ চাঁদ দুলালো ছায়া সাগর জলে যবে
হেরিনু কৌতুকে
আমার সেই গলার হার দোলে তোমার বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি গাঁথা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত কলিত কল্লোলে॥

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি'।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবান নাহি আমার হাতে।

এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা॥

মায়র জাহাজ
জাভা সমুদ্র
১ অক্টোবর। ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

৪ অক্টোবর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অত্রসহ যে লেখাটা পাঠাচ্চি তার থেকেই সব বুঝতে পারবে। যথাস্থানে চালান করে দিতে দেরি কোরো না।

⌞যে একটা কবিতা তোমাকে পাঠিয়েছি ডাকযোগে সেটা এখনো পেয়েছ কিনা জানিনে। যাই হোক তার প্রথম ছুটো লাইন বর্জ্জনীয়। অর্থাৎ তার প্রথম লাইন হবে—

"সাগরজলে সিনান করি সজল এলো চুলে।"⌟

ইতি ৪ অক্টো ১৯২৭

"কিস্তা" জাহাজ

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

অক্টোবর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয় আজ বিজয়া দশমীর দিনে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। ইতি ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

৮ এপ্রিল ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রথীরা চলে গেল। আমি আর কিছুদিন পরে সুবিধামত জাহাজ অবলম্বন করে যাব স্থির করেছি। যদি শরীর ভালো থাকে তবে ১লা বৈশাখে হয়ত যাব।···

আমার সব লেখাগুলো শ্রেণীবদ্ধ করে পাকাভাবে বাঁধিয়ে রাখবার জন্যে সুরেনকে বোলো।

এখানে কষে বৃষ্টি হয়ে গেল। তোমাদের ওখানেও আশা করি ভদ্র রকম বৃষ্টি হয়েচে।

শরীরটা ক্লান্ত আছে। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হৈমন্তীর জ্বরের খবর পেয়ে বড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। নিয়মিত জানিয়ো সে কেমন থাকে।

আমাকে যে সব গালমন্দ করে কিছুই গ্রাহ্য করি নে— তোমাদের যখন আক্রমণ করে তখন সেটাতে আমাকে বাজে, আঘাতে আমার মতন লোকের পরীক্ষা— সে পরীক্ষা আমার উপর দিয়ে কতদিন থেকেই চলচে— এক সময়ে বেদনা বাজত— এখন আর ভয় করি নে— বোধ হয় পরীক্ষায় পাস করেচি। আমার একটা গর্ব্ব মনে এই আছে আমি কোনোদিন আমার আক্রমণের রূঢ় প্রতিবাদ করিনি।

জোড়াসাঁকোর জনতার উপদ্রব এড়াবার আশায় এখানে ম্যুজিয়ম সংলগ্ন মুকুলের বাড়িতে এসেচি। সুন্দর জায়গা— লোকের উৎপাত নেই। কাল বিকেলে আমাকে দিয়ে একটু বক্তৃতার মতো করিয়ে নিয়েচে— না করলেই ভালো হত— কিন্তু অনুরোধ এড়াবার মতো শক্তি না থাকলে তার দণ্ড থেকে নিষ্কৃতির আশা করা অন্যায়। যখন সময় পাবে ও নিরুদ্বিগ্ন হবে তখন একবার দেখা করে সব খবর দিয়ে যেয়ো। ইতি ৯ অগস্ট ১৯২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

২৫ অগস্ট ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার শরীর সুস্থ হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

একবার কলকাতায় এসো। তোমার সঙ্গে কাজকর্ম্মের কথা কয়ে দেখা যাক্। ইতি ২৫ অগস্ট ১৯২৮

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নন্দলালকে বোলো, তাঁর কাছে কাগজের নমুনা পাঠানো হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। কাগজ-ওয়ালারা অপেক্ষা করে আছে।

আরো একটা বক্তব্য— ···কে বিদ্যালয় থেকে তাড়াবার হুকুম হয়েছিল। সেটা কি অপরিহার্য্য? আরিয়ামকে কিম্বা কোনো কর্ত্তৃপক্ষকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কোরো। কোনো ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে তার খুব বিপদ আছে। প্রথমত তার একটা বৎসর নষ্ট হবে— দ্বিতীয়ত এ রকমের অপমানে নৈতিক অবসাদ ঘটে।

৫২

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিদ্যালয়ের শিথিলগ্রন্থিগুলিকে আঁট করে তোলবার মুখেই আমাকে চলে আসতে হল তাই মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ভালো করে যখন ভেবে দেখি তখন বুঝতে পারি যে আমাদের যা সামর্থ্য আছে তার মধ্যেই নিজের কাজকে যথাসম্ভব সুসম্পন্ন করাই সঙ্গত। কোনোদিন এত বেশি সম্পদ আমাদের জুটবে না যখন বল্‌তে পারব, বাস্‌, আর দরকার নেই। আজ কুড়ি বছর পূর্ব্বে যখন হাতে কিছুই ছিল না তখন মনে হত বছরে যদি দু তিন হাজার পাই তাহলেই আর ভাবনা থাকে না। আজ বছরে বারো হাজার টাকা খরচ করেও মনে বুঝচি অভাব আগেকার চেয়ে বেশি বই কম নয়। বস্তুত অর্থলাভের দ্বারা দৈন্য কখনই ঘোচে না। কাব্য বা সঙ্গীত বা চিত্রের মতোই কর্ম্মেরও একটা art আছে। সম্পূর্ণতার দ্বারাই তার দৈন্য ঘোচে। উপকরণ বৃদ্ধির দ্বারা কোনোদিন দৈন্য ঘোচেনা, উপকরণের সামঞ্জস্য দ্বারাই সেটা সম্ভব। যা আমার হাতে আছে সেইটেকেই সুঘটিত করতে পারলে সে স্থায়ী মূল্য পায়, তাকে তার আপন সীমার চেয়ে বড়ো করতে গেলেই সে সুষমা হারায়। আমার কাজের সেই কুড়িবছর আগেকার সুকুমার মূর্ত্তিটি যখন মনে পড়ে তখন আমার অন্তরের থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ওঠে। তবু এ কথাও স্বীকার

করতে হয় সকল কর্ম্মই কাব্যের মতো অহৈতুক আনন্দময় নয়। অর্থাৎ কেবল তার রূপের সৌষ্ঠব নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া চলেনা তার ফলের বিচারও চাই। মানুষের অভাব আছে তা পূরণ করতে হবে। এর জন্যে যে সাধনা সে রূপের সাধনা নয়। তার শেষ লক্ষ্য সিদ্ধি। জলপাত্রের চরম কথাটা এই যে তাতে করে বেশ ভালো করে জলসঞ্চয় বা জল পান করতে পারা চাই— সেই সঙ্গেই গৌণভাবে তাকে সুন্দর করা ভালো। কীট্‌স্-এর Ode to Grecian Urn কাব্যটি ব্যবহারের অতীত, সুতরাং সুন্দর হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যে পাত্রটি দেখে তিনি ঐ কবিতা লিখেছিলেন, তার মূল প্রয়োজন ছিল আধারের কাজ ভালো করে করা— আনুষঙ্গিক ভাবে সুন্দর যদি সে নাও হত তাহলে খুব বেশি নালিশের কারণ থাকত না। বিদ্যালয়টাও তেমনি ব্যাবহারিক বস্তু, বিশেষ অভাব পূরণের জন্যে— অর্থাভাবে, লোকাভাবে, নিষ্ঠাভাবে তা যে পরিমাণে অসমাপ্ত থাকবে সেই পরিমাণেই সেজন্যে লজ্জিত হওয়া চাই। অতএব সমুদ্রের এপারে ওপারে দৌড়োদৌড়ি করতেই হবে, তাতে শরীর থাক্ আর যাক্।

তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, জিনিষটাকে আত্মীয়ের মতো দেখো। যদি কোথাও শৈথিল্য ধরা পড়ে তবে দুঃখবোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা কোরো। আমার অনুপস্থিতিতেই তোমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেশি এই কথাটি ভুলোনা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই আত্মীয়োচিত দায়িত্ববোধ যদি জেগে ওঠে তাহলে আমি সব চেয়ে আনন্দিত

ও নিশ্চিন্ত হই। সম্প্রতি আমরা বিদ্যালয়ের যে সমস্ত ব্যবস্থাবিধিকে আঁট করে তুল্‌ছিলুম, তার মধ্যে ওখানকার মেয়েদের বেষ্টন করতে পারিনি। সেখানে শান্তিনিকেতনের পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি দেওয়া দুঃসাধ্য। আমি ওখানকার আশ্রমসম্মিলনী থেকে অনেক প্রত্যাশা করচি। এই সম্মিলনীর যোগে ওখানকার ছাত্রদের মধ্যে একটা স্বকর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধ জেগে উঠ্‌চে অনুভব করে আমি মনের মধ্যে খুব একটা আশ্বাস বোধ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশ্রম-সম্মিলনীতে মেয়েরা আছে পদ্মপত্রে জলের মতো— তারা ওর সঙ্গে এক হয়ে যায় নি। এই কারণে সমস্ত আশ্রমের প্রতি মেয়েদের নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হচ্চে না। তারা কি পেতে পারে এ কথা যতটা ভাবচে কি দিতে পারে এ কথা তত ভাবচে না। তাতে করে আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের প্রাণের যোগ ত্যাগের পথে সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চেনা। এইটে আমাকে সবচেয়ে আঘাত দিয়েচে। কেননা যেদিন থেকে আশ্রমে আমি মেয়েদের স্থান দিয়েছি সেইদিন থেকেই আমার মনে এই কল্পনা ছিল যে আশ্রম রচনায় মেয়েদের ত্যাগ এবং সেবা সুন্দর এবং প্রাণবান হয়ে উঠ্‌বে। পূর্ব্বকালের ছাত্রীদের মধ্যে ইভা ও বাব্‌লি হৃদয় দিয়ে আশ্রমকর্ম্মের আনুকূল্য করেচে— সেইজন্যে আজো আশ্রমের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সরস ও সবল হয়ে আছে। তারা নিয়মরক্ষা সম্বন্ধেই যে কেবল সতর্ক ছিল তা নয় তারা আশ্রমের কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা ঘট্‌লে সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যথিত হয়ে উঠত— বারবার আশ্রম ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনা

করতে আস্‌ত, সেটা তাদের নিজের অধিকারলাভের সুবিধাসাধনের দাবী নিয়ে নয়, সাধারণ হিতের প্রতি লক্ষ্য করে। সেই জন্যে তখনকার দিনের উৎসব প্রভৃতিতে তাদের অক্লান্ত উৎসাহ আমাদের এত বেশি সাহায্য করেচে। আশ্রমের প্রতি আত্মীয়ভাবের নিষ্ঠা যদি ওখানকার মেয়েদের মনে স্বভাবতই স্ফূর্ত্তি না পায় তা হলে জানব ঐ অংশে সমস্ত আশ্রমের সাধনা ব্যর্থ হয়েচে। নুটু আমাদের আশ্রমেরই মেয়ে— শিশুকাল থেকে সে সর্ব্বতোভাবেই ঐখানে মানুষ হয়েচে— আশ্রমের জন্যে সে সাধ্যমত চেষ্টা করচে এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ওখানকার ছাত্রীমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে না পারলে যথার্থ সফলতালাভ করবে না। তাই ইদানীং আমার মনে হচ্ছিল যে মেয়েরা যদি স্বতন্ত্র আশ্রম-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করে ও সম্মিলনীতে তাদের সম্মিলিত সাধনা যদি আশ্রমের হিতসাধনে তাদের দায়িত্বকে উদ্বোধিত করে তোলে তাহলে আমার সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়। একদিন শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লী ছিল না— তখন ওখানে দুই একটি গৃহস্থ বাড়িতে ছাড়া মেয়েরা কেউ থাকতেন না। তখন কতদিন আমি কবিসুলভ কল্পনায় আশ্রমলক্ষ্মীদের কথা ভেবেছি— তখন আমার মনে ছিল ওখানে গুরুপত্নীদের আসন প্রতিষ্ঠা যদি হয় তাহলে আশ্রম প্রাণে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু আমার সে কল্পনা রূপ গ্রহণ করেনি। এমেরিকায় Urbanaয় যখন ছিলাম তখন Mrs Seymour প্রভৃতি গুরুপত্নীদের লোকসেবা আমি দেখেছি ও তার মাধুর্য্য আমি ভোগও করেছি। ঠিক সেই

প্রাণের জিনিষটি হৃদয়ের যত্নটি পুরুষদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। আমার মনে ছিল মেয়েদের আগমনে আশ্রমে এই সেবাশুশ্রূষার অমৃতধারা কল্যাণে পূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। নানা উদ্যমের স্রোতে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবাহিত হবে এবং আশ্রমের মধ্যে একটি সামাজিকতার ভাবকে সরস করে তুল্‌বে। সেটা যে ঠিকমতো হয় নি এটা আমার কাছে নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকে। তাই মনে হয় এর মধ্যে আমাদেরই ত্রুটি আছে। হয়তো এর কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে মেয়েদের শক্তিকে ঠিকভাবে আবাহন করতে পারিনি। কিন্তু সেইরকম বাইরের আনুকূল্যের প্রতি অপেক্ষা করে থাকা ঠিক হবে না। মেয়েদের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে সে যেন আপনার স্থান আপনিই জয় করে নেয়। আশ্রমের মধ্যে সেটা কোনোকারণেই যেন অব্যক্ত না থাকে। মেয়েরা যদি আশ্রমসম্মিলনী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার মধ্যে ওখানকার গুরুপত্নীরাও স্থান গ্রহণ করেন তাহলে তাঁদের সকলের যোগে শ্রীভবনের ও সেইসঙ্গে সমস্ত আশ্রমের শ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে। মনে আশা করে আছি একদা ওখানে নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত হবে। এখন থেকে মেয়েরা সকলে মিলে তার ক্ষেত্রকে নিষ্কণ্টক ও তার বিধিবিধানগুলিকে যদি সুদৃঢ় করে তোলেন, ওখানকার চিত্তকে সম্পূর্ণ অনুকূল করেন তাহলে কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। এখনো সেইজন্যে আশা করে থাকব।

পাঠভবনের জন্যে আমি যে আদর্শপত্র তৈরি করে দিয়েছি,

সেটিকে বিশ্লেষণ করে তোমরা অধ্যাপকেরা মিলে একটা কর্ত্তব্য তালিকা তৈরি কোরো। সেই তালিকার মধ্যে কোন্‌গুলি অনুষ্ঠিত হচ্চে কোন্‌গুলি অসম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্চে এবং কোন্‌গুলি আদৌ অনুষ্ঠিত হচ্চে না তা নিয়তই তোমাদের চোখের সামনে থাকা চাই। অন্য দেশের লোকের কাছে যখন শান্তিনিকেতনের কথা বলি তখন এই সব আদর্শের কথা বলে থাকি, এবং তা শুনে তারা বিস্ময় বোধ করে— কিন্তু এগুলি যদি অধিকাংশই অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে আমার পক্ষে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় কিছুই হতে পারেনা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুমাত্র নিষ্ঠা দাবী করি নি। খুব সম্ভব আমি তার অধিকারী নই। যদি অধিকারী হতুম তাহলে এতদিনে আশ্রমকে ঘিরে সহায়কারী লোকের অভাব হত না। আশ্রমের আদর্শের মধ্যে যে সত্য আছে আমি কেবল সেই সত্যের দোহাই দিয়েছি। যে কারণেই হোক্‌ আমাদের দেশে ব্যক্তিগত নিষ্ঠার প্রভাবই সব চেয়ে প্রবল— সেই নিষ্ঠার যোগেই আমাদের দেশে ত্যাগ সহজ হয়। এই ব্যক্তিস্বরূপের মহিমা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ যদি তাঁদের মুখোষ পরে আড়ম্বর করেন তাহলে সেটা একটা গুরুতর অপরাধ হয়ে ওঠে। অতএব ও পথ আমার নয়। সেইজন্যেই তোমাদের কাছে নির্দ্দিষ্ট কাজের চেয়ে বেশি কিছু দাবী করতে আমি কুণ্ঠিত হই। কাজের ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই সেই বেশিটুকুর দরকার হয়। সেই বেশিটুকু দেওয়া সহজসাধ্য, এমন কি, আনন্দময় হতে পারত, যদি

বিদ্যালয়ের আদর্শগত সত্যরূপের প্রতি আমাদের অনুরাগ প্রবল হত। তাহলে নিজের কথা অনায়াসেই ভোলা যেত। কিন্তু সেটাকে দাওয়া করা যায় না। দেনাপাওনার সম্বন্ধেই দাবী-দাওয়ার কড়াক্রান্তি হিসাব নিকাস চলে— কিন্তু যা দেনা-পাওনার অতীত তার উপরে ব্যক্তিবিশেষের জোর খাটেনা, ব্যবস্থাবিভাগের জোর খাটে না— সত্য স্বয়ং তাঁর সমস্ত আনন্দ নিয়ে যাঁর অন্তরে আবির্ভূত হন তিনি বিনাবাক্যেই সর্ব্বসমর্পণ করেন। সেই কথা যখন মনে ভাবি তখন একথাও স্বীকার করি যে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজকে সত্য করে তোলবার ভার আমার মতো লোকের নেওয়া [উচিত] ছিল না। আমি ভাবুকমাত্র, আমার মনে ভাবের রূপ প্রকাশ পায়, তাতে আমার নিজেকে উৎসাহ দেয়, আমার নিজেকে আমার সহজ আরামের আয়োজন থেকে সঙ্গহীন উপলবন্ধুর পথে বের করে আনে— কিন্তু আমার নিজের মধ্যে প্রেরণাশক্তি নেই। এ শক্তি কেউ চাইলেই পায় না। এ শক্তি ঈশ্বরদত্ত। যার এ শক্তি স্বভাবত নেই তার এমন কোনো কাজের ভার নেওয়া উচিত নয় যে কাজের জন্যে বিভিন্ন চরিত্রের নানা লোকের প্রয়োজন। সেই বহুকে এক লক্ষ্য অভিমুখে প্রেরণ করা কেবল ভাবুকের কাজ নয়। অথচ দুর্দ্দৈবক্রমে কোনো এক সময়ে এই কর্ম্মভার আমি স্বীকার করেছি। আমি এই কাজের যোগ্য নই বলেই প্রথম দিন থেকেই নিরতিশয় দুঃখ ও বিরুদ্ধতা পেয়ে এসেচি। এইজন্যেই এই কর্ম্মের অন্তরের দিকে যতই অভাব বেড়েচে বাইরের দিকে এর রূঢ়তা ততই কঠিন হয়েচে। ততই টাকার

প্রয়োজন এত উগ্র হয়ে উঠেচে। সকলের সব অভাব আমাকে একলাই মেটাতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি আমার একলারই স্কন্ধে। তাতে প্রত্যহ আমার শরীর পীড়িত, চিত্ত উদ্বেগে অশান্ত— দুরাশার তাড়নায় সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘুরে বেড়াচ্চি ফল অতি অল্পই মিলচে— অপরপক্ষে অহৈতুক প্রতিকূলতা ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌চে। এমনি করে আজ ২৫ বৎসর বহু টানাটানি করে কেটে গেল, এখনও কূলের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলেম না। আর বেশিদিনের মেয়াদ নেই। এখন এই অল্প কয়দিনের জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য বা ক্লান্তির দোহাই দিয়ে আমার চেষ্টায় শৈথিল্য ঘটতে দেব না। প্রদীপে তেল জোগাতে হবে। নইলে আজ আমি কিছুতেই শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে আসতুমনা।

ইংরেজি সোপান ও সহজপাঠ যাতে অতি শীঘ্র ছাপানো হয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হয় সেজন্যে বিশেষ চেষ্টা কোরো। ইংরেজি সোপান প্রথম ভাগখানা ছাপা শেষ হতে দেরি হওয়া উচিত নয়— অবিলম্বে হাতে নিয়ো। কত কপি ছাপা কর্ত্তব্য তার পরামর্শ কর্ম্মসচিবের কাছ থেকে নেওয়া দরকার। সহজপাঠের ছবিগুলি শেষ হতে আশা করি দেরি হবে না।

··· সম্বন্ধে আমার মনে একটা সঙ্কোচ রয়ে গেছে। তাঁর কাছে কিছুমাত্র ত্যাগের দাবি আমি করতে পারি নে। তাঁকে যেন অনুরোধের পীড়নে বাধ্য করা না হয়। আমাকে তিনি জানেননা আমার কাজকেও অল্পই জানেন— উৎসাহ-

পূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আশ্রমের কাজে আত্মসমর্পণ করবেন তার কোনো হেতু নেই। সেটা যদি সহজ হত তবে আমার পক্ষে আনন্দের হত। কিন্তু কোনোদিনই হয় নি হঠাৎ আজই হবে এমন আশা আমি করব না।

মঙ্গলবারে বম্বাই মেলে যাত্রা করব। যদি সোমবার, এমন কি মঙ্গলবার অপরাহ্ণেও একবার আসো তবে যদি কিছু বলবার থাকে বলব।

✓আমার সব Lectureগুলো ও বাংলা ও ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ও Personality Creative Unity, Sadhana সঙ্গে এনো। বিশ্বভারতীর সদ্যঃপ্রকাশিত Journal খানাও চাই, যার মধ্যে ক্ষিতিবাবুর বাউল আছে। ইতি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

এক খণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্ম চাই।✓

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩
৭ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আমি যে কাজের কল তৈরি করে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম তার ভার এখন রথীর উপরে। রথী তাকে আরো বেশি পাকা করে তুল্‌তে পারবেন। তোমাকে এই কলের দৌত্য করতে হবে। অর্থাৎ হুকুমগুলোকে প্রচার করা, তদ্বির করা

ইত্যাদি। আসবার সময় দেখে এসেছিলুম লোকাভাবে পাঠভবনের শিক্ষাকার্য্যে বড় বড় ফাঁক পড়েছিল। জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে আমাদের বরাবর ক্ষতি হয়েচে। কিন্তু আমাদের সবচয়ে ক্ষতির কারণ এই যে, ওখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা সহযোগিতা এবং আদর্শের ঐক্য আজ পর্য্যন্ত ঘটে নি। আমাদের ভারতবর্ষীয়দের মনে ব্যক্তিগত অভিমান তাদের সত্যসাধনাকে ছাড়িয়ে পদে পদে উদ্যত হয়ে ওঠে বলেই এটা ঘটে। তোমাদের কর্ত্তব্য হবে আশ্রমে নানা উপায়ে একটা সামাজিকতা গড়ে তোলা। পরস্পরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করতে ভুলো না। রথী যদি প্রতিদিন পালা করে দুজন অধ্যাপককে আহারে নিমন্ত্রণ করেন ত অনেক গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। ওখানকার য়ুরোপীয়দের সঙ্গেও আমাদের অধ্যাপকদের সর্ব্বদা আলাপ আলোচনার উপলক্ষ্য থাকা উচিত। এখন দুইপক্ষ সমুদ্রের দুইকূলে বাস করেন— আমাদের বিশ্বভারতীর আদর্শের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে ক্ষতিজনক। ভিতরে ভিতরে আমাদের দুই জাতে পরস্পরের মধ্যে যে একটা মর্ম্মগত অসহযোগিতা আছে সেটা ক্ষয় করতে না পারলে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। এই সাধনার দায়িত্ব বিশেষভাবে আমাদেরই— যদি অকৃতকার্য্য হই তো সেজন্য প্রধানত আমরাই দোষী। কেননা আতিথ্যের ভার আমাদেরই উপর। দোষত্রুটি সকলেরই আছে। সেই ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে হবে। হাঙ্গেরি থেকে নতুন অধ্যাপক আসচেন— তিনি যেন এসেই না অনুভব

করেন যে, আশ্রমে আমরা উভয় পক্ষ তেলে জলের মতো থাকি। এই ব্যাপারে আমাদেরই সামাজিক গুণের খর্ব্বতা প্রকাশ পায়। আমরা অত্যন্ত গ্রাম্যপ্রকৃতির লোক। সকল দেশের সকল সমাজের লোককে সহজে আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করতে পারিনে। এমন কি, ইংরেজরাও আমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ সে কথা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জোর করে বলতে পারি। কিন্তু এই লজ্জাজনক গ্রাম্যতা দূর করা চাই।

✓ মহাভারতের সারাংশ চিহ্নিত করে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস ভালো হয়েচে। হৈমন্তী যদি এই অংশটুকু ছাপাখানার জন্যে কপি করেন তবে তাঁরও উপকার হবে আমাদেরও কাজে লাগ্‌বে। এটা এমন করে করেছি যে ছেলেমেয়ে সকলেই অসঙ্কোচে ব্যবহার করতে পারবে।✓

ইংরেজি সোপানের প্রথমভাগকেও দুই খণ্ড করা যায়— যেখান থেকে hasএর দৃষ্টান্ত আরম্ভ হল সেইখান থেকেই দ্বিতীয়ভাগ সুরু করা ভালো। অর্থাৎ সব নীচের বর্গে এই এক এক অংশ এক এক বৎসরের খোরাকরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে। নীচের বর্গের বৎসর ছ মাস করে হওয়া চাই। বস্তুত পাঠভবনের সকল বর্গই অর্দ্ধবার্ষিক হলে ভাল হয়। তাহলে পাঠের উন্নতি আরো স্পষ্ট করে বিচার করা যেতে পারে।

বাংলা সহজপাঠ আশা করি ছাপানোর ব্যবস্থা হচ্চে। ইংরেজি সোপানের নাম বদলে “ইংরেজি সহজ শিক্ষা” নাম দিতে পারো— এই শ্রেণীর প্রথম অংশ হবে শ্রুতিশিক্ষা। শ্রুতিশিক্ষার উদাহরণ আরো অনেক বাড়ানো যায়। কোনো

য়ুরোপীয় Travellers' Guide নিয়ে তার থেকে প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য বাক্যগুলি অনুসরণ করে "সহজশিক্ষা" আরো সম্পূর্ণ করে লিখ্‌তে পারো।

বেনোয়ার খবর আশা করি ভালো। পুপের ফরাসী শিক্ষার ভার তারই উপর এ কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো—এবং আমার অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ৭ মার্চ্চ ১৯২৯

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টাকারের বাংলায় নলিনীকে বাসা দিলে কোনো ক্ষতি হবে না।

... কাছ থেকে আমার সেই ইংরেজি অনুবাদপদ্ধতির পাণ্ডুলিপি অবিলম্বে উদ্ধার করে নিয়ো— কোনোমতেই ভুলো না। সেগুলো যদি ছাপিয়ে রাখতে পারো এর পরে কাজে লাগবে।

৫৪
১০ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আমরা এই যে জাহাজে চলেচি এতে প্রতিদিন আমাদের একটা শিক্ষা হচ্চে। যাত্রা আরম্ভের মুখে আমাদের সকলেরই মনে একটা সঙ্কোচ ছিল— যাত্রীদের এড়িয়ে চলছিলুম। কিন্তু ওরা সহজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে

মিশে গেচে। সুধীন্দ্রদের মনে এখন কিছুমাত্র বিমুখভাব নেই। সামাজিকতা করবার মতো শক্তির অভাব ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যেই দেখি। এই চরিত্রগত অভাবই শান্তিনিকেতনে এতকাল প্রকাশ পাচ্চে। আমরা শক্তি থাকলে অতি সহজেই য়ুরোপীয় বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে পারতুম। কিন্তু তাতে যে পরিমাণে প্রয়াসের দরকার সেটুকু এ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে পারি নি। ওদের আমরা দূরেই রেখে দিয়েচি। অথচ শান্তিনিকেতনে এই অধ্যাপকেরা এমন কোনো ব্যবহার করেন না যাতে আমাদের অভিমান ক্ষুণ্ণ হয়। এটা নিতান্তই আমাদের স্বভাবের দৈন্য। যতই বিদেশে আসি ততই এটা আরো স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। আমাদের এই গ্রাম্যতার জন্যে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গেও আমরা এই চিত্তসঙ্কীর্ণতাবশতই সহজে মিলতে পারি নে। অন্য প্রদেশের ছাত্ররা ওখানে বেড়ার মধ্যে বাস করে— আমরা একটুও এগিয়ে গিয়ে ওদের আপন করে নিতে পারি নে। তাতে নিজেদের যেটুকু স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত ঘটে সেটুকুও সহ্য করা আমাদের পক্ষে শক্ত। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ এই কারণেই আমাদের লোকের পক্ষে এত বেশি দুঃসাধ্য— ভারতের বাইরেই এর প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু শান্তিনিকেতনেও যদি আমরা বিদেশকে স্বদেশে না টানতে পারি তাহলে ঐ আশ্রমের আদর্শ একেবারেই ব্যর্থ হল। শুধু ক্লাস চালানো আমাদের কাজ নয়। আত্মীয়তার সম্বন্ধকে ওখানে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে হবে। যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ং

—এক নীড়ও বাঁধতে পারি নি, এক গাছেও আশ্রয় নিই নি। আমরা আছি নানা পক্ষী নানা বৃক্ষে। এমন হয় কেন— নিজেদের একবার জিজ্ঞাসা কোরো। ওখানে অতিথি এলে কেউ তাদের কোনো খবর নেন না কেন সেও জিজ্ঞাস্য, আদর অভ্যর্থনার একটি ভাব ওখানকার আকাশে ছড়িয়ে যাবে এইটেই সাধনা করতে হবে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এই সৌজন্য যথেষ্ট ছিল— এখন আমরা প্রতিদিন বর্ব্বরতায় তলিয়ে যাচ্চি। ওখানে ছাত্র ও বিশেষত ছাত্রীরা এই বর্ব্বরতা থেকে যদি উদ্ধার পায় তাহলে সে একটা বড়ো কাজ হবে। ইতি ১০ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

১৪ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এই জাহাজে চল্‌তে চল্‌তে একটা বিষয় নিয়ে মনে খুব বিস্ময় বোধ করেচি। অনেক ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে আমার বই আছে। আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েচে। তারা নানা রকম কাজে ভ্রমণ করতে বেরিয়েচে— কেউ জানত না যে এই জাহাজে আমার সঙ্গে দেখা হবে। এমন ভাবে ভ্রমণ কালে আমার বই সঙ্গে করে নিয়ে আসবার মধ্যে অনেকখানি কথা আছে। আমাদের সহযাত্রী ডারুয়িন

(বিখ্যাত ডারুয়িনবংশীয়) দীর্ঘকাল থেকে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমার Gardener বহন করে বেড়ান। আমার রচনা আমার মত প্রভৃতি সম্বন্ধে এদিককার এত লোকের জানা আছে হঠাৎ তার পরিচয় পেয়ে মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠতে হয়। পৃথিবীতে সব চেয়ে যেখানে আমার যথার্থ পরিচয় ও আমার রচনার আলোচনা কম সে হচ্চে শান্তিনিকেতন। কিন্তু এই শান্তিনিকেতনের কোনো লোক যখন য়ুরোপে যাবে তখন তাদেরি কাছ থেকে আদর পাবে যারা তাদের চেয়ে যথার্থভাবে আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালো করে জানে।... সাবরমতী আশ্রমে মহাত্মাজির কার্য্য সম্বন্ধে এ পরিমাণ অজ্ঞতা বা উপেক্ষার সুদূর সম্ভাবনা মাত্র নেই। আমি কোনো অনিচ্ছুক মনের উপর কখনো আমার মত চাপাতে চেষ্টা করি নি— কিন্তু সাহিত্যিকভাবে আমার লেখার যেটুকু মূল্য আছে অন্তত সেটুকুও শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জানা উচিত। তোমরা দেশ থেকে বেরিয়ে এলে বুঝতে পারতে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে কত বিস্তীর্ণভাবে আমার যোগ আছে— সেই যোগের একটা সার্থকতা আছে— পৃথিবীর ইতিহাসে সে একটা কাজ করচে, সেটা স্থানীয় পলিটিক্‌সের চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও মূল্যবান— এই কথাটা কেবল আমার কাছের লোকদের পক্ষে বোঝাই সব চেয়ে অসম্ভব হয়েচে। এই মানসিক বাধাটুকু বরাবর থেকে গেছে বলেই আমি শান্তিনিকেতনে বেশি কিছু দিতে পারলুম না— সেইজন্যেই ওখানকার কাজে ঔদাসীন্য ঘুচল না। অথচ ওখানে যা

বহুকাল থেকে আমি ছড়িয়ে দিয়ে এসেচি, যা কোনো চিহ্ন না রেখে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তারি কিছু কিছু অংশ কুড়িয়ে নিয়ে এসে সমস্ত পৃথিবীতে আমার আপন করতে পেরেচি— কিন্তু ওখানে এমন আসন তৈরি হল না, যাতে আমাকে কুলোয়। তাই আমাকে এত দুঃসহ পরিশ্রম করতে হচ্চে, এত প্রাণপণ দুঃখ করেও যথেষ্ট ফল পাচ্চিনে। কিন্তু ফল পাওয়ার মানেই মজুরি চুকিয়ে পাওয়া— তাতেই বোধ হয় কাজের দাম কমে যায়— এইজন্যেই বিনা প্রতিদানে নিজের কাজ দিয়ে প্রাণ দিয়ে মানুষকে ঋণী করে যাওয়াই ভালো —পাওনা চুকিয়ে নেওয়া একেবারেই ভালো নয়। বুঝে পড়ে নিতে অনেক সময় চাই— সেই সময় আমার জীবিতকালের পরে আসাই ভালো। ইতি ১৪ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসুমতীর একটা লেখা দেখ্‌তে পাই নি যেটাতে টাইটানিক ডোবার উল্লেখ আছে। সেটার সংশোধন আবশ্যক। ঐ পত্রগুলির তর্জ্জমা পেলে কাজে লাগত।

৫৬

৩ নবেম্বর ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চার নম্বর ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও তার মূল বাংলা (নৈবেদ্যে) কপি করে পাঠিয়ে দিয়ো এখানে বই হাতের কাছে নেই। হারাসানের অসুখ নিয়ে আশা নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে দিন যাচ্চে। কিন্তু মনটাকে বর্ত্তমানের হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করচি।

তুমি তোমার নতুন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েচ শুনে খুসি হলুম— আমিও কবে উপরিতলায় অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারব সেই চিন্তা করচি।

লেখবার চেষ্টা করি— বাধা বিস্তর। দায়গুলো ঘাড় থেকে নামলে শরৎকালটার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে মোকাবিলা করতে পারব। ইংরেজি সোপান ? নন্দলালকে মনে করিয়ে দিয়ো সহজ পাঠের ছবিগুলো সেরে ফেলতে। বছর খানেক প্রায় হতে চলল— আর দেরী সয় না। ইতি ১৭ কার্ত্তিক ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

৯ এপ্রিল ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। ইংলণ্ডে এসে ইংলণ্ডের মহত্ত্ব যদি চোখে না পড়ে তবে সেটা দুর্ভাগ্য, ওখানে তোমার ভালো লাগ্‌চে তার চেয়ে ভালো খবর আর কিছু নেই। আমার প্রায় চারটে লেকচার হল। ড্রামণ্ডের চিঠি পেলুম। ১৯ মে ও ২১ মে এই দুদিন দুটো লেকচারের জন্যে রেখেচে। কিন্তু চারটের কমে জিনিষটা জোর পাবে না। ওকে লিখ্‌তে হবে। এখানে বেশ রোদ্দুর পড়েচে। কদিন বৃষ্টিবাদলের উৎপাত ছিল— সে কেটে গেছে। এখন থেকে এই রকমই চল্‌বে আশা করচি।...

বিজয়ার খবর এতদিনে পাওয়া গেল। বোধ হয় আসবে। এখানে চেম্বারলেন এসেচেন, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। প্রথম দিন আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ইতি ৯ এপ্রেল ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮

৬ জুন ১৯৩০

কল্যাণীয়েষু

হয় ত এতদিনে বাসায় পৌঁচেছ। আমি ডানা মেলচি নতুন রাস্তায়। কিন্তু মন ক্লান্ত, বুঝতে পারি আমি তোমাদের বয়সী নই। দেশ থেকে দুঃখের খবরে মন পীড়িত হয়ে থাকে এই বেদনার ভার সত্যভাবে বহন করবার জন্যে যৌবনের জোর চাই। কিছুদিন থেকে নিজের একলা জীবনের বোঝাটা বড়ো বেশি অনুভব করচি। বহুদিন থেকে মানুষকে নানা কথা শুনিয়েছি কিন্তু কাছে টানতে পারি নি। দায়িত্ব নিয়েছি প্রকাণ্ড আকারের, তার দাবী মস্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন, চেষ্টা করেচি সহায় পেতে— ফুটো ঝুলি থেকে সব খসে পড়ে, কিছুই জমিয়ে তুলতে পারি নে। ভিতরে একটা ছেলেমানুষ আছে, সে বাজে খেলা নিয়ে দিন কাটাতে চায়, কিন্তু বাইরে যে-বুড়োটা আছে সে কর্ত্তব্যের দোহাই পেড়ে খেলা মাটি করে দেয়। কাজ করতে গেলে উপকরণ চাই, খেলতে গেলে কিছুই চাই নে। আমার শাস্তি এই যে, উপকরণ পাব না, কাজ করব— খেলাঘরে আপিস বানাতে হবে— দিন বয়ে গেল। এই দোটানার মাঝখানটাতে দিনান্তকালের পূরবীর সুরে রব উঠ্‌চে, আর কেন, আর কতদিন? খেলা জমাতে পারতুম, কিন্তু কাজ জমাবার হুকুম এল— অথচ কাউকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। শেষ পর্য্যন্ত পাঁকের

উপর দিয়ে একলা লগি ঠেলে নৌকো চালাতে হবে। ইতি

৬ জুন ১৯৩০

আজও সেই বায়োকেমিক ওষুধ এল না। থাকগে ওষুধ —এখন চল্‌লুম—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

১৬ জুন ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। লণ্ডনে তাড়াহুড়ো করে একজিবিশন হতে দেবনা। আমরা যখন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত য়ুরোপে আছি তখন কোনো এক সময়ে ভালো করে উদ্যোগ করা কঠিন হবেনা। Illustrated London News ওয়ালারা আপনা হতে ছবি ছাপবার প্রস্তাব করেচে। Studioতে ছাপা হতে পারলে আরো খুসি হই।— বসুমতীতে যে পত্রাবলী ছাপা হয়েছিল Unwinরা তারি তর্জ্জমা ছাপতে ইচ্ছুক। তোমার কাছে যদি থাকে আমাকে পাঠিয়ে দিলে একটু একটু করে তর্জ্জমা করার চেষ্টা করি। তুমি যখন এখানে আসবে Boots এর Ragesan Hair Tonic এক বোতল আমার জন্যে নিয়ে এসো— উপকার হয়েচে।

Manchester[এ] যাতে Exhibition হতে পারে এণ্ড্রুজের সেই ইচ্ছে। হলে ভালোই হয়। লণ্ডনে যে ৪৭ খানা ছবি ইণ্ডিয়া সোসাইটির দেয়ালে অকারণে ঝুলচে সেইগুলো এণ্ড্রুজ বর্ম্মিংহামে নিয়ে যাবে।

এখানে আমার দিন ভালোই যাচ্চে। হৈমন্তীকে সেমন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ১৬ জুন ১৯৩০

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

৯ জুলাই ১৯৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, দীর্ঘকালের মতো ঘুরপাক খেতে চল্‌লুম। মনে করলে ভয় হয়। তুমি সঙ্গে থাকলে খুসি হতুম, তোমারও উপকার হ'ত— কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব হবেনা মনে করে এণ্ড্রুজকেই স্থির করেচি। আপাতত সঙ্গী সহায় রূপে চল্‌ল এরিয়ম— তার পরে ২০শে তারিখ নাগাদ এণ্ড্রুজ সেখানে গিয়ে জুটবে। চিত্রপ্রদর্শনী আরম্ভ হবে ১৭ই তারিখে। আশা করি সেখানে সমাদর পাবে। এই ছবি সম্বন্ধে ভিতরের দিকেই আমার নেশা আছে, বাইরে থেকে উৎসাহের দরকার হয় না। কিন্তু আমার দেশের কণ্ঠে এখানকার ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি ওঠে, সেইটেকে জাগাতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত

হতে পারি। তাদের কাছ থেকে স্তুতি আমি চাইনে— কিন্তু তাদের ক্রূর কটাক্ষবিক্ষেপ থেকেও আত্মরক্ষা করবার ইচ্ছে আছে। ইতিমধ্যে তোমাদের ওখানে রথী যাচ্চে— আশা করি ভালোই থাকবে। তোমরা ডেনমার্কে চলে যাবার আগেই রথীদের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হতে পারবে আশা করি। তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় দেশে ফেরবার আগে আর দেখা হবেনা। চেষ্টা করব আর ব্রিটিশ খাড়ি পাড়ি না দিতে। সুধীর কর জেলখানায়, আমার বই ছাপানো সম্প্রতি লবণাশ্রু জলে পরিপ্লাবিত। সেমন্তী ওরফে অমিতি এবং তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ৯ জুলাই ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

৮ নবেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বৃহস্পতিবারে যাব। অতএব এখন এখানে এসোনা। অনেক জরুরি চিঠিপত্র জমে উঠেচে। আমি সেই গল্প মাজাঘষা এবং লেকচার লেখায় নিবিষ্ট আছি— তা ছাড়া কুঁড়েমিও আছে। কোনো দায়িত্বকে স্বীকার করতে এখন একটুও ভালো লাগেনা।···

এখানে বেশ অনুভবগম্য রকমের শীত পড়েচে।…ইতি
২২ কার্ত্তিক ১৩৩৯

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্রহায়ণের পত্রধারা পাঠিয়েছ কি? প্রুফ পাই নি।

৬২
[১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার জন্যে মনটা ব্যথিত হয়ে আছে। য়ুরোপে হয় তো যাওয়া ভালোই হবে— তবু তার পূর্ব্বে একবার এখ[া]নকার সহজ চিকিৎসা চেষ্টা করে দেখো। ছাঁচি কুম্‌ড়োর রস প্রভৃতি পথ্যযোগে বিশেষ উপকারের দৃষ্টান্ত দেখেচি। একবার জীবন রায়ের পথ্য ও ওষুধ দেখতে দোষ কি। পথ্য সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সতর্ক। সেই সতর্কতার গুণে রাণী অনেক দিন অনেক পরিমাণেই সুস্থ আছে। কিশোরী তারই বিধানে অসম্ভব রকমে আরোগ্যলাভ করেছে। ইতিমধ্যে তুমি যদি বায়োকেমিক সাইলিসিয়া খেয়ে দেখ তাতে দোষ নেই আর সেই সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌।

কলকাতায় এসেছি। এখানকার দুই একটা ঝঞ্ঝাট সেরে যতশীঘ্র পারি শান্তিনিকেতনে ফিরব। ঘনঘোর বর্ষা নেবেছে —বৃষ্টির প্লাবনে দেশ ভেসে যাচ্চে— আকাশ মেঘাবৃত।

গরম নেই। শান্তিনিকেতন নিশ্চয়ই খুব মনোরম হয়েছে। আশ্রমে তোমার অভাব খুবই অনুভব করব— কিন্তু যাই হোক তোমার আরোগ্য হওয়া চাইই। কবিতাটি নিশ্চয়ই ভালো এবং পরিচয়ওয়ালারা নেবেই। আজকালের মধ্যে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হবে আশা করি। যদি অল্পদিনের মতো আশ্রমে আসো তাহলে তোমাকে খুবই সাবধানে রাখতে পারব— আশঙ্কা কোরোনা।

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ

৬৩

[অক্টোবর ? ১৯৩৩]

ওঁ

অমিয়

এতদিন পরে আজ তোমরা চলে গেলে কীরকম খারাপ লাগচে বলতে পারি নে। এ যেন মৃত্যুর বিচ্ছেদের মতোই কেবলি মনকে বৃথা আঘাত করচে। যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন কোনোমতেই মনে হয় না কোনোদিন মৃত্যু আসতে পারে। কিন্তু শেষকালে আসে। তার পরে মনকে সেই শূন্যতার সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়ে নিতে হয়। তোমাদের পুরোনো বাসায় জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল— তোমাদের ছোটো সংসার ঐখানে সুদূর পর্য্যন্ত শিকড় মেলেছিল। আজ ছিন্ন করতে হোলো— কেননা মনের প্রসার সংসারকে

ছাড়িয়ে যায়— তাকে দুঃখ পেয়ে দুঃখ দিয়ে নতুন নীড় বাঁধতে হয়। একদিন হয় ত মনে মনে এ কথা উঠ্‌বে যে ভাগ্যে বন্ধন ছিঁড়েছিলেম। টবের গাছকে বড়ো ভূমিতে যাবার সময় আঘাত পেতেই হয়— আশা করি এ আঘাত কাটিয়ে নিরাময় হয়ে উঠবে— এবং তখন তোমার পুরাতন জীবনের সঙ্গে মুক্ত নিঃসংসক্তভাবে আবার একবার আনন্দের যোগ অনুভব করবে। আমার বয়স হয়ে গেছে, নতুন সম্বন্ধ আর সহজে গড়ে ওঠে না— অল্প কয়েকদিনের জন্যে মনের বাসা বদল করা বড়ো কঠিন। তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিল যে এ বয়সে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়। কিন্তু তরুণজীবনকে এমন করে আঁকড়ে থাকা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত অন্যায়। একান্ত মনে কামনা করি তুমি স্বাধীনতার অবারিত মুক্ত আলোকে মনের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ধন্য হবে। আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি খুসি হব— চাইতে সঙ্কোচ কোরোনা। তুমি আমার অনেক করেচ, অনেক ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়েছ— তোমার সহযোগিতা আমার পক্ষে বহুমূল্য হয়েছিল সে কথা কোনোদিন ভুলতে পারবোনা— কোনোদিন তোমার অভাব পূর্ণ হবেনা। কিন্তু কতদিনই বা বাকি আছে।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

৬৪

২ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার কথা বারবার মনে পড়ে। তুমি আমাকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলে পেয়েছিলে, এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়, এইজন্যে আমি তোমার পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছি। এরকম সঙ্গ আমি আর কারো কাছ থেকে আশা করি নে। সৌভাগ্যক্রমে অক্সফোর্ডে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছ, সেখানে কৃতিত্বলাভ করতে পারবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তোমার এই অভিজ্ঞতা তোমার জীবনকে মূল্যবান কোরে তুলবে মনে কোরে খুশি আছি। আমার চিত্তের ধারা বাইরে তার বেগ ক্রমশই হারাচ্চে বোধ করি এখন তার অন্তঃশীলা হবার সময় হোয়ে এল। লোকচক্ষুর গোচরে অনেক দিন কেটে গেছে, এখন আস্তে আস্তে আলো নিবিয়ে নেপথ্যে যাবার সময় হোলো এই কথাটাকে সহজ মনে স্বীকার করা উচিত। মহাভারতে আছে অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করতেই জানতেন বেরোবার বিদ্যা তাঁর জানা ছিল না— আধুনিক কালের মানুষ আমরা, জীবনসংগ্রামে ব্যূহ থেকে বেরোবার রাস্তাটা শিখি নি। আমার মনের অবস্থা যাই হোক বাইরে এখনো পথ খোলসা হয় নি। এখানকার সব খবর হৈমন্তীর কাছ থেকে পাচ্চ

আমার নিজের খবর এই যে সমস্ত খবর সংক্ষেপ করবার জন্যেই আমার মন উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২ এপ্রেল ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

২৫ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম।...

য়ুরোপে তুমি বরাবরকার মতো স্থিতিলাভ করতে চাও, অন্তরে বাহিরে হয়তো বাধা পাবে না। যেখানে না পাওয়া যায় সেইখানেই আমাদের যথার্থ দেশ। আমি নিজেও এই সংকল্প অনেকবার মনে এনেছি। য়ুরোপে মানবমনের সংঘাতে মনের নিগূঢ় শক্তি চরম পূর্ণতায় উদ্বোধিত হয় তাও আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবু অনেকখানি বাকি থাকে, সেটা হচ্ছে অন্তরতম সম্বন্ধ, তাকে বিশ্লেষণ করে জানাতে পারিনে। অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুর সমাবেশে তার বহুধা বেদনা আমার সমস্ত মনকে জড়িয়ে রেখেছে— জন্মপূর্বের স্মৃতি আছে তার মধ্যে, আমার দৃষ্টিতে আমার শ্রুতিতে, আমার চিন্তায় আমার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের বহুতন্ত্রবিশিষ্ট

বীণায় সে আপন সুর বেঁধে দিয়েছে। তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে আমার ভোজে খাদ্য থাকে, এমন কি খাদ্য বেশিও থাকে কিন্তু তার স্বাদ থাকে না। এই কারণে যতবার আমি দেশের বাইরে গেছি এখানকার রূপে রসে ভরা আকাশ আমাকে ডাক দিয়ে পাঠায়। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন দিয়ে আমি ভালোবেসেছি বাঙালীর মেয়েকে, তার সকরুণ মাধুর্য্যে আমার মন অভিষিক্ত হয়েছে। যখন দূরে যাই এখানকার শ্যামশ্রীর স্মৃতিপটে তারি ছবিটি ফুটে ওঠে আমার মনে, মেঠো মূলতানের সুরে দূর থেকে বাজ্‌তে থাকে তারি কণ্ঠের গান বাংলার ভাষায়—

মনে রইল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায়গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হোলো না।

তখন কেবলি মনে পড়তে থাকে তমালতালীবনরাজিনীলা তটভূমি, সমুদ্রের পূর্ব্বপারে। আর মনে পড়ে মেঘচ্ছায়াঘন বর্ষার দিন আর ধারামুখরিত বর্ষার রাত্রি; বুকের মধ্যে বাজ্‌তে থাকে, মেঘৈর্মেদুরমম্বরংবনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অন্য কোন্‌দেশে পাব মাঘের শেষে আমের বোলের গন্ধের সঙ্গে মেশানো ক্লান্ত কোকিলের করুণ ডাক। আরো কত বলব কত সূক্ষ্ম কত বিরাট, কত গভীর, দেশে কালে সুদূর-প্রসারিত তার কত প্রতিবেদন, যার ভাষা নেই, যার ইঙ্গিত যূথীমালতীর সৌরভের মতো আর্দ্রবাতাসে সর্ব্বব্যাপী। অথচ এদেশের মানুষ পদে পদে আমাকে কঠিন আঘাতে জর্জ্জর

করেছে, নির্ম্মমভাবে আমাকে অবমানিত করেছে, অসহ্য হয়েছে কতবার, নিঃশব্দে আমি তা সহ্য করে এসেছি, তবুও আজ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারলুমনা তোমাদের আমি চাইনে। আমি অত্যন্ত বেশি বাঁধা পড়ে গেছি, দুঃসহ দুঃখেও আমার নিষ্কৃতি নেই। অথচ এও জানি সমাজের বাইরে একটা পারিবারিক দ্বীপের নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার জন্মদেশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলুম, সেই বিচ্ছেদের সমুদ্র পেরিয়ে দেশের শস্যক্ষেত থেকে আমি ফসল আনতে পারিনি, নিজের খাদ্য আমার নিজেকে একলা জন্মাতে হয়েছে, তার জাত আলাদা। দেশকে আমি যতই ভালোবাসিনে কেন, অনিবার্য্য কারণে আমার মন তবু আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সেইজন্যে এখানকার বাজারে সাহিত্যযাচনদার প্রবীণ মুরুব্বি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করতে বসে আমার অনেক সময়ে হাসি পায়। আমি যে জন্মব্রাত্য, শিশুকাল থেকেই আমি শ্রেণীভ্রষ্ট, এমনকি ব্রাহ্মসমাজও আমাকে খুঁটিতে বাঁধতে পারেনি। এইজন্যেই দেশের লোকের কাছ থেকে আমি প্রশংসা পেয়েছি প্রীতি পাইনি। কিন্তু বাঁধনের সর্ত্তে প্রীতি যদি না পেয়ে থাকি তবে তা নিয়ে খেদ করব না।···

এ কথা মনে রেখো যে দেশেই থাকো তোমার সার্থকতা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। ইতি ২৫ এপ্রেল ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬

২৯ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এ মেলে তোমার আর একখানি চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। বোধ হয় শুনে থাকবে আমরা দলবল নিয়ে সিংহলে যাচ্চি। অর্থসংগ্রহের এই পন্থা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, সব সময়ে সন্তোষজনকও হয় না। কিন্তু অনুশীলনার দিক থেকে এর মূল্য আছে। সিংহলবাসীরা উৎসুক হয়ে আছে তারা আর্টের এমন একটা আদর্শ পাবে, যেটা তাদের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নতুন পথ করে দেবে। বোম্বাইয়ে আমরা কিছু অর্থ পেয়েছিলুম কিন্তু উপকার করেছি তার চেয়ে বেশি। এই কাজটাকে বোধহয় বিশ্বভারতীর একটা প্রধান কাজের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। আজকালকার দিনে সব চেয়ে তারস্বর পলিটিক্সের ; তার কাছে যখন আমাদের গান নিয়ে নাচ নিয়ে দাঁড়াই তখন সভাসুদ্ধ লোক অবজ্ঞা করে আমাদের তাড়িয়ে যে দেয় না এইটেতে বুঝতে পারি বধিরের কানেও মন্ত্র প্রবেশ করে। আজকাল বাংলাদেশ থেকে নাচ গান ও ছবির ঢেউ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়চে এর প্রথম প্রবর্ত্তনা এইখান থেকেই. সে কথা স্বীকার করতে হবে। হৈমন্তী নাচে বিশেষ একটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেচে। ওর মধ্যে সত্যিকার আর্টিস্ট্ আছে সে জেগে উঠেচে— এই নিয়ে সে খুব আনন্দ পেয়েছে। আমরা চেষ্টা করব ওকে এই পথে যথাসম্ভব এগিয়ে দিতে।—

তুমি ওখানে আমার বাণীকে প্রকাশ করবার ভার নিতে চাও শুনে খুসি হলুম। আজকাল আমার নীরব হবার সময় এসেছে। এখন আমার গোধূলির কাল। এখন আমার দূরকালের স্মৃতিপটে নানা রং ভেসে উঠ্‌চে, কিন্তু গানের সময় শেষ হয়ে এলো। যে সব কথা বলবার ছিল তাদের অজস্র বলতে পেরেচি জীবনের বসন্তকালে প্রথম উপলব্ধির আনন্দে —প্রজাপতি যেমন ডানা নিয়ে গুটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে চিত্তভাবও তেমনি আপন নানাবর্ণবিচিত্র ভাষা সঙ্গে নিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। আজ নূতন প্রসারিত সেই সহজ-চঞ্চল ভাষা নেই— নিজের পুরোনো লেখা— অন্তত ইংরেজি লেখা— সম্পূর্ণ অন্য জন্মের বলে বোধ হয়, এখন আর সে আপন ইন্দ্রজাল নিয়ে ধরা দেয় না। অতএব আজ আমার হয়ে বলবার ভার তোমাদেরই পরে, তোমাদের কণ্ঠস্বরে বাধা নেই ব'লে তাই আনন্দ পাবে— আমার হাতে যা এতদিনে ম্লান হয়ে গেছে তোমার হাতে আবার তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ইতি
২৯ এপ্রেল ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

১৫ মে ১৯৩৪

ওঁ কলম্বো

কল্যাণীয়েষু

বড়ো দুঃসময় পড়েছে। প্রথমত প্রজারা নিঃস্ব, শস্যের দাম অসম্ভব কমে গেছে, খাজনা প্রায় একেবারেই বন্ধ। নোবেলপ্রাইজের সুদ বন্ধ। বরোদার রাজা তাঁর মাসিক ৬০০ টাকার দান বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের সাংসারিক ও বিশ্বসাংসারিক খরচপত্র আয়ের তলানি এবং ঋণ দিয়ে চালাতে হচ্চে। তাই বেরিয়েছি দলবল নিয়ে, নাচগান করে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। গেলবারে বোম্বাই থেকে কিঞ্চিৎ পেয়েছিলুম, না পেলে মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হোতো। এবারে এসেছি সিংহলে। মনোহরণ করতে পেরেছি কিন্তু সেই পরিমাণে অর্থহরণ করা সহজ নয়। বিশেষত এতদূরে সমস্ত দল নিয়ে আসার ব্যয় বিপুল। খরচ বাদে অল্প কিছু উদ্বৃত্ত থাকার আশা করা যায়। এ কিন্তু ফুটো কলসীতে জল ঢালা, যে টাকা আনি তাতে ছিদ্র বোজে না— ক্রমাগতই অকুলানের ধারাকে প্রবাহিত রাখার জন্যেই আমি দেশ বিদেশ থেকে টাকা আনচি— কিন্তু চিরদিন তো বাঁচব না।—

য়ুরোপের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার জন্যে আমাদের কাউকে সেখানে যদি রাখতে পারি তবে সেটা নিশ্চয় কাজে লাগবে। রথীকে সে কথা বলেচি। তার কোনো ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না রথী ভাবচেন। শান্তিনিকেতনে কলেজ ইস্কুলটা

বস্তুত বিশ্বভারতীর আপন সন্তান নয়, পোষ্যপুত্র। ওরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই— অথচ ওদের পোষবার জন্যেই আমাদের যথার্থ নিজের কাজকে দেউলে অবস্থার অতলস্পর্শ গহ্বরের মুখের কাছে দাঁড় করিয়েছি— সবসুদ্ধ একদিন ডুবতে হবে। কিন্তু মোহের ছলনা এ'কেই বলে— সত্যের চেয়ে মায়ার প্রলোভন বেশি। আমার কিছু করবার দিন নেই। এখন কন্‌স্টিট্যুশন— তার জন্যে খাটতে হয় কিন্তু তাকে দূর থেকে নমোনমঃ। ইতি ১৫ই মে ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮
২৬ মে ১৯৩৪

ওঁ চন্দননগর

কল্যাণীয়েষু

এ বৎসর অসহ্য গরমে তাড়া করে বের করে এনেছে শান্তিনিকেতন থেকে। গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েছি— অনেককাল পরে আরেকবার সেই বোটের আতিথ্য নিতে হোলো। এ পদ্মার চর নয় চন্দননগরের নদীতীর। ঠিক এই জায়গাটাতে সামনের ঐ বাড়িতে ছিলুম যখন আমার বয়স আঠারো। মনে পড়ে সেই কাঁচা বয়সের কথা। মনটা কীরকম ছিল নৈহারিক, আপনাকে ভালো করে পাই নি বলে নিজেই নিজের কাছে সব চেয়ে অচেনা ছিলুম। কিন্তু যখন ছিলুম বোটে

তখন মনটা দানা বেঁধে উঠছিল। তখন সোনার তরীর কবিতার কাছাকাছি ঘুরচি। সাধনায় ছোটো গল্প লিখচি মাসে মাসে। কল্পনার ফোয়ারার মুখে লেখার ধারা তখন অজস্র চলছিল। বোটের বাসা আমার সেই অবারিত রচনার সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। বোটে প্রাণযাত্রার আয়োজন উপকরণ অত্যন্ত বিরল; প্রকৃতির আমন্ত্রণ চারদিকে ছিল সীমাহীন বাধাহীন, কিন্তু সংসারটা ছিল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে— দিনযাপনের মধ্যে ভার ছিল না, দায় ছিল না, আসবাব-পত্রের বোঝা ছিল না, লোকব্যবহারের উত্তর প্রত্যুত্তর ছিল না— আপনার মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়বার পথে দরজার কাছে কিছুই পায়ে এসে ঠেকত না। আজ বোটে এসে কতকটা সেই রকম সামগ্রীবিরল দিন পাওয়া গেছে। এখানে কোনো খবর এসে পৌঁছয়না, খবরের কাগজ পড়ি নে, যাদের কিছুমাত্র খাতির করতে হবে এমন সঙ্গী একজনও নেই। পড়বার বই অল্প কয়েকটা আছে, না পড়বার সময় সুদীর্ঘ। বেশ লাগচে। কবিতায় সনেট যেরকম বোটের জীবনযাত্রা ঠিক সেই জাতের, সুপরিমিত, তাতে বাহুল্য কিছুই নেই— দিনটা রাত্রিতে এসে পরিসমাপ্ত হয় অতি সহজে। টমসনের চিঠি পেয়েছি— আমার কবিতা সঞ্চয়িকায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেচে। আনুষঙ্গিকভাবে বলেছে জগতে আমি best short story writer। নির্ব্বাচনের কাজ কি চল্‌চে? তোমার কি যথেষ্ট অবকাশ আছে? উপযুক্ত লোকের পরামর্শ নিয়ো —মাঝে মাঝে মাজাঘষা করারও বোধ হয় প্রয়োজন হবে।

টমসনের চিঠিতে দেখলুম, তোমাকে অপ্রকাশিত যে কবিতাগুলো পাঠিয়েছিলুম, তার সম্বন্ধে Sturge Moore প্রশংসা করে বলেছে, They are of first rate quality। সেগুলোও কি কাব্যসংগ্রহে স্থান পাবেনা? বাছাই করার পরে আমার সম্মতির জন্যে আমাকে পাঠাবার যে কোনো প্রয়োজন আছে তা আমার মনে হয় না। কেননা এ সম্বন্ধে সেখানকার সমজদারের বিচারই চরম বলে গণ্য করতে হবে। আমার পক্ষে ঠিকমতো বোঝা একেবারেই অসম্ভব। যাই হোক এই কাজটা যত সত্বর পারো সেরে ফেলো। ···

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা যত শীঘ্র পারি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ও বইটা নিয়ে আমার দেশবাসীর মধ্যে নিন্দা-প্রশংসার তুমুল তোলাপাড়া চলচে। বিদেশেও যদি নিন্দিত হয় তাহলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে। কিন্তু আজকাল আমার মন নিন্দাপ্রশংসায় অত্যন্ত উদাসীন হয়ে আসচে। সাহিত্যিকের পক্ষে সেটা ভালো কি না সন্দেহ করি।

যে ফরাসী যুবকদের কথা লিখেছিলে তাঁরা এসে পোঁচেছেন— আজকালের মধ্যেই আমার এখানে দেখা করতে আসবেন।—

তোমাকে আমার কবিতার যে তর্জ্জমা পাঠিয়েছি তার শেষ দুটি লাইন বাদ পড়েছে বলে নালিশ করেছ। বইখানা হাতের কাছে নেই— তাই ওটাকে সম্পূর্ণ করা শক্ত।

In the heart of the day allowed to me
I feel the invisible roll of
Time's chariot wheel rushing in silence।

কিন্তু এটা ঠিক জোড়া লাগবে কিনা তা তো আন্দাজে বলতে পারচিনে। ইতি মে ২৬ ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

Adyar
মাদ্রাজ

কল্যাণীয়েষু

তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। এতরকম লেখাও লিখ্‌তে হয়েছে। আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা এখন স্বভাবত ছোটে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে। কর্ত্তব্য ফাঁকি দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম লীলা দিয়ে— পড়া এড়িয়ে লিখেছি কবিতা। মধ্যবয়সে সেই অকর্ম্মণ্যতা খুব কষে পূরণ করেছি লিখে লিখে। সে সব লেখা বোঝাটানা লেখনীর লেখা। তখন সেটাতে প্রবৃত্তি ছিল। নানা ভাবনা ভাবতুম আর লিখ্‌তুম— গদ্য ভাষায় নানা চাল উদ্ভাবন করতে ভালোই লাগত— তখন বাংলা গদ্য ভাষার গতিতে কলাবৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল না। তার

চাল দুরস্ত করবার কর্ত্তব্য শেষ করেছি। তার আড়ষ্টভাব গেছে, সে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে হাত পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার কলাচর্চ্চার সখটা ছুট্‌চে ছবির দিকে। এর মাঝখানে কর্ত্তব্যের গদি থেকে বক্তৃতার ফরমাস এলে ধৈর্য্য থাকে না। অথচ উপায় নেই। এখন মাদ্রাজে এসে এই লোকহিতকর পালা চলচে— টাগোরকে সাজতে হচ্চে কখনো শিক্ষাসংস্কারক, কখনো পল্লিসংস্কারক, কখনো বিশ্বসংস্কারক। এখন সব সাজ ফেলে দিয়ে চিত্রকূটের শিখরে চড়ে নির্জ্জনবাসের জন্যে মন উৎসুক।

তুমি তো পাড়ি দিলে সমুদ্রপারের দিকে— মনটা পিছনের টান এড়াতে পারছিল না— কেননা তখনো ওপারের ভোজে পাত পড়ে নি, দুদিকেই তখন ফাঁকা। আমি নিশ্চয় জানি সেখানে পৌঁছলেই মানুষের আহ্বান আসবে, সাড়া দেবে তোমার মন। এদেশে ভিড় আছে, এক খাঁচায় অনেকগুলি বন্দী পাখীর ভিড়। তাদের বাণী নেই, গান নেই, তারা কিচিমিচি করে, খোঁচাখুঁচি করে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে থাক্‌তে হয় কেননা সর্ব্বদা খাটো হয়ে আছি বলে। ভূমৈব সুখং —এখানে মানুষের ব্যবহারে ভূমার স্পর্শ নেই। তারস্বর উঠচে পলিটিক্সের হাটে। কিন্তু তার মধ্যে কী ক্ষুদ্রতা, কত মিথ্যা। মিথ্যার মিশোল সকল দেশের পলিটিক্সেই আছে। কিন্তু সে যেন দুধের সঙ্গে জলের মিশোল। আমাদের এখানে গোড়ার জিনিষটাই জল, অবাস্তবতা— তাতে হোয়াইট্যাবের দোকান থেকে কেনা টিনের দুধের ছিটে। গোড়ায় মস্ত ফাঁকি

ওঁ

Adyar
মাদ্রাজ

কল্যাণীয়েষু

তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। এত রকম লেখাও লিখতে হয়েছে। আজকাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায়। মনটা এখন স্বভাবত ঝোঁকে ছবির দিকে। লেখায় খাটাতে হয় কর্তব্যবুদ্ধিকে। কর্তব্য ফাঁকি দেওয়ার দিকেই মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। জীবন আরম্ভ করেছিলুম লীলা দিয়ে — সেটা এড়িয়ে লিখেছি কবিতা। মধ্যবয়সে সেই অকর্মণ্যতার খুব কষে পূরণ করেছি লিখে লিখে। সে সব লেখা তোমাদের চেনা লেখনীর লেখা। তখন সেটাতে প্রবৃত্তি ছিল। নানা ভাবনা ভাবতুম আর লিখতুম — গদ্য ভাষায় নানা চাল উদ্ভাবন করতে ভালোই লাগত — তখন বাংলা গদ্য ভাষার সাহিত্যে কলাবৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল না। তার চাল দুরস্ত করবার কর্তব্য শেষ করেছি। তার আত্মনির্ভর হয়েছে, সে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে হাত পা খেলাতে পারে। তাই এখন আমার কলম চঞ্চল স্বভাবত ছুটেছে ছবির দিকে। এর মাঝখানে কর্তব্যের দাবি থেকে বক্তৃতার ফরমাশ এল [illegible]। অথচ উপায় নেই। এখন

মাঝপথে এসে এই লোকহিতের পালা চলচে — ঠাকুরকে সাজতে হচ্চে কখনো শিক্ষাসংস্কারক, কখনো পল্লিসংস্কারক, কখনো বিশ্বসংস্কারক। এখন সব সাজ ফেলে দিয়ে চিত্রকূটের শিখরে চড়ে নির্জনবাসের জন্যে মন উৎসুক।

তুমি তো পাড়ি দিলে সমুদ্র পারের দিকে — মনটা পিছনের টান এড়াতে পারছিল না — কেননা তখনো ও পারের লোকে হাত ধরে নি, দুদিকেই তখন ফাঁকা। আমি নিশ্চয় জানি সেখানে পৌঁছলেই মানুষের আহ্বানে আবার সাড়া দেবে তোমার মন। এদেশে ভিড় আছে, এক খাঁচায় অনেকগুলি সঙ্গী পাখীর ভিড়। তাদের ডানা নেই, গান নেই, ওরা কিচিমিচি করে, খোঁচাখুঁচি করে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে থাকতে হয় কেননা সর্বদা সাথী হয়ে আছি দলে। দুঃখের মূল — এখানে মানুষের ব্যবহারে ভূমার স্পর্শ নেই। তারস্বর উঠচে পলিটিক্সের হাটে। কিন্তু ওর মধ্যে কী ক্ষুদ্রতা, কত মিথ্যা। মিথ্যার মিশোল সকল দেশের পলিটিক্সেই আছে। কিন্তু সেখানে দুধের সঙ্গে জলের মিশোল। আমাদের এখানে গোড়ার জিনিষটাই জল, অবাস্তবতা — তাতে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর দোকান থেকে কেনা টিনের দুধের ছিটে। গোড়ায় মস্ত ফাঁকি রয়ে গেছে — এ দেশের

হিন্দুস্থানির পরে তার দিকে মহাত্মাজির নজর পড়েছে।

এসব তোমার edit করতে দিচ্ছি। তার সঙ্গে এ নিয়ে মোকাবিলা কোরো। তাকে সংশোধিত ও মুদ্রিত এক কপি দিয়েছি। সেই সঙ্গে তার অনুবাদ। ওটা একটু হাত চালিয়ে শোধ করতে পারো যদি ভালো হয়। আমার নিজের মনে হয়, কোনো আপত্তি না করে ছাপিয়ে দেওয়াই ভালো। এসব কী বলেন?

আমার সমস্ত ইংরেজি কবিতাগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে ছাপাবার প্রস্তাবটা ভুলো না। ইয়েট্স্ কিম্বা কোনো কবির সাহায্য নিয়ে বাছাই করা ভালো। ওতে কিছু কাঁচা জিনিষ আছে— হয়তো কাঁচা লাইনগুলোকেও মাজাই করা দরকার। স্বয়ং সুধীর উপস্থিতি থাকলেই ভালো হোতো। কিন্তু সেই অকিঞ্চনের প্রত্যাশায় থেকো না। নিজের লেখার তর্জমায় ঢের ঢের অবিচার করেছি। নিজের লেখা বলেই বোধ করি এত শৈথিল্য, এত অনাদর।

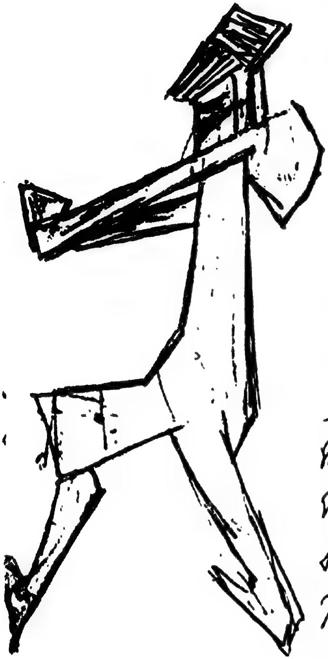

আমার সাম্প্রতিক কীর্ত্তির কিছু
নমুনা খবরের কাগজের
আবর্জ্জনা থেকে উদ্ধার করে
পাঠাচ্ছি।

Man নামক তিনটে
বক্তৃতা Humanismএর চূড়ান্ত
এইটেই রাধাকৃষ্ণনের অভিমত।
কিন্তু এত জোরাল মদ তাদের
পছন্দসই হবে কিনা সন্দেহ।
সেই সম্বন্ধে একটা বড় লেখা
লিখেছি সেটা ও সঙ্গে চলল —
কিন্তু সেটা রাধাকৃষ্ণনের দখলে
তাঁদের Contemporary Indian
Philosophy নামক গ্রন্থের জন্যে।
ইতি ২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রয়ে গেছে— এতদিন ধস্তাধস্তির পরে তার দিকে মহাত্মাজির নজর পড়েছে।

টমসন গোরা Edit করতে রাজি। তার সঙ্গে এ নিয়ে মোকাবিলা কোরো। তাকে সঞ্চয়িতা ও পুনশ্চ এক কপি দিয়েছি। সেই সঙ্গে চার অধ্যায়। ওটা একটু হাত চালিয়ে শেষ করতে পারো যদি ভালো হয়। আমার নিজের মনে হয়, কোনো অপেক্ষা না করে ছাপিয়ে দেওয়াই ভালো। টমসন কী বলেন ?

আমার সমস্ত ইংরেজি কবিতাগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে ছাপাবার প্রস্তাবটা ভুলো না। ইয়েট্‌স্‌ কিম্বা কোনো কবির সাহায্য নিয়ে বাছাই করা ভালো। ওতে বিস্তর কাঁচা জিনিষ আছে— হয় তো কাঁচা লাইনগুলোকেও ঝালাই করা দরকার। স্বয়ং স্বশরীরে উপস্থিত থাকলেই ভালো হোতো। কিন্তু সেই অনিশ্চয়ের প্রত্যাশায় থেকো না। নিজের লেখার তর্জ্জমায় ভূরি ভূরি অবিচার করেছি। নিজের লেখা বলেই বোধ করি এত শৈথিল্য, এত স্পর্দ্ধা।

আমার মাদ্রাজিকীর্ত্তির কিছু নমুনা খবরের কাগজের আবর্জ্জনা থেকে উদ্ধার করে পাঠাচ্চি।

Man নামক তিনটে বক্তৃতা Unwinরা ছাপায় এইটেই রাধাকৃষ্ণনের অভিমত। কিন্তু অত ছোটো বই তাদের পছন্দসই হবে কিনা সন্দেহ। আর্ট সম্বন্ধে একটা বড়ো লেখা লিখেছি সেটা ঐ সঙ্গে চলত— কিন্তু সেটা রাধাকৃষ্ণন দখল

করচেন Contemporary Indian Philosophy নামক বইয়ের জন্যে। ইতি ২৩ অক্টোবর ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

১৫ নবেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার প্রেরিত দুখানা প্যাম্ফলেট শেষ করে তোমাকে লিখতে বসলুম। মাদ্রাজ থেকে তোমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছি বোধ হয় পেয়েচ। ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে নাচগান বর্ষণ করে বেড়ানো এই আমার এক কাজ হয়েচে। হাসি পায় মনে করলে যখন ভাবি এই সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত দেশ জুড়ে বক্তৃতামঞ্চে কন্‌গ্রেসের উত্তেজনা বিস্তার করে বেড়াচ্চেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু কী স্তূপাকার অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা। এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের অনৈক্য কেবল ভাষাগত নয় স্থানগত নয় মজ্জাগত। পরস্পরের মানবসম্বন্ধ কেবল যে শিথিল তা নয়, অনেকস্থলেই বিরুদ্ধ। আমরা ভোটের ভাগ বিভাগ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছি, যেন অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাক্‌লেও ভোটের সামঞ্জস্যে এই ফাটল ধরা দেশের সর্ব্বনাশ নিবারণ করতে পারবে।

আজকাল আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখবার চেষ্টা করি; মরবার কারণ যেখানে আছে সেখানে মরেই এর চেয়ে সহজ কথা কিছুই নেই। পার্লামেণ্টরি রাষ্ট্রতন্ত্র! একি বিলিতি দাওয়াইখানা থেকে ভিক্ষে করে আন্‌লেই তখনি আমাদের ধাতের সঙ্গে মিলে যাবে! নিয়ুয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমাটির উপর বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে। সাদা কাগজের মোড়কে আমাদের ভাগে কী দান কী পরিমাণে এসে পৌঁছল সেটা বেশি কথা নয়, যাকে দেওয়া হচ্চে তারি পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে কতটা টেঁকে সেইটেই ভাববার বিষয়। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় যে আমাদের এতখানি দিতে প্রস্তুত হয়েচে। সন্দেহ নেই যে এই দেওয়াটাই শেষ কথা নয়, এটা আমাদের ভবিষ্যতের বড়ো দাবীকে উত্তেজিত করে দেওয়া মাত্র—থলির মুখ খুলল, এর পরে শেষ পর্য্যন্ত থলি ঝেড়ে দিতে হবে,—ওর শিলমোহরটা এবার টুট্‌ল। বিদেশী সাম্রাজ্যের এতটা দাক্ষিণ্য ইংরেজজাতের ছাড়া আর কোনো জাতের হাত দিয়ে হতে পারত না। হয়তো এই দানের সঙ্গে সঙ্গে সুবুদ্ধিও আছে। জগৎ জুড়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণিবাতাস জেগে উঠচে তাতে ভারতবর্ষের মন না পেলে ভারতবর্ষকে শেষ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করা সম্ভব হতে পারে না। যে মুসলমানকে আজ ওরা সকলরকমে প্রশ্রয় দিচ্চে সেই মুসলমানই একদিন মুষল ধরবে। যাই হোক্, লুব্ধতা স্বভাবে প্রবল থাকলে

সুবুদ্ধির দূরদর্শিতা কাজ করতে পারে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস য়ুরোপের অন্য যে কোনো জাত এমন কি আমেরিকান কর্ত্তা হলে ভারতবর্ষের গলার ফাঁসে আরো লাগাত জোর—নিজেদের নির্ম্মম বাহুবলের পরেই সম্পূর্ণ ভরসা রাখত।—আমাদের তরফে একটা কথা বলবার আছে, ইংরেজের শাসনে যতই দাক্ষিণ্য থাক্ আজ পর্য্যন্ত না মিলল আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা, না জুটল যথেষ্ট পরিমাণে পেটের ভাত, না ঘটল স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। শাসনতন্ত্রের কাঠামো রক্ষা করতেই পুঁজি শেষ হয়ে আসে, প্রজাদের মানুষ করে তুলতে হাতে কিছুই থাকে না। এই ঔদাসীন্য আমাদের শতাব্দী ধরে হাড়ে মজ্জায় জীর্ণ করে দিল। আমাদের পাহারা আছে আহার নেই এমন অবস্থা আর কতদিন চল্‌বে। অথচ ওদের নিজের দেশে প্রজার অন্নাভাব সম্বন্ধে ওদের কত চিন্তা কত চেষ্টা। কেননা ওরা ভালো করেই জানে আধপেটা অবস্থায় কোনো জাতের মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। আমাদের বেলায় সেই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ওরা ছোটো করে নিয়েছে তারি নির্ম্মমতা আমাদের সুদূর ভাবীকালকে পর্য্যন্ত অভিভূত করে রেখেচে। তাই মনে হয় নিজেদের স্বভাবগত সমাজগত প্রথাগত সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও নিজের দেশের ভার যে করেই হোক নিজেকেই নিতে হবে। পরের উপর নির্ভর করে থাকলে দুর্ব্বলতা বেড়েই চলে, তা ছাড়া ইতিহাসের আবর্ত্তমান দশাচক্রে অনন্তকাল ইংরেজের শাসন অচলপ্রতিষ্ঠ থাকতেই পারে না। নিজের ভাগ্য নানা ভুলচুক নানা দুঃখকষ্ট বিপ্লবের

মধ্য দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই।— সেই শিক্ষার আরম্ভপথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম।✓য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়,— চিরদিনই চীনের মতোই ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব কী দুঃখ কী অন্ধতা কী শোচনীয় নিঃসহায়তা, বলে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্ব্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি, না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার এই গ্রামের কাজে✓ এতদিন পরে মহাত্মাজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন— অনেক আগে সুরু করা উচিত ছিল, এ কথা আমি বারবার বলেচি। আজ তিনি কন্‌গ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন এর অর্থ এই যে কন্‌গ্রেস জাতিসংঘটনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিল্‌লে অনতিবিলম্বে মাথা ঠোকাঠুকি করে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ

করতে পারে না। আমার অল্পশক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারি নি কিন্তু এই কথা মনে রেখো পাবনা কন্‌ফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেচি। আর, ✓ শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে, ফলের কথা আজ কে বিচার করবে।— খেলাচ্ছলে আমার তিনটে গানের ইংরেজি তর্জ্জমা করেছি তোমাকে এই সঙ্গে পাঠাই। ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯৩৪

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি চয়নিকার প্রস্তাব ভালো। প্রবন্ধগুলো type করিয়ে পাঠাব। চার অধ্যায়ের কথা ভুলো না। Gilbert Murrayর চিঠি পাইনি। তোমার হাত দিয়ে Maud Roydenকে চিঠি পাঠিয়েছিলুম— তিনি পেয়েছেন তো? Muriel Lester?

৭১

২৮ নবেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার কবিতার ইংরেজি তর্জ্জমা পড়ে দেখলুম। Fruit Gathering এবং Lover's Giftএর অধিকাংশ কবিতাই একেবারে অচল। পড়তে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হোলো। কী

রকম কাঁচা হাতে অবহেলা করে লিখেচি। এগুলো বরাবরকার মতো বাদ দিতে হবে। Fugitive থেকে গোটাকতক বাদ পড়বে। যেগুলো বর্জ্জনীয় বলে দাগ দিয়েছি তার দু চারটে সম্বন্ধে ঈষৎ দ্বিধা হয়েচে। যাই হোক ভালো করে পড়ে দেখো। Crossingএর অনেকগুলোই ভালো লাগল। আমার বোধ হয় গীতাঞ্জলির পরেই সেগুলো ছাপানো যেতে পারে। মূল কবিতাগুলির সময়পর্য্যায় দূরবর্ত্তী নয়। ইংরেজি বইয়ের নাম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ না করে এবং ঐ নামগুলো একেবারে বাদ দিয়ে যদি কবিতাগুলি ছাপানো যায় তাহলেই আমার মতে সেটা ভালো হয় কারণ ঐ বইগুলি এখন থেকে একেবারে চাপা দিতে হবে। অমনিতেই বিক্রি হয় না সুতরাং লোকসানের আশঙ্কা নেই। Gitanjali, Gardener, Crescent Moon, Fugitive, Chitra, Sacrifice and Other Plays— এইগুলো একত্র করে একখানা বই বের করাই শ্রেয়, আর ওরি সঙ্গে অন্য বই থেকে বর্জ্জনীয় বাদ দিয়ে বাকিগুলো গেঁথে দিলেই চলে যাবে। Stray Birds এবং Fireflies একদল পাঠকের কাছে উপাদেয়— সকলের কাছে হয় তো নয়। ওর কোন্‌গুলো রাখা যেতে পারবে উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির কোরো— আমার পক্ষে বলা শক্ত। Sacrifice and Other Plays চলবে কি না জানিনে— সেও তোমরা ঠিক কোরো। চিহ্নিত বইগুলি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।…

বিশ্বভারতী Journal থেকে আমার গদ্য লেখা টাইপ

করিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। হাল আমলের কবিতাগুলোও *সেইসঙ্গে পাঠাব*— যদি ইংরেজি চয়নিকায় সেগুলো যাবার যোগ্য মনে করো তো দিতে পারো। মোদ্দা কথা এই চয়নিকা[র] জন্য কাব্যবিচারে আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কোরো না। আমি ঠিক বুঝতেই পারিনে। কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবার দরকার নেই— কারণ আমার ইংরেজি লেখা সম্বন্ধে লেখকজনোচিত অহঙ্কার আমার লেশমাত্র নেই। এ চিঠিটা Air Mailএ যাবে কিন্তু বইগুলো যাবে সাধারণ ডাকে— অতএব পৌঁছতে দেরি হবে। য়ুরোপে যাবার সঙ্কল্প মাথার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জরিত হচ্চে। ইতি ২৮ নবেম্বর ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Gitanjali, Gardener, Crescent Moon, Chitra পাঠাবার দরকার নেই বলে পাঠালুম না— Gitanjali থেকে শিশুদের কবিতা অবশ্য বাদ পড়বে। আমি যেগুলো চিহ্নিত করেছি তারো অতিরিক্ত কিছু যদি ছাঁটতে চাও নির্ম্মমভাবে ছেঁটো।

৭২

১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ইতিমধ্যে কাশি ঘুরে এসেচি। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন মালব্যজির অস্বাস্থ্যের জন্যে পিছিয়ে গেছে, কিন্তু সঞ্জীব রাওয়ের বিদ্যালয়ে আমার আমন্ত্রণ ছিল সেটা আর কাটাতে পারলুম না। আবার আমাকে যেতে হবে ৮ই ফেব্রুয়ারিতে। আজকাল বাইরের দিকে দৌড়ধাপ আমার একটুও ভালো লাগে না। উদার প্রান্তর এবং উন্মুক্ত আকাশের নীচে আপনার মধ্যে নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে বসে থাকতে ভারি ভালো লাগে। এখন কাজ না করাটাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এ কথাটা সবাইকে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না। অথচ বাইরের ছোটো বড়ো নানাবিধ দায় আমার চারদিকে প্রতিদিন জটিল জাল বিস্তার করচে— কিছুদিন থেকে জনতার ক্ষেত্রে আমাকে আগেকার চেয়ে বেশি করেই ঘুরপাক খাওয়াচ্চে। এর প্রয়োজনীয়তা অতি যৎসামান্য। এদের সরকারী ধুমধামের একটা সজ্জারূপে এরা আমাকে ব্যবহার করতে চায়— অথচ এই ব্যবহার্য্য জিনিষটির প্রতি এদের আন্তরিক মমতা কিছুমাত্র নেই— খুচ্‌রো কাজে আমাকে জীর্ণ করে ফেল্‌তে এরা অকুণ্ঠিত। আমি জানি অন্য দেশের সমাজে আমার মতো মানুষের প্রতি যেমন তেমন দাবী প্রয়োগ করতে সঙ্কোচ বোধ করে, এখানে সঙ্কোচ মাত্র নেই,

তার কারণ যথেষ্ট পরিমাণ শ্রদ্ধা নেই। এই কারণেই আমার মন অত্যন্ত ক্লান্ত এবং চারিদিক থেকে বিমুখ হয়ে পড়েচে। যদি অর্থে এবং সামর্থ্যে কুলোতো তাহলে কিছু কালের জন্যে বিদেশে অজ্ঞাতবাস করে আসতুম।

এতদিনে আমার চিহ্নিত বইগুলি বোধ করি পেয়েছ। ওগুলোর প্রতি চোখ বুলোতে গিয়ে দেখলুম একদা কী অযত্ন করে তর্জ্জমা করেচি। মূলটা ভাষান্তরে তার মূল্যটা কতদূর হারিয়ে ফেলচে সেটা যথোচিত সময় নিয়ে বিচার করি নি—আজ তার জন্যে লজ্জা বোধ হয়। তোমার কাছে আমার নিবেদন, সম্পূর্ণ আমার উপরেই নির্ভর না করে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ কোরো। অবিচার করবার আশঙ্কা আমার তরফ থেকেই বেশি।

তুমি সেই তিনটে গানের অনুবাদ ওখানে ছাপতে দিতে চেয়েচ। দিয়ো।

চার অধ্যায় গল্পের গোড়ায় একটা সূচনা লেখা হয়েচে—সেটা তোমাকে পাঠাব। ইতিমধ্যে স্থির করেচি বইটা এখানে প্রকাশ করে দেব। দেখাই যাক্ না কী পরিণাম হয়। কিন্তু তাই বলে তোমার তর্জ্জমায় ঢিল দিয়ো না। যদিই এখানে ওরা এটা বন্ধ করে দেয় সেখানে ওটা প্রকাশ চল্‌বে। এ কথা ওদের বোঝা উচিত সমস্ত গল্পটাই বৈভীষিক রাষ্ট্র-উদ্যমের বিরুদ্ধে।

আমাদের এখানে শীতের আবির্ভাব পরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে। তোমাদের ওখানকার কুহেলিকাবৃত মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিসিক্ত শীতের

কথা কল্পনা করলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রকৃতির স্পর্শ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার জন্যে সর্ব্বদাই তোমরা আচ্ছাদন বহন করে বেড়াচ্চ। সেই নিত্যবন্ধনদশার ভয়ে ও দেশে বাস করতে ইচ্ছে করে না। এখানে, বিশেষত, শান্তিনিকেতনে শীতকালটা অত্যন্ত রমণীয়— রৌদ্রের মধ্যে কী বিস্তীর্ণ প্রসন্নতা! পাতাঝরানো গাছ অতি অল্পই আছে। দুঃশাসন শীত বনলক্ষ্মীর বস্ত্র হরণে কৃতকার্য হতে পারে নি। শিউলি ফুলের দিন ফুরিয়েছে, কাঁটা নাগেশ্বর ফুলের গন্ধে বাতাস মদবিহ্বল, আর আমাদের হিমঝুরি ফুলের উচ্চচূড়-বীথিকা তার পাতার স্তবকে স্তবকে ঘন দোদুল্যমান ফুলের রূপোলি কারুকার্য্যে নিবিড় বিচিত্রিত। হিমঝুরি নামটা আমারি দেওয়া— ওর চলিত নাম জানি নে।

এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান্ ঘরে বাস করে এসেছি— কোথাও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারি নি। এবার কোণার্কের এই কোঠা থেকেও সরে যাবার চেষ্টায় আছি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্ত্ত্যলোকে ঐটেই আশা করচি আমার শেষ বাসা হবে। তারপরে লোকান্তর। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলবার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে হবে।

আমার ছবির সম্বন্ধে আমার খুব বেশি আগ্রহ নেই। এমন কি ওর সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচ আছে। আজও ছবিতে খ্যাতি অর্জ্জন করি নি বলে চিত্রকর-রূপে আমার মনটা মুক্ত, ও আপন খেয়ালে লীলায় রত লোকমতের নেপথ্যে—

কোনোদিন যদি দশের মনোরঞ্জন করে তো ভালোই, না করে তো ক্ষতি নেই। এই আঁকাজোকার যে স্থায়ী মর্য্যাদা আছে তা আজো আমার বিশ্বাসগম্য হয় নি। ভাবীকালের কাছে আমার পরিচয়ের সম্বল নিতান্ত কম জমে নি, তার উপরে আরো বাড়িয়ে তুলে লাভ কী। আমার মনে হয় কীর্ত্তিস্তম্ভকে যত প্রশস্ত করে গড়া যায় ততই কালের হাতে আক্রমণের লক্ষ্যকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যশের তরীতে বোঝাই যতই স্বল্প অথচ মূল্যবান করা যায় ততই ডুবির আপদ কমে। ইতি ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

১ জানুয়ারি ১৯২৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি চিঠিতে চিত্রপ্রদর্শনী সম্বন্ধে যা লিখেছিলে তা অল্প একটুখানি মেজে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিয়েছি, তোমার নাম দিইনি। তোমরা লণ্ডনে আমার ছবি দেখাতে চাও, আমি কিন্তু মনে উৎসাহ পাইনে—আমার ছবি এতই যূথভ্রষ্ট শ্রেণীহারা এতই অশিক্ষিত আঙুলের খেলামাত্র যে ওগুলোকে সমজ্‌দারের দৃষ্টির কাছে ধরতে আমি কুণ্ঠিত। আমার মৃত্যুর

পরে ওর আবরণ মোচন কোরো— তখন ওর মূল্য হবে ঐতিহাসিক দিক থেকে।

রাশিয়ার চিঠিতে এমন কিছু যদি বাদ পড়ে থাকে যেটাতে ওর স্বাদ নষ্ট হয় তাহলে সে তোমরা ফিরিয়ে নিতে পারো। কিন্তু নাম না দিয়ে একজায়গায় টমসনের উপর খোঁচা ছিল সে যেন না থাকে। ঝগড়াটে সুরটা undignified বলে অনেক জায়গায় ছেঁটেচি, কিন্তু তোমাদের মতে যদি তাতে ক্ষতি হয়ে থাকে যথোচিত ব্যবস্থা কোরো। বিশ্বভারতী পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখ্‌লুম তাতে রাশিয়ার দুই একটা চিঠির তর্জ্জমা আছে। তর্জ্জমা আমার নয়, হিরণকুমার সান্যালের— যদি তুলনা করে এটাই গ্রাহ্য মনে হয় তবে যথাকর্ত্তব্য কোরো। কপি করে পাঠিয়ে দেব।

গিল্‌বর্ট্‌ মারের সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তিনি তিন জায়গায় মাত্র অল্প কিছু বদল করেছেন, তাই নিয়ে তিনি কুণ্ঠিত। আমি তাঁকে চিঠি লিখব, ইতিমধ্যে যদি দেখা হয় তবে তাঁকে বোলো, তিনি যেটুকু বদল করেচেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, নিজের ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র অভিমান নেই সে তুমি জানো। নিজের শক্তির পরে অবিশ্বাস আছে বলেই ইংরেজি লিখতে আমি এত অনিচ্ছুক, কাউকে সহায় পেলে তবে ভরসা হয়। ইংরেজি ভাষার সাধনা করি নি তবু সিদ্ধির পুরস্কার পাব এ তো ন্যায়সঙ্গত নয়।— তোমাকে আর বারে যে কয়টা কবিতা পাঠিয়েছি— তার উপরে আরো গোটাকতক চোখে পড়ল— এইসঙ্গে পাঠাই। কিন্তু বারবার বলচি বাছাই

করবার ভার তোমাদের উপরে— সেইজন্যেই নিজে বাছাই করলুম না।— বাংলা সঞ্চয়িকা সম্প্রতি সুধীন্দ্রের হাতে এসে আট্‌কা পড়ে আছে··· তাকে তাড়া দিয়ে এসেছি।

"আবার জাগিনু আমি" কবিতার তর্জ্জমা চেয়েছ। সে কবিতা কার রচনা জানিনে। যদি আমার হয়, তবে কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যায় কে আমাকে বলে দেবে। আমার আধুনিক কালের কবিতা আমার আধুনিককালীন বিস্মরণশক্তির স্রোতে ভেসে চলে যায়, আমি তার নাগাল পাইনে। সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। উর্ব্বশী ও সাজাহানের পূরো তর্জ্জমা চেয়েচ। শক্তি নেই আমার— মন অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েচে— কী আমার বাংলা কী ইংরেজি, ভাঁটার নদীর মতো আমার মনের তটভূমি থেকে বহুদূরে সরে গেছে, স্রোতে পৌঁছতে সময় ও পরিশ্রম লাগে, তাই লেখা মাত্রেই আমার এত বিতৃষ্ণা। তবু দেখব যদি পারি।

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমাটা এসিয়া কাগজ চেয়েচে— অবশ্য দাম দেবে। সেটা আমার হাতের শোধন পাবার জন্যে আমার কাছে পাঠাবার দরকার আছে বলে মনে করিনে। তোমাদের সেখানকার ওস্তাদরা পছন্দ করলেই যথেষ্ট। ইতি
১ জানুয়ারি ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩ ক

৬ জানুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চার অধ্যায় প্রকাশ করে দিয়েছি। বিশ্বাস করিনে কর্ত্তারা ওটা বন্ধ করে দেবে— বন্ধ করবার ন্যায্য কারণ কিছুমাত্র নেই, তৎসত্ত্বেও যদি উপদ্রব করে তবে সেটা বোকামি হবে। বোকামির বিরুদ্ধে সতর্ক হবার দরকার বোধ করিনে। যাই হোক্ বইখানা যখন প্রকাশিত হোলোই তখন ওটা তর্জ্জমা করবার কোনো হেতু রইলনা। ⌄সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এরকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়, যদি তার সজীবতা না থাকে ৮ এবারে আমারই পুরানো তর্জ্জমা ঘাঁটতে গিয়ে একথা বারবার মনে হয়েচে। তুমি বোধ হয় জানো বাছুর ম'রে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায়না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্ত্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি তৈরি করা হয়, তারি গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জ্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূর্ত্তি— তার আহ্বান নেই ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয়, তবে যার গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে। পরিচয়ের

অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব-ঘটে তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্য্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের দশা ঘটে, মিলটনের পর ড্রাইডেন পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীন রূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্ব্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল— তার মধ্যে ছিল সর্ব্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রতমনকে পথ নির্দ্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, কেবল বিজ্ঞান নয় সাহিত্যসম্পদও আপন উদ্ভবস্থানকে অতিক্রম করে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য যদি সীমাবদ্ধ হয় যদি তাতে আতিথ্যধর্ম্ম না থাকে তবে স্বদেশের লোকের পক্ষে সে যতই উপভোগ্য হোক না কেন সে দরিদ্র। আমরা নিশ্চিত জানি, যে,

যে-ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিদ্র নয়, তার সম্পত্তি স্বাজাতিক লোহার সিন্ধুকে দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।

একদা ফরাসী বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস-পরায়ণ। ধর্ম্মই হোক রাজশক্তিই হোক যা কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায় তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান, সেই বিশ্বকল্যাণ ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ, সে মুক্তদ্বার সাহিত্য, সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতি ও পরজাতির মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ। স্বার্থসাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষা, তাদের ভেদনীতি অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে উঠছিল, সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয়স্রাবে য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেইজন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায়না, তা শান্তি আনলেনা।

তারপর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আস্‌চে— প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা

বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয় যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠ্‌চে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখিনে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জান্‌তুম— অকস্মাৎ দেখ্‌তে পাই সমস্ত যাচ্চে বিপর্য্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠচে, হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে-ভীরুতা বিষয়বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয় যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুর্গ্রহ আপন প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে তারা আপন স্বাধীনতা আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন কী, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্ব্বরতাকে শিরোধার্য্য করে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতায় মানুষের আভিজাত্য নষ্ট করে দেয়, তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ য়ুরোপ এই যে আপন মনুষ্যত্বের খর্ব্বতা মাথা হেঁট করে স্বীকার করচে, আত্মরক্ষার উপায়রূপে নির্ম্মাণ করচে আপন কারাগার এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করচে না? ইংরেজি সাহিত্যে একদা আমরা বিদেশীরা যে নিঃসঙ্কোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম আজ কি তা আর আছে? একথা বলা বাহুল্য

প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য, কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর নিকটের সকল অতিথিকেই আসন জোগাতে পারে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য, সকল কালেরই মানুষ সেই সাহিত্যের স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে তোলে, তার প্রতিষ্ঠাভিত্তি সর্ব্বমানবের চিত্তক্ষেত্রে।

আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বল্‌তে পারি তা আমারি ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলচি,— অথবা তাও নয়— একজন মাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলচি— আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার একথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই কথা বলতে হবে এই সাহিত্যের অন্য নানাগুণ থাক্‌তে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্ব্বভৌমতা, যাতে করে বিদেশ থেকে আমিও এ'কে অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের

যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করচি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্চে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই একটা ব্যতিক্রম যে নেই তা হতেই পারে না। মনে পড়চে রবার্ট ব্রিজেসের নাম। আরো আছে।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকর্তর নিকটবর্ত্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্ত্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্দ্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের

আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনস্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারেনা, বল্‌তে পারেনা বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বল্‌তে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে তাহলে বল্‌তেই হবে এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধ।৮ সাহিত্য সর্ব্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ-নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহবেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করচে মানুষের সাহিত্য মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্ব্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্ত্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন; যে-তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। যে-নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারিনে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগে হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল—

তাকে যেন সত্যই নূতন বলে ভ্রম না করি, সে আপন জরা

নিয়েই জন্মেছে, তার আয়ুঃস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে ।✓

এতটা কথা তোমাকে কেন বল্‌লুম তা বলি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত ইংরেজি কবিমণ্ডলীর প্রতি আমার আকর্ষণ যখন প্রবল ছিল তখন সেই প্রীতির টানেই তাদের কাছে যাবার চেষ্টা করেচি। সেই প্রীতির প্রতিদানও পেয়েছিলেম। তখন কালের মধ্যে নমনীয়তা ছিল। এখন তার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, এ যেন অনাবৃষ্টির যুগ। মরুতে যে গাছ ওঠে তার টেক্‌নিক্ কাঁটার টেক্‌নিক্— সে কেবলি বলে দূরে থাকো, যে যার আপন আপন চণ্ডীমণ্ডপে। এখন ঐ মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে আমার সাহস হয়না— ওরা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যাতে ওদের আমরা বুঝিনে ওরাও আমাদের বুঝতে চায় না। আমার লেখাগুলোকে গুছিয়ে তুলতে তোমার যতটুকু উৎসাহ আমার তা নেই। ওখানকার মাটিতে আমাদের গাছ কিছুদিন তাজা থাকলেও তার পরে তার পাতা কুঁক্‌ড়ে মুক্‌ড়ে যায়। তাকে লুপ্ত হতে দেওয়াই তার প্রতি সদ্ব্যবহার। সেজন্যে ভয় তো নেই, এখানকার মাতৃভূমিতে হয়তো তার ফসল কোনোদিন নিঃশেষিত হবে না। অবশেষে একদা বিশ্বসাহিত্যে আমদানি রপ্তানিতে কৃত্রিম-মাশুলের পাহারা যাবে ঘুচে, তখন এপারের ফসল পৌঁছবে ওপারে।— আমার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে আমার অন্তরের অনুরাগ সবচেয়ে অক্ষুণ্ণ আছে Sturge Mooreএর প্রতি। তিনি জনতার ফরমাসে নব্যতার ভেক ধরেন নি, তাঁর মধ্যে

সাহিত্যের আভিজাত্য অম্লান। আর আমি জানি আধুনিকতার কঠোর ঘর্ষণে তাঁর সহৃদয়তায় কড়া পড়ে যায় নি। একবার কোনো অবকাশে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানিয়ো আমি তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করি তেমনি ভালোবাসি। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪
৭ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, প্রায় একমাস ধরে ঘুরেছি। এবারে বেরিয়েছিলুম পশ্চিম ভারতের অভিমুখে। গিয়েছি লাহোর পর্য্যন্ত। এই কারণে চিঠিপত্র অনেককাল বন্ধ। শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত হয়ে থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই নে। এবারে মূর্ত্তিটা দেখা গেল। তুমি যে মহাদেশে আছ সেখানে মানুষের চিত্তসমুদ্রে সুরাসুরের মন্থন চলচে, আবর্ত্তিত হয়ে উঠ্‌চে বিষ এবং অমৃত প্রকাণ্ড পরিমাণে। সেখানে চিন্তা বলো, কর্ম্ম বলো, কল্পনার লীলা বলো সমস্তের মধ্যেই একটা বিরাট বেগের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নিরন্তর চলেচে— প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেখানে সমস্ত মানুষের উদ্বেলজীবনের আঘাত

প্রতিঘাত কেবলি কাজ করচে। সেখানে মানুষের সম্মিলিত শক্তি ব্যক্তিগত শক্তিকে অহরহ রাখ্‌চে জাগিয়ে। ভারতবর্ষের দিগন্ত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরে, সেই বেড়ার মধ্যে যা হচ্চে তাই হচ্চে, তার বাইরের দিকে বেরোবার কোনো গতি নেই। যেখানে জীবনের ভূমিকা এত ছোটো সেখানে মানুষের কোনো চেষ্টা চিরন্তনের ক্ষেত্রে কোনো বৃহৎরূপ প্রকাশ করবে কিসের জোরে। ইতিহাসের যে পটে আমাদের ছবি উঠচে, সে ছিন্ন ছিন্ন পট, তার চিত্রের রেখা ক্ষীণ, বর্ণ অনুজ্জ্বল, তাতে প্রবল মনুষ্যত্বের স্পষ্টতা ব্যক্ত হবার পরিপ্রেক্ষণিকা পাওয়া যায় না। তাই আমাদের পলিটিক্স, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সব কিছুরই মাপকাঠি ছোটো। এই নিয়ে মহাজাতির পরিচয় গড়ে তোলা অসম্ভব। এই পরিচয়ের অভাবে আমাদের আত্মসম্মানবোধের আদর্শ নীচে নেমে যায়।

সর্ব্বত্রই দেখা গেল White Paper নিয়ে আলোচনা চলচে। ছেলেবেলায় কাঙালীবিদায়ের যে দৃশ্য দেখেছি তাই মনে পড়ে গেল। ধনীর প্রাসাদ অভ্রভেদী, তার সদর ফাটক বন্ধ। বাহিরের আঙিনায় জীর্ণ চীরপরা ভিক্ষুকের ভীড়। কেউ পায় চার পয়সা, কেউ দু আনা, কেউ চার আনা। তক্‌মা-পরা দ্বারীদের সঙ্গে তাদের যে দাবীর সম্বন্ধ তা কেবল কণ্ঠের জোরে। এই জন্যে তারস্বরের চর্চ্চাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে যেটা লজ্জা, সে এই ভিক্ষুকদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি নিয়ে। যে ব্যক্তি দান করছে সুদূর ঊর্দ্ধে দোতলার বারান্দায় তাদের আত্মীয়-কুটুম্বের মজলিশ।

যত কম দিয়ে যত বেশি দেওয়ার ভড়ং করা যেতে পারে স্বভাবতই তাদের সেইদিকে দৃষ্টি। রাজদ্বারীদের একহাতে শিকি দুয়ানির থলি, আরেক হাতে লাঠি ; সেটা পড়চে, যারা চোখ রাঙায় তাদের মাথার পরে।

দেখতে দেখতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্চে তা রক্তপঙ্কিল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বল্‌লুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। আজকাল পল্লীগঠনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হতে পারে। তিনি বল্‌লেন আগা খাঁ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্চে। পাছে গান্ধিজির অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার এই উপক্রম। বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্ম্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক্ করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক্ করে দিল— মিল্‌ব কোন্ শুভবুদ্ধিতে আপীল করে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্ত শাসন হবে ফুটো কলসিতে জল ভরা।

ইংরেজ মানব ইতিহাসে হেয়তম যে পাপ করেছে সে হচ্চে চীনের মতো অত বড়ো দেশের কণ্ঠে জোর করে আফিম ঠেসে দিয়ে। নিজের উদরপূরণের জন্যে এত বড়ো নরহিংসা সভ্য-

বর্ব্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। অবশেষে নিজের স্বার্থকে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশে ইংরেজ আজ হিন্দুমুসলমানের ভিতরকার প্রভেদকে যে প্রশস্ত করে দিলে এও উক্ত প্রকার বিষপ্রয়োগেরই অনুরূপ। কোনো এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয়কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশে দুই প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষবীজ সে রোপণ করে দিয়ে গেল কবে আমরা তাকে উৎপাটিত করতে পারব? একটা জাতির ভাবী ইতিহাসকে এমনতর কলুষিত করে দিলে; সভ্য য়ুরোপের সঙ্গে সম্পর্কের এই নিদারুণ পরিশিষ্ট ভারতবর্ষকে সুচিরকাল বহন করতে হবে। আজ আগা খাঁ এসেছেন সেই সর্ব্বনেশে সভ্যতার দূত হয়ে আমাদের মৃত্যুশেল নিয়ে। আমরা নিরস্ত্র আমরা নিঃসহায়, বিনাশের সঙ্গে লড়ব কী করে? পঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকর রূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই— এখানে উভয়পক্ষের বিকৃতসম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস অত্যাচার ঘটচে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্চি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট করে দিলে।

ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি একটা কোনো আকস্মিক অভাবনীয় উপপ্লব না ঘটলে এই নাগপাশবন্ধন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না। ভারতবর্ষ যে ইংরেজের একান্ত লোভের সামগ্রী; তার বিষয়সম্পত্তির সামিল; এ'কে

না হলে তার অন্নবস্ত্রের কম্‌তি ঘটবে, রাষ্ট্রীয় প্রতাপের প্রথম শ্রেণী থেকে তাকে নিচে নাম্‌তেই হবে। এতবড়ো ত্যাগস্বীকার করতে তাকে যে বলব সে কিসের দোহাই দিয়ে? সভ্যতার দোহাই? কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্ত্তমান সে সভ্যতা মানুষখাদক। তার একদল victim চাই-ই যারা তার খাদ্য, যারা তার বাহন। তার ঐশ্বর্য্য, তার আরাম, এমন কি তার কাল্‌চার উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে আজ শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। লোভ প্রবৃত্তিটা সর্ব্বব্যাপী হতে পারে কিন্তু লোভের ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের অধিকারীকে স্বল্পপরিমিত হতেই হবে। যে কোনো কারণবশতই হোক যার জোর আছে সে সেই ক্ষেত্রকে নিজে অধিকার ক'রে অন্যের উপর প্রভুত্ব করে। এমন অবস্থায় জোরের সঙ্গে জোরের সমানে সমানে লড়াই চলে, কিন্তু সেখানে ডিপ্লমাসির চাল চেলে নানা আকারের রফানিষ্পত্তি হতে থাকে। কিন্তু যেখানে একপক্ষের জোর আছে অন্যপক্ষের জোর নেই সেখানে নির্ব্বল পক্ষ আপনার প্রাণ দিয়ে অপরকে পোষণ করবার কাজে লাগে। যতক্ষণ লোভ রিপু এই বর্ত্তমান সভ্যতার ও স্বাজাত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে কাজ করে ততক্ষণ এর থেকে বলহীনের নিষ্কৃতি নেই; কেননা, যে দুর্ব্বল এই সভ্যতা তারই প্যারাসাইট। অতএব প্রবলের হাত থেকে যখন দানপত্র আসবে তখন তা অত্যন্তই White paper হয়ে আস্‌বে, তাতে রক্তের লেশ থাকবে না; সেই পাতে যে উচ্ছিষ্ট আমাদের ভোগে পড়বে সেটা হবে কাঁটা-চচ্চড়ি, তাতে মাছের গন্ধ থাকবে মাত্র খাদ্যবস্তু অতি অল্পই থাকবে। লোভী মনিবের পাত থেকে সেই মোটা মাছের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করব কিসের জোরে? কেবলমাত্র পেটভরার চেয়ে বেশি জোগান তার যদি না থাকে তবে সেটাতে তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেবে না; তার যে সভ্যতা প্রাচুর্য্য-অভিমানী তারও দাবী তো মেটাতে হবে। কী দিয়ে? যে দুর্ব্বল তারই ক্ষুধার অন্ন দিয়ে। এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত কতবড়ো চিরদুর্ভিক্ষের আসন পেতে আছে তা কি জানো না? এর অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অনটনও যখন ওদের ভাগ্যে দৈবাৎ ঘটে তখন ওরা কী রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাও তো আমরা দেখেছি।

এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণ-রক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের অতিরিক্তের তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে! এই যদি অপরিহার্য্য হয় তবে লর্ড চার্চ্চহিলের জবাব দেব কী? এই সমস্যা তো সবলের সামনে নেই। তাদের সমস্যা বলের সঙ্গে বলের প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই প্রতিযোগিতা আজকাল সাংঘাতিক হয়ে উঠেচে। সম্প্রতি এর প্রকাণ্ড আঘাতে ওদের দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে আছে, আরো আঘাতের আশঙ্কা চারদিকেই উদ্যত। এমন অবস্থায়

যারা বুদ্ধিমান তারা দুর্ব্বলের সহায়তাকেও উপেক্ষা করে না। বিগত যুদ্ধে সেই সহায়তা পেয়ে লর্ড চর্চ্চহিল্‌ও কৃতজ্ঞের বদান্যতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আর কখনো যে সেই সহায়তার প্রয়োজন হবেনা তা বলা যায় না। কিন্তু কৃতজ্ঞতার স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী, তার উপরে ভর দিয়ে আমাদের আবেদনের ভিত্তি পাকা করবার ব্যর্থ চেষ্টা দুর্ব্বলের পক্ষে বিড়ম্বনা।

যখন সামনে এতবড়ো দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখনি বুঝতে পারি যে এই দুর্ব্বলের প্রতি নির্ম্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুক্‌রো নিয়ে আমরা বাঁচব না। সভ্যতার বণিক্‌বৃত্তি যতদিন না ঘুচবে ততদিন ভারতবর্ষকে ইংরেজ মহাজনের পণ্যদ্রব্য হয়ে থাকতেই হবে, কোনোমতেই তার অন্যথা হতে পারবে না। একপক্ষে লোভ যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সারথি সেখানে অপরপক্ষে দুর্ব্বলকে বল্গাবদ্ধ বাহনদশা যাপন করতেই হবে। অবস্থাবিশেষে কখনো দানা বেশি জুট্‌বে কখনো কম। অসহিষ্ণু হয়ে যে-জীব হ্রেষাধ্বনি করবে পা-ছোঁড়াছুঁড়ি করবে তার স্পর্দ্ধা টিঁকবে না।

সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্ত্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্ব্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত

হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব— এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আর আজ য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্য্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জমে উঠেছে। সে কি নিরাপদ প্রতাপের কোনো মন্ত্রের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে তার লোহার ক্যাশবাক্সের মধ্যে? অনেক বড়ো বড়ো জাত লুপ্ত হয়েছে, অনেক উদ্দামগতি ইতিহাস হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে স্তব্ধ হয়েছে, আর আমরাই যে White Paperএর ক্ষুদকুঁড়ো খুঁটে খুঁটে খেয়ে চিরকাল টিঁকে থাকব এমন আশা করি নে— মরণদশার অনেক লক্ষণ তো দেখতে পাই। কিন্তু সর্ব্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্যরাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহু কালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ঘুরে অবশেষে ফিরে এলাম আপন কুলায়ের কোণে। ভারতে দেখলুম আলোহীন,

মাহাত্ম্যহীন ধূলিনত জীবনের রঙ্গভূমি, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লুম আমাদের য়ুরোপের প্রভু সেই আমাদের ভাবীকালের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। অল্পকিছু সম্বল নিয়ে অভুক্তপ্রাণের ছোটোখাটো প্রয়োজন, জীর্ণ আসবাব, উপস্থিত মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র দাবীর উপর বহুকোটি মানুষ প্রতিদিনের মাথা গোঁজবার পাতার কুঁড়ে বাঁধচে, তাতে বৃষ্টির জল রৌদ্রের তাপ নিবারণ হয় না। ধনী পথিক কটাক্ষে চেয়ে চলে যায় আর ভাবে এই এদের যথেষ্ট, কেননা ওরা আমাদের থেকে অনেক তফাৎ— আমরাও ভাবি এই আমাদের বিধিলিপি। বুঝতে পারি ওরা যে-গ্রহের আমরা সে গ্রহের নই। যখন এ কথাটা সম্পূর্ণ বুঝি তখন সমুদ্রের ওপারের খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই চলে যায়। এও মন বলে, ওদের ভাষা, ওদের প্রকাশের পদ্ধতি, ওদের ভালোমন্দর বোধসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টায় শুধু ব্যর্থতা নয়, অমর্য্যাদাও আছে। যেখানে আমার আপন অধিকার নিঃসংশয় সেইখানে ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।— সম্প্রতি আমার তর্জ্জমা-গুলো পড়ে কথাটা মনে আরো সুস্পষ্ট হোলো। এ তো আমার লেখা নয়। নিজের এ পরিচয় কেনই বা দিতে যাওয়া— এ তো নিজেকে ব্যঙ্গ করা। যত পারো কবিতাগুলো ছেঁটে ছুঁটে বাদ দিতে দিয়ো।— একবার গলদ করেছি বলেই তার সংশোধনের অধিকার আমার নেই এ কথা মানতে পারি নে।

আপন পরিচয়ের জন্যে তাগিদই বা কিসের? যখন

ভাবি অজন্তার গুহাচিত্রগুলির কথা, তখন নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ মনের মধ্যে উপলব্ধি করি। ওরা কা'রা, একদিন অন্ধকারে বসে যারা দিনের পর দিন বিচিত্র সৃষ্টির আনন্দকে গুহাপ্রাচীরে চিত্রিত করেছিল? তারা তো এই সৃষ্টির সাফল্যেই আপন প্রয়াসের মূল্য হাতে হাতেই পেয়েছিল। তাদের যে-আত্মা সত্য সেই পেয়েছে আনন্দ, তাদের যে নাম মায়া খ্যাতির মজুরী তার জন্যে ওরা দাবী করে নি? অনাগত কালের সম্মুখে ঐ নামটাকে চাঁদার ঝুলির মতো পেতে রাখতে চাই কেন? এই দানের লোভের মতো এতবড়ো বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে? আজ সকালে আকাশে আতপ্ত বসন্তের আভাস এসেছে, আমার সামনে ঘাসের মধ্যেকার অনামা ফুলগুলোর উপর লাল ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্চে; এই সদ্য মুহূর্ত্তের প্রাণনের আনন্দে আমার মনটা ফাল্গুনের তরুণ আলোকে ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছের হিল্লোলিত পাতার মতো ঝলমল করচে। জীবনের অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্চি যা পাওয়ার জিনিষ, এর চেয়ে আরো লোভ কেন? যখন কিছু লিখেচি সেও তো আপনার মধ্যে এই রকম পাতার হিল্লোল, হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলক, প্রকাশের হর্ষবেদনা। সে তো বিনা-নামের অতিথি, গর্‌ঠিকানার পথিক। তাকে নামের ঠেলা-গাড়িতে চাপিয়ে হাটে হাটে ফিরিয়ে বেড়াবার কী দরকার! নামটা মায়া বলেই নাম নিয়ে যত ঈর্ষা বিদ্বেষ, বিবাদ বিরোধ। একদিন আমার লক্ষ্যের অতীত অজানা লোকালয়ের রাজপথে

লক্ষ লক্ষ নামে নামে ঠেলাঠেলি হতে থাকবে, তারি মাঝখানে আমারো বেদনাহীন চেতনাহীন শব্দমাত্রসার নামটা চলবার জায়গা পেতে পারবে এই কল্পনার মরীচিকা নিয়ে আজ আমার মনে কোনো উৎসাহ হচ্চে না। জীবযাত্রার সমস্ত উদ্যোগ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার এল, আজ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ঠেকে বিশ্বসত্তার স্পর্শে আমার চৈতন্যের তন্ত্রীতে এই যে ঝঙ্কার উঠ্‌চে— আমার পক্ষে এই তো চরম। তারো পরে একটা নাম থাক্‌বে কি না থাকবে তাতে কী আসে যায়!

চার অধ্যায় অনুবাদের কপি পাঠিয়ো না, হয়তো পথেই মারা যাবে। তোমার তর্জ্জমা পুনঃসংস্কার করবার মতো মেজাজ আমার নেই— ঐখানেই ছাপিয়ে দিয়ো। যদি ছাপানো দরকার না বোধ করো তাহলে ছাপিয়ো না।—

দোল পূর্ণিমা আসচে, বসন্ত উৎসবের আয়োজন করচি। এইই আমার কাজ। ইতি ৭।৩।৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠি পাবে কি না সন্দেহ। নাইবা পেলে, আমি লেখবার দরকার বোধ করেছিলুম লিখেচি। বাস্‌।

৭৫

২৮ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল হোলো তোমাকে একটা মস্ত চিঠি লিখেছি। সম্ভবত সেটা তোমার হাতে পৌঁছয় নি। এরকম চিঠিপত্রের অনিশ্চয়তা ঘটলে লিখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কাজের কথা থাকলে চুপ করে থাকা চলে না। সুবিধে এই রথীরা য়ুরোপে যাত্রা করে বেরিয়েছেন, তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় কথাবার্ত্তা হতে পারবে।

আমার নতুন এডিশন সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ পরামর্শ যদি পেতে চাও সে ঘটবে না। আর যে আমি কখনো য়ুরোপে যাব সে সম্ভাবনা নেই। চলাফেরার বয়স পেরিয়ে গেছি। তা ছাড়া নিজের খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা ক্রমশই কমে আসচে। এই কথাই কেবলি মনে হয় যে যদি সাহিত্যে কোনো স্থায়িত্বযোগ্য কীর্ত্তি করে থাকি তবে তার স্থায়ী হবার দামটাকেই বড়ো করে দাবী করা মূঢ়তা। কিছু করতে পেরেছি এইজন্যেই আমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ। দামের জন্যে পরের কাছে হাত পাতলেই বাজারে তার হিসাব নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়। দামটা শেষপর্য্যন্ত পাবেই বা কে? আমার ব্রহ্মদত্যি? অর্থাৎ যার না আছে ক্ষুধা, না আছে রসনা, না আছে পাকযন্ত্র, খেয়ে নিতেও যে পারে না, বেঁধে নিতেও যে জানে না। আমি জানি কালের পরিবর্ত্তন হবে,

রুচির গতিও বাঁক ফেরাতে ফেরাতে চলবে। সেই পরিবর্ত্তনের থানায় থানায় নতুন নতুন কবি আড্ডা করবে, যুগে যুগে নব নব পরিতৃপ্তির রসদ জোগাবে তারাই। জানি এমন সব কবি আছেন গুণী আছেন যাঁরা সকল কালের ভাণ্ডার ভরে দিয়ে গেছেন— সেটা আপনিই ঘটেচে—না ঘটলেও তার লোকসান তাঁদের কাছে পৌঁছত না। মৃত্যুর যতই কাছে আসচি ততই ভাবীকালের কাছে হাত বাড়াবার আগ্রহ চলে যাচ্চে। ভাবীকাল আপনার পাওনার হিসাব আপনিই করে; যা রক্ষণীয় তাকে বর্জ্জন করেছে নিশ্চয়ই এমন হয়েছে ভূরি ভূরি। তা নিয়ে জগতের কোথাও কি কোনো শোক আছে? ঐ যে মহেঞ্জদারো ধ্বংসাবশেষ অতীত মানবমহিমার সাক্ষ্য নির্ম্মমভাবে মরুবালুর তলায় চাপা দিয়ে রেখেছিল। তাদের কবিরা সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কি বাণীরূপ দেয় নি? আর কোনোদিন তার গুঞ্জনমাত্রও শোনা যাবে না। কার বুকে বেজেছে সেই ক্ষতি? কত শতাব্দী গেল তার উপর দিয়ে— চাষীরা চাষ করচে, মাঝিরা নৌকো বাইচে, রাজার রাজত্ব ভাঙচে গড়চে, সমস্তই চলেছে মহাবিস্মৃতির অভিমুখে। পৃথিবীতে দিনের পর দিন সূর্য্য উঠবে সূর্য্য অস্ত যাবে, অসংখ্য যারা জাগবে আর যারা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাবে তাদের মধ্যে এই একটিমাত্র আমি কোথাও থাক্‌বো না। সেই অন্তহীন জীবনপ্রবাহের মধ্যে আমার আজকের দিনের কয়েকটা কথা হয়তো কিছুকালের জন্যে ফেনার মতো ভেসে চলবে। সেদিনকার সেই বেদনাশূন্য চলার অনিশ্চিত কল্পনা নিয়ে কেন আমি ভেবে মরব, সম-

সাময়িকের হাটের খাঁচার মধ্যে পরস্পরের খোঁচাখুঁচি জাগিয়ে তুলব? অতএব যাক্‌গে। আমার দরজার সামনেই সজনে গাছের পাতা ঝরে গেল, আবার কচি পাতা ওঠবার রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে। প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া এখন চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে; মধ্যাহ্নের তপ্তহাওয়ায় গাছে গাছে দোলাদুলি লেগেছে; উড়তি ধূলোয় আকাশের নীলিমাতে ধূসরের আভাস দিয়েছে— চারদিকে নানা পাখীর কলকাকলী। এরা সবাই মিলে আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল জাগিয়ে চলেছে— এদেরি মধ্যে মনটাকে ছড়িয়ে দিই না কেন, এই নিরন্তর বহমান অনিত্যের স্রোতে সাঁতার কেটে যাই না কেন? আর ক'দিনই বা বাঁচব? একে আমরা বলি মায়া, কিন্তু এই তো বাস্তব, খ্যাতিই তো মায়া, সেই তো প্রেতের অন্ন। বর্ত্তমান অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গণে আমি রবাহূত, আমার জন্যে পাত পাড়া রয়েছে, নানা রসের আয়োজন, ভোজ শেষ করে দিয়ে যাই, সন্ধে হয়ে এল।

বইগুলো পেয়েছ— তাতে আমার উচ্ছেদ চিহ্ন দেখেছ। কিন্তু মনে কোরো না তাতেই আছে আমার চরম বিচার। স্পষ্ট অনুভব করেছি বিস্তর আবর্জ্জনা আছে। আমার কোনো মমতা নেই, বরঞ্চ লজ্জাই আছে। সম্মার্জ্জনার জন্যে আমার পরামর্শ বাহুল্য। যে কোনো আমার ইংরেজ কবিবন্ধু যেরকম করেই ওগুলো নিয়ে বর্জ্জন মার্জ্জন করুন আমার তাতে লেশমাত্র আপত্তি ঘটবে না। তুমি তাদের সম্মতি নিয়ে যা দাঁড় করাবে তাতেই আমি স্বাক্ষর দেব। এ কথা আমি নিশ্চিত জানি ওর মধ্যে থেকে বিস্তর ত্যাগ করা উচিত।

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা Asiaতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা রথী ঠিক করবেন। ঐ কাগজের খাতিরে ইংলণ্ডে ছাপা বন্ধ রাখা চলবে না। মূল্যও ওরা সামান্যই দেবে, দুশো ডলার। ওদের আগ্রহ অনুসারে আমাদের চলবার দরকার নেই। তোমার পাব্লিশরের মত নিয়ে কাজ কোরো। রথীদের পরামর্শেই চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা এখানে পাঠাতে cable করেছিলেম। কোনই প্রয়োজন ছিল না, কেননা নিশ্চিত জানি আমি কোনো বদলই করব না। এতে কেবল সময় নষ্ট হবে। এখনো বলচি আমার অপেক্ষা না রেখে তুমি ছাপতে দিয়ো। বস্তুত তোমার এই ম্যানস্ক্রিপ্ট আমার হাতে পৌঁছবে কিনা তাও জানিনে, যদি পৌঁছয় বহু দেরি হবে। কবে পাঠানো হোলো আমাকে জানিয়ো।

তোমার অনুরোধমতো design আঁকতে বসেছি। শাদা কালো করি নি— রং দিয়েছি, তাতে ক্ষতি নেই— রং বাদ দিলে আপনিই ওগুলো হবে শাদা কালো। রঙের জন্যে আমার হাত নিশপিস্ করে।…

জাপানে দলবলসমেত আমাদের যাবার একটা আমন্ত্রণ শীঘ্রই পাব বলে অনুমান করচি। লোভের কারণ আছে বলেই হয় তো যেতে হবে নতুবা যাবার আর কোনো তাগিদ দেহে মনে নেই। ইতি ২৮।৩।৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

১২ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মেল পাবার দুই একদিন পরে তোমার তর্জ্জমা এসে পৌঁছল। পড়বার সময় পাই নি— অনেকগুলি ছোটবড়ো কাজে জড়িয়ে আছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্চে একটা নতুন কবিতার বই ছাপানো। এই জাতের কাজে হাত দিলেই নিজের জাতটা নিজের কাছে ধরা পড়ে। আমি কবি, এইটেই হোলো আমার প্রথম এবং শেষ কথা— আর যে সব আমার কাঁধে ভর করেছে সেগুলো বাহ্য। বটগাছে বাঁদর লাফায়, পাখী বাসা বাঁধে, কিন্তু বটগাছটা তাদের বাদ দিয়েই। আমি গল্প লিখে থাকি— তার সদ্য প্রমাণ চার অধ্যায়। কিন্তু যখন কবিতা নিয়ে পড়ি তখন মনে হয় ওগুলো পরগাছা, শিকড় নেই অন্তরে। সন্দেহ হয় ওদের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে। ওদের হাঁক-ডাক বেশি, কিন্তু সাঁচ্চাই ? চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা পায় সেটা ঠিক খাঁটি গদ্যের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা— নবেলের নির্জ্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয় তো দেরি হবে। যোগাযোগটা ওর চেয়ে গদ্যের এলাকায় টেঁকসই হবার কথা —যদিও তার মধ্যে কবির কলম শিল্পকাজ চালায় নি তা

বলতে পারিনে। কেননা কবি যদি ত্রিসীমানায় থাকে তাকে চাপা দেওয়া অসম্ভব। তোমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিশ্চয় তর্জ্জমাটা দেখেচেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফ থেকে তাঁরা কী বিচার করেন জানতে ইচ্ছে করি। সাহিত্যের বাইরেও এর মধ্যে তাঁদের ঔৎসুক্যের কারণ আছে— সে হচ্চে আধুনিক বাংলায় বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের একটুক্রো ছবি। এ ঔৎসুক্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। অন্তত কবির তরফে এটাতে আমার নিজের কোনো দরদ নেই— আমার দরদ হচ্চে এলা অন্তর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। যে ভাষায় তার বেদনা ফুটে উঠেছে সে ভাষা কোনোমতেই রূপান্তরিত করা যায় না। সুতরাং বাঙালী পাঠক এর থেকে যা পাবে ইংরেজি পাঠক কোনোমতেই তা পেতে পারে না। এমন ফল আছে রস বাদ দিয়েও যার শাঁস থাকে, তা নিয়ে ব্যবসা চালানো যায়— কিন্তু আমের রস যে পেল না আঁঠি নিয়ে সে কী বিচার করবে আন্দাজ করা শক্ত নয়। এই সব কথা যখন চিন্তা করি তখন মনে সংশয় হয়। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ এই ওখানকার সমজদারদের মত নিয়ে যদি বোঝো এটা কেবলমাত্র চলনসইয়ের চেয়ে বেশি নয়, অথবা তার চেয়েও কম তাহলে ছাপতে দিয়ো না। এ ক্ষেত্রে পাব্লিশরদের মতের দাম অর্থের দাম দিয়ে। তারা জানে এটা যাকে বলে সেন্সেশনাল, একদফা বিক্রি হবে— লোকে দুইপক্ষ থেকে গোলমাল করবে, মুনফার দিক থেকে এর সার্থকতা আছে। কিন্তু সেই বিচারটা অশ্রদ্ধেয়। যা হোক্, ওখান থেকে তুমি খাঁটি ওজন পেতে

পারবে। প্রথম যখন ইংরেজিতে তর্জ্জমার কথা উঠেছিল তখন সংশয় ছিল বাংলায় ওটা চলতে দেবে কিনা। সে সম্বন্ধে আশঙ্কা নেই। বস্তুত আপত্তি উঠ্‌চে দেশের লোকের পক্ষ থেকেই।

টমসনকে যে চিঠি লিখেচি তার নকল তোমাকে পাঠাই। আমি সরেজমিনে হাজির হয়ে তোমাদের আলোচনায় যোগ দিতে পারব সে আশা কোরো না। আমার দৈহিক মানসিক ও আর্থিক অবস্থা সমস্তই এর প্রতিকূলে। যদি রথীর সঙ্গে যেতুম তাহলে খরচ কিছু বাঁচত কিন্তু দেহটার আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি নে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অভ্যাসগুলি ক্রমশই পাকা হয়ে উঠতে থাকে। তখন বিশল্যকরণীর উদ্দেশে গন্ধমাদন সুদ্ধ উৎপাটন করা এ যুগে আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। এখন জীবনটা নিশ্চলতার দিকেই ঝুঁকেছে— মনটা তারি মধ্যে যেটুকু লাফালাফি করে তার বেশি আর আশা করা যায় না।

Collected Editionএ ছেঁটে ফেলার কাজে একটুও মমতা দেখিয়োনা। তোমাদের কার্ট্‌ ব্লাঁশ অধিকার দিচ্চি। আমি যা দাগ দিয়েছি তাতেও আমার মন তৃপ্তি পায় নি। লাগাও কোপ। পরিবর্ত্তন যদি উপযুক্ত লোকের হাতে হয় কিসের আপত্তি? তুমিই আমাকে represent করতে পারবে। তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় Sturge Mooreএর মত কবি যদি মাজাঘষা করেন আমি স্বয়ং থেকে তার বেশি কিছুই করতে পারি নে। তাঁকে অবশ্য পারিশ্রমিক দিতে হবে। এবং

বইটার মলাটে লিখে দেওয়া চলবে Edited by Sturge Moore— অবশ্য যদি তোমাদের মত থাকে।

কাল বর্ষশেষ— পর্শু নববর্ষ। আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি ২৯ চৈত্র ১৩৪১

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

১৪ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ পয়লা বৈশাখ। আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আজকের [দিনে] তোমাদের সকলকেই আশ্রমে একত্রে পেতে ইচ্ছে করে। এবারে রথী বৌমা চলে গিয়ে অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকচে।

বিলেতের কাগজগুলো আজকাল সময় পেলে পড়ি। একটা জিনিষ তিনচার বার লক্ষ্য করেছি। দেখেছি এমন কি ভদ্র কাগজেও "বাবু"দের উপরে তীব্র অবজ্ঞার কটাক্ষপাত চলিত হয়ে উঠচে। বুঝতে পারচি, বাংলাদেশের হাতে ওরা যে আঘাত পেয়েছে সে ওরা ভুলতে পারচে না। এটা হয়তো ওরা জানেই না ঢাকা প্রভৃতি সহরে যে কাণ্ড ঘটেছিল সেটা বাঙালী যুবকদের স্মৃতিতে কী রকম বিঁধে আছে। যাই হোক বাঙালীদের প্রতি ওদের বিদ্বেষ এত তীব্র বলেই Gilbert Murrayকে আমি যে অমন চিঠি লিখেছি তার মধ্যে থেকেও

ওরা খুঁৎ বের করেছে। আজই Time & Tide কাগজে Wyndham Lewis লেখায় "বাবু"র উপরে বিশ্রী খোঁচা,। তাই আমার আশঙ্কা হচ্চে আমার চার অধ্যায় বইখানাকে ওরা সেই বিদ্রূপ ও বিদ্বেষের খোরাক করবে। ওটার থেকে বাছাই করে ওরা নিজের মনের মতো বচন তুলে ব্যবহারে লাগাবে। সেটা প্রথমত আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর হবে, দ্বিতীয়ত তাতে আমার দেশের লোক আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হবে। বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় এ সব কথা ভালো করে বিচার করা দরকার। আমি এখনো তোমার তর্জ্জমা পড়বার সময় পাই নি— কদিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েচে। কিন্তু কথাটা তুমি বিশেষ করে ভেবে দেখো। রথীর সঙ্গেও পরামর্শ কোরো। রথীর সঙ্গে এতদিনে হয়তো দেখা হয়ে থাকবে।··· ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮
৪ মে ১৯৩৫

কল্যাণীয়েষু

"শেষ সপ্তক" বলে নতুন কবিতার বই আমার জন্মদিনে বেরবে। প্রতিদিন একটা দুটো করে লিখে চলেছি তাই নিয়ে মন হয়ে আছে গুঞ্জরিত। চার অধ্যায় দেখবার সময়ই

পাই নি। আজ কবিতার পালা শেষ করলুম। আজ একবার তর্জ্জমাটা নিয়ে পড়ব।

ইংরেজি কবিতার সঞ্চয়িকার প্রস্তাবটা ভালো। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজটা সম্পন্ন কোরো— ভালোই হবে। এর পরে আমার রচনার পুনঃসংস্কার সহজ হবে। যখন বাছাই চলবে তখন কিছু কিছু শোধনও যদি চলে দোষ কি।

রথীর সঙ্গে দেখা এতদিনে নিশ্চয় হয়েছে। তাদের কোনো খবরই পাই নি। আন্দ্রের চিঠি থেকে জানলুম তারা গেছে হাঙ্গেরিতে তাও নিশ্চিত তথ্য বলে জানা গেল না। মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার কথা। মে মাস ত পড়েচে।

আমার জন্মোৎসব নিয়ে গোলমাল চলচে। একটা মাটির বাসা ফেঁদেচি সেইদিন গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান হবে। ঘরটা দেখবার যোগ্য হয়েচে।

আজই air mail দিন— বেলা দুপুরের মধ্যে। তাই তাড়াতাড়ি সারলুম। ইতি ২১ বৈশাখ ১৩৪২

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

২৬ জুন ১৯৩৫

চন্দননগর

কল্যাণীয়েষু

এতদিনে চার অধ্যায়ের কৃত তর্জ্জমা আমাদের শেষ হল। তুমি ইংরেজি পাঠকের দিকে তাকিয়ে অনেকটা বদল সদল

করেছ— তাতে বাঙালী পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়— এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির আশঙ্কা আছে। ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের ওখানকার উপদেষ্টারা যদি আধুনিকতার প্রলেপ দিয়ে দেন সে ভালোই, কিন্তু ভাব বদলানো সঙ্গত হবে বলে মনে করি নে। বাংলা বইটা নিয়ে যদিও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যাচ্চে তবু লোকের বিশেষ ভালোও লেগেছে সন্দেহ নেই। এক সংস্করণ শেষ হ'য়ে গেছে। শেষ সপ্তকটা সমঝদাররা ভালোই বলছে। আজ কালিদাস নাগের চিঠিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া গেছে। এর পরে একটি ছোট্ট পদ্য কাব্যের বই ছাপা শুরু করেছি। লোকে না মনে করে প্রাচীনের কলমে ছন্দ ক্ষরতে চাচ্চে না। এ বইটার নাম হবে ছায়াছবি। গোটা ৩৫শের বেশি কবিতা দেব না। ভূরিভোজন কবিতার পক্ষে বর্জ্জনীয়, শরীরের পক্ষেও ভালো নয়, এ কথা তোমার দৃষ্টান্তের দ্বারা তুমি প্রচার করতে থাকো।

রথীরা আর দিন ১০।১২র মধ্যে দেশে পৌঁছবে। তখন তোমাদের সব খবর পাওয়া যাবে। এণ্ড্রুজ সিমলায় নির্জ্জনে বসে কি একটা লেখায় মগ্ন। আমরা আশ্রমে ফিরলে তিনি বোধ হয় আসবেন। কবিতার সঞ্চয়নকার্য্য কি কিছু এগিয়েছে? ওটা সম্বন্ধে সেখানকার পাঁচজনের মতই গ্রাহ্য। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

১১ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা রওনা হয়ে গেছে। এতদিনে পেয়ে থাকবে। ওটা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে করা। অপ্রিয় কথা হয়তো থাকতে পারে। সেজন্যে ও বইটা যদি ওখানকার পাঠকদের পথ্য না হয় তাহলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বইটা বন্ধ করে দিয়ো। মূল বাংলাটা যখন বেরিয়েছে তখন তর্জ্জমা না বেরলেও ক্ষতি নেই। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতির জন্যে রুচি চলে গেছে। যে বইগুলো পূর্ব্বেই বেরিয়ে গেছে সেইগুলোকে ছেঁটেছুঁটে যথাসম্ভব চলনসই করলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। বস্তুত আমার দায়িত্ব বাংলা লেখাগুলো নিয়ে। মনে বিশ্বাস আছে ওর অন্তত অনেকটা অংশ টেঁকসই হয়েছে। যারা বাংলা ভাষার সাধনা করবে এ তাদের জন্যেই রইল। আমার দেশেও চার অধ্যায়ের প্রতি অনেক পাঠক প্রসন্ন নয়। দেখতে পাচ্চি সাহিত্যের সঙ্গে চাটুবাক্য না মেশালে রসসম্ভোগে বাধা হয়। এই চাটুভাষণ বর্ত্তমান কালের উদ্দেশে। ভাবীকালে তার প্রয়োজন চলে গেলে সাহিত্যের বিচার বিশুদ্ধ হতে পারবে।

সেদিন Ernest Rhysএর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। ভালো লাগল। গীতাঞ্জলির সত্যযুগে ওঁর সঙ্গে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওঁর স্ত্রী খুব সহৃদয় এবং রসজ্ঞ

১১।।১১

স্ত্রীলোক ছিলেন। গোল্‌ডর্স্‌ গ্রীনে ওঁদের বাড়ি ছিল, পিছনের ছোটো আঙিনায় ছিল গোলাপের ক্ষেত— কতদিন অপরাহ্লের পড়ন্ত রোদে সেখানে ছায়ায় বসে চা খেয়েছি গল্প করেছি। ড্রয়িংরুমের কোণে একটি কেদারা ছিল, সেইটেতে আমারি যেন বিশেষ স্বত্ব জন্মে গিয়েছিল। রিজ্‌ খুব কাজে ব্যস্ত লোক, অথচ যখনি আমার কোনো প্রয়োজন হোত ওঁকে ডেকে পাঠালেই কাজ কামাই করে গোল্‌ডর্স্‌ গ্রীন থেকে কেন্সিঙটনে এসে উপস্থিত হতেন— ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁকে নিয়ে কাটিয়েছি। ওঁদের তুজনের মধ্যে যথার্থ একটি কবিত্বের রস ছিল। আমার কোনো লেখা নিয়ে যখন ওঁর পরামর্শ নিতুম শব্দের বাছাই নিয়ে অত্যন্ত খুঁটিনাটি করতেন— আমার অনেক শিক্ষা হয়েছিল। আমার কাব্যসঞ্চয়নের কথা ওঁকে লিখেছি। আমার বিশ্বাস তুমি যদি ওঁর পরামর্শ নাও তবে উনি যথেষ্ট যত্ন করে বিচার করবেন। যাই হোক চয়ন সম্বন্ধে ইদানীং তোমার কাছ থেকে কোনো খবর পাইনি। যদি এমন হয় তুমি নিতান্ত ব্যস্ত থাকো সময় না পাও তাহলে রীজের মত লোকের উপর ভার দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

রথী বৌমা কাল ফিরে এসেছেন— শরীরও দেখলুম ভালো, মনটাও আশান্বিত। ওখানে বন্ধুমণ্ডলীতে তোমার প্রতিষ্ঠা দেখে ওঁরা খুব খুসি হয়েছেন। যে দেশে গেছ সে দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারলে নিজের দেশেরই প্রতি অন্যায় করা হয়। আমাদের নব্যযুবকেরা অনেকে তার উল্টো পথে চলেন। ওদের প্রতি অপ্রিয়তা ও অসৌজন্যকে তারা পৌরুষ

বলে মনে করে। এ কথা ভুলে যায় পরুষ ব্যবহার ইংরেজ যদি সহ্য করে সেটাতে আমাদের বাহাদুরি নেই, সে ওদেরি ঔদার্য্য। যেখানে শাস্তির আশঙ্কা নেই সেখানে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকেরা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে আনন্দ পায়। এ কথা আমি বারবার স্বীকার করি যে, বুদ্ধিতে এবং চরিত্রে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক উপরে। ওরা মাঝে মাঝে যতই অন্যায় অবিচার ও ভুল করুক ওদের চিত্তবৃত্তিতে যে শ্রেয়োবুদ্ধির বেদনা আছে সে আমাদের নেই। যতই আমার বয়স হচ্চে ততই স্বজাতির জন্যে আমার লজ্জা ও নৈরাশ্য বেড়ে উঠচে। ইংরেজিতে যাকে malice বলে সেটা এদের স্বভাবে অহৈতুক।··· যে মানুষ কোনো কিছুতে কৃতকার্য্য হয়েছে তার মাথা হেঁট করতে এদের কী অসীম আনন্দ। ইতি ১১ জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

৪ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি বোধ হচ্চে গ্রীষ্মের অবকাশে ঘুরে বেড়াচ্চ। তাই অনেককাল পরে তোমার চিঠি পেলুম। লেস্‌নির জন্যে চিঠিখানি আজকের ডাকেই রওনা করে দেব— তিনি এলে ভালোই হবে। এণ্ড্রুজ এতদিন পরে আশ্রমে এসেছেন— তাঁকে

আমার ইংরেজি কাব্যসম্বন্ধে আমার অনুশোচনা জানালুম। তাঁরও মত এই যে বর্জ্জনীয় কবিতাগুলি বাদ দিয়ে একটা সমগ্র পরিশোধিত সংস্করণ বের করা। গীতাঞ্জলি, Crescent Moon এবং Gardener অখণ্ডই থাকবে— বাকি বইগুলো ছাঁটা আবশ্যক। আমার রুচিমতো ছেঁটেছি— কিন্তু আমার রুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবার দরকার নেই— ঐটেকে অবলম্বন করে তোমরাও ছেঁটেকেটে একটা ভদ্র জিনিষ দাঁড় করালে খুসি হব। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে আবর্জ্জনাগুলো সরিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব। ম্যাকমিলানরা লিখেছিল সিলেক্‌শনের কথা, সেটা ভালো প্রস্তাব। কিন্তু তার চেয়ে ভালো প্রস্তাব, সমস্তটাকে মেরামৎ করা। এই সংশোধিত সংস্করণে চিত্রা, Cycle of Spring এবং Post Officeটা জুড়তে পারো— অথবা শুধু চিত্রাকেই কাব্যের অন্তর্গত করে নিয়ে অন্যগুলোকে স্বতন্ত্র বের করতে পারো।

চার অধ্যায়ের তর্জ্জমা এণ্ড্রুজকে পড়তে দিয়েছিলুম। তার খুব ভালো লেগেছে।··· তোমাকে পূর্ব্বেও বলেছি আবার বলছি ঐ তর্জ্জমাটা প্রকাশ করা যদি তোমরা সঙ্গত না মনে করো তাহলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হবো না। খ্যাতি অর্জ্জনের মোহ আমার মন থেকে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসচে। ঐ নেশাটার মতো দুঃখকর জিনিষ পৃথিবীতে অল্পই আছে। অথচ কী ফাঁকি ওটা! জগতে সত্যকার আনন্দের উপকরণ যথেষ্ট আছে, সে সব বিনি পয়সার দান, এবং সৌভাগ্যক্রমে

তা ভোগ করবার শক্তিও আমার আছে; লোকের মুখের কথার জন্যে ঘুর খেয়ে বেড়ানোর মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই। এই শূন্য মরীচিকার রাজ্য থেকে বিদায় নেবার সময় আমার আসন্ন হয়ে এসেছে, তাই রোজই ভাবি এর থেকে মন সরিয়ে নিয়ে এবার পাত্র ভরে নিই আনন্দের চিরউৎসধারা থেকে। মনকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন, কিন্তু এই সাধনায় লেগে থাকাই দরকার।

শেষ সপ্তক তো প্রকাশ হোলো— যাদের ভালো লেগেছে তাদের বিশেষ ভালো লেগেছে— আবার অনেকে এতে চিনির অংশ কম দেখে নিজেদের বঞ্চিত বোধ করচে। বোধ হয় তারা স্থির করেছে বয়সে বাড়চি রসে কমছি— হয়তো বা কথাটা সত্যি। এবার ছন্দে লেখা কবিতার বই বের করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, নাম দিয়েছি বীথিকা। জানিনে তাতে গুড়ের অংশ কী পরিমাণ আছে।

এ বৎসর বর্ষা নিতান্তই ফাঁকি দিয়েছে। বর্ষামঙ্গল করে দেখি, দেবতা কবির আহ্বান মানেন কি না। ইতি ৪ অগষ্ট ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

২৫ অগস্ট ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

দিশি এমন একটি কাগজও নেই যাতে আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করেনি। রাষ্ট্রনৈতিক শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে বর্ণভেদমূলক উত্তেজনা আছে।

আমার জীবলীলার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে সে কথা বলা বাহুল্য। আমি য়ুরোপীয় নই, কর্ম্মের কাছে আত্মবলি দিয়ে শক্তি সাধনার চরমমূল্য স্বীকার করিনে। ভাঁটার গতি সমুদ্রের দিকে, জীবনের এই ভাঁটার খেয়াকে উজানের দিকে লগি ঠেলে চলবার প্রাণপণ প্রয়াসকে ধন্য ধন্য করা আমার ভারতীয় স্বভাববিরুদ্ধ। আজ আমার মন সমুদ্রমুখে, কর্ত্তব্যের দোহাই পাড়লে ফল হবে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারি নি, চেষ্টায় আছি নূতন কর্ম্ম বাড়াব না।

বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের নিরুপায় অক্ষমতা সুদীর্ঘকাল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। তার বিরুদ্ধে কণ্ঠচালনা করে সান্ত্বনাচেষ্টারও অন্ত নেই। সেই ক্ষীণ কলরবের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিজের কাছে ফিরে এসে আমাদের পরিহাস করে। তবুও এই পথে অনেকদিন স্বর সাধনা করতে ছাড়ি নি—এখন দিন শেষ হয়ে এল, বহির্ম্মুখী চেষ্টাগুলোকে প্রতিসংহার করবার সময় এসেছে।

প্রবলের বাহুবল প্রয়োগের যুদ্ধরূপটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে দারুণতর অভিঘাত আছে তার লাল রংটা চোখে পড়ে না বলে সে সম্বন্ধে ইণ্টরন্যাশনাল দরদ জাগাবার সম্ভাবনা নেই। তারি সাংঘাতিকতা দুর্ব্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক।

আমাদের মতো দুর্ব্বল যখন মার খায় তখন স্বীকার করে নিতে হয় সেটা অনিবার্য্য। আমরা মারের জন্যে নিজের হাতে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি, অথচ বোকার মতো কান্নাকাটি করি। আমাদের কলসকে শতছিদ্র করেই গড়েছি, ঘরে যখন আগুন লাগে জল তখন যায় নিকেশ হয়ে; ধর্ম্মের নামে সেই ফুটো ঘটটাকে মঙ্গলঘট বলেই সযত্নে তুলে রাখি, তার পরে জলাভাব নিয়ে পরের অনুকম্পার পরিমাণ বিচার করি। এমন স্থলে বিদেশী রাজন্যবর্গকে দোষ দিয়ে আত্মপরিতোষ লাভের চেষ্টা লজ্জাজনক মূঢ়তা। ইতিহাসে আমাদের চেয়ে অনেক মজবুৎ জাত মরেছে, আর আমরাই যে দুর্ব্বলতা বুকে আঁকড়ে ধরে চিরকাল বেঁচেই থাকব বিধাতার এমন আদুরে ছেলে আমরা নই। অতএব মরণের রোগীর চিকিৎসা শেষ পর্য্যন্তই করতে হবে কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়ে। এত কথা তোমাকে বলবার উদ্দেশ্য হচ্চে এই যে, পঁচাত্তর বছরের জীর্ণ শরীরের বোঝা নিয়ে আয়ুপথের শেষ মাইলটা যখন চলতে হচ্চে তখন উপস্থিত দায় সামলানোই যথেষ্ট কঠিন, আর কোনো উত্তেজনায় এই ফাটলধরা মনটাকে দোল খাওয়াতে উৎসাহ হয় না।

চার অধ্যায় বোধ হয় পাও নি, হয়তো পাবে না। বিশেষ ক্ষতি হবেনা। তোমরা যে সিলেক্‌শন সঙ্কলন করেছ তার খসড়াটা আমার কাছে পাঠালে না কেন? হয়তো সেইটেতেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল, শারদোৎসবের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। পশ্চিম মহাদেশে তোমরা যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিপুল সমুদ্যোগের সম্মুখে আছ, তোমাদের কাছে আমাদের এই কোণের ঘরের খেলা অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হবে। কিন্তু এইটুকুর জন্যেই বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ— আমাদের থলি ছোট্ট, অল্প দানই অনেকখানি। ইতি ২৫ অগষ্ট ১৯৩৫

তোমাদের কবি—

৮৩

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বাইরে থেকে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবেনা যে এবার আমার জীবনে প্রদোষকাল ঘনিয়ে এসেছে। মন বলচে সংসারে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। আমাদের জীবনের আরম্ভকালে শৈশবে আমরা দায়মুক্ত, জীবনের প্রান্তেও তাই। এখন যা কিছু সক্রিয়তা সব অন্তরের দিকে। এই ক্রিয়াটা ধীরে ধীরে বোঁটা আলগা করবার দিকে। আমাদের বয়সে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়েই হোক বা আসক্তির আকর্ষণবশতই

হোক সংসারকে যদি চারদিক থেকে আঁক্‌ড়ে থাকি তবে সেটাতে কল্যাণ নেই। দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতই সম্বন্ধসূত্রগুলো জীর্ণ হয় তবু মরতে চায় না, আমি সেটাকে লজ্জাকর মনে করি। উপনিষদে আছে দুই পাখী এক ডালে আছে। একটি পাখী ভোগ করে আর একটি পাখী দেখে। সংসার থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে সেই ভোগের দিক থেকে নিরাসক্ত দেখার দিকে সরে আস্‌তে ইচ্ছে করচি। ভোগ বলতে কেবল সুখভোগ বোঝায় না, কর্ম্মভোগও বটে। তার থেকে ছুটি নেবার অধিকার আমার হয়েছে। আমি ফাঁকি দিই নি, নানা পথ দিয়েই নিজের শক্তিকে উৎসর্গ করেছি। কর্ম্মের উদ্যোগে যেমন সার্থকতা আছে কর্ম্ম থেকে অবকাশের মধ্যে তেমনি সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতার জন্যে প্রতিদিনই আমার মন উৎসুক। তোমরা আছ যৌবনজোয়ারের উদ্দাম টানের মধ্যে, আমাদের এই ঘাটের মনোবৃত্তি ঠিকমতো বুঝতেই পারবে না। তা নাই বোঝো, আমরা ডাঙায় এসে আমাদের পণ্য বেচেকিনে দিয়ে অনাগতের অভিমুখে তোমাদের বোঝাই করা নৌকোর ভাসান দেখচি। দেখ্‌তে আনন্দ আছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে তোমাদের চল্‌তি নৌকোয় চড়ে বসব এমন আশা কোরো না। যাক্‌।

নতুন কবিতাগুলি এণ্ড্রুজ নিয়ে গেছে। তার কাছ থেকে পাবে। আমি যেরকম ছেঁটেকেটে দিয়েছি সেইটেকে চরম বলে ধরে নিয়ো না। তোমাদের বিচারবুদ্ধিকে খাটিয়ো। যেখানে আমার সঙ্গে মতের অনৈক্য হবে সেখানে তোমাদের

মতকেই প্রাধান্য দিয়ো। আমার লেখার ভালোমন্দ সব সময়ে আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি নে। যেমন আমার "শেষের কবিতা" তেমনি "চার অধ্যায়", ওর ভাষার রসেই ওরা সজীব প্রফুল্ল। অর্থাৎ কবিতার যে মূল্য, প্রধানত ওদের সেই মূল্য। ভাষান্তরে সেটা টেঁকে না। মূল ভাষার রস বাদ দিয়ে বাকি যেটুকু থাকে সেটা সাহিত্যভাণ্ডারে রক্ষণীয় কিনা জানি নে। সেইজন্যে ইংরেজি "চার অধ্যায়" সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উৎসাহ নেই। আসল কথা খ্যাতির ওঠানামার বাজারে নতুন কারবার করতে আমার ঔৎসুক্য চলে গেছে।

আমার একটা নতুন কবিতার বই বীথিকা নাম ধরে বেরিয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার অনতিকালের মধ্যে পাবে। কীরকম লাগ্‌বে জানি নে। এর অধিকাংশ কবিতা এক-সূত্রে গাঁথা নয়। তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। একটা থেকে আরেকটাতে যাবার সেতু না থাকাতে মনকে ফাঁক ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চল্‌তে হয়, পড়বার আরাম তাতে ঘনিয়ে উঠতে পারে না। কেবল এক একখানি কবিতা এক একদিনের মতো যদি জোগান দেওয়া যেতে পারত তা হলেই ভালো হোতো। কিন্তু এরকম ছাপানো বই হাটের মতো, সেখানে বিচিত্র অসংলগ্ন পণ্যের বাজার। তাদের আলাদা আলাদা রূপ, আলাদা আলাদা দাম। তাই আশঙ্কা হচ্চে এ বইটা সাধারণের গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু সেটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কবিতা জিনিষটা হাত পেতে সদ্য গ্রহণ করবার নয়। গ্রহণ করা ব্যাপারটার একটা পরিণতিকাল আছে—

দেওয়া এবং নেওয়া একেবারে অব্যবহিতভাবে মিলিত হয় না।

এখানে শারদোৎসবের আয়োজন চলেচে। কিন্তু বর্ষা এবার বিলম্বে এসে কিছুতে দখল ছাড়চে না—স্তূপাকার মেঘে শরৎকে অবরুদ্ধ করে রেখেচে। বস্তুত এবার আমার শারদোৎসব একটা protest meetingএর মতো হবে—যেন, জেলে রয়েছে যে বন্দী তাকেই কনগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করে তার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করা। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪
৭ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে আগেই লিখেছি চার অধ্যায়ের ইংরেজি তর্জ্জমা ছাপানো সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র গরজ নেই। প্রথমত তর্জ্জমাটা আমার নয় দ্বিতীয়ত আমার লেখায় ভাষা প্রধান বাহন। অর্থাৎ ওর প্রধান কথাটা শব্দার্থের দ্বারাই ব্যক্ত হয় না, অনেকখানিই ভাষার ব্যঞ্জনায়। সেটা বাদ দিলে যে দীনতা ঘটে সেটা অপরিচ্ছন্ন—তাকে আমি বিদেশী সভায় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। নিজে তর্জ্জমা করতে হলে নতুন

করে লিখতে হোত। দুটো কারণে সেটা অসম্ভব— এখন দেহে মনে জোর নেই— দ্বিতীয়ত ইংরেজি লেখা খোলে ইংরেজি আবহাওয়ায়, জাহাজে চড়লে আপনিই কলমের বুলি ফিরে যায়, এখানে সে নিতান্তই বাঙালী।

এণ্ড্রুজ আমার একত্রীকৃত কাব্যগ্রন্থ বের করবার পক্ষপাতী। তাঁকে বলেছি Ernest Rhys আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাঁর সাহায্য আমি পূর্ব্বেও পেয়েছি এখনো পেতে ইচ্ছুক। আমার বিশ্বাস সাহিত্যবিচারে তাঁর সূক্ষ্ম বোধশক্তি আছে। তিনি অত্যন্ত রুক্ষ আধুনিক নন এই জন্যে আমার কবিতার সুরের সঙ্গে তাঁর সুর মিলবে। আমার এই মত ম্যাকমিলানকে জানিয়ো। তিনি যদি Edit করেন (অবশ্য মূল্য নিয়ে) আমি নিশ্চিন্ত থাকব। আমি নিজে কেটেছেঁটে যা দাঁড় করিয়েছি সেটা তাঁকে একবার দেখিয়ো। তাঁর সঙ্গে appointment করে তুমি যদি আলোচনা করতে পারো আমি খুসি হব। —একটা কথা বলা আবশ্যক— The Cycle of Springএ অনেকগুলি Lyrical কবিতা আছে— আমার মত এই যে তার মধ্যে যেগুলি চয়নযোগ্য এই বইয়ে যেন তারা স্থান পায়। Cycle of Spring অনেকে পড়বেনা— এটা পড়বে। এণ্ড্রুজ Cycle of Spring ভাঙতে চান না কিন্তু তাঁর আপত্তি স্বীকার-যোগ্য নয়। আরো দুই একটা কবিতা পাঠাই যদি চালানো মত হয় চালিয়ো, ফাল্গুনীর সম্বন্ধে Rhysএর মত নিয়ো। তুমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছ নানা কাজে, তোমার উপর আমার দায় চাপাচ্ছি, ভালো লাগচেনা, উপায় নেই।

বীথিকা এতদিনে পেয়ে থাকবে— নানা রকমের কবিতা এর মধ্যে জুটে গেছে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভেবে দেখলুম The Cycle of Spring বাদ দেওয়াই ভালো, ওতে বিশেষ কিছুই নেই।

আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

৮৫

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারি নি। তার কারণ নানা কর্ম্মজালে নিরন্তর এবং নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলুম তার উপরে শরীর ভেঙে পড়েছিল। কয়েকদিনমাত্র হোলো ডাক্তারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আজ ৭ই পৌষের উৎসব সমাধা করে তোমাকে এই পত্র লিখতে বসলুম। ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে বই কখানা পেয়ে পড়বার খোরাক পাওয়া গেল। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বইখানি আমার খুব ভালো লাগচে। তোমাদের ওখানকার আধুনিক কালকে আমার মনে হয় ক্ষণকালের একটা আকস্মিক উৎক্ষেপ, চিরকালের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ— নিজের মধ্যে হঠাৎ চিরন্তনের সম্বল নিঃশেষ হয়ে

এসেচে বলেই, নিজের দৈন্যকে নিয়েই জয়পতাকা বানাবার চেষ্টা করচে। ইতিহাসে কতবার এ রকম মেকি রাজা মহা সমারোহ করে এসেছে, তাদের প্রতাপের আড়ম্বরে ভিড়ের লোক মুগ্ধ হয়েছে, তার পরে হঠাৎ দেখা যায় সেই রাজাও নেই সেই ভিড়ও গেছে সরে। আর আজকের দিনের যে আধুনিক কাল পূর্ব্বতন মানুষের আনন্দের আদর্শকে অবজ্ঞা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এরি কি নূতন ছাপমারা মূল্যের তালিকা চিরকালের বাজারে চলবে? যে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় এ'কে ঠিকমতো যাচাই করা যেতে পারত তোমরা তার বাইরে, তোমরা আজকের দিনের মুখর ভিড়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেষি করে আছ। যাক্ এ সব তর্কে কোনো ফল নেই। আমার মন আজ নিতান্ত নিরাসক্ত— মুখের কথা কেনাবেচার হাটে আমার লোভ ক্ষীণ হয়ে এসেচে, জানি সে কতই ফাঁকা। —অমলার অকস্মাৎ মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেচি। তার পরে আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা গভীর ছিল। এমন মনস্বিনী এমন তেজস্বিনী সত্যপ্রতিষ্ঠ মেয়ে কম দেখেছি। তার সংসারে তার অভাব যে কত বড়ো প্রকাণ্ড অভাব তা বুঝতে পারি —কিন্তু কোনো কথা বলবার নেই।

৭ই পৌষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এণ্ড্রুজকে ও অরনেস্ট্ রীজকে যে চিঠি লিখেছি সে বোধ হয় তুমি দেখ নি। তাতে জানিয়েছি, যে এখান থেকে যে সব কবিতার তাড়া এণ্ড্রুজের সঙ্গে গিয়েছে সে আমার নির্ব্বাচিত নয়। নির্ব্বাচনের ভার তাঁরই উপরে যিনি এডিট করবেন। অপ্রকাশিত কবিতাগুলো আমি বর্জ্জন করতেই চাই। আমার প্রশ্ন চিত্রা সম্বন্ধে, সেটা কি ত্যাগ করাই স্থির করেচ। আমার তাতে লেশমাত্র আপত্তি নেই। নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমি যে কিছুতেই বেদনাবোধ করব এমন আশঙ্কা মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করে দিয়ো। আমি নিজেই যেগুলো বহিষ্কৃত করেছি তার বাইরেও যদি ত্যাজ্য কিছু থাকে তবে তা ছেঁটে দিতে দ্বিধামাত্র কোরো না। এ সম্বন্ধে এণ্ড্রুজকে আমার মত স্পষ্ট করেই জানিয়েছি তবু তুমি তাঁকে আর একবার অভয় দিয়ে আমার মতটা জানিয়ে দিয়ো। নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার মমত্বর চেয়ে নিষ্ঠুরতাই বেশি আছে এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো। ফাল্গুনীটা গদ্য নাটক, ডাকঘরেরই সমজাতীয় এই কারণে ওটা কাব্যসংগ্রহে স্থান পাবার অযোগ্য, তা ছাড়া ওর লিরিক ছন্দ ও সুরের উপরই একান্ত নির্ভর করে। বহুকাল পূর্ব্বে একজন ফরাসী সমালোচক ওর খুব প্রশংসা করে সুনিপুণ সমালোচনা করেছিলেন— আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।

কিন্তু ইংরেজি তাঁর আপন ভাষা নয় বলেই ভাষার দিকে তিনি বাধা পান নি। Darmstadtএ থাকতে একজন হাইডেলবর্গের ছাত্র ওর মর্ম্মকথা এমন সুন্দর করে বলেছিল যে সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর হয়েছিল। দেখেছি গীতাঞ্জলির তর্জ্জমা ইংরেজের কাছে এত ভালো লাগে তার প্রধান কারণ ওর ভাষা। অন্য ভাষার য়ুরোপীয়দের কাছে Gardener ওর চেয়ে অনেক বেশি আদৃত— তাদের কাছে ভাবের আকর্ষণ প্রবল।

অনেক কাল পরে দুখানি ইংরেজি [বই] আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। একখানি নেভিনসনের "Looking Backward"— নামটা ভুল হোলো, মনে নেই। আর একখানি লরেন্স বিনিয়নের Asian Minds in Art। অন্তরের মধ্যে পরমানন্দে অনুভব করলুম এ রা আধুনিক নন এঁরা সর্ব্বকালীন। এঁরা ভূমাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে শ্রদ্ধা করেন তাঁর সঙ্গে চাতুরী করেন না। বই পড়ে অনেককাল এমন পরিতৃপ্তি পাইনি। ইচ্ছা করছিল যেন না শেষ হয়ে যায়। শুনেছি নেভিন্‌সনের আত্মজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে। শশধরকে বোলো আমাকে পাঠিয়ে দিতে আমি তার দাম দেব। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

৭ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের খবর পেয়েছ কিনা জানি নে। গল্পটাকে নাচে গানে গেঁথে নাট্যমঞ্চের উপরে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পালাটা নিয়ে আমরা জয়যাত্রায় বেরিয়েছিলেম। কলকাতা পাটনা এলাহাবাদ দিল্লি মিরাট লাহোর এই কয় জায়গায় আসর জমিয়েছিলুম। সকল জায়গা থেকেই প্রভূত প্রশংসা পেয়ে এসেছি। যদি প্রত্যক্ষ দেখতে তাহলে বুঝতে গানে নাচে বর্ণচ্ছটার সমবায়ে সমস্তটার ভিতর দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যের কী রকম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শকরা বারবার করে বলেছে এ জিনিষটা য়ুরোপে নিয়ে যাওয়া উচিত। লোকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে রঙ্গভূমির ভূমিকায় এই আমার শেষ প্রয়াস। কোনো একটি অনামা বন্ধু আমাদের ঋণমোচনের জন্য আমাকে এককালীন ষাট হাজার টাকা দান করে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।··· বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর করবার জন্যে দুর্ব্বল জীর্ণ শরীরকে ক্লান্তির চরমসীমায় নিয়ে চলেছিলুম। শ্রদ্ধাবিহীনের দ্বারে ব্যর্থ ভিক্ষাপাত্র বহনের দুঃখ ও অসম্মান প্রত্যহ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন উপলব্ধি করেছি আমার দেশে আমার যথার্থ স্থান নেই, আমি একান্তই বিদেশী। এমন সময়ে অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত অনুকম্পা আমাকে বিস্মিত করেছে। এই দান ব্যক্তিগত,

এ আমার দেশের দান নয়— এমন কেউ দিয়েছেন যিনি আমার সমানধর্ম্মা। আমাকে বিশেষ করে মুগ্ধ করেছে এইজন্যে, বিশেষভাবে আমারই ভার লাঘব ও সম্মান রক্ষার জন্যেই এই দাক্ষিণ্য, কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে নৈর্ব্যক্তিক অর্ঘ্যদান নয়। আমি বেঁচে থাকি, আমি আরাম পাই এই অকৃত্রিম দরদ দেশের কোনো একটিমাত্র জায়গাতেও থাক্‌তে পারে এমন প্রত্যাশার লেশমাত্রও আমার মনে ছিল না। অথচ যাঁরা একমুহূর্তের জন্যেও আমার কর্ম্মক্ষেত্রের সুদূর প্রান্তেও পা বাড়ান নি তাঁরা নিজেদের কীর্ত্তি এবং স্বার্থের জন্যে আমার নামের সংস্রব প্রার্থনা করতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করেন না, অর্থাৎ তাঁরা আমার ভার বাড়িয়েই থাকেন, ভার লেশমাত্র কমাবার জন্যে লেশমাত্র ইচ্ছা দেখান না। বাংলাদেশের কাছ থেকে মিথ্যা নিন্দা ও গালি দেশের লোকের বিনা আপত্তিতে আমি যেমন সহ্য করেছি এমন আর কেউ করে নি। এ দেশে আমার শেষ বয়স পর্য্যন্ত আমি চিরনির্ব্বাসন-দশা ভোগ করেছি। আমার শক্তি আমার অর্থ আমার খ্যাতি এই প্রদেশকেই নিঃশেষে আমি সমর্পণ করে দিয়েছি। আজ গঞ্জনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে জীবনযাত্রার সুদীর্ঘ পথের শেষে আমার প্রদেশের বাইরে থেকে এই যে ভালোবাসার প্রমাণ পেয়েছি এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার আমি আর কিছু পাই নি। যে ছুটি আজ আমার অত্যন্ত আবশ্যক ছিল সেই ছুটির এতবড়ো দাম একমুহূর্ত্তে যিনি শোধ করে দিয়েছেন তাঁর উদ্দেশে রইল আমার জীবনের শেষ নমস্কার।

নেভিন্‌সনের বইখানি পেয়ে অত্যন্ত খুসি হয়েছি। এখনকার অনেক আধুনিক লেখকের মধ্যে ওঁকেই দেখেছি যিনি একান্তভাবে মডার্‌ন্‌ নন, যিনি সকল কালের। ওঁর রচনার মধ্যে লেখনীর নৈপুণ্য নয় চরিত্রের মহিমা প্রকাশ পায় তাতে ভারি আনন্দ দেয়। যে স্বচ্ছবাতাসে আলোক বাধা পায় না, আবিল হয় না, ওঁর লেখার চারদিকে সেই বায়ুমণ্ডল আছে।

একটা খবর দেবার আছে। বোধ হয় ইতিমধ্যেই পেয়ে থাকবে। কৃপালানির সঙ্গে বুড়ির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। অত্যন্ত খুসি হয়েছি। কৃপালানিকে আমি অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি, ওকে যে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সীমানার মধ্যে পেয়েছি এ আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। বোধ হয় দিন দশ পনেরোর মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হবে। তার পরে আমার ছুটি। কিছুদিনের জন্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করব। যদি যথোচিত সঙ্গতি থাকত তাহলে একবার য়ুরোপ ঘুরে আসতুম। অশুভগ্রহের যে রকম সব লক্ষণ দেখা যাচ্চে তাতে আশঙ্কা হচ্চে য়ুরোপে হয়ত বা যুগান্তর আসন্ন— পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই ক্ষত আহত দশার পূর্ব্বে একবার দেখে আসতে পারলে হ'ত ভালো। ওদের ইতিহাসের স্তরে স্তরে অনেকদিন অনেক পাপ জমে এসেছে, কোন্‌ রক্তস্নানে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে জানি নে।

আজকাল লিখতে ক্লান্তি ও অনিচ্ছা বোধ হয়। আমার ইস্কুলপালানে ছেলেবেলা আজ আবার আমার ঘাড়ে চেপেছে। সেই আমার পলাতকা মন এতদিন তোমাকে চিঠিপত্র লেখে

নি। অনেকদিন পরে আজ অপরাহ্ণকালে কলম নিয়ে বসেছি। কিছুকাল থেকে লিখব লিখব করছিলুম— না লিখে ফেলতে পারলে ভিতরে ছুটি পাওয়া যায় না— তাই এই চিঠিখানা —এখন কলম বন্ধ করি। ইতি ৬।৪।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিখানি সমাধা করার পরেই মনটা আমার লজ্জাবোধ করচে। জীবনের খাতায় আদায়ের কোঠায় আমার কম জমা হয় নি, অথচ অনাদায়ের শূন্যগুলোর পরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাগ্যের কৃপণতার পরে অভিমান করার মতো দীনতা আর-কিছু হতে পারে না। পাওনার হিসেব নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করতে থাকা আত্মাবমাননা। সম্প্রতি আমার শরীর নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েচে বলেই এই অসন্তোষ অস্বাস্থ্যে ভর দিয়ে হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে শরীর ভালো ছিল তখন জীবনের সমস্ত গ্লানির উপরে আমার মন সম্পূর্ণ জয়ী হয়ে সুগভীর শান্তিতে পূর্ণ হয়ে ছিল, তখন বাইরের সমস্ত প্রতিকূলতা আমার কাছে অবাস্তব প্রতিপন্ন হওয়াতে আমার যাত্রাপথের শেষ অংশটা খুব স্নিগ্ধ হয়ে এসেছিল। এ কথাটা পরিষ্কার বুঝেছিলুম আয়ুর স্রোতে সত্য মিথ্যা দুইই প্রচুর পরিমাণে মিশিয়ে থাকে, কিন্তু গঙ্গার ধারা আপনার পাঁকের অংশটাকে সহজে গৌণ করতে পেরেছে বলেই সে শুচি, তেমনি যা অবাস্তব তাকে গ্রহণ করেও সর্ব্বান্তঃকরণে অস্বীকার করতে

পারাই মনের স্বাস্থ্য এবং সম্মান রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক। আজ তোমাকে চিঠি লেখার পরেই দেখতে পেলুম, মনের তলায় যে পাঁকের পলি পড়ে নাড়া খেলেই হঠাৎ সমস্ত স্রোতটাকেই সে ঘুলিয়ে ফেলে। চরিত্রের এই অসম্ভ্রমের থেকে নিষ্কৃতি চাই— নালিশের ধুলো-ওড়া বাতাসের ঊর্দ্ধে যেখানে স্তব্ধ নির্ম্মল শান্তি সেখানে ডানায় ভর করে পৌঁছতে পারলে ক্ষীণতা থেকে ইতরতা থেকে রক্ষা পাব। বাইরের আদালত থেকে আমার সব নালিশ উঠিয়ে নিলুম। উপরের আদালতে জীবনের মামলায় জিৎ হবেই এই দৃঢ় প্রত্যাশার উপরে জীবনের পরিণামে যেন অবিচলিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমার লেখার ইংরেজি অনুবাদ প্রভৃতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলে তখন তার ধাক্কা আমার মনকে লাগে নি— আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম উপস্থিতকালের দেনাপাওনার তর্ক অশ্রদ্ধেয়— হিসাব যখন নিকাশ হবে তখন সে হবে আমার অগোচরেই, তার ফলাফল আমার অতীত— এবং উপস্থিত-কাল যে ফল নিয়ে আমার সম্মুখে ধরে তার পরিমাণ ও মূল্য নিয়ে হর্ষশোক ছেলেমানুষী। কাজের আনন্দটাই থাক্ আমার, তার বেশি আর যা কিছু দিয়ে নিজের নামটাকে ফুলিয়ে তুল্‌তে ব্যস্ত হই তার প্রতি যেন সম্পূর্ণ বিমুখ হতে পারি এই আমার কামনা। নামের মোহ জড়িয়ে আছে মনকে কুয়াষার মতো, লোকমুখের বাক্যের কুয়াষা— ছিন্ন হয়ে যাক্ সে— নির্ম্মল আলোর মধ্যে মুক্তি পাক অন্তরাত্মা। ইতি ৭।৪।৩৬

রবীন্দ্রনাথ

৮৮

১৩ জুলাই ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। আমিও বারবার তোমাকে চিঠি লিখি-লিখি করেছি। কিন্তু প্রাণ যখন সচল ছিল তখন সে আপনার বোঝা আপনিই বয়েছে, এখন সে স্থাবর হয়ে পড়াতে ছিয়াত্তর বছরের আয়ুর ভারে মন্থর মনটাকে কোনো কাজে চেতিয়ে তোলা বড়ো শক্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে স্থাণু হয়ে থাকা তো চলে না, সেইজন্যে আজকাল প্রকৃতির সাহচর্য্য আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে। উভয় পক্ষেই পরস্পরের কাছে কোনো দাবীদাওয়া নেই। আর একটা আনন্দ পাই বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্যে। ওদের জীবনলীলায় বয়স যেন থেমে আছে, ওরা প্রাচীন নবীন একসঙ্গেই— বয়সের ক্লান্তি ওদের একটুও নেই। ঐ শাল গাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল আজও ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্চে কিন্তু ক্ষণিকায় আমি ত্রিশবছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে। আমার কবিতার ভিতর দিয়েই কুষ্ঠির গণনা করা যেতে পারে, তার মধ্যেই রয়ে গেছে বয়সের হিসাব। আকাশের উপর দিয়ে যে দিনরাত্রি আসে যায় কালিদাসের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের ছায়া আলোর সম্পদ একই, অথচ ৭০ বছরের মধ্যেই তারা আমার দেহমনকে

যেন বহু জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসছে। সঞ্চয় ফেলতে ফেলতে চলেছি, পরিচয়ের বদল হচ্চেই। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই যে, আমাদের পারিপার্শ্বিক আমাদের পরিণতির নূতন পর্ব্বকে সহজে স্বীকার করতে চায় না, এক-কালের দাবী অন্যকালেও চাপাতে চায়। এইজন্যেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চাশের পর সমাজের রঙ্গভূমি থেকে নেপথ্যে সরে যেতে বলে। এদেশের উপদেশ অনুসারে সমাজ অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ জীবনের মাঝখানটাতে। বাল্য-কালও দায়িত্ববিহীন, বৃদ্ধবয়সও। সামনের জীবনের জন্যে বালককে যখন প্রস্তুত হতে হয় তখন সংসার তার উপরে কর্ত্তব্যের দাবী করে না। কিন্তু মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত হওয়া উচিত। মৃত্যুকে যারা নঙর্থক ব'লেই জানে, তারা, যেন চিরদিনই বাঁচতে হবে সেই রকম ভঙ্গীতে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ঠিকমতো ক'রে থেমে যাওয়াতেই প্রাণের পূর্ণতা প্রকাশ পায় এটা মনে রাখলে সেই থামবার জন্যেই সাধনা করা চাই। বস্তুত সকলে মিলে ঠিক সময়ে থামতে দিতে চায় না ব'লেই শেষ বয়সটা এত ক্লান্তির কারণ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর প্রবেশ-প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ অবকাশ অপেক্ষা করে আছে তাকে যদি বাইরের সংসার এবং অন্তরের পূর্ব্বাভ্যাসে মিলে নষ্ট করতে না থাকে তাহলে সেটা খুব সুন্দর। য়ুরোপের নকল ক'রে কর্ম্মপূজাকে আমরা এত বড়ো কৃত্রিম মূল্য দিয়েছি যে জীবনটা যে একটা আর্ট, সুতরাং সমাপ্তিতে তার একটা সম্পূর্ণতা আছে বাহাদুরী ক'রে এটা আমরা

ভুলতে বসেছি। বৃদ্ধের আদর্শ যারা, অর্থাৎ যারা ঠিকমতো ক'রে বুড়ো হোতে জেনেছে একদিন আমাদের সমাজে তাদের খুব বড়ো জায়গা ছিল। আজ সে জায়গা তাদের দিতে চায় না ব'লেই তাদের তারুণ্যের ভান করতে হয়। কম্যুনাল্ এওয়ার্ড নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়, সাহিত্যের মজুরিগিরি চালাতে হয়, Foreword লেখা, নবজাত মাসিকপত্রের আশীর্ব্বাণী পাঠানো, নতুন রচনা সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া ইত্যাদি হাজার রকম উপদ্রব মেনে না নিলে কর্ত্তব্যত্রুটির অপবাদ আক্রমণ করে। আগে অরণ্য ছিল এখন তাও নেই, গিরিশিখরে সমুদ্রতীরে আধুনিক বানপ্রস্থের রসদ জোগানো যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়। অতএব দেখতে পাচ্চি সুন্দর করে মরাটা অদৃষ্টে নেই, ক্লান্তিতে জীর্ণ জীবনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মাঝ রাস্তায় মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে অজায়গায় থামতে হবে।

তোমাকে আর এক খণ্ড "পত্রপুট" দিতে বলব। আশা করি নূতন সংস্করণের গদ্য বইগুলিও তোমাকে পাঠানো হচ্চে। প্রুফ সংশোধন করতে নিয়ে দেখি সেগুলি পাঠ্য। ইতি ১৩ জুলাই ১৯৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯

২৮ জুলাই ১৯৩৬

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠি পাই নি, বোধ করি ডিগ্রি-পরীক্ষার প্রবন্ধ রচনা নিয়ে ব্যস্ত আছ। আমিও দীর্ঘকাল তোমাকে চিঠি লিখি নি। সম্প্রতি লেখবার একটা তাগিদ এল ভিতর থেকে। মনটাকে খোলসা করবার প্রয়োজনে। তুমি সমুদ্রের ওপারে আছ, বাদবিবাদের চক্রবাত্যা থেকে দূরে, সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ। তুমি আমাকে ভালো ক'রে জানো সেও একটা সুবিধা।

ভারতশাসনযন্ত্রের কিছু অংশ আমাদের দান করা হোলো ব'লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দাক্ষিণ্যগৌরব অনুভব করছে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রতত্ত্ববিচারে যাঁরা অধিকারী তাঁরা বলছেন দান ক'রেও যতদূর সম্ভব দান না-করবার নৈপুণ্য এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন এই পোলিটিকাল কানামামার চেয়ে নেই-মামাও ভালো ছিল। এই তর্কে এ পর্য্যন্ত আমি বেশি মন দিই নি কারণ ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে দানে পাওয়া ঘোড়ার দাঁত গুণতে নেই। যেটাতে আমার মনকে পীড়া দিয়েছে সেটা হচ্চে এই যে, এই দানের অঞ্জলিতে বাংলাদেশের ভাগ্যে যে কুপথ্য মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ক্রিয়া চলবে চিরকাল ধ'রে। রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে বাংলাদেশে দ্বন্দ্ববিরোধের এমন একটা

বাসা বানানো হোলো যাতে ক'রে এ দেশের সেই শান্তিকে নানা উপলক্ষ্যে প্রখর চঞ্চুঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে যে-শান্তি আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির মূল আশ্রয়। মুসলমানেরা ভুলেছেন রাজশক্তির পক্ষপাতে তাঁদের সৌভাগ্য সূচনা করছে না। যে মার মারা হয়েছে এটা একলা হিন্দুর নয়, সমস্ত জাতের মর্ম্মে মার, গাছের প্রাণবাহী শিকড় কেটে দেওয়ার মার। বিষয় বিভাগে পার্টিশনের মামলায় যে পক্ষেরই হার হোক্ বা জিত হোক্, দুই ভায়েরই একান্নবর্ত্তী তহবিলে সর্ব্বনাশ ঘটায়, পৌষমাস তাদেরই যারা মামলার উৎসাহদাতা। দেউলিয়া হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেদের ঝোঁকে এ কথা বুঝতে সময় লাগে।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারসামঞ্জস্যের গুরুতর ব্যত্যয় ঘটলে সমস্ত দেশের শাসনযন্ত্র যায় বিকল হয়ে। এর ফলে যে-একটা সর্ব্বব্যাপী অপটুত্ব ঘটা অবশ্যম্ভাবী সেটা সমগ্র বাংলাদেশের পক্ষেই লজ্জা এবং দুঃখের কারণ হবে, এই সহজ কথাটাও যাতে ভুলিয়েছে কর্ত্তৃপক্ষ এমন একটা মাদকরসের পরিবেষণ করেছেন। তাই যাকে মারছেন সেও করছে জয়ধ্বনি। সংসারে ন্যায়ের প্রয়োজন কেবল ধর্ম্মরক্ষার জন্যে নয়, কর্ম্মরক্ষার জন্যেও।

মারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। "মহম্মদী"-পত্রে আমার কবিতায় পৌত্তলিকতা ও দুর্নীতির প্রভাব নির্দ্দেশ ক'রে যে নালিশ দায়ের করা হয়েছিল তারও জবাব দিতে হোলো। এত বড়ো প্রহসনের কিয়দংশ তুমি সেখান থেকেও ভোগ করেছ

ব'লে বোধ হচ্চে। যাঁদের সাধারণত আমরা এডুকেটেড ব'লে থাকি লেখক নিঃসন্দেহ সেই জাতীয়। কিন্তু একটা পরিব্যাপক প্রমত্ততায় বিভ্রম জন্মিয়েছে। আর কিছুকাল পূর্ব্বে এ রকম অদ্ভুত ঘটনা হয় নি, হোতে পারত না।

পাঠ্যনির্ব্বাচনসমিতিতে পিতৃদেবের আত্মজীবনী বিচারকালে মুসলমান পক্ষের বিচারক মহর্ষির দিদিমার মৃত্যুকালীন ঠাকুরদেবতার নামোচ্চারণের বিবরণমাত্রকেই আপত্তিজনক ব'লে মত দিয়েছিলেন। এই সমস্ত অদ্ভুত আপত্তি কেবলমাত্র বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধেই খাটছে। এই আদর্শে বিচার করলে ইংরেজি সাহিত্যে এর সমতুল্য এবং এর চেয়ে আরো অনেক বেশি এই জাতীয় আপত্তির কারণ ছড়াছড়ি পাওয়া যাবে সেটা প্রমাণ করতে অত্যন্ত বেশি গবেষণার দরকার করে না। কিন্তু সেটা লক্ষ্য করলেও তাতে কোনো চাঞ্চল্য ঘটবার আশঙ্কা নেই। ওঁরা বাংলা বিদ্যালয়ে পাঠ্য ইংরেজি সাহিত্যকে বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের রোচক ক'রে পরিবর্ত্তিত করার প্রস্তাব এখনো পর্য্যন্ত করেন নি। এ'কেই বলে কম্যুনালিজম্, এই কম্যুনালিজমের উপরেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিৎপত্তন হোলো।

এই সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা নিয়ে কয়েকদিন হোলো, কলকাতা টাউনহলে একটি সভা ডাকা হয়। আমাকে সভাপতিত্ব নেবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল। এই পদ আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

এ কথা শুনে তুমি হয়তো বিস্মিত হবে। তুমি জানো

পোলিটিকাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ। এতকাল ধরে আমি যে কর্ম্মের ভূমিকা রচনা করেছি আমাদের দেশের পোলিটিকাল আলোড়নের আঁধি তার হাওয়াকে আবিল করে দিতে পারে এই আশঙ্কা বরাবর আমার মনে ছিল। সাধারণত পলিটিক্‌সের উন্মাদনায় বহুল পরিমাণে যে মিথ্যা যে অত্যুক্তি যে দলাদলির বিদ্বেষবিষ উগ্র করে তোলে তার দূষিত সংক্রামকতা থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীদের মনকে সতর্কভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। তুমি তো জানো যখন কিছুকালের জন্যে আমেরিকায় বক্তৃতার নিমন্ত্রণে আশ্রম থেকে দূরে ছিলেম তখন সেই সময়কার পলিটিক্‌সের বেনোজল প্রবলবেগে আশ্রমকে আক্রমণ করেছিল, তার উচ্ছৃঙ্খলতা তার পঙ্কিলতা থেকে শান্তিনিকেতনকে প্রকৃতিস্থ করতে দীর্ঘকাল সময় লেগেছিল। যে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আজ আমরা ঝগড়া করছি তাতে একপক্ষ আজ প্রশ্রয় পেয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষের অনেকেরই মনে তার তাপ আটানব্বই ডিগ্রির যথেষ্ট উপরে। এই বহুকালীন সাম্প্রদায়িক চিত্তবিকার যে আমাদের দেশের সার্ব্বজাতিক কল্যাণের ভিত্তিকে জর্জ্জর করে রেখেছে সে কথা উপলব্ধি করার মতো বিবেচকতা এবং স্বীকার করার মতো সাহস তাদের নেই। শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রে এই সাম্প্রদায়িকতার কাঁটা গাছ যাতে কোনোমতে শিকড় গাড়তে না পারে সেজন্যে আমার মনে সর্ব্বদাই উদ্বেগ আছে।

ভারতশাসনযন্ত্র ইংরেজজাতি দ্বারা চালিত। এই কারণে

এই শাসন যখন আমাদের কোথাও পীড়া দেয় তখন তার আন্দোলনে স্বভাবতই সমস্ত ইংরেজজাতির পরেই আমাদের বিরুদ্ধভাব প্রবল হয়ে ওঠে। সমস্ত জাতির পরে এই অবিচার করার মধ্যে যে অন্যায় আছে যে অসত্য আছে তা আমাদের মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। তাতে যে প্রমাদ ঘটায় অন্যদিকে তার অনৌচিত্য বিচার না করলেও বলা যেতে পারে যে আমাদের রাষ্ট্রমঙ্গলসাধনায় সে প্রতিকূল।

তুমি আমার মত জানো এবং অন্যদেরও আমি অনেকবার বলেছি যে পরজাতির শাসনভারপ্রাপ্ত সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে ইংরেজকেই আমি সব চেয়ে শ্রদ্ধা করি। ওদের সঙ্গে আমাদের যে রকম অস্বাভাবিক সম্বন্ধ তাতে এই শ্রদ্ধার কথা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন এবং আমাদের পক্ষে শোনা শ্রুতিসুখকর নয়। সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেশে এমন অনেক নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে যার সঙ্গে ওদের সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়েছিল অথচ যা উচ্চারণ করবার অধিকার আমাদের নেই, যার ফলে দেশে আগুন ছড়িয়ে গেছে এবং তার শাস্তি আমাদের যুবকেরাই ভোগ করেছে। এই কারণগুলিতে বাংলাদেশের যুবকদের মনের দৃষ্টি তীব্রভাবে কলুষিত হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও বলতে হবে ইংরেজকে বিচার করবার সময়ে এই সমস্ত অভ্যুৎপাতকেও একান্ত করে দেখলে চলবে না। য়ুরোপে আরো কয়েকটি বড়ো বড়ো মহাজাতি আছে, পরদেশীয়দের শাসন করবার ক্ষেত্র আছে তাদের অধীনে। তারা যে আমাদের শাসনকর্ত্তা নয় অন্তত এ কথাটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই স্বীকার করতে

হবে। আমি আজ যা লিখছি, এবং আমাদের রাষ্ট্রসভায় ভারতশাসননীতি সম্বন্ধে অধীন জাতির বক্তব্য যে পরিমাণ স্বাধীনতার সঙ্গে আলোচিত হয়ে থাকে, পাশ্চাত্য শাসিত অন্য কোনো দেশেই তা সম্ভবপর হোত না। এখানে সীডিশনের সীমা যেখানে আরম্ভ অন্যত্র সেটা তার অনেক পশ্চাতে সে কথা ভুলে থাকি বলে উষ্মাপ্রকাশের সময় আমাদের বিভ্রম জন্মায় যে জোরটা আমাদেরই ; জোরটা যে অপর পক্ষের ধৈর্য্য এবং পৌরুষে সেটা আমাদের মনে চাপা থাকে। আমেরিকাকে আমরা দূরের থেকে মান দিয়ে থাকি যেহেতু তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। সেখানে নিগ্রোদের প্রতি লাঞ্ছনা ও পীড়নের পাশবতা ছেড়ে দিলেও সেখানকার আদালতে যে রকম চূড়ান্ত অন্যায়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায় আমরা ভারতবাসীরা তাতে অভ্যস্ত নই। পূর্ব্ব এসিয়ায় ভ্রমণকালে পাশ্চাত্য অধিকৃত দেশে যে রকম চুপি চুপি কানে কানে বলা আতঙ্কের পরিচয় পেয়েছি ভারতবর্ষে সে রকম আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। ভারতীয় সংস্কৃতিজ্ঞ সিলভ্যাঁ লেভি একদা বলেছিলেন, ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সুগম ক'রে ইংরেজ যে বিষম ভুল করেছেন ফরাসীরা যেন তাঁদের অধিকৃত দেশে সে রকম ভুল না করেন। মাঝে মাঝে স্পষ্ট বুঝতে পারি ভারতীয় রাজপুরুষেরাও এই নিয়ে মনে মনে অনুতাপ করে থাকেন, কিন্তু নিঃসঙ্কোচে গায়ের জোরে উক্ত অধ্যাপকের উপদেশ পালন করা ইংরেজের পক্ষে অসাধ্য। রাগ করলে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ নিজের জাতিধর্ম্ম যতই বিস্মৃত হোন তবু তার মধ্যে লজ্জা-

সরমের কিছু জায়গা থাকে। কেননা ওঁদের জাতের মধ্যে যাঁরা যথার্থ বড়ো এবং সেই কারণে যাঁরা তার প্রতিনিধি তাঁদের কাছে জবাবদিহি আছে। এই হেতু রাজপুরুষেরা জোর ক'রে বলতে পারে না আমাদের যা খুসি তাই করব। অনায়াসে বলতে পারত নবাবরা বাদশারা, সুযোগ পেলে আমাদের উপরাজারাও, পর্দ্দার আড়ালে অন্ধকারে বলতে চেষ্টা করেছে আমাদের অনেক জমিদারও, এবং আজ বলতে পারে য়ুরোপের অধিকাংশ কড়া কড়া জাতি। সেইজন্যে আন্দামানের স্ত্রীবিরল নারকীয়তাকে আমরা যখন দণ্ডধারীদের মুখের সামনে নিন্দা করি তখন আমাদের মতো দুর্ব্বল জাতেরও মুখের সামনে ওরা জোর গলায় বলতে পারে না যে যারা দণ্ডনীয় তাদের নরকেই পাঠাতে চাই। যথাসম্ভব সাধুতার সুরে ওদের বলতে হয় আন্দামান শান্তিধাম না হোক্ স্বর্গীয় শান্তিধাম বটেই। ইংরেজের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ আছে কার্য্যগতিকে সেই আদর্শ থেকে যারা ভ্রষ্ট হয় তারাও বাহুবলের স্পর্দ্ধায় সেই আদর্শের প্রকাশ্য অবমাননা করতে পারে না। যদি পারত তা হোলে কৌন্সিলের ক'জন স্পষ্ট বক্তা আন্দামান স্বর্গলোকের বাইরে স্থান পেত?

ইংরেজের মধ্যে যাঁরা মহৎ তাঁদের অনেককে আমি দেখেছি। তাঁরা স্বজাতিকৃত বা পরাজাতিকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুন্ঠিত হন না। তাঁরা হয়তো রাষ্ট্রনীতিক নন কিন্তু যাঁরা রাষ্ট্রনীতিক তাঁরা কী জাপানে কী য়ুরোপে সমগ্র জাতির যথার্থ প্রতিনিধি ব'লে গণ্য হোতে পারেন না। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রচালকেরা যদি তাঁদের দেশের মহত্তর দলের বিচার-

বুদ্ধিকে নগণ্য করতে পারতেন তা হোলেই মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ আজ হয়তো তাঁদের দ্বারা ভূমিসাৎ হোতে পারত। যেমন হয়েছে জার্ম্মানিতে, ইটালিতে, যেমনটা ঘটাতে হাত নিশপিশ করেছে ইংলণ্ডের নবদন্তোদ্গত ফাসিস্টদের। বলা যায় না কালক্রমে ইংলণ্ডে যদি এই ফাসিস্টের রাস্তাই প্রশস্ত হয় তা হোলে আন্দামানে লোক-বিরলতা ঘটবে না এবং কৌন্সিলের সকল সভ্যেরই বুলি সমান নম্রমধুর হয়ে উঠবে, যেমন হয়েছে জর্ম্মনিতে, যেমন হয়েছে ইটালিতে।

দূরে যেতে হবে না, কাছেই দেখলেম এণ্ড্রুজকে। তিনি নির্ভয়ে স্বজাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই স্বজাতির সম্মান-বৃদ্ধি করেছেন, সেজন্যে তাঁর দেশের লোকের অনেকেই যতই বিরক্ত হোক, তাঁকে লিঞ্চ করেনি। জর্ম্মানিতে থাকলে তাঁর সরকারী বাসা নির্দ্ধারিত হোত কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাবটা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। ভারতের প্রতি তাঁর আনুকূল্যটাকে তারা আপনাদের সহজপ্রাপ্য ব'লেই অনায়াসে হাত পেতে নিয়েছে কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তিনি যে অন্যায়কারী স্বজাতির বিরুদ্ধে রায় দিতে পেরেছেন এই শিক্ষাটাই নিজেদের আচরণে তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

পলিটিক্সের উত্তেজনা থেকে দূরে কেন থাকি তার কারণ তোমাকে বলা বাহুল্য ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান উপলক্ষ্যে আমি আমার আচরিত রীতির ব্যতিক্রম কেন করেছি তোমার কাছে তা স্পষ্ট করার জন্যেই এতখানি বলতে হোলো।

প্রথমেই ব'লে রাখি হিন্দুর তুলনায় ভাগবাটোয়ারার হিসাবে মুসলমান কতগুলো পদ ও সুবিধা পাবে তাই গণনা ক'রে ক্ষুব্ধ হোতে লজ্জা বোধ করি। এই রকম কাড়াকাড়ি নিয়ে আমাদের মধ্যকার বিরুদ্ধতা আরো তীব্র ক'রে তোলা আমার মতে নির্ব্বুদ্ধিতা। এ সমস্তই বাহ্য এবং তুচ্ছ। কিন্তু যখন থেকে আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক বিভাগের সঙ্কল্পমাত্র হয়েছে তখন থেকে পরে পরে যে সকল বিভীষিকা প্রবলবেগে উদ্যত হোতে পারল, এবং অবশেষে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে রকম ক্রুর দৃষ্টিপাত রূঢ়ভাবে সম্ভবপর হোলো তখন ব্যাপারটাকে ভারতশাসনের দ্যূতক্রীড়ায় একটা পোলিটিকাল চালমাত্র ব'লে আমার মতো সাহিত্যিকের পক্ষেও চুপ করে থাকা নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠল। নইলে আমাকে এই আলোচনার ক্ষেত্রে কিছুতেই টানতে পারত না। রাষ্ট্রশাসনসৌকর্য্যের দিক থেকে নয়, সাধারণ মনুষ্যত্বের দিক থেকে ব্যাপারটাকে বিচার করবার সময় এল। রাষ্ট্রিক ভাগবাটোয়ারা থেকে যে সব অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্চে এ যে সকল দিকেই আমাদের সমাজকে সংস্কৃতিকে শান্তিকে আক্রমণ করবার আয়োজন করছে। এতে মুসলমানের ক্ষতি আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। মুসলমানের সম্বন্ধে দিনে দিনে আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিকে যদি চিরদিনের মতো বিষাক্ত ক'রে তোলে তার মতো সভ্যনীতি-উচ্ছেদক সর্ব্বনেশে অভিঘাত আর কী হোতে পারে? তুমি জানো আমি মুসলমান বিদ্বেষী নই। অনেক শ্রদ্ধেয় মুসলমানের সঙ্গে আমার সখ্য

সহজ ও সুন্দর হয়েছে। জনসাধারণ শ্রেণীভুক্ত বিস্তর মুসলমানের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাদের আমি আন্তরিক স্নেহ করেছি। তাদের আমি আনুকূল্য দিয়েছি এবং তাদের কাছ থেকে আনুকূল্য পেয়েছি। কখনো তারা আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি। বস্তুত সেইজন্যেই বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমি এত উদ্বিগ্ন। পোলিটিকাল পক্ষপাতে যে মনোভাবের সৃষ্টি এবং যে সকল আচরণের উদ্ভব হচ্চে সেটা অব্যাহত থাকলে যে রকম সাম্প্রদায়িক নিন্দনীয়তা ক্রমশই প্রচণ্ড হয়ে উঠবে তার মতো বর্ব্বর ও অরুচিকর আর কিছু হোতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের ব্যবহারে এমন একটা অদ্ভুত জেদ দেখতে দেখতে বেড়ে উঠছে সেটাকে ছেলেমানুষী ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতুম যদি না কথায় কথায় সেটা শোকাবহ হয়ে উঠত। একটা দৃষ্টান্ত, মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুশোভাযাত্রায় বাজনা বাজিয়ে চলা। এতদিন এ নিয়ে কথা ওঠে নি আজও না হয় না উঠত; যদি উঠেইছে তা হোলে কিছুক্ষণের জন্যে মসজিদের উপাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে বাজনা না হয় বন্ধ রাখাই হোত, এরকম রফানিষ্পত্তি অত্যন্তই সহজ। কিন্তু যে মনোভাব থাকলে সহজ ব্যাপারও অসাধ্য হয় সেইটেই সব চেয়ে বিপদের বিষয়। খুব সম্ভব হিন্দু শোভাযাত্রীদের হাতে মসজিদের সামনে এলেই ঢাকের কাঠি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে ওঠে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকদের কারো কারো কাছে শুনেছি ঠিক তাঁদের উপাসনাকালে সরস্বতী পূজোর ভাসানের বাজনা উপাসনামন্দিরের সামনে অস্বাভাবিক উদ্যমের সঙ্গে

বেড়ে ওঠে। ✓দেবভক্তি ছাড়িয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিজের দেবতারই অবমাননা করে✓ যে কোনো কিছুতে এই বিদ্বেষকে নিরন্তর ও প্রবল ক'রে তোলে বর্ব্বরতার সৃষ্টি হয় তাতেই। আমি তো ছিয়াত্তরে পা দিয়েছি। আমার এই দীর্ঘকালের কেবল শেষ কয়েক বৎসরই সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বুদ্ধির আকস্মিক উত্তেজনা অমানুষিক বীভৎসতার আকারে প্রবল হয়েছে দেখতে পাই। লজ্জা সকলেরই পক্ষে, এবং বিপদ সমস্ত দেশের। এই বিপদের মারাত্মক শিকড় নানাদিকেই প্রসারিত হবার উপক্রম করেছে। আমি সাহিত্যিক, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের কথা উল্লেখ করলেম, অন্য সকল কথা বলতে ধিক্কার বোধ হয়। তাই মনুষ্যত্বের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যেই পোলিটিকাল সভায় উপস্থিত হয়েছি। ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বেদনায় আমাকে থাকতে দেয় নি।

আমার দেশের লোক কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজজাতির প্রতি তোমার শ্রদ্ধা যদি এতই তবে ভারতে ইংরেজশাসনের চিরন্তনতা কামনা করো না কেন? আমার উত্তর এই, ইম্পীরিয়ালিজমের বিরাট জালে জড়িত বিদেশী রাজ্যশাসন ভারতের পক্ষে স্বভাবতই অশুভকর। এম্পায়ার বল্‌তে যদি এক অখণ্ড কলেবর বোঝাত তা হলে তত বেশি ভাবনার কারণ থাকত না। গোয়ালঘর গয়লার এক গৃহস্থালিতে থাকতে পারে কিন্তু গয়লার আত্মীয় পরিবারের সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না। তার মূল্য প্রধানত দুধ জোগাবার, ভার বহন করবার। অত্যন্ত পীড়াতেও তার

বাসিন্দা যদি শিঙ বাঁকায় তা হলে তার ভাঙা কপালের প্রমাণ হতে বিলম্ব হয় না। আজ শতাধিক বৎসর ইংরেজ-শাসনের পরেও গ্রামে গ্রামে যে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আরোগ্য-বিধানের অভাব, পথঘাটের দুর্গতি, শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষীণতা, যে সুগভীর নিরানন্দ, তার দুর্ব্বিষহ পরিব্যাপ্তি চোখের সামনে থেকে আমাকে হতাশ করে দিয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধবিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পারিনে। বিশাল রাজ্যের অন্নের সংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগনিবারণ কী অসাধারণ উদ্যম নৈপুণ্য ও যত্নের সঙ্গে সেখানে নির্ব্বাহ করা হচ্চে তার বিচার করে মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষ্যা না হয়ে থাকতে পারে না। তার প্রধান কারণ সোভিয়েট রাশিয়া একটি অখণ্ড সজীব কলেবর। তার ভিন্ন অংশে বেদনার ও প্রয়োজনের তারতম্য নেই, ছিন্ন হয়ে যায় নি নাড়ী। সেখানে সোভিয়েট য়ুরোপ এবং সোভিয়েট এসিয়ার মাঝখানে কোনো অসম্মান নেই। একদা ইম্পীরিয়ল আমলে সেখানে অখৃষ্টানের প্রতি খৃষ্টানের উপদ্রবে দেশ বারম্বার রক্তে কলুষিত হয়েছে আজ তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। এই শান্তিময় সভ্যতা আনতে সেখানে দুই শতাব্দী লাগে নি, অল্প কয় বৎসর মাত্র শাসনের এই আশ্চর্য্য ফল। ধনস্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থনীতিই শাশ্বত এবং শ্রেয়, আর ধনসাম্যমূলক অর্থনীতি এতই অশ্রদ্ধেয় যে তার সম্বন্ধে চিন্তা আলোচনা বা গ্রন্থপাঠের স্বাধীনতা পুলিসের দণ্ডাভিঘাতে দমনীয়, শাসন-কর্ত্তাদের এই মনোভাব ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক থাক্।

সোভিয়েট মত প্রচার উপলক্ষ্যে উক্ত গবর্মেণ্ট জনমতের স্বাধীনতাকে যদি দণ্ডপ্রয়োগের দ্বারা দমন করে থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিচার করতে গেলে হাস্যাস্পদ হব। আমি কেবলমাত্র তুলনা করচি সেখানকার সঙ্গে আমাদের দেশের অন্নবস্ত্র শিক্ষা ও আরোগ্যবিধানের। উভয় রাজ্যের এই বিপুল প্রভেদের মূল কারণ, এম্পায়ার নামধারী রাষ্ট্রিক জীবের মধ্যে সেই দ্বিখণ্ডতা জৃম্ভিত যার ভিতর দিয়ে সজীব দেহের স্নায়ুর যোগ নেই, যোগ আছে শাসনবন্ধনের। এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ইংরেজ কর্ত্তারা আপন মহত্ত্বকে খর্ব্ব না করে থাকতে পারে না।

হিন্দু ভারতের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাংঘাতিকরূপে অনিবার্য্য। আমরা মার খাবার জন্যেই অতি বিশুদ্ধভাবে তৈরি করেছি নিজেকে। আমরা কিমা-করা মাংস, বাঁচবার জন্যে নই, গলাধঃকৃত হবার জন্যেই। আমাদের শতধাবিভক্ত জীর্ণ জনসমাজ কোনো আগন্তুক অকল্যাণকে এ পর্য্যন্ত ঠেকাতে পারে নি। আমরা আত্মঘাতী জাত; বাহির থেকে মারের নানা পথ নিজের হাতে সনাতনী নৈপুণ্যে পাকা করে বাঁধিয়ে রেখেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাভবে অভিভূত হতে হতেও তা নিয়েই শ্লাঘা ক'রে থাকি। মারটাই কেবল পেয়ে এসেছি তার থেকে শিক্ষা পাই নি। ইতিহাসে আমাদের চেয়ে মজবুৎ অনেক জাত মরেছে— আমরাই যে আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা ও অস্বাস্থ্যের কারণগুলোকে সযত্নে সর্ব্বদেহেমনে পোষণ ক'রেও বেঁচে থাকব, আমরা

বিধাতাপুরুষের এত বড়ো আদুরে ছেলে নই। পরের অনুকম্পার পরেই আমাদের পরিত্রাণ যদি নির্ভর করে তবে এই অনুকম্পালাভের জন্যেও শক্তির প্রয়োজন আছে। সেই শক্তির দ্বারা ভিক্ষার লাঘবতা অনেকটা দূর হয়। দুর্ব্বলের অহঙ্কার অত্যন্ত হেয়। সেই ক্লীব অহঙ্কার নিয়ে জোর গলায় আজকাল হুঙ্কার দিয়ে বলি, করব না ভিক্ষে, নিজের জোরেই দাবী সার্থক করব। ভালো কথা, কিন্তু হায় রে, জোড়ভাঙা সমাজে সেই নিজের জোরটা কোন্‌খানে? যত জোর আপনজনকে গালাগালি করতে, পরস্পরকে খর্ব্ব করতে, দলাদলির দ্বারা দলিত করতে দেশের ইষ্ট। যত জোর কেবল কি গলাতেই, যতক্ষণ না সেই গলা বাহির থেকে প্রবলমুষ্টি এসে চেপে ধরে? ইতি [২১-২৮।৭।৩৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

৮।৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ,
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্য্যে ঘনঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,

বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে, তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল আকাশের দুর্ব্বোধ সঙ্কেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভি নিনাদে।

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এলো ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এলো মানুষধরার দল,
গর্ব্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্ব্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হোলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সঙ্গীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো,
অশুভধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মান-হারা মানবীর দ্বারে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো,—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক্ তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী ॥

৮।২।৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আফ্রিকার উপরে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলে। লিখেছি। কিন্তু কিসের জন্যে বুঝতে পারি নে। আধুনিকের ভঙ্গী আমার অনভ্যস্ত। আমার নিজ দেশী ভাষায় যে রস আছে সেখানে পরদেশীর রসনা পৌঁছবে না। ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার সাহসমাত্র নেই। বাংলা কবিতাকে শিক্‌লি বেঁধে পরের হাটে নিয়ে যেতে দুঃখ হয়। তা ছাড়া ধিক্কার বোধ করি খ্যাতির জন্যে হাত পাততে অনাত্মীয়ের দ্বারে। কাঙালপনার বয়স প্রায় কেটে এসেছে। বাংলাভাষার কুলুপমারা এই কবিতা নিয়ে ওদের কী কাজে লাগবে? ইতি

২৭ মাঘ ১৩৪৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১
২৯ মার্চ ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ওখানে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে শুনে খুসি হলুম। এবারে তোমার এখানকার পালা আরম্ভ হবে। কিন্তু সময় খারাপ। হাওয়া চলচে এলোমেলো ভাবে। বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য পাকা হয়েচে, খুসি হয়েছেন কর্ত্তারা,—

কিন্তু একদিন সময় আসবে যখন মোটা অঙ্কে বিল চুকোতে হবে। উপস্থিত সুবিধের খাতিরে রাষ্ট্রের ভারসামঞ্জস্য উল্‌টে দিলে সে খেলায় খেলোয়াড়কে বিপন্ন হতেই হবে। আসল কথা রাষ্ট্রনেতারা যখন সুবুদ্ধির জায়গায় রাগারাগির হাতে হাল ছেড়ে দেন তখন কেবল সওয়ারিদের নয় ভাবনার দিন আসে কর্ণধারদেরও।— প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ যদি তোমার ভাগ্যে জোটে তবে আমাদের ভাগ্যেও সেটা স্পৃহণীয় হবে।...

আফ্রিকার সেই কবিতা তর্জ্জমা করে পাঠিয়েছি। সে তর্জ্জমার উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। আমার বর্ত্তমান সেক্রেটারি সাহেবের প্রবর্ত্তনায় অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখাটা স্পেক্টেটরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমিও এক কপি এতদিনে পেয়েচ।

আমাদের একটা নৃত্যাভিনয় হয়ে গেল। ভালো হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস— কিন্তু রুচির বিচারের ধ্রুব আদর্শ নেই —অতএব যার যা খুসি বল্‌তে পারে। এ সকল ব্যাপারে চুপ করে থাকা বা গালমন্দ দেওয়ার মাঝখানে সেতু বেঁধে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। যোগ্য অযোগ্যের বাছাই করাও দুঃসাধ্য। যুদ্ধপর্ব্বের পরে শান্তিপর্ব্বে এইটেই শেষ কথা যে আমার সঙ্গে যার মতে মেলে সেই যোগ্য, যার মেলে না সেই অযোগ্য। ইতি ২৯।৩।৩৭

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

...

৯২

৩ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে দুটো লেখা পাঠাই। একটা আমার কবিতার তর্জ্জমা, ম্যাঞ্চেষ্টর গার্জিয়ানে পাঠিয়েছি, আর একটা আমার জাপানকে লেখা পত্র।— এণ্ড্রুজকে যে চিঠি লিখেছ দেখলুম। পাঞ্জাব-প্রবাস তোমার কাজে লাগবে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারবে। বুদ্ধিমান বাংলার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছ— আর না হলেও চলবে।— পাকা বুদ্ধির ঠেলায় জাতটাকে ফুটির মতো ফাটিয়ে তুলেছে, এইবার পচবার সময় এলো— সেই রঙই ধরেছে। এখানে কেউ কারো চেয়ে কম নয়, অথচ নিজেদের শ্রেষ্ঠতা যথার্থভাবে প্রমাণ করতে না পেরে সংসারে কেবলি হটে যাচ্চে, তাই গাঁজিয়ে উঠচে ঝাঁজিয়ে উঠচে কুৎসা গ্লানি, প্রতিহত অহঙ্কারের তীব্র জ্বালা। নিন্দার বাজারদর অত্যন্ত চড়ে গেছে। আমার মন সরে যেতে চাচ্চে সুদূরে— সেই দূরকে নিজের ভিতরেই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করচি। একটা উপায় সায়ান্স— নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশ-কালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করেছি। যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব, —আমার সমস্ত অন্তঃকরণকে ধরা দিয়েছি তার টানে, সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে

রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ— যে অর্থ বহন করে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।

ভিড় চলেছে আশ্রমে— ছুটির জন্যে মন ব্যাকুল।

সেমন্তীকে কিছুকাল আগে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলুম। সেই চিঠিতে তার সঙ্গে ছবির পাল্লা দিয়েছি— এ প্রতিযোগিতায় আমার জিৎ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই— তবু স্পর্দ্ধা করে চেষ্টা করেছি। সেমন্তীকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো— এবং হৈমন্তীকে। ইতি ৩।১২[১]।[১৯]৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩

২১ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি তো জানো আমার মনের মধ্যে একটা যেন ষড়-ঋতুর পর্যায় আছে, হাওয়া বদল হয় যখন, ফসল যায় বদ্‌লে। একটা সময় আসে যখন মনের উত্তরে হাওয়ার গতি থাকে বাইরের দিকে, সেদিকে আজ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগেছে, পাতা-ঝরেপড়া বনস্পতির শাখায় শাখায় আর্ত্তস্বর জেগে উঠল। তা হোক, সেদিকের দিগন্ত দূর-প্রসারিত, তার ভাষার মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের কলকল্লোল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই আমার তো মাঠের ধারে বাসা, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটার

সরু পথ, চলেছে সেই পল্লীর দিকে, যার সুখদুঃখের সঙ্গে মিশেছে সবুজ বনের ছায়া, যার সুর গুঞ্জনধ্বনির উপরে ওঠে না। দূর সমুদ্রতীরের আহ্বানে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিতে যাই, নিজের বাণীর সূত্রে সেখানকার সঙ্গে পরিচয়ের সম্বন্ধ গাঁথতে চাই, কিন্তু দুই সূত্রে গ্রন্থি বাঁধবার নৈপুণ্য আমার নেই বলে সন্দেহ হয়। তখন বুঝতে পারি বাইরের বিশ্বে মাঝে মাঝে ভ্রমণ করা চলে কিন্তু বাস করতে হয় নিজের বাস্তুসীমানার মধ্যে। সেখানকার বাস্তুদেবতার বাণী দিয়ে যখন শিল্প সৃষ্টি করি তখন সম্পূর্ণ ভোলা ভালো বাইরের বাজারের কথা, সব দেশের সব কবিরাই তাই করে থাকে। আমাদের সঙ্গে ওদের দেশের তফাৎ এই যে ওদের পরিবেশটাই বড়ো, ওদের আত্মপরিচয়ের পরিপ্রেক্ষণিকা ওদের আপন সীমানার মধ্যেই মস্ত, তার মূল্য অনেক বেশি। মানুষের মধ্যে আপন পরিচয়ের সম্বন্ধ বড়ো করা সত্য করা, বড়ো করে বাঁচা। সেইজন্যে সেই বহুবিস্তৃত পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্যে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজকাল আমার মনে একটা বৈরাগ্য প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। আমার মনে হয় অপরিচিত থাকার গর্ব আর্টিস্টের মানসিক আভিজাত্যের লক্ষণ। অজন্তা গুহার আর্টিস্টরা কেবল যে দুর্গম নিরালোক গুহার মধ্যে আপন বহুসাধনার সৃষ্টিকে সঞ্চিত করেছে তা নয়, নিজেদের নামটা মুছে ফেলে গেছে— নিজের অন্তরাত্মার কাছ থেকে ছাড়া আর কারো কাছে তারা পুরস্কার দাবী করতে হাত বাড়ায় নি। আমার তো ঈর্ষা হয় মনে। বল্‌তে গেলে

আমাদের দেশটা অন্ধকার গুহার মতোই কঠিন সীমাবেষ্টিত— এখানে সেই আলোক নেই যাতে বাইরের দৃষ্টি সঞ্চরণ করতে পারে। কিন্তু এটা তো সত্য, সৃষ্টি তার বেষ্টনের মধ্যে থেকেও সীমাকে বহুদূরে অতিক্রম করে— যেমন করেছে গুহাচিত্রগুলি। এই অতিক্রম করার মানে এ নয় যে প্রাচীরসীমার বাইরে তারা আবিষ্কৃত হবেই, তার মানে এই যে খ্যাতিহীনতার দ্বারা তাদের লাঘব হতে পারে না— সৃষ্টিকর্তারা যখনি তাদের সৃষ্টি করেছে তখনি সেই মুহূর্ত্তটুকুতে তাদের দেনাপাওনা দেশকালের অতীত হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এ কথাটা কেন বিশেষ করে আজ আমার মনে হোলো সে কথা তোমাকে বলি। আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বল্‌লেই হয়। প্রথমত বিদেশী হাটে রপ্তানি করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয়ত দেশের মাতব্বর লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন বলে আশাই করি নে, যদি করেন তবে প্রভূত মুরুব্বিয়ানা মিশিয়ে করবেন। অথচ দিন রাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন, যে সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ বলে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজন্তাগুহায়— তার বাইরেকার সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে, সুতরাং এখন

ইকবালের কথায় মন দিতে পারব না। এর মৌতাৎ যখন ফিকে হয়ে আসবে তখন ছবি নিয়ে পড়ব, সে আরেক জাতের নেশা, সেও খ্যাতির দাবী রাখে না, অর্থাৎ মাৎলামি করবার অবিমিশ্র স্বাধীনতা দেয়। খ্যাতি যখন না চাইতে আসে, তখন তার আয়োজনের বিশেষ খরচা বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে তার পরিচয় পেয়েছি, বিদেশ থেকে নামজাদা অতিথি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এখানকার গীত নৃত্য দেখে বলে গেছেন এমন কিছুই তাঁরা কোথাও দেখেন নি ; সংখ্যাতত্ত্ববিৎ ফিশার বলেছেন এর পরিচয় যদি সিনেমাযোগে সমুদ্রপারে পাঠানো যায় সে একটা বহুমূল্য পদার্থ হবে। কেবল একজন বাঙালী দর্শক বলে গেলেন এরকম নৃত্যকলায় চিত্তের বলহানি করা হচ্চে। ইতি ২১।১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ

৯৪

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সেমন্তীর জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলেম। চার্লির পত্রে তার শেষ খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

জন্মমৃত্যুর মাঝখানকার এই জীবনটা ক্ষণিক জীবন তাতে তো সন্দেহ নেই, অর্থাৎ প্রজাপতির সঙ্গে আয়ুর পরিমাণ নিয়েই তার তফাৎ। মানুষ, অন্তত আমরা অনেকেই এই

ক্ষণজীবনের তরণীকে আয়ুর সীমানা পারের দিকেই লগি ঠেলে চালাচ্চি। তার মানে নিজের ভিতর থেকে সেই অভিজ্ঞতাকে রচনা করতে চাচ্চি অন্যকালে অন্যেরা যাকে আদর ক'রে আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে গেঁথে নেবে। অন্যের অনুভূতির স্রোতে নিজের অনুভূতিকে ভাসিয়ে দিয়ে তাকে দূর ভবিষ্যতের ঘাটে ঘাটে চালান করে দেওয়া, অর্থাৎ এমন ব্যবসা করা, যার পাওনা জমতে থাকে প্রেতলোকের খাতাঞ্চিখানায়, কারো ভোগে আসে না,—হয়তো সারাজীবন লোকসান দিয়ে যখন ডিভিডেণ্ট ডিক্লেয়র্ড হয় তখন তহবিল হয় অদৃশ্য। অথচ এই পাওনার দাবী নিয়ে যে হাতাহাতি চলে, তা কোম্পানির কাগজের স্বত্বের মকদ্দমার চেয়ে কম উষ্মাজনক নয়, এমন কি এতে পিছন দিক থেকে গুপ্ত ছুরি মারামারিও চলে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন এই মরীচিকাসম্পদের জন্যে লোভ ছিল প্রবল। সাহিত্যিক ভাষায় যাকে অমরতা বলে থাকে, যার স্বত্বসাব্যস্তের নিশ্চিত দলীল মহাকালের বড়ো আদালত থেকেও সব সময়ে পাওয়া যায় না সেটা আমার নামে রেজেষ্টরি হয়ে গেছে বলে বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে, প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনে তক্‌রার করেছি, এখন তা নিয়ে স্বগত উক্তিতেও সময় নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হয় না। নামের ঝুলিতে যা জমা হয় কী হবে তার দাম যাচাই করে। এতদিন ধরে যে ফসল ফলিয়েছি, যার কিছু উঠেছে মরাইয়ে কিছু ছড়িয়ে আছে ক্ষেতের মধ্যে, সে সমস্ত ভাণ্ডারে তুলে থাকে থাকে ভাগ করে গুছিয়ে রাখবার জন্যে

আমার এই শ্যামলী পাড়ায় একটা উদ্যোগ চলেছে। আমাকে তাতে মাঝে মাঝে মন দিতে হয়, এই কথা ভাবি দানের জিনিষ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে, যা অন্যের জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছে তাকে এলোমেলো করা চলবে না, অন্যের প্রতি সম্মান রক্ষার জন্যেই। কিন্তু কী জানি এই ভাবীকালের সমুদ্র-পারগামী জাহাজে মাল তোলার কাজে আমার মন ক্লান্ত হয়, সেই সঙ্গে বারবার মনে ইচ্ছা জাগে আমার মৃত্যুর পরে যেন স্মৃতিসভার উদ্যোগ না করা হয়। বার্ষিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সভাধিবেশনে স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার কৃত্রিম কর্তব্যতা আমাদের দেশে কোনো কালে ছিল না,— ক্রমশ এরকম চেষ্টার মধ্যে জোরগলার ঘোষণাগুলো মিথ্যায় জড়িয়ে আসে, এই সম্ভাবনা মনে করতেও আমার মন সঙ্কুচিত হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভোলবার শক্তি আছে— সেই শক্তির ভিতর দিয়েই সত্যের বাছাই হয়, বাইরে থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে সেই শক্তিকে ব্যর্থ করা অন্যায়। এই ভোলার দ্বারাই মানুষ মৃতব্যক্তির অনেক লজ্জা চাপা দিয়েছে। একসময়ে যে শিরোপার জরির কাজগুলো ছিল উজ্জ্বল যদি স্বতই তার জেল্লা কমে যেতে থাকে তবে ক্ষণে ক্ষণে তার প্রদর্শনী করাকে কি সম্মান দেখানো বলে? যদি না কমে থাকে তা হলে স্বতপ্রকাশিত মহিমার উপরে বার্নিশ লাগাবার চেষ্টায় অনেক সময়ে উল্টো ফল হয়।

তোমাকে এই খবরটা দিতে বসেছিলুম, যে আমি সম্প্রতি ক্ষণিক জীবনের ছোটো আয়ুর মাপের পেয়ালায় প্রতিদিনের

রসপানে প্রবৃত্ত আছি, আমার ক্ষণিকার প্রথম কবিতায় যার কথা লিখেছিলুম। দ্বারের সমুখে পাতাঝরা শিমুল গাছ ফুলে উঠেছে ভরে। মধুর লোভে ছোটো বড়ো নানাজাতের পাখী ভিড় করেছে। কিছুদিন পরে ফুল যাবে নিকেশ হয়ে, কচিপাতার পালা আসবে, মধুলোভীদের কাকলী নীরব হবে, তখন উঠবে ওর আপন পাতারই মর্মরধ্বনি। নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবচি, দিনের পাওনা দিন আমাকে দিয়ে যাচ্চে, তার প্রয়াস নেই, তার বোঝা নেই, তার দাম নেই যেমন আমার বাগানের বাতাবীনেবুর গাছে যে রোদ ঝিলমিলিয়ে উঠচে তার কোনো দাম নেই। দাম পাওনার তাগিদে যদি পাড়ায় বেরোনো যেত, দিনের সীমা-পেরোনো সঞ্চয়ের পাকা খাতা নিয়ে পড়তে হোতো, তাহলে দিন হোতো মাটি। আজকাল গান তৈরি করচি, রিহর্সলে বসচি, এ গানের এ কাজের খুশিটুকু ক্ষণিকের মধ্যে পরিমিত, কাল কেউ এ সব মনে রাখবে না, কিন্তু আজ এর মধ্যে যে মধু আছে সে আজকের পক্ষে যথেষ্ট। ইতি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

✓ভারতের পুরাপ্রাচীন ঐতিহাসিক ভগ্নশেষের যে বিবরণ তোমার চিঠিতে লিখেছ পড়ে ভালো লাগল। এই মনে হোলো যে, মানুষ যে একদিন বেঁচে ছিল, তার সহজ জীবনযাত্রার প্রতিদিনের সঙ্গে আপনার চারি দিককে নানারকম করে মানিয়ে নিয়ে তাতে আপন নানারকম স্বাক্ষর দিয়েছিল এইটে যখন দূরকালের ভিতর দিয়ে অনুভব করা যায় তখন আনন্দ হয়। আমাদের চলতি কালকেই অতীতকালের মধ্যে নতুন করে আবিষ্কার করি, বেঁচে থাকার মূল্য অন্যযুগের কাছ থেকে যাচাই করে নিই। তখনকার একখানা ভাঙা কলসের মধ্যে জীবনযাত্রার সঙ্গে সেকালের ভালবাসার স্বাদ পাই✓ চীনে কবিদের বাণীতে মানবজীবনের এই প্রতিদিনের পথচলা রাস্তায় প্রত্যক্ষ পদবিক্ষেপ যেমন সহজভাবে দেখতে পাওয়া যায় এমন আর কোনো দেশের কবিতায় দেখি নি। কোনো একটা বড়ো উপদ্রবে মনের দর্পণ যখন বেঁকে চুরে গেছে তখন তাতে সংসারের যে প্রতিবিম্ব ত্যাড়াবাঁকা হয়ে পড়ে তাতে চিরকালের মানুষের সহজ ছবি পাইনে, সবকিছুর সঙ্গে একটা ব্যঙ্গ মিশে থাকে— সেটা হয়তো সেই সময়কার ঐতিহাসিক মেজাজের একটা তীব্র পরিচয় দেয় কিন্তু সেটা সবসময়কার নয়। যথার্থ সবসময়কার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ করতে পার।

আমার মনে হয় আছে— জগৎসংসার থেকে দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যে রসকে আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে, বলেছে হাঁ, তাকে সে স্থায়িত্ব দেবার জন্যে এমন একটা রূপ দিতে চেয়েছে যাকে বলা যায় সুসম্পূর্ণ, পর্ফেক্ট্। ইস্ফাহানে যে মসজিদ দেখেছিলেম তাতে মানুষের যে যত্ন প্রকাশ পেয়েছে সে বীর্যবান যত্ন। সুবৃহৎ সুসম্পূর্ণতার জন্যে বিপুল অধ্যবসায়। আমি মুসলমান না হতে পারি এমন কি তার প্রতি বিদ্বেষ থাক্তে পারে কিন্তু সেই স্থাপত্যের পরে একটি ওঁ মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে, মানুষ বলেছে হাঁ, স্বীকার করে নিলুম, আমার অমুসলমান মনও তাকে স্বীকার করে। কিন্তু যা অস্বাস্থ্য, যা বিকার, যা মুদ্রাদোষ তা সাইকলজির বিষয়, তা কবিতার নয়। মানুষের বড়ো সাধনা সমস্ত জীবনকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছে, মর্ত্যকে বানাতে চেয়েছে স্বর্গের কল্পমূর্ত্তিতে। সাহিত্য এবং চিত্রকলা প্রথম থেকেই এই কাজে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছে। আধুনিকতা অনেক সময়ে এই ইচ্ছাকে ছেলেমানুষি বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে চিরকালের ছেলেমানুষ আছে, সে অনাবশ্যককে লীলাচ্ছলে বানায়। ছন্দে বন্ধে বাঁকা ভাষায় খামকা মানুষ যে কবিতা লেখে যার মধ্যে অপ্রাকৃত এবং অসংগতও অসংকোচে স্থান পায় সেই খেলাকে কী বল্বে? এই খেলাকে খুশির খেলা করতে চাই তার মধ্যে সুন্দরের রস দিয়ে, তাকে কারুশিল্পে মনোলোভন করে। এই হোলো যাকে বলে লিরিক। এপিক হোলো আশ্চর্য্যকে নিয়ে খেলা করা। আর নাট্য হোলো কাল্পনিক

ঘটনাবলীকে এমন করে গেঁথে তোলা যাতে সে আমাদের মনে যাথার্থিকের আবির্ভাব আনে। একেও খেলা বলচি এই জন্যে যে, বাস্তবের মধ্যে ঘটনাগুলির সুসংবদ্ধ বাছাই থাকেনা, তাতে বহু অবান্তরের মিশোল। সংহত সুসঙ্গত ঘটনাগ্রন্থনে যে নিবিড় যাথার্থ্যের রূপ জেগে ওঠে বাস্তবে তা নেই। নাটকে এই যে বাছাইকরা গাঁথুনির কাজ এও শিল্পীর কাজ। এই শিল্পজাত যাথার্থ্যের অনুভূতি যে নিছক সুন্দর হবেই তা নয়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা স্বতই আমাদের বিস্ময়ের আনন্দ দেয়। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়, যথার্থ বড়ো নাটক আর যাই হোক সবটা নিয়ে কখনো অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না— তার নিবিড়তা তার বৃহৎ সত্যদৃষ্টি তাকে তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে। আমি যে চীনে কবিতার কথা বল্‌ছিলেম তা সামান্য কিন্তু তুচ্ছ নয়, তার যাথার্থ্য নিরাভরণ সহজরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কবিদের অনেককে দেখি তারা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তুচ্ছকে নিয়ে যেন বাহাদুরির চেষ্টা করে— সামান্যকে সহজ আনন্দের স্পর্শমণির ছোঁওয়া দিয়ে অসামান্য করে তোলবার প্রয়োজন স্বীকার করে না। তারা অলঙ্কারকে অবজ্ঞা করে কিন্তু এই অবজ্ঞাই তাদের অলঙ্কারদম্ভ। সহজজীবনকে সহজচোখে দেখার মতো সুন্দর কিছুই নেই, কিন্তু তাকে নিয়ে গায়েপড়া ওস্তাদীতে মন বিমুখ করে। মহেঞ্জোদারোর ভগ্নশেষের থেকে সব অবান্তর বাদ পড়ে গেছে, তার ইঙ্গিতগুলির মধ্যে কেবল এই সহজ কথাটুকু পাই যে, মানুষ সেদিনও বেঁচে ছিল। প্রাণের কাছে প্রাণের বাণী আশ্চর্য্য। নানাবিধ সঙ্কল্প

নানাবিধ প্রয়াস দিনের থেকে বাদ দিয়ে যখন আমি জানলায় বসে চেয়ে দেখি, বাইরের আমের গাছে বোল ধরেছে, শীত-শেষের রৌদ্রে ঝিলমিল করচে সোনাঝুরির পাতা, গাছের ছায়ায় নাচচে শালিখ, বিনা কাজে বেলা বয়ে যাচ্চে, তখন বুঝি, এই আমার চীনভাষার কবিতা, এই আমার মহেঞ্জো-দারোর হাজার বছর ডিঙিয়ে যাওয়া সহজজীবনের এমন একটি স্পষ্ট আভাস যা নূতন যুগের জীবনলীলার সঙ্গে অনায়াসে মিতালি করতে পারে। ২১।২।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬

১৪ এপ্রিল ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রখর রৌদ্র, শরীর মন ক্লান্ত। কিছুদিন হোলো Aldous Huxleyর নতুন বইখানি পড়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল— আধুনিক যুগের চিত্তবিকৃতির ব্যঙ্গ মানুষের পূজার ঘরে যে রকম কুৎসিত উৎসাহের সঙ্গে কালাপাহাড়ি আরম্ভ করেছিল, তাতে ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছিল, ঐ বইটিতে নিত্যকালের হাওয়ায় মানুষের শাশ্বত সাধনার বাণীর স্পর্শ পাওয়া গেল।

আমার জীবনের শেষপর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে

সংক্রামিত হয়ে চলেছে দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্দ্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখিতে পাই নে। জগৎজোড়া গৃধ্নুতার তাড়নায় এক পক্ষে অভ্রভেদী স্পর্দ্ধা অন্য পক্ষে ভূলুণ্ঠিত সেলাম— কী অসহ্য কুশ্রী। ধ্বংস মহাসাগরের মুখের এই ভাঁটার টান একদিন হয়তো থমকে যাবে একদিন হয়তো উল্টো স্রোতের জোয়ার কল্লোলিত হয়ে উঠবে— সেই শুভ লক্ষণ দেখে যেতে পারব কিনা কে জানে। আমাদের কালের প্রথম যুগে যে সমস্ত শ্রদ্ধার দান অযাচিত দাক্ষিণ্যে আমাদের দ্বারে এসেছিল, আজকের দিন অট্টহাস্যে তাদের লাথিয়ে ধূলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেচে, সেইসঙ্গে তাদের নিত্যতার সম্বন্ধে মানুষের এতকালের বিশ্বাস একটা শ্বাসরোধকর আঁধির মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে চলল। এর নিষ্ঠুর পরিণাম আজ তো দেখচ পৃথিবীর তিনমহাদেশে— এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয় ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে— এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না— মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ

৯৭

২৭ মে ১৯৩৮

মঙপু, Mungpoo
দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

তুমি কি গ্রীক তর্জমার বই আমাকে পাঠিয়েছ? এখনো পাইনি, পেলে স্বাদ গ্রহণ করব। মিসেস্ সেলিগ্‌ম্যানের রচনাটা পড়ে ওঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য— কেননা সম্প্রতি আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে। সেই জন্যে নিতান্ত দায়ে না পড়লে চোখ ব্যবহার করতে সাহস হয় না। এমন কি বড়ো চিঠি অনিলকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়— বিশেষত অপরিচিত হাতের অক্ষর। চোখের কাজ অনেক হয়ে গেছে, এখন কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চাই ছবি আঁকার জন্যে। চিত্রলেখার সঙ্গে আমার মিলন হোলো গোধূলি লগ্নে। আসন্ন রাত্রির মুখে, ভেবেছিলুম যাকে বলে হানিমুন, নির্জ্জনতায় তাকে সম্ভোগ করা যাবে— তাকে আচ্ছন্ন করচে কাজে এবং জনতায়— এদিকে চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে আসচে।

ম্যাকনিকলের ঈশোপনিষদের তর্জমা আমার ভালো লাগল না। ঐ উপনিষদটি আমার সব চেয়ে প্রিয়— ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য্য গভীর। কিন্তু অনুবাদক এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি। দেখা হোলে বলব— আরো অনেক কথা বলবার আছে। আমরা নামব জুলাইয়ের আরম্ভে। যদি

তার আগেই তোমরা আস এখানে একবার আসতে পারো
ইহি ২৭।৫।৪৫ [১৯৩৮]

তোমাদের

---

[১৭] জুন ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ধীরেন সবে এসেছে য়ুরোপ থেকে প্রাণের হাওয়া নিয়ে। অনেক সে ঘুরেছে প্রসারিত অভিজ্ঞতাক্ষেত্রে। তার সঙ্গে কথা কয়ে খুব ভালো লাগচে— প্রধান কারণ সে আধুনিকের নেশাগ্রস্ত নয়। তার কথার ভাবে বুঝলুম তার মতে বৈদগ্ধ্যের কুণোমহলে যাকে up to date নয় বলে ভ্রূ বাঁকায় সেটাই চিরকালের মতোই out of date। অনেক কর্মী এবং ভাবুকদের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে সে এইটে বুঝেছে যে idealএর কেবল idiom বদলে দিয়ে তাকে নূতন উপলব্ধি বলে মনে করা য়ুরোপের উদারচিত্ত ত্যাগীদের কথা নয়। খুব একটা আশ্বাস মনে এসেছে। বিশেষত আজ যখন ব্যঙ্গের সুর সত্যকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করচে যার থেকে সভ্যতার চিতার আগুন জ্বলবার লক্ষণ দেখচি। আমাদের দেশে এর ছোঁয়াচ লেগেছে, বড়োর অভ্যর্থনায় ভঙ্গীবিকারকে তারা তারুণ্যের স্পর্দ্ধা বলে ঠিক করে রেখেচে। চরিত্রের

নিষ্ঠাপরায়ণ উদারতাকে উপহাসের আঘাতে হৃতমূল্য করাকেই না ঠকবার ব্যবসা বলে তারা। সেই জন্যেই Aldous Huxleyর নতুন বইখানি পড়ে আমার এত আনন্দ হোলো। তার ভাষায় তার ইঙ্গিতে কোথাও বড়োকে বিদ্রূপ করা হয় নি। এই বড়োই তো চিরকালের বড়ো, আমরা তো একেই মেনে এসেছি— মহৎকে মহৎ বলতে সুন্দরকে সুন্দর মানতে আমাদের তো আনন্দ হয়েছে— ভালোকে নিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলতে আমাদের যে লজ্জাবোধ হয়।— ধীরেন যে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্মের তেজ নিয়ে এসেছে সেই পৌরুষের উৎসাহে অনেকদিন পরে আধুনিক পরিবেষ্টনের চিত্তবিকৃতি থেকে আমাকে যেন চিরপুরাতন সঞ্জীবনী হাওয়ায় জাগিয়ে তুললে — দেহে শক্তি থাকলে দুরূহ সাধনায় বেরিয়ে পড়তুম— মন বেরিয়েছে।— বৌমার শরীরের জন্যে আমাকে তাঁর সঙ্গে আরো অনেকদিন থাকতে হবে। পুরীর পালা শেষ হলে না হয় এখানে একবার এসো। ইতি জুন ১৯৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৯

১৬ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের নিয়ে ক'টা দিন বেশ আনন্দে ছিলুম। এখানে মুখর লোক ঢের আছে কিন্তু কথা কবার লোক নেই বললেই হয়— মনটা যেন উপবাসী থাকে। দেশ জুড়ে নানা কাগজে নানা চেঁচামেচি শুনি— যেন বুড়ো বুড়ো ইস্কুলের ছেলে ছুটি পেয়েছে তারা চেঁচাতে জানে ভাবতে জানে না— এ দেশে বুদ্ধির স্তর নেবে যায়। অতএব তোমার উচিত হচ্চে কোনো ছুতোয় এখানে এসে পড়া— তোমাকে পাঞ্জাবীদের কোনো দরকার নেই।

তোমার বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। ইতি ১৬।১০।[১৯]৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

'মায়ার খেলা'র নৃত্যাভিনয় হবে— তারি সুরের আবর্তে দিনরাত পাক খাচ্ছি। এ ছাড়া এ সময়টা ঘোরতর ভিড়ের

সময়— কোনোখান দিয়ে পালাবার ফাঁক পাইনে। খসড়া সম্বন্ধে লিখব ঠিক করেছিলুম— তখন একটু সময় ছিল— ভয় হোলো পাছে বাংলার আধুনিকরা মনে করে আমি তাদেরই জয়ধ্বনি করছি। এই যুগের মধ্যে যে আবর্তন যে আবিলতা এসেছে আমি জীবন আরম্ভ করেছিলুম তার থেকে দূরের হাওয়ায়— এই ক্ষুব্ধ মনোবৃত্তি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না। তাই ব'লে জানবার কৌতূহল নেই বা তাকে অশ্রদ্ধা করি তা নয় কিন্তু জানবার ভাষাতেই যদি তালা লাগানো থাকে তা হলে হতাশ হয়ে এই সাহিত্য-লীলাটাকেই দোষ দিই কিংবা নিজের অদৃষ্টকে। যা হোক ১৫ জানুয়ারির পরে ছুটি পাব তখন মনে করিয়ে দিয়ো। হৈমন্তী আমাকে পেশোয়ারে আসতে অনুরোধ করেছেন তার থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাকে তাঁর সমবয়সী ব'লে ভুল করেছেন। ইতি ১৬।১২।[১৯]৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

Whitehead পড়ছি— ভালো লাগছে। এইমাত্র তোমার বই পেলুম।

১০১

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

৭ই পৌষের পালা শেষ হোলো। স্তরে স্তরে আমার বকুনি চুকিয়ে দিয়েছি। এখন চলেছে দূরাগত জনতার জলপ্রপাত। ছুটির সুযোগে কৌতূহল মেটাতে আস্‌চে দলে দলে। আমি তাদের লক্ষ্যস্থল। এর মধ্যে আমার লেখাও চলেছে মাতৃভাষায় বিমাতৃভাষায়। দায়ে পড়ে। মায়ার খেলার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে— তার পুরোনো জীর্ণ অংশগুলো মেরামত করতে হোলো— প্রায় ২০টা নতুন গান লিখেছি। পুরোনো হাতের সঙ্গে নতুন হাতের বুনোনি মিলচে কি না জানি নে। এলম্‌হর্স্ট এসেছে— লাগছে ভালো— এমন বন্ধু দুর্লভ। ওর সঙ্গে দেশবিদেশে অনেক দিনরাত্রি কাটিয়েছি— মনে পড়লে মন কেমন করে— nostalgiaর বাংলা কী? একসঙ্গে ভ্রমণে বন্ধুত্বের সেতারে যেন সুর বাঁধা হয়ে যায়।— তোমার বই পেয়ে দু চার পাতা পড়বার সময় পেয়েছি— বুঝেছি রীতিমত ভালো বই হয়েছে। এলম্‌হর্স্ট পড়তে নিয়েছে তার পড়া হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছি। ২৮।১২।[১৯]৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পর্শু তোমাকে চিঠি লিখেছি। কাল তোমার আর একখানা চিঠি পেলুম। বুদ্ধদেবের সমালোচনা পূর্বেই পড়েছি—সে তোমাকে তাদের দলের বেদীতে বরণ করবার উৎসাহ প্রকাশ করছে। দরকার ছিল— কেননা সম্প্রতি সে ঘোষণা করছে আমার সময় চলে গিয়েছে। এখন ভগ্নাবশেষের উপর তাদের সৃষ্টি রচনার জন্যে রাজমিস্ত্রির কাজে তোমাকে পেয়েছে বলে তারা আশ্বস্ত। আজ আমার একমাত্র এই সান্ত্বনা, আমি যাঁদের দলে পেয়েছি— অর্থাৎ যাঁদের সময় আমার মতোই চলে গিয়েছে তাঁদের নাম মুছবে না— আর সম্প্রতি যাঁরা খালি ঘরে ঢুকে পড়েছেন, যথা— কাজ নেই কথাটা শেষ করে। পূর্বেই তোমাকে জানিয়েছি— আজকাল বিষম ব্যস্ত আছি, নানাবিধ প্রচেষ্টায় মনকে চালাতে হচ্ছে একবার এ রাস্তায় একবার ও রাস্তায়— এর থেকে বুঝতে পারবে এখনো এই জীবকে পিঁজরাপোলে চালান করতে দেরি হবে। ইতি ৩০।১২।[১৯]৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৩

১০ জানুয়ারি ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

এবার আমাকে কাজের ভূতে পেয়েছে। এক ভূতে নয়, পাঁচ ভূতে। রাজা মহারাজার আগমন একটা বড়ো ব্যাপার —চক্রবাত্যা। সৌভাগ্যক্রমে ফল খারাপ হয়নি কিন্তু শরীর পড়েছে যেন কাৎ হয়ে। ধাক্কা সামলে ওঠার পূর্ব্বেই কলকাতার বেদরদী বেরসিক অনভিজ্ঞ আত্মাভিমানীদের জন্যে তিন তিনটে নাটক চড়াতে হয়েছে রিহর্সলের কুমোরের চাকে —খ্যাতির জন্যে নয়, অর্থের জন্যে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে এই দুর্গতির অবসান হবে। তারপরে যখন হাঁফ ছাড়বার সময় আসবে তখন তোমার কবিতার সমালোচনা করব। বুদ্ধদেব ভালোই লিখেছে। তার পূর্ব্বেই আমার অভিমত বেরলে খুশি হতুম। গোলেমালে মাথার ঠিক ছিল না। আগন্তুকদের ভিড় চলেচে— আমাকে জনতাতঙ্ক ব্যাধিতে পেয়ে বসেছে। ইতি ১০।১।৩৯

১০৪

*১২ জানুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার বাংলা লেখার তুমি যে তর্জমা করেছ পড়ে খুব খুশি হলুম। মডারন রিভিয়ুতে পাঠিয়ে দেব। এলমহর্স্ট

চলে গেলেন। ভালো লাগল। বন্ধুভাবে ওঁকে খুব নিকটে পেয়েছি। অনেকদিন দেশে দেশান্তরে একসঙ্গে ঘুরেছি এইরকম উপলক্ষ্যে নানা অবকাশে পরস্পরকে বুঝতে পারা সহজ হয়। তা ছাড়া ওঁর কাছ থেকে আমরা যে রকম সাহায্য পেয়েছি এমন আর কারো কাছ থেকে নয়।— তিনটে নাটকের রিহার্সল আমার ঘাড়ে চেপেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই শীতের সময় তোমরা যদি আসতে পারতে তাহলে এখানে জমত ভালো।

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

১০৫

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সুরের বোঝাইভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চল্‌তি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তার মূল্যের আদর্শ। ঐতিহাসিক এক একটা অপঘাতে সাহিত্য-সেতারের কানে মোচড় লাগায়। জানিনে কোন্ নতুন সুরের প্রতি লক্ষ্য করে বেসুরের মাত্রা চড়তে থাকে, কেউবা বলে

পৌঁচেছে সুরে, কেউবা বলে পৌঁছবে। এত দিন যে ধুয়ো বেঁধে গান সাধা চলছিল তার অভ্যাস বদলে যাচ্চে। ধুয়ো সুরকে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস রক্ষা করাটাই অবজ্ঞার বিষয় হয়েছে। পৃথিবীর জমিটা স্থির আছে বলেই তার উপরে আমরা নানাপ্রকার ঘর বাড়ি বানিয়ে এসেছি। যে কারণেই হোক সেই পৃথিবীটা ভূমিকম্পের পৃথিবী হয়ে উঠেছে— মনোলোকের অবচেতন স্তরে যে আগুন চাপা ছিল সে হয়েছে চঞ্চল— আগেকার নিয়মে পাকা ইমারত বানানো চলবে না। মিস্ত্রি-মহলে এই রকমের একটা রব উঠেছে। এখন যে জিনিষটা বানানো হবে সেটা হবে টলমলে বাঁকাচোরা সুষমাহারা, পাঁকে পাথরে সব কিছু মিশিয়ে যাবে তার মধ্যে। সাজানো কিছুর উপরে শ্রদ্ধা নেই— কেননা মনের ভূগর্ভে সব স্তর ভেঙে চুরে উল্‌টে পালটে গেছে। অন্তত মানবলোকের কোনো এক জায়গায় কোনো একদল ভূতত্ত্ববিদ্ এই রকম হিসেব করেছেন। এই নাড়া-খাওয়া অব্যবস্থা এখনো তো অনুভব করচিনে— আমাদের পাড়ায় করবার কোনো সাংঘাতিক কারণ ঘটে নি। কিন্তু এ মুল্লুকে যাঁরা কাঁপন-লাগা পায়ের ছাঁদে পাঁয়তারা সুরু করেছেন— তাঁদের দেখে মনে ভাবনা লাগে— ভালো বুঝতে পারিনে। না বুঝতে পারার কারণ এই যে, অস্থির ইতিহাসের এলেকায় যে চালটার উদ্ভব হয়েছে নকল অস্থিরতার সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। তার কাছে এ নিতান্ত খেলা বলে ঠেকে। সেখানে ধ্রুবর প্রতি বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে একটা বাণীর প্রয়াস আছে—

সেটা ক্রমশ ফুটতে ফুটতে হয়ত একটা নূতন স্তরের ধ্রুবপদে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু অন্যত্র যেটা দেখি সেটার অনেকখানিই চাল, তার চলন গিয়ে ঠোকর খায় সঙ্কীর্ণ সীমায়। কান পেতে থাকি, জিজ্ঞাসা করি এরা কী শোনাতে চায়— কানে আসে গোলমাল, নতুন ফ্যাশানের কলরব। গোলমাল করার চেয়ে সহজ কিছু নেই— যদি সবটাই হয় গোল, মাল কিছুই না থাকে। কোনো এক দেশে ভাঙনের যুগের ব্যাকুলতা যে কাকুতি জাগিয়ে তোলে, তার উদ্ব্যগ্র ভাষা অনেকখানি হয়তো বোঝা কঠিন, কিন্তু বোঝবার একটা কোনো বিষয় তার ভিতরে আলোড়িত হয়, তার অন্তর থেকে বাণীর ইঙ্গিত ফেনায়িত হয়ে উঠতে থাকে— সে ইঙ্গিত আপন মত্ততায় ব্যাকরণেরও বাঁধানিয়ম ভাঙে। বস্তুত সেই ভাঙাচোরার উচ্ছৃঙ্খলতাই তার ঈডিয়ম্‌রূপে কাজ করে। যেখানে বলবার উদ্বেগেই বলবার বেড়া ভাঙতে থাকে সেখানে বেড়া ভেঙেছে বলেই হয় তো রাস্তার নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে অন্তর্গূঢ় আবেগে বলবার কোনো তাড়া নেই কেবল বেড়া ভাঙারই উৎসাহ আছে সেখানে মনে সন্দেহ জাগে।

পাশ্চাত্যজগতে যখন মানুষের মনের মধ্যে কোনো একটা চাঞ্চল্য জাগে তখন ঝড় যেমন অরণ্যের গাছপালার মধ্যে কোলাহল তোলে সেইরকম সেখানকার পুঁথিপাড়ায় জাগায় মুখরতা। অত্যন্ত ঘন সেখানকার পুঁথির ভিড়। তাই হাওয়া জোরে বইলে এক পুঁথি থেকে আর এক পুঁথিতে তোলপাড় সঞ্চারিত হতে থাকে— তৈরি হয়ে ওঠে পুঁথির কোলাহল।

সেই এক এক হাওয়ার কলগর্জন এক একটা পুঁথিগত নাম পায়— সেই নামের বন্ধনে দল বাঁধা হয়। সভ্যতা জিনিষটাই জনতা, এই জন্যে সভ্যদেশে এইরকম উপসর্গ সর্বদা দেখতে পাই।

আমি যখন জন্মেছিলুম তখন এদেশে নবসভ্যতার ভিড় জমে নি। তাই চারদিকে সারি সারি পুঁথির বেড়া ছিলনা। মানুষের বেষ্টন নিষ্ঠুর করে আমাকে ঘিরেছিল— প্রহরীরা ছিল যাকে বলে প্রিমিটিভ, আদিম জাতীয়, আমার সব নিরক্ষর শাসনকর্তা। সেই বেষ্টনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিত পুকুরের জলে বটের ছায়া, আর পাতিহাঁসের সাঁতার কাটা— দক্ষিণ পাড়িতে খাড়া ছিল সারি সারি নারকেল গাছ— নীল আকাশের নিচে কী নিবিড় সঙ্গ পেয়েছিলুম কাউকে বোঝাতে পারব না। অত্যন্ত খুশি হয়েছিলুম— কিন্তু সেই খুশি হওয়া সম্বন্ধে যুগধর্মের কোনো বিশেষ বিধান ছিলনা— হয় তো সাইকো-এনালিসিসের কোনো এক কোঠায় তার কোনো বিশেষ এক আখ্যা ছিল, সনাতন কিম্বা আধুনিক, কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে কোনো পুঁথিপ্রবীণ ছিল না আমার কানের কাছে। পুঁথির কারখানাঘরে সর্বদা যেখানে ছাঁচ তৈরি হচ্চে, ছাঁচ বদল হচ্চে, মাপকাঠি হাতে সাহিত্যিক ইন্‌স্পেক্টর নোটবই পকেটে ঘুরে বেড়াচ্চে সে দেশ ছিল বহুদূরে, দিগন্তের পরপারে। সেই জন্যে ভাষা বানিয়েছি আপন মন দিয়ে, ছন্দ বানিয়েছি যা খুশি তাই। মানুষকে ভালোবেসেছি মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে। সেই সংবেগ ঠেলা দিয়েছে পালের হাওয়ার

মতো কল্পনার তরীতে, কখনো এ বাঁকে কখনো ও বাঁকে, কিন্তু পুঁথিলোকের আইনের সীমানা থেকে দূরে। তাই নিয়ে তখনকার বিধানকর্তারা হেসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যাও ছিল অল্প, তাদের অট্টহাস্যের জোরও ছিল কম। তখনকার সাহিত্যরাজ্যে রাজত্ব পদার্থটা ছিল খুব হাল্কা। একদল লোক পিঠ চাপ্‌ড়ে বলেছে বাহবা, সেটা আকস্মিক, সেটা মুখ্য কথা নয়। সম্পূর্ণ আমার নিজের গরজে লিখ্‌চি, এই কথাটাকে কোনো বারোয়ারি বাহবা ছাড়িয়ে ওঠবার মতো জোর পায় নি— নিন্দেও ছিল নিতান্ত ভ্যালসা। জোর ফরমাস ছিল না, লেখার আনন্দ ছিল ডুবসাঁতারের আনন্দ— ডাঙা থেকে মুরুব্বির দল ঘন ঘন সাবাস বলে ওঠে নি। তার ফল হয়েছে কী এবং তার মূল্য কতখানি হয়তো এখনো তা নিশ্চিত বলবার সময় হয় নি। যেটা আমার ভালো লেগেছে সেটা নিশ্চিত ভালোই এই বিশ্বাসে জোরে সাবল মারবার কোনো ধাক্কা তখন ছিল না— এই আত্মপ্রত্যয় ছাড়া আর কোনো ধ্রুব আদর্শ যে আছে এখনো তার প্রমাণ হয় নি। কেমন করে হবে? আজ দেখতে পাচ্চি এ বেলায় যাঁরা সমজদার সেজে আইন জারি করে বেড়াচ্চেন ও বেলায় তাঁদের তকমা কেড়ে নেওয়া হচ্চে। এটুকু বুঝেছি এই পুঁথিপাড়ার বাজারদর হিসেব করে যাঁরা নতুন খাতা খুলে কারবার ফেঁদেছেন তাঁদের অদৃষ্ট চলেছে চোখে ঠুলি দিয়ে। এই শীতের দুপুর বেলায় সামনের জানলা খুলে মুকুলে ভরা ঐ আমবাগানের দিকে চেয়ে প্রায়ই ভাবি— জন্মেছি এই পৃথিবীতে, খুব খুশি

হয়েছি— প্রকাশ করেছি নিজেকে আপনা হতে নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে, তাতে মশ্‌গুল্‌ করেছে— বাস্‌ এইখানেই থামা যাক্‌— আর তো কিছু দরকার নেই— পালা তো শেষ হবেই— তারও পরেকার পালার হিসেব কল্পনা করতে বসে ভিতরকার একটা লোভী পাগল— তার সেই হিসেবের উপরে আজ আর আস্থা নেই। এতদিন যেমন যেমন খুশি হয়েছি সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সংস্কার জন্মেছে খুশি করবার জোগান বুঝি হাতে হাতে দিয়ে গেলুম। সেটা স্থায়ী সত্য না হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কেই বা স্থায়ী, কীই বা স্থায়ী। অনিশ্চিত দখলের দাবী নিয়ে তবে এত তীব্র ঝগড়া কেন— রাগারাগি কী জন্যে, লোভই বা কিসের? মরীচিকার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে আদালতে নালিশ?

এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের— গান আর ছবি। এদের উপরে বাজারের বস্তাবন্দীর ছাপ পড়েনি। যদিও আমার গান নিয়ে বচসার অন্ত নেই তবু সেটা আমার মনকে নাড়া লাগায় না। তার একটা কারণ সুরের সমগ্রতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চলে না। মনের মধ্যে ওর প্রেরণা ব্যাখ্যার অতীত। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধিতা নিয়ে যে সব যাচনদাররা গানের আঙ্গিক বিচার করেন কোনোদিন সেই সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিই নি; এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার

পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা— তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজবোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারেনি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্দ্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। গান বচনের অতীত বলেই ওর অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন। গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই যে জাগরণের কথা বলচি তার মানে এ নয় যে সে একটা মস্ত কোনো অপূর্ব সৃষ্টি সহযোগে। হয় তো দেখা যাবে সে একটা সামান্য কিছু— কিন্তু আমার কাছে তার সত্য তার অকৃত্রিম বেদনার বেগে। কিছুদিন পরে তার তেজ কমে যেতে পারে, কিন্তু যে সম্ভোগ করেছে তাতে তার কিছু আসে যায় না যদি না সে অন্যের কাছে বকশিশের বাঁধা বরাদ্দ দাবী করে। নতুন রচনার আনন্দ আমি পদে পদে ভুলি, গাছ যেমন ভোলে তার ফুল ফোটানো। সেই জন্যে অন্যেরা যখন ভোলে সে আমি টেরও পাই নে। যে ছন্দ উৎস বেয়ে অনাদিকাল ধরে ঝরচে রূপের ঝরনা তারই যে কোনো একটা ধারা এসে যখন চেতনায় আবর্তিত হয়ে ওঠে এমন কি ক্ষণকালের জন্যেও, তখন তার যে জাদুতে কিছু-না রূপ ধরে কিছু একটার, সেই জাদুর স্পর্শ লাগে কল্পনায়— যেন ইন্দ্রলোকের থেকে বাহবা এসে পৌঁছয় আমার মর্ত্যসীমানায়— সেই দেবতাদের উৎসাহ

যে দেবতারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁরা কড়ি মূল্য দেন, কিন্তু সে স্বর্গীয় কড়ি।

এই যা সব বকচি তা এখনকার হিসাবে শোনাচ্চে অত্যন্ত অবাস্তব— বিশেষত এর মধ্যে রূপক এবং ভাষার অলঙ্কার এসে পড়চে। ওটা আমার মজ্জাগত অভ্যাস। পারো যদি ওসব বাদ দিয়ে পোড়ো। আর একটু স্পষ্ট করে বলি। গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে, প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না। আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিণীতে:—

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
হে গরবিনী।

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারম্বার, কিন্তু গানের সুর শুন্‌লে বুঝবে, এই বারম্বারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্‌ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলঙ্কার। এই দূরবিলাসী গাইয়েটাকে অবাস্তবের নেশাখোর বলে যদি অবজ্ঞা করো, এই গরবিনীকে যদি দোক্তা খেয়ে পানের পিক ফেলতে দেখলে তবেই তাকে সাঁচ্চা বলে মেনে নিতে পারো, তবে তা নিয়ে তর্ক করব না— সৃষ্টিক্ষেত্রে তারো একটা জায়গা আছে,

কিন্তু সেই জায়গাদখলের দলিল দেখিয়ে আমার সুরলোকের গরবিনীকে উচ্ছেদ করতে এলে আমি পেয়াদাকে বলব ওকে তাড়িয়ে তো কোনো লাভ নেই। কেননা ঐ আঁচলে পানের পিকের ছোপলাগা মেয়েটা জায়গা পেতে পারে এমন কোনো ঘোর আধুনিক ভৈরবী রাগিণী হাল আমলের কোনো তানসেনের হাতে আজো তৈরি হয় নি। এই সুরে যে চিরদূরত্ব সৃষ্টি করে সে অমর্ত্যলোকের দূরত্ব, তাকে অবাস্তব বলে অবজ্ঞা করলে বাস্তবীকে আমরা তাঁদের অধিকার স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে যাব, এবং গির্জেতে গিয়ে প্রার্থনা করব ত্রাণকর্তা এদের যেন মুক্তি দেন।

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ তার ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু এগুলোকে পুলিস কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি— গানে তার বাধা দিয়েছে— তার চারদিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা কিছু অবান্তর যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সবকিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন, আবর্জনা; তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা এমন বেআইনী বিধি মানতে মনে বাধচে। অন্তত গানে এ কথা ভাবতেই পারি নে। আজকালকার য়ুরোপে হয় তো সুরের ঘাড়ে বেসুর চড়ে বসে ভূতের নৃত্য বাধিয়ে বসেছে। আমাদের আসরে এখনো এটা পৌঁছয় নি— কেননা আমাদের পাঠশালায় য়ুরোপীয় গানের

চর্চ্চা নেই। নইলে এতদিনে বাংলায় নকল বেতালের দল কানে তালা ধরিয়ে দিতে কসুর করত না।

যাই হোক যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান। একেই বুঝি এখনকার সাইকলজি বলে এস্‌কেপিজ্‌ম্‌।

আর আছে আমার ছবি। কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল। আমার এই রেখানাট্যের নটী আর কারো চোখে ধরা দেয় কিনা তার সঠিক খবর পাইনে। ইংলণ্ড থেকে তুই একটা প্রেসনোটিস্‌ বেরিয়েছে—নিন্দে করে নি— তুই একটাতে আছে পেটভরা রকমের প্রশংসা। প্যারিসে একদা এর চেয়ে বেশ উঁচু গলায় বলেছিল বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এই প্রশংসা আমার মনকে আঁকড়ে ধরে নি, মুক্ত আছে মন, আমার ছবির প্রশংসা টেঁকসই কিনা সে তর্ক বাজারে ওঠে নি, আমার মনেও না। আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাতু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুত প্রকাশলীলার আনন্দই যথেষ্ট। ত্রিপুরার পরলোকগত রাধাকিশোর মাণিক্যকে গবর্মেণ্ট যখন প্রথম মহারাজ উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি বলেছিলেন, আমি তো আমার আপন প্রজার কাছে মহারাজাই, আমার এ পদ চিরস্থায়ী। কিন্তু সরকার বাহাতুর যে উপাধি দেবেন, সে দিতেও পারেন আবার কেড়ে নিতেও পারেন— কী বা তার দাম! আমার ছবির খ্যাতির সম্বন্ধেও সেই কথা। তার

গায়ে ছাপ লাগায় যে মানুষ ছাপ মোছেও সে। তার চেয়ে অখ্যাতির গৌরবে আছে সে ভালো— আমিই তাকে মাঝে মাঝে দিচ্চি বাহবা।

এতক্ষণ যা বল্‌লুম এ'কে সাইকলজির কোন্ ছাপে লাঞ্ছিত করবে জানিনে। হয় তো বল্‌বে ভীত অহঙ্কারের বৈরাগ্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমি বলব এ জীবন আপন অভিজ্ঞতার প্রান্তসীমায় এসে আজ নতুন হতে চায়, সংশয়ের পুরাতন বলি-পড়া বাকল খসিয়ে ফেলতে তার শখ গিয়েছে— আসুক নববসন্ত, বাইরে নয়, অন্তরের গভীরে। ইতি ১৪।২।৩৯

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিষম ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কখনো শান্তিনিকেতনে কখনো কলকাতায় কখনো এ ঘরে কখনো ও ঘরে চিঠিখানা যখন তখন লিখেছি— এক নক্ষত্রের সঙ্গে আর এক নক্ষত্রের তফাতের সঙ্গেই তুলনীয়— তবুও সবটা মিলে নেব্যুলা গোছের হয়েছে। শরীর ক্লান্ত ছিল বলেই লিখেছি— ওকে একেবারে ডোণ্ট্‌কেয়ার করে দিয়ে।

আজ তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। পাতিয়ালার প্রস্তাবটা চিন্তনীয়। একটা কিছু করবার সংকল্প চল্‌ছে।

ওখানে বাঙালীর সংস্রব আছে শুনে সংশয় ঠেকচে। তবু বেড়া ডিঙিয়ে যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা দেখব।

ভাষা পরিচয়টা পেয়েছ কি? এখন এখানে আছেন আওয়াগড়ের রাজা— সমস্ত মনোযোগটা আকর্ষণ করে আছেন —ইনি যেতে যেতেই বিদেশী সমাগমের সম্ভাবনা আছে— বানপ্রস্থের বয়সে এত ভিড় সয় না। ইতি ১৫।২।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তুমি জান চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যাই বলি না কেন বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকচুর সে ঘটিয়েছেই সব সময়ে জানতে পারি বা না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করিনি— বোধ হচ্চে না করবার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট। জগদীশ বল্‌তেন সাহিত্যের জলচর আমি যদি না হতুম তাহলে বিজ্ঞানের ডাঙায় আমি মাথা তুলে বেড়াতুম। আমার মানসিক চালচলনে বিজ্ঞানের ঝোঁক ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠচে।

আমার হালের লেখার মধ্যে তার প্রভাব প্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ হয়, সেই প্রভাবটা যদি ভিতরকার জিনিষ হয় তাহলেই সেটা অকৃত্রিম হতে পারে। তুমি জানো আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলুম তখন আমাদের পরিবার ছিল এদেশের সমাজ থেকে নির্বাসিত— আমরা ছিলুম দ্বীপে রবিন্‌সন ক্রুসোর মতো, হাতের কাছে তৈরি জিনিষ কিছুই পাই নি, সব আপনারা তৈরি করে নিয়েছি— সেই নিজের তৈরি আত্মরচনার মধ্যে বেড়ে উঠেছি সুদীর্ঘকাল ধরে। মনে আছে ছেলেবেলা প্রায় শুনতুম পিরিলি বাড়ির ভাবভঙ্গী ভাষা বেশভূষা আচার ব্যবহার নিয়ে পরিহাস, তারা ভাবতে পারত না এই জিনিষটাই অকৃত্রিম, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে, বাইরে থেকে সাজানো নয়। আমাদের মধ্যে এই যে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা ঘটেছে এটা কাজ করেছে আমার জীবনের সকল বিভাগেই। এমন কি যে ধর্মশিক্ষার মধ্যে জীবন আরম্ভ করেছি সেই ধর্মকেও যতক্ষণ না আপন স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি দিয়ে রূপান্তরিত করতে পারলুম ততক্ষণ তাকে গ্রহণ করতে পারিনি। প্রথম বয়সে কাব্য আরম্ভ করেছিলুম অনুকরণে, বিহারীলালকে, অক্ষয় চৌধুরীকে রেখেছিলুম সামনে, কিন্তু অল্পবয়সেই একদিন কখন বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়লুম; তেতলার ঘরে দুপুর বেলায় সেই হঠাৎ মুক্তির প্রবল আনন্দের কথা আজও মনে পড়ে— অথচ যে কবিতাটা সেদিন আমার নবীন লেখনীকে কুলত্যাগিনী করেছিল তার কাঁচা ছেলেমানুষি আজকের দিনে কোনো শ্রেণীর কবির পক্ষেই গৌরবের

বিষয় হোতো না। আমাকে আমার স্বভাবের পথ ধরিয়ে দিয়ে নিজে সে কোথায় করেছে অন্তর্ধান। মনে আছে যে প্রবল বেদনায় সেই লেখাটা হঠাৎ উৎসারিত হয়েছিল সেটা অত্যন্ত আমার অন্তম, ভিড়ের লোকের হাতে দিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল— একলা ঘরে বসে সেটা লিখেছিলুম স্লেটে, এবং মুছে ফেলেছিলুম। তারপর থেকে আমার কাব্য-স্বরূপ আপন দেহকে প্রকাশ করেছে আপন প্রাণশক্তির প্রবর্তনায়। এর মধ্যে স্বাভাবিক পরিবর্তন চলে কিন্তু অনুকরণ চলে না। এই ডাঙার শরীর যদি কোনো খেয়ালে জলে সাঁতার দিতে চায় তবে মানুষরূপেই দেয়, রুই মাছ সেজে দেয় না। দেশবিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেচে আমার মনে এবং রচনায়, তাকে স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে হয় তো বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শে তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয় নি। ভিতরের দিক থেকে ভাব গ্রহণ করবার মানসিক আধার প্রশস্ত, কিন্তু বাইরের দিকে যে দেহরূপ আছে তার স্বাভাবিক গঠন একটা চেহারার সীমায় বাঁধা, সেই সীমার মধ্যেই কিছু কিছু তার বাড়া কমা, কিছু কিছু তার অদলবদল চলতে পারে— কিন্তু আগাগোড়া রূপবদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয় সেটা আদর্শকে নকল করা। এই জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। এই দেখনা কেন, যাচনদার এখনকার কোনো ছবিকে ওরিয়েণ্টাল মার্কা দিয়ে যদি হাটে চালান দেয় তা হলে বুঝব সেটা ম্যুজিয়মের

জিনিষ; কোনো একসময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল সজীব ছিল তারি ছাঁচে ঢালা নকল পদার্থকেই আজ ওরিয়েণ্টাল বলে। অবনের মধ্যে যদি প্রাচ্যশিল্পের প্রেরণা থাকে সেটা ভিতর থেকেই কাজ করবে, তাঁর চিত্র দেহের বাইরে রূপ যদি কেবলি অজন্তা কাংড়াভ্যালি আর মোগল আর্টেরই দাগা বুলানো হতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ী যাচনদারেরা তাকেই ওরিএণ্টাল আর্ট বলে খাতির করবে বটে কিন্তু তাকে স্বভাবসিদ্ধ আর্ট বলা চলবে না। অবনের আর্টের যদি স্বাভাবিক প্রাণগত অভিব্যক্তি থাকে তবে তাকে একান্ত বিশেষ শ্রেণীগত মার্কার বেষ্টনীভুক্ত করা চলবেই না। তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলচি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়েটের বা অডিনের বা এজরাপাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না। সজীব দেহের আপন চেহারার পরিচয়েই মানুষকে সনাক্ত করা চলে, তার পরে চালচলনে তার ভাবের পরিচয় নেওয়া সম্ভব হয়। যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?

তোমাকে আমি এত কথা বললুম তার মূলে আছে আমার নিজের কাব্যরূপের অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সেই অভিব্যক্তি

নানা পর্বে নানা পথে গেছে কিন্তু সব নিয়ে স্বতই তার একটা চেহারার ঐক্য রয়ে গেল। যুগধর্মের তিলকলাঞ্ছিত হবার লোভে সেটাকে বদলকরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি এখনকার ইংরেজ কবিদের যে সব নমুনা কপি করে পাঠাচ্ছ পড়ে আমার খুব ভালো লাগচে,— সংশয় ছিল আমি বুঝি দূরে পড়ে গেছি, আধুনিকদের নাগাল পাব না—এই কবিতাগুলি পড়ে বুঝতে পারলুম আমার অবস্থা অত্যন্ত বেশি শোচনীয় হয় নি। তুমি যদি এই সময়ে কাছে থাকতে তোমার সাহায্যে বর্তমান সাহিত্যের তীর্থ পরিক্রমা সারতে পারতুম।

আমার পূর্ব চিঠির উত্তরে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে সেটা পড়ে খুব খুশি হয়েছি।

আমার বড়ো বড়ো বহরের চিঠি দেখে মনে কোরো না আমার অবকাশের waste land বুঝি বহুবিস্তৃত। একেবারেই তার উল্টো। আমার জীবনের এই একটা প্যারাডক্স, যখন টানাটানি হয় বেশি তখনি ছড়াছড়ি হয় বিস্তর। ২৩।২।৩৯

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮

৮ মার্চ ১৯৩৯

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি একি
আমার লেখার ঘরে
শেল্‌ফের পরে,

মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা,
রেশ্‌মি সবুজ রং, তার পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধে বেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা,
কোনো খানে হেথা
অরণ্যের বর্ণগন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা সমস্ত বৃথাই,
ওর সারা জীবনের দিনে রাতে
যাহা ওর অর্থ-জানা সম্পূর্ণ পৃথক তার সাথে।

আমি ভাবিতেছি বসে, এ নিখিলে
যেটুকু আমার প্রাণে কী এক বিধানে গেছে মিলে
আমার জগৎ তাই,
যাহা তার বেশি তাহা একেবারে নাই।
প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যের পরে
স্পর্শ তারে করে
চোখে দেখে তারে
তার বেশি সত্য যাহা তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর যে কী জিনিষ সে রহস্য জানে কি ও কভু ?

আমি যেথা আছি
মন মোর তাহা হতে সত্য লয় বাছি,
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই তো অগম্য হয়ে নিকটেই আছে চারিধারে।
যার কাছে স্পষ্ট তাহা কোথা আছে সেই,—
হয়তো বা এখনি সে আছে এখানেই,
যে আলোকে তার ঘর,
সে আলো আমার অগোচর॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমিয়

জিনিষটা কি বেশি শুক্‌নো
এবং মেটাফিজিক্যাল হয়েছে।
যা অনুভব করি, বা অনুমান করি
তা সবটা বল্‌তে পারি নি।
এর মধ্যে একটা কথা হচ্চে জীবজগতে
এত রকম বোধ আছে যা আমার
বোধের থেকে একেবারে অন্যরকম।
আর একটা কথা, হয়তো এমন কোনো
সত্তা আছে, যা এইখানেই, অথচ
যা অদৃশ্য আলোকে অগোচর,
যার বৃহৎ চেতনায় যা প্রকাশ পাচ্চে

সে আমি ভাবতেই পারচি নে—
যে চেতনার আমি অন্তর্গত।

২৪ ফাল্গুন
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ

১০৯

১০ মার্চ ১৯৩৯

শান্তিনিকেতন

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি এ কী
আমার লেখার ঘরে,
শেলফের পরে
মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা,—
রেশমি সবুজ রং তার পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা,
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণগন্ধ নাই,
তার কাছে গৃহসজ্জা সমস্ত বৃথাই।
সারা জীবনের দিনে রাতে
অর্থ-জানা যাহা ওর, সম্পূর্ণ পৃথক তার সাথে

আমি ভাবি এ নিখিলে
যা আমার প্রাণেমনে আছে মিলে
আমার জগৎ শুধু তাই,
যাহা তার বেশি তাহা একেবারে নাই।
বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্বমাঝে।

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্য-পুঁথির পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা, তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানে না ও কভু।

পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ,
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা সুন্দর যা, অনির্বচনীয়
যাহা প্রিয়,
তার বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।

আমি যেথা আছি
মন যে আপনটানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই তো অগম্য হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারিধারে।
যার কাছে স্পষ্ট তাহা কোথা আছে সেই,
হয় তো বা এখনি সে আছে এখানেই,
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি বহু দূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপ পুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমিয়

এই দ্বিতীয় সংস্করণটাকে কি বাহুল্যদোষে পেয়ে বসেছে হয়তো এ সব জিনিস একটু কম বোঝানোই ভালো— কারণ এর ধর্মই হচ্ছে স্পষ্ট না বোঝানো।

রবীন্দ্র

১১০

১৭ মার্চ ১৯৩৯

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ছোটোখাটো অনাহূত কাজগুলো আলোতে বাদলা রাতের পতঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে, তারা কোনোটাই বেশি ক্ষণ থাকবার মতো নয়— কিন্তু আলোর যথার্থ উদ্দেশ্যটাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। তুচ্ছ যত দাবি আমার অবকাশের উপর চার দিক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আমার ভাবনা যায় এলোমেলো হয়ে। নিজের সময়ের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে কারো সামান্য দরবার ঠেকিয়ে রাখা এদেশে দুঃসাধ্য। কেননা আমাদের সমাজটা অত্যন্ত সস্তাদামী সময়ের বারোয়ারী সমাজ, সবার সময় সকলেরই। পরের অবকাশের তহবিল-ভাঙা দাবির জন্যে কোনো বিশেষ যোগ্যতার অধিকারভেদ নেই।— একই জাজিম পাতা, অনিমন্ত্রণে সকলেই যেখানে খুশি বসবার গুমর করে। অনায়াসে বলতে পারে, আমি সামান্য লোক বলেই কি

আমাকে উপেক্ষা করতে হবে। ভাবতেই পারে না যে জগতে সামান্য লোকের স্থান যদি সামান্য পরিমাণেই না হয় তাহলে অসামান্যদের দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় সদর রাস্তায়।

মাঝে মাঝে নানা খেয়াল মাথায় চাপে। প্রবন্ধ লেখবার বয়স গেছে। তা ছাড়া প্রবন্ধ আপন ভার এবং আয়তন নিয়ে অধিকাংশ রাস্তাতেই চলতে পারে না; চিঠি চলে যায় বিনা-বাঁধানো রাস্তায় বাইসিক্‌লের মতো। চিঠির সেই হালকা চাকায় আমার মন আজকাল চলতে উৎসুক। কিছু দিন থেকেই ভাবছি তোমাকে একখানি চিঠি লিখি— হয়ে উঠছে না। আমাদের দেশে গোধূলির এক রকম সিঁদুরে রঙের আলোকে বলে কনে-দেখা আলো, সেই আলোতেই কনের রূপ খোলে। সেই রকম এক জাতের অবকাশ আছে যাকে বলা যেতে পারে চিঠি-লেখা অবকাশ। সেটা ঘটে সময়ের সান্ধ্যক্ষণে, অর্থাৎ মানসিক দুপুর রোদ্দুরেও নয়, অন্ধকার রাত্রেও নয়, যে প্রদোষের আলোর উপর কাজ-কামাইয়ের ম্লান রং লাগে।

আজ সকালবেলায় জমেছে ঘন মেঘের ছায়া, গত রাত্রির বর্ষণস্মৃতিভারে বাতাস মন্থর, থেকে থেকে বিদ্যুতের ঘোষণা অনুসরণ করে ডেকে উঠছে মেঘ। এই রকম সকালবেলাকার নিবিড় বাদলা সমস্ত দিনের নিষ্কর্মতার ভূমিকা বিছিয়ে দেয়। যাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা স্বভাবতই মধুর অর্থাৎ লিরিক-জাতীয় তুমি যদি তাই হতে তাহলে আজকের এই চিঠিতে মেঘ-মল্লারের সুর লাগত। লিরিকের পর্ব শেষ হয়ে গেছে, ঠিক

মনের দিক থেকে যে তা নয়, বাইরের দিক থেকে। অর্থাৎ অবকাশের দেবতা এই অকেজো সকালে যে-সুরেই তাঁর বীণার তার বাঁধুন আমার এ চিঠি সুরালো হবে না, কেননা আধুনিকতার যুগলক্ষ্মীর সভায় মাধুরী-মদের পেয়ালায় টানাটানি। সাকীই বা কোথায়?

তাহলে লাগা যাক্ সাবধানে যথাসাধ্য ডুল্‌কি চালে "থট্"-এর চালনায়। কী বলব থট্-কে? চিন্তা? অশ্রদ্ধেয়। মনন? নৈব নৈব। বৌদ্ধ বিষয়? রাস্তা বন্ধ। সংস্কৃত ভাষায় একটা শ্লোকে বলেছে, চিতা এবং চিন্তার মধ্যে চিন্তাটাই বেশি করে জ্বালিয়ে মারে। এই অলক্ষুণে শব্দটা বাংলা ভাষায় বিনা চিন্তায় অস্থানে প্রবেশ করেছে। "মনন" শব্দটা ব্যবহার করতে বাধে, কেন না মনন মনের একটা ক্রিয়া, অর্থাৎ thinking— এই ক্রিয়ার পরিণামকেই সাধারণত thought বলে, সে-রকম শব্দ হচ্ছে "মত", কিন্তু ওটা চলেছে থিওরি এবং ওপিনিয়নের প্রতিশব্দ রূপে। মননের বিষয় বা মননের যোগ্য হিসাবে আপাতত মন্তব্য কথাটা চালানো যেতে পারে। কিন্তু thoughtful শব্দের জায়গায় মন্তব্যবান বলা চলবে না। কেননা যাদের মননের শক্তি বা অভ্যাস আছে তারাই thoughtful। সে হিসাবে সে স্থলে মননশীল বা মননশক্তিমান বলাই সংগত হবে। চৈঠিক সাহিত্যের সুবিধে এই যে ভাষান্তর সাধনার সুগম্ভীর দায়িত্ব সে না নিলেও নিতে পারে, এ ভার রইল তাঁদেরই পরে এ কাজটাকে যাঁরা বলেন "বাধ্যতামূলক"।

আমি থট্-কে আপাতত বলব মন্তব্য। যদিও মন্তব্য কথাটা অন্য অর্থে চলে গেছে। যদি বলি সুধীন্দ্রের "স্বগত" বইখানি মন্তব্যে ঠাসা, তাহলে এই বাক্যটা সুধীন্দ্রের ভাষার চেয়েও বেশি দুরূহ হবে বলে মনে করি নে। "কোনো কোনো কাব্য মন্তব্যভারাক্রান্ত, তাতে রসের অংশ কম" বললে বুঝতে বাধবে না। কিন্তু যদি বলি চিন্তাভারাক্রান্ত। তাহলে বোঝাবে দেউলে হবার পথে। মন্তব্য মন্থর ভাষা স্বভাবত আমার নয়— ফলের মধ্যে যেটুকু প্রোটীন খাদ্য থাকে, আমার ভাষায় মন্তব্য অংশ সেইটুকু, আমার ভাষা কোনো দিন প্রোটীন-ঘন পাঁঠার প্রতিযোগিতা করতে পারবে না— অন্তত নিজের বিচারে আমি এটা ঠিক করেছি।

যাক্, যে কথাটা কিছু দিন থেকে ভাবছি সেটা হচ্ছে এই :— মানুষের মনে একটা প্রবল জোয়ার ভাঁটার পর্যায় আছে। মানুষ বলছি যাকে, সে ব্যক্তিগত মানুষ নয়, নেশনগত মানুষ। প্রথম বয়সে যে নেশনের সংস্রবে আমাদের মনে প্রথম উদ্বোধন জেগেছিল, তার চিত্তসমুদ্রে তখন ভরা জোয়ার, তার উদার মনের প্রসারণ সকল দিকেই, মনুষ্যত্বের সকল প্রদেশেই। মনে স্থির করেছিলুম এই প্রসারণ কেবলি ব্যাপ্ত হোতে থাকবে, এই প্রসারণই পাশ্চাত্য সভ্যতার নিত্য স্বভাব। মনের ও হৃদয়ের সকল প্রকার রিপুগত বুদ্ধিগত সংকীর্ণতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যই তার নিরন্তর প্রয়াস। এই জন্যই তখনকার পাশ্চাত্য সাহিত্য এত সহজে আমাদের মনকে অধিকার করেছে— তার বাণী স্বতই সর্বজনের

অভিমুখী। এই প্রেরণার অনুকূলেই আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হয়েছিলুম। তখনকার তরুণের দল ধর্মমত ও সমাজনীতির বাঁধগুলি ভাঙবার জন্য চঞ্চল হোলো, সেই সঙ্গে সঙ্গেই জাগল রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার সাধনা। আমি জানি, আমার মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির যে উৎসাহ উন্মুখ হয়েছিল তাতে সেই সম্প্রসারণ যুগের চরণপাতের ছন্দ লেগেছিল। ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ববর্তী যুগশাসনের শিকল নিঃসংকোচে ছিঁড়ে ফেলবার ভরসা পেয়েছিলুম তখনকার সেই আবেগের আনন্দে।

ভাঁটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে। আমাদের এই কোণের দেশের ছোটো এলেকাতেও অকস্মাৎ তার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করলে। নবীনবয়সীরাও আচার বিচারের সনাতনত্ব নিয়ে স্পর্ধা করতে লাগল— ক্রমে ক্রমে উল্‌টে গেল হাওয়া। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, অচলায়তনের প্রাকারশ্রেণী আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল। এ'কে উত্তুরে হাওয়া বলতে পারি এইজন্যে যে ওটা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেই। কেননা তখন উত্তর-পশ্চিমের মনোরাজ্যে শীতের সংকোচন দেখা দিতে শুরু করেছে। বুদ্ধিপ্রভাবের বিরুদ্ধে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে। তাই আমাদের দেশেও সহজ হোলো বুদ্ধিকে অমান্য করে সংস্কারকে শিরোধার্য করে নিতে, বিচারের স্বাধীনতা চার দিক হতে লাগল অবরুদ্ধ। ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হোলো চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ। দেখতে দেখতে চার দিকে

নানাবিধ নমুনার গুরুমূর্তির আবির্ভাব সংক্রামক হয়ে উঠল। পরলোক পথের পাথেয় মন্ত্রের জন্যে, ইহলোক পথের চালনা-বিধির জন্যে যে কোনো কর্ণধারের হাতে নিজের কান সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছেয়ে ফেললে সমস্ত দেশকে।

এই তামসিক মনোবৃত্তিরই সাংঘাতিক চেহারা দেখা দিল য়ুরোপে। বড়ো বড়ো নেশন, বুদ্ধি বিদ্যা ও বীর্যে যারা অসামান্যতা দেখিয়েছে, যাদের জয়দৃপ্ত ইতিহাসের শিক্ষাকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বুদ্ধি অনুশীলনে স্বাধীন কর্তৃত্বের গৌরবকে আমরা এত কাল একান্ত শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছি তাদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় কেউ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে এক একটা বড়ো বড়ো জড়পিণ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল। এই নিঃসাড় জড়ত্ব সজীব মাংসকে পাথর-করে-তোলা বীভৎস ব্যাধির মতো মানব-জগতের সর্বত্র সঞ্চারিত হতে চলল। দলে দলে পোলিটিকাল গুরুদের ধনুর্ধর চেলারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধিতার তপস্যায় আজ প্রবৃত্ত। সেই তপস্যায় কৃচ্ছ্রসাধনার অন্ত নেই। তাতে মস্তিষ্ককে, হৃদয়কে আত্মসম্মানকে স্বকৃত ও পরকৃত পীড়নে দ'লে দ'লে করছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অবশেষে আজ, এমন কি, কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে।···স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্যে যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফাসিস্টের সাপ

ফোঁস করে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলুম, Proud power tries to keep truth safe in its own exclusive hand with a grip that kills it। ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়। তুমি তো জানো আমাদের দেশে এক দল সন্ন্যাসী গাঁজা খেয়ে বুদ্ধিকে বিহ্বল করে, সেটা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধিকে তারা বিশ্বাস করে না। ফাসিস্ট দলপতি দলের বুদ্ধির প্রতি একটুও বিশ্বাস রাখে না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণরা যখন শূদ্রদের একেশ্বর অধিনেতা ছিলেন তখন সর্বাগ্রে তাদের বুদ্ধিকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছিলেন— হুকুম ছিল পদধূলি পাবে, কিন্তু ছাড়া পাবে না, মেনে চলবে কিন্তু ভেবে চলবে না। পৃথিবীতে বোধ হয় সেই সব প্রথম ফাসিস্ট নীতির প্রবর্তনা। কোনো রাষ্ট্রিক শক্তির অক্ষুণ্ণতা যদি নির্ভর করে অধিকাংশের বুদ্ধি-পঙ্গুতার পৃষ্ঠে স্বল্পাংশের বুদ্ধি-স্বাধীনতার নিরাপদে অধিরোহণ তাহলে— থাক্‌গে ও সব কথা, আমরা অন্য কালের লোক।

বাঁধা পথ নেই চিঠির, ও রেলগাড়ি নয়, ও চলে খোলা মাঠের মধ্যে। একটা সাহিত্যের তর্ক তুলব তোমার সঙ্গে, এই কথা মনে করেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভূমিকাটাই চার পা তুলে বেড়া ডিঙিয়ে দৌড়ে চলেছে

আপন খেয়ালে। তার হাঁফ ধরেছে তবেই এবার আসল কথাটার সুযোগ পাওয়া গেল। তবে শোনো। ডিক্টেটরি বুদ্ধি যতই গরম হয়ে ওঠে ততই একেশ্বর নেতারা ভুলে যায় যে, বিধাতার অন্যমনস্কতায় তারা সর্বজ্ঞ হয়ে জন্মায় নি। মানুষকে চালনা করবার নেশা এমনি তাদের পেয়ে বসে যে সকল বিষয়েই মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উগ্রভাবে উদ্যত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ডিক্টেটররা কেবল রাষ্ট্রিক ব্যাপারে নয়, সামাজিক বিধানে নয়, সাহিত্যে আর্টেও আপন শাসন রুদ্ররীতিতে প্রচার করছে। মানুষের এই বিভাগটা ছিল বিশেষভাবে গুণীদের হাতেই, পালোয়ানদের হাতে নয়। আকবর বাদশাও গানের আসরে তানসেনকে মেনে চলেছেন, সেখানে যদি তিনি বাদশাহী করতেন তাহলে সে হত সাংগীতিক ভূতের কীর্তন।

তোমার মনে আছে কি না জানি নে, যখন মস্কৌতে গিয়েছিলুম তখন প্রসঙ্গক্রমে চেকভ-এর প্রতি সমাদর প্রকাশ করেছিলুম। তখনি দেখা গেল সেটা স্থানকাল-পাত্রোচিত হয়নি। চেকভ আধুনিক রুশ-বিদ্রোহ-কালের পূর্বকার লেখক। তিনি বুর্জোয়া, তাঁর রচনা প্রোলিটেরিয়েট যুগের সম্মানের পংক্তিতে বসতে পারে কি না বোধ করি এই সংশয় প্রবল ছিল। আমার আশা ছিল তাঁর চেরি অর্চর্ড নাটকখানির অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটবে। সেটা সম্ভব হোলো না। হিটলারি শাসনেও শুনতে পাই ভালো ভালো বই জাতের ছুতো তুলে তিরস্কৃত। ছবি প্রভৃতিরও সেই দশা।

হিটলারই মেলবন্ধন করেন। নাজি-নীতি অনুসারে সাহিত্যের কে কুলীন কে অন্ত্যজ, তাঁর উপরেই তার নিষ্পত্তির নির্ভর। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত হাস্যকর, সেটা চাপা পড়ে গিয়েছে এর শোচনীয়তার তলে।

সেদিন কোনো এক বাংলা কাগজে দেখা গেল, আমরা এখানকার কবিরা যদিও রাশিয়ান নই, তবুও আমাদের কবিতারও শ্রেণীবিচার হচ্ছে সোভিয়েট আদর্শে; ভাবের দিকে সে রচনা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে নয়, জাতের দিকে সে বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট এই নিয়ে। সেদিন কাগজে দেখলুম— সত্যমিথ্যা জানি নে,— কোনো বিভাগে হিন্দুর চাকরি দুর্লভ হওয়াতে কোনো হিন্দু উমেদার মুসলমান ধর্ম নিয়েছিল। আধুনিকতার বাজারে আন্তরিকতা বা ভালোমন্দ বিচার না করে রচনাকে প্রোলিটেরিয়েট সাজে সাজানো হয়তো কালক্রমে দায়ে পড়ে চলতি হতে পারে। আমাদের সন্তোষ এক কালে কতকগুলি সাঁওতালি গান সংগ্রহ করেছিল, জানি নে সে গান বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট। না জেনেও তার মধ্যে কোনো কোনো গান খুব ভালো লেগেছিল। তার থেকে প্রমাণ হবে কি যে, সেগুলি বুর্জোয়া। যখন ময়মনসিংহগীতিকা হাতে পড়ল খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। শ্রেণীওয়ালাদের মতে এসব কবিতা হয়তো বা প্রোলিটেরিয়েট, কিন্তু আমি তো জাত-বুর্জোয়া, আমার ভালো লাগতে একটুও বাধে নি। ভাঁটার দিনে যখন উপরকার প্রবাহের প্রবল ঐশ্বর্যের চেয়ে তলাকার নুড়িপাথর পাঁকের প্রাধান্য জোর

পেয়ে ওঠে তখন প্রোলিটেরিয়েট নুড়ি বালির আদর্শেই কি নদীর শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে। মনুষ্যত্বের আদর্শের চেয়ে জন্মগত শ্রেণীগত আকস্মিকতা বেশি অভ্যর্থনা পায় সমাজের দুর্দিনে। সে দুর্দিন সকল সমাজে সকল সময়েই দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আন্তরিক শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বাহ্যিক শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে নি— এখন পাশ্চাত্য মহাদেশের কোনো কোনো প্রদেশে সামাজিক গোঁড়ামি সাহিত্য নিয়েও যদি জাত-ঠেলাঠেলি করতে থাকে তাহলে আমরা তাতে কেন যোগ দিতে যাব।

আমাদের সামাজিক বৈঠক কি এত কাল জাতযাচনদারি নিয়ে যথেষ্ট সরগরম ছিল না— শেষকালে কি জাত মানা মত্ত হস্তী সাহিত্যেরও পদ্মবনে ঢুকে পড়বে। আমি বুঝতে পারি এর আন্তরিক কারণটা। নতুন যুগে সাহিত্য আপন রচনায় আপন কালের বিশেষ সাক্ষ্য দেবে, সময়ের এই দাবিটা মনকে চঞ্চল করেছে। যুগে যুগে গুটি কেটে বেরোয় সাহিত্যের প্রজাপতি, বাণীর ডানায় নূতন রঙের ছাপ লাগিয়ে। কিন্তু সেটা লাগে সহজে প্রাণধর্মের তাগিদে। আমাদের বর্তমান সাহিত্যে তেমনি করেই কি এক দিন নব জীবনের রং লাগে নি। এমন কি অল্পকাল আগে হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন তাঁদের কাব্যে যে প্রসাধন নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন সে কি আজ সম্পূর্ণ বদলে গেল না। তা নিয়ে সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে জাতবদলের কি কোনো তর্ক উঠেছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বিদ্যাপতি কিছু মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন,

"শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল"। এ তো মিলেই থাকে— এ নিয়ে তো সমাজে শৈশব এবং যৌবনের দুই বিরুদ্ধ দলে হাতাহাতি করে না। তার পরে স্বভাবের নিয়মে প্রৌঢ় বয়সও আসে, তখন সাজগোজ আপনি ঘুচে যায়, আগেকার মতো সংকোচ করে সামলে কথা কওয়াটার প্রয়োজন থাকে না। ভাষাটা স্পষ্ট হয়, তার মধ্যে বুদ্ধির পরিণতি দেখা দেয় —কিন্তু তাই বলে যে সেটা বেহায়াগিরি আকারে তা নয়—. তার ভাষার অকুণ্ঠিত তেজটা সহজ ; সহজেই সে ভাষা অশ্লীল হয় না যদি সে ভদ্রঘরের মেয়ে হয়। সাহিত্যেও আয়ুর পর্বে পর্বে বয়ঃসন্ধি ঘটে। যদি সত্যই ঘটে তাহলে সেটাকে নিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে গলা চড়াবার দরকার হয় না— দাবি বুঝে দরজি এসে আপনিই মাপের এবং ছাঁটকাটের বদল করে থাকে।

আমাদের সাহিত্যে সেই আন্তরিক পরিণতি স্বভাবত ঘটে নি। প্রকাশে নতুনত্ব হওয়া উচিত এই ব্যগ্রতা মনকে অস্থির করেছে। নকল নতুনত্ব দেখলেই চিনতে পারি কোন্ দোকান থেকে তার আমদানি। কেননা যে সব স্বকীয় রীতি বা মুদ্রাভঙ্গী ব্যক্তিবিশেষে স্বাভাবিক তারও অনুকরণ দেখলে বোঝা যায় এটা আধুনিকতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সাজ। এক বয়সে মোলায়েম মুখে গোঁফ ওঠাবার জন্যে কিশোরদের অধৈর্য দেখা যায় এও তেমনি। এ ক্ষেত্রে এই উপদেশ মানতে হবে যে, আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে গোঁফ আপনিই উঠবে। যদি প্রকৃতির বিশেষ খেয়ালে গোঁফ

একেবারেই না ওঠে তাহলে মেয়েলি মুখের উপর বার বার ক্ষুর বোলাতে থাকো, হয়তো ফল পাবে, হয়তো পাবে না। উপায় কী।

✓ ইতিমধ্যে সাহিত্যের প্রোলিটেরিয়েট বুর্জোয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের ছাপ মারবার যে অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের দেশে দেখা গেল সেও ঐ একই উত্তেজনার অঙ্গীভূত। সাহিত্যে এ-রকম শ্রেণীভেদ অত্যন্ত নূতন সন্দেহ নেই, কেননা অত্যন্ত অসংগত আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সম্প্রতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুসলমান কর্তৃত্বের উপলক্ষ্যে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক শাসনের যে নূতনত্ব রুদ্রমূর্তি ধরল তার উপরে সোভিয়েট বা নাজি শাসন চালানো যায় যদি তাহলে তো নৌকোডুবি হবে। সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশ-বিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে। তাহলে সাম্প্রদায়িক শাসনকর্তারা এক দিন ইংরেজি সাহিত্যকেও আমাদের বিদ্যালয় থেকে নির্বাসন দেবেন— কেননা ঐ সাহিত্য খ্রীষ্টানের সাহিত্য হলেও পৌত্তলিক দেবদেবীদের নামে ও ভাবরসে সমাকীর্ণ, অভিষিক্ত। অবশেষে কোনো এক ভবিষ্যতে যদি দেশে বলশেভিক নীতি ও ব্যবস্থার প্রাধান্য ঘটে তাহলে? এখন তো কর্তাদের আমলে আমার রচনা এখানে ওখানে মুসলমানি ছুরির খোঁচা খায়, তার নাকের সামনে তর্জনীও ওঠে। তখন মার্ক্‌সিজ্‌মের কোন্‌ গোরস্থান সামনে আছে?

এখনো ঘন মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। ইতি ১৭।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১

১১ এপ্রিল ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে আগেই বলেছি গদ্য প্রবন্ধের ভার বইতে আমার মন চায় না। বয়স যখন অল্প ছিল তখন প্রাত্যহিক দেখাশুনোর ফসল সংগ্রহ করে চিঠিতে চালান করতে ভালোবাসতুম। তার প্রধান কারণ মনটা তখন পথে ঘাটে পলাতকা হয়ে বেড়াত, যা দেখত যা শুনত তাতেই তার ছিল ঔৎসুক্য। এই ঘোরাফেরা আর চিঠির বকুনি এক জাতের। তখন বৈঠকে-বসা মেজাজ তাকিয়া হেলান দিয়ে গোঁফে তা দেওয়া শুরু করে নি। দেহের কথা বলছি নে, মনের দিকে দেয় নি তখনো গোঁফের রেখা। সেদিন চিঠিগুলো উঠত অজস্র ফেনিয়ে বাইরের দিকের চলাচলের মন্থনবেগে। ছিন্নপত্রে তার পরিচয় পেয়েছ। বুদ্ধির দোষে ওগুলোকে আস্ত রাখি নি। তখন জানতুম না চিঠি চাষের ফসলের জন্যে নয়, ও আপনি গজিয়ে ওঠে রাস্তার ধারে, চিহ্নিত করে দেয় পথচলার ইতিহাসকে, কেবল শস্যটুকু ঝাড়াই বাছাই করে নিয়ে ডালপালা সব বাদ দিলে ওর মানে যায় চলে।

তার পরে এল প্রবন্ধের মাল বোঝাই করার পালা। প্রধানত এই পর্ব দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে। মন ভারাক্রান্ত ছিল কর্তব্যবুদ্ধিতে। সেই ভার চেপেছিল গদ্যের স্কন্ধে। ফিরে যখন তাকাই তখন কলমটাকে মনে হয় আদিম যুগের অতিকায় জন্তুর দলে। কিছু কাল তার আধিপত্য ছিল। একেবারে তার দিন যায় না, কিন্তু যে আত্মশ্লাঘার অভিব্যক্তির মুখে তার ল্যাজ প্রসারিত হয়ে চলেছিল, তার জোর কমেছে। বাহুল্যে তার আর রুচি নেই।

এখন লিখি লিখতে যদি মন যায়। লেখার পায়ে-চলার পথে চলি আলাপ জমিয়ে যাবার ঝোঁকে। তার দায়িত্ব বহু লোকের কাছে নয়। যাকে ভালো করে চিনি তার সামনে বসে বকে যাওয়া সহজ, কেননা সেও ভিতর থেকে বকিয়ে নেয়। লেখাটার পরিমাণ থাকে দুটি মনের মাপে। যুগ্ম তারা চলে পরস্পরের কাছ থেকে অলক্ষ্যটান ধার করে নিয়ে, চিঠির চাল সেই অলক্ষ্য লেনা-দেনার চাল।

আজ তোমাকে লেখবার উপলক্ষ্য হোলো সুধীন্দ্র দত্তর স্বগত বইখানি পড়ে। পড়তে কিছুকাল ইতস্তত করেছিলুম, ভয় ছিল আমার দেহের বর্তমান অবস্থায় ওটা উপযুক্ত লঘুপথ্য হবে না। কিন্তু জনশ্রুতি ক্রমশই অত্যুক্তির দিকে চলে। সুধীন্দ্রের লেখা দুরূহ এ বাণীর সুর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে। তাহলেও সংস্কারটার একেবারেই মূল নেই এও বলতে পারি নে। হয়তো তাঁর গদ্য চলতে চলতে আপন পথ পাকা করে

নিয়েছে, গোড়ায় সে চলত বন্ধুর পথে। তা হোক কিন্তু তাঁর গদ্য কেন যে জলের মতো সহজ কখনোই হোতে পারে না তার কারণ আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আগেকার চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছিলুম বাংলায় "চিন্তা" শব্দটাকে ইংরেজি "থট্" শব্দের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারব না। সুধীন্দ্র ওকে "মনন" বলেছেন যে অর্থে ওতে ভাবনার একটা প্রক্রিয়া বোঝায়। কিন্তু যে বিষয়টাকে নিয়ে মনন করা যায় এবং যা মননের পরিণতি তাকে বাংলায় "মত" বললেই ভালো হোত, সে সুযোগ আর নেই। তাই আমি মনে করি "মন্তব্য" শব্দটাতে কাজ চল্‌তে পারবে।

সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন। সাহিত্য-রচনায় কারো বা চিত্তবৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব কারো বা মননের। আরো একটা প্রবর্তনা আছে তাকে বলা যেতে পারে লোকহিতৈষা, তাতে শ্রেয়োবুদ্ধির ফসল চাষ হয়। আমার নিজের লেখা নিজে বিচার করতে সম্মতি যদি দাও তাহলে বলতে হয় আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা। সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে হয় তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা আছে। মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পাকা দাম নেই। তাই সুধীন্দ্র অনায়াসে

বলতে পেরেছেন এ বইয়ে তাঁর অনেক পুরোনো মতের সঙ্গে তাঁর এখনকার মত মেলে না অথচ তাই বলে তাঁর কাছে সেগুলো পরিত্যাজ্য বলে মনে হয় নি, কেন না তিনি মনন-বিলাসী। গীতার সঙ্গে এই ভাবটার সুর মেলে, যে গীতা বলেন ফলের দিকে দৃষ্টি রেখো না। যে সাধনার মূল্য সাধনাতেই প্রকাশ পায় বিশেষভাবে সিদ্ধিতে নয় তার এই দশা। কিন্তু তাঁর লেখার কোন্ এক জায়গায় মনে হয়েছিল তিনি "আর্ট ফর্ আর্ট্স্ সেক" মতটাকে বুঝি অমান্য করেছেন। যদিচ তাঁর ব্যবহারে তার প্রমাণ পাই নি। তিনি ভাবতে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসাটাই তাঁর দান। আর্টিস্ট মাত্রেরই চরম শক্তি, প্রকাশ করবার ভালোবাসায়। গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিস্ট। তার একটা পরিচয় পাই ভাষার শব্দের উপরে তাঁর একান্ত অনুরাগে। যারা যথার্থ সাহিত্যিক, শব্দে তাদের নেশা। এই নেশার মৌতাৎ দুই জাতের। রসসাহিত্যে ধ্বনি আর রূপকের ব্যঞ্জনা প্রধান উপকরণ, মনন-সাহিত্যে যাথার্থ্যের সূক্ষ্মবোধ। অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দে তার অর্থটা আভিধানিক চাপে কঠিন দানা বেঁধে গেছে, সে অর্থ ব্যবহারের দ্বারা স্বীকৃত, চেহারার দ্বারা পরিচিত নয়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে প্রয়োজন অনুসারে বিস্তর নতুন শব্দ চালিয়েছেন যাদের অর্থগুলি সজীব। তত্ত্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান আছে তবু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, তিনি আর্টিস্ট। তাঁর মননের আনন্দ বাছাই-করা শব্দের খেয়ায় চেপে বসেছে। শব্দগুলি অপরিচিত সুতরাং সাধারণ পাঠককে

বুঝতে বাধা দেবে এ দুশ্চিন্তা তাঁকে ঠেকায় নি। তাঁর লক্ষ্য মুখ্যত রচনার প্রতি গৌণত পাঠকদের দিকে। কেননা পাঠক সম্প্রদায়টা স্থাণু নয় সে সচল— সে কোনো এক বিশেষ যুগের শিকলে বাঁধা জীব নয়— না আধুনিকের না সনাতনের। যে লোক বাঁধা যুগের বেতনে লোভ রাখে তার লেখা ঋতু পরিবর্তনের বিদায় হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো খসে পড়ে। কিন্তু জল্পনা করে লাভ নেই। কোন্ রচনা যে চলতি যুগের রথে চলেছে চিরন্তনের গম্যস্থানে তার নিশ্চিত পরিচয় পাব কার কাছ থেকে। “সময়হারা” বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম তার মূলকথাটা এই, বর্তমানে আমরা সময় হারাতে পারি কিন্তু ভবিষ্যতের সুস্বপ্নের পথ হারাই নে, হতভাগার শেষ সম্বল ঐটে, চেম্বরলেনের শান্তির আশার মতো।

ও কথা যাক। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যোগ্য লেখকের প্রধান নির্ভরদণ্ড তার সাহস। তার লক্ষ্য লেখার দিকে, পাঠকের দিকে নয়। সুধীন্দ্রের ঐ গুণটি দেখেছি, তিনি পাঠকদের কাছে পাওনা হিসাব করে দমে যান নি। তাঁর লেখা পড়ে অল্প লোক। রসসাহিত্যে লোকের ভিড় অসহ্য ; কাউকে কোন টিকিট দেখাতে হয় না। এই বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার বাংলা দেশের মনকে অলস করে দিয়েছে, এখানে অযোগ্যের অহংকারে কোনো বাধা নেই। মনন-সাহিত্যে অনুশীলনের অপেক্ষা আছে, সেটা কুঁড়ে মনের কর্ম নয়। সেইজন্যে আমাদের দেশে ঐ বিভাগে বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

সুধীন্দ্রনাথের এই বইখানিতে জমেছে তাঁর মনন-সাধনার

ফসল। তাঁর এই সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি আমার মত জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে ফাঁকি দিতে হবে। চিঠির কোণটুকুর মধ্যে প্রবেশ করে দায়িত্বের আয়তন খাটো করা সহজ। বিচারকের সঙ্গে লেখকের স্বাজাত্য থাকা চাই, সুধীন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রভেদ আছে অনেকখানি। যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ, কোনো এক কালে হয়তো আমি সেখানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলুম, কৌতূহল যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেখানে আমার চলার পথে ঘাস উঠে গেছে। অনেক দিন থেকে আমাকে অন্য রাস্তায় টেনেছে সে তুমি জানো। কর্তব্য-সাধনার কাছে আমাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে তার মধ্যে বই পড়াটাই সর্বপ্রধান। সুধীন্দ্র দেশবিদেশের নানা সাহিত্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন— মনের অভিজ্ঞতা কেবলি বাড়িয়ে চলায় তাঁর শখ— সে শখ নিছক আরামে মেটাবার নয় বলেই আমাদের দেশে মননভূমির ভবঘুরে এত অল্প। আমার জানাশোনার মধ্যে আর এক জন লোক জানি যিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি মননবিলাসী, তিনিও গ্রন্থবিহারী। তিনি অনেক ভাবেন, অনেক পড়েন, অল্প বয়সেও তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি নি। তাঁর লেখা যখন পড়ি মনকে বলি,— মন তুমি কৃষিকাজ বোঝো না— চাষ-আবাদ করা হয় নি, সোনা যদি পেয়ে থাকি সে পড়ে-পাওয়া। এই প্রসঙ্গে প্রমথর রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা আবশ্যক যে তাঁর লেখায় কেবল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নয় প্রাণের সরস প্রবাহ প্রবল।

সুধীন্দ্র নানা বিষয়েই পড়াশুনো করেছেন কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়ে তাঁর মন জমাট বেঁধে যায় নি। জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাযাবর। ওঁর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ওঁর পথ-চলতি মন নিয়ে। যদি উনি শঙ্করাচার্য বা ব্যর্গসঁ-র মতের দুরূহ ভিত্তিতে পাথরের স্থায়ী দেয়াল গেঁথে বসতেন, এমন কি ফ্রয়ডের মনোবিকলন-শাস্ত্রের সব কটা চারিত্রগ্রন্থির কুটিল তত্ত্ব পারিভাষিক সমেত মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক লাইসেন্স পাওয়া কুৎসাপ্রয়োগের যথেষ্ট দাবি করতে পারতেন, তাহলে মাথা হেঁট করে ওঁর পাশ কাটিয়ে চলতুম। যাঁদের বচনে ও ব্যবহারে আছে সবজানার সুগোচর বা অগোচর ঔদ্ধত্য তাঁদের পাণ্ডিত্যকে বরাবর ভয় করে এসেছি, অধিকাংশ সময় অন্ধ শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু আপন লোক বলে মেনেছি মাননিক পথের পথিকদের, দুর্গম যাত্রী হলেও। ভ্রমণের শখ ভ্রমণকারীর সংসর্গে অনেকখানি মেটে।

স্বগত বইখানির অনেকটা অংশের আলোচনা যথা নিয়মে করতে পারি নে। কেননা সুধীন্দ্র তাঁর লেখায় যে সব বিদেশী লেখকদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বই আমি পড়ি নি। সেটা আমার শরীরের ক্লান্তিতে, কাজের ব্যস্ততায়। প্রথম বয়সে যখন ইংরেজি সাহিত্যের রসসত্রে প্রবেশ পেলুম তখন মেতে ছিলুম দিনরাত্রি। সেই ব্যগ্রতার চাঞ্চল্যে মনের সৃষ্টি চলেছিল এগিয়ে। বিষয়বস্তু যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল চিত্তের মন্থনবেগ। ক্রমে সেটা

নিজের ভিতরকার অজানা সম্পদকে তীরে তুলে এনেছিল। বাইরের পাওয়ার আবেগেই নিজেকে পাওয়ার পালা শুরু হয়। বাইরে থেকে সঞ্চয়টা এর প্রধান জিনিষ নয়, তার চেয়ে ভিতর থেকে নিজের পরিচয়টি আরো বড়ো। সেই আত্মপরিচয়ের এলেকায় এসেছি। এখন সেই আপনাকে পাওয়ার ভূমিকাতেই সকল পাওনাকে আত্মসাৎ করবার সময়। যদি এখনকার কালে জন্মাতুম মনের কী চেহারা তৈরি হয়ে উঠত কেমন করে বলব। সভ্যতার নানা অধ্যায়েই বিচিত্রের মিশ্রণ সৃষ্টির কাজ করতে থাকে। যে সভ্যতায় মিশ্রণের বাধা ঘটে সেখানে আদিম মালমসলা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির দৈন্য প্রকাশ করে। তাই যে সব তরুণদলের চিত্ত এখনকার যুগের প্রবর্তনায় আলোড়িত আমি তাদের নবজীবনের দৃশ্য দেখছি দূর সমুদ্রের প্রবালদ্বীপের মতো। যদি সময় থাকত তাহলে নৌকো বেয়ে সেখানে কিছুদিনের মতো সায়ের করে আসা যেত। মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই তোমাদের মতো সিন্ধবাদ নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। সুধীন্দ্র সেই সিন্ধবাদের দলের একজন। এই "স্বগত" বইয়ে তিনি আলাপ জমিয়েছেন। কিন্তু সে আলাপ সম্পূর্ণ আমাদের মতো আনাড়িদের লক্ষ্য করে নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন এখনকার কালের সকলেরই কামিংস এজরা পৌণ্ড ঈডিথ সিটওয়েল এলিয়ট অডেন স্পেণ্ডর সম্প্রদায়ের সভাস্থলে অবাধে যাওয়া-আসা আছে। কাজেই তাঁর এই অংশের সাহিত্যালোচনায় সমজদারদের মধ্যে মাথা নাড়ানাড়ি চলবে। আমার মতো

সেকেলে লোক ভালোমানুষের মতো শুনবে আর মেনে নেবে। আমি সম্ভোগ করতে পারি, এই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে যে সব কথা উঠে পড়ে এমন কি তা নিয়ে তর্কও করতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত, যেমন বিষ্ণু দের চোরাবালি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য। ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারি নি। কিন্তু নিজের মনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সমজদারের প্রশস্তিবাদ উড়িয়ে দিতে সাহস হয় না। মনে ভাবি তিনি এখনকার কালের যাচাইখানা থেকে যে কষ্টিপাথর পেয়েছেন সে আমার জানার মধ্যে নেই। তাঁর নির্দেশমতো বোঝবার চেষ্টা করলুম।

একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়। তাতে প্রমাণ হোতে পারে আমি এখনকার দিনের নই। তা নিয়ে লজ্জা করব না কিন্তু এখনকার দিনের সম্বন্ধে লজ্জা করবার কারণ আছে দেখতে পাচ্চি। অত্যন্ত রিরংসার বাস্তব চিত্রের অভিযোগ বাঁচাবার জন্যে সুধীন্দ্র এর মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ও ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ করেছেন। মেলাতে পারলুম না।···

গদ্যকাব্যে আমার ছন্দোমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রয়োজন ছিল। অনেকের কাছে ভর্ৎসনা পেয়েছি। আমার কৈফিয়ৎ এই, গদ্যকাব্যে যে বিশেষ জাতীয় রসরচনার অবকাশ পাওয়া যায় তার থেকে সাহিত্যকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

আমাদের দেশে যোগী সন্ন্যাসী যাঁরা, বিশেষ সাজ ও বিশেষ আচরণের দ্বারা সাধারণের থেকে তাঁরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র, তাই ভেকধারণের সাহায্যে তাঁদের চেনা সহজ। কিন্তু যে যোগী সংসারের মধ্যেই আছেন তিনি যথার্থ মুক্ত, সাজের দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রমের আচারের দ্বারা বদ্ধ নন। প্রথাগত দৃষ্টিতেই যারা দেখতে অভ্যস্ত তিনি তাদের চোখে পড়েন না। অথচ তাঁর মধ্যে সাধনার যে সত্য আছে সেটা প্রচলিত পরিচয় ও পদ্ধতির বাইরে ব'লেই তার মধ্যে থেকে একটা গভীর নিজকীয়তা জেগে ওঠে, সেটা মূল্যবান,— সংসারের সঙ্গে সংসারাতীতের সামঞ্জস্য ঘটিয়েই সেই মূল্য প্রকাশ পায়। গদ্যকাব্য ভেকধারী নয়, তাই তার মধ্যে সাহিত্যের হরিজন ও জাতকুলীন সহজে মিলে গিয়ে কবিত্বের সম্মান পেতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমার মতের সমর্থন এহ বাহ্য, কোনো বিশেষ পরিবেশ থেকে আন্তরিক স্বভাবের প্রেরণায় কাব্য দেখা দিল কি না-দিল সেটা সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। সলোমনের গীতিকে রসিকেরা জাতে ঠেলেন না সে প্রচলিত ছন্দের সাজে সভাস্থলে আসে নি বলেই। মনে পড়ছে যেন কোনো চীন জ্ঞানী বলেছেন যে, যে রাজ্যে রাজত্বকে

অতিশয় দেখা যায় না শ্রেষ্ঠতা সেই রাজ্যেরই। ছন্দ সম্বন্ধে অত বড়ো কথা বলতে মুখে বাধে, কেননা তার সঙ্গে আমার মনের মেলামেশা বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু একথা জোর করে বলতে পারি যে, যে-ছন্দ বাইরে থেকে অতিপ্রত্যক্ষ নয়, আসন যার কাব্যের গূঢ় অন্তরে, শাসন তার নেই বলেই তার গৌরব। যে হারুন-অল্‌-রসীদ, আমির-ওমরাওদের মধ্যে সিংহাসনে বসেন তাঁকে তো সেলাম দিয়েই থাকি, রাজদণ্ড ফেলে দিয়ে অগোচরে যিনি সাধারণ প্রজাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান মনে মনে তাঁকে যদি মান দিতে না পারি তবে সেটাতে আপনাকেই খর্ব করি বাদশাকে নয়।

চিঠি লিখে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বভার হালকা করলুম তার একটা কারণের আভাস দিয়েছি পূর্বেই, অর্থাৎ এই বইখানি সম্বন্ধে সব কথা বলবার মতো আয়োজন আমার ভাণ্ডারে নেই, আর একটা কারণ এই যে, আমার বর্তমান অবস্থায় আপন লোকের পাশাপাশি পায়চারি করতে করতে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ, দশ জনের কাছে জবাবদিহির সতর্কতাটা সর্বদা মনে রাখতে হয় না। ইতি ১১।৪।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২

[৬ মে ১৯৩৯]

কল্যাণীয়েষু

পুরীতে এসেছি, সে খবর পূর্বেই পেয়েছ। উড়িষ্যায় যাঁরা নতুন রাষ্ট্রনায়ক আমি তাঁদের নিমন্ত্রিত অতিথি। ব্যাপারটার মধ্যে নূতনত্ব আছে।

সেকালে যাঁরা রাজা বা রাষ্ট্রাধ্যক্ষ ছিলেন গুণীদের সমাদরের দ্বারা তাঁরা নিজের দেশকে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমাদৃত করতেন, এই দাক্ষিণ্যে সমস্ত মানবসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা যোগ রক্ষা করতেন, স্বীকার করতেন মানব-চিত্তোৎকর্ষে সর্বজনীন উত্তরাধিকার।

আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছি আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবহার। এই ব্যবহারের মধ্যে গুণীদের কোনো স্থান নেই। অর্থনীতি দণ্ডনীতির পরিধিতে যে শক্তির প্রতিষ্ঠা শক্তির সেই বাহ্যরূপটাকেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা চালনা করে থাকেন, তার গভীরে আছে যে চিৎশক্তি তাকে চালনা করবার অধিকার রাষ্ট্রকর্তাদের থাকতে পারে না কিন্তু তাকে স্বীকার ক'রে সম্মান ক'রে রাষ্ট্রমঞ্চকে মহৎ পরিবেষ্টনী দিতে পারে। এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক কিন্তু এইটেই লক্ষ্যের বিষয় যে প্রাচ্য রাষ্ট্রব্যবহারে নম্রভাবে আপন গুণজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ উপেক্ষিত হয় নি।

পারস্যে তুমি আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলে। সেখানকার রাজা বহুব্যয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি আতিথ্য পেয়েছিলুম সমস্ত পারস্যদেশের। সে কথা তুমি

জানো। কেবল রাজা নন রাষ্ট্রপারিষদেরাও সকলেই অভ্যর্থনার কাজে নিয়ত মনোযোগী ছিলেন। আমি ছিলেম বিদেশী, আমার রচনার সঙ্গে পারস্যের পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ; আমার খ্যাতিকে পারসিকেরা কেবল বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন মাত্র। সেই বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করে তাঁরা আমাকে যে সম্মান দিয়েছিলেন, সে সম্মান সেই মানবচিত্তের উদ্দেশে যে চিত্ত দেশকালের আশু প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করে বিরাট ইতিহাসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি প্রথম যখন ইজিপ্টে গিয়ে পৌঁছলুম তখন কায়রোতে পার্লামেণ্ট অধিবেশনের কাজ চলছিল। সেই কাজের মাঝখানে অবকাশ দিয়ে সেখানকার সদস্যেরা এসেছিলেন আমার প্রত্যুদ্‌গমনে। জাপান য়ুরোপের একনিষ্ঠ চেলা। সেখানে যখন গিয়েছিলেম জনসাধারণ প্রভূত উৎসাহে আমাকে সম্মান দেখিয়েছিল। কিন্তু মিকাডোর তো কথাই নেই একজনো রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে আমার একদিনেরও সংস্রব ঘটে নি। বোধ করি আমি তাঁদের সন্দেহদৃষ্টিতে ছিলুম। আমি যে তাঁদের সন্দেহের যোগ্য সে কথা স্বীকার করি।

পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তির একান্ত অহমিকার পরিচয় পাওয়া যায় লীগ্ অফ্ নেশন্‌সের প্রতিষ্ঠায়। সে বৈঠকে নেশনদের একমাত্র প্রতিনিধি তাঁরাই যাঁরা রাষ্ট্রচালক। শুনেছি পিতৃদেব যখন বোলপুরে প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তার অনতিকাল পূর্বে সেখানে ডাকাতের উৎপাত ছিল। তিনি একজন দস্যুপতিকেই আশ্রম রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। এই রক্ষাকার্যে

তার সতর্কতা অবিচলিত ছিল কিন্তু শোনা যায় তার ডাকাতি মন নিরুদ্ধ থাকতে পারে নি। প্রভুর অগোচরে তার দস্যুবৃত্তির চাঞ্চল্য দূরে দূরে উপদ্রব করে বেড়িয়েছে। নেশনের স্বার্থরক্ষার প্রতিনিধিরা একত্র জোট বাঁধলেই যে স্বার্থসমষ্টির রং বদলিয়ে সেটা পরার্থবুদ্ধির শুভ্রতা লাভ করবে তা আশা করা যায় না। এ তো সূর্যের আলো নয় যে তার সাতরশ্মি একদল হলেই শুভ্র হয়ে উঠবে। স্বার্থের মিলন ভিতরে ভিতরে ভাঙনের বুদ্ধি সঙ্গে করেই আনে। লীগ্ অফ্ নেশন্‌সে তাই বাঁধন ছেঁড়ার ইতিহাস অধ্যায়ে অধ্যায়ে বেড়েই চলেছে। তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষের ইতিহাসে ক্ষমতালোলুপ নেশনরা দেখতে দেখতে যেরকম দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে এমন আর কোনোদিন হয় নি অথচ লীগ্ তাদের ঠেকাতে পারে নি। কেমন করে ঠেকাবে? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, যে-শর্ষে দিয়ে ভূত ঝাড়াবে সেই শর্ষেকেই পেয়েছে ভূতে। স্বার্থের চেয়ে কল্যাণকে বড়ো করে মানবার যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা রাষ্ট্রপতিরা সেই মনীষীদের উপেক্ষা করে নি প্রাচীন ভারতে প্রাচীন চীনে। সেইজন্যে যুদ্ধনীতিতেও মনুষ্যত্বকে স্বীকার করেছিল ভারতবর্ষ আর চীনে সামরিক মনোবৃত্তি অত্যুচ্চ সম্মান পায় নি।

ও কথা থাক্। এখন নিজের কথা বলি। আমার কোনো কর্ম নেই, এখানে আমাকে কারো কোনোই প্রয়োজন নেই, যাঁরা আমাকে যত্ন করে রেখেছেন তাঁরা আমার কাছ থেকে কোনো ব্যাবসায়িক পরামর্শ দাবী করেন নি। আমার শরীর

মনে সমুদ্রের হাওয়া যে শুশ্রূষা শীতল হাত বুলিয়ে দিচ্চে সেটা নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত উড়িষ্যাপ্রদেশের আতিথ্যের প্রতীক। রাষ্ট্রিক কর্মবিধির মধ্যে এ কোনো বাধা পায় নি, একে সঙ্কুচিত করে নি বাজেটসভার কৃপণতা। সার্কিটহৌসের দোতলায় অসঙ্কোচে বসে অবিমিশ্র অকর্মণ্যতায় আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি; এখানকার সচিবেরা আমার ক্লান্ত স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করে প্রত্যহ এসে আমার এই অনাবশ্যক দিনযাপনকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্চেন। কঠোর কর্তব্যক্ষেত্রের মাঝখানেও মানবসম্বন্ধের আত্মীয়তা স্বীকার করবার যে মনোবৃত্তি আমাদের দেশের নাড়ীর মধ্যে রয়ে গেছে, সেই কথাটা এখানে এসে বিশেষ করে অনুভব করেছি।

উড়িষ্যার বর্তমান রাষ্ট্রশাসনের ভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রজাবাৎসল্য এবং বিচক্ষণতা দূরের থেকে অনুমান করেছিলুম, এখন নিকটের থেকে অনুভব করচি। এই সঙ্গে মনে একটা আশঙ্কা জাগে যখন দেখি উড়িষ্যার এই সৌভাগ্যের গৌরব সকল দলকে অন্তরে অন্তরে একত্র করতে পারেনি। যখন দূরের থেকে আমরা রাষ্ট্রিক মুক্তির কামনা করেছিলুম তখন স্বপ্নাবেশে তার মহার্ঘ্যতা দীর্ঘকাল কল্পনা করেছি। কিন্তু শুভাদৃষ্টের দান যখন হাতে এল তখন তার মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার যোগ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্চি নে। তাই দেখা গেল এখানকার একদল ছাত্র আপন নবলব্ধ রাষ্ট্রসম্পদের মর্যাদা নষ্ট করে তাকে সর্বজনের কাছে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে সংকোচ করলে না। তুমি তো য়ুরোপের

বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যায়তনের সঙ্গে সুপরিচিত, তার কর্মধারাকে অবরুদ্ধ করবার জন্য এরকম হাস্যকর বাল্যলীলা কখনো দেখেছ কি? এরকম উপদ্রব এ দেশে আজকাল দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়চে, বিদ্যাসাধনার শান্তি ও গাম্ভীর্য নষ্ট করে দিচ্চে। এই কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল যখন আমাদের পোলিটিশানেরা আপন দলাদলির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তরুণের জয়ধ্বনিতে ছাত্রদের বুদ্ধিস্থৈর্য ও আত্মসংযম রক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন, এমন কি তাদের অন্যায় আবদারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। সেদিন আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেছিলুম, এবং বুঝেছিলুম এতে করে রাষ্ট্রতপস্যার মূলে লাগিয়ে দেবে দুর্বলতার বিনাশ শক্তি। ছেলেমেয়েদের আবেগ-প্রবণ মনে আত্মশ্লাঘার বেগে তাদের শ্রদ্ধাভক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে গোড়া থেকে শিথিল করে দিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্রের যে হাওয়া দূষিয়ে দেওয়া হয়েছে তার থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাব না।

রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেককালের সাধনার জিনিষ এবং যাদের কাছে পরমমূল্যবান্ তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত লাগায় বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়। আজকের দিনে চেম্বরলনি সঙ্কটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চেম্বরলেন গায়ে পড়ে ছাতাহাতে ফ্যাসিষ্টব্যূহের মধ্যে মাথা হেঁট করে ঢুকে পড়লেন, যুদ্ধবিভীষিকায় আতঙ্কিত য়ুরোপে আশু শান্তির আশ্বাস সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন, পরক্ষণেই

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাভৈঃ বাণীতে আশ্বস্ত চেকোশ্লোভাকিয়াকে নাজি নখদন্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে দেখেও অনায়াসে লজ্জা সম্বরণ করলেন। তবু তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে যে ইংলণ্ড পূর্বে ও পশ্চিমে অপমানিত, সে তো তাঁকে ও তাঁর দলবলকে সমূলে উৎখাত করবার চেষ্টায় ক্ষেপে ওঠে নি। আত্মসংবরণ করে সকল মতের সকল দলের লোক আজ আশু বিপত্তির সদ্য প্রতিকারের চেষ্টায় সংহত করচে দেশের সমস্ত শক্তি। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব সাধনের শিক্ষায় যাদের চরিত্র বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি তারা এই ক্ষুব্ধ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি তীব্র স্বরে দোষারোপ করে কলহ করতে করতে দেশের কর্তব্য-বুদ্ধিকে ভেঙেচুরে বিক্ষিপ্ত করে দিত। ওরা কাজকে সফল করবার জন্যে ভুলতে জানে, রফা নিষ্পত্তি করতে পারে, তর্ক বিতর্ক থামিয়ে দিয়ে কোমর বাঁধতে একমুহূর্তে প্রস্তুত হয়। আজ আমরা স্বারাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত করে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে জন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তিচালনা। যে শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য, এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ। মূল্যবান সম্পদকে সৃষ্টি করে তোলার একান্ত উদ্যমে যারা অভ্যস্ত নয় দেশের শুভগ্রহের সেই সকল ত্যাজ্যপুত্রেরা গোড়া থেকেই ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে। বাল্যোচিত আবদারগ্রস্ত তাদের মনোবৃত্তি, অতি

তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সঙ্গে তারা আপোষ করতে নারাজ। এরাই তেরো কাঠা বালুজমির জন্যে তেরো হাজার টাকার মামলা চালায়।

যারা স্বভাবত অকর্মণ্য তারা অসহিষ্ণু। এই অসহিষ্ণুতাকে ভয় করি। যারা এক লাফে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সদ্যফল পেতে চায়, তারা ভুলে যায় প্রতিকূলতার মাঝখানে আড্ডা করে বারে বারে প্রতিহত হয়েও অক্ষুণ্ণ ধীর বুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত।

অকস্মাৎ আমার চিঠিতে এই যে প্রসঙ্গ উঠে পড়ল তার কারণ আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা কথা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠচে যে যতদিন কন্‌গ্রেস পরিণতি…

[অসম্পূর্ণ]

১১৩

৮ মে ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আজ তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু সেটা চিঠি হয়ে উঠল না। বাংলায় আর একটা শব্দ আছে চিঠা—সেটা দলিলপত্রে ব্যবহার হয়। কিন্তু সাহিত্যের দফতরে সেটাকে টেনে নিতে পারলে কাজে লাগত।

বর্তমান পলিটিক্‌সের চালচলন দেখে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল তাই সেই প্রসঙ্গটার কক্ষপথে পৌঁছবামাত্র

আমার চিঠি তার ভারাকর্ষণে চ্যাপটা হয়ে পলিটিক্সের শনিগ্রহের চারদিকে ঘুর খেতে লাগল। দৌড় দিয়েছে লম্বা চালে কিন্তু রস পেলুম না। মাথার মধ্যে মেঘ ঘনিয়েছিল, ভেবেছিলুম হবে একচোট ধারাবর্ষণ কিন্তু হোলো কিনা শিলবৃষ্টি। তার কারণ কড়া হাওয়া দিয়েছিল মনের আবহমণ্ডলে।

ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগৎ জুড়ে, লুটোপুটি করচে ওষধি বনস্পতি, দোহাই পাড়চে শাখা প্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবেই যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচা ফল অনেক যাবে পড়ে পাক ধরবার পূর্বেই। একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টিঁকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে, যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে ঢুঁ মারবে ভিতর থেকে। আমরা সেই অনিবার্যতার সঙ্গে জড়িত তাও জানি, আমাদের জোর লাগাতে হবে তার দক্ষিণে নয় বাঁয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে চরমে নিয়ে যাব সবাই মিলে সত্যমিথ্যার ঠেলাঠেলিতে। তবু গীতার শাসন মানতে হবে—ইতিহাসবিধাতার সৃষ্টিকার্যে খাটুনি খাটতেই হবে কিন্তু মনকে রাখতে হবে নিরাসক্ত। বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচামেচি করি কেন, হিস্টিরিয়ার হাত পা খেঁচুনি কেন লাগে কথায় কথায়। বাংলাদেশের মনে অল্প একটুতেই ধূলো-ওড়ানো আঁধি লাগে, ঊনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে সেইটেই সবচেয়ে দুর্বল হাওয়া। দেখতে সে পালোয়ান, কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্যের পক্ষভুক্ত তারা এর হাঁসফাসানিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। যারা অব্যবস্থিত চিত্ত

তাদেরকে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে মহৎকাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি— শান্তোদান্ত-উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।

তোমার চিঠিখানা প্রবাসী সম্পাদকি কারখানায় চালান হয়ে গেছে, কেননা সময় নেই। জ্যৈষ্ঠমাসের ছাপার অক্ষরে দেখতে পাবে।

Family Reunion বইখানি গভীরভাবে ভালো লেগেছে। যদি মন স্থির করতে পারি পরে তোমাকে কিছু লিখব।

আগামীকাল ২৫ বৈশাখ। এখানে আয়োজন চলেচে। ভালো লাগচেনা।

২৪ বৈশাখ ১৩৩৯ [১৯৩৯]

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৪

২৩।২৪ এপ্রিল ১৯৩৯

পুরী

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, নতুন কবিতা লিখতে ফরমাস করেছ কিন্তু ক্লান্ত শরীর মনে নতুনের স্ফূর্তি হয় না— শুকনো ডালের মজ্জা থেকে ফুল রস পাবে কোথা থেকে। অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি কলকাতা থেকে; সার্কিট হাউসের দোতালায় সমুদ্রের সামনে বসে আছি একটা কেদারায়। এ সমুদ্রের প্রাণটা যেন পাণ্ডুবর্ণ,

নীলিমার নিবিড়তা নেই এর জলে, ঢেউগুলো কি আমারি বুকের রক্তদোলনের মতো হাঁফধরা, শ্রান্ত এর একঘেয়ে শব্দ, আর ঐ সারবাঁধা ফেনার পদবন্ধ, নির্জীব পয়ারের চোদ্দ অক্ষর বাঁধা লাইনের মতো তটের উপর গড়িয়ে পড়ছে পুনঃ পুনঃ— ঐ বারবার অনুচ্চ ভাষায় ফিরে ফিরে আসাতে জোর দেয় না— জোরকে নিঃশেষ করে দেয়। বাতাসটা অত্যন্ত ঘুম-পাড়ানে। তন্দ্রাবিষ্ট দিনের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি ঐ সাদা ফেনমালার নিরর্থক গতায়াতের মতো। ভেবেছিলুম এখানে এসে কিছু লিখব, কিছুতেই মন লাগল না লিখতে। এমন সময় তোমার অনুরোধ এল— কেদারায় পড়ে পড়েই লিখলুম। কলমটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হোলো। মনে পড়ছে এইখানেই এই বাড়িতেই লিখেছিলুম— হে আদি জননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার। সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল— তার সঙ্গে ছন্দের পাল্লা দেবার স্পর্ধাতেই আমার সেই লেখা। এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্ম-সমাহিত মনের ফলফলানোর নিগূঢ় আবেগ। যদি মনকে কর্মবিতৃষ্ণা থেকে টেনে তুলতে পারি তাহলে তোমাকে আর একটা চিঠি লিখব। ইতি ২৩।৪।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫

২০ মে ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

কিছু কাল আগেই দেশের মন ছিল মরুময়। দিগন্তব্যাপী অনুর্বরতা তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের সম্বন্ধ অবরুদ্ধ করে বহু যুগকে দরিদ্র করে রেখেছিল।

এমন সময় আশ্চর্য অল্পকালেই বৃহৎ শূন্যতার মাঝখানে কন্‌গ্রেস মাথা তুলে উঠল দূর ভবিষ্যতের অভিমুখে, মুক্তির প্রত্যাশা বহন করে, বহুশাখায়িত বিপুল বনস্পতির মতো। বিরাট্ জনসাধারণের মন আশ্চর্য দ্রুতবেগে বদলে গেল; সেই মন আশা করতে শিখল, ভয় করতে ভুলে গেল, বন্ধন-মোচনের সঙ্কল্প করতে তার সঙ্কোচ আর রইল না।

কিছু দিন আগেই দেশ যা অসাধ্য বলেই হাল ছেড়ে বসে ছিল এখন তা আর অসম্ভব বলে মনে হল না। ইচ্ছা করবার দৈন্য আজ ঘুচেছে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশের এত বড়ো পরিবর্তন ঘটতে পেরেছে কেবল এক জন মাত্র মানুষের অবিচলিত ভরসার জোরে, সেই ইতিহাসের বিস্ময়করতা হয়ত ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে অস্বীকৃত হতেও পারবে এমনতরো অকৃতজ্ঞতার আশঙ্কা মনে জাগছে।

সফল ভবিতব্যতার আশ্বাস নিয়ে আজ যে কন্‌গ্রেস

অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিভার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালে কালে তার সংস্কারসাধনের তার সীমাপরিবর্ধনের প্রয়োজন নিশ্চয় ঘটবে তা জানি। কিন্তু চঞ্চল হয়ে বর্তমানের সঙ্গে হঠাৎ তার সামঞ্জস্যে আঘাত করে একটা নাড়াচাড়া ঘটাতে গেলে মন্দিরের ভিৎ হবে বিদীর্ণ। প্রাণবান সৃষ্টির ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেও বড়ো রকম বিপর্যয় সাধন করবার যোগ্য অসামান্য চারিত্রশক্তি এ দেশে সম্প্রতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না সে কথা স্বীকার করতেই হবে। দেশের যে একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজীর শক্তিতে গড়ে উঠেছে এখনো সেটাকে তাঁরি সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তুমি জানো আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়—অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীত কালে আড়ষ্ট ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে এ কথা আমি মানি নে। বর্তমান কন্‌গ্রেস যত বড়ো মহৎ অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সমস্ত মত ও লক্ষ্য যে একেবারে দৃঢ়নির্দিষ্ট ভাবে নির্বিকার নিশ্চল হয়ে গেছে তাও সত্য হতেই পারে না। কোনো দিনই তা না হোক এই আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু এই কন্‌গ্রেসের পরম মূল্য যখন উপলব্ধি করি এবং এ কথাও যখন জানি এই কন্‌গ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের সৃষ্টি, তখন হঠাৎ এ'কে সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না। তখন এই কথাই মনে হয় এর পরিণতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এর ভিতর

থেকেই সঞ্চারিত করতে হবে। বাইরে থেকে কাটাছেঁড়া করে নয়।

ইতিপূর্বে কন্‌গ্রেসনামধারী যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আন্দোলন জাগিয়েছিল তার কথা তো জানা আছে। তার আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি, স্বদেশের পরিত্রাণের জন্যে সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেকার উপর-ওয়ালার দিকে। পরবশতার ধাত্রীক্রোড়েই তার স্বাধীনতা আশ্রয় নিয়ে আছে এই স্বপ্ন তার কিছুতে ভাঙতে চায় নি। সেদিনকার হাতজোড়-করা দোহাই-পাড়া মুক্তি-ফৌজের চিত্তদৈন্যকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি সে তুমি জানো। হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁইয়ে দিলে সোনার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্মশক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস্র সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে। নব জীবনের তপস্যার সেই প্রথম পর্ব আজো সম্পূর্ণ হয় নি, আজো এ রয়েছে তাঁরি হাতে যিনি একে প্রবর্তিত করেছেন। শিবের তপোভূমিতে নন্দী দাঁড়িয়েছিলেন ওষ্ঠাধরে তর্জনী তুলে, কেননা তপস্যা তখনো শেষ হয় নি, বাইরের অভিঘাতে তাকে ভাঙতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল।

এই তো গেল এক পক্ষের কথা, অপর পক্ষের সম্বন্ধেও ভাবনার কারণ প্রবল হয়ে উঠেছে। কন্‌গ্রেস যতদিন আপন পরিণতির আরম্ভ-যুগে ছিল, তত দিন ভিতরের দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অল্পই ছিল। এখন সে প্রভূত

শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত পৃথিবী। সে কালের কন্‌গ্রেস যে রাজদরবারের রুদ্ধ দ্বারে বৃথা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরত আজ সেই দরবারে তার সম্মান অবারিত, এমন কি সেই দরবার কন্‌গ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু মনু বলেছেন সম্মানকে বিষের মতো জানবে। পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম বলো ফাসিজ্‌ম বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কন্‌গ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে অধিকার করে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থ ভাবে কন্‌গ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হোত তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে ; এই ব্যবহার-বিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্দ্ধার প্রভাব। খৃষ্টান-শাস্ত্রে বলে স্ফীতকায়া সম্পদের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যের প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ। কেননা ধনাভিমানী ক্ষমতা আনে তামসিকতা। কন্‌গ্রেস আজ বিপুল সম্মানের ধনে ধনী, এতে তার স্বর্গরাজ্যের পথ করছে বন্ধুর। মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক, এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র

হয়েছেন তাঁদের মন কি উদার ভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে-উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত। ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিট্‌লারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন। সত্যের যজ্ঞে যে-কন্‌গ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্বী, তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন শক্তিপূজায় নরবলিসংগ্রহের কাপালিক মুসোলীনি ও হিট্‌লার যাঁদের আদর্শ। আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহারলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি। এত দিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলা দরকার। গত কন্‌গ্রেস অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালী জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে এই অভিযোগ বাংলা দেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস করে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে। চার দিকে সকলেই বিরুদ্ধ চক্রান্ত করছে, সর্বদা মনের মধ্যে এই

রকম সংশয়কে আলোড়িত হতে দেওয়া মনোবিকারের লক্ষণ। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে মিলনকেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বলা বাহুল্য। যে বিচ্ছেদের বাহন স্বয়ং ধর্মমত তার মতো দুর্লঙ্ঘ্য আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের যে আত্মীয়বুদ্ধির ক্ষীণতা তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ও আচারের পার্থক্য। এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের সরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে। যে-দেশের আচার অন্ধ জিদ্‌ওয়ালা নয়, যে-দেশের ধর্মভেদ সামাজিক জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে নি সেই দেশে রাষ্ট্রিক ঐক্য স্বতই সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের দেশে কন্‌গ্রেস সেই সাধারণ সামাজিক ঐক্যের ভিতর থেকে আপনি সজীব ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাকে স্থাপন করা হয়েছে এমন একটা সামাজিক অনৈক্যের উপরে, যে অনৈক্য প্রত্যেক পাঁচদশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত খুঁড়ে রেখেছে এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষক দল।

কারণ যাই হোক প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি। মনে পড়ছে আমার কোন এক লেখায় ছিল, যে-জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিশ্লিষ্ট, মড়্‌মড়্‌ ঢলঢল করে যার কোচবাক্স,

জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে-সেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় ততক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের মুক্তিযাত্রাপথের রথখানাকে আজ কন্‌গ্রেস টেনে রাস্তায় বের করেছে। পলিটিক্সের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় চলতে যখন সুরু করলে তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই। অবস্থাটা যখন এমন তখন কংগ্রেসকর্তৃপক্ষদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা কর্তব্য। কেননা সন্দিগ্ধ মন সকল প্রকার আঘাত ও অবৈধতাকে অতিমাত্র করে তোলে। তাই ঘটেছে আজ। সমস্ত বাংলা দেশের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে। এর অত্যাবশ্যকতা ছিল না। সমগ্র একটা বড়ো প্রদেশের এ রকম মনশ্চাঞ্চল্যের অবস্থায় বাংলা দেশের নেতাদের ঠিক পথে চলা দুঃসাধ্য হবে।

বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর মনে একটা বিশেষ সংকল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোনো বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সংকল্পকে ক্ষুণ্ণ করে এ আশঙ্কা তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক। তিনিই দেশকে এতদিন এত দূর পর্যন্ত নানা প্রমাদের মধ্য দিয়েও চালনা করে এনেছেন ; সেই চালনার ব্যবস্থাকে শিথিল হতে দিতে যদি

তিনি শঙ্কিত হন তাহলে বলব না যে সেই শঙ্কা একাধিপত্য-প্রিয়তার লোভে। প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষমাত্রেরই নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকলে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। এই বিশ্বাসকে তাঁরা ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ধ্রুব করে রাখেন। মহাত্মাজীর সেই বিশ্বাস যে সার্থক মোটের উপর তার প্রমাণ পেয়েছেন গুরুতর ভুলচুক সত্ত্বেও। এবং তাঁর মনে যে পরিকল্পনা আছে সেটাকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করতে তিনি ছাড়া আর কেউ পারবে না—সেও তিনি বিশ্বাস করেন। সকল প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই এই রকম বিশ্বাসে অধিকার আছে। বিশেষত যখন তাঁর কৃত অসমাপ্ত সৃষ্টি গড়ে উঠবার মুখে। হয়ত মহাত্মাজীর সৃজন-শালায় আরো অনেক মূল্যবান নূতন উপকরণ যোগ করবার প্রয়োজন আছে। এই যোগ করা যদি ধৈর্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতায় না ঘটে তাহলে সমগ্রেরই হবে ক্ষতি। এ অবস্থায় মূল সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর রাখতেই হবে। আমি নিজের সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করব যে মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চারিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তাহলে অন্য রকম প্রণালীতে কাজ করতুম। কী সে প্রণালী আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি। আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই। এই প্রভাব আছে জগতে অল্পলোকেরই। দেশের সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ যদি সে রকম শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয় তবে তাঁকে তাঁর পথ

ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর কর্মধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারব না। সময় আসবে যখন ক্রমে অভাবক্রটির মোচন হবে এবং সেই অভাব মোচনে আমরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছাকে আপন যোগ্যতা অনুসারে প্রবৃত্ত করতে পারব। সামনের যে ঘাট লক্ষ্য ক'রে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সেদিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মত বলব না তার উর্ধ্বে আর ঘাট নেই। আরো আছে এবং তার জন্যে আরো মাঝির দরকার হবে।

আমার মনে যে পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল তার কথা পূর্বেই বলেছি। আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত; কোনো দেশেরই ইতিহাসে তার অন্যথা হয় নি। সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হয়ে কোনো লাভ নেই। সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের নানা আয়তনের জয়তোরণের চূড়া কিন্তু তাদের কোনোটারই ভিৎ গাড়া হয় নি বালির উপরে। যখন লুব্ধ মনে তাদের উপরতলার অনুকরণে প্ল্যান আঁকব তখন দেশের সামাজিক চিত্তের মধ্যে নিহিত ভিত্তির রহস্যটা যেন বিচার করি।

কিছু দিন হোলো একটি বিরল-বসতি পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আছি সদ্য উন্মথিত রাষ্ট্রিক উত্তেজনা থেকে দূরে। অনেক দিন পরে ভারতবর্ষকে এবং আপনাকে শান্ত মনে দেখবার অবকাশ পাওয়া গেল। দেখছি চিন্তা করে মানবজগতে দুই প্রবল শক্তি নিয়ে পলিটিক্সের ব্যবহার।

একটার প্রয়োগ বাহিরের দিকে সেটা যন্ত্রশক্তি, আর একটার কাজ মানুষের মন নিয়ে সেটাকে বলতে পারি মন্ত্রশক্তি। আজ য়ুরোপের সঙ্কটের দিনে এই দুই শক্তির হিসাব গণনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে পদচারণা করছে।

বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই শক্তির কোনোটাই সহজসাধ্য নয়, অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগশিক্ষাচর্চা। বহুকাল ধরে আমরা পরের অধীনে আছি, যন্ত্রশক্তির আঘাত কী রকম তা জানি কিন্তু তার আয়ত্তের উপায় আমাদের স্বপ্নের অগোচর। অত্যাবশ্যক বোধ করলে বাহিরের কোনো পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার ফেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। সে রকম মহাজনরা আজও এই গরিব জাতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ইতিহাসে দেখা গেছে প্রবলের সঙ্গে অসমকক্ষের মিতালি খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। তাতে কুমীরের পেট ভরে অবিবেচক খাল-কাটিয়ের খরচায়। তা ছাড়া অমঙ্গল প্রতিরোধের যোগ্য জনমনঃশক্তি বহুকালের অব্যবহারে গিয়েছে মরচে পড়ে। ভরসা হারিয়েছি। কোনো একটা নেশার ঝোঁকে মরিয়া হয়ে যদি ভরসা বাঁধি বুকে, তবে সে গিয়ে দাঁড়াবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়। এক দিন ছিল যখন সাহস ও বাহুবলের যোগে চলত লড়াই। এখন এসেছে সায়ান্স, শিক্ষিত বুদ্ধির ’পরে ভর করে। শুধু বুদ্ধি নয় তার প্রধান সহায় প্রভূত অর্থবল। অথচ আমাদের লড়তে হবে

শূন্য তহবিল এবং এমন জনসংঘ নিয়ে যাদের মন কর্মবিধানে দৃঢ় নয়, যারা অশাসিত। যাদের শক্তি হয় অচেতন হয়ে থাকে নয় অন্ধ হয়ে ছোটে। দেশের পলিটিক্সের আরম্ভ হয়েছিল এই দুরূহ সমস্যা নিয়ে। সেই জন্যে প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকো বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চমেণ্ট দিয়ে। সেটা দাঁড়িয়েছিল খেলায়। এই রিক্ততার সমস্যা নিয়েই এক দিন মহাত্মা এসে দাঁড়ালেন বিপুল শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে, দুঃখ সয়েছিলেন, মাথা হেঁট করেন নি। বিনা যন্ত্রশক্তিতে লড়াই যে চলতে পারে এইটে প্রমাণ করতে তাঁর আসা। একটা একটা উপলক্ষ্য নিয়ে তিনি লড়াই শুরু করে দিলেন, কোনোটাতে যে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন তা বলতে পারি নে। কিন্তু পরাভবের মধ্যে দিয়ে জেতবার ভূমিকা সৃষ্টি করছেন। ক্রমে ক্রমে সেই মন তৈরি করছেন যে-মন তাঁর সংকল্পিত অস্ত্র যথাযোগ্য সংযম ও সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। এই অস্ত্র ছাড়া কেবল যে আমাদেরই উপায়ান্তর নেই তা নয়, সমস্ত পৃথিবীরই এই দশা। হিংস্র যুদ্ধ নিরন্ত; সে একই কেন্দ্রের চারি দিকে ধ্বংস-সাধনের ঘুরপাক খাওয়ায়; তার সমাপ্তি সর্বনাশে।

হিংস্র যুদ্ধের ফৌজ তৈরি করা সহজ, বছরখানেকের কুচকাওয়াজে তাদের চালিয়ে দেওয়া যায় রণক্ষেত্রে। কিন্তু অহিংস্র যুদ্ধে মনকে পাকা করে তুলতে সময় লাগে। অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল, তাদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ভাঙা চলে, এমন সিদ্ধিলাভ চলে না যা মূল্যবান,

এমন কি পাশব শক্তির রীতিমতো ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে পারে না, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পৃথিবীতে আজ যে-সব জাতি যে কোনো রকম লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলেরই জোর সর্বজনীন জনশিক্ষায়। বর্তমান যুগ শিক্ষিত বুদ্ধির যুগ, স্পর্ধিত মাংসপেশীর যুগ নয়। জাপানের তো কথাই নেই— বড়ো বড়ো অন্য সকল প্রাচ্য জাতিই সর্বত্র জনশিক্ষাসত্র খুলেছেন। আজকের দিনে আমরা দেশের বহু কোটি চোখ-বাঁধা মোহের বাহন নিয়ে এগোতে পারব না। মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে জনশিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি প্রমাণ পেয়েছেন ভিড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে কোন্ জননায়ক পলিটিক্‌স্‌কে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। মনে নানা সংশয় জাগে, স্পষ্ট বুঝতে পারি নে এ সকল পথযাত্রার পরিণাম। কিন্তু নিশ্চিত বিচার করা আমার পক্ষে কঠিন; আমি পলিটিক্‌সে প্রবীণ নই। এ কথা জানি যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজীই তার প্রমাণ। তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তাহলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সে জন্য হয়ত অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে

সময় লাগবে। কন্‌গ্রেসের অভিমুখে যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি— কিন্তু দূরের থেকে। কেননা দেশের জননায়কতার দায়িত্ব অত্যন্ত বৃহৎ, তার ভালমন্দ ফলাফল বহুদূরব্যাপী, অনেক সময়েই তা অভাবনীয়। নিজের উপরে যাঁর স্থির বিশ্বাস আছে তিনিই তা বহন করতে পারেন, কিন্তু এ সকল পোলিটিকাল প্রয়াস আমার পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমি অনুভব করি নে। পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার নিজের এত দিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সান্ত্বনা পাই। গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে। স্বদেশসেবায় সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায় আত্মকল্যাণসাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সকলে সম্মিলিত হতে পারে। আমার সামান্য শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই কাজে মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে। মহাত্মাজী যখন স্বদেশকে জাগাবার ভার নিয়েছিলেন তখন একান্তমনে কামনা করেছিলুম তিনি জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পথে উদ্বোধিত করবেন। কেননা আমি জানি দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।

আজ আমি জানি বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্‌সের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে— সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে— আমার দেখার শক্তি নেই। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়-সঙ্কল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলা দেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।

মংপু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০।৫।৩৯

অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুনশ্চ বক্তব্যে একটা কথা জানিয়ে রাখি। হিন্দু মুসলমানের চাকরির হার বাঁটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নামস্বাক্ষর করতে আমার

যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। দীর্ঘকাল চাকরির অন্নে বাঙালীর নাড়ী দুর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় তো হোক্,— তাহলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরের বড়ো রাস্তা খুঁজে বের করতে। এই দুঃখের ধাক্কাতেই আনবে যুগান্তর। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি। তার একটি মাত্র কারণ আছে। স্বজাতির দুই শ্রেণীর মধ্যে পক্ষপাতের অন্যায় বিচার দেখলে শাসনকর্তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, তার ফলাফল তাঁরাই বিচার করবেন। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে দুই অসমান বাটখারায় অন্নবিভাগের শোচনীয় পরিণাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নানা দৃষ্টান্তে কথায় কথায় তীব্র করে তোলা। তাকে শান্ত করবার অবকাশ থাকবে না। পৃথিবীতে হিট্‌লার-মুসোলীনির দল অন্যায় করবার অপ্রতিহত সুযোগ পেয়েছেন নিজের প্রবল শক্তির থেকে। তারও একটা ভীষণ মহিমা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নীচের তলার শাসনকর্তারা সুযোগ পেয়েছেন, উপরতলার প্রশ্রয় থেকে— এই অবিমিশ্র অন্যায়ে পৌরুষ নেই। তাই যারা অবিচার সহ্য করতে বাধ্য হয় তাদের মনে সম্ভ্রম জাগে না, অশ্রদ্ধা জাগে। দেশশাসনের ইতিহাসে এই স্মৃতিটা হেয়। কিন্তু আমাদের সমস্যা এই শাসনকর্তাদের নিয়ে নয়। কেননা শাসনকর্তাদের হাতবদল হবেই, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারতভাগ্যের শরিক, অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের

মধ্যে যদি গভীর করে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয় তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না। তাই আজ যে ব্যবস্থায় মুসলমানের জমার ঘরে ভুক্ত করছে সুবিধা, দীর্ঘকালের হিসাবে সেটা রয়ে যাবে নিয়ত ক্ষতির ছিদ্ররূপে। তা বলে এই চিন্তায় হিন্দুদের সান্ত্বনার কথা নেই, কেননা আমাদের ইতিহাসের তহবিল সাধারণ তহবিল।

১১৬

১৬ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ শ্রীনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

মনটা কি রকম বিমুখ হয়েছে। বুঝতে পারচিনে মানেটা কী। ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না। সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়া কি ভিতরে ভিতরে হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছে? যখন বড়ো ইতিহাসের কল বিগড়িয়ে যায় তখন ঘরের ভিতরকার ছোট ছোট ধাক্কাতেও যেন বেসুর বাজাতে থাকে। এই সময়ে কারো যদি অসুখ বিসুখ করে কিম্বা সংসারে কোনো চিন্তার কারণ ঘটে তার ছায়া খুব দীর্ঘ হয়ে দেখা দেয়।

ঠিক এই সময়টাতে বিশ্বভারতীর প্রকাশক সংঘ আমার সমগ্র একটা গ্রন্থাবলী বের করতে উদ্যত হয়েছেন। আমার কাছে আমার রচনার যে অংশ বেঁচে আছে, যার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেনি তাকেই আমি চিনি। যারা আছে কবরস্থানের মধ্যে তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে মৃত্যুর নৈরাশ্য

চেপে ধরে মনকে, সাহিত্যিক জীবনের ধ্বংসাবশেষে ব্যর্থতার স্তূপগুলো মরুপ্রদেশের চেহারা দেখিয়ে দেয়। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গানকে নতুন সংস্করণের ওঝা ভূত নামিয়ে দেখাচ্চেন— তাদের সত্যতা চলে গেছে অথচ তারা বেঁচে থাকার ভান করচে। আমার লেখার যে অংশে ভূতুড়ে বাড়ি সেইখানে আমি আছি সম্প্রতি। এখানে পরাভবের ইতিহাস আমার মনে একটা অবসাদ ঘনিয়ে রেখেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিস্তর লিখেছি, অগত্যা তার মধ্যে বিস্তর আছে যা ভালো নয়। যেমন জীবনটা তেমনি তার সাহিত্য-রচনা ভালোমন্দ জড়িয়েই। সে তো অন্যায় নয়।— অতি বিশুদ্ধ বাছাইয়ে বাস্তবতার ক্ষতি হয়। আমার আপত্তি হচ্চে সেই অংশে যেখানে একহাঁটু কাদা ভেঙে এসেছি, ঘাটে এসে পৌঁছইনি। নিষ্কৃতি নেই। ত্যাজ্য যারা কেবলমাত্র জন্মস্বত্বের দোহাই দিয়ে মিতাক্ষরার আইন অনুসারে তারা উত্তরাধিকারের দলিল বার করে। শাস্ত্রে আছে মৃত্যুতেই ভবযন্ত্রণার অবসান নেই, আবার জন্ম আছে। আমাদের যে লেখা ছাপাখানার প্রসূতিঘরে একবার জন্মেছে তাদের অন্ত্যেষ্টি সংকার করলেও তারা আবার দেখা দেবে। অতএব সেই অনিবার্য জন্মপ্রবাহের আবর্তন অনুসরণ করে প্রকাশকেরা যদি বর্জনীয়কে আসন দেন সেটাকে দুষ্কর্ম বলা চলবে না।

সে এক সময় গেছে যখন সমস্ত দেশেরই মন আর তার ভাষা ছিল কাঁচা, তার মনের জমি ছিল নিচু। তখনকার উপাদানে কমদামী করে দিত উৎপন্ন জিনিষকে। আমরাই

নিজের সাধনায় স্তরে স্তরে জমি উঁচু করেছি, আর আঁট করেছি তার মাটি। এখন একটা সাধারণ উৎকর্ষ সহজ হয়েছে সমস্ত সাহিত্য জুড়ে। তাই তখনকার লেখার সঙ্গে এখনকার লেখার জাত গেছে বদল হয়ে। আমার তো মনে হয় আমার রচনার ছুইবয়সের মধ্যে ঐক্যই নেই, কী ভাবের দিক থেকে কী ভাষার দিক থেকে। আমাদের চিত্তের জন্মান্তর হয়ে গেছে। তাই আমার এই গ্রন্থাবলীর গোড়ায় রয়েছে চৌরঙ্গীর মিউজিয়ম আর তার সঙ্গে জোড়া হচ্চে আলিপুরের পশুশালা।

স্পেঙ্গর ও ফস্টরের ছুটি চটি বই পড়লুম। আমার নিজের মত এই যে আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই আমাদের সেই দলাদলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে গড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই। রসের দিক থেকে মানুষের ভালোমন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মনটা হয়তো সোশিয়লিস্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজ্‌মের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত রেখে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়? কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পার রান্নাঘরে, তবে সায়ান্সের জয়জয়কার করব কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হোলেই হোলো।

মাঝে মাঝে তোমাকে কিছু কিছু লেখবার জন্যে মন উৎসুক হয়েছে, ঘটে ওঠেনি। মনের দিবালোকের উপরে একটা কুয়াশা নেমেছে, সে একটা বিস্মরণের আচ্ছাদন। মৃত্যুর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় মৃত্যুর অনেক পূর্ব থেকে, এই প্রক্রিয়াটা হচ্চে জীবনে অস্পষ্টতার বিস্তার; অর্থাৎ রাত্রির ভূমিকা গোধূলিতে। এই অনিবার্যকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। মৃত্যুতে যেমন সঙ্কোচ নেই এতেও তেমনি সঙ্কোচের কারণ থাকা অসঙ্গত। সঙ্কোচ স্বভাবতই থাকত না মৃত্যুকে যদি শূন্যাত্মক পদার্থ বলে মনে না করতুম, যদি তার সম্বন্ধেও দায়িত্ব আছে মনে করে তার জন্যে প্রস্তুত হবার একটা পালা থাকৃত জীবনযাত্রার শেষ পর্বাধ্যায়ে। মৃত্যুটাকে যদি পথের বিপরীত দিক থেকে একটা কলিশনের মতো আসতে দিই তাহলেই সেটা ঘটে দুর্ঘটনার মতো। বাঁশিতে টর্মিনসের ইস্টেশনে আসবার ঘোষণ জানিয়ে এঞ্জিনের দম কমিয়ে দিয়ে লক্ষ্যটাকে যদি স্বীকার করে নিই তাহলে সেটা যথোচিত হয়। কিন্তু পুরোদমে চলবার দাবী এখনো আমার উপরে সম্পূর্ণ রয়েছে। দরকারী কাজের ভিড় বেড়ে উঠেছে বই কমে নি। যাকে আমরা "দরকার" আখ্যা দিয়েছি সেটা হচ্চে জীবনযাত্রার অধিকারে, তাকেই একান্ত বলে মানার মধ্যে আছে জীবনকেই একান্ত বলে স্বীকার করা। সেটা যে ভুল, দিনাবসানের বেলায় তার প্রমাণ আসে পদে পদে, তখন পুরাতনের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে সহজ মনে অদরকারের চর্চাটাই শোভন। কেননা মৃত্যুর পরে সত্তার যদি নূতন চাষের

পালা থাকে তাহলে প্রস্তুত হবার জন্যে আগেকার ঋতুর শিকড় সমস্ত উপড়ে ফেলা চাই, ক্ষেতটাকে দরকারশূন্য করতে পারলেই সেটা যথোচিত হবে। পূরো কাজের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাওয়াই ট্র্যাজিক। কিন্তু মৃত্যুকে কেন বলব ট্র্যাজেডি ; কেন বলব শেষ, কেন বলব না নূতন আরম্ভ ? নূতন আরম্ভের সূচনাস্বরূপেই আসে পুরাতনের শেষ। সেই শেষই হচ্চে কাটাশস্যের শূন্য ক্ষেত, পাগলাহাতির পায়ে দলা ফসল ক্ষেত নয়। কাটা শস্যের ক্ষেতেই সফলতার আশা বিরাজ করে, হঠাৎ দলাশস্যের ক্ষেতেই হাহুতাশ। তর্ক ওঠে মৃত্যু যে শেষ নয় তার কোনো প্রমাণ নেই। আমি যে রবিঠাকুর তার লেশমাত্র প্রমাণ ছিল না রবিঠাকুর আসবার আগে, কেননা রবিঠাকুর তখন একেবারেই ছিল না। যা হয় তা আপনার প্রমাণ আপনি নিয়ে আসে হওয়ার দ্বারাই। তর্ক করে কোনো লাভ নেই— মনের মধ্যে একটা প্রেরণা এই আসে যে, আলো যখন কমে আসচে তখন আপিসের বাইরেকার ডাক শুনে খাতাপত্র বন্ধ করাই ভালো, আলো কমার অর্থটাকে ছুটির পরবর্তী কোনো একটা পূর্ণতার দিকেই স্বীকার করে নেওয়া যাক শূন্যতার দিকে নয়। যাই হোক্ কাজের ভিড় জোর করে ঠেলে নিয়ে চলাটাই আজকাল আমার নিরর্থক বলে মনে হয়— দেহমন তার প্রতিবাদ করচে। কর্ত্তব্যের পূর্বাভ্যাস এখনো ক্ষীণহাতে লগি ঠেলচে— মন বলচে লগি ফেলে দিয়ে স্রোতে ভাসান দেওয়াই তীর্থযাত্রার শেষ পথ। কিন্তু বর্তমান যুগটা কর্মের যুগ, এ যুগ মৃত্যুকে শূন্য বলে জানে,

সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তাই বোধ হচ্চে জীবনের গোলামি করতে হবে শেষ পর্যন্ত, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এর চেয়ে নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কিছু হতে পারে না।

আজ এই পর্যন্ত। ইতি ১৬।৭।৩৯

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। যখন কন্‌গ্রেস সম্বন্ধে তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম বর্তমান সংকট তখনো উপস্থিত হয় নি। সেই জন্যে তখন যা বলেছি তার চেয়ে বেশি কিছু বলবার ছিল না। শরীর মন যদি অনুকূল হয় তবে উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে সংবাদপত্রে সর্বজনগোচর করে লিখব।

যে বয়স আশি বছরের কাছাকাছি পৌঁচেছে সে বোধহয় তোমাদের কাছে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের দুর্গম চূড়ায়।— তার উপরকার হিমশীতল স্তব্ধতা তোমাদের উষ্ণরক্তে ঠিক অনুভব করতে পারবে না। তোমাদের উপরোধে আমার মন গলতে চায়না। কোনো ডাকে সাড়া না দেবার সময় কাছে আসচে বলে অনুভব করছি।

১১৭

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, মানুষের জগৎ দেখতে দেখতে উলট পালট হয়ে যাচ্চে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে— ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে বস্তুব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে মারাত্মক রিপু বীভৎস হয়ে উঠছিল তার সম্বন্ধে লজ্জাভয় হয়েছে অনভ্যস্ত। এই রক্তপিপাসু বসে আছে পুলপিটের পিছনেই, কলেজ ক্লাসের আঙিনায়; ধর্মতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক তত্ত্ব এর চারদিকেই বিচিত্র বাক্যপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে চলেছে কিন্তু একে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারচে না, এ বসে বসে ভিৎ খুঁড়ে চলেছে— আজ Babelএর স্তম্ভ পড়চে ভেঙে চুরে। এর কোনো প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে— মারের পর মার আবর্তিত হচ্ছে, থামবে কোথায়? এরা আমাকে দিয়ে কিছু বলাতে চায়, নিজের মনের মতো কিছু— আমার দ্বারা সে কখনোই ঘটে না। কিছু বলব বলে ভেবেছিলুম। এবার আমার শরীর অত্যন্ত অপটু— বোমা-লাগা ভাঙা সহরের মতো— কলম চলে নেহাৎ খুঁড়িয়ে। মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে করি ব্যক্তিগত জীবনের যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তারি চার দিকে কাব্যের প্যাটারন গেঁথে একাধিপত্য করি নিজের মনোজগতে—

সাহায্য করবে চারদিকের গাছপালা, ঋতুপর্যায়। একে কি বলবে আত্মকৈন্দ্রিক জীবন— ঠিক তা নয়, এর কেন্দ্র সেই বিরাটের মধ্যে, যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকে তাকে অতিক্রম করে বিরাজ করে— একে বলবে মিস্টিক। যদি বলো এই হচ্চে এস্‌কেপিজ্‌ম্‌— প্রতিবাদ করব না— যে অঘাসুরকে আমি ঠেকাতে পারি নে এমন কি স্বয়ং চেম্বরলেনের ছাতাও পারে না, কী করব তার মার খেয়ে, ধিক্কার দিতে পারি— বিষবর্ষী শতঘ্নীর প্রচণ্ড গর্জনের কাছে সেটা শোনাবে অত্যন্ত হাস্যকর। কবির আল্‌টিমেটম দেওয়া হয়ে গেছে— তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বা তিনচার শতাব্দী পরে। আমার যা বলবার, তার শেষ কথা বলে নিয়েছি— পড়ে দেখো বলাকার ৯৩ পৃষ্ঠায়—

ওরে ভাই কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত,—
এ আমার, এ তোমার পাপ—
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আমার যদি কণ্ঠ থাকত তাহলে এই কবিতার সমস্তটা আমি মানববিশ্বের কাছে পড়ে শোনাতুম। এর উপরে একটা কথাও আমার বলবার নেই। মীটিং করে কী হবে,— মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর। কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক? আমার এই কবিতা তোমরা হয়তো ভুলে গেছ— যদি না ভুলতে তাহলে বলতে আমার যা কাজ আমি শেষ করে দিয়েছি— আবার তাতে জল মিশিয়ে তাকে নতুন করে পরিবেষণ করা সাহিত্যিক দুর্নীতি।

আজ বাংলা দেশে যে আস্ফালন আলোড়ন চলচে তার মধ্যে এত নকল গর্জ্জন আছে যে তাতে আমি লজ্জিত। এই ব্যর্থ শক্তির চোখরাঙানি-রঙ্গভূমি থেকে দূরে থাকতে চাই।

যে কবিতার কথা বলচি তার একটা অত্যন্ত দুর্বল তর্জমা করেছিলুম— বোধ হয় আছে Fugitiveএ— কিন্তু তাতে আমার কণ্ঠস্বর পাবেনা। ওটা একবার তর্জমা করে দেখতে পারো— আমার শক্তি আর নেই, এখন আমার পল্‌তের শেষভাগটা জ্বলচে— ধোঁয়ার সঙ্গে আলোর দ্বন্দ্ব চলচে। ইতি ১৮।৯।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখচি তুমি কলকাতায়— বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লেগেছ কি? যদি বেকার থাক তাহলে কিছুদিনের মতো নগাধিরাজের এই নিভৃত কোণটার পরিচয় নিয়ে যেতে পারো। গৃহকর্তা

গৃহস্বামিনী উৎসুক আছেন— তোমার সহচারিণী দুটিকে আনলেও অসুবিধে হবেনা।

১১৮

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ মংপু

কল্যাণীয়েষু

এ যেন বিশ্বজুড়ে একটা দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে মানুষের ভদ্রনীতির মূল কাঠামোটা দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত-রকমে তেড়ে বেঁকে যাচ্চে। আর কিছুকাল আগে এই চেহারার বীভৎস ব্যঙ্গ বিকৃতি ভাবতেই পারতুম না। কখন ভিতরে ভিতরে সভ্যতার মূল্য বদল হয়েছে, সেটা প্রধানত দাঁড়িয়ে গিয়েছে জীবনযাত্রায় বস্তু-ব্যবহারের যান্ত্রিক নৈপুণ্যে। বহু বস্তু প্রসূতি যন্ত্রশালার মালখানায় বসে মারাত্মক লোভরিপুর লোলরসনা অহরহ লালায়িত হয়ে উঠছিল। তার সম্বন্ধে শক্তিলুব্ধ গৃধ্রজাতিদের লজ্জাসংকোচ ক্রমশই আসছিল ক্ষীণ হয়ে। এই রক্তপিপাসু বসে থাকে পুলপিটের পিছনেই, কলেজক্লাসের আঙিনায়। এর চারদিকে বুদ্ধির উৎস থেকে ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতিতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্বের বাক্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে, সে রয়েছে অস্নাত, তাকে ধৌত করতে পারচে না। সে কেবল অন্ধ উৎসাহে ভিৎ খুঁড়ে চলচে রাজ্যসাম্রাজ্যের নিচের তলায় বসে, জয়স্তম্ভগুলো টলমল করচে, সেই সঙ্গে ভেঙে পড়চে মনুষ্যত্বের বাঁধনগুলো। এর কোনো প্রতিকার

আছে বলে ভেবে পাইনে। ঢালু গর্তের দিকে সেই রিপুর চলেছে ধাক্কা যে রিপু বহুযুগ ধরে এসিয়া ও আফ্রিকার দুই দুর্বল মহাদেশ থেকে আপন অশুচি খাদ্য জুগিয়ে নিরাপদে পরিপুষ্ট হয়েছে; তার মুরুব্বিরা ভাবতে পারে নি একদিন এর শোধ তুলবে তাদের সুযোগবঞ্চিত স্বগোত্রীয়রাই। মারের ঘূর্ণিপাক চলেছে, অস্ত্রের পিছনে অস্ত্র, চলেছে অন্তহীন গণিতের পথে— এ থামবে কোথায়? তাদের ভোজের উচ্ছিষ্টের পিচ্ছিলপথে চলচে হানাহানি, দেখতে হয়েছে কুৎসিত। সঙ্কটের দিনে এরা শান্তি চায় কিন্তু ক্ষেত্র পরিষ্কার করতে চায় না।

আমাকে তোমরা বলচ কিছু লিখতে, কোন্ পক্ষের মনের মতো কথা বলি ভেবে পাইনে। এদিকে আমার শরীর অপটু, কলম চলচে খুঁড়িয়ে। মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে ভাবচি ব্যক্তিগত জীবনের যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে তারি চারিদিকে কাব্যের প্যাটার্‌ন্ গেঁথে নিভৃতে একাধিপত্য করব নিজের মনোজগতে, তার সাহায্য করবে চারিদিকের গাছপালা, ঋতু-পর্যায়। এ'কে কি বল্‌বে আত্মকেন্দ্রিক জীবন? ঠিক তা নয়। এর কেন্দ্র আছে সেই বিরাটের মধ্যে যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকেও তাকে অতিক্রম করে বিরাজ করচে। হাজার বছর কেটে গেছে কিন্তু পৈশাচিক ইতিহাসে মানুষের দুঃখ আজকের দিনের চেয়ে কম ছিল না, যখন মধ্যএসিয়ার তুরাণী লুঠকারীর দল অগণিত নরকঙ্কাল বিছিয়ে চলেছিল দুর্দান্ত দস্যুবৃত্তির পথে, যখন এসীরিয়ার নিষ্ঠুরতা মানবপীড়নের কোনো সীমা মানে নি,

যখন খৃষ্টীয় ধর্মাধ্যক্ষেরা ধর্মের নামে মানুষকে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছিঁড়ে কেটে পুণ্য উপার্জন করছিল— তখন এই বিরাট ছিলেন অবিচলিত, কিন্তু নিঃশব্দে তাঁর হিসাব নিকাশ চলছিল— কেউবা গেল লুপ্ত হয়ে কেউবা রইল সুপ্ত হয়ে, নতুন নতুন চেনা অচেনার ঠাঁই বদল চলল, আরম্ভ হোলো মনুষ্যত্বের নতুন নতুন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় নাম লেখাব যে সে রাস্তা বন্ধ।— ভাগ্য অনুকূল হলে ইতিহাসের চতুরঙ্গে আমরা হতে পারতুম খেলোয়াড় কিন্তু হয়েছি ব'ড়ে। স্বাতন্ত্র্য খুইয়েছি শনৈঃ শনৈঃ, আজ ধর্মের নামেই হোক অধর্মের নামেই হোক, বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে যাব এ কোন্ পঙ্গুতা নিয়ে ? অঘাসুরকে ঠেকাবার ভঙ্গী করতে পারি যেমন ভঙ্গী করেছিল বকাসুরকে মারবার জন্যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের শিশুপুত্রটি ভাঙা কাঠি হাতে নিয়ে, তার চেয়ে তোমরা যাকে বলো এস্‌কেপিজম্, আমার সেই কবিত্বই ভালো। দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটে নি। দেখলুম ঐ স্পর্দ্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকারচিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনীর বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে ; দেখলুম নন্-ইণ্টরভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপবলিককে দেউলে

করে দিতে— দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলরের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনফা তো কিছুই হোলো না— পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হোলো দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজ্‌মের নাৎসিজ্‌মের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্যে, কেননা সাম্রাজ্যিকদের অফুরন্ত অর্থ আছে সামর্থ্য আছে আর সহায়শূন্য চীন লড়চে প্রায় শূন্য হাতে, কেবল তার নির্ভীকবীর্যে ভর করে।

কিন্তু ভেবে দেখো ঐতিহাসিক বিপ্লবে কবির আল্‌টিমেটম্ আমি ইতিপূর্বেই দিয়ে দিয়েছি— সত্য তার সাড়া পাওয়া যাবে না— তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বহুশতাব্দী পরে। কবি ঘোষণা করেছে :—

> স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
> তত তার বেড়ে ওঠে,— বিশ্বধরাতল
> আপনার খাদ্যবলি না করি বিচার
> জঠরে পূরিতে চায়। বীভৎস আহার
> বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
> তখন গর্জিয়া নামে রুদ্র, তব বাজ।

কবি একদা বলেছে :—

> ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত,—

এ আমার, এ তোমার পাপ,
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলেস্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আমার যা বলবার আমি শেষ করে বলে দিয়েছি। এরা বলে মীটিং করতে। মীটিঙের কতটুকু পরিধি, কতটুকু প্রাণ, কতটুকু কণ্ঠস্বর? কবি কি খবরের কাগজের প্রতীক। বলাকা আর একবার পড়ে দেখো, আমার এই কবিতা হয়তো ভুলে গেছো। যদি না ভুলতে তাহলে বলতে আমি শেষবারের মত যা বলেছি তাতে জল মিশিয়ে নূতন করে পরিবেষণ করা সাহিত্যিক দুর্নীতি। ইতি ২০।৯।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৯

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে প্রথমে যে চিঠি লিখেছিলুম সেইটেকেই ফলিয়ে আর একটা চিঠি লিখেছি। এতদিনে পেয়ে থাকবে। এই দ্বিতীয় চিঠি কাগজে ছাপবার দিকে লক্ষ্য করে রচনা। সেই জন্যে তার সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আছে। তোমার কি মনে হয় জানিয়ো। অবশ্য মনের মধ্যে খুব একটা প্রবল উত্তেজনা চলচে— প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেই সেটা মুহূর্তে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, দ্বিতীয় চিঠিটাও তারি চাঞ্চল্যের ধাক্কায় লেখা। এই দুটোর মধ্যে যেটা তুমি প্রকাশযোগ্য মনে করো প্রকাশ করব।

এখানে এসে কিছু একটা লিখব মনে ছিল— কিন্তু একদিকে শরীরের অবসাদ আর একদিকে আকাশে মেঘলা-দিনের আবিলতা আমাকে বাধা দিচ্চে— তবু একটা ছোটো গল্প লিখ্‌তে শুরু করেছি— কল্পনা এখনো তার অন্তরের মধ্যে রাস্তা খুঁড়ে বের করে নি।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাবার ব্যামোর কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। তাঁর যে হার্টের দুর্বলতা আছে তা কল্পনাও করি নি। তাঁর সুস্থ সবল চেহারায় অতবড়ো রোগ কল্পনা করা যায় না।

তিনি কেমন আছেন জানিয়ো আর তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো।

১২০

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে গেল চিঠি লেখার পরে আজ Time and Tide কাগজে সার নর্মান এঞ্জেলের লেখা প্রবন্ধ থেকে দুই এক জায়গা তর্জমা করে দিই।

গত সপ্তাহে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বলেছেন, যে সকল দেশ উপলব্ধি করেছে যে তাদের রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য আশু বিপদগ্রস্ত তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা যে প্রস্তুত এ আমরা কাজে ও কথায় সুস্পষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমরা পোলাণ্ডের পক্ষ নিতে প্রতিশ্রুত। অন্যের স্বাধীনতা রক্ষার সমর্থন যদি না করি তাহলে মূলেই স্বাতন্ত্র্যনীতিকে বঞ্চনা করা হয় এবং সেই সঙ্গেই বঞ্চিত হয় নিজেদের স্বাধীনতা।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের এই উক্তিকে সাধুবাদ দিয়ে সার নর্মান বলচেন, এই স্বাতন্ত্র্যনীতি যেমন আক্রান্ত হয়েছে পোলাণ্ডে তেমনি হয়েছিল ম্যাঞ্চুরিয়া, এবিসীনিয়া, চীন, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ব্রিটেন অত্যাচারিতকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাজে ও কথায় অস্বীকার করেছে।

সার নর্মানের সমস্ত আলোচনাটা পড়ে দেখো। এর থেকে দেখা যাবে ইংরেজের বড়ো এবং ছোটোর মধ্যে উঁচু নিচুতে কত তফাৎ। এই ছোটো যখন বড়ো আসনে বসে দেশকে চালিত করে তখন শুধু যে দেশের গৌরব নষ্ট হয় তা নয়, দেশের প্রকৃত স্বার্থেও আঘাত লাগে।

সার নর্মানের লেখার একটা জায়গা পড়ে শঙ্কিত হলুম। তিনি বলচেন এমন কথা এদিকে ওদিকে একটু আধটু শোনা যাচ্চে যে, যেহেতু জাপান জর্মনি সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়েছে—আমাদের উচিত এখনি জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চীনকে ঠেলে দেওয়া। যদি এমন কাজ করি তা হলে তো আমরা মরেচি। তিনি বলচেন, Now to sacrifice China to Japan would be to revert to appeasement in its most evil form. And we are in danger of doing it from sheer moral obtuseness.

আমরা এই কথা বলি, জাপান সম্বন্ধে নিরাপদ মৈত্রী স্থাপনার ইচ্ছা যদি ইংলণ্ডের কোনো সম্প্রদায়ের মনে আজ জাগে তাহলে বুঝব দুর্বল হয়ে গেছে ইংলণ্ডের আত্মসম্মানবোধ।— ইতি ২৮।৯।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১

৬ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

অমিয়

তোমার ঘুম কবিতাটি খুব ভালো লাগল। কেবল প্রশ্ন মনে জাগে যখন অনাদি সৃষ্টির ঘোলা ঘুম ভাঙবে তখন থাকবে কী— প্রলয় কি শুভ্রশূন্যতা— ভালোমন্দহারা নিঃশব্দ, একটা অনন্ত না, যার কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই। সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্নের নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন নিয়ে মহানিদ্রা— তারা আশা দেখায়, ভয় দেখায়, কিন্তু কতক্ষণের জন্যে? যুগে যুগে নিঃশেষে পালা শেষ করে মিলিয়ে যাচ্ছে চিরসত্যের মুখোষপরা ক্ষণিকের নাট্যলীলা— কত গেল তলিয়ে এই ঘুমের তলায়, তাদের নাম জানি নে ধাম জানি নে— অথচ অমরতার ফাঁকি উপাধি ছড়াছড়ি যাচ্চে লোকালয়ে লোকালয়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যে পাতা কীটে কাটচে নিমেষে নিমেষে, কেউবা মানুষ খুন করা অমর, কেউ বা ছড়া বানানো অমর— কোনো রূপসী মুগ্ধ মনের বিহ্বলতায় অমরী, অকূল ঘুমের তরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে হাসচেন মহাকাল ভাসমান ফেনাগুলোর দিকে তাকিয়ে।

তোমাকে বর্তমানের নিষ্ঠুর অট্টহাস্য নিয়ে আরো কিছু লেখবার ইচ্ছে ছিল। হয়তো লিখব— আমার গল্পটা নিয়ে ব্যস্ত আছি। ইতি ৬।১০।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

১২২
১৫ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, কিছুদিন তোমার কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তোমার বাবা কেমন থাকেন জানিয়ো। এবারে কি শান্তিনিকেতনে ফিরবে না। যদি ইচ্ছে কর শ্যামলীটা সম্পূর্ণ ভোগ করতে পার।...

আমি বোধ করি ১৫।২০ নবেম্বরে স্বস্থানে ফিরব। ইতিমধ্যে তোমাকে যদি এখানে পাওয়া যেত খুব খুসি হতুম। ১৫।১০।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৩
২২ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তোমার "চেতনস্যাকরা" আগেই পড়েছিলুম। পড়ে রীতিমতো ভালো লেগেছিল। কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখব লিখব করছি সময় পেয়ে উঠি নি। তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে।

কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের দ্বারা যাকে সহজ দেখায়, সে আবর্জ্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য— তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার এই কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম। নিজের চিরাভ্যস্ত রচনাধারার সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমার পক্ষে বোঝা সহজ। পাহাড়ে আছি তাই একটা পার্বত্য তুলনা মাথায় আসচে। দূরে পাহাড়ের শিখরের নীলিমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে নির্ঝরের যাত্রা— সে স্বচ্ছ, সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোয় ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়। তার কলধ্বনিও লাগে ভালো, দৃষ্টির উপরেও তার প্রভাব আছে। সেই ঝরনা যখন নেমে এল নিম্নভূমিতে তখন সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সে বিচিত্র, কত ভাঙা চোরা কত খসে পড়া জিনিষকে সে টেনে নিয়ে চলেছে, কত আওয়াজ মিলচে তার কলস্বরে যার সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই, কোথাও ফেনা উঠচে ফেনিয়ে, কোথাও বালি কোথাও কাদা ঘুলিয়ে উঠচে তার আবর্ত্তে— এই সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে অতিক্রম করে তার ধারা, তার চলমান রূপ, কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করচে না, তার সমগ্রতাকে রক্ষা করচে, তার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দিচ্চে তুচ্ছতা, সেই তুচ্ছতাকে উপহাস করবার উপলক্ষ্য দেবার জন্যেই। মনে মনে ভেবে দেখলুম সৃষ্টির এই সর্বগ্রাহী লীলা আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়, আমি এখানে নামতে পারিনি। কিন্তু তুমি যে ভূতলচারিণী স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছো, তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও না কোথাও মিল

আছে, মিল নেই পাঁকে বোজা ডোবার সঙ্গে। এরা কিন্তু ডোবাকেই আধুনিক বলে। যদি তাকে আধুনিক বলতে হয় তাহলে শ্রাবণ মাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, বর্ষার জল কল কল করে বয়ে যাক, পাঁক গুলে নিয়ে, চিংড়িমাছের বাসাগুলোর বিপ্লব ঘটিয়ে, তীরে তীরে এঁটো বাসন মাজার ঝঙ্কার তুলে, উছলে পড়ে গোয়ালঘরের গোবরগাদা লেহন করে, পরস্পরের পিঠে মাথারাখা ঘোলাজলে নিমগ্ন মোষগুলোকে পঙ্কশয্যার আরাম দিয়ে। এ সমস্তর সঙ্গেই মিল করে ব্যাপ্ত হয়ে থাকবে, শ্রাবণের আকাশ, মেঘের ডাক, আর রিমঝিম বৃষ্টি। কিন্তু গায়ের জোরে বাহাদুরি করলে চলবে না। এই পেঁকোজলে কবির ছন্দ যেন উলঙ্গ শিশুর মতো অনায়াসে নৃত্য করে, বুড়োবয়সের স্পর্দ্ধিত নগ্নতা যদি "আমি আধুনিক" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পঙ্কসভায় নাচতে আসে তাহলে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া কর্তব্য হবে। ইতি বিজয়া। ১৩৪৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক "পরিস্থিতি" সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে সময় পেলে পরে বলব।

১২৪

৩০ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে মাঝে মাঝে অনুরোধ আসছে আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। অর্থাৎ একটা পথ দেখাতে হবে অসাধ্য জটিলতার মধ্য দিয়ে। আমি তো কিছুই ভেবে পাই নে।

আমাদের অবস্থাটা এই :— শাসনশক্তি একদিকে মারণ-উচাটনের সমস্ত তোড়জোড় নিয়ে কড়া আইন আর লাল পাগড়ির বেড়া তুলে কেল্লা ফেঁদে বসে আছে। দেশকে বশীকরণের এই একমাত্র উপায়ের প্রতিই তার চরম বিশ্বাস। আর এক দিকে আছে রিক্ত হাতে নিঃস্ব পকেটে নিঃসহায়ের দল। তারা অহিংস্র শক্তিকেই পরম পরিত্রাণ ব'লে আশ্রয় করবার উপদেশ পায় কিন্তু তার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছে না। কেননা এই বিশ্বাসমতে সমস্ত জগতে কাজ কিম্বা অকাজ কিছুই চলছে না। হিংস্রতার জোরেই মানুষের মতো পরমহিংস্র জীবের হাত থেকে মানুষকে বাঁচতে হবে এই শিক্ষার উদ্যোগ বিচিত্র উপকরণ সমেত প্রবলভাবে চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সকল শিক্ষা হ'তেই যারা বঞ্চিত এ শিক্ষার আয়োজনও তাদের ঘরে নেই। তারা শ্বাপদ মানুষের শিকারের দলে চিরকালের মতো গণ্য। হরিণের মতো

পালাবার অধিকারও তাদের নেই, চারদিকে বেড়া দেওয়া। তারা মৃগয়াজীবী রাজন্যের রিজার্ভ ফরেস্টে বাস করে।

মনে পড়ছে একটা গল্প শুনেছিলুম কোনো একজন বিশ্বাস-পরায়ণা ভল্‌টেয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পালকে পাল ভেড়ার দলকে মন্ত্র পড়ে কি মারা যায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, মাডাম, নিশ্চয়ই যায়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক চাই। এই আর্সেনিক প্রয়োগের মারাত্মক আয়োজন আজ বিশ্ব জুড়ে এমন পরিব্যাপ্ত যে, যারা মরছে আর যারা মারছে এই দুই পক্ষের কারো চোখে আর কোনো রাস্তাই পড়ছে না।

বলিদানের রক্তে দেবতাকে তৃপ্ত করবার হিংস্র পূজাবিধি মানুষের বর্বর অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো উপদেষ্টা বলেছেন: একমাত্র প্রেমের দ্বারাই এই পূজা সার্থক হতে পারে। শুনে মানুষের মনে হয়েছে কথাটা পারমার্থিক ভাবে সত্য, ব্যাবহারিক ভাবে নয়। অর্থাৎ জীবনের যে বিভাগে আশু ফললাভকে উপেক্ষা করা যেতে পারে সেই বিভাগেই তার মূল্য আছে কিন্তু ফললাভ যেখানে লক্ষ্য সেখানে দেবতার প্রসন্নতা পাবার জন্য চাই বলির রক্ত। এর মূল মনস্তত্ত্ব হচ্ছে এই যে তীব্র কটুস্বাদ ওষুধের পরেই রোগীর বিশ্বাস সম্পূর্ণ নির্ভর করবার জোর পায়, সন্দেহ থাকে না এটা ওষুধের মতো ওষুধ বটে। তাই আজ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় দাওয়াইখানায় ঝাঁঝালো ওষুধের আমদানি বেড়েই চলেছে। শক্তিলাভের টনিক রক্তবর্ণ শক্তির উৎকট রঞ্জনে প্রকটিত। কথায় বলে সহস্রমারী চিকিৎসকঃ, বিস্তর মরতে

মরতে তবে চিকিৎসাবিধিতে বিশ্বাসের বদল হয়। সেই মরণের শিক্ষালয় খুলে গেছে সর্বত্র। এই মরণ শিক্ষালয়ে কোটি কোটি ছাত্রদের মারতে মারতে শিক্ষার শেষ পরিণামে মানুষ কবে ও কোথায় পৌঁছবে বলতে পারি নে। দেখতে পাই ক্লাস চলেইছে কিন্তু শিক্ষার শেষে গিয়ে ঠেকচে না। পুনরাবর্তনই হচ্ছে উত্তরোত্তর বেশি জোরে। এই অবস্থায় আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন্ পথে চলব, কোনো উত্তর ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকি।

আমরা যে সনাতন বড়ো রাস্তার ধারে জীর্ণ আগল দেওয়া ঘরে বাস করি সেখানে শত শত শতাব্দী ধরে বাইরে থেকে এসেছে সৈনিক, এসেছে বণিক, পড়েছে আমাদের পিঠের উপরে, ঢুকেছে আমাদের ভাঁড়ারে, অবশেষে আমাদের মেরুদণ্ড পড়েছে বেঁকে, ভাঁড়ারে বাকি আছে খুদকুঁড়ো। অতএব সনাতন শিক্ষাবিধির সাহায্যে ঐতিহাসিক পরীক্ষায় আমরা যে পাস করেছি সম্মানের সঙ্গে, এ কথা বলবার মুখ নেই আমাদের। কেউ কেউ গর্ব করে বলেন আজও তো আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু এমন বাঁচা আছে যা বিলম্বায়মান মৃত্যু। এই তো আমাদের দশা। এখন যাঁরা হিংস্র শক্তির প্রধান চেলা অথবা অধ্যাপক তাঁদের কাছে আমার বলবার কথা এই যে, অনেক কাল দেখলুম তাঁদের সিদ্ধিলাভের চেহারা, তার ভার অনেকটা আমরাই বহন করে এসেছি কিন্তু আজ কি তাঁরা জয়লাভের সীমানায় এসে পৌঁছলেন? পাস করলেন কি মনুষ্যত্বের পরীক্ষায়। মেতেছেন যাঁরা প্রতিযোগিতায় তাঁরা

জয়ের আশা করছেন কার? হিংস্র শক্তির। এ শক্তি সর্বনাশ সাধনের পূর্বে কোনো কালেই তো শান্তিতে পৌঁছতে পারে না। এ যে শুধু মানুষের জীবিকা ধ্বংস করছে তা নয় তার চিত্ত-শক্তিতে দিচ্ছে বিষ মিশিয়ে— যা কিছু তার শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় বোমা ফেলে দিচ্ছে তাকে ধূলোয় গুঁড়িয়ে। আমাদের লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে কিন্তু আজ এই যে দুর্গতির নাগরদোলায় নিরন্তর ঘুরপাক দেখতে পাচ্ছি এই লজ্জা কার?

হিংস্র শক্তির পাদপীঠ মানুষের দৌর্বল্যে, আর মাটি চৌচীর করে তার চাষ লাগাবার ক্ষেত্র দুর্বলের অসহায়তায়। এই নিয়েই তার ব্যবসায়। অনেক দিন থেকে এই ব্যবসায়েই পৃথুল হয়েছে শক্তিমানের কলেবর— তার প্রতাপের পরিধি। বহুকাল থেকে বহুসংখ্যক মানুষকে সে অতলে নামিয়ে এসেছে, দাবিয়ে রেখেছে ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে আমরা তা জানি। তার প্রভাবের সীমানার মধ্যে পাছে কারো বললাভের সূচনা হয় এজন্য তার সুদূর প্রসারিত সতর্কতা। নরহত্যার বিপুল আয়োজনে ও ব্যয়ভারে ক্লান্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্যে যেই ভার-লাঘবের চেষ্টা করে অমনি চম্‌কে উঠে দেখে ভুল হয়েছে। চৈতন্য হয়েছে আপন মহিমার পরে বিশ্বাস রাখবার জন্যে তার দরকার অপরিমিত সংখ্যক খাঁড়া ও খর্পর। হিংস্র শক্তির যে নিদারুণ জাগরূকতা আজ জল স্থল শূন্যে মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তার করে রেখেছে এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা যায় না। মানব-হননের অসংখ্য তোরণ নির্মাণ করতে করতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিজয়-অভিযান কুচকাওয়াজ করে

চলেছে। কেউ কোথাও থামতে পারছে না পাছে আর কেউ এগিয়ে যায়।

১৯৩০ খৃষ্টশতকে গিয়েছিলুম জর্মনিতে। জেতা যে নিশ্চিত জিতেছে এই কথাটাকে সে নানারকমে দেগে দিচ্ছিল বিজিতের মনে। চিরস্থায়ী কালো কালিতে অপমানকে এঁকে দিচ্ছিল ঐতিহাসিক স্মৃতিপটে। বিজিত দেশগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন করে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করছিল যাতে তাদের পঙ্গুতা অবিস্মরণীয় হয়। রাষ্ট্রস্বার্থবুদ্ধির পক্ষে এমন মূঢ়তা আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু হিংস্র শক্তির এইটে প্রকৃতিসিদ্ধ ; অহংকারকে সে সম্ভোগ করতে চায়। ক্ষমাহীন প্রতিহিংসুক নীতি তার সুবিচার এবং শ্রেয়োবুদ্ধিকে অন্ধ ক'রে দেয়। দেখা গেল জয়ের দ্বারা হিংস্রতার উষ্মা শান্ত হয় না, উত্তরোত্তর তার উদগ্রতা বাড়িয়ে উঠতে থাকে। তখন জর্মনির তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমার সমস্ত মন আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের দিকে। তারা তখন স্বজাতির ভবিষ্যৎকে একটা মহৎ সফলতার দিকে নিয়ে যাবে সংকল্প করেছিল। তার মধ্যে ক্রোধ ছিল না, দ্বেষ ছিল না, ছিল নূতন সৃষ্টির আবেগ। বর্বরতার উপরে সভ্যতার জয়লাভ নির্ভর করে এই সফলতার পরে। কিন্তু হিংস্র শক্তিই বর্বর। সার্থকতার পথ থেকে মানুষকে সে করে ভ্রষ্ট, মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমানিত করায় তার আনন্দ। সেই তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে তরুণ জর্মনিকে অবশেষে হিংস্র ক'রে তুললে, তাকে বর্বরতার পথে টেনে নিলে। য়ুরোপের মাঝখানে হিংস্র শক্তির প্রকাণ্ড

একটা অনাসৃষ্টি দেখা দিল। যে নির্মম শাসনশক্তি আমাদের দেশে ব্যেপে দিয়েছে নির্জীব তামসিকতা, সেই শক্তিই য়ুরোপে জাগিয়ে তুলেছে উগ্র কঠোর তামসিকতা। আমাদের ক্ষীণ রেখার ছবি কারো চোখে পড়বেনা, কিন্তু য়ুরোপে হিংস্র শক্তির অফুরান লীলা আজ উৎকটভাবে দেখা গেল। দেখলুম একবারকার যুদ্ধের ফসল যখন সে ঘরে তোলে তখন আর-একবারকার যুদ্ধের বীজ বপন করতে সে ভোলে না।

এবার যুদ্ধের বান ডেকে এসেছে, প্রলয়ের ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে হিংস্র শক্তির হাজার হাজার পালের উপর। যে পক্ষই হোক উপস্থিতমতো একটা ফল পাবে যাকে সে বলে জিত। তারপর চলবে সেই কাঁটাগাছের চাষ যা মনুষ্যত্বকে বিক্ষত করবার জন্যে। সেই জন্যেই বলি, এ-পক্ষেরই হোক আর ও-পক্ষেরই হোক জয়কামনা করব কার। জয় যে হিংস্র শক্তির।

আমি পোলিটিশান নই। যাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা তাঁরা কল্পনা করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তাহলে বরলাভ করব। এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দরকষাকষির হাটে। এটা আন্তরিক মৈত্রীর নয়, দীর্ঘকাল হয়ে গেল সেই সম্বন্ধ-সাধনার অবকাশ এ-দেশে আজ পর্যন্ত ঘটে নি। আমাদের পক্ষে শাসনকর্তাদের বিশ্বাসপরতা অনুভব করি নি, অনুভব করেছি সন্দিগ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের যখন অবসান হবে তখন শক্তির জয় হবে মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার দ্বারা

যে নম্রতা এবং দায়িত্ববোধ আনে সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়াজনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতে হিসাবনিকাশের অবকাশ এসেছিল ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পরিমাণে ঘনিয়ে এল বেত চাবুক জেল জরিমানা গোরাগুর্খা ও প্যুনিটিভ পুলিস।

শক্তির পরে যে দেশের শাসনভার, স্বতই সে দেশের চেহারা কী রকম দাঁড়ায় তা আমাদের সামনে শোচনীয়ভাবে স্পষ্ট। নিঃসন্দেহ সেটা তাঁদেরও সুস্পষ্ট গোচর যাঁদের রাজছত্র সমস্ত দেশের দিকে দিকে ছায়া বিস্তার করেছে। সেখানে কোটি কোটি লোক অর্ধাসনে ক্লিষ্ট, অশিক্ষিত, আরোগ্যবিধানহারা, তাদের পানীয় জল কোথাও শুষ্ক কোথাও দূষিত, তাদের রাস্তাঘাটের অভাব চলাচলের প্রয়োজনের মাঝখানে, এ সমস্ত যদি উচ্চাসনবাসীর চোখে প'ড়েও না পড়ে হয় তাহলে বুঝব এইটেই শক্তির শাসনের লক্ষণ। দেশে কী নেই তা বললুম, কিন্তু যা আছে, সর্বত্রই, সে হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিচ্ছেদ। দুর্বলতা থেকেই এর উদ্ভব, দুর্বলতাকেই এ পোষণ করে রাখে। নিজের দায়িত্ব যাদের হাত থেকে নিঃসহায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরই ঘটে এই দুর্বলতা। শক্তি-শাসনের এই বাহনটা দানাপানি খেতে রইল রাজার আস্তাবলে, আমাদের অন্নবস্ত্র অনেক কিছুর ক্ষয় হবে কিন্তু এর বিনাশ হবে না।

মৈত্রীর দ্বারা শাসিত যাদের নিজের দেশ একবার তাদের সঙ্গে আমাদের দশার তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

সেখানে বহুদিন ধরে বহুসংখ্যক বেকারদের অন্নপথ্য চলছে রাষ্ট্রভাণ্ডার থেকে, কেননা মানুষের উপবাসজনিত দুর্বলতা সইবে না যেখানে রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা শাসনে নয় মিলনে। দেহে মনে জ্ঞানে কর্মে আনন্দসম্ভোগে সেখানে সকল প্রকার আনুকূল্যই প্রচুর পরিমাণে। স্বল্প অভাবও সেখানে দৃষ্টিতে পড়ে। স্বভাবের কার্পণ্যবশত মৈত্রী যেখানে তিরস্কৃত সেখানে সমস্ত অধ্যবসায় রাষ্ট্রপ্রতাপকে অপ্রতিহত ক'রে তোলবার দিকে। কিন্তু ক্ষমতার অন্ধ ঔদ্ধত্য বুঝতে পারে না মানুষে মানুষে নির্মমতার নীরস ও অসম্মানজনক সম্বন্ধ কখনই টেঁকে না চিরকাল, সময় আসে যখন ভিতরের তাপ দুঃসহ হয়ে ওঠে এবং বাইরের বন্ধনজাল বিদীর্ণ হয়ে যায়। শক্তির থেকে মৈত্রীর রাস্তাবদল কোন্ সত্যের আঘাতে ঘটবে তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই কেবল এইটুকু অনুমান করতে পারি যে, শক্তির হাত থেকে আমাদের বরলাভ আরো দুঃসম্ভব হবে যখন সেই শক্তি জয়লাভে দৃপ্ত হয়ে কর্তৃত্বের অধিকারে নিজেকে ধ্রুব-প্রতিষ্ঠ কল্পনা ক'রে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হবে।

আর্ল বল্ড্‌উইন সম্প্রতি আমেরিকায় একটি বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ যেটা ইংরেজের, সেটা সমষ্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ যেটা জর্মনির, তার চেয়ে আইডিয়ালে অধিকতর উচ্চদরের। তিনি বলেন গণতন্ত্র এবং সমষ্টিতন্ত্রের মধ্যে মূলগত প্রভেদ এই যে, গণতন্ত্র স্বীকার করে মানুষের সেই মর্যাদা এবং সেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যা সে দাবী করতে পারে ঈশ্বরের আপন

সন্তান ব'লেই। তাঁর মতে গণতন্ত্রের মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানের যে একটি ঐক্যনীতি আছে সংকটের দিনে সকলপ্রকার বাহ্য তাড়নার চেয়ে সেইটেই আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রাষ্ট্রঘটিত আলোচনার সঙ্গে রাষ্ট্রনেতারা ঐশ্বরিক বিধানের একত্রে উল্লেখ প্রায় করেন না। কেননা ঐশ্বরিক বিধানকে যদি মানতে হয় তাহলে দেশে কালে তাকে বিশ্বভূমিকার উপরে স্থাপিত করা চাই। ব্রিটনের রাষ্ট্রনীতি যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছানুকূল ধর্মনীতির অন্তর্গত হয় তা হলে সেই নীতির মধ্যে কেবল ইংরেজের নয় আমাদেরও সমান স্থান আছে। আমরাও মানুষ, আমরাও ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং আমাদেরও মানবমর্যাদা, আমাদেরও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ধর্মনীতির ক্ষেত্রে সম্মানের যোগ্য। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারে তাকে যদি অস্বীকার করা হয় তা হলে সমষ্টিতন্ত্রীয় রাষ্ট্রনীতিকে অন্তত ঈশ্বরের নাম ধরে নিন্দা করা উচিত হয় না। রাষ্ট্রিক ইচ্ছার প্রভাবকে স্বরাষ্ট্রের সীমায় সংকীর্ণ করে দেখবার প্রথা চলে আসছে কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রভাবকে সেই সীমার মধ্যেই একান্ত ক'রে দেখা তো চলে না। আর্ল বল্ড্উইন তাঁদের আইডিয়াল সম্বন্ধে বলেছেন "These ideals require men of their own free will to co-operate with God himself in the raising of mankind". যে স্বাজাতিক অধিকারের মধ্যে মৈত্রীর প্রাধান্যই প্রবল সেখানে মানুষের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যে ঈশ্বরের সহযোগিতার কথা স্বভাবতই মনে আসে কিন্তু পরজাতীয় অধিকারে যেখানে শক্তির শাসনতন্ত্রই

প্রবল সেখানে মানুষকে উপরে তোলবার জন্যে ঈশ্বরের সঙ্গে হাত মেলানোর কথা মনে আনা কখনই সহজ হ'তে পারে না। বস্তুত আমরা তার উল্‌টো পরিচয়ই পেয়েছি। অতএব আমাদের শাসনকর্তারা স্বগোত্রীয় মণ্ডলীর মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির উচ্চ আদর্শের অনুগত এ কথা শুনে আমাদের উৎসাহের কোনো কারণ ঘটে না, কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের নাম নিলে সেটা আমাদের কানে দুঃখ দেয়।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন রয়ে গেল আমাদের গতি কী। যে পথে বড়ো বড়ো দেশ আজ উন্মত্তের মতো ধাবমান সে পথ আমাদের অবরুদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই। সে পথে শক্তিশালীরাও যে কোথায় পৌঁছবেন সেটা সন্দেহজনক। এইটুকুই বলতে পারি ইতিহাসের গতি রহস্যময়। দুর্বলের দুঃখও প্রবলের জাহাজে ছিদ্র ক'রে দিয়েছে তার প্রমাণ আছে। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহই একমাত্র সুযোগ নয়, বঞ্চিতের নৈরাশ্যও কোথা থেকে সুযোগ আকর্ষণ করে আনে এখনি তা বলতে পারি নে। বলতে পারি নে ব'লেই তার আকস্মিক আবির্ভাব বলশালীকে একদিন অভিভূত করবে। যে অভাগাদের পক্ষে মৈত্রীর পথেও কাঁটা, যুদ্ধের পথেও বাধা তারাই একান্ত আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের অভাবনীয় বিধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে যারা পরজাতীয় মানুষকে চিরকালের মতো নাবিয়ে রাখে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ-মারা কলের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে তাদের মুখে হরিনামের দোহাই শুনলে মন আশ্বস্ত হয় না। ঈশ্বরের নাম নিয়েই বলব

বাইরের থেকে আমাদেরকে দেখায় নিঃসহায় তবে আমরা নিঃসহায় নই। আমরা বাস করি যে মানবমণ্ডলীর মধ্যে, তারা সকলেই সাম্রাজ্যলুব্ধ নয়, আমাদেরও আপন বলে গণ্য করবে এমন নিস্পৃহ মনুষ্যত্ব কোনো একটা জায়গা থেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। নইলে ঈশ্বরের বিধানের অর্থ কী।

৫।১১।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৫

২৭ নভেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার নতুন কবিতার বইখানি আমাকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। সকল সৃষ্টিতেই চেতন অবচেতনের মিলিত লীলা। আমার ছবি রচনায় দেখি অচিন্তার অতল থেকে হঠাৎ ভেসে ওঠে রেখার রূপ— সচিন্তমন তার পরে তাকে দখল করে বসে। আধুনিক মনোলোকে কাব্যের প্রকাশ রহস্য আমি বোঝবার চেষ্টা করচি— যেখানে তার আবির্ভাব কৃত্রিম নয় সেখানে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে— অভ্যাসের বাধাকে একান্ত বলে মান্‌লে ভুল হবে। তোমার ঘুমের কবিতাকে লক্ষ্য করে যে চিঠি লিখেছিলুম তার একটা কপি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভার জন্যে লিখ্‌তে বসেছি। আজকাল

কলম সহজে সরে না। পলিটিকসের আলোচনা এর পরে অবকাশ পেলে করব। কিন্তু এদিকে পুপুর বিয়ে এসে পড়ল। ২৭।১১।৩৯

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১২৬

৩১ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন থেকে তোমার প্রতীক্ষা করে আসচি। মাঝে মাঝে জনরব শুনি আজ আসচ কাল আসচ হপ্তাখানেকের মধ্যে আসচ। অসম্ভব ভিড়ের আক্রমণ নিরবচ্ছিন্ন চলেছে—বোধ হয় স্থানাভাবের আশঙ্কায় আসনি। এলে কোনোমতে জায়গা করে দিতুম। আমার মুস্কিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন, কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ— তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়— তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোকে বুঝতেই পারে না।

দুই রাজার অভ্যুদয় হয়েছে। এক রাজা কাল ভোরে চলে যাবেন। আওয়াগড় হয়তো আরো কয়েকদিন থাকবেন —উনি অত্যন্ত সাদা মানুষ— ওঁর থাকার মধ্যে কোনো ভার নেই।

যাই হোক তুমি যদি আসতে পার, খুশি হব। আমাকে তৈরি

হতে হবে, পয়লা বৈশাখের জন্যে— কিন্তু মন তৈরি হবার সময় পাচ্চে না। এই রকম অবস্থায় সুদূরে কোথাও দৌড় মারতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই সুদূরও হয়তো তাড়া করবে। Yeatsএর সেই দ্বীপটা কোথায় জানো? স্বয়ং কবিও তার সন্ধান পাননি। আকাশপ্রদীপ আকাশকুসুমবনের ইশারা করে কিন্তু পথ দেখায় না। আসল পথটা সেইখানেই যেখানে আজ শালের মঞ্জুরী ধরেছে আর অজয় নদীর ধারে নাগকেশরের বনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ইতি ৩১।৩।৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

১২৭
২৫ মে ১৯৪০

ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

তুমি চলে যাওয়ার পর আমাদের এখানকার আসর মুষড়ে পড়েছে। তার পরে আবার আকাশ অত্যন্ত ভ্রূকুটিল ভঙ্গী ধারণ করেছিল। কী করা যায়, আমি খুচ্‌রো কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করে দিলুম। তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব— সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরি নয়। লক্ষ্মীর

চেলারা দুঃসময়ের কাছে ভেবড়ে যায় কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিম্বা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে। আজ এই খানিকক্ষণ হোলো সূর্যের আলো পরিণত শিমুলের তুলোর মতো ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে আকাশে একটা দুশ্চিন্তার কালিমা লেপে গিয়েছিল সেটাকে মুছতে আরম্ভ করেছে। মনে আশা হচ্চে কাছে হোক দূরে হোক একটা সহজ পরিণাম আছেই যার মধ্যে ভাগ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে। মানুষের মন হিসেবী, তাই সে ভীরু, তাই সে আশঙ্কার কারণ খতিয়ে খতিয়ে মাথা ধরিয়ে তোলে, মানুষের আত্মা বীর্যবান, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, কেননা তার মাপকাঠি বহুদূরকে নিয়ে। তার মাপকাঠি রাজ্যসাম্রাজ্য পেরিয়ে যাবে, পৌঁছবে সেইখানে যেখানে সর্বমানবের চরম জয়পতাকা অভ্রভেদ করে আছে। সেই পতাকার বাহন কারা সে তকরার করে লাভ নেই, নিশ্চয়ই খুঁৎখুঁতে ঝগড়াটে পরশ্রীকাতর বাঙালী নয়। তবু বাঙালীও হয়তো সেখানকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে কিছু একটা পাথেয়ের জোগান দেবে। কিন্তু হায়রে, জগজ্জয়ী বীরের অন্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব কীট লাগিয়ে দিয়ে বাঙালী প্রতিদিন তাতে বিকার ঘটিয়ে দিচ্চে। ওর মনের মধ্যে উয়ের বাসা, তৈরি জিনিষকে নষ্ট করতেই আছে। ওর কণ্ঠে সব চেয়ে যে সুর অকৃত্রিম সে হচ্চে দুয়ো দেবার সুর।

✓ তোমার প্রেরিত মৃচ্ছকটিকম এইমাত্র পেলুম। এই নাটকে বাস্তবতা আছে কিন্তু বিশ্বাসজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং

বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করচে না আঁচড় কাটচে। যা হোক ভালো করে পড়ে দেখব। এই নাটক অনেক দিন আগে পড়ে দেখেছিলুম, ভালো লেগেছিল কিন্তু মনে হয়েছিল তখনকার পাঠকদের দাবী করবার স্বভাব পাকা নয়, বিষয়-বস্তুকে যেমন তেমন করে আলগা করে গড়ে তুললেও লোকের অবকাশরঞ্জন হোত।৮

চেষ্টা করে দেখচি য়ুরোপের ইতিহাসে পরে পরে দুটো দারুণ যুদ্ধের তাৎপর্য বুঝে দেখতে। এই নিয়ে যারা উত্তেজিত উৎসাহ প্রকাশ করচে তারা কাপুরুষ। তারা নিজেরা অক্ষম বলেই সক্ষমদের সংকটে উল্লাস বোধ করচে। এটা হচ্চে দূর থেকে নিরাপদে ছুয়ো দেবার প্রবৃত্তি।

যখন গরমবোধ করবে এখানে এসে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ো। ইতি— ২৪।৫।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১২৮

৩১ মে ১৯৪০

নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী

দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
সুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়,
কেন এ অন্যায়।

অন্যায়ের এই সম্মার্জনী
উঠেছে আজ ঝেঁকে,
এ যে কঠিন পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা,
অনেক কালের লুব্ধ হালের চাষের মাটির থেকে
লুপ্ত করে নিষ্ফলা চেহারা।
জমে ওঠা মৃত বালির স্তর
ভাসিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহ্বর ;
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ,
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।

হুব্‌লা ক্ষেতের পুরোনো সব পুনরুক্তি যত
অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।

অন্তরেতে মৃত
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত,
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।
বিত্ত ওদের করেছে বঞ্চনা,
ধরিত্রীকে অসম্মানে মাড়ায় অন্যমনা।
অপঘাতের ধাক্কা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে
জাগায় হাড়ে হাড়ে।
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন ক্ষেতে।

শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে,
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে কী রইবে।
পালিস-করা জীর্ণতাকে চিন্‌তে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি ॥

৩১।৫।৪০

১২৯

২০ জুন ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু অমিয়,

কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে সুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এসিয়া আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ গিলেছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্ব্যচোষ্য লেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌঁছচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে। যে সব বঞ্চিত শাবকদের জিভে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল ঠাণ্ডা ছিলনা। অবশেষে ভুক্ত অভুক্ত দুইপক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার সুরু হোলো শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। আজ সে কাতর কণ্ঠে বলচে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো বাইরে থেকে আসে না ভিতরে তার উৎস। লুব্ধ অভ্যাসবশত অন্যদের না খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হননীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে কারো বা কসের দিকে গোপনে দাঁতগুলো কী অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলছিল আজকের দিনে বড় করে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণভাবে সেটা প্রকাশ পেল। এটা যে না হলে নয়। শিকারকে চিবোতে যদি দাঁতের দরকার

হয় তাহলে পাশের শিকারীকেও দাঁত খিঁচোবার জন্মে দাঁতের দরকার হবেই। আজকের হানাহানিতে যে জিতল কালকের আশঙ্কা নিবারণের জন্মে তাকে উঠে পড়ে বৈজ্ঞানিক ডেন্টিস্ট্রির চর্চ্চা করতেই হবে। শ্বাপদ সভ্যতার শিক্ষামন্দিরে এই আত্মঘাত চর্চাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠতে বাধ্য। এই কামড়ের ঘূর্ণাচক্র অন্তহীন বেগে বাড়তেই থাকবে। আজ যারা কামড়ায় নি কামড় খেয়েছে তারা দায়ে পড়ে কালই কামড়বিগ্যার পাঠশালা খুলবে। য়ুরোপের উত্তর অংশে অনেকদিন অহিংস্র শান্তিকে আশ্রয় করে যথার্থ সভ্যতার মহৎরূপ বিরাজ করছিল আজ তারা ক্ষ্যাপাজন্তুর কামড় খেয়েছে, কাল তাদের ঠাণ্ডা রাখবে কীসে? তাহলে এই বিরাট পশুশালার মধ্যে মান্‌ষের সন্ধান পাব কোথায়। ডারুয়িন বল্লেছেন বানরের অভিব্যক্তি মান্নুষে কিন্তু মান্‌ষের অভিব্যক্তি এ কোন্ জানোয়ারে। প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মে চর্মে ভারাক্রান্ত বিকট জন্তুরা আস্ফালন করে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তারা তো প্রাণলোকের অসহ্য হয়ে উঠল, টিঁকতে পারল না— সৃষ্টিবিভাগে সেই ব্যর্থ পরীক্ষার স্মৃতি এখনি কি লুপ্ত হয়েছে। আবার সেই বর্মের বোঝা বেড়ে উঠে মানবধর্মকে অন্তরে অন্তরে ফেলচে পিষে। মানবসৃষ্টির জন্মে যিনি দায়ী তিনি বলচেন, লজ্জা দিলে, এ চলবে না, এদের পিঠের থেকে বর্ম নামিয়ে নেওয়া গেল মনের মধ্যে সেটা ঢুকে সর্বনেশে হয়ে উঠল, এ তো বাঁচবার লক্ষণ নয়। প্রাচীন ডাইনোসরদের সঞ্চরণক্ষেত্র আজকের দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে,

সেখানে তার প্রেত উঠেছে জেগে, যে রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে সেই রাস্তা দিচ্চে দেখিয়ে।

তবু সেই বর্মমন্থর জন্তুরাই যে মানুষের ভবিষ্যৎবর্ত্মের পথপ্রদর্শক এ কথা মন মানতে চায় না। কেননা সমস্ত বিরোধের মধ্যে মানুষকে দেখেছি। মাথাগুণতিতে তারা অল্প, কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আজ যে বৈশ্যয়ুরোপ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র, শূদ্রের দাস্য নিজের শক্তিক্ষেত্রে অপহরণ করে অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে এই তো দেখচি বিনাশের ঢালুতটে তার পা পড়ল। টিঁকে থাকবার শক্তি তার নয়, সে শক্তি তাদেরই যারা অলুব্ধ, যারা নম্র, যারা শান্ত, যারা বিশ্বাসপরায়ণ, যারা প্রমাণ করতে এসেছে মনুষ্যত্ব পরস্পরকে গিলে গিলে নয়, পরস্পরে মিলে মিলে। তারা কোনো একটা বিশেষ জাতি নয় তারা সকল জাতির মধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে অখ্যাত হয়ে আছে। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার যাত্রা, এই কথা সে প্রমাণ করবে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়। ইতি ২০।৬।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৩০

২০ জুন ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র তোমার দ্বিতীয় চিঠি পেলেম। তোমাকে একটা চিঠি আজ সকালেই লিখেছি, কিন্তু তোমার চিঠির ঠিক উত্তর দেওয়া হয় নি। যেমন সমস্ত জীবাণুকোষ মিলে একদেহ, তেমনি প্রত্যেক মানুষকে মিলিয়ে এক মহামানব এ বিশ্বাস আমি পূর্বেই জানিয়েছি। দেহকোষের এক অংশে আঘাত লাগলে সব দেহই পীড়িত হয়। ঐক্যের অনিবার্য ধর্মই তাই। ঐক্যের বেদনা যাঁরা নিজেরই মধ্যে উপলব্ধি করেন তাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি। আমাদের ধারণার অতীত যে বিরাট মহাপুরুষে এই বোধ সম্পূর্ণ হয়ে আছে উপনিষদে তাঁকে বলেন সর্বানুভূঃ, তিনি সমস্তই অনুভব করেন। প্রত্যেকে তাঁর মধ্যে, অথচ তিনি প্রত্যেকের অতীত। এইজন্যে তিনি নির্মমভাবে প্রত্যেককে বিচার করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন সমগ্রের মধ্যে ভুল ঢুকেছে অতএব তাকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি বলতে পারেন নতুন করে আরেক সমগ্র রচনা করা চাই। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতার একটা আদর্শ আছে— স্পষ্ট বুঝতে পারি প্রথম যুগের উদ্ভিদ পশুপক্ষী কী কুশ্রী ছিল, অভিব্যক্তির তপস্যায় সমস্তই একটা সুশ্রীতায় পৌঁচচ্ছে। এই অভিব্যক্তি তাঁরই আত্মোপলব্ধির সোপান-পরম্পরা। দেখছি এতে স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না ওজনের

ভুল হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেইজন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী করে। আমাদের সেই চেষ্টাই নৈতিক চেষ্টা যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের শোধন হয়, জগদ্‌গুরুরা তারি ধ্যান করেছেন। এই ধ্যানে তাঁরা পেয়েছেন মূলগত শোধনের উপায় প্রেম ও ত্যাগ— তাই তাঁরা প্রচার করেছেন। বলেছেন, মা গৃধঃ, বলেছেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। তাঁদের এই বাণী বিরাট মহাপুরুষের বাণীর অন্তর্গত। আমাদের আশার কথা এই বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সুতরাং ক্রমশ যুগ যুগ ধরে এ বীজের মতো কাজ করবে নইলে এমন সব আশ্চর্য কথা ভাষা পেতই না— এ কথার মতো অদ্ভুত কথা নেই যে আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। বহু শতাব্দী ধরে এই নীতির ব্যতিক্রম হয়ে চলেছে— কিন্তু ব্যতিক্রমের ভিতর দিয়েই গড়া চলে, যেমন করে আমরা কবিতা লিখি। এই ব্যতিক্রম টেনে আনে মূর্তি গড়ায় হাতুড়ি পেটানো, তাতেও যখন বিরাটের মনের মতো হয় না তখন নতুন সৃষ্টির সংকল্প আসে— পশুসৃষ্টিতে এই রকম প্রলয়ের কাজ যুগযুগান্তর দেখেছি, মানুষ সৃষ্টিতেও রক্তের অক্ষরে কতবার পালটিয়ে লেখা দেখেছি। একদিন যদি চরম ফেলকরার কাটাদাগ সেই ইতিহাসের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত চিহ্নিত হয় তবে পাতার কিছু অংশ বাকি থাকবে তাই নিয়ে পরের অধ্যায়ের পত্তন হবে— আজ যাঁরা সেই বাকির দলে, খবরের কাগজের মোটা শীর্ষ লাইনে তাঁদের নাম ওঠে না, কাটা পড়ার দলই

চলেছে ডঙ্কা বাজিয়ে, যে পর্যন্ত তারা না পৌঁছয় মহতী বিনষ্টিতে। উপনিষদে আছে স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যা করেছেন। স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ— তপস্যায় উত্তপ্ত হয়ে তিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন— এ তো সর্বশক্তিমানের পরিচয় নয়— এর মধ্যে বিপুল প্রয়াস সুতরাং বিপুল দুঃখের উদ্দীপনা আছে এবং এই তপস্যার কেন্দ্রস্থলে আছে পরিপূর্ণ কল্যাণের আদর্শ। তা যদি না হোতো তবে যাঁরা সত্যের জন্যে মঙ্গলের জন্য martyr হয়েছেন তাঁদের পাগল বল্‌তুম। উলটে এই কি প্রমাণ হচ্চে না যে যারা তাঁদের বিদ্ধ করেছে দগ্ধ করেছে তারাই মত্ত তারাই অন্ধ। তোমার কবিতা খুবই ভালো লাগল, আমি যা বলতে চাই তোমার স্বকীয় ভাষায় চমৎকার করে বলেছ। হোমানলের দারুণ উত্তাপের মধ্যে তপস্বীকে তুমি দেখেছ। তাঁর জয় হোক। ইতি ২০।৬।৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

প্রবাসীতে তোমার কবিতা বেরোয় যেন।

১৩১

২৩ জুন ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয় শেষ চিঠিদুটো তোমাকে যা লিখেছিলুম, অনিল কপি করে প্রবাসীতে পাঠিয়েছে। সে দুটো ছাপবার যোগ্য কিনা আমার সন্দেহ আছে। তোমারও যদি সন্দেহ থাকে তাহলে ছাপতে নিষেধ করে দিয়ো।

ইতিমধ্যে যে কবিতা জমেছে তার অনেকগুলো সানাই বইটাতে দেবার মতো বলে মনে হয়। ওগুলো দেখে তুমি বাছাই করে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই। বইটা শ্রাবণের [মধ্যে] ছাপানো হবেনা অতএব সময় আছে।

আমরা ২৮শে তারিখে রওনা হয়ে ২৯শে পৌঁছব কলকাতায়। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি? সেই ডিগ্রি অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হতে হবে।

এখানে দিন চলচে ভালো যেতে ইচ্ছে করে না। এবার তোমাকে নিয়ে পাহাড়ে আমাদের বেশ জমেছিল যে পর্যন্ত না কলকাতায় তোমাকে কাজে লাগতে হয় শ্যামলীতে এসে আড্ডা কর না।

"ছেলেবেলা" বলে ছেলেদের ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ণনা লিখেছি। তোমাকে দেখাবার ইচ্ছে আছে।

ইতি ৯ আষাঢ় ১৩৪৭

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৩২

২৯ জুলাই ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয় তোমার চিঠি পেয়ে কী রকম বেদনা বোধ করলুম তা বলতে পারি নে। তোমাকে কাছে রাখতে পারব একান্ত আশা করেছিলুম। তবু এ কথা বলতেই হবে বাংলাদেশের কুটিল চিত্তের জাল ছিন্ন করে তুমি যে চলে যাচ্চ এ হয় তো মোটের উপর ভালোই হোলো। নইলে একদিন অনুশোচনা করতে হোত। কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা তুমি ৭ই অগস্টের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকো। আর কোনো কারণ নয়— তোমাকে আমি যে অন্যদের চেয়ে শ্রদ্ধা করি সেটা দেখাবার সুযোগ পেতুম। তোমার সম্মান তুমি এখানে পেতে। তুমি হার মেনে যেয়ো না চলে। আমাদের সভায় তুমি মাথা-তুলে দাঁড়াতে পারবে। এখানে তোমার এই শেষ কাজ করে যেয়ো। অন্যেরা যেন কোনোমতে মনে না করে যে বাংলাদেশ থেকে তুমি অসম্মানিত হয়ে গেলে। শান্তিনিকেতনের সম্মানের তো মূল্য আছে। ইতি ২৯।৭।৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

১৩৩

২২ অগস্ট ১৯৪০

ওঁ

অমিয়

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বিশ্বভারতী মারফৎ আমার ঘাড়ে একটা গল্প লেখার ফরমাস চাপিয়েছে। সেই ঘাড়ের উপর যে মাথাটা টলটল করচে সেটা প্রায় গজভুক্ত কপিত্থবৎ— লিখতে হয় কষ্টে মন্থর গতিতে। অন্যান্য সকল কাজকে সে মুড়িয়ে খেতে খেতে চলেছে।

আধুনিক কাব্যপরিচয় পেয়েছি পড়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছি। দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে এসেছে। তার আকৃতি চেনা তার প্রকৃতিও। তাহলে বলতে হবে আধুনিক কবিতা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসচে। কবির প্রেয়সী বুড়ি হয়ে মরে যায় না। আজও এসে বাতায়নে আঘাত করে চম্পক অঙ্গুলির। এই যে চির আধুনিক এর স্বরূপ কী, চির সনাতনীর সঙ্গে মূলগত প্রভেদ কী সে কথাটা বুঝিয়ে বলবার ভার তোমারই পরে। তুমি হচ্চ আমার লিপিকার সেই প্রভাত ও সন্ধ্যার মতো— তোমার একদিকে সূর্য উঠচে যূথী বনে আর একদিকে সন্ধ্যা আসন বিছাচ্চে নক্ষত্র সভায়। তোমার নিজের মধ্যে তুমি একত্রে অধিকার করেছ প্রাচ্য প্রতীচ্যের উদয়াস্ত লোককে। আমি আজ মুখ ফিরিয়ে চলেছি একদিকে, তাকে কী নাম দেবে জানি নে।

এই সংকলন গ্রন্থে এখনো অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কালশিল্পী বিকৃতিকে নূতনত্ব ব'লে স্পর্দ্ধা করেছে। বিকৃতি তার অস্বাভাবিকতা দ্বারা চমক লাগায়— যে জন্যে আপন পোষা জীব জন্তুর মধ্যে ইচ্ছা ক'রে মানুষ বিরূপের সন্ধান করে। অস্বাভাবিক আকস্মিক, স্বাভাবিক চিরকালের। অদ্ভুত এবং অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সে তো কবিরাই জানে। বিজ্ঞানীর কাছে দুইয়ের মূল্যই সমান।

আমার সময় অত্যন্ত কম এবং শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

ইতি ২২।৮।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঝে মাঝে তুমিও যে আমাকে হতবুদ্ধি করো নি তা বলতে পারি নে। যখন ধাঁধা লেগেছে তখন মনে হয়েছে আজকাল সাহিত্যে যেন গালিভার্স ট্র্যাভল্‌সের লীলা, আমরা কোন্ পক্ষ কে এবং কী তার সংজ্ঞা নির্ণয় করে দেবে কে। এই ডিগবাজি খেলার মধ্যে যারা রস পায় তারা তো যা হোক একটা কিছু পায়, পায় না যারা তাদের চুপ করে থাকাই ভালো। সেই চুপ করে থাকাতেই কি হার, না সেইটেতেই সুবুদ্ধি? আধুনিককে যখন আমি অবিশ্বাস করি সেটা তার বাস্তবকে নয় তার অস্বাস্থ্য, এবং নিশ্চিত জানি অস্বাস্থ্যের পরিণাম হয় মৃত্যু নয় আরোগ্য।

১৩৪

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়চে, দিনগুলো বহন করা যেন অসাধ্য বোধ হয়। তবু কাজ করতে হয়েছে তবু এত অরুচি বোধ সে বলতে পারি নে। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে— বিধান রায় আশঙ্কা করেন হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে। সেই জন্যে কালিম্পঙে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মন বিশ্রামের জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হোলো না। চল্লুম আজ কালিম্পঙ। তুমি তো পুরীতে আছো, বহুকাল তোমার খবর পাই নি। এখানকার কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের প্রয়োজন হলেই আমাকে টানাটানি করতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁদের জালে ধরা দেবার মতো নির্বুদ্ধিতা আমার কেটে গিয়েছে— বারবার পরীক্ষা হয়ে গেছে কখনো আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার করেন নি— এঁদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। এঁরা যাঁদের বিপক্ষ বলে গণ্য করেন অন্তত তাঁদের চেনা যায়। তাঁদের সুস্পষ্ট ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এঁদের কুটিলনীতি পেরে উঠবে না। ছুটি নিলুম।

ছেলেবেলা বইটা পেয়েছ কি। দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম বহুকষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি।

আনন্দবাজার পূজার সংখ্যায় যাবে— কি রকম হয়েছে কী জানি। লিখতে আর প্রবৃত্তি নেই। ইতি ১৯।৯।৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্চে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জরণ। তারি একটুখানি নমুনা পাঠাই :—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দের মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি এ কালিম্পঙ?

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটিদিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ ?

২৫।৯।৪০

লিখতে রীতিমত কষ্ট বোধ হয়। চিঠির প্রথমাংশসমেত কবিতাটি যদি কপি করে পরিচয়-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঠিকানায় পাঠাতে পার খুশি হব। ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

এখানে শরৎকালটা রমণীয়, যদি কিছু দিন কাটিয়ে যেতে পারো ভালো লাগবে, আমারো লাগবে ভালো। এখানে লেখাপড়ার কাজ অবাধে করতে পারবে।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

১৩৬

৪ জানুয়ারি ১৯৪১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, খবরের কাগজে তোমার মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেলুম। তিনি দীর্ঘকাল দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় পুরীতে একরকম বন্দী হয়ে ছিলেন, এতকাল পরে নিষ্কৃতি পেলেন। তবু মৃত্যুর অভিঘাত সর্বদাই অপ্রত্যাশিত। গতবার পুরীতে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন কথাবার্তায় তাঁর স্বচ্ছবুদ্ধির পরিচয়ে বিস্মিত হয়েছি— রোগবেদনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত তাঁর মন ছিল জাগ্রত।

বিশেষ করে তোমার পিতার জন্যে মনে উদ্বেগ অনুভব করি। বড় শোকে আপন সান্ত্বনাকে গভীর বৈরাগ্যের মধ্যে আপনিই উদ্ভাবন করে— সে কথা জানি— তিনিও পুরুষোচিত ধৈর্যের সঙ্গে বিয়োগদুঃখ বহন করতে পারবেন সন্দেহ নেই। তাঁকে আমার সমব্যথার অভিবাদন জানিয়ো। ৪।১।৪১

শান্তিনিকেতন

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৭

৮ জুন ১৯৪১

শান্তিনিকেতন

৮।৬।৪১

কল্যাণীয়

অনেকদিন তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় ছিলুম। ঠিক করেছিলুম অসুখবিসুখে জড়িয়ে আছ। আমারো সেই দশা। অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি, চিঠি প্রত্যাশা করাও অন্যায়। অদৃষ্টের এই অকরুণতার দিনে মাঝেমাঝে দুটো একটা টুকরো খবর পেলেও মন খুশি থাকে।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

পরিশিষ্ট ১

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী

পরিণয়মঙ্গল

হৈমন্তী দেবী ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিণয়-উপলক্ষে

উত্তরে তুয়াররুদ্ধ হিমানীর কারাতুর্গতলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বপ্নমন্ত্রপাশ
কঠিনের মরুবক্ষে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,
হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেঁথেছে তাহারি শুভ্রমালা
নিভৃত গোপন চিত্তে; সেই অর্ঘ্যে পূর্ণ করি ডালা
লাবণ্যনৈবেদ্যখানি দক্ষিণসমুদ্র-উপকূলে
এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
রবির সোহাগগর্ব বর্ণগন্ধমধুরসধারে
বৎসরের ঋতুপাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্ধান মুহূর্তে তুস্তর অন্তরাল—
দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে।

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ ১৩৩৫

২

পথসঙ্গী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে-আলোকে যায় মিলে।

তেহেরান
৬ মে ১৯৩২

পারস্যভ্রমণকালে লিখিত

৩

বিকেল বেলার দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পূব গগনের দিগন্তে কি
জাগায় কোনো বোধ ?
লক্ষ কোটি আলো বছর পারে
সৃষ্টি করার যে বেদনা
মাতায় বিধাতারে
হয়তো তারি কেন্দ্র মাঝে
যাত্রা আমার হবে,
অস্ত বেলার আলোতে কি
আভাস কিছু রবে ?

১২।৯।৩৮

‘সেঁজুতি’ গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

৪

কয়েক মাসের খেয়ালের ক্ষেতে
ফসল যা ফলেছিল
তখনো সেদিন গাঁয়ের বাহিরে
ধরণীর কোলে ছিল।
তুমি সঞ্চয় করি
আঁঠি বেঁধে দিয়ে ভরি নিলে খেয়া তরী।
ঘাটে এনে দিলে তারে
ব্যাপারী দলের দ্বারে।
কী পারানি দিয়ে পূরাব তোমার সাধ,
আমার দিনের শেষের কড়িতে
লহ এ আশীর্বাদ।

২৫ বৈশাখ
১৩৪৭

'নবজাতক' গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

কল্যাণীয়
শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

হে বন্ধু নূতন করে
আরোগ্যের স্বাদ দিলে মোরে
পুরাতন কাল হতে নূতন কী রস
আনি দিল সত্যের পরশ।

অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা,
তোমার বুদ্ধির বিচিত্রতা,
ভূয়োদর্শনের তব দান
বন্ধুত্বেরে করে মূল্যবান।

নবোদিত প্রভাতে যেমন
শিখরে শিখরে হয় আলোর এ-নব্য পরশন
তেমনি আঁধার গুহা হতে
ফিরে যবে আসি মুক্ত সংসারের স্রোতে
জীবনের সার্থকতা এবে এক নূতন আলোকে
ফিরে আসে চোখে॥

৭ই পৌষ
১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ

৫

হে বন্ধু নূতন ক'রে
আরোগ্যের স্বাদ দিলে মোরে
পুরাতন কাল হতে নূতন কী রস
আনি দিল সঙ্গের পরশ।
অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা,
তোমার বুদ্ধির বিচিত্রতা,
ভূয়ো দর্শনের তব দান
বন্ধুত্বেরে করে মূল্যবান।
নবোদিত প্রভাতে যেমন
শিখরে শিখরে হয় আলোর ক্রমশ পরশন
তেমনি আঁধার গুহা হতে
ফিরে যবে আসি মুক্ত সংসারের স্রোতে
জীবনের সার্থকতা একে একে নূতন আলোকে
ফিরে আসে চোখে॥

৭ পৌষ
১৩৪৭

'রোগশয্যায়' গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথ-কৃত
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা

নবযুগের কাব্য

উনিশ খ্রীস্টশতকে আধুনিক কালের পাঠশালায় আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের যখন চেহারা দেখলুম তখন দেখা গেল তার রাস্তা পাকা করে বাঁধানো। সকল দেশের দিকে সে খোলা। সে পথে আমাদের মনের চলাফেরা বাধা পেল না। যে-সকল আনন্দতীর্থের দিকে তার নির্দেশ ছিল আমরা সহজেই তাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলুম। বড়ো বড়ো তীর্থযাত্রী যাঁরা এই পথকে প্রশস্ত করতে করতে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়েছিল। অবশেষে এমন বিপর্যয় যে হঠাৎ আসতে পারে যাতে করে সেই বিশ্বপথ ও যানবাহনের পরিবর্তনে আমরা একটা অপরিচয়ের দুর্গমে এসে পড়ব তা মনে করতে পারি নি।

কিন্তু সেই সনাতনী সীমানার মধ্যে মাঝে মাঝে আবহাওয়ার বদল যে লক্ষ্য করি নি তা নয়। ইংরেজি সাহিত্যে আলেকজাণ্ডার পোপ যে-ঋতুর বাহন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সে-ঋতুর নন। এই বদল মনেরই বদলের অনুবর্তী। প্রাকৃত জগৎ এবং মানস জগতকে দুই যুগের কবিরা ভিন্ন চেহারায় দেখেছেন তাই ছন্দ ও ভাষা আপনিই বদলিয়েছে তার প্রকাশভঙ্গী। আমরা সেই অধুনাউপহসিত ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যের দান গ্রহণ করেছি, দীক্ষা পেয়েছি তারই কাছ থেকে। সেই অনুসারে যা সুন্দর যা মহৎ তাকে সন্ধান করেছি বিশেষ-

ভাবে বিশেষ স্থানে, বিশেষ অনুষ্ঠানে তার জন্যে আসন পেতেছি।

এমন সময় য়ুরোপে প্রকাণ্ড এক যুদ্ধে মস্ত একটা সামাজিক ভূমিকম্প ঘটল। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের ভূমিকা যেন বদলে গেল। রূঢ় হ'ল ভাষা, যে-সকল আবরণের দ্বারা আচরণের প্রসাধন করা হ'ত তার সম্বন্ধে একটা অসহিষ্ণুতা দেখা দিল।

আজ পর্যন্ত প্রসাধনের দ্বারা মানুষ আপনার একটা পরিচয় নিজের চেষ্টায় রচনা করে এসেছে। নিজের নগ্নতার উপরে পরিয়েছে শিল্পের উত্তরীয়। অর্থাৎ মানুষের যে স্বরূপ প্রকৃতিদত্ত, তার উপরে সে স্থাপন করেছে নিজের রচনা। সে যা ইচ্ছা করে, সেটাকেও করেছে আপন প্রকাশের অঙ্গ। মানুষ স্বয়ং কী এবং মানুষ কী চায় এই দুইয়ে মিল করিয়ে তবেই মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণ ব'লে জেনেছে ও জানিয়েছে। এইজন্যেই ইতিহাসে যাঁরা মহাপুরুষ ব'লে গণ্য তাঁরা কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক, আর অনেক পরিমাণে আমাদের ভাবের সৃষ্টি। পূজা করবার একান্ত প্রয়োজন আছে মানুষের, সেই প্রয়োজন ব্যস্ত হয়ে রয়েছে আপন শিল্প-উপকরণ নিয়ে। ভক্তিক্ষুধাতুর মানুষ ইতিহাসের বাস্তব মূর্তির উপরে রঙ চড়িয়ে আপনাকে ভুলিয়ে কত অনৈসর্গিক প্রতিমা বানাচ্ছে তার সংখ্যা নেই। শুধু পূজা করা নয়, রস-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রবল। তাই তার উপভোগের বিষয়কে সে দোষমুক্ত সুসংগতি দিয়ে রুচির অনুকূল করতে চায়। যে অন্ন তার

প্রাণরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক, তাকে কেবলমাত্র আপন ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে পশুর মতো যেমন তেমন করে মানুষ খেতে পারে না। যে-ক্ষুধা প্রকৃতিদত্ত তার আশুনিবৃত্তি সংবরণ ক'রে মানুষ তার উপরে স্বরচিত শিল্পের শোভনতা বিস্তার করে। অন্নের সামনে নিজেকে একান্ত ক্ষুধিত ব'লে চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে তার সম্পূর্ণ উপভোগের ব্যাঘাত ঘটে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উপকরণকে অপরূপতা দেবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে উপভোগের যে আবরণ সৃষ্ট হয়েছে তারই শ্রেষ্ঠতা বিচার ক'রে তার স্বাজাতিক সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিচার হয়ে থাকে। যৌনবৃত্তি মানুষের একটি আদিম প্রবল প্রবৃত্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু যে মানুষ সেই বৃত্তিকে দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার ঐকান্তিক অসংযত পথে চালনা করে সে নিন্দনীয় হয় কেবল নীতির আদর্শ থেকে নয় উপভোগের উৎকর্ষ বিচারে। এই-সব আদিম প্রবৃত্তির মুখ্য ভাষাকে গৌণ ছন্দে ঢালাই ক'রে মানুষ তাকে অলংকৃত করে। বুভুক্ষাকে শরীরের শাসন থেকে নিয়ে আসে মনের রাজ্যে, কাম রাজবেশ ধরে প্রেমের, তবেই সে দিতে পারে পুরো আনন্দ, যা ক্ষুধাতৃপ্তির চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষ আপনাকে এবং আপনার চার দিককে আদিকাল থেকেই বানিয়ে তুলছে আপন আনন্দলোক সৃষ্টির জন্যেই। এই বানিয়ে তোলা তার স্বধর্ম— সে সৃষ্টিকর্তা। যেটাকে বলা যেতে পারে কৃত্রিম সেটা থেকে তার স্বভাবেরই প্রমাণ হয়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পাষাণ-প্রকৃতির উপরে মাটির স্তরের

আবরণ প্রকাশ করেছে নানা বর্ণের নানা রসের ফুল ফল ফসল। এই স্তরে সে যে বিচিত্র রূপ নিয়েছে তা সর্বজনের। বসন্তে গিয়েছি চীনদেশে, বহু সমুদ্র পার হয়ে গেছি দক্ষিণ-আমেরিকায়। প্রত্যেক জায়গায় ফুলফলপল্লবের আছে কিছু প্রভেদ, কিন্তু তার উপরে আছে সৌন্দর্যের সর্বজনীনতা। যেখানেই গেলুম বিশ্বপ্রকৃতিতে নানা আকারে একটা চির-পরিচয় দেখা দিল। সেটাই তার আবরণে। মানুষের মধ্যেও তাই, আতিথ্যের রূপভেদ, কিন্তু সমস্তটার মধ্যে যেখানে আছে সৌজন্যের সর্বজনীনতা সেখানে বিদেশের মধ্যেও স্বদেশকে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সৌজন্যের এই আবরণ মানুষের আপন সৃষ্টি, এইখানেই আমরা সকলে মিলি, এই আবরণের মধ্য দিয়েই দূরকে কাছে পাওয়া যায়।

বালক-বয়সেই ইংরেজি সাহিত্যের আঙিনায় যাওয়া-আসা শুরু করেছি। ভাষার আভিধানিক বেড়াটা যেমনি পার হয়েছি অমনি ওখানকার ফলের বাগান থেকে ফল পাড়বার আনন্দে বেলা কেটেছে। যেটুকু বাধা পেয়েছি তাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি বরঞ্চ ঔৎসুক্য বাড়িয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের পথে এই যে সর্বজনীনতার আহ্বান পেয়েছিলুম একে সমতলতা বললে অসংগত হবে। এর মধ্যে বাঁকচোর উঁচুনিচু যথেষ্ট ছিল। লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যের অভাব ছিল না। কিন্তু রূঢ়ভাবে কোনো দেউড়ি থেকে কোনো দ্বারী ঠেকিয়ে রাখে নি।

সেদিন গেল, এখন নতুন যুগ এসেছে। যে সাহিত্যে

চলাফেরা অভ্যস্ত ছিল সেখানে হঠাৎ দেখি রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমি বিদেশী ব'লেই যে আমাকে এই রকম ধাঁধা লাগিয়েছে তা নয়, আমার কোনো কোনো ইংরেজ বন্ধুকেও জিজ্ঞাসা ক'রে খবর পেয়েছি তাঁদের পক্ষেও এই আধুনিক কাব্য সহজবোধ্য নয়।

একটা কথা কানে এল, এখনকার কবিতা অবচেতনতত্ত্বে-পাওয়া কবিতা। অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়া অসংলগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে মন সে সেখানে অনেকখানি ছুটি নিয়েছে। এই অর্থের সংগতিতেই আনে সর্বজনীনতা, যেখানে এই সংগতিসূত্র ছিঁড়ে গেছে সেখানে প্রত্যেক মানুষের মন আপন প্রাইভেট পথের পাগ্‌লা পথিক। এখানকার রাস্তাঘাট নিয়ে গোলমাল ঠেকবার কথা।

অথচ আর্ট যেহেতু সায়ান্স নয় সেইজন্যে তার মর্মকথাটার স্বাতন্ত্র্য ঐকান্তিক। তার থেকে আনন্দ পেতে হলে অত্যন্ত বিশেষ করে তার আপন দেউড়িতেই যেতে হবে। সায়ান্সের মতো কোনো সাধারণতত্ত্ব তার তত্ত্ব নয়।

✓ কবি কিংবা আর্টিস্টের এই স্বাতন্ত্র্য, যাকে ইংরেজিতে বলে uniqueness, এর গভীর ভিত্তি অবচেতন মনে তাতে সন্দেহ নেই। ভিত্তি হতে পারে কিন্তু সমস্তটাই যদি নিছক অবচেতনার কীর্তি হয় তা হলে স্বপ্ন ছাড়া আর-কিছুই বাকি থাকে না।

অবশ্য স্বপ্ন জিনিসটা যে একেবারে ধোঁওয়া, তা নয়, প্লাবনের মাঝে মাঝে এক-এক টুকরো খাপছাড়া ডাঙা উঠে

পড়ে। সেই-সব অপ্রত্যাশিত দৃশ্য মনকে বিশেষভাবে টানে তার একটা প্রমাণ ছেলে ভোলাবার ছড়া। অনেক চেষ্টাকৃত সাহিত্যের আয়ু পেরিয়ে সেগুলো আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। তারা সব অদ্ভুত স্বপ্নের বানানো কিন্তু রস আছে তাদের মধ্যে, নইলে মানবশিশু ভোলে কী নিয়ে।

খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে,
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে,
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

এ স্বপ্নরূপ বানানো সহজ নয়। সব অসম্ভব ছবি, কিন্তু ছবি। বোধ করি অসম্ভব ব'লেই উজ্জ্বল হয়ে চোখে ঝলক মারে— অর্থসংগতির দরকার নেই। পাখি হয়ে খোকা বিলে চরে বেড়াচ্ছে, তার মাছ ধরবার অন্যায় বাধা ঘটাচ্ছে দুটো প্রাণী— চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এইটেতেই ওর রস।

এই অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক কাব্যে ব্যবহার করা চলতে পারে যদি ঠিকমত তার ব্যবহার হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একটা ছবি ফুটে ওঠে, বিশেষ একটা রস জাগে মনে। কাব্যের সেই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা চলবে না। ✓

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব প্রচার হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগতে অবচেতনের যেন একটা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাহিত্যে এর বেগ আর রোধ করা যায় না। এই অপ্রকাশ ভূগর্ভের জিনিসকে নানারকম প্রকাশের ব্যবহারে লাগানো চলছে।

ইতিপূর্বে কাব্যে অবচেতনী কল্পনার প্রভাব ছিল না যে তা নয় কিন্তু সে ছিল যেন নেপথ্য থেকে। এখন সে এসেছে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে। আধুনিক সাহিত্যে ও আর্টে তার এই প্রকাশ্যতার বিশেষ একটা কাজ বিশেষ একটা দান আছে ব'লে ধরে নিতে হবে নইলে বলতে হবে তার আবির্ভাব একটা উপদ্রব; বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে এত বড়ো একটা অভিযোগ আনতে সাহস হয় না।

বর্তমান সাহিত্যে আমার অনভিজ্ঞতা আমি কবুল করি। তাই আমি খুঁজি এমন কোনো পথচারীকে যিনি এ পথের পথিকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, আধুনিক সাহিত্যে যাঁর পরিচয় বই-পড়া পরিচয় নয়, যিনি কাছের থেকে নবীন কবিদের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছেন। সদ্যসৃষ্টির শিল্পবিকাশের আবহাওয়ায় যাঁর চিত্তে আপন মজ্জার ভিতর থেকে প্রকাশের চেষ্টা সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে এই নতুন ঋতুর ফুল-ফসলের সত্য খবর পাবার আশা করা যায়। অর্থাৎ এটা জানা চাই তাঁর মধ্যে যে প্রভাব এসেছে সেটা অব্যবহিত, সেটা দূরের থেকে নকলের উদ্যম নয়।

অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' এবং 'এক মুঠো' বই দুটি পড়তে বসেছি এই বিশ্বাস মনে নিয়ে। ইংলণ্ডে যাঁরা এই নূতন সাহিত্যের কর্ণধার অমিয় আজ অনেক দিন ধ'রে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়ে এসেছেন। নূতন কালের কোন্ প্রেরণা কোন্ বেদনা এই-সব কবিদের সৃষ্টিকে প্রাণবান করেছে কাছে

থেকে তিনি তা জেনেছেন, এবং তার প্রবর্তনা তাঁর নিজের মনের মধ্যে এসে কাজ করেছে। এই প্রবর্তনায় যদি তাঁকে রচনার ক্ষেত্রে নিয়ে আসে তবে সে তাঁকে কেবল বাইরের আঙ্গিক গড়িয়ে ছাড়বে না, তাঁর ভিতরের কথা এই রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবে। এইজন্যে আর্টের যে বিকাশ আমার অপরিচিত তাঁর কবিতার মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুসরণ করেছি।

কিছুকাল আগে আমি যখন মংপু পাহাড়ে ছিলুম, অমিয়র "চেতন স্যাকরা" কবিতাটি হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। আমার দৃষ্টিশক্তি এখন ক্ষীণ এবং শরীর ক্লান্ত এইজন্যে ধারাবাহিক বই পড়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। তাই পথচল্‌তি পথিকের খাপছাড়া দৃষ্টিতে আমার কাছে নূতন অভিজ্ঞতার বিষয় বিচিত্র স্বাদ এনে দেয় অকস্মাৎ। এ অবস্থায় টুকরো থেকে সমগ্রের পরিচয় আমাকে নিতে হয়— খুব যে ভুল করি তা বোধ হয় না।

এই কবিতাটি পড়ে অমিয়কে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা এখানে উদ্‌ধৃত করলে আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে।

"তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে। কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের ভঙ্গিতে যাকে সহজ দেখতে হয় সে আবর্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য। তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ আপন অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে।

"পাহাড়ে আছি তাই একটা পার্বত্য তুলনা মাথায়

আসছে। দূরে গিরিশিখরের নীলিমার আভাস থেকে দেখা যাচ্ছে শুভ্র রেখায় নির্ঝরের বিশ্বযাত্রা, সে স্বচ্ছ; সে নির্মল, সূক্ষ্ম আলোয় ছায়ায় রচিত তার উত্তরীয়, তার কলধ্বনি দূর থেকে কানে পৌঁছয় না, মনে পৌঁছয় তার অশ্রুত কল্লোল। এইখানে প্রতীকরূপে দেখতে পাই দূর পুরাতনকালীন আমাদের রচনার ধারা। এর যা রস তা ভোগ করেছি অনেক দিন, পরিবেশনও করেছি, একে অবজ্ঞা কোরো না। কেননা যদি রসাত্মকতাকে কাব্যের ধর্ম বলা হয় তবে এ রসেরও বিশেষত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে। তবে কিনা এইখানেই শেষ নয়। সেই ঝরনা নেমে এল নিম্নভূমিতে, অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে হ'ল নানারঙা। কত ভাঙাচোরা কত খসে-পড়া জিনিস সে টেনে নিয়ে চলেছে; কত আওয়াজ মিলছে তার কলস্বরে, যার সঙ্গে তার সুরের মিল নেই, হয়তো ধোবার গাধা চেঁচিয়ে উঠছে তার তীরের ডাঙায়। কোথাও বুদ্‌বুদপুঞ্জ উঠছে ফেনিয়ে, কোথাও বালি, কোথাও কাদা, কোথাও শহরের আবর্জনা, সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে তার ধারা, তার চলমান রূপ। কিছুই তাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না, তুচ্ছতা তাকে পরিহাস করে কিন্তু প্রতিরোধ করে না। মনে ভেবে দেখলুম সৃষ্টির এই সর্বগ্রাহী লীলারূপকে কিছু কিছু যাচাই না করে নেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। এইটেতেই বোধ করি আমাদের সেকালের সাবধানী শুচিতা, যেটাকে তোমরা আভিজাত্যবুদ্ধির শৌখিনতা ব'লে হেসে থাকো, বলো বুর্জোয়া। তা হোক কিন্তু তুমি যে ভূতলচারিণী

স্রোতস্বিনীর পরিচয় দিয়েছ তার সঙ্গে আমার দূরবিহারী নির্ঝরের কোথাও একটা মিল আছে তো। মিল নেই পাঁকে-বোজা এঁদো ডোবার সঙ্গে। কেননা সে একেবারে বোবা, একেবারে অন্ধ, প্রাণধারার নাড়ীর গতির সঙ্গে তার নিশ্চল রুগ্ণ পঙ্গুতার কোনোখানে যোগ নেই।✓একেই যদি আধুনিক কাব্যের চলৎস্রোতে ভাসিয়ে আনতে হয় তা হলে অপেক্ষা করতে হবে "ভরা বাদর মাহ ভাদরের"। বর্ষার প্লাবন বয়ে যাক পঙ্কপিণ্ডের উপর দিয়ে, চিংড়ি মাছের বাসাগুলোয় বিপ্লব ঘটিয়ে, পিছল ঘাটে এঁটো বাসন মাজার ঝংকারে ঝংকারে কল্লোল মিলিয়ে, উছলে-ওঠা ঢেউগুলোতে গোয়ালঘরের গোবরগাদা লেহন করে, পিঠে পিঠে মাথা রাখা মোষগুলোকে পঙ্কক্লিন্ন জলে অবগাহনের তৃপ্তি দিয়ে।✓ এই সমস্ত কিছুর সঙ্গেই মিল করে থাকবে বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশ, মেঘের গর্জন, আর ঝিমঝিম বৃষ্টি। এই পেঁকো বন্যায় আকাশে ঘোলা জল ছিটিয়ে কবির ছন্দ যেন অনায়াসে নৃত্য করে উলঙ্গ শিশুর মতো। বুড়োবয়সের স্পর্ধিত নগ্নতা চিৎকার স্বরে নিজের আধুনিকতা ঘোষণা ক'রে অবিমিশ্র পঙ্কসভায় নাচতে যদি আসে তা হলে পুলিসে খবর দেওয়া দরকার হবে।"

অমিয়কে যা লিখেছি তার মোদ্দা কথাটা এই যে আমাদের সকল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন অনেক কিছু মিশতে থাকে যাকে আমরা ইচ্ছে করে সরিয়ে রেখে দিই; কিন্তু আমাদের অবচেতন মন তাকে গ্রহণ করে, সব জড়িয়ে নিয়েই আমাদের উপলব্ধির বাস্তবতা। আমাদের অনুভূতিতে সেই অগোচরের

দান যদি ঠিকমত ভাবে গ্রহণ করতে পারি, তার সহযোগে যদি একটা অনুভূতিকে বিশেষ রসে উদ্‌বোধিত করা সম্ভব হয় তা হলে কাব্যের যুগযুগান্তর নিয়ে তর্ক করার দরকার হয় না। বেশের বদল করেও যদি কাব্যই আবির্ভূত হয় তবে তাকে অভ্যর্থনা করতে কুণ্ঠিত হব না। 'খসড়া' বইটিতে "হাঁসপাতাল" ব'লে যে কবিতা বেরিয়েছে তার লেখার ছাঁদ একেবারেই আমাদের ধরনের নয় কিন্তু তার মধ্যে যে একটি অনুভূতির রহস্যময় ছবি দেখা দিয়েছে তাকে আদর ক'রে মেনে নিতে হবে। কেননা ঠিক এই ছবির বিশেষ রসটা অন্য কোনো ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারত না।

"ঘুম" ব'লে একটা কবিতা দেখলুম। যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে তার অনুভূতি সে আমার কাছে অত্যন্ত নতুন ব'লে ঠেকল। বিশ্বকে কবি বিরাট ঘুমের ভূমিকায় দেখছেন। কালের প্রাঙ্গণে নিখিলের চলাফেরা হচ্ছে কিন্তু তার চৈতন্য নেই। সে যেন একটা চলনশীল ঘুমের মতো। মনে প্রশ্ন ওঠে ঘুম ভাঙবে যখন তখন থাকবে কী। প্রলয় কি রূপহীন গতিহীন শুভ্র শূন্যতা? ভালো-মন্দর ভেদহারা একটা নিঃশব্দ না, যার কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই? মহানিদ্রা-সাগরের মধ্যে অসংখ্য রূপের যে-সব আবর্তন দেখা যায় তারা যাচ্ছে তলিয়ে এই ঘুমের অচেতন তলায়। এদিকে অমরতার নানা উপাধি, যা ঘুমের চেয়ে সত্য নয়— উঠছে মেলাচ্ছে লোকালয়ে লোকালয়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যে পাতা কীটে কাটছে নিমেষে নিমেষে। উপাধি মাথায় নিয়ে

চলেছেন কেউ বা মানুষ-খুন-করা অমর নামধারী, কেউ বা ছড়া-বানানো অমর, কোনো রূপসী মুগ্ধ মনের বিহ্বলতার অমরী। অকূল ঘুমের তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে হাসছেন মহাকাল, এই-সব ভাসমান ফেনাগুলোর উদ্গত অহমিকার দিকে তাকিয়ে। "ঘুম" কবিতা থেকে আমি যা বুঝলুম সেটাই একমাত্র অর্থ কি না জানি নে— কেননা অর্থস্পষ্টতার প্রতি কবির মমতা নেই। এই কবিতাগুলি পড়লে ছায়াপথের সঙ্গে তুলনা মনে আসে, এখানে স্পষ্ট এবং অস্পষ্টের মেলা বসে গেছে। যেখানে অস্পষ্টতার আবরণ সুন্দরীর ঘোমটার মতো বিশেষ রস প্রকাশের সহায়তা করে সেখানে তাকে কবিত্বের খাতিরে মেনে নিতে পারি কিন্তু যেখানে বাণী তার চেয়ে দুর্গমতায় পৌঁচেছে সেখানে মার্জনা করতে পারব না। কেননা যে বচন একেবারেই বোধগম্যতার বাইরে সেখানে যিনি বলছেন তিনিই একমাত্র বক্তা এবং তিনিই একমাত্র শ্রোতা, সাহিত্যের সর্বজনীন সভায় তাঁর স্থান নেই। এর মধ্যে সংকটের কথা এই যে বোধগম্যতার রাস্তা আমার কাছে বন্ধ ব'লেই যে অন্যের কাছেও বন্ধ তার নিশ্চয়তা নেই। সাহিত্যের এই রহস্য চিরদিনই রহস্য থেকে যাবে— এই তর্কের মধ্যে আমরা সকলেই চলে এসেছি, আঘাত পেয়েছি আঘাত করেছি।

বসন্ত আসবে আসবে করছে, বাতাসে শীতের আমেজ আছে। সামনে সকাল বেলার কাঁচা-সোনা-রঙের রৌদ্রে পাণ্ডুবর্ণ আকাশের গায়ে য়ুকলিপ্টসের ঝালর-দোলানো

পাতাগুলো ঝিলমিল ক'রে উঠছে। এরি মধ্যে মধ্যে পাখির কিচিমিচি। টবে অনেক দিনের প্রত্যাশিত বেগনি রঙের ক্যামেলিয়া এইবার ফুটে উঠল ব'লে। বাঁধানো চৌবাচ্চায় জলের ধারে সোনালি মাছের খবর নিতে এসেছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে বক। এই-সমস্ত নিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন প্যাটর্‌নে সাজিয়ে তোলা আমার সকাল বেলা। এই ফর্দ থেকে ঐক্য-বিলাসী মন স্বতই কী কী অবাস্তরকে বাদ দিয়েছে একটু ভেবে দেখলে তার দিশে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ ধ'রে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছিল গোরুর গাড়ির, অবশেষে কাছাকাছি এসে হুড়মুড় করে ঢেলে দিলে এক বোঝা ইঁট। বাগানের ওপারে আধখানা তৈরি পাঁচিল। যতক্ষণ মন ছিল বাগান উপভোগে, ততক্ষণ এটা একেবারে খেয়ালের মধ্যেই আসে নি। তার পরে বেস্পতিবারে হাটে যাবার পথে মাছওয়ালা একটা বড়ো টুকরো রুইমাছ এনেছে ঝুড়িতে, হাত নেড়ে বললুম দরকার নেই। আমার বাগানঘেরা সকালবেলাতে এ কোনো চিহ্নই দিল না। ঝাঁট দিতে এসেছিল মেথর কাঁকরের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, কখন এল কখন গেল সেটা ঠাহরের মধ্যে নেই। হঠাৎ এক সময়ে মনে হ'ল মধুপুর যেতে হ'লে মোটরে আসানসোল পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ধরাই সুবিধে। এরি মধ্যে নেপথ্যবাসী মন বলে উঠছে, হালসিঙ্কি, ফরওয়র্ড ব্লক, চেম্বরলেনের ছাতা। এক মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল একটা কাক রান্নাঘরের আঁস্তাকুড় থেকে একটা কী আমিষের আবর্জনা নিয়ে জামগাছের ডালে বসে চঞ্চু দিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করছে।

তার পরেই চোখ ফিরল টবের দিকে, দেখলুম আরো দুটো কুঁড়ি ধরেছে ক্যামেলিয়ার ডালে। এই সকাল বেলার ছবিতে আপন স্বভাব অনুসারে আমার সচেতন মন অনেক কিছু বাদ দিয়ে আল্‌পনা কেটেছে। অবচেতন মন যা-তা আঁকজোক পাড়ে কিন্তু রেখা-রঙের সমন্বয় ক'রে ছবি আঁকে না। হাল আমলের কবি হয়তো পণ করেন আঁকজোক কিছুই বাদ দেব না, তাতে যেখানে-সেখানে নানা আঁচড়ে ছবির ঐক্যকে যদি অস্পষ্ট করে দেয় সেও স্বীকার। এটা খানিকটা বিজ্ঞানী বুদ্ধি। বিজ্ঞান আর্টের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়— যা কিছু আছে তাদের সমান দাম দিয়ে মেনে নেবার দিকে তার ঝোঁক। আর্টের মধ্যে আছে সম্ভোগের দাবি, আর সায়ান্স সব-কিছুকে নির্বিচারে টেনে আনে। আধুনিক যুগের প্রকাশ-তত্ত্বে আছে এই দুয়ের মিল। তার নমুনা এই দুটি বইয়ের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়। একটি যেমন "সংসার" কবিতায়; বহু টুকরো নিয়ে এর মধ্যে যে একটা গুচ্ছ বেঁধেছে, তার মধ্যে ভাবনা বেদনা স্মৃতি জড়িয়ে গেছে যেমন-তেমন ভঙ্গিতে। সাবধানতা নেই কিন্তু একটা মর্মকথা আছে। এর এই অসাবধান নৈপুণ্যে আঁজলা ভরে ওঠে অনেক কিছুতে। ওর পরের কবিতার নাম "আরোগ্য", কত সহজ, ছোটো কয়েকটা টুকরোয় কী রকম অনলংকৃত সম্পূর্ণতা। "দরজা" কবিতা পড়ে দেখবার মতো। একটুখানি মনে পড়ে আমার নিজের কবিতা "স্বপ্ন", সেইজন্যেই এর স্বাতন্ত্র্য এমন প্রবল ক'রে মনে লাগে, এ আর-এক যুগের ভাষা, আর-এক যুগের দৃষ্টি। এ সদর

রাস্তার ধূলিধূসর কবিতা, এ পরিচ্ছন্ন সভাগৃহের নয়। পড়ে দেখো খসড়ায় "চায়ের বেলা"। ছেঁড়া সুতোর শিল্প। দেখো "পুষ্পদৃষ্টি", বিজ্ঞানের রোমান্স, ধরা পড়েছে কয়েকটি সহজ লাইনে, ঘকুনির অংশ অত্যন্ত অল্প। "যৌগিক" কবিতায় বিপুল বিচিত্র মাটির উপর চার দিকে জড় ও জীবনের মেলামেশার যে আওড় লেগেছে দু-চারটে হালকা কথায় তার ছবি ফুটেছে, এই স্বল্পবাক্‌ বিশেষত্বেই এর রস। কালো জলে পরিচিত বন্দরের দিকে জাহাজ ভেসে চলেছে কেমন তার একটা ইঙ্গিত। সমুদ্রের নীল কারখানা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চাকা উঠছে পড়ছে, পৃথিবীকে বানিয়ে তোলবার মজুরি চলছে দিনরাত্রি, এ বিরাট কলের ধোঁওয়া নেই, আগুন আছে চাপা, ডাইনামো চোখে পড়ে না— জাহাজের মালেক প্রকৃতির কারখানা-ঘর থেকে নিরুদ্ধ বেগ চুরি করে এনে তার বাঁধন খুলছে নিজের প্রয়োজনে। স্বার্থে স্বার্থে লেগে যাচ্ছে মাতামাতি। কবি দেশবিদেশের দিগন্তের হাতছানি দেখে এসেছেন, কেবলমাত্র কলকাতা শহরের গলি-ঘুঁজির নয়। দরকার নেই তার গেঁয়ো রসের গাঁজিয়ে ওঠা তাড়ি জোগাবার।

আরো অনেক কিছু নির্দেশ করবার আছে। সময় নেই, জায়গা নেই। আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে। তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সেই বিদ্রোহ জয়ী হোক এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি আনন্দ পেয়েছি

অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ পরিধি নিয়ে নয়। এ নয় কেবল যৌন রসভোগের উদ্‌বেলতা, এ নয় আঙ্গিকের বিস্ফোরণে ভাষাকে উলটপালট ক'রে দেওয়া। অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য আছে এর মধ্যে— বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে আছে এর সঞ্চরণ।

১৩৪৬

অনিন্দিতা দেবী অমিয় চক্রবর্তীর মাতৃদেবী; 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামে, ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার নারীসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি একদা নিরন্তর লেখনী চালনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; ১৯২১-২৩ সাল মধ্যে লিখিত এই প্রবন্ধগুলি তাঁহার 'আগমনী' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল।

অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নিকটবর্তী হইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনান্তকাল পর্যন্ত সে প্রীতি উভয়ের জীবনেই নানাভাবে ফলবতী হইয়াছিল। অল্প বয়সে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে একান্ত শোকার্ত হইয়া অমিয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনালাভ করিয়াছিলেন, প্রথম চিঠি কয়খানিতে তাহার নিদর্শন আছে। সাক্ষাৎ ও চিঠিপত্রের সূত্রে এই যোগ বিস্তারিত হয়। ছাত্রদশা অতিক্রম করিবার পর ১৯২৬ সালে অমিয়চন্দ্র বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসহকারীরূপে। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণেও অমিয়চন্দ্র একাধিকবার ভ্রমণসঙ্গী হইয়াছিলেন।

১৯৩৩ সালে অধ্যয়নসূত্রে অমিয়চন্দ্র বিদেশযাত্রা করেন। শান্তিনিকেতনে বাসকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কিরূপ একান্ত হইয়াছিলেন ৬৩ ও ৬৪ -সংখ্যক পত্র এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য; অংশত এখানে তাহা উদ্‌ধৃত করা গেল :

"এতদিন পরে আজ তোমরা চলে গেলে কী রকম খারাপ লাগচে বলতে পারি নে। এ যেন মৃত্যুর বিচ্ছেদের মতোই কেবলি মনকে বৃথা আঘাত করচে।... তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিল যে এ বয়সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়।... তুমি আমার অনেক করেচ, অনেক ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়েছ— তোমার

সহযোগিতা আমার পক্ষে বহুমূল্য হয়েছিল সে কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না— কোনোদিন তোমার অভাব পূর্ণ হবে না।…”

ইহার পরের চিঠি—

“অমিয়, তোমার কথা বারবার মনে পড়ে। তুমি আমাকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলে পেয়েছিলে, এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়, এইজন্যে আমি তোমার পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেয়েছি। এরকম সঙ্গ আমি আর কারো কাছ থেকে আশা করিনে।”

বিদেশে বাসকালে ও অধ্যয়ন সমাপ্তির পর দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অমিয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত এই সহকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিই তাহার নিদর্শন। নবজাতক কাব্যগ্রন্থের কবিতা নির্বাচন ও গ্রন্থন অমিয়চন্দ্র করেন, নবজাতক গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে লিখিয়াছেন। আফ্রিকা কবিতা বিশেষভাবে অমিয়চন্দ্রের অনুরোধেই লিখিত। লক্ষণীয় যে, জীবনের শেষ ভাগে দেশের রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বহু ক্ষেত্রেই শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে পত্রযোগে লিখিত।

১৯৩২ সালে পারস্যভ্রমণকালে সঙ্গী অমিয়চন্দ্রের উদ্দেশে একটি রচনায় তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে—

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে আলোকে যায় মিলে।

—

VISVA-BHARATI
LIBRARY

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

দ্বাদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র । দ্বাদশ খণ্ড

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩

শ্রীভবতোষ দত্ত- কর্তৃক সম্পাদিত

© বিশ্বভারতী ১৯৮৬

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭
মুদ্রক শ্রীরমারঞ্জন ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন প্রেস । শান্তিনিকেতন

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী ১
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী ২২৯
অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী ২৩১
রমা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী ২৩৬
ইবিতা দেবীকে লিখিত পত্র ২৩৯
অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ২৪৩
শান্তা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী ২৪৭
কালিদাস নাগকে লিখিত পত্রাবলী ২৬৭, ৩২০ ক-ঝ
সীতা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী ৩২০

পরিশিষ্ট

ক. প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ৩২৯
ছাত্র মুলু ৩৩৫
খ. সি. এফ. এন্‌ড্‌রুজকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩৪৩
গ. রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র ৩৫৯

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-রামানন্দ প্রসঙ্গ ৪৪৩
পত্রধৃত প্রসঙ্গ ৪৪৯
সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী ৫৪৭
বিজ্ঞপ্তি

চিত্রসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ আখ্যাপত্র

ভি. লেসনি, রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ (পশ্চাতে),
এম. উইণ্টারনিৎস ॥ প্রাগ ১৯২৬ ৯০

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩৫১

Gitanjali প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ৪৬৩

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র :
পত্রসংখ্যা ৫৭ ॥ আংশিক পাণ্ডুলিপিচিত্র ৬৮

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

১

[১৮৯৮]

আমি ইতিপূর্ব্বেই প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা লইয়া অভিনন্দনজ্ঞাপন পূর্ব্বক আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। উহার প্রত্যেক গদ্য প্রবন্ধই সুপাঠ্য হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] প্রবন্ধটি সুগম্ভীর চিন্তাপূর্ণ— পাঠ করিয়া যথার্থ উপকার পাইলাম বলিয়া ধারণা হয়। নগেন্দ্র বাবুর গল্পটি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার অসামান্য ভাষা-নৈপুণ্য এবং প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ বলিতে পারি···প্রদীপের মত এমন একখণ্ড বাংলা সাময়িক পত্র ইতিপূর্ব্বে আমার হস্তগত হয় নাই।

২

বোলপুর * ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লিখিতে ভুলিয়াছিলাম জর্ম্মান কাগজগুলি এখানেই পাঠাইয়া দিবেন, সংকলনের উপায় করিব। কতকগুলি সংকলন হাতে আসিয়াছে সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিব। এখানে কবে আসিতে পারিবেন ?

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৫ জুলাই ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার লিখিত ইংরেজি পত্রখানি Modern Review পত্রে ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন—আশা করি বিচারে ভুল করেন নাই।

প্রুফে দ্বিতীয় গেলির শেষপ্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি। ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও পদচ্ছেদ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন আছি— দয়া করিয়া যথেচ্ছা সংশোধন করিয়া দিবেন।

নেপালবাবু কিছু দিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছুকালের

মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে আরো আনন্দের কারণ হইবে।

আশা করি আপনার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ইতি
৯ই শ্রাবণ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ আজ রবিবার বলিয়া প্রুফ রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠানো গেল না— তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি? প্রবাসীর জন্য চারুকে গুটি তিনেক কবিতা পাঠাইয়াছি, এখনো প্রাপ্তিসংবাদ পাই নাই।

৪

[২২ জানুয়ারি ১৯১১ ?]

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুরোধ পালন না করা আমার পক্ষে কঠিন সেইজন্যই আপনার প্রস্তাবে রাজি হইলাম, নহিলে ভিড় করিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। অজিত প্রভৃতি দুই একজন এখানকার দলের লোক ইচ্ছা করেন বক্তৃতার দিনটা বৃহস্পতিবারে না হইয়া বুধবারে পড়ে তাহা হইলে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারেন।

আমি সেই সভায় উপাসনার কাজ করিব না কেবল

আমার যাহা বলিবার তাহা বলিব। কি বিষয়ে বলিব তাহা আগে থাকিতে জানাইয়া দেওয়া কঠিন কারণ আমি যখন মুখে কিছু বলি তখন কি যে বলিব তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানিবার কোনো উপায় আমার হাতে নাই। কিছু লিখিয়া পাঠ করি সে সময় এবং শান্তি নাই। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কুমারস্বামী আশ্রমে আসিয়াছিলেন— তিনি আমার কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন— সেইজন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়াতাড়ি গোটা তিনচার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারস্বামী যদি সেগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিয়া দেন তবে Modern Review পত্রিকায় ছাপাইবেন। তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আসিলে আমার আপত্তির কারণ থাকিবেনা। অজিত কতকগুলি তর্জ্জমা করিয়াছিল— সেও কুমারস্বামীর হাতে আছে— তিনি যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহা আপনি প্রকাশ করিবেন।

কিন্তু স্বকৃত তর্জ্জমার বিড়ম্বনাগুলিকে কুমারস্বামী মাজিয়া ঘষিয়া দিলে তাহাতে অনুবাদক বলিয়া আমার নাম সংযোগ করা সঙ্গত হইবেনা।

ডাক্তার বসু বলিতেছিলেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়ালা ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়াছেন—তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[এপ্রিল ? ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তত্ত্ববোধিনীতে আমার ও বড়দাদার যে লেখা বাহির হইতেছে চারু তাহা প্রবাসীর জন্য চাহিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ দুইটি কতক ছাপানো ফর্ম্মা ও প্রুফ এবং কতক কাপি আকারে পাঠাইতেছি। বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্রবাসীতে দিতে ইচ্ছা করেন ত দিবেন।

আমার বড় মেয়ে একটি ইংরাজি গল্পের তর্জ্জমা করিয়াছেন পাঠাইতেছি যদি পছন্দ করেন ত প্রবাসীতে দিবেন নচেৎ ভারতী প্রেসে পাঠাইয়া দিবেন।

আগামী ১লা বৈশাখে আমাদের আশ্রমে নববর্ষের উৎসব হইবে— সে জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ রহিল। তখন Easter-এর ছুটি আছে। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল— তাহারা এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে— আপনি তাহাদের সহায় না হইলে তাহাদের গতি নাই— এই কারণে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিব এইরূপ ভরসা তাহাদিগকে দিয়াছি।

ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে— এইজন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না— জ্যৈষ্ঠে যাইবে।

বোলপুরে কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতি মঙ্গলবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২৩ মে ১৯১১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি

অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্ব্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল। কিন্তু আগে অজিতের লেখাটা বাহির হইয়া গেলে তাহার পরে এটা প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয়? ভাবিয়া দেখিবেন। আমি ঐ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি। যখন ইচ্ছা করেন পাইবেন।

মাতা শান্তার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি— তাঁহার এই অস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা।

চারুকে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা কম্পোজ হইবামাত্র সেটা ছাপিবার জন্য যেন তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

২৭ মে ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন— তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। ইতিমধ্যে আমি কালীমোহনকে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেন।

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে— সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভাল করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া দেখিবেন— যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্ম্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া

বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রতীক্ষা নামক লেখাটি অল্প স্বল্প সংশোধন করিয়া দিলাম। গোড়ার দিকে দুই চার লাইন বর্ণনা ছিল, যাহা বাহুল্য এবং নিতান্ত দস্তুরমত, সেইগুলি বাদ দিয়াছি। শেষটুকুতেও অল্প একটু হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য আজই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে আপনার পত্রে তাহার উল্লেখ পাইলাম। অবশ্য, এখন নিজের সম্পাদকী দফ্‌তরের জন্যই ইহাদের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। তত্ববোধিনীর রুচি এবং ক্ষুধা দুই সঙ্কীর্ণ অতএব প্রবাসীর জন্যও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে এমন আশা করা যায়। আপাতত কাগজগুলি এই ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। এখানে আমার সঙ্কলনকারী দুই একটি আছে।

কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি— বোধ হয় পাইয়াছেন। আশা করি আমার এই লেখাটিতে আমার শত্রু মিত্র কোনো পক্ষকেই উদ্বেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কিনা। ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[সেপ্টেম্বর ১৯১১ ?]

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কলিকাতায় আমার যাওয়া কোনোমতেই সম্ভবপর হইবে না। এইরূপ যাতায়াতে আমার শরীর ও কাজের প্রচুর ক্ষতি হয়। আশুকে লিখিয়াছিলাম যে যদি শরীরটা ভাল থাকে ত যাইব— এখনো ভাল থাকিবার কোনো লক্ষণ দেখিতেছিনা। এবার রামমোহন রায় সভায় আমার যাওয়া ঘটিবে কি না সন্দেহ। গেলেও বক্তৃতাদি করিতে পারিব না। শক্তিতে কুলাইবে না।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[৩১ অক্টোবর ? ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। বোধ করি সবসুদ্ধ এক ফর্ম্মার অধিক হইবেনা। আমার ইচ্ছা প্রবাসীতে এই প্রবন্ধটি ছাপা হইলে সেই সঙ্গে চটি আকারে ইহাকে বাহির করিয়া চার পয়সা দামে বিক্রয় করা হয়। ছাপিবার খরচ বোধ করি বেশি হইবে না— সে খরচটা বিক্রয়ের মূল্য হইতে তুলিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা সুলভ চটি আকারে প্রচার করিলে উপকার হইতে পারে। যদি আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি থাকে তবে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। লাভের টাকা এইরূপ সুলভ পুস্তিকা প্রকাশকার্য্যেই নিযুক্ত করা যাইবে।

এখনো নদীর উপকূল পথ গুণ টানিয়া চলিবার পক্ষে সর্ব্বত্র সুগম হয় নাই অতএব শিলাইদহের নিকটেই পদ্মার চরে বোট বাঁধিয়া থাকিব। প্রুফ ও পত্রিকা প্রভৃতি “শিলাইদা, নদিয়া” ঠিকানাতেই পাঠাইবেন।

শান্তা ও সীতাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন ইতি মঙ্গলবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

৪ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ সেই নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় লেখাটা শেষ করিয়াছি— যদি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব কিন্তু রেজেষ্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবেনা— প্রায় এক ফর্ম্মা হইবে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই যে পুস্তিকা প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিবেন না। যে সকল প্রবন্ধ জনসমাজের বিচার-বুদ্ধিকে আঘাত করিয়া উদ্বোধিত করিবার উদ্দেশে লিখিত সেগুলি এইভাবে প্রচার করিলে যদি কোনো উপকার প্রত্যাশা করেন তবেই চেষ্টা করিবেন। আর একটি কথা মনে রাখিবেন আপনি নিজে যে প্রবন্ধগুলিকে যোগ্য মনে করিবেন সেইগুলিই ছাপিবেন। আমি এ সম্বন্ধে কোনো বিচার করিতে পারিব না। আপনার মনে যেটা ভাল লাগিবে অর্থাৎ যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেইটেই নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। আমার সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আপনার এই অধিকার রহিল— যাহা প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অন্যত্র। কিন্তু আপনি লেশমাত্র সঙ্কোচ মনে রাখিবেন না। আপনি যদি কোনো প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি তাহাতে কিছুমাত্র রাগ করিবনা।

নিবেদিতা আমার "কাবুলিওয়ালা"র যে ইংরেজি তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।

Mrs Shomeকে আপনি বোধহয় জানেন। তাঁহারই এক কন্যাকে বৌমার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবার কথা চলিতেছে— যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায় তবে আপনাকে জানাইব। ইতি ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

৯ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জয়-পরাজয়ের তর্জ্জমাটি আমার ভাল লাগিল। কেবল দুই এক জায়গায় প্রুফের মার্জ্জিনে আমি দুই একটা suggestion দিয়াছি আপনি বিচার করিয়া যথাবিহিত করিবেন। দুই একটা বাক্য কানে কেমন দুর্ব্বল ঠেকিয়াছে কিন্তু তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

নিবেদিতার কাবুলিওয়ালা কাল বিকালে পাইয়াছি। যদিচ রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠানো তবু সেটির খাম ছিঁড়িয়া খুলিয়া আবার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ তিনখানি খুলিয়া জোড়া

চিঠি ইতিমধ্যে পাইয়াছি। বেশ বুঝা যাইতেছে আমাদের রাজকীয় শনির সন্দেহদৃষ্টি ইতিমধ্যে আমার প্রতি তীক্ষ্ণভাবে পড়িতেছে। চাণক্য রাজাকে বিশ্বাস করিতে বারণ করিয়াছেন বেশ দেখা যাইতেছে রাজায় প্রজায় বিশ্বাসের সম্বন্ধটা রাখিবার আশা করাই দুরাশা।

আমাদের বিদ্যালয়ের পরেও এতদিন পরে গোপনে রাজদণ্ডপাত হইয়াছে। হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গের রাজকর্ম্মচারীদের ছেলেরা বিদ্যালয় হইতে সরিতে আরম্ভ করিতেছে। এমন কি, টেলিগ্রাফযোগে তাহাদিগকে সরানো হইতেছে। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতিই একান্তভাবে লক্ষ্য রাখিয়া আমি ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও বিদ্যালয়ে কোনোপ্রকার অশান্তিকর আলোচনা ঘটিতে দিই না। বস্তুত আমি ছাত্রদের মন সেদিক হইতে একেবারে ফিরাইয়া দিয়াছি— সেজন্য আমাকে নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ধর্ম্মপ্রচার হউক অথবা অন্য যে কোনো হিতকর্ম্মই হউক্— কোনো কিছু গড়িয়া তুলিতে গেলেই দেশের রাজার নিকট হইতে বাধা পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে মুখামুখি একটা বোঝাপড়ায় নামা যাইবে সে রাস্তাও বন্ধ— মেঘনাদের মত মেঘের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যখন রাজশক্তি অস্ত্রপাত করে তখন তাহার জবাব দিবারও যো নাই নিজেকে বাঁচাইবারও পথ বন্ধ। এইপ্রকার ভীরু প্রণালীতে প্রজাদের সমস্ত হিতচেষ্টাকে দলন করিবার উদ্যোগের মত এমন হীনতা এবং দীনতা কি আছে। ইহাতে যে প্রজাকে শাসন করা হইতেছে রাজা তাহার চেয়েও

নিজেকে নীচে আনিয়া ফেলিতেছে। গুপ্তচর বিদূষকের দল যেখানে রাজাকে কানে ধরিয়া চালাইতেছে সেখানে রাজ্য-শাসনের সেই নিদারুণ প্রহসন কোন্ দানবীয় অট্টহাস্যে গিয়া সমাপ্ত হইবে!

যাহা হউক, দুই অসমপক্ষের এই অন্যায় লড়াই যতদিন চলিতে পারে চলুক্। দুঃখের মধ্য দিয়া পরাভবের মধ্য দিয়াও যিনি সারথি তিনি গম্যস্থানে লইয়া যাইবেন— ইতিমধ্যে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের যা কর্ত্তব্য তাহা করিব। হারিলেও ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে থাকিবেন— সেইখানে আমাদের জিত।

গবর্মেণ্টের এই গুপ্ত ছুরির আঘাতে কি পরিমাণে আমাদের রক্তশোষণ করিতে পারে তাহা আর কিছুদিন গেলে বুঝিতে পারিব। কিন্তু এই অন্যায়ের ছুরির বাঁট নাই— যে আঘাত করে সে কখনই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। ইতি ২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে।

"রূপ ও অরূপ" বলিয়া একটি লেখা প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়াছিলাম— পাইয়াছেন কি ?

হেমলতা বৌমার কবিতাটি আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য জ্ঞানের নিকট দিয়াছিলাম— পান নাই কি ?

আপনার প্রেরিত কাগজগুলি ষ্টেশনেই পাইলাম সুতরাং সঙ্গেই আসিয়াছে তাহার একটা সদ্গতি করিবার চেষ্টা করিব।

গল্প সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব ত আমার কাছে ভালই ঠেকিতেছে। ১১ই মাঘের পূর্ব্বে গল্প লেখায় হাত দেওয়া ঘটিবে না। ইতি শুক্রবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

[ডিসেম্বর ১৯১১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দীর্ঘকাল কন্যার পীড়ার উদ্বেগে Theistic Conference-এর জন্য "ধর্ম্মশিক্ষা" প্রবন্ধটি লিখিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া সেটি লিখিয়াছি। কিন্তু এখানে নিরুদ্বেগ অবকাশ এত বেশি যে প্রবন্ধটি বিনা বাধায় যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এত বড় বাংলা প্রবন্ধ কনফারেন্স্ সভায় পাঠ করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যদি সময় থাকিতে লেখা শেষ করিতে পারিতাম তবে ইংরেজি অনুবাদের চেষ্টা করিয়া ওটাকে বিদেশীদের কাছে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যাইত। কিন্তু আর তাহার সময় নাই। অতএব যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে লেখাটা আর কোনো সময়ে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে পড়িয়া চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে ভাবিয়াছিলাম লেখাটা পাঠাইয়া দিব তাহার পরে আপনারা যা খুসি করিবেন কিন্তু তাহার চেয়ে নিজে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষালন করাই ভাল। কাল সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিতে চেষ্টা করিব। মঙ্গলবার আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে। কি বলেন? মঙ্গলবার সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হইতে পারিবে কি? যদি জোড়াসাঁকোয় ইহার উত্তর পাঠাইয়া দেন তবে কাল সন্ধ্যার সময়েই পাইব। ইতি রবিবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

[জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বড়দিদির লেখা পাঠাইলাম। "ধর্ম্মের অধিকার" লেখাটার প্রুফ একবার দেখিতে দিবেন— তাহার মধ্যে কাটাকুটি জোড়া-তাড়া অনেক আছে— ভুল থাকিতে পারে। ইতি শনিবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে— কেননা তাঁহাদের দুইজনের কাছ হইতে বিপদে আপদে অর্থের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিবে।

আমি এখানে থাকিতে থাকিতে আপনি কি দুই একদিনের জন্য এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? আমি বোধহয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিতে পারি। একবার

যদি আসা সম্ভব হয় তবে আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন। যদি ব্যাঘাত না থাকে তবে কবে আসিতে পারেন জানাইবেন। ইতি ২৬শে মাঘ ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনস্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ানো চলিতেছে। আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— আর ২০।২২ দিন লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আপনি যদি "জীবনস্মৃতি"র সমস্ত কাপি আমার কাছে রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপরে শেষ তুলির পোঁচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। সীতার ইচ্ছা জীবনস্মৃতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিই— তাহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুলা একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

[১৩১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সেই পাঠ্যবহিটার কাপি পাঠাই। ইহার সঙ্গে গোটা দুই তিন গল্প যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে “রাসমণির ছেলে” একটি এবং “গুপ্তধন” একটি। গুপ্তধন গল্পটি “আটটি গল্পে” পাইবেন, আরও গল্প যদি দেওয়া দরকার বোধ করেন তবে সেই আটটি গল্প হইতে বাছিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য যদি এই কাপির মধ্যে কোনো কারণে কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন আবশ্যক বোধ করেন তবে কুণ্ঠিত হইবেন না। বইয়ের নাম কি হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাঁচি। নামকরণ আমার আসে না।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

[১৩১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল রেজেষ্ট্রি ডাকে আপনাকে সেই সংকলিত স্কুল বইয়ের কাপি পাঠাইয়াছি। তাহার মধ্যে রাসমণির ছেলের গল্পটা দিতে বলিয়াছি। কিন্তু আমার বোধ হয় সেটা না দেওয়াই

ভাল। কারণ এই নূতন গল্পটি আর একটি বইয়ে ছাপান হইতেছে এবং এ বইটি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি— ইহা পব্লিশরের হাতে দিই না— সে বই হইতে গল্প চুরি করিয়া আমাদের বিদ্যালয় কেন নিজেকে নিজে ঠকাইবে? আপনি আটটি গল্প বই হইতে অনধিকার প্রবেশ, কাবুলিওয়ালা, সাক্ষ্যদান প্রভৃতি তিন চারটি গল্প বাছিয়া লইয়া এই বইয়ের মধ্যে পুরিয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না এবং সেই ছোট ছোট গল্প ছেলেদের পড়িবার পক্ষেও সুবিধা হইবে। কি বলেন? জীবনস্মৃতির প্রুফটা পাঠাইবেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১
[১৯১২]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল শিলাইদহে যাওয়া হয় নাই। হয় ত আগামী কাল রাত্রে যাইব।

যদি এবারকার জীবনস্মৃতির ফাইল প্রস্তুত না হইয়া থাকে তবে অসংশোধিত প্রুফ পাইলেও চলিবে। অমনি আষাঢ়ের কাপি পাঠাইবেন, হয় ত কিছু যোগ করিতে হইবে। জীবনস্মৃতি

বই ছাপার কাজ কাপি অভাবে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। বৃহস্পতিবার।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

শিলাইদহ, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের জীবনস্মৃতি পাইলাম, সীতাকে এই খবরটা দিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। কিন্তু চৈত্রের প্রুফ ত পাইলাম না— সেইটেই সর্ব্বাগ্রে দরকার।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রুফটা সম্বন্ধে ডাকেই যদি ডাকাতি হইয়া থাকে তবে আর একখানা পাঠাইবেন

২৩

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ প্রুফ পাইলাম। ইহার শেষ প্যারাগ্রাফটায় কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। আজই তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধা হইল না, কারণ, হাতে এখন একটা অন্য লেখার উপসর্গ আছে। "ভগ্নহৃদয়" শীর্ষক এই প্যারাগ্রাফটি বৈশাখের কিস্তিতে চালাইয়া দিবেন। সেই হইলেই ঠিক ভাল হয়— চৈত্রের শেষে ওটা ঠিক সঙ্গত হয় নাই— তাই এই প্যারাগ্রাফটা কাটিয়া রাখিলাম।

সেই বইটার নাম "পাঠসঞ্চয়" দিলে কেমন হয়? যে প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়াছি তাহার মধ্যে কোনোটা যদি অনুপযুক্ত মনে করেন তবে বাদ দিয়া দিবেন।

"জীবনস্মৃতি"র শেষের কথাগুলা মোটামুটিভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয়দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? বিশেষত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি— এটা লিখিতে সময় যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। দেখা যাক কতদূর কি হইয়া দাঁড়ায়। ইতি ১৩ ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

৭ মার্চ ১৯১২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পাঠসঞ্চয় লইয়া ত বিপদে পড়া গেল। গ্রন্থাবলী ঘাঁটিয়া ছেলেদের উপযোগী আর একটি প্রবন্ধও পাওয়া গেলনা। এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবাসীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল সঙ্কলন চলিয়াছে তাহার মধ্য হইতে আমার লেখা, এবং মীরার ও হেমলতা বৌমার লেখা হইতে বাছিয়া যতগুলা প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ করেন জুড়িয়া দিবেন। সেই প্রবাসীগুলি হাতের কাছে থাকিলে নিজেই দেখিয়া দিতাম। স্মরণশক্তির অবস্থাও এমন যে কখন কি লিখিয়াছি তাহা মনেও নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকার দুই একটা ইস্কুল সম্বন্ধে কিছু যেন লিখিয়াছিলাম। এমন আরো কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। ইহাতে যদি না কুলায় তবে আর ত উপায় দেখি না। তাহা হইলে অগত্যা প্রাইভেট পড়ার জন্যই এই পাঠসঞ্চয়টা তৈরি করিতে হইবে।

আমার প্রবন্ধপাঠসভায় সভাপতি কে হইবেন সেটা বিচার করিয়া স্থির করিবেন। আশুর কথা ত পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—আশু মুখুয্যে মশায়ের কথাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন—তিনিও ত বিচারক মানুষ। অবশ্য আমার মতামত তাঁহার কাছে কেমন ঠেকিবে তাহা জানি না। সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে সমস্ত বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া

দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে বাড়ি চলিয়া যাইতে পারেন— এইটেই ভাবনার কথা। যাঁহার কথায় জবাব চলে তাঁহাকে ভয় করা কাপুরুষতা, কিন্তু সভাপতি যদি বিমুখ হন তবে সভার শেষ মুহূর্ত্তটা রামমোহন রায়ের গানের "শেষের সে দিন"-এর মতই ভয়ঙ্কর— কারণ, তখন "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

আগামী সোমবারে চাটগাঁ মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি। দেখা হইলে সকল কথা আলোচনা হইবে। ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

২১ এপ্রিল ১৯১২ ●

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামী মঙ্গলবারে অভিনয়। এখানে বেশ ঠাণ্ডা আছে— বোধ হয় কলিকাতা হইতে আসিয়া উপকার বোধ করিবেন। শাস্ত্রীরা আসিতে পারিলে খুব খুসি হইব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

১৩ মে ১৯১২

ওঁ শিলাইদা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কয়েকদিন থেকে আবার অসুস্থ বোধ করচি। জীবনস্মৃতি শ্রাবণের কিস্তিতে শেষ করে দিয়েছি— দেখলুম আর লেখবার সময়ও পাব না— ক্রমে জটিলতার অরণ্য ভেদ করে কলমও চলবে না।

লোকেনকে লিখে দেখব। আজকাল সে লেখায় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে কি হয় বলা যায় না।

এখান থেকে ৭ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ও বোধ হয় ১০ই বোম্বাই রওনা হব।

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। সীতাকে বলবেন শ্রাবণের জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিটা তাঁর কাছেই পাঠাব— সেটা আর এক ব্যক্তির দ্বারা কাপি করিয়ে নিয়েছি। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭
২৭ জুন [১৯১২]

ওঁ

3 Villas on the Heath
Vale of Health
Hampstead
London. N. W.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লণ্ডনে একটু ফাঁকা জায়গা দেখিয়া একটা বাসা করিয়াছি। ছয় সপ্তাহ এখানে থাকিয়া তাহার পর বাহির হইয়া পড়িব।

এখানে আমি সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যিকদের চক্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। আমরা কবিতা ও গল্পের ইংরেজি তর্জ্জমা প্রকাশ করিবার জন্য ইহারা অকৃত্রিম উৎসাহের সহিত অনুরোধ করিতেছেন। আমার ভাল গল্পগুলির মাঝারি রকমের তর্জ্জমা খাড়া করিয়া দিলে ইহারা যত্নপূর্ব্বক মাজিয়া ঘষিয়া লইবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন— এবং ভাল Publishers পাওয়া যাইবে এমন আশা পাওয়া গেছে।

Modern Reviewতে যে কয়টি বাহির হইয়াছিল পাঠাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া আর কিছু কি করা যাইতে পারে?

Modern Review এবারে পাই নাই। এখানে Ludgate Circus ঠিকানায় Thomas Cook & Son-এর কেয়ারে পাঠাইলেই আমি পাইব। দয়া করিয়া চারুকে বলিয়া দিবেন।

এ পর্য্যন্ত আমার শরীর ভালই আছে।

প্রবাসীর জন্য পথ হইতে দুইটি লেখা পাঠাইয়াছি

আশা করি শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া সেগুলি আপনার হস্তগত হইয়াছে। এখানে এমন আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছি যে লেখার অবকাশ পাওয়া শক্ত হইয়াছে।

শাস্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। আশা করি আপনার শরীর ভাল আছে। ইতি ২৭শে জুন [১৯১২]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮
৭ অক্টোবর ১৯১২

এখন হইতে আমার ঠিকানা

ওঁ C/o Prof. Seymour
Urbana.
Ilinois
U. S. A.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা আপনার পত্রে বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিলাম।

আমার মনে হয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন জানাইয়া অভিভাবকদের নিকট মাসিক আরো দুই টাকা বেতন দাবি করার সময় আসিয়াছে। ইহাতে সকলেই সম্মত না হইতে পারেন কিন্তু যাঁহাদের অবস্থা ভাল তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে

পারেন। বর্ত্তমানে যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের অভিভাবকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ২০ টাকা বেতন যদি না দেন তবে তাহাদিগকে রাখিতেই হইবে কিন্তু ভবিষ্যতে ২০ টাকার কমে ছাত্র লওয়া হইবে না এইরূপ নিয়ম করা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপকদের বেতন কম করিবার প্রস্তাব করা আমি ঠিক মনে করি না। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজে হইতে কিছু কি ত্যাগ করিবার কথা বলিতে পারেন না? উঁহাদের মধ্যে কেহ একজন দৃষ্টান্ত দেখাইলেই পথ সরল হইতে পারে।

আমি জানি না আমাদের বিদ্যালয়ের বেতনের হার অন্যত্র অপেক্ষা বেশি কিনা কিন্তু আমি ইহাদের কাহারও কাছে কিছু দাবি করিতে পারি না। ত্যাগ করিবার দাবি একমাত্র আমারই উপর আছে— বিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব যথার্থভাবে আমারই গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ আমি অন্যের কাছে হাত পাতিতে পারি না। অতএব বিদ্যালয়ে অনটন যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে আমারই অপরাধ আছে— সেজন্য আমি অন্যকে দণ্ডনীয় করিব কি করিয়া? অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদায় করা একটা পন্থা বটে কিন্তু তাহা হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্যয় বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কারণ তাঁহারাই বিদ্যালয়ের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

যেমন করিয়া হোক একদিন ইহার সমস্ত দায় আমাকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে একথা মনে মনে ভাবিয়াছি।

অবশ্য আমার সামর্থ্যেরও সীমা আছে— সে সীমা যে বেশি দূরে তাহা নহে— কারণ, আমি ঋণে মগ্ন। তা ছাড়া আমার আয়ুর চেয়ে বিদ্যালয়ের আয়ু বেশি এই কথাই ধরিয়া লওয়া উচিত— অতএব আমার আয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের আয়কে এক করিয়া দেখিলে এক দিন বিপদ ঘটিবেই।

আসল কথা, যে জিনিষের প্রয়োজনকে সকলে সত্যভাবে স্বীকার না করে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখা বিড়ম্বনা। যেটুকু আমার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে সেইটুকুই যদি সত্য হয় তবে সেই শক্তির শেষ পর্যন্তই চলুক। দেশালাই জ্বলে বাতিকে জ্বালাইবার জন্য, কিন্তু বাতি যদি না জ্বলে তবে দেশালাইয়ের শেষটুকু পর্য্যন্ত জ্বলুক— ততক্ষণ যতটুকু পথ পার হওয়া যায় ততটুকুই ভাল।

বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথা শুনিয়া দেশে ফিরিবার জন্য আমার মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার বন্ধুরা বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমার বই ছাপার ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের আয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বই বিক্রি করিয়া কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস করিবার ভরসা আমার চলিয়া গিয়াছে।···

আমেরিকায় যাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। সেখানে কিছু সুবিধা হইতে পারে কিনা দেখিব। কিন্তু ভিক্ষা করিবার বিদ্যা আমি একেবারেই জানি না— এবং দেশের কাজের জন্য বিদেশে ভিক্ষার ঝুলি বাহির করিতে আমার অত্যন্ত লজ্জা

করে। অতএব আমার বিশ্বাস ঝুলিটা লুকানোই থাকি[ে]ব এবং যখন ফিরিয়া আসিব তখন শূন্য হাতেই ফিরিব।

জোর করিয়া বলিতে পারি না তবে আন্দাজে বলিতে পারি হয় ত হাজার খানেক টাকা নূতন বাড়ি তৈরি করিবার জন্য পাঠাইতেও পারি কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যা পূরণ হইবে? অন্তর্যামী, যিনি অন্তরে বসিয়া বাহিরে ফল দিয়া থাকেন তিনি দেখিতেছেন আমাদের তপস্যা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবেন না। যাহার আয়ু নাই তাহাকে মরিতে দিতেই হইবে। বাহিরে যে টানাটানি দেখিতেছেন সেটা অন্তরের টানাটানির বাহ্য লক্ষণ মাত্র। বাহির হইতে জোড়াতাড়া দিয়া একটা ইস্কুলকে খাড়া করিয়া রাখা চলে কারণ তাহা প্রাণের জিনিষ নহে কিন্তু আশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখা চলে না। অতএব, যদি সামর্থ্য না থাকে তবে লোভ করিব না— আমাকে জবাব দিলেও তাঁহার সেবকের অভাব ঘটিবে না এই কথাই মনকে বুঝাইয়াছি। ইতি ২১শে আশ্বিন ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুবার সঙ্গে আমার দেখা
হইয়াছে। ভালই আছে।
রোটেনস্টাইনকে অনুরোধ করিয়া

২৯

২ ডিসেম্বর ১৯১২

ওঁ

508 W. High Street.
Urbana
Illinois
U. S. A.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পাঠসঞ্চয় ত চলিল না। অতএব লাভের হিসাবটা এখন আলোচনা করিবার বিশেষ কোনো তাড়া নাই, আপাতত, ওটা ছাপার খরচ সম্বন্ধে বোধ হয় বিবেচনা করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। সেটা ত চাপা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। কত খরচ হইয়াছে সে খবরটা জানাইবেন। নূতন ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা করা সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়া দেখিবেন এবং পুরাতন ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছেও একবার দরবার করিবার কথা ভাবিয়া দেখিবেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলি আশা করি কোনো ব্যবসাদার ইংরেজ প্রকাশক গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবে এবং সেই সঙ্গে আমার তরফেও আমি কিছু প্রস্তাব করিব— যদি সুবিধামত আপোষ হইয়া যায় তাহা হইলে কিছু পাইতে পারি। কিন্তু এদিকে আমি এক কীর্ত্তি করিয়া বসিয়াছি— বোলপুরের নিকটবর্ত্তী সুরুলের বাড়িটি সিংহদের কাছ হইতে আট হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া বসিয়া আছি এবং সেই দেনাটা শোধ করিবার চিন্তাও করিতেছি। গীতাঞ্জলি হইতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু যদি পাওয়া যায় তবে ঐ দেনাটা কালক্রমে শোধ হইবার আশা আছে। ইতিমধ্যে ঐ বাড়িটা

বিদ্যালয়ের ব্যবহারে লাগাইবার কথা ভাবিবেন। রথী ফিরিয়া গেলে ঐখানে তাহার ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া ঐ সূত্রে তাহার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্রকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার সংকল্প আমার মনে আছে। রথীর ফিরিবার বিলম্ব আছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ এত দিনে পাইয়া থাকিবেন। Times এবং Nationএ তাহার ভাল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। বই সম্বন্ধে ইংরেজ পাঠকদের কাছ হইতে দুই একখানা পত্রও পাইতেছি। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল রাত্রে বষ্টনে আসিয়াছি। পথে আপনার পত্র পাইলাম। রচেষ্টারে উদারমতি ধর্ম্মসম্প্রদায়দের একটি কন্‌গ্রেস ছিল, সেখানে আমি আহূত হইয়াছিলাম। কুড়ি মিনিট সময়ের মেয়াদে Race Conflict সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য আমার প্রতি অনুরোধ ছিল। সেখানে জর্ম্মনির প্রসিদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ Eucken ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়া আমি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছি। তিনি

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এবারকার ডাকে সন্তোষকে পাঠাইয়া দিয়াছি। Manchester Guardianএ Lascelles Abercrombie যে সমালোচনা লিখেছেন সেটা বোধ হয় দেখেছেন। বোধ হয় কালীমোহন তার এক কপি বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। সেটা পড়লে আপনারা খুসি হবেন। যিনি লেখক তিনি ইংলণ্ডের কবি ও সমালোচকদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছেন। আমার সব চেয়ে এইটে আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় যে ইংলণ্ডের আধুনিক কবিসম্প্রদায় এমনতর অকুণ্ঠিত ঔদার্য্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের কবিকে উচ্চ আসন দিয়েছেন।

আমি এখানকার সভায় পড়বার জন্যে গোটাকতক ইংরেজি বক্তৃতা লিখেছি। তার একটা শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছি। সেখানকার শ্রোতাদের ভাল লেগেছে। সম্ভবত এখানেও পড়তে হবে। তার পরে Wisconsin, Iowa, Perdue এবং Michigan বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। অর্থাৎ এদেশে যতদিন আছি এগুলো পড়তে হবে। যদি সময় পাই তাহলে আরো গোটাকতক লিখব। তার পরে ইচ্ছা আছে ইংলণ্ডে যখন ফিরে যাব তখন সেখানেও একবার এই প্রবন্ধগুলো যাচাই করে নেব। এখানকার লোকেরা যতই ভাল বলুক এদের বিচারশক্তির উপর আমার শ্রদ্ধা নেই — দেখেছি এখানে নিতান্ত সস্তা জিনিষও উচ্চ মূল্যে বিকিয়ে যায়। আমাদের দেশের কত অযোগ্য লোক এখানে বক্তৃতা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করচে। তাদের দ্বারা দেশের গুরুতর অনিষ্ট হচ্ছে।…

যাই হোক্ একবার ইংলণ্ডের হাটে পরীক্ষা না করলে আমার এই ইংরেজি রচনাগুলির ঠিক ওজন বুঝতে পারচি নে। আপনারা আমাকে হাজার অভয় দিন তবু বিদেশী ভাষা ব্যবহার করবার সঙ্কোচ সহজে ঘুচতে চায় না। এদেশে পাঁচ ছয় বছর থেকে ভাষার সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেলে তবে অসঙ্কোচ হতে পারতুম। যাই হোক আমার ইংরেজি গদ্য লেখা এখন কোনো কাগজে পাঠাতে ইচ্ছা করিনে— এখানকার কাগজে ছাপাবার জন্যে বারবার অনুরোধ পেয়েছি কিন্তু সে কাটিয়ে দিয়েছি। Rochesterএ যে ছোট্ট প্রবন্ধ পড়েছিলুম সেটা পাঠাচ্চি কিন্তু তাতে পদার্থ কিছুই নেই— যদি ছাপাবার যোগ্য মনে করেন ত ছাপাবেন। এখানকার এই অহরহ ঘোরাফেরা চলাবলায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি— এর থেকে কবে উদ্ধার পাব তাই ভাবচি। শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৩

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

ফেব্রুয়ারি ১৯১৩

Felton Hall
Cambridge. Mass.
Boston

ফাল্গুন ১৩১৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছি। গতকল্য The Problem of Evil সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। শ্রোতারা বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Woods আমাকে বলিতেছিলেন যে ভারতবর্ষ হইতে অনেক অযোগ্য লোক আসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ দেশে বক্তৃতা করিয়া থাকে— ইহাতে এমন অবস্থা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের কেহ বক্তৃতা করিবে শুনিলে শ্রোতা দুর্লভ হইয়া উঠে। একদা ভারতবর্ষের প্রতি এ দেশের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এখন ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে।··· ইহারা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু এ দেশের নিকট ইহারা আমাদের দেশকে অপমানিত করিতেছেন। দেশে আমাদের সম্মান নাই বিদেশেও যদি আমাদের মাথা হেঁট করিতে হয় তবে আমাদের কি দশা হইবে।

পাঠসঞ্চয়ের ছাপাই খরচের দেনা শোধ করিয়া দিবার জন্য কলিকাতায় লিখিয়া দিতেছি। বোধহয় আমাদের বিদেশভ্রমণের ব্যয় জোগাইতে গিয়া আমার তহবিলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা

শোচনীয় হইয়াছে— অতএব ৩।৪ মাসিক কিস্তিতে যদি এ দেনা শোধ হয় তাহা হইলে কি অসুবিধা হইবে? এ বই কি বিক্রয়ের কোনো প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারিবে না? আমাদের বিদ্যালয়েও কি ইহা পাঠ্যরূপে চলিবে না? যদি কিছু কিছু বিক্রয় হয় তবে তাহা হইতে এই খরচের দেনার পরিমাণ টাকা আমাদের খাতাঞ্চি যদু চাটুয্যেকে দিতে বলিবেন। দেনা শোধ হইলে বিদ্যালয়কে দেওয়া যাইবে।

এখানে অনেকে আমার বিদ্যালয় সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন— হয়ত এখান হইতে সাহায্য লাভ করা অসম্ভব হইবে না। কেবল মুস্কিল এই যে দশ জনের কাছে প্রচার করিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। নিজের দেশের কাজের জন্য এ দেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে এত লজ্জা বোধ হয় যে আমি মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া অভাব জানাইতে পারি না। আমি যদি আর একটু মুখর ও প্রখর হইতে পারিতাম তবে এখান হইতে সকল অভাব মোচন করিয়া ফিরিতে পারিতাম— কিন্তু আমার দ্বারা সে বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আমি আমার “পুরস্কার” কবিতার কবির মত শুধু বোধ করি মালা হাতে করিয়াই ফিরিব— যদিও নেপালবাবু আমার স্কন্ধে মোহরের থলি দেখিবার জন্য পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

১ মে ১৯১৩

ওঁ

37 Alfred Place West
South Kensington
London S. W.

1 May 1913

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া বুবা এবং প্রশান্ত দুই জনের সঙ্গেই দেখা হইয়াছে। বুবা আমাদের বাসার কাছাকাছিই থাকে এবং প্রশান্তও বোধ হয় আজকালের মধ্যে এই পাড়ায় আসিয়া আশ্রয় লইবে। এখানকার দুই চারি জন ভাল লোকের সঙ্গে যাহাতে বুবার আলাপ পরিচয় হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিব। বাহিরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস একেবারেই নাই বলিয়াই এখানকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ করা আমাদের ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সকলেই বাসার মধ্যে পড়িয়া পড়া মুখস্থ করে— দেশকে ও দেশের লোককে চেনে না। সে হিসাবে আমাদের কালীমোহন ইংরেজি শিক্ষায় যথেষ্ট কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও এখানকার অনেক ভাল লোকের দলে মিশিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের কাছ হইতে সকল বিষয়েই উপকৃত হইয়াছে।

Race Conflict প্রবন্ধটি আপনাদের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছি তাহার মধ্যে একটি Hibbert Journal ও

একটি Quest পত্রিকায় দিয়াছি। এই দুটি পত্রই Quarterly সুতরাং জুলাই মাসে বাহির হইবে। এখনো প্রবন্ধগুলি এখানকার কেহ দেখে নাই। আগামী ১৯শে মে তারিখ হইতে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বক্তৃতা Quest Societyর সভায় পাঠ করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছি। অর্থ ও খ্যাতির লোভে কৃপণতা করিতে ইচ্ছা করি না— অতএব প্রথম প্রবন্ধটি Modern Reviewর জন্য পাঠাইতেছি। এটি Chicago Universityতে প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ইংরেজির কোনো গলদ থাকে দৃষ্টি রাখিবেন— কেন না ইংরেজি ভাষাটা আমি না জানিয়া আন্দাজে লিখি। এ প্রবন্ধগুলি আমি কানের অভ্যাসে লিখিয়াছি এবং এ দেশের শ্রোতারা কানে শুনিয়া ভাল বলিয়াছে— কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার উপরে ইস্কুল-মাষ্টারী চোখ পড়ে নাই। একজন ইংরেজ একবার চোখ বুলাইয়াছিলেন তিনি কেবলমাত্র গোটাকতক articleএর বাহুল্য বর্জ্জন ও অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকটা অব্যয় প্রয়োগের ত্রুটিও মার্জ্জনা করিয়াছেন। অতএব অনুমান করিতেছি একেবারে চমক লাগাইয়া দিবার মত ভুল ইহাতে নাই।

চৈত্র মাসের প্রবাসী আমি এখনো পাই নাই— বোধ করি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়া গোলমালে মারা গিয়াছে। বাংলা লেখা অনেক দিন বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছি। ইংরেজিও যে বিস্তর লিখিতেছি তাহা নহে। নিতান্তই কুঁড়েমিতে ধরিয়াছে। বোধ করিতেছি এটা অনাবশ্যক কুঁড়েমি নয়।

শান্তা সীতাকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

ইতি ১৮ই বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২২ মে ১৯১৩

ওঁ

C o Messers Thomas Cook & Son
Ludgate Circus
London
২৯ বৈশাখ ১৩২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দূর হইতে আপনি বুবার জন্য যে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন তাহার অনেকটা অমূলক। আপনি তাহার প্রতি নিশ্চিন্ত চিত্তে আস্থা স্থাপন করিবেন এবং তাহার সম্বন্ধে আপনার মনে কোনো সংশয় আছে একথা তাহাকে বলিবেন না। তাহার ইচ্ছা, চেষ্টা ও শক্তির প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আছে ইহা জানিতে পারিলেই সে যথার্থ বল পাইবে। এখানকার কোনো লোকের প্রতি তাহার অভিভাবকতার ভার দিলে নিজের সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ববোধ শিথিল হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বুবার এখানে আসা যে ব্যর্থ হইবে না এ আশ্বাস আমি আপনাকে দিতে পারি।...

ইতিমধ্যে আমার আরো অনেকগুলি অনুবাদ জমা হইয়াছে। এইবার ম্যাকমিলানদের সহযোগে সেগুলি প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে। গীতাঞ্জলি এখানে সর্ব্বত্রই যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা আমার আশার অতীত হইয়াছে।

প্রবাসীর যে শত্রুসংখ্যা বাড়িতেছে ইহাতে আনন্দিত হইবেন। ইহাতে প্রবাসীর প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শত্রুসৃষ্টি করা শক্তিরই লক্ষণ— বিশ্ববিধাতারও শত্রুর অভাব নাই। আপনি বন্ধু যদি না পাইতেন তবে শত্রু দেখা দিত না। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪
১৬ মে ১৯১৩

ওঁ

C/o Messers Thomas Cook & Son
Ludgate Circus
London
16 May 1913

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাকে Modern Reviewর জন্য যে লেখাটা পাঠাইয়াছি তাহা আগামী সোমবারে পড়িতে হইবে এইজন্য তাহা ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া দেখি তাহাতে বেশ বড় বড়

অনেকগুলা ভুল রহিয়া গিয়াছে; তাহার কতকগুলার জন্য আমি দায়ী—কারণ সেগুলা আমার ইচ্ছাকৃত না হইলেও আমার স্বকৃত বটে— আর কতকগুলা টাইপ লেখকের— দুইয়ে মিলিয়া অপরাধের বোঝা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি ছাপা সারা হইয়া যায় নাই। যদি পারি আজই আপনাকে একটা সংশোধিত পাণ্ডুলিপি পাঠাইব। এই জন্যই পরের ভাষায় লিখিতে আমি এত দ্বিধা বোধ করি। ফাঁকে ফাঁকে এত গলদ থাকিয়া যায় যে সে বাছাই করা দায়। বিশেষত বড় গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে এত বেশি কথার ভিড় যে তাহার ভিতর হইতে দুষ্ট ব্যাকরণের কীটগুলাকে নজর করিয়া বাহির করিতে পারি না। ছারপোকাওয়ালা হিন্দুস্থানী খাটিয়াগুলাকে যেমন করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া আছড়াইতে হয় আমার বাকি প্রবন্ধগুলাকেও তেমনি করিয়া একবার আছড়াইব এই স্থির করিয়াছি।

চৈত্র মাসের প্রবাসী ও দুই খণ্ড Modern Review আমেরিকা ঘুরিয়া আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নভেম্বর ১৯১৩]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কণিকার তর্জ্জমাগুলি Modern Reviewতে বাহির হইয়াছে শুনিয়া প্রথমটা বড় ভয় পাইয়াছিলাম কেননা সেগুলা কাঁচা অবস্থার লেখা। তাহার পরে আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক পড়িয়া দেখিলাম ভয়ের কোনো কারণ নাই— আপনি আগাগোড়া মাজিয়া ঘষিয়া প্রায় নূতন করিয়া দিয়াছেন।

Ernest Rhys ও Andrews সাহেবের কাছ হইতে The Gardener সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছি তাহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি। এই তর্জ্জমাগুলি সম্বন্ধে আমার মনে কিছু ভয় ছিল। গীতাঞ্জলির তর্জ্জমায় ছন্দের অভাব তত বেশি গুরুতর নহে কিন্তু ক্ষণিকা সোনার তরী জাতীয় কবিতায় নিছক গদ্য পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে কেমন শোনাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না— এখন ভরসা হইতেছে ভাল লাগিতে পারে।

এইমাত্র ইংলণ্ড হইতে India Societyর সেক্রেটারি Fox Strangways সাহেবের নিকট হইতে পত্র পাইলাম তাঁহারা আমার চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ সোসাইটির জন্য ছাপিতে দিয়াছেন। এই মেলেই আমার কাছে একখানি preface চাহিয়াছেন। এখানে মূল মহাভারত খুঁজিয়া পাইলাম না। আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদার

মিলনকাহিনী মহাভারতে যেরূপ আছে দয়া করিয়া সংক্ষেপে সেইটুকু ইংরেজিতে লিখিয়া রথীকে দিলে রথী এই মেলেই যথাস্থানে পাঠাইতে পারিবে—আপনার হাতে জিনিষটিও ভাল হইবে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬
৭ ডিসেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চোখের বালি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। অন্তত এ কাজ করিতে আমার বিস্তর সময় লাগিবে। Anderson চোখের বালির বিশেষ ভক্ত— তিনি ঐ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষ্যে উহার একটি অংশ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন সেটুকু সুন্দর হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি রাজি হইবেন। ইংরেজি করিতে হইলে যে যে অংশ বাদ দেওয়া দরকার তাহা আমি দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি। এবং তাঁহার তর্জ্জমা হইলেও আমি একবার দেখিয়া ঠিক করিয়া দিলে তাঁহার বুঝিবার ভুলের ত্রুটি সংশোধন হইতে পারিবে।

আপনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য যে তিনটি ছাত্রের

কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে তৃতীয়টিকে ছাড়া অন্য কাহাকেও লওয়া সঙ্গত হইবে না। স্থানাভাব ঘটিয়াছে, এ স্থলে অধিক বয়সের ছাত্র লইয়া ছোট ছেলেদের স্থান জুড়িয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সকল প্রকারেই ক্ষতিকর। চতুর্থ শ্রেণীতেও বাহিরের ছাত্র লওয়া আমাদের অনভিমত— কারণ তাহাতে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অনিষ্ট হয়— অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের অধ্যাপনার পার্থক্য থাকাতে বাহিরের ছাত্রকে মাঝখানে লইলে আমাদের কাজ বাড়িয়া যায় ও অন্য ছাত্রদের ক্ষতি ঘটে— এই জন্য উমাপদ বাবুর দৌহিত্রটিকে বিদ্যালয়ে লওয়া সম্বন্ধে অধ্যাপকদের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে। এই সম্বন্ধে তাঁহারা বারবার অনেক দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন— বস্তুত বিনা বেতনে ছাত্র লওয়া তেমন গুরুতর বাধা নহে। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭
১১ ডিসেম্বর ১৯১৩

ওঁ
শিলাইদা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চোখের বালির স্থানে স্থানে ছাঁটিয়া দেওয়া গেল। খুব যে বেশি বাদ পড়িল তাহা নহে। পড়িয়া বুঝিলাম স্থানে স্থানে তর্জ্জমা করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। জ্ঞানবাবুর কলম

কিরূপ চলে জানিনা কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন যদি এ কাজে লাগে তবে চলনসই গোছের একটা জিনিষ খাড়া করিতে পারে। তাহাকে অনুরোধ করিলে ফল পাইতে পারেন, অবশ্য লেখার মূল্য সে লইবে না। সুরেন যদি তর্জ্জমা করে তবে আমার সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে পারিবে। আমি নিজে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করি না। আমার অনভ্যস্ত কলম ইংরেজি ভাষা সঙ্কটের মধ্যে পথ করিয়া চলিতে বিস্তর সময় লয়। কাজটা এত কঠিন যে ভাল ইংরাজ লেখকের পক্ষেও দুঃসাধ্য আমার ত কথাই নাই।

সেই ছেলেটির কথা জগদানন্দকে লিখিতেছি— ছাত্র নিয়োগ সম্বন্ধে আমার স্বাধীন অধিকার নাই। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

[ডিসেম্বর ? ১৯১৩]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুরোধ মত সুরেন চোখের বালির প্রথম কিস্তি ওখানে পাঠাইয়াছেন। অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে আছি। একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা পেন্সিলের লেখায় পরিবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র। মোটের

উপর আমারও বোধ হয় ভালই হইয়াছে, আপনি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আগামী বুধবার সায়াহ্নে কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অল্পকালের মধ্যে যে গল্পের বই পড়িয়াছি তাহার মধ্যে The Charwoman's Daughter নামক বইখানি বড় ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার একজন আধুনিক কবি এবং তাহার গদ্যরচনা ইংলণ্ডের পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জানি না, বাংলায় তর্জ্জমা করিতে হইলে কাহারো অনুমতির প্রয়োজন হইবে কিনা। গ্রন্থকারের নামটি James Stephen। রথীর কাছে এই বই আছে। রথী রাঁচি গিয়াছে— ফিরিলে পাওয়া যাইতে পারে। সত্যেন্দ্রের চোখ খারাপ— নহিলে তাহারই হাতে তর্জ্জমা হইত ভাল। চারুকে চেষ্টা করিতে বলিবেন। আবশ্যক মত কিছু কিছু বাদসাদ দেওয়া দরকার হইতে পারে। গল্পটি ভাল সন্দেহ নাই— কিন্তু যাহারা গল্প পড়ে তাহাদের ভাল লাগিবে কিনা সে কথা বলা কঠিন। Joseph Conrad এখনকার কালের গল্পলেখকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়— তাঁহার

ছোট গল্প কিছু কিছু পড়িয়াছি— পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৬ এপ্রিল [১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

খাসিয়া বালক দুটিকে লইতে আমার আপত্তি নাই। ব্যবস্থাপক সভার হাতে আপনার পত্রখানি দিয়াছি তাঁহাদের অধিবেশনে কর্ত্তব্য স্থির হইবে, কোনো বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে স্থানাভাব ঘটিয়াছে, ছুটির পরে জায়গা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

১৩ই বৈশাখে ছাত্রগণ অচলায়তন অভিনয় করিবে— আপনি আমার মাতাদের লইয়া আসিতে পারিবেন? তাঁহাদিগকে আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ দিবেন এবং আপনি সস্ত্রীক আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩১৫[১]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] '১৩১৫' স্থলে '১৩২১' হইবে। দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়।

৪১

১৯ জুন ১৯১৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুস্কিল এই যে সবুজ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে। ঐ কাগজটা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। অন্য পত্রিকাগুলি বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে— তাহাতে তাহারা পাঠকদের মনকে বিশেষভাবে আঘাত করে না, নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সবুজপত্রের একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশে পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্ত্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিনা কারণে সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখিবার বয়স আমার এখন নাই। ছুটির জন্য মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল আছে— অথচ কোনো মতেই ছুটি পাই না। এদিকে আজকাল আমার ক্ষমতার মধ্যে প্রাচুর্য্য জিনিষটা নাই তাই যেটুকু রচনা করি তাহাতে একটি কাগজের পেট কোনোমতে ভরে, উদ্বৃত্ত থাকে না। নহিলে প্রবাসীকে কদাচ বঞ্চিত করিতাম না— প্রবাসীর জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মনে মনে ঠিক

করিয়াছি আর একটা বছর সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া অবসর লইব। এই বৎসরে দেশের যৌবনকে যদি উদ্বোধিত করিতে পারি তবে আমার বৃদ্ধ বয়সের কর্ত্তব্য সমাধা হইবে বলিয়া মনে করি। রবি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে একবার শেষ বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে চায়। ইতি ৫ই আষাঢ় ১৩৩১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

[সেপ্টেম্বর ? ১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই সঙ্গে একটি ইংরেজি কবিতা পাঠাইতেছি। কবিতাটি আমার বন্ধু Mrs. Seymour-এর রচনা। এটি আমাদের সকলেরই বিশেষ ভাল লাগিয়াছে— বোধ হয় আপনারও পছন্দ হইবে সেই আশায় পাঠাইলাম। যদি Modern Reviewতে ছাপান তবে এক কপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন—

Mrs. Seymour
909 Nevada Street
Urbana. Illinois
U. S. A.

প্রবাসীর জন্য আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া উঠিয়াছে— কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া উঠে না। শুনিয়াছি

চারু পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসিবেন তিনি পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইতে পারিবেন। আশা করি ভাল আছেন— ছুটিতে কি কোথাও যাইবেন?

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

[১১ অক্টোবর ১৯১৪]

ওঁ

বুধগয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব মঙ্গলবারে পৌঁছিব সেখানে চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে। এই দুই তিন দিনের জন্য প্রবাসীর কাজের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে সে অপরাধে আমাকেই অপরাধী করিবেন এবং ক্ষমাও করিবেন আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি। ইতি রবিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

[নভেম্বর ১৯১৪]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

“শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে” গানটি তর্জ্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু মূলটা নির্ম্মল হইয়াছে বলিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু বাংলা এবং ইংরেজি উভয়েরই মালিক যখন আমি তখন কোনোপক্ষে নালিশ করিবার কোনো পথ নাই। অসিতের ছবির সঙ্গে এ লেখাটার কোনো বিরোধ হইবে না অতএব সে পক্ষেও ক্ষোভের কারণ দেখি না। এক্ষণে আপনার সম্পাদকীয় যাচনদারের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় তবে ছাপাখানায় রওনা করিবেন।

গীতালি পাইয়াছেন ?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

৩ মার্চ [১৯১৫]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কবিতা প্রবাসীর জন্য পাঠাইলাম। যে খুসি নাম দিবেন। এক একটা লাইন বড় আছে, বোধ হয় দুই কলামকে এক করিয়া যদি এটা ছাপান তবে স্থানাভাব হইবে না। আমার

বোধ হয় কবিতা সেইরূপভাবে ছাপানো হইলে গদ্য প্রবন্ধের সহিত তাহার একটু বিশেষত্ব রক্ষা হয়।

মার্কাস অরেলিয়সের আত্মচিন্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুচার লাইনের বেশি লিখিতে পারিব না। মন এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছে এবং বিশ্রামও অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আশা করি ভালো আছেন। ইতি ১৯ ফাল্গুন [১৩২১]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৭ অক্টোবর ? ১৯১৫

শ্রীনগর
শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটি

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাশ্মীরে আসিয়া পড়িয়াছি— বোধ করি ভালই লাগিবে। এ পর্য্যন্ত গিরিরাজের সঙ্গ পাইবার অবকাশ পাই নাই— সম্মান সৌজন্যের ব্যূহ যদি ভেদ করিতে পারি তবে কিছু আনন্দ সঞ্চয় করিতে পারিব বলিয়াই আশা করিতেছি।

ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অনুবাদক আমি ; কিন্তু ঢাক-বাদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শান লাগিয়া ঈর্ষ্যার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রের পক্ষেও ভালো হইবে না,

আমার পথও কণ্টকিত হইবে। তা ছাড়া কর্ম্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে— অনেক বন্ধু এবং অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন— সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অবন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসরশয্যার সন্ধানে আছি— জুটিবে কিনা জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না।

আপনার শরীর অনেকদিন হইতে খারাপ আছে শুনিয়া মন উদ্বিগ্ন আছে। অবকাশই আপনার একমাত্র পথ্য, কিন্তু জানি তাহা আপনার পক্ষে দুর্লভ। তবু একথাটা মনে রাখা উচিত যে অর্থ সম্বন্ধে দেনা করাটা যেমন অনুচিত প্রাণ সম্বন্ধেও তাই। আপনি কিছুকাল হইতে প্রাণের তহবিলে ঋণের দিকে ঝুঁকিয়া কাজ চালাইতেছেন— এ সম্বন্ধে একেবারে কি কোনো জবাবদিহি নাই ?

শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি
আনুমানিক ২০শে আশ্বিন ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

[মার্চ ১৯১৬]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা বাংলা হইতে ইংরেজি করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলাম এণ্ড্রুজ লিখিয়া লইতেছিলেন। তারপরে সেইটেকে দুরস্ত করিয়া তিনি লিখিয়া দিলে আমি আবার তাহার উপর কিছু কারিগরি করিয়া তবে জিনিসটা দাড়াইয়াছে।

জীবনস্মৃতির তর্জ্জমাটার প্রুফ কাল সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা পাইয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে সুরেন দুইএক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়াছিল সেইগুলো পূরণ করিয়াছি দুএক জায়গায় কিছু বদল করিতেও হইয়াছে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

২৮ মার্চ ১৯১৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছাত্রশাসনের ইংরেজিটা যে তর্জ্জমা সে কথা বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না— কেন না ইংরেজিতে কিছু কিছু বদল আছে— এবং রচনাটা প্রায়শই আমার।

চারুকে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন Modern Reviewতে জীবনস্মৃতির অনুবাদ বাহির হইবে Yeatsকে একখণ্ড ও Rhysকে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে। আপনিও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইতি ১৫ চৈত্র ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

৫ জুন ১৯১৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জাপানে পৌঁচেছি। অভ্যর্থনার ঘূর্ণি ঝড়ে পাক মেরে বেড়াচ্চি। কবে একটু শান্তি পাব জানিনে। আমার এখানকার খবর সমস্ত বোধহয় পেয়েচেন।

কোবে সহরে অনেকগুলি বাঙালি আছেন তাঁরা একটি সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠা করলেন। যা কিছু প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখবেন ছবি সমেত প্রবাসীতেই পাঠানো হবে স্থির হয়েচে। আপনি তার ভাষা একটু দেখে শুনে যদি ছাপান তা হলে এঁদের বিশেষ উৎসাহ হবে। এক খণ্ড প্রবাসী এঁরা বিনা-মূল্যে পেতে আশা করেন।

এখনি টোকিয়োতে যাচ্চি। তাই ব্যস্ত আছি। শান্তা

সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

[মে ১৯১৭]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণটি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি পাঠাইতে পারেন আজই দেখিয়া আজই ফিরাইয়া দিব। আমার সেই ইংরেজি লেখাগুলি কি পাওয়া যাইবে ?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

[জুন ? ১৯১৭]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামীকাল বুধবারে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় যদুবাবুরা এসে বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থ প্রকাশের নিয়ম আলোচনা করবেন। আপনিও দয়া করে আসবেন। ইতি মঙ্গলবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

২৮ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দুমুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে কিছু লিখব বলেই ঠিক করেছিলুম কিন্তু দেখচি উদ্বেগ ও ক্লান্তির দরুণ আমার মনের শক্তি খুব তলায় এসে ঠেকেচে। এমন কি কারো সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখি অতি সামান্য কথাটা পর্য্যন্ত বেধে যায়। এদিকে কন্‌গ্রেসের সময় একটা লেকচার দিতে হবে এই চিন্তাটা মাথার উপর চেপে আছে, তাতে লেকচার এগোচ্চে না কিন্তু সেই চিন্তার আওতায় অন্য ছোটখাটো লেখাগুলো মুষড়ে আছে। তার পরে এই শান্তিনিকেতনের শরৎকালের দিনগুলি আমার মনের মধ্যে যে মন্ত্র আওড়াতে থাকে তাতে

আমার ধারণা একেবারে বদ্ধমূল করে দেয় যে আমি একজন কবি। সে ধারণাটার মস্ত দোষ এই যে, কিছুই না করাটা যে আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য নয় এমন একটা বিশ্বাস পেয়ে বসে। মনে হয় জগৎটা মস্ত, কালটাও নিরবধি, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃষ্টি করে চলেচেন তা অতি বিচিত্র,— এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে আমি যদি ঘাসের ফুলও হই তবে সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারটাকে তেমনি করেই মেনে নিতে হবে যেমন করে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাকে মানতে হয়। আমার চরম প্রয়োজনটা কি তা আমি জানি নে কিন্তু আমি সত্য যা তা আমাকে পূরোপূরি হতে হবে এইটুকু জানি। কিন্তু আমি যে সত্য কি সে খবরটা নানা দূত নানা রকম করে শুনিয়ে যায়। মুস্কিল এই যে, চৌমাথার ধারে আমার বাসা হয়েচে— জগতের Associated Pressএর আপিসটা তারই উপরের তলায়— সেখানে আমার নিজেরই খবরটা নানা রকম পাঠান্তরে নানা দিগন্তর থেকে এসে জমা হয়। কোনো একটা এক-রাস্তার ধারে যদি আমার বাসা মিলত, তাহলে আমার এই সাতান্ন বছর বয়সে হয় আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হতুম, নয় পাঁচালির দল করে গৌড়ীয় সুধীজনের মনোরঞ্জন করতুম— কিছু না হলেও তবু আলিপুরের জজ আদালতের সাম্‌লা-পদ্মবনে মাম্‌লা-বিলাসিনী যে লক্ষ্মী বিরাজ করেন তাঁর সেবকের ফর্দ্দে আমার একটা নাম লেখা হয়ে যেত। যাক্ এখন আর পরিতাপ করে কোনো লাভ নেই।

কিন্তু আপনি আমার কাছ থেকে প্রবাসীর প্রবন্ধ আদায় করবার জন্যে নানা কৌশলে চেষ্টা করে থাকেন এ রকম

জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না— ভয় মৈত্রী প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশি না পাই ত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় করে নিতুম। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্চে এই যে, খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনোমতেই গোরা লেখা হত না। নিতান্ত অতিষ্ঠ না হলে আমি অধিকাংশ বড় বা ছোট গল্প লিখতুম না। যদি জিজ্ঞাসা করেন আমার মেজাজ এমন বিশ্রী কেন তবে তার উত্তর এই যে, আজ পর্য্যন্ত নানা প্রমাণ পেয়েও আমার সত্য বিশ্বাস হয় নি যে, আমি লিখতে পারি। ফরমাস পাবামাত্রই আমার মনে হয় আমার শক্তি নেই। অথচ শক্তি নেই সেটা ধরা পড়ে এমন ইচ্ছাও হয় না। এই ব্যাপারের মূলে একটি গোপন কথা আছে, সেটা বল্লে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। সে হচ্চে এই যে, যে-ব্যক্তির লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে চলে সে রবীন্দ্র ঠাকুর নয়। যে-ব্যক্তি গাল খায় এবং নোবেল্ প্রাইজ পায় সেই হচ্চে স্যার রবীন্দ্রনাথ। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে পাছে একদিন ধরা পড়ে যায়। এই জন্যে কারো কাছে দাদন নিলে শোধ করবার ভয়ে তার রাত্রে ঘুম হয় না। যারা বলে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা আমি নিজে করি নি, আর কেউ করেচে তারা ঠিকই বলে। বস্তুত স্যার রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেই না। আমাকে কোনো ইংরেজি সভাতে বক্তা

বা সভাপতিরূপে যদি ডাকা হয় তাহলেই আমার বিপদ— কেন না যিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখেন তিনি কোনোমতেই আমার সঙ্গে ইংরেজি সভায় আসতে রাজি হন না— এই জন্যে যদি বা সভায় যাই তবে চাণক্য মুনিকে স্মরণ করে "ন ভাষতে"র দলে বসে থাকি। ছোটখাট ইংরেজি কেজো চিঠি লেখার কাজে গীতাঞ্জলির অনুবাদককে কোনোমতে ভিড়তে পারি নে— বোধ হয় পাছে তাকে কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি করে দিই এই তার ভাবনা— কিন্তু কোনো বড় চিঠি লেখবার বেলায় হঠাৎ দেখ্‌তে পাই সে অনাহূত এসে কলম বাগিয়ে বসেচে। এই রকম খেয়ালী লোকের হাতে আমার খ্যাতিপ্রতিপত্তি বাঁধা আছে বলেই কোনো কাজের ভার নিয়ে আমি কাউকে কথা দিতে পারি নে। যাই হোক্ প্রবাসীর লেখার জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন তাতে বুঝতে পারব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন আমি লিখ্‌তে পারি।

"আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধটা স্বহস্তে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার জন্যে আমাকে আরো কেউ কেউ অনুরোধ করেচেন। চেষ্টা করে দেখ্‌ব। আমার মুস্কিল এই যে, অনুবাদ করতে পারি নে, আমাকে প্রায় নতুন করে লিখ্‌তে হয়। কেন না ঠিকমত অনুবাদ করতে গেলে নিজেকে ভুলে লেখা চলে না। নিজেকে না ভুল্‌লে আমি কথা ভুলি, ব্যাকরণ ভুলি, ষ্টাইল ভুলি। ইতি ১১ই কার্ত্তিক ১৩২৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

৩১ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি কোনো উপায়ে ইংরেজি অনুবাদ করতে পারি বলে সংস্কৃত অনুবাদ করতেও পারব এমন আশা করলেন কি করে? আমি বাংলা লেখাতেই যে সমস্ত কুকীর্ত্তি করি তাতে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী যদি নামমাত্র রাজা না হতেন তাহলে আমাকে কোন্‌কালে উহ্য করে দিতেন। আপনি আমাকে বৈয়াকরণিক মহাপাতকে উৎসাহিত করবেন না। বিধুশেখর শাস্ত্রীকে যদি অনুরোধ করেন তবে তিনি অতি সহজেই ঐ গানটিকে সংস্কৃত করে দিতে পারেন। আমি ওকে সংস্কৃত রেলপথের প্রায় লিলুয়া পর্য্যন্ত এগিয়ে রেখেছি— অনুস্বার বিসর্গের যোগে আর একটা ষ্টেশন পার হলেই যাত্রা সমাপ্ত হয়।

ইংরেজি বইগুলো ওরা একেবারে stereotype করে রাখে— একেবারে বহু সহস্র ছাপা শেষ হলে তবে বদলের সময় আসে— এই হয়েচে মুস্কিল। যা হোক্ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"র ইংরেজিটা বইয়ের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করা যাবে।

কাল থেকে বিষম বাদলা নেমেচে। এত বর্ষণের পরেও আজও আকাশে প্রসন্নতার লক্ষণ দেখচি নে। ইতি ১৫ই কার্ত্তিক ১৩২৪

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

[৫ নভেম্বর ১৯১৭]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখা ত এগিয়ে চলেচে। আমি সকালে কেবল লিখি। বাকি দিনটা চিঠি লেখা এবং কুঁড়েমির মধ্যে ভাগ করে নিয়েচি। এখন আমার যে রকম শক্তি এবং মনের ভাব তাতে অল্প একটুখানি লেখার কাজের সঙ্গে সের দশ পনেরো ছুটি মিশিয়ে তবে কোনো রকমে লেখকের ব্যবসা চালাতে পারি। যে সব সম্পাদক নিত্য জোগান্ দাবী করেন তাঁদের মন রাখব কি করে এখন থেকে তাই ভাবচি। অথচ আমার দোষ হচ্চে অ্যাডাম্ স্মিথের অর্থনীতির নিয়মেই আমার লেখার কারবার চলে-— ডিমাণ্ডের তাগিদ এলে তবেই আমার সাপ্লাই সুরু হয়। আপনি যদি এই সময়ে আমাকে একটু ধাক্কা না দিতেন তবে আমি এই শরৎকালের স্বচ্ছ অতল দিনগুলির মধ্যে ডুব মেরে নিছক নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতুম, আমার টিকি দেখা যেত না। দায়ে পড়ে যখন লিখ্‌তে সুরু করা গেল তার অল্পক্ষণের মধ্যেই মন সম্পূর্ণ আলাদা সুর ধরল, বল্লে, আমার লেখা উচিত ছিল। অথচ অল্পক্ষণ আগে আমি ওঁরই মন্ত্রণায় কলম ছেড়ে জানলার কাছে নেহাৎ ভালমানুষের মত চুপচাপ করে বসেছিলুম। আমি যদি চাণক্য হতুম তাহলে তিনি অন্য যে দুই একটি অবিশ্বাস্য পদার্থের উল্লেখ করেছেন তার

গোড়াতেই মন পদার্থকে বসিয়ে দিতুম। আমরা না চাইতেই মন জিনিসকে পেয়েচি অথচ কি করলে ওকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি জন্মায় এই সাধনাতেই জীবনটা গেল।

সাতটা লম্বা চওড়া পাতা আমার ক্ষুদে অক্ষরে ভরে গেছে। অর্থাৎ দু কলমে ভাগ করলে প্রবাসীর ১৪ কলমের বেশি ভর্ত্তি হবে। হয়ত আরো গোটা দুই ঐ রকম লম্বা পাতা ভরবে— অর্থাৎ আপনার ফর্ম্মা দুয়েক জুড়ে বসবে। হিসেব ঠিক হল কি না বল্‌তে পারি নে কিন্তু কাছাকাছি হয়ত হবে। এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান, হোমরুল, ইন্টার্ণ্‌মেণ্ট্‌ প্রভৃতি কোনো কথাই বাদ পড়ে নি। লিখ্‌তে লিখ্‌তে কথা বেড়ে চলেচে— আরো দুতিন দিন যদি এমন ভাবে চলে তাহলে, সেদিন যেমন অবিশ্রাম বাদলার পালা পড়েছিল, সেই রকম হবে— বাতাসের সোঁ সোঁ, বৃষ্টির ঝরঝর মেঘের গরগর সমস্ত মিশে বীরকরুণ-হাস্যরসের একটা ছোটখাটো চক্রবাত্যার মত দাঁড়িয়ে যাবে। হয়ত ছাপা হবার পূর্ব্বে একবার সভায় দাঁড়িয়ে পড়লে আসর গরম করা যেতে পারে। সে সম্বন্ধে যথাকালে আপনার পরামর্শ নেওয়া যেতে পার্ব্বে।

সেই শচীন্দ্র দাসগুপ্ত এবং তার ভাইয়ের বধ ও বন্ধনের যে ইতিহাস সাক্ষ্যসাবুদসমেত আমার কাছে এসে জমেচে সে সম্বন্ধে আপনার কাছে সমস্ত দলিলসহ একটা প্রকাশ্য পত্র লিখতে চাই। সেই পত্র আপনি প্রবাসীর সাময়িক আলোচনা বিভাগে যদি সদরে পেশ করে দেন তাহলে কেমন হয়?

আপনারা শান্তিনিকেতনের এই ছুটির সময়কার শারদীয়া

মূর্ত্তিটা যে দেখ্‌তে পেলেন না এটা আপনাদের লোকসান হল। ইতি

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

৮ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করে প্রবন্ধটি আর একবার শোধন করে লিখচি। কাল পর্শু দুদিন সময় লাগবে বলে বোধ হচ্চে। প্রবাসীর দেড় ফর্ম্মার বেশি হবে বলে বোধ হয়না। ত্রিশ লাইনের চওড়া কাগজের দশ পৃষ্ঠা ভর্ত্তি হয়েচে— revise করবার সময় আমার যতটা ছাঁট পড়ে ততটা বাড়তি হয় না। এইজন্যে বলতে পারচিনে কতটা হবে। কাল এখানকার অধ্যাপকসভায় পড়েছিলুম— সকলেই নিরতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন। যদি আদৌ সভাস্থলে এটা পড়ি তা হলে প্রবাসী বাহির হবার পূর্ব্বেই। পৌষ মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব করলে ভাল হবে না। অঘ্রানেই বাহির হওয়া চাই। Manchester Guardian আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে লেখা চাচ্চে। এইটেকেই ইংরেজি করে তাদের দিলে তাদের এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বোধ হয় এ প্রবন্ধটা

কিছু উপকারে লাগতে পারবে সেজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি চাই ছুটি আপনারা মঞ্জুর করেন না, সেটাতে পরিণামে আত্মপ্রসাদ লাভেরই কারণ ঘটে। কিন্তু তাই বলেই Theistic Conferenceএর সভাপতিত্ব আমার কর্ত্তব্যের একটা অঙ্গ এ আমি কোনো মতেই মানতে পারিনে। Social Conferenceর চৌকিদারী করবার জন্যে পর্শু দিন ভূপেনবাবুর পত্র পেয়েছিলুম। তাঁকে জানিয়েচি কোনো কন্‌ফারেন্সের চৌকির মাপে বিধাতা আমাকে তৈরি করেন নি সুতরাং সভাপতিত্ব সম্বন্ধে আমি চিরকৌমার্য্যে সত্যবদ্ধ হয়ে পড়লুম; আমাদের দেশে আজকাল কন্যাদায়ের মতই সভাদায়টা খুব প্রবল হয়ে উঠেচে— অল্প দিনের মধ্যেই অনেকগুলি ঘটকালি আমার কাছে এসেচে— তার মধ্যে প্রথমটি ত লগ্ন পর্য্যন্ত পৌঁছলই না অথচ তার ঘটক বিদায় করতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি! আমার বয়সে এই সকল বিষয়ে খুবই সাবধান হওয়া উচিত।

বোধ হচ্চে দুচার দিনের মধ্যে অন্তত দুচার দিনের জন্যে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। ইতি ২১ কার্ত্তিক ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

১০ জানুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি গল্প চান কিন্তু মনে ত হয় আমার বড় গল্প লেখবার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আসল কথা, ক্লান্তিতে আজকাল মনটা যেন ঝুঁকে পড়েচে। ইচ্ছা করচে কলমের গোলামী সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এখানে ছেলেদের ক্লাশে মাষ্টারিতে ভর্ত্তি হই। দুটো ক্লাশ পড়াতে শুরু করেচি— বেশ ভাল লাগচে। সন্ধ্যার সময় মানুষের ঘরে ফেরবার সময় আসে— তখন বড় সংসারের কাজ আর চলে না। ছোট ছেলেদের মধ্যে আমি সেই ঘরটুকু পাই। আর ত পাব্লিকের হাটে কারবার করতে একেবারেই ভাল লাগে না। আমার একদিন ছিল যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমার গভীর একটা মিল ছিল। মাঝে এল লোকালয়। সেখানে প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরে ছুটোপাটি করেচি। আজ আবার দেখচি বিশ্বপ্রকৃতি আমার জানলায় এসে উঁকি মারচে। বড় আকাশ থেকে আমার ডাক আসচে। পৃথিবী থেকে আমার বিদায়ের রাস্তা ঐ দিক দিয়েই কোথায় চলেচে। এখনকার খাতাপত্র বন্ধ করে আবার আমাকে বেরতে হবে। জীবনের আরম্ভে বিশ্ব আমার কাছে এসেছিল, জীবনের পরিণামে আমাকেই সেই বিশ্বের দিকে চলতে হবে, সেই দিকেই আমার কিছু পাবার আছে, কিছু দেবার আছে— হয় ত ঐখান থেকেই সমস্ত ভাঙা জুড়ে নিয়ে, বেসুর সেরে নিয়ে তবে আবার রাজার আরেক দরবারে তালিম দিতে পারব।

এদিকে আবার ফেব্রুয়ারি মাসে বম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতে আমার যাত্রা স্থির হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেচি। হয় ত মার্চ্চের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ঘুরতে হবে। এই ভ্রমণের পরে যদি আবার হঠাৎ কলমের মুখে জোয়ার আসে বলা যায় না। তা হলে আবার লিখতে বসব। কিন্তু এর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেবেন না। এবার টাকাও না। দরকার হবে না। খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত থেকে বইয়ের টাকা আসবে। ওদিকে বম্বেতে কিছু অর্থোপার্জ্জনের আয়োজন চল্‌চে। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ছাপতে যদি ইণ্ডিয়ান প্রেস নারাজ হন তা হলে আপনি ওগুলি ছাপিয়ে নেবেন। সীতা আশা করি ভাল আছে। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

[২৩ এপ্রিল ১৯১৯]

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এণ্ড্রুজ দিল্লিতে। সেখান থেকে দুই একটা চিঠি যা লিখেচেন তাতে মনটাকে উত্তপ্ত করেছে। আমার মনের তাপ-মান যন্ত্র আমার কলম। সুতরাং তার ভাষাটা চড়ে উঠচে। দুতিনখানা গরম চিঠি এণ্ড্রুজকে পাঠিয়েচি। বক্ষ্যমাণ

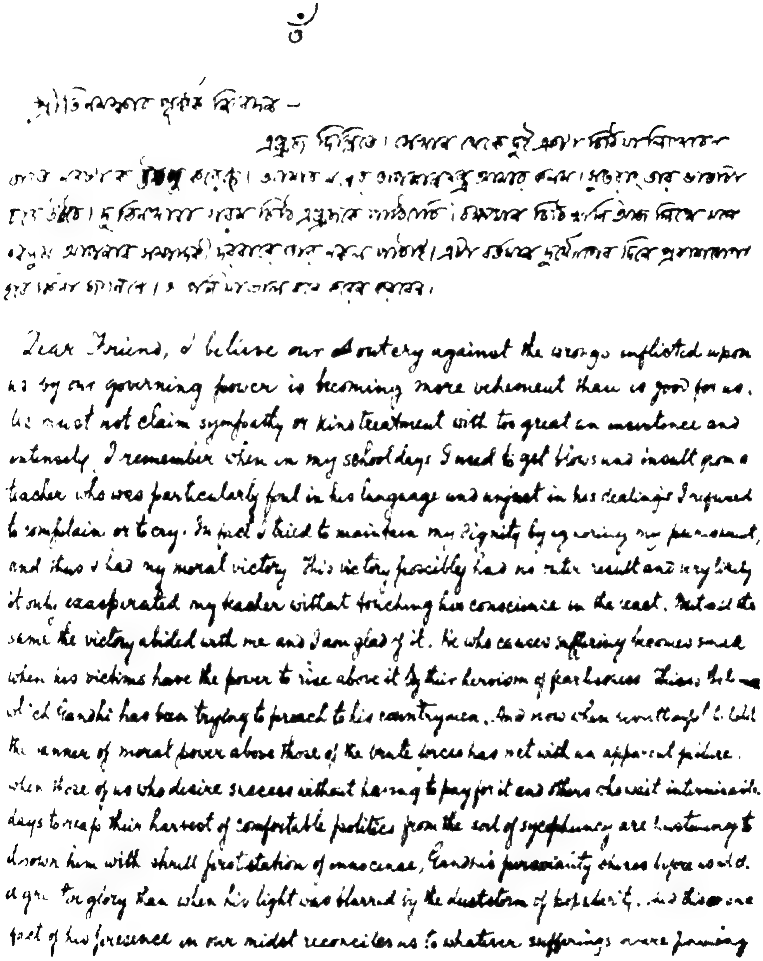

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন —

[illegible]

Dear Friend, I believe our outcry against the wrongs inflicted upon us by our governing power is becoming more vehement than is good for us. We must not claim sympathy or kind treatment with too great an insistence and intensely. I remember when in my school days I used to get blows and insult from a teacher who was particularly foul in his language and unjust in his dealings I refused to complain or to cry. In fact I tried to maintain my dignity by ignoring my punishment, and thus I had my moral victory. This victory possibly had no outer result and very likely it only exasperated my teacher without touching his conscience in the least. But all the same the victory abided with me and I am glad of it. He who causes suffering becomes small when his victims have the power to rise above it by their heroism of fearlessness. This is the lesson which Gandhi has been trying to preach to his countrymen. And now when his attempt to hold the banner of moral power above those of the brute forces has met with an apparent failure, when those of us who desire success without having to pay for it and others who wait interminable days to reap their harvest of comfortable politics from the soil of sycophancy are hastening to drown him with shrill protestation of innocence, Gandhi's personality shines before us with a greater glory than when his light was blurred by the duststorm of popularity. And this one fact of his presence in our midst reconciles us to whatever sufferings are forming

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ৫৭ । আংশিক পাণ্ডুলিপিচিত্র

চিঠিখানি আজ লিখে মনে করলুম আপনার সম্পাদকী দরবারে তার নকল পাঠাই। এটা বর্ত্তমান দুর্যোগের দিনে প্রকাশযোগ্য হবে কিনা জানিনে। আপনি যা ভাল মনে করেন করবেন।

Dear Friend, I believe our outcry against the wrongs inflicted upon us by our governing power is becoming more vehement than is good for us. We must not claim sympathy or kind treatment with too great an insistence and intensity. I remember when in my schooldays I used to get blows and insult from a teacher who was particularly foul in his language and unjust in his dealings I refused to complain or to cry. In fact I tried to maintain my dignity by ignoring my punishment, and thus I had my moral victory. This victory possibly had no other result and very likely it only exasperated my teacher without touching his conscience in the least. But all the same the victory abided with me and I am glad of it. He who causes suffering becomes small when his victims have the power to rise above it by their heroism of fearlessness. This is the lesson which Gandhi has been trying to preach to his countrymen, and now when his attempt to hold the banner of moral power above those of the brute forces has met with an apparent failure, when those of us who desire success without having to pay for it and others who wait interminable days to reap their harvest of comfortable politics from the soil of sycophancy are hastening to disown him with shrill protestation of innocence, Gandhi's personality shines before us with a greater glory than when his light was blurred by the duststorm of popularity. And this one fact of his presence in our midst reconciles us to whatever sufferings we are passing through and whatever others we have to face. The expression of the best ideal of the age need not grow fat in bulk but let it become immortal with its truth. And the rejection of it by a number of timid people overwhelmed with terror by no means proves its rejection by our history. Please convey my *namaskar* to Mahatmaji in these days of his trial.

Yours Rabindranath Tagore

৫৮

১১ মে ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন সংবাদ ১৩০৪ শালে, সুতরাং বছর বাইশ পূর্ব্বে, লিখিত।

যথারীতি জন্মোৎসব হয়ে গেল— সেদিন আমার নামের

প্রথম অংশ বলবান ছিল— তার পর দিন থেকে দ্বিতীয় অংশ আপন পালা সুরু করেচে। বেশ পেট ভরে বৃষ্টি হয়েচে।

সংযুক্তাকে আমার সংযুক্ত আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি
২৮ বৈশাখ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

২৪ অগষ্ট ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ইংরেজি "ঘরে বাহিরে"র সমালোচনার cuttings আমার কাছে অনেকগুলি আসিয়াছে। সকলগুলিতেই সাধারণত সাহিত্য ও উপদেশ ও বিচারের তরফ হইতে বইখানির বিশেষ প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছে। কেবল একখানি মাত্র কাগজে boycott সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং এই উপলক্ষ্যে গাঁধির চেষ্টার বিরুদ্ধে আমার মত খাড়া করা হইয়াছে। অনেক কাগজেই একথা বলিয়াছে যে এ বইখানিতে প্রকাশিত তত্ত্বগুলি য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য। বস্তুত "ঘরে বাইরে" বইখানিকে বাঙালী পাঠক যেরূপ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়াছিল বিলাতের পাঠকেরা তেমন করিয়া দেখে নাই— ইহাতে অমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমি আমাদের দেশের পোলিটিক্যাল অবস্থাকে মুখ্য করিয়া সাহিত্য

রচনা করিতে অক্ষম— অথচ সেই কুণো দৃষ্টিতে আমার লেখা পড়িলে পদে পদে উল্টা বুঝিতে হয়। এইজন্যই “অচলায়তন”কে কেবল হিন্দুসমাজের উপর আরোপ করিয়া ও বইটাকে অধিকাংশ পাঠক অত্যন্ত বাঁকা করিয়া ধরে। অচলায়তন যদি সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই না থাকিত তবে এ বই আমি কখনই লিখিতাম না। “ঘরে বাইরে”র মূল কথাটি রাষ্ট্রতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব আকারে বর্ত্তমান কালের সকল জাতির মধ্যেই চিন্তায় ও কর্ম্মে ব্যাপকরূপে সংক্রামিত। সেই কারণেই এ বইটি আমার পক্ষে লেখা সহজ হইয়াছে। অবশ্য গল্পের মূল ভাবটি যতই সর্ব্বজনীন হউক না তাহার মূর্ত্তিটি বিশেষ দেশকালকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না— সেই কারণে “ঘরে বাইরে” বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন আশ্রয় করিয়া আপন আখ্যায়িকার কাঠামো বানাইয়াছে। ইহা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নহে।

সুরেনকে “গোরা” তর্জ্জমা করিতে অনুরোধ করিয়াছি॥ কিন্তু ইহার তর্জ্জমা শেষ হইয়া প্রকাশ হইতে অন্তত আরো দেড় বৎসর লাগিবে। অতএব “ঘরে বাইরে”র প্রতিষেধকরূপে এখনি ফল দিতে পারিবে না। যাহা হউক সুরেনকে আর একবার তাড়া দিব।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

[৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এইমাত্র মুলুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বড় ব্যথা বোধ করিলাম। তাহাকে আমি পড়াইয়াছি এবং তাহার প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ ছিল। আমাকে আপনাদের ব্যথার ব্যথী বলিয়া জানিবেন। ঈশ্বর আপনাদিগকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন। ইতি সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

[২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুলুর শ্রাদ্ধদিনের উপাসনা উপলক্ষ্যে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার সারমর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি কোনোরূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন ত করিবেন। ইহার কাপি আমার কাছে নাই। অতএব প্রয়োজন অতীত হইলে ইহা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন— অগ্রহায়ণের শান্তিনিকেতনে ছাপিব। ইতি বুধবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

১৫ নভেম্বর ১৯১৯

ওঁ　　　　　　　　শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে রাত্রে শিলং প্রভৃতি ঘুরিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম তাহার পরদিন প্রাতেই এখানে চলিয়া আসিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল ঘটিয়া উঠিল না। আশা করি পুরীতে গিয়া আপনারা সুস্থ হইয়াছেন।

আপনাদের এখানকার বাড়ি অনেকদিন ব্যবহার করেন নাই। ক্রমশই উহা জীর্ণ হইতেছে। যদি বিদ্যালয়কে এই বাড়ি বিক্রয় করেন তবে ইহা আমাদের বিশেষ উপকারে লাগে। এখানে অত্যন্ত স্থানাভাব ঘটিয়াছে। অনুরোধে পড়িয়া বিচলিত হইবেননা— এ ঘর যদি আপনাদের প্রয়োজনে লাগে তবে ত আমরা খুসিই হইব— এখানে আপনাদের থাকা আমাদের পক্ষে লাভ।

আমেরিকার নেশন পত্র একখণ্ড ডাকে পাঠাইতেছি। এনাটোল ফ্রাঁসের একটি বক্তৃতা ইহাতে বাহির হইয়াছে তাহা Modern Reviewতে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য।

গোরার ইংরেজি তর্জ্জমার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়া সুরেনকে চিঠি লিখিলে হয়ত ফল হইতে পারে। তার কাজের ভীড় হয়ত কিছু কমিয়াছে।

শান্তা সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩

২৫ নভেম্বর ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

… কে আপনাদের এখানকার কুটীরে বাস করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। আমার আশঙ্কা হয় পাছে সে মনে করে আমরা ব্যাঘাত ঘটাইতেছি এইজন্য এই ঘরখানি বিদ্যালয়ের তরফ হইতে ক্রয় করিয়া দখল করিবার প্রস্তাব পাকা করিতে পারিতেছি না। … মনে কষ্ট পায় বা অসুবিধা ভোগ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আপনাকে প্রতিবেশীরূপে পাইবার লোভ মনে প্রবল ছিল বলিয়াই এই কুটীরটাকে কোনমতে আপনার হাতে গছাইয়া দিয়াছিলাম— ভাবিয়াছিলাম আপনাকে intern করা গেল কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিতে পারিলাম না। দীর্ঘকাল আপনার অন্তর্ধানবশত যখন সন্দেহ করিতেছিলাম যে আপনি হয়ত এখানকার মায়া কাটাইলেন তখন আপনার এই ঘরটাকে, নিকটবর্ত্তী পেয়ারা গাছ সমেত, পুনশ্চ আশ্রমে খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে আপনার পুনরাবির্ভাবের কোনো সম্ভাবনা থাকে এই সংশয়ে দ্বিধা করিতেছিলাম। আমরা আপনার স্থলাভিষিক্ত কাহাকেও এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই না— হয় আপনারা, নয় আশ্রম, এই ছিল আমার কামনা। ঠিক এখনি যদি এই কামনা পূর্ণ না হয় তবে অন্তত অদূরবর্ত্তী কোনো এককালে পূর্ণ হইবে এই আশা করি।

ইহার মূল্য কি হইতে পারিবে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

চিঠি লিখিয়া সুরেনের কাছ হইতে জবাব পাওয়া কঠিন। যদি কোনো মধ্যাহ্নে তাহার আপিসে চারুকে পাঠাইয়া দেন— তবে সুরেনের কাছ হইতে গোরার তর্জ্জমা সম্বন্ধে পাকা কথা সে আদায় করিয়া আনিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহার মোকাবিলায় আলোচনা হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না।

Autumn Festival তর্জ্জমার সম্মতি চাহিয়া আমার কাছে বিস্তর পত্র আসিতেছে। সম্ভবত আপনার কাছেও আসিয়াছে বা আসিবে— আপনি সম্মতি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৬ ৪

২৯ নভেম্বর. ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সাংলি হইতে সেখানকার রানীর ভগিনী ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত পটবর্দ্ধন জানুয়ারির প্রারম্ভে আশ্রমে আসিবেন। পটবর্দ্ধন কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট তিনি আশ্রমের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। ইহাদিগকে বাসের স্থান দিতে হইবে।

এখানে নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিতে সাত আটমাস লাগে, বারম্বার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সেইজন্য আপনার পরিত্যক্ত কুটীরটিকে শীঘ্রই তাঁহাদের বাসোপযোগী করিয়া মেরামত করিতে হইবে।

আপনার কুটীরের মূল্য সম্বন্ধে এখানকার অধ্যক্ষদের মত যাচাই করিলাম। তাঁহারা তিন শো টাকা দাম ধরিতেছেন। আপনার কি এই মূল্যে সম্মতি আছে? আপনি যাহা সঙ্গত বোধ করেন বলিয়া পাঠাইবেন। এবং যদি বিক্রয় স্থিরই করেন তবে আপনার আসবাবপত্র সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই মেরামত সারিতে পারিলে সে সময়ে আপনার এই ঘর কাজে লাগাইতে পারিব। আজকাল এখানে স্থানের এত অভাব যে আমরা আশু প্রয়োজনের জন্য তাঁবু কিনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুকাল হইল কানপুর এল্‌গিন মিলে পত্র লিখিয়াও ক্যাটালগ পাই নাই। শীঘ্র যে কোথায় তাঁবু পাওয়া যাইতে পারে তাহার খবরই পাইলাম না। এইজন্য উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এবার কন্‌গ্রেসে যে প্রার্থনা মন্ত্র তিনটি পাঠাইয়াছি মডার্‌ন রিভিয়ুর জন্য পাঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময় ও স্থান আছে কিনা জানি না। কাল ৭ই পৌষ উৎসব সমাধা হইয়া গেল— আপনাদিগকে স্মরণ করিয়াছি। আজও অতিথি অনেক আছেন— উৎসবের পরিশিষ্ট চলিতেছে। শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি ৮ই পৌষ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৩ জানুয়ারি [১৯২০]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এণ্ড্রুজের পত্রটি আপনাকে দেখতে পাঠাচ্চি। এর কোন্ অংশ আপনার কাগজে বাহির করা যায় সে আপনি বিচার করে গ্রহণ করতে পারবেন। পত্রখানিতে অনেক কথা ভাববার আছে কিন্তু এতে ভারতবাসীকে যে আহ্বান আছে সেটা প্রকাশ হলে হয়ত কর্ত্তৃপক্ষকে অনর্থক সতর্ক করা হবে এবং ভারতবাসীর পক্ষে সেটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এবারকার কন্‌গ্রেসে আমাদের খুব একটা বড় সুর দেবার অবকাশ ছিল। গান্ধী এবং শ্রদ্ধানন্দ সেই সুর লাগিয়েছিলেন কিন্তু মোটের উপর আমার মনে হয় dignity এবং সংযমের অভাব ঘটেচে। পঞ্জাবের উৎপাত সম্বন্ধে আমাদের এত বেশি বাচালতা করা অনাবশ্যক ছিল— উচিত ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের অতিমাত্র উত্তেজনার দ্বারা কমিশনের বিচারকে বিচলিত না করা। আমাদের কথা পৃথিবীর কাছে যাবে না। আজ পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে পৃথিবীর কাছেই বিচার চলচে। আমরা যা পেয়েচি সে ত সয়েচি— তাতে আমাদের উপকারও হয়েচে— কিন্তু দোষীর দণ্ডের ভার সমস্ত জগতের উপর। যদি কমিশন দুর্ব্বলভাবে সত্য গোপন করতে চায়, তখনই আমাদের যা কর্ত্তব্য তা করা উচিত হবে। ঝগড়াটে সুর কিম্বা জিতের বড়াই ছেলেমানুষি— এত বড় উপলক্ষ্যের অনুপযুক্ত। লাট সাহেবকে তাড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে আমরা যে সব আবদার করেছি সে যেন আদুরে ছেলের বাপের কাছে আবদার করার মত— আমাদের কি সেই সম্বন্ধ? সত্য প্রকাশ হোক্ সেইটেই সব চেয়ে বড় দণ্ড, moral দণ্ড, তার চেয়ে ছোট দণ্ড আমরা মাপ করতে পারি— সত্যই নিজের দণ্ড নিজে গ্রহণ করুন— আমরা চঞ্চলতা করে এই বিচার প্রণালীর গাম্ভীর্য্য নষ্ট করলে দুঃখের কথা। ইতি ২৮ পৌষ

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

[ফেব্রুয়ারি ১৯২০]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের এখানে অবিচ্ছেদে অতিথি সমাগম চলিতেছে আজ ভাবিয়াছিলাম ছুটি পাইব— পাই নাই। আশা করি কাল আপনার পত্রের জবাব দিতে পারিব এবং মুলুর সম্বন্ধে একটা লেখা সম্ভবত পাঠাইব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুলুর সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা ও কালীমোহনের লেখাটি পুস্তিকায় গ্রহণ করিবেন। এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহার পত্র ছাপিতে সম্মতি দিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমি এই সঙ্গে একটি লেখা পাঠাইতেছি ইহা আপনার পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে পারেন। ছেলেরা বোধ হয় কেহ কেহ মুলুর সম্বন্ধে লিখিতে প্রস্তুত হইতেছে।

মুলুর ফোটোগ্রাফ পাইলে তাহার ছবি আঁকানো সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারিব। ইতি ২৬ মাঘ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

১ মাচ ১৯২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুলুব ছবি প্রভৃতি সম্বন্ধে আপনি যে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছেন তাহার কোনো হেতু নাই। যে সব ছেলের আঁকিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের হাতে মুলুর ফোটোগ্রাফগুলি দিয়াছি তাহারা এই ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় উৎসাহ বোধ করিতেছে। আমার বিশ্বাস অন্তত একটি ভালো ছবি ইহাদের হাত হইতে বাহির হইবে। এজন্য ইহারা কিছু সময় চায়। লেখা সম্বন্ধে ছেলেদের স্বাভাবিক জড়তা আছে। সেই জন্যে এপর্য্যন্ত তাহাদের কাছ হইতে মুলু সম্বন্ধে কোনো লেখা পাই নাই। মুলু সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোনো প্রস্তাব করিতে আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না, কেননা, তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনেও বেদনা আছে। ইতি ২১শে ফাল্গুন ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

৯ মার্চ ১৯২০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

Young Indiaতে আমার সমস্ত পুস্তিকাটি খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। বিশ্বভারতীর অর্থসম্বল কিছুই নাই: লোকের কাছ হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করি না, সেইজন্য আমার বই বিক্রয়ের টাকার উপরেই আমার একমাত্র নির্ভর। তাহার ক্ষতি করা আমার বিদ্যালয়েরই ক্ষতি করা।

"কর্ণকুন্তীসংবাদে"র ইংরেজি Modern Reviewর জন্য পাঠাইলাম। সুরেন বোধ করি "গোরা" তর্জ্জমা করিতে সাহস করিতেছে না। কেম্ব্রিজ হইতে এণ্ডাসনের পত্র পাইয়াছি তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন আমার গল্পের মধ্যে গোরা তর্জ্জমা করিতে তাঁহার সখ, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বলিয়া দ্বিধা করিতেছেন। আমারও বোধ হয় কোনও নিছক ইংরেজের পক্ষে গোরা তর্জ্জমা করা সহজ নহে। এণ্ড্রুজ আসিলে তাহার সঙ্গে একত্রে মিলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। ইংরেজি ভাষায় আমার কলম যদি সহজে চলিত তবে Modern Reviewর জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, কিন্তু নূতন অভ্যাসের আর সময় নাই। ইংরেজিই কি আর বাংলাই কি লিখিতে বসিতে কিছুতে মন যায় না। ইতি ২৬ ফাল্গুন ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

মহেশবাবু সম্বন্ধে আপনি যে কথা লিখেছেন আমার মনে লেগেচে। তিনি ঠিক বিশ্বভারতীর যোগ্য অধ্যাপক। শাস্ত্রী-মশায়কে আমি তাঁর কথা বলব এবং তাঁকে আমাদের এখানে পাবার জন্য চেষ্টা করব।

রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভার সভাপতিত্বে যাব কিনা মনে সংশয় আস্‌চে। কলকাতা আমার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটের স্থান—আমি শান্তি ও বিশ্রামের জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছি। আর আমি নানা মিথ্যাতর্কের জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করিনে। এতে আমার শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়চে, নিজের কাজের ক্ষতি হচ্চে। মন উদ্‌ভ্রান্ত থাকাতে ভাল করে লিখ্‌তেও পারচিনে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয়ে উঠ্‌বেনা। মোটের উপর, কলকাতার আবর্ত্ত আমার পক্ষে আয়ুক্ষয়কর। কিছু না কিছু মিথ্যার আঁধি সেখানে সৃষ্টি হবেই। তাই আমি সেখানে কিছুকাল যাবনা স্থির করেচি। ইতিমধ্যে লেখা শেষ হলে প্রবাসীতে পাঠাব। ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

শ্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

মহেশবাবুর কথা আপনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ইহাতে শাস্ত্রীমহাশয় রথী এবং অন্যান্য সকলেই উৎসাহিত হইয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। তিনি এখানে আসিতে সম্মত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে কলম সরিতেছে না। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

নভেম্বর ?, ১৯২২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

উত্তর দিতে দেরি হইল, তার কারণ অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে আছি, একটুও সময় পাই না। আপনি জানেন ইংরেজি প্রবন্ধ অত্যন্ত দায়ে না পড়িলে লিখি না, কারণ অভ্যাস নাই, ভরসা নাই, এ ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে ক্ষিপ্রতা নাই— তার উপরে

আমি স্বভাবত অত্যন্ত অলস— তার উপরে আমার ঘাড়েই রাজ্যের কাজের দায় চাপিয়াছে। তবু আপনার অনুরোধ ঠেলিতে পারি না— তাই আমার অনবকাশের ছোট ছোট ফাঁকের ভিতর দিয়া খানিকটা পুরাতন খানিকটা নূতন লেখা রিফু করিয়া তালি দিয়া একটা কাঁথা গোছের প্রবন্ধ আপনাকে পাঠাইলাম। আপনিও ইহার মধ্যে কিছু সূচিকর্ম্ম করিয়া এটাকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিবেন। নামকরণের ভার আপনারই উপর। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে তিন শত্রু। তিনখানা কাগজের বোঝা মাথায় লইলেন এ সংবাদে আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন লোকবাক্যকে আমি বিশ্বাস করি না— অনেক সময়ে কেবলমাত্র তিপ্পান্নতেই নৌকাডুবি ঘটে। শাকের আঁটিতে ভার নাও বাড়িতে পারে, কিন্তু ভারসামঞ্জস্য সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। শেষ বয়সে বিশ্বভারতী কাঁধে তুলিয়া ভারলাঘবতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিতে বসিলাম— ইহাতে আপনি কৌতুক বোধ করিবেন— শান্তা সীতাকেও এই কৌতুকের ভাগ দিবেন। ইতি তারিখ জানি না অগ্রহায়ণ ১৩২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ জানুয়ারি ১৯২৩

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

“মুক্তধারা”র বইগুলি আপনি বিশ্বভারতীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দ পাইলাম। আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

৭ মাঘ ১৩২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।

Irelandএর মনীষী Æ (George Russel) Freeman সাপ্তাহিকে Lessons of Revolution নামক যে প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন তাহাতে আমাদের ভাবিবার কথা অনেক

আছে, সেই জন্য কাগজখানি আপনাকে পাঠাইলাম। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩৩০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

২ মে ১৯২৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সঙ্গে এক যাত্রায় য়ুরোপে যাবার সম্ভাবনা আছে শুনে আনন্দিত হলুম। অপেক্ষা করে আছি কবে জাহাজের খবর পাব। আজও পাই নি। টুচি বলেন ইটালীয়ানরা আমাদেরই মতো— সময় মতো খবর দেওয়া বা কোনো কাজ করা ওদের ধাতে নেই। আশা তো আর দুই এক দিনের মধ্যে জানতে পাবো— এবং সম্ভবত ১৫ই মে মাসেই রওনা হতে পারব। ২৫শে বৈশাখের উপলক্ষ্যে একটা নাট্য অভিনয়ের উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে আছি।

কলকাতা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। তিন চার দিন আগে বোলপুরে বহুসংখ্যক মুসলমান গুণ্ডার আমদানী হয়েছিল— সময় মতো সশস্ত্র পুলিসের সমাগমে তারা তামাসা বন্ধ করেই আবার কলকাতায় ফিরেছে। ইতি ১৯শে বৈশাখ ১৩৩৩

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

১০ মে ১৯২৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাকে ভুল বুঝবেন না, বুঝলে অন্যায় হবে। কারণ প্রবাসীর প্রতি মমত্ব ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আমি অনেক কঠিন বাধার সঙ্গে লড়াই করে এসেচি। আপনাদের যে সব লেখা দিই অর্থ অর্জ্জন তার উদ্দেশ্য নয়— বস্তুত অর্থের দাবী করতে আমার একান্ত সঙ্কোচ বোধ হয় তার কারণ আমি সহজ প্রীতিবশতই আপনাকে বরাবর লেখা দিয়ে এসেচি— সে জন্যে অত্যন্ত নিকট আত্মীয়দেরও মনে প্রবল বেদনা দিতে হয়েচে। বিশ্বভারতীতে চির দুর্ভিক্ষ, তা ছাড়া আজকাল আমার সব লেখাই গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের হাতে পড়ে··· এই বিভাগের প্রয়োজন ও প্রণালী দুইই আমার অগোচর। এইটুকু জানি, এক এক সময়ে টাকার আশু প্রয়োজন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে— অল্পকাল আগে সেই রকম দিন এসেছিল। আমার হাতে নগদ টাকা বলে কোনো বালাই নেই, আমার ভিক্ষার ঝুলিতেও শনির দৃষ্টি। এই জন্যেই যে মুহূর্ত্তে যে কেউ টাকা হাতে ধন্না দিয়ে বসে অবিলম্বে তার হাতে লেখা গিয়ে পড়ে। কিন্তু কার্য্যবিধি আমার নয়। শরীর ক্লান্ত থাকাতে আমার সঙ্গে আর্থিক আলোচনা কেউ করে না। কিন্তু আমার লেখা তো আমারই— তার বিরুদ্ধে আপনার সম্পাদকীয় দ্বার বন্ধ হবে এমন কোনো অপরাধ আমি করি নি। আপনার কাজের সঙ্গে আমার লেখার সম্বন্ধ আছে সেজন্যে অন্য যে-

কোনো জায়গা থেকেই আমি শাস্তি পাই সেটাকে আমি অন্যায় বল্‌তে পারি নে কিন্তু আপনি যদি শাস্তি দেন তবে সেটাকে কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত বলা চল্‌বে না। আমার লেখা কোনো কোনো অবস্থার দুর্ব্বিপাকে পণ্য দ্রব্য হয়ে ওঠে— কিন্তু যখনি সে কথা ভোলবার সুযোগ পাই আমি তো নির্ব্বিচারে স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকেই পাঠিয়ে দিই— এটুকুর জন্যেও ত আপনার কাছে বিচার দাবী করতে পারি— দোকানদারও নিজের দোকানের জিনিষ আত্মীয়কে উপহার দিতে পারে। যখন আপনার কাছ থেকে টাকাও পেয়েছি তখনো সে টাকাকে আমি মূল্য বলে মনে করি নি। পর্শু চলে যাব— কথাটা খণ্ডন করবার সময় পাব না— লেখাও হয় ত অনেকদিন বন্ধ থাক্‌বে— কিন্তু আমার এই অবসাদের সময় আপনারা আমার প্রতি মনকে প্রতিকূল করবেন না। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৩।

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

৭৮

১২ মে ১৯২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চিঠিখানি পেয়ে আরাম পেলুম।

“বৈকালী” লোকহস্তে পাঠাচ্ছি। কালিদাসের চিঠিতে এর বিবরণ পাবেন। যেমন ইচ্ছা ছাপাবেন। পরে এগুলি বই আকারে বের করব।

অত্যন্ত শ্রান্ত আছি। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩

আপনাব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

২৫-২৬ অক্টোবর ১৯২৬

ওঁ

ভিয়েনা

২৫ অক্টোবর

১৯২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মডার্‌ন্ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য বেরিয়েচে, আপনার চিঠিতে সেটাকে আপনি ভুল বলে জানিয়েচেন। আমি তাকে ভুলের চেয়ে কেন বেশি মনে করি সে কথা গোপন করা উচিত নয়।

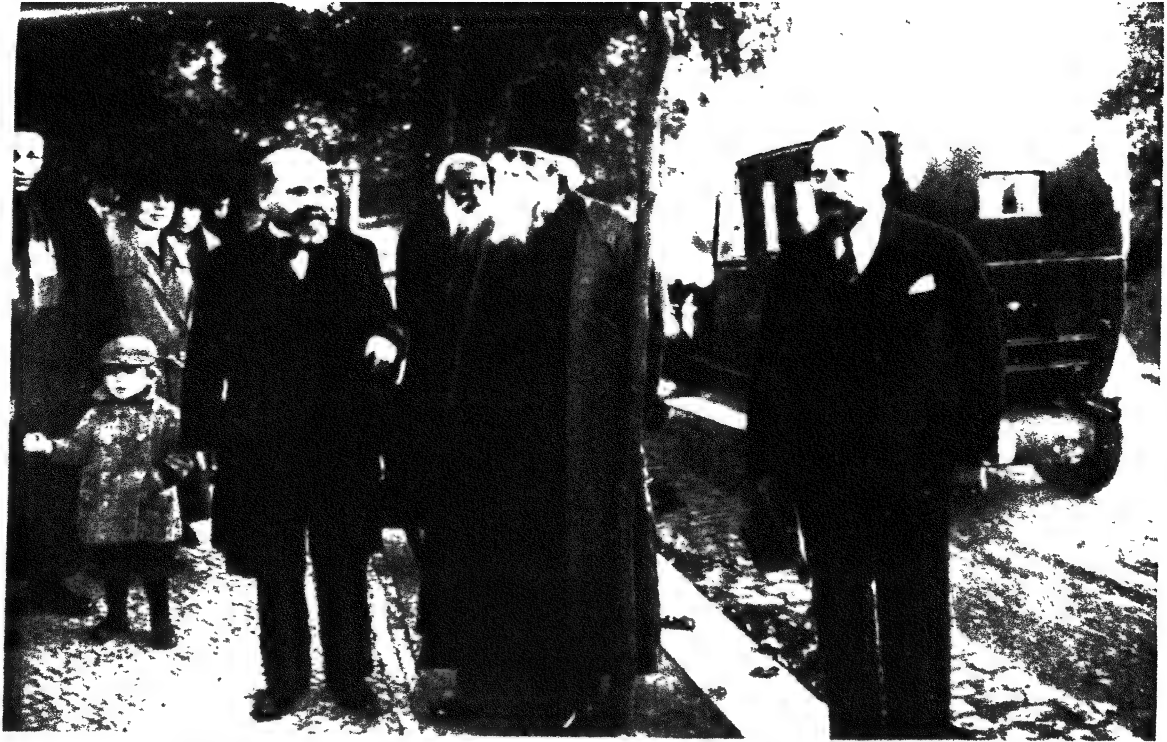

চিত্রে বাঁ দিক থেকে মি. লেসনি, রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ (পশ্চাতে), এম. ভিন্টারনিৎস

সরলা যখন আপনার সম্পাদকের কার্য্যকে ব্যবসাদারী বলেছিল তখন সেটাকে আপনার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশত ভুল বলে মনে করতে পারতুম। কিন্তু লেখার মধ্যে অসম্মানকর শ্লেষ ছিল বলেই আমি তা ভাবতে পারি নি এবং সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করেই আত্মীয়মণ্ডলীকে বেদনা দিয়ে প্রকাশ্যে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি— বিশেষ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করে তার ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করি নি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি বিচারক নই, আমি ফরিয়াদী কিন্তু সে জন্যে ত বিচারের আদর্শ স্বতন্ত্র হতে পারে না।

প্রথমতঃ বুঝতে হবে, আপনার কাগজে আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা স্বতই অতিপরিমাণ লাভ ক'রে লোকের চোখে উগ্র হয়ে লাগে— নায়ক-এর মতো কাগজে এর গুরুত্ব অনেক কম হয়। এই লেখায় সাধারণ লোকে যে চমৎকৃত হয়েচে দেশের কোনো কোনো চিঠি থেকে তার পরিচয় পেয়েছি। দ্বিতীয়ত আমার সম্বন্ধে এ রকম তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেশী বিদেশী শত্রু মিত্র কারো কাছ থেকে অনেকদিন পাই নি। যাদের সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমার মতান্তর আছে আমার মত ও আচরণকে আক্রমণ করবার ন্যায্য অধিকার তাদেরই। কিন্তু আপনার কাগজে এটা মতঘটিত প্রতিবাদ বা আক্রমণ নয় ব্যক্তিগত অবমাননা।

দেশের পলিটিক্স্, সমাজ বা সাহিত্যিকরুচি অথবা সমব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা নিয়ে লোকের মন যখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয় তখন বাদপ্রতিবাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কটুকাটব্য

আপনি এসে পড়ে। তখন পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃতি অন্যায় হলেও নিরতিশয় অসঙ্গত মনে হয় না। তৎসত্ত্বেও নন-কো-অপারেশনের ঘোর আন্দোলনের মুখেও আমার বিরুদ্ধবাদী কোনো পত্রে এমন ভাবে আমার প্রতি গ্লানিপূর্ণ শ্লেষ প্রয়োগ সম্প্রতি কোথাও ঘটেচে বলে জানি নে।

মডার্ন্ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে যে প্রসঙ্গে সমালোচনা বেরিয়েচে সে হচ্চে ফ্যাসিস্ট্ দলের প্রতি আমার আতিথ্যবিরুদ্ধ ব্যবহার। সে সম্বন্ধে আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাতে আমার বন্ধুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হতেও পারেন কিন্তু তাঁদের বক্ষ অত্যন্ত বেশি গরম হয়ে ওঠবার মতো বিষয় এটা নয়। আমার পত্র প্রকাশের পর ইটালীর বাহিরে ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানা স্থানের কাগজ থেকেই কাটা টুক্‌রো পেয়েছি কোথাও কেউ আমাকে এমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বক্রোক্তি করেন নি— আমার কৈফিয়ৎটাকে সাধারণত শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেচেন। এমন কি ফর্ম্মিকিও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হলেও দুঃখ প্রকাশ করেচেন আমাকে অসম্মান করেন নি।

লেখাটাকে ভুল বল্‌চেন। কিসের ভুল? ঘটনার ভুল? এ সম্বন্ধে যেটুকু ঘটনা প্রাসঙ্গিক সে আমার চিঠিতেই আছে। কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ করে বলেচেন চিঠি আমার কি না তাঁর সন্দেহ রয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর মতে চিঠি আমার এতই অযোগ্য যে ওটাকে জাল বলে মনে করলেই আমার লজ্জা রক্ষা হয়। বোধ করি ইটালীর কোনো ফ্যাসিস্ট কাগজেও এমন ছদ্মসন্দেহের কুটিল অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয় নি।

নিকটের ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক সময়ে ক্ষিপ্রহস্তে কর্ত্তব্যবুদ্ধি চালনার আশু প্রয়োজন ঘটে— সে অবস্থায় মানুষের ক্ষোভের মাত্রাও বেশি হয়। সে অবস্থায় মান্য ব্যক্তিকে বা বন্ধুকেও বিনা বিচারে বা স্বল্প প্রমাণে কঠিন কথা বলা সম্ভবপর হয়। সেই কারণে যদুনাথ সরকার মশায়ের পত্র নিয়ে আপনার ইংরেজি বা বাংলা বা উভয় কাগজেই যদি অপ্রিয় আলোচনাও হত তাহলে সেটা আক্ষেপের বিষয় হলেও বিস্ময়ের বিষয় হ'ত না। কিন্তু দূরের ব্যাপার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যবুদ্ধির অসংযত উত্তেজনা স্বাভাবিক নয় বলেই অন্তত মান্য বা বন্ধুব্যক্তির প্রতি আমরা ধৈর্য্য প্রত্যাশা করি। তার ব্যতিক্রম ঘটলে সেটা অশোভন হয়।

··· র সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয় নি ; তার সঙ্গে সম্বন্ধ আপনার সম্বন্ধ অনুসরণ ক'রেই। কিন্তু ··· আত্মীয়ের মত নিকটে এসেছিল। ··· আমার কাছ থেকে অজস্র স্নেহ পেয়েছে। মডারন রিভিয়ুতে ও তার পনেরো দিন পরে প্রবাসীতে সর্ব্বজনগোচর যে অবমাননা আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয়েছে তারা যে তা স্বীকার করে নিতে পারলে এটাই সব চেয়ে আমাকে বেদনা দিয়েছে। অবশ্য কর্ত্তব্যের দাবী আত্মীয়তার দাবীর চেয়ে বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই দাবী কি এত অত্যন্ত বেশি ছিল যে, ভাষায় অপরাধীর প্রতি সামান্য সৌজন্যেরও সংযম রক্ষা করা অসাধ্য হয়েছিল।

আপনি Forwardএর প্যারাগ্রাফের উল্লেখ করেছেন। সুধীন্দ্র বসুর প্রেরিত সংবাদমালার পরে সে প্যারাগ্রাফ গ্রথিত।

তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে সংবাদ অবিশ্বাস করবার কোনো হেতু ছিল না। তবু যখনি সংবাদ অসম্পূর্ণ বলে জেনেছেন তখনি অসঙ্কোচে দোষ স্বীকার করেছেন। আপনার দুই কাগজে যে আলোচনা বেরিয়েচে সে আমার নিজের লেখা পত্র অবলম্বন করে— উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।

জীবনে আত্মীয়তার বিকার বন্ধুত্বের বিপর্য্যয় বিনা কারণেই বারবার ঘটেচে— চুপ করেই সহ্য করেছি। এবারেও প্রতিবাদ করব না, এমন কি, বৃদ্ধ দার্শনিক কবির সাঙ্গোপাঙ্গেরাও না করেন এই আমার ইচ্ছা। তবে কি না যেটা যা সেটাকে তাই বলেই গণ্য করার প্রয়োজন আছে— ইচ্ছাকৃত অত্যাচারকে অজ্ঞানকৃত ভুল বলে চাপা দিতে গেলেই যথার্থ ভুলের সম্ভাবনা ঘটে— সেইজন্যেই আপনার চিঠির উত্তরে এই চিঠি লিখ্লুম— নইলে কোনো কথাই বল্তেম না।

এই বিদেশে আমার পত্রে আপনি কিছুমাত্র ক্ষোভ অনুভব করেন এ আমি ইচ্ছা করি নে। সেই জন্যে দেশের ঠিকানায় পাঠালেম, ফিরে গিয়ে পাবেন— ততদিনে এই বিতর্কের অনেক উত্তাপ আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। ইতি ২৬ অক্টোবর ১৯২৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবিবেচনা ও ত্রুটি সম্বন্ধে আপনি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা লইয়া যদি বিবাদ বিতর্ক করি তাহাতে নিজের বেদনার উপরে অশান্তি চাপানো হইবে। জীবনে সহস্র অপরাধ করিয়াছি,— আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি যে দোষবহুল মানুষ এ আমার ছদ্ম বিনয়বাক্য নহে। অতএব আপনার প্রতি ব্যবহারে কখনো জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অন্যায় অবিচার করি নাই এমন স্পর্দ্ধা মনে রাখি না। আমি অত্যন্তই অসতর্ক— বিবেচনার ত্রুটিতে দুঃখ পাই ও দুঃখ দিয়া থাকি। অতএব আপনার অভিযোগের প্রতিবাদে পীড়াজনক বাগ্‌বিতণ্ডাকে পুঞ্জীভূত করিয়া না তুলিলেই আমার পক্ষে গ্লানির কারণ অল্প ঘটিবে।

কেবল একটিমাত্র কথা বলা উচিত মনে করি। এণ্ড্রুজ কেন যে আমার পত্র পাওয়ামাত্র প্রকাশ করেন নাই সে সম্বন্ধে তিন চারটি পত্রে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে— বরঞ্চ তিনি এই পত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমার সেই পত্র যে আমার যোগ্য হইয়াছিল এ কথা তাহার প্রমাণ নহে— আমার বলিবার বিষয় কেবল এই যে, এই বিশেষ

ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার ধারণা ভুল হইয়াছিল। ইতি ৮ই পৌষ ১৩৩৩

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

৪ জানুয়ারি ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সীতার কন্যাটির মৃত্যু হয়েছে শুনে মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করচি। তার যে রকম বেদনাপ্রবণ মন, সে খুব কষ্ট পাচ্চে সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এ রকম শোকের সান্ত্বনা দিতে পারে এমন শক্তি কার আছে। এসময়ে সে আপনাদের কাছ থেকে দূরে আছে এও দুঃখের কথা।

আপনি কবে আসতে পারেন লিখবেন। আপনার সেই কুটীর প্রস্তুত আছে। ইতি ৪ জানুয়ারি ১৯২৭

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

৫ জানুয়ারি ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্ভবত আগামী কাল বৃহস্পতিবারে মধ্যাহ্নের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব — দুই তিন দিনের জন্যে সেখানে থাকবার কথা। ইতিমধ্যে আপনি যদি আশ্রমের অভিমুখে না আসেন তাহলে সেখানেই দেখা হবে। ইতি বুধবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ জানুয়ারি ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার যে কখানি চিঠি ছাপা হয়েচে তাতে এমন কিছুই নেই যা অছাপ্য। যাতে কাউকে আঘাত করতে পারে এমন জিনিষ বর্জ্জন করলেই আর কিছুতে ক্ষতি হবে না। ব্যক্তিগত আলোচনা চিঠি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে চিঠিত্ব চলে যায়— সেই সহজ ভাবটি রাখবার জন্যে অন্য হিসাবে অনাবশ্যক হলেও কিছু কিছু ঘরের কথার আমেজ থাকা ভালো।

আমি রবিবার প্রাতে অত্যন্ত পীড়িত ক্লান্ত হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে

পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলুম— শ্বাস বড় বেশি বাকি ছিল না। আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপের সুযোগ হল না। স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি কলকাতায় বাস আমার পক্ষে পথ্য নয়। এই শীতের সময় এখানে বিদেশী অতিথির আমদানী প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণেই হচ্চে কিন্তু তাদের অভ্যর্থনা কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলে সেটা স্বীকার করে নিতে হবে। কলকাতায় ভূরি পরিমাণ অকৃত্যের চাপে একেবারে তলিয়ে যেতে হয়,— এ বয়সে সেটা সয় না।

নটীর পূজার অভিনয় কলকাতায় হবে সম্প্রতি তারই আয়োজনের ভার নিতে হয়েচে। কাজটা সহজ নয়— অবকাশ একেবারে সম্পূর্ণ গিলে খাচ্চে। শাস্তার কন্যার সঙ্গে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি এখনো হল না— কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়েছে— দেখা হলে হয়ত পাকা হবে। ইতি
১ মাঘ ১৩৩৩

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

২৮ মে ১৯২৭

ওঁ

Uplands
Shillong

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি বোধহয় জানেন বালী দ্বীপে হিন্দুসভ্যতা আলোচনার জন্য কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে সেখানে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে আমি যুগলকিশোর বিরলা মহাশয়ের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেম। এখনো পাই নি, পাব কিনা জানি নে। জাভা গভর্মেণ্টের কাছে আমি অর্থসাহায্য প্রার্থনাও করি নি। বিরলা যদি সাহায্য না করেন তবে আমি যেমন করে পারি নিজের ব্যয়েই যাব— সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই। আমি নিজে বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি এবং এও জানি আমার দ্বারা কাজটা সহজসাধ্য হতেও পারে। জাভা গবর্মেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি। সেখান থেকে যাঁদের উৎসাহ পেয়েচি তাঁরা পুরাতত্ত্ববিৎ— আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পেলে তাঁদের সন্ধান-কার্য্যের সুবিধা হতে পারবে।

এখানে এসে প্রথমটা জ্বরে পড়ে কিছু দিন অসুখে কেটেচে। আমি যদি বা উঠেচি পুপের জলবসন্ত হল, অল্প অল্প করে সে সেরে উঠ্‌চে— এবারকার হাওয়া বদলটা, যাকে বলে successful, তা নয়। হাওয়াটা ঠাণ্ডা একথা স্বীকার করতে হবে— নিম্নভূমিতে জ্যৈষ্ঠ মাস বলতে যে কি বোঝায় তা ভুলে যাই বলেই কেবলমাত্র ঠাণ্ডার জন্যে মনে কৃতজ্ঞতা জন্মায় না। যা সহজে পাই তার চেয়ে বেশি পাবার ইচ্ছে মন থেকে ঘোচে না। শিলঙ শিলঙই থাকবে অথচ দার্জ্জিলিংও হবে এইটেই মনেব কামনা। ইতি ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আপনাদেব
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

৫ জুন ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সেই ছাটা কাগজগুলি আমার টেবিলের উপর ছিল এই পর্য্যন্তই জানি— তার চেয়ে হাল আমলে কোথায় তাদের গতি হয়েচে আমি তার কিছুই ঠিকানা জানি নে। তাদের আর উদ্ধার হবে বলে বিশ্বাস করি নে— এই শৈলমালার ধূলির ভিতর দিয়ে একদা এখানকার পুষ্পপল্লবের মধ্যে তাদের নবজন্ম লাভ হবে।

পুপে সেরে উঠেচে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও ঘন বৃষ্টিধারায় অবগুণ্ঠিত। ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

১৮ জুন ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার সঙ্গে Thompsonএর কথাবার্ত্তা যা কিছু হয়েচে কোনো ছাপার বহিতে তার গতি হবে এমন আশঙ্কা মনেও উদয় হয় নি। সেগুলো যে আমাকে দেখিয়ে নেবে এমন মানুষই ও নয়। Early British Officerরা তাদের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীমাত্রকে ঠাকুর বলত এ খবর আমার জানা নেই। Castle of Indolence এবং Faery Queen আমি পড়ি নি— Princessএর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই— আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।

The Ring & the Book একটা মাম্‌লার ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্যের সমষ্টি। ঘরে বাইরেতে প্রত্যেকে মুখ্যতঃ নিজের সম্বন্ধেই নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করেছে— অন্যেরা গৌণ।

বিমলার struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের— সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করচে— নিখিলেশও নিজের feelingএর সঙ্গে নিজের কর্ত্তব্যের adjustment করচে। অন্য কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধে এরা সাক্ষ্য দিচ্চে না। এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখচে।

টমসন লিখেচেন আমি কাকে বলেচি যে আমি বাইবল্ পড়ি নি। আমাকে প্রশ্ন করলে সহজেই জানতে পারতেন আমি New Testament পড়েচি— একান্ত বিতৃষ্ণাবশত Old Testament পড়ি নি। আমি Shakespeare ভালোবাসি কি না এ প্রশ্ন করবারও যথেষ্ট অবকাশ তাঁর ছিল। আমার বয়স যখন ৯ আমি ম্যাকবেথ তর্জ্জমা করেছি। ৩ আষাঢ় ১৩৩৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ জুলাই ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি অমিয়কে যদি জিজ্ঞাসা করতেন জান্‌তে পারতেন এবার আপনার সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগেই আমি তাকে বারবার বলেছি যে প্রবাসীর সঙ্গে অন্য কোনো কাগজের

প্রতিযোগিতায় আমি যোগ দিয়েচি এই অন্যায় জনশ্রুতিকে দূর করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম বলেই কিছুই করতে পারি নি সত্য, কিন্তু শীঘ্রই আমার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করব বলে প্রস্তুত হতে যাচ্ছিলুম। সেটা যখন অসম্ভব হল তখন বুঝতে পারচি বন্ধুত্ব সম্পর্ক নিয়ে চিরদিন আমার যেরকম আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেচে এবারেও তাই ঘট্‌ল। অর্থাৎ কোনো অপরাধ না করেও আমাকে দুঃখ পেতে হবে।

বারবার দেখেচি যখন পরস্পর বোঝাপড়ার একটা কোনো বাধাও ঘটে তখন বাইরে থেকে অত্যুক্তি ও মিথ্যা উক্তি কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে। যখন চিত্তরঞ্জন ও দ্বিজেন্দ্রলাল আমার অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন তখন আমার জবানী এমন সকল কথা আমাদের দুই পক্ষের সুপরিচিত লোকে তাঁদের কাছে রটিয়েছিল যার কোনই মূল ছিল না। মিথ্যা জনশ্রুতি আপনাদের কানে যে পৌঁচচ্ছে না তা বল্‌তে পারি নে। এইরকম সময়ে ছোট কথা বড়ো হয়ে ওঠে, আকস্মিক ঘটনাকে চেষ্টা-ঘটিত বলে মনে হয়।···

এই সব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে যখন ক্ষোভের কারণ ঘটে তখন একান্ত লজ্জিত হই এবং তাতে আমার গভীরতর ক্ষতির কারণ ঘটে। আপনাদের কারো সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই রকম খিটিমিটির দ্বারা আহত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা আমার পক্ষে [আর] নেই। আমি কোনো অভিমানকে মনে স্থান দিতে চাই নে। আমার অন্তরের একান্ত প্রার্থনা আমার মন যেন বাধামুক্ত হয়। আমার বয়স আয়ুর শেষ কোঠায় এসে

পৌঁচেছে তবু আজও প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গ্লানির দ্বারা নিজেকে আক্রান্ত দেখ্‌লে খেদের অন্ত থাকে না। জীবনে যে সম্বন্ধগুলি মূল্যবান তার সংখ্যা খুব বেশি নয়— তাদের মূল্য উপলব্ধি করেছিলাম বলেই আজ যখন চিত্ত মুক্তিকামনায় উৎকণ্ঠিত তখনো তাদের দ্বারা অপঘাতে অবসাদের হাত এড়াতে পারি নে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ করবেন না— নিষ্কৃতি দেবেন।

আপনি বোধ হচ্চে ···র লিখিত কোনো একটা নিন্দাসূচক পত্রের আভাস আপনার পত্রে দিয়েচেন। এ কথাটা আমাকে কেন লিখ্‌লেন। কর্ত্তব্য তো ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপরের কথা— *আমি* বেদনা বা লজ্জা পাব, বা আমার কাজের ক্ষতি হবে বলে আপনি কেন সঙ্কুচিত হবেন? ইতি ১ জুলাই ১৯২৭

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ জুলাই ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল আপনার চিঠির শেষ অংশে যখন বিশ্বভারতীর আর্থিক ব্যবহার ঘটিত নিন্দাসূচক পত্রের উল্লেখ দেখেছিলুম তার ঠিক সঙ্গতি না বুঝতে পেরে আমার ধোঁকা লেগেছিল।

এটা জানা ছিল, যে ··· অনেকদিন থেকেই বিশ্বভারতীর মাথায় বজ্রাঘাত করবে শাসিয়েছিল— অনুমান করেছিলুম আপনার উল্লিখিত চিঠি তারি রচনা।

এমন দিন ছিল, যখন সবুজপত্রে আমার বড়ো বড়ো অনেক রচনা গল্প ও কাব্য বাহির হয়েছিল। তখন এ রকম ভাবের কথা শুনি নি। আজ দৈববিপাকে যখন থেকে লেখা বেচাকেনা করতে বাধ্য হয়েছি তখন থেকে নিজেকে অবমাননা ও বেদনার থেকে রক্ষা করা আমার পক্ষে অসাধ্য হোলো। যে মানুষ হাটে নেমেছে সে বন্ধুত্বের দাবী করতে পারে না। পূর্ব্বে আমার যে সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য ছিল আজ পণ্যশালায় তা বিকিয়ে দিয়েচি। এই বিরুদ্ধতার এই ভুল বোঝাবুঝির আবহাওয়া আমার শান্তির পক্ষে সাধনার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। এর থেকে প্রাণপণে আমাকে দূরে যেতেই হবে। অসমাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করতে হবে। তার পরে সাহিত্যের কারখানা থেকে ছুটি নেব। অনেক লিখেছি। আর লিখ্‌ব না। কলম বন্ধ করে এবার আমাকে অন্য সাধনার পথে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাতে হবে।

নিশ্চয়ই অবিবেচনাবশত আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করেচি। সকল সময়ে সব দিক চিন্তা করতে পারিনে এ দোষ আমার আছে। সেই জন্যেই সকল দিকেই আমার সংসারের পথ কণ্টকিত। অন্তরের দিক থেকে এই কণ্টক তোলবার চেষ্টা করব।

আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনি

যেন না মনে করেন যে, কোনো বাইরের বিভীষিকায় আমি শঙ্কিত। জীবনে সে রকম আঘাত নিরন্তর সহ্য করে করে সয়ে গেছে। এখন যে বিভীষিকাকে ভয় করি সে আমার নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতা। ইতি ১ জুলাই ১৯২৭

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রসঙ্গে আর একটি ক্ষোভের কথা বলে সব কথা শেষ করি। কাল আপনি পাত্রাবশিষ্ট লেখার কথা বলেছিলেন। বৃক্ষবন্দনা ও বর্ষশেষ কবিতা দুটি আমার আধুনিক সব লেখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি। দুঃখের বিষয় কবিতার কোনো দাম নেই। ধর্ম্মবোধ লেখাটাও অবহেলা করে লিখি নি। কিন্তু এ কথাটা আজকের চিঠিতে অপ্রাসঙ্গিক।

৮৯

২ জুলাই ১৯২৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অনেক কথা হৃদয়ে চাপা থাকে, বলবার প্রয়োজন হয় না, দুঃখের দিনে সেগুলো বলবার সময় আসে। আজ সেই রকমের একটা কথা আপনাকে বলি :—

জানিনা, কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুত্বের সীমা অত্যন্ত

সঙ্কীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্চে, আমার হৃদ্যতা-প্রকাশের প্রাচুর্য্যের অভাব। শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একলা ছিলুম, লোকসঙ্গ না পাওয়াতে লোকব্যবহারের শক্তি সম্ভবত আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্যেই এ জীবনে বন্ধুসমাজে আমার বাস করা ঘটে নি। শিশুকালের মতো আজো বস্তুত আমি একলাই আছি। সেটাতে আমার অনেক ক্ষতিও হয়েচে, তাছাড়া একটা স্বাভাবিক আনন্দের বরাদ্দ আমার ভাগ্যে চিরদিন কম পড়ে গেছে।

যখন বয়স হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারি নি। এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু, ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এই চারজনের নাম [মনে] পড়চে। হঠাৎ এক সময়ে অরবিন্দকে নিয়ে অন্তত বাইরের দিক থেকে জগদীশ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। আমার সে একটা সুদীর্ঘ ও সুগভীর দুঃখের ঘটনা।

তার পরে হঠাৎ এক সময়ে, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো, যদুবাবুর কাছ থেকে একটা অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ নিষ্ঠুর চিঠি পাই, সে কথাও আপনি জানেন। সেই অবধি তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে আমি সাহস করি নি। তিনিও সম্ভবত আমার কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মরীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই আমার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেচেন। অথচ তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ গুরুতর বিষয়ে আমার মতবিরোধ ছিল।

আপনারা ছাড়া আমার স্নেহভাজন অল্পবয়সের সুহৃদ কেউ কেউ ছিলেন এবং এখনো আছেন। তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রকে মৃত্যুদ্বারা হারিয়েছি, কাউকে কাউকে হারিয়েছি অকারণে অথবা অজ্ঞাত কারণে।

এখন আয়ুর প্রান্তে এসেচি — নূতন সম্বন্ধ রচনার সময় চলে গেছে।

আপনি হয় ত সব কথা জানবার সুযোগ পান নি কিন্তু আজ আপনাকে বলচি, আপনার জন্যে, অর্থাৎ আপনার প্রবাসী প্রভৃতির জন্যে আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক বার অনেক আঘাত পেয়েছি। সেটা আমি কর্ত্তব্যবোধেই স্বীকার করেচি। প্রবাসীতে অগ্রগামী হয়ে আপনি যে পদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তন করেছিলেন অন্য সকল কাগজ যখন তারই অনুবর্ত্তন করে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন আমি সেজন্য অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি। প্রমথ সবুজপত্রে একেবারে সেদিকে যান নি বলেই আমি আরাম পেয়েছিলুম। সবুজপত্র কোনো হিসাবেই প্রবাসীর প্রতিযোগী ছিল না, নিজের প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই আমার পক্ষে সবুজপত্রকে আনুকূল্য করা এত সহজ হয়েছিল। না হলেও সবুজপত্রকে পরিত্যাগ করতে পারতুম না কারণ ইন্দিরা আমার

একান্ত স্নেহের পাত্রী এবং প্রমথকে সাহিত্যিক ও মনস্বী বলে বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

সেই সবুজপত্রকে দীর্ঘকাল আমি উপবাসী রেখেচি অথচ আমি মনে মনে জানি তাঁরা সহায়তা আশা করেই দ্বিতীয়বার আসরে নেমেছিলেন। তার একটা কারণ, আমার সময় ও শক্তির প্রাচুর্য্য এখন নেই। দ্বিতীয় কারণ বিশ্বভারতীর দাবিদ্রে৷ আমি আজ দরিদ্র। আমাকে ভিক্ষা কেউ দেয় না, উপাৰ্জ্জন করতে হয়। সবুজপত্র থেকে বার বার আমার কাছে একটা বড়ো উপন্যাস দাবী করা হয়েছিল কিন্তু সেটা বর্ত্তমান অবস্থায় দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে জেনেই উপন্যাস লেখাই আমি সুদীর্ঘকাল বন্ধ রেখেছিলুম। প্রমথ যদি বিচিত্রার ভার না নিতেন তাহলে আমি উপন্যাস কখনোই লিখ্‌তুম না।

কিন্তু যখনি এই উপন্যাস লিখ্‌তে বসেচি তখনি আমার মনে হয়েচে প্রবাসীর জন্যে একটা উপন্যাস লিখ্‌তেই হবে। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে নয়, এতকাল বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েও প্রবাসীর প্রতি (আপনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার খাতিরেই) যে মনোভাব পোষণ করে এসেচি সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে। আমার পক্ষে, এ বয়সে একসঙ্গে কলমের রথে জুড়ি গল্প হাঁকানো প্রায় অসাধ্য বল্‌লেই হয় কিন্তু তাও আমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল।

একদা প্রত্যক্ষত আপনার মধ্যে দিয়েই প্রবাসী ও মডার্‌ন্ রিভিয়ুর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক সম্বন্ধ ছিল।

তাতে আমি খুবই তৃপ্তি পেয়েচি। সম্প্রতি কিছুকাল থেকে হয় তো দুই পক্ষেই সেই অব্যবহিত সম্বন্ধের ব্যাঘাত হয়েচে। তাতে মনে যে কঠিন দুঃখ পেয়েছি তার কারণ সাহিত্যিক নয়। এটা নিছক বন্ধুত্বের বেদনা। আপনার কাগজের ভিতর দিয়ে আমাদের পরস্পরের স্পর্শ ছিল সেটার মধ্যে কঠিন ব্যবধান পড়েচে। অন্যান্য কারণের মধ্যে আর্থিক কারণটাই হয় তো সর্ব্বপ্রধান। তাই ইদানী এই অর্থের সম্পর্কটাকে অস্বীকার করবার মৎলবই মনে মনে আঁটছিলুম। এখন বুঝতে পারচি সেটাতে ভুল বোঝার সৃষ্টি হত। হয়ত কখনো না কখনো এমন কথার সৃষ্টি হতেও পারত যে, "সস্তার তিন অবস্থা।" একবার ভুল বোঝার দূষিত হাওয়া সুরু হলে তার স্পর্শে সমস্তই বিকৃত হয়।

যাই হোক্ প্রবাসী ও মডারন্ রিভিয়ুর তো দরোয়াজা বন্ধ। অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যে একটি অকৃত্রিম আত্মীয়সম্বন্ধ আছে সেটা প্রকাশ করবার পথে দেয়াল উঠ্ল। সবসুদ্ধ জড়িয়ে আবহাওয়াটা আমার পক্ষে এতই দুঃখজনক হয়েছে যে, আমার সাহিত্যিক জীবনের পরেই আমার ধিক্কার জন্মেছে। লেখার আনন্দ আজ একটা গুরুতর ব্যাঘাত পেয়েচে। শুধু তাই নয় এই সমস্ত ব্যাপারে আমাকে একটা খর্ব্বতার মধ্যে নামিয়েছে তাতে নিজের জন্যে বড়ই লজ্জা বোধ করি। কেউ জানে না, মুক্তির জন্যে আমার মনের মধ্যে কত বড় একটা উৎকণ্ঠা আছে। আমার সেই সাধনায় ব্যাঘাত হয় যখন এই সকল ব্যাপারে আমাকে নিজের দিকে সচেতন করে তোলে।

সেই নিজেটা বড় ক্ষুদ্র, মাঝে মাঝে তার অনাবৃত পরিচয় পেলে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। এ কয়দিন এত কষ্ট পাচ্চি সেই জন্যে। সেই জন্যেই সাহিত্যের সাধনা ফেলে রেখে অন্য সাধনাটার দিকে দৌড় মারবার জন্যে মন আজ এত উৎসুক হয়েচে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্তই কম্‌লি হয় ত ছাড়বে না।

২ জুলাই ১৯২৭

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৮ জুন ১৯২৮

ওঁ

[কলম্বো]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কোনো মতে শরীরটাকে টান্‌তে টান্‌তে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এত দূরে এসে পৌঁচেছি — কিন্তু আর চলচে না। ঘাটের থেকেই ফিরতে হোলো। দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেচি— ছোট ছোট দাবীর শিলবৃষ্টিতে আমার দেহ মনের সমস্ত ডাঁটাগুলো একেবারে আল্‌গা হয়ে গেছে। ডাক্তার বল্‌চে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি।

চিঠি দুটো ছাপবেন।

অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হোয়ে বড়োই তৃপ্তি পেয়েছি। এ সম্বন্ধে একটা লিখেছি ফিরে গিয়ে আপনার হাতে দেব। আগামী ১০ই তারিখে একটা জাহাজ যোগে যাব মাদ্রাজে— সম্ভবত ১৪ই ছাড়ব মাদ্রাজ থেকে রেলযোগে— যদি পথের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম কামনায় না নামতে হয় তাহলে বোধ করি ১৬ই পৌঁছব কলকাতায়। ইতি ৮ জুন ১৯২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"লেখন" সম্বন্ধে লেখাটি পাঠিয়েছি, পেয়েচেন বোধ করি। ক্ষুদ্রকায়া কবিতা সম্বন্ধে দুচারটে কথা লিখেছি— সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অত্যন্ত ভীরুতা আছে, বলা বাহুল্য য়ুরোপে সেটা নেই, আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। Fireflies সম্বন্ধে একটি অ্যামেরিকান পত্রিকার সমালোচনা ক্ষুদুর হাতে দিয়েছিলুম, সেটা বোধ হয় সে হারিয়ে ফেলেচে। কিন্তু অ্যামেরিকায় Dial সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যিক পত্র— তাতে Firefliesএর কবিতাকে যে ভাবে কবিতার

পদবী দিয়েই সমালোচনা করেচে সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য অপূর্ব্বকে বলেছিলুম ঐ লেখাটা আপনাকে দিতে। বোধ হয় দিয়েচে। তাতে এইটে দেখা যায় সেখানকার সাহিত্যিকদের সাহিত্যরসবোধ ভীরু নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে বার বার তার প্রমাণ পেয়েছি এবং তার উল্টো প্রমাণ এদেশে সর্ব্বদাই পাই। জাপানের এবং চীনের কাব্য সম্বন্ধে য়ুরোপের পাঠকদের যে প্রভূত আনন্দবোধ দেখেচি তাতে করে তাদের বিচারশক্তির ঔদার্য্য দেখতে পাই। এই ঔদার্য্য কন্টিনেণ্টের চেয়ে ইংলণ্ডে কম তা সত্য।

সেই নাম্নী কবিতাটার প্রুফ একবার দেখতে হবে— অল্পস্বল্প কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক আছে। ইতি ৫ আশ্বিন ১৩৩৫

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ অক্টোবর ১৯২৮

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

যদুনাথ সরকার মহাশয় মৃত যুগের কাহিনী নিয়ে কারবার করেন— টুক্‌রো খবর জোড়াতাড়া দেওয়াই তাঁর অভ্যস্ত। তিনি পণ্ডিত, সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করে

তাতেই তিনি তৃপ্তি পান— মরা জিনিষ নিয়ে এমন করে ম্যুজিয়ম সাজানো চলে, যথাস্থানে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ঘরগড়া কাঠামোর মধ্যে জীবধর্ম্মী পদার্থকে লেবল্ মেরে যিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তিনি অস্থানে আপন শক্তির অপব্যবহার করে থাকেন। তিনি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অবধি চিরকাল ছেলে-পড়ানো ব্যবসাতেই এতকাল কাটিয়েছেন, অর্থাৎ বাঁধা নিয়মের পুনরাবৃত্তি করেছেন ও উপরওয়ালাদের হুকুম মেনে চলেচেন। সেইজন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি মৃত পদার্থের মতোই ব্যবহার করেচেন— নিজের চিত্ত থেকে তাকে কিছুই দিতে পারেন নি, বরঞ্চ তার ক্ষয় সাধন করেচেন। আশু মুখুজ্জে মশায়ের মনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব রূপ ছিল— বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তিনি পণ্ডিতী করেন নি, সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তার অন্তরের থেকে তার প্রাণশক্তিকে নব নব বিকাশের মধ্যে উদ্ভাবিত করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। মৃত বস্তুর কোনো বালাই নেই, তাকে নেড়ে চেড়ে সাজিয়ে রাখলেই, স্ক্রু পেরেক লাগিয়ে জোড়াতাড়া দিতে পারলেই চুকে যায়; কিন্তু সজীবের সঙ্গে কারবারে সতেজ চিত্তের ও সমগ্রদৃষ্টির প্রয়োজন হয় তাতে পদে পদে ভুলের আশঙ্কা আছে—কিন্তু শক্তিমানের হাতে সেই ভুলও ভালো, পাণ্ডিত্যাভিমানীর জড় হস্তে প্রাণের অবমাননা এবং হুকুমের তামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গর্হিত। আশু মুখুজ্জে মশায় জানতেন এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি শেষ হয়ে যায় নি, সবে আরম্ভ হয়েচে। তাকে দেশের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে

তুলতে হবে, তাকে এমন কিছু করে তুলতে হবে যা অন্য কোনো দেশের প্রতিষ্ঠানের নকলমাত্র নয়।

সৌভাগ্যক্রমে মুখুজ্জে মশায় কেবলমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, নির্ভীক চিত্তশক্তির বলে পুরাতনের মধ্যে নূতনের উদ্বোধন করতে পারতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো একটা শ্রেণীগত কাঠামোর মধ্যে এঁটে সেঁটে ঠেসে রেখে তার পর থেকে দুই চক্ষু বুজে অন্ধ প্রদক্ষিণের জন্যে বাঁধা প্রণালীতে চক্রপথ সৃষ্টি করতে চাননি। সেই কারণেই তিনি ভুলও করেছিলেন, কিন্তু সব ভুলকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করেছিলেন। পণ্ডিত সরকার মশায় শাস্ত্র মিলিয়ে এবং সর্ব্বদা উপরওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার কাজ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কোনো কূলই রক্ষা করতে পারেন নি।

তাঁর এইরকম বিশুদ্ধ পণ্ডিতী মনোভাববশতই তিনি নিশ্চয় ঠিক করে বসেচেন যে আমার বিদ্যালয়ে আমিও জোড়াতাড়ার কাজে লেগেচি। ইচ্ছা করলেও তা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমার কোনো কর্ম্মঅনুষ্ঠানকে পণ্ডিত মশায় তাঁর সযত্নপঠিত পুরাতন ইস্কুল বইয়ের থেকে সঙ্কলিত সুনির্দ্দিষ্ট কোনো জড়প্রণালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারবেন না। তাকে ঠিকমতো বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ আমি পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত,— ধ্যানদৃষ্টিতে সমগ্রভাবে দৃষ্ট সত্যরূপকে জীবনের সৃষ্টিপ্রণালীতে অন্তর থেকে বাহিরে উদ্ভিন্ন করে তোলবারই সাধনা করে থাকি। আমার বাক্যের রচনা ও

কর্ম্মের রচনা সেই একই পথে চলে। পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করা এই বিধানেই হয়, ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্পূর্ণ অন্য বিধানে।

পণ্ডিত সরকার মশায় বলেন, আত্ম-অগোচর অনুকরণের পথ বেয়ে আমি কিছু উপনিষদ কিছু খৃষ্টানী মিলিয়ে একটা জোড়াতাড়া বিদ্যায়তন তৈরি করেছি। আমি যা করেছি তা বর্ত্তমান যুগেই আছে, সে আওরঞ্জেবের যুগে নয়, অতএব সশরীরে এসে স্বচক্ষে দেখে আটায় আঁটা বা পেরেক-ঠোকা জোড়গুলো যদি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে কথাটা নিয়ে যথার্থভাবে আলোচনা করা চলে। তিনি আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে এক কাল্পনিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শিখরে চড়িয়ে দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক দূরবীন কষে একটা আভাস এদিক থেকে একটা আভাস ওদিক থেকে নিয়ে একটা টুক্‌রো-জোড়া ছবি এঁকেচেন। বহুকাল পূর্ব্বে এক সময়ে সরকার মশায় দয়া করে আমার বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন। সেটা বিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভকালে। তার পর অতি দীর্ঘকাল এখানে একবারো আসেন নি। এর মধ্যে এখানকার কর্ম্মে আমার মনস্তত্ত্ব যে ভাবে নিযুক্ত আছে সেটা তাঁর সুদূরস্থিত মনোভাবের মধ্যে অকস্মাৎ যে একটা থিয়োরি জাগিয়ে তুলেচে, সেটা সাইকোএনালিসিসের স্বপ্নবিশ্লেষণের বিষয় হতে পারে কিন্তু সেটা বর্ত্তমানের ইতিহাস রচনায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। যাঁরা জোড়া-দেওয়া প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করেন, আমার

বিশ্বাস বর্ত্তমান ইতিহাসকে সত্যভাবে প্রত্যক্ষ করা তাঁদের অসাধ্য।

যদি পণ্ডিত সরকার মশায় এমন কথা বলেন যে উপনিষদের প্রভাব আমার মনের উপর আছে এবং আধুনিক কালের প্রভাব থেকেও আমার মন মুক্ত নয়, তবে সে কথা আমি গৌরবের সঙ্গেই স্বীকার করব। কিন্তু যে চিত্ত বর্ত্তমান ও অতীতকালের অনুপ্রেরণাকে গ্রহণ করেচে তার তো একটা নিজের স্বাতন্ত্র্য থাকে— সে তো একটা জোড়া দেওয়া সঙ্কলন ব্যাপার নয়। মাছের ঝোল যে খায় তার দেহের মধ্যে মাছের ঝোলের মাছ এবং তার আলু কাঁচকলা এক সঙ্গেই কাজ করতে থাকে— তার পটোলের অংশ পাটোলিক ও মাগুর মাছের অংশ মাগৌরিক ভাবে জোড়াদেওয়া রূপে কাজ করেনা। অবশ্য যে-ঝুড়িতে মাগুর মাছ ও আলু পটল আনা হয় সেই ঝুড়িতে ঐ উদ্ভিদ ও জলচর একত্র হয় কিন্তু একীকৃত হয় না। আমার বিদ্যালয়টা ঝুড়ি নয় আশা করি সে কথা বলা বাহুল্য। ঐতিহাসিক মশায়কে আমার মতো লোকের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই ধৃষ্টতা যে, পৃথিবীতে যত বড় বড় সভ্যতা, এমন কি বড় বড় কর্ম্মী ও গুণী জন্মেচে তাদের প্রকৃতিতে নানা প্রভাবসঙ্করতা ঘটেচে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকারী চিত্তের অখণ্ড স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশ পেয়েছে। শেক্সপিয়রকে ঐতিহাসিক ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যেতে পারে তাঁর কত অংশ গ্রীক, কত অংশ খৃষ্টান, কত অংশ রোমান, কত অংশ কেল্টিক, স্যাক্‌সন ও এলিজাবীথিয়

বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের— কিন্তু তাই বলে যদি কোনো *প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, শেক্সপীয়রের রচনা* বৈরাগীর আল্‌খাল্লার মতো একটা তালি দেওয়া ব্যাপার তাহলে পৃথিবী জুড়ে এত লোক অট্টহাস্য করে উঠবে যে সভা জমানো অতি বড়ো প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমার পক্ষ নিয়ে তত বড় নিঃসংশয়ভাবে তত বড় ব্যাপক হাস্যের দিন আসেনি, কিন্তু তাই বলেই নির্ভয়চিত্তে হাস্যকর ব্যাপার ঘটানো অধ্যাপকদের পক্ষে শোভন নয়।

এমেরিকা য়ুরোপ থেকে কোনো কোনো শিক্ষাতত্ত্বের অভিজ্ঞ অধ্যাপক আমার বিদ্যালয়ে এসে এখানকার আকার প্রকার পর্য্যালোচনা করে গেছেন। তাঁরা এখানে যা দেখেচেন সেটা তাঁদের নতুন বলেই ঠেকেচে এবং বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেই তাঁদের গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তার উল্লেখ করেচেন। তাঁদের ভুল হতে পারে কিন্তু তাঁরা স্বয়ং এখানে উপস্থিত থেকে দেখে গেচেন। প্রত্নতত্ত্ববিং যা বলেচেন তা না দেখে। না দেখে পাণ্ডিত্য করা যায় কিন্তু সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া যায় না।

মনের ক্ষোভে অনেক কথা লিখলেম। আজ সুদীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানকে আমি গড়ে তুলচি— তাতে আমার স্বাস্থ্য, সময় ও সামর্থ্য যে কি পরিমাণে ব্যয় করেচি তা আপনারা অনেকেই জানেন। দেশের লোকের কাছ থেকে আনুকূল্যের চেয়ে প্রাতিকূল্য যে কত পেয়েছি সে কথাও আপনাদের অগোচর নেই। যাঁরা এই আশ্রমের ক্রমশ বিকাশের অতিবন্ধুর পথ অভিজ্ঞভাবে অনুসরণ করে এসেচেন তাঁরা এর

সম্বন্ধে ভালো মন্দ যাই বলুন স্বীকার করে নিতে পারি। কিন্তু যাঁরা না জেনে বা অতি অল্পমাত্রই জেনে এর প্রতি প্রকাশ্য অবজ্ঞাবর্ষণ করতে কুণ্ঠিত হন না, গোপনে এর ক্ষতি করতে যাঁদের উৎসাহ তাঁদের সম্বন্ধে আমার ক্ষুব্ধ মনের এই প্রশ্ন কিছুতে শান্ত হতে চায় না যে, এই কাজে আমার শক্তি প্রায় নিঃশেষে ব্যয় করে আমি তাঁদের কাছে বা দেশের কাছে কী এমন অপরাধ করেচি। আমি তাঁদের সাহায্য প্রত্যাশা করিনে কিন্তু আমার পথে বাধা দেবার জন্যে কেন তাঁদের এই রুচি?

আমার বয়স সত্তরের কাছে এল— এই বিদ্যালয়ের সকল ভার দেশের উপেক্ষা সত্ত্বেও প্রাণপণে বহন করতে গিয়েই নিষ্ঠুর উদ্বেগের ক্লান্তিতে আজ আমার শরীর অবসন্ন। তবু আপনি জানেন সম্প্রতি আমার দুর্ব্বলতাকে অস্বীকার করে পুনর্ব্বার এই বিদ্যালয়ের পরিচালনাভার সম্পূর্ণ নিজের পরেই নিয়েছি। মনের মধ্যে এই একটি মাত্র আশা আছে যে আমার অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করে আজ আমার দেশের লোক আমার ভার যদি লাঘব নাও করেন তবু ভারবৃদ্ধি করবেন না। ব্যক্তিগতভাবে যত অন্যায় আঘাত আমি সহ্য করেছি এমন আজকের দিনে আমার দেশের কোনো খ্যাতিমান লোককেই সহ্য করতে হয় নি। আমি কখনো তার প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আমার প্রতি অন্ধ অবজ্ঞাবশত আমার কর্ম্মকে আঘাত করলে আমাকে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দেওয়া হয়।

শিক্ষাসত্র নামটা চল্‌বেনা। আপাতত নামের প্রতি হস্তক্ষেপ করবনা।

সেই গাছের গল্পটা সম্বন্ধে সেদিন আপনাকে বল্লুম যে সেটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লেখা অতএব সমস্তটা নতুন করে লেখা দরকার হবে। তার পরে পড়তে গিয়ে দেখলুম প্রায় তার একটি কথাও বদল করার দরকার হবে না। সেটা আপনাকে পাঠাব কিন্তু অঘ্রানের পূর্ব্বে ছাপবেন না।

আমার চৈন বন্ধু সু এখানে আসচেন— তিনি যখন কলকাতায় যেতে ইচ্ছা করবেন তখন তাঁর সঙ্গে যাব। তিনি এলে বুঝতে পারব কবে যাওয়া সম্ভব হবে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩

১০ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

অমিয়কে তাড়া লাগাব।

আমার চৈন বন্ধুটিকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে আছি।

হোম য়ুনিভর্সিটির কথাটা আমার মনে লেগেছে। এই রকম অনুষ্ঠানের উদ্দেশে কতকগুলি পাঠ্যগ্রন্থ রচনার আশু প্রয়োজন হবে। সে কথাটাও ভেবে দেখবেন।

অপূর্ব্বকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা সে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে। আপনাকে পাঠাবার জন্যে তাকে লিখে দিয়েছি।

সেদিন যদুবাবুর সমালোচনা সম্বন্ধে আপনাকে একটা দীর্ঘ পত্র লিখেচি। সেটা কি পাননি? আপনার আজকের পত্রে তার উল্লেখ নেই কেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১১ অক্টোবর ১৯২৮

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

সেদিন যদুবাবুর সম্বন্ধে চিঠিখানা লেখার পরেই মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। আমার শরীর ক্লান্ত এবং মন নানা-প্রকার দুর্য্যোগে এত অত্যন্ত উদ্বেজিত যে এই ব্যথিত অবস্থায় ছোট আঘাতও বড়ো হয়ে ওঠে— এখন শান্তভাবে বিচার করা কঠিন। কিন্তু মনের মধ্যে নিয়তই এই কথাটা জেগে ছিল যে ঐ চিঠি আমার যোগ্য হয়নি। আপনি ওটা ছাপতে চান না শুনে আমি আরাম বোধ করলুম।

নাম্নী কবিতাটার কয়েক কপি যদি পাঠিয়ে দেন ত কাজে লাগাতে পারব।

সেই গাছের গল্প তো দুতিন [দিন] আগেই পাঠিয়েছি এতদিনে নিশ্চয় পেয়ে থাক্‌বেন।

অপূর্ব্বর কাছ থেকে তার চিঠিখানার ইংরেজি অনুবাদ তলব করে পাঠাবেন। তাকে আমি আগেই লিখে দিয়েছি। ইতি ১১ অক্টোবর ১৯২৮

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫

২৬ নভেম্বর ১৯২৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

··এর উক্তি অনেক স্থলেই শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। সিংহলে থাকতেই তাঁর সেখানকার বিবরণ শুনেছিলুম। মনে রাখবেন তিনি সেখানকার য়ুরোপীয় প্লান্টারদের নিমক খাচ্চেন।

তবু আমি ডিসিল্‌ভাকে মডারন রিভিয়ুর লেখাটি পাঠিয়ে দিলুম।

শরীর ক্লান্ত। তার উপরে বিদ্যালয়ের কাজের ভার নিয়ে নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে আছি। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬

৮ ডিসেম্বর ১৯২৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

নন্দলালরা কলাভবনের নতুন ঘরগুলি সাজিয়ে তোলবার ব্যাপারে নিতান্ত ব্যস্ত। তাই কোনো কাজে হাত দিতে পারচেন না। চেষ্টা করবেন যদি গীতাঞ্জলির কোনো কবিতার সঙ্গে ছবি এঁকে কন্‌গ্রেস উপলক্ষ্যে বিক্রির জন্যে পাঠাতে পারেন। একটু বড়ো সাইজে দেয়ালে ঝোলাবার মতো। আর আর ছবি প্রায় সবগুলিই প্রবাসী মডারন রিভিয়ুতে ছাপা হয়ে গেচে। সেগুলি বাছাই করে নতুন ব্লকে ছাপানো যেতে পারে কিনা ভাবচেন। ৭ই পৌষের ব্যাপারটা চুকে না গেলে মন স্থির করতে পারচেন না।

আপনি জানেন, জোরোয়াস্ত্রিয় শাখার ব্যাখ্যানকারের নাম আমরা আমাদের বুলেটিন বা কাগজে প্রচার করিনি। করার প্রয়োজন ছিল। তার কারণ বুঝতে পারচেন। তারাপুরওয়ালাকে শাস্ত্রীমশায় বক্তৃতাগুলি লিখিত আকারে দিতে বলে অকৃতকার্য্য হয়েচেন এই তো জানি। শাস্ত্রীমশায় এলে খবরটা আরো স্পষ্ট করে জানা যাবে। ইতি ৮ ডিসেম্বর ১৯২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিরতিশয় ব্যস্ততার মধ্যে "সাহিত্যবিচার" বক্তৃতার মোট কথাটা দ্রুত লেখনী চালনায় লিখে আপনাকে পাঠাই। মাজা ঘষার, ভেবে দেখার সময় একটুও নেই এর পরে অন্য কাজের অবতারণার সম্ভাবনা আছে। অতএব যেমন আটপৌরে ভাবে লেখা গেল তেমনি পাঠিয়ে দিচ্চি। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৮

৮ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার এই লেখাটি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে প্রবাসীতে ছাপাবেন। ইতি ৮ নভেম্বর ১৯২৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৯

১৫ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা লিখে পাঠাবার চেষ্টা করব। Political Philosophy of Rabindranath নামে যে একটি ইংরেজি বই সম্প্রতি বাহির হয়েচে সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে আপনার নামে প্রবাসী আপিসে পাঠিয়েছিলুম — কোনো একজন ব্যানার্জ্জি উপাধিধারী "প্রাপ্ত" বলে স্বীকার করেছিলেন। সে লেখা আপনার গোচর হয়েচে কিনা আপনার চিঠি থেকে বুঝতে পারলুম না। বিষয়টা স্বতই উপদ্রবজনক সেইজন্যে আপনার বিচারের অপেক্ষা করেছিলুম।

বরোদায় একটা বক্তৃতার জন্যে আমি আহূত। সেইটি লিখতে হচ্চে। প্রতিদিন অনুভব করচি আমার রচনাশক্তির সহজস্রোত মন্দীভূত হয়ে আসচে। বোধ হয় আমার চিত্ত সেই ধারায় কাজ করতে এখন আর উৎসাহ বোধ করে না। বিশেষত আমার মন ইংরেজি লেখায় অত্যন্ত অনবধান হয়ে পড়েচে। বড়ো ধীরে ধীরে কলম চলে। এটা প্রত্যেক বারে ঘটে যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসি— বোধ হয় যেন ইংরেজি ভাষায় চিন্তা করবার প্রণালীটা এখানে রুদ্ধ হয়ে আসে। অথচ হিবার্ট লেকচার উপলক্ষ্য করে আমার কিছু বলবার আছে। আমি

স্বভাবত কুঁড়ে, বাইরে থেকে খুব একটা চাপ না পড়লে আমার অনেক কথাই অকথিত থেকে যায়। তাই আমার ক্লান্ত মনকে এই কাজের জন্যে তাগিদ করচি। দেশে থাকতে এত ছোট ছোট দুঃখ এবং দায় এসে নিরন্তর এত অকারণ আবর্জ্জনায় আমার দিনগুলোকে ভারাক্রান্ত করে যে, মনে করচি য়ুরোপে কোনো নিভৃত স্থানে গিয়ে আমার লেখাটা শেষ করব। নিজের ভিতরকার যেটা বড়ো দান সেটা বড়ো শান্তি ও অবকাশ ছাড়া যথোচিতভাবে উদ্ভাবিত হতে চায় না। সেই শান্তি ও নিরাবিল অবকাশকে আপন অন্তরের জিনিষ করে তোলবার জন্যে একান্ত মনে চেষ্টা করি। যদি সফল হতে পারি তবে নিজের জীবনটাই নৈবেদ্যরূপে রচিত হতে পারবে অন্য কোনো রচনা নাইবা হোলো।— একটা ইংরেজি লেখা চেয়েচেন। আপনি চাইলে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সহজ হয় না। মুস্কিল এই যে শীতের অনেকটা সময় রেলপথে কাটবে— নিমন্ত্রণরক্ষায় এবং ভিক্ষা সংগ্রহে। সংগ্রহ বেশি হবে বলে আশা করিনে— কিন্তু বাংলার বাহিরে নিগ্রহের আশঙ্কা কম— অতএব ঝুলি নিয়ে বেরতে হবে— কেননা এই ভিক্ষাটা সাধনারই একটা অঙ্গ--- বোধ করি নিরর্থক হলেও তার একটা সার্থকতা আছে। আমার পোলিটিকাল মত সম্বন্ধে প্রবাসীতে যে লেখা লিখেচি সেটা যদি আপনার মনঃপূত হয় তবে সেইটেই কাউকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে পাঠিয়ে দিলে সেটাকে আমি শোধন করে কিছু পরিমাণে তাকে স্বকীয় করে আপনার কাছে পাঠাতে পারি। আর যদি শতকরা একশত পরিমাণে আমার কিছু চান তবে

সে প্রস্তাবটা মনে রইল কিন্তু অবস্থাগত প্রচুর অনুকূলতার উপর তার সাফল্য নির্ভর করবে। ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯২৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনি বোধহয় জানেন কিছুদিন থেকে আমার যে কোনো লেখা যে কোনো কাগজে বেরচ্ছে সে আমার দীর্ঘকালের পুরোনো লেখা। এত পুরোনো যে পুরোনো বলে ধরা পড়ে না। অমল তার ম্যুনিসিপাল শকটের জন্যে এমনি একটা লেখা জন্মতারিখ চাপা দিয়ে বোঝাই করবে বলে নিয়ে গেছে।

২১ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রামকৃষ্ণ পরমহংস যেদিন আমাদেব বাড়িতে পিতৃদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সেদিন আমি বাড়িতে ছিলাম কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎকারের স্থলে উপস্থিত ছিলাম না। নিবেদিতার মুখের ভাবে অনুভব করেছিলুম তিনি সন্তুষ্ট হন নি। তিনি পরমহংসদেবকে যথোচিত শ্রদ্ধা করেন নি সেটা অসম্ভব নয়। কেননা তিনি একেবারেই বিগ্রহ

মানতেন না, এবং উপনিষদের অনুশাসন অনুসারে তাঁর চিরজীবনের সাধনা ছিল শান্ত সমাহিত আত্মসংযতভাবের। ভক্তিপ্রেমের যে আবেগ তাঁর মধ্যে ছিল তার একমাত্র পরিতৃপ্তি তিনি পেয়েছিলেন পারসিক সুফী কাব্যগ্রন্থে। আমাদের দেশের শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে ভাবোন্মাদের আলোড়ন আছে তাকে তিনি দূরে পরিহার করেছিলেন তার প্রধান কারণ এ নয় যে ধর্ম্মবিশ্বাসে তাঁর মনে একটা আভিজাত্য-বোধ ছিল, আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ ঐ দুই ধর্ম্মমতের সঙ্গে যে সকল মূর্ত্তি ও কাহিনী জড়িত তাকে তিনি আধ্যাত্মিক দিক থেকে নির্ম্মল ও নিরাময় মনে করতেন না। সেই কাহিনীগুলিতে রূপকের মূলগত ভাব-প্রধানতা অতিক্রম করে অতিবাস্তবের ভাববিরোধী স্থূলত্ব প্রকাশ পেয়েছে বলে তার প্রতি তাঁর চিত্ত নিরতিশয় বিমুখ ছিল। ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে তাঁর একটা অত্যন্ত শুচিত্ববোধ ছিল, সেই শুচিত্ব খৃষ্টান ধর্ম্মের স্থূল মতবাদকেও সহ্য করতে পারত না। রামমোহন রায়ের মধ্যে একেশ্বরবাদের একটা প্রবল ঐকান্তিকতা ছিল, যে জন্য আজও ভারতবর্ষ তাঁকে প্রসন্ন মনে স্বীকার করতে পারেনি— আমার পিতা বাল্যকালেই সেই অতি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের আদর্শ রামমোহন রায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন— সেই কারণে বিগ্রহপূজার সংস্রবমাত্র যেখানে আছে সেখানে তাঁর মন আঘাত পেয়েছে। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের সিংহদ্বার দিয়ে— এইজন্যে আত্মউপলব্ধির বিশুদ্ধ আত্মসমাহিত আনন্দের সাধনা তাঁর ছিল না— শাক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম

থেকে হৃদয়াবেগ মন্থন করে নেওয়া এবং তার আন্দোলনে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া তাঁর [পক্ষে] সহজ ছিল। যাই হোক আমার এই মত আপনাকে জানালুম এ প্রকাশ করবার জন্যে নয়।

শপথ গ্রহণ সম্বন্ধে এণ্ড্রুজকে একদা যে পত্র লিখেছিলুম সেটা আপনাকে পাঠাই বোধহয় মডারন্ রিভিয়ুতে এটা চলতে পারে।

আপনার পত্রে লিখেছেন আমার সম্বন্ধে যে সব গঞ্জনাবাক্য সম্প্রতি মুখর হয়ে উঠেছে সেগুলি আমার কর্ণগোচর করা অনাবশ্যক ও অন্যায়। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সুখকর না হলেও তার প্রয়োজন ছিল। বাইরের অপমানে বিচলিত হওয়ার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে সেইটেতে যখন লজ্জা দেয় তখনি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নিজের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা একান্তই চাই। তুচ্ছ কারণে চিত্তবিক্ষেপের দ্বারা জীবনকে ব্যর্থ করার মতো এত বড়ো আধ্যাত্মিক অপব্যয় আর নেই। তার থেকে নিজেকে বাঁচাবার অধ্যবসায় আমি গ্রহণ করেছি—আর সময়ই বা কত আছে? সাধনা সত্য হয়েছে কিনা পদে পদে তার প্রমাণ দরকার করে— যদি একেবারেই তা না পাই তবে অলস শক্তি নিয়ে আত্মবিস্মৃত হবার আশঙ্কা ঘটে। তার চেয়ে বাইরের অবমাননা ও আঘাত অনেক গুণে ভালো। বস্তুত বাইরের অকস্মাৎ অকারণ লাঞ্ছনায় আমাকে কঠোরভাবে বিস্মিত করেছিল বলেই আজ আমি অন্তরতম শান্তিধামের পথে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি— মনে আশা আছে

এপথ থেকে সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা আর ঘটবে না, ক্ষণকালের জন্যে ঘটলেও নিজেকে উদ্ধার করতে পারব। কিছুদিন থেকে একটা বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হয়েছে যে, এখান থেকেই আমাদের পাথেয় নিয়ে যেতে হয়— মরুপথের পারে যাবার জন্যে জল নিয়ে যাবার মতো,— নানা খুচ্‌রো আঘাতের ধাক্কায় সেই জল সঞ্চয় যদি মরুবালুর উপরে ক্ষয় করতে থাকি তাহলে তার কঠোর দায়িত্ব আছে। কথাটা পুরোনো কিন্তু যেদিন তার সত্যতার পূরো খবরটা মনে আসে সেদিন মনে হয় একথাটা আগে কোনোদিন শুনি নি। আশা করি সময় থাকতেই শুন্‌তে পেয়েছি। ইতি ২১ নবেম্বর ১৯২৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০১

২৮ নভেম্বর ১৯২৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কোরীয়-রবীন্দ্রসংবাদ আপনাকে পাঠানো হয়েচে। আপনার আজকের পত্রে তার উল্লেখ দেখলুম না। বোধকরি রেজেস্ট্রি ডাকের গতি বিলম্বিত।

…কে দিয়েচেন আমার লেখা তর্জ্জমা করে দিতে। ফলের আশা ত্যাগ করে যদি সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে দিয়ে থাকেন

তাহলে দুঃখের কারণ থাকবেনা। দান্তের কাব্যে পাপীদের বিশেষ একটি বস্তির দ্বারে লেখা আছে এখানে যারা যায় তাদের ফেরবার আশা নেই। যে রচনাকে চিরবিলুপ্তির দণ্ডযোগ্য মনে করেন তাকে ··র [কাছে] দেবেন সে আর ফিরবেনা।

আমার দুটো ইংরেজি লেখা আপনাকে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলেচি। অপরাধের মধ্যে এরা পুরোনো লেখা। কিন্তু অপরিচিত। বাল-বিধবার মতো। দ্বিতীয়বার পরিণয় প্রথম পরিণয়েরই সামিল। বিশ্বভারতীর পত্রিকায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসে ছিল, বহুকাল পূর্ব্বে। আপনি আজ যদি প্রকাশ করেন তবে অপূর্ব্বরূপেই প্রতিভাত হবে। কিছু বাদসাদ দিয়েচি, নামান্তরও ঘটেচে, এখন আপনি যদি গোত্রান্তর করেন তবে তাদের সদ্গতি হবে। ম্যুনিসিপাল গেজেটে অমল এমনি করেই আমার একটা লেখা বিস্মৃতির ঝুলি থেকে উদ্ধার করেচে— সম্পর্ণ নতুন বলেই পাঠকেরা তাকে স্বীকার করে নিয়েচে কেউ তাকে বৈধব্যের খোঁটা দেয় নি। ইতি
১২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বরোদার পথে আমেদাবাদে শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। যখন নিশ্চয় বুঝলুম কোনোমতে সাহিত্যসম্মিলনে এ শরীর নিয়ে পৌঁছতে পারব না— তখন বহুকষ্টে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে একটা লেখা অবনের মারফৎ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেম। দেশের লোক আমাকে সহজে ক্ষমা করেন না জেনেই এই কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। তাও ব্যর্থ হল ক্ষমা পাই নি। শুনলুম ডাকপেয়াদার মারফতে না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এ সকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ত্রুটি আছে কিন্তু কাউকে অসম্মান করবার কারণ ও ইচ্ছা আমার ছিল না। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনোদিন লিখিনি— এর থেকে প্রমাণ হয় স্বদেশবাসীকে আমি যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেছি। যতটা সম্ভব দূরে থাকবারই চেষ্টা করব।

আপনার শরীর অসুস্থ শুনে উদ্বিগ্ন রইলুম। আমার শরীর এখনো কাজের বা'র হয়ে আছে। লম্বা চেয়ারে নিষ্কর্ম্ম পড়ে পড়েই দিন কাটাবার চেষ্টা করি। কিন্তু যথেষ্ট বিশ্রামের

সম্ভাবনা বিরল। আপনি ও শান্তা কেমন আছেন কালিদাসকে লিখ্‌তে বলে দেবেন। ইতি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২১ জুন ১৯৩০

ওঁ Dartington Hall
Totnes

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এখনো আপনার প্রেরিত অমৃতবাজারের রিপোর্ট পাই নি। যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা করব। কিন্তু যদি হিন্দুমুসলমানে আত্মকলহের বেশী কোনো খবর না পাওয়া যায় তাহলে চুপ করে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। পলিটিক্‌স্‌ একটা দ্যূতক্রীড়া। পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে হারজিতের লড়াই। কোনো পক্ষ যদি অন্যায় চাল চালে তবে জগৎসভার কাছে তার নিন্দা প্রচার করা চলে। কিন্তু কে বিচার করবে— এ খেলায় ধর্ম্মের নিয়ম কেউ তো মানে না। আর দয়ার দোহাই কাকেই বা দেব? আয়ার্লাণ্ডে কৃষ্ণপিঙ্গল উপদ্রবের কথা মনে আছে তো? এত বড়ো নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খলতা সমস্ত য়ুরোপের সামনেই ঘটেচে— অথচ তাদের পরস্পরে রক্তের সম্বন্ধ আছে। গবর্মেণ্টকে ঠেলে ফেলতে গেলে গবর্মেণ্ট সনাতন রীতি

অনুসারে দলে ফেলতে চাইবেই। এই অনিবার্য্য দুঃখ সহ্য করেও যদি মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে পারি তবে জিতে গেলুম। রাষ্ট্রবিপ্লবে যে অস্ত্র দুর্ব্বলের হাতে আছে আমরা তা ব্যবহার করচি আর প্রবল প্রতিপক্ষের হাতে যে অস্ত্র আছে তারাও তার প্রয়োগ করচে— এই সঙ্গে গুপ্তিছুরিও পিঠের দিকে চালাচ্চে—এ ছুরি আমাদের কারখানাতেই তৈরি।— একটা কথা বলে রাখি, শুনলুম প্যারিসে আমার কোন্ ইণ্টারভিয়ু অবলম্বন করে সমুদ্রের এপার থেকে ওপারে তারযোগে আমার কলঙ্ক প্রচার হয়েচে। কোনো কাগজওয়ালাকে ইণ্টারভিয়ু দিইনি— যারা কাগ্‌জি নয় তাদের কাছেও কোনো মন্দ কথা বলি নি। ম্যাঞ্চেষ্টর গার্জিয়েনে যে প্রসঙ্গ বেরিয়েচে সেটা সমূলক এবং যথাযথ। এ ছাড়া স্পেক্টেটরে একটা লেখা বেরিয়েচে দেখে থাকবেন। নানা হাঙ্গামে লেখা বন্ধ আছে— চিঠিপত্রও চলচে না। শরীর মন্দ নেই কিন্তু মন পীড়িত। ইতি ২১ জুন ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪

২৬ অগস্ট ১৯৩০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিষ আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলেমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে সেই জন্যেই আসল জিনিষকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউবা আমাকে উপহাস করে, কেউবা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানিনে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার ক'রে এবং প্রণাম ক'রে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে, যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোষ পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষ রূপে দেখে তখনি এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে, যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সঙ্কীর্ণ হয়ে

এসেছে অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে প্রিয় হবার নয়।

ঢাকার উৎপাত সম্বন্ধে স্পেক্টেটরে আমি যে পত্র পাঠিয়েচি তার একটা নকল পাঠাই। আমার এ চিঠি স্পেক্টেটরে স্থান পাবে কি না জানিনে।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানা ভাবে দেশে গিয়ে পৌঁছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারিনে বলে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। বারবার মনে হয় বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। যাক্ গে। ইতি ২৬ অগস্ট ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫
৪ অক্টোবর ১৯৩০

ওঁ অতলান্তিক মহাসাগর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেচি, চলেচি আমেরিকার পথে। রাশিয়া যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কি রকম চলচে আর ওরা তার ফল কি রকম পাচ্চে সেইটে অল্পসময়ের মধ্যে দেখে নিতে চেয়েছিলুম।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্চে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম্মবিরোধ, কর্ম্মজড়তা, আর্থিক দৌর্ব্বল্য, সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেচে সে হচ্চে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা বিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিষপত্র কেবলি হারায় তার পরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেচে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়— কেবলি বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, ক্ষিধে পায় কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপর অন্ধ নিভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত— অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপরে দেওয়া চলেনা— তারপরে সব শেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেচি তাহলে সেটা কেমন হয়? ওরা একদিন ডাইনি বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েচে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেচে, ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেচে, নিজেরই ধর্ম্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব্ব করে রেখেচে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা

কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়— এ সমস্ত দূর হল কি করে? বাইরেকার কোনো কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ড্সের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কার সাধনের ভার দেওয়া হয় নি, একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েচে, সে হচ্চে ওদের শিক্ষা। জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েচে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেচে, বর্ত্তমান তুরুষ্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্ম্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" কেন না ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি,— যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

রুশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেন না কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েচি। ভারতের উন্নতি সাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রি টম্সন্ অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েচে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ার প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীয় লোকের মতোই তাদের

অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চ্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরিওয়ালাদের পায়ের ধূলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোটায়, মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের পরে খুন চেপে যায় তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না, উপরওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুৎ, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত। এই তো হোলো ওদের দশা,— বর্ত্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্য্যশালী নয়, কেবল মাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েচে— রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি— ঘরে বাইরে প্রতিকূলতা— তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করেচে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেচে তার "ডিফিকাল্টি" ভারতকর্ত্তৃপক্ষের ডিফিকাল্টির চেয়ে বহুগুণে বড়ো। অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এ রকম আশা করা অন্যায় হোত। কিইবা জানি কিইবা দেখেচি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে! আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতি দুর্ব্বল

আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখ্‌লুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। Law and Order কি পরিমাণে রক্ষিত হচ্চে বা না হচ্চে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাই নি— শোনা যায় যথেষ্ট জবরদস্তি আছে, বিনা বিচারে দ্রুতপদ্ধতিতে শাস্তি সেও চলে, আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হোলো চাঁদের কলঙ্কের দিক কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য্য— যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেচে। শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্ত্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেচে— এখানে তাই হোলো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্চে— পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানব-সমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ। আমাদের সম্রাটবংশীয় খৃষ্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্টিস যে কি রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেচেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না— কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চষমার দরকার করে না। প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স

হোলো—এতকাল আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্ব্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যার দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেচে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়েছি। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েচি, তাঁরা বাহবাও দিয়েচেন, যেটুকু ভিক্ষে দিয়েচেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সবচেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্ত্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সবচেয়ে গুরুতর ব্যাধি হোলো এই— সে সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

যাই হোক এ দেশের "এনর্ম্মাস্ ডিফিকল্টিজে"র কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকল্টিজ্ অতিক্রমের চেহারা চোখে দেখ্‌লুম। বিস্তারিত বিবরণ লেখবার সময় নেই। অন্যদের যে সব চিঠি লিখেচি সেই সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে অনেক কথা জানতে পারবেন। এ সমস্ত সংবাদ সবাইকে জানানো চাই অতএব ইংরেজিতে তর্জ্জমা করে মডারন রিভিয়ুতে ছাপাবেন।

শান্তিনিকেতনে সুরেন করের কাছে কিছু চিঠি পাবেন,

রাণী প্রশান্তকেও লিখেচি— রথীকে লিখেচি তার কপি হয় ত শান্তিনিকেতনে আছে। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬

১৮ নভেম্বর ১৯৩০

ওঁ

ন্যুয়র্ক

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরীর যখন অসুস্থ এবং মন যখন উদ্বিগ্ন সেই দুর্ব্বল অবস্থায় অর্দ্ধশয়ান দেহে একটা কবিতা লিখেছি। সেই কবিতার একটা কোনো অর্থ আছেই, কিন্তু সে অর্থ আমার কাছে যত সত্য অন্যের কাছে তেমন হবে বলে আশা করি নে। তবু অন্তত অপাঠ্য হবে না আশা করে প্রবাসীতে পাঠাবার সঙ্কল্প করেছিলুম। সংশোধনের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু অমিয় বিলম্ব সইতে পারলনা অসংশোধিত অবস্থাতেই আপনাকে পাঠিয়েচে। কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমি বিলম্ব সইতে পারি কিন্তু অসম্পূর্ণতা সইতে পারি নে তাই বিশুদ্ধ পাঠ নকল করে পাঠাতে হল। এখনো মনে দ্বিধা রয়ে গেছে।

প্রাণলক্ষ্মী

আঁধার তিথিতে তারকা-বীথিতে
তন্দ্রাজড়িত চন্দ্র।
যূথীকলিগুলি দিতেছে আকুলি
হিমগদগদ গন্ধ।
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, ঘন কুয়াষায়,
ঘুমে জাগরণে, কায়ায় মায়ায়,
তোমায় আমায় আলোয় ছায়ায়
যুগলে ঘটিল দ্বন্দ্ব।
জন্ম-মরণ-অতীত বেলায়
স্মরণের পরপারে
তব ভাবনায় মোর চেতনায়
এক হোলো একেবারে॥

সূর্য্য যখন উড়ালো কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জান্‌তে।
সেই ধ্বনি ধায় বকুল শাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়
আকাশপথের পান্থে।

তরুণ রথের সে ধ্বনি, পথের
মন্ত্র শুনায়ে দিলে
তাই পায়ে পায় দোঁহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে ॥

তিমির-ভেদন আলোর বেদন
লাগিল বনের বক্ষে
নব-জাগরণ পরশরতন
আকাশে এলো অলক্ষ্যে
কিশলয়দল হোলো চঞ্চল,
শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,
সুরলক্ষ্মীর স্বর্ণকমল
তুলে বিশ্বের চক্ষে।
রক্ত রঙের উঠে কোলাহল
পলাশকুঞ্জময়
তুমি আমি দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিনু আলোর জয় ॥

সঙ্গীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে।
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।

চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসন-ভঙ্গে।
উষারুণ হোতে রাঙা গোধূলির
দূরদিগন্তপানে
বিভাসের গান হোলো অবসান
বিধুর পূরবী তানে॥

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেচে বিশ্বচিত্র।
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।
মোর ফাল্গুন হারায় যখন
আশ্বিনে ফিরে লহ।
তব অপরূপে মোর নবরূপ
দুলাইছ অহরহ॥

আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী,
বনবাণী হোলো শান্ত।

জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত।
নিখিলে ঘনালো দিবসের শোক
বাহির আকাশে ঘুচিল আলোক,
উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
হৃদয়ে এলে একান্ত।
লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠালো
জানি না কি উদ্দেশে॥

দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নব-জাগরিত বিশ্বে।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।
হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল আঁধারে ধুয়ে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ান
অসীম দূর ভবিষ্যে।
অজানা তারায় বাজে তব গান
হারায় গগনতলে।
বক্ষ আমার কাঁপে দুরু দুরু,
চক্ষু ভাসিল জলে॥

প্রেমের দিয়ালী দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি।
মোর সঙ্গীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপন-লিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এলো যে রাতি ॥

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি
আঁধারে হতেছে গুপ্ত।
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।
শুধু ঝিল্লির ঘন ঝঙ্কার
নীরবের বুকে বাজে।

কাছে আছ তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে ॥

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য ?
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ণ ?
যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে পথে তোমার নিবায়োনা বাতি,
আরতিব দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য ।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকেব জয় ॥

যদি মনে করেন আধুনিক সাহিত্যে এ কবিতা চল্‌বেনা **তাহলে** ছাপবেননা। আমার সংশয় ছিল, অমিয়র উৎসাহে **পাঠাচ্ছি**। ইতি ১৮ নবেম্বর ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭

২৬ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দু মুসলমান প্রবন্ধটির কথা শান্তাকে বলেছিলুম বটে কিন্তু পাঠানো হয় নি। আজ রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠালুম। পাণ্ডুলিপিটা নিতান্ত আটপৌরে ভাবেই আপনার কাছে গেল— …র হাতের লেখা সুস্পষ্ট নয়, আমার অংশটাও অপরিচ্ছন্ন। মুদ্রাকরের দল এর চেয়ে দারুণতর অত্যাচারে অভ্যস্ত তাই কাপিটাকে অসংস্কৃত অবস্থাতেই পাঠাতে সঙ্কোচ করলুম না। প্রুফে যদি এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হয় তার জন্যে প্রস্তুত রইলুম। জুলাই মাসের প্রথম তারিখে দার্জ্জিলিং থেকে অবতরণ করব। ইতি ২৬ জুন ১৯৩১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮

৩০ জুন ১৯৩১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রুফ এখানেই পাঠাবেন। কারণ দার্জ্জিলিং থেকে নামা পিছিয়ে গেল। যথোচিত সংশোধন করে দেব। ইতি ১৫ আষাঢ় ১৩৩৮

আপনাদের

দার্জ্জিলিং

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯

২৭ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আশা করি পকেটঝাড়া শেষ করে ডাকঘর আমার প্রুফখানি অবশেষে আপনাদের আপিসে পৌঁছিয়ে দিয়েচে। সংশোধন করবার সময় দেখা গেল প্রতিলেখনকালে লেখক অনেকগুলি প্রমাদ ঘটিয়েচেন— দুই এক জায়গায় লাইন-ছুটও হয়েচে।

স্বদেশে যে “রবীন্দ্রসকাশে” প্রবন্ধটা বেরিয়েছে সেটা অধিক ভর্ৎসনার ভার সইবে না— ওটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

আপাতত ক্লান্ত আছি। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ

কলকাতায় গিয়ে বন্যাপীড়িতদের জন্যে কিছু একটা করবার চেষ্টা করব। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— ইংরেজি প্রবন্ধের প্রুফ আপনি দেখে দিলেই চল্‌বে। কিছু ত্রুটি থাকলে শোধন করে নেবেন।

---

২৮ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কলকাতায় স্টেজ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়েচে। সার্ পি. সি. রায় আজ তাঁর তরফে অনুরোধ করে পাঠিয়েচেন— বলেচি যদি স্টেজ আমার হাতে দেন এবং দর্শক আদি জোগাড় করতে পারেন তবে অন্তত একটা অভিনয়ের ফসল তাঁকে দিতে পারি।

সুভাষ বসুর অনুরোধের উত্তরেও সেই কথা জানাতে হোলো। আমার এবং রথীর শরীরের যে দশা তাতে জিনিষটাকে ঘটিয়ে তোলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। দেশের আর্থিক দুর্দ্দিনে অন্যান্য বারের মতো দর্শক হবে বলে আশা

করিনে— অথচ এর গোড়াতেই খরচ তাই হতাশ হয়ে সংকল্পটাকে বর্জ্জন করব বলেই মনে করেছিলুম। এমন সময় এঁদের অনুরোধের সুযোগ নিয়ে এঁদের উপর ভার চাপিয়েছি। এঁরা সম্ভবত দর্শক জোটাবার কাজে অনেক পরিমাণে সফল হবেন। ভাঙা শরীর আরো ভাঙতে রাজি আছি কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে যদি ফল না পাই তাহলে আমার পক্ষে সে ক্ষতি কঠিন হবে। চার রাত্রি এটা চালাতে চেষ্টা করব এবং যাঁরা যে রাত্রির ভার নেবেন তাঁদের হাতে সে রাত্রির মুনফা অর্পণ করব। চার রাত্রি আমাদের সকলের পক্ষেই দারুণ হবে— তবু দায়িত্ব নিচ্চি। আজো সমস্ত দিন বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করচি, নইলে প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব হবে। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩৩৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১
৩০ অগস্ট ১৯৩১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বন্যার সাহায্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পত্র ও দূত আসছে। এই আবর্ত্তের মাঝখানে পড়ে আমি শঙ্কিত হয়েছি। অবশেষে এখানকার সুহৃদ্‌গণের পরামর্শে স্থির হয়েচে বিশ্বভারতীর অর্জ্জিত অর্থ বিশ্বভারতী স্বয়ং ব্যবহার

করবার ব্যবস্থা করবেন। আত্রাইয়ের তীরবর্ত্তী যে জায়গাটা বন্যায় একান্ত পীড়িত তারই সঙ্গে বিশ্বভারতীর ঘনিষ্ঠ যোগ। সেইখানকার আনুকূল্য বিশ্বভারতীর মুখ্য অবলম্বন, নোবেল প্রাইজ ফণ্ডের সুদ সেইখান থেকে আসে। আমরা নিজের চেষ্টায় যে অল্প পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করতে পারব তাকে বিক্ষিপ্ত করে না দিয়ে এইখানেই প্রয়োগ করা হবে এই স্থির হয়েচে। আপনি এখানে এলে এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব। আমার শরীর এখন কোন প্রকার কাজেরই যোগ্য নয়— এমন কি লেখাপড়াতেও মন দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়েচে। তবু অবস্থা বিশেষে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাজ করে। চারিদিকের দাবীর মাঝখানে থেকে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য— দূরে কোথাও গিয়ে বানপ্রস্থ্য আশ্রয়ই আমার পক্ষে বিহিত। কিন্তু কিছু পরিমাণে কাজের দায়িত্ব অনিবার্যভাবে আমাকে আঁকড়ে আছে বলেই আমার মুখে বিশ্রামের দাবী জোর পায় না। আমার পক্ষে বিশ্রাম একটা নঙ্‌র্থক শূন্যতামাত্র নয়, বিশ্রাম হচ্চে জীবনের নূতন পর্য্যায়ের ভূমিকা— এটাকে নষ্ট করায় হয়ত আন্তরিক অপরাধ আছে এই জন্যেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে মনটা এত বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। ইতি ১৩ ভাদ্র ১৩৩৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২

২৪ নভেম্বর ১৯৩১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছবি ছাপতে চান— রাজি আছি। কিন্তু আপনাদের কাউকে বাছাই করে নিতে হবে। আমার নিজের পছন্দের উপরে ভরসা নেই। সাধারণের ভালো লাগবার মতো জিনিষ হওয়া চাই। ছবি সম্বন্ধে আমি কোমর বেঁধে আধুনিকতার চর্চ্চা করিনি, করবার উপায়ও ছিল না, কারণ পরিচয়ের অভাব। বিদেশী আর্টিস্টরা কেউ কেউ বলেচেন আমার চিত্রকলায় সাবেকি আধুনিকীর অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেচে— কথাটা যদি সত্য হয় এ ঘটকালি অজ্ঞানকৃত। যাই হোক ইণ্ডিয়ান আর্ট যাকে বলে সেটা আমার আনাড়ি কলমে প্রকাশ পায় নি— অতএব এর জাতকুল মিশিয়ে কারো ভালো লাগবার আশা নেই। সম্পূর্ণ কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষ, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ফাউণ্ডলিঙ। তাই এদেশের নিষ্ঠাবানদের মহলে ওকে দাঁড় করাতে ভয় করি। তবুও ছবিগুলোর মধ্যে এমন কিছু কিছু আছে যাকে দেখে আচারী লোকেরা হুঁকোর জল ফেলে দেবে না। দেখে শুনে নেবেন, নইলে আমাকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে চঞ্চলতার সঞ্চার হবে। আরো দেখতে হবে এমন ছবি, যাকে আমার কালীঘাট থেকে আপনাদের কালীঘাটের কালীর হাতে নিবেদন করলে নিতান্ত বলিদানের আশঙ্কা থাকবে না। অর্থাৎ যাতে নিরাপদে ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় সে ভার আপনাকেই নিতে হবে। মহুয়ার জন্যে আমার খাতায়

আঁকা দুই একটা রঙীন ছবি ইউ রায়দের কারখানায় তৈরী হয়েই আছে। দেখতে পারেন, কিন্তু সেগুলি খাতার পাতায় যদৃচ্ছাকৃতভাবে রচিত হয়েছিল। করুণার কাছে খোঁজ করে দেখবেন। ইতিমধ্যে ২৪ নবেম্বর ১৯৩১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৮ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে— দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষতঃ সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি— তারা অনাহূত এসে হাজির— রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখ্‌বেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,— নামাশ্রয়হীনাকে নামের

আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্যে কতো আপিল বের করেন অনামাদের জন্যে করতে দোষ কি। দেখবেন যেখানে এক নামের বেশি আশা করেন নি সেখানে বহুনামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠ্‌বে। রূপসৃষ্টি পর্য্যন্ত আমার কাজ তার পরে নামবৃষ্টি অপরের। কখনো কখনো নাম করবার উদ্যোগ আমরা নিজেই করি। জনরব এই যে রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিজের চেষ্টায় নিজের নাম উঁচু করে তুলচেন। যাতে নাম হয় এমন কিছু কিছু কাজ করেছি,— অবশেষে উনসত্তর বছরের পরে বাংলাদেশে বিস্তর কাঠখড় দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে এক জয়ন্তী সাজিয়ে নিজের নামমহিমাকে পাকা করবার জন্যে সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি রেখে গেলুম। যখন আমার জীবনী বের করবেন আমার এই চরম চাতুরীটার কথা উল্লেখ করতে ভুল্‌বেন না— দেশের অনেক চতুর অন্তত মনে মনেও আমাকে বাহবা দেবে। বাংলার ভাবী কবিদের কাছে স্বনামসৃষ্টিপদ্ধতির একটা অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া গেল। ইতি ২ পৌষ ১৩৩৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৪

২৭ জুন ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার

আপনার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলুম। দুর্গতির আজ বন্যা বয়েছে পৃথিবীতে, আমার আর বিশেষ করে নালিশ করবার নেই। নিজের সাধ্যসীমার মধ্যে প্রয়োজন-সঙ্কোচ করে জীবনধারণ করবার সাধনা ভালোই— আমি তার জন্যে আনন্দে প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু এমন অপঘাত এসে পড়ে যাতে বেড়া ভেঙে যায়। মীরার ছেলে নীতু লাইপ্‌জিকে ছাপার কাজ শিখছিল, খবর এসেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরেচে। মীরাকে যেতে হচ্চে জর্ম্মনিতে। এই দুঃখাভিঘাতের জন্যে কোনোদিকেই প্রস্তুত ছিলাম না। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়িটা ভাড়া দেবার চেষ্টা করেছিলেম। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্প্রতি একটি রোটারি প্রেস কিনেছেন, সেইটে বসাবার জন্যে তাঁরা ওটা মাসিক চারশো টাকায় ভাড়া নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে বিচার করে বল্‌লেন, জায়গাটা ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়। জমিদারী ছাড়া প্রায় আমার সমস্ত আয় বিশ্বভারতীর। সেইজন্যে শেষ কালটায় লেখার ব্যবসা ধরতে হোলো। কিন্তু এ আমার সম্পূর্ণ সইবে না— কেননা লেখার শক্তিতে এখন আমার আর বেগ নেই— লিখতে ইচ্ছেও করেনা— লেখা বেচতে আরো অপ্রবৃত্তি।

দুর্দ্দশার কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলুম এই জন্যে, পাছে আপনি মনে করেন আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারে কোনো বিকৃতি ঘটেছে।

দৈন্য পৃথিবীর অধিকাংশ জনতার সঙ্গে মানুষকে সমানক্ষেত্রে নাবিয়ে আনে। বস্তুত তাদের চেয়ে জীবিকার সুযোগ আমরা অধিক পেয়েছিলুম দৈবগতিকে, নিজ গুণে নয়। সেইটে বুঝতে পারা ভালো— এবং বুঝতে পেরেও মনের শান্তিরক্ষা করা চাই। সকলের চেয়ে দুঃসহ দৈন্য অন্তরের, সেইটে থেকে রক্ষা পেলেই জীবন সার্থক মনে করব।

কেদার এলে তার সঙ্গে ছবির বই ছাপানোর পরামর্শ করতে হবে। ইতি ১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫
২৬ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

খড়দহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল এখানে এসেচি। আশ্রমে যাবার পূর্ব্বে যদি এখানে আসতে পারেন তাহলে আলোচ্য বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ হতে পারবে। আশ্রমে আশা আছে সেখানে

গেলে আপনার যত্নের ত্রুটি হবে না। মীরাও এখন সেখানেই। সেই ছবির বইয়ের সম্বন্ধে বুবা কি কিছু চিন্তা করচে? ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৬
২১ এপ্রিল ১৯৩৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার প্রেরিত বইখানি পেলুম। পৃথিবীতে যুগান্তর এলো। তার লক্ষণ য়ুরোপে দেখা দিচ্চে। কারণ য়ুরোপে মানুষ ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছে সম্পূর্ণরূপে।

অতীত ইতিহাস যদি সন্ধান করি তবে দেখতে পাব, কী আর্থিক কী সামাজিক পদ্ধতি মানবসংসারে একটানা চ'লে আসে নি। এক মহাভারত আলোচনা করলে তার যত পরিচয় পাই তেমন কোনো একখানা বইয়ে পাওয়া যায় না। যে সব রীতি সব শেষে পরিণত হয়েচে তাই যে সব চেয়ে ভালো আমাদের চার দিকে চেয়ে দেখলে সে কথা মানা যায় না।

মানুষ অনেক প্রথা তৈরি করে তুলেচে যা মোটের উপর কাজ-চালানো, অথচ যা নানা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দুঃখকর, এমন

কি, মনুষ্যত্বের অপমানজনক। জীবনযাত্রা যখন সংকীর্ণ পরিধিতে স্তব্ধ হয়ে জটাবহুল ছিল না তখনকার প্রত্যেক রীতি-নীতি ধর্ম্মের নামে সনাতন চেহারা ধারণ করবার শান্ত অবকাশ পেয়েছিল। যেখানে অবস্থা আজও প্রায় সেই রকমই অচঞ্চল, নব যুগের আবর্ত্ত যেখানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি সেখানকার স্থাবরতায় পুরাতন নীতির ভিত্তি কাঁপে নি— সেখানে অবস্থান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে পুরাতন অনুশাসনপাশ ছিন্ন হয় নি। সেই অবস্থার ভাষায় অন্য অবস্থাকে বিচার করা চলে না।

য়ুরোপে আর্থিক নীতি অনেক দিন থেকেই বিশেষ পন্থায় চলছিল। সেখানে ধনসৃষ্টি ও ধনভোগে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই ছিল প্রবল। তার প্রথম আঘাত লেগেচে গার্হস্থ্যে। গৃহযাত্রায় স্বভাবতই স্ত্রীপুরুষের অধিকার ভাগ আছে। পুরুষের কর্ত্তব্য ধন আহরণ, মেয়ের কর্ত্তব্য সংসারের প্রয়োজনে তার ব্যয়ের ব্যবস্থা। মেয়েকে আর্থিক দিকে পুরুষের অধীন থাকতেই হয়। সেই অধীনতায় পুরুষের ইচ্ছা ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে নম্রভাবে না মেলাতে পারলে সে বাঁচেই না। কিছুকাল থেকে য়ুরোপে জীবনযাত্রার আদর্শ বহুব্যয়সাধ্য হওয়াতে পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীর দায়িত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। সেখানে ঘর ভেঙে বাসার বিস্তার বেড়ে চলেচে। মেয়েরা তাদের চিরকালের আশ্রয়চ্যুত হয়ে স্বয়ং জীবিকাউপার্জ্জনে বাধ্য হয়েচে। আর্থিক স্বাতন্ত্র্য যে লাভ করে সে স্বভাবতই ভীরুভাবে পরের মন জোগায় না। পাশ্চাত্য মহাদেশে এই অর্থোপার্জ্জনরীতির বিপর্য্যয় ঘটাতেই ক্রমশই স্ত্রীধর্ম্মনীতির

পরিবর্ত্তন স্বতই ঘটে আসচে। এর প্রভাব পুরুষের উপর পড়্‌তেও বাধ্য। তারা অনেকেই গার্হস্থ্যের দায়িত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত, অপর পক্ষে বহুসংখ্যক মেয়েও তাই। এরা উভয়েই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায় অতএব এদের বিবাহ ঠিক কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই নিয়ে সে দেশে আন্দোলনের সীমা নেই।

এর সঙ্গে যোগ দিয়েচে বিজ্ঞান— বিশেষত মনোবিজ্ঞান। স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় সমস্ত আব্রু সে খসিয়ে দিয়েচে। উপন্যাস নাটক রঙ্গভূমি সব জায়গাতেই মানবপ্রকৃতি আজ অনাবৃত। মানব ইতিহাসের আদি যুগে দেহ ছিল নগ্ন আজ মানুষের মনের রইল না বস্ত্র।

এমন সময় য়ুরোপে এল সর্ব্বনেশে এক যুদ্ধ। অতিকায় মৃত্যু এসে মানুষের মনকে দিয়েছে নির্লজ্জ নির্ম্মম করে। সেই কয় বৎসর বহুসংখ্যক মানুষ এমন এক অনিত্যতার মধ্যে দিনযাপন করেছে যেখানে সে আজ আছে কাল নেই। মৃত্যু ব্যাপারটা যদিও চির সত্য তবু মানুষ যখন সংসারযাত্রা করে তখন মৃত্যু যেন নেই এইভাবেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মৃত্যুকে কাছে দেখা সত্ত্বেও মৃত্যুকে যদি ভুলে না থাকতে পারে তবে কোনো বিশ্বাস কোনো ব্যবস্থার উপরেই সে বাসা বাঁধতে পারে না। কিন্তু য়ুরোপে এই বৎসর ধরে এত বিরাটরূপেই মৃত্যুকে সামনে রাখতে হয়েছে যে সংসারের সমস্ত স্থিতিপ্রবণ নীতির পরেই তার আস্থা গেছে শিথিল হয়ে। এই সমস্ত কারণ জড়িয়ে মানুষ

আজ আপন অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা একেবারে মূলের থেকে পরখ করে দেখ্‌তে প্রবৃত্ত। যখন মানুষের ছিল সম্পন্ন অবস্থা, তার ভোগের অধিকার ছিল ব্যাপক, তখন পুরাতন নিয়মকে নাড়া দিতে তার ভয় ছিল, পাছে কোনো জায়গায় তার আরামে তার ঐশ্বর্যে ভাঙন লাগে— আজ সেই ভয়ের দশা গেছে— যার যার পুরোনো আশ্রয়ের জীর্ণ ভিত্তি থেকে সবাই বেরিয়ে পড়চে। নূতন করে পরীক্ষা করবার ভয় আর রইল না কারো।

য়ুরোপে যে তোলাপাড়া চল্‌চে সে স্বভাবের নিয়মে, বহু লোককে নিয়ে— কেবল বইপড়া কয়েকজন চষমাপরা লেখক পাঠকের সৌখীন বিচার নিয়ে নয়। ভীষণ তাদের আগ্রহ, রুশিয়ার দিকে তাকালেই তা দেখা যায়। এই আগ্রহ সম্ভবপর হোতো না যদি নূতন অবস্থায় মানুষের কাছে একান্তভাবে ধরা না পড়ে থাকে যে, যে-সব বাঁধন একদা ছিল স্থিতির অনুকূলে, আজ তাতে স্থিতির সহায়তা আর করচে না কেবল তা বন্ধনরূপেই আছে। বলা বাহুল্য সেখানেও সনাতনী আছে মানব স্বভাবে। সেও রীতিমাত্রকেই পবিত্র প্রত্যাদেশ বলে মানে। তাদেরকেও সমাজে প্রয়োজন আছে। পরখ করবার দিনে তাদের বিরুদ্ধতাও সত্যের পরিচয়ে সহায়তা করে।

আজ যুগান্তরের দিনে আমরা বইপড়া পণ্ডিতরা অপেক্ষাকৃত দূরে আছি। জিনিষটাকে কেউ বা দেখচি বন্ধমুক্ত প্রবৃত্তির দিক থেকে, কেউ বা অন্ধদৃষ্টি সনাতনের মোহের থেকে। আমার মন বল্‌চে, নিশ্চিত জানি নে মানুষ কী

করে আপন অপরিহার্য্য সমস্যার সমাধান করে— পাশ্চাত্যে সমূল সমাধানের যে প্রচণ্ড উদ্যম চলেচে সেটা শাস্ত্রিক নয়, সাহিত্যিক নয়, সেটা সামাজিক জীবন মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন-ঘটিত। যদি পরজন্ম থাকে তবে পৌত্র হয়ে জন্মিয়ে তখন ফলাফল দেখে বিচার করব। ইতি ২১ এপ্রেল ১৯৩৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৭

১২ জুলাই ১৯৩৩

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যখন সানফ্রান্‌সিসকোয় বক্তৃতায় আহূত হয়ে গিয়েছিলুম— বোধ হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে— একজন গুপ্তচর আমার হোটেলে এসে আমাকে খবর দিলে যে সেখানকার গদর পার্টি আমাকে হত্যা করবার চক্রান্ত করচে— তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে এরা কয়েকজন সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করেচে। আমি বললুম, আমি বিশ্বাস করিনে।— সে বল্‌লে তুমি বিশ্বাস করো বা না করো তোমাকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ, তুমি আমাদের অতিথি। তারা হোটেলে আমার পাশের ঘরে স্থান নিলে। আমি যখন

বক্তৃতা করতে যেতেম তারা আমার সঙ্গেই যেত, বক্তৃতার সময় প্ল্যাটফরমে আমার কাছেই বসত। ইতিমধ্যে একদিন শুনতে পেলুম, হোটেলের লবিতে কয়েকজন শিখদের মধ্যে আমার সম্পর্কে মারামারি হয়ে গিয়েছিল তাই নিয়ে হোটেলের কর্ত্তারা তাদের বের করে দেয়। ঝগড়ার কারণ সম্বন্ধে আমি এই শুনেছিলুম যে, একদল আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু যারা আমার প্রতিকূল তারা বাধা দিতে এসেছিল। সত্য কারণটা কী নিশ্চিত জানবার উপায় ছিল না। সহরে প্রথম যখন এলুম এরা আমাকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিল। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলুম, আমাকে এরা অভ্যর্থনা করে নি, এবং অপ্রসন্নভাবে বসে ছিল— আমার বক্তৃতার ভাব কিছু বুঝতে পেরেছিল কিনা জানিনে, বোধ হয় পারে নি। এদের এই অদ্ভুত আচরণ নিয়ে পিয়র্সনের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। সে-বার আমেরিকায় আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল ন্যাশনালিজ্‌ম। পাশ্চাত্যে প্রচলিত ন্যাশনালিজ্‌মের বিরুদ্ধে আমি বলেছিলুম। পিয়র্সন অনুমান করেছিলেন হয়তো সেটা গদরদলের অনুমোদিত ছিল না। যাই হোক তারপরে এদের সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নি। না হবার একটা কারণ, আমার রক্ষকদের কাছ থেকে এরা বাধা পেয়েছিল। কোনো ভারতবর্ষীয় দল আমাকে হত্যা করবার সঙ্কল্প করেছে একথা শেষ পর্য্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারি নি,— যারা আমাকে রক্ষা করবার উপলক্ষ্যে সর্ব্বদা আমার অনুসরণ করত তাদের প্রতি আমি বারম্বার বিরক্তি প্রকাশ করেছি। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর

কাজ শেষ করে যখন লস্ এঞ্জেলিস্-এ গেলেম তখনো এরা আমার সঙ্গে ছিল, কিন্তু আমার অগোচরে।

আমার কর্ম্মজাল আমার পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হয়ে উঠেচে। বিশেষত সম্প্রতি অমিয় অক্ষম হয়ে আমাব বোঝা দুর্ব্বহ করে তুলেচে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নেবার চেষ্টায় আছি। লেখনীটাকেও তাল্লাক দেবার সময় উপস্থিত হোলো। ইতি ২৮ আষাঢ় ১৩৪০

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৩
১৬ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"তুমি আমাদের পিতা" গানটির স্বরলিপি আছে বলে জানিনে। দিনু আজকাল জোড়াসাঁকোয় থাকে কেউ গিয়ে যদি তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারে তো সহজ হয়। সুরটা শিখতে দেরি হবে না। নইলে অনাদির ঠিকানা যদি বের করতে পারেন সে শিখিয়ে দেবে। অনাদি বোধ হয় সঙ্গীত সম্মিলনীতে গান শেখায়।

আপনি উপাসনার আরম্ভে একটি কবিতা চান, গীতাঞ্জলি

বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় ৪৯ সংখ্যক কবিতাটি বোধ হয় কাজে লাগতে পারে। সেটা ছেলেদের জন্যেই লেখা।

…র কাছ থেকে ছবি উদ্ধার করা অসম্ভব হবে। আমাদের অনেক ছবি তার রসিদ সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। চিঠি লিখ্‌লে উত্তর পাবার আশা নেই। কিশোরীকে বলে দিয়েছি কলকাতায় গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিশোরী সম্প্রতি গিরিডিতে— তার স্ত্রী অসুস্থ। আশা করি শীঘ্রই কলকাতায় যাবে। ছবিগুলোর জন্যে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। অবশেষে কি আদালতের শরণ নিতে হবে?

আমরা এই মাসের শেষভাগে সিংহলে যাবার উদ্যোগ করচি। স্বদেশে অন্নসংস্থানের আশা নেই। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৯
১৯ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১৯১৬ থেকে ১৭ খৃষ্টশক পর্য্যন্ত আমেরিকায় বক্তৃতায় নিযুক্ত ছিলুম। সেই সময়ে সংবাদপত্র যোগে খবর পাওয়া যেত,— মহাত্মাজি অসহযোগ প্রচার করচেন। এ কথা স্বীকার

করব, আমার সেটা ভালো লাগে নি। তার কারণ, যেমন খিলাফতের লক্ষ্য ভারতবর্ষের বাইরে, অসহযোগের লক্ষ্য প্রায় তাই। ইংরেজরাজের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগই চালাই বা অসহযোগই জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়। ওটা কলহমাত্র, সেই কলহের পরিণামে সার্থকতা নেই। মহাত্মাজি দেশের লোকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অত বড়ো প্রভাব অপর পক্ষকে তারস্বরে অস্বীকার করবার নঙর্থক উদ্দেশে খরচ হয়ে যাচ্ছে, এই কথা কল্পনা করে আমার মন পীড়িত হয়েছিল। সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজি নিজের চারদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্ত্তকার্য্য বাণিজ্য— এই কর্ত্তব্যগুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকায় সুতো কাটায় দেশচিত্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হতে পারেই না। জানি এই সংকল্পে বাধার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল— তখন সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করা সার্থক হোতো। এত দিন ধরে সংগ্রাম তো যথেষ্টই হোলো, দুঃখের তো অন্ত নেই। তার পরিবর্তে আজ রক্তহীন সাদা কাগজ পাওয়া গেল। সেই কাগজে শূন্যতা যথেষ্ট কিন্তু রচনা কতটুকু?

সেই সময়ে আমি জগদানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলুম আমাদের কোনো প্রাক্তন ছাত্র সেটি কপি করে রেখেছিল। আজ দৈবাৎ সেই কপি আমার হাতে পড়েছে। লেখাটি

আপনার কাছে পাঠালুম। প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে যদি মনে করেন তবে ছাপাবেন। সংক্ষেপে আমার বলবার ছিল এই যে পরের সঙ্গে অসহযোগ নিয়ে আন্দোলন না করে নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগের জন্যে দেশের বহুধা শক্তিকে একত্র করতে পারলে তাতে স্বরাজের যে রূপ অভিব্যক্ত হোতো, সেই রূপটি হোতো সত্য। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০
১১ মে ১৯৩৪

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার টেলিগ্রাম পেলুম। রাশিয়ার চিঠির তর্জমা ছাপবেন, আপত্তির কোনো কারণ নেই।

এখানকার লেকচারের কথা লিখেছেন, শুনে দুঃখ বোধ হোলো। একসময় কথা মুখে বাধতনা, তখনো বয়স যে বিশেষ অল্প ছিল তাও নয়, কিন্তু বুদ্ধিটা তখনো ছিল বিকেল বেলাকার পড়ন্ত রৌদ্র, কাজ চালাবার চেয়েও কিছু বেশি। অল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটু ঝাপসা হয়ে এসেছে। নদীতে দেখা যায় এক এক সময়ে দেখতে দেখ্‌তে দীর্ঘ চর পড়ে যায়। আমার সেই অবস্থা, বাণীর ধারা অনেক দূর পিছিয়ে গেছে।

বক্তৃতা (বিশেষত ইংরেজিতে) লিখতে বসতে মন একান্ত নারাজ হয়ে ওঠে। চীনে মালয় দ্বীপে পরীক্ষা করে দেখেছি, মুখে মুখে যা বলা যেত লিখিত ভাষার সঙ্গে তার বর্ণভেদ প্রায় ছিল না। এখন প্রতিদিন দেখি বোবা মনের ডাঙাগুলিই কলকথাস্রোতের উর্দ্ধে মাথা তুলে উঠচে। তাই পুরোনো লেখা জুড়ে তেড়েই কাজ চালাই। অধিকাংশের কাছেই তা পুরোনো নয়, দৈবাৎ ধরা পড়ি। বলবার কথা তো এখন শেষ হয়ে এসেছে তাই পুনরাবৃত্তি করলে অন্যায় হয় না। সেই কাজ করেই শেষ পর্য্যন্ত কাজ চলে যাবে। এখনকার বক্তৃতা পূর্ব্বতন কালের উচ্ছিষ্ট, কোন্ লজ্জায় পাঠাব আপনার কাছে।

বিষম ব্যস্ত করে রেখেচে। এখানকার বিবরণ যদি অনিলকে দিয়ে লেখাতে পারি পাঠিয়ে দেব।

আষাঢ়ের জন্যে সময় পেলে একটা কবিতা পাঠাব। — বুবার লেখা প্রবন্ধটি (বাংলা আর্টের পরিণতি সম্বন্ধে) এখানে বিশেষ কাজে লেগেচে— লেখাটা ভালো লাগল। ইতি ১১ মে ১৯৩৪

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২১

১০ জুলাই ১৯৩৪

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে ইংরেজি কবিতাটি পাঠিয়েচেন সেটি আমারি লেখা তাতে সংশয় নেই— এক সময় ঐ রকম ইংরেজি ছন্দের পরখ করতে কৌতূহল হয়েছিল। গোটাকয়েক লিখেছি। কিন্তু পরের ভাষার কাছে অপরাধী হবার সঙ্কোচ আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না— সেইজন্যে এগুলোকে বর্জ্জনীয় ভাবেই ফেলে রেখেচি। এই কবিতাটি আপনাদের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় তো ছাপাতে পারেন। অন্যগুলো যে কোন জীর্ণ খাতায় সমাধিস্থ হয়ে আছে আমার মনেও নেই।

Supreme Man বলে একটা প্রবন্ধ আজকালের মধ্যেই পাঠাব— যদি মনঃপূত হয় Modern Reviewতে ছাপতে পারেন।

প্রবাসীর জন্যে যে কবিতা পাঠিয়েছিলুম তার প্রুফ পাই নি। ইতি ২৫ আষাঢ় ১৩৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২২

৭ জানুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাকে যে অনুরোধ করেছেন তা আমার পক্ষে অসাধ্য দুই কারণে। আমি প্রতিদিন অনুভব করচি যে জনসঙ্ঘের মধ্যে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করা আমার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক। এতে প্রত্যেক বারে আমার মূলধনের যে ব্যয় হয় এ বয়সে তার আর পূরণ হবার আশা থাকেনা। ইতিপূর্ব্বে কম্যুনাল এওয়ার্ড সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছি তাই আপনারা ব্যবহার করবেন, আমি কিন্তু নিষ্কৃতি চাই।

আমার দ্বিতীয় কারণটি দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক আমার পূর্ব্ব কারণের প্রতিবাদ। বহু পূর্ব্ব হতে "প্রবাসে" অর্থাৎ বাঙলার বাইরে, জড়িয়ে পড়েচি কর্ত্তব্যদাবীর জালে। ইংরেজিতে বক্তৃতা লিখ্‌তে বা সঙ্কলন করতে হবে। বর্ত্তমানে বাংলা লেখার কাজেও আমার লেখনীকে ঠেলাঠেলি করতে হয়—তার মধ্যে যে starter ছিল সেটা এখন অচলপ্রায়— তার উপরে, ইংরেজি লেখার কাজে মনকে অনেক দেলাশা দিয়ে তবে একটু নড়াতে পারি। আসলে কর্ত্তব্যটা হয় তো তত ভারি নয় যত ভারি তার দুশ্চিন্তা। এই সকল ব্যাপারে মনটা উদ্বেজিত হয়ে আছে— কাজ করতে হয় সমস্ত দিন, এমন কাজ যা নেহাৎ দায়ে পড়া।

আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, এবং প্রসন্নমনে আমাকে ছুটি দেবেন। ইতি ২২ পৌষ ১৩৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৩

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রদর্শনী সম্বন্ধে সমালোচনাগুলি পড়ে মনে হোলো অমিয়র চিঠি না ছাপানোই ভালো। হয়তো ওতে অবিচার করা হবে, অন্তত ঝগড়ার সূত্রপাত হতে পারে। অমিয়ের পত্র অনুসারে যাঁরা কিছু বলেন না অথচ ছবিগুলিকে নিন্দনীয় মনে করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমতের মূল্য কী তা তো জানি নে। এ সকল ব্যাপারে মতবিরোধ অনিবার্য্য অতএব কোনো এক পক্ষের মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কিছু বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না। গত মাসের প্রবাসীতে এটা ছাপা হয় নি ভালোই হয়েছে।

আমাকে সত্বর পশ্চিম প্রদেশের আমন্ত্রণে বেরতে হবে। অল্পবয়সে ভ্রমণে বের হবার জন্যেই ঔৎসুক্য ছিল, সবসময়ে সুযোগ ঘটত না, এখন ঠিক তার বিপরীত। বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে লিখেছিলেন—“পায়ে শিক্লী মন-উড়ুউড়ু কিন্তু

পাথেয় নাস্তি”— এখন আমার মনেই বন্ধন, পায়ে টান লেগেছে, পাথেয়ও জুটল। এবার এখানে নববসন্তের আমন্ত্রণটা ব্যর্থ হবে। ভালো লাগে না এই মনে করে যে, ঋতুরাজের প্রাঙ্গণে বার্ষিক বিদায় আর তো বড়ো বেশি জুটবে না। ইতি ১৯ মাঘ ১৩৪১

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৬ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ পর্য্যন্ত আমার বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিকমতো হোলোই না। সভার মধ্যে রিপোর্টারকে দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বর্ত্তমান যুগের অনেক উপদ্রবের মধ্যে এই উপদ্রবও অনিবার্য্য. নিজের গান আমাকে শুনতে হবে দলিত অবস্থায়, নিজের কথা আমাকে পড়তে হবে বিকৃত ভাষায় এ আমার ললাটের লিখন। কিছু কাল পূর্ব্বে সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেম, আমার নিজের ভালো লেগেছিল অন্য অনেকেরও। একান্ত আশা করেছিলুম, সেটার রিপোর্ট হবে না, হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। অবশেষে কাগজে যখন দেখলুম তাকে, হাঁসপাতালে অপঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো, তার থেকে যে

আঘাত পেয়েছিলুম সামলে উঠ্‌তে সময় লেগেছিল। এই সব ক্ষত বিক্ষত পদার্থকে সংশোধন করা আমার মতো কুঁড়ে লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমি জানি এ সম্বন্ধে আমার নিজের বিশেষ ভাষা ও ভঙ্গীই আমার প্রধান শত্রু। রিপোর্টের ছাঁচের মধ্যে তাদের শোচনীয়তা ঘটে। যত ভালোই হোক্ সব কথাই যে ধরে রাখতে হবে এমন অত্যন্ত গরজ নেই— কিন্তু যে কটা কথা থাকে সুস্থ অবস্থায় থাকলেই বাঁচি।

কলম্বোর কলাসদনে যখন বক্তৃতা দিয়েছিলেম তখন রিপোর্টার ছিল এবং যে রিপোর্ট তারা বানিয়েছিল সেটা তাদেরি যোগ্য। এটাকে আমি বর্জ্জন করেছিলুম কিন্তু আমাকে অপদস্থ করবার জন্যে কে এই ছেঁড়া জিনিষ আমার অগোচরে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। ওটা নিতান্তই অপ্রকাশ্য— ওকে জাতে তুল্‌তে গেলে যে শুদ্ধির প্রয়োজন তৎপরিমাণ ধৈর্য্য আমার নেই। আপনার সম্পাদকীয় নিমতলার ঘাটে ওটাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেবেন। জিনিষটার ভিতর এমন কিছুই নেই যাতে করে ওর অবলুপ্তিতে কোনো অনুশোচনার কারণ ঘটতে পারে।

সম্প্রতি লেখনীর কাজে আমার নিরতিশয় বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে। হয় তো আমার শেষ আশ্রম এইরকম লেখাবিরল অবস্থাতেই কাটবে। কবিতার তহবিল শূন্য হয়ে গেছে। ফসলের শেষ কুড়ানি একটা বইয়ের মধ্যে মরাইজাৎ হয়েছে— আমার জন্মদিনের মধ্যে সেটা বেরবার কথা। অনেকগুলি চিঠি আমার দপ্তরে জমা হয়েছে, তার মধ্যে আত্ম্য অনাত্ম্য

নানা কথারই আলোচনা আছে। যদি সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন তবে তার থেকে অনেক কালের রসদ জোগাতে পারব— কিন্তু নতুন লেখার দিকে মন একটুও ঝুঁকচে না, ছুটির জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি।

আশ্রমের বন্ধুরা জন্মোৎসবের আয়োজন করচেন। সেটা তাঁদেরই কৃত্য, আমার তাতে কোনো হাত নেই। ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩৪২

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৫

২০ জুন ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি প্রবাসীতে যে লেখার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে বিশেষ কিছু ক্ষোভের বিষয় আছে বলে লক্ষ্য করি নি। কোনো লেখকের কোনো বক্তব্য বিষয় অপ্রিয় হলেও সেটা যদি অন্যায় না হয় তবে তা নিয়ে বিচলিত হওয়া উচিত বোধ করিনে। সাহিত্যে অসৌজন্য ও বিদ্বেষবুদ্ধি বা অসরলতাই নিন্দনীয়।

অনিল কাল কলকাতায় যাচ্চে সেখানে আপনার হাতে একটা কোনো তর্জ্জমা হয় তো দিতে পারবে। ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৬

২৬ জুন ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে কবিতাগুলির ইংরেজি তর্জ্জমা পাঠিয়েছিলেন তার অধিকাংশই আমার Fugitive বইয়ে আছে। ওর মধ্যে একটি ছিল যেটি ব্যবহারে লাগানো চলে। আপনি জানেন নিজের ইংরেজি বিদ্যের উপরে আজও আমার শ্রদ্ধা জন্মায় নি— সেই জন্যে সেটা তর্জ্জমার জন্যে সুরেনকে দিয়েছিলুম। কাজের ভিড়ে করে উঠতে পারি নি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে তখনি একটা অনুবাদ লিখে আপনাকে পাঠিয়েছি— চলনসই হোলো কিনা বিচার করবার যোগ্যতা আমার নেই। দেরি হয়ে গেল বলে লজ্জিত আছি।— আপনি সুরেনকে যদি এক-খানি চিঠি দেন তাহলে নিঃসন্দেহই তার কাছ থেকে অনুবাদটি পাবেন। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৭

৮ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জর্ম্মনিতে আমার বই বিক্রি সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অবশেষে যখন হিসাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো যে তাকে টাকায় পরিণত করতে গেলে এক আঁজলাও ভরে না। সমস্ত আয় জর্ম্মনিকেই দান করে এলুম। তার মূল্য যদি হ্রাস না হোতো তাহলে বিশ্বভারতীর জন্যে আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না। আজ আমার বই সেখানে কী পরিমাণে বিক্রি হয়, এবং তার গতি কোন্ পথে আমি কিছুই জানি নে। এইটুকু জানি আমার তহবিলে এসে পৌঁছয় না। সেজন্য দুঃখ করে ফল নেই, কেননা লাভের অঙ্ক বেশি হবার প্রত্যাশা করি নে,— বস্তুত য়ুরোপের হাটে আমার বই বিক্রির মুনফা তর্কের অতীত, হিসাবের খাতাটা দর্শন শ্রবণের অগোচরে। আমার পক্ষে হিট্‌লারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞমহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুসি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন একজন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্ব্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন যদি হোতো সাধারণের মধ্যেই:

শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাঁর যখন খুসি পরিতোষ প্রকাশের জন্যে কবিকে পারিতোষিক পাঠাতেন তাহলে কপিরাইট আগলানোর মতো বণিগ্‌বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করত না। রুচিও আছে রৌপ্যও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তাঁরা দুটাকা পাঁচশিকার পরিমাণেই তাঁদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন— তার ফলে যাঁদের রুচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডটা তাঁদেরই নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্ব্বরতা এ কথা মানতেই হবে।

অন্তরতর শব্দের প্রয়োগ বেদে পাওয়া যায়, যথা,

> তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
> সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

জ্যোতিদাদার গানেও এই অন্তরতর শব্দের প্রয়োগ আছে, প্রয়োজন অনুসারে আর একটু সুর চড়িয়ে এই তরকেই আমি তম করেছি। ইতি ৮ জুলাই ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৮

২৯ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সাদর নমস্কার সম্ভাষণ

এখানকার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ-চেষ্টায় ছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমারও দুঃসময়। কিছু দিতে পারছিলুম না বলে মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এমন সময় দেশ ও আনন্দবাজারের দুই সম্পাদক পূজার সংখ্যার দুটি কবিতার জন্যে একশো টাকা বায়না দিয়ে যান, সেই টাকাটা বন্যার তহবিলে গিয়েছে। আগেকার মতো অনায়াসে লেখবার ক্ষমতা এখন নেই। সেইজন্যে বিস্ময় কবিতাটা দিয়ে ওদের ঋণশোধ করব বলে স্থির করেছি। ক্লান্ত কলম নতুন লেখায় প্রবৃত্ত হতে অসম্মত। কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে একটি কবিতা দিয়ে অন্যটি হস্তান্তর করা ছাড়া আমার উপায় নেই। কিছুদিন থেকে শরীর বিশেষভাবেই অসুস্থ হয়েছে সাধারণ ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি।

শান্তি একটি গানের স্বরলিপি আপনাকে পাঠিয়েছে—সেটার সংশোধন আবশ্যক। শান্তিকে বলে দিয়েছি সংশোধিত স্বরলিপি অবিলম্বে আপনাকে পাঠাতে।

আপনার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে আশা করি। ইতি
২৯ অগস্ট ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯

১০ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আমার মনে হয় চিরকুমারসভার ইংরেজি করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাংলা দেশে শ্যালী ভগ্নীপতির সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ, এমন কি, ভারতের অন্যত্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে। তা হোক, সুরেন যদি তর্জ্জমা করে তুলতে পারে আমি তাতে কোনো আপত্তি করবনা। আমি তাকে চিঠিও লিখে দিচ্চি। আমার বিশ্বাস "শেষের কবিতা" যদিও দুরূহ তবু সেটার তর্জ্জমা একেবারে অসম্ভব না হতে পারে— ইংরেজি জানা পাঠকের কাছে এর রস অধিগম্য হতেও পারে— কিন্তু চিরকুমার সভার গোড়াকার কথাটাতেই ওরা হুঁচট খাবে। হয় তো এ সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করে দিলে জিনিষটা কৌতুকাবহ হতেও পারে।— আমাদের দেশের একজন সাহিত্য অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আমার লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই, দৃষ্টান্তস্থলে চিরকুমার সভারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গীতিকাব্য লেখকদের কলম হাসতে ও হাসাতে পারেনা— অতএব সাবধান হবেন। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০

১৪ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ও আমার অনুরোধ জানিয়ে সুরেনকে পত্র লিখেছি— তার জবাব পাই নি। সম্প্রতি সুরেনের বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্তই কঠিন হয়ে উঠেছে, খুব সম্ভব সেইজন্যে অন্য কিছুতে সে মন দিতে পারচে না।

কৃপালানি “শেষের কবিতা” তর্জ্জমায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। প্রথম অংশ কতকটা করেছে, মনে হয় তো ভালোই হয়েছে। তার কবিতা তর্জ্জমার ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল। গোটা দুয়েক করেও দিয়েছি। এ কাজ তাকে খুব ধীরে ধীরে করতে হয়, প্রথম কারণ তর্জ্জমা করা সহজ নয়, দ্বিতীয় কারণ বাংলা ভাষায় তার দখল কাঁচা। এক সুবিধে ইংরেজি ভাষায় তার কলম চলে সহজে— অমিত রায়ের মতোই সে অক্সোনিয়ন। আপনি তাকে অনুরোধ করলে হয় ত সে কাজটা সম্পন্ন করতেও পারে— বলতে পারিনে। এখন সে ছুটিতে আছে।

আজকাল আমার মন সকল প্রকার কর্ম্মধারা থেকে সরে এসেছে— ডাঙায় তোলা জীর্ণ নৌকোর মতো, অতি লঘু দায়িত্বও স্বীকার করতে সে নারাজ— দিনাবসানের ম্লায়মান আলোটুকুকে রেখেছি নিষ্কৃতির সন্ধানে। ইতি ১৪ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১

১৭ অক্টোবর ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা কবিতা এলো মাথায় এবং মাথা থেকে কলমের মুখে— গভীর জল থেকে হঠাৎ যেমন মাছ ধরা পড়ে বঁড়শিতে —পাঠাই প্রবাসীর দরবারে।

সুরেন লিখেছে, চিরকুমার সভায় পদে পদে গান এবং শ্লোক, অনুবাদের পক্ষে ওগুলো সহজসাধ্য নয়। "শেষের কবিতা" তর্জ্জমা করতে সুরেন রাজি ছিল কিন্তু সেটা আমার সম্মতিক্রমে কৃপালানি অনেকটা সেরে ফেলেছে। আপনি অনুরোধ করলে সুরেন হয় তো দুই বোন, মালঞ্চ অনুবাদ করতে পারে— ওর দ্রুত কলমে বেশি সময়ও লাগবেনা। তর্জ্জমা করতে নিজেই কোমর বাঁধব এমন পালোয়ানি আমার কাছ থেকে এখন আর আশা করবেন না। গ্রীষ্মে কুয়োর জল অনেক নিচে নেবে গেলে টেনে টেনে জল তুলতে যেমন দম নিক্‌লিয়ে যায়— লেখার প্রয়োজনে কথার জোগান দেওয়া আমার পক্ষে তেমনি দুঃসাধ্য হয়েছে। ইংরেজি কথার তো কথাই নেই। বাল্যকালে ইংরেজি শিক্ষায় অবহেলা করেছি এ কথাটা মাঝে মাঝে ভুলতে বসেছিলুম— কিন্তু সেই অবহেলিত অশিক্ষিত ইস্কুলপালানে বাল্যবয়স গোপনে লুকিয়ে ছিল, প্রাচীন বয়সের শিথিল শাসনের দিনে বেরিয়ে পড়েছে। যদি কিছু দিনের জন্যে য়ুরোপে যাই তাহলে এই ছেলেটাই কোথা থেকে হঠাৎ

আপন বিলিতি মুহুরিআনা প্রকাশ করবে। হয়ত জাহাজ থেকেই সুরু হবে তার বাহাদুরি। বারবার দেখেছি আমার মনের মধ্যে হাওয়ায়-বাজা একটা যন্ত্র আছে, হাওয়ার হাতে তার সুরের বৈচিত্র্য জাগে। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭২

২ জানুয়ারি ১৯৩৬

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সুরেন অল্প একটু অবকাশ সম্প্রতি পেয়েছে। তাকে মডার্ন্ রিভিয়ুর জন্যে অনুরোধ করলে শিক্ষা বা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করতে দ্বিধা করবে না। এখানে এমন কোনো অধ্যাপককে জানি নে যাঁর লেখনীতে তৎপরতা আছে।

কর্ম্ম এখন আমার পক্ষে বোঝা অথচ তাকে কাঁধের থেকে নামানো অসম্ভব হয়েছে— এদিকে শরীর অপটু, মনও বাহিরের দিকে নেই। ইতি ২২ জানুয়ারি ১৯৩৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩

৪ মার্চ ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা কবিতা তর্জ্জমা করে পাঠাচ্ছি। আশা করি এটা গ্রহণীয় হবে।

আপনাদের কাগজে দেখা গেল তদীয় উত্তুঙ্গতা আগা খাঁয়ের আচরণে পূর্ব্বাপরের যথেষ্ট সামঞ্জস্য নেই বলে আভাস দেওয়া হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে এ রকম নিন্দাবাদের কারণ আছে বলে আমি মনে করিনে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সাধনকে পুণ্যকর্ম্মই বলা যায়। বিশ্বমুসলমানীর প্রচেষ্টাও সেই লক্ষ্য অভিমুখে। প্যান ইসলামীয় প্রচেষ্টা ভারত সাম্রাজ্যের অনুকূল নয়। তার অর্ঘ্য রাজদ্বার পেরিয়ে চলে যায়। ইতি ৪ মার্চ্চ ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪

২২ মে ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা জরুরী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলে আপনার অনুরোধ রাখতে পারি নি। শুধু তাই নয়, তর্জ্জমা করতে বসেছিলেম কলম গেল ঠেকে। আজকাল প্রায় এমন হয়। বৃহস্পতিবারে কলকাতায় যাব। স্থান পরিবর্ত্তনে যদি বুদ্ধির উদ্যম বাড়ে চেষ্টা করে দেখব। ইংরেজি লেখাটা স্বাভাবিক নয়— বয়স যত বাড়চে এই কথাটা ততই স্পষ্টতর হচ্চে। ইতি

২২ মে ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহিলাদের সম্মেলনে উদ্বোধনের ভার নিতে যদি অনুরোধ করেন তবে আমি প্রস্তুত হব। বড়ো জনতায় সভার কার্য্য পরিচালনা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

অক্টোবরের ৪।৫ তারিখে কলকাতায় আমার কাজ আছে।

তার দু-চার দিন পূর্ব্বে বা পরে যদি সভার দিন স্থির করেন এবং যদি নিতান্ত অক্ষম না হই, তবে কর্ত্তব্য পালন করব।

কাহিনীতে পরিশোধ বলে যে কবিতা আছে তা গানের সুরে নাট্যীকৃত করেছি। সেটি কপি করে প্রবাসীর জন্যে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সেটি ৪।৫ অক্টোবরে নাট্যসূচিরূপে প্রকাশিত হবে। অন্য সমস্ত কবিতা সম্প্রতি নিঃশেষিত। কবে নূতন লেখার অঙ্কুরোদ্গম হবে বলতে পারি নে। ইতি ১ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৬

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরীর ভালো ঠেকচে না। টৌন হলে যে দুর্গতি হয়েছিল সে কথা মনে করে উদ্বিগ্ন আছি— মহিলা সম্মেলনের ভিড় এবং কর্ত্তব্যের পেষণ জীর্ণ শরীরে সইবে কী? এখন শরীরে যে ব্যয় ঘটে তা আর পূরণ হবার আশা নেই। মেয়েরা কি আমার পরে দয়া করবেন না। বিশ্বভারতীর অবশ্যসম্পাদনীয় কাজ নিয়ে আমাকে অগত্যা কলকাতায় যেতে হবে, সে কাজের পীড়নটাও কম হবে না কিন্তু এ দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই:

অভাবের দুশ্চিন্তার ভারও যে দুর্ব্বহ। আমার অবস্থার কথা চিন্তা করে আপনি যথোচিত পরামর্শ দেবেন। দোতলায় ওঠানামার কথাটাও বিচার্য্য। শান্তা আমাকে একখানি স্বরচিত গল্পের বই পাঠিয়েছিলেন, সেখানি আমার অগোচরে কোনো সাহিত্যরসলোলুপ কর্তৃক আমার টেবিল থেকে অন্তরায়িত হয়েছে। আমার সেই অনবধানতার জন্যে লজ্জিত আছি। আজকাল আমার ঘরে এ রকম ঘটনা বিরল নয়। জরায় দেহটাও যেমন, মনোযোগটাও তেমনি শিথিল হয়ে যায়। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৭

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাদের অনুরোধ অস্বীকার করা আমার সাধ্য নয়। কলিকাতায় বিচিত্রায় সঙ্গীতভবনের সাহায্যকল্পে পরিশোধ অভিনয় করাতে যাব। আট নয় দশ তারিখ স্থির হয়েছে। তার পরে কোনো একটা দিন আমাকে ডাকবেন। লিখ্‌তে বলেছেন, সময় করে উঠতে পারচিনে, মনও ক্লান্ত। যদি

না লেখা হয় তবে মুখে কিছু বলব, বেশি নয়। ইতি ১১ই আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৮

৫ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অগ্রাণের প্রবাসীর জন্য আমার কবিতার একটি কাটাকুটি-চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে যদিও পূর্ব্বপ্রকাশিত কোনো কবিতার সম্পর্ক আছে তবুও তাকে নূতন বলেই গণ্য করা উচিত। আপনি সেটি বোধ হয় এখনো দেখেন নি।

মহিলা সম্মেলনীর অধিনেত্রীদের দয়া করে জানাবেন তাঁদের সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে মারাত্মক হবে। কারণ বলি। আপনি আমাদের অর্থ দৈন্যের কথা জানেন। এখানে সঙ্গীতবিভাগ আছে, বৎসরে আড়াই হাজার টাকা খরচ লাগে—সেই টাকার সংস্থান করবার জন্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গীতাভিযানে যাত্রা করে থাকি। এবার নানা কারণে বিলম্ব হয়ে গেছে। কোনোমতে ছুটির পূর্ব্বে কলিকাতায় শনি রবি দুটি দিনের ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে স্বয়ং আমাকে আবৃত্তি

প্রভৃতি শ্রমসাধ্য নানা কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে। তার উপরে রবিবারে সভানায়কতা আমার জীর্ণ দেহের পক্ষে অসাধ্য।

আমার অভিভাষণ লিখ্‌তে আরম্ভ করলেম। ভেবেছিলেম মুখে মুখেই বলব— কারণ রিহর্সল প্রভৃতি নানা ব্যাপার নিয়ে সময়ের অত্যন্ত টানাটানি। কিন্তু সভায় যখন উপস্থিত থাকতে পারব না তখন না লিখে উপায় নেই। শান্তা যদি আমার হয়ে লেখাটি পড়ে দেন তাহলে এবারকার মত প্রাণ নিয়ে নিষ্কৃতি পাই। নিজের অপরিহার্য্য দায় নিয়ে শরীরের উপর যে পীড়ন চল্‌চে তাই আমার পক্ষে দুঃসহ।

যাই হোক যথাস্থানে আপনি আমার আর্তি জানিয়ে ক্ষমা সংগ্রহ করে দেবেন— আমি আর পেরে উঠ্‌চি নে। ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৯

৬ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি সীতার ইংরেজি লেখা পড়ি নি। ইংরেজি লেখাকেই আমি ভয় করি। আধুনিক ইংরেজি গল্পরচনার ভাষা আমাদের কাছে দুর্গম— আমরা যে ইংরেজি শিখেছি তার আদর্শ বিস্তর

বদলে গেছে। আমি সেই জন্যে এই দুঃসাধ্য কাজে সহজে হাত দিতে চাই নে। যদি এই সময়ে থাকতুম ইংলণ্ডে, হয়তো ওদের আধুনিক ভাষার ছাঁচটা অলক্ষ্যে মনের ভিতর জমে উঠত। কিন্তু ওদের এখনকার সাহিত্যিক ইংরেজি দূরে থেকে আয়ত্ত করা অসম্ভব। মোটের উপর আমার এই বক্তব্য। বস্তুত আজকাল আমার লেখার ইংরেজি তর্জ্জমার উপর আমার কিছুই আসক্তি নেই— জানি প্রত্যেক ভাষা আপন সাহিত্য-সম্পদ কৃপণের মতো বন্ধ করে রেখে দেয়, ভাষান্তরে তার রস পৌঁছতে দেয় না। দেবেন সীতাকে তর্জ্জমা করতে। আমার আপত্তি নেই।

নারীসম্মেলনে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হবে সে কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি। আমি এখন কৃপার যোগ্য। ইতি ২০ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪০

২০ জানুয়ারি ১৯৩৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজকাল লেখা আমার পক্ষে সহজসাধ্য না হওয়াতে যথাসম্ভব কলম বন্ধ করে আছি। শুধু যে শরীর অপটু তা নয় মনও বিমুখ। লেখার স্রোত ভিতরের থেকে বন্ধ হয়ে আসচে। ভাষার ক্ষীণতায় আমার চিন্তার ধারা এখন আর নৌবাহ্য নয়।

ললিত চাটুয্যে মশায় আমার কবিতা তর্জ্জমা করে থাকেন আমি জানি। বই আকারে সেগুলি প্রকাশ করবার ইচ্ছা জানিয়ে আমার সম্মতি চেয়েছিলেন। না দেবার কারণটা আপনাকে বলি। ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র গুপ্ত আমার কবিতার অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন। অসম্মতি দিয়ে তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলুম। সেটা আমার দুর্ব্বলতা। এ নিয়ে ম্যাকমিলানরা বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করে পত্র লেখেন— বলেন এর দ্বারা আমার যে অখ্যাতি হয় তাতে আর্থিক দিকেও আমার ক্ষতি ঘটে। আমি নিশ্চিত জানি আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত যাঁরা তাঁদের কাব্যরচনার ভাষা ও রীতি মধ্যভিক্টোরীয় যুগের, এখনকার সাহিত্যবাজারে সে অচল হয়ে এসেছে। মডারন কালের যোগ্যতা পাকা হয়ে উঠতে যথেষ্ট সময় নেবে। আমি নিজে অনুবাদ করতে সাহস এবং উৎসাহ হারিয়েছি। ললিতবাবুর তর্জ্জমা আপনি মডারন্ রিভিয়ুতে যদি ছাপান আমার আপত্তি নেই— কিন্তু সেগুলি নিয়ে তিনি বই ছাপাবেন এতে

আমি সম্মত হতে পারি নে। তাঁর অনুবাদগুলি তিনি ম্যাকমিলানকে পাঠিয়ে দিলে তাদের বিচারে যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে কোনো কথাই থাকে না। ইতি ২০।১।৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪১
২৬ জানুয়ারি ১৯৩৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১০ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যাব, ১৩ই কনভোকেশন। আমার বক্তৃতা বাংলা ভাষায় লেখা। ইতিমধ্যে আপনি এলে দেখা হবে।

বোষ্টমী স্নান করে যখন সিক্ত বস্ত্রে চলে আসছে তার গুরু বল্‌লে, তোমার দেহখানি সুন্দর। সে সময়ে তার কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল সেটাতে বোষ্টমীর নিজের মনের প্রচ্ছন্ন আবেগকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তাই সে পালিয়ে গিয়ে আপনাকে বাঁচায়। আমার বিশ্বাস গল্পের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি বুঝতে বাধা ঘটে না। ইংরেজি তর্জ্জমায় কথাটা স্পষ্ট হয়েছে কি না জানি নে। ইতি ১৩ মাঘ

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪২

১৯ মার্চ ১৯৩৭

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরবিন্দের তিনটে তর্জ্জমার মধ্যে একটা প্রকাশযোগ্য। সেটা অনিল কাল আপনার কাছে রওনা করে দিয়েছে। suggestion শব্দের তর্জ্জমা নিয়ে একদা তখনকার শান্তিনিকেতন পত্রে আলোচনা করেছিলুম। “সঙ্কেত” “ইঙ্গিত”-জাতীয় শব্দের আভাস তাতে ছিল। সুধীর কর কলকাতা থেকে ফিরলে খুঁজে বের করব। ইতি ১৯।৩।৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৩

২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সিটি কলেজের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুর অন্যায় আক্রমণের প্রসঙ্গে তাঁর আচরণের নিন্দা করার অনুরোধ আপনাকে জানিয়েছিলুম কিন্তু তার পরেই মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা সঙ্গত নয়। বিশেষত সুভাষ আগামী কনগ্রেস অধিবেশনে যে পদ

পেয়েছেন তার সম্মান কোনো আলোচনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হবে না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও অন্যায়কে আমি ক্ষমা করতে পারি নে এ আমার দুর্বলতা। বিধাতা আমাকে ভোলবার অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন কেবল এই ক্ষেত্রেই আমার স্মরণশক্তি কাঁটা গাছ রোপণ করতে ছাড়ে না এটা আমার পক্ষে না আরামের না কল্যাণের। আপনি আমাকে অনুতাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ইতি ২৫।১।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৪
৯ মে ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্প্রতি আমার নববর্ষের বাচন ও জন্মদিনের কবিতা নিয়ে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা আমার অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। যখনি প্রথমে আমার নজরে পড়ল আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম, কিন্তু আকস্মিক দুর্যোগের ত্রুটি সংশোধনের সময় থাকে না। কবিতাটি অল্প পরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে— সেইটিকেই আমার অনুমোদিত পাঠ বলে গণ্য করবেন। এই সকল কারণেই মাঝে মাঝে আমার খ্যাতি

নিয়ে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখলে আমি নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করি। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৫

১৩ মে ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রবিরশ্মি বইটা সম্বন্ধে চারুকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে করেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না। আমার কৈফিয়তে চারুকে যে চিঠি লিখেছি তার নকল পাঠাই। তাঁর বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবস্থা ছাড়িয়েছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয় অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অতিশয় বেশি দিতে গেলে কম দেওয়া হয়। বোধ হয় চারু ক্লাস পড়াবার উপলক্ষ্যেই এটা লিখেছেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও থাকলে ভালো হোত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগ্য হত।

ঠাণ্ডায় আছি, লোক কম গরমও নেই। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৬

১৮ জুন ১৯৩৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

শরীরে মনে শক্তির উদ্‌বৃত্ত দিনে দিনেই ক্ষয় হয়ে আসচে— এই জন্যে দিনকৃত্যের বাইরে এমন কোনো কাজ করতে উৎসাহ পাই নে যা আমার অভ্যস্ত পথের বাইরে পড়ে। আমার মনে ইংরেজি ভাষার শিকড় শিথিল হয়ে গেছে, বাংলা রচনার রাস্তাতেও রথের চাকা বারবার বেধে যায়। ক্লান্ত মনকে তাড়া লাগালে হয়তো কাজ চালাবার মতো খানিকটা পথ এগোতে পারে কিন্তু অত্যন্ত বেশি আপত্তি করে— কোন্‌দিন ধর্মঘট করে বসে এ আশঙ্কা করি। কিছুদিন পূর্বেও আমি জরাকে বিশ্বাস করতুম না, অপটুতার একটু আভাস পেলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতুম। এখন শেষ বয়সের ডিক্টেটরের শাসন মানতে বাধ্য হয়েছি— হাতখরচের মতো সামান্য কিছু রেখে আমার তহবিলে সে শিলমোহর এঁটে দিচ্চে— অত্যাচারটা স্বীকার করতে লজ্জা হয় বলেই কলম চালাতে যাই কিন্তু স্পিংহীন চাকার মতো তার আর্তনাদ উঠতে থাকে।

এখানে শরীর কিছু ভালো হয়েচে কিন্তু প্রাণের উদ্যম এখনো অজয় নদের মতো তটের তলায় তলিয়ে আছে— বর্ষায় ধারায় কিছু স্রোত বাড়ে কিন্তু পণ্য চালাবার মতো নয়।

উপস্থিত কিছু কাজ শেষ করে ছুটির চর্চাতে লাগব ভাবচি অর্থাৎ ছবি আঁকতে বসব— সেখানে আমার খ্যাতির জোয়ার ভাঁটা খেলে না— তাই আরাম পাই। ইতি ১৮।৬।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৭
২৯ জুন ১৯৩৮

ওঁ

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

আমি তিন চার দিনের মধ্যে নেমে যাব— যথাস্থানে গিয়ে ঝুলি ঝেড়ে দেখব— যদি দেবার যোগ্য কিছু পাই পাঠিয়ে দেব। এখানে পাহাড়ি আষাঢ় জাপানী চালে নির্মম ভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করচে রাস্তা ঘাট দিচ্চে ধ্বসিয়ে— মার এড়িয়ে যাত্রা করতে পারলে নিশ্চিন্ত হব। ইতি ২৯।৬।৩৮

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৮

৩০ অগস্ট ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কিছুদিন থেকে নানা কাজে ও অকাজে নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলুম এবং এখনো আছি— সেই জন্যেই নোগুচির চিঠির উত্তর এখনো দিতে পারি নি— যত শীঘ্র পারি দেব— ক্লান্তির জন্যে কিছু লেখবার উৎসাহ বোধ করি নে। এদিকে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে হলকর্ষণ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুত হতে হচ্ছে। ইতি ৩০।৮।৩৮

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪৯

৯ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সঙ্কোচ হয় তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে— আটকাবে কে? ৯।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার চিঠি ছাপতে পারেন, আপত্তি নেই। জানাতে পারেন শরৎ কখনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি, আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি। ইতি ১১।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫১

১৭ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শরতের সম্বন্ধে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটা পড়ে অনিল বললেন, যখন এই ঘটনা প্রসঙ্গে কোনো তারিখের উল্লেখ নেই তখন সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল না এ কথা কী করে বলা চলে। আন্দাজে বলেছি বটে কিন্তু এ কথা সত্য যে শরতের খ্যাতি যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত তার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা চলচে সে যদি তাঁর যশোবিস্তারের পূর্বকার হয় তাহলে এ নিয়ে সন্দেহ করবার দবকার নেই। ইতি ১৭।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫২

১ অগস্ট ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের এখানে হিন্দিভাষী ছেলেমেয়েরা হিন্দি শিক্ষার সুযোগ পায় কিন্তু নিয়ম করেছি তাদের পরীক্ষা দিতে হবে

বাংলা ভাষায়। তাতে ওদের হিন্দি শিক্ষায় শৈথিল্য হচ্চে না অথচ তারা বাংলা শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পাবে না। উত্তর-পশ্চিমে বাঙালী ছেলেদের জন্যে যদি এই নিয়ম চালানো হয় তাহলে আমার তরফ থেকে আপত্তি শোভা পাবে না। আশা করি এই বাধাটুকুতে বাঙালি ছেলেদের পরাভব হবে না। ইতি ১।৮।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৩

৪ অগস্ট ১৯৩৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যাঁদের কাছ থেকে খবর নিতে গিয়েছিলুম তাঁরা আমাকে অসম্পূর্ণ সংবাদ দিয়েছিলেন, অন্তত তাঁদের কথা থেকে আমি এই বুঝেছিলুম যে উত্তরপশ্চিমের বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেদের জন্য বাংলা শিক্ষার সুযোগ আছে কেবলমাত্র সেখানকার পরীক্ষার ভাষা হিন্দি বা উর্দু। আপনার পত্রে জানা গেল কথাটা বিশুদ্ধ সত্য নয়। অতএব এ সম্বন্ধে মহাত্মাজি বা জহরলালকে কিছু লেখবার দায়িত্ব আমার আছে সে কথা স্বীকার করি। অবসর পেলেই চেষ্টা করে দেখব। ইতি ৪।৮।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৪

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

সেণ্টজেভিয়র্সের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আপনার সুগ্রথিত অভিভাষণটি পড়ে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। আমার উদ্দেশে আপনাদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বাণী আমার জীবনে বিধাতার প্রসন্নতাকে সার্থক করে। ইতি ৪।৯।৪০

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৫

২৯ মার্চ ১৯৪১

২৯।৩।৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিলাত থেকে আপনাকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম তাদের মধ্যে অতর্কিতে অহমিকা এসে পড়েছে। সেজন্যে লজ্জিত আছি। যদি আমার পক্ষে তখন চিত্তসংযম সম্ভবপর হোতো, যদি এ সকল পত্রে নিজের অগোচরে অনেক অত্যুক্তি প্রবেশ না করত তাহলে ইতিহাস হিসাবে এর মূল্য বিশুদ্ধ হতে পারত। অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারে অভাবনীয় প্রশংসা লাভে নূতন যশস্বীর অনিবার্য চিত্তচাঞ্চল্য মনস্তত্ত্বের ইতিহাস হিসাবে

উপাদেয় হতেও পারে। এইজন্য স্বকৃত কর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিনি।

পাঠকেরা এই চিঠিগুলির মধ্য থেকে] অহঙ্কারের প্রচ্ছন্ন স্বাদ মার্জনা করে নেবেন এই আশা করি।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৬
৬ এপ্রিল ১৯৪১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

একদা য়ুরোপ থেকে আপনাকে যে সমস্ত পত্র লিখেছিলেম সে সম্বন্ধে সেদিনকার চিঠিতে আমার মন্তব্য কিছু বলেছি, সেটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করে না বললে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে। সেই একটি সময় গিয়েছে যখন য়ুরোপের উত্তর প্রান্ত থেকে পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত জন-মনে আমাকে উপলক্ষ্য করে যে একটি বিস্ময় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা অভাবনীয়, বোধ হয় ঐ মহাদেশে সে যুগে কোনো কৃতী পুরুষ এমন প্রভূত সমাদরের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। তখনকার মহাযুদ্ধে[র] পরবর্তী য়ুরোপে মনোবৃত্তির মধ্যে যে একটি সর্বজনীন আলোড়ন উপস্থিত

হয়েছিল প্রাচ্য দেশের এই কবির অভ্যর্থনার ভূমিকা ছিল তাই, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ যাই হোক ঘটনাটা ছিল অচিন্তনীয় সুতরাং নিজের মুখে তার আভাসমাত্র দেওয়া অত্যন্ত সংকোচজনক। এই আশ্চর্য ইতিহাসটিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে বাইরের সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। মনে আছে এই সময় কৌতূহলবশত লর্ড সিংহ একবার আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন, জানি তিনি বলেছিলেন যদি তাঁর এ রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না ঘটত তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রথীন্দ্রনাথ বার্লিনে আরোগ্যশালায় শয্যাগত ছিলেন তাই এত বড় দুর্লভ অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে রইলেন। এ দুঃখ আমি কখনো ভুলতে পারব না। আর আমার অন্য স্বদেশ-বাসী যাঁরা সঙ্গে ছিলেন একমাত্র যাঁরাই সাক্ষ্য দিতে পারতেন তাঁরা তখনো নীরব ছিলেন এবং এখনো নীরব আছেন। এমন কি আমার সঙ্গে থাকায় তাঁরাও উন্মুক্ত হৃদয়ের যে অভ্যর্থনা য়ুরোপের সর্বত্র লাভ করেছিলেন তাও আর কোনো ভারতবাসী এত অন্তরঙ্গভাবে [লাভ] করতে পারে নি। আমি কখনো তাঁদের মুখ খোলবার জন্যে কিছুমাত্র তাগিদ করিনি এবং সাক্ষ্য সমর্থনের অভাবের মধ্যে চুপ করে থাকাই বরাবর শোভন মনে করেছি। এই রকম নীরবতার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ সেদিন আমার যাত্রাপথে পদে পদে যে প্রবল উত্তেজনা জাগ্রত হয়ে উঠছিল তার মধ্যে সমগ্র

ব্যাপারের একটা স্পষ্ট দৃশ্য দেখতে পাওয়া এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে বলা দুঃসাধ্য ছিল।

আমার জীবনের সেদিনকার এই যে আশ্চর্য ঘটনা সহসা অত্যুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আমি কে? আমিই তো ছিলেম সেই ব্যাপারের উপলক্ষ্য, আমিই তো ছিলেম তার কেন্দ্রস্থলে। যাঁরা অনতিদূরে থেকে সেই দৃশ্য দেখেছেন তাঁরা সে সম্বন্ধে ইচ্ছে করলে বলতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা বলেন নি, অথচ য়ুরোপের সেই বিপুল সমাদর ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্তরঙ্গভাবে তাঁদের [যুক্ত] করে নিয়েছিল। এস্থলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ইতিহাসের কিছুমাত্র আভাস আমার তরফ থেকে দেওয়ায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ হবার আশঙ্কা আছে। অতএব একদিন কোনো মহালগ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই যে মিলন ঘটেছিল তার ইতিহাস বা বিবরণ অকথিত থেকে গেল। হয়তো তাই থাকাই ভালো। আমি এ সম্বন্ধে কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করতে একান্ত অনিচ্ছা বোধ করি। কেননা সেদিনকার সেই ভ্রমণ ব্যাপারে যাঁদের সঙ্গ সহায়তা পেয়েছিলুম তাঁদের অক্লান্ত সেবা ও সতর্কতা নিরন্তর না পেলে আমার পক্ষে এক পা চলা অসম্ভব হোতো। তাঁদের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুশ্রূষা পেয়েছিলুম তা অত্যন্ত মূল্যবান, তারা যদি য়ুরোপের রাস্তাঘাট থেকে আমার খ্যাতির ছিন্ন চিহ্নগুলো কুড়িয়ে নিয়ে না সংগ্রহ করে থাকেন তবে সেজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করতে আমি নিরতিশয় লজ্জা বোধ করি। বস্তুত আমি জানি সেদিনকার সেই খ্যাতির কোনো

স্থায়ী মূল্য নেই কারণ সম্পূর্ণ জানার মধ্যে তার মূল ছিল না। এখনি তা অনুজ্জ্বল এবং লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে কিছু দিন পরে তা সুদূর স্মৃতিরূপে হয়তো অস্পষ্ট থেকে যাবে। কিন্তু যত্ন ও ভালোবাসা সত্যকার জিনিস অন্তরের ভিতর থেকে জীবনকে তা পূর্ণতা দান করে, কোনো কালে তার ক্ষয় নেই। সেদিন য়ুরোপও আমার বাহিরের সংস্রব থেকে জানি না কী কারণে আমাকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছিল সেই অহৈতুক মানব প্রেম আমার জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে অভূতপূর্ব সার্থকতা দান করেছে। বাহিরের কোনো বিস্মৃতি আর তাকে অপহরণ করতে পারবে না। আমার সৌভাগ্য এবং আমার গৌরব এই প্রীতিতেই, খ্যাতিতে কদাচিৎ নয়। সেই জন্য আমার সেই ভ্রমণ ব্যাপারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এই দৈনন্দিন সেবার ধারাসূত্র সকলের চেয়ে সত্য হয়ে আমার মনের মধ্যে আজো রয়ে গেছে আর বাকি বাহিরের সমস্ত দান প্রতিদান আমার মন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেজন্য আক্ষেপ না করাই আমি শ্রেয় মনে করি। ঈশোপনিষৎ মানুষকে তার জীবনান্তকালের এই মন্ত্র দিয়েছেন "ওম্ কৃতং স্মর", নিজে যা করেছ তাই স্মরণ কর, আর সমস্ত কথা নিয়ে যেন চিত্তবিক্ষেপ না ঘটে, লোকের মুখের কথা লোকের মুখেই রইল। কিন্তু অন্তরের সম্পদ জীবনের কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে তার শেষ পুরস্কার অর্পণ করবে সেই পুরস্কারকেই আমি বলি শান্তি।

আমাদের দেশে সামান্য কারণেই লোকে আধ্যাত্মিক শক্তির অতিমানবিক প্রভাব কল্পনা করে থাকেন, আপনি

জানেন এই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমার নিজের মধ্যে কোনো ঘোষণা কোনো দিন প্রকাশ পায় নি কারণ আমি তা বিশ্বাস করি না। এ জীবনে যে মূলধনটুকু নিয়ে জনতার হাটে প্রতিপত্তির কারবার করে এসেছি সে আমার কবিত্বশক্তি মাত্র। সেই দান যে আমি ভাগ্যের হাত থেকে গ্রহণ করে জন্ম নিয়েছিলেম একথা অস্বীকার করলে কিংবা কম করে বললে যে কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করা হবে সেটা মিথ্যে অহংকারের চেয়েও ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু আমার এই কবিত্বের পরিমাণ বা গুণ যতই হোক এবং যাই হোক তা যথার্থ ভাবে জানবার কোনো সুযোগ য়ুরোপীয়ের ঘটে নি, তাঁরা সেটা হয়তো আন্দাজে ধরে নিয়ে থাকবেন। এই আন্দাজের মধ্যে সহজেই অতিকৃতি এসে পড়ে সুতরাং যে আদর্শে তাঁরা সেদিন আমাকে বিচার করেছিলেন সে ছিল তাঁদের নিজেরই অন্তরের সৃষ্টি তাতে তাঁরা আনন্দ পেয়েছিলেন এবং আমাকে উপলক্ষ্য করে সেই আনন্দ সম্ভোগ করেছিলেন এজন্য নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। আপনারা শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন এমন কি বিরক্ত হোতেও পারেন যে সেদিন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ আমাকে যে সমাদরের আসন দিয়েছিলেন তা তৎপূর্বে আমার দেশে আমার জন্য তেমন প্রশস্তভাবে কখনো পেতে দেওয়া হয় নি।

আমার বয়েস হয়ে গিয়েছে। খ্যাতি সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রীতির সঙ্গে সেদিন য়ুরোপ আমাকে যে সম্মান দান করেছিলেন তা আমি সবিনয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি এবং আমার অন্তরের মধ্যে সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি

আজ পর্যন্ত সাদরে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই খ্যাতির স্থায়িত্বের মূল্য সম্বন্ধে আমার কোনো অত্যাশা নেই, অথচ এই প্রীতির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ মাত্র করি নে।

আর বেশি বলবার শক্তি আমার নেই, লোকালয়ের রাস্তা থেকে কিছু খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলুম কি না যার মূল্য আছে, বলতে পারি নে। কিন্তু মানুষের প্রীতিলাভ করেছি অজস্র এবং যেহেতুক সে প্রীতি অধিকাংশ পরিমাণে অপরিচিত অনাত্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছি এই জন্যে তাকে আমি সর্বমানবের দান বলে নতশিরে গ্রহণ করি।

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ

১৫৭

১০ এপ্রিল ১৯৪১

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

সেদিন আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলুম সে আমার অপটুতাবশত বোধ হয় স্পষ্ট হয় নি এবং সমস্ত চিঠিখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় তার মর্মকথা প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সেই জন্যেই জানি না কি কারণে আমার সেই পত্র আপনাকে বেদনা দিয়েছে। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এই ছিল যে একদিন সমস্ত য়ুরোপের কাছ থেকে আমি যে সম্মান পেয়েছিলুম তা অভাবনীয়, তা বিশ্বাস করা সহজ নয়, সেই জন্য কোনো দিন আমি নিজের মুখে এর কোনো বর্ণনা করি নি। এই ভ্রমণব্যাপারে আমার সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারতেন এবং দিলে সেটা শোভনও হোতো। আজ পর্যন্ত দেন নি। কিন্তু আমি অনুশোচনা করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। কারণ আমার বয়সে এ অভিজ্ঞতাটুকু পেয়েছি লোকখ্যাতির কোনো স্থায়ী মর্যাদা নেই। অদৃষ্টের একমাত্র মূল্যবান দান ভালোবাসা। তা যেহেতু অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলে এই জন্যে বাহির থেকে কাল তাকে অপহরণ করতে পারে না। এই যথার্থ ভালোবাসা আমি সমস্ত য়ুরোপ থেকে এবং আমার ভ্রমণসঙ্গীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাভ করেছি। এই কৃতজ্ঞতা স্থায়ী ভাবে আমার মনে রয়ে গেল।

সাধারণভাবে এই কথাটুকু আপনাকে জানাতে চেয়েছিলুম এবং একথা আজ আমি সকলকেই জানাতে পারি।

নিজের অঙ্গুলি চালনা করতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এই জন্য আজ দৈবক্রমে কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীকে নিকটে পেয়ে তার হাত দিয়ে আমার যা জানাবার কথা আপনাকে জানালুম। নিশ্চয় জানবেন এর মধ্যে আমার কোনোখানে কোনো ক্ষোভ মাত্র নেই। আমি যা পেয়েছি তা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার করলুম এবং যা পাই নি তার জন্যে কারো কাছে কোনো নালিশ জানাব না। ইতি ১০ই এপ্রিল ১৯৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮

২৫ এপ্রিল [১৯৪১]

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

সেই চিঠিখানা যদি ছাপানো শ্রেয় মনে করেন একবার আমাকে দেখতে পাঠাবেন কারো মনে কিছুমাত্র আঘাত দিতে ইচ্ছে করিনে— ইতি ২৫ এপ্রেল

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৯

২৬ এপ্রিল ১৯৪১

ওঁ

২৬।৪।৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রীমৎ পরমহংসের সঙ্গে আমার পিতৃদেবের সাক্ষাৎকারের বিবরণ কিছুমাত্র আপত্তিজনক বলে আমি মনে করিনে। কিন্তু বর্তমানে তা অত্যন্ত অসময়োচিত তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমার স্বদেশবাসীরা আমার অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ আনন্দ করছেন, এই সময়ে অশোভন ও ক্ষোভজনক এক আন্দোলনের সৃষ্টি করতে আমি চাইনে। এই কারণে আমি মনে করি পরে কোনো এক শান্ত সময়ে ছাপালেই চলবে। এমন কি আমার অবর্তমানে আরো উপযোগী হবে, অতএব আমার মনে হয় এই লেখাটি ভাবী ঐতিহাসিকের জিম্মায় থাকলেই নিরাপদ হবে। তখন এর প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলে এই চিঠিখানি ঐ পত্রের সাক্ষ্য দান করতে পারবে। ইতি

আপনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬০

৬ মে ১৯৪১

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

পুরস্কার অনেক সময় সম্মুখে আসে, কিন্তু হাতে পৌঁছয় না। কিন্তু সে পুরস্কার প্রায়ই বাইরের দান। য়ুরোপে যে সম্মান আমাকে আনন্দ দিয়েছিল বস্তুত সে সম্মান নয়, সে অকৃত্রিম প্রীতি। আমার সঙ্গে য়ুরোপীয় মনের যে সংযোগ ঘটেছিল সে কোন্ সূক্ষ্ম প্রভাবের পথ দিয়ে তা বলা শক্ত। এই জন্যই সে অহৈতুক হৃদয়ের দান আমাকে পদে পদে এতো তৃপ্তি দিয়েছিল নরওয়ে থেকে আরম্ভ করে প্রাচ্য য়ুরোপ পর্যন্ত। কারণ আমি বার বার আপনাদের বলেছি যে সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সম্মান আমি তার স্থায়িত্বকে বিশ্বাস করি না। ইংলণ্ডে আমার রচনার ভাষা তাদের পরিচিত ভাষা। এই জন্য তার সমাদর প্রথম বিস্ময়ের পর ক্রমেই অনুজ্জ্বল হবার কথা। সেখানে সাহিত্যের ভাষা মূলতই তলিয়ে যাচ্ছে। আমার হাতের ইংরেজী ক্ষণকালের জন্য যতই বিস্ময়কর হোক চিরকালের বন্ধনে তার নোঙর আঁকড়ে থাকতে পারবে না, সে আমার জানা কথা। সেইজন্য এই সন্তপাতি সম্মান নিয়ে গর্ব করতে আমার লজ্জা করে। আমার স্বদেশীয়রা যাঁরা ইতিমধ্যে ইংরেজ সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁরা আমার এই আশঙ্কার কথা আপনাকে জানাতে পারবেন। এমন কি এই অশ্রদ্ধায় তাঁরাও

হয়ত মনে মনে কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন। আমি তো বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে কখনো অঞ্জলি পেতে দাঁড়াই নি। আমি যে তাঁদের সাহিত্যিক মণ্ডলের মধ্যে স্থান নিতে পারি তা আমি কল্পনাও করিনি, প্রত্যাশাও করিনি। সুতরাং এ ব্যাপারটা সব শুদ্ধ একটা দৈবাগত অপঘাত বললেই হয়। কিন্তু য়ুরোপের অন্যত্র আমি যে সমাদর পেয়েছি— সে হৃদয়ের। সে অলক্ষিত পথে আপন রহস্যজালে আকর্ষণ করে, বাহ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যিক নিক্তি দিয়ে তারা স্যাকরার দোকানে দাম যাচাই করে না। দাম তাদের হৃদয়ের নিগূঢ় কক্ষে, এ আমি পদে পদে অনুভব করেছি, ক'রে যেমন বিস্মিত হয়েছি তেমনি আনন্দ পেয়েছি। বস্তুত এই দানের একমাত্র সাক্ষী আমি নিজে— আমার অন্তরাত্মা। দ্বিতীয় বার য়ুরোপে গিয়ে এই স্নেহলিপির উপরে পুনর্বার যে দাগা বুলোতে পারবো তার সুদূর সম্ভাবনা রইলো না। কারণ য়ুরোপ আজ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। অতএব এ নিয়ে এখন আক্ষেপ করা মিথ্যে এবং পুনর্বার এর সমর্থনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ ছেলেমানুষী। যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ না করেও তাঁরা এই আশ্চর্য মানবহৃদয়ের সম্বন্ধ রহস্য অনুভব করে থাকবেন এবং সেইটুকুই জানবার ও জানাবার কথা। তার বেশী কিছু তন্ন তন্ন করে বিবরণ বলবার ও লিখবার আজ আর কোনও মূল্য নেই। আপনি নেপথ্যে থেকে অল্প যেটুকু আভাস পেয়েছেন সেও এই অকৃত্রিম মানব প্রীতির। এই প্রীতি এতটা বিস্তারিত হয়েছিল যে আমার

সঙ্গীরাও পূর্ণ স্বাদ পেয়েছেন এবং আজও তা তাঁরা ভোগ করে থাকেন। এইটিই আমার জীবনের ইতিহাসে সব চেয়ে বড়ো কথা। এতে আমার হৃদয়ের যে প্রসার ঘটেছে সে একটি অপূর্ব শিক্ষা এবং তার জন্য আমি য়ুরোপীয় মহাদেশের কাছে সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ। আমার হৃদয় দিয়ে আমি সেখানে মানবহৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছি। এই হৃদয়ের সংস্পর্শ কখনো বিলুপ্ত হবার নয়। জানবেন এর সমর্থন আমার চিত্তের মধ্যে মানবপ্রেমের উদ্বোধনে। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন না। দুঃখ করবার কারণ বাইরে পড়ে থাক। আনন্দের ভোজ মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইতি ৬ মে ১৯৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

১৬১

১৪ মে ১৯৪১

নমস্কার নিবেদন

আমার নিজের স্মরণশক্তির উপর আর নির্ভর করতে পারা যায় না। হয়তো কোনো এক সময় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে আমাকে আহ্বান করা হয়েছিল এবং সে প্রস্তাব যদি গ্রহণ না করে থাকি তাহলে তা গ্রহণ করবার মতো

দুঃসাহসিকতা আমার ছিল না। এপর্যন্ত অনুমান করতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত কোনো তথ্য আপনাকে জানাতে পারি না। ইতি ৩১ বৈশাখ ১৩৪৮ সন

রবীন্দ্রনাথ

১৬২

২৭ মে ১৯৪১

২৭।৫।৪১

প্রীতিভাজনেষু

আমার গল্পটা সম্বন্ধে অনেকেব মনে দ্বিধা জন্মেছে। অর্থাৎ এর মধ্যে আক্রমণ করা হয়েছে স্থানে স্থানে, কেউ কেউ একথা মনে করেন। আমার রচনা বলেই নিষ্কৃতি পাবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বারংবার এ রকম খোঁচা দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য আমার অনুরোধ এই,— এই লেখার যে সকল জায়গায় কোনো উত্তেজনার কারণ আছে সেখানে যথোচিত পরিবর্তন কবাই উচিত। আপনি যদি এই সংশোধনে মনোযোগ কবেন তবে আমি নিশ্চিন্ত হই। বারংবার আক্রমণের মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। বিশেষত যখন তার শাস্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। আপনি এ বিষয়ে বিচার করে দেখবেন।

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৬৩

৩১ মে ১৯৪১

ওঁ ৩১।৫।৪১

নমস্কার নিবেদন

আমার শরীর মনের বর্তমান অক্ষম অবস্থায় কোনো প্রকাশযোগ্য গল্প লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার ভালোমন্দ বিচার করাও দুঃসাধ্য, সেইজন্য এই গল্পটি এখনকার মত বন্ধ রাখাই ভালো মনে করি। যদি কখনো সুস্থ হয়ে উঠতে পারি তাহলে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। এখন এটি প্রচ্ছন্ন থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না। ইতি

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

১৬৪

২ জুন ১৯৪১

শান্তিনিকেতন

ওঁ ২।৬।৪১

প্রীতিভাজনেষু

এবারে কয়দিন ধরে বুদ্ধদেব নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। আমার স্বভাবের দোষ এই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে উত্তর না দিয়ে থাকতে পারি নে। কিন্তু এই দুর্বল শরীরে তার যথেষ্ট দাম দিতে হয়। এবারে নিরতিশয় ক্লান্তিতে আমাকে অভিভূত করেছে। মুখে মুখে লেখাগুলি যা বলেছি জানি নে তা কতদূর সমাদর যোগ্য। বুদ্ধদেব

ওগুলি স্বভাবতই প্রকাশ করতে ইচ্ছে করেছেন কিন্তু সেজন্য আপনি বেশি ব্যস্ত হবেন না। বিচার পূর্বক যখন খুসি প্রকাশ করবেন, এ সম্বন্ধে কোনো তাড়া নেই। আমার মনের যন্ত্র এখন ভালো করে চলচে না সেইজন্যে গল্পটা সম্বন্ধে দ্বিধা রয়ে গেছে। যদি কখনো সুস্থ হই তবে ওটার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করা যাবে। এখন আর আমার শক্তি নেই।

আপনার
রবীন্দ্রনাথ

১৩৫
৪ জুন ১৯৪১

৪।৬।৪১

নমস্কার নিবেদন

আপনাকে যে গল্পটা পাঠিয়েছি আমার বর্তমান দুর্বল বিচার বুদ্ধিতে তার ভালো মন্দ কিছুই ঠিক করতে পারি নি। ভেবেছিলাম আপনি সম্পাদকরূপে একটা কোনো মন্তব্য স্থির করে দেবেন, আপনার কাছ থেকে সেই নির্ভর না পাওয়াতে গল্পটা একরকম শূন্য আশ্রয় করেই রয়েছে। কোথাও এক জায়গায় ঠাঁই পেলেই ভালো হয়। আপনার উপরে নির্ভর করে আছি। ইতি

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

অন্য যাঁদের পরামর্শ নিয়েছি তাঁরা ভালোই বলেছেন তাই আশ্বস্ত হয়েছি।

১৩৩

৬ জুন ১৯৪১

৬/৬/৪১

প্রীতিভাজনেষু

কিছুদিন থেকে আমার ক্লান্তি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। স্পষ্ট করে কিছুতে মন দিতে পারি নে। এই অবস্থায় রোগশয্যায় আমি বুদ্ধদেবদের কিসব বলেছিলুম তার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কিন্তু সেগুলি ধরতে পারে নি।* আপনি তার বর্জনীয় অংশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করবেন অসঙ্কোচে। ওর মধ্যে যে অংশটুকু প্রকাশযোগ্য তাই রাখবেন। বোধহয় সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা আছে সেগুলি রক্ষণীয়। কিন্তু আপনি নিঃসঙ্কোচে এই বকুনিগুলিকে মেজে ঘষে নেবেন। আমার দিকে তাকাবেন না। আমি ভাবতেই পারি নে। গল্পটি যদি শ্রাবণ মাসের পূর্বে বের হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাতে আমি কোনো ক্ষতি দেখি নে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো তাড়া নেই। মিস্ র‍্যাথবোনকে যে চিঠি লিখেছি তার তর্জমা বোধ হয় হাবুলকে দিলে তিনি ভালো রকমে করতে পারবেন। আমার পক্ষে মন দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আমার প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করে আমার লেখার দায় আপনি যদি অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারেন তবে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হই। আপনাদের উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমার কোনো গতি নেই। ইতি

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

যা বলেছিলুম তাকে সম্পূর্ণ কানে নিতে পারে নি। তাকে সম্পূর্ণতা দেওয়া এখন আমার পক্ষে অসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ

* এই পত্র শ্রুতলিপিরূপে অপরের হস্তাক্ষরে লিখিত। লেখার সময়ে সম্ভবত কবি কথিত কয়েকটি কথা মূল চিঠির তারকা চিহ্নিত অংশে বাদ পড়ে যায়। পরে কবি স্বাক্ষরের পর যে মন্তব্য করেন সেটি কবির হস্তাক্ষরেই পত্রের প্রান্তে লিখিত আছে।

-৬৭

৮ জুন ১৯৪১

৮.৬।৪১

প্রীতিভাজনেষু

এবারে বিস্তারিত ভাবে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে বুদ্ধদেব আমার মাথা ঘুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আজও সুস্থ হতে পারি নি। এটা দেখা গেল আমি যা বলেছি এবং যা লেখা হয়েছে এ দুয়ের মধ্যে ঠিক মিল পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তখন অসুস্থ ছিলুম বলে দেখে দিতে পারি নি— এখন দেখছি ভুল করেছি। তাই চিত্র এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কোনো মতে পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করে আপনাকে পাঠিয়েছি। এরকম করে মুখে মুখে বকুনি প্রকাশ অন্যায়। এতে নিজের মান হানি হয়, এবার তা খুব বুঝেছি। যা হোক আপনি যথোচিত বিধান করবেন। ইতি

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ

২৪।৬।৪১

১৬৮

২৪ জুন ১৯৪১

প্রীতিভাজনেষু

আমার পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে ভ্রমণকালে যাঁরা আমার সঙ্গী ও সাঙ্গনী ছিলেন তাঁদের অনবধান বা ঔদাসীন্যবশত সাধারণের অবগতির জন্য আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রক্ষা করেন নি এমন একটি অন্যায় অপবাদ প্রবাসীতে আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে— এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। আমি আবিষ্কার করলাম তাঁরা সমস্ত বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু যে কোনো কারণে হোক এতদিন পর্যন্ত সেই বিস্তারিত রিপোর্ট অগোচরে রয়ে গেছে। আজ তার আবিষ্কার হওয়াতে আমি আমার ভ্রমণ সহচরদের নিকটে আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখন তাঁদের এই সংগৃহীত বিবরণের যথোচিত ব্যবহার হোতে কোনো বাধা ঘটবে না। ইতি

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

১৬৯

৭ জুলাই ১৯৪১

শান্তিনিকেতন

৭।৭।৪১

প্রিয়বরেষু

শ্রীমান সুধীরচন্দ্র কর "সাহিত্যে সমসাময়িকতা" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশার্থে আপনাকে পাঠিয়েছেন সেটা কিছুতেই আমার নামের সংস্রবে প্রকাশের যোগ্য নয়। ভাব এবং ভাষায় তিনি সঠিক আমার উক্তি ধরতে পারেন নি। অতএব আপনি ঐ প্রবন্ধটি ছাপাবেন না। ইতি ৭।৭।৪১

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ

সংযোজন

১

[১৯১২ ?]

আপনার সম্পাদিত বাংলা আরব্য উপন্যাস উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি পূর্বেই ইহা ক্রয় করিয়া আমার পরিবারস্থ বালক বালিকা ও বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবকাশ কালে পড়িবার জন্য দিয়াছি— ইহা হইতেই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মত বুঝিতে পারিবেন। জগতে কথা-গ্রন্থের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের তুলনা পাওয়া যায় না— অথচ নানা কারণে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি গৃহস্থ ঘরে রাখা যায় না। আপনি সংশোধিত আকারে বাংলায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শিশুপাঠ্য সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ শিশুসম্প্রদায়ের পিতামাতারও মনোরঞ্জন করিবার যোগ্য।

২

২৫ জুলাই ১৯২৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভালোই হয়েছে। আমার বিশ্বাস দেবীর হাতে ছবি আরো ভালো হবে। ওর তুলিতে রস আছে শুধু রূপ নয়। আপনি নির্ভয়ে ওর পরে ভার অর্পণ করতে পারবেন।

ঘন বর্ষা নেমেচে। মাঝে মাঝে তার ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দুর উঁকি মারে। হাওয়া দিচ্ছে বেগে— গাছপালার মধ্যে মাতামাতি

লেগেচে। এমন সময়টাতে কলকাতায় যেতে মন সর্‌চে না। ওদিকে প্রশান্ত তার-যোগে ডাক্তারের দোহাই পাড়চে। দ্বিধার মধ্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। খুব বেশি বিলম্ব করতে পারব না। এই সপ্তাহটা পেরবে বলে মনে ভরসা নেই। ইতি ৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২১ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কৃপালানি শেষের কবিতার এক অংশ তর্জ্জমার পর অনেকদিন চুপচাপ আছেন। আমার বিশ্বাস তাঁকে অনুরোধ করলে সুরেনের হাতে এই কর্ত্তব্য চালান করে দিতে তিনি অসম্মত হবেন না। একাজ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। ইতি ২১ অক্টোবর ১৯৩৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র : ১-২
অরুন্ধতী দেবীকে : ১-৬
রমা দেবীকে : ১
ইষিতা দেবীকে : ১

১

৮ মে ১৯২৫

তেহারান

কল্যাণীয় শ্রীমান কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়,

তোমরা পথের সাথী,
দিবসে এনেছ পিপাসার জল
রাত্রে জ্বেলেছ বাতি।
আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়
পথ হয় অবসান,
তোমাদের তরে রেখে যাই মোর
শুভ কামনার দান :—
তোমাদের পথ হোক অবারিত
নিয়ে যাক্ কল্যাণে,
নব নব ঐশ্বর্য আসুক
গানে কর্ম্মে ও ধ্যানে।
মোর স্মৃতি যদি মনে রাখ কভু
এই বলে রেখো মনে,
ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও বা
ধরে নাই এ জীবনে॥

২৫ বৈশাখ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

দেশে ফিরে এসে দেখলুম আমাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। জমিদারীর আয় বন্ধ, দেনার সুদ বাড়ছে, জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি করবার বা ভাড়া দেবার চেষ্টায় রথী প্রবৃত্ত, দিন খরচের মাজ্জিন ছাঁটা চল্‌চে। এই অবস্থায় পারস্য ভ্রমণের লেখাটা "বিচিত্রা" হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চাচ্চে। আমাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি তাই ধরা দিতেই হবে।

তোমার বাবার জন্যে দেনা পাওনার সম্পর্ক রাখতে চাই নে সে কথা তাঁকে বারবার বলেচি—প্রবাসীতে মাঝে মাঝে কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি যদি পাঠাই সেজন্যে আমাকে কিছু দেবার প্রস্তাব কোরো না। একেবারেই সে আমার ভালো লাগে না। বড়ো কোনো লেখা যার বড়ো দাম আছে সে আমাকে বিক্রি করতেই হবে। বিশ্বভারতীর জন্যে লিখে উপার্জ্জনের পথ করব এমন কথা মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কিন্তু নিজের সংসারের জন্যে জীবিকার সন্ধান করতে হবে এই পরিণামে আজ এসে ঠেকেছি। লেখা ছাড়া আর কোনো রাস্তা আমার নেই তাই কোমর বাঁধতে হোলো।

আশাকরি তোমরা ভালো আছে [আছ]। দার্জ্জিলিং [থেকে] যখন নামবে একবার দেখা যেন হয়—কেন না

ছবিগুলোর একটা গতি করতে হবে। দার্জ্জিলিঙে রথীর ঘরে আমার যে ছবি ঝোলানো আছে সেগুলো তো দেখেচ?

এখানে সম্প্রতি গরমটা কেটে গেছে। ইতি ৪ আষাঢ় ১৩৩৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

২৬ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত উদ্বেগ এবং ক্লান্তির পরে এখানে এসে গভীর আরাম পেয়েচি। এখানকার শিউলিতলা যেরকম সুগন্ধ শুভ্র ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তেমনি এখানকার শরতের দিনের সূর্য্যালোকশুভ্র মুহূর্ত্তগুলি আমার মনের উপর ঝরে পড়ে আমার মনকে একেবারে ঢেকে দিচ্চে। কাল রাত্রিটি জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল—বিদ্যালয়ের ছেলেরা মাঠে মাঠে "জগৎ জুড়ে উদার সুরে" "মহারাজ একি সাজে" প্রভৃতি গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—কিছুতে যেন থামতে পারছিল না। আমি আমার সেই খোলা ছাতের উপর একলা বসে শুনছিলুম—আমার ভারি ভাল লাগছিল। এইগানগুলি যে কত সত্য তা যখন এই মাঠে ঐ ছেলেদের মুখ থেকে শুনি

তখন হৃদয় ভরে বুঝতে পারি। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের মাঝখানে সুন্দর আছেন, কলকাতার ট্র্যামের রাস্তার ধারে সে কথা সুস্পষ্ট মনে আনা বড় শক্ত। জীবনটা সেখানে অনন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জল থেকে তোলা মাছের মত কেবল ধড়ফড় করতে থাকে।

আমার কোনো একটা manuscript চেয়েচ, দেব এখন। স্মৃতি যেটা চেয়েছিল সেটা ছাপাখানার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারি নি বলে তাকে দিতে পারি নি। তার জন্যেও একটা সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে বেবিকেও একটা না দিলে ভাল লাগবে না।

তোমরা আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

৯ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ কোনোমতে সময় করতে পারলুম না—সমস্ত দিন লোক এবং কাজের ভিড় গেচে। এখন চল্লুম। আবার কোনো একদিন হঠাৎ এসে জুটব।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। যদি বোলপুরে গিয়ে গান শিখে আস্‌তে পার তাহলে খুব আনন্দের বিষয় হবে— বেবিকেও তাহলে তার বাজনাটা নিয়ে যেতে বোলো। গাড়ি প্রস্তুত।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২১ অক্টোবর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

M. Dubois কি এখন ভারতবর্ষে? তিনি এখানে যদি আস্‌তে চান ত নিশ্চয়ই তাঁকে আস্‌তে বোলো। না হয় কিছুদিন থাক্‌বেন তাতেই বা দোষ কি?

আমি নানা কাজে ও ভাবনায় ব্যস্ত ও ক্লান্ত আছি। ইতি ৪ কার্ত্তিক ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার জন্মদিনের চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। আমি কিছুদিন থেকে কলকাতায় আছি। আরো কিছুদিন থাকতে হবে।

আমাদের সকলেরই জীবনে নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রামের কিছু না কিছু কারণ আছে। সেটা থাকা দরকার—তাতে আমাদের বাড়িয়ে তোলে। নিরতিশয় শান্তি এবং স্তব্ধতা মনের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়। সেই জন্যেই দুঃখকে কোনো মোহ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখলে আমাদের কল্যাণ নেই—তাকে স্বীকার করে নিয়ে তার উপরে উঠ্‌তে হবে। মানুষের আত্মা যে তার বাইরের সমস্ত অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এবং বড় এই কথাটা বারবার প্রতিদিন মনে করতে করতে নিজের সমস্ত বাইরের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে আমরা মুক্ত করতে পারি। নিজের সেই বন্ধনমুক্ত বিজয়ী আত্মাকে বড় করে উপলব্ধি করবার শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দিন এই আমার আশীর্ব্বাদ।

আমার আরো অনেক নতুন গান জমে উঠ্‌চে যখন দেখা হবে শিখিয়ে দেব।

বেবিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী কল্যাণীয়াসু

তোমাদের
মিলন হউক ধ্রুব,
জীবন শোভন শুভ
ভুবন আনন্দ সুধাময়,
লাভ কর নিত্য নিত্য
পুণ্য অমৃতের বিত্ত,
হোক সত্য সুন্দরের জয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬ ফাল্গুন ১৩২৮

৩

১০ মার্চ ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি ত জান তোমাদের আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। তোমাদের বিবাহ প্রেমে ও কল্যাণে সুন্দর ও সার্থক হোক এই আমার সর্ব্বান্তঃকরণের কামনা।

আজকাল রেলপথের বিঘ্ন ঘটাতে তোমাদের বিবাহে উপস্থিত থাক্‌তে পারি নি। সে বিঘ্ন এখনো ঘোচে নি, কিন্তু খুব সম্ভব বুধবারে এখান থেকে রাত্রে রওনা হয়ে বৃহস্পতিবারে কলকাতায় পৌঁছব—কেন না ১৮ই তারিখে লেডি সাহেবের সঙ্গে আমাকে নেপাল যাত্রা করতে হবে। তোমাকে যে গ্রন্থাবলী দিয়েচি তাতে আমার নাম লিখে দেব সে কথা আমার মনে আছে। এখানে সোমবারে ফাল্গুন পূর্ণিমায় সন্ধ্যার সময় গান বাজনা হবে, যদি তোমরা কোনো সুযোগে আস্‌তে পার তাহলে খুব খুসি হব—অনেক নতুন গান শুন্‌তে পাবে। কিছু নতুন গান এইবার তোমার সঞ্চয় করা উচিত হবে। সেই বীণকারও এখানে আছে, তার বীণা শুন্‌লে তুমি নিশ্চয় খুসি হবে। ইতি ২৬ ফাল্গুন ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

২৯ মে ১৯৩৩

ওঁ

শ্রীমতী রমা কল্যাণীয়াসু

যে আশীর্ব্বাদ তোমাকে পাঠালুম এখনি তার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি নেই, রইল তোমার কাছে। এর মধ্যে যে কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই, ঈশ্বরের কাছ

থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, এ'কে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় এ'কে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তাহলেই এই দান সার্থক হবে—নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য্য পেয়েও হারানো হবে। "উত্তিষ্ঠত নিবোধত" এই মন্ত্রের অর্থ এই— "ওঠো, জাগো।" জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধন করতে হয়। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশীর্ব্বাদ

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী,

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্ম্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কাল স্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর,
দুঃখেরে স্বীকার করি ; অনিত্যের যত আবর্জ্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জ্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্ম্মে তব—উত্তিষ্ঠত নিবোধত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০ জুন ১৯৩৩]

আশীর্ব্বাদ

[শ্রীমতী ইষিতা দেবী কল্যাণীয়াসু]

Glen Eden
Darjeeling

আলোর আশীর্ব্বাদ জাগিল
তোমার সকল বেলায়,
ধরার আশীর্ব্বাদ লাগিল
তোমার সকল খেলায়।
বায়ুর আশীর্ব্বাদ রহিল
তোমার আয়ুর সনে,
কবির আশীর্ব্বাদ রহিল
তোমার বাক্যে মনে॥

অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১-২

১

১৪ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

খুহু, তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহামোহোপাধ্যায়দের পণ্ডপাণ্ডিত্যের বর্ম্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখ্‌তে পাই—তাতে খুসি হই—কিন্তু তোমাদের শনিবারের চিঠির সমরাঙ্গনে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী দেখ্‌লে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকৃতে পারে না—তারা অপরাধিনী হলেও। নারীদের প্রতি পুরুষস্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়—আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা,—কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক। সিভিল ক্রিমিনাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে "ছায়েবানুগতা" ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত করে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তাহলে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময়ে মূলবস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখ্‌তে হয়, মেয়েদের অপরাধও তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো বলে মনে

হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্ম্মিণীর সহধর্ম্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্ম্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা করে দেখো। ইতি ২৮ কার্ত্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৭ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অক্টোবরের The Living Age কাগজে "Apostles of Utopia : Lenin and Gandhi in Silhouette" নামক প্রবন্ধে গান্ধির যে চিত্রটি দিয়েচে সে খুব সুন্দর, মডারন্ রিভিয়ুতে উদ্ধৃত করবার যোগ্য। তোমাদের সম্পাদকী টেবিল-ক্ষেত্রে এ কাগজের নিশ্চয় আনাগোনা আছে—যদি হাতের কাছে না থাকে আমাদের কাগজখানা তোমার কাছে পাঠাতে পারি।

এমেরিকার The Nation কাগজে Mother India সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠিয়েছি সেটা ডিসেম্বরে তোমাদের কাগজের নোটের মধ্যে কি কোনো কাজে লাগবে?

১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তাদেবী ও কালিদাস নাগকে লিখিত

পত্র ১-২১ ও ১-৩২

[শান্তিনিকেতন] ১১ মে ১৯১৯

শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী কল্যাণীয়াসু
প্রবাসীর জন্য প্রান্তরবাসীর উপহার

গান

এই বুঝি মোর ভোরের তারা
এল সাঁঝের তারার বেশে।
অবাক্ চোখে ঐ চেয়ে রয়
চিরদিনের হাসি হেসে।
সারা বেলা পাইনি দেখা,
পাড়ি দিল কখন একা,
নাম্‌ল আলোক-সাগর-পারে
অন্ধকারের ঘাটে এসে॥

সকাল বেলায় আমার হৃদয়
ভরিয়েছিল পথের গানে।
সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা
কোন্ সুরে যে কেই বা জানে
পরিচয়ের রসের ধারা
কিছুতে আর হয় না সারা,
বারে বারে নতুন করে
চিত্ত আমার ভুলাবে সে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২১ জানুয়ারি ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, জেনোয়াতে এসে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। তুমি আমার ডায়ারির কথা লিখেছ—কিন্তু সেই ডায়ারিতে কি যে বকেচি তার প্রায় কিছুই মনে নেই। তাতে মেয়েদের কথা লিখেছিলুম তা মনে আছে, কিন্তু কিভাবে তা মনে নেই। ও সম্বন্ধে যা বলবার আছে সব যে সম্পূর্ণ করে বলেছিলুম তা সম্ভব নয়। কেন না ডায়ারি জিনিষটা মনের ক্ষণিক মেজাজের প্রতিবিম্ব—ওতে কেবল এক পাশের ছবি ওঠে—চারপাশ ঘুরিয়ে ত ছবি তোলা যায় না।

এতদিনে খবর পেয়ে থাক্‌বে দক্ষিণ আমেরিকার পথে আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল, পেরু যাওয়া হল না, আর্জেন্টিনায় ডাক্তারের হাতে প্রায় দু'মাস বন্ধ হয়ে চুপচাপ পড়েছিলুম। ছুটি পেয়েই ইটালিতে এসেছি। এখানকার কাজ সেরে ভারতযাত্রা করতে আর দিন পঁচিশেক দেরি আছে। অর্থাৎ জেনোয়া থেকে যে জাহাজ ১৫ ফেব্রুয়ারিতে ছাড়বে সেইটেতে যাওয়া স্থির করেছি। আশা করি কোনো কারণে আর তারিখ বদল হবে না। কেননা এ শরীর নিয়ে বিদেশে ঘুরতে আর ইচ্ছে করচে না। অতএব যখন এই চিঠি পাবে তার এক মাসের মধ্যেই দেখা হবে। বড় গল্প লিখ্‌তে বলেছ। সে কি সম্ভব? চল্‌তে চল্‌তে গলাবন্ধ বোনা যায়

কিন্তু চল্‌তে চল্‌তে কি ষোলো হাত বহরের সাড়ি বোনা সহজ? আজ সকালে মিলানে যাচ্ছি। সাম্‌নে অনেক ঘোরাঘুরি অনেক বকাবকি আছে। ইতি ২১ জানুয়ারি ১৯২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯২৫ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

প্রবাসী পেয়ে খুসি হলুম। কাজে লাগবে।

কালিদাসের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে শুনে খুব খুসি হয়েছি, তোমাদের মিলন শুভ হোক্ এই আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২২ এপ্রিল ১৯২৫ ৯ বৈশাখ ১৩৩২

শ্রীমতী শান্তা দেবী
ও
শ্রীমান কালিদাস নাগ

আশীর্ব্বাদ

দুইয়ের মিলনে রচিয়া পাত্রখানি,
ভরি রাখো তাহে একের অমৃত আনি
সে অমৃত করি পান
জীবন হইবে গান,
চিত্ত হইবে চির-কল্যাণবাণী ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২৫ নভেম্বর ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার আশা ত্যাগ কর— যুগলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্যে আমার খেয়ালে ভর করেছিলেন, সম্প্রতি তাঁর ঠিকানা কোথায় কেউ জানে না। এখানে এসে অবধি নিজের শরীরের দুঃখটা নিয়েও যে একটু বেশ আরাম করে তাকে লালন করব তারও সময় পাই নি। কাল গবর্ণর দেখা দিয়ে চলে গেছেন— কিন্তু অবকাশের ফাঁকা কোথাও নেই, সমস্ত নিরেট করে কাজে অকাজে ঠাসা। এর উপরে ইংরেজি লেকচারটা যেমন করে হোক্ যত শীঘ্র পারি শেষ করে দিতে হবে। সবচেয়ে মুস্কিল

হচ্চে লেখায় অরুচি। নানা দিকের দাবীতে নানা দিকে আমাকে যতই টান্‌চে আমার মন ততই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠ্‌চে।

ক্ষুহুর বিয়ের ত আর দেরি নেই— এর মধ্যে কলকাতায় যাওয়া আসা আমার হাড়ে সইবে না। বিবাহ আসরে সশরীরে থাকতে পারব না— আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ পৌঁছবে। ইতি ৯ অগ্রাণ ১৩৩২

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মার্চ ১৯২৬ ?]

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, প্রুফ কাল প্রশান্তর হাতে দিয়েছিলুম, সে নিশ্চয় হারিয়ে ফেলেচে। “ভুবন” শব্দে দীর্ঘ উকার ছিল এ ছাড়া আর ভুল ছিল না।

ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তারই একটা তোমাদের দেব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সেগুলো খবরের কাগজে একবার মোটামুটি বেরিয়ে গেছে। তার পরে আবার বই আকারে সেগুলো ছাপা আরম্ভ হয়েছে— প্রবাসী বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট আগেই ছাপা হয়ে যাবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। কোনো কাজ অত্যল্পমাত্রও করা

আমার পক্ষে একান্ত অরুচিকর ও শ্রান্তিজনক হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে পালাবার ইচ্ছা। আজ বৌমা ও পুপেকে দেখতে এখানে জোড়াসাঁকোয় এসেছি—রাত্রে আলিপুরে ফিরব।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

[এপ্রিল ?, ১৯২৬]

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, লেখাটা দুই একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাত ওল্টাও

[পরের পাতায়]

শেষ শ্লোকটি

বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে কূলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে॥

[জানুয়ারি ১৯২৭ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। এবার কলকাতায় গেলে তোমার মেয়ের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করব—কিন্তু কবে যেতে পারব এখনো ঠিক করি নি। যেতে একটুও ইচ্ছে নেই। আগেকার মতই একটা ক্লান্তি আমাকে ক্রমে ক্রমে পেয়ে বস্‌চে— কলকাতায় গেলে নানা উপদ্রবের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে এই আশঙ্কা। এ ছাড়া রেলযানে ভ্রমণটা আমাকে অল্পেই কাবু করে তোলে। তোমার বাবা আসবেন লিখেছেন— তাঁর মুখে তাঁর নবতমা নাৎনির কথা শুন্‌তে পাব। আমার আশঙ্কা হচ্চে পাছে আমার নন্দিনীর নামে আমি যেসব গান রচনা করেছি পাছে সেগুলি তিনি নিজের ব্যবহারে বাজেয়াপ্ত করেন। নিজের কাব্য সম্বন্ধে কবিদের ঐ এক মস্ত বিপদ— Tresspassers will be prosecuted এই নুটিস দরজায় লটকে দেবার জো নেই। ইতি

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

[৯ জানুয়ারি ১৯২৭]

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, কথা ছিল মঙ্গলবারে শান্তিনিকেতনে যাব— আর আজ তোমাদের ওখানে গিয়ে তোমার কন্যাকে আর কন্যার মাকে দেখে আসব। কিন্তু দুদিনের উপদ্রবে শরীর আজ একেবারে ভেঙে পড়েছে— তাই আজ বিকেলের গাড়িতেই পালাতে বাধ্য হলুম। ইতিমধ্যে চুপচাপ করে থাকব। ইতি রবিবার

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

২৫ মার্চ ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল আমার "বৃদ্ধজন্মে"র কবিতাটি প্রবাসীর বৈশাখী নৈবেদ্যরূপে তোমরা গ্রহণ করতে পার নি। তাই "বৃক্ষবন্দনা" বলে আর একটি কবিতা কাল পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছা আমার এইরকম কবিতাগুলি প্রবাসীতে দ্বিধাবিভক্ত পাতায় ছাপা না হয়। অন্য নানা জাতের নানা লেখার সঙ্গে কবিতা মিশে গেলে হোয়াইট্‌য়াবে লেড্‌লর দোকানের শেলফ্‌ মনে পড়ে। এইজন্যে কবিস্বভাবসুলভ অভিমানবশত আমি আমার

কবিতাগুলির জন্যে স্বতন্ত্র পংক্তি ও আসন দাবী করি। তোমাদের সাময়িক পত্রের সাম্যতন্ত্রে যদি তা বাধে তাহলে আমরা নাচার।

ভিয়েনা থেকে তেজেশকে যে একটি পত্র লিখেছিলুম আমার গাছের কবিতার ভূমিকাস্বরূপ সেটি দিতে হবে। পত্রের কাপি এই সঙ্গে পাঠাই। ইতি ১১ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২২ মে ১৯২৭

Uplands
Shillong

কল্যাণীয়াসু

কাল তোমাদের প্রবাসী আপিসের ঠিকানায় আমার নববর্ষের বক্তৃতাটা পাঠিয়েছি-এতদিনে পেয়ে থাকবে। তোমাদের আধুনিক ঠিকানা না জানা থাকাতে তোমাদের স্বহস্তে পৌঁছিয়ে দিতে পারি নি। এখানে এসে প্রথম কয় দিন অসুখে পড়েছিলাম—আমি যদি বা সেরে উঠলুম পুপে পড়েচে। এই শিক্ষা হয়েছে যে পরিবর্ত্তন হলেই পরিশোধন হয় না। এখানে আর কিছু না হোক ঠাণ্ডা পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখরতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল সেটা সম্বন্ধে মত বদলানো

উচিত বোধ করি। স্থানভেদে জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবহারের অন্যথা হয়— ইংলণ্ডে যার মধুর স্বভাব ভারতবর্ষে তারই রুদ্রমূর্ত্তি। এইটে নিয়ে যদি পোলিটিকাল আন্দোলন করা যায় তাহলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পক্ষপাত দোষের শোধন হবে বলে কি মনে কর? এ বছরে আমি অপার্ব্বত্য বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের সঙ্গে নন্‌-কোঅপরেশন জাহির করে চলে এসেছি, তাতে নিজেকে খুবই উন্নত বলে বোধ করচি— কিন্তু হায়, জ্যৈষ্ঠ অপেক্ষা করতে জানে— যেমনি নেমে পড়ব অমনি চেপে ধরবে। ইতি
৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
১২ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ

মেডান
সুমাত্রা

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, সেদিন লিখলুম প্রবাসী পাইনি আজ লিখ্‌তে বসেচি প্রবাসী পেয়েচি। হয়ত দুটো চিঠি এক সঙ্গেই পাবে। এবারকার প্রবাসী দেখে খুসি হলুম—ফজ্‌লি আমের মতো,

শাঁস অনেকখানি। বিপরীত ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্চি। ইংরেজি ভাষায় বলে “গড়িয়ে-যাওয়া পাথর শ্যাওলা জমাতে পারে না।” কোথাও এবং কোনো সময়ে একটুখানি বসে যে লিখ্‌ব সে আশঙ্কা মাত্র নেই। যদি বা দুদশ মিনিট বসবার সময় পাই, দেহমনে ঘূর্ণি হাওয়ার দম শীঘ্র বন্ধ হতে চায় না। সেই ঘুর্ বন্ধ না হলে সামান্য একখানা চিঠি জমানোও শক্ত হয়, “প্রবন্ধ পরে কা কথা”— পাক-খাওয়া মন বাক্যগুলোকে যেন তুলো ধুনে নয়-ছয় করতে থাকে। কাল ছিলেম মালয় উপদ্বীপে, আজ এসেছি সুমাত্রায়— আজ বিকেলে এখান থেকে পাড়ি দেব যবদ্বীপে। সেখানে গিয়েও ঘুর্ ঘুর ঘুর্। তার উপরে বক্ বক্ বক্।

তোমার কন্যার নামের ফর্দ্দ সেদিন তাড়াহুড়ো করে পাঠিয়েছি— কারণ এখানে সব কাজই তাড়াহুড়োর ঝাঁপতালে— দিনগুলো মোটরগাড়ি চড়ে ছোটে, স্বপ্ন দেখি দ্রুতলয়ে। পছন্দসই কিছু জুটল কি? চারুশ্রী, সৌম্যশ্রী, সোমশ্রী, শান্তিশ্রী, স্বচ্ছশ্রী, স্নিগ্ধশ্রী, রম্যশ্রী কিন্তু ওদিকে তোমার নামকরণের দিন বোধ হয় চুকে গেছে। তোমার চিঠি যখন আমার হাতে পৌঁছল তখন সে চিঠি তোমার শুভদিনের পঞ্জিকা হিসাব করে পৌঁছয় নি— তখনি দেরি হয়ে গিয়েছিল।

এই চিঠিটা তোমাকে লিখচি, কেবলমাত্র চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন এই খবরটি দেবার জন্যে। কিন্তু সেই খবর দিতে গিয়ে যদি লম্বা চিঠি লিখি তাহলে চিঠির দৈর্ঘ্য আমার কথার প্রতিবাদ করবে। এইজন্যে নীচের ক’টা

লাইন বাদ দিতে হল। বাদ দেবার আর একটা কারণ আছে। সকালে এই হোটেলে এসে পৌঁচেছি এখনো স্নান হয় নি। বলা বাহুল্য স্নান হলে তবে আহার হবে। শরীর রক্ষার জন্যে আহারের কত প্রয়োজন সেকথা তোমার মত বিদুষীকে বলা অনাবশ্যক তবু কথাটার প্রসঙ্গ যে এখানে তুল্‌লুম সে কেবলমাত্র আরো দুটো লাইন পূরিয়ে দেবার জন্যে। এর থেকেই বুঝবে ক্রমাগত নাড়া খেয়ে খেয়ে মগজ থেকে সমস্ত স্বাধীন চিন্তা কিরকম ঝরে পড়েচে। যে কথাগুলো না লিখ্‌লে চলে [না] সেকথা ছাড়া আর কিছুই লেখবার শক্তি নেই। চিঠির কাগজের রেখাগুলো দেখ্‌চি ভর্ত্তি হয়ে গেল— যে দুটো বাকি আছে সে দুটোতে নামজারি করব— নামের দ্বারা মানুষ কাল দখল করতে চায় আমি চিঠির কাগজের স্থান দখল করব। ইতি ১৭ অগস্ট ১৯২৭

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

[নভে / ডিসেম্বর ১৯২৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

গোটাকতক বেশ প্রমাণসই ভুল এবারকার আলাপ আলোচনায় দেখা গেল। "অসীম"কে "সসীম" করে অর্থটাকে

এক মেরু থেকে আর এক মেরুতে চালান করে দেওয়া হয়েচে। ১৬১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের এক জায়গায় হওয়া উচিত ছিল “সেই বিশেষ রকম করে দেখাশোনা জানার সুযোগ আমার ও আমার প্রিয়জনের দেহমনের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে সেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হলে সেই অভিজ্ঞতার সুখ থাকে না।” চিহ্নিত অংশটি লুপ্ত হওয়াতে তাৎপর্য্যটা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েচে, এই সমস্ত বাক্যবিকারে তোমাদের কোনো দোষ নেই— এ সমস্ত এখানকার লিপিকারের স্বরচিত। যা হোক্ ভাবীকালে একবার আমার লেখার প্রুফ আমার হাত দিয়ে গেলে রচনা হয়তো নিরাপদ হতে পারে— আমি যে খুব পয়লা নম্বরের প্রুফ-দেখিয়ে এমন অহঙ্কার নেই— তবে কিনা স্বকৃত পাপের জন্যে স্বয়ং শাস্তি পাওয়ার মধ্যে একটা নৈতিক তত্ত্ব পাওয়া যায়— প্রুফ দেখা ব্যাপারে পরকীয় পাপের সমস্ত শাস্তিই নিজেকেই পেতে হয় অপরাধকারীর গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে না। বিশ্ববিধানে প্রুফ দেখা ব্যাপারে ন্যায়নীতির একটা মূলগত ব্যত্যয় আছে একথা অতি বড় আস্তিককেও মান্‌তে হবে। যদি বলো এতে লেখকের ধৈর্য্যচর্চ্চার সহায়তা করে আজ পর্য্যন্ত তার প্রমাণ পাই নি— বরঞ্চ প্রত্যেকবারের আঘাতেই অধৈর্য্যের পরিমাণ বাড়ে বই কমে না। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

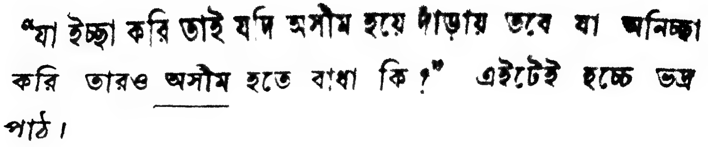

"যা ইচ্ছা করি তাই যদি অসীম হয়ে দাঁড়ায় তবে যা অনিচ্ছা করি তারও অসীম হতে বাধা কি?" এইটেই হচ্ছে ভদ্র পাঠ।

১৪

১ ডিসেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একটি মেয়েকে চিঠিগুলি লিখেছিলুম, তিনি নাম দিতে চান না। এর মধ্যে আমার অনেক মনের কথা আছে হয় ত সেগুলি অপাঠ্য হবে না। মেয়েটি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী অথচ স্বভাবতই ভক্তি নম্র, এই জন্যেই তাঁকে বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি চিঠি লিখেছিলুম। তোমার সম্পাদকীয় বিচারে এগুলি যদি প্রবাসীতে গ্রহণীয় মনে করো তবে ছাপিয়ো। যদি না মনে করো লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। একটা কথা নিশ্চিত মনে রেখো যদি আমার কোনো লেখা কোনো কারণে তোমাদের ভালো না লাগে আমি বিরক্ত হই নে। হয়ত তার একটা কারণ, নিজের উপর আমার বিশ্বাস আছে, আর একটা কারণ মানব চিত্তে অপরিহার্য্য রুচি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমার ধৈর্য্য আছে—পূর্ব্বে এতটা ছিল না। আমাকে গাল দিলে এখনো লাগে কিন্তু অকপট ভাবে অপ্রশংসা করলে সেটাকে সহজে মন থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে পারি।

এই মেয়েটির কাছে আমার আরো অনেক চিঠি আছে—পরে দেবেন বলেচেন। যদি উৎসাহ পাই তবে সেগুলিও কপি করে তোমার দপ্তরে উপহার পাঠাব।

৪ তারিখে কলকাতায় যাচ্চি তার পরে কোনোদিন প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের আশা রইল। ইতি ১ ডিসেম্বর ১৯২৭

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
১৬ মে ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ভিন্ন মোড়কে "সংস্কার" নামে একটি ছোট্ট গল্প পাঠালুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আলস্যবশত প্রশান্তকে দিয়ে কপি করিয়েছি—আশা করি তাতে তোমাদের বা ছাপাওয়ালার গুরুতর পীড়ার কারণ হবে না।

জাহাজে উপযুক্ত জায়গা এখনো পাই নি। জুনের শেষাশেষি পাব এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। ইতিমধ্যে নীলগিরি অঞ্চলে কুনুর পাহাড়ে অবস্থান করা স্থির করেচি। এবারকার প্রবাসী যদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাও তাহলে বিদেশে পাড়ি দেবার পূর্ব্বে হস্তগত হবে। আপাতত আছি আডিয়ারে,

সহর থেকে দূরে নির্জ্জনে। সেই সুযোগে গল্পটা লিখেচি— এটা তোমাদের পক্ষে উপাদেয় হবে কিনা জানি নে— একদল পাঠক ভ্রূকুটি করবে বলে আশঙ্কা করি। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার ঠিকানা :—
C/o Maharajah Bahadur
Pithapuram
Coonoor, Nilgiri Hills
Madras

১৬
৭ মার্চ ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড়ো খুসি হলুম। আমি কলকাতায় পৌঁছিয়েই জনতার তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি— নইলে তোমাকে খবর পাঠিয়ে দেখা করতুম। আমি যে জীবনের চতুর্থ প্রহরের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছি প্রতিদিন সে সম্বন্ধে আমার সংশয় দূরে যাচ্চে। প্রাণযাত্রার গোড়াতেই উদ্ভিদের পালা— চক্রপথ ঘুরে এসে

সেইখানেই লীলা সাঙ্গ করতে হয়— আমার এখন সেই উদ্ভিদের দশা— সচলতা ক্রমেই হ্রাস হয়ে আসচে। তা নিয়ে মনে কোনো পরিতাপ নেই— কেবল মুষ্কিল এই যে চারদিকে আর সকলে চঞ্চল— তারা আমাকে নিয়তই দলে টানতে চায়, স্থির থাকতে দেয় না— মনে ভয় হয় যে শেষদিনেও তারা ঘনঘন স্ট্রিকনীন ইনজেক্ট করে আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবে।

কালিদাসের সঙ্গে আমেরিকায় অনেকবার দেখা হয়েচে। সেখানে সে খুব আসর জমিয়েচে— খুসি হয়েচি। ভেবেছিলুম কলকাতায় শীঘ্র যাব না। কিন্তু সেখানে একটা বসন্ত উৎসবের পালা হবে, আমি উপস্থিত না থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না তাই জনসাধারণের দরবারে হাজিরা দেওয়া চাই অতএব সেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৭ মার্চ ১৯৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

১৭ জুন ১৯৩৫

ওঁ চন্দননগর

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, নিশ্চয় পড়ে দেখব তোমাদের বই,— অনেকদিন এ কাজ করি নি। নদীর জল শুকিয়ে এলে তার ক্ষীণাবশেষ

প্রবাহের সঙ্গে ডাঙার সম্বন্ধ যেমন দূরে পড়ে যায়, ভয় হয় পাছে এখনকার কালের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের তেমনি দূরত্ব ঘটে থাকে। আয়ুর জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে রুচির এবং ঔৎসুক্যের ওঠা পড়া চলে— তাই বর্ত্তমানকে বিচার করা ব্যাপারে নিজের যোগ্যতাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নে— সেইজন্যে আমি এখনকার বাণী থেকে আমার কানটাকে সরিয়ে রাখি। তাহোক, পড়ে দেখব তোমাদের বই, তারপরে বোঝাপড়া হবে। ইতি ১৭ জুন ১৯৩৫

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

১৮ জুলাই ১৯৩৫

কল্যাণীয়া শান্তা ও সীতা

তোমা[দে]র মায়ের মৃত্যু সংবাদ দুদিন হোলো পেয়েছি। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন তাঁর প্রতি সেবাই ছিল তোমাদের ভালবাসার দান— আজ তোমাদের একমাত্র অর্ঘ্য তাঁর জন্যে শোক। সেই শোক তোমাদের চিত্তকে পবিত্র করুক, দুঃখের গভীরতা থেকে উৎসারিত হোক নির্ম্মল শান্তি ও সান্ত্বনা,

তাঁর স্মৃতি কল্যাণ বর্ষণ করুক তোমাদের জীবনে। ইতি
১৮ জুলাই ১৯৩৫

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজকাল আমি শরীর মনের অবসাদের জন্যে পড়াশুনোয় বিমুখ হয়েছি। ইজি-চেয়ারাসনে নৈষ্কর্ম্য সাধনাতেই আমি নিযুক্ত। সেইজন্যে, তুমি আমাকে যে বই পাঠিয়েছিলে সেটা আমার অগোচরে কোনো গল্পপাঠপিপাসু অধিকার করেছে, আমিও সতর্ক ছিলুম না। আজকাল লঘু দায়িত্বও আমার পক্ষে গুরুভার। তাই কাজে ফাঁকি দিতে পারলে আমি ছাড়ি নে, কিন্তু নির্ম্মম কাজ এই পলাতকার পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্চে। তোমাদের রচনা আমার ভালোই লাগবে, কিন্তু ভালো করে বলবার মতো বেগ কলমে নেই। ইতি
৬ আশ্বিন ১৩৪৩

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, তুমি ভুল করেছ। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে Mrs Woodrowর নিমন্ত্রণে আতিথ্য বিভ্রাটের বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। ওটা বেরিয়েছিল জীবনস্মৃতিতে।

কালিদাস দিগ্বিজয় করে দেশে ফিরেছেন। যদি দেখা হয় তার ইতিহাস শোনা যাবে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো এবং সম্পাদকের বৈঠকে বসে এ কথা মনে রেখো যে-সাহিত্যের তটভূমিতে দীর্ঘকাল ফসল ফলিয়ে এসেছি তাতে জীর্ণ আয়ুর ভাঙন ধরেছে। যে তটে নতুন জমির উদ্ভব হচ্চে তোমাদের দূত পাঠিয়ো সেই ক্ষেত্রেই। ইতি ৯ পৌষ ১৩৪৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

[সেপ্টেম্বর অক্টোবর ? ১৯৩৭]

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, ডুবুডুবু দেহটাকে পাঁচদশটা ডাক্তার জাল ফেলে অতলের থেকে টেনে তুলেছে। বোধ হচ্চে মনটা এখনো

সম্পূর্ণ ডাঙায় ওঠে নি, তার কাজ চলচে না পুরো পরিমাণে, থাক্ কিছুদিন জলে স্থলে বন্যা নেমে যাওয়া ঘাটের কাছটায়। পশুদিন এক জ্যোতিষী গণনা করে লিখেছেন যে ৯২ বছর আমার আয়ু। শুনে অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। কিছুদিন দেহটার উপর কড়া চিকিৎসা চালালে গ্রহ নক্ষত্ররা আশা করি হঠে যাবে। মিসেস ওয়াডাকে ছবি অনেকদিন হোলো পাঠিয়েছি— কোনো খবর মেলে নি। সমুদ্রের কোন পারে তার গয়াপ্রাপ্তি হোলো কী জানি। ছবিটা ভালো আঁকা হয়েছিল।

কলমটা খোঁড়াচ্ছে অতএব তাকে ছুটি দেওয়া যাক্। ইতি তারিখ ? আশ্বিন ১৩৪৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১০ মার্চ ১৯১৭ ?]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সাহিত্যমণ্ডলীতে আমি ত আজকাল একঘরে', তুমি বুঝি আমাকে জাতে তোলবার চেষ্টায় আছ ? যারা আমাকে একঘরে' করেছে তারা আমাকে না জেনে সম্মান করেছে, আমাকে স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে, তাতে ক্ষতি কি ? আর কিছু না হোক্ নিরালা পাওয়া যায়। ভক্তমালে কবিরের গল্প পড়েচ ত ?

যাই হোক্ যুবকদের আহ্বান আমি কখনো অনাদর করিনে। ঐ বয়সের সঙ্গেই আমার মিল হয় ওটা যারা পেরিয়েচে যাদের চাল্‌শে ধরেছে তাদের চষমায় আমার চেহারা বীভৎস হয়ে ওঠে। আমি যৌবনের কবি, তাই জরা আমাকে পরিহার করে। তোমরা আমাকে লুটপাট করে যদি দখল করে নেও তাতে আমার আনন্দ আছে—আমার পাকাচুল দেখে ভয় কোরো না, ওটা আমার অদৃষ্ট পিতামহীর পরিহাসের হাস্যে শুভ্র হয়ে উঠেছে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
৩ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সাহিত্য পরিষদের একটা বিভাগ তোমরা দখল করে বসেচ এই খবরটা যখন তোমার কাছে পেলুম তখন মনে বড় সন্দেহ হল। তারপরে যখন শুনলুম এই বিভাগে আমাকে তোমরা স্থান দিয়েচ তখন সন্দেহ আরো বাড়ল। আজ তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। আসল কথা তোমাদের জিতটাও ভুল, আমার স্থানটাও তথৈবচ। মায়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই মুক্তি। এখন তুমি মুক্ত পুরুষ। এখন যদি কোনো কাজে হাত দাও সেটা ছোট হলেও সত্য হবে। যে ছাত্ররা idea-পিপাসু তাদের নিয়ে একটা ছাত্র-বৈঠক গড়তে কতক্ষণ লাগে?

আমাকে চাও ? আমাকে পাবে। কিন্তু আমি ত এখন বেকার নই। বাংলাদেশের বয়স্কদের কাছ থেকে তাড়া খেয়েচি কিন্তু ছোটদের এখনো বিচারবুদ্ধি হয় নি তাই আমার নিরাপদ আশ্রয় তারাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে বাংলাদেশেও মানুষ কিছুদিন শিশু থাকে, তাদেরই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমি কোনো-রকমে রক্ষা পাব। এদের নিয়ে আমি আছি। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর জাল আরো নিবিড় হয়েচে। আমার ক্লাস আছে এইজন্যে ছুটি পাইনে, আমার মত ঢিলে লোকের পক্ষে সেটা ভাল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা প্রতিদিন স্পষ্ট করে বুঝতে পারচি যে, নিজেকে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে কোনো লাভ নেই। যেখানে আছি সেইখানটুকুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এরই কূলকিনারা পাইনে। ক্ষেত্রের পরিধি বাড়ালেই যে ক্ষেত্র সত্যই বড় হয় তা নয়। তাই আমার এই শিশুদেবতার অর্ঘ্য জোগাতেই আমি লেগে আছি—অন্য কাজের তাড়ায় পূজায় ক্রটি ঘটাতে আর সাহস হয় না। ক্রটি অমনিতেই যথেষ্ট আছে।

অতএব আগামী শনিবারে যদি তুমি আসতে পার ত তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি, বাক্যসংযোগে এবং সুরুসংযোগে। দুই একটি ছাত্রও সঙ্গে আন্‌তে পার।

কিছুতে বিচলিত হোয়োনা, মনটাকে খুসি রাখ। ইতি ৩রা এপ্রেল, ১৯১৭

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[শান্তিনিকেতন *] ১০ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

পালিয়ে বেড়াচ্চ কেন? তুমিও অটল থাকবে আমিও নড়ব না এমন অবস্থায় যে ব্যবধান ঘুচ্‌তে পারেনা জিওমেট্রি না জানলেও একথা নিশ্চয় বলা যায়। বর্ষশেষের দিনে যদি এখানে উপস্থিত হতে পার তাহলে সকলে মিলে বর্ষারম্ভের উৎসব করা যায়। আজ ডাক্তার বেণ্ট্‌লি এইমাত্র চলে গেলেন—বেশ জমেছিল—ডাক্তার মৈত্র না আসাতে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া জমিয়ে রেখেচি—তাঁকে এই খবর দিয়ো। যদি ভাল চান ত নববর্ষের উৎসবে আস্‌তে যেন চেষ্টা করেন—এখানে তাঁর কাজের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ আছে। ইতি

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

[শান্তিনিকেতন *] এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, আজ বিকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। দুইএক দিন থাকব। শরীর ক্লান্ত আছে। ইতি শুক্রবার

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা * ২৬ জুন ১৯১৭

ওঁ

কাল বুধবারে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় বিচিত্রা সভায় বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থপ্রকাশের নিয়মালোচনার জন্যে ব্রজেন্দ্রবাবু যদু সরকার প্রভৃতি অনেকে মিলিত হবেন। অতএব তুমি তোমার সিংহদের সঙ্গত্যাগ করে কিছুক্ষণ নরসিংহ নরশার্দূলদের সালোক্য ও সামীপ্য উপভোগ করতে এস। আমার বর্ত্তমান ঠিকানা ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট। মঙ্গলবার।

---

২৮ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনে আমার সেই কোণ আশ্রয় করেছি। এখানে চারিদিকেই ছুটির হাওয়া, কেবল আমারই ছুটি নেই। দেশবিদেশের এত চিঠি জমেছে যে সমস্ত দিন ধরে উত্তর লিখ্‌চি; উত্তরে বাতাসের ঝড়ে আমার ছুটি থেকে কেবলি পত্র খস্‌চে। এর উপরে বিদ্যালয়ের কাজও আছে।

অরুণদের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। আশা-করি সে সুস্থ আছে, শান্তিতে আছে এবং যথাসম্ভব বিনাবাক্যে কালাতিপাত করচে। শুনছিলুম তার প্রিন্সিপালকে নিয়ে

কাগজে গোলমাল চলছিল, ভরসা করি অরুণ তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নি। ইতি ১১ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২০ অক্টোবর ১৯১৯

Shillong

কল্যাণীয়েষু

এখন ছুটি। তাই শিলঙ পাহাড়ে বিশ্রাম অনুসন্ধানে এসেছি। কিন্তু একাদশীর দিনে কেউ কেউ যেমন ভাত খায় না বলেই গুরুপাক সামগ্রী বিস্তর খেয়ে বসে, আমার ছুটিও সেই রকমের। নিয়মিত কাজ বন্ধ থাকে বলেই অনিয়মিত কাজের চাপ অপরিমিত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে একটু আধটু সৌখীন ধরণের যে বাংলা লেখা চল্‌ছিল তাকে আমি ডরাইনে কিন্তু ইংরেজি ভাষায় আনমনে লেখা চলে না। মোটর গাড়ির রাস্তা বেয়ে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে যাবার সময় শ্বশুরবাড়ির সুখস্মৃতিতে যেমন মন উতলা করলে চলে না, সর্ব্বদাই হাওয়াগাড়ির শিঙে ফোঁকার প্রতিই কান রাখতে হয় তেমনি ইংরেজি লেখবার সময় কলমটাকে বেশ আরামে পায়চারি করাবার জো নেই—সর্ব্বদাই মাষ্টার মশায়ের হুঙ্‌কারের প্রতি কান পেতে থাক্‌তে হয়। এই ভূমিকার থেকে বুঝবে ছুটির ক'টা দিন ইংরেজি লিখে কাটাচ্চি—সুতরাং

এ'কে ছুটি বলা চল্‌বে না। অষ্ট্রেলিয়ায় যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলির কাছ থেকেই নিমন্ত্রণ পেয়েচি। বাঙালীর মনের কথা যদি বাংলা ভাষায় বল্‌লে চল্‌ত তাহলে ভাবনা ছিলনা—কিন্তু মন সহজে যে ভাষায় কথা কয় ঠিক তার উল্টো ধরণের ভাষার লাইনে কলম চালাতে হবে—এই অত্যন্ত বোয়াড়া রকমের সার্কাস প্র্যাক্‌টিস করতে আমার শারদীয় অবকাশ কাটাতে হবে।

এবারে আশ্রমে ছুটি হবার আগের দিনে শারদোৎসব অভিনয় হয়ে গেচে। তোমাদের দলের মধ্যে প্রশান্ত এবং সিদ্ধান্ত এসেছিলেন। এঁরা বলেন এবারকার অভিনয়টা সকল বারের সেরা হয়েছিল। এ খবরটা যে আত্মশ্লাঘার জন্যেই তোমাকে দিলুম তা নয়—লঙ্কাদ্বীপে তোমার কিঞ্চিৎ চিত্তদাহ হবে সে অভিপ্রায়ও আছে।

তোমাদের কলেজের যে বর্ণনা করেচ তা পড়ে খুসি হলুম। এই বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌বার ভার তুমি গ্রহণ কর। আপনাকে হারিয়ে ফেলা যে কি সর্বনাশ সেটা এদের বুঝিয়ে দিয়ো—নিজের দেহটাকে বিক্রি করে অন্যের পুরোনো কাপড় কেনার মত এত বড় ঠকা আর কিছু হতে পারে না সেটা যেন ওরা উপলব্ধি করে। সিংহলে একবার বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবার বাঙালীর মানসিক উপনিবেশ ওখানে স্থাপিত কর। যদি দুই এক জনকে বাংলা ভাষা শিখিয়ে দিতে পার তাহলে বাংলার সঙ্গে সিংহলের আর একবার নাড়ীর যোগ হতে পারবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় যাবার পথে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে। ইতি ৩ কার্ত্তিক ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ রথী বল্‌চেন তুমি তাঁকে কোন্ চিঠি কপি করে দেবে এবং তার বদলে তিনি তোমাকে ছবি দেবেন এই কথা ছিল।

৮

৩ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আশ্রমে ফিরে এসেচি। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পথে গৌহাটি, শিলেট ও আগরতলা ঘুরে এলুম। বলা বাহুল্য বক্তৃতার ত্রুটি হয়নি। দিনে চারটে করে বেশ প্রমাণসই বক্তৃতা দিয়েছি এমন দুর্ঘটনাও ঘটেচে। এমনতর রসনার অমিতাচারে আমি যে রাজি হয়েচি তার কারণ ওখানকার লোকেরা এখনও আমাকে হৃদয় দিয়ে আদর করে থাকে এটা দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম। বুঝলুম কলকাতা অঞ্চলের লোকের মত ওরা এখনো আমাকে এত বেশি চেনেনি—ওরা আমাকে যা-তা একটা কিছু মনে করে। তাই সেই সুযোগ পেয়ে খুব কষে ওদের আমার মনের কথা শুনিয়ে দিয়ে এলুম। একটা

গল্প আছে—একটি ছোট মেয়ে পশুশালা দেখ্তে এসেছিল। জিরাফের খাঁচাটার সাম্নে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পরে মুখ ফিরিয়ে এই বলে চলে এল— I simply don't believe it. খুব বেশি সমাদর পেলে আমারও ঠিক ঐ রকম মনের ভাবটা হয়। ভাবি, এ কখনো সম্ভব হতে পারে? কিন্তু এবারে এখানকার মানুষের কাছ থেকে যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলুম সেটা বিশ্বাস হল। ওরা সরল। ভাবলুম ওদের বোধ হয় বুদ্ধি কম, নইলে ভক্তি বেশি হবে কেন? যাহোক্, যখন কিছু বলবার ইচ্ছে হবে (বয়স বেশি হলে বাচালতা বাড়ে) তখন একদম শিলেট চাটগাঁ আসাম প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে হাজির হব, এইরকম স্থির করেচি। তুমি যে লঙ্কাদ্বীপে গিয়েচ সে জায়গাটাও বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হবেনা—অগ্নিকাণ্ড করবার পক্ষে, তা আমি বলচিনে। ওরা বোধহয় অনেক খ্যাতনামাদের সম্পর্কে আসে নি, আর অনেক বক্তার অনেক বক্তৃতা শোনে নি, তাই ওদের মন তাজা আছে, কথার ভিতর দিকে যদি কোনো স্বাদ থাকে সেটা বোধহয় এখনো পায়— অতএব তুমি ওদের জন্যে কিছু কাজ করতে পারবে বলে আশা হয়। বিদেশের ধুলায় ওরা চাপা পড়ে গেছে, তুমি কোদাল হাতে ওদের বের করে তোল— ওরা নিজেদের নিজেরা আবিষ্কার করুক— ওদের মধ্যে কি লিপি লেখা ছিল, সেটা পড়ুক, তার মানে বোঝবার চেষ্টা করুক। তুমি ঐতিহাসিক,— ইতিহাসের সজীবক্ষেত্রে এদের দাঁড় করাও, বুঝিয়ে দাও ইতিহাসের

প্রত্যেক অধ্যায়ের চরম কথাটা হচ্ছে, "আত্মানং বিদ্ধি"।

ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জানুয়ারি ? ১৯২১]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আর ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যে রেলগাড়িতে উঠ্‌তে হবে। তার পরে কাল চড়ব জাহাজে। নিজেকে যেন একটা মালের বস্তা বলে মনে হচ্চে। যদি তোমাদের বয়স থাক্‌ত তা'হলে ভাবী আশার নেশায় এতক্ষণে ভোর হয়ে থাক্‌তুম— কিন্তু যৌবন যে গেছে তার প্রমাণ এই যে, নড়াচড়া ভাল লাগ্‌চে না— স্থবিরত্ব হচ্চে স্থাবরত্ব।

সুকুমারের দিদির বই এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে ছিল— অতি সত্বর সেটা আদায় করবার পরামর্শ দিয়ো— কেননা তার জিনিষপত্রের মধ্যে নশ্বর জগতের নশ্বরতা যত সপ্রমাণ হয় এমন আর কোথাও না।

হার্ভার্ডে লানমানের সঙ্গে দেখা হলে তোমার সম্বন্ধে আলোচনা করব— যদি কোনো সুবিধা করতে পারি চেষ্টার ত্রুটি হবেনা। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিয়ো।

আবার বসন্তে দেখা হবে—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[ফেব্রুয়ারি—মার্চ ? ১৯২১]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার এখানকার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি আটলান্টিক পাড়ি দেবার ইচ্ছে। য়ুরোপে ফেরবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে আছে। এ দেশটা য়ুরোপের উপগ্রহ; তার সঙ্গে বাঁধা কিন্তু মস্ত একটা তফাৎ আছে— য়ুরোপের চারদিকে যে প্রাণময় বায়ুমণ্ডলী আছে এদেশের তা নেই— ভারি শুক্‌নো। বাতাস থাক্‌লে আলোতে ছায়াতে যে গলাগলি হয় এখানে তা নেই— সব যেন কাটা-কাটা ছাটা-ছাটা। আমার ত এখানে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে। আমি এ দেশকে এত কম জানি যে, বিচার করতে পারিনে, কিন্তু তবু আমার মনে হয় এখানে যেটা আমাকে পীড়ন করে সে হচ্চে এখানে বেশি জান্‌বার নেই;— যেন আমাদের কোপাই নদীতে ডুবসাঁতার কাট্‌বার চেষ্টা— আর সব আছে, পাঁক আছে, বালী আছে, গর্ত্ত আছে, জল এক হাঁটুর বেশি নয়।

Dr. Woods কে তোমার কথা বলেছিলুম তিনি বলেছিলেন মার্চ্চ মাসের মধ্যে দরখাস্ত করলে তোমার পক্ষে স্কলারশিপ পাওয়া শক্ত হবেনা। তাতে যেন উল্লেখ থাকে যে তুমি কলেজের প্রিন্সিপাল ছুটিতে আছ। আমি রথীকে বলেছিলুম তোমাকে জানাতে— সে বোধহয় ভুলে গেছে।

যাহোক তুমি অধ্যাপক লেভির certificateসহ দরখাস্ত কোরো।

আমার গানের তর্জ্জমা পেয়ে আমি বড় খুসি হয়েছি অধ্যাপককে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো—শীঘ্রই তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় এখানকার প্রবাস দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করচি। একটা জিনিশ এখানে দেখা গেল—বর্ত্তমানে সমস্ত United States ইংলণ্ডের হাতে—তারাই এখানকার মন ধন এবং রাজসিংহাসন অধিকার করেচে। এখানে ভারতবর্ষের স্থান সঙ্কীর্ণ হয়েচে—ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও এখানকার মন উত্তেজিত। তোমরা যখন এদেশে আসবে সুখী হবেনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৯ এপ্রিল ১৯২১

ওঁ

ক৹

প্যারিসে এসে দেখি, তুমি নেই। ফাঁকা বোধ হচ্চে। এখানে সেই আমার জানলার কোণে লেখবার ডেস্কের কাছে চুপচাপ বসে আছি। আলোচনা করবার মত কথা অনেক

জমে উঠেচে—তুমি থাকলে বসে বসে সেগুলি খালাস করবার চেষ্টা করা যেত। যা হোক্ স্ট্রাসবুর্গে যাব। প্রথমে যাচ্চি স্পেনে— আগামী মঙ্গলবারে যাত্রা করব। সেখান থেকে কোথা দিয়ে কোথায় যাওয়া সহজ সেটা হিসেব করে দেখতে হবে। ইটালি সুইজারলাণ্ড, জার্ম্মানি, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড সুইডেন এবং নরোয়ে— এই কটা দেশ দেখ্‌তে হবে। তোমরা কেউ সঙ্গে থাকলে বেশ হত। যাহোক এই ঘুরপাকের মধ্যে কোনো একটা ভাগে স্ট্রাসবুর্গে যেতে পারব।

দেশে ফিরব জুনের শেষে। তখন আকাশের পূর্ব্ব দিগন্তে নবমেঘের ভ্রূকুটী অন্তরালে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখা যাচ্ছে। তুমি কি ভাবচ আমি তখন দেশে রাষ্ট্রনায়কের পদ গ্রহণ করে চরকার চক্রান্তে যোগ দেব? আমাকে তুমি কাজের লোক মনে করচ? আমি যদি জগতের উপকার করবার লোভে পড়ে বিধাতার খাতাঞ্চি খানায় গিয়ে কাজের মজুরা নিয়ে আসি তা হলে আমার জাত যাবে যে,— বেকার কুলীনদের পংক্তিতে আমার স্থান হবে না। তাহলে আকাশের মেঘ যখন তার বার্ত্তা পাঠাবে তখন ধরণীর মেঘমল্লারে তার জবাব দেবে কে? আমি দক্ষিণ হাওয়ার পথের পথিক, আমাদের চাল হচ্চে এলোমেলো চাল, আমাদের কাজ হচ্চে কাজে ফাঁকি দেওয়া— আমরা সভাসদদের দলের লোক নই— দরবার ভাঙলে তবে আমাদের ডাক পড়ে। এতদিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত

ছিল যে আমি মহাযান সম্প্রদায়ের। যাহোক, দেখা হলে বোঝাপড়া হবে। ইতি ১৯ এপ্রেল ১৯২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য্য লেভীকে আমার নমস্কার দিয়ো— এ সময়ে তিনি প্যারিসে নেই এ আমার দুর্ভাগ্য।

১২

২৮ অক্টোবর ১৯২১

Shantiniketan
Oct. 20, 1921

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, তোমার এবারকার চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি হলুম। কাল যে নিরবধি এবং পৃথিবী যে বিপুলা আমাদের এ দেশে সে কথা বারবার ভুলে যেতে হয়। তুমি ইটালিতে দান্তে-উৎসব থেকে আহরণ করে সেই নিরবধি কালের হাওয়া তোমার চিঠিতে এখানে পাঠিয়ে দিয়েচ— এতে আমার হৃদয় যেন অনেকদিন পরে খানিকটা হাঁফ ছেড়ে নিতে পারল। আমাদের দেশে লোকসমাজে জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিত যে কত সঙ্কীর্ণ তা য়ুরোপে থাকতে একেবারে ভুলে যেতে হয়, তাই সেখানে যেসব সঙ্কল্প করেছিলেম এখানে দেখি তার প্রশস্ত

স্থান নেই। এখানে যে ভাষা সে গ্রাম্যভাষা, এবং তার মধ্যে দিয়ে যে বার্ত্তা দেওয়া যায় তা বিশ্বের বার্ত্তা নয়— তাতে কলহ করা চলে এবং খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখা যায়। কোনো বড় সঙ্কল্প যখন মনের মধ্যে বহন করা যায় তখনি নিজের পরিবেষ্টনের যে অনৌদার্য্য সেটা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে থাকে। এতদিন শান্তিনিকেতনের সৃষ্টিকার্য্য আমার একলার হাতেই ছিল-- এর দ্বারা মস্ত কোনো লোকহিত করচি সে কথা ভাবিও নি— কেবলমাত্র একলা মাঠের মধ্যে বসে অন্তরের ভাবনাকে বাহিরের সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড় করাচ্ছিলেম। কিন্তু বিশ্বভারতী ত লিরিক জাতীয় কর্ম্ম নয়, এ হচ্চে এপিক জাতীয়। আমার দেশ যদি এ কাজ গ্রহণ না করে তবে আমার পক্ষে এ একটা বিষয় বোঝা হয়ে উঠবে। আমি কিন্তু বোঝা বইবার মজুরী করব বলে' বিধাতার হুকুম পাইনি— আমাকে স্বাধীন থাক্‌তে হবে। য়ুরোপে আমি এত বেশি আদর পেয়ে এসেচি, আমার দেশের কাছে সেইটেই আমার পক্ষে লাঞ্ছনার কারণ হয়ে উঠেচে। সবাই বল্‌তে চায় যে, যে -হেতু আমি অন্তরে অন্তরে বিজাতীয় ভাবাপন্ন সেই জন্যেই বিদেশীর কাছে আমার সম্মান। যেন ভারতবর্ষের যে আলো সে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের চক্ষুকেই দৃষ্টি দেয় অন্য দেশের পক্ষে তা অন্ধকার— যেন ভারতবর্ষের ক্ষেতে যে-ফসল ফলে বিদেশের কাছে তা অন্নই নয়। অথচ এইসব অত্যুচ্চ স্বাজাতিকরাই, উড্রফ সাহেব যখন তন্ত্রশাস্ত্রের গুণগান করেন, তখন বলেন না, অতএব তন্ত্রশাস্ত্রে ভারতীয়তার অভাব আছে।

যাই হোক এইসব নানা দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি জানকীর মতই আমার বর্ত্তমান অবস্থাকে বলচি তুমি দ্বিধা হও আমি অন্তর্ধান করি। সে আমার অনুরোধমত দ্বিধা হল। একদিকে কাব্য, আরেক দিকে গান। আমি এরই মধ্যে তলিয়ে গেছি। আমি প্রায় রোজই একটি দুটি করে বাল্যকালের কবিতা লিখ্‌চি। এই বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমানদের জগৎ থেকে আমি যেন পলাতকা। আমার আরেকবার বোঝা দরকার হয়েচে যে এই জগৎটা খেলারই ধারা— আর যিনি এই নিয়ে আছেন তিনি নিত্য কালেরই ছেলেমানুষ। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারার কোনো ব্যবহারিক অর্থ ই নেই, তাদের পারমার্থিক অর্থ— তারা হ'চ্চে, তারা হ'ল, আর কিছুই না। তারা রূপ, তারা কথা, তারা রূপকথা। এইজন্যই যখন আমরা রূপ দিচ্চি, কথা গড়্‌চি, রূপকথা বলচি তখনই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সুর মিল্‌চে। তাই যেদিন সকালে ছোট্ট একটুখানি গান তৈরি করি সেদিন প্রকাণ্ড এই কর্ত্তব্য জগতের ভারাকর্ষণটা একেবারে শূন্য হয়ে যায়, সেদিন ইণ্টারন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির গাম্ভীর্য্য দেখে হাসি পেতে থাকে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি— হায়রে হায়, জীর্ণ কীর্ত্তির ধূলিস্তূপের নীচে কত অসংখ্য নাম আজ চাপা পড়ে আছে। কিন্তু আমার আজ সকালের গান! মানুষ ওকে ভুলে গেলেও ও চলে' যেতে যেতে অন্য গানকে জাগিয়ে দিয়ে যাবে— জগতের সেই গানের চির ধারার মধ্যে ওর গতিবেগ মরবে না— বিশ্বসৃষ্টির ছন্দদোলার মধ্যে ওর দোলনটুকু রইল। তাই

বারবার মনে ভাবি আমি আমার খেলার দোসরকে তাঁর চন্দ্রসূর্য্য পুষ্পপল্লবের মধ্যে একা বসিয়ে রেখে আজ কার বোঝা ঘাড়ে করে কোন্ চূলোয় চলেচি। সমস্তই ধূলোর মধ্যে ধপাস্ করে ফেলে দিয়ে দৌড় মারতে ইচ্ছে করচে। ইস্কুলে পড়তে গিয়েছিলেম পারিনি, সম্পাদকী করতে গেলেম ছেড়ে দিলেম, পলিটিক্‌সে টানে যখন, বাঁধন কেটে পালাই। অতএব আমার নির্ব্বাসন সমস্ত জবাবদিহি থেকে;—আর আমি আমার যে দোসরের কথা পূর্ব্বেই বলেচি তাঁরও সেই অবস্থা।

সকালে যে দুটো গান তৈরি করেচি· লিখে পাঠালুম। ইতি ৩রা কার্ত্তিক ১৩২৮

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২১ জুন ১৯২২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেচে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দী-চিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশ-রঙ্গভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তর-বাহিত

স্মৃতি-স্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল,—সম্প্রতি আমি আমার সাম্‌নেকার ঐ সারবন্দী শালতালমহুয়া-ছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হ'ল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ ক'রে চলেচে। ওরা মানুষের মত আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসে নি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ বলে অবজ্ঞা করে না। এই জন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে' দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগী করে' প্রাণের খেলা-ঘরে ডাক্‌তে থাকে— আমাদের মর্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্চে আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করচি— সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে কম মানুষ হয়েচি— আমার মন ঘাসের মত কাঁপচে, পাতার মত ঝিল্‌মিল্ করচে। কালিদাস এই উপলক্ষ্যেই বলেছিলেন, "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।" অন্যথাবৃত্তি হচ্চে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূরকালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চল্‌চে, মনের মাস্টারী সুরু হয় নি—

আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেচে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। যাই হোক, এই সময়টাতে ঘন মেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেচে, আর ছোট ছোট চঞ্চল জলধারা ইস্কুল-ছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মত চারদিকে খিল্‌খিল্‌ করচে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েচে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল। ঘন মেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেচে— তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েচে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েচে "মত্ত দাতুরী।" এ আসরে আমার আসন পড়ে নি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ করে' যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মত আমারো গান চলেচে দিনের পর দিন— তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই— মেঘ যেমন "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জন ধ্বনিতে গান ধরেচি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেচে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হ'ল
অকারণে—

ঠিক এমন সময়ে সমুদ্রপার হ'তে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল

মানবসংসারে আমার কাজ আছে,— শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চল্‌বে না, মানব-ইতিহাসের যে সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীব আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আস্‌তে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র :— সে হচ্চে খৃষ্টান আর মুসলমান-ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টান-ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে ধর্ম্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃষ্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। “য়ুরোপীয় বৌদ্ধ” বা “য়ুরোপীয় মুসলমান” শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে-জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। “মুসলমান বৌদ্ধ” বা “মুসলমান খৃষ্টান” শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপরপক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মত। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্চে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়,— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক

হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে' মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মস্‌জিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেচে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টান্‌তে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেচে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বস্‌তে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে' গণ্য করার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই।— ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মত দুই জাত, একত্র হয়েছে;— ধর্ম্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল,— আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্ম্মমতে প্রবল,— এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এ'রা কি করে মিল্‌বে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে "হিন্দু" যুগের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে। হিন্দুযুগ হচ্চে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ,— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে এ'কে

দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিষকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সাম্‌লাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক্ মোট কথা হচ্চে, বিশেষ একসময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মত করেই গড়ে তুলেছিল— এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্ট হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মত মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা ত এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে' মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দু মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মত তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতলোকের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেল্‌বার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েচে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড় এই

সংস্কারটাকেই বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগ পরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্যদেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়েচে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেচে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আস্‌ব; যদি না আসি তবে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

১৪ নভেম্বর ১৯২২

ওঁ

ত্রিবিন্দ্রম

কল্যাণীয়েষু

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। সম্প্রতি আছি ত্রিবঙ্কুরে। এখনি বেরতে হবে। বিশ্বভারতী প্রচারের ভার নিয়েচি। ভাবটা লোকের মনে প্রবেশ করেচে। যেখানে কিছু বলেচি সেখানেই লোকের মনে লেগেচে। আশা করচি ভারতবর্ষের সর্বত্র থেকে সভা পাওয়া যাবে। আমি চাই বিশ্বভারতী বিশ্বভারতের হৃদয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়। তুমি যখন আস্‌বে দেখবে অনেক দূর কাজ এগিয়েচে। শান্তিনিকেতন এখন আর

বোলপুরের কোণে নেই— বেরিয়ে পড়েচে— এখন তার রথযাত্রা। আমি এতদূর আশা করি নি— কারণ গান্ধি তাঁর সন্ন্যাসীর কম্বল দিয়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বের কাছ থেকে ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন। প্রথম যখন দেশে ফিরে এলুম তখন দেখতে পেলুম বিশ্বমণ্ডলী থেকে ভারতবর্ষ দূরে চলে গেছে। ভারি উদ্বেগ মনে জেগেছিল। আজকের দিনে যখন সমস্ত জগতে একটি মহান্ ভাবী যুগের সাড়া এসেছে, অতিথি বল্‌চেন অয়মহং ভোঃ, তখন ভারতবর্ষই বধির হয়ে তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলে তার অভিসম্পাৎ দুঃসহ হবে। যাই হোক্ এখন দেখ্‌তে পাচ্চি, মাঝে ভারতবর্ষের বিশ্বচৈতন্যকে জোর করে চাপা দেওয়া হয়েছিল বলেই সে নিজের বিরাট্‌কে ফিরে পাবার দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেচে। আশ্চর্য্য এই যে, আমি কোথাও এবার বাধা পাই নি। পথ এখন প্রতিদিন সুগম হয়ে আস্‌চে এখন কেবল সহকারী সুহৃদবৃন্দের দরকার। এ পর্যন্ত পশ্চিম মহাদেশ থেকেই আনুকূল্যের প্রস্তাব এসেচে। এখন দেশের লোকের সহযোগিতার প্রতীক্ষায় আছি। প্রশান্ত খুব কাজ করচে। তুমি ফিরে আসচ এতে আমার মন খুব আশান্বিত হয়ে উঠেচে। মনে রেখো তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। বিশ্বভারতীতে তুমি তোমার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাবে। তুমি বিশ্বভারতীর জন্যেই যথাযথভাবে প্রস্তুত হয়ে আস্‌চ— আমি তাই তোমার প্রত্যাশায় উৎকন্ঠিত হয়ে আছি।

আমার নিজের হাতে আর বেশি সময় নেই— অস্তগমনের কাল কাছে আস্‌চে— আমার শেষ দান তোমাদের হাতে দিয়ে

যেতে পারলে আমার মন প্রসন্ন হবে।

রথীকে বলেচি বিশ্বভারতীর সংস্থানপত্র প্রভৃতি প্যারিসে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। সেখানকার ভারতবাসীদের সভ্য করবার চেষ্টা কোরো।— এখন তবে চলি। রথ প্রস্তুত— সহযাত্রীরা তাড়া লাগিয়েচে। ইতি ১৪ই নবেম্বর ১৯২২

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১ জানুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হিন্দু য়ুনিভর্সিটি কন্‌ভোকেশনে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। প্রথমে টেলিগ্রাফ করেছিলুম যাব না। মনে করেছিলুম আমার বদলে রথীরা গিয়ে বরোদার মহারাজকে চেপে ধরবে। কিন্তু রথীরা দিল্লির সপ্তভূপতিসঙ্গমে যাচ্চে— তারা যখন দিল্লিতে রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী ঠিক সেই সময়েই বরোদা বারাণসীতে। আমি চীনে চলে যাব, রাজা যাবেন য়ুরোপে— মাঝের থেকে বিশ্বভারতীর ঝুলি ধনাধ্যক্ষের হাতে শূন্য ফিরে আসবে। তাই রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাতে যেতে হবে। সেখানে বিজয়নগরমের ভূতপূর্ব মহারাণীও যাচ্চেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা করা

দরকার হবে। তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি সেখানে একটা লেকচার দেবে, সেটাতে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান তোমাকে নির্দেশ করতে হবে। বৃহস্পতিবার রাত্রে ছাড়ব রবিবার রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তনের যাত্রা করব। ঐ কয়দিন যদি কলেজে কাজ থাকে ছুটি নিয়ো। আসলে কেবল শুক্রবারটা তোমাকে হয়ত কাজ কামাই করতে হবে— শনিরবি ত তোমাদের প্রায়ই ছুটি থাকে। অতএব এতে তোমার কর্ত্তব্যের বিশেষ ত্রুটি হবে না। অথচ কবিসঙ্গমে তীর্থদর্শনও হতে পারবে। পথিমধ্যে নানা আলোচনার অবকাশও পাওয়া যাবে। ইতি ১১ জানুয়ারি ১৯২৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ওঁ Feb. 26. 1924

কল্যাণীয়েষু

Romain Rollandকে যে চিঠি লিখেচি তার কপি তোমাকে পাঠাই। কাগজে ছাপাবার জন্যে নয়, তোমার দেখবার জন্যে।

ভারতীকে যে কবিতা দিতে বলেছিলুম সেটা মণিলালকে এখনো দিলে না কেন ?

একটা সনেট লিখেচি। কপি ক'রে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিয়ো।

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষ বেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে ; নিখিলের আনন্দ মেলায়
স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা,
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূঁজিতে।

১৭

২২ ডিসেম্বর ১৯২৪

ওঁ বুয়েনোস্ আইরিস্

কল্যাণীয়েষু

আজ ৭ই পৌষ। মন আজ তোমাদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে। এবারকার যাত্রাটা ঠিক শুভলগ্নে আরম্ভ হয় নি। শরীরটা বিগ্‌ড়ে বসে আছে। পেরু যাওয়া বন্ধ। কিন্তু কিছুই না করেও এখানকার লোকের প্রচুর আদর পাচ্চি। এদের দেশে আছি এতেই এরা খুসি। আগামী ৩রা জানুয়ারি ইটালিতে যাত্রা করব। আশাকরি সেখানকার কাজে বাধা হবে না।

শরীর মন যখন পীড়িত হয় তখন আমি কবিতা লিখি। জলকে পীড়া দিলে তবে সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারা ছোটে। প্রশান্তকে কিস্তি কিস্তি কবিতা পাঠিয়েছি, নিশ্চয় দেখেচ, ২৪ অক্‌টোবরে “ঝড়” বলে যে কবিতা লিখেছিলুম তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চি যে, সেই সময়ে হাওয়া বেয়ে একটা নিবিড় ব্যথা আমার মনকে প্রবল ঝাপটা দিয়ে গিয়েছিল। তার ইংরেজিটা তোমাকে পাঠাচ্চি। আরো গোটাকতক কবিতা পাঠালুম—প্রশান্তদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ কোরো। এবারকার কবিতাগুলো যেন স্বপ্নে লেখা—ভালো কি মন্দ তা বুঝতেই পারি নে— যখন খুসি তখন, যেমন খুসি তেমন করে লিখেই গেছি। আমার কবিত্বশক্তির মাপকাঠিহাতে যারা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে তারা যে এই বিশ্বের কোনোখানে

আছে তা একেবারেই মনে ছিল না। মাঝখানে দীর্ঘ কিছুকাল ভোলবার সময় না দিলে এ কবিতাগুলো সম্বন্ধে আমি নিজেই বিচার করতে পারব না। হারুনা মারু থেকে তোমাদের যে কবিতা ইত্যাদি পাঠিয়েছিলুম তার এক বর্ণ আজ আমার মনে নেই। সেগুলো সব উড়ো কাগজে লেখা, বাঁধা খাতায় লেখা নয়। প্রশান্তকে যে কবিতাগুলো পাঠাই তাতে অনেক বদল থাকে যা আমার খাতায় নেই অতএব সেগুলো যেন নষ্ট না হয়। এত নানা জায়গা থেকে ডাকে পাঠিয়েছি যে সবগুলো সে পেয়েছে কিনা তাও জানি নে। কি রকম অস্বাস্থ্যের ক্লান্তিতে হিজিবিজিলেখার মেজাজে আজকাল কবিতা লিখি তার একটা ডাকে-মারা-যাওয়া নমুনা তোমাকে নিম্নে লিখে পাঠাই :—

অস্তিত্বের বোঝা
বহন করা ত নয় সোজা।
পাঠশালে কতকাল পুঁথিদানবের সাথে যোঝা।
ছেঁড়া ছাতা কক্ষে নিয়ে অহোরাত্র পথে পথে খোঁজা
ডালভাত বধূ বন্ধু চাকুরি-বাকুরি জুতো মোজা।
কোনো মাসে জোটে রুজি, কোনো মাসে রুটিশূন্য রোজা।
নানা সুরে হাসি কান্না, বোঝা ও না-বোঝা, ভুল বোঝা।
সভাতলে ছুটোছুটি ঝুটোপুটি রাজা আর প্রজা।
একদিন নাড়ী ক্ষীণ বালিসে আলসে মাথা গোঁজা,
ভিটেমাটি বাঁধা রেখে বহু দুঃখে ডেকে আনা ওঝা,—
তহবিল ফাঁকি bill-এ সবশেষে শেষ চক্ষু বোজা॥

বলা বাহুল্য এটা পুনশ্চ ডাকে মারা যাবার অভিপ্রায়েই তোমাকে লিখে পাঠালুম ; এটাতে পস্টারিটির ঠিকানার টিকিট মারা হয় নি। তিন সমুদ্র পারে আছি— ভারতসাগর, মধ্যধরণী সাগর আর অতলান্তিক— তোমাদের সদ্য খবর পাবার আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেচি। য়ুরোপে পৌঁছে তাজা খবর পাব বলে ভরসা করে আছি— কিন্তু যে রকম আভাস পাওয়া যাচ্চে তাতে বোধ হচ্চে ভারতের খবরের পনেরো আনাই shoe-খবর। “গোরু মেরে জুতোদান” বলে একটা প্রবাদ আছে ; কর্ত্তারা আমাদের গোরুও মারচে, আমাদের জুতোও দান করচে ; এ’কে বলে শূ-শাসন। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

১৮

৯ জানুয়ারি ১৯২৫

ওঁ ৯ জানুয়ারি ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

ইটালি অভিমুখে চলেচি। কিন্তু মনে উৎসাহ পাচ্চি নে, মনে হচ্চে এবার অযাত্রায় বেরিয়েছি। আসল কথা, প্রাণের শিখা ম্লান হয়ে এসেচে। বুয়েনোস্ আইরেস্-এর বড় দুজন ডাক্তার আমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে পরীক্ষা করে শেষকালে রায় দিয়েচেন, যে, দেহের কল আর বল এই দুটো পদার্থের

মধ্যে কলটা আছে ঠিক, বলটা নেই। তার মানে হচ্চে এই যে প্রদীপটা ফুটো হয় নি, শিখাটা ম্লান হয়ে এসেচে। তেলটাকে কেবলি ক্ষয় করে' এসেছি ভর্ত্তি করবার সময় দিই নি। পেরুতে যাবার জন্যে ছু'বার চেষ্টা করেচি, ডাক্তারের নিষেধ ছু'বার দ্বার রোধ করে দাঁড়ালো। অবশেষে এবার ফিরে চলেচি। আর্জেন্টিনাতে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিইনি, কিন্তু শেষাশেষি আমার নিভৃতনিবাসের দরজা খুলে দিয়েছিলুম। প্রায়ই এক এক দল করে নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, তার জবাবে পূরো বক্তৃতা দিত হত। এই উপলক্ষ্যে আর্জেন্টিনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েচে। এখানকার লোকে আমাকে খুবই ভালোবাসে, এ আমি একেবারেই প্রত্যাশা করি নি। আমি যে তাদের দেশে এতদিন ছিলুম এতেই তারা আনন্দিত।

শিখা যখন ম্লান হয়, যখন সাম্‌নের পথের দিকে মন চল্‌তে চায় না তখন সুদূরের পিছনের কথাই মনকে প্রদোষের ছায়ায় ঘনিয়ে ধরে। মৃত্যুর কালো পটের উপর দূরস্মৃতির ছবি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে। তাই আজকাল আমার মনে আমার কিশোরের সেই সব কালের কথা ঘুরে বেড়াচ্চে যে সব কাল দিগন্তের সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেছে। সামনের দিকে তাদের কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমার কবিতার মধ্যে তাদের আশ্রয়ের জন্যে স্বপ্নলোক বানিয়েছি। এই এক খেলা। এ খেলার ঠিক মানে তোমরা অনেকে বুঝতে পারবে না, কেননা প্রভাতের সূর্য্য তোমাদের চোখের সামনে,

তোমাদের ছায়া পিছনের দিকে, সেদিকে তোমাদের ঔৎসুক্য নেই। আমার আলো পিছনের দিকে, ছায়া আমার সম্মুখের পথে। সেইজন্যে আমার গান, হাওয়ায় পিছনের দিকে উড়ে যাচ্চে, তার সব সুর তোমাদের কানে স্পষ্ট করে পৌঁছবে না। এ কবিতাগুলো এখন ছাপবার দরকার নেই, আমার মৃত্যুর পরে ছাপিয়ো। তা ছাড়া এগুলো নিয়ে কাগজে কাগজে হরির লুঠ দিয়ো না।

ইটালিতে যাচ্চি কিন্তু নতুন পরিচয়ের শক্তি আছে বলে বোধ হচ্চে না। নতুন দেশে যেতে হলে কিছু উদ্‌বৃত্ত হাতে নিয়ে যেতে হয়, সেই উদ্‌বৃত্তের অভাব বোধ করচি। মনের সাম্‌নে শিলাইদহের নদীর চর ভাস্‌চে, ইটালির মানচিত্রে তার স্থান নেই। এমন কি, আমার বিশ্বাস কোনো সমুদ্র পার হয়ে আজ সেখানে পৌঁছন যাবে না। সব মানচিত্র থেকেই সে সরে গেছে, সে কেবল আমার মানসচিত্রেই আঁকা রয়ে গেল।

কবে ভারতবর্ষে গিয়ে উত্তীর্ণ হব ইটালিতে না পৌঁছে এখান থেকে তা স্থির করতে পারচি নে। খুব সম্ভব, রথী জেনোয়াতে আস্‌বে এবং তার কাছ থেকে তোমাদের সকলের এবং দেশের লোকের আধুনিক বিবরণ পাওয়া যাবে। তার পরে সকল দিক বিবেচনা করে যা হয় ঠিক করা যাবে। এতদূরে ছিলুম যে, দেশ ঝাপসা হয়ে গেছে। সেখানকার খবরের কাগজে ভারতবর্ষের স্থান নেই। সেখানকার সব চেয়ে বড় ও ভালো কাগজে অল্পদিন আগে Tower of Silence এর একটা ছবি বেরিয়েছিল, তার নীচে বর্ণনাচ্ছলে লেখা ছিল যে, এখানে

ধর্ম্মবিদ্রোহীদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়— ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই প্রথা নিবারণের চেষ্টা করচে। এই রকম খবরের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটে থাকে। যাই হোক্ ভারতবর্ষ থেকে আমার এতদিনকার অতিদূরত্ব আমার মনকে যেন উপবাসী করে তুলেচে। যখন চীনে জাপানে ছিলুম তখন নির্বাসনবোধ এমন সুতীব্র ছিল না। তার প্রধান কারণ বর্ত্তমান চীন জাপানের ভিতরে অতীত ভারতবর্ষের স্পর্শ পদে পদে পাওয়া যাচ্ছিল; যাই হোক্ ভারতবর্ষের নিকটের দিকে এগিয়ে চলেছি বলে মনটা আরাম বোধ করচে।

ইটালিতে তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌তে কাজে লাগ্‌ত। তুমি এদের সবাইকে জানো, ভালো করে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারতে, আমাকে হাৎড়িয়ে বেড়াতে হ'ত না। যাই হোক্ সেখানে যাঁরা তোমার বন্ধু আছেন তাঁরা বোধ হয় আমার দায়িত্ব নিতে পারবেন। কিন্তু এবারে গোড়া থেকেই সব উল্‌টে পাল্‌টে যাওয়াতে মনে হচ্চে যেন বিশেষ সুবিধে হবেনা।

একটা কথা প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলো না। তুমি ত জানই সাঙ্‌ঘাইয়েতে কাতুরির কাছ থেকে কূপখনন উপলক্ষ্যে আট হাজার টাকা নিয়েছিলুম। কথা ছিল এই শীতেই কাজ আরম্ভ হবে। আমি শান্তিকেতন থেকে যত চিঠি পেয়েচি তাতে এ ব্যাপারের কোনো উল্লেখমাত্রই নেই। ভয় হচ্চে পাছে আট হাজার টাকা বিশ্বভারতীর অভাবের অন্ধকূপে

তলিয়ে গিয়ে থাকে। তাহলে নিতান্ত অন্যায় হবে। আমার নাম করে এ সম্বন্ধে গোরাকেও সতর্ক করে দিয়ো। জরুরি প্রয়োজনের কথা জানিয়েই এ টাকা কাস্তুরির কাছ থেকে পেয়েছিলুম।

প্রবাসীতে নিশ্চয়ই আমার ডায়ারি বেরিয়েচে; এতদিনে একখণ্ড আমার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারত— কিন্তু এখনো পাইনি— শেষ মডারন্ রিভিয়ু অনেক দিন হল হাতে এসেছিল, তার পনেরো দিন পরে প্রবাসী আসবার কথা, কিন্তু কি কারণে পাওয়া গেল না।

আজ একটা কবিতা লিখেচি তোমাকে পাঠাই। ১৯শে তারিখে জেনোয়াতে পৌঁছব। সেখানে পৌঁছিয়ে এই চিঠি ডাকে দেব। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৩০ অক্টোবর ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রোগের নির্জ্জন দুঃখের মধ্যে মাঝে মাঝে তোমাকে পেয়ে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেছি। রবি যখন মধ্যাহ্ন আকাশে ছিল তখন দিক্‌চক্র থেকে দূরে দূরেই কাটিয়েছে— এখন অপরাহ্ণ, এখন নেমে এসেছে দিগন্তে, এখন মেঘমণ্ডল নিয়ে

পৃথিবীর স্পর্শ নেবার জন্যে সে ঝুঁকে পড়েছে— এখন নিভৃত আকাশের একেশ্বরত্ব ভোগে তার মন নেই।

আমার কানের বেদনা অনেকটা কমে এসেছে কিন্তু শোনবার পথ এখনো রুদ্ধ হয়ে আছে— ডাক্তার আশা দিচ্ছে শ্রুতি আবার ফিরে পাব— কিন্তু এখনো সেদিকে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি।

শান্তাকে নিয়ে তুমি যে-বনবাসে গেছ তার বিবরণ পেয়ে ঈর্ষ্যা বোধ করচি। আমার নির্ব্বাসন আমার ব্যাধির বেদনাকারার মধ্যে।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ১৩ কার্ত্তিক ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

২ জানুয়ারি ১৯২৬

ওঁ

পরশু ৪ঠা তারিখে কলকাতায় যাচ্ছি। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ো। ইতি ২ জানুয়ারি ১৯২৬

২১

১৩ মে ১৯২৬*

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ক্লান্তিতে যখন আধমরা হয়ে পড়ে আছি এমন সময়ে রামানন্দ বাবুর কাছ থেকে অত্যন্ত কঠিন একখানা চিঠি পেয়ে দেহমন দুইই আরো দমে গেল। তাঁর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করি নি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতির— বাইরের কোনো ঘটনার আকস্মিক উৎপাতে আমাদের পরস্পর ব্যবহারের এমন উলটপালট হয়ে যেতে পারে এ কথা কখনো কল্পনা করি নি। যে সকল ব্যবহারের মধ্যে আমার নিজের হাত নেই তার জন্যে আমার প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা কি যথাযোগ্য হয়েচে ?

ইদানীং প্রায় ৪০টা ছোট গীতিকাব্য লিখে তার নাম দিয়েছি "বৈকালী"। সবগুলো একটা খাতায় কপি ক'রছিলুম— মনে ছিল প্রবাসীতে পাঠাব— তাঁদের কাজ হয়ে গেলে ছোট একটি বইয়ে ছাপাব। অনেকগুলো করে কবিতা ছাপানো ভুল— তাছাড়া বারবার মনে হয় আমার বেশি দিনের মেয়াদ নয় তাই জমাবার দূরাশা রাখি নে, হাতে হাতে খরচ করে যাওয়াই ভালো। হয় ত খাতাটা তোমার কাছে পাঠাবো, যদি রামানন্দবাবু প্রসন্নমনে সেগুলি গ্রহণ করতে পারেন তাঁকে দিয়ো— যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে রথীর কাছে খাতাটা ফেরৎ দিতে ভুলো না। যে লেখাগুলো আগেই ছাপা হয়েছে

তাতে × চিহ্ন দিয়েছি। তোমরা যদি এগুলো ছাপবার যোগ্য বোধ কর তাহলে কপি করে নিয়ে ছাপিয়ে খাতাটা বই ছাপবার জন্যে ফিরে দিয়ো।

এবার জন্মদিনে তোমাদের সঙ্গে ভালো করে দেখাই হল না— অত্যন্ত কাছে আছি বলেই বোধ হয় দূরে ঠেলে রেখেছ— দূরে গেলে তখন বোধ হয় কাছে পাবার অভাব অনুভব করবে। এখনো হয় ত সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হই নি— হয় ত কিছু আশীর্ব্বাদী সংগ্রহ করতে পারবে। ইতি ১৮ [?] বৈশাখ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মডার্‌ন্‌ রিভিয়ু ও প্রবাসীর মন্তব্যের ভাষায় ও যুক্তিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম্‌ সন্দেহ নেই। নিজের সম্পর্কীয় ব্যাপারে মানুষ ছোটো কথাকেও বড়ো করে তোলে। যে জিনিষ বাইরের সে সব জিনিষকে ভিতরে নেওয়া একেবারেই ভালো নয়। অন্যায় বা ভুল বোঝাবুঝিকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করলে সেটাকে বাড়িয়ে এবং ছড়িয়ে ফেলাই হয়— আমি কোনো কথা কইতে চাইনে।

অনেক দিন থেকে তোমাকে স্নেহ করে আসচি। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে তোমারি পীড়া তা নয় আমারো। মাঝে মাঝে তাতে নাড়া লাগ্‌তে পারে, বন্ধন আশা করি ছিড়বে না। কিন্তু বারে বারে অকারণে বা স্বল্প কারণে অদৃষ্টের মার খেয়ে খেয়ে ক্রমে গ্রহনক্ষত্রের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস মনে পাকা হয়ে উঠ্‌চে। বহুদিন থেকেই প্রায় প্রত্যেক বন্ধুসম্বন্ধ আমার ভাগ্যে অকস্মাৎ প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। একে সেটা দুঃসহ তার উপরে যদি বল্‌তে হয় যে নিশ্চয়ই আমারই স্বভাবে দোষ আছে তবে তাতে একগুণ দুঃসহতা দুই গুণ হয়ে ওঠে— তাই নক্ষত্রের পরে দোষারোপ করি— তাতে তার উজ্জ্বলতায় কলঙ্ক লাগে না।

এবার প্রবাসে একে ত তোমার চিঠি পাইনি তার পরে তোমার কন্যার জন্মসংবাদ যখন বাইরের লোকের কাছ থেকেই পাওয়া গেল তখন মনে সন্দেহ হতে লাগল আমার গ্রহ বুঝি আবার নড়ে চড়ে উঠেছেন।

হঠাৎ দূরের থেকে ফিরে এসে যখনি এই সমস্ত ব্যক্তিগত পঙ্কিলতার মধ্যে একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত গেড়ে যাই তখনি নিজের খর্ব্বতা নিয়ে দুঃখ বোধ করি। এত বড় পরাভব আর নেই। এ হচ্চে সামান্য ছায়াকে কল্পনায় অপছায়া করে তুলে আন্দোলিত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আত্মঅসম্মান ঘটানো। এই মায়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব। তা করতে গেলে নিজেকে যথাসাধ্য বিবিক্ত রাখা দরকার হবে।

তোমাদের কল্যাণ হোক এই অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করি। ইতি ৮ই পৌষ ১৩৩৩

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০
৩০ ডিসেম্বর ১৯২৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তোমাদের প্রস্তাবটি ভালো। আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ভাববার কথা, আমি কি কোনো বিশেষ নামধারী কোনো ধর্ম্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত? কোনো সমাজের সংজ্ঞার সঙ্গে আমার মিল হবে না বলে আশঙ্কা করি। অথচ যদি ব্রাহ্মসমাজের কোনো অনুষ্ঠানে কোনো প্রধান স্থান নিই তাহলে লোকের একটা ভুল ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

তার পরে আর একটা কথা আছে। হঠাৎ য়ুরোপ থেকে এসেই যে সন্দেহঘন বায়ুচক্রের প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েচি তাতে আমার শরীর মন আবার পীড়িত হবার পথে চলেচে। তাই এর থেকে আপনাকে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে অজ্ঞাতবাস আশ্রয়ের সংকল্প করচি। মাঘের মাঝামাঝি এ প্রদেশে থাকব কি না সন্দেহ— অন্তত থাকবার ইচ্ছা নেই। অতএব তোমাদের যজ্ঞকার্য্যে সশরীরে আমাকে পাবে না বলেই মনে

হচ্চে। যদি দুগ্রহের নিষ্ঠুর পাশবদ্ধ হয়ে নিতান্ত পড়ে থাকতেই হয় তখন যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। আপাতত তোমাদের ও বিধাতার কাছে ছুটির দরবার রইল। ইতি ১৫ই পৌষ ১৩৩৩

অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

৯ জানুয়ারি ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার শরীর মনে আবার সেই আগেকার মত অবসাদ ঘনিয়ে আসচে— কোনো কর্ম্মে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারচি নে। বর্লিনের ও বুডাপেস্টের ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি দুশ্চিন্তা ও দুশ্চেষ্টার জালে আবার ধরা দিই তাহলে আমার প্রাণপুরুষ আর আমাকে ক্ষমা করবেন না। বর্লিনের বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার হিস্ আমাকে বলেছিলেন যে, আমার কাছে warning এসেচে— এখনো তাকে উপেক্ষা করবার শক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি বেশিদিন থাকবেনা— এখন থেকে যেন আমি ভিড়ের কাজ থেকে সরে এসে কোণের মধ্যে আশ্রয় নিই। অন্য দুই এক জায়গায় ডাক্তার জোর করে আমার engagements ভেঙে দিয়েছিলেন

তাতে আমার গুরুতর আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল। মনে করে এসেছিলেম এখন থেকে জনতা ছেড়ে বিরলে নিভৃতে বাস করব। প্রথমে আবেদন নিয়ে এসেছিলেন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। তাঁর পত্নীর স্মৃতিসভায় সাভাপত্য করতে হবে। আমি তাঁকে ডাক্তারের অনুশাসন জানালেম। তিনি বল্লেন, আচ্ছা যদি আপনি সভাসমিতির কাজ একান্তই ত্যাগ করেন তাহলে নিষ্কৃতি দিলুম। কিন্তু যদি আর কোথাও আবির্ভূত হন কেবল আমাকেই বঞ্চিত করেন তাহলে বুঝব আমার প্রতিই আপনি প্রতিকূল। আমার পক্ষে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে নির্ব্বিচারে সকল প্রকার সভাচর্য্যা থেকে দূরে পলায়ন। এই মুক্তির পন্থায় তোমরাও আমার সহায়তা কোরো।

বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে তোমাদের আলোচনা পড়ে দেখলুম। খুসি হলেম। বিশ্বভারতী থেকে খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে বোধ হয় না। তোমাদের শক্তি আছে, শিক্ষা আছে, মণ্ডলী আছে অতএব কৃতকার্য্য হবে সন্দেহ নেই। ইতি

১ জানুয়ারি ১৯২৭

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

১৭ মার্চ ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস— ডান হাতের আঙুলে আঘাত লেগে লেখা খুড়িয়ে চল্‌চে, আর দাক্ষিণ্যও হারিয়েছে। ঠিক এই সময়েই বসন্ত উৎসবের আহ্বান। কবির কাছে সে আহ্বান সর্ব্বাগ্রগণ্য। একদিকে লিখে লিখে যাচ্চি অন্য দিক থেকে অভিনয়ের পালাও চল্‌চে। দেহে দুঃখ পেলে অনেক সময়ে আমার কলমে রস বেরোয়, খেজুর গাছের দশা আর কি। তোমাদের দাবী পরে শুন্‌ব— আপাতত দক্ষিণ হাওয়ার তাগিদটা মেটাই। দাঁড়ের কাজ আছে চিরদিন— পালের কাজ ক্ষণে ক্ষণে। মনের দুঃখে চুপচাপ ছিলুম— বীণাপাণির শুশ্রূষা স্পর্শ হঠাৎ এসে পৌঁচেছে। আজ তাঁকে ছেড়ে দণ্ডপাণিদেব তলব মান্‌তে পারচি নে। এবার উৎসবে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নি— এখানকার নব শালমঞ্জরীর নিমন্ত্রণমর্ম্মর আপনি যদি কানে গিয়ে পৌঁছয় তো এসো। কিন্তু তোমরা কাজের লোক— হয়তো তোমাদের দরজা বন্ধ। আমাদের উৎসব দোলের পরদিন, শনিবারে— পূর্ণচন্দ্র খুব বেশি ক্ষুণ্ন হবেন না। ইতি
৩ চৈত্র ১৩৩৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

২০ মার্চ ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল তোমাদের প্রত্যাশা করেছিলুম। একবার অপরাহ্নে একবার সায়াহ্নে গাড়ি তোমাদের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলুম— ব্যর্থ ফিরে এলো। তোমরা এলে খুসি হতুম সে কথা পূর্ব্বে জানিয়েছি। ভুল বোঝাবুঝির প্রদোষ আলোকে আশা করি কোনো ছায়া হঠাৎ উপচ্ছায়ার আকার ধরেনি। ইতি ৬ চৈত্র ১৩২৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

১৯ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, অনেকদিন পলাতক ছিলুম এখন আর ফাঁক নেই, রাস্তাঘাট আঁটবন্ধ। মুলতুবি কাজগুলো গেটে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে— তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে হাবড়ার টিকিট কিনতে বেরব, সাধ্য কি তার। অগ্রহায়ণে রাজধানীতে অনেকগুলো বিয়ে আছে যদিচ তার কোনোটাতে আমার কোনো স্বার্থ নেই

তবু সভায় উপস্থিত থাকতেই হবে সেই অবকাশে আমাকে প্রজাপতির পক্ষপুটচ্ছায়া থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারো— সেই সন্ধানে রাস্তা আগ্‌লে বসে থেকো। আপাতত সময় নেই। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

৩০ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সভাসজ্জার কাজে আমাকে কেন খাটাবার চেষ্টা করো। একবার যদি এই আবর্ত্তে ধরা দিই তবে আমাকে উদ্ধার করবে কে? সম্প্রতি কিছু দিন থেকে দৈবদুর্য্যোগে জনসাধারণের লক্ষ্যগোচর হয়ে পড়েচি, সেই জন্যেই চতুর্দিক থেকে অনুরোধ— নানা আকার আয়তন ধরে আমার উপর এসে পড়চে উল্কাবৃষ্টির মতো। নিভৃতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্যে আজকাল আমার যে কতদূর আকাঙ্ক্ষা তা তোমাদের বয়সে তোমরা বুঝতেই পারবে না। রায়মশায়ের প্রশস্তিবাদ লিখে পাঠিয়েছি। আমার কাছ থেকে আর কিছু প্রত্যাশা কোরোনা।

সুবর্ণরেখাতীরে শাস্তারা ভালো আছে আশা করি।

ভাগীরথীতীর থেকে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ পাঠাই। ইতি
১৩ কার্ত্তিক ১৩৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৯ জুলাই ১৯৩৩

কল্যাণীয়েষু

Wilberforce এর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটা মেসেজ তোমার জুলুম অনুসারে রচনা করেচি। সেটা এতক্ষণে তোমার মার্কিন বন্ধু মারফৎ তোমার হস্তগত হয়ে থাকব [থাকবে]। টাইপ করা কপিতে পরিদর্শককৃত একটা প্রমাদ প্রবেশ করেচে সংশোধন করে নিয়ো। এক জায়গায় আছে The evil cause has not died ইত্যাদি—cause টা evil হতেই পারে না কারণ cause টা suppression of slavery। এ স্থলে শুধু "evil" যদি রাখো তাহলে নালিশের কারণ থাকেনা। আমার যথার্থ নালিশ তোমার উপদ্রব নিয়ে। জনসাধারণকে নোটিস দিয়েছি যে বাংলা দেশের ভদ্র প্রথামতো আমার বহু দিন পূর্ব্বে মরা উচিত ছিল কিন্তু মরি নি— সেই পরিতাপ মনে রেখে এখন থেকে মৃতবৎ ব্যবহার করব— চিঠির জবাব দেব না, সভাপতি হব না, বইয়ের foreword লিখব না, মেসেজ পাঠাব না— কলমটাকে ডাইভোর্স করে দেব। কিন্তু তুমি কেন আমার এই জীবন্মৃত্যুব্রত ভাঙবার জন্যে উঠে পড়ে

লেগেচ তার একটা কৈফিয়ৎ দেবে। যদি তোমার ব্যবহার সংশোধন না করো তা হলে অকৃত্রিম মৃত্যু ছাড়া আমার আর গতি থাকবে না। তাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে তোমাকে আর আমার হবে আত্মহত্যার পাতক। সাবধান করে দিলুম। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

এইমাত্র চোখে পড়ল "cause" শব্দটা কেটে তার জায়গায় evil বসানো হয়েছে— অতএব প্রথম নালিশটা প্রত্যাহার করচি— দ্বিতীয় নালিশটা রুজু রইল।

৩০

২৬ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুব খুসি হয়েছি। শেষ সপ্তকের কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। সাধারণ পাঠকেরা নতুন কবিতা পেলেই তাকে কোনো পুরাতন শ্রেণীভুক্ত করে তবে সেটাকে ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ তাদের জাত-মানা মন—জাতের পরিচয় যে ছিঁড়েছে এমন কবিতাকে তার আত্মগত পরিচয়ে অভ্যর্থনা করে নিতে তারা অসম্মত। ছেলেবেলা থেকেই আমার মন জাত-খোওয়ানো—

তার প্রকাশ সুরু হতেই বাধা পেয়ে পেয়ে তবে আতিথ্য লাভ করেছে। মনে আছে ক্ষণিকা যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন পাঠকরা ভেবেই পায় নি একে কী ভাবে নেবে— একে কোন্ কোঠায় বসাবে, একে বাঁধানো হুঁকো দেবে কিনা ঠাওরাতে না পেরে চুপ করে বসে ছিল— নিমন্ত্রণও করে নি, তাড়া করেও যায় নি, বিনা আহ্বানে ও চৌকি জুড়ে জায়গা করে নিলে। খেয়া এক দিন এলো মুদ্রাযন্ত্রের “গারাজ্” থেকে রথে চড়ে। দরজা খোলেই না— বহু বৎসর ধরে প্রথম সংস্করণের রথের পরেই সে অচল হয়ে বসে রইল। শেষ সপ্তকের কী গতি হবে জানিনে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন খ্যাতি বিস্তারের প্রতি লোভ ছিল বিস্তর। ঐ রিপুটা একেবারে তিরোহিত হয়েছে বল্‌লে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু বুঝতে পারচি এটা যাই যাই করচে— আশা হচ্চে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ওর সহমরণ হবে না। সাহিত্যের হাটে দরদস্তুর নিয়ে বকাবকির দিকে আমার কান এখন এগিয়ে যায় না— তবু তোমাদের মুখ থেকে যখন অভিনন্দন পাই তখন বুঝি আমার কলমের গাছে ফল ধরেচে।

বাংলার নদীমাতৃক আতিথ্য থেকে অনেকদিন দূরে ছিলুম। এবারে তাপিত দেহ নিয়ে এসেছি সুজলা বাংলার শুশ্রূষালয়ে। প্রায় মাসখানেক কাটল। ইতিমধ্যে বর্ষা পূর্ব্বদিগন্তে তাঁবু গেড়ে বসেছে। এখন মনটা শান্তিনিকেতনের দিকে উৎসুক— বর্ষার এমন বিরাট আত্মদান যজ্ঞ আর কোথাও দেখিনি।—

তোমাদের ঘাটশিলার পরিচয় আমার অজ্ঞাত নয়। সুবর্ণরেখার উপলবন্ধুর চরের উপর প্রথম সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ বকের দলের মৌন সভা দেখেছিলুম, আজও মনে আছে। এক সময়ে সেখানে বাসা বাঁধবার কথা মনে এসেছিল, ঘটে উঠল না। একবার শান্তিনিকেতনে এসে আমার মাটির ঘরটা দেখে যেয়ো— ওর শিল্পকলা দেখে নিশ্চয় খুসি হবে। ইতি ২৬ জুন ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১
[১৯৩৫]

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

কোথাও নড়িনি, নড়বার শক্তিও নেই দেহে। তাই বলে মনে কোরোনা তোমাদের যৌবনের সচলতাকে আমি ঈর্ষা করি। কালিদাসের যক্ষ ছিল রামগিরি আশ্রমে আবদ্ধ, পাঠিয়েছিল মেঘদূতকে নদীগিরিপারে বার্ত্তা বহন করে। আমি আছি শান্তিনিকেতন আশ্রমে—আমার দূত মনোদূত, তাকে যেখানে ঘোরাই সে ভূগোলের রাজ্য নয়—সে বার্ত্তা বহন করে নিয়ে আসে আমারই কাছে—আনন্দে আছি। কেবল ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মের দায় এখনো স্কন্ধে চেপে আছে, সেটাকে নামাতে পারলে আর কোনো নালিশ থাকে না। "লেখা তো লিখেছি ঢের" লেখনী এখন সিভিল ডিস্‌ওবীডিয়েন্সের

রাস্তায় দাঁড়িয়েছে; আমিও তাকে হ্বোইট পেপরের অধিকার দেব-বলে মন স্থির করেছি। ভিড়ের লোকের মন পাবার জন্যে খ্যাতির হাটে আনাগোনা করতে আর উৎসাহ নেই। তোমরা এই শুভকামনা করো সম্পূর্ণ ভারবিহীন হোক আমার বিদায়কালের যাত্রা। যে উদার আলস্য কবিদের মূলধন আমি তাই নিয়েই জন্মেছিলুম—আমার যানবাহনটা ছিল দায়বিহীন বাণী বহন করবার জন্যে, তাতে ফাঁক ছিল ঢের,—কপালের দোষে যাত্রা আরম্ভের মুখেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গুরুভার কর্ত্তব্যের দল বিশ্বহিতের দোহাই দিয়ে, ফাঁক গেছে ভরে, ঠেসাঠেসিতে বাণী পড়েছেন সঙ্কুচিত হয়ে। অনেকদিন এমনি বোঝা টেনে কাটল এখন আর নয়—পুরোনো কলমটাকেও জেটিসন্ করবার ইচ্ছে।

ঘাটশিলায় গিয়ে রামানন্দবাবুর শরীর আশা করি সুস্থ হয়েছে। অনেকদিন পূর্ব্বে ও অঞ্চলে গিয়েছিলুম—একটি ছবি মনে আছে, ছোটো বড়ো নানা উপলে বিভক্ত সুবর্ণরেখা নদী বয়ে চলেছে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান ধূসর আলোয় একদল বক স্তব্ধ বসে আছে নদীবক্ষের মধ্যে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপরে—প্রাণবান করেছে তারা সন্ধ্যার শান্তিকে। সেই ধ্যানী বকের দল এখনো আছে, না সর্ব্বজীবশত্রু মানুষের সমাগমে পালিয়ে গেছে জানিনে—যদি গিয়ে থাকে তাহলে ক্ষতি হয়েছে।

তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো আর

রামানন্দবাবুকে আমার প্রীতিঅভিবাদন জানিয়ো। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৪২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮
৮ মে ১৯৩৬

কবিসম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে
পি-ই-এন সমিতির সম্পাদকের প্রতি
দায়ভারগ্রস্তা বরাহনাগরিকার
প্রশস্তিবাদ

মৎস্যের তৈলেই মৎস্যের ভর্জ্জন,
সংক্ষেপে শস্তায় দায়ভার বর্জ্জন,
গ্রামোফোনে তুলে নিয়ে সিংহের গর্জ্জন
সিংহেরই কানে ফুঁকে গৌরব অর্জ্জন।
শুধু সাড়া দেয় তব নাসিকার তর্জ্জন,
শুধু চিঠি সই করে লজ্জা বিসর্জ্জন।

খেটে মরে ভেবে মরে আর যত সজ্জন,
নিষ্ক্রিয় মহিমায় তোমায় নিমজ্জন ।।

অনুষ্ঠাতার গুণমুগ্ধা
শ্রীরাণী মহলানবিশ
বকলম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ বৈশাখ ১৩৪৩ বরনগর

১৩
২৫ জুলাই ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

কালিদাস, কোথাও নড়ি নি, নড়বার শক্তিও নেই দেহে। আমার ছুটি এখানকার সকলের ছুটির মধ্যে। লোকে যায় বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প নিয়ে—তার আয়োজন বিস্তর; ব্যয়ও কম নয়। অথচ প্রকৃতি নিজের হাতেই বায়ু পরিবর্ত্তন করে দেন—সন্ধ্যার আকাশে তুলির পোঁচ লাগে নতুন রঙের—প্রাঙ্গণে এতদিন ছিল জুঁই বেল, তারা বিদায় নিল, এল শিউলি, কিছু কিছু মালতীও রয়ে গেল উপরি সময়ের ফরমাসে—ওদিকে মাঠে বাটে কাশবনে শুভ্রতার স্তব্ধ ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত, শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না, চাঁদের বর্ষাজলে ধোপ দেওয়া নূতন উত্তরী, বাতাসে ব্যাপ্ত হয়েছে শিশিরের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। এই

পরিবর্ত্তন যদি নিজের খরচে করতে হ'ত তাহলে বুঝতে পারতুম এর মর্যাদা। বিনামূল্যের প্রশ্রয়ের আড়ালে বিধাতা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠদানগুলিকে আড়াল করে দিয়েছেন, সুলভ বলেই তারা হয়েচে দুর্লভ। ভালোই হয়েচে—কন্‌সেশনের টিকিট কিনে গাড়িতে ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে পিণ্ডীকৃত হয়ে ঠাঁই বদলের দূরাকাঙ্ক্ষায় ছুটোছুটি করতে হয় না। এই নি-কড়িয়া চেঞ্জের জলস্থল আকাশব্যাপী ঐশ্বর্য্য আমার মতো কয়েকটা বাদসাহি কুঁড়ের জন্যে ভিড়ের লোকের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে তাদেরি উদাসীন দৃষ্টির পর্দ্দার ওপারে। এমনি করেই বিধাতা তাঁর আমদরবারের মাঝখানেই খাস দরবারের আসর পাতেন। যারা সমজদার তারা নিমন্ত্রণ-পত্র আকাশ থেকে কুড়িয়ে পায় আর কেউ খবরই জানে না। এটা বোঝা যায় যারা অধিকারী তাদের সংখ্যা খুবই কম—সেই সামান্য ক'জনের জন্যে রাজাধিরাজের উৎসব সভায় এত ধুমধাম কেন তাই ভাবি। যুগ যুগ ধরে তাঁর বীণকারকে বায়না দিয়ে রেখেছেন কেবল এদের মন ভোলাতে। বাঁশি আজ বাজল, আমার দুই চক্ষু যোগ দিয়েছে ঐ কয়েক টুকরো সাদা মেঘের দলে, আমার মন বেরিয়েছে অভিসারে, একলা বসে শিশির-ভেজা মাঠের ধারে, নির্ম্মল নীলাকাশের নিচে; এই অভিসারের পথ ই, আই, আরের রেলপথ নয়। অতএব চুপচাপ নিস্তব্ধ ছুটির ভ্রমণ সেরে নিচ্চি—এরপর বায়ু পরিবর্ত্তনের দল যখন জমবে ভিড় করে, মুলতবি কাজের অনুশোচনা ঠেলা দেবে মনকে তখন আমারো রিটার্ণ টিকিটের

মেয়াদ ফুরোবে, সুবিধা এই, তখন এইখান থেকে এইখানেই ফিরব—সেই ছুটি এইখানের মাঝে আছে অদৃশ্য সমুদ্র।

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে যে চিঠিখানি লিখতে লিখতে সেটাকে গদ্য-কাব্যের বান ডেকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেখি সেটা দেরাজের মধ্যে পড়ে আছে। তোমার জিনিষ তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া গেল। চিঠিখানার সেদিনকার তারিখে এসে ইতিপ্রাপ্তি হয়নি, অতএব ওটা কালাতীত হয়ে রইল। ইতি

১২ জুলাই ১৯৩৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ক

[৪ মে ১৯২২]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কালিদাস, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। রমাঁ রলাঁর সঙ্গে তোমার ভাল রকম পরিচয় হয়ে গেছে এটা বড় আনন্দের কথা। য়ুরোপে যত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েচে সকলের চেয়ে এঁকেই আমার কাছের বলে মনে হয়েছিল। এঁরি সঙ্গে আলাপ করবার সময় আমার ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞতা আমাকে সকলের চেয়ে কষ্ট দিয়েছিল। আমি যখন ভারতবর্ষের দিকে ফিরছিলুম তখন আমার মনে ছিল যে, রমাঁ রলাঁর মত লোক যে-ভাবের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছেন মহাত্মাজি এই ভাবটাকেই আমাদের জনসাধারণের মনে গভীর ও ব্যাপকরূপে উদ্বোধিত করে তুলচেন। আমি তাই ঠিক করেছিলুম আমার তরফ থেকে আমার কাজে ও রচনায় আমি এঁর সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু ফিরে এসে দেখি এখানে এমন একটা হাওয়া বইচে যাতে আমার প্রাণমন পীড়িত হয়ে উঠ্‌ল। প্রথম পীড়া হচ্চে মানসিক অত্যাচার। একে ত আমাদের অলস মন স্বভাবতই গতানুগতিক, তারপরে প্রকাণ্ড একটা moral জবরদস্তিতে প্রচলিত মতের লেশমাত্র বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করবার সাহস কারোর ছিল না। অর্থাৎ দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার উজান

হাওয়া খুব প্রবল বেগে বইছিল। সেইজন্যেই এমন মূঢ়ের মত কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল যে, অন্য সব কিছু চিন্তা চেষ্টা আলোচনা পরিত্যাগ করে' কেবলমাত্র চরকা কেটে ও খদ[দ]র পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশ স্বরাজ লাভ করবে। সে স্বরাজটা যে কি তা স্পষ্ট করে প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করবার ভরসা বা ইচ্ছামাত্রও কারো ছিল না। দেশের শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান লোকেরাও বল্‌ত, এটাই আমাদের creed, আমাদের ধর্ম্মমত, অতএব এর সম্বন্ধে তর্ক চল্‌বে না। দেশের অধিকাংশ লোকই বিনা বিচারে এমন অদ্ভুত কথা বেদবাক্যের মত মেনে নিতে পারলে এর চেয়ে স্বরাজ সিদ্ধির বিরুদ্ধ প্রমাণ আর কি হতে পারে। তারপরে সমস্ত দেশ জুড়ে একটা চোখরাঙানী, একটা মুখ-চেপে-ধরার ভঙ্গী। এই মানসিক অত্যাচারের চোরাবালির উপরে একরাত্রে এরা স্বরাজের অভ্রভেদী দুর্গ গড়ে তুল্‌তে চেয়েছিল। বাংলাদেশে সবাই যে বিশ্বাস করেছিল যে, কোনো বিশেষ উপায়ে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত বন্ধনমুক্ত হবে তা নয়—কিন্তু অনেকেই মনে করেছিল সাধারণকে ভোলাবার এ একটা ফন্দী—এমনকি মহাত্মাজিও সেইরকম বেণের মত হিসাব করে এইরকম চাল চাল্‌ছিলেন তা বিশ্বাস করবার মত প্রমাণ আছে। তিনি এণ্ড্রুজকে পত্রে লিখেছিলেন, সাধারণ লোককে এমনি সুনির্দ্দিষ্ট আশ্বাসবাক্য না দিলে তাদের

উৎসাহ হয় না। তুমি জান, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে বহু শতাব্দী ধরে কনিষ্ঠ অধিকারী বলে গণ্য, এইজন্য শ্রেষ্ঠ অধিকারীরা মন ভুলিয়ে তাদের সদগতিসাধন করা কর্ত্তব্য বলে মনে করে এসেচে। তাতে তাদের মন ত গেছে মারা, তারপরে তাদের সদগতিও ঘটল না। বর্ত্তমান যুগের জননায়ক এসেও তাদের সেই মন ভোলাবার উদ্যো[ে]গ প্রবৃত্ত হলেন। এটা হ'ল কিরকম? না, যে পাখীর পা আছে শিকল দিয়ে দাঁড়ে বাঁধা, তার ডানায় শিকল বেঁধে তাকে টান মেরে মুক্তি দেবার চেষ্টা—তার ফল হচ্চে এই, পাও যায় ভেঙে, ডানাও যায় ছিঁড়ে। যারা অন্তরে অন্তরে শিকলদেবতার উপাসক, তারাই নূতন শিকলের সহায়তায় পুরাতন শিকলকে ভাঙ্‌তে চেষ্টা করে। তুমি ত জানই এ আমি কিছুতেই সইতে পারি নে। আমি বল্‌তে চেষ্টা করলুম, আমি সত্যকে মানতে রাজি আছি কিন্তু মহাত্মাজিকে না। তাতে লোকে খুসি হল না।—এই ত গেল পয়লা নম্বর। তার পরে দেখলুম সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ঘোরতর একটা পাশ্চাত্য বিদ্বেষ। সাধারণ পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে এইরকম উগ্র রাগদ্বেষের স্থান আছে—সর্ব্বত্রই এই রকম রিপুর স্টীমেই স্বাদেশিকতা জগন্নাথের রথযাত্রা ঘট্‌চে—অতএব যদি শাক্ত পোলিটিশনের দল খড়্‌গ খর্পর নিয়ে পোলিটিকাল কালিঘাটে পশ্চিম যমদেবতার বাহন মহিষটাকে বলি দেবার সঙ্কল্পে ঢাক ঢোল বাজাত আমি তাতে যোগ দিতুম না বটে;

কিন্তু আশাভঙ্গের দুঃখ পেতুম না। কিন্তু আমার মনে এবার এই একটা আনন্দ গর্ব্ব জেগেছিল যে আমাদের দেশের পলিটিক্স্ দ্বেষহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এইটেই আমরা পৃথিবীকে দেখাতে পারব। কিন্তু দ্বেষহিংসাকে শরীরের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে মনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে তাতে যে কম অকল্যাণ ঘটে তা বল্তে পারি নে। এই কয় বৎসর ভারতবর্ষের এক সভাতল থেকে আর এক সভাতলে কেবলি জালিয়ানবাগের অত্যাচার ও খিলাফতের অন্যায় ঘোষণা করে' সেই অভিযোগের দ্বারাই নন্-কোঅপরেশন নীতিকে প্রবল করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের স্বাতন্ত্র্য যে ভারতবাসীর মনুষ্যত্বের গৌরবসাধনের জন্যেই এ কথার উপর বিশেষ জোর দেখা গেল না—কেবল লোকের মনে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা পরকৃত বিশেষ অন্যায়ের স্মৃতি গভীর করে দেগে দেগে দেওয়া হতে লাগ্ল। অথচ সেই সঙ্গে মুখে বলা হতে লাগ্ল যে, খবরদার মনে যেন হিংস্রতা না আসে—নাকের মধ্যে ঠেসে ঠেসে নস্যি গুঁজে দিয়ে বলা হতে লাগ্ল, খবরদার, হাঁচি যেন কোন মতেই না আসে। দুটো চারটে বড় বড় হাঁচি যখন সশব্দে বেরিয়ে পড়ল তখন উপদেশকেরা আশ্চর্য্য হয়ে হাত উল্টে বল্লেন, "না, এদের দ্বারা নন্-কো-অপরেশনের উচ্চ নীতি কিছুতেই পালিত হতে পারে না—কেননা, এদের প্রচণ্ড হাঁচির রোগ আছে।" যাদের নস্য দেওয়া রোগ আছে, নাসিকার সংযমশীলতার সম্বন্ধে তাদের

হঠাৎ সন্দেহ ঘটল। ওদিকে যতক্ষণ সভায় সভায় অহিংস্রতার মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে পদে পদে তীব্র বিদ্বেষের চর্চ্চা চল্‌ছিল তখন দেশের অধিকাংশ লোক—যাদের মনের মধ্যে হিংসা আছে ও হিংস্রতার উপর ষোল আনা শ্রদ্ধা আছে—তারা ভাবছিল "এ বেশ হচ্চে। দেশকে মদ খাওয়ানো দরকার—কিন্তু যে মহাত্মাজি সেটাকে গঙ্গাজল বলে খাওয়াচ্চেন, তিনি আমাদের সকলের চেয়ে চতুর। শুঁড়ির দোকানকে পুণ্যতীর্থ করে তোলাই আমাদের দেশে মাংলামিকে পাকা করে তোলবার উপায়।" ইংরেজ গবর্মেণ্ট যে সয়তানী এই মন্ত্রটাকে নিশিদিন জপ করানো যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজি বারবার সকলকে ডেকে বলতে লাগ্‌লেন-"সয়তানীকে ঘৃণা কর কিন্তু সয়তানের প্রতি প্রেম যেন অক্ষুণ্ণ ও প্রবল থাকে।" কিন্তু যারা সরলবুদ্ধির লোক তারা এত অসীম সূক্ষ্মতা ধারণা করতেই পারে না। তাদের সহজেই মনে হয় যে, মার জিনিষটা abstract, একটা গড়িয়ে আসা পাথরও মারে, লাফিয়ে ওঠা ঢেউও মারে, আবার মেছোবাজারের গুণ্ডাও মারে—মারের উপর রাগ করার কোনো মানেই নেই—যে ব্যক্তি মারে রাগটা একমাত্র তারি পাওনা, অতএব সয়তান-বর্জ্জিত সয়তানীর উপর কোন নালিশই থাকতে পারে না—সয়তানটার উপরেই রাগ করতে হবে। যাই হোক্‌ নন্‌-কোঅপরেশন উদ্যোগের দুটো বড় জিনিষ টিকল না, একটা হচ্চে ৩১ ডিসেম্বর—সেটা টিঁকল না তার কারণ, সাধনার

অনুপাতেই সিদ্ধি এইটেই হচ্চে সত্য—সাধনাকে চরখায় চড়িয়ে সংক্ষিপ্ত করে সিদ্ধি হতে পারে না—সাধনা ছেলেখেলা নয়, জনসাধারণকে ফাঁকা কথায় ভোলান নয়। দ্বিতীয় যেটা টিঁকল না সে হচ্চে অহিংসা—তারও প্রধান কারণ, ক্ষমার পথেই অহিংসার সাধন এইটেই হচ্চে সত্য, অক্ষমার চর্চ্চা করে,’ পদে পদে বিদ্বেষবুদ্ধিকে উত্তেজিত করে’ অহিংস্রতায় উত্তীর্ণ হওয়া এ কেবল মহাত্মাজির উপদেশবাক্যের দ্বারা হতেই পারে না। শুধু কেবল ইংরেজ গবর্মেণ্টের প্রতি ও ইংরেজ-জাতির প্রতিই যে বিদ্বেষ জেগেচে তা নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি—বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি। বিদ্যার যেন পূর্ব্ব পশ্চিম দিগ্‌ভেদ আছে। যেমন করে বিলাতি কাপড় পোড়ানো চল্‌তে লাগ্‌ল তেমনি করেই বিদেশী culture সম্বন্ধে লঙ্কাকাণ্ড সুরু হল। তাই আমাকে আমাদের “দেশাত্মবোধের” পাণ্ডারা বল্লে আমি পশ্চিমের মোহে মুগ্ধ—সেখানকার সাকীদের হাত থেকে প্রশংসার মদ খেয়ে সেইখানকার মাটিতেই আমার মন লুটোপুটি খাচ্চে। আমার যজ্ঞক্ষেত্রে আমি পশ্চিমের অতিথিদের আমন্ত্রণ করেচি এতেই আমার বুদ্ধিবিকার প্রকাশ পাচ্চে। আমি পশ্চিমে রমা রলা প্রভৃতি যে সমস্ত মনস্বীদের দেখে এসেচি সমস্ত মানব সংসারের তপস্যাকেই তাঁরা গ্রহণ করেচেন, তাঁদের কাছে দেশবিদেশের একান্ত ভেদ ঘুচে গেছে—এইজন্যে তাঁদের দেশের দেশাত্মবোধিদের কাছ থেকে তাঁরা দুঃখ পাচ্চেন,—

ভারতবর্ষে এসে আমি মহাত্মাজিকে দেখ্‌লুম তিনি তাঁর আইডিয়ালকে ভারতপলিটিক্সের বেষ্টনীর মধ্যে বেড়ার মধ্যেকার ধেনুর মত পুরে রেখেচেন। আমি বরাবর এই কথাই জানি যে, যে-আইডিয়াল দেশের চেয়ে বড় সেই আইডিয়ালেই দেশ বড় হয়। এঁরা সকলেই বলেন, আগে দেশের আইডিয়ালকে মানি তার পরে সর্ব্বজনীন আইডিয়ালকে মানা সম্ভব হবে। এঁরা ভুলে যান ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ রোগ যে আরোগ্যতত্ত্বের সাহায্যে সারে সেই আরোগ্যতত্ত্ব সকল ব্যক্তিরই। দেহের আকৃতি (physiognomy) প্রত্যেক দেহের পক্ষে স্বতন্ত্র, কিন্তু দেহের মূল প্রকৃতি সাধারণ দেহতত্ত্বের (physiology) অন্তর্গত। যে পরিমাণে মনুষ্যত্বকে লাভ করব সেই পরিমাণেই দেশকে লাভ করব। পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে বর্জন করাই যাঁদের মতে প্রাচ্যের মনুষ্যত্বের সাধনা তাঁরা হয়ত কোন্‌দিন এমন কথা বল্‌বেন, পশ্চিমের হতভাগ্য লোকদের পক্ষে পৃথিবী নিরবলম্বভাবে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে মরচে, কিন্তু ভারতবর্ষের দেবানুগৃহীত মানুষদের পক্ষে পৃথিবী বাসুকির ফণার উপর স্থির হয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন। যাই হোক দেশের লোকের মন সম্প্রতি ‘গুরু’-ভারপীড়িত। চরখা ও খদ[দ]রের ধ্যানে নিমগ্ন। এবং এমন একটি আকাশকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করচে যার কেবলমাত্র পূর্ব্বদিকই আছে পশ্চিমদিকের লেশমাত্রও নেই।

আমি “মুক্তধারা” বলে একটি ছোট নাটক লিখেচি

এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাক্‌বে। তার ইংরেজি অনুবাদ Modern Review-তে বেরিয়েচে। তোমার চিঠিতে তুমি ‘machine’ সম্বন্ধে যে আলোচনার [কথা] লিখেচ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করচে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেচে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারচে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্চে সেই মার্‌নেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েচে। আর ধনঞ্জয় হচ্চে যারা যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বল্‌চে, “আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিৎব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।” যাকে আঘাত করা হচ্চে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করচে আত্মার ট্রাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বল্‌চে, “মার লাগিয়ে জয়ী হব।” পৃথিবীতে মন্ত্রী বল্‌চে, “হে মন, মারকে ছাড়িয়ে ওঠ জয়ী হও।” আর নিজের যন্ত্রে নিজে

বন্দী মানুষটি বল্‌চে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্চে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্চে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্চে অভিজিৎ।

অনেক বক্‌লুম, এখন থামি। আজ ২১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার, আগামী সোমবার ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মদিন। তোমরা দূর থেকে সেইদিনের কথা স্মরণ করে' আমাকে চিন্তা করেচ, আমিও সেইদিনে তোমার কথা স্মরণ করব। এবার বৃষ্টিহীন খরতর রৌদ্রের মধ্যে নববর্ষ দেখা দিয়েচে—আমার সেই বলাকার নববর্ষই মনে পড়চে। আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সেই নববর্ষই এসেচে—রুদ্রই বুঝি পথ দেখাবেন। আমার দেশ আমাকে ত্যাগ করেচে, অতএব সকল দেশের উপরেই আমার অধিকার বুঝি পাকা হল। অভিজিৎ উত্তরকূটের সিংহাসন ত্যাগ করেছিল তার চেয়ে বড় রাজ্যের মধ্যে মুক্ত হবার জন্যে,—তেমনি দেশে আমার যে সম্মানের বন্ধন ছিল সে আমাকে মাতৃগর্ভের নাড়ির মতই ত্যাগ করচে মুক্ত ধরণীকে লাভ করব বলেই। রাণাকে ও তাঁর স্ত্রীকে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো। ইতি

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সীতা দেবীকে লিখিত পত্র : ১-৫

১২ ॥ ২১

১০ জুন ১৯১৭

The Yews
দার্জ্জিলিং

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার "নিরেট গুরু" বইখানি পেয়ে আমি দুঃখ পাব কি সুখ পাব এখনো ঠিক করতে পারচিনে। কারণ আমিও নেহাৎ কম নই আমার দুশোটি ছাত্র—তাদের গোনবার সময়ে আমার ঠিকে ভুল হয় কিনা এ পর্য্যন্ত তার আলোচনা হয়নি। কিন্তু এটা দেখা গেচে ছাত্র গোনবার বেলায় আমার হিসাবে একজন কম পড়ে না বরং একজন বেড়ে যায়—আমি নিরেট গুরুর মত বোকামি করে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে বাদ দিই নে। যখন আমার সন্দেহ হল তোমার নিরেট গুরু বইটি আমাকে পাঠানোর মধ্যে কোনো একটি শ্লেষ আছে তখন অত্যন্ত রাগ করে ঠিক করলুম আমি ঠিক ওর একটি উল্‌টো উপাধি গ্রহণ করব। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলুম "ফাঁপা গুরু" নামটার মধ্যে বিশেষ গৌরব নেই—বড়ই হাল্কা। অতএব ঐ লাইনে উপাধি নেওয়া আমার চল্‌বে না। তোমার বইয়ে গুরুগিরির যে শোচনীয় পরিণাম দেখিয়েচ সেটাতেও আমার অনেক উপকার হয়েচে—আর কিছু না হোক আমি খুব মোটা পশমের মোজা পরচি তাতে হঠাৎ পা ঠাণ্ডা হবার আশঙ্কা আপাতত নেই। একটা কথা স্বীকার করতেই

হবে যে, সংসারে নিরেট গুরু বিস্তর আছে—তার বিনামূল্যে যে ঘোড়াটা পায় তার কান কেটে দেয় অথচ ঘোড়ার ছায়ার মূল্য দিয়ে ফতুর হতে থাকে। আমি চেষ্টা করব যাতে ঘোড়ার ছায়ার চেয়ে ঘোড়াটাকে মূল্যবান বলে জানতে পারি এবং পা ঠাণ্ডা হবা মাত্র তখনি নাড়া ছেড়ে না যায়। মুস্কিল হচ্চে তোমার নিরেট গুরুর শিক্ষাটা আমি যত সহজে ও নম্রভাবে গ্রহণ করচি অধিকাংশ গুরুমশায়ই তা করবে না—তারা মনে করবে ওটা একটা বানানো গল্প! ইতি

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২৮ অক্টোবর ১৯১৮

ও

কল্যাণীয়াসু,

তোমার তর্জ্জমা পেয়েছি -- সেটা দেখাও শেষ করেচি। তোমার লেখা বেশি কাটতে হয় না বলে আরাম পাই, নইলে অতবড় লেখা আর কারো হলে হাত দিতে ভয় হত। আপাতত আর তর্জ্জমা না হলেও চল্‌বে— এখানে এখনও আমার সমস্ত দুপুরবেলা তর্জ্জমা সংশোধন করতেই কেটে যায়,

হয়রান হয়ে পড়েছি। এই কিস্তিটা শেষ হলেই বাস্, আর নয়। ইংলণ্ডে যাওয়ার কিছুই ঠিক নেই। যাবার ইচ্ছা আদবেই নেই। যদি আমার বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহলে যেমন করে হোক্ আমাকে টেনে নিয়ে যাবেন। আপাতত সেই কোণটাতে এসে বসেছি—চিঠির পর চিঠি লিখচি—তর্জ্জমার পর তর্জ্জমা দেখচি। শনি, মঙ্গল, রাহু বা কেতু, কোন্ গ্রহ যে তর্জ্জমার অধিপতি তা ঠিক জানিনে—সেই গ্রহ আমার কোষ্ঠীতে সম্প্রতি খুব উচ্চ স্থানেই আছে—সেই গ্রহ শান্তি হলেই আমিও শান্তি পাব। কিন্তু এ কথাও সকৃতজ্ঞভাবে আমার মনে রাখা উচিত যে সেই তর্জ্জমার গ্রহই আমাকে নোবেল প্রাইজ পাইয়েছিল। বিদ্যালয় না খুল্‌লে তোমরা বোধহয় এখানে আসবে না। ইতি ১১ই কার্ত্তিক ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৯

কল্যাণীয়াসু

মুলুর অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হয়েচি। ওকে আমি মনে বিশেষ স্নেহ করতুম। তোমাদের, বিশেষত তোমার মায়ের শোক অন্তরের সঙ্গে অনুভব করচি। কিছু পরিমাণে বেদনার ক্ষমতাই আমাদের আছে কিন্তু সান্ত্বনার ক্ষমতা ত নেই। ঈশ্বর তোমাদের শান্তি দিন এই প্রার্থনা করি। ইতি ২১ ভাদ্র ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

শ্রীমতী সীতা দেবীর প্রতি
রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ

অন্তরে মিলন-পুষ্প
সৌন্দর্য্যে ফুটুক,
সংসারে কল্যাণ ফলে
ফলিয়া উঠুক ॥

১১ আশ্বিন
১৩৩০

৫

২৬ ডিসেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম, এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইনি। ধাঁ করে যে কয়টা নাম মাথায় এল লিখে দিই অমেয়া (অমিয়া নয়), আনতি, সুমনা (ফুল) স্বরেণু।

এইটুকু মাত্র লিখেচি হেনকালে আলিগড়ের সন্নিহিত কোন্ এক জায়গা থেকে পাঁচজন ব্যক্তি আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। আমার সময় হনন করতে। তারপরে এলেন দুজন ওলন্দাজ। তাঁরা এইমাত্র চলে গেলেন, কার্ড পাঠিয়েচেন দুজন পার্সি— এখনি আসবেন। তারপরেই চায়ের সময় আসবেন এক জন ইংরেজ। সন্ধের সময় আর কে আস্‌বেন জানা নেই। ইতি ১০ই পৌষ, ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

ক

শ্রীমান প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্র মুলু

শ্রীমান প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আশ্রমের ভূতপূর্ব ছাত্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ বাসরে আচার্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা—

৪ঠা আশ্বিন ১৩২৬

এখানে যারা একসঙ্গে এসে মিলেচি, তাদের অনেকেই একদিন পরস্পরের পরিচিত ছিলুম না; কোন্ গৃহ থেকে কে এসেচি, তার ঠিক নেই। যে দিন কেউ এসে পৌঁছল, তার আগের দিনেও তার সঙ্গে অসীম অপরিচয়। তারপরে একেবারে সেই না-জানার সমুদ্র থেকে জানা শোনার তটে মিলন হল। তারপরে এই মিলনের সম্বন্ধ কতদিনের কত না-দেখাশুনোর মধ্যে দিয়েও টিঁকে থাক্‌বে। এই জানাটুকু কতই সঙ্কীর্ণ, অথচ তার পূর্ব্বদিনের না-জানা কত বৃহৎ।

মায়ের কোলে যেমনি ছেলেটি এল, অম্‌নি মনে হল এদের পরিচয়ের সীমা নেই; যেন তার সঙ্গে অনাদিকালের সম্বন্ধ, অনন্তকাল যেন সেই সম্বন্ধ থাক্‌বে। কেন এমন মনে হয়? কেননা, সত্যের ত সীমা দেখা যায় না। সমস্ত "না" বিলুপ্ত করেই সত্য দেখা দেয়। সম্বন্ধ যেখানেই সত্য সেখানে ছোট হয় বড়, মুহূর্ত্ত হয় অনন্ত; সেখানে একটি শিশু আপন পরমমূল্যে সমস্ত সৌরজগতের সমান হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে কেবল জন্ম এবং মৃত্যুর সীমার মধ্যে তার জীবনের সীমা দেখা যায় না, মনের মধ্যে আকাশের ধ্রুবতারাটির মত সে দেখা দেয়। যার সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর হয়নি, তা'কে মৃত্যুর

মধ্যে কল্পনা করতে মন বাধা পায় না, কিন্তু পিতামাতাকে, ভাইকে, বন্ধুকে যে জানি, সেই জানার মধ্যে সত্যের ধর্ম্ম আছে—সেই সত্যের ধর্ম্মই নিত্যতাকে দেখিয়ে দেয়। অন্ধকারে আমরা হাতের কাছের একটুখানি জিনিষকে একটুখানি জায়গার মধ্যে দেখ্‌তে পাই। একটু আলো পড়্‌বামাত্র জান্‌তে পারি যে, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা-কিছু ভয়ভাবনা, সে কেবল অন্ধকার থেকেই হয়েচে। সত্য সম্বন্ধ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই আলো ফেলে এবং এই আলোতে আমরা নিত্যকে দেখি।

হৃদয়ের আলো হচ্চে প্রীতির আলো, অপ্রীতি হচ্চে অন্ধকার। অতএব এই প্রীতির আলোতে আমরা যে সত্যকে দেখ্‌তে পাই, সেইটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে; বাহিরের অন্ধকার তাকে যতই প্রতিবাদ করুক, এই শ্রদ্ধাকে যেন বিচলিত না করে। সত্যপ্রীতির কাছে অল্প বলে কিছু নেই, সত্যপ্রীতি ভূমাকেই জানে। সংসার সেই ভূমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যু সেই ভূমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে থাকে, কিন্তু প্রেমের অন্তরতম অভিজ্ঞতা যেন আপনার সত্যে আপনি বিশ্বাস না হারায়।

আমাদের যে অতি প্রিয়, প্রিয়দর্শন ছাত্রটি এখানে এসেছিল—না-জানার অতলস্পর্শ অন্ধকার থেকে জানার জ্যোতির্ম্ময়লোকে—এল তার জাগ্রত জীবন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ চিত্ত নিয়ে, আমাদের কাজে কর্ম্মে সুখে দুঃখে যোগ দিলে—আজ শুন্‌চি সে নেই। কিন্তু যেই শুন্‌লুম সে নেই,

অমনি তার কত ছোট ছোট কথা বড় হয়ে উঠে আমাদের মনের সামনে দেখা দিলে। ক্লাসে যখন সে পড়্‌ত, তখন সেই পড়ার সময়কার বিশেষ দিনের বিশেষ এক-একটি সামান্য ঘটনা, বিশেষ কথায় তার হাসি, বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে তার উৎসাহ, এসব কথা এতদিন বিশেষভাবে মনে ছিল না, আজ মনে পড়ে গেল। তারপরে ছেলেদের আনন্দবাজারে যে-সব কৌতুকের উপকরণ সে জড় করেছিল, সে সমস্ত আজ বড় হয়ে মনে পড়েচে।

বড়লোকের বড়কীর্ত্তি আমাদের স্মরণক্ষেত্রে আপনি জেগে উঠে। সেখানে কীর্ত্তিটাই নিজের মূল্যে নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই বালকের যে-সব কথা আমাদের মনে পড়্‌চে, তাদের ত নিজের কোনো নিরপেক্ষ মূল্য নেই। তারা যে বড় হয়ে উঠেছে সে কেবল একটি মূল সত্যের যোগে। সেই সত্যটি হচ্চে সেই বালক স্বয়ং। পূর্ব্বেই বলেচি সত্য ভূমা। অর্থাৎ বাইরের মাপে, কোনো প্রয়োজনের পরিমাণে তার মূল্য নয়—তার মূল্য আপনাতেই। সেই মূল্যেই তার ছোটও ছোট নয়, তার সামান্য চিহ্নও তুচ্ছ নয়—এই কথাটি ধরা পড়ে প্রেমের কাছে।

তোমাদের সঙ্গে সে যে হেসেছিল, খেলেছিল, একসঙ্গে পড়েছিল, একি কম কথা! তার সেই হাসি খেলা, তোমাদের সঙ্গে তার সেই পড়াশোনা, মানুষের চিরউৎসারিত সৌহার্দ্দ্য-ধারারই অঙ্গ, সৃষ্টির মধ্যে যে অমৃত আছে, সেই অমৃতেরই অংশ। আমাদের এখানে তোমাদের যে প্রাণপ্রবাহ, যে

আনন্দপ্রবাহ বয়ে চলেছে, তার মধ্যে সেও তার জীবনের গতি কিছু দিয়ে গেল, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সেও আপনাকে কিছু রেখে গেল। এখানে দিনের সঙ্গে দিন, কাজের সঙ্গে কাজ, ভাবের সঙ্গে ভাব, প্রতিদিন যে গাঁথা পড়চে, নানা রঙে নানা সুতোয় মিলে এখানে একটি রচনাকার্য্য চল্‌চে। সেইজন্যে এখানে আমাদের সকলেরই জীবনের ছোট বড় নানা টুক্‌রো ধরা পড়ে যাচ্চে: সেই বালকেরও জীবনের যে অংশ এখানে পড়েচে, সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সেইটুকু রয়ে গেল, এই কথাটি আজ তার শ্রাদ্ধ-দিনে মনে করতে হবে।

তা ছাড়া তার জীবনের কীর্ত্তিও কিছু আছে এখানে। ভুবনডাঙার গরীবদের জন্যে সে এখানে যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে, তার কথা তোমরা সবাই জান। চাঁদা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময়ে মঙ্গল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্চে নিজের সাধ্য দ্বারা, নিজের উপার্জনের অর্থের দ্বারা কাজ করা। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুলু তাই করেচে। সে পুরানো কাগজ নিজে বোলপুরে বয়ে নিয়ে বিক্রী করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করত। সে নিজে তাদের শেখাত, তাদের আমোদ দিত। এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য সে নেয়নি। এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত, তা নয়, তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত। তার এই কাজটি, এবং তার চেয়ে বড় তার এই উৎসাহটি, আশ্রমে রয়ে গেল।

পূর্ব্বে বলেচি, অপরিসীম অ-জানা থেকে জানার মধ্যে মানুষ আস্‌বামাত্রই সেই না-জানার শূন্যতা এক নিমেষে চলে যায়—সেই না-জানার মহাগম্ভীর সত্যের দ্বারা নিমেষে পূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে বুঝ্‌তে পারি, আমাদের গোচরতা এবং অগোচরতা দুইকেই ব্যাপ্ত করে সত্যের লীলা চল্‌চে। অগোচরতা সত্যের বিলোপ নয়। পাবার বেলায় এই যে আমাদের অনুভূতি, ছাড়বার বেলায় একে আমরা ভুলব কেন? ঢেউয়ের চূড়াটি নীচের থেকে উপরে যখন উঠে পড়্‌ল, তখন সত্যের বার্ত্তা পেয়েছি, ঢেউয়ের চূড়াটি যখন উপর থেকে নিচে নেমে পড়্‌ল, তখন সত্যের সেই বার্ত্তাটিকে কেন বিশ্বাস করব না? এক সময়ে সত্য আমাদের গোচরে এসে "আমি আছি" এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে লিখে দিলে—তার স্বাক্ষর রইল; এখন সে যদি অগোচরে যায়, অন্তরের মধ্যে তার এই দলিল মিথ্যা হবে কেন? ঋষি বলেচেন—

> "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
> ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, মৃত্যু সৃষ্টির বিরুদ্ধ শক্তি নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে যেগুলি চালক শক্তি, তার মধ্যে অগ্নি হচ্চে একটি; অণু পরমাণুর অন্তরে অন্তরে থেকে তাপরূপে অগ্নি যোজন বিয়োজনের কাজ করচেই। সূর্য্যও তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে এবং ঋতুসম্বৎসরকে চালনা করচে। জল পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান, বায়ু পৃথিবীর

নিশ্বাসে নিশ্বাসে সমীরিত। সৃষ্টির এই ধাবমান শক্তির মধ্যেই মৃত্যুকেও গণ্য করা হয়েচে। অর্থাৎ মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণকে অগ্রসর করে দিচ্চে—মৃত্যু ও প্রাণ এই দুইয়ে মিলে তবে জীবন। এই মৃত্যুকে প্রাণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভক্ত করে দেখ্‌লে, মিথ্যার বিভীষিকা আমাদের ভয় দেখাতে থাকে। এই মৃত্যু আর প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিরাট ছন্দের মধ্যে আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিধৃত হয়ে লীলায়িত হচ্চে; এই ছন্দের যতিকে ছন্দ থেকে পৃথক করে দেখ্‌লেই তাকে শূন্য করে দেখা হয়, দুইকে অভেদ করে দেখ্‌লেই তবেই ছন্দকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই যতিকে ছন্দের অঙ্গ বলে দেখা সহজ হয়—কেননা, আমাদের প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে শ্রাদ্ধের দিন হচ্চে শ্রদ্ধার দিন, এই কথা বলবার দিন যে, মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রদ্ধা করি।

আমাদের প্রেমের ধন স্নেহের ধন যারা চলে যায়, তারা সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে দিক, তারা আমাদের জীবনগৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায়, তার মধ্য দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি, অসীম পূর্ণকেই যেন দেখতে পাই। আমাদের সেই যে অসত্য দৃষ্টি, যা জীবন-মৃত্যুকে ভাগ করে ভয়কে জাগিয়ে তোলে, তার হাত থেকে সত্যস্বরূপ আমাদের রক্ষা করুন, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতে নিয়ে যান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন [পত্র] অগ্রহায়ণ ১৩২৬

ছাত্র মুলু

দুর্গম স্থানে যাইবার, অজানা লক্ষ্য সন্ধান করিবার প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক উৎসাহ আছে, বিশেষত যাদের বয়স অল্প। এই যাত্রাকালে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া পদে পদে বাধা অতিক্রম করাই আমাদের প্রধান আনন্দ। কেননা, এই রকম নিজের শক্তির পরিচয়েই মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রবলতা।

এই কারণে আমার মত এই যে, শিক্ষার প্রথম ভূমিকা সমাধা হইবার পরেই ছাত্রদিগকে এমন পাঠ দিতে হইবে যাহা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। অথচ শিক্ষক এই কঠিন পাঠ তাহাদিগকে এমন কৌশলে পার করাইয়া দিবেন যে, ইহা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য না হয়। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাহাতে ছাত্রেরা পদে পদে দুরূহতা অনুভব করে, অথচ তাহা অতিক্রমও করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মনোযোগ সর্ব্বদাই খাটিতে থাকে এবং সিদ্ধিলাভের আনন্দে তাহা ক্লান্ত হইতে পায় না।

এখানকার বিদ্যালয়ে আমি যখন ইংরেজি শিখাইবার ভার লইলাম, তখন এই মত অনুসারে আমি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার দায়িত্ব আমার হাতে আসিল। তৃতীয় শ্রেণীতে আমি যে সকল ইংরেজি রচনা পড়াইতে সুরু করিলাম, তাহা

সাধারণত কলেজে পড়ানো হইয়া থাকে। অনেকেই আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, এরূপ প্রণালীতে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না।

মুলু আমার এই ক্লাসের ছাত্র ছিল। পড়াতে সে কাঁচা এবং পড়ায় তাহার মন নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল। শিশুকাল হইতেই তাহার শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া প্রণালীবদ্ধভাবে পড়াশুনা করার অভ্যাস তাহার ঘটে নাই। এইজন্য নিয়মিত ক্লাসের পড়ায় মন দেওয়া তাহার পক্ষে বিতৃষ্ণাকর এবং ক্লান্তিজনক ছিল।

বাল্যকালে ক্লাসের পড়ায় আমার অরুচি নিঃসংশয় প্রবল ছিল, একথা আমি অনেকবার কবুল করিয়াছি। এইজন্য প্রাচীন বয়সে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াও, পাঠে কোনো ছাত্রের অমনোযোগ বা অরুচি লইয়া ক্রোধ বা অধৈর্য্য আমাকে শোভা পায় না। পাঠে যাহাতে ছেলেদের মন লাগে একথা আমি বিশেষভাবে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি না; অর্থাৎ পাঠে অনবধান বা শৈথিল্যের জন্য সকল দোষ ছেলেদেরই ঘাড়ে চাপাইয়া ভর্ৎসনা এবং শাস্তির জোরে মাষ্টারির কাজ চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

সেইজন্য আমার ক্লাসের ইংরেজি পড়ায় মুলুর মন লাগে কিনা তাহা আমার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, মুলুর মন লাগিতে কিছুই বিলম্ব হইল না। কোনো কোনো ছেলে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিবার ভয়ে পিছনের আসনে বসিত। কিন্তু মুলুর আসন ছিল

ঠিক আমার সম্মুখেই। সে দুরূহ পাঠ্য বিষয়কে যেন উৎসাহী সৈনিকের মত স্পর্দ্ধার সহিত আক্রমণ করিতে লাগিল।

আমার ক্লাসে ছেলেরা যে বাক্যগুলি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করিত, ঠিক তাহার পরের ঘণ্টাতেই এণ্ড্রুজ সাহেবের নিকট তাহাদিগকে সেই বাক্যগুলিরই আলোচনা করিতে হইত। মুলু এইসব বাক্য লইয়া ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল প্রবন্ধ সে এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে উপস্থিত করিত। এমন হইল, সে দিনের মধ্যে তিনটা চারিটা প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।

এই যে তাহার উৎসাহ হঠাৎ এতদূর বাড়িয়া উঠিল, তাহার কারণ আছে। প্রথমত, আমার ইংরেজি ক্লাসে আমি কখনই ছাত্রদিগকে বাংলা প্রতিশব্দ বলিয়া দিয়া পাঠ মুখস্থ করাই না। প্রতিপদেই ছাত্রদিগকে চেষ্টা করিতে দিই। এই চেষ্টা করিবার উদ্যমে মুলুর চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তৃপ্ত হইত। আমি যতদূর বুঝিয়াছিলাম, বাহির হইতে কোন শাসন বা তাগিদ সম্বন্ধে মুলু অসহিষ্ণু ছিল। তাহার পরে, তাহাদের পাঠ্য বিষয় বিশেষরূপে কঠিন ছিল বলিয়াই মুলু তাহাতে গৌরব বোধ করিত। এই কঠিন পাঠে তাহাদের প্রতি যে-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা সে অনুভব করিয়াছিল। এইজন্য ইহার যোগ্য হইবার জন্য তাহার বিশেষ জেদ ছিল। আর একটি কথা এই, যে, আমি ন্যুম্যান, ম্যাথু আর্নল্ড্, ষ্টিভেন্‌সন্‌ প্রভৃতি লেখকের রচনা হইতে যে-সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে পড়াইতাম,

তাহার মধ্যে গভীরভাবে ভাবিবার কথা যথেষ্ট ছিল। এই কথাগুলি কেবলমাত্র ইংরেজি বাক্য শিক্ষার উপযোগী ছিল, এমন নহে। ইহাদের মধ্যে প্রাণবান সত্য ছিল,—সেই সত্য মুলুর মনকে যে আলোড়িত করিয়া তুলিত তাহার প্রমাণ এই যে, এইগুলি কেবলমাত্র জানিয়া ইহার অর্থ বুঝিয়াই সে স্থির থাকিতে পারিত না; ইহাতে তাহার নিজের রচনা-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিত। কাঠে অগ্নি সংস্পর্শ সার্থক হইয়াছে তখনি বুঝা যায় যখন কাঠ নিজে জ্বলিয়া উঠে। ছাত্রদের মনে শিক্ষা তখনি সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝি, যখন তাহারা কেবলমাত্র গ্রহণ করে এমন নহে, পরন্তু যখন তাহাদের সৃজনশক্তি উদ্যত হইয়া উঠে। সে শক্তি বিশেষ কোনো ছাত্রের যথেষ্ট আছে কি নাই, সে শক্তির সকলতার পরিমাণ অল্প কি বেশি, তাহা বিচার্য্য নহে, কিন্তু তাহা সচেষ্ট হইয়া ওঠাই আসল কথা। মুলু যখন তাহার নবলব্ধ ভাবগুলি অবলম্বন করিয়া দিনে দুটি তিনটি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল, তখন এণ্ড্রুজ তাহার মনের সেই উত্তেজনা লইয়া প্রায় আমার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন।

এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানসিক উদ্যমশীল বালক অল্প কিছুদিন আমার কাছে পড়িয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাকে কোনো একটা বাঁধা নিয়মে টানিয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন; ইহার নিজের বিচারবুদ্ধি ও সচেষ্ট মনকে সহায় না পাইলে ইহাকে বাহিরে বা ভিতরে চালনা করা দুঃসাধ্য। সকল ছেলে সম্বন্ধেই একথা কিছু না কিছু খাটে এবং এইজন্যই

প্রচলিত প্রণালীর শিক্ষাব্যাপারে সকল মানবসন্তানই ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয় এবং জবরদস্তি দ্বারা তাহার সেই স্বাভাবিক বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাকে পীড়া দেওয়াই বিদ্যালয়ের কাজ। বাহ্য শাসন সম্বন্ধে মুলুর সেই বিদ্রোহ করা সহজ হইত না বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং ইহাও আমার বিশ্বাস ছিল যে, অন্তত ক্লাসে ইংরেজি পড়া সম্বন্ধে আমি তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে অকৃতকার্য্য হইতাম না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘প্রসাদ’ [মাঘ ১৩২৬]

পরিশিষ্ট

খ

রামানন্দকে লিখিত ৭৯ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এণ্ড্রুজকে লেখা পত্র।

Vienna. July 20. 1926.

My Friend,

My mind is passing through a conflict. I have my love and gratitude for the people of Italy. I deeply appreciate their feeling of admiration for me which is so genuine and generous. On the other hand the Italy revealed in Fascism alienates herself from my own ideal picture of that country which I should love to cherish in my heart. I fervently hope that this movement is not in harmony with the true nature of Italy, and that it is only a momentary eruption on her surface life. The painful facts about this movement that are daily coming to my notice since I have left Italy make them almost a matter of personal grievance for me because of the assurance I have had from the people of that land of their regards for my own self.

You know that I had my first introduction to Italy when I was invited to Milan last year. It takes long to study the mind of a people but not to feel their heart when that heart opens itself. I was in the town only for a few days and in that short time I realised that the people really loved me. One can claim, rightly or wrongly, praise as one's desert, but love is a surprise every time that it comes. I was strongly moved by that surprise when I found loving friends and not merely kind hosts in the people of Italy. It grieved me deeply, and I felt almost ashamed, when I suddenly fell ill and had to sail back home before I could fulfil my engagements in all other towns.

Then followed the magnificent gift from Mussolini, an almost complete library of Italian literature for my institution. It was a great surprise to me. In this greeting I felt the touch of a personality which could express itself in this manner, in an appropriate action of unstinted magnificence.

This helped me to make up my mind to visit Italy once again in spite of the misgivings created by the reports reaching us in India about the character of the Fascist movement. I could gather from the literature that had come to my notice that the Fascist movement contained in it elements that were against my ideals, that it was tainted by conspiracy, dealing its blows in secret, driving the corrupt politics of Europe towards barefaced barbarity. But lately we have lost our faith in all mutually recriminating reports from the western countries. For it is an open secret that along with the army and navy and air crafts the bigger nations of the West think it necessary to maintain their organizations of world-wide propaganda of misrepresentation. Neither did I have any qualification nor the intention to dabble in politics which specially concerns any of the European countries. And this was why I wanted to keep my mind neutral when I came to Italy. But we live in a whirlwind to talk today and an individual like myself is compelled to contribute to that universal noise, dragged by the chain of *Karmas* as we say in our country.

I allowed myself to fall a victim to this relentless Karma with its ever lengthening coil of consequence when I succumbed to the importunity of press interviewers in Italy.

An interview is a dangerous trap in which our unwary opinions are not only captured but mutilated. Words that come out of a moment's mood are meant to be forgotten, but when they are snap-shotted, most often our thoughts in them are presented in a grotesque posture which is an irony of accident. The camera in this case being also a living mind the picture becomes a composite one in which two dissimilar features of mentality have a mesalliance that is likely to be unhappy and undignified.

My interviewers in Italy were the products of three personalities— that of the reporter, the interpreter and mine. Over and above that, there evidently was a hum in the atmosphere of another insistent and universal whisper which without our knowing it, mingled in all our talks. Being ignorant of Italian I had no means of checking the result of this concoction. The only precaution which I could take was to repeat emphatically to all my listeners that I had no opportunity to study the history and character of Fascism.

But since then I have had the chance of knowing the contents of some of these interviews from the newspaper cuttings that my friends have gathered and translated for me. And I was not surprised to find in them what was inevitable. Through misunderstanding, wrong emphasis, natural defects in the means of communication, and the pre-occupation of the national mind, some of these writings have been made to convey that I have given my deliberate opinion on Fascism, expressing my unqualified admiration.

This time it was not directly the people of Italy whose hospitality I enjoyed, but that of Mussolini himself as the head of the Government.

This was no doubt an act of kindness, but somewhat unfortunate for me. For, always and everywhere official vehicles, though comfortable, move only along the chalked path of programme too restricted to lead to any places of significance, or persons of daring individuality ; they are for providing visitors only with specially selected morsels of experience.

The opinions which I could gather in an atmosphere of distraction were enthusiastically unanimous in the praise of Mussolini for having rescued Italy in a most critical moment of her history from the brink of ruination. In Rome I came to know a professor, a genuinely spiritual character, a seeker of peace who was strongly convinced not only of the necessity but of the philosophy of Fascism. About the necessity I am not competent to discuss, but about the philosophy I am doubtful. For it costs very little to fashion a suitable philosophy in order to mitigate the rudeness of facts that secretly hurt one's conscience. One thing that surprised me most, coming from the mouths of fervent patriots, that the Italian people, owing to their unreasoning impulsive nature, had proved their incapacity to govern themselves, and therefore in the inevitable logic of things they lent themselves to be *governed from the outside* by **strong hands.** However these are the facts that immediately and exclusively concern Italy herself, the validity even of which has sometimes been challenged by European critics. But whatever may be the case, the methods and the principle of this Fascism concern all humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience, and walks through a blood-stained path of violence and stealthy crime. I have said it over and over again that the aggressive spirit of Nationalism and of Imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the West, is a menace to the whole world. The demoralisation which it produces in European politics is sure to have disastrous effects, especially upon the peoples of the East, who are helpless to resist Western methods of exploitation. It would be most foolish, if it were not almost criminal, for me to express my admiration for a political ideal which openly declares its loyalty to brute force as the motive power of civilisation. That barbarism is not altogether compatible with material prosperity may be taken for granted, but the cost is terribly great—it is fatal. This worship of unscrupulous force as the vehicle of nationalism keeps ignited the fire of international jealousy which is for universal incendiarism, a fearful orgy of devastation. The mischief of the infection of this moral aberration is great because today the human races have come close together and any process of destruction once set going does its work in an enormously wholesale manner. Knowing all this could I be credited to having played my fiddle while an unholy fire was being fed with human sacrifice?

I was greatly amused in reading in a Fascist organ how the writer vehemently decrying pantheistic philosophy of the passive and meditative East, comparing with it the vigorous self-assertion and fury of efficiency which he acknowledges to have been borrowed by his people from their modern schoolmasters in America. This has suggested to my mind the possibility of the idea of Fascism being an infection from across the Atlantic.

The unconscious irony in this paper lies in the fact of the writer's using with unction the name of Christanity in this context, the religion which had its origin in the East. He evidently does not realise that if Christ were born again in this world he would forcibly have been turned back from New York had he come there from outside, if for nothing else, at least for the want of the necessary amount of dollars to be shown to the gatekeeper. Or if he had been born in that land, Ku Klux Klan would secretly have knocked him to death or have lynched him. For did he not give utterance to the political blasphemy that blessed are the meek, thus insulting the Nordic right to rule the world ? and the economic heresy that blessed are the poor ? Would he not have been put into prison for twenty or more years for saying that it was as easy for the prosperous to reach the kingdom of heaven as for the camel to pass through the eyes of a needle ? The fascist professor deals a pen-thrust against what he calls our pantheism which as a word has no synonym in our language nor as a doctrine any place in our philosophy. He does not seem to have realised that the Christian idea that God remains essentially what he is while manifesting himself in the son's being belongs to the same principle as our principle of immanence. The divinity of God according to it accepts humanity for its purpose of self-revelation and bridges the infinite gulf between them. This idea has glorified all human beings, has had the effect in the Christian West to emancipate individuals from the thraldom of absolute power. This has trained that attitude of mind which is the origin of the internal politics of western people. It has helped to distribute the power of government all over the country and thus has given it a permanent foundation which cannot be tampered with or destroyed by the will of one individual or whim of a group of them. This consciousness of the dignity of the individual has encouraged in the West the freedom of conscience and thought. We in the East come to Europe for this inspiration. We are also dreaming of the time when the individuals belonging to the people of India will have the courage to think for themselves and express their thoughts, feel their strength, know their rights and take charge of their own government.

The fascist organ is evidently fascinated by the prospect of economic self-aggrandisement of the nation at the cost of moral self-respect of the people. But it is the killing of the goose for the sake of the golden eggs. In the olden civilisations the slavery of the people did build for the time being stupendous towers of splendour. But this spirit of slavishness constantly weakened the foundations till the towers came down to the dust, offering as their sole contribution to humanity ruins haunted by venerable ghosts.

In bygone days in India, the state was only a part of the people. The mass of the population had its own self-government in the village community. Dynasties changed but the people always retained the power to manage all that was vital to them. This has saved them from sinking into barbarism, this has given our culture a community through centuries of political vicissitude.

Our western rulers have destroyed this fundamental structure of our civilisation, the civilisation based upon obligations of intimate human relationship. And therefore nothing today has been left for the people through which they can express their collective mind, their creative will, realise the dignity of their soul, except the political instrument the foreign model of which is always before their envious gaze. We come to Europe for our lesson in the mastery of this instrument, as Japan has done and has been successful in her purpose. But must our friend, the fascist philosopher, come to us to copy our political impotence, the result of the surrender of freedom for centuries to the authority of some exclusive reservoir of concentrated power, while rejecting our great ideal of spiritual freedom which has its basis upon the philosophy that infinite truth is everywhere, and that it is for everyone to reach it by removing the obstruction of the self that obscures light ?

I am sure that you will be interested to know what was the impression that I have carried from my interview with Mussolini. We met only twice and our meetings were extremely brief owing, very likely, to our mutual difficulty of communication through the slow and interrupted medium of an interpreter.

In the hall which emphasised its bigness by the unusual bareness of its furniture Mussolini has his seat in a distant corner. I believe this gives him the time to observe visitors who approach him, and makes him ready to deal with them. I was not sure of his identity while he was walking towards me to receive me, for he was not tall in proportion to his fame that towers high. But when he came near me I was startled by the massive strength of the head. The lower part of the face, the lips, the smile revealed a singular contradiction to the upper one, and I have often wondered since then, if there was not a secret hesitation in his nature, a timid doubt which was human. Such an admixture of vacillation in a masterful personality makes his power of determination all the more vigilant and strong because of the internecine fight in its own character. But this is a mere surmise.

For an artist it is a great chance to be able to meet a man of personality who walks solitary among those who are mere fragments of a crowd which is always on the move, pressed from behind. Such men are the makers of history and one cannot but feel anxious lest they might miss their eternity by using all their force in capturing the present by its throat leaving it killed for all future. Men have not altogether been rare who furiously created their world by trampling human materials into the shape of their megalomaniac dreams, at last to burden history with the bleached bones of their short-lived glory, while there were others, the serene souls, who with their light of truth and magic of love have made deserts fruitful along endless stretches of grateful years.

But, to be honest, I must confess that I cannot fully trust my own impression caught from a momentary glimpse of Mussolini with which mingled the emphasis of the surroundings in which I was placed. There have been times when history has played tricks with men and through a combination of accidents has magnified the features of essentially small persons into a parody of greatness. Such a distortion of truth often finds its chance not because these men have an extra-ordinary power in themselves but because they represent some extraordinary weakness of those whom they lead. This produces a mirage of wrong appearance and startles our imagination into a feeling of awe and exaggerated expectation. To be tortured by tyranny is tolerable but to be deluded into the worship of a falsified ideal is humiliating for the whole age which by chance is submitted to it. If Italy has made even a temporary gain through a ruthless politics she may be excused from such an obsession—but for us outsiders who believe in idealism there can be no such excuse. And therefore it would be wise for us to wait before we bring our homage to a person, who has suddenly been forced upon our attention by a catastrophe, till through the process of time all the veils are removed that are woven round him by colourful sensations of the moment.

My letter has run on to a great length. But I hope you will bear with it knowing that it has helped me in making my thoughts clear about my experience in Italy and also explaining the situation in which I have been placed.

Rabindranath Tagore

পরিশিষ্ট

গ

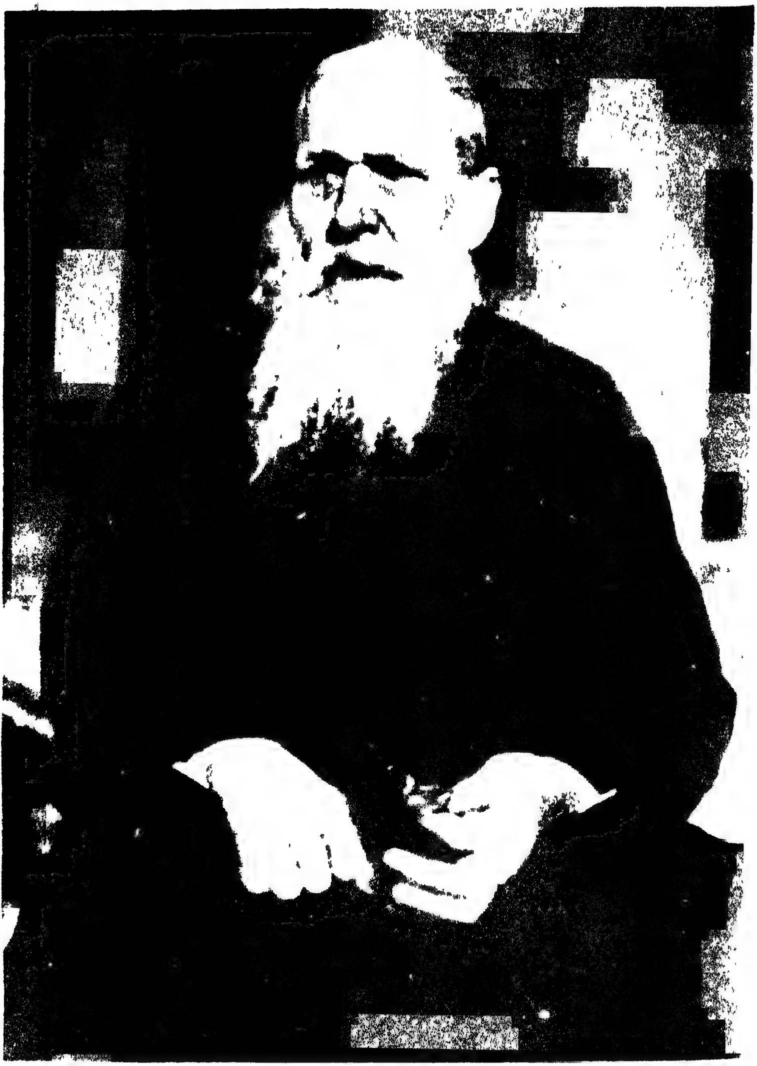

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৫ - ১৯৪৩

১
৩ জুলাই ১৮৯৮

বাঁকুড়া
২০শে আষাঢ়, ১৩০৫

মান্যবরেষু,

"প্রদীপে" প্রকাশার্থ আপনি যে কবিতাটি দিয়াছেন, তজ্জন্য সাতিশয় অনুগৃহীত হইলাম।

জ্যৈষ্ঠের "ভারতীতে" প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আপনি কোথায় কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হয় জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের এই বাঁকুড়া সহরের অন্তর্গত রামপুর ও গোপীনাথপুর নামক দুইটি পল্লীতে, লুধিয়ানা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় নানাবিধ চাবখানার কাপড় প্রস্তুত হয়। তসরের উৎকৃষ্ট কোটের ও চাপকানের কাপড়, ধুতি ও সাড়ী, গর্ভসূতি বা বাফ্‌তা এবং সুন্দর টেব্‌ল্‌ক্লথ্‌ও প্রস্তুত হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর সহরে গরদের থান, ধুতি এবং সাড়ী প্রস্তুত হয়। বাঁকুড়া সহরে বাসন (পিতল ও কাঁসার) সকল প্রকারই তৈয়ারী হয়। তন্মধ্যে অপর জেলাতে প্রধানতঃ এলোকেশী (মুখ বিশিষ্ট) ডিবে, গাডু, পোর্সলেন ডিষের অনুকরণে নির্ম্মিত কাঁসার ডিষ, প্রভৃতি রপ্তানী হইয়া থাকে। স্বদেশবস্তু ভাণ্ডারের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় অত্রস্থ মুখার্জ্জি কোং'র কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু রামনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিলে জিনিষের মূল্য, কারিকরের নাম, কলিকাতা পাঠাইবার খরচ প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক্ খবর জানিতে পারিবেন।

মেদিনীপুরে একপ্রকার পিতলের জগ্ (Jug) নির্ম্মিত হয়, তাহা বড়ই সুন্দর। এখানে সাধারণ ব্যবহার্য্য লন্ঠন বেশ সুন্দর প্রস্তুত হয়। ইতি

অনুগৃহীত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"প্রদীপ" সম্পাদক

২

২৫ অক্টোবর ১৯১৭

কলিকাতা

৮ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি "আমার ধর্ম্ম" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাহার ইংরেজী হওয়া দরকার। ইংরেজীতে উহা বাহির হইলে আপনার ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের লোকদের ধারণা ঠিক হইবে। এখন কেহ বা আপনাকে বৌদ্ধ, কেহ বৈষ্ণব, কেহ মধ্যযুগের Saint কেহ বা Mystic বলিয়া নিশ্চিন্ত আছে। ইংরেজী প্রবন্ধটি Sādhana কিম্বা personality, এই দু-খানি বহির যেটিতে ইচ্ছা ছাপিতে পাঠাইতে পারেন, আমার এইরূপ মনে হইতেছে। এই Suggestion মডার্ন রিভিয়ুর জন্য করিতেছি না।

আপনার জীবনের ভিতরের কথা আপনার গ্রন্থাবলী হইতে

অনেকটা বুঝা যায়। সমস্ত চিঠি সকলে রাখিলে আরও বুঝা যাইত। কিন্তু বাহিরের ব্যাপারও কিছু কিছু জানা দরকার। তাহাতে অন্ততঃ সত্যের অপলাপ নিবারিত হয়। আপনি জমিদারী সম্বন্ধে বা স্বদেশী সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহা…না অন্য কোন রকমে লিখিয়া রাখিয়াছেন কিনা জানি না; কিন্তু এগুলির এবং অন্যান্য বাহ্য ঘটনার একটি বৃত্তান্ত থাকা দরকার। আমি এসব জিনিষ সাময়িক পত্রে ছাপিতে বলিতেছি না। সদ্য সদ্য, বহিতেও না। কিন্তু যাহা আপনার নিকট হইতে ভিন্ন জানা যাইবে না, তাহা আপনি লিখিয়া রাখিলে ভাল হয় বলিয়া এই চিঠি লিখিতেছি। জমিদারী সম্বন্ধে আপনি যাহা করিয়াছেন, বোলপুরে একদিন তাহা আপনার মুখে শুনিয়া, তখনই আপনাকে এ সব কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম। কোন একটা কারণে এতদিন বলি নাই। ইতি

ভবদীয়
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩

২৯ অক্টোবর ১৯১৭

কলিকাতা
১২ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

আজ সকালে আপনাকে চিঠি লেখার পর মনে হইল, মডার্ন রিভিয়ুতে আপনি The nation নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাও Nationalism বহিতে থাকা আবশ্যক। আপনি Nation এর অর্থ করিয়াছেন The people of a country organised for political and economical exploitation, আপনার কাছে শুনিয়াছি কোন কোন ইংরেজ সমালোচক ইহাতে খুঁত ধরিয়াছেন। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, cultural unity ইত্যাদি থাকিলে nation হয়। কিন্তু আপনি বলিতেছিলেন যে এরূপ unity আমাদের থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য লোকেরা আমাদিগকে nation বলিয়া মানিতে চায় না। ইহা ঠিক্ জবাব। এসব কথা The nation প্রবন্ধে আপনি জুড়িয়া দিয়া তাহার পর Nationalism বহিতে ঐ প্রবন্ধ ছাপিলে বেশ হইবে। "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটির সংস্কৃত পাইলে আমি মূল ও অনুবাদ নাগরী অক্ষরে ছাপিয়া প্রচারের ভার লইতে পারি।

আপনি প্রবাসীর সম্পাদক হইলে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিতেন না বলিয়াছেন। তাহা ঠিক্। কেন না, তাহা হইলে

তখন সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আপনি ছাড়িতেন না। প্রবাসীর বর্ত্তমান সম্পাদকও মনে মনে কখনও ছাড়ে নাই; কিন্তু মুখে বেশী তাগিদ দেয় নাই এই জন্য যে সম্পাদকতা তাহার জীবিকা। সেটাও বোধ হয় আমার ভুল। আমার ইহা বুঝা উচিত ছিল যে আপনার নিকট লেখা চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করা আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য।

অগ্রহায়ণ মাসের কাগজটি বাহির হইলে প্রবাসীর বয়স ২০০ মাস হইবে। ১ম মাসে আপনার লেখা ছিল। ২০০তম মাসের জন্য কিছু একটি পাইলে আনন্দিত হইব। আপনার চিঠিখানি শান্তা দখল করিল। প্রত্যেক চিঠির অন্ততঃ দুপ্রস্ত নকল আপনার হাতের পাইলে তবে ঠিক্ হয়।

ভবদীয়
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪
২২ আগষ্ট ১৯২৫

শান্তিনিকেতন,
৬ই ভাদ্র, ১৩৩২।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা—আচার্য্য
মহোদয় সমীপে,

সবিনয় নিবেদন—

আমি যখন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের পদ আপাততঃ পাঁচমাসের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার এই ধারণা

ছিল যে, ইহা বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের শাসন পরিদর্শন-আদির অধীন হইবে না। এক্ষণে দেখিতেছি, সে ধারণা ভ্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার যে চিঠির দ্বারা বিশ্বভারতীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, ও বি-এ পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে এই সর্ত্তের উল্লেখ আছে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিশ্বভারতী অথবা শিক্ষাভবন পরিদর্শন করাইবেন।, এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের মত কি, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের অধীন কোন বিদ্যামন্দিরে কাজ করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। এই জন্য আমি দুঃখের সহিত শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষতা কার্য্যে ইস্তফা দিতেছি। আপনি দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করিলে উপকৃত হইব। ইতি

আজ্ঞাধীন

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ।

৫

২৩ আগষ্ট ১৯২৫

শান্তিনিকেতন

৭ই ভাদ্র, ১৩৩২।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার নামে কল্য আমার যে ইস্তফা পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা পাইয়া থাকিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশ্যন্সের যে ধারা অনুসারে বিশ্বভারতীকে তাঁহাদের পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহা দেখিলাম। তাহাতে পরিদর্শন করা বা না করা কিছুরই উল্লেখ নাই।

যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার পরীক্ষা ও উপাধিগুলি recognise করেন, তাঁহারা কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে inspect করিবার সর্ত্ত করেন নাই।

যাহা হউক, এ সকল বিষয় আপনাদের বিবেচ্য। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি inspectionএ রাজী নহি বলিয়া ইস্তফা দিয়াছি। তাহা গ্রহণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৬

৯ মে ১৯২৬

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৩।

ভক্তিভাজনেষু

এই চিঠি লিখিতেছি বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। কোন প্রকারে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমি আপনার লেখা পাইবার জন্য কখনও কাড়াকাড়ি করি নাই। তাহা আগ্রহ ও লোভের অভাববশতঃ নহে। তাহার কারণ অন্যরূপ। আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে

অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একটি কারণ। দ্বিতীয়তঃ, যে-যে স্থলে আপনি টাকা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তথায় আমি টাকাও দিয়াছি। আগে আগে আমি নিজেই এ সব স্থলে কিছু টাকা দিতাম। সম্প্রতি "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" প্রকাশের মাঝামাঝি বা তাহার পরে (আমি তখন প্রায় শান্তিনিকেতনে থাকিতাম বলিয়া ঠিক্ সময় মনে নাই) বিশ্বভারতী কার্য্যালয় দশটাকা করিয়া পৃষ্ঠাহার নির্দ্দেশ করেন। ঐ হারে কিছু টাকা দেওয়া হইয়াছে। পরে হার-নির্দ্দেশের ভার প্রবাসী আফিসের উপরই দেওয়া হয়। প্রবাসী আফিস ও প্রেস এবং বিশ্বভারতী কার্য্যালয় উভয় পক্ষের দেনাপাওনার হিসাব হইয়া গেলে বাকী টাকা যত শীঘ্র পারি, দিব।

যাহা হউক উক্ত উভয় কারণে আমার একটা ধারণা ও আশা জন্মে, যে, যে-লেখার জন্য আপনি টাকা লইতে সম্মত তাহা আমি পাইব, এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিব। কিন্তু কাল রাত্রে শান্তিনিকেতনে আহারের পর শুনিলাম, যে, "নটীর পুরস্কার" নাটিকাটি "বসুমতীকে" ছাপিবার জন্য ৬০০ টাকায় দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য যদি প্রবাসী উহা প্রকাশ করিবার অযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কিছু বলা উচিত নহে। অন্যথা আমার পক্ষে ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। ছয়শত টাকা দিতে সম্ভবতঃ আমিও পারিতাম। আমি প্রবাসীতে "মুক্তধারা" ছাপিবার অধিকারের জন্য ১২৫০ টাকা নগদ এবং ৩৭৫০ খানি "মুক্তধারা" বিশ্বভারতীকে দিয়াছিলাম।

সুতরাং "নটীর পুরস্কার" পাইলে সম্ভবতঃ দরদস্তুর করিতাম না। এ সব কথা আপনার জন্য লিখিতেছি না; লিখিতেছি, বিশ্বভারতী কার্য্যালয় আমার প্রতি অনাস্থা দেখাইয়াছেন ও অবিচার করিয়াছেন, এই বিশ্বাসবশতঃ।

এখন অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে, যে, আপনি যদি অতঃপর আমাকে বিনা দক্ষিণায় কিছু লেখা দেন, কিম্বা কিছু দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বভারতী কার্য্যালয়ের এবং আমার এই সন্দেহ স্বভাবতই হইবে, যে, আমি বিশ্বভারতীর আর্থিক ক্ষতির কারণ।

অতএব আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই, যে, আপনি অতঃপর আমাকে বাংলা বা ইংরেজী কোন লেখা দিবেন না। আমি জানি, আপনার লেখা না পাইলে আমার কাগজ দুটির গৌরব হ্রাস পাইবে। কিন্তু অতঃপর আপনার লেখা গ্রহণ করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না। আমার হৃদয়মনে দুঃখের কারণের অভাব নাই। তাহার উপর, বিশ্বভারতীর ক্ষতি করিতেছি, কিম্বা উহার যে সামান্য সেবা আমি করি তাহা স্বার্থপ্রযুক্ত করি, এরূপ কোন সন্দেহের আঘাত আমার পক্ষে দুঃসহ হইবে।

আমি যদি কোন ভুল করিয়া থাকি, কিম্বা আমার কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা সংশোধনের সুযোগ দিলে অনুগৃহীত হইব। ইহা পুনর্বার লেখা পাইবার কৌশল নহে,

বিশ্বাস করিবেন। উহার লোভ, আশা ও গৌরব ত্যাগ করিলাম। ইতি

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ ঃ আমি চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রনাথ সুরের আত্মীয়দিগকে যে বহি ছাপিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং অপ্রকাশিতপূর্ব হইবে এই রূপ আমার সংকল্প ছিল। সুতরাং নটীর পুরস্কার আমি ছাপিতে পাইলে প্রবাসীতে ছাপিতাম না, একেবারে বহির আকারে নন্দলালবাবুর কতকগুলি রঙীন ছবিতে অলংকৃত করিয়া বাহির করিতাম। ছাপার খরচ, কাগজ ও ছবির ব্লকের দাম, দপ্তরীর পাওনা, সব আমি দিতাম। কিন্তু বহিটি আগেই প্রকাশিত হইয়া যাইবে বলিয়া উহা বহির আকারে বাহির করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৭

৩০ জুন ১৯২৭

১৫ আষাঢ় ১৩৩৪

ভক্তিভাজনেষু,

আপনি কাল যে আমাকে মৌখিক বলিয়াছিলেন, চিঠিতে কথাগুলা শক্ত হইয়া যায়, এবং সব কথা বলাও হয় না, তাহা ঠিক্। কিন্তু আমার এটা একটা দুর্বলতা বা অক্ষমতা, যে,

আমি যথাসময়ে মৌখিক সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারি না—সব কথা মনে পড়ে না। এইজন্য আপনার অবগতির জন্য এই চিঠিতে কয়েকটা কথা লিখিতেছি।

অনেক দিন আগে আমি আপনাকে একটা উপন্যাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন আপনার ইচ্ছা হয় নাই। তাহার পর শান্তাও বলিয়াছিল। তখনও আপনার মানসিক অবস্থা অনুকূল ছিল না। তাহার পর নানা কারণে এবং আপনার ইচ্ছা হওয়ায় আপনি “বিচিত্রার’ জন্য উপন্যাস লিখিতেছেন।

ফণীবাবুর কন্যা রাণুকে আপনি যে-সব চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রবাসীতে ছাপিবার জন্য কালিদাস আপনার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আপত্তি না থাকায় সেগুলি কালিদাসের নিকট ছিল। কিন্তু রাণু সেগুলি কাগজে না ছাপাইয়া একেবারে পুস্তকের আকারে বাহির করিতে চায়, এই কারণে সেগুলি আপনি কালিদাসের নিকট হইতে ফেরত লইয়াছিলেন। এখন বোধ হয়, সেই চিঠিগুলিই “বিচিত্রার” শ্রাবণ সংখ্যা হইতে উহাতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহার আষাঢ় সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। হয়ত রাণুর মত পরিবর্তন ইহার কারণ।

এই প্রকারে নানা কারণে আপনার বৃহৎ ও ভাল লেখাগুলি “প্রবাসীতে” না গিয়া অন্যত্র ছাপা হইবে। অবশ্য “প্রবাসীর” কোন একটা দাবী আছে, তা নয়। কিন্তু “প্রবাসীর” সহিতই, লেখক হিসাবে, আপনার সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী।

এবং সম্প্রতি হঠাৎ "প্রবাসীর" কোন সাহিত্যিক, নৈতিক বা অন্যবিধ অপকর্ম ঘটে নাই। এই জন্য অতঃপর "প্রবাসী" অন্য কাগজের পাত্রাবশিষ্টের মত কিছু কিছু পাইলে তাহাতে তাহার উপকাব না হইয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাও গোপন করিবার চেষ্টা করা বৃথা, যে, আমি অহঙ্কারশূন্য নহি। ব্যক্তিগতভাবে আমি উহা ত্যাগ করিতে চেষ্টা যে না করি, তাহা নহে। কিন্তু "প্রবাসী" ও আমি ঠিক্ এক নই। আমার জামাতা কন্যা পুত্রবধূ পুত্রদেরও ইহার সহিত যোগ এবং সম্ভবতঃ কিছু কিছু অহঙ্কার আছে। সুতরাং লোকের চোখে খাট হইলে তাহাতে শুধু যে উহার ক্ষতি হইবে, তাহা নহে, আমার পরিবারস্থ সকলে ব্যথিত হইবে।

আপনার কাছে বৃহৎ ও ভাল লেখা পাইবার উদ্দেশ্যে এসব কথা লিখিতেছি না। কারণ, আমি জানি, আপনি নিজে হইতেই স্বভাবতঃ "প্রবাসীর" সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। "প্রবাসীকে" বড় ও ভাল লেখাগুলি দিলে তাহাতে আপনার ও বিশ্বভারতীর আর্থিক ক্ষতি হইবে। কারণ যাঁহারা প্রবাসীকে Crush করিয়া নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চান, তাঁহারা ধনী লোক; তাঁহারা যত টাকা দিবেন, আমার তত দিবার সাধ্য না থাকিতে পারে। অথচ আমি, প্রবাসীর প্রতি আপনার প্রীতিবশতঃ বিনামূল্যে বা সস্তায় আপনার লেখা লইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। এইজন্য আপনি আমাকে কোন লেখা না দেন, ইহাই আমি চাই।

বিশ্বভারতীর একটি Publishing board আছে (যদিও উহা নামে মাত্র, কাজ প্রায় autocraticallyই হইয়া থাকে)। ঐ board যদি আপনার সব লেখার দক্ষিণা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, এবং তাহার পর আপনি যাহাকে যেটি ইচ্ছা দিতেন, তাহা হইলে আমার কোন লেখা লইতে অসুবিধা বা আপত্তি হইত না। কিন্তু এরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা আপনার উচিত, ইহা আমি বলিতে পারি না।

আপনি প্রবাসীকে crush করিবার ষড়যন্ত্রে কাহারও সহিত যোগ দিবেন, ইহা অসম্ভব—কাল আপনাকে তাহা মৌখিক বলিয়াছি। আজ সেই কথাই চিঠিতে আবার লিখিতেছি। অতএব আপনাব উদ্দেশ্য ও মনের ভাব সম্বন্ধে আমার কোন ভ্রান্তি হইবে না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ ত আপনার বা আমাব মনের ভাব জানে না। তাহারা, বাহিরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা হইতেই এক একটা অনুমান ও সিদ্ধান্ত করিবে ও করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে, একটি নূতন সচিত্র মাসিক কাগজ বাহির হইয়াছে। উহা অন্য সব পুরাতন সচিত্র মাসিকের ন্যায় প্রবাসীরও rival। অধিকন্তু মৌখিক ইহা রটিত হইয়াছে, যে, উহা প্রবাসীকে crush করিবে। এইরূপ কাগজে আপনার লেখা অধিক পরিমাণে বাহির হইলে তাহা হইতে যাহা অনুমান হয়, লোকে তাহাই করিবে।

আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, এইসব কথা প্রবাসীর জন্য লেখা আদায় করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি না।

এ বিষয়ে আমি sensitive। এই কারণে আমি কতকটা উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমি বরাবর আপনার ও বিশ্বভারতীর অনুকূল অনেক কথা লিখিয়া থাকি। সমালোচনাও (তদপেক্ষা কম) কখন কখন করিয়াছি। এখন অনুকূল কিছু লিখিলে তাহার ব্যাখ্যা এই হইবে, যে, আমি আপনার অনুগ্রহ পুনর্লাভের চেষ্টা করিতেছি এবং তাহারই ফলে এখনও "খুদকুঁড়া" কিছু কিছু পাইতেছি। সমালোচনা করিলে বা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তাহার ব্যাখ্যা এই হইবে, যে, আমি আর অনুগ্রহ না পাওয়ায় সুর বদ্‌লাইয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাও এখন সঙ্কোচের বিষয় হইয়াছে। তাহা যে অনুগ্রহলাভচেষ্টা নহে, তাহার ত আমি রাস্তায় placard দিতে পারি না। সেদিন আপনার বাড়ীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর আপনি যে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে আমাকে একটি লেখা দিতে বলিয়াছিলেন, ও তিনি দিয়াছিলেন, তাহা আমি হাসিমুখে লইলেও আমার ধিক্কার বোধ হইয়াছিল—এই ভাবিয়া, যে, আমি কি লেখা আদায় করিতে গিয়াছিলাম? কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, আপনি আমাকে ব্যথা দিবার জন্য তাহা করেন নাই, এবং আমি ব্যথিত হইব ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিলে করিতেন না।

আর অধিক লিখিব না। সকল দিক্ দিয়া আমার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, স্থির করা কঠিন। যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়া কাজ করিব।

টম্‌সনের বহি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটি চাহিয়াছি। তাহা ছাপিব। যে প্রবন্ধটি অমিয়বাবু সেদিন দিয়াছেন, তাহাও ছাপিব। আপনার অন্য কোন লেখা সম্বন্ধে আমার প্রার্থনা নাই। বোধ হয় আমাকে অন্য কোন লেখা না দেওয়াই ভাল।

একটি কথা আপনাকে বলিয়া রাখি। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটি দীর্ঘলেখা পাইয়াছি। তাহাতে প্রধানতঃ, উহার জন্য প্রদত্ত টাকা ব্যয় ও গচ্ছিত রাখা সম্বন্ধে সমালোচনা আছে। আমি মনে করিতেছি, প্রথমতঃ কর্মসচিবের নিকট হইতে information চাহিব। তাহার পর কি করিব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। ইহাও আমার একটি বিপদ্; যাহাই করি না কেন, তাহার কুব্যাখ্যা হইবে। কিছু না করিলেও কুব্যাখ্যা হইবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ : প্রবাসীর ভাদ্রসংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। সুতরাং টম্‌সনের বহি সম্বন্ধে লেখাটি ছাড়া অনুগ্রহ করিয়া আর কিছু পাঠাইবেন না। অমিয়বাবুকে বলিবেন তিনিও যেন আপনার আর কোন চিঠি না পাঠান। প্রবাসী crushed হয় কি না, তাহার experiment টা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে হইয়া যাওয়াই ভাল।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ। (২) মডার্ন রিভিউয়ের জনাও অনুগ্রহ করিয়া অতঃপর আমাকে কোন লেখা দিবেন না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৮

১ জুলাই ১৯২৭

১৬ই আষাঢ় ১৩৩৪

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পড়িয়া আমি সাতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইলাম। 'প্রবাসী' বিষয়ক চিঠিতে বিশ্বভারতীর কথা লেখা আমার খুব অবিবেচনা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আরও মর্মাহত হইলাম।

বিশ্বভারতীর কথা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা স্বতন্ত্র পত্রে, ভিন্ন সময়ে, আমার লেখা উচিত ছিল। তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার বুঝিবার ভুল বা সন্দেহ হইত না। আমি আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি। তাহা হইলেও এখনও আমার এই ধারণা আছে, যে, আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন না। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি, যে, বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কোন প্রকার বিভীষিকা দেখাইবার জন্য একেবারেই নহে। আমি আপনাকে অনেক বৎসর

হইতে জানি। মানবচরিত্রজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান আমার একেবারেই নাই, মনে করি না। সুতরাং আপনাকে ভয় দেখাইবার শাসাইবার কল্পনাও আমার মনে আসিতে পারে, এত বড় আহাম্মক ও অমানুষ আমি নহি। আপনাকে নির্ভীক বলিয়া জানি, কাগজেও লিখিয়াছি। বিশ্বভারতীর বিষয় লিখিবার প্রকৃত কারণ লিখিতেছি। আপনি বিদেশে চলিয়া যাইতেছেন। আপনার অনুপস্থিতির সময়ে যদি আমাকে বিশ্বভারতীর সংশ্রব ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে কারণ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ হইবে বলিয়া এখন একটুকু আভাস দিয়া রাখা দরকার মনে করিয়াছিলাম। আমি আমার কাগজ দুটাতে ছাপাইবার জন্য যাহা পাই, তাহা আমাকে বাধ্য হইয়াই ছাপিতে হয়। কিন্তু যে লেখাটি পাইয়াছি, তাহার লেখক, উহা আমাকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি, লেখেন নাই। সুতরাং আমি মনে করিয়াছি, যে উহা না ছাপিবার বা ছাপিবার উভয় অধিকার আমার আছে। সেই কারণে আমি information চাহিব; এবং বিশ্বভারতীর সভ্য রূপে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিব। যদি সংস্কারের প্রয়োজন আছে মনে করি, চেষ্টা করিব, কিন্তু যদি দেখি, যে, তাহা করাইবার আমার ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে হয়ত পদত্যাগ করিব। ইহা লইয়া কাগজে একটা কোন আন্দোলন করিবার সংকল্প আমি করি নাই, এবং করিবও না। কারণ বলিতে চাই না। কিন্তু কোন বিভীষিকা কারণ নহে।

এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য বলিলাম। ইহা আপনি

বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলে আমি শান্তি পাইব, নতুবা আমি যে অবিবেচনার কাজ করিয়াছি, তাহার ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে।

বিশ্বভারতী সম্বন্ধীয় লেখাটি অধ্যাপক টুচির নহে, ইহাও জানাইতেছি। টুচি আমাকে কখন কিছু বলেন নাই, লেখেন নাই। অন্য অনেকের কাছে মৌখিক অনেক কথা শুনিয়াছি, লিখিত সমালোচনা কেবল এই সেদিন একটি পাইয়াছি। বাস্তবিক দোষ বিশ্বভারতীর পরিচালনায় কি ঘটিয়াছে ঠিক্ জানি না। কিন্তু অনুসন্ধান কর্ত্তব্য, ইহা বুঝিয়াছি। আরও জানাইতেছি যে, ইহার সহিত "বিচিত্রা" ও "প্রবাসী" ঘটিত ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

আমার জামাতাকন্যা প্রভৃতির সহিত প্রবাসীর সম্পর্কের যে কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে লিখিয়াছি। তাহাব জন্য তাহাদিগকে দোষী করিবেন না।

খুতু এখন বাড়ী নাই; সুতরাং সে কিছু বলিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। যদি সে কোন অন্যায় কথা বলিয়াও থাকে, তাহা হইলেও তাহার সহিত আমার চিঠির কোন সম্পর্ক নাই, জানিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পরিবারস্থ কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া আমি চিঠি লিখি নাই।

"পাত্রাবশিষ্ট" কথাটি ব্যবহার করার অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু উহা কেন ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। আপনি আমাকে আগে

যে-যে লেখা দিয়াছেন, এবং এখনও যেগুলি আমার হাতে মজুত আছে, তাহার প্রত্যেকটি আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। "বৃক্ষবন্দনা" ও "বর্ষশেষ" আমার ত খুবই ভাল লাগিয়াছে, আমার কোন সমঝদার মফঃসলস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐগুলিকে আপনার আগেকার সব লেখার চেয়ে ভাল বলিয়া লিখিয়াছিলেন। এইরকম আরও appreciation এর বিষয় আপনাকে জানান আবশ্যক মনে করি নাই। "ধর্ম্মবোধ" লেখাটিও আমি খুব সারবান্ মনে করি, এবং ইহাতে যে বর্ত্তমান সময়ের সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের একটি সমস্যার আলোচনা আছে, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং আমি আপনার কোন একটি লেখারও প্রতি অনাদর জানাইবার জন্য কিম্বা তৎসম্বন্ধে আমার মনে তাচ্ছিল্যের ভাব থাকার জন্য "পাত্রাবশিষ্ট" কথাটা ব্যবহার করি নাই। আমি ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম, যে, আগে অন্যেরা আপনার লেখা বাছিয়া লইবে, এবং যাহা বাকী থাকিবে, আমি তাহা পাইব। আপনিও আমাকে এখানে মৌখিক বলিয়াছিলেন, যে, "বিচিত্রার" লোকেরা যে রকম করিয়া আপনার সব কবিতাগুলি দখল করিয়া লয়েন বা লইতে চান, তাহা আপনার ভাল লাগে না। কার্য্যতও দেখিতেছি, যে, তাঁহারা পর্য্যাপ্তেরও অধিক লেখা পাইয়াছেন। আমি ইহা অভিযোগের ভাবে বলিতেছি না। আমার যাহা ধারণা, তাহা কেন জন্মিয়াছে, তাহাই বলিতেছি। কিন্তু আবার

বলিতেছি যে, আমি যে কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা করা উচিত হয় নাই. অন্য কোন কথা ব্যবহার করা উচিত ছিল। সেই নিমিত্ত, ঐ কথাটা ব্যবহার করার জন্য পুনর্বার ক্ষমা চাহিতেছি।

“সবুজপত্রে” আপনি বড় বড় লেখা যখন দিয়াছিলেন, তখন আমি কেন কিছু বলি নাই বা করি নাই, তাহার সব কারণ এতদিন পরে বলিতে পারিব না: কারণ সব কথা মনে নাই, বিস্মৃতিবশতঃ হয়ত অজ্ঞাতসারে অপ্রকৃত কথা বলিয়া বসিব। কিন্তু ইহা বলিতে পারি, যে, তখন কিছু না বলা এবং এখন কিছু বলার সঙ্গে “লেখা কেনাবেচার” কোন সম্পর্ক নাই। আপনি “বিচিত্রা”কে লেখা দেওয়ার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছেন: আমি তাহা দেখিতে পারিতেছি না। অনেক দিন হইতে প্রবাসীকে আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বিশ্বভারতী “ভারতী”কে নিজের organ করিয়া আপনাকে সম্পাদক করিয়া চালাইবেন, এইরূপ একটি প্রস্তাব হইয়াছিল, Mr. Andrews আমাকে বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আপনার অসম্মতিতে তাহা ফাঁসিয়া যায়। ইহা ১টি ধাপ। “নটীর পূজা” সেই ষড়যন্ত্রের ফলে আমি পাই নাই; কেহ নগদ টাকা আনিয়া ধন্না দিয়া বসিয়াছিল বলিয়া নহে। ইহা আর একটি ধাপ। তৃতীয় প্রমাণ, ইউরোপ হইতে কোন কর্ত্রী লিখিয়াছিলেন, যে, প্রবাসীকে আপনার লেখার monopoly হইতে বঞ্চিত করা তাঁহার একটি achievement; যদিও monopoly কোন

কালে ছিল না, আমি তাহা চাই নাই, এবং চাহিলেও আপনি সেরূপ হাস্যকর আবদার পূর্ণ করিতেন না। আর এক প্রমাণ, আপনি ভিয়েনা হইতে যে চিঠি আমাকে এখানে পাঠান, তাহার নকল এখানে অন্ততঃ দুই ব্যক্তির নিকট আসিয়াছিল। "বিচিত্রার" সহিত ইহাদের কাহারও কাহারও যোগ আছে। "বিচিত্রার" capitalist সরল অন্তঃকরণে টাকা দিয়া থাকিবেন ; ইহা বিশ্বাস করিতে কোন বাধা দেখি না। কিন্তু প্রবোচক ও উদ্যোক্তাদের কাহাকেও কাহাকেও আমি আপনার চেয়ে ভাল করিয়া চিনি। তাঁহাদের দ্বারা প্রবাসীকে crush করার কথা বটিয়াছে। আপনার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ আমি কেন করিব? "প্রবাসীর" সাহিত্যিক সম্বন্ধ ছেদন গভীর দুঃখের সহিত করিতেছি ; স্পর্দ্ধার সহিত করিতেছি না। ক্ষুদ্রচেতা লোকদের বাক্যবাণ সহ্য করা আমার এখন ক্ষমতার অতীত হইয়াছে বলিয়া আমি এই উপায় অবলম্বন করিলাম। ইহা আমার সমূহ ক্ষতির এমন কি সর্বনাশেরও কারণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াও করিলাম। সূর্য্যের কিরণ সহ্য হয়, বালুকার উত্তাপ সহ্য হয় না।

আমি অনেকের কাছে বলিয়াছি, যে, "বিচিত্রার" দ্বারা এই একটি উপকার অন্ততঃ হইবে, যে, রবিবাবু আবার আর একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস জগৎকে দিবেন। আমি আশা করি, আমার ব্যবহার আপনার মনের স্থৈর্য্য ২/১ ঘণ্টা অপেক্ষা বেশী সময়ের জন্য নষ্ট করে নাই, এবং আপনি বরাবর আরও ভাল ভাল জিনিষ জগৎকে দিতে থাকিবেন। আমি ব্যবসাদার

ও স্বার্থপর হইলেও সম্পূর্ণ সংকীর্ণমনা নহি। আমার ব্যবসার যদি ক্ষতি হয় (তাহা নিশ্চিত নহে, যদিও সম্ভবপর), তাহা হইলেও অন্যকৃত উপকার বুঝিবার ও স্বীকার করিবার ক্ষমতা আমার আছে।

আপনি আমার আগেকার চিঠির কোন কোন কথা যদি কাহাকেও বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই চিঠিখানার সেই সেই বিষয়ক কথা তাঁহাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিবেন, এই অভিলাষ জানাইয়া এবং এতবড় চিঠি দ্বারা আপনার সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা চাহিয়া পত্র শেষ করিলাম।*

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

---

১ জুলাই ১৯২৭

১৬ই আষাঢ় ১৩৩৮

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার চিঠির জবাবে যে চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে লিখিয়াছি, খুড়ু বাড়ী নাই বলিয়া তাহাকে আপনার উল্লিখিত তাহার বিশ্বভারতীবিষয়ক মন্তব্য সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বিকালে সে আফিস হইতে বাড়ী আসার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যাহা বলিল, তাহার তাৎপর্য্য দিতেছি :—

---

* এই পত্রের উপরে লাল কালির বেষ্টনীতে লিখিত রয়েছে : অমিয়বাবুর মারফং প্রাপ্ত চিঠির উত্তর। এই চিঠি প্রথমে পাই।

বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কোন document তাহার নিকট নাই, এরূপ document সংগ্রহ করিয়া বেড়ান তাহার কাজ নয়। তার হাতে এমন document আছে যাতে আপনাদের সকলকেই বিশ্বভারতী সুদ্ধ "dustbin" এ সে বসাইতে পারে, এরূপ idiotic কথা সে বলিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িতেছে না। এরূপ মন্তব্য সে করিয়াছে কিনা, তাহার আলোচনা তাহার সঙ্গেই হওয়া উচিত।

আমারও মনে হয় মুকাবিলা আবশ্যক হইলে অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়েরই উপস্থিতি প্রয়োজন।

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১০
১ জুলাই ১৯২৭

১৭ই আষাঢ় ১৩৩৪

ভক্তিভাজনেষু,

আপনি কাল অমিয়বাবুর মারফৎ যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আগে পাইয়া তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য কালই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। ডাকের চিঠিটি আজ সকালে পাইলাম।

এই ব্যাপাবটি লইয়া আমি অত্যন্ত অশান্তিতে কাল কাটাইতেছি। এই অশান্তি শেষ করিবার জন্য আমি আপনার সহিত সম্বন্ধটিকে সাহিত্যিক সম্পর্ক শূন্য করা শ্রেয়ঃ

মনে করিয়াছি—যদিও প্রথম প্রথম আমার সাহিত্যিক ব্যবসাই আমাকে আপনার সাহচর্য্যের সৌভাগ্য প্রদান করে। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিব, আমি ব্যবসার খাতিরেই আপনার অনুরাগী ও ভক্ত সহচর ছিলাম কিনা। আমার ব্যবহার দ্বারা আপনিও প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিবেন—যদিও আমার ধারণা আপনি মনে করেন না, যে আমি সাংসারিক সুবিধার জন্য আপনার সহিত যোগ রাখিয়া থাকি।

আপনাকে আমি মৌখিক বলিয়াছি, এবং চিঠিতেও আবার লিখিতেছি, যে, প্রবাসীব সহিত অন্য কাগজের প্রতিযোগিতায় আপনি যোগ দিয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ বা বিশ্বাস বা কল্পনা, জাগ্রত অবস্থায় দূরে থাক্, স্বপ্নেও আমার মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। একপ কোন জনশ্রুতিও আমার কাণে পৌছায় নাই। আপনি প্রবাসীকে অনেক ভাল লেখা দিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন ও দিতেন, ইহা আমি জানি ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

আপনি আমাকে বন্ধু মনে করেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য ও গৌরব। যে-যে কারণে তাহা মনে করেন, তাহার কোনটিরই অভাব আমার জীবিত কালে আমার পক্ষ হইতে ঘটিবে না, আমার এইরূপ বিশ্বাস। সুতরাং "বন্ধুত্ব সম্পর্ক নিয়ে চিরদিন আমার যে রকম দুর্ঘটনা ঘটেচে এবারেও তাই ঘটল, অর্থাৎ কোনো অপরাধ না করেও আমাকে দুঃখ পেতে হবে", এখন এইরূপ আপনার মনে হইলেও কিছুদিন পরে আপনি বুঝিতে পারিবেন, যে, আমার পক্ষ হইতে

আন্তরিকভাবের এবং তাহার পরিচায়ক বাহ্য ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে, যে, সাহিত্যিক সম্পর্ক ছেদন করিলাম, তাহার দু-একটা কারণ আগেই লিখিয়াছি।

আমি আপনার নিকট এত প্রকারে ঋণী যে, সে-সব ঋণ কোন কালেই শোধ হইবে না। শোধ হউক, এ ইচ্ছাও আমার নাই; ঋণীই আমি থাকিতে চাই। আপনি আমার পরলোক ও ইহলোকের সন্তানদিগকে স্নেহ করিয়াছেন ও করেন, এই ঋণটি আমার হৃদয়ের গোপন সম্পত্তি, আমি বিশ্বাস করি, খুড়র বিরুদ্ধে আপনি অনেক কথা শুনিয়া থাকিলেও, এবং যদি তাহার সত্য অপরাধ থাকে তাহা সত্ত্বেও আপনি তাহাকেও স্নেহ করিবেন।

"কোনো অপরাধ না করেও" আপনাকে "দুঃখ পেতে" হয়, ইহা সত্য কথা। কিন্তু আপনার যাঁহারা বন্ধু তাহাতে তাঁহাদের দোষ আছে কিনা, জানি না। আপনি আমাকে বন্ধু মনে করেন, এই সম্মান ও আনন্দ আমি পাইয়াছি বলিয়া আমার কথাই কেবল বলিতে পারি। আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, কবিঋষিরূপে আপনি অসাধারণ মানবচরিত্রজ্ঞ হইলেও লৌকিক ব্যবহারে আপনি কোন কোন মানুষকে চিনিতে পারেন না, এবং তাহাদের মৎলব বুঝিতে পারেন না; কোন কোন স্থলে সকল পক্ষের কথা শুনিয়া জানিয়া একটা মত বা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন না, মনে মনে একতরফা ডিক্রী দেন। এইরূপ সব কারণে এমন অবস্থা দাঁড়ায়, যে, আপনাকে কষ্ট পাইতে হয়।

আপনাকে কষ্ট দিবার জন্য ইহা লিখিলাম না ; আপনি নিরপরাধ হইয়াও কেন কখন কখন দুঃখ পান, তাহার একটা কারণ আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা লিখিলাম।

আপনার সম্বন্ধে কোনো "মিথ্যা জনশ্রুতি" আমার কানে পৌঁছায় নাই, পৌঁছাইবার দুর্মতি ও দুঃসাহস এ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই।

Forward এ অমলের Greater India Society সম্বন্ধীয় চিঠির সহিত আপনার কোন প্রকার যোগ আমি সন্দেহ বা কল্পনা করি নাই : যতদূর জানি কালিদাসও করেন নাই।

আমি Greater India Societyর সভ্য এখনও হই নাই। উহা আমার বিদেশে থাকা কালে গত বৎসর আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয়। উহার অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ছাপি ও বিজ্ঞাপন ছাপি, আমার সহিত এ পর্য্যন্ত উহার এই সম্পর্ক আছে। অবশ্য, উহার সভ্য না হওয়ার বা উহাকে উৎসাহ না দিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। উহার সম্বন্ধে আপনি অন্য যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমি কালিদাসকে পড়িতে দিব ; তাহার কিছু বলিবার থাকিলে সে বলিবে। আশা করি ইহা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধ নহে।

আপনার মত ধীর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিটিমিটির দ্বারা বিচলিত না হইতে বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। কিন্তু আমি ইহাই জানাইবার জন্য এ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, যে, আপনি জানিবেন আমি খুব দুঃখ পাইলেও আপনার প্রতি

আমার মনের ভাব এবং আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা অপরিবর্ত্তিত আছে ও থাকিবে।

বিশ্বভারতীর কথা আপনাকে কেন লিখিয়াছিলাম এবং টুচি যে আমাকে কোন কথা বলেন নাই লেখেন নাই, তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি।

আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বেও কখন কখন আপনি বেদনা বা লজ্জা পাইবেন এরূপ কিছু ভাবিয়া সমালোচনা হইতে নিবৃত্ত হই নাই, সমালোচনা করিয়াছি। বিশ্বভারতী সম্বন্ধীয় যে লেখা পাইয়াছি, তাহাতে আপনার উপর কোন দোষারোপ নাই; কারণ বিশ্বভারতীর এখন constitution হইয়াছে। সুতরাং এখন যে আপনার দুঃখ বা লজ্জা পাওয়ার চিন্তা আমাকে নিরস্ত করিবে তাহা নহে—যদিও আমি স্বীকার করি যে এই চিন্তা আমার মনে আসা স্বাভাবিক। কাগজে কোন বিষয়ে লিখিবার আগে, অন্য প্রতিকার আছে কিনা; লিখিলে ফল হইবে কিনা; সুফল হইবে, না কুফল হইবে; কুফল বেশী হইবে, না সুফল বেশী হইবে; এইরূপ নানা দিক দিয়া বিষয়টির বিবেচনা আবশ্যক। সংকোচের এই রকম কারণ অনেক সময়ে থাকে। বক্ষ্যমাণ ব্যাপারে অবশ্য আমি এখনও এরূপ বিস্তারিত চিন্তা করি নাই।*

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

---

* এই পত্রের উপর লাল কালির বেষ্টনীতে লিখিত রয়েছে: ডাকে প্রাপ্ত চিঠির উত্তর।

২২।২৫

১১

জুলাই ১৯২৭

১৮ই আষাঢ় ১৩৩৪

৩রা জুলাই, ১৯২৭।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার আজকার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি জানি, আমার জন্যে আপনি আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক বার অনেক আঘাত পাইয়াছেন। তা ছাড়া আমি নিজেও, ইচ্ছা করিয়া নহে, আপনাকে দুঃখ দিয়াছি। তাহার জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। কি করিলে ভবিষ্যতে আপনি আমার জন্য ও আমার দ্বারা আঘাত না পান, তাহা আমি এখনও ঠিক্ করিতে পারি নাই; চিন্তা করিতেছি। আপনি আপনার যে বন্ধুদের নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সমশ্রেণীস্থ লোক আমি নই। তথাপি, আপনি যখন বন্ধুশ্রেণীতে আমাকে স্থান দিয়াছেন, সেই জন্য আপনাকে জানাইতেছি, আমার আপনার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ পূর্ব্ববৎ আছে—বরং বাড়িয়াছে।

"প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর দরোয়াজা বন্ধ", ইহা আমার কাণে ও হৃদয়ে বড় কঠোর ও নিষ্ঠুর শুনাইতেছে। আমি আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি। তাহা আপনি যে ভাবেই গ্রহণ করুন, তাহা বারণ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নাই। যাক্, আমি লিখিতে জানি না; মনের কথা বলিতে পারিব না, ভাষার অভাবে।

ভগবানের নিকট আলো চাহিতেছি। আপনার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ চাহিতেছি।

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ আপনি, "সস্তার তিন অবস্থা", লিখিয়াছেন। আপনি ত চিরকালই প্রীতিবশতই লেখা দিয়াছেন। বিনামূল্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা সস্তা ত কিছু নাই। কিন্তু আমি সব সময়ই আপনার লেখা পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। টাকা যখন সামান্য কিছু দিয়াছি, তাহার জন্য আপনি লিখিয়াছেন, ইহা কখনও মনে করি নাই। আমি বড় অশান্তিতে আছি। এই জন্য অসম্বদ্ধ কথা লিখিলাম।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১২

১৪ নভেম্বর ১৯২৯

২-১, টাউনশেণ্ড রোড্,
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৪।১১।১৯২৯ রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

অমিয়বাবু শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবীর অনুবাদিত যে দুটি কবিতা পাঠাইয়াছেন তাহা পাইয়া অনুগৃহীত ও আহ্লাদিত হইলাম। ডিসেম্বরের কাগজে উহা ছাপা হইবে।

আপনাকে ছুটি অনুরোধ জানাইয়া রাখিতেছি। যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও অবসর পান তাহা হইলে কিছু করিবেন—আপনাকে বিন্দুমাত্রও পীড়ন করা আমার অনভিপ্রেত এবং অনভ্যস্ত তাহা আপনি জানেন।

ভাদ্রের প্রবাসীতে আপনি "ধ্যানী জাপান" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষে আছে—"ধ্যানের শক্তি আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখ্‌তে বসিনি. কোরিয়া দেশের একজন যুবকের সঙ্গে একদিন আমার কি কথা হয়েছিল সেইটি জানাবার জন্যে কলম ধরেছিলুম। সে কথা পরে হবে।"

এই কথা জানিতে আমার ও অন্য পাঠকদের কৌতূহল আছে। যদি সহজে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

আমার কাগজ ছুখানার সম্পাদকীয় কতক ভার বুবার উপর পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আরও বেশী করিয়া পড়িবে। সে প্রতি বৎসর মডার্ণ রিভিয়ুর চারিটা বিশেষ সংখ্যা বাহির করিতে চায়। আগামী জানুয়ারী সংখ্যাতে সে Art, Archaeology ও History সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ দিতে চায়। আপনি যদি পারেন ত Art বা History সম্বন্ধে যে-কোন রকমের একটি প্রবন্ধ দিলে অনুগৃহীত হইব।

কারবারে বড় জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। যাই যাই করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারি নাই। তাহার পর কয়েকটি লোকহিতকর কাজ উপলক্ষ্যে কাশী

যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম আপনি শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন। সুতরাং আপনার দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইল। আশা করি, শীতের আরম্ভে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৩

১৭ই নভেম্বর ১৯২৯

2-1, Townshend Road,
Bhawanipur, Calcutta.
Nov 17, 1929.

ভক্তিভাজনেষু

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আপনার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা লিখিয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন জানিয়া প্রীত হইলাম। "Political Philosophy of Rabindranath" নামক পুস্তক সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধটি ছাপা হইয়াছে। এই চিঠির আগেই হয় ত তাহা অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে দেখিতে পাইবেন। আমি উহার প্রুফ আপনাকে পাঠাইতে বলিয়া কাশী গিয়াছিলাম। আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ায় প্রুফ আপনাকে পাঠান হয় নাই।

বড়োদার বক্তৃতা লেখা হইয়া গেলে আপনি যদি পারেন তাহা হইলে ইংরেজী প্রবন্ধ একটি লিখিয়া দিবেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত আপনার পোলিটিক্যাল মতসম্বন্ধীয় লেখাটির

তর্জমা অবশ্যই আমার ইংরেজী কাগজে চলিতে পারে। কিন্তু বুবার বরাত, special number এর জন্য আপনার Art বা History সম্বন্ধে একটি লেখা। নূতন লেখা সম্ভব না হইলে কোন অপ্রকাশিত বক্তৃতাদি পরিবর্ত্তন দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু আপনার উপর কোন প্রকার চাপ দেওয়া মোটেই আমার অভিপ্রেত নহে। আপনাকে সব কথা জানাইয়া রাখিলাম। বেশ স্বচ্ছন্দ মনে অবসর সময়ে কিছু করিতে পারিলে করিবেন।

বাংলাদেশে আপনার অশান্তির কারণ আমি কখন ক্বচিৎ প্রত্যক্ষ জানিতে পারি, এবং অধিকাংশ সময় লোকমুখে শুনি। যাহারা এই কারণ ঘটায়, সর্বাপেক্ষা অপরাধী তাহারাই; কিন্তু যাঁহারা এ সব জিনিষ আপনার চক্ষুগোচর বা কর্ণগোচর করেন, তাঁহাদেরও দোষ আছে। কারণ, তাহা করিয় আপনার বা অন্য কাহারও উপকার তাঁহারা করেন না, এবং তাহার দ্বারা কোন প্রতিকারও হয় না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৪

১৯ নভেম্বর ১৯২৯

ভবানীপুর

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

ভক্তিভাজনেষু

আমি আপনাকে কাজ উপলক্ষ্যে চিঠি লিখিলেও আপনি কাজ সম্বন্ধীয় কথার জবাব দিয়া অতিরিক্ত যাহা লেখেন তাহাতে উপকৃত হই এবং আনন্দ পাই। আপনি যে লিখিয়াছেন, “নিজের ভিতরকার যে বড়ো দান সেটা বড়ো শান্তি ও অবকাশ ছাড়া যথোচিত ভাবে উদ্‌ভাবিত হতে চায় না। সেই শান্তি ও নিরাবিল অবকাশকে আপনার অন্তরের জিনিষ করে তোলবার জন্যে একান্তমনে চেষ্টা কবি। যদি সফল হতে পারি তবে নিজের জীবনটাই নৈবেদ্যরূপে রচিত হতে পারবে—অন্য কোন রচনা নাই বা হোলো”। আপনার ভিক্ষা সার্থক না হইলেও লিখিয়াছেন— “এই ভিক্ষাটা সাধনারই একটা অঙ্গ—বোধ করি নিরর্থক হলেও তার একটা সার্থকতা আছে”।

এই সকল কথা পড়িয়া আমার আন্তরিক দৈন্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ নবেম্বর মাসের “প্রবুদ্ধ ভারতে” Romain Rolland-র প্রবন্ধে আপনার পিতার সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণের

সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত আছে। ইহা রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের পক্ষ হইতে লেখা। অন্য versionটি প্রকাশিত হইলে সত্য নির্ণয়ের সুবিধা হইত।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৫

২৭ অগস্ট ১৯৩১

২৭।৮।১৯৩১।

ভক্তিভাজনেষু

আমাকে একটি কাজের ভার লইতে হইয়াছে যাহা করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি।

রঘুনাথ মল্লিক নামক চোরবাগানের মল্লিক গোষ্ঠীর একটি যুবক সংস্কৃতে এম. এ. পাস করিয়া "কালিদাসের গল্প" লিখিয়াছেন এবং তাহা চিত্রিত করাইয়া প্রকাশ করিতেছেন। সেই বইটির একটি ছোট ভূমিকা আপনাকে লিখিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে আমাকে বলিয়াছেন। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা আমি জানি, আপনি কিরূপ কর্ম্মপীড়িত তাহাও জানি। এই কারণে এ ভার লওয়া আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু অনেক সময় মানুষকে অগত্যা অনেক কাজ করিতে হয়। সেইজন্য, আপনি অনুরোধ রক্ষা করিতে পারুন বা না পারুন, আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। বহির পাতাগুলি ও কতকগুলি ছবি পাঠাইতেছি। এগুলি আমি স্বয়ং আপনাকে দিব বলিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ চলিয়া আসায় দেওয়া হয় নাই। বহিখানি আপনি আদ্যোপান্ত পড়িবেন, এরূপ

অসঙ্গত অনুরোধ আমি করিতেছি না। কালিদাস সম্বন্ধে ২।৪ কথা এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর কিছু আস্বাদ বাঙালী পাঠকেরা পাইলে ভাল হয়, এই প্রকার বা অন্য যাহা আপনার বিবেচনায় ভাল, তাহা লিখিলেই কাজ চলিবে। এক পৃষ্ঠার বেশী লিখিবার প্রয়োজন নাই।

আপনি কিছু না লিখিলেও আমার চিত্তবিক্ষেপ হইবে না—বলা বাহুল্য।

ভবদীয়

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ বহির পাতা ও ছবিগুলি ডাকে রেজিষ্টরী করিয়া পাঠাইতেছি।

১৩

২১ ডিসেম্বর ১৯৩১

2-1, Townshend Road,
Bhawanipur P. O.
Dated the 21st Dec., 1931.

ভক্তিভাজনেষু

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের উৎসবে শান্তিনিকেতনে আপনার বক্তৃতার যে তাৎপর্য্য প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, তাহার একটি অনুবাদ আপনাকে পাঠাইতেছি। মহাত্মাজির সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য বাঙালী ছাড়া অন্যেরাও জানিলে উপকৃত হইবেন বলিয়া উহা ইংরেজীতে ছাপিতে চাই। কিন্তু অনুবাদক মূলের বেশী অনুসরণ করায় ইংরেজীটা ভাল হয় নাই।

অল্পস্বল্প সুধরাইলে যদি চলনসই হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করিবেন ; নতুবা অনুবাদটি ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

মস্কোতে আপনার ছবিসমূহের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আপনি ইংরেজীতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার একটি ফোটোগ্রাফ কেদার রথীর নিকট হইতে আনিয়াছেন। তাহার প্রতিলিপি মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপিবার অনুমতি চাহিতেছি। নিষেধপত্র না আসিলে বুঝিব আপনার অনুমতি আছে। আর, যদি চিঠি লিখিয়া অনুমতি দিবার অবকাশ হয়, তো আরও ভাল।

আপনার ছবি চারিখানির ব্লকের প্রুফ দেখিয়া নন্দলালবাবু অনুমোদন করিয়াছেন। সংশোধন যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহা করা হইয়াছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৭

২ অগস্ট ১৯৩২

১রা আগষ্ট, ১৯৩২।

ভক্তিভাজনেষু

আপনাদের ছবিগুলি সম্বন্ধে কালিদাসের সহিত কথা হইয়াছে। অন্যান্য ছবির সহিত উহার ব্লক প্রস্তুত করিবার জন্য U. Roy & Sons এর বর্তমান মালিক করুণাবিন্দু বিশ্বাসকে দেওয়া হয়। শুনিলাম, করুণাবাবু বলিয়াছেন, যে,

তিনি যাহাদের নিকট হইতে ছবিগুলি পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ফেরত দিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে যে formal চিঠি তাঁহাকে দশবার দিন পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, তাহার লিখিত জবাব তিনি এখনও দেন নাই। লিখিত জবাব পাইবার চেষ্টা করাইব। তাহার পর কর্ত্তব্য স্থির করিব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৮

৭ ডিসেম্বর ১৯৩২

The 7th Dec., 1932.

ভক্তিভাজনেষু

পৌষের প্রবাসীর জন্য আপনি "পত্রধারার" যে তিনটি চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার প্রথমটি ছাপিতে পারিলাম না কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ঐরূপ কারণে মিঃ ব্রেল্‌স্‌ফোর্ডের বহি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটির কয়েকটি জায়গা দাগ দিয়া পাঠাইতেছি। ঐগুলি সম্বন্ধে যাহা বিহিত, করিয়া আমাকে ফেরত দিলে অনুগৃহীত হইব।

যাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাহাও ছাপিতে না পারার হীনতাবোধে আমার অনিদ্রা ঘটিতেছে।

আপনার সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে পারিব, তখন সব কথা বলিব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৯

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

43, Wellesley Street,
Calcutta, 17-9—1934.
রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যার ২৫৪ পৃষ্ঠায় আপনার "Message to the Society of Friends, Ireland" আমি "Moral Warfare" নাম দিয়া ছাপিয়াছি, দেখিয়া থাকিবেন। উহা আপনার কয়েক বৎসর আগেকার লেখা—বোধহয় বিলাতে থাকিতে আইরিশ কোয়েকারদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। উহা অপ্রকাশিত অবস্থায় আমার নিকট ছিল। সেপ্টেম্বর সংখ্যার গোড়ায় দিবার মত কিছু খুঁজিতে খুঁজিতে আমি উহা পাই। উহা প্রেসে কম্পোজ করিতে দিবার পর আপনার "I am He" প্রবন্ধটি পাই 'Moral Warfare' তখন কম্পোজ হইয়া গিয়াছে, এবং জিনিষটিও ভাল। সুতরাং দুইটিই ছাপা হইয়াছে।

প্রেস অফিসার যদিও Warning দেন নাই, তথাপি তিনি কেদারনাথকে মৌখিক বলিয়াছেন, যে, জিনিষটি আপত্তিজনক। কারণ, উহাতে মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে "The evils" এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, "the cowardly violence of evils"-এর বিরুদ্ধে "Spiritual powers array" করার কথা, "aggressive power pitifully fails when human nature bears insult and pain without retaliating" ইত্যাদি কথা আছে ; অতএব (প্রেস অফিসারের মতে) জিনিষটি ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে। কেদার বলিয়াছেন, যে, ইহা বিশেষ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিত বা অভিপ্রেত নহে, নেশ্যনমাত্রেরই সহিত অন্য নেশ্যনের ব্যবহার সম্বন্ধে ইহা লিখিত। প্রেস্ অফিসার বলেন, আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন লোকে কি বুঝিয়াছে। কেদার বলেন, আমি 'Author-কেই জিজ্ঞাসা করিব।

অবশ্য আপনি বিশেষ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টেরই বিরুদ্ধে ইহা লেখেন নাই, যদিও ব্রিটিশ নেশ্যন অন্যায় করিলে অন্য অন্যায়কারী নেশ্যনের মত তাহাদেরও বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

আপনি উত্তরে যাহা লিখিবেন তাহা প্রেস অফিসারকে দেখাইতে হইবে না। তবে তিনি যদি কেদারকে কোন উপলক্ষ্যে ডাকেন ও কথা উঠে তাহা হইলে কেদার আপনার মত জানাইতে পারিবে। লেখাটি যে অনেক আগে লিখিত, তাহা কেদার জানিত না, এবং কোন্ বৎসর ও মাসে আমি উহা পাইয়াছিলাম তাহা লিখিয়া না রাখায় আমিও তারিখ ছাপিতে পারি নাই।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২০

১৪ জানুয়ারি ১৯৩৫

43, Wellesley Street
14-1-1935.

ভক্তিভাজনেষু

আপনি অমিয়বাবুর চিঠির উপর লণ্ডনে ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে কিছু মত প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার প্রুফ দেখা এবং তাহা প্রবাসীর পৃষ্ঠাভুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর সহকারী সম্পাদকদের বুঝিবার ভুলে উহা মাঘের প্রবাসীতে ছাপা হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। আমি প্রায়ই আফিস যাইতে পারিনা। এই জন্য এই রূপ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। লেখাটি ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২১

২১ জানুয়ারি ১৯৩৬

43, Wellesley Street
২১।১।১৯৩৬.
রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

কাল এয়ার মেলে পারিস হইতে একটি চিঠি পাইয়াছি। তাহার নকল পাঠাইতেছি। (তাহাতে উল্লিখিত পুস্তিকাটি

এখনও পাই নাই)। এই রূপ চিঠি আপনি আগেই পাইয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী শান্তির জন্য ভারতবর্ষ হইতে সহযোগিতা করিতে হইলে সে চেষ্টার নেতৃত্ব আপনাকে করিতে হইবে। অতএব এ বিষয়ে আপনার উপদেশ চাহিতেছি। আপনি যাহা করিবেন বা করিতে বলিবেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে।

আপনার "শিক্ষার" নূতন সংস্করণটি দেখিতেছিলাম। ইহাতে যাহা আছে, তাহার অন্ততঃ কতকগুলি প্রবন্ধ ইংরেজীতে বাহির হইলে সমস্ত ভাবতবর্ষের শিক্ষিত লোক উপকৃত হয় এবং বাহিরের লোকও অনেকে জানিতে পারে। "তপোবন" প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে কি? না হইয়া থাকিলে আপনার ওখানকার অধ্যাপকেরা কেহ করিলে ভাল হয়। উহাতে যাহা আছে, তাহার অনেক কথা ইংরাজীতেও আপনি লিখিয়াছেন বলিয়াছেন, কিন্তু সমস্তটির অনুবাদ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২২

২ মার্চ ১৯৩৬

43, Wellesley Street,
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪২।

ভক্তিভাজনেষু

মডার্ন রিভিয়ুর জন্য আপনার একটি কি দুটি লেখা চাহিতেছি। ছোট, বড় কবিতা, গদ্য-যাহা হউক, হইলেই

হইবে। যাঁহাদের লেখায় কাগজখানার মূল্য বাড়িয়াছে, আপনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। সম্প্রতি আমাকে উহার লেখকদের একটি তালিকা ছাপিতে হইবে। তাহাতে গোড়ায় আপনার নাম দিব। এইজন্য এখন কিছু লেখাও আপনার বাহির হওয়া চাই।

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২৩
৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৩।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার "জাপানে-পারস্যে" গ্রন্থে আমার নাম মুদ্রিত করায় অনুগৃহীত হইয়াছি।

আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২৪
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

P 283, Darga Road,
Circus P.O.
১৬।৯।১৯৩৬।

ভক্তিভাজনেষু

পরশু আপনার বাড়ীতে আপনার কবিতা পাঠের পর একটি কথা আপনাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভিড়ের

মধ্যে সুবিধা হইল না।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে এখানকার কয়েকজন মহিলা কর্ম্মী একটি মহিলা সম্মেলন করিতে চান। তাহাতে, সারা বাংলাদেশে যে-সব মহিলা শিক্ষাদান ও অন্যান্য উপায়ে পল্লীউন্নয়ন প্রভৃতি কাজ করেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইবে। যাঁহারা ইহার উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা আপনি এই সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন। আমিও মনে করি, আপনি ইহা করিলে যেরূপ শুভফল হইবে, অন্য কেহ তাহা করিলে সেরূপ হইবে না। আপনি সম্মত হইলে তারিখ আপনার সুবিধামত নির্দ্ধারিত হইবে। সম্মেলনটির উদ্যোগ শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ করিতেছেন। ইনি ময়মনসিংএর শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের কন্যা, আগে একটি গবর্ণমেণ্ট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাহা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়া দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এখন ভবানীপুরে একটি নারী প্রতিষ্ঠান চালান। তাহাতে পল্লীগ্রামে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার নিমিত্ত প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আপনার বিশেষ অসুবিধা না হইলে সম্মেলনটির উদ্বোধন আপনি করিলে আনন্দিত হইব।

আমি শুনিয়াছি, আপনার যত কবিতা লেখা ছিল, সমস্তই আপনার শেষ কবিতার পুস্তকে ছাপা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর যদি কিছু লিখিয়া থাকেন বা লেখেন, তাহা হইলে

কার্ত্তিকের ও অগ্রহায়ণের প্রবাসীর জন্য একটি করিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।

কার্ত্তিকের প্রবাসী ২৩শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর, বাহির হইবে।

আমি এখন শান্তার কাছে আছি। তাহার ঠিকানা চিঠির ১ম পৃষ্ঠার মাথায় লিখিয়া দিয়াছি। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৫

১৩ অক্টোবর ১৯৩৬

P. 283, Darga Road,
Circus P. O., Calcutta.
the 13th Oct., 1936.
রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

বিহার প্রদেশের অন্যতম বিহারী নেতা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে চান। তিনি শিক্ষাবিষয়ে যোগ্য লোক। পড়াশুনাও বেশ আছে। তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আর একজন লোক দাঁড় করাইবেন, তিনি এইরূপ শুনিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটদাতাদের মধ্যে অনেক বাঙালী আছেন। তিনি আশঙ্কা করেন, যে, আপনার দ্বারা এই বাঙালী ভোটারদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে

ভোট দেওয়ান হইবে। সেইজন্য আপনাকে চিঠি লিখিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনি না, তাঁহাকে চিনি। তিনি যোগ্য লোক।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৬

২০ জানুয়ারি ১৯৩৭

20 Mullen Street,
Elgin Road P. O.
কলিকাতা।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৭।

ভক্তিভাজনেষু

আপনি সুস্থ আছেন এই অনুমান করিয়া এই চিঠি লিখিতেছি।

মডার্ণ রিভিয়ুর ফেব্রুয়ারীসংখ্যার গোড়ায় ছাপিবার মত কোন লেখা হাতে নাই। সুরেনবাবুকে একটি অনুবাদের জন্য লিখিয়াছি। এখনও উত্তর পাই নাই। আপনার নিকট কবিতার অনুবাদ বা গদ্য কিছু যদি থাকে, দিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৭

১৮ মাচ ১৯৩৭

20 Mullen Street

১৮।৩।১৯৩৭

ভক্তিভাজনেষু

অরবিন্দ জেনিভা থেকে যে তর্জমাগুলি পাঠিয়েছেন, তার কিছু অনুমোদিত হলে অনিলবাবু আমাকে যেন পাঠিয়ে দেন, এই কথা তাঁকে বললে অনুগৃহীত হব।

আপনি গত রবিবারে অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদের আলোচনা যখন কচ্ছিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল, sugest আর suggestion এর বাংলা কি হবে। এইরকম আরও খুব প্রচলিত কয়েকটা ইংরেজী শব্দ আছে, যার বাংলা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৮

১৯ মে ১৯৩৮

20 Mullen Street,
Elgin Road, P. O.

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

ভক্তিভাজনেষু

অনিলবাবুর চিঠির মধ্যে আপনার ২রা জ্যৈষ্ঠের চিঠি পেয়েছি। পেয়েই "রবিরশ্মি" সম্বন্ধে চারুবাবুকে লেখা

আপনার চিঠি না-ছাপতে আমার সহকারীদিগকে লিখে দিয়েছি। চারুবাবুকেও তা জানিয়ে দিলাম। তিনি যদি ছাপতে বলেন, তখন ছাপা হবে। একথাও তাঁকে লিখেছি যে, তিনি শুধু "আমার আপত্তি নাই" বললেই ছাপব না; তিনি Positive ইচ্ছা প্রকাশ করলে ছাপব।

আপনার চিঠির শেষ কথাগুলি থেকে মনে হল আপনি নিরুপদ্রবে আছেন। তাতে প্রীত হয়েছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৯

২৮ অগস্ট ১৯৩৮

20 Mullen Street,
Elgin Road P. O.,
কলিকাতা।

২৮-৮-১৯৩৮।

ভক্তিভাজনেষু

জাপানী কবি য়োনে নোগুচি আপনাকে ও মহাত্মা গান্ধীকে চীন জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমার নিকটও আসিয়াছে। যদি আপনি আপনাকে লিখিত চিঠির কোন উত্তর দেন, তাহা হইলে আমি তাহার একটি নকল পাইলে উপকৃত হইব।

ধীরেন লিখিয়াছেন আপনার স্বাস্থ্য এখন ভাল আছে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুনঃ—আমি মহাদেব দেশাইকেও লিখিলাম গান্ধীজী কোন জবাব দিলে যেন একটি নকল পাই।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৫০

৩১ মার্চ ১৯৩৯

১নং উড্ স্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৭ই চৈত্র ১৩৪৫।

ভক্তিভাজনেষু

আমাকে একটি প্রদর্শনী খুলবার জন্যে বাঁকুড়া যেতে হ'চ্ছে। রবি সোমবার ১৯শে ২০শে চৈত্র সেখানে থাকতে হবে। এইজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।

তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে দেশের যে উপকার হ'য়েছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সভার কাজ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষক ছিল বলে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য এর পরিচালক, ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন ব'লে, এর সব কাজই উপেক্ষা ক'রে চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে ব'লে মনে হয়। তা না হ'লেও, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সুবিচার বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস

লেখকেরা করবেন বলে মনে হয় না। এইজন্যে, আপনি যদি বিশ্বভারতীর সংস্রবে বা অন্য কোনরকমে এ বিষয়ে গবেষণা, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করান তো বড় ভাল হয়। যথাসময়ে, সভার শাতাব্দিক উৎসবও হতে পারবে।

শ্রীমান্ হিতেন ও যোগানন্দ এ বিষয়ে আপনার উপদেশ নেবার জন্যে যাচ্ছেন।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩১

১১ জুলাই ১৯৩৯

1 Wood Street,
Dated the 11th July 1939.

ভক্তিভাজনেষু

আমি গত শনিবার রাত্রে আপনাকে একটি চিঠি লিখিয়াছি। তাহা লিখিবার কারণ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রদেব লিখিত "সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র" নামক পুস্তকের নিম্নলিখিত বাক্যগুলি :—

"'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'প্রবাসীতে' লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র প্রবাসীতে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল যে, তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক করে যেন পূর্বাহ্ণে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত

করলে তবেই সে উপন্যাস 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হবে,—এ সর্ত্তে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে 'প্রবাসীতে' রচনা পাঠাতে তাঁকে বারংবার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই প্রবাসীতে কখনো কোন রচনা দেন নি।"

কোন বিখ্যাত বা অবিখ্যাত লেখকের লেখা পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করা আশ্চর্য্যের বা দোষের বিষয় নহে। কিন্তু আমি শরৎবাবুর লেখা পাইবার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ বা চেষ্টা করি নাই। কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর বহির ঐ কথাগুলি অবলম্বন করিয়া আমার উপর আক্রমণ হইয়াছে। তাহা গত শনিবার রাত্রে দেখিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আমার চিঠিতে একটা বাক্য আছে যাহা ঔদ্ধত্য প্রকাশক মনে হইতে পারে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য রূপ ছিল। বাক্যটা এইরূপ ঃ—

"আমি জানি আমি কখনও আপনাকে এরূপ অনুরোধ করি নাই যে, আপনি শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করুন।" ইহার পর আমার লেখা উচিত ছিল, "এই কারণে আমার মনে হয় আপনি কখনও তাঁহাকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করেন নাই।" কিন্তু মনের চঞ্চল অবস্থায় তাড়াতাড়িতে তাহা লেখা হয় নাই। এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন। আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসীর প্রতি মমতাবশতঃ

তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাহা আপনার মহত্ত্ব। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। এইজন্য, আপনি যাহা জানেন তাহা জানিতে চাহিয়াছি। জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

এ বিষয়ে প্রবাসীতে কিছু লেখা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু আপনার এ বিষয়ে কি মনে আছে না জানিয়া কিছু লেখা উচিত হইতেছে না।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩২

১৪ মার্চ ১৯৪০

১নং উড্ ষ্ট্রীট,

১লা চৈত্র ১৩৪৬।

ভক্তিভাজনেষু

এপ্রিল মাসের মডার্ন রিভিয়্ উহার চতুঃশততম সংখ্যা হইবে। অনেক আগে যুদ্ধ বাধিবার আগে ভাবিয়া ছিলাম সেটিকে বেশ বড় আকারে ভাল করিয়া ছাপিয়া বাহির করিব। কিন্তু যুদ্ধের জন্য কাগজপত্রের মূল্যবৃদ্ধিবশতঃ তাহা করিতে পারিলাম না। তথাপি ৪০০তম সংখ্যার মর্য্যাদা রক্ষা হইবে যদি আপনার ছোট একটি লেখাও উহাতে থাকে। যদি অপ্রকাশিত কিছু কবিতা বা গদ্য রচনা থাকে অনুগ্রহ করিয়া অনিলবাবুকে তাহা পাঠাইয়া দিতে বলিবেন। এ মাসে

আমাকে অন্য কাজ অনেক করিতে হইয়াছিল, বলিয়া আপনাকে চিঠি লিখিতে বিলম্ব হইল। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ —আপনার বাঁকুড়ার যে-যে বক্তৃতার অনুলিপি কেহ লইয়াছিলেন, তাহা আপনাকে পাঠাইতে চিঠি লিখিয়াছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩৩

২ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

১নং উড্ স্ট্রীট্,
১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল।

ভক্তিভাজনেষু

পরশু সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজে আমি যা বলেছিলাম, আপনার কাছে তা পাঠাচ্ছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৪

২৮ নভেম্বর ১৯৪০

১নং উড্ স্ট্রীট,
কলিকাতা।
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।

ভক্তিভাজনেষু

পরশু শনিবার আমি শান্তিনিকেতন যাইব। যদি ডাক্তারদের নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে আপনার নিকট

যাইব ; আর যদি নিষেধ থাকে, তাহা হইলে কেবল আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়া আসিব, যেমন আপনি জোড়াসাঁকোতে থাকিতে অনেকবার করিয়াছি।

কোন অনুরোধ করিতে আপনার নিকট যাইব না। আপনাকে দেখা ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষও অন্তরে লইয়া যাইব না।

সংবাদ লইয়া জানিয়াছি আপনি কিঞ্চিৎ বল পাইয়াছেন। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৫

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

1 Wood Street
Park Street P. O.
৩০শে মাঘ, ১৩৪৭।
১২।২।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

ফাল্গুনের প্রবাসীর জন্যে ছাপা আপনার "ঐকতান" কবিতাটির একটি ইংরেজী অনুবাদ হলে বাঙালী ছাড়া অন্যেরাও আনন্দিত ও উপকৃত হবেন। অনুবাদটি আপনার দ্বারা হলেই খুব ভাল হয়। কিন্তু আপনি এখন সেরূপ পরিশ্রম করতে পারবেন কি না জানি না। অবশ্য এস্প্রেস নন্দিতারও অনুমতি চাই। যদি পারেন, তাহলে অন্য কাউকে

বলতে হয় না। নইলে, আপনার মত হলে, আপনাদের অধ্যাপক শ্রীমান্ ক্ষিতীশকে বলে দেখতে পারি।

"তিন সঙ্গীর" ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপাবার লোভ আছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে অনুবাদ করাতে ও অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশ করাতে অনুমতি দেন, তাহলে ক্ষিতীশকে অনুরোধ করতে পারি। তিনি রাজী আছেন। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬৬

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

1 Wood Street.
Dated the 18th Feb. 1941.

ভক্তিভাজনেষু

১১ই মাঘের আপনার ব্যাখ্যানে মহাত্মা রামমোহন রায়কে আপনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ঐদিন ক্ষিতিমোহন বাবুও তাঁর বক্তৃতায় রামমোহনের প্রকৃত স্থান নির্দেশ করে তাঁকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করেন। আবার ঐদিনই আমিও তাঁর সম্বন্ধে প্রসঙ্গত কিছু বলেছিলাম। এই আকস্মিক মিলটি আপনার গোচর করবার জন্যে আমার মুদ্রিত বক্তৃতাটা এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আশা করি আপনি এখন ভাল আছেন।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৭

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

1 Wood Street,

২০।২।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনি ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের যে বহিখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজ প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আফিস হইতে তাহা আপনার নিকট একখানি প্রেরিত হইবে। আপনি একবার পাতা উল্টাইয়া দেখিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—অনিলবাবু আমাকে লিখিয়াছেন যে, অমিয়বাবু আপনার "ঐকতান" কবিতাটির অনুবাদ করিতেছেন। তাহা শীঘ্র পাইবার আশা করিতেছি। তিনি যদি এই সঙ্গে আপনার "গান্ধি মহারাজ" কবিতাটিরও ইংরেজী তর্জমা করেন, তবে বড় ভাল হয়। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ঐটির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, গান্ধিজী শেষবার বাংলাদেশে (মালিকান্দায়) আসিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন ও বাংলার সেই কলঙ্ক এই কবিতাটির দ্বারা শুধু ক্ষালিত হয় নাই, পরন্তু এইটির দ্বারা মহাত্মাজীর অবাঙালী শিষ্যদের সহিত বঙ্গের একটি মধুর যোগসূত্র ও মিলনসূত্রও স্থাপিত হইয়াছে। এই

সদ্ভাবসূত্রের খুব আবশ্যক ছিল, আছে ও বরাবর থাকিবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৮

২ এপ্রিল ১৯৪১

২রা এপ্রিল, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনাকে কল্য লিখিয়াছিলাম যে, আপনার নূতন চিঠিটিও, অর্থাৎ ২৯শে মার্চের চিঠিটিও, প্রবাসীর বৈশাখ সংখ্যায় ছাপিতেছি। তাহা না ছাপাই স্থির করিলাম। আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া ও আপনার অনুমতি না লইয়া উহা ছাপা উচিত বোধ হইল না, এবং উহা ছাপা আবশ্যকও মনে হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইলে এবং আপনি অনুমতি দিলে পরে ছাপা যাইতে পারিবে। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৯

১৭ এপ্রিল ১৯৪১

১৭ই এপ্রিল, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনাকে বিন্দুমাত্রও কষ্ট দেওয়া আমার অনভিপ্রেত।

কিন্তু ক্ষিতীশ আপনার "নবজাতক" গ্রন্থের "জন্মদিন" কবিতাটির একটি অনুবাদ আমাকে দেওয়ায় আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। এটি আপনাকে দেখিয়ে প্রকাশ করবার অনুমতি নেবার ভার ছিল অমিয়বাবুর উপর। তিনি অনুমতি নিয়েছেন কিনা জানতে পারিনি। সেইজন্যে জানতে চাচ্ছি এটির প্রকাশে আপনার সম্মতি আছে কিনা।

অনুবাদটি মূলের শাব্দিক অনুসরণ করেনি ; কিন্তু তাৎপর্য্য ঠিক থাকলে ছাপা চলবে।

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪০
২০ এপ্রিল ১৯৪১

২০।৪।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

একটি চিঠির প্রুফ আপনাকে না পাঠিয়ে আগে তার নকলটিই আপনাকে পাঠাচ্ছি। যদি নকলের সবটির বা কোন কোন অংশের প্রকাশে আপনার সম্মতি থাকে, তা হলে সমস্ত নকলটি বা তার অনুমোদিত অংশ প্রেসে পাঠাব, নতুবা পাঠাব না।

এই চিঠিটির প্রথম প্যারাগ্রাফে আপনার পিতৃদেবের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যে-সব কথা আছে, তাতে রামকৃষ্ণের কোন ব্যক্তিগত সমালোচনা নাই।

সুতরাং তাহা প্রকাশে কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। অবশ্য আপনার সত্য ও ন্যায্য কথাগুলি অনেকের পক্ষে প্রীতিকর হবে না। কিন্তু সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ ভক্তেরা এমন সব কথা বানিয়েছেন যার জন্যে বিষয়টির অপক্ষপাত ঐতিহাসিক বিবেচনার নিমিত্ত আপনার কথাগুলি নিরপেক্ষ লোকদের জানা আবশ্যক।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সম্বন্ধে আপনার চিঠিটিতে ছিল— "কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের সিংহদ্বার দিয়ে— এই জন্যে আত্মন্যেবাত্মানং উপলব্ধির বিশুদ্ধ আত্মসমাহিত আনন্দের সাধনা তাঁর ছিল না— শাক্তবৈষ্ণব ধর্ম্ম থেকে হৃদয়াবেগ মন্থন করে নেওয়া এবং তার আন্দোলনে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল।"

আমি এই বাক্যগুলি নকল করি নি— এগুলি ব্যক্তিগত সমালোচনা মনে হতে পারে বলে বাদ দিয়েছি।"

আমি বুঝতে পারছি, আমি আপনার উপর উপদ্রব কচ্ছি। কর্ত্তব্যের দায়ে কচ্ছি বটে, কিন্তু তা কষ্টকর হলে আপনি অসঙ্কোচে আমাকে নিষেধ ও নিবৃত্ত করবেন, এই ভরসায়।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ—

২০।৪।১৯৪১

"জন্মদিন" কবিতাটির পরিবর্ধিত অনুবাদটি পাইয়া বাধিত হইলাম। উহা কল্য সোমবার প্রেসে পাঠাইব। উহার প্রুফ

পাঠান অনাবশ্যক।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪১

২৬ এপ্রিল ১৯৪১

২৬শে এপ্রিল, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ১৫শে এপ্রিলের চিঠি পেলাম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত আপনার পিতৃদেবের সাক্ষাৎকারের বিষয় যে চিঠিখানিতে আছে, তা ছাপানো যে একান্ত আবশ্যক, এমন কথা বলতে পারিনে। এটি ছাপালে অনেকে ক্লেশ অনুভব করবেন তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং না ছাপালেই ভাল।

আপনি কোনো চিঠিই ছাপাবার জন্যে আমাকে লেখেন নি। এটিও প্রকাশ করবার জন্যে লেখেননি। সবগুলি বা কোনটিই যে ছাপতে হবে, এমন কোন কথা নাই। আরও কয়েকটি চিঠি আছে, যার একটি বাক্যও ছাপাবার জন্য নকল করি নি। কেবল যেগুলিতে কারো মনে আঘাত লাগবে না, সেইগুলিরই নকল প্রেসে দিয়েছি। তারও প্রুফ আপনার কাছে যাবে।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪২

২৮ এপ্রিল ১৯৪১

২৮।৪।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আপনার পিতৃদেবের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আপনার চিঠিটির বিষয়ে আপনি ২৬শে এপ্রিল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। আপনার ইচ্ছা অনুসারে উহা কোন উপযুক্ত সময়ে ছাপিবার জন্য রাখিলাম। আপনার ২৬শে এপ্রিলের চিঠিটিও উহার সঙ্গে রাখিয়া দিলাম।

আপনার "সভ্যতার সঙ্কট" সম্বন্ধীয় ভাষণে যাহা যোগ করিয়াছেন, সুধীরবাবুর চিঠির মধ্যে তাহা পাইয়া প্রেসে পাঠাইয়া দিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী বাহির হইয়া গেলে একবার শান্তিনিকেতন যাইবার ইচ্ছা আছে। তাহার আগে কয়েক জায়গায় আপনার জন্মোৎসব করিয়া যাইতে হইবে। ইতি

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৩

৫ মে ১৯৪১

৫।৫।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

গত ৭ই এপ্রিল আপনার যে দীর্ঘ টাইপ লিখিত পত্র

পাইয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া বিচলিত হইয়াছিলাম—ইহা আপনাকে সেই চিঠি পাইবার পর জানাইয়াছিলাম।

চিঠিটির প্রুফ দেখিবার সময় সে কথা আবার মনে পড়িয়াছিল। বিচলিত হইবার কারণ এই যে, আপনি ইয়োরোপে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যে প্রীতি ও সম্মান পাইয়াছেন, তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত আমাদের এবং দেশের অন্য লোকদের আনন্দ ও কল্যাণের নিমিত্ত প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। না হওয়ায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি এবং দেশের অন্য লোকেরাও বঞ্চিত হইয়াছেন।

আমি ইয়োরোপে অল্প যে কয় জায়গায় আপনার সঙ্গে ছিলাম, তাহা হইতেই ইয়োরোপের অন্যত্র লোকেরা আপনাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বুঝিয়াছিলাম। আপনার সহিত পরিচিত হইবার ও নিকট সংস্পর্শ লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভের পর আপনি প্রথম যখন বিদেশ যাত্রা করেন, তখন আমার চক্ষে দিনের আলো ম্লান হইয়াছিল—ভাবিয়াছিলাম আমাদের দেশের বাহিরে পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, তাহারা আপনার লেখা পড়ে শুধু ইহাই ত তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট; আপনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তাহারা না-ই পাইল। কিন্তু ইয়োরোপে কয়েকদিন আপনার সঙ্গে থাকিয়া মানুষের আপনার সংস্পর্শ লাভে কি আনন্দ ও কল্যাণ তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আপনি যে আমাদের,

বাঙালীদের, ভারতবর্ষীয়দের একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, তাহা বুঝিয়াছি। ভারতবর্ষের বাহিরে আপনার প্রতি মানুষের মনের ভাব বুঝিবার সুবিধা বাঙালীদের হইত, যদি আপনার ভ্রমণসঙ্গীরা ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন।

আমার ইয়োরোপ দর্শনের বৃত্তান্ত মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত "Letters from the Editor" এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত "সম্পাদকের চিঠিতে" বাহির হইত। তাহাতে আপনার সম্বর্দ্ধনার কথাও থাকিত। তাহার পর আমার বহু বক্তৃতায় এবং ২/১টা প্রবন্ধে সে সব কথা বলিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে ত আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম না। সুতরাং আমার ক্ষোভ আছে। আমার বিচলিত হইবার অন্য কোন কারণ নাই।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৪

৭ মে ১৯৪১

১, উড্ স্ট্রীট,
Dated the 7th May 1941.

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৬ই মের চিঠিখানি পেয়েছি। এটি আষাঢ় মাসের প্রবাসীর জন্যে রাখলাম।

আজ আপনার "গল্পসল্প" পুলিনের কাছ থেকে আ-বাঁধা

অবস্থাতেই আনিয়েছিলাম জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসীতে" 'পুস্তকপরিচয়' বিভাগে উল্লেখ করবার জন্যে। কিন্তু করে ফেলেছি তার চেয়ে বেশি—একেবারে আগাগোড়া পড়ে ফেলেছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৫

১০ মে ১৯৪১

১, উড্ স্ট্রীট্,
১০ই মে, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আমি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে দুটি জিনিষ সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহা আপনার অবগতির জন্য পাঠাইতেছি।

এই দুটি বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত বক্তব্য লিখিব। এখন কেবল উল্লেখ করিলাম মাত্র।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৬

১১ মে ১৯৪১

১১ই মে, ১৯৪১।
রবিবার

ভক্তিভাজনেষু

"সাহিত্যে চিত্রবিভাগ", প্রবন্ধটি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম।

আজ রবিবার, প্রেস বন্ধ। কাল এটি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই দিবার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিব। এখন "বিবিধ প্রসঙ্গ" ছাড়া আর কিছুর জায়গা না থাকিবারই কথা। কিন্তু অন্য কিছু রাখিয়া দিয়া বা "বিবিধ প্রসঙ্গ" কমাইয়াও ইহা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দিতে হইবে।

বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা কেন officially দেওয়া আবশ্যক, আমি আজ তাহাও সংক্ষেপে বিবিধ প্রসঙ্গের জন্য লিখিয়াছি। ইহা যে গবর্ণমেণ্ট দিবেন, সে আশা আমি করিনা। কিন্তু যাহা হওয়া উচিত, আমি তাহাই বলিয়াছি। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট recognition ভিন্নও ইহা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় রূপে চালান যাইত, যদি যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আমাদের দেশে পাওয়া যাইবে না। পরে এ বিষয়টির আরও আলোচনা হয় ত করিব। আপাততঃ যাহা লিখিয়াছি, তাহা শীঘ্রই আপনার নিকট পাঠাইব। এ বিষয়ে আমার যতটুকু লেখা কম্পোজ হইয়াছে, তাহা আগেকার চিঠিতে আপনাকে পাঠাইয়াছি। ইতি

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৪৭

১৩ মে ’৪১

1, Wood Street,

Dated, the 13th May 1941.

ভক্তিভাজনেষু

সাহিত্যের চিত্রবিভাগ সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধটির প্রুফ দেখা হইয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে কাল বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখা একটি প্রবন্ধ আপনাকে পাঠাইতেছি। ইহা লিখিত হইবার ইতিহাস আমি যাহা অনুমান করি, তাহা আপনাকে মৌখিক জানাইব। আমি ১৬ই মে প্রাতে আপনার দর্শনপ্রার্থী। তখন দেখা হইলে কথা হইবে।

আপনাকে যে কখনও সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি করা হয় নাই, তাহার দায়িত্বটা আপনার উপর চাপান হইয়াছে। অথচ আপনার মুখেই শুনিয়াছি, আপনাকে সভাপতি করবার প্রস্তাব কখনও করা হয় নাই। আপনি পীড়িত হইবার পর, এক বৎসর আগে আপনাকে যে সভাপতি করিবার কথা তোলা হয়, সেটা makebelieve.

আপনাকে পরিষৎ অনেকবার সহকারী সভাপতিরূপে পাইয়াছিলেন, অথচ “অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও” সভাপতিরূপে আপনাকে তাঁহারা পান নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

পরিষৎকে রাজা বিনয়কৃষ্ণর বাড়ী হইতে সাধারণ স্থানে

আনিবার নিমিত্ত আপনি সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহা আপনার মুখে শুনিয়াছি। সে কথার কোন উল্লেখ প্রবন্ধটিতে নাই। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ—প্রবন্ধটির লাল দাগগুলি আমার দেওয়া নহে।

র. চ.।

৪৮

১৪ মে ১৯৪১

ক্লান্ত থাকিলে এই লম্বা চিঠি পরে পড়িবেন।

১৪ই মে, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আজ প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠসংখ্যা বাহির হইল। ইহার অন্য সব পাতা ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য একটি পাতা অতিরিক্ত ছাপিয়া মাঝখানে বসাইয়া দেওয়া হইল।

আপনাকে কাল "বঙ্গলক্ষ্মী" হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের যে প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছি, আপনাকে কোন বাদপ্রতিবাদে জড়িত করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। আপনাকে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ যে কখনও সভাপতি করেন নাই, ইহা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। এ বিষয়ে যাহা ঐতিহাসিক সত্য তাহা জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। এইজন্য পাতাটি পাঠাইয়াছি।

আপনাকে অক্স্‌ফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্‌টরেট প্রদানের

যে অনুষ্ঠান হয়, সেই সময়ে—কিছু আগে বা পরে—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, আপনাকে পরিষদের সভাপতি করিবার প্রস্তাব কেহ কখনও করেন নাই। এক বৎসর আগে যে আপনার মত এ বিষয়ে পরিষদের পক্ষ হইতে জানিবার চেষ্টা হয়, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার আগে, পরিষদের আধ শতাব্দীর জীবনে, যখন আপনি সুস্থ সবল ছিলেন, তখন আপনাকে কেন সভাপতি করা হইল না, ইহাই হইবে ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসা। হীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও" তাঁহারা আপনাকে কোনদিনই সভাপতি-রূপে পান নাই। এই অনেক চেষ্টা কি প্রকার, তাহা তিনি লেখেন নাই। "পরিষৎ-পরিচয়" নামক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বহিতে দেখিতেছি, পরিষদের কর্তৃপক্ষ আপনাকে সহকারী সভাপতিরূপে পাইয়াছিলেন ১৩০১, ১৩০২, ১৩০৩, ১৩০৮, ১৩১২, ১৩১৩, ১৩১৪-১৫, ১৩১৬ ও ১৩২৪ সালে। আপনি সহকারী সভাপতি হইতে রাজী হইয়াছিলেন এতবার, অথচ সভাপতি হইতে রাজী হইলেন না একবারও, কর্তৃপক্ষের "অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও" ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে।

হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আপনার পরিচয় দীর্ঘকালের, এবং তিনি আপনার রচনাবলী ও নানা কার্যের সহিত পরিচিত। লিখিবার বড় বড় এত বিষয় আপনার সম্বন্ধে থাকিতে, আপনি যে সাহিত্যপরিষদের সভাপতি হন নাই এই বিষয়টি সম্বন্ধেই কেন তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন, সে বিষয়ে আমার অনুমান

লিখিতেছি।

আপনাকে অক্‌সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্‌টর উপাধি দিবার পর আমি সে বিষয়ে প্রবাসীতে একটি নোট লিখি। বিবিধ প্রসঙ্গে সেই নোটটির পরেই আর একটি নোটে লিখি যে, আপনার সম্মানের অভাব নাই, সম্মানপ্রার্থীও আপনি নহেন, কিন্তু ইহা বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় যে, বিদেশে যিনি এত সম্মান পাইয়াছেন অযাচিত ভাবে, তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ একবারও সভাপতি করেন নাই। আমার এই নোটটি প্রেসে কম্পোজ করা হইয়াছিল, ছাপা হইতে যাইতেছিল, এমন সময় পরিষদের সেক্রেটারি ও প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারের মারফৎ আমাকে অনুরোধ করিলেন যেন ঐ নোটটি ছাপা না হয়। কারণ বোধ হয় এই, যে, ওটি ছাপা হইলে লোকে ব্রজেন্দ্রবাবুর মুরুব্বি যদুবাবু ও হীরেন্দ্রবাবুকে দোষ দিবে যে তাঁহারা আপনাকে কখনও সভাপতি করেন নাই। যাহা হউক, আমি নোটটি ছাপি নাই। পাছে আমি ভবিষ্যতে ঐরূপ কিছু লিখি তাহারই অগ্রিম জবাব ব্রজেন্দ্রবাবু হীরেন্দ্রবাবুর দ্বারা এই প্রবন্ধে দেওয়াইয়াছেন আমার অনুমান এই।

আপনাকে যে প্রবন্ধের পাতাটি পাঠাইয়াছি, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুরই দ্বারা লাল কালীতে চিহ্নিত "বঙ্গলক্ষ্মী" হইতে ছিন্ন।

এই দীর্ঘ পত্রের উত্তর চাহিতেছি না। ১৬ই মে শুক্রবার প্রাতে আপনার অনুমতি পাইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তখন আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানাইবেন। ইচ্ছা না করিলে কিছু বলিবেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব না। "পরিষৎ-পরিচয়" পুস্তক আমার সঙ্গে থাকিবে। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৯

১৭ মে ১৯৪১

১৭।৫।১৯৪১

ভক্তিভাজনেষু

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে এ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে আপনার যত লেখা পেয়েছি, প্রায় সবই না চেয়ে পাওয়া। এই জন্যে আপনার লেখা চাইবার অভ্যেস আমার হয়নি। কিন্তু "গল্পসল্প" পড়ে যখন দেখলাম, অন্তত ছোট ছোট গল্প আপনি এখনও লিখছেন, তখন আমার লোভ হয়েছিল, এবং এখনও আছে, স্বীকার করছি।

আপনি একটি গল্প ডিক্‌টেট্‌ করছেন শুনে আমি এ চিঠি লিখছি না—সেটি হয়ত অন্য কারও অনুরোধ অনুসারে লিখছেন। "গল্পসল্প" পড়ে আমি প্রলুব্ধ হয়েছি. এ কথা আপনাকে জানাব আগে থাকতেই স্থির ছিল। এই জন্যে এই চিঠি লিখলাম।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫০

২৬ মে ১৯৪১

২৬শে মে, ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার নূতন গল্পটি পেয়ে একান্ত অনুগৃহীত বোধ করছি। এত বড় আনন্দের কারণ আমার ঘটবে তা কল্পনা করিনি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫১

২৯ মে ১৯৪১

১নং উড স্ট্রীট,
২৯শে মে ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ২৭শে মে লেখা চিঠি এইমাত্র আজ ২৯শে মে পেলাম। চিঠিটি দেখ্‌ছি ২৮শে ডাকে দেওয়া হয়েছিল।

আপনার গল্পটির প্রুফ আজই আপনার কাছে পাঠান হবে। এর সংশোধন বা এর থেকে কিছু পরিবর্জন আপনি স্বয়ং করলে তা যে রকম মানানসই ভাবে করা হবে, আমার দ্বারা তা হবে না। সেইজন্যে সকলরকম অনাবশ্যক কাজ থেকে আপনাকে রক্ষা করবার ঔৎসুক্য আমার থাকলেও এই কাজটি আপনি যতটুকু পারেন করে বা করিয়ে দেবেন, আমার ইচ্ছা এইরূপ। আপনার কাছ থেকে প্রুফ ফেরত

এলে আমিও দেখব। কিছু করা দরকার হলে আমি ক'রব। তার অনুমতি আপনি দিয়েছেন, আমি জেনে রাখলাম।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫২

১ জুন ১৯৪১

১লা জুন ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৩১শে মে'র চিঠি অনুসারে আপনার গল্পটির ছাপা বন্ধ করিলাম। ইতি

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৩

১ জুন ১৯৪১

১নং উড স্ট্রীট,

Dated the 1st June 1941.

রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

আজ দিনের বেলা আপনার চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়েছি যে, গল্পটি আপনার ইচ্ছা অনুসারে ছাপা হবে না।

এর থেকে আপনি মনে করবেন না যে, আমি গল্পটিতে কোনো গুণ দেখিনি বা রস পাইনি। গুণ দেখেছিলাম, রসও পেয়েছিলাম। তবে সাহিত্যিক কোন বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তের উপর কথা বলার অভ্যাস আমার নেই, সেইজন্যে

প্রেসে লিখে দিয়েছি গল্পটি না ছাপতে। গল্পটিতে আপনি যে আক্রমণ আছে বলেছেন, তা আছে বটে। কিন্তু আমি তা বাদ দিয়ে বা বদলে সেটিকে আইনের ও বে-আইনী আইনের কবলের শঙ্কা থেকে মুক্ত করতে পারতাম।

যাক্— । আপনি যখন বলেছেন, ওটি করবেন না, তার উপর কথা নেই।

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৪
৪ জুন ১৯৪১

১নং উড স্ট্রীট
কলিকাতা
৪ঠা জুন ১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

"বদনাম" গল্পটি সম্বন্ধে আমার ত্রুটি হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ এইরূপ মনে হওয়ায় আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি। ইহার দৈর্ঘ্যের জন্য আগেই ক্ষমা চাহিতেছি।

আপনার ২৭শে মে'র চিঠিতে আপনি লিখিয়াছিলেন, "... আমার অনুরোধ এই,—এই লেখার যে সকল জায়গায় উত্তেজনার কারণ আছে সেখানে যথোচিত পরিবর্তন করাই উচিত। আপনি যদি এই সংশোধনে মনোযোগ করেন তবে আমি নিশ্চিন্ত হই।" আপনার এই আদেশ পালন করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমার নিজের

সাহিত্যিক বিচারশক্তি ও রচনাশক্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাস প্রযুক্ত এবং আপনার সাহিত্যিক বিচার ও শক্তির উপর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকায় আমি নিজে গল্পটিতে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন না করিয়া প্রুফে তাহা করিবার ভার আপনাকেই দিয়াছিলাম। তাহাতে আপনি হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন যে, আমার মতে গল্প প্রকাশযোগ্য নহে। বাস্তবিক কিন্তু আমার মত সেরূপ নহে। আপনি প্রুফ পাইবাব পর ৩১শে মে আমাকে লেখেন, "...এই গল্পটি এখনকার মত বন্ধ রাখাই ভালো মনে করি।" আমি ১লা জুন আপনার এই চিঠি পাইয়াই আপনাকে জানাই যে, গল্পটির প্রকাশ বন্ধ করিলাম। তাহাতেও আপনি মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে, আমার মতে গল্পটি প্রকাশযোগ্য নহে। বাস্তবিক কিন্তু আমি কখনও সেরূপ মনে করি নাই। আমি ১লা জুন দিনের বেলাকার চিঠিতে লিখিয়াছিলাম যে, গল্পটির প্রকাশ বন্ধ করিলাম, কিন্তু রাত্রে আমার প্রকৃত মত জানাইয়া আপনাকে একটি চিঠি লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম পরদিন ২রা জুন ডাকে দিব বলিয়া; কিন্তু diffidence বশতঃ তাহা ডাকে দেওয়া হয় নাই (তাহা এই চিঠির মধ্যে দিতেছি।)

আমার সামান্য যাহা সাহিত্যিক বিচারশক্তি ও রসানুভূতি আছে, তদনুসারে গল্পটি প্রকাশযোগ্য। উহার রস আমি আস্বাদন করিয়াছি। উহার অন্য উপযোগিতা এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষও যথেষ্ট আছে। উহার দুই এক জায়গায় অল্প যে

পরিবর্তন আবশ্যক তাহা আমিই হয়ত করিতে পারিতাম। জায়গাগুলি আমি দাগও দিয়াছিলাম, কিন্তু diffidence বশতঃ পরিবর্তন করি নাই। পরিবর্তন করিয়া দিলে, গল্পটি সম্বন্ধে আপনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা থাকিত না।

আমি এ সকল কথা লিখিলাম গল্পটি সম্বন্ধে আমার মত জানাইবার নিমিত্ত এবং আপনার আদেশ পালন না করায় আমার যে ত্রুটি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিবার নিমিত্ত। "গল্পটি প্রকাশ করিতে অনুমতি দিন," এই চিঠিটিকে এরূপ কোন আবেদন বা অনুরোধ মনে না করিলে বাধিত হইব। আপনি উহার প্রকাশ বন্ধ করিতে বলিয়াছেন, ইহা আমি চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

ছোট খামের ভিতর, ১লা জুন রাত্রে লিখিত যে চিঠিটা আছে, তাহা মনের বিচলিত ও ব্যস্ত অবস্থায় লেখা। তার অসংযমের ক্ষমা চাহিতেছি। গল্পটি প্রকাশ করিতে না পারায় আশাভঙ্গজনিত চিত্তচাঞ্চল্য হইয়াছিল। চিঠিটা সেই অবস্থায় লেখা। এখন মনের সে অবস্থা নাই। দীর্ঘ চিঠির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৫

৪ জুন ১৯৪১

৪ঠা জুন, ১৯৪১।
রাত্রি।

ভক্তিভাজনেষু

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত আপনাকে একটি কথা জানাইতেছি। আপনি বিবেচনা করিলে উপকৃত ও সুখী হইব।

আপনার "সাহিত্য, গান, ছবি" শীর্ষক যে প্রবন্ধের প্রুফ আপনার নিকট আজ গিয়াছে, তাহার এক জায়গায় আছে, "তখন দেখতুম মেয়েদের সতীত্বধর্মর দুরন্ত তেজ", ইত্যাদি। আপনি যে প্রকৃত সতীত্বধর্মকে উপহাস করেন নাই, তাহা আমি বুঝি। কিন্তু বাংলাদেশে এখন একদল লেখক আছে যাহারা, কি পুরুষ কি নারী, সকলেরই চারিত্রিক শুচিতা মূল্যহীন মনে করে ; আমার আশঙ্কা এই যে, তাহারা আপনার উক্তিটিকে তাহাদের মতের সমর্থক মনে করিতে পারে। এই আশঙ্কাও আমার আছে যে, আপনার এই কথাগুলি অবলম্বন করিয়া আপনার নিন্দুকেরা আপনার বিরুদ্ধে propaganda চালাইতে পারে। ইহারা এখনও সক্রিয় আছে। তাহাতে অবশ্য আপনার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাতে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবান লোকেরা ব্যথা পাইবেন এবং নিরপেক্ষ এমন অনেক লোক আপনাকে ভুল বুঝিতে পারেন, তলাইয়া চিন্তা করিয়া কোন জিনিষ

বুঝিতে যাঁহারা অভ্যস্ত নহেন।

এই জন্য আমার মনে হয়, আপনি "সতীত্বধর্মের দুরন্ত তেজ" শব্দগুলি ব্যবহার না করিয়া অন্য প্রকারে আপনার বক্তব্য বলিলে ভাল হয়। আমার নিজের মতে আপনার কথাগুলি সুপ্রযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময়, লোকে যাহাতে ভুল না বুঝে বা কুব্যাখ্যা করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে লেখার সাহিত্যিক উৎকর্ষ (literary excellence) বলি দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

আমার আশঙ্কা অমূলক হইতে পারে। কিন্তু যাহা মনে হইয়াছে তাহা আপনাকে জানান আবশ্যক বোধ হওয়ায় জানাইলাম।

এই প্রবন্ধটিতে আপনি এক জায়গায় বিষ্ণু ওস্তাদের উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মনে হইতেছে, আপনি আপনার অন্য একটি রচনায় যদুভট্ট ওস্তাদের আপনাকে ধরিবার চেষ্টার কথা লিখিয়াছেন। হয়ত উভয় ওস্তাদই ঐরূপ চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। ইতি—

প্রণত
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৬

৫ জুন ১৯৪১

৫।৬।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

"বদনাম" গল্পটি সম্বন্ধে আপনাকে আগে দু'খানা চিঠি

লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, আপনার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা না জানিয়া সে দুটা ডাকে পাঠাইতে ভরসা হয় নাই। আজ আপনার ৪ঠা জুনের চিঠি পাইয়া সেই দুটা চিঠি পাঠাইতেছি। গল্পটি সম্বন্ধে আমার মত সেই দুটাতে পাইবেন। উহা নিশ্চয়ই প্রকাশযোগ্য। আমি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। সামান্য পরিবর্তন আবশ্যক। তাহা আপনার দ্বারা অনুমোদন করাইয়া আনিতে অল্প সময় লাগিবে, এবং তখন আষাঢ়ের প্রবাসীতে স্থানও থাকিবে না, বা যথেষ্ট থাকিবে না। অতএব, আপনার মত হইলে আমি উহা আপনার সংশোধন ও অনুমোদনান্তে শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, ইহাতে আপনার আপত্তি হইবে না।

যদি আষাঢ়েই ছাপানো একান্ত আবশ্যক মনে করেন, টেলিগ্রাফ করাইবেন; চেষ্টা দেখিব। কিন্তু দুঃসাধ্য হইবে।

বুদ্ধদেব বাবুকে লেখা চিঠিটির প্রুফ আপনার কাছে আগেই চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা আষাঢ় সংখ্যায় ছাপিব। সে সম্বন্ধে একটি চিঠিও আপনাকে আজই পাঠাইয়াছি। বুদ্ধদেব বাবুকে আপনি সাহিত্য, গান ও ছবি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব মূল্যবান। সমস্তই সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাইবে। তাঁহাকে আপনি দু-এক জায়গায় যে certificate দেওয়া গেছে [গোছের] প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার দোকানদারী অপব্যবহার তিনি ও তাঁর

গ্রুপের লোকেরা করিতেও পারেন। এইজন্য সেগুলি, আপনি অনুমতি দিলে, বাদ দিতে পারি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৭

৫ জুন ১৯৪১

৫।৬।১৯৪১।

ভক্তিভাজনেষু

আপনি মিস্ রাথবোনের চিঠিটা উপেক্ষা না করায় ভারতবর্ষের কল্যাণ হইয়াছে—সত্যপ্রিয়, ন্যায়পরায়ণ ও মানবজাতির-স্বাধীনতাপ্রিয় সমুদয় বিদেশী লোকেরাও সত্যকথা জানিয়া উপকৃত হইবে, যদি আপনার কথা তাহাদের নিকট পৌঁছিতে দেওয়া হয়। আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন যে, মিস্ রাথবোন "ভারতহিতৈষী" ইংরেজদের মুখপাত্র।

আপনি যাহা লিখিয়াছেন অন্য কেহ তাহা লিখিতে পারিতেন না, লিখিলেও তাহা খবরের কাগজে ছাপা হইত না—ভারত "রক্ষা" (!) আইন অনুসারে চাপা পড়িত।

ইংরেজী বিবৃতিটির আপনার অনুমোদিত কোন অনুবাদ থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিতে বলিবেন। মাসিক কাগজে তাহা থাকিলে ভবিষ্যতের বাঙ্গালীরাও তাহা পড়িতে পারিবে। তাহাতে তাহাদের জ্ঞান ও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বাড়িবে। ইতি—

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৫৮

৬ জুন ১৯৪১

১নং উড্ স্ট্রীট,
৬।৬।১৯৪১ ।

ভক্তিভাজনেষু

গল্পটির প্রুফ পাইলাম। আবার আগাগোড়া কম্পোজ করিয়া আমাকে প্রুফ দিতে প্রেসে লিখিয়া দিলাম। আপনার নিকট আবার প্রুফ পাঠাইবার সময় হইবে না। ইতি—

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ একটি ফর্মা (৮ পৃষ্ঠা) অতিরিক্ত ছাপিতে হইবে। কারণ, আপনার গল্পটির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অন্য গল্প ছাপা হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেও এখন আর সময় নাই বলিয়া আপনাকে আর প্রুফ পাঠান চলিবে না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৫৯

৭ জুন ১৯৪১

৭।৬।১৯৪১ ।

ভক্তিভাজনেষু

“সাহিত্য, গান ও ছবির” প্রুফ পেয়েছি। আপনার চিঠি পেয়েছি।

লেখাটির প্রুফ আমি একবার দেখে দিয়ে ছাপতে বোলবো। আপনার অনভিপ্রেত কিছু যাতে না থাকে, তার চেষ্টা আমি ক'রবো।

গল্পটি আষাঢ়ের প্রবাসীতেই ছাপা হবে। অন্য লেখা কিছু কিছু শ্রাবণের প্রবাসীর জন্যে রেখে দিচ্ছি। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬০

৯ জুন ১৯৪১

1 Wood Street
Dated, the 9th June 1941

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৮ই জুনের চিঠি ও তার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে আপনার নূতন লেখাটুকু পেয়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রুফ আমি দেখব।

আমি যথাসাধ্য আপনার ইচ্ছার অনুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করব। আশা করি, কিছু ত্রুটি হ'লেও গুরুতর কিছু হবে না।

ব্যারামের ভোগের উপর আপনার এই সব দুর্ভোগ নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৬১

২৫ জুন ১৯৪১

1 Wood Street,
Dated, the 25th June 1941.

ভক্তিভাজনেষু

আপনার কল্যকার চিঠি পেয়ে আমার মন থেকেও একটা বোঝা নেমে গেল। এই চিঠিটি শ্রাবণের “প্রবাসীতে” আপনার যে পত্রাবলী বেরবে, তার গোড়াতেই ছাপা হবে।

আপনার যে ভ্রমণবৃত্তান্তটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বাংলায় হ'লে “প্রবাসী”তে, ইংরেজীতে হলে “মডার্ন রিভিয়ু”তে ছাপা হতে পারবে অবশ্য, যদি আপনার ইচ্ছা সেইরূপ হয়। আমার কোন দাবী নাই। কেবল যা মনে হল, তাই লিখলাম। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬২

৮ জুলাই ১৯৪১

৮ই জুলাই, ১৯৪১

ভক্তিভাজনেষু

আপনার ৭ই জুলাইয়ের চিঠি পেলাম।

সকালে সুধাকান্ত ও সুধীরবাবুর চিঠি পেয়েই আমি সুধীরবাবুর প্রেরিত প্রবন্ধটি ছাপতে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। আপনার সম্মতি ভিন্ন সেটি কোনমতেই ছাপা হ'ত না।

এর জন্যে যে আপনাকে চিঠি লিখতে হয়েছে, এতে আমি বড় দুঃখিত।

আমাকে লেখা আপনার যে-সব চিঠি প্রবাসীতে ছাপা হচ্ছে, তার দু-একটিতে শান্তা ও সীতার নাম আছে তাই দেখে শান্তার এক কন্যা তাঁর মার কাছে দুঃখ জানিয়েছেন, "চিঠিতে কেমন তোমাদের নাম ছাপা হয়, আমাদের হয় না।" তাতে শান্তা কন্যাকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, "তোমরা বড় হও, তখন তোমাদেরও নাম বেরবে" তাতে কন্যাটি বললেন, "ওঁর (অর্থাৎ আপনার) চিঠিতে তো বেরবে না।" ইতি।—

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬৩

ভক্তিভাজনেষু

শ্রীমতী লীলাবতী রায়কে আমি কয়েক বৎসর আগে হইতে জানি এবং ঢাকায় তাঁহার অনুষ্ঠিত শিক্ষাদান কার্য্য ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় দেখিয়াছি। এইরূপ কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। আপনিও বোধ হয় নামে তাঁহাকে চিনেন এবং তাঁহার কাজের কথাও শুনিয়া থাকিবেন। ইতি।

প্রণত

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-রামানন্দ-প্রসঙ্গ

প্রবাসী- ও মডার্ন রিভিয়ু-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ প্রায় চুয়াল্লিশ বছরের। রামানন্দ-সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বিদায়' ('কল্পনা' কাব্যে সংকলিত) ১৩০৫ এর বৈশাখে যখন প্রকাশিত হয়, তখনও দুজনের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় নি। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে জানতেন। রামানন্দ সিটি কলেজে অধ্যাপক থাকার সময় 'দাসী' (প্রকাশ ১৮৯২) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাতে গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' (১৩০২ ফাল্গুন) কাব্যের সমালোচনা করেন। পরের মাসেই (১৮৯৬ মার্চ) রামানন্দ নিজেই রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতাটির একটি সমালোচনা লেখেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে এলাহাবাদে আসেন। এখানে আসার কিছুদিন পর তিনি 'দাসী'র সম্পাদনাভার ত্যাগ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'প্রদীপ' পত্রিকা। রামানন্দ তার সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ 'প্রদীপে' প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রদীপ' উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। সেকালের প্রায় সব বিখ্যাত লেখকই এতে লিখতেন। 'প্রদীপে'র বৈশিষ্ট্য ছিল ত্রিবর্ণচিত্র মুদ্রণ। যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরী' চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-জীবনীকার অনুমান করেন রামানন্দই রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চিত্রের ব্যাখ্যামূলক

একটি প্রবন্ধ চেয়ে থাকবেন।[1]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একবার এলাহবাদে যান। মৃত বলেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। তখনই রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় (১৯০০) রামানন্দের বাড়িতে।

১৩০৬ মাঘ মাসে রামানন্দ 'প্রদীপে'র সম্পাদনাভার ত্যাগ করেন। ১৩০৮ সালের বৈশাখে (১৯০১ এপ্রিল) প্রকাশিত হল সুবিখ্যাত প্রবাসী। রামানন্দ আমৃত্যু এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই পত্রিকার দানের কথা সকলেই জানেন। এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ কত ঘনিষ্ঠ ছিল, রামানন্দকে লেখা পত্রেই তার প্রমাণ। তাঁর অজস্র কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসীতে। সবুজপত্র বা বিচিত্রায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হলেও প্রবাসীর দাবী ছিল সর্বাগ্রগণ্য। শুধু নিজের লেখা নয়, প্রবাসীতে সংকলনের জন্য তিনি নিজে অথবা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের দ্বারা বিদেশী পত্রিকার রচনার অনুবাদ করিয়ে পাঠাতেন। রামানন্দ লিখেছেন—

'রবীন্দ্রনাথ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসীর জন্য বিলাতী ও আমেরিকার বহু মাসিক পত্রের ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া তাহার কোন কোন অংশ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাহাকে কাহাকেও অনুবাদ করিতে দিতেন, সমুদয় অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন এবং কোন কোন অনুবাদ সন্তোষজনক না হইলে স্বয়ং সমস্তটি লিখিয়া দিতেন, তখন তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলেন না।'[2]

---

[1] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড, ১৯৭০. পৃ. ৫০৪

[2] প্রবাসী ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৬০-৬১

রবীন্দ্রনাথ সাময়িক পত্রে লিখে দক্ষিণা পান প্রবাসীতেই প্রথম। একথা রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে স্মরণ করেছেন। প্রবাসীর দক্ষিণা দেওয়া নিয়ে ভারতী পত্রিকা কটাক্ষ করলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

'এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার। তারপরে এই ইতিহাসের ধারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন, তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুঃকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয়

দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্ম্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী' সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।'[৩]

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ প্রকাশ করলেন মডার্ণ রিভিয়ু। এই পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের মূল অথবা অনুবাদিত রচনা প্রকাশিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন—

'রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামীর যুগ্মনামে কবির ইংরেজি অনুবাদকবিতা দুইটি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯১১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, শিশুকাব্যের "জন্মকথা" ও "বিদায়"। সেই সময় হইতে প্রায় প্রতি মাসে রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো রচনার তর্জমা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে। এই অনুবাদকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছে পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। ১৯১১ হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে মডার্ন রিভিউতে তাঁহার বহু অনুবাদ মুদ্রিত হয়।…

১৯১০ সালের মার্চ মাসের মডার্ন রিভিউতে পান্নালাল বসু-কৃত 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর অনুবাদ মুদ্রিত হয়।'[৪] স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর পূর্বে ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে 'সমস্যা-পূরণ' গল্পটি ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারের দ্বারা অনুবাদিত হয়ে মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এণ্ডরুজ লিখিত যে প্রবন্ধটি রামানন্দ মডার্ণ রিভিয়ুতে (অগস্ট ১৯১২—An Evening with Rabindra) প্রকাশ করেন সেটি তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজের লেখনী-নিঃসৃত সর্বপ্রথম রচনা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য—

---

[৩] সবুজপত্র ১৩৩৩ আশ্বিন পৃ ৬-৭

[৪] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয়খণ্ড ১৯৭৭, পৃ ৩১৪।

'তখন কবি সম্বন্ধে বাংলার বাহিরে কেহই বিশেষ কিছু জানিত না·—জীবনস্মৃতির ইংরেজি তর্জমা তখনো হয় নাই। কবি সম্বন্ধে কোনো বই প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং নানা কারণে এই প্রবন্ধটিকে সময়োপযোগী রচনা বলিতে হইবে।'[৫]

প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকা বঙ্গদেশে, বঙ্গের বাইরে ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে মডার্ণ রিভিয়ু রবীন্দ্রনাথের নানা রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেশে ও বিদেশে কবির অভিমত পৌঁছে দিয়েছে।

রামানন্দ শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারেই প্রয়াসী হন নি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ প্রচারেও সাহায্য করেছিলেন। বোলপুর ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। ১৯০৮ সালে রামানন্দ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় স্থায়িভাবে চলে আসেন। ১৯১১ সালে তিনি 'রাজা' নাটকের অভিনয় উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথমে আসেন। ১৯১৭ তে রামানন্দ শান্তিনিকেতনে বেশ কিছুদিনের জন্য বাস করতে আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র মুলুকে তিনি এখানেই ভরতি করে দেন। মুলুর অকালবিয়োগের (১৯১৯ সেপ্টেম্বর) পূর্বেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। শান্তিনিকেতনে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা প্রবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হত—একথা রামানন্দ বলে গিয়েছেন। ১৯২৫-এ রামানন্দ বিশ্বভারতীর কলেজ-বিভাগে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন; তবে কোনো কোনো বিষয়ে মতান্তরের জন্য পদত্যাগ করলেও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের আদর্শ প্রচারে কখনোই ক্ষান্ত হননি। বস্তুত প্রবাসীর সর্বজন-পঠিত

---

[৫] তদেব পৃ ৪৩৫

‘বিবিধ প্রসঙ্গ’টিতে এ সম্পর্কে সংবাদ প্রায়শঃ দেখা যেত।[৬] রামানন্দের বিশেষ সতর্কতা ছিল রবীন্দ্রনাথের কার্যধারার যেন কখনোই ভুল ব্যাখ্যা না হয় এবং শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠান, শিক্ষাক্রম যেন সর্বজন-গোচর থাকে।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯১২তে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তখন রামানন্দ ছিলেন নেপথ্যে সক্রিয়। ১৯৩১-এ কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রশস্তি-গ্রন্থ ‘Golden Book of Tagore’ রামানন্দই সম্পাদনা করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রপরিচয়-সভা প্রকাশিত জয়ন্তী-উৎসর্গ গ্রন্থে (১৩৩৮) রামানন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটি রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তাঁর বহু রচনার অন্যতম ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

[৬] দ্রষ্টব্য, সোমেন্দ্রনাথ বসু, প্রবাসী : সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, ১৯৭৬।

পত্র ১। ‘প্রদীপ’ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত (পৌষ ১৩০৪—মাঘ ১৩০৬) মাসিক পত্রিকা। ‘প্রদীপ’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত ১৩০৫ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসের যুগ্ম সংখ্যা সম্পর্কে। এই পত্রে উল্লিখিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ এবং নগেন্দ্র গুপ্তের গল্প ‘হীরার মূল্য’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকার ‘সাময়িক-সাহিত্য’ বিভাগেও (অগ্রহায়ণ ১৩০৫ পৃ ৭৬৪-৬৫) প্রশংসা-সূচক মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ‘রাসায়নিক পরিভাষা’ এই সংখ্যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

পত্র ২। জার্মান কাগজগুলির পরিচয় জানা যায় না। প্রবাসী পত্রিকার ‘সংকলন ও সমালোচন’ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করে পাঠাতেন।

পত্র ৩। ‘ইংরেজি পত্রখানি’। এটি ৪ জানুয়ারি ১৯০৯-এ নিউইয়র্কের আইনজীবী M. H. Phelpsকে লিখিত পত্র। ভারতবর্ষের তৎকালীন সমস্যা কি ছিল এবং তিনি কিভাবে ভারতকে সাহায্য করতে পারেন জানতে চেয়ে ফেল্‌প্‌স্‌ রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিয়েছিলেন। তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসের ধারা ব্যাখ্যা করে ভারতের তৎকালীন সমস্যাটি উপস্থাপিত করেন। পত্রটি মডার্ন রিভিয়ু, অগস্ট ১৯১০-এ মুদ্রিত হয়।

লক্ষণীয়, এই পত্রটি যে-সময়ে লেখা হয় তখনও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত হন নি। কিন্তু তখনই আমেরিকার এই বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ চলেছে। অনুমান করা যায় ইলিনয়ে অধ্যয়নরত রথীন্দ্রনাথের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফেল্পস-এর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ

১৯০৬ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ইলিনয়ে ছিলেন। এই সময়ে ইলিনয়ে তিনি 'কসমোপলিটান' ক্লাব গঠন করেন এবং এর সভাপতি হন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এই রকম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রথীন্দ্রনাথ 'অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবস্' গঠন করেন। সম্ভবত এরই সূত্র ধরে ফেল্পস্ ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কে কৌতূহলী হন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯২২ সালে ফেল্প্স্ ভারত ভ্রমণে এসে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের কৃষি-ফার্ম পরিদর্শন করেছিলেন। ফেল্প্সকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের মুখ্যাংশ নিম্নে মুদ্রিত হল :

'... I need not dwell at length on the evils of the resulting caste system. ... It has largely contributed to the freedom from narrowness and intolerence which distinguishes the Hindu religion and has enabled races with widely different culture and even antagonistic social and religious usages and ideals peaceably side by side—a phenomenon which cannot fail to astonish Europeans who, with comparatively less jarring elements have struggled for ages to establish peace and harmony among themselves. But this very absence of struggle, developing into a ready acquiescence in any position assigned by the social system, has crushed individual manhood and has accumstod us for centuries not only to submit to every form of domination, but sometimes actually to venerate the power that holds us down. The assignment of the business

of government almost entirely to the military class reacted upon the whole social organism by permanently, excluding the rest of the people from all political co-operation, so that now it is hardly surprising to find the almost entire absence of any feeling of common interest, any sense of national responsibility, in the general consciousness of a people of whom as a whole it has seldom been any part of their pride, their honour, their dharma, to take thought or stand up for their country. This completeness of stratification, this utter submergence of the lower by the higher, this immutable and all-pervading system, has no doubt imposed a mechanical uniformity upon the people but has at the same time kept their different sections inflexibly and unalterably separate, with the consequent loss of all power of adaptation and re-adjustment to new conditions and forces....

The mechanical incompatibility and consequent friction between the American colonies and the parent country was completely done away with by means of a forcible severance. The external force which in the eightneenth-century-France stood to divide class from class had only to be overcome by *vis major* to bring emancipation to a homogeneous people. But here in India are working deep-seated social forces, complex internal reactions, for in no other country under the sun has such a juxtaposition of races, ideas and religions occured ; ··· At the sacrifice of her own political welfare she has through long ages borne this great burden of heterogeneity, patiently working all the time to evolve out of these warring contradictions a great synthesis. ··· For us, there can be no question of blind revolution, but of steady and purposeful education. If to break up the feudal system and the tyrannical conventionalism of the Latin Church which had outraged the healthier instincts of humanity, Europe had needed the thought-impetus of the Renaissance and the fierce struggle of the Reformation, do we not in a greater degree need an overwhelming influx of higher social ideals before a place can be found for true political thinking? Must we not have the greater vision of humanity which will impel us to shake off the fetters that shackle our individual life before we begin to dream of national freedom? ····.

We have begun to be dimly conscious of the value of the time we have allowed to slip by, of the weight of the clogging effete matter which we have allowed to accumulate, and are angry with ourselves. We have also begun to vaguely realize the failure of England to rise to the great occasion, and to miss more and more the invaluable co-operation which it was so clearly England's mission to offer.'

'চারুকে ··· পাঠাইয়াছি'। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রেরিত এই তিনটি কবিতা 'প্রণতি' (যেথায় থাকে সবার অধম), 'সাধন' (ভজন পূজন সাধন আরাধনা), এবং 'রাজবেশ' (রাজার মত বেশে)। প্রবাসী,

ভাদ্র ১৩১৭ সালে প্রকাশিত।

পত্র ৪। 'বক্তৃতার দিনটা'—মৌখিক ভাষণ 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা' বৃহস্পতিবার ১২ মাঘ ১৩১৭ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভায় কথিত। এটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৩ শক এবং প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮ তে মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৫। আনন্দ কে. কুমারস্বামীর (১৮৭৭-১৯৪৭) মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল বিংশ শতকের প্রথম থেকেই জাগ্রত ছিল। ১৯০৭ সালে তিনি যখন প্রথম ভারতভ্রমণে আসেন, তখন থেকেই হ্যাভেল প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা আর্ট স্কুল' এবং এর তৎকালীন সহ-অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ১৯০৯ এর জানুয়ারিতে কুমারস্বামী জোড়াসাঁকোতে অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে কিছুকাল বাস করেন। মনে হয় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে।

কুমারস্বামী ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আভাসিত ভারতের নিজস্ব জীবনদর্শনকে জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করবার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি তর্জমা করতে আগ্রহী হন।

১৯১১-র মার্চ-এপ্রিলে মডার্ণ রিভিয়ুতে অজিত চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় কুমারস্বামীর অনুবাদিত 'Janmakatha' ও 'Biday' (Farewell) প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, কুমারস্বামী তাঁর 'Art and Swadeshi' (1911, Madras) গ্রন্থের 'Poems of Rabindranath Tagore' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী-

কৃত কয়েকটি রবীন্দ্র-কবিতার তর্জমা পরিমার্জনা করে ঐ গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এইগুলি হল : (১) The Touch Stone—খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর (২) The way of Salvation—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি (৩) The Meta-Physics of a Poet—যার খুসি রুদ্ধ চক্ষে (৪) Salvation—চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি (৫) The Guide—অদৃষ্টেরে শুধালেম, (৬) Death—ওগো মৃত্যু তুমি যদি (৭) The Creation of Woman—শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী (৮) Is it true—এ কি তবে সবই সত্য—ইত্যাদি। এই অনুবাদ প্রসঙ্গে কুমারস্বামী ঐ প্রবন্ধে বলেন : 'The translations convey only a shadow of the original poetry, they give only meaning, that in the songs themselves is inseparable from their music. Some are based on versions supplied to me by Mr. A. K Chakravarti, others on translations given to me by the author himself'. (Ananda K. Coomaraswamy. Art and Swadeshi, p. 126).

ভগিনী নিবেদিতাকৃত 'কাবুলীওয়ালা'র ইংরেজি তর্জমা জানুয়ারি, ১৯১২ সালে মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত এবং ১৯১৬ সালে 'Hungry Stones and Other Stories' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

'ছুটি'র তিনটি অনুবাদ হয়েছিল। নিবেদিতাকৃত তর্জমাটি পাওয়া যায় নি। 'Hungry Stones' (১৯১৬) গ্রন্থে 'ছুটি'র যে ইংরেজি অনুবাদটি 'The Home Coming' নামে সংকলিত হয়েছে সেটি

এগু অকৃত। 'ছুটি'র অপর অনুবাদ 'The School Closes' রজনীরঞ্জন সেনের 'Glimpses of Bengali Life (১৯১৩) গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ৬। 'তত্ত্ববোধিনীতে···চাহিয়া ছিলেন'। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'।

'ইংরেজি গল্পের তর্জমা'—মাধুরীলতার অনুবাদিত এই গল্পটি 'মামাভাগ্নী'—প্রবাসীতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সালে মুদ্রিত।

'ব্যাকরণের প্রথমাংশ'—'বাংলা ব্যাকরণের তির্যকরূপ'—প্রবাসীতে আষাঢ়, ১৩১৮ সালে মুদ্রিত।

'বোলপুরে কলেজ স্থাপন'—শান্তিনিকেতনে এই কলেজ বা 'শিক্ষাভবনে'র প্রতিষ্ঠা হয় আরও অনেক পরে' ১৯২৫ সালে। এর প্রথম অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দ্রঃ রামানন্দের পত্র ৪ ও ৫।

পত্র ৭। 'জীবনস্মৃতি'—প্রবাসীতে জীবনস্মৃতির প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩১৮ থেকে ধারাবাহিকরূপে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত।

'অত্যুৎসাহী শিক্ষক'—সম্ভবত কালীমোহন ঘোষ। দ্রঃ পত্র ৮

'অজিতের লেখাটা'—১৩১৮ সালে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত 'রবীন্দ্রনাথ'—এই বৎসর প্রবাসীর আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত।

'বড়দাদার লেখাটা'—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ'—যুগপৎ প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনীতে আষাঢ় ১৩১৮ থেকে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত।

পত্র ৮। 'অ জিতেরই লেখার'—পূর্বপত্রে উল্লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ।

'জীবনস্মৃতি'—১৩১৮ সালের ২৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে একটি ঘরোয়া আসরে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন এর 'বালক' অংশ পর্যন্ত রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই লেখাটিই সংশোধন করে, সম্পূর্ণ করে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। জীবনস্মৃতির এই পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত খসড়াটি সীতাদেবীর কাছে রক্ষিত ছিল। বর্তমানে এটি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

পত্র ৯। 'প্রতীক্ষা'—সম্ভবত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্রের রচনা। প্রকাশকালে গল্প রচয়িতার নাম ছিল 'রতন'। এটি একটি ইংরেজি গল্প অবলম্বনে লিখিত এবং প্রবাসীতে আষাঢ় ১৩১৮ সালে প্রকাশিত।

'নিজের সম্পাদকী দপ্তরের'—রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বৈশাখ ১৩১৮ থেকে চৈত্র ১৩২১ পর্যন্ত।

পত্র ১১। 'হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ৭ কার্তিক, ১৩১৮ সালে রিপণ কলেজ হলে পঠিত হয়। এটি প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সালে মুদ্রিত ও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ১২। 'নিবেদিতা'—নিবেদিতার মৃত্যুতে (অক্টোবর ১৯১১) রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য, প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সালে মুদ্রিত।

পত্র ১৩। 'জয় পরাজয়ের তর্জমাটি'—যদুনাথ সরকারের অনুবাদিত 'Victorious in Defeat,' মডার্ণ রিভিয়ুতে, ডিসেম্বর ১৯১১ সালে মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথকৃত এর অপর তর্জমা 'The Victory'—

'Hungry Stones and Other Stories' (১৯১৬) গ্রন্থে সংকলিত।

'গোপন রাজদণ্ডপাত'—নবেম্বর ১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গ-আসাম সরকার এক গোপন ইস্তাহারে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়কে সরকারী কর্মচারীদের পুত্রদের পক্ষে অনুপযোগী বলে ঘোষণা করেন। এই সম্পর্কে মডার্ণ রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারি, ১৯১২ এবং Myron H. Phelps এর বিবৃতি, অমৃতবাজার পত্রিকা, ২, ফেব্রুয়ারি ১৯১২ দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৪। 'দৌহিত্রের'. —নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৩২)

'রূপ ও অরূপ'—প্রবাসী পৌষ ১৩১৮তে মুদ্রিত। 'হেমলতা বৌমার কবিতাটি'—কবিতাটি 'মহান', প্রবাসীর উপরিউক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত।

পত্র ১৫। 'ধর্মশিক্ষা প্রবন্ধটি'—সিটি কলেজে একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনীতে ১১ পৌষ সকালে এটি পঠিত হয় এবং 'তত্ত্ববোধিনী', মাঘ ১৩১৮ সালে মুদ্রিত হয়। পরে এটি পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত ও 'সঞ্চয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ১৬। 'বড়দিদির লেখা'—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর লেখা 'পিতৃস্মৃতি' প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮ সালে মুদ্রিত হয়। 'ধর্মের অধিকার'ও প্রবাসীর উক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৮। 'আমার মেয়াদ ··· যাইতে হইবে।' এই অনবকাশের কারণ,—এই বৎসর ১৯ মার্চ তারিখে কবির বিলাত যাত্রা স্থির হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই যাত্রা পণ্ড হয়। পরে ২৪ মে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কবির

প্রথম বিলাত যাত্রা ঘটেছিল উচ্চশিক্ষার প্রয়াসে ১৮৭৯ সালে। দ্বিতীয়বার ১৮৯০ সালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। এবারে এই তৃতীয়বার বিলাত যাওয়ার মূলে একদিকে ছিল বাইরে বেরিয়ে পড়বার জন্য অন্তরের দুর্নিবার স্পৃহা অন্যদিকে তাঁর গল্প ও কবিতার তর্জমা পাঠে মুগ্ধ শিল্পী রোটেনষ্টাইনের একান্ত আগ্রহ। বস্তুত, রোটেনস্টাইনের আগ্রহে ও অনুরোধে লণ্ডন থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও প্রমথলাল সেন রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডন যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই সঙ্গে তাঁরা জানান যে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন গেলে তাঁর 'মনের মত' লোকের অভাব হবে না।

দ্র: W. Rothenestine, Men and Memories p. 263

পত্র ২৯। 'পাঠ্যবহিটা'—পাঠসঞ্চয়, ১৩৩৯ সালে ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত।

'আর একটি বই'—'গল্প চারিটি', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা', 'দর্পহরণ' ও 'মাল্যদান' এর সমষ্টি ; এটি আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮ মার্চ ১৯২২-এ প্রকাশিত।

'সাক্ষ্যদান'—'আটটি গল্প' গ্রন্থে (১৩১৮, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত) গল্পটির নাম ছিল 'সাক্ষী'। গল্পগুচ্ছে এর পুনর্নামকরণ হয় 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'।

পত্র ২৩। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস ·· দিয়াছি'—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'। পরবর্তী পত্রপরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৪। 'শিক্ষা সম্বন্ধে ··· লিখিয়াছিলাম'—এই লেখা 'আমেরিকার একটি বিদ্যালয়'—প্রকাশ, প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৬।

'প্রবন্ধ পাঠ সভায় ··· ভাবনার কথা।' এই প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে ৩ চৈত্র ১৩১৮ সালে ওভার্টুন হলে পঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী। এ বিষয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সংবাদ এইরূপ: 'A meeting of the Chaitanya Library will be held in the Overtoune Hall, on Saturday next at 5-30 P.M. when Babu Rabindranath Tagore will read a paper on "The Evolution in Indian History" Mr. Justice Chowdhury will preside' (The Statesman, Tuesday, March 14, 1912).

এই প্রবন্ধটির যদুনাথ সরকারকৃত ইংরেজি অনুবাদ 'My Interpretation of Indian History'—মডার্ণ রিভিয়ু, অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯১৩-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ সম্পর্কে নানারূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯ এ মুদ্রিত হয়।

এই প্রবন্ধটি ১৩২৩ সালে 'পরিচয়' গ্রন্থে প্রথম সংকলিত হয়, পরে 'সমাজ' (১৩৪৪ সং) ও 'ইতিহাস' (১৩৬২) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই প্রবন্ধের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ পুনরায় আলোচনা করেন 'A Vision of India's History'-তে। এটি এপ্রিল ১৯২৩-এ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে ও পরে ১৯৫১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পত্র ২৫। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে ১০ বৈশাখ (১৩১৯) মঙ্গলবার

'রাজা ও রাণী' অভিনীত হয়েছিল। রামানন্দ শান্তা ও সীতাদেবীকে নিয়ে এই অভিনয় দর্শনে এসেছিলেন। দ্রঃ সীতাদেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ. ১০৪, প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন পৃ. ৫০৪।

পত্র ২৬। তৃতীয়বার বিলাতযাত্রার জন্য কবি বোম্বাই রওনা হন ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (১২ মে ১৯২৪) সালে। বোম্বাই থেকে বিলাতের জাহাজ ছেড়েছিল ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (২৭ মে ১৯২৪) সালে।

পত্র ২৭। ১৬ জুন (১৯১২) লণ্ডনে পৌছানোর কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনের বাড়ির কাছে হাম্পস্টেডহীথ অঞ্চলে বাসা ভাড়া করেন। অল্পদিনের মধ্যেই রোটেনস্টাইনের বাড়িতে তিনি ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের সঙ্গে পরিচিত হন। রোটেনস্টাইনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস্ স্টফোর্ড ব্রুকস, ব্রাডলে, মেসফিল্ড, আর্নেস্ট রীস, ফক্স স্ট্রাঙ্গওয়েজ, স্টার্জ মুর, রবার্ট ব্রিজেস, এজরা পাউণ্ড, ঈভলীন আণ্ডারহিল, এণ্ড্রুজ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এঁদের নিয়ে রোটেনস্টাইন তাঁর বাড়িতে গীতাঞ্জলির কবিতা পাঠের এক সান্ধ্য আসর বসান।

এঁদেরই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের ইংরেজি তর্জমা হয়। জর্জ ক্যালডেরন 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ দান করেছিলেন 'The Maharani of Arakan' নামে। অ্যালবার্ট হলে ৩১ জুলাই এটি অভিনীত হয়েছিল। এই উপলক্ষে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। এরপর ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় 'The Post Office' (ডাবলিন

অ্যাবি থিয়েটারে অভিনীত মে, ১৯১৩), 'Chitra,' 'Malini' এবং 'The King of the Dark Chamber'। পাণ্ডুলিপি থেকে এই অনুবাদিত নাটকগুলি কবি নিজেই শ্রোতাদের পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

"Meanwhile Tagore was translating some of his own plays, one of which, 'The Post Office,' was acted later in Dublin, ... I most admired 'Chitra' and next to this 'The king of the Dark Chamber' which he read one evening to a number of friends at our Hampstead house'—W. Rothenstein, Men and Memories Vol. 2, (1932) p 264.

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানান যে এই সময়ে ইণ্ডিয়া সোসাইটির সেক্রেটারি কক্স স্ট্রাঙ্গওয়েজ অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে কোন সম্মানসূচক উপাধি দেওয়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ভারতের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাধিকার দিতে অসম্মত হওয়ায় সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। রোটেনস্টাইনই 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'কে রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বকৃত তর্জমাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুরোধ করেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটি এই পুস্তক প্রকাশে সম্মত হলে এই অনুবাদগুলি নিয়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পরিকল্পনা হয়। এরপর রোটেনস্টাইনের অনুরোধে ইয়েটস এর ভূমিকা লিখে দেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে 'Gitanjali' বা 'Song Offerings' এর ৭৫০টি কপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হল ১০ নভেম্বর ১৯১২ সালে। এর মধ্যে মাত্র ২৫০ খানা ছিল

বিক্রয়ের জন্য।

'দুইটি লেখা' — লণ্ডন যাত্রার পথে জাহাজে ১৬ জ্যৈষ্ঠ লিখিত 'জলস্থল' এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯-এ লিখিত 'দুই ইচ্ছা' শ্রাবণ ১৩১৯ সালে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

পত্র ২৯। 'পাঠসঞ্চয়'—১৩১৯ সালে ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশ সরকারের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এটি ১৯, ২০, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত পাঠ্যবই। বইটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্যতম বাংলা পাঠ্যগ্রন্থরূপে নির্বাচনের জন্য পেশ করা হয়, কিন্তু অনুমোদিত হয়নি।

'সুরুলের বাড়িটি'—বাড়িটিকে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছিল। গৃহপ্রবেশ হয় ১ বৈশাখ ১৩২১-এ। পরে শিলাইদহস্থিত রথীন্দ্রনাথের কৃষি-গবেষণাগারটি এখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এটি বর্তমানে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কেন্দ্র।

'গীতাঞ্জলির ··· হইয়াছে'। রোটেনস্টাইন অঙ্কিত কবির প্রতিকৃতিসহ ইংরাজি গীতাঞ্জলি ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

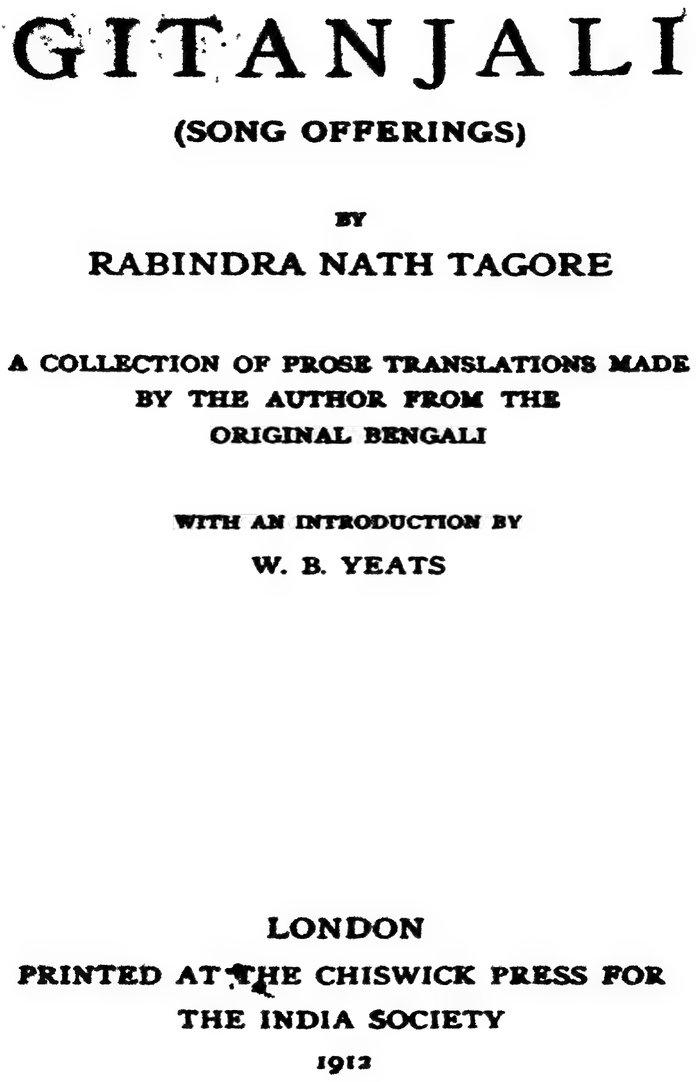

GITANJALI

(SONG OFFERINGS)

BY

RABINDRA NATH TAGORE

A COLLECTION OF PROSE TRANSLATIONS MADE
BY THE AUTHOR FROM THE
ORIGINAL BENGALI

WITH AN INTRODUCTION BY
W. B. YEATS

LONDON
PRINTED AT THE CHISWICK PRESS FOR
THE INDIA SOCIETY
1912

Gitanjali প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

GITANJALI

(SONG OFFERINGS)

BY

RABINDRANATH TAGORE

A COLLECTION OF PROSE TRANSLATION MADE
BY THE AUTHOR FROM THE
ORIGINAL BENGALI

WITH AN INTRODUCTION BY
W. B. YEATS.

LONDON
PRINTED AT THE CHISWICK PRESS FOR
THE INDIA SOCIETY
1912

উল্লিখিত প্রশংসিত সমালোচনা ঐ বৎসর ৭ নভেম্বর 'Times Literary Supplement' পত্রিকায় এবং ৬ নভেম্বর 'Nation' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৩০। 'Race Conflict'—বক্তৃতাটির প্রকাশ মডার্ণ রিভিয়ু, এপ্রিল, ১৯১৩ সালে। অজিত চক্রবর্তীকৃত এর অনুবাদ 'জাতিসংঘাত' প্রবাসীতে এবং প্রিয়ংবদা দেবীকৃত অনুবাদ 'জাতিবিরোধ' 'ভারতী' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সালে মুদ্রিত হয়েছিল।

অয়কেনের নিকট থেকে সমাদর লাভের বিবরণ প্রাপ্তব্য 'রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী' প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪২। এই চিঠিতে উল্লিখিত অয়কেনের পত্রটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় ভাদ্র ১৩৪৯ সালে মুদ্রিত হয়।

Abercrombie কৃত গীতাঞ্জলির সমালোচনা 'ম্যাঞ্চেষ্টার' গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ১৪ জানুয়ারি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

এই পত্রে উল্লিখিত অন্যান্য ইংরেজি বক্তৃতার প্রসঙ্গ পরবর্তী ৩১ ও ৩২ সংখ্যক চিঠিতেও আছে। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত এই প্রবন্ধগুলি পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে লণ্ডনে ক্যাক্সটন হলে যে ১৯১৩ সালে পঠিত হয়। এইগুলি এবং আরও দুটি প্রবন্ধ 'Sadhana' (ম্যাকমিলান ১৯১৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

পত্র ৩২, ৩৩। এই পত্রদ্বয়ে উল্লিখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে পূর্বের পত্র-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ৩৫। 'কণিকার তর্জমা'—'Poems' নামে অনুবাদিত 'কণিকার' (১৮৯৯) পঁচিশটি কবিতা মডার্ণ রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯১৩ সালে মুদ্রিত হয়। এই কবিতাগুলির কয়েকটি 'Stray Birds' (১৯১৬) গ্রন্থে সংকলিত।

'Ernest ··· পাইয়াছি।' রীহস্ ও এণ্ড্রুজের পত্রের তারিখ যথাক্রমে ১১ এবং ২৯ অক্টোবর, ১৯১৩। এগুলি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ 'Chitra' রামানন্দের ভূমিকাসহ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে লণ্ডন থেকে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৩৬। রবীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত অ্যাণ্ডারসনের একাধিক পত্রে 'চোখের বালি' তাঁর প্রিয় গ্রন্থরূপে উল্লিখিত হয়। ১২ মে ১৯১৩-তে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন তাতে জানা যায় যে 'Asiatic Quarterly'-তে প্রকাশের জন্য 'চোখের বালি' সম্পর্কে তিনি একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি 'CHOKHER BALI' নামে 'Asiatic Quarterly'-র জুলাই (১৯১৩) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এতে মূল উপন্যাসটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পরে পরিচিতি হিসাবে মূল উপন্যাসের শেষাংশ থেকে কিছু অংশ—প্রবাসযাপনের পর মহেন্দ্রর প্রত্যাবর্তন, রাজলক্ষ্মীর আসন্ন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আশা ও মহেন্দ্রর পুনর্মিলন পর্যন্ত তর্জমা করে দেওয়া হয়। উপসংহারে লেখক জানান: 'I am conscious that this is but a rough rendering of a poet's prose, and it needs some daring to attempt a translation of the work of one who can put his own verses into English which has almost all the charm of the original ··· I do not pretend that my version retains any reflection of the simple charm of style of the original. But it may serve to show in what fashion Mr. Tagore deals with the pathos of life and death, common to all humanity in East and West ··· A musician, a critic, an essayist, a poet, a dramatist, a novelist, a philosopher, a grammarian, he is also as his poems show, a mystic, filled with a strong sense of the riddle of life'. —Asiatic Quarterly, July 1913.

পত্র ৩৭, ৩৮। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'চোখের বালি'র ইংরেজি তর্জমা 'Eye Sore' মডার্ন রিভিয়ুতে জানুয়ারি ১৯১৪ থেকে ধারাবাহিক-রূপে ডিসেম্বর ১৯১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত।

পত্র ৪০। অচলায়তন নাটকখানির রচনাকাল ১৩১৮। শান্তিনিকেতনে এর প্রথম অভিনয় হয় ১৩২১ এর ১৩ বৈশাখ। গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পূর্বে সি. এফ. এণ্ড্রুজের সংবর্ধনা উপলক্ষে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং পিয়ার্সনও যোগদান করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, এই অভিনয় উপলক্ষেই শিল্পী নন্দলাল প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। দ্র: The Ashram, Vol. I. No. 10—published from Brahma Vidyalaya, Santiniketan, p. 39., প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ পৃ. ১৫২-১৫৩।

পত্রে উল্লিখিত '১৩১৫' অনবধানজনিত।

পত্র ৪২। 'ইংরেজি কবিতা'। কবিতাটি 'Hymn', মডার্ন রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯.৪ সালে মুদ্রিত।

'প্রবাসীর জন্য…পারিবেন।' এই গানগুলির আটটি গান 'শরতের গান' নামে প্রবাসীতে কার্তিক ১৩২১ সালে প্রকাশিত। রচনাকাল ৬ ভাদ্র—১৪ আশ্বিন ১৩২১। শেষের গানটি (আলো যে আজ গান করে) শান্তিনিকেতনে রচিত। অন্যগুলি সুরুলে। অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'গীতিগুচ্ছ' নামে আরও চব্বিশটি গান প্রকাশিত হয়। রচনাকাল শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২১, স্থান সুরুল ও

শান্তিনিকেতন।

পত্র ৪৪। উল্লিখিত গানটির তর্জমা 'Thou hast come again to us in the burst of a sudden storm',—মডার্ণ রিভিয়ুতে, ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে প্রকাশিত। এইসঙ্গে কবিতাটি অবলম্বনে অসিতকুমার হালদারের অঙ্কিত একটি চিত্রও মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৪৫। কবিতাটি (জানি আমার পায়ের শব্দ) ২৭ মাঘ ১৩২১-এ পদ্মাতীরে রচিত। এটি 'প্রেমের বিকাশ' নামে প্রবাসীতে চৈত্র ১৩২১ সালে মুদ্রিত ও পরে বলাকা কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

'মার্কাস অরেলিয়সের আত্মচিন্তা'—গ্রীক ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বঙ্গানুবাদ করেন। এটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৩১৪ ফাল্গুন থেকে ১৩১৬র ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে। এ ছাড়া মূল গ্রীক থেকে 'মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা'র রজনীকান্ত গুহকৃত বাংলা অনুবাদ রামানন্দ কর্তৃক ১৩২০ সালে প্রবাসী কার্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির পরিচয় ও সমালোচনা প্রবাসীর (ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৫৮৩) পুস্তক পরিচয় বিভাগে মুদ্রিত হয়েছিল।

সম্ভবত রজনীকান্ত গুহের এই গ্রন্থ সম্পর্কেই রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি সমালোচনা চেয়েছিলেন।

পত্র ৪৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' ও 'তোড়া' কবিতা দুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবিতা দুটি যথাক্রমে 'Champa' এবং 'A Posy' নামে মডার্ণ রিভিয়ু নভেম্বর ১৯১৫তে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক হিসাবে পরিচিতি

ছিল 'Translated by a Poet'। কবিতা দুটি পরে কবির 'Lover's Gift and Crossing' (1918) গ্রন্থে স্বীকৃতিসহ সংকলিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুটি কবিতার রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি তর্জমা ওই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৩ এবং ৪৬।

পত্র ৪৭। 'ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা', এটি 'Indian Students and Western Teachers', মডার্ণ রিভিয়ুতে এপ্রিল ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক E. F. Oaten ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধটি 'সবুজপত্রে' (চৈত্র ১৩২২) মুদ্রিত হয়। এটি অবলম্বনে উপরিউল্লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধটি রচিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত 'জীবনস্মৃতি'র তর্জমা মডার্ণ রিভিয়ুতে, জানুয়ারি ১৯১৬ থেকে ডিসেম্বর ১৯১৬ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে 'My Reminiscences' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৪৮। 'ছাত্রশাসনের'—পূর্বপত্রে উল্লিখিত প্রবন্ধ 'ছাত্রশাসনতন্ত্র'।

পত্র ৫০। উল্লিখিত 'অভিভাষণ' চিত্তরঞ্জন দাশের। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ উগ্র-জাতীয়তাবিরোধী বক্তৃতাগুলির সমালোচনা করেছিলেন।

পত্র ৫১। 'আগামীকাল…আলোচনা করবেন।' এই আলোচনা সভায় 'Home University Library' এবং 'Cambridge

Manuals of Science and Literature' এর আদর্শে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। এই সভায় গৃহীত এতৎসম্পর্কিত বিশদ নিয়মাবলী প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৪-এ মুদ্রিত হয়। পরিকল্পিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' ছয়ভাগে বিভক্ত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ প্রধান উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহক নিযুক্ত হন। এই ছয়টি বিভাগ ও তাহার সম্পাদকগণের পরিচয় :

(ক) দর্শন—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
(খ) বিজ্ঞান—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রশান্ত মহলানবীস
(গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি—যদুনাথ সরকার
(ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভাষা—প্রমথ চৌধুরী
(ঙ) কলা—অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(চ) শিক্ষাবিজ্ঞান—অস্থায়ী সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধারণ সম্পাদক যদুনাথ সরকার। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ. ৪২২-২৩।

উল্লেখ্য, নানা কারণে এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৩৫০ সালের ১ বৈশাখ গ্রন্থন-বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রকাশিত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও উদ্যোগে প্রায় অনুরূপ উদ্দেশ্যে 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৬ সালে। এ সম্পর্কে ৯৩ সংখ্যক পত্র পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫২। 'কন্‌গ্রেসের সময় ··· লেকচার দিতে হবে।' এই বক্তৃতা

শেষ পর্যন্ত দিতে হয়নি। তবে কলকাতায় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি কবিতা 'Thou hast given us to live' এবং 'Our voyage is begun Captain'—পাঠ করেছিলেন।

'আমার ধর্ম'—'প্রবর্তক পত্রিকায় (বর্ষ ২, সংখ্যা ৯) প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে 'আমার ধর্ম' লিখিত এবং সবুজপত্র আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ ও প্রবাসী পৌষ ১৩২৪-এ প্রকাশিত হয়। পরে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়।
রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে 'আমার ধর্মে'র ইংরেজি অনুবাদ করতে অনুরোধ জানান। দ্রঃ রামানন্দ পত্র সংখ্যা ২। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকৃত এর কোন পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাওয়া যায় নি। 'আমার ধর্মে'র ইন্দু দত্ত কৃত অনুবাদ 'My Religion' 'A Tagore Testament' (Meridian Books, London 1953) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

'আপনি যদি ··· হত না'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোন অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিন-শ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, না-ও যদি পারেন আমি কোনো দাবি করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম, গোরা আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারও ফাঁক দিইনি।' প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, প্রভাতরবি 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৪৪।
পত্র ৫৩। 'ঐ গানটিকে'—'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি। এটি প্রবাসী ভাদ্র ১৩২৪ সালে মুদ্রিত হয়। দ্রঃ রামানন্দ পত্র-৩।
"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"র ইংরেজিটা,—"কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"র

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত তর্জমা 'Thou Shalt Obey' মডার্ন রিভিয়ু, সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে মুদ্রিত। এর অপর অনুবাদ 'The Master's Will Be Done,' 'Towards Universal Man' (১৯৬১) গ্রন্থে সংকলিত।

স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রথমোক্ত তর্জমাটি প্রকাশিত হলে তৎকালীন শাসকসম্প্রদায় বিব্রত বোধ করেছিলেন। এজন্য তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ইংরেজি কাগজগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের 'অপরিণত রাজনৈতিক বুদ্ধির' প্রতি বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছিল। এর জবাবে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার গভীরতার প্রমাণ হিসাবে নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'A well wisher of the Empire' এই ছদ্মনামে 'Sir Rabindranath and Politics' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি স্টেটস্‌ম্যান কাগজে ৭ অক্টোবর ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর ফলে ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শনিবারের চিঠি আশ্বিন ১৩৪৮ (পৃ. ৮৫০-৮৫১)।

পত্র ৫৪। 'লেখা তো…চলেছে'—'ছোটো ও বড়ো' নামে প্রবন্ধটির রচনাকার্য।

'শচীন্দ্র দাসগুপ্ত…বন্ধনের'

রংপুরের উকিল যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শচীন্দ্র দাশগুপ্ত পুলিশী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ বর্ণনা করে তিনি যে চিঠি লিখে গিয়েছিলেন সংবাদপত্রে তা প্রকাশের অপরাধে তার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ঐ চিঠি প্রবাসীতে কার্তিক ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৫৫। 'প্রবন্ধটি'—'এটি ছোটো ও বড়ো', প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সালে মুদ্রিত, পরে কালান্তরে সংকলিত।

'এইটেকেই ইংরেজি করে'—এই প্রবন্ধটির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনুবাদ 'The Small and the Great' মডার্ণ রিভিয়ু, ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। এটি পরিমার্জিতরূপে ঐ বৎসর বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকার মে-জুলাই সংখ্যায় 'The Great and Small' নামে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটির রবীন্দ্রনাথকৃত সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত অনুবাদ 'India's Problem'—মডার্ণ রিভিয়ুতে, জানুয়ারি ১৯৪০ সালে প্রকাশিত। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে' প্রবন্ধটির কোনো তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

পত্র ৫৭। 'দু তিনখানা গরম চিঠি' জালিয়ানওয়ালাবাগে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন। এ ব্যাপারে ২৪ ও ২৫ এপ্রিল (১৯১৯) তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের দু'খানা চিঠি 'Visva-Bharati News'—মে, ১৯৬৯ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। ৫৭ সংখ্যক পত্রে উদ্ধৃত ইংরেজি চিঠিখানা মডার্ণ রিভিয়ু, মে ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৫৮। 'ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন সংবাদ'—প্রকৃতপক্ষে 'গান্ধারীর আবেদন' অভিপ্রেত। এটি ফাল্গুন ১৩০৪ সালে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে কবি কর্তৃক পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথকৃত এর ইংরেজি তর্জমা, 'Mother's Prayer' মডার্ণ রিভিয়ুতে জুন ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। মডার্ণ রিভিয়ুর মুদ্রিত পাঠ থেকে কিছু পরিবর্তিত আকারে এটি প্রথমে 'Fugitive'

(For Private Circulation 1919) শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত হয়। পরে ম্যাকমিলানের 'Fugitive' (1921) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ৫৯। 'ঘরে বাহিরের' (১৯১৬) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত তর্জমা 'Home and the World'। এর সমালোচনা যেসব বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : The Book Monthly (July 1919), The York Shire Post (July 1919), The Evening Sunday New York (24th June 1919), Illustrated London News (July 1919).

উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য সমালোচকেরা উপন্যাসটিকে বিচার করেছেন, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্রসঙ্গে Nation (August 1919) পত্রিকার মন্তব্য সংকলনযোগ্য : '.. as we read, we become more and more convinced ... that the real intention of the book is not at all to present a picture of the Swadishi movement, or of a Bengal Household or even of a mystic, a passionate and foolish woman and a rhetorical self-seeker. It is intended partly as a parable to ourselves and partly upon the true meaning and aim of life .... This philosophy is anti-nationalist, whether in the big nation or the small, the oppressor or the oppressed, and it speaks much for Mr. Tagore's wisdom and courage that he has not hesitated to apply it to his own country as well as the country of the Rowlatt Bills.

... Man's history Nikhil's old tutor declares, has to be built by the united effort of all the races in the world, and therefore 'this selling of conscience for political reasons—this making a fetich of one's country, won't do. I know that Europe does not at heart admit this, but there, she has not the right to pose as our teacher.' It is a hard lesson to learn for greed is always united to romanticism, but unless we learn it, we perish.'

পত্র ৬০, ৬১। 'মুলুর মৃত্যু'—রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র মুলু (মুক্তিদা প্রসাদ) ছিলেন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯ ভাদ্র ১৩২৬-এ কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। শান্তিনিকেতনে মুলুর শ্রাদ্ধবাসরে ৪ আশ্বিন ১৩২৬-এ রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষণটি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা অগ্রহায়ণ ১৩২৬-এ মুদ্রিত হয়। এটি পরে রামানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত মুলু সম্পর্কিত স্মারকগ্রন্থ 'প্রসাদ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান সংকলনের পরিশিষ্টে এটি সংযুক্ত হয়েছে।

পত্র ৬২। 'শিলং প্রভৃতি ঘুরিয়া'—দ্রঃ কালিদাস নাগকে লিখিত, ৮ সংখ্যক পত্র।

'Education and War'—এনাতোল ফ্রাঁসের এই বক্তৃতাটি মডার্ণ রিভিয়ুতে, ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে সংকলিত হয়েছে। দিনেন্দ্রনাথকৃত এর তর্জমা 'শিক্ষার আদর্শ', 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৬৩। 'Autumn Festival'— 'শারদোৎসবে'র রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ, 'মডার্ণ রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯১৯ সালে প্রকাশিত।

পত্র ৬৪। সাংলি— পূর্বতন মহারাষ্ট্রের করদ রাজ্য। এটি অধুনা বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত ধারওয়ার 'বেলগাঁও',

সোলাপুর, বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চল। দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নব জ্ঞান-ভারতী, ভৌগোলিক, (১৯৫৭), ৫১৮

সাংলির রাণীর ভগিনী ও তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত পটবর্ধন জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কি না জানা যায় নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বৎসর মার্চ মাসে সাংলির উইলিংডন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীপরশুরাম লছমন বৈদ্য বিশ্বভারতীতে 'অভিধম্ম' অধ্যয়নের জন্য যোগদান করেন।

পত্র ৬৫। 'প্রার্থনামন্ত্র তিনটি': (১) Light the signal, Father, (২) Yet I can never believe (৩) If it is thy will—এইগুলি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের যথাক্রমে ৫৯ (আমরা কোথায় আছি), ৬২ (তব চরণের আশা) এবং ৪৮ (আঘাত সংঘাত মাঝে) সংখ্যক কবিতার ইংরেজি তর্জমা, মডার্ণ রিভিয়ুতে, জানুয়ারি ১৯২০ সালে মুদ্রিত। কবিকৃত এই তর্জমাত্রয় নিতান্তই আক্ষরিক অনুবাদ ছিল না।

প্রথম দুটি তর্জমা কৃষ্ণ কৃপালানি-সম্পাদিত 'Poems—Rabindranath Tagore, (১৯৪২) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

পত্র ৬৬। উল্লিখিত এণ্ড্রুজের পত্রটি সম্ভবত পূর্ব আফ্রিকা থেকে ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এণ্ড্রুজের পত্র। ফেব্রুয়ারি ১৯২০ মাসের মডার্ণ রিভিয়ুর 'Notes' অংশে উদ্ধৃত এই দুটি চিঠির দ্বিতীয়টিই সম্ভবত এই পত্রের অভিপ্রেত।

পত্র ৬৭, ৬৮। 'মুলুর সম্বন্ধে একটা লেখা'— এটি 'ছাত্র মুলু', স্মারক গ্রন্থ 'প্রসাদে' সংকলিত।

'কালীমোহনের লেখাটি'— 'মুক্তিদাপ্রসাদ', 'শান্তিনিকেতন'

পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক যুগ্মসংখ্যা ১৩২৬-এ মুদ্রিত ও পরে 'প্রসাদ' গ্রন্থে সংকলিত।

পুস্তিকা—মুলুর মৃত্যু উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'প্রসাদ'।

'একটি লেখা'— 'ছাত্রমুলু', এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে।

পত্র ৭০। 'পুস্তিকাটি'—'The Centre of Indian Culture'। ১৯১৯ সালের ১০-১২ মার্চ রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজের অন্তর্গত আদৈয়ের ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'The Centre of Indian Culture' প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল। এটি 'The Society for the Promotion of National Education, Adyar', Madras (১৯১৯) থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধটি ১৯২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ৩ মার্চ তারিখের Young Indiaতে (Vol II, No 8 এবং 9) সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। Young India তে এটি প্রকাশ করবার উপলক্ষ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকার ২৫ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় (Vol II, No 8) সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়: It is a happy augury that the leaders of Indian thought are directing their efforts towards determining what system of education would best help the development of the national being. Philosophers, historians, scientists, sociologists, captains of Industry and politicians must all combine in arriving at a proper solution of this all-important question. But it is given to the poet to look into the future and draw a prophetic picture for the direction of the rest. The poet is able to sense things which others may not arrive at even by close search and subtle reasoning. Dr. Tagore has given his best thought and energy to the solution of the educational problem. His thoughts therefore command respect and careful consideration at the hands of every earnest worker. His thoughts on National education he has put together in a beautiful pamphlet under the title 'The Centre of Indian Culture.' He has dealt with the problem in all its phases in his usual poetic style wherever simile or metaphor comes with the force of an irrestible argument and the joy of an agreeable surprise. We wish our readers will not miss the delight and education which this pamphlet will yield to them. The only way open to us to tempt our readers to go to the original is rudely to tear a few sentences from their poetic setting and string them together into a summary which our readers will find elsewhere.'

“‘কর্ণকুন্তী সংবাদের’ ইংরেজি— ‘রবীন্দ্রনাথকৃত কর্ণকুন্তী সংবাদের ইংরেজি তর্জমা ‘Karna and Kunti’ এপ্রিল ১৯২০ সালের মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয় ও পরে ‘Fugitive’ (ম্যাকমিলান ১৯২২) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

উল্লেখ্য, টমাস স্টার্জ মুর ‘কর্ণকুন্তী সংবাদে’র তর্জমা করেছিলেন ‘The Foundling Hero’। এটি তাঁর ‘Collected Works’ (১৯৩১)-এর অন্তর্ভুক্ত।

'নৌকাডুবি'র ইংরেজি তর্জমা করা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন তাঁর ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন 'as a matter of preference (I may be wrong) I had rather do চোখের বালি or best of all গোরা। Personally, I prefer the latter among all your novels. But it is long and I know not why, more difficult than your other books.'

প্রকৃতপক্ষে গোরার ইংরেজি তর্জমা করেন উইলিয়াম পিয়ারসন। এটি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে জানুয়ারি ১৯২৩ থেকে ডিসেম্বর ১৯২৩ পর্যন্ত মুদ্রিত এবং ১৯২৪ সালে গ্রন্থকারে (ম্যাকমিলান) প্রকাশিত হয়।

পত্র ৭৩। 'একটি কাঁথা গোছের প্রবন্ধ'—এটি সম্ভবত রামানন্দ-সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ 'Welfare' এর জন্য। 'Welfare' (জানুয়ারি ১৯২৩) থেকে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধের কিছু অংশ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩-এর মডার্ণ রিভিয়ুতে উদ্ধৃত হয়েছে। 'তিনখানা কাগজের বোঝা'—রামানন্দ-সম্পাদিত এই তিনটি কাগজ— 'প্রবাসী' (১৯০১) 'Modern Review' এবং 'Welfare' (১৯২৩)।

পত্র ৭৪। 'মুক্তধারা' নাটকটি প্রবাসী পত্রিকায় বৈশাখ ১৩২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই একই সময়ে এটি ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৭৫। 'যক্ষপুরী'—পাণ্ডুলিপিতে এর নাম ছিল 'নন্দিনী'। পরে সংশোধিতরূপে 'রক্তকরবী' নামে প্রবাসীতে আশ্বিন ১৩৩১ সালে মুদ্রিত হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৩৪ সালে কলকাতায় 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গমঞ্চে 'The Tagore Dramatic Group' কর্তৃক নাটকটির

প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

'AE........ প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন'—মডার্ণ রিভিয়ু, অক্টোবর ১৯২৩, পৃষ্ঠা ৪৮৪ তে প্রবন্ধটি অংশত মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৭৬। ১৯২৬ সালে রামানন্দ জেনেভায় জাতিসংঘের সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পান। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও ইতালী ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ে এক সময়ে যাত্রা করেননি। কবি রওনা হন মে মাসে, রামানন্দ অগস্টে।

পত্র ৭৭। এই পত্রপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামানন্দের ৬ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথ "নটীর পূজা" নাটিকাটি প্রকাশার্থ বসুমতীতে দিয়েছেন এ সংবাদে রামানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুযোগ করে পত্র দেন। তারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র। 'নটীর পূজা' বসুমতীতে বৈশাখ ১৩৩৩-এ প্রকাশিত হয়। এটি গ্রন্থাকারে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬-এ। লক্ষণীয় রামানন্দ তাঁর পত্রে 'নটীর পূজা'কে 'নটীর পুরস্কার' বলে উল্লেখ করেন।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের প্রতিষ্ঠা জুলাই ১৯২৩ সালে। ১৯২২ সালেই রবীন্দ্ররচিত সমস্ত বাংলা বইয়ের স্বত্ব বিশ্বভারতীতে অর্পিত হয়েছিল।

পত্র ৭৮। ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ সালে আগরতলায় থাকাকালীন কবি কিছু গান রচনা করেন। এই গানগুলি 'বৈকালী' নামে গ্রথিত করে তিনি প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠান। এইগুলি থেকে ৩২টি গান প্রবাসীতে আষাঢ়-কার্তিক মাসে (১৩৩৩) মুদ্রিত হয়। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে থাকা কালে বৈকালীর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সফল হয় নি। এর

বহুকাল পরে 'বৈকালী' গ্রন্থাকারে পাঠকলভ্য হয়। 'বৈকালী' সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, বৈকালী (১৯৭৪)।

পত্র ৭৯। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে সেটি প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৩-এ প্রকাশিত কবির ইতালী-ভ্রমণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কয়েকটি ঘটনা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, ইতালী-ভ্রমণ তার অন্যতম। এজন্য এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

১৯২৫ এর জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রবীন্দ্রনাথ ইতালীতে অল্পদিনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে আবার তাঁর ইতালী যাওয়ার কথা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তা হয় নি। ইতিমধ্যে অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির মধ্যস্থতায় তৎকালীন ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী বেনিটো মুসোলিনী বিশ্বভারতীকে বহু মূল্যবান ইতালীয়ান গ্রন্থ উপহার পাঠান। ফর্মিকি ও জিউসেপ্পে তুচ্চি নভেম্বর ১৯২৫-এ অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্য মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ১৯২৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইতালী ভ্রমণে যান, সঙ্গে থাকেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদ্বয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথকে ইতালীতে প্রভূত সম্মান সহকারে আপ্যায়ন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার বিবরণ ইতালীর বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে কবি মুসোলিনী সম্বন্ধে যে-সব প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন তা যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এইসব পত্রিকায় স্থান পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতালী সফর এবং

ইতালীর প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস মনোভাব দেশবিদেশে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করে। ইতালী ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ জেনেভায় উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে রোলাঁর সাক্ষাৎকার হয়। রোলার মারফৎ ইতালীতে মুসোলিনীশাসনের স্বরূপ তাঁর কাছে উদঘাটিত হয়[1]। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসনের কদর্য দিকটি প্রচ্ছন্ন রেখে তাঁকে শুধুমাত্র বাহ্যিক উন্নতির দিকটাই দেখানো হয়েছিল। অতঃপর ইতালীর ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের ফলে ঐ দেশের দেশত্যাগী অধ্যাপক সালভাদোরির স্ত্রীর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে বিবরণ শোনেন তাতেও ইতালীয় সরকারের বর্বর নিষ্ঠুরতার দিকটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল।[2] তখনই রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনী ও ইতালীর ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে নিজ অভিমত ব্যক্ত করে শান্তিনিকেতনে এণ্ড্রুজকে এক পত্র দেন। ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি এই পত্রের একটি প্রতিলিপি এলমহার্স্টকেও পাঠান। এটি মানচেস্টার গারডিয়ান (৫ আগস্ট ১৯২৬) পত্রিকায় মুদ্রিত হলে[3] বিশ্বের মানুষের কাছে ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে কবির প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ পায়।

১ দ্রঃ অবন্তীকুমার সান্যাল, রমাঁ রলাঁ, 'ভারতবর্ষ' (১৯৭৬) পৃ ১০৩—১৫৯

২ দ্রঃ Rabindranath Tagore's Interview with an Italian Exile's wife, Visva-Bharati Bulletin, Oct 1926 P 299-203.

৩ পত্রটি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, অক্টোবর ১৯২৬-এ আংশিক মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ পত্রটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

এই পত্র উপলক্ষে প্রবাসী (আশ্বিন ১৩৩৩) এবং মডার্ণ রিভিয়ু (অক্টোবর ১৯২৬) পত্রিকার যথাক্রমে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'Notes' অংশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে লেখা হয় '...... কবি পূর্ব্বে ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও তৎপরে তাঁহাদিগের সমালোচনা করিয়া ইতালীয়দিগের মনে যে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে কোন প্রকারেই লাভজনক হইতে পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য দান করে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে আদর্শ তাহাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাও না হইলেই ভাল হইত......যদি তিনি বা তাঁহার কর্ম্মসচিবগণ উন্মুক্ত চক্ষু অবস্থায় সঙ্কীর্ণ স্বদেশবাদের চরম উদাহরণ ইতালীর প্রভু মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ উন্নত ও উদার—বিশ্বপ্রেমবাদীর অনুপযুক্ত কার্য্য করেন ও দ্বিতীয়তঃ যে কোন কারণ দেখাইয়া তীব্র সমালোচনায় সেই মুসোলিনীর আতিথেয়তার প্রতিদান করেন ; তাহা হইলে অন্তত একথা বলিতে হয় যে, ব্যাপারটি সকল দিক হইতে দেখিলে আদর্শরূপে সম্পন্ন হয় নাই। দার্শনিক কবি সকল বাহ্যিক অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন,...কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ কর্মসচিবদ্বয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (যাঁহারা যুবক, ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু মনীষীর সহিত পত্রালাপে তৎপর এবং সুচিন্তা ও সুব্যবস্থায় বিচক্ষণ, তাহারা) কি বলিয়া কবিকে ইতালীর স্বেচ্ছাচারী নেতা ও মানব-স্বাধীনতার আদর্শের বিরুদ্ধাচারী মুসোলিনীর গৃহে অতিথিরূপে লইয়া গেলেন ?...ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সখ্য-স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা ইহাদিগের সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাই,

যে-পরিচয় আমরা তাঁহাদিগের বিশ্বভারতীর সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টার মধ্যে পাইয়াছিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষানীতির আজন্ম সমালোচক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যখন বিশ্বভারতীর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হয় তখন আমরা সে-চেষ্টার মধ্যে compromise বা আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া লাভের চেষ্টার পরিচয় পাই। এই অল্প লাভের আশা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহান ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত নহে। কারণ যে-কবি, যে-মহাপুরুষ স্থান কাল ও পাত্রের সকল প্রলোভন, অত্যাচার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া দীর্ঘ পঞ্চাশ বর্ষাধিককাল নিজের জীবনের আদর্শের গতি শ্রেয়ের পথে রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কদাপি ক্ষুদ্র সুবিধার চেষ্টায় আদর্শকে বলিদান দিতে পারেন না। যে অদূরদর্শিতার ও আদর্শনিষ্ঠার অভাবের পরিচয় আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ঘটিত ব্যাপারে প্রথম পাই, আজ কবির কর্ম্মসচিবদিগের ইতালীয় 'এডভেনচারে' আমরা তাহারই পরিচয় দ্বিতীয় দফায় পাইলাম।'—প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ ৯৮৯ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৯২৬, পৃ ৩৪৩-৩৪৪-এ 'Tagore's Condemnation of Fascism' এবং অক্টোবর ১৯২৬, পৃ ৪৭০-৪৭১-এ 'Dr. Tagore's European Tour' অংশেও অনুরূপভাবে মন্তব্য করা হয়।

৭৯ সংখ্যক পত্রের সূচনায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর এইসব মন্তব্যের কথাই কবি উল্লেখ করছেন।

'আপনার চিঠি'— প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত উল্লিখিত মন্তব্যের জন্য পত্রিকাদ্বয়ের তৎকালীন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দায়িত্বক্ষালনের চেষ্টায় রামানন্দ জেনিভা থেকে

রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই পত্রই অভিপ্রেত। দ্র: নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে য়ুরোপে (১৩৭৬), পৃ ২১৫।

'সরলা যখন···দিয়েছি'— ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী প্রবাসী সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁরা লেখকদের 'সরস্বতীর বিনা পণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।' এই অভিযোগে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রবাসীর পক্ষ সমর্থন করে সবুজপত্র আশ্বিন ১৩৩৩-এ একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে তিনি প্রবাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ করেন এবং প্রবাসীর পূর্বাপর আনুকূল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে লেখেন 'প্রবাসী সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন···তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে, এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি। ···কিন্তু অর্থ ই তো একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভার-পীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।'

'এমন কি ফর্মিকিও···করেননি।' ম্যাঞ্চেষ্টার গারডিয়ানে ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনী সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রকাশিত হলে এর একটি উত্তর দেন ইতালীয় অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি। দ্র ম্যাঞ্চেষ্টার গারডিয়ান, ২৫ আগষ্ট, ১৯২৬।

রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য— অবন্তীকুমার সান্যাল, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর ও রম্যাঁ রলাঁ,

এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪, পৃ ৬৩-১০৭।

'আপনি Forward এর···গ্রথিত।' রবীন্দ্রনাথ ভিয়েনায় থাকাকালে রামানন্দ কয়েকদিনের জন্য তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। এই সময়ে মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীতে প্রকাশিত মন্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে অনুযোগ করেন। রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করেই মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীর তৎকালীন সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় ঐ মন্তব্য করেছেন। পরে জেনেভা থেকে রামানন্দ যে চিঠিতে ঐ মন্তব্য সম্পর্কে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দায়িত্ব লাঘব করার চেষ্টা করেন তাতে তিনি লেখেন 'গত বছর ফরোয়ার্ডে যখন আপনার সম্বন্ধে সুধীন্দ্র বোসের (ইটালী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে) লেখা বেরোয় তখন কুদুই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার একটা লম্বা জবাব মডার্ন রিভিয়ুতে ছাপিয়েছিল। কাজেই তার সম্বন্ধে আপনি ভুল করবেন না।' দ্রঃ নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে য়ুরোপে পৃ ২১২-১৩। রামানন্দের এই চিঠির প্রসঙ্গেই কবির এই মন্তব্য।

'Forward' এর ঘটনাটি ছিল এই: ১৯২৫ এর ৬ ফেব্রুয়ারি মিলান থেকে Mary Blankenhorn রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ সম্পর্কে আমেরিকার Nation পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করেন। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইতালীর বিভিন্ন সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু বিরূপ মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল। ২২।৭।২৫ তারিখের 'Forward' পত্রিকায় সুধীন্দ্র বসু 'Tagore in Italy' প্রবন্ধে ইতালীর সরকারী পত্রিকার এই বিরূপ

মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করেন ও পরিশেষে লঘুভাবে মন্তব্য করে লেখেন যে রবীন্দ্রনাথের পরার্থবাদের (altruism) বাণী য়ুরোপের উপযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ এ স্থলে এই লেখাটির কথাই উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইতালীয়রা রবীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন বলে যে ধারণা সুধীন্দ্র বসুর লেখা থেকে প্রতিপন্ন হয় তাকে খণ্ডন করে 'Forward' পত্রিকায় ২৫।৭।২৫ তারিখে সুধীরকুমার পাহিড়ীর একটি প্রতিবাদ 'Rabindranath Tagore in Italy' এবং Modern Review পত্রিকায় অগষ্ট ১৯২৫-এ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ 'Rabindranath Tagore and Italy' প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৮০। 'আমার পত্র'—সম্ভবত 'ফ্যাসীবাদ ও মুসোলিনী' সম্পর্কে ভিয়েনা থেকে ২০ জুলাই ১৯২৬ এ এণ্ড্রুজকে লিখিত পত্র— দ্র ৭৯ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ৮৩। 'নটীর পূজার অভিনয়'—এই বৎসর মাঘোৎসবের পর ১৪, ১৫, ও ১৭ই মাঘ রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় জোড়াসাঁকোতে 'নটীর পূজা' নাটিকাটি অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং উপালির ভূমিকায় অভিনয় করেন। উপালির ভূমিকা এবারেই প্রথম সংযোজিত হয়। প্রথম অভিনয়ে এটি ছিল না। 'নটীর পূজা'র প্রথম অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব (১৩৩৩) উপলক্ষে।

পত্র ৮৪। জাভা ও বালী ভ্রমণের জন্য ঘনশ্যামদাস বিড়লা দশহাজার এবং নারায়ণদাস বিজরিয়া এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন জানা যায়। দ্রঃ Visva-Bharati Annual Report And Audited Accounts 1927, pp. 41.

পত্র ৮৬। এই পত্রে উল্লিখিত ছাপার বহি E. Thomson কৃত Rabindranath Tagore—His Life and Works (1921) Association Press, Y. M. C. A. Calcutta এবং Rabindranath Tagore – Poet and Dramatist (1926), Oxford, London.

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ 'বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনামে টমসনকৃত বইয়ের এক সমালোচনা প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪-এ প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যশিক্ষানবিসী সুরু করেছিলেন কালিদাসের কুমারসম্ভব এবং শেকসপীয়রের ম্যাকবেথের অনুবাদ দিয়ে। ম্যাকবেথের আংশিক অনুবাদ 'ভারতী'র 'সম্পাদকের বৈঠকে' (আশ্বিন ১২৮৭) প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ম্যাকবেথের অনুবাদ করেন তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বৎসর। এ বিষয়ে তথ্যালোচনার জন্য দ্রষ্টবা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনস্মৃতি (১৩৫০) পৃ ৭০; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয় (১৩৫০), পৃ ৮৫-৮৯; প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, (১৩৭৭) পৃ. ৪৩-৪৪ সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের আদি পর্ব (১৯৭৮), পৃ ১০২-১০৬, ১০৮, এবং প্রশান্তকুমার পাল রবিজীবনী, প্রথমখণ্ড (১৩৮৯), পৃ ২২৫-২২৬।

পত্র ৮৮। এইটি ও পরবর্তী পত্রটি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রামানন্দলিখিত পত্র সংখ্যা ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১।

'বৃক্ষবন্দনা' ও 'বর্ষশেষ' প্রবাসী পত্রিকায় যথাক্রমে বৈশাখ

ও জ্যৈষ্ঠমাসে (১৩৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৮৯। 'যখনি···বসেচি'। এই উপন্যাস 'তিন পুরুষ'। পরে এর নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'। বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশের তাগিদে মে ১৯২৭-এ গ্রন্থটির রচনার সূত্রপাত হয়। এটি আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'যোগাযোগ' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীর জন্য 'শেষের কবিতা' রচনা করেন। 'শেষের কবিতা' প্রবাসীতে ভাদ্র ১৩৩৫ থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৯০। 'চিঠি দুটো' চট্টগ্রামের মুনসেফ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' (ভাদ্র ১৩২৪) পড়ে কবিকে যে পত্র লেখেন রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে ৬ ভাদ্র ১৩২৪ তাঁকে একটি পত্র দেন। পরে ভাদ্র ১৩২৯-এ প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধ পাঠ করে জ্ঞানচন্দ্র ৪ ভাদ্র ১৩২৯, ২১ অগস্ট ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথকে আর একটি চিঠি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দেন ৬ ভাদ্র ১৩২৯।

রবীন্দ্রনাথের এই দুটি পত্রই প্রবাসীতে শ্রাবণ ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

'অরবিন্দ ঘোষ··· দেব।' মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যাওয়ার পথে শ্রীঅরবিন্দের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ২৯ মে ১৯৩০। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নির্মলকুমারী মহলানবিশ লেখেন: "কবি জাহাজে ফিরে এসে বললেন 'অরবিন্দকে দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছে। একেবারে উজ্জ্বল চেহারা— চোখ দুটোর মধ্যে কী আছে বর্ণনা করা যায় না, এমন

আশ্চর্য চোখের ভাব। বুঝলুম অন্তরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েছেন, তা না হলে চেহারার এ রকম দীপ্তি হয় না। বহুদিন পরে ওঁকে দেখা—খুশি হলুম দেখে।' এই সাক্ষাৎ এত বেশি মনকে নাড়া দিয়েছিল যে সমস্ত দিন কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বললেন না।" নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্য' (১৩৬৩)। অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অরবিন্দ ঘোষ' শ্রাবণ ১৩৩৫-এ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৯১। 'লেখন' (১৩৩৪) কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা 'লেখন' প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫ সালে মুদ্রিত হয়। ওই প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ জানান এই গ্রন্থে মুদ্রিত চারটি কবিতা ও অপর একটি কবিতার দুটি পংক্তি (১। তোমারে ভুলিতে মোর হ'ল নাক মতি, ২। ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে, ৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন ৪। প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার ৫। শুধু এইটুকু মুখ অতি সুকুমার—প্রথম দুই পংক্তি) বস্তুত প্রিয়ম্বদা দেবীরই রচিত—ভুলক্রমে 'লেখন' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

'Fireflies সম্বন্ধে 'Dial' কাগজের সমালোচনা মডার্ণ রিভিয়ুতে নভেম্বর ১৯২৮ সালে মুদ্রিত হয়।

৯১ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত সাহিত্যিকদের সাহিত্য-রস-বোধের ভীরুতা সম্বন্ধে তুলনীয়: 'জাপানে ছোট কাব্যের অমর্য্যাদা একেবারেই নেই। ছোটদের মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের, কেননা তারা জাত আর্টিস্ট। সৌন্দর্য বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না।...কিছুকাল পূর্ব্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা

করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে দলের লোকের অভাব নেই।'—লেখন, প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫।

'নাম্নী' মহুয়ার অন্তর্গত সতেরটি কবিতা, ভাদ্র আশ্বিন ১৩৩৫-এ শান্তিনিকেতনে রচিত, প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫-এ মুদ্রিত।

পত্র ৯২। এই পত্রটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মধ্যে একটি সশ্রদ্ধ সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ বিদ্যমান ছিল। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের গয়া ভ্রমণকালে যদুনাথ পাটনা থেকে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। পাটনা থেকে তিনি যে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে' আসতেন এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতাদি করতেন তা যদুনাথের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে স্পষ্ট বোধগম্য। দ্রঃ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৫২। উল্লেখ্য, 'অচলায়তন' নাটকটি আশ্বিন ১৩১৮তে প্রবাসীতে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপে' এটি যদুনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। তারও পরে ১৩২০ পর্যন্ত যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের অন্তত সতেরোখানি প্রবন্ধ ও গল্পের ইংরেজি অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৩২০তেই যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধের অনুবাদ করেন—'My Interpretation of India's History' নামে।

অতঃপর ১৯২১ পর্যন্ত যদুনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল এমন নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যদুনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতেও উৎসুক ছিলেন। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালে যদুনাথ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ওই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বভারতীর

আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘপত্র (৩১ মে, ১৯২২ দ্রঃ প্রবাসী চৈত্র ১৩৫২) লেখেন। এই পত্র পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ সদস্যপদের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

১৯২৮-এ যদুনাথ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তখন তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'স্যার উইলিয়ম মেয়ার স্মারক' বক্তৃতা দেন। ওই বক্তৃতামালা পরে 'India Through the Ages' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। ৯২ সংখ্যক পত্রে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার উপস্থিত কারণ আর কিছু পাওয়া না গেলেও এই বক্তৃতামালার 'Rabindranath Tagore's World Mission of India' অংশে যদুনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্যকে এর কারণ বলে অনুমান করা যেতে পারে : 'This latest form of the Hindu revival we owe to Rabindranath Tagore. It is a very close but unconscious copy of the movement which began in Russia in the 19th century, the very language of the Slavonic leaders being repeated by the Indian poet'—Jadunath Sarkar, India Through the Ages (1923) p. 125

পুনরায় উনিশ শতকের রাশিয়ার Slavophile আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য দেখিয়ে যদুনাথ বলেন, 'This latest form of Indian thought is based entirely on a new interpretation of our ancient Upanishads under the unconscious influence of Christianity'—ওই গ্রন্থ পৃ ১২৭।

এই পর্বে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হলেও ১৯৩১ সালেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ও যতুনাথের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। উভয়ের ঐ সময়কার চিঠিপত্রের সাক্ষ্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

'গাছের গল্পটা'—বলাই, এই বৎসর শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসব উপলক্ষে রচিত, ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত; প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সালে মুদ্রিত। পরে গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত।

পত্র ৯৩। 'হোম য়ুনিভার্সিটির ··প্রয়োজন হবে।'[১] প্রবাসী পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৪৮-এ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার 'আহার ও আহার্য' গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে রামানন্দ লিখেছিলেন:

'আমরা অনেক বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের বাডীতে বসিয়া জ্ঞান লাভের সুবিধার নিমিত্ত বিলাতী হোম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরির অনুরূপ কতকগুলি বাংলা বহি লিখাইবার ও প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগিয়াছিল, একখানি চিঠিতে জানাইয়াছিলেন।' সম্ভবত ৯৩ সংখ্যক পত্রটিই রামানন্দ উল্লিখিত পত্র।

মনে রাখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৯১৭ সালে 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ' গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা হলেও তা তখন কার্যকরী হয়নি। এই বিষয়ে ৫১ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য। ৯৩ সংখ্যক পত্রে 'হোম য়ুনিভার্সিটি'র আদর্শে পাঠ্যগ্রন্থ রচনার

---

(১) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'সেই যে বাংলা Home Library পর্য্যায়ের বই লেখাবার প্রস্তাব করেছিলে—সেটা ভুলো না। ভারি দরকার'—চিঠিপত্র-৫, পত্র-৫৩, পৃ ২১৯।

আশু প্রয়োজনের কথা উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে কবির এই অভিপ্রায় সফল হয়েছিল ১৯৩৯ (১৩৪৬) সালে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রথম প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

'অপূর্ব্বকে···দিয়েছি।' মূল চিঠি 'এসিয়া ও য়ুরোপ'—প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত। অপূর্বকুমার চন্দ-কৃত এর ইংরেজি তর্জমা 'Europe Asia and Africa' নামে মডার্ন রিভিয়ুতে ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে মুদ্রিত।

পত্র ৯৪। 'গাছের গল্প'— বলাই, ৯২ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত।

'অপূর্ব্বর···পাঠাবেন'—এ বিষয়ে ৯৩ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ৯৫। 'মডার্ন রিভিয়ুর লেখাটি'—এটি নিশ্চিত করে জানা যায় না।

অক্টোবর ১৯২৮-এ মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত সন্ত নিহল সিং রচিত 'DONOUGHMORE DYARCHY FOR CEYLON' প্রবন্ধটি কবির অভিপ্রেত হতে পারে।

পত্র ৯৬। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার যে সূত্রপাত করেছিলেন প্রাচীন জরোথুস্ত্রীয় ধর্মালোচনাও ছিল তার অন্যতম। এজন্য তিনি বোম্বাইয়ের ধনী পার্শী সম্প্রদায়ের সহায়তা প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে Bombay Chronicle পত্রিকায় প্রকাশিত জে. কে. নরীম্যানের 'The Indian Institute of Parsis' প্রবন্ধে লেখা হয়: 'I was frankly against the Parsis making large donations to Visva-Bharati. And that for two reasons. In the first place an institution like Shantiniketan located in India, can not have all the facilities; the paraphernalia of research, such as are commanded by older universities in Europe and America. It lacked environs. It lacked the innate enthusiasm which time and not money can supply. The Manuscripts on which the young students guided by elders, are expected to work do not survive in a state of preservation the ravages of India's humid climate'

এই পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি পঠিতব্য। রামানন্দ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর জ্ঞাতব্য জেনে নরীম্যানের বক্তব্য খণ্ডন করে যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছিলেন ডিসেম্বর ১৯২৮ এর মডার্ন রিভিয়ুর 'Notes' অংশে।

পত্র ৯৭। ১৮ এবং ২১ অগস্ট ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-পরিষদের সভায় দুটি মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন— 'সাহিত্যের স্বরূপ' ও 'সাহিত্য-বিচার'। এই ভাষণ দুটি অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য-বিচার'—প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ৯৮, ৯৯। এই পত্রদ্বয়ে উল্লিখিত 'লেখাটি' এবং 'প্রবন্ধ'— 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'। এটি শচীন সেনের 'The Political Philosophy of Rabindranath' গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা— প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত।

বরোদার বক্তৃতাটি হয়েছিল ২৭ জানুয়ারি, ১৯৩০। বক্তৃতার বিষয় 'Man the Artist'। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৯।

ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে ১৯৩০ এ প্রদেয় হিবার্ট লেকচারের জন্য কবি এই সময়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১০০। এই বৎসর নভেম্বর মাসের 'Prabuddha Bharat' পত্রিকায় প্রকাশিত রোম্যা রোলাঁর 'Ramkrisna and the king Shepherds of India' প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি তাঁর 'The Life of Ramkrisna' (১৯২০) গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ। রোম্যা রোলাঁ এই গ্রন্থ রচনার উপকরণ পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্যদের কাছ থেকেই। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিজ্ঞতা জানতে চেয়ে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে যে-পত্র (রামানন্দের পত্র ১৪) লেখেন তদুত্তরে এই পত্রে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ।

দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'র প্রথম খণ্ডে একাধিকবার পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (বিশ্ববাণী, পৌষ ১৩৮৫, পৃ ৫৩১-৫৩৮)।

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রে নিবেদিতার উল্লেখ বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকালে নিবেদিতার উপস্থিতির প্রশ্ন ওঠে না। মনে হয় পরবর্তীকালে নিবেদিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট কিংবা রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছ থেকে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনেছিলেন এবং কোন সময়ে রবীন্দ্র-সমীপে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন হলে সন্তোষ প্রকাশ করেননি।

এই পত্রের দ্বিতীয় বাক্য এবং তৃতীয় বাক্যের অর্থবোধে একটু সংশয় হতে পারে। বস্তুত প্রথম 'তিনি' দ্বারা নিবেদিতাকে

বোঝালেও দ্বিতীয় 'তিনি' শব্দে মহর্ষিকে বোঝানো হয়েছে। 'শপথ গ্রহণ'—এণ্ড্রুজের কাছে লেখা উল্লিখিত মূল পত্রের তারিখ অক্টোবর ১৯২৩। এই সময়ে এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক গার্ল-গাইডের শাখা হিসাবে আশ্রমের মেয়েদের দ্বারা গঠিত 'সহায়িকা'র পক্ষে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়া উচিত হবে না। এণ্ড্রুজকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত চিঠিটি লিখেছিলেন। এটি ডিসেম্বর ১৯২৯-এ মডার্ন রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০১। 'কোরীয়রবীন্দ্র সংবাদ'—'কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত'— প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬-এ মুদ্রিত হয়।

'দুটো ইংরেজি লেখা'— 'Organisation' এবং 'Wealth and Welfare'। এ দুটি মডার্ন রিভিয়ুতে যথাক্রমে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। 'Organisation'—বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে, জুলাই ১৯২৬ সালে মুদ্রিত 'The Rule of the Giant' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। 'Wealth and Welfare' বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি অক্টোবর ১৯২৪ সালে মুদ্রিত 'City and Village' এর সংশোধিত রূপ।

পত্র ১০২। রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত লেখাটি 'পঞ্চাশোর্দ্ধম্'। এটি সম্মেলনের শেষ দিনে ৪ ফেব্রুয়ারি স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক পঠিত হয় ও পরে বিচিত্রায় ফাল্গুন ১৩৩৬ এবং প্রবাসীতে বৈশাখ ১৩৩৭ সালে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০৩, ১০৪। ১৯৩০ সালের এপ্রিল-মে মাসে ভারতে এক অস্থির ও জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। লবণ আইন

অমান্য আন্দোলন, শোলাপুরে সামরিক আইনের সন্ত্রাস, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং গান্ধীজি ও জওহরলালকে কারাগারে নিক্ষেপ—এই পটভূমিকায় বিলাত থেকে ১০৩ ও ১০৪ সংখ্যক পত্র লিখিত হয়েছিল।

'ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়েনে যে প্রসঙ্গ'— ১৬ মে (১৯৩০) ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়েনে রবীন্দ্রনাথের 'India and England' বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে ভারত সরকারের দমননীতি ও প্রজা নিপীড়নের ফলে ইংলণ্ড সম্পর্কে ভারতের পূরতন শ্রদ্ধার মনোভাবটি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভারতের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব মতামত জানাতে গিয়ে বলেন :

'...' I have often been asked in England to offer my opinion about what should be done at the present juncture when things have become so critical. My answer has always been that I do not believe in any external remedy where inner relations have been so deeply affected. For this reason, I can not truly point to any short cut to win relief or any easy remedy to heal the deeply-seated disease. What is most needed is rather a radical change of mind and will and heart.

What I really believe in is a meeting between the best minds of the East and the West in order to come to a frank and honourable understanding. If once such an open channel of communication could be cut whereby sincere thought might flow freely between us unobstructed by mutual jealousy and suspicion and unimpeded by self-interest and racial pride, then a reconciliation might be bridged over'.

'স্পেক্টেটরে একটা লেখা'—৭ জুন (১৯৩০) স্পেক্টেটর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'India—An Appeal to Idealism' লেখাটি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ভারতে যে সরকারী সন্ত্রাস ও দমননীতি চালানো হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইংলণ্ডের গণতন্ত্রী মানুষদের কাছে কবির এই আবেদন। ইংলণ্ড গণতন্ত্রের গৌরবময় আদর্শের ধারক। পরদেশের প্রতি আচরণেও ইংলণ্ড যেন এই আদর্শের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখে—কবির আবেদনের মূল বক্তব্য ছিল এই।

এখানে প্রসঙ্গত য়ুরোপকে সমালোচনা করে তিনি বলেন… "To-day Europe in the illumination of her intellect has brought her science and also her spirit of service. But unfortunalety she has not come to Asia to reveal the generosity of her civilization, but to seek an unlimited field for her pride and power, 'trying to make these things eternal.'

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : '…the fact glimmers out that our people, with a pious determination, has kept unshaken the difficult ideal which they have accepted from their great leader Mahatma Gandhi who—the Spirit of Buddha himself—upholds the noblest spirit of India,...None of us can cowardly claim immunity or mitigation of suffering, when, even if rashly, the subversive forces of history have been brought down upon our country in the hope of building her history upon a new foundation.'

পত্র ১০৪। 'ঢাকার উৎপাত ··নকল পাঠাই'—ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণে বৃটিশের নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র দেন তা ৩০ অগস্ট ১৯৩০-এ স্পেক্টেটর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত তিনি এতে লেখেন 'We have not the least doubt that the most expensively and elaborately organized power which the British Govt has in India is more than sufficient in checking at once any symptoms of violence in our communal relationship. ...I know from my own correspondence that this event at Dacca has alienated more than anything else in Bengal, the sympathies of those who were still clinging to their faith in British justice Other happenings had shaken public confidence but this has struck at its very foundation.'—এই পত্রের কিয়দংশ মডার্ণ রিভিয়ু অক্টোবর ১৯৩০ এর 'Notes' অংশে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০৫। 'অতএব ইংরেজিতে·· ছাপাবেন'। 'রাশিয়ার চিঠি'র

(১৩৩৮) ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের বর্তমান পত্রের সমকালে হয় নি। শশধর সিংহকৃত অনুবাদ 'Letters From Russia' ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত হয়েছিল। অনুমান করা যায় ১৯৩১ এর পর, ১৯৩৪ এর পূর্বে এই অনুবাদ করা হয়েছিল যদিও তখন তা প্রকাশিত হয় নি।

'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহার (আদিতে নাম ছিল সোভিয়েট নীতি) পরিচ্ছেদটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ মডার্ণ রিভিয়ুতে 'The Soviet System' নামে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৪ এর জুন মাসে ওই পত্রিকাতেই ওই পরিচ্ছেদের শশধর সিংহকৃত অনুবাদ 'On Russia' প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞায় অনুবাদিত অন্যান্য সকল অংশের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে লণ্ডন কমন্স সভায় যে প্রশ্নোত্তর হয় তার বিবরণ টাইমস্ পত্রিকায় (১৩ নভেম্বর ১৯৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে 'রাশিয়ার চিঠি'র (বিশ্বভারতী ১৯৭০) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০৬। 'একটা কবিতা লিখেছি'—এটি 'প্রাণলক্ষ্মী'। ৭ নভেম্বর ১৯৩০-এ কবিতাটি প্রথম রচিত হয় এবং প্রকাশের জন্য রামানন্দের কাছে প্রেরিত হয়। ঐ দিনই এটি বাতিল করে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতরূপে কবিতাটি প্রবাসীর জন্য পাঠানো হয়। এই পত্রে 'প্রাণলক্ষ্মী'র সংশোধিত তৃতীয় পাঠটি পাওয়া যায়। এই তিনটি পাঠই প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটি (প্রথম স্তবক বর্জিত) 'তুমি' নামে পরিশেষ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে।

পত্র ১০৭। 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধটি প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৮ সালে মুদ্রিত এবং পরে কালান্তরে সংকলিত হয়।

পত্র ১০৯। 'ইংরেজি প্রবন্ধের···নেবেন।' সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত 'The Soviet System' এর প্রুফ। ১০৫ সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

পত্র ১১০। 'কলকাতায়···হয়েচে।' উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে কলকাতায় 'গীতোৎসবের' জন্য স্টেজের প্রয়োজন।

পত্র ১১২, ১১৩। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮ সালে তাঁর আঁকা চারখানা ছবির মুদ্রণ প্রসঙ্গে এই পত্রদ্বয়লিখিত। মহুয়ায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রবাসীতে মুদ্রিত ছবি থেকে বিভিন্ন।

পত্র ১১৪, ১১৫। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র (২৭ জুন ১৯৩২) থেকে জানা যায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবির একটি 'পোর্টফোলিও' মুদ্রণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য কেদারনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র-২।

পত্র ১১৮। উল্লিখিত গানটির সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত স্বরলিপি 'গীতলিপি' প্রথমখণ্ডে (১৯১০) পাওয়া যায়, পরে স্বরবিতান ৩৬ খণ্ডে সংকলিত হয়।

পত্র ১১৯। 'সেই সময়ে···প্রচার করচেন।' বস্তুত ১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে আদর্শগত ভেদ সুবিদিত। দেশে ফিরে এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন ১০ অগস্ট, ১৯২১-এ। এ সম্পর্কিত দ্বিতীয়

প্রবন্ধ 'সত্যের আহ্বান' তিনি পাঠ করেন কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, ২৯ অগস্ট ১৯২১-এ। ইতিপূর্বে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কবির মনোভাব জানতে পেরে গান্ধীজি 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' (১ জুন ১৯২১) 'The Poet's Anxieiy' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

'সেই সময়ে…ছাপবেন।' জগদানন্দ রায়কে লিখিত চিঠি প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) প্রকাশিত হয়। তাতে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন—'Non-Co-operation (নন্‌-কো-অপারেশন) অকাজতার আবির্ভাব অন্তিমে। শাস্ত্রে বলে কর্মের দ্বারাই কর্ম থেকে মুক্তি, নৈষ্কর্ম্যের দ্বারা নয়, পাস করার দ্বারাই স্কুল থেকে মুক্তি, আমার মত ইস্কুল ত্যাগ করার দ্বারা নয়। আজ সময় এসেছে নিজেদের সব কাজ নিজেরা মিলে করতে হবে…কাজের উপলক্ষে আমাদের যে মিল সেই মিলই সত্য মিল, সেই সত্য মিলই হচ্চে চরম লাভ। অ-কাজ করবার উপলক্ষে যে মিল সে কখনই স্থায়ী হোতে পারে না।'

পত্র ১২০। এই চিঠিটি কবির তৃতীয়বার সিংহল ভ্রমণের সময় কলম্বো থেকে লিখিত।

'রাশিয়ার চিঠি'র তর্জমা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১০৫ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

১০ মে (১৯৩৪) কলম্বোর রোটারি ক্লাবে কবি ভারতীয় 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন।

পত্র ১২১। 'যে ইংরেজি কবিতাটি…হয়েছিল।' এটি 'Breezy April, *Vagrant April*' (*ওগো দখিন হাওয়া*)। দ্রষ্টব্য Edward Thompson, Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist (1948) pp. 268-269.

'Supreme Man'—এটি মূলত 'মানুষের ধর্মে'র দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বনে রচিত। ইংরেজি অনুবাদে কবিকে সাহায্য করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। এটি সংশোধিতরূপে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Man' বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতারূপে কবি কর্তৃক পঠিত হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৩ সালে। মডার্ণ রিভিয়ুতে এর প্রকাশ অগস্ট ১৯৩৪-এ।

পত্র ১২২। 'ইংরেজিতে বক্তৃতা'—সম্ভবত কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন—ভাষণ রচনা।

পত্র ১২৩। ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে নিউ বর্লিংটন আর্ট গ্যালারীতে ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ভারতীয় ললিতকলার একটি প্রদর্শনী হয়। ওই-দেশীয় শিল্পসমালোচকগণ 'ম্যাঞ্চেষ্টর গারডিয়ান', 'বর্লিংটন ম্যাগাজিন', 'সানডে টাইমস্' 'মর্ণিং পোস্ট' প্রভৃতি পত্রিকায় এই প্রদর্শনীর বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু ঐ প্রদর্শনী দেখে অমিয় চক্রবর্তীর মনে হয়েছিল যে প্রদর্শিত ছবিগুলির মান কোনক্রমেই প্রশংসাযোগ্য নয়, কেননা তা ভারতবর্ষের জীবনের রূপকে যথার্থরূপে প্রতিফলিত করতে পারে নি। এ বিষয়ে ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪-এ তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্রে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন "আমরা যেন বিদেশী কাগজের দুচারটে স্তুতি মন্তব্য বা এমন কি ছবি বিক্রী থেকে আসল কথা না ভুলি। যাঁরা শ্রদ্ধাবশত চুপ করে থাকেন বা disappointment প্রকাশ করেন এদেশে তাঁরাই বন্ধু। কেননা যাঁরা প্রশংসা করেন ভারতীয়ত্বের বা আমাদের কোনো অতি উচ্চ অমানবীয় শিল্প

প্রতিভার চিহ্নকে, তাঁদের যদি প্রশ্ন করা যায় এইসব বিশেষণের পরে তাঁরা তাদের কোনো বড় দরের শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে এই জাতীয় শিল্পকে সমাসনে বসাতে রাজি কি না—তাহলেই সব মুখোষ খসে পড়ে। এ রকম দুরাশা উন্মত্ততার প্রলাপ বলেই এই স্তুতিবাদকের দল গ্রহণ করবেন। কিন্তু paticn হয়ে 'ভারতীয়' শিল্পকে অনেকেই সমাদর করতে রাজি। যাঁরা একটু art এর মর্মগ্রাহী তাঁরা একটুও পরিচয় পান নি এই ঘটা করে সাজানো প্রদর্শনীতে, যে ভারতবর্ষ আজ বেঁচে আছে।" (এই পত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত)।

চিত্র প্রদর্শনী সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠানোর পরেই ১২৩ সংখ্যক পত্র লিখিত হয়। এ বিষয়ে দ্রঃ চিঠিপত্র-১১, পত্রসংখ্যা ৭৩।

"পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু কিন্তু পাথেয় নাস্তি"

প্রকৃতপক্ষে এই চরণটিতে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'টঙ্কাদেবী' কবিতাটির প্রথম দুই পংক্তির দুই খণ্ডিত অংশ স্থান পেয়েছে।

প্রিয়নাথ সেনের কাছে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই পংক্তি দুটি উদ্ধৃত করেন নিম্নরূপে—

"ইচ্ছা সম্যক্ উপবন ভ্রমণে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী, মন উড়ু উড়ু, এ কি দৈবের শাস্তি!"

দ্রঃ চিঠিপত্র ৮, পৃ ৩৫।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (১৩২২ ? পৃ ২৮) গ্রন্থে এই দুই পংক্তির রূপ হল—

'ইচ্ছা সম্যক্ জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি।'

'সুপ্রভাত' (ভাদ্র ১৩১৭, পৃ ৭৫) থেকে প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ছন্দ' (১৩৬৯) গ্রন্থে উদ্ধৃত এর পাঠ এইরূপ—

'ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবোর শাস্তি।'

পত্র ১২৪। ১১ পৌষ, ১৩৪১ সালে 'অলবেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের' উদবোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এটি ১২ পৌষ আনন্দবাজার পত্রিকার 'রিপোর্টে' প্রকাশিত ও পরবর্তীকালে 'সংগীতচিন্তায়' গ্রথিত হয়। কলম্বোর কলাসদনে বক্তৃতার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১২০ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

'অনেকগুলি চিঠি'—অমিয় চক্রবর্তী, অজিত চক্রবর্তী এবং দিনেন্দ্রনাথকে লিখিত মোট ৮ খানা পত্র, প্রবাসীতে যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও আশ্বিন ১৩৪২-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ১২৫। প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪২-এ প্রকাশিত নির্মলকুমার বসুর প্রবন্ধ 'বাঙালীর চরিত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র লিখিত। উক্ত প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য: ইংরেজ আমলে পূর্বতন গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ায় সমাজে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। ব্যক্তিত্বের অতিবৃদ্ধির ফলে সম্মিলিতভাবে কোনো বড়ো কাজ করা আর বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে লেখক তিনটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেন, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', 'কংগ্রেসী করপোরেশন' এবং 'বোলপুরের শান্তিনিকেতন।' এ সম্পর্কে লেখকের অভিমত: 'ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এ তিনটির মধ্যে

ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক বাঙালীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক আর করপোরেশনই হউক তাহা মোটামুটি এক একজন মহা শক্তিশালী বাঙালীর কীর্তি। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই চরম ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক। তাঁহারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা অসংখ্য লোকের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। অর্থাৎ তাহা কোনও সমাজের দ্বারা গড়া জিনিষ নয়। যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা হইয়াছে, তাহারা একান্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি।' লেখকের আশঙ্কা 'তাঁহাদের পরে তাঁহাদের অপেক্ষা নীরেস লোকের হাতে পড়িলে যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?'

পত্র ১২৬। 'তখনি একটা···পাঠিয়েছি'—এটি শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ 'Today I gain you truly'—মডার্ণ রিভিয়ু, জুলাই ১৯৩৫-এ মুদ্রিত। কবিতাটির নীচে স্থানকালের নির্দেশ—চন্দননগর ২৬. ৬. ৩৫।

পত্র ১২৮। 'কার্ত্তিক সংখ্যার···উপায় নেই।' কার্ত্তিকের প্রবাসীতে 'বিস্ময়' এবং 'মাটিতে আলোতে'—এ দুটি কবিতাই মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমটি ২৫ অগস্ট, দ্বিতীয়টি ৪ মে ১৯৩৫-এ রচিত।

প্রেরিত স্বরলিপি 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম' গানটির। এটি প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩৪২-এ মুদ্রিত।

পত্র ১২৯। 'সাহিত্য অধ্যাপক···করেছেন।' অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৪১, পৃ ২৩২) এই মত ব্যক্ত করেন।

পত্র ১৩০। 'তার কবিতার···দিয়েছি।' এই তর্জমা দুটি 'I am singular (আনিগাম অপরিচিতের নাম) এবং 'Do you hear the rumbling of Time's Chariot' (কালের যাত্রার ধ্বনি)।

কৃষ্ণ কৃপালানিকৃত 'শেষের কবিতার' ইংরেজি তর্জমা 'Shesher Kavita' ১৯৪৪ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং কবিকৃত ইংরেজি তর্জমাদ্বয় এতে সন্নিবিষ্ট হয়।

পরবর্তীকালে কৃপালানিকৃত 'শেষের কবিতা'র তর্জমা লণ্ডন থেকে 'Farewell My Friend (The New India Publishing Co. Ltd, London 1946) নামে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথকৃত 'I am singular' তর্জমাটি আংশিকভাবে গৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের 'Do you hear···Chariot' এর স্থানে কৃপালানিকৃত 'Can you hear the wheels of Time' তর্জমাটি গৃহীত হয়।

'কালের যাত্রার ধ্বনি' কবিতাটির রবীন্দ্রনাথকৃত উক্ত তর্জমা বিশ্বভারতী কোয়ার্টালিতে (নভেম্বর ১৯৩৫—জানুয়ারি ১৯৩৬) এবং 'Boundless Sky' (বিশ্বভারতী ১৯৬৪) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৩১। 'একটি কবিতা'—এটি 'পৃথিবী', প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সালে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে 'দুইবোনে'র ইংরেজি অনুবাদ হয় নি। কৃষ্ণ কৃপালানিকৃত 'দুইবোনে'র অনুবাদ 'Two Sisters' (বিশ্বভারতী) ১৯৪৫ সালে এবং মালঞ্চের অনুবাদ 'The Garden' অগস্ট ১৯৫৬ সালে (Jaico Publishing, Bombay) প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৩৩। 'একটি কবিতা'—'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'একজন লোক' কবিতাটির

তর্জমা 'A Person An oldish up country Man'—মডার্ণ রিভিয়ু, এপ্রিল ১৯৩৬-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

'তাঁর সম্বন্ধে···চলে যায়।' ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬-এ দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী সভায় আগা খাঁ (তৃতীয়) প্রদত্ত ভাষণ সম্পর্কে এপ্রিল ১৯৩৬-এ মডার্ণ রিভিয়ুতে 'Notes' অংশে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তৎসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য।

পত্র ১৩৪। 'তর্জমা করতে···ঠেকে।' সম্ভবত মহুয়ার অন্তর্গত 'সবলা' কবিতার আংশিক তর্জমা 'Why Deprive me My Fate of My Woman's Right'—দ্র: মডার্ণ রিভিয়ু, জুন ১৯৩৬।

পত্র ১৩৫। 'মহিলাদের সম্মেলন'—লাবণ্যলতা চন্দের উদ্যোগে আয়োজিত নিখিলবঙ্গ মহিলা-সম্মেলন।

'কাহিনী···করেছি।' 'নাট্যগীতি' রূপে 'পরিশোধ', প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৩-এ প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এই বছর ২৪ ও ২৫ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাট্যগীতি অবলম্বনে পুনর্বার রচিত নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' স্বরলিপিসহ ভাদ্র ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। 'শ্যামা'র পরিশিষ্টরূপে 'পরিশোধ' নাট্যগীতি রবীন্দ্ররচনাবলী ২৫ খণ্ডে সংকলিত।

পত্র ১৩৬। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই ১৯৩৬-এ কলকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার সভাপতিত্ব করেছিলেন।

পত্র ১৩৮। 'কাটাকুটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি'—এটি 'ঘটভরা' কবিতার পাণ্ডুলিপি। কবিতাটি মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা, 'শেষ সপ্তকে'র

সাতাশ সংখ্যক কবিতার এটি পূর্বরূপ।

'আমার অভিভাষণ'—মহিলা সম্মেলনে পাঠ করবার জন্য 'নারী' রচিত হয় ১৬ আশ্বিন ১৩৪৩-এ। উল্লেখযোগ্য, কবি শেষ পর্যন্ত মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ২৬ আশ্বিন সেখানে একটি মৌখিক ভাষণ দান করেন। 'নারী' প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪৩-এ মুদ্রিত হয় ও পরে 'কালান্তরে' সংকলিত হয়।

পত্র ১৪০। 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু' এবং 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া' এ দুটি গানের ললিত চট্টোপাধ্যায়কৃত ইংরেজি তর্জমা যথাক্রমে 'Morning' এবং 'The Night Lamp' মডার্ন রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারি ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের অষ্টাশীতি কবিতার তর্জমাসহ একটি সংকলন গ্রন্থ 'SHEAVES' প্রকাশ করেন ১৯২৯ সালে (ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ)

পত্র ১৪১। '১৩ই কনভোকেশন'—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ পাঠ করেন নিয়ম-সম্মত 'গাউন' পরিধান না করেই। এই ভাষণ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় ছাত্র-সম্ভাষণ'। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

'ইংরেজি তর্জমায়'—'বোষ্টমীর' প্রথম ইংরেজি তর্জমা করেন সি. এফ. এণ্ড্রুজ। ম্যাকমিলানের 'Hungry Stones and other Stories' (১৯১৬) গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত

'বোষ্টমী'র অনুবাদ 'The way faring Woman' মডার্ণ রিভিয়ু ডিসেম্বর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এই তর্জমাটিই এই পত্রের অভিপ্রেত।

পত্র ১৪২। অরবিন্দ বসুকৃত বলাকার ৩৮ সংখ্যক কবিতার অনুবাদ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয়। অরবিন্দ বসু পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আরও অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এগুলি হল: The Flight of Swans (John Murray, 1955), The Herald of Spring (John Murray 1957), Wings of Death (ঐ ১৯৬০), Later Poems of Rabindranath Tagore (Peter Owen 1974), এবং Lipika (ঐ ১৯৭৭)

'Suggestion শব্দের তর্জমা'—শান্তিনিকেতন পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৩২৬) থেকে ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় জনৈক পত্রলেখক এ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তাঁর একটি জিজ্ঞাসা ছিল, 'By suggestion I can cure you. The Great Power latent in this form of suggestiveness is well known.—suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ কি ?' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানান :

"সাধারণত বাংলায় suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ ব্যঞ্জনা ও ব্যঞ্জনাশক্তি চলিয়া গিয়াছে। কোনো বিশেষ বাক্য প্রয়োগে শব্দার্থের অপেক্ষা ভাবার্থের প্রাধান্যকে ব্যঞ্জনা বলা হয়। কিন্তু এখানে "suggestion শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে,

আভাসের দ্বারা একটা চিন্তা ধরাইয়া দেওয়া। এস্থলে 'সূচনা' ও 'সূচনাশক্তি' শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

পৌষ সংখ্যার 'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ লেখেন "পূর্ববারে লিখিয়াছি হিপ্নটিজম প্রক্রিয়ার অন্তর্গত suggestion শব্দের প্রতিশব্দ 'সূচনা'। আমরা ভাবিয়া দেখিলাম সূচনা শব্দের প্রচলিত ব্যবহারের সহিত ইহার ঠিক মিল হইবে না। তাই ইংরেজি suggestion এর স্থলে 'অভিসঙ্কেত' শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি।"

পত্র ১৪৩। এই পত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা, প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ১৭৪-১৭৬ এবং 'সিটি কলেজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠি'—প্রবাসী উপরিউক্ত সংখ্যা পৃ ৩০০।

পত্র ১৪৪। 'জন্মদিন কবিতাটি প্রবাসীতে মুদ্রণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এ বছর পঁচিশে বৈশাখ কবি কালিম্পঙে ছিলেন। 'অলইণ্ডিয়া রেডিও'র অনুরোধে কবি 'জন্মদিনে' কবিতাটি টেলিফোনে আবৃত্তি করেন। কলকাতার বেতারকেন্দ্র থেকে কবির আবৃত্তি প্রচারিত হয়। এই আবৃত্তি অবলম্বনে কোন কোন সংবাদপত্রে অসম্পূর্ণভাবে এটি মুদ্রিত হয়। কবি কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে কবিতাটি প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ১৪৫। 'রবিরশ্মি ···ছাপাবেন না।'—উল্লিখিত পত্রটি পরে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় এবং তাঁর অনুমতিক্রমে প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৫ সালে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৪৮। যোনে নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) জাপানের জাতীয়তাবাদী কবি ও শিল্পরসিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'From the Eastern Sea' (১৯০৩) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক মহলে তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের পর তিনি ইংরেজিতে অনুবাদিত রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থসমূহের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবসমন্বয়মূলক উদার মনোভাবের প্রতি আকৃষ্ট হন। আদর্শের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নোগুচির একটি বিষয়ে মিল ছিল এই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা প্রচার করলেও উভয়েই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের হাত থেকে স্বদেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে অক্সফোর্ডে 'The Wisdom of the East' বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নোগুচি বলেন 'The reason why Tagore is received with so much respect and acclaim [in the West] is that he expresses the soul of his people with traditional feeling and religiosity...He is a poet who sums up all the traditional literature of the past.'[১]

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে ভ্রমণ করছিলেন তখন কোবে থেকে ট্রেনে টোকিও যাওয়ার পথে রবীন্দ্রসন্দর্শনে অত্যুৎসাহী নোগুচি রবীন্দ্রনাথের কামরায় প্রবেশ করে তাঁকে অভিনন্দিত

---

[১] Stephen. N. Hay, Asia, Ideas of East and West (1970) p 86.

করেছিলেন। সেইসময় তিনি তাঁর স্বরচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। নোগুচি-রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা 'Sir Rabindranath Tagore' এবং প্রবন্ধ 'Tagore in Japan' মডার্ণ রিভিয়ুতে যথাক্রমে অগস্ট ও নভেম্বর ১৯১৬তে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে তিনি জাপানী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবনী 'Indo-no-shijin' (The Indian Poet, Tokyo 1926) রচনা করেন। তাতে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন—

"Japan is now in a crisis....In trying to over come this crisis Tagore's teachings offer us many suggestions. I do not agree with him completely but I do believe that almost all his opinions can help us in saving contemporary Japan".[২]

১৯৩৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। ঐ বৎসর নভেম্বরের শেষে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। ৩০ নভেম্বর আম্রকুঞ্জে তাঁর সংবর্ধনা হয়। পর বৎসর অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর জাপানের চীন আক্রমণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচির মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ঘটে। 'এশিয়াকে রক্ষার জন্য জাপানের পক্ষে চীন অধিকার প্রয়োজন' এই মর্মে নোগুচি ২৫ জুলাই ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি দেন। চীনের

---

২. ঐ গ্রন্থ পৃ ৩৩-৩৪

বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধাভিযানকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করবেন এই চিঠিতে নোগুচি এ রকম আশা ব্যক্ত করেন। নোগুচির এই পত্রের কথাই ১৪৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে তীব্র নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ ১ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) এই পত্রের উত্তর দেন। ২ অক্টোবর নোগুচি এর এক স্পর্ধিত উত্তর দেন এবং রবীন্দ্রনাথ পুনরায় তার যথাযোগ্য উত্তর দেন।

নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পত্রবিনিময় Visva-Bharati Quarterly পত্রিকার Vol IV, Part 3 তে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে The Sino-Indian Cultural Society থেকে এটি Pamphlet-5 রূপে প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৪৯, ১৫০, ১৫১। রামানন্দলিখিত ৩১ সংখ্যক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনটি পত্র পঠনীয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল সম্ভবত ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে 'বিচিত্রা'র আসরে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বেশ কয়েক বছর পূর্বেই শরৎসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল। ১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যখন লেখক-নামবিহীন 'বড়দিদি'র ধারাবাহিক প্রকাশ হতে থাকে তখন রচনাশক্তির নৈপুণ্যের জন্য অনেকেই এটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে করেছিলেন। শোনা যায়, এই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ 'বড়দিদি' পাঠ করেন এবং লেখকের অপূর্ব রচনাকুশলতায় মুগ্ধ হন। ভারতীর 'আষাঢ়' সংখ্যায়

(১৩১৪) 'বড়দিদি'র লেখকের নাম প্রকাশ পায়। শরৎচন্দ্র তখন ব্রহ্মদেশে।

১৯১৪ সালে শরৎসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের একটি বিবরণ পাওয়া যায় কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অসিতকুমার হালদারের পত্রে: "আমার বেশ মনে আছে ১৯১৭ সালে যখন পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারু এবং আমরা কজন গয়া, প্রয়াগ, বরাকর গুহা প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন চারুর দ্বারাই সাহিত্য জগতের দুটি মহৎ শিল্পীর পরিচয় ঘটেছিল। ট্রেন চলেছে, রবীন্দ্রনাথ বাইরের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে বসে আছেন। চলন্ত ট্রেনে রবীন্দ্রনাথের সামনে চারু শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত-মশাই' বইখানি অতিশয় সন্তর্পণে রেখে দিলে রবীন্দ্রনাথ বইখানি তুলে নিলেন এবং পড়া শেষ করে চারুকে বললেন 'চারু, তুমি আজ আমাকে নতুন করে বাঙালীর মনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলে।' পরমুহূর্তেই তিনি শরৎচন্দ্রের বইখানির আদ্যোপান্ত মনস্তত্ত্ব-ঘটিত বিশ্লেষণ করে গুণগান করলেন।" রবীন্দ্রভাবনা বৈশাখ ১৩৮৫, পৃ ৫৮।

১৯০৭ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' 'বিরাজ বৌ,' 'পরিণীতা' 'পণ্ডিতমশাই' 'পল্লীসমাজ' 'চন্দ্রনাথ,' 'বৈকুণ্ঠের উইল,' 'অরক্ষণীয়া' 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) প্রভৃতি প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালেই তিনি ব্রহ্মদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংযোগের সূত্র পাওয়া যায় ২৯ পৌষ ১৩২৪ সালে (জানুয়ারি ১৯১৮) বাজে শিবপুর

থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্রে : 'আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম কিন্তু পথে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর কাছে টেলিফোঁ করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে।' স্বভাবতই মনে হয় এই সময়ের পূর্বেই উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই বৎসর ১৮ মার্চ বিচিত্রার আসরে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎচন্দ্র বিচিত্রার পরবর্তী অধিবেশনে (২৮ মার্চ, ১৯১৮) স্বরচিত নূতন গল্প পড়ে শোনাতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ সভায় তিনি পাঠ করেছিলেন 'একটি গল্প'। দ্র নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৮৪৩-৪৪ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ (১৯৬২ সং) পৃ ৩৫৬।

প্রবাসীতে শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার নরেন্দ্র দেব ও প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দের মধ্যে যে মতান্তর ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৬ 'আলোচনা', পৃ ৭০০-৭০৩।

-পত্র ১৫২, ১৫৩। এই সময়ে রামানন্দ যুক্তপ্রদেশের বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পত্র দ্বারা অবহিত করেছিলেন এবং এই সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্যের অনুকূলে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৪৬ এর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশিত 'আগ্রা-অযোধ্যায় বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় বাধা' শীর্ষক আলোচনায় রামানন্দ লিখেছিলেন :

'...ঐ প্রদেশে এমন স্থায়ী বাসিন্দাও অনেক আছেন যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী নহে। তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীদের

সংখ্যাই বেশী। হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের নিজের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবার ও পরীক্ষা দিবার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, বাঙালী ছেলেমেয়েদেরও সেই স্বাভাবিক অধিকার আছে, কারণ তাহারাও ঐ প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাহাদের অভিভাবকেরা হিন্দুস্থানী অভিভাবকদের মত ট্যাক্স দিয়া থাকেন এবং পৌর কর্ত্তব্য পালন করেন।

…যে যে শহরে বাঙালীর সংখ্যা বেশী—হয়ত কয়েক হাজার বাঙালী বাস করে, সেখানে বাঙালী ছাত্রদের জন্য বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার, অন্ততঃ বাংলাভাষা শিক্ষা দিবার, ব্যবস্থা দাবী করা অন্যায় নহে।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট যদি তাহাতেও রাজী না হন, তাহা হইলে আর একটি দাবী তাঁহারা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কোন মতেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সেটি এই :

এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কানপুর প্রভৃতি বড় বড় শহরে বাঙালীরা নিজের ব্যয়ে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া চালাইয়া আসিতেছে। কয়েকটি গত শতাব্দী হইতে চলিতেছে। বাঙালীদের এরূপ বালিকাবিদ্যালয়ও আছে। এইগুলিতে বাংলা শিখান হয় এবং শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিখান যাইতে পারে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট এই বিদ্যালয়গুলিকে তাঁহাদের 'জানিত' (recognised) বিদ্যালয় বলিয়া মানিয়া লউন এবং তাহাদের ছাত্রছাত্রীদিগকে সরকারী পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করুন।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, অনুমতি পাইলে বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা কোন্ ভাষায় উত্তর লিখিবে? ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নের

উত্তর তাহারা হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের মত ইংরেজিতে দিবে, অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর তাহারা বাংলায় দিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা ভাষার ও নানা ভাষায় পরীক্ষা করেন ; পরীক্ষার্থী অল্প হইলেও প্রশ্নপত্র রচনা করান। অবাঙ্গালীদের প্রতি বঙ্গে এ বিষয়ে যে ন্যায্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হয়, বাঙালীরা বাংলার বাইরে স্থায়ী বাসিন্দা হইলে যদি সেইরূপ ন্যায্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার আশা করে তাহা অস্বাভাবিক নহে।

বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা যে ন্যায্য সুবিধাটুকু চাহিলাম, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি তাহাও দিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে অন্য রকম একটি সুবিধা তাঁহাদের এডুকেশন বোর্ডের একটি নিয়ম অনুসারে চাহিতে পারা যায়। এই নিয়মে আছে যে বোর্ডের চেয়ারম্যান বা তাঁহার নামিত কোন ব্যক্তি ("his nominee") ইচ্ছা করিলে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার সকল বিষয়েরই উত্তর ইংরেজীতে দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এই বৈকল্পিক নিয়মটি, যে-সব পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা ইংরেজী, তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত করা হইয়া থাকিবে। তাহাদের সম্বন্ধে যে সুবিবেচনা দেখানো হইয়াছে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সেই সুবিবেচনা করা অস্বাভাবিক বা অন্যায় নহে। এইজন্য আমরা বলি, 'বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকে যদি উত্তর বাংলাতে লিখিবার অনুমতি না-দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইংরেজীতেই উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া হউক।' এবং এই অনুমতি প্রদান কাহারও মর্জিসাপেক্ষ না রাখিয়া এই নিয়ম অনুসারে করিবার ব্যবস্থা হউক যে, হিন্দুস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা নহে, সেইরূপ পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা

করিলে পরীক্ষার সকল বিষয়ে তাহাদের উত্তর ইংরেজিতে লিখিতে পারিবে। তাহা হইলে এখন পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশের সমুদয় ভারতীয় ছাত্ররা যেমন নানা বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতে দিয়া আসিতেছে, বাঙালী পরীক্ষার্থীরা অতঃপরও তাহা পারিবে।' প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ৭১৫-৭১৬। এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য 'যুক্তপ্রদেশে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য', 'যুক্তপ্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা'—প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৬ পৃ ৮৫৮-৮৫৯।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দ্বিভাষিক অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম কিভাবে নিরূপিত হবে এ বিষয়ে বরদৌলিতে ১১. ৩. ৩৯ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য Pattabhi Sitaramayya, The History of the Indian National Congress Vol II, p 89.

পত্র ১৫৫। রামানন্দের কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাবলী ১৯১১-১৯৪০ ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবাসীতে প্রকাশিত এই পত্রগুচ্ছ অন্যান্য পত্রসহ বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত। উল্লিখিত চিঠিসমূহ এই সংকলন-গ্রন্থে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পত্র ১৫৬। রথীন্দ্রনাথের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয় বার্লিনে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে। এই সময়ে য়ুরোপভ্রমণে লর্ড সিংহ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অন্য সঙ্গীরা ছিলেন শ্রীনিকেতনের কর্মী শ্রীলাল, তৎকালীন ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, প্রশান্ত মহলানবিশ এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশ।

পত্র ১৫৮, ১৫৯। উল্লিখিত 'সেই চিঠিখানা' এবং 'এই লেখাটি' বর্তমান সংকলনের ১০০ সংখ্যক পত্র।

পত্র ১৬১। এই পত্র রামানন্দের ৪৭ সংখ্যক পত্রের উত্তরে লিখিত। এই প্রসঙ্গে রামানন্দের ৪৮ সংখ্যক পত্রও দ্রষ্টব্য। বস্তুত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি-তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায় না।

পত্র ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ও ১৬৬— এই কটি পত্রে উল্লিখিত গল্পটি 'বদনাম'। এটি প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৬৪। উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলি 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস' নামে 'কবিতা' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ১৬৬। 'ওর মধ্যে···রাখবেন।' উল্লিখিত বিষয় 'সাহিত্য, শিল্প' প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮ সালে মুদ্রিত এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'সত্য ও বাস্তব' নামে সংকলিত হয়।

মিস্ র‍্যাথবোনকে লিখিত খোলা চিঠির মূলানুগ অনুবাদ, প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়েছিল। সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে অনুবাদকের নাম অনুল্লিখিত থাকে।

পত্র ১৬৭। 'তাই চিত্র···পাঠিয়েছি'—এটি 'সাহিত্য গান ছবি' নামে প্রবাসীতে আষাঢ় ১৩৪৮ এ মুদ্রিত হয়েছিল। এর কিয়দংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী ১৯৭৬) ১৪ খণ্ডের 'গ্রন্থ পরিচয়ে' সংকলিত হয়েছে।

পত্র ১৬৮। উল্লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য নির্মলকুমারী মহলানবিশ, কবির সঙ্গে য়ুরোপে, (১৩৭৬) ভূমিকা।

পত্র ১৬৯। দ্রষ্টব্য রামানন্দ-লিখিত ৬২ সংখ্যক পত্র।

সংযোজিত পত্র ১। গ্রন্থটি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে

সম্ভবত ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩১৮র 'প্রবাসী বিজ্ঞাপনী'তে গ্রন্থটির বিজ্ঞপ্তি এইরূপে পাওয়া যায়:

আরব্যোপন্যাস (সচিত্র) ১॥০ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, সম্পাদিত। অশ্লীল অংশ পরিবর্জিত। বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া প্রকাশিত। উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

পত্র ২। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর চিত্রকলা সম্পর্কে কবির অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য ক্ষণিকা, (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সংখ্যা) ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৮০।

পত্র ৩। এই পত্রে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ১৩০ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ১। এই পত্র-কবিতাটি ১৯৩২ সালে কবির পারস্য ভ্রমণকালে তাঁর জন্মদিনে ৬ মে রচিত হয়। রচনাকাল ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯ এর পরিবর্তে ভ্রমক্রমে '১৩৩২' লিখিত হয়েছে। এটি ঈষৎ সংশোধিত-রূপে 'পরিশেষ' (ভাদ্র ১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পত্র ২। 'ছবিগুলোর···হবে।' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রামানন্দকে লেখা ১১৪ ও ১১৫ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী হয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩১ (৯ পৌষ ১৩৩৮) সালে কলকাতা-টাউন হলে।

২০-২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ গভ: আর্টস্কুলে রবীন্দ্রনাথের অপর একটি চিত্র-প্রদর্শনী হয়। এই উপলক্ষে সেই সময়ে কুড়িটি চিত্র "Illustrated Catalogue"-এ মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রথম মুদ্রিত প্রকাশ 'চিত্রলিপি'। (বিশ্বভারতী সেপ্টেম্বর ১৯৪০)

অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ১। 'তোমার বিদ্রূপের···খুসি হই'— বাংলা সাহিত্যে বহু-নিন্দিত এবং বহু-প্রশংসিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই ১৩৩১ এর ১০ শ্রাবণ (১৯২৪, ২৬ জুলাই) প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'র সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে প্রথম দিকে এর যোগ ছিল না। তখন সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস এবং কর্মাধ্যক্ষ হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। এই পত্রিকা প্রধানত সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই পরিকল্পিত হয়েছিল। অশোক চট্টোপাধ্যায় নিজেও ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর লেখা 'আনন্দবাজার' গল্পসংগ্রহটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'শনিবারের চিঠি'তে যে-সব বেনামী ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশিত হত, তার অন্যতম লেখক ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র কয়েকটি সংখ্যাতে উদীয়মান কবি নজরুল ইসলামের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষণ করে পদ্য প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' এবং 'কালিকলমে'র সঙ্গেও এই সূত্রেই 'শনিবারের চিঠি'র সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' ৯ ফাল্গুন ১৩৩১ সংখ্যাতেই শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তী পর্যায় মাসিকরূপে দেখা দেয়। কিন্তু অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৩৩২ এর কার্তিক সংখ্যাতেই এই পর্যায় শেষ হয়।

সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস এবং সহকারী সজনীকান্ত দাস।

তৎপরবর্তী পর্যায় ৯ ভাদ্র ১৩৩৪ থেকে আরম্ভ হল। এই পর্যায়েই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি এই সময়েরই। সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে (১ম খণ্ড, ১৩৬১, পৃ ২৫৯-৬০) অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করে এই চিঠিটি মুদ্রিত হয়েছে। 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গকুশলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁর চিঠিতেও সপ্রশংস উল্লেখ করেন : "'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্টএর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে— তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গ সাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্য-লোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা গলিতে নয়।" দ্র শনিবারের চিঠি মাঘ ১৩৩৪।

অতঃপর ৪ ও ৭ চৈত্র ১৩৩৪-এ জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'য় আহূত বিখ্যাত সাহিত্যসভায় বাংলাসাহিত্যে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সভার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'সাহিত্য সমালোচনা' প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ২২২-২২৭।

'শনিবারের… হলেও' এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস লেখেন "আমরা কার্তিক সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা' বিভাগে কোনও মহিলা লেখিকার গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া

তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আহ্বান' করিলাম।" সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি (১৩৬১) ম খণ্ড, পৃ ২৬০।

পত্র ২। 'অক্টোবরের··· যোগ্য' Ernest Lothar রচিত লেনিন এবং গান্ধী সম্পর্কিত এই লেখাটি ভিয়েনার 'Neue Freie Presse' থেকে 'Living Age' পত্রিকায় উদ্ধৃত। এরই কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে মডার্ণ রিভিয়ু ডিসেম্বর ১৯২৭-এ মুদ্রিত।

'Mother India' সম্পর্কিত উল্লিখিত চিঠিটি মডার্ণ রিভিয়ু ডিসেম্বর ১৯২৭ এর 'Notes' অংশে মুদ্রিত।

শান্তাদেবীকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ২। 'ডায়ারির কথা'—পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি।

পত্র ৫। 'ইংরেজি লেকচার — সম্ভবত প্রথম ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসে প্রদত্ত অভিভাষণ। ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে 'The Philosophy of Our People' পাঠ করেন। এইটি Visva-Bharati Quarterly Vol III তে (জানুয়ারি-মার্চ ১৯২৬, পৃ ২৯১-৩১১) এবং মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯২৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৬। ঢাকায় বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে সংবর্ধনা জানানো হয় তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি এবং ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত বক্তৃতা। (৭-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫ ফেব্রু '২৬)।

সবুজপত্র (চৈত্র ১৩৩২), প্রবাসী (মাঘ ১৩৩২) প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ১০। 'বুদ্ধ জন্মের কবিতা'—'বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব' 'বৃক্ষবন্দনা' এবং তেজেশচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠি 'গাছপালার প্রতি ভালবাসা' প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩৪-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ১১। 'নববর্ষের বক্তৃতা'—শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ 'নববর্ষ' নামে প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৪-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৪। 'একটি মেয়ে'—মহিমচন্দ্র সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর কয়েকটি পত্র পৌষ ১৩৩৪ থেকে ধারাবাহিকরূপে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৭।

পত্র ১৫। 'সংস্কার' গল্পটি প্রবাসীতে আষাঢ় ১৩৩৫-এ মুদ্রিত হয় এবং পরে 'গল্পগুচ্ছে' সংকলিত হয়।

পত্র ১৬। এই বৎসর ১৭-২০ মার্চ কলকাতায় জুজুৎসু প্রদর্শনীর পরে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'নবীন' এর অভিনয় হয়েছিল।

কালিদাস নাগকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ১। ১৯১৬-১৭ সালে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' সম্পর্কে বক্তৃতার পর এদেশের জাতীয়তাবাদী মহলে তার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে যে ভাষণ দেন (বাঙ্গলার কথা, 'নারায়ণ' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪-এ প্রকাশিত, পরে পুস্তকাকারে 'দেশের কথায়' মুদ্রিত)

তাতে বলেন 'এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে-জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানব জাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে।

…এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ, এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় ওই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন।'—দেশবন্ধু রচনাসমগ্র (১৩৮৪) দেশের কথা, পৃ ২১। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীয় সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছেন। দ্রষ্টব্য—রামানন্দের কাছে লিখিত পত্রসংখ্যা ৫০ ও এই পত্রের পরিচয়।

পত্র ২। এই বৎসর (১৩২৪) জগদীশচন্দ্র বসু সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পত্র ৫। 'বিশ্ববিদ্যাগ্রন্থ' প্রকাশ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য রামানন্দের ৫১ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ৭। এই পত্রে উল্লিখিত অষ্ট্রেলিয়ায় বক্তৃতাদান ও ইংরেজিচর্চার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৩ কার্তিক, ১৩২৬-এ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ; দ্র চিঠিপত্র ৫, পৃ ২৬৪।

রবীন্দ্রনাথের অষ্ট্রেলিয়া যাওয়া শেষ পর্যন্ত ঘটেনি।

পত্র ৮। কবি এই বছর পূজাবকাশে ১১ থেকে ৩১ অক্টোবর শিলংএ কাটান। শিলং থেকে ৩১ অক্টোবর রওনা হয়ে তিনি ঐ দিন গৌহাটী পৌঁছেন। কবির গৌহাটী অবস্থানকালে (৩১ অক্টোবর—২ নভেম্বর) জনসাধারণের পক্ষ থেকে জুবিলী পার্কে, সাহিত্য-

পরিষদের গৌহাটী শাখার পক্ষ থেকে কার্জন হলে এবং অসমীয়া মহিলাদের তরফ থেকে আইনকলেজ হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ গৌহাটী সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সঙ্কলিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সত্যভূষণ সেন, গৌহাটীতে রবীন্দ্রনাথ, কবিপ্রণাম (১৩৪৮), পরিশিষ্ট পৃ. ২২-২৪।

কবি শিলংএ থাকাকালে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক গোবিন্দনারায়ণ সিংহের এবং শ্রীহট্টের অন্যান্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের অনুরোধক্রমে তিনি শ্রীহট্টভ্রমণে সম্মত হন। কবি গৌহাটী থেকে আসাম বেঙ্গল রেলপথে যাত্রা করে ৫ নভেম্বর (১৯১৯) শ্রীহট্টে পৌঁছেন এবং সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন।

৬ নভেম্বর সকালে শ্রীহট্ট টাউনহল প্রাঙ্গণে জনসাধারণের প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে কবি প্রায় 'দেড়ঘণ্টাকাল' বক্তৃতা করেছিলেন। এটি পরে 'বাঙালীর সাধনা' নামে প্রবাসী পৌষ ১৩২৬-এ মুদ্রিত হয়। ওই দিন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে কবি মহিলা সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় টাউনহলের বিপুল জনসমাবেশে তিনি পুনরায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা অনুলিখিত না হওয়ায় মুদ্রিত হয় নি। ঐ সভার শ্রোতা, গোবিন্দনারায়ণ সিংহের পুত্র সুধীরেন্দ্রনারায়ণ পরে লেখেন 'আজো আমার সেদিনকার কথা সুস্পষ্টরূপে মনে আছে। বক্তৃতা সুরু হল প্রথমে খুব ধীরে ধীরে, কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছায় না। তারপর আস্তে আস্তে কণ্ঠ তাঁর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল। কবি

সে-বক্তৃতায় আমাদের দেশের দুর্দশার যথার্থ হেতু বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন যে নিম্ন বর্ণের লোকদের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও অপ্রীতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ। ভারতবর্ষের পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। তিনি আশা করেন যে একদিন পৃথিবীর এক ধর্ম হবে। সেদিন স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধবে না। বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হবে ভারতবর্ষই কেননা, এখানে যত ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার বর্ণগত পার্থক্য-বিশিষ্ট নরনারীর বাস পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়। উপসংহারে বল্লেন "সূর্য্য পূর্বদিকেই উদিত হয়। বাংলা দেশ ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। সমগ্র ভারতবর্ষ তাই আজ বাংলার দিকে আশা করে চেয়ে আছে। বাঙালীকেই আজ ভারতের এই জনজাগরণযজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে হবে।" মনে আছে এই বক্তৃতায় এক জায়গায় কবি বলেছিলেন— "এক নয়, দুই নয়, বহু বহু রাজা আমাদের শোষণ করছেন।" তা ছাড়া এ কথাও বলেছিলেন— "কাগজের নৌকোতে ক'রে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না।" মানে দরখাস্ত পেশ করে স্বরাজ মেলে না। "অধর্মেন এধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি'—তাঁর প্রিয় এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে তার তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।'১

৭ নভেম্বর, মুরারিচাঁদ কলেজ ছাত্রাবাসে প্রায় চার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ছাত্ররা কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এর

---

১ সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ, কবিপ্রণাম (১৩৪৮) পরিশিষ্ট পৃ. ৫

উত্তরে কবি প্রায় একঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন। কবি-প্রদত্ত এই ভাষণ পরে 'আকাঙ্ক্ষা' নামে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় পৌষ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্টে রবীন্দ্র সংবর্ধনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ, কবি-প্রণাম (১৩৪৮) পরিশিষ্ট পৃ ১-৮।

শ্রীহট্ট থেকে চাঁদপুর-গোয়ালন্দের পথে কবি ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় এবং তার পরদিন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেন।

পত্র ৯, ১০। লণ্ডন থেকে জাহাজে রওনা হয়ে ১৯২০ সালের ২৮ অক্টোবর রাত্রে কবি নিউইয়র্ক পৌঁছেন। তিনি আমেরিকা ত্যাগ করেন ১৯ মার্চ ১৯২১-এ। এই সময়ে, কবির আমেরিকা অবস্থান কালে ৯ এবং ১০ সংখ্যক পত্র লিখিত।

কবি হার্ভার্ডে বক্তৃতা করেন জানুয়ারি ১২ ও ১৩ তারিখে। বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'The Folk Poets of Bengal' এবং 'The Meeting of East and West'। ৯ এবং ১০ সংখ্যক পত্র স্পষ্টতই এই তারিখের পূর্বে লিখিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সময়ে এণ্ড্রুজের কাছে লিখিত এক পত্রে[১] কবি হার্ভার্ডের বক্তৃতা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন 'I am going to read my lecture on the Poet's Religion to-night to the Wellesley College students. To-morrow and the day after I have to read two more lectures in Emerson Hall, Harvard" এই পত্রের

---

[১] Modern Review July 1922 p7 দ্র Letters From Abroad (1924) p.59

তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৯২১। কিন্তু তারিখটি সম্ভবত ভ্রমাত্মক। আমেরিকার তৎকালীন সংবাদপত্র Evening Globe এর ১২ জানুয়ারির সংখ্যায় কবি-প্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত খবরটি মুদ্রিত হয় :

'Wellesley Jan 12. Dr. Rabindranath Tagore, the famous Indian mystic philosopher and poet addressed a large audience of Wellesley faculty and students at the Houghton Memorial chapel on the college campus, at 8. 15 last evening. The address was in the form of a paper on the subject "The Poet's Religion" read by R. Tagore, the author and was philosophical and symbolic in form and content' [২]

৬ জানুয়ারি বোস্টন থেকে অপর এক সংবাদে প্রকাশ :

'Dr. Rabindranath Tagore, oriental philosopher and poet, will spend two days at Harvard next week speaking Wednesday and Thursday afternoon at 4-30 O'clock in the new lecture hall'[৩]

উল্লেখযোগ্য ১২ ও ১৩ জানুয়ারি (১৯২১) যথাক্রমে বুধ ও বৃহস্পতিবার ছিল।[৪]

[২, ৩] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সংবাদপত্র-কর্তিকা 1921.

[৪] J. G. Jethabhai 100 years' Indian Calendar (3rd Ed. 1932), p 305

'হার্ভার্ডে……হবে না।' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কালিদাস নাগের পত্র, প্যারিস, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ১৯২১।[৫]

পত্র ১০। 'আমার গানের……জানিয়ো' —এই তর্জমা সম্ভবত সিলভ্যাঁ লেভিকৃত 'মাটীর প্রদীপ' ও 'জনগণমনের' ফরাসী তর্জমা।

জানুয়ারি ১৯২১-এ প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ ও বণিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে 'হিন্দুস্থান সভা'র প্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষে সিলভ্যাঁ লেভি বক্তৃতা করেন এবং 'মাটীর প্রদীপ' গানটি ছন্দে অনুবাদ করেন। গানটি গীত হওয়ার পূর্বে অনুবাদটি তিনি সভাস্থ সকলকে শোনান। এবিষয়ে কালিদাস নাগ লিখেছিলেন 'তাছাড়া "জনগণ" গানটিও—এত প্রিয় হয়ে উঠেছে যে সেটিও Levi অনুবাদ করে প্রোগ্রামে ছাপিয়েছেন।' দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কালিদাস নাগের পত্র, ১৪ জানুয়ারি ১৯২১।

রবীন্দ্রনাথের গানের তর্জমা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সিলভ্যাঁ লেভির পত্র:

'……I have now done with the translations into free verse of your pieces selected by Kalidas Nag; I wish to make them known (anonymously as for my part) to the French public.'[৬]

সম্ভবত লেভির জীবিতকালে এই সব অনুবাদের প্রকাশ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালে ফরাসী ভাষায় লিখিত '50 unpublished poems of Rabindranath Tagore

---

[৫] রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

[৬] রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত

Translated from Bengali by Sylvian Levi' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

পত্র ১১। অগস্ট ১৯২০-তে রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে এসে এখানকার ধনী ব্যবসায়ী কাহ্‌নের (Albert Kahn) 'Autour dumonde' নামক বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এবারেও তিনি এখানে উঠেছিলেন। সিলভ্যাঁ লেভি এই সময়ে ষ্ট্রাসবুর্গে ছিলেন।

পত্র ১২। দান্তের সপ্তম শতাব্দিক উৎসব ফ্লোরেন্সে সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কবি এই সময়ে 'শিশু ভোলানাথের' কবিতাগুলি রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

পত্র ১৫। শেষ পর্যন্ত এই সমাবর্ত্তনে কবির যাওয়া হয়নি।

পত্র ১৬। এই পত্রে উল্লিখিত রোম্যাঁ রোল্যাঁকে লিখিত (২১ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন) রবীন্দ্রনাথের চিঠি রোম্যাঁ রোল্যাঁর 'Inde' গ্রন্থে (1960 Editions Albin Michael) এবং অবন্তীকুমার সান্যাল অনুবাদিত এই বইয়ের বাংলা তর্জমা 'ভারতবর্ষে' (র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব ১৯৭৬, পৃ ৫১-৫৩) প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটিতে পিয়ার্সনের চরিত্র-মহত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

'সনেট'টি বৈশাখ ১৩৩১-এ 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পরে 'পূরবী' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

পত্র ১৭। এইসময়ে হারুনামারু জাহাজে রচিত কবিতাগুলি 'পূরবী' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কবি ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর থেকে পেরু যাত্রার পথে জাহাজে অসুস্থ অবস্থায় 'ঝড়' কবিতাটি রচনা

করেন। এর ইংরেজি 'Tempest' মডার্ণ রিভিয়ু মার্চ ১৯২৫-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৮। 'আজকাল আমার···স্বপ্নলোক বানিয়েছি।' সম্ভবত 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্গত 'ক্ষণিকা', 'খেলা', 'কৃতজ্ঞ', 'কিশোরপ্রেম', 'তারা', 'মিলন', 'অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতা।

'ডায়ারি'— 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' প্রবাসী ,অগ্রহায়ণ ১৩৩১ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত।

'আজ······কবিতা লিখেচি' কবিতাটি 'মিলন'— পূরবী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

পত্র ১৯। কালিদাস নাগ এ সময়ে প্রথমে ধলভূমে এবং পরে ঘাটশিলায় অবস্থান করছিলেন।

পত্র ২১। এই পত্র প্রসঙ্গে রামানন্দের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৭৮ সংখ্যক পত্র এবং এই পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ২২। দ্রষ্টব্য রামানন্দের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৭৯।

পত্র ২৩। এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চলছিল।

'আমার নিজের··· করি।' প্রসঙ্গত তুলনীয় 'অবশ্য ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি নে।' চিঠিপত্র-৯, পত্র ১০৩, পৃ ১৮০।

পত্র ২৪। অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ বাগচী ও কালিদাস নাগের উদ্যোগে 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে কবির যবদ্বীপ ভ্রমণের পূর্বে কবিকে তাঁরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

পত্র ২৮। 'রায় মহাশয়ের প্রশস্তিবাদ'— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে।

পত্র ২৯। Wilberforce সম্পর্কিত বাণীটি Visva-Bharati News (Aug 1933)-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

সীতাদেবীকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ

পত্র ২। তর্জমাটি সম্ভবত 'তপোবন' (প্রবাসী ১৩১৬, পৌষ) অবলম্বনে 'Message of the Forest'। এটি ১২ জানুয়ারি ১৯১৯-এ বাঙ্গালোরে কানাড়ী শিল্পসঙ্ঘের অভ্যর্থনায় কবির পঠিত ভাষণ। 'মডার্ণ রিভিয়ু মে ১৯১৯-এ এটি প্রকাশিত হয় এবং পরে সংশোধিত আকারে 'The Religion of the Forest' নামে 'Creative Unit'y গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামানন্দের পত্র-প্রসঙ্গ

পত্র ১। 'প্রদীপে…কবিতাটি'—কবিতাটি 'যাচনা', ৭ আষাঢ় ১৩০৫-এ রচিত এবং 'প্রদীপ' শ্রাবণ ১৩০৫-এ মুদ্রিত।

এটি পরে 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

দেশীয় শিল্প ও পণ্যজাত দ্রব্য সম্পর্কে যাতে দেশের শিক্ষিত লোকদের একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মে এজন্য জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে 'বেনোজল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশজাত এই সব দ্রব্যের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন 'সুবিধা ও অবসরমত একটু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক নিজ নিজ জেলায় যত প্রকার দেশী জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহার ঠিকানা,

কারিকরের নাম-ধাম, মূল্য, পরিমাণ, কলিকাতায় পাঠাইবার উপায় ও খরচা প্রভৃতি সম্বন্ধে তালিকা এবং যদি সম্ভব হয় নমুনাদি পাঠাইয়া আনুকূল্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।'

পত্র ২। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যায় প্রকাশিত এবং আষাঢ় ১৩২৪-এ 'নারায়ণ' পত্রিকায় উদ্ধৃত 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তরে 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধটি রচিত এবং সবুজপত্র আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৩। 'The Nation' প্রবন্ধটি মডার্ণ রিভিয়ু জুলাই ১৯১৭ তে মুদ্রিত হয় এবং পরে সংশোধিতরূপে 'Creative Unity'-তে (Macmillan 1922) সংকলিত হয়।

এই পত্রের পরবর্তী প্রসঙ্গের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫২ ও ৫৩।

পত্র ৬। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৭৭।

পত্র ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ র জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৮৭, ৮৮, এবং ৮৯।

পত্র ১২। 'ইন্দিরা দেবীর…কবিতা'-এ দুটি A Prayer (ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু) এবং I Know My Days Will End (জানি গো এ দিন যাবে)

পত্র ১৩। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের ৯১ সংখ্যক পত্র এবং উক্ত পত্রের পরিচয়।

পত্র ১৪। এই পত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯৯ এবং ১০০।

পত্র ১৬। ১৫ আশ্বিন ১৩৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে মহাত্মাজির জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি 'মহাত্মা গান্ধী' শিরোনামে প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ এ প্রকাশিত হয়েছিল। এর

ইংরেজি অনুবাদ MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI. মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯৩২-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এটির নীচে উল্লিখিত হয়: Translated by a journalist for the Modern Review from the Poet's Bengali speech at Santiniketan on Gandhiji's last birthday as published in PRABASI. Printed with the Poet's approval.

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ মস্কোতে চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'The Meaning of My Pictures' এই নামে তাঁর নিজের ছবি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে এই ভাষণটির প্রতিলিপি মডার্ণ রিভিয়ু জানুয়ারি ১৯৩২-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

'ছবি চারিখানি'—মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯৩২ সালে এবং প্রবাসী মাঘ ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের চারিখানি ছবি মুদ্রিত হয়।

পত্র ১৮। 'ব্রেলস্‌ফোর্ডের বহি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি'—হেনরী নোয়েল ব্রেলস্‌ফোর্ড-কৃত 'Rebel India' (London 1931) বইটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা 'Rebel India' মডার্ণ রিভিয়ু, জানুয়ারি ১৯৩৩-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ২০। এই পত্র প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১২৩ এবং উক্ত পত্রের পরিচয়।

পত্র ২১। 'একটি চিঠি পাইয়াছি'—এটি সম্ভবত এই বৎসর ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য আহ্বান পত্র।

'তপোবন' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের রচনা 'The Message of the Forest' মডার্ণ রিভিয়ু যে ১৯১৯ এ প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ২২। এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চর 'একজন লোক' কবিতাটির অনুবাদ 'A Person,—An Oldish Upcountry-man'— পাঠিয়েছিলেন। দ্র রবীন্দ্রনাথের ১৩৩ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ২৪। মহিলাসম্মেলন ও প্রবাসীর জন্য কবিতা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩৫।

পত্র ২৬। মডার্ণ রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭-এ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় অনুবাদিত ('Morning') তোমারি নামে নয়ন মেলিনু 'এবং ('The Night Lamp' 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া') মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ২৭। অরবিন্দ বসু-কৃত তর্জমা এবং Suggest ও Suggestion এর বাংলা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪২ এবং ঐ পত্রের পরিচয়।

পত্র ২৮। দ্রষ্টব্য পত্র ১৪৮ এবং উক্ত পত্রের পরিচয়।

পত্র ৩১। শরৎচন্দ্রের প্রবাসীতে লেখা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪৯, ১৫০, ১৫১ এবং উক্ত পত্রসমূহের পরিচয়।

পত্র ৩২। এপ্রিলের (১৯৪০) মডার্ণ রিভিয়ুতে রবীন্দ্রনাথের 'Poem : Raidas the Sweeper, was a tanner by caste' (পুনশ্চর : রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো) কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

পত্র ৩৩। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৫৪।

পত্র ৩৫, ৩৭। অমিয় চক্রবর্তী ও ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক যুগ্মভাবে কৃত-

‘ঐকতান’ কবিতাটির অনুবাদ ‘The Great Symphony’ মডার্ণ রিভিয়ু মার্চ ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়। ‘গান্ধি মহারাজ’ কবিতাটির কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ ‘Gandhi Maharaj’ মডার্ণ রিভিয়ু এপ্রিল ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়।

‘তিনসঙ্গী’র ইংরেজি অনুবাদ সম্ভবত হয় নি।

পত্র ৩৮। ‘নূতন চিঠিটি’—এটি রামানন্দের নিকট লিখিত ১৫৫ সংখ্যক চিঠি, প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮-এ এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

পত্র ৩৯। ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনুবাদিত ও কবি কর্তৃক সংশোধিত ‘জন্মদিন’ কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা ‘BIRTHDAY’ মডার্ণ রিভিয়ু, মে ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৪০। ‘একটি চিঠির প্রুফ’— এট রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বর্তমান সংকলনের ১০০ সংখ্যক চিঠির প্রুফ।

পত্র ৪১। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৫৮ ও ১৫৯।

পত্র ৪২। ‘সভ্যতার সঙ্কট’ প্রবন্ধটি ১৩৪৮ এর জন্মদিনে পাঠ করবার জন্য রচিত। পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। ১ বৈশাখ ১৩৪৮, সায়াহ্নে রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে এটি উদয়ন প্রাঙ্গণে ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক পঠিত হয়েছিল। কিঞ্চিৎ সংশোধিতরূপে প্রবন্ধটি প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮-এ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ লেখেন : ‘রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণটি প্রথমত যে আকারে লিখিত ও দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন এবং নূতন কিছু বাক্যও ইহাতে যোগ করিয়াছেন। “প্রবাসী”র এই সংখ্যায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ভাষণ। ইহা

আলাদা পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে বিক্রীর জন্য রাখা হইয়াছে।

ইহার যে ইংরেজি অনুবাদ “Crisis of Civilization” নাম দিয়া দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, কবি তাহারও সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। সেই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পাঠ মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে।’

পত্র ৪৩। উল্লিখিত পত্র রামানন্দকে লিখিত ১৬০ সংখ্যক পত্র, প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ৪৫। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ অংশে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, যেমন ‘বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গণ্য করা হউক’, ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গীতালির গান’, ‘সাধারণ লোকদের জন্য রবীন্দ্রসংগীত সভা’, ‘নিখিল ভারত রেডিও ও বাংলা ভাষা’, ‘রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথ’, ‘বিশ্বভারতীর স্বাতন্ত্র্য কেন আবশ্যক’, ‘রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙালীর কর্তব্য’ ইত্যাদি। যে দুটি বিষয় রবীন্দ্রনাথের অবগতির জন্য পাঠানো হয়েছিল সম্ভবত উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলির প্রথমটি তার অন্যতম। অপরটি নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ।

পত্র ৪৬। ‘সাহিত্যে চিত্র বিভাগ’ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই মুদ্রিত হয়।

পত্র ৪৭, ৪৮। সাহিত্যপরিষদের সভাপতিত্বের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র।

পত্র ৫০। ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত গল্পটি ‘বদনাম’, প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪ ও ১৬৫ সংখ্যক পত্রে এই গল্পটির

মুদ্রণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়।

পত্র ৬০। এই পত্রে উল্লিখিত নূতন লেখাটি 'সাহিত্যশিল্প'—প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮-এ মুদ্রিত। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের ১৬৬ সংখ্যক পত্র ও এই পত্রের পরিচয়।

পত্র ৬১। ভ্রমণবৃত্তান্তটি প্রবাসী বা মডার্ণ রিভিয়ুতে মুদ্রিত হয় নি। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের ১৬৮ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

পত্র ৬২। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৬৯।

ব্যক্তি-পরিচয়

অজিত	অজিত চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮), শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক
অনাদি	অনাদিকুমার দস্তিদার (১৯০৩-১৯৭৪), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও সংগীতশিক্ষক
অনিল	অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬-১৯৭৬), রবীন্দ্রনাথের এককালীন একান্ত সচিব
অপূর্ব	অপূর্বকুমার চন্দ (১৮৯২-১৯৬৬), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক
অমল	গগনচন্দ্র হোমের পুত্র অমল হোম (১৮৯৪-১৯৭৫), সাংবাদিক
অমিয়	কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—) রবীন্দ্রনাথের এককালীন একান্তসচিব
অরবিন্দ	অরবিন্দ বসু (১৮৯৫-১৯৭৭) জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়। দ্রষ্টব্য ১৪২ সংখ্যক পত্রের পরিচয়।

অরুণ	অরুণকুমার সেন দীনেশ সেনের পুত্র, কবি সমর সেনের পিতা
অসিত	অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪), প্রথমে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ও পরে জয়পুর ও লক্ষ্ণৌর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।
আগা খাঁ (তৃতীয়)	আগা সুলতান মহম্মদ শাহ (১৮৭৭-১৯৫৭) ইসমাইলী মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা।
'আমার বড় মেয়ে'	মাধুরীলতা দেবী (১৮৮৬-১৯১৮)
আশু	বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪) প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ
আশু মুখুজ্জে	বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯২৪)
ইন্দিরা	ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী।
এনাটোল ফ্রাঁসে	প্রকৃত নাম Jacques Anatole Francois Thibault (১৮৪৪-১৯২৪), ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও নাট্যকার
করুণাবিন্দু বিশ্বাস	ইউ রায় এণ্ড সন্স এর কার্যাধ্যক্ষ
কাডুরি	সাংহাইয়ের এককালীন ধনী ব্যবসায়ী ও ইহুদি-সংঘের সভাপতি
কালিদাস	কালিদাস নাগ (১৮৯২-১৯৬৬) ঐতিহাসিক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা
কালীমোহন	কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২-১৯৪০), শ্রীনিকেতনের

	গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী, সংগীতজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষের পিতা
কিশোরী	কিশোরীমোহন সাঁতরা, গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ
কুমারস্বামী	আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী (১৮৭৭-১৯৪৭)। ৫ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য।
কেদার	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৬৫) রামানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র
কেশবচন্দ্র	'নববিধানে'র প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)
কৃষ্ণ কৃপালানি	জন্ম ১৯০৭, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক, মীরা দেবীর জামাতা
গান্ধী	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)
গোরা	গৌরগোপাল ঘোষ (১৮৯৩-১৯৪০) শ্রীনিকেতনের প্রথম যুগের বিশিষ্ট কর্মী
চারু	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) প্রবাসীর সহসম্পাদক, লেখক
চিত্তরঞ্জন	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)
চৈন বন্ধু	সু-ৎসী-মো, রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সময় দোভাষীর কাজ করেন, শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২৮ সালে।
জগদীশ	বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭)
জ্ঞান	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মী, আশ্রমিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র

জোতিদাদা	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)
টমসন	এডওয়ার্ড টমসন (১৮৮৬-১৯৪৬) বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের অধ্যক্ষ
টুচি	Gussepe Tucchi (১৮৯৪-১৯৮৪) প্রাচ্য ভাষাবিদ ইতালীয় অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপক (১৯২৫-২৬)
ডাক্তার বসু	জগদীশচন্দ্র বসু
ডি সিলভা	W. A. De Silva সিংহলের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। ১৯২২ এ সিংহল ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।
তারাপুরওয়ালা	I. G. S. Tarapoorwala (১৮৮৪-১৯৫৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর পারসিক ভাষার অভ্যাগত অধ্যাপক (১৯২৭-২৯)
দান্তে	মধ্যযুগের বিখ্যাত ইতালীয় কবি Dante Alighieri (১২৬৫-১৩২১)
দিনু	রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র।
নগেন্দ্র গুপ্ত	(১৮৬১-১৯৪০) সাংবাদিক ও সাহিত্যিক
নন্দলাল	শিল্পী নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ
নিবেদিতা	ভগিনী নিবেদিতা, মার্গারেট নোবল্ (১৮৬৭-১৯১১)

নীতু	নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৩২) মীরা দেবীর পুত্র
নেপালবাবু	নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৬-১৯৪৪) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক
নোগুচি	য়োনে নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) ১৪৮ সংখ্যক পত্রের পরিচয় দ্রষ্টব্য
পরমহংস	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬)
পিয়র্সন	উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন (১৮৮১-১৯২৩)
প্রফুল্ল রায়	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) রসায়নবিদ, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা
প্রমথ	প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) সবুজপত্রের সম্পাদক, সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল
প্রশান্ত	প্রশান্ত মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) রবীন্দ্রনাথের কর্মসচিব, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা
ফর্মিকি	কার্লো ফর্মিকি (১৮৭১-১৯৪৩) রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপক (১৯২৫-২৬)
বড়দাদা	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)
বড়দিদি	সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)
বিধুশেখর শাস্ত্রী	(১২৮৫-১৩৬৪) বিশ্বভারতীর দীর্ঘকালের অধ্যাপক
বীণকর	সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী
বুবা	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বৌমা	প্রতিমা দেবী। ১৮৯৩-১৯৬৯
বুদ্ধদেব	সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। ১৯০৮-১৯৭৪
ভূপেনবাবু	ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৭৭-১৯৬২), শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক
মণিলাল	সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮৮-১৯২৯
মহেশবাবু	পণ্ডিত ও দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষ, বাঁকুড়া স্কুলের শিক্ষক।
মার্কাস অরেলিয়স	রোমদেশীয় সম্রাট ও দার্শনিক। ১২১-১৮০ খ্রী
মীরা দেবী	রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। ১৮৯৪-১৯৬৯
ডঃ মৈত্র	দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। ১২৮৪-১৩৫৬। চিকিৎসক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী
মৈত্রেয়ী দেবী	দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা, লেখিকা, সমাজসেবী
যদুবাবু	ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)
রথীন্দ্র	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১)
রাজেন্দ্র শাস্ত্রী	(১৮৫৯-১৯১৯) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও সরকারী অনুবাদক
রাণী	নির্মলকুমারী মহলানবিশ
রামানন্দ	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(১৮৬৪-১৯১৯) বিজ্ঞানের অধ্যাপক, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং দীর্ঘকাল সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক
রোম্যাঁ রোলাঁ	(১৮৬৬-১৯৪৪) ফরাসী ঔপন্যাসিক ও শান্তিবাদী দার্শনিক

লর্ড সিংহ	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (১৮৬৩-১৯২৮)
ললিত চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক ও সাহিত্যিক
লোকেন পালিত	(১৮৬৫-১৯১৫), স্যার তারকনাথ পালিতের পুত্র, বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী, সুহৃদ
লানমান	চার্লস লানমান (১৮৫০-১৯৪১), হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
লেভি সাহেব	সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫), প্রাচ্যভাষাবিদ চেকোস্লাভীয় পণ্ডিত, বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপক
সন্তোষ	কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬)
সরলা	সরলা দেবীচৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)
সীতা	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪)
সুকুমার	সাহিত্যিক সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)
সুকুমারের দিদি	সাহিত্যিক সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯)
সুধীন্দ্র বসু	(—১৯৪৫) জন্মস্থান ঢাকা, আইওআ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক
সুধীরচন্দ্র কর	(১৯০৬-১৯৭৭) রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব
সুভাষ	সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫ ?)
সুরেন	শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯৪-১৯৭০)

শচীন্দ্র দাশগুপ্ত	৫৪-সংখ্যক পত্রপরিচয় দ্রষ্টব্য
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	(১৮৭৬-১৯৩৮) কথাসাহিত্যিক
শান্তি	শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
শাস্ত্রী মহাশয়	পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (১২৮৫-১৩৬৪)
শ্রদ্ধানন্দ	পূর্বনাম লালা মুন্সিরাম (১৮৫৫-১৯২৬), হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা
হেমলতা বৌমা	(১৮৭৩-১৯৬৭) দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী, আশ্রম-বালকদের বড়মা, লেখিকা

সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্র একদা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কোনো কোনো পত্র একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে প্রবাসীতে এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে। প্রকাশের একটি যথাসাধ্য তালিকা নীচে দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এই-সব পত্রের প্রকাশকালে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চিঠিগুলির কিছু কিছু অংশ বর্জন করে মুদ্রিত করেন, কোনো কোনো চিঠি 'অপ্রকাশ্য' বলে চিহ্নিত করেন। বর্তমান সংকলনে পত্রগুলি যথাসম্ভব মূলানুযায়ী মুদ্রিত, তবে কোনো কোনো স্থলে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্জিত হয়েছে। এই সংকলনের প্রথম পত্রটি শান্তাদেবীর 'ভারত-মুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থের পৃ ৩১ থেকে গৃহীত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী

প্রবাসী

	বর্তমান পত্রসংখ্যা
বৈশাখ ১৩৪৮	১৩, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৪
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮	৯৬, ৯৯, ১০১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭
আষাঢ় ১৩৪৮	১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৬০
শ্রাবণ ১৩৪৮	১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৬৮
ভাদ্র ১৩৪৮	১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩
আশ্বিন ১৩৪৮	৬২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ৮৫, ৯০, ৬১, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৪
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮	৩৫
কার্তিক ১০৪৯	৪, ৭৬, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৬ ১৪৯, ১৫০, ১৫১; ১৫২, ১৫৩

মাঘ ১৩৫৪	৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৭, ১৮, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ৩৬, ৪৭
ফাল্গুন ১৩৫৪	৪০, ৪৬, ৪৮, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭১, ৭২
চৈত্র ১৩৫৪	৬, ১১, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৫
দেশ	
২৩ জানুয়ারি ১৯৬০	১৬৮
২৯ মে ১৯৬৫	১২৯
৩ জুলাই ১৯৬৫	১৩, ৬৬
মাসিক বসুমতী	
আষাঢ় ১৩৭২	১৩, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪১, ৫২
শ্রাবণ ১৩৭২	৫৩, ৫৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ১৫৫, ১৫৬
আশ্বিন ১৩৭২	১০২, ১০৪, ১১৩, ১১৬, ১১৯, ১২৪
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা	
কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪	১৫৬
মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪	৮৬
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫	১৪৬

শ্রাবণ-আশ্বিন	১৩৭৫	৭৩
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৫	৮৩
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৫	১২৯
শ্রাবণ-আশ্বিন	১৩৭৬	১৩৮
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৬	৬২
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৬	১২৭
বৈশাখ-আষাঢ়	১৩৭৭	৩২
শ্রাবণ-আশ্বিন	১৩৭৭	১১৪
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৭	১৩০
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৭	১৪০
বৈশাখ-আষাঢ়	১৩৭৮	১২৪
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৮	১৩৫
মাঘ-চৈত্র	১৩৭৮	১৪১
বৈশাখ-আষাঢ়	১৩৭৯	১৫২
কার্তিক-পৌষ	১৩৭৯	১৪৯

অরুন্ধতী দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৯	৩

রমা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৮	১

ইবিতা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৮ ১

শান্তা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৮ ১৬

আশ্বিন ১৩৪৯ ২, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১

কালিদাস নাগকে লিখিত

প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৯ ৮
পৌষ ১৩৪৯ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২,
মাঘ ১৩৪৯ ১, ১৪, ১৫
চৈত্র ১৩৪৯ ১৬, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬
২৭, ৩১, ৩২

আজকাল। ৪ মে ১৯৮৪ ১২ক

শান্তিনিকেতন পত্রিকা
শ্রাবণ ১৩২৯ ১৩

সীতা দেবীকে লিখিত

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ ৫

প্রসাদের উদ্দেশে

শান্তিনিকেতন পত্রিকা

অগ্রহায়ণ ১৩২৬ শ্রাদ্ধবাসরে কবি-প্রদত্ত ভাষণ

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ পত্রাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেন প্রয়াত পুলিনবিহারী সেন। এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। এই গ্রন্থসম্পাদন সম্পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তখন ১৪১টি পত্র মুদ্রণের কাজ শেষ হয়েছে। অতঃপর ১৯৭৭-এর প্রথম দিকে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং ১৯৭৮-এর প্রথম দিকে শ্রীভবতোষ দত্তের উপর এই ভার ন্যস্ত হয়।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পত্রগুলিতে প্রসঙ্গের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলপত্রের সঙ্গে মেলানো, তথ্যাদি সংগ্রহ, সর্বোপরি শান্তিনিকেতন প্রেসের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের জন্য গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হল।

এই খণ্ডে সংকলিত পত্রগুলির প্রাপ্তিস্থল স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হল। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিগুলি রামানন্দ তাঁর দুই কন্যা সীতাদেবী ও শান্তাদেবীকে দুই ভাগে ভাগ করে দেন। সীতাদেবী রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির প্রাক্‌কালে তাঁর কাছে সংরক্ষিত চিঠি বিশ্বভারতীকে দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিও তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন। শান্তাদেবী তাঁর সংরক্ষিত পত্রগুলি দান করেন রবীন্দ্রভারতীকে। সীতাদেবীর নিকট থেকে রবীন্দ্রভবনের জন্য চিঠিপত্র এবং পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কৃতিত্ব পুলিনবিহারী সেনের। রামানন্দের পরিবারবর্গের কাছে লিখিত মূল পত্রগুলি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। এ ছাড়া আরো চিঠি থাকা সম্ভব।

বর্তমান সংকলন মুদ্রণের কাজ যখন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে তখন

কালিদাস নাগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় ('আজকাল', ৪ মে ১৯৮৪)। বর্তমান সংকলনে এটি সংযোজিত হল (পৃ ৩২০ ক-৩২০ ঝ)। পত্রটি প্যারিস থেকে ১ বৈশাখ ১৩২৯-এ কালিদাস নাগের লেখা চিঠির উত্তর। কালিদাস নাগের চিঠিটি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে।

প্রবাসীতে রবান্দ্রনাথের যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি মূল পত্রের অস্বাস্তিকর-প্রসঙ্গবর্জিত। কয়েকটি চিঠি রামানন্দ 'অপ্রকাশ্য' চিহ্নিত করে শান্তাদেবীকে দেন। চিঠিপত্র দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশের যখন প্রস্তাব হয়, তখন পুলিনবিহারীর আগ্রহাতিশয্যে শান্তাদেবী সেগুলি কপি করে নিতে দেন। তদনুযায়ী এই চিঠিগুলি গৃহীত। প্রথম দিকের কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ অমুদ্রিত রাখা আছে। পরবর্তীকালে যথাযথ মুদ্রণের নীতি গৃহীত হলেও পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদিত অংশের পরিবর্তন করা হয় নি।

চিঠির শীর্ষে বাঁদিকে যে ইংরেজি তারিখ তা পত্রে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী প্রদত্ত অথবা পত্রান্তর্গত প্রসঙ্গ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। অনুমিত তারিখ বন্ধনীর দ্বারা চিহ্নিত। তারকাযুক্ত তারিখ ডাকঘরের ছাপ থেকে গৃহীত। তারিখের পূর্বের তারকাচিহ্ন চিঠি ডাকে দেবার এবং তারিখের পরবর্তী তারকাচিহ্ন চিঠিবিলির নির্দেশক।

পত্রের অভ্যন্তরস্থিত তৃতীয় বন্ধনীযুক্ত সমস্ত অংশই অনুমিত পাঠ।

যথাসম্ভব সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানো সম্ভব হয় নি। সংখ্যা-মুদ্রণে কয়েকটি প্রমাদের প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। দ্রষ্টব্য পৃ. ২৪৫, ৩০৬, ৩০৭, ৪৫০, ৪৫৮ এবং ৪৬০।

গ্রন্থপরিচয় রচনায় নানা ব্যক্তির কাছে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। প্রয়াত মনোরঞ্জন গুহ এবং শ্রীক্ষিতীশ রায় মহাত্মা গান্ধী-সম্পাদিত 'Young India'তে প্রকাশিত 'The Centre of Indian Culture'-এর সারাংশ প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য অনুগ্রহ করে জানিয়েছিলেন। শ্রীনির্মালা আচার্য লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরি থেকে 'চোখের বালি'র এণ্ডার্সন-কৃত অনুবাদের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। শ্রীপার্থ বসু কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরনো স্টেটস্ম্যান পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। শ্রীগার্গী দত্তের সাহায্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত যদুনাথ সরকারের 'India Through the Ages' বইখানি দেখবার সুযোগ হয়েছে।

তথ্য সন্ধানে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রভবনের অন্যান্য কর্মীদের সাহায্য সব সময়েই অবারিত ছিল। বর্তমান সম্পাদকের অধ্যক্ষতার (জানুয়ারি ১৯৭৮-মে ১৯৮১) পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীনরেশ গুহ ভবন-গবেষণা-সহায়িকা ড. সাধনা মজুমদারকে বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদন কর্মে সহায়তা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। গ্রন্থপরিচয় ও তথ্যসংগ্রহ, প্রেস কপি প্রস্তুত করা এবং প্রুফ সংশোধন করা— সকল পর্যায়েই তাঁর সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। রবীন্দ্রভারতীতে সংরক্ষিত পত্রগুলি মেলানোর কাজে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তা উল্লেখ্য।

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	শুদ্ধরূপ
১৯৬	১৮	স্প্রিং
২১৩	১০	নিগূঢ়
২১৩	১৮	সম্বন্ধরহস্য
২২৫	২০	রোদ্দুর
২৪৫	২	১-৩৩
২৮৬	৪	অম্বুবাচীর
২৯৭	২	ফুটো
৩০৬	৭	২৪
৩১৭	৭, ৮	৩৩, ১৫
৩২৪	১	তারা
৩৬০	১৭	Personality
৩৬২	৮, ১৮	Nation
৩৯০	১৩	করিয়া
৪০৪	১১	suggest
৪৩২	১৫	অসংযমের জন্যে
৪৪৪	২	এলাহাবাদ
৪৫০	৮	১৯১২
৪৫৮	১১	১৯
৪৬০	৫, ৬	১৯১২
৪৭১	৬	শাসক
৪৮৬	৭	লাহিড়ীর

মূল্য ৪২'০০ টাকা

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ -সহ রবীন্দ্রনাথ। ১৩১০

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

336787

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র । ত্রয়োদশ খণ্ড

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে
লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ : মার্চ ১৯৯২

শ্রীনিরঞ্জন সরকার ও শ্রীঅনাথনাথ দাস
-কর্তৃক সংগ্রথিত ও সম্পাদিত

© বিশ্বভারতী ১৯৯২

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস। ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

বিষয়সূচী

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী ১

শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবীকে লিখিত পত্র ১২৭

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্রাবলী ১৩১

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১৫৭

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র ১৬১

পরিশিষ্ট ১

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় -লিখিত পত্র ১৮৩

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী -লিখিত পত্র ১৮৫

পরিশিষ্ট ২

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : Santiniketan Reminiscence ১৯৩

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার পরিচয় ২০২

গ্রন্থপরিচয়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় -পরিচিতি, পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ২১৩

সুবোধচন্দ্র মজুমদার -পরিচিতি, পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ৩১৫

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -পরিচিতি ৩৩৮

কুঞ্জলাল ঘোষ -পরিচিতি, পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ৩৪৩

সাময়িকপত্র ও গ্রন্থে প্রকাশের সূচী ৩৪৭

ব্যক্তিপরিচিতি ৩৪৯

বিজ্ঞপ্তি ৩৫৫

সংকেত ৩৫৮

চিত্রসূচী

আলোকচিত্র

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ-সহ : ১৩১০ প্রবেশক

সুহৃদ এবং আশ্রমিক -সহ রবীন্দ্রনাথ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাস

পাণ্ডুলিপিচিত্র

পত্রাবলী :

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

১

২৫ মে ১৯০২

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E.B.S.R

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

এইমাত্র আপনার চিঠি পাইলাম: আমি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে আসিয়াছি। পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করিতেছিলাম। এখানে আসিয়া শরীর কিছু যেন ভাল আছে অন্তত মন নিরুদ্বেগ থাকাতে অনেক কাজ করিতে পারিতেছি। শীঘ্র ফিরিব সংকল্প ছিল কিন্তু বোধহয় বিলম্ব হইতে পারে। কাজ পড়িয়াছে।

পনেরো দিনের অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গেলে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। রুগ্‌ণ কন্যাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিবেন এরূপ প্রত্যাশা করিব না।

কন্যার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে আমার মতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শ্রেয় নহে কিন্তু নিকটে যখন হোমিয়োপ্যাথির ব্যবস্থা নাই তখন উপায়ান্তর দেখি না।

যাহা হউক, রথীর ভার আপনার উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্তই আছি জানিবেন। ইতি ১১ই জ্যৈঃ ১৩০২ [১৩০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ জুলাই ১৯০২

ওঁ [শিলাইদহ]

নমস্কার সম্ভাষণপূৰ্ব্বক নিবেদন—

অদ্য আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যেরূপ ছুটি ইচ্ছা করিয়াছেন সেইরূপ লইবেন। এ পত্র যথাসময়ে পৌঁছিবে কি না জানি না। যে যে magazines বিলাত হইতে আনাইবার কথা ছিল তাহার তালিকা সুবোধ আজও আমাকে পাঠাইল না— সেইজন্য এ পর্য্যন্ত সেগুলি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। ইতি ৩২শে আষাঢ়, ১৩০৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৭ জুলাই ১৯০২]

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

রেবাচাঁদ আর ফিরিবেন না। সুবোধ আজ রাত্রে বোলপুরে যাইতেছে। অবিনাশ বসু নামক Kinder Garten ওয়ালা একটি শিক্ষক পয়লা অগষ্ট হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ আপনারা সকলে ভাগ করিয়া কাজ করিবেন—দেখিবেন ছোট ছেলেদের মধ্যে কোনপ্রকার

উচ্ছৃঙ্খলতা না দেখা দেয়— যথাসময়ে সমস্ত কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাকে আজ রাত্রেই পুরী যাইতে হইবে। সেখানে আমার জমি আছে তাহা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ গোল করিতেছে তাহা নিষ্পত্তি করিয়া আসিতে হইবে। হয়ত আমার বোলপুরে ফিরিতে আরো সপ্তাহখানেক বিলম্ব হইতে পারে। আপনারা কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হোরিকে এক ঘণ্টা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না কি? আমার শরীর মাঝে যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার চেয়ে ভাল আছে। আপনারা নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন কি? ইতি রবিবার [১১ শ্রাবণ ১৩০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২০ অক্টোবর ১৯০২]

ওঁ

[কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

জগদানন্দ রেমিটেণ্ট্ জ্বরে শয্যাগত। সুবোধ তাহার কন্যার পীড়ায় আবদ্ধ। এই সকল আশঙ্কাতেই আমি পূজার সময় বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলাম। যাহা হউক্, এখন কি করিয়া সেখানকার কাজ চলিবে ভাবিয়া পাইতেছি না। পণ্ডিতমহাশয় নানা অনুনয় করিয়া স্বদেশে

হইতে তাঁহার পরিজনদের কলিকাতায় আনিতে গেছেন। সপ্তাহের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে— কিন্তু আমার মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাড়ীতে ব্যাম লইয়া আমি নড়িতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। সমস্ত যেন খেলার মত বোধ হইতেছে। সুবোধ যদি এখনও না আসিয়া থাকে তাহাকে একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দিবেন। নরেন্দ্রও কি আসেন নি? তাঁহাকেও তাড়া দিবেন। এণ্ট্রেন্স্ ক্লাসের অঙ্কের কি গতি হইবে? রেমিটেণ্ট্ জ্বর সারিতে কতদিন লাগিবে এবং তাহার পরে বললাভ করিতেও কতদিন বিলম্ব হইবে কিছুই বলা যায় না— তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়াও দীর্ঘকাল জগদানন্দ পূরা কাজ করিতে পারিবেন না এবং মাঝে মাঝে জ্বরেও পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই— এজন্য আমি বারম্বার তাঁহার কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হইয়াছে। আমি ঠিকা লোকের চেষ্টায় রহিলাম কিন্তু উভয়ের বেতন বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে— অতএব জগদানন্দ যে পর্য্যন্ত না আরাম হন ও পূরা কাজ করিবার বললাভ করেন ততদিন তাঁহাকে ক্ষতিস্বীকার করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে আপনারা মিলিয়া, রথীদের অঙ্কচর্চ্চার যাহাতে ব্যাঘাত না হয় সে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষকাভাবে আজকাল ছেলেদের অনেকটা সময় হাতে থাকিবে— বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে নষ্ট হইবার দিকে না যায়। রথীকে আপনার ঘরে শুতে দিবেন— তাহাকে প্রেম প্রভৃতির সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবেন এবং

সর্ব্বপ্রকার নিয়মরক্ষায় বিশেষরূপে ব্রতী করিবেন। ছাত্রদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন শৈথিল্য ঘটিতে দিবেন না। আমি জানি আপনি এ সকল বিষয়ে উদাসীন নহেন তথাপি একান্ত উদ্বেগবশত আপনাকে লিখিলাম। এই অরাজকতার সময়টুকু আপনাকে বিশেষ সচেষ্ট ও সতর্কভাবে চালাইতে হইবে। ইতি বৃহস্পতিবার [৬ কার্তিক ১৩০৯]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৭ অক্টোবর ১৯০২]

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

সিংহ তাহার বাড়িতে কালীপূজার দিনে রথী ও প্রেম সিংহকে লইয়া যাইবার জন্য ধরাধরি করিতেছে। এ প্রস্তাবে আমার উৎসাহ নাই। রথীর পড়াশুনার মধ্যে সম্প্রতি কোনপ্রকার অনিয়ম ঘটিতে দিতে ইচ্ছা করি না— বিশেষত যদি দৈবাৎ সেখানে গিয়া অসুখ বিসুখ হয় তবে মুস্কিলে পড়িতে হইবে— অতএব সাবধান থাকাই ভাল। প্রেমের পক্ষেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন।

সিংহের হাত দিয়া সেখানকার লাইব্রেরির জন্য Grant Duff's Mahrattas এবং Letters from a Mahratta Camp বই পাঠাইতেছি। আশা করি সে যথা অবস্থায়

আপনার হাতে তাহা দিবে। এ গ্রন্থ পড়িতে আপনার ঔৎসুক্য হইবে জানিয়াই কিনিয়াছি। পড়িবার সময়, যে সকল ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে কাব্যে নাটকে বা উপাখ্যানে লিখিবার যোগ্য বোধ করিবেন দাগ দিয়া রাখিবেন।

সুবোধ এখনো আসিয়া পৌঁছিল না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। সুবোধের সঙ্গে অচ্যুতের ফিরিবার কথা ছিল তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইল জানি না। এবারে ছাত্রদিগকে যাহাতে ভূগোল পড়ান হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিবেন। ভূগোল সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনভিজ্ঞতা অদ্ভুত ও হাস্যকর।

আশা করি রথীসন্তোষের পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে। নরেন্দ্র তাহাদিগকে জিয়োমেট্রি পড়াইতেছেন কিন্তু আলজেব্রা ও পাটিগণিত বোধহয় বন্ধ আছে।

আমি এখানে রোগতাপ লইয়া অত্যন্ত উন্মনা আছি। আমার স্ত্রীর রোগ এখনো সারিবার দিকে গিয়াছে বলা যায় না। রেণুকার এখনো sore throat চলিতেছে—মীরা কাল জ্বরে পড়িয়াছে। কেবল শমী সম্প্রতি ভাল আছে। সে বোলপুরে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। আমি যে কবে বোলপুরে ফিরিতে পারিব কিছুই বলিতে পারি না। ডাক্তার ছুটি চাহিতেছিলেন—কিন্তু এখন আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে কোনক্রমেই ছুটি দেওয়া চলে না—এইজন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও দিতে পারিলাম না।

হরিচরণ যে সংস্কৃত পাঠ লিখিতেছিলেন সেটা বোধহয় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। হোরির খবরটা দিবেন। ইতি সোমবার [১০ কার্তিক ১৩০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নভেম্বর ১৯০২]

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আপনার চিঠি পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম।

এখানে আমার উদ্বেগের কারণ দূর হয় নাই। যদি[ও] স্ত্রীর অন্যান্য উপসর্গ শান্ত হইয়াছে তথাপি দুর্ব্বলতা এত অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে যে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানাবিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনকার্য্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছি [করিয়াছেন]।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইঁহাকে লিখিয়া দিলাম। সেই লেখা আপনারা পড়িয়া

দেখিবেন— যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইহাকে সেইরূপ সাহায্য করিবেন।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম— আপনি জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষ-সমিতির সভাপতি আপনি ও কার্য্যসম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কা[ে]জই আপনাদের নির্দ্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন। নিয়মগুলির যেরূপ পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

রমাকান্তবাবুর ছেলে গেছেন আমি জানি। কুঞ্জবাবুর সঙ্গেও দুই একটি ছেলে যাইবে— ইহারাও বেতন দিবে।

অচ্যুতের আসা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি। অক্ষয়বাবু বোধহয় বিরক্ত হইয়াছেন।

রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন। এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য করিবেন।

আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুসি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব।

ঐতিহাসিক পাঠও আপনাকে লিখিতে হইবে। যখন অবসর পান ইহাতে হাত দিবেন।

ইংরাজের ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে একটি যথার্থ ইতিহাস ছেলেদের জন্য লেখা আবশ্যক। British India

নামক একটি চটি বই পাইয়াছি তাহা অবলম্বন করিলে লেখা সহজ হইবে।

এখনি ডাক্তারের বাড়ি যাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি লিখিয়া বিদায় হইতেছি। শুনিলাম কুঞ্জঠাকুর একলা কাজ করিতে অক্ষমতা জানাইয়াছে— যথার্থ অবস্থা এবং কি করা কর্ত্তব্য আমাকে জানাইবে[ন]। পূর্ব্বে রান্নাঘরে শরৎ নামক যে চাকর কাজ করিত বোধহয় এখন তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে— যদি তাহাকে রাখিলে কাজের সুবিধা বোধ করেন তবে রবি সিংহকে পত্র লিখিয়া তাহাকে আনাইয়া লইবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৫ ডিসেম্বর ১৯০২

ওঁ [কলিকাতা]

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্ব্বাপেক্ষা

ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্যসম্বন্ধ থাকে না। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?

আমি আগামী সোমবারে প্রাতের ট্রেনে বোলপুরে যাইব। আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ডিসেম্বর ১৯০২]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় সম্ভাষণ—

যেভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ প্রশান্ত করিয়া কার্য্যপ্রণালীকে পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা ছিল অতিথি থাকাকালে তাহার অবসর পাওয়া অসম্ভব। প্রসন্নচিত্তে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন তাহা করিবেন এ সম্বন্ধে আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আমি তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি— বোধহয় সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ না করিয়া কাজ বিধিমত চালানো কঠিন নহে ইহা দেখানো সম্ভব। কিন্তু আপনারা যদি আমার শারীরিক

মানসিক সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিয়া আমাকে কিছু পরিমাণে নিষ্কৃতি দিতে পারেন তবে আমি নিরুদ্বিগ্ন হই।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১০ জানুয়ারি ১৯০৩

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আমি কয়েকদিন আপনাদের সংবাদ লইবার জন্য উৎসুক ছিলাম— কিন্তু সময় পাই নাই— কয়েকদিন নিয়ম রচনায় ব্যস্ত ছিলাম। সকল বিষয়েই পাকাপাকি নিয়ম না করিলে ক্রমশঃ শৈথিল্যের দিকে যাইবে— বিশেষত আমার অনুপস্থিতিকালে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি— তিনি যেরূপ বিধান করিয়া দিবেন তাহাই সকলে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিলে শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে। এখন হইতে প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজ বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এবার শান্তিনিকেতনে আসিবার সময় আপনি এবং জগদানন্দ আপনাদের বিছানা ও ভোজনপাত্র সঙ্গে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ কাল টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া গেছেন। বোধ করি কাজ পাইয়াছেন। তাঁহার স্থান শূন্যই রাখিলাম।

সুবোধ এখনো আসিয়া পৌঁছেন নাই— কাল সকালে আসিতেও পারেন।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, ব্যাঙ্কে এখন আমার এক বৎসরেরও সঙ্গতি নাই— বৎসরশেষে বোধ হয় অনেক টাকা অনটন পড়িবে— অতএব এবারকার মত আপনার ঘর যদি না করি মাপ করিবেন— শুনিয়াছি আপনার ভাই এখনো দেশ ছাড়িবার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই, অতএব এখন আপনার তেমন বেশি তাগিদ নাই: পূবদিকে যে ভিত পত্তন করা হইয়াছে তাহার উপরে ল্যাবরেটরি ঘর তৈরি করিব, যতদিন না যন্ত্রাদি সংগ্রহ হয় ততদিন কুঞ্জবাবু সপরিজনে সেখানে আশ্রয় লইবেন তাহার পরে তিনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবেন— কাজ লইবার সময়েই তিনি বাসস্থানের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আমি নিজের লেখাপড়ার জন্য একটি নিভৃত ঘর তৈরি করার সংকল্প করিয়াছিলাম তাহাও আপাতত স্থগিত রাখিয়াছি, যদি অর্থের সচ্ছলতা ঘটে তবে দেখা যাইবে। নরেন যদি না আসেন, তবে আপনি ও জগদানন্দ মাঝের ঘরে স্থান লইবেন, আমাকে আপনার ঘরটি ছাড়িয়া দিতে হইবে— নতুবা আমার লেখা একেবারে বন্ধ। সে ঘরে দিনের বেলায় আমি কাজ করিব— রাত্রে যাঁহার খুসি শয়ন করিতে পারিবেন।

আপনারা কৃষ্ণনগরে স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়াছেন শুনিয়া খুসি হইলাম। জগদানন্দের যত্নে নিশ্চয়ই সেখানে আপনাদের

কোন অভাব নাই— বোধহয় আহারাদি সম্বন্ধে নিতান্ত তপস্বীর ন্যায় আপনাদিগকে কাল যাপন করিতে হইতেছে না। ফিরিবার সময় কিছু নবদ্বীপের খইয়ের মোওয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন— শান্তিনিকেতনে আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। কৃষ্ণনগরের বাজারে এখানকার বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য সোনামুগ প্রভৃতি কোন আহার্য্যদ্রব্য যদি শস্তা পাওয়া যায় মনে করেন (বিপিনকে বলিলেই সে সন্ধান লইবে) তবে এখানকার জন্য, যে পরিমাণ আপনাদের লাগেজের সঙ্গে সহজে আসিতে পারে লইয়া আসিবেন মূল্য এখানে হিসাব করিয়া লইলেই হইবে। অমি শুক্রবার প্রাতের মেলে কলিকাতায় যাইব— আমার ভৃত্যটিকে যথাসময়ে মুক্তিদান করিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২২ জানুয়ারি ১৯০৩

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

গত সোমবারে রথী ইনস্পেক্টার আপিসে গিয়া তাহার দরখাস্ত সহি করিয়া আসিয়াছে। বুধবারে আপনার পত্র পাইলাম ইতিমধ্যে কেবল দুই তিন দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে উৎসবের আমোদ হইতে বঞ্চিত করিলাম না। এখানে

তাহারা সময়ের অপব্যয় করিতেছে না— যত্ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতেছে— বিদ্যার্ণব প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা তাহাদিগকে সংস্কৃত পাঠে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। তাহারা ১২ই মাঘে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে বোলপুরে ফিরিবে এবং তাহার পর হইতে কোন কারণেই তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত হইবে না। লরেন্সসাহেব আগামী মার্চ্চ মাসে বোলপুরে যাইবে। আমি মাঘের শেষ সপ্তাহে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িব— ফিরিতে দুই তিন মাস লাগিবে। ইতিমধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য আমি নিয়ম দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সত্যেন্দ্রের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি— যাহাতে নিয়ম কোনমতেই শিথিল হইয়া [না] পড়ে আমি বার বার তাহাকে সেই উপদেশ দিয়া দিয়াছি। কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আমি সঙ্গত বোধ করি— এখন হইতে, নিয়ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আপনারা সকলেই অনুগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি সতর্ক থাকিবেন।

সোমবার ১১ই মাঘ উপলক্ষ্যে ছুটি থাকিবে। যদি ইচ্ছা করেন তবে শনিবার অপরাহ্নে ছুটি লইয়া সোমবার রাত্রে বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন। সত্যেন্দ্রকে এই সম্বন্ধে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। ইতি ৮ই মাঘ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[২৪ জানুয়ারি ১৯০৩]

ওঁ [কলিকাতা]

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার আবেদনখানি আমি সত্যর নিকট পাঠাইয়া দিলাম তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাকে দীর্ঘকালের *জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইবে এই জন্যই বিশেষরূপে একজনের উপরেই সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার স্থাপন করিয়া যাইতে হইল*— আপনি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন এ বন্দোবস্তে তাহা ঘটিবে না বলিয়া আশা করি। ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে যথোচিত সংযত করিয়া রাখিবেন তাহাতে কোন বাধা নাই, ক্লাসের বাহিরে তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব একজনের উপরে থাকাই সঙ্গত— নতুবা কার্য্যপ্রণালীর ঐক্যরক্ষা হয় না। ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও সংস্কার স্বভাবতই বিভিন্ন— সেইজন্য বৃহৎ কার্য্যে নিয়মের সাহায্যেই ঐক্য স্থাপিত হয়। সকলেই নিয়মের অধীনে থাকিলে অধ্যাপকদের মধ্যে বাদ-বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ত্তব্যবিধির সহিত পরস্পর সৌহার্দ্যের কোন সংঘাত হওয়া উচিত নহে।

আমি ১২ই মাঘ মেলে যাইব। আপনাদের গল্পগুলি শুনা যাইবে। আমি পণ্ডিতমহাশয় ও সতীশকে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।

রেণুকা কলিকাতায় আসিয়াছে। ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছি।

মীরার পড়াশুনা বোধহয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। হোরি চলিয়া আসায় আপনাদের অনেকটা অবকাশ ঘটিবে। আমার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র যাইবে। তাহার মধ্যে A. M. Bose-এর ছেলে একটি। [১০ মাঘ ১৩০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভ হইতেই আপনি এখানকার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বৎসরে আপনার সহিত আমার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেছে আশা করি তাহা চিরদিন রক্ষিত হইবে।

এখানে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকিল না সুতরাং আপনার বিদায় গ্রহণে আমি প্রতিবন্ধক হইতে পারি না — আপনি অব্যাহত উন্নতিলাভ করিতে থাকুন্ এই আমার অন্তরের কামনা জানিবেন।

এখানকার এণ্ট্রেন্স ক্লাসের দুটি ছাত্রকে আপনি যেরূপ যত্ন ও দক্ষতা সহকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে

আপনার নিকট প্রভূত কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও সন্তোষ এ বৎসর এণ্ট্রেন্স দিতে পারিবে এরূপ আশার কোন কারণ ছিল না— আপনি রথীন্দ্রকে একবৎসরে ও সন্তোষকে এই কয়েকমাসে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার যেরূপ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে আশাতীত— ইহাতে অধ্যাপনা সম্বন্ধে আপনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের প্রতি আমার একান্ত আস্থা জন্মিয়াছে। ইহার পরে আপনি যে বিদ্যালয়েই যোগ দিন না কেন আপনাকে পাইয়া যে সে বিদ্যালয় লাভবান্ হইবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই এক বৎসর যে আপনাকে অধ্যাপকরূপে পাইয়াছিল রথীন্দ্রের পক্ষে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যদি কখনো আমার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ঘটে তবে পুনরায় আপনাকে আমার সহায়রূপে পাইব এ আশা আমি মন হইতে দূর করি নাই।

চারা অবস্থায় আপনি যে বৃক্ষে জল সেচন করিয়াছেন দূরে গিয়া আপনি তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। এ বিদ্যালয়ে আপনার সেই গৃহকোণটি আপনি মাঝে মাঝে আসিয়া অধিকার করিবেন— এবং অন্য কর্ম্মের মধ্যেও ইহাকে স্মরণ করিয়া ইহার মঙ্গল কামনা করিবেন।

এখানে যাহাতে আপনারা আনন্দে থাকেন সে চিন্তা অহরহই আমার হৃদয়ে ছিল— তথাপি যদি না জানিয়া বা ভুল বুঝিয়া কখনো আপনার ক্ষোভের কারণ হইয়া থাকি তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন— এখানে যাহা কিছু আনন্দের

ও আশ্বাসের ছিল এখানে এই এক বৎসরে যাহা কিছু লাভজনক বোধ করিয়াছেন তাহাই স্মরণে রাখিবেন ও আমাকে হিতৈষী বন্ধুভাবেই চিন্তা করিবেন। ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২৮ মার্চ ১৯০৩

ওঁ হাজারিবাগ

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনার লেখাটি একেবারে কালবৈশাখী ঝড়ের মত— প্রচণ্ড ও আকস্মিক। কিন্তু শুধু এইরূপ দম্‌কা হইলে চলিবে না— সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তান্তও চাই। শিক্ষামহলের কর্ত্তারা এতদিন ধরিয়া কি প্রণালীতে শিশুদের রক্ত শোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা বিস্তারিত করিয়া আলোচনা করা দরকার— ছাত্রদের মাথাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের জঠরের মধ্য দিয়া কি উপায়ে গজভুক্ত কপিত্থবৎ বাহির হইয়া আসে তাহা আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখান উচিত— নহিলে শুদ্ধমাত্র ঝড়কে লোকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঠেকাইবে— আপনার এ লেখা সহজে কেহ গ্রহণ করিবে না।

এখানে আসিয়া অবধি আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৮।৯ দিন আমি জ্বরে পড়িয়াছিলাম। উঠিয়াছি কিন্তু কাশি ও দুর্ব্বলতা যায় নাই। তার পরে শমী পড়িয়াছিল,

কাল হইতে তাহার জ্বর নাই— কাশি আছে। আজ মীরা পড়িয়াছে। নগেন্দ্রের স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছিল। পিসিমার শরীর অসুস্থ। চাকরদের অনেকেই শয্যাগত। রেণুকার প্রত্যহ ১০২° জ্বর আসিতেছে। কোনদিকেই আশাজনক কিছুই দেখি না। এখানকার একজন বাঙালী বলিলেন এ জায়গাটা ম্যালেরিয়ার পক্ষে ভাল কিন্তু পেটের পক্ষে বিশেষ ভাল নহে— এখানকার জলে লোহা আছে সুতরাং অম্ল অজীর্ণ লিভারের উপদ্রব যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষে এ স্থান পরিত্যাজ্য। সেই বোলপুরেরই পুনরাবৃত্তি আর কি। যাই হোক্ আমাদের সকলেরই এখানে শরীর খারাপ হইয়াছে। পথটি এমন যে ইচ্ছা বা আবশ্যক হইবামাত্রই যে দৌড় দেওয়া যায় এমন জোটি নাই। মনে মনে ভাবিতেছি প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইলে তার পরে হয়ত উপকার হইতেও পারে। আমার মনটা পালাই-পালাই করিতেছে।

আপনারা যে দল বাঁধিয়াছেন সে খুবই ভাল কিন্তু ব্রতভঙ্গ হইতে দিবেন না। স্ত্রীলোকের প্রতি উপদ্রব সচরাচর আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া মনে করি না— দৈবক্রমে কদাচিৎ হয়ত আপনাদের কোন একজনের চোখে পড়িতে পারে। কিন্তু adventure খুঁজিয়া Quixotic কাণ্ড করিয়া তুলিবেন না— যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন এমনভাবে কাজ করিবেন।

আজকাল ত্রিপুরায় কোন সুবিধা হওয়া শক্ত। সেখানে কোন কাজ খালির খবর কিছু পাইয়াছেন কি ? যদি পাইয়া

থাকেন তবে আমাকে জানাইবেন আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। ইতি ১৪ই চৈত্র ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

বড়বাজার

•১৭ এপ্রিল ১৯০৩

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার

আমি ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। রেণুকাকে আলমোড়ায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার শীঘ্র যাইতে হইবে, আমার শরীর ভালো নহে। এই সকল কারণে, চিঠির জবাব দিতে পারি নাই। কতদিনে সুস্থির হইয়া বসিব কে জানে। আপনি কুষ্টিয়া গেছেন শুনিয়া খুসি হইলাম— জায়গাটি ভাল— মাছ দুগ্ধের অভাব নাই— আমাদের সঙ্গে কুষ্টিয়ার নানা সম্বন্ধ। আমাদের ম্যানেজারের সহিত আলাপ করিবেন তিনি আবশ্যকমত আপনাকে সাহায্য করিতে পারিবেন। [৪ বৈশাখ ১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

২৭ এপ্রিল ১৯০৩

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ,

এখনো সুস্থির হইতে পারি নাই। রেণুকা হাজারিবাগেই আছে। আলমোড়ায় তাহাকে এত পথ ভাঙিয়া স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে না। আমি পরশ্ব হাজারিবাগে যাত্রা করিব।

রথী মজঃফরপুর হইতে বোলপুরে আসিয়াছে, এখানে তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে। ডিগ্রির প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছি— রথীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।

এখানে গরম ভয়ানক। ইতিমধ্যে একদিন ১০৫॥° ডিগ্রি তাপ উঠিয়াছিল। আজ বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়া গেল। কয়েকটি ছেলে রহিয়া গেছে—সতীশ তাহাদের দেখাশুনার ভার লইয়াছেন। অধ্যাপকরা বাড়ি গেছেন। সুবোধ বোধহয় শ্বশুরের চেষ্টায় দিল্লিতেই পোষ্ট অফিসে একটি কাজের জোগাড় করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার আর আশা করি না। আপনাদের Trinityর মধ্যে কেবলমাত্র জগদানন্দ অবশিষ্ট রহিলেন— নরেন আশ্রমে পুনঃপ্রবেশের প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ [১৩১০]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ আবশ্যক হইলে আমাদের নায়েব বামাচরণ আপনাকে নানাবিষয়ে সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।

শ্রী

১৬

১৫ মে ১৯০৩

ওঁ Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের কষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। পথে এত বিভ্রাট আছে তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করিলে যাত্রা করিতে সাহসই করিতাম না। কিন্তু তবু আসিয়া ভালই করিয়াছি। এত ক্লেশেও রেণুকার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই এবং আশা করিতেছি কিছুদিন বিশ্রাম করিতে পারিলেই সে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পূরা উপকার লাভ করিতে আরম্ভ করিবে। স্থানটি রমণীয় সন্দেহ নাই— বাড়িও বেশ ভাল পাওয়া গেছে— বাতাসটি বেশ সুখপ্রদ বলিয়া মনে হয়— নীচেকার অসহ্য গরম হইতে এখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়াছি। শীত এখনো তেমন কড়ারকম বোধ হইতেছে না, গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে হয় বটে,. কিন্তু আমাদের দেশের শীতের মত হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরাইয়া দেয় না। কাল পরশু বৃষ্টি

হইয়া বাতাস বেশ পরিষ্কার হইয়া গেছে— মাঝে মাঝে কুহেলিকার আবরণ সরিয়া গিয়া তুষারশিখরশ্রেণীর আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

রথীর সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ কিছু স্থির করি নাই। তবে, তাহাকে যখন আমেরিকা বা য়ুরোপে পাঠাইতেই হইবে তখন এফ্, এ, পরীক্ষার পড়া পড়াইয়া এই সময়টা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। এই দুই বৎসর তাহাকে যথারীতি শিখাইলে বিদ্যাচর্চ্চার পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়। সম্মুখে পরীক্ষার উত্তেজনা নাই বলিয়া যে তাহাকে শিথিল ভাবে পড়ান হইবে তাহা মনে করিবেন না। যতদূর জানি সে মনোযোগ দিয়া পড়া করিতেছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার লেখা ত আমি আর পাই নাই। হাজারিবাগে থাকিতে কেবল একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম— সে সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়াওছি। আপনি বিস্তারিতভাবে লিখিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু সে লেখা ত আজও আমার হস্তগত হয় নাই।

আপনার সেই রামময়ের স্ত্রীর গল্প সম্বন্ধে শৈলেশকে একটা তাগিদ দিয়া পত্র লিখিবেন— শৈলেশ সেটা সমালোচনীতে বাহির করিবেন বলিয়াছিলেন।

মনে হইতেছে আমি বোলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কুঞ্জবাবুর কাছ হইতে শুনিয়া আসিয়াছি যে তিনি আপনার প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার ভুল হইয়া থাকে আমাকে জানাইবেন।

কুষ্টিয়ায় আশা করি আপনি ভালই আছেন। সেখানে আপনার কাজ কি রূপ চলিতেছে? ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

২৪ মে ১৯০৩

ওঁ Thomson House

আলমোড়া

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

রেণুকার সম্পূর্ণ আরোগ্য অপেক্ষা করিয়া আমাকে বোধহয় এখানে কিছু দীর্ঘকালই থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে রথীর পড়ার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। সুবোধ ত চলিয়া গেছেন—আপাতত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন এম্, এ, (বর্ত্তমানে অন্যত্র অধিক বেতনে হেড্‌মাষ্টারি করিতেছেন) ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কার্য্য লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহারা অস্থায়ী হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করি না। আর একজন বি, এ, ইনিও কোনো স্কুলে প্রধান গণিতশিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। আপাতত এই কয়জন হইলে রথীকে শেখানো ও বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ চলিয়া যাইবে। রথীর ছয়মাসের পাঠ্য আমরা স্থির করিয়া

পাঠাইয়াছি। ছয় মাস হইয়া গেলে তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইবে। মোহিতবাবু সাহিত্য ইতিহাসে পরীক্ষকতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মোহিতবাবু আলমোড়ায় আসিয়া আমার অতিথিরূপে আছেন। তিনি এখানে দিন পনেরো থাকিবেন।

কুষ্টিয়ার কাজে কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আপনার বনিবার সম্ভাবনা নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। জায়গাটি মন্দ নহে। সেখানে উকিল চন্দ্রময়বাবুর সঙ্গে কি আলাপ হইয়াছে? লোকটি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি, শান্ত— তাঁহার প্রতি সেখানকার সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। আপনি বোধহয় তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিলে সুবিধা পাইতে পারিবেন।

রথী প্রথম শ্রেণী এবং সন্তোষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস হইয়াছে বোধহয় খবর পাইয়াছেন।

যে একশত টাকা আপনার প্রাপ্য আছে সে আমি নিজেই দিব— সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সম্প্রতি আমি নিতান্তই জড়িত হইয়া পড়িয়াছি— কবে নিষ্কৃতি পাইয়া সচ্ছল অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব জানি না। আমি একটু মাথা তুলিতে পারিলেই আপনাকে স্মরণ করিব।

নরেন তাঁহার বৈদ্যবাটির কাজ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন। বোলপুরে পুনরায় কাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক আছেন— কিন্তু যাঁহারা সেখানকার কাজেই স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদিগকে কিছুদিনের মত রাখিয়া বিদ্যালয়ের ক্ষতি করিতে পারি না। সুবোধ

আমার এই অনুপস্থিতিকালে হঠাৎ চলিয়া গিয়া বিদ্যালয়ের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছেন। নূতন শিক্ষক যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ের রীতিপদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত করাইয়া দিবার প্রায় কেহই নাই।

আশা করি আপনার পরিজনবর্গ সকলেই ভাল আছেন। আপনার সেই অজীর্ণের ভাব এখন কমিয়াছে? ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
[২ জুন ১৯০৩]

ওঁ

Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

আপনি আমাকে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। কুঞ্জবাবুর প্রতি আপনার চিত্ত যেরূপ একান্ত বিমুখ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সংক্রান্ত কোন আলোচনা আপনার কাছে করা আমি অকর্ত্তব্য জ্ঞান করি। তিনি আপনার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন একথা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়াও উচিত নহে, করেন নাই বলিয়াও আপনাকে অকারণ পীড়ন করা অনাবশ্যক। এইজন্য কুঞ্জবাবু সম্বন্ধে আমি চুপ করিয়া গিয়াছিলাম।

রথীর প্রতি আপনার যে স্নেহের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে আশা

করি তাহা ক্ষণিক নহে। অবকাশমত রথীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সংবাদ লইবেন তাহাকে পরামর্শ দিবেন ইহা আমি আনন্দের বিষয় জ্ঞান করি। কুঞ্জবাবুর উপস্থিতিতে আপনার এ সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হওয়া উচিত হয় না। আপনি অনায়াসেই শান্তিনিকেতনে অতিথি থাকিয়া যতদিন ইচ্ছা কাটাইয়া আসিতে পারেন।

অবশ্য এটুকু আপনি বোঝেন, কুঞ্জবাবু বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছেন— বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত আপনার কোন সংঘর্ষ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আপনার দ্বারা তাহা হইবেই বা কেন?

বিদ্যালয়ের অধ্যাপনবিধি নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার মোহিতবাবুর উপর দিয়াছি। জগদীশ, মোহিতবাবু এবং দুর্গাদাস গুপ্ত ডাক্তার আপাতত এই তিন জনে কমিটি বাঁধিয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করা গেল। মোহিতবাবু এখান হইতে কাল রওনা হইয়া প্রথমে বোলপুরে নামিবেন— সেখানে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় যাইবেন। মাসে একবার করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন। এইভাবে চলিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি আশা করি।

আজ হেমবাবু (হেমচন্দ্র মল্লিক) এখানে আসিবেন— কাল মোহিতবাবু যাইবেন— ইঁহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইতি মঙ্গলবার [১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

একটি বৃহৎ কাজের ভার লইলেই নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। আমিও আমার স্বভাবের অসম্পূর্ণতা নানারূপেই অনুভব করি। তৎসত্ত্বেও আমার উপরে যে ভার পড়িয়াছে তাহা আমাকে বহন করিতেই হইবে। ভার লাঘব করিবার জন্য আপনারা সকলেই আমার যথার্থ সহায় হইবেন এই আশা আমি সর্ব্বদা একান্তমনে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্ব্বলতা আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ। কিন্তু আমার চেয়ে আমার কাজকে যদি আপনি বড় করিয়া দেখিতেন তবে কোন সঙ্কটেই আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া সত্য এবং কল্যাণের জয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আমি ত আমার নিজের বা আর কাহারো কোনো ত্রুটি দেখিয়া আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করি নাই। কিন্তু আপনি নিজেকে ভুলিতে পারেন নাই। আপনি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে আপনার করিয়া লন নাই। এ বেদনা আমার আজও মনে আছে। ইতিমধ্যে যে কোন ঘটনাই হউক্— আপনি, সুবোধ এবং জগদানন্দ আমার অন্তর অধিকার করিয়া আছেন— আমরা আত্মীয়ভাবেই ছিলাম— সে ভাব ভোলা কঠিন। সেই জন্যই বিদ্যালয়ের

প্রতি আপনাদের অনাসক্তি ও বিমুখতা আমার পক্ষে চির-কালই ক্লেশকর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া এই অন্যায় কথা আপনি মনেও স্থান দিবেন না যে বিদ্যালয়ের পক্ষে কোন আশঙ্কা বা অবনতির কারণ ঘটিয়াছে। প্রতিদিনই আমি এই বিস্ময় অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ঠিক এই সময়ে বিদ্যালয় তাহার অনেক বালাই কাটাইয়া একটি মহিমাময় নবযৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে। সে সকল ভিতরের কথা আপনি জানিতে পারিবেন না। বস্তুত বিদ্যালয়ের ঠিক ভিতরের মর্ম্মটি আপনি কোনদিন একান্তভাবে আপনার অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। আপনি বাহির হইতে সংশয়ের চক্ষে পরের মত করিয়া দেখিয়াছেন। সেইজন্যই আজ আপনি ইহার অভ্যুদয়জ্যোতি দেখিতে পাইতেছেন না কিন্তু আপনারা নিঃসংশয় হইবেন এমন দিনও আসিবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের কথা ছাড়িয়া দিন— ইহার ভার যদি ঈশ্বর আমার উপর দিয়া থাকেন তবে সমস্ত বিঘ্ন বিপদের মধ্যেও তিনি ইহাকে সফলতা দিবেন— এ ভার যদি অপহরণও করেন তবু আমার কিছুদিনের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু আপনাদের সহিত আমার যে বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। বিদ্যালয়ের সূত্রে আপনাদের সহিত যোগ না থাকিলেও অকৃত্রিম সহজ সৌহার্দ্দ্যের সহিত আপনাদিগকে বরাবর নিকটে পাইব এ

আশা পরিত্যাগ করিব না।

কয়েকদিন হইল রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি তাহাকে লইয়া একান্ত উদ্বেগে ছিলাম সেইজন্যই পত্র লিখিতে পারি নাই— মনে করিয়াছিলাম দেখা হইবে তাহাতেও নিরাশ হইয়াছি। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩১১ [১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১৪ ডিসেম্বর ১৯০৩

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আমি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখিব না— কিন্তু ঠিকটি ঘটিয়া উঠিল না— পোষ্ট্ অফিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। তাই ইতিমধ্যে আপনার চিঠি পাইলাম।

সাতই পৌষের উৎসবে আপনি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনে যাইবেন নতুবা আপনাকে ক্ষমা করিব না। অনেকদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

আপনার প্রবন্ধে আপনি বড় বেশি ঝগড়া করিয়াছেন— দেখা হইলে এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে।

এবার কিছু দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে কাটাইবেন— আলোচ্য বিষয় অনেক আছে।

এখনি বোট ছাড়িয়া দূর চরে যাইতেছি— তাই তাড়াতাড়ি এই চিঠি লিখিয়া ডাকে দিলাম। ৭ই পৌষে নিরাশ করিব না। আমি সম্ভবত আগামী রবিবার মেলে বোলপুরে যাইব। ইতি ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১
১৪ জানুয়ারি ১৯০৪

ওঁ [শিলাইদহ]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

আপনার পত্র শান্তিনিকেতন হইতে ঘুরিয়া আজ এইমাত্র শিলাইদহ আসিয়া পৌঁছিল। তখন আপনার দুটি ছাত্র রথী ও সন্তোষ এবং অধ্যাপক সুবোধ পদ্মার জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতেছিল এবং আমি তীর হইতে তাহাদিগকে সুসংবাদ জানাইলাম। ইহাতে স্নানকারীদের আনন্দ আন্দোলনে পদ্মার তরঙ্গচাঞ্চল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সকলেই ভোজের প্রত্যাশা করিতেছে। যদি এখানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন করেন তবে পদ্মার টাট্‌কা ইলিষ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইবেন। অতএব অবিলম্বে এখানে আসিবেন।

অধ্যাপক সমিতিতে আপনার স্থায়ী অধিকার আমরা সাদরে রক্ষা করিব। শুদ্ধ তাহাই নহে— আমাদের বিদ্যালয়ের মন্ত্রণা-সভাতেও আপনার আসন আমরা পাতিয়া রাখিব এবং সে আসন যেন শূন্য না থাকে আমাদের এই দাবী রক্ষা করিবেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে আপনি নিজের জিনিষ বলিয়া মনে রাখিবেন এই আমার অনুরোধ। ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি। রথীরা ১৭ই ১৮ই পর্য্যন্ত থাকিবে। যদি অল্পস্বল্প পড়াইবার সুবিধা করিতে পারি তাহা হইলে মাঘ মাসটা তাহারা এখানেই কাটাইয়া যাইবে। এই সময়টি এখানে বড়ই রমণীয়। জগদানন্দও আসিবেন এমন কথা আছে— তাহা হইলে আপনাদের সেই বোলপুর মাঠের অধ্যাপক-Trinity একবার এই পদ্মার উর্ম্মিলীলার মধ্যে মিলিত হইতে পারিবে। মনে রাখিবেন এখানে খেচর ভূচর জলচর ও উভচর কোনো শ্রেণীর খাদ্যই নিষিদ্ধ ও দুর্লভ নহে, সুবোধ প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। আপনি যেদিন ছাড়িবেন তাহার আগের দিন যদি আমরা খবর পাই তবে চরে আসিবার জন্য কুষ্টিয়া হইতে আপনার নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিব। ইতি ৩০শে পৌষ ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১ মার্চ ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার—

দীনেশবাবুর প্রবন্ধ অত্যন্ত অযোগ্য হইয়াছে। ছাপার পূর্ব্বে দেখি নাই, ছাপার পরে লজ্জিত হইয়া আছি। ওটা যে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল তাহা একেবারে ভুলিবার চেষ্টায় আছি— দোহাই আপনার এ প্রবন্ধ লইয়া আপনি আন্দোলন জাগাইবেন না। কোনো তর্ক না তুলিয়া সাধারণভাবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিবেন। এই লেখাটা বাহির করার জন্য আমি শৈলেশকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছি।

আপনার সাংসারিক দুর্ঘটনার সংবাদে ব্যথিত হইলাম।

আপনি কোথায় কাজ আরম্ভ করিতেছেন কিরূপ বুঝিতেছেন সে সমস্ত সংবাদ কিছুই লেখেন নাই।

এখানে বিদ্যালয় তুলিয়া আনিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আছি। মোহিতবাবু কাজে যোগ দিয়াছেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠে আবার বোলপুরে যাইব। ১৫ই বৈশাখে বিদ্যালয়ের ছুটি— ছুটির একমাসও আমি এইখানে কাটাইব মনে করিতেছি। ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

২২ মার্চ ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ।

কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার—

আমি এখানকার নায়েবের কাছে আপনার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। নায়েব আপনার ওকালতীর উপক্রমণিকায় যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যখন অবকাশ পান এখানে আসিবেন এবং শামলা মুকুট গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু ব্যায়ামশিক্ষক মহাশয়কে আমার মিনতি জানাইয়া বলিবেন কাহারো কাছে কোন প্রকার উমেদারি করা আমার বয়সে আর সাজে না। সামাজিক ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছি, আবার সেই পরিত্যক্ত ঝুলি কাঁধে করিয়া কাহারো দ্বারে গিয়া হাজির হইতে পারিব না।

আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল— তাহার কতক কতক লেখাও ছিল। তখন সে আমাকে একপ্রকার রাজি করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু সুবোধের উপর নির্ভর করিয়া তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরং-অবস্থা যদি আমার হয় তবে "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্"।

তা ছাড়া আমার শরীর মন নিতান্ত পরিশ্রান্ত। যা কাজ ঘাড়ে লইয়াছি তাহার ভার অল্প নহে। তা ছাড়া অর্থসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে মনের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয় না।

সুবোধ ইতিমধ্যে প্রখর পদ্মাস্রোতে স্নান করিতে গিয়া পা

মচ্‌কাইয়া পড়িয়াছিল— সেই অবধি নিজের পদসেবায় অহরহ নিযুক্ত আছে। সন্তোষও সপ্তাহ দুয়েক পা ভাঙিয়া চিকিৎসাধীনে আছে। মোহিতবাবুরও সেই অবস্থা। অধ্যাপকদিগকে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

আমরা এখানে প্রায় আষাঢ়ের আরম্ভ পর্য্যন্ত থাকিব। ইতিমধ্যে আপনার সাক্ষাৎকার আশা করা যাইতে পারিবে। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

১১ এপ্রিল ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

আমার শরীর বড় ভাল নয়। রোজই অল্প অল্প জ্বর আসিয়া ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারের সহিত পরামর্শের জন্য একবার কাল কলিকাতায় যাইব।

আপনার অল্প বয়স। ভাগ্যকে লইয়া আর অধিক দিন খেলা করিবেন না। মনস্থির করিয়া ফেলুন্। না হয় কোমর বাঁধিয়া হেডমাষ্টারিতেই লাগিয়া যান্ না কেন। যতই দ্বিধা করিবেন শরীর মন ততই বিকল হইতে থাকিবে। কিন্তু

পরামর্শ জিনিষটা অত্যন্ত সহজ ও শস্তা, তাহাতে প্রায় কোনো ফল হয় না— তবু না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কিছু মনে করিবেন না। ইতি ২৯শে চৈত্র ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

বড়বাজার

০১৯ জুলাই ১৯০৪

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

কাল হইতে রথীর জ্বর নাই কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, আজ প্রাতে পিত্তবমন হইয়াছে। মজঃফরপুরে শরৎ বলিতেছিলেন সেখানে দুই চারিটি বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী উকিলের স্থান আছে— আপনি সেখানে গেলে বোধহয় একটু চেষ্টা করিলে উন্নতি করিতে পারিবেন। শরৎ নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু মনস্থির করিয়া কাজে লাগিবেন। মজঃফরপুরের আবহাওয়া খারাপ নয় তবে অজীর্ণের পক্ষে কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না। মঙ্গলবার [৪ শ্রাবণ ১৩১১]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

২০ অক্টোবর ১৯০৩

ওঁ

গিরিডি

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

আমার বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আমি ইতিমধ্যে বুধগয়ায় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য গিরিডিতে আশ্রয় লইয়াছি। এখানে আছি ভাল। এখানকার ঐ শীর্ণধারা উস্রি নদীর দ্বারা আলিঙ্গিত প্রান্তরের উপরে স্নিগ্ধ শুভ্র শরৎকালটি বড় মধুরভাবে আবির্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু আপনি সার্ভে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কি না বলুন। দ্বিধা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে জীবনটাকে ব্যর্থ করিবেন না। এইবার একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।

ছুটির পর হইতে বোলপুর বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে। বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল। নগেন্দ্রবাবু গেলেন— মোহিতবাবুও থাকিবেন না। কেবলমাত্র কুড়িটি অল্প বয়সের ছাত্র স্কুলে রাখিব তাহার অধিক আর লইব না— এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বিদ্যালয়ের আরম্ভকালে আপনারা ইহার মধ্যে যে একটি স্বচ্ছতা ও শান্তি দেখিয়াছিলেন পুনরায় তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিব। আপনাদের পুরাতনের মধ্যে এখন কেবল জগদানন্দ বাকি। যাহাই হউক, পুরাতন

সম্বন্ধ বিস্মৃত না হইয়া এই বিদ্যালয়ের মধ্যে আপনার হৃদয়কে প্রেরণ করিবেন। ইতি ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩১১

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

২৫ অক্টোবর ১৯০৭

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আপনার কাছে সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে— কিন্তু এ কথা মনে রাখিবেন তাঁহার তাণ্ডবলীলার উপদ্রব আপনার চেয়ে অনেক বেশি সহিয়াছে এমন লোক চারিদিকেই আছে। ইহাতে কোনো সান্ত্বনা পাইবেন কি না জানি না কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিবেন এত ঝাঁকানিতেও এ সংসারের সন্ধিস্থলগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় নাই। আমার সুখ দুঃখে কি আসে— জগন্নাথের রথ চলিতেছে এবং ইচ্ছা করি বা না করি আমাকে তাহা টানিতেই হইবে। মুখ ভার করিয়া মনে বিদ্রোহ রাখিয়া টানাই পরাজয়— প্রফুল্লমুখে চলিতে পারিলেই আমার জিৎ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং
প্রাপ্তম্ প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনা পরাজিতা।

সুখ বা হোক্ দুখ বা হোক্
প্রিয় বা অপ্রিয়
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করি নিয়ো।

বরণ ত করিতেই হইবে, পেয়াদায় করাইবে, তাহার উপরে হৃদয়কে কেন পরাস্ত হইতে দেওয়া? তাহাতে কি শিকি পয়সার লাভ আছে? বরঞ্চ, যাহা কিছু হইতেছে তাহাকে সহজে স্বীকার করিয়া লইলে বিশ্বশক্তির একটা আনুকূল্য হৃদয়ের মধ্যে লাভ করা যায়। আমি এই বুঝিয়া বসিয়া আছি— বেদনার কারণ ঘটিলে যে বেদনা পাই না তাহা নহে কিন্তু আমার সেই বেদনার মেঘে জগতের সমস্ত আলোককে আমি আচ্ছন্ন করিতে দিই না। মাথাটাকে যদি মেঘের উপরে রাখিতে পারি তাহা হইলে ধ্রুবজ্যোতি কখনো ম্লান হয় না— যদি নিজের মাথা ধূলায় অবনত করি তাহা হইলেই ভ্রম হয় যে জ্যোতি বুঝি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩১১

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

বড়বাজার

*১১ নভেম্বর ১৯০৪

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

কই না। মোহিতবাবু ত বোলপুরে যাচ্চেন না। দীনেশবাবুকে নিচ্চি। আপনি ত ফাঁদে পা দিলেন না। ছুটির পরে একবার বোলপুরে যাবেন কি? সোমবারে খুল্‌বে। আমি কালই যাচ্চি। রথীরা আপাতত গিরিডিতেই রইল। তার শরীর এখনো নির্দ্দোষ হয় নি। একবার দেখা দেবেন— পরামর্শ করবার বিষয় অনেক আছে। ইতি শুক্রবার [২৬ কার্ত্তিক ১৩১১]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

[মে ১৯০৫]

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি পাইলাম কিন্তু আপনি ধরা দিতেছেন না কেন? যে সব কথা পাড়িয়াছেন ডাকযোগে কি ইহার ভালরূপ আলোচনা হওয়া সম্ভব? একবার মোকাবিলার প্রয়োজন। কাল বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতায় যাইতেছি দিন দুই তিনের

মধ্যেই ফিরিবার কথা— তাহার পরে একবার এখানে আসিয়া জমিবেন। আজকাল আমাদের সভা বেশ জমজমাট্‌— প্রতিদিনই সায়াহ্নে আমরা অধ্যাপকেরা মিলিয়া নানা বিষয়ের আলোচন[া] করিতেছি— আপনি থাকিলে খুসি হইতেন। জানেন বোধহয় সুবোধচন্দ্র আবার এখানে ভাসিয়া আসিয়াছেন। আপনাকেও বোধহয় একদিন ধরা দিতে হইবে। ইতি রবিবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

২ জুন ১৯০৫

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

একবার ক্ষণকালের মত এদিকটা ঘুরিয়া যান না। আজকাল আমাদের এখানে আলোচনা বেশ জমাট রকম হইয়া থাকে। আমি অধ্যাপকদের লইয়া প্রায় মাসখানেক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিছু না কিছু বলাকহা করিয়াছি— তাহার পরে বড়দাদাও কিছুদিন সন্ধ্যার আসর জমাইয়াছিলেন— আজকাল আবার আমার হাতে পড়িবার উপক্রম করিয়াছে।

আপনি আবার কাগজের ফাঁদে ধরা দিতেছেন? সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবেন ত? বড় ঝঞ্ঝাট। বিশেষত সাপ্তাহিক কাগজ। আমার স্কন্ধে "ভাণ্ডার" বলিয়া এক কাগজ পড়িয়াছে দেখিয়াছেন ত? আমি যত মনে করি কাজের আবর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িব ততই কাজ আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরে।

কেন যে কি মনে করিয়া ভাণ্ডার সম্পাদন করিতে রাজি হইয়াছিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাকেই বলে গ্রহ।

হইল = হইয়াছে। করিল — করিয়াছে। ইত্যাদি। গিল— গিয়াছে হইতে পারিত। যখন কথাটা "গেল" তখন "গিয়াছে" হইতেই হইবে এমন কথা নাই। এক সময় কথাটা ছিল "গইল" কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এরূপ পরিবর্ত্তনকে আমল না দিলে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমে অত্যধিক হইয়া উঠিবে। এক সময় লিখিত বাংলায় "আমারদিগের" কথা ব্যবহৃত হইত এখন তাহার স্থানে "আমাদের" হইয়াছে। পূর্ব্বে লেখা হইত "করহ" এখন লেখা হয় "কর"— পূর্ব্বে লেখা হইত "করিহ" এখন লেখা হয় "করিয়ো"। এ বড় অধিক দিনের কথা নয়। ভাবিয়া দেখুন "নয়" কথাটা পূর্বে "নহে" ছাড়া অন্য কোনো আকারে ব্যবহৃত হইত না — এখন ছাপার অক্ষরে "নয়" সহ্য করিতেছেন কিরূপে? ক্রমে ক্রমে একে একে ভাষাটাকে আধুনিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া আনিতে হইবে। Chaucer-এর ইংরেজি চিরদিন টেঁকে নাই। রামমোহন রায়ের ভাষাটা একবার পড়িয়া দেখিবেন।

কিন্তু এ সব তর্ক মোকাবিলায় না হইলে ভাল করিয়া হয় না। শনিবারে আসিয়া পড়ুন না। ইতি ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্যগ্রন্থাবলী নিশ্চয় একসেট পাইবেন।

বড়বাজার

*২৬ আগষ্ট ১৯০৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল এখন একটু ভাল। তাই এই অবকাশে কাল টৌনহলে এক প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছিল। আজ ক্লান্ত হয়ে আছি। আপনি কি সময়ে অসময়ে কলকাতাতেও আসা ছেড়ে দিয়েছেন? করচেন কি? ছেলেরা বর্ত্তমানে গিরিডিতে, ভবিষ্যতে কাশীতে যাবার প্রস্তাব আছে। আপনি কি ছুটিতে ও অঞ্চলে যেতে পারবেন? [১০ ভাদ্র ১৩১২]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

বড়বাজার

*৩০ আগষ্ট ১৯০৫

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

বাজে গুজবে কর্ণপাত করিবেন না। সুযোগ ঘটিলে আপনাকে বিস্মৃত হইব না নিশ্চয় জানিবেন। ইতি বুধবার [১৪ ভাদ্র ১৩১২]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

৮ অক্টোবর ১৯০৫

ওঁ

গিরিডি

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। আমি যে কিরূপ আবর্ত্তের পাকে পড়িয়াছিলাম তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন না। সে সময় আপনার চিঠিপত্র যদি পাইয়া থাকি তবে কর্ম্মের পাকে তাহা সাফ তলাইয়া গেছে। কেবল আপনার কাছে নয় ঐ সময়টাতে আমি অনেকের কাছে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। গিরিডিতে সম্প্রতি বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি—ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে আজ দূত আসিয়াছে আজই আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। কতদিন হইবে কে জানে। রথীও কাল যাইবে। যদি দুই তিনদিনের মধ্যে কলিকাতায় যান তবে দেখা হইতে পারিবে।

আপনাকে একখণ্ড "আত্মশক্তি" এবং "বাউল" নামধারী দুটি আমার স্বরচিত গ্রন্থ উপহার পাঠাইতে শৈলেশচন্দ্রকে লিখিয়া দিয়াছিলাম সে দুইখানি হস্তগত হয় নাই বলিয়া আপনার পত্রের ভাবে অনুমান করিতেছি। সে জন্য মজুমদার কোম্পানিকে অথবা পোষ্ট্ আফিসকে দায়ী করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক যদি না পাইয়া থাকেন তবে পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন—হয় ত কালক্রমে সফল হইবেন—বার বার আঘাতে শৈলেশও বিচলিত হইতে পারেন।

আপনার ঘরের খবর কি ? সন্তানসন্ততি এবং তাঁহাদের জননী ভাল আছেন ত ? এই সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব —একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন এমন ভরসা হয় না।

একবার গিরিডিতে দেখা দিয়া গেলেন না কেন ? এখনো সময় আছে— এখনো তৎপর হউন। জায়গাটা পাকযন্ত্রের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

[১১ ডিসেম্বর ১৯০৫ ?]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

কিছুদিনের জন্য সভাসমিতি হইতে পলায়ন করিয়া বোলপুরে আশ্রয় লইয়াছি। বেশি দিন এমন আরামে কাটিবে না। আবার কখন্ জনতা হইতে ডাক পড়িবে, নির্জ্জনতা হইতে বিদায় লইতে হইবে।

আপনি যে হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া নওগাঁওয়ে মাষ্টারি লইয়া পলায়নোদ্যত হইয়াছিলেন শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। আপনার মনে যদি এই ছিল তবে আমাকে পূর্ব্বে জানাইলেন না কেন ? যাহা হউক্ এখন হইতে আপনার জন্য সুযোগ চিন্তা করিতে থাকিব। কিন্তু জমিদারীর অধ্যক্ষতাভার লইবার চেষ্টা আপনি কোনোমতেই করিবেন না। যদি এ ফাঁদে পা দেন তবে

অনুতাপের পালা অবিলম্বেই সুরু হইবে। তা ছাড়া ত্রিপুরায় যে কাজের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে সে কাজ তেমন নির্ভরযোগ্য নহে।

আপনি সুযোগমত একবার বোলপুরে আসিতে পারিলে অনেক বিষয়ে মোকাবিলায় আলোচনা হইতে পারিত। এই সপ্তাহের মধ্যে যদি আসেন ত আমার সহিত দেখা হইতে পারে।

এখানে জাপান হইতে এক জুজুৎসু-শিক্ষক আসিয়াছেন—তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিবার যোগ্য। ইতি সোমবার।

[২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১২ ?]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২৮ জানুয়ারি ১৯০৬

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার

সুবোধের বৃহস্পতিবারের পত্র আজ পাইলাম। এতদিনে সে নিশ্চয়ই দিল্লী চলিয়া গেছে। আপনি ইতিমধ্যে দয়া করিয়া মীরাকে পড়াইবার ভার লইবেন। কেবল একঘণ্টা ইংরেজি পড়াইলেই চলিবে।

রথীরা মার্চ্চমাসে অ্যামেরিকায় রওনা হইবে। অতএব আপনি শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন। শরতের চিঠিখানা

পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে যদি চ বেশি ভরসা দেয় নাই তথাপি আপনি গিয়া পড়িলে আপনাকে পরামর্শ আদির দ্বারা যথোচিত সাহায্য করিবে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। একবার দুর্গা বলিয়া ঐ অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িবেন কি? বারম্বার হাল ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া বেড়ানো আপনার পক্ষে কোনোমতেই শ্রেয় নহে। হুগলির মায়াও আপনাকে ছাড়িতে হইবে— অথচ এমন জায়গায় আপনাকে যাইতে হইবে যেখানে আপনার সহায় কেহ আছে। কাজ আরম্ভের দুর্গতি সহ্য করিতেই হইবে,— পশ্চিমে একটু সুবিধা এই যে খরচ কম— অল্প কিছু পাইলেই আপনার দিন চলিয়া যাইবে। তা ছাড়া ভাল আম এবং লীচু যখন খাইবেন তখন নিশ্চয়ই মনে করিবেন এ দেশে আসা আমার বিফল হইল না।

বিদ্যালয় অঞ্চলের খবর কি? কিছুদিন ত আপনি এণ্ট্রেন্স ক্লাসে ইংরেজি পড়াইয়াছিলেন। নিতান্তই কি নৈরাশ্যজনক? রথীদের অধ্যাপনা স্বাস্থ্য এবং সাহিত্যচর্চ্চাদি কিরূপ চলিতেছে জানাইবেন। বোটে আসিয়া বিশেষ আরাম বোধ করিতেছি। কলিকাতায় আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল— শরীরের গ্রন্থিতে দুই একটা থাবাও লাগাইয়াছিল —এখানে আগমনমাত্রেই সমস্ত বেদনা দূর হইয়াছে।

আকাশে মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আপনাদের ওখানে দৈবের অবস্থা কিরূপ? ইতি রবিবার [১৫ মাঘ ১৩১২]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

[ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আপনি তবে নিঃসম্বল মজঃফরপুরে ভাসিয়া পড়িতে অনিচ্ছুক। তা যদি হয় তবে আপনাকে অধ্যাপনকার্য্যেই আমি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। আমি এখানকার কাজ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া আপনার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিব। রথীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি ভাসিয়া পড়িবে— সে ত আর বেশি দিন নয়। আপনিও এণ্ট্রেন্স ক্লাস তাড়াইয়া জীবন কাটাইতে নারাজ— এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আপনার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশা করি ভাগ্য একেবারে প্রতিকূল হইবে না।

আমার পূর্ব্বপত্রে আপনাকে ওকালতির অভিমুখে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি— এখন দেখিতেছি আপনার ব্রহ্মণ্যদেব আপনাকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতে কোনোমতেই ভ্রষ্ট হইতে দিবেন না। অতএব অদৃষ্টের সঙ্গে বৃথা বিরোধের চেষ্টা না করাই ভাল। ইতি তারিখ জানি না।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

৮ এপ্রিল ১৯০৬

ওঁ আগরতলা

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়া গেছে। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে— রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। এতদিনে রথীদের রেঙ্গুন ছাড়িবার কথা। তাহাদের সংবাদ আমার হস্তগত যে কবে হইবে তাহার ঠিকানা নাই।

রথীদের সহিত আপনার যে সম্বন্ধ তাহা তাহারা কোনোদিন বিস্মৃত হইবে বলিয়া আমি আশঙ্কা মাত্র করি না। আপনি তাহাদের আত্মীয়শ্রেণীতেই গণ্য হইয়াছেন— সেই সম্পর্ক অনুভব করিয়া আমিও কোনোদিন আপনাকে দূরে রাখি নাই।

নিজের কাজের সম্বন্ধে কিরূপ স্থির করিলেন জানিতে উৎসুক আছি। এইবার একটু দৃঢ়সংকল্প হইয়া ভবিষ্যৎটাকে আক্রমণ করুন কেবলই হতাশচিত্তের অবসাদে জীবনটাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবেন না।

এই ষ্টেটের কোনো একটা কাজের জন্য যদি আকাঙ্ক্ষা রাখেন তবে রমণীকে একখানা পত্র লিখিবেন। তিনি ত আপনাকে জানেন। রমণীকে আমি নিজে অনুরোধ করিতে

পারি না— কারণ আমার অনুরোধ অসঙ্গত হইলেও তাঁহার পক্ষে এড়ানো কঠিন। এখানে একটি জজের পদ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে— আপনি আত্মপরিচয় দিয়া আবেদন করিয়া দেখিবেন।

আমি আগামী বৃহস্পতিবারে বরিশালে যাইব— তাহার পরে শনি আমাকে যদি নিষ্কৃতি দেয় তাহলে বোলপুরে ফিরিবার চেষ্টা করা যাইবে।

আশা করি আপনার সমস্ত সংবাদ ভাল। ইতি ২৫শে চৈত্র ১৩১২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৯ মে ১৯০৬

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার

দোহাই আপনার। আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন পত্ররচনায় আমার শৈথিল্য অসামান্য— সেজন্য প্রথমে রাগ করিয়া অবশেষে তাঁহারা ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কালক্রমে আপনিও ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিবেন।

আমার মেজাজ সম্বন্ধে আপনি এমন ভুল বোঝেন কেন?

আমি সাধারণ ভদ্রলোকদের অপেক্ষা যে অধিক কোপনস্বভাব সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। আপনার পূর্ব্ব পত্রে বিচলিত হইবার মত কোনো কথা দেখি নাই। অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি তাহার উপরে আবার রাগ করিয়া অপরাধ বাড়াইব আমার এমন প্রকৃতি নয়। ইতিমধ্যে শিলাইদহ প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিতে হইয়াছে—তাহার উপরে বৈষয়িক এবং বেগার নানা কাজে আমাকে হাঁফ ছাড়িবার সময় দিতেছে না এমন অবস্থায় উত্তর যদি না পান তবে আমার মেজাজের উপর সন্দেহ করিবেন না। একবার যদি আমার পরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন তবে এরূপ দুটা চারটে ত্রুটিতে আপনাকে টলাইতে পারিবে না।

জাপানে রথীরা পৌঁছিয়াছে—কিন্তু চিঠি আসিবার সময় হয় নাই। দুইচার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে আশা করিতেছি। ইতি ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

৩ অক্টোবর ১৯০৬

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার

জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়া আপনি বড়দাদাকে বিপদে ফেলিয়াছিলেন—তিনি উত্তরে প্রকাণ্ড এক লেখা ফাঁদিয়া শ্রান্ত

হইয়া পড়িতেছিলেন। আজকাল বড়দাদার লিখিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়— বিশেষত তিনি একটা দার্শনিক প্রবন্ধের চিন্তায় নিবিষ্ট আছেন— অন্য কোনো প্রসঙ্গে তাহার বিঘ্ন ঘটিলে তিনি পীড়িত হইতে থাকেন এবং তাহাতে বস্তুত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে— এই জন্য তিনি আমার উপরে প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। আমি একটা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব কিন্তু আমার অবস্থাও বিশেষ আশাজনক নহে। কিন্তু আমার বোধ হয় জাতিভেদ সম্বন্ধে মীমাংসা সদ্য আপনার পক্ষে জরুরী নহে এইজন্য বড়দাদাকে আমি আপাতত নিষ্কৃতি দিবার জন্য এ ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছি— কিন্তু খুব বেশি তাগিদ দিবেন না।

চট্টগ্রাম এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে মনস্থির করিতে হইবে— কিন্তু স্বয়ম্বরসভায় গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিবেন না— সময় উত্তীর্ণ হইয়া লগ্ন বহিয়া যাইবার পূর্ব্বে যাহার হউক্ একজনের গলায় মালা দিবেন। কিছু না হয় ত মজঃফরপুর আছে— কিন্তু মালদহ নৈব নৈবচ। অজিতকে ব্রহ্মদেশের খবর সংগ্রহে তাড়া লাগাইব।

মহাভারত অর্দ্ধমূল্যে পাওয়া অসম্ভব নহে। আপনি শৈলেশকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র লিখিবেন— অমনি "খেয়া"র জন্য তাগিদ দিবেন। শৈলেশ স্বভাবতই নিশ্চেষ্ট— আপনিও যদি নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করেন তবে বিধাতা আপনার সহায় হইবেন না।

আমার বিদ্যালয়ের পরমায়ু ঈশ্বরের হাতে। তিনি যদি

উপযুক্ত লোক জোগাইয়া দেন তবেই ইহার উন্নতি হইবে নতুবা ইহা স্কুলের পদবী হইতে খুব বেশি উপরে উঠিতে পারিবে না। আপনারা আমার যতটা ক্ষমতা কল্পনা করেন ততটা আমার নাই। আমার যে পরিমাণ সাধ সে পরিমাণ সাধ্য নহে। বিজয়ার সাদর নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৭ই আশ্বিন ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

১৩ নভেম্বর ১৯০৬

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আজ আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। যদি এমন হয় যে সম্প্রতি আপনি বেকারপ্রায় অবস্থাতেই আছেন তবে পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত এখানকার এণ্ট্রেন্স্ ক্লাসের কর্ণধার পদ আপনি অধিকার করিতে পারিবেন কি? তাহা হইলে আমি বড়ই নিশ্চিন্ত হই। কাজটা সুখকর নয় জানি—কিন্তু এই কাজে আপনার হাড় পাকিয়া গেছে আপনার পক্ষে কয়েক মাসের জন্য এ বোঝা দুঃসাধ্য হইবে না। যদি কোনো মতে মন স্থির করেন তবে দেরি করিবেন না—এখনি অবিলম্বে পূরাদমে কাজ সুরু করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দরকার হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতেই কি আপনার আশ্রয় পাওয়া

যাইবে? এখানে রথী সন্তোষ নাই কিন্তু জগদানন্দ আপনাদের ভাণ্ডাহাটের একমাত্র মালিক হইয়া সপরিজনে জমিয়া বসিয়া আছেন। এখন এখানকার স্বাস্থ্যও খারাপ নহে। লাইব্রেরিতে বইও বিস্তর জমিয়াছে। অতএব নির্বিচারে তথাস্তু বলিয়া একেবারে গাড়িতে চড়িয়া বসুন। ছাত্রকয়টির মধ্যে দুজনকে, মনের মতন পাইবেন— বাকি তিনটিকে কোনোমতে লগি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে নেহাৎ যদি

যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি
কোঽত্র দোষঃ—

আমি রোগশয্যা হইতে খাড়া হইয়া উঠিয়াছি— এখন আর কোনো উপসর্গ নাই। কেবল মাঝে মাঝে মনটা এই হেমন্ত-কালের মরাল-কল-কূজিত পদ্মার সিকতিনী বেলাভূমির জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছে। যদি আপনাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে একবার পদ্মার আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। মীরা, বেলার কাছে মজঃফরপুরে গেছে —আমার ঘরে এখন কেবল শমী অবশিষ্ট। তাহার প্রতিও আপনি যদি কিছুদিন মনোযোগ করেন তবে আমি একবার ছুটির সুখ ভোগ করিয়া আসি। স্বার্থের কথা সমস্তই খোলসা করিয়া বলিলাম আপনার কোনো স্বার্থে যদি না বাধে তবে একবার অনুকূল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতি
২৭শে কার্ত্তিক ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

১৭ এপ্রিল ১৯০৭

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

আপনার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে পর্য্যন্ত নানা দ্বিধায় কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া না বসিতেছিলেন সে পর্য্যন্ত আপনার জন্য বিশেষ উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলাম। এখন যে এক জায়গায় স্থিতিলাভ করিয়া বসিয়াছেন ইহাতে বড়ই তৃপ্তি বোধ করিতেছি। এখন হইতে আপনার সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি এক জায়গায় সংহত হইয়া নিশ্চয়ই ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতে থাকিবে। যে কোনো অবস্থার মধ্যেই পড়ুন না কেন আপনি নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে পারিলেই সমস্ত বিশ্বকে অনুকূল দেখিতে পাইবেন।

আমি বিদ্যালয়ের কাজে ক্রমশই বেশি করিয়া জড়িত হইতেছি। অনেক ছাত্র বাড়িয়াছে— দায়ও বাড়িতেছে। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ঘরদুয়ার ফাঁদিতে হইতেছে। ল্যাবরেটরি ঘরের উপরে একটি দোতলা হইয়াছে— তাহাতেও কুলাইতেছে না। এখনো নানা কাজের জন্য আরো অনেকগুলি ঘর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অর্থব্যয়ের আশঙ্কা করিবার অবকাশও পাওয়া গেল না— চারিদিকেই মিস্ত্রি লাগাইয়া দেওয়া গেছে। আর কিছুদিন পরে এখানে আসিলে চিনিতেই পারিবেন না। ইতিমধ্যে আমার ছাত্রদের নীড়ে পানবসন্ত আসিয়া ঢুকিয়াছে— দেখিতে দেখিতে পাঁচটি ছুটি পড়িয়াছে—

আরো অনেকগুলি পড়িবে বলিয়া 'মরিয়া' হইয়া বসিয়া আছি। আমার বৃহৎ সংসারটির এই সমস্ত সমস্যা। এখনি অদূরে একটি ছেলে colic বেদনা লইয়া কাঁদিতেছে— আপনাকে মনস্থির করিয়া পত্র লেখা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে— ওদিকে ডাকের সময় হইয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক্ আপনি একটু স্থির হইয়া বসিয়া বিবিধ মক্কেলের বহুবিধ থলি ঝুলি ও লোহার সিন্ধুকের মধ্যে আপনার শিকড় বিস্তার করিয়া দিন তারপরে একদিন আপনার ওখানে আমাদের নিমন্ত্রণ রহিল। ইতি ৪ঠা বৈশাখ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ ইতিহাস রচনার খবর পাইয়া উৎসুক হইয়া রহিলাম।

৪২
২২ মে ১৯০৭

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণ—

বুকপোষ্টে গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠাই। শ্রদ্ধার সহিত যদি পড়িয়া দেখেন তবেই আমার মূল্য লাভ হইবে— তার বেশি আর কিছু দিবেন না। সমস্ত খণ্ড শেষ হইতে এক বৎসরেরও উপর লাগিবে অতএব দিব্য অবকাশমত রহিয়া বসিয়া পড়িতে পারিবেন।

আমরা কি, দেশের যথার্থ অবস্থা কি তাহার সত্য পরিচয় পাওয়া দরকার ; সেই পরিচয় পাওয়া গেছে— অতএব এই পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই প্রতিকারের পত্তন করিতে হইবে— মিথ্যাস্বপ্নের উপর করিলে কোনো ফল নাই।

আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মীরার বিবাহ স্থির। স্থান শান্তিনিকেতন। পাত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইতি ৮ই জ্যৈ: ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২৯ মে ১৯০৭

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণ—

গদ্য গ্রন্থাবলী একটি একটি খণ্ডে সুদীর্ঘকালে শেষ হইবে— অতএব যদি ইহার মূল্য উপলক্ষ্য করিয়া বোলপুর বিদ্যালয়কে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন তবে যখন খুসি যেমন খুসি দিতে পারেন। তবে কথা এই, বিদ্যালয় হইতে আপনারও ত গুরুদক্ষিণা প্রাপ্য হইয়াছে— বিদ্যালয়ের অতি দুর্ব্বল শিশু অবস্থায় আপনি তাহাকে পালন করিয়াছেন এখন অপেক্ষাকৃত সমর্থ অবস্থায় সে যদি আপনাকে কিঞ্চিৎ উপহার দিতে উদ্যত হয় তবে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

দেশের কথা লিখিতে গেলে পুঁথি বড় হইয়া উঠিবে। যদি

কোনো প্রবন্ধআকারে কোনো কাগজে লিখি তবে দেখিতে পাইবেন— যদি নাও লিখি তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

নগেন্দ্রকে বিবাহের পরে আমেরিকায় রথীদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখিতেই পাঠাইব। ফিরিয়া আসিলে রথীদের সঙ্গে একসঙ্গে এক কাজে যোগ দিতে পারিবে।

বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসাতে আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছি। আজ সন্ধ্যার গাড়িতে মজঃফরপুর হইতে শরৎ আসিবেন। বেলা পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

বোধহয় খবর পাইয়াছেন জগদানন্দের বড় মেয়েটির বিবাহ সম্ভবত আষাঢ় মাসে সম্পন্ন হইবে। বিবাহ বোলপুরে হওয়াও অসম্ভব নহে— বরপক্ষ সেইরূপ প্রস্তাব করিয়াছে— কারণ পাত্রটি ভাগলপুরে কাজ করে— বোলপুরে আসা তাহার পক্ষে সুবিধাকর। ওদিকে কলিকাতায় ২৩শে তারিখেই শ্রীশবাবুর দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন প্রজাপতি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন— তিনি এক fool হইতে অন্য foolকে আশ্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

১ সেপ্টেম্বর ১৯০৭

ওঁ বোলপুর

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনাকে আজ প্রায় ২০।২৫ দিন হইল একখণ্ড "প্রাচীন সাহিত্য" (গদ্য গ্রন্থাবলীর ২য় খণ্ড) পাঠাইয়াছি। এখানিও আমি স্বহস্তে মোড়াই করিয়া টিকিট লাগাইয়া ঠিকানা লিখিয়া রওনা করিয়া দিয়াছি। মনে করিতেছিলাম একটা প্রাপ্তি-সংবাদ পাওয়া যাইবে। সংবাদ পাইতে যতই দেরী হইতে লাগিল মনে ভাবিলাম আমার সংবাদ পাইয়া কাজ নাই কিন্তু আপনার অবসরের অভাব উত্তরোত্তর এই মত বাড়িয়াই চলুক— মক্কেলের নিবিড় ব্যূহে এমন একটুও ফাঁক যেন না থাকে যে ছিদ্রটুকু দিয়া একটা ক্ষুদ্র পোষ্টকার্ডও কোনোমতে গলিয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে।

ইতিমধ্যে কাল আপনার চিঠি আসিয়া হাজির। তাহাতে আমার চোখের বালি ও কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে কিন্তু "প্রাচীন সাহিত্য" সম্বন্ধে উল্লেখমাত্র নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতেছে আমারই বইখানি আপনার হস্তগত হয় নাই— এবং সেও যে মক্কেল সম্প্রদায়ের ঘন পরিবেষ্টনবশত তাহা নহে, পোষ্ট আপিসের বিড়ম্বনাই তাহার কারণ।

কিন্তু ইহার প্রতিকার কি? আপনাদের পোষ্ট বিভাগে নিশ্চয়ই কোনো রসগ্রাহী ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব আছে। তাঁহার

রুচি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান তদনুরূপ নহে।

বররুচি লিখিয়াছিলেন—

অরসিকেষু কবিত্ব নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

কিন্তু সুরসিকের দৌরাত্ম্যের কথা যদি জানিতেন তবে ঐ সঙ্গে তাঁহাকে এ কথাও লিখিতে হইত—

সুরসিকেন কবিত্ব প্রচারণং
শিরসি &c &c &c

যাই হউক পোষ্ট অপিসের পাপে আপনাকে দণ্ডনীয় করিব না— আর দুই চারিদিনের মধ্যেই আরো একখণ্ড বাহির হইবে, এবং ইতঃপূর্ব্বে "লোকসাহিত্য" নামে তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে এই তিনখানি একত্রে রেজিষ্ট্রি ডাকে আপনাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

মীরার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল তাহাকে লইয়া কিছুকাল উদ্বেগে কাটিয়াছে— এখন সে কতকটা ভাল আছে। আপনার সন্তানগণ ও গৃহিণী ভাল আছেন ত?

বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে— পূজার পরে একশত জনের বেশি হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। ইতি রবিবার ১৫ই ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭

শিলাইদহ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

মনুষ্য না পক্ষী! শিলাইদহ থেকে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করবেন।

মীরাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখানে তার শরীর একটু ভালই আছে, ইতিমধ্যে এই দিক থেকে ডেপুটি বাহাদুরের ভ্রূকুটির অন্তরালে একটুখানি বৈষয়িক মেঘগর্জ্জন শোনা গেল। তাই চলে আসতে হল। ডেপুটির ক্ষোভ শান্ত করে দিয়েই চলে যাব স্থির করেছিলুম ইতিমধ্যে পদ্মা আমার মনোহরণ করে বস্‌ল এখন পড়ে পড়ে জলকল্লোল শুনচি। কর্ম্মের উপলক্ষে আগমন বটে কিন্তু অত্যন্ত অকর্ম্মণ্যভাবে দিনক্ষেপ করচি। কেবল মনের খুব নিভৃত দেশে একটি কাঁটা থেকে থেকে বিঁধচে— মনে পড়চে ডেপুটিবাবু নিমন্ত্রণ করে গেছেন যেন যাবার দিনে তাঁর ওখানে অন্তত একটা বেলা কাটিয়ে যাই। লোকটি নিরতিশয় ডেপুটি— নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে মুহূর্ত্তকাল আত্মবিস্মৃত নন— তাঁর ইঙ্গিতের পশ্চাতে ব্রিটিশরাজের সমস্ত প্রতাপ অপেক্ষা করে আছে এই গৌরবটুকু তিনি কিছুতেই হজম করতে পারচেন না। যাই হোক্ আজকালকার দিনে সান্ত্বনার বিষয় এই যে নিমন্ত্রণটা মধুর ভাবেই হয়েচে এবং এক বেলার চেয়ে বেশি দিনের আতিথ্য আমাকে নিতে হবে না।

আপনার প্রস্তাবটি অত্যন্ত উত্তম। কিন্তু ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়। আমি ভাল এ কথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করবার অবকাশ না পায়। ছেলেরা বিশেষত বুড়োরা ওটা যতই ভুলে থাকে ততই ভাল। অতএব এ কথাটা বিবেচনা করে দেখ্‌বেন। বাল্যকালে একটা ভুল শিক্ষা হয়েছিল

লেখাপড়া করে˙যেই
গাড়িঘোড়া চড়ে সেই—

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর ভুল শেখানো হবে যদি বলা যায়—

ভাললোক হবে যেই
পুরস্কার পাবে সেই।

এবারে কলকাতা থেকে বেরবার সময় আমার কোনো অনুচরকে বলে এসেছিলুম আপনাকে "লোকসাহিত্য" ও "সাহিত্য" গ্রন্থ দুটি পাঠিয়ে দিতে। যেহেতু শৈলেশের উপর এ ভার দিই নি আপনি এত দিনে নিঃসন্দেহ পেয়েচেন। আশা করি ধনেমক্কেলে লক্ষ্মীলাভ করচেন। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

১৮ অক্টোবর ১৯০৭

ওঁ বোলপুর

প্রিয়বরেষু

বিজয়ার সাদর নমস্কার গ্রহণ করবেন। আপনি কোনো একটি মঙ্গলকর্ম্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার ইচ্ছা করেন। আমার বোধ হয় আপনি যেখানে আছেন সেখানকার বাঙালীর মনে যদি দেশহিতের জন্য উদার উৎসাহ জাগাবার চেষ্টা করেন তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করবেন। যে কয়জন বাঙালী আছেন সকলে সদ্ভাবে মিলে সুখে দুঃখে এক হয়ে পড়াশুনা আমোদপ্রমোদ এবং হিতকর্ম্মে ক্ষুদ্র সমাজটিকে সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল করে তুল্‌তে পারেন তাহলেই মস্ত কাজ করা হবে। আপনি বল্‌বেন— শক্ত— শক্ত নয় ত কি? বল্‌বেন, বাধা বিস্তর— বাধা ত আছেই। কিন্তু যদি নিজেরই ভিতরকার সমস্ত বাধা কাটিয়ে যথার্থভাবে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন ও কিছুতেই হাল ছেড়ে না দেন তাহলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন। আমরা যেখানেই থাকি চারদিকেই আমাদের খুব আঁট বাঁধ্‌তে হবে— তা না হলে চিরদিন পড়ে মার খাব এতে আর সন্দেহ নেই। সেখানে ছেলেদের শেখান, মেয়েদের শেখান, বুড়োদের কর্ত্তব্যবন্ধনে টেনে আন্‌তে চেষ্টা করুন— সেখানকার হাওয়াটা পরিষ্কার করে ফেলে উচ্চভাবে পরিপূর্ণ করে তুলুন— কোনোমতেই দম্‌বেন না, কোনোমতেই পিছবেন না— কারো দ্বারা উপহসিত হয়ে বা বাধা পেয়ে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করবেন না—

নিজের দ্বিধাহীন শক্তিকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে তুলে সকলের মাঝখানে মাথা উঠিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবেন — এর চেয়ে আর কোনো কাজ নেই।

আমি বিদ্যালয়কে ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে এখানে পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা ভোগ করতে এসেছি। ছুটির পরে অনেক ছাত্র বৃদ্ধি হবে— ১০০ জন ছাড়িয়ে যাবে— তখনকার জন্যে আরো জন তিনেক সদুৎসাহী ইংরেজি বাংলায় অভিজ্ঞ ভাল শিক্ষক খোঁজ করচি। আপনি কি হুগ্‌লি ট্রেনিং অ্যাকাডেমির শিক্ষক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানেন? তিনি কি রকম লোক? তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কি রকম? বিদ্যালয়ে লোকের অভাবে আমাকে বড়ই পীড়া দিচ্চে। শুধু শিক্ষক হলে হবে না— মানুষ হওয়া চাই।

আশা করি সপরিজনে ভাল আছেন। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

৫ ডিসেম্বর ১৯০৭

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার

যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে

বেড়াইতে গেল— তাহার পরে আর ফিরিল না।

আমি আগামী কল্য শিলাইদহে পদ্মায় বাস করিতে যাইব। সেখানে মেয়েদের লইয়া কিছুদিন থাকিব তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া বোলপুরে আমার কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮

ওঁ
শিলাইদা

সবিনয়নমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আরো দুঃখ যদি দেন ত তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া লইব— আমি পরাভূত হইব না।

আপনি নিজের কোনো সংবাদ লেখেন নাই কেন? ওখানে আপনার কাজ কিরূপ চলিতেছে? পরিজনবর্গের অস্বাস্থ্য লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন তাহা বোধ করি কাটিয়া গিয়াছে।

আমি পদ্মার তীরে নিভৃতে আশ্রয় লইয়াছিলাম— আমার ভাগ্যদেবতা সেই সন্ধান পাইয়া এখানেও তাঁহার এই শিকারটির প্রতি লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন। আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয়

লোক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন। প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি ত জানেন কোনোদিন কোনো আপত্তি করিয়া জয়ী হইতে পারি নাই। আমি চূড়ান্তভাবে "না" বলিতে আজও শিখি নাই। যাহা হউক সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। দেশে শান্তি যখন নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে। যদি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসি খবর পাইবেন।

বিজয়বাবুর সংবাদ কি? কিছু লিখিতেছেন?

গদ্যগ্রন্থাবলীর কোন্ পর্যন্ত পাইয়াছেন ভুলিয়াছি বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই। মনে করাইয়া দিবেন। ইতি ২৪শে মাঘ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন—

ও সব কথা আর তুল্‌বেন না— যা প্রবাহিত হয়ে যাচ্চে তাকে যেতে দিন— জীবনে কত স্তুতিনিন্দা কত সম্মান অপমানের মধ্যে দিয়ে আজ প্রায় পঞ্চাশের পারে এসে ঠেকেছি

—সস্ত যেটাকে অত্যন্ত বড় এবং কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়েছে সে সমস্তই ছায়ার মত হয়ে গেছে— এম্‌নি করে একদিন সমস্ত বাদবিবাদের বাইরে ভেসে চলে যাব তার পরে যা সত্য তাই স্থির হয়ে থাক্‌বে— তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভও থাকবে না কোনো লোকসানও থাক্‌বে না। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি – তার পরে এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়— অন্তত আমি ত এইখানেই চুকিয়ে দিলুম। এতে বৃথা অনেকটা সময় যায়— আমার ত আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কত দিন এই রকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব? দূর হোক্‌ গে, সমস্ত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানাটানি করে না মারে— সব পাপ শান্ত হোক্‌।

পৃথিবীতে আইন বলুন আদালত বলুন সবই ত আধাখেঁচড়া —সম্পূর্ণতা কোন্‌ ব্যবসায়েই বা আছে? এই সমস্ত জড়তা জটিলতা অস্ফুটতার মধ্যে দিয়েই মানুষ আপনার ইচ্ছাকে সফল করতে চেষ্টা করচে। যে দেশে সকল বিচারকই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেখানে আইন আদালতের প্রয়োজনই হয় না। চোর জুয়াচোরের যখন অভাব নেই তখন কুবিচারকেরও অভাব থাকতে পারে না— কারণ চোরও ত অবস্থাভেদে বিচারকের আসনে স্থান পায়। যে উপকরণে চোরকে গড়ে সেই উপকরণে বিচারককে গড়বে না এমন স্বতন্ত্র কারখানাঘর ত জগতে নেই।

জড়িয়ে মিশিয়ে ভালয় মন্দয় সমস্ত তৈরি হয়ে উঠ্‌চে অতএব বাস্তব ব্যাপারের কাছে খুব বেশি কিছু দাবী করবেন না — অথচ এই বাস্তবের সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর থেকেই পরিপূর্ণের প্রত্যাশা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করবেন না— এই আশ্চর্য্য দ্বন্দ্বই হচ্চে মানুষের জীবন। সেইজন্যেই গীতা বলেন কাজ করে যান লড়াই করে যান তারপরে ফল যা হয় তা হবে। বস্তুত উপস্থিত ফলটা কিছুই নয়— কাজের দ্বারা কাজ থেকে মুক্তিলাভটাই হচ্চে চরম সিদ্ধি। এই ত আমার ফিলজফি— কিন্তু

> "প্রেমদাস সুন্দর মূরখ হ্যায়
> কহনা হ্যায়, নেহি করনা।"

ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৪ জুলাই ১৯০৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। মাঝে আমি দীর্ঘকাল নির্ব্বাসনে ছিলুম— অর্থাৎ মেয়েদের নিয়ে বোলপুরের বাহিরেই কাটাতে হয়েচে। আবার সম্প্রতি ফিরে এসেচি। কিন্তু এখন আমার কাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে।

আমাদের জমিদারীর মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেচি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথ ঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিস্তালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্ম্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে গ্রাম্যসমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্চে— হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েচে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।

যাই হোক একদিকে বোলপুর বিস্তালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করচি।

এমন সময়ে আপনি আমাকে আহ্বান করেচেন। এ আহ্বানে আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল ভাবেই সাড়া দিচ্চে কিন্তু নিশ্চয়ই জানবেন আমার ক্ষমতা নেই যে আমি অন্য কাউকে

কোনো লক্ষ্যসাধনে নিযুক্ত করি। আমি স্বভাবতই leader শ্রেণীর নই। আমার মনে যে চিন্তা আসে সেইটেকে লিখ্‌তে পারি এবং যখন দেখি আমার পরামর্শ কেউ কাজে পরিণত করবার কোনো চেষ্টা করচে না তখন আমি নিজের একক চেষ্টায় সেই কাজ আরম্ভ না করে থাকৃতে পারি নে। কিন্তু অন্য কাউকে তাঁর নিজের শক্তির উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করে দিতে গেলে আমি রাস্তা খুঁজে পাই নে। যাঁরা স্বভা[ে]বই leader তাঁরা মানুষকে উপকরণের মত ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরা প্রত্যেককে তার স্বস্থানে স্থাপন করতে পারেন এইজন্য মানুষরা তাঁদের সাড়া পেলে আর স্থির থাকৃতে পারে না— সার্থকতা অন্বেষণে তাঁর চারদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জমাট হয়ে বসে। আমাকে সেই দলের লোক বলে ভ্রম করবেন না— আমি লেখক মাত্র— এবং যেটুকু সাধ্য আছে সেই পরিমাণে সাধকও বটে। আপনারা যখন প্রীতিগুণে কাছে আসেন তখন মনে উৎসাহের জোয়ার আসে, যখন দূরে যান তখন নিজেকে অসহায় বোধ হয়। ঈশ্বর যে কলম চালানোর ভার দিয়েচেন তার দ্বারা যদি লোকের হৃদয়ক্ষেত্রে ঢেলা ভেঙে কিছু চাষ দিয়ে যেতে পারি— কিছু বীজ বোনাও যদি সারা হয় তাহলেই আমার কাজ সাঙ্গ হবে— কিন্তু ফসল ঘরে তুলে মাড়াই করে গোলা পূর্ণ করবার মত সঙ্গতি আমার নেই— আমি কৃষাণ মাত্র। তা হোক আপনারা মাঝে মাঝে কাছে আস্‌বেন আমার কাছ থেকে কাজের ভার নেবার জন্যে নয় আমারই কাজকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে— চতুর্দ্দিকে আপনাদের হৃদয় অনুভব

ক'রে আমি "আমরা" হয়ে উঠতে পারি। আপনাদের বল আমাকে দিন; — আমার বল আছে বলেই যে তার আকর্ষণে যোগ দেবেন তা নয় কিন্তু আপনাদের বল আছে বলেই আমাকে দান করবেন। আপনাদের সঙ্গে আমার যে মিলন হয়েছে তা ঈশ্বর একদিন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সার্থক করে দেবেন। ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

১৫ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

হঠাৎ হৃদ্‌রোগে সন্তোষের বাপ মারা গেছেন হয়ত সংবাদপত্রে সে খবর পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার পরিবার এবং সন্তোষের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। তিনি ত ঋণ ছাড়া আর কিছু জমাইয়া যাইতে পারেন নাই— আর রাখিয়া গিয়াছেন চারটি অবিবাহিত কন্যা। সন্তোষ আপাততঃ আমেরিকাতেই যাহাতে উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াই পত্র লিখিয়াছি। সেখানে চেষ্টা করিলে এখনি সে মাসিক ৩০০।৪০০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। আমার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্র কলেজের ছুটির তিন মাসের মধ্যে ১৫০০ টাকা জমাইয়া তাহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল— অল্প মাস পাঁচ ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। এইবার পূজার ছুটিতে আমাদের কোনো কোনো অধ্যাপক পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন— দিনুও গিয়াছিল। সেই সময়টাতে বিদ্যালয়ে শারদোৎসবের নিমন্ত্রণে সত্য আসিয়াছিল। পশ্চিমের যাত্রীদিগকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মন উতলা হইয়া উঠিল। কাহারো নিষেধ না মানিয়া কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাহাদের দলে ভিড়িয়া বাহির হইয়া গেল। লাহোর পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে ও দিনুকে জ্বরে ধরিল। সেখান হইতে দুইজনে অজিতকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল। দিনু চিকিৎসায় রক্ষা পাইয়া গেল। সত্যেন্দ্র তিন চার দিন জ্বর ভুগিয়া নববধূকে অনাথা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর লীলা অনেক দেখিলাম।

আপনার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই! বোধহয় সম্বলপুরে গিয়া অবধি এদিকে আর আসেন নাই। যে বিদ্যালয়টিতে চারা অবস্থায় জলসেচন করিয়া গিয়াছেন ফল ধরিবার কাছাকাছি সময়ে এখন তাহাকে একবার দেখিয়া যাইবেন না? আপনাদের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে কেবল এক জগদানন্দ অতীত ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন— আর সকলেই নূতন লোক — সমস্যাও নূতন নূতন উঠে — জালে কতবার কত গিঁঠ পড়িয়া যায়— আমাকেই একলা বসিয়া সেই গ্রন্থি মোচন করিতে হয়।

এখানকার লাইব্রেরি হইতে বই লইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন— পাঠানো ও ফিরিয়া পাঠানোর উৎপাত ও তজ্জনিত ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়া আর কোনো আপত্তির কারণ দেখি না। কেননা দেখিতেছি অধ্যাপকগণ ছুটির সময় বাড়িতে বই লইয়া যাওয়াই নিয়ম করিয়া তুলিয়াছেন এমন অবস্থায় আপনার বেলায় লাইব্রেরির দ্বার রুদ্ধ করা চলিবে না। আপনার যে বই আবশ্যক হইবে অজিতকে লিখিবেন— অজিতই লাইব্রেরির অধ্যক্ষ।

রথী ও সন্তোষ আগামী জানুয়ারিতে গ্রাজুয়েট করিবে। রথী তাহার পরে সেখানে কোনো কৃষিক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজ করিয়া পাকা হইয়া আসিবে এইরূপ সংকল্প করিয়াছে, কিন্তু সন্তোষের পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা বলিতে পারি না— হয়ত উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিবে। পোড়া দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমার ইচ্ছা করে না যে তাহারা আসে।

মাঝে মাঝে চিঠিতে আপনাদের সংবাদ দিবেন। আর যদি সুযোগমত দেখা দিতে পারেন ত কথাই নাই। গদ্য-গ্রন্থাবলী নিয়মমত পাইতেছেন ত? শেষ বই বাহির হইয়াছে "সমাজ"। তাহার পর হইতেই ছাপাখানার আর সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৫ বোলপুর

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

২১ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ　　　　　　　　বোলপুর

সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনি এত অল্পে আঘাত পান— সেই আঘাতের বেদনা আবার আমাদেরও ফিরে এসে লাগে। এবারে বিজয়ার সময় কলকাতায় ছিলেম না— তখন সপরিজনে বোটে শিলাইদহে ছিলাম— সেখানে শরীর একেবারেই ভাল ছিল না— জ্বর প্রভৃতি নানা উপসর্গে অনেকদিন ভুগেছিলুম— তার সঙ্গে নানাবিধ দুশ্চিন্তা জড়িত হয়ে ছিল— সেইজন্যেই আপনার বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ আমার অন্তঃকরণে ফলিত হয়েও প্রতিফলিত হবার সুযোগ হয় নি। সে জন্যে আমি ত নিজেকেই করুণার পাত্র বলে মনে করি। যাই হোক আপনি এ বিশ্বাস দৃঢ় করে রাখ্‌বেন যে এখানে আপনার আসনটি যত্নেই রয়েছে এবং দ্বার রুদ্ধ হয় নি। আপনি অন্যায় সংশয়ের দ্বারা আমার প্রতি অবিচার করবেন না।

এখান থেকে নভেল প্রভৃতি যেরকম বই আপনি ইচ্ছা করেন অজিত আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারবে— তাতে আপনি সঙ্কোচ করবেন না।

বিদ্যালয়ের নূতন সেশন আরম্ভ হয়েছে। তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাকেও ক্লাশ নিতে হচ্চে তাতে ক্লাসের সুবিধা হচ্চে কি না বলা কঠিন কিন্তু

আমার সমস্ত অবসর মারা যাচ্ছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। ইতি ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

১১ ডিসেম্বর ১৯০৮

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠিতে সন্তোষের কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। সন্তোষ যে বেশ সহজ স্বাভাবিকতা লাভ করিতে পারে নাই সে পূর্ব্বেই জানিতাম। সে নিজেকে ভুলিতে পারে না—এইজন্য তাহার কথা সাজানো কথার মত হইয়া উঠে। এটা একটা মানসিক অস্বাস্থ্যতা, অতএব এ লইয়া ক্রুদ্ধ হইবেন না—তাহার প্রতি করুণা রক্ষা করিবেন এবং স্নেহ করিবেন। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যখন বয়স হইবে এবং সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তখন তাহার এ রোগ কাটিয়া যাইবে। হাম, দাঁত ওঠা প্রভৃতি কতকগুলি অল্পবয়সের শারীরিক রোগ আছে তেমনি আপনাকে ভুলিতে না পারা এবং আপনার শক্তিকে ভুল বোঝা অল্প বয়সের মনোবিকার। এই বিকারকে অনেকেই উত্তীর্ণ হইয়া পুনশ্চ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অনেকস্থলেই দেখা যায়। সন্তোষকেও এই যৌবনসুলভ বিকৃত আত্মচেতনার ব্যাধি কাটাইয়া সহজ মানুষ হইয়া উঠিতে

হইবে। সংসারের আঘাত অভিঘাতে আপনিই তাহা ঘটিবে। বিশেষত যাহারা এইরূপ অভিমানগ্রস্ত সংসারে তাহারা প্রশ্রয় পায় না— তাহারাও অন্যকে পীড়িত করে বলিয়া অধিক আঘাত লাভ করে। সন্তোষকে এই দুঃখের ভিতর দিয়া যাত্রা করিতে হইবে এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি দয়া রাখিবেন। সৌভাগ্যক্রমেই রথীকে এই আত্মাভিমান আক্রমণ করে নাই— সে তাহার কোনো পত্রে কখনো আভাস ইঙ্গিতেও নিজের গৌরব প্রকাশ করে নাই এ সম্বন্ধে রথী তাহার পিতাকে জিতিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আছে। ইতি ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

১৩ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ বোলপুর

প্রিয়বরেষু

যোগেন্দ্রবাবুর কাছে যথাসম্ভব আপনার সমস্ত খবর নিয়েছি। আমার নিজের খবর ভালই। অভিযোগ করবার বিষয় বিশেষ কিছুই দেখছিনে— জমিদারীতে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কিছু অর্থাভাব ঘটেছে— কিন্তু সে অভাবটাকে এমন সীমায় ঈশ্বর নিয়ে যান নি যাতে নালিশ দায়ের করা যায় বা আপিল মঞ্জুর হতে পারে। তা ছাড়া মনে মনে ঠিক করে আছি মামলা

আর করব না তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মৎলব করচে। অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগই নি— ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।

আজ বর্ষশেষ— কাল এখানে নববর্ষের উৎসব হবে। প্রার্থনা করি যে নববর্ষ কেবল পঞ্জিকার প্রথম পাতে দেখা না দিয়ে যেন জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আর কোনো সার্থকতা চাইনে। নূতন জীবন চাই। পুরাতনের যত ভয় লজ্জা দুঃখের জের যেন আর না টেনে আনতে হয়— একেবারে সব সাফ করে দিয়ে বড় রাস্তায় যেন বেরিয়ে পড়তে পারি। আর সমস্তেরই মৃত্যু আছে কেবল আবর্জ্জনারই কি মৃত্যু নেই নাকি?

নববর্ষ আপনার জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণের ভার অঞ্চলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করে নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। অর্থাৎ যাই নিয়ে আসুক্ সুখই হউক দুঃখই হউক্ আপনি তাকে অপরাজিত চিত্তে গ্রহণ করবার শক্তি লাভ করুন।

আপনি আমার বইগুলি পাচ্ছেন কিনা খবর দেন না কেন? প্রকাশকরা যদি ফাঁকি দেয় আমার ত জানবার কোনো উপায় নেই। গদ্যগ্রন্থাবলী সবগুলি এবং "শান্তিনিকেতন" পাচ্ছেন ত? ইতি ৩১শে চৈত্র ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

২৩ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

রথীর পরীক্ষা নিশ্চয় এতদিনে হয়ে গেছে। তাকে য়ুরোপে যাবার পাথেয় গতকল্য পাঠিয়েছি। সে একবার ফ্রান্স ও জর্ম্মনিতে তার শিক্ষা সমাধা করে আসুক। বোধহয় এই বৎসরের শেষ ভাগে সে সশরীরে ফিরে আসবে।

সন্তোষ বেশ ভাল পাস করেই B. S. ডিগ্রি পেয়েছে। অর্থাৎ Bachelor of Science। ও সেখানে আরো দু বছর থেকে উপার্জ্জন করে কিছু মূলধন হাতে নিয়ে দেশে ফেরবার সঙ্কল্প করেছে।

আমাদের মেয়ে ইস্কুলের বেতন ও নিয়মাদি বালক বিদ্যালয়েরই সমান। যদি ইতিমধ্যে এখানে একবার আসেন তবে সমস্ত স্বচক্ষে দেখেশুনে তার পরে যথাবিহিত স্থির করবেন।

আপনাকে চিঠি লিখচি— কিন্তু তিনদিকে তিন জন লোক বসে। ওদিকে আজই লুপ মেলে বোলপুর যাত্রা করব তার সময় আসন্ন। আজকাল ভাবের ক্ষেত্র থেকে কাজের ক্ষেত্রে নেমে অবধি সময়ের অত্যন্ত টানাটানি— এ পর্য্যন্ত আপনাকে সুস্থভাবে এক লাইন লেখবার সময় পাই নি। আজ এখনি না লিখলে আর অবকাশ হবে না বলে কোনোমতে লিখে দিচ্চি। আশা করি হাতের অক্ষর ও ভাষা বুঝতে গোল হবে না—

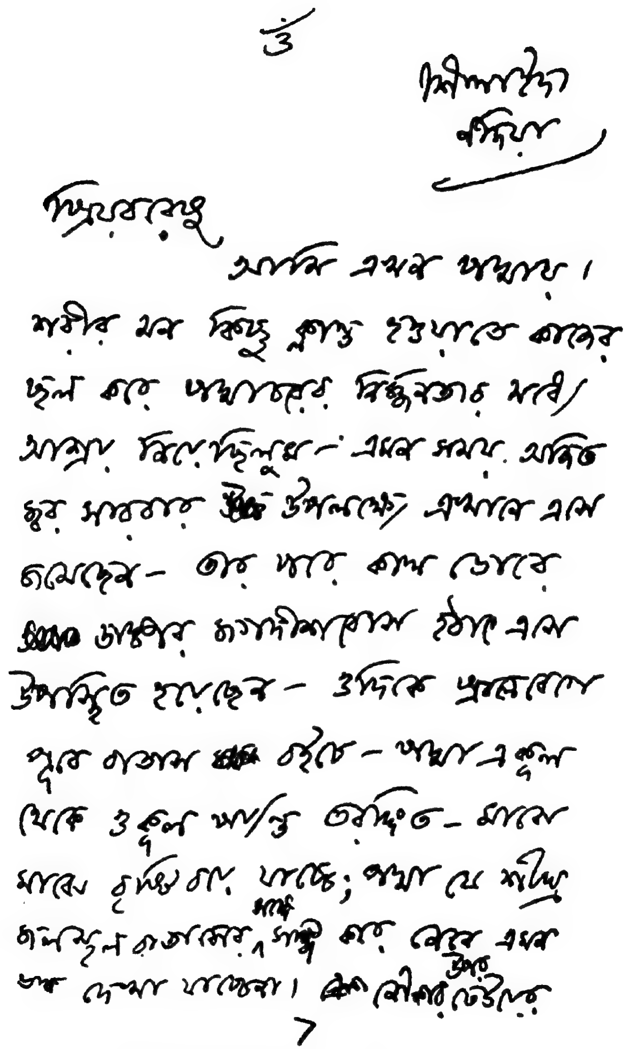

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমি এখন পদ্মায়। শরীর মন কিছু ক্লান্ত হওয়াতে কাজের ছুটি করে পদ্মাচরের নিস্তব্ধতার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম — এমন সময় অজিত কুমার সাবধান উপলক্ষ্যে এখানে এসে জমেছেন — তার পরে কাল ভোরে ডাক্তার জগদীশপ্রসাদ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন — ওদিকে প্রবলবেগে পূবে বাতাস বইছে — পদ্মা এ কূল থেকে ও কূল পর্যন্ত তরঙ্গিত — মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে; পদ্মা যে শান্তি জলস্থল রাজ্যের মধ্যে সাক্ষী করে রেখে এখন তার দেখা যাচ্ছেনা। নৌকার উপর ঢেউয়ের

7

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

যদি গোল ঠেকে যখন দেখা হবে সমস্ত বোঝাপড়া করে নেওয়া যাবে। ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

[২৫ জুলাই ১৯০৯]

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমি এখন পদ্মায়। শরীর মন কিছু ক্লান্ত হওয়াতে কাজের ছল করে পদ্মাচরের নির্জ্জনতার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম—এমন সময়ে অজিত জ্বর সারাবার উপলক্ষ্যে এখানে এসে জমেছেন— তার পরে কাল ভোরে ডাক্তার জগদীশ বোস হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন— ওদিকে প্রবল বেগে পূবে-বাতাস বইচে— পদ্মা এ কূল থেকে ও কূল পর্য্যন্ত তরঙ্গিত— মাঝে মাঝে বৃষ্টি বয়ে যাচ্চে ; পদ্মা যে শীঘ্র জল-স্থল-বাতাসের সঙ্গে সন্ধি করে নেবে এমন ভাব দেখা যাচ্চে না। নৌকার উপর ঢেউয়ের আঘাত চলচে বলে চিঠি লেখা শক্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যালয়ে ভিড় কিছু বেড়েছে। কিন্তু একটা নতুন দোতলা ঘর তৈরি হচ্চে, সেটা হলে তাতেই দু তলায় ২৫ জন ছাত্র ধরবে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না।

১৮ টাকা বেতন অভিভাবকদের পক্ষে কিছু কঠিন তবু তৎসত্ত্বে এতেও আমাদের টানাটানি হয়। ছেলে যত বাড়চে মাষ্টারও বাড়চে— সুতরাং খরচও বাড়চে। কবে একে নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব জানি নে।

আপনাদের মেয়েটিকে কেন আশ্রমে দিয়ে গেলেন না? আমি প্রতীক্ষা করে ছিলুম। যদি মনের মধ্যে সঙ্কোচ বোধ করে থাকেন সেটা আপনার অন্যায় হয়েছে। এখনো চিন্তা করে দেখবার সময় আছে।

রথীর দেশে ফেরবার সময় আসন্ন হয়েছে— হয় ত আর এক মাস পরেই ফিরবে— তার পরে তার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সন্তোষও আগামী সেপ্টেম্বরে ফিরে আস্‌বে। ইতি রবিবার [৯ শ্রাবণ ১৩১৬]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭
৯ আগষ্ট ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নি[বেদন]

এ [খানে] পদ্মার আতিথ্য ভো[গের বাসনা] শ্রাবণের বর্ষাতেও [আমার মনকে] নিরস্ত করিতে পারিতেছে [না।] মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে[র দিকে]মন টানে— কিন্তু এবার প[ণ] করিয়া আসিয়াছি— গোর[া] গল্পটা শেষ করিয়া তবে জলগ্রহণ— গ্রহণ বলা চলে [না] জল ত্যাগ করিব। তাই ঘা[ড়] গুঁজিয়া গোরা লিখি[তেছি-] [শে]ষের দিকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। [বি]দ্যালয় সম্বন্ধে আপনার [যাহা] কিছু বলিবার আছে [তাহা] আপনি অসঙ্কোচে [বলিবেন।] জনশ্রুতি ঠাকুরাণীর [মুখে য]াহা শুনিতে পান [তাহা] আমার শ্রুতিগোচর [করি]বেন। অপরে আমাদিগকে কিভাবে দেখিতেছে তাহা [জানা] ভাল— যদিও সকল [সম]য় তাহাতে উপকার [হয় না,] তথাপি Knowledge is power।

আজ রথীর চিঠি প[াইলাম] সে এখন জর্ম্মনিতে আ[ছে।] দেশে ফিরিবার পা[থেয়র জন্য] টেলিগ্রাফ করিয়াছিল [। তাহা] পাঠান হইয়াছে— [হয়ত] সে আর দুই কিম্বা অ[ার এক] সপ্তাহ পরেই ফিরিতে পারে। আশা করি সকল ক'টিকে লইয়া ভাল আছেন। ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠা[কুর]

৫৮

২০ আগষ্ট ১৯০৯

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

জনশ্রুতিঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর বোধ করি কিছু প্রবল এই জন্যই ছোটকথা বড় হইয়া উঠে। আসল কথা, যে ব্যবস্থা আছে তাহার চেয়ে এত ভাল করা যাইতে পারে যে প্রিন্স অফ ওয়েলসের ছেলেরাও ওখানে কষ্ট বোধ করে না— কিন্তু তাহাতে অর্থের প্রয়োজন— এবং অমন উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই। যাহারা সচরাচর মেসে খাইয়া কষ্টে পড়াশুনা চালায় তাহারাই আমার এখানে পড়িতে আসে— অতএব তাহাদেরই উপযোগী বেতন ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন জায়গায় সুখী লোকের ছেলের স্থান নাই। আপনি ত জানেন রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। তখনকার আহারাদির চেয়ে এখনকার বন্দোবস্ত ভাল বই মন্দ নয়। মেয়ে ইস্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে একত্রে খায় ও থাকে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোনো পার্থক্য রাখি নাই। ইহা নিশ্চয় জানিবেন আমার সামর্থ্য থাকিলেও ছাত্রদিগকে বর্ত্তমানের অপেক্ষা অধিক আরামে রাখিবার চেষ্টা করিতাম না। আদুরে ছেলেদের আদর ঝাড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় শিক্ষা। ইহাতে যে অভিভাবক কষ্ট [বোধ] করেন তাঁহারা নিজের কোলের উপরে বসাইয়াই ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন

তাহাতে কেহ বাধা দিবে না।

রথীকে বোম্বাই ঠিকানায় বেলা পত্র লিখিতেছে। তাহাতে আপনার খবর দিবার কথা লিখিতে বলিয়া দিলাম। যদি সে চিঠি তাহার হস্তগত হয় তবে আপনিও যথাসময়ে তাহার কাছ হইতে সংবাদ পাইবেন।

কলিকাতায় অহোরাত্র লোকজনের ভীড়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি সেইজন্য আপনাকে চিঠি লিখিতে দেরি হইয়া গেল। এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি। ইতি ৪ঠা ভাদ্র ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

১৮ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

এবার কিছু বৈষয়িক ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে গেছি। এইটে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই এবারকার মত বিষয়ব্যাপার থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পেতে পারব এই রকম আশা হচ্চে।

আপনার দক্ষিণ হস্তের রাখী আপনার দাক্ষিণ্য বহন করে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে আমি সাদরে তা গ্রহণ করলুম।

আমার গ্রন্থাবলী এবং শান্তিনিকেতন বোধহয় সবই

হস্তগত হয়েছে। ইতিমধ্যে চয়নিকা প্রভৃতি যে দুইএকখানা বই বেরচ্চে— প্রকাশকেরা তা আমাকে উপহার স্বরূপে দিতে কৃপণতা করচেন। সেইজন্যে আমিও কাউকে দিতে পারচিনে।

রথীকে শিলাইদহে রেখে এসেছি। সেইখানেই তার কর্ম্মের রথ তাকে চালাতে হবে।

ছুটির সময়ে আস্‌চেন না বুঝি ? সবসুদ্ধ আছেন কেমন ?
ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

২ ডিসেম্বর ১৯০৯

ওঁ

[জোড়াসাঁকো
কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠিখানি পেয়ে উদ্বিগ্ন হলুম। আপনি যদি মেয়ো হাঁসপাতালে থাক্‌তে ইচ্ছা করেন তবে এইসঙ্গে সেখানকার অধ্যক্ষ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে যে পত্রখানি দিলুম সেটি ব্যবহার করে দেখ্‌বেন— আমার বিশ্বাস সেখানে তাঁর কাছে বিশেষ যত্ন পেতে পারবেন।

রথীকে নিয়ে আমি এতদিন জলপথে ঘুরছিলুম— দিন তিনেক হল ফিরেছি, রথী শিলাইদহে আছে। আমি আবার কাল লুপ মেলে বোলপুরে যাচ্চি।

আপনি হতাশ হয়ে নিজের মনকে পীড়িত করবেন না, তাতে আপনার আরোগ্যর ব্যাঘাত ঘট্‌বে। আপনি নীরোগ হয়েছেন এই সংবাদটি পেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

[৮ ? ফেব্রুয়ারি ১৯১০]

ওঁ [কলিকাতা]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমি আজ কয়দিন ধরে আপনাকে চিঠি লিখতে বসচি কিন্তু কোনোমতেই সময় পাচ্চি নে। কলকাতায় আমি কি অবস্থায় থাকি জান্‌লে আপনি আমাকে দয়া করতেন। আজই বোলপুরে পালাচ্চি।

রথীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু ব্যবস্থা যা কিছু হয়েছে সে জন্যে আমাকে দায়ী করলে চল্‌বে না। আমি এসকল বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম অনভিজ্ঞ বলে সমস্ত ভার অন্যদের উপর চাপিয়ে চুপ করে ছিলুম— কেবল টাকাটা আমি দিয়েছি মাত্র এবং ছেলেটি আমার। অপরাধ অনেক হয়েছে এবং সে সমস্তই আমাকেই গ্রহণ করতে হচ্চে কিন্তু আপনার কাছে আমি বেকসুর খালাস প্রত্যাশা করি।

আপনি যে ছেলেটির কথা লিখেছেন তাকে নিতে কোনো

আপত্তি নেই— কেবল সম্প্রতি একেবারেই স্থানাভাব। গ্রীষ্মাবকাশে নূতন ঘর তৈরি হলে তার পরে আষাঢ় মাসে নূতন ছেলে নেওয়া সম্ভব হবে— তৎপূর্ব্বে চল্‌বে না।

ছেলেদের মধ্যে যাতে কোনো রকম ইন্দ্রিয়শৈথিল্য না ঘটে সেজন্যে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা হয়— কিন্তু ১৩০ জন ছেলের মধ্যে বাংলাদেশে এই উপসর্গ সম্পূর্ণ ঠেকানো গেছে একথা আমার নিজেরই প্রত্যয় হয় না। আমি দেখ্‌তে পাই আমাদের দেশ এ সম্বন্ধে একেবারে কলুষপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন। ঘরে ঘরে এই ব্যাধি। যে সব ছেলে এখানে আসে তারা এই উপসর্গ সঙ্গে করে নিশ্চয়ই আনে— তারপরে আমরা উপদেশ দিয়ে পাহারা দিয়ে যতটা সম্ভব এটাকে দমন করে রাখি— কিন্তু কৃতকার্য্য কি পরিমাণে হই তা নিশ্চয়রূপে জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়— তবে শিক্ষকদের দ্বারা কোনো বিকার ঘটে না এ কথা বোধহয় জোর করে বল্‌তে পারি।

আপনি ভাল আছেন ত? আমার শরীরটা ভালো নেই। ইতি মঙ্গলবার [২৬? মাঘ ১৩১৬]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

১৩ এপ্রিল [১৯১০]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। রথী সপরিজনে এখানে আসিয়াছে। সন্তোষ পাঁচটি গাভী সংগ্রহ করিয়া এখানে গোষ্ঠলীলা আরম্ভ করিয়াছে।

সুবোধ আজকালের মধ্যে দেশে ফিরিবে— সম্ভবত এখানে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে।

আশাকরি সকলে মিলিয়া ভাল আছেন। ইতি ৩রা বৈশাখ [১৩১৭]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

২৯ আগস্ট ১৯১০

ওঁ জোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

কয়দিন হইল কলিকাতায় আসিয়া আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু কলিকাতায় আমি অহরহ এমন জনতার মধ্যে থাকি যে কোনো কাজ বা অকাজ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তাই উত্তর দিতে পারি নাই।

হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স্ কোম্পানির অবস্থা খুব ভাল বলিয়াই জানি। সুরেন তাহার সেক্রেটারি। এ কোম্পানি সম্বন্ধে আমার মনে ত কোনো আশঙ্কা নাই। আপনি সুরেনকে আপনার পরিচয় দিয়া একখানা চিঠি লিখিলেই সকল কথা অবগত হইবেন।

রথীর সঙ্গে এতদিন বোটে করিয়া জলপথে বেড়াইতেছিলাম। আবার তাহাকে লইয়া বোলপুরে চলিলাম। সেখানে দুই চারিদিন থাকিয়া সম্ভবত সে শিলাইদহে ফিরিবে। ইতি ১৩ই ভাদ্র ১৩১৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

১৮ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

সম্প্রতি শিলাইদহে রথীদের আতিথ্য অবলম্বন করিয়াছি। ছুটিটা এখানেই কাটাইব মনে করিতেছি।

রথীরা এইখানে ঘরকন্না পাতিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে—এখন হইতে এইখানেই তাহার স্থিতি। সন্তোষ বোলপুরে গোষ্ঠলীলায় নিযুক্ত আছে। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

২৫ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ শিলাইদা

নদিয়া

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এ জগতে যদি অমোঘ নিয়ম না থাকিত তবে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইত। নিয়ম ব্যতীত প্রকাশ হইতেই পারে না। খেলা করিতে গেলেও খেলার নিয়ম মানিতে হয় নতুবা খেলার আমোদই হয় না, তাহা উন্মত্ততা হয় মাত্র। এই নিয়মই যখন তাঁহার ইচ্ছা— তখন আমাদের ইচ্ছাকে এই নিয়মের অনুগত না করিলে দুঃখই পাইতে হইবে— যখন বিশ্বের ইচ্ছাকে তাঁহার নিয়ম জানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইব— তখনই তাঁহার আনন্দের সহিত আমার আনন্দের মিলন হইবে। যতদিন বিদ্রোহ করিব, মানিতে চাহিব না, ততদিন পরাভূত হইতে হইবে।

বিধাতার রাজ্যে যেখানে নিয়ম সেখানে ব্যত্যয় নাই এই কথা যখন মানুষ জানে তখনি সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ— তেমন প্রসাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহার ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা নহে এই জন্যেই বিশ্বে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখিতে পাই— এই কারণেই তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা জানিতে পারি— এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া আমরা সার্থকতা লাভ করিতে পারি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরাজ্যে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখি— কিন্তু কেবলি যে জগতে নিয়মকে দেখি তাহার বেশি কিছুই দেখি না তাহা নহে। পয়ারে চোদ্দ অক্ষরের নড়চড় হইবার জো নাই— তাহার ভাষা ছন্দ ও অর্থের সুবিহিত সুসঙ্গতি আছে— কিন্তু আমরা যদি পয়ারে কেবল চোদ্দ অক্ষরই দেখিতাম অথবা কেবলই প্রত্যেক শব্দের ও পদের সহিত একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ আছে ইহাই জানিতাম তবে তাহাকে কাব্যই বলিতাম না। কিন্তু কাব্যের সমস্ত অটল অমোঘ স্খলনহীন নিয়মের ভিতর দিয়াই তাহার গভীরতম সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত, কাব্যকর্ত্তার অন্তরতম আনন্দ ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে— সেইজন্যই তাহা কাব্য। আলঙ্কারিক তাহার মধ্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম দেখিয়া বাহবা দেয়— বৈয়াকরণ তাহার মধ্যে ব্যাকরণের সূত্র ঠিকমত বজায় আছে দেখিয়া পুলকিত হয়, অভিধানবাগীশ তাহার শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি দেখিয়া খুসি হইয়া নস্য লইতে থাকে— কিন্তু সমস্ত নিয়ম ও সঙ্গতির ভিতর হইতে নিয়ম ও সঙ্গতির অতীত আনন্দ তাহারাই দেখে যাহারা রসিক— তাহারা ইহার মধ্যে কবির নিয়মনৈপুণ্য দেখে না, কবির আনন্দউচ্ছ্বাস দেখে। তাহারা যখন জগৎকে দেখে তখন বৈজ্ঞানিকের মত কেবল সত্যকেই দেখে না— দার্শনিকের মত চিত্তকেও দেখে, এবং কবির মত আনন্দকে দেখে— কারণ তাহার নিজের মধ্যে সত্য আছে, চিত্ত আছে, আনন্দ আছে— তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলসঙ্গত নিয়মবন্ধনও আছে, চেতনাময় গতিশক্তিও আছে এবং

আনন্দময় মুক্তির অনুভূতিও আছে— জগতের মধ্যে যখন সে এই তিনের যোগ দেখে তখনি সচ্চিদানন্দকে দেখে, এবং তখনি তাহার দেখা সম্পূর্ণ হয়। নতুবা যখন একটাকে দেখে অন্যটাকে দেখে না তখনই সে বিদ্রোহ করে অহঙ্কার করে, তর্ক করিতে থাকে এবং নীরস হইয়া মরে। আনন্দ আছে অতএব নিয়ম নাই এ কথা যেমন মিথ্যা, নিয়ম আছে অতএব আনন্দ নাই, এ কথাও তেমনি মিথ্যা। আনন্দ হইতেই নিয়ম হইয়াছে নতুবা নিয়ম আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিত, নিয়মের মধ্য দিয়াই আনন্দ প্রকাশ পায় নতুবা জগতে কোথাও আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতাম না, প্রেম উপলব্ধি করিতাম না। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬

•১৫ এপ্রিল [১৯১১]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

বিদ্যালয়ে আমার জন্মোৎসবে আপনি আস্‌বেন শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি। এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনের একটি গভীর মঙ্গলসম্বন্ধ যে চিরন্তন হয়ে উঠেছে এই কথাটির পরিচয় আমার কাছে বহুমূল্য বলে জানবেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আপনি নিজের যেন বিশেষ

ক্ষতি করবেন না— আপনার ইচ্ছাকেই আপনার উপস্থিতি বলে বরণ করে নেব। ইতি ২রা বৈশাখ [১৩১৮]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

৮ জুন ১৯১১

ওঁ শিলাইদা

নদিয়া

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ—

ছেলেরা আপনার উপর রাগ করে নাই। প্রথমত রথী ত রাগ করিতেই পারে না— কারণ, কার্য্যবশত সেও বোলপুরে আসিতে পারে নাই— দ্বিতীয়ত সন্তোষের রাগী স্বভাবই নয়। আপনি যদি ক্ষতিস্বীকার করিয়া আসিতেন তাহা হইলে আমি নিতান্তই দুঃখিত হইতাম। আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যের প্রয়োজন দেখি না।

আমাদের প্রত্যেকের ভীরুতা সম্মিলিত হইয়াই ত সমাজভয় জিনিষটা জুজুর মত জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের অন্যায় অত্যাচার স্বীকার করিব না ইহাতে যত দুঃখই পাই না কেন, একথা জোর করিয়া বলিতে পারিলে তবেই একদিন সমাজ সীধা হইতে পারিবে— নিজের বুকের রক্ত দিয়া যতই ইহার খোরাক জোগাইবেন বুকের রক্তের প্রতি ইহার লোভ ও দাবী

ততই আরো বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। বক্তৃতা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার যথার্থ প্রতিকার হয় না— কারণ, যে সকল প্রথা সমাজের লোককে বেদনা দিতেছে তাহারা যে বেদনাকর ইহা বুঝাইবার জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সমাজের লোক যেদিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমাজের মুখে তুড়ি মারিয়া বলিতে পারিবে কেয়ার করি না তোমাকে— তুমি যা খুসি তাই কর— তখনই সমাজ ভালমানুষটির মত তাড়াতাড়ি রফানিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

আমি এখন শিলাইদহে ছুটিটা রথীর আতিথ্যে যাপন করিতেছি। এখানে আমার ছোট কন্যা এবং জামাতাও আছে। সকলে মিলিয়া বেশ আনন্দে কাজকর্ম্ম এবং চাষবাস লইয়া আছে। ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২২ জুলাই ১৯১১

ওঁ

শ্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

পাঁচ ছয়দিন হইল বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার লইয়াছি, কি উপায়ে শোধ করিতে হইবে এখন হইতে তাহা চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন দেনার বোঝা যাহা কাঁধে চড়িয়া বসিয়া আছে তাহা সিন্দ্‌বাদের সেই স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তিটির মত, তাহার নড়িবার কোনো তাগিদ্ নাই— প্রতি মাসে তাহার সুদ জোগাইতেছি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন চপলা লক্ষ্মী আমার প্রতি নিগ্রহ সম্বন্ধে কিরূপ অচপল— অনেকদিন হইতেই আমার প্রতি তাঁহার ব্যবহার সমভাবেই আছে। আমার হাতে দেনা কেবলি বাড়িয়া চলিয়াছিল দেখিয়া বিষয়ের ভার সম্পূর্ণ রথীর হাতে দিয়া আমি সংসারের রণে হার মানিয়া ভঙ্গ দিয়াছি। ঋণ দিয়াই সে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে পরিশোধ দিয়া যদি শেষ করিতে পারে তবেই সে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান।

উচ্চ সুদে ধার করিয়া দেওয়া ছাড়া যদি আর কোনো রাস্তা থাকিত তবে নিশ্চয় জানিবেন আমি আপনাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া দিতাম। কিন্তু যে নিজে ডুবিয়াছে সে অন্যকে কূলে টানিয়া তুলিবে কি করিয়া ?

সমাজ দেবতার কাছে বলি দিবার প্রথা আরো কতদিন চলিবে জানি না। রক্ত কি আর কিছু বাকি আছে ? দুঃখ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ শিক্ষা হইতেছে না—সমাজ কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত না গিয়া কোনোমতেই ক্ষান্ত হইবে না ? অমঙ্গলকে স্বীকার করিতেছি প্রত্যেকেই অথচ প্রতিকার করিতেছি না কেহই, এমন সাংঘাতিক জড়ত্ব পৃথিবীর আর কোনো দেশে কি দেখা গিয়াছে ? যে সমাজ সমাজের আশ্রিতবর্গকে সর্ব্বপ্রকারে পীড়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না সেই সমাজকে মানিয়া চলাই অপরাধ। দুর্ব্বল বলিয়াই দুঃখের

ভয়ে মানি, মানি বলিয়াই দুঃখ পাই— এই চক্র এমনি করিয়াই ফিরিতেছে। ইতি ৬ই শ্রাবণ ১৩১৮

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১১

ওঁ কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেছে। আগামী ১৬ই অক্টোবরে জাহাজ বম্বাই ছাড়বে— তার ৩।৪ দিন আগে আমাদের রওনা হতে হবে। এরই মধ্যে সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে। মাঝখানে এমন একদিনো সময় পাব না যখন ফাঁকতালে আর একটা ছোটোখাটো ভ্রমণ সেরে নেওয়া যেতে পারে। যদি B. N. R. দিয়ে যাত্রা কর্ত্তুম তাহলেও একবার উঁকি মেরে আসা অসম্ভব হত না— কিন্তু এলাহাবাদ হয়ে যাবার কথা হচ্চে— এলাহাবাদে সত্য আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবার প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনার সাদর নিমন্ত্রণটি মনের মধ্যেই তোলা রইল সেটিকে কাজে লাগাতে পারা গেল না। এবারকার মত সমুদ্রপারেই চল্লুম— তার পরে ফিরে এসে যদি ভ্রমণের ঝোঁকটা না মিটে যায় তাহলে ভারতবর্ষেই কিছু ঘোরা ফেরা করে নেব— আপনার নিমন্ত্রণটি যদি ততদিন পর্য্যন্ত কায়েম থাকে তাহলে

সেটি যথারীতি আদায় করে নেব। মনে ত করচি এখন থেকে খাঁচায় বসৎ তুলে দেওয়া গেল— বাকি ক'টা দিন উড়ে উড়েই কাটিয়ে দেব।

আপনি বোধহয় জানেন না রথী এবং বৌমা আমার সঙ্গে বিলাত যাচ্চেন। রথী মাস তিনচার থেকে চলে আস্‌বেন— আমরা হয়ত বছর খানেক অথবা ভাল লাগ্‌লে তার চেয়ে বেশি দিনও থাকৃতে পারি— অতএব দীর্ঘকালের জন্য আপনাদের নমস্কার করে পাড়ি দিতে চল্লুম। ইতি ১৩ই আশ্বিন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

১৯ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

অপমান ত অনেক সহিয়াছি— বোধ করি সম্মানও সহ্য করিতে পারিব। আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। যিনি মান দিয়াছেন তিনিই আমার মান রক্ষা করিবেন একেবারে কাৎ হইয়া পড়িতে দিবেন না। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

১৫ ডিসেম্বর ১৯১৩

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

সত্য বলিয়াছিলাম বলিয়া দেশের অনেক লোক রাগ করিয়া আমাকে গালি দিতেছেন। ইঁহাদের নিকট হইতে এই অসম্মানই আমি ভূষণ বলিয়া এতদিন গলায় ধরিয়াছি আজও ইহা বহন করিব— অতএব এ লইয়া আপনি লেশমাত্র দুঃখবোধ করিবেননা।

অসম্মানের চেয়ে সম্মানে আমাকে অনেক বেশি ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে সেজন্যে চিঠি ছোট করিতে হইল।

ইতি ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

১৯ এপ্রিল ১৯১৪

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সাদরনমস্কার সম্ভাষণ

আপনার শরীর অনেকটা সারিয়াছে শুনিয়া খুসি হইলাম।

রথী কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে।

অ্যালোপ্যাথি ব্যবস্থায় যখন উপকার পাইয়াছেন তখন আর চিকিৎসার বদল করিবেন না। যদি বোঝেন জড় মরিতেছে না তখন চেষ্টা দেখিবেন।

সর্ব্বপ্রকারে আপনার কল্যাণ হউক নববর্ষারম্ভে এই আমি কামনা করি। ইতি ৬ই বৈশাখ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

১৩ জানুয়ারি ১৯১৬

ওঁ বোলপুর

প্রীতিনমস্কারনিবেদন

অনেককাল পরে আপনার চিঠিখানি পাইয়া বড় আনন্দ হইল।

বন্দেমাতরমের নামে দেশে যে একটা দুষ্কৃতির ঢেউ উঠিয়াছে সেটার ত একটা Psychology আছে— ঘরে বাইরে গল্পে তারই আলোচনা চলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিয়া আগে হইতে ভাবিয়া একাজে প্রবৃত্ত হই নাই— আপনা-আপনি কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিবেন।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যে মাঘের মাঝামাঝি একটা অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে— তাই লইয়া বিষম ব্যস্ত আছি। একবার ধাঁ করিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া যাইবেন না কি? ইতি ২৮ পৌষ ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

ওঁ　　　　　　　　　　শিলাইদা

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটা এতই সহজ যে ঘটা ক'রে তার অর্থ বোঝাতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে দেখা যায় যে যদি চ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্চে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্ম্মল, ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান— অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌তে গেলে দেখি ফুল ঝরচে, পাতা শুকচ্চে, ডাল মরচে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেচে, তবুও বিশ্বের চির-নবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরামৃত্যু Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবনযৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্ত্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্ত্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌ল। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখ্‌তে গেলেই দেখি সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তাহলে অনাদি-কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত— এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে

চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্চে মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চল্‌চে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করচে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্চে। সর্দ্দার বল্‌চে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করিনে— আচ্ছা দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস ত ধর্। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে চিরন্তন করে দেখ্‌তে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাক্‌লে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ ত মারা যেত। ইতি ২০ মাঘ ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

[ফেব্রুয়ারি / মার্চ ১৯১৬]

ওঁ

প্রীতিনমস্কার

আমি আপনার উপর লেশমাত্র বিরক্ত হই নাই। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে হয়ত আমার অজ্ঞাতসারে আমার কলমের মুখে সেই ক্লান্তির একটা গ্লানি প্রকাশ হয়ে থাকবে

কিন্তু আপনার প্রতি রাগ করবার কোনো কারণ ঘটেনি এবং আমি স্বভাবতই যে রাগী তাও নয়।

ফাল্গুনীতে সর্দ্দারের কাজটা ভিতরে থেকে গোপন— যারা তার দ্বারা চালিত হয় তাদের মধ্যেই সর্দ্দারের প্রকাশ— এইজন্যে সর্দ্দারকে আমি অধিকমাত্রায় নাড়াচাড়া করি নি।

[মাঘ/ফাল্গুন ১৩২২]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

[এপ্রিল ? ১৯১৭]

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমি দেশে ফিরে এসে রথীর সম্বলপুরপ্রয়াণের বৃত্তান্ত প্রথম শুনলুম। আপনি দিনরাত্রি কি রকম অক্লান্ত যত্নে তার সেবা করেচেন এইটেই হচ্চে তার একমাত্র ধ্র‍ুয়ো। রথী যে পথের থেকে ব্যামো নিয়ে আপনার ঘরে গিয়ে নাম্‌লেন এটা কেবলমাত্র আপনার স্নেহের পরীক্ষার জন্যে দেবতার চক্রান্ত। এই পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হয়েচেন— তবে কিসের জন্যে এত কুণ্ঠিত হচ্চেন ? আপনার ঘরে বিলাস-উপকরণের যদি অভাব থাকে তবে সে জন্যে দায়ী হচ্চেন স্বয়ং লক্ষ্মী— কিন্তু হৃদয়-ভাণ্ডারের যে পরিপূর্ণতা প্রকাশ করেচেন সে ত সম্পূর্ণ আপনার নিজেরই। সংসারে এই জিনিসটাই সব চেয়ে বিরল এবং এরই মূল্য সব চেয়ে বেশি।

একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় সমুদ্রতীরে ঘুরপাক খাইয়ে আবার আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। বিদেশে অনেক জয়মাল্য বরমাল্য লাভ করেচি— এখন স্বদেশে সেইগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার পালা চলবে।

আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে? নববর্ষ আপনার গৃহকে কল্যাণপূর্ণ করুক। ইতি। [চৈত্র ? ১৩২৩]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭

ওঁ

সাদরনমস্কার নিবেদন

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" বক্তৃতাটি যাতে বহুসংখ্যক পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছয় এই মনে করেই প্রবাসী ও ভারতীতে ছাপিয়েচি। সবুজপত্রের পাঠক অল্প এবং এবারে অনেক বিলম্বে ওটা ছাপা হওয়াতে সবুজপত্র বেরবার আগেই অন্য কাগজে ছাপ্‌তে হল। ঐ বক্তৃতাটি যদি কেবলমাত্র সাহিত্যের সামগ্রী হত তাহলে কথাই ছিল না। যা হোক্ যাতে ওটা আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যস্ত আছি। ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

১৮ মে ১৯২২

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার আত্মজীবনীর একটি ছোট অধ্যায় পড়ে আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। সন্তোষকে দেব, ওদের শান্তিনিকেতনে বের করবে। এখানে আমাদের কাজ হঠাৎ নানা শাখাপ্রশাখায় অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েচে। তাই নিয়ে আমাদের নিরন্তর চিন্তা ও চেষ্টা করতে হচ্চে অবকাশমাত্র নেই। দুই একজন উৎসাহী অথচ পাকা লোক যদি পাওয়া যেত তাহলে অনেকটা ভার লাঘব হত। আপনি যে আর এক স্রোতে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেসে গিয়েচেন, এখন আপনাকে আর ফিরিয়ে আনবার পথ নেই— নইলে আপনাকে ছাড়তুম না। আমার এখানে সমুদ্রপার থেকে কেউ কেউ আসচেন তাঁদের কাছ থেকে অনেক কাজ পাওয়া যাচ্চে। আপনি যদি কোন এক অবকাশে একবার এসে দেখে যান তাহলে অনেক নতুন জিনিষ দেখ্‌তে পাবেন এ জায়গা চিন্‌তে পারবেন না। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

৩ অক্টোবর ১৯২২

ওঁ

Hawarden
Race Course
Coimbatore

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন

আপনি এতবড় অদ্ভুত ভুল করলেন কি করে? আপনার সঙ্গে আমার বর্ণিত হেডমাস্টারের কোন্‌খানে মেলে? আপনি চলে যাবার পরে হিতৈষীবর্গের তাড়নায় আমি বীরভূমের কোনও জেলা ইস্কুল থেকে একটি ভদ্রলোককে তার হেডমাস্টারি সমেত সমূলে উৎপাটিত করে আমাদের বিদ্যালয়ে রোপণ করেছিলেম। কিন্তু মাটির গুণে এখানে তাঁর শিকড় বস্‌ল না। আপনাকে ফিরে পেলে ত আমরা হরির লুট দিই— কিন্তু সেই আমাদের ভূতপূর্ব্ব হেডমাস্টারটিকে? নৈব নৈবচ। দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চি। এখান থেকে সিংহলে যাবার কথা আছে। বাঙালী বিজয়সিংহ এককালে সেখানে জয় করতে গিয়েছিলেন, আমি যাচ্চি ভিক্ষা করতে। ফিরব ডিসেম্বরে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯২২ [১৬ আশ্বিন ১৩২৯]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন—

আমাদের বাড়িতে আমরা একরকম লম্বাগোছের কাপড় ব্যবহার করে থাকি, সেই বেশ আপনি যদি পছন্দ করেন তবে কেন গ্রহণ করবেন না তার কারণ বুঝিনে। তার পরিমাণের প্রাচুর্য্য দেখে কেউ কেউ ভয় পান, কিন্তু প্রাচ্যবেশের ঔদার্য্যই ত সেই প্রাচুর্য্য নিয়ে। কিছু বদল সদল করে নিতে পারেন। আমার নিজের জিনিষপত্র কোথায় কি আছে তার ঠিকানা জানিনে— একটা নমুনা পাঠাবার চেষ্টায় রইলুম। নববর্ষের সাদর নমস্কার। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ মে ১৯২৩

ওঁ শিলং আসাম

সাদর নমস্কার নিবেদন—

আপনাকে চিঠি লেখার পরদিনই শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসেচি। তার উপরে আমার একমাত্র ভৃত্য ছুটি নিয়ে তার জন্মস্থানে চলে গেছে। তাই আপনাকে কাপড় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারিনি। কোথায় আমার সম্পত্তির কোন্ অংশ

আছে আমি নিজে জানিনে। অতএব বর্ষার সময়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে কাপড় পাঠাবার সুবিধা করতে পারব না। আশ্রমে ফিরে গেলে একবার মনে করিয়ে দিতে ভুলবেন না। অত্যন্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েচি। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

নভেম্বর ১৯২৩

ওঁ পোরবন্দর

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

নানাস্থানে নিয়ত ঘুরে বেড়াতে হচ্চে। অনেকদিনের জমা চিঠি হঠাৎ পথের মধ্যে কোনো এক জায়গায় পাই— জবাব দেবার সময় থাকে না। মনও অস্থির থাকে— শান্ত হয়ে বসে লিখ্‌তে পারিনে। এ কাজটা আমার নয়, অথচ আমাদের আর কারো দ্বারাও এটা সম্পন্ন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এইজন্যে ভিক্ষাবৃত্তির ঘূর্ণি হাওয়ায় আমাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরপাক খাইয়ে বেড়াচ্চে। এর একটা সুবিধা হচ্চে এই যে, বিশ্বভারতীর অন্তরের কথাটা ভারতের নানা প্রদেশে বল্‌বার সুযোগ পাচ্চি। এদিককার মানুষেরা সাদাসিধে, বড় আইডিয়াকে তারা শ্রদ্ধা করে, আমার উপরেও তাদের অশ্রদ্ধা নেই, তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশের লোকের মত তারা

আমাকে এত নিকটে থেকে এত অধিক’করে জানবার অবকাশ পায় নি। তার পরে আবার শুনেচে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েচি, মনে ভাবে সত্যিই বুঝি বা মানুষটা কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা কিছু হবে। সেইজন্যে মন পরিষ্কার করে কথাগুলো শোনে, কাজেই বুঝতে তাদের বিশেষ বাধে না।

এবার আপনি যখন আশ্রমে ছিলেন, আমার সঙ্গে স্থির হয়ে বসে কথা ক’বার সুযোগ পান নি। আপনি যদি কোনো সঙ্কোচ না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে দাবী করতেন তাহলে অনায়াসে আলাপ হতে পারত। সাধারণত আমার সময় অল্প বটে, কিন্তু মোটের উপর আমাদের সময় জিনিষটা স্থিতিস্থাপক। টান দিতে পারলে খানিকটা বেড়ে যায়— যদি ভরসা করে টান দিতেন তাহলে সময়ের নিতান্ত অভাব হ’ত না। আসলে, আমি কাজে যে খুব বেশি ব্যস্ত তা নয় কিন্তু আমার মন আজকাল নিয়তই ক্লান্ত থাকে, এইজন্যে যতটা পারি জগৎসংসারটাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলি— কিন্তু জগৎসংসারের স্বভাব এই যে, সে চেপে এসে পড়ে। আপনি আমাকে যখন ছুটি দিতে চেয়েছিলেন তখন আর সবাই যে ছুটি দিয়েছিল তা নয়— সুতরাং আপনিই বঞ্চিত হয়েচেন আমি বিশেষ নিষ্কৃতি পাইনি।

সম্প্রতি রাজবাড়িতে আছি, রাজদরবারে চা খেতে যেতে হবে। রথ এসে দ্বারে প্রস্তুত। অতএব নমস্কার। [অগ্রহায়ণ ১৩৩০]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ মে ১৯২৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

আপনাদের ওখানে যাঁরা যাঁরা আমার জন্মদিনে আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন।

পুরাণে যে ইন্দ্র মন্দর পর্ব্বতের ডানা কেটে তাকে অচল করে দিয়েছিলেন বর্ত্তমান যুগে আমার প্রতি তিনি হস্তক্ষেপ করেচেন। আমি আমার এই ঈজিচেয়ারের অস্তশিখর অবলম্বন করে আছি— এই নিশ্চলতার রাত্রি অবসান হোক্ তারপরে আপনাদের দিগন্তে একবার আহ্বান করে দেখবেন। ইচ্ছা থাকলে রাস্তা পাওয়া যায় কথাটা সত্য, পা-দুটো যদি ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই। পদের অসামর্থ্যেই আমি বিপদাপন্ন। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৩২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

২ অক্টোবর ১৯২৫

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সুহৃদ্বরেষু

মাঝে মাঝে শরীর বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে ওঠাতে চিঠিপত্র লেখা একরকম বন্ধ করে দিয়েছি। আপনার পূর্ব্বের চিঠির

উত্তরে রথীকে বলেছিলেম ছুটির সময়ে আপনাকে আস্‌তে লিখতে— নিশ্চয় সে ভুলে গেছে। এখনো যদি সময় উত্তীর্ণ হয়ে না থাকে তাহলে একবার মোকাবিলা করে যাবেন। ইতি ১৬ই আশ্বিন ১৩৩২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

২৭ ডিসেম্বর ১৯২৫

ওঁ Santi-Niketan
Bengal, India

প্রিয়বরেষু

এখানকার কাজের সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তাতে আমি লেশমাত্র বিরক্তি বোধ করিনি। বিদ্যালয়ের কাজে শৈথিল্য আছে বলে আমিও অনেকসময়ে উদ্বেগ অনুভব করেছি, সম্পূর্ণ প্রতিকারের পথ দেখ্‌তে পাই নে— আমার অবস্থাও এমন যে নিজে এর ভিতরে থেকে সংস্কার সাধন কর্ত্তে পারি নে। তা ছাড়া এই পরীক্ষা-পাস করাবার ইস্কুলটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শসঙ্গত জিনিষ নয়— দেশে এই উদ্দেশ্য নিয়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান আছে। আমি তাই এ জিনিষটা উঠিয়ে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে প্রস্তাব করি। কর্ত্তৃপক্ষদের এখনো রাজি করতে পারি নি। আশা করি এক সময়ে এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারব।

৭ই পৌষের উৎসব শেষ হয়ে গেল। কয়েকদিনের উৎপাতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচে। ইতি ১২ই পৌষ ১৩৩২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

৬ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ কলিকাতা

সবিনয়নমস্কার নিবেদন

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম এখনো জের ফুরোয় নি। ক্রিস্টমাসের সময় আশ্রমে উপস্থিত থাকব। আপনি এলে দেখাসাক্ষাৎ আলোচনার সময় করে নেব। ইতি ৬ নবেম্বর ১৯২৭ [২০ কার্তিক ১৩৩৪]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

[আগস্ট ১৯২৮]

ওঁ [কলিকাতা]

প্রিয়বরেষু

অসুস্থ শরীরের ক্লান্তিতে বিছানায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি। ডাক্তারের এই বিধান। কিছু বলসঞ্চয় করে নিয়েই য়ুরোপে পাড়ি দেবার ইচ্ছা। ঠিক কবে যেতে পারব এখনো নিশ্চিত

বলা যায় না। এখানকার কাজ ত অনেক করেছি— দেশ গ্রহণ করুক বা না করুক আমার তরফে কোনো কার্পণ্য হয়নি। ওপারের লোক আমাকে প্রার্থনা করচে— এখন সেখানেই আমার স্থান। যেখানে দৈবক্রমে জন্মেছি সেই কি আমার সত্য জন্মভূমি? [শ্রাবণ ১৩৩৫]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১০ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

আমি যে কত ক্লান্ত এবং ছোট ছোট কত কাজ ও অকাজের দায় আমার এই পরিশ্রান্ত জীবনটাকে নিয়তই গুরুভারে আক্রান্ত করে রেখেচে যদি জান্‌তেন তাহলে আপনি আমার নিরুত্তর লেখনীকে ক্ষমা করতেন। আয়ু যখন শেষের দিকে আসে তখন যেটুকু কাজ নিতান্তই নিজের সেইগুলিরই দাবী স্বীকার করে আর সমস্ত ত্যাগ না করতে পারলে গুরুতর ক্ষতি হয়। তৎসত্বেও সংসারে থাক্‌তে গেলে একেবারে নিছক স্বধর্ম্মটুকু পালন করে চল্‌লে চলে না। অনেক বাজে [কাজ] করতে হয়, বাজে লোকের উদ্দেশে। প্রায়ই বঞ্চিত করি বন্ধুদেরই। যখন থেকে বুঝেছি যে শরীরটাকে মেরামৎ করে মজবুৎ করে তুল্‌তে পারব না তখন থেকেই আবার আমার

এখানকার সমস্ত কর্ম্মভার নিজে তুলে নিয়েছি— যতদিন বাঁচি যথাসম্ভব এটাকে সম্পূর্ণ করে যেতে ইচ্ছা করি। অথচ উত্তমশক্তি এখন অপর্য্যাপ্ত নয়, তাই কৃপণতা করা ব্যতীত আমার অন্য উপায় নেই। দরাজ হাত তাকেই শোভা পায় যার হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সম্বল আছে। আমার হয়েচে অন্তভক্ষ্য ধনুর্গুণ। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮ [২৪ আশ্বিন ১৩৩৫]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

[২৭] অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ "UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

প্রিয়বরেষু

বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

রথীরা এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই। কলম্বোতে ৩ নবেম্বরে জাহাজ আসিবে। দক্ষিণের রেলপথে যে দুর্য্যোগ তাহাতে অনেক ঘুরিয়া তবে দেশে পৌঁছিতে পারিবে। নবেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি তাহারা ঘরে ফিরিতে পাইবে।

আমি চুপচাপ ঘরে পড়িয়া থাকি, চলাফেরা প্রায় বন্ধ। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। ইতি শুক্লা ত্রয়োদশী [১০] কার্ত্তিক ১৩৩৫

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

৫ জানুয়ারি ১৯২৯

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal

প্রীতিনমস্কার

বিলাতী নববর্ষদিনের শুভকামনানিবেদন গ্রহণ করবেন।

শান্তিনিকেতনের কাজের ভার আবার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেচি। শরীরে শক্তিলাঘব ঘটেচে তাই বলে কর্ম্মের দায়িত্ব-লাঘব করা চল্‌বে না। যতদিন আয়ু আছে ততদিন লগি ঠেলতে হবে, কর্ণধার ছুটি মঞ্জুর করচেন না।

রথী ফিরে এসে কাজে লেগে গেছে। শ্রীনিকেতনের ভার সম্পূর্ণ তার উপরে। খুবই ব্যস্ত হয়ে আছে। আজকাল নিত্যকর্ম্মের মধ্যে নৈমিত্তিক উপদ্রব হচ্চে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো। এক একদিন বিশ পঁচিশ জন লোক এসে সাইক্লোনের মত আশ্রমময় পাক খেয়ে বেড়ান কাজ করা দায় হয়। লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করি— তাঁরা চেষ্টা করেন টেনে বের করতে। জয় হয় তাঁদেরই। ইতি ৫ই জানুয়ারি ১৯২৯ [২১ পৌষ ১৩৩৫]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১

১৫ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ　　　　　শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করবেন এবং ছেলেমেয়েদের আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে দেবেন। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

ওঁ　　　　　শান্তিনিকেতন

প্রীতিভাজনেষু

নাগপুর দিয়ে আসা সম্ভব হল না। বিলিতি ডাকগাড়ি অনুসরণ করে চলে আসা গেল। অন্য কোনো উপলক্ষ্যে নিশ্চয় দেখা হবে। রথী অনেকটা সুস্থ হয়েচে, তবু যথেষ্ট সাবধানে থাকা আবশ্যক। আমার শরীরের অবস্থা বয়সেরই উপযোগী— পঞ্জিকা সংশোধন করতে না পারলে তার সংশোধন অসম্ভব। এখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত স্থাবর অবস্থায় দিনযাপন করতে হবে। ইতি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ [২০ মাঘ ১৩৩৭]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ ডিসেম্বর ১৯০১

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কার

ভুল বুঝেচেন— আগেকার সঙ্গে একমাত্র প্রভেদ এই যে আগে অবকাশের টানাটানি ছিল না। এখন কর্ম্মজালে চিন্তাজালে জড়িত হয়ে পড়েচি— উদ্বেগও যথেষ্ট। মনোযোগের শৈথিল্য যদি লক্ষ্য করে থাকেন তার এই কারণ। ছুটি পাবার জন্য সর্ব্বদা মন উৎসুক হয়ে আছে— গুরুভারাক্রান্ত সময়ের বোঝা বয়ে ক্লান্ত হয়ে আছি। ইতি ৩ পৌষ ১৩০৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

৮ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার

অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে গিয়েছিলুম বোটে, ডাকঘর-বিবর্জ্জিত জলপথে। সেখান থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছি স্বভবনের শয্যাতলে।

কিছুকাল থেকে নিজে চিঠিপত্র খুলি নে জবাব যায় পরের হাত দিয়ে। এ যুগে বানপ্রস্থের সুযোগ নেই সেই জন্যেই ঘরের মধ্যেই নৈষ্কর্ম্যের বেড়া তুলতে হয়— সত্তর বছরের পরে

কর্ত্তব্য অপালন করার অধিকার দাবী করা যেতে পারে। কিন্তু কমলি নেই ছোড়তি— বিছানা থেকে মুক্তি পেলেই উঠ্‌তে হবে রেলগাড়িতে— সেটা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য তাগিদে। যে দায় ঘাড়ে পড়েছে তাকে বহন করতে হবে যতদিন না শ্মশানপথে আমি শেষ বহনীয় হই। স্টেট্‌সম্যানে যে সংবাদ পেয়েছেন সেটা আমার স্বাস্থ্যলাভের সংবাদ নয় সেটাতে আমার দুর্গ্রহের তাড়না সূচনা করচে।

কাজ শেষ পর্য্যন্তই করতে হবে, তবু চেষ্টা করি ক্ষীয়মাণ শক্তি যতটা বাঁচাতে পারি। চিঠি পেলেই উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বাভ্যাস আজও আছে সেইজন্যে চিঠি যাতে না পাই সেই ব্যবস্থা করা হয়েচে— তাতে নিন্দা পাবার আশঙ্কা আছে— কিন্তু নিন্দাবাক্য লিপিবদ্ধ আকারে যাতে আমার কাছে না এসে পৌঁছয় পরিজনবর্গ সেরকম সতর্কতা অবলম্বন করেচেন। অর্থাৎ বেঁচে থেকে মৃত্যুর যতগুলি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা করা যাচ্চে। কিন্তু বেড়ার মধ্যে ফাঁক আছে এত যে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক মনে আরাম কেদারায় চুপচাপ থাকা অসম্ভব। এই কারণে খবরের কাগজে আমার উদ্যমশীলতার যে সকল সংবাদ পাবেন সময়োচিত তার ব্যাখ্যা করে নেবেন। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯৩৩ [২২ কার্তিক ১৩৪০]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫

১০ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

পত্রবিভাগের সচিব এখন ছুটিতে। আপনার চিঠিখানি অবাধে আমার হাতে এসে পৌঁচেছে।

জরাসুর ক্রমশই আমার দেহে তার অধিকার বিস্তার করচে। ম্যাণ্ডেটের অবস্থা পেরিয়ে এখন রীতিমত অক্যুপেশনের চেহারা দেখা দিচ্চে। মস্তিষ্ক রাজধানীটার পরে এখনো বোমা পড়েনি, কিন্তু মেরুদণ্ডটাকে কাবু করেছে, হৃদ্‌যন্ত্রটাও হার মানবার অবস্থায়। সর্ব্বাঙ্গে এই পরাভব বহন করে চুপচাপ করে থাকি, কাজকর্ম্মের দিকে মন নেই, লেখনী চালনাকে উজানে লগি ঠেলার মতো লাগে।

বিজয়ার অভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫ [২৩ আশ্বিন ১৩৪২]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে সেই কারণে চিঠিপত্র লেখা এবং পড়া আমার পক্ষে কষ্টকর ও ক্ষতিকর।

বাংলা দেশের দুর্গতির লক্ষণ প্রতিদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে, এর কারণ আমাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা। নেতা এবং নীত সকলেরই প্রকৃতিগত বিষের ক্রিয়া দেশের জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করেছে। মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয় কিছু বলবার চেষ্টা করি, জানি তা ব্যর্থ। আমার দায়িত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এখন আমি কোনো পক্ষকে বিচার করতে চাই না এবং বিচার করতে আমি অক্ষম। আমার এই শেষ কয়দিন আমার আপন কর্মক্ষেত্রের একপ্রান্তে বসে শান্তিতে যাপন করতে ইচ্ছে করি। ভালো মন্দের দণ্ড পুরস্কার যাঁর হাতে তিনিই তার বিধান করবেন। আমি বিদায় নিলুম। ইতি ১০।৯।৩৮ [২৪ ভাদ্র ১৩৪৫]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭

১৮ এপ্রিল ১৯৩৯

ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

প্রীতিনমস্কার

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানবেন।

আমি কেবলমাত্র কবি, তার চেয়ে বেশি কিছুই নই। দেশকে নতুন করে গড়বার শক্তি যদি আমার থাকত তাহলে স্বতই এতদিনে তার পরিচয় পেতেন। যে কাজ পারি তা সাধ্যমতো করেছি, যা পারি নে তা যদি করতে যেতুম তাহলে অঘটন ঘটাতুম। অহঙ্কারের তাড়নায় নিজের সহজ সীমা লঙ্ঘনের চেষ্টায় পৃথিবীতে বিস্তর দুষ্কর্ম্মের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এই বয়সে আমার উপর সেই দুর্গতির ভার চাপাতে চান কেন? অকৃতিত্বের অপবাদ সইতে রাজি আছি কিন্তু নির্বুদ্ধিতার নয়। আপনার চিঠিতে একথাও লিখেছেন ঘোরা ফেরা ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখি নে কেন— অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করি তাও আপনার মনঃপূত নয়। সখ করে কাজ করিনে, দায়িত্ব অন্তরে এসে চেপে ব'সে চালনা করে, সে দায়িত্বের ক্ষেত্র ক্ষমতার সীমানার মধ্যেই। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

২০ ? জুন ১৯৩৯

মংপু দার্জ্জিলিং

প্রীতিভাজনেষু

ক্লান্ত শরীর নিয়ে এই পাহাড়ে এসেছি।

গীতা সম্বন্ধে আপনার বইখানি পেলুম। এর ভাষা সরল এবং এতে চিন্তার বিষয় যথেষ্ট আছে। ইতি ২০[?]।৬।৩৯ [৫ ? আষাঢ় ১৩৪৬]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

[শান্তিনিকেতন]

শ্রীমান করুণা কিরণের কর্ম্মপথ যাত্রা সর্বতোভাবে নির্বিঘ্ন ও জয়যুক্ত হউক এই আমার সর্বান্তঃকরণের কামনা। ইতি ৪. ৯. ৩৯ [১৮ ভাদ্র ১৩৪৬]

আশীর্বাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

২৮ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ　　　　　　　　　　মংপু

প্রীতিনমস্কার

বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

কিছুদিন পাহাড়ে কাটানো গেল— ফেরবার সময় হয়েছে। জীর্ণ শরীর সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য নয়। ইতি ২৮।১০।৩৯ [১১ কার্তিক ১৩৪৬]

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০১

১২ নভেম্বর ১৯৩৯

ওঁ　　　　　　"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

প্রীতিনমস্কার

শরীর আমার অকর্মণ্য তাতে সন্দেহ নেই। য়ুরোপে থাকতে দেহচালনা করতে ডাক্তারেরা আমাকে বারবার নিষেধ করেছে। আমাদের দেশে তাদের নিষেধের দোহাই কেউ মানতে চায় না। তাই দেহের প্রতি পীড়ন বেড়ে চলেছে। যাঁরা দয়া করে ক্ষমা করেন তাঁদের নমস্কার করি। যাঁরা করেন না তাঁদের কাছে আমার স্বাস্থ্যকে আমি বলি দিয়ে আসচি। অনেক সময় এমন দুর্নিবার কারণ ঘটে যে আমার কাজের

খাতিরেই অনুরোধ কাটিয়ে উঠতে পারি নে। এই কথাই বারবার মনে হয়, দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ বিপত্তি— কারণ শক্তি কমতে থাকে দাবী বাড়তে থাকে— অক্ষমতাবশত অনেককে দুঃখ দিতে হয় এমন দায়গ্রস্ত জীর্ণজীবন বহন করে লাভ কী। ইতি ১২।১১।৩৯ [২৬ কার্তিক ১৩৪৬]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

১৪ জুন ১৯৪০

ওঁ Gouripur Lodge
Kalimpong

প্রিয়বরেষু

দীর্ঘকাল রোগে ভুগেছিলেন খবর পাই নি সেরে উঠেছেন শুনে খুশি হলুম। আজকাল চারিদিকেই দুঃসংবাদ, দুর্ঘটনা ঘটচে পদে পদে। মনটা খারাপ হয়ে থাকে। দূরে নিকটে এই বিনাশের আবর্তে আমি যে কেমন করে আজও টিঁকে আছি তাই ভাবি শরীর মন যেন আলগা বৃন্তে সদ্যঃপাতী হয়ে আছে।

আপনি আমার অন্তরের শুভকামনা গ্রহণ করুন। ইতি ১৪।৬।৪০ [৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৩

১৮ জানুয়ারি ১৯৪১

ওঁ

শ্রীমান করুণাকিরণের শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আমার কামনা এই যে, দম্পতির সম্মিলিত জীবন এই নূতন সংসার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত তাহার বেদীতলে কল্যাণের ধ্রুব প্রতিষ্ঠা হোক। নরনারীর অকৃত্রিম প্রেমের উৎসে বিধাতার আশীর্বাদ স্বত উৎসারিত হয়, নবদম্পতির চিত্তে সেই উৎসধারা অবাধ হউক অক্ষয় হউক পুণ্য অনুষ্ঠানে এই আমার আশীর্বাদ দূর হইতে প্রেরণ করিতেছি। [৫ মাঘ ১৩৪৭]

শান্তিনিকেতন
শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮. ১. ৪১

শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবীকে লিখিত

শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

১

২৭ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয় কিরণ

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১০ কার্ত্তিক ১৩৩৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ এই সংবাদে আনন্দিত হলুম। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবীকে লিখিত

১

২০ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৩ কার্ত্তিক ১৩৩৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

১

[নভেম্বর ১৯০২]

কল্যাণীয়েষু

১১০ টাকা পাঠাইলাম। ইহার মধ্যে ১০০ টাকা বিদ্যালয়ের, দশ টাকা পাথেয় খরচ। যদি পথ-খরচ আরো বেশি লাগে তবে ১০০ টাকা হইতে আপাতত লইয়া পরে আমাকে লিখিলে পূরণ করিয়া পাঠাইব।

মিস্ত্রিকে বেতন চুকাইয়া ছাড়াইয়া দিবে।

শমীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়ো। উহার আহারাদির সময় তোমরা একজন কেহ উপস্থিত থাকিলেই শরীরের অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিবে। যেদিন ক্ষুধা নাই বলিয়া খাইবে না সেইদিন সাবধান হইবে। বিদ্যালয় হইতে বাড়িতে যাতায়াতের সময় অথবা খেলার সময় অধিকক্ষণ রৌদ্র যেন না লাগায়। উমাচরণকে কাছাকাছি সর্বদা হাজির রাখিবে। দাস্ত কোন্ দিন হইল না বা পেটের অসুখ করিল উমাচরণ যেন তোমাদের খবর দেয়। জ্বরের ভাব আরম্ভ হইবামাত্র Aconite 30° অথবা Belladonna 30° দিবে— পেটের গোলমালের সূত্রপাতেই Nux 30° দিবে। কুঠিবাড়িতে দোতলাতেই রথীর সঙ্গে শমী শুইবে— তুমিও যদি সেখানে শুইতে পার ত ভাল হয়।

চাবি তোমাকে দেওয়া যাইতেছে। যখন যে জিনিষ দরকার— যথা চা জ্যাম বিস্কুট— তুমি বাহির করিয়া লইয়া

চাবি নিজের কাছেই রাখিবে। উমাচরণকে কিছুতেই চাবি দিয়ো না কারণ উহাকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।

তোমাদের জন্য নূতন গুড়ের সন্দেশ দেওয়া গেল— সকল ছাত্র এবং অধ্যাপকেরাই যেন ভোগ করেন।

রথীর গায়ে দিবার জন্য একজোড়া মোটা সিল্কের চাদর দিলাম— অল্প শীতের সময় একটা, এবং বেশি শীতের সময় এক জোড়া পরিলে বোধ করি বেশ কাজ চলিয়া যাইবে।

যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে মনোরঞ্জনবাবুকে সমস্ত বলিয়ো। কুঞ্জবাবু সম্বন্ধে কোনপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার তোমরা মনে রাখিয়ো না— উপযুক্ত লোক পাওয়া বড় কঠিন। ঔষধের বাক্স ও বইগুলি যেন অন্তর্হিত হইয়া না যায়। বই অনেকগুলি এখানে আনিয়াছি বাকিগুলি সম্ভবত অধিকাংশ ডাক্তারের নিজের— কিন্তু ঔষধগুলির অধিকাংশ শান্তিনিকেতন আশ্রমের।

Religious Systems এবং Origin of Aryans বই দুখানি পাঠাইলাম— লাইব্রেরিতে রাখাইয়ো। লাইব্রেরি ঝাড়িয়া তাহার মধ্যে নূতন করিয়া ন্যাপ্‌থালিন দিবে। বইগুলি ও পুঁথিগুলি এক একবার রৌদ্রে দিবে।

তাঁত শীঘ্র সম্পূর্ণ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে। যত শীঘ্র পারি আমি ছাপার বন্দোবস্ত পাঠাইব। History Readers মনোরঞ্জনবাবু যদি লিখেন ত ভাল হয়। ইতি
[অগ্রহায়ণ ১৩০৯]

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২

২৫ জুলাই ১৯০৩

ওঁ [আলমোড়া]

কল্যাণীয়েষু,

আসন্ন ঝড়ের মুখেই তুমি বিদ্যালয়কে ছাড়িয়া আসিয়াছিলে। ইতিমধ্যে তাহার উপর দিয়া বিপ্লব চলিয়া গেছে। আমি সুদূরে রোগতাপের মধ্যে কেবল চিঠি ও টেলিগ্রামযোগে এই সঙ্কটের সময়টাকে এক রকমে উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। অন্তত এই সময়ে যদি তুমি থাকিতে তবে আমাকে এত বেশি হাঙ্গাম করিতে হইত না। অনুপস্থিতি যখন অনিবার্য সেই সময়ে এই সমস্ত পরিবর্তন করা যে আমার পক্ষে কিরূপ সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না।—রঙ্গমঞ্চ যেখানে, নেপথ্য তাহা হইতে যদি হাজার মাইল দূরে থাকে তবে অভিনয় ব্যাপারের দশা যেরকম হয় বিদ্যালয়ের সেই দশা হইয়াছিল। ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ কালে কালে বহুতর বিঘ্ন কাটাইয়াই চলিতে হইবে—শুভানুষ্ঠানের নিয়মই এই— নতুবা সে বল, বেগ ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। ইহা দেখিয়াছি, বিপ্লবে যতটা ক্ষতি হয়, লাভ তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। যাহা হউক এইরূপ আঘাত-পরম্পরায় বিদ্যালয় ক্রমশই প্রসারতা ও পরিণতি লাভ করিতেছে— আমারও ভরসা ক্রমে বাড়িতেছে—বন্ধুরাও ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছেন এবং সেই সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে যখন ইহাকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে

না। ইহার শৈশবে মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দ ও তুমি ইহাকে লালন করিয়াছ, এখন কৈশোরে তোমাদের মধ্যে একা জগদানন্দ অবশিষ্ট আছেন— ইহার বলশালী তেজোময় যৌবন আসন্নপ্রায়, যদি ধৈর্যের সহিত এখন তুমি ইহার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিতে তবে গৌরব লাভ করিতে সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয় বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসের একটি অঙ্গ হইবে ইহা মনে করিয়ো— যাঁহারা ইহাতে জীবন-সমর্পণ করিবেন তাঁহাদের জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু বিধাতার রণক্ষেত্রে অনেক লোকেই আহত হয়, সকলেই টিঁকিয়া থাকে না।

রাণীর রক্ত ওঠা থামিয়া গেছে— কিন্তু তাহার শরীর ভাল নাই। পেটের অসুখ চলিতেছে— দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আমার মনে কোন আশা নাই।— জন্মমৃত্যুর উপরে যাঁহার মঙ্গলচ্ছায়া সমানভাবেই পড়ে সেই বিধাতার হস্তে আমি রেণুকাকে সমর্পণ করিয়াছি।

অনেকদিন পরে সম্প্রতি এখানে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বাদলার উপদ্রব অন্যান্য পাহাড়ের মত অত্যধিক নহে।

সত্যেন্দ্র পর্শু এখানে আসিয়াছে। হেমবাবু [হেমচন্দ্র মল্লিক] আমার প্রতিবেশী— তাঁহার নিকট হইতে অনেক সহায়তা পাইয়া থাকি। ইতি ৯ই শ্রাবণ, ১৩১০

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৩০ নভেম্বর ১৯০৩

ওঁ [কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু,

কই— সেই ইংরাজী রীডার কপি করিয়া পাঠাইলে না? আমি ত কাল যাত্রা করিতেছি। ইতিমধ্যে পাঠাইলে ছাপার বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম। মোহিতবাবুকে বলিয়া গেলাম— তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি প্রেসে দিয়া দেখিয়া শুনিয়া ছাপাইবেন। বিলম্ব করিয়ো না।

রথীর জন্মদিনের উৎসব আশা করি নির্ব্বিঘ্নে ও আনন্দে সম্পন্ন হইয়াছে। মনোরঞ্জনবাবুরা আসিয়াছিলেন কি?

রাজেন্দ্রবাবুর জন্য উদ্বিগ্ন আছি। এদিকে ভবেন্দ্রবাবুও অনুপস্থিত— পদে পদে পাঠের বিঘ্ন ঘটিতেছে। যখন কোন অধ্যাপক ছুটি লইবেন তখন তাঁহার ক্লাসের ছেলেরা নিজে পড়ার ব্যবস্থা যাহাতে করে এরূপ নিয়ম করিয়ো। ছাত্রগণ ঘরে সময় পায় না বলিয়া তোমরা আক্ষেপ কর, অতএব কোন অধ্যাপক অনুপস্থিত হইলে যে সময় হাতে পাওয়া যাইবে সেই সময়টিকে তোমাদের মনের মত কাজে লাগাইয়া লইয়ো— যেন এলোমেলো ভাবে সময় না কাটায়।

ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক মঙ্গলভাব রক্ষা করিয়ো। তাহাদিগকে সন্তানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ধৈর্য্যের সহিত নিয়ত তাহাদের হিতসাধন করিবে এই আমি সর্ব্বদা কামনা করিতেছি।

মাঝে মাঝে দীনু ও সন্তোষকে অধ্যাপনা সম্বন্ধে পরামর্শ

দিতে ভুলিয়ো না। ছেলেদের ধর্ম্মভাব যাহাতে সজীব থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়। নূতন দুটি-একটি ছেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

নগেন্দ্রবাবুকে বলিয়ো ভবেন্দ্রবাবুকে যখন একেবারেই বিদায় দেওয়া যাইতেছে তখন যেকয়দিন তিনি আইন পড়ার উপলক্ষ্যে কামাই করিয়াছেন সে কয়দিনের বেতন কাটিবার প্রয়োজন নাই।

ঈশ্বর তোমাদের সকলের কুশল করুন। ইতি সোমবার
[১৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০]

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৪

১৭ আগষ্ট ? ১৯০৫

ওঁ [কলিকাতা]

সুবোধ—

কলকাতায় এসে মহারাজের টেলিগ্রাফ পাওয়া গেল যে তিনি মঙ্গলবারে ছাড়বেন। মঙ্গলবারে টেলিগ্রাম পেলুম যে সেদিন তিনি আস্‌বেন না— আমি বিরক্ত হয়ে ঠিক করলুম বুধবার রাত্রেই আমি গিরিডি যাব। বুধবারে টেলিগ্রাম পেলুম— am indisposed, shall start after three days, will you kindly wait? কাজেই উত্তর দিতে হল যে, shall wait। ইতোমধ্যে পার্টিশনের [ব্যা]পারে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে প্রত্যহই দলবেদলের লোক আস্‌চে, তারা ধরেছে এই সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে

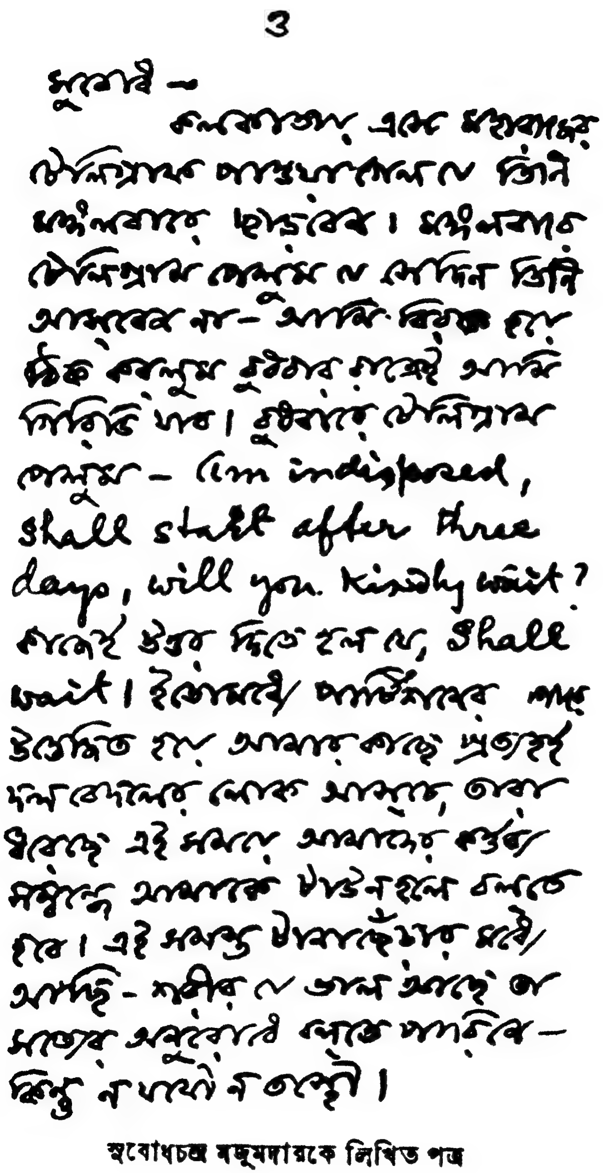

ও

সুবোধ —

কলকাতায় এসে মহারাজের টেলিগ্রাম পাওয়া গেল যে তিনি মঙ্গলবারে ছাড়বেন। মঙ্গলবারে টেলিগ্রাম পেলুম যে সেদিন তিনি আসবেন না — আমি বিরক্ত হয়ে ঠিক করলুম বুধবার সকালেই আমি শিলিগুড়ি যাব। বুধবারে টেলিগ্রাম পেলুম — I am indisposed, shall start after three days, will you kindly wait? কাজেই উত্তর দিতে হল যে, Shall wait। ইতোমধ্যে পার্টিশানের শোকে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে প্রত্যহই দল বেঁধে লোক আসচে, তারা ধরেছে এই সময়ে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে টাউনহলে বলতে হবে। এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে আছি — শরীর যে ভাল আছে তা হাতের অক্ষরেই বুঝতে পারবে — কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ।

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র

আমাকে টাউন হলে বল্‌তে হবে। এই সমস্ত টানাছেঁড়ার মধ্যে আছি— শরীর যে ভাল আছে তা সত্যের অনুরোধে বল্‌তে পারিনে— কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ।

তোমাদের খবর কি? শমী মীরার পড়া কি রকম চল্‌চে? বৌঠাকরুণকে বলে দিয়ো মীরাকে তিনি যেন তাঁর ঘরকরনার সঙ্গিনী করে রাখেন— চাই কি ওকে দিয়ে তিনি তাঁর হিসেব রাখাতে পারেন। এ ছাড়া মিষ্টান্ন তৈরির ব্যাপারে যদি তাকে সহকারীরূপে দীক্ষিত করে রাখেন তবে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কাজে লাগ্‌বে এবং তোমাদেরও মধ্যে মধ্যে গুরুদক্ষিণা মিল্‌তে পারে।

ইস্কুলের ছেলেরা কি করচে? পালিত কি ভাবে চল্‌চে? সর্ব্বেশের সঙ্গে তার কি বাগ্‌যুদ্ধ হয়? কিছু পড়াশুনো করচে ত? অরুণ দেবল কি রকম দিন যাপন করচে?

রথী সন্তোষদের পড়া চলে? সেই জর্ম্মান বন্ধুর কাছে জর্ম্মান শিক্ষার চেষ্টা করচে কি? সেটা এই সুযোগে কতকটা অগ্রসর হলে ভাল হয়।

পিসিমার খবর কি? তাঁর কি রকম লাগ্‌চে? শালবনে খুব ঘুরে বেড়াচ্চেন? বেড়াতে না পারলে তাঁর মন টিঁকবে না? তাঁর শরীর কি রকম আছে?

সেই জমি নেবার কথা তোমার ন দাদাকে বলেছ ত?

আজ এই সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিষের রসিদ পাঠাই।

শমীর ধুতি ৪ জোড়া—

তোয়ালে ছোট বড় ৯ জোড়া

কাঁসার থালা— ৬ খানা
কাঁসার বাটি— ১৮
কাপড় ঝোলানো র‍্যাক্— ৮টা
দিশি ছাতা— ৬টা
মুগের ডাল— ১০ সের
টার্কিশবাথসোপ, একবাক্স।

ইতি বৃহস্পতিবার [১ ভাদ্র ? ১৩১২]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[২৫] অক্টোবর ১৯০৫

ওঁ [কলিকাতা]

সুবোধ,

তোমার ৭৬৲ টাকা বাদে ৩০০৲ টাকা পাঠাচ্ছি। পিসিমাকে বোলো যে, আমার তহবিল একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। এই টাকাতেই যেমন করে হোক কার্ত্তিক মাস না চালালে আমি বিপদে পড়ব। আমার হাতে ঠিক ২৫ টাকা আছে তাতেই আমার কলকাতার খরচ চালাতে হবে। আজ মাসের ৮ই, আজই যদি আমার এই অবস্থা, তবে আগামী মাসে আমাকে দেনা দিয়ে মাস সুরু করতে হবে— এ রকম আর কতদিন চলবে? তোমরা এখানে না এলে তোমাদের যেদিন ইচ্ছা বোলপুরে যেয়ো।

সুরেনের একটি পুত্রলাভ হয়েছে— আজ তাকে দেখতে

যেতে হবে। পিসিমা বোধহয় এতক্ষণে খবর পেয়ে থাকবেন।

আসবার সময় তাড়াতাড়িতে বৌঠাকরুণের কাছে বিদায় নেওয়া হল না, সে জন্যে মনটা অনুতপ্ত আছে। বিদায় নিতে গেলে গাড়িও পেতুম না— আমরা একেবারে ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলুম।

তোমরা বোলপুর বিদ্যালয় খোলবার বরঞ্চ দুই-এক দিন আগে গেলেই ভাল করবে। সেখানে সত্যেন্দ্র আছেন। অক্ষয়ের শরীর কি রকম? আজই ডাকে ভাই-কোঁটার বস্ত্রাদি গেল— আর কিছুক্ষণ পরেই পাবে বোধহয়।

শ্রীশবাবুকে বোলো গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে লাইনের কাছে অর্থাৎ স্টেশন থেকে ৪।৫ মাইলের মধ্যে যত সম্ভব জমি— এক স্থানে বা ভিন্ন স্থানে— একটা মৌজা বা ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা যেন নিশ্চয়ই করেন— নইলে ভারি অসুবিধা হবে। আমার ইচ্ছা আছে মীরার জন্যে আমি ঐ অঞ্চলে ঐ রকমের একটা সম্পত্তি করে রাখি সেটাতে বাড়ি করে চাষবাস করে তাকে দেব— এই সংকল্পটা আমার মনে খুব লেগে গেছে, তোমরা এতে আমাকে সাহায্য কোরো। শরৎও একখণ্ড জমি ইচ্ছা করছেন— সে তিনি নিজের খরচেই করবেন। যাই হোক ও অঞ্চলে যতই জমি যেখান থেকে পাওয়া যায়— তার স্বত্ব কিছুমাত্র ভাল থাকলেই নেবার চেষ্টা করা যেন হয়। তোমার ন দাদাকে এ সম্বন্ধে খুব একটা তাগিদ দিয়ো। ইতি [৮]কার্তিক ১৩১২

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

কল্যাণীয়েষু,

তোমার বিপদের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইয়াছি। এই দুঃসময়ে তোমার যে পরিমাণ ছুটির প্রয়োজন তাহা অসঙ্কোচে লইয়ো। আমি মীরাকে এক ঘণ্টা ইংরেজি পড়াইবার জন্য মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিয়া দিয়াছি। তোমার স্ত্রীর অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি পীড়া বোধ করিতেছি। কালক্রমে ছাড়া তাঁহার সান্ত্বনার কি উপায় আছে তাহা ত জানি না। বোলপুরে পিসিমার কাছে গেলে যদি তাঁহার আরাম পাইবার সম্ভাবনা বোধ কর, তবে সেইখানেই লইয়া যাইবে। কারণ, আত্মীয়দের মধ্যে সর্ব্বদাই শোকের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়, হয়ত দূরে কতকটা শান্তি পাইতেও পারেন। সমীরের টীকা দেওয়া হইয়াছে? আশা করি তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটে নাই। আমি এখানে আর এক সপ্তাহের অধিক থাকিব না। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া কলিকাতাতেও বিলম্ব করিব না। রথীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি যাত্রা করিবে অতএব তাহাদের আর অধিক বিলম্ব নাই— ইতিমধ্যে যাত্রার আয়োজনস্বরূপ কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে হইবে। সন্তোষ যদি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে তবে তাহাকেও আনাইয়া লইতে হইবে। তুমি যে কয়দিন কলিকাতায় আছ যদি পার ত

ইংরেজি সোপানটাকে অগ্রসর করিয়া লইবে।

একবার প্রমথর সঙ্গে সেই বিবাহ প্রস্তাবটার পুনরালোচনা করিয়া দেখিয়ো। তিনি যখন বিলাতেই যাইতেছেন তখন আর ত জাতের ভয় রাখিলে চলিবে না— আমি তাঁহার লণ্ডনের খরচ যথাসম্ভব জোগাইব।— কেদার দাসগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিয়ো তিনি যে ছেলেটির কথা জানাইয়াছেন তাহার কি হইল— B. L. Chowdhury ইহার কথা বলিয়াছিলেন। যদি সুবিধা হয় তাহাকে দেখাইয়া লইয়ো। তোমার স্ত্রীকে ঈশ্বর সান্ত্বনা দান করুন এই আমি কামনা করি। ইতি ১৮ই মাঘ ১৩১২

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

---

১ জুন ১৯০

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালবেলায় মোহিতবাবু এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি গ্রীষ্মাবকাশের অবশিষ্ট কয়দিন বোলপুরে যাপন করেন। আমি সম্মতি দিয়েছি। আমি খুব সম্ভব আগামী বৃহস্পতিবারে যেতে পারব— কারণ বুধবারে আমার প্রবন্ধপাঠের কথা হচ্ছে— তাহলে মোহিতবাবু, তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যা আমার সঙ্গেই যাবেন এবং প্রায় দিন দশেক ওখানেই থাকবেন। যে ঘরে মীরা, পিসিমা আছেন সেইখানেই তাঁদের থাকবার

বন্দোবস্ত করতে হবে, আর ত কোথাও সুবিধা দেখ্‌চি নে— অতএব ঐ দিন দশের জন্যে মীরাদের ঘর ছাড়তে হবে।

নরেন ঠাকুর শুনচি যেদিন রাত্রের ট্রেনে যাবে বলে গেল সেদিন না গিয়ে তার পরদিন মেলট্রেনে গেছে। তার এই অপরাধ মার্জনা করবার যোগ্য নয়। সে রাত্রে নিশ্চয় যাবে বলেই আমি তোমাকে চিঠি বা টেলিগ্রাফ দিই নি— নরেনও যেতে পারেনি বলে আমাকে যদি খবর দিত তাহলেও আমি যথোচিত বিধান করতে পারতুম— এই কারণে উমাচরণকে দু দিন দুঃখভোগ করতে হল এবং আমাকে কালিগ্রামে যেতে দিলে না। নরেনকে জানিয়ো তার এই ব্যবহারে তার প্রতি আমার একান্ত ঘৃণা জন্মিয়েছে। বিপদে লোককে উদ্ধার করবার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে যে ব্যক্তি কুণ্ঠিত হয় সে আবার মানুষ! যে কয়দিন নরেন অনুপস্থিত ছিল সে কয়দিনের মাইনে তাকে যেন না দেওয়া হয়!

বেলা প্রজ্ঞার আমিষ আহারের বইটা (অর্থাৎ ২য় খণ্ড) চেয়ে পাঠিয়েছে, সেটা আমাদের লাইব্রেরিতে আছে— খোঁজ করে নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়ো এবং সেইসঙ্গে নতুন ম্যাগাজিন প্রভৃতি যা হাতে এসেছে পাঠিয়ো।

গরম কি রকম? প্রথম কয়দিন এখানে অসহ্য হয়েছিল কাল থেকে ঠাণ্ডা দেখা দিয়েছে।

স্কুলে তোমার কার্য্যভার সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রকে যে পত্র লিখেছি বোধ করি পেয়ে থাকবে। ঐ রকম ভাবে কাজ চালিয়ো।

মীরার পড়া বোধহয় যথানিয়মেই চল্‌চে। তার রান্নাটাও যাতে রোজ হতে থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

আমার বাসস্থানটি এতদিনে বোধহয় অনেকটা সমাপ্তির দিকে গেছে— কিন্তু আশা করি কোনো একদিন ঝড়ে তার খড় কুটো সমস্ত উড়িয়ে বাড়িটাকে নেড়া না করে দেয়। লোহার শিক দিয়ে এঁটে দেওয়াই ভাল। কুসুমতোকে আমার নাম করে বোলো যদি বাকি র‍্যাক্‌টা ইতিমধ্যে তৈরি করে দেয় ত আমি খুসি হই। মোহিতবাবু যাবার পূর্বে লাইব্রেরিটা বেশ সুসম্পূর্ণ করে রাখা চাই।

য়োকোহামায় সন্তোষরা পৌঁছে যে চিঠি ডাকে দিয়েছে সেটা পশু´ আমি পেয়েছি। তোমরা কি রথীর কোনো চিঠি পেয়েছ। চিঠিটা সন্তোষ জাহাজেই লিখেছিল সুতরাং বিশেষ নতুন কোনো খবর নেই। ৩০শে এপ্রিলে তারা য়োকোহামায় পৌঁচেছে। ইতি শুক্রবার ১৩১৩

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৮

৩ জুন ১৯০৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

যে রকম গতিক দেখা যাচ্চে আগামী শনিবারের পূর্ব্বে যে ছুটি পাব, সে আশা দেখচি নে। এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজি মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত আটক পড়েছে, কাজেই তার পরে

শুক্রবারে প্রবন্ধ পাঠ করে শনিবারে আমি খালাস পাব। উমাচরণকে তা হলে ৮ই পাঠাতে হবে। তাকে ৭ই বোলপুর পাঠাব—৮ই তুমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো নইলে সে ভয় পাচ্চে। ৭ই মেলে বোলপুরে যাবে—৮ই মেলে বর্দ্ধমানে গেলেই চলবে। কাকে তুমি কি চিঠি লিখতে বলেছ আমি ত কিছুই বুঝতে পারলুম না।

অরুণকে দীনেশবাবু এক সপ্তাহের মত চান—অরুণই শুনচি আসতে চেয়েছে। অতএব পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল—কিন্তু তাহলে তাকে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায় উপস্থিত হতে দেওয়া চলবে না। দেখচি কেবল উপেন আর সুজিতকে পরীক্ষায় পাঠান সঙ্গত হবে।

তারকবাবুরা আমাকে ধরেছেন যে আমাদের স্কুলের তিন মাস ছুটির সময় সানোসান যদি তাঁদের টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জুজুৎসু শেখান এবং তার পর থেকে হপ্তায় দুদিন করে এসে Exercise করিয়ে যান ত ভাল হয়। আমি জানি সানোসান ঐ সময়ে ছুটিতে পাহাড়ে যেতে ইচ্ছুক অতএব এ প্রস্তাবে তিনি বোধহয় সম্মত হবেন না। যা হোক্ তাঁর মত পেলে আমি পালিতকে জানাব।

এখানে বড়দিদি মেজবোঠান নদিদি প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে বল্‌চেন যে মীরা বেমানান্ মোটা হয়ে পড়েছে। সর্ব্বদা কাছে থাক্‌লে বোঝা যায় না কিন্তু এখানকার মেয়েরা সকলেই বড় আপত্তি করচেন। শুনে আমার মনটা উদ্বিগ্ন হয়েছে। নদিদি আমাকে বিশেষ করে বলচেন ওকে স্যাণ্ডাউয়ের

Exercise করাতে। অর্থাৎ কেবল হাত পা নেড়ে যে Exercise করতে হয়। কিন্তু তোমরা কেউ বোধহয় তার নিয়ম জান না। অতএব ইতিমধ্যে দু বেলা ওকে দ্রুতপদে খুব খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে আসা চাই— এটা যাতে হয় সে তোমাকে দেখ্‌তে হবে। ও সকালে বিকালে যে দুধ খায় তার পরিবর্ত্তে ওর চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবে। বিপিনের হাতের তৈরী কড়া চা যেন না হয়। আমি যা বল্লুম সেটা যাতে পালন হয় তা করতেই হবে। ওর পড়া এবং রান্না চল্‌চে ত ?

বেলাকে আমিষ রান্নার বই পাঠিয়েছ ত ?

সানোদের জন্যে সুটকে মাছ কাঁকড়ি এবং পেঁয়াজ পাঠান হয়েছে— পেয়েছে কি না এবং পছন্দ হয়েছে কি না খবর দিয়ো।

তোমাদের আম পাঠাতে হবে কি না অর্থাৎ বোলপুরে আম পাওয়া যাচ্চে কি না জানিয়ো। আমের ভারি দুর্গতি। কোনো আমই মুখে দেবার জো নেই।

কাল রাত্রে এখানে বৃষ্টি হয়ে এখনো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমাদের আকাশের অবস্থা কি রকম ?

ইংরেজী সোপানের দ্বিতীয় খণ্ড ত পেয়েছ! অনেকগুলো ছাপার ভুল দেখলুম। এই খণ্ডটি একদিন অন্তর সত্যরঞ্জন নরেন খাঁদের ক্লাসে পড়ালে হয়। ইতি ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

সানোসানোর বাংলা চলচে ? কুসুমতো কি করচে ? তোমার

নূতন ছাত্রীদের পড়া এগচ্চে ?

সত্বর এ পত্রের উত্তর পেলে উমাচরণ সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করা যাবে।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৯

৪ জুন ১৯০৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমরা সমস্ত ভুল বুঝিয়াছ। আমি বলিয়াছি এক একটা ক্লাস তুমি সাত দিন করিয়া পড়াইবে— অর্থাৎ প্রথমে সত্যর ক্লাস এক সপ্তাহ পড়ানো হইল— তাহার পরের সপ্তাহ অক্ষয়ের ক্লাস পড়াইলে— তাহার পরে জ্ঞানবাবুর, তাহার পর অজিত— তাহার পরে কয়েক দিন History Geography— তাহার পরে আবার সত্যর ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া আবার পড়াইয়া চলিবে।— ইহাতে স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তোমার কিছুই জানিতে বাকী থাকিবে না। ইহাতে প্রতিদিন তোমাকে এক ঘন্টার বেশী পড়াইতে হইবে না।

মোহিতবাবুরা যদি যান ত শান্তিনিকেতনেই থাকিবেন। অরুর মেয়ের বিয়ে যদি বোলপুরে ১লা আষাঢ়েই স্থির হইয়া যায় তাহা হইলে মোহিতবাবুকে লইয়া যাইব না।

বিদ্যালয়ের যে সকল বই এদিকে ওদিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া লাইব্রেরিতেই

গুছাইয়া রাখিবে। মাঝের ঘরে যে আলমারিটা খালি আছে সেইটাতেই রাখিতে পার।

মীরাকে বলিও সে যেন প্রত্যহ ব্যায়ামচর্চা করে। তাহার দিদিকে আমি শিলাইদহে রোজ ডাম্বেল মুগুর ডন অভ্যাস করাইয়া দুইবেলা ছাতে দ্রুতপদে পায়চারি করাইয়া অতিরিক্ত মোটা হওয়ার মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। মীরাকেও এখন হইতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। নহিলে ভবিষ্যতে যখন প্রতিকারের উপায় থাকিবে না তখন কেবলি অনুতাপ করিতে হইবে।

মীরার Sohrab Rustam পড়া শেষ হইলে তাহাকে টেনিসনের Enoch Arden পড়াইতে শুরু করিয়ো। ইতি
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১০
[১১ ? ডিসেম্বর ১৯০৬]

ওঁ

সুবোধ,

আজ কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁছিলাম। দুই-একদিন এখানে থেকে শিলাইদহে যাব। কাওয়াগুচির সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি বিশেষ অনুনয় সহকারে Goldstucker's পাণিনিখানা পড়তে চাইলেন, বারবার বললেন আমি কোন মতেই হারাব না। আমিও ওঁকে সে বইখানি দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি—

অতএব Babu Surendranath Tagore, 19 Store Road, Ballygunge, Calcutta ঠিকানায় উক্ত বই ভালরকম মোড়াই করে রেজেস্ট্রী ডাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

ইংরেজি সোপান যেন আবার তোমার জন্য দেরী না হয়— তাগিদ রেখো— তোমার অবশিষ্ট অংশ লেখা শেষ কোরো।

ইস্কুলের খবর কি? ভূপেনবাবু চলে যাওয়াতে আশা করি বিশেষ মুস্কিল ঘটবে না! সত্যর খবর কি?

লাইব্রেরির র‍্যাকগুলো এই বেলা তৈরি করিয়ে নিয়ো— কুসুমাতুকে আমার নাম করে বোলো। আমার প্রাসাদ কতদূর এগোলো? ইতি মঙ্গলবার [২৫ ? অগ্রহায়ণ ১৩১৩]

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১১

২৭ মার্চ ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু,

মহারাজের স্টেটে তুমি কর্মে প্রবেশ করিয়াছ শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। সেখানে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া তোমার শক্তির পরিচয় দিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে থাক এই আমি কামনা করিতেছি। আশা করিতেছি এই উপলক্ষে তোমার সমস্ত চেষ্টা উদ্বোধিত হইয়া তোমার জীবন সম্পূর্ণতর হইবে। তোমার এখানকার দেনা পাওনা সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিব।

আমি এখানকার গ্রাম্যসমাজ স্থাপনার চেষ্টায় এখনো আবদ্ধ আছি। ভূপেশের সহযোগিতা করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে একজন উৎসাহী যুবক পাওয়া গিয়াছে। আশা হইতেছে এ কাজ সফল হইয়া উঠিবে। আর একটি যুবককে পূর্ববঙ্গে সমাজ গঠনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি— সে ছেলেটিও ভাল— তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাইব মনে করিতেছি।

বোটে আমরা ভালই আছি। গরম পড়িয়া আসিয়াছে। বৃষ্টির প্রত্যাশায় আছি— মেঘ করিয়া আছে কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া উদ্বিগ্ন আছি। বৃষ্টি অভাবে কেবল আবাদের নহে, স্বাস্থ্যেরও অপকার ঘটিতেছে।

আমেরিকার পত্র নিয়মিত পাওয়া যাইতেছে। সেখানকার সংবাদ ভালই। রথী সন্তোষের পড়াশুনা যথোচিত অগ্রসর হইতেছে। সন্তোষ যদি অশ্বপালন ও চিকিৎসা শিখিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে বোধ করি তোমাদের মহারাজের অধীনেও তাহার উপযুক্ত কাজ জুটিতে পারে। তুমি তাহাদিগকে পত্র লিখিয়ো— তোমার দুঃসংবাদে তাহারা ব্যথিত আছে।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ১৪ই চৈত্র ১৩১৪

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১২

২৭ জুলাই ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

আমার কি আর টানাটানি সয়? নড়াতে গেলেই আমার আয়ুসুদ্ধ নড়ে ওঠে। এই ত শরীরের অবস্থা। তারপরে আজকাল বিদ্যালয়ের এত কাজে আমাকে নিযুক্ত থাকতে হয় যে অল্পকালের জন্যেও ছুটি পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

তারকবাবুকে দীর্ঘকাল দেখিনি বটে কিন্তু তাঁকে ভুলে গেছি এমন আশঙ্কা করবার কারণ নেই।

যদি শাখাপরিষৎ স্থাপন করবার উদ্যোগ কর তাহলে নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে দুই একজন কৃষ্ণবিষ্ণুকে টেনে আন্‌তে পারবে। ত্রিবেদী আছেন, ব্যোমকেশ আছে, হীরেন্দ্রবাবুকেও পাওয়া বোধহয় অসম্ভব নয়— এঁরা সকলেই আসর জমিয়ে তুলতে পারবেন। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্যপরিষৎ স্থাপন করা যে অত্যন্ত কল্যাণকর এ সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই— অতএব দূর হতে টেলিপ্যাথিক সহানুভূতির দ্বারা যদি তোমাদের সভার কোনো উপকার হয় তবে সে সম্বন্ধে কৃপণতা করব না।

পিসিমা রাঁচি গেছেন— সেখানে তাঁর শরীর ভালই আছে। ইতি ১১ই শ্রাবণ ১৩১৭

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৩

২৯ জুলাই ১৯১১

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

আমি নানা জালে জড়িয়ে আছি সেইজন্যে যখনই একটু অবকাশ পাই তখনি কুঁড়েমি ধরে, কোনোমতেই সামান্য কোনো কাজেও হাত দিতে পারি নে। এমনি করে লোকের কাছে আমার নানা সামাজিক ঋণ বেড়ে চলেছে— সে আর শোধ দেবার প্রত্যাশা রাখি নে। তোমার লেখাটি সম্বন্ধেও আমার সেই বিপত্তি ঘটেছে। আজ খুব লজ্জার সঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্চি।

বৌমা ও সন্তোষের মা কিছুদিন এখানে নেই। বৌমা তাঁর পিতৃভবনে এবং বৌঠাকরুন তাঁর ভ্রাতৃভবনে, আর সন্তোষ তার গোষ্ঠে।

আচ্ছা, এই বোলপুরের মরুভূমিতে এক জোড়া উট পালন করলে কি রকম হয়? ওরা ত কাঁটা গাছ খেয়ে কাটায়, এখানে সে রকম উদ্ভিজ্জের অভাব নেই— তপ্ত বালিও যথেষ্ট আছে। কিছু অল্প বয়সের জন্তু যদি কেনা যায় ত কত দাম লাগে, কোথায় পাওয়া যায় এবং সবসুদ্ধ এ প্রস্তাবটা সঙ্গত কি না আমাকে লিখে দিয়ো। লাথির চোটে আমার এখানকার ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে দেবে না ত? ওরা ত গাড়িও টানে— ভারও বয়, কাজে লাগে—আবার দুধও পাওয়া যেতে পারে— কেবল দেখতে সুশ্রী নয়— কিন্তু এখানকার মনুষ্যলোকে তার জুড়ি পাওয়া যাবে। যাই হোক্ সৎপরামর্শ দেবে।

এবারকার দরবারে যদি তোমার কাজ খালি হয় তবে আমি ঐ পদের প্রার্থী রইলুম। যদি ৭৫ টাকা আমার পক্ষে অতিরিক্ত বলে গণ্য হয় তাহলে আমি ৫০ টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকব, এমন কি আরো কমে আমার আপত্তি নেই। বেতন এখানে মনি অর্ডার করে পাঠাবার যে ব্যয় তাও আমি ঘর থেকে দিতে রাজি আছি।

তোমরা সকলেই আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি
১৩ই শ্রাবণ ১৩১৮

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৪

৩০ মার্চ ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

সুবোধ, তুমি নিশ্চয় অধ্যাপক বকিলকে জানো। ইনি কিছুকাল থেকে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করচেন। এঁর যে পরিমাণ বিদ্যা ও যোগ্যতা ও অপরপক্ষে সাংসারিক অভাব, আমরা বিশ্বভারতী থেকে তার অনুরূপ কিছু দিতে পারি নে। অথচ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি এঁর অভাব মোচন হয়। ইনি অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট— ইংরেজি কবিতা রচনায় খ্যাতিলাভ করেছেন— বোধহয় এঁর কাব্যগ্রন্থ বিলাতে শীঘ্র প্রকাশিত হবে। জয়পুর থেকে এডুকেশন বিভাগের যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েচে সেই পদের জন্যে বকিলের

মত যোগ্য লোক পাওয়া শক্ত হবে। এ বিষয়ে তুমি তাঁকে সাহায্য করতে যদি পারো তো কোরো।

শুনেছ বোধ হয় আমি চলেছি য়ুরোপে— ইংলণ্ডে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে। রথী বৌমাও যাবেন।

বৃষ্টি নেই, গরম পড়েছে, চাষ বন্ধ, জলাশয় শুকনো— ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি ১৭ চৈত্র ১৩৩৪

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

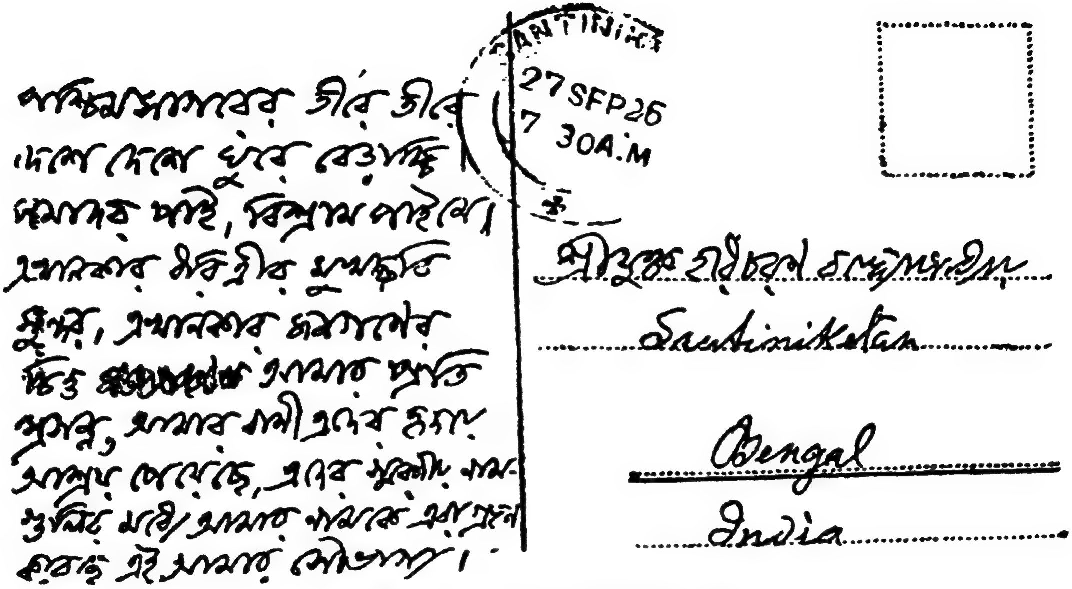

পশ্চিমসাগরের তীরে তীরে
দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
সময় নাই, বিশ্রাম পাইনে।
এখানকার প্রকৃতির মুখশ্রী
সুন্দর, এখানকার জনগণের
চিত্ত [illegible] আমার প্রতি
প্রসন্ন, আমার বাণী এদের হৃদয়ে
আশ্রয় পেয়েছে, এদের সুকীর্তি নাম-
গুলির মধ্যে আমার নামকে স্থান দান
করেছে এই আমার সৌভাগ্য।

SANTINIKETAN
27 SEP 26
7 30 A.M

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Santiniketan
Bengal
India

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

*SANTINIKETAN
27 SEP 26
7' 30 A. M.

[জার্মেনী]

পশ্চিমসাগরের তীরে তীরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমাদর পাই, বিশ্রাম পাই নে। এখানকার ধরিত্রীর মুখচ্ছবি সুন্দর। এখানকার জনগণের চিত্ত আমার প্রতি প্রসন্ন, আমার বাণী এদের হৃদয়ে আশ্রয় পেয়েছে, এদের স্মরণীয় নামগুলির মধ্যে আমার নামকে এরা গ্রহণ করেছে এই আমার সৌভাগ্য।

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

১

১০ নভেম্বর ১৯০২

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতে আমি বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতা দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য্যব্রত।

ইহা ধর্ম্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে

এমন একটি জিনিষ দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এসব কার্য ফরমাসমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায় গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্য্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়— অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা— এমনকি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব্ব করিতে

না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্ত্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে হেমেন্দ্রবাবুর পুত্র প্রেমানন্দের সৌখীন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে— সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও সৌখীনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোন ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড় কাচা

সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে— ও ব্যবহার্য্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সেই অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তকৃতকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার

যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু আচারবিরুদ্ধ কোন অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যেভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মত মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি— আমি এখন কেবলমাত্র কোন বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে

ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সঙ্কীর্ণতা হইতে স্বার্থ হুইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে— এইজন্যই আর্য্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্ব্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ মেতৎ —

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহাতে আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ — ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্ব লাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত বলিতেন। - এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে — সংযমের দ্বারা ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতার দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠার দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগসাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য্যব্রত।

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র

প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্ম্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতানোঽসি' উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত্র কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।"

'হে দেব, হে পিতঃ, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্ম্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতাদিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্ম-সাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্ব্বল্য-জনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এইসকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মত না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশতঃ নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোন মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্য্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দ্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্দ্ধারণ তাঁহারা

করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্দ্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্ত্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিষপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিষপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিষ নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিষপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্ম্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দ্দিকে, পায়খানার কাছে কোনরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংশ্রব প্রার্থনীয় নহে। জিনিষপত্র ক্রয়, বাজার করা, ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে— কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দ্দারকে বা মালিদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিয়োপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোন দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্ব্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন!

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন— আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দ্দিষ্টদিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোষ্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোষ্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব

রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোন বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোন ছাত্রের অভিভাবক কোন বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিষপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর

অনুমতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

—

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয় চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বতঃউৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোন অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম্ম— এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্ব্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে

পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্ম্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য— অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারো উপর চাপানো যায় না— এবং এসকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্ব্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই— বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি— সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্ম্মের যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্ত্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্ব্বদা আমার,

উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্ব্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না— কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায় কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাসদোষ এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে— এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্য্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত কার্য্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই— এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এইসমস্ত সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোন আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে— ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সঙ্গত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভাল হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখী মাছ ও ছোট জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখী খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্য্যের সহিত মুক্ত পাখীদিগকে বশ করানোই ভাল। শান্তিনিকেতনে

কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালীদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোন বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোন ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেষণ করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়— যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে— নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্য্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনপ্রকার সঙ্কোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেষণ করিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেষক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভাল হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি এজন্য সকল কথা ভালরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি

সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোন আদেশ নির্দ্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্ত্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট ১

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর পত্র

বর্তমান পরিশিষ্ট-ভাগে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারখানি পত্র এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একখানি পত্র সংকলিত হল।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়-অংশের শেষে তাঁর আর একখানি পত্র এবং গ্রন্থপরিচয়-অংশে ধৃত প্রসঙ্গসূত্রে আরো দু-খানি পত্র ব্যবহৃত হয়েছে। পরিচয়-অংশে যে পত্রখানি মুদ্রিত, তার উত্তরে, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর তৎকালীন অন্যতম একান্তসচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী যে পত্র লিখেছিলেন, প্রাসঙ্গিক বোধে এই পরিশিষ্ট অংশের শেষে তা সংযোজিত হয়েছে।

সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কোনো পত্র পাওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সাতখানি পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে।

১

ওঁ

সম্বলপুর

মহরম

বৃহস্পতিবার

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আসল চেষ্টাটা আপনার দুটো কথা শোনা। কিন্তু সম্বলপুর কারাগৃহটি এমনিতর হয়েচে যে দু একদিন ছুটি করে যে ইদিক সিদিক একটু নড়ে চড়ে আসি তার যো নেই। কাজ-কর্ম্ম বড়ই কম তার উপর উকিলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে ২ দালাল সৃষ্টি— সুতরাং সম্বলপুরের মতন ছোট জায়গায় স্বাচ্ছন্দ্যের আশা একরকম মরুভূমে মরীচিকার মতন দুরাশায় পরিণত। ফলে হয়েচে এই যে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও ছুটিছাটার সময় আপনার সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ করে 'কণ্টকময় সংসার' পথের কিছু "পাথেয়" সংগ্রহ করে আনবো তার সামর্থ্য থাকে না। অনেকজন্মের পুণ্যফলে কোন অজানা জলাভূমির উৎপাটিত শুষ্ক তৃণদলের মতন ভেসে এসে পাদপ্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিলুম। সে গৌরবের স্থানটা বুঝি রাখতেই পারি না। আজ একবার বসে বসে আপনার পুরোনো চিঠি খানকতক ওলটপালট করে দেখছিলাম। তার মধ্যে বহু পূর্ব্বের একখানা ভর্ৎসনারও চিঠি পেলুম। যে সময় সেটা পেয়েছিলাম সে সময়ে মনের অবস্থার কথা এখন মনে নাই। কিন্তু আজ সেখানা পড়ে নিজের ওপর কি যে ধিক্কার অনুভব কল্লুম তা বলতে পারি নে। মনে হল মাথাটা যেন ছিন্ন হয়ে ধুলিতে

লুটিয়ে পড়লো। তার প্রতি অক্ষর সত্য, প্রতি অক্ষর fully deserved ত বটেই। কিন্তু সেভাবে ভর্ৎসনা কর্ত্তে কেউ পারে বলে ত আমি জানি না। তার সংযম, তার উদারতা, তার হৃদয়বানতা তার natural dignityর সমুখে I felt like one overpowered,— annihilated! আপনি কি সকলের সঙ্গেই— আমার মত সকল নগণ্য অপদার্থদের সঙ্গে ব্যবহারেতেই আপনার এই সংযত উদার মহাপ্র[া]ণতার পরিচয় দিয়ে এসেচেন— না আমার সহস্র জন্মের সঞ্চিত পুণ্য আমাকে এ গৌরবের অধিকারী করে দিয়েচে?

উদার হৃদয়ের এক কোণে একটু আমার স্থান রাখবেন মহাশয়। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হয়ে এল। জীবনে কাউকে যে বাঁধতে পেরেছি বলে মনে হয় না। যদি ধরা দিয়েছেন, আর ছাড়াবেন না। মহাপ্রাণের এক কোণে একটুখানি জায়গা ছেড়ে রাখবেন।

জানেন মনোরঞ্জন খোসামুদি জানে না। এ ভাষা তার প্রাণের mother tongue না হলে তার লেখনীতে বজ্রপাত হোতো।

ভবদীয়

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

4/6/19

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

মহাশয়

আজ Statesmanএ Viceroyকে প্রেরিত আপনার চিঠীর মর্ম্ম প্রকাশিত দেখিলাম। মহাকবি, ব্রাহ্মণ, আজ আপনি মরুময় ভারত মহাদেশে বলদৃপ্ত অসুর প্রবৃত্তির অন্ধ আস্ফালনের সম্মুখে তাহার সমস্ত পাশবশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণোচিত ভাষায় তাহাকে যে তিরস্কার করিয়াছেন তাহা সে পশুশক্তিকে লজ্জিত করুক আর নাই করুক, সে ভাষা আজ সুষুপ্ত দেবলোককে দীর্ঘকাল অশ্রুত যথার্থ মানবীভাষার ঐশী ঝঙ্কারে জাগাইয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। মহাশয় বহুদিন কাষ্ঠ পাষাণে ব্রহ্ম আরোপ করিয়া তাহাকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। মানুষকে কিন্তু দেবতাজ্ঞানে তাহার সকলপ্রকার অপকর্মকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়া লইবার মত "discipline" বা তাহার সমস্ত "Communiqueকে" দৈববাণী বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইবার প্রবৃত্তি অন্তরাত্মা পোষণ করিতে শেখে নাই। আপনার পত্রের শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে Lord Hardinge আজ Viceroy থাকিলে নরকরাগরঞ্জিত মহাদুর্নীতির তাণ্ডব অভিনয় মানব ইতিহাসকে কলুষিত করিতে পারিত না। এমন দিনকাল পড়িয়াছে যে মানুষের দুঃখে মানুষ দুঃখ প্রকাশ করিবার অধিকারও বুঝি

হারায়। অন্ততঃ ভারতবাসীর এ বিষয় অত্যন্ত সাহসের অভাব দেখিয়া সে সে পথেও মহাশাসনের একটা আশঙ্কা করে বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে একান্ত স্বাভাবিক, হৃদয়ের এ ভাষা আপনার মুখেই প্রথম বাহির হইল তাহার কারণ কি। O Duyer এর নিমিত্ত 'farewell address' 'manufacture' করিলেই কি সত্যটা নিজেকে ভুলিয়া মিথ্যা হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষের কি এমনি দুর্দ্দিন আসিয়া পঁহুছিয়াছে? নাকি কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষে ভারত কর্ম্মচারীরা এমনি করিয়াই ধুলি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবে। ভগবানকেও ভুলাইবে।—

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ Sambalpur, B. N. R.
Dated 8. 6. 40

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রায় দেড়মাস ভুগিয়া আজ তিন দিন হইল রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছি। আবার জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে আপনার নিকট হইতে চিরবাঞ্ছিত প্রীতি ও স্নেহসংস্পর্শ প্রার্থনা করি।

সংবাদপত্রে আপনার সংবাদ মোটামুটি পাইয়া থাকি। মাংপুতে আপনার শরীর অপেক্ষাকৃত ভালই আছে সংবাদপত্রে সম্প্রতি দেখিয়াছিলাম।

আশা করি ভালই আছেন। বহুদিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নাই। কতদিনে আবার কলকাতায় ফিরিবেন ?

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

ভবদীয়
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ Sambalpur, B. N. R.
Dated 11. 12. 40

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামী Xmasএর ছুটীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা গত কয়েকমাস হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছি। ইতিমধ্যে আপনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। এ সময় আশাকরি আপনার পার্শ্বচরেরা কোনো ব্যবধান উপস্থিত করিবেন না। বহুকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। দূরে থাকি, সুবিধামত সময় করিয়া উঠিতে পারি না, আশাকরি আপনার পার্শ্বচরেরা যে Interdict কাগজেপত্রে জারি করিতেছেন তাহা আমাতে প্রযোজ্য হইবে না। আপনি যে জানিতে পারিলে নিশ্চয় সে অনুমতি দিবেন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সেইজন্য এই সঙ্গে আপনার নিকটস্থ incharge ভদ্রলোকদিগকে সবিনয় অনুরোধ করি যে আমার ইচ্ছা

আপনাকে জ্ঞাপন করিয়া আমার পত্র আপনাকে দেখাইয়া আমাকে আপনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

আমি আপনার অনুমতিপত্রের আশায় রহিলাম। Xmas ছুটি 22nd আরম্ভ। এর মধ্যেই যেন অনুমতি পাই, ইতি

ভবদীয়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

১।৭।৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নিবেদন

আপনার ২০।৬।৪১ তারিখের চিঠি পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পড়িয়া শোনানো হইয়াছে। আজ কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা মোটেই ভালো যাইতেছে না, সে জন্য এখানে সকলেরই মনে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। স্বাস্থ্যের এরূপ অবস্থাতেও তিনি চিঠির বক্তব্য, এবং তাঁহার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন এই দুয়ের জন্যই আপনাকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার জন্য আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁহার ডান হাতের আঙুলে বাতজনিত বেদনা এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাহেতু স্বহস্তে কাহারো সহিত পত্র-ব্যবহার করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছে। এই কারণেই আপনার চিঠির জবাব স্বহস্তে দিতে পারিলেন

না বলিয়া তিনি দুঃখিত। কিন্তু তিনি আশা করেন আপনি এজন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

আজ কলিকাতার কয়েকজন চিকিৎসক তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আসিয়াছেন। অতঃপর কিভাবে তাঁহার চিকিৎসা করা হইবে সে বিষয় তাঁহারা বিবেচনা করিবেন।

আপনি আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি ১।৭।৪১

বিনীত
শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পরিশিষ্ট ২

Monoranjan Bandyopadhyay :
Santiniketan Reminiscence

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় :
আমার পরিচয়

SANTINIKETAN REMINISCENCE
A VIGNETTE

Manoranjan Bandyopadhyay

THE POET

It is always a pleasure to think and talk about great men and their ways, for in their greatness and goodness we see the sunny side of our common human nature reflected in its colourful beauty. Reading recently in the pages of Visva-Bharati News Mr. Khitibhusan [Kshitimohan] Sen's contribution regarding Dr. Tagore's personality, I seem to have caught an infection which urges me to add a word or two of mine own to enliven the portraiture.

It was years ago when I met the Poet at Santiniketan at close quarters. Before that I had often heard of him and read his poetry— and who had not— but that was my first rencontre. He required no pointing out, for his pictures were so common and so broadcast that a look showed the original of the copies which I had so often seen and known.

On my first presentation to him I don't

remember to have talked with him. The distance between us was so great and the bridging of it was not yet [done]. I saw the lion in his lair—distantly admired his personal charms and left.

Within a month or two chance brought me into closer touch with him.

One thing, I believe, is common to all really great men. It may be a fanciful standard of mine but I believe, there is a psychology behind it. On your approaching a really great man you don't feel out of place in his society. However humble you may be, one undefined look of cordiality from him makes you feel that you are welcome. His heart is too broad to lack room for a fellowman who comes to do him honour.

Rabindranath was one of those elect. Believe me when I say that I have seen men justly high in reputation for learning & intelligence but so self-conscious, narrow and self-centred that you feel scared at their proximity.

So I felt quite at home with him within the first few hours of my acquaintance with him. Though my place was one of subordination to him, I never had reason to feel the existence of the yoke. I served him almost because I loved him. If I may be permitted to use that bold expression from the place where I stood.

They from outside talked of him in those days as a man of the fast and jolly set. His age, his wealth, his position in life, his personal charms and his sentimental leanings as reflected in his poems— the age of নৈবেদ্য had not yet come— gave a plausible colour to such gossips. In fact on my first visit to Santiniketan before I met the Poet I was told by a grown-up young man of Raipur family that on Hat-days when men and women came in large numbers to the Bolpur Hat, the Poet sat in a niche carved on the side of a hummock on the road side near the Santiniketan temple and played on his flute !

You may know a man for years but still you may know very little of him. But you live with him in intimate association day and night except the sleeping hours, in a month's or two months' time you know him through and through. That is at the root, I believe, of the English expression "No man is hero to his own valet." I had that chance and when within a short time I came back to the society of the senseless gossipers I could offer to swear with my person dipped into the Ganges to my neck that Rabindranath in that respect was sterling gold. Vulgarity or anything vile never did or could cast even a passing shadow on him.

He was no prig but he was never risque. I remember once when talking pleasantly about his financial stringency in his new educational venture, he told us a story of an offer of a marriage in his younger days from a Madras Millionaire— was it Bobili ?—how he was introduced to his bride to be— or rather his bride not to be— and her mother somewhere I forget. He described all that passed in that meeting with such an amount of pleasant and inimitable humour that at the end of it we felt refreshed and uplifted as after a breezy walk across a moonlit world.

His power of conversation was unique in its impressiveness in matters both grave and gay. He could discuss for hours with pundits on serious topics with a charm of depth and spontaniety which was a treat to hear. He was not less at home with children hardly above eleven or twelve which was the maximum age of our alumni in those days. In fact, I have known of children shunning the society of their playmates of their own accord to hang upon his honeyed words.

Babu Akshay Sarkar was a literary man of high repute— an associate and contemporary of the great Bankim. He was far above Rabindranath in age. He used to address him as Rabi. Rabindranath had been once talking serially of the great story of the Mahabharata for the education and delectation of the school children. We used to join up to listen, so did Babu Akshay Sarkar. Some days later when I met him at Chinsurah he told me with a feeling of deep appreciation that he had heard men without number— and professional men too— talking of the Ramayana and the Mahabharata stories— but till he heard Rabindranath he never knew how charmingly these stories could be told. He said that he had been to Santiniketan for a day's stay only but the great story-teller captivated him and he could not leave the place till he finished after sixteen days.

Rabindranath was nature's gentleman, true to the culture and tradition of his family. I know of a man in sudden distress who wanted a loan of Rs 400/- for a short period. The man was poor. There was no security of repayment. He went to see the Poet all right but he could not venture to broach the subject. The kind-hearted man instinctively felt that his visitor was not easy in mind. He heckled him for the cause in his sweet, sympathetic way till the man mumbled out what he needed. At once came the angelic assurance that there was no need to lose peace of mind over the matter and in ten minutes time four hundred rupees in currency note were thrust into his pocket by his son in the secrecy of an adjoining chamber. How many others might have been benefited in the same secret fashion the grateful hearts may know, but it can be truly said of the poet that his left hand never knew the benefactions his right hand gave. I am told this visitor paid back the loan in time.

One other incident comes uppermost to my mind at the present moment. I had been to Malda side on a private affair of mine. On my return journey I reached Bolpur early morning at about 3-30 A. M. I could not resist the temptation of seeing my old place and the tutelary deity thereof. I broke my journey and walked up to Santiniketan. It was still dark. I treaded my way to the small double-storied attic in which the poet lived in those days. I had noiseless shoes on. I looked in at the lower storey. The doors and windows were all open but the poet was not there. So I went softly up the stairs because it was still sleeping time. I had hardly reached the first landing on the stairs when what do you think I beheld? It was a sight for the gods to see. On the small open veranda I found an old-world Rishi incarnate seated on the floor in deep meditation. I stopped there and looked on for full fifteen minutes when what looked like a trance was over. The poet's age was nearer to forty than fifty in those days.

I would not multiply instances which can be found galore in the good man's life.

I will turn now to another side of the picture. With all his greatness the poet was not a god. He had his failings and one of them I would mention. With all his intelligence he at times, yielded to secret insinuations of tell-tale sneaks. He invariably cast off the obsession and asserted his normal self in a short time, but for the time being, to use his own expression, he acted as one possessed.

A certain individual once happened to speak against me to him in private. He was deeply annoyed but would not tell me why. Every morning at prayer time we met before we dispersed to our classes. His sweet, smiling greetings were our encouragement and asset for the day. I missed them. The poet somehow avoided me. The same was repeated in the evening too. I felt upset. With my helpless poverty, however, there was a modicum of pride in me. My heart declined to stay on such condition. When on the next morning too, I found the shadows still lowering on his countenance, I made up my mind to make up or break away from the place which was no longer a place for me. After the morning classes were over I packed up my little belongings and prepared to leave the place by the afternoon train if matters did not improve in the meanwhile. At about 2 P.M. I sought him out in his study where he was alone, writing. My manners at the time were abrupt and unceremonious; because I was desperate. He looked up at me from his papers and waited for me to begin. I began with vehemence demanding the reason for the change in him. I do not remember what I said. The clouds seemed to lift a little. He gave me the cause. The report was all false and I at once demanded to be confronted with the man, the reporter. The downright honesty of my challenge seemed to have a palliative effect on him. There was a returning flicker of cordiality in his looks, the tension was relaxed. He would not confront me with that man but he assured me that he believed me. It took some time before he returned to normal.

Any other man in similar circumstances would have dealt with me differently. But here the heart was sound and though at times it got warped, it was not dead and never damaged. After all he was a man and what man is there without his failings. But in spite of his failings of this nature, which bore the guinea stamp of truly greatman's failings,.... never led him to do a wrong to his fellow-man. His nature was supremely adorable and I, for one, small and insignificant as I am, have ventured to nurse the memory of my association with him as the greatest gift and noblest asset of my life.

Sambalpur
August 15, 1939.

আমার পরিচয়

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

…দূর পল্লীগ্রামে ছাত্রজীবনে যখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যার্থী, তখন কোন সুযোগে কবিবরের নিকট হইতে আমি মাসিক কিছু বৃত্তি পাইয়াছিলাম। আমি দরিদ্রের সন্তান, সুতরাং এই বৃত্তি তখন আমাকে যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ ও কত আশা দিয়াছিল, তাহা অনুমানেরই বিষয়, বলিবার কথা নয়। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কিছু বিদ্যালাভ করিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার ভিত্তি।

কলেজে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করিতে করিতে, আমার ছাত্রজীবনের শেষ ও সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। আমি দরিদ্র, সুতরাং সহায় সম্পত্তির বলে কার্য্য জুটাইয়া লওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। নিজের যাহা কিছু বিদ্যা ছিল, তাহারই বিনিময়ে পল্লীগ্রামে ও পরে কলিকাতার বিদ্যালয়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া আমি সেই সময়ে পিতার দুর্ভর সংসারভার-বহনের ক্লেশ কিঞ্চিৎ উপশমিত করিতে লাগিলাম। আমার দাদা (পিতৃষ্বসার পুত্র) শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাটীতে সদর বিভাগে খাজাঞ্চির কার্য্য করিতেন। সেই সূত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার অফিসে যাইতাম এবং তাঁহার মুখে কবীন্দ্রের

বিদ্যোৎসাহিতা ও বিদ্যানুরাগিতার কথা এবং কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা তন্ময় হইয়া শুনিতাম। একদিন জোড়াসাঁকোর বাটীতেই দাদার মুখেই কথায় কথায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা শুনিলাম। ছাত্রজীবনে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেখানেই যে কার্য্যেই থাকি না কেন, বিদ্যালোচনা— বিশেষত সংস্কৃতের চর্চ্চা— আমি কখনও ত্যাগ করিব না। এইজন্যই আমি সর্ব্বদাই শিক্ষাবিভাগের কার্য্যেরই পক্ষপাতী ছিলাম। দাদা বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপকেরা পরম সুখে অধ্যাপনা করেন— প্রভুর সমদর্শিতায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি শ্ববৃত্তি বলিয়াই বোধ হয় না, অধ্যাপনাদি সকল কার্য্যেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আহারের বিষয়ে পরাধীনতা থাকিলেও, তাহা সুখকর ও স্পৃহণীয়, কারণ শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের মনস্বিনী জননী প্রত্যহই নিয়মিতভাবে সুখভোগ্য অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শিক্ষকতায় পরাধীনতার তীব্র আস্বাদের সহিত আমি পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলাম, সুতরাং ঐরূপ স্পৃহণীয় বিষয়ের বিবরণ শুনিবামাত্রই, আমার মনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প, আমি 'হংসমধ্যে বকো যথা', সুতরাং, আমার সে আশা উদ্বাহু বামনের প্রাংশুলভ্য ফলপ্রাপ্তির আশার ন্যায় নিতান্ত উপহাসাস্পদ, ইত্যাদি নানা প্রকারে, নিজ বিদ্যার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়া আমি মনকে অতিকষ্টে নিবৃত্ত করিলাম— তখন জানিতে পারি নাই যে, আমার ভাগ্যবিধাতা আমার অলক্ষ্যে 'তথাস্তু'

বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় আমার সেই অলীক আশা সফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে, আমার দাদা একদিন কবিবরের নিকটে তাঁহার পূর্ব্ব প্রদত্ত বৃত্তির উল্লেখপূর্ব্বক আমার পরিচয় দিয়া, মফস্বলে আমার জন্য একটি কার্য্যের প্রার্থনা জানাইলে, কবিবর তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করেন এবং তদানীন্তন সদর নাএব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া, আমাকে মফস্বলে কোন একটি কার্য্যে নিযুক্ত করার অনুমতি দেন। ইহার কিছুদিন পরেই আমি কার্য্য পাইলাম— আমি কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারি পতিসরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হইলাম। তখন শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কালীগ্রামের ম্যানেজার ছিলেন। ১৩০৯ সালে শ্রাবণের প্রথমে আমি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টরূপে সদর কাছারি পতিসরে উপস্থিত হইলাম। তখন ভয়ানক বর্ষা। পতিসরের চারিদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর বর্ষার প্লাবনে একাকার হইয়া গিয়াছে— কোথায়ও কিছুই দেখা যায় না, কেবল বহুদূরব্যাপী নিমগ্নপ্রায় হরিৎ ধান্যশীর্ষ-সমূহ, আর সেই সবুজ সাগরের মধ্যে দূরে দূরে দূর হইতে পুঞ্জীভূতরূপে প্রতীয়মান তৃণাচ্ছাদিত গ্রাম্য গৃহসমূহের পঞ্জরনিকর। এইরূপ ভীষণ বর্ষায় ম্যানেজারবাবু আমাকে মফস্বলে যাইতে দিলেন না— আমি কাছারিতে থাকিয়াই কিছু কিছু কার্য্য করিতে ও শিখিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। কবিবর সেই সময় জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একদিন কর্ম্মচারীদের নিকটে শুনিলাম শ্রীযুত বাবুমশায় (অর্থাৎ

কবিবর) শিলাইদহে আসিয়াছেন, দুই এক দিনের মধ্যেই জলপথে এখানে আসিবেন। প্রভুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হইবে ভাবিয়া, আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পরদিন শুনিলাম, শ্রীযুত বাবুমশায় আসিয়াছেন, অদূরে বোটের মাস্তুল ধান্যশীর্ষ ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, অবিলম্বেই বোট ঘাটে আসিয়া লাগিবে। সকলেই দেখা করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন, আমিও দেখাদেখি প্রস্তুত হইলাম। এদিকে যথাকালে বোট পতিসরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। কর্ম্মচারীরা পদগৌরবানুসারে অগ্রপশ্চাদভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন— আমিও গতানুগতিকের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যথারীতি প্রভুর পাদবন্দনাদি করিলেন, আমিও সামাজিক নিয়মে সবিনয়ে ভক্তিভাবে নমস্কার করিলাম। আমি নূতন কর্ম্মচারী, সুতরাং, প্রথম সাক্ষাৎকারে আমার সহিত বিশেষ কথোপকথনের সম্ভাবনা নাই— দুই একটি কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, আমি বিদায় লইয়া আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন— 'বাবুমশায় আপনাকে ডাকিতেছেন, আসুন।' আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে বোটে গিয়া বাবুমশায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি স্বাভাবিক সস্নেহে মধুর বাক্যে আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন, আমি বসিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখানে কি কর?' আমি বলিলাম, 'আমিনের সেরেস্তায় কাজ করি।' ইহার পরে তিনি বলিলেন, 'দিনে

সেরেস্তায় কার্য্য কর, রাত্রিতে কি কর?' আমি বলিলাম, 'সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি ও কিছুক্ষণ এক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া press-copy প্রস্তুত করি।' পাণ্ডুলিপির কথা শুনিয়া বাবুমশায় উহা দেখিতে চাহিলেন। আমি ঘরে আসিয়া উহা লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ বইখানি দেখিয়া, কবিবর আমাকে ফিরাইয়া দিলেন, কিছুই বলিলেন না। আমি বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

এইরূপে পতিসরের কাছারিতে আমার শ্রাবণ মাস অতীত হইল। ভাদ্রের প্রথমে একদিন ম্যানেজারবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুমশায় আপনার নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'শৈলেশ! তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।' এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?" বলা বাহুল্য, আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার স্বভাবের অনুরূপ হয় নাই, সুতরাং ম্যানেজারবাবুর নিকটে ঐরূপ অচিন্তিত সুসংবাদ শুনিয়াই আমি আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলাম, ভাবিলাম আমার আন্তরিক প্রার্থনা বুঝি পূর্ণ হইতে চলিল। আমি প্রস্থানের জন্য সজ্জিত হইয়া, বিদায় লইয়া, নৌকায় আত্রাই ষ্টেশনে পঁহুছিলাম এবং রাত্রি (বোধহয়) দশটার মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কার্য্য থাকিলে, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমি কলিকাতায় অপেক্ষা করিলাম না, পরদিনই প্রাতঃকালের ট্রেনেই শান্তিনিকেতনে আসিয়া

গুরুদেবের সহিত দেখা করিলাম। ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন। গুরুদেবের সঙ্গে আমি তাঁহার কাছে আসিলাম, গুরুদেব পরিচয় করাইয়া দিলেন। এতদিনে আমার আশার ফল ফলিল— আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক হইলাম। কিছুদিন অধ্যাপনার পরে, একদিন গুরুদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিচরণ! তুমি কি এই স্থানেই অধ্যাপনা করিবে, না পতিসরে ফিরিয়া যাইবে?' আমি উত্তর করিলাম, 'এই আশ্রমের কার্য্য আমার ভালই লাগিতেছে— আমি পতিসরে যাইব না।' গুরুদেব সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন, 'বেশ! তবে এইখানেই থাক।' আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তদবধি আমি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

আমি যখন কলেজের বিদ্যার্থী ছিলাম, সেই সময়ে পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট কাব্যাংশ ভিন্ন অন্য সংস্কৃত কাব্যের সহিত আমার পরিচয় হয় নাই। কোন সংস্কৃত কোষের বা পাণিনির পূর্ণ মূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই— মল্লিনাথের টীকায়ই খণ্ডিতরূপ কোষাংশ, সূত্রাংশ দেখিয়াছিলাম মাত্র। সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে সম্পূর্ণমূর্ত্তি সংস্কৃত কাব্য কোষ ও পাণিনি দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। আমি উৎসাহের সহিত ঐ সকল পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম এবং ক্রমশঃ অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টার ফলে নূতন নূতন বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময় গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে বালকগণের অধ্যাপনার্থ

আমি 'সংস্কৃতপ্রবেশ' রচনা করিতে আরম্ভ করি। এই পুস্তক রচনার সময়ে, একদিন কবিবর কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বাঙ্‌লা-ভাষার অভিধান রচনার কথা বলেন। 'সংস্কৃতপ্রবেশ'-এর তিন খণ্ডের রচনা শেষ করিয়া, আমি গুরুদেবের কথানুসারে ১৩১২ সালে অভিধানের কার্য্য আরম্ভ করি। অভিধানের কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আমাকে কলিকাতায় কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ে সঙ্কল্পিত অভিধানের কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাত জন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও আমার এই দুঃখ-নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না— কেবল, অবসরক্রমে মধ্যে মধ্যে যোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া গুরুদেবের নিকটে মনের বেদনা জানাইয়া গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া আসিতাম। সহৃদয় মহাত্মার নিকটে কোন সদ্বিষয়ের নিবেদন ব্যর্থ হয় না,— আমার দুঃখের নিবেদন সার্থক হইল— গুরুদেবের মন টলিল— তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অভিধানের বিষয় জানাইয়া, বৃত্তির কথা বলিলেন— মহারাজও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিবেন, স্বীকার করিলেন। এইরূপে আমার অর্থসমস্যার মীমাংসা হইলে, গুরুদেব দেখা করিবার জন্য আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার নিকটে বৃত্তির ব্যবস্থার কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমার জন্যই কবিবর ভিক্ষুবেশে অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার

চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম— আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদনের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বাষ্পকলুষকণ্ঠে ভাষা ফুটিল না— কেবল অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম— বিগলিত অশ্রুধারা মনের ভাব ব্যক্ত করিল, আমি নত হইয়া পদরজ মস্তকে ধারণ করিলাম। আমার হৃদয়গত ভাব কবিবর বুঝিতে পারিলেন— ধীর সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, 'স্থির হও, আমি কর্ত্তব্যই করিয়াছি।' আমি আর কিছুই বলিলাম না, ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরেই, গুরুদেবের অনুমতি লইয়া, আমি পুনর্ব্বার শান্তিনিকেতনে আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলাম এবং মহারাজের বৃত্তিলাভে উৎসাহিত হইয়া, বহুদিনের পরে, অভিধানের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে থাকিলাম। এই সময়ে গুরুদেব একদিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইহার সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু নাই।' কবিগুরুর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে— ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া, ১৩৩০ সালে এই বৃহৎ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি।···

গ্রন্থপরিচয়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭১-১৯৫০) হুগলি জেলার চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের সহায়তাকল্পে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রহ্মবান্ধব মাঝে মাঝেই শান্তিনিকেতনে আসতেন। সেই সময় একবার, সম্ভবত সে বছরের পৌষ বা মাঘমাসে, তাঁর সঙ্গে এসে মনোরঞ্জনও কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে বাস করে যান— তখনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি সে-সময় সদ্য ওকালতি পরীক্ষা দিয়েছেন। এর অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "মনোরঞ্জনবাবুকে আমার বিদ্যালয়ে বদ্ধ করিতে পারিলে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিব। তিনি আইনে পাস হউন্ বা না হউন্ এক বৎসর এখানে কাজ করিয়া যান্ তাহাতে আমার অনেক সাহায্য হইবে। কারণ, তিনি অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যাপারে তাঁহার কাছ হইতে আমি অনেক তথ্য লাভ কারতে পারিব। প্রথম হইতেই আমি তাঁহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলাম— সেইজন্যই আশঙ্কা হইতেছে তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।"

মনোরঞ্জন আইন পরীক্ষায় সেবার অকৃতকার্য হয়েছিলেন। এর পর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সম্ভবত ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০২), ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কৃতবিদ্য শিক্ষক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে যোগ দেবার আগে মনোরঞ্জন একাধিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি স্থায়ী হতে পারেন নি, বৎসর-খানেক মাত্র এখানে অধ্যাপনা করে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০৩) মনোরঞ্জন অস্বাস্থ্যের কারণে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান।

অধ্যাপনাবিষয়ে নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থাভাজন হয়েছিলেন। তাঁর বিদায়গ্রহণকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের

ক্ষতিরূপেই মনে করেছিলেন।[1] ত্রিপুরার কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র এ-বিষয়ে লিখছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই রথীকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বোলপুরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকাতে তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য অধ্যাপক পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবে।"

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দেবার পর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অল্পকাল কুষ্টিয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করার সময় পুনরায় আইনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কুষ্টিয়ার কর্ম ত্যাগ করে চুঁচুড়ায় ফিরে হুগলির আদালতে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেন। এখানে বছর দুই সফলতা লাভের ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ওড়িশার সম্বলপুরে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করেন। সম্বলপুরেই তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হয়।

শান্তিনিকেতনে কর্মসূত্রে স্বল্পকালীন সান্নিধ্যেই মনোরঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের একটি ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ সুহৃদরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। ২ বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন, "এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনের

---

[1] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথও এই ঘটনাকে বিশেষ ক্ষতি বলে মনে করেছিলেন। মনোরঞ্জনকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশ—"আপনি ছাড়িয়া পলাইলেন? আপনি প্রধান একটা ভরসা ছিলেন— the right man in the right place— আপনার পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করে এমন একটা লোকও দেখিতেছি না।··· একটা রসগ্রাহী মধুমক্ষিকা জাল কাটিয়া পলায়ন করিল।···" —'স্মৃতি' গ্রন্থ, পৃ. ৪-৫

একটি গভীর মঙ্গলসম্বন্ধ যে চিরন্তন হয়ে উঠেছে এই কথাটির পরিচয় আমার কাছে বহুমূল্য বলে জানবেন।" আর-একটি চিঠিতে লিখছেন, "আমাকে হিতৈষী বন্ধুভাবেই চিন্তা করিবেন।"

মনোরঞ্জন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের হিতৈষণা যে কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখবার ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও প্রয়াসে। মনোরঞ্জনকে লেখা অনেক পত্রই রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াসের সাক্ষ্য দেয়। মনোরঞ্জন যখন হুগলিতে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থ ও অভাব-অনটনে বিব্রত হয়ে ব্যবসায়ের অনুকূল অন্য কোনো ক্ষেত্র অথবা জীবিকার বিকল্প বৃত্তি অন্বেষণের চিন্তায় ব্যাকুল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অধ্যাপনাকর্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার আশ্বাস দিয়েছেন, নূতন বৃত্তিতে প্রস্তুতির জন্য উৎসাহিত করেছেন, কখনো কোনো কাজের সন্ধান দিয়েছেন, কখনো বা কোনো কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ওকালতি-ব্যবসায়ের অনুকূল কোনো ক্ষেত্রের সন্ধানও দিয়েছেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র করুণাকিরণের কাছ থেকে জানা যায়, সম্বলপুরে ওকালতি ব্যবসায়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে সন্ধান দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তৎকালে সম্বলপুরের অধিবাসী কবি বিজয়রত্ন মজুমদারকে মনোরঞ্জনের একখানি পরিচয়পত্রও লিখে দিয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সন্তোষ ৪ বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট: "আপনি যে পর্য্যন্ত নানা দ্বিধায় কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া না বসিতেছিলেন সে পর্য্যন্ত আপনার জন্য বিশেষ উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলাম। এখন যে এক জায়গায় স্থিতিলাভ করিয়া বসিয়াছেন ইহাতে বড়ই তৃপ্তি বোধ করিতেছি।"

সঙ্গলাভের অভিলাষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে, কলকাতায়

ও শিলাইদহে আসার জন্ত বার বার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সুযোগ করতে পারলে মনোরঞ্জনও জোড়াসাঁকোয় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছেন কিংবা শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে দু-চারদিন কাটিয়ে গিয়েছেন। ১৯৩৭-৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যন্তকাল পর্যন্ত তাঁদের পত্রালাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র দেড় মাস আগে তাঁকে লেখা মনোরঞ্জনের পত্রে উভয়ের সম্বন্ধ যে কত গভীর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হল—

ওঁ

Sambalpur, B N.R.
20. 6. 41

পরম শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, ক'দিন থেকে কেন যেন ঘুরতে ফিরতে বারবার আপনার কথাই মনে হচ্ছিল। মাঝখানকার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ডিঙ্গিয়ে গিয়ে শান্তিনিকেতনে সেই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিনের কথা। সহসা বহুদূর অতীতের আকস্মিক পুনরাবৃত্তি মনটাকে চঞ্চল কোরে তুলছিল, কেন জানি না। তার মাঝে আজ সন্ধ্যার সময় একজন একখানা gramaphoneএ[১] আপনার recitation দেয়া দুখানা record নিয়ে আমাকে শোনাতে এলো। অত কাছে থেকে আপনার ভাষা আজ কত বর্ষ যে শুনিনি তা মনে নাই। একে মনটা কেমন ঘুলিয়েই ছিল তাতে এত কাছে থেকে ঘরে ব'সে আপনার ভাষা যেন মনটার ভিতরে একটা বেদনার সৃষ্টি করছিল। তাই আপনাকে চিঠী একখানা না লিখে থাকতে পারলুম না। মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে

---

[১] Gramophone

সাক্ষাতের সৌভাগ্য বুঝি আমার আর হবে না। বয়স আমার যথেষ্ট হয়েচে, দৌড়ঝাঁপ ক'রে দূর দেশে যাওয়া আসার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই মনে মনে লুপ্ত অতীতের স্বপ্নরাজ্য সৃজন ক'রে সেকালের ভাবে, সেকালের ভাষায় আপনাকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ সাদর অভিবাদন প্রেরণ করিতেছি। জানি না হয়ত বা এই আমার আপনাকে শেষ অভিবাদন। তা' না হ'লে এতদিনের পর হঠাৎ পূর্ব্বস্মৃতি জেগেই উঠবে কেন, আর মনের মধ্যে এ অকারণ ব্যাকুলতাই বা ঘনিয়ে উঠবে কেন ?

আজকাল আবার শুনি আপনি নাকি নিজে চিঠী পড়তে পারেন না, পড়ে শোনাতে হয়। সেও এক জঞ্জাল। তাই ভাবি ওরা আপনাকে আমার এ চিঠীখানা প'ড়ে শোনাবে কি না। না শোনালেও আমার বিশ্বাস আমার মনের কথা তাদের পুরোনো দিনের অভ্যস্ত পথের লুপ্ত চিহ্ন ধ'রে স্বস্থানে উপনীত হবেই হবে। সেই আমার ভরসা। চললুম

ইতি

বিদায়প্রার্থী

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরসময়ে যথাসাধ্য সাহিত্যচর্চা করেছেন। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁর কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত রবীন্দ্র-আলেখ্য **Santiniketan Reminiscence—A Vignette** এই সংকলনের পরিশিষ্ট অংশে (পৃ. ১৯৩-২০১) মুদ্রিত হল।

রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে বন্ধু ও আত্মীয়পরিজনদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু'খানি পত্র মনোরঞ্জন 'স্মৃতি' (প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৪৮) নামক গ্রন্থে সংকলন করেছিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

পত্র ১। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ [১৩০৯]। পত্রশেষে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বঙ্গাব্দ ১৩০২ স্থলে ১৩০৯ হবে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ৭ পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ। বিদ্যালয়-সম্পর্কিত এই চিঠি স্পষ্টতই পরবর্তীকালে লেখা। এখানে বঙ্গাব্দ ও খৃস্টাব্দ রবীন্দ্রনাথ ভ্রমক্রমে মিশিয়ে ফেলেছেন।

রথী। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১)। তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর' সংকলনগ্রন্থে (প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৮) বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পত্র ২। "যে যে magazines বিলাত হইতে আনাইবার কথা ছিল ..."

রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের সূচনাকাল থেকেই নিজে পড়ার জন্য এবং শিক্ষকদের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদি আনিয়ে দিতেন। বিলাত থেকে যে-সমস্ত পত্রিকা আনাবার প্রসঙ্গ এই চিঠিতে আছে, তার সুস্পষ্ট তালিকা দেওয়া সম্ভব হল না। পরবর্তী নানা সময়ে যে-সমস্ত পত্রিকা বিদ্যালয়ে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯ বৈশাখ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লেখা একটি চিঠিতে (প্রকাশ : দেশ, ১৮ কার্তিক ১৩৬২, পৃ. ১৩) তৎকালে আমেরিকায় পাঠরত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— "...এবারে ৪০ টাকা বেশি পাঠাচ্ছি। নিম্নলিখিত কাগজগুলি subscribe করে আমাকে পাঠাতে হবে—

The Hibbert Journal
$ 2·50
The Open Court
$ 1·00
The Living Age
$ 6·00

…তোমরা আমাকে April সংখ্যা পর্যন্ত Open Court পাঠাইয়া দিয়াছ— অতএব তারপর থেকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে দিয়ো। যদি ইচ্ছা কর আগে তোমরা পড়ে তার পরসপ্তাহে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ (তারিখহীন, প্রকাশ : দেশ, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, বর্ষ ২২ সংখ্যা ১৫) এরূপ অনেক পত্রিকার উল্লেখ করেছেন, এগুলি প্রধানত 'প্রবাসী' পত্রের 'সঙ্কলন' বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখা। চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল—

"মাসিক কাগজ গত বৎসরে যতগুলো পেয়েছি তার মধ্যে থেকে কেবল Broda-র International Review (ঠিক নামটা লিখলুম কি না জানিনে) Humanitarian Review, Literary Digest এবং ঐ রকমের আর একটা American Weekly (নামটা ভুলে যাচ্ছি) Twentieth Century থেকে সঙ্কলন করা গেছে।… Hibbert Journal থেকেও অজিত অনেকগুলো সঙ্কলন করেছে।… The Quest নামক একখানি Theological Magazine subscribe করা ভাল হবে। এবং Nation কাগজের বদলে The Public opinion কাগজটা নিলে হয়ত ব্যবহারে লাগতে পারে— কারণ এই কাগজে নানা লোকের নানা মত ও নূতন বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়ে থাকে।…

Chambers, Strand, Pearson, Windsor, Pall Mall এগুলো এখনি বন্ধ করে দিয়ো। Nationও কাজ নেই। The Quest যদি আনাও তাহলে গত October মাসের সংখ্যা থেকে আনিয়ো— কারণ তার মধ্যে আলোচ্য জিনিষ আছে।"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নানা ধরনের বই পাঠিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করার যে চেষ্টা করতেন, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল :

বর্তমান গ্রন্থের ৫ সংখ্যক পত্রে (পৃ. ৭) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'খানি বই পাঠিয়ে লিখেছেন, "এ গ্রন্থ পড়িতে আপনার ঔৎসুক্য হইবে জানিয়াই কিনিয়াছি। পড়িবার সময় যে-সকল ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে কাব্যে নাটকে বা উপাখ্যানে লিখিবার যোগ্য বোধ করিবেন দাগ দিয়া রাখিবেন।"

জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশও উদ্‌ধৃত হল—

"তোমাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক চটি বই পাঠাবো বলে কিনে রেখেছি। এগুলি খুব ভাল। শিশুপাঠ্য নয়, অথচ সহজবোধ্য। এগুলি অবলম্বন করে তোমরা যদি ছেলেদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত বক্তৃতা দিতে পার তাহলে ভাল হয়। এর পরে পাঠ্যপুস্তকরূপে সে-সমস্ত ছাপাও হতে পারে।"—১০ ভাদ্র ১৩১৯

"বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি এতদিনে নিশ্চয় তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে।…পেলে যেন তোমাদের বিদ্যালয়ের কাজে লাগাতে পার,— এবং তত্ত্ববোধিনীতে কিছু কিছু করে লেখা দিয়ো।"—২ কার্তিক ১৩১৯

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষককে রবীন্দ্রনাথের এই রকম উৎসাহদানের দৃষ্টান্ত আরো আছে।

পত্র ২। সুবোধ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক

সুবোধচন্দ্র মজুমদার (? ১৮৭৮ - ৬ জানুয়ারি ১৯৩০)। বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র তাঁর বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

পত্র ৩। তারিখহীন। পত্রে 'পয়লা অগস্ট' উল্লেখ আছে এবং পত্রশেষে রবিবার থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ অগস্টের পূর্বের রবিবার, ২৭ জুলাই ১৯০২, এই পত্র রচনার কাল।

রেবাচাঁদ। সিন্ধুদেশবাসী রেবাচাঁদ, (?—৮জানুয়ারি ১৯৪৫) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের খৃস্টধর্মাবলম্বী শিষ্য। পরে খৃস্টান সন্ন্যাসীরূপে তিনি 'অণিমানন্দ' নাম নিয়েছিলেন। কলকাতার সিমলাবাজার স্ট্রীটে তাঁর সহযোগিতায় ব্রহ্মবান্ধব ১৯০১ খৃস্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মবান্ধবের সহযোগিতায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন রেবাচাঁদও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে থেকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে সম্ভব হয় নি, রেবাচাঁদই কার্যত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব এবং রেবাচাঁদ রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অল্পকালই যুক্ত ছিলেন। নানাকারণে অল্প কয়েকমাসের মধ্যে তাঁরা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেন। পরবর্তীকালে রেবাচাঁদ কলকাতায় 'Boys own Home' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে (প্রকাশ : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০, পরবর্তীকালে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থভুক্ত) বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বে ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের সহায়তার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' (১৯৬১) গ্রন্থের 'বোলপুর

ব্রহ্মবিদ্যালয় গঠনে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব' অধ্যায়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে রেবাচাঁদের যোগ বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য সংকলিত হয়েছে। এ-ছাড়া, শ্রীদীপ্তিময় রায়-লিখিত 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত' (প্রকাশ ১৩৯৩) গ্রন্থেও প্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য আছে।

"আমাকে আজ রাত্রেই পুরী যাইতে হইবে। সেখানে আমার জমি আছে তাহা লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট্ গোল করিতেছে…।"
এই প্রসঙ্গে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নববর্ষ দৈনিক বসুমতী (১৩৬৭) পত্রে প্রকাশিত 'বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ বোর্ড-অব-রেভেনিউ-এর কাছ থেকে পুরীর বালুখণ্ড গভর্নমেণ্ট এস্টেটে জমি ইজারা নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে পুরীর কালেক্টর মিঃ গ্যারেট রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানান যে, বালুখণ্ড এস্টেটকে সরকার য়ুরোপীয় ও ভারতীয়— এই দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জমি য়ুরোপীয় অংশে পড়েছে। সুতরাং তিনি যেন ঐ জমির ইজারা ত্যাগ করেন; তাকে ভারতীয় অঞ্চলে অনুরূপ একটি ভালো জমির লীজ দেওয়া হবে। চিঠিটি[১] এই—

To

Babu Rabindranath Tagore

Dear Sir,

I am to inform you that the Board of Revenue have made allocation of sites in Balukhanda Govt.

---

১. A. Garrett -লিখিত উল্লিখিত পত্র বিপিনচন্দ্র পাল-সম্পাদিত 'New India' পত্রের ৩১ জুলাই ১৯০২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

Estate, Puri for European and Native quarters and that separate places drawn out distinguish one from the other. The site you have in the Estate consequently falls in the European quarters. So the Board desire to take it back from you, giving you, equally good site in exchange in the Native quarters. I request you to be so good as to waive your claims to the land leased out to you and engage somebody here on your behalf to select sites with me for you in the Native quarters. An early reply is solicited.

Yours truly
Sd. A. Garrett
Collector

রবীন্দ্রনাথ মিঃ গ্যারেটকে কী জবাব দিয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারের কী পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না।···

তিনি [বিপিনচন্দ্র] এই চিঠির কথা জানতে পেয়ে 'নিউ ইণ্ডিয়া'র এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র ভাষায় সরকারের বর্ণবিদ্বেষসৃষ্টির প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রথমেই লিখলেন,

'When first we saw this letter, we could not exactly understand whether we were in India or America.'"

অনুমান করা হয়, পুরীর ঐ জমি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অধিকারেই ছিল, পরবর্তীকালে এখানে একটি ছোটো বাংলোবাড়ি

নির্মাণ করান। এই বাড়িটি সম্পর্কে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল।"

পুরীর এই বাড়ি ১৯০৫ খৃস্টাব্দে তিন হাজার টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়, এই তথ্য শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ঠাকুর পরিবারের হিসাবের খাতা থেকে জানা যায়।[১]

হোরি। Yoshinari Hori। জাপানি মনীষী ওকাকুরার মধ্যস্থতায় হোরি সান রবীন্দ্রনাথের নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ে তিনি অল্পকালই ছিলেন। পাঞ্জাবে ভ্রমণ করতে গিয়ে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে ১৩ শ্রাবণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে লেখা একটি চিঠিতে[২] জানাচ্ছেন—

"আমার এখানে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃতশিক্ষা করিবার জন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম হোরি— নিজেকে সে চিদানন্দ নাম দিয়াছে। বড় নম্র শান্ত প্রকৃতি— তাহার অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া এই দূরদেশের প্রান্তে মাঠের মধ্যে একাকী সংস্কৃতভাষা অধ্যয়নের কঠোর চেষ্টা বড় বিস্ময়কর। তাহার সৌম্যমূর্তি ও বিনীত ব্যবহারে এখানকার ভৃত্যেরাও মুগ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মূল সংস্কৃত গ্রন্থে অধ্যয়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিখিতে তাহার সুদীর্ঘকাল লাগিবে। কারণ

---

[১] শ্রীসমীর রায়চৌধুরী এই তথ্যটি আমাদের জানিয়েছেন।

[২] প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮, পৃ. ১০

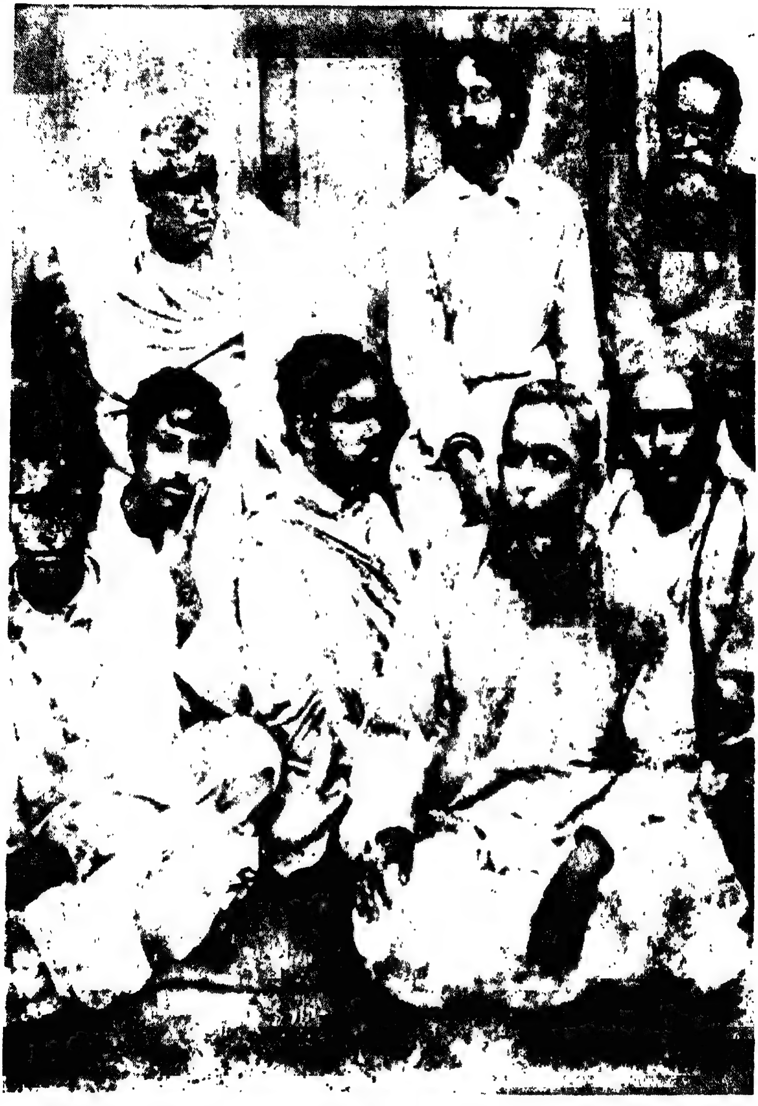

সুহৃদ ও আশ্রমিক -সহ রবীন্দ্রনাথ: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মনোমোহন চক্রবর্তী,
অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব, কুঞ্জলাল ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সংস্কৃত শব্দ সে উচ্চারণই করিতে পারে না— বার বার বিফল হইয়াও সে হতোদ্যম হয় না। মধ্যে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহার উৎসাহ হ্রাস হয় নাই।”

কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠিতে (দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠা) হোরির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায়।

পত্র ৪। তারিখহীন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরুতর অসুস্থ সহধর্মিনীর চিকিৎসা উপলক্ষে ঐ সময় কলকাতায় ছিলেন। পরবর্তী ৫-সংখ্যক চিঠি কালীপুজোর আগে লেখা। আলোচ্য চিঠির শেষে বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। ঐ বছর কালীপুজোর আগের বৃহস্পতিবার ৬ কার্তিক ১৩০৯।

জগদানন্দ। জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩)। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনাপর্ব থেকে আরম্ভ করে ১৯৩২ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণের কাল পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিদ্যালয়ের পরিচালন-দায়িত্বও নিষ্ঠা এবং কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন।

বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ জগদানন্দ সম্বন্ধে বিশদ পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য, শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ সমিতি-প্রকাশিত পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত ‘জগদানন্দ রায়’ (প্রকাশ ১৩৭৬) গ্রন্থ, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালার অন্তর্গত শ্রীনিরঞ্জন সরকার-লিখিত ‘জগদানন্দ রায়’ গ্রন্থ (প্রকাশ ১৩৮৩)। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ সংখ্যায় তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়। শিবধন বিদ্যার্ণব। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায়

ঠাকুর-পরিবারে সংস্কৃত পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করেন। পরে, তাঁকে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য নিয়োগ করা হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। এখানকার বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা বিষয় শিক্ষা দিতেন। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে তাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করতেন।"

অল্প কয়েকমাস শিক্ষকতার পর, বিদ্যালয়ের প্রথম বছরেই শিবধন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান।

'কবিপ্রণাম' (১৩৪৮) গ্রন্থে শিবধন বিদ্যার্ণবের পুত্র রাধানন্দ ভট্টাচার্য-লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও শিবধন বিদ্যার্ণব' রচনায় উভয়ের যোগাযোগের বিবরণ পাওয়া যায়।

"পণ্ডিতমহাশয় নানা অনুনয় করিয়া স্বদেশ হইতে তাঁহার পরিজনদের কলিকাতায় আনিতে গেছেন।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭৭) এই পত্রে উল্লিখিত পণ্ডিতমহাশয় সম্বন্ধে লিখেছেন (পৃ. ৫৬), "হরিচরণ পণ্ডিতমহাশয় অনুপস্থিত।" কিন্তু উল্লিখিত পণ্ডিতমহাশয় শিবধন বিদ্যার্ণব বলেই আমাদের অনুমান। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের কথা— গুণস্মৃতি' প্রবন্ধে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫০) লিখেছেন, "···আশ্রমে আসিয়া [শ্রাবণ/ভাদ্র ১৩০৯]···পণ্ডিত শিবধনকে তখন অধ্যাপনা করিতে দেখি নাই, আমি আসার পূর্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।" আমাদের অনুমান, বিদ্যালয়ে শিবধন অনুপস্থিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই পত্ররচনায়

সময়ে (৬ কার্তিক ১৩০৯) তিনি বিদ্যালয়ের কাজ চূড়ান্তভাবে ছাড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে মনে হয়, গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয়ে যোগ দিতে দেরি হওয়ায় শিবধন কুণ্ঠিত; দেশ (পূর্ববঙ্গ) থেকে পরিজনবর্গকে কলকাতায় আনার জন্য আরো সপ্তাহখানেক সময় তিনি প্রার্থনা করেন। কিন্তু শিবধন আশ্রমবিদ্যালয়ের কাজে আর যোগ দিতে পারেন নি।

আলোচ্য পত্রে উল্লিখিত 'পণ্ডিতমহাশয়' হরিচরণ হতে পারেন না— এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনো এভাবে উল্লেখ করেছেন এরকম দেখা যায় না, তাঁকে সর্বত্রই 'হরিচরণ' বলে উল্লেখ করতেই দেখা যায়।

"বাড়ীতে ব্যাম লইয়া আমি নড়িতে পারিতেছি না।"

এইসময় পত্নী মৃণালিনী দেবীর গুরুতর অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আবদ্ধ ছিলেন। ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ঘটে।

নরেন্দ্র। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। চন্দননগরের অধিবাসী নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পূর্বপরিচিত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। নরেন্দ্রনাথ ১৩১১ বঙ্গাব্দে বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে চলে যান, পুনরায় এই বছরের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে অল্প কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।

প্রেম। প্রেমানন্দ সিংহ, রায়পুরের সিংহ-পরিবার থেকে আগত বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র। পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন।

পত্র ৫। তারিখহীন। ৪-সংখ্যক পত্রের সংযোগে ও পত্রশেষে সোমবারের উল্লেখসূত্রে রচনাকাল নির্ধারণ করা করেছে।

সিংহ। রবীন্দ্রনাথ সিংহ, রায়পুরের অধিবাসী।

"Grant Duff's Mahrattas এবং Letters from a Mahratta Camp বই…"

Captain James Cunningham Grant Duff, *History of the Marathas.* (1826). Longman and Company, London.

Thomas Duer Broughton, *Letters from a Mahratta Camp.* (1813). John Murray, London.

অচ্যুত। অচ্যুতচন্দ্র সরকার। সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৪টি চিঠি সংকলিত হয়েছে 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পত্রের ১১ সংখ্যক সংকলনে (শ্রাবণ ১৩৯১) এবং অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা ৮ খানি সংগ্রথিত এই পত্রের পৌষ ১৩৯০, দশম সংকলনে।

সন্তোষ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬)। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষান্তে আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪১, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৪৯, শারদীয় দেশ ১৩৫০, ১৩৫৩ ইত্যাদি সংখ্যায় প্রকাশিত। সন্তোষচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে বেদনা পেয়েছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে মুদ্রিত পত্রে।

রেণুকা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকা দেবী (১৮৯১-১৯০৩)।

মীরা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯)।

শমী। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৬-১৯০৭)।

"হরিচরণ যে সংস্কৃত পাঠ লিখিতেছিলেন…"

'সংস্কৃত প্রবেশ' (১-৩ ভাগ)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (১৩৫৩ ?) গ্রন্থে এ-বিষয়ে লিখেছেন, "…কয়েক পৃষ্ঠা সংস্কৃত পাঠের পাণ্ডুলিপি গুরুদেব আমাদের দিয়ে বলেছিলেন, এটা দেখে এখন পড়াও, আর এই পদ্ধতি-অনুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আরম্ভ কর। সেই পাণ্ডুলিপির প্রণালী-অনুসারে আমি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ [?] সংস্কৃত প্রবেশ লিখেছিলাম।"

'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম ভাগের প্রথম প্রকাশকালে সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ যা নিবেদন করেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে সংকলিত হল—

"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃত শিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ সংস্কৃত প্রবেশ প্রথম কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।"

এই গ্রন্থ এককালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পত্র ৬। তারিখহীন। এই পত্রে বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষকে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্তারিতভাবে লেখার কথা বলেছেন, বর্তমান গ্রন্থে সেই পত্রখানি সংকলিত। ঐ পত্রের তারিখ ২৭ কার্তিক ১৩০৯,— এই সূত্র থেকে

আলোচ্য পত্রের রচনাকাল অনুমান করা হয়েছে।

“বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম— আপনি জগদানন্দ ও সুবোধ।”

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে পত্নী ও কন্যার গুরুতর পীড়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ বৎসর দুই বিদ্যালয় থেকে প্রায়ই দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। জমিদারি তত্ত্বাবধান উপলক্ষেও কখনো কখনো তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, এ-ছাড়া স্বদেশের নানা কর্মের আমন্ত্রণে যোগদান তো ছিলই। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে অস্ত্রোপচারের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন অর্শরোগে কষ্ট পেয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যেও অনেক সময় তাঁকে বিদ্যালয়ের কর্মভার থেকে মুক্তি নিতে হয়েছে।

এই-সমস্ত কারণে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের পরিচালন-দায়িত্ব বিশেষ কোনো শিক্ষক বা শিক্ষকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। ঐ সময়ে এবং পরবর্তীকালেও বিদ্যালয়-পরিচালন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের একটি বিবরণ এখানে দেওয়া গেল—

১৩০৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উপর অর্পণ করেন। ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে থাকা সম্ভব হত না বলে রেবাচাঁদই সমস্ত তত্ত্বাবধান করতেন, ব্রহ্মবান্ধব মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন থেকে পরামর্শ বা নির্দেশ দিয়ে যেতেন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতান্তরের ফলেই ব্রহ্মবান্ধব কয়েকমাসের মধ্যেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন, এবং রেবাচাঁদও ১৩০৯ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পর আর বিদ্যালয়ে ফিরলেন না। এর পর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ-অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

এইসময় পত্নীর গুরুতর পীড়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল কলকাতায় আবদ্ধ থাকতে হয়। দূর থেকে নির্দেশ দিয়ে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মের যথাযথ ও সুশৃঙ্খল চালনায় অসুবিধা বুঝে ১৩০৯ সালের পুজোর ছুটির পর রবীন্দ্রনাথ তিনজন শিক্ষকের এক 'অধ্যক্ষসভা' গঠন করে তাঁদের উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন।

এই ব্যবস্থা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। অচিরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে, বিশেষত, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর হওয়ায় 'অধ্যক্ষসভা' প্রায় অচল হয়ে পড়ে। তখন, ১৩০৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের শেষের দিকে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যম জামাতা, বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর পরিচালনার সম্পূর্ণ ও একক দায়িত্ব দিলেন।

এই ব্যবস্থাও যথেষ্ট কার্যকর হল না। অপরকে চালনা করার স্বাভাবিক ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথের তেমন ছিল না। শিক্ষক ছাত্র সেবক —সকলকে পরিচালনা করে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবিধানে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যর্থ হলেন। সেই পর্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকার আরোগ্যচেষ্টায়, প্রথমে হাজারিবাগ, পরে আলমোড়ায় অধিকাংশ সময় থাকায়, বিদ্যালয়ের কাজকর্মের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করতে পারছিলেন না। সেজন্য আলমোড়ায় থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনের উপর বিদ্যালয়ের অধ্যাপনবিধি-নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, মোহিতচন্দ্র সেন ও ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্তকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তার উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত করবেন ঠিক করলেন (দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ১৮-সংখ্যক পত্র, পৃ. ২৯)। কিন্তু দুর্গাদাস এই ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় তাঁর জায়গায় রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হলেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৫ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে

একটি চিঠিতে লিখছেন, "বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই।... তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও।"

এর অল্পকাল পর, ১৩১০ বঙ্গাব্দের শীতের ছুটিতে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের বসন্তরোগে বিদ্যালয় গৃহেই মৃত্যু ঘটে। এই সময় সাময়িকভাবে বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে প্রধান শিক্ষকরূপে মোহিতচন্দ্র সেন যোগ দেন। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "মোহিতবাবু আসিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।"

১৩১১ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পর পুনরায় বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে। মোহিতচন্দ্র ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধি, পাঠ্যসূচী এবং পাঠনব্যবস্থার বিধিবদ্ধ রূপদানে মনোনিবেশ করলেও শারীরিক কারণে তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আরো কয়েকমাস মোহিতচন্দ্র প্রধান শিক্ষকের পদে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথকেই এই সময় বিদ্যালয়-পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার কথা মোহিতচন্দ্রকে লেখা একাধিক চিঠিতে জানা যায়। এই সময় পূজাবকাশের মধ্যে ২১ আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দিলেন। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের সঙ্গে মোহিতচন্দ্রের কর্মসূত্র-যোগ এখানেই ছিন্ন হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য সাময়িকভাবে বিদ্যালয় থেকে চলে যান। সুস্থ হয়ে উঠেও, পরে আর তিনি কাজে যোগ দেন নি। সুতরাং আবার রবীন্দ্রনাথকেই পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতে হল।

অবশেষে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়

পরিচালনায় নির্বাচনপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বিদ্যালয়ের পরিচালকরূপে সর্বাধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি হল, শিক্ষণব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রকে আদ্য মধ্য ও শিশু— এই তিন ভাগে ভাগ করা হল। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন; তাঁরা শিক্ষণবিষয়ে সর্বাধ্যক্ষকে সাহায্য করতেন। সর্বাধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় অধ্যক্ষ সকলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এক বৎসরের জন্য অধ্যাপকসভা-দ্বারা নির্বাচিত। পরবর্তীকালে নির্বাচিত শিক্ষক-প্রতিনিধির সহায়তায় বিদ্যালয় পরিচালনার এই ব্যবস্থা আরো প্রসারিত হয়। তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'শান্তিনিকেতন' পত্রে বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য জানা যায়।

"রমাকান্তবাবুর ছেলে গেছেন আমি জানি। কুঞ্জবাবুর সঙ্গেও দুই একটি ছেলে যাইবে— ইহারাও বেতন দিবে।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনায় গুরুশিষ্যের প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হত না। বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বিবৃত করেছেন, তার মধ্যে দুটি সংকলিত হল—

"…এটি আমার মনে ছিল যে যারা আসবে তাদের সঙ্গে আমার দেনা পাওনার সম্পর্ক না থাকে— বিদ্যাদানকে ব্যবসায় করে তুললে শিষ্যদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে অন্তরায় ঘটে; ছাত্র মনে করে, আমি কিছু দিচ্ছি তার পরিবর্তে কিছু পাচ্ছি।…"[১]

"ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত,

---

১, প্রবাসী, ২৭ বৈশাখ ১৩৪৩। 'প্রাক্তনী'-গ্রন্থভুক্ত।

অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এ দিকে ও দিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল।…”[১]

এই পত্র রচনাকালে বিদ্যালয়ে বেতন গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত হলেও শিক্ষক ও কর্মীদের পুত্রকন্যা ও নিকট আত্মীয়েরা বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত, এ-ছাড়া স্বল্প-সংখ্যক ছাত্রকে অবৈতনিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হত।

অক্ষয়বাবু। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী সাহিত্যিক। ‘প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে’র অন্যতম সংকলক; ‘সাধারণী’, ‘নবজীবন’ ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর পুত্র অচ্যুত আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগের কথা জানা যায়। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২ অংশে (পৃ. ১৯৭), মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় অক্ষয়চন্দ্রের শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ক্লাসে যোগ দেওয়ার বিবরণটি উল্লেখযোগ্য।

“অক্ষয়বাবু বোধহয় বিরক্ত হইয়াছেন।”

অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পাঠানোর পর থেকেই

---

১. ‘যাত্রার পূর্বকথা’ নামে ১৩৩১ কার্তিক সংখ্যা ‘প্রবাসী’ পত্রে মুদ্রিত। ‘বিশ্বভারতী’ (১৩৫৮) গ্রন্থের ১১ সংখ্যক রচনা।

নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মতবিরোধ ঘটে। বিদ্যালয়ে প্রদেয় বেতনবিষয়ে, অচ্যুতের শিক্ষালাভবিষয়ে নানা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; শেষ পর্যন্ত অচ্যুত বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পূর্ণ করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যে ('রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ১০, পৌষ ১৩৯০) এর পরিচয় পাওয়া যায়।

"রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন।"
তৎকালে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের এন্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীদের ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুল্‌স-এর টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হত। বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক জগদানন্দ রায় কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন বলে, নানারকম সুবিধার কথা বিবেচনা করে রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবার প্রস্তাব হয়— এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ তা অনুমোদন করছেন। এই প্রসঙ্গে ৯-সংখ্যক পত্রের শেষাংশ (পৃ. ১৪) দ্রষ্টব্য।

"আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুশি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব। ঐতিহাসিক পাঠও আপনাকে লিখিতে হইবে।"
এই সময় বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থের বিশেষ অভাব থাকায়[১] রবীন্দ্রনাথ

গিরিডিবাসী সুধাংশুবিকাশ রায় সেকালে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক-তালিকা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা করায়, উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৭ ফাল্গুন ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লিখছেন, "পাঠ্যপুস্তকের তালিকা কেন চাহিতেছেন? পাঠ্যপুস্তক আছে কোথায় যে তালিকা দিব? ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে প্রত্যহ পাঠ্যপুস্তক তৈরি হইয়া উঠিতেছে।..."—'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ৯, শ্রাবণ ১৩৯০

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই অভাব পূরণে নূতন ধারায় পাঠ্যগ্রন্থ রচনার জন্য প্রথমাবধি বিশেষ উৎসাহ দান করেছেন। এ ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কিশোরপাঠ্য বই লেখার জন্যও শিক্ষকদের বিভিন্ন সময়ে উৎসাহিত করেছেন। এ-রকম কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংস্কৃত প্রবেশ', জগদানন্দ রায়, 'গ্রহনক্ষত্র', 'পোকামাকড়', 'বিজ্ঞানের গল্প', 'গাছপালা' প্রভৃতি; সতীশচন্দ্র রায়, 'গুরুদক্ষিণা'; অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'খ্রীষ্ট'; শরৎকুমার রায়, 'শিখগুরু ও শিখজাতি', 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' ইত্যাদি; সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, 'হজরত মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা'।

এই চিঠিতে মনোরঞ্জনকে রবীন্দ্রনাথ যে-যে বই লেখার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নি বা মুদ্রিত হয় নি।

"British India নামক একটি চটি বই পাইয়াছি…"।
W. H. Davenport Adams -লিখিত *The Makers of British India* গ্রন্থ।

কুঞ্জঠাকুর। আশ্রম-বিদ্যালয়ের পাকশালার তৎকালীন পাচক।

পত্র ৭। "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না।"
ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের সূচনাকালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মচারীদের আদর্শে জীবন যাপন করতে হত। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই প্রাচীন হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্মের আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে চলতেন। শিক্ষার্থীরা সকালসন্ধ্যা কাষায় বস্ত্র পরে

উপাসনায় বসত, গায়ত্রীমন্ত্র ধ্যান করত, উপাসনা শেষে সমবেত হয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করত। প্রাতঃকালে উপাসনার পর ছাত্ররা শিক্ষকদের পদধূলি নিয়ে প্রণাম করে গাছের তলায় নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পাঠগ্রহণের জন্য বসত। রান্নাঘরে খাবার সময় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ছাত্র শিক্ষক আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বসতেন। ব্রাহ্মণ-পাচক ও ব্রাহ্মণ-কর্মী আহারার্থীদের পরিবেশন করত।

অব্রাহ্মণ কুঞ্জলাল ঘোষ শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ায় সমস্যার উদ্‌ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বর্ণাশ্রম-সমাজের এই সংকীর্ণ আচার ও আচরণবিধি অন্তরের মধ্যে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৯ ও ১৬ কার্তিক, তৎকালীন সর্বাধ্যক্ষ নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশদুটি[1] তাঁর মনোভাব পরিবর্তনের পরিচয় দেয়—

“…একজন মুসলমান-অভিভাবক ছাত্র দিতে চান। আমিও লইতে ইচ্ছা করি। ছেলেটির বয়স অল্পই, আমি লিখিয়াছিলাম তাহার জন্য চাকর ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার, তাহার যে উত্তর পাইয়াছি তাহা পাঠাই। এ ছেলেটিকে যদি আপনারা লওয়া স্থির করেন তবে অভিভাবককে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না— যদি সুবিধা বোধ না করেন তাহাও লিখিবেন।”

“মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একটি চাকর দিতে তাঁহার পিতা রাজি অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাঁহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে একত্র খাইবেন। শুধু তাই নয়— সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে এক ঘরে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যূথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা শুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি-

---

[1] দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩, পৃ. ৩৩৬-৩৭

পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শালবাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটিকয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্রে রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? একসঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না? চাকর রান্নাঘর হইতে কয়েকজনের খাওয়া আনাইয়া শালবাগানে খাওয়াইয়া যাইবে। যে কয়জন তাহার সঙ্গে একত্রে খাইতে সম্মত তাহারা নিজের বাসন নিজে মাজিবে। ছেলেদের পক্ষে এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত সাধনা উপকারজনক। প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু-মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা। আবার একবার বিবেচনা করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে আপনাদের আশ্রমদ্বারে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন না— যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র ভগবান তাঁহার নাম করিয়া প্রসন্নমনে নিশ্চিন্তচিত্তে এই বালককে গ্রহণ করুন; আপাতত যদি বা কিছু অসুবিধা ঘটে সমস্ত কাটিয়া গিয়া মঙ্গল হইবে।…"

পত্র ৮। তারিখহীন। কুঞ্জলাল ঘোষকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে যে-সব সমস্যা ও অশান্তি দেখা দিয়েছিল, এই চিঠিতে সেই ঘটনাজনিত ক্ষোভ লক্ষ করা যায়। ৯-সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার ভার তাঁর জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর ন্যস্ত করার কথা মনোরঞ্জনকে ২০ পৌষ ১৩০৯ তারিখে জানাচ্ছেন। ৭-সংখ্যক চিঠিতে (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯) রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনকে লিখছেন, "আগামী সোমবারে প্রাতের ট্রেনে বোলপুরে যাইব।" এর থেকে অনুমিত হয়, বর্তমান পত্র সত্যেন্দ্রনাথের উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার দেওয়ার আগে লেখা। সম্ভবত

শান্তিনিকেতন থেকে এই পত্র কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় প্রেরিত হয়। ডিসেম্বরের শেষভাগে পত্রটি রচিত, অনুমান করা চলে।

“যেভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ প্রশান্ত করিয়া কার্য্যপ্রণালীকে পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা ছিল অতিথি থাকাকালে তাহার অবসর পাওয়া অসম্ভব।”

এই পত্ররচনার কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে নিয়ে ‘অধ্যক্ষসমিতি’ গঠন করেন, মনোরঞ্জনকে সভাপতি ও কুঞ্জলাল ঘোষকে ‘কর্মসম্পাদকে’র পদে মনোনয়ন করেন। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিস্তারিত নিয়মাবলী লিখে পাঠান, এই গ্রন্থের ৬-সংখ্যক পত্রে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যাশা নিয়ে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, তা সফল হয় নি। বিদ্যালয়ের কর্মী ও অধ্যাপকগণের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তি দেখা দেয়। বর্তমান পত্রে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ এই কারণেই।

পত্রে যে অতিথিপ্রসঙ্গ আছে, সেই অতিথি জগদীশচন্দ্র বসু ও হেমচন্দ্র মল্লিক। জগদীশচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আসার খবর তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, হেমচন্দ্রের আগমন-সংবাদের সূত্র ক্যাশবহির হিসাব। সম্ভবত পৌষ-উৎসবের কিছুদিন পরই তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

পত্র ৯। সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকার স্বামী। সত্যেন্দ্রনাথ L.M.S. ডিগ্রিপ্রাপ্ত অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক ছিলেন। রেণুকার সঙ্গে বিবাহের পরই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে পাঠান। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বে বিভিন্ন সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ

শিক্ষকতা করেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল তাঁকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার দায়িত্বও দিয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্র-রেণুকার বিবাহ-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কথা লিখেছেন (চিঠিপত্র ৬, পত্র-সংখ্যা ১৬)। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী সত্যেন্দ্রপ্রসঙ্গে 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৯৭৫, পৃ. ১৩-১৫) লিখেছেন—"আমাদের ভগিনীপতি সত্যবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থপরিবারে মানুষ হয়েছিলেন, তাই বিদেশ গিয়ে তাদের আদব কায়দা তাঁর ভালো লাগল না। বাবা যখন সত্যবাবুর কাছে তাঁর চলে আসার কারণ শুনলেন তখন তাঁর জন্য বিরক্ত হন নি ; বরং সত্যবাবুর জন্য একটা মায়া হল, সফল হয়ে আসতে পারলেন না বলে। পরে বাবা তাঁকে শান্তিনিকেতনে কাজ দিয়েছিলেন। সেখানে সত্যবাবু বেশ খুশিতে ছিলেন। রানীদি তখন বেঁচে নেই, তা হলেও আমাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন কখনো ছিন্ন হয় নি। দুঃখের বিষয়, তিনিও বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর ছাত্রদের বাসের জন্য 'সত্যকুটির' নামে একটি বাসগৃহ তৈরি হল।"

"আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি—"
নানা সময়ে বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থা বিষয়ে ৬-সংখ্যক পত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে (দ্র. পৃ. ২৩১) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

"পূবদিকে যে ভিত পত্তন করা হইয়াছে···।"
পূর্ববর্তী বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের, বর্তমান পাঠভবন-দপ্তরের পূর্বদিকের ঘরটির (বর্তমানে ঐ বাড়ির দোতলায় ওঠার বাঁ দিকের ঘর) ভিত্তিস্থাপনার প্রসঙ্গ।

“আপনারা কৃষ্ণনগরে স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়াছেন⋯।”

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ৬-সংখ্যক পত্রের টীকা ‘রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন।’ (পৃ. ২৩৫)।

পত্র ১০। “গত সোমবারে রথী ইনস্পেক্টার আপিসে গিয়া তাহার দরখাস্ত সহি করিয়া আসিয়াছে।”

দ্রষ্টব্য, ৬ সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ. ২৩৫)।

বিদ্যার্ণব। শিবধন বিদ্যার্ণব। আশ্রমবিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক।

দ্রষ্টব্য ৪ সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ. ২২৫-২৭)।

পত্র ১০। লরেন্সসাহেব। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের গৃহবিদ্যালয়ের শিক্ষক। ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, “এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না।⋯”[1]

শিলাইদহের বসবাস উঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনার পূর্বেই লরেন্সকে বিদায় দিয়েছিলেন। কিন্তু লরেন্স যাতে অন্যত্র উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন তার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ত্রিপুরার রাজকর্মচারী কর্নেল মহিম ঠাকুরকে ১৮ ভাদ্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দে লেখা এক চিঠিতে[2] রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “আমাদের শান্তিনিকেতন বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলায় ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরাজি অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার, তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ

---

১. ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লরেন্সের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

২. ‘রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা’ [১৩৪৮], পৃ. ১০৮।

আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখন ছাড়িতে চায় না কিন্তু উপায় দেখি না।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষেই রবীন্দ্রনাথ লরেন্সকে বিদ্যালয়ের ইংরাজি শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন। ৮ মাঘ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন, "লরেন্সসাহেব আগামী মার্চ্চ মাসে বোলপুরে যাইবে।" এর অল্প কিছুকাল পরে, ১৯ চৈত্র ১৩০৯ হাজারিবাগ থেকে দীনেশচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "সেখানে [শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে] ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্ম একজন ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়াছি কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া আসিতে পারি নাই সেইজন্ম মন উদ্বিগ্ন আছে।"

লরেন্স শান্তিনিকেতনে বেশিদিন থাকেন নি। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮) গ্রন্থের পরিশেষে আশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যাপকদের যে তালিকা দিয়েছেন সেখানে ১৩০৯ থেকে ১৩১১ বঙ্গাব্দকাল পর্যন্ত যে-সমস্ত অধ্যাপক এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন তাঁদের সঙ্গে লরেন্সের নামও অন্তর্ভুক্ত আছে।

মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা ২০ আষাঢ় ১৩১১ (৪ জুলাই ১৯০৪) এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "লরেন্সকে জিজ্ঞাসা করবেন বোলপুরেই যদি আবদ্ধ রাখি তাহলে কত টাকা বেতনে সে থাকতে রাজি হয়। তার যাতায়াতেই অনেক টাকা মাশুল খরচ পড়ে যাবে— তার উপর বেতন যা দাবী করবে সেটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে মন্দ হবে না। জর্মান উচ্চারণটা আপনারা ভাল করে দোরস্ত করে নেবেন।"

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে ২৩ কার্তিক ১৩১১ (৮ নভেম্বর ১৯০৪) তারিখে দেখা যায়

নরেন্দ্রকে দেওয়া কিছু অর্থের হিসাব (‘নরেন্দ্র সাহেবকে দেওয়া ২৲’)। সম্ভবত, নরেন্দ্র ১৩১১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে চলে যান।

“আমি মাঘের শেষ সপ্তাহে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িব—”
মধ্যমা কন্যা রেণুকার অসুস্থতার সূত্রপাত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এইসময় ভ্রমণে বের হওয়া সম্ভবপর হয় নি।

পত্র ১১। তারিখহীন। ৮ মাঘ ১৩০৯ তারিখ লেখা .পত্রে (১০ সংখ্যক) ‘সত্যেন্দ্রের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি’ এবং বর্তমান পত্রের ‘আপনার আবেদনপত্রখানি আমি সত্যর নিকট পাঠাইয়া দিলাম…’ প্রধানত এই দুই বিবরণের বিচারে এই পত্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘের অব্যবহিত পূর্বে লেখা বলে অনুমান করা যায়।

“আমি পণ্ডিতমহাশয় ও সতীশকে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।”

সতীশ। সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪)। বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রামের জমিদারবংশীয় অখিলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফ.এ. পাস করার পর কলকাতায় বি.এ. পাঠরত অবস্থায় তাঁর সুহৃদ অজিতকুমার চক্রবর্তীর সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এর অনতিকালের মধ্যেই সতীশচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। এখানে আসার এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই অকালপ্রয়াত প্রতিভাবান তরুণ শিক্ষকের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার স্মরণ করেছেন।

সতীশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পুলিনবিহারী সেনের তত্ত্বাবধানে সংকলিত, প্রকাশিতব্য ‘সতীশচন্দ্র রায়’ গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত

পরিচয় পাওয়া যাবে।

বর্তমান পত্রে পণ্ডিতমহাশয় ও সতীশকে রবীন্দ্রনাথ যে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দেবার কথা লিখেছেন, সেরূপ গল্প কোথাও মুদ্রিত হয়েছে বলে জানা নেই। পণ্ডিতমহাশয় অর্থাৎ শিবধন বিদ্যার্ণবের লেখা প্রবন্ধাদির সন্ধান পাওয়া যায়। সতীশচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই সংকলিত হয়েছে অজিতকুমার চক্রবর্তী -সংকলিত 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' (১৩১৯) গ্রন্থে। রচনাবলীতে অসংকলিত, সাময়িকপত্রে প্রকীর্ণ রচনাগুলির মধ্যেও প্রকৃত গল্পের সন্ধান পাওয়া গেল না।

"রেণুকা কলিকাতায় আসিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকা (রানী) (১৮৯০-১৯০৩) অসুস্থ হওয়ায় এইসময় সম্ভবত তাঁকে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ফেরার প্রসঙ্গ এই চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭) গ্রন্থে লিখেছেন, "ক্রমশ যখন রানীর অসুখ ধরা পড়ল তখন শুনেছি নাটোরের মহারাজা তাঁকে মধুপুরে নিয়ে যান। অমলা দাসের পরিচর্যা আর হাওয়াবদলের গুণে তার বেশ উপকার হয়েছিল।"

"আমার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র যাইবে। তাহার মধ্যে A.M. Bose-এর ছেলে একটি।"

A.M. Bose, প্রখ্যাত আইনজীবী ও দেশনেতা আনন্দমোহন বসু। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র, জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়, অরবিন্দমোহন বসু (১৮৯৫-১৯৭৭) ছাত্ররূপে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইসময় আসেন নি। কয়েকদিন পরে, ২৩ মাঘ শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

অরবিন্দমোহন পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচনার অন্যতম প্রধান ইংরেজি অনুবাদকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে,

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও প্রবন্ধ-সংকলন 'শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ' (১৩৮৮) গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২ অংশে (পৃ. ১৫০-৫৬)।

পত্র ১৩। "এখানে আসিয়া অবধি আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"
পীড়িত কন্যা রেণুকাকে নিয়ে, বায়ুপরিবর্তনে পীড়া উপশমের আশায় রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে হাজারিবাগে গিয়েছিলেন।

নগেন্দ্রের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সহধর্মিনী নির্মলনলিনী (নলিনীবালা) দেবী।

পিসিমা। রাজলক্ষ্মী দেবী, মৃণালিনী দেবীর দূর সম্পর্কিত পিসিমা।

"পথটি এমন যে ইচ্ছা বা আবশ্যক হইবামাত্রই যে দৌড় দেওয়া যায় এমন জো টি নাই।"
এই পত্ররচনাকালে, গিরিডি পর্যন্ত রেলযোগে যাওয়া সম্ভব ছিল। সেখান থেকে পুস্‌পুস্‌ বা মানুষে-টানা গাড়িতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে হাজারিবাগে পৌঁছানো যেত।

পত্র ১৪। "আমি ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি।"
হাজারিবাগে রেণুকার পীড়ার উপশম না হওয়ায় চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কলকাতায় আসেন, সঙ্গে মীরা দেবী ও শমীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসেন। মীরা দেবীকে কলকাতায় রেখে শমীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে যান, সেখানে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে কলকাতা ফিরে আসেন।

"আপনি কুষ্টিয়া গেছেন শুনিয়া খুসি হইলাম—"
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে চলে যাবার পর

বেশ কিছু কাল কোনো স্থায়ী কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিরূপ উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তা তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিতে জানা যায়। কুষ্টিয়াতে মনোরঞ্জন কিছুকাল ওকালতি-কর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেষ্টা করেন। এইসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নানাভাবে আনুকূল্য করতে সচেষ্ট ছিলেন, পরবর্তী কয়েকখানি চিঠির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পত্র ১৫। অসুস্থ কন্যা রেণুকাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে হাজারিবাগ যান। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি না হওয়ায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে, বৈশাখের শেষভাগে রেণুকাকে নিয়ে আলমোড়া যাত্রা করেন। বর্তমান পত্র রচনার কাল ১৩১০— এই হিসেবে স্থির হয়েছে।

"আপনাদের Trinity-র মধ্যে কেবল জগদানন্দ অবশিষ্ট রহিলেন—" শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের তিনজন শিক্ষক জগদানন্দ রায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার।

নরেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বৈদ্যবাটিতে কাজ পেয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এইসময় তিনি পুনরায় আশ্রম বিদ্যালয়ে ফিরে আসতে উৎসুক ছিলেন।

পত্র ১৬। "রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের কষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে।"
রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসুস্থ কন্যাকে নিয়ে আলমোড়া যাত্রাকালে, পথে কষ্টভোগের যে বিবরণ গিরিডি-নিবাসী সুধাংশুবিকাশ রায়কে ২৭ বৈশাখ [১৩১০] তারিখে লেখা চিঠিতে দিয়েছিলেন, এখানে তা উদ্ধৃত হল—

"সুদীর্ঘ পথে বিচিত্র রকমের দুঃখভোগ করা গেছে। প্রথমত মধুপুর ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম ষ্টেশনমাষ্টার আশ্বাস দিলেন বম্বাইমেলের সঙ্গে আমাদের গাড়ি জুড়িতেও পারেন। অবশেষে টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলেন এত অল্প সময়ের চেষ্টায় তাহা সম্ভবপর হইবে না।

মোগলসরাই যখন পৌঁছানো গেল ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন আমাদের গাড়ি মেলে যাইবে না, প্যাসেঞ্জারে জুড়িয়া দিবেন। আমি বলিলাম, কেন এমন শাস্তি? ষ্টেশনমাষ্টার কহিলেন তিনি কোনপ্রকার টেলিগ্রাফ পান নাই। আপনার গিরিধি ষ্টেশনের বাঙ্গালীপ্রভু, হয়, কোন কর্ম্মের নয়, নয় তাহাকে কেহই আমল দেয় না— একে ত সেখানেই তিন দিন গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম তাহার পরে পথে শুনিলাম কেহ কোনপ্রকার খবর পায় নাই। যে সময় বেরিলি পৌঁছিবার কথা তাহার বারো ঘণ্টা পরে পৌঁছিলাম। সেখানে একদিনও অপেক্ষা না করিয়া সেইদিনই কাঠগোদামে আসিতে হইল— সেখানে না পাইলাম থাকিবার জায়গা, না পাইলাম আলমোড়া যাইবার কুলি— সেই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে অনাহারে রেণুকাকে লইয়া এক্কায় চড়িয়া রাণীবাগ নামক এক জায়গায় ডাক বাংলায় গিয়া কোনমতে অপরাহ্ণে আহারাদি করা গেল। যাহা হউক্‌ পথের সমস্ত কষ্ট বর্ণনা করিয়া কি হইবে? কোন প্রকারে গম্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—"

সমালোচনী। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা মজুমদার লাইব্রেরি থেকে এই মাসিক পত্রটি শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের এবং শান্তিনেকেতন বিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৭। "সুবোধ ত চলিয়া গেছেন— আপাতত শান্তিনিকেতনের

বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।”

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয় সুবোধচন্দ্র মজুমদার ১৯০২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকহিসেবে যোগ দেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকর্মে ধৈর্যসহকারে তিনি থাকতে পারেন নি। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে চারজন শিক্ষকের কথা লিখেছেন, তাঁরা হলেন— জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায় ও কুঞ্জলাল ঘোষ। বিদ্যালয়ে আরো তিনজন শিক্ষক আনাবার যে প্রসঙ্গ আছে, তাঁরা সম্ভবত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও গোপালচন্দ্র কবিকুসুম। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র সেনের পত্রাবলীর মধ্যে এই সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়।

মোহিতবাবু। মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী ন'টি খণ্ডে কাব্য-গ্রন্থ নামে সম্পাদনা করেন। মোহিতচন্দ্রের স্মরণে রবীন্দ্রনাথ ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ (১৯১৭) গ্রন্থের ‘বন্ধুস্মৃতি’ অধ্যায়ে এবং অন্যত্র তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মোহিতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগের বিবরণ দিয়েছেন পুলিনবিহারী সেন ‘সম্পাদক ও কবি’ নিবন্ধে (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮)।

পত্র ১৮। পত্ররচনার তারিখ নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে অনুমিত— মোহিতচন্দ্র আলমোড়া ত্যাগের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ তারিখে এক পত্রে তাঁকে লিখেছেন, “আপনি তো আমাদের ঝরনার জলের রাজ্য হইতে কলের জলে[র] দেশে গেলেন…”।

মোহিতচন্দ্র আলমোড়ায় ১৩১০ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২০ জ্যৈষ্ঠ

কাটিয়ে আসেন। বর্তমান পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "কাল মোহিতবাবু যাইবেন…"। পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবারের উল্লেখ করেছেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ছিল।

"কুঞ্জবাবুর প্রতি আপনার চিত্ত যেরূপ একান্ত বিমুখ হইয়াছে …।" কুঞ্জলাল ঘোষের সঙ্গে বিরোধই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তিনিকেতন ত্যাগের প্রধান কারণ। মনোরঞ্জনের মনে এ রকম ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জলালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। এই ধারণা তাঁর মনে কীভাবে হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মনোরঞ্জনের লেখা 'Santiniketan Reminisences|A vignette'[১] শীর্ষক পুস্তিকায় (প্রকাশ ১৫ অগস্ট ১৯৩৯) এই মন্তব্যে অনেকখানি পরিস্ফুট হবে—"A certain individual once happened to speak against me to him [Rabindranath] in private. He was deeply annoyed but would not tell me why."

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ তাঁর পরলোকগত পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী আমাদের লিখে পাঠিয়েছেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল—

"বাবা শান্তিনিকেতনে যোগদানের কিছু পর কুঞ্জলাল ঘোষ আসেন। তিনি ছাত্রদের ও রবীন্দ্রনাথের কাছে বাবাকে ব্রাহ্মধর্মবিরোধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। গুরুদেবের আচরণেও বাবা কিছু শীতলতার আভাস পান।… বেদনাহত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতন পরিত্যাগের চিন্তা শুরু করেন। কবির কাছে কুঞ্জলাল আরো অভিযোগ করেন যে, সতীশচন্দ্রের

---

[১] বঙ্গানুবাদ শ্রীনিরঞ্জন সরকার-কৃত "শান্তিনিকেতন-স্মৃতি। একটি চরিত্রচিত্র: কবি", *Visva-Bharati News*-এর May-June 1981 সংখ্যায় প্রকাশিত। মূল রচনাটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্যচর্চায় বাধা দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর কাজের ভার অতিরিক্ত করে দিয়েছেন।…"

কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে মনোরঞ্জনের ধারণা যে অমূলক, তাঁকে লেখা এই গ্রন্থের ১৩-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

পত্র ১৯। পত্রশেষে রবীন্দ্রনাথ রেণুকার মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন। আলমোড়া থেকে ফিরে রেণুকার মৃত্যু ঘটে ২৮ ভাদ্র ১৩১০ তারিখে। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির শেষে ১৩১১ বঙ্গাব্দ উল্লেখ করেছেন, যা স্পষ্টতই লিপিপ্রমাদ। ১৩১১ স্থলে ১৩১০ ধরতে হবে।

"…আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্বলতা আপনার কর্ম্মপরিত্যাগের কারণ।"
১৮-সংখ্যক পত্রপরিচয়ে এই বিষয়টি আলোচিত।

"…সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।"
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা নিতান্তই ক্ষুদ্র আকারে —জন ছয় ছাত্র সম্বল করে। বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। দেশবাসী এই বিদ্যালয় বিষয়ে হয় বিরূপ অথবা উদাসীন ছিলেন। সেই সময়ের বিদ্যালয়ে যে-সমস্ত ছাত্র এসেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যে-সব ছেলে এসেছিল তারাও যে সব রত্ন তা নয়; কোথাও যাদের গতি নেই, বাপ-মা ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে তারাই প্রথমে এসেছিল এখানে। একজন অভিভাবক আমাকে বলেছিলেন তাঁর ছেলের সম্বন্ধে, 'এ অত্যন্ত অবাধ্য, এ'কে যথাসাধ্য মারবেন, আমি খাটের খুরোতে বেঁধে এ'কে মেরেও কোনো ফল পাইনি তাই আপনার হাতে দিচ্ছি।' কোনো কোনো ছাত্র এমন দুর্দান্ত ছিল যে

তারা সাপ দেখলেই ধরতে চাইত, কেউ তালগাছের চূড়ায় উঠে বসে থাকত— সেখান থেকে পড়েও মরে নি।"[1]

বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কর্মরত শিক্ষকগণের অধিকাংশও অন্তরে সংশয় পোষণ করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর আশা জাগ্রত ছিল; সেই আশার পরিচয় বর্তমান পত্রে পরিস্ফুট।

পত্র ২১। "…তাহাদিগকে সুসংবাদ জানাইলাম।"
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ।

পত্র ২২। "দীনেশবাবুর প্রবন্ধ অত্যন্ত অযোগ্য হইয়াছে।…"
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রের তৃতীয় বর্ষ, মাঘ ১৩১০ সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'সাহিত্যের আদর্শ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের প্রসঙ্গ। দীনেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসমাজে মানবপ্রকৃতির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ও বৈপরীত্য কল্পনা করেছেন। প্রবন্ধের পরিশেষে তাঁর মন্তব্য, "তাঁহার [সেক্সপীয়রের] কবিতা উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলে না। কতক পরিমাণে বর্ব্বরযুগের দম্ভ, তেজ ও অহঙ্কারের ছায়া পড়িয়া তাঁহার কাব্য ও নাটকগুলিকে রাজসিক গুণের আধার করিয়াছে। উহাতে চূড়ান্ত প্রতিভা আছে, কিন্তু উদ্দাম প্রতিভার শাসন নাই— উঁহাতে মানবপ্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতা ও অদম্য লীলা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা শীলতা ও স্বভাবনম্রতায় ভূষিত হইয়া লোকহিতকর হয় নাই।… আমাদের মহাকাব্যগুলির ভিত্তি সংযম, উহারা সাত্ত্বিকগুণের শুভ্রদীপ্তিতে সমস্ত অদ্ভুত ঘটনাকে কল্যাণের

১, প্রাক্তনী, পুনর্মুদ্রণ ৭ পৌষ ১৩৮৬, পৃ. ১৮

মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেখাইতেছে। মনে হয়, সেই সকল কাব্য সমাজের যে স্তর উদ্‌ঘাটন করিয়াছে— শেক্সপীয়র-বর্ণিত সমাজের স্তর তাহার বহু নিম্নে।…"

এই ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের কাছে 'অত্যন্ত অযোগ্য' বলে মনে হয়েছিল।

"এখানে বিদ্যালয় তুলিয়া আনিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আছি।" ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বিদ্যালয়ের শীতের ছুটির মধ্যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং বিদ্যালয় গৃহেই তাঁর মৃত্যু হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। রোগ সংক্রমণের আশঙ্কায়, মাঘ মাসের শেষের দিকে, শীতকালীন ছুটির শেষে বিদ্যালয় সাময়িকভাবে শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। গ্রীষ্মাবকাশের পর, ১৩১১ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, বিদ্যালয় পুনরায় শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হয়।

"মোহিতবাবু কাজে যোগ দিয়াছেন।" বিদ্যালয় শিলাইদহে সাময়িকভাবে নিয়ে যাওয়ার পর মোহিতচন্দ্র সেন প্রধান শিক্ষকরূপে কাজে যোগ দেন (১৩ ? ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। পরে, বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনলে মোহিতচন্দ্রও সেখানে আসেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য মাস দুইয়ের মধ্যেই তাঁকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে হয়। এর পর কিছুকাল প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁর নাম থাকলেও কোনো প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

১৩১১ বঙ্গাব্দে পূজাবকাশের মধ্যে, আশ্বিন মাসে, মোহিতচন্দ্রের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে ৬-সংখ্যক পত্রপরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৩। "আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল··· "

সতীশচন্দ্র রায় ছাত্রদের নানাভাবে সাহিত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন ; রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর রচনায় তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। সতীশচন্দ্রের মনে বিদ্যালয় থেকে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের ইচ্ছা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু ঐ সময় তা সম্ভবপর হয় নি ; পরবর্তীকালে সেই ইচ্ছা সার্থক হয়। যতদূর জানা যায়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পাদিত 'শান্তি'ই প্রথম হাতে-লেখা পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩১৪। এই ধরনের আরো কয়েকটি ছাত্র-সম্পাদিত পত্রিকার উল্লেখ করা গেল— প্রভাত (১৩১৬), বাগান (১৩১৭), আশ্রম (১৩১৭), কুটির (১৩১৭), The Ashram (১৩২০) ইত্যাদি।

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরং···

কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত শ্লোক। পত্রে উদ্ধৃত 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্' অংশ পরবর্তী শ্লোকের দ্বিতীয় পাদ।

পত্র ২৫। শরৎ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার স্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

পত্র ২৬। "আমি ইতিমধ্যে বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণ করিয়া···।"

বুদ্ধগয়ায় এই ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা সহযাত্রী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য যদুনাথ সরকার। রথীন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদারও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' অধ্যায়ের প্রথমাংশে এই ভ্রমণের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন।

"বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল।"
মোহিতচন্দ্র সেন প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন বিদ্যালয়ে কিছু নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক বয়স্ক ছাত্র নিয়েছিলেন। এই ছাত্ররা বিদ্যালয়ে অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয় থেকে যাওয়ার পরই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে ভবিষ্যতে বয়স্ক ছাত্র আর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় থেকেই বারো বছরের অনধিক বয়সের ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি না করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

নগেন্দ্র। নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক।

পত্র ২৭। "ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আপনার কাছে সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে—"
রবীন্দ্রনাথ 'পাগল' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১১, 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থভুক্ত), সে সম্বন্ধে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে কোনো আলোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র।

"সুখং বা যদি বা দুঃখং…"
'মহাভারত' শান্তিপর্বের (১৭৪.৩৯) অন্তর্গত শ্লোক।

পত্র ২৮। "মোহিতবাবু ত বোলপুরে যাচ্ছেন না। দীনেশবাবুকে নিচ্ছি।"
মোহিতচন্দ্র সেন ১৩১১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়মাসে শারীরিক কারণে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা চলে আসেন। বর্তমান গ্রন্থের ২২-সংখ্যক পত্র-পরিচয়ে মোহিতচন্দ্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মোহিতচন্দ্রের পক্ষে নানাকারণে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আর যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি, এই সময় রবীন্দ্রনাথকে পরিচালন-দায়িত্ব নিতে

হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই দায়িত্বভার দীর্ঘকাল বহন করা তাঁর শারীরিক ও অন্যান্য কারণে সম্ভব ছিল না। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে এইজন্যই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু, ১ অগ্রহায়ণ ১৩১১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখছেন, "সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক বেশি শিক্ষক সঞ্চিত হয়েছে। অতএব এখন আপনি এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হবেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে আপনাকে জানাব।"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে দীনেশচন্দ্রকে পেতে বিশেষ আগ্রহী থাকলেও দীনেশচন্দ্রের পক্ষে সেখানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

পত্র ২৯। ৩০-সংখ্যক পত্রে অধ্যাপকগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য-আলোচনা-সভার বিবরণ আছে। বর্তমান পত্রে এই সভার যে প্রসঙ্গ আছে, তা পরবর্তী পত্রের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণের পূর্বে লিখিত, এই অনুমানে পত্রের কাল নির্ধারণ করা হয়েছে।

"আজকাল আমাদের সভা বেশ জমজমাট—"

এই সায়ংকালীন সভা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮) গ্রন্থে লিখেছেন, "[রবীন্দ্রনাথ] অধ্যাপকদিগের প্রত্যেককে অধ্যয়নে অনুশীলনে ও রচনাকার্যে উৎসাহ দিলেন, যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ তাঁহাকে সেই বিষয়ে পুস্তক আনাইয়া দিয়া পরামর্শ দিয়া আলোচনা করিয়া সেই অনুরাগকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া দিলেন। অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি সায়ংসভা গঠিত করিলেন— তাহাতে নানাবিষয়ে আলোচনা এবং পাঠ হইত। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রধর্ম সকল বিষয়ে পাঠ এবং কথাবার্তা হইত…।"

জগদানন্দ রায় 'স্মৃতি' প্রবন্ধে ('শান্তিনিকেতন পত্র', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

লিখেছেন, "...মোহিতবাবু আসিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ এই সভায় পড়িয়াছিলাম। গুরুদেব এই সভায় আসিয়া বসিতেন। সতীশবাবু যখন আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি সাহিত্যের আসরখানিকে রচনাপাঠে মশগুল রাখিতেন। গুরুদেব যে সকল প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহার প্রথম প্রসাদ এখনকারই মতো আমাদেরই ভাগ্যে জুটিত।... তার পরে পূজনীয় বড়বাবু মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া অধ্যাপকদিগকে লইয়া বৈঠক করিতেন। তাহাতে সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইত, তাহা অধ্যাপকদিগকে কম উপকৃত করে নাই।..."

এই ধরনের সভায় রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু আলোচনা পরবর্তীকালে কেউ কেউ অনুলিখন করেছেন।

পত্র ৩০। "আমার স্কন্ধে 'ভাণ্ডার' বলিয়া এক কাগজ পড়িয়াছে দেখিয়াছেন ত?"

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেছেন। এ ছাড়া, প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদনা-দায়িত্ব না নিলেও অনেকগুলি সাময়িকপত্র-সম্পাদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে তিনি 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[1] এইকালে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রেরও তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে চৈত্র ১৩১৩, দু বছর রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় 'ভাণ্ডার' নিয়মিত বের হয়। তৃতীয় বর্ষের দুটি সংখ্যাও (বৈশাখ ১৩১৪, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৪) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বের হয়েছিল। কার্তিক ১৩১৪ থেকে ভাণ্ডারের নবপর্যায় ও চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'ভাণ্ডার' পত্র একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। এই পত্রিকায় বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্তা আলোচিত হয়েছে। প্রথম বছর (বৈশাখ ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ একাই সম্পাদনার দায়িত্বভার বহন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে প্রমথনাথ চৌধুরী যোগ দেন।

কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্‌যোগে ও অনুপ্রাণনায় রবীন্দ্রনাথ, ভাণ্ডারের সম্পাদন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে, 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে এই পত্রিকা প্রকাশে কেদারনাথের লক্ষ্য সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বিলাতী-বর্জন, স্বদেশীদ্রব্যনির্মাণ ও প্রচার তাহার [কেদারনাথের] তদানীন্তন জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। এই সদুদ্দেশ্যে ৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপনা করা হইয়াছিল। তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিলেন শুধু দেশী পণ্যের বিপণী খুলিলেই চলিবে না; দেশের লোককে স্বদেশীভাবাপন্ন করিবার জন্ত সাহিত্য ও শিক্ষার মধ্য দিয়া উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতে হইবে।

"এই কাজে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তিনি দেশে দেখিতে পাইলেন না…"

কাব্যগ্রন্থাবলী। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত, নয় খণ্ডে প্রকাশিত কাব্য-সংগ্রহ। প্রকাশকাল, ১৯০৩-৪ খৃস্টাব্দ।

পত্র ৩১। "…কাল টৌনহলে এক প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছিল।" কলকাতা টাউন হলে ৯ ভাদ্র ১৩১২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই চিঠিতে তার উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ও

পরবর্তীকালে ‘আত্মশক্তি’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ৩৩। “আমি যে কিরূপ আবর্তের পাকে পড়িয়াছিলাম…”
বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে দেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথ একসময় তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন, এই চিঠিতে উল্লিখিত আবর্ত, তাঁর তৎকালীন কর্মব্যস্ততা।

প্রসঙ্গত, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন এইরকম কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে—

১১ আশ্বিন ১৩১২ তারিখ কলকাতায় সাবিত্রী লাইব্রেরিতে সভাপতিত্ব, দেওঘরে সরলা দেবীর বিবাহ-অনুষ্ঠানে (১৮ আশ্বিন) যোগদান, বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিজয়াসম্মিলনে (২৩ আশ্বিন সোমবার) গিরিডি থেকে যোগ দিতে আসেন।

“…কলিকাতা হইতে আজ দূত আসিয়াছে আজই আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।”
২৩ আশ্বিন সোমবার অনুষ্ঠিত বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদে বিজয়া সম্মিলন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ‘দূত’ পাঠিয়ে আহ্বান করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার ১২ অক্টোবর ১৯০৫ সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত।

‘আত্মশক্তি এবং বাউল’।
‘আত্মশক্তি’: প্রবন্ধগ্রন্থ, প্রকাশ, আশ্বিন ১৩১২। ‘বাউল’: গীত-সংকলন, প্রকাশ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫।

শৈলেশচন্দ্র। মজুমদার কোম্পানী
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা। ঠাকুর এস্টেটের পতিসর কাছারিতে কিছুকাল ম্যানেজার ছিলেন। রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রথম যুগের প্রকাশক মজুমদার লাইব্রেরির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নবপর্যায়

'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকর্মে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী, পরবর্তীকালে সম্পাদক।

পত্র ৩৪। "কিছুদিনের জন্য সভাসমিতি হইতে পলায়ন করিয়া বোলপুরে আশ্রয় লইয়াছি।"
স্বদেশী অন্দোলন পরবর্তীকালে যে রূপ নেয় তা রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হয় নি। তিনি এই আন্দোলন থেকে সরে এসে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এক পত্রে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের (১৯৫৭) গ্রন্থপরিচয়ে, পত্র ২৩ টীকা-প্রসঙ্গে (পৃ. ২১৭-১৮) উদ্‌ধৃত।

"এখানে জাপান হইতে এক জুজুৎসু শিক্ষক আসিয়াছেন—"
সানো জিন্নোসুকে। সম্ভবত নভেম্বর ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। বিদ্যালয়ে তিনি অল্পকালই ছিলেন। সানো সান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সুবোধচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৮-সংখ্যক পত্রপ্রসঙ্গ।

পত্র ৩৫। সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে ১৮ মাঘ ১৩১২ বঙ্গাব্দে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "আমি মীরাকে এক ঘণ্টা পড়াইবার জন্য মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিয়া দিয়াছি।" বর্তমান পত্রটি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা সুবোধচন্দ্রকে বর্ণিত পত্র। পত্রশেষে রবিবারের উল্লেখ আছে। সুবোধচন্দ্রকে ১৮ মাঘ ১৩১২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন সেদিন বুধবার, তার পূর্ববর্তী রবিবার, ১৫ মাঘ এই পত্র-রচনার কাল— এই অনুমান।

পত্র ৩৬। সুবোধচন্দ্রকে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ বঙ্গাব্দের

১৮ মাঘ লিখছেন, "রথীরা মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি যাত্রা করিবে।" এই সংকলনগ্রন্থের ৩৫-সংখ্যক পত্র এবং বর্তমান পত্রে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রের বিদেশ যাত্রার প্রসঙ্গ আছে। রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র উচ্চশিক্ষার্থে ২০ চৈত্র ১৩১২ (৩ এপ্রিল ১৯০৬) আমেরিকা যাত্রা করেন। এই তিনখানি চিঠিই অল্পকালের ব্যবধানে লেখা। আলোচ্য ৩৬ সংখ্যক চিঠি ১৩১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুনের আরম্ভে লেখা, এরূপ অনুমান করা চলে।

পত্র ৩৭। "সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়া গেছে। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা…"
ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের সুদীর্ঘকাল ধরে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ও তাঁর পুত্র রাধাকিশোরমাণিক্য বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য, ত্রিপুররাজ্যের অকৃত্রিম হিতৈষীজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেক সময়েই রাজ্যপরিচালনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন, রবীন্দ্রনাথও অসংকোচে তাঁর মতামত দিতেন। এরূপ একটি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুররাজকে ১৬ শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গাব্দে লিখছেন—

"স্থানীয় দলাদলির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, নিঃস্বার্থ, সুশিক্ষিত, সুদক্ষ লোক মহারাজের সম্প্রতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।" এর অব্যবহিত পর (কার্তিক ১৩১২), দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ উচ্চপদস্থ কর্মচারী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের মনোনয়নক্রমে ত্রিপুরার রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। রমণীমোহন ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে রাজ্যের বাজেটের যে খসড়া পেশ করেন, মহারাজ সে-বিষয়ে আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরায় আহ্বান করেন।

এই সময়েই বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তাবিত সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হন। বরিশালে যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় যান। ত্রিপুররাজ্যের বাজেট প্রণয়নে তৎকালে অনুসৃত মূলনীতি রবীন্দ্রনাথের সংগত মনে না হওয়ায়, তিনি সে-বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মত মহারাজের কাছে লিখিতভাবে নিবেদন করেন, সেই নিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্‌ধৃত হল—

"রাজ্যের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক ভাগ আছে। একটি মহারাজের স্বকীয়, আর একটি রাষ্ট্রগত। উভয়কে জড়ীভূত করিয়া রাখিলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে— এই উপলক্ষ্যে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয়— এই দুই বিভাগের সন্ধিস্থলে নানাপ্রকার দুষ্ট চক্রান্তের অবকাশ থাকিয়া যায়।

"যাহা মহারাজের স্বকীয়— অর্থাৎ সংসারবিভাগ, নিজ তহবিল, পরিচরবর্গ এবং মহারাজের ভ্রমণাদি ব্যাপার যাহার অন্তর্গত— তাহার উপরে মন্ত্রী বা আর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া চলে না। এইজন্য মহারাজার স্বকীয় বিভাগকে মন্ত্রীর অধিকার হইতে, স্বতন্ত্র করিয়া মন্ত্রীর প্রতি রাষ্ট্রবিভাগের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা আবশ্যক হইবে।[১]"

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন পুলিসের জুলুমে পরিত্যক্ত হওয়ায় প্রস্তাবিত সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নি, রবীন্দ্রনাথ বরিশাল থেকে ফিরে আসেন। আলোচ্য পত্রে রবীন্দ্রনাথের চট্টগ্রামে যাওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল ঐ সময় তা সম্ভবপর হয় নি ; ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তা কার্যকর হয়।

---

১. 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' সংকলনগ্রন্থে (প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৮) সম্পূর্ণ পত্রখানি মুদ্রিত।

পত্র ৩৯। "জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়া আপনি বড়দাদাকে বিপদে ফেলিয়াছিলেন…

দ্বিজেন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন, "আমি তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম ; কিন্তু লিখিতে লিখিতে এত details আসিয়া পড়িল যে, তাহা শেষ করিতে অনেক সময় এবং পুঁথির পাতা ব্যয় করিতে হয়।… আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বলিয়াছি, তিনি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ এর পর সংক্ষেপে তাঁর মতামত জানান। 'স্মৃতি' [১৯৪১] গ্রন্থের প্রথমে এই পত্রটি মুদ্রিত।

কতকটা প্রতিশ্রুতি দিলেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ লিখতে পারেন নি, কিন্তু অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে চতুরাশ্রমের বর্তমানকালে উপযোগিতার কথা আলোচনা করেছেন।

পত্র ৩৯। "চট্টগ্রাম এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে মনস্থির করিতে হইবে—"

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসংস্থানের জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা এখানে জানা যাচ্ছে।

পত্র ৪০। "ছাত্র কয়টির মধ্যে দু'জনকে মনের মতন পাইবেন— বাকি তিনটিকে কোনোমতে লগি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে…"

উল্লিখিত ছাত্রকয়টি সম্ভবত অরুণচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুজিতকুমার চক্রবর্তী, অরবিন্দমোহন বসু ও যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী', পঞ্চম খণ্ডে (বৈশাখ ১৩৯৭), পৃ. ৩৫১-৫২।

"যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ—"

ঘটকর্পর-রচিত 'নীতিসার' ১৩-সংখ্যক শ্লোকের (উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ-

মূর্পৈতি…) শেষ ছত্র। এই শ্লোকের রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ পাঠান্তর-সহ মুদ্রিত হয়েছে 'রূপান্তর' (১৯৬৫) গ্রন্থে।

পত্র ৪১। "এখন যে এক জায়গায় স্থিতিলাভ করিয়া বসিয়াছেন…" ওড়িশার সম্বলপুরে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় (১৯০৭) থেকে স্থায়ীভাবে ওকালতি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

"ল্যাবরেটরি ঘরের উপরে একটি দোতলা হইয়াছে—"
উল্লিখিত দোতলা 'বলভী' কুটির, ইঁটের দেয়ালের উপরে খড়ের ছাউনি দেওয়া চালাঘর। বর্তমান পাঠভবন-দপ্তরের সামনের অংশের দোতলায় এই ছাত্রাবাসটি ছিল। ১৯০৭ সালে নির্মিত এই ছাত্রাবাস ১৯২২ সালে ভেঙে তার জায়গায় পাকা ছাদের দোতলা ঘর তৈরি করা হয়।

পত্র ৪২। "বুকপোষ্টে গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠাই।"
মজুমদার লাইব্রেরি-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সংগ্রহ 'গদ্য গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ড (বৈশাখ ১৩১৪)।

"আমরা কি, দেশের যথার্থ অবস্থা কি তাহার সত্য পরিচয় পাওয়া দরকার…"
এই কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতার দিকে লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য।

এইসময়ে নানাকারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। মুসলমান সমাজ ইসলামধর্মের মূলতত্ত্ব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন, তাঁরা নিজেদের হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক ভাবতে শুরু করেন। বাংলাদেশের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন, মূলত হিন্দুসমাজের আন্দোলন— এরূপ ধারণা মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল

হতে থাকে। বিদেশী দ্রব্যবর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারচেষ্টাকে মুসলমানসমাজ, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট মানের দেশীয় দ্রব্যগ্রহণে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন— এ রকম ধারণা করতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত অসন্তোষের কারণে বাংলাদেশের নানা জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়।

ব্রিটিশ সরকারও নানা উপায়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে বিরোধ সঞ্চারিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তার চেষ্টা করতে থাকেন। মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ ও অনগ্রসর, প্রধানত এই যুক্তিতে মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কারে রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Assembly) তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

স্বদেশের এই জটিল রাজনৈতিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ গভীর উদ্‌বিগ্ন হন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে (প্রকাশ : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪, 'সমূহ' গ্রন্থভুক্ত) এই সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিকার বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পত্র ৪৩। "দেশের কথা লিখিতে গেলে পুঁথি বড় হইয়া উঠিবে। যদি কোনো প্রবন্ধ আকারে কোনো কাগজে লিখি তবে দেখিতে পাইবেন…"

'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে দেশের সমস্যা ও সমাধানের পথনির্দেশ আছে।

"নগেন্দ্রকে বিবাহের পরে আমেরিকায় রুগীদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখিতেই পাঠাইব। ফিরিয়া আসিলে রুগীদের সঙ্গে একসঙ্গে এক কাজে যোগ দিতে পারিবে।"

১৯০৭ খৃস্টাব্দের ৬ জুন রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, এর অব্যবহিত পরই

(২৮ জুন) রবীন্দ্রনাথ জামাতাকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠান। আমেরিকা থেকে ফিরে নগেন্দ্রনাথ কিছুকাল শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কৃষিকর্মে যোগ দেন।

"…জগদানন্দের বড় মেয়েটির বিবাহ…"

জগদানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা দুর্গেশনন্দিনী দেবীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

" শ্রীশবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ…"

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা অরুণা দেবীর সঙ্গে প্রভাতকুমার সেনের বিবাহ হয়।

পত্র ৪৪। "বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে—"

এই সময়ে রাজনৈতিক কারণে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশের শাসকবর্গের দমননীতির ফলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অনেক অভিভাবক অধিক সংখ্যায় ছাত্র পাঠাতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহও এর সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭ জুলাই ১৯০৭ তারিখে রথীন্দ্রনাথকে লেখা পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর চিঠিতেও—"ছেলে প্রায় ৮০টি হয়ে দাঁড়িয়েছে— বৃহৎ কাণ্ড…। প্রায় প্রতিদিনই দু-একজন ক'রে নতুন ছেলে আস্‌চে— আর তাদের রাখবার স্থান নেই।…" এই সময়ের ছাত্রদের কয়েকজনের নাম— মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী, সরোজরঞ্জন রায়চৌধুরী, সত্যরঞ্জন বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমর বড়াল, জ্যোতির্ময় হালদার, সিদ্ধার্থ রায়, বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, সরোজচন্দ্র মজুমদার, ত্রিগুণানন্দ রায়, রামরেণু গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ, প্রমোদনাথ রায়, প্রণবদেব

মুখোপাধ্যায়, গৌরগোপাল ঘোষ, অপূর্বকুমার চন্দ প্রমুখ।

বলা বাহুল্য, তালিকাবদ্ধ ছাত্রদের সকলেই যে একই কালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তা বলা যায় না।

পত্র ৪৫। 'মনুষ্য না পক্ষী!'

এই সময় নানা ধরনের কাজে, কলকাতা শান্তিনিকেতন শিলাইদহ অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ যাতায়াত করেছেন, সম্ভবত নিজের দ্রুত স্থান পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখেই এই মন্তব্য। রবি-জীবনীকার ঐ সময়ে তাঁর যাতায়াতের যে প্রমাণ দিয়েছেন, সংক্ষেপে দেখানো হল—

২ ভাদ্র ১৩১৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। ৩ ভাদ্র থ্যাকার কোম্পানি গিয়েছেন; ৪ ভাদ্র সুকিয়া স্ট্রীট, পার্শিবাগান ইত্যাদি অঞ্চল; ৫ ভাদ্র বালিগঞ্জ এবং ঐ দিনই কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। ২২ ভাদ্র সপরিবারে কলকাতা গিয়েছেন। ২৬ ভাদ্র শিলাইদহে রওনা হয়েছেন।

তুলনীয়, 'কড়ি ও কোমল' (প্রথম সং ১২৯৩)-ভুক্ত, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত 'পত্র' শীর্ষক কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্র—

> মা গো আমার লক্ষ্মী,
> মনিষ্যি না পক্ষী!
> এই ছিলেম তরীতে,
> কোথায় এনু ত্বরিতে!
> কাল ছিলেম খুলনায়,
> তাতে তো আর ভুল নাই,
> কলকাতায় এসেছি সদ্য,
> বসে বসে লিখছি পদ্য।

অপিচ দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ২ (১৩৯৫), পৃ ২১৩-১৬।

"আপনার প্রস্তাবটি উত্তম। কিন্তু ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয় ?"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে ছাত্রদের লেখাপড়া খেলাধূলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার দানের প্রথা প্রবর্তন করেন নি। এমনকি, ছাত্রদের কৃতিত্ব-অনুযায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি প্রকারে চিহ্নিত করার পদ্ধতিও বর্জন করেছিলেন।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'বাড়ির আবহাওয়া' অধ্যায়ে তাঁর ছাত্রাবস্থার একটি ঘটনাকে উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, এখানে তা উদ্‌ধৃত হল—

"...ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা ছন্দোমালা বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, 'গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।' তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি প্রাইজ পাও নাই ?' আমি কহিলাম, 'না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।' ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যর প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সামনেই সে-কথাটা অন্য লোকের কাছে

বলিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে, তাহা আমার মনেও ছিল না; হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম, কিন্তু সেটা ভালো হইল না। আমার তো মনে হয়, ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে; ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না, ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।"

পত্র ৪৭। "যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল— তাহার পরে আর ফিরিল না।"
রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র সরোজচন্দ্র মজুমদার (ভোলা) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শমীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। মুঙ্গেরে শ্রীশচন্দ্রের আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে শমীন্দ্রনাথ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, সেখানেই ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গ এবং মৃত্যুশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের (প্রকাশ মে ১৯৫৭) 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে (পৃ. ২১৮-২৪)।

"আমি আগামী কল্য শিলাইদহে পদ্মায় বাস করিতে যাইব।"
একই তারিখে (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৪), বিদ্যালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছেন, "আগামীকল্য আমি একলা শিলাইদহে যাইতেছি। সেখানে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বেলা মীরাকে ডাকিয়া পাঠাইব।"

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা ও কনিষ্ঠা মীরাকে নিয়ে শিলাইদহে প্রায় চার মাস কাটিয়ে আসেন।

পত্র ৪৮। "আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয় লোক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন।"

উল্লিখিত 'কনফারেন্স' বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনায় অনুষ্ঠিত ১৯০৮ ফেব্রুয়ারির অধিবেশন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণ বাংলায় দিয়েছিলেন।[1]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর কাজ যাতে বাংলাভাষায় সম্পন্ন হয়, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই চেষ্টা করে আসছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "রাজসাহি সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন।··· পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।"

পাবনায় অনুষ্ঠিত সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রকৃত উন্নতির একমাত্র উপায় যে পল্লীর সার্বিক উন্নতি বিধান, সে কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করেন, এবং পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা দেশবাসীর কাছে উপস্থাপিত করেন।

'সভাপতির অভিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে সভাস্থলে বিতরিত। পরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত। পরবর্তীকালে 'সমূহ' [২৫ জুলাই ১৯০৮] গ্রন্থভুক্ত।

"যাহা হউক সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কি না সন্দেহ।"
১৯০৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসের বিপরীত মতাবলম্বী দু'দলের মধ্যে তুমুল বিশৃঙ্খলা ঘটে ও শেষ পর্যন্ত সম্মেলন পণ্ড হয়, তার পরও এই বিবাদ দীর্ঘপ্রসারী হয়।

বর্তমান পত্রের আলোচ্য অংশে সেই ঘটনার ইঙ্গিত আছে। এই সময়েই, ১২ ফাল্গুন ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "কন্‌ফারেন্স আমাকে সভাপতিপদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র গালিসংযুক্ত এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।"

"বিজয়বাবুর সংবাদ কি? কিছু লিখিতেছেন?"
সাহিত্যিক বিজয়রত্ন মজুমদার ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষে এই সময় সম্বলপুরে ছিলেন।

পত্র ৪৯। "দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাকে কিছু বলে নিয়েছি—"
'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাঘ ১৩১৪ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের সম্ভোগ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যের বিরূপ সমালোচনা করায়, ঐ একই সংখ্যায় 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য' নামে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়। পরে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সংখ্যায় 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে পুনরায় রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনা লেখেন, সম্ভবত বর্তমান পত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গেই মন্তব্য করছেন।

"প্রেমদাস সুন্দর মূরখ হ্যায়…"

সন্তকবি প্রেমদাস গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের কবীরপন্থী সন্ত ভান সাহেবের (১৭০০-১৭৫৫) অনুবর্তী জীবনদাসের শিষ্য ছিলেন। এঁর রচিত কবিতার সঙ্গে কোন্ সূত্রে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন জানা যায় না। জগদীশচন্দ্র বসুকে ২৪ জুন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ প্রেমদাসের একটি পদের কয়েকছত্র ব্যবহার করেছেন (দ্র. চিঠিপত্র ৬, পত্র ৩)। ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' (প্রকাশ ১৯৩০) গ্রন্থে প্রেমদাসের উল্লেখ করেছেন। শ্রীমতী পম্পা মজুমদার 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' (১৯৭২) গ্রন্থে এবং শ্রীরামেশ্বর মিশ্রের 'মধ্যযুগীন হিন্দি সন্ত-সাহিত্য ঔর রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৯) গ্রন্থে প্রেমদাসের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা জানা যায়।

পত্র ৫০। "আমাদের জমিদারীর মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি।…"

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ প্রথম দিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকলেও অল্পকালের মধ্যেই তিনি আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসেন; দেশের প্রকৃত উন্নতির পন্থাবিষয়ে আন্দোলনে অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে মতপার্থক্যই এর কারণ। আমাদের দেশের মুমূর্ষু পল্লীসমাজের উজ্জীবনই দেশের প্রকৃত উন্নতির একমাত্র উপায়, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করতেন, তাঁর নানা সমকালীন রচনায় এই আদর্শ সুস্পষ্ট।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তাঁর চিন্তা দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেন। সমসাময়িককালে প্রচারিত পল্লীসমাজ

সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাবসূচী[1] এখানে পুনর্মুদ্রিত হল—

পল্লীসমাজ

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লী-সমাজ সংস্থাপন করিতে হইবে। সহর, গ্রাম কি পল্লীনিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায় মত অন্যূন পাঁচজনের উপর প্রতি পল্লী-সমাজের কার্য্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লী-সমাজের কার্য্য করিবেন। পল্লী-সমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লী-সমাজ সাধ্যমতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

উদ্দেশ্য

১' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্‌ভাব সংবর্দ্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২. সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিসের দ্বারা মীমাংসা।

৩. স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪. উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লী-সমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা-সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫. বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্ব্বধর্ম্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের

---

[1] হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-রচিত 'কংগ্রেস' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, অপিচ দ্রষ্টব্য 'পল্লীপ্রকৃতি' (১৩৬২), গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২২২-২৪।

মধ্যে প্রচার ও সর্ব্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি, ধর্ম্মভাব, একতা, স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬. প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ, অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭. পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকারস্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮. আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য্য বা গো মহিষাদি পালন-দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯. দুর্ভিক্ষনিবারণার্থে ধর্ম্মগোলা-স্থাপন।

১০. গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয়বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১. সুরাপান বা অন্যরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১২. মিলনমন্দির club-স্থাপন করা ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩. পল্লীর তত্ত্ব[তথ্যের]-সংগ্রহ— অর্থাৎ, জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের উন্নতি, অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রী-সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর), ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐ সব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪. জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাব সংস্থাপন ও ঐক্য-সংবর্দ্ধন।

১৫. জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্য্যের সহায়তা করা।

অর্থের ব্যবস্থা

পল্লী-সমাজের কার্য্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বারা চলিবে। যাঁহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ সালিসিতে মেটানো হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থ-সাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্য্যেও সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসীমাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে কি মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লী-সমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি পুজার নাচ-তামাসায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়, ঐ সমস্ত অপব্যয় সঙ্কোচ করিলে সেই অর্থ-দ্বারা পল্লী-সমাজের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লীসমাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।"

অনুমান করা যেতে পারে, এই কর্মসূচীটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার কথা বর্তমান পত্রে আলোচনা করেছেন।

বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটি মণ্ডলে ভাগ করে বিভিন্ন মণ্ডলে যে অধ্যক্ষগণকে রবীন্দ্রনাথ কর্মভার অর্পণ করেন, তাঁরা— কালীমোহন ঘোষ, ভূপেশচন্দ্র রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও অক্ষয়চন্দ্র সেন (রায় ?)।

নিজ জমিদারিতে পল্লীউন্নয়ন-কর্মসূচী রূপায়ণের এই প্রথম প্রচেষ্টা নানা কারণে স্থায়ী হয় নি।

পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও তা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টার বিস্তারিত তথ্য 'পল্লীপ্রকৃতি' (১৯৬২) সংকলনগ্রন্থের গ্রন্থ-পরিচয় অংশে (পৃ. ২২১-৭৪) সংকলিত।

পত্র ৫১। "হঠাৎ হৃদ্‌রোগে সন্তোষের বাবা মারা গেছেন…"
সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৪০ বৎসর বয়সে, ৮ নভেম্বর ১৯০৮ খৃস্টাব্দে মারা যান। এই সময় তিনি সাঁওতাল পরগনার দুম্‌কা জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কর্মরত ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সমগ্র পরিবারটির অভিভাবকরূপে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন।

শ্রীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা তাঁরই আগ্রহ ও সনির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে ও বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রীশচন্দ্রকে লেখা তাঁর কয়েকখানি পত্র সংকলিত, এগুলির মধ্যে উভয়ের নিবিড় বন্ধুতার পরিচয় আছে।

"সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল— অদ্য মাস পাঁচ ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম।"
রবীন্দ্রনাথের মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। তাঁর পত্নী রেণুকার মৃত্যু হয় ভাদ্র ১৩১০ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ উদ্‌যোগী হয়ে আষাঢ় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পাথুরিয়াঘাটার সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ছায়ার সঙ্গে পুনরায় তাঁর বিবাহ দেন।

পত্র ৫৩। "...সন্তোষের কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম।"
আমেরিকায় অধ্যায়নরত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের লেখা কোনো চিঠি পড়ে তাঁর এককালীন শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুণ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর মনোভাব জানিয়েছিলেন।

পত্র ৫৪। যোগেন্দ্রবাবু। চন্দননগরের অধিবাসী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র ধীরেন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে কিছুকাল ছাত্র ছিলেন। যোগেন্দ্রকুমার "বিশ্বভারতীর অঙ্কুর" প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬), বিদ্যালয়ের সূচনাকালের একটি আকর্ষণীয় পরিচয় দিয়েছেন।

"...ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে..."

শান্তিনিকেতন আশ্রমের এই বালিকা-বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রী হেমলতা গুপ্ত (১৮৯৭-১৯৮৮) এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদের কাছে এই বিবরণ দিয়েছেন—

১৩১৫ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশের পর ঢাকার প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা কিরণবালা ও ইন্দুলেখাকে নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয়ের সূচনা। হেমলতা গুপ্ত আসেন সে-বছর পৌষ-উৎসবের পর। পরে গয়া-প্রবাসী তারকচন্দ্র রায়ের কন্যা প্রতিভা ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা সুধা আসেন। এই কয়জনই ছিলেন বালিকা-বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী। দেহলী বাড়ির একতলা ছিল ছাত্রীনিবাস।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তাঁদের দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে দেহলী-সংলগ্ন 'নতুন বাড়ি'তে থাকতেন। মীরা দেবী ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ে যোগ দেন।

আর-একজন অনাবাসিক ছাত্রী ছিলেন ঢাকার রাধাকান্ত গুহঠাকুরতার বালবিধবা কন্যা লাবণ্যলেখা দেবী। তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের পরিবারেরই একজন, তাঁর কন্যাস্থানীয়া। অল্প কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সাগরিকা। তিনি নিচু বাংলায় তাঁর জ্যাঠাইমা হেমলতা দেবীর কাছে থাকতেন। মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলা দেবী যখন বিদ্যালয়ের বালিকাদের তত্ত্বাবধান-ভার নিলেন তখন তাঁর দুটি কন্যাও বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি চলে গেলে সেই স্থানে আসেন 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জননী গিরিবালা দেবী। তাঁর দুই কন্যা, কাত্যায়নী ও কল্যাণী এই বালিকাবিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

বালিকা-বিদ্যালয়ে তাঁদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাকে সহশিক্ষা বলা যায় না। ছাত্রীনিবাসের বাইরে ইচ্ছামত তাঁরা চলাফেরা করতে পারতেন না, ক্লাসও হ'ত ছাত্রীনিবাস সংলগ্ন কোনো ঘরে। সেখানে অবশ্য সেই শ্রেণীর ছাত্ররাও এসে পড়ে যেত। ছাত্রীদের আহার্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সাধারণ পাকশালা থেকে আসত।

বালিকা-বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী বিষয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৯ অক্টোবর ১৯০৯ খৃস্টাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত হল—

"স্ত্রীবিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থির করা কর্তব্য। নতুবা ওখানকার বালকবিদ্যালয়ের সঙ্গে হয়ত তার সুর না মেলবার আশঙ্কা আছে। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও অনেকের মন বোধহয় এ সম্বন্ধে পীড়িত হচ্ছে— সেটা ঠিক কল্যাণকর নয়। অবশ্য যেখানে কোনো অন্যায় নেই সেখানে কারো সংস্কারের দিকে তাকাবার দরকার নেই— কিন্তু সংস্কারকে একেবারেই অশ্রাব্য করারও প্রয়োজন দেখিনে। তার

মানে, কাজ থাকলে কাজ চালাতে হবে, কিন্তু যেখানে কাজ নেই সেখানে সতর্ক হওয়া উচিত। মেয়েরা শান্তিনিকেতনে, জগদানন্দের বাড়িতে, বা নীচের বাংলায় অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত স্বেচ্ছামত যাতায়াত করতে পারবে না এই নিয়ম করে দিয়ো— এবং ক্লাসের প্রয়োজনের বাইরে অধ্যাপকদের সঙ্গেও তাদের যোগ থাকবে না। তাদের ওঠা খাওয়া প্রভৃতির সময় সুনির্দিষ্ট থাকবে এবং তারা বাইরে বেড়াতে যাবার সময় তাদের কর্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এইরকম নিয়ম থাকা ভাল।"

বালিকাবিদ্যালয় নিয়ে নানারকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে পূজাবকাশের পর উঠে যায়।

'গদ্য-গ্রন্থাবলী', 'শান্তিনিকেতন'।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গদ্যগ্রন্থ 'গদ্যগ্রন্থাবলী' নামে ১৬টি খণ্ডে বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় মজুমদার লাইব্রেরি, কলকাতা থেকে, বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে এবং অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষণাদির সংকলন 'শান্তিনিকেতন' নামে ১৭টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খৃস্টাব্দে।

পত্র ৫৫। "সে [রথীন্দ্রনাথ] একবার ফ্রান্স ও জর্মনিতে তার শিক্ষা সমাধা করে আসুক।"

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফেরার পথে অল্প কিছুকাল ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও জার্মানিতে কাটিয়ে আসেন। তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'স্বদেশ অভিমুখে' অধ্যায় থেকে জানা যায় "জার্মানির গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এক পর্বকাল নিয়মিত বক্তৃতা শুনেছি।" এই সমস্ত দেশে, রথীন্দ্রনাথের পক্ষে নিয়মিত কোনো শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

"ও [সন্তোষচন্দ্র] সেখানে আরো দু'বছর থেকে উপার্জন করে…" সন্তোষচন্দ্রের পক্ষে, শিক্ষান্তে, এই পরিকল্পনা-অনুযায়ী আমেরিকায় থেকে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি আমেরিকা থেকে ১৯০৯ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে দেশে ফিরে আসেন।

পত্র ৫৮। এই চিঠির শেষ অংশে রথীন্দ্রনাথের দেশে ফেরার আনুমানিক সময়ের উল্লেখ আছে। রথীন্দ্রনাথ ১৯০৯ খৃস্টাব্দের আগস্ট-মাসের শেষদিকে ফ্রান্স থেকে দেশের দিকে যাত্রা করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে এই পত্ররচনার কাল অনুমান করা হয়েছে।

জগদীশ বোস। জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উভয়ের মধ্যে যোগের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড।

"… একটা নতুন দোতলাঘর তৈরি হচ্চে…" বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বে গ্রন্থাগারের (বর্তমানে পাঠভবন-দপ্তর) উপরে এই দোতলাঘর তৈরি হয়। ইটের দেয়াল, উপরে খড়ের চাল-দেওয়া এই নতুন ছাত্রাবাসটির নাম দেওয়া হয় 'বলভীকুটির'।

পত্র ৫৯। "ইতিমধ্যে চয়নিকা প্রভৃতি যে দুই একখানা বই বেরচ্চে—" রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম নির্বাচিত সংকলন 'চয়নিকা' ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক ১৯০৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত 'চয়নিকা' গ্রন্থে নন্দলাল বসু -অঙ্কিত সাতখানি রঙিন ও একরঙা চিত্র মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া গ্রন্থারম্ভে 'মুখপত্রে' রবীন্দ্রনাথের একখানি পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্র ছিল। নন্দলাল বসু -অঙ্কিত চিত্রগুলির নাম: ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে; কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া, বাহির হনু তিমির-রাতে; যদি মরণ

লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দেও সলিলমাঝে; ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর; হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ; ভূমির 'পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর···, আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

এই অতি দুষ্প্রাপ্য সংকলনগ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ আছে জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা-প্রকাশিত শ্রীস্বপন মজুমদারের 'রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি' প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্বে (প্রকাশ ১৩৭৫)।

"রথীকে শিলাইদহে রেখে এসেছি। সেইখানেই তার কর্ম্মের রথ তাকে চালাতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁদের বিদেশযাত্রার পূর্বেই, ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাঁদের কৃষিব্যাবসাতে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাভাবনা আরম্ভ করেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ১৯০৪ খৃস্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—

"জমির সন্ধান কোরো। ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগবে। সন্তোষ ও রথীকে agricultureএর জন্যই তৈরি করা স্থির করেছি— ওরা দুইজনে মিলে চাষবাস করবে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করে জীবন কাটাবে। চাষের জন্য স্বাস্থ্যকর জায়গা থাকা দরকার— নইলে কালিগ্রামে যথেষ্ট জমি আছে।···"

শ্রীশচন্দ্রকে এই অনুরোধের কারণ, এইসময় তিনি Land Acquisition officer ছিলেন। পশ্চিমগামী নূতন রেলপথ (Grand chord) নির্মাণকল্পে বিহার ছোটনাগপুর অঞ্চলে যে-সমস্ত জমি তৎকালীন ভারত সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন, সেই জমির অধিকারীদিগকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব শ্রীশচন্দ্রকে

দেওয়া হয়েছিল। কর্মোপলক্ষে ছোটনাগপুরের ভূমি ও ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের পরিচয় ও যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, অনুমান করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, সম্ভব হলে কৃষিকর্মের উপযোগী একত্র সংলগ্ন ১০০০ বিঘা পরিমাণ জমি এই অঞ্চলে সংগ্রহ করবেন। এই উদ্দেশ্যে শ্রীশচন্দ্রকে তিনি দু-তিন বছর ধরে ক্রমাগত তাগিদ দিয়েছেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৮ কার্তিক রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"রথীদের গত সপ্তাহের পত্রে তাহারা এইবেলা জমীসংগ্রহের কথা বলিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা, যেখানে তাহাদিগকে চাষ করিতে হইবে সেখানকার মাটির নমুনা লইয়া তাহাদের কলেজে **Laboratory**তে **analyse** করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং সেখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক বিবরণ জানিয়া অধ্যাপকদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানে জমী সন্ধানের চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু ছোটনাগপুরে কর্ডলাইনের ধারে কি আর জমী পাইবার কোনো আশা নাই?… তোমার মুখ হইতে একটা শেষ জবাব পাইবার প্রত্যাশায় আছি—যদি জবাব দাও তবে আমার যথোচিত সাধ্যমত অন্যত্র কোথাও চেষ্টা দেখিতে পারি—যখন এত খরচ করিয়া একটা বিদ্যা শিখাইতে পাঠানই গেল তখন তাহার একটা ক্ষেত্র তাহাদিগকে দিতেই হইবে। যদি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিতান্তই না পাওয়া যায় তবে অগত্যা অন্য কোথাও অনুসন্ধান করিব।…"

পর বৎসর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২২ কার্তিকে লেখা আর একখানি চিঠির অংশ—

"ছোটনাগপুরের দিকে জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে না কারণ সেদিন একজনের কাছে শুনিলাম 'গোমো'র জমি আর বড় বাকি নাই। অগত্যা ময়ূরভঞ্জে জমির জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। সেখানে জমি আছে কিন্তু স্বাস্থ্যকর হইবে না। কি

করা যাইবে— এত খরচ করিয়া কৃষি শিখাইয়া শেষকালে জমি অভাবে সমস্ত ব্যর্থ করা ত যায় না।…”

এই বৎসরেই, ১৯ পৌষ ১৩১৪ তারিখে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখছেন—

“এখানে জমির খবর লইয়া দেখিলাম কোথাও একত্র সংলগ্ন পঞ্চাশ বিঘা জমি পাওয়াও অসম্ভব।… বাংলার এ অঞ্চলে কোথাও জমি পাইব না, ওখানেও যদি না পাওয়া যায় তবে ছেলেদের পক্ষে স্বাধীন কৃষিব্যবসায় করা একেবারে অসম্ভব হইবে।”

কয়েকদিন পর, ২ মাঘ ১৩১৪ তারিখে আবার লিখছেন—

“চাষের জমি যা হয় হবে, ‘গুমো’য় বাসের জমি অন্তত বিঘা দশ পনেরো একটু রমণীয় জায়গায় পাওয়া যায় কি না খবর নিয়ো। সেইসঙ্গে চাষের জমি ১০০০ বিঘা না হোক ২০০/৩০০ বিঘার চেষ্টা দেখা যাক— একটু উর্ব্বরা দেখে জমি বেছে নেওয়া চাই।”

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ চিঠিতে শ্রীশচন্দ্রকে ২৮ চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দে জানাচ্ছেন—

“জমির সম্বন্ধে আমি ক্রমশই হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি। ছেলেরা ফিরিয়া আসিলে কোথায় যে কাজ ফাঁদিবে তাহা ত জানি না। বাংলাদেশে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় জমি পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই জানিয়াছি। অন্যত্র ততোধিক। যদি জমি না পাওয়া যায় তবে রথীকে আমাদের জমিদারীতে প্রজাদের উন্নতিসাধনের কাজে নিযুক্ত করিয়া দিব।”

উপযুক্ত কৃষিযোগ্য জমি সংগ্রহ করতে না পেরে শেষে রথীন্দ্রনাথকে স্বাধীন কৃষিব্যবসায়ে নিযুক্ত করার আশা রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন দিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলাইদহেই কর্মক্ষেত্র

প্রস্তুত করে দেন। এ-বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'আবার শিলাইদহ' অধ্যায়ে লিখেছেন—

"১৯০৯ সালের শেষ দিকে আমি দেশে ফিরলাম। এসে দেখি শিলাইদহের কুঠিবাড়ি আমার জন্য প্রস্তুত— জমিদারির কাজকর্ম তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার খেতখামার গড়ে তুলব, কৃষি নিয়ে পরীক্ষা গবেষণা করব— এই ছিল বাবার অভিপ্রায়।··· ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা আমায় নিয়ে বেরোলেন জমিদারি অঞ্চলে— উদ্দেশ্য, প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হবে ও সেইসঙ্গে জমিদারির কাজকর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেব।···

শিলাইদহে আমার নূতন জীবন শুরু হল— আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের একজন সম্পন্ন-কৃষাণ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরী হল, আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও গৃহপালিত পশুর জাব খাবার মতো নানাবিধ ঘাসের বীজ। এ-দেশের উপযোগী করে নানারকম লাঙল, ফলা ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরী করা হল— এমন কি, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ছোটোখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল।"

শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ কর্মের যে রথ চালাবার জন্য রেখে এসেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি; রথীন্দ্রনাথের 'সম্পন্ন কৃষাণ'-জীবন সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

পত্র ৬০। "আপনি যদি মেয়ো হাসপাতালে থাকতে ইচ্ছা করেন তবে এইসঙ্গে সেখানকার অধ্যক্ষ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে যে পত্রখানি দিলুম···"

কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের তৎকালীন রেসিডেন্ট সুপারিন-

টেনডেন্ট ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁর হাসপাতালস্থ বাসভবনের প্রশস্ত ছাদে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো বন্ধু-সম্মিলন হত। মেয়ো হাসপাতালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসার জন্ম রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে যে চিঠিখানি লিখে দিয়েছিলেন তা 'স্মৃতি' [১৯৪১] গ্রন্থ থেকে (পৃ. ১০১) উদ্ধৃত হল—

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পায়ে অকস্মাৎ ক্ষত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে এইজন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিলে তাঁহার উপকার হইবে এবং যত্ন ও শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না নিশ্চয় জানি এই কারণে তাঁহাকে মেয়ো হাসপাতালে আশ্রয় লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্বেও আপনার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি এইজন্য পুনশ্চ আপনাকে আমার বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিলাম। ইনি অল্পেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন বিশেষত এই পা লইয়া ইঁহাকে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিতে হইল বলিয়া ইনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার নিকট হইতে যত্ন ও আশ্বাস পাইলে ইঁহার মনে বলসঞ্চার হইতে পারিবে এবং আরোগ্যও সহজ হইয়া উঠিবে এই আশা করিয়া আপনার হস্তে ইঁহাকে সমর্পণ করিতেছি— ইঁহার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়ো হাসপাতালে চিকিৎসা লাভ করেছিলেন

কি না জানা যায় না, তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানা যায় "একবার মনোরঞ্জন-বাবুকে দেখিতে জেনেরাল হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল…।"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়খানি চিঠি সংকলিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায়।

পত্র ৬১। রথীন্দ্রনাথের বিবাহের তারিখ ১৪ মাঘ ১৩১৬, বৃহস্পতিবার। বর্তমান পত্রখানি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে আসার আগে ২৬ মাঘ লিখেছিলেন, এইরকম অনুমান করা যায়।

"রথীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল…"

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী বিনয়িনী দেবী ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ১৪ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

পত্র ৬২। "সন্তোষ পাঁচটি গাভী সংগ্রহ করিয়া এখানে গোষ্ঠলীলা আরম্ভ করিয়াছে।"

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন' আশ্রমের সীমানার মধ্যে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন, সেইজন্য বিদ্যালয়ের ভোজনশালায় দীর্ঘকাল নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা ছিল। বালকদের খাদ্যপদার্থের তালিকায় পুষ্টির জন্য দুধকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হত; অথচ বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ সংগ্রহ করা সেকালে বিশেষ সমস্যা ছিল। সেইজন্য প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের নিজস্ব গো-শালার কথা চিন্তা করেছিলেন, দু-চারটি গো-পালনের ব্যবস্থাও করেন। হাজারিবাগ থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ২১ চৈত্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ

এই প্রসঙ্গে লেখেন—

"বোলপুরে দুগ্ধের বড়ই টানাটানি। এখান হইতে একটা গাভী ও একটা মহিষ সেখানকার ছাত্রদের জন্য কিনিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। পথের খরচ অনেক লাগিবে— প্রায় প্রত্যেকটা জন্তুটাতে কুড়ি টাকা— কিন্তু সেও স্বীকার করিতে হইতেছে— বোলপুরে বহু চেষ্টায় পয়স্বিনী গাভী জুটাইতে পারি নাই। আশ্রম আছে অথচ ধেনুর অভাব ইহা অসঙ্গত।"

চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের গো-শালার পরিকল্পনা সফল হয় নি। সেজন্য বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র যখন আমেরিকা থেকে গো-পালন বিদ্যা শিখে দেশে ফিরলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রম-বিদ্যালয়ের কাছেই গো-শালা তৈরি করে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল, এই ব্যবসায়ে সন্তোষচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে সচ্ছলভাবে পরিবার প্রতিপালন করতে পারবেন, অন্য দিকে বিদ্যালয়ের দুগ্ধ-সমস্যারও সমাধান হবে।

সন্তোষচন্দ্রের গো-শালা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এতদূর উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য এলাহাবাদ থেকে উৎকৃষ্ট জাতের ছাগল আনাবার চেষ্টাও করেছিলেন।[১]

সন্তোষচন্দ্র কিন্তু এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য হতে পারেন নি, তিনি অবশেষে বিদ্যালয়ের কর্মে যোগ দেন। বোলপুরের অনুর্বর জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে এবং সুলভে পশুখাদ্য উৎপাদনের অসামর্থ্যই সাফল্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পত্র ৬৩। "হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অবস্থা খুব ভাল বলিয়াই

---

১. দ্রষ্টব্য, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৩-সংখ্যক চিঠি, 'দেশ' ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১৪।

জানি। সুরেন তাহার সেক্রেটারি।"

পাটনার অধ্যাপক অম্বিকাচরণ উকিলের অনুপ্রেরণায় সমবায়নীতিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯০৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় ১৪ নম্বর হেয়ার স্ট্রীটে রেজিস্টাড অফিস করে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্‌ ইন্‌সুরেন্স সোসাইটি নামে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথ এই বীমা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও প্রধান কার্য-নির্বাহক (Chief Executive Officer), ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অর্থসচিব (Treasurer), এবং অম্বিকাচরণ উকিল সংগঠক (Organizer) মনোনীত হন।

এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম-শতবার্ষিক সমিতি-প্রকাশিত, শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুভাষ চৌধুরী -সম্পাদিত 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলনগ্রন্থে' (প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৯) ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী -লিখিত 'সুরেন্দ্রনাথ-স্মৃতি' প্রবন্ধ (পৃ. ১২৫-১২৯)।

পত্র ৬৫। "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ"

ঘটকর্পর-রচিত 'নীতিসার' কাব্যগ্রন্থভুক্ত শ্লোকের অংশ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বিলাতযাত্রার আগে আমেদাবাদে থাকাকালীন (১৮৭৮ খৃস্টাব্দ) 'ডাক্তর যোহন হেবরলিন -কর্তৃক সমাহৃত' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন। অধিকাংশ সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের মূলে পূর্ব-উল্লিখিত গ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত 'নবরত্নমালা' (প্রকাশ ১৯০৭) গ্রন্থেও এই শ্লোক বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত।

পত্র ৬৭। "আমি এখন শিলাইদহে ছুটিটা রথীর আতিথ্যে যাপন

করিতেছি।"

এই সময় রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহে কৃষিকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। এ-বিষয়ে ৫৯-সংখ্যক পত্র-পরিচয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও এইসময় রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কৃষিকর্মে যোগ দিয়ে সপরিবারে শিলাইদহে বসবাস করছিলেন।

পত্র ৬৮।…"বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার লইয়াছি…"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথকেই প্রধানত এর আর্থিকভার বহন করতে হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো বন্ধু ও হিতৈষীর কাছ থেকে কখনো কখনো তিনি আনুকূল্য লাভ করেছেন। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য কিছুকাল প্রতি বছর এক হাজার টাকা রাজ্যের সরকারি তহবিল থেকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম যুগের অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন এক হাজার টাকা বিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তার জন্য দান করেন, সে-কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের অর্থ-সংকট প্রথমাবধিই ছিল। এই বিদ্যালয়ের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন না নেওয়ার যে-নীতি অবলম্বন করেন, এই আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যই শেষপর্যন্ত তা বিসর্জন দিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অভাব মোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা তাঁর রচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করলে অনেকখানি স্পষ্ট হবে—"ছেলেদের অন্নবস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত।… আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এ-দিকে ও-দিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল

তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল।"[1]

পত্র ৬৯। "আমাদের য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেছে।"
এইসময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে দীর্ঘকালের জন্যে দূরে কোথাও ঘুরে আসার তীব্র ব্যাকুলতা জন্মেছিল। এর জন্য কিছু আয়োজনও সম্পন্ন হয়, কিন্তু নানাকারণে এই যাত্রা সম্ভব হয় নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে 'ডাকঘরের পূর্বে ও পরে' অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পত্র ৭০। "অপমান ত অনেক সহিয়াছি— বোধ করি সম্মানও সহ্য করিতে পারিব।"
রবীন্দ্রনাথকে লেখা মনোরঞ্জনের চিঠিটি এখানে মুদ্রিত হল—

Sambalpur
১৬. ১১. ১৩

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মুখুর্য্যে মহাশয়[2] যখন আপনাকে L. L. D[3] উপাধি দিলেন এখানে কেহ কেহ বল্লেন 'আহা খুব হোলো'— আমার মনে হোলো বিশেষ কিছুই হোলো না। এটা যদি বিলেত যাবার আগে হোতো তাহলে মুখুর্য্যে মহাশয়ের appreciation এবং independence এর কতকটা পরিচয়

---

১. 'বিশ্বভারতী' (প্রকাশ ৭ পৌষ ১৩৫৮) গ্রন্থভুক্ত।

২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

৩. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতই ভ্রমক্রমে D. Litt উপাধিকে L. L. D বলে উল্লেখ করেছেন।

হোতো। বিলাত থেকে ফেরবার পর আর এ উপাধির বড় বেশী কিছু মূল্য ছিল না। এতে মুখুর্য্যেমহাশয় কেবল নিজের লজ্জা নিবারণ কল্লেন মাত্র।

কিন্তু আজকের কাগজের সংবাদ একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আজ আমার বুক দশ হাত আমি যে বাঙালী শুধু তাই বলে নয়। আমি আপনার সাক্ষাৎ পরিচিত ও অনুগৃহীত? এর স্পর্দ্ধায় আর আমার রাখতে জায়গা নাই। আজ যখন পাঁচজন আমার কাছে এসে আপনার **Nobel Prize** পাবার কথা বলে **congratulate** কচ্চে তখন যেন আমি একটা আপনার পক্ষীয় লোক বলে কত বড় একটা গৌরব অনুভব কচ্চি তা আপনাকে কেমন করে জানাবো।

আপনি মহাশয় একটু সাবধান হবেন। জগৎব্যাপী সুকীর্ত্তি তার ঐশী আশীর্ব্বাদ আপনার কাছে ব'য়ে এনেছে তা ত জেনেচেনই। এ আশীর্ব্বাদ আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করে লোককোলাহল থেকে সরে যান। তা না হলে সর্ব্বদা এই কথারি আলোচনা আপনার কানের কাছে করে করে আপনার **Genious**কে কোনোরকমে না **effect** করে, কেন না—

"তারা তোমার নামে বাটের মাঝে
মাশুল লয় যে ধরি।
দেখি শেষে ঘাটে এসে
নাইক পারের কড়ি" ইত্যাদি--

তাদের আলোচনার মাশুল অলক্ষ্যে দিতে দিতে 'পারের কড়ি'তে কম না পড়ে যায়।— পরিশেষে আমাকে যে গৌরবের অধিকারী করেছেন তার জন্য সংখ্যাতীত ধন্যবাদ গ্রহণ করে আমাকে অনুগৃহীত করেন।

ভবদীয়
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে অপমান সহ্য করার যে উল্লেখ করেছেন, তা স্পষ্টত তাঁর সাহিত্য, সমাজচিন্তা, ধর্মবোধ ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ তুলে চন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট স্বদেশবাসীদের সুদীর্ঘকালের বিরোধিতার দিকে লক্ষ করে লেখা।

মনোরঞ্জন তাঁর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিদান প্রসঙ্গে যে অভিযোগ করেছেন, তা আংশিক সত্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদের পরে (২৬ ডিসেম্বর ১৯১৩) অনুষ্ঠিত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অধিবেশনে ডি. লিট. উপাধিদানের প্রস্তাব গৃহীত হয় এই ঘটনার পূর্বেই। অবশ্য, ইংল্যাণ্ডে ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্যদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির সংবাদ নানাভাবে এ-দেশে কিছু কিছু প্রচারিত হয়েছিল।

পত্র ৭১। "সত্য বলিয়াছিলাম বলিয়া দেশের অনেক লোক রাগ করিয়া আমাকে গালি দিতেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদে কলকাতা থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে অনেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত (৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০) এই সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাষণে দেশবাসী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পূর্ব-বিরোধিতার কথা স্মরণ করে কিছু রূঢ় মন্তব্য করেন,[১] এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

---

[১] 'সঞ্জীবনী' পত্রের ২৮ নভেম্বর ১৯১৩ (১২ অগ্রহায়ণ ১৩২০) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই মৌখিক ভাষণটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা Calcutta

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, আলোচ্য পত্রে তার ইঙ্গিত আছে।

পত্র ৭৩। "বন্দেমাতরমের নামে দেশে যে একটা হুজুগের ঢেউ উঠিয়াছে সেটার ত একটা Psychology আছে— ঘরে বাইরে গল্পে তারই আলোচনা চলিতেছে।…"

ভারতবর্ষের পরাধীনতামোচনের উপায় হিসেবে সন্ত্রাসবাদের পথকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সমর্থন করেন নি, সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাঁদের পথ রবীন্দ্রনাথের কাছে নীতিহীন বলে মনে হয়েছে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রকে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনের নামে দেশে 'হুজুগের ঢেউ' বয়ে যায়— এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের এই মতই প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনে সন্ত্রাসবাদের পথকে রবীন্দ্রনাথ কী দৃষ্টিতে বিচার করেছিলেন, তাঁর নানা প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে তার পরিচয় আছে। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর আক্রমণের খবরে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ১০ পৌষ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে জগদানন্দ রায়কে আমেরিকা থেকে একটি চিঠিতে[১] লিখছেন—

"কাল হঠাৎ সকালে খবরের কাগজে পড়া গেল দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কে একজন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। পড়ে আমার মনটা অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছে। আমরা মনে করি পাপকে আমাদের কাজে লাগাব, কাজ ত গোল্লায় যায় তারপর সেই পাপটাকে সামলায় কে? এ যে

Municipal Gazette (13 Sept. 1941)-এ 'The Poet's Reply to the Nobel Prize Deputation' নামে (Part II, pp. xxii) এই ভাষণটি পুনর্মুদ্রিত।

[১] বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, পত্র ১১

চালুনিতে করে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা। পৃথিবীতে যারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করাটাকে বিলম্বজনক ও কষ্টসাধ্য মনে করে তারাই সিঁধ কেটে বড় মানুষ হতে চায়। আমাদের হতভাগ্য দেশে আমরা যথার্থ ত্যাগস্বীকার করে দেশের কাজ করতে কষ্ট বোধ করি বলেই আমাদের ওখানেই একদল বীরপুরুষ বোমা ছুঁড়ে দেশ উদ্ধার করতে চায়। এই বোমা কোন্‌খানে গিয়ে পড়ে বল দেখি? একেবারে স্বদেশলক্ষ্মীর মঙ্গলঘটের উপরে। আমাদের দেশে দুর্গতি ত নানা আকারেই বিরাজ করচে, তার উপরে আবার এই সয়তানটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিলে কে? একে ত সহজে বিদায় করতে পারবে না। এখন থেকে ক্ষণে ক্ষণে অকস্মাৎ কোন্ অন্ধকার থেকে এ হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ে আমাদের ভাঙ্গা কপালকে আরো ভাঙ্গবে।”

'ঘরে বাইরে' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে সবুজপত্রে প্রকাশিত হবার সময়েই (১৩২২ বঙ্গাব্দ) এর নানারকম প্রতিকূল সমালোচনা হতে থাকে। এই উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র সন্দীপকে রবীন্দ্রনাথ দেশের সন্ত্রাসবাদীদের টাইপচরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে স্বদেশভক্ত সন্ত্রাসবাদীদের হেয় করেছেন, এরকম অভিযোগও উঠেছিল।

এই উপন্যাস বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পরিশেষ অংশে (১৯৬১) তা সংকলিত হয়েছে।

“বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যে মাঘের মাঝামাঝি একটা অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে—”

১৩২২ বঙ্গাব্দে অনাবৃষ্টিজনিত শস্যহানির ফলে বাঁকুড়ায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার সাহায্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়, মাঘোৎসবের পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় করেন। এই

অভিনয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধন' নামে একটি নাট্যভূমিকা লিখে দেন, তা ফাল্গুনীর পূর্বে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধনে' কবিশেখরের এবং 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে 'বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষাকল্পে ফাল্গুনী অভিনয়' নামে একটি অনুষ্ঠানপত্রী প্রকাশিত হয়।

পত্র ৭৫। ৭৪-সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটা' আলোচনা করেছেন। অনুমান করা চলে যে, মনোরঞ্জন এই নাটক সম্বন্ধে আরো কিছু প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকে করায় তার উত্তরে এই চিঠি লেখেন।

পত্র ৭৬। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬-১৭ খৃস্টাব্দে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের শেষে দেশে ফেরার পর এই চিঠিটি লেখেন। তিনি কলকাতায় আসেন ১২ মার্চ ১৯১৭ (২৮ ফাল্গুন ১৩২৩)। রথীন্দ্রনাথের 'সম্বলপুর প্রয়াণের' কথা বিষয়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর মাতৃদেবীর জীবদ্দশায়, অর্থাৎ ১৯১৮ খৃস্টাব্দের আগেই রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক তাঁদের সম্বলপুরের বাড়িতে যান।— এ সমস্ত তথ্য এবং পত্রশেষে নববর্ষের উল্লেখ থেকে এই চিঠির রচনাকাল অনুমিত।

"একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় সমুদ্রতীরে ঘুরপাক খাইয়ে আবার আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে।"

১৯১৬ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার নিউইয়র্কের James B. Pond, Lyceum-এর পক্ষ থেকে সে দেশে কতকগুলি বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ পান। আমন্ত্রণের শর্ত ছিল— এই প্রতিষ্ঠানের

ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার নানা প্রতিষ্ঠানে চল্লিশটি বক্তৃতা দেবেন এবং প্রতি বক্তৃতার জন্য পাঁচশো ডলার সম্মানদক্ষিণা পাবেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন দূর করার জন্য এই অর্থ বিশেষ সহায়ক হবে, প্রধানত এই আশায় রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ৩ মে ১৯১৬ (২০ বৈশাখ ১৩২৩) আমেরিকার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে জাহাজযোগে যাত্রা করেন। তিনি আমেরিকার পথে জাপানে তিন মাস ও আমেরিকায় কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব চার মাস ছিলেন। নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতাসূচী শেষ হবার আগেই আমেরিকা ত্যাগ করেন, ফেরার পথে আবার তিনি জাপান হয়ে আসেন।

আমেরিকা যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ জাপানে যে তিন মাস ছিলেন, সেই সময় অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন, এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **'The Message of India to Japan'** এবং **'The Spirit of Japan'**।

আমেরিকার নানা জায়গায় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ থেকে ২০ জানুয়ারি ১৯১৭, রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন অথবা নিজের রচনা থেকে পাঠ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ (**Cult of Nationalism**)। এই উপলক্ষে আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, একত্রিশটি বিভিন্ন শহরে তাঁকে যেতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের **'Passage to Amarica'** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পত্র ৭৭। "'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতাটি…"

এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা রামমোহন লাইব্রেরি হলে ৪ আগস্ট

১৯১৭ খৃস্টাব্দে পাঠ করেন, পরে ১১ আগস্ট তারিখে আলফ্রেড থিয়েটারেও পঠিত হয়।

পত্র ৭৮। "আপনার আত্মজীবনীর একটি ছোট অধ্যায় পড়ে আমার খুব ভাল লাগল। সন্তোষকে দেব, ওদের শান্তিনিকেতনে বের করবে।" এই রচনাটি শান্তিনিকেতন পত্রের তৎকালীন সম্পাদক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত দিয়েছিলেন কি না, জানা যায় না। শান্তিনিকেতন পত্রে এটি প্রকাশিত হয় নি। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র করুণাকিরণ আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর পিতা আত্মজীবনীটি কোনো কারণে বিনষ্ট করেন।

"এখানে আমাদের কাজ হঠাৎ নানা শাখাপ্রশাখায় অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েচে।"
এই পত্র যে সময়ে লেখা তার অল্পকাল আগে, ৮ পৌষ ১৩২৮ (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাসভায় বিশ্বভারতী সোসাইটির পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর সংস্থিতি (Constitution)ও গৃহীত হয়। এর আগে ১৮ আষাঢ় ১৩২৬ রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রারম্ভোৎসব সম্পন্ন করে বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

রায়পুরের কর্নেল নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে সুরুলগ্রামের সন্নিহিত কুঠিবাড়ি কেনেন, সেটিকে কেন্দ্র করে ১৯২২ খৃস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতী কৃষিবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। অল্পকালের মধ্যেই এই বিভাগের কাজের প্রসারণ ঘটে এবং এটি 'বিশ্বভারতী পল্লীসংগঠনবিভাগ' নামে পরিচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বিভাগের কর্মকেন্দ্র কুঠিবাড়ি ও তার সংলগ্ন পল্লীর নামকরণ করেন 'শ্রীনিকেতন'।

এই সময়েই বিশ্বভারতীর নিজস্ব গ্রন্থপ্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠার চিন্তাও আরম্ভ হয়।

"আমার এখানে সমুদ্রপার থেকে কেউ কেউ আসচেন তাঁদের কাছ থেকে অনেক কাজ পাওয়া যাচ্চে।"
এই পত্ররচনাকাল পর্যন্ত সমুদ্রপার থেকে যে-সমস্ত বিদেশী কর্মী শান্তিনিকেতনের কর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: J. W. Petavel, W. W. Pearson, C. F. Andrews, L. K. Elmhirst এবং Stella Kramrisch।

১৯১৩ খৃস্টাব্দে Petavel শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দিয়ে কয়েকমাস বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। Pearson ও Andrews উভয়েই ১৯১৪ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। Elmhirst আসেন ১৯২১ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে, তাঁর অর্থানুকূল্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে Stella Kramrisch শান্তিনিকেতনে কর্মীরূপে যোগ দিয়েছিলেন।

পত্র ৭৯। "আপনি এতবড় অদ্ভুত ভুল করলেন কি করে? আপনার সঙ্গে আমার বর্ণিত হেডমাস্টারের কোন্‌খানে মেলে?"
শান্তিনিকেতন পত্রের ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় 'আলোচনা: বিশ্বভারতীর কথা,[১] শীর্ষক একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাশ হয়ে গেছে।'— তিনি তো

---

[১] 'বিশ্বভারতী' (৭ই পৌষ ১৩৫৮) গ্রন্থভুক্ত।

এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল— ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাশের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তার বনল তা,. তিনি বিদায় নিলেন। তারপর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।"

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভে বৎসরকাল প্রধান অধ্যাপকের পদে ছিলেন, এই বইয়ের ১২-সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা চলে, 'শান্তিনিকেতন' পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনাটি পড়ে মনোরঞ্জনের ধারণা হয়, বর্ণিত হেডমাস্টার তিনিই।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কথা' গ্রন্থে "পূর্ব-স্মৃতি" রচনায় লিখেছেন (পৃ. ২৬), "নগেনবাবু [নগেন্দ্রনারায়ণ রায়] রামপুরহাট হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। কুঞ্জবাবুর অবসর গ্রহণের পরে তিনি আশ্রমের অধ্যাপক হন।··· 'স্মৃতি'তে ৮৫ পৃষ্ঠায় কবি এঁরই বিষয় লিখেছেন, মনে হয়।"

"দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে কলকাতায় শারদোৎসব অভিনয়ের পর (অ্যালফ্রেড থিয়েটার ও ম্যাডান থিয়েটার :

১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২), রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২২ পশ্চিম ভারত ও সিংহল ভ্রমণে বের হন, ডিসেম্বরের শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এভাবে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল, নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ।

পত্র ৮২। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের গুজরাট ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী গৌরগোপাল ঘোষ পোরবন্দর থেকে রথীন্দ্রনাথকে ২৭ নভেম্বর ১৯২৩ খৃস্টাব্দে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "22nd Nov. এখানকার Club Houseএ গুরুদেব খুব কম কিন্তু selected audienceএর কাছে বিশ্বভারতীর ideal সম্বন্ধে বললেন।⋯" বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত এই মূল পত্র অনুসারে বর্তমান পত্রের কাল অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ৮৫। "⋯এই পরীক্ষা-পাস করাবার ইস্কুলটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শসঙ্গত জিনিষ নয়—"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের যে আদর্শরূপ রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছিল, বাস্তবে নানা কারণে তা কোনোদিনই সমগ্রভাবে রূপায়িত হতে পারে নি। প্রথম থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, পরোক্ষভাবে হলেও, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বরাবরই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ও পরবর্তীকালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিত। ছাত্রদের ইন্‌স্পেক্টর অফ্ স্কুলস্-আয়োজিত টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হত। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই, ভাইস চ্যান্সেলর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সরাসরি ছাত্র পাঠানোর অধিকার দেন।

কিন্তু দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা-পাস করানোই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হয়ে উঠুক, রবীন্দ্রনাথ তা কোনোদিনই প্রসন্নমনে স্বীকার করে নিতে পারেন নি; বিশেষত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরও পরীক্ষা পাসের দিকে বিদ্যালয়ের এরকম নির্ভরতা তাঁকে হতাশ করে। কিন্তু অভিভাবকদের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর আদর্শ বিদ্যালয়ে সর্বাংশে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি; উপরন্তু বিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকও অভিভাবকদের মতের সমর্থক ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ১৬ জানুয়ারি ১৯২৬ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে লিটন এরূপ মন্তব্য করেছেন: "Visva-Bharati is at present unique and as you say it has grown from within and owes its success to its independence from conventional standards.··· I see no reason whatever why it should not some day enjoy a charter of its own and challenge competition with Universities of a different stamp."[১]

পত্র ৮৭। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁকে কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতনে

---

[১]. শ্রীসনৎকুমার বাগচী-রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ' গ্রন্থের (প্রকাশ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ) "লিটন ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে মূল পত্রের বঙ্গানুবাদ (পৃ. ৫৮-৬০) প্রকাশিত।

ফিরে আসতে হয়। এই সময় ডাক্তার নীলরতন সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী diathermic ray নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা যেতে হয়েছিল। ২৫ জুলাই ১৯২৮ খৃস্টাব্দে তিনি রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখছেন, “নীলরতনবাবু আমার শরীরের জন্যে Diathermic চিকিৎসার পরামর্শ দিচ্চেন তাই প্রশান্তরা কলকাতায় আমাকে টানাটানি করচে।” ৩০ আগস্ট ১৯২৮ রথীন্দ্রনাথকে এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, “আজ ডাক্তারের ডায়াথার্ম্মিক থেকে ছুটি পেয়েচি।…”

এই সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তাঁর মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে, আলোচ্য চিঠিখানি এই সময়ের রচনা।

সুস্থ হয়ে উঠে আবার ইংল্যাণ্ড যাবেন, রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা থাকলেও কার্যত তা সম্ভব হয় নি। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে, প্রায় দুবছর পর হিবার্ট বক্তৃতাদানের (The Religion of Man) জন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন।

“যেখানে দৈবক্রমে জন্মেছি সেই কি আমার সত্য জন্মভূমি ?”

ইয়োরোপের মানুষ তাঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত সুদূর প্রাচ্যজগতের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে একদা তাঁদের আত্মীয়রূপে গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে, ১৯৩০ সালের ২৬ আগস্ট লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন—

“কোথা থেকে জানি নে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে; আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের

লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে, যখন ভারতবর্ষীয়দের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন এরা মানুষরূপে দেখে তখনি এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে, যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে।"

এশিয়ার দূরপ্রান্তবর্তী বিচিত্র জনসমাজের সঙ্গে যোগ, তাঁদের আত্মীয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছিল। নিজের জন্মভূমিতে সুদীর্ঘকাল তাঁর স্বদেশবাসী একাংশের অস্বীকৃতি, বিরুদ্ধতা, এমন-কি অহেতুক বৈরিতার তুলনায় এই প্রীতি, নিঃসন্দেহে তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। পৃথিবীর সকল দেশই যে তাঁর দেশ, সকল মানুষই তাঁর স্ব-জন, স্বভাবগত তাঁর এই প্রত্যয় দেশান্তরের অভিজ্ঞতায় দৃঢ়তর হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ বার বার আলোচনা করেছেন, এ-রকম তিনখানি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল।

আর্জেন্টিনার বুয়োনেস এয়ারিস থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ২২ নভেম্বর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখছেন—

"এখানকার সকলে যে কত গভীর আত্মীয়তার সঙ্গে আমাকে ভালবাসে তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। এখানেই আমার বাসা বাঁধা উচিত ছিল, কেননা এরা সত্যই আমাকে চায় এবং আমার কাছ থেকে কিছু সত্য চায়।··· জন্মভূমিতে আমাদের আত্মীয়ের কাছ থেকে আমরা সহজেই ভালোবাসা এবং সাহচর্য্য চাই,— কিন্তু আমাদের মানস-আমি, সেও কি মানুষের কাছ থেকে দরদ চায় না, সেও কি মানুষের কাছ থেকে পুরো মূল্য না পেলে নিজেকে দরিদ্র জ্ঞান করে দুঃখ পায় না? সেই আমার মানস-আমি, আমার জন্মভূমিতে অধিকাংশ কালই

লক্ষ্মীছাড়া গৃহছাড়া হয়ে কাটিয়েছি।··· এসব দেশে আমি যে গভীর ভালোবাসা পাই সেটা জন্মগত আত্মীয়তার জিনিস নয়, সে যে মর্মগত আত্মীয়তার জিনিস— তার চেয়ে বহুমূল্য আর কিছু নেই, এই ভালবাসার অজস্র দাক্ষিণ্য দেখে আমি বিস্মিত হই।"

১৯৩০ খৃস্টাব্দে শেষবার ইয়োরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিনে প্যারিস থেকে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখছেন—

"আজ আমার জন্মদিন। এখানে যে রবীন্দ্রনাথ আছে সে এখানকার উপকরণ নিয়ে নিজেকে একটা সম্পূর্ণতা দিয়েছে। তার সঙ্গে পঁচিশে বৈশাখের রবি ঠাকুরের মিল হবে না। দেশে ফিরে গেলে তবে আমি তাকে ফিরে পাব, সেখানকার সব কিছুর সঙ্গে। তার মূল্য কিন্তু ঢের কম, ভেজাল দেওয়া জিনিষের মতো। সেখানকার নানা হালকা এবং বাজে পদার্থে তাকে খাটো করেচে— বহু অকিঞ্চিৎকরতার সঙ্গে জড়িত হয়ে সে আত্মমর্যাদা ভুলে যায়। তাই সেখানে মন পালাই পালাই করে। অথচ সেখানে আকাশে বাতাসে রূপে রসে এমন কিছু আছে যা আমার মানস-খাদ্যের প্রাণপদার্থ। আসল কথা আমার বিশ্বপ্রকৃতি আছে সমুদ্রের ওপারে, মানব-প্রকৃতি আছে এপারে। এখানকার মানুষ আমাকে গভীর করে সম্পূর্ণ করে উদ্বোধিত করে, তাই নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারি। তাই আমার জন্মভূমি পূর্বে ও পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত।"

হেমন্তবালা দেবীকে ১৭ আগস্ট ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে একটি চিঠিতে এইরকম জানিয়েছিলেন—

"দেশের অধিকাংশ লোকে আমাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না, এবং আমার আঘাতে অপমানে যথেষ্ট ব্যথিত হয় না, এই সত্যকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি— বুঝেছি দেশের মধ্যে তার স্বাভাবিক কারণ রয়েচে।···

স্বদেশের বাইরে আমার জন্যে সুপ্রশস্ত ও স্থায়ী আসন আছে— যখন জীবলোক থেকে বিদায় নিয়ে যাব তখন আমার ভাগ্যবিধাতাকে অক্ষুণ্ণ প্রণাম নিবেদন করে যেতে পারব— তিনি আমাকে অনেক দিয়েছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এই মিনতি জানিয়ে যাব যে বাংলাদেশে আর নয়।"

পত্র ৮৮। "…আবার আমার এখানকার সমস্ত কর্ম্মভার নিজে তুলে নিয়েছি—।"

এই সময় বিশ্বভারতীর পুনর্গঠন-উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়, কিন্তু যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য এই উদ্‌যোগ, তা সফল হয় নি। শেষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় বিভাগের পরিচালনভার নিজে নেন (সেপ্টেম্বর ১৯২৮)। এই সংকলনের ৯০-সংখ্যক চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কর্মভার নেবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন আশ্রমসচিবের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি উদ্‌ধৃত হল—

আশ্রমসচিব সমীপে

সবিনয় নিবেদন

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে দায়িত্বভার সম্পূর্ণরূপে আমি গ্রহণ করিয়াছি। আমার অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত বিদ্যালয়ের কোনো ব্যবস্থাই ঘটিতে পারিবে না ইহা জ্ঞাপন করিলাম। ইতি ২৫ নভেম্বর ১৯২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কানাডা যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে

সমিতির কাছে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর অবর্তমানে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যপদের (Founder President) দায়িত্ব পুত্র রথীন্দ্রনাথকে দেবার সিদ্ধান্ত জানান। ৫ মার্চ ১৯২৯ শান্তিনিকেতন সমিতি এক বিশেষ অধিবেশনে এ-সম্বন্ধে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

Resolved that the Santiniketan Samiti welcomes the idea and requests Rathindranath Tagore to discharge the President's function during his absence.

শান্তিনিকেতন সমিতির এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে বিশ্বভারতী সোসাইটির সদস্যগণের একাংশ এর বিরূপ সমালোচনা করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের মনোভাব জানা যায় নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ খৃস্টাব্দের এই চিঠিখানিতে[১]—

…"কিছুকাল পূর্ব্বে সংসদের সভায় রথীর প্রতি আমার ভারার্পণ সম্বন্ধে কোনো কোনো সভ্য বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, একি apostolic (?) succession হতে চলল! সে কথা শুনে অবধি বুঝতে পেরেছি আমাদের কর্ম্মে বুলির রাজত্ব বড়ো হয়ে উঠ্‌চে। যে ভার আমার সে ভার আমি প্রাণ দিয়ে পেয়েছি— আমিই জানি সে ভার কার উপরে দেওয়া চলে— কেবল ভোটের মধ্যে এমন মায়ামন্ত্র নেই যার দ্বারা ঠিক মত নির্ব্বাচন হতে পারে, সংসদে যে তা হয় না তার পরিচয় সর্ব্বদাই পাই, নতুবা গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিতে প্রভাতের নির্ব্বাচন কোনোমতেই সম্ভবপর হত না। অসুস্থ শরীরেও যে-ভার আমি নিজের পরে নিয়েছি, তার দরদ কতখানি তা সেইসব সভ্যেরা কখনই বুঝবেন না যাঁরা বিশ্বভারতীর জন্য যথার্থভাবে কিছুই ত্যাগ করেন নি। আমি যখন রথীর পরে ভার দিয়েছি— ভোটওয়ালা সভ্যদের সেই

---

[১] দেশ, ১১ চৈত্র ১৩৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

দরদ না থাকতেই তারা বিচারের অধিকারী। রথীর সঙ্গে আমার আত্মীয় সম্বন্ধ আছে বলেই রথী বাধা পেত এবং বাধা পেয়েছে, সেই বিপদের সম্ভাবনা আমি স্বীকার করতে রাজি নই— ডিমক্রাসির জয়পতাকা শূন্যআকাশে অভ্রভেদী করবার উপলক্ষেও না। কিন্তু আমি বেশিদিন বাঁচব না— এবং অচিরকালের মধ্যেই ডিমক্রেসীর জয়পতাকা আমার সৃষ্টির বুক জুড়ে আকাশে উড়বে। Apostolic successionএর কোনো আশঙ্কা নেই, আমি নিজের টাকা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে প্রাণপাত করে তার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। আমার অবর্তমানে কি ঘটবে সে আমার অগোচর নেই। ইতিমধ্যে যে ডিমক্রাসি নিজে কিছুই দেবে না তারই ইচ্ছাসাধনের পথ প্রশস্ত করবার জন্যে আমি চললুম বিদেশে— ভিক্ষার ঝুলি এবং ক্ষীণ প্রাণ নিয়ে।…”

বিদেশভ্রমণের শেষে দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী পরিচালনা বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন-সচিবকে যে চিঠি লিখেছিলেন, অতঃপর তা মুদ্রিত হল—

ওঁ

আশ্রম সচিব মহাশয় সমীপে

নিবেদন—

যে পর্য্যন্ত এই শান্তিনিকেতনের সমস্ত কর্ম্মপরিচালনার ভার আমি পুনর্ব্বার প্রত্যক্ষভাবে নিজে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারি ততদিন পর্য্যন্ত নিজে দায়িত্বস্বীকার করিয়া ইহার ব্যবস্থাভার শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের প্রতি অর্পণ করিলাম। তিনি আমার প্রতিনিধিরূপে কাজ চালাইবেন। আশা করি সংসদ ইহাতে সম্মতি দিয়া আমার শ্রম ও চিন্তার লাঘব করিবেন। ইতি ৪ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ৮৯। পত্রশেষে 'শুক্লা ত্রয়োদশী'র উল্লেখ থেকে এই চিঠির তারিখ নিরূপণ করা হয়েছে।

“রথীরা এখনো আসিয়া পৌছায় নাই।”
১৯২৮ খৃস্টাব্দের ১৭ মে রথীন্দ্রনাথ প্রধানত চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য সপরিবারে ইউরোপ গিয়েছিলেন, ৯ নভেম্বর ১৯২৮ তাঁরা স্বদেশে ফিরে আসেন।

পত্র ৯০। “রথী ফিরে এসে কাজে লেগে গেছে। শ্রীনিকেতনের ভার সম্পূর্ণ তার উপরে।”
১৯২৮ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে ইউরোপ থেকে ফিরে রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন-সচিবপদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পত্র ৯১। “নাগপুর দিয়ে আসা সম্ভব হল না।”
১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২ মার্চ হিবার্ট বক্তৃতাদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই সময়ে তিনি ইউরোপ রাশিয়া ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১ বোম্বাইয়ে নামেন। বোম্বাই থেকে তিনি ইম্পিরিয়াল মেল ট্রেন ধরে এলাহাবাদ হয়ে কলকাতায় আসেন।

পত্র ৯৪। “অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে গিয়েছিলুম বোটে,”
হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ২২ অক্টোবর ১৯৩৩ তারিখের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “শরীরটা ভালো নেই। ভাবছি বোটে করে গঙ্গাযাত্রা করব। খড়দহের সামনে বোট বাঁধা আছে।”

এরপর ৫ নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখে আর একটি চিঠিতে লিখছেন, “দুর্ব্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলুম বোটে। ইনফ্লুয়েঞ্জা সংগ্রহ করে দুর্ব্বলতর

অবস্থায় ফিরে এসেছি— কিছুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন।”

“বিছানা থেকে মুক্তি পেলেই উঠ্‌তে হবে রেলগাড়িতে—”

বোম্বাই নগরীতে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইবাসী রবীন্দ্র-অনুরাগীদের আগ্রহে ও সরোজিনী নাইডুর বিশেষ উদ্‌যোগে রবীন্দ্র-সপ্তাহপালনের আয়োজন হয়। ২৩ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রসপ্তাহ-অনুষ্ঠানে ‘শাপমোচন’ ও ‘তাসের দেশ’ নাটক দুটি বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী ও কর্মীরা অভিনয় করেন, রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের এবং কলাভবনের ছাত্র ও অধ্যাপক -অঙ্কিত চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়, কারুশিল্পের নিদর্শনও এই প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাত্রায় বিশ্বভারতীর দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ কর।

Visva-Bharati News, February 1934 সংখ্যায় প্রকাশিত ‘With Rabindranth in Bombay’ শীর্ষক রচনায় এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

“স্টেট্‌সম্যানে যে সংবাদ পেয়েছেন সেটা আমার স্বাস্থ্যলাভের সংবাদ নয় সেটাতে আমার দুর্গ্রহের তাড়না সূচনা করচে।”

ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদটি সম্ভবত এই—

Two new Tagore Plays

Successful production in aid of Visva Bharati

A crowded house witnessed the successful production of Rabindranath Tagore's two new and unpublished

plays, 'Chandalika' and 'Tasher Desh' at the Madan Theatre last evening under the direction of the Poet···

The plays will be repeated today and on Friday.

—The Statesman, Calcutta
13th Sept. 1933

কলকাতার অভিনয় সম্বন্ধে *Visva-Bharati News*, Oct-Nov 1933 সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের প্রাসঙ্গিক অংশ—

Rabindranath's latest playlet 'Tasher Desh' was staged in Calcutta on the 12th, 13th and the 15th September last. Along with it Gurudeva read his new play 'Chandalika' in its entirety···

ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও প্রধানত বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকে এই সমস্ত কাজে এগিয়ে আসতে হয়।

"চিঠি পেলেই উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বাভ্যাস আজও আছে সেইজন্য চিঠি যাতে না পাই সেই ব্যবস্থা করা হয়েচে—"
এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন থাকায় রথীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করেন, রবীন্দ্রনাথকে লেখা সব চিঠিই সরাসরি তাঁর কাছে না পাঠিয়ে প্রথমে তাঁর একান্তসচিব সেগুলি দেখবেন, তার পর গুরুত্ব বুঝে তিনি প্রয়োজনীয় চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবেন।

পত্র ৯৬। এই চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন একান্তসচিব

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর হস্তাক্ষরে লেখা, শেষে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেছেন।

"বাংলাদেশের দুর্গতির লক্ষণ প্রতিদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে;··· *এই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নানাকারণে দূষিত হয়ে* উঠেছিল। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা, কংগ্রেসের ভিতরে নীতিগত ব্যবধান ও দলাদলি, মন্ত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠিগত সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা—এ-সবের মধ্যে দুর্গতি-লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'আমার এই শেষ কয়দিন আমার আপন কর্মক্ষেত্রের একপ্রান্তে বসে শান্তিতে যাপন করতে ইচ্ছে করি'—এ-রকম ইচ্ছা প্রকাশ করলেও দেশের এই দুর্দিনে তাঁর পক্ষে নিরাসক্তভাবে বসে থাকা সম্ভবপর হয় নি। ২৮ নভেম্বর ১৯৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখেছিলেন[১] তার মধ্যে তাঁর উদ্‌বেগের পরিচয় আছে। চিঠিটির অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হল—

My dear Jawaharlal

I asked you to come and meet me not because I had any definite plan to discuss or any request to make. I merely wanted to know your own opinion about Bengal whose present condition puzzless me and makes me dispair. My province is clever but morally untrained and supercilious in her attitude towards her neighbours, she breaks into violent hysteric fits

---

১. প্রতিলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

when least crossed in her whims. I know her weakness but I cannot maintain my detachment of mind and passively acquiesce in her doom of perdition…

পত্র ৯৮। "ক্লান্ত শরীর নিয়ে এই পাহাড়ে এসেছি।"
এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমাস মংপুতে ড. মনোমোহন সেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের এই অবকাশ যাপনের বিবরণ দিয়েছেন।

"গীতা সম্বন্ধে আপনার বইখানি পেলুম।"
M. Banerjee, Advocate, 'Readings from the Gita' (First part) written originally for Gangadhar Sahitya Parisat on 20. 7. 1936. পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পত্র ৯৯। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবনে প্রবেশ-উপলক্ষে আশীর্বাদ।

পত্র ১০১। ৮ নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখের *The Statesman* সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্রসহ এই খবরটি প্রকাশিত হয়—

Dr. Rabindranath Tagore was the guest of honour at a party given by Mr. N. R. Sarkar, Finance Minister, Bengal, at the latter's Calcutta residence. The poet is seen above on his arrival at the party, accompanied by his host.

সংবাদপত্রে প্রচারিত এই খবর পড়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখ সংবাদপত্রের কর্তিত অংশসহ রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠি লেখেন—

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ Statesmanএ এই ছবিটি দেখে আমার একটি দুঃখের কথা মনে পড়লো। আমার প্রথম পাঁচটি মেয়ের বিয়েতে আপনাকে ডাকতে সাহস করিনি। কেননা ভয় ছিল পাছে কোনো কারণে হয়ত আপনার কোনো বিশেষ অসুবিধা হয়। শেষ দুটী মেয়ের বিয়েতে সাহস করে আপনাকে ডেকেছিলুম। আপনি আসেন নি। মধ্যে মধ্যে কাগজে দেখেছি আপনি সময়ে সময়ে বিবাহাদিতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আজ এই ছবিটি দেখেও মনে হোলো এ সৌভাগ্য থেকে কেবল আমিই বঞ্চিত হয়েচি। নলিনীরঞ্জন সরকার ধনী লোক কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি আন্তরিকতার দিকে থেকে তাঁর চেয়ে আমার আদর অভ্যর্থনা কোনো অংশে কম হোতো না বরং বেশীই হোতো। কিন্তু আপনি এলেন না। আমি ধনী নই আমি দরিদ্র, নলিনীরঞ্জন লক্ষপতি— মনে হয় হয়ত এই দারিদ্র্যই আমার সৌভাগ্যের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি যা কত আশা করে পাইনি, নলিনীরঞ্জন মহাশয় তা' সহজেই পেলেন।

কথাটা নতুন নয়— তবে আপনার কাছে ধনী ব'লে আকৃষ্ট হই নি। তাই আপনার কাছে এ অবহেলার কথা মনে হ'লে মনের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করি। শুধু ধনীর সঙ্গে কোনো বন্ধনে কখনও আসি নি, আসতে চাইও নি। ইতি ভবদীয়

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি মনোরঞ্জনের পূর্বোদ্ধৃত চিঠির উত্তরে লেখা।

১ নভেম্বর ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে নলিনীরঞ্জন সরকার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে চিঠি লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ—

“আপনি ৫ই নভেম্বর কলিকাতা আসিবেন লিখিয়াছেন। এবার এখানে আসিয়া যদি আমার বাড়িতে একবার পদধূলি দিবার অবসর হয় তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সে সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং আলাপ আলোচনা করিবার একটু সুযোগ কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে করিয়া দিতে চাই। ৫ই অথবা ৬ই নভেম্বর বিকালে যে কোনও দিন আপনার সুবিধা অনুসারে স্থির করিতে পারি।…”

নলিনীরঞ্জনের এই অনুরোধক্রমেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখছেন—

“অনেক সময় এমন দুর্নিবার কারণ ঘটে যে আমার কাজের খাতিরেই অনুরোধ কাটিয়ে উঠতে পারি নে।”

নলিনীরঞ্জন তৎকালে দেশের আর্থিক জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির তখন তিনি প্রধান ব্যক্তি। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে নতুন ভারত শাসন আইন-অনুসারে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রীসভায় (ফজলুল হক-মন্ত্রীসভা) তিনি অর্থমন্ত্রী পদে ছিলেন। পরবর্তীকালে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্য হন। নলিনীরঞ্জনের সহায়তা বিশ্বভারতীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ২৯ আগস্ট ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠিতে নলিনীরঞ্জন লিখছেন—

"আমি আগামীকাল গোয়ালিয়র রওনা হইতেছি, কোন সুযোগ পাইলেই বিশ্বভারতী সম্পর্কে কিছু কাজ করিয়া আসিবার চেষ্টা করিব। বিশ্বভারতীর কোন উপকার করিবার সুযোগ পাইলে আমি তাহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি; কারণ সকলের সমবেত শুভবুদ্ধির উপর এই প্রতিষ্ঠানের দাবী ভুলিবার নয়। Dr. Jenkins[1]এর সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই; তবে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ফিরিয়া তাঁহার সহিত আপনাদের সম্পর্কে আলাপ করার ইচ্ছা আছে। তখনই বিশ্বভারতীর বিষয়টি শেষ করিয়া ফেলিতে চাই; এবারকার বাজেটে বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, Health Centre প্রভৃতি সব বিভাগের জন্ত যাহাতে grant রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব।…"

ইতিপূর্বে ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশের বাজেটে নলিনীরঞ্জন বিশ্বভারতীর জন্ত Capital Grant-এর সংস্থান রেখেছিলেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে তাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে এই তথ্য জানা যায়। শুধু এই সময়েই নয়, পরবর্তীকালেও নলিনীরঞ্জন নানাভাবে বিশ্বভারতীর সহায়তা করেছেন।

সুতরাং, বিশ্বভারতীর প্রয়োজনেই, ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নলিনীরঞ্জনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, নলিনীরঞ্জনের দুর্দিনে বিশ্বভারতী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান করে যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাতে তিনি সামাজিকভাবে বিশেষ উপকৃত হন।

---

[1] তৎকালীন বাংলা সরকারের Director of Public Instruction.

সুবোধচন্দ্র মজুমদার (১৮৭৮ ? - ১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্ঞাতিভ্রাতা। সুবোধচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন আষাঢ় ১৩০৯ বঙ্গাব্দে। শ্রীশচন্দ্রের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুবোধচন্দ্রের পরিচয় ঘটে, এরকম অনুমান করা যায়। তিনি প্রধানত ইংরেজি ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় তাকে নিয়ে হাজারিবাগে ছিলেন (১৯০৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে), সেইসময় সুবোধচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ত্যাগ করে দিল্লীতে নব-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আবার আশ্রম বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনেন। অক্টোবর ? ১৯০৩ খৃস্টাব্দে (আশ্বিন ১৩১০) রবীন্দ্রনাথ অবলা বসুকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য আমি সুবোধকে আবার দিল্লি হইতে টানিয়া আনিয়াছি। সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত। দিল্লিতে সে হেডমাস্টার হইয়া আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি তাহাকে জবরদস্তি করিয়া এখানে ফিরাইয়াছি।…"

অনুমান করা যায়, ১৩১০ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশের পর সুবোধচন্দ্র আবার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জমিদারির সদর কাছারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগ করেন। ৩ বৈশাখ ১৩১৪, রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "এই বৎসর হইতে সেখানে [শিলাইদহে] সুবোধচন্দ্রের রাজত্ব।" কিন্তু শিলাইদহের কাজেও সুবোধচন্দ্র বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেন নি। সেই বছরই পৌষ মাসে শিলাইদহে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর কন্যা লতিকার (লতু) মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুশোকে

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সুবোধচন্দ্র শিলাইদহ ত্যাগ করেন। ২ মাঘ ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে শ্রীশচন্দ্রকে জানাচ্ছেন, "সুবোধ অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিতে অক্ষম এইরূপ আমাকে জানাইয়াছে—বোধকরি জয়পুরে অথবা দিল্লীতে কোনো কাজের আশা পাইয়া থাকিবে।"

শিলাইদহ ত্যাগ করে সুবোধচন্দ্র জয়পুর রাজ্যের কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকালই সেখানে কাজ করে ফিরে আসেন এবং কাটোয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর সে-কাজও ছেড়ে দিয়ে আবার জয়পুর রাজ্যের কাজে ফিরে যান। পরবর্তীকালে সুবোধচন্দ্র জয়পুর-রাজসরকারের কাজে বিশেষ উন্নতি করে রাজ্যের প্রধান সচিবপদে (Secretary Mahakma Khas) প্রতিষ্ঠিত হন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুবোধচন্দ্রের যোগাযোগ পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ ছিল। সুবোধচন্দ্র তাঁর তিন পুত্রকেই শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, সমালোচনী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাময়িকপত্রে সুবোধচন্দ্রের কিছু সাহিত্যচর্চার নিদর্শন আছে। তাঁর রচিত তিনখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য : 'পঞ্চপ্রদীপ' (১৩১৮), 'সিধন' (১৩২৪), 'আমাদের গ্রাম' (১৩৩২ ?)।

•

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

পত্র ১। সুবোধচন্দ্র ২৭ কার্তিক ১৩০৯ (১৩ নভেম্বর ১৯০২) তারিখে শমীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান, কুঞ্জলাল ঘোষকে ঐদিনই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী লিখে পাঠানো হয় (বর্তমান গ্রন্থভুক্ত পত্র,

পৃ. ১৬৩-৮০)। বর্তমান পত্রের রচনাকাল এর থেকেই অনুমান করা হয়েছে।

“কৃষ্ণবাবু সম্বন্ধে কোনপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার তোমরা মনে রাখিয়ো না—”
কৃষ্ণলাল ঘোষের সঙ্গে বিদ্যালয়-পরিচালনা বিষয়ে তৎকালীন অধ্যক্ষসভার সদস্যদের (মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার) মতবিরোধ প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের মনোরঞ্জনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৬ সংখ্যক পত্রের গ্রন্থপরিচয়ে (পৃ. ২৩০-৩৩) আলোচিত হয়েছে।

“Religious Systems এবং Origin of Aryans বই দুখানি পাঠাইলাম— ”
উল্লিখিত প্রথম গ্রন্থটি বিষয়ে সম্ভাব্য চারখানি গ্রন্থের নাম করা গেল। এগুলির মধ্যে যে-কোনো একখানি বই রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে থাকতে পারেন।

Sonnenschem-রচিত, ‘Religious Systems of the World / A Contribution to the Study of Comparative Religion’ (1892), F.W. Hopkins, ‘The Religion of India’ (1895), M. Monier Williams, ‘Religious Thought and Life in India’ (4th edn. 1891), A. Barth, ‘The Religions in India’ (1889)।

অপর গ্রন্থটি I. ‘Taylor. রচিত ‘The Origin of the Aryans’ (1889)।

⋮

“তাও শীঘ্র সম্পূর্ণ করিয়া দিবে। যত শীঘ্র পারি আমি ছাপার বন্দোবস্ত পাঠাইব।”

বিদ্যালয়ের আরম্ভকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি টেকনিক্যাল বিভাগ স্থাপন করার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ত্রিপুররাজ মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে ১৩ শ্রাবণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে একটি চিঠিতে লিখছেন—

"বেশ শান্তির সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ চলিয়া যাইতেছে। কেবল অর্থাভাবে ও যন্ত্রাভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না।" সেই বছরই, ৭ চৈত্র জানাচ্ছেন, "কারখানার উপযুক্ত একটি বড় ঘর বানাইতেছি— একজন বন্ধু আমাকে engine ও অন্যান্য যন্ত্র দিবেন কথা দিয়াছেন।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার পরিচয় জানা যায়।

বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা প্রথম পর্বে আরম্ভ হলেও অর্থাভাবে মাঝে মাঝে বন্ধ রাখতে হয়। পরবর্তীকালে, বিশ্বভারতী-পর্বে বিদ্যালয়ে তাঁত ও কাঠের কাজ শেখানোর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়।

পত্র ২। "আসন্ন ঝড়ের মুখেই তুমি বিদ্যালয়কে ছাড়িয়া আসিয়াছিলে। ইতিমধ্যে তাহার উপর দিয়া বিপ্লব চলিয়া গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্নী ও মধ্যমা কন্যার অসুস্থতার জন্য দীর্ঘকাল বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনি অনেক রকম ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করলেও শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হয় নি। সুবোধচন্দ্র যখন প্রথমবার বিদ্যালয় ছেড়ে যান (১৯০৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে), তখন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ রেণুকাকে নিয়ে হাজারিবাগে, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরিচালন-দায়িত্ব অর্পিত, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের

শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন নি। রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে চিঠিপত্রে নানারকম পরামর্শ দিয়ে বিদ্যালয়ের স্থিতি ও শৃঙ্খলা ফেরানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন— আলোচ্য পত্রে সেই 'বিপ্লব'-কালের কথা তিনি স্মরণ করেছেন।

"—বন্ধুরাও ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছেন···"

বিদ্যালয়ের সূচনায় স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেও দু-এক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরিচিত বন্ধুমণ্ডলী ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেন। এইসময় বিদ্যালয়ের নিদারুণ অর্থকষ্ট চলছিল। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো সুহৃদ অর্থ-সাহায্য দিয়েও বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন।

এই চিঠি লেখার কয়েক মাস আগে ১৯০৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে, জগদীশচন্দ্র বসু, মোহিতচন্দ্র সেন ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। অনুমান করা যায়, এইসমস্ত বন্ধুদের কথাই রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে উল্লেখ করছেন।

পত্র ৩। আলোচ্য চিঠিখানিতে ভবেন্দ্রবাবুর বিদায়-প্রসঙ্গ ও রথীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালনের উল্লেখ আছে।

১৮ কার্তিক ১৩১০ তারিখে লেখা একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখছেন, "ভবেন্দ্রবাবু ও গোপালবাবু এই দুটি বিজ্ঞাপনের লোক একেবারেই অযোগ্য। নিশিকান্ত এলে ভবেন্দ্রবাবুকে বিদায় করে দিতে হবে।"

ভবেন্দ্রনাথকে বিদায়দানের সময় ও রথীন্দ্রনাথের জন্মদিবস (১৩ অগ্রহায়ণ) —এই দুই তথ্যের ভিত্তিতে পত্ররচনার কাল অনুমিত।

"কই— সেই ইংরাজী রীডার কপি করিয়া পাঠাইলে না ?"

উল্লিখিত 'ইংরাজী রীডার' সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজি সোপান' (প্রকাশ ৭ মে ১৯০৪) বইয়ের পাণ্ডুলিপি। যে প্রণালীতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষা শেখানো হত তা পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পর্যায়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমার ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন।

রাজেন্দ্রবাবু, ভবেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু :

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্মী ও শিক্ষক, পরবর্তীকালে শিলাইদহে ঠাকুর পরিবারের দেবত্র সম্পত্তির নায়েব ও সেখানকার মাইনর স্কুলের শিক্ষক।

ভবেন্দ্রনাথ ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দে কিছুকালের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

নগেন্দ্রনারায়ণ রায় শিক্ষকরূপে ১৩১০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে যোগ দেন। প্রথম থেকেই তাঁকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৩১১ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশে তিনি অন্যত্র চলে যান। 'দেশ' শারদীয় ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭৯-সংখ্যক পত্র-পরিচিতিতে (পৃ. ২৯৭-৯৮) তাঁর প্রসঙ্গ আছে।

"মাঝে মাঝে দিনু ও সন্তোষকে অধ্যাপনা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে ভুলিয়ো না।"

এইসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এফ.এ., বি.এ. প্রভৃতি পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিতেন। শিক্ষক-

পরীক্ষার্থীরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কিছু কিছু ক্লাস নিতেন।

"…যে কয়দিন তিনি আইন পড়ার উপলক্ষ্যে কামাই করিয়াছেন সে কয়দিনের বেতন কাটিবার প্রয়োজন নাই।"

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি ঘটলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতন কাটার নিয়মের দৃষ্টান্ত এখানে যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অভিভাবক ছাত্রের বেতন দিতে বিলম্ব করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ডদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকেই জানা যায়। ২৫ পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "—বিদ্যালয়ের নিয়মিত ব্যয় প্রতি মাসে আমাকে বহন করিতে হয়— একটা হিসাব করিয়া না চলিলে এক দিন বিদ্যালয়কে গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে উপনীত করা হইবে। অতএব বেতন সম্বন্ধে আমি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম দৃঢ়ভাবেই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ প্রতি মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বেতন প্রত্যাশা করিব— দশ দিনের পর হইতে প্রত্যহ এক আনা দণ্ড গ্রহণ করা হইবে— সেই মাস পূর্ণ হইলেও বেতন না পাইলে পর মাসের ১৫ই তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিতে বাধ্য হইব। ছুটির সময়কার বেতন বাদ পড়িবে না।"[১]

'সাধারণী', 'নবজীবন' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র অচ্যুতচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অচ্যুত বিদ্যালয়ে

---

[১] দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ১০, পৌষ ১৩৯০, পৃ. ৯-১৫।

কিছুকাল অনুপস্থিত ছিল, অক্ষয়চন্দ্র পুত্রের অনুপস্থিতিকালের বেতন না দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

পত্র ৪। পত্রে উল্লিখিত দেশের সমসাময়িক সমস্যাবিষয়ে কলকাতা টাউন হলে বক্তৃতাটি "অবস্থা ও ব্যবস্থা"। রবীন্দ্রনাথ শুক্রবার, ২৫ আগস্ট ১৯০৫ (৯ ভাদ্র ১৩১২) তারিখ এই বক্তৃতাটি দেন। চিঠির শেষে বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। অনুমান করা হয়েছে, অন্তত এক সপ্তাহ আগে, ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার এই চিঠি লিখেছেন।

"মহারাজের টেলিগ্রাফ পাওয়া গেল…"
ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের টেলিগ্রাফ।

পালিত, সর্ব্বেশ, অরুণ, দেবল :
বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র যতীন্দ্রনাথ পালিত, সর্বেশচন্দ্র মজুমদার, অরুণচন্দ্র সেন, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল।

"রথী সন্তোষদের পড়া চলে? সেই জর্মান বন্ধুর কাছে জর্মান শিক্ষার চেষ্টা করচে কি?"
এইসময় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের গিরিডির বাসভবনে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র কিছুকাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ২০ কার্তিক ১৩১১ তারিখে শ্রীশচন্দ্রকে জোড়াসাঁকো থেকে যে চিঠি লেখেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল—
"ভাই

আমার পিতার শরীর ভাল নয়। এখন আমার কোথাও নড়বার জো নেই।… যে পর্যন্ত না ডেকে পাঠাই রথী সন্তোষদের তোমার কাছে রেখেই পড়িয়ো। তাদের এইটুকু বোলো যেন সমস্তদিনের কর্ত্তব্যের একটা কাল-পর্য্যায় ঠিক করে নিয়ে সেই অনুসারে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যায়। সংস্কৃত তর্জমা ও ব্যাকরণটা প্রত্যহই যেন চলে তাছাড়া

Buddhist India পড়ে ইংরাজিতে তার প্রত্যেক অধ্যায়ের একটা সংক্ষেপ মর্ম্ম লেখে। রামায়ণ মহাভারতটা বেশ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন-পূর্ব্বক তার থেকে উদ্ধারযোগ্য তথ্যগুলি যেন উদ্ধার করে। এবং জার্মান শিক্ষার প্রতিও অবহেলা না করে।…"

এইসময়ে শ্রীশচন্দ্রকে লেখা আরো কয়েকটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায়, ঐ সময় গিরিডি নিবাসী Ehlers নামে এক জার্মান প্রতিবেশীর কাছে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন।

"সেই জমি নেবার কথা তোমার ন দাদাকে বলেছ ত ?"
এই প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৫৯-সংখ্যক চিঠি ও তার টীকা (পৃ. ২৮০-৮৩) দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫। "সুরেনের একটি পুত্র লাভ হয়েছে—"
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ (২৫ অক্টোবর ১৯০৫-২৪ জানুয়ারি ১৯৫৩)।

"শ্রীশবাবুকে বোলো গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে…স্টেশন থেকে ৪।৫ মাইলের মধ্যে যত সম্ভব জমি… সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা যেন নিশ্চয়ই করেন—"
ছোটনাগপুরের নিসর্গসৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তাঁর যৌবনকাল থেকেই। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী বালিকা ইন্দিরা দেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্র বালক সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগে যে অবকাশ যাপন করেছিলেন তার একটি মনোরম আলেখ্য 'দশদিনের ছুটি' নামে ১২৯২ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যা 'বালক' পত্রে প্রকাশ করেন।

এরপর ১৩১০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকার ব্যাধি নিরাময়ের জন্য যখন হাজারিবাগ যান, 'সম্ভবত তখনই তাঁর মনে ঐ অঞ্চলে একটি নিভৃত বাসস্থান নির্মাণের ইচ্ছা অঙ্কুরিত হয়। ৩ ভাদ্র ১৩১০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখছেন,

"হাজারিবাগের কাজ যদি তুমি পাও আমার জন্য বরাকর নদীতীরে শালবনবেষ্টিত একটি বৃহৎ ভূখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এরূপ একটি জমি আছে— নিবারণবাবু ও গিরীন্দ্রবাবু তাহা আমার জন্য জোগাড় করিবেন আশা দিয়াছিলেন— কিন্তু তাঁহাদের নীরবতা ও নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছি। ১০০।২০০ বিঘা জমি যদি পাই তবে আমি সেখানে আমাদের একটি বন্ধুপল্লী বসাইব। তাহা আমাদের তপোবন হইবে। তোমারও একটি কুটীর তাহার মধ্যে থাকিবে। সকলে মিলিয়া চাষবাস করিয়া গোরুবাছুর রাখিয়া বিশ্রব্ধ আলাপে এবং ভাবের চর্চ্চায় সুখে থাকিব। যদি এরূপ ভাল জায়গা অল্প নিরিখে স্বাস্থ্যকর নির্জন স্থানে তোমার জানা থাকে তবে নিশ্চয় আমার কথা স্মরণ করিয়ো— আমি এইরূপ আশ্রমের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি।..."

সুবোধচন্দ্রকে লেখা আলোচ্য চিঠিতেও দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের মনে হাজারিবাগ অঞ্চলে জমি কেনার আগ্রহ অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। এর পরও প্রায় দু বছর রবীন্দ্রনাথ ছোটনাগপুর অঞ্চলের নানা জায়গায় ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে কৃষিকর্মে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এই গ্রন্থের ৫৯-সংখ্যক চিঠির টীকায় (পৃ. ২৮০-৮৩) রথীন্দ্রনাথকে কৃষিকর্মে প্রতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

অক্ষয়। অক্ষয়কুমার বসু। ১৩১১ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে অল্পকাল শিক্ষকতা করেন।

গিরীন্দ্রবাবু। গিরীন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পীড়িতা কন্যা রেণুকাকে নিয়ে মার্চ ১৯০৩ খৃস্টাব্দে যখন হাজারিবাগে যান তখন গিরীন্দ্রবাবুর অতিথিরূপে তাঁর বাড়িতে ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে হাজারিবাগ থেকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, গিরীন্দ্রবাবু আমাদের যত্নে আচ্ছন্ন করে রেখেচেন। তিনি এ পর্য্যন্ত আমাদের কোন অভাব ঘটতে দেন নি— আমরা তাঁরই বাড়িতে আছি।"

শরৎ। শরৎকুমার চক্রবর্তী। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (বেলা) স্বামী।

পত্র ৬। "তোমার বিপদের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইয়াছি।"
সুবোধচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা রমার অকালমৃত্যুর বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন।

সমীর। সমীরচন্দ্র মজুমদার। সুবোধচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র।

"একবার প্রমথর সঙ্গে সেই বিবাহ প্রস্তাবটার পুনরালোচনা করিয়া দেখিয়ো।"
দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা মীরা দেবীর বিবাহদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল যাবৎ নানা সূত্রে পাত্রের সন্ধান করছিলেন। বর্ত্তমান পত্রে প্রমথ চৌধুরীর যোগাযোগে পাত্র-সন্ধানের প্রসঙ্গ জানা যায়।

কেদার দাসগুপ্ত। কেদারনাথ দাসগুপ্ত (১৮৭৮–১৯৪২) বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় কলকাতায় ৭ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী সামগ্রীর একটি দোকান খোলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর পরিচয় হয়। পরে কেদারনাথ দেশবাসীকে

স্বদেশীভাবে উদ্‌বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় 'ভাণ্ডার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর উপর ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ায় তিনি স্বদেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকল্পে কেদারনাথ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় 'Union of East and West' নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্‌যোগে লণ্ডনে ও আমেরিকায় বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়, ১৯১২ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তখন এই সমিতি তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

কেদারনাথ দাসগুপ্ত ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগের বিষয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড ও সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থের 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩০-সংখ্যক চিঠির টীকাতেও (পৃ. ২৫৬-৫৭) বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত।

B. L. Chowdhury।

বনোয়ারীলাল চৌধুরী (?)। দ্রষ্টব্য, শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ -সংকলিত, সুকুমার রায় -রচিত 'বিলেতের আরো চিঠি', সংখ্যা ৬।— 'এক্ষণ' গ্রীষ্ম ১৩৯১, পৃষ্ঠা ৭, ৬৯।

পত্র ৭। তারিখহীন। চিঠির শেষে 'শুক্রবার ১৩১৬' এরূপ উল্লেখ আছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের শেষভাগে যে এই চিঠিটি লেখা হয়েছে তা 'তাঁর ইচ্ছা তিনি গ্রীষ্মাবকাশের অবশিষ্ট কয়দিন বোলপুরে যাপন করেন'— এই বাক্য থেকে অনুমিত।

'বুধবারে আমার প্রবন্ধপাঠের কথা হচ্চে'— ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, বুধবার, রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ওভারটুন হলে 'শিক্ষাসমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই চিঠিখানি এর পূর্ববর্তী শুক্রবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লেখা, এ রকম অনুমান করা হয়েছে।

"মোহিতবাবু, তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যা…"
মোহিতচন্দ্র সেন, সুশীলা সেন, মীরা ও উমা।

"যে ঘরে মীরা, পিসিমা আছেন সেইখানেই তাঁদের থাকবার বন্দোবস্ত করতে হবে,…
পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী ও কন্যা মীরা যে ঘরে ঐসময়ে ছিলেন সেটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রবেশমুখে 'নতুন বাড়ি'র একখানি ঘর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ও পুত্রকন্যাদের বসবাসের জন্য খড়ের চালার এই মাটির ঘর ক'খানি তৈরি করিয়েছিলেন। মৃণালিনী দেবীর দূর-সম্পর্কিত পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী রবীন্দ্রনাথের মাতৃহীন শিশুসন্তানদের অভিভাবিকা হিসেবে এই ঘরে থাকতেন।

"প্রভার আমিষ আহারের বইটা (অর্থাৎ ২য় খণ্ড) চেয়ে পাঠিয়েছে…"
প্রভাসুন্দরী দেবী রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা, স্বামী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। উল্লিখিত গ্রন্থ 'আমিষ ও নিরামিষ আহার', প্রকাশ ১৩ আশ্বিন ১৩১৪, হাওড়া। নূতন সংস্করণ, সম্বলপুর, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। নিরামিষ বিভাগ ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড; আমিষ বিভাগ ৩য় খণ্ড, সংক্ষিপ্ত।

"আমার বাসস্থানটি এতদিনে বোধহয় অনেকটা সমাপ্তির দিকে গেছে…"
'নতুন বাড়ি'-সংলগ্ন রবীন্দ্রনাথের আবাসগৃহ 'দেহলি' নির্মাণের প্রসঙ্গ।

পত্র ৮। "এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজি মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত আটক পড়েছে, [পড়েছি] কাজেই তার পরে শুক্রবারে প্রবন্ধ পাঠ করে শনিবারে আমি খালাস পাব।"

দেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য মহারাষ্ট্রে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে সখারাম গণেশ দেউস্কর কলকাতায় মহারাষ্ট্রের এই শিবাজী উৎসবকে বঙ্গদেশে প্রচলনে উদ্‌যোগী হন। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ "শিবাজী উৎসব" কবিতা রচনা করেন, আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রে তা প্রকাশিত হয়।

শিবাজী মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মহারাষ্ট্রে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন; সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর গৌরব বোধ না করারই কথা। সম্ভবত এইজন্য, শিবাজীকে অখণ্ড ভারতবর্ষের সংহতির পথিকৃৎরূপে গ্রহণ করা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় ছিল।

শিবাজী উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় পান্তির মাঠে (বর্তমানে বিধান সরণীর বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রাবাস অঞ্চল) ৪ জুন থেকে ৮ জুন ১৯০৬ স্বদেশী শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্রের তিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি— বালগঙ্গাধর তিলক, গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে ও মুঞ্জের উপস্থিতিতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে কলকাতায় এই উৎসব পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠান হয় মঙ্গলবার ৫ জুন, অশ্বিনীকুমার দত্তের সভাপতিত্বে। রবীন্দ্রনাথ-রচিত "শিবাজী উৎসব" কবিতাটি পাঠ করেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে যোগ দেন নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল-রচিত 'রবিজীবনী' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড (১৩৯৭) দ্রষ্টব্য। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'কংগ্রেস' (দ্বিতীয় সং ১৩২৮) ও শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়ের *India's*

Fight for Freedom গ্রন্থে তৎকালীন আন্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

পত্রে যে প্রবন্ধ পাঠের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর "শিক্ষাসমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ (৬ জুন ১৯০৬) বুধবার ওভারটুন হলে পঠিত এবং 'ভাণ্ডার' পত্রের জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরেন বৃহস্পতিবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ।

"উমাচরণকে তা হলে ৮ই পাঠাতে হবে।··· তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো নইলে সে ভয় পাচ্ছে।···"
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপককে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন (দ্রষ্টব্য. শারদীয় দেশ ১৩৪৯, পৃ. ৪০২), "বর্ধমানে আমার ভৃত্য উমাচরণ [নন্দী] পুলিশের কবলে অন্তর্ধান করাতে আমি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি— বাহনবিহীন গণপতির মত আমার অচল অবস্থা— আশা করি সুবোধচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিয়া যথাসময়ে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে— কাল বৃহস্পতিবারে দার্জিলিং মেলে কলিকাতা ছাড়িব— তাহার মধ্যে বাহনটি যদি না পৌঁছে তবে দুস্তর প্রবাসসমুদ্রে সহায়হীন অবস্থায় ভাসিয়া পড়িব।···"

···"জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায়··· কেবল উপেন আর সুজিতকে ·· পাঠান সঙ্গত হবে।"
বাংলাদেশে ১৯০৫-০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে প্রথম থেকেই বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্য তিনি প্রশ্নপত্রও রচনা করেন, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে তা সংকলিত হয়েছে।

এই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যালয়ের কোনো কোনো ছাত্রকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। পত্রে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর মধ্যম ভ্রাতা সুজিতকুমার চক্রবর্তীকে সে বছর রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থীরূপে পাঠানোর জন্য অনুমোদন করেছেন। অনুমান করা যায়, এই ব্যবস্থা স্বল্পকালই স্থায়ী হয়।

“তারকবাবুরা আমাকে ধরেছেন··· সানোসান যদি তাঁদের টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জুজুৎসু শেখান···।”

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্যতম উদ্যোক্তা, প্রখ্যাত আইনজীবী স্যর তারকনাথ পালিত ১৯০৬ খৃস্টাব্দে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে কারিগরি শিক্ষার একটি বিদ্যালয় কলকাতায় আপার সার্কুলার রোডে স্থাপন করেন; পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠান যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং এর নতুন নামকরণ হয় ‘কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি’।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সেইসময় রবীন্দ্রনাথ জুজুৎসু শিক্ষা ব্যবস্থার যে আয়োজন করেন, তার দৃষ্টান্তে তারকনাথ তাঁর টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষিত করতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন।

সানো সান। কুসুমতো॥ জাপানী জুজুৎসু-শিক্ষক সানো সান সম্বন্ধে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩৪-সংখ্যক পত্রের পরিচিতি অংশে (পৃ. ২৫৯) সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র সত্যরঞ্জন বসু ‘রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা’ (১৩৬৮) গ্রন্থে “আশ্রম-স্মৃতি” রচনায় সানো সান ও কুসুমতো সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা লিখেছেন তা উদ্‌ধৃত হল—

“আমরা জুজুৎসু-বিশারদ সানো সান-এর কাছে জাপানী মল্লবিদ্যা শিক্ষা করি। কী সুগঠিত গৌরবর্ণ দেহ অথচ সাধারণ জাপানীদের মত খর্বাকৃতি নয়। শান্ত প্রকৃতি মৃদুভাষী, কত যত্ন নিয়েই ফূর্তি

শেখাতেন। বিশেষ ধরনের— মোটা দো-সুতি খদ্দরের মত মোটা 'কিমানো' পরতে হত সে সময়ে।…"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রও সানো সানের কাছে জুজুৎসু শিক্ষা করেন। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের "স্বদেশী আন্দোলন" অধ্যায়ে রথীন্দ্রনাথ তাঁদের জুজুৎসু শিক্ষার কথা বর্ণনা করেছেন।

পূর্ব-উল্লিখিত গ্রন্থে সত্যরঞ্জন বসু কুসুমতো সম্বন্ধে লিখেছেন— "জাপানী ছুতার কুসুমতো সান্ কাঠের কাজ শেখাবার জন্যে এসেছিলেন সানো-সান্-এর আগে। তাঁর কাজের একাগ্রতা ও একক করণ-পদ্ধতি আমাদের খুবই তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কাজের সময় কথাবার্তা একদম বলতেন না। আমরা ছিলাম তাঁর কাঠের [কাজের ?] জোগানদার। তাঁকে কুসুমবাবু বলে সকলে ডাকতো। বেশ আলাপী ও সদাহাস্যমুখ। অল্পদিনের মধ্যেই দুখানা নৌকা তৈরী করলেন। কাঠ বাঁকানো ও জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি নতুন ধরনের। একখানার তলদেশ চেপ্টা— নামকরণ হল 'চিত্রা', আর একখানা 'সোনার তরী' শিরতোলা তলদেশ। কুসুমবাবু কিছুদিন আগরতলায় আর্টিজেন স্কুলে কাঠের কাজ শিখিয়েছিলেন।"

সত্যরঞ্জন, নরেন খাঁ। সত্যরঞ্জন বসু, ত্রিপুররাজ্য থেকে আগত তৎকালীন ছাত্র।’ 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে (১৩৬৮) "আশ্রম-স্মৃতি" প্রবন্ধে সত্যরঞ্জন রবীন্দ্রনাথ ও সে-যুগের শান্তিনিকেতন-আশ্রমের একটি আলেখ্য রচনা করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ খাঁ তৎকালীন ছাত্র।

পত্র ৯। "মীরার Sohrab Rustam পড়া শেষ হইলে তাহাকে টেনিসনের Enoch Arden পড়াইতে শুরু করিবো।"

Mathew Arnlod-এর *Sohrub Rustum* এবং Tennyson-এর *Enoch Arden* জাতীয় কাব্য সাধারণত শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও এ ধরনের বিষয় পড়াতে দ্বিধা করেন নি। তিনি নিজে ক্লাস নেওয়ার সময় Sohrab Rustum কবিতার যে পাঠনপ্রণালী তৈরি করেছিলেন, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা' দ্বাদশ সংকলনে (৭ পৌষ ১৩৯১) তা সংকলিত হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ' (৭ই পৌষ ১৩৮৮) সংকলনগ্রন্থের পরিশিষ্ট ৪ (পৃ. ১৬৫-২২৪) অংশে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষাদান-প্রণালী বিষয়ে তৎকালীন কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংকলন করা হয়েছে।

পত্র ১০। এই চিঠি লেখার তারিখ নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলির উপর নির্ভর করে অনুমান করা হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেনকে ১৩ কার্তিক ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বোলপুর থেকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "ভূপেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় বর্দ্ধমানে পড়িয়া আছেন— কাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম।···

আমি অগ্রহায়ণে বিদ্যালয় [খুলিলে] দিন পনেরো কাজকর্ম্ম চালাইয়া দিয়া বোটে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি—"

২৭ কার্তিক ১৩১৩ বঙ্গাব্দে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোলপুর থেকে লিখছেন,

"যদি আপনাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে একবার পদ্মার আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব।"

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহ অঞ্চলে বিশ্রামের জন্যে গিয়েছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের চলে যাওয়ার যে প্রসঙ্গ এই চিঠিতে আছে, তা তাঁর অসুস্থতার জন্য সাময়িক অনুপস্থিতি। ভূপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজ থেকে বিদায় নেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দে।

কাওয়াগুচি। জাপানদেশীয় পণ্ডিত ও পরিব্রাজক। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় এসে থাকার সময়ে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। কাওয়াগুচির লেখা *Three Years in Tibet* নামে ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সত্য। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর পুত্র।

"আমার প্রাসাদ কতদূর এগোলো?"
'দেহলি' বাড়ির দোতলার ঘর বলে অনুমান করা যেতে পারে।

পত্র ১১। "মহারাজের স্টেটে তুমি কর্মে প্রবেশ করিয়াছ শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন হইলাম।"
সুবোধচন্দ্র ১৯০৮ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে যখন শিলাইদহে ছিলেন, ঐ সময় একটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় তাঁর শিশুকন্যা লতিকার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২৪ পৌষ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখছেন,
"এখানে সুবোধের ঘরে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ভূপেশ সর্বদাই একটা পিস্তলে গুলী ভরিয়া বীররসের চর্চা করিয়া এবং নিরীহ চখাচখিগুলিকে ক্ষত ও হত করিয়া আনন্দ অনুভব করে। সুবোধের এক আত্মীয় ভূপেশের হাত হইতে সেই ভরা পিস্তল লইয়া সুবোধের ছেলেমেয়েদের খেলাচ্ছলে ভয় দেখাইতেছিল— তাহারা তখন ভূপেশের কোলে বসিয়াছিল, গুলি ছুটিয়া গিয়া নন্তুর কপালের মধ্যে প্রবেশ

করে। তখন সুবোধ আমার কাছে বোটে কাজে নিযুক্ত ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই লতুর মৃত্যু হইয়াছে।"[1]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ২ মাঘ ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "সুবোধ অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিতে অক্ষম এইরূপ আমাকে জানাইয়াছে— বোধ করি জয়পুরে বা দিল্লীতে কোনো কাজের আশা পাইয়া থাকিবে।"

সুবোধচন্দ্র দেশীয় রাজ্য জয়পুরে কাজে যোগ দেন।

"আমি এখানকার গ্রাম্যসমাজ স্থাপনার চেষ্টায় এখনো আবদ্ধ আছি।…" কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪) পর থেকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস শিলাইদহ অঞ্চলে বাস করছিলেন, এই নিদারুণ মৃত্যুশোক অন্তরে নীরবে সহ্য করেও তিনি 'গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন' চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৫০-সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ. ২৭১-৭৫) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য পত্রে গ্রাম্যসমাজ স্থাপনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ থেকে যে 'উৎসাহী যুবকে'র কথা লিখেছেন, তিনি পল্লীউন্নয়নকর্মে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী কালীমোহন ঘোষ। অপর যে যুবকের প্রসঙ্গ আছে, তাঁর পরিচয় জানা যায় নি।

ভূপেশ। ভূপেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র রায়ের অনুজ।

পত্র ১২। "যদি শাখাপরিষৎ স্থাপন করবার উদ্যোগ কর …" অনুমান করা যায়, সুবোধচন্দ্র জয়পুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা

---

১. দেশ, রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯

স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে যাওয়ার জন্ম আহ্বান করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলার বাইরেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধে (প্রকাশ, 'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩১২। 'আত্মশক্তি' গ্রন্থভুক্ত) লিখেছেন—

…"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয় লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষদ্‌কে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রহণ করিয়াছেন।…"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা বাংলাদেশের বাইরে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত হয়।

এই চিঠি থেকে এরকম অনুমান করা চলে, জয়পুর-অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালিসমাজ পরিষদের শাখা স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন। সুবোধচন্দ্র তাঁদের পক্ষ থেকে এই সভাস্থাপনে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও সহায়তার আশায় তাঁকে জয়পুর যেতে অনুরোধ করেন, কিন্তু নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না বলে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তা আহ্বান করার উপদেশ দেন।

পত্র ১৪। অধ্যাপক বকিল।

বোম্বাইয়ের অধিবাসী, পার্শী, জাহাঙ্গীর জীবাজী ভকিল ১৯২৪ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। কিছুকাল তিনি বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ 'শিক্ষাভবনে'র অধ্যক্ষতা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অধ্যাপক ভকিলের ইংরেজি এবং বাংলাভাষাতেও কিছু কিছু রচনা তৎকালে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নানা কারণে, অধ্যাপক ভকিল শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিয়ে বোম্বাইয়ে ফিরে যান। আলোচ্য চিঠিতে, রবীন্দ্রনাথ ভকিলের বিশ্বভারতীর কর্মে থেকে যাওয়ার কোনো কোনো অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্মসচিব প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে ২৭ ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন—

"নতুন ব্যবস্থায় যাদের বিদায় করতে হবে তাদের জানান দিতে যতই দেরি করবে ততই বৃথা লোকসান বাড়ানো হবে। ভকিলের মতো অধ্যাপক, যাদের কাজ প্রায় কিছুই নেই, অথচ মাইনে বড়ো কম নয়, তাদের আর বহন করা আর্থিক হিসাবে ভাল নয় অন্ত হিসাবেও তথৈবচ।"

জাহাঙ্গীর ভকিল সম্ভবত ১৯২৮ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে বোম্বাই প্রদেশে ফিরে যান। পরে তাঁর পত্নীর সহযোগিতায় শান্তিনিকেতনের আদর্শে তিনি পুনাতে 'Childrens' Own School (পরবর্তীকালে Pupils' Own School) নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

…"চলেছি য়ুরোপে— ইংলণ্ডে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে।"

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতাদানের জন্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড যাত্রা স্থির ছিল। শারীরিক কারণে এই ইউরোপ যাত্রা স্থগিত করে কলম্বো থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২৩ জুন ১৮৬৭ - ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৯) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তাঁর এক নিকট-আত্মীয়, জোড়াসাঁকো সেরেস্তার কর্মচারী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। হরিচরণ তখন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সেকালের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। যদুনাথের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ এইসময় তাঁকে লেখাপড়ার জন্য কিছুকাল আর্থিক সহায়তা করেন।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদুনাথের অনুরোধে পতিসর কাছারিতে জমিদারি সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। সেই বছর ভাদ্র মাসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকরূপে পতিসর থেকে হরিচরণকে বোলপুরে নিয়ে আসেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে হরিচরণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী 'সংস্কৃত প্রবেশ' (১-৩ ভাগ) রচনা করেন। এই পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশকালে (১৯০৪ খৃ) সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

…"বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছেলেদের যখন সংস্কৃতশিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ সংস্কৃত প্রবেশ কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।"

'সংস্কৃত প্রবেশ' পুস্তক রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা ভাষার একটি অভিধান রচনায় প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে হরিচরণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকর্মের অবসরকালে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণয়ন আরম্ভ করেন। এই কাজ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আর্থিক অসংগতির কারণে হরিচরণকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে, ১৩১৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কলকাতায় একটি কলেজে

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাস

কাজ নিতে হয়। এই সময় তাঁর অভিধান সংকলনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে তাঁর অভীষ্ট কর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। হরিচরণ তিন মাস পর শান্তিনিকেতনে ফিরে পুনরায় স্বস্থানে স্বকার্যে অভিনিবিষ্ট হন। এর পর সুদীর্ঘকাল নিরলস পরিশ্রম করে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তিনি এই বৃহৎ কোষগ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করেন। এরপরও দশ বৎসর তাঁর পক্ষে গ্রন্থমুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নি; এইসময় তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংস্কারে প্রবৃত্ত ছিলেন।

এই অভিধান রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন এখানে সেটি সংকলিত হল—

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনাদের অধ্যাপক হরিচরণ একখানি বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন— আপনারা যাহা চান ইনি তাহাই করিয়া তুলিতেছেন। ব্যাপারখানি প্রকাণ্ড হইবে। একবার দেখিয়া দিবেন। যদি পছন্দ হয় তবে এটা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। বাংলাসাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয় না এমন শব্দও ইহাতে স্থান পাইয়াছে সেইটে আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের উপর এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। ইতি ২০শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিধান সংকলনের কাজ সমাপ্ত করলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের আনুকূল্য কামনা করে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—

"শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বিশ বছর ধরিয়া বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান বাংলায় নাই। এই পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে আমরা প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছি। এই বৃহৎকর্ম্ম সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রকাশ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের পাঠক-সাধারণ এই কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিবেন একান্তমনে ইহাই কামনা করি।" (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রকাশের ব্যয়বহন বিশ্বভারতীর পক্ষে সেই সময়ে সম্ভবপর না হওয়ায়, হরিচরণ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও অপরিসীম সাহস সম্বল করে নিজেই এই গ্রন্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে প্রকাশ করতে থাকেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়, শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে।

'আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক'— রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনা হরিচরণের মধ্যে যথার্থভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর কর্মের ক্ষেত্রে তিনি আজীবন সাধকের ব্রতই উদ্‌যাপন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেই হরিচরণ এইভাবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যে-সমস্ত শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের প্রয়োজন সর্বদাই দেখা দিত। হরিচরণ কখনো পরিচালন-ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না; সম্ভবত এই কারণে এবং কতকটা হরিচরণের স্বভাবগত সংকোচের ফলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ বিরল। এ-পর্যন্ত তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি

পত্রেরই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে হরিচরণেরও মাত্র একখানি পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের স্মৃতি, শান্তিনিকেতন আশ্রম-জীবনের কথা, তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা, এ-ছাড়া অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধনিবন্ধ তখনকার অনেক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন -প্রসঙ্গ এবং আত্মস্মৃতিমূলক রচনাসমূহের অধিকাংশই 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (১৯৪৫ ?) ও 'কবির কথা' (১৩৬১) এই দুটি গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গে তাঁর রচনা যে-সমস্ত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, সেগুলির একটি নির্বাচিত পঞ্জী এখানে দেওয়া গেল—

শান্তিনিকেতন পত্র : আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩

প্রবাসী : অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ; জ্যৈষ্ঠ, মাঘ, চৈত্র ১৩৪৯ ; বৈশাখ, ভাদ্র ১৩৫০ ; মাঘ ১৩৫৫ ; অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ ; মাঘ ১৩৬৩ ; ফাল্গুন ১৩৬১

মাতৃভূমি : শ্রাবণ, আশ্বিন ১৩৫২

দেশ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ ; ১৫ মাঘ ১৩৫০ ; ১০ মাঘ ১৩৫৪ ; ৪ মাঘ ১৩৫৫

গাঙ্গেয় : বৈশাখ ১৩৬৩

শ্রীসুদর্শন : ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

এগুলি ছাড়াও দ্রষ্টব্য, ১ বৈশাখ ১৩৫১ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে হরিচরণকে 'সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যদানে'র উত্তরে তাঁর পঠিত ভাষণ 'আশীর্বাদ'।

বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে (পৃ. ২০২-০৯) 'শান্তিনিকেতন'

পত্রের আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমার পরিচয়' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগের পরিচয়স্বরূপে মুদ্রিত হল।

সংযোজন

বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ১ অংশের বিবরণে (পৃ. ১৮২), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কোনো পত্র পাওয়া যায় নি, এরূপ বলা হয়েছে। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে হরিচরণের রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্র (তারিখহীন) পরে লক্ষগোচর হওয়ায় সেটি এখানে মুদ্রিত হল।

ওঁ

সুখচর
১লা বৈশাখ

শ্রীচরণেষু

গুরুদেব, আজকার দিনে আমার অন্তরের প্রণাম গ্রহণ করুন এবং নববর্ষের স্নেহাশীষ প্রদান করুন।

আশা করি, আপনার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। আমার শরীর বর্ত্তমানে বড়ই খারাপ। নিবেদন ইতি

প্রণত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখচর পোঃ
২৪ পরগণা

কুঞ্জলাল ঘোষ 'সহায়শ্রেণীভুক্ত' কর্মীরূপে শিবনাথ শাস্ত্রী -প্রতিষ্ঠিত কলকাতার সাধনাশ্রমে (প্রতিষ্ঠা ১৮৯২ খৃস্টাব্দ) ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে যোগ দেন ও পরে 'সংকল্পাধীন পরিচারক'রূপে আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বীরভূম জেলার নলহাটির অধিবাসী ছিলেন, এরূপ জানা যায়। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

কুঞ্জলাল ঘোষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে, আনুমানিক কার্তিক মাসের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের আরম্ভে, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯০২ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনাকার্য্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।···

বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিনজনের উপর দিলাম— আপনি জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষসমিতির সভাপতি আপনি ও কার্য্য-সম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের নির্দ্দেশমত চলিবেন।···"

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যখন পীড়িতা মধ্যমা কন্যার স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় শান্তিনিকেতন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই পর্বে, বিদ্যালয়-পরিচালন-দায়িত্ব অনেকাংশে কুঞ্জলালের উপর অর্পণ করা হয়। অধ্যাপনার কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

কুঞ্জলালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি মাত্র একখানিই পাওয়া গিয়েছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ইতিহাস-আলোচনায় ২৭ কার্তিক ১৩০৯ বঙ্গাব্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

কুঞ্জলাল অল্পকালই এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুমান করা যায় কোনো কারণে তাঁর কাজে রবীন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হন। বিদ্যালয় থেকে কুঞ্জলালের বিদায়গ্রহণপ্রসঙ্গে মোহিতচন্দ্র সেন ১০ জুলাই [১৯০৩] তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "কুঞ্জবাবুকে বিদায়পত্র দিয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত এবং আশ্বস্ত দুই হইলাম। আমাদের এ সাধনায় 'গড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল বারবার'। সেইজন্যে দুঃখ। যা' হোক কুঞ্জবাবু শ্রাবণের আরম্ভেই যাবেন এটা সুখবর। ভেঙ্গে যখন গেল তখন জীর্ণ রাবিস্ যতশীঘ্র স্থানান্তরিত হয় ততই ভাল।"

২৪ জুলাই শুক্রবার [১৯০৩] মোহিতচন্দ্র আর-একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "রমণীবাবুর কাছে শুন্‌লাম যে যদুবাবু কুঞ্জবাবুকে বোলপুরে বিদায় দেবার সময় শ্রাবণের মাহিনা ও furniture বাবদে ৮০৲ অতিরিক্ত দিবেন বলিয়াছেন।…"

কুঞ্জলাল ঘোষ ১৩১০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসের শুরুতেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

কুঞ্জলাল ঘোষকে ২৭ কার্তিক ১৩০৯ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে লেখা কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী এই চিঠিখানির বিষয়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য প্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে ইঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এই লেখা আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন— যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন।" 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (প্রকাশ ৭ই পৌষ ১৩৫৮) গ্রন্থে কুঞ্জলালকে

লেখা এই চিঠি বিষয়ে যে পরিচয় মুদ্রিত, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

“শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর-বৎসরই লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে; ‘রবীন্দ্রজীবনী’কার অনুমান করেন, ‘ইহাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম constitution বা বিধি।’ এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—‘শান্তিনিকেতনের কাজে ১৯০৮ সালে যোগ দিই। কী আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং কিভাবে তিনি ইহার পরিচালনা চাহেন এখানে আসিয়া তাহা জানিতে চাহিলে তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে দেন। পত্রখানি কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী, এবং আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা। তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যগুলি রীতিমতো হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা। তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তখনই যে তাঁহার অন্তরে শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখা দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি লেখা কবিগুরুর পত্নীবিয়োগের মাত্র দিনদশেক পূর্বে— খুব উদ্বেগের একটি সময়ে, পত্রশেষে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। তবু এই পত্রে যে সূক্ষ্ম বিচার ও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।’”

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

…“হেমেন্দ্রবাবুর পুত্র প্রেমানন্দের…” পৃ ১৬৫।

রায়পুরের হেমেন্দ্রনাথ সিংহের পুত্র, বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র প্রেমানন্দ সিংহ। পরবর্তীকালে প্রেমানন্দ বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়।

"শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে।" পৃ. ১৭২।

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (১৩৫৮) গ্রন্থে এই অংশের পুলিনবিহারী সেন -লিখিত টীকা নিম্নরূপ—

"বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূলকার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষা-বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রস্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।"

"সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি⋯"। পৃ ১৭৯।
রবীন্দ্রনাথের এই পত্র রচনাকালে (২৭ কার্তিক ১৩০৯) তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী মৃত্যুশয্যায়। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে।

গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রে প্রকাশের সূচী

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, ৯৯ ও ১০৩-সংখ্যক বাদে ১০১ খানি পত্র 'স্মৃতি' (১৯৪১ ?) গ্রন্থ থেকে সংকলিত। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রখানি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (১৯৪৫ ?) গ্রন্থ থেকে গৃহীত। কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ও পরে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (৭ই পৌষ ১৩৫৮) সংকলন-গ্রন্থে মুদ্রিত।

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র ছাড়া অন্যান্য পত্রগুলি 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত ; নীচে তার সূচী দেওয়া হল—

পত্র	প্রকাশ কাল
১	অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
২	চৈত্র ১৩৬৭
৩	মাঘ ১৩৬৭
৫-৬	বৈশাখ ১৩৬৮
৭	ফাল্গুন ১৩৬৭
৮	পৌষ ১৩৬৭
৯	আষাঢ় ১৩৬৮
১০	শ্রাবণ ১৩৬৮
১১	আশ্বিন ১৩৬৮
১২	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
১৩	পৌষ ১৩৬৭
১৪	ভাদ্র ১৩৬৮

ব্যক্তিপরিচিতি

‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশের বিভিন্ন স্থানে যে-সমস্ত ব্যক্তিপ্রসঙ্গ আছে, এখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা-সহ সেগুলির নির্দেশ এবং যথাস্থানে কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া যায় নি ব'লে সেগুলি এখানে দেওয়া হল। গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো কোনো ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

অক্ষয়। অক্ষয়কুমার বসু। দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩২৪

অক্ষয়বাবু। অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পৃ. ২৩৪-৩৫

অচ্যুত। অচ্যুতচন্দ্র সরকার। পৃ. ২২৮, ৩২১-২২

অজিত। অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)। তরুণবয়সে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অজিতকুমারের যে গভীর শ্রদ্ধা জন্মে, তার ফলে বি. এ পাস করবার পরই তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। সমস্ত দিক থেকে ছাত্রদের হৃদয় উদ্‌বোধিত করার ক্ষমতা অজিতকুমারের যেমন ছিল তার সঙ্গে একমাত্র তাঁর সুহৃদ সতীশচন্দ্র রায়ের তুলনা করা চলে। রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের প্রতিভার কথা নানাভাবে স্মরণ করেছেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগের বিবরণ পাওয়া যাবে। অজিতকুমার রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা রূপে স্বীকৃত। তাঁর সম্বন্ধে পরিচয়ের জন্য ‘ভারতকোষ’ প্রথম খণ্ডে পুলিনবিহারী সেন লিখিত অজিতকুমার চক্রবর্তী ‘নিবন্ধ’ এবং ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্যসংখ্যা ‘দেশ’ পত্রে ‘ভক্ত ও কবি’ দ্রষ্টব্য।

অরু। অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র।

অরুণ। অরুণচন্দ্র সেন। পৃ. ৩২২

উপেন। উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র।

উমাচরণ। রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য। পৃ. ৩২৯

কাওয়াগুচি। পৃ. ৩৩৩

কুঞ্জঠাকুর। পৃ. ২৩৬

কুঞ্জবাবু। কুঞ্জলাল ঘোষ। পৃ. ৩৪৩-৪৫

কুসুমতো/কুসুমাতু। পৃ. ২৫৯, ৩৩০-৩১

কেদার দাশগুপ্ত। কেদারনাথ দাশগুপ্ত। পৃ. ৩২৫-২৬

গিরীন্দ্রবাবু। গিরীন্দ্র গুপ্ত। পৃ. ৩২৫

চন্দ্রময়বাবু। চন্দ্রময় সান্যাল। শিলাইদহে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী।

জগদানন্দ। জগদানন্দ রায়। পৃ. ২২৫

জগদানন্দের বড় মেয়ে। দুর্গেশনন্দিনী দেবী (দুর্গা)। পৃ. ২৬৫

জগদীশ/জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে উভয়ের মধ্যে যোগের বিবরণ আছে।

জর্মান বন্ধু। Ehlers ব'লে অনুমান করা চলে। পৃ. ৩২২-২৩

জ্ঞানবাবু। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব'লে অনুমান করা চলে।

জুজুৎসু-শিক্ষক। সানোসান। পৃ. ২৫৯, ৩৩০-৩১

তারকবাবু। তারকনাথ পালিত। পৃ. ৩৩০

তোমার ন'দাদা। সুবোধচন্দ্র মজুমদারের অগ্রজ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পৃ. ৩৩৫-৩৬

দেবল। নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। পৃ. ৩২২

দিনু। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিজেন্দ্রবাবু। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পৃ. ৭০

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। পৃ. ২৮৩-৮৫

দীনেশবাবু। দীনেশচন্দ্র সেন।

ন'দিদি। স্বর্ণকুমারী দেবী।

নগেন্দ্র। নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর ভ্রাতা। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ১৩-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত।

নগেন্দ্র। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর স্বামী। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ৪৩-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত। অপিচ দ্রষ্টব্য, পৃ ২৬৪

নগেন্দ্রবাবু। নগেন্দ্রনারায়ণ রায়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে ১৩১০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে যোগ দেন। প্রায় প্রথম থেকেই তাঁকে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৩১১ বঙ্গাব্দের শারদীয় অবকাশে তিনি কাজ ছেড়ে চলে যান। দ্রষ্টব্য, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', দেশ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৯, পৃ ৪২৬

বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ২৫৪, ৩২০

নগেন্দ্রের স্ত্রী। নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর স্ত্রী নির্মলনলিনী (নলিনীবালা) দেবী। পৃ ২৪৫

নরেন্দ্র। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃ ২৪৬

নরেন্দ্র খাঁ। নরেন্দ্রনাথ খাঁ। পৃ ৩৩১

নলিনী। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, স্বামী, ডাক্তার সুহৃদ চৌধুরী।

নলিনীরঞ্জন। নলিনীরঞ্জন সরকার। পৃ. ৩১৩-১৪

পণ্ডিত মহাশয়। শিবধন বিদ্যার্ণব। পৃ. ২২৫-২৭

পালিত। যতীন্দ্রনাথ পালিত। পৃ. ৩২২

প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। পৃ. ৩২৭

প্রমথ। প্রমথ চৌধুরী।

প্রেম'প্রেম সিংহ। প্রেমানন্দ সিংহ। পৃ. ২২৭, ৩৪৫

প্রেমদাস। পৃ. ২৭০

পিসিমা। রাজলক্ষ্মী দেবী। মৃণালিনী দেবীর দূর-সম্পর্কিত পিসিমা। ১৯০২ খৃস্টাব্দে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবীর অভিভাবকতা ও তত্ত্বাবধানের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। 'নতুন বাড়ি'তে রাজলক্ষ্মী দেবী শমীন্দ্র ও মীরাকে নিয়ে থাকতেন, রথীন্দ্রনাথ থাকতেন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে।

বকিল। জাহাঙ্গীর বকিল। পৃ ২৪৫, ৩৩৬

বড়দাদা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড়দিদি। সৌদামিনী দেবী।

বিজয়বাবু। বিজয়রত্ন মজুমদার। সাহিত্যিক, ওড়িশার সম্বলপুরের ব্যবহারজীবী ছিলেন। পৃ ৩৭০

বিদ্যার্ণব। শিবধন বিদ্যার্ণব। পৃ ২২৫-২৭

বেলা। মাধুরীলতা, রবীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা।

ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশ মুস্তফী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই ব্যোমকেশ মুস্তফী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মসূত্রে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। প্রতিষ্ঠানের গৃহনির্মাণ থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থাগার চিত্রশালা ইত্যাদি স্থাপনায় তাঁর নিরলস পরিশ্রম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দে ব্যোমকেশ পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত হন, পরবর্তীকালে সহকারী সম্পাদকরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থলে পরিষদের শাখা-সভা স্থাপন করে তিনি তাঁর উদ্যোগ ও কর্মকুশলতার পরিচয়

দিয়েছেন। সাহিত্যকর্মে, সাময়িকপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

বৌ-ঠাকরুণ। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিণী যুগলমোহিনী দেবী। দ্র. সুবোধচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, সংখ্যা ৪, ৫।

বৌমা। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিণী শৈলবালা দেবী। দ্র সুবোধচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, সংখ্যা ১৩।

ভবেন্দ্রবাবু। ১৩১০।১১ বঙ্গাব্দে কিছুকালের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। মোহিতচন্দ্র সেনকে ১৮ কার্তিক ১৩১০ বঙ্গাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে ভবেন্দ্রনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃ ৩২০

ভোলা। সরোজচন্দ্র মজুমদার। শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। সরোজচন্দ্রের মৃত্যুর (১০ আষাঢ় ১৩১৭) পর প্রকাশিত 'সরোজ-স্মৃতি' গ্রন্থে (প্রকাশ, আশ্বিন ১৩১৮) তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় সংকলিত হয়েছে। ষোল বৎসর বয়সে সরোজচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি প্রবেশিকা বর্গের ছাত্র ছিলেন।

ভূপেনবাবু। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের শিক্ষক।

ভূপেশ। ভূপেশচন্দ্র রায়। পৃ. ৩৩৪

মনোরঞ্জনবাবু। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ২১৩-১৭

মীরা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী। পৃ. ২২৯

মেজ বৌঠান। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী।

মোহিতবাবু। মোহিতচন্দ্র সেন। পৃ. ২৪৮, ২৫২

যোগেন্দ্রবাবু। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৬

রথী। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২১৮

রবীন্দ্রনাথ সিংহ। পৃ. ২২৮

রমণী। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯১৯)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা। কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ট্রাস্ট ডীড সম্পন্ন করেন (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), রমণীমোহন তার অন্যতম ট্রাস্ট্রি নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ১৩১০ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠন করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও মোহিতচন্দ্র সেনের সঙ্গে রমণীমোহন তার সদস্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনোনয়নে রমণীমোহন ১৩১০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু বিশেষ কারণে কার্যকাল শেষ হবার আগেই কলকাতা পৌরসভার কাজে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা পৌরসভার সহ-সভাপতি পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

রাজেন্দ্রবাবু। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্মী ও শিক্ষক। পরে, শিলাইদহে ঠাকুর পরিবারের দেবত্র সম্পত্তির নায়েব ও সেখানকার মাইনর স্কুলের শিক্ষক। পৃ ৩২০

রাণী/রেণুকা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা। পৃ. ২২৯, ২২৪

রেবাচাঁদ (অণিমানন্দ)। পৃ. ২২১-২২

লরেন্স সাহেব। পৃ. ২৪১-৪৩

শমী। শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২২৯, ২৬৮

শরৎ। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃ. ২৫৩, ৩২৫

শ্রীশবাবু। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ২৭৫

শ্রীশবাবুর দ্বিতীয়া কন্যা। অরুণা দেবী। পৃ. ২৬৫

শৈলেশ। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ২৫৮-৫৯

সত্য। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯৩৩)। পৃ. ৩৩৩

সত্যরঞ্জন। সত্যরঞ্জন বসু। পৃ. ৩৩১

সতীশ। সতীশচন্দ্র রায়। পৃ. ২৪৩-৪৪

সত্যেন্দ্র। সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃ. ২৩৯-৪০, ২৭৫

সন্তোষ। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ২২৮, ২৭৯, ২৮৫-৮৬

সন্তোষের মা। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিণী যুগলমোহিনী দেবী।

সর্বেশ। সর্বেশচন্দ্র মজুমদার, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র। এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে সর্বেশ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রবর্তন হয়। পৃ. ৩২২

সমীর। সমীরচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ৩২৫

সানো সান। পৃ. ২৫৯, ৩৩০-৩১

সিংহ (রবীন্দ্রনাথ সিংহ)। পৃ. ২২৮

সুজিত। সুজিতকুমার চক্রবর্তী। অজিতকুমার চক্রবর্তীর ভ্রাতা, বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র।

সুবোধ। সুবোধচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ২২০-২১, ২৪৮, ৩১৫-১৬, ৩৩৩-৩৪

সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৮৭

সুরেনের পুত্র। সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৩২৩

হরিচরণ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ৩৩৮-৪২

হোরি। হোরি সান। Yoshinari Hori। পৃ. ২২৪-২৫

হেমবাবু। হেমচন্দ্র বসু মল্লিক। রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের পিতৃব্য।

হেমেন্দ্রবাবু। হেমেন্দ্রনাথ সিংহ। পৃ. ৩৪৫

হীরেন্দ্রবাবু। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ব্যবহারজীবী।

A. M. Bose। আনন্দমোহন বসু। পৃ. ২২৪

A. M. Bose-এর ছেলে। অরবিন্দমোহন বসু। পৃ. ২৪৪-৪৫

B. L. Chowdhury। পৃ. ৩২৬

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের পক্ষ থেকে পুলিনবিহারী সেন ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে তৎকালীন উপাচার্য মহাশয়ের কাছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের প্রস্তাব করেন। শিক্ষকগণের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদানের কাল অনুসারে কয়েকখণ্ডে চিঠিপত্রগুলি পর পর প্রকাশিত হবে, এই রকম স্থির হয়। তাঁর এই পরিকল্পনা বিশ্বভারতী অনুমোদন করেন এবং পুলিনবিহারী সেন শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরবর্তী খণ্ডে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠিপত্র সংকলনের দায়িত্ব বর্তমান সংকলয়িতাদের উপর অর্পিত হয়।

'চিঠিপত্র' ত্রয়োদশ খণ্ডে পূর্ব-উল্লিখিত চারজন শিক্ষকের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সঙ্গে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র-কন্যার কাছে লেখা কয়েকখানি চিঠিও অন্তর্ভুক্ত হল। যে চারজন শিক্ষকের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হল, এঁরা ১৯০১-০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত মূল পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। মনোরঞ্জন তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 'স্মৃতি'গ্রন্থে (প্রকাশ ১৯৪১) সংকলন করেছিলেন। 'স্মৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত হয় নি, এরূপ একখানি চিঠি (১০৩-সংখ্যক), এ ছাড়া শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবীকে

লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনখানি চিঠি, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'Santiniketan Reminiscence', রবীন্দ্রনাথকে লেখা মনোরঞ্জনের একখানি চিঠি ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একখানি চিঠি শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে।

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি মূল পত্র (৪-সংখ্যক) রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। 'কথাসাহিত্য' পত্রের অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ থেকে আশ্বিন ১৩৬৮ সংখ্যায় অবশিষ্ট পত্রাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়: এগুলির মূল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি। যে আকারে পত্রগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এখানে তারই অনুসরণ করতে হয়েছে। 'স্মৃতি'গ্রন্থ এবং 'কথাসাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত অনেক চিঠিই বর্তমান গ্রন্থ সংকলনকালে পুনর্বিন্যস্ত। তারিখহীন চিঠিগুলি বিন্যাসের সময় পত্ররচনার স্থানকালের যে অনুমান করা হয়েছে, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে যথাস্থানে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে। সংকলিত চিঠিগুলির কোনো ক্ষেত্রেই কোনো অংশ বর্জন করা হয় নি।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত মূল পত্রাবলী সহ বিভিন্ন উপাদান রবীন্দ্রভবন-কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে। পুলিনবিহারী সেন এই কাজে নানাভাবে উৎসাহিত করে গিয়েছেন, অনুরূপভাবে নানাভাবে সহযোগিতা করে গিয়েছেন শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত, বর্তমান সংকলনভুক্ত ৫৭-সংখ্যক ছিন্ন পত্রখানির সম্ভাব্য পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন শ্রীকানাই সামন্ত ও পুলিনবিহারী সেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের সূচনা থেকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীশঙ্খ ঘোষ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের কর্মভার নিয়ে থাকার সময় সমগ্র পাণ্ডুলিপি পূর্বাপর ধৈর্যসহকারে দেখে সম্পাদনা বিষয়ে

যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যথাসাধ্য তার অনুসরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল অনেকগুলি পত্ররচনার কাল নির্ধারণ করতে সহায়তা করেছেন ; এ ছাড়া আমাদের অজ্ঞাত বেশ-কিছু তথ্যের সন্ধানও দিয়েছেন। কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রের অবিকল প্রতিলিপি পাওয়া গিয়েছে শ্রীসুনীল দাসের সৌজন্যে। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি তথ্য জানিয়ে সহায়তা করেছেন। শ্রীসুবিমল লাহিড়ী এই গ্রন্থ মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে যথারীতি সম্পাদনাকর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের অনুকূলতায় গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রুফের আদান প্রদান সহজতর হয়েছে। অন্যান্য অনেক বিষয়ে অনেকের সাহায্য গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে উল্লিখিত। এঁদের সকলের প্রতি সংকলয়িতাগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

সংকেত

মূল পত্রের বানান পূর্বাপর রক্ষা করা হয়েছে। শুধু কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির অবিকল প্রতিলিপি পরে পাওয়ায়, মুদ্রিত অংশের সকল ক্ষেত্রে মূল বানান অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নি, গ্রন্থশেষে শুদ্ধিপত্রে মূল বানানের রূপটি দেখানো হল। ছিন্ন পত্রের পাঠের সম্পূর্ণতার জন্য এবং অর্থবোধের জন্যও যে-সমস্ত জায়গায় যোগ করতে হয়েছে সেখানে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত।

পত্র-সংখ্যার নীচে ছোটো হরফে ছাপা তারিখ চিঠির অংশ নয়। তারিখ সম্পর্কে সংশয় থাকলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় পোস্টমার্ক থেকে তারিখ নেওয়া হয়েছে। এইরূপ জায়গায় তারিখটি তারকাচিহ্নিত, ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া আছে। একটি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই 'পোস্টমার্ক' বলতে চিঠি ডাকে দেওয়ার স্থান এবং তারিখ ধরতে হবে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানির পোস্টমার্কে চিঠিখানি পাওয়ার স্থান ও তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	১০	অমি	আমি
২৮	৩	সম্পূর্ণতাবে	সম্পূর্ণভাবে
৩১	৮	ব্যৃহে	ব্যূহে

পত্র ৮৬. পৃ. ১১২। পত্ররচনাস্থল কলিকাতা স্থলে শান্তিনিকেতন হবে। রবীন্দ্রনাথ ৩ নভেম্বর ১৯২৭ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। ৬ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে থাকার প্রমাণ আছে। ৮ তারিখে তিনি এখান থেকে অনেককে চিঠি লিখেছেন। শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল এই তথ্য আমাদের জানিয়েছেন।

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র। প্রথম ও চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংশোধন তিনটি মুদ্রণপ্রমাদ, বাকি সমস্তই মূল পত্রের বানান।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৩	২	উদ্ভত হইয়াছে	উদ্ভত হইয়াছেন
	৫	পূর্বেই	পূর্ব্বেই
১৬৪	৬	কার্য	কার্য্য
	২২	লঘুচিত্ত	লঘুচিত্তে
১৬৫	৮	ভালো	ভাল
	১৯	লেখা	খেলা
১৬৬	৭	নির্ধারিত	নির্দ্ধারিত
	১০	কোনো	কোন
১৪৭	১৭	মুহূর্তে	মুহূর্ত্তে
	১৮	মুহূর্তেই	মুহূর্ত্তেই
	২১	কোন সূত্রে	কোন্ সূত্রে
১৬৮	২১	সর্বাপেক্ষা	সর্ব্বাপেক্ষা
১৭০	১৪	ভো	

১৭২	১০	তরকারির	তরকারীর
১৭৩	১৭	কোনো	কোন
	২৩	পোষ্টকার্ড	পোষ্টকার্ড্
১৭৪	১৫	কোনো	কোন
১৭৫	৩	ক্রমশ	ক্রমশঃ
	৭	স্বতঃউৎসারিত	স্বতউৎসারিত
	১২	সর্বদা	সর্ব্বদা
১৭৬	১১	চাপানো	চাপান
	২২	সর্বদা	সর্ব্বদা
	২৩	কাহারও	কাহারো
		দাবি	দাবী
১৭৮	২৩	করানোই	করানই

গ্রন্থপরিচয়

২২৯	২১	তারিখথীন	তারিখহীন
২৩২	১০	সুরু হয়ে	শুরু হয়
২৪৬	৩	কিছুকাল ওকালতি-কর্মে প্রতিষ্ঠালাভ করার চেষ্টা করেন' স্থলে হবে-	কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।
২৭১	৯	মজুমদার	মজুমদারের
২৭৩	১৯	[তথ্যর]	[তথ্য]
২৭৪	১৩	পূজার	পূজার
২৭৭	২৪	অশ্রাব্য	অগ্রাহ্য
২৯৩	২০	দুভিক্ষ	দুর্ভিক্ষ
২৯৭	১৬	বণিত	বর্ণিত
৩১৪	১৭	উল্লেখ	উল্লেখ

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

T4
41
vol-14
G-2078

কবিতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত।
চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত।
চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী
চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল ঘোষকে লিখিত

ছিন্নপত্র । শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী । ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে । নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী । রাণু দেবীকে লিখিত

সাহিত্যিকবর্গসহ রবীন্দ্রনাথ

চতুর্দশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ।। চতুর্দশ খণ্ড

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের
পত্রাবলী ও আনুষঙ্গিক পত্র/প্রবন্ধ/কবিতা

প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৪০৭

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত

© বিশ্বভারতী, ২০০০

ISBN-81-7522-255-7 (V.14)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক কল্যাণ মৈত্র
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক সার্ভিস প্রিন্টার্স
৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড। কলকাতা ৫০

মুদ্রক প্রিন্ট ও গ্রাফ
৯সি ভবানী দত্ত লেন। কলকাতা ৭৩

সূচীপত্র

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ১
প্রাসঙ্গিক পত্র ও রচনা ১৪৯
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত ১৫১
প্রাসঙ্গিক পত্র ও রচনা ১৫৯

পরিশিষ্ট ১

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -লিখিত পত্র ও প্রাসঙ্গিক রচনা ১৬৭

পরিশিষ্ট ২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -লিখিত পত্র ও প্রাসঙ্গিক রচনা ২৩৫

পরিশিষ্ট ৩

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে সংস্থার ম্যানেজার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯০৯ ২৭৫
...চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯১৪ ২৭৮
চিন্তামণি ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮৮
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিশ্বভারতীকে গ্রন্থস্বত্ব দান প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র ২৮৯
চিন্তামণি ঘোষের পক্ষে হরিকিশোর ঘোষের পত্র ২৯১
চিন্তামণি ঘোষকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি পত্র :
২০ অক্টোবর ১৯২২ ২৯২
২৪ নভেম্বর ১৯২২ ২৯৪
৫ ডিসেম্বর ১৯২২ ২৯৫

পরিশিষ্ট ৪

চিন্তামণি ঘোষ ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে চুক্তিপত্র : ১ জানুয়ারি ১৯১০ ২৯৬

পত্র পরিচয় ৩০৫

চিত্রসূচী

	সম্মুখীন পৃষ্ঠা
সাহিত্যিকবর্গ সহ রবীন্দ্রনাথ	প্রবেশক
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্রের প্রতিলিপিচিত্র	২৪

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

১

১৪ জানুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনার গল্প পড়িয়া যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত আমি শিলাইদহে থাকিব তাহার পরে কলিকাতায় যাইব। সেই সময়ে মুখে আপনাকে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া জানাইবার সুবিধা হইবে। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। ইতি ৩০শে পৌষ ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

* ১৮ জানুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
[১৩১০]

সবিনয় নমস্কার

১১ই মাঘ প্রাতে ১০টার সময় জোড়াসাঁকোর বাটিতে

অথবা তাহার পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজে আসিলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে। ইতি সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

* ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. R.
[মাঘ ১৩১০]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপক সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি সম্প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে আছি। কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেই আপনার লেখায় হাত দিব।

আপনি বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে যে দশটাকা দান করিয়াছেন সে জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।

শিলাইদহে কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইতেছে তাহা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। ইতি সোমবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪

ওঁ

সবিনয় নমস্কার

চিঠিতে একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। আমার অনুরোধের জোর যতটা আপনি ও অন্যেরা মনে করেন ততটা নহে— এটুকু আমি ইঙ্গিতে জানাইলাম। ইতি ২০শে মাঘ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৪

ওঁ

গিরিডি

সবিনয় নমস্কার

বীণায় ওয়াড় পরাইয়া দেয়ালে লট্‌কাইয়া রাখিয়াছি এখন গানের প্রস্তাব করিবেন না— দোহাই আপনার। একটি সরস্বতীর বন্দনা গান আমার গীতসংগ্রহে দেখিতে পাইবেন—

“মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবনমাঝে।”

সেটাতেই যদি কাজ চালাইতে পারেন তবে উত্তম হয়। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

* ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

উপনিষৎসংগ্রহ সম্বন্ধে তোমরা যেরূপ সর্ত্ত করিতে ইচ্ছা কর তাহাতেই রাজি আছি। আমার ইচ্ছা এই যে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলীতে ধর্ম্মপিপাসু লোকদের জন্য একত্রে নানা ব্যঞ্জনের ভোজের সৃষ্টি করিব। উপনিষৎ অংশ না থাকিলে অসম্পূর্ণ হইবে। ইহার স্বত্ব বোলপুর বিদ্যালয়ের। কিঞ্চিৎ যৎসামান্য কিছু দিলেও আপত্তি করিব না। এক কাজ করিতে পার। আগে তোমাদের খরচ তুলিয়া তাহার পরে লাভের অংশ দিয়ো। আমার বিশ্বাস, যাহারা আমার শান্তিনিকেতন কিনিতেছে তাহারা এ বইও পড়িবে।

গানের ভূমিকার ত কোনো প্রয়োজন দেখি না— কারণ ইহা পুরাতন সামগ্রী। এইটুকু মাত্র লিখিয়া দিতে পারেন ইহাতে অনেকগুলি নূতন গান দেওয়া হইয়াছে।

"সখি প্রতিদিন হায়" গানটির জন্য এত খোঁজাখুঁজি করিতেছে কেন? এ গান ত আমার কাব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছেই। সে বই কাছে না যদি থাকে তবে যোগীন সরকারের গানের মধ্যে নিশ্চয় পাইবে।

আগামীকাল কলিকাতায় যাইব। রথী পরশু আসিবে।

কবীর শীঘ্র ক্ষিতিমোহনবাবুকে পাঠাইবে। ইতি বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

"ঋদ্ধি" জিনিষটাতে প্রশংসা করবার বিষয় যদি বিশেষ কিছু থাকৃত তাহলে সানন্দে লিখে পাঠাতুম। নিতান্তই platitude।

অজিত বোলপুরে। সেখানেই প্রুফ পাঠালুম।

তোমাদের বইগুলি এখনো ছাপাখানার জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্চে না দেখে সকলেই বিস্মিত। কিন্তু প্রকাশক নামক প্রাণীর চালচলন আমি জানি বলেই আমি বিস্ময় বোধ করচি নে। আজ সত্যেন্দ্র এসেছিলেন—তিনি চয়নিকার জন্যে উৎসুক। শৈলেশ বলছিল তোমাদের বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকে বই কিন্‌তে এসে ফিরে যাচ্চে—সেটা ক্ষতিজনক। শুনচি তোমরা মণিলালের কাছে, বিতরণের জন্য, কতকগুলি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছ—কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞাপন বিলি করা আমি শ্রেয় বোধ করি নে।

আমার নূতন গানগুলি অজিত তোমাদের কাছে কি

পর্য্যন্ত পাঠিয়েছে জানি নে সুতরাং কোন্‌গুলো আমাকে কপি করে পাঠাতে হবে বুঝতে পারচি নে।

রথী এসেছে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। ইতি ২৬শে ভাদ্র ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব।

কিন্তু ছবি ভাল হয় নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম কারণ এগুলি আমার রচনা নয়।

নন্দলালের পটে যেরকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।

নিজের প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিজের কোনো মত প্রকাশ করা শিষ্টাচার নয়। কিন্তু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যে কেউ দেখ্‌চেন সকলেই অত্যন্ত রাগ করচেন। মূল ফোটো খুব ভাল হয় নি কিন্তু তার ছাপা মূলকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। সকলেই একবাক্যে বলচে এখনো যদি বাঁধা না হয়ে থাকে এই

ছবি বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্তত আমাকে যে আরো ৯খানা বই দেবে তাতে আমার ছবি দিয়ো না। কারণ যাঁদের বই দেব তাঁরা সকলেই আমাকে স্বচক্ষে দেখেছেন— ছবি দেখে শেষে আমাকে ভুলে যাবেন।

দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখনি এক বক্তৃতা অভিযানে চলেছি। অতএব ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

১২ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আবার সেই পদ্মাতটে আশ্রয় নিয়েছি। এখন এর শারদ মুখশ্রী প্রসন্ন সুন্দর।

ভক্তবাণী ২য় খণ্ড পেয়েছি। তোমাদের ছাপার খরচ উঠে গেলে যে রকম ভাবে দিতে চেয়েছ সেই কথাই রইল।

উপনিষৎ সংগ্রহের মূল্যও সেই নিয়মেই দিয়ো তবে কিনা বিদ্যালয়কে না দিয়ে শাস্ত্রীমহাশয়কেই দিয়ো।

চয়নিকার ছবি নিয়ে আবার হাঙ্গামা কেন করচ? ওটা পরিত্যাগ করলেই আনন্দের বিষয় হত। আমার প্রত্যেক বইয়েতেই ছবি দেখে দেখে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছি—

এমনি হয়েছে যে আয়নাতে নিজের মুখ দেখা বন্ধ করতে ইচ্ছা হয়।

একটা শস্তা দামের চয়নিকা ছাপিয়ে যদি কেবল ১০০ খণ্ড বেশি দামের বই স্বতন্ত্র রাখ্‌তে তাহলে পাঠকদেরও উপকার হত, ব্যবসায়ীরও লাভ হত। অনেকেরই ইচ্ছা কেনে কিন্তু সাধ্যে কুলচ্চে না। আমি যদি পাঠক হতুম তবে চার টাকা দিয়ে চয়নিকা কিনতুম না।

অবনদের সঙ্গে প্রয়াগে বোধহয় তোমার মাঝে মাঝে মিলন হচ্চে। কলারসের সঙ্গে কলারসজ্ঞের জমেছে কেমন?

ইতি ২৬শে আশ্বিন ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১৯ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

তোমার রাখী সাদরে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করলুম।

ছবির নূতন প্রুফ আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেছেন।

মণিলাল আজ যাচ্চেন—বোধ হয় তোমার সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া করে নেবেন।

আমার বরোদায় নিমন্ত্রণ আছে। যাব কিনা সন্দেহ।

বাংলার উপর দিয়ে মস্ত একটা ঝড় গেছে। এখনো সমস্ত খবর পাই নি। আমাদের চাষাদের ধান যদি কাৎ হয়ে থাকে

তবে আমাদেরও সেই সঙ্গে ভূমিসাৎ হতে হবে।

শিশু বের হয় নি বলে অনেকের নিকট হতে লাঞ্ছনা পাওয়া যাচ্চে। অত আগে থাকতে ঘোষণা করলে কেন? সাধারণের কাছে সত্যরক্ষা না করলে তাদের শ্রদ্ধা হারাবে।

কোথাও পালাতে ইচ্ছা করচে। কিন্তু পথ পাচ্চি নে—পাথেয়েরও অভাব। ঈশ্বর যদি ডানা দিতেন তাহলে রেলোয়ে কম্পানি ছাড়া আর সকলেরই সুবিধা হত। ডানা যদি না দিলেন তাহলে মনটাকে অচল করলে কোনো নালিশের কারণ থাক্‌ত না। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২৩ অক্টোবর ১৯০৯

UTTARAYAN
Santiniketan. Bengal

সঙ্কলনে মন দিতে পারিয়াছ কি? ছুটির সময়ে যদি নির্জ্জন শান্তি প্রয়োজন বলিয়া বোধ কর তবে শান্তিনিকেতনের মতো এমন জায়গা আর পাইবে না—আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করো তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। লুপ মেলের লৌহ উচ্চৈঃশ্রবায় যদি আরোহণ করো তবে তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার কথা সপ্রমাণ হইবে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

২ নভেম্বর ১৯০৯

ওঁ

সুহৃদ্বরেষু

তোমাকেই চিঠি লিখ্‌ব বলে স্থির ছিল এমন সময় মণিলালকে প্রবাসী সংকলনের জন্য একটা চিঠি লেখা জরুরি হয়ে উঠ্‌ল তাই নিতান্ত অলসপ্রকৃতি বশত সব কথা এক-চিঠিতে লিখে শ্রমলাঘবের কৌশল উদ্ভাবন করেছিলুম। এমনি করেই মানুষ অপরাধের সৃষ্টি করে—এবং যেটিকে লাঘব করবার জন্যে এত ফন্দী করে সেইটেকেই দশগুণ বাড়িয়ে তোলে। তোমাকেই লেখা আমার কর্ত্তব্য ছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই—তুমি মনে যে বেদনা পেয়েছ বিধাতা সেইটেকেই আমার সকলের চেয়ে গুরুদণ্ডস্বরূপ বিধান করেচেন—আমি অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করচি তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

গানের বই সংশোধন করা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভালই হয়—এ জন্যে যতগুলি পারি নূতন গান তোমাকে পাঠানো যাবে।

কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমার কোনো কথায় উত্তেজিত হয়ে নিজেদের কোনো ক্ষতির কারণ ঘটিয়ো না। তাহলে সেটাও আমাকে দণ্ড দেওয়া হবে। গোরা তোমরা সময়মত এবং সুচারুরূপে ছাপিয়ে দিলেই আমার কোনো ক্ষোভ থাক্‌বে না। আমার মনে এই ছিল যে, ধীরে ধীরে

ছাপালে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল থাকবার আশঙ্কা থাক্‌বে না সেই জন্যেই তাগিদ দিয়েছি। নিজের বই সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বভাবতই অধীর ও অসহিষ্ণু— প্রকাশক হয়ে আজও যদি সেটা সহ্য করবার শক্তি তোমার না হয়ে থাকে তাহলে তোমার কি দশা হবে আমি তাই ভাব্‌চি। চিত্তকে পর্ব্বতের মত কঠিন করতে না পারলে গ্রন্থকার সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে তুমি টিঁক্‌তে পারবে না। আমার কথায় বিচলিত হোয়ো না— আমি তোমার উপরে রাগ করে একেবারে আগুন হয়ে থাকব আমার এমন রুদ্রতা তুমি কল্পনা কোরো না। এই পবিত্র কাগজখণ্ডে পবিত্র কালী দিয়ে আমি স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিচ্চি তোমার উপরে আমার শিকি পয়সার রাগ নেই। বিশেষত তুমি ভ্রমক্রমে একটা গলদ্‌ করে ফেলেছ সেটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড তার উপরে এই সুযোগে আমি যদি তোমার প্রতি চক্ষুরক্তবর্ণ করে দাঁড়াই তাহলে ঈশ্বর আমাকেই বা ক্ষমা করবেন কেন? তোমার দুঃখে তুমি আমাকে ব্যথিত বলেই জেনো ক্রুদ্ধ বলে মনে কোরো না।

যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কোনো সুবিধা থাকে তাহলেই দিয়ো নতুবা যদি বিরক্ত হয়ে দাও তাহলে আমার প্রতি নির্দ্দয়তা করা হবে— কখনো তা কোরো না। দেখ, এই সমস্ত বই ছাপানো প্রভৃতি যে জঞ্জাল নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া গেল তা আর বেশি দিন পর্য্যন্ত চল্‌বেনা —এই জন্যেই যা লিখেছি তা যথাসম্ভব নির্ভুল করে ছাপিয়ে দিয়ে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন ব্যগ্র হয়েছে। যখন

দ্বিতীয় সংস্করণ হবে তখন আমারও দ্বিতীয় সংস্করণের সময় হবে। ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল যদি ছাপিয়ে যাই তাহলে পাছে আমার প্রেতাত্মা সেই ভুলগুলোতে জড়িয়ে পড়ে দিনরাত্রি ইণ্ডিয়ান্ পব্লিশিং হৌসকে ঘিরে ঘিরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেলে বেড়ায় এই আমার একটা মস্ত ভয় আছে—অতএব ভুল সংশোধন না হলে আমার গয়ায় পিণ্ডদান হবে না! কিন্তু, হায়, হায়, কত-শত পিণ্ডেরই যে প্রয়োজন হবে!

আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা কর। ইতি ১৬ই কার্ত্তিক ১৩১৬

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩
১৭ জুন ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

লেখা ত কিছু নেই। শীঘ্র যে কিছু আশা আছে তাও বল্‌তে পারি নে।

যতীন বাগচি একটি লেখা আমাকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছে—এটা খুব interesting। প্রবাসীর জন্যে অত্রসহ পাঠিয়ে দিচ্চি।

গানগুলো সাময়িকে ছাপ্‌তে দিতে আমার প্রবৃত্তি নেই—ওর প্রতি লোভ দিয়ো না।

ছাগলের জন্যে চিন্তামণিবাবুকে কিছু লিখেছ কি? ও আমাদের চাই। এক ট্রাক্ নিতেও আমাদের আপত্তি নেই। তুমি এর একটু ব্যবস্থা করে দিয়ো। ইতি ৩রা আষাঢ় ১৩১৭

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
২৪ জুন ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

তথাস্তু। কিন্তু নমুনার বইগুলি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি সুদ্ধ লেগে একটা তার কিনারা করে তুলতে পারব এই ভরসা আমার আছে।

রামানন্দবাবুকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করে ফেলবার জন্যে অনেকদিন থেকে সাধনা করচি। এবার যখন তিনি ব্যাধির তাড়নায় কাজ ছেড়েই দিয়েছেন তখন একবার সপরিজনে এই প্রান্তরের শুশ্রূষা গ্রহণ করে দেখুন না— হয়ত সুস্থ হতে পারেন। এলাহাবাদে তাঁর যাবার কথা ছিল। আগে নিকটের পরীক্ষা সমাধা করে দূরে গেলে হয় না? তাঁকে কোনো কাজ করতে হবে না। কেবল তিনি

দর্শক হয়ে বসে থাক্‌বেন। এখানে থাক্‌লে তাঁর পত্রিকা চালনার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমিও মাঝে মাঝে এখানে এসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যেতে পারবে। ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

২৫ জুন ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার চিঠি বোধহয় পাইয়াছ। তোমার কাছ হইতে বইগুলা আসিয়া পৌঁছিলেই তোমার suggestion মত লেখা আরম্ভ করিয়া দিব। চলিত কথার রীতি সম্বন্ধে তুমি যে পরামর্শ দিয়াছ তাহা কাজে লাগানো শক্ত হইবেনা।

কল্যরাত্রে আশ্রমে সন্তোষের ভাই ভোলার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তোষ কলিকাতায় গেছেন— দেখা হইয়াছে কি ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

* ২ জুলাই ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সঙ্কলন সমালোচন শিরোনামা তুলে দিতে চাও দিয়ো— What is in a name? তবে শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধগুলি পরে পরে একত্রে ছাপিয়ো — চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ো না।

বইগুলি পেয়েছি। যতই ভেবে দেখ্‌চি ততই বুঝচি অজিতের কর্ম্ম নয়। আমাকেই করতে হবে তার পরে কোনো ইংরিজি ব্যাকরণ-মুদ্রারাক্ষসকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে নিতে হবে। বাংলা ভাষাকে ত analyse করে এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নি — অতএব অনেক চিন্তা করতে হবে। এ পথে চিন্তা করা অজিতের অভ্যস্ত নয়। তৈরি করে তুল্‌তে সময় লাগ্‌বে নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বেনা।

ছাগলগুলি কবে আমাদের শান্তিনিকেতনের তৃণরাজি কবলিত করতে আস্‌বে?

যুষ্মদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

জুলাই ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

Myron Phelpsকে যে ইংরাজি চিঠিখানা বৎসরখানেক

হল লিখেছিলুম তার একটা type written copy পেয়েছি। এটা রামানন্দবাবুকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কোরো Modern Reviewতে এর স্থান হতে পারে। এর ভাষা, বানান, punctuation সমস্তই তাঁকে দেখে দিতে হবে। Copyistও কিছু কিছু ভুল করেছিল—যতটা পারলুম সংশোধন করে দিলুম। ইংরাজি ভাষার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করে এবং দুই একজন আত্মীয় বন্ধুর সাহায্য নিয়ে এটা আমাকে লিখ্‌তে হয়েছিল—মনের ভাব একরকম ব্যক্ত করেছি—যদি ছাপা সম্ভব হয় ত ছাপতে দিয়ো নইলে আমি যেন অবিলম্বে ফিরৎ পাই। যদি কোনো অংশ পরিত্যাগ বা বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন করলে ভাল হয় তাহলে রামানন্দবাবু নির্ম্মমভাবে তা করবেন—আমি তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি—কিন্তু ছাপার পূর্ব্বে সংশোধনটা আমি দেখ্‌তে পাই যেন।

প্রবাসীর জন্যে এই সঙ্গে একটি কবিতা পাঠাই। অনেকদিন পরে গান লিখ্‌তে গিয়ে সামলাতে না পেরে কবিতা লিখে ফেলেছি সে জন্যে সকল পাঠকের ক্ষমা প্রার্থনা করি—এ রকম অপরাধ এখন আর বেশি হবেনা।—এই মাসেই যেন কবিতা বাহির হয়।

রামানন্দবাবুর মত আমাকে শীঘ্র জানাবে।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
২৮ জুলাই ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার গল্পটি ভালই হয়েছে। সামান্য কিছু কাটাকুটি করেছি। শেষ অংশটি বাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য—পাঠকদের ধর্ম্মনীতির প্রতি লক্ষ্য করে নয়, সাহিত্যকলার খাতিরে। লঙ্কাকাণ্ডে সীতা উদ্ধারের পর আবার উত্তরকাণ্ডে দুর্ম্মুখের দুর্যোগে তাকে বনবাস দেওয়া যেমন বাড়াবাড়ি তোমার উপসংহার অংশটিও তদ্রূপ—এরকম উপসংহার অপঘাত মৃত্যু। এইটুকু বাদ দিলে তোমার গল্পটি বিশেষ উপাদেয় হবে সন্দেহ নেই। ইতি ১২ই শ্রাবণ ১৩১৭

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখাটি অদ্যকার ডাকেই ফেরৎ পাঠাচ্চি।

১৯
* ৯ অগস্ট ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। দেখা কোরো। ইতি মঙ্গলবার

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

নিম্নলিখিত গানটি এইবারকার প্রবাসীর প্রান্তে স্থান পাবে কি? গীতাঞ্জলিতে এ গান অত্যন্ত অশুদ্ধ আকারে বেরিয়েছে —গীতাঞ্জলি এখনো প্রকাশ হয় নি— অর্থাৎ আশ্বিনের পূর্ব্বে মণিলাল তাকে বাজারে দেবে না। বিশুদ্ধ পাঠটিকে কোথাও রক্ষা করবার জন্যেই আমার এই ব্যাকুলতা।

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।
জীবনে আজো যাহা
রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও
হয় নি মিছে।

আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে
বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা॥

নাম কি দিতে হবে জানি নে। কবিতার নাম দেওয়া শক্ত। বস্তুত নাম না দেওয়াই উচিত— কারণ নামে কবিতার পরিচয় নয়।

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১
৬ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ রেজেষ্ট্রি ডাকে তোমাকে দুটো সংকলন পাঠানো গেল। যদি পছন্দ না হয় ফেলে রেখে দিয়ো না— আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ো। মনে কোরো না আমি রাগ করে বলছি— আমিও এককালে সম্পাদকি করেছি— সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করতে দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিতে হয়। তোমার বিচার ও অভিরুচি অনুসারে নিঃসঙ্কোচে তোমার কাজ করে যেয়ো —কিছুতেই আমি লেশমাত্র ক্ষুব্ধ হব না। বিষয়টা হয়ত

উপাদেয় নয়— তার উপরে লম্বা— লেখিকারাও কাঁচা অতএব যদি এই রচনাগুলি বর্জ্জন কর তবে আমরা গর্জ্জন করব না— আবার অন্য লেখাও পাঠাব।

এখানে কবে আসৃচ? ২১শে ভাদ্র

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ মণিলালকে বোলো ত আমার নামে একটা চোখের বালি ও নৌকাডুবি যেন V. P. ডাকে সত্বর পাঠিয়ে দেয়।

২২
১২ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ রেজেষ্ট্রি ডাকে ছুটি সঙ্কলন পাঠাচ্ছি এবং ঐ সঙ্গে আমার একটি "মৌলিক" যাচ্চেন। সঙ্কলনছুটির একটি হেমলতা বৌমা ও অন্যটি আমার কন্যার ভাগে পড়েছিল— কিন্তু শোধন করতে করতে তাদের নিজস্ব এতই যৎসামান্য বাকি রয়ে গেল যে এই ছুটি সঙ্কলনে তাদের নাম দেওয়া নিতান্ত অন্যায় হবে মনে করে এ ছুটিকে বিনা নামেই চালাতে ইচ্ছা করি। মীরার যে ছুটি সংকলন পূর্ব্বে পাঠিয়েছি তাতে প্রায় কিছুই বদলাতে হয় নি এই জন্যে নিঃসঙ্কোচে তার নাম ব্যবহার করা গেছে— হেমলতা বৌমার লেখায় কতকটা অধিক পরিমাণে কাটাকুটি করতে ও মাঝে মাঝে নূতন কথা যোজনা

করতে হয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেগুলিতে তার নামের অধিকার ছিল— কিন্তু এবারে আর চল্‌ল না। এই সঙ্কলন যদি মনোনীত হয় তবে বোধ করি অগ্রহায়ণে যাবে। তার পরমাসের জন্যও লেখা চল্‌চে। যদি সঙ্কলন দুটি পছন্দ না হয় তবে অবিলম্বে মণিলালের হাতে দিয়ো— কার্ত্তিকের ভারতীতে বের করে দেবে।

আমার নিজের লেখাটার নাম মাতৃশ্রাদ্ধ— বোধহয় পছন্দ না হলেও দেবে কেননা আমার নাম আছে— যদি সম্ভব হয় তবে কার্ত্তিক মাসে যাবে কি?

এখানে দুটো অভিনয়ের আয়োজন সুরু হয়েছে— এক শারদোৎসব দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের খাতা। দেখ্‌তে আস্‌বে ত? সত্যেন্দ্রকে টেনে আন্‌তে পারবে? ইতি ২৭শে ভাদ্র ১৩১৭

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্য হবে না।

সে জন্যেও না— আসল কথা অনেকদিন ধরে লিখে আস্‌চি। বয়সও কম হয় নি— আর অল্প কাল অপেক্ষা করলেই আমার রচনার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে— আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে আলো নিবিয়ে সরে যাব তখন সকল প্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে পড়ব— তখন আমাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আমার লেখাগুলোকে বিচার করতে পারবে। তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে— অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই কেননা আমার কবিতা তো রয়েইচে— যদি ভাল হয় ত ভালই, যদি ভাল না হয় ত ও আবর্জ্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগ্‌বেনা— আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছা করি নে। তোমরা আমার লেখা ভাল বল্‌লে আমার ভাল লাগে না এমন কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয়— প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে— সেই জন্যেই ঐ নেশাটাকে প্রশ্রয় দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না— কারণ ঐ জিনিষটার মধ্যে অনেকটা আছে যা মিথ্যা— অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছা নয় নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছা— সেই ইচ্ছা এ সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে, অত্যুক্তিকে ভালবাসে— নিজের নাম নামক জিনিষ এমনি একটা বিশ্রী জিনিষ। যখন আমার নিজের নাম আর আমার নিজের কানে পৌঁছবে না তখন তোমরা সেটাকে বর্জ্জয়িসেই হোক্‌ আর ইংলিশ অক্ষরেই

বোলপুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের আলোচনা ঠিক সুসঙ্গত হবেনা। সে কথাও না — আসল কথা, অনেকদিন ধরে লিখে আসচি, এখনও শেষ হয় নি — আর অল্প কাল অপেক্ষা করলেই আমার লেখার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে — আমি যখন পৃথিবী থেকে একেবারে আলো নিবিয়ে সরে যাব তখন সকল প্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে পড়ব এবং আমাকে যথা-

সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আমার লেখাগুলোকে বিচার করতে পারবে। তবুও আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে - অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার. নেই কেননা আমার কবিতা ও রচনাদি - যদি ভাল হয় ত ভালই, যদি ভাল না হয় ত ও আবর্জনা দূর করবার কাজে/ তোমাদের মতন লাগবেনা - আপনি নিঃশব্দে মরে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো উড়াতে ইচ্ছা করিনে। তোমরা আমার লেখা ভাল বললে আমার ভাল লাগে না এমন কথা বললে মিথ্যা বলা হয় - প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে - সেইজন্যেই ঐ লোভটাকে প্রশ্রয় দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না — কারণ, ঐ নিবেদনটার মধ্যে/ অনেকটা আছে যা মিথ্যা - অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছায় নয় নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছায় -

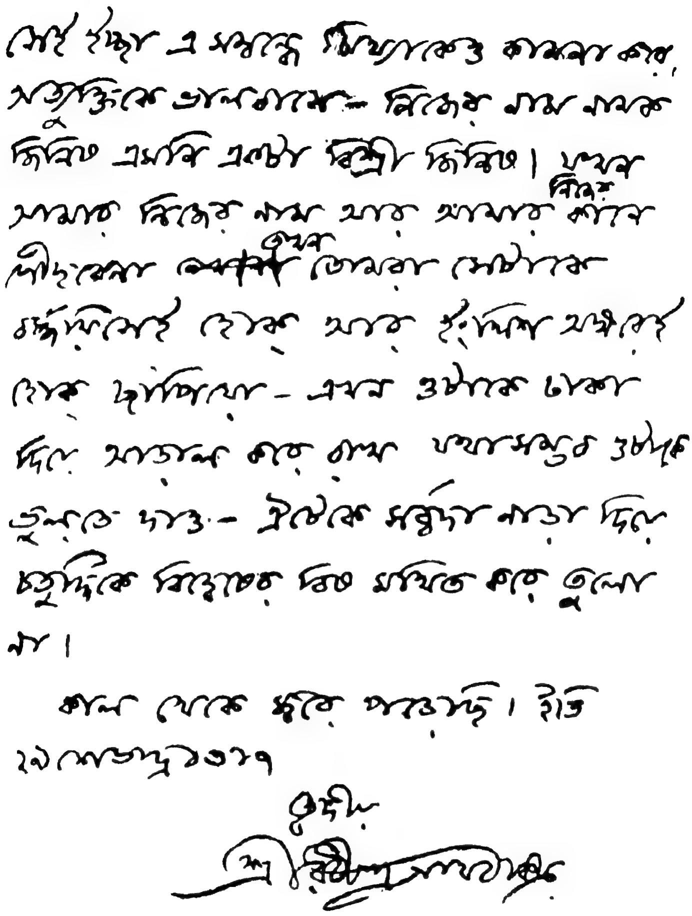

সেই ইচ্ছায় এ সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে, সত্যকে ভালবাসে — নিজের নাম বদলে লিখেছে এমনকি একটার বিশ্রী লিখেছে। যখন আমার নিজের নাম আর আমার নিজের কাছে পীড়াজনক ~~[illegible]~~ তখন তোমরা সেটাকে ঢক্কা পিটিয়েই ছেপে আর ইংরিজি অক্ষরেই ছেপে ফাঁপিয়েছ — এখন ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখ যথাসম্ভব ওটাকে ভুলতে দাও — ওকে সর্ব্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহের বিষ সঞ্চিত করে তুলো না।

কাল থেকে জ্বরে পড়েছি। ইতি
২৬শে ভাদ্র ১৩২৭

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত
পত্রের প্রতিলিপিচিত্র

হোক ছাপিয়ো—এখন ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখ যথাসম্ভব ওটাকে ভুল্‌তে দাও—ঐটেকে সর্ব্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলো না।

কাল থেকে জ্বরে পড়েছি। ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩১৭

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আর একবার জ্বরে পড়ে পুনর্ব্বার আবার কাল সেরে উঠেছি, আর পড়বার ইচ্ছা নেই।

আমাদের অভিনয় বোধহয় আশ্বিনের ১৪/১৫ই নাগাদ হবে—তোমরা দলে বলে স্বজন পরিজনে পরিবৃত হয়ে এসো। ইতি ২রা আশ্বিন

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫
নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আগামী বৎসরেও সঙ্কলনের ভার কি আমাদের উপর

দেবে? বোধহয় তোমাদের প্রয়োজন হবে না। মিথ্যা তোমাদের খরচ বিস্তর হয়। মাসিক কাগজ গত বৎসরে যতগুলো পেয়েছি তার মধ্যে থেকে কেবল Brodar International Review (ঠিক নামটা লিখ্‌লুম কিনা জানি নে), Humanitarian Review, Literary Digest এবং ঐ রকমের আর একটা American Weekly (নামটা ভুলে যাচ্চি) ও Twentieth Century থেকে সঙ্কলন করা গেছে। বাকি সমস্ত পুরাতন কাগজের বোঝা ঘেঁটে বের করতে হয়েছে। Hibbert Journal থেকেও অজিত অনেকগুলো সঙ্কলন করেছে—এবারেও মীরাকে দিয়ে সঙ্কলন করিয়েছিলুম সে তোমার কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য কাগজ থেকে একটাও পাওয়া যায় নি।

যদি অজিত ফেরে (তার শরীর অসুস্থ বলে ফেরবার কথা হয়েছে) তাহলে Hibbert Journal প্রভৃতি Philosophical পত্রিকা থেকে লেখা পাওয়া যাবে—অন্য কাউকে দিয়ে ও সব লেখা লেখানো যায় না। তাহলে The Quest নামক একখানি Theological Magazine subscribe করা ভাল হবে। এবং Nation কাগজের বদলে The Public Opinion কাগজটা নিলে হয়ত ব্যবহারে লাগতে পারে—কারণ এই কাগজে নানা লোকের নানা মত ও নূতন বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর subscription বার্ষিক ১৩ শিলিং।

যাই হোক্ সঙ্কলন সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে একবার

আলোচনা করে তার পরে কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। Chambers, Strand, Pearson, Windsor, Pall Mall এগুলো এখনি বন্ধ করে দিয়ো। Nationও কাজ নেই। The Questটা যদি আনাও তাহলে গত October মাসের সংখ্যা থেকে আনিয়ো— কারণ তার মধ্যে আলোচ্য জিনিষ আছে। ইতি

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬
৩ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমি এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি বটে কিন্তু সেটার উপর তোমরা চোখ দিলে চল্‌বে না। জিনিষটি ছোট নাটক— শারদোৎসবের স্বজাতীয়— আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের অনুরোধে পড়ে লিখ্‌তে বসেছি। তাকে টুক্‌রো করে তোমাদের কাগজে দিলে কারো ভাল লাগ্‌বে না। জিনিষটাও একটু অদ্ভুত রকমের হবে— কেউ বল্‌বে ভাল কেউ বা বল্‌বে মন্দ এবং অনেকে হয়ত ভেবেই পাবে না ভাল বল্‌বে কি মন্দ বল্‌বে। মোটের উপর বারো আনা লোক বল্‌বে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্চে। আমি সে কথা অস্বীকার করি নে— শক্তির

রূপান্তর ঘটে— সেই রূপান্তর ঘটবার সজীবতা ঈশ্বর যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে রক্ষা করেন তাহলেই শক্তির সার্থকতা ঘটে। যাই হোক্ হঠাৎ যে জিনিষটাকে ঠিক ধরা যাবে না তাকে মাসিকে দিলে তার আর দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না। তুমি ত দেখেইছ শারদোৎসবটাতে পাঠকদের কিরকম পীড়া উৎপাদন করেছে।

গোটাকতক সংকলন জমেছে ফিরে গিয়ে দেওয়া যাবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

১১ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তুমি বোধহয় জাননা বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থা সম্প্রতি সম্পূর্ণই আমার আয়ত্তের অতীত— কারণ আমার দ্বারা অনর্থই ঘট্‌ছিল। যা হোক্ আমি যথাস্থানে আবেদন জানিয়েছি আশা করি বাধা ঘট্‌বে না।

আমার কলকাতায় যাবার সময় আসন্ন হয়ে এল, কারণ ছুটি শেষের আর দেরি নেই। তখন সঙ্কলন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। অজিতের ফিরে আসাই স্থির হয়েছে— সুতরাং তার দ্বারা হয়ত তোমাদের সঙ্কলনের সাহায্য হতে পারবে।

আমার নাটকটা আজ শেষ করেছি। আর একবার তুলি বুলতে হবে। ২৫শে কার্ত্তিক ১৩১৭

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

১৫ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। অতএব যথাসময়ে ছেলেদের পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো। বিদ্যালয়ের বেতন মাসিক দশ টাকা স্থির হয়েছে।

আমি সম্ভবত সপ্তাহখানেক পরেই কলকাতায় ফিরব। ইতি ২৯শে কার্ত্তিক ১৩১৭

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

২ ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তুমি কাল এসে ফিরে গেছ সেজন্য আমি দুঃখিত আছি। আজ যদি আর একবার চেষ্টা কর তাহলে ফিরতে

হবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ১৯শে মাঘ ১৩১৭

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০
ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার পাণ্ডুলিপি পেয়েছি— কিন্তু এখনো হাত দিতে পারিনি। ব্যস্ত আছি। গোড়ার পরিচ্ছেদটা একটু আমি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

নানাবিধ লেখায় ব্যস্ত আছি। তার মধ্যে একটা ব্যাকরণও আছে।

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১
১০ মার্চ ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমার বিবাহের সংকল্প কাগজে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তখন সেই শুভসংবাদে আমার বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। কিন্তু নরেন্দ্র

সেন মশায়ের কাগজে আমি প্রবন্ধ লিখব কিনা এ সংবাদে তোমাদের এত কৌতূহল উদ্রেক হল কেন? এই কাগজের সঙ্গে কোম্পানির কাগজের সম্বন্ধ আছে শুনেছি বটে—কিন্তু ভবসমুদ্রে এই কোম্পানির কাগজের নৌকোটার উপরে আমি ত আজকাল তেমন ভরসা রাখিনে।

নরেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে গত কল্য অনুরোধ পেয়েছি—আমি সম্মতি দান করি নি। না দেবার প্রধান কারণ এই যে, এতদিন ধরে কলমের মুখে অনেক কালী মাখিয়েছি এখন তার কলঙ্ক ক্ষালন করে ভালমানুষটি হয়ে চুপ করে বসে থাকব এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু গবর্মেণ্টের এই কাগজের জয়ঢাকটাকে অবলম্বন করে পলিটিক্‌স্ বাদ দিয়ে অন্যান্য ভাল ভাল প্রয়োজনীয় তথ্য দেশময় প্রচার করবার সুযোগ অবলম্বন করলে দোষ কি? কোন দীনপ্রাণ প্রাইভেট কাগজের দ্বারা ত এ সুবিধা ঘটতে পারে না। বস্তুত আমাদের বাংলা খবরের কাগজগুলো ত লোকশিক্ষার পক্ষে উপযোগী হচ্চে না—হলেও তার গ্রাহক হওয়া শক্ত হয় এমন স্থলে এ রকম কাগজের দ্বারা কাজ পাওয়া যেতে পারে। ইতি ২৬শে ফাল্গুন ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী রবিবারের পর রবিবারে "রাজা" অভিনয়ের নিমন্ত্রণ রইল। ব্যাকরণ লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

* ৪ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমাকে Modern Review প্রতিবারেই পাঠাবার গোল হয়। বোধ করি তোমাদের আপিসে একটা কোনো ভুল আছি [আছে]। গত জানুয়ারিতে যখন V. P.তে Modern Review আমার কাছে যায় তখন আমি শিলাইদহে ছিলুম— হয়ত সেখানকার ঠিকানা তোমাদের আপিসে রয়ে গেছে। এটা সংশোধন করে নিয়ে যাতে আমি নিয়মমত কাগজটা পাই সে ব্যবস্থা করে দিয়ো। আজ ৪ঠা তারিখেও যখন পেলুম না তখন অন্য তারিখেও না পেতে পারি এই আশঙ্কায় তোমাকে লিখ্‌তে হল। আমার নাম কি subscriberদের তালিকায় নেই ? আমি কিন্তু subscription দিয়ে খালাস হয়েছি।

বর্ষশেষের দিনে তোমরা আস্‌তে পারবে ত ? সেদিন মেয়েরা কেউ আস্‌বেন কিনা আজও জানতে পারা গেল না। ইতিমধ্যে জগদীশ দুই দিন এখানে যাপন করে গেছেন। এই জেলার প্রতি যতদিন থেকে রাম সদয় হয়েছেন ততদিন হনুমানের উপদ্রবটা বড় বেড়ে গিয়েছে— মাঝে মাঝে একটা দুটো প্রায়ই যাতায়াত করচে।

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

১৭ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

“নববর্ষ” লেখাটা ছাপিয়ে তার প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাতে বিলম্ব কোরো না।

সত্যেন্দ্রের নওরোজি তর্জ্জমাটি ভারি আশ্চর্য্য হয়েছে।

তোমার কাছে মীরার একটা সঙ্কলন আছে— Hibbert Journal থেকে— সেটা প্রবাসীর পক্ষে অতিমাত্রায় Theological এবং *From the bottom up* নামক মিসনারি লিখিত বই থেকে আরো দুটো সঙ্কলন দিয়েছিলুম— এগুলি তত্ত্ববোধিনীর উপযুক্ত অতএব যদি মায়া ত্যাগ করে পাঠাতে পার তাহলে আমার কাজে লাগ্‌বে।

অনেকদিন তোমাদের কোনো খবর নেই কেন?

উলুউলু মাদারের ফুল
তোমার গল্প এল কতদূর?

ইতি ৪ঠা চৈত্র [বৈশাখ ১৩১৮]

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

* ১৬ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ —

বাঃ তুমি ত বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও! এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে— এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছে[ছেঁ]ড়ি করতে হবে! সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে তিরোহিত হয় তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠ্চ।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক্ তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই এবং বড়দাদার লেখাটাও পাঠানো যাচ্চে। বড়দাদার লেখা ও প্রুফ আমাকে পাঠিয়ো।

কই— প্রবাসী ত পাইনি। বোলপুরে পাঠিয়েছ বুঝি? এখানে একখানা পাঠিয়ে দিয়ো।

একটা নূতন নাটক লেখবার চেষ্টায় আছি। দুইএক দিনের মধ্যেই সুরু করব।

বড়দাদার লেখার দুই কিস্তিই এবার একসঙ্গে ছাপিয়ো।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

২০ মে ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ "আপনার জীবনটা চাই"—এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাক্‌ত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাক্‌ত না—তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাক্‌বে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্চে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহকিতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচি নে বলে কিছু স্থির করতে পারচিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন; অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and white-এ আমার জীবনটার একগালে চুন ও একগালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও শাদাচুল ও শ্বেতশ্মশ্রুতেও

অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুল্‌তে পারে না।

মাতা সীতাকে জানিয়ো যে, উৎসব হলে তবে তাঁরা বোলপুরে যাবেন এ কথাটা গ্রাহ্যই নয়—তাঁরা গেলেই আমাদের উৎসব হবে এইটেই আসল কথা। আর মাতা শান্তাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো—তিনি আমাদের আশ্রমে গিয়ে পীড়াভোগ করেছিলেন সেই দুঃখস্মৃতিই যেন আমাদের স্মরণকে আচ্ছন্ন করে না রাখে।

এইমাত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ রায় মহাশয়ের এক তীব্র চিঠি পেলুম। তাতে তোমার প্রতি তিনি সৌহৃদ্য প্রকাশ করেননি। তাঁর "গোরা"র সমালোচনাটা "বঙ্গদর্শনে"ই পাঠিয়ে দিয়ো। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস সেটা বেরয়নি দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু সপরিজনে এখানে আসবেন কথা ছিল—কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। তুমি তাঁর কোনো সংবাদ রাখ কি? ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬
২১ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

টুর্গেনেভের "মুমু" নামক একটি করুণ গল্প দিনুকে দিয়ে

তর্জ্জমা করিয়েছিলুম— সেইটি তোমাকে বুকপোষ্টে পাঠালুম— যদি পছন্দ না কর তাহলে ভারতীর হাতে পাঠাতে কিছুমাত্র বিলম্ব কোরো না— কারণ ওরা নবীন লেখক, বাধায় বা বিলম্বে অধীর হয়ে পড়ে। এখানে ছুটিতে আছে ওকে দিয়ে আরো কতকগুলো জর্ম্মান ফরাসী ও রাসিয়ান গল্প তর্জ্জমা করাব। তাহলেই ওর হাত তৈরি হয়ে যাবে— ওর তর্জ্জমায় হাত খেলে ভাল।

হিবর্ট্ জার্নাল থেকে মীরা একটা ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ তর্জ্জমা করেছিল। নিশ্চয়ই সেটা তোমাদের মাসিকের পছন্দসই জিনিষ নয়— কিন্তু সেটা তত্ত্ববোধিনীতে ঠিক খাপ খায়— সেটা তোমাদের দেরাজের মধ্যে বন্ধ করে রেখে কোনো ফল হবে না। মনে কোরো না তোমরা ছাপ্‌তে দেরি করচ বলে লেখিকা বা তার বাবা অধীর হয়েছে। কিছু মাত্র নয়। মীরার নাম করবার নেশা নেই— আমারও সে সম্বন্ধে কোনো তাগিদ নেই। কিন্তু আমি সম্পাদক, সম্পাদক হয়ে সে কথাটা তোমার বোঝা উচিত। *From the Bottom Up* নামক বই থেকেও তার গোটা দুয়েক সঙ্কলন আছে— সেগুলোও তত্ত্ববোধিনীতে বার করে দিতে পারলে তাকে দিয়ে আর কতকগুলো লিখিয়ে নিতে পারি।

মোহিতবাবুর স্ত্রী আমাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা লিখেছেন— বোধ করি তিনি সেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। আমার বিশ্বাস এটা তোমাদের কাগজে দেবার যোগ্য হয়েছে। এই সঙ্গে বলে রাখি এমন অনেক কবিতা তোমরা

বের কর যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমন গন্ত প্রবন্ধও দুই একটা দেখা যাচ্চে।

ক্ষিতিমোহনবাবুর গতিবিধি তুমি কিছু লক্ষ্য করতে পেরেছ? শিলাইদহে আমি আসা অবধি তিনি আমার কক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে আমি হাতছাড়া করতে চাইনে। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

২৩ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কবিকে তুমি যেমন করে পার এখানে রওনা করে দাও। তার পরে আমার এলাকার মধ্যে এসে পড়লে আমি তাকে সুস্থ না করে ছাড়ব না। কিছুতে সত্যেন্দ্রের মনে যেন দ্বিধা উপস্থিত না হয়। এখানে তার কিছুমাত্র অসুবিধা হবেনা—তার প্রধান কারণ এটা হচ্চে গৃহস্থঘর, এ আশ্রম নয়। এখানে দিনু আছে—তাছাড়া আমি আছি—ছুটির দিনগুলো সুরে বেসুরে গল্পে গুজবে বেশ জমে যাবে। যে কোনো উপায়ে তুমি তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ো। তুমি নিজে যদি তাকে সঙ্গে করে আনতে পার তাহলে আরো ভালো হয়। তাহলে সম্পাদকের কাজও কিছু গুছিয়ে যেতে পার। কিন্তু একদিন

আগে পরিষ্কার খবর পাঠিয়ে দিয়ো। কারণ যথাসময়ে কুষ্টিয়ায় পাল্কি রাখ্‌তে হবে— নইলে মুস্কিল হবে। তোমরা কে কে আসচ, কখন আস্‌চ একেবারে নিশ্চয় নির্দ্দিষ্ট করে লিখো।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী সম্বন্ধে আমার অভিমত। "জীবন বৈচিত্র্য" লেখাটি ভাল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয় নি— অনেকস্থলেই নিরর্থক ও অদ্ভুত হয়েছে। প্রথমেই ঐটে পড়ে ভাবছিলুম এটা কেন দিয়েছ। "বুদ্ধদেব" কবিতায় চিন্তা ও ভাব দুইই অগভীর। "নববর্ষ" প্রবাসীতে দেবার কোনো দরকার ছিল না। "প্রকৃতিসুন্দরী" কবিতাটি কাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্চে? যদি প্রকৃতিকে হয় তবে শেষ দুই ছত্রের অর্থ কি? "গোপন হৃদয়পটে" কল্পনা তাকে আঁক্‌তে যায় কেন? বোধ হচ্চে, লেখাটির ভিতরকার মানে হচ্চে প্রেমের আবেগে সমস্ত প্রকৃতি আজ মাধুর্য্যের নিবিড়তা লাভ করেছে। কিন্তু সেটা কিছুই স্পষ্ট হয় নি। "ফুল আজি তব গন্ধে হয়েছে সুরভি" —এ কি প্রকৃতির গন্ধে? "তব লজ্জা আঁকিয়াছে" ইত্যাদি, এ কি প্রকৃতির লজ্জা? কেন লজ্জা? আবার "নদী আজি গাহে" এ কি প্রকৃতির গান? প্রকৃতির গন্ধে প্রকৃতির ফুল সুরভি হবে, প্রকৃতির লজ্জায় প্রকৃতির রবি রাঙা হবে, প্রকৃতির গানে প্রকৃতির নদী গান করবে এ কথা বিশেষ করে বলবার দরকার কি? তার পরে "লভিয়াছে নবপ্রাণ সকল জগৎ" —কেন? "মোর দগ্ধ তপ্ত হিয়া তোমার চরণপ্রান্তে পড়িছে লুটিয়া বিফল বেদনাভরে।" এ কি প্রকৃতির পায়ে? সমস্ত কবিতাটা পড়ে দেখো— প্রকৃতিসুন্দরীর সঙ্গে খাপ খায় না। যদি

অন্য কোনো সুন্দরীর কথা হয় তবে মেয়ে লিখ্‌চে কেন? এ যে গীতিকাব্য—এ ত ড্রামাটিক্‌ নয়। সব সময়ে কবি কোনো উপস্থিত সত্যকে অবলম্বন করে লেখে না—কিন্তু পুরুষের কল্পনা পুরুষের যোগ্য এবং মেয়ের কল্পনা মেয়ের যোগ্য হওয়া চাইনে কি?—হেমেন্দ্র সিংহের লেখা নিতান্ত চক্‌মকি ঠোকা—যতটা স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয় তার চেয়ে ঠক্‌ঠক্‌ ঢের বেশি—বাক্যগুলো এরকম ক্রমাগত ঘাড়ের উপর এসে পড়তে গেলে ভারি শ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। “যযাতির স্বর্গপ্রাপ্তি” এমন একটি জিনিষ যাকে প্রশংসাও করা যায় না, নিন্দাও করা যায় না। লাভ কবিতাটি সনেট—(সনেট জিনিষটি তীরের মত—তার শেষ প্রান্তে একটি ঝক্‌ঝকে ও তীক্ষ্ণ ফলা থাকা উচিত সেইটে বুকে এসে বিঁধ্‌বে।) এ কবিতার ভাবটি পুরাতন ও তার প্রকাশটিও বিশেষত্বহীন। ইনি আমার নামে একটি কবিতা রচনা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেটি প্রশংসার যোগ্য—তার প্রধান কারণ সেটি আমার নামে, দ্বিতীয় কারণ, মন্দ হয় নি। “মহাকর্ষণ” লেখাটা স্কুলপাঠ্য। “চন্দ্রসূর্য্য” কবিতাকণাটি, কণামাত্র কিন্তু কবিতা নয়—এ সব জিনিষ হীরের মত কঠিন ও উজ্জ্বল হলে তবেই এদের কণিকতা আদরণীয়—বালুর কণা দিয়ে কেউ হার গাঁথে না। “তুই বন্ধু” কবিতা সম্বন্ধেও এই কথা। তোমার সমালোচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তারকনাথ রায়কে তুমি লাঠির বাড়ি মেরেছ, খড়্গাঘাত করনি—তাতে করে মানুষকে কেবল আধমরা করা হয় সেটা ভাল নয়—একেবারে এক কোপে সেরে দিলেই তুই পক্ষে

ভাল। সত্যেন্দ্রের কবিতা ও গদ্য দুইই আমার ভাল লেগেছে। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ত্বদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ— সত্যেন্দ্রকে শিলাইদহে নিশ্চয় পৌঁছিয়ে দিয়ো।

৩৮

২৭ মে ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি। কিন্তু অজিতের প্রবন্ধ শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ভ হলেই ভাল হয়। লোকের তখন জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য একটু বাড়তে পারে।

সত্যেন্দ্রকে কবে এখানে পাঠাবার উদ্যোগ করলে আমাকে সত্বর জানিয়ো। এখানে তার কোনো অসুবিধা হবেনা। তুমি যদি না আসৃতে পার মণিলাল কি তাকে পথ দেখিয়ে আন্‌তে পারবে না?

বড়দাদার লেখার প্রুফ দেখে পাঠিয়েছি— সংশোধিত প্রুফটি তুমি অবিলম্বে তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাতে ভুলো না।

তোমার গল্প কতদূর? একবার এখানে এসে আসর জমিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যাও না? ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

১।২ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

জ্ঞানের হাত দিয়ে জীবনীটা পাঠিয়েছি— পেলে কিনা কোনো খবর দাওনি কেন? সবটা পড়ে দেখো— যদি কোথাও কোনো খট্‌কা বাধে তবে সেটা সাফ করে ফেলো।

শ্রাবণে তোমরা আমার বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছ লিখেছ— তা যদি হয় তবে সেইটে চুকে গেলে ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে আমার জীবনস্মৃতি বের করলে কেমন হয়? তাহলে একটা প্রসঙ্গক্রমে ওটা বের হতে পারে।

সাময়িকপত্রাদি তোমরা যা পাও— ব্যবহারের অতীত হয়ে গেলে আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার? রামানন্দবাবু দিতে সম্মত হয়েছেন। চেষ্টা করা যাবে যাতে প্রবাসীরও কাজে লাগে। ইতি সোমবার

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ শান্তার শরীর কেমন আছে?

৪০

জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার ব্যাকরণ এবং বড়দাদার গীতাপাঠ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। গীতাপাঠের প্রুফটা একবার কাপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার একটা প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে ও অন্যটা আমার কাছে পাঠিয়ো। জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ—জিনিষটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি—আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে কিন্তু আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ইত্যাদি।

ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে রাজি আছো? ওটা যে খুব রসালো জিনিষ এমন কথা আমার শত্রুপক্ষেরাও বল্‌বে না—ওর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে যুবক পাঠকের চরিত্র বিকার ঘট্‌তে পারে। তির্য্যক্‌রূপের মধ্যে যে রূপ আছে তাতে মুনিগণের তপস্যার বিঘ্ন হবে না অতএব এরকম জিনিষ কি মাসিকে চল্‌তে পারবে?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের এবারকার প্রবাসী মোটের উপর ভাল হয়েছে।

বিশেষত এবারকার কষ্টিপাথর নামের উপযুক্ত হয়েছে। অনাবশ্যক লোককে আঘাত কোরো না— অনাবশ্যক এই জন্যে বলচি যাদের মরণদশা তারা মরবেই— মাঝের থেকে গো-হত্যার পাপে লিপ্ত হও কেন? যারা সাহিত্যের গুণ্ডাগিরি ব্যবসায়ে পাকা হয়ে উঠেছে খুনজখমের খ্যাতিটা তাদেরি হোক্ তোমরা ভদ্রলোক, দয়ামায়া আছে বলেই যেন সকলে তোমাদের স্মরণ করে। যারা লিখতে অক্ষম তারা সহজেই হতভাগ্য— বিধাতাই তাদের দণ্ড দেন, তার উপরে তোমরা কেন তাদের দুঃখের বোঝা বাড়াও? যারা তোমাদের প্রতি দ্বেষ বহন করে তারা নিজের অন্তরতাপে নিজে দগ্ধ হয়, তাদের উপর আর অগ্নিবাণ বর্ষণ কোরো না— শান্ত হয়ে হাস্য মুখে প্রফুল্ল চিত্তে সম্পাদকের আসন আলো করে থাক এই আমি আশীর্ব্বাদ করি— ললাটে ভ্রূকুটির চিহ্ন দূর হয়ে যাক্। রামানন্দবাবুর চিহ্নিত একটি প্রবন্ধ শরৎবাবুকে দিয়ে সঙ্কলন করিয়েছি সেটা পাঠাই— সংশোধন তুমি করে নিয়ো— আমার সময় আদবে নেই— আরো কতকগুলো পরে পরে পাঠাব।

৪১
জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বড়দাদার গীতাপাঠের কাপি আজ পাওয়া গেল। বোধ

হচ্চে বড়দাদার কাছ থেকে প্রুফ সংশোধন করিয়ে আনিয়েছ। তবে কেন সেই সংশোধিত প্রুফ তুমি তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়ে দিলে না? গতবারে আমি শেষ প্রুফের উপর লিখে দিয়েছিলুম যে সংশোধিত প্রুফ যেন তত্ত্ববোধিনী প্রেসে পাঠানো হয়— কিন্তু শেষে দেখা গেল তোমাদের ছাপাখানা তা করে নি। মাঝের থেকে আমাকে দুবার প্রুফ সংশোধনের বৃথা দুঃখ দেওয়া হল। আমার প্রতি এ রকম নিষ্ঠুরতা কোরো না। তোমাদের সংশোধন-করা একটা প্রুফের ফাইল অতি সত্বর সমাজে পাঠিয়ে দিয়ো।

সেই নাটকটা এতদিন পরে একটু মন দিয়ে লেখবার অবকাশ পাওয়া গেছে। এ পর্য্যন্ত এখানে অতিথির অভাব ছিল না সেইজন্য লেখায় সম্পূর্ণ মন লাগেনি, খাপছাড়াভাবে চলছিল। এখন নিভৃতে বেশ একটু হাঁকিয়ে কলম চালানো যাচ্চে। ভীড় থাক্‌লে মোটর গাড়ি পূরা দমে চালানো যায় না— কলম সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এখন বোধ করি আর দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যে আমার এ লেখাটা শেষ হয়ে যাবে।

সত্যেন্দ্রর খবর কি? তাকে বিচলিত করতে পারা গেল না— যাকে বলে ধ্রুব সত্য।

এই নাটকটা নিয়ে আটকে পড়া গেছে নইলে বেরিয়ে পড়তুম— ওদিকে বোলপুর থেকে কাজের ডাক পড়চে। ইতি মঙ্গলবার

ত্বদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

৮ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বিলাতী গল্প বাংলায় আর বাকি নাই দেখিতেছি। Tourgenevএর Triumphant Love নামক একটি সুবিখ্যাত গল্প আছে— সেটিও আমি দিনুকে দিয়া তর্জ্জমা করাইয়াছিলাম—হয়ত বা তাহাও পূর্ব্বে কোথাও বাহির হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু এত খবর রাখাও ত কম কথা নয়। যেখানে যত গল্প বাহির হইতেছে চুম্বকসহ তাহার কি একটা রেজিষ্টার তোমরা রাখিয়া থাক? অনেক "মৌলিক" নামধারী গল্পও ত তর্জ্জমা।

কবিকে আমার কবিজীবনীটা পড়িতে দিয়ো। সে ত সম্পাদক শ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল— অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। সত্যেন্দ্রের শরীর ত ভাল আছে? আজও বুঝি সংসারে তাহার পথপ্রদর্শক জুটিল না? ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনুর "প্রেমের জয়জয়ন্তী"টা কি পাঠাইব? তাহার মূলটি য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটি প্রথমশ্রেণীর গল্প বলিয়া খ্যাত।

৪৩

১৬ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

নাটকখানা লিখ্‌তে সুরু করেছি। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘের ঘটা, চারিদিকে ঘন সবুজ ক্ষেত, আমার তিনতলার ঘরের জানালা দরজা সমস্ত খোলা— কলম এগতে পারচে না —একেবারে রাজকীয় আলস্যে ভরপূর হয়ে বসে আছি। তবু একটা অঙ্ক শেষ হয়েছে।— গীতাপাঠের শ্রাবণ কিস্তির পাণ্ডুলিপি অজিতের কাছে আছে— তাকে লিখে দিয়ো যেন রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। ছাপবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়ে দিয়ো। আমার লেখা পরে দেব এখন। ইতি আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

২৯ জুন ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বোলপুর থেকে বিষম তাড়া আস্‌চে। আর স্থির থাকতে দিলে [না।] শুক্রবার চাঁদপুর মেলে কলকাতায় পৌঁছব। শনিবার সকালে দেখা হবে কি? সত্যেন্দ্রকে খবর দিয়ো। নাটকটা শেষ করেছি। যদি ইচ্ছা কর শনিবার মধ্যাহ্ন বা

অপরাহ্লে ওটা শোনাবার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রবিবারে আমাকে বোলপুরে দৌড়তেই হবে। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩১৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫
১৪ জুলাই ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

শেষকালে নাটকটা প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজে পত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি চল্‌বে এই আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা। তোমাদের সম্বর্দ্ধনাটা শেষ হয়ে গেলে সেটা নিঃশেষে হজম করবার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণে গাল খেয়ে নেবার সুযোগ হবে। সমস্ত জিনিষটা আর একবার মেজে ঘসে বাড়িয়ে কমিয়ে এবারে বেশ আমার মনের মত করে নিয়েছি।

জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি— ওটাও সাফসোফ করে দিচ্চি —খুব মনোযোগ করে দেখলুম এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মত হয়েছে— নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২/৩ দিনের মধ্যে ওর ১ম কিস্তিটা পাঠিয়ে দেব।

তোমাকে নিয়ে ভারি একটা মুস্কিলে পড়েছি। তোমার কাছ থেকে পুরাতন সঙ্কলন চাইতে গেলেই তুমি মনে কর আমি রাগ করেছি— সেই জন্যে তুমিও দিতে পার না আমিও চাইতে

পারিনে। কিন্তু আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলচি কিছুমাত্র রাগ করি নি। হেমলতাকে দিয়ে আমি সুফী ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড বড় বই তর্জ্জমা করাচ্চি। তারই প্রথম অংশ তোমাদের হাতে পড়েছে। কিন্তু এরকম ধারাবাহিক জিনিষ প্রবাসীতে বেরবার যোগ্য নয় অথচ এই রকম জিনিষই তত্ত্ববোধিনীতে বের করা উচিত। এই সুযুক্তিটি তোমার সম্পাদকীয় মস্তিষ্কে খুব করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে সেই লেখাটি অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে যদি ষড়রিপুর কোনোটা থাকে তবে সেটা ক্রোধ নয়, সেটা লোভ। লেখা ত তোমরা যথেষ্ট পাচ্ছ—এমন কি, তত্ত্ববোধিনীর মুখের গ্রাসে অংশ বসাচ্চ তবু সামান্য ছুটকো লেখাতেও তোমাদের লোলুপতা ঘুচল না! নিবৃত্তিস্তু মহাফলা— এই কথা স্মরণ করে, প্রবৃত্তি দমন করে সেই ক্ষুদ্র তর্জ্জমাটি যথাস্থানে ফেরৎ পাঠাবে। ইতি শুক্রবার

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

২৬ জুলাই ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

“রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি” প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনীর। অন্নদা ওটা নিতান্ত বোঝবার ভুলে তোমার হাতে দিয়ে

এসেছে। ওটা জ্ঞানকে সমর্পণ কোরো— পরের ধনে লোভ কোরোনা। অচলায়তনের কাপিটা দখল করবার জন্যে নেপালবাবু সেটা নকল করিয়ে নিচ্চেন— তোমরা সেই নকলটি পাবে— আসলটি পাচ্চ না। জীবনস্মৃতির প্রুফ পাঠিয়েছ লিখেছ কিন্তু এখনো পাই নি। তোমাদের প্রবাসীতে লেখা দিয়ে আমাকে অনেক দুঃখ পরিপাক করতে হচ্চে— ফল হবে এই যে আমাকে নিজের প্রতি অত্যাচারপূর্ব্বক আরো কিছু লিখ্‌তে হবে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭
সেপ্টেম্বর ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

প্রবাসীর জন্য রেজেষ্ট্রি ডাকে আজ আমার "বাংলা নির্দ্দেশক" সন্তোষের "অশ্বের মনস্তত্ত্ব" এবং শরৎবাবুর একটা সংকলন পাঠাই। অশ্বের মনস্তত্ত্বটি বেশ ভাল লেখা হয়েছে, একবার ভেবেছিলুম তত্ত্ববোধিনীতেই নেব— তার পরে লোভ সম্বরণ করা গেল।

সোনার তরীর ইংরেজি তর্জ্জমা অজিত করেছিল— বিলাতে তার এক ইংরেজ মহিলা বন্ধুকে দিয়ে সংশোধিত করিয়েছিল তার পরে বিখ্যাত কবি ও ঋষি Edward Carpenterকে

দেখিয়ে সেই মহিলা ওটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। Carpenter অজিতের কতকগুলি ইংরেজি অনুবাদের খুব প্রশংসা করেছেন। আমার ত বোধ হয় তার মধ্যে কতকগুলি এর চেয়েও অনেক ভাল—সেইগুলির দিকে আমার ঝোঁক ছিল কিন্তু অজিতের ঝোঁক এইটের উপরেই তাই পাঠিয়ে দিলুম। দুজন ইংরেজের হাতের মধ্যে দিয়ে ফিল্‌টার হয়ে নিশ্চয়ই এর বাঙালিত্ব দোষ ঘুচে গিয়েছে, রামানন্দবাবুকে দেখিয়ো—যদি পছন্দ করেন Modern Reviewতে ছাপ্‌তে পারেন।

তোমরা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে আমার ছবি বের করে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছ। এই রকম বারবার নিজের ছবি কাগজে দেখার মত শাস্তি নেই। ঐ পাতগুলোর উপর আমি চোখ ফেল্‌তে পারি নে। দোহাই তোমাদের—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আর আমার ছবি বের কোরো না।

ভারতীর জন্যে গল্প লিখ্‌তে বসেছি কিন্তু কাজের ভিড় এবং শরীরের অপটুতার জন্যে এগতে পারচিনে। মুস্কিলে পড়েছি, পাতা ষোলো লিখেছি এখনো অন্তত ১২/১৩ পাতা বাকি।

তোমাদের খবর সব ভাল ত? রামানন্দবাবুকে বোলো ২০০ টাকা হস্তগত হয়েছে।

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার "সওগাদ" পেয়ে খুসি হলুম। অত্যন্ত কাজের ভিড়ে পড়ে এখন এটি ভোগ করবার সময় পাওয়া চাওয়া যাবে না। তুমি শারদোৎসবে এসো— তখন সব আলাপ আলোচনা করা যাবে। শরীরটা একান্ত ক্লান্ত হয়ে আছে। আজই তোমার কাপি (জীবনস্মৃতি) পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

৬ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

প্রিয়বরেষু

যেখানে ডাঙ্গার প্রান্তে জলের প্রান্তে আকাশের প্রান্তে পৃথিবীর প্রান্তে আসিয়া কোলাকুলি করিতেছে সেই নির্জ্জনে ফুলের মধ্যেকার ভ্রমরটির মত একেবারে চুপ করিয়া পড়িয়া আছি।

"নিবেদিতা" প্রবন্ধটা বোধ করি পাইয়াছ। তাহার প্রুফ চাই কিছু কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে কি তোমাদের অসুবিধা হইবে? এখান হইতে প্রুফ যাতায়াতে

ঠিক চারদিন লাগিবে। যদি নিতান্ত অসম্ভব হয় তবে যেমন আছে তেমনিই থাক্।

জগদীশের নিকট হইতে কাবুলিওয়ালার ইংরেজিটা সংগ্রহ করা হইয়াছে কি? তিনি সেটা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩১৮

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০
১৩ জুন ১৯১২

ওঁ

চারু

আজ মার্সেলসে পদার্পণ করব। যাত্রাটা নির্ব্বিঘ্নে কেটেছে। এত দিন শান্তির পরে কাল সমুদ্রে ঝড় দেখা দিয়েছিল তাতে ভূমধ্যসাগর উতলা হয়ে উঠেছিল কিন্তু আমার অন্তরাত্মাকে ক্ষুব্ধ করতে পারে নি। ইতিপূর্ব্বেই প্রবাসীর জন্যে দুটো লেখা বোলপুরে পাঠিয়েছি— পেয়েছ বোধ করি। কাগজগুলো কুকের কেয়ারে আমার নামে পাঠিয়ে দিয়ো। দেশের খবর কি? ৩১ জ্যৈষ্ঠ

ত্বদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

* ৭ অগস্ট ১৯১২

TELEGRAM
"WHITMORE"

Butterton Vicarage,
New Castle,
Staffs.

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। দেশ থেকে যাত্রা করবার সময় মনে করেছিলুম কিছুকালের জন্যে মানুষের ঘূর্ণির মধ্যে থেকে পরিত্রাণ পাব। এ দেশে মানুষের অভাব আছে এমন কথা আমার মনে ছিলনা— কিন্তু অপরিচিত জায়গার সুবিধা এই যে ভিড়ের মাঝখানেই নিরালা পাওয়া যায় তাই ভেবেছিলুম অপরিচয়ের তটভূমিতে একলা দাঁড়িয়ে এখানকার জনসমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখ্‌তে পাব। কিন্তু বুঝতে পারা গেল আমার কুষ্ঠিতে ওটা লেখে না। লণ্ডনের পাকের মধ্যে খুব এক চোট ঘুর খেয়ে কয়েকদিন হল পাড়াগাঁয়ে একটি পাদ্রির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমার পক্ষে এও ঠিক উল্টো ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ ভিড়ের মধ্যে থাক্‌তে গেলে অপরিচিত হওয়ার সুবিধা আছে, ফাঁকা পাওয়া যায়— কিন্তু দুই একজনের সঙ্গে বাস করতে গেলে রীতিমত বন্ধুত্ব না থাক্‌লে মনের ভিতরটাতে বিশ্রাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা লোক খুব ভাল সন্দেহ নেই।

মনে আশা ছিল ভ্রমণের বিবরণ বিস্তারিত করে লিখ্‌তে পারব। কিন্তু সরস্বতীর বরাবর পদ্মবনে থাকার অভ্যাস তিনি ভিড়ের দিকে ভিড়বেন না। সময় নেই। এমন কি,

চিঠি লেখাই প্রায় অসম্ভব হয়েছে। তবে, তোমরা যদি এখানে থাক্‌তে খুসি হতে। তোমাদের কবি এখানকার কবিসভায় আসন পেয়েছে এবং সে আসনটি নিতান্ত ছোট নয়। আদর জিনিষটা উপাদেয় সে কথা স্বীকার করতেই হবে কিন্তু আমার সম্মানে আমার দেশের অগৌরব কিছু পরিমাণে দূর হবে এইটে আনন্দের বিষয়—এবং সব চেয়ে আমার আনন্দ হয় এই কথা স্মরণ করে যে আমি যা রচনা করেছি, এখানকার গুণীরা বল্‌চেন এঁদের পক্ষে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এটা গর্ব্বের কথা নয় আনন্দের কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল সমস্ত বিরোধের ভিতর দিয়ে যখন দেখ্‌তে পাই তখন মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরম প্রেমকে কিছু পরিমাণে সত্যরূপে অনুভব করবার সুযোগ পাওয়া যায়।

আষাঢ় মাসের প্রবাসী ও জুন মাসের Modern Review আমাকে পাঠালে না কেন? লণ্ডন থেকে দূরে থাকাতে এবারকার মেল এখনো হস্তগত হয় নি—হয় ত আজ পাওয়া যেতে পারে—দেখব তার সঙ্গে এসেছে কি না। বিদেশে দেশের বাণীর জন্যে মন উৎসুক হয়ে থাকে অতএব তোমাদের কাগজ-পত্র পাঠাতে অবহেলা কোরো না। বলা বাহুল্য Thomas Cook & Son Ludgate Circus London ঠিকানায় আমার চিঠি পাঠানোই ভাল। সত্যেন্দ্রকে আমার অন্তরের স্নেহ জানিয়ো—সে আজ এখানে থাক্‌লে কত আনন্দ হত।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

৫ সেপ্টেম্বর ১৯১২

ওঁ

আমার ঠিকানা—
21 Cromwell Road
South Kensington
London
S. W.

প্রিয়বরেষু

চারু এখানে পদার্পণ করে অবধি আষাঢ় মাসের প্রবাসী পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে আসচি। কলকাতায় যাদের যাদের চিনি সকলেই[সকলকেই] লিখেছি— তোমাকেও জানিয়েছি— এখানে সুকুমারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়বার জন্যেও চেষ্টা করেছি— কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারি নি। আবার তোমাকে লিখ্‌চি; এবারও যদি ফল না হয় তবে এই আশাটা একেবারে পরিহার করে নিশ্চিন্ত হব— আশার অবধি নেই, শাস্ত্রে এই কথা বলে বলেই এতদিন চেষ্টা করতে ছাড়ি নি কিন্তু অন্তত আষাঢ় মাসের প্রবাসী সম্বন্ধে আশার একটা সীমান্ত আমার সম্মুখে আসন্ন হয়েছে।

আমার সম্বন্ধে নানা খবর হয় ত নানা দিক থেকে পেয়েছ অতএব আমার কাছ থেকে সে সম্বন্ধে বেশি কিছু প্রত্যাশা কোরোনা। কেবল একটা খবর দেওয়া আবশ্যক হয়েছে বলে দিচ্চি। Modern Reviewতে যে কটা গল্পের তর্জ্জমা বেরিয়েছে পড়ে রোটেন্‌ষ্টাইন খুব বিস্ময় প্রকাশ করচেন।

তিনি এগুলো মেজে ঘষে সংশোধন করে ছাপতে চান। লেখকরা যদি সম্মতি দেন তাহলে এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। রামানন্দবাবু হয় ত সম্মতি আনিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমার খুব ভাল গল্পগুলো যে তর্জ্জমা হয়েছে এমন আমার মনে হয় না।

আমি এ দেশে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে আমেরিকায় যাত্রা করব। ইতিমধ্যে এখানকার কাজ সমস্ত শেষ করে যেতে হবে।

এখানে বেশি যে লিখ্‌তে পারি তা নয়— সময়ও বেশি পাই নে, শরীরও যে খুব ভাল তা বল্‌তে পারি নে, যা কিছু লিখি সমস্ত শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানকার ভাণ্ডারীর কাছ থেকে তোমাদের প্রবাসীর জন্যে যদি কিছু মাঝে মাঝে আদায় করে নিতে পার চেষ্টা করে দেখো। তত্ত্ববোধিনীর পাত্র পূর্ণ হয়ে যা উপচে পড়বে তা বিতরণ করতে বোধ হয় অজিত কৃপণতা করবে না।

এবার থেকে কুকেদের কেয়ারে আমাকে পত্র ও পত্রিকা না দিয়ে ২১ নম্বর ক্রমোয়েল রোডের ঠিকানায় দিয়ো— তাহলে একটু শীঘ্র পাওয়া যায়। রামানন্দবাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ো। এবং শান্তা সীতাকে বোলো এখানকার দৈত্যপুরীর সদর রাস্তার ধারে বসে তাদের সেই শীর্ণ নিভৃত গলিটির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ইতি ২০ ভাদ্র ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— কবির খবর এসে অবধি পাই নি। সত্যেন্দ্র কেমন

আছে, কি করচে জানিয়ো। সত্যেন্দ্র যদি কোনোক্রমে আমার সঙ্গে আসৃতে পারত তাহলে তার পক্ষে কতদিক থেকে যে কত ভালই হত এই কথাই আমার বারবার মনে হয়।

তোমার সেই গল্পটার কি গতি হল?

৬ অক্টোবর ১৯১২

ওঁ

আমার ঠিকানা
21 Cromwell Road
South Kensington
London, S. W.
[২ আশ্বিন ১৩১৯]

প্রিয়বরেষু

বারম্বার আমার সম্মান সম্বর্দ্ধনার কথা কাগজে পড়তে পড়তে আমি যে কতটা সঙ্কোচ অনুভব করচি সে কথা বল্‌তে পারি নে। এখানকার লোকে আমার রচনার আদর করচেন সে ঘটনায় আমি পুলকিত হই নি এমন কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু তোমরা যখন সেই সমস্ত খবর জোড়াতাড়া দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে থাকো তখন আমি বড় লজ্জা পাই। বিশেষত এবারকার প্রবাসীতে দেখলুম Miss Radford এবং Miss Sinclairএর চিঠি দুটো তর্জ্জমা করে দিয়েছ— আমি যে কি ভয়ে ভয়ে আছি পাছে তোমরা ওগুলো Modern Reviewতে তুলে দাও তা আমি বল্‌তে পারি নে। ওগুলো

প্রাইভেট পত্র—ছাপা হলে হয় ত তাঁদের পক্ষে বিশেষ সঙ্কোচের কারণ হবে এবং ওটা ঠিক সঙ্গত হবে না। অবশ্য কি করেচ জানি নে, এবং যদি করে থাক নিষেধ করে প্রত্যাখ্যান করবারও সময় নেই। কিন্তু দোহাই আমার—এখানে প্রাইভেটভাবে কে কি বল্‌চেন তা নিয়ে প্রকাশ্যপত্রে আলোচনা কোরো না।

বহুকাল পরে কাল ১লা আশ্বিনে ১লা আষাঢ়ের প্রবাসী পেলুম। অন্যান্য মাসের প্রবাসী ঠিক সময়েই পেয়েছি কেবল ঐ আষাঢ়টাতেই আট্‌কে গিয়েছিল।

য়েট্‌স্‌ যে বইটা Edit করচেন সেটা ভূমিকা সমেত ছাপাখানায় গেছে—বোধ হচ্চে অক্টোবর মাসের মধ্যেই বের হতে পারবে। হাতে আরো অনেকগুলো জমেছে। ছোট গল্প আরো গোটাকতক পেলে মন্দ হত না। সুকুমার কিছু তর্জ্জমা করতে সুরু করেছে। সুকুমারের তর্জ্জমা মন্দ হয় না। গোটা তিনেক নাটক করে ফেলেছি, কবিতাও কম হয় নি। শেষ বয়সে যে আমাকে ইংরেজি ভাষার সাধনা করতে হবে সে কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। ক্ষণিকায় লিখেছিলুম পরজন্মে আমি হয় ত আমার লেখার সমালোচক হব—ইহজন্মে তার একটা ভূমিকা হল, নিজের লেখার নিজে অনুবাদক হওয়াও একটা উৎকট ব্যাপার—ওতেও নিজের রচনাকে কম পীড়ন করতে হয় না—একেবারে তার সর্ব্বাঙ্গে কালশিটে পাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রামানন্দবাবুকে বোলো Modern Reviewর জন্য

রোটেনস্টাইনকে লিখ্‌তে একটু যেন পীড়াপীড়ি করে ধরেন। Modern Reviewর প্রতি তাঁর খুব একটা শ্রদ্ধা আছে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে তিনি যদি একটা সমালোচনা লেখেন এবং আমাদের আধুনিক শিল্পীদের প্রতি তিনি যদি কিছু সদুপদেশ দেন তা হলে সেটা নিশ্চয়ই উপাদেয় হবে। জ্যোতিদাদার ছবি তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছে— তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে এখানকার কোনো একটা কাগজে তিনি লিখ্‌বেন মনে করেচেন।

জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এঁরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করচেন। ও বইটা কি বিক্রি হবার আশা আছে? বিপরীত রকম খরচ করেছে।

জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রের একটা বড়সড় ভদ্র রকম সমালোচনা কোরো— সরাসরি বিচার করে দু লাইনে সেরে দিয়ো না।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

জানুয়ারি ১৯১৩

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois
U. S. A,

প্রিয়বরেষু

চারু, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেলুম। কিছুদিন থেকে প্রবাসীতে আমার লেখা পৌঁচচ্ছে না কেন জিজ্ঞাসা করেছ। তার একটা কারণ বল্লেই বাকিগুলো বলবার আর দরকার হবে না—কিছুকাল থেকে বাংলা একেবারেই লিখি নি। কোনো কালে যে এ দেশে এসে ইংরেজিতে যে কোনোরকম লেখাপড়া করব এ কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। সেইজন্যেই বিদেশযাত্রার আরম্ভের মুখে খুব কষে কোমর বেঁধে দেদার বাংলা লিখ্‌তে সুরু করেছিলুম, ভেবেছিলুম এইরকম অনর্গল চল্‌বে। তোমরাও সেইভাবে পাত পেড়ে বসেছ। ইতিমধ্যে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা ভারতী যখন তলব দিলেন তখন ক্রমশ বুঝতে পারলুম এখানে আমাকে এখানকারই কাজ করতে হবে। সমুদ্রের ওপারের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে এসেছে। এখানে ত চিরদিন থাক্‌ব না, এই ক'দিনের মধ্যে এখানকার কাজ যতটা পারি শেষ করে দিয়ে যেতে চাই। অতএব এখন তোমরা ডাক দিলে সাড়া পাবে না।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি ম্যাকমিলানরা ছাপবার ব্যবস্থা করচে।

ওরাই আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে। সুবিধা এই যে, ইংলণ্ডে আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ওদের কারবার আছে। বোধ হয় আর্থিক কিছু সুবিধা হতেও পারে। এবারকার বইগুলো ত সব বিকিয়ে গেছে— লোকে খুব উৎসুক হয়ে উঠেছে— সকলের ভালও লেগেছে— অতএব এইবার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে আমার বিদ্যালয়ের অকাল ঘুচতেও পারে। এ দেশে বোধ হয় লক্ষ্মী সরস্বতীর সতীন নন কেননা, এ দেশে বহুবিবাহ আইনবিরুদ্ধ— এই একটা মস্ত ভরসার কথা দেখা যাচ্চে।

এদিকে তর্জ্জমা জমে উঠ্‌চে। একবার লজ্জার বাঁধ ভাঙলে তখন-ব্যাকরণের রক্তচক্ষুকে আর কে ভয় করে! ছেলেবেলায় যে রকম করে দুই পায়ের চটি সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যেতুম, ঠিক তেমনিভাবেই ইংরেজি ভাষার ষত্ব ণত্ব ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলেছি— মোদ্দা, চলা বন্ধ করি নি। আজ এই খানিকক্ষণ হল শারদোৎসব তর্জ্জমা করে সেরেছি —কাল ওটা আরম্ভ করেছিলুম।

তুমি ত জানই এ দেশের লোকেরা বক্তৃতার কাঙাল। যতই চেষ্টা করি না কেন, বক্তৃতা না করে পার পাবার জো নেই। সে জন্যে কিছু কিছু লিখ্‌তে হচ্চে। এ কাজটা আমার কাছে তেমন স্বচ্ছ নয়, অথচ এটার প্রয়োজন আছে। এদিকে ওদিকে নিমন্ত্রণ জুটচে— যতটা পারি কাটাবার চেষ্টায় থাকি— কিন্তু বাদসাদ দিয়েও বাকি থাকে— সব নিমন্ত্রণ ত বিনা বক্তৃতায় সারবার জো নেই তাই প্রস্তুত হতে হচ্চে— সামনে

যদ্দূর দৃষ্টি যাচ্ছে কোথাও অবকাশের টিকি মাত্র দেখতে পাচ্চি নে।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর জন্যে আমি সত্যই দুঃখ বোধ করি। আমি এ দেশে খ্যাতিলাভ করব কল্পনাও করি নি, সুতরাং সেজন্যে অগ্রসর হয়ে আসি নি—দৈবক্রমে জুটে গিয়েছে। এই খ্যাতির সর্ব্বপ্রধান সুখ এই যে এতে করে আমার দেশের লোকের মনে আনন্দ হবে—এ আমার একলার জিনিষ নয়। কিন্তু এক জায়গায় দুঃখ উৎপন্ন হচ্চে সে আমারও দুঃখ। দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন এ দেশে যশ উপার্জ্জন করবেন তখন আমি তাতে অন্তরের সঙ্গে সুখী হব এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি। আমাদের দেশের যে কেউ যেটুকু সফলতা লাভ করতে পারচেন সে যে আমাদের প্রত্যেকেরই। দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতিভা কি তাঁর একলার সামগ্রী? তিনি যেখানে মহৎ সেখানে সে মহত্ত্ব আমাদের সকলেরই, কিন্তু যেখানে তিনি ক্ষুদ্র, সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র। দস্যু রত্নাকরের পুত্রপরিবারেরা তার ঐশ্বর্য্যের ভাগ নিয়েছিল কিন্তু তার পাপের ভাগ নিতে ত পারে নি। চাঁদের জ্যোৎস্না সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু তা'র কলঙ্ক তা'র নিজের বুকেই দাগা থাকে। আমার কবিতার মধ্যে অযোগ্য জিনিষ ঢের আছে—আমার বাঁশির সকল রন্ধ্রেই যে উঁচু সুর বেজেছে তা নয়—আমার প্রকাশের স্রোতের মধ্যে পাপের মূর্ত্তিও যে প্রকাশ পায় নি এ কথা কখনই সত্য নয়—কিন্তু নদীর জলে কাদা মিশল থাকে বলে সেইটেই ত তার মুখ্য জিনিষ নয়—সেটা সত্ত্বেও যদি তার

জল স্নানে পানে কাজে লাগে তবে পৃথিবীসুদ্ধ লোক ত তাকে ক্ষমা করে—সেই ক্ষমা যদি দ্বিজেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে একেবারে না পাই তবে আমার কবিত্বের গ্লানির চেয়ে তাঁরি চিত্তের গ্লানির জন্যে আমি বেশি-বেদনা পাব। এই গ্লানি কবে এবং কেমন করে দূর হবে জানি নে কিন্তু প্রার্থনা করি এই কালিমা সম্পূর্ণ কাটিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভাকে পবিত্র করুন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীর জন্যে একটা কবিতা এই সঙ্গে পাঠাই। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা আমার যতগুলি কবিতা ছাপিয়েছ কোনোটাই নির্ভুল হয় নি। বোধ হয় পাণ্ডুলিপি থেকে কেউ নকল করে দিয়েছিল এবং নকলে ভুল থেকে গিয়েছিল। কতকগুলো ভুল গুরুতর ছিল—কবিতার অর্থ বোঝা কেউ দরকার মনে করে না বলেই সেগুলো ধরা পড়ে নি। যাই হোক, কবিতার উপর এরকম অল্পমাত্র নিষ্ঠুরতাও ব্যথাজনক।

৫৫

১৭ মে ১৯১৩

C/o Messers Thomas Cook & Son,
Ludgate Circus
London

প্রিয়বরেষু

চারু আসল কথা আমার আদবে আর লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না। কলমের সঙ্গে মনটাকে জুতে আজ পর্য্যন্ত তাকে হয়রান করে ছুটিয়েছি, মারামারি ঠেলাঠেলি রক্তপাতও কম

হয় নি—এখন মনে হয় এই লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে আর প্রবেশ করা নয়। প্রবাসীর সঙ্গে আমার লেখনীর একটা যোগ সাধন হয়ে গেছে এবং তার প্রতি আমার অন্তরের স্নেহ আছে—সেই মমতাবন্ধনে হয় ত আবার কোন্ দিন জড়িয়ে পড়ব কিন্তু মুক্তি লাভের জন্যেই চেষ্টা করতে হবে। আমার হাটের বেসাতী হয়ে গেছে বোধ হচ্চে যেন—এবারে ভিড় ঠেলাঠেলি এবং লাভ লোকসানের হিসাব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে ঘরের মুখে রওনা হতে হবে—নইলে রাত্রি এসে পড়বে—আর পথ দেখ্‌তে পাব না।

তোমাদের সামনে একটা লড়াইয়ের দিন এসেছে দেখ্‌তে পাচ্চি—কিন্তু তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহ সত্ত্বেও আমাকে বোধ হয় হার মানতে হবে। তোমরা যখন দস্যুর আক্রমণে পড়েছ তখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি ভগবান অপহরণ করচেন—জয়ী হবার গৌরব আর আমার সইবে না, এখন পরাভবের তলায় নেমে মাটির উপরে আসন নেবার সময় এসেছে। হাতের কাজ যা ছিল তা একরকম চুকিয়েছি—এবার পায়ের কাজ, এখন বিদায়ের রাস্তায় চল্‌তে হবে, ধুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। অতএব বোঝা হাল্‌কা করে দিয়ে যাত্রা করা যাক্—এখন আর পিছু ডেকো না।

এখান থেকে রওনা হতে বোধ হয় আর খুব বেশি দেরি হবে না। ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

১৭ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

আমার সম্মান লাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

* ৫ মার্চ ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি— কিন্তু এগুলো গান সে কথা মনে রেখো— সুর না থাকলে এ যেন নেবানো প্রদীপের মত —এ ত ছাপতে দিতে ইচ্ছা করে না।

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।
বুকের পরে দোলে রে তার
পরাণ-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,

গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা।
আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা অতলা॥

এর মধ্যে ত কোনো আইডিয়া নেই এর যে বাসন্তী চঞ্চলতা আছে সেটি গানের সুরেই ব্যক্ত হচ্চে— শাদা কথায় এর কোনো নেশা নেই— এই জন্যে কাগজে ছাপবার যোগ্য বলে একে মনে করি নে। বরঞ্চ আর একটা দিচ্চি সেটা যদিচ গান তবু চল্‌তেও পারে।

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলা শেষের তান
পথে চলি, পথিক শুধায়
“কি নিলি তোর দান ?”
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কি বা আছে,
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই ক’খানি গান।

ঘরে আমার রাখ্‌তে যে হয়
বহু লোকের মন ;—
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি,
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে
করব মূল্যবান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেটা বক্তৃতা করেছিলুম সেটা তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়েছি। লিখ্‌তে গিয়ে দেখলুম মনের মত হল না। তবু দ্বিজেন্দ্রর কাছে কপিটা কিম্বা ওর প্রুফ চেয়ে নিয়ে দেখো যদি চলনসই মনে কর তবে প্রবাসীতে নিতে পার। কিন্তু ছাপবার কি সময় আছে? ইতি বৃহস্পতিবার

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮

* ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তুমি ত জানই, প্রবাসীকে সাহায্য করতে পারলে আমি কত খুসি হই। সবুজপত্র থেকে তোমরা যত খুসি

তোলো আমার আপত্তি নেই। মণিলালের মনের ভাবটা এই যে গল্প যদি তোমরা একেবারে গোটা তুলে নাও তাহলে সবুজপত্রের বিশেষ ক্ষতি হবে, কারণ, সবুজপত্রের মত কাগজ সাধারণের কাছে মুখরোচক হতে পারেনা—ঐ একটুখানি গল্পের প্রলোভন থাকাতেই ওর উপর লোকের দৃষ্টি পড়ে। এ কথা আমি নিশ্চিত জানি প্রবাসীতে কোনো লেখা বের হলে যত লোক পড়ে সবুজপত্রে তার সিকিও পড়ে না—সে জন্যে আক্ষেপ করে আর কি করব? ও কাগজের সম্পাদক এবং প্রকাশকের বিনা সম্মতিতে তোমাদের ত কিছু করবার জো নেই। আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমরা যে প্রস্তাব করেছ সেটা যথাস্থানে উত্থাপন কোরো।

আমি ইতিমধ্যে প্রায় গোটা-কুড়িক গান লিখেছি সেইগুলি ক্রমে ক্রমে তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি—সেগুলোর প্রতি আর কারো কোনো দাবীদাওয়া নেই। তার মধ্যে একটা ত তুমি হস্তগত করেইচ।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

* ২২ অক্টোবর ১৯১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখনো প্রয়াগে। কাল দিল্লি যাব। গীতালির প্রুফ

দেখা হয়ে গেছে। অনেক বদল করেছি। কিছু বাদ পড়েছে —ততোধিক বেড়ে গেছে। সম্প্রতি কবিত্বের নেশা খুব জমেছিল— দিল্লি যাত্রায় সেটা ছুটতে পারে।

তুমি যে ইংরিজি তর্জ্জমাগুলো কপি করে নিয়ে গেছ সেগুলো খাঁ করে ছাপিয়ো না। বিলেতে ওগুলো গেছে। তাছাড়া আমেরিকান দস্যুদের ভয় করি। অসিতের ছবিগুলোর সঙ্গে যেগুলো ছাপাবে আমি নিজে তর্জ্জমা করে দেবে [দেব]।

এতদিনে সবুজপত্রের জন্যে গল্প লিখতে সুরু করেছি। কবে শেষ হবে জানি নে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

* ৮ নভেম্বর ১৯১৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কই, নৌকাডুবি কই? কলিকাতায় আজ রওনা হব অতএব যদি জোড়াসাঁকোয় আসতে পার তবে মোকাবিলা হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিবার

৬১

জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার স্রোতের ফুল-এর সকল পাপড়ি ফোটে নি। কাঁচায় পাকায় মিশল। যে অংশটি ভাল সে খুবই ভাল—কিন্তু যা ভাল নয় তা ভাল যে নয়ই তাতে সন্দেহ নেই—এর কি উপায় করা যায়! অন্তঃপুরের atmosphere খুব চমৎকার জমেছে কিন্তু বাইরের দিকটা খাপছাড়া আছে। নবকিশোর চল্‌বে না। ও রক্তমাংসের মানুষ হয় নি। তোমার গুরুকে তুমি অতিমাত্রায় লঘু করেছ। আমি হলে সমস্ত struggleএর মধ্য দিয়ে ওর মাহাত্ম্য দেখাতে চেষ্টা করতুম। মানুষকে নিতান্ত মাটি করলেই বোঝা যায় তাকে সত্য করা হয় নি। নবকিশোরের বাপকেও তুমি বেশ plausible করতে পার নি। উচিত ছিল ওকে আমাদের ভূপেনবাবু বা বিধুশেখর শাস্ত্রীর মত করা। অর্থাৎ বাইরে আচারের আবরণটা পাকা কিন্তু যখন হৃদয়ের পরিচয় আবশ্যক হয় তখন inconsistently সেটা টেঁকে না। নবকিশোরের বক্তৃতা তার চরিত্রকে একেবারে সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাকে অত্যন্তই স্বল্পভাষী করা আবশ্যক—কেজো লোকদের যেমন হওয়া উচিত। মালতীর চরিত্রও বেশ সত্য হয় নি। যদি তোমাকে কাছে পেতুম তাহলে আমি একবার অন্যরাস্তা দিয়ে তোমার কলমটাকে চালিয়ে দিতুম। আমার ত মনে হয় এটা

rewrite করা নিতান্ত দরকার। জিনিষটার মধ্যে যদি কোনো পদার্থ না থাকৃত তাহলে কোনো কথাই কইতুম না— কিন্তু এটার মধ্যে এতটা ভাল আছে যে এ জিনিষ কিছুতে নষ্ট হতে দিতে পারি নে। মুস্কিল এই যে, তোমার বইয়ের খুড়ি ও গিন্নি চোখের বালির অন্নপূর্ণা ও রাজলক্ষ্মী, বিপিন ও নবকিশোর মহেন্দ্র ও বিহারীর ছাঁচে গড়া হয়েছে— এমন কি মালতীতে বিনোদিনীর আদল খুব আসৃচে। এটা তোমার একেবারেই কাটিয়ে দিতে হবে। আমার শরীরটা ভাল থাকলে আমি স্থির থাকৃতে পারতুম না নিজে লেগে যেতুম— কিন্তু সে অসম্ভব। Next best হচ্চে তোমাকে নিকটে বসিয়ে লেখানো— সেও বোধহয় অসম্ভব হবে। অতএব দেখা হলে আরো দু চারবার তোমার সঙ্গে কথা কয়ে যতটুকু সুবিধা হতে পারে সে ছাড়া অন্য উপায় দেখি নে।

আমার কিন্তু মাথাটা ফুটো হাঁড়ির মত একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে— ছুটি পাওয়া গেল।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

জানুয়ারি ১৯১৫

চারু, "শান্তিনিকেতন" গানটি তর্জ্জমা করেছি যদি রামানন্দবাবু পছন্দ করেন তবে ব্যবহার করতে পারেন। এটা যে এখানকার স্কুলের ছেলেদের গাবার গান সেটা বোধ

হয় নোটে বলে দেওয়া আবশ্যক হতে পারে। কলকাতা গেলে দেখা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩

* ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, দুটো নূতন কবিতা পাঠিয়েছি বোধ করি পেয়েছি [পেয়েছ]। আমি যে ভাবে ছেদ প্রভৃতি দিয়েছি সেই ভাবেই ছাপিয়ো। চল্‌তি ভাষায় লেখা ভাঙা ছন্দ পড়তে পদস্খলন হয় না ত? লেখক স্বয়ং ত দিব্য আরামে পড়তে পারেন— কিন্তু পাঠকের উপরে ভরসা হয় না।

ভবসিন্ধুবাবু পিতৃদেবের যে জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে একটি গল্প আছে যে আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোন্ ঘর আমার ইচ্ছামত ভাঙচুর করাতে পিতৃদেব প্রথমে আমাকে ভর্ৎসনা করেন তার পরে আমার অকীর্ত্তি সংশোধন করে দেন, তার পরে আমাকে বাস করবার জন্যে নূতন বাড়ি দেন। যখন সমালোচনা করবে তখন পাঠকদের বোলো আমার নূতন বাড়ির ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তার প্রধান কারণ আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙি নি, যা কিছু ক্ষণভঙ্গুর তা তিনি নিজেই একরকম ভেঙে শেষ করে গেছেন, উত্তরবংশীয়ের জন্যে অপেক্ষা করেন নি।

অতএব ঐ গল্পটি সংশোধন করা কর্ত্তব্য— তা যদি করা হয় তাহলে শেষাংশটিই বাকি থাকে অর্থাৎ তিনি আমাকে বাসের জন্যে একটা নূতন বাড়ি দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে অনেক পিতাই এমন কাজ করে থাকেন অতএব এই ঘটনা আমার পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হোক মহর্ষির জীবনীর পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইতি ২৩ মাঘ ১৩২১

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ পিতামহদের কীর্ত্তির প্রতি কালাপাহাড়ি করা যে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ এই সংবাদটি আমার পাঠকবন্ধুরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করবেন অতএব এই বেলা এই মিথ্যাটাকে সরিয়ে ফেলা কর্ত্তব্য। আমার বিরুদ্ধে সত্যপ্রমাণ যা আছে তাই এত বেশি যে সনাতনীর দলে আমার মুখ দেখাবার জো নেই— তার উপরে আর কেন?

৩৪

অক্টোবর ১৯১৫

ওঁ

চারু, চারটি গান পাঠাই— যদি প্রকাশের ভার নাও তবে নামকরণেরও ভার নিতে হবে।

সত্যেন্দ্র দত্তের ছুটো কবিতার তর্জ্জমা করে একজন আমার ডেস্কের উপর রেখে গেছে— কোনোমতেই আত্মপরিচয় দিতে চায় না— সেই জন্যেই তার নাম ফাঁস করতে পারলুম না, মনে

দুঃখ রইল। যদি Modern Reviewতে চলে তাহলে অনুবাদকের উৎসাহ বাড়তে পারে।

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল
আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা
পাগল হাওয়ার গান সে গায়।
মাঠে মাঠে পুলক লাগে
ছায়ানটের নৃত্যরাগে,
শরৎ-রবির সোনার আলো
উদাস হয়ে মিলিয়ে যায়।

কি কথা সে বল্‌তে এল
ভরা ক্ষেতের কানে কানে?
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন
উঠেছে আজ নবীন ধানে?
মেঘে অধীর আকাশ কেন,
ডানা-মেলা গরুড় যেন,
পথভোলা এই পথিক এসে
পথের বেদন আন্‌ল ধরায়॥

—

আমার নিশীথ রাতের বাদল-ধারা!
এসহে গোপনে
আমার স্বপনমাঝে দিশাহারা!
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন
দাও ঢেকে মোর পরাণমন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা,
ওগো নিশীথ রাতের বাদল-ধারা!
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়ো গো, নিয়ো গো
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ করে!
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে,
দিয়ো গো, দিয়ো গো
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া,
ওগো নিশীথ রাতের বাদল-ধারা!

* * *

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে
তখন তুমি ছিলেনা মোর সনে।
যে কথাটি বলব তোমায় বলে'
কাট্‌ল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে

উঠ্‌ল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে।
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥

ভেবেছিলেম আজ্‌কে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে,
পাখীর গানে আকাশ গেল পুরে,
সেই কথাটি লাগ্‌ল না সেই সুরে
যতই প্রয়াস করি পরাণপণে।
তখন তুমি ছিলে আমার সনে॥

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে।
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
বলেছে সে কোন্ ইসারায়,
দিবসরাতির মাঝ-কিনারায়
ধূসর আলোয় অন্ধকারে।
গাইনে কেন কি ক'ব তা;
কেন আমার আকুলতা!
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা,
সুর যে হারায় অকূল পারে॥

তুমি যেতে যেতে গভীর স্রোতে
ডাক দিয়েছ তরী হতে।
ডাক দিয়েছ ঝড় তুফানে
বোবা মেঘের বজ্রগানে,
ডাক দিয়েছ মরণপানে
শ্রাবণ রাতের উতলধারে।
যাইনে কেন জান না কি?
তোমার পানে তুলে আঁখি
কূলের ঘাটে বসে থাকি
পথ কোথা পাই পারাবারে॥

—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

নভেম্বর ১৯১৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এবারকার সবুজপত্র বেরবার দেরি আছে— অথচ তোমাদের প্রবাসী ত আসন্ন। অতএব শিক্ষার বাহন তোমাদের দিলে সবুজপত্রের প্রতি জুলুম করা হবে— সেও আমার প্রতি জুলুম করবে।

দেবেন্দ্র সেনের তর্জ্জমাটা কানে ভাল ঠেকচে না বলে

পাঠাই নি। আর কিছু একটা যদি হাত দিয়ে বেরয় ত পাঠিয়ে দেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেনকে তার প্রুফটা পাঠিয়ো

৬৬

জানুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, Sister Niveditaর কাবুলিওয়ালা এবং যদুবাবুর ঘাটের কথা পাঠালে না?

"অহল্যা"র ইংরেজি ভাবানুবাদটি একবার Nationএ বেরিয়েছিল কিন্তু মাজ্‌তে মাজ্‌তে তার এতই বদল হয়ে গেছে যে গোটা দুই তিন লাইন ছাড়া তার আর পূর্ব্বস্মৃতি কিছুই নেই। বোধ হয় এটা Modern Reviewতে বের করলে ক্ষতি হবে না। বাঁকুড়ার Thompson এই তর্জ্জমাটার প্রশংসা করছিলেন—তাই তোমাদের পাঠাচ্ছি।

সুরেনের ফেব্রুয়ারি কিস্তির জীবনস্মৃতি পেয়েছ?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জানুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নিম্ন ঠিকানায় জীবনস্মৃতির তর্জ্জমাওয়ালা Modern Review পাঠিয়ে দিয়ো। চয়নিকা ২য় সংস্করণের কথা মনে রেখো।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ernest Rhys Esq
48 West Heath Drive
Hampstead. London

জানুয়ারি সংখ্যা এঁকে
আমি পাঠিয়েচি।

W. B. Yeats
18 Woburn Buildings
Upper Woburn. London

৬৮

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ফাল্গুনী সম্বন্ধে সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত মশায়ের একটি প্রবন্ধ তোমাদের বৈঠকে পাঠাচ্ছি। বাহুল্য অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছি। সুরেন্দ্রবাবুর পত্রোত্তরে যে পত্র লিখেছি তার এক অংশ উদ্ধৃত করি :—

ফাল্গুনীটা কোনো এক ফাল্গুনে আমের মঞ্জরীর মত

অকস্মাৎ দক্ষিণ পবনে বিকশিত হয়ে উঠেছিল— তারপরে সেটা মধুকরের গুঞ্জনগান না শুনেই কেবলমাত্র কীটের দংশনে বিমর্ষ হয়ে মাটিতে ঝরে পড়বে, তাতে কোনো ফল ধরবে না, এটা আমার পক্ষে ক্লেশকর। জিনিসটি যে রসাল জাতীয় সেটা আপনি বেশ করে প্রমাণ করেচেন। আপনি ওটাকে প্রদক্ষিণ করে ওর স্বাদগন্ধবর্ণ নানা দিক থেকে যাচাই করে দেখেচেন এই আনন্দের ইতিহাসটুকু কোনো এক মাসিক পত্রের সত্তঃপাতী পত্রে পুষ্পরেণুর মত কিছুক্ষণের জন্যও সংলগ্ন হয়ে থাক্ না। যদি চ এক মধুপের গুঞ্জনেই বসন্তের আসর জমে না, কিন্তু আমার পোড়াকপালে ফাল্গুনও জ্যৈষ্ঠের মত রুদ্রমূর্তি ধরে ওঠে; অতএব কোনো একটা দুঃসাহসিক দক্ষিণ হাওয়ার একটু দাক্ষিণ্যও যদি পাই তবে সেইটুকুকেই সঞ্চয় করে নিয়ে এবারকার বসন্তলীলা চুকিয়ে যেতে চাই। —সবুজপত্রে আমার সম্বন্ধে আলোচনায় সঙ্কোচ বোধ করি— ভারতীতেও প্রায় তদ্রূপ। প্রবাসী আমার প্রতি প্রতিকূল নন, অতএব আমার কাব্যসমালোচন ওঁরই সভাপ্রান্তে আসন যদি পায় সেটা অশোভন হয় না। অতএব প্রবাসীর দরবারে আমি আমার দরখাস্ত পেশ করব। ইতি—

এই প্রবন্ধটি যদি গ্রাহ্য হয় তবে চৈত্রেই যেন বাহির হয়। যদি গ্রাহ্য না হয় এবং চৈত্রেই যদি বাহির না হয় তবে মণিলালের হাতে দিতে বিলম্ব কোরো না। কারণ এক চৈত্রে ফাল্গুনী সবুজপত্রে বেরিয়েছিল, আর এক চৈত্রে যদি তার ব্যাখ্যা

বের হয় তাহলেই বা দোষ কি? ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩২২

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্রের প্রবাসীর জন্যে গোটা দুয়েক কবিতা এইসঙ্গেই পাঠাচ্চি।

আমার মনের জান্‌লাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।
দেখ্‌তে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে নাম ধরে
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দ্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,

আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে॥

২১ চৈত্র ১৩২১
সুরুল

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

সেইমত আজি মোর প্রভাতের আনন্দ-স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
একবেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি'
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

২৬ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৬৯

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

“You are my friend in all difficulty and doubt and companion in the darkest passage of life.”

৭০

* ৮ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, ক্ষিতিমোহনবাবুকে মোক্তার করে আমার কাছ থেকে একটি গানের জন্যে দরবার করেচ। আমার দরবারে মোক্তারের প্রয়োজন একেবারে নেই সে তুমি জান। কিন্তু আমার ভাণ্ডার যে শূন্য। গান আমার হাতে দু চারটে আছে বটে কিন্তু তোমাদের কাগজের পক্ষে এমন গান চাই যা গাবার এবং পড়বার দুই ক্ষেত্রেই উভচরবৃত্তি করতে পারে— যা সুরের ঘরে পিসি এবং কাব্যের ঘরে মাসির মত। তেমন ত খুঁজে পাই নে। ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে একটা আদায় করেচে মণিলাল— আর একটা যেটা কিঞ্চিৎ চলনসই গোছের আছে পাঠালুম। পয়লা বৈশাখে কি দর্শন দিতে পারবে? রামানন্দবাবু এখানে একসময়ে আসবার ঈষৎ আভাস দিয়েচেন— তিনি এলে খুসি হব, অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। আমেরিকায় Lynchingর কয়েকটা সাক্ষ্যপ্রমাণ কাল তাঁর কাছে ডাকে পাঠিয়েচি পেয়েচেন বোধ হয়— তাঁর Notes-এর,

মশানে এই দুষ্কৃতির বিবরণগুলিকে শূলে চড়ানো চাই।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চির-আমি

(বাউলের সুর)

যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন
এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়া তরী
এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচাকেনা,
মিটিয়ে দেব লেনাদেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা
এই হাটে,
আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে।

যখন জম্‌বে ধূলা তানপুরাটার
তারগুলায়
কাঁটালতা উঠ্‌বে ঘরের
দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের

পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির
ধারগুলায়
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে।

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশী
এই নাটে,
কাট্‌বে গো দিন, যেমন আজো
দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এমনি সেদিন উঠবে ভরি,
চরবে গোরু, খেল্‌বে রাখাল
এই মাঠে।
তখন আমায় নাই বা মনে রাখ্‌লে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে
নেই আমি !
সকল খেলায় করবে খেলা
এই-আমি।

নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আস্‌ব যাব চিরদিনের
সেই-আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে!
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

১ জুন ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি cutting পাঠিয়েছ আমার আশঙ্কা হচ্চে ওর মধ্যে সত্য আছে। আমাদের কর্ম্মচারীদের ওটা পাঠিয়ে দিয়েছি— যদি অন্যায় ঘটে থাকে তাহলে প্রতিকার করা হবে সন্দেহ নেই। লেখক যদি আমাকে পত্রযোগে সংবাদ দিতেন তাহলে যথাসময়েই সদুপায় হতে পারত।

Rothensteinকে চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে একটা পোলিটিক্যাল প্রবন্ধ লেখা হয়ে গিয়েছিল—এণ্ড্রুজ সেইটে কপি করে মডারন রিভিয়ুর জন্যে রামানন্দবাবুকে পাঠিয়েচেন। কিন্তু সেটা প্রকাশযোগ্য কি না আমার সন্দেহ আছে। রামানন্দবাবুকে বিচার করে দেখ্‌তে বোলো। ওটা কাগজে

বের করা হবে মনে করে লিখি নি। ওটা যদি ছাপা না হয় আমি তাতে লেশমাত্র ক্ষুব্ধ হব না।

Anatole Franceএর *White Stone* বই থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে তোমাদের কাগজে ছাপবার জন্যে এণ্ড্রুজকে লিখ্‌তে বলেছিলুম— বোধ হয় লিখেচেন। জিনিসটা অত্যন্ত উপাদেয়। ওটা তোমাদের Gleanings বা আর কোনো বিভাগে দিলে লোকের ভালই লাগ্‌বে। ইতি ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২
৬ জুন ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিনের জন্যে তুমি আস্‌তে পারলে বেশ খুসি হই। আমার সেই বালিকা বন্ধুটি এখানে এসে জুটেচে, আমার দিন বেশ কাটচে।

ছাপাখানাটাকে খাড়া করা গেছে। একজন লোকের দরকার যিনি বলে দিতে পারেন কি কি জিনিসের প্রয়োজন এবং তার খরচ কত। সুকুমারের ভাই শুনেচি ওস্তাদ। কিন্তু বড় ওস্তাদ না হলেও চল্‌বে— একজন লোক যাঁর ছাপাখানা চালাবার অভিজ্ঞতা আছে যিনি দরদস্তুর ও

আইনকানুন জানেন এমন কাউকে দিন দুয়েকের জন্যে কি পাওয়া যায় না। হয় ত তুমিই বলতে পার কিন্তু তোমার কি অবকাশ হবে? যাই হোক এ সম্বন্ধে পরামর্শ ও সহায়তা চাই। ইতি ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

*১০ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমরা প্রবাসীতে সবুজপত্র থেকে "কালো মেয়ে" কবিতাটি যদি তুলে দাও তাহলে দুটি সংশোধনের প্রতি মন দিয়ো— যথা,—

১৬২ পাতার অষ্টম লাইন
"সমস্ত পরিবারের নিত্য মনস্তাপ" না হয়ে হবে
"সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ।"
১৬৫ পাতার ৪র্থ লাইন—
"যেমনতর ওর ঐ ভাঙা জান্‌লাখানি।"
না হয়ে হবে
"যেমনতর ওর ভাঙা ঐ জান্‌লাখানি।"

আজকাল ইস্কুলমাষ্টারির কাজে ব্যস্ত আছি।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪
৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যে দুটি কবিতার প্রুফ পাঠাইয়াছ দুটিই *Lover's Gift*এ বাহির হইয়াছে।

ইস্কুলমাষ্টারিতে তলাইয়া গেছি— সরস্বতীর পদ্ম এখান হইতে অনেক উর্দ্ধে— অতএব অলমতিবিস্তরেণ। ইতি ২১ ভাদ্র ১৩২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫
২৮ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তোমার বই আমার হাতে পৌঁচেছে, পড়েওচি, ইচ্ছা ছিল মোকাবিলায় তন্ন তন্ন করে ঐ বই সম্বন্ধে আমার মৌখিক রায় জানাব— কারণ বিস্তর কথা— সব কথা লেখবার মত আমার শক্তি নেই। কলকাতায় থাকতে তোমার সঙ্গে দেখা হল না। যদি কখনো অবসরমত একখানা বই হাতে এখানে এই ছুটির মধ্যে একদিনের জন্যে আস্‌তে পার তাহলে আমার মন্তব্য সুস্পষ্ট করে বলব। ইতি ১১ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

[নভেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

একটি শিক্ষকের আশু প্রয়োজন। প্রধান কাজ বাংলা পড়ানো। আমাদের এখানে আমারই রচিত গ্রন্থ পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয়েচে; তার কারণ এখানে নির্ব্বাচন সমিতিতে দীনেশবাবু প্রভৃতি বাংলাভাষার সমজদার কেউ নেই। এখন, এমন লোকের দরকার যিনি দীনেশবাবুদের এলাকায় বাস করেন না, যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমক খান না। খুব বেশি অর্থ দাবী করলে কষ্ট পাব—কিন্তু আদরের ত্রুটি হবেনা—এখানে বিশ্বভারতীতে পাঠের সব সুযোগই পাবেন—আর যদি গলা থাকে তাহলে গানও শিখ্‌তে পারবেন, আর যদি নাও থাকে তাহলে মাঝে মাঝে উপদ্রব সহ্য করবার চেষ্টা করব। একটু সংস্কৃতের অনুস্বার বিসর্গের যদি দূর সম্পর্কও থাকে তাহলে ভাল। কেননা, নইলে ষত্বণত্ব জ্ঞানহীন আমাদের মত আনাড়ির পক্ষে অধ্যাপনাটা স্পর্দ্ধার বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি তোমার মনে হয় যে লোকটি রসিক এবং উৎসাহী তাহলে অসংস্কৃতভাবেই তাঁকে নিতে পারব। মোদ্দা কথা, তাঁকে বিশ্বভারতীর ক্লাসে ভর্ত্তি হতেই হবে, এর অন্যথা হলে চল্‌বেনা। একটু মনোযোগ কোরো। দরকার আছে। নেপালবাবু আশ্রম ত্যাগ করচেন।

ইংরেজি ভাষায় ম্যাট্রিক্যুলেশনের খেয়া পারাপারে মজবুৎ কাউকে তোমার জানা আছে কি ?

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭
১৭ মে ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট্ করে রেখেচি। এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা-কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮
২১ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

Letters from an Onlooker-এর আলাদা কপি কি এখনো ছাপা হয় নি ? আমি বিলাতের বন্ধুদের পাঠাতে চাই।

"ঘোড়ার পরীক্ষা" মডার্ণ্ রিভিউর জন্যে পাঠালুম।

শান্তিনিকেতন পত্রে কোন কোন প্রবন্ধে মৌলিন্য কথাটা ব্যবহার করেচি সেটা চল্‌বেনা। তার স্থানে স্বমূলকতা কি চলে? নেহাৎ না হয় ত মৌলিকতা বসিয়ে দিয়ো অর্থাৎ যখন প্রবাসীতে উদ্ধৃত করবে।

পনেরই শ্রাবণে কলকাতায় যাব দিনদুয়েক থাক্‌ব। ইতি
৫ শ্রাবণ

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯
*৩০ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব—সোমবারে সকালে ফিরব—ইতিমধ্যে তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ইতি বুধবার

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০
২৭ নভেম্বর ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শোনা গেল জগদানন্দ সম্পাদকী দরবার থেকে তোমার

উপর পত্র জারি করেচেন, তাতে তুমি বিচলিত হোয়ো না। আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রের খিড়কির দরজা জগদানন্দের সভায় আর তার সদর দরজা না হয় প্রবাসী আপিসে রইল তাতে ক্ষতি কি? আমাদের পত্র যোগে আমরা নাম করতেও চাই নে গ্রাহক বাড়াতেও চাই নি, অথচ এখানে যে আয়োজন হচ্চে বাইরে যদি তার ব্যবহার চলে তাহলে তাতে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু নেই। একজন ছাত্র শান্তিনিকেতনের লেখাগুলি প্রবাসীতে পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছে এবং উপকৃতও হয়েচে—সেই বার্ত্তাটি জানিয়ে সে আমাকে পত্র লিখেচে—তাই আমার এই কথাগুলি মনে এল।

তোমাকে একটা গল্পের প্লট শিলঙ থেকে পাঠিয়েছিলুম, পেয়েচ ত? কাজে লাগ্‌বে কি? কিন্তু গল্পে কি কোনো প্লটের বিশেষ দরকার আছে? যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এবং যদি ততদিনে মনে থাকে তবে সেই প্লটটা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

তুমি একবার সশরীরে সুরেনের আপিসে গিয়ে "গোরা" তর্জ্জমা সম্বন্ধে তার অভিপ্রায় জেনে নিয়ো। তার কাছ থেকে চিঠির জবাব পাওয়া দুর্লভ। ইতি ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

১৯ জানুয়ারি ১৯২০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার সেই "কথিকা"গুলো তোমরা অনেককাল হল শুনেচ—নতুন কিছুই নয়। বিজয়বাবু আমার মুখে সেগুলো নতুন শুনে বিচলিত হয়েচেন। কিন্তু ছাপার অক্ষরে পড়লে হয়ত তত অপূর্ব্ব বোধ হবেনা। এগুলো কোনো বিশেষ প্রণালীতে বা বিশেষ সমারোহে বের করতে আমি লজ্জা বোধ করি। জান ত আমি বিশেষ অভ্যর্থনা সইতে পারি নে। আমার এই লেখাগুলো এখনো ছাপাবার জন্যে মনে তাগিদ আস্‌চেনা। এত বেশি লেখা লিখেচি যে আজকাল অপ্রকাশের শান্তির জন্যে আমার মন উৎসুক।

প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উদ্ধৃত আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ পড়ে অধ্যাপক এণ্ডার্সন কেম্ব্রিজ হতে খুসি হয়ে আমাকে পত্র লিখেচেন, অনুবাদ-চর্চ্চা প্রভৃতি লেখা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও করেচেন। তোমাদের ঐ সংখ্যা সম্বন্ধে আরো অনেকগুলি সকৃতজ্ঞ পত্র পেয়ে আনন্দ বোধ করেচি। ইতি
৫ই মাঘ ১৩২৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

৫ মার্চ ১৯২০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গল্প লেখবার মত মেজাজও নেই সময়ও নেই। মনে হয় ও পাঠ উঠে গেছে—এখন ইচ্ছা করলেও আর লিখ্‌তে পারব না। তবে এক কাজ করতে পারি। আমার কথিকার ছোট ছোট গল্প—সে নিতান্তই গল্পস্বল্প—দু চারটে দিতে পারি। কিন্তু যারা ক্ষুধার খাওয়া চায় তাদের পেট ভরবে না, ওতে বস্তু অংশ নেই—যারা কিঞ্চিৎ রসগ্রহণ করে খুসি থাক্‌তে চায় তাদের ওতে একটুখানি তৃপ্তি দিতে পারে। তুমি যদি নিজে গল্প লিখ্‌তে চাও আমি বরঞ্চ ভেবে চিন্তে প্লট দিতে পারি কিন্তু আজকাল তাও আমার মাথায় সহজে আসে না। বোধ হচ্চে আমার মানসিক উন্নতি হচ্চে—আমি সাহিত্যে গল্পের ক্লাস থেকে হয় ত বা লোকশিক্ষার ক্লাসে উত্তীর্ণ হব-হব করচি। তাহলে মরবার পূর্ব্বে আমার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জোগাড় করে যেতে পারব। কিন্তু তাতে মস্ত একটা ভয়ের কথা এই যে, পুণ্যফলে হয় ত বাংলা দেশে অধ্যাপকরূপে আমার পুনর্জ্জন্ম ঘটবে—সেইটে এড়াতে চাই। ইতি ২২ ফাল্গুন ১৩২৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩

[জুলাই ১৯২২]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সত্যেন্দ্রের নামে এই কবিতাটি তার স্মৃতিসভায় পড়বার জন্যেই লিখেছিলুম তাই তোমাদের পাঠাই নেই [নি]। তোমার তাগিদ পেয়ে পাঠালুম— কিন্তু গোপন রেখো— বন্ধুমহলেও কাউকে দেখিয়ো না। আগামী ৯ই তারিখে জোড়াসাঁকোয় আমার সন্ধান করলে পাবে। সেই সময়ে প্রুফটা একবার দেখিয়ে নিয়ো।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

[৮ জুলাই ১৯২২]

ওঁ

কলিকাতা

অয়মহং ভো

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

* ১০ মে ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবেনা। একবার

এসে কিছু আলাপ আলোচনা করে যাও না। আপাতত আমি চলৎশক্তিরহিত— ভাগ্যক্রমে এখনো বলৎশক্তি আছে। কিছুকাল পরেই আর একবার য়ুরোপে পাড়ি দেব।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৮৬

[জুলাই ১৯২৫]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চারু, বর্ষায় ফাল্গুনের আবাহন হবে, তার জন্য কোন কৈফিয়তের দরকার ছিল না। তবু পাঠাচ্ছি।

ফাল্গুনী নাটকের সূচনা অংশে— একেবারে শেষভাগে রাজাকে যখন কবি বসন্তোৎসবের আনন্দে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করবেন, রাজা তখন প্রশ্ন করবেন—

রাজা— কবি তুমি যে এই ভরা বাদলের মাঝখানে ফাল্গুনের তলব করে বসলে, এ তোমার কি রকম ক্ষ্যাপামি?

কবি— এ ক্ষ্যাপামি শিখেছি সেই ক্ষ্যাপার কাছ থেকে যিনি জ্যৈষ্ঠের হোমহুতাশনের ভরা দাহনের মধ্যে সজলজলদ-স্নিগ্ধকান্ত আষাঢ়ের অভিষেক-উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র জারি করে' বসেন কদম্বের নবকিশলয়ে। যিনি পাতা ঝরা উত্তরে হাওয়ার সুর এক মুহূর্তে ফিরিয়ে দিয়ে বনসভায় দক্ষিণ হাওয়ার আসর

জমিয়ে তোলেন। বর্ষার শিঙাখানা কেড়ে নিয়ে তাতেই যদি বসন্তের বাঁশী বাজিয়ে তুলতে না পারি তবে আমি কবি কিসের?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

২১ ডিসেম্বর ১৯২৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চারু, তোমাদের ওখানে যাওয়া স্থির করেছি। প্রথমে ভেবেছিলেম ডিসেম্বরের মধ্যেই যাত্রা করব কিন্তু তোমাদের তখন কলেজ বন্ধ থাকবে শুনে জানুয়ারির শেষভাগেই যাবার সঙ্কল্প করচি। রমেশ তাঁর বাসায় আমাকে আশ্রয় দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তোমাদের পাড়াতেই নাৎনী সম্পর্কীয় আত্মীয়া আছে বলে রমেশকে কথা দিতে সাহস করছি নে। যাহোক স্থানকালে উপস্থিতমত এর মীমাংসা হতে পারবে।

আমার জন্যে অভ্যর্থনার বিরাট পর্ব্ব করলে সইবে না, তাহলে শান্তিপর্ব্ব ডিঙিয়ে একেবারে স্বর্গারোহণপর্ব্ব এগিয়ে আসবে।

আমার সঙ্গে কালীমোহন যাবেন—আর ভাবছি নন্দলালকেও নেব—হয় ত আমাদের মুসলমান অধ্যাপক জিয়াউদ্দীনও যেতে পারেন। রথীরও যাবার ইচ্ছা আছে।

অতএব সেখানে গিয়ে আমরা শান্তিনিকেতন পঞ্চায়েৎ বসাতে পারব। ইতি ৬ই পৌষ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮

ং ৩/৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ঢাকার সাধারণের তরফ থেকে দুই ভদ্রলোক দূত স্বরূপে এসে বিশেষভাবে ঢাকার আতিথ্যের জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে আমি তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি— তার পরে অন্যত্র নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছি। এই জন্য বাধ্য হয়ে তিনদিন পূর্ব্বে ঢাকায় গিয়ে সেখানে জনসাধারণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। ক্ষণকালের জন্য তিল মাত্রও সন্দেহ হয় নি যে এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কিছু মাত্র ক্ষোভের কারণ হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার প্রতিশ্রুতি আমি সর্ব্বাংশেই রক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। ১০ই থেকে ১৪ই পর্য্যন্ত রমেশের বাড়িতে থাকব সে সম্বন্ধেও কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি। এ স্থলে ঢাকার সাধারণের তরফে যাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব করেছেন তাঁদের প্রত্যাখ্যান করা কি আমার কর্ত্তব্য হতে পারে? বিশেষত ঢাকার, এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে এই

আমার প্রথম পরিচয়। এঁদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি এমন স্পর্দ্ধা আমার পক্ষে একান্ত অসঙ্গত হত। রমেশের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে বসে আছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারচিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯
১৩ মার্চ ১৯২৭

SANTI-NIKETAN
BENGAL, INDIA

তোমার ফরমাস মতো দোলের কবিতা লিখে অমিয়কে দিয়ে নকল করিয়ে পাঠালুম। কিন্তু মনে রেখো এই কবিতাটিকে ছাপাখানার মসীবন্ধনে বন্দী করবার অধিকার তোমাদের দিচ্চি নে—আবৃত্তিসভায় এর অবগুণ্ঠন মোচন করতে পারো এই পর্য্যন্ত তোমাদের শাসনের সীমা।

“সাগরকূলে” শব্দের অর্থ হচ্চে জীবন সমুদ্রের বা হৃদয় সমুদ্রের কূল,— দূর প্রান্ত,— সেইখানে নিভৃতে দেবতা সংসার কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে সুপ্ত থাক্‌তেও পারেন—হঠাৎ কোনো পূজারী আপন পূজার দ্বারা তাঁকে আবিষ্কার করেন, জাগ্রত করেন।

ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলির প্রতি হঠাৎ দুর্দ্দৈবের দৃষ্টি পড়াতে সেটা অপঘাতে কিছু দিন পঙ্গু হয়ে আছে। লেখা দুঃখকর।

অতএব আমার এই ক্ষত অঙ্গুলির উপহারটুকুর মধ্যে কিছু বেদনাও রইল।

রমেশ ও তাঁর গৃহিণীকে আমার সস্নেহ অভিবাদন জানিয়ো এবং তুমিও সপরিজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি
২৯ ফাল্গুন ১৩৩৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০
৫ মে ১৯২৭

VISVA-BHARATI
SANTI-NIKETAN, BENGAL

কলিকাতা

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু তুমি যে লাইনটা আমার তথাকথিত রচনাবলী থেকে উদ্ধার করে পাঠিয়েচ তার অর্থ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। একটু প্রণিধান করে দেখ্‌লেই বুঝবে রচনাটা আমার নয়, আমার যে কৌতুকপ্রিয় দুষ্টগ্রহ মুদ্রাকরের কর পরিচালন করে থাকেন তাঁরই। তাঁর অনেক কীর্ত্তিই আমার গ্রন্থকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। অনেক পরাশ্রিত জীব অতিকায় তিমির কলেবরে সংসক্ত হয়ে তাকে শোষণ করে থাকে, তারা উক্ত তিমির বিধিদত্ত অঙ্গ নয়, গ্রহদত্ত আনুষঙ্গিক।

যে মানুষ মস্ত বাড়ি পেয়েছে অথচ যার ঝাঁড় দেবার ফরাস বেশি নেই লেখা সম্বন্ধে আমার সেই দশা— আস্‌বাবের চেয়ে আবর্জ্জনা বেশি হয়ে ওঠে।

যাই হোক, ঐ লাইনটার বিশুদ্ধ আদিপুরুষ সম্প্রতি কোন্ প্রেতলোকে বাস করেন তাও আমি জানি নে। যে-ছাত্রদের তুমি পড়াবে তাদের তুমি সন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত করাতে পারো। এই দুঃসাধ্য গবেষণার কাজ আমার দ্বারা ঘটে উঠবেনা— আমি সামান্য কবি মাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎ নই। কাল যাচ্চি শিলঙ পর্ব্বতে Uplands নামক কুটীরে। ইতি ২২ বৈশাখ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১
৯ মে ১৯২৭

Uplands, Shillong.

কল্যাণীয়েষু

“সমস্যা” লেখাটা সাম্‌নে নিয়ে আগাগোড়া মিলিয়ে অসঙ্গতির ফাটলের মধ্যে থেকে একটা কোনো অর্থ বের করবার চেষ্টা করব। ঝোঁকের মাথায় কোন্ অর্থে কোন্ শব্দটা ব্যবহার করেচি সব সময়ে পরে তা মনে থাকে না— হয়তো সেই রকমের একটা তাড়াহুড়োর উত্তেজনায় শব্দেতে ভাবেতে

জটা পাকিয়ে গেছে, কোথাও যে গাঁঠ পড়েছে তখন তা জান্‌তেও পারি নি। ওটা যদি মুদ্রাকরের মুদ্রাদোষবশত না হয়ে থাকে তাহলে অনবধানের অপরাধ স্বীকার ক'রে শোধনের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। মুদ্রাকরে গ্রন্থকারে মিলে গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় প্রমাদ যা বিকীর্ণ করা গেছে তার পরিমাণ বড় কম হবে না।

কোনো ভালো অভিধান দেখো তো, বেতস বল্‌তে বাঁশও হয়, এমন সাক্ষ্য পেয়েছি। কবিতা যখন লিখেছিলেম তখন খাগ্‌ড়ার কথা ভেবেছি—শরেতে যে ভদ্ররকম বাঁশি হয় তা নয় কিন্তু ওর মর্ম্মস্থানের ফাঁকটুকুতে নিঃশ্বাস সঞ্চার করে সুর বের করা যায় বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু যখন দেখা গেল বেতস বলতে শর বোঝায় না এবং অর্থমালার সর্ব্বপ্রান্তে বেণু কথাটা পাওয়া গেল তখন বাগর্থের দ্বন্দ্ব মিট্‌ল দেখে নিশ্চিন্ত হয়েচি। তুমি কোন্ কৃপণ অভিধানের দোহাই দিয়ে আবার ঝগ্‌ড়া তুলতে চাও ?

এখানে আছি ভালো। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২

১৫ মে ১৯২৭

Uplands, Shillong.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। তুমি কি মনে করনা, নিছক খ্যাতি লাভের মধ্যে অগৌরব আছে? রচনা শুধু যে অনেকে বুঝবেনা তা নয় অনেকে তাকে নিন্দা করবে এও কবির পুরস্কারের অঙ্গ। যতীন্দ্র সিংহ যদি আমাকে প্রশংসা করতেন সে কি আমার পক্ষে ভাবনার কারণ হত না? পৃথিবীর সব ভালো জিনিষের মতোই ভালো লাগ্‌বার শক্তিও দুর্লভ— বিধাতা তাকে হরির লুঠের বাতাসার মতো নেহাৎ শস্তা করেন নি ভালোই করেছেন। অতএব যারা কবির নিন্দা করে তাদের কৃপা কোরো, তাদের উপর রাগ কোরোনা। যে কবির কাব্যে কলঙ্ক আরোপ করলে তাকে নিষ্প্রভ করা হয়, তার প্রভা ক্ষীণ। বস্তুত নিন্দাটা হচ্চে পরখ করবার প্রণালী, খাঁটি জিনিষকে বাজিয়ে দেখা। তাকে মারলে দোষ নেই যাকে মারলেও মরে না— বস্তুত যা অল্পপ্রাণ তাকেই যেন আমরা দয়া করে নিন্দা না করি। এই কারণেই সংসারে বিধাতার নিষ্ঠুরতা তাদেরই পরে যারা শক্তিমান— তারা অযোগ্যের হাতে মার খেতে জন্মেচে। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২ জুন ১৯২৭

Shillong.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এতদিন পরে সঙ্কলন বইখানা হাতে এসে পৌঁচেছে। প'ড়ে দেখ্‌লুম— স্পষ্টই দেখা যাচ্চে— একটা কর্ত্তৃপদের স্খলন হয়ে বাক্যটা অর্থচ্যুত হয়েচে। সম্পূর্ণ বাক্যটা এই রকম হওয়া উচিত: "আত্মীয়তার সম্বন্ধ কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি।" কবে কোথায় এই প্রধান পদটি পড়ে গেছে আমি তা বলতে পারি নে। আমার বিপুল রচনামণ্ডলের মধ্যে কোথায় যে কি রকম অপঘাত ঘটচে তা আমার চোখেও পড়েনা। আমার সৃষ্টির কাজ করে দিয়ে আমি তো খালাষ, তারপরে গ্রহ উপগ্রহরা তাদের মধ্যে কোথায় কোন্ ছিদ্র খনন করচে কিছুই জানিনে, ভাবীকালের পুরাতত্ত্ববিদ্দের গবেষণা কাজের বিস্তর খোরাক দিয়ে যাবো বলে মনে হচ্চে।

বহুকাল পরে একটা উপন্যাস লিখ্‌তে লেগেছি। আয়তনটা বোধ হয় ছোটো হবেনা। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

VISVA-BHARATI
10, CORNWALLIS STREET
Calcutta, ১৭ সেপ্টেম্বর 1927

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, সময় ত আমার মুহূর্ত্তমাত্র নেই। তুমি আমাকে যে অনুরোধ করেচ তা পালন করতে হলে আমাকে একখানা বড় গোছের বই লিখ্‌তে হয়। আশ্রমে আমি কিছুকাল পঞ্চভূত পড়িয়েচি তাতেই জানি ওর মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে যা মোচন করে সকলের পক্ষে সুগম করতে অনেক বাক্য ও চিন্তা ব্যয় করা দরকার। শুনেচি ক্ষিতিমোহনবাবু ঐ বইগুলি অধ্যাপনার ভার নিয়েছিলেন। পূজার ছুটির সময় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলে কাজে দেখবে।

চয়নিকায় ছাপার ভুল মারাত্মক। এক কপি সংশোধন করে প্রশান্তকে দিয়েচি— সেইটে দেখে তোমার নিজের বই যদি শুধরে না নাও তাহলে আমার কবিতার দুর্ব্বোধ্যতার অপবাদ তোমার মনেও বদ্ধমূল হবে।

আমার বিদায় অভিবাদন।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

১৯ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার নিজের মনে হয় Selection জাতীয় বইয়ের সাদাসিধে নাম দেওয়া ভালো। এমন দিন গেছে যখন তর্কশাস্ত্রেরও কুসুমাঞ্জলি নামে আপত্তি ছিল না—এখন আভরণ ব্যবহারের যুগ চলে গেছে—কুণ্ডল কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ মেয়েরাও ত্যাগ করতে উদ্যত। সহজ নামটাই দিয়ো যথা

“সত্যেন্দ্রনাথের
কাব্যসঞ্চয়ন”

অথবা

“কাব্যসঞ্চয়ন”
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
রচনা হইতে)

এ অঞ্চলে যাতায়াত একেবারে ছেড়ে দিয়েচ না কি? ঢাকা সহরের নাম সার্থক দেখচি। খৃষ্টমাসের ছুটিতে দেখা দিয়ে গেলে দোষ কি? ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৬

২৮ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, সময় অল্প, সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দেব। যে মানুষ না চায় তাকে কেউ কিছু দিতে পারেনা, দিলে দান বিফল হয়। চাওয়া এবং দেওয়া একটা চক্র, পরস্পরের যোগে পরস্পর সম্পূর্ণ। তুমি তোমার ছাত্রের কল্যাণার্থী, একান্ত মনেই চাও যে তার শিক্ষা সার্থক হয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছার পথ বন্ধ, সে যদি না চায়। আমাদের দেশে গুরুভক্তির অর্থই তাই। গুরুর নিজের জন্যে ভক্তির প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁর দানক্রিয়ার জন্যে তার প্রয়োজন আছে,— ভক্তির দ্বারা গুরুর কাছে ছাত্র আপন দাবীকে সত্য করে— তখন গুরুর কল্যাণ ইচ্ছার বাধা দূর হয়। পাওয়ার জন্যেই পাওয়ার বাধার মূল্য আছে। বাধা দূর করতে গিয়ে পাওয়ার শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তীর্থে পৌঁছনোর সার্থকতা তীর্থে যাত্রার কৃচ্ছ্রতার দ্বারাই পরিপূর্ণ। দেবতাকে না পাওয়াটাই দেবতাকে পাওয়ার ভূমিকা, মাঝে থাকে প্রার্থনা। যেটাকে পেয়েই আছি সেটাকে আমরা সব চেয়ে কম পাই। এই জন্যে ভগবান যদিচ নিজেকে দিয়েই রেখেচেন— তবু চেয়ে পাওয়ার দুঃখের ভিতর দিয়ে পাওয়ার আনন্দকে প্রগাঢ় করতে হবে। বস্তুত তাঁকে না পাওয়াটা মায়া, ঐটে লীলা— যিনি আছেন তিনি নেই হয়ে খেলা করেন, যিনি দিয়েচেন তিনি দেন নি বলে ফাঁকি দেন। বাহ্য বিষয়েও

তাই, জ্ঞানের বিষয়েও তাই। চাষ করে মানুষ অন্ন পেয়েচে বলে তার সেই পাওয়া পশুর পাওয়ার চেয়ে বড়ো। পশুর জ্ঞান সহজবোধের সীমার বাইরে বেশি দূর যায় না, মানুষের জ্ঞান সাধনা-সাধ্য জ্ঞান। সে জ্ঞান যে হেতু অসাধ্য নয় সেই হেতু সেটা পেয়েইচি, যে হেতু সাধনার অপেক্ষী সেই হেতু সেটা পাই নি। এই না পাওয়ার বাধার ভিতর দিয়ে মানুষের পাওয়ার গৌরব। ভগবানকে পাওয়া সম্বন্ধে সেই একই কথা —তাঁকে পাওয়ার সাধনার দ্বারাই পাওয়ার যোগ্যতাগৌরবে মানুষ বড় হয়ে ওঠে। বড়ো না হয়ে উঠে কেউ বড়োকে পেতেই পারে না। অঞ্জলির মধ্যে সরোবরের জল তুলে নিতে পারো না। আকাশ থেকে ধারা বর্ষণ হচ্চে, তোমার কাজ হচ্চে জলাশয় তৈরি করা— অর্থাৎ আকাশের জলকে নিজের বিশেষ চেষ্টার দ্বারা নিজের জল করে নেওয়া— প্রার্থনার দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সেই জলাশয়কে বড়ো করা, গভীর করা হয়।

প্রার্থনা অনেক শ্রেণীর আছে। ধন প্রার্থনা, মান প্রার্থনা, বিদ্যা প্রার্থনা, পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থনা। এ সমস্ত প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি— বিশ্বব্যাপারের নিয়মের সঙ্গে নিজের যথার্থ ইচ্ছার যোজনার দ্বারাই এরা সফল হয়। অর্থাৎ বিশ্বশক্তির সঙ্গে আত্মশক্তির মিলন ঘটানো আবশ্যক। পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে চাও, ঠিক পথে শক্তি প্রয়োগ করো। কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে প্রার্থনা— প্রেমকে প্রেমের দ্বারাই চাওয়া— মানব সংসারেই হোক্ আর অধ্যাত্মলোকেই হোক প্রেমের আত্ম-

প্রকাশ প্রার্থনাতে—সে প্রার্থনা সাজে সজ্জায় মিষ্টবাক্যে মিষ্টব্যবহারে সাধ্যসাধনায়—অর্থাৎ আত্মত্যাগে—ভগবানের কাছেও আমাদের প্রার্থনা শুধু বাক্যে নয়, ত্যাগে কল্যাণে সে প্রার্থনা সার্থক। যাকে ভালোবাসি তাকে ফাঁকি দিই নে, কেননা সে স্থলে ফাঁকি দেওয়া নিজেকেই বিড়ম্বিত করে—ভগবানকে যদি ভালোবাসি তবে শুধু কথায় তাঁকে ফাঁকি দিতে ইচ্ছেই হবেনা, স্বভাবতই সত্যকার ত্যাগের দ্বারা তাঁকে প্রার্থনা করি। যদি বলো তাঁকে না ভালোবেসে তাঁর ভালোবাসা পাওয়া যাবে—সে তো পাচ্চই নিমেষে নিমেষে নিশ্বাসে নিশ্বাসে—তোমার অস্তিত্বের মধ্যেই তাঁর ভালোবাসা, —কিন্তু সে পাওয়াকে নিজের দেওয়ার দ্বারা তুমি আপন করে নিতে পারলে না বলেই সে পেয়েও না পাওয়া। প্রেমের প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের প্রেমকে আপন করা হয়, সেই আপন করাই ভগবানকে পাওয়া। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বলাকার "শঙ্খ" বিধাতার আহ্বান শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে

অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।

শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখ্‌তে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়—পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখ্‌লে তাঁকে খর্ব্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলি সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে সাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়—তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেই রকম। সে সম্বন্ধ জীর্ণপত্রের মতো খসে পড়েচে—তাতে চিরসত্যরূপী সাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্ব্বনাম “আমি” ও “সে” —যে চলে যায় সেই হচ্চে সে, তার স্মৃতিবন্ধন নেই,—আর যে অহং কাঁদচে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে আমি বলতে কবি নয়—“আমি-আমার” করে’ যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি আমার তাজমহল যে মানুষটা বলে, তারই প্রতীক ঐ গোরস্থানে—আর মুক্ত হয়েচে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী—তাকে কোনো একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না সাজাহান নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।

বামী যেমন দীপ হাতে একটা অন্ধকার ঘূর্ণি সিঁড়ি বেয়ে চল্‌চে, সমস্ত নক্ষত্রলোককে আমি সেই দীপহাতে ছোটো মেয়েটির মতোই দেখ্‌চি। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ যদি তার আলো নিবে যায়—তা হলে সে আপ্‌নাকে আর দেখ্‌তে পাবে না—অসীম অন্ধকারের মধ্যে একটা কান্না উঠ্‌বে, "আমি হারিয়ে গেছি।"

আমি নিজে কাজের ভিড়ের মধ্যে এমনি চাপা পড়েচি যে ঐ পলাতকার "বামী"র মতোই একেবারে হারিয়ে গেছি বলে বোধ হচ্চে, আমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে বাইরে হাত বাড়িয়ে আঁকুবাঁকু করে মরচি। ইতি ৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৮

১৫ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তুমি তো জানোই, আমার জীবনে বারম্বার নিরবচ্ছিন্ন নিন্দার দলবদ্ধ আক্রমণ সমুদ্যত হয়ে উঠেচে, আমার সান্ত্বনার বিষয় এই যে, আমার ব্যবহারে তার কারণ ঘটতে দিই নি, এবং আমার লেখনী সেই কলহের ক্ষেত্রে অবতরণ করে প্রতিপক্ষতা করতে অস্বীকার করেচে। ইতিপূর্ব্বে অনেক বড়ো বড়ো ধনুর্দ্ধরেরাই ব্যূহ রচনা ক'রে আমার পরে অবিশ্রাম শরবর্ষণ করেচেন তবুও এখনো টিঁকে আছি,

আজকের দিনেও যাঁরা থেকে থেকে মুষ্টি আস্ফালন করচেন কালকের দিনে তাঁদের সেই উগ্র উত্তেজনার কোনো চিহ্ন কোথাও থাক্‌বে না। যাঁরা আমার অখ্যাতির ধ্বজা উচ্চ ক'রে ধ'রে উচ্চতা লাভ করতে চান আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি তাঁরা নিজের মহিমা দ্বারাই অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুন, কুৎসা-ব্যবসায়ের কুৎসিত উপায়ে নয়। গৌরবে স্বদেশের কোনো সাহিত্যিক আমাকে ছাড়িয়ে যাবেন না এমন নীচ কামনা আমার মনে কদাচ যেন স্থান না পায়—তাঁদের সাধনা সফল হোক, নবযুগের সাহিত্য সিংহাসনে বসে তাঁরা রাজটীকা পরুন, আর সেই আত্মপ্রসাদে, অন্য কবির খ্যাতি খর্ব্ব করবার অসহ্য উষ্মা, তাঁদের মনে শান্ত হোক্।

তোমাকে অনেক দিন দেখি নি। ছুটি উপলক্ষ্যেও কি ঢাকা থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারবেনা? ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৫ এপ্রিল ১৯৩১

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, তোমাদের চয়নিকায় আমার কবিতা আহরণ করতে চাও আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। কপিরাইট

বিশ্বভারতীর এই জন্যে একবার সচিবের অনুমতি দরকার হতে পারে নতুবা প্রশান্তর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমাকে ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছ ঐটে কঠিন ঠেকচে। জীর্ণ দেহের মধ্যে অলস মন আপন নিভৃত নীড় রচনা করে অদৃশ্যপ্রায়ভাবে কালযাপন করবার আয়োজন করেচে। লেখবার স্বাভাবিক ইচ্ছে আর নেই—লেখবার পথ এখন উজানের পথ—সুতরাং লেখনী আজ লগির আকার ধরেচে—বাণীনির্ঝর তলিয়ে গেছে বালুর নীচে, খুঁড়ে জল বের করতে হয়। এখন থেকে আমার প্রত্যাশা তোমরা ছেড়ে দাও। দেখা হলে সকল কথার আলোচনা হবে। ইতি ২ বৈশাখ ১৩৩৮।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০
১১ জুন ১৯৩১

আশীর্ব্বাদ পত্রী
শ্রীমান প্রেমোৎপল,
শ্রীমতী অমিয়া,

বিকশি' কল্যাণবৃন্তে যুগলের হিয়া
অন্তরে অক্ষয় হোক্ প্রেমের অমিয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮

১০১

৪ অক্টোবর ১৯৩২

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তার পুঞ্জিত হোলো জীবনের ভাঙা আশা।
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধূলা।
দূষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু,
শোষণ করিছে আয়ু।
যেখানে-সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া
দীপ নিবে যায়, তীব্র গন্ধ ধোঁওয়া
রোধ করে নিঃশ্বাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ॥

ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর্ ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নাই বন্ধন।
প্রভাত আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।
সন্ধ্যাতারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথায় লুকাও লাজে।
যেখানে ক্ষুদ্র যেখানে পীড়িত তুমি,
কর্কশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের মরুভূমি

তাহার বাহিরে তোমার উদারস্থান,
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান ॥

১৮ আশ্বিন,
শুক্লপঞ্চমী
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২

১৫ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, একজাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয় তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপ-রচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার একজাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার "বৈশাখ" কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেচ। বলা বাহুল্য, এটা শেষজাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত কিছু। যেমন "সোনার তরী" কবিতাটি (ছিলাম তখন পদ্মায় বোটে। জলভারনত কালোমেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেচে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেচে ফেনা। নদী অকালে কূল

ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্চে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকো হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেচে। ঐ অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত। মনে আছে এগ্রি-কালচারাল বিভাগীয় দ্বিজু রায় বিদ্রূপ করেছিলেন শ্রাবণ মাসের ধানের অসাময়িকতা উল্লেখ করে।

ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল দিনের ছবি "সোনার তরী" কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত। "বৈশাখ" কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্রমধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম, সেদিন চারদিক থেকে বৈশাখের যে তপ্ত রূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ঐ কবিতায় প্রকাশ পেয়েচে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ঐ কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তাহলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্চে নিম্নের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামুর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ রন্ধ্র হতে ছুটে আসে।

খোলা জানলায় বসে ঐ ছায়ামুর্ত্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেচি শুষ্ক রিক্ত দিগন্তপ্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হুহু করে ছুটে আসচে ঘূর্ণা নৃত্যে, ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্ত্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেচি, পড়ে দেখো।

তারপরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে—

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েচ।

সেদিনকার বৈশাখ মধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল বলেই ওটা লিখ্‌তে পেরেচি। ধূধূ করচে মাঠ, ঝাঁঝাঁ করচে রোদ্দুর, কাছে আমলকি গাছগুলোর পাতা ঝিলমিল্ করচে, ঝাউ উঠচে নিঃশ্বসিত হয়ে, ঘুঘু ডাক্‌চে স্নিগ্ধ সুরে,—গাছের মর্ম্মর, পাখীদের কাকলী, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙামাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্ত্তস্বর সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠ্‌তে থাকে নিঃসঙ্গ বাতায়নে একলা বসে সেটি শুনেচি, অনুভব করেচি, আর তাই লিখেচি।

অমিয়র চিঠিতে তুমি লিখেচ, সকালবেলাকার আলো-অন্ধকারের সময়কে প্রত্যুষ বলা হয়ে থাকে—সেই শব্দটাকে ব্যবহার করলে তার স্থলে প্রদোষ ব্যবহার করবার আভিধানিক দোষ কেটে যায়। প্রত্যুষ শব্দটা দিনরাত্রির একটি বিশেষ সময়কে নির্দ্দেশ করে—অর্থাৎ যাকে বলে ভোর বেলা। ভোরে বা সন্ধ্যায় আলোকের অস্ফুটতায় যে একটি বিশেষ ভাব মনে আনে, প্রত্যুষ শব্দে সেটাকে প্রকাশ করা হয় না। প্রদোষ শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করি এবং করব। দোষ শব্দের অর্থ রাত্রি,—প্র উপসর্গটা সামনের দিকে তর্জ্জনী তোলে—অতএব ঐ শব্দটাকে বিশ্লেষণ করে দুই

অর্থই পাওয়া যেতে পারে,— অর্থাৎ যে সময়টার সম্মুখে রাত্রি, অথবা রাত্রির সম্মুখে যে সময়। রাত্রির প্রবণতা যে দিকে।— কিন্তু শব্দ বিশ্লেষণের দরকার নেই, দরকার আছে twilight শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়ার। প্রদোষ শব্দটা সাধারণত বেকার বসে থাকে তার দ্বারা আমি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করব, যেহেতু অন্য কোনো শব্দ নেই।

তুমি আমার কাব্য বিশ্লেষণ করে বই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েচ তার নাম দিতে চাও রবিরশ্মি। রবিকে উহ্য রেখে রশ্মিচ্ছটা নাম দিতেও পারো। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৩৯।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার গ্রন্থে আমার লাইন উদ্ধৃত করবে তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার অনেকগুলি কাব্যই বিশ্বভারতীর, কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি নেওয়া দরকার হবে। ইদানীংকার যে বইগুলোর স্বত্ব আমার সে সম্বন্ধে কোনো বিপদ নেই।

১০৩

২১ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পরে বৃহস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা কোরো। আমাদের

জীবনে, সুতরাং সাহিত্যেও, হয়তো কোনো একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙি নৌকো বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসচে সেদিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে। সেই দিনেই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্চে সেই শ্রাবণ দিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক,—সেদিনটা বিশেষ দিন নয়, সেদিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায়নি। অতএব আমার ইতিহাসে আর তোমাদের ইতিহাসে এইখানে বাদ প্রতিবাদ হবেই, দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে আমাদের হাতে নেই। আদালতে তোমাদেরই জিৎ রইল। আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে। শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে। তুমি বল্‌বে, ওটা কাল্পনিক, আমি বল্‌ব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিস্টিক্। এমনতরো কথা কাটাকাটি করলে কথার অবসান হবে না।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয়তো কি—নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি

বল্‌চ তুমি তার ধ্বনি শুনেচ, কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেচি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্ত্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয় তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিই নে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই। ইতি ৪ কার্ত্তিক ১৩৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪
২৭ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে গানটি পাঠিয়েছ সে গানে প্রদীপ শিখায় ও কবির চিত্তে কোনো প্রভেদ আছে বলে মনে করি নে। উতল হাওয়া যাকে বলা হচ্চে সেও একান্ত বায়ব্য পদার্থ না হতে পারে। অবশ্য ব্যাপারটা আত্মজীবনীর একাংশ নয়। মানুষের একটা কাল্পনিক আত্মজীবনী আছে, সেখানে তার নানা অনুভূতির অবাস্তব লীলা। এ না থাকলে কেবলমাত্র কবিজীবনীর সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করে গীতিকাব্য লেখা অসম্ভব। অন্তরে অনেকবার যে সব ভাব নানা উপলক্ষ্যে

ভাবিত হয়েচে, বিস্মৃত হয়েচে, প্রেতশরীরীর মতো তারা ঘুরে বেড়ায় মনের কোণে কোণে, তাদের সূক্ষ্ম সত্তা নিয়ে। এই সূক্ষ্মতাবশতই বিবিধ রূপ দিয়ে তাদের আবদ্ধ করা সহজ।

প্রদীপ শিখার সঙ্গে ভোরবেলাকার তারার স্বাভাবিক সখিত্ব। উভয়েরই জীবনের চরম কথাটি সেই সময়ে আসন্ন আলোকে বিলীন হবে, অন্তিম মুহূর্তের জানাশোনা হবে দুজনের। সেই যে তাদের বাণী মরণ দূতের জন্যে অপেক্ষা করচে— উতল হাওয়ার কানে কানে সেই কথাটি দেবার ইচ্ছা আছে শ্রীমতী দীপশিখার। অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অকথিত বাণীর বেদনাগান এ'কে বলা যায়। এ গান কত ঘরে কত কুণ্ঠিত হৃদয়ে বসন্ত নিশীথে গুঞ্জরিত হয়ে উঠ্‌চে— কবি তাকেই সুর দিয়েচে। যার প্রয়োজন সে এ'কে গ্রহণ করতে পারে, যার প্রয়োজন নেই সেও হয়তো দেখ্‌বে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তারো মনের কোথায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ইতি ১১ই অগ্রহায়ণ রবিবার।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫

২৩ জানুয়ারি ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে প্রশ্নগুলি করেচ, সে তোমার নিজের নয়, সে পরের. সেই জন্যে তার জবাব দিতে ইচ্ছে করে না। প্রশ্ন-

গুলির মধ্যে অন্তত একটিতে কৈফিয়তের দাবী আছে, তার জবাবদিহী করতে আমার ধিক্কার বোধ হয়। তুমি ছাড়া আর কারো পত্রের উত্তরে কথা কইতুম না।

তোমাদের কবি অধ্যাপক বলেচেন আমি আদর্শবাদ ভাববাদ নিয়ে কল্পনা বিলাস করি, "প্রকৃত বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্রে" অবতীর্ণ হইনি। মুস্কিল ঐ প্রকৃত বিশেষণ নিয়ে। বৈষয়িক শব্দের চলিত অর্থ যদি গ্রহণ করো তাহলেও এ কথা নিশ্চিত তোমরা জানো, যে সময় ঐ কবিতাটি লিখেছিলুম সে সময়ে পুরাপুরিই বিষয় কাজে নিযুক্ত ছিলুম—এবং এ কাজে খ্যাতিও পেয়েছি। তার অনতিকাল পরে আমি পল্লীর কাজে শিক্ষার কাজে আমার অর্থ আমার স্বাস্থ্য আমার সংসার ভাসিয়ে দিয়েছি। বাংলা দেশ ছাড়া অন্য সকল দেশের লোকই এ খবর ভালো করে জানে। বাঙালীর মুখে অনেক বার শুনেছি আমি কেবল কবিত্বই করে থাকি—তার কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বাংলা দেশে জন্মেছি। যা সুপ্রত্যক্ষ তাকেও যারা চোখে দেখতে পায় না তাদের সেই অন্ধতার মূলে যে চিত্তবৃত্তি আছে তার সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করাই ভুল। আজ ৩৫ বৎসরের দুঃসহ দুঃখে ও দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে যা আমি আমার প্রদেশবাসীদের দেখাতে পারি নি আজ তা প্রমাণের চেষ্টা করে কী হবে।

২। যে-প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখ দুঃখের সম্বন্ধ মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেল। যে নিয়ে যায়,

মৃত্যুর ছদ্মবেশে সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী, পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাব চির পরিচিত মুখশ্রী। কোনো পৌরাণিক পরলোকের কথা বলচি নে সে কথা বলা বাহুল্য এবং কাব্যরসিকদের কাছে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে বিবাহের অনুষ্ঠানটা রূপক। পরলোকে আমাদের প্রাণসঙ্গিনীর সঙ্গে ঠিক এই রকম মন্ত্র পড়ে মিলন ঘটবে সে আশা নেই। আসল কথা পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।

৩। ধরণীর ধুলায় তো আজও আছি তবু নিশীথ আকাশের দিকে যখন তাকাই তখন মনে যে আনন্দ পাই সেই আনন্দের সম্বন্ধটা কি অস্বীকার করতে হবে। নক্ষত্রের সঙ্গে এই আনন্দের পরিচয় আমাদের নেই না কি। অন্তত আমার তো আছে। আমি কখনো কখনো রাত তুটোর সময় বিছানা ছেড়ে বাইরে দাঁড়িয়েছি সে কেবল ঐ আকাশভরা নক্ষত্রের ডাকে— সেই কথাটাকেই কাব্যে বলেছি—

লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।

৪। উর্ব্বশী যে কী কোনো ইংরেজি তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে চাই নে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্য্য মাত্রই এব্‌স্ট্র্যাক্ট— সে তো বস্তু নয়— সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ উর্ব্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য— সেই জন্য

কোনো কর্ত্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্ত্তব্য বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল এব্‌স্ট্র্যাক্ট সৌন্দর্য্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যে হেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য্য সেই জন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটি বলেছেন উর্ব্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সে জন্যে আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণ করেছি সে ফুলও নয় প্রজাপতিও নয় চাঁদও নয় গানের সুরও নয়— সে নিছক নারী— মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়, যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই।

হায় রে অদৃষ্ট, কবিকে এমন করে কাব্যব্যাখ্যা করতে হয়। এক একসময় সন্দেহ হয় যে-অন্ধতায় আমার প্রত্যক্ষ কর্ম্মকে অগোচর করে রাখে সেই জাতীয় অন্ধতায় আমার কাব্যের অর্থকেও আচ্ছন্ন করে। তাই আমার ব্যাখ্যায় কোনো ফলের আশা করি নে। ইতি ১০ মাঘ ১৩৩৯।

রবীন্দ্রনাথ

১০৬

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মনে রাখতে হবে উর্ব্বশীকে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়,

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্ত্তকী, দেবলোকের অমৃতপান-সভার সখী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয় নারীর সৌন্দর্য্য নিয়ে। হোক্ না সে দেহের সৌন্দর্য্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপ-সৌন্দর্য্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্ব্বশীতে সেই দেহসৌন্দর্য্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েচে। সে যেন চির যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত— তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য্য।

কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য। রসবোধের সঙ্গে পেটুকতার যে তফাৎ এতেও সেই তফাৎ। ভোজনরসিক যে, ভোজ্যকে অবলম্বন করে এমন কিছু সে আস্বাদন করে যাতে তার রুচির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করে। পেটুক যে, তার ভোগের আদর্শ পরিমাণগত, রসগত নয়। সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয় তবুও তা অনির্ব্বচনীয়। উর্ব্বশীতে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দেহধারণ করেচে সুতরাং তা এব্‌ষ্ট্র্যাক্ট নয়।

মানুষ সত্যযুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্তভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায়, সে যে এব্‌স্ট্যাক্টভাবে কেবলমাত্র তার ধ্যানেই আছে কোনোখানেই তা বিষয়ীকৃত হয় নি একথা মান্‌তে তার ভালো লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গলোকের অবতারণা। যা আমাদের

ভাবে রয়েছে এব্‌স্‌ট্যাক্ট, স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ। যেমন যে-কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে প্রত্যহ দেখতে পাইনে অথচ যা আছে আমাদের ভাবে, সত্যযুগে মানুষের মধ্যে তাই ছিল বাস্তবরূপে এই কথা মনে করে তৃপ্তি পাই—তেমনই এই কথা মনে করে আমাদের তৃপ্তি যে, নারীরূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্ব্বশী মেনকা তিলোত্তমায়। সেই বিগ্রহিণী নারী-মূর্ত্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্ব্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।

অন্তত পৌরাণিক কল্পনায় এই উর্ব্বশী একদিন সত্য ছিল যেমন সত্য তুমি আমি। তখন মর্ত্ত্যলোকেও তার আনাগোনা ঘটত, মানুষের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ ছিল—সে সম্বন্ধ এব্‌স্ট্র্যাক্ট নয় বাস্তব। যথা পুরুরবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই উর্ব্বশী। আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে—কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিমা কোথায় গেল!

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশি।—একটা কথা মনে রেখো।—উর্ব্বশীকে অবলম্বন করে যে-সৌন্দর্য্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হোতো—হয় তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচু সুর লাগত। কিন্তু রসিক লোকে কাব্যের বিচার এমন করে করে না। উর্ব্বশী উর্ব্বশীই, তাকে যদি নীতি উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী করে গড়তুম তাহলে ধিক্কারের যোগ্য হতুম।

সেকালে উর্ব্বশী অনেক মানুষকে কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট

করেচেন। একালে ইন্দ্রদেব তোমাকেই পাঠিয়েচেন আমার কর্ত্তব্য মাটি করবার জন্যে। অথচ এটা প্রোফেসারীয় কর্ত্তব্য —কবির কর্ত্তব্য নয়, অতএব আমার উচিত ছিল এই কর্ত্তব্যকে শ্রদ্ধা করা। ইতি ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭
২ অক্টোবর ১৯৩৩

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে মায়া শরৎঋতুতে সূর্য্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে। মনকে রাঙিয়ে তোলে, এমন কোনো কথা বলে না, যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ক্ষণিকার "আবির্ভাব" কবিতায় একটা কোনো অন্তর্গূঢ় মানে থাকতে পারে কিন্তু সেটা গৌণ, সমগ্রভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে, সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তাহলে আর কিছু বলবার নেই।

তবু "আবির্ভাব" কবিতায় কেবল সুর নয় একটা কোনো কথাও বলা হয়েছে সেটা হচ্চে এই যে, একসময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুনমাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি

রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণগন্ধগান নিয়ে ; সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব— তার আশা আকাঙ্ক্ষার একটি বিশেষ বাণী ছিল। তারপরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল তখন সেই প্রথম যৌবনের বসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যাম সমারোহ— জীবনে বাণীর বদল হোলো, বীণায় আর এক সুর বাঁধতে হবে ; সেদিন যাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখচি আর এক মূর্ত্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্চি তার অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ সে এক হলেও তার জন্যে একই আসন মানায় না।

খেয়ার "অনাবশ্যক" কবিতার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বলে মনে করি নে। আমাদের ক্ষুধার জন্যে যা অত্যাবশ্যক, তার কতই অপ্রয়োজনে ফেলাছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে-ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই— সেই অনাবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি অথচ বঞ্চিত হয় সে, যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রতিদিন দেখতে পাচ্চি সংসারে যেখানে অভাব সত্য সেখান থেকে নৈবেদ্য প্রচুর পরিমাণেই বিক্ষিপ্ত হয় সেই দিকে যেখানে তার জন্যে প্রত্যাশা নেই, ক্ষুধা নেই।

তোমাকে যদি কাছে পেতুম তাহলে খাটিয়ে নিতুম প্রাচীন কবিতা সঙ্কলনে। দেখলুম কাজটা সহজ নয়, কেননা মনের

মতো জিনিষ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। হয়তো মনটা অত্যন্ত বেশি খুঁৎখুঁতে।

ইংরেজি ভাষায় বাংলা কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে আমার সংশয় ঘোচে না যে হেতু ইংরেজি ভাষার ঠিকমতো নাড়িজ্ঞান আমাদের হতেই পারে না। আধুনিক ইংরেজি কাব্যের অন্তরে বাহিরে নতুন যুগের মিস্ত্রি লেগেছে—এতই রূপান্তর হচ্চে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমাদের দেশের কোনো কারিগরের পক্ষেই সম্ভব নয়। ললিতবাবুকে বোলো এণ্ড্রুজ সাহেবকে তাঁর লেখা পাঠাতে, তিনি যদি পছন্দ করেন তবে Unwin বা আর কোনো প্রকাশকের জিম্মে করে দিতে পারেন—আমার ভরসা নেই। এণ্ড্রুজ কাল এখানে এসেচেন। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮

৫ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু শরীরটা রীতিমত অপটু। অথচ কাজের দায় ঘাড়ে চেপে আছে। সেই Oxford Book of Bengali Verses মাথার উপর ঝুলচে। ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু কাজ সেরেচি। রামায়ণ মহাভারত থেকে ভদ্র রকমের দুই একটা টুকরো পাঠাতে পারো? সে যেন স্বাদেশিক সাহিত্যের তিলক পরা

না হয় যেন সার্ব্বদেশিক সাহিত্যের যোগ্য হতে পারে। অলমতিবিস্তরেণ ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩

তোমাদের
কবি

১০৯
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, নিজের কবিতার মধ্যে এমন অনেক কথা থেকে যায় যার ঠিক অর্থটি সেই কবিই দিতে পারে যে সেটা সদ্য বসে সেটা লিখছিল। অন্তত তার মনে তৎকালে অর্থটা সুস্পষ্ট ছিল অনবলুপ্ত কর্পূরের গন্ধের মতো। তার বহুকাল পরে অর্থের আভাসমাত্র থাকে, প্রকাশটা হয় ক্ষীণ। তখন অর্থবিচার সম্বন্ধে সে বিচারকের পদ নিতে পারে না, দশজন জুরির মধ্যে একজন হতে পারে মাত্র।

জীবনে অনেক সুখদুঃখ অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার স্থায়িত্ব নেই যা চেতনায় আবির্ভূত হতে হতেই বিস্মৃতির নেপথ্যে সরে যায়। কেবল নিজের ব্যক্তিগত জীবনে নয় সকল মানুষের জীবনে। সেই সকল ঘটনার বেদনা যতই প্রবল হোক তারা খবরের কাগজে ব্যক্তিগত নিদারুণ সংবাদের ছোটো ছোটো প্যারাগ্রাফের মতো এবেলার বার্ত্তা ওবেলা যায় মিলিয়ে। এইগুলোকে বলা যেতে পারে শ্রাবণের

রাত্রির বর্ষণ, অন্ধকারের মধ্যে মুখরিত হয়ে চলেছে আংশিক এবং ক্ষণিক গোচরতার মধ্যে। ভেবে দেখ না এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের পাড়ায় মানব জীবনের যে অগণ্য সুখদুঃখ ক্রন্দিত হয়ে উঠ্‌চে সে কত বড়ো মোটা পর্দ্দার পিছনে। সাহিত্যে সেইগুলি নিয়ে যা সৃষ্টি করব সে হচ্চে সংসারের বহু বিস্মৃতিরই ধারাপতন। ইতিহাসের বড়ো বড়ো জিনিষ রক্ষিত হচ্চে নানা আকারে, তারা আমাদের স্মৃতিসম্পদ; যেগুলি অখ্যাত অগোচর অথচ যেগুলি প্রত্যেক মানুষেরই চেতনায় প্রতিমুহূর্ত্তে তরঙ্গিত সেই সমস্ত আশুবিলীয়মান পদার্থকে রূপ দিতে চাই যে রচনায় তারই ধারাকে খুব সম্ভব কবি জীবনের শ্রাবণরাত্রির বিস্মৃতিবৃষ্টি বলেচেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা স্মৃতি অধিকার করবে বটে কিন্তু মূলে তারা বিস্মৃতিপুঞ্জ, সংসারের বর্জ্জনাধারে তারা বিলোপের অপেক্ষা করচে। ইতি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১০
২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

রুদ্ধগৃহ অনেক দিনের লেখা। পড়তে গেলে অন্য কারো রচনা বলে বোধ হয়। তুমি প্রশ্ন না করলে ওর অস্তিত্বের

পরিচয় পেতুম না। কিন্তু ওর বিষয়বস্তুটা দুর্ব্বোধ মনে হোলো না।

জীবনে যখন কোনো বড়ো শোক আসে তখন মনে করতে পারি নে কালে তার ক্ষয় হতে পারে। নিজের কাছে নিজের শোকের একটা অভিমান আছে। এত তীব্র বেদনাও যে কোনো চিরসত্যকে বহন করেনা সে কথাটাকে আমরা সান্ত্বনাস্বরূপে গ্রহণ করিনে, তাতে আমাদের দুঃখের অহংকারে আঘাত লাগে। জীবনটা থাকে কালের চলাচলের পথে, তার বিশ্রামহীন চাকার তলায় গুরুতর বেদনার চিহ্নও জীর্ণ হয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসে। আমাদের কাছে প্রিয়জনের মৃত্যুর একটিমাত্র দাবি, সে বলে মনে রেখো। কিন্তু প্রাণের দাবি অসংখ্য, মনকে সে অহোরাত্রি নানাদিক থেকেই আকর্ষণ করতে থাকে—দাবির সেই উপস্থিত ভিড়ের মধ্যে মৃত্যুর একটিমাত্র আবেদন টিকতে পারেনা। মনে যদি থাকে স্মৃতির ব্যথা যায় ক্ষীণ হয়ে। কিন্তু শোকের অভিমান জীবনকে বঞ্চিত করে ও শোককে ধরে রাখতে চায়। চারিদিকের দরজা বন্ধ করে দেয়, প্রাণের দূতগুলিকে বলে দেয় not at home। প্রাণ আপন বিচিত্র ফসলের ক্ষেতকে উর্ব্বর করে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু শোক অভিমানী তার মাঝখানে একটা শোকোত্তর জমি রাখতে চায় সেইটেতে সাধের মরুভূমি বানায়। মৃত্যুর সঞ্চয় নিয়ে কালের বিরুদ্ধে তার মকর্দ্দমা। ভিতরে ভিতরে ক্রমেই হারতে থাকে কিন্তু হার মানাতে চায়না লেখক বলচে হার মানাই ভালো। মনকে নিজকৃত কবরে

জীবিত সমাধি দেবার মতো অভিশাপ কিছু হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে পরবর্ত্তীকালের "বলাকা"র ভাবের সঙ্গে এই লেখার মিল আছে। ইতি ২১।৯।৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১১
৭ এপ্রিল ১৯৩৬

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয় শ্রীমান কনক
ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী লীলার
শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্ব্বাদ—

দুর্গম সংসার পথে আজ হতে, হে যুগল যাত্রী,
প্রেমের পাথেয় নিয়ে পূর্ণপ্রাণে চলো দিনরাত্রি।
দুঃখের মিলাক দাহ, সুখের ঘুচুক মোহ ধন্ধ
আঘাতে সংঘাতে থাক্ অবিচ্ছিন্ন মিলনের বন্ধ।

২৫ চৈত্র
১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১২

২ জুন ১৯৩৬

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু আর তো পারা যায় না। ক্রমাগত ফরমাস আসচে নানাদিক থেকে। বিষয়টা এক কলমটাও এক অথচ বাণীকে করতে হয় বিচিত্র। তোমাদের অনুরোধ এড়াবার জো নেই— অতএব

যুগলযাত্রী করিছ যাত্রা,
নূতন তরণীখানি।
নবজীবনের অভয় বার্ত্তা
বাতাস দিতেছে আনি।
দোঁহার পাথেয় দোঁহার সঙ্গ,
অফুরান হয়ে র'বে।
সুখের দুখের যত তরঙ্গ
খেলার মতন হবে।

ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৩
২৯ অগস্ট ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কনক চলে যাবার পরে বজেটের মীটিং বসেছিল। আবিষ্কার করা গেল তহবিলে ভাঁটা পড়েছে। বেতন দেবার পরিমাণ সামর্থ্য নেই। কারণ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ধনভাণ্ডারে সর্ব্বত্রই সুদ কমে এসেছে—অতএব আয় ব্যয় সমন্বয়ের দুঃসাধ্য সাধনায় ইচ্ছাকে সংযত করতে হোলো। যদি শনিগ্রস্ত আমার ভাগ্যেও সুদিন আসে তাহলে আমন্ত্রণের পথ খুলতেও পারে। ইতি ২৯ অগস্ট ১৯৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৪
১৬ এপ্রিল ১৯৩৭

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

নববর্ষারম্ভে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের কল্যাণকামনা গ্রহণ কর। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫

২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কোনো আপত্তি নেই— রবিরশ্মির অসম্পূর্ণ অংশকেও যদি রবির নামের সম্মতি দিতে চাও তাতে দোষ কী। ইতি ২৩।১।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৬

৩০ জানুয়ারি ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে উৎসর্গ পত্র রচনা করেছ তোমার রবিরশ্মির প্রথম ভাগে তা ব্যবহার করতে পারো, আমার সম্মতি আছে। ইতি ১৬ মাঘ ১৩৪৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৭

১৩ মে ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নিজের অন্তরের জিনিষকে বাহিরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দেখতে অদ্ভুত লাগে। তখন সেটাকে পরিচয়ের দৃষ্টি থেকে দেখি নে, দেখি কৌতূহলের দৃষ্টিতে। অনেকদিন বেঁচে আছি তাই আমার রচনার আরম্ভ অংশ প্রাগিতিহাসের কোঠায় পড়ে গেছে— বর্তমান ইতিহাসের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত, নইলে আজ মানুষ জন্মাত না, সঙ্কোচে তিনি আদি জীবসৃষ্টির চিহ্ন চাপা দিয়েছেন মাটির নিচে। বৈজ্ঞানিক গুপ্তচর তাঁর সৃষ্টির আব্রু নষ্ট করতে উদ্যত। আমার কাব্যেরও সেই দশা। দ্রৌপদীর লজ্জা শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন, আমার কবিতার লজ্জা তোমরা রাখলে না। বনফুল বইখানার জন্যে ততটা ক্ষোভ নেই, কেননা সেটা সত্যিই কাঁচা। কিন্তু কবিকাহিনীতে ভগ্নহৃদয়ে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে, এই জন্যেই ওদের কৃত্রিম প্রগল্‌ভতাকেই বলা যায় জ্যাঠামি। সদরে তার প্রদর্শনীটা ভালো নয়। তখনকার কালে এই কাঁচা পাকার অবস্থা ছিল বাংলা দেশের সর্বত্রই— এই জন্যেই কবিকাহিনী পড়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ উদীয়মান কবির জয়ধ্বনি করেছিলেন, ভগ্নহৃদয় পড়ে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য বালক কবিকে সম্মান

জানাবার জন্যে তাঁর বৃদ্ধমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা দেশের সেই বাল্যলীলার পর্ব ঘুচেছে, কিন্তু অনেকখানি আছে স্ত্রৈণতা, মা বলতে সে অজ্ঞান, আর প্রিয়ার তো কথাই নেই। আতুরে সাহিত্য, তাতে মেয়ের প্রশ্রয়ই বেশি, বেশ একটু আর্দ্রভাবের সেন্টিমেণ্টালিটি। বাল্যযুগের পরবর্তী আমার সাহিত্যে (বিশেষত সন্ধ্যাসঙ্গীত আদিতে) সেই স্যাৎসেঁতে ভাব রোগের মতো লেগে আছে। আছে তাতে সাধারণের দরদ পাবার আগ্রহ। সেটা ক্রনিক হয় নি এই আমার রক্ষা, নইলে কোন্‌কালে সেই রুগ্ন কাব্যের নাড়ী ছেড়ে যেত। তুমি তার সেই সেকালের সর্দ্দি-ধরা গদ্‌গদ বাণীকে যখন কিছুমাত্র খাতির করেছ, তখন আমি কুণ্ঠিত হয়েছি। অনেক চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু তোমাদের ঠেকানো যায় না। যে অবলা প্রাণী ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে বাঁচতে চায়, শিকারীর আনন্দ তাকেই লক্ষ্য করতে। লাগিয়েছ ফাঁস, এনেছ টেনে। যা হোক্‌ ভাগ্যক্রমে সেই আদ্যযুগই আমার অন্তিম যুগ হয় নি। তাও জোর করে বলা যায় না। আধুনিক যুগীয় জীবের অমানুষিক মোটা মোটা দাঁত উঠেচে দেখে ভয় লাগে, তাদের পাতে লেহ্য চোষ্য তো চল্‌বেই না, ভদ্ররকম চর্ব্যও নয়— রূঢ়ভাবে তাদের শ্বানীন (?) দন্ত (canine teeth) দিয়ে প্রচণ্ড ভঙ্গীতে ছিঁড়ে খাবার জিনিষ তারা পছন্দ করবে বলে মনে হয়। আমরা যে সুপক্ক জিনিষের ভোজকে সভ্যমানবোচিত মনে করে এসেছি তার প্রতি অবজ্ঞা করে ওরা হাসবে, বলবে অতিসভ্যতা মানুষের দাঁত

খারাপ করে দিয়েছে, স্বাদকেও করেছে কৃত্রিম; বেশি আদর দিয়েছে রসনাকে। ভয় হচ্চে কথাটার মধ্যে হয় তো কিছু সত্য আছে। জীবকে প্রকৃতি প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী নয়;— তৎসত্ত্বেও সন্তানবৎসলা মায়ের মতো মানুষকে প্রকৃতি দুর্বলতাবশত আদুরে করেছে বেশি, হয় তো শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবার পক্ষে তার ফল ভালো নয়। সদ্যস্ক ভাবীকালের দিক থেকে এই রকমের নির্মম কথাই কানে ভেসে আসচে। অবশ্য চিরন্তন ভাবীকালের কী রায় তা নিশ্চিত জানি নে, মামলায় হাইকোর্টে জিৎ নিয়ে কিছুকাল হাঁকডাক করে শেষকালে প্রিভিকৌন্সিলের বিচারে জিতের ধন ফেরৎ দিতে হয় এমনো দেখা গেছে। যেমন ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ তেমনি রুচির আইনেরও। অতএব খ্যাতিটাকে নিয়ে উৎফুল্ল কিম্বা অবসাদগ্রস্ত হবার জরুরী দরকার নেই, ওটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই ভালো। আমি সে চেষ্টা করে থাকি কিন্তু সিদ্ধপুরুষ হয়েছি জেনে শিবনেত্র হয়ে বসবার সময় এখনো আসেনি। যদি আসে তাহলে পৃথিবীতে খাঁটি ও মেকি মজুরীর শেষ ময়লা ঝুলিখানা ফেলে দিয়ে হাল্কা হয়ে পারের খেয়ায় চড়তে পারব। ভাগ্যের কাছে এই শেষ আশীর্বাদটাই চাই। সে সব চরম কথা থাক। তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌরব বোধ করি কিন্তু একটা কথা এই মনে হয় কাব্যরস আস্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশি যত্নে পথ দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়। নিজে নিজে সন্ধান করা ও আবিষ্কার করায় সত্যকার আনন্দ। তা ছাড়া কাব্যের কেবল

একটা মাত্র বাঁধা মানে না থাকতে পারে— তার আসনে এতটা স্থিতিস্থাপকতা থাকে যাতে ভিন্ন আয়তনের মানুষকে সে তার আপন আপন বিশেষ স্থান দিতে পারে। অনেক বিশেষ কাব্যকে বিশেষ প্রকৃতির লোক স্বভাবতই বুঝতে পারে না, সভা থেকে তাদের চলে যাবার দরজা খোলা রেখে তাদের সহজে বিদায় নিতে দেওয়া ভালো। চাদর ধরে টেনে এনে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টায় সত্য ফল হয় না। ধরে নেওয়া চাই রসের সামগ্রী অনেকের কাছে অনাস্বাদিত থাকবেই— জ্ঞানের সামগ্রীও তাই। এই নিয়ে মনের ক্ষোভ মেটাবার জন্যেই কবি বলেছেন ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ। যে ভিন্নতা স্বাভাবিক তাকে প্রসন্ন মনে সেলাম করে দূরে চলে যাওয়াই ভালো। নিজের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে কেউ যে কাব্য বিচার করবে না তা নয়, কিন্তু তাতে অনেকখানি ফাঁক থাকা চাই, নিরেট ঠাসা গাইডবুক সাবালক ভ্রমণকারীর স্বাধীন চেষ্টাকে প্রতিহত করে। উত্তরে বল্‌তে পারো সংসারে নাবালকের সংখ্যা বিস্তর আছে— আমি বলি ও পথে তাদের না চলতে দেওয়াই ভালো।

আমার কথা যদি বলো আমি বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে তোমার বই পড়েছি, অনেকদিন ধরে অনেক লেখা লিখেছি— সকলের প্রতি আমার সমান টান নেই— অনেকের প্রতি আমি নিষ্ঠুর, অনেকের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। তোমার অনুসরণ করে তাদের সঙ্গে পদে পদে মোলাকাৎ হোলো। কাউকে চিনলুম, কাউকে চিনলুম না, কাউকে নতুন

দেখায় দেখলুম। মজা লাগল এই মনে করে যে, এদের সব দূরের থেকে দেখা, যেমন করে দেখা যায় অতীত কালের কবির কবিতাকে। কিন্তু অতীত কালের কবিতার একটা মস্ত সুবিধা আছে, বর্তমান কালের আবরণ থেকে তা মুক্ত। সাহিত্য, যা চিরকালের আদর্শেই বিচারযোগ্য, কাছের দৃষ্টিতে সে আত্মরূপকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে না। হাল আমলের সংস্কারগুলো কাছের বলেই প্রবল, সেই প্রবলতাকেই সত্যের নিদর্শন বলে হালের লোক বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাস নির্ভর-যোগ্য নয় বারে বারে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই জন্যেই বলি তোমাকে আর একবার জন্মাতে হবে। সে জন্যে তাড়াতাড়ি করার কোনো দরকার নেই, না করলেই সব দিকে ভালো। পাঠকদের কাছে তোমার বই ঔৎসুক্যজনক হবে বলে মনে করি— নিজের মতের সঙ্গে নিজের মত মিলিয়ে কখনো তারা এদিকে মাথা নাড়বে কখনো ওদিকে, যাদের কোনো মত নেই তারাও যেন বইখানা কেনে, যথাসম্ভব কাজে লাগবে— কিন্তু তাদের কথা চিন্তা করবার দরকার নেই। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৮

১৬ মে ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTI-NIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু চিঠিতে আমার কথা বোধ হয় ভালো করে স্পষ্ট হয় নি। না হবার কারণ, আমার মনটা আজকাল অস্পষ্ট। আমার ধারণা ছিল রবিরশ্মি সাহিত্যালোচনার উচ্চ পর্যায়ের। অর্থাৎ বাছাই করে সমগ্র কাব্যের একটা সুপরিস্ফুট মূর্তি এতে গড়া হবে। কিন্তু বইটা হয়েছে প্রধানত ছাত্রদের পড়বার জন্যে, তন্ন তন্ন ব্যাখ্যা— যাদের বিচারবুদ্ধি পাকা হয় নি তাদের পথ দেখিয়ে চলা, আগাগোড়া সমস্ত পথ। এর একটা প্রয়োজন আছে সেটা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাহিত্যসভার প্রয়োজন নয়। পথ যাদের অচেনা, সেই সব ছাত্রদের পরিচালনার কাজ এই বইয়েতে যথোচিতভাবেই হবে— বিদ্যালয়ে যাঁরা ক্লাস পড়াবেন তাঁদের পরিশ্রম তুমি বাঁচিয়েছ। সেদিক থেকে তোমাকে আশীর্বাদই করতে হবে। কিন্তু ভোজের নিমন্ত্রণ একে বলব না, সে নিমন্ত্রণে ভোজ্যেরও বাছাই এবং ভোক্তারও বাছাই অত্যাবশ্যক। কিন্তু তা নিয়ে তোমাকে দোষ দিতে পারি নে— কেননা সেটা তোমার উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না, অথচ আগে থাকতে সেইটেই আমি প্রত্যাশা করেছিলুম, দেয়ালকে রাস্তা মনে করে দুর্যোধনের মতো মাথা

ঠুকেছিলুম। দুর্যোধনের আক্ষেপে বিচলিত হোয়ো না, একটু হেসো। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৯
২০ মে ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার ঘরে যত আশীর্বাচন বর্ষণ করেছি এমন আর কোথাও না। শুভ ইচ্ছা ফুরোয় না কিন্তু বচন ফুরোয় যে। তরুণের গলায় বাগ্‌বাদিনী যে বরমাল্য দিয়েছিলেন প্রাচীনের গলায় আজ তা শুকিয়ে এসেছে।

প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের উপর তুমি যে প্রবন্ধ লিখেছ তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। হতে পারে তার একটা কারণ গুণগানের আকর্ষণে। কিন্তু গুণগান তো অনেক শুনেছি। মুখ মরে এসেছে। কিন্তু তোমার এই রচনায় যে একটি চিত্র সম্পূর্ণ হয়েছে তাতে কলানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। দ্রষ্টব্যকে সুস্পষ্ট করতে হলে এই রকম বাছাই কৌশল থাকা চাই, তাতে বহুলতার জায়গায় এই রকম ফুটে ওঠে সৌসাম্য, সেইটেই আর্ট। তোমার লেখনী থেকেই তারি অপেক্ষা করি, সেটা হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমগ্র। পেটুকের পরিবেষণ সেরে

নিয়েছ, এবার হোক্ রসিকের আমন্ত্রণ। সবটাকে দিতে গেলে আসলটাকে দেওয়ার ব্যাঘাত হয়। ইতি ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"UTTARAYAN"
SANTI-NIKETAN, BENGAL.

ওঁ

শ্রীমান পুলকের শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে আশীর্ব্বাদ

নবসংসার সৃষ্টির ভার
নত শিরে নিয়ো দুজনে,
মিলনাঞ্জলি যুগল হিয়ার
দিয়ো বিধাতার পূজনে।
কল্যাণ দীপ জ্বালায়ো ভবনে
বিশ্বেরে কোরো অতিথি,
মানবের প্রেমে জাগায়ো জীবনে
পুণ্য প্রেমের প্রতীতি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০

৩১ অগস্ট ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গল্পের প্লট অলস সময়ের সৃষ্টি, মনের কোণে মাকড়ষার জাল রচনা। এই ব্যস্ততার দিনে সে সমস্তই ছিঁড়ে সাফ হয়ে গেছে— মাকড়ষাটা সুদ্ধ ভেগেছে। এক সময় কোণগুলো তারা দখল করে ছিল এখন মগজের মধ্যে ঝাঁটিয়ে চলেছে কাজের কথা, ভারি ভারি বিষয়— তারা যে রাস্তা দিয়ে রথ হাঁকিয়ে চলে সে রাস্তায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির কণা মাত্র খুঁটে পাবার জো নেই। আবার যদি এই অকেজো বুদ্ধি নিয়ে জন্মাই অকেজো সময়ে, তখন গল্পের প্লটের দাবী যদি জানাও হয়তো পেতে দেরি হবে না। এখন দিন ফুরিয়েছে। ব্যস্ত আছি ক্লান্ত আছি এবং নিষ্কৃতির সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আছি। ইতি ৩১।৮।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সার ফিলিপ হার্টগকে লিখিত

[১৯২৪ ?]

Dear Dr. Hartog,

May I take the liberty of introducing to you my friend Mr. Charuchandra Banerji—Lecturer, Calcutta University—who has won rare distinction as a Bengali author and whose critical knowledge of Bengali literature I greatly admire. I am told that you want for Dacca University a lecturer for this subject—I know no one who is better fitted for this post than my friend.

Sincerely yours,
Rabindranath Tagore

২

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

১৬ মে ১৯৩৮

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রবিরশ্মি বইটা সম্বন্ধে চারুকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে করেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না। আমার কৈফিয়তে চারুকে যে

চিঠি লিখেছি তার নকল পাঠাই। তাঁর বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবস্থা ছাড়িয়েছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয় অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অতিশয় বেশি দিতে গেলে কম দেওয়া হয়। বোধ হয় চারু ক্লাস পড়াবার উপলক্ষ্যেই এটা লিখেছেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও থাকলে ভালো হোত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগ্য হত।

ঠাণ্ডায় আছি, লোক কম গরমও নেই। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

২০ ডিসেম্বর ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে মনে আত্মীয় বিচ্ছেদের শোক পেয়েছি। এই দুঃখের দিনে তোমাদের সকলের জন্য শান্তি ও সান্ত্বনা কামনা করি। ইতি ২০।১২।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

১

[১৯০৬ ?]

তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

২

[১৯০৮ ?]

অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরস হইয়াছে যে··· অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে— আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই— তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।

৩

[১৯০৯ ?]

বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে— বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে, ইহাই তাহার গর্ভবেদনা— এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে— যতক্ষণ

পর্য্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্ম্মুখী হইয়া না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে— নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম— ইহা মুক্তির বেদনা— একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়া-অবসান হইবে— 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে' কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি 'মুমুক্ষু'। নামটা কিছু কড়া গোছের বটে— যদি অন্য কোনো সুশ্রাব্য নাম মনে উদয় হয় তবে চয়নিকার প্রকাশককে জানাইয়া দিয়ো।

৪

[১৯১০ ?]

একরকম অনুবাদ আছে যাহা রূপ হইতে প্রতিরূপ আঁকার মত— তাহাতে কেবল চেহারাটা দেখা যায় কিন্তু সে চেহারা কথা কহে না— অর্থাৎ তাহাতে খানিকটা পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশই বাদ পড়ে। তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি— আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে— ইহা শিল্প কার্য নহে সৃষ্টি কার্য। বাঙ্গলা সাহিত্যে তোমার এই অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে— ইহাদিগকে পূর্ব নিবাসের পাস্

দেখাইয়া চলিতে হইবে না— তোমার তীর্থরেণু পুষ্পরেণু হইয়া উঠিয়া নূতন গন্ধে বাতাসকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

১৫ জানুয়ারি ১৯১৩

কল্যাণীয়েষু

সত্যেন্দ্র, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট। নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙার বন্দোবস্ত। সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটা বোঝা যায়— নিতান্ত গেঁয়ো রকমের। সমালোচকেরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদি— তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভালো লাগে এবং না লাগে সেইটুকু। সেটুকুর মূল্য কেবলমাত্র আমার ঘরে পাঁচ-দশ জনের কাছে, কিন্তু বড়বাজারে সে টাকা একেবারেই চলে না— এই দৈন্যটি বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই।

তাই ত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবো না কেন?— কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না

কেন? যে কবি সেই ত দ্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই।··· প্রভৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। এ সমালোচনা ত সাহিত্য-পথের মশাল নয়, এ কেবল চকমকি ঠোকা—ছোট্ট ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তার খটাখট্ শব্দটাই বেশি। এতে কি পথিকদের কোনো সুবিধা হয়? ইতি ২ মাঘ ১৩১৯।

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[১৯১৮]

সত্যেন্দ্র, তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে অন্যায় হবে না? আমার দৃষ্টিতে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকির উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তাহলে কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক নেই —ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ ক'রে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে—"কোথা জল, কোথা স্থল"—এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড় 'ল্' তত বড় নয়—সেইজন্যে জ-টাকে দেড়মাত্রা করতে হয়েছে। তোমার বিধি অনুসারে 'জল'কে একমাত্রা

করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেই ত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে।

"When we two parted" কবিতাটির সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা আমার মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু শেষকালে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করি নি— আমার অভিপ্রায় এই ছিল যদি কেবলমাত্র প্রথম লাইনটা পড়া যায় তাহলে সম-অসমমাত্রার ছন্দের লয়টা ইংরেজের কানে পরিচিত হতে পারে— মনে কর যদি এমন হত—

When we two parted
Silence and tears

তাহলে তো ছন্দভঙ্গ হত না— এমন অবস্থায় 'In'টাকে ফাল্‌তো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত ছন্দের মধ্যে ফাল্‌তো অংশের লক্ষণই এই যে, সেটাকে বাদ দিলে মূল ছন্দের তাল কাটে না— ও জিনিসটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আসনে ওঁর স্থান নেই। তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল— কিন্তু আমার বোধ হয় যে সেটা অনাবশ্যক।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

১

[২১ অগস্ট ১৯১২]

কল্যাণীয়েষু মণিলাল, আমি "শিশু"র গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে।···

আমি তর্জমার কাজে লেগেই আছি। এদের সকলেরই খুব ভাল লাগ্‌চে। আমার ইংরেজি যে কোনো সভ্যদেশে চল্‌তে পারে সে কথা আমি মনেও করতে পারতুম না কিন্তু দেখা যাচ্ছে একেবারে হুহুঃ শব্দে চল্‌ছে। ক্রমশ তার পরিচয় পাবে। চিত্রাঙ্গদা আমি সেরে ফেলেছি। আরো অনেকগুলো শেষ হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রকে বোলো সে যদি আমার কতকগুলো লেখা ইংরেজি গদ্যে (পদ্যে নয়) তর্জমা করে দিতে পারে আমি খুব খুসি হব। সে অনেকের কবিতা বাংলায় তর্জমা করেছে কিন্তু আমার কবিতা বাংলায় তর্জমা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই আমি বঞ্চিত হয়েছি; একবার ইংরেজিতে চেষ্টা করে দেখ্‌তে বোলো।···

তোমার রবিদাদা

২

৭ অক্টোবর ১৯১২

C/o. Prof. Seymour
Urbana
Illinois
U.S.A.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মণিলাল, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পাওয়া গেল। চৈতালির পরে তোমরা যে বইগুলো ছাপিয়েছ সেগুলো আমাকে পাঠালে না কেন ?

আমার ইংরেজি গীতাঞ্জলি ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বোধ হয় আর হপ্তাতুয়েকের মধ্যেই বের হতে পারবে। তারপরে আমার অন্যান্য তর্জমাগুলোর কপি প্রকাশকের হাতে দিয়ে আমি এখান থেকে অপ্রকাশ হব। আটলান্টিকের পারঘাটার দিকে পাড়ি দেব। সেইখানকার ঠিকানাতেই এবার থেকে চিঠি দিয়ো।

সত্যেন্দ্রের "কুহু ও কেকা" পড়ে আমি ভারি খুসি হয়েছি। সত্যেন্দ্র একলাই আমাদের বংলার কাব্যনিকুঞ্জকে একেবারে মুখরিত করে রেখেছে। অমর কবিসভায় ওর একখানি আসন যে ধ্রুব হয়েছে আমার মনে সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না।··· ২১ আশ্বিন ১৩১৯

তোমার রবিদাদা

২৭ অগস্ট ১৯১৬

Urbana

কল্যাণীয়েষু

মণিলাল, এখানে এসে অবধি চিঠিপত্র লেখা প্রায় বন্ধ আছে। ইংরেজি লেক্‌চার লিখেই দিন কাটচে— তারপরে এইগুলো আওড়াতে আওড়াতে কতকাল যাবে। প্রশান্ত সাগর পাড়ি দেবার আগে একবার তোমাদের কাছে আর এক দফা বিদায় গ্রহণ করা যাক্।···

এলাহাবাদে আমার যে সব বই ছাপবার জন্যে আয়োজন চলছিল তার কোন্‌টার কি হল? কেবল "ঘরে বাইরে" এবং "সঞ্চয়" পেয়েচি। শুনেছি "ঘরে বাইরে" নিয়ে অনেক রোখারোখি লেখালেখি চলেচে। দূরে থাকবার এই একটা মস্ত সুবিধে—তোমাদের ওখানকার কাগজের তুফান এই বৃহৎ পৃথিবীর আকাশে অতি ক্ষুদ্র মর্মরধ্বনিও তোলে না।

সত্যেন্দ্রের খবর কি? তাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। সত্যেন্দ্র একটা নাটক লিখবে আশা দিয়েছিল— তার অঙ্কুর কি দেখা দিয়েচে?

আমার আশীর্বাদ। ১১ই ভাদ্র ১৩২৩

রবিদাদা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্য কক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সংগীত তব দ্বারে।

জানি, তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ-সম;
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,

করুণ কোমল।   তুমি বঙ্গ-ভারতীর বীণা-'পরে
সোনার নূতন তার এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তার হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সংগীত; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া— রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও
বেঁধে গেলে বন্ধুত্ব বন্ধন, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি!

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে' গেলে দান
দূর কালে; কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়

অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে’— অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি’ শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই— কোন্ লোকে রাত্রি তব হ’ল ভোর,
উদয়গিরির তলে কোথা তুমি দাঁড়াইলে আজি,
নবসূর্য্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ?   সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রু সাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে সকরুণ বিদায়ের তান,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন আহ্বান।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে

আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক— সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি'
ঝরে পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি ওই খেয়া-'পরে করি' ভর—
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;
দক্ষিণের-দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্তপ্রভাতে,
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণদিনে, শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথরাত্রে ; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপনমনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি' ; সর্ব্ব আবরণ করি লীন

চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্ত্যকবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার; যদি কভু দেখা হয়
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়—
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে! যেমনি অপূর্ব্ব হোক্ নাকো,
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
বিজড়িত— আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে— ব্যর্থ নাহি হোক্ এ কামনা।

১৮ই আষাঢ়
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট ১

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -লিখিত পত্র ও প্রাসঙ্গিক রচনা

১২ মে ১৯২৭

ওঁ

রমণা, ঢাকা।
২৯এ বৈশাখ ১৩৩৪

শ্রীচরণকমলে

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন, ময়মনসিংহে আপনার জন্মদিনের উৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হলো। এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগী সেখানকার উকীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী নীহারকণা; উৎসবের সমস্ত ব্যয় এঁরাই বহন করেছেন। নীহারকণা "আর্ট ও আহিতাগ্নি"-রচয়িতা শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেনের ভাগিনেয়ী। আপনার প্রতি ভক্তি তাঁর অসাধারণ।

ময়মনসিংহে আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো যাঁরা আপনার বিশেষ ভক্ত। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার এবং শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী শোভনা গুপ্তা।

সম্প্রতি হরানন্দবাবুর বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে; চোরে তাঁদের সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে। একটা সুট্-কেস খুল্‌তে না পেরে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো; সেই সুট্-কেসে আপনার কতকগুলি চিঠি ছিলো, সেইগুলি অপহৃত বা দগ্ধ হয় নি। এতে শোভনা আনন্দিত হয়ে পিতাকে ব'লেছিলেন— বাবা, গহনা কাপড় জামা গেছে, আবার হবে; কিন্তু

চিঠিগুলি গেলে যে ক্ষতি হতো তা তো পূরণ হতো না। চিঠিগুলি যে বেঁচেছে এই আমাদের পরম লাভ ও আনন্দের বিষয়!

শোভনার এই উক্তি ময়মনসিংহ-ময় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

আমি আমার অভিভাষণে জগতের সকল কবির চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ ব'লেছি ব'লে কেউ কেউ আমার উপর বিরক্ত হয়েছে শুনলাম। কিন্তু এও শুনলাম যে তাঁরা আপনার রচনা হয় একটাও বা অধিক পড়েন নি। এই রকম মূঢ় লোকেরাই আপনার অপূর্ব্ব দানের মহামূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাদের আপত্তি আমি তুলনায় সমালোচনা করেছি। আমি এই কর্ম্ম ক'রে বহু কাল থেকে বহু লোকের বিরক্তি-ভাজন হয়েছি; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিবাদ প্রথম আমিই প্রবাসীতে তাঁর "আলেখ্য" বই সমালোচনা-প্রসঙ্গে করি। জীবনের অবশিষ্ট দিন কটাও আপনার মহিমা কীর্ত্তন ও প্রচার করেই কাটবে। আপনার কবিতাগুলি বুদ্ধি ও মনের শৃঙ্খল মোচন করে, আপনার গানগুলি বাঙালীর জীবন-বেদ! শোকে দুঃখে সান্ত্বনা, আনন্দে উৎসাহ, ক্লান্তিতে রসায়ন। আপনার প্রবন্ধগুলি যুক্তির শাণ-যন্ত্র! এই সত্য জানা কথাও লোককে বোঝাতে হয় এই আমার দুঃখ।

সেবক
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ এপ্রিল ১৯৩১

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY
House Tutor, Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA
Dacca Hall
RAMNA, DACCA

১লা বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীচরণকমলে নিবেদন,

আজ নববর্ষে আপনাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি। আমার জীবনের শিক্ষাদীক্ষা আনন্দ অনেকখানি আপনারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান। এইজন্য আপনি জগদ্‌গুরু হলেও বিশেষ ক'রে আমার গুরু। আমি নিত্য আমার আহ্নিককৃত্যের পরে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কল্‌কাতা থেকে ঢাকায় আসায় আমার সকল রকমে সুবিধা হলেও আপনার দর্শন লাভে বঞ্চিত হয়ে থাকায় বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়ে আছে। আপনার জন্মোৎসবে এবার আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য বিশেষ উৎসুক হয়ে আছি।

আপনাকে আমি নিত্য স্মরণ করলেও আমি আপনাকে পত্র লিখ্‌তে সাহস করি না। আমি যদি কখনো পত্র লিখি তবে আপনার সুবিধা হলে উত্তর দিবেন, নতুবা দিবেন না, তাতে আমার কোনো দুঃখ হবে না।

এখানে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আছেন, তাঁকে আপনি চেনেন। তিনি বাংলা ভাষার গীতিকবিতার একটি চয়নিকা কর্‌ছেন। আমাকেও তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। আমরা আদিমতম বাংলা থেকে আরম্ভ করে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লেখা কবিতার মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট কবিতা বেছে নিয়ে মনোজ্ঞ চয়ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। আপনার কবিতা থেকে বাছাই ক'রে নেওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হয়েছে। আপনার কবিতা দিয়েই বইখানি ভ'রে দিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু মোটের উপর আপনার কবিতা চল্লিশটির বেশি নেওয়া যাবে না। এখন আমাদের সমস্যা হয়েছে কোনটি রেখে কোনটি দেওয়া যায় তা স্থির করা। আমি যেটি নিতে চাই, তিনি বলেন অন্যটিই বা না নেওয়া যাবে কেন। সবই নিতে ইচ্ছে করে ব'লে আপনার কাছে এসে আমাদের নির্ব্বাচন থেমে গেছে। সে যাই হোক, যে কোনো চল্লিশটি কবিতা গ্রহণ ক'রে আমাদের চয়নিকার গৌরব বৃদ্ধি কর্‌তে পারি এই অনুমতি আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি।

আর একটা প্রার্থনাও আমাদের আছে। যদি আপনি অনুগ্রহ ক'রে ঐ কাব্য চয়নিকার একটি ভূমিকা লিখে দেন তবে আমাদের সৌভাগ্যের কথা হয়। বাংলা গীতিকবিতার উৎপত্তি পরিণতি বিশেষত্ব সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু লিখে দিতে স্বীকৃত হন তা হলে আমরা পরম সৌভাগ্য বিবেচনা কর্‌ব।

আমাদের এই চয়ন ইংরেজী প্যাল্‌গ্রেভের গোল্‌ডেন ট্রেজারী অফ সঙ্গ্‌স্‌ এণ্ড লিরিক্‌স্‌ চয়নের অনুযায়ী কর্‌বার ইচ্ছা। খুব সুন্দর ক'রে ছাপতে রাজি হয়েছেন এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস।

এখন আমাদের সাফল্যের নির্ভর আপনার দয়ার উপর।

প্রণত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ অক্টোবর ১৯৩২

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER DACCA UNIVERSITY
House-Tutor, Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA
Dacca Hall
RAMNA, DACCA

১১ অক্টোবর ১৯৩২

শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ বিজয়ার পরদিন পেয়ে ধন্য হলাম, এই আশীর্ব্বাদ আমার জীবনে পাথেয় হ'য়ে থাকবে।

আপনার বৈশাখ নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতার দু-একটি স্থান একটু অস্পষ্ট হ'য়ে আছে আমার কাছে। কবিতার দ্বিতীয় ষ্ট্যাঞ্জায় আছে—

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হ'তে ছুটে আসে।

এই ছায়ামূর্ত্তি অনুচর কাহারা?

পরের এক ষ্ট্যাঞ্জায় আছে—

সকরুণ তব মর্ম্ম সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-পরে।

বৈশাখের করুণ মর্ম্ম ও শান্তিপাঠ কি? বৃষ্টি বর্ষণ? বৈশাখের দুঃখ কি? তা'র তপস্যা-লব্ধ মেঘজাল?

এই দুটি স্থানের সংশয় মোচন করলে উপকৃত হবো।

আমি আপনার চয়নিকা ও সঞ্চয়িতার কবিতাগুলির একটি ব্যাখ্যা লিখ্‌বার আয়োজন করছি। এর আগে অজিত, আবদুল ওদুদ, কুমুদনাথ দাস প্রভৃতি যাঁরা আপনার কাব্য-আলোচনা করেছেন তাঁরা কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব মাত্র নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। আমি কবিতাগুলির অন্তর্গূঢ় ভাব ছাড়া শব্দ ও বাক্যের সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব। এখানে অনেকে অতি বিজ্ঞ

রকমের ব্যাখ্যাপুস্তক বাহির করে বিক্রয় করছেন। তা ছাড়া অনেক অধ্যাপক এসে আমার বই থেকে আমার টীকা-টিপ্পনী লিখে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপনা করেন। এইজন্য আমি মনে করছি আমার নোটগুলি আমিই আমার নামে প্রকাশ করব। এ সম্বন্ধে আমি আপনার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ চাই। আমার বইয়ের নাম রাখব মনে করেছিলাম রবি-রশ্মি। রবি-রশ্মি-বিশ্লেষণ রাখলে বেশ হতো, কিন্তু বড় হ'য়ে যাবে। রবিচ্ছবি, রবির বর্ণচ্ছটা প্রভৃতি নামও মনে হয়েছে। কিন্তু সকলগুলির মধ্যে রবি-রশ্মি নামটিই আমার মনঃপূত হচ্ছে। আপনি তো অনেকের ছেলে-মেয়ের নাম রেখে দেন, আমার এই শেষ পূজার অর্ঘ্যের নাম নির্ব্বাচন আপনি করে দিলে বেশ হয়। রবি-রশ্মি যদি আপনি সমর্থন করেন তবে ঐ নামই রাখ্‌ব। সাত-আট বৎসর ক্রমান্বয়ে আপনার কাব্য পড়িয়ে আমার যা-কিছু জ্ঞান সংগ্রহ হয়েছে, সেইগুলি একত্র ক'রে তার সঙ্গে আমার আযৌবনের পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা মিলিয়ে এই অর্ঘ্য রচনা করব। আমার শক্তির অল্পতায় তা হয়তো আপনার পূজার উপযুক্ত হবে না, তথাপি আমার ঐকান্তিক আন্তরিকতা এই পূজার মধ্যে আমি নিবেদন ক'রে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে চাই। আমার জীবনের কাজ ফুরিয়ে এসেছে। এইবার বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে শান্তিনিকেতনে আপনার পদপ্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেবো এই অর্ঘ্য হাতে বহন ক'রে।

প্রণত সেবক
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ নভেম্বর ১৯৩২

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY.
House-Tutor. Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA,
Dacca Hall
RAMNA, DACCA.

২৪ নভেম্বর ১৯৩২

শ্রীচরণকমলে প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার বসন্ত নামক পুস্তকে একটি গান আছে সেটি গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫৮ পৃষ্ঠায়ও আছে। সেই গানটির ইংরেজী অনুবাদ ললিত চাটুজ্জে মশায় করেছেন এবং তাঁর একখানি ইংরেজী কবিতা সঞ্চয়নের মধ্যে সেটি সন্নিবেশিত করেছেন। সেই বইখানি এখানকার আই-এ পরীক্ষার পাঠ্য। জগন্নাথ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক সেই ইংরেজী অনুবাদের অর্থ জান্‌বার জন্য ইউনিভার্সিটি আর কলেজের অনেক অধ্যাপকের কাছে ঘুরে শেষে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি যা হোক একটা অর্থ তাঁকে বাৎলে দিয়েছি। কিন্তু আমিও নিশ্চিত হবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। যদি দয়া ক'রে এই গানটীর অর্থ আমাকে জানান তো সুখী ও উপকৃত হবো। বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ দুটিই এই সঙ্গে দিলাম।

সেবক
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরে ধীরে ধীরে বও,
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথ রাতের বাঁশি বাজে,
শান্ত হও গো শান্ত হও।

আমি   প্রদীপশিখা তোমার লাগি'
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে
মৃদু মৃদু কও ॥
তোমার   দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেহ আনি' ॥
আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও ॥

এখানে এই আমিটি কে ? কেবল মাত্র প্রদীপশিখা, না কবিও ? আমার কিছু কথা আছে—সেই কথা কি ? এবং সেই কথা ভোরের বেলার তারাকে বল্‌বার তাৎপর্য্য কি ?

THE NIGHT LAMP

Softly, softly, softly blow
O Night-wind, O restless wind ;
Thrills a note on Midnight's pipe !—
Hush, O wind, go soft and slow.
I, the night-lamp for thy sake
In fear and trembling keep awake,—
Tell thy secret in mine ear,
But hush, O wind, speak it low.
News from far-off winds in spring
Unto my room-corner bring ;
I too have a word to send
To the stars at darkness' end :
Take it in thine ear, O wind—
Take it softly ere you go.

১৩ জানুয়ারি ১৯৩৩

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY
House-Tutor, Dacca Hall

UNIVERSITY OF DACCA,
Dacca Hall
RAMNA, DACCA

১৩ জানুয়ারি, ১৯৩৩
পৌষসংক্রান্তি

শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়েছে। এখানে মোহিতলাল মজুমদার, শহীদুল্লাহ্, আর আমি বাংলা পড়াই। আপনার চয়নিকা, চিত্রা, মানসী, আর সঙ্কলন, সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ, বি-এতে পাঠ্য আছে। সেই বইগুলির কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে মোহিত-বাবু শনিবারের চিঠির ভাবাবিষ্ট হ'য়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা আমার মত চায়। আমার নিজের মতের সমর্থনের জন্য আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ও মত চাই।

১। এবার ফিরাও মোরে কবিতা সম্বন্ধে মোহিত-বাবু বলেন—কবি যদিও এবার ফিরাও বলেছেন, কিন্তু তিনি ফিরেন নি, সেই পূর্ব্বেকার মতনই আদর্শবাদ ভাববাদ আইডিয়ালিজ্‌ম্ নিয়েই তিনি কল্পনাবিলাস করেছেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হন নি। এবার ফিরাও মোরে কবিতার নামটিও যথোপযুক্ত হয় নি, এবার নিয়ে যাও মোরে হওয়া উচিত ছিল। এই রকম ধ্বংসমূলক সমালোচনা তিনি শনিবারের চিঠিতেও লিখেছেন।

২। সিন্ধুপারে কবিতার সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ্ বলেন যে সেখানে পরজীবনের কোনো কথা বলা হচ্ছে না, তা যদি হ'ত তা হ'লে সিন্ধুর ওপারে নাম হ'ত, তাতে এই ইহজীবনের কথাই বলা হয়েছে।

বাসরঘরের যে দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা কবির কাব্যের সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের ছবি।

৩। উৎসর্গের অন্তর্গত প্রবাসী নামক কবিতায় কবি বলেছেন—

মনে হয় যেন সে-ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে-দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

আবার কবি বলেছেন—

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

কিন্তু এর মাঝখানেই আবার বল্‌ছেন—

লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।

যদি কবির সঙ্গে ধরণীর তৃণ জল ধূলার যোগ অনাদি কাল থেকে থেকে—থাকে, তবে আবার তারকার সঙ্গে যোগ থাকে কেমন ক'রে?

৪। গীতাঞ্জলির অন্তর্গত ভারততীর্থ কবিতায় আছে—

এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

মহা-মানবের সাগর-তীরে চিত্ত জাগ্রত হবে, তাতে মহাসাগরের সঙ্গে তো ওতঃপ্রোত [ওতপ্রোত] যোগ হবে না।

৫। উর্ব্বশী কবিতায় মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল মানে কি? মুনিরা সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তপঃভ্রষ্ট হয়, অথবা যে-কেউ তপস্যা করছে কিছু প্রকাশ করবার সৃষ্টি করবার লাভ করবার, সে তা চরমসুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে চায়? মোহিত-বাবু বলেন যে এই উর্ব্বশী

কবিতার মধ্যেও নাকি আগাগোড়া ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা হয় নি। যিনি অ্যাবস্‌ট্র্যাক্‌ট্ অ্যাব্‌সোলিউট্ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটী, তাঁকে বর্ণনা করতে গিয়ে সাকার মূর্ত্ত ক'রে তোলা হয়েছে।

ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচল-বাসিনী উর্ব্বশী।

এই ষ্ট্যাঞ্জাটির অর্থ কি?

আরো অনেক বিবাদ আছে। তবে এই কয়টির বিতণ্ডাই প্রধান। আপনার অভিমত পেলে আমি জোর ক'রে আমার মত প্রকাশ করতে পারব। আর এগুলির ব্যাখ্যা আপনার কাছ থেকে জানা হ'য়ে গেলে আমার রবি-রশ্মির মধ্যেও কাজে লেগে যাবে। বই লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এই মহান্ সঙ্কল্প যেন শ্রদ্ধার সহিত উদ্‌যাপন করতে পারি।

আমাদের ঢাকা-হল থেকে ছাত্রদের বাৎসরিক পত্র শতদল প্রকাশিত হয়। তার সম্পাদক আপনার কাছে আশীর্ব্বাদ-বাণী প্রার্থনা ক'রে পত্র লিখেছিল শুন্‌লাম। সে এখনো কোনো লেখা না পাওয়াতে আপনার কাছে আমাকে দিয়ে সুপারিশ করাতে চায়। যদি কিছু লেখা দু-চার লাইনও পাঠান ছাত্রেরা কৃতার্থ হবে।

সেবক
[চারু বন্দ্যোপাধ্যায়]

৭

অক্টোবর ১৯৩৩

CHARU BANDYOPADHYAY, M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY.
HOUSE-TUTOR, DACCA HALL

UNIVERSITY OF DACCA
Dacca Hall
Ramna, Dacca.

বিজয়াদশমী ১৩৪০

শ্রীচরণকমলে

আজ আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

আমি যে গুরুভার ব্রত গ্রহণ করেছিলাম, তা ভগবানের কৃপায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে উদ্‌যাপন করবার কাছাকাছি এনেছি—রবিরশ্মি বিশ্লেষণ প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। বলাকার পরিচয় লিখ্‌ছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো পাল্লা দিয়ে পারবার জো নেই—প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন বই বেরুচ্ছে, আর আমার কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে, কর্তব্য গুরুতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু আমি অবিশ্রাম পরিশ্রম ক'রে কাজ ক'রে চলেছি। ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজের ৬৫০ পৃষ্ঠা টাইপ করা হয়েছে। বোধ হয় হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি হবে।

ক্ষণিকার মধ্যে আবির্ভাব নামে যে কবিতাটি আছে সেটির অন্তরের কথাটি কি? সে কি কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অসাময়িক আবির্ভাব বা অনুভব? অথবা জীবনদেবতার আবির্ভাব? কে 'বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ্য বিরচন?' এটির একটু দিগ্‌দর্শন করিয়ে দিলে উপকৃত হবো।

খেয়ার মধ্যে 'অনাবশ্যক' নামে একটি কবিতা আছে, তারও তাৎপর্য্য আমাকে জানালে সুখী হবো। এই দুটি কবিতা সম্বন্ধে আমার একটু অস্পষ্টতা আছে। অনাবশ্যক কবিতাটির কথা একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু আপনি কি বলেছিলেন তা এখন মনে নেই।

এখন লেখবার সময়ে খট্‌কা লেগেছে। এখানে এমন কেউ শ্রদ্ধাবান্ নেই যার কাছে একটু পরামর্শ করতে পারি। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার অনেক উপদ্রবই ক্ষমা করেছেন, এও ক্ষমার্হ হবে আশা করি।

শ্রীমান্ প্রশান্ত মধ্যে এখানে এসেছিলেন। তিনি বল্‌ছিলেন যে আপনি একটি কবিতা-সঞ্চয়ন করছেন। তার পুরাতন বিভাগে আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি তা হ'লে ভালো হয়। আমি তো এ আমার সৌভাগ্য ব'লে মনে করব। কিন্তু এতদূর থেকে আমি কি কিছু কাজে লাগ্‌তে পারি আপনার? খুব ইচ্ছা ছিল এই ছুটিতে গিয়ে আপনার কাছে থাক্‌ব। কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ল না। গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়েছিলাম, ঐ আশায়। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তখনো আপনি দার্জিলিং থেকে নামেন নি। যদি আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো সম্ভব হয়, তবে আমাকে আদেশ করলে আমি কৃতার্থ হবো।

রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কবিতার কতকগুলি অনুবাদ করেছেন ইংরেজীতে। তিনি সেইগুলি অনেককে শুনিয়েছেন, অনেকেই ভালো বলেছেন। আমিও কতকগুলি শুনেছি, আমারও ভালো লেগেছে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে আপনি সেগুলি একবার দেখেন। তবে লেখকের নিজের মুখে শোনা ও পড়ার মধ্যে তফাৎ আছে। তাই তিনি ইচ্ছা করেন যে যদি কখনো আপনার সুবিধা হয় তিনি গিয়ে আপনাকে কিছু শোনাতে পারেন। আর তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীকে আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে ব'লে ঐ কবিতাগুলি প্রকাশের বন্দোবস্ত ক'রে দেন, এবং একটি ভূমিকা লিখে দেন। এই বই থেকে যা লাভ হবে, তার কিছু অংশ তিনি বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করতে ইচ্ছা করেন, যদি বিশ্বভারতী অনুগ্রহ ক'রে এই সামান্য দান গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত তিনি জান্‌তে চান।

প্রণত সেবক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

CHARU BANDYOPADHYAY M.A.
LECTURER, DACCA UNIVERSITY

SEGUN-BAGAN
Ramna, Dacca

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

শ্রীচরণকমলে অসংখ্য প্রণাম পূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্রে বিশ্বভারতীর আর্থিক অসচ্ছলতার সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। কনককে যে আপনি নিতে পার্‌লেন না, তার জন্য আমার অন্য দুঃখ নেই, কেবল সে যে আপনার সান্নিধ্য ও প্রভাব থেকে বঞ্চিত হলো এই তার ও আমার দুর্ভাগ্য ব'লে মনে হচ্ছে। আপনার আশীর্বাদে কনক কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজের স্কুল বিভাগে একটি কাজ পেয়ে সেইখানে গেছে। এখানে তার আর্থিক লাভ হবে, কিন্তু আপনার স্নেহাশ্রয়ে তার যে পরম লাভ হতো তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে রইল। তাকে ব'লে দিয়েছি সে মাঝে মাঝে আপনার চরণধূলি নিতে শান্তিনিকেতনে যাবে। তার কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তাতে জেনেছি যে আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ সমানই আছে, সেও আপনার স্নেহ পেয়ে আনন্দিত ও ধন্য হয়ে এসেছে। আমার আর আট মাস পরে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আমি গিয়ে আপনার চরণতলে বস্‌ব এবং এই বানপ্রস্থের কালে আপনার ও বিশ্বভারতীর সেবা ক'রে আমার শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত কর্‌ব।

আপনার বৈশাখ কবিতায় ছিল "মুখে তুলে করাল পিনাক", পিনাক বাদ্যযন্ত্র নয় ব'লে সেই লাইনটি এখন পরিবর্তন করেছেন "বিষাণ ভয়াল"। কিন্তু আমি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল পড়াতে গিয়ে দেখ্‌লাম তাতে পিনাক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—"তের হাজার বাজাইল রুদ্রাক্ষ পিনাক" ১৯৯ পৃষ্ঠা। তবে এই পিনাক হয়তো তারের যন্ত্র ছিল, মুখের বাদ্য নাও হ'তে পারে।

আর একটি কথা অনেক দিন থেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা ছিল, আজ জানাই। আপনার বিসর্জন নাটকখানি এখানকার. বি-এ অনার্স ও পাসের পাঠ্য, আমি পড়াই। যত সংস্করণ হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই আমি সংগ্রহ করেছি। আমার মতে শ্রীমান্ প্রশান্ত মহলানবিশ ১৩৩৩ সালে বিশ্বভারতী থেকে যে সংস্করণ বাহির করেছিলেন সেইটিই সর্বোত্তম, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলিতে সৌন্দর্য ও নাটকত্বের হানি হয়েছে। দেবীর মন্দিরে রাজা পূজায় আসীন এবং সেই সময়ে অপর্ণা এসেই রাজার বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ ক'রে বললে—"বিচার প্রার্থনা করি"—এটি চমৎকার Dramatic Exposition হয়েছে। সেই দৃশ্যটি বাদ দেওয়া সমীচীন হয়নি। আর তা ছাড়া হাসি ও তাতাকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু তারাও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাদ পড়েছে। অপর্ণার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে সেই বালক-বালিকার ভয় ও বেদনা মিশে রাজাকে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প করেছিল, রাজা যেই আদেশ দিলেন যে বলি নিষেধ হলো, হাসি অমনি তার ভাইকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল যে "রক্তের সব দাগ মুছে গেছে"—এর মধ্যেও একটি সুন্দর ইঙ্গিত ছিল, সেটি আমরা হারাচ্ছি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে। এই রকম পদে পদে অনেকগুলি Dramatic Irony নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে ক'রে বইখানির সৌন্দর্যহানি হয়েছে মনে করি। আমার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী আমার সঙ্গে একমত হয়ে আপনাকে তাদের অনুরোধ জানাতে বলেছে যে যদি সম্ভব হয় তবে অবিলম্বে বিসর্জনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির করবার জন্য আপনি আদেশ দিলে আমরা সকলে সুখী হব ও সকল সাহিত্য-রসিক সুখী ও কৃতজ্ঞ হবেন। বাংলা-সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ নাটকখানিকে বিকলাঙ্গ দেখতে ইচ্ছা করে না। আশা করি আমাদের আবেদন আপনি বিশেষ বিচার ক'রে দেখবেন।

প্রণত সেবক
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

১ গোবিন্দ দাস রোড, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
২০এ জানুয়ারি ১৯৩৮

শ্রীচরণকমলে

প্রণাম পূর্বক নিবেদন,

আপনার নিজহাতে-লেখা পত্র পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এই পত্রে আমার প্রার্থনার স্পষ্ট উত্তর পেলাম না।

আমার রবিরশ্মি বইয়ের পূর্বভাগ আমি আপনার নামে ও অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও আমার কয়েকজন বন্ধু যাঁদের কাছ থেকে আমি আপনার কাব্য-রসাস্বাদনে সাহায্য পেয়েছিলাম তাঁদের নামে-উৎসর্গ করতে চাই। কিন্তু আমার পুস্তকের প্রকাশক কল্‌কাতা-ইউনিভার্সিটি আপত্তি তুলেছেন যে অপরের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আপনার নাম দেওয়াতে আপনার সম্মতি আছে কি না। উৎসর্গপত্রের একটা নকল এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি; আপনি দেখে আপনার সুস্পষ্ট সম্মতি দিলে সুখী হব।

প্রণত
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ

কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
এবং
আমার বাল্যসখী
শ্রীমতী নলিনীবালা রায়
ও
পরলোকগত বন্ধুবর
নলিনীকান্ত সেন, সুরেশচন্দ্র আইচ, অজিতকুমার চক্রবর্তী
এবং

অন্যান্য যে-সকল পরিচিত অথবা অপরিচিত সাহিত্যসুহৃৎ
যাঁহাদের বাক্য ও রচনা হইতে আমি
রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের অমৃত-রসাস্বাদনে
সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি
তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে
এবং
সকল কালের ও সকল দেশের রবীন্দ্রকাব্যরসিক
মহানুভবদিগের উদ্দেশে
আমার এই অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থ প্রয়াস
পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত
উৎসর্গ করিলাম

১০

১৫ মে ১৯৩৮

ওঁ

"মাতৃকা"
৪৪এ রাণী হর্ষমুখী রোড্, পাইকপাড়া, কলিকাতা
১৩ই মে, ১৯৩৮

শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও নিবেদন,

আমার রবিরশ্মি সম্বন্ধে আপনার অভিমত পেলাম। তাতে প্রশংসার লেশমাত্র নেই। এতে আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম আপনি আমাকে কত আপনার জন মনে করেন। বাহির দেউড়ি থেকেই সস্তা প্রশংসা দিয়ে আমাকে বিদায় ক'রে দেন নি। এই পরম সৌভাগ্যে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। এবং আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম বারবার জানাচ্ছি। ডক্টর সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতির বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখ্‌লেই মনে

হয় সেটা কতখানি মেকি, কী দারুণ অত্যুক্তি, আর কী বিষম ব্যাজস্তুতি।

প্রণত সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

১৬ মে ১৯৩৮

ওঁ

"মাতৃকা"
৪৪এ রাণী হর্ষমুখী রোড্, পাইকপাড়া,
কাশীপুর পোষ্ট্-অফিস, কলিকাতা
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও নিবেদন,

আমার ছেলের বিয়ে। আমার পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতার সনির্বন্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনার আশীর্বাদ লাভ।

প্রণত সেবক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ— ছেলের নাম পুলক, মেয়ের নাম মায়া।

চাঁদপুর রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জন্য লিখিত ও পঠিত অভিনন্দন পত্র

রবীন্দ্র-বন্দনা

হে কবি-গুরু, তোমার এই জন্মদিনে আমরা তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। তোমার জন্মলাভে আমরা লাভবান্ হইয়াছি নানা রকমে, সেই জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে আমরা বন্দনা করি।

হে রবি, তোমার উদয়ে বঙ্গদেশ হইতে সমগ্র ভারতে তোমার ভাতি উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে, তোমার প্রতিভায় সমগ্র জগৎ প্রভাস্বর হইয়াছে। তুমি প্রদীপ্ত, তোমার প্রোজ্জ্বল প্রভায় বাংলাদেশের মানস-কাননে নববসন্তের অভ্যুদয় হইয়াছে। তুমি প্রাণময়, তোমার সন্দীপন-মন্ত্রে বাংলার সুপ্ত প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার মহিমার অসামান্য ঐশ্বর্য্য ও অকৃপণ দানের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ শ্রদ্ধার সহিত তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

হে ঋষি, তুমি সত্যদ্রষ্টা, সত্যভাষী, সত্যপ্রকাশক। তুমি বিশ্বমানবের বন্দনীয়। তোমার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য বিশ্ববাসী উৎকর্ণ হইয়া আছে, তোমার তূর্য্যকণ্ঠ অকুণ্ঠিত হইয়া সত্য নির্দ্দেশ করিতেছে। তোমার সত্যনির্দ্দেশ আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সার্থক হোক, আমরা যেন তোমার প্রচারিত সত্যমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারি।

হে বিশ্ব-পুরোহিত, তুমি বিশ্ব-মিলন-যজ্ঞের মহা-ঋত্বিক, বিশ্বের কল্যাণমন্ত্র পাঠ করিয়া তুমি বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতকে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়াছ। তুমি ভূমার উপাসক, ব্রহ্মের পূজক, তুমি সঙ্কীর্ণ ভারতকে মহত্ত্বের উদার বৃহৎ ক্ষেত্রে মুক্তি দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছ। ভারতের ঋষিদের বরেণ্য শিব-সঙ্কল্প তোমার কণ্ঠে পুনরুদ্গীত হইয়াছে। তোমার আরব্ধ এই যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। হে বরণীয়, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

হে স্বদেশব্রত, স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্ত্তি তুমি। তুমি এই সোনার বাংলাকে ভালোবাসিয়াছ, তুমি ভারতের ভুবনমনোমোহিনী রূপকে বন্দনা করিয়াছ। আবার তুমিই কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না রাখিয়া মাতৃভূমিকে ভালোবাসিতে শিখাইয়াছ, মাতার কাছে সকল সন্তানই সমান সমাদরের যোগ্য এবং মাতার কোলের কাছে হিংসা দ্বেষ অশোভন—এই মহাসত্য তুমিই প্রচার করিয়াছ। দেশকে তুমি সত্য করিয়া চিনিতে শিখাইয়াছ, পরের দ্বারে ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ বলিয়া আত্মচেষ্টা ও আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা কর্ম্মের ভিতর দিয়া স্বদেশের সেবা করিতেও তুমিই শিখাইয়াছ। হে সাত্ত্বিক স্বদেশহিতৈষী, তুমি অপরের অন্যায়ে বজ্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছ, আবার স্বদেশের অন্যায়ে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়াছ। অন্যায় যে করে ও অন্যায় যে সহে তাহাদের উভয়ের উপরেই রুদ্রের বজ্রাভিসম্পাত তুমি প্রার্থনা করিয়াছ। তুমি আমাদিগকে সেই সাহস দাও যাহাতে আমরাও তোমার ন্যায় অন্যায়কে অনায়াসে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি ; সেই শক্তি দাও যাহাতে আমরা যাহা ন্যায় বলিয়া মনে করি তাহা অকুণ্ঠিত সাহসে পালন করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে সেই প্রেরণা দাও যাহাতে আমরা সত্য শিব ও সুন্দরকে আমাদের জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারি।

হে কবি, বঙ্গভারতীকে তুমি বিশ্বভারতীতে পরিণত করিয়াছ; বঙ্গভারতীর বীণার তন্ত্রে যে অনন্ত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তাহা তুমি বিচিত্র মূর্চ্ছনায় প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছ। তোমারই রঙ্গমল্লী বীণার আলাপ শুনিবার জন্য চির-উষার ও চির-তুষারের দেশ হইতে চির-ঊষর দেশ পর্য্যন্ত উৎসুক হইয়া আছে, তুমি যাহা শুনাইয়াছ তাহাতে বিশ্ববাসী মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তোমারই জন্য বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব, এবং বিশ্বকবিসভায় আমরা তোমারই করি গর্ব্ব! হে রবিকবি, আকাশের যে রবি তোমার মিতা তাহার

রথে মাত্র সপ্তাশ্ব যোজিত, আর তোমায় কাব্য-রথে তুমি সহস্রছন্দের অশ্ব সংযোজিত করিয়াছ। তুমি আশ্চর্য্যকর্ম্মা, তুমি মহামনীষী, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তুমি পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো সবারই সমানবয়সী, তুমি সকলের বয়স্য বন্ধু, শিশুভোলানাথ তোমার খেলার সাথী, যুবক-যুবতী তোমার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখীর গানে সম্মোহিত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাহারা পরকালের ডাক শুনিয়া খেয়া পার হইবার জন্য তাহাদের জীবনের নৈবেদ্য সাজাইতেছে তাহাদেরও পরম নির্ভর ও সান্ত্বনা তুমি। হে সার্ব্বভৌম কবি, তুমি সার্ব্বজনীন কবি, সকল লোকের মনের আনন্দ তুমি, সকল লোকের মনের কথা প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার সুহৃৎ তুমি, সকলের শোকে সান্ত্বনা, নিরাশার আশা, নিরুদ্যমের সাহস ও উৎসাহ তুমি। তোমাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বন্দনা করি।

হে প্রিয়তম, তুমি যে আমাদের কতখানি প্রিয় তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার মতো ভাষা তুমিই এখনো আমাদিগকে দিয়া উঠিতে পারো নাই। তোমাকে আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তুমি আমাদের আত্মার আত্মীয়, মনের মিতা, জীবনের নিয়ন্তা বন্ধু, তোমার নিকটে আমরা অজস্র দান গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইহা বলিয়াও তোমার প্রতি আমাদের মনের নিগূঢ় প্রীতিটিকে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তুমি আমাদের মুগ্ধ মনের বন্দনা ও অভিনন্দন গ্রহণ করো।

হে যশস্বী, তুমি অমর, তুমি অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছ, তোমার প্রাণ-সঞ্জীবনী-শক্তি তোমার স্বদেশে ও স্বজাতির মধ্যে অমৃত হইয়া চিরবিরাজ করিবে। যে বাণী ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আকাশে নিত্যবিরাজিতা, তাঁহাকে তুমি নবভূষণে ভূষিতা করিয়াছ, সেই বাক্‌দেবীই নিত্য তোমার আরতি করিবেন, তোমাকে বিজয়-মাল্য দিয়া স্বয়ম্বরসভায় যে কাব্যলক্ষ্মী বরণ করিয়াছেন তিনি

তোমাকে চিরকাল জয়যুক্ত করিয়া রাখিবেন।

হে নবীন, তোমার মনে চিরযৌবন ও চিরবসন্ত বিরাজিত। তুমি জরাকে পরাজিত করিয়াছ, অস্বীকার করিয়াছ, যৌবনের জয়টীকা তোমার ললাটে সুশোভিত। শত বসন্ত ও শত শরৎ তোমার কণ্ঠের সঙ্গীতে মুখরিত ও ধন্য হোক, শত বর্ষা তোমার কণ্ঠের সুরধুনীকে সঙ্গীত-মুখর করিয়া রাখুক। শঙ্কর তোমাকে নিরাময় রাখুন, যিনি শিব, শিবতর, ময়স্কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

রমণা, ঢাকা
২৭এ বৈশাখ ১৩৪০

প্রণত সেবক
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ মে ১৯৩৩

ময়মনসিংহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

রবীন্দ্র-পরিচয়

আমি যখন সাবেক হিসাবে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার বয়স বড় জোর বারো বৎসর হবে। আমি সেই বয়সে আর সেই বিদ্যা নিয়ে তখনকার সকল বড় সাহিত্যিকের বই প'ড়ে শেষ করেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর সকল উপন্যাস, মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি কবির কাব্য, দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির নাটক আমি পেটুক ছেলের মতনই গিলেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর 'সীতারাম' উপন্যাস সদ্যঃ প্রকাশিত হ'লে আমার সেখানি পড়বার আগ্রহ এমন প্রবল হয়েছিল যে দোকানে বই কিন্‌তে যাবার বিলম্ব আমার সয়নি ; বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর কাছেই আমরা থাক্‌তাম ; তাই তাড়াতাড়ি আমি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর কাছে বই কিন্‌তে গিয়ে তাঁর ধমক খেয়ে এসেছিলাম, এবং তিনি যদিও আমাকে বলেছিলেন যে, এ বই তো তোমার মতন ছেলেমানুষের পড়্‌বার নয়, তবু আমি তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়েই দোকান থেকে সেই বই কিনে প'ড়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিলাম। আমার বই পড়ার জন্য এই রকম লোভ থাকা সত্ত্বেও আমি রবীন্দ্রনাথের কোনো বই বা রচনা বি.এ. ক্লাসে পড়ার আগে পড়িনি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ নামে যে একজন কবি আছেন এ সংবাদও আমার কাছে পৌঁছেনি।

বাংলা ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে, ইংরেজী ১৮৯৩ সালে, বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতে কল্‌কাতায় ষ্টার থিয়েটারে একটি শোকসভা হয়। তখন আমি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি। বঙ্কিমবাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকাতে আমি সেই সভায় উপস্থিত হই, যদিও তখন আমার পায়ের নখে একটা ঘা হ'য়ে আমি এক রকম পঙ্গু হয়েই ছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ, আর সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সেই দিন আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখ্‌লাম, এবং তাঁর মধুর

অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে ও সুন্দর চেহারা দেখে একটু আকৃষ্ট হলাম। তাঁর বক্তৃতার পর সমস্ত শ্রোতা এক বাক্যে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লেন—"রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান।" আমি তখন পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ঐ চীৎকারের কোনো মর্মই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌লাম না। শোকসভার গাম্ভীর্যহানির আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই গান গাইলেন না। আমিও রবিবাবুর বিশেষ কোনো পরিচয় না পেয়েই বাড়ী ফিরে এলাম।

তার পর দ্বিতীয় দিন রবিবাবুকে দেখ্‌লাম আমি যখন ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়ি, ১৮৯৬ সালে, ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে; সকল কলেজের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার সভায় তিনি অন্যতম বিচারক ছিলেন, অপর দুজন বিচারক ছিলেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। সেদিনও সকল শ্রোতা ও দর্শকেরা সভার কার্যশেষে চীৎকার জুড়ে দিলেন, "রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান!" রবিবাবু অনুরোধ অস্বীকার ক'রে লজ্জান্বিত মুখে কেবলই ধীরে ধীরে মাথা নাড়্‌ছেন, আর জনতার চীৎকারও চল্‌ছে। আমি জনতার অভদ্রতা দেখে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলাম, একজন ভদ্রলোক কিছুতেই গান গাইবেন না, তবু তাঁকে গাইতে পীড়াপীড়ি করা আমার কাছে অত্যন্ত বেয়াদবী ব'লে মনে হলো। আর মনে হলো যে এমনই বা কি গান যে শোন্‌বার জন্য এমন কাঙ্‌লামি কর্‌তে হবে। আমি বিরক্ত হ'য়ে সভাত্যাগ ক'রে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, দ্বারের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার কানে অশ্রুতপূর্ব মধুর কণ্ঠের স্বরমূর্ছনা ভেসে এসে প্রবেশ কর্‌ল, আমি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নীত হ'য়ে চট্ ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম রবিবাবু গান গাইতে আরম্ভ করেছেন। আমি সভায় সাম্‌নের দিকেই বসেছিলাম, কিন্তু উঠে চ'লে আসার পর আমার সম্মুখে অগ্রসর হবার পথ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, আমি জনতার ব্যূহ ভেদ ক'রে ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে না পেরে সেই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েই মন্ত্রমুগ্ধ স্তম্ভিতের মতন গান শুন্‌তে লাগ্‌লাম। সে যেন মনুষ্যকণ্ঠের স্বর নয়, যেমন মধুর তেমনি তীক্ষ্ণ স্পষ্ট, আর গানের

ভাষা সুরের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। তিনি সেদিন গাইলেন—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা!
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা!
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে, মিছে যশ ল'য়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।

তখন আমার নবীন মনে স্বদেশপ্রেমের রঙীন নেশা নূতন লেগেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীত আমাকে একেবারে মোহাবিষ্ট ক'রে ফেল্‌লে।

তার পরে আবার আর একদিন ঐ ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' নামক নাটিকা পাঠ করেন। তার অল্পদিন আগেই আমার সহপাঠী বন্ধু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ঐ হলেই রবিবাবুর কবিতার এক সমালোচনা পাঠ করেন। এই দুই সভাতেই

সভাপতি ছিলেন গুরুদাসবাবু। রবিবাবু তাঁর নবরচিত নাটিকা পাঠ কর্‌তে উঠে ভূমিকা স্বরূপ বল্‌তে লাগ্‌লেন—"কয়েক বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু আমাকে এই হলে কোনো লেখা পড়্‌তে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা কর্‌বার সুযোগ আমার হয়নি। সম্প্রতি আজকার মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমাকে এখানে কিছু পাঠ কর্‌তে অনুরোধ করেন। আমি মনে কর্‌লাম যে এই সুযোগে বঙ্কিমবাবুর অনুরোধের ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব, তাই আমি আমার লেখা পাঠ কর্‌তে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার লেখা এখানে পাঠ কর্‌তে আমার স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কারণ, অল্প কয়েক দিন আগে এই হলে, এই সভাপতির অধীনে হয়তো বা ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা পাঠ হয়ে গেছে। যিনি সমালোচক, তিনি বয়সে তরুণ। তরুণ বয়স যথার্থ সমালোচনার সময় নয়। তরুণ বয়সে লোকে কবি হতে পারে, কিন্তু সমালোচক হতে হ'লে প্রবীণ বয়সের দরকার। কাঁচা বাঁশে বাঁশী হতে পারে বটে, কিন্তু লাঠি হ'তে হ'লে পাকা বাঁশের দরকার। মানুষকে ভাইপো হয়েই জন্মাতে হয়, কিন্তু অনেক লোকে জ্যাঠা হবার পূর্বেই জ্যাঠাইয়া যান। সকল মানুষের মধ্যে সকল গুণ থাকে না, আর তা প্রত্যাশা করাও যায় না। ময়ূরের পুচ্ছ আছে কিন্তু তার কণ্ঠে কোকিলের সুস্বর নেই, আবার কোকিলের কণ্ঠ আছে, তার ময়ূরের মতন সুন্দর পুচ্ছ নেই। ইক্ষুদণ্ডে আম্রফল ফলে না, আর আম্রশাখায় ইক্ষুরস পাওয়া যায় না। অতএব কবির কাব্যে কি আছে তারই বিচার না ক'রে, কি নাই তাই নিয়ে তাকে দোষারোপ কর্‌লে তার প্রতি অবিচার করা হয়। তাই আজ আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এখানে এসেছি আমার লেখা পাঠ কর্‌তে।"

এই ভূমিকা ক'রে তিনি গান্ধারীর আবেদন পাঠ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। সে কী কণ্ঠস্বর, কী সুন্দর উচ্চারণ, কী কবিত্বমধুর ওজস্বী ভাষা! সমস্ত শ্রোতা স্তব্ধ হ'য়ে শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

সেই সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের পত্নীর অপমানসূচক লেখা প্রকাশ ক'রে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। গান্ধারীর উক্তির মধ্যে আমরা রবিবাবুর ধিক্কার অনুমান ক'রে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলাম, যখন শুন্‌লাম রবিবাবু গান্ধারীর জবানী বল্‌ছেন—

পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ ল'য়ে বাধে অহরহ,— ভালো মন্দ
নাহি বুঝি তার,— দণ্ডনীতি ভেদনীতি
কূটনীতি কত শত,— পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে'— মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহ কর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হ'তে,—পুরুষেরে ছাড়ি'
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে
কলুষ পরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ,— পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে-নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ!

এই নাটিকা পাঠ শেষ হ'লে গুরুদাসবাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবুকে দিয়ে রবিবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ালেন। হেমেন্দ্রবাবু প্রথমে কিছুতেই সম্মত হচ্ছিলেন না, শেষে গুরুদাসবাবুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হ'য়ে ধন্যবাদ দিলেন, সে যেন বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগরের হাতে মনসাদেবীর পূজা পাওয়া।

যখন রবিবাবু হেমেন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ ক'রে কবিত্বরসালো তিরস্কার করছিলেন, তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি হেমেন্দ্রবাবুর কয়েকজন বন্ধু সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গিয়ে নিজেদের বিরক্তি ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

ধন্যবাদ প্রভৃতি শেষ হলে, সমস্ত শ্রোতা আবার চীৎকার আরম্ভ করলে— রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান!

আমি এর পূর্বে একদিন রবিবাবুর গানের আস্বাদ পেয়েছি, আজ আর জায়গা ছেড়ে নড়বার নামও করলাম না। অনেক অনুরোধের পর রবিবাবু গাইলেন—

কে এসে যায় ফিরে ফিরে,
আকুল নয়নের নীরে।
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখ 'পরে।
সে যে আমার জননী রে।
কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি।
    কাহার ভাষা হায়,
    ভুলিতে সবে চায়।
সে যে আমার জননী রে।
ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
    আপন সন্তান
    করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে।
বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন।

সে স্নেহ উপহার
রুচে না মুখে আর।
সে যে আমার জননী রে।

সেই সভায় অনেক বিলাতফেরত ইঙ্গবঙ্গ না-ইংরেজ না-বাঙালী গোছের বিদেশী পোষাক-পরা ও বিদেশী ভাষায় কথা বলায় চেষ্টিত লোক ছিলেন, তাঁদের অবস্থা দেখে আমরা তখন অত্যন্ত সুখ অনুভব করেছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন স্বদেশভক্ত কবির তীব্র তিরস্কারে লজ্জিত হ'য়ে নিজেদের গায়ের বিদেশী পোষাক গা থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচেন।

'গান্ধারীর আবেদন' নাটিকাটির মধ্যে আমরা সাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত দেখ্‌তে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলাম। তখন আমাদের মনে হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্র হচ্ছেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, দুর্যোধন Bureaucracy, গান্ধারী ইংরেজ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা (British sense of Justice), ভানুমতী British prestige, পাণ্ডবেরা স্বাধিকার-বঞ্চিত ভারতবাসী এবং দ্রৌপদী ধর্মপথে চলার শাস্তি ও গৌরব!

এর পরে তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নার উড্‌বার্ন সাহেব একবার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সকল মেম্বরকে তাঁর বেল্‌ভিডিয়র প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। সেই দিন রবিবাবু সুশুভ্র ঢাকাই মস্‌লিনের একটি প্রচুর কুঁচি-দেওয়া ঘাঘরার মতন মুসলমানী জামা নামক একটি জোব্বা গায়ে দিয়ে ও পাঞ্জাবী নাগরা জুতা পায়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁকে কেমন দেখ্‌তে হয়েছিল তা তাঁরা বুঝ্‌তে পারবেন যাঁরা বাংলার ইতিহাসে ইংরেজ আমলের পূর্ব্বের নবাবদের ছবি দেখেছেন। সেইদিন হেমেন্দ্রবাবুও গিয়েছিলেন, রবিবাবু তাঁকে কাছে ডেকে আলাপ করেন, এবং যখন ফটো তোলা হয় তখন হেমেন্দ্রবাবু বেছে বেছে রবিবাবুরই পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলান।

আমি তখনো রবিবাবুর কোনো বই চোখেও দেখিনি। আমি

প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পড়্‌তে ভর্তি হয়েছি, আর থাকি হিন্দু হোষ্টেলে। সেখানে একদল লোক ছিল যারা রবিবাবুর কাব্যকে অস্পষ্ট ও অর্থহীন ব'লে নিন্দা করত, এবং আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিতাম, রবিবাবুর কোনো লেখা না প'ড়েই।

একদিন এক মজ্‌লিশে রবিবাবুর নিন্দা হচ্ছিল। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিচ্ছিলাম। সেখানে মুখ বুজে বসেছিলেন আমাদের সহপাঠী অধুনা স্বর্গগত নলিনীকান্ত সেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের নিন্দাসভা ভেঙে গেলে নলিনী নিজের ঘরে চ'লে গেল এবং তখনই আমার ঘরে ফিরে এসে আমার বিছানার উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী ফেলে দিয়ে কোনো কথা না ব'লে ঘর থেকে চ'লে গেল। নলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে কি বই দিয়ে গেল দেখ্‌বার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে দেখ্‌লাম রবিবাবুর গ্রন্থাবলী। তার প্রথম পৃষ্ঠা খুলেই পড়লাম--

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি।
দেখ তোমারি দুয়ার 'পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।

কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেই আবার পড়্‌লাম—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার
শুনেছি শুনেছি তাহা!
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী—
কেমন মধুর আহা!
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।

তরুণ বয়সে প্রাণে যে কবিত্ব জাগে, যে আকূতি প্রকাশ করবার জন্য মূক মন ভাষা খুঁজে ব্যাকুল হয়, আমার প্রাণের সেই কবিত্ব ও আকূতি যেন এই কবির লেখায় ভাষা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। আমার মনে হলো আমি যে কথা বল্‌তে চাই অথচ পারি না, সেই কথাই তো এই কবি আমার জবানী ব'লে রেখেছেন। আমার মনের এই কথাটিও কবি পরে 'ক্ষণিকা' কাব্যে বলে চুকেছেন—

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে।
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার প্রাণমন হরণ করল। আমি আর পরের বই পড়্‌তে পারুলাম না। নলিনী সেনকে তার বই ফিরিয়ে দিয়ে তখনই ছুটলাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ের দোকানে। একখানি টালী আকারের গ্রন্থাবলী কিনে নিয়ে হোষ্টেলে ফিরুলাম এবং সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আমার জীবনের আনন্দ বন্ধু শিক্ষক গুরু সহচর হ'য়ে আছে।

এই সময়ে আমাদের সহপাঠী সুরেশচন্দ্র আইচ আমাদের সঙ্গে হিন্দু হোষ্টেলে বাস করুছিলেন। আমি শুন্‌লাম তিনি রবিবাবুর গান গাইতে পারেন। এর পরে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'তে অধিক বিলম্ব হয়নি। কত সন্ধ্যা আমরা ইডেন গার্ডেনে গিয়ে সুরেশের মধুর কণ্ঠের গান শুনে অতিবাহিত করেছি, তার স্মৃতি আজও মনকে হর্ষবিষাদে অভিভূত করে—সুরেশ আজ পরলোকে, কিন্তু সে আমাকে যে অমৃতের আস্বাদ দিয়ে গেছে তা আমার জীবনকে মাধুর্যে অভিষিক্ত ক'রে রেখেছে।

এই সময়ে বা এর পরে এখন তা ঠিক মনে নেই, এবং কি উপলক্ষে তাও এখন স্মরণ নেই, কল্‌কাতায় লোকমান্য টিলক, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি দেশনেতারা সমবেত হয়েছিলেন।

তাঁদের জন্য এলবার্ট হলে সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় আর কি কি হয়েছিল এবং কে কি বলেছিলেন তা আজ আর কিছুই মনে নেই, কেবল মনে আছে রবিবাবু গান গেয়েছিলেন—

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে!
থেকো না থেকো না ওরে ভাই
মগন মিথ্যা কাজে।

রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গান—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!"

আমি তাঁর কণ্ঠ থেকে ঐ সময়েই ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে কোনো উপলক্ষে শুনেছিলাম।

বাংলা ১৩০৮ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় মজুমদার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন ও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আয়োজন করতে থাকেন। আমার বই কেনার প্রবল ঝোঁক ছিল। আমি বই কিনতে যাওয়া উপলক্ষে মজুমদার মহাশয়দের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। সেই সময়ে শ্রীশবাবুর ভাই-পো প্রবোধবাবু ফরাসী লেখক থিওফিল গ্যাতিয়ের লেখা মধুর উপন্যাস মাদ্‌মোয়াজেল্ দ্য মোপ্যাঁ পুস্তকের একটি প্রশংসাসূচক পরিচয় পাঠ করেন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে। মিটিং শেষ হ'য়ে গেলে আমি প্রবোধবাবুকে তাঁর লেখার প্রশংসা জানিয়ে ফরাসী বইখানির ইংরেজী তর্জমা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলাম। এই সূত্রে প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, এবং তিনি আমাকে সন্ধ্যাকালে মজুমদার লাইব্রেরীতে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন, এই বলে যে, "সন্ধ্যাবেলা আসবেন না আমাদের ওখানে, অনেকে আসেন, সাহিত্য আলোচনা হয়।"

এর পর থেকে আমি মজুমদার লাইব্রেরীর সান্ধ্য মজ্‌লিশের একজন সদস্য ব'লে গণ্য হ'য়ে গেলাম। এখানে "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি মজুমদার লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি পাশের ঘরে রবিবাবু ব'সে আছেন। আমি লাইব্রেরী ঘরে বস্‌লাম, এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভে ভাগ্যবান্ লোকদের ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। একটু পরেই সুবোধ মজুমদার লাইব্রেরী ঘরে এলেন, এবং আল্‌মারী থেকে রবিবাবুর 'কাহিনী' বইখানি বাহির ক'রে নিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম "সুবোধবাবু, এ বই কি হবে?" তিনি বললেন—"রবিবাবুকে দিয়ে 'পতিতা' কবিতাটা পড়াব।" আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে নিতান্ত সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার সহিত তাঁকে বল্‌লাম—"সুবোধবাবু, আমি যাব?" তিনি বললেন—"আসুন না।" আমি কৃতার্থ হ'য়ে সেই ঘরে গেলাম।

অপরিচিত আমাকে যেতে দেখে রবিবাবুর মুখে একটি লাজুক হাসি ফুঠে উঠ্‌ল, এবং তাঁর মুখ অপ্রতিভ হয়ে উট্‌ল। 'পতিতা' কবিতাটি পড়বার কথা আগেই স্থির হ'য়ে ছিল। কিন্তু অপরিচিত আমার সাম্‌নে 'পতিতা' সম্বন্ধে কবিতা পড়তে তাঁর লজ্জা বোধ হচ্ছে ব'লে আমার মনে হলো। তিনি মাথা নত ক'রে নতনেত্রের উর্ধ্বদৃষ্টি আমার মুখের দিকে প্রেরণ ক'রে বলতে লাগ্‌লেন—"এ কবিতাটা কি বোঝা যায়?" আমি বল্‌লাম, "বোঝা যাবে না কেন? এ কবিতা তো চমৎকার!" তখন বুঝি নি যে রবিবাবু আমার মতের জন্য ঐ কথা বলেন নি, তিনি কবিতা পাঠের ভূমিকা স্বরূপ নিজের কাছেই নিজে ঐ কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। তিনি আমার কথা কানে না তুলেই নিজের মনে ব'লে যেতে লাগলেন—"আমি এই কবিতায় বল্‌তে চেয়েছি—রমণী পুষ্পতুল্য—তাকে ভোগে ও পূজায় নিয়োগ করা যেতে পারে। তাতে যে কদর্যতা বা মাধুর্য প্রকাশ পায় তা ফুলকে বা রমণীকে স্পর্শ করে না,—রমণী বা ফুল চির-অনাবিল,—তাতে ফুল বা রমণীর কোনো ইচ্ছা মানা হয় না ব'লে সে ভোগে বা পূজায় নিয়োজিত হয়, তাতে নিয়োগকর্তার মনের কদর্যতা বা

মাধুর্য মাত্র প্রকাশ পায়। যে সহজ-পূজ্য তাকে ভোগ্যের পদবীতে নামিয়ে আনে যে সেও একটা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পতিতা হলেও নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, অনুকূল অবস্থা পেলে সে পুনর্বার পবিত্রতা লাভ কর্‌তে পারে। পাপের অন্যায়ে সে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে মাত্র, কিন্তু তার আত্মা একেবারে নষ্ট হয়নি—তার আত্মা বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের মতো হয়ে আছে। ঋষির কুমারই পতিতার কলুষ-তামস জীবনের মধ্যে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ ক'রে প্রকৃত জীবনপথের সন্ধান তাকে দেখিয়ে দিলেন। ভক্ত যখন জাগায় তখনই তো ভগবান জাগেন, তাই তো আমরা বলি জাগ্রৎ ভগবান্! পতিতার নারীত্বের পূজারী কেউ ছিল না, ঋষিকুমার তার প্রথম পূজারী হ'য়ে তাকে তার নারীত্বের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলেন। সৎগুণ সে পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় যে পর্যন্ত না ভাবের ভাবুক এসে তার উপাসনা কর্‌ছে। শক্তিমানের পূজা না পেলে শক্তি জাগরিত হয় না।"

এই ভূমিকা ক'রে তিনি কবিতাটি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। সে স্বর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গো আকুল করিল মোর প্রাণ।

পতিতা কবিতাটি পড়া হ'লে সুবোধবাবু অনুরোধ কর্‌লেন 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির উক্তি পাঠ কর্‌তে।

এর পূর্ব রাত্রেই সঙ্গীতসমাজে 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় হ'য়ে গেছে, বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে। রবিবাবু তাতে রঘুপতির ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করেছিলেন। তিনি রঘুপতির উক্তি পড়্‌তে অনুরুদ্ধ হ'য়ে বল্‌লেন, "নাটকের পাত্র-পাত্রীর কথা কেবল পড়্‌লে তার যথার্থ ভাবটি প্রকাশ করা যায় না। নাটক অভিনয়ে যে অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি থাকে তাতে ভাব প্রকাশে সাহায্য করে। ইংরেজী ড্রামা মানে এক্‌শান, মোশান।"

তার পর তিনি রঘুপতির উক্তি পাঠ করলেন।

পাঠ শেষ হ'লে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্রাহ্মণ" কবিতার মধ্যে, যে আছে—

'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।'

এর অর্থ কি? আমার এক বন্ধু এর অর্থ করেন যে অনেক দেবারাধনা মানত্ করার পর তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু আমি বলি ওর অর্থ বহু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারের মধ্যে তোমার জন্ম, তাই আমি জানি না তুমি কার পুত্র। আমাদের মধ্যে কার অর্থ সঙ্গত?"

রবিবাবু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু ক'রে মৃদু স্বরে বল্লেন—"আপনি যে অর্থ করেছেন তাই ওর অর্থ।" অপরিচিত আমার কাছে ঐ কথার আলোচনায় তিনি অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করছেন বুঝ্তে পেরে আমি আর কোনো কথা বল্লাম না।

এই আমার রবিবাবুর কাছে প্রথম যাওয়া।

এই সময় মজুমদার লাইব্রেরীর উদ্যোগে পক্ষান্তে একটি ক'রে সাহিত্যিক সভা হতো। তাতে গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা প্রভৃতি হতো। সেই সভায় রবিবাবু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি যশস্বী সাহিত্যিকেরা যোগ দিতেন। একদিন রবিবাবু গান গাইতে আরম্ভ ক'রে একটা কলি পুনঃপুনঃ ফিরে ফিরে গাইছেন আর লজ্জিত ভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্ছেন দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি গানের পদ ভুলে গেছেন, ও মনে করবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারছেন না। তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে গানের পদ চেঁচিয়ে ব'লে দিতে লাগ্লাম, ও তিনি গাইতে লাগ্লেন। আমি তাঁকে বিপদ্ থেকে উদ্ধার করাতে তিনি আমার দিকে এমন কোমল দৃষ্টিতে একবার চাইলেন যে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে গেল। তাঁর সেই দৃষ্টিতে লজ্জা,

কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ফুটে উঠেছিল।

এই সময় আমি আমেরিকার কবি অলিভার ওয়েণ্ডেল হোল্‌মস্ সাহেবের একটি কবিতা অনুবাদ করেছিলাম "বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন" নাম দিয়ে। আমি সেই কবিতাটিতে সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর ক'রে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের নামে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেটি ছাপা হলো দেখে আমার আর আনন্দের সীমা রইল না। রবিবাবুর বিচারে যে কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে গেল সে তো দিগ্‌বিজয়ী হ'তে পারে। তখন আমি শৈলেশবাবুকে বল্‌লাম যে সেটি আমারই লেখা, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরই রূপান্তর মাত্র। রবিবাবু শৈলেশবাবুর কাছে আমার কথা শুনে বলেছিলেন যে আমার আত্মগোপন ক'রে ছদ্মনাম নেবার কোনো আবশ্যক ছিল না।

এই সময়ে আমি লেখ্‌বার চেষ্টা করেছিলাম। আমি একটি প্রবন্ধ "দাবার জন্মকথা" লিখে 'বঙ্গদর্শনে' ও "লিখনসৃষ্টির ইতিহাস" লিখে 'ভারতী'তে ভয়ে ভয়ে দিয়েছিলাম। দুটিই আমার স্বনামে ছাপা হলো। শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে নিজে ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আমি তাঁকে ভারতী সম্পাদনে সাহায্য করতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তখন বি.এ. পাস ক'রে বেকার ব'সে ছিলাম, কেবল দুপুর বেলা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়্‌তে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। আমি সরলা দেবীকে সাহায্য করতে সম্মত হলাম। আমি শুধু লেখক হওয়ার সুযোগ পেলাম না, বহু বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগ্‌লাম এবং বহু লেখকের লেখা আমার হাত দিয়ে মার্জিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'তে লাগ্‌ল।

কাশীতে সাহিত্য-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানকার সেক্রেটারী আমাকে অনুরোধ করলেন উদ্বোধনের উপযোগী একটি গান লিখে দিতে হবে। আমি কবিতা লিখ্‌বার দুশ্চেষ্টা মাঝে মাঝে করলেও আমার কবিত্বের প্রতি আমার কোনো দিনই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না।

তখনো রবিবাবুর পরবর্তী কবিদের অভ্যুদয় হয় নি। আমি কাশীর সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী মহাশয়কে লিখ্‌লাম যে "আমা হতে এই কার্য হবে না সাধন। তবে আমি হয় রবিবাবুকে দিয়ে অথবা সরলা দেবীকে দিয়ে আপনাদের একটি গান লিখিয়ে দেবো।" সেক্রেটারী মহাশয় অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত লাভের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'য়ে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখ্‌লেন। আমিও দুই জনের কাছে গান রচনা ক'রে দেবার অনুরোধ ক'রে পাঠালাম। রবিবাবু ছিলেন তখন শিলাইদহে। তিনি আমাকে পত্র লিখ্‌লেন যে তিনি শীঘ্র কল্‌কাতায় আসছেন, এবং কোনো নির্দিষ্ট তারিখে জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে যদি আমি যাই তা হ'লে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে পারবে।

আমি নির্দিষ্ট দিনে বিকাল বেলা জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে দ্বারোয়ানকে দিয়ে আমার নামের কার্ড রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখনই নীচে নেমে এলেন। তাঁর পরনে একটা ঢিলা পাজামা, ঢিলা পাঞ্জাবী গায়ে আর পাঞ্জাবীর জামার গলার বোতামটি খোলা। পরে লক্ষ্য করেছি তিনি কখনই জামার গলার বোতাম দেন না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি আমাকে কি ফর্‌মাস করেছিলেন না?" আমি বল্‌লাম—"সরস্বতীবন্দনা সম্বন্ধে একটা গান লিখে দিতে বলেছিলাম।" আমার কথা শুনেই তিনি ব'লে উঠলেন—"ওরে বাস্‌ রে! গান লেখ্‌বার সাধ্য কি আমার আছে আর! গান-টান আর আমার আসে না।—

চলে গেছে মোর বীণাপাণি। (চৈতালি)

আমার একটা পুরাণো গান আছে—

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয় কমল বন মাঝে!

সেই গানটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবেন।"

আমি ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরে এলাম। কবির বীণাপাণি কবিকে

ত্যাগ ক'রে গেছেন ব'লে কবি ১৩০২ সালে বিলাপ করেছিলেন। কিন্তু তার পরে হাজার গান রচনা করেছেন আর হাজার খানেক কবিতাও লিখেছেন।

১৩১২ সালে আমি "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" নামে একটি গল্প লিখে প্রকাশ করবার জন্ম 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। রামানন্দবাবু গল্পটি ফেরৎ দিয়ে অনুরোধ করলেন গল্পটির আয়তন সংক্ষেপ ক'রে দিলে ছাপা হ'তে পারবে। দীনেশবাবু আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় অবধি খুব স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। তাঁকে ঐ গল্পটির কথা বলাতে তিনি বল্‌লেন—"তুমি ঐ গল্পটি রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দাও, আর তাঁকেই বলো সংক্ষেপ ক'রে দিতে।"

দীনেশবাবুর পরামর্শ অনুসারে তাঁর নাম করেই গল্পটি রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখন শিলাইদহে। তিনি আমাকে লিখ্‌লেন, তিনি শীঘ্রই কল্‌কাতায় ফিরে আস্‌ছেন, তখন তাঁর সঙ্গে জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি মোকাবেলায় আমার সঙ্গে আমার গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

একদিন প্রাতে রবিবাবুর জোড়াশাঁকোর নূতন লাল বাড়ীতে গেলাম। নীচে পূর্বদিকের কোণের ঘরে তিনি বসে ছিলেন, আর সেখানে ছিলেন —শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি। আমি নমস্কার ক'রে রবিবাবুর ডান দিকে ফরাসের একপ্রান্তে বস্‌লাম। তখন 'বঙ্গদর্শনে' রবিবাবুর 'চোখের বালি' শেষ হয়ে 'নৌকাডুবি' বাহির হচ্ছে। তার সম্বন্ধেই কথা চল্‌ছিল। আমি যখন গেলাম তখন শুন্‌লাম দীনেশবাবু বল্‌ছেন— "আপনি তো দুটি মেয়ে এনে উপস্থিত করেছেন। ওদের কার সঙ্গে শেষকালে রমেশের প্রণয় প্রবল হবে? দুজনের মধ্যে রমেশকে ফেলে যে গোলমালের সৃষ্টি করলেন, তা থেকে উদ্ধার পাবেন কেমন ক'রে।"

রবিবাবু হেসে বললেন—"আমি তো তা কিছুই জানি না যে রমেশ

কমলা আর হেমনলিনীর মধ্যে পড়ে কি যে কর্‌বে। আমি তো কখনো আগে ভেবে চিন্তে কিছু লিখি না, লিখ্‌তে লিখ্‌তে যা হ'য়ে দাঁড়ায়। দেখা যাক শেষে কি হয়।

আমি বল্‌লাম— যদি তেমন তেমন কোনো গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তা হ'লে একজনকে মেরে ফেল্‌লেই হবে।

এর উত্তরে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন— এ বয়সে আর আমাকে স্ত্রীহত্যা কর্‌তে বল্‌বেন না।

তাঁর এই কথা সকলের মনে লাগ্‌ল, কারণ এর অল্পদিন আগেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল।

যতক্ষণ কথাবার্তা চল্‌ছিল ততক্ষণ রবিবাবু মাঝে মাঝে আমার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম যে তিনি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না, অথচ চিনিচিনি কর্‌ছেন, এবং আমি কে হ'তে পারি তা মনে মনে মিলিয়ে বেছে বেছে দেখ্‌ছেন। তিনি নিশ্চয় ভাব্‌ছিলেন যে এই প্রগল্‌ভ লোকটি কে যে বিনা পরিচয়ে আমাকে পরামর্শ দিতে সাহস করে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর কথার মধ্যেই রবিবাবু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আপনি কি চারুবাবু?" আমি তাঁর অনুমান মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিতেই তিনি আবার যে কথা চল্‌ছিল তারই আলোচনায় যোগ দিলেন।

যখন সভা ভঙ্গ হলো তখন তিনি আমাকে বল্‌লেন আমি আপনাকে যা বল্‌বার তা শৈলেশকে দিয়ে ব'লে পাঠাব।

এর পর আমি অবস্থাবিপর্যয়ে কয়েক বৎসর কলকাতাছাড়া হ'য়ে ছিলাম। রবিবাবুর সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি।

ইংরেজী ১৯০৮ সালে আমি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের তরফ থেকে কল্‌কাতায় ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস নামে একটি পুস্তক প্রকাশের ও বিক্রয়ের দোকান খুলি। আমার উপরে ভার ছিল সকল প্রসিদ্ধ লেখকের বই প্রকাশের অধিকার সংগ্রহ করার। অমি রবিবাবুকে দিয়ে

বউনি করব সঙ্কল্প ক'রে রামানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবাবুর কাছে গেলাম। রামানন্দবাবু আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে রবিবাবু বললেন—"এর জন্য আপনার কোনো সুপারিশ আন্‌বার আবশ্যক ছিল না। কেউ যদি আমার এই সমস্ত কুকর্মের ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করেন সে তো আমার পরম উপকার করা হবে। আপনি যবে বল্‌বেন আমার সব বই আপনার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো।"

এই হলো তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সূত্রপাত।

এই সময় সত্যেন্দ্র দত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন তাঁর 'তীর্থসলিল' ছাপা চল্‌ছে। তিনি প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা প্রেস থেকে প্রুফ নিয়ে আমার বাসায় আস্‌তেন আর আমাকে তাঁর কবিতা শোনাতেন। একদিন আমি তাঁর 'বেণু ও বীণা' উৎসর্গ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন কর্‌লাম "এ বইটা আপনি কাকে উৎসর্গ করেছেন?"

সত্যেন্দ্র বললেন—"আপনিই বলুন না।"

সেই উৎসর্গে লেখা আছে—

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন
যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক
সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশে
এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।

আমি বল্‌লাম—"ইনি হয় শেক্‌স্‌পীয়ার, আর নয় রবিবাবু।"

সত্যেন্দ্র উত্তর কর্‌লেন—"স্বদেশের কবি থাকতে আমি বিদেশে যাব কেন?"

আমার আনন্দের অবধি থাক্‌ল না। আমার মনে মনে ধারণা ছিল যে রবিবাবু জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তখনও আমাদের দেশে তাঁর প্রতিভা সর্বজনসমাদৃত হয় নি, একদল নিন্দক প্রবল হ'য়ে তাঁকে খাটো

কর্‌বারই ব্রত গ্রহণ করেছিল। তাই আমার মনের ধারণা লোকের কাছে আমি প্রকাশ ক'রে কখনো বল্‌তে সাহস করি নি। আজ সত্যেন্দ্রকে আমারই মতানুকূল পেয়ে আমি আনন্দিত হলাম, আমার পৃষ্ঠপোষক পেয়ে আমার সাহস বাড়লো, আমি মনে জোর পেলাম।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ পাকে-চক্রে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে জানাতে লাগ্‌লেন যে আমাকে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে চান। আমাকে একদিন বল্‌লেন—"চারু, তুমি কি আমাকে একজন এমন লোক দিতে পারো যে একটু সংস্কৃত জানে, ইংরেজীটাও নেহাৎ ভুল করে না, আর আমার লেখাগুলোকে নিতান্ত তুচ্ছ ব'লে অবহেলা করে না।"

বন্ধুবর অজিত চক্রবর্তী আমাকে বললেন—"গুরুদেব তোমাকেই চান।"

আমি তখন সদ্যঃ ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস খুলেছি, আমার উপর নির্ভর ক'রে ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণিবাবু অনেক টাকা ব্যয় করেছেন, এখন আমার তাঁর কর্ম ত্যাগ ক'রে বোলপুরে চ'লে যাওয়া উচিত হবে না ব'লে আমার মনে হলো। আমি রামানন্দবাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌লাম; তিনি বল্‌লেন—"না, আপনি এখন যেতে পারেন না।"

আমি বাধ্য হয়ে কবিগুরুর আমন্ত্রণ স্বীকার কর্‌তে না পেরে খুবই ক্ষুণ্ণ হলাম। তখন কবিকে বল্‌লাম—"আপনি যদি লোক চান তো আমার চেয়ে বহু গুণে ভালো লোক আপনাকে এনে দিতে পারি।"

তিনি লোক চাওয়াতে আমি বন্ধুবর বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেনকে শান্তিনিকেতনে আস্‌তে প্ররোচিত করি।

আমি একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের আশ্রমে আমার জিনিষপত্র রেখে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে গেলাম। ক্ষিতিমোহন বল্‌লেন—"তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি, তার পর একসঙ্গে বেড়াতে যাব।"

ক্ষিতিমোহনের প্রতি আমার প্রীতির প্রবল টান কবি টের পেয়ে-

ছিলেন। আমি ক্ষিতিমোহনের কাছে আগে গিয়ে পরে তাঁর কাছে এসেছি এই নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে বল্‌লেন—"ক্ষিতিমোহনের মোহ এতক্ষণে কাটুল।"

আমি লজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর কাছে বসলাম।

তিনি তখন শান্তিনিকেতনে শালবীথির ধারে মাঠে একখানা তক্তপোষের উপর একলা ব'সে ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্ষিতি এসে আমার পাশে ব'সে বল্‌লেন—"চারু, চলো বেড়াতে যাই।"

কবি হেসে বল্‌লেন—"হাঁ, যখনি চারুচন্দ্র ক্ষিতি আর রবির মাঝখানে পড়েছেন, তখনই জানি যে রবির গ্রহণ লাগ্‌বে।"

ক্ষিতিমোহন আমার আশা ত্যাগ করে পলায়ন কর্‌তে কর্‌তে ব'লে গেলেন—"না না, আমি চারুকে নিয়ে যেতে চাইনে, ও আপনার কাছেই থাক।"

'শারদোৎসব' নাটক সদ্যঃ লেখা হয়েছে, শান্তিনিকেতনে ছাত্রশিক্ষকে মিলে তার অভিনয় কর্‌বেন, তার আগে বইখানি শোভন রূপে ছেপে প্রকাশ কর্‌বার জন্য আমার ডাক পড়েছে। কবি বই প'ড়ে আমাদের শোনালেন। কথা হলো যে প্রারম্ভে একটি মঙ্গলাচরণ দিতে হবে। কবি অনুরোধ কর্‌লেন, শাস্ত্রী মহাশয় একটা সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ লিখে বা বেদ থেকে খুঁজে দেবেন। আমি বল্‌লাম—"যাঁর লেখা বই সেই কবিই মঙ্গলাচরণ লিখ্‌বেন, আর কারো অনধিকার প্রবেশ এখানে খাটুবে না।"

কবি হেসে বল্‌লেন—"আমার প্রকাশকের তো বড় কড়া শাসন দেখি। তা তোমরা যদি আমাকে এখন ছুটি দাও তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি যে আমার প্রকাশকের হুকুম তামিল করিতে পারি কি না।"

তিনি নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলেন—গান তৈরী ও সুর সংযোজনা সব হয়ে গেছে। সে গানটি শারদোৎসবের প্রথমেই আছে—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে বরণে এস গানে।

রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে একবার শিলাইদহে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি কাছারীর পরপারে চরের গায়ে বজরা বেঁধে বাস কর্‌ছিলেন। দুখানি বজরা পাশাপাশি বাঁধা, একখানিতে কবি নিজে বাস করেন, আর অন্যখানিতে অজিতকুমার পীড়িত হ'য়ে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য বাস কর্‌ছিলেন। আমি অজিতের বজরায় বাসা পেলাম। আমি কবিকে প্রণাম ক'রে স্নান কর্‌বার জন্য আমার বাসা বজরায় যাব বলে উঠ্‌লাম। কবির বজরা থেকে অজিতের বজরায় যাবার জন্য একটি তক্তা এক বোট থেকে আরেক বোট পর্যন্ত ফেলা ছিল। আমি যখন অপর বজরায় যাবার জন্য উঠ্‌লাম, কবি আমাকে বল্‌লেন—"চারু, দেখো সাবধানে যেয়ো, এখানে জোড়াসাঁকো নেই, এক সাঁকো দিয়েই পার হ'তে হবে।"

সে সময়ে তিনি আমাকে যে যত্ন করেছেন তা আমার জীবনের মহার্ঘ সম্বল হ'য়ে আছে। নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়ানো, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সর্বদা উৎসুক থাকা, অজিতকে ক্রমাগত বলা, দেখো অজিত, তোমার বন্ধুর যেন কোন অসুবিধা না হয়।

পরদিন রাত্রে আমাকে তাঁর বোটে থাক্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন। এত বড় লোকের অত কাছে থাক্‌তে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লাম—আমি তো অজিতের সঙ্গেই বেশ আছি, এখানে শুলে আড়ষ্ট হ'য়ে আমারও অসুবিধা হবে আর আপনারও বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে।

কিন্তু কবি কিছুতেই শুন্‌লেন না, অজিতকে বল্‌লেন—"অজিত, তোমার বন্ধু তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে চান না। অতএব তুমিও তোমার বাসা বদল ক'রে এই বোটে এসো।"

সন্ধ্যার সময় খুব ঝড়জল আরম্ভ হলো। কবি বল্‌লেন—"অজিত অতিথির সম্বর্ধনা করো, গান ধরো।"

কবি গান ধর্‌লেন, অজিত সঙ্গে যোগ দিলেন—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার !

তারপরে আবার গান ধর্‌লেন—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো !
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো !

এই দুটি গানই আমি ‘প্রবাসী’র জন্য চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম, এবং কবির হাতে লেখা কাগজের টুক্‌রা দুটি এখনো আমার কাছে আছে।

এই সময় ‘প্রবাসী’তে ‘গোরা’ বাহির হচ্ছিল। তিনি আমাকে বল্‌লেন আরো একদিন থেকে ‘গোরা’র কপিও সঙ্গে নিয়ে যেতে। আমি তাঁর কাছে থেকে ‘গোরা’ লেখার পদ্ধতিও দেখ্‌বার সৌভাগ্যলাভ কর্‌লাম। ঘাড় কাত ক’রে ঘস্‌ঘস্‌ ক’রে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, আর খানিক লিখে ফিরে প’ড়ে অপছন্দ অংশ চিত্রবিচিত্র ক’রে কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কত সুন্দর সুন্দর রচনাংশ যে কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন তা দেখে আমাদের কষ্ট হয়েছে। আমি বল্‌লাম যে, আপনি যা লিখে ফেলেন তাতে আর তো আপনার অধিকার থাকে না, তা বিশ্ববাসীর হ’য়ে যায়, অতএব সব থাক।

কবি হেসে বল্‌লেন—“তুমি বড় কৃপণ। সব রাখ্‌লে কি চলে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস না থাকলে কি সৃষ্টি কখনো সুন্দর হতে পারে।”

শিলাইদহে থাক্‌বার সময় আমি কবির খুব ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ কর্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সেই সময় তাঁর উপাসনায় তন্ময়তা আর গভীর ধ্যান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভোর-রাত্রে একখানি চেয়ার বোটের সাম্‌নে পেতে পূর্বদিকে মুখ ক’রে তিনি ধ্যানে বসতেন, আর বেলা হ’লে সূর্যের আলোক প্রতপ্ত হ’য়ে তাঁর মুখের উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যানভঙ্গ হতো না। তাঁকে সেই তন্ময় অবস্থায় দেখে আমার মনে হতো ‘নৈবেদ্যে’র সেই কবিতাটি যেটি তিনি তাঁর পিতা মহর্ষিকে

লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই জোড় কর করি
কর তাহা দরশন।
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি,
বহিয়া যেতেছে অমৃতলহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া, লহ রে
শুভাশিস্-বরিষণ।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।
ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে,
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে।

বোলপুরেও আমি তাঁকে এমনি ধ্যানরত অনেকদিন দেখেছি। তখন তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশিত উপদেশাবলী প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে বল্‌তেন আর প্রত্যহ প্রত্যূষে মন্দিরের পূর্বদিকের বারান্দায় ব'সে ধ্যানস্থ হতেন, এবং মুখে রোদ এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যানভঙ্গ হতো না। 'গীতাঞ্জলি' রচনার সময় আমি লক্ষ্য করেছি তিনি কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ যেন সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে যেতেন। কোনো এক উৎসব উপলক্ষে আমরা বহু লোকে বোলপুরে গিয়েছিলাম। খুব সম্ভব 'রাজা' নাটক অভিনয় উপলক্ষে। বসন্ত কাল, জ্যোৎস্না রাত্রি। যত স্ত্রীলোক ও পুরুষ এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই পারুলডাঙ্গা নামক এক রম্য বনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কেবল আমি যাইনি রাত জাগ্‌বার ভয়ে। রাত্রিতে আমার

ঘুমভেঙে গেল গায়ে কিসের স্পর্শ লেগে। জেগে দেখি স্বয়ং কবি এসে আমার গায়ে তাঁর নিজের গায়ের মলিদা চাদর ঢাকা দিয়ে দিচ্ছেন। আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌লাম। কবি আমাকে বল্‌লেন—"তুমি উঠো না, ঘুমোও, তোমার শীত কর্‌ছে, তাই গায়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

আমি শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম আমার সৌভাগ্যের কথা। কোন্ সুকৃতির ফলে আমার মতন গুণহীন এত বড় কবি ঋষির স্নেহভাজন হ'তে পারল।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি। গভীর রাত্রি। হঠাৎ আমার ঘুম আবার ভেঙে গেল, মনে হলো যেন শান্তিনিকেতনের নীচের তলার সামনের মাঠ থেকে কার মৃদু মধুর গানের স্বর ভেসে আস্‌ছে। আমি উঠে ছাদে আলসের ধারে গিয়ে দেখ্‌লাম, কবিগুরু জ্যোৎস্নাপ্লাবিত খোলা জায়গায় পায়চারি কর্‌ছেন আর গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইছেন। আমি খালিপায়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলাম। আমি গুরুদেবের কাছে গেলাম, কিন্তু তিনি আমাকে লক্ষ্য কর্‌লেন না, আপন মনে যেমন গান গেয়ে পায়চারি কর্‌ছিলেন তেমনি পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে গান গাইতে লাগ্‌লেন। গান গাইছিলেন খুব মৃদুস্বরে। আমি পিছনে পিছনে বেড়াতে বেড়াতে গানের কথা ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। তিনি গাইছিলেন—

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাব না গো যাব না যে,
থাক্‌ব প'ড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥
আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

আমারে যে জাগ্‌তে হবে,
কি জানি সে আস্‌বে কবে—
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

এই গানটি পরে 'গীতালি'তে স্থান পেয়েছে, এবং সেখানে তারিখ দেওয়া আছে ২২এ চৈত্র ১৩২১ সাল।

অনেকক্ষণ পরে গান থাম্‌লে তিনি অতি মৃদুস্বরে বল্‌লেন—"চারু এসেছ?"

আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি তেমনি মৃদু স্বরে বল্‌লেন—"যাও তুমি শোও গে।"

বুঝ্‌লাম তিনি একলা থাকতে চান। আমি চ'লে এলাম। 'গীতালি'র গানগুলি রচনার সময় আমি কবির কাছে ছিলাম। অনেকগুলি গান রচিত হ'লে তিনি আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তুমি আমার এই গানগুলি নকল ক'রে দিতে পারো, তা হলে ছাপ্‌তে দিতে পারি। যে খাতায় গান লিখেছি সেটা প্রেসে দেওয়া চল্‌বে না, খাতাখানা রথী চেয়েছে।"

আমি গানগুলি নকল ক'রে দিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার কেমন লাগ্‌ল?"

আমি বল্‌লাম—একটা গান একটু অস্পষ্ট হয়েছে, মানে ঠিক ধরা যায় না।

কবি চ'টে গেলেন। বিরক্ত স্বরে বল্‌লেন—"তুমি কিচ্ছু বোঝো না, ও ঠিক আছে।"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লাম—আমি বুঝ্‌তে পারিনি সেই কথাই বল্‌ছিলাম, কবিতার কোনো ত্রুটির কথা আমি বলি নি।

কবি গম্ভীর ও নীরব হ'য়ে রইলেন। আমি প্রণাম করে চলে এলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে গেছি। রাত্রে আমার বাসা বেণুকুঞ্জে কবির

কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভেঙে গেল—"চারু, তুমি ঘুমিয়েছ?"

আমি ধড়মড় ক'রে উঠে পড়্‌লাম, এবং মশারির দড়ি ছিঁড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি মশারি সরিয়ে কবিগুরুকে বস্‌বার জায়গা ক'রে দিলাম।

তিনি আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তুমি ঠিকই বলেছ, ঐ গানটার কোনো মানেই হয় না, আমি প'ড়ে দেখি যে আমি নিজেই তার মানে বুঝ্‌তে পারি না, কি ভেবে যে লিখেছিলাম তা এখন আর ধর্‌তেই পারি না। সেটাকে বদ্‌লে এনেছি, দেখো তো এটার কোনো মানে হয় কি না।"

আগের গানটি কেটে সেই কাগজে সেই গানের পাশে নূতন ক'রে আর একটি গান লিখে এনেছেন, কেবল আমাকে তিরস্কার করায় আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি ভেবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার সেটি যে কৌশল মাত্র তা আমার বুঝ্‌তে বাকী রইল না। আমার মনের ক্লেশ দূর কর্‌বার জন্য নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে থেকে আবার একটি নূতন গান রচনা করেছেন। ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম তখন ১১টা বেজে গেছে।

নিম্নে প্রথম লিখিত কবিতাটি তার সংশোধন সমেত দিলাম এবং তার পরে পরিবর্ত্তিত ও 'গীতালি' পুস্তকে প্রকাশিত কবিতাটিও তার সকল সংশোধন সমেত দিলাম—

কেন আর মিথ্যা আশা
বারে বারে
হাত ধরে
ওরে তোর সঙ্গে যে কেউ
যাবে না রে
এ তোমার রাত্রিশেষের ভোরের পাখী
তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি,
যা রে তুই বিজন পথে চ'লে যা রে।

ওদের ঐ   হৃদয়-কুঁড়ি   শিশির রাতে
ব'সে রয়   চোখের জলের   অপেক্ষাতে।
মেটাতে   পারবে না যে   আঁধার নিশা
তোমার এই   ফোটা ফুলের   আলোর তৃষা,
সে যে তাই   চেয়ে আছে   পূবের পারে ॥

২

যে থাকে থাক না
ওরা থাকে ঘরের দ্বারে
যে যাবি যা না
যা না তুই আপন পারে।
যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম গায় রে
তোমারেই গেল   ডাকি,
একা তুই চ'লে যা রে।
কুঁড়ি চায় আঁধার রাতি
রসে মাতি।
শিশিরের অপেক্ষাতে।
চায় না নিশা
ফোটা ফুল আলোর তৃষায়
প্রাণে তার আলোর তৃষা
কাঁদে সে অমানিশায়
সে কাঁদে সে অন্ধকারে ॥

‘গীতালি’র উৎসর্গের কবিতাটিতেও বহু পরিবর্তন করা হয়েছিল, তার কাটা কপিও আমার কাছে আছে। এই রকম বহু কবিতার সংশোধন-সাক্ষী কাটা কপি আমার কাছে আছে। সেগুলিকে প্রকাশ করতে পারলে কবির মনের চিন্তার একটু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। আমার

খাতিরে যে কবিতাটিকে একেবারে বর্জন ও লোকলোচন থেকে বিসর্জন করেছেন সেটিও যে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

যখন 'গীতালি'র গান নকল কর্‌ছিলাম সেই সময় একদিন বন্ধুবর অসিতকুমার হালদার আমাকে বল্‌লেন—"চলো গয়া বেড়িয়ে আসি।" অসিতের প্রস্তাব রবিবাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ও শুনে তিনিও যেতে প্রস্তুত হলেন। শেষে কবিও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লেন, এবং ক্রমে আমাদের দল বেশ পুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল, শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও মীরা দেবীও চল্‌লেন। যাত্রার সময় রবিবাবু আমাকে বল্‌লেন —"চারু, আমিও তোমাদের সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাসে যাব।"

আমি অনেক অনুরোধ ক'রে তাঁকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করালাম, তাঁকে এই বলে বুঝিয়ে বল্‌লাম—তাতে আপনার তো কষ্ট হবেই, আর আপনার কষ্ট হচ্ছে ভেবে আমাদেরও শান্তিস্বস্তি কিছু থাক্‌বে না।

গয়ায় তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তাঁরা সহরে একদিন রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা কর্‌লেন। সেই সভায় বসন্তবাবু গান গাইলেন আর এক ভদ্রলোক হারমোনিয়াম বাজালেন। একটি কচি মেয়ে আবৃত্তি কর্‌লে। তার প্রথম লাইনটি মনে আছে—

তবু মরিতে হবে।

সভা থেকে বেরিয়ে বুদ্ধগয়ায় আস্‌বার রাস্তায় গাড়ীতে রবিবাবু আমাকে বল্‌লেন—"দেখেছ চারু, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি না হয় গোটাকতক গান কবিতা লিখে অপরাধ করেছি, তাই বলে আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে এ রকম যন্ত্রণা দেওয়া কি ভদ্রতাসঙ্গত! গান হলো, কিন্তু দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে পাল্লা দিতে লাগ্‌লেন যে কে কত বেতালা বাজাতে পারেন আর বেসুরো গাইতে পারেন, গান যায় যদি এপথে তো তার বাজনা চলে তার উল্টো পথে। গায়ক বাদকের এমন স্বাতন্ত্র্য

রক্ষার চেষ্টা আমি আর কস্মিন্ কালেও দেখিনি। তার পর ঐ একরত্তি কচি মেয়ে তাকে দিয়ে নাকি সুরে আমাকে শুনিয়ে না দিলেও আমার জানা ছিল যে তঁবু মরিতেঁ হবেঁ।"

রবিবাবু বুদ্ধগয়ায় পাণ্ডার অতিথি হ'য়ে বুদ্ধগয়াতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বাসায় একদিন নন্দলাল ব'লে এক ভদ্রলোক এসে 'বরাবর' পাহাড় দেখে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে তিনি সেখানকার এক জমিদারের প্রধান কর্মচারী, তিনি সেখানে থাক্‌বার তাঁবু যান বাহন আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, কবি শুধু কষ্ট ক'রে গিয়ে দেখে আসবেন বৌদ্ধ আমলের গিরিগুহা।

আমরা সবাই রওনা হলাম। কবির দৌহিত্রের জ্বর হওয়াতে মেয়েরা আস্‌তে পার্‌লেন না, এবং তাঁদের জন্য নগেনবাবুরও আসা হলো না। গয়া থেকে রেলে বেলা নামক ষ্টেসনে নেমে আমরা এক হাতীতে রওনা হলাম। রবিবাবু পাল্কীতে যাবেন, কিন্তু পাল্কী তখনও আসে নি, নন্দলালবাবু আশ্বাস দিলেন—"আপনারা চ'লে যান, হাতী আস্তে আস্তে যাবে, আর পাল্কী পরে রওনা হলেও আগে চ'লে যাবে।"

আমরা চ'লে গেলাম। নন্দলালবাবু আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ফল দিয়ে দিলেন পাথেয়, এবং ব'লে দিলেন সেখানে তাঁবু পড়েছে এবং সেখানে পাচকেরা অন্ন প্রস্তুত ক'রে রেখেছে।

আমরা বরাবর পাহাড়ের নীচে পৌছে দেখি মাঠ ধূ ধূ করছে, কোথাও তাঁবু বা খাদ্যপানীয়ের কোনো আয়োজন নেই। কবির আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে আমি প্রস্তাব কর্‌লাম আমরা আগে গিয়ে গুহাগুলো দেখে আসি, কবি যে আস্‌বেন তার কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না, আর যদি আসেনই তবে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা যাবে, তাতেও কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা গুহা দেখে নেমে এলাম। তখনো কবির পাল্কীর পাত্তা নেই। ক্ষুধায় নাড়ী চোঁচোঁ কর্‌ছে। সঙ্গীরা অল্পবয়সী, তাদের ক্ষুধার তাড়না বেশী। তারা ফলের ঝাঁকা আক্রমণ করলে।

আমি তাদের মুখ থেকে কেড়ে একটি নাসপাতি ও একটি কলা রক্ষা করলাম কবির জন্য।

অনেকক্ষণ পরে কবির পাল্কী এলো। কবি এসে যখন শুনলেন মাঠের মাঝখানে একটি গাছ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, এবং বিশুদ্ধ মেঠো বাতাস ছাড়া আর কিছু খাদ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি বল্লেন—"ভাগ্যে মেয়েরা আর শিশুটি আসেনি। আর পাহাড় দেখে দরকার নেই, ফেরো।"

আমি বল্‌লাম—এতদূর যখন এলেন তখন গুহা না দেখেই ফিরে যাবেন?

তিনি পাল্কী থেকে নাম্‌তে কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন আমি জোর ক'রে তাঁকে কিছু খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি কেবল একটি কলা খেলেন। আমি নাসপাতি ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না ক'রে বল্‌লেন—"আমার কি শক্ত জিনিস খাবার জো আছে। তোমরা যদি কিছু খেতে পাও তবে উমাচরণকেও একটু দিও।"

আমি বল্‌লাম—উমাচরণকে আমি খেতে দিয়েছি।

উমাচরণ তাঁর ভৃত্য, বালককাল থেকে তাঁর পত্নীর কাছে আদরে যত্নে কাজ শিখে মানুষ হয়েছে। ভৃত্যের প্রতি কবির সন্তানবাৎসল্য ছিল।

সন্ধ্যাবেলা বেলা ষ্টেসনে ফিরে গেলাম। কবির সমস্ত দিন স্নান হয়নি, আহার হয়নি, রৌদ্রে পথে যাতায়াতে ও মনের বিরক্তিতে তাঁর চেহারা অত্যন্ত ম্লান ও গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। তিনি ষ্টেসনের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত প্লাট্‌ফর্মের উপর পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

আমরা কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করছিলাম না। অনেকক্ষণ পরে আমি আস্তে আস্তে তাঁর পিছনে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলাম। তিনি আমাকে নিকটে দেখে বল্‌লেন—"জীবনে দুঃখ পাওয়ার দরকার আছে।"

আমি তাঁর কথা সমর্থন ক'রে কি বল্‌তে গেলাম। তিনি সে কথা গ্রাহ্য না ক'রে দুঃখ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব অবতারণা ক'রে অনর্গল বলে

যেতে লাগ্‌লেন। আমি বুঝ্‌লাম, ঐ যে দার্শনিকতা তা কেবল নিজের বিরক্ত মনকে সান্ত্বনা দেবার ও রুষ্ট মনকে শান্ত করবার উপায় মাত্র, তাঁর ঐ উক্তি স্বগত, আমাকে উপলক্ষ ক'রে নিজেকে বলা। অতএব আমি চুপ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে শুন্‌তে লাগ্‌লাম মাত্র। আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় যে ঐ চমৎকার উক্তির একবর্ণও আমার এখন মনে নেই; যদি তা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তাম তবে সেটি তাঁর 'ধর্ম' নামক পুস্তকে যে দুঃখ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে তার চেয়েও উৎকৃষ্ট ব'লে গণ্য হতো।

আমাদের বরাবর যাত্রার কাহিনী 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। যা সেখানে নেই তাই আমি বল্‌ছি।

কবি অনেকক্ষণ কথা কয়ে ক্লান্ত হ'য়ে স্তব্ধ হলেন।

আমি ওয়েটিং রুম থেকে একখানা চেয়ার প্লাট্‌ফর্মের মধ্যখানে পেতে দিয়ে তাঁকে বস্‌তে অনুরোধ করলাম। তখনো আমাদের ট্রেন আস্‌তে দেরী আছে। অল্পক্ষণ পরে গয়া থেকে একখানা ট্রেন এলো। গেঁয়ো ষ্টেসনের প্লাট্‌ফর্মের উপর ঐ অসাধারণ চেহারার ও পোশাকের লোককে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে দেখে ট্রেনের সকল গাড়ীর জানালা থেকে মুখ ঝুঁকে পড়্‌ল। ট্রেন চ'লে গেল। কয়েক জন গেঁয়ো লোক সেই ষ্টেসনে নেমেছিল। তারা বাইরে বেরিয়ে যাবার পথে সৌম্যমূর্তি কবিকে সমাসীন দেখে তাঁর থেকে দূরে অথচ তাঁর সাম্‌নে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের একজন দেখে দেখে গম্ভীরভাবে বল্‌লে— কোই রৈস (সম্ভ্রান্তব্যক্তি) হৈঁ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্‌লে— নেই, কোই রাজা হোঁইহেঁ। তৃতীয় ব্যক্তি দুজনেরই অনুমান না-পছন্দ ক'রে মাথা নেড়ে বল্‌লে— নেহি, কোই সাধু হৈঁ জরুর।

আমার মনে হলো ঐ তিনজনেরই অনুমান সত্য— তখন কবির মুখে আভিজাত্যের গাম্ভীর্য, রাজসিক তেজ, আর সাত্ত্বিক ভাবের স্নিগ্ধতা মিলে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। কবির মনে তখন যে সাত্ত্বিক ভাবের কি ঢেউ চলছিল তার সম্বন্ধে তাঁর 'গীতালি' পুস্তকের শেষের

কয়েক পৃষ্ঠা চিরকাল সাক্ষী হ'য়ে থাকবে।

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন ঘোরে।

বুদ্ধগয়ায় একদিন তিনি সমস্ত দিন অস্নাত অভুক্ত থেকে ঘরে দরজা দিয়ে কেবল গান লিখে লিখে ভগবানের সঙ্গে মিলন অনুভব করেছিলেন। তারও একটু পরিচয় 'গীতালি'র পাতায় লেগে আছে।

তোমার কাছে চাইনে আমি অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।
বাইরে হোথায় দ্বারের কাছে
কাজের লোকে দাঁড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে যাক্‌না ফিরে
আপন ঘর।
আমি গান শোনাব গানের পর।

গয়া থেকে রবিবাবু এলাহাবাদ গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হলো। আর সবাই শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। এই যাত্রায় ১৩২১ সালে এলাহাবাদে 'বলাকা'র জন্ম হয়। যখন তিনি ফিরে কল্‌কাতায় এলেন তখন মাঘ মাস। তিনি আমাকে বল্‌লেন—"দেখ চারু, আস্‌বার সময় রেল লাইনের দুধারে দেখ্‌লাম কত ফুল ফুটে রয়েছে। তারা সব বসন্তের অগ্রদূত। তাদের ওপর আমার একটা কবিতা লিখ্‌তে ইচ্ছে

করছে। কিন্তু আমাদের দেশের বুনো ফুলের তো কোনো নাম নেই। অভিধানে পণ্ডিত মশায়রা পুষ্পবিং বলেই খালাস। তাদের পরিচয় জান্‌বার জন্য কারো মনে যদি এতটুকু আগ্রহ থাকৃত, তাহলে য়ুরোপীয় ফুলের মতন তাদেরও নাম গোত্র সব নির্ণয় হ'য়ে যেত।"

আমি বল্‌লাম—আপনি ওদের নামকরণ করে ওদের জাতকর্ম করে দিন, ওরা ঐ নামেই চিরকাল পরিচিত হবে।

কবি কবিতা লিখ্‌লেন, কিন্তু প্রচলিত ফুলের বেনামীতে।—

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর।
এখনো শীত হয়নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস্ গান।
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।

আমার স্মৃতি থেকে লেখার সময়ের পৌর্বাপর্য সব ঘটনায় রক্ষা ক'রে বল্‌তে পারছি না। একটু আধটু উল্টাপাল্টা হ'য়ে যাচ্ছে। পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে দেখে শুনে লিখ্‌লে হয় তো কতকটা পৌর্বাপর্য রক্ষা হ'তে পারৃত। কিন্তু আমি তো ইতিহাস লিখ্‌ছি না, আমি লিখ্‌ছি আমার মনে রবীন্দ্রনাথের ছবি। তাই ঘটনার ওলোট পালোটে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

একবার এক উৎসব উপলক্ষে আমরা অনেকে শান্তিনিকেতনে গেছি। কবি আমার সঙ্গী বন্ধুদের বল্‌লেন—"দেখো, তোমরা যেখানে থাক্‌বে সেখানে চারুকে আর সত্যেন্দ্রকে নিয়ে যেয়ো না। তোমরা সমস্ত রাত গোলমাল করবে, ঘুমুবে না। চারু বড় ঘুমকাতুরে আর সত্যেন্দ্রের শরীর ভালো নয়। তোমরা ওদের আমাকে দিয়ে যাও। আমি ওদের খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে রাখবো।"

বন্ধুরা আমাদের আশা ত্যাগ ক'রে তাঁদের বাসায় চ'লে গেলেন। আমরা কবির সঙ্গে আহার ও আলাপ ক'রে শয়ন করলাম কবিরই শয়ন-

কক্ষের পাশের ঘরে, তাঁরই বিছানায় তাঁরই মশারি খাটিয়ে। অল্প দু-একটা কথা বলার পর সত্যেন্দ্র ও আমি নীরব হ'য়ে গেলাম। খানিক পরে সত্যেন্দ্র মৃদুস্বরে আমাকে ডাক্‌লেন—"চারু, ঘুমিয়েছ?"

আমি বল্‌লাম—না।

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি ভাব্‌ছ?"

আমি পাল্টে প্রশ্ন কর্‌লাম—তুমি কি ভাব্‌ছ?

সত্যেন্দ্র বল্‌লেন—"আমি ভাবছি যে আমাদের কী সৌভাগ্য। আমার আনন্দে ঘুম আস্‌ছে না।"

একবার ১৩২২ সালে বা ১৩২১ সালের শেষে 'প্রবাসী'র জন্য একখানি উপন্যাস আবশ্যক হয়। রবিবাবুকে অনুরোধ কর্‌বার জন্য আমি আর সত্যেন্দ্র তাঁর কাছে গেলাম। রবিবাবুকে আমাদের আবেদন জানালে তিনি আমাকে বল্‌লেন—"তুমি নিজে লেখ না।"

আমি বল্‌লাম "আমার প্লট মনে আসে না। প্লট পেলে লিখ্‌তে চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।"

কবিগুরু বল্‌লেন—"তোমরা সব বড় পরে জন্মেছ। বছর কুড়ি আগে যদি জন্মাতে তাহলে তোমাদের আমি দেদার প্লট দিতে পার্‌তাম। তখন আমার মনে হতো আমি দুহাতে প্লট বিলিয়ে হরির লুট দিতে পারি। একটা প্লট আমি নিজে লিখ্‌ব ব'লে ভেবে রেখেছিলাম, সেইটেই তোমাকে দিই। ধরো একটি শিক্ষিত মেয়ে এক অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে গিয়ে পড়্‌ল। তার আদর্শের সঙ্গে ওদের কি রকম বিরোধ বেধে যাবে তাই দেখাও…

ঐ প্লটটি আমার 'স্রোতের ফুল' নামক উপন্যাসের ভিত্তি।

এর পরেও আমি তাঁর কাছ থেকে প্লট পেয়েছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। কবি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"চারু, কি লিখ্‌ছ?"

আমি তো সর্বদাই কিছু না কিছু লিখি, বেকার ব'সে কখনো থাকি না। কিন্তু সেসব লেখা কি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা ব'লে গণ্য হবার যোগ্য। তাই তিনি আমাকে যখনই জিজ্ঞাসা করেন আমি কিছু লিখ্‌ছি কি না, তখনই আমি আমার লেখার বিষয় গোপন ক'রে বলি, না আমি কিছুই লিখ্‌ছি না। আমি কিছুই লিখ্‌ছি না শুনে তিনি বল্‌লেন—"দেখ, সরস্বতী স্ত্রীলোক, তাকে বশ করতে হলে কেবল সাধ্যসাধনায় তার মন পাওয়া যাবে না, তার উপরে মাঝে মাঝে কড়া হুকুম করাও দরকার। জানো তো যে মেয়েরা কড়া স্বামী ঝাল লঙ্কা আর জোঁদা টক পছন্দ করে। তুমি একটু হুকুম ক'রে দেখো, ঠিক বশ মানাতে পার্‌বে।"

আমি বল্‌লাম— একটা প্লট পেলে লিখ্‌তে চেষ্টা করতে পারি।

কবি একটু উন্মনা হয়ে বল্‌লেন—"প্লট! আচ্ছা ধরো…"

তার পর যে গল্পের কাঠামো বল্‌লেন তাকে আমি 'দুই তার' নামক উপন্যাসে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। এর পরে আমার 'হেরফের' উপন্যাসের প্লট বোলপুরে পেয়েছিলাম, আর 'ধোঁকার টাটি'র প্লট তিনি আমাকে শিলং পাহাড় থেকে পত্রে লিখে পাঠিয়েছিলেন, যদিও রামযাদুর চিত্র এঁকে আমি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছি।

একবার মাঘোৎসবের দিন আমি জোড়াশাঁকোর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আমি যেতেই দারোয়ান আমাকে বল্‌লে—"বাবুমশায় আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।"

বন্ধুরা সব সভায় গেল, আমি কবির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীর উপরতলায় একেবারে পশ্চিমের দিকের ঘরে গেলাম। কি জন্যে আমাকে ডেকেছিলেন তা আমার এখন মনে নেই, কিন্তু সেদিন আমি আর একটি যে দৃশ্য দেখেছি তা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।

দারোয়ান এসে খবর দিলে একজন লোক বাবুমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কবি বল্‌লেন—"তাকে বলো, এখন তো আমার সময় নেই। উপাসনা আরম্ভ হবার সময় হয়ে এসেছে, আমাকে সভায় যেতে হবে।"

দারোয়ান বল্‌লে— সেই লোকটিকে এ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি বল্‌লেন তিনি বেশীক্ষণ বিলম্ব করাবেন না, তিনি কেবল মাত্র প্রণাম করেই চ'লে যাবেন।

কবি তাঁকে আস্‌তে অনুমতি দিলেন।

যিনি এলেন, দেখ্‌লাম, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ, অপর একজন তাঁর হাত ধ'রে নিয়ে আস্‌ছে। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এসেছি।"

কবি বল্‌লেন—"হাঁ, আমি রবীন্দ্রনাথ।"

বৃদ্ধ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লেন—"আমি অন্ধ, আমার এক মেয়ে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। কিন্তু বিধবা হ'য়ে সে কয়েকদিন কান্নাকাটি ক'রে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। আমার কৌতুহল হলো জান্‌তে যে তার কি হলো যে হঠাৎ কান্না বন্ধ হয়ে গেল। তাকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সে বল্লে—'আমি রবিবাবুর "নৈবেদ্য" বই প'ড়ে তা থেকে পরম সান্ত্বনা পেয়েছি, আর আমার শোক দুঃখ কিছু নেই।' আমি তাকে বল্‌লাম—'দারুণ শোক তাপ দূর হয়ে যায় এমন যে বই তুমি পেয়েছ, তা আমাকেও প'ড়ে শোনাও।' মেয়ে আমাকে সেই বই প'ড়ে প'ড়ে শোনালে। আমি তা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি আর বড় সান্ত্বনা লাভ করেছি। এই কথাটি বলে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার জন্য আমি কল্‌কাতায় এসেছি।"

এই কথা ব'লে অন্ধ আবার কবিগুরুকে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন। আমি 'নৈবেদ্যে'র ভাব হৃদয়ে ধারণ ক'রে কবির সঙ্গে মাঘোৎসবের উপাসনায় যোগ দিতে গেলাম।

রবীন্দ্রনাথের বিনয় ও ধৈর্য অসাধারণ। কল্‌কাতায় এলে তাঁর কাছে দর্শকের আনাগোনার আর অন্ত থাকে না। সকাল সাতটা থেকে লোক

আস্‌তে আরম্ভ করে, আর রাত নটা দশটা পর্যন্ত আস্‌তে থাকে। যার যখন অবসর ও ইচ্ছা সে তখন আসে, কিন্তু কবির যে বিশ্রাম করার অবসর পাওয়া দর্‌কার, তাঁর যে স্নানাহার আবশ্যক, এ সম্বন্ধে কারুরই হুঁশ থাকে না। আমারও থাকৃত না সে অপরাধ স্বীকার ক'রে রাখি, আমাদের মনে হতো যে আমাদের যখন অবসর আছে তখন তাঁরও আছে। এক একদিন দেখেছি, লোকের পরে লোক আস্‌ছে, কবি ঠায় ব'সে আছেন, নড়া নেই চড়া নেই বসার ভঙ্গী পরিবর্তন করা নেই, ভৃত্য এসে দূরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে যে আহার অপেক্ষা কর্‌ছে, কবি তার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে নীরবে তিরস্কার করেছেন আর সে বেচারা মুখ কাচুমাচু ক'রে পলায়ন করেছে। আমি অনেক সময় আগন্তুকদের কৌশলে বিদায় ক'রে দিয়ে কবিকে উদ্ধার করেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা গেছি, লোকের পরে লোক আস্‌ছেন, কেউ নূতন গান শিখে নিচ্ছেন, কেউ তাঁকে দিয়ে কিছু পড়িয়ে শুন্‌ছেন, কেউ নানা বাজে কথা পেড়ে বকর বকর কর্‌ছেন। আর কবি অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের সকলের মন রক্ষা কর্‌ছেন। রাত্রি আটটা বেজে গেল, আমরা উঠি উঠি কর্‌ছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আচ্ছা আপনার ফ্রুডের স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে মত কি? আমার তো মনে হয়"—চল্‌ল তাঁর অনর্গল বক্তৃতা। কবি তাঁকে বল্‌লেন—"দেখ, তোমার সঙ্গে বুঝি চারুর পরিচয় নেই, ও সম্পাদক মানুষ, ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে রাখ্‌লে তোমার ফ্রুডের কিছু হিল্লে লাগ্‌তে পারে।" সে ভদ্রলোক কবির ব্যঙ্গ বুঝতে পার্‌লেন না। তিনি কেবল এক "ও" বলে আবার বকতে লাগ্‌লেন। তাঁর বকুনি আর থামে না দেখে আমি উঠবার উপক্রম কর্‌লাম, তখন প্রায় রাত্রি দশটা। আমাকে চ'লে যেতে উদ্যত দেখে কবি আমাকে বল্‌লেন, "চারু, তুমি চলে যেও না, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, তুমি আর একটু বোসো।"

এতক্ষণে সে ভদ্রলোক উঠ্‌লেন। তিনি চ'লে গেলে কবি কুপিত ভাবে আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তোমাকে আমি আমার বন্ধু ব'লে জান্‌তাম, কিন্তু সে ভ্রম আজ আমার ঘুচ্‌ল।"

আমি তো অবাক্। ভীত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই তিনি রেগে বল্‌লেন—"তুমি আমাকে ঐ ফ্রুডের ভূতের হাতে অসহায় ফেলে রেখে চ'লে যাচ্ছিলে কোন্ আক্কেলে।"

আমি তো এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে হেসে বাঁচলাম।

সেই ভদ্রলোক এতক্ষণ ফ্রয়েড নামকে ফ্রুড উচ্চারণ ক'রে ক'রে আমাদের মনের মধ্যে যে হাস্য জমা ক'রে তুলেছিলেন, তা এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে গেল।

এর পরে একদিন আমি রাত নটার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে দেখলাম তাঁর ঘরে তখনো অনেক লোক ব'সে রয়েছেন। আমাকে দেখে রথীবাবু আমাকে বাইরে ডেকে বল্‌লেন—"সকাল থেকে বাবা এই ঘরে ব'সে আছেন, তাঁর এখনো স্নানাহার হয় নি, আপনি যদি পারেন সব লোককে বিদায় কর্‌তে একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন।"

আমি তখন নিতান্ত অসভ্যের মতন ঘরের সব লোককে ডেকে ডেকে কবির অবস্থা জ্ঞাপন কর্‌তে লাগ্‌লাম। রূঢ় হবে ব'লে বাড়ীর লোকেরা যে কথা বল্‌তে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, আমি বাইরের লোক হওয়াতে তা অনায়াসে ব'লে সকলকে বিদায় কর্‌তে লাগ্‌লাম। সকলকে বিদায় ক'রে আমিও বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়েছি, দেখ্‌লাম আর একজন ভদ্রলোক তখন সিঁড়িতে উঠ্‌ছেন, রাত দশটা হয়েছে, তাঁর ডাক্তারী ব্যবসায়ের বিশ্রামের অবসরে তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। আমি তাঁকে সিঁড়িতেই গেরেপ্তার ক'রে কবির দুরবস্থার সংবাদ দিলাম, কিন্তু তাঁর অনুকম্পা উদ্রেক কর্‌তে পার্‌লাম না। তিনি আবার ভয়ানক বাচাল ও গল্পে; তিনি একবার কথা ফেঁদে বস্‌লে কোথায় যে তাঁর কমা সেমিকোলন পড়বে তা কেউ বলতে পারে না,

তাঁর কথায় তো কোথাও দাঁড়ি ছেদ নেই-ই। তাঁকে নাছোড়বান্দা হ'য়ে ঘরে প্রবেশ কর্‌তে দেখে রথীবাবু যেরকম হতাশ নিরুপায় ভাবে আমার দিকে চাইলেন তাতে আর আমার চ'লে যাওয়া হলো না, আমি কবিকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য আবার ঘরে ফিরে গেলাম এবং পাঁচ মিনিট পরেই আগন্তুককে স্পষ্ট ব'লে দিলাম যে রাত অনেক হয়েছে, এখন আমাদের চলে যাওয়া নিতান্ত উচিত।

রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যের পরিচয় আমি আর একদিন পেয়েছিলাম, তা যথাস্থানে বল্‌তে ভুলে গেছি। ১৩২১ সালে যখন 'গীতালি'র গান রচনা চল্‌ছিল, তখন আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম তা আগে বলেছি। তার কিছুদিন আগে কবি সুরুলে নূতন বাড়ী কিনেছেন, যেখানে এখন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত আছে। একদিন কবি বল্‌লেন, "চলো চারু, তোমাকে আমার নূতন বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে আসি।" আমরা এক ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে রওনা হলাম। বোলপুর বাজারের কাছে গিয়ে একটা অপরিসর রাস্তার মধ্যে গাড়ীর মোড় ফেরাবার দরকার হলো। কবি গাড়ীর ভিতর থেকে চীৎকার ক'রে কোচমান্‌কে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ওরে এখানে মোড় ফেরাবার চেষ্টা করিসনে, করিসনে, গাড়ী উল্‌টে যাবে, গাড়ী উল্‌টে যাবে।"

কোচমান তাঁর নিষেধ না শুনে গাড়ী ঘোরাতেই লাগ্‌ল। কবি শান্ত ভাবে আমাকে বল্‌লেন যে গাড়ী উল্‌টে যাবে, তুমি ভয় পেয়ো না, গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়্‌বার চেষ্টা করো না। এই ব'লে তিনি আমার হাত চেপে ধর্‌লেন পাছে আমি তাঁর নিষেধ না মেনে লাফ দিতে যাই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী সত্যিই উল্টে গেল। আমাদের কিছুমাত্র আঘাত লাগেনি। আমরা গাড়ীর খোল থেকে গর্তের ভিতর থেকে উপরে ওঠার মতন ক'রে বেরিয়ে এলাম। তার পর হেঁটে শান্তিনিকেতনে ফির্‌লাম, সেদিন আর সুরুলে যাওয়া হলো না।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যেদিন এল, সেদিন কবির

বিচলিত ভাব আর অধৈর্য দেখেছি। সমস্ত দিন অনাহার অস্নাত। রুক্ষ শুষ্ক চেহারা, মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, কারো সঙ্গে কোনো কথা নেই, কেবল বারান্দার একধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত পায়চারি কর্‌ছেন। কাছে কেউ যেতে সাহস কর্‌ছে না, কেবল এণ্ড্রুজ সাহেব একবার তাঁর কাছে গিয়ে কি বল্‌লেন, আর কবি উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন—"ও নো নো নো!"

তার পর তাঁর লেখ্‌বার টেবিলে ব'সে খস্‌খস্‌ করে লর্ড হার্ডিংকে পত্র লিখে নিয়ে এসে এণ্ড্রুজ সাহেবকে দেখ্‌তে দিলেন। এণ্ড্রুজ সাহেব সেই চিঠি প'ড়ে বল্‌লেন বড় উগ্র হয়েছে। চিঠিটা আরো মোলায়েম করা দরকার। কবিকে অনেক সাধাসাধি ক'রে সাহেব কিছু পরিবর্তন কর্‌তে সম্মত করালেন। কিন্তু যা পরিবর্তন হলো তাও সকলের মনে আতঙ্ক সঞ্চার কর্‌তেই লাগ্‌ল। কবি আর মোলায়েম কর্‌তে রাজী হলেন না। সেই চিঠিই বোধ হয় লাট সাহেবের কাছে গিয়েছিল, এবং সমস্ত ভারতবাসীর আহত আত্মসম্মান রক্ষা করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্তি হ'লে সত্যেন্দ্র প্রস্তাব করেন যে সাহিত্য-পরিষৎকে দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করাতে হবে। সত্যেন্দ্র আর মণিলাল পরম উৎসাহ সহকারে টাকা সংগ্রহ কর্‌তে ও লোকমত গঠন কর্‌তে লেগে গেল। আমি বরাবর তাদের সহকারী হ'য়ে কাজ ক'রে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন ক'রে তুলেছিলাম। ভাগ্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে আমরা তাঁকে দেশের সাহিত্য-পরিষৎকে দিয়ে সম্বর্ধনা করাতে পেরেছিলাম, তাই দেশের ইজ্জৎ রক্ষা হয়েছে, নইলে আমাদের লজ্জা রাখ্‌বার আর জায়গা থাক্‌ত না।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আহার কর্‌বার সৌভাগ্য আমার কয়েকবার হয়েছে। কবির সবই কবিত্বময়। আহার-স্থান সজ্জিত করা হয়েছিল যেন এক পরীস্থান রূপে। দুটি নিমন্ত্রণসভার বর্ণনা দেবার ক্ষীণ চেষ্টা আমি করেছি আমার 'যমুনাপুলিনের ভিখারিণী' আর 'জোড়-বিজোড়' নামক উপন্যাসের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ এমনি বিনয়ী যে 'প্রবাসী'র জন্য কোনো লেখা আমার হাতে দিয়ে বা চিঠিতে পাঠিয়ে আমাকে বল্‌তেন—দেখো 'প্রবাসী'তে চল্‌বে কি না।

আমি বাংলা বানান সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ক'রে বানান সংস্কার কর্‌বার চেষ্টা করেছি। আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার যে আমি রবীন্দ্রনাথকে আমার মতাবলম্বী করতে পেরেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তোমার এক 'মতো' ছাড়া সব বানান আমি মেনে নিলাম, তবে যদি সুনীতি চাটুজ্জেও তোমাকে সমর্থন করেন তবে অগত্যা আমাকে সেটাও মেনে নিতে হবে।

তিনি কল্‌কাতা ইউনিভার্সিটিতে তিনটি বক্তৃতা করেন এবং সেগুলি পরে 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়। তিনি এই সময় চীনদেশে যাবেন ব'লে বড় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ব'লে দিলেন যে প্রুফ চারুকে দিয়ে দেখিয়ে নিলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিদেশে যেতে পারব। প্রথম প্রবন্ধের প্রুফ যেদিন আমার কাছে এলো তার পর দিন কবি চীনে যাবেন। আমি রাত্রে তাড়াতাড়ি প্রুফ দেখে সকালেই কবিকে একবার দেখিয়ে নেব ব'লে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। প্রুফের মধ্যে আকৃতি শব্দটা আকৃতি হ'য়ে থেকে গিয়েছিল, আমি সংশোধন করিনি। কবি আমাকে বল্‌লেন—"চারু, তোমার দেখা প্রুফে ভুল থেকে গেল কেমন ক'রে!"

এই তিরস্কারও আমার কাছে পরম পুরস্কার ব'লে মনে হলো।

চীন থেকে যেদিন ফিরে এলেন, সেদিন আমিও ষ্টিমার-ঘাটে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলাম। আমি তখন কঠিন পীড়াগ্রস্ত, একরকম চলচ্ছক্তিহীন। কবিগুরু ডাঙায় নেমেই আমাকে দেখে সস্নেহে আমার পিঠে হাত রেখে আমাকে বল্‌লেন— "চারু, তোমার একি দশা হয়েছে! প্রতিপচ্চন্দ্রমা ইব!" সেই স্নেহ স্পর্শ আজও আমার অঙ্গের ভূষণ হ'য়ে রয়েছে।

তখন 'পূরবী'তে প্রকাশিত কবিতা লেখার পালা চলেছে। আমাকে কবি পত্র লিখে জানালেন—"চারু, কয়েকটা কবিতা লেখা হয়েছে, খদ্দের অনেক, আগে তোমাকে প'ড়ে শোনাতে চাই, দেখে যেতে পারো যদি কোনোটা তোমাদের 'প্রবাসী'তে চলে।" আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে প'ড়ে শোনালেন অনেকগুলি কবিতা। আমি বল্‌লাম—এ যে দেখি আপনার আবার 'মানসী' 'সোনার তরী'র যুগ ফিরে এসেছে!

কবি হেসে বল্‌লেন—"তবে যে তোমরা বলো যে আমি আর কবিতা লিখ্‌তে পারি না। তবে ভালো হয়েছেই বলে তুমি বেশী লোভ কোরো না, একটা—গোণা একটা—বেছে নাও।"

আমি ছুটি কবিতা বেছে তাঁকে বল্‌লাম—এই ছুটির মধ্যে কোন্‌টি আমি নেবো, তা আর আমি স্থির কর্‌তে পারছি না, আপনিই দিন যেটা হয়।

কবি হেসে বল্‌লেন—"তুমি ভারি চালাক, ছুটো নেবারই ফন্দি: তবে ঐ ছুটোই নাও।"

সেই সব কবিতার কবির হাতে লেখা কপি আমার কাছে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

যখন আমি কবির কবিতা থেকে চয়নিকা প্রথম প্রকাশ করি, তখন কবির সঙ্গে বহু কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়। পরেও ঢাকায় শিক্ষকতা করার উপলক্ষে অনেক কবিতার মর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পেয়েছি। সে গুলিও আমার কাছে লেখা আছে। যদি অবসর পাই তবে কবির কাব্যের মর্মকথা প্রকাশ কর্‌বার বাসনা আছে।

সেই সময় আমি তাঁর সমস্ত গানেরও একটা সংগ্রহ প্রকাশ করি। আমি তখন তাঁকে অনুরোধ ক'রে ক'রে বহু গান তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। প্রেমের গানও বাদ দিই নি। আমি তাঁকে যেদিন "বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল, সে কি আমারই পানে ভুলে চাহিবে না" গানটি গেয়ে শোনাতে অনুরোধ কর্‌লাম, সেদিন আমাকে তিনি বল্‌লেন

—"চারু, তুমি আমার মান মর্যাদা আর কিছু রাখ্‌লে না। তবে দরজা দাও, তোমার কাছে তো খেলো হয়েইছি, আর অপরের কাছে আমাকে খেলো কোরো না।"

কবি যখন কল্‌কাতায় 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় করেন, তখন তাঁর হুকুমে আমার মতন মুখচোরা অক্ষমকেও রঙ্গমঞ্চে নাম্‌তে হয়েছিল। শেষ দৃশ্যে যখন কবি-বাউল সকলের সঙ্গে মিলে বসন্তের বন্দনা গান কর্‌ছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখার প্রলোভন ত্যাগ কর্‌তে না পেরে পকেট থেকে আমার চশমা বার ক'রে চোখে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কবি নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার কাছে এসেই দিলেন এক ধমক— চশমা খুলে ফেল বল্‌ছি!

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একজন বাংলার উপাধ্যায় চাই জেনে আমি সেই পদের জন্য প্রার্থী হবো স্থির ক'রে রবীন্দ্রনাথের সুপারিশ পাবার জন্য তাঁকে শান্তিনিকেতনে পত্র লিখ্‌লাম। তিনি তখন কল্‌কাতায় এসেছেন, আমি পীড়িত ছিলাম ব'লে খবর পাই নি। দুদিন পরে খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম। আমি তাঁকে আমার আবশ্যক নিবেদন কর্‌লে তিনি বল্‌লেন—"দেখো দেখি তোমার কাণ্ড, তোমার কি সব অসাময়িক, যদিও তুমি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক! এতদিন তুমি কী কর্‌ছিলে? আজই সকালে আমি একজনকে ঐ কাজের উপযুক্ত ব'লে প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছি, এখন আমি তোমাকে কি ব'লে সুপারিশ করি বলো তো। তুমি আমাকে কী মুস্কিলেই যে ফেল্‌লে তার আর ঠিকানা নেই।"

আমি বল্‌লাম—আপনি আমাকেও একটা যা হয় লিখে দিন। তার পর আমার গুণপনা আর আপনার প্রশংসা আর অপর প্রার্থীর গুণপনা ও আপনার প্রশংসা যাচাই হ'য়ে যার ভাগ্যে হয় জয় জুটে যাবে।

কবি চিন্তিত হ'য়ে গম্ভীর হলেন। আমি বুঝ্‌লাম যে আমার অনুরোধ তাঁকে বিপন্ন করেছে। তখন আমি প্রশংসাপত্র বিনাই বিদায়

নেবো ভাবছি, এমন সময় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমার যাও ক্ষীণ আশা ছিল, তাও আর রইল না, আমার স্থির ধারণা হলো যে আর আমার কোনো প্রশংসাপত্র পাওয়ার পথ খোলা রইল না।

কবি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেলেন—"চারু, তোমরা বোসো, আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, আমাকে কাপড় বদ্‌লে এখনি বেরুতে হবে।"

অল্পক্ষণ পরেই কবি কাপড় বদ্‌লে আলখাল্লা প'রে ফিরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়াতে তিনি চোখের ইসারায় আমাকে তাঁর অনুসরণ ক'রে যেতে বল্‌লেন। আমি উঠে বেরিয়ে পড়লাম, এবং কবির সঙ্গে তাড়াতাড়ি মোটরে চ'ড়ে রওনা হলাম—কোথায় তা তখনো জানি না। মোটর জোড়াশাঁকো থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলে তিনি শোফারকে আদেশ করলেন গাড়ি বিশ্বভারতীর আপিসে নিয়ে যেতে। সেখানে গিয়ে কবি আমার জন্য সুপারিশ ক'রে ভাইস চ্যান্সেলার হার্টগ সাহেবকে এক পত্র লিখে দিলেন, তাতে আমাকে যে প্রশংসা করলেন তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেই পত্র আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখো তো, হবে?"

আমার মন আনন্দে এমন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে আমি কথা বল্‌তে পার্‌লাম না। তখন কবি আমাকে বল্‌লেন—"দেখ চারু, তোমার জন্যে আমি আজ যা কর্‌লাম তা আমার অতি নিকট কোনো আত্মীয়ের জন্যেও কর্‌তাম না।"

কবীন্দ্রের সেই পত্রের প্রশংসার জোরেই এখানে আমার চাকরী হ'য়ে গেল এবং সেই চাকরী আমি এখনো কর্‌ছি।

কবি-মানুষটিরই পরিচয় বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল। কবি-মানসের পরিচয় দেবার আর স্থান নেই। শুধু তাঁর কবিমনের কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ ক'রেই আমার প্রসঙ্গ সমাপ্ত কর্‌ব।

রবির উদয়ে যেমন বিশ্ববাসী নবচেতনা লাভ করে, আমাদের রবির উদয়েও তেমনি আমাদের দেশের এক অপূর্ব চেতনা লাভ হয়েছে। তিনি নরোত্তম, তিনি আমাদের দেশের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতিভূ, তিনি সত্য শিব সুন্দরের উপাসক কবি। তিনি ব্যক্তিজীবনে ও জাতিজীবনে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হওয়ার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর জীবন-দেবতা তাঁকে ক্রমাগত "শঙ্খ" বাজিয়ে "আবার আহ্বান" করেছেন— আগে চল আগে চল! তিনি সুন্দর ভুবনকে ভালোবেসেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছে শ্যাম সমান—

সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।

ইহপরকালকে সুন্দর আনন্দময় ব'লে যিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে অভয় দিয়ে কেবল মাত্র সত্যের পথে চল্‌তে বলেছেন বন্ধন থেকে মুক্তিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, তাঁর আশীর্বাদ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে সত্য হোক্।

পরিশিষ্ট ২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -লিখিত পত্র ও প্রাসঙ্গিক রচনা

১

৫ সেপ্টেম্বর ১৯২১

৪৬, মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট
২০শে ভাদ্র ১৩১৯

পূজ্যবরেষু—

চারু ও মণিলালের চিঠিতে আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। আনন্দে মনে মনে প্রণাম করিয়াছি; কিন্তু, চিঠি লিখি নাই। কারণ বিলাতের অতিব্যস্ত জীবনের মধ্যে, correspondenceএর বোঝা বাড়াইয়া, আপনাকে আর অধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই।

আজ আমার নূতন প্রকাশিত "কুহু ও কেকা" এবং "জন্মদুঃখী" পাঠাইলাম; এবং সেই ছুতায় আপনাকে চিঠি লিখিয়া ধন্য হইলাম।

বাংলার কবির বিলাতে সংবর্দ্ধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু উহা এতই সংক্ষিপ্ত যে উহাতে তৃপ্তি হয় নাই। সে যাহা হোক্, কবির দিগ্বিজয় জগতের ইতিহাসে, বোধ হয়, একেবারে নূতন জিনিস। কিন্তু, প্রতিভার এই প্রাপ্য পূজায় বিস্মিত হইবার বড় বেশী কিছু নাই। আমি জানিতাম, যে, আপনার কবিতার অমৃত আস্বাদ যে পাইবে, সেই আপনার বিশ্বজনীনতার অপূর্ব্ব সুরে মুগ্ধ হইবে। তা' সে ইংলণ্ডের লোকই হোক আর ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডেরই হোক্।

"জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব;
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী! তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।"

আপনার সম্মানে দেশের সকলেই সম্মানিত অনুভব করিতেছে। কেহ বলিতেছে, এই ব্যাপারে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, বাঙালী নূতন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, আমাদের কবি-সংবর্দ্ধনার তরঙ্গ বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; আবার কেহ বলিতেছে, মহম্মদ মক্কার চেয়ে মদিনায় গিয়া বেশী সম্মানিত হইয়াছেন। এ সব বাহিরের কথা। এ ছাড়া, আমাদের পাঁচ সাত জনের ব্যক্তিগত একটি পরম লাভ হইয়াছে। আমরাও যে প্রকৃত সাহিত্যরসের আস্বাদ জানি এবং কবি ও অকবির প্রভেদ বুঝিতে পারি, তাহা ইংলণ্ডের সাহিত্য-রসিকেরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

Yeats, Pater, Rothenstine প্রভৃতির আপনার কবিতার উপর ভক্তির কথা পড়িয়া অবধি আমার একটি কথা মনে হয়। মনে হয়, যে, গোত্রগত প্রাধান্য এবং কুলদেবতার সঙ্কীর্ণ পূজাবিধি উল্টাইয়া দিয়া, সাম্রাজ্য-সম্ভব সমন্বয় এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের বিশ্বজনীন পূজাবিধি, যেমন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করিয়াছিল, তেমনি cultureএর আধার বড় বড় Idealist বা কবিরাই বর্ত্তমান যুগের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, যুগধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মহামিলনের রাখীসূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতেছেন। ইহাতে যে বিশ্বজনীনতার সূত্রপাত হইতেছে তাহার তুলনায় বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদের এক এক মহাদেশ-ব্যাপী মিলন-সঙ্ঘ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র। হয় তো, আমার এই সিদ্ধান্ত ভুল; তবুও ইহা আপনাকে নিবেদন করিলাম। সুবিধামত এ সম্বন্ধে একটু লিখিলে আনন্দিত হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

স্নেহার্থী
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২

৫ নভেম্বর ১৯১২

৪৬, মস্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২০শে কার্ত্তিক ১৩১৯

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি দু'খানি যথাসময়ে পৌঁছেচে। 'কুহু ও কেকা' সম্বন্ধে আপনি যা' লিখেচেন তাতে আমি আপনার স্নেহেরই পরিচয় পেয়েছি। আশীর্ব্বাদের করুণ হস্তের স্পর্শই লাভ করেছি। আর আপনার কাছে এও আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হবে, যে, মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করেছি। ভাল লিখ্‌তে পারি বলে নয়,—বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির স্নেহ লাভ কর্ত্তে পেরেছি বলে।

যখন 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু'র জন্যে নানা দেশের কবির কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ করছিলুম তখন ভেবেছিলুম, যে, আপনার রচিত যদি কোনো ইংরাজী কি সংস্কৃত কবিতা পাই তা' হলে সেটিকে অনুবাদ ক'রে আমার বিশ্ব-কবিসভা উজ্জ্বল ক'রে তুলি। কিন্তু, তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় আমার সেই মানসী কবি-সভায় একটি উচ্চতম আসনই শূন্য ফেলে রাখ্‌তে হ'ল। সেই অবধি মনটা ক্ষুণ্ণ এবং বইটায় খুঁৎ থেকে গেছে। এবারে আপনি ইংরেজীতে অনেক বই লিখেছেন এবং লিখ্‌ছেন; এই সময়ে যদি মৌলিক কোনো কবিতা,—অন্ততঃ Whitmanএর ধরনের গদ্য-কবিতা,—বাংলায় না লিখে একেবারে ইংরেজীতে লেখা হ'য়ে পড়ে তবে সে লেখাটি যেন আমি একবার দেখ্‌তে পাই। তা' হলে আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর্ত্তে পারব।

কলেজ ছেড়ে পর্য্যন্ত ইংরেজীতে কাউকে চিঠি পর্য্যন্ত লিখি নি, নইলে আর এক রকমেও ঐ সাধটা মিটতে পারত। অন্ততঃ আপনার অমূল্য সময় এবং অনুবাদের শ্রম অনেক পরিমাণে বাঁচিয়ে দিতে পারতুম; —অবশ্য আমার নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধ্যের অনুপাতে। কিন্তু, দুঃখের

বিষয় artistic expression আয়ত্ত করা দূরে থাক, ইংরেজীরচনার Idiom পর্য্যন্ত একরকম ভুলেই গিয়েছি। সুতরাং ইংরেজীতে কাব্যানুবাদের চেষ্টা, এখন আমার পক্ষে বিড়ম্বনা।

সর্ব্বশেষে আমার একটি নিবেদন আছে। য়ুরোপীয়েরা আমাদের আনন্দের অংশী হয়,— আমাদের কবির কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয় এতে আমাদের একটুও হিংসা হবে না, বরং আনন্দই হবে। আর সেই অমৃতের আস্বাদ যত বেশী পায় ততই ভাল। কিন্তু, আপনার অসুস্থ শরীরের কথাটাও একেবারে ভুল্‌লে চল্‌বে না। ইতি

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৬

১৯ ডিসেম্বর ১৯১২

৪৬, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
১৯শে ডিসেম্বর ১৯১২

শ্রীচরণেষু—

"গীতাঞ্জলি"র ইংরাজীটি পেয়ে অনুগৃহীত হলুম। *Nation, Times* ও *Atheneum*এর সমালোচনাও দেখিচি।

'জলে না নাব্‌লে সাঁতার শেখা যায় না' আমাদের স্বদেশী নেতারা যখন বিশেষ কোনো রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্যে সোরগোল সুরু করে থাকেন তখনই ঐ কথাটার উপরে বেশী ক'রে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা, একসময়ে, আমারও খুব ভাল লাগ্‌ত এবং ঠিক বলেই মনে হ'ত। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, জলে নাবাটাও যেমন দরকারী, যে লোকটা সাঁতার শিখ্‌তে চাইছে তার ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্যের ওজন বোঝাটাও তেম্‌নি দরকারী। আমাদের দেশে খবরের কাগজের অভাব নেই, কিন্তু সম্‌ঝদার সমালোচক

কই? অবশ্য, সবাই যে Matthew Arnold হ'বে কি Walter Pater হ'বে তা' আশা করা যায় না; Creative Criticism করবার মত প্রতিভা চিরকালই দুর্লভ আছে এবং থাক্‌বে। কিন্তু যেটুকু উচ্চ শিক্ষিত লোকদের কাছে স্বভাবতঃ আশা করা যেতে পারে তাই বা কই?

Nation বা *Times*এ যাঁরা গীতাঞ্জলির সমালোচনা লিখেছেন তাঁরা কেউ Matthew Arnold নন্, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁদের মত লেখকই বা আমাদের দেশে কই? তাঁরা যে কথাটি বল্‌তে চেয়েছেন, তা' বেশ অনায়াসেই পরিষ্কার ক'রে বল্‌তে পেরেছেন, যা' বুঝেচেন তা অপরকেও বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন; আমাদের সে সামর্থ্য কই?

আমাদের চেয়ে যে ওঁরা বেশী রসগ্রহণ করেছেন এ কথা আমি সহজে স্বীকার করতে পারি নে; কিন্তু যেটুকু পেরেছেন সেইটুকুতেই মশ্‌গুল্ হয়ে উঠেছেন; সেটুকু একলা ভোগ করেন্ নি, সকলকে বেঁটে দিয়েছেন, এইটেই তাঁদের বিশেষত্ব, এইটেই গৌরব। ওখানকার তুলনায় আমাদের দেশে cultureএর হাওয়া বইছে না বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না! এখানে ভাবের ব্যাপারীরা মাড়োয়ারী মহাজনদের মত নিজের নিজের পুঁজিটুকু নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করছে; লেনাদেনা একরকম বন্ধ; কোনো কিছুই ফলাও হ'তে পাচ্ছে না; আড়ৎদার চিরকাল আড়ৎদারই থেকে যাচ্ছে; হৌস্‌ওয়ালা সওদাগর হ'তে পাচ্ছে না। ভারি Depressing.

আপনার শরীর এখন কেমন? ওদিকেও একটু নজর রাখ্‌তে হ'বে; এটি আমাদের সকলের অনুরোধ!

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

স্নেহার্থী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পুনশ্চ—

এবার মাঘোৎসবে আমরা আপনাকে লাভ করতে পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হল।

৮ মে ১৯১৫

দেশমাতৃকার মনস্বী সন্তান সাহিত্য-সম্রাট কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথির পরমায়

ফুল ফোটানো আবহাওয়া এই
করলে কে গো সৃষ্টি ?
মধুর তোমার দৃষ্টি ।
প্রণাম তোমায় করি,
আমরা কমল, ভুঁইচাঁপা, যূঁই
কুন্দ, নাগেশ্বরী ।

মন-হরিণের মনোহরণ
বাজাও তুমি বংশী ;
মানস-সরের হংসী,
তোমার পানে চায় গো,—
উল্লাসেরি কলধ্বনি
কণ্ঠে তাহার ছায় গো ।

সত্য-যুগের আদিম !— গ্রহ-
ছত্রপতি সূর্য্য !
তোমার সোনার তূর্য্য
ব্যক্ত চরাচরে,—
বাষ্প-গোপন-শক্তিতে সে
বজ্র সৃজন করে !

সত্য-মণি জাগাও তুমি,
চারু তোমার কর্ম্ম
ফুল ফোটানো ধর্ম্ম,—
জাগরণের সঙ্গী !
বিশ্বে তুমি নিত্য কর
নূতন রঙে রঙ্গী !

তোমার প্রকাশ মহোৎসবে
আমরা মিলি হর্ষে—
মিলি বরষ-বর্ষে ;
নাই আমাদের স্বর্ণ,
আমরা আনি অন্তরেরি
প্রীতির পরম-অন্ন !

জন্মতিথির পরম প্রসাদ
দাও আমাদের ভক্তি,—
প্রাণে পরম শক্তি ;
দেখাও দুনিরীক্ষ্য
অন্তরে যাঁর আরাম এবং
আসন অন্তরীক্ষ ।

২৫শে বৈশাখ
১৩২২

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৮ মে ১৯১৮

মালা-চন্দন

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

বাংলাদেশের হৃদ্‌কমলে গন্ধরূপে নিলীন হ'য়ে ছিলে,
মূর্ত্তি কখন্ নিলে ?
কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে
ওগো কবি ! তোমার আগমনে—
নিখিল হৃদয় উঠ্‌ল দুলে নূতন স্ফূর্ত্তিভরে,
কাননে ফুল ফুট্‌ল থরে থরে,—
চাঁপার হ'ল তড়িৎ-কান্তি, অশোক যেন আলোয় আলো করে,
ওগো চমৎকার !
কানায় কানায় উঠ্‌ল ভ'রে আনন্দে সংসার !
গুমট্ কেটে বইল দখিন হাওয়া !
পাথর-চাপা কপাল যাদের তুমি তাদের নিধি হঠাৎ-পাওয়া
ওগো গন্ধরাজ !
এ কি পুলক রাজে তোমার ওই পরিমল-মণ্ডলেরি মাঝ !
স্বর্গে মর্ত্ত্যে এ কি আসা-যাওয়া !
তুমি এলে, বইল যেন বোধন-বেলার হাওয়া !
হাজার পাখীর কূজন-গানে শেষ অবসাদ—
কোথায় গেল ভেসে—
বিস্মরণী-লতায় ঘেরা কোন্ স্বপনের দেশে !

*

ছয় ঋতু গায় তোমার আগে ফুল্-মুকুলে-পল্লবিত পালা,
স্থবির স্থাবর জগৎ জাগে, উচ্চকিত চক্ষে কি তার আলা !
মৃত্তিকাময় পৃথ্বী-ছাড়া দূর গগনে কৃত্তিকা ছয় বোন্

পীযুষ-ব্যথা বক্ষে নিয়ে হ'ল যে উন্মন
ধাত্রী তোমার হ'তে
হৃদয়-রসের সকল ধারা তোমায় ঘিরে বইল উছল স্রোতে ;
পান ক'রে তায়, স্নান ক'রে তায়
দান ক'রে তায় দু' হাত ভ'রে ভ'রে
তৃষার্ত্ত প্রাণ সুধার ধারায়
দিলে সরস ক'রে।
সরস্বতীর হরষ-বীণায় স্পন্দ-রূপে লুকিয়ে ছিলে তুমি
কোন্ উষসী জাগিয়ে দিল চুমি'—
তোমায় ওগো মঞ্জু-গায়ন্ কবি !
ভালে কি তার এম্নিধারা চাঁপার দিনের চাঁপার বরণ রবি
মূর্ত্তি ধ'রে সপ্তম রাগ উদয় হ'লে রাগ-রাগিণীর মেলায় !
বাঁশীতে বশ কর্‌লে বিশ্ব হেলায় !
তোমার গানের পেতে সুধার কণা
এল বনের হরিণ ধেয়ে, সাপ নোয়াল ফণা।

*

দূর-গমনে নিকট করে তোমার গানের আলো,
ভালোবেসে যে দীপ তুমি জ্বালো—
অচেনারে চিনিয়ে সে ত্থায়, পরকে আপন করে,
তোমার হিয়ার চিন্তা-মণি-ঘরে
বিশ্ব-মানব জল্‌সা করে, ওঠে বিপুল হর্ষ-ব্যাকুল গীতি
দুখের মূল্যে আনন্দ-ক্রয় চল্‌ছে সেথা নিতি ;
ছন্দে নাচে জন্ম-মরণ, পতন-অভ্যুদয়,
মিলিয়ে হাতে হাত,
ছন্দ-ছাড়া নয় সেথা কেউ নয়।
মন্ত্রে পূত রাখীর সূতায় সেথা সবাই মিল্‌ছে সবার সাথ।

বিশ্ব-নরের জীবন-যজ্ঞে দীপ্ত ভালে তারার তিলক এঁকে
চক্রুর পাত্র হাতে—
উঠ্‌লে তুমি, কবি!
সকল হানাহানির ঊর্দ্ধ্বে থেকে, দৃষ্টি হানো নিশাচরের নৃশংস উৎপাতে
দিব্য পাবক ছবি!
তোমায় হেরে হাল্‌কা হ'ল চির-ব্যথার জগদ্দলন শিলা,
অন্তরায়ণ-অন্তরালে বন্দীমনের শিকল হ'ল ঢিলা।

*

অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি
তোমায় বরণ করি।
আশার গানে আলোর বানে সকল দিলে ভরি'
প্রাণের প্রভায় সংশয়েরি ঘুচালে শর্ব্বরী!
নূতন আলো দিলে নূতন আঁখি,
ঊর্দ্ধ্ব-শিকড় অধঃশাখা অশথ্‌-চারী পাখী!
মুগ্ধ হৃদয়—হারাই ভাষা— মূর্চ্ছি' পড়ে মন—
বনের পুলক ফুল দিয়ে তাই মনের পুলক কর্‌ছি নিবেদন
প্রণাম তোমায় কর্‌ছি অনুপ কবি!
যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি দ্যাখেন্‌ বিশ্বছবি
নিত্যদিনই নূতন রূপে নূতনতর ছাঁদে
চিত্তলোকে পুলক যে দ্যায়—
নূতন আলোক পৌর্ণমাসী চাঁদে।

২৫শে বৈশাখ
১৩২৫

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৬

৪ জুন ১৯১৯

শ্রীচরণেষু—

আজ নীরবে যাব প্রণাম ক'রে
একটু শুধু নিয়ে পায়ের ধূলো,
সঁপে মোদের প্রাণের অর্ঘ্য, কবি,
বল্‌ব নাকো বাক্য কতকগুলো !
বাক্য যে আজ শুধুই জ্বালার মালা,
হৃদয় সে যে রুদ্ধ ব্যথার ডালি,
মৌন মুখে তাই তোমারে দেখি
তিরিশ কোটির নয়ন দিয়ে খালি।
শঙ্কামূঢ় স্বদেশবাসীর পাশে
দেখি তোমায় আত্ম-বোধের ঋষি,
অভিচারের মন্ত্রে যখন ঘোলা
আকাশ জুড়ে নামে অকাল নিশি ;—
জগৎ যখন নিচ্ছে বিভাগ ক'রে
মারণ এবং উচ্চাটনে মিলে,
সে সঙ্কটে সত্য-অনুরাগী !
আত্মপ্রদ মন্ত্র তুমি দিলে।
আত্মনিষ্ঠ মানুষ স্বয়ম্প্রভু,
মন ব'লে তার একটা মহাল আছে,—
ভয়ঙ্করের ভোজবাজীতে কভু
খাজ্‌না আদায় হয়নাকো তার কাছে।
সেই মহালের খবর তুমি দিলে,
সূর্য্য জাগে তোমার তূর্য্যরবে
মানুষ ব'লেই প্রাপ্য যে মর্য্যাদা

সে মর্য্যাদা পেতে হবেই হবে।
সত্যকথা সত্য যুগের কথা ;
কলি যুগে চার দিকে তার ঘাঁটি,
কলির মানুষ— আমরা— ভাবি মনে
কামান যা' কয় সেই কথাটাই খাঁটি।
গোলন্দাজের গোলা যে বোল্ বলে
সেই বুলিটাই বুঝি চরম বলা,
আজ দিয়েছ তুমি সে ভুল ভেঙে
তিরিশ কোটির ঘুচিয়ে মনের মলা।
অপ্রমত্ত তোমার সরস্বতী
ভূভারতে দান করে আজ ভাষা,
সঞ্চারে বল আত্মাতে আত্মাতে,
বাক্যে মনে সত্য হবার আশা।
সাঁচার আদর জাগছে তোমায় হেরে
মিথ্যাচারের মহাজনীর হাটে,
কুণ্ঠিত দীন মনের উপর থেকে
ভ্রূকুটিময় মেঘলা বুঝি কাটে।
জীবন যাদের অসম্মানের বোঝা,
তলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে;—
তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
হাল্কা ক'রে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তক্‌মা ছেড়ে এসে সবার মাঝে।
সারা ভারত ঋদ্ধ তোমার ত্যাগে,

ঘুচল এবার টুটল মনের জরা,
তিরিশ কোটির প্রাণের স্পন্দ, কবি,
তোমার প্রাণের ছন্দে প'ল ধরা।

২১শে জ্যৈষ্ঠ
১৩২৬

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

২২ ডিসেম্বর ১৯১৮

৭ই পৌষ
১৩২৫

শ্রীচরণেষু—

যেদিন জ্যোতির দীক্ষা
পেলেন পরম পুণ্যবান্
অন্তরের পদ্মদলে
আনন্দের পেলেন সন্ধান
সে অমৃত-সিক্ত দিনে
হে কবি! হে বিশ্বের আহ্লাদ!
পুণ্যহীন যাচে তব
পদধূলি আর আশীর্ব্বাদ।

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি-প্রশস্তি

(ঋষি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত)

বাজাও তুমি সোনার বীণা, হে কবি! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে!
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি বঙ্গ জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা সাথে নন্দা!
যে ফুল ফুটে স্বর্গ-বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা!

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার কর গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী! তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।

জীবন ব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ।
পান্থ! এসে পুষ্প-রথে
পৌঁছিলে হে অর্দ্ধ পথে,—
সারথি তব শুভ্র-শুচি কীর্ত্তি অকলঙ্ক।

অর্দ্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পূরে চিত্ত ;
সোনার তরী দিয়েছ ভরি'
তবুও আশা অনেক করি ;—
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

চাতক ! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু !
মরাল ! তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে !
চকোর ! তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন !
বিষাণ যবে বাজালে, মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বদ্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,
দিশারি ! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারি ! তোলো রত্ন !
যে তানে টলে শেষের ফণা
পেয়েছ তুমি তাহারি কণা ;
অমৃত এনে দিয়েছে শ্রেনে,— নহে সে নহে প্রত্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরাণ-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য ;

শোকের রাতে রহিলে ধ'রে,
হিরণ্ময় মৃণাল-ডোরে
রুদ্রে নিলে বরণ ক'রে রসায়ে নিলে রুক্ষ।

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির-দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগত যবে ক্ষিপ্ত;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা,
চাহ না তবু মুক্তি বিনা;
উজল মনোমুকুর তব হয় নি মসীলিপ্ত।

বাজাও কবি! অলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা গন্ধে;
সে ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে;
তোমার নামে মেতেছে দেশ, মিলেছে মহানন্দে।

মলিন মেঘে বিজলি সম উজলি' আছ বঙ্গ!
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ!
সূর্য্য সম উজলি' ভূমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল হৃদয়-প্রাণ লভিয়া তব সঙ্গ।

বরণ

তোমারে বরি হে কবিসম্রাট
কবিসূয় মহাযজ্ঞে কবি !
বঙ্গবাণীর হে বরপুত্র !
প্রতিভা-প্রতিমা অরূপ রবি !
কবি হোতা কবি উদ্গাতা হেথা
মিলিয়াছে কবি-কুঞ্জ-ধামে ;
যজ্ঞ-নিপুণ বুধমণ্ডলী
আজি একত্র তোমার নামে।
বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা
হে কবি ! তোমায় বরি হে আজি—
বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া
বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।
অযুত আঁখির উজল আলোকে
হে কবি ! তোমায় আরতি করি,
অযুত হিয়ার শুভ-কামনার
শুভ্র-শোভন চাঁদোয়া ধরি।
গান গেয়ে তুষি গানের রাজারে
গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে ;
পঞ্চাশতের পান্থশালায়
সাজাই তোমারে পুষ্পদলে।
বঙ্গের কবি-মনীষীরা আজি
ব্যাপৃত নূতন সবন-কাজে,
কবি-নৃপমণি ! তব আগমনী
ধ্বনিছে লক্ষ হৃদয় মাঝে !

অর্ঘ্য

কবি-সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যাদিগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)

পাই নাই খুঁজে নেতের পাছুড়ি,
'বিশ আড়া ধান' আনি নি, কবি!
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি
বিকচ কমল কোমল-ছবি।
পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি;
আঁখিজলে শুধু করি' অভিষেক
দর্ভ-আসনে বসাতে চাহি।
জীবনের বহু শূন্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছ বীণার তানে,
অন্ধ যামিনী হেসেছে পুলকে,—
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য?—
কোথা পাব মোরা?— ভাবি গো তাই!
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই?
ব্রহ্মে যখন আছ নিমগন
কাব্য-লোকের লোচন রবি!
স্বর্গে বসিয়া আশিসিছে তোমা
ব্রহ্মবাদিনী বাচক্লবী।
শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
—তোমার যোগ্য নাহিক' অর্ঘ্য,—
তবু লও প্রীতি-রাখীর ডোরা।

গান

কীর্ত্তি-গগন-সূর্য্য হে !
বঙ্গ-ভুবন-পূজ্য হে !
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা' ছিল উহ্য, হে !
পূজ্য হে !

যা' ছিল অজানা তুচ্ছ, হে !
কর কটাক্ষে উচ্চ সে ;
জগতের কবি—
সভামাঝে রবি !
বাজাও বঙ্গ-তূর্য্য হে
পূজ্য হে !

দিগ্বিজয়ী

দেশে আসে দিগ্বিজয়ী— দিগ্বিজয়ী কবি,
জয়োদ্ধত পশ্চিমের জয়মাল্য লভি।
দেশে দেশে দিগ্বিজয়ী— কত কথা জাগে আজি মনে,
রঘুর বিজয়-যাত্রা ফুটে ওঠে কল্পনা-নয়নে,
শত্রুর প্রাসাদ-শীর্ষে রোপিয়া অশথ
হূন পারসীকে দলি' চলে মহারথ;

তবু সে রাজার দিগ্বিজয়
সেই জয় বাহুবলে হয়।
চিত্তে জাগে আরেক বারতা
শঙ্করের দিগ্বিজয়-কথা,
তপ্ত তৈলে কটাহ ভরিয়া
তর্ক যুদ্ধে বেলান্ত ধরিয়া
পণ্ডিতের সেই দিগ্বিজয়
বুদ্ধিবলে সম্ভব সে হয় ;—
দায়ে ঠেকি' বড় বলে পরাস্ত যে জন
সে কথায় সায় নাহি দেয় প্রাণমন।
কবি রবি কবি শুধু— রঘু নয়, শঙ্কর সে নহে,
তবুও সে দিগ্বিজয়ী, বিশ্ব-কবি ছত্র তার বহে—
মুগ্ধ মনে, আনন্দে স্পন্দিয়া তোলে বিশ্বের পরাণ
বঙ্গ-রবি,— অস্তভূমি পশ্চিমের স্পর্শে সে অম্লান।

আভ্যুদয়িক

(রবীন্দ্রনাথের "নোবেল প্রাইজ" পাওয়াতে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিলল আসি'।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি— কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌ল ডুরি !
কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায় ।

'রাজার পূজা আপন দেশে কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে ;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে ।"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু-ঘোটক হাঁকে !

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্পনিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল !— হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া !
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চ্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে ।
তান জেগেছে— প্রাণ জেগেছে— উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন ।

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা ।
পূর্ব্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি !
“বঙ্গভূমি ! রম্য তুমি” বলছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
“ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুবতারার পিয়াসী গো, শুভ তোমার অভ্যুদয় ।”

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে ;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু ।

ধন্য কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি ।
বঙ্গভূমি ধন্য হ’ল তোমায় ধরি’ অঙ্কে কবি !
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি !
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারা ।

রবীন্দ্র-মঙ্গল

গান

সাত সাগরের ঢেউয়ের মেলায় খুশীর কোলাহল !
(আমরা) জয়ধ্বনি কর্‌ব কি, বল্‌, চোখের কূলে জল !
দিগ্বিজয়ী ফির্‌ল ঘরে
হেম-অরোরার মাল্য প'রে,
মাথায় দধি-পাত্র করে বরণ হিমাচল !
নিমেষ-হারা থির-দামিনী
পূজ্‌ল ওরে দিন-যামিনী
অরুণ-রাণী আপন খোঁপার সঁপ্‌ল চাঁপার দল !
'নৈশ-ভানু'— অবাক্ ছবি—
তারেও অবাক্ কর্‌লে কবি
নুইয়ে শাখা পাইয়ে দিলে কল্পতরুর ফল !
ধ্রুব-তারার তিলক ভালে
অমর-তিলক কে পরালে,
(আজ) কাঙাল-দেশের মন্‌-মাণিকে ভুবন সমুজ্জ্বল !
প্রাণের পরাগ ছন্দে ঢেলে
বিশ্ব-কবিচ্ছত্র পেলে,
আমরা ওরে কি দেব, বল্‌, কি আছে সম্বল !
স্বদেশ, কবির বালাই নিয়ে.
ষাট বছরের 'ষাট' বানিয়ে
পথের ধুলায় স্নেহের আসন পেতেছে আঁচল !

নমস্কার

নমস্কার ! করি নমস্কার
কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,—
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,—
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,—
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্ত্তি পারাবার,—
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

স্ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,—
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান ;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,—
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার
বেণু-বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার
চিত্ত-প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অবিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,

শোণিত নিষেক-শূন্য নৈষ্ঠ্যের নিত্য-পক্ষপাতী
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত-হার—
নমস্কার ! কবি নমস্কার !

রুদ্ধকণ্ঠ পঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অত্যাচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল হে ধিক্কার,—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য-ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা !"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত পারা,—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র,— গ্যাথে নিজ রক্তের ফোয়ারা,—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আগে শান্তিবারি-ধার,—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশ দিক,—
বিশ্বকবিচ্ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,—
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,— বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,—
নিত্য-তারুণ্যের টীকা ভালে যার চিত্ত-চমৎকার
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হূন্' 'গল্' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শান্তির কান্তি হাস্যে যার স্বর্গের মন্দার
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্য অরোরার ;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্তি স্বদেশ-আত্মার"—
বারম্বার ! তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ যার ভক্ত,— করে ভক্তিনিবেদন ;
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন ;
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার,—
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার ।

শ্রদ্ধা-হোম

(কবিগুরু-প্রশস্তি ! গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দ)

জয় কবি ! জয় জগৎ প্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয় !
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয় ! জয় ! জয় !
প্রাণ প্রণবের দ্রষ্টা নব ।
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব ! জয় ! জয় !

যুবন্ প্রাণের গাও আরতি—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !
বাক্ তব বিশ্বস্তবা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে—
চিত্তে দোলায় উল্লাসে ! জয় ! জয় !

পাবনী বাগ্‌দেবীর কবি
পাবীরবীর গায়ন রবি !
পুণ্য পাবকচ্ছবি ! জয় ! জয় !
জয় কবি ! জয় হৃদয়-জেতা !
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা !
চিদ্-রসায়ন প্রচেতা ! জয় ! জয় !

শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি
মানস-হবি এই আকৃতি ;
কবি ! সবিতা-দ্যুতি ! জয় ! জয় !

প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ ! জয় ! জয় !

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে,
অস্ফুট বোলে দেশ বলে—"জয় ! জয় !"
তোমার সুব্রহ্মণ্য বাণী
তারার ফুলের মাল্যখানি
কণ্ঠে কবি দ্যান্ আনি ! জয় ! জয় !

কবি-পূজা

কুবেরের রাজ্য ছাড়ি' উত্তরে যাদের বাড়ি
তোমারে পূজিল তারা স্বর্ণচম্পাদলে
বাল্মীকির সরস্বতী লভিলেন নব জ্যোতি
হে কবি ! তোমার পুণ্যে পুনঃ পৃথ্বীতলে,
দুনিয়ার জ্ঞানীগুণী মুগ্ধ তব বীণা শুনি
আজি বিশ্বগুণী গণে গণনা তোমার
উজলিয়া মাতৃভূমি আজি উজলিছ তুমি
জগতের যতনের নব রত্নহার !
এ হার টুটিবে যবে এ কাল সে কাল হবে
লুকাবে জ্যোতিষ্ক বহু বিস্মৃতি-আঁধারে,
তুমি রবে অবিচল সূর্য্যকান্তি সমোজ্জ্বল
অনন্ত কালের কণ্ঠে বৈজয়ন্তী-হারে,

বাণী তব বিশ্ব ছায়   কুবেরেরও পূজা পায়
পূজা পায় পুষ্পলাবী রতন কাঞ্চন,
তারি সঙ্গে অনুক্ষণ   মোরা করি নিবেদন
অনুরক্ত হৃদয়ের আরক্ত চন্দন।

কবি-জুবিলি

মিছিল্

প্রথম মুরৎ— স্বর্গদূত

উর্ব্বশী মোরে দিয়েছে পাঠায়ে
স্বর্গ-ভুবন হতে—
কবিরে পরাতে মন্দার-মালা
এসেছি মরাল-রথে!
জননী, জায়া, কি কন্যার মত
ভকতি কি স্নেহ, প্রেম
দেয় নি সে; দেছে স্মৃতির নিকষে
চির-উজ্জ্বল হেম!
জীবন-ভোরের সঞ্চয় সে যে
সে যে গো দিব্য দান,
ক্ষয় অপচয় হয় না তাহার
হয় না কখনো ম্লান।
অমরার সার মন্দার-হার
পর এ মর্ত্ত্যে বসি'
মর্ত্ত্যের কবি! এ মালা তোমারে
পাঠায়েছে উর্ব্বশী।

দ্বিতীয় মুরৎ— প্রকৃতি !

বরষায় বেণী এলাইয়া দাও,
শীতেরে কাঁদাও ফুলের ঘায়ে,
ভাসাও গো সাদা মেঘের ভেলাটি
শরতের সাথে গগন-গায়ে !
ফাল্গুনী ফুলে নামহারা কোন্
নায়িকার নাম দেখ গো লেখা,
অতীতের পুরে পশি হের কার
আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা ;
পুষ্পের সাথে পুলকিয়া ওঠ,
ঝঞ্ঝার সাথে দাও গো দোলা ;
কিবা সে অতীত কিবা অনাগত
তব তরে সব দুয়ার খোলা !
দীপ্ত-লোচন লুপ্ত-বচন
তাপস গ্রীষ্ম ভীষণ-ছবি,
তাহারেও কথা কহাও গো তুমি,
ভাষা দাও তুমি তারেও, কবি !
অনাগত আর অতীতের মাঝে
বাঁধিয়া তুলিছ মানসী সেতু,
অচেত-চেতনে মিলায়ে যতনে
উড়ায়ে দাও হে বিজয়-কেতু !
বায়ু বহে' যায় ধীরে অতি ধীরে
কানে কহে' যায় তোমারি শুধু,
ওগো গগনের চির-আত্মীয়
ওগো জগতের পুরাণো বঁধু !
মৌন মাটিরে বাস তুমি ভালো—

মূক বলে' তারে কর না ঘৃণা ;
মুগ্ধ প্রকৃতি হৃদয়ের প্রীতি
নিবেদিছে তাই বচন-হীনা ।

তৃতীয় মূরৎ— বালক

বাজিয়েছিলাম পাতার বাঁশী
রথের মেলায় গিয়ে,
আপনি নাকি তাই লিখেছেন
ছাপার হরফ দিয়ে ?
আমার ভেঁপুর আওয়াজ, সে কি
সব্বের উপর ওঠে ?
সোর্‌গোল আর খোল করতাল
ছাপিয়ে উধাও ছোটে ?
সব চেয়ে কম বেশী আমায়
জানে হাবুল টেঁপু ;
আপনি নাকি বাঁশী বাজান ?
আমিও বাজাই,— ভেঁ—পু !

চতুর্থ মূরৎ— বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'

বরষে বরষে সারা দেশ জুড়ি'
বলির রক্ত ছোটে,
সারা দেশ জুড়ি শিশুহিয়াগুলি
শিহরি শিহরি ওঠে !
দেবতা দেখিতে দেখে বিভীষিকা,
ঘুমাতে পারে না রাতে,
স্বপনে গড়ায় রক্তের ধারা,

মোছে তারা দুই হাতে !
সঙ্কোচে সারা প্রাণ ভরে' ওঠে,
ঘোচে না রক্তরাশি,
নিষ্ঠুর খেলা খেলে প্রবীণেরা,
শিশুর শুকায় হাসি,
ওগো কবি ! ওগো তরুণ-হৃদয়,
করুণ তোমার গাথা—
করিছে স্মরণ অশ্রুনয়ন
বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা' ।

পঞ্চম মুরৎ— ভিখারিণী মেয়ে

ছুটে এসেছিনু মা-হারা বালিকা
মায়ের মায়ার লোভে
পূজা-বাড়ী নাকি মা এসেছে, শুনি
ভরা ঘট দ্বারে শোভে !
অচল প্রতিমা ফিরে চাহিল না,
কথা কহিল না কেহ ;
ক্ষুণ্ণ ফিরিয়া চলেছি ;— সহসা
তুমি ডেকে দিলে স্নেহ ;
যাহা দিলে, ওগো ! ভিক্ষা সে নয়,
সে নহে অনুগ্রহ,
মমতায় করে' নিলে আপনার
আমারে,— গ্লানিমা সহ ।
দেবতার মত ভালবাস তুমি
নাহিক তোমার তুলা,
সকলের সাথে তোমারে নমি হে
ভিখারী— পথের ধুলা ।

ষষ্ঠ স্মরণ— বঙ্গবধূ

বালিকা বয়সে মার কোল ছাড়ি
পর-বাসে বাঁধে যে জন গেহ,
পরখ যাহারে করে গো সবাই,
শাসন করে গো, করে না স্নেহ।
আগমনী শুনি ভিখারিণী-মুখে
মন ছুটে যায় বাপের ঘরে,
কুণ্ঠিত সেই বঙ্গের বধূ
হে কবি! তোমারে প্রণাম করে।
মূক বেদনারে ভাষা দেছ তুমি,
হাল্‌কা করেছ মনের ব্যথা,
মনে মনে তাই নিবেদি' চরণে
মালা এ অশ্রু-সলিলে গাঁথা।

সপ্তম স্মরণ— উপেক্ষিত

মরিয়া যে শুধু দিতে জানে, হায়,
জীবনের পরিচয়,—
চোর নয় তবু চুরি যে করেছে
ভুলিয়া লজ্জা ভয়,—
'আপদ' বলিয়া দূর হ'তে যারে
লোকে করে বর্জ্জন,—
ভালবেসে কবি তাদেরো ফুটালে!
করি তোমা বন্দন!

অষ্টম স্মরণ— ভৃত্য

চুরি অপবাদ ভূষণ যাহার
ত্রুটি অপরাধ নিত্য,

ঘোর নির্ব্বোধ, দেখিলেই যারে
রাগে জলে' যায় পিত্ত,
উমেশেই বল, কেষ্টাই বল,
যা খুসী বলিয়া ডাক,
উত্তর দিবে, হইবে হাজির,
মোটে সে চটিবেনাক,
পোষা জন্তুর মত পোষ-মানা
সদা প্রফুল্ল-চিত্ত,
দেউড়িতে এসে গড় করে আজ
সেই পুরাতন ভৃত্য!
হইতে পারে সে ক্ষেত্রবিশেষে
মোহন কি শঙ্কর—
অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে; তবু
নিরেট ভয়ঙ্কর।

নবম মুরৎ— খুড়া মহাশয়

দু'কুড়ি ও দশ?— তোমার বয়স?
তুমি আরো ঢের বুড়া!
তোমার অনেক পরে জন্মেছে
চক্রবর্ত্তী খুড়া।
তারি গোঁফ চুল ভুরু পেকে গেল,
টাকে মুড়াইল চূড়া;
দু'কুড়ি ও দশ? মোটে? ভুল! তুমি
ব্রহ্মার চেয়ে বুড়া।

দশম মূরৎ— বৃদ্ধ

রায় বসন্ত দিয়েছে পাঠায়ে
এই অনন্ত বুড়ারে হেথা,
সেই মানুষটি দেখিতে এসেছি
ফাঁস করে যেই বুড়ার কথা !
শাদা মন আর শাদা মাথা নিয়ে
এসেছি অনেক দিনের পরে,
শুনে মধুবাণী দেখে হাসিখানি
ফিরে চলে' যাব দেশান্তরে !
আল্‌বোলা আর তব্‌লা সিতার
পাল্কীতে হোথা এসেছি রেখে
হেসে হেসে আর বাঁচিনে রে ভাই
বুড়োর নকল নাকাল দেখে।
(আমুদে বুড়ার নকল দেখে !)

একাদশ মূরৎ— গৌরাঙ্গভজা

জনম অবধি মোরে
গালি দেওয়া !
লাঞ্ছিত লজ্জিত করা খালি !
বিদ্রোহী করিয়া তোলা ?
আমার সে
ভগ্নীপতি-ব্রতা যত শালী,
না হয় গৌরাঙ্গে মজি
ভজি তারে ;
অভদ্র বিদ্রূপ তাই বলি' ?

জোন্স-স্মিথ-টম্‌সন
নামাঙ্কিত
উপহার দেওয়া নামাবলী ?
সিঁদুর মাথায়ে বুটে
হায় হায় !
মাথা হেঁট— অপমান করা ?
হায়রান শুধু শুধু
পাঠাইয়া
হাকিমের মিথ্যা হর্‌করা !
কংগ্রেসে দিলাম চাঁদা
তবু মিছে
ছল ধরা ? গেছি আমি চটে,
তোমাদের হুজুগেতে
আমি— আমি—
আমি যোগ দিবনাক মোটে !

দ্বাদশ সুরং— অপরূপ-রূপা বাংলা

বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝে
যে জন বিরাজ করে
ডান হাতে যাঁর খড়্গ জ্বলিছে
বাঁ হাত শঙ্কা হরে,
ললাট-নেত্রে বহ্নি যাঁহার
স্নেহ-বিভা দু'নয়নে,
হে কবি ! তোমারে দেছেন প্রসাদ
তিনি প্রসন্ন-মনে ।

দেউলের দ্বার খুলেছে তাঁহার
  মিলেছে মিলেছে দিশা।
তাঁর ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে তব
  হে কবি! পোহায় নিশা।

ত্রয়োদশ মুরৎ— বিশ্বযোগী— ভারত-মহিমা

বিতরিলে ব্রহ্মবিদ্যা, মিশাইলে সীমায় অসীমে!
রচিলে ভাবের সেতু যুক্ত করি পূরবে পশ্চিমে!
সমীপে আনিলে স্বর্গ, স্বদেশেরে জানিলে সুন্দর
স্বর্গ হ'তে গরীয়ান!— মূর্ত্ত যেন দেবতার বর!
প্রতিষ্ঠা করিলে প্রাণে ভারতের প্রাচীন সাধনা,
বহুর মাঝারে এক,— জগতের চির-আরাধনা,
সপ্তর্ষির পুণ্য-জ্যোতি সমর্পিলে বাঙালীর ভালে,
সত্যের নিষ্কাম ভায় লুপ্ত করি' দিলে দেশ-কালে!
বিশ্ব-যোগে যুক্ত হ'লে— বিশ্বনাথ প্রেরিল বারতা!
জগতে ঘোষিত হ'ল বিশ্বমানবের আত্মীয়তা!
"জ্যোতিষ্ক কুটুম্ব" যত হেরি তোমা' আনন্দিত-মন
নক্ষত্র অক্ষরে[১] লিখি পাঠাইল তোমারে লিখন!
কর্ম-ক্লিষ্ট কোলাহল মন্ত্রে যেন শূন্যে গেল মিশি;
মহাশান্তি এল নামি'[২] তব পুণ্যে, হে কবি! হে ঋষি

পাঠান্তর : ১ নক্ষত্র অক্ষরে— জ্যোতির অক্ষরে।
২ মহাশান্তি এল নামি— দিব্যশান্তি এল মর্ত্ত্যে।

চতুর্দশ মুরৎ— কাবুলিওয়ালা

প্রকাণ্ড এই চেহারাটায়
প্রকাণ্ড যে হৃদয় আছে,
বাংলাদেশের ওগো কবি !
গোপন সে নেই তোমার কাছে !
ভুষো মাথা পাঞ্জাখানি
ছাপা ছিল পাঁজর পরে,
কারেও তো সে দেখাইনিক,
দেখ্‌লে তুমি কেমন করে' ?
বাংলা মুলুক যাদুর মুলুক
তুমি যাদুগিরের রাজা,
তোমার তরে বাবুসাহেব !
এনেছি এই আঙুর তাজা।

পঞ্চদশ মুরৎ — সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী

জীবন তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল
সার্কাস করি শূন্যে ;
পুরাণো গরিমা ফিরিয়া পেয়েছি
হে কবি ! তোমারি পুণ্যে।
পুরাণো গরিমা সহজ মহিমা
প্রাণের রং-মহালে,
সার্থক ফিরে হ'ল এ জীবন
প্রাণের গভীর তালে।
সুরে ও কথায় মিলিয়া লতায়
নির্ঝরে রবিরশ্মি !

পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত শুধু
করিতেছে "হা হতোঽস্মি" !
পরাণের মাঝে জনম লভিয়া
সহজে পরাণে পশি,
আজিকে আবার চলনে আমার
শত চাঁদ পড়ে খসি'।

ষোড়শ মুরৎ— দাসী

রাণী নই, তবু রাজার প্রসাদ
মাথায় ধরেছি আমি,
সৌরভে তাঁর ভরি' আছে মম
জীবনের দিনযামী ;
আঁধারে শুনি সে চরণের ধ্বনি,
আঁধারে একেলা হাসি,
বাসক-সজ্জা করি আমি তাঁর
আঁধার ঘরের দাসী।

বন্দনা

কীর্ত্তি-গগন-সূর্য্য হে !
বঙ্গ-ভুবনে পূজ্য হে !
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে !
পূজ্য হে !
যা ছিল অজানা তুচ্ছ হে,
কর কটাক্ষে উচ্চ হে,

জগতের কবি-
সভা-মাঝে কবি,
বাজাও বঙ্গ-তূর্য্য হে!
পূজ্য হে!

জুবিলি

রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পারবে সে,—
রাজার পূজা আপন রাজ্যে
কবির পূজা সব দেশে!
চাণক্যের এই প্রাচীন বাক্য
লক্ষ কথার এক কথা,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হতে পারবে তা।
নজীর খুঁজে নাই যদি পাই
নাই তাতে ভাই দুঃখলেশ,
পর্ব্ব নূতন করবে সৃজন
রঙ্গভরা বঙ্গদেশ!
রাজার প্রভাব আপন রাজ্যে
কবির প্রভাব সব দেশে,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হতে পারবে সে।
বিধান দিলাম পাঁতি লিখে
সই করিলাম নিম্নে তার;
কবির সেরা বঙ্গরবি
জানাই তাঁরে নমস্কার!

পরিশিষ্ট ৩

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে সংস্থার ম্যানেজার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯০৯

Agreement between *Babu Rabindranath Tagore* of the one part, and Charuchandra Bandyopadhyay, B.A., Manager of the Indian Publishing House, Calcutta on behalf of its Proprietor, of the other part, dated *21st. June 1909.*

This agreement witnesseth that I, *Rabindranath Tagore* do hereby convey and assign to the Indian Publishing House, Calcutta, for the space of five years the sole right of printing and publishing my works entitled *Bichitra Prabandha*, *Prachin Sahitya*, *Lok Sahitya*, *Adhunik Sahitya*, *Sahitya*, *Hasya Koutuk*, *Byanga Koutuk*, *Prajapatir Nirbandha*, *Prahasan*, *Raja Praja*, *Samuha*, *Swadesh*, *Samaj*, *Siksha*, *Sabdatatwa*. *Dharma*, *Galpaguchchha* (complete), *Rajarshi*. *Bou Thakuranir Hat*, *Chokher Bali*, *Nouka Dubi*, *Gora*, *Saradotsab*, *Mukut* and *Santi-niketan*, from the date of their publications, provided the Indian Publishing House undertake to defray all the expenses for printing and publication of the said books. Provided further that the Indian Publishing House shall not only publish and store the books but shall also make arrangements for the sale of those books, shall submit to me in the months of January and July of each year an account of all sales effected during the preceding six months, and shall pay me a royalty of *25* per cent. of the actual price of the books at which they are sold. Provided also that in the event of the Indian Publishing House failing to comply with any or all of the abovementioned conditions in any particular, or failing to print and publish any of the books after the edition is exhausted in a respectable garb, at least in the same style in which its previous edition was printed and published, or failing to supply without any reasonable cause the public demand for any book within a reasonable period, say six months from the date of receipt of the complete revised copy for the new edition from me or my representative, I shall be at liberty to resume all the rights in the abovementioned books hereby conveyed and assigned and to debar any further sale of such books by the said Indian Publishing House through its Manager or Proprietor or his heirs or assigns, and further that in the event of the Indian Publishing House faithfully conforming to and fulfilling all the conditions above laid down during the whole of the prescribed period of five years, its Proprietor or Proprietors shall have a right to continue to publish the books on the same terms and conditions so long as the copyrights of the works remain vested in the author or his heirs, executors or assigns.

And that I, Charuchandra Bandyopadhyay, on behalf of the Proprietor of the Indian Publishing House, Calcutta, do hereby undertake the printing, publication and sale of the abovementioned books on the conditions and under the provisos above set forth at the cost and risk of the INDIAN PUBLISHING HOUSE, the said *B. Rabindranath Tagore* being in no way liable for any expense thereby incurred, and that I agree to pay to the said *B. Rabindranath Tagore*, his heirs, executors or assigns, a royalty on every copy of the book *sold* according to the scale above prescribed, namely, *25* per cent. of the actual price at which each copy *sold.*

Given under our hands and seals this *21st day of June* in the year *one thousand nine hundred* and *nine* of the Christian era.

Witnesses :

(1) [স্বাক্ষর] *Ajitkumar Chakravarty* (2)	[স্বাক্ষর] *Rabindranath Tagore*
(1) [স্বাক্ষর] *Ajitkumar Chakravarty* (2)	[স্বাক্ষর] *Charuchandra Bandyopadhyay* ***Manager, Indian Publishing House, Calcutta.***

পরিশিষ্ট ৩/২

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলকাতার স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপ্রকাশের চুক্তিপত্র ১৯১৪

Judicial stamp paper
26 March 1914

Articles of Agreement made and entered this day of 1914 between Rabindranath Tagore, son of Maharsi Debendranath Tagore, residing at No. 6 Dwarkanath Tagore Street in the town of Calcutta, by caste Brahmin, landholder and author of various works in Bengalee (hereinafter called the *Author*) *of the one part* and Chintamoney Ghosh, son of Madhab Chandra Ghosh, residing at Allahabad in the United Provinces of Agra and Oudh, by caste Kayastha, trader and owner of the Indian Press in Allahabad and Proprietor of the Indian Publishing House Calcutta (hereinafter called the *Publisher*) *of the other part*; **Whereas** by an Agreement dated 14th July 1908 and made between the Author of the one part and Charuchandra Bandopadhya on behalf of the Publisher of the other part, the author gave permission and the publisher undertook to publish and sell the "Poetical works" of the author upon the terms and subject to the conditions therein mentioned and whereas by another Agreement of the same date and between the same parties the author gave permission and the publisher undertook to publish and sell the works of the author entitled "complete

Prose works" in 16 parts "Little stories" and "Novels" including "Gora" under the term and subject to the condition therein mentioned and whereas by another Agreement dated the 21st June 1909 and made between the same parties the author gave permission and the publisher undertook to publish and sell the author's works entitled "Bichitra Prabandha," "Prachin Sahitya," "Loka Sahitya," "Adhunik Sahitya," "Sahitya," "Hasya Kautuk," "Byanga Kautuk," "Prajapatir Nirbandha," "Prahasan," "Raja Praja," "Samuha," "Swadesh," "Samaj," "Siksha," "Sabdatatwa," "Dharma," "Galpaguchchha" complete, "Rajarshi," "Bow Thakuranir Hat," "Chokher Bali," "Nowkadubi," "Gora," "Saradotsab," "Mukut," and "Santi Niketan" under the terms and subject to the conditions therein mentioned and whereas since the date of the last Agreement the author has produced various and other works, and whereas in supersession of the said three several Agreements the author and the publisher have agreed to enter into these presents for the publication and sale of the works mentioned in the schedule hereto annexed and marked A in the manner hereafter appearing. Now these presents witness and it is hereby mutually agreed by and between the parties hereto for themselves their and each of their heirs executors administrators representatives and assigns as follows :—

1. That the said three Agreements dated respectively the 14th July 1908, 14th July 1908 and 21st June 1909 shall stand cancelled as from

the 1st of April 1914.

2. That on the 30th day of April 1914 the Publisher shall submit to the Author a true and faithful account of the copies published by the Publisher of the various works included in the said three Agreements and showing the number of copies thereof which remained unsold on the 1st of April 1914.

3. That the sale of all works and publications the sales whereof were authorised by the said three several Agreements and which were published before the said 1st day of April 1914 but which remained unsold on the said date shall be subject to the provisions contained herein.

4. The Publisher shall at his own risk and expense produce and publish all and every works of the Author mentioned in the said schedule A and before such publication have the quality of the printing and paper of such work or works approved by the Author.

5. The Author guarantees to the Publisher that the said works mentioned in the said schedule A or any of them are or is in no way whatever a violation of any existing copyright and that it contains nothing of a libellous or scandalous character and that he will indemnify the Publisher from all suits, claims, proceedings, damages, and costs which may be made taken or incurred by or against him or them on the ground that the said works mentioned in the said schedule A or any of them are or is an infringement of copyright or contains anything libellous or scandalous.

6. The Publisher shall during the legal term of unrestricted copyright have the exclusive right of producing and publishing the works mentioned in the schedule A hereto. The Publisher shall have the general control of the publication and sale of the works mentioned in the said schedule A and the Author shall not during the continuance of this Agreement (without the consent of the Publisher) publish or permit to be published any abridgment of the works mentioned in the said schedule A or any of the books mentioned in schedule A. All rights of translation, of dramatization of all and every the said works shall remain the property of the Author.

7. The whole right title and interest in the manuscript and in the copyright of the works shall remain the property of the Author who hereby empowers the Publisher to take in his (the Author's) name but at his (Pubiisher's) expense any action legal or otherwise that he (the Publisher) may consider necessary to protect his (Publisher's) rights under this Agreement, and also at his (the Publisher's) own expense to carry out or abide by any order that shall or may be made by any Court or Courts in action or legal proceedings whatsoever and for the purposes aforesaid the Author hereby constitutes nominates appoints the Publisher so long as these presents shall remain in force, his true and lawful attorney to use his name and to sign his name in any documents papers or writings that may be necessary in the premises.

8. The Publisher shall not assign the benefit of

or delegate his obligations as Publisher under this agreement except that the whole agreement may be assigned to such person or persons as may succeed to him in his business as a Publisher.

9. The Publisher shall pay to the Author a Royalty of Rupees Twenty Five per cent of the advertised retail price on all copies of the said works sold by him during the term aforesaid.

10. The Publisher shall submit monthly a true and faithful account of the copies of the said several works published and sold by him during the month preceding and such account shall be settled and adjusted each month as aforesaid by cash payment provided that in case of failure to submit accounts during the said time, owing to any unforeseen cirumstances, the Publisher will have thirty days of grace for submission of the said account and payment to the author.

11. If the Publisher should at any time commit any act of Insolvency the Author may by notice in writing terminate this Agreement.

12. If the Publisher shall at the end of three years from the date hereof or at any time thereafter give notice to the Author that in his or their opinion the demand for the work or works mentioned in the said schedule A or any of them has ceased or if the Publisher shall for six months after the work or any of them is or are out of print decline or after due notice neglect to publish a new edition or if the quality of the printing and paper of the work or works is such as is not approved by the author then and in either such case this Agree-

ment so far as it relates to such particular work or works shall terminate and the right to print and publish such work or works shall revert to the Author who shall be entitled to purhcase from the publisher forthwith (if he or they insist and they are at his or their disposal) the stereotype or electrotype plates and the blocks or plates used for illustrations for such work or works aforesaid and whatever copies the Publisher may have on hand of the said work or works at the net cost of production and if the Author does not within three months purchase and pay for the said stereotype or eleetrotype plates blocks used for illustrations and copies the Publisher shall be entitled to and any time therefore to dispose of such stereotype or electrotype plates blocks or plates used for illrstrations and copies or melt the plates paying to the Author 10 per cent of the net proceeds of such sale.

13. The Author may require an Inspection of the Publisher's Account Books every six months after the account has been renderd and also on termination of the Agreement by any cause whatsoever hereinbefore mentioned. On the Author demanding in writing an Inspection the Publisher shall forthwith permit the Author or his agent nominated by him to examine all Books and Documents relating to the Publication and Sale of the Books the subject matter of this Agreement. In Witness whereof

Witnesses :—

[স্বাক্ষর]
C. F. Andrews, Bolpur.
[স্বাক্ষর]
A. P. Sen, Lucknow
[স্বাক্ষর]
Apurva Krishna Bose
Printer, Indian Press
[স্বাক্ষর]
Nayan Chandra Mukerjee
Artist, Indian Press

[স্বাক্ষর]
Rabindranath Tagore
(Author)

[স্বাক্ষর]
Chintamoney Ghosh
Proprietor, Indian Press
Allahabad
and
Indian Publishing House,
Calcutta

SCHEDULE A.

PROSE WORKS

1. Bichitra Prabandha.
2. Prachin Sahitya.
3. Adhunik Sahitya.
4. Loka Sahitya.
5. Sahitya.
6. Hasya Kautuk.
7. Byanga Kautuk.
8. Prahasan.
9. Prajapatir Nirbandha.
10. Raja PraJa.
11. Samuha.
12. Swadesh.
13. Samaj.
14. Shiksha.
15. Shabdatatwa.
16. Dharma.
17. Santiniketan Part I
18. „ „ II
19. „ „ III
20. „ „ IV
21. „ „ V
22. „ „ VI
23. „ „ VII
24. „ „ VIII
25. „ „ IX
26. „ „ X
27. „ „ XI
28. „ „ XII
29. „ „ XIII

30. Gora Vol. I
31. „ „ II
32. Nauka Dubi.
33. Chokher Bali.
34. Rajarshi.
35. Bauthakuranir Hat
36. Galpa Guchchha part I
37. „ „ II
38. „ „ III
39. „ „ IV
40. „ „ V
41. Rajah.
42. Saradotsab.
43. Mukut.
44. Vidyasagar Charit.

POETICAL WORKS

45. Atti Galpa
46. Chariti Galpa
47. Achalayatan.
48. Sandhya Sangit.
49. Provat Sangit.
50. Bhanu Shingher Padabali.
51. Chabi o Gan.
52. Kari o Komal.
53. Balmiki Prativa.
54. Chitrangada.
55. Viday Avishap.
56. Prakritir Pratishodh.
57. Malini.
58. Mayar Khela.

59. Bisarjan.
60. Raja o Rani.
61. Sonar Tari.
62. Manashi.
63. Chitra.
64. Chaitali.
65. Kanika.
66. Kshanika.
67. Kalpana.
68. Katha.
69. Kahini.
70. Katha o Kahini.
71. Sankalpa o Swadesh.
72. Sishu.
73. Naivedya.
74. Kheya.
75. Smaran.
76. Utsarga.
77. Dharma Sangit.
78. Gan.
79. Gitalipi Part I
80. „ „ II
81. „ „ III
82. „ „ IV
83. „ „ V
84. Gitanjali.
*85. Gitimalya. R.T.
86. Chayanika Royal edition.
87. „ Popular „

---

* তালিকায় : 45. 46. 47. আসলে পূর্ব ভাগের অন্তর্গত, 85. Gitanjali 2nd part মুদ্রিত ছিল, কেটে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ *Gitimalya* লিখে R.T. সই করে দেন।—স:

পরিশিষ্ট ৩/৩

ক

চিন্তামণি ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২*

ওঁ

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটিকে যথাবিধি সর্ব্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আশা করি বিশ্বভারতীর মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি যথোচিত বিধান করিয়া দিবেন। এই কাজের জন্য আমার ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস আপনার নিকট যাইতেছেন। ইঁহাদের সহযোগে আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ সম্মত হইব। ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশৎ বর্ষ-পরিক্রমা পুস্তকে বলা হয়েছে: 'সুখের বিষয় এই পত্র ব্যবহার করারও প্রয়োজন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় জানতে পেরে চিন্তামণিবাবু তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হন।' এই পত্র পাঠানো না হয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের পাঠানো প্রতিনিধিদের মুখে হয়তো এই পত্রের অভিপ্রায় চিন্তামণিবাবু জানতে পেরেছিলেন, অথবা অপর কোনো হাতচিঠি পেয়েছিলেন।—স.

পরিশিষ্ট ৩/৩

খ

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে গ্রন্থস্বত্ব দান করলে সেই সূত্রে ইণ্ডিয়ান প্রেস-মুদ্রিত মজুত বইয়ের হস্তান্তর শর্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিযুক্ত অ্যাটর্নি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

Allahabad
4th October, 1922

Babu Chintamoney Ghose

Dear Sir,

With reference to the agreement between yourself and Dr. Rabindranath Tagore dated the 2nd June 1914, regarding the publication of his prose and poetical works therein mentioned, the situation in regard thereto has now changed owing to the copyright of these works having been made over by Dr. Tagore to Viswabharati.

Dr. Tagore is deeply sensible of the amicable relations subsisting between him and yourself and the efficient manner in which the Indian Press has done its part and now that he himself will no longer be the controlling authority he feels it would be better for both parties if the publishing and selling rights of the books comprised in the agreement as well as of those since published by you be now made over by you to Viswabharati.

I understand that you are willing to do this on Viswabharati paying to you an amount equal to one-third of the published retail price of the stock at present in your hands which stock will thereupon also become the property of Viswabharati. I also understand that on this letter being confirmed by Dr. Tagore you are prepared to send your son who is your constituted attorney to Calcutta for the purpose of making over the stock to an agent appointed by Viswabharati on an undertaking being given by Dr. Tagore that the payment of the said one-third of the retail price shall be made to you within 3 months of the date of the delivery of the said stock.

Yours faithfully
(Sd) *Surendranath Tagore*
Constituted Attorney
of
Dr. Rabindranath Tagore

গ

চিন্তামণি ঘোষের পক্ষে তাঁর পুত্র হরিকিশোর ঘোষের পত্র

৪ অক্টোবর ১৯২২

Allahabad
4th October, 1922

Mr. Surendra Nath Tagore
6 Dwarakanath Tagore's Lane
Calcutta.

Dear Sir,

With reference to your letter dated 4th inst. I, on behalf of my father B. Chintamoni Ghosh, have the pleasure to intimate you that he agrees to the terms referred to in your above letter regarding the handing over of the Right of Publishing and Selling of all Bengali works of Dr. Tagore hitherto published by the Indian Press Allahabad to the Visvabharati.

Yours faithfully
(Sd) *H. K. Ghosh*

পরিশিষ্ট ৩/৩

ঘ

VISVA-BHARATI
(THE SANTINIKETAN UNIVERSITY)

PRATISTHATA-ACHARYA
(Founder-President)
RABINDRANATH TAGORE

Regd. Office
SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA

Sravasti, Colombo Oct. 20. 1922

Srijut Chintamoni Ghosh
Indian Press
Allahabad

Dear Sir,

With reference to the arrangement entered into between yourself, the Visva-Bharati, and my nephew Surendranath Tagore, acting on my behalf, I have pleasure in confirming the terms of my nephew's letter dated the 4th. October, 1922, that is to say as President of the Visva-Bharati I accept with thanks your offer to make over to the Visva-Bharati your publishing and selling rights in respect of my books comprised in our agreement dated the 2nd. of June, 1914 as well as of those since published by you in consideration of receiving an amount equal to one-third of the retail price of the stock at present in your hands (which stock will thereupon become the property of Visva-Bharati). I also personally undertake that on your son who is your constituted attorney giving delivery of the stock to the appointed agent of Visva-Bharati, on a suitable date to be arranged between them after the re-opening, I shall guarantee for the payment to you of the aforesaid amount within three months from the date of such delivery.

I should like to add my personal appreciation of the efficient manner in which you and your press have always performed your part of the agreement and to make it clear that the sole reason why I suggested this arrangement was that the copyright of my Bengali books having been made over to Visva-Bharati our future relations will no longer be in my own personal control and would feel very sorry should anything happen in the future to impair our past relations. It is clearly understood that this new arrangement does not in any way affect your right of translating my Bengali books into Hindi and of publishing and selling such translations on the former terms.

Yours faithfully,
(Sd.) Rabindranath Tagore

পরিশিষ্ট ৩/৩

ঔ

Ref. No. 6634
D.O

VISVA-BHARATI
P.O. SANTINIKETAN
BENGAL

Please quote Ref. Number when replying. All letters to be addressed to the Secretary only.

To
Babu Chintamoni Ghosh,
Indian Press
Allahabad

Dated, November 24, 1922.

Dear Sir,

I am sorry for the delay owing to my absence from here in answering your last letter with regard to the fixing of date for taking delivery of the Bengali books of my father in your stock. As I shall be in Calcutta at the end of this month as well as about the middle of the next month it will be equally convenient for me to take delivery of the stock either on the 30th of this month or on the 14th of December.

Kindly let me know to my address in Calcutta which of these dates would be convenient for you, and I shall arrange accordingly.

M.D./R.T.

Yours faithfully
(Sd.) R. N. Tagore

VISVA-BHARATI

(THE SANTINIKETAN UNIVERSITY)

6710
V.P. Mis

PRATISTHATA-ACHARYA
(Founder-President)
RABINDRANATH TAGORE

Regd: Office
SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA

Santiniketan December 5, 1922

To
The Indian Press
Allahabad

Dear Sir,

In compliance with your letter No. nil of the 29th ultimo I shall make arrangement to take over the charge of the books of my father from 13th inst. I shall try to be present personally. In case of failure I shall appoint a responsible man to take delivery.

With reference to your enquiry as to who will be responsible for payment of your dues, I am to inform you on behalf of Visvabharati, that the authorities of the Visvabharati will certainly be responsible for payment, my father having conveyed the copyright of his books to the said Visvabharati. I have been carrying on this correspondence with you on behalf of Visvabharati as its Secretary.

Yours fathfully,
(Sd.) R. N. Tagore

পরিশিষ্ট ৪

কলকাতা 'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস' পরিচালনের অংশীদারী সম্বন্ধে এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ ও কলকাতা কান্তিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে ১ জানুয়ারি ১৯১০এর চুক্তিপত্র।

This indenture made this First day of January one thousand nine hundred and ten between Chintamoney Ghosh, son of Madhab Chandra Ghosh deceased, residing at 3 Pioneer Road in the town of Allahabad in the United Provinces of Agra and Oudh, by caste Kayastha, by occupation Proprietor of the Indian Press Allahabad, of the one part **and** Manilal Ganguly, son of Abinas Chandra Ganguly deceased, of No. 6 Dwarka Nath Tagore's Lane in the town of Calcutta, by caste Brahmin, by occupation Proprietor of the Kantik Press Calcutta, of other part **Whereas** the said Chintamoney Ghosh has for sometime past carried on the business of a publisher and bookseller under the style of The Indian Publishing House at No. 22 Cornwallis Street in Calcutta aforesaid **and whereas** the said Chintamoney Ghosh has agreed to admit the said Manilal Ganguly into partnership in the said business of a publisher and bookseller as from the 1st day of August 1909 for the term and upon the conditions hereinafter contained **and whereas** upon the treaty of the said partnership it was agreed that all books already printed or hereafter to be printed at the costs and with the capital of the said Chintamoney Ghosh should be considered to belong exclusively to him and all books already printed or to be printed hereafter at the cost and with the capital of Manilal Ganguly should belong exclusively to the said Manilal Ganguly **Now this indenture witnesseth** as follows :—

1. The said Chintamoney Ghosh and Manilal Ganguly will become and continue partners in the said business of a publisher and bookseller during their joint lives subject nevertheless to determination as hereinafter provided.

2. The business of the partnership shall be carried on at No. 22 Cornwallis Street aforesaid or at any other place the said parties may hereafter mutually agree upon.

3. Each partner shall on or before the 1st day of March 1910 pay the sum of Rupees 1000 into the Bengal Bank at Calcutta aforesaid and such sum together with all monies received on account of the partnership shall be paid therein from time to time and shall form and be deemed a floating capital of the said firm from which all payments made in the course and on account of the said business shall be drawn by Cheques by the said Manilal Ganguly. All future capital required for carrying on the said business shall be advanced by the said partners in equal moieties and if any partner shall with the consent of the other partner bring in additional capital or leave in the business as capital any part of the nett profits carried to his credit at any general account the same shall be considered as a debt due to him from the partnership and shall bear

interest after the rate of Rs. 6 per cent. per annum thereon until payment thereof payable half yearly but such additional capital shall not be drawn out by him without giving six calender months' written notice of his intention so to do to the other partner and he shall be bound to draw out the same on a like notice being given to him by the other partner and at the expiration of such last mentioned notice interest shall cease to be payable thereon.

4. The said capital and stock implements and utensils in trade and furniture and materials used in carrying on the said business purchased out of the partnership funds as well as the gains and profits of the said business shall belong to the said partners in equal moieties.

5. The said Manilal Ganguly shall be in charge of the said business and shall diligently employ himself in or about the business of the said partnership and carry on manage and conduct the same for the greatest benefit and advantage of the partnership and shall give such time attention and supervision as may be necessary for the efficient management thereof. The said Chintamoney Ghosh shall not interfere with the carrying on management or conduct of the said business and shall not during the continuance of the partnership either alone or in partnership with any other person or persons carry on or be concerned directly or indirectly in the business as a bookseller in Calcutta and its suburbs and shall not sign the name of the said firm.

6. The partners shall keep proper books of account and entries shall be made therein of all such matters dealings transactions and things as are usually entered in books of account kept by persons engaged in concerns of a similar nature and the same shall be posted up under the personal superintendence of the said Manilal Ganguly. The said books of account and all letters papers and documents belonging to the partnership except such as are to be kept at the Bankers shall be kept at the office of the partnership and each partner shall have full and free access thereto at all times but shall not remove the same from such depository.

7. No partner shall be at liberty to draw from the partnership for his own private use on account.

8. The said Manilal Ganguly shall be entitled to an amount equivalent to Rs. 15 per cent. on the total profit at the end of each year as an allowance for the management of the firm which will be considered as part of the working expenses.

9. All books of which the partners are or shall be the proprietors shall be sold by the firm and the firm will be entitled to a commission at a rate varying from 10 to 33⅓ per cent. as settled about individual books on the published price or the retail selling price at which the books will be sold. Such commission together with the commission on the sale proceeds of all books of other publishers shall be considered as receipts and earning of the partnership, the amount will be accounted for in the annual account.

10. The rent of the premises used for the purposes

of the said business and all rates and taxes payable in connection therewith and the allowance as aforesaid and the salaries and wages of all clerks and persons employed in the said business and all expenses losses and damages which shall be incurred in carrying on the same or in anywise relating thereto and the interest if any on the capital payable to either of the partners shall be paid out of the receipts and earnings and capital of the said business and in case of deficiency thereof then by the said partners in equal moieties.

11. The said Manilal Ganguly shall send an account to the said Chintamoney Ghosh by the 15th of every English month of all the receipts earnings and capital and debts and outstandings of the said partnership for the month immediately preceding.

12. The partners shall be entitled to the nett profits of the said partnership in equal shares and the said nett profits shall be divided between the partners as soon after as the general yearly account shall have been taken and settled as hereinafter provided.

13. An account of the stock implements and utensils of trade belonging to the said partnership and of the book debts and capital shall be taken and the statement of the affairs of the said partnership made yearly to be computed from the date hereof. But if at the end of any one year of the said partnership it shall be found to be unprofitable the said partnership shall thereupon be dissolved if mutually agreed upon, otherwise the partnership will be considered to be a floating one.

14. Each party shall sign duplicate copies of each of such statements of affairs and shall retain one of them for his own use and another copy thereof shall be written in a fair hand in one of the partnership books and likewise signed by each of them and such account shall not again be opened unless some manifest error shall be discovered in either of them within one month thereafter and then so far only as respects the correcting of such error and every such statement of affairs shall in all other respects be conclusive evidence between and binding on the said partners.

15. Either party may determine the partnership hereby created on breach of any of the conditions herein contained or otherwise on giving unto the other of them three calender months' notice thereof in writing.

16. Neither party shall become bail or surety for any other person nor lend spend give or make away with any part of the partnership property or draw or accept any bill note or other security in the name of the said firm except in due course of the said partnership nor without the consent of the other of them give credit to any person forbidden by the other or borrow money or goods or enter into any contract or engagement on account of the said firm.

17. The death of any partner shall not dissolve the partnership but the representatives of the deceased partner shall have the option to be declared by notice in writing to be given to the surviving partner within three calendar months

after his death of succeeding to his share in the said partnership as from his death as sleeping partners and if such option shall be exercised the said partnership shall be carried on as from the death of such deceased partner as nearly as may be according to the provisions of these presents but so that the representatives of the deceased partner shall succeed to his share in the said partnership and be substituted for him as sleeping partners only without any right to interfere in or have any control over the conduct or management of such business but with power for them or for some person nominated by them at all reasonable times to have access to and examine and copy the books documents and papers of the partnership and to join in taking general account and valuation **provided also** that in case the representatives of a deceased partner shall elect to become sleeping partners by virtue of such option as aforesaid all proper instruments for carrying the provisions of this present clause into effect shall be executed and made between them and the surviving partner, when it would be mutually settled who would be the managing partner.

18. At the termination of the said partnership a valuation and account of the stock effects and capital and good will, if any, of the said firm similar to the yearly account hereinbefore mentioned shall be taken copied and signed in like manner and become equally conclusive and the balance of such account then found to exist shall belong to the said partners in equal moieties and

be realised and divided accordingly and thereupon they shall execute mutual releases.

19. The term "partners" unless repugnant to the context shall also include their respective heirs executors administrators and representatives.

20. That if any dispute doubt or difference shall arise either before or after the expiration or determination of the said co-partnership between the said parties or the representatives of either of them under or the touching or relating to the construction of these presents or to the said partnership property rights credits or effects or to any of the partnership accounts business or transaction whatsoever every such dispute doubt or difference shall within 30 days after the same shall arise be referred to the arbitration of two indifferent persons and an umpire to be chosen by the referees before entering upon such reference ; and the award of such referees or umpire in the matters of such reference shall be made within 30 days next after the first reference to them or within such enlarged time or times as shall be allowed by the said referees and endorsed on these presents and shall be final and conclusive on both parties respectively and their respective representatives and in case either party shall for the space of 15 days after request in writing refuse or neglect to nominate his referee or in case the referees or either of them when chosen shall for the like space of time neglect or refuse to choose an umpire as aforsaid or to act the referee of the other party may proceed alone in the business of the reference and his award if made within the time

aforesaid shall in like manner be conclusive on both the said parties and their representatives to all intents and purposes whatsoever **and** this submission shall upon the application of either party be made a rule of the High Court of Justice in accordance with the provisions of the Indian Arbitration Act (of 1899) and any Act amending the same **and** the costs thereof and of the said reference and of all matters incident thereto shall be borne and paid by the said parties in equal moieties.

In witness whereof the parties have hereunto set and subscribed their respective hands and seals the day month and year first above written.

Signed, sealed and delivered.

(Sd.) Chintamoney Ghosh
(Sd.) Manilal Ganguli

Witness
(Sd.) Charu Bandyopadhyay
(Sd.) Kalachand Dalal

পত্রপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯০৪ থেকে ১৯৩৮ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ব্যাপী চিঠিপত্র-সম্বন্ধের রবীন্দ্রনাথের লেখা ১২০টি চারুচন্দ্রের ১০খানি চিঠি রক্ষিত হয়েছে। মধ্যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৮, ১৯২১, ১৯২৩-১৯২৪. ১৯৩০, ১৯৩৫ এই ন বছরে কোনো পক্ষে পত্র ব্যবহার নেই। চারুচন্দ্রের সব কটি চিঠি ঢাকা বাসকালের, অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় চিঠিই চারুচন্দ্র রক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন আজীবন অচ্ছিন্ন রবীন্দ্রানুরাগী।

২৮শে এপ্রিল ১৮৯৪ কলকাতা স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, গাইতে অনুরুদ্ধ হয়েও গান নি। চারুচন্দ্র তখন এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র, সতেরো বছর বয়স। দ্বিতীয়বার দেখেন, চারুচন্দ্র লিখছেন, ১৮৯৬ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা-সভায়, সমবেত শ্রোতাদের পীড়াপীড়িতে তিনি 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানটি গেয়ে শোনান। তারপর দেখেন ওই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলেই 'গান্ধারীর আবেদন' পাঠ সমাবেশে, কবিতাপাঠের পর সেদিনও একটি গান গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রশান্তকুমার পাল সে সভার দিন ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৭ শুক্রবার বলে ধার্য করেছেন, সভা বিবরণ সূত্রে চারুচন্দ্রের সাক্ষ্যও উদ্‌ধৃত করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে চারুচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ১৮৯৭এ, বি.এ. পড়ার কালে। তাঁর হিন্দু হস্টেলের এক সহাধ্যায়ী নলিনীকান্ত সেন ('রবি-রশ্মি'র ইনিও একজন উৎসর্গভাগী) ১৮৯৬এর শেষ দিকে সদ্য বেরোনো একখানি 'কাব্য গ্রন্থাবলী' বই তাঁকে পড়তে দেন, দীর্ঘ দিন পর চারুচন্দ্র তার পৃ ১ ও পৃ ৭এর 'প্রভাতী' ও 'উল্লাস' থেকে মনে করে কয়েক ছত্র কবিতা উদ্‌ধৃত করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার

প্রাণমন হরণ করল।··· সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আমার জীবনের আনন্দ বন্ধু শিক্ষক গুরু সহচর হয়ে আছে।'

মধ্যবয়সীদের মধ্যে রবীন্দ্রবিরোধিতা আর একাংশ তরুণদের দলে রবীন্দ্রপ্রাণিত রচনাচর্চার দিন সে সময়ে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী তরুণদের যে নামগোত্রহীন রবীন্দ্রচক্রের কথা বলেছেন চারুচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই তার অংশী হয়ে পড়েন। যতীন্দ্রমোহন বলেছেন এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।[১] চারুচন্দ্র বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকেও পরিচিত করে দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন ১৯০৩ সালের কিছু আগে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের আকস্মিক পরিচয় হয়ে যায় তার আগেই, চারুচন্দ্রের বিবৃতি অনুযায়ী কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে মজুমদার লাইব্রেরির এক সান্ধ্য মজলিশে (সম্ভবত আলোচনা-সমিতির বৈঠকে) ১৭ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে, সঙ্গীত সমাজে 'বিসর্জন' অভিনয়ের পর দিন। সেখানে ভূমিকা সহকারে 'পতিতা' কবিতাটি পড়ার পর তাঁর অপর একটি কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্রের অভিমত তিনি গ্রাহ্য করেছিলেন। এর পরে-পরেই ভারতী এবং নব্য প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে চারুচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয় এবং ভারতী সম্পাদন কাজে সরলা দেবীকে তিনি সাহায্য করতে থাকেন। এই সময়কার ভারতীর সুসম্পাদনার জন্য চারুচন্দ্রের শ্রমের কথা সরলা দেবী একটি চিঠিতে স্বীকার করেছেন। চারুচন্দ্রের পুত্র প্রেমোৎপল লিখেছেন, এই সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী চারুচন্দ্রকে একটি সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন, হয়তো এই তার উপলক্ষ। ভারতীর সম্পাদন সহায়তায় চারুচন্দ্র বৎসরাধিক-কাল সংসৃষ্ট ছিলেন।

এই বইয়ের দ্বিতীয় চিঠির সূত্রানুযায়ী ১১ মাঘ ১৩১০ (২৫ জানুয়ারি

---

[১] 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' ১৩৫৪ পৃ ১৬। চারুচন্দ্র অবশ্য লিখেছেন ১৩১৩য় 'বেণু ও বীণা' প্রকাশ কালেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না। দ্র. 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়'। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯ পৃ ৫৮৪।

১৯০৪) সোমবার প্রাতে জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন চারুচন্দ্র। বঙ্গদর্শনে তখন মাঘ কিস্তির 'নৌকাডুবি' বেরিয়েছে, রমেশের সঙ্গে কমল ও হেমের সম্বন্ধ-জটিলতা নিয়ে আলোচনা চলছে অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে, চারুচন্দ্র এক সহজ সমাধান প্রস্তাব করে বসলেন কথার মাঝখানে। 'কথার মধ্যেই রবিবাবু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি চারুবাবু?"' ১৯০৪এ লেখা পাঁচখানি পত্রেই পাঠ 'সবিনয় নমস্কার' বা 'সবিনয় নমস্কার নিবেদন/সম্ভাষণ', এবং সম্বোধন 'আপনি'।' পাঁচটি চিঠিতেই চারুচন্দ্রের ঠিকানা ৪২ বীডন রো, কলিকাতা, কেবল চতুর্থ পত্রখানি রি-ডাইরেক্টেড হয়ে যায় তাঁর দেশের বাড়ি জীরাট, বলাগড় পোস্ট অফিস, হুগলিতে। চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'এর পর আমি অবস্থা বিপর্যয়ে কয়েক বৎসর কলকাতাছাড়া হয়ে ছিলাম।' সম্ভবত প্রথম যান মালদহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে, মালদহের অন্তর্গত চাঁচলের রাজার ভাগিনেয়ী ছিলেন তাঁর মা, মালদহেই চারুচন্দ্রের জন্ম, সেখানেই তাঁর বাল্য কেটেছিল। তারপর ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্ম নিয়ে[১] এলাহাবাদে গিয়ে ওঠেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি—বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর ১৯০৬এ।[২] রামানন্দ তখন এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ বের করছেন—ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে, চিন্তামণি ঘোষের আনুকূল্যে। প্রবাসীতে চারুচন্দ্রের অনেকগুলি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে এর মধ্যে। চিন্তামণি ঘোষ লিখেছেন, চারুচন্দ্র প্রায় চার বছর কাল ইণ্ডিয়ান প্রেসের সিনিয়র রীডার, জেনারেল প্রেস অ্যাসিস্টেণ্ট এবং প্রেসের সংযুক্ত বুক ডিপোর ভারপ্রাপ্ত কর্মীরূপে কাজ

---

[১] ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রধান প্রুফ রীডারের কাজ। দ্র. শান্তা দেবী : 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১২৫।

[২] দ্র. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী'। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫০ পৃ ২৬৬। শান্তা দেবীর সাক্ষ্যে রামানন্দের বাড়ি তখন ২/১ সাউথ রোড, এলাহাবাদ।

করে গেছেন।[১]   চারুচন্দ্র জানিয়েছেন, ১৯০৮ সালে এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের তরফে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস নামে তিনি দোকান খোলেন, তাঁর উপরে ভার ছিল প্রসিদ্ধ লেখকদের বই প্রকাশের অধিকার সংগ্রহ করা, সে কারণে ‘রবিবাবুকে দিয়ে বউনি করব সঙ্কল্প করে রামানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবাবুর কাছে’ তিনি যান। রামানন্দ ছাড়াও ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ স্থাপনে এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের ভূমিকা ছিল, নেপালচন্দ্র অচিরেই বোলপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে যোগ দেন। যেভাবেই হোক, ১৪ই জুলাই ১৯০৮ এবং ২১শে জুন ১৯০৯এ কলকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারীর পক্ষে ম্যানেজার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট তিনটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়, তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ গদ্যগ্রন্থ ছোটো গল্প ‘গোরা’-সহ অন্যান্য উপন্যাস এবং আরো পঁচিশখানি বইয়ের মুদ্রণ প্রকাশ বিক্রয়ের অধিকার ও দায়িত্ব তাঁরা লাভ করেন বিক্রয়মূল্যের এক-চতুর্থাংশ রয়্যালটিতে।[২]

১৯০৮এ চারুচন্দ্র যখন কলকাতায় ফেরেন ভারতী নতুন করে বেরোতে শুরু হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায়, সৌরীন্দ্রমোহন মণিলাল তাঁর সহযোগী। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে খুলেছেন কান্তিক প্রেস, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

---

[১] চারুচন্দ্রকে দেওয়া চিন্তামণি ঘোষের আশংসাপত্র অনুসারে।

[২] চিন্তামণি ঘোষের জীবনীকার অবশ্য লিখেছেন: ‘Charu Babu and Babu Nepal Chandra Roy...who were both close to Rabindranath Tagore *materialised the poet's ambition* to get all his published and unpublished works printed, published and distributed for sale from one place— The Indian Press’. N. G. Bagchi: *Chintamoni Ghosh & the Saga of the Indian Press* 1984 p 20.

‘১৯০৮ সালের আষাঢ় মাস থেকে কান্তিক প্রেসে আমাদের আসর বসতে লাগল নিত্য। চারুচন্দ্র এ সময়ে কলকাতায় থাকেন… এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের এখানকার কর্মাধ্যক্ষ হয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থ-প্রকাশের ভার পেয়েছেন তখন ইণ্ডিয়ান প্রেস। তাঁরা এখানে দোকান খুলেছেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২।১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে।’ ১লা অগস্ট ১৯০৯ থেকে মণিলালের সঙ্গে প্রকাশনার অংশীদারী ব্যবসায়ে নামলেন চিন্তামণি ঘোষ। এ বাবদে চিন্তামণি ঘোষ এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে অংশীদারীর শর্তাদি নিয়ে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হল ১লা জানুয়ারি ১৯১০এ (দ্র. এই বই পৃ ২৯৬-৩০৪), তারও সাক্ষী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সাক্ষী কালাচাঁদ দালাল। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রথম দিকের বইয়ে প্রকাশক বলে কালাচাঁদ দালালের নাম থাকত।

৩১শে জুলাই ১৯০৮এ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, ‘চারুচন্দ্রের এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কবি ও লেখক থেকে একেবারে নিতান্ত গুরুদাসপন্থী প্রকাশক…’। ২৬শে মার্চ ১৯১৪য় এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং কলকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ৮৭খানি বইয়ের যে নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সেখানে মণিলালের সংস্রব নেই, চারুচন্দ্রেরও নেই। তার অনেক আগেই, সম্ভবত ১৯০৯এর শেষ দিকেই চারুচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হয়েছেন প্রবাসীর সঙ্গে (দ্র ২৩.১০.১৯০৯এর পত্র ৬), হয়তো ১৯১০এর মাঝামাঝি পূর্ণত সংযুক্ত হয়েছেন প্রবাসী মডার্ন রিভিউয়ের সহ-সম্পাদকরূপে। অজস্রবিষয়ের নিয়মিত লেখকরূপেও বটে। হয়তো ওই বই সূত্রে আরো বলতে হয় অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রায়াংশ রচনার অবিচ্ছিন্ন গুণগ্রাহী প্রকাশ-পত্র রূপে প্রবাসী মডার্ন রিভিউয়ের অনন্ত ভূমিকার ক্ষেত্রে চারুচন্দ্রের নিরন্তর মধ্যবর্তিতার কথা। ১৯২৭এর মাঝামাঝি রামানন্দ যে রবীন্দ্রনাথকে সক্ষোভে লিখেছিলেন, ‘প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা

করিলাম’, তার আগেই প্রবাসী অফিসের কর্ম ত্যাগ করে চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়রূপে যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময়ের বিষয় তখন রবীন্দ্র রচনার অর্থদ্ব্যর্থ, বা মুদ্রণসংশয়।

ভারতী ১৩১৬ আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্যূন ৪৬খানি বইয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ‘চয়নিকা’ ও ‘গান’ বই দুখানিতে প্রকাশকের অধিক ভূমিকা চারুচন্দ্র পালন করেছিলেন। এ সব বইয়ের অনেকগুলি এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা, কয়েকখানি কলকাতা কান্তিক প্রেসে। দূর স্থানে ছাপা হওয়ার ফলে ‘গান’ বইয়ের ভুল কবিকে ক্ষুব্ধ করেছিল, কান্তিক প্রেসে নতুন করে ছাপা নিয়ে তিনি নির্বন্ধ করেছিলেন, দ্র ২.১১.১৯০৯এর পত্র ১২। ‘গান’ তখনই ফের পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল কি না জানা যায় না যদিও প্রথম ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ যে ‘গান’ বইখানি আমরা দেখেছি তাতে ‘নূতন গান’ পর্যায়ে ১২ই পৌষ ১৩১৬র (২৭.১২.১৯০৯) লেখা গান আছে, আর ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত প্রকাশিত পরের ‘গান’ বইখানি আগের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কৃশকায়। ইতস্তত ছাপার ভুল বাদ দিলে চারুচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা রবীন্দ্রনাথের বইগুলি মুদ্রণের শৈলি ও সৌকর্যে বিশেষভাবেই দৃষ্টান্তজনক, তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য পাই বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। বুদ্ধদেব লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের কোনো ইণ্ডিয়ান প্রেস-সংস্করণ ব্যবহার করার বা চোখে দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন যে মুদ্রণের পারিপাট্যে শুধু নয়, পৃষ্ঠাসজ্জায় ও কবিতার পঙ্‌ক্তি ও স্তবকবিন্যাসে তাতে প্রকাশকের রুচি ও সাহিত্যবোধের পরিচয় কী রকম উজ্জ্বল ছিল।… অনুমান করা শক্ত নয় যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগের জন্যই এমনতর চারুতা সাধন সম্ভবপর হয়েছিল।’[১]

---

[১] দ্র. দেশ সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৩ পৃ ১৯৬। চারুচন্দ্রের সহযোগের আগে এবং পরে ইণ্ডিয়ান প্রেসের মুদ্রণ পরিপাট্য এবং তার কর্মকৃৎ রূপে চিন্তামণি ঘোষের সুনাম

ইণ্ডিয়ান প্রেসে যোগ দেবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। ১৯০৯এ লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিতে (পত্র ৬) আপনি-তুমি-র দোলাচল রয়েছে, ক্রিয়ার প্রয়োগে: '"সখি প্রতিদিন হায়" গানটির জন্য এত খোঁজাখুঁজি করিতেছে কেন?' 'করিতেছেন' লিখে তারপর শেষের 'ন' টি কেটে দেওয়া। এইখান থেকে চারুচন্দ্রের ঠিকানা

Babu Charuchandra Banerji
The Indian Press
3 Pioneer Road
Allahabad.

ঠিকানা বদল হল দেখা যায় অচিরে, ২৪শে জুন ১৯১৪র পত্র ১৪ থেকে চারুচন্দ্রের নতুন উদ্দেশ

Babu Charuchandra Banerji
210/3/1 Cornwallis Street
Calcutta.

পত্র ১৬ থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে Prabasi Office বা "Prabasi" Office লাইনটি বসেছে। পত্র ২৫ থেকে রাস্তার

অবশ্য ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিল। চিন্তামণি প্রবাসী ছাপার জন্য ইণ্ডিয়ান প্রেসে বাংলা বিভাগ খোলেন। শান্তা দেবী লিখেছেন, 'তাঁহারই ইণ্ডিয়ান প্রেসে "প্রবাসীর" প্রথম পাপড়িগুলি বিকশিত হইয়াছিল। এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বাংলাদেশেও তখন হইত কি না সন্দেহ।' রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী (দশ খণ্ড 'কাব্যগ্রন্থ') ছাপার জন্য তিনি নিজের কারখানায় সুদৃশ্য টাইপ ঢেলে নিয়েছিলেন। মাত্র চার দিনে অতি মনোরমভাবে 'গীতালি' ছেপে বেঁধে বের করে দিয়ে তিনি কবিকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

ঠিকানা দাঁড়িয়েছে 210-3-1 Cornwallis Street এই রূপে, ৮ জুলাই ১৯২২এর পত্র ৮৪তে রবীন্দ্রনাথের জরুরি তলব পুনঃপ্রেরণের জন্য ঠিকানার নীচে ৪১/১ শিবনারাণ দাসের লেন লিখে দিয়েছেন কেউ বাংলায় মেয়েলি হাতে।[১] তার অনেক আগেই অবশ্য চিঠির পাঠ 'প্রিয়বরেষু', 'সুহৃদ্বরেষু', 'প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ' ইত্যাদি থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪র পত্র ৫৮ থেকে স্থির হয়ে গেছে 'কল্যাণীয়েষু'তে। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬র পত্র ৬৯এ সংশয় অন্ধকার পথে বিপদের বন্ধু বলে স্বীকার করে চারুচন্দ্রকে দু ছত্র ইংরেজি পদ লিখে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

অন্তত এক দশকের এই ক্রমান্বিত ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস। আশ্বিন ১৩১৩য় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা' নামে দ্বিতীয় কাব্যখানি 'বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক··· অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন কবির উদ্দেশে' সসম্ভ্রমে উৎসর্গিত হয়েছিল। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, 'ঘরে থাকতে পরকে দিতে' যাবেন কেন বই— কবির এই স্বীকার জানতে পেরে অন্তরের সায় সমর্থন খুঁজে পান তাতে চারুচন্দ্র। প্রবাসী মাঘ ১৩১৩য় 'খেয়া', তারপর দেবালয় কার্তিক ১৩১৭য় 'রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' প্রবন্ধে চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জন্য 'উচ্চতম কবির সিংহাসন দাবি' করেছিলেন, এবং এই প্রত্যয় অবিচলিতভাবে জ্ঞাপন করে গেছেন সারা জীবন। ১৩৩৪এ চারুচন্দ্র লিখেছেন ময়মনসিংহ রবীন্দ্রজন্মোৎসবে 'আমি আমার অভিভাষণে জগতের সকল কবির চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলেছি···'। ১৯৩৪এ 'বঙ্গ-বীণা' সংকলন করতে গিয়েও চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'আপনার কবিতা দিয়েই বইখানি ভরে দিতে ইচ্ছা করে।'

কাব্যমুগ্ধতাতেই শেষ নয়। 'শ্রাবণে তোমরা আমার বার্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছ' বলে রবীন্দ্রনাথ যে উপলক্ষে পরিহাস

---

[১] পত্র ৭০এর ঠিকানায় ভুলক্রমে একবার 210-3-2 Cornwallis Street লেখা হয়েছে।

করেছেন, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সে কবি-সংবর্ধনার (টাউন হল ১৪ মাঘ ১৩১৮) মুখ্য চার বা পাঁচজন উদ্যোক্তার চারুচন্দ্র একজন। সে সময় চৌরঙ্গির হপসিং কোম্পানির তোলা 'সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যে'রও এক রশ্মি চারুচন্দ্র। রবীন্দ্রবিদ্বিষ্টদের নিরস্ত করতেও সতত সক্রিয় ছিলেন এঁরা। ১৩৩৪এ চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি এই কর্ম ক'রে বহুকাল থেকে বহু লোকের বিরক্তিভাজন হয়েছি ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিবাদ প্রথম আমিই প্রবাসীতে তাঁর "আলেখ্য" বই সমালোচনা প্রসঙ্গে করি…'। ১৭ মে ১৯১৩য় লণ্ডনে টমাস কুকের কেয়ারে লেখা পত্র ৫৫য় রবীন্দ্রনাথ যে 'তোমরা যখন দস্যুর আক্রমণে পড়েছ তখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি ভগবান অপহরণ করচেন—জয়ী হবার গৌরব আর আমার সইবে না' ব'লে লিখেছেন, 'আনন্দবিদায়' অভিনয় বা তা নিয়ে বিরোধী কাগজগুলির প্রবল সোরগোল তার অপরোক্ষ উপলক্ষ হওয়া সম্ভব। পত্রলেখকের জানার কথা নয়, চিঠি লেখার দিনেই সন্ন্যাস রোগে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়েছে।

ইতিমধ্যে অজস্রধারা গান গল্প কবিতা নাটকের পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ দেয়ানেয়ার সংযোগ উপর্যুপরি হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। পুত্রকে পড়তে পাঠিয়েছেন চারুচন্দ্র শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের লেখার নকল করতে, নিজের জন্য লেখা শুধরোতে, গল্পের প্লট চাইতে এসেছেন বারংবার—বোলপুরে, শিলাইদহে, একবার সহযাত্রী হয়ে গেছেন গয়া বুদ্ধগয়া বরাবর পাহাড় থেকে এলাহাবাদ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অত্যন্ত যত্নে কৃত 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি তুলে দিয়েছেন চারুচন্দ্রের 'হাতেই', লিখেছেন, 'তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি।' বানান নিয়ে ভাষা নিয়ে শব্দের যথার্থ প্রয়োগ নিয়ে বিশ্রব্ধ আলোচনা করেছেন তাঁর সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকঙ্কণ পড়াবার ভার পেয়ে বহু পণ্ডিত-বিদগ্ধের সাহায্য পরামর্শ সহকারে ব্যাপক প্রস্তুতি করেছেন চারুচন্দ্র পড়াবার, তাঁর ব্যবহার্য চণ্ডীমঙ্গলের টেক্স্‌ট্‌খানি 'অমূল্য' মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ। চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'তিনিই প্রথমে তাঁহার মন্তব্য দ্বারা আমার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া দেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন।' এই তথ্য পরে 'আন্তর ও বাহ্য বহু প্রমাণ দ্বারা' তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতী বঙ্গদর্শন তত্ত্ববোধিনী এবং পরে সবুজপত্রের বাইরে, হয়তো উপরেও, রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের মুখ্য কাগজ প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ। মডার্ন রিভিউ তাঁকে ইংরেজি লিখতেও নিরন্তর প্রণোদিত করেছিল, অন্যের করা রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছিল ধারাবাহিকভাবে। ইংরেজিভাষাভাষী বহির্বঙ্গে, বহির্ভারতেও, তাঁর প্রাথমিক পরিচয় এই কাগজের সূত্রে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশের যাবতীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর প্রবাসী অফিসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সাময়িক অনন্বয়ের সূত্রপাত হয় সে অনেক পরের কথা। ততদিনে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধচ্ছেদ হয়ে গেছে।

চারুচন্দ্র ইণ্ডিয়ান প্রেস ছেড়ে প্রবাসীতে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁর সঙ্গে বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হয় নি। ১৯০৯ থেকে ১৯১২ চার বছরে চারুচন্দ্রের প্রণীত অনূদিত সম্পাদিত প্রথম নয়খানি বইই ছেপেছিলেন ইণ্ডিয়ান প্রেস/ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। তার পর কুন্তলীন প্রেস, এম. সি. সরকার, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুরু লাইব্রেরি এবং আরো নানা প্রসিদ্ধ সংস্থা তাঁর বই প্রকাশ করলেও ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে তাঁর মোট সতেরোখানি বই প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সম্বন্ধচ্ছেদ হয়ে যায় মাঝপথেই— বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব নেবার পর। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২এর পত্রে চিন্তামণি ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে

পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।' ইণ্ডিয়ান প্রেস সর্বশেষ রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন 'শিশু ভোলানাথ', ১৯২২এর সেপ্টেম্বরে। 'শিশু ভোলানাথ' পর্যন্ত যাবতীয় মজুত বই তাঁরা বিশ্বভারতীকে হস্তান্তর করেন এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয় মূল্যে, সম্ভবত ১৩ ডিসেম্বর ১৯২২এ, দ্র. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, এই বই পৃ. ২৯৫।[১] জুলাই ১৯২৩এ প্রতিষ্ঠা হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। গ্রন্থনবিভাগ ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলী থেকে বাছাই করে 'সঙ্কলন', ও 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ বের করেন শ্রাবণ ১৩৩২এ। অগ্রহায়ণ ১৩৩২এ বেরোয় 'প্রবাহিণী'। পাঠকের বাছাই অবলম্বন করে 'চয়নিকা' তৃতীয় সংস্করণ বেরোয় ফাল্গুন ১৩৩২এ।[২]

ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে তুলে নিয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রন্থপ্রকাশের স্বত্ব সমর্পণ নেহাৎই রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় না হওয়া সম্ভব। চিন্তামণি ঘোষের জীবনীকার লিখছেন :

...as Shanti Niketan gradually grew up into Viswa Bharati, a regular source of income was found indispensably necessary for meeting monthly expenses. Friends suggested to the poet to procure the copyright of his entire publications from the Indian Press in favour of the Viswa Bharati and

---

[১] মজুত বইয়ের মোট বিক্রয়মূল্য রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার বলেছেন ৭৮,০০০ টাকা, চিন্তামণির জীবনীকার লিখেছেন, ৮৭,০০০ টাকা।

[২] 'কিছুদিন আগে, রবীন্দ্রনাথের ২০০টি কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোট সংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

বর্তমান সংস্করণ চয়নিকা মোটামুটি এই লোক-প্রিয়তা অনুসারে সংকলন করা হইয়াছে।' দ্র. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -লিখিত 'পাঠ পরিচয়', 'চয়নিকা' ৩য় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ. ফাল্গুন ১৩৩২।

thus earn the Publisher's profit for the institution. By the Deed Agreement the Indian Press was the copyright owner. Beside the legal hurdle there was a moral binding also. The Indian Press had spared no pains to publish the Poet's works promptly and to his entire satisfaction, and the Poet felt very sorry to make such a suggestion. But there was no other way out also. At last he wrote personally to Chintamoni Babu about this predicament. Quick came the spontaneous offer from Chintamoni Babu, relinquishing all his title to the Copyright of the Poet's works in favour of the Viswa Bharati—a rare example of his large-heartedness which amazed the Poet so much that he wrote to him at once, expressing his heart-felt appreciation of this noble gesture.…’’[১]

ইণ্ডিয়ান প্রেসের সুমুদ্রণ, তৎপরতা এবং উদ্যোগী প্রচার বিস্তার প্রবাদ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তৎসত্ত্বেও সম্বন্ধ-ব্যবধানের দ্বিতীয় একটি সূত্রও পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয়। বেশ কিছু দিন ধরেই ইণ্ডিয়ান প্রেসের গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যবস্থায় কিছু অবস্থান্তরের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় চিন্তামণি ঘোষ প্রেসের কার্যভার থেকে অবসর নিয়ে প্রেসটিকে তাঁর পুত্রগণের সহযোগে একটি প্রাইভেট কোম্পানি করে দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯১৯এ চিন্তামণি রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লেখেন :

---

[১] N. G. Bagchi, *Chintamoni Ghosh & the Saga of the Indian Press* 1984 p 22

'আপনাকে আমার পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী এখন এক ব্যক্তি নহেন। একটি কোম্পানির হস্তে ইহা এখন হইতে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং অতঃপর কোনো পুস্তকাদি প্রকাশ করিবার সময় কোম্পানির তাহার লাভালাভ হিসাব করিয়া দেখা আবশ্যক হইবে। কার্যতঃ তাহাই হইতেছে।'

অতঃপর লেখেন :

'এ পর্যন্ত আপনার সমস্ত পুস্তক লাভ-লোকসান বিবেচনা না করিয়াই আমি সানন্দে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এখন হইতে আপনার নূতন কোনো বই ছাপিতে হইলে কোম্পানি তাহার লাভালাভ দেখিবেন। এই জন্য আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার নব-লিখিত কোনো পুস্তক প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইলে তাহা ছাপিবার পূর্বেই অনুগ্রহ করিয়া একবার ইণ্ডিয়ান প্রেসের বর্তমান পরিচালকগণকে তাহার লাভ-লোকসানের হিসাব করিবার সুযোগ দিয়া বাধিত করিবেন।'

২৮ নভেম্বর ১৯১৯এ চিন্তামণি ঘোষ পুনরায় একখানি চিঠিতে লেখেন :

'এতকাল ইণ্ডিয়ান প্রেসের হর্তাকর্তা আমি একাই ছিলাম··· কিন্তু এখন আমার শারীরিক অক্ষমতা বশত উহার ভার একটি কোম্পানির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।··· কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, উহার পরিচালকেরা এমন কোনো বন্ধন স্বীকার করিতে পারিবেন না যাহাতে লাভ-লোকসানের সম্বন্ধ বিচার করিবার কোনো সুযোগ নাই।

'আপনার সহিত আমার ব্যবসায়ের চেয়ে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার সম্বন্ধই বেশী। কিন্তু কোম্পানি জিনিসটা একটা হৃদয়হীন পদার্থ মাত্র। সে লাভ ছাড়া অন্য কিছুরই খাতির রাখে না। এই বুঝিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন।'[১]

এই পত্রপরম্পরা থেকে অনুমান হয় অন্তত এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের অপর উপায় স্থির করে নিষ্কৃতি লাভ করতে চেষ্টা

---

[১] চিন্তামণি ঘোষের পত্র কয়খানি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

করেছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ যখন প্রতিষ্ঠা হয় চারুচন্দ্র তখনও প্রবাসী সম্পাদনার কাজে যুক্ত। কিন্তু ১৯২২এর সত্যেন্দ্র-স্মৃতিসভার পর আড়াই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ নেই। ১৯২৪এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পূর্বাহ্ণে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি সুপারিশ পত্র মাত্র তিনি দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে লাভ করেছেন।

৩

১৯২০তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পার্ট টাইম ক্লাস নিতে শুরু করেন চারুচন্দ্র, প্রবাসী অফিস আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাগাভাগি হয়ে যায় তাঁর কর্মজীবন। ১৯২০র দুটি মাত্র চিঠির দ্বিতীয়টিতে প্রবাসীর জন্য গল্প লেখা, চারুচন্দ্রের জন্য গল্পের প্লট ভেবে দেওয়া এবং অধ্যাপনা নিয়ে পরিহাস করেছেন দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ পাশাপাশি। প্রসঙ্গত, চারুচন্দ্রের পুত্র লিখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পর্বে তাঁর সৃষ্টিধর্মী লেখাতেও 'কোটাল জোয়ার' এসেছিল, এই সময়-পরিসরের মধ্যে নখানি উপন্যাস দুটি ছোটো গল্পের বই ও একখানি বারোয়ারি উপন্যাসের একাংশ তিনি লিখেছিলেন। পড়ানোর পূর্বাহ্ণে শ্রেণীবিভাজিত, বিস্তৃত একটি সিলেবাস তৈরি করে নেন পাঠ্যবিষয়ের (সে সিলেবাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত করেছিলেন)— সেও শ্রমসাধ্য কাজ। দীনেশচন্দ্র সেন হৃষীকেশ বসুর সহযোগে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর নতুন দুভাগ বইও সম্পাদনা করেন এই সময়, পড়াতে গিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলেন সুবৃহৎ দু খণ্ড 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী'।[১] সে-সব বই যতদিনে বেরিয়েছে তার আগে পুরোপুরি অধ্যাপন কর্ম নিয়ে তিনি ঢাকা-বাসী। ১০ মে ১৯২৫এর পত্র ৮৫তে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে বাংলা-ইংরেজিতে মেশানো চারুচন্দ্রের ঠিকানা: শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/44 Nilkhet Road / Ramna / Dacca। সে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ

---

[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রাচীন সাহিত্য পড়িয়েছেন চারুচন্দ্র। 'শূন্যপুরাণ' (১৩৩৬) বা 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী' (১৩৪১) সম্পাদনার উপলক্ষ হয়তো তাই।

অভিযোগ করেছেন : 'চারু, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবে না।' হয়তো গ্রীষ্মের ছুটিতেও আসার অবকাশ নেই, পুরোপুরি, অবিচ্ছিন্ন ঢাকা-জীবন এখন তাঁর।

রামানন্দের আশংসাপত্র থেকে অনুমান হয় ১৯২৪এ পুজোর আগে বা পরে যোগ দিয়েছিলেন চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই নিযুক্তির সূত্রে সোচ্ছ্বাসে বলেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের সুপারিশের কথা (দ্র. এই বই পৃ ১৪৯)। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'His connection with the Calcutta University led to his appointment as a Professor in the Bengali Department of the Dacca University.' চারুচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ সান্‌স্‌ক্রিটিক স্টাডিজ অ্যাণ্ড বেঙ্গলি-র লেকচারার পদে যোগ দিয়েছিলেন। ২৫ অগস্ট ১৯২৮এর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক এম.এ. ডিগ্রি দান করেন।

ঢাকায় চারুচন্দ্রের রবীন্দ্রকৃতির প্রথম তথ্য পাই পত্র ৮৬তে। ১৯২৫এর বর্ষায় ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনী যে 'ফাল্গুনী' অভিনয় করেন প্রোগ্রাম পত্রীতে চারুচন্দ্র সে সম্মিলনীর সম্পাদক বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ষায় 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের একটি সূচনার কৈফিয়ত লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চারুচন্দ্র অভিনয়ও করেছিলেন সে নাটকে। ১৯২৬এর ফেব্রুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা ও অন্যত্র পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা সফর করেন। ১৯২৫এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে চারুচন্দ্রকে লেখেন তাঁর 'জানুয়ারির শেষভাগেই যাবার সঙ্কল্পে'র কথা, কিন্তু রমেশের (বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার) বাসাতেই থাকার কথা তিনি দিতে পারছেন না (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে হয়তো চারুচন্দ্রও তাঁকে সেই নির্বন্ধ করেছিলেন)। ফেব্রুয়ারি ১৯২৬এর শুরুতে লেখেন, ঢাকার সাধারণের তরফ থেকেও দুজন দূত এসে তাঁকে আমন্ত্রণ করে গেছেন অতএব নির্ধারিত দিনের তিন দিন আগে গিয়ে তাঁদের অতিথি হয়ে

থাকতে চান যাতে পূর্ব-ব্যবস্থার ব্যত্যয় না হয়। এই অতিরিক্ত তিন দিনের থাকা নিয়ে রমেশচন্দ্রকেও তিনি টেলিগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু 'গুরুদেবের অন্যত্র বাসের নতুন ব্যবস্থায় ইউনিভার্সিটির ছাত্রেরা যে নিতান্ত *নিরুৎসাহ' হয়েছেন সে কথা চারুচন্দ্র লিখে* জানান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।[১] ঢাকা সফরের আর কোনোখানে চারুচন্দ্রের উল্লেখ নেই। পরের বছর ঢাকা জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বসন্তোৎসব উপলক্ষে চারুচন্দ্রের ফরমাস মতো দোলের কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'ছাপাখানার মসীবন্ধনে বন্দী করবার অধিকার' না দিয়ে। এই ১৯২৭এর ময়মনসিংহ রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের ভাষণেই, চারুচন্দ্র লিখেছেন, তিনি বলেছেন, 'জীবনের অবশিষ্ট দিন কটাও আপনার মহিমা কীর্তন ও প্রচার করেই কাটাব।' চারুচন্দ্রের এর পরের চিঠির ঠিকানা

Charu Bandyopadhyaya, M.A.
Lecturer, Dacca University
House Tutor, Dacca Hall
Ramna, Dacca.

১৪ এপ্রিল ১৯৩১এর এই চিঠিতে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে প্রস্তূয়মান 'বঙ্গ-বীণা' কাব্যচয়নিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি ভূমিকা প্রার্থনা করেন চারুচন্দ্র। 'শ্রী' ও 'চন্দ্র' বর্জিত নাম চিঠিতে এই প্রথম। ২ অক্টোবর ১৯৩৩এর পত্র ১০৭এ রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে পাওয়া গেছে খামে লেখা উপরের এই নাম-ঠিকানা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাল শেষ হতে চারুচন্দ্র যোগ দেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানান ৪ বৈশাখ ১৯৪৪এর অনুষ্ঠানে। আরো দুবার তাঁর ঠিকানা বদল দেখা যায়

---

[১] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চারুচন্দ্রের চিঠিখানি গোপালচন্দ্র রায়: 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' ১৩৭৯ পৃ ৩৯এ সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির খামে। ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮এর পত্র ১১৫য় ঠিকানা : ১ গোবিন্দদাস রোড/লক্ষ্মীবাজার/ঢাকা। পত্র ১১৮তে পাই

শ্রী চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
"মাতৃকা"
৪৪এ রাণী হর্ষমুখী রোড
পাইকপাড়া, কাশীপুর

নীচে লেখা : Cossipur, Near Calcutta। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পর কলকাতার কাছে এই বাড়িখানি কিনেছিলেন চারুচন্দ্র।

প্রাচীন সাহিত্যের চেয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুচন্দ্র মুখ্যত পড়াতেন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না কিন্তু লিখেছেন, 'বন্ধুদের মুখে শুনেছি, "চয়নিকা"র যে কপিটি তিনি ক্লাশে ব্যবহার করতেন তার পাতায় পাতায় তাঁর স্বরচিত পাণ্ডুলিপি গ্রথিত ছিল : বহু ব্যাখ্যা, উল্লেখ, ভারতীয় ও বৈদেশিক কবিদের রচনা থেকে তুলনীয় অংশ— এই সব ছিল ছাত্রদের জন্য তাঁর আয়োজিত ভোজ।' ১৯২৮ থেকে তাঁর চিঠিপত্রেরও একটানা বিষয় রবীন্দ্ররচনা—বিশেষ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। 'রবি-রশ্মি'র ভূমিকায় চারুচন্দ্র লিখেছেন, এ বই তাঁর বারো বছরের অধ্যাপনার ফসল। 'রবি-রশ্মি'র পূর্বভাগ মাত্র মৃত্যুর আগে চারুচন্দ্র দেখে যেতে পেরেছিলেন।

৪

ভারতী যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কথাসাহিত্যিক চারুচন্দ্র; একই সঙ্গে রাবীন্দ্রিক আবার সদ্য-আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাবগতির অবধানপরায়ণ। চারুচন্দ্রের 'পুষ্পপাত্রে'র প্রথম গল্পগুলিকে 'বাঙ্গালা গল্পের রাজ্যে নূতন, বিশিষ্ট' বলে অভ্যর্থনা করেছিলেন ভারতী (দ্র. আশ্বিন ১৩১৭)। তরুণ আধুনিকেরা ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। মণীশ ঘটকের উপন্যাসে তুমুল স্বদেশীর দিনে শিলেট শহরের

হালফিল বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেটের অন্তঃপুরিকা ডিট্‌জ লণ্ঠনের পল্‌তে উসকে প্রবাসীর পাতা উলটে নিবিষ্ট হয়ে পড়েন রবিবাবুর গান, প্রভাত মুখুজ্জের উপন্যাসে, চারু বাঁড়ুজ্জের ছোটো গল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন তাঁর শিক্ষানবিশির পর্বে ‘প্রবাসী’ পত্রিকা স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রতি বৎসর গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কৃত গল্পগুলি তাঁরা সাগ্রহে পাঠ করতেন।[1] তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্পে’র ভূমিকায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘তিনি যে অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর অগ্রদূত, সে সত্যের ইঙ্গিত’ও পেয়েছেন। আধুনিক বাস্তবতা বা ইতরজনপ্রান্ত বা মন্দ-অমাঙ্গল্যের প্রবেশ ঘটেছিল তাঁর প্রৌঢ় লেখাতে, যদিও বুদ্ধদেব বসুর বিবেচনায় তা স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে নি লেখকের স্বভাবজ অপ্রবণতাবশে। তথাপি চারুচন্দ্রের মৃত্যুর সম্বন্ধগত পর প্রবোধকুমার সান্যাল যে লিখেছেন, ‘যে বাস্তবতা ও স্ত্রীপুরুষের বিশ্লেষণমুখিতা এখনকার কথাসাহিত্যে অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত তাহার পূর্বাভাস চারুচন্দ্রের গল্পে ও উপন্যাসে পাওয়া যায়’, তাতে আরো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের সূত্র নির্ণীত হয়েছে বলে মনে হয়।

হয়তো আধুনিক ইয়োরোপীয় অনুষঙ্গের অধিক সুব্যবহার হয়েছে তাঁর লেখাতে। ‘কন্টিনেণ্টাল’ লেখার নানা বিষয় প্রসঙ্গের বিনিয়োগের চেয়েও সে ক্ষেত্রে বেশি উল্লেখ করতে হয় তর্জমাগুলি। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমেই তাঁরা ভাবানুবাদ করেছেন, তাঁর অনুগামীদের রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিক অনুবাদের প্রবর্তনা করেন নি। কিন্তু সেও অনুযাত্রীদের কাছে কম নয়। সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছেন, ভারতী গোষ্ঠীর চারুবাবু ছিলেন তাঁদের তরুণ বয়সের হিরো। বড়ো একটা catholic জানলা তাঁরা খুলে দিয়েছিলেন। ‘ফরাসী ও রুশ গল্পের “ছায়াবলম্বনে”র ওস্তাদ সূপকার’ বলেছেন জীবনানন্দ দাশ চারুবাবু মণি গাঙ্গুলিকে, প্রধানত এঁদেরই সূত্রে, তিনি লক্ষ্য করেছেন, ‘রবীন্দ্র বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন

---

১ দ্র. ‘কনখল’ (১৯৬৩) ১৯শ অধ্যায় এবং ‘বৃষ্টি এল’র (১৯৫৪) ‘দুটি মৃত্যু’ প্রবন্ধ।

ঐতিহ্য ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড়ো বড়ো বৈদেশিক উজ্জ্বল আলোর কাছে।'

মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে এসে আজও অবশ্য চারুচন্দ্রের রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রচর্চার দিকটাতেই আমাদের বেশি করে চোখ যায়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র-পরিচয়

পত্র ১। কুমারখালি, শিলাইদহ॥ কুমারখালি কলকাতা থেকে ১১৯ মাইল দূরত্বে ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ের স্টেশন, গড়াই নদীর তীরে একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

পাবনা জেলা থেকে ১৮৭১ সালে কুমারখালি নদীয়া জেলার অধীনে আসে।

শিলাইদহ কুমারখালি থেকে ৫ মাইল দূরে পদ্মা ও গড়াইয়ের[১] সঙ্গমস্থলের অতি নিকটে পদ্মার তীরে অবস্থিত।

দ্র 'বাংলায় ভ্রমণ' ১ম খণ্ড। ২য় সং ১৯৪০ পৃ ১০৭-১০৮।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'শিলাইদহ গোরাই ও পদ্মার মোহানায় অবস্থিত। নদী এখানে ঘুরে গেছে বলে মোহানার কাছেই স্রোতের ঘূর্ণিতে একটা মস্তবড়ো 'দহ'র সৃষ্টি হয়েছিল। তার থেকে শিলাইদহ নাম।'—'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং, পৃ ২৮।

'আপনার গল্প…'॥ চারুচন্দ্র লিখেছেন, দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে প্রবাসী থেকে সংস্কারার্থ ফিরে আসা তাঁর 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' গল্প সংশোধনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। দ্র এই বই পৃ ২০৪।[২] 'পুষ্পপাত্র' (১৩১৭) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

'৯ই মাঘ পর্যন্ত…'॥ তুলনীয় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩০শে পৌষ ১৩১০ লেখা চিঠি : '৯ই মাঘ পর্যন্ত আমি এখানে আছি। রথীরা ১৭ই-১৮ই পর্যন্ত থাকিবে।'[৩] রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র ছাড়া শান্তি-

---

[১] গড়াই বা গড়ুই। তু. 'বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ুই নদীর ব্রিজ দেখা গেল' বা 'গড়ুই পেরিয়ে যখন আসল পদ্মায় পড়লুম…', ইত্যাদি। 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ৬৭, ১২৮।

[২] চারুচন্দ্রের স্মৃতিকথায় সময়টি ভুলক্রমে ১৩১২ বলে উল্লেখ আছে।

[৩] কুষ্টিয়া স্টেশন দিয়েই সাধারণত শিলাইদহে আসাযাওয়া চলত। কুষ্টিয়া

নিকেতনের অধ্যাপক সুবোধ মজুমদারও তখন শিলাইদহে ছিলেন।

'শিলাইদহে…'॥ ঠাকুরবাড়ি জমিদারির বড়ো কাছারি ছিল শিলাইদহ গ্রামে। উত্তরবঙ্গের জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার পাওয়ার পর নভেম্বর ১৮৮৯ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে শিলাইদহে থাকতে শুরু করেন।

'বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম'॥ শান্তিনিকেতন আশ্রমের অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা ৭ই পৌষ ১৩০৮, ২২ ডিসেম্বর ১৯০১। ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-দিন।

কালীপদ রায় লিখেছেন, 'ডিসেম্বর মাসে সূচনা হলেও ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের অধ্যয়নের কাজ শুরু হয়।' দ্র 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' ১৩৮৮ পৃ ৮।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সাহায্য॥ শুভার্থীদের নিয়মিত বা এককালীন সাহায্য বা দান প্রথমাবধিই আসতে শুরু করেছিল। ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বাৎসরিক এক হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ৭ চৈত্র ১৩০৯এর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এখন সহায়তা আপনি আসিতেছে। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৫০ টাকা মাত্র বেতন পান— কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়— তিনি একদিন বোলপুরে আসিয়া নিঃশব্দে আমাকে ১০০০ এক সহস্র টাকা দিয়া গেলেন।' এই শিক্ষক মোহিতচন্দ্র সেন, পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।[২]

ঘাট থেকে নদীপথে পাবনা ডান দিকে রেখে শিলাইদহের ঘাটে এসে পৌঁছতে হত, এই রকম বিবরণ পাওয়া যায়।

[১] শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৯ পৃ ৪৭৯-৪৮০। চিঠিপত্র ১৩, পৃ ৩৩-৩৪।

[২] মোহিতচন্দ্রের এই দানের কথা প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রেও উল্লেখ আছে। দ্র. চিঠিপত্র ৮, পত্র ১৭২।

পত্র ২। ১১ই মাঘ ॥[১] ১১ই মাঘ মাঘোৎসব পুণ্যতিথি, ১৮৪৩এ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের সাম্বাৎসরিক। ১৭৫০ শকে ভাদ্র মাসে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, 'ভাদ্রোৎসবই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বাৎসরিক, তাহাই রামমোহন রায় -কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রাচীনতর। মাঘ মাসে সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ করা দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সাল হইতে আরম্ভ করেন।' দ্র সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' ১৯২৭ সং, পৃ ৭২।

জোড়াসাঁকোর বাটি ॥ ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

আদিব্রাহ্মসমাজ[২] ॥ ৫৫ নম্বর অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

১৩১০ বা ১৮২৫ শকাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ওই বছরের মাঘ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শেষ পৃ ১৬২তে ব্রাহ্মসমাজের 'চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিকে'র এই বিজ্ঞাপন :

আগামী ১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ফাল্গুন ১৮২৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ওই সভার বিবরণস্থলে দেখা যায় সকালে এবং রাত্রিকালে দুই বেলাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠের পর উপাসনাদি সমাপ্ত হলে রবীন্দ্রবাবু দুই বারে দুটি উপদেশ দেন। রাত্রের উপদেশটি 'দিন ও রাত্রি' নামে এবং সকালের উপদেশটি 'মনুষ্যত্ব' নামে 'ধর্ম' ১৩১৫ গ্রন্থে সংকলিত।

---

[১] দ্র এই বই পৃ ২০৩।

[২] ১৮৬৬তে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর মূল বা পুরাতন সমাজ ১৮৬৮তে আদিব্রাহ্মসমাজ এই নাম-পরিবর্তন করে। দ্র. Sivanath Sastri : *History of the Brahmo Samaj* 1974 edn pp. 52, 113-118.

দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮২৫ শক পৃ ১৬৭-১৭০ ও পৃ ১৭৪-১৮০, 'ধর্ম' রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, ১৩৭৪ সং পৃ ৩৪১-৩৪৮, ৩৪৮-৩৫২।

পত্র ৩। E.B.S.R. ॥ ঈস্টর্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রাস্তায় প্রথম গাড়ি চালান। ১৮৭১এ এই রেল গোয়ালন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। '১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারের হাতে আসে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকার নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ পর্যন্ত একটি মাঝারি মাপের লাইন খুলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে এই লাইনটি নর্দার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ও অন্য কয়টি লাইন ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত একত্র হইয়া "ঈস্টর্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে" নামে অভিহিত হয়। এন ডব্লিউ রেলওয়ে প্রমুখ সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অন্যান্য রেলওয়েসমূহের নামকরণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'স্টেট্' কথাটি উঠাইয়া দেওয়া হয়।' দ্র. 'বাংলায় ভ্রমণ' ১ম খণ্ড ২য় সং ১৯৪০ পৃ ৬২-৬৩।

'বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপক…' ॥ সতীশচন্দ্র রায়। উত্তরভারত ভ্রমণান্তে সতীশচন্দ্র ১৫ জানুয়ারি বোলপুরে ফেরেন। তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ (১৮ মাঘ ১৩১০) মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'সতীশের তরুণ জীবন ও সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে।' দ্র 'সতীশচন্দ্র রায়'। বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০।

সে বছরেই ১৩১০ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর সতীশচন্দ্র আশ্রমের অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম যুগের এক ছাত্র সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন : 'অল্পদিনের জন্যই তাঁকে পেয়েছিলাম।… গ্রীষ্মের

ছুটির পর আশ্রমে গিয়ে শুনলুম সতীশবাবু বসন্তরোগে আক্রান্ত। সেইজন্য বিদ্যালয় শিলাইদহে বসেছে। আশ্রমে কোদো আর কে যেন আছেন সতীশবাবুর পরিচর্য্যার জন্য। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছি। বাইরে জানলা দিয়ে দেখা যায়। লেবরেটরী ঘরের মেঝের উপর যেন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন। আমাকে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হল না। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে এসে শিলাইদহ যাত্রার ব্যবস্থা হল…'। 'আশ্রম-স্মৃতি'। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮) গ্রন্থে সংকলিত।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছেন, 'সতীশবাবুর মতো শিক্ষক বিরল।… অল্প সময়ের জন্য তাঁকে পেয়েছিলাম— কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তারই মধ্যে যা পেয়েছিলাম, ভোলবার মতো নয়।' দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং পৃ ৭২-৭৫।

শিলাইদহে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত। 'সম্প্রতি বোলপুর বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপকের বসন্তরোগে বিদ্যালয়গৃহে মৃত্যু হওয়ায় আমাদের সমস্ত ইস্কুলটি শিলাইদহে আনিয়াছি সে খবর বোধ হয় পাইয়াছ। ইহাতে বিস্তর ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে—তাহাই লইয়া এখনো বিব্রত আছি। ১৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় এখানেই থাকিবে।' শিলাইদহ থেকে মহিম ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭ ফাল্গুন ১৩১০এর পত্র।

অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন: '১৩১০ সালের মাঘে সতীশ যখন অকালে বসন্তরোগে এই আশ্রমে মারা গেলেন তখন মোহিতবাবু তাঁহার কলিকাতার অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়া যোগ দিলেন। তখন কিছুকালের জন্য শিলাইদহে বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। মোহিতবাবু সেইখানে গিয়া বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করিলেন। ১৩১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় বোলপুরে

ফিরিয়া আসিল। তখন মোহিতবাবু অধ্যক্ষ।' দ্র 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' ১৩৫৮ পৃ ২৫। মোহিতবাবু, মোহিতচন্দ্র সেন।

পত্র ৫। গিরিডি। শারীরিক অসুস্থতা ও বিদ্যালয়ের সমস্যা ছাড়াও চরমপন্থী-মডারেট নানা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের মাঝখানে স্বদেশের প্রতি কেবল 'উপস্থিত কর্তব্যে'র অনুরোধে 'স্বদেশী সমাজ' গঠনের চেষ্টায়— তার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে দীর্ঘ শ্রাবণ মাস কাটিয়ে ১ ভাদ্র ১৩১১ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথ গিরিডি যান। গিরিডিতে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।[1] এখান থেকেও সখারাম গণেশ দেউস্করের 'বৈদ্যুত তাড়নায়' তাঁকে লিখে পাঠাতে হয় 'শিবাজী উৎসব' কবিতা, ১১ ভাদ্র ১৩১১।[2] কিন্তু এই দিনেই দীনেশচন্দ্র সেনকে চিঠিতে লিখছেন, 'এখনো আমার কল্পনাশক্তি প্রসুপ্ত আছে।'

---

[1] রথীন্দ্রনাথ লিখছেন: শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কলেক্টর হিসাবে রেল-কোম্পানির জন্য জমি দখল করেছেন। গিরিডিতে তাঁর হেড আপিস।' তাঁর বারগাণ্ডার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং পৃ ৯৭-৯৮।

[2] দ্র. 'স্বদেশী সমাজ' স্বতন্ত্র ১৩৬৯ সংস্করণে ৭ ও ১৬ শ্রাবণ ১৩১১ মিনার্ভা ও কার্জন রঙ্গমঞ্চে পঠিত দুটি প্রবন্ধ, তার বর্জিতাংশ ও রচনাপরিচয়, তদ্ব্যতীত অমল হোম -সংগৃহীত 'স্বদেশী সমাজে'র সংবিধান পৃ ৫৮-৬৪। আরো দ্র. অবলা বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, চিঠিপত্র ৬, বৈশাখ ১৩৬৪ পৃ ৯০-৯২। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা ১১ ভাদ্র ১৩১১র চিঠি, চিঠিপত্র ১০, বৈশাখ ১৩৭৪ পৃ ২৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্রজীবনী' ২, ১৩৯৫ সং পৃ ১২৬, ১৪৬-১৫০ ও প্রশান্তকুমার পাল: 'রবিজীবনী' ৫, ১৩৯৭ পৃ ২০১-২০৩।

ত্রিপুরার মধ্যমরাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর গিরিডিতে এ যাত্রায় তাঁর অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তিনি স্মরণ করেছেন, 'আমাদের অবস্থান সময়েই কবির বিখ্যাত "শিবাজী" লেখা হয়েছে— আবৃত্তি করে আমাদের শুনিয়েছেন ও সেটি বঙ্গদর্শনে ছাপাবার জন্য দিয়েছেন…'। দ্র 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' ১৩৬৮ পৃ ৯০।

'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে' ॥ রচনা শিলাইদহ ৫ আশ্বিন ১৩০২। কাব্য-গ্রন্থাবলী ১৩০৩ পৃ ৪৩০, কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ পৃ ৮১।

চারুচন্দ্র জানিয়েছেন, 'কাশীতে সাহিত্য-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে সেখানকার সেক্রেটারির অনুরোধে তাঁকে উদ্‌বোধনের উপযোগী একটি গান লিখে দেবার নির্বন্ধ করলে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "ওরে বাস্ রে! গান লেখবার সাধ্য কি আমার আছে আর! গান-টান আর আমার আসে না—চলে গেছে মোর বীণাপাণি (চৈতালি), আমার একটা পুরানো গান আছে—

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমল বন মাঝে

সেই গানটা দিয়ে চালিয়ে দেবেন।" আমি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।' দ্র. এই বই পৃ ২০৩।

এই স্মৃতিতে দুটি বিভ্রম আছে। প্রথম, চিঠির সাক্ষ্যে দেখা যায়, গানটির কথা রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, সাক্ষাতে বলেন নি। দ্বিতীয়, বারাণসীস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখা গঠিত হয় চিঠির অন্যূন সাড়ে-চার বছর পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২২শে ফাল্গুন। দ্র. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৬ পৃ ১৯৬।

পত্র ৬। শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলী ॥ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা ও সেই সঙ্গে অপরাপর ধর্মপ্রসঙ্গ পুস্তক। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত এই সিরিজ বা গ্রন্থাবলীতে ক্রাউন ১/২৪ সাইজের ছোটো ছোটো বইয়ে 'শান্তিনিকেতন' 'ভক্তবাণী' 'কবীর' 'উপনিষৎসংগ্রহ' ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভক্তবাণী' তিন খণ্ড রবীন্দ্রনাথের নামেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। 'উপনিষৎসংগ্রহ' দু খণ্ড 'মূল, সংক্ষিপ্ত সরল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ' বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত, যদিও মানসী পত্রিকা কার্তিক ১৩১৮ সংখ্যায় 'বঙ্গসাহিত্য, ১৩১৭ সাল' নামে সারদাচরণ

মিত্রের লেখা ‘রিপোর্ট’এ ‘শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “উপনিষদসংগ্রহ” সানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন’ বলে উল্লেখ আছে। ক্ষিতিমোহন সেন চার খণ্ডে ‘কবীর’ প্রকাশ করেন। তিনিও প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে লিখেছেন, ‘যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।’

‘শান্তিনিকেতন’ ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রদত্ত ভাষণমালা, ক্রাউন ১/২৪ আকারের সতেরো খণ্ডে সংকলিত ১৯০৯-১৯১৬। ১০ শ্রাবণ ১৩১৬ তারিখের চিঠিতে কাদম্বিনী দেবীকে ‘“শান্তিনিকেতন” নামক আমার ধর্ম্মোপদেশের বইগুলি শীঘ্রই’ পাঠিয়ে দেবার কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতী, আষাঢ় ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের এই বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায় :

শান্তিনিকেতন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে ভূষিত। অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য চারি আনা।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬র বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ‘শান্তিনিকেতন’ দশম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭য় ‘শান্তিনিকেতন’ নবম ও দশম খণ্ডের এই সমালোচনা প্রকাশিত হয় :

শান্তিনিকেতন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড চারি আনা মাত্র। রবীন্দ্রবাবুর দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বাঙলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। সহজ ভাষায় লিখিত প্রাচ্য আদর্শাদির সুমধুরআলোচনা যথার্থই শান্তির সঞ্চার করে। দ্র পৃ ১৭৭।

গান॥ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ১৯০৯ পৃ ৪+৪১২+১৪ এলাহাবাদ 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে' শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

'গানের ভূমিকা…'॥ রবীন্দ্রনাথ 'গানের ভূমিকার ত কোনো প্রয়োজন দেখি না' লিখলেও 'গানে'র এই ইণ্ডিয়ান প্রেস -সংস্করণে 'প্রকাশকের নিবেদন' রূপে এই ভূমিকা ছাপা হয়েছিল :

প্রকাশকের নিবেদন

বর্ত্তমান গ্রন্থে কবির কিশোরকালের সকল শ্রেষ্ঠ গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যত গান রচনা হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তাঁহার অসংখ্য বিক্ষিপ্ত রচনা অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা গিয়াছে।

সঙ্গীত সুরের অপেক্ষা রাখে। সুরহীন কথা অসম্পূর্ণ। যে সকল পাঠক এই সকল গানের সুরের সহিত পরিচিত, তাঁহারা ত আনন্দ পাইবেনই, আর যাঁহারা পরিচিত নহেন, তাঁহারাও বঞ্চিত থাকিবেন না; কারণ কবির গান প্রায়ই ছন্দময় ও কবিত্বরসপূর্ণ। অনেক গানে এখনো সুর বসানো হয় নাই, সঙ্গীতজ্ঞ পাঠক সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

পাঠকের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান সংস্করণে গানগুলিকে ভাব বা বিষয়ের সঙ্গে সমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুঞ্জিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যথা—প্রকৃতি-সঙ্গীত, ঋতু-সঙ্গীত, ভাবপ্রধান-সঙ্গীত ইত্যাদি। বিভাগ সম্পূর্ণ করিবার জন্য বাল্মীকি প্রতিভা ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও জাতীয়-সঙ্গীতকেও ভাব অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিতে গিয়া বহু ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত

ত্রুটি অনিবার্য্য হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিয়া এই সম্পূর্ণ সঙ্গীত পুস্তকের সমাদর করিবেন আশা করি। এই পুস্তকে সাতশত সাতাশটি গান আছে।

‘গান’ প্রকাশিত হবার অব্যবহিত সময়ে প্রবাসীতে মুদ্রারাক্ষস নামে চারুচন্দ্র নিজেই বইয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখেন, আলোচনাটি এখানে উদ্ধৃত করি :

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে কবিবরের কৈশোরকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যত গান রচিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই আছে। ইহাতে ৭২৭টি গান সংগৃহীত হইয়াছে। এমন সম্পূর্ণ সংগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা অপেক্ষা গানের দ্বারা সাধারণের নিকট অধিক পরিচিত। তাঁহার গান ধর্ম্মসভায়, জাতীয় উৎসবে, পরিবারে, মজলিসে, হাটে, মাঠে সর্ব্বত্র সমান আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেই সকল গানের মনোজ্ঞ সংগ্রহপুস্তক আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। ছাপা পরিষ্কার ; এণ্টিক কাগজে ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৪০৫ পৃষ্ঠা। সুন্দর মনোরঞ্জক বাহ্যদৃশ্য। মূল্য দুই টাকা। উপহার দিবার উপযুক্ত। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো সংস্করণ এমন সম্পূর্ণ ও সুন্দর হয় নাই। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৬ পৃ ৫২৩।

‘গানে’র কথাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘ইহা পুরাতন সামগ্রী’। আগের আগের সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের গানের সংগ্রহ যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কালানুক্রমে তার বিবরণ এইরকম

১ রবিচ্ছায়া। যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র প্রকাশিত। বৈশাখ ১২৯২ পৃ ২+১৪+১৭১ গান সংখ্যা ২০১।

২ গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা। বৈশাখ ১৩০০ পৃ ২+২৬ +৪০৭ গান সংখ্যা ৩৫২।

৩ কাব্য গ্রন্থাবলী। আশ্বিন ১৩০৩ পৃ ৪৭৬ গান অংশ পৃ ৪২৯-৪৭০, গান সংখ্যা ২৮০।

৪ কাব্যগ্রন্থ ৮ম ভাগ। গান খণ্ড। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত ১৩১০ পৃ ৬+২৫+৩৩৮।

৫ গান। যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রকাশিত। আশ্বিন ১৩১৫ পৃ ১৬+৪০০।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের 'গান' রবীন্দ্রনাথের গানের ষষ্ঠ সংস্করণ।

'নতুন গান…' ॥ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ইহাতে অনেকগুলি নূতন গান দেওয়া হইয়াছে।' ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ - ১২ পৌষ ১৩১৬র মধ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের পনেরোটি নতুন লেখা গান ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ বইয়ে 'নূতন গান' বিভাগে পৃ ৪০৭-৪১২ এই ছয় পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়।

'সখি প্রতিদিন এসে ফিরে যায় কে!' ॥ ৫+৫ মোট ১০ ছত্রের গান, রচনা ১০ আশ্বিন ১৩০৪। 'বীণাবাদিনী', বৈশাখ ১৩০৫ পৃ ২৭১-২৮১: মিশ্র ছায়ানট, একতালা এই রাগতাল অনুযায়ী স্বরলিপি সহ মুদ্রিত। 'কল্পনা' (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যে 'সকরুণা' নামে সংকলিত, রাগনির্দেশ: আলেয়া। 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (প্রকাশ আশ্বিন ১৩০৩) স্বভাবতই গানটি নেই। কাব্যগ্রন্থ ৮ম ভাগ (১৩১০) পৃ ১৮, রাগনির্দেশ: আলেয়া। যোগীন সরকারের প্রকাশিত 'গান' (১৩১৫) পৃ ১৬, রাগনির্দেশ: আলেয়া।

কাব্য গ্রন্থাবলী ॥ রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংগ্রহ পুস্তক। শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক। কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৫ই আশ্বিন ১৩০৩ পৃ ৪+৮+৪৭৬।

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হইল। এজন্য আমার স্নেহভাজন প্রকাশকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।'

যোগীন সরকারের গান ॥ 'গানে'র কপি হাতে পেয়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে বোলপুর থেকে ২রা অগ্রহায়ণ ১৩১৫ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'আপনি পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বইখানি যে এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়াছেন সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।'

রথী ॥ প্রায় সাড়ে তিন বছর পর রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরছেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে।

কবীর ॥ ক্ষিতিমোহন সেন -প্রণীত 'কবীর' ১ম খণ্ড এই চিঠির বৎসরাধিককাল পরে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড ভূমিকা ১ আশ্বিন ১৩১৭ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭ এ বিজ্ঞাপিত:

> কবীর (প্রথম খণ্ড)—শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্যায়ের অন্তর্গত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ডবল ক্রাউন ২৪ ভাঁজের ১৩২+১৬ পৃষ্ঠা মূল্য।৵০

ওই মাসেই 'ভারতী'তে সমালোচনা-সূত্রে লেখা হয়: 'ক্ষিতিবাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া বহু নূতন দোঁহা সংগ্রহ করিয়াছেন,—অনুবাদগুলির ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল…'। ভারতী, কার্তিক ১৩১৭ পৃ ৬১৭।

'কবীর' চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডেরই আখ্যা পত্রে 'শান্তিনিকেতন / কবীর/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর…' এই ক্রমে পরিচয় মুদ্রিত আছে। মূল্য যথাক্রমে ছয় আনা, ছয় আনা, ছয় আনা ও চার আনা। প্রথম তিন খণ্ডে সতীশচন্দ্র মিত্র, চতুর্থ খণ্ডে পাঁচকড়ি মিত্রের নাম প্রকাশক রূপে আছে। চারটি খণ্ডই কান্তিক প্রেসে হরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত। প্রথম খণ্ড 'অগ্রজ ও গুরু পরলোকগত অবনীমোহন সেন মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতিতে', দ্বিতীয় খণ্ড 'পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে' (তারিখ ১২. ১১. ১৭.) এবং তৃতীয় খণ্ড 'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে' উৎসর্গিত হয়। তৃতীয় খণ্ডের উৎসর্গের তারিখ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

পত্র ৭। 'ঋদ্ধি'॥ ঋদ্ধি (বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি)। 'চরিত্র-গঠন'-প্রণেতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেস। ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত। পৃ ২+৫+২৬০+('চরিত্র-গঠন' সম্বন্ধে অভিমত) ৪। মূল্য ১।০। ভূমিকা এলাহাবাদ, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১৫।

ভূমিকায় লেখা হয়েছে, 'যাহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি জাতীয় সম্পদ ও দেশীয় ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় "ঋদ্ধি"তে তাহারই উপায় ও সঙ্কেত দৃষ্ট হইবে।' '"চরিত্র-গঠন" সম্বন্ধে নানা অভিমতে'র অনুরূপ 'ঋদ্ধি'র জন্যও প্রকাশক যশস্বী ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬য় 'ঋদ্ধি'র এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :

ঋদ্ধি

চরিত্রগঠন-প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। গার্হস্থ্যশাস্ত্র (Domestic Economy) সম্বন্ধে একমাত্র পুস্তক। ঘরে ঘরে ইহা পঠিত হইলে দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচিবে। দরিদ্র বাঙালী সঞ্চয় শিখিবে। জীবনযাত্রা সরল হইবে। ছাপা কাগজ উত্তম; বাঁধাই বিলাতীর মত সুদৃশ্য। মূল্য ১।০ মাত্র। সর্ব্বত্র সবিশেষ প্রশংসিত। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অভিমত দেখুন—

অতঃপর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং প্রবাসী, ভারতী ও হিতবাদী পত্রিকার অভিমত বিজ্ঞাপনে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া হয়।

প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় 'ঋদ্ধি' বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছিল (দ্র. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৬, পৃ ৫২৩-৫২৪ ও

ভারতী, কার্তিক ১৩১৬, পৃ ৪০৪-৪০৫)। প্রবাসীর আলোচনাটি করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ভারতী মন্তব্য করেছিলেন, 'এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল।…"ঋদ্ধি"র কয়েকটি মোটামুটি কথা কার্ডবোর্ডে লিখিয়া বসিবার ঘরে প্রত্যেকের ঝুলাইয়া রাখা উচিত।'

অজিত ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী।

'তোমাদের বইগুলি…' ॥ এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রকাশক চিন্তামণি ঘোষের পক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে ১৪ই জুলাই ১৯০৮ এর দুটি এবং ২১শে জুন ১৯০৯এর একটি— মোট তিনটি এগ্রিমেণ্ট মোতাবেক লেখক একটি চুক্তিতে তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহের, এই দিনের অপর চুক্তি দ্বারা তাঁর ষোলো খণ্ড গদ্যগ্রন্থাবলী, ছোটোগল্পগুলি এবং 'গোরা' সহ অন্যান্য উপন্যাসের শর্তসাপেক্ষ প্রকাশ ও বিক্রয়ের অধিকার দান করেন। ২১ জুনের অপর এগ্রিমেণ্টে লেখক প্রকাশককে তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'প্রহসন', 'রাজা প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'শিক্ষা', 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম্ম', সম্পূর্ণ 'গল্পগুচ্ছ', 'রাজর্ষি', 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'শারদোৎসব', 'মুকুট' ও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থসমূহের এবং পরবর্তী কালের রচনাসমূহের শর্তানুযায়ী প্রকাশ-বিক্রয়ের অনুমতি দেন। তিনটি চুক্তির ক্ষেত্রেই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশকের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

তিনটি চুক্তিই ১লা এপ্রিল ১৯১৪র নতুন এগ্রিমেণ্ট দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। নতুন চুক্তিতে ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ এবং ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা রবীন্দ্রনাথের সাকুল্যে সাতাশিখানি

বইয়ের প্রকাশ-বিক্রয়ের কর্তৃত্ব লাভ করেন।

সত্যেন্দ্র ॥ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শৈলেশ ॥ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। মজুমদার লাইব্রেরির পুস্তক প্রকাশক।

মণিলাল ॥ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন ॥ ভারতী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩১৬ সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ ছাড়া আরো তিনখানি বইয়ের সম্বন্ধে :

রাজা ও রাণী। রাজর্ষি। নৈবেদ্য

রবিবাবুর এই গ্রন্থগুলি বহুদিন বাজারে ছিল না। সুন্দরভাবে নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

—এই সংবাদ ছিল। অপিচ, ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬ সংখ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপনে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদ্য-প্রকাশিত বইসমূহের এই বিস্তৃত সম্প্রচার প্রকাশিত হয় :

গোরা

আগাগোড়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের শেষ কি তাহা জানিবার জন্য আর কাহাকেও অধৈর্য্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে না। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

চয়নিকা

কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসমুদ্র হইতে রত্নরাজি বাছিয়া বঙ্গবাণীর অপরূপ কণ্ঠমালা রচিত হইয়াছে। কবিবরের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ পাঠে যাঁহাদের সময় বা সুবিধা নাই তাঁহাদের পক্ষে এই চয়নিকা (selection) বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিই স্থান পাইয়াছে। ইহাতে আটখানি মৌলিক বহুবর্ণে

মুদ্রিত পরিকল্পনা চিত্র ও কবিবরের একখানি আধুনিক চিত্র আছে।[1] আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই রাজ সংস্করণের মূল্য চারি টাকা, সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা।

গান

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গান'এর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশি গান আছে—এবং এখনকার রচিত গানগুলিও দেওয়া হইয়াছে। এমন সমগ্র সম্পূর্ণ সংগ্রহ আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা বাঁধাই মনোরম। উপহার দিবার যোগ্য। মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যগ্রন্থাবলী

বিচিত্র প্রবন্ধ ১।০
লোকসাহিত্য ।৵০
হাস্যকৌতুক ।৵০
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ৸০
সমাজ ৸০

সাহিত্য ॥৵০
আধুনিক সাহিত্য ॥৵০
ব্যঙ্গকৌতুক ।৵০
রাজা প্রজা ১৲
শিক্ষা ॥০

প্রাচীন সাহিত্য ॥০
প্রহসন ॥৵০
সমূহ ॥০
স্বদেশ ॥০
শব্দতত্ত্ব ॥০

ধর্ম্ম ৸০

গল্পগুচ্ছ (নূতন সংস্করণ)

পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম খণ্ডে অনেক আধুনিক নূতন গল্প আছে। এমন বিচিত্র সুন্দর ছোট ছোট গল্প জগতের কোনো ভাষায় নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲

রাজর্ষি

প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নূতন সংস্করণ। বালক ও ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী নির্দ্দোষ সুন্দর করুণ উপন্যাস। মূল্য ৸০

---

[1] 'চয়নিকা'য় (১৩১৬) সাতখানি রঙিন চিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়।

শান্তিনিকেতন

সরল সহজ ঘরের কথায় ধর্ম্ম আলোচনা। পড়িলে উপাসনার কাজ হয়—অন্তর পবিত্র পুলকিত হয়। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। দশম খণ্ড অবধি বাহির হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০

ভক্তবাণী

জগতের সকল ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়ক চিন্তা ও উক্তির মনোজ্ঞ সংগ্রহ পুস্তক। প্রতি খণ্ডের মূল্য চার আনা। দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শিশু ৸০ কথা ও কাহিনী ৸০

মুকুট (নাটিকা) ।০

বিদ্যাসাগরচরিত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। মহাপুরুষের জীবনীর চমৎকার আলোচনা। বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য। মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নাটকাবলী

বিসর্জ্জন

রাজর্ষি উপন্যাসের আখ্যান নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত। ইহা কবিবরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মূল্য ॥০

রাজা ও রাণী

সর্ব্বজনসমাদৃত করুণ নাটক। গানে হাস্যে কবিত্বে করুণরসে বিচিত্র। নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য বারো আনা।

শারদোৎসব

অতি সুন্দর সরস নাটিকা শরৎ ঋতুর আগমনে মানবের প্রাণে যে অকারণ পুলক সঞ্চার হয়, সেই সরস মধুর ভাবটিকেই কবির অমৃতমুখী

প্রতিভা আকার দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ইহার একএকটি গান একএকটি রত্ন বিশেষ— ভাবসম্পদে অতুলনীয়, প্রাণ মাতাইয়া দেয়, মন গলাইয়া দেয়, পুলকে হৃদয় ভরিয়া ওঠে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদ্বয়ের পরিকল্পিত দুখানি ছবি আছে।[1] মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

নৈবেদ্য ॥০ খেয়া ১৲

ভগবদ্‌বিষয়ক অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাপুস্তক। ইহারা দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের সহায়, সম্পদের বন্ধু, উৎসবের সহচর হইবার একান্ত উপযুক্ত।

সংকল্প ও স্বদেশ

কবিবরের স্বদেশ সম্পর্কীয় যাবতীয় কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অনেক কবিতা আজকাল মুখে মুখে শোনা যাইতেছে। মূল্য আট আনা।

গীতলিপি

রবিবাবুর যত গান আছে তাহার নির্দ্দোষ স্বরলিপি বাহির হইতেছে, প্রথম খণ্ডে কবিবরের নূতন কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি আছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৶০

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

[1] 'রবি-রশ্মি'র 'শারদোৎসব' অধ্যায়ে চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি যখন কলিকাতার ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম, তখন আমি এই পুস্তক প্রকাশ করি। ইহাকে লোচন-রোচন করিবার জন্য ইহার আকার করি একটু নূতন ধরণের— প্রাচীন পুঁথির আকারের, এবং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া লই।' 'রবি-রশ্মি' —পশ্চিম ভাগে' ৫ম সং পৃ ৮৮।

'চয়নিকা'॥ 'চয়নিকা' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রস্তুত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং-হাউস প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ।

প্রবাসী ও ভারতীর কার্তিক ১৩১৬ সংখ্যাতেই 'চয়নিকা' সমালোচিত হয়, কাজেই 'চয়নিকা' এই চিঠির অল্পদিন মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। দ্র প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৬ পৃ ৫২২ ও ভারতী, কার্তিক ১৩১৬ পৃ ৪০৫ যথাক্রমে মুদ্রারাক্ষস ও সত্যব্রত শর্মা -সমালোচিত। প্রসঙ্গত, মুদ্রারাক্ষস চারুচন্দ্রের ছদ্মনাম।

নূতন গানগুলি॥ ১৬ ভাদ্র ১৩১৬ - ১২ পৌষ ১৩১৬র মধ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের পনেরোটি নতুন গান ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণে সংকলিত হয়। যথাক্রমে

শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে ১৮ ভাদ্র ১৩১৬
আমার মিলন লাগি তুমি আসৃচ কবে থেকে ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার ১৯ আশ্বিন ১৩১৬
দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
এস হে এস, সজল ঘন, বাদল বরিষণে! ১৭ ভাদ্র ১৩১৬
আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন ১৬ ভাদ্র ১৩১৬
আসন-তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব! ১০ পৌষ ১৩১৬
আলোয় আলোকময় কর হে ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬
মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে!
যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই চঞ্চল অন্তর
অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি ১২ পৌষ ১৩১৬
জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি, জয় তোমার করুণা

‘রথী এসেছে…’। এপ্রিল ১৯০৬এ রথীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ্যা শিখতে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফেরার পথে ইয়োরোপে কয়েক মাস কাটিয়ে পূর্ব চিঠির বয়ান অনুযায়ী রথীন্দ্রনাথ ২০ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ কলকাতায় এসে পৌঁছন। দ্র. পত্র ৯-এর টীকা এবং *On the Edges of Time* গ্রন্থে Outward Bound ও Homeward Bound দুই অধ্যায়। ১৯৮১ সং পৃ ৬৫- ৬৭ ও পৃ ৭১-৭৩।

পত্র ৮। ‘চয়নিকা’। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। এলাহাবাদ ‘ইণ্ডিয়ান প্রেসে’ শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ১৯০৯ পৃ ৪+১০+৪৫৯+৮

মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত ‘কাব্যগ্রন্থে’র অনুরূপে এই ‘চয়নিকা’তেও বিবিধ বিষয়ক্রমে কবিতা বিন্যস্ত হয়েছে। কবিমানস, রসস্বরূপ, রূপক, বিশ্বপ্রকৃতি, মানব, কণিকা, অতীত, কথা, ভূমা ও পরিণাম এই দশ পর্যায়ে ২৫৮টি কবিতা এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য একটি করে নতুন প্রবেশক কবিতা ছিল, ‘চয়নিকা’র জন্যও ‘ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে’ ইত্যাদি বারো ছত্রের একটি মুখপাতের কবিতা ব্যবহৃত হয়, ‘কাব্যগ্রন্থে’র রূপক বিভাগের এটি প্রবেশক কবিতা। মূলত এই সবকয়টি প্রবেশক লেখা, সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি কবিতা নিয়ে পরে ‘উৎসর্গ’ (১৩২১) কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

‘চয়নিকা’ চারুচন্দ্রের প্রকাশিত, চারুচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থও বটে, অনেকবারই তিনি ‘আমার সম্পাদিত চয়নিকা’ বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

১। কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, ‘চয়নিকা’র যে প্রথম সংস্করণটি ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, তার কবিতা সংকলন করেন চারুচন্দ্র।’ দ্র. ‘রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’। রবীন্দ্রভাবনা, বৈশাখ ১৩৮৫ পৃ ৪৮।

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে বইয়ের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভালো বলেছেন, নির্বাচন কেমন বলেন নি, তাতে মনে হয় কবিতা নির্বাচনে তাঁরও হয়তো হাত ছিল, অন্তত তার পূর্ণ দায়িত্ব চারুচন্দ্রের ছিল না।

'চয়নিকা'র প্রারম্ভে পাঁচ স্তবকের একটি 'প্রকাশকের নিবেদন' ছাপা হয়েছিল।

'ছবি ভালো হয় নি…' ॥ কথার তাৎপর্য ছবির ছাপা ভালো হয় নি। মূল ছবির সঙ্গে তুলনাক্রমে হয়তো তাঁর মনে হয়েছে।

'চয়নিকা'র জন্য চারুচন্দ্রের লেখা 'প্রকাশকের নিবেদন' অংশটি এখানে সংকলন করে দেওয়া যায় :

প্রকাশকের নিবেদন

দুই শ্রেণীর পাঠকের জন্য কবির কাব্য হইতে চয়ন করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। এক, যাঁহারা কবির রচনা পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে কতকগুলি ভাল নমুনা দেখাইয়া কবির কাব্যের সহিত পরিচয়ের ভূমিকা সাধন করিয়া দেওয়া। আর এক, যাঁহারা কবির রচনা ভালবাসেন তাঁহাদের সর্ব্বদা উপভোগের জন্য এক জায়গায় কতকগুলি ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া।

শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকদের সকলকেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারেন এমন চয়নকর্ত্তা কোথাও মিলিবে না। আমরাও এ অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইব এমন আশা করি না। আমরা এমন অনেক কবিতাকে এ গ্রন্থে নিশ্চয় স্থান দিয়াছি যাহা কবির কোনো না কোনো ভক্তের নিকট মাঝারি বা তাহার চেয়ে নীচের দরের জিনিষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে— এবং এমন অনেক কবিতা ছাড়িয়াছি যাহা তাঁহাদের কাছে বিশেষ আদরের। ইহাতে এই প্রমাণ হয় কবি বিচিত্র লোককে বিচিত্র ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন— তিনি অনেকের কাছে অনেক রকমে পরিচিত। সে হিসাবে প্রত্যেক পাঠক নিজেই নিজের বিশেষ

ব্যবহারের জন্য চয়ন করিয়া না লইলে তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই।

তাই বলিয়া প্রত্যেক পাঠকের রুচির মধ্যে একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইবে এমন আশঙ্কাও করি না। বিশেষত কোনো বিশেষ কবি যে-পাঠকশ্রেণীর নিকট বিশেষভাবে প্রিয়, নিঃসন্দেহেই তাঁহাদের মধ্যে রস-গ্রহণ-শক্তির একটা গভীরতর ঐক্য আছে। অতএব আমরা যে-কবির কাব্যের অনুরাগী তাঁহার কাব্য হইতে যখন চয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন অন্য অনুরক্তগণের সহিত যে আমাদের বিশেষ বিরোধ ঘটিবে এমন শঙ্কা করিবার হেতু নাই। চয়নের ভার সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে পড়িয়াছে বলিয়া যে আমরা নিজেদের কেনো পীড়া দিই নাই এমন কথা পাঠকেরা মনে করিবেন না। অনেক কবিতা ছাড়িয়াছি যাহার দুঃখ এখনো মন হইতে যায় নাই, যে জন্য এখনো মনে দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে।— ইহার মধ্যে এমন অনেক কবিতা দিয়াছি যাহা এই কবির কাব্যের বিশেষ বৈচিত্র্যের পরিচয় দিবার জন্যই উদ্ধৃত হইয়াছে।

সংগৃহীত কবিতাগুলিকে আমরা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি। চয়নকর্ত্তার কাজের সুবিধা লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে এই শ্রেণীবিভাগ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে পাঠকদের কোন সুবিধা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কবিতা জিনিষকে শ্রেণীতে ভাগ করা সহজ নহে। এই শ্রেণীভাগ সম্বন্ধে পাঠকদের সকলের সঙ্গে যে আমাদের মতে মিলিবে তাহাও আশা করি না— মতে মিলিবার প্রয়োজনও নাই। এই ভাগ যখন কবির কৃত ভাগ নহে, তখন পাঠকগণ যদি পছন্দ না করেন তবে ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

পরিশেষে প্যাল্‌গ্রেভ তাঁহার 'স্বর্ণগীতিভাণ্ডার' প্রকাশের সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন সেই মহাজনবাক্য অনুসরণ করিয়া আমিও এই

বলিয়া উপসংহার করি যে,—এ চয়নের মধ্যে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুলত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে।[১] সেজন্য নিন্দাভাজন হইতে হইবে,—উপায় নাই। তবে পাঠকসমাজের নিকট হইতে এইটুকু ভরসা রাখি যে "গোলাপ ফুলকে ভালবাসিলে পদ্মফুলকে অবজ্ঞা করিবার তাঁহাদের কোন কারণ নাই।" চয়নিকায় যদি গোলাপ ফুল বাদ গিয়া থাকে, অন্য কোন ফুল দিয়াই তো সাজি ভরিয়াছি, কবিভক্তেরা অন্ততঃ এ কথার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই দিবেন।

'এই ছবিগুলোর জন্যই… নন্দলালের পটে যে-রকম দেখেছিলুম…'। নন্দলালের পটে॥ নন্দলাল বলেছেন, বাঁকুড়ার এক সাধুকে তাঁর ইষ্টদেবী তারামূর্তির ছবি করে দিয়েছিলেন তিনি, সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথের সাজশে সে ছবি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর লালবাড়ীতে গিয়ে দেখা করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'চয়নিকা'র ছবির জন্য বরাত করেন। দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল: 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' ১৯৮২ পৃ ৩৩৫-৩৩৬, ৩৭৬-৩৭৯।

আগেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে 'শিবতাণ্ডব' ও 'নকল বুঁদি'র ছবি তিনি এঁকেছিলেন। নতুন করে আঁকলেন আরো পাঁচখানি।

'এই ছবিগুলো'॥ 'চয়নিকা'র মোট সাতখানি নন্দলালের আঁকা ছবি, কবিতা-ছত্র উদ্‌ধৃত করে ছবির নাম দেওয়া, যথাক্রমে: ১ 'ভূমিকা'র 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে', ২ 'যাত্রা'

---

[১] পল্‌গ্রেভ অবশ্য ইচ্ছা বা অনিচ্ছাজনিত কোনো ত্রুটির প্রসঙ্গ করেন নি—কবিতা নির্বাচনে তাঁর সুবিহিত নীতি ছিল এবং কবিতা সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত। "স্বর্ণগীতিভাণ্ডারে"র স্বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, "Poetry gives treasures "more golden than gold", leading us in healthier ways than those of the world..."।

কবিতার 'কেবল রব মুখের পানে চাহিয়া', ৩ 'হৃদয়-যমুনা'র 'যদি মরণ লভিতে চাও। এস তবে ঝাঁপ দাও…', ৪ 'পরশ পাথরে'র 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর', ৫ 'বৈশাখ' কবিতার 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' ('শিবতাণ্ডব' নামে খ্যাত ছবি), ৬ 'নকল গড়' কবিতার '…একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়' এবং 'শেষ খেয়া'র 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিন-শেষের শেষ খেয়ায়'। ৫ এবং ৬ সংখ্যক ছবি রঙিন, অপরগুলি একরঙা।

নন্দলালের ১৯০৯এর জলরঙে আঁকা পোস্টকার্ড সাইজের 'দীক্ষা' ছবি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন 'গীতাঞ্জলি'র একটি গান (৫০ সংখ্যক: 'নিভৃত প্রাণের দেবতা/যেখানে জাগেন একা')। রচনা ১৭ পৌষ ১৩১৬।

'দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্চি… এখনি এক বক্তৃতা অভিযানে…' ॥

দেদার বক্তৃতা বা ২৮ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতার এই মাত্র সংবাদপত্র বিবরণ লক্ষ্য করা গেছে—

১৮ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনা বিষয়ে বক্তৃতাসভায় বাবু সারদাচরণ মিত্র ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীঘাপতিয়ার কুমার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। পত্রিকা বিবরণ এইরকম: The student members of the Parishad passed a most enjoyable evening on Sunday, the 26th September last, when Babu Rabindra Nath Tagore entertained them with an instructive lecture in which he explained in his usual eloquent and felicitous manner the aims and objects of the students' section for the foundation of which he was primarily responsible.— অমৃতবাজার পত্রিকা ৪ অক্টোবর ১৯০৯।

সিটি কলেজ হলে রামমোহন রায় ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় বক্তৃতা। এই সভা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের বিবরণ:
There was a large and representative gathering... as the crowd in the upper storey was enormous, an overflow meeting was held downstairs. Mr. Rabindra Nath Tagore presided over the main meeting, while Dr. Prankrishna Acharya presided over the other... Pandit Sakharam Ganesh Deuskar made a stirring appeal for funds to preserve and protect the house in Radhanagar where the late Raja was born. Speeches were also delivered by Mr. B. C. Ghose and Babus Peary Mohan Chowdhury and Dhirendra Nath Chowdhury dealing with the qualities of head and heart of the late Raja. Mr. Rabindranath Tagore then delivered a long speech in Bengali.— অমৃতবাজার পত্রিকা ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৯।

পত্র ৯। 'আবার সেই পদ্মাতটে...' ইত্যাদি ॥ পত্র ৭এর সাক্ষ্য অনুযায়ী রথীন্দ্রনাথ আমেরিকার পাঠ সমাপ্ত করে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ কলকাতায় ফেরেন, চিঠিতে পাওয়া যায়, 'রথী এসেছে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি।' রথীন্দ্রনাথকে ১০ই অক্টোবর ১৯০৯ পদ্মাতটে শিলাইদহে যান রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৯ অক্টোবর লেখেন, 'অজিত, আমি আগামীকাল প্রত্যুষেই রথীকে নিয়ে

শিলাইদহে যাচ্ছি। বিশেষ কাজ আছে।'[১] রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> আমি তখন আমেরিকা থেকে ইয়োরোপ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন। আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই আন্দোলনে তিনি কী উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি আশা করেছিলেন বাঙালির মনে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছে সেটা দেশসেবার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।···
>
> ভিত গাঁথার কাজ তাঁর সাধ্যমতো তিনি সূত্রপাত করেছিলেন নিজেদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে।··· তিনি সংকল্প করলেন গ্রামোন্নতির কাজ যতটা পারেন তাঁর আদর্শমতো তিনি নিজেই জমিদারির মধ্যে প্রচলন করবেন।
>
> কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখাবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা তিন জনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারব তাঁর আশা ছিল। আমি সব-আগে ফিরে এলুম। আসবামাত্রই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য।[২]

পদ্মাতটে এবারকার প্রসন্ন শারদ মুহূর্তের এক কারণ সংকল্পসিদ্ধির

---

[১] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিঠি।

[২] 'পল্লীর উন্নতি' পুলিনবিহারী সেন স. 'রবীন্দ্রায়ণ' ২য় খণ্ডে. অতঃপর 'পিতৃস্মৃতি' সংযোজন ভাগে সংকলিত। দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' পৃ ২০৭-২৫১।

সূচনা। আরেক কারণ অনেক শোকতাপের পরে প্রবাসী পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলন। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে এই অংশ বিস্তারিত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> Towards the end of 1909 I returned home. The house at Shelidah was being got ready for me—I was to look after the estates. I could at the same time have a farm of my own and carry on agricultural experiments as I pleased. The prospect could not be better for a young man with plenty of energy. Hardly had I got home than Father took me out on a tour round the estates to make me acquainted with the people and teach me the details of management. It was a novel experience for me to travel with Father—just the two of us—in a house-boat. Successive bereavements and particularly the loss of Sami had left him very lonely and he naturally tried to pour all his affection on me as soon as he returned home. As we drifted along through the network of rivers so familiar to both of us, every evening we sat out on the deck and talked on all sorts of subjects. I had never talked so freely with Father before this...[১]

শারদ মুখশ্রী ॥ এই সময়ে লেখা 'গীতাঞ্জলি'র তিনটি গানে এই প্রসন্ন সুন্দর শারদ মুখশ্রীর প্রতিফলন ঘটেছে।

---

[১] *On the Edges of Time* 1981 pp 73-74.

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর ২৫ আশ্বিন ১৩১৬

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি ২৭ আশ্বিন ১৩১৬

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ৩০ আশ্বিন ১৩১৬

প্রসঙ্গত এ যাত্রায় ২৪ আশ্বিন শিলাইদহে এসে ৩০ আশ্বিনে কলকাতায় গেছেন, রথীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে রেখে। দ্র. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৩১ আশ্বিন ১৩১৬ (১৭ অক্টোবর ১৯০৯) তারিখে লেখা চিঠি :

কল্যাণীয়েষু, কাল সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছে শুনলুম তুমি তার আগের দিনই বোলপুরে চলে গেছ।… রথী শিলাইদহে…'।[১]

'ভক্তবাণী'। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬ সংখ্যায় 'ভক্তবাণী'র এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

ভক্তবাণী

জগতের সকল ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়ক চিন্তা ও উক্তির মনোজ্ঞ সংগ্রহ পুস্তক। প্রতি খণ্ডের মূল্য চার আনা। দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতী, চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যার বিজ্ঞাপনে পূর্ব বয়ানের মধ্যে 'তৃতীয় খণ্ড অবধি বাহির হইয়াছে' এই পরিবর্তিত তথ্যটি মাত্র গৃহীত হয়।

'ভক্তবাণী' তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

'শান্তিনিকেতন/ভক্তবাণী'। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। পৃ ২+৮১ মূল্য।৶০

---

[১] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিঠি।

'শান্তিনিকেতন/ভক্তবাণী' (দ্বিতীয় ভাগ)। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ.। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। ১৯০৯ পৃ ২+৮৭ মূল্য ।০

'শান্তিনিকেতন/ভক্তবাণী' (তৃতীয় ভাগ)। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেস ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত পৃ ২+৯২ মূল্য ।০

'শান্তিনিকেতন ভক্তবাণী'তে সংকলয়িতার নাম নেই, প্রথম ও তৃতীয় ভাগে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। 'ভক্তবাণী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের নাম গ্রন্থকর্তারূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। পুলিনবিহারী সেন অনুমান করেছেন, 'প্রিয়ম্বদা দেবী, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি সংকলিত ভক্তবাণী'। প্রিয়ম্বদা দেবী ১৩১৮-১৩১৯এর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায় ধারাবাহিকভাবে 'সাধুবাক্য' সংকলন করেছিলেন, 'ভক্তবাণী' প্রকাশের তা পরবর্তী। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা ২৬ বৈশাখ ১৩১৬র চিঠিতে অবশ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুজ্ঞার ইঙ্গিত আছে। 'ভক্তবাণী' প্রথম ভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মোট ৩৪টি বাণী সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে যথাক্রমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মোট ৩৩টি বাণী সংকলিত হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে যথাক্রমে St Francis de Sales, St Teresa, Thomas a Kempis, Arvillon, St. Anselm, St.

Epharim, Bona, Madame Guyon, St. Augustine, Pinart, Fenelon, Drexeline ও St Chrysostom এই খৃস্টীয় সাধুদের মোট ৪৬টি বাণী বঙ্গানুবাদে সংকলিত হয়েছে, অনুবাদকের নাম নেই।

'উপনিষৎ সংগ্রহ' ॥ (মূল, সংক্ষিপ্ত সরল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ)। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রথম খণ্ড ।০ আনা, দ্বিতীয় খণ্ড ।৵০ আনা।

'সস্তা দামের চয়নিকা' ॥ ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান প্রেসের বিজ্ঞাপনেই 'চয়নিকা'র দুই সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল : 'আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণের মূল্য চারি টাকা ; সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা' এই ভাবে।

১৯১৪য় ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে পুনর্নবীকৃত এগ্রিমেণ্টে ও চয়নিকা Royal edition ও Popular edition এই দুই রকম গ্রন্থের জন্য পৃথক্ চুক্তি দেখা যায়।

বিশ্বভারতী সংস্করণ রূপে ছাপার সময়েও রাজসংস্করণ এবং সাধারণ সংস্করণের এই পার্থক্য মেনে চলা হয়েছে। যেমন ৩য় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৩২এ কাগজের মলাট ২৸০, বাঁধাই ৩।০, মোটা অ্যান্টিক কাগজে ৪॥০ ও বাঁধাই ৫৲ এই চার ধারা বই প্রচলিত হয়। পরবর্তী পুনর্মুদ্রণসমূহে এই চার ধারা বইয়েরই প্রচলন ছিল। কার্তিক ১৩৪১এর পুনর্মুদ্রণে ২৸০ ৩॥০ ও ৪৲ টাকা মূল্যে তিন ধরনের 'চয়নিকা' ছাপা হয়। অতঃপর ফাল্গুন ১৩৪৮এর 'নূতন সংস্করণে' ৩॥০ ও ৪॥০ মূল্যে দুই রকম 'চয়নিকা' প্রচলন করা হয়।

'অবনদের সঙ্গে প্রয়াগে' ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন এলাহাবাদে।

রাখী। ১৯০৫এ বঙ্গবিভাগের বছর থেকেই ১৬ অক্টোবর ৩০ আশ্বিনের দিনটি রাখীবন্ধনের দিন রূপে পালিত হতে থাকে। সীতা দেবী লিখেছেন, '৩০শে আশ্বিন তখন মহা ধুম করিয়া রাখীবন্ধন

হইত··· লাল ও হলদে রেশমী সুতা দিয়া আমরা তখন নিজেরাই বাড়ীতে অতি সুন্দর রাখী তৈয়ারী করিতাম ও পরিচিত সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রাখী বাঁধিয়া বেড়াইতাম।' দূরস্থজনকেও রাখী পাঠানো হত। ১৯০৫এর সেদিনেই এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রাখী পাঠিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন : 'Thus to you from us of Bengal, is sent today this thread of Rakhi-Bandhan, in token not merely of the union of Provinces and parts of Provinces but of bond that knits us all as children of one Motherland together. Bande Mataram.' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পাঠানো সেদিনের রাখী পেয়ে দার্জিলিং থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯ অক্টোবরের ১৯০৫এর চিঠিতে লেখেন, 'আপনার প্রেরিত "রাখী" কলিকাতা আশ্রম হইতে পুনঃ-প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছে। আপনি যে এত ব্যস্ততার মধ্যে এমন দিনে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সাদরে রাখীগাছি ধারণ করিয়াছি।'

পর বছর ৩১ আশ্বিন ১৩১৩য় ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'মনে করে এই দূরস্থিতকে রাখী পাঠিয়েছ এতে কত খুশি হলুম বলতে পারি নে।'

চারুচন্দ্রের এই রাখী পাঠানোর বর্ষে ১৩১৬য় ৪ঠা আশ্বিনের পরের কোনো শনিবার অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আগামী ৩০শে আশ্বিন তোমরা একটা উৎসব করতে চেয়েছ··· যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র করে দেবার মালিক নয় তেমনি আমাদের রাখিবন্ধনের গণ্ডির দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মত জাতিকেই গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব তা চলবে না।··· তোমাদের আশ্রমে তোমদের রাখিবন্ধনের দিনকে খুব

একটা বড়ো দিন করে তোলো…।'[১]

১৩১৬র রাখীবন্ধন দিন উপলক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকায় ৪ ৬ ৯ ১২ ও ১৫ অক্টোবর ১৯০৯ তারিখে বিশদ বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় :

জাতীয় মিলনোৎসব

রাখী-বন্ধন

৩০এ আশ্বিন ১৩১৬ সাল

(১৬ অক্টোবর ১৯০৯)

যে দিনে বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছিল, আবার সেই দিন আসিতেছে। ৩০এ আশ্বিন তারিখে বঙ্গবাসীর দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বাঙ্গালী মৃত্যুর মধ্যে যেদিন অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে সে দিন

১। সমগ্র বঙ্গবাসী কাহারও রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিবে না।

২। সকলে দুগ্ধ বা ফলাহার করিয়া অথবা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং যিনি রাজার উপরে রাজা, পতিত জাতির উদ্ধারকর্ত্তা, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

৩। বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলে একত্র হইয়া নিম্নলিখিত মহাব্রত গ্রহণ করিবেন।

(ক) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন। (খ) স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার। (গ) স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে আপন আপন শক্তি ও অর্থ নিয়োগ।

৪। সে দিন সমস্ত বঙ্গবাসী স্নানান্তে পরস্পরের হস্তে "রাখী-

---

[১] দ্র 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৭৫। নিবেদিতার ১৬. ১০. ১৯০৫এর পত্র : *Letters of Sister Nevedita*, ed S. P. Basu 1982 pp 1274-1275. শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্র, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৩ পৃ ৬৯। সুচারু দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭১ পৃ ২০। অজিতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ পৃ ৩০০-৩০২।

বন্ধন" করিবেন এবং চিরদিন, সুখে-দুঃখে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গবাসী সমুদয় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পরস্পরের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন।

৫। এতৎ সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে শিশু, রোগী এবং যে কোন লোক বা সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুসারে উক্ত তারিখে পকান্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য তাহাদের জন্য অরন্ধন বাধ্যকর নহে।

এই বিজ্ঞপ্তি শ্রীআনন্দচন্দ্র রায় শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ শ্রীআবদুল রসুল শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার শ্রীমতিলাল ঘোষ শ্রীযাত্রামোহন সেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত। ৪ঠা অক্টোবর মৌলবী দীদার বক্সের নেতৃত্বে বীডন স্কোয়ারে স্বদেশী সভা হয়। ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার পত্রিকার পৃ ৪ চতুর্থ কলমে ফেডারেশন হল নির্মাণের সাহায্যকল্পে এই আবেদন প্রচারিত হয়। ফেডারেশন হল Hall of United Bengal.

An Appeal

On the 16th October 1905, the Province of Bengal, from time immemorial the home of the Bengali-Speaking people was sundered in twain by an executive order issued by the Government of India. On that day, ever to be remembered in our history, we solemnly vowed, before God and man, amid the unbounded enthusiasm of thousands and tens of thousands of our countrymen, to do all that lies in our power to avert the consequences of the Partition of Bengal. We resolved to build a Hall as the visible symbol of the indissoluble union between the old and severed Province which no administrative order can set aside.…

এই হল ফেডারেশন হল, Hall of the United Bengal. আনন্দমোহন বসু হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ৪১ জন আবেদনকারীর প্রথম নাম তারকনাথ পালিত, তৃতীয় নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং শেষ নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ অক্টোবর তারিখে এক পত্রলেখক ফেডারেশন হল নির্মাণ আহ্বায়কদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ সি. আর. দাশ এ রসুল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নাম নেই বলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বরোদায় নিমন্ত্রণ ॥ এই চিঠির মাত্র দুদিন আগে বরোদায় যাওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন। দ্র. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি ৩১ আশ্বিন ১৩১৬ :

আমি বরদায় যাব কি না ভাবচি। দীর্ঘ পথ—পথের অনিয়মে পাছে শরীর বিকল হয় তাই ভাবচি। যদি বরদায় না যাওয়া ঘটে তা হলে হয়ত বোলপুরেই অবকাশ যাপন করব…’।

দ্র. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৮ পৃ ১৩।

বরোদায় ১৩১৬ শারদীয় পূজার সময় অনুষ্ঠিতব্য মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের, এ বাবদে সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা বরোদার মুখ্যমন্ত্রী রূপে সদ্য-নিযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যক্তিগতভাবেও তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। অসুস্থতাবশত তাঁর যাওয়া হয় নি, তাঁর পরিবর্তে বরোদায় পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।[১]

---

[১] বরোদা সাহিত্য সম্মিলন বরোদায় সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের উপক্রমণিকা। এই সূত্রে এই কয়টি তথ্য এখানে সংকলন করে দেওয়া যেতে পারে।

রমেশচন্দ্র দত্ত বরোদা রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর পদে অগস্ট ১৯০৪ - জুলাই ১৯০৭

ঝড় ॥ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাসের সংবাদ কাগজে দেখা যায়। অজয়ের প্লাবনের সংবাদ বেরোয় ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৯এর কাগজে। ২০ সেপ্টেম্বর বেরোয় রবিবার অপরাহ্নে 'Calcutta experienced a thunderstorm of excep-

---

পরিসরে নিযুক্ত থাকার পর রয়্যাল কমিশন অন ডিসেন্ট্রালাইজেশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্যরূপে মনোনীত হন। কমিশনের কর্ম-পরিসরের শেষে মার্চ ১৯০৯এর শেষ দিকে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর শ্রীকারসাম্পজির অবসর গ্রহণের পর ১ জুন ১৯০৯ বরোদার মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়ে দ্বিতীয়বার বরোদায় গমন করেন। ৩০ নভেম্বর ১৯০৯এ বরোদায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

দ্র. J. N. Gupta : *Life and Works of Romesh Chunder Dutt C. I. E.*, London : J. M. Dent & Sons Ltd. 1911 pp 309-416, 445-455, 479-485.

রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্মমুহূর্ত থেকে তার নেতৃস্থানীয় ছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি। কর্মব্যপদেশে অন্যত্র থাকা কালেও পরিষদের বহু কল্যাণ তিনি সাধন করেছেন। ডিসেন্ট্রালাইজেশন কমিশনের কর্ম-পরিশেষে কলকাতায় এলে কয়েকদিনের মধ্যেই পরিষদ ২ বৈশাখ ১৩১৬ তারিখে তাঁর সংবর্ধনার জন্য সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বরোদায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দৃষ্টান্তে সেখানে তিনি মহারাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের যত্ন করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিত হয়েছে :

> বরোদায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর বিগত শারদীয়া পূজার সময় বরোদা নগরে মহারাজ গাইকোয়াড়ের প্রবর্তনায় যে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য তিনি স্বহস্তে বিশেষ নিমন্ত্রণ দ্বারা পরিষৎকে আহ্বান করেন এবং বরোদাধিপতির কৃপাকটাক্ষ দ্বারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন, এই আশা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে যে সবিশেষ সম্মান লাভ করেন, তাহাতে পরিষৎ সভাস্থলে সমবেত দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বিশেষ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুখ্যতঃ রমেশচন্দ্রের যত্নে ও উৎসাহেই সেই সম্মিলন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য

tional severity'— সেই সংবাদ। ২১ সেপ্টেম্বর বেরোয় The Deluge in Calcuttaর বিবরণ যাতে 'the whole town

---

পরিষদের অনুকরণে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনার সূচনা হইয়াছে, ইহাও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

পরিষৎ-পত্রিকায় মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়:

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলন

মহারাজ গাইকোয়াড়ের উৎসাহে বরোদা নগরে যে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলন পূজার সময় ঘটিয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের প্রধান পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। পরিষদের মান্য সভ্যগণ ব্যতীত পরিষৎও বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। দুঃখের বিষয় পূজার কয়দিন ধরিয়া সম্মিলন ঘটায় পরিষদের পক্ষ হইতে অধিক প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভবপর হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রতিনিধিরূপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে সহসা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময়ে পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য ও পূর্ব্বতন সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া পরিষদের লজ্জা মোচন করেন। তিনি এই সময়ে রাজপুতগণের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজপুতানা ভ্রমণ করিতেছিলেন। জয়পুরে থাকিতে পরিষৎ-সম্পাদকের টেলিগ্রাফ মাত্র পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বরোদা যাইতে সম্মত হন; পরিষৎ যেরূপ বিশেষ সম্মানসহ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুগ্রহ না করিলে পরিষৎকে বিশেষ লজ্জার ভাগী হইতে হইত। সম্মিলনে তখন অতি অল্প সময় বর্ত্তমান ছিল; সেই সময়ের মধ্যে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিষদের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় উচ্চপদস্থ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি পরিষদের পক্ষে উপস্থিত হওয়ায় পরিষৎও সম্মিলনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও গৌরব পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পরিশিষ্টে প্রকাশিত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে।

পশ্চিম ভারতে পূর্ব্ব হইতেই গুজরাটী সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত আছে; ঐ পরিষদের সহিত আমাদের পত্র ব্যবহার ও আদানপ্রদান আরম্ভ হইয়াছে।

was flooded'। ২০ অক্টোবর ১৯০৯এর অমৃতবাজার পত্রিকায় সমগ্র পূর্ব বঙ্গ দিয়ে বয়ে যাওয়া The Destroyer Cycloneএর

বরোদার সম্মিলন উপলক্ষে মাহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষদেরও সূচনা হইয়াছে। বঙ্গীয়-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রমেশবাবুই এই মহারাষ্ট্র পরিষদেরও স্থাপনাকার্য্যে লিপ্ত থাকায় আমাদের বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুসরণ করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইতেছে, ইহাও আমাদের শ্লাঘার বিষয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামে পত্র :

Baroda
1st. November 1909

My dear Mahamahopadhyaya,

The Executive Committee of the Maharashtra Literary Conference deem themselves to be under a deep obligation to you for having kindly taken the trouble to attend the Conference. The co-operation and sympathy of men living in distant parts of India, with the cause of the conference are greatly appreciated and the success of the conference was chiefly due to them. You will kindly accept our sincere thanks for the same. Your utterances at the conference were peculiarly valued as proceeding from one who had bestowed great thought and study on the subjects dealt with.

You will kindly communicate our thanks to the Bangya Sahitya Parishad of Bengal for their having deputed to the Conference as their deligate a man so eminently qualified as yourself.

I beg to remain
Yours sincerely
Sampatrao Gaekwad
Chairman of the Reception Committee.
(Maharashtra Literary Conference, Baroda.)

এই সাহিত্য-সম্মিলনের অল্পদিন পরেই রমেশচন্দ্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

দ্র 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩১৬ পৃ ১০৩-১০৪, পৃ ১২৪, পৃ ১৮৩।

ব্যাপক বিবরণ। দ্র. *Amrita Bazar Patrika* ১৩-২০ অক্টোবর ১৯০৯।

'শিশু'। 'শিশু' মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র সপ্তম ভাগরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২] . আখ্যাপত্র : শিশু। কাব্যগ্রন্থ সপ্তম ভাগ।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেনকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :

ওঁ

বোলপুর।

প্রিয়বরেষু,

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি বলিয়া ত গর্ব্ব করিতে পারি না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং তিনি আমাকে কিছু স্নেহও করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বরোদায় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষ্যে তিনি আমাকে দুই তিন খানি পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত আছে। তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে— বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি— এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল— তাঁহার কর্ম্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অরুগ্ন নির্ম্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ইতি ১৬ই পৌষ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] 'কাব্যগ্রন্থ' সপ্তম খণ্ড 'শিশু'-ভাগ রূপে মোহিতচন্দ্র সেনের আগ্রহে পুরাতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন এম.এ. সম্পাদক। মজুমদার লাইব্রেরী। ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সন ১৩১০। ২ আশ্বিন পৃ ৬+২+৩+১৭৪।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 'শিশু' ১৩১৬য় প্রকাশিত হয়, তার আখ্যাপত্র :

শিশু। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৩১৬ পৃ ৩+২+১৬১+৩ মূল্য ৸০।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের বিজ্ঞাপনে 'ছেলেদের জন্য ভালো ভালো বই' পর্যায়ে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিশু"' বিজ্ঞাপিত হয়।

'পাথেয়েরও অভাব। ঈশ্বর যদি ডানা দিতেন…॥ তু. 'ইচ্ছা সম্যক তব দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি। পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি॥' রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাংশ। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ৬৬ খণ্ডে উদ্‌ধৃত পৃ ৩৯।

রেলোয়ে কম্পানি॥ সরকারি অধিগ্রহণের আগে কোম্পানি বা ব্যবসায়ী সংঘই এখানে রেলওয়ের নির্মাণ-পরিচালনের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ঈস্‌টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কলকাতা থেকে কুষ্ঠিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ খোলেন, ১৮৬২তে এই লাইনে প্রথম গাড়ি চলে। 'কলিকাতা ও সাউথ ঈস্‌টার্ন রেলওয়ে কোম্পানি' নামে সংস্থা কলকাতা থেকে ক্যানিং পর্যন্ত ২৮ মাইল লাইন বাঁধেন। ১৮৮৪ সালে ঈস্‌টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির হাত থেকে

ও নতুন কবিতার সমবায়ে প্রস্তুত হয়েছিল, এ বাবদে মোহিতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময় এবং আনুষঙ্গিক তথ্যসমূহ পুলিনবিহারী সেন -কৃত 'সম্পাদক ও কবি' সংকলনে পাওয়া যায়। দ্র 'সম্পাদক ও কবি', ৫ম পরিচ্ছেদ। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ পৃ ৪২-৪৯।

সরকারের হাতে আসে। এই সব বড়ো লাইন ছাড়া কোনো কোনো কোম্পানি ন্যারো গেজের লাইন খুলেছিলেন। মার্টিন কোম্পানি বেলগাছিয়া-হাসনাবাদ ৪৩ মাইল, হাওড়া-আমতা ২৮ মাইল, হাওড়া-শিয়াখালা ২০ মাইল গাড়ি চালাতেন। ম্যাকলাউড কোম্পানি মাঝেরহাট-ফলতার ২৭ মাইল রেলপথ তত্ত্বাবধান করতেন। সরকারি রেলওয়ের পাশাপাশি এই-সব কোম্পানির রেলওয়ে অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল।

দ্র. 'বাংলায় ভ্রমণ' ১৯৪০ পৃ ৪৫, ৪৯, ৬১-৬৪, ১৭৭।

পত্র ১১। উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন॥ সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন, 'আশ্রমের উত্তর দিকে "উত্তরায়ণ"।..."উত্তরায়ণ" হচ্ছে সীমার নাম, বাড়ির নাম নয়। সে সীমায় ছোটো ছোটো কয়েকটি বাড়ি আছে।' সে-সব বাড়িতে কবি বিভিন্ন সময়ে বাস করেছেন।

দ্র সুধীরচন্দ্র কর 'রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র পরিচয়' ১৩৬৭ পৃ ৫০-৫১।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৯ সালে ভাদ্রের প্রথমে যখন আশ্রমে যোগ দেন, তিনি দেখেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ থাকতেন অতিথিশালার দোতলায়, পরে 'আশ্রমের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত প্রান্তরে বাসের জন্য খড়ে-ছাওয়া একটি বড়ো বাসগৃহ ও পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ' করলেন, তারপর দেহলী নির্মিত হলে সেখানে বাস করতে লাগলেন। দ্র হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'শান্তিকেতনের ইতিহাস'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ পৃ ১৬৪-৬৭।

শান্তিনিকেতনের রেলস্টেশন বোলপুর, ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের স্টেশন। দ্র 'বাংলায় ভ্রমণ' ১৯৪০ পৃ ১২৩-১২৪।

সংকলন॥ ইংরেজি সাময়িকপত্রাদি থেকে কৌতূহলপ্রদ নির্বাচিত রচনা 'প্রবাসী'র জন্য শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। সে-সব লেখাতে তাঁর নিজের সংস্কারও থাকত

কমবেশি। তু. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বোলপুর থেকে লেখা ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০এর চিঠি: 'লিখিতে ভুলিয়াছিলাম জর্মান কাগজগুলি এখানেই পাঠাইয়া দিবেন, সংকলনের উপায় করিব। কতকগুলি সংকলন হাতে আসিয়াছে সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিব।' দ্র. চিঠিপত্র ১২ পৃ ২।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল প্রবাসীর 'সংকলন' বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজি অনেক মাসিকপত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সারসংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ তো খুবই হইত; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ দিকের থালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন।' 'রবীন্দ্রনাথ ও মাসিকপত্র' শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

আমেরিকা থেকে ফিরে শিলাইদহে নতুন জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে একা থাকার পূরক হিসেবে সেখানে একটি লাইব্রেরি করে নিতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ, সেই সূত্রে তখন আমেরিকায় পাঠরত ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে লেখেন: 'Magazine পাঠাবার দরকার নেই।··· প্রবাসীর সঙ্কলন অংশের ভার বাবার হাতে পড়ায় যত exchange magazine আসে রামানন্দবাবু সব বাবাকে দেন—সঙ্কলন হয়ে গেলে বাবা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। বোধ হয় দেখেছ এখন প্রবাসীর খুব উন্নতি হয়েছে, ১০০ পাতা reading matter—দামও খুব কম রাখা হয়েছে···।' 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য' (১৯৮৮) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত পত্র পৃ ২৫।

'Magazine পাঠাবার দরকার নেই…' এই সূত্রে নগেন্দ্রনাথকে ৯ বৈশাখ ১৩১৫য় লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি স্মরণ করা যায় যেখানে 'হিবার্ট জার্নাল' 'ওপেন কোর্ট' ও লিডিং এজ' এই তিনখানি কাগজ subscribe করে তাঁকে পাঠাতে, এবং সে বাবদে ৪০ টাকা বেশি পাঠাচ্ছেন বলে লিখছেন। দ্র. দেশ, ১৮ কার্তিক ১৩৬২ পৃ ১৩ ও চিঠিপত্র ১৩ পৃ ২১৮-২১৯।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা সূত্রে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: '…কোনো ভালো প্রবন্ধ বা কোনো ভালো বই বাহির হইলে তাহা লইয়া অধ্যাপকদের সঙ্গে [রবীন্দ্রনাথ] আলোচনা করিতেন।… এই আলোচনা আরো ব্যাপক করিবার জন্য কবি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে অনেক বিখ্যাত ইংরাজি মাসিক পত্রিকা আনাইতেন। ইহার মধ্যে স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন, হারপার্স ম্যাগাজিন, উইণ্ডসার ম্যাগাজিন, চেম্বার্স জার্নাল, কন্‌টেম্পোরারি রিভিউ, অ্যাটলান্টিক মান্থলি, লিটারারি ডাইজেস্ট ইত্যাদি থাকিত। ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নানা বিষয়ক প্রবন্ধের সার সংকলন করিবার ভার বিভিন্ন শিক্ষকদের দিতেন। শিক্ষকরা সংকলন করিয়া গুরুদেবকে দিতেন। তিনি উহা দরকার মতো সংশোধন করিয়া প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেন। প্রবন্ধের শেষে প্রত্যেক শিক্ষকের আদ্যাক্ষর থাকিত, যথা: অ = অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৩১৬ সালের প্রবাসীতে সংকলন ও সমালোচনা পরিচ্ছেদে ইহার নিদর্শন আছে। গুরুদেবের মতে এইরূপ সংকলনের অভ্যাস বাংলা রচনা আয়ত্ত করার এক উৎকৃষ্ট উপায়।' 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ', বিশ্বভারতী ১৩৮৮ গ্রন্থে উদ্‌ধৃত পৃ ১৮২-১৮৩।

প্রসঙ্গত 'সাধনা' এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রেও রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক সারসংগ্রহ', 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বা সংকলনজাতীয় রচনার সংস্থান

করেছিলেন। 'সাধনা'র জন্য সংকলন তিনি স্বয়ং প্রস্তুত করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' সূত্রে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, '"বঙ্গদর্শন" পরিচালনায় গুরুতর ভার আমার উপর ছিল—অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিলাতী ও দেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সংকলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন…'। দ্র 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' ১৩৭৬ সং পৃ ২০৪।

'নির্জন শান্তি… শান্তিনিকেতনের মতো এমন জায়গা আর পাইবে না…' ॥ তু. বোলপুরের মতো এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেত না।' ছিন্নপত্রাবলী. ৩০০১০০ ১৮৯৪ তারিখের ১৭৩ সংখ্যক পত্র।

'লুপ মেলের…' ॥ তু. 'কলকাতায় গাড়িতে কোন গতিকে যদি চড়ে বস, যদি লুপ মেলের গাড়িতেই চড়তে পার তাহলে বোলপুরে সন্ধ্যা ৭॥০টার সময়ে না এসে পৌছে তোমার গতি নেই।' প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্র, এপ্রিল ১৯০২। চিঠিপত্র ৮ পৃ ১৯৭।

পত্র ১২। 'গানের বই সংশোধন… যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কানো সুবিধা থাকে …' ॥

এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের ছাপায় ভুল থাকার দরুন সম্ভবত কলকাতায় ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কান্তিক প্রেসে নতুন করে ছাপার কথা ওঠে। পরে, চারুচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে নিযুক্ত থাকা কালেই ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের বই কান্তিক প্রেসে ছাপা হয়েছে।

'গোরা' ॥ 'গোরা' প্রবাসীর ভাদ্র ১৩১৪ - ফাল্গুন ১৩১৬ মধ্যে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত। প্রবাসীতে প্রকাশকালেই 'গোরা' আংশিকভাবে (পৃ ১৭০) প্রবাসী কার্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়ে ॥৵০ আনা মূল্যে প্রচারিত হয়েছিল, এপ্রিল ১৯০৯। অতঃপর 'গোরা' কান্তিক প্রেসে ছাপা হয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক দুই খণ্ড একত্রে

প্রকাশিত হয়। প্রকাশ-বিবরণ এইরকম :

গোরা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ১৯১০ প্রথম খণ্ড পৃ ৪+৩৪৬, শেষ খণ্ড পৃ ২+৩৪৭-৫৯৮ মূল্য দুই টাকা চারি আনা। উৎসর্গ/শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ কল্যাণীয়েষু/ ১৪ মাঘ ১৩১৬।

১৪ মাঘ ১৩১৬ রথীন্দ্রনাথের বিবাহের দিন, 'গোরা' রথীন্দ্রনাথের এই বিবাহের উপহার। অতএব পত্রিকায় গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বেই 'গোরা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভারতী, চৈত্র ১৩১৬য় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের এই বিজ্ঞাপন ছিল :

> গোরা
>
> আগাগোড়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ৫৯৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

পত্র ১৩। 'যতীন বাগচির একটি লেখা' ॥ 'তাঁতি পোকা'। যমশেরপুর, নদীয়া থেকে যতীন্দ্রমোহন বাগচী[১] একরকম বয়ননিপুণ পোকার সমাচার নিয়ে পাঠান, 'তাঁতি পোকা' নামে প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৭ পৃ ৩৭৩-৩৭৫এ প্রকাশিত। শুঁয়োপোকার মতো দেখতে দু দল

---

[১] মুখ্য রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে পরিগণিত যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'সঙ্গীত সমাজে'র সভ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছিলেন। দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' ১৩৫৪ পৃ ১১-১২। তিনি বিপিনচন্দ্র পালের New India পাক্ষিক-পত্রে রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন বলে সম্প্রতি জানা গেছে। *Subha*, New India 1/6, 16 September 1901, *Kankala* (The Skeleton)', New India 1/39, 19 May 1902. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবীন্দ্রজীবনী' ৫ম খণ্ড ১৯৯ পৃ ৩২-৩৩।

পোকা গাছের ওপর থেকে নিচু ডালে এধারে ওধারে তাঁতের মাকুর মতো দ্রুত যাতায়াত ক'রে মাকড়সাজালের চেয়েও সূক্ষ্ম বিশদ ও বিস্তৃত এক অদ্ভুত বস্ত্র বয়ন করছে আর রাখালপাখালেরা সেই কাপড় কেউ মাথায় জড়াচ্ছে কেউ হাওয়ায় ওড়াচ্ছে এই দেখে যতীন্দ্রমোহন বিষয়টি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গোচর করেন, ম্যাজিস্ট্রেট জানান ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ন্যাচারাল হিস্টরি-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখে পাঠান : 'It is unlike any web produced by any insect I have hitherto seen and it would be most important to obtain specimens of the animal that produced it.' চিঠিচালাচালির অবসরে তাঁতি পোকা অদর্শন হয়ে যাওয়ার ফলে নমুনা সংগ্রহ করা যায় নি, যতীন্দ্রমোহন বিষয়টি লিখে পাঠান রবীন্দ্রনাথকে।

'তাঁতি পোকা' প্রকাশিত হবার পরের মাসে বাবুরহাট, ত্রিপুরা থেকে অবনীমোহন চক্রবর্তী 'কাপড়-ধরা গাছ' নামে তুলনীয় আর একটি দৃষ্টান্ত লিখে পাঠিয়েছিলেন। দ্র. 'আলোচনা : তাঁতি পোকা'। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭ পৃ ৫১২।

গানগুলো…'॥ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ - ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ মধ্যে কলকাতা, তিনধরিয়া ও বোলপুরে 'গীতাঞ্জলি'র (৬২ থেকে ৮৩ সংখ্যক) বাইশটি গান লেখা হয়।

'ছাগলের জন্য চিন্তামণিবাবুকে…'॥ চিন্তামণিবাবু এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ। 'ছাগল…' শান্তিনিকেতন গোষ্ঠ বা গোশালার জন্য ছাগল। চিঠিপত্র ১৩য় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ১৮ অক্টোবর ১৯১০-এর পত্রে টীকা স্থলে লিখিত হয়েছে : 'সন্তোষচন্দ্রের গো-শালা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এতদূর উৎসাহিত হয়েছিলেন যে এলাহাবাদ থেকে উৎকৃষ্ট জাতের ছাগল আনাবার চেষ্টাও করেছিলেন।' দ্র. চিঠিপত্র ১৩ পৃ ২৮৫-২৮৬।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি ও গোপালন বিদ্যায় স্নাতক হয়ে ফিরে শান্তিনিকেতন গোশালার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

পত্র ১৪। 'নমুনার বইগুলি ॥ সম্ভবত 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় আকর বই।

'রামানন্দবাবুকে আশ্রমে আবদ্ধ করে ফেলার সাধনা…' ॥ রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনে একটি মাটির বাড়ি কিনেছিলেন: ছোটো ছেলে মুলুকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দেওয়ার পর ১৯১৭র গ্রীষ্মের ছুটির সময় থেকে ১৯২৯এ মুলুর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে এসে থাকতেন মাঝে মাঝে। দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে থাকতে যান ১৯২৪এ, বিশ্বভারতী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যান ১৯২৫এ, তারপরেও নানা ভাবেই সারাজীবন আশ্রমের সম্বন্ধে আবদ্ধ থেকেছেন। কিন্তু ১৩১৭র (১৯২০) অসুস্থতার সময় তিনি আশ্রমের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে পারেন নি। শান্তা দেবী লিখেছেন:

১৯০৭এর শেষে সুরাট কংগ্রেস হইতে রামানন্দ পীড়িত হইয়া আসেন। তাঁহার রোগ সারিলেও শরীরের দুর্বলতা সারে নাই। তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিল ভীষণ পরিশ্রম ও নানা দুশ্চিন্তা।

১৯১০এ এই সব কারণেই বোধ হয় তিনি আবার পীড়িত হইয়া পড়েন। ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের পরামর্শে তাই তিনি গরমের পূর্বেই দার্জিলিং গেলেন। তিনি তথায় গিয়া শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা ও ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারের পত্নী হেমলতা দেবীর বাড়িতে উঠিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর অন্য সকলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্র. 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৪৯।

'এলাহাবাদে তাঁর যাবার কথা…' ॥ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ থাকা কালে রামানন্দ এলাহাবাদে বসতি করেন, সেখানে মুখ্যসমাজের

তিনি ঘনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার্হ ছিলেন। মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীর পত্রিকার জন্মও এলাহাবাদে।

পত্র ১৫। 'তোমার suggestion মতো লেখা'। সম্ভবত প্রবাসীর 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের লেখা।

'চলিত কথার রীতি' সম্পর্কে পরামর্শ…। এই পরামর্শের কথা জানা যায় না তবে বাংলা বানানের রীতি সম্বন্ধে চারুচন্দ্রের পরামর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন বলে চারুচন্দ্র তাঁর স্মৃতি-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। দ্র. এই বই পৃ ২২৯।

বুদ্ধদেব বসু চারুচন্দ্রের চলিত রীতি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে তাকে গৌরব দান করেছেন, তিনি লিখেছেন, চলিত ভাষা বলে 'এই নতুন রীতির যখন আদিযুগ তখনই তিনি ছোটোগল্পে তা ব্যবহার করেছিলেন ("নীলকুঠি" : বঙ্গাব্দ ১৩১৯); ১৩২৮ সালে বেরোলো "মুক্তিস্নান"। চলিত ভাষায় প্রথম উপন্যাস তাঁর, এবং পরবর্তী আরো দশখানা উপন্যাসে তিনি "সাধু" ভাষাকে বর্জন করে চললেন। সে যুগে অনেকে ধরতে পারেন নি চলিত ভাষার সার্থকতা ঠিক কোনখানে… কিন্তু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা পড়ে প্রতীতি জন্মে যে চলিত ভাষার মর্মসুরটি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন—বুঝেছিলেন যে বাংলা ভাষাকে নম্য, গতিশীল ও মিশ্রধ্বনিসম্পন্ন করে তুলতে হলে এই রীতি ভিন্ন উপায় নেই।' 'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩ পৃ ১৯৭।

প্রসঙ্গত, 'চলিত কথার রীতি' সম্বন্ধে এই পরামর্শ 'সবুজপত্র'-পূর্ব কালের।

ভোলার মৃত্যু। তু. একই দিনে অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা পত্র : কাল রাত্রে হৃৎপিণ্ডের গতি রোধ হইয়া ভোলার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তোষ আজ মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। ইতি ১১ই আষাঢ় ১৩১৭।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র ভোলা, সরোজচন্দ্র মজুমদার (১৮৯৩-১৯১০) সন্তোষচন্দ্রের ছোটো ভাই, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শমীন্দ্রের সহপাঠী। ১০ আষাঢ় ১৩১৭ (২৪ জুন ১৯১০) শেষ রাতে আশ্রমের ছাত্রাবাসে হৃদ্রোগে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় রবীন্দ্রনাথ শুশ্রূষা করেছেন তার শয্যাপাশে বসে, সেই বিবরণ সুধীরঞ্জন দাস রক্ষা করেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথায়, উদ্ধৃত করি :

একদিন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরে গিয়েছে—রাত্রের খাওয়া শেষ হলে সুহৃদ ও আমি, আর কে কে বেরিয়ে পড়েছি খেলার মাঠে।··· হঠাৎ নজরে পড়ল, আমাদেরই ঘরের সামনে কারা লণ্ঠন নিয়ে ছুটোছুটি করছে। খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম, একটা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায় মনে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। আমরা সব তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরে। এসে দেখি ভোলা তাঁর বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন এবং গুরুদেব তাঁর পাশে একটা মোড়া না কিসের উপর স্তম্ভিতভাবে বসে আছেন, নির্নিমেষ চোখে ভোলার দিকে তাকিয়ে। একটা টিপাইয়ের উপর কয়েকটা বাইওকেমিক ওষুধের শিশি। একটু পরেই বোলপুর থেকে হরিচরণ ডাক্তারবাবু এসে যখন বুক পিঠ ও নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বুঝতে পারলাম যে আমাদের সতীর্থটিকে আমরা হারালাম। গুরুদেবের তন্ময় মুখচ্ছবিতে যে দুঃখ ও করুণার ভাব ফুটে উঠেছিল আজও তা ভুলি নি। ভোলার হঠাৎ কী হল আমরা কিছুই বুঝলাম না, পরেও জানতে পারি নি। মনের মধ্যে বিশেষ করে জাগছিল এই কথাটা, শমী গেলেন ভোলাদের মুঙ্গেরের বাড়ি হতে, আর ভোলা চলে গেলেন গুরুদেবের আশ্রম থেকে। ভোলা ও শমীর মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল বলেই বোধ হয় এই কথাটা বার বার মনে আসছিল। প্রত্যুষে তাঁর দেহ সৎকার করে শ্মশান থেকে যখন

সকলে ফিরলাম তখন রোদ উঠে গেছে।

'আমাদের শান্তিনিকেতন' ১৩৯৪ সং পৃ ৯৫।

পত্র ১৬। 'সংকলন সমালোচন শিরোনামা…' ॥ প্রবাসীর পৌষ সংখ্যা থেকে 'সংকলন ও সমালোচন' এই শিরোনাম উঠে যায় এবং অতঃপর বিভাগনামা ব্যতিরেকেই সংকলনের লেখাগুলি ছাপা হতে থাকে।

'শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধগুলি…' ॥ শান্তিনিকেতনের লেখকদের সংকলন বিভাগের জন্য লেখা প্রবন্ধ।

'…What is in a name ?' ॥

What's in a name ? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet ;

শেক্‌স্‌পীয়র : 'রোমিয়ো অ্যাণ্ড জুলিয়েট' ২. ২. ছত্র ৪৩-৪৪।

'…ব্যাকরণ-মুদ্রারাক্ষস' ॥ মুদ্রারাক্ষস ছদ্মনামে চারুচন্দ্র গ্রন্থসমালোচনাদি লিখতেন।

'বাংলা ভাষাকে ত analyse করে এ পর্যন্ত দেখা হয় নি…' ॥

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে analyse করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সাধনা পত্রে, তারপর সাহিত্য পরিষদের সভায়। সাহিত্য পরিষদে সন ১৩০৪এ 'ব্যাকরণ বিষয়ে শাখা সমিতি' গঠিত হয়। ওই বছরের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ পাণিনি ও মুগ্ধবোধের অনুবাদ মাত্র।… বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত।' সন ১৩০৮এ তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ' পাঠ করেন, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন 'বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ'। শাস্ত্রী মহাশয় সে সভায় বলেন, 'এক মাস পূর্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা করি। রবীন্দ্রবাবুর মত লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই।' সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক বাঙ্গালা ব্যাকরণ আলোচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর যে অগ্রণী হয়েছেন, পরিষৎ সভায় এজন্য তাঁদের সাধুবাদ করা হয় (যথাক্রমে ২৭ জুলাই ১৯০১ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১এর মাসিক অধিবেশনে)। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩০৭ ও ১৩০৮ বর্ষে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ব্যাকরণ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরিষদের অধিবেশনে পঠিত আরো দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পৌষ ১৩০৮এ এবং ভারতী আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১১ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বই বেরোয় ফেব্রুয়ারি ১৯০২এ। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-বিশ্লেষণের নতুন অধ্যায় শুরু হয় প্রবাসী পত্রিকায়। প্রবাসী ১৩১৮ বর্ষের আষাঢ় ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক ও অগ্রহায়ণে অন্যূন পাঁচটি ব্যাকরণ প্রসঙ্গ রচনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন— এই বাক্যটিকে তার ভূমিকা স্বরূপে গ্রহণ করতে হয়।

পত্র ১৭। মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌কে লেখা ইংরেজি চিঠি ॥ *The Problem of India : A Letter* শিরোনামে মডার্ন রিভিউ অগস্ট ১৯১০এ (পৃ ১৮৪-১৮৭) মুদ্রিত। ছাপার পূর্বে রামানন্দবাবু প্রুফ পাঠিয়েছিলেন, দ্র. রামানন্দকে লেখা ২৫ জুলাই ১৯১০এর পত্র, চিঠিপত্র ১২ পৃ ২-৩। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রুফে দ্বিতীয় গেলির শেষপ্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি।'[1]

১৯১০এ কোনো সময় ন্যুইয়র্কের আইনজীবী মাইরন ফেল্‌প্‌স এদেশে এসেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহেও গিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ১৯১০এ শিলাইদহে তাঁর নূতন জীবন শুরু হল— 'আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী অঞ্চলের একজন সম্পন্ন কৃষাণ।... এই সময় আমেরিকা থেকে এসেছিলেন মাইরন ফেল্‌প্‌স্— ইনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে এঁর

---

[1] ফেল্‌প্‌স্‌কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রখানির মুখ্যাংশ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৪৫০-৪৫২য় মুদ্রিত হয়েছে।

লেখা অনেক প্রবন্ধাদি তখনকার অনেক কাগজে প্রকাশিত হত। তাঁর একটি লেখায় তিনি আমাদের মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।' দ্র. 'পিতৃস্মৃতি' ১৩৭৮ সং পৃ ১২২।

মাইরন ফেল্‌প্‌সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার সাক্ষাৎ ও আলাপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন সীতা দেবী। দ্র. 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৯৩-৯৪, ১০৯।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'র মুখবন্ধে ‘বিপ্লব আন্দোলনে যুক্ত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা মার্কিন দেশে যে-সব বিদেশী মনীষীর সহানুভূতি ও সাহায্য' লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাইরন ফেল্‌প্‌সের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌ নিউইয়র্কে "ইণ্ডিয়া হাউস" স্থাপন করেন। রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন লণ্ডনের বক্তৃতায় ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করেন তখন তিনি বহু খ্যাতনামা লোকের স্বাক্ষর সমন্বিত প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ইনি অবশেষে গেরুয়া কাপড় পরিয়া ভারতে আগমন করেন এবং সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়া ভারতের মাটিতেই দেহরক্ষা করেন।' দ্র. 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' ১৩৯০ সং পৃ ৮।

'প্রবাসীর জন্য কবিতা'॥ চারুচন্দ্রকে 'একটি কবিতা পাঠাই' লিখলেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৫ জুলাই ১৯১০এর চিঠিতে 'প্রবাসীর জন্য চারুকে গুটি তিনেক কবিতা পাঠাইয়াছি' বলে উল্লেখ আছে। 'প্রণতি' (যেথায় থাকে সবার অধম দীনের চেয়ে দীন), 'সাধন' (ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে) এবং 'রাজবেশ' (রাজার মত বেশে) এই তিনটি কবিতা প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭ পৃ ৪০৯-৪১০এ প্রকাশিত হয়। শ্রাবণের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃ-অভিষেক'

কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। পৃ ৪০৭-৪০৮।

পত্র ১৮। 'তোমার গল্পটি'॥ 'বন্ধু'। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭ পৃ ৪২৭-৪৩৪। গল্পে 'মায়ার খেলা' ও 'পতিতা' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আছে। শ্রাবণের প্রবাসীতে চারুচন্দ্রের 'একটি মেহেদির গান' গল্প প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৯। 'কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি'॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, '২৫শে শ্রাবণ কবি কলিকাতায় যান, গীতাঞ্জলির শেষ কয়টি গান সেখানে রচিত।' বইয়ের পাদটীকায় রেলপথে ও কলকাতায় লেখা মোট পাঁচটি গানের (সংখ্যা ১৫২-১৫৪; ১৫৬-১৫৭) হিসেব আছে। 'রবীন্দ্রজীবনী' ২ ১৯৯৫ সং পৃ ২৯৬।

পত্র ২০। 'গীতাঞ্জলি…'॥ 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশকাল ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ বলে উল্লেখ আছে। 'গীতাঞ্জলি' ভাদ্রের প্রথম দিকেই নিশ্চয় প্রকাশিত হয়, প্রবাসী ভারতী দুই পত্রিকাতেই আশ্বিন সংখ্যায় বইখানি আলোচিত হয়েছিল।

'জীবনে যত পূজা…'॥ রচনা ২৩ শ্রাবণ ১৩১৭, ১ম সং ১৪৭ সংখ্যক গান পৃ ১৬৭। প্রথম সংস্করণ বইয়ে অষ্টম ছত্রে 'হারাল ধারা' স্থলে 'হারাল ধরা' এই মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্য করা যায়। সংশোধিত রূপে পুনরায় প্রবাসীতে প্রকাশিত: 'গান'। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭ পৃ ৬১০।

প্রসঙ্গত, ১১ মাঘ ১৩১৭ বুধবার একাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে রবীন্দ্রনাথের প্রাতঃকালীন বক্তৃতার শেষে 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' গানটি গীত হয়েছিল। চৈত্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সংকলিত বক্তৃতার শেষে নয়টি গানের সপ্তম গান রূপে 'ভৈরবী-তেওরা' এই রাগতাল নির্দেশসহ গানটি দশ ছত্রে মুদ্রিত হয়। দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৮৩২ শক পৃ ১৯৫।

‘মণিলাল’। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ।

পত্র ২১। ‘লেখিকারা’॥ লেখিকারা, পরের চিঠির সাক্ষ্যে, হেমলতা দেবী ও অতসীলতা, বা মীরা দেবী।[1]

‘ত্নটো সংকলন…’॥ এই সূত্রে ১ ভাদ্র ১৩১৭য় শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: ‘হেমলতা বৌমা ও মীরা তাদের সেই সংকলনটার প্রতি মনোযোগ করে কি?’ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীর ‘সংকলন ও সমালোচন’ বিভাগে এই লেখিকাদের রচনাদুটি সম্ভবত ২১শে ভাদ্র ১৩১৭য় পাঠানো এই লেখা। আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতেও এই দুই লেখিকার দুটি সংকলন বেরিয়েছিল, সে নিশ্চয় আগের পাঠানো।

দ্র. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭:

অতসী দেবী: ‘ভারতের ভাগবতধর্ম্ম’ (১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ধর্ম্ম-ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক সভায় গ্রিয়রসন পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম) পৃ ৫৩৮-৫৪০।

হেমলতা দেবী: ‘জাপানে ভক্তিবাদের গুরু’ (১৯০৮এর ধর্ম্ম-ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক সভায় শ্রীযুক্ত আনেসাকি পঠিত প্রবন্ধের সারানুবাদ) পৃ ৫৪৯-৫৫৩।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭:

হেমলতা দেবী: ‘বাহ্য ধর্ম্ম’ (ধর্ম্ম ও ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক

---

[1] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘লেখিকারা কাঁচা’, বোধহয় হেমলতাকে তা তিনি মনে করতেন না, পরন্তু নির্ভর করতেন। দ্র. ২৩ আষাঢ় ১৩১৭ শিলাইদহ থেকে পুত্রবধূ প্রতিমাকে লেখা চিঠি: ‘হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো।’ চিঠিপত্র ৩ পৃ ১। হেমলতার কবিখ্যাতি হয়েছিল এরই মধ্যে। তাঁর প্রথম কাব্য ‘জ্যোতিঃ’ ১৩১৭ পৃ ৯৬ মূল্য ॥৵০ (রবীন্দ্রনাথের দেওয়া গ্রন্থনাম) প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ পৃ ২০৮এ মুদ্রারাক্ষস কর্তৃক আলোচিত হয়।

সভায় মিস্ রোজেনবর্গ কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত) পৃ ৩২-৩৫।

অতসী দেবী: 'হিন্দু ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি' (ধর্ম্ম ও ইতিহাসের আন্তর্জ্জাতিক সভায় সার আলফ্রেড লায়াল কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত) পৃ ৩৫-৩৯।

'চোখের বালি ও নৌকাডুবি' ॥ ১৯১০এর গোড়াতে চারুচন্দ্র প্রবাসী-মডার্ন রিভিউয়ের সহ-সম্পাদক রূপে যোগ দিলে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কলকাতার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন[১] এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে অতঃপর রবীন্দ্রনাথের পুস্তকসমূহ ছাপা হতে থাকে।

চোখের বালি। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস সং জুন ১৯১০ ক্রাউন ১৬ পেজি পৃ ২+৩১০।

নৌকাডুবি। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস সং জুন ১৯১০ ক্রাউন ১৬ পেজি পৃ ২+৩৬৮।

পত্র ২২। 'রেজেষ্ট্রি ডাকে দুটি সংকলন…' ॥ সংকলন দুটি অগ্রহায়ণে নয়, প্রবাসী পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা থেকে 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগনাম নেই।

অতসী দেবী: 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' (১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়ান রিভিয়ুতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মুশীর হোসেন কিদ্‌বাই লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত) প্রবাসী, পৌষ ১৩১৭ পৃ ৩৪৮-৩৪৯।

হেমলতা দেবী: 'ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানীর মিশ্রণ' (ধর্ম্ম ও ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জ্জাতিক সভায় পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত)। প্রবাসী, পৌষ ১৩১৭ পৃ ৩৪৯-৩৫৩।

'মাতৃশ্রাদ্ধ' ॥ প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭ পৃ ১-৪। 'শান্তিনিকেতন' দ্বাদশ খণ্ডে (১৯১১) সংকলিত পৃ ১৯-৩৪।

---

[১] আসলে ইণ্ডিয়ান প্রেসের কলকাতা শাখায় অংশীদার।

'মাতৃশ্রাদ্ধ' শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১৮ ভাদ্র ১৩১৭ বুধবারে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ভাষণ 'আশ্রমের ছাত্র হীতেন্দ্র হীরেন্দ্র নরেন্দ্র ও মণীন্দ্রনাথ নন্দীর মাতা, মথুরানাথ নন্দীর পত্নী যোগমায়া দেবীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্দিরে কথিত। কবির সহিত তৎকালীন কর্মী ও ছাত্রদের সম্বন্ধ কী গভীর ছিল, তাহা উক্ত ভাষণ হইতে বুঝা যায়।' রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড ১৩৯৫ সং পৃ ২৯৬।

'সত্যেন্দ্রকে…' ॥ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পত্র ২৩। 'আমার লেখা সম্বন্ধে…' ইত্যাদি ॥ রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে চারুচন্দ্রের প্রবন্ধ।

সম্ভবত আশ্বিন ১৩১৭র অভিনয়ানুষ্ঠানের আগেই চারুচন্দ্রের লেখাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা হয়, মনে হয় লেখাটি তিনি দেখেছিলেন বা লেখার বিষয় তাঁকে জানানো হয়েছিল এবং প্রবাসীতে ওই লেখা মুদ্রণে এর পূর্বেও তিনি কুণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অস্বাচ্ছন্দ্য জানতে পেরে চারুচন্দ্র কলিকাতা দেবালয় সমিতির ৩০ ভাদ্র ১৩১৭ / ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০এর বক্তৃতা সভায় তাঁর লেখা পাঠ করেন। সভার প্রতিবেদনে বলা হয়:

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০: শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, 'রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বড়ই মধুর হইয়াছিল।

কার্তিক সংখ্যা দেবালয়ে চারুচন্দ্রের বাইশ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। 'রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে'। দেবালয়,[১] কার্তিক ১৩১৭ পৃ ১৪৮-১৬৯।

---

[১] 'দেবালয়'। শান্তা দেবী লিখেছেন, 'প্রবাসী অফিসের পাশের বাড়িতে তখন তিনতলায় থাকিতেন পণ্ডিত সীতারাম তত্ত্বভূষণ সপরিবারে।… তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নীচের তলায় দোতলায় থাকিতেন সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চারুচন্দ্র 'রবীন্দ্রনাথের জন্য উচ্চতম কবির সিংহাসন দাবি' করেছিলেন, কোন্ কোন্ লক্ষণে তিনি বিশ্বের উচ্চতম বা শ্রেষ্ঠ—তাই তাঁর প্রবন্ধের বিষয়। এইভাবে তাঁর প্রবন্ধের শুরু: 'কিছুকাল হইতে বাংলার সাহিত্যসেবিগণ সবিস্ময়ে শুনিতেছেন যে বাংলার দুজন শ্রেষ্ঠ মনীষী—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার [নাথ] শীল ও শ্রীযুক্ত

বাড়িটা তাঁহারই ছিল, কিন্তু তিনি দেবালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন উদ্দেশ্যে বাড়িটি দান করিয়াছিলেন। একতলায় দেবালয় গৃহ ছিল। সেই গৃহের একদিকে ছিল লাইব্রেরী এবং আর একদিকে উপাসনা ও বক্তৃতাদির স্থান। দেবালয়ে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা, সুন্দরীমোহন দাসের 'নৌকাবিলাস' প্রভৃতি কথকতা, New Thought প্রচারক আমেরিকান মহিলাদের বক্তৃতা ও পুস্তিকা বিতরণ, মহারানী সুনীতি দেবীর কথকতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতা এবং বৈষ্ণব ভক্তদের পাঠ ও মালপোয়া বিতরণ মাঝে মাঝে হইত। অন্যান্য অনেক বক্তা, গায়ক ও কথকদের কথাও নিয়মিত হইত। দুইবার ইঁহারা রবীন্দ্রনাথকেও আনিয়াছিলেন।' 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৫২।

দেবালয় সমিতির বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে—:

দেবালয় সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন-মন্দির।

দেবালয়ের সভা-সমিতিতে কথনও রাজনৈতিক বক্তৃতা ও আলোচনা হইবে না।

দেবালয় হইতে 'দেবালয়' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ ইহার নিয়মিত লেখক।

দেবালয় কর্ম্মস্থান— ২১০/৩/২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাঠকগণ দেখিবেন দেবালয়ের একটু বিশেষত্ব আছে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

প্রসঙ্গত, দেবালয় পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ অন্যতম লেখক ছিলেন। দেবালয়ের বক্তৃতাসভায় রবীন্দ্রবান্ধবদের অন্যতম ডব্লু ডব্লু পিয়ার্সন চারুচন্দ্রের পরেই বক্তৃতা করেছেন। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব' নামে রবীন্দ্র-বিরোধীদের ধূম্রোৎপাদনকারী পুস্তিকার রচনাটিও দেবালয়েরই এক অধিবেশনে পঠিত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি— সমসাময়িক সমগ্রজগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হন নাই। বাঙালার এত বড় সৌভাগ্য সহজে বিশ্বাস করিবার নহে; আবার যাঁহারা এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের সহিত এমনি ঘনিষ্ঠ পরিচিত যে, তাঁহাদের কথাও অবিশ্বাস করিবার জো নাই। এই কথাটি কোন্ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই আলোচনা করিয়া দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।'

চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে স্থির করেছিলেন তাঁর কাব্যের অনন্য অধ্যাত্মভূমি— 'যাহা সামান্যতা পরিহার করিয়া ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে,··· যাহা বিশ্বের ভিতর দিয়া মানবমনকে বিশ্বেশ্বরের চরণপদ্মের অভিমুখিন করে। ইহা ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সাধনা। এবং এই লক্ষণটি আমরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।'

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা মতো পরের মাসেই সাহিত্য পত্রিকা চারুচন্দ্রের রচনাকে আক্রমণ করেন :

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' নামক স্তবে দেবালয়ের চাতাল হইতে চূড়া পর্যন্ত বোঝাই হইয়া গিয়াছে। 'চারু' প্রথমেই একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন, 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি— সমসাময়িক সমগ্র জগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হয় নাই।' বিজ্ঞানাচার্য ডাক্তার রায় উদক্ষার যান যবক্ষার যানের সাহায্যে বকযন্ত্রে এই মত প্রতিপন্ন করিলে, সত্যই বাঙ্গালীর বুক দশ হাত হইয়া উঠিবে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সমালোচনায় এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বাঙ্গালী জগতের

সাহিত্যের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। 'সাময়িক সমগ্র জগৎ' যতই উদ্ভট হউক, সেই জগতের সমগ্র সাহিত্যের এমনতর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও তুলনায় সমালোচনা করিবার শক্তি এ মরজগতে সকলের নাই। আমরা ত আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখিতেই পারি না! অতএব, বাঙ্গালীর এই গৌরবটুকু অম্লানবদনে পরিপাক করিতে চেষ্টা করিব। আর 'বিশ্বসাহিত্যের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ' মনীষী শীল ও ডাক্তার রায় চারু সমালোচককেও সমসাময়িক সমগ্র জগতের 'একমাত্র সমালোচক' বলিয়া স্বীকার করিবেন, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ নাই! রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, কিন্তু তাঁহার সকল কবিতাই কামধেনুর মত দোহন করিলে 'আধ্যাত্মিক' দুগ্ধ দান করে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

দীর্ঘ বিস্তারের পর আলোচনার শেষে লেখা হয়েছিল :

হে ভগবান্! রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব; তুমি তাঁহাকে চারু-সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জ্জলা খোসামুদি ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।

'মাসিক সাহিত্য আলোচনা'। সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৭।

পত্র ২৪। জ্বর ও বিদ্যালয়ের আসন্ন অভিনয়ের কথা একই কালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পুরোনো ছাত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে, পত্রখানি উদ্ধৃত করি :

কল্যাণীয়েষু,

আমার শরীর ভাল চল্‌চেনা। মাঝে দুবার জ্বরে পড়েছিলুম—ম্যালেরিয়া নয়। এখনো দুর্বল আছি।

বিদ্যালয় ১৭ই আশ্বিন বন্ধ হবে। তারপরে কলকাতায় যাব। ছুটিতে কোথায় থাকব এখনো ঠিক করতে পারি নি। সম্ভবত শিলাইদহে যাব।

এখানকার খবর ভাল। ছেলেরা ছুটির পূর্ব্বে একটা কিছু

অভিনয় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। তোমার শরীর ভাল আছে ত?

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৪ঠা আশ্বিন ১৩১৭

পত্র ২৫। 'ঠিক নামটা লিখলুম কিনা জানি নে…'। ঠিক নাম সম্ভবত *International Socialist Review*, শিকাগো থেকে ১৯০০ সালে প্রকাশারম্ভ। অপর যে-সব পত্রিকার উল্লেখ এই পত্রে আছে তার মধ্যে নীচের পত্রিকাগুলির পরিচয় এইরূপ :

Literary Digest, নিউ ইয়র্ক, প্রকাশারম্ভ ১৮৯০-

American Weekly '(নামটা ভুলে যাচ্চি)' সম্ভবত *American Magazine*, নিউ ইয়র্ক ১৮৭৬-

Nation, লণ্ডন ১৯০৭- (এই কাগজখানি ১৯২১ থেকে *Athenaeum* কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে *Nation and Athenaeum* নামে প্রকাশিত হতে থাকে), অথবা

Nation, নিউ ইয়র্ক ১৮৬৫-

The Strand Magazine (সচিত্র মাসিক), লণ্ডন ১৮৯১-

Pearson's Magazine, লণ্ডন ১৮৯৬-

Pall Mall বা *The Pall Mall Magazine* মাসিক, লণ্ডন ১৮৯৩-

ইত্যাদি- প্রসঙ্গত ১৩১৭য় প্রবাসীর সংকলন এই-সব পত্রিকা থেকে করা হয়েছিল উল্লেখ পাওয়া যায় :

হিবার্ট জার্নাল, ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন, পিয়ার্সন্‌স্ ম্যাগাজিন, পল মল ম্যাগাজিন, স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন, সায়েন্টিফিক রিভিয়ু, উইণ্ডসর ম্যাগাজিন, ফর্টনাইটলি রিভিয়ু, হিউম্যানিটারিয়ান রিভিয়ু, লিটারারি ডাইজেস্ট, মডার্ন রিভিয়ু, স্ক্রিবনার্স ম্যাগাজিন, ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু, ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন ও ফরাসি লা রেভ্যু পত্রিকা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলন)। 'ধর্ম-ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায়

পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত' বলে কোনো কোনো রচনার উল্লেখ আছে, সে প্রবন্ধের আকর পত্রিকার উল্লেখ নেই।

পৌষ ১৩১৭ সংখ্যা থেকে 'সংকলন ও সমালোচনা' এই বিভাগ নাম বর্জিত হয়, কিন্তু সংকলনের রচনাসমূহ যথারীতিই প্রকাশিত হতে থাকে।

পত্র ২৬। 'এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি··· জিনিষটি একটি ছোট নাটক···'॥ ২ কার্তিক ১৩১৭য় সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠি: আজ থেকে নাটক লেখায় হাত দিয়েছি— কিন্তু এখানে সমস্ত দিন আমার ছাতের উপরকার খোলা ঘরটাতে বসে কেবলি সমুখের দিগন্তশয়ান পদ্মা ও অন্য তিন দিকের শস্যপরিপূর্ণ সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়েই সময় কেটে যায় কোনো কাজ করতেই ইচ্ছা যায় না।[১]

ইন্দুলেখা দেবীকে লেখা চিঠি ১২ কার্তিক ১৩১৭:

শিলাইদহে এসে ভাল বোধ হচ্চে। বাড়ির ছাতের উপর একটি ছোট ঘর আছে সেইখানে আমি থাকি। চারিদিকের দরজা খুলে দিলে সম্মুখে পদ্মা নদী— ও অন্য দিকে মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা আমাকে একটা নূতন নাটক লেখবার জন্যে ধরেছেন— তাই একটু একটু করে লিখি— লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না— অধিকাংশ সময় চুপ করে বসেই কাটে।'[২]

নাটকটি 'রাজা' নাটক।

'টুকরো করে কাগজে দিলে কারো ভালো লাগবে না'॥ সম্ভবত সাহিত্য পত্রিকার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লেখা। প্রবাসীতে ধারাবাহিক 'গোরা' এবং অপর একখানি নাটকের সূত্রে সাহিত্য লিখেছিলেন, 'ক্রমশ প্রকাশে নাটক একেবারে খুন হইয়া থাকে; উপন্যাসও জখম হইয়া যায়।' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৫।

---

[১] রবীন্দ্রভাবনা, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা পৃ ১২।

শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ পৃ ১৬৮।

স্মরণীয়, পরের বছরে প্রবাসীতে একত্রে এক সংখ্যায় সমগ্র 'অচলায়তন' নাটক প্রকাশিত হয়েছিল।

'রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্ছে…'। এই কথাও সম্ভবত সাহিত্য পত্রিকার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া। প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৭য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার সূত্রে সাহিত্য লিখেছিলেন, 'স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম রবীন্দ্রনাথের রচনা। নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। ইহাতে কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই।… শিক্ষানবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন কবিও এই অপচারগুলি মুদ্রিত করিতে লজ্জিত হন নাই—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৭ পৃ ৪০১।

'শারদোৎসব' ॥ রচনা সম্পন্ন ৭ ভাদ্র ১৩১৫। প্রথম অভিনয় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ১৩১৫ পূজাবকাশের পূর্বে, এই অনুষ্ঠানে চারুচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন এবং কবিকে নাটকের একটি নান্দী রচনায় প্রবৃত্ত করেছিলেন। দ্র. 'রবিরশ্মি— পশ্চিম ভাগে' পৃ ৮৮-৮৯।

'শারদোৎসব' নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল।

পত্র ২৭। 'যথাস্থানে…' ॥ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির কাছে।

'ছুটি শেষের আর দেরি নেই…'। এ বছরে পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় পুনরারম্ভ ২৯ কার্তিক ১৩১৭, ১৫ নভেম্বর ১৯১০। অতএব 'রাজা' লেখার কাল শিলাইদহে ১৩১৭র পূজাবকাশে, ২ কার্তিক থেকে ২৫শে কার্তিক, ২৪ দিনে। প্রবাসীতে সমালোচিত মাঘ ১৩১৭। শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয় ৫ চৈত্র ১৩১৭ (১৯ মার্চ ১৯১১)।

'অজিতের ফিরে আসা…' ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৯১০ সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা করেন, অক্টোবরে অক্‌স্‌ফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে ভর্তি হন। ব্যাধির কারণে অবিলম্বে

তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ১৯১১ জানুয়ারির প্রথম দিকে তিনি দেশে এসে পৌছন।[১] অজিতকুমারের 'অ' স্বাক্ষরিত অনেক সংকলনই প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ২৮। চারুচন্দ্রের বড়ো ছেলে প্রেমোৎপল ১৯১০ সালের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৮৩) পরে যশস্বী লেখক হয়েছিলেন।

পত্র ২৯। মাঘোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় এসে বোলপুরে ফিরে গিয়েছিলেন, তার পরেই আবার এই সময়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন, এই পত্রে লক্ষ্য করা যায়। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড ১৩৯৫ সং পৃ ৩১১।

পত্র ৩০। 'নানাবিধ লেখা... ব্যাকরণ...' ইত্যাদি॥ ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৭য় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, প্রবাসী, মানসী, দেবালয়, মডার্ন রিভিউ, সঙ্গীত-প্রকাশিকা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখার একটি তালিকা প্রশান্তকুমার পাল করে দিয়েছেন, দ্র. 'রবিজীবনী' ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৯০ পৃ ১৯৫, ২০৪। ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধ ১৩১৮য় পর পর প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৩১। 'আমার বিবাহের সংকল্প...'॥ ইতোপূর্বেই 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশার্থ তার সহ-সম্পাদক বাবু পদ্মিনীমোহন নিয়োগী সমীপে এই প্রতিবাদ-পত্রখানি রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন :

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি, এরূপ সম্পূর্ণ

---

[১] বিলাত থেকে লেখা সংরক্ষিত শেষ চিঠিতে অজিতকুমার লিখেছেন তাঁর বোম্বাই পৌছবার কথা ৬ জানুয়ারি ১৯১১। সুয়েজের পথে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০এর পত্র থেকে সাউথ হিল পার্ক হ্যাম্পস্টিড থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯১০এ

অমূলক সংবাদ কোনো বাংলা সংবাদপত্রে প্রচার করা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি— দয়া করিয়া আপনাদের পত্রে ইহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ইতি ৫ই শ্রাবণ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরে আমেরিকা থেকে ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯এর একখানি পত্রেও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পরিহাস করে লিখেছেন :

কল্যাণীয়েষু/মণিলাল— বেশ দেখা যাচ্ছে এ জগৎ সংসারে ডাকঘর বিভাগের কর্ত্তা মনোযোগ পূর্ব্বক কাজ দেখেন না। আমার শুভ পরিণয়ের খবর এবং নিমন্ত্রণপত্র যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ধন্য কিন্তু বর এখনো পান নি— এবং যদি বধূ কেউ থাকেন তাহলে তাঁরও হস্তগোচর হয় নি…' ইত্যাদি। দ্র. পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত 'পত্রাবলী'। শারদীয় দেশ পত্রিকা ১৩৭৩ পৃ ২২, ৩১।

অর্থাৎ এই প্রচার বেশ কতক দিন স্থায়ী হয়েছিল বোঝা যায়।

'নরেন্দ্র সেন মহাশয়ের কাগজ…'॥ নরেন্দ্রনাথ সেন, রায়বাহাদুর (১৮৪৩-১৯১১)। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের অন্যতম সদস্য নরেন্দ্রনাথ ১৯০৫এ টাউন হলের বয়কট প্রস্তাব সভার সভাপতি হয়েছিলেন, পরে স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। নরেন্দ্রনাথ প্রতাপ মজুমদারের পর 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র সম্পাদক, পরে ওই কাগজের স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন। এই চিঠির 'নরেন্দ্র সেন মহাশয়ের কাগজ…' সরকারি মুখপত্র 'সুলভ সমাচার' নামে সাপ্তাহিক পত্র। অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন :

পত্র— রবীন্দ্রনাথের কাছে অজিতকুমারের লেখা এই যাত্রা-পরিচ্ছেদের মোট বারোখানি পত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

বাঙ্গালী পাঠকগণের জন্য একটা সুলিখিত ও সুপরিচালিত বাঙ্গালা কাগজের অভাব তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। এই কারণে, গভর্মেণ্ট যখন একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায় করিয়া নরেন্দ্রবাবুকে তাহার সম্পাদন ও পরিচালন-ভার গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তখন তিনি সে অনুরোধ অবহেলা করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই।… “সুলভসমাচারে”র ন্যায় একখানি বহুজনপাঠ্য সংবাদপত্র প্রকাশিত করিতে গেলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। ইচ্ছা থাকিলেও, অর্থাভাবে এইরূপ সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার সংকল্প অনেককেই ত্যাগ করিতে হয়। গভর্মেণ্ট যখন সেই অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন এবং নরেন্দ্রবাবুকে পত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি লোকসাধারণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার এই সুযোগ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। “সুলভসমাচারে”র সম্পাদনভার গ্রহণ করায়, অনেকেই তাঁহাকে গালাগালি দিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু তিনি যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, তাহাই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রহিলেন…’।

‘স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন’। বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১৮ পৃ ৪১৩-৪২১।

‘রাজা অভিনয়’ ॥ প্রথম অভিনয় শান্তিনিকেতন, ৫ চৈত্র ১৩১৭। চারুচন্দ্র গিয়েছিলেন।

পত্র ৩২। ‘বর্ষশেষের দিনে…’ ॥ বর্ষশেষের উৎসবে কলকাতা থেকে সমাজপাড়ার মেয়েরা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে অভিভাবক করে ‘রাজা’ দেখতে আসেন, শান্তা দেবী সেই বিবরণ রক্ষা করেছেন তাঁর রামানন্দ-জীবনীতে :

‘গোরা’র যুগের পর রবীন্দ্রনাথের নামে তখন ছেলেমেয়েরা পাগল। তিনি স্বয়ং অভিনয়ে নামিবেন একথাও কানে আসিল। কে যে প্রথম কথাটা পাড়িয়াছিলেন মনে নাই। বোধ হয় একটি বিবাহ-

সভায় ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনী ও রামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাত্রেই পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন শান্তিনিকেতনে যাইতেই হইবে।··· কিন্তু ছোট ছোট মেয়েদের একলা ত যাইতে দেওয়া হইবে না। রামানন্দ ছিলেন এই সব অর্বাচীনদের বন্ধু। তাহারা গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল।··· সুতরাং ছয়-সাতটি বালিকার অভিভাবক হইয়া তিনি আশ্রমে চলিলেন।

শান্তা দেবী অভিনয়েরও বর্ণনা দিয়েছেন :

সেবার প্রথম ‘রাজা’ অভিনয় হয়। মাটির ‘নাট্যঘরে’ খড়ের চালের তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্য তোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন আতস-বাজির ফুলের মত ঝলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেবার (এখন জস্টিস) সুধীরঞ্জন দাস হইয়াছিলেন ‘সুদর্শনা’ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ‘কাঞ্চীরাজ’। অভিনয়ের আগে-পরেও রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বিতরণের কি সমারোহ! অতিথিশালার উপরের ঘরে বসিয়া একসঙ্গে পঞ্চাশটা পর্যন্ত গান তিনি গাহিয়া গেলেন। অতিথিদের সঙ্গে করিয়া সমস্ত আশ্রম নিজে দেখাইলেন। তাঁর আতিথ্য, তাঁর সৌজন্য, তাঁর বাৎসল্য, তাঁর কর্মমাধুর্য, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, তাঁর প্রসন্নতা কিছুরই যেন সীমা ছিল না। ‘রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা’ পৃ ১৬০।

সুধীরঞ্জন দাস ‘রাজা’র অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেলেন, তাঁর লেখাতেও এই অনুষ্ঠানের কথা আছে। তিনি লিখেছেন, ‘মনে পড়ে আমরা যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠলাম তখন “রাজা” অভিনীত হয়েছিল। সে অভিনয়ে খুব লোকসমাগম হয়েছিল। কলকাতা থেকে আশ্রমবন্ধু বহু অতিথি এসেছিলেন। আমাদের অভিনয় শেখাতে গুরুদেব খুব বেশি পরিশ্রম করেছিলেন···’।

‘জগদীশ···’। জগদীশচন্দ্র বসু।

'রাম, হনুমানের উপদ্রব…' ॥ সরকারি নেকনজর, সেই সঙ্গে সরকারি গুপ্তচরদের তৎপরতা—এই রাজকীয় শনির সন্দেহদৃষ্টি নিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ২৩ কার্তিক ১৩১৮ তারিখের চিঠিতেও উল্লেখ পাওয়া যায় :

'আমাদের বিদ্যালয়ের পরেও এতদিন পরে গোপনে রাজদণ্ডপাত হইয়াছে…'। এবং 'গুপ্তচর বিদূষকের দল যেখানে রাজাকে কানে ধরিয়া চালাইতেছে সেখানে রাজ্যশাসনের সেই নিদারুণ প্রহসন কোন্ দানবীয় অট্টহাস্যে গিয়া সমাপ্ত হইবে!' দ্র. চিঠিপত্র ১২শ মূল পত্র এবং টীকা পৃ ১৪-১৫, পৃ ৪৫৭।

পত্র ৩৩। 'নববর্ষ' ॥ প্রবাসী, ১৩১৮ পৃ ১২৬-১২৯। ওই লেখাই 'অন্তরের নববর্ষ' নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ পৃ ৩১-৩৪এ প্রকাশিত হয়। 'শান্তিনিকেতন' চতুর্দশ খণ্ডে সংকলিত।

'সত্যেন্দ্রের নওরোজি' ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ইরানে নওরোজ'। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮। 'নওরোজের গান' নামে 'মণি-মঞ্জুষা'য় (১৯১৫) সংকলিত।

From the Bottom Up… ॥ The Life of Washington Irving. তু. বিলাতপ্রবাসী অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা পত্র : 'এখানে আমি বইহীনতার নির্জ্জন দ্বীপে রবিন্‌সন ক্রুশো হয়ে বসে আছি। পড়বার উপযুক্ত একখানি বই সঙ্গে ছিল সেটি দুদিনেই শেষ করেছি। বইটির নাম *From the Bottom Up*। পড়ে খুবই উপকার পেয়েছি। য়ুরোপের যেখানে মহত্ত্ব এবং আমাদের যেখানে দৈন্য এই বইটিতে সেই জায়গাটা খুব বড়ো করে দেখিয়ে দেয়…' শিলাইদহ ১৯ অক্টোবর ১৯১০।

'উলুউলু মাদারের ফুল…' ॥ 'উলু উলু মাদারের ফুল / বর আসচে কতদূর…' -ইত্যাদি, বাংলা ছড়া।

পত্র ৩৪। 'একেবারে আমার জীবনে…' ॥ 'জীবনস্মৃতি'।

সদ্য সম্পন্ন 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর ১৩১৮র জন্মোৎসবে কলকাতা থেকে আসা অভ্যাগতদের পড়ে শোনান। শান্তা দেবী লিখেছেন: 'ফিরিবার সময় রামানন্দ প্রবাসীতে "জীবনস্মৃতি" প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।' প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক হিসাবে চারুচন্দ্র সম্ভবত রামানন্দের ইচ্ছা তাঁকে পুনরায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

'ব্যাকরণের একটা কিস্তি…' ॥ কয়েকদিন আগেই রামানন্দকে লেখেন: 'ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে— এইজন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না— জ্যৈষ্ঠে যাইবে।'

এই পত্রে দেখা যায়, জ্যৈষ্ঠের আরম্ভে সে লেখা প্রস্তুত হয়েছে। প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যকরূপ' ছাপা হয়।

'বড়দাদার লেখা…' ও প্রুফ ॥ লেখা 'গীতাপাঠ'।

বৈশাখ ১৩১৮ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' যুগপৎ প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সম্ভবত স্থির হয়েছিল প্রবাসীতে পাঠানো পাণ্ডুলিপির প্রুফ থেকে তত্ত্ববোধিনীর ছাপা হবে। রামানন্দকে এক সপ্তাহ পরে লিখেছেন: 'চারুকে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা কম্পোজ হইবামাত্র সেটা ছাপিবার জন্য যেন তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮'।

'নূতন নাটক…' ॥ 'অচলায়তন'।

পত্র ৩৫। 'আপনার জীবনটা চাই…' ॥ চারদিনের মধ্যে "জীবনস্মৃতি"র জন্য দ্বিতীয় তাগাদা।

Halliday সাহেব ॥ বাংলা প্রদেশের প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর বা ছোটোলাট (১৮৫৪-১৮৫৯) সার ফ্রেডারিক জেম্‌স্ হ্যালিডে।

'এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি…' ॥ মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশ ছাড়া

রামানন্দ লিখিতভাবেও সম্ভবত 'জীবনস্মৃতি'র জন্য অনুরোধ করেন। চারুচন্দ্রের লেখা এই চিঠির তিনদিন পর রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফঃস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্ব্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল ...।'

'মাতা সীতাকে জানিয়ো...'। এ বাবদে সীতা দেবীর জবানি উদ্ধৃত করি, ১৩১৮র ২৫শে বৈশাখ দুপুরের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'নেপালবাবু আমাদের শিশুকাল হইতেই জানেন, এলাহাবাদে আমরা বহুকাল একই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আদর করিয়া আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। কবি আমাদের সামনে আসিয়া নেপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি, আপনার এখানে এসে মাতৃসম্মিলন হল নাকি?" চারুচন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "উনি যে কেবল নেপালবাবুরই মা তা নয়, আমারও বটে।" সত্যই তিনি আমাকে স্নেহ করিয়া মা বলিয়া ডাকিতেন, এ স্নেহ তাঁহার জীবনান্তকাল পর্যন্ত ছিল।

'রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে আমিও একজন candidate হলাম।"'

১৩১৮র জন্মোৎসব থেকে ফিরে আসবার পর, সীতা দেবী লিখেছেন: 'আবার উৎসব হইলেই আমরা শান্তিনিকেতনে যাইব এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাবা সে-কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, তাহার

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে লিখিলেন, "উৎসব হলে তাঁরা আসবেন এ কোন কাজের কথা নয়, তাঁরা যখন আসবেন তখনই উৎসব।"

চারুচন্দ্রকেও একই কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'তিনি আমাদের আশ্রমে গিয়ে পীড়াভোগ করেছিলেন…' ॥ ১৩১৮র জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শান্তা দেবী পীড়িত হয়ে পড়েন। পীড়ার বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

২৩শে বৈশাখ রাত্রিতে বর্তমান লেখিকা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তাহাকে লইয়া তাহার পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত, তাহাকে ফেলিয়া কোথাও যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইল হয়ত তাঁহাদের আতিথ্যের ত্রুটিতেই পীড়া হইয়াছে। তিনি রাত্রিতে তিন চার বার ডাক্তার লইয়া আসিলেন, ছেলেদের বলিলেন ভাল বিছানা করিয়া দিতে, ছেলেরা নিজেদের সমস্ত বালিশ বিছানা আনিয়া নীচু বাংলায় জড়ো করিল। কিন্তু দিনের বেলা পাঠের সভা গানের সভা অন্যত্র করিলে পীড়িতা বালিকা ও তাহার পিতা সভার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হন এই জন্য নীচু বাংলার বারান্দাতেই সভা হইতে লাগিল।

এই চিঠির পর ৯ই জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মাতা শান্তার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি— তাঁহার এই অস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা।'

এর পরেও কুশল জানতে চেয়ে চারুচন্দ্রকে লিখেছেন, 'শান্তার শরীর কেমন আছে?' দ্র. পত্র ৩৯।

' "গোরা"র সমালোচনা' ॥ শ্রীতারকচন্দ্র রায় -কৃত। বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ১৭৪-১৮০।

তারকচন্দ্র 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে' ভারতসত্তা ও

ভারতবর্ষের যে একটা দোলাচল উপস্থিত হয়েছে ‘গোরা’ উপন্যাসে তার মধ্য থেকে একটা পথসন্ধান লক্ষ্য করেছেন :

> কিভাবে সংস্কার করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত বর্তমান ভারতের বিরোধ না ঘটে, ইহা একটি কঠিন সমস্যা। আজি পর্য্যন্ত কেহ এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন বলিয়া জানি না। কিন্তু প্রশ্নটি যে অনেকের মনে জাগিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “গোরা” এই প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

পত্র ৩৬। ‘টুর্গেনেভের “মুমু”…’ ॥ ইভান সের্গীভিচ তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩), ‘মুমু’ (১৮০৪) তাঁর কারাবাসকালে দাসপ্রথার অত্যাচার নিয়ে লেখা প্রসিদ্ধ গল্প। ‘মুমু’ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নি।

‘এখানে ছুটিতে আছে ওকে দিয়ে আরো কতকগুলো জার্ম্মান ফরাসী ও রাশিয়ান গল্প তর্জ্জমা করাব…’ ॥ এই সব তর্জমারও হদিশ পাওয়া যায় না। ‘দিনেন্দ্র রচনাবলী’তেও (১৩৪৩ পৃ ৬+১২৪) দিনেন্দ্রনাথের কোনো ‘গল্প তর্জ্জমা’ সংকলিত হয় নি।

‘ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ’ ॥ ‘ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান’ (হিবার্ট জার্নাল হইতে সংকলিত)। শ্রীঅতসী দেবী। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৮ পৃ ৪৩০-৪৩৪।

তু. মীরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৬ শ্রাবণ ১৩১৮র পত্র :

‘প্রবাসীতে তোর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বেরিয়েছে— দেখেছিস ত ?’

চিঠিপত্র ৪ পৃ ২৬।

‘*From the Bottom Up* থেকে সংকলন[১]…’ ॥

‘ডাউলিং’। শ্রীঅতসী দেবী। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৫৯৮-৬০১ (*From the Bottom Up* গ্রন্থে একজন আইরিশ পাদ্রি নিজের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে আমেরিকায় ধর্ম

---

[১] *From the Bottom Up* : The Life Story of Alexander Irving.

প্রচারে নিযুক্ত আছেন। নিউ ইয়র্কের যে সকল বাসাবাড়ীতে সেখানকার দীনতম ব্যক্তিরা আশ্রয় লইয়া থাকে সেখানে দীর্ঘকাল ইনি কাজ করিয়াছেন। সেইখানকার যে দুই-একজন ব্যক্তির বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ডাউলিং একজন।)

'দরিদ্র ডিউক' (সত্য ঘটনা, *The Bottom Up* গ্রন্থ হইতে)। শ্রীঅতসী দেবী। প্রবাসী, মাঘ ১৩২০ পৃ ৩৮২-৩৮৫।

'মোহিতবাবুর স্ত্রী'র কবিতা ॥ 'কবির প্রতি'। শ্রীসুশীলা দেবী।[1] প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২৬৪-২৬৫।

'ক্ষিতিমোহনবাবুর গতিবিধি…' ॥ ক্ষিতিমোহন সেন চারুচন্দ্রের বন্ধু. শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁর যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে চারুচন্দ্রেরও হয়তো কিছু ভূমিকা ছিল।

পত্র ৩৭। 'কবিকে…' ইত্যাদি ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পরের চিঠিতে দেখা যায়: 'সত্যেন্দ্রকে কবে এখানে পাঠাবার উদ্যোগ করলে আমাকে সত্বর জানিয়ো।' ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

পরে পরে আরো দেখা যায়:

'সত্যেন্দ্রের খবর কি? তাকে বিচলিত করতে পারা গেল না— যাকে বলে ধ্রুব সত্য।'

'সত্যেন্দ্রের শরীর ত ভাল আছে?' ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

মনে হয় এ যাত্রা সত্যেন্দ্রনাথের শিলাইদহে যাওয়া হয় নি।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী সম্বন্ধে অভিমত ॥ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সংখ্যার যে-সব

---

[1] মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা সেন 'কাব্যগ্রন্থে'র জন্য প্রস্তূয়মান 'শিশু' কাব্যের গুণগ্রাহী পাঠিকা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। মোহিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অস্থায়ী বালিকাবিভাগের তিনি কিছুদিন তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর করা ইংরেজি রূপকথার তর্জমার প্রশংসা করেছিলেন এবং তার জন্য প্রকাশক সংগ্রহ করে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন তার তালিকা এই রকম :

'জীবন-বৈচিত্র্য'। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ পৃ ১১৬-১২৫[1]।
'বুদ্ধদেব' (কবিতা)। শ্রীপ্রভাসকুমার ঘোষ পৃ ১২৫-১২৬।
'নববর্ষ' (শান্তিনিকেতন আশ্রমে নববর্ষের উৎসবে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১২৬-১২৯
'প্রকৃতি সুন্দরী' (কবিতা)। শ্রীহেমপ্রভা দত্ত পৃ ১২৯[2]

---

[1] আগের রচনার পূর্বানুবৃত্তি, এই সংখ্যায় 'শৈশবে'র বিবরণ লেখা হয়েছে।

[2] রবীন্দ্রনাথ যে কবিতার এতখানি বিশ্লেষণ করেছেন তা এখানে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া যেতে পারে :

প্রকৃতি সুন্দরী

ফুল আজি তব গন্ধে হয়েছে সুরভি।
তব লজ্জা আঁকিয়াছে রাঙা করি রবি।
নদী আজি গাহে তব হৃদয়ের গান
সকরুণ সুরে। লভিয়াছে নব প্রাণ
সকল জগৎ। মোর দগ্ধ তপ্ত হিয়া
তোমার চরণপ্রান্তে পড়িছে লুটিয়া
বিফল বেদনা ভরে। তোমার আহ্বান
ধ্বনিয়া তুলিছে আজি অভিনব তান
মৃদু-মন্দ সুরে মোর হৃদয়-বীণায়।
দূরে কোন মায়াপুরে কভু দেখা যায়
নীরব তোমার হাসি। ছল ছল আঁখি
কভু রচে মায়াজাল বেদনায় মাখি।
অনন্ত আকাশখানি তব রূপে ভরি
অতৃপ্ত নয়নদুটি করিতেছে পান।
কল্পনা এঁকেছে আজি তোমারে সুন্দরী
গোপন হৃদয়পটে; প্রেম দেছে প্রাণ।

শ্রী হেমপ্রভা দত্ত

‘নির্বাণ’। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ পৃ ১৩৫-১৪১[১]
‘যযাতির স্বর্গপ্রাপ্তি’ (নাট্যকবিতা)। শ্রীনিরুপমা দেবী পৃ ১৪২-১৪৫
‘লাভ’ (কবিতা)। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী পৃ ১৫০
‘মহাকর্ষণ’। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃ ১৬৩-১৬৯
‘চন্দ্র ও সূর্য্য’ (চতুষ্পদী কবিতা)। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ পৃ ১৬০
‘দুই বন্ধু’ (চতুষ্পদী কবিতা)। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় পৃ ২০৩
‘নমস্কার’ (কবিতা)। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ ১৮৭
‘জন্মদুঃখী’ (উপন্যাস) প্রথম পরিচ্ছেদ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ ১৮৯-১৯৩[২]

‘তোমার সমালোচনা’: বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৭য় প্রকাশিত তারকচন্দ্র রায়ের ‘নব্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ’ প্রবন্ধকে ‘কষ্টিপাথরে’র মাসিকপত্র আলোচনা স্তম্ভে চারুচন্দ্র দেড় কলম ৭৪ লাইন ব্যাপী বর্জয়িস অক্ষরে ‘চিন্তালেশহীন অক্ষম রচনা’ বলে নিপাতিত করেছিলেন।

‘লাভ’ সনেটের লেখিকার অপর যে রচনাটি রবীন্দ্রনাথ ‘প্রশংসার যোগ্য’ বিবেচনা করেছিলেন সেটি প্রবাসীর পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়:

‘অর্ঘ্য’ (শ্রদ্ধাস্পদ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত)। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২৬৫-২৬৬[৩]

---

[১] পরের সংখ্যায় সমাপ্য এই অংশে ‘শাক্যসিংহের ধর্ম্মে’র প্রসঙ্গ আলোচিত।

[২] ‘ ‘জন্মদুঃখী’ নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie- রচিত *Livsslaven* নামক উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে’। প্রবাসীতে প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ - চৈত্র ১৩১৮, গ্রন্থাকারে ১৩১৯ পৃ ১৬২।

[৩] প্রফুল্লময়ী দেবীর ‘অর্ঘ্য’ কবিত নিয়ে সাহিত্য পত্রিকা টিপ্পনি করেছিলেন: ‘শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে “কবি-সম্রাট” উপাধি দিয়াছেন। যদি “সাহিত্যিক”দিগকে খাজনা দিতে হয় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। আশা করি নূতন সম্রাট অওরঙ্গজেবের মত অপর পক্ষের উপর জিজিয়া কর ধার্য্য করিবেন না।’ ‘মাসিক সাহিত্য সমালোচনা’, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৮।

উল্লেখযোগ্য, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সুকুমার রায় -প্রণীত 'ফটোগ্রাফি' রচনাটির রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি।

পত্র ৩৮। 'তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল'। 'জীবনস্মৃতি' প্রবাসীতে সমর্পণ করার প্রসঙ্গ। একই দিনে ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮য় রামানন্দকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন, 'জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। এবং 'জীবনস্মৃতি' অনেকটা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে…' অর্থাৎ 'সমর্পণে'র এখনও কিছু দেরি।

'অজিতের প্রবন্ধ…'॥ রামানন্দকে লেখা পূর্বোল্লিখিত চিঠির পরের লাইনেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

…কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন— তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে।

অজিতকুমারের প্রবন্ধ প্রস্তুত হয়েছিল ১৩১৭ চৈত্রে। দ্র. মীরা দেবীকে লেখা শান্তিনিকেতন থেকে চৈত্র ১৩১৭য় রবীন্দ্রনাথের চিঠি :

'অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য-রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে…'।

চিঠিপত্র ৪ পৃ ১৯।

১৩১৮র রবীন্দ্রজন্মোৎসবে অভ্যাগতদের তিনি লেখাটি পড়ে শোনান। দ্র. সীতা দেবী : 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ২৪। আষাঢ়-শ্রাবণ দুই সংখ্যা প্রবাসীতে অজিতকুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

‘রবীন্দ্রনাথ’। অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২৩৩-২৫৩ ও প্রবাসী, শ্রাবণ১৩১৮ পৃ ৩৪০-৩৫৯। গ্রন্থাকারে : ‘রবীন্দ্রনাথ’। অজিতকুমার চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৩১৯ পৃ ১০৫ মূল্য ॥০। প্রবাসীতে সমালোচিত আষাঢ় ১৩২০ পৃ ৩৮৪। গ্রন্থের ‘নিবেদন’ স্থলে লেখক বলেছেন :

‘কবিবর স্বয়ং তাঁহাকে নূতন সংস্করণের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটিকে গ্রহণ করিয়া আমাকে আশাতীতরূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন। আমার ভক্তির এই তুচ্ছ অর্ঘ্য যে তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, ইহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।’

পত্র ৩৯। ‘জ্ঞানের হাত দিয়ে…’॥ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তু. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮র চিঠি :

‘কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি— বোধ হয় পাইয়াছেন।’

অর্থাৎ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৩১শে মে ‘জীবনস্মৃতি’র কপি প্রবাসীতে পাঠানো হয়েছে। চারুচন্দ্রকে লেখা এই চিঠি হয়তো ১৯শে জ্যৈষ্ঠের লেখা। সীতা দেবী জানিয়েছেন, ‘১৫ই কিংবা ১৬ই মে তিনি শিলাইদহ হইতে বাবাকে একখানি চিঠি লেখেন এবং “জীবনস্মৃতি” এক কিস্তি ডাকে আমার নামে পাঠাইয়া দেন।’

‘আর বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস…’॥ ১৮ কার্তিক ১৩১৮র পত্রে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন, ‘আমার সঙ-বর্দ্ধনা’। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রদত্ত কবি-সংবর্ধনা, ১৪ মাঘ ১৩১৮য় কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত।

‘ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে ‘জীবনস্মৃতি…’॥ ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত বর্ষকাল ধরে প্রবাসীতে ‘জীবনস্মৃতি’ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

‘সাময়িকপত্রাদি…’॥ ১৮ জ্যৈষ্ঠের চিঠিতেই রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য আজই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে আপনার পত্রে তাহার উল্লেখ পাইলাম।’[১]

প্রবাসীর জন্য ‘সংকলন’ লেখবার সূত্রে ‘ব্যবহৃত’ বা অব্যবহৃত সাময়িকপত্রাদি রামানন্দ বরাবরই পাঠিয়েছেন। রামানন্দের পাঠানো এই-সব পত্রিকা রথীন্দ্রনাথ সংগ্রহ ও রক্ষা করেছিলেন, দ্র. নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রথীন্দ্রনাথের চিঠি।[২]

পত্র ৪০। ‘আমার ব্যাকরণ…’॥ বৈশাখের কোনো সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী-সম্পাদককে লিখেছিলেন, ‘ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে—এইজন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না—জ্যৈষ্ঠে যাইবে।’

জ্যৈষ্ঠে চারুচন্দ্রকে লেখেন, ‘ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই…’। সম্ভবত এতদিনে সে লেখা পাঠানো হয়ে উঠল।

‘তির্য্যকরূপের মধ্যে যেরূপ আছে…’॥ প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্ রূপ’ প্রবন্ধ।

‘ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে…’॥ ইতোপূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ভারতী, বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্বের ব্যাকরণ-লেখা নিয়ে ‘গদ্যগ্রন্থাবলী’র পঞ্চদশ ভাগ রূপে ‘শব্দতত্ত্ব’ (১৩১৫) প্রকাশিত হয়েছিল। এই সূত্রে ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ দ্বাদশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় স্থলে বলা হয়েছে : ‘১৩০৮ সালে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত যে “আন্দোলনে”র সূত্রপাত হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ তাহার অগ্রণীস্বরূপ।’ প্রবাসীর এই পর্যায়েও রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ব্যাকরণ

---

[১] চিঠিপত্র ১২ পৃ ৯

[২] ‘রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য’ ১৯৮৮ পৃ ২৫

প্রসঙ্গ লিখতে প্রবৃত্ত হন, ধারাবাহিকভাবে না হলেও তাতে এই কয়টি প্রবন্ধ পর পর প্রকাশিত হয়—

বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌ রূপ। আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২২৪-২২৬
বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য। ভাদ্র ১৩১৮ পৃ ৪৬৯-৪৭৮
বাংলা নির্দ্দেশক। আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৬৭২-৬৭৪
বাংলা বহুবচন। কার্তিক ১৩১৮ পৃ ৯০-৯৩
স্ত্রীলিঙ্গ। অগ্রহায়ণ ১৩১৮ পৃ ১২০-১২২

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৮ সংখ্যায় (পৃ ৩৭৬-৩৭৭) সতীশচন্দ্র বসু 'কোন কোন স্থান ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না' বলে 'তির্য্যক রূপে'র এক সমালোচনা লেখেন। অপর সব লেখার অনুবৃত্তি বা প্রতিক্রিয়া রূপে বিজয়চন্দ্র মজুমদার যোগেশচন্দ্র রায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণপ্রসঙ্গ আলোচনাও প্রবাসীতে পিঠোপিঠি প্রকাশিত হয়েছিল।

'জিনিষটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করছি…'॥[১] সেই সঙ্গে লিখেছেন, তাতে 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ'ও ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তবু বিদ্বৎজনের পরিতোষ যদি না হয়—

আপরিতোষাদ্‌ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ ১. ৬।

'এবারকার কষ্টিপাথর…'॥ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর 'কষ্টিপাথরে' তারকচন্দ্র রায় সম্বন্ধে তিরস্কার কিছু অতিশয় হয়েছিল, 'লাঠির বাড়ি'র বদলে 'এক কোপে সেরে দিলেই' ঠিক হত বলে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করেছিলেন। তারকচন্দ্র ভারতী বঙ্গদর্শনেরও সংযুক্ত লেখক রূপে গণ্য ছিলেন।

---

[১] 'জীবনস্মৃতি'র পূর্বতন খসড়ায় দেখা যায়, গ্রন্থসূচনাটি অন্যরকম ছিল। দ্র 'জীবনস্মৃতি' খসড়া। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ পৃ ১১০-১১১।

'শরৎবাবু…' ॥ শরৎকুমার রায়।

পত্র ৪১। 'সংশোধিত প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে…' ॥ ৫৫ নম্বর অপার চিৎপুর রোডস্থিত আদিব্রাহ্মসমাজের মুদ্রণালয় থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছেপে বার হত।

'সেই নাটকটা…' ॥ 'অচলায়তন'।

পত্র ৪২। 'Tourgeuev-এর Triumphant Love নামক একটি সুবিখ্যাত গল্প…' ॥ 'প্রেমের জয়জয়ন্তী' (Turgenieuffএর *The Song of Triumphant Love* গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে)। শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮ পৃ ৫১০-৫২২। *The Song of Triumphant Love* (১৮৮১) গুস্তাভ ফ্লবেরের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গিত। তুর্গেনেভের শেষ জীবনের গল্প। তাঁর 'আসীয়া' বা 'ফার্স্ট লাভ' ইত্যাদির তুলনায় অপূর্ণতাবহ বলে মনে করা হয়, খানিকটা লীডার বা ফুটকি-চিহ্নের আধিক্যের জন্যও বটে। কার্লাইল ও গল্স্ওয়ার্দি উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন গল্পটির। দিনেন্দ্রনাথের অনুবাদ, ভারতীগোষ্ঠীর অতুলনীয় রূপে, বিশেষভাবেই মূলানুগ।

'কবিকে আমার কবিজীবনটা…' ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও 'জীবনস্মৃতি'।

'পথপ্রদর্শক…' ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বিবাহ ৪ বৈশাখ ১৩১০।

পত্র ৪৩। 'নাটকখানা…' ॥ 'অচলায়তন' নাটক।

পত্র ৪৪। 'নাটকটা শেষ করেছি…' ॥

২রা জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'একটা নতুন নাটক লেখবার চেষ্টায়' রয়েছেন, 'দুই একদিনের মধ্যেই শুরু' করবেন। ৪১ নং চিঠিতে ফের উল্লেখ পাই 'সেই নাটকটা এতদিন পরে একটু মন দিয়ে লেখবার অবকাশ পাওয়া গেছে', শুধু তাই নয়, 'নাটকটা নিয়ে আটকে পড়া গেছে' বলে কোথাও বেরিয়ে পড়ার বাধা। ১লা আষাঢ়ের চিঠিতে দেখা যায় 'নাটকখানা লিখতে শুরু' করেছেন

এবং 'রাজকীয় আলস্যে ভরপুর হয়ে বসে'ও *এরই মধ্যে 'একটা* অঙ্ক শেষ হয়েছে'। ১৪ই আষাঢ় ২৯শে জুন নাটকখানি শেষ হয়েছে লেখা। অর্থাৎ ১৬ মে থেকে ২৯ জুনের মধ্যে 'অচলায়তন' নাটকের সংকল্প থেকে সমাপ্তি।

জুলাইয়ের প্রথম রবিবার কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নাটকখানি পাঠ করে শোনান। এ সম্বন্ধে সীতা দেবী লিখেছেন :

'সেদিন রবিবার ছিল। বিকাল হইতে-না-হইতে আমরা কয়জন বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম কতক্ষণে তিনি আসিবেন। প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে ইহারই মধ্যে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।···

শ্রোতার দল আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল।··· পাঠের ব্যবস্থা যে জায়গায় হইয়াছিল, লোক তাহার তুলনায় অতিরিক্তই হইয়া গিয়াছিল। ক্রমাগতই একজনের পর একজন নূতন শ্রোতা আসিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ আবার গোড়া হইতে শুরু করিতেছেন। 'অচলায়তনে'র অনেক গান, সবগুলি তিনি একাই গাহিয়া গেলেন। তবে গলা একটু ভার থাকায় নীচু গলায়ই গাহিলেন। লোকের ভীড়ে আর কথাবার্ত্তা বলিবার কোন সুবিধা হইল না। তাহার পরদিনই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।[১]

পত্র ৪৫। 'শেষকালে নাটকটা···' ॥ 'অচলায়তন' রচনা সমাপ্তি ১৪ই আষাঢ় ১৩১৮। উৎসর্গপত্র লেখা পরদিনে। 'আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপে এই অচলায়তন বইখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের নামে উৎসর্গ করিলাম। ১৫ই আষাঢ়। শিলাইদহ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশ : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৫৫৪-৫৯২। গ্রন্থাকারে : অচলায়তন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ

---

[১] 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৫২-৫৪।

যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ২ অগস্ট ১৯১২ মূল্য বারো আনা, পৃ ১৩৮।

'অচলায়তনে'র জন্য প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে এক সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠা এবং ২০০ টাকা সম্মানদক্ষিণা দিয়েছিলেন।

'এই [নাটক] নিয়ে কাগজে-পত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি চলবে...'। তু. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি : 'আর্য্যাবর্ত্তে অক্ষয় সরকার অচলায়তন সম্বন্ধে খুব একটা সচলায়তনের সমালোচনা ঝেড়েচেন। দেখেছ?' অক্ষয় সরকার লেখেন, 'অচলায়তনে আছে কেবল একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানীর উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা।' দ্র. আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়া মাত্রে প্রবাসী 'অচলায়তনে'র এই আলোচনা মুদ্রিত করেন :

এই নাটকখানি সমগ্র গত বৎসর আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বাহির হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ইহার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রতিবাদ, সমালোচনা ভদ্রভাব হইতে অভদ্রভাবে পর্যন্ত হইয়া গেছে। ভালো জিনিষ চিরকাল এমনি দুকূল রাখিয়া চলিতে পারে না; একদলের তাহা বরণীয় হয়, এবং অপরদলের হয় অসহনীয়। এই গ্রন্থখানিতে আশ্চর্যরকম নাট্যকৌশলে অর্থহীন আচার ও কুসংস্কারের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিচার ও প্রেমের উদারতার প্রতিবাদ কবিত্বরসে ভিজাইয়া তোলা হইয়াছে। যে সকল রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী লোক ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহার চমৎকার কবিত্বের অপলাপ করিতে পারেন নাই। মতে না মিলিলেও এই হিসাবে এ পুস্তকখানি সকলেরই পরম উপভোগ্য হইয়াছে। মহাকবির এই অসাধারণ নাটকখানি যে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিচারমূলক প্রতিবাদ হইলেও অসাম্প্রদায়িক তাহা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এ গ্রন্থ প্রবাসীর পাঠকের সুপরিচিত; সুতরাং পল্লবিত সমালোচনা

নিষ্প্রয়োজন।—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ পৃ ৫৮৪-৫৮৫।

আলোচনা চারুচন্দ্রের করা বলেই মনে হয়।

'তোমাদের সম্বর্দ্ধনাটা…' ॥ ১৪ মাঘ ১৩১৮, ২৮ জানুয়ারি ১৯১২য় টাউন হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনার আয়োজন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কিন্তু তার সূত্রপাত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অনামিকা গৃহসভায়' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই 'ক্ষুদ্র পঞ্চকে'র উদ্‌যোগে; প্রস্তাবক, চারুচন্দ্রের সাক্ষ্যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অতঃপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শক্রমে 'কৃতবিদ্য ও কৃতিসমাজের' সহকারে একটি সংবর্ধনা সমিতি গঠিত হয় এবং সমিতির অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্র. যতীন্দ্রমোহন বাগচী : 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' ১৩৫৪ পৃ ৩৭-৪২ ; পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত 'কবি-সংবর্ধনা : ১৩১৮-১৩২৮', দেশ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮ পৃ ৩৫-৪৫।

'জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েচি… : 'জীবনস্মৃতি'র পাঠ সংস্কার। কালীপদ রায় জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' লেখায় প্রবৃত্ত হন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের হাতে লেখা 'শান্তি' পত্রিকার ছাত্র-পরিচালকদের নির্বন্ধে। 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পরিচ্ছেদটি 'সর্বপ্রথম' সেখানে প্রকাশ পেয়েছিল। দ্র. 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' ১৩৮৮ পৃ ৭২-৭৩।

চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার আগে ১৩১৮র জন্মোৎসবে অভ্যাগতদের কাছে পঠিত 'জীবনস্মৃতি'র লেখা অনেকটাই সংস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রামানন্দকে লেখা চিঠিতে পর পর এই সংশোধনের উল্লেখ আছে :

১. ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ : 'আমি ওই লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি…'।

২. ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ : 'জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে— সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে।'
৩. ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ : যে পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে তার পরের বাকি অংশ 'আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কি না।'
চারুচন্দ্রকেও আগের চিঠিতে লিখেছেন, 'ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ…'।

এই সব পত্রের সাক্ষ্যে বোঝা যায় 'জীবনস্মৃতি'র প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের অনেকটাই তফাত হয়ে গেছে। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত প্রথম পাঠের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পুলিনবিহারী সেন ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'জীবনস্মৃতির খসড়া' সংকলন করেছিলেন। অতঃপর নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- সম্পাদিত 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয় বিবরণে এই পূর্বতন খসড়ার তথ্য ও পাঠ প্রাসঙ্গিক স্থলে মুদ্রিত হয়। দ্র. 'জীবনস্মৃতির খসড়া'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০ পৃ ১০৯-১২৭ ও 'গ্রন্থপরিচয় : জীবনস্মৃতি'। বিশ্বভারতী বিশেষ সংস্করণ ১৩৬২ পৃ ১৫৭-২২৯।

'জীবনস্মৃতির খসড়া'র গোড়াতে সংকলয়িতারা খসড়ার মুদ্রণের এই প্রধান দুটি কৈফিয়ত দিয়েছেন :
'আত্মপরিচয় দিতে গিয়া যেখানে ইঙ্গিতমাত্র করিলে চলিত সেখানে কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলে লেখককে যাঁহারা অতিকথনের অপবাদ দিবেন না, তাঁহারা আনন্দিত ও উপকৃত বোধ করিবেন মনে করিয়া এই পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ মুদ্রিত হইল।'

দ্বিতীয়ত, 'খসড়াটিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি আছে যাহা সম্ভবত কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, এবং মূল চিঠিগুলিও এতদিনে বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।'

বারংবার 'সাফসোফ করে' 'জীবনস্মৃতি'কে 'সাহিত্যে চলবার

মতো' করে তুলতে সযত্ন হয়েছেন লেখক। বইয়ের যে তিনটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার তৃতীয়টি 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়, এর পরেও গ্রন্থের পাঠ তিনি পুনরায় সংস্কার করেছেন যদিও পত্রিকার শেষ কিস্তি আর গ্রন্থের প্রকাশকালের ব্যবধান সামান্যই। পত্রিকার পাঠ ও গ্রন্থমধ্যে সংস্কার সূত্রে দ্র. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়: 'কলকাতার গুপ্ত সমিতি— উনিশ শতক' ১৩৯২ পৃ ১৭৭-১৮৪।

প্রসঙ্গত, 'জীবনস্মৃতি' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় -প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য 'কাব্যের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে' লিখেছিলেন। দ্র. 'বঙ্গভাষার লেখক'। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত ১৩১১ পৃ ৯৬৪-৯৮৪।

'সুফিধর্ম' ▪ হেমলতা দেবী লিখেছেন, 'পূজ্যপাদ কবি আমাকে সুফীবাদের ইংরাজি গ্রন্থ পড়াতেন সে সময়ে। একবার পড়িয়ে দিয়ে পরদিন সেটা লিখে আনতে বলতেন। লেখাগুলি সংশোধন করে দিতেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।… সুফী মতের অনুবাদগুলি সে সময়কার তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশ হয়েছিল।' দ্র. 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ম্মুখিন সাধনার ধারা'। বঙ্গলক্ষ্মী, কার্তিক ১৩৪৮ পৃ ৬৪২।

সুফী মত সম্বন্ধে হেমলতা দেবীর এই লেখাগুলি ১৩১৮-১৩১৯ সাল ১৮৩৩-১৮৩৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

'সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা'। আশ্বিন-কার্তিক ১৮৩৩ শক পৃ ১৫১-১৫৩
'সুফী আশ্রম'। মাঘ ১৮৩৩ পৃ ২৩৮-২৪০
'সুফী গুরু ও সুফী শিষ্য'। চৈত্র ১৮৩৩ পৃ ২৭৫-২৭৮
'সুফীদের ভ্রমণ'। বৈশাখ ১৮৩৪ পৃ ১৫-১৭
'খিল্‌বৎ' (সুফী সাধকদের জন্য নির্দেশ)। অগ্রহায়ণ ১৮৩৪ পৃ ১৯৬-১৯৯

প্রথম লেখাটির উপলক্ষে লেখিকা লিখেছিলেন, 'সুফীধর্ম্মের সমস্ত

বিধিবিধান, ইহার সাধনাপদ্ধতি আলোচনা ও সংগ্রহ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফীসম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত গুরু মহম্মদ ই-সররর্দ্দি অবারিফুল মআরিক নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহারই ইংরাজি অনুবাদ হইতে আমরা সারসংকলনে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ আমাদের দেশের প্রচলিত সাধনপদ্ধতির সহিত অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন। এ সম্বন্ধে সুফীদের সহিত ভারতের ভক্তদের যে আদানপ্রদান ছিল তাহা ঐতিহাসিকের আলোচ্য।'

অন্য লেখার সূত্রে 'পারস্য সুফিশাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ হইতে' এইরূপ উল্লেখ আছে।

প্রসঙ্গত, সুফী মত নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় হেমলতা দেবীর পূর্বে পরম্পরাক্রমে লিখতে শুরু করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৩৩ শকের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

পত্র ৪৬। 'রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি' ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত ওই নামের লেখা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৮৩৩ শক পৃ ১৬৭-১৬৯।[১]

রচনাটি সারসংকলন মাত্র নয়, পুরাতন-ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার সহায়তায় এদেশের আধুনিক ধর্মীয় পরিস্থিতির অনুধাবন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিন শতাব্দীর প্রাচ্য প্রভাবে রোমীয় বহুদেববাদের যে পরিণতি ঘটিয়াছিল, জর্ম্মান পণ্ডিত ফ্রান্জ্ কুমণ্ট্ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনের সহিত রোমের তাৎকালিক অবস্থার সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।'

---

[১] 'রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি' প্রবাসী, 'কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। দ্র. প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮ পৃ ৩০৪-৩০৫।

মূল প্রবন্ধের বক্তব্য উপস্থাপনের পর তুলনামূলকভাবে তাঁর দেশকালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সংকলয়িতা :

> বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রায় এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়। সেই জন্যই কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ অথবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শেষ বয়সের মতের সহিত হিন্দুসমাজের মতের মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে একসময়ে উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী মত পরিবর্ত্তনের কোনো গুরুতর বিঘ্ন ঘটায় নাই। বস্তুত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমের ন্যায় ভারতেও ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন মতের সহিত নবীন মতের যে একটি আনাগোনা চলিতেছে তাহা একটু দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে—ইহাদের বিরুদ্ধতা ক্ষয় হইয়া ইহাদের ভেদচিহ্ন যে প্রতিদিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংকলয়িতার মতে, ‘জর্ম্মান পণ্ডিত রোমের বহুদেববাদের যে পরিণতি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এমনি রেখায় রেখায় আমাদের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মবৈচিত্র্য ও তাহার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ছবি আঁকিয়া দিয়াছে।’

পত্র ৪৭। ‘বাংলা নির্দ্দেশক’॥ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮ পৃ ৬৭২-৬৭৪।[১] ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ নামে ‘শব্দতত্ত্বে’র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) অন্তর্ভুক্ত।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার : ‘অশ্বের মনস্তত্ত্ব’। প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৮ পৃ৭৩-৭৬।

‘শরৎবাবুর সংকলন’॥ শরৎকুমার রায়, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

---

[১] পরের মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। দ্র. ‘“বাংলা নির্দ্দেশক” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’। প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৮ পৃ ৯৫-৯৬।

‘সোনার তরীর ইংরেজি তর্জমা’ ॥ *The Fugitive and other Poems*. Macmillan 1921এর ১৭ সংখ্যক কবিতা রূপে আছে ‘সোনার তরী’র তর্জমা। অজিতকুমারের অনুবাদটি মুদ্রিত হয়েছিল কি না জানা যায় নি।

‘বিখ্যাত কবি ও ঋষি Edward Carpenter...’ ॥ গীত রচয়িতা ও বিজ্ঞান প্রচারক, ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক এডোয়ার্ড কার্পেন্টার (১৮৪৪-১৯২৯) শ্রমিক আন্দোলনে ও সোশিয়ালিস্ট আন্দোলনে প্রথমাবধি সক্রিয় ছিলেন, পরে প্রধানভাবে ধর্মভাবিত হন। মুক্তচ্ছন্দে লেখা তাঁর কবিতায় হুইটম্যানের প্রতি বিশেষ অনুরাগের পরিচয় আছে।

‘সেই মহিলা…’ ॥ সম্ভবত সার হেনরি কটনের সহোদরা মিসেস্ টমাস, বিলাতে অসুস্থতার সময় অজিতকুমারকে মাতৃসমা পরিচর্যা করেছিলেন এবং যাঁর অনুরোধে অজিতকুমার শুয়ে-শুয়েই রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা তর্জমা করে শুনিয়েছিলেন। দ্র. লণ্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১০ নভেম্বর ১৯১০এর পত্র :

> কাল অক্সফোর্ড যাচ্ছি। আপনার কবিতা বিস্তর তর্জমা হয়েছে—এখানে কাউকে কাউকে শুনিয়েছি, সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু কাউকেই পাচ্ছি না যে ওগুলো revise করে নেবে। তাই অপেক্ষা করছি।

‘প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুতে আমার ছবি…’ ॥ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮য় ‘জীবনস্মৃতি’ রচনার সূচনাপত্রে (পৃ ৪৪১) মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯১১য় রবীন্দ্রনাথ থেকে যদুনাথ সরকার-অনুবাদিত *Beauty and Self Control* রচনার সূচনাপত্রে (পৃ ২২৫) বাবু সুকুমার রায়-কর্তৃক গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ‘একপঞ্চাশৎ জন্মদিনের ফটোগ্রাফ’ মুদ্রিত হয়েছিল।

‘ভারতীর জন্য গল্প…’ ॥ সম্ভবত ‘রাসমণির ছেলে’। ভারতী, আশ্বিন ১৩১৮য় প্রকাশিত। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে গল্পটির বিষয় লিখছেন :

‘কাল শনিবারে গল্পটা লিখে শেষ করেছি। আজ রবিবার রেজেষ্ট্রি ডাক বন্ধ বলে ডাকে দেবার সুবিধা হল না। সৌভাগ্যক্রমে ফণী বলে একটি ছাত্র কলকাতায় যাচ্চেন তাঁরই হাতে দিয়ে দিলুম—এতক্ষণে হয়তো পেয়েছ। তোমাদের সময় অল্প বলেই এই উপায় অবলম্বন করা গেল।’

এই গল্পের জন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীর কাছে দক্ষিণার দাবি করেছেন, পূর্ব চিঠিতেই লিখেছেন, ‘তুমি বোধ হয় জান অচলায়তনের জন্যে রামানন্দবাবু আমাকে ২০০ টাকা দিয়েছেন। তোমরা যা দেবে আমি শিরোধার্য করে নেব, কিন্তু একেবারে বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করি নে।’[২]

পত্র ৪৮। “সওগাদ”॥ সওগাত (ছোটো গল্প সংকলন) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা ১৩১৮ পৃ ১৫২+৮ মূল্য আট আনা।

‘সওগাত’ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গিত :

‘শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / প্রিয়বরেষু—’। ‘বন্ধু / আমার জীবনের পুলক-বেদনার / সওগাত / তোমাকে দিলাম / চারু’।

‘সওগাত’ ১৬টি ছোটো গল্পের সংকলন। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮য় আলোচিত।

‘তুমি শারদোৎসবে এসো…’॥ পূজার ছুটির আগে ৬ই আশ্বিন ১৩১৮ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ‘শারদোৎসব’ অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। তু. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১১ তারিখের চিঠি[১]

‘সত্যেন্দ্র ও চারুকে বোলো ৬ই আশ্বিন শনিবার রাত্রে এখানে

---

[২] শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৭৩ পৃ ১৮।

[১] ‘পত্রাবলী’। শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৭৩ পৃ ১৮।

শারদোৎসব হবে। যদি সেদিন দুপুরের ট্রেনে রওনা হন, তাহলেও যথাসময়ে এসে উপস্থিত হতে পারবেন। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৮।

অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা চিঠি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১[২] :

'আমাদের এখানে ৬ই আশ্বিনে শারদোৎসব হইয়া ছুটি হইবে।… যদি সম্ভব হয় তবে তুমি আমাদের ৬ই আশ্বিনের উৎসবে আসিয়া যোগ দিতে পারিলে আনন্দিত হইব।… ইতি শনিবার [৩০ ভাদ্র ১৩১৮]।'

প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠি, ? ১৯১১[৩]

'এখানে শারদোৎসব অভিনয়ের আয়োজন চলচে। আমাকে সবাই মিলে সন্ন্যাসী সাজাচ্চে। কলকাতা থেকে এবারেও মেয়ের দল সব আসচেন।'

কলকাতা থেকে এবারেও এই অনুষ্ঠান দেখতে অনেকেই এসেছিলেন— চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, কৃষ্ণকুমার মিত্রের দুই কন্যা। রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী সেজেছিলেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী ঠাকুরদাদা, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় লক্ষেশ্বর, প্রমথনাথ বিশী ধনপতি। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে লালচে কাগজে ছাপা প্রোগ্রামে নতুন তিনটি গান ছিল, তার একটি 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। সীতা দেবী এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ রক্ষা করেছেন তাঁর বইয়ে।[৪]

পত্র ৪৯। 'নিবেদিতা'॥ মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ (১৮৬৭-১৯১১), নিবেদিতার মৃত্যুতে লেখা প্রবন্ধ 'ভগিনী নিবেদিতা'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ পৃ ১৬৬-১৭৩, 'পরিচয়' (১৯১৩) গ্রন্থে সংকলিত পৃ ৯২-১০৫।

ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যু হয় ১৩ অক্টোবর ১৯১১য়, মৃত্যুকালে

---

[২] রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ পৃ ১৯।

[৩] চিঠিপত্র ৩ পৃ ১৭।

[৪] 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৫৯-৭১।

জগদীশচন্দ্র-অবলা বসুর আমন্ত্রণক্রমে তিনি দার্জিলিঙে রায় ভিলায় বিশ্রাম যাপন করছিলেন। বসু-পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার অনেক দিনের প্রিয়সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, জগদীশচন্দ্রের 'কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন নিবেদিতাকে।' প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৪ ও নভেম্বরের মডার্ন রিভিউয়ে (১৯১১) অবলা বসু নিবেদিতার সম্বন্ধে দীর্ঘ স্মৃতি-তর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিবেদিতার সৌহৃদ্য হয়েছিল, জগদীশচন্দ্রেরই সূত্রে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be *my* friend too!'—রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি, কলকাতা ১৬ জুন ১৮৯৯।[১] নিবেদিতা অতিথি হয়ে এসেছিলেন শিলাইদহে, বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অপর বন্ধুদের সাথী হয়ে, রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও নিবেদিতার সাহায্য চেয়েছিলেন শিক্ষিকারূপে, বঙ্গদর্শনে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের বিবরণ লিখেছিলেন নিবেদিতার পাঠানো তথ্য অবলম্বন করে, গোরার চরিত্র রচনাতেও স্বীকার করেছিলেন নিবেদিতার দৃষ্টান্ত।[২]

---

[১] বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলকাতা থেকে লেখা চিঠি। *Letters of Sister Nivedita* Vol 1, April 1982 pp 1651-66.

[২] ১৯০৪এর বর্ষশেষে নিবেদিতা গিয়েছিলেন শিলাইদহে, অবলা বসু - জগদীশচন্দ্র তখন সেখানে, সম্ভবত ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৪ থেকে ২ জানুয়ারি ১৯০৫ এই শিলাইদহ বাস। দ্র. শ্রীমতী ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি, ১৭ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ১৯০৫। *Letters of Sister Nivedita* Vol II April 1982 p 711.

রবীন্দ্রনাথ সদলে বুদ্ধগয়া যান ১৯০৪এ পূজাবকাশের সময়। নিবেদিতার

নিবেদিতার মৃত্যুর পর ১৮ কার্তিক ১৩১৮য় শিলাইদহ থেকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'নিবেদিতা সম্বন্ধে

পত্রে দলটির বিবরণ পাওয়া যায়। The Great Day of Durga Puja 1904এ নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন (C/o The Raja of Amwa, Zemindari House, Rajgir থেকে ১৫ অক্টোবর ১৯০৪এ লেখা) '...We have been a party of 20 spending 4 days at Bodh-Gaya —in the Guest-House— and I think it has been an event in all our lives. The Boses were there—and 2 children, 4 in all. The Poet [রবীন্দ্রনাথ] was there with his son and a friend—a prince with his tutor. 3 of my boys, a distinguished scholar, and another friend, and Swami Sadananda and his nephew, also Christine.

এই distinguished scholar পাটনা কলেজের ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক যদুনাথ সরকার।

যদুনাথ সরকার পরবর্তীকালে ওই ভ্রমণের কথা স্মরণ করেছেন, দ্র. *Sister Nivedita as I knew Her*, Hindusthan Standard, Puja Annual 1952. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সবিস্তারে লিখেছেন এই ভ্রমণের প্রসঙ্গ :

...মনে পড়ে বুদ্ধগয়ার কথা। ১৯০৪ সাল হবে। জগদীশচন্দ্র, শ্রীমতী অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতাসহ বুদ্ধগয়া যাবেন স্থির করেন, পিতৃদেবকে অনুরোধ করলেন সঙ্গী হতে। ক্রমে দলটি বেশ বড় হয়ে গেল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর ও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালু কর্তা), আমি ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার— কেউ বাদ পড়লুম না। আমরা বুদ্ধগয়ার মোহান্তের অতিথি হব ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেষ প্রয়োজন হয় নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল তাতেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম।

এই সময়ের বিবরণ লিখতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ আরো স্মরণ করেছেন

...মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারো আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস

প্রবাসীতে কিছু লেখবার জন্য জগদীশ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন —আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম তাই সেইটে লিখ্‌চি…'। একই দিনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখা এই চিঠি, 'আজ সেই নিবেদিতা সম্বন্ধীয় লেখাটি শেষ করিয়াছি—যদি সময় থাকে তবে আজই

নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল।…

বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব একই পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, মাত্র দু-তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল। বড়ো দুঃখ যে তার আজ কোনো অনুলিপি নেই।

'আচার্য জগদীশচন্দ্র'। 'পিতৃস্মৃতি'র সংযোজন ১৩৭৮ সং পৃ ২৫৩-২৫৪।

লণ্ডনে ১৯০০ সালের শেষ দিকে নিবেদিতার অনুবাদিত দুটি গল্পের কথা জানা যায়, তার একটি মাত্র ('কাবুলিওয়ালা') গল্পের সন্ধান মেলে পরে।

শিলাইদহ গৃহবিদ্যালয়ের জন্য নিবেদিতার সাহায্য চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের বাড়ি দিতে চেয়েছিলেন নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কারণে, দ্র. মিস্ ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি ৪-৫ জুলাই ১৯০৪ : 'Mr. R. N. Tagore has offered me his beautiful house for a Normal School.' *Letters of Sister Nivedita* Vol II 1982 pp 653-654. এবিষয়ে নিবেদিতার রক্ষিত চিঠিখানি অবশ্য বঙ্গদর্শনে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটির পরে লেখা।

পরবর্তীকালে 'গোরা' অনুবাদ করার সময় পিয়ার্সন 'গোরা'র সঙ্গে নিবেদিতার সম্বন্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন (শান্তিনিকেতন. ১৯২২এ লেখা চিঠি) : 'You ask me what connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I

পাঠাইব কিন্তু রেজেষ্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবে না—প্রায় এক ফর্ম্মা হইবে··· ইতি ১৮ই কার্তিক ১৩১৮।'[৩]

'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে এ দেশের দরিদ্র লোকসাধারণের জন্য নিবেদিতার 'সকরুণ সুকোমল এবং শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড মাতৃস্নেহে'র পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছেন, দরিদ্রসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য তিনি 'সতীর তপস্যা' করেছিলেন। 'মাতৃহৃদয়া' এই বিদেশিনীকে 'লোকমাতা' আখ্যায় ভূষিত করে তাঁর মহত্ত্ব ও তপস্যার গৌরব রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে তাঁদের দুজনের ধাতু ও লক্ষ্য যে ভিন্ন, 'তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে', সে কথাও বলেছেন অকুণ্ঠিতচিত্তে:

> অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।'[৪]

নিবেদিতাও যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতী হতে পারেন নি তার অন্তত দুটি পরিচয় লিখে গেছেন মিস্ ম্যাকলিয়ডের কাছে ১৫ অক্টোবর ১৯০৪ ও শ্রীমতী ওলি বুলের কাছে ৫ জানুয়ারি

---

gave her something which came very near to the plot of *Gora*. She was quite angry at the idea of *Gora* being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin.' দ্র. *The Visva-Bharati Quarterly*, August-October 1945 pp 178-179.

[৩] চিঠিপত্র ১২ পৃ ১২।

১৯০৫এ লেখা দুখানি পত্রে।

---

৪ নিবেদিতার পত্রাংশ দুটি এইরকম। প্রথমটি বুদ্ধগয়ায় থাকার সময় মিস্ ম্যাকলিয়ডকে লেখা, রাজগির ১৫ অক্টোবর ১৯০৪ :

The Poet, Mr. Tagore was ā *perfect* guest. He is almost the only Indian man I have ever seen who has nothing of the spoiled child socially about him. He has a *naif* sort of vanity in speech which is so childlike as to be rather touching. But he thinks of others all the time—as no one but a Western hostess could. He sang and chatted day and night— was always ready— either to entertain or to be entertained— served Dr. Bose as if he were his mother —struggles all the time between work for the country and the national longing to seek mukti. In short— never was any man so *ridiculously maligned* when suspected of things vulgar and immoral. But for all this, Mr. Tagore's is not the type of manhood that appeals to me. He is much more attractive to Christine.

Letters of Sister Nivedita Vol II 1982 pp 685-687.

দ্বিতীয় চিঠি শিলাইদহ বাসের অভিজ্ঞতা থেকে বিবরণ, শ্রীমতী ওলি বুলকে ৫ জানুয়ারি ১৯০৫এ লেখা :

With all our trust and regard for the Poet--and I am grateful to him for having been born !— so tenderly does he love the Bairu [জগদীশচন্দ্র], and so assiduously does he serve him !— we are learning now to understand what it was that Swamiji felt about them all. Gradually as we exhausted what we had taken with us on Friday, we both felt the pressure of an atmosphere in which we could not draw breath— in which all had become commonplace, an atmosphere in which Bo and the Poet were absolutely

'নিবেদিতা' প্রবন্ধের[৫] অল্পকাল মধ্যে বিলাতযাত্রার জাহাজে বসে ভারতবর্ষে আগত 'শ্রদ্ধাপরায়ণ ইয়োরোপীয় তীর্থযাত্রী'দের কথাতে নিবেদিতার কথা পুনরায় উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্র. 'যাত্রার পূর্ব পত্র', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৩১৯এ প্রকাশিত। পরে নিবেদিতার *The Web of Indian Life* বইয়ের নবসংস্করণের (১৯১৮) ভূমিকা লিখে দেন, ভূমিকার তারিখ ২১ অক্টোবর ১৯১৭। 'কাবুলিওয়ালার ইংরেজি'॥ লণ্ডনবাসকালে জগদীশচন্দ্র সে দেশে

---

happy and in place— but in which the Bairu seemed distorted somehow. By Monday noon, I had nothing left in me to say, either to him or to GOD.

Letters of Sister Nivedita Vol II 1982 p 711

এডোয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেছেন তার মধ্যেও তাঁর প্রতি নিবেদিতার বিরুদ্ধতার এবং এদেশের লোকসাধারণ সম্বন্ধে নিবেদিতার অপার মমতার প্রসঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

'I didn't like her' he said, 'She was so violent. He added, 'She had a great hatred for me and my work, epecially here, and did all she could against me.'

এবং

Speaking to me once of Sister Nivedita's 'violence' he added. 'But there could be no doubt of her devotion to my people. I have seen her, a delicately nurtured lady, living uncomplaining and cheerful in conditions of sheer squalor. And '(his face brightened) 'she could be *ferocious* at any wrong or injustice done to my people.'

E. P. Thompson: *Alien Homage* 1993 p 110 ও Edward Thompson : *Rabindranath Tagore Poet & Dramatist.* 1948 p 284.

[৫] নিবেদিতার *Studies from an Eastern Home* (1913) গ্রন্থে 'ভগিনী নিবেদিতা'র আংশিক অনুবাদ গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্ররচনা প্রচারে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। ২ নভেম্বর ১৯০০ তারিখের চিঠিতে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন[৬] 'তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব।' প্রসঙ্গত জগদীশচন্দ্র বহুদিন ধরেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।[৭] অনুবাদের জন্য তিনি লোকেন পালিত এবং Mrs. Knightএর[৮] নাম প্রস্তাবও করেছিলেন।

---

[৬] রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রবিনিময় সূত্রে দ্র. রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৫৭ পত্র পৃ ১৩-১৯, পত্রপরিচয় পৃ ১৭৪-১৭৯।

[৭] এই সূত্রে জগদীশচন্দ্রের বিলাত যাওয়ার পূর্বে শিলাইদহে আসার নানা বিবরণের এক জায়গায় রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> Every week-end that Jagadish came to Shelidah he would make Father read out to him the short story that he had written the previous week and get a promise from him to have another ready the next week-end. It was not only the necessity of filling the pages of *Sadhana* or *Bharati* but this constant demand from his friend that made Father write so many short stories at this period.
>
> *On the Edges of Time* 1981 edn p 25.

[৮] Mrs. Knight বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রসিদ্ধ অনুবাদিকা Miriam S. Knight. *The Poison Tree* translated by Miriam S, Knight, London 1884. মিসেস নাইট *Stories of Bengal Life* (১৯১২) নামে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পেরও অনুবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বিলাতবাসকালে প্রভাতকুমারের মিসেস নাইটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২এর এক পত্রে লণ্ডন থেকে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

মজুমদার এজেন্সী প্রকাশিত দু খণ্ড 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম খণ্ড বেরোনো মাত্রে (প্রকাশ ১ আশ্বিন ১৩০৭) রবীন্দ্রনাথ বিদেশে তাঁর বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে লেখেন, 'প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে : পোস্টমাস্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knightএর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।'

২০ নভেম্বর ১৯০০ তারিখে লেখা পরের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'লোকেনকে আমার গল্প তর্জ্জমার জন্য ধরেছি—কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন।'

এই দুই চিঠির উত্তরে জগদীশচন্দ্র লেখেন, 'তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না।··· সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয় তার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি? আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

সম্প্রতি বঙ্কিমবাবুর অনুবাদকারিণী Mrs Knightএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বৃদ্ধা, ভারতবর্ষে তিনি ২৮ বৎসর বাস করে এসেছেন। ১৮৬৩ সালে বাঙ্গলা শিখতে আরম্ভ করেন। বলছিলেন, 'রবিবাবুর এত নাম শুনি আজকাল, বেশী কিছু পড়ি নি।' বল্লাম, আমরা সকলে রবিবাবুর ভক্তশিষ্য। সত্যেন্দ্রর কাছ থেকে 'গল্পগুচ্ছ' দুখানা চেয়ে তাঁকে পড়তে দেব ভেবেছি। দ্র. 'প্রভাত-রবি': দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃ ১৭১।

‘এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই।’

অতঃপর ১৬ জানুয়ারি ১৯০১এর পত্রে লেখেন, ‘তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই।’[৯]

জগদীশচন্দ্র যে তিনটি গল্পের তর্জমা করিয়েছিলেন তার দুটি — ‘ছুটি’ ও ‘কাবুলিওয়ালা’র অনুবাদ করেছিলেন নিবেদিতা, নভেম্বর ১৯০০তেই তাঁর পত্রে সেই উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমতী ওলি বুলকে লেখা ২৯ নভেম্বরের চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন :

> The Cabuliwallah and Leave of Absence are both Englished... one thing I have done—I have made an ink-impression of my right hand—in memory of the Cabuliwallah ![১০]

---

[৯] ১২ ডিসেম্বর'১৯০০ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় লেখেন, ‘আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুই খণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ— কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল…’। ‘চিঠিপত্র’ ৬ ১৩৫৭ পৃ ১৮। প্রসঙ্গত মজুমদার এজেন্সী প্রকাশিত ‘গল্পগুচ্ছ’ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৩০৮।

[১০] 33 Powis Square, Bayswater W. / Thursday Evening, Nov. 29, 1900এর পত্র। দ্র. *Letters of Sister Nivedita* Vol I April 1982 pp 402-404.

জগদীশচন্দ্র বিদেশে রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ প্রকাশ বা প্রচারে সক্ষম হন নি। প্রায় এক দশক পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন মডার্ন রিভিউয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্প ছাপাবার উদ্‌যোগ করেন তখন খোঁজ পড়ে নিবেদিতার অনুবাদের। নিবেদিতা তখন জীবিত। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে ৮ই ফাল্গুন ১৩১৭র চিঠিতে লেখেন :

ডাক্তার বসু বলিতেছেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়ালা ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়াছেন— তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই।

সে লেখা সম্ভবত তখন খুঁজে পাওয়া যায় নি। নিবেদিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রামানন্দকে লেখেন— ১৮ই কার্তিক ১৩১৮য়, বর্তমান চিঠির অব্যবহিত আগে :

নিবেদিতা আমার 'কাবুলিওয়ালা'র যে ইংরেজি তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।[11]

শেষ পর্যন্ত ১৯১২ জানুয়ারি সংখ্যা মডার্ন রিভিউয়ে *The Cabuliwalla* প্রকাশিত হয়। ম্যাকমিলান কোম্পানি-কর্তৃক *Hungry Stones and Other Stories* (1916) প্রকাশিত হলে সেখানেও শেষ গল্প রূপে গৃহীত হয় নিবেদিতারই অনুবাদ।[12]

পত্র ৫০। মার্সেল্‌সে॥ ২৪ মে ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী ও সোমেন্দ্র

---

[11] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ৮ ফাল্গুন ১৩১৭ ও ১৮ কার্তিক ১৩১৮র দুখানি পত্র, দ্র. 'চিঠিপত্র' ১২ বৈশাখ ১৩৯৩ পৃ ৪-৫, পৃ ১২-১৩।

[12] 'কাবুলিওয়ালা' অনুবাদের সঙ্গে নন্দলাল বসু -অঙ্কিত একখানি চিত্রও মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়, এই পরিচায়িকা সহ : The Cabuliwalla by Babu Nanda Lal Bose/By the courtesy of Babu Rabindranath Tagore.

দেব বর্মন সহ রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ের পথে কলকাতা ছেড়ে ২৭ মে ১৯১২ S. S. City of Glasgow জাহাজে বোম্বাই থেকে মার্সেল্‌সের পথে যাত্রা করেন। ২৯ মে ও ৩০ মে আরব সমুদ্র পাড়ি দেবার পথে লেখেন ‘জলস্থল’ ও ‘সমুদ্রপাড়ি’ দুটি নিবন্ধ। ৩১ মে ১৯১২ আরব সমুদ্রের পথেই কন্যা মীরা দেবীকে লেখেন :

জাহাজ তো ভেসে চলেছে। ভয় করেছিলুম খুব seasickness হবে কিন্তু তার লক্ষণ দেখচি নে। সমুদ্র তেমন উতলা নয়। অথচ ঢেউ একেবারেই নেই তা নয়। ঠিক আমাদের মুখের সামনে দিয়ে পশ্চিমে হাওয়া দিচ্চে তাই এক একদিন বেশ একটু দোলা লাগাচ্চে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। সোমেন্দ্রটা মাঝে মাঝে মাথা ঘুরচে বলে ক্যাবিনে চিৎ হয়ে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নিচ্চে।··· বৌমা বেশ কাটিয়ে দিচ্চেন। ওঁর ভাবটি বেশ নিঃসঙ্কোচ। নতুন জায়গায় নতুন পথে নতুন লোকদের মধ্য দিয়ে যাচ্চেন বলে যে কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ আছে তা দেখচি নে। ইতিমধ্যে একদিন কেবল seasick হয়েছিলেন।···

চারুচন্দ্রের চিঠির সঙ্গে একই দিনে ডাকে দেওয়া চিঠিতে (15 Juin 1912 St. Denis, Paris 26) বড়ো মেয়ে মাধুরীলতাকে লিখছেন :

বেল, কাল মার্সেল গিয়ে পৌঁছব। সমুদ্রযাত্রাটা নির্বিঘ্নে কেটে গেছে। কাল একটু ঝোড়ো ছিল— বৌমার একটু মাথা ঘুরেছিল আমার ত কোনো কষ্ট বোধ হয় নি।

চারুচন্দ্রকে ‘সমুদ্রে ঝড়ে’র উল্লেখ করেছেন। ‘লণ্ডনে’ শীর্ষক রচনায় পাওয়া যায় ‘প্রবল বেগে বাতাস’ ও ‘তাহাতে’ সমুদ্রের আন্দোলনের ফলে ‘যেদিন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌঁছিয়াছি’ এবং তারপর ‘মার্সেল্‌স্ হইতে একদৌড়ে প্যারিসে আসিয়া একদিনের

মতো হাঁপ ছাড়িলাম।'

মার্সেল্‌স্ ফ্রান্সের পুরাতনতম শহর এবং প্রধান ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর।

'প্রবাসীর জন্যে··· লেখা···'। এ যাত্রায় বাইরে থেকে সমস্ত লেখাই রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে অজিতকুমার চক্রবর্তীর কাছে পাঠান, বিভিন্ন স্থানে নির্দেশমতো বিলিব্যবস্থা সাপেক্ষে, দ্র. ২৬ জুন ১৯১২য় লেখা অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্র :

শ্রীচরণেষু,

গুরুদেব, গত সোমবার পোর্ট সৈয়দ থেকে অতগুলো লেখা একসঙ্গে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছি তেমনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। আপনার সমুদ্রযাত্রা যে দেবতার কৃপায় সুখকর হয়েছে সেজন্য দেবতাকে ধন্যবাদ—কারণ আমাদের ভয় ছিল যে আপনি বুঝি সি-সিক্ হয়ে পড়েন···

আপনার লেখাগুলি সবই যেখানে যা পাঠাবার পাঠিয়েছি। তত্ত্ববোধিনীতে শ্রাবণে যে তিনটি লেখা পাঠিয়েছেন তিনটিই যাবে। আশা করছি এমনি অনেক পাব— তাই হাতে না রেখে সমস্তই দিয়ে বসলুম।··· ইতি।

প্রবাসীর লেখাদুটিও শ্রাবণ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় :

'জলস্থল' (রচনা আরব সমুদ্র বুধবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)। 'দুই ইচ্ছা'(রচনা লোহিত সমুদ্র বুধবার ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯ যথাক্রমে পৃ ৪৩১-৪৩৪ ও পৃ ৪৩৭-৪৪০।

প্রবাসীর ওই সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩১৯) রবীন্দ্রনাথের দুটি গানও বেরিয়েছিল, সম্ভবত আগে দেওয়া :

'নিকটের যাত্রা' (অনেক কালের যাত্রা আমার অনেক দূরের পথ) পৃ ৩৬২ ও 'ঝড়' (ঝড়ে উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি) পৃ ৩৮৯।

'জলস্থল' চতুর্থ প্রবন্ধ রূপে 'পথের সঞ্চয়' (১৩৪৬) গ্রন্থে এবং গানদুটি

'গীতিমাল্যে'র (১৩২১) যথাক্রমে ১৪ ও ১৯ সংখ্যক গান রূপে গৃহীত হয়।

পত্র ৫১। 'লণ্ডনের পাকের মধ্যে…' ॥ ১৮৭৮এ লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কালে তাঁর চোখে পড়েছিল, 'ধোঁওয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব—এই হচ্ছে লণ্ডনের যথাসর্ব্বস্ব।' 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র প্রথম পত্র ১৯৬১ সং পৃ ২০। ১৯১২র জুন মাসের গোড়াতে লণ্ডনে পৌঁছে এবারের প্রথম অভিজ্ঞতা 'লণ্ডনের রাস্তায়… ভয়ানক প্রকাণ্ড… চলিবার বেগ', 'অতি বিপুল মানুষ-কলের' একটা চেহারা—' কী দাহ, কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি!' 'পথের সঞ্চয়' ১৩৫৭ মুদ্রণ পৃ ৯০, পৃ ৯৪। লণ্ডনে পৌঁছে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্লুম্‌স্‌বেরি হোটেলে।[১] তারপর রোটেনস্টাইনের সূত্রে কবি-পরিচয়ের প্রসার হওয়ার ফলে অনুরাগীর ভিড়ে দ্রুত পরিবৃত হয়ে পড়েন। জুলাই ১৯১২য় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে যে লিখেছেন, 'অজিত, আমি এখানকার পাকের মধ্যে পড়ে গেছি…' (দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৮ পৃ ১৮) সে এই সমাদরের পাক। এই জুন মাসেই রোটেনস্টাইন-আহূত রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ সভায় চার্লস ফ্রীয়ার অ্যাণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন (দ্র. C. F. Andrews : "An Evening with Rabindra", *The Modern Review,* August 1928 pp 225-228)। অ্যাণ্ডরুজ পরে লিখেছেন, '"I must get away", he said to me, with pathetic emphasis... this publicity is drying up all that is in me. I must get away and rest and be quiet."

'পাড়াগাঁয়ে একটি পাদ্রির বাড়িতে…' ॥ সদ্য পরিচিত অ্যাণ্ডরুজ তাঁর

---

[১] *On the Edges of Time* 1981 edn pp 99-100.

বন্ধু স্টাফোর্ডশিয়রের পাদ্রি রেভারেণ্ড ও শ্রীমতী উট্রমের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা করে দেন। দ্র. C. F. Andrews : "With Rabindra in England", *The Modern Review*, January 1913 pp 70-75 ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৩১৯ পৃ ২২০-২২৪, 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এই ব্যবস্থা যে 'ঠিক উলটো ব্যবস্থা' হয়েছে, এই চিঠির অব্যবহিত আগে উইলিয়ম রোটেনস্টাইনকে বাটারটন ভিকারেজ, স্টাফোর্ডশিয়র থেকে ৫ অগস্ট ১৯১২ তারিখে লেখা চিঠিতে তার কিছু সূত্র আছে : '...the country round is beautiful and our host and hostess are nice people. So I have nothing to complain of. But I have made a discovery since I came here that I had grown fond of Hampstead without being aware of it. The reason of it was that while there I could easily go to a place which was dear to me and it gave me a purpose in my daily life in London...' ইত্যাদি। দ্র. Mary M. Lago : *Imperfect Encounter* 1992 pp 51-52.

রোটেনস্টাইন হ্যাম্পস্টীড-এ ভিলাস অফ দি হীদ-এ রবীন্দ্রনাথের বাসা ঠিক করে দিয়েছিলেন।

'ভ্রমণের বিবরণ…' ॥ ভ্রমণের বিবরণ লেখার 'সময় নেই' লিখলেও প্রবাসী ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই যাত্রার অনেকগুলি বিবরণ স্বতন্ত্র শিরোনামে বা 'বিলাতের চিঠি' পর্যায়ে পরপর পাশাপাশি মুদ্রিত হয় এবং সে লেখা অবলম্বন করে ভাদ্র ১৩৪৬এ 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থ সংকলিত হয় (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ১)। বৈশাখ

১৩৫৪য় দ্বিতীয়বার মুদ্রিত নতুন সংস্করণে বইয়ের প্রচলিত বিন্যাস এবং রচনার পাঠ স্থিরীকৃত হয়েছে।

‘এখানকার কবিসভায়…’ ॥ ১০ জুলাই ১৯১২য় ট্রোকাডেরো রেস্তরাঁয় ইণ্ডিয়া সোসাইটি আহূত সভায় লণ্ডনের বিশিষ্ট কবিসাহিত্যিকগণ সাদর সংবর্ধনা করেন রবীন্দ্রনাথকে। কবি ইয়েট্স সভাপতিত্ব করেছিলেন সে সভায় এবং বলেছিলেন, ‘To take part in honouring Mr. Rabindra Nath Tagore is one of the great events of my artistic life.’ হাউস অফ কমন্সের ভারতীয় বাজেট অধিবেশনে এই সংবর্ধনার সপ্রশংস উল্লেখ হয় এবং টাইম্স্ কাগজে এ নিয়ে লেখা ছাপেন (Dinner to Mr. Rabindra Nath Tagore : A Bengali Poet, *The Times*, July 13, 1912) তার আগেই ৩০ জুন রোটেনস্টাইনের গৃহে আর্নেস্ট রীজ, এলিস্ মেনেল, মে সিনক্লেয়ার, ইভলীন আণ্ডারহিল, এজরা পাউণ্ড, হেনরি নেভিনসন, চার্লস্ ট্রেভেলিয়ন, চার্লস অ্যাণ্ডরুজ প্রমুখ নির্বাচিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ইয়েট্স যে ‘গীতাঞ্জলি’র পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতা পাঠ করে শোনান তাকে রথীন্দ্রনাথ ‘ঐতিহাসিক সন্ধ্যা’ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি ইয়েট্সের ‘musical ecstatic voice’এর কথা বলেছেন, অ্যাণ্ডরুজ বলেছেন, সে যেন সন্ধ্যা স্তোত্রের মতো : ‘As the late evening drew on W. B. Yeats began to recite Rabindra Nath's verses ; each short poem seemed a vesper hymn.’ (দ্র. C. F. Andrews : “An Evening with Rabindra”, *The Modern Review*, August 1912 pp 225-228 ; Notes : “Rabindranath Tagore in England”, *The Modern Review*, September 1912 pp 316-320 ; R. N. Tagore : *On the Edges of*

Time 1981 p 101)। রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, সে সন্ধ্যার নীরব মুগ্ধতা পরদিন থেকে ব্যাপক প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে।

'লণ্ডন থেকে দূরে থাকলেও…'। কবি আছেন রেভারেণ্ড উট্রমের গৃহে, স্টাফোর্ডশিয়রে।

'সত্যেন্দ্রকে'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পত্র ৫২। সুকুমার। সুকুমার রায় ফোটোগ্রাফি ও প্রিন্টিংয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯১১য় অক্টোবরের শেষ দিকে লণ্ডনে এসে পৌঁছান। ১৯ জুন ১৯১২য় পিয়ার্সনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে 'পেপার' পড়েন তাতে 'রবিবাবুর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ' ছিল। ৯ জুলাই ১৯১২য় হ্যাম্পস্টেড হীদ্-এ রবীন্দ্রনাথের বাড়ি তাঁর খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। ২৫শে জুলাই ১৯১২র পত্রে সুকুমার লিখছেন: আজ একটা বড় পার্টি আছে। মিসেস নাইডু আসবেন। আমাদেরও সব নেমন্তন্ন হয়েছে। গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে, East West Societyতে, 'The Spirit of Rabindranath' বলে একটা paper পড়লাম। লোক মন্দ হয় নি। Quest কাগজের editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন)— তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Questএ ছাপাবেন।

রবিবাবু দু সপ্তাহ nursing homeএ ছিলেন, কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন। তরশু দিন আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন Royal Court Theatreএ তাঁর ডাকঘর অভিনয় হয়েছিল! 'মালিনী' আর 'চিত্রাঙ্গদা'ও বোধ হয় শীগ্গির-ই কোথাও করা হবে। বিলেতে রবিবাবুর খুব-ই নাম হয়েছে। এখানকার বড় বড় poetরা রবিবাবুর নাম করতে পাগল। এবার যিনি Poet Laureate হলেন, Dr. Bridges, তিনি তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর

সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।[১]

'Modern Reviewতে যে কটা গল্পের তর্জ্জমা…'-ইত্যাদি॥ মডার্ন রিভিউয়ে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পের তর্জ্জমা' ১৯১০-১৯১২ :

দি মডার্ন রিভিউ ১৯১০

We Crown the King, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, January pp 20-26.

The Hungry Stone, trs. by Panna Lal Basu, February pp 185-191.

The Skeleton, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, March pp 213-217.

At Midnight, trs. by Anath Nath Mitra, April pp 387-393.

The Trust Property, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, May pp 426-431.

The Elder Sister, trs. by Rashbehari Mookerjee, July pp 31-36.

The Renunciation, trs. by Prabhat Kumar Mukherji, August pp 163-167.

Subha, trs. Anath Nath Mitter, September pp 289-293.

দি মডার্ন রিভিউ ১৯১১

The Postmaster, trs. by Debendra Nath Mitter, January pp 36-39.

---

[১] শান্তিলতা চৌধুরীকে লেখা চিঠি। লীলা মজুমদার : 'সুকুমার রায়' ১৩৭৬ পৃ ১১৪য় উদ্‌ধৃত।

Raja and Rani, trs. by Keshab Chandra Banerjee, June pp 560-561.

The Innocent Injured, trs. by Keshab Chandra Banerjee, November pp 482-483.

Victorious in Defeat, trs. by Jadunath Sarkar, December pp 560-565.

দি মডার্ন রিভিউ ১৯১২

The Cabuliwallah, trs. by the Sister Nivedita, January pp 50-56.

The Supreme Night, trs. by Jadunath Sarkar, June pp 579-583.

The River Stairs, trs. by Jadunath Sarkar, October pp 340-345.[১]

Adamant, trs. by Jadunath Sarkar. December pp 571-573.[২]

• তিন বছরে মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত এই ষোলোটি গল্পের মূল, যথাক্রমে :
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *We Crown the King* : 'রাজটিকা'।
পান্নালাল বসু অনুবাদিত *The Hungry Stones* : 'ক্ষুধিত পাষাণ'।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Skeleton* : 'কঙ্কাল'।
অনাথনাথ মিত্র অনুবাদিত *At Midnight* : 'নিশীথে'।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Trust Property* : 'সম্পত্তি সমর্পণ'।
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Elder Sister* : 'দিদি'।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Renunciation* : 'ত্যাগ'।
অনাথনাথ মিত্র অনুবাদিত *Subha* : 'সুভা'।
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র অনুবাদিত *The Postmaster* : 'পোস্টমাস্টার'।
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত *Raja and Rani* : 'সদর ও অন্দর'।
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত *The Innocent Injured*: 'উলুখড়ের বিপদ'।

আগের দিনের ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ তারিখের পত্রে অজিত চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

আমার গল্পের যে কটা তর্জ্জমা মডার্ন রিভিয়ুতে বেরিয়েছে পড়ে রোটেনষ্টাইন খুব বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[৩] তিনি বলেন এগুলো সংশোধন করে ছাপতেই হবে। কিন্তু আমার ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমাই হয় নি সেই জন্যে দ্বিধা বোধ করছি।

যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *Victorious in Defeat* : 'জয়-পরাজয়'।
ভগিনী নিবেদিতা অনুবাদিত *The Cabuliwallah* : 'কাবুলিওয়ালা'।
যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *The Supreme Night* : 'এক রাত্রি'।
যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *The River Stairs* : 'ঘাটের কথা'।
যদুনাথ সরকার অনুবাদিত *Adamant* : 'মহামায়া'।

[৩] রোটেনস্টাইন স্মরণ করেছেন, 'I happened, in *The Modern Review,* upon a translation of a story signed Rabindranath Tagore which charmed me, I wrote to Jorasanko— were other stories to be had? Some time afterwards came an exercise book containing translations of poems by Rabindranath, made by Ajit Chakravarty, a schoolmaster on the staff at Bolpur. The poems, of a highly mystical character, struck me as being still more remarkable than the story, though but rough translations.

—*Men and Memories* : Recollections of William Rothenstein 1900-1922 Vol II 1932 p 262.

ম্যাকমিলান কোম্পানির গ্রন্থপরীক্ষক (রীডার) চার্লস্ হুইবলি প্রকাশার্থ পাঠানো রবীন্দ্রনাথের কবিতা-ব্যতীত গদ্যরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'Then there is a collection of essays and short stories, badly translated, which may for the present be neglected.'

—*Macmillan Reader's Reports*, Vol F, November 1912. Mary M. Lago : *Imperfect Encounter* 1972 pp 21-22-এ উদ্‌ধৃত।

এর আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ২৭ জুন ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

আমার ভাল গল্পগুলির মাঝারি রকমের তর্জ্জমা খাড়া করিয়া দিলে ইহারা যত্নপূর্বক মাজিয়া ঘষিয়া লইবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন—এবং ভাল Publishers পাওয়া যাইবে এমন আশা পাওয়া গেছে।

Modern Reviewতে যে কয়টি বাহির হইয়াছিল পাঠাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া আর কিছু কি করা যাইতে পারে?[৪]

মডার্ন রিভিউয়ের আগেও বিপিনচন্দ্র পালের *New India* কাগজে ১৯০১-১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘সুভা’ (Subha), ‘বিচারক’ (The Judge), ‘কাবুলিওয়ালা’ (The Kabuli), ‘জীবিত ও মৃত’ (Alive and Dead), ‘কঙ্কাল’ (The Skeleton) অন্তত এই পাঁচটি গল্পের তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়, তার প্রথম দ্বিতীয় ও পঞ্চম গল্প কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনুবাদ।[৫]

---

[৪] চিঠিপত্র ১২ পত্র ২৭ পৃ ২৭।

[৫] চারুচন্দ্রকে লেখা এই চিঠির অব্যবহিতকালের মধ্যেই Natesan কোম্পানি *Glimpses of Bengal Life* (জুন ১৯১৩) নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ১৩টি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

আগেই উল্লেখ করেছি বিপিনচন্দ্র পালের *New India* কাগজে যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর ‘সুভা’ ‘বিচারক’ ও ‘কঙ্কাল’ গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। *New India*য় তাঁর আরো কোনো কোনো গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়। মোট অনুবাদ-তালিকা এই রকম :

Subha (সুভা) ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০১ সংখ্যা, অনুবাদক J. M. Bagchi

The Judge (বিচারক) ৪ নভেম্বর ১৯০১ সংখ্যা, অনুবাদক J. M. Bagchi

The Kabuli (কাবুলিওয়ালা) ৩১ মার্চ ১৯০২ সংখ্যা, অনুবাদক G. Sarma

Alive and Dead (জীবিত ও মৃত) ১৮ নভেম্বর ১৯০১ ও ২৫ নভেম্বর ১৯০১ দুই সংখ্যায়। অনুবাদকের নাম নেই।

এই চিঠির কয়েক মাস মধ্যেই মাদ্রাজের G. A Natesan কোম্পানি *Glimpses of Bengal Life* নামে রবীন্দ্রনাথের তেরোটি গল্প নিয়ে বই ছেপেছিলেন, অনুবাদ রজনীরঞ্জন সেন -কৃত (ভূমিকার তারিখ ১৩ জুন ১৯১৩)।[৬] নতুন প্রকাশিতব্য গল্পসংগ্রহের জন্য অবশ্য এই-সব অনুবাদ বিবেচিত হয় নি।

১৯১৬ ও ১৯১৮য় ম্যাকমিলান কোম্পানি রবীন্দ্রনাথের *Hungry Stones and Other Stories* এবং *Mashi and Other Stories* নামে নানা জনের অনুবাদ সংবলিত দুখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথম বইয়ে তেরো ও দ্বিতীয় বইয়ে রবীন্দ্রনাথের চোদ্দটি গল্প সংকলিত হয়েছিল। সূচীপত্র ও মূল গল্প এই রকম:

Hungry Stones and Other Stories ১৯১৬

The Skeleton (কঙ্কাল) ১৯ মে ১৯০২ সংখ্যা. অনুবাদক J. M. Bagchi. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল: 'রবিজীবনী' পঞ্চম খণ্ড ১৩৯৭ পৃ ৩২-৩৩।

এ ছাড়াও অজিতকুমার চক্রবর্তী 'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদ করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। ১৯১০ নভেম্বরের গোড়ার দিকে অসুস্থ অবস্থায় লণ্ডন থেকে অজিতকুমার লেখেন মিসেস টমাস, অসুখে যিনি তাঁকে মায়ের মতো যত্ন করছেন, 'তাঁর অনুরোধে শুয়ে শুয়ে কাবুলিওয়ালাটা তর্জমা করে তাঁকে দিয়েছি— তিনি বললেন, "it is charmingly done— একটু আধটু সংশোধন করতে হবে— সে আমি করব"। দ্র° এই বই পৃ ৪১২।

[৬] রজনীরঞ্জন 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'পণরক্ষা', 'সুভা', 'অতিথি', 'শুভদৃষ্টি', 'কঙ্কাল', 'ঘাটের কথা', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'স্বর্ণমৃগ', 'অনধিকার প্রবেশ' ও 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অনুবাদ করেছিলেন।

৮ অক্টোবর ১৯১৩য় জে. ডি. অ্যাণ্ডার্সন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I have written an indulgent review of Rajani Ranjan Sen's versions of your galpas in the current Spectator.' প্রসঙ্গত আর্নেস্ট রীজ তাঁর রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থের ভূমিকায় (নভেম্বর ১৯১৪) রজনীরঞ্জনের সহায়তার স্বীকৃতি করেছিলেন।

The Hungry Stones (ক্ষুধিত পাষাণ) ।
The Victory (জয়-পরাজয়) ।
Once there was a King (অসম্ভব কথা) ।
The Home-Coming (ছুটি) ।
My Lord, the Baby (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) ।
The Kingdom of Cards (একটা আষাঢ়ে গল্প) ।
The Devotee (বোষ্টমী) ।
Vision (দৃষ্টিদান) ।
The Babus of Nayanjore (ঠাকুর্দা) ।
Living or Dead ? (জীবিত ও মৃত) ।
"We Crown the King" (রাজটিকা) ।
The Renunciation (ত্যাগ) ।
The Cabuliwallah (কাবুলিওয়ালা) ।

এই তেরোটি গল্পের The Victory লেখকের নিজস্ব অনুবাদ, পরের সাতটি লেখকের সাহায্য নিয়ে চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজের নতুন তর্জমা। ভূমিকায় অধিকন্তু উল্লেখ আছে : 'Assistance has also been given by the Rev. E. J. Thompson, Panna Lal Basu, Prabhat Kumar Mukerji and Sister Nivedita.'

Mashi and Other Stories ১৯১৮

Mashi (শেষের রাত্রি) ।
The Skeleton (কঙ্কাল) ।
The Auspicious Vision (শুভদৃষ্টি) ।
The Supreme Night (এক রাত্রি) ।
Raja and Rani (সদর ও অন্দর) ।
The Trust Property (সম্পত্তি সমর্পণ) ।

The Riddle Solved (সমস্যা-পূরণ)।
The Elder Sister (দিদি)।
Subha (সুভা)।
Postmaster (পোস্টমাস্টার)
The River Stairs (ঘাটের কথা)।
The Castaway (আপদ)।
Saved (উদ্ধার)।
My Fair Neighbour (প্রতিবেশিনী)।

এই বইয়ের গল্পও নানাজনের অনুবাদ দ্বারা প্রস্তুত হয়।[৭]

‘এ দেশে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত…’ ॥ ১৯ অক্টোবর ১৯১২য় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করেন।

শান্তিনিকেতনের ‘ভাণ্ডারী’ ॥ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর অনুপস্থিতিকালে সে কাগজের দায়িত্ব পেয়েছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। বাইরে থেকে তত্ত্ববোধিনী এবং অন্যান্য কাগজের লেখাও রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের কাছে পাঠিয়েছেন। দ্র' রবীন্দ্রনাথকে লেখা অজিতকুমারের চিঠি :

এবার যে দুটো লেখা পাঠিয়েছেন তা ভাদ্র মাসে যাবে—কারণ শ্রাবণ সংখ্যা দু-চারদিনের মধ্যেই বের হবে। একটা—‘কাজ ও

---

[৭] বহু অবধান সত্ত্বেও ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের গল্প সংগ্রহ প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ হয় নি। কেউ কেউ বলেছেন, গৃহীত গল্পের অসম মান ও অনুবাদের ত্রুটি তার কারণ। চার্লস্ অ্যাণ্ডরুজের অভিভাবকত্বে চূড়ান্ত পাঠ প্রস্তুত হয়েছিল, অ্যাণ্ডরুজের সাহিত্যবোধের অভাবও অনেকে কারণ বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত দীর্ঘ অপেক্ষিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে বিলম্বের কারণ হিসেবে অ্যাণ্ডরুজ ম্যাকমিলানকে জানিয়েছিনেন, কবি বহু কাজে ক্লান্ত এবং অনুবাদ তিনি নিজে হাতে করতে চান। সে সময় তিনি পান নি। দ্র. Mary M. Lago *Imperfect Encounter* 1972 pp 166-167, 219-223 এবং E. P. Thompson : *Alien Homage* 1993 pp 16-25.

খেলা' পত্রিকায় যাবে— অন্যটা লণ্ডনের লেখাটা প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেব মনে ভাবছি। আপনার লেখাগুলো আমার কাছে পাঠালে আমি যেখানে যা দেবার ঠিকমত পাঠিয়ে দেব। দ্র. দেশ সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৬ পৃ ১৫৮-১৫৯।

তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ২৭ জুন ১৯১২র চিঠি :

> প্রবাসীর জন্য পথ হইতে দুইটি লেখা পাঠাইয়াছি, আশা করি শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া সেগুলি আপনার হস্তগত হইয়াছে।

কুকেদের কেয়ারে : Thomas Cook & Son, Ludgate Circus, London ঠিকানায়।

শীর্ণ নিভৃত গলি॥ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশের সমাজপাড়ার গলি। এই গলির ২১০/৩/১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রবাসী অফিসের বাড়ি। সীতা দেবী শান্তা দেবী দুজনেই রবীন্দ্রনাথের এই 'শীর্ণ নিভৃত গলিটি'র মনে পড়ার কথা তাঁদের বইয়ে উল্লেখ করেছেন। দ্র. সীতা দেবী : 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ১১৮। শান্তা দেবী : 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৪২।

পত্র ৫৩। 'আমার সম্মান-সম্বর্দ্ধনার কথা কাগজে পড়তে…'॥ সম্ভবত প্রবাসীতে প্রকাশিত বিবরণের উল্লেখ : 'ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা'। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ পৃ ৫৬১-৫৬৬।

বিলেতের 'খবর জোড়াতাড়া দিয়ে ঢাকঢোল বাজা'নোতে সংকোচের কথা জানালেও অনামিত বিবরণটি লিখেছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। দ্র. ১৪ অগস্ট ১৯১২য় লেখা অজিতকুমারের পত্র :

> আপনার গৌরবের কথা একটুখানি এবার প্রবাসীতে দিয়েছি— 'ইংলণ্ডে রবীন্দ্রসম্বর্দ্ধনা' নাম দিয়ে— অবশ্য কারো নামে বের হবে না।

দ্র. দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৬ পৃ ১৬২।

এর আগের চিঠিতে ৭ অগস্ট ১৯১২ অজিতকুমার লিখেছিলেন :

> গুরুদেব, এবার রথী সন্তোষকে যে দীর্ঘ পত্র দিয়াছেন তাহাতে

ওখানকার উৎসবের সমস্ত সংবাদ জানিলাম। ইহার পূর্ব্বে এখানকার কাগজে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়া গিয়াছে। মিস Sinclair প্রভৃতি পত্রযোগে যে ভক্তির অর্ঘ্য পাঠাইয়াছেন তাহাও দেখিলাম। দ্র. দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৬ পৃ ১৬১।

রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্রকে স্টপফোর্ড ব্রুকের প্রশংসার চিঠিখানিও পাঠিয়ে লিখেছিলেন, 'আশা করি তোমরা এটাকে কাগজে ছাপিয়ে বসবে না।' অতঃপর ইভলীন আণ্ডারহিল, রোটেনস্টাইন এবং ইয়েট্‌সের মন্তব্য এবং অয়কেনের পত্র পাঠিয়ে লেখেন, 'দেখো যেন ছাপিয়ে বোসো না।' ১৭ অক্টোবর ১৯১২, ১৪ ডিসেম্বর ১৯১২ ও ৩০ জানুয়ারি ১৯১৩র পত্র, দ্র. 'রবীন্দ্রভাবনা' ১৯৮৭ পৃ ২০-৩০।

'ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা' লেখায় রোটেনস্টাইনের বাড়িতে আয়োজিত সান্ধ্যসম্মিলনে ইয়েট্‌স -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ ও কবিতাপরিচয়-ভাষণ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণের প্রসঙ্গ ও পাঠ সংকলিত হয়েছিল। ভুলক্রমে বিবরণলেখক একে ইণ্ডিয়া সোসাইটি -সংবর্ধনার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন। বিবরণের অংশ এইরকম :

সংবাদপত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের সাহিত্য-সমাজ এই বঙ্গীয় কবিকে গত ১২ই জুলাই এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে কিরূপে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিয়াছিলেন। সেই সান্ধ্যসভায় ইংলণ্ডের প্রায় সকল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কবি য়ীট্‌স ছিলেন সভাপতি। এচ্, জি, ওয়েল্‌স্ উপস্থিত ছিলেন,—তিনি সোস্যালিষ্ট এবং ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক *A Modern Utopia* সাহিত্যসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মিস্ মে, সিন্‌ক্লেয়ার ছিলেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী। নেভিন্‌সন্, হ্যাভেল, রদেনষ্টাইন তো সুপরিচিত নাম। রলেস্‌টন ছিলেন, তিনিও একজন বড় কবি। একটা

বিরাট্ জনতাময় সভা না করিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটি যে এই বাছা বাছা লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কবিসম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, এবং অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। যে বৈঠক উপযুক্ত সমজ্‌দারের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেখানে যে উৎসবটি জমিয়া উঠে, হৃদয়ের ভাব-উৎস যেমন সহজে খুলিয়া যায়, এমন কেবল বাজে লোকের দলবৃদ্ধির দ্বারা হয় না। স্বভাবত উত্তেজনাপ্রিয় ইংলণ্ডবাসী আপনা হইতে যে এরূপ চিত্তবিভ্রান্তকারী বারোয়ারি সৃষ্টি না করিয়া একটি রসিকজনসম্মিলনের মনোহর মধুচক্র রচিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্ঘ্য বহন করিয়া যেসকল পত্র আসিয়াছে তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রী-কবির পত্রই শুনাইবার মত। একজন লিখিয়াছেন :— ‘যে দিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়ে না যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোন দিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কিনা।’

আর একজন লিখিয়াছেন, ‘আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য্য আছে মাত্র তা নয়— কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যুৎচমকের মত আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে—সেই তাহারি একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। একজন লোক আরেকজনের চোখ দিয়া দেখিতে পারে কিনা আমি জানি না বোধ হয় পারে না ; কিন্তু একজনের অন্তরের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিশ্চয় আর একজনের বিশ্বাসকে জাগায়। St. John of the Crossএর ‘আত্মার অন্ধকার রাত্রি’ নামক কবিতাটি ছাড়া আপনার কবিতার তুলনা খুঁজিয়া পাই না— কিন্তু আপনি একটি পরিপূর্ণ অদ্বৈত বোধে

এবং একটি অধ্যায় তত্ত্বদৃষ্টিতে St. John এবং অপর সকল খৃষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান "মিষ্টিসিজ্‌ম" ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমায় পরিপূর্ণ: সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়— জগতের মায়াবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেই জন্য তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্ম্মল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোনো দিনই সন্তোষ দেয় নাই। কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, তাহা গতরাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছসুন্দর ইংরাজীতে এমন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন যাহা আমি ইংরাজীতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোনো দিন দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।"

প্রথম পত্রের লেখিকা মার্গারেট র‍্যাডফোর্ড, দ্বিতীয়টি লিখেছিলেন মে সিনক্লেয়ার। মে সিনক্লেয়ার তখন বিলেতে মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী, ওই সময়ই তাঁর *Feminism for the Women Writers' Suffrage League* (১৯১২) প্রকাশিত হয়। মূল চিঠি দুখানি এখানে উদ্ধৃত করি :

1 Portland Villas
East Heath Road
Hamstead
July 8th

I should like to try and tell you if I may what a great experience it was to me, to hear your poems. They fill my spirit.

I have never felt as I felt last night save when I first read certain parts of our English Bible. I thank God that I heard them as I did— it was a wonderful evening to me.

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনাও লেখেন : *Song Offerings of Rabindra Nath Tagore. The North American Review*, May 1913.

We are just going away— it will be a grand memory to my brother and my Mother and to me that we have met you. I look forward eagerly to having your poems when they are printed. I have the pleasure at having your daughter-in-law to tea with me—but I go away tomorrow.

Margaret Radford.

২

4 Edwardes Sqr. Studios
Kensington
July 8. 1912.

Dear Mr. Tagore,

It was impossible for me to say anything to you about your poems last night, because they are of a kind not easily spoken about. May I say now that as long as I live, even if I were never to hear them again, I shall never forget the impression that they made. It is not only that they have an absolute beauty, a perfection as poetry, but that they have made present for me forever the divine thing that I can only find by flashes and with an agonizing uncertainty. I don't know whether it is possible to *see* through another's eyes. I am afraid it is not; but I am sure that it is possible to believe through another's certainty.

There is nothing to compare with what you have done except the poem of St. John of the Cross : 'The Dark Night of the Soul' and you surpass him and all

Christian poets of Mysticism that I know by that sense of the Absolute, that metaphysical insight. It, to my mind, Christian mysticism almost completely lacks.[1] It deals too much in sensual imagery, it is not sufficiently austere and subtle— it has not really *seen through* the illusion of the world. And therefore its passion is not and cannot be entirely pure.

At least so it has always seemed to me, and that is why finding this imperfection in it, it sends me away still unsatisfied.

Now it is satisfaction— this flawless satisfaction— you gave me last night. You have put into English which is absolutely transparent in its perfection things it is despaired of ever seeing written in English at all or in any Western language.

I am rejoiced to learn that the Poems are to be published here in the autumn.

With kind regards,

Sincerely yours
May Sinclair

'য়েট্‌স্‌ যে বইটা Edit করচেন . . .' ইত্যাদি।। 'বইটা' : *Gitanjali or Song Offerings*. ইয়েট্‌সের ভূমিকা লেখা শেষ হয় ৭ সেপ্টেম্বর

---

[১] অজিতকুমার লেখেন, 'Miss Sinclair ঠিকই লিখিয়াছেন, Christian mysticismএ ইহার সঙ্গে তুলনীয় কি আছে? সেখানে আছে পাপবোধের খণ্ডতা এখানে আছে অমৃতবোধের পূর্ণতা।' ৮ই শ্রাবণ ১৩১৯এর পত্র।

১৯১২র মধ্যে। দ্র. রোটেনস্টাইনের *Men and Memories* দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২ পৃ ২৬৬-২৬৭।

'সুকুমারের তর্জ্জমা ...'।। পিয়ার্সনের বাড়িতে পড়া 'বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে paper'এ সুকুমার রায় 'রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা ('সুদূর', 'পরশপাথর', 'সন্ধ্যা', 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি) অনুবাদ' করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে লেখা ২১ জুন ১৯১২র চিঠি, দ্র. লীলা মজুমদার : 'সুকুমার রায়' ১৩৭৬ পৃ ১১১-১১২ ।

অপিচ, ১৮ অগস্ট ১৯১২ তারিখের এক পত্রে উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ইয়েট্সকে লিখেছিলেন : 'Tagore is busy here translating plays and poems he has written for children ... & Sakumar *(sic)* Roy is doing his best with some of the longer poems.'

দ্র. ফিনেরান, হার্গার ও মার্ফি স' *Letters to W. B. Yeats* ১৯৭৭ পৃ ২৪৮-২৪৯ ।

সুকুমার রায়ের করা রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প তর্জমার কথা জানা যায় নি।

'গোটা তিনেক নাটক' অনুবাদ।। প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে সঞ্জীবনীর লন্ডনস্থ সংবাদদাতা 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে' যে সব সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল :

> রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী' ও 'ডাকঘর' অনুবাদ করিয়াছেন। কবি ত্রিভেলীয়ান তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'ডাকঘর' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি মিঃ রদেনস্টাইনকে জানাইছেন যে, ইহা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করিবে। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের আর কোনও নাটক আছে কি না এবং থাকিলে তাহা অনুবাদ করিয়া অতি সত্বর যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। আমাদের সুপরিচিত

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন— যিনি এদেশে ইংরেজীতে প্রথম হইয়া সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন— রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক অনুবাদ করিতেছেন। দ্র. প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৯ পৃ ১১৫-১১৬।

প্রসঙ্গত 'চিত্রাঙ্গদা' *Chitra* (১৯১৬) নামে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 'মালিনী' *Sacrifice and Other Plays* (১৯১৭) এর অন্তর্গত হয়ে ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক প্রকাহিত হয়। 'ডাকঘর' অনুবাদ করে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, *The Post Office* (জুলাই ১৯১৪) নামে কুয়ালা প্রেস ডাবলিন দ্বারা প্রকাশিত।

'ক্ষণিকায় লিখেছিলুম পরজন্মে . . .' ইত্যাদি ।। দ্র 'কর্মফল' কবিতা, ক্ষণিকা :

যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

মডার্ন রিভিউয়ে রোটেনস্টাইনের প্রবন্ধ ।। ১৪ নভেম্বর ১৯১২র চিঠিতে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'Ramananda Babu wrote to me last week, & I will try to find time to write something for the Modern Review.'

রোটেনস্টাইনের প্রবন্ধ মডার্ন রিভিউ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় : *A Basis for the Appreciation of Works of Art.* A lecture delivered before the Cambridge University, by William Rothenstein. Modern Review, February 1913 pp 125-136। প্রবন্ধের পৃ ১২৭এ রোটেনস্টাইন[1] ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হয়।

'ভারতীয় আর্ট সমাজ . . . আমাদের আধুনিক শিল্পীদের প্রতি তিনি যদি কিছু সদুপদেশ দেন . . .'॥ জানুয়ারি ১৯১০এ লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি অফ আর্টসের ভারতীয় বিভাগের অধিবেশনে কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পকে হীনজ্ঞান করার সরকারি মনোভাবের বিরোধিতা করে পেপার পড়েছিলেন, রোটেনস্টাইন তাঁকে সমর্থন করেন সভায় এবং টাইম্‌স্ কাগজে লেখা চিঠিতে। তাতে ভারতীয় শিল্পের স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা এবং পশ্চিমি শিল্পীদের শিক্ষণীয় সম্পদের কথা ছিল। এই বাদানুবাদের ভিত্তিতে টাইম্‌স্ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধও ছাপেন (Art in India, Times, March 1, 1910)। রোটেনস্টাইনের চিঠি এবং টাইম্‌সের সম্পাদকীয় দুইই মডার্ন রিভিউ কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয়, এখানকার শিল্পীমহলেও তা নিয়ে সাড়া পড়ে যায়। মডার্ন রিভিউ এ নিয়ে নিজেদের সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করেছিলেন (Eastern Art Makes Events in the West। জুলাই ১৯১০)। এই বাদানুবাদের প্রত্যক্ষ সুফলে রোটেনস্টাইনকে সভাপতি করে ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৫ জুন ১৯১০এ। ভারতের ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্রকলা এমন-কি সংগীত ও সাহিত্যের আরও অনাবিষ্কৃত প্রসার রয়েছে এই বিশ্বাসে এবং ভারতবর্ষের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা আরও ভালোভাবে বোঝার আগ্রহকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। এখানকার আধুনিক শিল্পী— পশ্চিমি শিল্পাদর্শকে যাঁরা দৃষ্টান্তজ্ঞান করে শিল্পচর্চা করছিলেন, তাঁদের সদুপদেশ দেবার জন্যেই নিশ্চয় রোটেনস্টাইনের ভূমিকা।

---

[1] রোটেনস্টাইন সম্বন্ধে আগেই প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় পরিচায়িকা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। দ্র. 'চিত্রকলাবিদ্যা ও উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের চিত্রাবলী'। অশ্বিনীকুমার বর্মন (ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন)। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৭ ও 'উইলিয়াম রোটেনস্টাইন'। অসিতকুমার হালদার। ভারতী, চৈত্র ১৩১৭।

'জ্যোতিদাদার ছবি তাঁর ...'॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে রোটেনস্টাইন। রোটেনস্টাইন ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৮য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি দেখে অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূল ছবির খাতা দেখে তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। পাশাপাশি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২য় লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ আরেকটু বিশদ করে রোটেনস্টাইনের মনোভাব জানিয়েছেন :

> সম্প্রতি জ্যোতিদাদার গোটাতিনেক ছবির খাতা আনিয়ে আমি রোটেনস্টাইনকে দেখতে দিয়েছি। তিনি দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন। আমাকে তিনি বল্লেন, আমি তোমাকে গোপনে বলচি, অন্য লোকে শুনলে হয় ত বেদনা পেতে পারে, ইনিই তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের হাতের যে নৈপুণ্য তাই এই ছবির মধ্যে আছে। এই ছবির খাতা এখানে যে দেখচে সেই খুব প্রশংসা করচে। এতদিন এই ছবির খাতা আমাদের দেশে যে অখ্যাতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে এতে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। এঁর ছবির বিষয়ে এখানে ইনি লিখবেন বলেছেন। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতা যে কোথায় কোথায় আছে তা জানি নে বলেই আমাদের দারিদ্র্য এত সুগভীর ।... এ ছবির একটা selection ছাপাবার জন্যে রোটেনস্টাইন আমাকে বলচেন। ছবি ছাপানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য তবু যেমন করে হোক এর একটা গতি করতে হবে।

আগের দিন ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১২র চিঠিতে স্বর্ণকুমারী দেবীকেও রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> জ্যোতিদাদার ছবির খাতা এখানকার কোনো কোনো আর্টিস্ট দেখে খুব প্রশংসা করচে। এরা বলে ওঁর drawing একেবারে প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের হাতের উপযুক্ত। এখানকার কাগজে ভাল লোক দিয়ে ওঁর ছবির সমালোচনার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে। এঁরা বল্‌চেন, উচিত ওঁর ছবির একটা slection ছাপাতে। ছবি ছাপানো ভয়ানক খরচ। অন্তত হাজার দেড়েকের

কমে হতেই পারে না। জ্যোতিদাদাকে লিখেচি যদি কিছু টাকা পাঠাতে পারেন তাহলে ছাপবার ব্যবস্থা করা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পর পর তিনখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির প্রশংসা ও ছবি ছাপবার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে লেখেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২র পত্রখানি এই :

ভাই জ্যোতিদাদা,

আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent— এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত। . . . যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিয এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোথেনস্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথাটা চাপা রাখলে চলবে না।

২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি

ওই দিনেই রোটেনস্টাইনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেছিলেন :

11. Oak Hill Park, Frognal
Hampstead
Sept 14. '12

My dear Sir.

Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetti and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been— and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. One or two of your sisters it has been my privilege to meet— I need not speak of your brother Rabindranath, so dear to all of us here; there is a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I saw at Benares. I hope, with your permission, to get one or two of your drawings reproduced here. If ever I return to India— a hope which is very near my heart— the privilege of your

acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

Your brother's presence among us is a great joy to us and his friendship I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you for your prompt response to my wish to see more of your work.

Believe me to be most faithfullly yours
William Rothenstein

এর পরের পত্রে ১৭ অক্টোবর ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

ভাই জ্যোতিদাদা

গত মেলে আপনার চিঠি পেয়েছি কিন্তু ছবির খাতা এসে পৌঁছতে বোধ হয় দু-এক মেল দেরি হতেও পারে। আমরা আবার পর্শু আমেরিকায় যাত্রা করচি। এখানে বলে দিয়ে যাব খাতা এসে পৌঁছলে Rothenstein এর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তাঁর সঙ্গে ঠিক করচি আপনার ছবি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ এখানকার Studio কাগজে এবং আমাদের Modern Reviewতে লিখতে। তাতে কিছু কিছু উদাহরণ আপনার খাতা থেকে সংগ্রহ করে দিতে পারেন।

শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ছবির খাতা এসে পৌঁছয় নি। ১৪ নভেম্বর ১৯১২য় রোটেনস্টাইন আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানান :

No parcels have yet come from India, but I had a charming letter from your brother and when the new books come I will set about getting the reproductions made.

২৬ নভেম্বর এবং ১৫ ডিসেম্বরের চিঠিতেও রোটেনস্টাইন খাতা এসে না পৌঁছনোর কথা জানান রবীন্দ্রনাথকে। অতঃপর ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩য় নিউইয়র্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রিনাথকে লেখেন :

আপনার খাতাগুলো সমস্তই রোটেনস্টাইনের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে। আমি লন্ডনে ফিরে গেলে সেগুলো থেকে ছবি নির্বাচন করে কিভাবে কি করা যেতে পারে তা স্থির করব। ইতিমধ্যে আপনি সেগুলো ছাপাবার খরচ কিছু সংগ্রহ করে রেখে দেবেন।

১৯১৪য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবির বই প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র নিম্নরূপ : Twenty-five Collotypes / From the Original Drawings by / Jyotirindra Nath Tagore. / Hammersmith. / Made and Printed by / Emery Walker Limited. / 1914.

বইয়ের ভূমিকা লেখেন উইলিয়ম রোটেনস্টাইন। দেড়-পৃষ্ঠার ভূমিকার শেষাংশে রোটেনস্টাইন লেখেন :

Art is the cultivation of passion, which like all cultivation, demands infinite labour, skill and patience, as well as infinite will, if it is to bear ripe and wholesome fruit. Something of this passion I feel in the drawings of Mr. Joytirindra Nath Tagore. He is of a simple and modest kind, but in each of the drawings one feels he was absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form and gravity of character of his sitter.

We are so used to seeing protraits of Maharajahs in their state apparel, or photographs of unusual types in books of travel, that this straightforward Portraiture of cultured Indian ladies and gentlemen, of whom we in England hear and know so little, is a new and delightful thing. Mr. Jyotirindra Nath Tagore has allowed some twenty-five of his drawings to be reproduced by Mr. Emery Walker. and I believe these will give to many of us the human and intimate picture of Bengali character we get from the novels of Bankim Chandra Chatterjee.

'জীবনস্মৃতি'তে গগনেন্দ্রনাথের ছবি॥ 'জীবনস্মৃতি'র জন্য গগনেন্দ্রনাথ চব্বিশখানি ব্রাশে আঁকা সাদা-কালো ছবি এঁকে দেন। আমেরিকা থেকে ১৪ ডিসেম্বর ১৯১২য় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'জীবনস্মৃতি'র বাঁধানো বই এখনো আমার হাতে আসে নি। আলগা অবস্থায় যখন এসেছিল তখনই ওর ছবিগুলো দেখেছি। যাঁরা দেখেছেন সকলেরই খুব ভালো লেগেচে। এখানকার একজন অধ্যাপককে দেখাচ্ছিলুম, তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে জড়িত হয়ে রইল এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করচি।

এর পরে মণিলালকে পুনরায় লেখেন :

গগন তাঁর সেই জীবনস্মৃতির ছবিগুলি যেন আমাকে পাঠিয়ে দেন— সেগুলি আমি ভাল করে বাঁধিয়ে নিতে চাই। রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ো।

গগনেন্দ্রনাথের ১৯১২ সালের এই ছবিগুলির সঙ্গে ১৯১০এ প্রকাশিত চীনা কালিতে আঁকা তাঁর Twelve Ink Sketchesএর মিল আছে বলা হয় কিন্তু অন্যান্য ছবির সঙ্গে এই ছবিগুলি অতুলনীয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী গগনেন্দ্রনাথের চিত্রব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন : এই চিত্রগুলিতে আমরা যে শুধু চিত্রার্পিত বিষয়ের বস্তুসত্তা অনুভব করি তাহাই নয়— বরঞ্চ তাহা বড় একটা করিই না— আমাদের মন দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিসগুলির অতিরিক্ত একটা ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এই ভাবাবেশের স্বরূপ কি তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পড়িলেই বোঝা যায়। এই ছবিগুলিতে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃশ্যগুলি আঁকিয়া ক্ষান্ত হন নাই, চিত্রে যতটা

সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মনকেও আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১]

বনস্মৃতি' ও ‘ছিন্নপত্র'।। ‘জীবনস্মৃতি' ও ‘ছিন্নপত্র' ব্যয়বহুল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নগেন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৯ সংখ্যায় প্রকাশিতবা ‘জীবনস্মৃতি' ও ‘ছিন্নপত্র' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত এই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত কবিকলগুরু রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্মৃতি” বহুলপরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থের নানা স্থানের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাইশখানি একেবারে নূতন ধরনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বইখানিকে কাগজে, চিত্রে, ছাপায়, বাঁধাই— সকল দিকেই সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রকাশক চেষ্টার ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি রাখেন নাই। ‘জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে কবিজীবনের যে পরিচয়টুকু আমরা পাই তাহাকে আমরা আরো স্পষ্ট, আরো সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে কবিবরের লিখিত বহুদিন সঞ্চিত রাশীকৃত চিঠিপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ‘ছিন্নপত্র' নামে একখানি গ্রন্থও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাংলাদেশের বাংলাকবির যথার্থ পরিচয় এই গ্রন্থ দুইখানিতে পাওয়া যাইবে। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থদুইখানির আদর হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জীবনস্মৃতির মূল্য ৫২ টাকা ও ছিন্নপত্রের মূল্য ৩ টাকা।

---

[১] দ্র ‘গগনেন্দ্রনাথের ছবি'। নীরদচন্দ্র চৌধুরী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ ২১১-২১২।

প্রসঙ্গত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্রসমূহ সূত্রে লিখেছেন, ‘এই শ্রেণীর অনেক চিত্রে তিনি ভারতীয় রীতির ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম বা প্রতীতিবাদের একটি নতুন অধ্যায় করেছেন রচনা।' ‘ভারতের শিল্প ও আমার কথা' ১৩৭৬ পৃ ১৮৪ ।

বিশেষ সুবিধা— ৩০ আশ্বিন মধ্যে দুইখানি পুস্তকের জন্য আদেশপত্র এক নামে একত্র পাঠাইলে ৮ টাকা স্থলে ৬॥০ সাড়ে-ছয় টাকায় দেওয়া হইবে।

নিম্নে আদেশপত্র দেওয়া হইল। অবিলম্বে উহা প্রেরণ করুন।

আদেশপত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সমীপেষু—

৫৫ নং অপার চিংপুর রোড— কলিকাতা।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে শ্রীযক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবপ্রকাশিত দুইখানি গ্রন্থ "জীবন-স্মৃতি" / "ছিন্নপত্র" . . . সেট্ ভি.পি.-তে / লোকমারফৎ পাঠাইয়া দিবেন। ইতি

১৩১ সাল, তারিখ . . .

নাম—

ঠিকানা—

দ্রষ্টব্য :— আগামী ৩০শে আশ্বিন মধ্যে প্রকাশকের নিকট এক নামে দুইখানি গ্রন্থের আদেশপত্র পৌঁছিলে ৮ টাকার স্থলে ৬॥০ টাকায় দেওয়া যাইবে। কলিকাতার অর্ডার লোকমারফৎ- ও মফস্বলের অর্ডার ভি.পি.তে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে।

বিজ্ঞপ্তিটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একাধিক্রমে তিন মাস মুদ্রিত হয়। অতঃপর 'জীবন-স্মৃতি' ২৫ জুলাই ১৯১২ এবং 'ছিন্নপত্র' ২৮ জুলাই ১৯১২ তারিখে প্রকাশ লাভ করে।

প্রকাশমাত্রেই প্রবাসী পত্রিকায় 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্রে'র পৃথক পৃথক আলোচনা হয়েছিল। দ্র. 'জীবন-স্মৃতি'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ পৃ ২১৯-২২০। 'ছিন্নপত্র'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ পৃ ২২০। অনামিত **আলোচনা**।

পরে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথের দুখানি নূতন পুস্তক' নামে 'বড়সড় ভদ্ররকম সমালোচনা' লেখেন। দ্র. প্রবাসী, পৌষ ১৩১৯ পৃ ২৮৫ -২৯০। অজিতকুমারের 'কাব্যপরিক্রমা' (১৩২২) গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ৫৪। 'কিছুদিন থেকে প্রবাসীতে আমার লেখা পৌঁচচ্ছে না কেন...'॥ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ থেকে কার্তিক ১৩২০ এই বর্ষকাল প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংবাদ ও আলোচনা, অথবা ভারতী তত্ত্ববোধিনী মানসী থেকে রবীন্দ্ররচনার আহৃতি মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

'ইংরেজি গীতাঞ্জলি ম্যাকমিলানরা... ওরাই আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে'॥ তু. রামানন্দকে লেখা চিঠি ২ ডিসেম্বর ১৯১২ : 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি আশা করি কোনো ব্যবসাদার ইংরেজ প্রকাশক গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবে এবং সেই সঙ্গে আমার তরফেও আমি কিছু প্রস্তাব করিব...'। এবং মাধুরীলতাকে ৩ মার্চ ১৯১৩ : 'ইংলণ্ডের ম্যাকমিলান কম্পানি আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে বলে কথাবার্ত্তা চল্‌চে।'

ইণ্ডিয়া সোসাইটির স্বল্পমুদ্রিত সংস্করণের পাশাপাশি 'গীতাঞ্জলি'র, সেই সঙ্গে অপরাপর রবীন্দ্রগ্রন্থানুবাদসমূহের ব্যাপক বাণিজ্যিক সংস্করণের সম্ভাবনা নিয়ে রোটেনস্টাইন ও ইয়েট্‌সের মধ্যে কথা হয়েছিল, লক্ষ্য করা যায়। ১৮ অগস্ট ১৯১২-র এক পত্রে রোটেনস্টাইন ইয়েট্‌স্‌কে লেখেন, এখন তাঁরা ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে ৭৫০ কপি পরিমিত একটি শালীন 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ করবেন। 'then we propose to offer the book to a publisher, in order that he may issue a larger and more popular Edition, together with other words of Tagore which he and others are working on, in a cheaper form'. রোটেনস্টাইন এই সূত্রে 'উইজ়ডম অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থমালার প্রকাশক জন মারে-র কথা বলেন ('Murray I believe is already writing through Cranmer Byang to produce several volumes of translations...'. ওই পত্রে, এবং ইয়েট্‌স্ তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করার পর : 'There is a rich mine. & if Murray has the courage. these might easily be three or four volumes— the Indian Society book would of course be one of them.')। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাকমিলান কোম্পানির দফ্‌তরেই সদ্যপ্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' ও রবীন্দ্রনাথের পরের গ্রন্থানুবাদগুলির পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া হয়। ম্যাকমিলান কোম্পানির রীডার চার্লস্ হুইবলি তাঁর সুপারিশপত্রে (নভেম্বর ১৯১২) লেখেন :

> Obviously you cannot publish all that at once... what I would suggest to you is this : I would take the already printed volume and publish it with Yeats's preface. Then if that were a success, you might publish another volume of verse. carefully edited by the author and possibly also a volume of dramatic dialogues. In the meantime I do not think you could run any risk by publishing Gitanjali, and you could have the satisfaction of introducing to English readers a real poet.

ম্যাকমিলানের সঙ্গে আর্থিক ও অন্যান্য চুক্তি নিয়ে ব্যবসায়িক কথাবার্তা চালাবার জন্য আর্থার ফক্‌স্ স্ট্র্যাংওয়েজকে রবীন্দ্রনাথ আইনানুগ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন (দ্র. আর্বানা থেকে ১৩.১.১৯১৩-য় রোটেনস্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে : '... I have get to sign a document before the notary public empowering Mr. Fox Strangways to negotiate with Messrs MacMillans on my behalf...' অতঃপর রোটেনস্টাইনের ১৭.১.১৯১৩-র চিঠিতে : '... Fox Strangways who has conducted the difficult negotiations with Macmillan with patience and firmness. & obtained for Gitanjali I fancy the best terms possible.')।

রোটেনস্টাইনকে লেখা ১৬.১.১৯১৩-র পত্রে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর বিদ্যালয়ের অর্থাভাব হেতু আরো অনুকূল শর্তে মার্কিন প্রকাশকদের কাছে তাঁর শিশুকবিতা ও নাট্যানুবাদ ছাপার প্রস্তাব করবেন কি না জানতে চেয়ে লেখেন : 'Dr. Lewis of Chicago told my son that publishers here are much more liberal and prompt with their cash than they are on your side'.

এই চিঠির সূত্রে রোটেনস্টাইন ফক্স্ স্ট্র্যাংওয়েজকে ম্যাকমিলানের সঙ্গে সংযোগ করতে বলেন এবং তাঁর লেখা ম্যাকমিলানের উত্তর লিখে জানান রবীন্দ্রনাথকে :

They write "—in regard to Mr R's letter, we told him [F Str] at the time when he first sent us the book & the unpublished manuscripts that we should be very glad to bring out a second volume of poems if the sale of 'Gitanjali' were satisfactory. & our attitude on the subject is still the same. We think therefore nothing in the meantime should be done either in America or elsewhere in regard to these poems, for if Gitanjali is as successful as we wish it to be we should no doubt be able to arrange to copyright the new poems in the United States & to publish them on both sides of the Atlantic on a royalty basis similar to that which has been arranged for Gitanjali...''—[1]

'তর্জ্জমা জমে উঠচে... শারদোৎসব তর্জ্জমা...'॥ তু. ইয়েট্‌স্‌কে রবীন্দ্রনাথ ২৪ অগস্ট ১৯১২ : 'He has been most prolific here— he has translated 22 new poems on children, making 26 in all for a volume of children's verses, & also 3 plays, each one of which is remarkable'।

মীরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২ : 'চিত্রাঙ্গদা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জ্জমা করেছি সেইগুলো ছাপাবার জন্যে আমার বন্ধু রোটেনস্টাইন খুব উৎসাহ করচেন। তা ছাড়া ''শিশু'' থেকে এবং অন্যান্য বই থেকেও অনেকগুলো তর্জ্জমা করেছি। সব শুদ্ধ নিতান্ত কম জমেনি।'

অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৪ জানুয়ারি ১৯১৩ : 'অজিত পর্শুদিন Yeats-এর গোটা দুয়েক ছোটো নাটক পড়ে আমার হঠাৎ ধারণা হল যে আমার শারদোৎসবটা নিতান্ত মন্দ লেখা হয় নি। সেই উৎসাহে তখনি সেটা তর্জ্জমা করতে লেগে গেলুম এবং কাল রাতেই সেটা শেষ করে ফেলেছি...'।

The Autumn-Festival নামে মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশ।[2] নভেম্বর ১৯১৯ পৃ ৪৬৯-৪৮২, এক লাইন এই মন্তব্যসহ : 'Translated by the author from a Bengali play written for the boys of Shantiniketan.'

---

[1] দ্র চিঠিপত্র ১২ পৃ ৩২, চিঠিপত্র ৪ পৃ ১০, *Letters to W.B Yeats*, ১৯৭৭, পৃ ২৪৮-২৫০। Lago *Imperfect Encounter* পৃ ২১-২২, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৫, ৯৭। জন মারে প্রকাশিত 'উইজডম অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থমালার সম্পাদক আলফ্রেড ক্রান্মার বীং। প্রসঙ্গত ১৯১৩ সালেই ম্যাকমিলান 'গীতাঞ্জলি' ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের *The Gardener* (অক্টোবর) *Sadhana* (অক্টোবর) এবং *The Crescent Moon* (নভেম্বর) ছেপে ফেলেছিলেন।

[2] রবীন্দ্রবীক্ষা ২৭, পৌষ ১৪০১-এ প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ পুনর্মুদ্রিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ২৫ নভেম্বর ১৯১৯ লিখেছেন, 'Autumn Festival তর্জ্জমার সম্মতি চাহিয়া আমার কাছে বিস্তর পত্র আসিতেছে...', সম্ভবত অপর কোনো ভাষায় তর্জ্জমার সম্মতি চেয়ে।[১]

'এ দেশের লোকেরা বক্তৃতার কাঙাল...'॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মাধুরীলতা মীরা দেবীকে, ইন্দিরা দেবীকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই উপর্যুপরি বক্তৃতার কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। মীরাকে ২২ অক্টোবর ১৯১২-র চিঠিতে লিখেছেন, 'এখানে এসে অবধি সহরে সহরে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চি।' তারপর ২২ জানুয়ারি ১৯১৩-য় লিখেছেন, রচেস্টার, সেখান থেকে বস্টন, নিউ ইয়র্ক, কালিফর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেওয়ার কথা। লিখেছেন, 'প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলুম— কিন্তু তোরা তো জানিস শেষ পর্য্যন্ত আমার অস্বীকার টেঁকে না। পীড়াপীড়ি এড়াতে পারি নে।' মাধুরীলতাকে লিখেছেন, 'এদেশের লোকের ভয়ানক বক্তৃতা শোনবার সখ। তাই এখানে এরা আমাকে ক্রমাগত বক্তৃতা করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে...' (১৯.২.১৯১৩-র পত্র)। রামানন্দকে লিখছেন (১.২.১৯১৩-র পত্র) : 'আমি এখানকার সভায় পড়বার জন্যে গোটাকতক ইংরেজি বক্তৃতা লিখেছি। তার একটা শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছি। সেখানকার শ্রোতাদের ভাল লেগেছে। সম্ভবত এখানেও [বস্টনে] পড়তে হবে। তার পরে Wisconsin, Iowa, Perdue এবং Michigan বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। অর্থাৎ এদেশে যতদিন আছি এগুলো পড়তে হবে।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ১৩.২.১৯১৩ তে লিখছেন, শিকাগো য়ুনিভার্সিটি, বর্স্টনে হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি, ইলিনয় য়ুনিভার্সিটি, তারপর, 'Michigan, Parduc, এবং Iowa University থেকেও নিমন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু আমার আর পোযাচ্ছে না।' তারপর ৬ মে ১৯১৩-য় লিখছেন

---

[১] দ্র. *Letters to W B. Yeats* ১৯৭৭ পৃ ২৫০; চিঠিপত্র ৪ পৃ ৬৯; দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৭ পৃ ১৩৮; চিঠিপত্র ১২ পৃ ৭৬।

ইন্দিরা দেবীকে : 'আমি সহরে একটু গুছিয়ে বসবামাত্রই বক্তৃতার জন্যে তাগিদ আসতে লাগল।... বলতে পারব না একথা বারবার বলার চেয়ে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ। এমনি করে আমেরিকায় আমার টুঁটি চেপে ধরে বক্তৃতা বের করে নিলে।'

এর মধ্যে ১৭ জানুয়ারি ১৯১৩-য় রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'I am sure you are most wise not to take unnecessary tasks upon yourself— I can imagine how people will be pressing you to lecture and write'.[১]

দ্বিজেন্দ্রবাবুর জন্যে আমি সত্যই দুঃখ বোধ করি... প্রার্থনা করি এই কালিমা সম্পূর্ণ কাটিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভাকে পবিত্র করুন'॥ ১৬ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে স্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত 'আনন্দবিদায়' প্রহসনের উদ্‌বোধনী অভিনয় প্রবল বিক্ষোভে হট্টগোলে অর্ধপথেই ভেঙে যায় এবং মারমুখী দর্শকের উত্তেজনার হাত থেকে বাঁচাতে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ থিয়েটারের পিছন-গলি দিয়ে নাট্যকারকে নিরাপদ স্থানে বার করে নিয়ে যান, এ বাবদে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব এই দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। ভারতী গোষ্ঠীর তরুণ কবি-লেখকেরা এই রবীন্দ্রনিগ্রহনাট্যখানি দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলেন। প্রভাতচন্দ্র লিখেছেন, 'নাটকের উদ্‌বোধনী দিবসে আমরা "ভারতী"র আড্ডার আড্ডাধারী কজন দেখতে গিয়েছিলাম সে ব্যঙ্গের স্বরূপটিকে; প্রতিবাদ করা বা ঝঞ্ঝাট পাকাবার মত কোন মৎলব তখনও পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে ক্রমশঃই উত্তেজনা বাড়তে থাকে, ধৈর্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ উত্তেজনার আধিক্যে পায়ের জুতো ছুঁড়ে মারেন এবং অন্যান্য দর্শকেরাও তাঁদের সঙ্গে সক্রিয় প্রতিবাদে যোগ দেন।

---

[১] দ্র. যথাক্রমে চিঠিপত্র ৪ পৌষ ১৩৫০ পৃ ৪০, ৪৮-৪৯, ৭৫: চিঠিপত্র ৫ পৌষ ১৩৫২ পৃ ১৪-১৫: Lago : *Imperfect Encounter* ১৯৭২ পৃ ৮৯

অপরপক্ষে নরেন্দ্র দেব লিখেছেন, 'আনন্দ বিদায়' বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর 'ভারতীর দল স্থির সংকল্প করলেন এ নাটক কিছুতেই অভিনয় করতে দেওয়া হবে না। প্রথম অভিনয় রজনীতেই এ নাটকের কণ্ঠরোধ করবার জন্য ভারতীর দল প্রেক্ষাগৃহের সকল শ্রেণীর আসনের বেশ কিছু প্রবেশপত্র কিনে ফেললেন এবং 'স্টার থিয়েটার বা দ্বিজেন্দ্রভক্তদের কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হল না যে 'আনন্দবিদায়'কে শুরুতেই রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় করবার জন্য ভিতরে ভিতরে কি বিপুল ষড়যন্ত্র হয়েছে।'[১]

প্রভাতচন্দ্র ভারতীর দর্শকদলের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নেই, অভিনয় দেখতে না গেলেও সম্ভবত তাঁরই কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের অশালীন ব্যঙ্গনাট্য এবং প্রতিলাঞ্ছনার তথ্য রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রীতিসম্বন্ধে চিড় ধরেছিল 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) গ্রন্থে অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত স্বলিখিত 'জীবনবৃত্তান্তে'র সূত্রে। সে লেখায় জীবনদেবতা ও দৈব প্রেরণা প্রসঙ্গে 'রবিবাবু তাঁহার সকল রচনা সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষভাবে Divine Inspiration দাবি করেন' এই দম্ভ ও অহমিকায় 'বিরক্ত, উত্যক্ত ও উত্তেজিত' হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 'তীব্র ভাষায় তিরস্কার' করে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন, রবীন্দ্রনাথও তার এক 'উগ্র' উত্তর দেন এবং তারপর আরো উত্তপ্ত পত্রালাপ চলে[২] — তার একটি মাত্র ২৩শে বৈশাখ ১৩১২ তারিখের রবীন্দ্র-লিখিত পত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড ১৩৯৫ পৃ ৩৭৩-৩৭৫)। অতঃপর ১৯০৬-এ গয়ায় বদলি হয়ে লোকেন পালিতের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা সূত্রে, 'তাঁর মতো সূক্ষ্মদর্শী ও মনস্বীব্যক্তি' রবীন্দ্রনাথের

---

[১] পুলিনবিহারী সেন সংগ্রহ, রবীন্দ্রভবন।

[২] দেবকুমার রায়চৌধুরী : 'দ্বিজেন্দ্রলাল', বন্ধু বাৎসল্য অধ্যায় পৃ ৩৪৯-৩৫১।

অস্পষ্ট ও লালসাপূর্ণ রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করতে অপারগ হয়েও তাঁর মতানুকূলে এলেন না দেখে, আর কেবল লোকেন পালিত নন, 'রবিবাবুর প্রতিভার যেরকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই এসব দেশে অধিকাংশ নবীন লেখকের লেখায় সংক্রামিত হয়ে পড়বে।' এই আশঙ্কায় তাঁরই পরামর্শে লিখিতাকারে কাগজে ছাপতে সংকল্পিত হলেন তাঁর বক্তব্য,[১] এবং ক্রমে ক্রমে 'কাব্যের অভিব্যক্তি' (প্রবাসী. কার্তিক ১৩১৩), 'কাব্যের উপভোগ' (বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪) ও 'কাব্যে নীতি' (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। 'কাব্যের অভিব্যক্তি'র প্রত্যক্ষ ইন্ধন 'অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থনে' অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা 'কাব্যের প্রকাশ' (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩) প্রবন্ধ। অজিতকুমার লিখেছিলেন কাব্য অস্পষ্ট হয় আইডিয়া বা ভাববিষয়ের বৃহত্ত্বের ফলে, দ্বিজেন্দ্রলালের মতে, 'সেটা বৃহৎ আইডিয়ার ফল নহে, অস্পষ্ট আইডিয়ার ফল।' 'আমাদের দেশের অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শীর্ষস্থানীয় কবিতা 'সোনার তরী' অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখান 'অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।' 'কাব্যের উপভোগে'র সম্পৃক্ত রূপে পিঠোপিঠি বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছিল 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য'। বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, তাঁর রচনায় অহংকার বা অস্পষ্টতাজনিত 'বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র আলস্য করেন নাই।' আর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রবন্ধে প্রবুদ্ধ উপভোগজনিত সমালোচনায় এদেশে নিতান্ত অভাবের কথা উল্লেখ করে লেখেন 'বঙ্গ সাহিত্যের মঙ্গল হিসেবেই তিনি অস্পষ্টতার প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তদুপরি 'রবীন্দ্রবাবুর জনকতক নগণ্য চেলা তাঁর উত্তমগুলি অনুকরণে অসমর্থ হয়ে তাঁর অর্থহীন কবিতাগুলোর অন্ধ অনুকরণে ভাবহীন ঝঙ্কার কর্ত্তেন। তাই আমার উক্ত প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয়েছিল।' 'কাব্যে নীতি'তেও তাঁর লক্ষ্য সেই অনুকারীদল।

---

[১] পূর্ব গ্রন্থ পৃ ৪১৪-৪১৬।

'রবিবাবুর কবিতার প্রাণহীন ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন।' তাঁরা 'রবিবাবুর দোষগুলি হুবহু নকল করিতেছেন।' সে দোষও অতি অধর্মজনক, গর্হিত দোষ। 'রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যখানি অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখান লম্পটের বা অভিসারিকার সে-সব গান এবং কাব্যখানিতে 'রবীন্দ্রনাথ পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমনি বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।' দুই কবির পক্ষাবলম্বীদের বাদবিতণ্ডার পাশাপাশি সাময়িক পত্রিকায় ব্যক্তিবিরোধ ও সাহিত্য বিতর্ক দুইই প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

এই বিসংবাদের চূড়ান্ত 'আনন্দ বিদায়' নাট্য ও তার অভিনয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের প্রকাশ তারিখ ১৬ নভেম্বর ১৯১২ বলে উল্লেখ করেছেন.[১] দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন অভিনয়ের দিন (১৬ ডিসেম্বর ১৯১২) গিয়ে তিনি দেখেন, 'বইটা তখনও প্রেস হইতে ছাপিয়া আসে নাই' ('দ্বিজেন্দ্রলাল' পৃ ৪৪৪)। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমথ চৌধুরীকে পত্রে লিখেছেন। ' ''আনন্দবিদায়ের''র চাবুক আট বৎসর আগেকার। অধুনা সেটা অভিনীত হয়েছে এই মাত্র।' তা হলে এ নাটক 'বঙ্গভাষার লেখকে'রই সময়কার। বইয়ের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, 'যদি কোনও কবি কোনওরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য।' তাঁর জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন, 'দ্বিজেন্দ্র যে দুর্নীতির প্রভাব হইতে বঙ্গসাহিত্যকে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি বাণীভক্ত মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।' আরো লিখেছেন, তিনি 'এ বিবাদ ব্যক্তিগতভাবে দেখেন নাই। কবিদ্বয়ের স্তাবকগণই' এ বিবাদকে প্রধূমিত করিয়াছিলেন।[২]

---

১ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৯. আষাঢ় ১৩৬৬ পৃ ২৮।

২ নবকৃষ্ণ ঘোষ : 'দ্বিজেন্দ্রলাল' ১৩২৩ পৃ ২৯১-২৯২।

প্রবাসে, ব্যথধামে, বৃহৎবিশ্বের অভ্যর্থনার মুখে দাঁড়িয়ে দেশজ দলাদলির ক্ষুদ্রতা এবং অনুরাগী অনুজ বন্ধুদের লাঞ্ছনার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ অসহায় বোধ করেছিলেন। পরের চিঠির উপান্ত্য অনুচ্ছেদে তা লক্ষ্য করা যায়। 'তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহ সত্ত্বেও আমাকে বোধ হয় হার মানতে হবে।' (দ্র. এই বই পৃ ৬৫)— যেদিন একথা লেখেন দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয় সেদিন। সম্ভবত পরাজয় স্বীকার করে নিয়েই দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি পত্র লিখেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে দ্বিজেন্দ্রলাল সে পত্রের উত্তর দিতেও বসেছিলেন।[1] প্রস্তূয়মান ভারতবর্ষ মাসিকের সূচনা পত্রের জন্য তিনি লিখে গিয়েছিলেন, 'আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন এবং রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।' পাশ্চাত্যদেশে রবীন্দ্রনাথের সমাদর বা নোবেল পুরস্কারের সংবাদ তিনি জেনে যান নি। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরাগী বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রজীবনীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার যোগ্য... সাময়িক পত্রে যে সকল সাময়িক আবর্জনা জমা হয় তাহা সাহিত্যের চিরসাময়িক উৎসবসভার সামগ্রী নহে।'[2]

পত্র ৫৫ । 'আমার হাটের বেসাতি শেষ হয়ে গেছে ...' ইত্যাদি।। আরও কিছুদিন পরে মীরা দেবীকে লিখেছেন[3] :

---

[1] জানুয়ারি ১৯২৭এর এক পত্রে দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সে কথা জানিয়ে তাঁকে ইংলন্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলেম, শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে উত্তর আমার হাতে পৌঁছয় নি।' দ্র. দিলীপকুমার রায় : 'তীর্থংকর' ১৯৮২ সং পৃ ২৭০।

[2] বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড ১৩৯৫ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল অধ্যায় পৃ ৩৬৬-৩৮২। গায়ত্রী মজুমদার : 'রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল' ১৩৮৬।

[3] চিঠিপত্র ৪ পৃ ৫৮-৫৯।

এখানকার লোকসমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য নিভৃত কোণটির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি তা হলে হাড়গুলো জিরয়। কিন্তু আবার ভাবি সেখানে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে— তা ছাড়া এবার ফিরে গেলে সেখানে মানুষের ধাক্কা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাবে— তার থেকে নিজেকে বাঁচানো আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে— এর উপরে আবার আমার সমালোচক বন্ধুদের দল আছে— তাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক উচ্চতর সপ্তকে চড়বে। মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার উপকরণ সেখানে যে কিছু কম আছে তা বলতে পারি নে। তা হোক তবু সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— নিজের বাসা ছেড়ে কোথায় বা ঘুরে বেড়াব। ...

গাণ্ডীব ॥ দ্র. মহাভারত, মৌষল পর্ব ৭-৮ অধ্যায়। তুলনীয় : অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই তখনই তিনি দস্যুর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। ' "স্বদেশী সমাজ" গ্রন্থের পরিশিষ্ট'। আশ্বিন ১৩১১।[১]

গাণ্ডীব তুলতে না পারার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ আরো কখনও কখনও ব্যবহার করেছেন যেমন, প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির তিনটি অংশ উদ্‌ধৃত করি[২] :

আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে— এখন গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। ৮ অক্টোবর ১৯১৪

প্রমথ, অর্জ্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুলতে পারে নি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আসবে না, মনে করচ? ১৩ এপ্রিল ১৯১৭

শেষ দশায় অর্জ্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারেন নি আমার সেই অবস্থা। আমার

---

[১] 'আত্মশক্তি'। রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড ১৩৭১ সং পৃ ৫৫২।

[২] চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৮৯. ২১৬, ১২৬।

চিরদিনের কলম আজ পরের ঘাড়েই চাপাতে হচ্ছে . . . । ১৩ মে ১৯৪১।

নিজের দৃষ্টান্ত ব'লে স্মরণ করবার আগে থেকেই মহাভারতোক্ত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের কাহিনীর উপরে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সংসক্তি ছিল লক্ষ্য করা যায়। অর্জুনের বীরত্বগৌরবের পরিপূর্ণ দিনের একখানি নাটক লিখেছিলেন যখন 'অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী। / সমস্ত জগৎ হতে অক্ষয় সে নাম'খানি লুণ্ঠন করে কুমারীহৃদয় পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন মণিপুররাজকন্যা।[1] অর্জুনের নিয়তিকৃত অশক্যতার দিনের আরেকখানি নাটক লেখবার পরিকল্পনাও ছিল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ জানিয়েছেন :

> লেখা হয় নি এমন একটা নাটকের কথা বলি। কবির কাছে শুনেছি, যে সময় 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি মহাভারতের গল্প নিয়ে লিখছেন তখন আরেকটা গল্পের কথাও মাথায় এসেছিল। যদুবংশের মেয়েদের দস্যুরা হরণ করে নিয়ে গেল, অর্জুনও তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। প্রথমে ভেবেছিলেন চৌদ্দ অক্ষরের পদ্যে লিখবেন, কিন্তু সেই সময় অনেকগুলি লেখা ঐভাবে হওয়ায় এটাতে আর হাত দেন নি। অনেক দিন পরে 'রাজা' আর 'অচলায়তন' যখন লেখা হয়, তখন ভেবেছিলেন এই নিয়ে একটা গদ্য নাটক লিখবেন। সেই সময় আমাকে বললেন কী ভাবে লেখবার ইচ্ছা। কৃষ্ণ, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর যদুবংশের সব বীরেরা বড়ো বড়ো কথা আর বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত, মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় নেই। মেয়েরা আছে শুধু ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ওদিকে অনার্য দস্যুরা হল পৃথিবীর মানুষ, তারা এসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, গান শোনায়। মেয়েদের মন তাদের দিকেই আকৃষ্ট হল। মেয়েরাই তখন লুকিয়ে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত নষ্ট করল— যাতে দস্যুরা তাদের সহজে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে। দস্যুদের ঠেকাতে গিয়ে অর্জুন দেখেন তাঁর

---

[1] 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯)

গাণ্ডীবের ছিলা কাটা। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন, কিন্তু তখন আর কিছু করবার সময় নেই। যে কারণেই হোক এ নাটকটা লেখা হয় নি।[১]

'এখান থেকে রওনা হতে...'॥ ফেরা : রবীন্দ্রনাথ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩য় লিভারপুল থেকে জাহাজে উঠে ৪ অক্টোবর বোম্বাইয়ে, ৬ অক্টোবর ১৯১৩য় কলকাতায় ফেরেন।

পত্র ৫৬। 'আমার সম্মানলাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে...' ইত্যাদি॥ অপর হস্তে লিখিত সাইক্লো করা পত্র।

১৪ই নভেম্বর ১৯১৩ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌঁছয়। সীতা দেবী লিখছেন, '১৪ই নভেম্বর কলেজ হইতে ফিরিবামাত্র শুনলাম যে রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাইয়াছেন। কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম কবিকে এই খবর টেলিগ্রামে জানাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে টেলিগ্রাম লিখিতে জানিতেন না, অন্য কাহাকে দিয়া লিখাইতে গিয়া দেরি হইয়া গেল, তাঁহার আগেই আর একজন টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন।'[২]

---

[১] প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ : 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' ১৩৯২ পৃ ১৫৮-১৫৯।

[২] 'পুণ্যস্মৃতি'। ১৩৪৯ পৃ ১১৯-১২০।

নোবেল প্রাইজের সংবাদ পাওয়ার পর চারুচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া পুলিনবিহারী সেন তাঁর প্রবন্ধে চারুচন্দ্রের 'সত্যেন্দ্র পরিচয়' (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯ পৃ ৫৮৩-৫৯৫) রচনা থেকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। 'রবিরশ্মি' বইয়ে 'গীতাঞ্জলি' আলোচনার সূত্রে চারুচন্দ্র প্রসঙ্গটি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন :

এই ['গীতাঞ্জলি'] পুস্তকের দ্বারা সমগ্র ইউরোপে কবির কবিত্বখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৩২০ সালের ২৭এ কার্তিক ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর এ দেশে সংবাদ আসে যে কবি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। সত্যেন্দ্র দত্ত এই সংবাদ পাইয়া একখানি এম্পায়ার কাগজ কিনিয়া লইয়া আমার কাছে আসেন, এবং সত্যেন্দ্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে মিলিয়া কবিকে সংবর্ধনা করিয়া আমাদের সানন্দ প্রণাম জানাইয়া টেলিগ্রাম করি; কবির নিকটে তাঁহার জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেলিগ্রাম প্রথম পৌঁছিয়া এ সংবাদ দেয়, তাহার পরে আমাদের টেলিগ্রাম পৌঁছে। ইহাতে সত্যেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন— তিনি বলিয়াছিলেন, আমি টেলিগ্রাম করিতে জানিলে আমার টেলিগ্রাম সর্বাগ্রে পৌঁছিত।

২৩শে নভেম্বর কলকাতা থেকে পাঁচ শো গুণগ্রাহীর একটা দল স্পেশ্যাল ট্রেনে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করতে চললেন। এই দলে সর্বধর্মের এবং সর্বসমাজস্তরের ব্যক্তিরা ছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের সভাস্থলে জাস্টিস্ আশুতোষ চৌধুরীর প্রস্তাবে ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন, জগদীশচন্দ্র ও পূরণচাঁদ নাহার তাঁকে মালা পরান এবং 'অভিনন্দনাদি প্রদান করিবার পর কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবীন্দ্রের অসীম শক্তি ও গুণরাশি বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা পাঠ' করেন। অপিচ রবীন্দ্রনাথের 'সম্মানলাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ' করতে গিয়েছিলেন তাঁদের এই বর্ণাঢ্য অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কষায় প্রতিভাসংণে সেই অভ্যাগতেরা বিস্মিত দুঃখিত ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এলেন।[১]

এই নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রবীন্দ্রসাহিত্যের ভক্ত স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে যাইয়া ৭ই অগ্রহায়ণ ২৩এ নভেম্বর ১৯১৩ সালে কবিকে সংবর্ধনা করেন।

তিনজনে যে টেলিগ্রামখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন তার প্রতিলিপি নিম্নরূপ :

টেলিগ্রাফ Date 14 Hour 16=10
Received at 16=43

16 Words
Rabindranath Tagore
Santiniketan. Bolpur.
Nobel Prize conferred
on you our congratulations
Manilal Satyendra
Charu

প্রসঙ্গত, অভিনন্দন সভায় সত্যেন্দ্রনাথের পঠিত কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় : 'আভ্যুদয়িক'। প্রবাসী, পৌষ ১৩২০ পৃ ২৩০-২৩৭। '৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে বোলপুরে ''রবীন্দ্র-সঙ্গমে'' পঠিত' বলে উল্লেখ আছে।

[১] পুলিনবিহারী সেন : 'কবি-সংবর্ধনা ১৩১৮-১৩২৮'। দেশ, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮ পৃ ৩৩-৭০ প্রবন্ধের 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। পুলিনবিহারীর প্রবন্ধে প্রতিলিপি-সহ অভিনন্দন পত্রখানি এবং তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের বহু-আলোচিত প্রতিভাষণটি মুদ্রিত হয়েছে ।

শান্তা দেবী লিখেছেন, 'মিত্ররা অনেকেই মনে করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের ভালবাসা ও সম্মানের অঞ্জলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই সব মানুষ তাঁহার কথায় আঘাত ত পাইয়াই ছিলেন, উপরন্তু অতিথিদের প্রতি কবির রূঢ়কথার জবাবদিহি করিতে না পারিয়া লজ্জায় সাধারণের কাছে এবং বিশেষ করিয়া শত্রুপক্ষের কাছে তাঁহাদের অনেকদিন মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

'অনুরাগের মর্যাদা যে দেন নাই ইহা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পরে অনেকখানি বুঝিয়াছিলেন। তিনি ২৫শেই রামানন্দের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া হাজির । ছোট বড় সকলকে ডাকিয়া খবর লইলেন। সেদিন যে উত্তেজনার বশে তাহাদের দেখেন নাই, স্বীকার করেন নাই— ইহার জন্য দুঃখ প্রকারান্তরে জানাইয়া দিলেন। রামানন্দ তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'আমাদের চেয়ে আপনাকে বাহিরের কোনো লোক বা জাতি বেশী ভালবাসিতে পারে ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না।' রবীন্দ্রনাথ পরাজিত হইয়া বলিলেন, 'আপনার কিংবা জগদীশ প্রভৃতির কথা আমি বলি নি।' তিনি চারুচন্দ্রের ক্ষুদ্র অফিসঘরেও একবার ঢুকিলেন, চারুচন্দ্র অভিমান ও বেদনায় দুদিন আহার করেন নাই। কবি তাহার পর রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়া বোধহয় তাঁহাকে অভিমান ভাঙ্গাইতে হইয়াছিল। পরে মাঘ মাসে রামমোহন লাইব্রেরীর এক সভাতেও তিনি ঐ বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন।'[১]

পুলিনবিহারী সেন 'কবি সংবর্ধনা ১৩১৮-১৩২৮' প্রবন্ধের 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সৎবর্ধনা শান্তিনিকেতন ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০' অধ্যায়ে এই সম্মান ও সংবর্ধনার বিষয়ে আনুপূর্ব তথ্য নথিবদ্ধ করেছেন। সীতাদেবী প্রণীত 'পুণ্যস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সত্যেন্দ্র পরিচয়' (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯), ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বোলপুরে রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা'

---

[১] 'রামানন্দ ও অর্ধ-শতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬৫।

(মানসী, পৌষ, ১৩২৩) লেখার যাবতীয় উপকরণ ছাড়া এডোয়ার্ড টমসনের দুখানি বইয়ের (*Tagore, His Life and Work* 1921 p 44 ও *Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist* 1926 pp 232-233) তথ্যও তাঁর লেখায় গৃহীত হয়েছে, ওই সংবর্ধনার সময় টমসন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিনবিহারীর সংকলন-বহির্ভূত সূত্র থেকে আরো দু-এক কথা উদধৃত করি। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে লেখা হয়েছিল :

Men assembled from other places, too, so that the gathering numbered more than a thousand souls. Science and literature, law and medicine, art and journalism, religion and education all had their eminent representatives there. The aristocracy and the various religious communities, too, were represented. Dr. J. C. Bose was elected to preside on the occasion. That was a rare moment when India's greatest scientist presented the homage and congratulation to India's greatest poet.[১]

বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত এই কলম ২০. ১১. ১৯১৩র Indian Daily Newsএর স্তম্ভে প্রকাশিত হয়[২] :

Poet Tagore

The Bolpore Deputation

An Interesting Ceremony

The long arranged deputation to wait upon Mr.

---

[১] *Honour to Rabindranath.* The Modern Review, December 1913 p 641.

[২] বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত কর্তিকাসংগ্রহ।

Rabindranath Togore at Bolepore to felicitate him on the award of Nobel Prize came off on Sunday. November 23rd. As previously announced a special train conveying about 500 among whom were also a few Europeans and Mahomedans the majority being Beangali gentlemen left, Howrah for Bolepore on the Loop line at 10-30 a.m. Young Bengali volunteers, who were pressed into the service were early on duty at Howrah to receive the guests and see them to their seats in the train. the trqain could not for obvious reasons be elaborately decorated but a single festoon of flags along its whole length marked it out as a vehicle containig, as a member of the deputation aptly remarked, "ardent pilgrims to the shrine of letters at Bolepore." In any case the journey was delightful.

Among the prominent members of the deputation were : Mr. Justice Chaudhuri, Mr. Bhupendra nath Basu, Dr. J. C. Bose, Professor Mahalanobis, Princip. Satish Chundra Vidyabhusan, Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose, Babu Krishna Kumar Miter, Dr. P. K. Acharya, Dr. Indu Madhub Mullick. the Rev. Mr. Melburn. Kumar Arun Chundra Sinha. Babu Hirendra Nath Dutt, Mr. S. M. Bose, Mr. D. C. Ghosh. Sr. N. Basu. Maulvie Abdul Kasem. Mr. Jogendra Nath Mitter. Mr. Jamini Mohan Mitter, Babu Ambuj Nath Chatterjee and almost all the members of the Sahitya Sabha and the Sahitya Parishad and the allied literary institutions in and out of Calcutta. A carriage was reserve for ladies of whom there were about twelve.

The train arrived at Bolepore at about 2-30 p.m. and the deputation was received on the platform by the Rev. C. F. Andrews (who had put on "dhoti" and "chaddar") and a member of students of Mr. Tagore's school. Mr. Tagore's house is about a mile from the stationand the deputation passed through a well-kept road both sides of which were lined with one continuous string of mangoe leaves beneath the bamboo support of which were placed on lotus leaves at intervals cowries, garlands, paddy, copper coins etc., as symbols of good luck.

The deputation was then conducted to a garden in the midst of which two seats were reserved, one of marble meant for the resident and the other of earth temporarily raised and covered with lotus leaves, meant for the poet. The proceedings were heralded by the blowing of conch shells and the singing of a welcome song by a few girls. In the meantime by way of reception the foreheads of the guests were anointed with sandal paste.

When all had assembled, about six members of the deputation went inside the house to accompany the poet to the place of meeting. This being done, on the motion of Mr. Justice Chaudhuri, seconded by Mr. Bhupendra Nath Basu, Dr. J. C. Bose was voted to the chair.

The poet was then garlanded amidst applause, after which Dr. Bose addresed a few words congratulating him on his own behalf and on behalf of the deputation. Next Babu Hirendra Nath Dutt read a short Bengali address which was printed on silk and presented it to Mr. Tagore.

Mr. Melburn

The Rev. Mr. Melburn recognised it as a great privilege to be allowed to say a few words on behalf of the European and Christian community and to offer a small handful of respect and congratulation to Mr. Tagore who had enriched not only the literature of his own country but the literature of England. In this connection the speaker mentioned that some of the passages of Mr. Tagore's book the "Gitanjali", were being used by Christian students in offering their prayers.

Dr. Satish Chundra Vidyachushan on behalf of the Bengal Sahitya Parishad and also on behalf of the Pandits of Bengal offered congratulations to Mr. Tagore in Sanskrit.

Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose in congratulating. Mr. Tagore on behalf of the Sahitya Sabha said that Mr.

Tagore occupied the highest place among the people of India.

Maulvi Abdul Kasem offered congratulation on behalf of the Mahomedan Community of...

Mr. Holland

Mr. Holland said that in awarding the Nobel Prize to Mr. Tagore Europe had honoured herself. In this year's award the often quoted couplet ; "East is East, and West is West and that never the twain shall meet" had been repudiated. This year East and West had met in the temple of spirit and not in the temple of God made with hands.

Mr. S. Bhattacharjee then presented Mr. Tagore with a gift in the shape of a picture on behalf of the Bengal artists.

Babu Purnendu Nath Nahar on behalf of the Jaina Sampradaya presented Mr. Tagore with a garland and congratulated him on the honour that he had obtained.

Professor Monmotho Mohun Bose also congratulated Mr. Tagore on behalf of the students of the Sahitya Parishad.

Mr. Tagore's Reply

Mr. Robindra Nath Tagore in reply thanked them for the honour done to him. Although he did not consider

himself worthy of the honour they were bestowing on him. yet he accepted it with great diffidence.

The deputation then broke up and made their way to the station where Mr. Tagore followed them. Then the train left after the usual exchange of cheers and reached Howrah at 10-15 p.m.

Indian Daily News 20. 11. 1913

পত্র ৫৭। 'সুর না থাকলে এ যেন নেবানো প্রদীপের মতো . . . ॥ তু প্রায় এক যুগ পরে বঙ্গবাসী পত্রিকায় গান পাঠিয়ে তার সম্পাদককে লিখছেন :

সুর থেকে বিচ্ছিন্ন গান আলোকহীন প্রদীপের মতো— আমার নিজের মতে প্রকাশযোগ্য নয়— শ্রাব্য পদার্থকে পাঠ্য বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হয় না . . . ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩০

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯০ পৃ ৭।

'দোল' (বসন্তে আজ ধরার চিত্ত) রচনা শান্তিনিকেতন, মাঘী পূর্ণিমা ২৮ মাঘ ১৩২০, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০ পৃ ৬৮২।

'গান' (রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি) রচনা শিলাইদহে ১৫ ফাল্গুন ১৩২০, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১ পৃ ২৫ । 'গীতিমাল্যে'র ৫৫ ও ৬৬ সংখ্যক গান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা॥ 'একটি মন্ত্র' (১৫ই মাঘে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজগৃহে পঠিত)। প্রকাশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩৫ শক পৃ ২৫১-২৫৬। রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছেন, 'ছাপবার কি সময় আছে?' রচনাটি প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০ পৃ ৫৭৯-৫৮৩তে পুনর্মুদ্রিত হয়।

'শান্তিনিকেতন' ষোড়শ খণ্ডের (১৯১৬) শেষ প্রবন্ধ ।

পত্র ৫৮। 'সবুজপত্র থেকে তোমরা যত খুসি তোলো আমার আপত্তি নেই ...' ইত্যাদি।। 'সবুজপত্র' সূচনা বৈশাখ ১৩২১। সবুজপত্র থেকে আহৃতি :

শান্তা দেবী লিখেছেন, 'সবুজপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের লেখা একরকম বন্ধ হইয়া গেল। প্রথম বৎসর (১৩২১) তিনি প্রবাসীতে কোনো লেখাই দেন নাই। তবে প্রবাসীর "কষ্টিপাথরে" তাঁহার বিখ্যাত গল্প "স্ত্রীর পত্র" এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা তোলা হইয়াছিল। মনে হইতেছে গল্প তোলাতে সবুজপত্রের দল আপত্তি করেন।'[১]

সবুজপত্রের সূত্রে 'মণিলালের মনের ভাবে'র উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সবুজপত্রের প্রস্তুতিপর্বে ও নানা সময়ে সবুজপত্র উপলক্ষ্যে মণিলালের সঙ্গে সংযোগও করেছেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, সবুজপত্রের প্রথম দু বছর সহকারী রূপে দেখাশুনা করেছিলেন মণিলাল।[২]

সবুজপত্র প্রকাশিত হবার পর প্রবাসীতে লিখতে না পারার এই কারণ জানিয়ে রামানন্দকে ৫ আষাঢ় ১৩২১এর পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুষ্কিল এই যে সবুজপত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে ঐ কাগজটা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। অন্য পত্রিকাগুলি বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে— তাহাতে পাঠকদের মনকে বিশেসভাবে আঘাত করে না, নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সবুজপত্রের একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশে

---

[১] 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬৬।

[২] 'চলমান জীবন' প্রথম পর্ব ১৩৬৩ সং পৃ ১০৮। প্রসঙ্গত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন ভারতীর দলের তরুণ সাহিত্যব্রতীগণই তাঁদের কাগজের জন্য সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীকে বৃত করেন। দ্র 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' ১৩৬৪ পৃ ১৪৬-১৪৮।

সবুজপত্রের সঙ্গে মণিলালের যোগসূত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি উদ্‌ধৃত করেছেন পুলিনবিহারী সেন। দ্র 'পত্রাবলী' শারদীয় দেশ ১৩৭৩ পৃ ১৬।

এইসূত্রে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এই পত্রগুলির সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে : চিঠিপত্র ৫ পৌষ ১৩৫২ পত্র ২৩, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৯।

পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।[১]

কেবল সবুজপত্রেই কেন তাঁকে নিবদ্ধ থাকতে হবে প্রমথ চৌধুরীকে সে বিষয় লিখেছিলেন ১৬ এপ্রিল ১৯১৪য় :

আমি নানা কাগজে আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারি নে— আমার শক্তির প্রাচুর্য আর নেই।[২]

অন্য পত্রিকাদি থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রণের সূত্রে শান্তা দেবী লিখেছেন, 'কোনো এক সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও প্রবন্ধাদি 'কষ্টিপাথরে' উদ্ধৃত করিবার অধিকার প্রবাসী-সম্পাদককে স্বয়ং দেন। সেইজন্য প্রবন্ধ ও কবিতা 'কষ্টিপাথরে' অনেক সময় উদ্ধৃত হইত।'[৩]

ভাদ্র ১৩২১ সংখ্যা পর্যন্ত সবুজপত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলি প্রবাসীতে 'কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ৪৭৫-৪৭৮

সবুজের অভিযান (সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩২১ পৃ ১৭-১৯)

বিবেচনা ও অবিবেচনা (সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩২১ পৃ ২০-৩২)

বাংলা ছন্দ (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ পৃ ৮৮-৯৫)

আমরা চলি সমুখ পানে (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ পৃ ৯৬-৯৭)

শঙ্খ (সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২১ পৃ ১৪১-১৪৪)

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২১ পৃ ৫৮২-৫৯০

স্ত্রীর পত্র (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২৩৯-২৬২)

---

[১] চিঠিপত্র ১২ পৃ ৪৯-৫০।

[২] চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৭৬ ।

[৩] 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬৬ ।

সর্বনেশে (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২০৯-২১১)

রাস্তব (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২১২-২২৪)

বাংলা ছন্দ (সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ২২৫-২৩৮)

অর্থাৎ প্রবাসীর দু মাসের 'কষ্টিপাথরে' ছোটো হরফে মোট ১৩ পৃষ্ঠা ২৪ লমে চার মাসের সবুজপত্রের রচনা সংকলন করা হয়েছিল। তালিকায় মূল রচনার আকরস্থল নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে।

'ইতিমধ্যে যায় গোটা কুড়িক গান লিখেছি . . .' ॥ একই কালে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন, 'প্রবাসীর জন্য আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া উঠিয়াছে— কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া উঠে না। শুনিয়াছি চারু পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসিবেন তিনি পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইতে পারিবেন।'[১]

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই গান সংগ্রহের স্মৃতি রক্ষা করেছেন। লিখেছেন 'গীতালি'র গানগুলি রচনার সময় আমি কবির কাছে ছিলাম। অনেকগুলি গান রচিত হলে তিনি আমাকে বললেন, "চারু, তুমি আমার এই গানগুলি নকল করে দিতে পারো। তা হলে ছাপতে দিতে পারি। যে খাতায় গান লিখেছি সেটা প্রেসে দেওয়া চলবে না, খাতাখানা রথী চেয়েছে ।"

আমি গানগুলি নকল করে দিলাম।'[২]

এই গানের অনেকগুলি প্রবাসীর জন্য চারুচন্দ্র নকল করেও আনেন। পরবর্তী কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের যথাক্রমে এগারো ও চব্বিশ মোট পঁয়ত্রিশটি গান নীচের ক্রমানুসারে মুদ্রিত হয়, ওই-সব গানের 'গীতালি' কাব্যে ধৃত গীত-সংখ্যাও পাশে উল্লেখ করা হল।

---

১ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫০-৫১।

২ 'রবিরশ্মি— পশ্চিমভাগ'-এর পরিশিষ্ট।

পত্রিকা থেকে গ্রন্থে নেওয়ার কালে অবশ্য অধিকাংশ গানেরই বহুল পাঠপরিবর্তন ঘটে।

'শরতের গান'। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ১-৩ ।

১ আলো যে / যায় রে দেখা॥ রচনা কলিকাতা ৬ ভাদ্র ১৩২১ গীতালি ৫। পরের সব কয়টি গানেরই রচনা সাল ১৩২১ ।

২ এই শরৎ আলোর কমল-বনে॥ র সুরুল ১১ ভাদ্র গী ১৫

৩ তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে॥ র সুরুল ভাদ্র গী ১৬

৪ আমার গোপন হৃদয় প্রকাশ হল॥ র সুরুল ১৩ ভাদ্র গী ১৯

৫ শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি॥ র সুরুল ভাদ্র গী ২৬

৬ কোন বারতা পাঠালে মোর পরানে॥ র সুরুল ২৮ ভাদ্র গী ৩৫

৭ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে॥ র সুরুল ১ আশ্বিন সন্ধ্যা গী ৪৫

৮ আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে॥ র শান্তিনিকেতন ১৪ আশ্বিন গী ৫৬

'চরম নমস্কার' নামে। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ৩

৯ ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার। শান্তিনিকেতন ১৬ আশ্বিন, সন্ধ্যা গী ৬১

'শেষের দান' নামে। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ৩

১০ ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে। শান্তিনিকেতন ১৭ আশ্বিন গী ৬৭ 'গান' শিরোনামে। প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১ পৃ ১৭

১১ শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে। সুরুল ১০ ভাদ্র গী ১৩

'গীতিগুচ্ছ'। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১ পৃ ১০৩-১০৯

১ দুঃখের বরষায় / চক্ষের জল যেই / নামল। শান্তিনিকেতন শ্রাবণ ১৩২১ গী ১

২ আমি হৃদয়ে যে পথ কেটেছি। কলিকাতা ৬ ভাদ্র গী ৪

৩ পথ চেয়ে যে কেটে গেল। সুরুল ৯ ভাদ্র গী ১২

৪ আমি যে আর সইতে পারি নে। ৯ ভাদ্র সুরুল গী ১১

৫ যখন তুমি বেঁধেছিলে তার। সুরুল ১২ ভাদ্র গী ১৭

৬ আগুনের পরশমণি/ছোঁয়াও প্রাণে। সুরুল ১২ ভাদ্র গী ১৮

৭ এক হাতে ওর কৃপাণ আছে। সুরুল ১৪ ভাদ্র গী ২০

৮ ঐ যে কালো মাটির বাসা। সুরুল ১৬ ভাদ্র, সন্ধ্যা গী ২২

৯ যে থাকে থাক না দ্বারে। সুরুল ১৭ ভাদ্র, সকাল গী ২৩

১০ শুধু তোমার বাণী নয় গো। শান্তিনিকেতন ১৮ ভাদ্র গী ২৫

১১ মোর মরণে তোমার হবে জয়। সুরুল ২২ ভাদ্র গী ২৮

১২ না বাঁচাবে আমায় যদি। সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে ২৬ ভাদ্র গী ৩২

১৩ মালা-হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল। সুরুল ২৭ ভাদ্র গী ৩৪

১৪ সামনে এরা চায় না যেতে। শান্তিনিকেতন ২৮ ভাদ্র গী ৩৬

১৫ শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? সুরুল ২৮ ভাদ্র, অপরাহ্ণ গী ৩৮

১৬ এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন / শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো। সুরুল ৩১ ভাদ্র গী ৪২

১৭ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে। সুরুল ১লা আশ্বিন সন্ধ্যা গী ৪৫

১৮ তোমার অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে'। শান্তিনিকেতন ১৩ আশ্বিন রাত্রি গী ৫৫

১৯ কাণ্ডারী গো, এবার যদি এসে থাক কূলে। শান্তিনিকেতন ১৪ আশ্বিন প্রভাত গী ৬৬

২০ মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই। শান্তিনিকেতন ১৭ আশ্বিন প্রভাত গী ৬৫

২১ আমার সুরের সাধন/রইল পড়ে'। শান্তিনিকেতন ১৮ আশ্বিন গী ৭৪

২২ পুষ্প দিয়ে মারো যাকে/চিনল না সে মরণকে। শান্তিনিকেতন ১৯ আশ্বিন গী ৭৩

২৩ এবার কূল থেকে মোর গানের তরী/দিলেম খুলে। শান্তিনিকেতন ১৯ আশ্বিন গী ৭৩

২৪ তোমার কাছে এ বর মাগি। শান্তিনিকেতন গী ৬৯

পত্র ৫৯। 'এখনো প্রয়াগে। কাল দিল্লি যাব . . .'॥ ১৩২১এর পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ সদলে বুদ্ধগয়া যান।[১] ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, '২৩শে আশ্বিন যাত্রা করিয়া গয়াতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক দলবদলসহ উপস্থিত হইলেন।'[২] 'বুধগয়া' থেকে ২৪শে আশ্বিন রামানন্দকে লেখেন, 'চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি ছটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব মঙ্গলবারে পৌঁছিব চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে।' অতঃপর ক্ষিতিমোহন সেনের জবানিতে পাই, 'গয়া হইতে রবীন্দ্রনাথ আর সকলকে বিদায় দিয়া চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। চারুবাবু পূর্বে বহুদিন এলাহাবাদেই ছিলেন, তাই তাঁহাকে কবি ছাড়িলেন না।'[৩]

চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'গয়া থেকে রবিবাবু এলাহাবাদ গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হল। আর সবাই শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন।'[৪]

---

[১] তু. প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠি : 'কিছুদিন থেকে মনে মনে ভাবছিলুম বুদ্ধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারাও সেখানে যাওয়ার আয়োজন করচে তাই একসঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেচি...'। চিঠিপত্র ৩ সং ১৩৪৯ পৃ ২০।

[২] 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' ১৩৫৯ পৃ ২২-৩০।

[৩] চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫১।

[৪] 'রবিরশ্মি—পশ্চিমভাগে' পৃ ৩৫৭।

প্রয়াগে রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন জর্জটাউনে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

চারুচন্দ্রকে লেখা এই পত্রে দেখা যায় ২৩ অক্টোবর ৬ কার্তিক ১৩২১ তারিখে তিনি দিল্লী যান।

'গীতালির প্রুফ ...'॥ '৩ কার্তিক প্রভাতে ' এলাহাবাদে 'গীতালি'র শেষ লেখাটি (এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে) লেখা হয়। ৫ কার্তিকের মধ্যে 'গীতালি'র প্রুফ দেখা শেষ হয়। ৬ কার্তিকে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। এলাহাবাদে ছিলেন ৪১ জর্জটাউনের বাড়িতে। সেখান থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন, কোথায় কখন আছি তার কিছুই স্থিরতা নেই তবু যদি কিছু বলার থাকে এলাহাবাদে সত্যর কেয়ারে চিঠি পাঠালে আমার কাছে কোনোরকমে পৌঁছবে।'[১] 'গীতালি' রচনা সমাপ্তির প্রায় পরে-পরেই প্রকাশ লাভ করে। প্রভাতকুমার নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি বইয়ের তথ্য উদ্‌ধৃত করেছেন, 'কবির অনুরোধমতো প্রেস সাতদিনের মধ্যে বই ছেপে বই প্রকাশ করলে কবি বিস্মিত হয়েছিলেন।'[২]

নয়নচন্দ্র এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের আর্টিস্ট এবং প্রুফশোধক, পণ্ডিতমশাই বলেও পরিচিত। তাঁর বিবরণ মতে 'আন্দাজ দুশো পৃষ্ঠা কবিতার' পুরো বই। কম্পোজ ও কারেক্‌শন সেরে চূড়ান্ত প্রুফ, মায় সূচীপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল তিনদিনে— তৃতীয় দিনে বেলা ৫টার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ রাতে দেখে পরদিন সকাল ৮টার মধ্যে অর্ডার প্রুফ পাঠিয়ে দেন, বিকেল ৩টেয় বই ছাপা সারা হয়ে কভার ছেপে পাঁচ রকমের পাঁচখানা মলাটে বাঁধাই করে নমুনা বই রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুমোদনার্থ পাঠানো হয়— বারবেলা থাকায় সন্ধ্যা ৭টার পর। সোমবার বেলা ১টার পরে কম্পোজ শুরু হয়েছিল, চার দিনের দিন সন্ধ্যায় বই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়।

---

[১] চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৯১

[২] 'রবীন্দ্রজীবনী' ২, ১৩৯৫ সং পৃ ৪৭৯।

নয়নচন্দ্র স্বয়ং বই নিয়ে গিয়েছিলেন, লিখেছেন, 'বই দেখে— বাঁধাই দেখে চিন্তামণিবাবুর ও ইণ্ডিয়ান প্রেসের সুখ্যাতি শুধু কবির কেন, সেখানকার সকলের মুখে আর ধরে না।' দ্র. 'ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কবি রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়। 'তরুণ রবি' ১৯৬১ পৃ ১৩৩-১৪৬ ।

গীতালি । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৯১৪ পৃ রয়্যাল ৪+৪+১১৭।

নভেম্বর ১৯১৪য় রামানন্দকে লেখেন, 'গীতালি' পাইয়াছেন?'[১] ২০ জানুয়ারি ১৯১৫র পত্রে জে ডি অ্যাণ্ডার্সন লেখেন, 'Have I written to thank you for your beautifully printed গীতালি ?'[২]

'ইংরিজি তর্জ্জমাগুলো...'॥ মডার্ন রিভিউ ডিসেম্বর ১৯১৪ সংখ্যার পৃ ৫৪৩এ রবীন্দ্রনাথের তিনটি গানের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথম লেখার গোড়ার দুই ছত্র পৃ ৫৪৩-এর বাঁ পৃষ্ঠায় মুখপাতের ছবির নীচে এইভাবে ছাপা হয়েছিল[৩] :

Thou hast come again to me in the
burst of a sudden storm,
Filling my sky with the shudder of
thy shadowy clouds.
—Rabindranath.

ছবি Babu Asitkumar Haldar-এর আঁকা বহুবর্ণ ছবি, U. Ray & Sons, Calcutta কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

---

১ চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫২

২ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।

৩ তিনটি গানের অপর দুটি গান : ১. I know that the flower one day shall blossom crowning my thorns (*Poems* ৫৩ সংখ্যক পৃ ৭৮) ও ২. I know that at the dim end of some day the sun will send its last look upon me to.

এর আগে ছবির সঙ্গে ছাপবার যোগ্য তর্জমার সূত্রে রামানন্দকে নভেম্বর ১৯১৪য় এই চিঠি লিখেছিলেন

"শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে" গানটি তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু মূলটা নির্মূল হইয়াছে বলিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু বাংলা এবং ইংরেজি উভয়েরই মালিক যখন আমি তখন কোনোপক্ষে নালিশ করিবার কোনো পথ নাই। অসিতের ছবির সঙ্গে এ লেখাটার কোনো বিরোধ হইবে না অতবে সে পক্ষেও ক্ষোভের কারণ দেখি না।[১]

'Thou hast come again ...' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত Poems (Visva-Bharati 1942)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে, দ্র ১৯৮৬ সং ৫৫ সংখ্যক কবিতা পৃ ৮০ ।

'সবুজপত্রের জন্যে গল্প...'॥ সম্ভবত 'অপরিচিতা' গল্প : সবুজপত্র, কার্তিক ১৩২১ পৃ ৪২১-৪৪৩। পত্র ৫ই কার্তিকে লেখা হলেও, সবুজপত্র কার্তিক সংখ্যা সম্ভবত দেরিতে বেরিয়েছিল, ৩ কার্তিকে লেখা 'গীতালি'র শেষ রচনাটিও ('এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে') 'শেষ প্রণাম' নামে ওই সংখ্যায় গল্পের পরে পৃ ৪৪৫এ মুদ্রিত হয়।

পত্র ৬০। 'নৌকাডবি'॥ 'নৌকাডুবি' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ : মজুমদার লাইব্রেরি, ভাদ্র ১৩১৩। বসুমতী ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৬।

'নৌকাডবি' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

'নৌকাডুবি' । প্রকাশক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮ জুন ১৯১০ পৃ ক্রাউন১/১৬, ২+৩৬৮ মূল্য এক টাকা চার আনা।

এর পর তৃতীয় সংস্করণ বেরোয় বসুমতী থেকে :

---

[১] চিঠিপত্র ১২ পৃ ৫২

'নৌকাডুবি' । প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । বসুমতী অফিস ১৩২০ পৃ ২+৪০৪+২ মূল্য দুই টাকা ।

এই পত্রে তৃতীয় সংস্করণের বইখানিই হয়তো রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন, মনে করা যায়।

পত্র ৬১। 'স্রোতের ফুল'।। চারুচন্দ্র স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া একটি প্লট তাঁর "স্রোতের ফুল" উপন্যাসের ভিত্তি । দ্র এই বই পৃ ২২২ ।

'স্রোতের ফুল' ভারতী বৈশাখ ১৩২১ থেকে পৌষ ১৩২২ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ভারতী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ১২১১-১২১৪য় সমালোচিত।

গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩২২ । আমরা বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি লক্ষ্য করতে পেরেছি :

'স্রোতের ফুল'। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার । রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ১৩২৬ পৃ ৪+৩৮১

উৎসর্গ : 'যাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার তুলনা / বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নাই, / যাঁহার স্নেহ লাভ করা / আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য, / সেই জগন্মান্য কবিবর / শ্রীযক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের / শ্রীচরণকমলে / ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য / স্রোতের ফুল / উৎসর্গ করিলাম।'

গ্রন্থপ্রারম্ভে উল্লিখিত হয়েছে : 'এই উপন্যাস রচনায় পূজনীয় কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকর মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম। চারু।'[১]

'ভূপেনবাবু বা বিধুশেখর শাস্ত্রী...'॥ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক।

---

[১] 'বহতা হুয়া ফুল' নামে লখনউ থেকে 'স্রোতের ফুলে'র হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক মাধুরী সম্পাদক রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় কবিরত্ন ।

পত্র ৬২। 'শান্তিনিকেতন' গান॥ 'আমাদের শান্তিনিকেতন সে যে সব হতে আপন...' ইত্যাদি, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে 'শারদোৎসব' নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠানপত্রীতে প্রথম প্রকাশ ৬ আশ্বিন ১৩১৮।[১] আগের 'মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ' গানের পরিবর্তে অতঃপর এই 'শান্তিনিকেতন' গানটি আশ্রমসংগীতরূপে প্রচলিত হয়। 'শান্তিনিকেতন' গানের তর্জমা Santiniketan তিন স্তবক দশ ছত্রে 'Oh, The Santiniketan, the darling of our hearts...' ইত্যাদি, প্রকাশ The Modern Review, February 1915 p 137. গানের নীচে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হয় :

Note. This song is sung in chorus in Bengali by the boys of the Santiniketan school.

ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন প্রকাশিত Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore (১৯৩৬) সংস্করণের অন্তর্গত The Fugitive and Other Poemsএর শেষ কবিতা রূপে গৃহীত পৃ ৪৫৭-৪৫৮।

পত্র ৬৩। 'দুটো নতুন কবিতা'॥ 'মুক্তি' (যখন আমায় হাতে ধরে) রচনা শিলাইদহ ১৯ মাঘ ১৩২১, প্রকাশ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১ পৃ ৫৮৫। 'প্রেমের বিকাশ' (জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও) রচনা

---

[১] সীতা দেবী : 'পুণ্যস্মৃতি', ১৩৪৯ পৃ ৬৭। যেভাবে সমস্বরে এই গান গেয়ে ছেলেরা অভ্যাগতদের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন তাতে গানটির রচনা ও প্রচলন আরো কিছুদিন আগের বলে মনে হয়।

কালীপদ রায় লিখেছেন, 'মোরা সত্যের পরে মন এই গানটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই লিখে তাতে সুর দিয়ে আশ্রমবাসী সকলকে শিখিয়েছিলেন। এই গানটি ১৯১১ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমসঙ্গীত হিসেবে উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে গাওয়া হত। ১৯১১ সালে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি লেখা হয়। তখন থেকেই এই গান আশ্রমবিদ্যালয়ের আশ্রমসঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।'— 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ', ১৩৮৮, পৃ ১২

পদ্মাতীর ২৭ মাঘ ১৩২১, প্রকাশ প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১ পৃ ৬০১ ।

যথাক্রমে 'বলাকা' (১৩২৩) কাব্যের ২২ ও ৩৩ সংখ্যক কবিতা।

ভবসিন্ধুবাবুর লেখা দেবেন্দ্রজীবনী ।। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত'। শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত। ২১১ নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মাঘ ১৩২১ পৃ ৪+৪+৩+৪১২ মূল্য ১৸৹। ভূমিকা শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

ভবসিন্ধু দত্ত সিটি কলেজের শিক্ষক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সিটি কলেজের পুরাতন ছাত্র ও বন্ধু। শান্তা দেবী জানিয়েছেন; সমাজপাড়ার বলিতে প্রবাসী অফিসের ২১০। ৩। ১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িটি তিনিই রামানন্দকে ঠিক করে দিয়েছিলেন।[১]

'গ্রন্থকারে নিবেদন' স্থলে ভবসিন্ধু দত্ত লেখেন, 'এই পুস্তক প্রণয়নে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রকার সাহায্য না পাইলে আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারিতাম না । তৎপরে পরলোকগত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, নবতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী এবং Modern Review পত্রিকাদ্বয়ের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং স্নেহাস্পদ শ্রীমান চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকট হইতে অনেক প্রকারে সহায়তা লাভ করিয়াছি ।'

বইয়ের ৪৮তম অধ্যায়ে (পৃ ৩৯৩-৪০৩) লেখক আপন পরিবারে দেবেন্দ্রনাথের কতখানি প্রভাব ছিল তার বর্ণনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই পুত্রকন্যাদের উপর পিতার প্রভাব বর্ণনা করবার পর লেখক লিখেছেন, 'পরিবারে তাঁহার কি প্রকার প্রভাব ছিল, তাহা চিন্তা করিলে অতি আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি যতদিন

পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজ করিতে পারিত না। সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া সকলকে কাজ করিতে হইত। যখন রবীন্দ্রনাথের উপর বিষয়সম্পত্তি পরিদর্শন করিবার ভার অর্পিত হয়, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন বাটীর বহির্দ্দেশে একটি জীর্ণ প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহা সংস্কার করিয়া নিজের ঘর করিয়া লয়েন। এইজন্য তিনি তাহা রীতিমত সংস্কার করিয়া সুন্দরভাবে ঘরটি প্রস্তুত করাইয়া লইলেন এবং সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। তখন মহর্ষি কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি আসিয়া দেখিলেন পুরাতন ঘর আর নাই, তাহার স্থানে এক নূতন ঘর দণ্ডায়মান। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। বঙ্গের ভবিষ্যৎ কবিসম্রাট বলির ছাগের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন, "এই ঘরে আমার পিতা বসিতেন এবং তাঁহার ঘর তুমি কাহার আদেশে ভগ্ন করিয়া এইরূপ নূতন করিলে? আমার পিতার ঘরের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। যে সমস্ত পুরাতন জানালা বা কপাট চৌকাট ছিল, তাহা তুমি এখনি লইয়া যথাস্থানে বসাও, এবং ঘরটি ঠিক্ যেমন ছিল তেমনি করিয়া দাও। তোমার একটি বসিবার ঘরের প্রয়োজন ছিল আমাকে পূর্বে বলিলে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতাম। তোমার এখন বেশী লোকজনের সহিত পরিচয় হইয়াছে, অনেক লোক তোমার নিকটে আসেন, সুতরাং তোমার একটি ঘরের প্রয়োজন হইয়াছে । একথা আমি বুঝিতে পারি নাই। এই ত্রিশহাজার টাকা লও এবং নিজের মনোমত ঘর প্রস্তুত করাইয়া লও, কিন্তু আমার পিতার ঘরটি ঠিক্ যেরূপ ছিল, সেইরূপই করিয়া দাও।" বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বিলম্ব করিলেন না।'

অতঃপর ভবসিন্ধু পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হিমালয়ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, 'প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। তাঁহার নিকট কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিয়া পথে দরিদ্রদিগকে দান করিতে আদেশ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাহার বিশেষ কিছু হিসাব

রাখিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ ভ্রমণের সময়ে সামান্য দানের হিসাব কে বা রাখিতে পারে! কিন্তু মহর্ষি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না! বাড়ী ফিরিয়া প্রত্যেক পয়সার হিসাব দিতে হইত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের যে কি-প্রকার আনন্দ হইত পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন! দেবেন্দ্রনাথ যে পয়সার মমতা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ হিসাব লইতেন তাহা নয়, কিন্তু অল্পবয়স হইতে যাহাতে তাঁহার পুত্র শৃঙ্খলা ও নিয়মের বাধ্য হইয়া কাজ করিতে শিক্ষা করেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।'

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১ সংখ্যায় অমৃতলাল গুপ্ত ভবসিন্ধু দত্তের বইখানির সপ্রশংস আলোচনা করে লিখেছিলেন, 'গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের এই ঋষির জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদিগকেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন । ... সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই এই পুস্তকের সমাদর হওয়া উচিত।' দ্র 'পুস্তক পরিচয়' পৃ ৫৯২-৫৯৩ । আলোচনাটির শেষে এই 'সম্পাদকীয় মন্তব্য' ছাপা হয় : 'ভবসিন্ধুবাবু মহর্ষিদেবের যে জীবনী লিখিয়াছেন, তার মধ্যে একটি গল্প আছে যে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো ঘর ভাঙচুর করাতে মহর্ষিদেব প্রথমে রবিবাবুকে ভর্ৎসনা করেন এবং পরে তাঁহার কৃতকর্ম পুনরায় পূর্ব্ববৎ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বাস করিবার জন্য একটি নূতন বাড়ি দেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে রবিবাবুর নূতন বাড়ীর ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তাহার প্রধান কারণ রবিবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙেন নাই ; যা-কিছু ক্ষণ-ভঙ্গুর তা তিনি নিজেই একরকম ভাঙিয়া শেষ করিয়া গিয়াছিলেন, উত্তরবংশীয়ের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। অতএব গল্পটির মধ্যে এইটুকুই সত্য যে মহর্ষিদেব রবিবাবুকে বাসের জন্য একটা নূতন বাড়ী দিয়াছিলেন।' প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১ পৃ ৫৯৩।

প্রসঙ্গত ভবসিন্ধু দত্তের বইখানি অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৩২৩) গ্রন্থের পূর্ববর্তী । এরও আগে 'শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের "ভারতগৌরব গ্রন্থাবলী" পর্যায়ের জন্য... বালক বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া [দেবেন্দ্রনাথের] একখানি ছোট জীবনী' তিনি রচনা করে দিয়েছিলেন ।

পত্র ৬৪। 'চারটি গান পাঠাই ...' ।। চারটি গানের দুটি ১৩২২এর প্রবাসী, কার্তিক সংখ্যায়, বাকি দুটি অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শিরোনাম সহ প্রকাশিত হয়

'পথভোলা' (কোন ক্ষাপা শ্রাবণ ছুটে এল/ আশ্বিনেরি আঙিনায়) প্রবাসী, কার্তিক ১৩২২ পৃ ১

'ডাক' (তোমার নয়ন আমায় বারে বারে) প্রবাসী, কার্তিক ১৩২২ পৃ ১

'নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা' (আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা) প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২২ পৃ ১২৯

'রাতে ও সকালে' (কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে) প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২২ পৃ ১২৯

প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ গান স্বরলিপি সহ 'গীতপঞ্চাশিকা'য় (আশ্বিন ১৩২৫) নিম্নক্রমে সংকলিত :

'কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ' ১২ সংখ্যক গান পৃ ৮, স্বরলিপি পৃ ৫৪-৫৭

'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' ৬ সংখ্যক গান পৃ ৪, স্বরলিপি পৃ ৩৮-৪০

'কাল রাতের বেলায় . . .' ৩ সংখ্যক গান পৃ ২, স্বরলিপি পৃ ৫৪-৫৭

সত্যেন্দ্র দত্তের তর্জমা।। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ফুলের ফসল' (১৩১৮) কাব্যের 'তোড়া' ও 'চম্পা' এই কবিতাদুটির তর্জমা মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়, অনুবাদকের নাম ছিল না ।

A posy. translated by a Poet from The original Bengali of Satyendranath Dutt in ফুলের ফসল or Harvest of

Flowers. *The Modern Review*. Nov. 1915 p 560. Champa, translated by a Poet from the original Bengali of Satyendranath Dutt in ফুলের ফসল or Harvest of Flowers. *The Modern Review*. November 1915 p 561.

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই তর্জমাদুটির সূত্রে ৭ অক্টোবর ১৯১৫র পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অনুবাদক আমি : কিন্তু ঢাক-বাদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শান লাগিয়া ঈর্ষ্যার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রের পক্ষেও ভালো হইবে না, আমার পথও কণ্টকিত হইবে । তা ছাড়া কর্ম্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে— অনেক বন্ধু এবং অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন— সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অবন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসরশয্যার সন্ধানে আছি— জুটিবে কিনা জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না।'— চিঠিপত্র ১২, পত্র ৪৬

প্রসঙ্গত দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশ করেছিলেন ।

A Posy ও Champa দুটি কবিতাই বহুল পরিবর্তিত রূপে রবীন্দ্রনাথের *Lover's Gift and Crossing* কাব্যে যথাক্রমে ৩১ ও ৫৩ সংখ্যক কবিতারূপে গৃহীত হয় ।

পত্র ৬৫। 'শিক্ষার বাহন'।। ১০ ডিসেম্বর ১৯১৫ রামমোহন লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করার' বাহন হিসেবে এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার জন্য সওয়াল করেছিলেন : 'মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতে হইবে?... তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না?'

'শিক্ষার বাহন' প্রকাশ : সবুজপত্র, পৌষ ১৩২২ পৃ ৫২৯-৫৫৫। 'পরিচয়' (১৯১৬) গ্রন্থে সংকলিত পৃ ১০৬-১২৮।[১] পরে 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত।

'দেবেন্দ্র সেনের তর্জ্জমা...'।। দেবেন্দ্রনাথ সেনের তিনটি কবিতার তর্জমা রবীন্দ্রনাথ মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশ করেন

The Maiden's Smile

My Offence (Translated from The Bengali poem of Devendranath Sen by Rabindranath Tagore.)

—*The Modern Review*, March 1916 p 345.

The Unnamed Child (translated from the Bengali of Devandranath Sen) by Sir Rabindranath Tagore

—*The Modern Review*. May 1916 p 498.

এর প্রথম কবিতাটি (প্রথম ছত্র : Methinks. my love, before the daybreak...) *Lover's Gift and Crossing* (1918) কাব্যে বহুপরিবর্তিত হয়ে ২১ সংখ্যক কবিতারূপে সংকলিত হয়।

পত্র ৬৬। 'Sister Nivedita-র 'কাবুলিওয়ালা' এবং ...' যদুবাবুর 'ঘাটের কথা'।। গল্পদুটি নিম্নক্রমে ১৯১২র মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়েছিল :

The Cabuliwallah. translated by Sister Nivedita. January 1912 pp 50-56 The River Stairs. translated by Jadunath Sarkar. October 1912 pp 340-345. 'কাবুলিওয়ালা' *Hungry Stones and Other Stories* এবং 'ঘাটের কথা' *Mashi and Other Stories* বইয়ে সংকলিত হয়। মডার্ন রিভিউয়ে

---

[১] দ্র. দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠি ৭ ও ৪৩। অগ্রহায়ণ, ১৩২৫, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫, চিঠিপত্র ১০। 'Vernaculary for the M.A. Degree', *The Modern Review*, November 1918 pp 462-463.

'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদের সঙ্গে নন্দলাল বসুর আঁকা কাবুলিওয়ালার ছবি মুদ্রিত হয়েছিল।

'অহল্যা'।। নেশন কাগজে 'অহল্যা'-র অনুবাদ আমরা সন্ধান করতে পারি নি। তবে ১৫ ডিসেম্বর ১৯১২-র পত্রের সঙ্গে অনুবাদটি তিনি রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়েছিলেন এবং The Nation-এর সম্পাদক ম্যাসিংহাম রোটেনস্টাইনকে বলেছিলেন : 'I propose that every fortnight Mr. Tagore, if he is willing, should write us a poem...' দ্র Lago, Imperfect Encounter ২৭৫, ১১২-১১৩। মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশ : Ahalya, translated by Rabindra Nath Tagore. The Modern Review, February 1916 p 175. পরে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত Poems (১৯৪২)-এ অন্তর্ভুক্ত, ১৯৮৬ সং ৭ সংখ্যক কবিতা ('Struck with the curse in midwave of your tumultuous passion ...') ইত্যাদি। পত্রিকায় কবিতার আগে এই ভূমিকা ছিল, গ্রন্থে বর্জিত :

(Ahalya, sinning against the married love, incurred her husband's curse, turning into a store to be restored to her humanity by the touch of Ramchandra.)

অনুবাদের প্রশংসা করে এডোয়ার্ড টমসনের পত্র আমরা দেখি নি, সাক্ষাতে মৌখিক প্রশংসা করা সম্ভব। তবে টমসন কবিতাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং অনুবাদ কবিতার পক্ষে হানিকর হয়েছে, বইয়ে এমন মন্তব্য করেছেন। টমসন লিখেছেন, 'The greatest poem in Mānasī is Ahalyā; I do not think he ever wrote a greater, at this or at any time.' অতঃপর লিখেছেন :

He has published a mutilated paraphrase in English (n. in a magazine only), on which it can never take its place among the world's masterpieces.

Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist. Oxford 1926 pp 75-76.

পরবর্তী সংস্করণে, ঈষৎ সংস্কারের পর পূর্ণ বয়ানটি এইরকম :

He published a mutilated paraphrase in English. The poem is extraordinarily subtle— profound philosophical thought burns like a slow fire in the steady, brooding lines. It is full of guesses, some of which science has already proved true, and others of which it may prove true hereafter : Rabindranath's 'interpenetrative power' attains its greatest triumph.

Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist. Oxford 1926 pp 67-68.

'interpenetrative power' শব্দবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ব্যবহার, দ্র. New Essays in Criticism 1903.

'বাঁকুড়ার Thompson...' ॥ এডোয়ার্ড টমসন ১৮৮৬-১৯৪৬। টমসন বাঁকুড়া ওয়েস্লিয়ান কলেজের (বর্তমান বাঁকড়া ক্রিশ্চান কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক (১৯১০-১৯২২) রূপে কাজ করবার পর অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন।

টমসনের Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph.D. ডিগ্রি পাওয়া বই। এর পূর্বে Rabindranath Tagore : His Life and Work নামে দি হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া সিরিজে একখানি বই তিনি লিখেছিলেন, ১৯২১ পৃ ১৬+৯৬ Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist লেখার পর টমসন বইয়ের জন্য ইয়েট্সের একটি ভূমিকা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছিলেন, নানা

কারণে চিঠিখানি উল্লেখযোগ্য বলে তার প্রাসঙ্গিক দু-এক অংশ উদ্ধৃত করছি :

পত্র ৬৭। 'জীবনস্মৃতির তর্জমাওয়ালা Modern Review'॥ একই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'চারুকে ইতিপূর্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন Modern Reviewতে জীবনস্মৃতির অনুবাদ বাহির হইবে Yeatsকে একখণ্ড ও Rhysকে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে। আপনিও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইতি ১৫ চৈত্র ১৩২২'।

'জীবনস্মৃতি'র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত অনুবাদ My Reminisences মডার্ন রিভিউয়ের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯১৬ বারো সংখ্যায় অনুবাদকের বিবিধ টীকা এবং গগনেন্দ্রনাথের চিত্রসমূহসহ প্রকাশিত হয়। My Reminiscences by Rabindranath Tagore, translated by Surendranath Tagore. The Modern Review, January 1916 1-8, February 1916 pp 137-142, March 1916 pp 285-290, April 1916 pp 361-367, May 1916 pp 475-480, June 1916 pp 583-589, July 1916 pp. August 1916 pp, September 1916 pp, Obtober 1916 pp, November 1916 pp, December 1916 pp. My Reminiscences ১৯১৭য় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থবিবরণ : My Reminiscences By Sir Rabindranath Tagore, with illustrations, Macmillan and Co., Limited. St. Martin's Street, London. 1917. pp. 11+272

বইয়ের তেরোটি চিত্রের প্রথমটি শশিকুমার হেশের আঁকা রবীন্দ্রনাথের রঙিন পোর্ট্রেট, অপরগুলি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি।

অনুবাদকের ভূমিকায় লেখা হয়েছে

The lightness of manner and importance of matter form a combination, the translation of which into a different language is naturally a matter of considerable difficulty. It was, in any case, a task which the present translator not being an original writer in the English language, would hardly have ventured to undertake, had there not been other considerations.

The translator, moreover, had the author's permission and advice to make a free translation, a portion of which was completed and approved by the latter before he left India on his recent tour to Japan and America...
প্রসঙ্গত ৩ মে ১৯১৬য় রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করেন। বইয়ের বিবিধ টীকা, অনুবাদকের সংযোজন, সেই সূত্রে অনুবাদক ভূমিকায় আরো লেখেন

All the footnotes here given have been added by the translator in the hope that they may be of further assistance to the foreign reader.

পত্র ৬৮ । 'সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ'॥ 'ফাল্গুনী (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)'। 'ফাল্গুনী' প্রথম প্রকাশ : সবুজপত্র, চৈত্র ১৩২১, পৃ অ- ই +৮০৭ -৮৬৩। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রবন্ধটি ... চৈত্রেই যেন বাহির হয়।' বেরিয়েছিল, দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ৫৯১-৫৯৭। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'রবি-দীপিতা'র দ্বিতীয় প্রবন্ধরূপে সংকলিত। পৃ ২১-৩৯। পূর্ব মাসেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -কৃত 'ফাল্গুনী' আলোচনা বেরিয়েছিল ভারতীতে, দ্র ভারতী ফাল্গুন ১৩২২।

৫ই মাঘ ১৩২২এর পত্রে সুরেন্দ্রনাথকে 'ফাল্গুনী'র মর্মকথা ব্যাখ্যা চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এই :

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি অতি সরল । সে হচ্ছে এই যে— জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়।

পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক। ওর সামনের দিকটা যৌবন। এই জন্যে জগতে চারি দিকে যৌবনটাকেই দেখচি, জরাটা চলে চলে যাচ্চে। তাকে এই দেখচি, তার পরক্ষণেই দেখচি নে। যেই শীতে সমস্ত ঝরে পড়ল অমনি দেখলুম শীত নেই ; বসন্ত এসে সমস্ত পূর্ণ করে বসেচে। তার থেকেই বুঝতে পারি আমাদের জরা নবতর যৌবনের বাহন। পুরাতন আপনাকেই পুনঃ পুনঃ করে পেতে চায়। এই জন্যে সে নিজেকে পুনঃ পুনঃ হারায়— হারিয়ে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সে যদি না চলে তাহলে পুরাতন আর নুতন হয় না— আমাদের নূতনটাকে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি। ফাল্গুনীতে গীতিনাট্যাংশটুকু হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে নানা ঋতুর তোরণদ্বার দিয়ে একই পুরাতনের নবীন হওয়ার লীলা। আর তারই সঙ্গে যে নাট্যটুকু আছে তার মধ্যে মানুষের যৌবন জরার অনুসরণ করতে গিয়ে কেমন করে মৃত্যুগুহার ভিতর দিয়ে নবজীবনে উত্তীর্ণ হয় সে বর্ণনা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে লীলা শীত বসন্তে, মানব প্রকৃতিতে সেই লীলা জরা-যৌবনে, জন্ম-মৃত্যুতে ।এই কথাটাকেই গীতে এবং নাট্যে ফাল্গুনীতে প্রকাশ হয়েছে ।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা সংকলিত পত্র পাওয়ার পরেই সুরেন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' সম্বন্ধে তাঁর লেখাটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। চারুচন্দ্রের চিঠিতে উদ্ধৃত করে দেওয়া সুরেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রখানিও ৬ই ফাল্গুন ১৩২২ তারিখে লেখা উদ্ধৃতাংশের আগে এই পত্রসূচনা ছিল :

শিলাইদহ
নদীয়া

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন,

ফাল্গুনীর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেচেন সেটি আমার তো ভালো লেগেচে। আমি ফাল্গুনীর রচয়িতা বলেই যে এমনটি ঘটল তা বোধ হয়

না— কারও এতদিন ধরে লিখে আসচি যে, আমি যে লেখক এ কথাটা ভোলবার সময় হয়েচে।

প্রবাসীতে যাতে লেখাটি বেরয় সেজন্য আমি এবার বিশেষভাবে তাগিদ করব। সম্পাদকের উপর মোড়লি করতে আমি কখনো সাহস করিনে— বিশেষত যে লেখা আমার নিজের সম্বন্ধে তা নিয়ে। কিন্তু এবার আমি বিনা সঙ্কোচে একটু জোরের সঙ্গেই হাঁক ডাক করে দেখব। . . .

আগের ৫ইমাঘ ১৩২২এর পত্রখানি এবং ৬ই ফাল্গুনের এই পূর্ণ পত্রখানি মৈত্রেয়ী দেবীর 'স্বর্গের কাছাকাছি' বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে ।[১]

'ফাল্গুনী'র আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নাটকখানিকে পুরাতন 'ছলিক নাটক' নামে একরকম গীতাভিনয়ের সগোত্র বলে নির্ণয় করেছেন যেখানে 'অভিনেতা আপন মনের কোনো গূঢ় অভিপ্রায়' নাচে গানে অভিনয়ে প্রকাশ করত, যে নাটকে 'পাত্রপাত্রীর চরিত্রসমাবেশের বাহুল্য স্থান পেত না।' এই নাটকের গূঢ় মর্ম কী ? সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> সমস্ত ফাল্গুনীটার হাওয়া থেকে এই সুরটা বেজেছে যে, জগতের ভিতরকার কথাটি যদি কেউ জানতে চায় তো সে কেবলমাত্র খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েই জানতে পারে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কোনও তত্ত্বচিন্তার কূটজালে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই, কোনও দার্শনিক কল্পনার মাপকাঠি ব্যবহার করতে চেষ্টা কোরো না, শুধু জগতের মধ্যে নানাপরিবর্তনের ভিতর যে একটি আনন্দলীলা চলেছে, বাউলের মতন সর্বাঙ্গ দিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে স্পর্শ কর; পুঁথির চোখটাকে, তর্কের চোখটাকে একেবারে কাণা করে দাও; সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বকে আলিঙ্গন কর, তাহলেই দেখতে পাবে যে

---

[১] 'স্বর্গের কাছাকাছি' ১৩৮৮ পৃ ২৬ ও পৃ ২৮-২৯ ।

প্রসঙ্গত সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ১৩১৫ সাল থেকে । সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'নিবেদন' (১৩১৮) কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ লিপি : 'হে রবি হে কবিবর ! লহ নমস্কার।'

অন্তরে বাহিরে দুই যন্ত্রে একই সংগীত উঠছে ; সেই সংগীত যতই তোমার মনকে স্পর্শ করবে ততই তোমার বিশ্বখেলায় যোগদান করা সার্থক হবে। ইতিপূর্বে কোনও কবি জগতের রহস্যটিকে ধরবার এমন সুন্দর উপায় এত পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করেছেন বলে আমি জানি না।

'গোটা দুয়েক কবিতা . . .' ।। 'খোলা জানলায়' (আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে)। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ৫৩৩। 'মাধবী' (কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে)। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ পৃ ৬১৪। যথাক্রমে 'বলাকা'র ৩৪ ও ১৪ সংখ্যক কবিতা।

পত্র ৭০। 'আমেরিকায় Lynching...'॥ অব্যবহিত পূর্বাহ্নের পেনসিলভেনিয়া কোট্‌সভিলের এক নিগ্রোনিধন এবং তার বর্ষকাল পরে জন জে চ্যাপম্যান -কর্তৃক তার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের কথা ১৯১২য় রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা-বাসকালে জানিয়েছিলেন রোটেনস্টাইন। নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

'চির-আমি'। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৪।

পত্র ৭১। 'পোলিটিক্যাল প্রবন্ধ ...'॥ At the Cross Roads. by Sir Rabindranath Tagore. মডার্ন রিভিউ। জুলাই ১৯১৮ পৃ ১-৪।

আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪), নোবেল পুরস্কার ১৯২১। The White Store : Sur La pierre blanche (১৯০৫)-এর অনুবাদ। মডার্ন রিভিউ, জুলাই ১৯১৮য় Gleanings স্তম্ভে আনাতোল ফ্রাঁসের এই বই থেকে উদ্‌ধৃতি ছাপা হয়, পৃ ৪০- ৪২, প্রাসঙ্গিক অংশ :

The discovery of the West Indies, the Exploration of Africa, the nevigation of the Pacific Ocean, opened up vast territories to European avidity. The white kingdoms joined issue over the extermination of the red, yellow and black races. and for the space of four centuries gave themselves up madly to the pillaging of three divisions of the world. That is what is styled modern civilisation.– The White Store. by Anatole France p 152.

পত্র ৭২। 'আমার সেই বালিকা-বন্ধুটি . . .'॥ কাশীর অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর তৃতীয়া কন্যা রাণু অধিকারী (পরে মুখোপাধ্যায়)। ২রা বৈশাখ ১৩২৫-এর চিঠিতে দেখা যায় তাঁর 'কাশীর নিমন্ত্রণ' ভানুদাদা গ্রহণ করতে পারেন নি 'বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি' দেওয়ার স্থির থাকায়।[১] তার বদলে ২রা জ্যৈষ্ঠ বড়ো মেয়ে মাধুরীলতার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি 'শান্তিনিকেতনে চারি মাস একযোগে কাটাইয়া দিলেন' বলে প্রভাতকুমার উল্লেখ করেছেন।[২]

ছাপাখানা॥ বৃহস্পতিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ (৬.১২.১৯৯৭)এর চিঠিতে শান্তিনিকেতন থেকে যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : আমেরিকার Lincoln সহর আমাদের বিদ্যালয়কে একটি ভাল ছাপাখানা উপহার দিয়াছেন। চালাই কি করিয়া? আর কিছু নয় ছেলেদের শিক্ষা ও আমোদ হয় অথচ আমাদের খরচ উঠিয়া যায় এমন উপায় কিছু বলিতে পারেন? চিন্তামণিবাবুকে বলিয়াছিলাম এই প্রেসকে তিনি তাঁর ব্যবসায়ের অন্তর্গত করিয়া লন তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। তিনি পারিয়া উঠিবেন না লিখিয়াছেন। এখানে এমন তৈরি ছাপাখানা এবং বিনা ভাড়ায় ঘর লইয়া কি কোনো ব্যবসায়ী ইহার ভার লইতে পারেন না? আপনি কাহাকেও জানেন? হরিদাসবাবু কি এ প্রস্তাবে রাজি হইবেন? ইস্কুল মাষ্টারের হাতে এ-সব জিনিষ দিতে ভয় হয়— দুদিন বাদে ইহার অক্ষরে এবং ভগ্নাংশে বোলপুরের প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া যাইবে— অবশেষে ভাবী যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক দল ইহার

---

১ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', ৫ 'সংখ্যক পত্র ১৩৬৯ সং পৃ ১৫-১৬ ।

২ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৯৫ সং পৃ ৬১৬ ।

ইতিহাস লইয়া ভয়ঙ্কর দলাদলি বাধাইয়া দিবে। অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

পুনশ্চ।

এই ছাপাখানায় বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ ছাপাইবার ব্যবস্থা করা যায় না কি ?[১]

ছাপাখানাটি নিয়ে সরকারি বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হয়েছিল। কলকাতা থেকে ৬ মার্চ ১৯১৮র পত্রে পিয়ার্সনকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> ... The printing press is still rusting in Shantiniketan. I have not yet received permission to use it. I shall wait a few more weeks and then I shall ask the good citizens of Lincoln, who made a present of it to my school, to take it back. Each one of us in this unfortunate country is looked upon with suspicion— and our authorities cannot see us clearly through the dust which they themselves raise ...

আলোচ্য চিঠিতে লক্ষ্য করা যায় আর তিন মাসের মধ্যেই সরকারি বাধা অতিক্রম করা গিয়েছিল।

সুকুমারের ভাই, উপেন্দ্রকিশোরের মেজো ছেলে সুবিনয় রায়, কলকাতার প্রসিদ্ধ ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স ছাপাখানার মুখ্য দায়িত্ব ছিল যাঁর উপরে।

বৈশাখ ১৩২৬এ এই প্রেস থেকে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের জন্য মাসিক পত্র 'শান্তিনিকেতন'-এর প্রথম সংখ্যা ছেপে

---

[১] যদুনাথ সরকার এই টীকা করেছেন : 'গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্সএর স্বত্বাধিকারী হরিদাসবাবুকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে"র সিরিজ তাঁহাদের আট আনা সংস্করণের মতন প্রকাশ করিতে সম্মত করি, এবং আমার আলোচনার ফল কবিকে জানাই ... চিন্তামণিবাবু এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ।' দ্র. প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২ পৃ ৩৯৬ ।

বেরোয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যার 'আশ্রম সংবাদ' স্তম্ভে এই বিজ্ঞপ্তি ছিল :

গুরুদেবের আমেরিকাবাসকালে Lincoln সহরের অধিবাসীগণ আশ্রমের বালকদিগের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্রমের যাবতীয় ছাপার কাজ ও গুরুদেবের সংগীতপুস্তকাদি ছাপা হইতেছে।

—'সংবাদ'। শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নূতন গানের বহি শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথের স্বরলিপিসহ আমাদের ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইয়াছে— গীতপঞ্চাশিকা, গীতবীথিকা ও বৈতালিক। বৈতালিক কতকগুলি পুরানো বাছা বাছা গানের সংগ্রহ, ইহাও স্বরলিপি সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে 'জাপানযাত্রী' বলিয়া একখানি বই ছাপা হইতেছে।

—'সংবাদ'। শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৬

অগ্রহায়ণের 'সংবাদে' দেখা যায় ছাপাখানায় আরো একটি মেশিন প্রেসের সংযোজন ঘটেছে, 'তাহাতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী ছাপানো আরম্ভ হইবে।'

প্রসঙ্গত, এই সময়ে ছাপাখানার মুদ্রাকররূপে ছিলেন জগদানন্দ রায়। 'গীতপঞ্চাশিকা', 'বৈতালিক', 'গীতবীথিকা' ও 'জাপানযাত্রী'র প্রকাশ তারিখ যথাক্রমে আশ্বিন ১৩২৫, চৈত্র ১৩২৫, বৈশাখ ১৩২৬ ও শ্রাবণ ১৩২৬।

পত্র ৭৩। "কালো মেয়ে"॥ সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২৫ পৃ ১৬২-১৬৫।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৫ পৃ ৪১৬-৪১৭য় কষ্টিপাথর বিভাগে সংশোধিত রূপে উদ্‌ধৃত। 'পলাতকা' (অক্টোবর ১৯১৮) কাব্যে সংকলিত।

'ইস্কুলমাষ্টারি কাজে ব্যস্ত আছি'॥ দ্র. পত্র ৭৪এর টীকা।

পত্র ৭৪। *Lover's Gift*॥ *Lover's Gift and Crossing.* The

Macmillan Company 64-66 Fifth Avenue. New York 1918 pp 158+8 (ads).

১৯১৮ মে মাসেই বইয়ের কপি এসে পৌঁছেছিল লেখকের কাছে। দ্র. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্র, পোস্ট মার্ক শান্তিনিকেতন ২৮ মে ১৯১৮ :

> *Lovers Gift* কয়েক কপি এসেছে। তোরা তিনধরিয়া যাচ্ছিস কি না ঠিক জানিনে বলে পাঠালুম না। ম্যাকমিলানরা একটা ৫০০ টাকার চেক পাঠিয়েচে ...[১]

'ইস্কুলমাষ্টারিতে...'॥ এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরীকে পিয়ার্সনকে অজিতকুমার চক্রবর্তী, বা আরো কাউকে কাউকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষকতার যে যে সব কথা সেই সময়ে লিখেছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯ জুলাই ১৯১৮র চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন :

> বিদ্যালয়ে আজকাল মাষ্টারি করে থাকি। তাতে আমায় প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্‌বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময়ে থাকে না অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়েই চল্‌তে থাকে— এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে। . . . এইজন্যে পঞ্চাশোর্দ্ধে ঐ অনিশ্চিত অসাময়িক কাজটা ছেড়ে দিয়ে গুরুমশায়গিরি ধরেচি। তাতে বেশ ভালই থাকি।

একই দিনে ২৯ জুলাই ১৯১৮য় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে :

> আমি আজকাল বিদ্যালয়ে মাস্টারী কাজে খুব উঠে পড়ে লেগে গেচি তিনটে ইংরেজি ক্লাস নিয়েচি— তারপর তিনটে ক্লাসের জন্যে পাঠ্য তৈরি করতে— আমার বিস্তর সময় যায়। ভালই লাগচে— যদিচ খাটুনি কম নয়।

---

[১] বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ পৃ ৩।

বোধ হয় এখানে যত অধ্যাপক আছেন সকলের চেয়ে বেশি।

পুনরপি ২১ জুলাই ১৯১৮য় :

ছেলে পড়ানোর কাজে উঠে পড়ে লেগেচি . . . তার উপর আমাকে ইংরেজি পড়াবার Text Book লিখতে হচ্চে . . .

২৮ জুলাই ১৯১৮য় ভানুসিংহের চিঠি : 'সকালে তুমি তো জান সেই আমার তিন ক্লাসের পড়ানো আছে . . .'। তারপর ৬ অক্টোবর ১৯১৮য় রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনকে লেখেন :

All through this last session I have been taking classes in the morning, spending the rest of the day writing text books. it is a kind of work apparently unsuitable for a man of my temperament. Aut I found it not only interesting, but restful ... Lately I came to that state of mind when I could not afford to wait for the inspiration of ideas, so I surrendered myself to some work which was not capricious, but had its daily supply of coal to keep it running. However, this teaching work was not a monotonous piece of drudgery for me ; for, contrary to the usual practice, I treated my students as living organism-- and dealing with life can never be dull ...'

বেশ কয়েকদিন পরের ১৮ আগস্ট ১৯১১এর কুচবিহারের মহারানী

---

১ 'চিঠিপত্র' ৫

২ *Letters to W. W. Pearson* The Visva-Bharati Quarterly May-July 1943 pp 82-83.

৩ 'পত্রাবলী'। দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭১ পৃ ১৯-২০।

৪ 'অনুবাদ-চর্চা-বাংলা হইতে ইংরাজি' রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৫০৮-৬০৭ মধ্যে সংকলিত।

সুনীতি দেবীকে লেখা চিঠিতেও পাই ইস্কুলমাস্টারিতে অত্যন্ত রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

> . . . ছেলেবেলায় যখন ছাত্র ছিলুম, তখন মাস্টারকে এড়িয়ে চলাই আমার একমাত্র কাজ ছিল— আজকাল তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে ইস্কুল মাস্টারি করতে বসে গেছি। ছেলেদের নিয়ে বেশ আছিও ভালো। ওদের সংসর্গে খানিকটা পরিমাণে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়, মন তাজা হয়ে ওঠে।

পিয়ার্সনের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখ করেছেন তা সম্ভবত 'অনুবাদ চর্চা' [বাংলা থেকে ইংরাজি] ১৯১৭ পৃ ১৪০। *Selected Passages for Bengali Translation* (1917) এই দুখানি বই। দ্বিতীয় বই প্রথমটির পরিপূরক বই। প্রথম বইয়ে অনুবাদের জন্য নির্ধারিত বাংলা প্যারাগ্রাফগুলির প্রার্থিত রূপান্তর এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে।

পত্র ৭৫ । 'চারু, তোমার বই ...'॥ 'হেরফের' (উপন্যাস)। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বিন ১৩২৫ পৃ ৪ + ২২৫ ।

গ্রন্থারম্ভে লেখা :

> এই গল্পের প্লটের মূল ধারাটি পরম পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্নেহের দান। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ১৫ আশ্বিন ১৩২৫ ।
>
> চারু

'হেরফের' উৎসর্গ : 'সোদরপ্রতীম শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য সুহৃদ্‌বরেষু ।'

'এই ছুটির মধ্যে...'॥ পূজার ছুটিতে ২১ আশ্বিন ১৩২৫ ৮ অক্টোবর ১৯১৯ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন, ২৫ আশ্বিন ১২ অক্টোবর মাদ্রাজের পথে গাড়ির গোলযোগে পিঠাপুরমে যাত্রাভঙ্গ করে তারপর কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে ফেরেন ৩ কার্তিক ২০ অক্টোবর ১৯১৮। দ্র 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় ১৯৯৫ সং পৃ ৬১৯-৬২০ ।

পত্র ৭৬। 'একটি শিক্ষকের আশু প্রয়োজন'॥ কালীপদ রায় লিখেছেন,

'রবীন্দ্রনাথ কখনও বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করেন নি, যথার্থ শিক্ষকদের তিনি খুঁজে বের করেছেন।'

'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' ১৩৮৮ পৃ ৩৯ ।

পত্র ৭৮। '...আলাদা কপি'॥ Letters from an Onlooker. by Rabindranath Tagore. Translated by Surendranath Tagore. Translation revised by the Author. ৮ পেজী ক্রাউন পৃ ১৩। পিছন মলাটে ছাপা : Printed by A. C. Sarkar at the Brahmo Mission Press. 211 Cornwallis Street. Published by Ramananda Chatterji. 210 Cornwallis Street. Calcutta

'বাতায়নিকের পত্র' অনুবাদ মডার্ন রিভিউ জুলাই ১৯১৯ পৃ ১-১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

' "ঘোড়ার পরীক্ষা" মডার্ন রিভিউয়ের জন্য ...'॥ 'ঘোড়া' : লিপিকা The trial of the Horse নামে অনুবাদিত। মডার্ন রিভিউ, অগস্ট ১৯১৯ পৃ ১৮৮-১৮৯। গ্রন্থাকারে THE TRIAL OF THE HORSE/ By/ Rabindranath Tagore ক্রাউন ৮ পেজী। pp 1-7 (Reprinted from the Modern Review from August, 1919.) মুদ্রক ও প্রকাশক পূর্ব গ্রন্থানুরূপ। অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দুটি অনুবাদ রচনাই বিপাকের বন্ধুদের জন্য পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

Trial of the Horse পরে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত The Parrot's Training and Other Stories (অক্টোবর ১৯৪৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পত্র ৭৯। তু. একই দিনে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি :

> কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব। রবিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভা বসবে সন্ধ্যা ছটার সময়... সোমবারেই আমাকে

ফিরতে হবে। ইতি— বুধবার (শান্তিনিকেতন ৩০ জুলাই ১৯১৯)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু হয় ৬ জুন ১৯১৯এ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তখন তিনি সভাপতি। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগের সংবাদ ও বসুমতী পত্রে ত্যাগপত্রের অনুবাদ পাঠ করে উত্থানশক্তিরহিত রামেন্দ্রসুন্দর কনিষ্ঠকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পদধূলি প্রার্থনা করে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ এলে তার মুখে মূল পত্রখানি শোনেন। অতঃপর তাঁর সংজ্ঞা লোপ হয় এবং সেই তাঁর শেষ নিদ্রা।

৬ জুলাই ১৯১৯এ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শোকপ্রকাশ ও স্মৃতি রক্ষা সমিতি গঠিত হয়, সমিতির সভাপতি হন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের নাম গৃহীত হয় তৃতীয় স্থানে। ৩ আগস্টের (১৮ শ্রাবণ ১৩২৬) স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে পরিষৎ যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করেন তার আয়োজকদের মুখ্যস্থানে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর এবং পরিষৎ-সম্পাদক রূপে তিনিই তাঁকে স্বরচিত অভিনন্দনপত্র প্রদান করেছিলেন। পরিষৎ-আয়োজিত রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্তি সংবর্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথও স্বরচিত স্বহস্তলিখিত একখানি অভিনন্দনপত্রে বোলপুর থেকে এসে পাঠ করে যান।

পত্র ৮০। 'আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রের...'॥ বৈশাখ ১৩২৬ থেকে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের জন্য মাসিক পত্র' শান্তিনিকেতন পত্রিকার সূত্রপাত হয়। প্রথম বছরের সম্পাদক জগদানন্দ রায়। পত্র-সূচনায় লেখা হয়, 'এই কাগজে আমরা যাহা কিছু বলিব তাহা কেবল-মাত্র আমাদের আশ্রমের ছাত্র ও আত্মীয়দিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিব।' তৎসত্ত্বেও প্রথমাবধি প্রবাসীর কষ্টিপাথর বিভাগে শান্তিনিকেতন পত্রিকা থেকে বিস্তারিত রবীন্দ্ররচনা সংকলন করে দেওয়া হতে থাকে। কার্তিক ১৩২৬ সংখ্যা পর্যন্ত আহৃত রচনার একটি তালিকা এখানে প্রস্তুত

করে দেওয়া গেল :

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

'গান' (পাখী আমার নীড়ের পাখী) পৃ ১৭৫

'নববর্ষ' (নববর্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যের উপদেশ) পৃ ১৭৫-১৭৬

'মৈসুরের কথা' পৃ ৭৬-১৭৭

'বিশ্বভারতী' পৃ ১৭৭

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৬

'অসন্তোষের কারণ' পৃ ২৪৪-২৪৫

'গান' (মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি) পল ২৪৫

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৬

'খাদ্য চাই' পৃ ৩৮১-৩৮২

'প্রতিশব্দ' পৃ ৩৮২

'বিদ্যার যাচাই' পৃ ৩৮২-৩৮৩

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৬

'১১ই আষাঢ়ের উপদেশের মর্ম পৃ ৪৩০-৪৩১

'বিশ্বভারতী' (১৮ই আষাঢ় বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের দিনে আচার্যের বক্তৃতার সারসংকলন) পৃ ৪৩১-৪৩২

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৬

'কল্যাণ' পৃ ৫৬৩-৫৬৫

'অনুবাদ-চর্চা' পৃ ৫৬৫

'প্রতিশব্দ' পৃ ৫৬৫-৫৬৬

'গান' (আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি) পৃ ৫৬৬-৫৬৭

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৬

'গান' (তীরে কি আর আসবে না তোর তরী) পৃ ৭৪

'গান' (দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন) পৃ ৭৪

'গান' (আমার বোঝা এতই করি ভারী) পৃ ৭৪

'গান' (আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে) পৃ ৭৪

'তোমাকে একটা গল্পের প্লট...'॥ 'দোরোখা' গল্পের প্লট ।

'সুরেনের আপিস...'॥ ১৪ নং হেয়ার স্ট্রীটে হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটির অফিস।

' "গোরা।' তর্জমা'।। শিলং থেকে ফিরে এসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ২৯ কার্তিক ১৩২৬এর পত্র :

গোরার ইংরেজি তর্জমার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়া সুরেনকে চিঠি লিখিলে হয়ত ফল হইতে পারে। তার কাজের ভীড় হয়ত কিছু কমিয়াছে ।

অতঃপর ২৬ ফাল্গুন ১৪২৬এ লেখেন :

সুরেন বোধ করি 'গোরা' তর্জমা করিতে সাহস পাইতেছি না। কেম্‌ব্রিজ হইতে এণ্ডার্সনের পত্র পাইয়াছি তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন আমার গল্পের মধ্যে গোরা তর্জমা করিতে তাঁহার সখ, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বলিয়া দ্বিধা করিতেছেন। আমারও বোধ হয় কোনও নিছক ইংরেজের পক্ষে গোরা তর্জমা করা সহজ নহে। এণ্ডরুজ আসিলে তাহার সঙ্গে একত্রে মিলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। ইংরেজি ভাষায় আমার কলম যদি সহজে চলিত তবে Modern Reviewর জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, নূতন অভ্যাসের আর সময় নাই ।

---

১ প্রবাসী. জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিনের সংকলন শান্তিনিকেতন পত্রিকার যথাক্রমে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার রচনা থেকে আহৃত। প্রবাসী, কার্তিক-সংখ্যায় গৃহীত গান কয়টি শান্তিনিকেতন, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬ যুগ্ম সংখ্যার পৃ ২৩, পৃ ৩০ ও পৃ ৩৩এ মুদ্রিত। শান্তিনিকেতন, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার আরো অনেকগুলি রবীন্দ্ররচনা প্রবাসী, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংকলিত হয়। প্রবাসীর 'কষ্টিপাথর' বিভাগে এ ছাড়াও পাশাপাশি সবুজপত্র থেকে রবীন্দ্ররচনা আহৃত হয়েছে।

এণ্ডরুজ এই সময় পূর্ব আফ্রিকায় ।

পরে 'গোরা' অনুবাদ করেন উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসন।

পত্র ৮১। ''কথিকা''॥ ৪ ভাদ্র ১৩৩৬এর চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ছোট ছোট গল্পকে ''কথানু'' না বলে ''কথিকা'' বলা যেতে পারে। ''গল্পস্বল্প'' বললে ক্ষতি কি? অতঃপর ২২ ফাল্গুন সে নিতান্তই গল্পস্বল্প ...' ।

'পুনশ্চ'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ইংরেজি গদ্যে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হওয়ার পরেই তাঁর মনে প্রশ্ন হয়েছিল 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, ''লিপিকা''র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে ।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভীরুতাবশত ''লিপিকা'' লেখার কাব্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি।' কিন্তু এই 'কথিকা'তেই তাঁর গদ্যকবিতা রচনার সূত্রপাত।

মাঘ ১৩২৪ থেকে মাঘ ১৩২৬এর পূর্ব পর্যন্ত এইরকম বাইশটি লেখা পাওয়া যায়। দ্র গ্রন্থপরিচয় 'লিপিকা' ১৩৮৫ সং পৃ ১৮৯০ ১৯০। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বঙ্গবাণী পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গবাণীতে 'লিপিকা'র একটিমাত্র কথিকা 'পরির পরিচয়' প্রকাশিত হয় : বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩২৯।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন, জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর নাইট পদবী প্রত্যাহার করবার পর বিচলিতচিত্তকে প্রশমিত করে 'কথিকা' পর্যায়ের লেখার শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ, দ্র. 'লিপিকার সূচনা', 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সংকলিত ১৯৮৫ পৃ ১৬৪-১৬৬।

'প্রবাসীর অগ্রহায়ণ |১৩২৬| সংখ্যায় উদ্ধৃত' রবীন্দ্ররচনা ।। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পৃ ৯৯এ আরম্ভেই এক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কথিকা : 'একটি চাউনি' ও 'একটি দিন' প্রকাশিত হয়। অতঃপর শান্তিনিকেতন পত্রিকা থেকে ছোটো ও বড়ো হরফে সংকলন করে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের লেখা নীচের রচনাগুলি :

'বাংলা কথাভাষা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১১৩-১১৬।
'শারদোৎসব'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১১৯-১২১।
'প্রতিশব্দ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১২৯-১৩১।
'১০ই ভাদ্র শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যের উপদেশ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৪৬-১৪৭।
'অনুবাদচর্চা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৪৭-১৪৯।
'তেল আর আলো'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৪৯-১৫১।
'মনোবিকাশের ছন্দ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৫১-১৫৩।
'আহারের অভ্যাস'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৫৩-১৫৪।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি ও শেষ তিনটি প্রবন্ধ বড়ো হরফে মুদ্রিত, প্রথম তিনটি প্রবন্ধ 'কষ্টিপাথর' বিভাগের বহির্ভূত ।

'বাংলা কথ্যভাষা প্রবন্ধের ভাষাতত্ত্বজনিত ত্রুটি নিয়ে পরের মাসে বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'ভাষাতত্ত্ব আলোচনা' প্রকাশ করেন, প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬ পৃ ২১১-২১২ । এই আলোচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিজয়চন্দ্রকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা উদ্‌ধৃত করে দেওয়া যেতে পারে :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আমাদের 'শান্তিনিকেতন' নামক ছোট একটি পত্রে 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শব্দ উচ্চারণ লইয়া দুই-একটা কথা বলিয়াছিলাম

এবং সেই সঙ্গে ব্যাকরণঘটিত মন্তব্যও কিছু ছিল। আপনি তাহা লইয়া প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বাংলা ভাষার সোদরা ভাষাগুলির সহিত পরিচয় না থাকাতে এ সকল বিষয়ে অনেক কথাই আন্দাজে বলিয়া থাকি। কিন্তু আন্দাজে বলার বলারও একটা গুণ এই যে তাহাতে আলোচনার ও সংশোধনের অবকাশ দেওয়া হয়। চাণক্যের উপদেশ (যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে) যদি শিরধার্য করিয়া লইতাম তবে তাহা শোভন হইত কিন্তু কল্যাণকর হইত না--- আমার তরফে এইমাত্র কৈফিয়ৎ। দুই অক্ষরের বিশেষণ বাংলা ভাষায় স্বরান্ত হইয়া থাকে এই নিয়ম সম্বন্ধে তোমাদের কোনো পাঠকের নিকট হইতে প্রতিবাদ পাইয়াছি এবং এবারকার 'শান্তিনিকেতন' পত্রে এই নিয়মের কচিত অন্যথা সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই সম্ভাবনা আমার পূর্বেও জানা ছিল কিন্তু উক্ত নিয়মের উল্লেখ নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে ঘটাতে ভাষাপ্রয়োগে সতর্ক হইতে ভুলিয়াছিলাম। যাহা হউক আমার মন্তব্য সম্বন্ধে আমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা পৌষের শান্তিনিকেতনে প্রকাশ করিব এবং আপনাকে পাঠাইয়া দিব। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় কারণ ইহাতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে কিন্তু আমার সম্বল বেশি নাই, তাই আন্দাজ লইয়া আমার কারবার। আমার মত ইস্কুল পলাতক ছেলেরই এই দুর্গতি ।

অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই । একবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিয়া দুই-চার দিন কাটাইয়া যাইতে পারেন কি ? তাহা হইলে আপনার সঙ্গে নানা কথা আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায়। কলিকাতার ভিড় এত বেশি যে, মন খুলিয়া কথা কহিবার ফাঁক পাওয়া যায় না। ইতি ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণক্রমে, সম্ভবত অগ্রহায়ণেই বিজয়চন্দ্র শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। পৌষ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রিকার 'আশ্রম সংবাদ' স্তম্ভে উল্লেখ আছে এ যাত্রায় কলাভবনে পুরাণ সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন।

অধ্যাপক এণ্ডার্সনের পত্র।। ১৩২৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসী পড়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক জে. ডি. অ্যাণ্ডার্সন রবীন্দ্রনাথকে ২০ ডিসেম্বর ১৯১৯ তারিখে প্রধানত তাঁর 'অনুবাদচর্চা' নিয়ে বিস্তারিত পত্র লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এইরকম :

> ... With what interest I read sundry of your articles in the Agrahayan number of the প্রবাসী— especially that on p. 147 on the difficulties of translation. I spend a good deal of my time in helping pupils to put Bengali into English and (not quite so much time) in helping them to put english into Bengali. The difficulty is to decide when to be free, when to be literal, in translation. Sometimes this difficulty is easily solved. For example, your own two delightful little prose poems একটি চাউনি and একটি দিন go into English very easily, and an almost literal translation is possible. In fact, the closer the translation, the better the result. On the other hand, your touching and admirable note on Pandit Sivanāth Sāstrī can hardly I think, be subjected to a literal translation throughout. It is not so much a matter of the choice of equivalent words as a style. Even in this, however, there are passages which go very easily and pleasantly into an

English guise which even you would not. I think. disapprove. Such for instance. is the Phrase :

মানুষের সঙ্গে যেখানে তাঁর বিলন হইয়াছে সেখানে আর তার নানা ছোটবড় কথা নানা ছোটবড় ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মত তাঁর মনের মধ্যে তাজা থাকিয়া গেছে ।

But. again. is it certain that every Englishman— our friend Pearson. for example— would choose that as an easier sentence to render into English than others that precede and follow it? It depends on the Englishman's own style and taste. doesn't it? You. a born man of letters. can vary your style almost at will. whereas the average mortal. whether Bengali or English. is fortunate if he has a tolerable mastery of one fairly good and agreeable manner of expressing his own or author's thoughts and emotions. From which it follows that some writers are difficult— not to understand but to translate. For the translator has to transfer to his own language not merely his original's meaning but also something of his manner of expression that can only be done by some effort of imaginative sympathy on the part of someone who has a command of his own speech approximately equal to your own command of Bengali and that. you will observe is asking much! I was interested (and edified) by your discussion of the proper terms for the translation of technical and scientific phrases.

পত্র ৮২। 'গল্প লেখবার মেজাজও নেই ...'॥ 'পাত্র ও পাত্রী' শব্দের পর (সবুজপত্র, পৌষ ১৩২৪) রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন লিখেছেন গল্পের বদলে কথিকা বা 'লিপিকা'র 'গল্পস্বল্প' (১৩২৪-১৩২৯), তথাকথিত আদ্যোপান্ত গল্প পুনরায় বেরোয় প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২এ, 'নামঞ্জুর গল্প'।

'ভেবেচিন্তে প্লট দিতে পারি...'॥ এই চিঠির আগে পরে অনেকগুলি গল্পের প্লট তিনি চারুচন্দ্রকে দিয়েছেন।

পত্র ৮৩। জুলাই ১৯২২। সত্যেন্দ্রের নামে কবিতা॥ মাত্র ৪১ বছর বয়সে ১০ আষাঢ় ১৩২৯ (২৫ জুন ১৯২২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা শোককবিতা 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে, রচনা ১৮ আষাঢ় ১৩২৯) একই সঙ্গে প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯ ও ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৯ পৃ ৩০৭-৩০৮ প্রকাশিত হয়, পরে 'পূরবী' কাব্যে (শ্রাবণ ১৩৩২) পঞ্চম কবিতা রূপে গৃহীত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন গৃহে, সেন্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শোকসভা হয়। কলকাতা রামমোহন লাইব্রেরি হলে শোকসভা হয় ২৬শে আষাঢ় ১১ জুলাই তারিখে। পরদিন ১২ জুলাই ১৯২২এর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি পূজা' নামে সে সভার বিবরণ সাহিত্য সংসদ -প্রকাশিত 'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছে'র ভূমিকায় সবিস্তারে উদ্ধৃত হয়েছে।[1] অমৃতবাজার পত্রিকার বিবরণটি এইরকম :

THE LATE POET SATYENDRA NATH DUTTA

— : o : —

CONDOLENCE MEETING

To mourn the death of the late Poet Satyendranath Dutt a meeting was convened by his friends and admirers at

---

[1] ড. অলোক রায় -সম্পাদিত 'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ' ১৯৮৪ পৃ ৩০।

the Rammohan Library on Tuesday evening. Dr. Rabindranath Tagore presided. Among those presen[t] were a number Indian ladies.

Mr. Charu Bandyopadh[y]aya. Assistant Editor of the "Modern Review" and "Probasi". in an extremely able and well-written paper recounted his reminiscences of the late poet and offered a critical estimate of his poetry.

Mr. P. N. Chaudhury in a neat little speech paid a glaring tribute to the sterling qualities which the illustrious deceased was endowed with by providence.

Kaji Nazrul Islam then read a poem as a tribute to the memory of the late poet.

DR. TAGORE'S SPEECH

Dr. Tagore in course of his speech said that the death of Satyendranath has left a gap on his heart and he considered it as his own personal loss. He was so closely related to the deceased in regard to his high literary attainments that he not only admired him but loved him. Dr. Tagore not only adored him for his poetic instincts but the one peculiar trait in his character attracted him most and that was the illustrious deceased wts [?] seeking after the truth in everything and in that direction he was singularly successful. Whenever he had occasion to write any verses he always thought of

Satyendra Nath and although the deceased was quite young Dr. Tagore at all time received his invaluable help in every matter concerning literature.

In conclusion Dr. Tagore read a poem specially composed for the occassion which was full of pathos. The meeting terminate path in the evening.

—The Amrita Bazar Patrika. Wednesday July 12. 1922. পৃ ৬ কলাম ৩।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে, তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন :

সভায় যেরকম জনসমাবেশ হয়েছিল, তেমন সমাবেশ শোকসভায় সচরাচর দেখা যায় না। সভায় উপস্থিত ছিলেন অনেক কবি ও সাহিত্যিক। উপস্থিত ছিলেন সি. এফ. এণ্ড্রুজ সাহেব— খদ্দরের গেরুয়া একটি পাঞ্জাবী ও ধুতি পরিহিত বেশে। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ এলেন। সেদিন তাঁর যে ব্যথাকাতর শোকাহত মূর্তি দেখেছি, তা ভোলবার নয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে মনে হয়েছিল যেন আত্মীয়বিয়োগে কাতর। ব্যথিত মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজ কবির উদ্দেশ্যে পড়লেন—

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে।

সমস্ত সভা নীরব হয়ে কবিতাটি শুনল। অতঃপর কোনো শোকপ্রস্তাব গৃহীত হল না, অন্য কেউ বক্তৃতা দিলেন না। সভা ভঙ্গ হল। সভার সকল লোক ব্যথিত শোকাহত হৃদয় নিয়ে ধীরে ধীরে সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সুধীরচন্দ্র সরকারও ওই শোকসভার একটি বিবরণ রক্ষা করেছেন তাঁর 'আমার

কাল আমার দেশ' বইয়ে ১৩৭৫ পৃ ৬০-৬১। তিনি লিখেছেন :

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামমোহন লাইব্রেরি হলে তাঁর স্মৃতির জন্য আমরা একটি সভার অনুষ্ঠান করি। কথা ছিল, সভা শেষ হবার পর একটা রীতিমতো কমিটি গঠিত হবে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য। অন্যান্য সভায় যেমন হয়ে থাকে তেমনভাবে কোনো সভাপতির নাম প্রস্তাব আমরা করি নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুবাসরে এসে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত কবিতাটি সভাপতি পাঠ করলেন।

আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে সেদিন সত্যেন দত্তের সেই স্মরণসভায় আর কোনও রেসোলিউশন্ নেওয়া বা কমিটি গঠন হল না। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী কবিগুরুর কবিতা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি চলে গেল। এই রকম শোকপূর্ণ সভা আমি আর কখনও দেখি নি।[১]

রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রের কাছে কবিতার প্রুফ দেখতে চেয়েছিলেন। প্রবাসীতে পাঠানো প্রেসকপির সঙ্গে প্রবাসীতে পাঠের কোনো কোনো স্থানে পার্থক্য হয়েছে, তাতে বোঝা যায় প্রুফে তিনি কবিতাটির সংস্কার করেছিলেন। প্রথম ছত্রেই এই তারতম্য চোখে পড়ে :

পাণ্ডুলিপির পাঠ

আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে

---

[১] প্রসঙ্গত সেন্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে দর্জিপাড়া নিউ জুভেনাইল লাইব্রেরির শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় ৭ই জুলাই শুক্রবার। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সে সভায় সভাপতিত্ব করেন, বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'পরলোকগত সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন' হয় ১১ জুলাই ২৭শে আষাঢ় তারিখে, প্রমথ চৌধুরী সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ মিত্র লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে পরিষদ ১৪ই জুলাই বন্ধ থাকবে ঘোষণা করা হয়।

পত্রিকার পাঠে হয়েছে

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে

রচনাবলী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত পাঠের পরেও পরবর্তী সংশোধনের হদিশ আছে, দ্র. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্দশ খণ্ড ১৩৭১ সং ৫২৫ ।

প্রসঙ্গত 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' কবিতার অনুষঙ্গ ও অন্তর্বিষয়ের দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য, দ্র. 'রবীন্দ্রকবিতাশতক' প্রথম দশক ১৩৮১ পৃ ১১৭-১৪৮। কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত হয়েছে বইয়ে। নানা পাঠভেদের প্রসঙ্গও তিনি অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, 'নতুন বৌঠানের তিরোধানে' ও 'পত্নীবিয়োগে' ছাড়া 'অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন-বিয়োগে তিনি যে-সব কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে কাব্যোৎকর্ষে "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" সর্বাগ্রগণ্য।' কবিতাটি তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথেরও 'অন্তিম পর্যায়ের [একটি] অবিস্মরণীয় কবিতা।'

পত্র ৮৪ । 'অয়মহং ভো'॥ ৯ জুলাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোকসভায় যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেই চারুচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন। সীতা দেবী লিখেছেন, 'চারুবাবুকে তিনি স্নেহ করিতেন, অনেক সময় তাঁহার কলিকাতা আগমনের সংবাদ চারুচন্দ্রই প্রথম পাইতেন। পোষ্ট কার্ডে "অয়মহং ভো" এই কয়টি মাত্র লিখিত থাকিত, কিন্তু হাতের লেখাই লেখককে ধরাইয়া দিত।'

শান্তা দেবী স্মরণ করেছেন, 'এই যুগে চারুবাবুর প্রিয়তম ও পূজ্যতম ব্যক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাঁহাকে "অয়মহং ভোঃ" বলিয়া স্বাক্ষরহীন একটি করিয়া কার্ড পাঠাইতেন।'[1]

'অয়মহং ভোঃ'। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ৪. ১১ ।

পত্র ৮৫ । 'ছুটিতেও কি ...' ।। ১৯২৪এ পুজোর আগে বা পরে চারুচন্দ্র ঢাকা

---

[1] 'পুণ্যস্মৃতি' ১৩৪৯ পৃ ৫৩। 'রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা' পৃ ১৬২।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনকর্মে যোগ দেন. মনে হয় ঢাকাতেই ছিলেন একটানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন গ্রীষ্মের মথে লেখা 'চলৎশক্তিরহিত', সম্ভবত ২১. ৩. ১৯২৪ - ১৭. ২. ১৯২৫এর মধ্যে প্রায় বর্ষকাল চীন জাপান দক্ষিণ আমেরিকা ইয়োরোপ তিন মহাদেশ পর্যটন করে ফিরেছেন ব'লে। 'কিছুকাল পরেই আরেকবার': পরের বারে ইয়োরোপ পাড়ি দেন অবশ্য পরের বছর, ১২ মে ১৯২৬ বোম্বাই হয়ে ইতালির পথে ইয়োরোপে।

পত্র ৮৬ । 'বর্ষার ফাল্গুনের আবাহন ...'॥ 'ফাল্গুনী' অভিনয়। বাণীমন্দির, সদর ঘাটে স্থিত ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনী ৭ জুলাই ১৯২৫ (২৩ আষাঢ় ১৩৩২) তারিখে 'ফাল্গুনী'র এই অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই সম্মিলনীর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উল্লেখ আছে। কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিঠিখানি সূত্রে যা লিখেছিলেন এখানে উল্লেখ করি :[১]

> ১৯২৫ সাল। ঢাকায় এই সময় কবিগুরুর 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় করেছিলাম আমরা। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমার পিতা, অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি । অভিনয়ের রিহার্সাল যখন পুরোদমে চলেছে তখন একদিন অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ বললেন, চারুবাবু! আমরা বর্ষাকালে 'ফাল্গুনী' অভিনয় করতে যাচ্ছি, অদ্ভুত নয় কি?' আমার পিতা বললেন, 'কবির কাছ থেকে একটা কৈফিয়ত আনিয়ে নেওয়া যাক না। সব দোষ কেটে যাবে।' কবিকে চিঠি লেখা হল। উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন সেই হল বর্তমান এই চিঠিখানি ।

অভিনয়ের অনুষ্ঠানপত্রীতে চিঠিতে পাঠানো কবির এই কৈফিয়তটির পূর্বে ভূমিকাস্বরূপে সবুজপত্র থেকে 'ফাল্গুনী'র ভূমিকার অংশ : 'বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে' থেকে 'আর অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্'

---

[১] 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র ও অপ্রকাশিত রচনা'। প্রবাসী. কার্তিক ১৩৪৮ পৃ ১২৩।

পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। কৈফিয়তের শেষে

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল
কার মন্তরে॥

অধিকন্তু এই চার ছত্র আছে। এর পর অনুষ্ঠানপত্রীতে 'ফাল্গুনী'র উনত্রিশটি গানের পাঠ পর পর মুদ্রিত করে দেওয়া হয়েছে ।

ভূমিকালিপিতে দেখা যায় রাজার পার্ট নিয়েছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ, শ্রুতিভূষণ ও দাদার ভূমিকায় ছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় বর্মা, কাজী আবদুল ওদুদ, আর চন্দ্রহাসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কনক বন্দ্যোপাধ্যায়।[১]

পত্র ৮৯। 'দোলের কবিতা...'॥ ঢাকায় অবস্থানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনরোধে তাঁদের মুখপাত্র বাসন্তিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বাসন্তিকা' ১৩৩২ তারিখ দেওয়া একটি গান লিখে দেন, অজ্ঞাত কারণে বাসন্তিকা পত্রিকায় সে গান ছাপা হয় নি।[২] ছাত্রদের ১৩৩৩এর বার্ষিক বাসন্তী পূর্ণিমা সম্মিলনী উপলক্ষ্যে বাংলার বরেণ্য কবিদের কাছে তাঁরা কবিতা প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের হয়ে চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে দোলের কবিতার জন্য আরজি করে পাঠান। আমন্ত্রিত কবিতাগুলি ১৩৩এর বাসন্তিকা পত্রিকার শেষ দিকে রঙিন কাগজে ছাপা হয়, রবীন্দ্রনাথের পাঠানো দোলের কবিতা তার মধ্যে ছিল না। 'মসীবন্ধনে বন্দী করবার অধিকার তোমাদের দিচ্ছি নে— আবৃত্তিসভায় এর অবগুণ্ঠন মোচন করতে

---

[১] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহ ।

[২] দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'জীবনের স্মৃতিদীপে' ১৯৭৮ পৃ ২০৬। গোপালচন্দ্র রায় : 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' ১৩৭৯ পৃ ৭৩-৭৫, ১৫৩-১৫৮। গোপালচন্দ্র 'বাসন্তিকা' কবিতা ছাত্রদের পত্রিকায় ছাপা না হবার কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করেছেন।

পারে।'— এই অনুশাসন নিশ্চয় তার কারণ। রবীন্দ্রনাথের পাঠানো এই এই দোলের কবিতাটি 'বনবাণী' (১৩৩৮) কাব্যের অন্তর্গত নটরাজ ঋতুরঙ্গ শালা'র কবিতা 'আলোকরসে মাতাল রাতে বাজিল কার বেণু' ইত্যাদি, প্রেরিত কবিতার পাণ্ডুলিপি পৃথক ফাইলে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে ।

পত্র ৯০ । 'যে লাইনটা আমার...' ইত্যাদি॥ 'সংকলন' (১৩৩২, পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৪) গ্রন্থে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা' প্রবন্ধের লাইন, সম্ভবত ক্লাস পড়ানোর সূত্রে ওই লাইনের অর্থগত অসঙ্গতি চারুচন্দ্রের চোখে পড়াতে তিনি বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা' প্রবন্ধের লাইন, সম্ভবত ক্লাস-পড়ানোর সূত্রে ওই লাইনের অর্থগত অসঙ্গতি চারুচন্দ্রের চোখে পড়াতে তিনি বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনেন।

'কাল যাচ্চি শিলঙ পর্বতে...'। অর্থাৎ এবারেও শিলঙ যাত্রার দিন ২৩ বৈশাখ ৬ মে ১৯২৭। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, অম্বালাল সরাভাইয়ের ব্যবস্থায় 'কবি সপরিবারে চলিলেন শিলঙে...' 'এবার শান্তিনিকেতনের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর বকীল ও জীবনী লেখক সপরিবারে শিলঙ পাহাড়ে গিয়েছিলেন।'[১]

পত্র ৯১ । 'সমস্যা' । পূর্ব পত্রের জের। দ্র. নম্বর চিঠির টীকা।

'বেতস...'॥ চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'ক্ষণিকা'র 'আবির্ভাব' কবিতার সপ্তম কলিতে আছে 'বনবেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ!' বেতন মানে বেত, তাহা নিরেট, তাহাতে বাঁশি হইতে পারে না। 'বনের বেণুর বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ' বলিলে অনুপ্রাস ও অর্থ দুইই রক্ষিত হইত। এই কথা কবির গোচর করিলে তিনি আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ...'

এই সে পত্রখানি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন কবিতা লেখার সময় তিনি ভেবেছিলেন থাগড়ার কথা এবং 'বেতস বলতে শর বোঝায় না এবং

---

[১] 'রবীন্দ্রজীবনী' তৃতীয় খণ্ড ১৩৯৭ সং পৃ ৩১১।

অর্থমালার সর্বপ্রান্তে বেণু কথাটাও তিনি পেয়েছেন ।

চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে লিখেছিলাম যে— অভিধানে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ নাই। না থাকুক। ইহার পরে যত অভিধান রচিত হইবে তাহাতে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ লিখিতে হইবে।'[১]

পত্র ৯২। চারুচন্দ্রের ১২ মে ১৯২৭ এর চিঠি। ময়মনসিংহের রবীন্দ্র সংঘ ২৫ বৈশাখ ১৩২৪ রবিবার রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করেন। এই উৎসবের উদ্যোগ ও ব্যয়ভার গ্রহণ করেন স্থানীয় উকিল প্রফুল্লকুমার বসু ও তাঁর পত্নী নীহারকণা। নীহারকণা 'আর্ট ও আহিতাগ্নি' রচয়িতা যামিনীকান্ত সেনের ভাগ্নেয়ী। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন, চারুচন্দ্র ভাষণ দিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র তাঁর পত্রে জানান :

আমি আমার অভিভাষণে জগতেরো সকল কবির চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলেছি বলে কেউ কেউ আমার উপর বিরক্ত হয়েছে শুনলাম। কিন্তু এও শুনলাম যে তাঁরা আপনার রচনা হয় একটাও, বা অধিক পড়েন নি। এই রকম মূঢ় লোকেরাই আপনার অপূর্ব দানের মহামূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাদের আপত্তি আমি তুলনায় সমালোচনা করছি । আমি এই কর্ম করে বহুকাল থেকে বহুলোকের বিরক্তিভাজন হয়েছি ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিবাদ প্রথম আমিই প্রবাসীতে তাঁর 'আলেখ্য' সমালোচনা প্রসঙ্গে করি। জীবনের অবশিষ্ট দিন কটাও আপনার মহিমা কীর্তন ও প্রচার করেই কাটবে। আপনার কবিতাগুলি বুদ্ধি ও মনের শৃঙ্খল মোচন করে, আপনার গানগুলি বাঙালীর জীবন-বেদ। শোকে দুঃখে সান্ত্বনা, আনন্দে উৎসাহ, ক্লান্তিতে রসায়ন! আপনার প্রবন্ধগুলি যুক্তির শাণ যন্ত্র। এই সত্য কথাও

---

১ 'রবিরশ্মি— পশ্চিমভাগে' ৫ম সং পৃ ১৭-১৮। 'বেতস' সূত্রে মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ অবশ্য cane এবং reed দুটি অর্থই দিয়েছেন. reed শর বা নল, গ্রাম্য বাঁশি হয় নলেও। reed বললেও বাঁশি বোঝাতে পারে : a reed made into a rustic musical pipe দ্র *SOD* ১৯৫০ নং পৃ ১৬৮৩।

লোককে বোঝাতে হয় এই আমার দুঃখ।

যতীন্দ্র সিংহ ॥ যতীন্দ্রমোহন সিংহের (১৮৫৮-১৯৩৭) ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে প্রকাশিত 'উড়িয্যার চিত্র' (১৩০৭-১৩০৯) পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে ...যতীন্দ্রবাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে।' পরে অবশ্য আধুনিক 'কামকলযময়' সাহিত্যের 'স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্‌বিগ্ন হয়ে তিনি সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন, 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' (১৯২২) নামে পুস্তককারে সংকলিত। সে লেখার মুখ্য অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ।[1]

পত্র ৯৩। 'সমস্যা' ॥ 'সমস্যা' প্রকাশ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫ পৃ ১৫৩-১৬৩। 'রাজা প্রজা'র (গদ্যগ্রন্থাবলী দশম ভাগ, জুন ১৯০৮) শেষ প্রবন্ধরূপে অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর 'রাজা প্রজা' বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে (চৈত্র ১৩৪৮) সংকলিত হয়।

'গদ্যগ্রন্থাবলী লইতে বাছিয়া... বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে' বিন্যাস করে বিশ্বভারতী 'সংকলন' গ্রন্থ (অগস্ট ১৯২৫) প্রকাশ করেন, 'সংকলনে'র নবম প্রবন্ধরূপে 'সমস্যা' গৃহীত হয়। 'সংকলনে'র রচনাসমূহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত, 'সমস্যা' প্রবন্ধ বিশেষভাবেই সংক্ষেপকৃত ।

পত্রিকা থেকে গ্রন্থে আহরণকালে 'সমস্যা'র পাঠ ও বিন্যাসের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল । পত্রিকার প্রথম ছয় অনুচ্ছেদ বইয়ে ছোটো হরফে মুদ্রিত হয়।

'সংকলন' গ্রন্থে মূল 'সমস্যা' প্রবন্ধের প্রথম সাঁইত্রিশ অনুচ্ছেদ বাদ

---

[1] এর আগে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা এবং চলিত ভাষা ব্যবহার নিয়েও যতীন্দ্রমোহন বিরূপতা করেছিলেন। দ্র. 'ইতিহাসে কবিত্ব': নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; 'একটি মোকর্দমার রায়, চলতি ভাষা বনাম সাধু ভাষা' : নারায়ণী আষাঢ় ১৩২৪।

পড়েছে, মূল 'সমস্যা'র আটত্রিশতম প্যারা থেকে 'সংকলনে'র প্রবন্ধ শুরু। চারুচন্দ্র যে কাবাটির অসংগতির কথা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন 'সংকলনে' সেটি 'সমস্যা' প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদের বাক্য, মূল প্রবন্ধের বিয়াল্লিশতম অনুচ্ছেদের।

'সংকলনে'র পাঠ ১৯২৫

কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি; নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সংশোধন ১৯২৭

আত্মীয়তার সম্বন্ধ কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি।

প্রবাসী পত্রিকার পাঠ, ৪৭তম প্যারা ১৯০৮

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সযোগ এবং কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি না হইলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

'রাজা প্রজা'র পাঠ, ৪২ তম প্যারা ১৯০৮

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

রচনাবলীর পাঠ

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে, অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

প্রসঙ্গত, প্রচলিত সংশোধনের কালে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'সংকলনে'র প্রবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন, মূল প্রবন্ধটি হাতে পান নি। অপিচ, চারুচন্দ্রকে জানালেও, প্রকাশক বা মুদ্রাকরের কাছে সংশোধনটি সম্ভবত পাঠান নি।

'সংকলন' নতুন বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের প্রথম পর্বের বই, গ্রন্থের

সম্পাদক বা সংক্ষেপকারী কে ছিলেন জানা যায় না ।[1]

নতুন উপন্যাস ।। 'তিন পুরুষ' । বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশারম্ভ আশ্বিন ১৩৩৪। জলধর সেনের এই নামের উপন্যাস ভারতবর্ষে প্রকাশ শুরু হয়েছে জেনে অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 'যোগাযোগ' নামে নামান্তরিত। নামান্তরের কৈফিয়ত স্বরূপ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রচনারম্ভে ভূমিকা সংযোজন করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেছে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি। 'বিচিত্রা'র পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবার সত্য পাঠ হয়ে গেছে। তিনবারের বেলায় মুখচাপা দেওয়া গেল।... 'তিন পুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল 'যোগাযোগ' ।

দ্র উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : স্মৃতিকথা' ৪র্থ খণ্ড ১৩৭৩ পৃ ১০৩-১০৬ ।[2]

পত্র ৯৪ । 'পঞ্চভূত' ॥ 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে চারুচন্দ্রের আলোচনা মৃত্যুর পর তাঁর

---

১ তৃতীয় সংস্করণ 'চয়নিকা'র পূর্বেই 'সংকলন' নামে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট তারিখে। অনুমান করা যায়, অল্প প্রচারিত মূল রচনার সহিত শিক্ষিত সাধারণের আংশিক পরিচয় সাধন আর গ্রন্থবিক্রয়ের আয়বলদ্ধি উভয়েই এই পরিকল্পনার মূলে। পূর্বে কোনো গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয় নি এমন রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। গ্রন্থসূচনায় বলা হয় : 'গদ্যগ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । এইবার আমরা গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া ''সংকলন' বাহির করিতেছি।. . .' দ্র বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎ বর্ষ-পরিক্রমা ১৯২৩-১৯৭৩ বিশ্বভারতী ১৯৭৮ পৃ ১৭-১৮ ।

২ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : 'তিন পুরুষ' উপন্যাস (পরে 'যোগাযোগ') রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুরোধক্রমে লিখেছিলেন।... 'যোগাযোগ' উপন্যাস 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ করবার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে তিন সহস্র টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলাম। এই দক্ষিণার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ''তোমাদের দেওয়া এ দক্ষিণা আমাদের দেশের পক্ষে সুষ্ঠু (decent)।'' আমাদের বেশ মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথার মধ্যে ইংরেজি ''decent'' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন ।'' ''স্মৃতিকথা'' ৪র্থ খণ্ড ১৩৭৩ পৃ ১০৩ ।

৩ প্রসঙ্গত 'ডায়ারী' বা 'পঞ্চভূতের ডায়ারী' নামে সাধনা মাসিকপত্রে মাঘ ১২৯৯-কার্তিক ১৩০২এর মধ্যে প্রকাশিত । 'পঞ্চভূত' নামে গ্রন্থাকারে বৈশাখ ১৩০৪ পৃ ১৯৫ ।

'রবীন্দ্রসাহিত্য পরিচিতি' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় পৃ ১২৫-১৩২। প্রকাশকের নিবেদন স্থলে লিখিত হয়েছে, বইয়ের এই প্রবন্ধ এবং আরো অনেকগুলি 'প্রবন্ধই অপ্রকাশিত অবস্থায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনার টীকা-টিপ্পনীর অঙ্গীভূত হইয়া ছিল। সেগুলি সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।'

'রবীন্দ্রসাহিত্য পরিচিতি'। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বোস মুখার্জী এণ্ড কোং, ২৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ১৩৪৯ পৃ ১০ + ১৩৪।

'পঞ্চভূত' প্রবন্ধটি অবশ্য ভ্রমক্রমে চারুচন্দ্রের রচনা মধ্যে স্থান পেয়েছে, এটি জয়ন্তী উৎসর্গ সংকলনের কালিদাস রায় প্রণীত রচনা । সম্ভবত চারুচন্দ্রের ক্লাস পড়ানোর উপকরণের মধ্যে রচনাটি লেখকনামহীনভাবে রাখা ছিল ।

'চয়নিকা'র ছাপার ভুল॥ এই 'চয়নিকা' সম্ভবত তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণের বই (ফাল্গুন ১৩৩২), পরবর্তী পুনর্মুদ্রণ (মাঘ ১৩৪০ পত্ররচনাকালে প্রকাশিত হয় নি বলে মনে হয়। বিশ্বভারতী সংস্করণের এই 'চয়নিকা' পূর্ববর্তী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 'চয়নিকা' বইকে বাতিল করে পাঠকের নির্বাচনে প্রস্তুত বই। প্রকাশক শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। আর্ট প্রেস, ১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। কবিতাসংখ্যা ২০৮, সর্বশেষ বই 'পূরবী' থেকে চারটি এবং একটি অপ্রকাশিত কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে।

দেখা যায়, এই সময়ের আরো কোনো কোনো বইয়ের মতো এই বইয়েরও ছাপার ভুল কবির মনঃপীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। দ্র সজনীকান্ত দাস : 'আত্মস্মৃতি' ১৩৮৪ সং পৃ ১৪৩-১৪৫।

পত্র ৯৫॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যসঞ্চয়নে'র কবিতা নির্ধারণ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা। নির্ধারিত কবিতার নামকরণের জন্য চারুচন্দ্র সম্ভবত

কয়েকটি বিকল্প নামও রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির নির্দেশ চারুচন্দ্র পাঠিয়ে দেন প্রকাশকের সমীপে :

৪৪ নীলখেত রোড
রমনা, ঢাকা
২৫শে নভেম্বর ১৯২৭

প্রিয় সুধীরবাবু,

সত্যেন্দ্র-চয়নিকার নাম সম্বন্ধে রবিবাবু লিখেছেন—

"আমার নিজের মনে হয় selection-জাতীয় বইয়ের সাদাসিধে নাম দেওয়া ভালো। এমন দিন গেছে যখন তর্ক-শাস্ত্রেরও কুসুমাঞ্জলি নামে আপত্তি ছিল না— এখন আভরণ ব্যবহারের যুগ চলে গেছে— কুণ্ডল কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ মেয়েরাও ত্যাগ করতে উদ্যত। সহজ নামটাই দিয়ো, যথা—

"সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন"
অথবা
"কাব্য-সঞ্চয়ন
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা হইতে)"

এখন যা হয় স্থির করবে...

আপনার
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়[1]

সুধীরবাবু, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানী প্রকাশন সংস্থার অধ্যক্ষ সুধীরচন্দ্র সরকার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যসঞ্চয়নে'র প্রকাশতারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ পৃ ২৬৪ + ৩।[2]

---

[1] 'স্মরণিকা'। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯১০-১৯৮৫ পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি সংকলন ১৯৮৭ পৃ ৬৬।

[2] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' ১৩৬৪ পৃ ১২।

পত্র ৯৯। 'তোমাদের চয়নিকা'॥ রমনা, ঢাকা থেকে এই চিঠির মাত্র পূর্ব দিনে ১ বৈশাখ ১৩৩৮ (১৪ এপ্রিল ১৯৩১) এর পত্রে চারুচন্দ্র পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি'র আদর্শে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখা বাংলা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার একখানি প্রস্তূয়মান 'চয়নিকা'য় রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করবার অনমতি চেয়ে সেই সঙ্গে ওই 'চয়নিকা'র জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি ভূমিকাও প্রার্থনা করেন। 'চয়নিকা' প্রকাশ হতে ১৯৩৪ সাল হয়ে গিয়েছিল ।

'বঙ্গবীণা'। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ ১৩৩৪ পৃ ৩ + ২২ + ৫৫৮ ।

গ্রন্থোৎসর্গ রবীন্দ্রনাথকে ।

উৎসর্গ
যাঁহার মোহন অঙ্গুলিস্পর্শে
বঙ্গ-বীণার
স্বর্ণতন্ত্রীতে সর্বাপেক্ষা সুমধুর ঝঙ্কার
রণিত হইয়াছে
সেই কবিশ্রেষ্ঠ
রবীন্দ্রনাথের
করকমলে

বইয়ের ২০১ থেকে ২৯২ সংখ্যক কবিতা-পর্যায়ের মধ্যে (পৃ ২০৭ থেকে ৩৬১) রবীন্দ্রনাথের সাঁইত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়, সংখ্যা কবিতানাম প্রথম ছত্র ও পৃষ্ঠাঙ্ক এইভাবে :

২০১ 'জাগরণী' (বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে) পৃ ২৩৭
২০৩ 'বাল্মীকি' (স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে) পৃ ২৩৯
২০৪ 'কুবারসম্ভব গান' (যখন শুনালে দেবী, দেব-দম্পতীরে) পৃ ২৪২
২০৫ 'বৈষ্ণব কবিতা' (সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি) পৃ ২৪৩

২০৭ 'স্বপ্ন' (দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে) পৃ ২৪৫

২০৯ 'গীতি-কবিতা' (আমি নাব্‌ব মহাকাব্য সংরচনে) পৃ ২৪৯

২১২ 'কবি' (আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার) পৃ ২৫২

২১৪ 'ভারত-লক্ষ্মী' (অয়ি ভুবনমোহিনী) পৃ ২৫৪

২১৭ 'শরৎ' (আজি কি তোমার মধুর মূরতি) পৃ ২৫৮

২২০ 'দর্পহরণ' (প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে) পৃ ২৬২

২২২ 'উর্বশী' (নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ . . .) পৃ ২৬৪

২২৩ 'নিবেদিতা' (ধরাতলে দীনতম ঘরে) পৃ ২৬৮

২২৮ 'নারী-প্রতিমা' (শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী) পৃ ২৭৪

২৩০ 'রহস্য-দীপ' (অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে) পৃ ২৭৬

২৩২ 'প্রিয়ার স্মৃতি' (অন্ধকার নিশীথিনী ঘুমাইছে একাকিনী) পৃ ২৭৮

২৩৪ 'সেকাল ও একাল' (মিছে তর্ক, থাক তবে থাক) পল ২৮০

২৩৬ 'কুণ্ঠিতা' (তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে) পৃ ২৮৪

২৩৮ 'অভিসার' (সন্ন্যাসী উপগুপ্ত) পৃ ২৮৭

২৪৪ 'পুটু' (চৈত্রের মধ্যাহ্ন বেলা কাটিতে না চাহে) পৃ ২৯৬

২৪৬ 'তরু সিং' (পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল) পৃ ২৯৮

২৪৮ 'শিবাজি' (বসিয়া প্রভাতকালে) পৃ ৩০০

২৫১ 'আশ্রম' (অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে) পৃ ৩০৭

২৫২ 'ইছামতী নদীর প্রতি' (অয়ি তন্বী ইছামতী তব তীরে তীরে) পৃ ৩০৮

২৫৪ 'বর্ষানন্দ' (হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে) পৃ ৩১১

২৫৫ 'শীতরাত্রে' (পৌষ প্রখর শীতে জর্জর) পৃ ৩১৫

২৫৭ 'বৈশাখ' (হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ) পৃ ৩২১

২৫৮ 'চৈত্র-নিশীথ-শশী' (কত নদীতীরে, কত মন্দিরে) পৃ ৩২৪

২৫৯ 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা' (ঝরঝর বরিষে বারিধারা) পৃ ৩২৫

২৬৩ 'মধ্যাহ্ন-ছবি' (বেলা দ্বিপ্রহর) পৃ ৩২৮
২৬৫ 'আবির্ভাব' (শ্রান্তি মানি তন্দ্রাতুর চোখ বন্ধ করি গ্রন্থখানি) পৃ ৩৩০
২৬৮ 'আসন্ন ঝটিকা' (ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে) পৃ ৩৩৪
২৭২ ''সমুদ্রের প্রতি' (এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা) পৃ ৩৩৭
২৭৫ 'সর্বজাতীয়তা' (ইচ্ছা করে মনে মনে) পৃ ৩৪০
২৭৭ 'প্রাচীন ভারত' (দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট) পৃ ৩৪২
২৭৯ 'সোনার তরী' (গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা) পৃ ৩৪৪
২৮৩ 'ঘুম-পাড়ানী' (আয় রে আয় রে সাঁঝের বা) পৃ ৩৫১
২৯১ 'মৃত্যু-রূপান্তর' (শুধু সুখ হতে স্মৃতি) পৃ ৩৬০

বইয়ের কবি পরিচয় স্থানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই পরিচয় লেখা হয় : রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং ভারতবর্ষ ও সমস্ত পৃথিবীর উচ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অন্যতম। তাঁহার প্রতিভা বিচিত্র-সৃষ্টিকুশলা, অতুলনীয়া। তাঁহার কাব্য গল্প প্রবন্ধ গান ও নাটক বঙ্গের ঘরে ঘরে পঠিত গীত অভিনীত ও সমাদৃত হয়। তাঁহার কবিতার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, কোন্‌টিকে ত্যাগ করিয়া কোন্‌টিকে গ্রহণ করিব, তাহা এক সমস্যা। নমুনা স্বরূপ আমরা কয়েকটি মাত্র কবিতা এই সংগ্রহে সমগ্র ও আংশিক উদ্‌ধৃত করিলাম। তাঁহার অসংখ্য কবিতা ও গান ও অন্যান্য রচনার রসাস্বাদন করিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থাবলীর শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ভূমিকায় সম্পাদকেরা উল্লেখ করেন, 'কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকর মহাশয় এই কাব্যসঞ্চয়নের পরিচয় লিখিয়া দিয়া এই পুস্তককে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।'

'পরিচয়'॥ রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গবীণা'র জন্য ভূমিকাটি লিখে পাঠান দার্জিলিঙ থেকে অক্টোবরের শেষ দিকে। ২৭ অক্টোবরে লেখা রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিবের নীচে উদ্‌ধৃত চিঠির সঙ্গে আসে লেখাটি।

Glen Eden
Darjeeling
১০ই কার্ত্তিক ১৩৩৮

সবিনয় নিবেদন,

রবীন্দ্রনাথ আজ এই রচনাটি আপনাদের কবিতা-সঞ্চয়ন বইখানির ভূমিকাস্বরূপে লিখেচেন।

তাঁর শরীর নিরতিশয় ক্লান্ত, বিশ্রাম এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্যে এখানে এসেচেন। মাসখানেক থাকবার কথা আছে ।

রচনাটি ঠিকমতো আপনার হাতে পৌঁছল এই সংবাদ পেলে বাধিত হব।

আমার সবহুমান নমস্কার নেবেন ।

ভবদীয়

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের শরীর যে তখন নিরতিশয় ক্লান্ত তাঁর নিজের লেখা পূর্বদিনের চিঠিতে তা দেখতে পাওয়া যায় । দার্জিলিঙ ২৬ অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে হেমন্তবালা দেবীকে কবি লিখছেন :

কল্যাণীয়াসু,

এখানে এসে অবধি শয্যাগত হয়েই আছি । বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা আবর্ত্ত শরীরের মধ্যে ঘুরপাক দিয়ে বেড়াচ্ছে । ...

'বঙ্গবীণার জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি এই :

পরিচয়

যখন কবি য়েট্‌স্ আমার গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার এই

যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হলো, এ'কে বাংলা-সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌চি, কিন্তু বস্তুত এ তো বিচ্ছিন্ন নয়,— যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জান্‌তে পারলে এর রস উপলব্ধি হয়তো সম্পূর্ণ হবে না।"

কথাটা অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার মনে লেগে ছিল। কোনো কাব্যের পরিচয় তা'র নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'তে পারে না ; যখনি তা'র বিচার করি, তখনি স্বদেশী বিদেশী যে-কোনো সাহিত্য আমাদের জানা আছে নিজের অগোচরেও তা'র সঙ্গে আমরা যাচাই ক'রে থাকি।

কলাসৃষ্টি বা সাহিত্যসৃষ্টিতে রুচি নিয়ে যখন তর্ক ওঠে, তখন তা'র অন্ত থাকে না। সংসারে এক একজন মানুষ থাকে যে সহজ কবি ; তেমনি সহজ রুচিবান্ লোকও রসসৌন্দর্য্যের 'পরে সহজ দরদ নিয়ে দৈবক্রমে জন্মায়। এই কবি এবং রসিক উভয়ে একই জাতের মানুষ, তফাতের মধ্যে এই যে, একজনের কাছে সুরের প্রাণ এবং গলা, আর একজনের আছে সুরে প্রাণ ও কান।

এই শ্রুতিবোধের সহজ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে না থাক্‌লেও যে-মানুষ বহুশ্রুত সে মূলসৌন্দর্য্যের একটা আদর্শ বাইরে থেকে সংগ্রহ ক'রে অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করতে পারে। এর জন্যে চাই, সাহিত্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা'র সঙ্গে নিয়তম পরিচয় থাকা। এই পরিচয় বিশুদ্ধ সম্ভোগের, এ তত্ত্ববিশ্লেষণের বা শবব্যবচ্ছেদের মতো অঙ্গবিভাগের চর্চ্চা নয়।

এই সম্ভোগকে খাঁটি করতে হ'লে যা-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু সাময়িক উত্তেজনামূলক, যা-কিছু ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি বা সামাজিক অভ্যাস-লালিত, তা'র থেকে মনকে বিবিক্ত ক'রে নিতে হয়। এ কাজ সহজ নয়, কেননা যা আমাদের কাছের জিনিষ, যা উপস্থিতমতো ঘাটে-বাটে দশের কোলে-কাঁধে আদর পেয়ে ফেরে, তা অচিরস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর হ'লেও তা'র প্রতি অভ্যস্ত স্নেহবশত তা'কে আমরা বেশি দাম দিয়ে ঠকি। এই রকম

পাড়ার হাটের রাঙ্‌তা-লাগানো সস্তা সামগ্রীর মোহ থেকে মনকে বাঁচাবার উপায় দূরপ্রসারিত সাহিত্যকে মনের সঞ্চরণক্ষেত্র করা। যে-সমস্ত রসসৃষ্টি ক্ষণকালের প্রশ্রয়ের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যকালের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েচে, তাদের সঙ্গে সর্ব্বদা চেনাশোনা থাক্‌লে সাহিত্যবিচার কর্‌বার অধিকার জন্মে ও আনন্দ ভোগ কর্‌বার শক্তি খাঁটি হ'য়ে ওঠে।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি সঙ্কলনের প্রয়োজন এই কারণেই। সাহিত্য বিজ্ঞানের মতো নয়। তা'র ঝুঁটা-সাঁচ্চা বিচার, যুক্তির দ্বারা সম্ভব হ'লে ভাবনা থাক্‌ত না; রুচি ছাড়া আর কোনো কষ্টিপাথর বা মানদণ্ড তা'র নেই। অথচ রুচি-সম্বন্ধে অতি অযোগ্য লোকেরও আত্মাভিমান আছে। এই রকম অভাজনের অসঙ্কোচ উপদ্রব সাহিত্যকে সহ্য কর্‌তেই হয়; চতুরাননের কাছে নালিশ ক'রেও কোনো ফল নেই। বিধি যেখানে আছে বিধাতার কাছে তা'র দরবার খাটে। এ তো বিধি নয়, এ যে উপলব্ধি। এ ক্ষেত্রে ক'রেও কোনো ফল নেই। নির্ব্বিবেক অত্যাচার ঘট্‌লে তা'র কোনো চরম প্রতিকার আছে ব'লে জানিনে,— একটি মাত্র উপায় হচ্চে, সাহিত্য অনুশীলনের সাহায্যেই সাহিত্যরুচির বিস্তার সাধন করা। এ জিনিষটা সাধুতার মতোই,— স্বাভাবিক সাধুতা যদি দুর্ব্বল হয়, তবে সাধুসঙ্গ হচ্চে পথ। কিন্তু মূলধন অল্প থাকা সত্ত্বেও এ প্রণালী যে সকলের পক্ষে খাট্‌বে তা নয়; তবু যাঁরা উপযুক্ত ভোজের আয়োজন ক'রে সাহিত্যরুচির উদ্বোধন কর্‌তে প্রবৃত্ত, তাঁরা অসাধ্যসাধনে অক্ষম হ'লেও অন্তত কবিদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বঙ্গবীণা'র পাশাপাশি চারুচন্দ্র 'মালিকা' (ঢাকা ১৯৩৪) নামে আরেকখানি কাব্যচয়নিকাও সংকলন করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের ৩৪টি কবিতা গৃহীত হয়।

পত্র ১০০। প্রেমোৎপল ও অমিয়ার বিবাহ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

পত্র ১০১। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চান্ন বছর পূর্তি জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। চারুচন্দ্র উত্তরে লেখেন, 'এই আশীর্বাদ আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে...'। দ্র. এই বই পৃ ১৭১।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ প্রকাশিত।

রচনাবলী ১৫শ খণ্ড ২য় সংস্করণে (চৈত্র ১৩৪৯) কাব্যভাগের সংযোজন রূপে, অতঃপর 'পরিশেষ' ২য় সংস্করণের (বৈশাখ ১৩৫০) সংযোজন অংশে গৃহীত। 'পরিশেষে' ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হলে 'এই সংস্করণে বাইশটি কবিতা নূতন সংযোজিত হইল' বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

পত্র ১০২। 'বৈশাখ'॥ রচনা চৈত্র ১৩০৬, প্রকাশ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৭ পৃ ১৯৬-১৯৮। 'কল্পনা' (১৩০৭) কাব্যে অন্তর্ভুক্ত।

'বৈশাখ নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতার দু-একটি স্থান একটু অস্পষ্ট হয়ে আছে'— তার ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে চারুচন্দ্র ১১ অক্টোবর ১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন, দ্র. এই বই পৃ ১৭১-১৭২।

দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।

এই ছায়ামূর্তি অনুচর কাহারা?

পরের এক স্ট্যাঞ্জায় আছে

সকরুণ তব মর্ম সাথে

মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-পরে।

বৈশাখের সকরুণ মর্ম ও শান্তিপাঠ কি? বৃষ্টি বর্ষণ? বৈশাখের দুঃখ কি? তার তপস্যা-লব্ধ মেঘজাল?

এই দুটি স্থানের সংশয় মোচন করলে উপকৃত হবো।

'বৈশাখ' কবিতা চারুচন্দ্রের 'রবি-রশ্মি' প্রথম খণ্ডে ১৯৩৮ পৃ ৪১৮-৪২২ আলোচিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদের 'সোনার তরী' এবং 'দ্বিজু রায়' প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি পূর্ণত চারুচন্দ্র তাঁর বিশ্লেষণে উদ্ধৃত করে দেন।

'সোনার তরী' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।। 'সোনার তরী' রচনা শিলাইদহ বোট, ফাল্গুন ১২৯৮. প্রকাশ সাধনা, আষাঢ় ১৩০০ পৃ ১২৭-১২৮। 'সোনার তরী' (১৩০০) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইংলণ্ডে সিসেস্টার কলেজ থেকে কৃষিবিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে এম আর এস এ ই এবং এম আর এ সি ডিপ্লোমা নিয়ে ফেরেন কিন্তু সরকারি কৃষিবিভাগে কাজ না পেয়ে ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হন। কৃষিবিদ্যাপাঠের অভিজ্ঞতা কার্যক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করতে পারেন নি।
দ্র. নবকৃষ্ণ ঘোষ : 'দ্বিজেন্দ্রলাল' ১৩২৩ পৃ ২৪, ৪৫-৪৬।

দ্বিজেন্দ্রলাল একসময় শিলাইদহে নিয়মিত অতিথি ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, Perhaps few persons know that D. L. Roy— the poet and dramatist— began his career as a trained agriculturist. In a spurt of enthusiasm the Government sent four students, to Cirencester College in England to study the science of the agriculture. D. L. Roy was one of the four. When the four scholars returned with their specialized knowledge the Government did not know what to do with them as a department for agriculture had yet to be organized. Some official high-up in the ranks had a brain-wave, and all four of them were appointed Deputy Magistrates.
দ্বিজেন্দ্রলালের দেওয়া শিলাইদহে আলুচাষের ব্যবস্থাপত্র অবশ্য অফলপ্রসূ হয়, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'Father was careful never again to seek agricultural advice from his friend.'

'এগ্রিকালচার বিভাগীয় দ্বিজু রায়...' তাঁর কৃষিবিদ্যায় অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছিলেন 'সোনার তরী'-র ব্যাখ্যায়। অজিতকুমার চক্রবর্তী -লিখিত 'কাব্যের প্রকাশ' (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩) প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধ লেখেন—প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৩,

সেই প্রবন্ধে 'তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান' পাওয়া 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা সূত্রে লেখেন :

কবিতাটির গদ্যার্থ এই :

একজন কৃষক শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ধান কাটিয়া নির্ভরসা হইয়া কূলে বসিয়া আছে। পরে সে দেখিল যে এক 'যেন চিনি' মাঝি পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া ধানগুলি দিল। পরে নিজেও যাইতে চাহিল। মাঝি তাহাকে লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। কৃষক শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল।...

পাঠক কবিতাটির গদ্যার্থ দেখিলেন,... এখন দেখুন ইহার বর্ণনা কিরূপ স্বভাবসঙ্গত। কৃষক ধান কাটিতেছেন বর্ষা কালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে। ধান তিন প্রকার : (১) হৈমন্তিক তাহাই কৃষকের আসল ধান্য— কাটে হেমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে; (২) আশু (নিজে খাইবার জন্যই প্রায় করে) কাটে শরৎকালে, ভাদ্র মাসে; (৩) বোরো (উড়িষ্যা অঞ্চলেই অধিক হয়)

প্রকৃতির পাশ কাটিয়া গিয়াছেন। নহিলে অন্ধকারে ঢিল মারিলেও হয় ত তিনটার মধ্যে একটায় লাগিত। রবিবাবুর এক ভক্ত এক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা এতই মনোরম যে আমি তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন— "যদি এ আশুধান্য হয় ও এটা বত্রিশে শ্রাবণ হয়। পরের দিনই ত ভাদ্র।" তিনি ত ইহাও বলিতে পারিতেন, যে, কৃষক ত দেখা যাইতেছে পাগল, যদি ধান না পাকিতেই কাটিয়া থাকে। বলদ যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়ে। রবীন্দ্রবাবু যদি জানিতেন যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দুই এক ভক্ত কি বিপদগ্রস্ত হন! যাক্।— তাহার পরে শ্রাবণ মাসে "এল বরষা" কিরূপ? বঙ্গদেশে আষাঢ় মাসেই বর্ষা আসে। তাহার পরে "একখানি ছোট ক্ষেত" হইতে "রাশি রাশি ভারা ভারা" ধান হইয়াছে! ক্ষেত বড়ই উর্বরা! ক্ষেতের "চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।" ক্ষেতখানি তবে একটি দ্বীপ। তবে

এ চর জমি। এরূপ জমিতে ধান করে না। এসব জমি শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে ডুবিয়া থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাহির হয়।

শ্রাবণের ধানের টীকা করে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন :

"এরূপ হইতে পারে যে কোন স্থানে কোন বৎসরে কেহ শ্রাবণ-মাসে আশু ধান কাটিয়াছে। কিন্তু এরূপ exceptional instance উপমায় দেয় না।"

চরজমিতে বোনা জলিধানের কথা রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে দেখতে পাওয়া গেছে :

> অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকরভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।...
>
> দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও পারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।... 'শাস্তি' সাধনা, শ্রাবণ ১৩০০

প্রদোষ॥ এই চিঠি পাওয়ার পরে চারুচন্দ্র 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ ও মতকে সমর্থন করেন। মল্লিনাথ, বট্‌লিঙ্ক-রথ ও মনিয়ের উইলিয়মসের সংস্কৃত অভিধান, বরাহমিহির ও রঘুনন্দনের প্রয়োগ, বাচস্পত্য অভিধান ও বিশ্বকোষের দৃষ্টান্ত আহরণ করে চারুচন্দ্র লেখেন :

> এই সকল প্রাচীন প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দেখে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে প্রদোষ শব্দ সমস্ত রাত্রির যে-কোনো অংশ বোঝাতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তা 'নিশাবসান', 'রাত্রিপর' এবং 'অতিক্রান্তরাত্রি' অর্থে ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আর ভাষা সজীব হলে তাতে নব নব শব্দ [illegible] পুরাতন শব্দের নব নব অর্থ সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয়ের মতন ভাষা ও সাহিত্যস্রষ্টার কোনো শব্দে নূতন অর্থ সংযোজনা করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

'প্রদোষ'। বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৯ পৃ ৮৮৫-৮৮৬

'রবিরশ্মি' ॥ চারুচন্দ্র তাঁর এই ৩১ অক্টোবর ১৯৩২ এর পত্রেই প্রথম 'রবিরশ্মি' নামের 'চয়নিকা ও সঞ্চয়িতার কবিতাগুলির' একখানি বিশ্লেষণগ্রন্থ লেখার সংকল্পের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানান। তিনি লেখেন,

'এর আগে অজিত, আবদুল ওদুদ, কুমুদনাথ দাস প্রভৃতি যাঁরা আপনার কাব্য আলোচনা করেছেন তাঁরা কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব মাত্র নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। আমি কবিতাগুলির অন্তর্গূঢ় ভাব ছাড়া শব্দ ও বাক্যের সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করবারও চেষ্টা করব।... এ সম্বন্ধে আমি আপনার অনুমতি ও আশীর্বাদ চাই। আমার বইয়ের নাম রাখব মনে করেছি রবি-রশ্মি।'... দ্র. এই বই পৃ ১৭১-১৭২।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের স্বত্ব॥ আশ্বিন ১৩২৯-এ চিন্তামণি ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।

এতদনুসারে '১৯২৩ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা' হয় এবং অতঃপর তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব ভোগ করতে থাকেন। দ্র. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ-পরিক্রমা ১৯২৩-১৯৭৩। বিশ্বভারতী ১৯৭৪ পৃ ৭-৮।

রবীন্দ্ররচনার উদ্ধৃতি-ব্যবহারের জন্য চারুচন্দ্র বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিহিত অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। 'রবিরশ্মি'র ভূমিকায় উল্লেখ আছে :

কবির মনোভাব বুঝিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বহু কবিতার বা প্রবন্ধের

অংশ উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। ইহার জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

পত্র ১০৩॥ পূর্বানুবৃত্তি : চারুচন্দ্র 'রবিরশ্মি' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ১৫ অক্টোবর ১৯৩২এর চিঠি পেয়ে পুনরায় এই প্রসঙ্গের বিস্তার করে তিনি চিঠি লিখেছিলেন :

এই পত্র পাইয়া আমি কবিকে জানাই যে তিনি বলিতেছেন যে শ্রাবণ মাসের ছবি দেখিয়া সোনার তরী লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে, চয়নিকায়, সঞ্চয়িতায় ও সোনার তরী পুস্তকে সেই কবিতার নিম্নে তাহার রচনার তারিখ দেওয়া আছে 'ফাল্গুন ১২৯৮'। এই অসঙ্গতির কি মীমাংসা?

'রবি-রশ্মি' ১৯৩৮ পৃ ২২৯-২৩০।

পত্র ১০৪॥ 'বসন্তে'র একটি গান, সে সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ও ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় -কৃত গানটির একটি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাঠিয়েছিলেন চারুচন্দ্র। ললিতমোহন ইতোপূর্বে 'বঙ্গবীণা'র সম্পাদনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' অনুবাদের উদ্যোগ করেছিলেন।

পত্র ১০৫॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীর্থ অধ্যাপকদের মধ্যে মতভেদ হলে 'এবার ফিরাও মোরে', 'সিন্ধুপারে', 'প্রবাসী', 'ভারততীর্থ' ও 'উর্বশী' এই পাঁচটি কবিতা সম্বন্ধে কবির ব্যাখ্যা প্রার্থনা করে চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দেন, দ্র. এই বই পৃ ১৭৫-১৭৭।

পত্র ১১০॥ 'রুদ্ধগৃহ'। বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২ পৃ ৩৩৭। গদ্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগরূপে প্রকাশিত 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র (প্রকাশ বৈশাখ ১৩১৪ পৃ ৩২০) অন্তর্গত।

বালকে প্রকাশিত হওয়ার পর পৌষ পৃ ৪২৭-৪৩০এ এই প্রবন্ধ নিয়ে কবিবন্ধু ও কবির এক পত্রবিনিময় প্রকাশিত হয়েছিল, রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়স্থলে পত্রচ্ছলে সেই 'উত্তর-প্রত্যুত্তর' অসংক্ষেপে

সংকলিত হয়েছে।

কবিবন্ধু লিখেছিলেন, '"রুদ্ধগৃহে"র ভাব ধরিতে পারিলাম না। একজনের মধ্যেই রুদ্ধ হইয়া থাকা, একজনকে লইয়াই চিরদিন শোক করা আপনি গর্হিত বলিয়াছেন। কিন্তু...' তাঁর মতে 'এক দিকে চাহিয়া থাকা, একের চারি দিকে ঘোরাই প্রকৃতির নিয়ম, তাহাই প্রকৃতির বন্ধনের কারণ।... পৃথিবী এক সূর্যের দিকে চাহিয়া ঘোরে বলিয়া কি তাহার কোটি গ্রহনক্ষত্রের সহিত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে? না, সেই সূত্রেই অনন্তের সহিত পৃথিবীর বন্ধন হইয়াছে? তাই পর্বত আকাশের দিকে চাহিয়া সুন্দর, তাই নদী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সুন্দর, রাত্রি দিনের দিকে চাহিয়া সুন্দর, মনুষ্য প্রকৃতির সন্তান, সেও যদি একদিকে চায় সেও সুন্দর হয়।'

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে লেখেন (সোলাপুর ২৫ আশ্বিন ১৯২৯এর চিঠি) : 'আপনি "রুদ্ধ গৃহ" যেভাবে বুঝিয়াছেন আমি ঠিক সে ভাবে লিখি নাই। আপনি যাহা বলিয়াছেন সে ঠিক কথা। একের চারিদিকেই আমাদিগকে ঘুরিতে হইবে, নহিলে অনেকের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইব। কিন্তু জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে— এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে। যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শতসহস্র 'একে'র মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই মহৎ একের দিকে লইয়া যাইতেছে।...

'শূন্যতার ভয় করিবেন না, কিছুই শূন্য থাকিবে না। সমস্ত শূন্য করিয়া দেয় জগতে এমন বিরহ কোথায়! ক্ষুদ্রতর এক বৃহত্তর একের জন্য স্থান রচনা করিয়া দেয়।... যাহাকে আমরা কখনোই চিরদিন ভালোবাসিতে পারিব না তাহাকে আমরা চিরদিনের জন্য চাই— কিন্তু প্রকৃতি-মতো আমাদের এ-সকল মিছে আবদার শুনিবেন কেন... আমাদের হাত হইতে মাটির ঢেলা কাড়িয়া লন, আমরা কাঁদিয়া-কাটিয়া সারা হই;... যে শিশু গোঁ ধরিয়াই

থাকে, কিছুতেই প্রসন্ন হইতে চায় না, তাহার পক্ষে শুভ নহে; সে মায়ের কাছ হইতে মার খায়: সেই রুদ্ধ গৃহ।...

'মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি। কিন্তু অনেক সময় সে ভয় অকারণ।... বিস্মৃতি আমাদের জীবনগ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি; মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবনবিকাশের সহায়তা করে। একটি গ্রন্থের মধ্যে সহস্র দাঁড়ি আছে, তবে তো তাহাতে ভাব ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। একটি জীবনের মধ্যেও শতসহস্র বিস্মৃতি চাই, তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব ব্যাকরণবিরুদ্ধ একটিমাত্র দীর্ঘস্মৃতি লইয়া জীবন শেষ করিলে জীবন শেষই হবে না।'

দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫। ফাল্গুন ১৩৭৩ সং পৃ ৫৬০-৫৬৪

সম্ভবত চারুচন্দ্রকে লেখা এই চিঠির দৃষ্টান্তে 'সঞ্চয়িতা'র গ্রন্থপরিচয়ে 'শা-জাহান' কবিতার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের এই 'প্রত্যুত্তরে'র অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। দ্র. 'সঞ্চয়িতা' ১৩৭৯ সং পৃ ৮৬১-৮৬২

পত্র ১১১॥ চারুচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীলার শুভ পরিণয় ৩ মে ১৯৩৬ ২০ বৈশাখ ১৩৪৩।

পত্র ১১২॥ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পুষ্পমালা - অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের আশীর্বাদপত্রী। বিবাহ ১৫ আষাঢ় ১৩৪৩ ২৯ জুন ১৯৩৬।

পত্র ১১৩॥ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বিষয়ে কলকাতা ও ঢাকা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., সম্ভবত চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে চারুচন্দ্র ঢাকা থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে বিশ্বভারতীর আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন, দ্র. এই বই পৃ ১৮০-১৮১।

এই চিঠিতে চারুচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসন্ন অবসরের পর

---

১ 'মৃত্যুলোক' পর্যায়ের পত্রমালায় এই চিঠিখানি প্রথম পত্ররূপে মুদ্রিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০ পৃ ১৭৭-১৭৯

২ 'উত্তর-প্রত্যুত্তরে'র শ্রী অঃ স্বাক্ষরকারী কবিবন্ধু শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল এইরূপ অনুমিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিশ্বভারতী'র সেবা করে শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত করবা'রও ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরে এসে কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। নিতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ চাকুরির সুবিধার্থে পরে তাঁকে এই আশংসাপত্র দিয়েছিলেন

Uttarayan.
Santiniketan. Bengal
November 24, 1938

Sriman Kanak Bandyopadhyaya has been known to me for some years past. mainly through his literary work. I was eager to have him as an adhyapaka of Bengali at Santiniketan but he could not join us as he had a more profitable offer from a Calcutta Institute. He is an M.A. in Bengali of both Dacca and Calcutta Universities and I am convinced he has the necessary equipment and interest to teach Bengali language and literature in any of our Colleges.

Rabindranath Tagore

হয়তো এটি তাঁকে ব্যবহার করতে হয় নি।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালে সিটি কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন, পরের বছর ১৯৪৮ এই স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৯৪৬তে ওই কলেজে বাংলা বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান, অতঃপর ১৯৭৫এ প্রফেসর এমেরিটাস হন। অধ্যাপক ও রবীন্দ্রসাহিত্যালোচক রূপে কনক বন্দ্যোপাধ্যায় যশস্বী হয়েছিলেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিরশ্মি' গ্রন্থ পরবর্তী সংস্করণ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন।

পত্র ১১৫।। সম্ভবত 'রবি-রশ্মি'র অসম্পন্ন পরের অংশ, 'পশ্চিমভাগে' বলে যে

দ্বিতীয়-ভাগ চারুচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় তাকেও 'রবিরশ্মি' নামের অন্তর্গত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন প্রার্থনা করেছিলেন চারুচন্দ্র, চিঠি রক্ষিত হয় নি।

চিঠিতে 'রবিরশ্মি'র উৎসর্গপত্রের প্রসঙ্গও ছিল।

পত্র ১১৬॥ 'রবিরশ্মি'র দীর্ঘ উৎসর্গপত্রটির জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন প্রার্থনা করে চারুচন্দ্র চিঠি লিখেছিলেন (আগে উল্লেখ করেছি, সে চিঠি রক্ষিত হয়নি), পরে চিঠিতে, বইয়ের প্রকাশক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন কর্তৃপক্ষের নির্বন্ধে তিনি স্পষ্ট অনুমতি প্রার্থনা করেন।

পত্র ১১৭॥ 'স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত...' ইত্যাদি।। তুলনীয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন' আশ্বিন ১৩৪৬ পৃ ।৶০ -॥০ 'ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, এ কথা মানবসন্তানমাত্রেই স্বীকার করে থাকে।'

' দ্রৌপদীর লজ্জা...' ইত্যাদি॥ দ্র. মহাভারত, সভাপর্ব ৬৬তম অধ্যায়।

'রবিরশ্মি' ও সে সম্বন্ধে কবির মন্তব্য :

'রবি-রশ্মি' : পূর্বভাগে' (কবিত্ব-উন্মেষ হইতে কল্পনা পর্যন্ত)। কলিকাতা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব উপাধ্যায়, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, বিবিধ-গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. কর্ত্তৃক বিশ্লেষিত। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ রয়্যাল পৃ ১৭+ ৪৩৪।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৯-এর একখানি পত্রে চারুচন্দ্র 'রবি-রশ্মি' নামে রবীন্দ্রকাব্যের 'অন্তর্গূঢ় ভাব এবং শব্দ ও বাক্যের সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণে'র একখানি পুস্তক রচনার সংকল্প জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ

প্রার্থনা করেছিলেন। ২৯ পৌষ ১৩৩৯-এর পত্রে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি কবিতার অর্থ জানতে চেয়ে তারপর লেখেন, 'বই লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছি।' বিজয়াদশমী ১৩৪০এর পত্রে ব্রত উদ্‌যাপন করার কথা লিখে জানান, ' ''রবি-রশ্মি'' বিশ্লেষণ প্রায়ে শেষ করে এনেছি।' মনে হয় অব্যবহিতিকালের মধ্যেই বইখানি প্রেসে গিয়েছিল। ১১ মাঘ ১৩৪৪ (২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮)এ 'রবি-রশ্মি'র উৎসর্গপত্রের জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন প্রার্থনা করে চারুচন্দ্র চিঠি লেখেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ 'রবি-রশ্মি'-র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় চারুচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন, 'সকলের চেষ্টা ও সাহায্য সত্ত্বেও পাঁচ বৎসর মাত্র অর্ধেক বই ছাপা হইল। বাকী অর্ধেক আমার জীবদ্দশায় হইবে কি না বিধাতাই জানেন।' অপর ভাগ প্রকাশিত হবার আগেই লেখকের মৃত্যু হয়।

'রবি-রশ্মি' লিখতে ব্যয় হয়েছে বর্ষ কাল যদিও প্রস্তুতি অনেকদিনের। চারুচন্দ্র লিখেছেন, 'এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি বারো বৎসরের নিরন্তর চেষ্টায়।'

আমি বারো বৎসর রবীন্দ্র-সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতে করিতে যখন যেখানে আমার মনের অনুকূল যে-সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাইয়াছিলাম তাহা আমার অধ্যাপনার টিপ্পনীর অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাতে সকল সময়ে লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা হইতেও আমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের রচনা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আমার লেখার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছি। ইহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকটেও ঋণী ও কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট ও ব্যাপক অধ্যাপনা ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আরম্ভ হয়। এই অধ্যাপনায় যাঁহারা ব্রতী ছিলেন বা আছেন সেই-সকল সহকর্ম্মীদের নিকটেও আমার অনেক ঋণ আছে, তাঁহাদের সহিত আলোচনাতেও অনেক জটিলতার মীমাংসা হইয়াছে।

সর্ব্বোপরি আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বয়ং কবিগুরুর কাছে। যখন

যেখানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার গোচর করিয়াছি, এবং তিনি আমার প্রতি তাঁহার অহেতুক স্নেহাতিশয়তার অনুরোধে সংশয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার অনেক কবিতা ও কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; এবং আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক স্থানে কবির ভাষাই পরিগৃহীত হইয়াছে। কবিগুরুর কাব্য-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের জন্য অনেক স্থানে তাঁহারই অন্য রচনার সাহায্য লইয়াছি, একটি কবিতাকে অন্য কবিতার বা প্রবন্ধের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে আমি অনেক স্থানেই গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সম্পন্ন করিয়াছি।

চারুচন্দ্র নিজেকে 'মাল্যগ্রন্থনকারী' এবং 'মুটেমজুর' আখ্যা দিয়ে বিনয় প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 'আমার এই নির্মিতি যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আকার ধারণ করিল, তাহারই সৌন্দর্যের জন্য ইহা রবীন্দ্রকাব্যরসিক সাহিত্যসমাজে সমাদৃত হইবে আশা করি।' তবু, হয়তো প্রবাসীতে ছাপার জন্য কবির মন্তব্য প্রার্থনা/প্রত্যাশা করেছিলেন যে মতামতে আনুকূল্য তত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মতামত পেয়ে চারুচন্দ্র পত্রপাঠ এই চিঠি লেখেন, তখন তিনি ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতার বাড়িতে আছেন। পত্রপ্রাপ্তি মাত্রে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে 'রবিরশ্মি' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সংবলিত চিঠি প্রবাসীতে ছাপতে বারণ করে লেখেন, ১৬ মে ১৯৩৮ এর চিঠি : রবিরশ্মি বইটা সম্বন্ধে চারুকে যে চিঠি লিখেছিলুম সেটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে মরেছেন তাঁকে নিন্দাই করেছি। ওটা ছাপাবেন না।...

রামানন্দ এ চিঠির উত্তরে লেখেন,

20 Mullen Street.
Elgin Road. P.O.
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

ভক্তিভাজনেষু,

অনিলবাবুর চিঠির মধ্যে আপনার ২রা জ্যৈষ্ঠের চিঠি পেয়েছি। পেয়েই 'রবিরশ্মি' সম্বন্ধে চারুবাবুকে লেখা আপনার চিঠি না-ছাপতে আমার সহকারীদিগকে লিখে দিয়েছি। চারুবাবুকেও তা জানিয়ে দিলাম। তিনি যদি ছাপতে বলেন, তখন ছাপা হবে। একথাও তাঁকে লিখেছি যে. তিনি শুধু 'আমার আপত্তি নাই' বললেই ছাপব না। তিনি positive ইচ্ছা প্রকাশ করলে ছাপব।...

প্রসঙ্গত প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ কিঞ্চিদর্ধিক দেড়-কলম 'রবিরশ্মি'র আলোচনা ইতিমধ্যেই ছাপা হয়েছিল, তাতে মুখ্যত যা লেখা হয়েছিল তা হল : চারুবাবুর গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজের সমালোচনাদক্ষতা রসগ্রাহিতার ফল পাঠকদিগকে দিয়াছেনই, অধিকন্তু অন্য অনেকের ঐরূপ শক্তিরও ফলভাগ তাঁহাদিগকে করিয়াছেন [Sic], এবং সর্বোপরি বহুস্থলে স্বয়ং কবিরই দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মর্মোদ্‌ঘাটন করাইয়াছেন।...

আমাদের ধারণা, ইহার দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথ সুগম হইবে, এবং যে সকল ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্য বা কবিতা পড়িতে হয়, ইহার দ্বারা তাঁহাদের রবীন্দ্রসাহিত্যানুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

অতঃপর, চারুচন্দ্রের ইচ্ছাক্রমেই রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫ ,পৃ মুদ্রিত হয়।

প্রাগিতিহাসের রবীন্দ্ররচনা ॥ প্রথমবয়সের কবিতা সম্বন্ধে কুণ্ঠা রবীন্দ্রনাথ বহুবার নানাভাবেই ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়ঃক্রমকালেই লিখেছেন 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের 'অসংযম' ও 'আতিশয্য', 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র 'উচ্ছৃঙ্খল কবিতা' নিয়ে সংকোচের কথা। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৩১৮) দেখি, 'প্রভাত-

সঙ্গীত'ই তাঁর প্রথম নিষ্ক্রমণ, প্রথম শস্যোদ্গম 'কড়ি ও কোমলে'। অতঃপর বিভিন্ন কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবেই আদিরচনার সম্বন্ধে তাঁর অপছন্দ প্রকাশ করেছেন।

ইন্ডিয়ান প্রেসের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র ভূমিকা (১৩২১) :

সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসঙ্গীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিষেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'চয়নিকা' নতুন সংস্করণের ভূমিকা [?]

'কড়ি ও কোমল' হইতে আমার কবিতার পূর্বপ্রত্যন্তের আরম্ভ। তার আগের কোনো লেখাকেই আমি কাব্য বলিয়া স্বীকার করি না। কেবলমাত্র গোত্র ধরিয়া আমার কাব্যপংক্তিতে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিককে সাজে, কাব্যরসিককে কদাচ নহে।

স্বনির্বাচিত 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকা (১৩৩৮) :

সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ।... ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ— লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশকালে (১৩৪৬) তিনি যে আদিরচনাকে স্থায়ী করে রাখবার বিরুদ্ধতা করেছিলেন, রচনাবলী-সম্পাদক 'নিবেদন' স্থলে রবীন্দ্রনাথের সেই লেখাটি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

ভূরিপরিমাণ যে সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না।

তব রবীন্দ্রনাথের সকল সংগ্রহই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র লেখা নিয়ে শুরু হয়েছে। রচনাবলী সংস্করণের জন্য বিশেষ করে লেখা ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।'

প্রসঙ্গত চারুচন্দ্র যে 'রবিরশ্মি' বইয়ের গোড়াতে দীর্ঘ স্থান জুড়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-পূর্ব আদি অচলিত উন্মেষ-পর্বের রচনার সবিস্তার বিশ্লেষণে ব্যয় করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষের সেও বোধ করি এক কারণ।

'কবিকাহিনী পড়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ...' ॥ দ্র. বান্ধব, দশম সংখ্যা ১২৮৫ পৃ ৪৬৪-৪৬৭। 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয়স্থলে উদ্ধৃত, ১৩৬৩ সং পৃ ২০২-২০৩।

'ভগ্নহৃদয় পড়ে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য...' ইত্যাদি ॥ 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পাঠ করে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য নবীন কবিকে যে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন তার বিবরণ অধুনালুপ্ত 'রবি' ত্রৈমাসিকপত্রের রবীন্দ্র-সম্মিলন সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩২ পৃ ৩৩৭-৩৩৮, পৃ ৩৪৩-৩৪৫ থেকে 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয় স্থলে উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে।

পত্র ১১৮ ॥ এই চিঠি 'রবিরশ্মি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগের চিঠির অনুবৃত্তি, এ চিঠিরও নকল তিনি রামানন্দকে পাঠিয়েছিলেন, দ্র. পূর্বোল্লিখিত রামানন্দকে লেখা ১৬ মে ১৯৩৮এর পত্র :

আমার কৈফিয়তে চারুকে যে চিঠি লিখেছি তার নকল পাঠাই। তাঁর বইটা ক্লাস বইয়েরই মতো হয়েছে, ছাত্রাবস্থা ছাড়িয়াছে যারা এটা তাদের উপযোগী নয় অথচ সেই রকম বইয়ের দরকার আছে। অতিশয় বেশি দিতে গেলে

কম দেওয়া হয়। বোধ হয় চারু ক্লাস পড়াবার উপলক্ষ্যেই এটা লিখেছেন সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও থাকলে ভালো হোত। যদি থাকত তা হলে বইটা প্রশংসারই যোগ্য হত।

প্রসঙ্গত, 'রবিরশ্মি'কে 'ক্লাস-বইয়ের' অধিক গুরুত্ব দিয়ে সেই মুহূর্তেই চিঠি লিখেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, তাঁর মতে

It will be as invaluable to serious students of the Poet's work as the Browning Cyclopaedia. It is however a good deal more than a cyclopaedia. It gives, a short sketch of a systematic criticism, and also contains a good deal of most interesting and important personal nots.

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের লেখা ১১ মে ১৯৩৮এর পত্র।

পত্র ১১৯ ॥ চারুচন্দ্র তাঁর তৃতীয় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন (দ্র. এই বই পৃ ১৮৪), তার উত্তর।

চারুচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়ার শুভবিবাহ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ (২৬ মে ১৯৩৮)।

'কবি রবীন্দ্রনাথ'। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ পৃ ১৮৮-১৯৯। চারুচন্দ্র এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, 'চিরযুবা কবি কর্তব্যে নিরলস, তিনি কেবল lotus-eater নন, তিনি কর্মীশ্রেষ্ঠ।'

পত্র ১২০ ॥ গল্পের প্লট : নানা সময়ে বহুজনকে রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্লট যুগিয়েছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ 'দেবী' (১৩০৬) গল্পের প্লট রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, সে গল্পের কোনো কোনো পরিবর্তনও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে করা হয়েছিল। দ্র. রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়ের ৬ আশ্বিন ১৩০৬ ও ২০ আশ্বিন ১৩০৬ এর পত্র।[১] শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে অধ্যাপকদের কাউকে কাউকে তিনি গল্পের প্লট দিয়ে গল্পলেখাতে প্রবর্তন করেছেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে পাই : 'আপনাদের গল্পগুলি শুনা যাইবে। আমি পণ্ডিত মহাশয় ও সতীশকে গুটি কয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।'[২] সতীশচন্দ্রকে দেওয়া দুটি কাহিনীবীজের সূত্র আছে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা সতীশের সেই সময়কার চিঠিতে :

> শুন আমি কি কি লিখেছি : রবিবাবুর অনুদিষ্ট 'আনন্দ ভিক্ষু'র কাহিনীটিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহাকে ভাল বলিয়াছেন—তবে তাঁহার ইচ্ছা ওটাকে Drama করি...
>
> তারপর Historical ballad লিখনের পরীক্ষাস্বরূপ (নিজে নিজে অবশ্য পরীক্ষা) শ্রীযুক্ত রবিবাবুর নিকট হইতে 'সংযুক্তার স্বয়ম্বর' বিষয়টি লইয়া একটি ballad লিখিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহার প্রশংসা করিয়াছেন...[৩]

'রবিবাবর অনুদিষ্ট "আনন্দ ভিক্ষু"র কাহিনী অবলম্বনে সতীশচন্দ্র "চণ্ডালী" কবিতা লেখেন, দ্র. বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১০, পরে এই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লেখেন, 'চণ্ডালিকা' নাটক।

পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প সম্বন্ধে তথ্যপঞ্জী সংকলনস্থলে রবীন্দ্রনাথের নানা জনকে দেওয়া প্লটের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে শরৎকুমারী চৌধুরাণীকে দেওয়া 'যৌতুক' গল্পের, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া 'দেবী' গল্পের এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া

---

[১] 'প্রভাত-রবি'। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ পৃ ১৬৭।

[২] শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ পৃ ২৭৬

[৩] 'সতীশচন্দ্র রায়ের পত্রাবলী'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪ পৃ ১৮৭

'কোনো একটি' গল্পের প্লট উল্লেখযোগ্য।[1] শরৎকুমারীর গল্পটির সূত্রে তাঁর 'রচনাবলী'র সম্পাদকীয় বক্তব্য স্থলে লেখা হয় :

রবীন্দ্রনাথ 'যৌতুক গল্পের প্লটটি শরৎকুমারীকে দেন এবং উহা লইয়া তাঁহাকে একটি গল্প রচনা করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ-মত পাঁচ-

---

[1] বনফুল উল্লেখ করেছেন, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'তোমাকে একটা গল্পের প্লট দেবো। তুমিই ঠিক পারবে। ভেবে দেখলুম আমার পক্ষে ও গল্প লেখা অশোভন হবে। পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে গল্পের প্লটটি পাঠান। পত্রটি এই :

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
ভাগলপুর

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সময়টা সেকালের প্রান্তঘেঁষা। মাঠাকরুন বড়োঘরের ঘরণী— স্বামী সহকারে চলেছেন তীর্থ পরিক্রমে। শেমিজ জুতোয় লজ্জা, অশ্বযানে সংকোচ, বাল্যাবধি পাল্‌কিবাহিনী, আধুনিকপন্থায় স্বামীর তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে সনাতনী আচার শ্বশুরকুলের বংশানুগত আভিজাত্য আঁকড়ে ছিল তার কোন ব্যত্যয় গৃহিণী সইতে পারতেন না, যদিও পুরুষমানুষের অনাচারে ধৈর্য রক্ষা করতে অগত্যা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তার ছেলেটি আধুনিক লোরেটোতে শিক্ষিত মেয়েকে বাছাই ক'রে বাপমায়ের অগোচরেই বিয়ে করেছিল, মেয়েটির বয়স গৌরীর কাছাকাছি যায়নি বলে দুঃসহ ক্ষোভ পরিবারে একদা আলোড়িত হয়েছিল। অল্পদিনে প্রমাণ হোলো এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে হয় না— এমন কি যে সকল আচারে ও পূজার্চনায় তার অভ্যাস ও বিশ্বাস ছিল না তারও খুঁটিনাটি সে মেনে চলত। স্বামী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজনায় বৃথা চেষ্টা করেছে। একটা কথা মেয়েটি বুঝতে পারত না কেন স্বামীসহবাস থেকে সে বঞ্চিত। সে সমস্যার ইতিহাস এই, স্বামীর স্বভাবচরিত্র ভালো কিন্তু একবার পদস্খলন হয়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে, ভয় নেই, কিছুকাল চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ হবে। সেই আশ্বাসে শ্বশুরের একান্ত ব্যস্ততায় ও সুন্দরীর লোভে সে বিয়ে করলে কিন্তু সংক্রামক স্বল্প বিপত্তি থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে চললে। রোগ উপশমের বাহ্যলক্ষণ যতই আশ্বাসজনক হোক তবু ভয় ছিল রোগটা পাছে সন্তান পরম্পরায় সংক্রামিত হয়। এদিকে স্ত্রীর বিশ্বাস এই সংযম স্বামীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক শুচিতার লক্ষণ। তাই জোড় মিলাবার চেষ্টায় নিজের প্রবৃত্তিও দমন করে চলত। অবশেষে হঠাৎ একটা অসংযমের উদ্দীপনার মুখে স্বামীকে অপরাধ স্বীকার করতে হোল। ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর গৃহত্যাগ— অথচ অন্তরের মধ্যে নিরন্তর জ্বলুনি। একবার শাশুড়ির পায়ের ধুলো নেবার প্রলোভনে স্টেশনের নিকটবর্তী গাছতলায় দুর্যোগের অপরাহ্নে যা ঘটল তার আভাস পেয়েছ। ছেলেটার

সাত দিনের মধ্যেই শরৎকুমারী 'যৌতুক' গল্পটি লিখিয়া ফেলেন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন না; কারণ পরবর্তীকালে তিনি এই প্লটটি আবার চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন এবং তিনি 'চাঁদির জুতা' গল্পটি লেখেন। গল্পটি চারুবাবুর 'বরণডালা' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।[১]

চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ অনেক গল্পের প্লট দিয়েছিলেন। তার দু-একটি, যেমন 'স্রোতের ফুল', 'হেরফের' উপন্যাসের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'এর ['স্রোতের ফুল' উপন্যাসের] পরেও আমি তাঁর কাছে প্লট পেয়েছি।'

রবীন্দ্রনাথের গল্পের কাঠামো নিয়ে তিনি লেখেন 'দুই তার' উপন্যাস। 'এর পরে আমার 'হেরফের' উপন্যাসের প্লট বোলপুরে পেয়েছিলাম। আর 'ধোঁকার টাটি'র প্লট তিনি আমাকে শিলং পাহাড় থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন...'।

'স্রোতের ফুল', 'দুই তার', 'হেরফের' 'ধোঁকার টাটি ছাড়াও 'দোরোখা' গল্প, 'নষ্টচন্দ্র' উপন্যাসের প্লট চারুচন্দ্রকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'দুই তারে'র ভূমিকাতে চারুচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন :

এই বইয়ের প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার আভাস পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মুখে মুখে আমাকে বলিয়াছিলেন;

কলঙ্ক অথচ চরিত্র মাহাত্ম্যের কথা চিন্তা করে দেখো। ইতি ৮ই চৈত্র ১৩৪৫ [মার্চ ২২, ১৯৩৯]
স্নেহাকৃষ্ট

বনফুল লিখেছেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল এই প্লটটি নিয়ে আলাদা একটা বই লিখব। কিন্তু তা আর পেয়ে উঠিনি। এই প্লটের মুখ্য চরিত্রটিকে আমার 'নির্মোক' উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলাম। 'নির্মোকে'র অমর এই প্লট থেকে সৃষ্টি।' দ্র. বনফুল : 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' ১৯৭৮

[১] ভূমিকা, 'শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী' ১৩৫৭

সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি মধ্যের ঘটনাগুলি গাঁথিয়াছি। দোল-পূর্ণিমা ১৩ই চৈত্র ১৩২৪।

'নষ্টচন্দ্রে'র ভূমিকায় উল্লেখ আছে : এই উপন্যাসের প্লটটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহের দান। লেখার সময় অনেক বদল হয়ে গেলেও এর কাঠামোটি কবিগুরুর দত্ত উপহার। রমণা, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩১২।

সম্পাদকের কথা

পত্র-বিবরণ পরের দিকে দুর্ভাগ্যবশত আংশিক বা অসম্পন্ন রয়ে গেল। বই পত্র তথ্যাদি -সূত্রে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র প্রয়াত কোরক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান প্রেসের শ্রীরবি ঘোষ, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগারের শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় ও শ্রীআশিস হাজরা এবং পাঠভবনের অধ্যাপক আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীঅনাথনাথ দাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের শ্রীসুবিমল লাহিড়ী ও স্বরলিপি-শাখার শ্রীসুভাষ চৌধুরী, এবং সর্বোপরি শ্রীশঙ্খ ঘোষ নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

এঁদের আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ১৫০'০০ টাকা
ISBN-81-7522-255-7 (V.14)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

বিচিত্রা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত।

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত।

চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী

চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল ঘোষকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ – ১৯৪১

পঞ্চদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ।। পঞ্চদশ খণ্ড

যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪০২

সম্পাদনা : শ্রীভবতোষ দত্ত

© বিশ্বভারতী ১৯৯৫

ISBN-81-7522-003-1 (V.15)

ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড । কলিকাতা ১৭
লেজার সেটিং শ্রীসঞ্জয় সাউ
অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া । ৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট । কলিকাতা ১২
মুদ্রক শ্রীঅরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্প্রেশনস । ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলিকাতা ৪

বিষয়সূচি

যদুনাথ সরকারকে লিখিত পত্রাবলি ৯

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্রাবলি ৩৫

যদুনাথ সরকার -লিখিত পত্র ৮৫

যদুনাথ সরকার -লিখিত প্রবন্ধ :

The New Leaven in Bengal ৯৬

স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম ১০৪

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত পত্রাবলি ১১৩

‘জীবনকথা’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা ১২৬

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-যদুনাথ প্রসঙ্গ ১৩১

রবীন্দ্র-যদুনাথ পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ১৪৭

রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ ১৭৫

রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ১৮১

রামেন্দ্রসুন্দর-রবীন্দ্রনাথ, পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ২২৭

বিজ্ঞপ্তি ২৪২

যদুনাথ সরকারকে লিখিত

১
১৬ অক্টোবর ১৯০৫

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার[১]
করপ্রকোষ্ঠেষু

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৮ মে ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণ-পূর্ব্বক নিবেদন

আপনার প্রেরিত বইগুলি ও পত্র কিছুকাল হইল পাইয়াছি– নানা ব্যস্ততায় এ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারি নাই– ক্ষমা করিবেন।

রাসমালা[১] পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। দেখি যদি কিছু সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু মুস্কিল এই, মনটা ওদিকে নাই আবার এ সব কাজ জবরদস্তি করিয়া হয় না।

মাঝে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল আবার সেই দিকে চলিয়াছি। ছুটিতে স্থির হইয়া বসা ঘটিল না। কোথাও যাইব মনে করিয়াছিলাম —এইখানকার এই মাঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেও মন সরে না।

রথীন্দ্র বিদ্যালয়ে একটি বেশ ভাল magic lantern[২] দিয়াছে —কবে ইহার মধ্য দিয়া আর একদিন আপনি জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবেন? মাঝে মাঝে এক একবার দর্শন দিয়া যাইবেন।

অজিত[৩] ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তি পাইয়া আগামী সেপ্টেম্বরে অক্সফোর্ডে যাত্রা করিবেন। তাঁহার সহিত আপনার এখানে পরিচয় ঘটিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া এখানেই তিনি অধ্যাপনার কার্য্য করিবেন। ইতি– ২৫শে বৈশাখ ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২১ জুন ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণ-পূর্ব্বক নিবেদন

দীনেশ বাবুর পুত্র[১] শ্রীমান অরুণ সহসা বাড়ি ছাড়িয়া পাটনা অভিমুখে কোথায় আসিয়াছে। সে আমাদের আশ্রমের ছাত্র— সম্প্রতি এফ, এ পাস করিয়াছে। তাহার ভাই ও ভগ্নীপতি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন। পত্রবাহকদের মুখে সমস্ত কথা শুনিতে পাইবেন।

আশাকরি আপনার খবর ভাল। বিদ্যালয় খুলিয়াছে— অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৭ই আষাঢ়, ১৩১৭

ভবদীয়
াথ ঠাকুর

৪
৪ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শকুন্তলার অনুবাদের[১] প্রুফ কয়েকদিন হইল পাইয়াছি।

বিদ্যালয়ের ছুটি আসন্নপ্রায়। ছেলেরা অভিনয়[২] করিবে—

তাহারই আয়োজন করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলিয়া এতদিন আপনাকে চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ একটা অভিনয় হইবে এবং আগামী কল্য আর একটা অভিনয় হইয়া বিদ্যালয়ের ছুটি হইবে।

আপনি যেভাবে তর্জ্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার শোভা পায় ইংরাজিতে তাহা কোনোমতেই উপাদেয় হয় না এইজন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইংরাজিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত বক্তব্য বিষয়টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়।

আপনি শুনিলাম কোথায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। একবার মনে করিয়াছিলাম আমাদের অভিনয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিব কিন্তু আপনার আসা সম্ভবপর হইবে না আশঙ্কা করিয়া এবং নিশ্চিত দিন স্থির না হওয়াতে আপনাকে ডাকিতে পারি নাই।

আশ্রমে আবার কবে দেখা দিবেন? ইতি ১৭ই আশ্বিন, ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫
২৬ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

শিলাইদ, নদিয়া

সবিনয় প্রীতি সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের picture post cards[১] সংগ্রহ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম

—আপনি যে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ইহাতে বড় আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি ছুটির কয়টা দিন শিলাইদহে পদ্মাতীরেই কাটাইবার আয়োজন করিয়াছি।[২]

৭ই পৌষের উৎসবে বিদ্যালয়ে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল —তখন বোধ হয় আপনাদের ক্রিষ্ট্মাসের ছুটি আরম্ভ হইবে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক, ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
৩ ডিসেম্বর ১৯১০

ওঁ

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার প্রেরিত ছবিগুলি আজ পাইয়াছি। সেগুলিকে সাজাইয়া একটি ফ্রেমে বাঁধাইয়া লইবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।

ক্রিষ্ট্মাসের সময়[১] জগদানন্দ ক্ষিতিমোহনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন অধ্যাপক একজিবিশন দেখিবার জন্য এলাহাবাদ যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন— কিন্তু আমার এখান হইতে নড়িবার ইচ্ছা নাই। আপনি সে সময় আসিলে আনন্দ লাভ করিব।

ময়মনসিংহে বোধহয় আগামী সরস্বতী পূজার সময় সাহিত্যসম্মিলন[২] বসিবে। ডাক্তার বসু সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন— তিনি আমাকে সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিবেন —সহজে নিষ্কৃতি দিবেন বলিয়া আশা করি না। উত্তরবঙ্গ সম্মিলনীর সঙ্গে তাহার দিনক্ষণে কাটাকাটি হইতেও পারে। ভাঙা শরীর লইয়া অধিক নড়াচড়া করিতেও পারি না। এই সকল কারণে এখনো কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আলোচনা হইতে পারিবে। ক্রিষ্ট্‌মাসের ছুটিতে ডাক্তার বসু শিলাইদহে পদ্মার চরে আমার সঙ্গ ইচ্ছা করিয়াছেন— কিন্তু মাঘোৎসবের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই জন্য সে সময়ে কোথাও যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭
২০ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার শরীর ভাল নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। ১লা বৈশাখের উৎসবে আপনার প্রত্যাশায় ছিলাম। আসিলেন না দেখিয়া স্থির

করিয়াছিলাম হয় ত ২৫শে বৈশাখে আসিবেন।

মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী লিখিয়াছেন তিনি বিদ্যালয়ে খুলিলে আষাঢ় মাসে এখানে আসিবেন। অতএব এই গরমে এখন আপনার গতিবিধির কোনো পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবেনা।

এখানে কলেজ স্থাপনের পরামর্শ[১] করিতে কলিকাতায় আশু মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন আমাকে টাকা জমা দিতে হইবে না— জামিন হইলেই চলিবে। অবশ্য ক্লাসের ঘর ও সাজ সরঞ্জামে টাকা লাগিবে। এ টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব কি না সন্দেহ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মনে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হইলে পরামর্শ করা যাইবে।

আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব[২] এখানকার ছেলেরা করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ যে উৎসব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সম্ভবত তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশনের দিনে— সে কবে আমি জানি না। সে সভায় আমি উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি না— যদি কোনোমতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কোথাও পালাইতে পারি সে চেষ্টা করিব।

আমার জন্মোৎসবের ভার যদি সাহিত্য পরিষৎ গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত চাঁদার টাকা লইয়া তাঁহারা সাহিত্যসম্বন্ধীয় কোনো একটা কাজের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। ওদিকে দৃষ্টি দিয়া কোনো ফল হইবে মনে করি না। এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরের উদ্যোগ আয়োজনে আমি যে কিরূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি তাহা

অন্তর্যামীই জানেন। আপনার নিরাময় সংবাদ পাইলে নিশ্চিন্ত হইব। নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানিবেন। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

[*৩১ অগস্ট ১৯১১]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু—

এবার আমাদের পূজার ছুটি সম্ভবত ৮ই আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইবে। ৬ই অথবা ৭ই আশ্বিনে শারদোৎসব[1] হইবার কথা। সে সময়ে আপনি যদি আসিতে পারেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। তখন রামানন্দ বাবুও আসিবেন কথা আছে। ছুটির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিতান্ত দায়ে না পড়িলে আমি কোথাও যাইব না— অতএব আপনি যখনি আসিবেন দেখা হইবে। বায়ু পরিবর্ত্তনে আপনি কি বিশেষ উপকার পান নাই? আমার শরীরটাও ভাল চলিতেছে না। যকৃৎটাই বিকল হইয়াছে। ইতি বৃহস্পতিবার। [১৪ ভাদ্র ১৩১৮]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯
২৩ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

পাইওনিয়র[১] আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ইহার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়া আছি। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই আসিবেন। ছেলেরা ৮ই পৌষে অচলায়তন[২] অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। দেখা হইলে অনেক কথা হইবে। ইতি ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এতদিন কলকাতায় ছিলেম। বিশেষ কাজের তাড়ায় আগামীকাল মঙ্গলবার ভোরবেলায় বোলপুরে রওনা হতে হবে। শুক্রবার পর্য্যন্ত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের এই সুযোগ হারাতে হল। ইতি সোমবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৩ জানুয়ারি ১৯১৪

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বোটে চড়িয়া জলে জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি— ১১ই মাঘের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ডাঙায় নামিতে হইবে। তাহার পরে কবে পশ্চিমে যাত্রা করিব এখনও নিশ্চয় বলিতে পারি না— কারণ, বিদ্যালয়ের কাজে অনেকদিন গাফিলি করিয়াছি কিছুদিন সেখানে স্থির হইয়া বসিতে না পারিলে ক্ষতি হইবে। হয়ত ফাল্গুন চৈত্রে কিছুদিনের ছুটি মিলিতে পারে তখন আপনাকে খবর দিব— কিন্তু আমার প্রতি নির্দ্দয় আচরণ[১] করিবেন না— সম্মান আমার পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। ইতি ২৯ পৌষ [১৩২০]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
৬ ডিসেম্বর ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

হরিদাসবাবু যে নিয়মে বিশ্বগ্রন্থ[১] প্রকাশের ভার লইতেছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে। এবার যখন কলিকাতায় যাইব তখন

তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথা ঠিক করিব।

আমার শরীর মন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে এইজন্য পরিশ্রম করিয়া কোনো বড় কাজ সম্পাদন করিবার আশা আর রাখি না। এখন শান্ত হইয়া পড়াশুনা করিব এবং এখানকার ছেলেদের লইয়া দিন কাটাইব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের এমন গাড়িতে জুড়িয়া দেয় যে, বাহক যখন থামিতে চায় তখন তাহার পিছনের গাড়ি তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলে। কিছু না কিছু কাজের দায় অনাহূত আসিয়া কাঁধে চাপে, তাহার কাছ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে তাহাকে নিকাশ করিতে হয়।

আমেরিকার Lincoln সহর আমাদের বিদ্যালয়কে একটি ভাল ছাপাখানা[১] উপহার দিয়াছেন। চালাই কি করিয়া? আর কিছু নয় ছেলেদের শিক্ষা ও আমোদ হয় অথচ খরচ উঠিয়া যায় এমন উপায় কিছু বলিতে পারেন? চিন্তামণিবাবুকে[২] বলিয়াছিলাম এই প্রেসকে তিনি যদি তাঁর ব্যবসায়ের অন্তর্গত করিয়া লন তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। তিনি পারিয়া উঠিবেন না লিখিয়াছেন। এখানে এমন তৈরি ছাপাখানা এবং বিনাভাড়ায় ঘর লইয়া কি কোনো ব্যবসায়ী ইহার ভার লইতে পারেন না? আপনি কাহাকেও জানেন? হরিদাসবাবু[৩] কি এ প্রস্তাবে রাজি হইবেন? ইস্কুলমাষ্টারের হাতে এসব জিনিস দিতে ভয় হয়— দুদিন বাদে ইহার অক্ষরে এবং ভগ্নাংশে বোলপুরের প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া যাইবে— অবশেষে ভাবীযুগের প্রত্নতাত্ত্বিকদল ইহার ইতিহাস লইয়া ভয়ঙ্কর দলাদলি বাধাইয়া দিবে। অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

৭ই ও ৮ই পৌষের উৎসবে আশ্রমবাসীরা আপনাকে প্রার্থনা করে। দর্শন যদি পাই তবে কাজও হয় আনন্দও হয়।

Education Commission-এর[৫] প্রশ্নাবলী পাইয়াছি। আপনাদের পরামর্শ পাইলে উত্তর দেওয়া সহজ হইত। ইতি ২০ অগ্রহায়ণ ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ছাপাখানায় বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ ছাপাইবার ব্যবস্থা করা যায় না কি?

১৩
[৫ অগস্ট ১৯১৯]

ওঁ

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রামেন্দ্রবাবুর শোক-সভায়[১] সভাপতিত্ব করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়িয়াছি। আপনি বিচিত্রা লাইব্রেরি হইতে যখন যে কোনো বই ইচ্ছা করেন পাইবেন। রোগশয্যা হইতে মুক্তি পাইবামাত্র বোলপুরে দৌড় দিব। ইতি

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
[২৭ অগস্ট ১৯২১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দেশে ফিরে এসে[১] অবধি আপনাকে দেখবার জন্যে একান্তমনে কামনা করেচি। কটকে আপনাকে পত্র লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে আপনার পত্র এবং বই কয়টি পাওয়া গেল। কবে দেখা হবে? যদি ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে আপনার আসবার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে তাহলে সময় পেলে আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাই। অনেকদিন আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলুম বলে শীঘ্র সময় পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা করবার ছিল। আগামী নভেম্বরে অধ্যাপক Sylvain Levy আশ্রমে এসে কিছুদিন অধ্যাপনা করবেন।[২] সেই সময়ে আপনাদের মত লোকের সমাগম আশ্রমে নিতান্ত দরকার হবে। ইতি [১১ ভাদ্র ১৩২৮]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
২ জুন ১৯২২

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম[১] যে আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে কোনো কারণে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে।

সেজন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়াছি এবং সেইজন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম।

আমার কাজের বিরুদ্ধে আমার দেশের লোকের একটা প্রতিকূল ধারণা আছে, ইহা আমার পক্ষে বিষম বাধা। কিন্তু আপনার মধ্যে সেই বিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে, আপনার চিঠির মর্ম্ম এখনো স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। বিশেষতঃ আপনি অনেকবার এখানে আসিয়াছেন, সকলপ্রকার অভাব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এখানকার প্রতি স্নিগ্ধভাব রক্ষা করিয়াছেন*; আপনি যে এখানকার আবহাওয়া বা কার্য্যপ্রণালীকে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন এমন আভাস তখন আপনার নিকট হইতে একবারও পাই নাই।

আপনি বলিয়াছেন, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge ঘৃণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ জ্ঞানের শিক্ষক ও সাধকগণকে "হৃদয়হীন, শুষ্কমস্তিষ্ক, 'বিশ্বমানবের' শত্রু", বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয়। একথা যদি সত্য হয় তবে আমার এই বিদ্যালয় কেবল যে নিষ্ফল তাহা নহে ইহার ফল বিষময়। কিন্তু একথার আপনি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

এতকাল পর্য্যন্ত এখানে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। এখানে বেশির ভাগ কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প কিছু বিজ্ঞান। যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্ত্তি হইয়াছে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেশে ত হাইস্কুল যথেষ্ট আছে তাহার উপর আর একটা বোঝা

বাড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল। তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য এই যে এদেশে হাইস্কুলে ছাত্রেরা যেটুকু শেখে এখানকার ছাত্রেরা অন্তত সেইটুকুই শিখিত। আপনি কি কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্বল্পপরিমাণ শিক্ষার মধ্যেই accurate knowledgeকে উপহাস করিতে দীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটি মত দাঁড়াইয়া গেছে যে, প্রমাণসঙ্গত প্রণালীতে যে মনস্বীরা জ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা "বিশ্বমানবের" শত্রু?

একথা আপনার জানা আছে যে, যথোচিত পদ্ধতিতে আমি নিজে শিক্ষা লাভ করি নাই। মনে করিতে পারেন সেই অশিক্ষা-বশতই জ্ঞানান্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি অশ্রদ্ধা করি,— এবং সেই অশ্রদ্ধা আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এখানকার অপরিণতবুদ্ধি বালকদের মনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন তবে আমাকে আপনি জানেন না ইহার বেশি আর কিছু বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইলাম, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, সত্যের দোহাই দিয়া আমি বলিব যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত অনুসন্ধানপ্রণালীর প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা আছে ; আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, এমন কি, হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও প্রামাণিক পদ্ধতির চর্চ্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি। আপনার প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তিগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্যসন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। আমাদের দেশের অনেকে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য

তাঁহাদের সাধনা এরূপ বিশুদ্ধ নহে। আপনার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই এখানকার কাজে আপনার সহায়তা পাইবার জন্য এমন আগ্রহের সহিত বারম্বার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনাকে যদি "বিশ্বমানবের" শত্রু বলিয়া মনে করিতাম তবে আপনার সংস্রব এমন করিয়া কামনা করিতাম না।

আচার্য্য বসুর অনুসন্ধানলব্ধ তত্ত্বগুলিকে দেশের যে-একদল লোক প্রাচীন আর্য্যঋষিদের ঝুলির মধ্যে গুপ্ত আছে বলিয়া কল্পনা করেন আপনার পত্রে আপনি তাঁহাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আপনার চেয়ে আমি তাহাদিগকে কম অশ্রদ্ধা করি না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুরাতন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীকে যাঁহারা অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করেন আপনি তাঁহাদের কথাও লিখিয়াছেন। আমি যে সে দলের নহি আপনি যদি তাহার প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা আলোচনা করিবেন, আমি তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া, প্রামাণিক প্রণালী অনুসারে শাস্ত্র আলোচনা ও উদ্ধার করিবার জন্য, যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। এখানকার লাইব্রেরিতে তাহার প্রমাণ আছে।

আমার এখানে ভাবাবেশের অস্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোন কোন বন্ধুমহলেও প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি— কিন্তু তাঁহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাঁহাদের ধারণা নির্ম্মল নহে, কিন্তু আপনার মধ্যেও এইরূপ প্রতিকূলতা যদি এমন প্রবল আবেগে উগ্র হইয়া ওঠা সম্ভবপর হয় তবে তাহা আমার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমনি কার্য্যোপযোগী, তাহার কার্য্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী বহুব্যাপক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাঁসপাতাল সমেত একটি শিক্ষাবিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীঘ্র ছোট আকারে তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে "বিশ্বমানবের" বিরুদ্ধতা করা হয় বলিয়া এখানকার কেহই মনে করেন না। কিন্তু আপনারা কি বলেন যে, ভাবুকতার কোনো সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল বিজ্ঞান ও এই সকল কারখানার কাজ শিখাইলেই exact knowledgeএর সাহায্যে ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে?

আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে "খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নবন্যায়ের কচ্‌কচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নকসার" উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যাহাকে "বোলপুরের বায়ু" বলেন সে কি কেবল এই সকল ফসলেরই উপযোগী? বেদান্তের নূতন ভাষ্য ও নবন্যায়কে বিদ্রূপ করিতে পারি এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই। কিন্তু "কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ ও আলিপনার নক্‌সা" সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ ও আর্ট সমালোচকদের

সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে— দেখিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশের প্রতি তাঁহাদের মানসিক বায়ু পরিশুদ্ধ বলিয়াই এগুলিকে তাঁহারা বহুমূল্য গণ্য করেন। আমার ইচ্ছা যে, আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিশুদ্ধ হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞানসাধনায় বিজ্ঞানের যে স্থান আছে তাহাকেও সকলে সম্মান করিতে শেখে।

আপনার চিঠির ভাষা হইতে বুঝিলাম "বিশ্বমানব" "বসুধৈব কুটুম্বকং" প্রভৃতি ভাষা ও ভাবের প্রতি আপনি অপ্রসন্ন হইয়াছে। অসংযতভাবে এইসকল শব্দের অমিতব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। আমার দ্বারা হয়ত তাহা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু আমার বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন ছাত্রদের মধ্যে আমি একজনকেও জানি না যে ব্যক্তি বিশ্বমানব বা বসুধৈব কুটুম্বকং লইয়া প্রবন্ধে বা গ্রন্থে, বক্তৃতায় বা কবিতায় কোনো আলোচনা করিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র ছাত্রকে জানি যাহার মন ভাবাবিষ্টতায় অভিভূত। কিন্তু মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য সাধনে প্রকৃতি দেবীর নিজের কি কোন হাত নাই, আমাদের আশ্রমের "ভক্তিবাষ্পাকুল বায়ু"র আর্দ্রতাতেই কি মন তৈরি হইয়া উঠে? এখানকার একটি ছাত্র চুরিও করিয়াছে সেজন্য কি এখানকারই বায়ু দায়ী? বৈজ্ঞানিক বায়ুতে কোনো বিকার কাহারও ঘটে না?

আমার ব্যক্তিগত প্রভাবকেই হয়ত আপনি দোষ দিতে চান। সে সম্বন্ধে আমার দুটি মাত্র কথা বলিবার আছে। আমার জীবনে আমি ভাবাবেগের যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কি ভাবাকুল হইয়া কেবলি রসবিলাসে জীবন কাটাইলাম?

আমি কি কাজের জন্য কোন উদ্যোগ কোন ত্যাগ কোন সাধন করি নাই! সেই সাধনায় কি কাঠিন্য নাই? চিন্তাকে বাক্যে প্রকাশ করাতেই কি কেবল যাথাতথ্যের প্রয়োজন, কাজে প্রকাশ করিতে কি শৈথিল্যত্যাগ ও বুদ্ধি এবং কল্পনার সংযম লাগে না? অতএব আমার প্রভাবে কি আমার ছাত্রদিগকে কেবল ভাবাবেগের জড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে আমি অর্থাভাব এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার অভাবের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, আর সেই কঠোর সাধনার কোন প্রভাবই তাহাদের উপর কাজ করিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের "এরোপ্লেন" কি কেবল ভাবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল "আনন্দেই সৃষ্ট" হইয়াছে, ইহার মধ্যে সঙ্কল্প নাই, চিন্তা নাই, পরীক্ষা নাই, দুঃখ নাই? এখানকার ছাত্রেরা কি তাহা দেখিতে পায় না?

দ্বিতীয় কথা, আমার শিক্ষা, আমার মতি এবং চরিত্র যাহা করিতে পারে তাহার বেশি কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার সামর্থ্যের অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই আপনাদের মত জ্ঞানের সাধকদিগকে চাহিয়াছিলাম। যদি পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনাপ্রণালী শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম। এখানে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে করেন না— তাঁহারা নিজেরা পরামর্শ করিয়া কাজ করেন। আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে যদি আমার অভিমান থাকিত তবে আমি নিজেই কর্ত্তৃপদ লইতাম। এখানকার বায়ু একমাত্র আমার ভাবাবেশের দ্বারা কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ আপনি যদি সন্ধান করিতেন তবে জানিতেন আমার ভাবের সঙ্গে এখানকার অধ্যাপকের ভাবের মিল নাই, আর

এখানকার ছাত্রদের পনেরো আনা রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমার ভাবের প্রতি আস্থা রাখে না। তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্যকে আমি বাধা দিই না, ইহাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত ও বিস্মিত চিত্তে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। আপনার মনে আমি ক্ষোভের কোন্ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার এরূপ বিরুদ্ধতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। আপনি "ফিলিষ্টাইন", আপনার কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী "বিশ্বমানবের" ক্ষতিকর, এমন কথা আমি কোনোদিন প্রকাশ্যে বা গোপনে আভাসেও প্রকাশ করি নাই কারণ ইহা আমার চিন্তাতেও আসিতে পারে না। আপনার পত্রে বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে যে উগ্রতা আছে তাহাতে সন্দেহ হয় তাঁহাদের সঙ্গে হয় ত আপনার বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। আমি তাহা জানিও না এবং তাঁহাদের আলোচনায় ঘরের কোণেও কোনদিন যোগ দিই না— যদিও একথা স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ করি যে, বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে ও আর্টসাধনা সম্বন্ধে আপনি যে মত যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি মিলি না।

আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন। এই কারণে আমার কর্ম্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞাবিমিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতায় আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের এখানে ত্রুটির অভাব নাই, ত্রুটি অন্যত্রও আছে, কিন্তু যথাবিহিতরূপে আপনি কি তাহার সন্ধান ও যথোচিতভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বিশ্বভারতীর সংকল্প মাথায় লইয়া ভারতবর্ষে যখন ফিরিলাম তখন সহায়তার জন্য সর্ব্বপ্রথমে আপনাকেই সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু

যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব; তৎসত্ত্বেও ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সত্যসাধক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[Recd. Darjiling, 6 June 1922]

১৬

৩০ নভেম্বর [১৯২৭]

ওঁ

মাননীয়েষু

অধ্যাপক বগ্‌ডানভের[১] নাম জানেন কি না জানি না। পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত, সুদীর্ঘকাল পারস্যে কাটিয়েচেন। ফরাসী ও জর্ম্মান ইনি মাতৃভাষার মতোই জানেন। অপরপক্ষে লোকটি নিরীহ। অনেকদিন আশ্রমে ছিলেন বলে এঁকে ভালো রকমই জানি— যদি সাধ্য থাকত তাহলে এঁকে আশ্রমেই রাখতুম। এখন ইনি আফগানিস্থানে কর্ম্মে নিযুক্ত কিন্তু ভারতবর্ষে থাকবার জন্যে একান্ত উৎসুক। ইনি শুনেচেন যে, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পারসিক ভাষা অধ্যাপনার কাজ খালি আছে— ইনি প্রার্থী। ভারতীয় কোনো মুসলমান পণ্ডিত বিদ্যায় এঁর সমতুল্য নন একথা নিশ্চিত জানবেন। লোকটি সুযোগ্য, ইংরেজি ভাষাতেও পুরো দখল আছে। আপনি নানা উপদ্রবের মধ্যে আছেন শুনেচি— নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে

পারবেন ও বিশ্ববিদ্যালয়কেও মুক্তি দেবেন আশা করে আছি। ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ [১৩৩৪]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭
১০ জানুয়ারি ১৯৩১

খাইলাম
অতি উত্তম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৮
১১ জুন ১৯৩৩

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামী কালকের কর্ত্তব্য সমাধা হলে পর্শু লিখব।

আজ অনেকটা ভালো আছি কিন্তু দুর্ব্বলতা আছে। এ জায়গাটি ভালো লাগচে। ইতি [২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ [

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামকান্ত সর্দ্দেশাই[১] একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোনো ছাত্র আমরা দেখি নি। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়— কিন্তু বোধশক্তিবান যে-চিত্তবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারিদিকের পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জসীভূত ক'রে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে তা অল্পই দেখা যায়। সেই শক্তি ছিল শ্যামকান্তের তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল,— কিছুই তার কাছে বিদেশী ছিল না। সে আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। আমরা তাকে সকলেই ভালোবেসেছিলুম। তার সময়কার এমন কোনো ছাত্র আমাদের ওখানে ছিল না বাংলা ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল।[২] তাছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল স্বাভাবিক। এই দুই পথ, দিয়েই তার মন আমাদের আশ্রমের আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই বিস্তারিত করতে পেরেছিল। দূর গৃহ থেকে এসেছিল শ্যামকান্ত, কিন্তু আপন হৃদয়মনের শক্তিতে সে আমাদের একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল, এবং এখনো নিকটেই আছে।

ইতি ১১ই জুন ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯
২৬ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু

থীসিস্[১] সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই। সেই কারণে নাম সই করে দেওয়া গেল।

এবার চলেছি সিংহল অভিমুখে[২] সে সংবাদ বোধ করি খবরের কাগজে পেয়ে থাকবেন। জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হয়ে যাব তার পরে সেখানেও তীরে বসে সমুদ্রের হাওয়া খাবার সুযোগ ঘটবে। এই হাওয়া খাওয়াটার সঙ্গে স্থূলতর অন্নের সংযোগ সাধন করতে হবে। সেই কথাটা চিন্তা করলে মন ক্লিষ্ট হয়— কিন্তু ভিক্ষুকের ভাগ্য কিছুকাল ধরে পশ্চাৎ থেকে তাড়না করচে— ঝুলিটা প্রশংসা-বাক্যেই বেলুনের মতো ফুলে ওঠে—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে—[৩]

বল্‌তে বলতে দীর্ঘপথ বেয়ে ফিরে আসি। দুঃখের কথা আর দীর্ঘতর করব না। নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ইতি ১৩ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত

১
১৯ জুলাই ১৮৯৭

ওঁ

যোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

অদ্য রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আমাদের যোড়াসাঁকোর বাটিতে উপস্থিত হইয়া আহার ও আলাপ করিলে বড় সুখী হইব। যদি ভোজন সম্বন্ধে আপনি বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন তবে আহারের পরেও আসিতে পারেন ;— আমাদের ভোজটা হিন্দু-মুসলমানী। অনুগ্রহপূর্ব্বক একটা উত্তর পাঠাইবেন। ইতি। ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২
১৪ অক্টোবর ১৮৯৭

ওঁ

যোড়াসাঁকো
২৯শে আশ্বিন [১৩০৪]

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। প্রদর্শনীর সংকল্পটা ছাড়িতে হইয়াছে— কারণ, লো:কে বড় একটা গা করিল

না। আপনি যদি আপনাদের অঞ্চলের সমস্ত শিল্পদ্রব্যজাতের তালিকা পাঠাইয়া দেন ত আমাদের স্বদেশ ভাণ্ডারের[১] কাজে লাগিবে।

আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে ভারতীর সম্পাদকীয় কার্য্যভার[২] আমি গ্রহণ করিতেছি। আপনাকে সত্বর একটা কিছু প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে। সাধনা আর বাহির করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। ভারতীর দ্বারাই আমাদের উদ্দেশ্যে সাধন করিতে হইবে।

তিলকের সমস্ত খবর[৩] কাগজে পড়িয়াছেন। এক্ষণে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিবার খরচা সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। আপনাদের অঞ্চলের জমিদারবর্গের নিকট হইতে কিছু কিছু জোগাড় করিতে পারেন না? আমরা মেয়েদের কাছ হইতেও কিছু কিছু পাইতেছি।

আমি দুই এক দিনের মধ্যে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করিব। যদি তিলকের চাঁদা সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিবার থাকে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বাড়ির ঠিকানায় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখিবেন।

এবার আমার হাতে যখন কাগজ আসিতেছে তখন আপনার আর নিস্তার নাই। নিয়মিত লেখার জন্য আপনার প্রতি নিয়মমত জুলুম চলিবে। পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাপন করিয়া রাখিলাম —কারণ, দস্যুবৃত্তির মধ্যেও একটু ধর্ম্ম থাকা চাই। আপনি কবে ফিরিতেছেন?

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[১৮৯৮]

ওঁ

[বৈশাখ, ১৩০৫]

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনার "ভূগোল" গ্রন্থ পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বইখানি আমার মনের মত হইয়াছে। স্কুলে গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না কিন্তু আশা করি সন্তানহিতৈষী পিতা মাত্রেই আপনার এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ছেলেদের ভূগোল শিক্ষা দিবেন।[১] বইখানি দোকানে বাহির হইয়াছে কি না খবর পাইতে ইচ্ছা করি।

ভারতী পাইয়া থাকিবেন। কিছু লেখার প্রার্থনা করি।[২] প্লেগের বিভীষিকায় কয়দিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতি সোমবার।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

[১৮৯৮]

ওঁ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫]

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনি নূতন ভারতী পান নাই শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি মফস্বলে ভ্রমণ করিতেছিলাম এবং ভারতীর সমস্ত কর্ম্মভার হিরণ্ময়ীর

উপরে। আমার নিকট যে ভারতীটি রহিয়াছে আপনাকে পাঠাই। প্রথম সংখ্যাটি মনের মত হয় নাই। আষাঢ়ের লেখাটি পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫
২০ এপ্রিল ১৯০৫

ওঁ

বোলপুব

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

নববর্ষের প্রিয়সম্ভাষণ জানিবেন। নিশ্চয় বাড়ি গেছেন। সব খবর ভাল ত?

একটি ছাত্রের আবেদন[১] পরপৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। বোধ হয় এমন আরো অনেক ছাত্র আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন জানিতে ইচ্ছুক আছি।

আমি ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অর্শ রোগ প্রেরণ করিয়াছেন —এবার দেশের জন্য কিছু করা হইল না, ঘরে বসিয়াই প্রচুর রক্তপাত করিতেছি।

ভাণ্ডার[১] বাহির হইয়াছে— প্রথম সংখ্যা ছাপার ভুলের ভাণ্ডার হইয়াছে। ভাণ্ডারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন, অমনি এক আধটা প্রবন্ধ ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কাগজটাকে কেজো কাগজ করিতে চাই। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
২৭ এপ্রিল ১৯০৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুব

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের স্কুলে দুটি মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র আছে— তাহাদিগকে আপনার নির্দ্দেশমত পরিষদের কাজে লাগাইয়া দিব। যে সকল ছেলের বয়স বারো বৎসরের অধিক নহে তাহাদের কাছে কিছু প্রত্যাশ্যা করিবেন না। নিতান্ত কচি এবং সম্পূর্ণ ঝুনো এই দুটোকেই বাদ দিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলি ভাণ্ডারে চালান দিব।

কথাসরিৎসাগরের তর্জ্জমায় কোনো অধ্যাপককে লাগাইয়া দিব। পঞ্চতন্ত্র ছেলেদের দিয়া তর্জ্জমা করাইয়া লইব।

অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" এখানকার দুটি ছাত্র[১] তর্জ্জমা করিতেছে— প্রায় শেষ হইয়াছে। মনে করিতেছি নিখিলবাবুর ঐতিহাসিক চিত্রে ছাপিতে পাঠাইব।

ধর্ম্মপূজার খোঁজ[২] লওয়া যাইবে।

আমাদের দেশে "নেশন" ছিল না ও নাই সে কথা সত্য —তাহার পরিবর্ত্তে কি আছে বা ছিল সেইটেই ভাল করিয়া বিচার্য্য। কারণ, ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত? আপনার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খোলসা করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন তবেই কতকটা সন্তোষজনক উত্তর আশা করিতে পারিবেন।[৩]

এবারকার ভারতীতে খেয়ালখাতা[৪] নামক একটা নির্লজ্জতার সৃষ্টি হইয়াছে সেটাতে আমাদিগকে বড়ই কাতর করিয়াছে। আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয়বন্ধুরা যখন যাহা খুসি লিখিতেন। বেশ বুঝিতেই পারিতেছেন তেমন লেখায় সত্যও থাকে না রচনার সৌন্দর্য্যও থাকিতে পারে না— সরলা হঠাৎ সেগুলিকে পাঠকসমক্ষে তুরী [তূরী] ভেরী দামামার কোলাহল সহকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে আমি, বিশেষতঃ বড়দাদা, অত্যন্ত ধিক্কার অনুভব করিতেছি। ভবিষ্যতে এই সমস্ত লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছি তাহা পালিত হইবে কি না জানি না কারণ, আজকাল দোকানদারিই সব চেয়ে নিদারুণ হইয়া দয়াধর্ম্ম গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

পরিষদের শৈশব বিভাগের ভার[৫] সম্পূর্ণ আপনাকেই লইতে হইবে। ইহাকে লাল ফিতার উদ্বন্ধনে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে দিবেন না। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

১২ ডিসেম্বর ১৯০৫

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি পড়িয়া যাহা বুঝিলাম সেইরূপই সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমাকে লইয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ? বস্তুত দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা— তাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়ের মত বৃহৎব্যাপারের কোনই সুবিধা হইবে না। টাকা এ সকল কাজে যে আকর্ষণে অজস্র আসিয়া পড়ে তাহা ভাবের আকর্ষণ— আমাদের দ্বারা ধনীলোকের চরণ আকর্ষণ নহে। আমি নিশ্চয় জানিতাম ময়মনসিংহের মহারাজ টাকা দিবেন না। তাঁহারা কোনো দিন উচ্চভাবের দ্বারা চালিত হন নাই— তাঁহাদের অভ্যাস ও সংস্কার সর্ব্বপ্রকার মহৎ ত্যাগস্বীকার ও দুষ্কর তপশ্চর্য্যার বিরোধী। হঠাৎ একটা আন্দোলনের বেগে কতদিনের জন্য কতটুকুই বা আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে পারে? গৌরীপুরকে আমি ঠিক চিনি না —কিন্তু তাঁহার মন্ত্রদাতা মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রতি আমার লেশমাত্র শ্রদ্ধা নাই— আমি ইঁহাদের কাছে যাতায়াত করিয়া বৃথাই সময় নষ্ট করিয়াছি।

ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে

এই স্পর্দ্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্ত্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই "লীডার" বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাট মাত্র— যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব— কিন্তু "নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই— যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি— ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ইতি
২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮
২ মে ১৯০৭

ওঁ

বোলপুর

বিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠি[১] পাঠাইতেছি। ইহা হইতে তাঁহার অভিপ্রায় ও তিনি কি কি কাজে কিরূপ ব্যাপৃত আছেন বুঝিবেন। পারিশ্রমিকের কথা পড়িয়া দেখিয়া যদি কিছু বাড়াইতে পারেন ত ভাল নতুবা ব্রাহ্মণ যাহা পাইবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বইগুলির যদি ইতিমধ্যে আনাইয়া দিতে পারেন তবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে বিলম্ব হইবে না।

আমিও আমার বিদ্যালয় দেড় মাসের জন্য বন্ধ করিয়া বিশ্রামের চেষ্টায় আছি। ইতিমধ্যে শিক্ষা-পরিষদের জন্য আমার সাহিত্য প্রবন্ধ[২] চতুর্থ কিস্তি লেখা হইয়াছে— পরিষদের ছুটি ফুরাইলে কোনো একদিন পড়িয়া আসিব— কিন্তু আপনাকে কি সভায় উপস্থিত দেখিতে পাইব ? না পাইলে ও আপনার চিরপ্রসন্ন মুখ না দেখিলে আমার পড়িয়া সুখ হইবে না।

রংপুর আমার প্রতি[৩] অত্যন্ত উপদ্রব সুরু করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইতেছে আপনারা এই চক্রান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। দৈবলক্ষণ কি আপনারা একেবারেই মানেন না? ইংরেজি শিখিয়া কি আপনাদের এই দশা হইল? এই বেলা আপনাদের রংপুরের শাখাটিকে সাবধান করিয়া দিন। দোহাই আপনাদের— আমারও আর সভা সমিতি এবং টানাটানি সহ্য হয় না। কি উপায় অবলম্বন করিলে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব তাহার একটা উপায় বলিয়া দিবেন।

আশা করি ভাল আছেন ও আনন্দে আছেন। ইতি ১৯শে বৈশাখ ১৩১৪।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯
১৮ মে ১৯০৭

ওঁ

[বোলপুর]

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন এখানে আসিয়াই তিনি শতপথ ব্রাহ্মণ যেখান যাহা পাওয়া সম্ভব আনাইয়া লইবেন। তাঁহার আসিতে আর প্রায় দুই সপ্তাহ আছে। তিনি একবার কাজে লাগিলে তাঁহার বিলম্ব বা শৈথিল্য দেখিতে পাইবেন না— এ সকল কাজে তাঁহার নিষ্ঠা আশ্চর্য্য। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০
২৬ জুন ১৯০৭

ওঁ

কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রাংশ আপনাকে পাঠাই যথাবিহিত ব্যবস্থা সত্বর করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি বলেন ত তাঁহাকে আমি এখনি কাজে লাগাইয়া দিব।

আমি এবার বরিশাল ও চট্টগ্রাম গিয়াছিলাম।[১] দুই জায়গাতেই সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদের জেলা হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। একটা প্রশ্নের তালিকার মত করিয়া দিলে জেলার নানা স্থান হইতে তাহার উত্তর তাঁহারা আনাইয়া লইতে পারেন। ভিন্ন জেলার উপভাষাগুলির তৌলন ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহারও বিবরণ চান। একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া এই কাজটা সারিয়া ফেলুন। মফস্বলের লোকদিগকে একবার ধরাইয়া দিলেই অতি সহজেই আপনারা সফলকাম হইবেন। দেরি করিবেন না। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ১১ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
২ জুলাই ১৯০৭

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় শতপথ সুরু করিয়া দিয়াছেন। এখানে সোসাইটির প্রকাশিত শতপথ তিন ভল্যুম আছে— সেই পর্য্যন্ত শেষ করিতেই অনেক দিন লাগিবে ইতিমধ্যে বাকি অংশ বাহির হইয়া যাওয়া সম্ভব— অথবা অন্যত্র হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। মোদ্দা কথা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় একবার যখন শতপথ লইয়া পড়িয়াছেন তখন উনি ফিরিবেন না।

আমি দীর্ঘকাল এখানে অনুপস্থিত ছিলাম। এখন যে প্রবন্ধ-পাঠের জন্য আবার কলিকাতা যাতায়াত করিব এমন সম্ভাবনা বিরল।[১] যদি কোনো জরুরি কাজে নাকে দড়ি দিয়া কলিকাতায় টানিয়া লইয়া যায় তবেই রাজধানীতে আমার শুভাগমন হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে প্রবন্ধ পাঠ করাও অসম্ভব নহে। আপনি একবার দয়া করিয়া এখানে পদার্পণ করিবেন আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা— সে কি একেবারেই সম্ভাব্যের বাহিরে? এখানে আসিলে মফস্বল পরিষদের সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে পারিবে। ইতি ১৭ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
২৯ জুলাই ১৯০৭

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র[১] পড়িয়া দেখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র বেদান্ত বিশারদ মহাশয়কে আমি জানি। ইনি কাশীতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন— সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অধিকার সাধারণ পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশি। লোকটি অত্যন্ত ভাল। ইঁহার সহিত পরিচয় হইলে আপনি খুসি হইবেন। ইতি ১৩ই শ্রাবণ ১৩১৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মফস্বল সাহিত্য পরিষদের শাখাগুলির জন্য একটা প্রশ্নাবলী তৈরি করার কি হইল?

১৩
[১৮ শ্রাবণ ১৩১৪

ওঁ

[*বোলপুর
৩রা আগস্ট ১৯০৭]

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

হঠাৎ কন্যার পীড়ার[১] সংবাদে বোলপুরে আসিতে হইয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদের সাহায্য-জন্য যে কয়খানি বইয়ের

দরকার তাহার তালিকা আপনাকে পাঠাইয়াছি। তাহার একটা ব্যবস্থা করিবেন। তিনি তাঁহার কাজে প্রবৃত্ত আছেন। আদর্শস্বরূপ আপনার অনুবাদখানি[১] দেখিবার জন্য তিনি উৎসুক আছেন— কবে পাওয়া যাইবে? অনেককাল আপনাদের কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। কেমন আছেন, কি করিতেছেন, কি বুঝিতেছেন, কি পরামর্শ এ সমস্তই মাঝে মাঝে জানিতে ইচ্ছা হয়। ইতি শনিবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
১১ জানুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয়নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রীমহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণের কতকটা অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। ছাপা আরম্ভ করাই তাঁহার ইচ্ছা। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইলে গ্রাহক ও অনুবাদক উভয়েরই উৎসাহ হয়। নতুবা এতবড় বৃহৎগ্রন্থ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করিয়া ছাপিতে দিলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে —সেটা ঠিক সঙ্গত হইবে না বলিয়া বোধ করি। এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আমাকে জানাইবেন। অন্ততঃ আগামী বৈশাখ হইতে যদি প্রকাশ আরম্ভ হয় তবে এখন হইতে গ্রাহকদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়া

রাখিতে পারেন। মাসে মাসে বা প্রতি তিন মাসে বাহির করিবার কোনো বাধা দেখি না।

আপনার শাশুড়ি ঠাকুরাণীর যেরূপ পীড়ার সংবাদ জানিতাম তাহাতে এ সময়ে আপনাকে এ পত্র লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। আশা করি আপনারা ভালই আছেন। ইতি ২৬শে পৌষ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনি ত বাসা বদল করিয়া বড় মুস্কিলেই ফেলিলেন। নূতন বাসার নাম ও নম্বর এ বয়সে আয়ত্ত করা কঠিন হইবে। যদি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র না পান ত নিশ্চয় জানিবেন আপনাকে ভুলি নাই কিন্তু আপনার বাসা ভুলিয়াছি।

কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে[১] আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানা পক্ষ হইতে গালিসংযুক্ত এত বিনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি যে কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম কন্‌ফারেন্স মঞ্চে যখন মাথায় কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে তখন তাহাকে হাত জোড় করিয়া বলিব

—বাবা, তুমি কোন্ পক্ষের লোক আমাকে বলিয়া যাও— তাহা হইলে আমি যে কোন্ দলে আছি সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। চৌকি কেহ মারে নাই এবং দুই দলেই আমাকে বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন সুতরাং আজও নিষ্পত্তি হইল না।

"ধ্বনিবিচার"[১] পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম —কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এই ভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে এই পন্থা ধরিয়া আলোচনাটিকে আরো অনেক শাখা প্রশাখায় বাহিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে করি। যথা, আপনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদ্যক্ষর সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন অন্তাক্ষরেও তাহা বিস্তারিতভাবে খাটাইয়া দেখা কর্ত্তব্য— কচ্‌কচ্ (চ), কট্‌কট্ (ট), কন্‌কন্ (ন), কর্‌কর্ (র), কল্‌কল্ (ল), কস্‌কস্ (স)— এই শব্দগুলির আদ্যক্ষর একই কিন্তু অন্তাক্ষরের পার্থক্যে কেন পৃথক্ অনুভূতি প্রকাশ হইতেছে তাহা আপনার প্রদর্শিত নিয়মানুসারে ব্যাখ্যা করা এক্ষণে সহজ হইয়াছে। আপনিও যে ইহার আলোচনা করেন নাই তাহা নহে। প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা বিশেষ মূর্ত্তি আছে এবং সেইজন্যই সেই সকল ধ্বনির সমবায়ে অনুভূতিমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্তত বাংলা ভাষায়

রচিত হইয়াছে এ তত্ত্বটি আপনার প্রবন্ধে সুন্দর করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

আমি চৈত্রমাসটা এখানে কাটাইয়া তবে কলিকাতার দিকে ফিরিব এইরূপ আমার অভিপ্রায়— বিধাতার অভিপ্রায় কি তাহা জানি না। আমাকে আপনি এখনো নূতন কর্ম্মে জুড়িয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছেন? আমার কি সেই বয়স? আমার বনগমনের কাল প্রায় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখন কেবল পাকা দাড়ি নাড়িয়া দূর হইতে পরামর্শ দেওয়াই আমাকে শোভা পাইবে— আর কি কাজ করিতে পারিব? এমন কি, কলমটাকেও বিসর্জ্জন দিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। যে হতভাগা ঠিক জায়গাটাতে থামিতে জানে না সে যে তালকানা— আশা করি আমার এ ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। ইতি ১১ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

২৪ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ

বোলপুর

সবিনয়নমস্কার নিবেদন—

বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আপনার মন হইতে কি দয়ামায়া সমস্ত দূর হইয়া গিয়াছে? আমার আপীল সম্পূর্ণ নামঞ্জুর— with cost? আপনি জানেন আমি আত্মরক্ষার জন্য যতদূরেই পলায়নের চেষ্টা করি না কেন, আপনারা ডাক দিলে[১] সাড়া না দিয়া থাকিতে

পারি না— সেই জন্যই আপনাদের দয়া প্রার্থনা করি। যেখানকার কাজ শেষ করিয়াছি সেখানে আপনারা আবার ফিরিয়া ডাকিলে আমি রক্ষা পাইব কি করিয়া? কর্ম্মফলও ত এক জায়গায় আসিয়া নিঃশেষিত হয় অন্তত তাহা এক পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে নূতন রূপে নূতন ক্রিয়া আরম্ভ করে। আমার কর্ম্মও তাহার ক্ষেত্রের লীলা শেষ করিয়া কি গোলাবাড়ির ইতিহাস সুরু করিতে পাইবে না? কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক করিব না— বিবাদ ত নয়ই। অনুরোধ রাখিবার চেষ্টা করিব— অর্থাৎ বাহিরের ব্যাঘাত যদি গুরুতর হইয়া না উঠে তবে বর্ত্তমান অবস্থায় আমার যেরূপ সাধ্য আছে সেইরূপই সাধন করিব। কিন্তু একটা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া আছে। এক ভদ্রলোক হুঙ্কার' নাম দিয়া কতকগুলি উগ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন ; আমার অনুমতি না লইয়াই তাহা আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি খুলনা ন্যাশনাল স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেছিলেন সেখানে রাজদূত তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে ধরিয়াছে। এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে খুলনায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে পুলিসের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি— সেখানকার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের পত্রও দেখিয়াছি হয় ত শীঘ্রই ডাক পড়িবে। এই টানাটানি আমার পক্ষে নিদারুণ— এদিকে আমার শরীরও এখন একেবারেই অপটু— যদি বোলপুর হইতে খুলনায় নাড়াচাড়া ঘটে তবে আমি যে সম্পূর্ণ আস্ত থাকিতে পারিব এমন আশা করিতে পারি না। এ অবস্থায় আমাকে আপনাদের জবাব দিতেই হইবে— নতুবা ডাক্তার কবিরাজে জবাব দিবে। সব কথাই ত শুনিয়া রাখিলেন —আমি ছোটখাট কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব কিন্তু যত্নে কৃতে যদি না ঘটিয়া উঠে তবে ক্ষমা করিবেন। সাহিত্য পরিষদের প্রতি আমার

অন্তরের শ্রদ্ধা আছে অতএব যদি কখনো সেবায় ত্রুটি ঘটে তবে তাহা ক্ষমতার অভাবে— তাহাতে সেবকের অপরাধ লইবেন না। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

[*১৬ ডিসেম্বর ১৯০৮]

ওঁ

[*বোলপুর]

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

যাহা বলিয়াছিলাম[1] লিখিয়া দিবার চেষ্টা করিব। রিপোর্টে ছাপিয়া বাহির করিবার মত কোনো কথা বলি নাই তবে রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে, যতটুকু মনে পড়ে লিখিয়া দিব।

কতকগুলি পুঁথি আছে— কবে নিশ্চিন্তমনে সেগুলি পরিষদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে?

আমার পিতৃদেবের ছবিখানি[2] যদি আমার বাড়িতে পাঠাইয়া দেন তবে মন সুস্থির হয়। ইতি ১লা পৌষ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
৯ মে ১৯০৯

ওঁ

কালকা
C/o. U. Ganguly Esq

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শব্দতত্ত্ব এবং অন্য গদ্য গ্রন্থগুলি[১] যথাসময়ে আপনার করকমলে গিয়া পৌঁছিবে। আমার প্রকাশকবর্গ যে আপনাকে ভুলিয়া আছেন ইহা আমি মনে করি নাই। আজই তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া দিলাম।

আমার শরীর বিশেষ একটু অসুস্থ হওয়ায় এই গ্রীষ্মের দিনে দূর পথ অতিবাহন করিয়া আজ কালকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যদি ভাল থাকি তবে কিছু দিন এখানে যাপন করিব।

অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই। আরো দীর্ঘকাল হয় ত দেখা হইবে না। স্মরণে রাখিবেন।

লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে।[২] তাঁহার একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যদি পাঠাইয়া দেন তবে বড় উপকৃত হইব। এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই।

ঈশ্বর আপনাকে নিরাময় করুন। ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩১৬।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯
১৪ জুলাই ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ
নদীয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

চিঠিখানি[১] পড়িয়া যাহা ভাল বুঝেন করিবেন। আমার খনিতে যত গভীর করিয়াই খনন করুন খনিজ পদার্থতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন না— আমার কাব্যে কেবল একটিমাত্র দুর্ভাগা কবিতায় খনিজ বস্তুর সংস্রব আছে— সে ঐ সোনার তরী— কিন্তু সে ত মগ্নপ্রায়।[২] অতএব পত্রলেখকটিকে আপনাদের বৈজ্ঞানিক বাণীভাণ্ডাগারে ডাকিয়া লইবেন।

সম্প্রতি পদ্মায় বেড়াইতে আসিয়াছি। অনেকদিন আপনার কোনো সন্ধান পাই নাই। আপনাকে আমার বইগুলি পাঠাইবার জন্য প্রকাশককে তাগিদ দিয়াছিলাম— তাহাতে কোনো ফল হইয়াছে কি না সংবাদ পাই নাই।[৩] আপনার শরীর মাঝে খারাপ হইয়াছিল। এখন ভাল আছেন ত? ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিকানায় নম্বর সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আছে। যেখানে সংখ্যার কোনো সংস্রব আছে সেখানে আমি বৈদান্তিক বলিলেই হয়— অর্থাৎ একের উর্দ্ধেই [ঊর্দ্ধেই] আমার কাছে অবিদ্যা।

২০

[*কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৯]

ওঁ

[*কলিকাতা
১৭-৯-০৯]

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে নিশ্চয় সাহিত্য পরিষদে আপনার প্রবন্ধ শুনিতে যাইব। অপরাহ্ণ বলিতে অনেকটা সময় বুঝায়— ঘণ্টাটা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ইতি শুক্রবার [১ আশ্বিন ১৩১৬]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১
১৩ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

লালগোলার রাজাবাহাদুর আমার গৃহে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হইতেছে।[১] তাঁহার প্রতি আমার

সুগভীর শ্রদ্ধা আছে এবং আমার ঘরে তাঁহার শুভাগমনকে আমি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করি। এবারে যে সুযোগ হারাইলাম বারান্তরে তাহা লাভ করিবার আশা মনে রহিল।

সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র হইয়া বরোদায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নহে[১] কিন্তু পাত্রটি যদি একেবারে বাণীশূন্য হয় তবে পাত্রের মুখরক্ষা হইবে কিসের জোরে। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা এ পর্য্যন্ত আমাকে দূরে রাখিয়াই চলিয়াছেন— প্রবাসে সভাসঙ্কটে কে আমাকে রক্ষা করিবে? যদি চাণক্যের পরামর্শ অনুসারে চুপ করিয়া থাকা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে লম্বশাটপটের আয়োজন করিয়া যাত্রা করিতে পারি কিন্তু তেমন অবিচলিত নিঃশব্দতার সহিত আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করিলে আপনারা কি নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিতে পারিবেন? নিশ্চয়ই সেখানকার যজ্ঞকর্ত্তারা সাহিত্য পরিষদের ইতিবৃত্ত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবেন তখন কিরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা আমি আমার মূঢ়তা গোপন করিব সে পরামর্শ আমাকে দিবেন। যদি আপনারা কেহ সাহিত্য পরিষদের বক্তব্য আমাকে লিখিয়া দেন তবে সজীব গ্রামোফোনের মত আমি তাহা আবৃত্তি করিয়া আসিবার ভার লইতে পারি। আপনি বা হীরেন্দ্রবাবু যদি যান তবে আমি আপনাদের পশ্চাতে থাকিয়া কেবলমাত্র হাত পা নাড়িয়া কাজ চালাইবার ভরসা রাখি। ইতি ২৭শে আশ্বিন ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২
[১৫ অক্টোবর ১৯০৯]

ওঁ

[শিলাইদহ[১]]

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

রাজি।

কিন্তু আমাকে নিরস্ত্র নিঃসহায়ভাবে পাঠানর জন্য দায়ী আপনারাই। আগামীকল্য সায়াহ্লে [সায়াহ্নে] কলিকাতায় পৌঁছিব। রবিবার প্রাতে আপনার সঙ্গে পরামর্শের সময় থাকিবে কি? একটু সাহস দিবেন। কবে যাত্রা করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন। ইতি শুক্রবার [২৯ আশ্বিন ১৩১৬]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩
২৫ জানুযাবি ১৯১০

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণা অসামান্য। সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তব্য ইহাঁর আবিষ্কারগুলি বাংলাভাষায় প্রচার করা। আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার

উৎসাহের অভাব হইবে না এইজন্য ভীমবাবুকে আপনার কাছে পাঠাইবেন [পাঠাইলাম] — আলাপ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

এতদিন চিনির কারখানা[১] আপনার মনোরাজ্যেই ছিল, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু সেটাকে দেহক্ষেত্রে বিস্তৃত করলেন কেন? ওটা একেবারে রহিত করা কি চলে না? কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় দীর্ঘকাল বিশ্রাম করা কি অসম্ভব? কলকাতার জাঁতার মধ্যে আর নিজেকে দলিত করবেন না— বেরিয়ে আসবার হুকুম এসেছে— এখন বিশ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে মহত্তর কাজে বসে যান। এ কথা আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই বলছি— আমার এ জায়গায় আপনাকে পাব এমন লোভ আমার থাকতে পারে কিন্তু আশা নেই অতএব নিরাসক্ত চিত্তেই আপনার মঙ্গল কামনা করচি।

সাহিত্য পরিষৎ ক্রমশঃ এমন সকল লোকের দ্বারা আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়চে যাঁরা খুব ভাল লোক, বুদ্ধিমান লোক, কৃতী

এবং সামর্থ্যশালী কিন্তু তাঁরা সত্যভাবে সারস্বত নন— এতে করেই পরিষদের সাত্ত্বিকতার লাঘব হয়ে আস্‌চে সুতরাং নিত্যতার গভীরতম মূলে আঘাত পড়চে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে দারিদ্র্যটা কোনোমতেই সাংঘাতিক নয় কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনে যখন বড় বড় লোহার চাকাওয়ালা বহু মূল্যবান দমকল বসে তখন জয়েণ্টষ্টক কম্পানি খুসী হয়ে ওঠে কিন্তু দেবীর চরণরেণু প্রত্যাশী মধুকরের দল প্রমাদ গণ্‌তে থাকে। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই রাজসিকতার স্থূলহস্তাবলেপটা নূতন এইজন্যে তার প্রতাপটা অপরিমিত এবং কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে সাহস করে না। পূর্ব্বকালে নবরত্ন সভায় রাজা একজনমাত্র ছিলেন সুতরাং নবরত্নকে আচ্ছন্ন করতে পারতেন না; এখন রাজা এত রকম বেরকম, তাদের সংখ্যা এত বেশি, তাদের ফরমাস এত বিচিত্র, তাদের মেজাজ এত অনিশ্চিত, তাদের ঔদার্য্যের এত অভাব অথচ দৌরাত্ম্যের এতই প্রাদুর্ভাব যে আসল জিনিষকে আর দেখবার জো থাকে না। আসল কথা কোনো জিনিষকে চালাতে হলে তার সাম্‌নেকার পথটা ত ছেড়ে দিতে হয়— আমরা কিছুতেই কাউকেই পথ ছাড়তে পারি নে —ঘোড়া ও সারথীর [সারথির] সাম্‌নে সবাই মিলে জড় হয়ে আমরা এমনি হুড়োহুড়ি করতে থাকি যে মনে করি তাতেই বুঝি অগ্রসর হবার খুব সাহায্য হচ্চে। অথচ উপায় ভেবে পাই নে —আজকাল সকল কাজেই মালমসলা এত বেশি গুরুতর হয়ে পড়েছে যে, তার খাতিরে সকলেরই কাছে আসল জিনিষটাকে আগাম বন্ধক রেখে কাজ সারতে হয়— সে বন্ধক আর উদ্ধার হয় না— চিরকাল বিকিয়ে থাক্‌তে হয়। বাড়ি গড়বার জন্যে যে রাজমিস্ত্রিকে ডাকা যায় অবশেষে সেই বাড়িটি দখল করে ধূমধাম

করে বাস করে আর গৃহস্থ চিরদিন দ্বারের বাইরে বসে গৃহকর্ত্তার ভাণ করে কাষ্ঠহাসি হেসে রৌদ্রে জলে লোককে অভ্যর্থনা করবার ভার নিয়ে থাকে।

বিদ্যালয় বন্ধ হবে ১৭ই তারিখে। বন্ধ হবার পূর্ব্বেই ছেলেরা একটা কিছু অভিনয় করবে[২]— আমাকে ত নিশ্চয়ই ছাড়বে না— সেই কথা ভাবচি। আপনার সভায়[৩] উপস্থিত থাকার প্রলোভন আমার খুবই আছে— যাবার চেষ্টা মনে জেগে থাক্‌বে নিশ্চয় জান্‌বেন— কিন্তু একথাও মনে রাখ্‌বেন আমার এইসব ছেলেদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল— এরা আমার সংসার পক্ষের ছেলে নয়, দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে— সেইজন্যে এদের জোর বেশি— এরা চেপে ধরলেই আমার পথ বন্ধ। আপনাকে আমাদের শারদোৎসবে টেনে আনার আশা করা কি একেবারেই দুরাশা? কিছুতেই বিচলিত হবেন না? ইতি ৩২শে ভাদ্র ১৩১৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫
অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

কুষ্টিয়া

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

পাব্লিকের সেবাকার্য্য হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে কতদিন থেকে চেষ্টা করচি— দূরে থাকি, চুপচাপ করে থাকি, কারো কোনো কথায়

থাকি নে, যেন মরেই গেছি এমনিতর ভান করে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি কিন্তু তবু আপনারা দয়া করেন না কেন? আপনারা কি এই কথাটাই জানিয়ে দিতে চান যে, সত্যি সত্যি না মরলে উপায় নেই ? এ রকম আভাস ইঙ্গিত প্রয়োগ করা কি বন্ধুর কাজ? সংসার এবং বিষয়কর্ম্ম থেকে একেবারে সরে পড়েছি— সুতরাং যে দাঁড় আশ্রয় করে আমি পাব্লিকের চিড়িয়াখানায় ঝুল্‌তে পারতুম সে দাঁড় ভেঙেছি— এখন ব্যাধের মত আমাকে আর তাড়া করে বেড়াবেন না। আপনাদের অনুরোধ বরাবর সাধ্যমত পালন করা আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেইজন্যে এখনো আপনাদের আহ্বান এড়ানো আমার পক্ষে সহজ নয়— সেই কারণেই আপনাদের দিক থেকেই দয়া হওয়া উচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচান। আমি যেটুকু পারি কাজ করচি এবং করব, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আমি আর মিশ্‌তে পারব না। গোলে হরিবোল্ দেওয়াই ভিড়ের প্রধান কাজ, এখন আমার সে রকম উদ্যম, ইচ্ছা, এবং গলার জোর নেই। আপনাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে সম্পূর্ণসহানুভূতি আছে— রজনী সেন মহাশয় যে দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন অবসান করেছেন আমি তার পরিচয়ও পেয়েছি এবং তাঁর আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখে মুগ্ধও হয়েছি— এইজন্যে আপনাদের চেষ্টায় তাঁর দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের ভারলাঘব হয় এ আমার একান্ত মনের ইচ্ছা— কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি সেখানে আমাকে আর আহ্বান করবেন না। এক পা বাড়ালেই দ্বিতীয় পা বাড়াতে হয়, শেষ কালে কেউ কোনোমতেই দোহাই মানে না, নজির দেখায়। আপনি যদি পীড়াপীড়ি করেন তবে অবশ্যই

আমাকে রাজি হতে হবে— কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার তরফের কথাটা একবার আপনার সাম্‌নে উপস্থিত করলুম— আমার প্রতি যদি দয়া না হয় তবে আমিই হার মান্‌ব।

আমি কিছু দিনের জন্য শিলাইদহে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছি। আমার নামের সহযোগে "কুষ্টিয়া" এই ঠিকানা দিলেই আমি চিঠি পাব। ইতি তারিখ ঠিক জানা নেই।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬
৭ জানুয়ারি ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মিত্র[১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Sc. ও আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের M.S.। ইনি গবর্মেণ্টের সাহায্যে সেখানে কৃষিতত্ত্ব শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে অনেকগুলি ছাত্র কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা (লইয়া) দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। হরিপ্রসাদ বাবুর নিকট আমি প্রস্তাব করিয়াছি, যে সাহিত্যপরিষৎকে কেন্দ্রস্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সকলে কৃষিতত্ত্ব আলোচনার একটি সভা স্থাপন করুন। হরিপ্রসাদবাবু এই

প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। আপনারা যদি ইঁহাদিগকে আহ্বান করেন ও আশ্রয় দেন তবে ইঁহারা বাংলা সাহিত্যে কৃষিবিদ্যার অবতারণা করিতে পারেন। হরিপ্রসাদবাবু এই পত্র লইয়া আপনার নিকট যাইতেছেন— যদি আপনাদের সম্মতি পান তবে ইঁহার বন্ধুদিগকে আপনার পতাকাতলে তিনি একত্র সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিবেন। ইঁহার সহিত নিয়মাদি আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

আপনি আশা করি আমাকে আপনাদের চিত্তলোক হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন নাই— আমি অন্তরালে আছি কিন্তু উদাসীন নহি— নানা কাজ হইতে নিষ্কৃতি না লইলে কোনো কাজই হয় না বলিয়া দূরে আসিয়াছি— কিন্তু তথাপি এখনো আমাকে আপনাদের সেবক বলিয়াই জানিবেন— তবে আগে ছিলাম বাজার সরকার, কথায় কথায় সকল কাজেই হাটে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে হইত এখন শেষ দশায় কিঞ্চিৎ পদোন্নতি হইয়াছে— কিন্তু বেতন সম্বন্ধে কিছুই প্রভেদ হয় নাই— বাঁধা খোরাক মেলে না, চরিয়া খাই, কাঁটাও জোটে ঘাসও মেলে— সেজন্য কোনো আক্ষেপ করিতে চাই না। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭
২৯ জানুয়ারি ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক মহাশয় সমীপে
বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী বর্ষে পরিষদের সভাপতিপদে শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু[১] মহাশয়কে বরণ করিবার প্রস্তাব আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আমার এই প্রস্তাব দয়া করিয়া যথাসময়ে সভাস্থলে জ্ঞাপন করিবেন।

আমার অপর প্রস্তাব এই যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়[২] মহাশয়কে পরিষদের একতম সহকারী সভাপতি পদে আহ্বান করা হয়। ইতি ১৫ই মাঘ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনাদের কালেজে সাহিত্য অধ্যাপকের প্রয়োজন আছে কাগজে দেখিলাম। ভয় করিবেন না— আমি উক্ত পদের প্রার্থী

নহি। কিন্তু আমার পরিচিত একটি ভদ্রলোক এই পদের জন্য উৎসুক আছেন। তিনি আমার পরিচিত এই মাত্র তাঁহার গুণ নহে। তিনি যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকটির নাম বসন্তবিহারী চন্দ্র— এম, এ। ইংরাজি সাহিত্য বেশ আলোচনা করিয়াছেন— বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রবেশ আছে—(অর্থাৎ আমার লেখাগুলোও পড়িয়াছেন এবং তাহার নিন্দা করেন না)— ইঁহাকে আমাদের বিদ্যালয়ে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু constipation-এর ধাত থাকায় এই কষা জায়গা তাঁহার সহিল না। দুঃখের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিতে হইয়াছে। লোকটি অত্যন্ত সজ্জন— সেইজন্যই আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলাম— আমার বিশ্বাস আপনারা যদি ইঁহাকে গ্রহণ করেন তবে অনুতাপ করিতে হইবে না। আপনার নম্বরটা কি আমি ঠিক লিখি? ১২ ত বটে? দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে মিলাইয়া ঐ নম্বরটি আমি মনে রাখি। পূর্ব্বে ৬ ছিলেন— এখন তাহার ডব্‌ল হইয়াছেন ইহাও মনে রাখিবার উপায়। পরিষৎ সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইয়াছে— দেখা হইলে আপনার সঙ্গে কথা হইবে। ইতি ৩রা ফাল্গুন ১৩১৭

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯
৪ মে ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের দেশে জম্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে কথাটা যে অমূলক নহে তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার বন্ধু তাঁহাদের প্রীতি আমি লাভ করিয়াছি সেই আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনার পরম সফলতা। কিন্তু সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের মত পরিহার করিতে বলিয়াছেন— আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধবয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন— আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন সে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব— তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব। কিন্তু সাধারণ জনসভা যে মানের মুকুট আমার মাথায় পরাইতে চাহেন তাহার ভারবহন করিতে গিয়া আমার মাথা হেঁট হইবে। আমি জানি আপনি

আমাকে ভালবাসেন সেইজন্য আপনার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, এই জনসভার স্নেহালিঙ্গন হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহ তাঁহারা পরিষদের সভ্য। আপনাদের এই কবিসম্বর্দ্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পাঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহাররূপে লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষৎকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার একপঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম— আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০
৫ মে ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। লেখক আমাকে জানাইয়াছেন যে, আপনাদিগকে আশু সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া আমার ঔদার্য্য প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে— অথচ আমার পূজাটাও একেবারে মারা না যায় এমন সান্ত্বনাজনক ব্যবস্থারও অভাব নাই।

আপনি জানেন আমি সংসারের জনতা হইতে সরিয়া আসিয়াছি আজ আমাকে এই গ্লানির মধ্যে কেন টানিয়া আনিলেন? অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের সভায় আমি উপস্থিত থাকিব না বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম— কিন্তু আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, একথা জানেন আত্মহত্যা করিলেই যে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা নহে। আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মুক্তি হইবে না। এই জন্য আপনাদের কাছে সানুনয়ে আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। আমার সম্মানে এই যে বাধা পড়িয়াছে ইহাতে আমি বুঝিয়াছি ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার কর্ম্ম অবসানে তিনি আমার মাথা নত করিয়া দিন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই ছুটি লইব, আমি তাঁহার কাছ

হইতে মজুরি চুকাইয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইব না। ইতি ২২শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

১০ মে ১৯১১

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আমাদের অধ্যাপক হরিচরণ একখানি বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত[১] হইয়াছেন— আপনারা যাহা চান ইনি তাহাই করিয়া তুলিতেছেন। ব্যাপারখানি প্রকাণ্ড হইবে। একবার দেখিয়া দিবেন। যদি পছন্দ হয় তবে এটা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। বাংলা সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয় না এমন শব্দও ইহাতে স্থান পাইয়াছে সেইটে আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের উপর এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। ইতি ২৭শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ বসন্তবাবুর আর একখানি পত্র পাইয়াছি। জগদীশের নিকট হইতে ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি কোনো কথাই আর কহিব না।

৩২
২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্রস্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ ত অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেন না এ আমার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্ব্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে— আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহুযুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে— নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করিতে যাই! আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে সে এই জল স্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ— সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন? পাছে লোকে আমাকে উপহাস করে? আমি যদি কালো আলপাকার চাপকানপরা আপিসের কেরাণীজীবনের পরিচয় দিই তবে লোকে সেটাকে একটা সত্যপদার্থ

বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে থাকে— আর আমার যে পরিচয়টা জগৎজোড়া পরিচয় সেটাতে যদি ট্র্যামগাড়ির যাত্রী ও সীজ্‌ন্‌ টিকিটওয়লাদের হাসি পায় তবে সে হাসি আমাকে হজম করিতেই হইবে। দেখুন, আমি আমার বোটের খোলা জানলায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক রঙের মাটির উপরে যখন সূর্য্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিক্‌প্রান্ত পর্য্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভমুহূর্ত্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্টসুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জা বোধ করি না। আমি মানুষ এইজন্যই আমি ধূলামাটিজল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই— ইহাই আমার গৌরব— আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে— আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইজন্যই আমার রক্তুতরঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গের তালটাকে চিনিতে পারিয়া নৃত্য করে কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গ আমাকে চেনে না— এইজন্য আমার প্রাণের সুখ গাছপালার প্রাণের সুখের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে কিন্তু গাছপালা আমাকে চেনে না। আমার স্মৃতি তাহাদের মধ্যে নাই। ইহাতে কি হাসিবার কিছু আছে? আপনার Execution of dutyতে গায়ের

জোরে আমি বাধা দিব না কিন্তু নালিশ জানাইয়া রাখিলাম। ইতি
১৭ই ফাল্গুন ১৩১৮

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩
১৭ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয় বন্ধু

সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে, আমি ত মনে মনে ওঝা ডাকিতেছি— আপনাদের আনন্দে আমি সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছি না। আপনি হয় ত ভাবিবেন এটা আমার অত্যুক্তি হইল কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার জীবন কিরূপ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

"কোলাহল ত বারণ হল
এবার কথা কানে কানে"—

এই কবিতাটি দিয়া আমি গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা সুরু করিয়াছিলাম[১] বারণটা যে কতদূর সফল হইল তাহা দেখিতেই পাইতেছেন।

আপনি আছেন কেমন সে কথা লেখেন নাই। শীঘ্রই কলিকাতায় একবার যাইতে হইবে তখন দেখা করিব। ইতি ১ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪
২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

কোনো ঠিকানা না রাখিয়া কিছুকালের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলাম।[১] ফিরিয়া আসিয়া আপনার চিঠিখানি পাইলাম। দুই একদিনের মধ্যেই আবার নিরুদ্দেশের মধ্যে ডুব মারিবার চেষ্টায় আছি। শিকারী যতই গুলি চালাইতে থাকে হাঁস তেমনি যেমন ঘন ঘন জলে কেবলি ডুব মারে আমার সেই দশা হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ আমি হঠাৎ দূর দূরান্তরের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছি তাই ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইবার আয়োজন করিতেছি। চিঠিতে কাহাকেও সাড়া দেওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছি— কিন্তু আপনার ডাকে চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত কঠিন বলিয়াই মৌনব্রত ভঙ্গ করিলাম। কিন্তু আমি উড়ুক্ষু— ডানা মেলিয়াছি— অতি শীঘ্রই আমি নাগালের বাহিরে পৌঁছিব— এমন কি, সেখানে গোলাগুলিও পৌঁছিবে না।

আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয় —আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর। আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলে হয়ত মঙ্গলই হয় —কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ত বাধা নাই। এত কথা যে বলিতেছি তার কারণ এই যে, প্রতিকূলতা চারিদিকেই তর্জ্জনী তুলিয়াছে, বুঝিতেছি যে দেশের লোককে আমি ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে —সেটা যদি দোষের হয় তবে তাহা আমার বুদ্ধিরই দোষ, হৃদয়ের দোষ নহে— আপনি জানেন আমি দেশের লোককে ভালই বাসি —সেই জন্যই আমি তাহাদের ভাল চাই— ভাল কথা চাই না। এই দুর্য্যোগের দিনে এই আশাটিকে সম্বল রাখিতে চাই যে বন্ধুরা যদি বা আমার মঙ্গলের আশা ত্যাগ করিয়া থাকেন তবু হৃদয় হইতে আমাকে ত্যাগ করেন নাই। ইতি ১২ পৌষ ১৩২১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫
১১ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার স্নিগ্ধ পত্রখানি পাইয়া আনন্দ পাইলাম। আমার শেষ চিঠিখানির সুরের মধ্যে কিছু রুদ্ররসের আমেজ দিয়াছিল না কি?

বোধ হয় সেটা করুণ রসেরই ছদ্মবেশ মাত্র— সূর্য্যাস্তকালেরমেঘের মত, বাহিরে দেখিতে আগুনের রং কিন্তু একটু আঁচড় কাটিলেই অশ্রুবাষ্প বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কিছু দীর্ঘকালের মত সমুদ্র পাড়ি[১] দিবার আয়োজন করিতেছি বোধ করি তাই মনের ভিতরটা কিছু আর্দ্র অবস্থায় আছে— দেশকে গভীরভাবে ভালবাসি বলিয়াই এইরকম সময়টায় অনেকদিনের রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে অভিমানের কথাগুলো কিছু আতপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাই আপনার চিঠিতে নিজেকে বোধ করি ঠিক সাম্‌লাইতে পারি নাই। সংযত হইবার বয়স হইয়াছে —অন্যকে উপদেশ দিবার বেলাতেও পাকাচুল কাজে লাগে কিন্তু নিজের দিকে তাকাইয়া দেখি কবির কোষ্ঠীতে বয়স আর কিছুতেই এগোইতে চায় না— শরীরটা শেষের পথে খুব ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু স্বভাবটা সেই যে পঁচিশের কাছে আসিয়া ঠেকিয়া গেছে কিছুতেই আর প্রমোশন পাইতেছে না। আমি জানিতাম গণিতের বুদ্ধি আমারই নাই কিন্তু আমার বিধাতারও যে আমারই দশা প্রতিদিন তাহা ধরা পড়িতেছে— আমার ভিতরকার বয়সটার সম্বন্ধে কেবলি তিনি ঠিকে ভুল করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে আমার পাকাচুলের সঙ্গে আমার আচরণের বড়ই বেমানান হইতেছে। সত্য কথা যদি বলিতে হয় আপনার মধ্যেও একদিকের অঙ্ক অন্যদিকে চালিয়া দেওয়া হইয়াছে —অনেক কাল হইতেই আপনার অন্তরের দিক হইতে হরণ করিয়া আপনার পাকাচুলের দিকে পূরণ করা চলিতেছে, এ ভুলটা আজ পর্য্যন্ত সংশোধন করা হইল না। কিন্তু এখন প্রার্থনা করিবার সময় হইয়াছে আপনার শরীরের দিকটায় ভুল অঙ্কের ভার আর যেন চাপানো না হয়। ইতি ২৭ পৌষ ১৩২১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধবার রাত্রে কলিকাতায় যাইব— আপনার পটলডাঙ্গার বাসার সমস্যা ভেদ করিতে পারিব না। আমি লিভিংষ্টোন্ নই আমি যৎসামান্য কবি মাত্র, ইহা মনে রাখিবেন।

৩৬

২৭ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।[১] আপনার ভাই[২] আমার কিছু কবিতা হরণ করিবার চেষ্টায় আছেন আপনার পত্রে এই খবর পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণ অভয় দিতেছি হরণের প্রয়োজন নাই, আহরণ করিবেন। দণ্ড যদি কেহ দেয় পাঠকেরা দিতে পারে, কবি দিবে না। ইতি ১৩ মাঘ ১৩২১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

ব্যোমকেশের মৃত্যুসংবাদ[১] পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আপনারও চিঠি পাইলাম।

আমার শরীর ক্লান্ত অথচ মন ব্যস্ত হইয়া আছে। কিছুকাল

হইতে শারীরিক অবসাদটাকে বহিয়া লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া কাজ চালাইতেছিলাম। কিন্তু এমন করিয়া বেশি দিন চলে না। তাই দূরে পালাইবার আলোচনা করিতেছি। য়ুরোপের পথ বন্ধ তাই জাপান দিয়া আমেরিকায় যাইবার উদ্যোগ চলিতেছে। দীর্ঘকালের জন্য যখন সুদূরে যাইবার ব্যবস্থা করা যায় তখন চারিদিকটা কেমন ঝাপ্‌সা হইয়া উঠে, মনে বাঁধন আলগা হইয়া যায়— কতকটা মৃত্যুকালের মত। তাই এখন যাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই মন দিতে পারিতেছি না। সংসার এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজন চুকাইয়া যা-কিছু উদ্বৃত্ত আছে তাহা পরপারের সদ্গতির জন্য নিঃশেষে প্রয়োগ করিতে হইতেছে--বস্তুত আমি এখন তীরস্থ— তাই স্থির করিয়া কিছুতে মন দিতে পারিতেছি না। ইতিমধ্যে একটু সুস্থ হইলেই আপনার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব। ইতি মঙ্গলবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮
৮ চৈত্র ১৩২৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২১ মার্চ্চ ১৯১৭

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

দেশে ফিরিয়া আসিয়াই[১] আপনার প্রীতিসুধাপূর্ণ পত্রখানি আমার কাছে মরুভূমির উৎসধারার মত লাগিল। আপনাদের মত

সুহৃজ্জনের কাছ হইতে চিরদিন যে সমাদর পাইয়া আসিয়াছি নানা দুর্য্যোগের মধ্যেও আজও তাহার কোনো ক্ষতি হয় নাই ইহা যে আমার পক্ষে কি গভীর সান্ত্বনা তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

বিদেশে আপনার কথা বারবার স্মরণ করিয়াছি। কলিকাতায় দিন দুয়েক থাকিবার অবকাশ পাইলেই নিশ্চয়ই আপনার দরবারে গিয়া হাজির হইতাম। সম্প্রতি এখানে আমার বালকদের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে এখান হইতে বাহির হইবার সম্ভাবনা বিরল। সে সময়ে কি কলিকাতায় থাকিবেন। অনেক গল্প করিবার বিষয় জমিয়াছে— সেগুলো হাতে হাতে খোলসা করিতে পারিলে ভাল হয় নহিলে কালক্রমে লোকসান হইতে পারে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯
১৮ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

দুই একদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— মুহূর্ত্ত কালের জন্য অবসর ছিল না তাই এবার দেখা হইল না।

গেল বছর কিছুকাল ধরিয়া যে বেগ খরচ করিতে হইয়াছিল তাহা আমার মূলধনের চেয়ে অনেক বেশি। এখন তাই দেনা শোধ

করিতে হইতেছে। অবস্থাটা অনেকটা দেউলিয়ার মত। ব্যয় এত সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে যে, নিত্য প্রয়োজনেও টানাটানি পড়িয়াছে। কলমটা অর্জ্জুনের শেষদশার গাণ্ডীবটার মতই ভারী হইয়া উঠিল। তাই খাতাপত্র বন্ধ করিয়া চুপচাপ পড়িয়া আছি। অতএব আশা করিতেছি এখন অন্তত কিছুকালের জন্য বাংলা সাহিত্যের "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো।"

ইতিমধ্যে কথা অনেক জমা হইয়া আছে। সেগুলা হাটের মধ্যে বলিয়া হট্টগোল বাড়াইবার উৎসাহ আমার আর নাই। তাই মাঝে মাঝে বন্ধুদের বৈঠকের জন্য মন উতলা হয়। সুযোগ যদি ঘটে তবে প্রাণটা খোলসা করিয়া লইব। কিন্তু দেখিতেছি পর্দ্দা নামিয়া আসিতেছে; নাটমঞ্চে আর মন টেঁকে না। ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০
১০ মে ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

কয়দিন অতিথি অভ্যাগতদিগকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম তাই পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

ভোরবেলা হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক মোট

বহিয়াছি এখন অপরাহ্নে বোঝা নামাইবার সময় হইয়াছ। আর ত মন লাগে না। কাজের বেলাটা এখন পিছনে পড়িয়া গেছে এই জন্যই ঐ দিক পানে এখন ছায়া পড়িবে। পঞ্চাশের উপরেও যাহাদের বয়স তাহাদেরও যদি recruit করিতে বসেন তাহা হইলে বুঝিব আপনাদের হারের পালা। আপনি সারথি, আপনার প্রবীণতা অশোভন নয় কিন্তু রথীগুলি নবীন দেখিয়াই বাছিতে হইবে।

শাস্ত্রীমহাশয়কে বাংলা শব্দতত্ত্ব বিচারে[1] বসাইয়া দিয়াছি। তাঁহার কাছ হইতে লেখা আদায়ের চেষ্টা করিলে খুব সম্ভব নিরাশ হইবেন না। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১
২৩ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

VASANTAMAHAL,
MYSORE

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমি ভ্রমণে বাহির হইয়াছি[1]— তাই আপনার চিঠি পাইতে বিলম্ব হইল। আপনি যে দুঃখ পাইয়াছেন[2] আমিও সদ্য সেই দুঃখ দহন হইতে বাহির হইয়াছি। আমার কন্যাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদিন রোগের কষ্টে কাতর হইতে দেখিয়াছি তাহার কোনো প্রতিকার করিতে পারি নাই— অথচ পিতার উপর শেষ পর্য্যন্ত তাহার নির্ভর

ছিল। যেখানে কল্যাণের কামনা আছে সেখানে কল্যাণের শক্তি আছে এ বিশ্বাস মানুষ কিছুতে ছাড়িতে পারে না। তাই ব্যর্থতার বেদনার মধ্যেও স্নেহের সম্বন্ধ উৎসুক হইয়া আছে। সেই সম্বন্ধ যখন চরম আঘাত পায় তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে এমন কোন্ বাণী আছে? আমি কেবল এই কথা ভাবি যে, যখন সত্যের দুই বিপরীত মূর্ত্তি দেখি, একদিকে স্নেহ, একদিকে বিনাশ; একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে সংহার, তখন কোন্‌টার উপর জোর দিব? হ্যাঁ এবং না, এ দুটাই ত এ-পিঠ ও-পিঠ হইয়া থাকে; কিন্তু দুই পিঠের মধ্যে কোন্‌টা হাঁ-য়ের পিঠ? ছবির দিক দিয়াই পটকে দেখিব, না উল্টাদিক দিয়া? কোন্‌টা হাঁ-য়ের পিঠ, ছবির পিঠ, আমি তাহা একরকম ঠিক করিয়া রাখিয়াছি— সেই থেকেই প্রাণমন দিয়া জীবনের সমস্ত তপস্যা দিয়া আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। এমন কিছু দিয়া সমস্ত হৃদয়মন ভরিতে চাই যাহাতে "মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"। যাহা যায় সে ক্ষতি ত মানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি সত্যের আশ্রয়ভূমি পর্য্যন্ত যায় তবে এত বড় ক্ষতি বহন করিবার শক্তি জগতে আছে কোথায়? কিন্তু স্পষ্টই ত দেখি, ক্ষতি বহন করিয়াই না-কে পিঠের দিকে ফেলিয়াই হাঁ আপনাকে নিত্য প্রকাশ করিতেছে। তাই দুঃখশোকের মধ্যে এই প্রার্থনাই আমি ধরিয়া আছি, "রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" ইতি ৯ মাঘ ১৩২৫

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদুনাথ সরকার -লিখিত পত্র

যদুনাথ সরকার -লিখিত প্রবন্ধ : The New Leaven in India

স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম

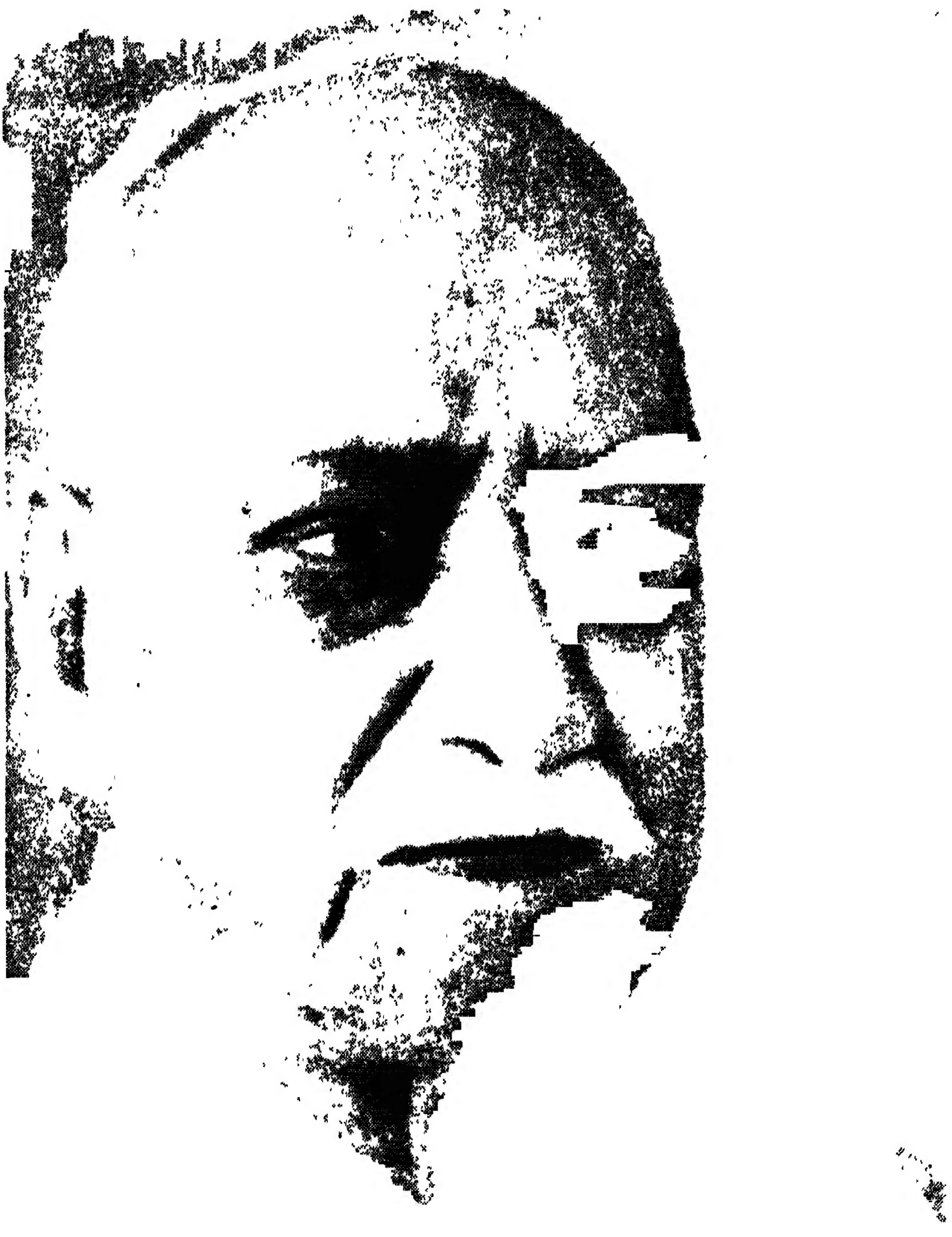

যদুনাথ সরকার

১৮৭০ – ১৯৫৮

Sarkar-abas
Darjiling 31st May 1922

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি মে ও জুন মাসের জন্য এখানে আসিয়াছি সুতরাং আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠের রেজিস্টারি পত্র কটক ঘুরিয়া এখানে পৌঁছিতে দেরি হইল। বিশ্বভারতীর গবর্নিং বডির সদস্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও দুইটি গুরুতর কারণে ঐ পদ অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, তজ্জন্য মার্জনা করিবেন।

প্রথমতঃ আমি এখন দূরে থাকি, এবং আর কয়েক বৎসর পরে পেন্সন লইয়া নিম্ন বঙ্গে বাস না করিবার ইচ্ছা। সুতরাং শান্তিনিকেতনের কার্যের তত্ত্বাবধান করা, নূতন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব। বৎসরে একবার মাত্র বার্ষিক অধিবেশনে দেখা দিলে কর্তব্য পালন হইবে না। যেখানে কাজ করিতে পারিব না, সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা আমি নিজের পক্ষে লজ্জাকর ব্যবহার এবং ঐ সংস্থানের প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করি। এই যেমন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের ও দূরের সদস্য এত অধিক যে ৩০ জন সদস্যের মধ্যে অনেক অধিবেশনে ৭ জনও জোটে না, অধিবেশন পণ্ড হয়। এলাহাবাদের

যদুনাথের এই পত্রটি এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পত্র একসঙ্গে যদুনাথ 'বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে' প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য প্রবাসী চৈত্র, ১৩৫২। কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশের সময় যদুনাথ তাঁর পত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

উকীলগণ না আসিলে কোরম হয় না। যেখানে স্থানীয় পণ্ডিত ও কার্য্যদক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নাই, যেখানে স্বাধীন আত্মনিবদ্ধ ইউনিভার্সিটি হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রদের দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত হইয়া, পরে তাহারা মামুলী কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্কটা সংসারের উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত। অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার অভাব বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে বোলপুরের কাজটা যে কাঁচা হইতেছে তাহা আপনিই আমাকে বলিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতিবৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই (১) প্রতি বিভাগে সর্ব্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং উচ্চ প্রণালীতে কাজ কবিরা উপযোগী শিক্ষা intellectual discipline and exact knowledge, পূর্ব্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমণ্ডলী, এবং (৩) শিক্ষার পরিপক্ব চরিত্রবান একনিষ্ঠ নেতা একজন। এই তিনটি থাকিলে টাকা বা জিনিষের অভাব বাধা হয় না, এবং এ অভাবও বেশী দিন থাকে না।

আমাদের মামুলী কলেজের IA ও BA শ্রেণী চারিটি প্রকৃতপক্ষে বিলাতের ভাল সেকেণ্ডারী স্কুলের কাজ করে; আর এদেশে প্রকৃত কলেজের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এম. এ ক্লাস হইতে আরম্ভ হয়। ঐ IA ও BA ক্লাসে চারি বৎসর খাটিয়া তবে 'আমাদের ছেলেরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার ও নিজে কাজ করিবার উপযুক্ত

হয়। বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাইস্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ পণ্ডিত ও মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে ৩য় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ)ও বেশ কার্য্যকর হইবে— যদি ছাত্র আসে। কিন্তু ২য় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের ৪টি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই। যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত. হইয়াছে সে কিরূপে রিসার্চ-অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে, তাঁহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না ; কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি অর্থাৎ উচ্চ general knowledge এবং ২ বা ৩ বিষয়ের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ— তাহাদের ঘটে নাই ; তাহাদের মধ্যভাগটা কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, সে এম এর ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায়, তাহার পক্ষে পূর্ব্বেই BAতে Economics & Political Science এবং একটি ভাষা রিসার্চ-বর্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্যক। ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত জানিলে চলিবে না, গ্রীসীয় ইতিহাস মিসর ব্যাবিলনের ইতিহাস, Political Philosophyতে অগ্রে BA পাশ করা আবশ্যক, নচেৎ মনটা সংকীর্ণ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ exact knowledge, পরের অর্জ্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া। তাহার পরে এবং উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌঁছিতে পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (grind বলিতে পারেন) মামুলী কলেজে হয়, বোলপুরে হয় না।

তাহার উপর, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledgeকে, intellectual disciplineকে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্ক মস্তিক "বিশ্বমানবের" শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে। তাহারা শুধু ভাবের

(emotion) দিকে, synthesisএর অত্যাবশ্যক ভিত্তি যে exact knowledge তাহা শেখে না বরং শেখা অনুচিত, কুশিক্ষা, বলিয়া মনে করে। এই যেমন আকাশে এরোপ্লেন উড়িতেছে দেখিয়া আমাদের মনে হয় "আহা! কি সুন্দর এইরূপ উড়াই মানবমস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ কাজ ও সুখ।" কিন্তু কত শ্রমের কত শুষ্ক তপস্যার কত exact knowledgeএর ফলে এরোপ্লেনের সৃষ্টি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাবি না। ইহার আবিষ্কারের পূর্ব্বে অসংখ্য পতঙ্গ ও পক্ষীর কেহ ছুরী ও অণুবীক্ষণ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া পক্ষ ও দেহের আনুপাতিক ওজন এবং আয়তন, পক্ষের ভিতর দিয়া শক্তিবাহক রগের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শুষ্ক exact knowledgeএর পুঁজী সংগ্রহ করা পরীক্ষার পর পরীক্ষা প্রাণত্যাগের পর প্রাণত্যাগ আবশ্যক হইয়াছিল। এরোপ্লেন আনন্দে সৃষ্ট হয় নাই।

তেমনি আচার্য্য বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ সকলেরই প্রাণ ও মৃত্যু উত্তেজনা ও ক্লান্তি আছে। আমরা অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠি "বাঃ! ইহাই ভারতের নিজস্ব মানসিক সম্পদ। আমাদের উপনিষদ যুগের পিতামহগণই ত বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রাণ আছে।" আমরা বুঝি না যে প্রাচীন ঋষিরা ভাবের উন্মেষে ঐ কথা বলেন, কিন্তু আচার্য্য বসু(র) প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভীষণ শুষ্ক; তিনি exact knowledge-এর সাহায্যে বিজ্ঞানাগারে পদে পদে পরীক্ষা করিয়া, সেই পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া এক ইঞ্চকে কোটিভাগে বিভক্ত করিয়া, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অবিশ্বাসীর হাত দিয়া সেই পরীক্ষা করাইয়া তাহাকে নিজমতে দীক্ষিত করিতে পারেন।

তেমনি পালী ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ

সংস্করণের পশ্চাতে কি অগাধ শুষ্ক পরিশ্রম রহিয়াছে। এই সব সংস্করণের সম্পাদক ম্লেচ্ছ পণ্ডিতগণ গণিয়া ঠিক করিয়াছেন যে ললিতবিস্তারে তৃতীয়ার একবচন কোথায় এবং কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, বৃহদ্দেবতায় দেবগণের উপাধি ও গুণগুলির নির্ঘণ্টু প্রস্তুত করিয়াছেন। আর আমরা আর্য্যসন্তান এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ হাতে করিয়া আত্মম্ভরিতার সহিত 'উপর চালাকী' করিতেছি, ভাব গদ্‌গদ হইয়া general remarks ঝাড়িতেছি, আর লিউম্যান ও ম্যাকডনেলের শুষ্ক শ্রমের প্রতি exact knowledgeএর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি।

আমি এখন মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নব্যন্যায়ের কচকচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ, এবং আলিপনার নকসা, অথবা মুঘল চিত্রের সাত নকলের খাস্ত নকল। ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতে ও জগৎকে exact knowledge দিতে পারে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের scientific history রচনা করিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি (kechauffe´) বা অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া 'জগৎ সভার মাঝে' গ্রহণীয় নুতন জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে পারে,— এ বিশ্বাসটা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহি না।

বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে। সেখানে যে বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই scientific method এবং exact knowledgeএর বিরোধী। যেমন বৈষ্ণবেরা ভক্তিবিগলিত অশ্রু হইয়া সব জিনিষ অস্পষ্ট দেখে, তেমনি বোলপুরের ছাত্রগণ শেখে ভাবের (emotion) বাষ্পের আবরণ দিয়া জগতের দিকে তাকাইতে। প্রথম হইতেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বলিয়া তাহারা অণুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দূরবীক্ষণ ব্যবহার

করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কোনোটাকেই ছাড়িলে পূর্ণতা লাভ করা যায় না।

আপনি দেখিতেছেন আমি কি অকাট দুরারোগ্য ফিলিষ্টাইন। তাহা হইবেই ত। আমি পেশাদার গুরুমহাশয় (মস্তিষ্কের, হৃদয়ের নহে), পণ্ডিত তৈয়ার করিবার চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদের আবির্ভাব বা নূতন প্রণালীর কথা শুনি সেখানেই দেখিতে যাই। পুরাতন নেশনাল কলেজ দুবার, বোলপুর ৩ বার, গুরুকুল একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্ব্বাঙ্গীণ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনি যখন পদ্যে ধর্ম্মব্যাখ্যানে বা গল্পে বেদান্তের নির্যাশ দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। আমি তাহা পূর্ণসত্য বলিয়া মানিয়া লই। কারণ আপনার যুক্তি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়; আর আমি জানি যে আপনি নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তবে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু যখন বোলপুরের দশ বারো বছরের ছেলে — আধার বিশ্বই হউক না কেন— “বিশ্বমানব” “অব্যক্ত মর্ম্মবেদনা” প্রভৃতি কথা আওড়াইতে থাকে তখন পুঁটি মাছের মুখে তিমি মাছের গলার আওয়াজের মত এগুলি অসঙ্গত শুনায়। আমাদের মামুলী কলেজে পাশ করা ছেলেরা যে রাজনৈতিক মঞ্চে নৃত্য করিতে করিতে ‘ডেমক্রেশি’ ‘কনষ্টিটুসন’ ‘সেলফ ডিটারমিনেশন’ প্রভৃতি বুলী আওড়ায় তাহাও ঠিক এইরূপ মূল্যের জিনিস।

কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। মামুলী কলেজে আমরা পেশাদার গুরু মহাশয়েরা ছাত্রের হৃদয়টার দিকে তাকাই না, শুধু মস্তিষ্কটা শানাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই অভাবটা বাহিরের গুরু মহাশয়

—সংসার হউক, আপনার কাব্য হউক, প্রকৃতির দৃশ্য হউক —পরে পূরণ করিয়া দেয়, কারণ হৃদয়টা শূন্য থাকিতে পারে না —যেমন Palace of Artএ টেনিসন সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন। বোলপুরের ছাত্রেরা যে আমাদের পেটেণ্ট করা প্রস্তরচক্রে মস্তিষ্ক শানায় না, exact knowledge বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellectual discipline শেখে না, শেখা অন্যায় মনে করে,— তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পূরণ হইতে পারে না; একমাত্র তরুণ বয়স এবং কলেজের শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাই এই অভ্যাস এই মনের ঝোঁক দিতে পারে। বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে পরে ইহা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রগণ রিসার্চ ক্লাশে উঠিয়া মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে (ভাসা ভাসা synthesis বাদে) কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না। অন্ততঃ তাহাদের শ্রমফল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য হইবে না। শুধু সংস্কৃত পড়িয়া যাঁহারা পণ্ডিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপীয় দর্শন অভ্যাস করিয়া তাহার সঙ্গে বা পরে সংস্কৃত চর্চা করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর মনের দৌড় ও ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ শেষোক্ত পণ্ডিতরাই প্রকৃত মূল্যবান গবেষণা করিতে পারেন।

আর একটি উপমা দিলেই আমার মনের ভাব পরিষ্কার হইবে, —এবং আমি যে কি ভীষণ ফিলিষ্টাইন সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্নেহ বশতঃ আপনার যদি দু-একটা সন্দেহ থাকে তবে তাহাও লোপ পাইবে। "ইণ্ডিয়ান আর্ট ভারতের নিজস্ব জিনিস, ইহা জগৎ সভার হাতে ভারতের অমূল্য অন্যত্র অপ্রাপ্য কাজ।" বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি। আমরা বলি যে রবি বর্ম্মার ছবিতে ভাব নাই, তাহা Nature-এর দানোপযোগী নকল। এই মত প্রচারের ফলে, অবনীবাবু ও

নন্দলাল ভিন্ন আর সব নব্য ইণ্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা কাজটি ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নাই, শরীর বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে নানা পরীক্ষা (studies বা sketches) করিয়া চিত্রের উপযোগী, ঠিক অঙ্গভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই; এক লাফে ভাবের ছবি আঁকিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এসব ছবির মধ্যে যাহা ভাল তাহাকে অজন্তার বা মুঘল চিত্রের নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না। অপরগুলির সব কাঁচা ও খারাপ, ঠিক শিশুর আঁকা বা cavemanএর আঁকা ছবির মত, শুধু রংগুলি তার চেয়ে ভাল। কিপলিংএর একটা গল্পে আছে যে একজন বিলাতী ভবঘুরে এদেশে এসে প্রথম এক্কা দেখে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠেন "oh how thruly Orienthal !" ইণ্ডিয়ান আর্টের চরম আকাঙ্ক্ষা এই কি যে সাহেবেরা বলিবে How truly oriental ! অর্থাৎ বিশ্বজগতের সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে না, কালা আদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন standard আছে তাহা দিয়া ইহার বিচার করা হইবে? (কই রুইজডেল্ বা কুইপএর landscape দেখিয়া কেহ ত বলে না oh! how truly Dutch ? টার্নার দেখিয়া কেহ ত বলে না oh! How truly English ?)

রবি বর্ম্মাতে ভাব নাই সত্য, কিন্তু রবি বর্ম্মাই কি ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির দৃষ্টান্ত? র‍্যাফেল লীটন টার্নর-এ ত কেহ ভাবের অভাব, কামোচিত অনুকরণ দেখেন নাই; অথচ তাহাদের কীর্ত্তির পশ্চাতে কত anatomy, observation of Nature, "Studies" (অর্থাৎ খশড়া) আছে, তবে তাঁহাদের হাত ঠিক হইয়াছে! Sir Frederick Leighton তাঁহার Flaming June নামক চিত্রের রমণীর মাথার নীচে দেওয়া

হাতের ভঙ্গির জন্য ১৬/১৭টা Sketch করেন, পরে তাহার একটি বাছিয়া লন ও ছবিতে বসান। সেই মত র‍্যাফেলের স্কেচ (Cartoons) আছে।

অথচ আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্টের গুরু হইতে নবীনতম শাগরেদ পর্য্যন্ত "Art is not photography" "The imitation of Nature is a slavish practice unworthy of a true artist" "Expression is higher than fidelity to life" এই সব বুলী আওড়ান এবং ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতিকে জঘন্য* গালাগালি দেন। ইহার ফলে ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষানবীসের হাত ঠিক করিতে যে পরিশ্রম যে প্রকৃতির অনুসরণ আবশ্যক তাহা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহঙ্কারে ত্যাগ করিয়া একেবারে ভাব-প্রকাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন— ফল প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি। সেই মত বোলপুরের ছাত্রেরা exact knowledgeকে ঘৃণা করিয়া এক লাফে synthesis এবং ভাবপ্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিতেছে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান আর্টের এবং সিন্‌থেসিস বাদ এ দুটাই plea for laziness হইয়াছে। মামুলী কলেজের ছাত্রগণ অলস হইলে, ঢিলে কাজ করিলে লজ্জা বোধ করে। ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ এরূপ করা গৌরবের বিষয়, মানসিক স্বাধীনতার চিহ্ন বলিয়া গর্ব্ব করে। ইহার প্রসূত ফল জগৎসভা কতদিন গ্রহণ করিবেন দেখা যাউক।

আমি যে কেন ফিলিষ্টাইন হইয়াছি তাহা বলিতেছি। যদি বোলপুরের ছাত্রগণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি বা চিত্রকর হইবে

---

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকার প্রতি লক্ষ করিয়া "Teines Lit. Suppl" এই মত লিখিয়াছেন।

এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান হইতাম না। কিন্তু দেড়শত বৎসর ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে বঙ্গমাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন। আর দুইশত বৎসরের ও তাঁহার দ্বিতীয় আসিবেন না, আমার বিশ্বাস। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রদিগকে এই আমাদের কলেজের ছাত্রদের মত সাধারণ সাংসারিক লোক বলিয়া বিচার করিতে হইবে, এক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে। তাহারা অলস parasite class বা intellectual aristocracy হইবার ন্যায্য দাবী করিতে পারে না। The winds of genius blow where they list মামুলী কলেজ তাঁহাদের সৃষ্টি করিতে পারে না। বোলপুরও পারিবে না। তবে সেই প্রচ্ছন্ন জ্যোতি ক্ষণজন্মা কবি বা শিল্পী মামুলী কলেজে নাম লিখাইলে আমরা তাঁহাকে steam rollerএর চাপে পিঁশিয়া ফেলি, বোলপুরে তাহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ঐ ক্ষণজন্মা পুরুষ নয় তাহাদের জন্য বোলপুর কি করিবে?

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না এজন্য যে কত কষ্ট পাইতেছি তাহা আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মী সমাজে এই বিশ্বভারতীর সহিত আপনার খ্যাতি জড়িত থাকিবে। আমি ২৯ বৎসর কলেজে পড়াইয়াছি এবং শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের অবস্থা (মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়িয়া দিন) প্রভৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি। এখন যদি আপনাকে প্রস্তাবিত পন্থার বিপদ না বলিয়া দিই তবে আপনাকে প্রতারিত করিব।

যদি ইচ্ছা করেন এবং অন্য বন্দোবস্তের মধ্যে এরূপ দ্রব্যের জায়গা হইতে পারে তবে বড়দিনের সময় ৩/৪টা বক্তৃতা বা ইতিহাসের রিসার্চ স্টুডেণ্টদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বোলপুরে যাইতে পারি। গ্রীষ্মে ও পূজায় আপনাদের ও আমাদের এক সময়েই ছুটী থাকে।

এবার কি এ অঞ্চলে আসিবেন না ?

াত
শ্রীযদুনাথ সরকার

THE NEW LEAVEN IN BENGAL

(An Appreciation of Babu Rabindronath Tagore's Short Stories.)

The India we live in is not the same land as the India of our great grand fathers. Wave after wave of change has swept over the country, till at last nothing remains unaltered save the granite foundations of Hinduism. Institutions have changed so much that should the shades of our great-grandfathers revisit the land in which they lived and worked and died, they would mournfully feel themselves as much out of place in it as if it were a land of foreigners. But it is not with the outer aspects of modern Indian life that we want to deal here. These aspects, especially in their relation to the State, have been ably set forth by Mr. Cotton in his New India. Nor do we want to deal with the influence which the light and learning of the West have had upon the intellect of the East. Our concern here is with the inner life of our people as far as it has been affected by the altered circumstances of this new era. We shall here see what effect the altered conditions of society have had upon the feelings and doings of the men we live among.

The West is giving us knowledge. But knowledge is not an unmixed blessing. Nay, it may even become a curse ; for knowledge may open our eyes to miseries which cannot be remedied, knowledge may create longings which are hard to realise. Therefore, we cannot affirm that as the people now have more of knowledge they must have more of happiness. Indeed, a school of thinkers (chief among them Sir Alfred Lyall and that delightful story-teller Mrs. Flora Annie Steele) have gone so far as to hold that the new knowledge has brought more misery than happiness. Borrowing the imagery of the Evangelists they are never tired of lamenting that this putting the new wine of Western thought into the old bottles of Eastern life has led to the bottles bursting and the wine being spilt.

We do not say that in the old life there was no sorrow and no suffering. Sorrow there was all the sorrow that must ever be the heritage of the progeny of Adam. But it was felt less intelligently, and therefore, less acutely. It was felt as a vague stirring within, felt almost like the dull sensations of the brute creation. Moreover, there were then two things to solace the human heart : Fatalism and Religiousness. The blind fatalism proverbial to Orientals furnished an ever ready explanation of the inequalities of human lots, and served to lesson the contrast between the happy and the miserable. Faith in a living God made this life a mystery and not a thing to reason about. An antidote to the sorrows of this life was supplied by the prospective bliss of the life to come. Our span of life and the pleasures and pains that flutter it, were dwarfed into utter insignificance by the side of the importance of the Life Eternal which comes from knowing Him and walking in His way.

The old life was more uniform. Its members were more in harmony with each other. In its social arrangement every one had his settled place, which he could not leave at will and which kept him in loving and friendly relation with all the rest. It was more stationary, more leisurely and it had therefore more of those affections which conservatism nourishes. There could be in it no rude transplantations of young hearts to utterly unsympathetic regions.

But the modern world moves on rapidly in the pursuit of material gain. It has no settled habits, no old affections for its affections are not allowed the time to grow old. (I say this of its active and more successful members and not of those sweet but weaker souls which fail because they cannot adapt themselves to the spirit of the age). There is less of charity, less of kindliness for men have less leisure to think, less leisure to be considerate to others. Its sudden changes and shiftings give violent wrenches to hearts not yet hardened, for there is less of that sympathy between man and man which makes the new comer feel at home among strange faces. The paradise of this new creed, the much-vaunted 'City of Palaces' of this new civilisation, Calcutta, what is it but a vast wilderness in which a stranger is really more solitary than in solitude itself ? Two instances taken from Robindronath Tagore's "Short Stores" will illustrate our meaning. The boy Fatik leaves the free open air life and troop of playmates of his village home, comes to Calcutta, and meets with cold loveless neglect and the apathetic gaze of strangers, but none to love him, none to care for him ; the very atmosphere of the city seems to choke him. 'The Post-master' of Ulapur pines alone in his hovel of a post-office ; there are men around him but he cannot mix with them ; there is no reciprocity of feeling between the two classes : the new knowledge has parted the cultured and the cultured more widely than of yore.

The new life is thus marked by two things : new forms of suffering have been created ; and the old forms of suffering have become more manifest and more keenly, because more intelligently, felt. The altered spirit of the age has brought in new sorrows, and increase of knowledge has heightened the acuteness of old sorrows. To take a particular instance of the latter class : — The heart of the girl Ratan (story No. 3) twines its tendrils round the post master. They cannot marry. But in the old world he would have looked upon this attachment as only the fidelity of a menial servant, and have forgotten her ; or it would have taken shape as a brute passion gratified by unholy union. But in the new world they are alive to the real nature of the attachment— the one with more, the other less, distinctness. It is this knowledge, this recognition of emotion, this intelligent suffering, that sharpens the edge of sorrow and heightens the tragedy of the parting.

Robindronath Tagore is an interpreter of this new phase of our society, of these new forms of suffering. Paradoxical though it may sound, we confidently predict that his short stores will last longer than his poems. For, those are a truer representation of life, or rather a fuller view of life as a whole than his poems— which give only a partial sketch of life and are incomplete even in that.

Of his poems the subject matter very often is the sentimental whining of lovers. The accessories are moonlight (‘the smile of the Moon’, as he is fond of calling it,) chaplets of flowers, the gentle zephyr, the melody of birds ; tears from eyes that must be half-bleared by such constant action of the water works, sights from hearts that are broken for no very conceivable cause,— in short the accompaniments of sickly sentimentality and want of virile strength. Their hero is often a ‘lover with a sad sonnet made to his mistress’s eye-brow’; their heroine another ’airy, fairy, Lilian.

But life is not all sun shine. (I beg pardon, it should be ‘moonlight’— for the sunshine here is hateful and our poets shun it to sit piping under the banyan tree.) Life is not a flowery bed— at least is modern times. The zephyr blows for but few, and not always even for them. There are times when the black angry clouds hurry through the sky, the wind roars, and the elements are at war. Then the moon hides her face in terror; timid zephyr flies away before the rushing guests of wind; the birds are cowed into silence: the flowers are (lying?) down by the pelting shower and mingled with dust, their very ... are torn up root by root and leaf by leaf. Such tempests of the soul are entirely ignored in his poems; nay, he hardly recognises even those slow agonies which tender and modest souls patiently bear, but which kill them inch by inch. To try to render these in sentimental namby pamby verse would be a mockery. Hence it is that we hold that his poems are but light toys, pretty trifles, for the mind to sport with in its hours of idleness, but to be laid aside in its more serious moods. Hence it is, that these poems must be adjudged to have failed in giving a true rendering of life.

But such a rendering of life, esp., of modern life, has been given by Robindronath in his short stories, with a degree of success unequalled by any other of our writers. The form chosen is the most felicitious. He has naturalised the short story in Bengali with wonderful success;— he has retained all the excellent features of its (French) original, while he has added beauties which are peculiar to him. But we shall not here criticise his style,— though some of the descriptions are flawless gems, perfect prose-poems, which only a practised poetical artist could have produced,— though some of his sentences and even single phrases have a wonderful suggestiveness and dramatic effect, bringing a whole scene before the reader's eye. Our work with him is to judge him as an interpreter of life, and to bring out the creed of which he is the preacher.

In this age of steam and electricity, society is always hurrying on. Those who cannot keep pace with its feverish haste, those who turn aside to minister pity and love, those who shrink from it selfish struggle,— in short, the meek, the tender, and the weak, are mercilessly cut off by it as useless encumbrances. These are stigmatised by it as failures in life; these are its victims. To be tender is a crime in its eyes. In the hard jostling for material gain, the tender and the unassuming are shoved to one side, or thrown down and trodden to death.

In this world we see many 'Wee modest crimsontipped flowers' blooming in the by-ways and nooks of life. They ask not for its praise, they fight not for its prises, they seek not to leave their obscure homes for the high places of the world. They only want to be let alone, they only crave a little love. Guided solely by the healthiness of nature, they take a simple unreasoning delight in the joys of life; they sport in its sun-shine, they follow their hearts' promptings untroubled by thought. There are many among them with the souls no more serious than the little squirrels that frisk on the ground and at the least alarm timidly run up the tree; only these squirrels cannot fly to a refuge, but have to bear to the full the tender mercies of human beasts of prey.

But society marches with iron heals, trampling under foot the flowers by the way-side. It cannot appreciate them; it will not even leave them unmolested. Society will not let them life their innocent lives. Society will crush their naturalness and force them to bow to its conventions. Society looks upon their healthy joy in life as a sin.

In these short stories our author has set forth some varieties of the sufferings of the new life. First comes the 'irrepressible' daughter in law (story No. 2) and how saddening is the truth put before us here ! In the old life daughters-in-law were occasionally beaten by furious mothers-in-law. But what did they suffer compared with some of their modern sisters,— slowly killed by loveless neglect and cut to the quick by the sharp taunts and cross looks of heartless money loving mothers-in-law ? Passing by the femme incomprise and the homesick boy, (stories 7 and 10,) we next have hearts, that cling to each other, that do harm to nobody but only want to make each other happy. But the world here interposes and rudely parts them, (stories 3, 6, 15, &c.)

These sufferings of the new life can have three possible results for their victims :— (i) some die ; unable to ...... down and are trodden in the press. (ii) In others the better self dies ; naturalness and healthiness are bent to conform to conventionality. Such probably was the fate of Uma (story No. 7,) probably she lived to be

"Old and formal, fitted to her petty part,
With a heard of wordly maxims preaching down a daughter-in-law' heart."

(iii) Others struggle on to a higher life through suffering : purified and tempered by passing through the fire. But such precious souls are rare, esp., in Bengal.

Our author is nothing if not an aesthetic artist. His view of 'art' seems to be that of Swinburne, namely, that 'art' has nothing to do with morality, and that to append a moral to any work only mars its beauty. Still, we venture to think that one has not to go very far before he can glean some teaching from these tales. For, the True (i.e., the truly Beautiful) is Good too; and such a true rendering of life cannot in nature fail to carry its moral with it.

The teaching of our author, if we mistake not, is :— Live and let live. Crush not the innocent freedom of nature. Let the little modest flowers of the world bloom unmolested; —they do you no harm, but they add to the beauty of God's glorious creation. Let our little squirrels frisk on; let our butterflies

"Flutter through life little day
In Nature's varying colours' breast"

Let children sport in the sunshine. For, these and the like of them bring the light and sweetness of paradise to our dismal earth. But when you see one of these lying unhappy, tenderly nurse it, give it love, and it will recover. Touch them with a gentle hand and a gentler heart ... Speak to them in their own language. Shield them from the ... its bitterness, its sorrows, and its corrupting influences.

Jadunath Sarkar

স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে (অষ্টম অধ্যায়) বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে মন্তব্য

...V (c)

57. We are now able again to turn to a brighter side of the picture and to dwell upon the work of two schools of exceptional interest which (if such influence as theirs should extend widely through the Presidency) would encourage sanguine hopes for the future of secondary education in Bengal.

58. The school founded by Sir Rabindranath Tagore at Bolpur in the western part of the Presidency is widely famous both in India and in the West. It is a boarding school for boys ; situated on a rolling upland in open country, and combining, in its course of training and methods of discipline, Indian tradition with ideas from the West. With regard to the general work of the school it must suffice to say that it is no small privilege for boys to receive lessons in their vernacular from one of the most accomplished and celebrated writers of the age. No one who has seen the poet, sitting bare-headed in a long robe in the open veranda of a low-roofed house— the wide hedgeless fields stretching to the distant horizon beyond— with a class of little boys, each on his carpet, in a circle before him on the ground, can ever forget the impression, or be insensible to the service which Sir Rabindranath Tagore renders to his country by offering to the younger generation the best that he has to give.

59. It is Sir Rabindranath's strong conviction that, while

English should be skilfully and thoroughly taught as a second language, the chief medium of instruction in schools (and even in colleges upto the stage of the university degree) should be the mother tongue. He has four reasons for this belief ; first, because it is through his mother tongue that every man learns the deepest lessons of life ; second, because some of those pupils who have a just claim to higher education cannot master the English language ; third, because many of those who do acquire English fail to achieve true proficiency in it and yet, in the attempt to learn a language so difficult to a Bengali, spend too large a part of the energy which is indispensable to the growth of the power of independent thought and observation ; and, fourth, because a training conducted chiefly through the mother tongue would lighten the load of education for girls, whose deeper culture is of high importance to India. He holds that the essential things in the culture of the West should be conveyed to the whole Bengali people by means of a widely diffused education, but that this can only be done through a wider use of the vernacular in schools. Education should aim at developing the characteristic gifts of the people, especially its love of recited poetry and of the spoken tale, its talent for music, its (too neglected) aptitude for expression through the work of the hand, its powers of imagination, is quickness of emotional response. At the same time, education should endeavour to correct the defects of the national temperament, to supply what is wanting in it, to fortify what is weak, and not least to give training in the habit of steady co-operation with others, in the alert use of opportunities for social betterment, in the practice of methods of organisation for the collective goods. For these reasons, in his own school at Bolpur he gives the central place to studies which can best be pursued in the mother tongue ; makes full educational use of music ("music is in the air here, though at first the boys did not care for it") and of dramatic representation ('boys are wonderful actors'), of imagination in narrative and of mannual work ; of social service among less fortunate neighbours and of responsible self-government in the life of the school-community itself. For the achievement of these aims he feels that, if the right place is found for it, there is strong need for British influence in Indian education. And he speaks with gratitude of the help which he has had from English teachers in his own school, but he would refuse such help at all costs, as being educationally harmful, where lack of sympathy prevented a true human relation between the English teacher and his Bengali pupils.

60. At Bolpur there are 160 boys, ranging in age from six to over sixteen years. The staff consists of twenty-two masters, or one to every eight boys. In all but the two highest classes of the school the greater part of the teaching— three-quarters of the whole— is given through the vernacular. The boys all learn history, geography and natural science during the greater part of their school course. The younger boys have regular class teaching in music and in drawing. Sir Rabindranath has found it necessary to form at the top of the school two classes, each of one year, preparatory to the university matriculation. It is in the higher of these two classes that the anxiety of the boys begins. They feel that they are face to face with a serious thing in their lives. For most of them their future career will depend on their passing the examination. But the course of study in the classes below these two upper classes represents more fully Sir Rabindranath Tagore's ideal in education.

61. The following table shows the arrangement of the work in the class just below the stage at which the boys begin their preparation for the university matriculation examination.

Bolpur School— Class below the two preparatory for matriculation.

Number of pupils in the class...	16 (one being a girl).
Average age...	14 years.
Length of each lesson-period...	45 (or 40) minutes.

	Lesson-periods per week.
Mother tongue (Bengali)	6
English	12
*Sanskrit	6
* Mathematics	12
* History	3
* Geography	3
* Natural science	6
Aggregate for the week of $5^{3}/_{4}$ hours a day.	48

In this class there are generally no out-of-school task set, all the work being done in class.

In addition, there is for all the younger boys—

Music	three periods a week.
Drawing	three periods a week.

---

* These subjects, as well as the vernacular, are taught through Bengali.

62. In the class above this, the boys drop natural science and geography in view of the special requirements of the university matriculation examination. At this stage, there are no compulsory drawing or music lessons. The time given to mathematics and Sanskrit is greatly increased. And there are tasks to be done out of class hours.

Bolpur School	*Preparatory class*	*Matriculation class.*
Subject	Number of boys in the class ... 16 Average age about 15	Number of boys in the class ... 17 Average age about 16
	Number of lesson-periods per week.	Number of lesson-periods Per week.
Mother tongue . .	6	6
English .	12	12
Sanskrit ...	9 (or, for additional Sanskrit 12).	9
Mathematics ...	12	12 (or, for additional mathematics, 18).
History ..	6	6
Weekly aggregate of lesson periods	45 (or 48)	45 (or 51)

The first four subjects in this list are compulsory for all the boys in the class.

Most of the boys take 'additional mathematics' and history as their other subjects for the matriculation examination. Others take history and additional Sanskrit or additional mathematics and Sanskrit.

Each lesson-period is 45 (or 40) minutes. Natural science and geography are dropped at this stage. In these classes there are no compulsory drawing or (compulsory) music lessons

Private tasks are done out of class.

63. Four members of the staff of Bolpur school—Mr. Jagadananda Roy (Mathematics), Mr. Santosh C. Majumdar (Natural Science), Mr. Promoda Ranjan Ghosh (English) and Mr. Nepal Chandra Roy (History) favoured us with the following expression of their views on points immediately affecting the connexion between high school and the University. In these views, Sir Rabindranath Tagore concurs—

(a) Geography, and Indian (with an outline of English) history should be compulsory subjects in the matriculation examination.

(b) A little mensuration should be introduced into the paper in geometry and, if possible, a little surveying as giving practical application to the subject.

(c) It is desirable that every boy should learn some natural science at school. But the examination test would not be the surest guarantee that his interest in science had been intelligently cultivated and trained. And it would be impossible for most schools to provide expensive laboratories, apparatus and materials. If, however, (so far as those branches of science are concerned) a general elementary training in physics and chemistry was all that would be required, this instruction could be given with simple apparatus in two lesson-periods a week. A certificate of the boy's having received this instruction might be required from his school authorities as a condition preliminary to his being allowed to enter for the matriculation examination. Moreover, for the compulsory paper in geography some study of scientific matters should be required.

(d) The boys from Bolpur are entered for the university matriculation examination as 'private students'. Sir Rabindranath Tagore and the members of his staff feel that it is important that this right should be retained. Bolpur School, wishing to work out its own methods, has not applied to the University for recognition.

64. The staff would like it to be possible for boys to take direct from Bolpur School the intermediate arts examination and (if good laboratories could be secured) the intermediate science examination. Work carried up to the intermediate stage would, in their opinion, complete the course appropriate to such a school.

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত পত্র

‘জীবনকথা’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত ভূমিকা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৪ – ১৯১৯

১
৯ মার্চ [১৯০০]

৬ উইলিয়ামস লেন
হ্যারিসন রোড পোঃ আঃ
২৬শে ফাল্গুন [১৩০৬]

যথোচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটি[১] পত্রিকার কলেবরভুক্ত করিবার জন্য যথাসময়ে পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। প্রবন্ধটি অন্যকে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত করিবে কি না জানি না, কিন্তু কবির কল্পনা-শক্তি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যাপারে কতটা কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপে সমাজদারের নিকট গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

বৈশাখের পত্রিকার জন্য আর একটি প্রবন্ধের ভিক্ষার্থী হইয়া আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আশা করি বঞ্চিত হইব না। বৈশাখের পত্রিকা যন্ত্রস্থ।

আপনি নিরবচ্ছেদে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকিলে আমাদের সাহিত্যসমাজের জড়তায় কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে আশা করি। আপনার প্রবন্ধে উৎসাহিত হইয়া আমার একটি ইংরাজিনবীশ অধ্যাপক বন্ধু[২] ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইডিয়মের তুলনা করিয়া একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন; তাঁহার আর একটি প্রবন্ধ পূর্ব্বেই পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

আপনি কতদিনে কলিকাতায় আসিবেন ? পত্রোত্তরে কুশল সংবাদে সুখী হইব।

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২
৩ এপ্রিল ১৯০০

৬ উইলিয়ামস লেন
২১শে চৈত্র ১৩০৬

যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার কাহিনী[১] উপহার পাইয়াছি এবং বলা বাহুল্য আগাগোড়া পড়িয়াছি। আপনার কবিতায় আমি বাল্যাবধি মুগ্ধ, সুতরাং আমার বলিবার কথা কিছুই নাই। 'গান্ধারীর আবেদন'[২] পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, এবার পড়িয়াও আনন্দের মাত্রা কমিল না। আমাদের পুরাতন মহাকাব্যের জীবন্ত রক্তমাংসময় চরিত্রগুলিকে আরও সতেজ ও আরও জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র[৩] শেষাংশ খবরের কাগজে উদ্ধৃত দেখিয়া তাহার পাঠে যে নূতন আনন্দরসের আস্বাদন পাইয়াছিলাম, 'ভাষা ও ছন্দে'[৪] সেই রস আরও ঘনীভূত ও গাঢ় ভাবে আস্বাদন করিলাম। অমাবাইয়ের ঐতিহাসিক কথা[৫] ও সোমকের পৌরাণিক কথা[৬]

আমাদের বর্তমান কালের অবস্থায় পথ্য স্বরূপ হইয়াছে বলিলে বোধ হয় আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা কবির প্রতিভা নৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বদ্ধ থাকিতে চায় না ও কালাকালের অপেক্ষা করে না, কিন্তু তথাপি কাহিনীর এই অংশ এবং পূর্ব্বপ্রকাশিত 'কথা'র কথাগুলি আমাদের কঙ্কালবর্জ্জিত শরীরে অস্থিগঠনে সহায়তা করিবে বলিয়া আমি কতকটা আশা করি। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'[৭] অন্য কাহিনীগুলির সহিত নিশ্চয় যুক্ত হয় নাই; স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বাহির হইলে মন্দ হইত না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার মাঝে মাঝে তীক্ষ্ম শর প্রয়োগ দেখিয়া আমি অনেক সময় ব্যথা পাইয়াছি বটে, কিন্তু একবার সাধনায় প্রকাশিত জাবালি সত্যকাম সংবাদ[৮] পড়িয়া সে দুঃখ গিয়াছিল; এবার 'কর্ণকুন্তী সংবাদে'[৯] তাহা অন্তর্হিত হইল, কর্ণ চরিত্রের মাহাত্ম্য যিনি এরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কর্ণচরিত্রের সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে তিনি অজ্ঞাতসারে অভিভূত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

লিখিবার কিছু নাই বলিয়া ক্ষুদ্র একটা সমালোচনা করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। এই মার্জ্জনা ভিক্ষার পর আর একটি ভিক্ষা আছে। পরিষৎ পত্রিকার বৈশাখের সংখ্যার[১০] জন্য একটি প্রবন্ধ; ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ হইলেই ভাল হয়। কোন পত্রিকায় এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের আলোচনা হয় নাই। ভবিষ্যতে এই দি[কে ব]লিতে আমার ইচ্ছা আছে, এবং বর্ষারম্ভে আপনার হাত হইতে এই কার্য্যের সূচনা হয় এইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি ১০/১২ দিনের মধে[্য প্র]বন্ধ একটি পাঠান সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমার বাড়ীর ঠিকানায় জেমো

কান্দিতে পাঠাইবেন। প্লেগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব আমি সপ্তাহমধ্যে বাড়ী যাইবার চেষ্টায় আছি।

আপনার কুশল সংবাদে সুখী হইব। ইতি

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৩
১৭ পৌষ ১৩০৭

৬ উইলিযামস লেন
১লা জানুয়ারি ১৯০১

প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন,

নূতন শতাব্দীর প্রথম দিবসে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপনাকে সম্ভাষণ করিতে পারিলাম না। পত্র দ্বারাই আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। গত শতাব্দীর শেষপাদ ব্যাপিয়া আপনার লেখনী মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার দীনতামোচনে নিরত রহিয়াছে, আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিবিধ উপহার মাতৃচরণে উৎসর্গ করিয়াছে। এই "শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা শুধু মিছে কথা ছলনা"র দিনে আপনি জননীর লাজ ঘুচাইবার জন্য অকৃত্রিম অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আপনার বন্ধুগণের অকপট হৃদয়ের প্রার্থনা যে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া আপনি মাতৃসেবায় নিযুক্ত থাকুন। বঙ্গসাহিত্য আপনার রচিত বিবিধ পুষ্পের মালা পরিয়া অলঙ্কৃত হউক।

অবিরাম সপ্তাহ কাল জ্বর ভোগের পর কাল আমার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। চারি পাঁচ দিন মধ্যে বাটীর বাহির হইতে পারিব ভরসা করি না। আপনি কলিকাতায় আর কতদিন আছেন জানিতে ইচ্ছা করি।

সঙ্গীত সমাজে বিসর্জ্জনের প্রথম অভিনয়[২] দেখিয়া বিস্ময় ও তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলাম; শরীরের অসুস্থতায় সমাজের দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

বলেন্দ্রনাথের রচনাগুলি[৩] নকলের পর এখন কি অবস্থায় কাহার কাছে আছে? আপনি একবার দেখিয়া প্রকাশের পৌর্ব্বাপর্য্যটা স্থির করিয়া দিলে ভাল হয়। আমার বিবেচনায় বাল্যকালের রচনাগুলি প্রথমে পৃথক রূপে বাহির করিয়া পরবর্ত্তী রচনাগুলি বিষয় অনুসারে সাজাইলে চলিতে পারে। যত শীঘ্র পারি সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব।

আগামী সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকার জন্য আপনার একটি প্রবন্ধ প্রার্থনীয়। পত্রিকার এই সংখ্যা যন্ত্রস্থ। যথাসম্ভব সত্বর প্রবন্ধটি পাইলে অনুগৃহীত হইব। ইতি

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পুঃ নিঃ। ত্রিপুরা মহারাজের নিকট পরিষদের আবেদন[৪] প্রেরণের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি?

৪
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০

৮ মধুসূদন গুপ্ত লেন
২৯ ভাদ্র ১৩১৭

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্রের মর্ম্ম কুমার শরৎকুমারকে[1] জানাইলাম। কোনরূপ একটি তালিকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে পুঁথির নকল আনা সুবিধা হইবে না। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তালিকা আছে কি না জানি না; সংবাদ পাইবার চেষ্টায় থাকিলাম। কুমার শরৎকুমারের উদ্যম এখন যেরূপ জ্বলন্ত অবস্থায় আছে, তাহাতে ইন্ধন যোগান আবশ্যক; নতুবা স্বভাবত নিবিয়া যাইতে পারে। দুই চারিখানা নূতনপুঁথি কোনরূপে সংগ্রহ করিতে পারিলে তাঁহার উৎসাহ বজায় থাকিবে।

আমার সম্বন্ধে সংবাদ চাহিয়াছেন— নূতন বার্ত্তা এই যে দেহযন্ত্রকে চিনির কারখানায় পরিণত করিয়াছি— প্রতি আউন্স জলে ১৫ গ্রেন চিনি মিশাইতে সমর্থ হইয়াছি।

সম্প্রতি শশিপদবাবুর দেবালয়ের[2] সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, প্রবন্ধের উৎকট নাম দিয়াও ফেলিয়াছি— ‘বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা’— কিন্তু কাগজ কলম হাতে লইয়া কি লিখিব স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা বলিবার ছিল, সব শেষ করিয়াছি —আর কিছু বক্তব্য নাই— এই মনে হইতেছে।

আপনি কলিকাতায় কখন আসেন, কখন চলিয়া যান, জানিতে পারি না; ধরিবার সুযোগও পাই না। পূজার পূর্ব্বে আসিবার সম্ভাবনা

আছে কি? তাহা হইলে প্রবন্ধ পাঠের দিনটা তদনুসারে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারি। এখন ২৪শে সেপ্টেম্বর পড়িবার দিন স্থির আছে।

শ্রীমান রথীন্দ্রের অনুবাদিত বুদ্ধ চরিতের[৩] কেবলই কি বিজ্ঞাপন বাহির করিতে থাকিবে ? উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন না কি ? রায়বাহাদুর শরৎ দাস[৪] দ্বারা অবদান কল্পলতার তর্জ্জমা আরম্ভ করাইয়াছি— ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধ চরিতটাও বাহির হইয়া গেলে ভাল হয়। শ্রীমানকে কি কেবল জমিদারিতেই মগ্ন রাখিবেন ?

সাহিত্য পরিষদের যতদিন পাকা বাড়ি[৫] ও অর্থসামর্থ্য ছিল না, ততদিন কাজ করিবার লোক জুটিত না। নিষ্করুণ ভাবে অপরের অর্থ দোহন করিয়া জিনিষটা যেই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, অমনি এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত কর্ম্মকর্ত্তা জুটিতেছেন যে, বুঝি তাঁহাদের রেষারেষিতেই পরিষৎ ভাঙিয়া পড়েন। জীবদ্দশাতেই পরিষদের সমাধি দেখিয়া যাইব কি না উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়াছে।

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৫
১৬ নভেম্বর ১৯১৩

১২ পার্সীবাগান লেন, কলিকাতা
৩০ কার্ত্তিক, ১৩২০

সুহৃদ্বরেষু,—

আজ ইউরোপ আপনার জয়ডঙ্কা[১] বাজাইয়াছে ও অবশেষে সোনার মুকুটের অলঙ্কার পরাইয়াছে, তাই শুনিয়া ও দেখিয়া

আপনার নিকট আনন্দ প্রকাশে, লজ্জা ও সঙ্কোচ হইতেছে। সেই আত্মাবমাননায় আমি প্রস্তুত নহি, বিধাতৃ-বিধানে আপনার যাহা প্রাপ্য, আপনি তাহা পাইয়াছেন— উহাতে আপনার স্বোপর্জ্জিত স্বত্ব আছে— উহা কোনোরূপ উপরিপাওনা নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ এতদিন যে অধিকারে বঞ্চিত ছিল, আপনাকে আশ্রয় করিয়া ও উপলক্ষ করিয়া, আজ তাহা আদায় করিল, এবং আমরা ভারতবাসী অংশতঃ তাহার ফললাভ করিলাম, তজ্জন্য আত্মপ্রসাদ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। সেই আনন্দপ্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। অনেকে বলিতেছেন, স্বদেশ যাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, বিদেশ তাঁহাকে চিনাইয়া দিল, ইহা স্বদেশের ধিক্কারের কথা। আমি তাহা স্বীকার করি না। স্বদেশের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহার নিজেকে চিনিবার সম্পূর্ণ শক্তি নাই ; যাহারা আপনার, তাহাদিগকে চিনিবারও শক্তি নাই ; যে শক্তিটুকু আছে, তাহার সম্যক্ প্রকাশেরও ক্ষমতা নাই। কালি যদি আমার দেশ গলা খুলিয়া বলিতে যাইত, আমার এই ভাঙা ঘরের দেওয়ালের ভিতর এমন প্রদীপ গুপ্ত আছে, যাহা জগতে আলো দিতে পারে, তাহা হইলে আমার দেশকে কিরূপ বিদ্রূপ ও অপমান সহিতে হইত, তাহা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু আজ যখন সেই জীর্ণ প্রাচীর ভিন্ন করিয়া স্বয়ংপ্রকাশ রবিজ্যোতিঃ আপনা হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই আলোতে সেই ভাঙা ঘরও প্রকাশ পাইয়াছে আজ সেই কুটীরবাসীদের আনন্দপ্রকাশের অবসর উপস্থিত। আজি আমরা অকুণ্ঠিত ভাবে জয়ধ্বনি দিব। আপনার জয় নহে— আপনার ‘সোনার বাংলা’র জয়— আপনার ‘ভুবনমনোমোহিনী’র জয়। বিধাতার হাতে আপনি যন্ত্রমাত্র— আপনাকে দিয়া বিধাতা এতকালের

এই অবমানিত জাতিকে জগতে প্রতিষ্ঠা দিলেন, আজি বিধাতার জয়। আপনার নিকট ঋণ প্রকাশের আজি অবসর নাই—সামাজিকতা লৌকিকতার নিয়মরক্ষার এখন সময় নাই। ভবিষ্যতের আশায় আজি প্রাণ উৎফুল্ল হইয়াছে। সেইজন্য আনন্দ করিব।

আপনি বহুবার আমাকে চিঠি লিখিবার সময় "সুহৃদ্বরেষু" এই পাঠে সম্বোধন করিয়াছেন ; আমি প্রত্যুত্তরে ঐ পাঠ ব্যবহারে সাহসী হই নাই, আজি তাহা ব্যবহারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৬
১৪ এপ্রিল ১৯১৪

৮ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
১লা বৈশাখ ১৩২১

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

নববর্ষারম্ভে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন।

কালনার ঘটনায়[১] দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায় জড়পদার্থ হইয়া বসিয়া আছি। এ ধাক্কার বেগ সমালাইতে কিছু দিন যাইবে।

আমার দত্ত সেই বালকটির[২] জন্য আপনাকে বিরক্ত করিতেছি। কয়েকমাস পূর্ব্বেই ব্রজেন্দ্রকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তখন স্থানাভাবে কোন সুবিধা হয় নাই। সম্প্রতি ব্রজেন্দ্র আমাকে পতিসর হইতে লিখিয়াছে,— সেখানে নূতন পদ খালি হইয়াছে। এখন তাহার প্রতি আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টি প্রার্থনীয়। ব্রজেন্দ্রের চিঠিখানি এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আমার কর্ম্মকথাখানির[৩] পাতা উল্টাইয়াছেন কি? শেষের প্রবন্ধটি ('যজ্ঞ') কোনও পত্রিকায় বাহির হয় নাই। অন্ততঃ ঐ প্রবন্ধটি একবার পড়িতে অনুরোধ করি। কর্ম্মকথায় প্রায় সমুদয় প্রবন্ধ naturalist ও evolutionist-এর তরফ হইতে লিখিয়াছি। যজ্ঞ প্রবন্ধটিতে একটু নূতন পথে চলিতে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত naturalism-এ কুলায় না দেখিয়া অন্য পথ আশ্রয় করিতে হইয়াছে। কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছি, বিচার করিবেন।

আমি আমার ঠিকানা বদলাইয়াছি। উপরে দেখিবেন।

১৩২০ সালটা পার করিলাম। কালনায় 'অঙ্গার অবশেষ' হইয়া গঙ্গাবারিস্পর্শে সদ্য চতুর্ভুজ বেশ প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তাহা যখন নিতান্তই ঘটিল না, তখন আরও কিছু দিন দৌরাত্ম্য করিব।

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৭
২৫ নভেম্বর ১৯১৪

৮ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
হ্যারিসন রোড ডাকঘর
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২১

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণ[১] আজিকার ডাকে পাঠাইলাম; একবার পাতা উলটাইবেন; কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ ইহাতে দিয়াছি; পঞ্চভূত, অতিপ্রাকৃত, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা। সাহিত্য পরিষদে মায়াপুরীটা পড়িয়াছিলাম, সেদিন আপনি উপস্থিত ছিলেন; আপনার সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠের ভাগ্য আমার বড় একটা জোটে না, সেই একদিন জুটিয়াছিল।

৫ই ভাদ্র সন্ধ্যার পর[২] আপনার দত্ত পুরস্কার মাথায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়াই শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম; সমস্ত ভাদ্রটাই শয্যাগত ছিলাম। আশ্বিন ও কার্ত্তিকের অর্দ্ধেক বাড়ীতে গিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিয়াছি; আবার কিছু দিন চলিবে। এইরূপে ঠেকো দিয়া যতদিন চলে চলুক।

সবুজ পত্রের সম্পাদক[৩] আমাকে একদিন আশা দিয়া গিয়াছিলেন, সবুজ পত্রে আমার 'কর্ম্মকথা'র আলোচনা করিবেন। তাঁহার হাতের আলোচনা দেখিবার জন্য উৎসুক আছি। সমালোচনাটা সম্মার্জ্জনার কাজ করিলেও আহ্লাদের সহিত পিঠ পাতিয়া দিব। আপনি একবার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন কি?

কর্ম্মকথার স্থানে স্থানে হিন্দুর সমাজতন্ত্রের প্রতি এক আধটু পক্ষপাতের কথা আছে— কিন্তু ওগুলা নিতান্তই অবান্তর কথা— প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কর্ম্মকথার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন

—মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিটা স্বভাবের নিয়মে— বাহির হইতে ঘাত প্রতিঘাতে— মানবসমাজে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে— কতটা গজাইতে পারে, অধিকাংশ প্রবন্ধে আমি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। Natural selectionকে নিংড়াইয়া কতটা ধর্ম্ম-রস আদায় করা যাইতে পারে, তাহাই দেখান আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। বিলাতে Evolution-তন্ত্রীরা যে পথে Ethics শাস্ত্র গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমি দেখাইয়াছি। Evolution হইতে সবটুকু পাওয়া যায় না। কর্ম্মকথার শেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞ'— এই প্রবন্ধটিতে আমি একটু নূতন পথে গিয়াছি। আপনি কর্ম্মকথা পড়িয়াছেন কি না জানি না— যজ্ঞ প্রবন্ধটি একবার সময়মত পড়িবেন কি? এই প্রবন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিয়াছি কি না তাহা কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম না।

ইতিমধ্যে আপনার কলিকাতা আসার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৮
৭ জানুয়ারি ১৯১৯

২৩শে পৌষ ১৩২৫
৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

কাল আমার কন্যা[১] ২৭ বৎসর বয়সে ছয় মাস রোগ ভোগের পর কোথায় চলিয়া গিয়াছে— ছয় মাস কি সে আসুরিক যাতনা

সহিয়াছে, তাহা কি লিখিব। পাষাণের মত বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছি —এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন প্রতিকার বা উপশম করিতে পারি নাই। বিশ্বব্যাপারের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি— নগ্ন মূর্ত্তি মরণের[১] সম্মুখে প্রণাম করিয়াছি। পরম কারুণিকের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া যে শান্তি, সে শান্তি লাভে আমি বঞ্চিত। চলিত ভাষায় আমি নাস্তিক। সে কথা তুলিয়া আমাকে প্রবোধ দিবেন না। নিজস্ব মরমের ব্যথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নাই— কিন্তু আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনি নিজে দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন— জগৎবিধানের অত্যাচারে বিশ্ব ব্যাপিয়া যে করুণ রোদন উঠিতেছে[১], আপনার হৃদয়ের তার তাহাতে যেমন ঝঙ্কার দিয়াছে আর কাহারও সামর্থ্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। নরদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার সমবেদনায় কখনও আমার বিশ্বাস নাই— বাল্যকালে যেদিন হইতে আপনার কবিতার আস্বাদন পাইয়াছি, আপনাতে নরদেবতার আবির্ভাব দেখিয়া নির্বাকভাবে আপনাকে পূজা করিয়া আসিতেছি। অপিচ আমার ভাগ্য যে আমি আপনাকে জানি— এবং আপনিও হয়ত আমাকে জানেন। অতএব নিঃসঙ্কোচে আপনাকে এই ব্যথা জানাইলাম। আপনি একটা উষ্ণ শ্বাস ফেলিবেন— তাহাতেই আমার পক্ষে যতটা সম্ভব শান্তি লাভ ঘটিবে।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

‘রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা

আমার শরীর ভাল নাই, আমার অবকাশও অল্প। রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে মনের মত করিয়া কিছু লিখিব এমন সুযোগ এখন আমার নাই। শুধু শ্রদ্ধা নহে, তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি সুগভীর ছিল, এ কথা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ কথা বলিবার লোক আরও অনেক আছে। যে কেহ তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, সকলেই তাঁহার মনীষায় বিস্মিত ও সহৃদয়তায় আকৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির, জ্ঞানের, চরিত্রের ও উদারহৃদয়তার এরূপ সমাবেশ দেখা যায় না। আমার প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার ঔদার্যের একটি অসামান্য প্রমাণ। আমার সহিত তাঁহার সামাজিক মতের ও ব্যবহারের অনৈক্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার চিত্তকে আমার প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই; এমন কি প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একদা আমার প্রশস্তিসভার আয়োজন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

বাংলার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না; কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা তাঁহার ছিল প্রভূত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয়বিচারে অথবা তাহার লেখন-প্রণালীতে অন্য কাহারও অনুবৃত্তি ছিল না।

দেশের প্রতি তাঁহার প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল; তাহা স্কুলপাঠ্য বিলাতী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত তৎকালীন কন্‌গ্রেস তোতাপাখী কর্তৃক উচ্চারিত বাঁধিবুলির দ্বারা পুষ্ট ছিল না। তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সংহত হইয়াছিল।

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাঁহাকে বারম্বার মর্মাহত করিয়াছে। তিনি যে সকল ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে পালন করিতেছিলেন তাহাতেও নানাপ্রকার বাধাবিরুদ্ধতা তাঁহাকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অজস্র মাধুর্য-সম্পদের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই— রোগ তাপ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহার প্রসন্নতা অম্লান ছিল। বিরোধের আঘাত তাঁহাকে গভীর করিয়া বাজিত, অন্যায় তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিত। কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে জানিতেন। সেই মাধুর্য সেই ক্ষমাই ছিল তাঁহার শক্তির প্রকাশ।

তিনি যদি কেবলমাত্র বিদ্বান্‌ বা গ্রন্থরচয়িতা বা স্বদেশপ্রেমিক হইতেন, তাহা হইলেও তিনি প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বভাবের যে একটি পূর্ণতা ছিল তাহারই গুণে তিনি সকলের প্রীতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এমন পুরস্কার অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

২৮ ফাল্গুন ১৩২৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী, 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা', চৈত্র ১৩৩০

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-যদুনাথ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের (১০ ডিসেম্বর ১৮৭০ —১৯ মে ১৯৫৮) প্রথম পরিচয় কী সূত্রে কোথায় হয়েছিল বলা যায় না। তবে যদুনাথের পিতা রাজকুমার সরকারের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। রাজকুমারের বাসস্থল রাজশাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রামে। এই গ্রাম দেবেন্দ্রনাথের পতিসর মহালের পার্শ্ববর্তী এলাকা। রাজকুমার ছিলেন রাজশাহী জমিদারসভার সম্পাদক। কলকাতায় এলে তিনি জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে রাজশাহী ব্রাহ্মসভার অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছিলেন।[১]

যদুনাথ ছাত্রাবস্থায় পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু তখন ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বলে জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪তে 'সাধনা'য় ছোটোগল্প লিখছেন সেই সময়েই সদ্য এম-এ পাস, রিপন কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ ইডেন হস্টেলের সুহৃদ সমিতির পত্রিকা. 'সুহৃদ'-এ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সম্বন্ধে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখেন "The New Leaven in Bengal"। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের যোগাযোগের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় যদুনাথের একটি রচনায়। "Sister Nivedita as I knew her"[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের বুদ্ধগয়া-ভ্রমণের বিববণ পাওয়া যায়। এই ভ্রমণে অন্যান্য সঙ্গী

---

[১] এই তথ্যের উৎস *Sir Jadunath Sarkar : A Centenary Tribute* published by the convener Sir Jadunath Centenary Meeting Committee on behalf of the Asiatic Society, Bangiya Sahitya Parishad & Calcutta Historical Society। তথ্যগুলি যদুনাথের আত্মীয় পরিজনদের থেকে সংগৃহীত।

[২] *Hindusthan Standard*, Puja Annual 1952

ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) পরবর্তী কালে স্বামী শঙ্করানন্দ নামে পরিচিত ব্রহ্মচারী অমূল্য। যদুনাথ তখন পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে তাঁদের ভ্রমণের সঙ্গী হবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কার পরামর্শে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। সম্ভবত যদুনাথকে নেওয়ার কথা জগদীশচন্দ্রই বলেন। পাটনা যাওয়ার আগে যদুনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে দুই বারে কাজ করেন, সে সময় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পবিচয় হয়েছে। ছাত্র হিসাবে কৃতী, ইতিহাসে পণ্ডিত হিসেবে সদ্যপরিচিত যদুনাথকে সঙ্গে নেওয়ার কথা জগদীশচন্দ্রই ভেবে থাকবেন। যদুনাথের প্রথম বই *India of Aurangzib* ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়, সে বই রবীন্দ্রনাথ দেখে থাকবেন। বুদ্ধগয়া-ভ্রমণকারীদের সঙ্গে যদুনাথ পাটনা থেকে যোগ দিয়েছিলেন।

যদুনাথ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জানিয়েছেন, তাঁরা মোহান্তের অতিথিশালায় থাকতেন। প্রতিদিনি ওয়ারেনের *Buddhism in Translation* এবং এডুইন আরনল্ডের *Light of Asia* থেকে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ কখনো গান গাইতেন, কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন। সেখানে এক জাপানি ভক্তকে তাঁরা দেখেছিলেন, তার নাম ফুজি। তিনি ছিলেন সামান্য জেলে, কিন্তু ভগবান বুদ্ধের পুণ্যতীর্থে তপস্যা করবার জন্য এসেছেন। প্রতিদিনি সন্ধ্যায় বোধিবৃক্ষের ছায়ায় বসে স্তবমন্ত্র পড়তেন :

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম চন্দিমায়
নমো নমো নন্ত গুণন্নবায়
নমো নমো সাক্যনন্দনায়।

এই প্রসঙ্গে যদুনাথ লিখছেন :

It interests me to think that Rabindranath remembered this hymn, and when he wrote his play Natir Puja he took care to insert it as Shrimati's prayer— Fuji had given the hint.

রবীন্দ্রনাথ এই জাপানি ভক্তের কথা অন্যত্রও স্মরণ করেছেন : 'দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা কবতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি কবতে লাগল : আমি বুদ্ধেব শরণ নিলাম।'[১]

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে যদুনাথ বুদ্ধগয়ায় কাটানোর ফলে দুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল— এ বন্ধুত্ব ববীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যদিও মাঝে দু-একবাব সংশয়েব আবিলতাও দেখা গেছে। বুদ্ধগয়া-ভ্রমণের পরের বছরই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে রাখী পাঠিয়ে দেন।

১৯০১-এর জুলাই মাস থেকে ওই বছবেব ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২৬-এব পূর্ব পর্যন্ত যদুনাথের কর্মক্ষেত্র কলকাতা ছিল না। এর মধ্যে দু-বছর তিনি ছিলেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৭-এর অগস্ট থেকে ১৯১৯-এর জুন পর্যন্ত। তার পরই ইন্ডিয়ান ইম্পিরিয়াল সারভিসে উন্নীত হয়ে তিনি কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে চলে যান, ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। তার পর আবার তিনি ফিরে আসেন পাটনায়। যদুনাথকে লেখা

---

[১] কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণ। দ্রষ্টব্য, 'বুদ্ধদেব', ১৩৬৩, পৃ ২।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি যথাযথ বোঝবার জন্য যদুনাথের স্থানপরিবর্তনগুলি মনে রাখলে ভালো হয়। রবীন্দ্রনাথের ২ জুলাই ১৯২২-এর চিঠি (সংখ্যা ১৫) যদুনাথ পেয়েছিলেন দার্জিলিঙে ৬ জুন। সে-সময় থেকেই তিনি দার্জিলিঙে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ ছেড়ে তিনি ১৯২৮ থেকেই স্থায়িভাবে দার্জিলিঙে বাস করতে থাকেন।

ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের পরিচয়ের সূত্রপাত থেকেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের লেখা যদুনাথ অভিনিবেশ সহকাবে পড়তেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক; ১৯০৮ খৃস্টাব্দ থেকে তিনি ইতিহাসেও অধ্যাপনা করতে থাকেন যদিও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ ১৯০১ সালেই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের তিনি ছিলেন রসিক পাঠক যদিও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী হেমচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যেই তিনি দীক্ষিত ছিলেন। যখন রবীন্দ্রনাথের 'সোনাব তবী' কবিতার অর্থ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে, তখনই যদুনাথ প্রবাসীতে 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন :

'রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ("সোনাব তরী"কে এ ভাবেব শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল।) এই ভাবগুলি আমাদের পুবাতন-স্মৃতি-অভ্যস্ত ভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষেই নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা কবা যায় না।...

শেলী ব্রাউনিং এমার্সনও আজকাল বেশী পড়িয়া পড়িয়া অতি পুরাতনের মত সহজ বোধ হয়। আমাদের দেশের সমালোচকেরা যদি ভাব-বিকাশ তাঁহাদেব কর্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের নূতন

ধরণের কবিতাগুলি পাঠকসমাজে বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িত।"[১]

পরবৎসর প্রবাসীতেই তিনি "দুই রকম কবি : হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে দুই কবির বিভিন্ন প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন।[২] হেমচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন না করেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎকর্ষ নিঃসংশয়রূপে বিশ্লেষণ করেন। অবশেষে বলেন 'এরূপ বর্ণনায় রবীন্দ্র অদ্বিতীয়। এর পাশে "হেম-নবীনের নাইকো জারিজুবি"। তাঁহাদের বর্ণনা যেন Conventional বোধ হয়।' এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে যদুনাথের রসগ্রাহিতা প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের সম্পর্কেও তাঁর গভীর রসপ্রতীতির নিদর্শন আছে। যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের গল্পেরও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর অনেক আগে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি The New Leaven in Bengal নামে রবীন্দ্রনাথের গল্পের আলোচনাও করেন।

১৯১০-এর ফেব্রুয়াবি মাসে ভাগলপুবে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে যদুনাথ উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনে ববীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাব নোট নেন যদুনাথ এবং ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁদের নোট অবলম্বনে খগেন্দ্রনাথ মিত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সংকলন করেন। প্রবাসীতে (চৈত্র ১৩১৬) সেটি প্রকাশিত হয়।[৩]

---

[১] প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৩

[২] প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৪

[৩] প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৬, পৃ ৯৬৯-৭২। সংকলিত ভাষণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় প্রসঙ্গত খগেন্দ্রনাথ লেখেন 'যাঁহারা সেদিন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রবাবুর ওজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা সেই কাব্যসম্পদে অতুল, জীবন্তভাবে অনুপ্রাণিত বক্তৃতার এই দীন সংস্করণে প্রীত হইবেন— এ আশা আমার নাই।'

১৯১০-এ রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথের পত্রালাপ শুরু হওয়ার আগে থেকেই তৎকালীন সাহিত্যিক বিতর্কে যদুনাথ যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করলেন, আবার প্রায় তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্ররচনার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি লেখেন :

'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির অনেকেরই ইংরেজী অনুবাদ করিয়া আমি Modern Review পত্রিকায় প্রকাশ করি তাহার তালিকা নীচে দিলাম। এগুলির গ্রন্থাকারে মুদ্রণ অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ বঙ্গের বাহিরের জগৎ বাঙ্গালা না জানার জন্য প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে চিনে না, ইংরেজীর ভিতর দিয়াই তাঁহার চিন্তা বিশ্বমানবের নিকট পৌঁছানো সম্ভব। লণ্ডনের একজন সাহেব প্রকাশক এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশের ও বিক্রয়েব ভার লইতে সম্মত হইয়া আমাকে পত্র লেখেন, কিন্তু এই সময়ে আমি, চাকরীর ঝঞ্ঝাটে ও পারিবারিক শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি।'

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের যে-সব বচনার অনুবাদ করেছিলেন[১] :

1.	The Philosophy of Indian History [ভারতবর্ষের ইতিহাস]	Dec.	1910	pp. 628-32
2.	Sakuntala : Its inner meaning [শকুন্তলা]	Feb.	1911	pp. 171-75
3.	The Future of India [পূর্ব ও পশ্চিম]	March	1911	pp. 238-44

---

[১] এই তালিকা যদুনাথেরই দেওয়া। অথচ মডার্ন রিভিউর মুদ্রিত প্রবন্ধের প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধে লেখক হিসাবে নাম দেওয়া আছে S. D. Varma সম্ভবত যদুনাথের ছদ্মনাম।

4. The Rise and Fall of the Sikh Power [শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ]	April	1911	pp. 334-38
5. Impact of Europe on India [নূতন ও পুরাতন]	May	1911	pp. 498-502
6. The Impact of Europe in India [নূতন ও পুরাতন]	July	1911	pp. 93-97
7. Beauty and Self-Control [সৌন্দর্যবোধ]	Sept.	1911	pp. 225-27
8. The Victorians in Defeat [জয় পরাজয়]	Dec.	1911	pp. 560-65
9. India's Epic [রামায়ণ]	Mar.	1912	pp. 237-40
10. Woman's Lot in East and West [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]	June	1912	pp. 573-79
11. The Supreme Night [একরাত্রি]	June	1912	pp. 579-83
12. Adamant [মহামায়া]	Dec.	1912	pp. 571-73
13. The River Stairs [ঘাটের কথা]	Oct.	1912	pp. 340-45
14. The Springhead of Indian Civilization [তপোবন]	Dec.	1912	pp. 563-67
15. Communal Life in India [স্বদেশী সমাজ]	June	1913	pp. 655-61

16. My Interpretation of Indian History Aug. 1913 pp. 113-18
[ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা]
17. Kalidas, the moralist Oct. 1913 pp. 347-49
[কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা]
18. Tagore's Ballads Apr. 1913 pp. 381
Poems : His Vow [পণরক্ষা]
The Voteress [পূজারিনী]

১৯১৯-এর ১২ এপ্রিল সি. এফ. অ্যান্ডরুজ যদুনাথকে এই অনুবাদগুলি বিলাতের পুস্তক প্রকাশককে দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন। অ্যান্ডরুজের চিঠি উদধৃত হল :

Santiniketan
Ap. 12. 1919

My dear Jodu Babu,

I have been very much impressed (on going through the file of the old Modern Review) with your translation from Gurudev's Bengali works and their permanent value both for English and for Indian readers if collected and revised.

If you were able to do this collection and revision [in] this hot weather and make them up into a complete book— with possibly one or two important new translation such as Gurudev might suggest— I should be most glad to assist you in any way I could by suggestions as to the needs of the English reader in England and also to recommend strongly Macmillan to publish the book if you could wish it.

I have spoken very strongly about this to Gurudev and he is very pleased with the suggestion. More and more in England there is the demand for more accurate knowledge of

India and I feel certain that the book would take. The Oxford University Press has shown how great the demand is by its publication of 'histories' and different series.

Could you write to me your opinion on the matter?

Yours very sincerely
C. F. Andrews.

যে-সময় যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ করছেন, সেই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন আসতেন এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের কাছে ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা করতেন।[১] ২-সংখ্যক পত্র ও তার টীকা দ্রষ্টব্য। যদুনাথ শান্তিনিকেতন শিক্ষাশ্রমের আদর্শেব অনুবাগী ছিলেন তার প্রমাণ তিনি বিখ্যাত মারাঠি ঐতিহাসিক-বন্ধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামকান্তকে ছাত্ররূপে শান্তিনিকেতনে যোগ দিতে প্রণোদিত করেছিলেন। শ্যামকান্ত তিন বৎসব এখানে পড়াশুনা করে ১৯১৬তে ম্যাট্রিক পাস করে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি যদুনাথ যে অনুরক্ত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর সেকালে মডার্ন বিভিউতে প্রকাশিত প্রবন্ধেও আছে। ১৯১৮ সালে 'The Vernacular Medium : Views of an Old Teacher" নামে প্রবন্ধে প্রসঙ্গত যদুনাথ লেখেন :

The other party, whose chief exponent was the poet Rabindranath Tagore, held that by tecahing Mathematics, History, Science and Geography in our Mother tongue we can not only secure greater thoroughness but also effect a reduction of the time so saved may be used in giving the boys a more thorough

---

[১] শান্তিনিকেতনের শিক্ষক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েব 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' (পৌষ ১৩১৯)-এর ভূমিকা এ-সময়েই লেখেন।

knowledge of English. Thus according to him the vernacular medium would ensure a deeper knowledge of things and of the English language also at the same time.[১]

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের গভীর সৌহার্দ্যের ফলে যদুনাথ যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও আদর্শের ব্যাখ্যাতা হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও যদুনাথের বিচারবোধ ও মননশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন। ১৩১৮ (অর্থাৎ ১৯১১)-তে প্রবাসীতে আষাঢ় সংখ্যায় 'অচলায়তন' নাটকটি প্রকাশিত হয়। তার প্রথম পাতার পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ নাটকটি যদুনাথকেই 'আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ' উৎসর্গ করেছিলেন।

পরবৎসর গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই উৎসর্গটি ছিল না। না থাকার কারণ অবশ্যই মনোন্তব নয়। কারণ অন্তত ১৯২২-এব পূর্ব পর্যন্ত এর কোনো প্রমাণ নেই ববং ১৯২১-এ বিদেশ থেকে ফিরে এসেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী পরিকল্পনা নিয়ে যদুনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে ব্যাকুল হয়েছেন দেখতে পাই। ১৯১৮তে স্যাডলার কমিশনের প্রশ্নের উত্তর যদুনাথের সঙ্গে পরামর্শ করেই লিখতে চান, তাও দেখা যায়।

দুজনের এই অব্যাহত সৌহার্দ্য আকস্মিক ভাবেই বাধাগ্রস্ত হয় বিশ্বভারতীব বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাব প্রাক্‌কালে। এ বিষয়ে ১৫-সংখ্যক পত্র এবং তার টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯২৬ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯২৮-এর ৭ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকার সম্পর্কে কিছু অনুযোগ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চিঠি লেখেন। তিনি বলেন:

---

[১] *Modern Review*, January 1918, p 4.

'তিনি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অবধি চিরকাল ছেলে-পড়ানো ব্যবসাতেই এতকাল কাটিয়েছেন, অর্থাৎ বাঁধা নিয়মের পুনরাবৃত্তি করেছেন ও উপরওয়ালাদের হুকুম মেনে চলেচেন। সেইজন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি মৃত পদার্থের মতোই ব্যবহার করেচেন— নিজের চিত্ত থেকে তাকে কিছুই দিতে পারেন নি, বরঞ্চ তার ক্ষয় সাধন করেচেন।'[১]

১৯২৮-এর মার্চ মাসে যদুনাথ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Sir William Meyer বক্তৃতা দেন। সেটি *India Through the Ages*[২] নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাতে যদুনাথ আধুনিক যুগে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছিলেন। যদুনাথ বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আন্দোলন উনিশ শতকে রাশিয়ার আন্দোলনের অসচেতন অনুকরণ। তিনি ওই আলোচনা শেষ করেছিলেন এই বলে :

It is incorrect to call it a Hindu revival. It is really a cosmopolitan movement which aims at bringing all humanity together and hence the Eastern poet's appeal has found a response in some of the noblest hearts of the west.[৩]

যদিও এই মন্তব্যে ক্ষোভের কোনো কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না, তবে উপনিষদের সঙ্গে খৃস্টীয় তত্ত্বের মিশ্রণের কথা বলাতেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ নতুন করে জেগে ওঠে।

---

[১] সমগ্র চিঠিখানির জন্য চিঠিপত্র ১২, পৃ. ১১৩-২০ দ্রষ্টব্য

[২] প্রথম প্রকাশ ১৯২৮

[৩] দ্রষ্টব্য "Rabindranath Tagore's 'World Mission of India' ", *India Through the Ages* (1993), pp. 76-77

অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে এই পত্র প্রকাশিত হয় নি— 'আপনি ওটা ছাপতে চান না শুনে আমি আরাম বোধ করলুম।'[১]

এই সাময়িক বিরূপতা রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে নি। যদুনাথ সরকারের ঘনিষ্ঠ প্রিয় ছাত্র ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন :

> Jodunath suffers from a sort of lofty loneliness of spirit, which is his own creation. For Rabindranath Jadunath perhaps had esteem and affection bordering on sentiment.[২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংবর্ধনায় আশীর্বাদ পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে, সেটি ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির
ফোন ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বড়বাজার ৫৫৫৫ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ দিবস ২রা ভাদ্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই পরিষদের আরম্ভ হইতে সদস্য আছেন, এবং বহুকাল বহু কমিটি ও অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া,

---

[১] বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১২, পৃ ৪৯০-৯২

[২] Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar (Panjab University, 1958) p. 54.

সভানেতৃত্ব করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে কাজ সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রচার এবং বঙ্গভাষায় মূল্যবান সাহিত্যসৃষ্টি কার্য্যে তাঁহার আজীবন শ্রম অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত করিয়াছে, সে আজ অনেক দিবস হইল।

আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর আমরা এই মন্দিরে হীরেনবাবুকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমাদের অনেক দিনের মনের বাসনা পূরাইতে চাহি।

এই শুভক্ষণে আপনার আশীর্বাদ বাণী পাইলে আমরা পরম উৎসাহিত হইব। আশা করি আপনাকে অযথা ক্লেশ দিতেছি না।

নিঃ ইতি
বশম্বদ
শ্রীযদুনাথ সরকার
সভাপতি।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ

পত্র ১। ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে এর কিছু অংশ আসামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে। ঘোষণার সময় থেকেই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ সালের জুন মাসে অর্থাৎ ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয় তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আন্তরিক ঐক্য উদবেল হইয়া উঠিবে।'[১]

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ অক্রূর দত্ত লেনে সাবিত্রী লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিহারীলাল সরকার, শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ। এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, যদি ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাজন কার্যে পরিণত হয় তবে বঙ্গদেশের পূর্ব ও পশ্চিমের বাঙালিরা ওই দিনটিকে ঐক্যদিবস হিসাবেই স্মরণ

---

[১] রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট, পৃ ৬১৬

করবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি প্রস্তাব করেন ওই দিন বাঙালিরা পরস্পরের হাতে হলুদ রাখী বেঁধে দেবে।

অতঃপর বঙ্গদর্শন কার্তিক ১৩১২তে প্রবন্ধটি পূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

'আগামী ৩০ আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বব যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙলার রাখিবন্ধনের দিন কবিযা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতা বাঁধিযা দিব। রাখী-বন্ধনের মন্ত্রটি এই : ভাই ভাই এক ঠাঁই। ভেদ নাই ভেদ নাই।'

এই মন্ত্র ও ববীন্দ্রনাথ-রচিত রাখী-সংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' একটি কার্ডে মুদ্রিত করে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এরূপ একটি কার্ড যদুনাথকে প্রেবণ করেন। পত্রীটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল : বন্দে মাতরম। / এক দেশ এক ভগবান / এক জাতি এক মনপ্রাণ। তৃতীয় পৃষ্ঠার (যা বর্তমান গ্রন্থে ১-সংখ্যক চিঠি রূপে ছাপা হল) '... যুক্ত যদুনাথ সরকার' এবং ...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' অংশ ববীন্দ্র হস্তাক্ষরে। তৃতীয পৃষ্ঠার বর্ধিতাংশে ডানপ্রান্তে ৩০শে আশ্বিন ১৩১২/১৬ই অক্টোবব/১৯০৫। চতুর্থ পৃষ্ঠায "বাংলার মাটি, বাংলার জল" গানটিব ১৬ পঙক্তি এবং প্রচারস্থান রূপে মুদ্রিত ছিল : ভাণ্ডাব/৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

গানটি বাখীবন্ধন উপলক্ষে বচিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব 'ঘরোয়া' (১৩৪৮), পৃ ১৭। রবীন্দ্রভবনে বক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে 'বাংলার বায়ু'র পবিবর্তে 'বাংলার হাওয়া' পাঠ, অবশ্য প্রথম মুদ্রিত রূপ 'বাংলার বায়ু'। দ্রষ্টব্য ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২, ২য় ভাগ, পৃ ২৩৭ এবং বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১২, পৃ ৩৫২।

পত্র ২। এই সময়ে যদুনাথ পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে মাঝে মাঝে আশ্রম বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে যেতেন।

১ এ বিষয়ে যদুনাথ-প্রদত্ত টীকা— 'আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করি যে কথা (প্রথম সংস্করণের) ঐ কটি ব্যালাড লিখিয়া তিনি কেন ক্ষান্ত হইয়াছেন, ওগুলি ত অতি উপাদেয় এবং যে কোনো সাহিত্যেই অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি উত্তর করিলেন বৌদ্ধ অবদান টডের রাজস্থান প্রভৃতি আধার গ্রন্থ তিনি ব্যবহার করিয়া শেষ করিয়াছেন; ফর্বস সাহেবের রচিত *Ras Mala or the Hindoo Annals of Goozerat* [১] হইতে কতকগুলি ঘটনা লইয়া

---

[১] রাসমালা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী আলেকজাণ্ডার কিনলক ফরবেস-লিখিত গুজরাট প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস। অনেকটা টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড আণ্টিকুইটিস' গ্রন্থের অনুরূপ রীতিতে ইতিহাস কিংবদন্তী মিলিয়ে লিখিত। ১৮৭৮-এ প্রকাশিত 'নূতন সংস্করণ' *Rasmala* রাসমালা*or Hindoo Annals of the Province of Goozerat in Western India* (1878) গ্রন্থের ভূমিকায় মেজর জে. ডবলিউ. ওয়াটসন এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

> Though professing to be a mere collection of legends or garland of chronicles, the Rasmala is in fact the first and most important epitome of the history of Goozerat hitherto made. It is a work of a profound and accurate scholar, provided by a thorough and intelligent sympathy with the people whose historical phases and domestic life he has in this work so vividly depicted.
>
> When, too, we consider the vastness of the field of time comprehended in the single volume, streching as it does from the days of the half fabulous monarchs of Wullabhee to the middle of the nineteenth century after Christ, it must be conceeded that Mr. Forbes has most ably acquitted himself of the interesting task.

অক্স্ফোর্ড থেকে রাসমালার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৪-এ। স্পষ্টতই যদুনাথ রাসমালার দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন।

আরও কটি ব্যালাড লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ বইখানা এখন হারাইয়া গিয়াছে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে 'জয় পরাজয়' গল্পের নায়ক কবিশেখরের নামটি ঐ রাসমালা হইতে লওয়া। তখনও অক্সফোর্ড ছাপাখানা রাসমালা পুনর্মুদ্রণ করে নাই; কিন্তু আমার কাছে যে পুরাতন সংস্করণ ছিল তাহাই রবীন্দ্রনাথকে ডাকে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তিনি আরও নূতন ব্যালাড লিখিবেন, আমাদের এ আশা পূর্ণ হইল না, কেন হইল না তাহার কারণ এই পত্রে দিয়াছেন।'

—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৫২, পৃ ৩৯৩

২ এ বিষয়ে যদুনাথ জানান, 'আমি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ জৈন হিন্দু ও মুসলিম সৌধ ও দৃশ্যের প্রায় একশত ম্যাজিক ল্যান্টর্ন স্লাইড নিজের খরচে প্রস্তুত করাইয়া শান্তিনিকেতনে উপহার দিই এবং এই পত্রের পূর্বকার বোলপুর-প্রবাসের সময় তাহার কতকগুলি দেখাইয়া ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করি।' কবি উপস্থিত ছিলেন।

৩ অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম যুগের শিক্ষক রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা। ১৯১০ খৃস্টাব্দে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি নিয়ে বিলাতে যান। তখন ম্যানচেস্টারে দর্শন ধর্মতত্ত্ব পড়াবার জন্য একটি কলেজ ছিল। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে এই কলেজ স্থাপিত হয়, পরে ১৮৯৮তে অক্সফোর্ডে সেই কলেজ স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ছিলেন এই কলেজে অধ্যয়নার্থীর নির্বাচক। রবীন্দ্রনাথ প্রসন্নকুমারের কাছে অজিতকুমারকে সুপারিশ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদ বিলাতে প্রচারিত হওয়ার আগেই অজিতকুমার-কৃত কিছু কিছু অনুবাদ বিলাতে প্রচারিত হয়।

পত্র ৩। ১ দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাদর্শের প্রভাবে অরুণচন্দ্র বিবাহবিমুখ হয়ে পড়ে— দীনেশচন্দ্রের এমন একটি ধারণা জন্মে। দীনেশচন্দ্র অরুণচন্দ্রকে বিবাহ দিতে চান, কিন্তু স্বাবলম্বী না হয়ে তিনি বিবাহ করতে সম্মত ছিলেন না। ফলে অরুণচন্দ্র গৃহত্যাগ করে গিরিডিতে চলে যান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আর তার সন্ধান করতে অরুণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিরণচন্দ্র এবং ভগ্নীপতি কুলদাপ্রসাদ সেনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন।

অরুণচন্দ্র পাটনায় যেতে পারে এই ভেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পাটনায় যদুনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন।[১] অরুণ-প্রসঙ্গে চিঠিপত্র দশম খণ্ডের বিভিন্ন পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪। ১ রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩০৯-এ প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। যদুনাথ-কৃত এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ Sakuntala : Its Inner Meaning নামে মডার্ন রিভিউ ফেব্রুয়ারি ১৯১১তে প্রকাশিত হয়।

---

[১] এ বিষয়ে বিস্তৃততর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, খণ্ড ৬, ১৯৯৩, পৃ ১৫৮ এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী খণ্ড ২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ২৯৩

যদুনাথ জানান 'ঐ বৎসর ঐ বিষয়ে আমার আর একটি অনুবাদ Beauty and Self-Control নামে September 1911 সংখ্যায় (pages 225 etc) বাহির হয়।' শকুন্তলার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন এক অজানা লেখক The Sakuntala — A Review নামে ১১-১৮ ডিসেম্বর ১৯০১-এর *New India* পত্রিকায়— এ তথ্য জানিয়েছেন, প্রশান্তকুমার পাল। দ্র রবিজীবনী ৬, .পৃ ১৮৩।

২ বর্তমান পত্র লেখার দুদিন পর ৬ অক্টোবর ১৯১০-এ বিদ্যালয়ের পূজাবকাশের আরম্ভ হয়। পত্র লেখার দিন অর্থাৎ ৪ অক্টোবর বালকছাত্রেরা বিসর্জন অভিনয করে। ৫ অক্টোবর বড়ো ছেলেরা অভিনয করে প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তে রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় এটি প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় অভিনয়, প্রথম অভিনয হয় ১৩১৭ বৈশাখে।

এ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৪ সংখ্যক-পত্র দ্রষ্টব্য— 'আমার এই সব ছেলেদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্বল— এরা আমাব সংসারপক্ষেব ছেলে নয়, দ্বিতীয় পক্ষেব ছেলে— সেইজন্য এদের জোর বেশি— এরা চেপে ধরলেই আমার পথ বন্ধ।'

পত্র ৫। ১ এ-বিষয়ে যদুনাথ জানান—

'বেলজিয়ম ও লুকসেমবুর্গে ছাপান ভারত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পিকচার পোস্টকার্ড প্রায় তিনশত বম্বেতে কিনিয়া আমি শান্তিনিকেতনে দান করি।'

২ রবীন্দ্রনাথ এবারকার শারদীয় অবকাশ শিলাইদহে কাটিয়েছেন। আশ্বিনের শেষে তিনি এখানে এসেছেন। ছিলেন কুঠিবাড়িতে।

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে শিলাইদহকেই কর্মক্ষেত্র করে নিয়েছেন। জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং কন্যা মীরাদেবীও সেখানে। রথীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ শিলাইদহে কৃষিগবেষণাকেন্দ্র করবেন —এরকম পবিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ কন্যা-জামাতাদের নিয়ে সেখানেই ছুটি কাটাবেন স্থির করেছেন।

পত্র ৬। ১ এই খৃস্টমাসটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় এবারই প্রথম শান্তিনিকেতনে খৃস্টোৎসব পালিত হয়। ববীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে পাঠ করেন 'যীশুচরিত'।

এ বছব এলাহাবাদে কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনে বসে। উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন সভাপতি ছিলেন। জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি অধ্যাপকের কংগ্রেসের একজিবিশন দেখার জন্য এলাহাবাদ যাওয়ার কথা হলেও তাঁদের যাওয়া হয নি। অকস্মাৎ এক জনরব উঠল যে এলাহাবাদে প্লেগ দেখা দিযেছে। একমাত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ই একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন।[১]

২ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয় মুর্শিদাবাদে ১৩১৩ সালের কার্ত্তিক মাসে, এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে স্থায়ী কববার জন্য ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে খসড়া নিয়মাবলি পেশ করা হয়। পরবর্তী ময়মনসিংহ অধিবেশনে ওই নিয়মাবলি সংশোধিত ও গৃহীত হয়।

ময়মনসিংহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১–৩ বৈশাখ ১৩১৮। সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মিলনে

---

[১] রবীন্দ্রজীবনী ২, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃ ৩০৯-১০

যান নি। বর্ষশেষ ও নববর্ষ উদ্‌যাপন তিনি শান্তিনিকেতনেই করেন।

পত্র ৭। ১ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের মনে এখানে একটি কলেজ স্থাপনের অভিলাষ জাগে। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন :

'বোলপুরে কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করিয়া দেখিব।'

—চিঠিপত্র ১২, পত্র ৬

শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনান্তে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। আশুবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলাম বাড়িঘর তৈরি করিতে যে টাকার প্রয়োজন সে আমাদের সাধ্যাতীত— অতএব সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।'

—শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

অবশেষে ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবন অর্থাৎ কলেজ স্থাপনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন ইচ্ছা পূর্ণ হয়। শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে যে বিস্তৃত আয়োজন হয়েছিল তার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৯ ও ৩০-সংখ্যক পত্রের টীকা।

পত্র ৮। ১ এটি শারদোৎসবের দ্বিতীয় অভিনয়। অভিনীত হয় ৬ আশ্বিন। রবীন্দ্রনাথ এতে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শারদোৎসব রচিত হয় ভাদ্র ১৩১৫তে। সেই বৎসরেই পূজাবকাশের পূর্বে এর প্রথম অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ এতে অভিনয় করেন নি, কিন্তু অনুকথকের কাজ করেন।

পত্র ৯। ১ বিলাত থেকে ফেরবার সময় জাহাজে জনৈক মিশনারির ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। পাদ্রিটি উপাসনার ভাষণে ভারতীয় সমাজকে অশিষ্টভাবে আক্রমণ করে। কালীমোহন ঘোষ অবশ্য তার প্রত্যুত্তর দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৩তে বোম্বাইয়ে অবতরণ করে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা করেন। এলাহাবাদের *The Pioneer* পত্রিকায় সম্ভবত এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৭ নভেম্বরের পায়োনিয়রে এর উত্তর দেন। এ প্রসঙ্গে ওই পত্রিকায় আবার যে মন্তব্য করা হয় যদুনাথ তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।[১]

এই পত্ররচনার দিনটি লক্ষণীয়। ২৩ নভেম্বর ১৯১৩তে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে পাঁচশত বিশিষ্ট ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত কবিকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য আসেন।

২ অচলায়তন নাটকটি রচিত হয় আষাঢ় ১৩১৮তে। প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় মুদ্রণকালে নাটক যদুনাথ সরকারকেই উৎসর্গ করা হয়, তারিখ : শিলাইদহ আষাঢ় ১৩১৮। উৎসর্গের ভাষা এই :

---

[১] দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ৬, পৃ ৪৩২

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম।

পরবর্তী বৎসর ১৯১২তে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন কিন্তু উৎসর্গ পত্রটি ছিল না। না থাকাব কোনো বিশেষ কাবণ ছিল বলে মনে হয় না। দেখা যাচ্ছে, তার পরেও উভয়ের প্রীতির সম্পর্ক এবং পত্রালাপ অব্যাহত ছিল।

পত্রে অচলায়তন অভিনয়ের সম্ভাবনার কথা থাকলেও এবারের পৌষ উৎসবে এই নাটকের অভিনয হয় নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে যদুনাথ আশ্রমে এসেছিলেন এবং সকালেব সভায ম্যাজিক ল্যান্টর্ন সহযোগে অজন্তা গুহা সম্পর্কে বলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শান্তিনিকেতনে ১৩২১ এর ২৫ বৈশাখে অচলায়তনের প্রথম অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

পত্র ১০। পত্রটি তারিখহীন। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে নেই। পত্রের বিষযবস্তু থেকে তারিখ অনুমান করাও সম্ভব নয়। যদুনাথেব সম্পাদনায় প্রবাসী পত্রিকায (ফাল্গুন ১৩৫২) প্রকাশিত পত্রের বিন্যাস এখানে অনুসরণ করা হয়েছে।

পত্র ১১। ১ এ বিষয়ে যদুনাথ জানান : পাটনায় যে হেমচন্দ্র লাইব্রেরি ও বাঙ্গালা সাহিত্যসভা আছে, তাহার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একবার পাটনা আনাইয়া স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীদের সহিত তাঁহাকে পবিচিত করিয়া দিতে চাই; উনি কতকটা সম্মত হন। উঁহাব একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ আনিযা কলিকাতায় ৩০০ খানা প্রিন্ট প্রস্তুত করাইয়া আমার কাছে রাখি, ঐ সম্মেলনে বিতরণ করিবার

জন্য। সে সভা আর আমার সময়ে হইল না। কয়েক বৎসর পরে বদলি হইবার সময় ঐ সুন্দর ছবিগুলি এমনি বিতরণ করিয়া দিলাম।

—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃ ৩৯৫

পত্র ১২। ১ পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থমালা প্রকাশের মূল পরিকল্পনা ছিল রামানন্দের। দ্রষ্টব্য প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ৩৮৩। রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য যদুনাথ রামানন্দ প্রভৃতিকে জোড়াসাঁকোব বাড়িতে আমন্ত্রণ কবেন। এই আমন্ত্রণের উল্লেখ রামানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৫১-সংখ্যক পত্রে আছে। এই আলোচনায় স্থির হয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ছয় ভাগে বিভক্ত হবে এবং ববীন্দ্রনাথ হবেন প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহক। সাধারণ সম্পাদক হবেন যদুনাথ। তিনি এ বিষয়ে প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৪-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাতে জানানো হয় :

> বর্তমান যুগে সকল সভ্যজাতির সমবেত চেষ্টায জ্ঞানের বিষয় সকল ব্যাপ্তি গভীরতা ও সূক্ষ্মতায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই জ্ঞান জনসাধারণের পক্ষে সুগম করিবার জন্য ইউবোপীয় ভাষায অনেক সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বিষয়ে নবতম তথ্যে পূর্ণ পণ্ডিতদেব উপযোগী গ্রন্থ ছাড়া সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য প্রাণালীতে রচিত অথচ আধুনিক উচ্চজ্ঞানপ্রদ অনেক ছোট পুস্তক ও পর্যাযবদ্ধ গ্রন্থাবলী সর্বত্রই পাওয়া যায়। তদুপরি পণ্ডিতেরা সাংসারিক লোক ও শ্রমজীবীদিগের অবসরকালীন শিক্ষার জন্য সরল ভাষায় বিশ্ববিদ্যাপ্রসারিণী বক্তৃতা (University Extension Lectures) প্রদান করিয়া এই সব নবজ্ঞান কলেজের বাহিরে বিতরণেব উপায় করিযা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই নাই। অথচ, ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এই নবোন্মেষশালী জ্ঞানের অধিকার অধিকতর আবশ্যক, কারণ ইহারই অভাবে ভারতের জনসাধারণ ইউরোপের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতীয় দেশীয় ভাষার সাহিত্য অনেক স্থলে এখনও মধ্যযুগের ইউরোপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতকে বিশেষ চেষ্টায় অল্পসময়ের মধ্যে দীর্ঘকালের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্তমান যুগের কঠোর জীবনসংগ্রামে নব্যতম জ্ঞানের পথ্যে বঞ্চিত ভারতীয় জনসাধারণ মুমূর্ষতা প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তি সরল মাতৃভাষায় রচিত সদ্‌গ্রন্থের দ্বারা ভারতময় সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে।

এইজন্য বাঙ্গলায় এবং পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় “বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ” নামে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা Home University Library এবং Cambridge Mannuals of Science and Literature -এর আদর্শে রচিত হইবে।

বিভাগগুলি ও তাহাদের সম্পাদকগণ

ক) দর্শন (সম্পাদক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং ডাক্তাব নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

খ) বিজ্ঞান (সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ)

গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি (সম্পাদক শ্রীযদুনাথ সরকার)

ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভাষা (সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)

ঙ) কলা (সম্পাদক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চ) শিক্ষাবিজ্ঞান (অস্থায়ী সম্পাদক স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এ ছাড়া এই প্রতিবেদনে গ্রন্থপ্রকাশের নিয়মাবলী এবং ইতিহাস বিভাগের প্রকাশযোগ্য গ্রন্থগুলির একটি তালিকাও দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদনটি 'যদুনাথ সরকার, সম্পাদক' এই স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়।

'বিশ্বগ্রন্থ' সম্পর্কে যদুনাথ-প্রদত্ত টীকা :

'গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স এর স্বত্বাধিকারী হরিদাসবাবুকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজ তাঁহাদের আট আনা সংস্করণের মতন প্রকাশ করিতে সম্মত করি এবং আমার আলোচনার ফল কবিকে জানাই। প্রথম প্রস্তাবিত সিরিজের একটা আভাস প্রবাসী পত্রিকার (১৩২৪, ১৭ ভাগ প্রথম খণ্ড ৪২২ পৃষ্ঠায়) 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' নামক প্রবন্ধে দিয়াছি।'

—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২

২ ১৯১৬তে রবীন্দ্রনাথ যখন মার্কিনদেশে যান, তখন তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যে উদ্দেশ্যে আমি যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিতে এসেছি তার মূলে আছে আমাব একমাত্র কামনা— ভারতবর্ষে আমার বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এইটিই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা।'[১] এরই ফলস্বরূপ লিনকন শহরবাসীরা

---

[১] *Loss Angeles Calif Times*. ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৬তে প্রকাশিত বিবরণ, ড. জয়তী ঘোষের অনুবাদ। দ্রষ্টব্য বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৬, পৃ ২২৫।

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি ছোটো মুদ্রাযন্ত্র উপহার দেয়। ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতন প্রেসের পত্তন। ১৩২৬-এর প্রথম থেকেই এই ছাপাখানা থেকে আশ্রমের যাবতীয় ছাপার কাজ ও রবীন্দ্রনাথের গানের বইগুলি ছাপা হতে থাকে।[1]

৩ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস/ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী। ১৯০৮ সালে চিন্তামণি ঘোষ কবির গ্রন্থ প্রকাশেব ভাব গ্রহণ করেছিলেন।

৪ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারীর পুত্র। ১৮৮৪তে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি (৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট) ছিল তাঁর প্রকাশালয়। সে-সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজেব বইগুলি ২৩০৯ টাকায় বিক্রি করে দেন।

৫ মাইকেল স্যাডলাবের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কাবের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের নিকট শিক্ষাবিষযক প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথেব এই চিঠি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই স্যাডলাব কমিশন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যান। কমিশনেব বিপোর্টে শান্তিনিকেতনেব শিক্ষাদর্শেব উল্লেখ আছে।[2] রবীন্দ্রনাথ যে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানেব বিশেষ পক্ষপাতী, এতে তার উল্লেখ ছিল। প্রায এই সময়েই যদুনাথ মডার্ন বিভিউ পত্রিকায় (১৯১৮ জানুযাবি) The Vernacular Medium :

---

১ দ্রষ্টব্য শান্তিনিতেকন পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। সংবাদ ১১ নং । ইহাতে আশ্রমের যাবতীয ছাপাব কাজ ও গুরুদেবের সঙ্গীত পুস্তকাদি ছাপা হইতেছে।

২ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ পৃ. ১০৪-১০।

Views of an Old Teacher নামে প্রবন্ধ লেখেন। তাতে মাতৃভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উল্লিখিত আছে।

পত্র ১৩। তারিখটি প্রবাসী-তে মুদ্রিত পাঠ থেকে সংগৃহীত।

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (৬ জুন ১৯১৯)।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের পদত্যাগপত্রের অনুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে (২ জুন) রামেন্দ্রসুন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়ে বলে পাঠান 'আমি উত্থানশক্তি বহিত । আপনাব পায়েব ধূলা চাই।' ববীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে মূল পত্রখানি পড়তে অনুবোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ পত্র পড়েন এবং বামেন্দ্রসুন্দর তাঁব পদধূলি গ্রহণ করেন। তারপর রামেন্দ্রসুন্দর যে তন্দ্রায় মগ্ন হলেন সেটিই তাঁর মহানিদ্রা।

রবীন্দ্রনাথ ১৭ জুন শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। ৩ আগস্ট রবিবার রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আবার চলে আসেন।

পত্র ১৪। তারিখটি সম্ভবত যদুনাথই মূল পত্রের শীর্ষে লিখে রেখেছিলেন। ১৯২১-এর জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণ শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

বিদেশভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে ও ভাষণে যে শিক্ষাদর্শ প্রতিফলিত হয়, তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনমূলক। এ-বিষয়ে দ্রষ্টব্য সি. এফ. অ্যান্ডরুজকে লেখা *Letters from Abroad* এবং *Letters to a Friend*। জয়তী ঘোষ -প্রণীত 'বিদেশভ্রমণে

রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও বিদেশে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুবাদ ও উদ্ধৃতি আছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে (তৃতীয় সংস্করণ ১৩৯৭) 'বিদেশ হইতে পত্রধারা' অধ্যায়ে (পৃ ৮৬-৯৮) এ সময়ের রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বিস্মৃত বিশ্লেষণ করেছেন। এই চিন্তাতে রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ে মগ্ন ছিলেন বলেই অনুমান করা যায় যে তিনি এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন।

২ সিলভ্যাঁ লেভি সস্ত্রীক আশ্রমে আসেন ১০ নভেম্বর ১৯২১। এই সূত্রে যদুনাথকে লেখা সি. এফ. অ্যান্ডরুজের চিঠিটিও উদধৃত করা যায় :

6 D N Tagore Lane
Calcutta [1921]

My dear Jadu Babu

The Poet has asked me to write to you and ask you if it would be possible for you to come to Calcutta towards the end of this week where there are holidays, I believe. He has very much that he wishes to talk over with you and he is very anxious indeed to see you. He is in such a rush of visitors that he has wished me to write for him. He is staying over Sunday in Calcutta.

Yours very sincerely
C. F. Andrews

এ সময় যদুনাথ কটকে অধ্যাপনা করছিলেন।

পত্র ১৫। ১ রবীন্দ্রনাথের এই পত্র যদুনাথের যে-পত্রের উত্তরে লিখিত হয়, সেটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে বিশ্বভারতী পরিচালকসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে

চিঠি দেন। যদুনাথ সে-পদ গ্রহণ করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন কয়েকটি নীতিগত কারণে। এই পত্র দুটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৪-সংখ্যক পত্রে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে ফিরে এসে যদুনাথের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করেছেন। সেই চিঠি লেখা হয়েছিল ২৭ আগস্ট। ওই চিঠিতে উল্লিখিত ছিল যে সিলভ্যাঁ লেভি নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে আসবেন। যদুনাথ এই চিঠির কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা যায় না। তবে ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ (৮ পৌষ ১৩২৮) শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠার সভায় যদুনাথ উপস্থিত ছিলেন মনে হয় না।

পরিষদের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর গভর্নিং বডির সদস্য মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তদনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে গভর্নিং বডির সদস্যপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে ১৯২২-এর মে মাসের শেষে চিঠি দেন।[১] রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির উত্তরেই যদুনাথ একটি দীর্ঘপত্র লেখেন (১১মে ১৯২২)। যদুনাথের প্রত্যাখ্যানের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত মনে বর্তমান আলোচিত পত্রটি লেখেন। সেই পত্র যদুনাথ পান দার্জিলিঙে ৬ জুন ১৯২২-এ।

যতদিন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম মাত্র ছিল, ততদিন যদুনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাগত আদর্শে মতৈক্য ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে উচ্চতর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করবার সূচনাতেই যদুনাথ বিরূপ হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কিছুকাল যাবৎ তিনি

---

[১] এই চিঠির প্রতিলিপি রবীন্দ্রভবনে নেই।

যদুনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন। ১৩২৫-এর ৮ পৌষ (১৯১৮, ২৩ ডিসেম্বর) আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয় এবং 'চিত্র সংগীত প্রভৃতি কলা এবং সংস্কৃত পালি ইংরাজী প্রভৃতি সাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ হয়।' সম্ভবত এই সময় থেকেই যদুনাথ— আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকেন।

শান্তিনিকেতনকে বিশ্বমানবসংস্কৃতির মিলনতীর্থরূপে পরিণত করার অভিলাষ রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই পোষণ করে আসছিলেন। এই ইচ্ছার স্পষ্ট প্রকাশ ১১ অক্টোবর ১৯১৬তে রথীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে :

> ...তারপরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগেব সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে— ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ যায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।
>
> —চিঠিপত্র ২। লস এঞ্জেলস। ১১ অক্টোবর ১৯১৬।

এই চিঠির অনেক আগে ৩ মার্চ ১৯১৩ সিকাগো থেকে ববীন্দ্রনাথ লেখেন :

> মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্য সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে

বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরবো না? এ দেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। ...মানুষকে তার সফলতাব সুরটি ধরিয়ে দেবাব সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখীদের কণ্ঠে সেই সুরটি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না?

১৯১২তে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে ও আমেরিকায় গেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকার বিদ্যালযেব যোগ স্থাপিত হয়। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর পরিচিতি আরও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৬তে আমেরিকায় গিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থলে ভাষণ দেন। তখনই তাঁর মনে স্বভাবতই সর্বজাতিব মিলনমূলক শিক্ষাদর্শের ভাবনা দেখা দেয। এ বিষয়ে যদুনাথকে লিখিত ১৪-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপক্ষে ১৯২১-এ বিশ্বভাবতী সাংগঠনিক রূপ পাওয়ার আগেই লোকচক্ষুর অন্তরালে ১৯১৮-ব ডিসেম্ববে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল। তখন এই সূচনাটি বাহিরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে নি। তখন এখানে প্রাচ্যসংস্কৃতির চর্চাই ছিল প্রধান। ১৯১৯-এর জুলাই (১৩২৬, ১৮ আষাঢ়) থেকে এর কার্যধারা শুরু হয়। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

তারপরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত।... সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের

বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

সকল বড় দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ; উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি।

—শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩২৬

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল বিশ্বভারতীর শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করে তাদের এই উচ্চতর লক্ষ্যে —চিন্তায়-কর্মে, ধ্যানধারণায় জীবনচর্যায় পরিপূর্ণতার পথে পৌঁছে দেওয়া। এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতি দিনই ঘটে।

বিশ্বভারতীর উদার শিক্ষানীতি 'মস্তভাব' ব্যক্ত হয়েছে 'শান্তিনিকেতন'-এর আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৬, সংখ্যায় :

আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

...বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে

হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

দেখা যাচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণায়ত বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ-শান্তিনিকেতনে সমগ্র বিশ্বকে ভাবাদর্শের দিক থেকে একটি নীড়ের আশ্রয়ে মিলিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এজন্য বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠনের ব্যাপারেও পঠিতব্য বিষয়গুলি ছিল বিচিত্র। সাহিত্য চিত্র ও সংগীত। সাহিত্যের মধ্যে ছিল সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান, বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, সিংহলি। প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাকাল ছয় বৎসর। প্রথম তিন বৎসরে বিষয়টির সাধারণ জ্ঞান এবং পরের তিন বৎসর বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

—দ্র শান্তিনিকেতন ১৩২৭ মাঘ, পৃ ৫৭৩-৫৮০।

এই পাঠপদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের কোনো স্থান ছিল না। শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ভাবে অভীপ্সিত বিষয়ে অধ্যয়ন করতে পারত। বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ স্পষ্টভাবেই জানান :

> The Visva Bharati is for higher studies. The system of examination will have no place whatever in the Visva Bharati, nor is there any conferring of degrees.
> Students will be encouraged to follow a difinite course of study but there will be no compulsion to adopt its rigidly.

—দ্র শান্তিনিকেতন ১৩২৭, পৃ ৫৭৩

এই নবপরিকল্পিত পাঠক্রমে অধ্যয়ন করার জন্য অনুমোদিত কোনো

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক ছিল না। পঠনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত অধিকার ও অনুরাগই ছিল যোগ্যতার নির্ণায়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তখনও শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয় নি।[১] ছাত্রছাত্রীরা আশ্রম-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেই বিশ্বভারতীতে প্রবেশাধিকার পেত।

এই শিক্ষাপদ্ধতি যদুনাথ অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি যে উপযুক্ত যোগ্যতা সৃষ্টি, সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের মধ্যে অধ্যয়ন, বিদ্যার উৎপাদন অর্থাৎ গবেষণার ক্ষেত্রে কঠোর শ্রম-সাধনার দ্বারা নির্দিষ্ট ফল লাভকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন, তাঁর পত্রেই তাব প্রমাণ আছে। তাঁর মনে হয়েছিল বিশ্বভারতীতে নীতিনিয়মেব কঠোরতা নাই। কেবল আদর্শ ও ভাবের পরিবেশই এখানে রচিত হয়েছে। পূর্বতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিশু ও কিশোরদের পক্ষে এটা উপযোগী হতে পারে, কিন্তু বিশ্বভারতীর উচ্চতব বিদ্যাচর্চাব ক্ষেত্রে এটি উপযোগী নয়। বিশেষত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই উচ্চতর পাঠক্রমে প্রবেশাধিকারকে যদুনাথ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পাবেন নি।

পত্র ১৬। ১ বহু ভাষাবিদ রুশদেশীয় পণ্ডিত বগদানফ (L. Bogdanov) ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতীতে পারসিয়ান অধ্যাপকেব পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালেব জুন মাসে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অন্যান্য কারণে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন।

---

[১] শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ জুলাইতে, এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

যদুনাথকে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীতে যোগ দেবার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁব সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হন। যদুনাথ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। সেইজন্যই পারসিয়ান অধ্যাপক পদে তাঁর নাম সুপারিশ কবে বাংলা ও ইংরেজি পত্রদুটি রবীন্দ্রনাথ যদুনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

I know Mr Boagdanov and, I am sure, it will be difficult to find any one more fit for the post which he applies for.

Rabindranth Tagore
Nov. 30, 1927

পত্র ১৭। দার্জিলিঙে যদুনাথ টোঙ্গা রোডের বাড়িতে এ সময়ে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে-সময় সেখানে ছিলেন। যদুনাথের গৃহে প্রস্তুত ছানা তিনি ববীন্দ্রনাথকে পাঠাতেন। ১০ জানুয়ারি ১৯৩১-এ যদুনাথ এই চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে পাঠান :

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

আমাব বাড়িতে প্রস্তুত টাটকা ছানা একটু আপনার জন্য পাঠাইলাম। যদি খাইয়া পছন্দ করেন প্রত্যহ পাঠান যাইবে।

বিনীত
শ্রীযদুনাথ সবকাব

ছানা নিয়মিত পাঠানোব ঘটনা যদুনাথের ছাত্র কালিকারঞ্জন কানুনগো বর্ণনা করেছেন : We once saw him carrying for the poet in Darjeeling some sweets prepared by Lady Sarkar.[১]

---

[১] *Jadunath Sarkar Commemoration Volume* (Punjab University, 1958), p 54.

তারিখটি প্রবাসী-তে প্রকাশিত পাঠ থেকে সংগৃহীত।

পত্র ১৮। যদুনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই পত্র লেখেন :

9 Tonga Road
Darjeeling
8th June 1933

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আশা করি আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। শ্যামকান্ত সরদেশাই-এর স্মৃতি কথা কিছু লিখিতে সম্মত হইয়াছেন। যদি আপনি বলিয়া যান তবে একজন কেহ তাহা লিখিয়া লইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত আজ প্রাতে রথীর সহিত করিয়া আসিয়াছি। এখন বোধহয় কাজটা শেষ করিয়া ফেলিতে সময় পাইবেন? আবশ্যক হইলে আমি এখান হইতেও লেখক পাঠাইতে পারি।

নিঃ ইতি

শ্রীযদুনাথ সরকার

১ শ্যামকান্ত সরদেশাই যদুনাথের ঐতিহাসিক বন্ধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সখারাম সরদেশাইয়ের সঙ্গে যদুনাথের মারাঠা ইতিহাস গবেষণার সূত্রে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ১৯০৪ থেকে। এ-সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও যদুনাথের পরিচয়। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যদুনাথ অন্তত ১৯১০ থেকেই মাঝে মাঝে গিয়েছেন বলে চিঠিপত্রের উল্লেখে জানা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে যদুনাথের উদ্যোগেই সরদেশাই পুত্র শ্যামকান্তকে (১৮৯৯–১৯২৫) শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করতে পাঠান। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্যামকান্ত আশ্রম-বিদ্যালয়ের

ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯১৬-তে এখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি পরে বম্বে থেকে বি.এ. বি.এস্‌সি. এবং বার্লিন থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বার্লিনে থাকতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৮ নভেম্বর ১৯২৫-এ সুইজারল্যান্ডের ডাবোস প্লাজের পার্ক স্যানিটোরিয়মে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৩৩ সালে শ্যামকান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে পিতা মাতামহ প্রভৃতিকে লেখা শ্যামকান্তের চিঠিপত্রের একটি সংকলনগ্রন্থ ('শ্যামকান্ত চীঁ পত্রেঁ') প্রকাশিত হয়। ওই গ্রন্থের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান পত্রটির প্রতিলিপি এবং তার মারাঠি অনুবাদ ছাপা হয়েছে।

গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। শুরুতে খণ্ড পহিলা—শান্তিনিকেতন ডিসেম্বর ১৯১২ - এপ্রিল ১৯১৬। শ্যামকান্তের এই পর্বের চিঠিতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা দিক এবং তৎকালীন আশ্রম-পরিবেশ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

২ শ্যামকান্তের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় ওই কিশোর বয়সেই তিনি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় হিসাবে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলায় তিনি বিশেষভাবে যত্ন নিযে পড়তেন। বিদ্যালয়ের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বাগান' এবং 'প্রভাত' পত্রিকা দুটির তিনি সদস্য এবং নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই-সব পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু লেখার নিদর্শন : 'মহারাষ্ট্র দেশের আচার ও ব্যবহার', 'মনকে উপদেশ (রামদাস স্বামী)', 'কোষ', 'সদ্বিবেক' (বাগান), মহারাষ্ট্রের ইতিহাস

(শান্তি) 'একটি আশ্চর্য পশু', 'তানাজী মালুসরে কর্তৃক সিংহগড় বিজয়', 'মহারাষ্ট্রীয় উপনযনের অনুষ্ঠান' (প্রভাত)।

এই অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা ও গল্পের তিনি মারাঠি অনুবাদ করে মারাঠি পত্রিকা 'আনন্দ-এ' প্রকাশ করেন। দ্র. শ্যামকান্ত চী পত্রে— ৩/২/১৪ এবং ২১/৬/১৪ তারিখের পত্র।

পত্র ১৯। ১ যদুনাথের প্রদত্ত টীকা থেকে জানা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব একটি পিএইচ. ডি. থীসিসের পরীক্ষক ছিলেন যদুনাথ ও ববীন্দ্রনাথ। যদুনাথ এ সম্বন্ধে আব কোনো তথ্য জানান নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সিন্ডিকেটে ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪-এ গৃহীত সিদ্ধান্তে দেখা যায় উপেন্দ্রনাথ বল Rammohan Roy শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। সেই নিবন্ধের পরীক্ষক নিযুক্ত হন ড. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর এন. এল., স্যার পি. এস. শিবস্বামী আয়াব কে. সি. এস. জি., সি. আই. ই. এবং স্যার এস. রাধাকৃষ্ণন কেটি., এম. এ., ডি-লিট.। কিন্তু পরে শিবস্বামী আয়ার পরীক্ষক হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে ১৬ ফেব্রুয়াবি ১৯৩৪-এর সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্যার যদুনাথ সরকার পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

গবেষণা সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ একমত হলেও রাধাকৃষ্ণন অনকূল ছিলেন না।

২ ১৯৩৪-এর ৬ মে ইচাংগো জাহাজে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সিংহল যাত্রা করেন। শিল্পী ও অভিনয়ের দল আগেই রেলপথে চলে গিয়েছে। এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর জন্য

অর্থ সংগ্রহ করা। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উক্তির তাৎপর্য এই পরিপ্রেক্ষিকাতেই পঠিতব্য। ২৮ জুন তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

৩ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতার পঙ্‌ক্তি।

রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ছিলেন ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ। তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যেও কখনও সংশয়মাত্র দেখা দেয় নি। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সেই কলেজেই অধ্যক্ষপদে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় কীভাবে হয়েছিল বলা যায় না। তবে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমাবধি সাহিত্যপিপাসু ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি 'নবজীবনে' বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন; ক্রমে ক্রমে 'সাধনা' ও 'ভারতী'তেও তিনি লিখতে থাকেন। তাঁর এই-সব প্রবন্ধের সূত্রেই বিজ্ঞানবিষয়ের লেখকরূপে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলমর্ম্ম' প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ১৮৯৬তে তাঁর বই 'প্রকৃতি' প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবেই ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা।

'বঙ্গভাষার লেখক'-এ লিখিত রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মকথায় জানা যায় ছাত্রাবস্থায় তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মে। এই সময় থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করতে অভ্যস্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মক্ষেত্রে। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর (১৩০১) থেকেই রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি ছিলেন। তা ছাড়া কাশিমবাজারের মহারাজার নিকট থেকে পরিষদের জন্য যে-জমি কেনা হয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্যতম ন্যাসরক্ষক। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধ ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ প্রকাশিত হয়। তার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যপরিষদের সঙ্গে সহকারী সভাপতি ও অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরও প্রথমাবধি পরিষদের সভ্য, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক রূপে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এর সেবা করে গিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রসাহিত্যের গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন, তাঁর চিন্তা ও প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীকাব প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর সমাজ ও ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক মত পোষণ করিতেন ; তৎসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অন্তরের গভীর একটি যোগ ছিল। উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিতেন। কবির মুখে ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কখনো বিরূপ সমালোচনা করিতে শুনি নাই।”[২]

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে ভাবচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর উভয়েই সমানভাবে উদবেলিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ‘রাখিবন্ধন’ উৎসবের প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষেই রচনা করেন ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটি। বামেন্দ্রসুন্দর ওই বিশেষ দিনে (৩০ আশ্বিন ১৩১২) অরন্ধনের প্রথার প্রস্তাব করেন।

---

[১] কোনো কোনো সময় দুজনের মধ্যে যে মতভেদ হয় নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (১৩১৪ শ্রাবণ) ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধে রাজনৈতিক পথ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন বামেন্দ্রসুন্দর তাকে সমর্থন করতে পারেন নি।

[২] রবীন্দ্রজীবনী ২য়, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৮৩ পুনর্মুদ্রণ ১৩৯৫ পৃ ৪৭২-৭৩

এই উপলক্ষেই ঘরে ঘরে পড়ার জন্য তিনি লেখেন ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’। তিনি এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায়। ২৭ ফাল্গুন ১৩১১তে জেনারেল অ্যাসেমব্লি হল-এ রবীন্দ্রনাথ পড়েন ‘সফলতার সদুপায়’।[১] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রামেন্দ্রসুন্দর। কোনো কোনো প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথেব মত শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনা করেছেন।

১৩১২তে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি, রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথই প্রস্তাব করলেন, ‘বাঙলাদেশ এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্যের জন্য সমস্ত বাঙলাদেশ ব্যাপিয়া, সমস্ত বাঙালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙলাব ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্যটার সূচনা হইতে পারে।’[২] রবীন্দ্রনাথেব এই প্রস্তাবের ফলে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীব আহ্বানে ১৩১৪ সালের ১৭ এবং ১৮ কার্তিক বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনেব প্রথম অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। উদবোধন-অনুষ্ঠানে রামেন্দ্রসুন্দর একটি দীর্ঘ

---

[১] প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪

[২] অভিভাষণ, মানসী ১৩২১, পৃ ৪২৩

প্রবন্ধ পড়েন— প্রবন্ধটির নাম 'মাতৃমন্দির'।[১]

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর সৌহার্দ্যের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁদের জন্মদিন পালন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন বাঙালির এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক ঘটনা। রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৯ এবং ৩০-সংখ্যক পত্রের টীকায় সংবর্ধনা সভার বিবরণ দেওয়া আছে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরই রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনাপত্রটি রচনা করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপর আয়োজনের দায়িত্বভার অর্পিত হলে পরিষৎ-সম্পাদক হিসাবে তিনি সানন্দে সে দায়িত্বপালনে অগ্রসর হন। রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনাজ্ঞাপনের বিরোধিতা করে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকে চিঠি লিখলে রামেন্দ্রসুন্দর তার অতিযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পক্ষে। এর কিছুদিন পরেই নোবেল পুরস্কারের সংবাদ আসে।

আবার ১৩২১ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে পরিষৎ এক সান্ধ্য সম্মেলনে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বরচিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনন্দনপত্র বচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামেন্দ্রসুন্দরের ৭-সংখ্যক পত্রের টীকায় তা সম্পূর্ণ উদধৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রের সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধার অবিস্মরণীয় মর্মস্পর্শী

---

[১] 'নানাকথা'য় সংকলিত

নিদর্শন রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিমকালের ঘটনা। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি :

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরণের কয়েক দিন পূর্বে 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া নবভারতে ত্যাগের দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাহার পদত্যাগ পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ কবেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রেব এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। বামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল।[১]

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জয়ন্তীতে সাহিত্য পবিষদ তাঁকে অভিনন্দন জানায়। তার উত্তরে প্রসঙ্গত ববীন্দ্রনাথ বলেন :

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি

---

১ সাহিত্যসাধকচরিতমালার 'বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' গ্রন্থে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা থেকে সংকলিত, পৃ ৮৯।

দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ : রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর

পত্র ১। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ড্রামাটিক ক্লাব উঠে গেলে ২৪ মাঘ ১৩০৩ (শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) খামখেয়ালী সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম সভার আহ্বায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। পরে আশুতোষ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিদের আহ্বানে বিভিন্ন স্থানে সভা আহূত হয়। গল্পপাঠ, আহার, গান-বাজনার আয়োজন থাকত সভায়। বর্তমান পত্রে রামেন্দ্রসুন্দরকে রবীন্দ্রনাথ এ রকম একটি সভায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই সভার আমন্ত্রণকর্তা সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। সভা বসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন নিমন্ত্রণপত্রও বেশ মজার ছিল। একটা স্লেট ছিল, সেটা পরে দারোয়নরা নিয়ে রামনাম লিখত, সেই স্লেটটিতে রবিকাকা প্রত্যেকবারে কবিতা লিখে দিতেন, সেইটি সভার সভ্য ও অভ্যাগতদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। ওই ছিল খামখেয়ালীর নেমন্তন্ন পত্র।' কবিতার আকারে নিমন্ত্রণপত্রটি রচনা করতেন রবীন্দ্রনাথ ৪ শ্রাবণ ১৩০৪ (১৯ জুলাই ১৮৯৭)-এর নিমন্ত্রণপত্রটি ছিল এরকম—

এতদ্দ্বারায় notification
খামখেয়ালীর সভাধিবেশন
চৌঠা শ্রাবণ শুভ সোমবার
জোড়াসাঁকো গলি ৬ নম্বার
ঠিক ঘড়ি ধরা রাত সাড়ে সাত
সত্যপ্রসাদ কহে যোড় হাত।
যিনি রাজি আর যিনি গররাজি
অনুগ্রহ করে লিখে দিন আজই।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খামখেয়ালী সভার কার্যবিবরণীর সঙ্গে এই নিমন্ত্রণপত্রটি পাওয়া যায়।[১] রামেন্দ্রসুন্দরকেও এটি পাঠানো হয়েছিল কিনা বোঝা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর খামখেয়ালী সভার সদস্য ছিলেন না। সম্ভবত এবারই প্রথম তিনি আহূত হলেন। ৪ শ্রাবণের কার্যবিবরণী পাওয়া যায় না বলে রামেন্দ্রসুন্দরের সভায় উপস্থিতির কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন নেই।

অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত ছিলেন না। সাধনা পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি লেখা বেরিয়েছে। তা ছাড়া এই সভার মাস কয়েক পূর্বে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম' (১৮১৯ শক, বৈশাখ, ইংরেজি ১৮৯৭) বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

পত্র ২। ১ নভেম্বর ১৯০৫ সালে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে 'স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র' নাম দিয়ে স্বাদেশিকতাবোধের উদ্‌বোধনে বাঙালি সমাজের নানা প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আধুনিক শিক্ষার সহিত স্বদেশী ভাবের সমন্বয় চেষ্টা বরাবর কাজ করিতে লাগিল। হিন্দুমেলা এই স্বদেশী ভাবের আর একটি অভ্যুত্থান। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্রকে সাহায্য করিয়া এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্বদেশী

---

[১] পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খামখেয়ালী সভার প্রতিবেদন এবং কবিতায় রচিত আমন্ত্রণলিপির খাতা ও অন্যান্য আকর থেকে এইসভার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্রষ্টব্য 'খামখেয়ালী সভার প্রতিবেদক রবীন্দ্রনাথ', দেশ শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৮।

শিল্পের, স্বদেশী মল্লবিদ্যার, স্বদেশী games-এর প্রদর্শনী হইত—স্বদেশী গান গীত ও স্বদেশী কবিতা আবৃত্ত হইত।

তাহার পর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া দেশের শিক্ষিতগণকে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার কিছুকাল পরে শশধরের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া আমাদের পরিবারে সাধারণের অগোচরে স্বদেশী ভাবের বিশেষরূপ চর্চা হইতেছিল। গোপনে স্বদেশী দেশালাই ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত তাঁত প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বদেশী ভাবের উত্তেজনাতেই খুলনা হইতে বরিশালে ষ্টীমার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজ-কোম্পানির সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন... তৎকালে বরিশালে স্বদেশীর দল তাঁহার সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে যাত্রী সংগ্রহ ও যাত্রী ভাঙানর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এরূপ Fuller-এব আমলে ঘটিলে কি বিপদ হইত অনুমান করিবেন।

কনগ্রেস গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের দিকেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করাইল।

সাধনা পত্রে ও তাহার পরে অন্যত্র এইরূপ আবেদন নীতি ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি চালনার দিকে মন দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলেন্দ্রনাথ এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

এই স্বদেশী ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের উপরে Indian Stores-এর অভ্যুদয়।...

এইরূপ আন্দোলন যখন দেশে ভিতরে ২ চলিতেছে, তখন যোগেশ চৌধুরী কংগ্রেসে শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়া কংগ্রেসের আবেদন-প্রধান ভাবকে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন— তাহার পর হইতে এই প্রদর্শনী বৎসরে ২ চলিতেছে।'

—চিঠিপত্র ১০, পৃ. ৩১-৩৩

স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ব্যবস্থা নানা উপলক্ষেই আয়োজিত হচ্ছিল। স্বদেশী ভাণ্ডার নামক এক যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে এ রকম একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই পত্রে স্বদেশী ভাণ্ডারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তার একটি ইতিহাস আছে। ১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে অম্বিকাচরণ উকিল নামে এক উদ্যোগী শিক্ষিত যুবক স্বদেশী ভাণ্ডার লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের বিশেষ যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি তহবিল থেকে দশ টাকা ধার নিয়ে এই ভাণ্ডারে দিয়েছিলেন।[১]

২ ১৩০৪-এর কার্ত্তিক মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করবেন বললেও আসলে ১৩০৫-এর বৈশাখ থেকে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এক বছর সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৫ ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যার পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন।

---

[১] এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী ৪, পৃ. ১৫৪।

৩ মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত নেতা বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) ১৮৯৭ সালে জুলাই মাসে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির দ্বারা প্ররোচিত হয়েই দুটি মারাঠা যুবক ১৮৯৭-এর জুন মাসে দুইজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। বিচারে তিলকের দেড় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। তাঁর সমর্থনের জন্য বোম্বাইয়ে উকিল পাওয়া যাচ্ছিল না। তিলক কলকাতায় অমৃতবাজাব পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষকে অবস্থা জানালে কলকাতার কৌঁসুলী নিয়োগের ব্যয় নির্বাহার্থ চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে সাগ্রহে যোগ দেন এবং তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে একহাজার টাকা সংগ্রহ করেন। মোট সতেরো হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। কলকাতা থেকে দুজন ইংরেজ ব্যারিস্টার প্রেরিত হন। কিন্তু কারাদণ্ড রোধ করা গেল না দেখে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করার জন্য 'তিলক ডিফেন্স ফন্ড' গঠিত হয়। প্রিভি কাউন্সিল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে। চিঠির তারিখ থেকে বোঝা যায় এই দ্বিতীয়বারের উদ্যমের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতে বলার কারণ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বোম্বাইয়ের মোকদ্দমায় ইংরেজ কৌঁসুলীর জুনিয়র রূপে কাজ করেছিলেন।

পত্র ৩। ১ রামেন্দ্রসুন্দরের 'ভুগোল' বইটির প্রকাশকাল চৈত্র ১৩০৪, ইংরেজি ১৮৯৮। এই বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্বাসপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তার কারণ বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' রামেন্দ্রসুন্দরের নিম্নলিখিত মন্তব্য :

আমার প্রধান ভয়, অনেক কথা বর্জন করিয়াও যাহা রাখিয়াছি, তরুণ মস্তিষ্কের পক্ষে তাহাও নিতান্ত অল্প হইবে না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বিবরণ আয়ত্ত করা অনেকটা কঠিন হইবে। কিন্তু সকল কথাই আয়ত্ত করিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। পাঠের সময় বালকেরা যদি একটা অনতিস্ফুট ছবি মানসচক্ষুতে দেখিতে পায়, তাহাতেও ফল আছে। গ্রন্থের ভাষা অবলম্বন করিয়া শিক্ষক মহাশয় যদি ছাত্রগণকে উপদেশ দেন, ও তাঁহার যত্নে বালকের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত করিতে এবং শিখিবার বাঞ্ছা উদ্রেক করিতে যদি এই গ্রন্থ কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে তাহা হইলেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

২ রবীন্দ্রনাথ ভাবতীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করার পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের এই কয়টি প্রবন্ধ ভারতীতে বের হয়েছিল : 'শিক্ষাপ্রণালী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, 'নানা কথা' বইতে সংকলিত), 'আচারে যুক্তি' (শ্রাবণ ১৩০৫, 'আচার' নামে 'কর্মকথা'য় সংকলিত) এবং 'বৈজ্ঞানিক পিশাচ' (ফাল্গুন ১৩০৫, 'উত্তাপের অপচয়' নামে 'জিজ্ঞাসা'য় সংকলিত)।

পত্র ৪। ১ স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫) তাঁর অনুজা সরলা দেবীর (১৮৭২-১৯৪৫) সহযোগে ১৩০২-১৩০৪ বঙ্গাব্দে ভারতী সম্পাদনা করেছেন। হিরণ্ময়ী প্রতিভাময়ী ছিলেন এবং সমাজসেবামূলক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। মহিলা আন্দোলন-সম্পর্কিত অনেকগুলি রচনা হিরণ্ময়ী-সম্পাদিত ভারতীতে বেরিয়েছে। ভারতীর ১৩২৩ বৈশাখে 'কৈফিয়ৎ' নামে হিরণ্ময়ী দেবীর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫। ১ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্‌কালে ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে (১৭ চৈত্র, ১৩১১, বৃহস্পতিবার) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের অভ্যর্থনার জন্য ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়েন। এই সভা আহ্বানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ছিল। পরিষদের একাদশ কার্য-বিবরণীতে দেখা যায়, দেশের পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে স্বদেশের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ধারে ছাত্রদের প্রবর্তিত করার একটি প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। পরিষদ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে এই সভার আয়োজন করে এবং রবীন্দ্রনাথকেই এ বিষয়ে ভাষণ দিতে অনুরোধ করে। এই সভার সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মেদিনীপুরের মৃগাঙ্কনাথ রায় নামে জনৈক ছাত্র তাঁকে নিজের আগ্রহ জানিয়ে চিঠি লেখেন। মৃগাঙ্ক সদ্য এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'আমাদের মাতৃভাষার, প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। পবিষদের সদুদ্দেশে সাহায্য করিতে ও আমার এ ক্ষুদ্র শক্তি বঙ্গ ভাষার উন্নতিসাধনে প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।' মৃগাঙ্কনাথের এই চিঠির অপর পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে বর্তমান পত্রখানি লেখেন।

২ ৯ বৈশাখ ১৩১২ (২২ এপ্রিল ১৯০৫) তারিখে ময়মনসিংহ শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি সারস্বত সম্মিলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ২৯ মার্চে *The Bengalee* পত্রিকায় বিশেষ

সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদ মুদ্রিত হয়েছিল : 'Babu Rabindranath Tagore will preside at the inaugural meeting of the Mymensingh Saraswat Exhibition.' কিন্তু অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি।

৩ স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩১২)। এর উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রামের যুবক কেদারনাথ দাসগুপ্ত। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেদারনাথ লিখেছিলেন : "আমাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশের যোগ্য লোকের মত 'ভাণ্ডারে' ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইবে। দেশে মাঝে মাঝে যে সকল কথা উঠিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে নানা বিচক্ষণ লোকের সংক্ষিপ্ত মত সংগ্রহ করিয়া 'ভাণ্ডারে' একত্র রক্ষা করা হইবে।' এইজন্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাণ্ডার পত্রিকাতে চারটি বিভাগ ছিল– প্রবন্ধ, প্রস্তাব, প্রশ্নোত্তর এবং সঞ্চয়। সঞ্চয় অংশে থাকত বিদেশের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র থেকে নানা ঔৎসুক্যজনক প্রবন্ধের সার সংকলন।

পত্র ৬। ১ স্কুলে বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র দুজন– রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এঁরা দুজন আশ্রমে সদ্য আগত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে সংস্কৃত চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। উভয়েই শাস্ত্রীমহাশয়ের পরিচালনায় বুদ্ধচরিতের অনুবাদ করছিলেন। পরে রথীন্দ্রনাথের হাতে অনুবাদের কাজটি সম্পূর্ণ হয় এবং 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত' নামে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী থেকে সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়।

২ ইতিপূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন প্রবন্ধে মত প্রকাশ করে আসছিলেন যে 'ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ'। ১৮৯৭

খৃস্টাব্দে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন 'Discovery of living Buddhism in Bengal'। এ মত পরবর্তীকালে স্বীকৃত না হলেও রাঢ়ের ধর্মপূজা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৪, প্রথম সংখ্যা), 'গ্রামদেবতা' নামে প্রবন্ধ লেখেন।

৩ বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার স্বামী বিবেকানন্দ ও বালগঙ্গাধর তিলকের প্রবল দেশাত্মবোধক কার্যকলাপ, রুদ্রপন্থায় বিশ্বাসী তরুণদের আত্মদান এবং বঙ্গভঙ্গ নামক ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালি শিক্ষিতজনের মধ্যে 'নেশন' বা জাতি ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্ন বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত হয়। এই প্রবন্ধকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এই-সব প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনাত্মক প্রকৃতি বিচার করে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরেব এই ধরনের প্রবন্ধ 'পরাধীনতা' প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায় (১৩০৪ অগ্রহায়ণ)। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লেখেন হিন্দুর একনিষ্ঠতা (১৩০৮ বৈশাখ)। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রবন্ধ :

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮)
হিন্দুত্ব (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮)
নেশন কী (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮)
ভারতবর্ষের ইতিহাস (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯)

এসময়ে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয় উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি

‘আত্মশক্তি’ ও ‘ভারতবর্ষ’ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত আছে। ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীতে (বৈশাখ ১৩১৯)।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ ‘রাষ্ট্র ও নেশন’ বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১৩০৮) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তাঁর ‘নানাকথা’ বইতে সংকলিত আছে। তাঁর অপর প্রবন্ধ ‘ভারতবর্ষেব ইতিহাস’ ভাণ্ডারে (শ্রাবণ ১৩১২) প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি সম্ভবত আলোচিত পত্রে ববীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখিত।

৪ রবীন্দ্রনাথেব ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর সম্পাদনায় ১৩১২-র বৈশাখ সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় ‘খেয়ালখাতা’ নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছিল। এর প্রথম লেখক ছিলেন বীরবল, লেখার নাম ‘খেয়ালখাতা’। তার পরেই সম্পাদিকা ‘খেয়ালের চৌহদ্দি’ নাম দিয়ে টিপ্পনী লেখেন : ‘সম্পাদিকার নিমন্ত্রণে ভারতীর খেয়ালখাতার দেউড়িতে গুণীজনাগ্রগণ্য বীরবল মহাশয় সান্ত্রীর খেয়ালে চাপিয়া আসিয়া যজ্ঞের আয়োজনকারিণীকে সন্ত্রস্ত করিতেছেন। তিনি কাকে রাখেন, কাকে মারেন। অতএব পরিমাপে “খেয়াল” এর চৌহদ্দির একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়াছে।’ খেয়ালখাতার প্রথমবারের লেখক ছিলেন বীববল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘সৌন্দর্য্য’ নামে একটি সরস মন্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বাংলা ভাষা ও বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে একটি তীব্র সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ‘আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল’ সেটি ‘পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক’। এটি রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে বর্তমানে সংরক্ষিত। এতে ৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২ (২৫ নভেম্বর

১৮৯৫) পর্যন্ত নানা জনের নানা বিষয়ক মন্তব্য লেখা আছে। তার পরে ১৩১৯-এ লেখা মন্তব্য।

৫ বেঙ্গল একাডেমি অব লিটাবেচার (১৮৯৩, ২৩ জুলাই প্রতিষ্ঠিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত (১৮৯৪, ২৪ এপ্রিল, ১৭ বৈশাখ ১৩০১ বঙ্গাব্দে) হওয়ার অব্যবহিত পরেই রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। সে-সময় রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি এবং কবি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সহকারী সভাপতি। তখন থেকেই বামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুদিন পর্যন্ত পরিষদের নানা পদে নিযুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ১৩০১-১৩০৩, ১৩০৮, ১৩১২-১৩১৬ পর্যন্ত সহকারী সভাপতি ছিলেন। সে-সময় পরিষদের কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৩১১ থেকে ১৩১৮ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পরিষদের সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ পরিষদের অন্তর্গত 'ছাত্রসভা' নামক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে তিনি এই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার নেওয়াব অনুরোধ জানিয়েছেন।

পত্র ৭। জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে এই চিঠিতে ব্যক্ত ববীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি তাঁর বিরূপতা বিশেষ তাৎপর্যবহ।

স্বদেশী আন্দোলনেব যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিব বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে এই শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশেব প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হয় না। প্রচলিত শিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছিল 'শিক্ষাব হেরফের' প্রবন্ধে (সাধনা, ডিসেম্বর ১৮৯২)।

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে (১৯০১) তিনি নিজস্ব শিক্ষাদর্শে পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শ থেকে ভিন্নতর এক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রচলিত স্কুলের থেকে ভিন্ন আদর্শের জাতীয় বিদ্যালয় অন্যত্রও তৈরি হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন -পরিচালিত বিদ্যালয় এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগবত চতুষ্পাঠী (১৮৯৫) এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে নতুন বেগ সঞ্চার হয়। ১৯০৪-এর ইউনিভার্সিটি বিল প্রণয়ন করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণকে নিরঙ্কুশ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে (আষাঢ় ১৩১১) নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেন :

> ‘সর্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেমব্রিজ-অক্সফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহাতে সাজ সরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে —কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন।’
>
> —য়ুনিভার্সিটি বিল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘স্বদেশী সমাজ’ পড়েন চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে (৭ শ্রাবণ ১৩১১, ২২ জুলাই ১৯০৪)।[১] শিক্ষাসমাজ প্রভৃতির বিভিন্ন কাজে শাসকমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের উদ্যোগই গড়ে তুলবার পবামর্শ রবীন্দ্রনাথ বার বাব দিচ্ছিলেন।

---

[১] সাধারণের বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি কার্জন রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয়বার পড়েন ১৬ শ্রাবণ ১৩১১, ৩১ জুলাই, ১৯০৪-এ।

১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর (আশ্বিন ৩০, ১৩১২) বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করা হল। নানা দিকে আন্দোলন চলেছে। অতঃপর ২৩ কার্তিক ১৩১২ (২৪ অক্টোবর ১৯০৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ফীল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত সভায়। ৮ নভেম্বর রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[১]

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গঠনপ্রণালীর খসড়া তৈরি করবার জন্য যে সভা বসে, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এদের ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতিতে তাঁর সম্পূর্ণ সায় ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা এই পত্রে তাঁর সেই মনোভাব ফুটে উঠেছে। 'শিক্ষার আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকা ভাণ্ডার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় (২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩১২) প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল সভাসমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা কিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন।'[২]

---

[১] সুমিত সরকার, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, p. 162.

[২] দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ৫২৭। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বক্তৃতা রচনাবলীর এই খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হয়েছে।

ভাণ্ডারের এই সংখ্যা প্রকাশের পরদিনই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে এই পত্র লেখেন, স্মরণ করা যেতে পারে। এই চিঠি লেখার পরেও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র রচনা প্রভৃতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করে কলিকাতা টাউন হলে ২৯ আশ্বিন ১৩১৩ তারিখে প্রবন্ধ পড়েন 'জাতীয় বিদ্যালয়'।

পত্র ৮। ১ কাশীতে ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ শেষ করে পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য (১৮৭৮-১৯৫৯) শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ২৪ জানুয়ারি ১৯০৫-এ। এখানে এসে তিনি মাধ্যন্দিন শতপথব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। এর প্রথম খণ্ড ১৩১৬ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভারতশাস্ত্র পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালার সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পরবর্তী কয়েকটি পত্রেও এই অনুবাদ প্রসঙ্গে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর কীভাবে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তা লক্ষণীয়।

২ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অনুরোধক্রমে ১৯০৭-এর জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে 'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি'— এই চারটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনে যথাক্রমে পৌষ ১৩১৩, মাঘ ১৩১৩, বৈশাখ ১৩১৪ এবং আষাঢ় ১৩১৪তে প্রকাশিত হয়। এই পত্রে সর্বশেষ প্রবন্ধ 'সাহিত্যসৃষ্টি'র প্রসঙ্গই উল্লিখিত। এই প্রবন্ধটির নাম প্রথমে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন 'মহাকাব্য'। প্রবন্ধটি

তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে পড়ে শুনিয়েছিলেন তাতে ইলিয়াড ওডিসি রামায়ণ মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে বলেই।[১]

জাতীয় শিক্ষাপরিষদে রবীন্দ্রনাথ যে এই ভাষণগুলি দেবেন, সে বিষয় *The Bengalee* ২৪ জুন ১৯০৬ সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হয় : At the invitation of the National Council of Education, Bengal, two of their members Babu Rabindranath Tagore (Director of Studies in Bengali for the Bengal National College) and Babu Mohini Mohan Chatterjee, M. A. B. L., have kindly undertaken to deliver courses of extension lectures at the above college at No. 191-1, Bowbazar Street. Babu Rabindranath Tagore's lecture will be on "Comparative Literature" and will be delivered in Bengali. The first lecture of the series will be delivered on Sunday, the 27th January at 4 P.M. sharp. Babu Mohini Mohan Chatterjee's lecture will be on "The Study of History" and will be delivered in every alternate Saturday at 4 P.M. commencing from the 2nd February.[২]

৩ বহরমপুরের প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন ১৩১৩ সালে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য। মুলতুবী সভার অধিবেশন সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখার উদ্যোগে আয়োজন করা যায় কিনা সেই চেষ্টা চলেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সেই সভাতে সভাপতি রূপে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। মুলতুবী সভাতেও তিনিই ছিলেন সভাপতি। রংপুরের সেই সভা হয় নি। বহরমপুরেই পরে ১৩১৪-র ১৭-১৮ কার্তিক সেই সভা

---

[১] দ্রষ্টব্য প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ৫ম, পৃ. ৩৫৮।

[২] তদেব, ৩৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত।

হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথই সভাপতিত্ব করেছিলেন।

এই সাহিত্যসম্মেলন সম্পর্কে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লিখেছেন : 'রামেন্দ্রসুন্দরের চেষ্টায়, আমার ক্ষীণ যত্নে ও রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে প্রথম সাহিত্য সম্মেলন হয়। তৎপরে অদ্যাবধি বৎসরের পর বৎসর সাহিত্য সম্মেলন হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম সম্মেলনে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমার কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে।'[১]

রামেন্দ্রসুন্দর এই সম্মিলনে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তার শিরোনাম 'মাতৃমন্দির'। প্রবন্ধটি 'নানাকথা' বইতে সংকলিত আছে।

পত্র ১০। ১ সদ্যবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ সহ রবীন্দ্রনাথ বরিশালে যান জ্যৈষ্ঠের শেষে অথবা আষাঢ়ের প্রথম দিকেই (১৩১৪)। বরিশালে মীরার শ্বশুরালয়। সেখান থেকেই চট্টল হিতসাধনী সভার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রামে যান। বরিশাল এবং চট্টগ্রাম দুজায়গাতেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের তিনি সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপনে উৎসাহিত করেন। এর মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথেরই সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধনে দেশের মধ্যে সংহতি নিয়ে আসবার স্বপ্ন ও বাসনা। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সময় থেকেই তিনি বাঙালির মধ্যে ঐক্যকে অব্যাহত ও অনৈক্য দূর করবার জন্য সাহিত্যকে অবলম্বন করতে বলে আসছিলেন। ১৩১৩ চৈত্র মাসে বহরমপুরে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের জন্য লিখিত 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

---

[১] নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর', ১৩২৭, পৃ. ২০।

'বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্য পরিষদের শাখাস্থাপন ও বৎসরে বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের বাৎসরিক মিলনোৎসব সাধনের প্রস্তাব অন্তত দুইবার আমার মুখ দিয়া প্রচার হইয়াছে। তাহাতে কী উপকারের আশা করা যায় এবং তাহার কার্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি।'

পত্র ১১। ১ বস্তুত কলিকাতা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেও পাঁচ দিন পরেই ২২ আষাঢ় ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। ২৪ আষাঢ় : ৯ জুলাই ১৯০৭ তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে তাঁর চতুর্থ প্রবন্ধ 'সাহিত্যসৃষ্টি' পড়েন। অপর তিনটি প্রবন্ধ পূর্বেই পড়া হয়ে গিয়েছিল।

পত্র ১২। ১ শতপথব্রাহ্মণের অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকে সংগ্রহ করবার আশায় বিধুশেখর রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিয়েছিলেন (১০ আষাঢ় ১৩১৪)। সেই চিঠিরই শেষের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এই পত্র লিখিত।

বিধুশেখরের এই চিঠিতে মুর্শিদাবাদের কান্দি স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদের জন্য পণ্ডিত রমেশচন্দ্র বেদান্তবিশারদকে সুপারিশ করতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

পত্র ১৩। ১ মীরাদেবীর অসুস্থতা। পরে চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

২ সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দরের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের কথাই বলা হচ্ছে। তখনও এই অনুবাদটি মুদ্রিত হয় নি। এটি ভারতশাস্ত্র-পিটকের প্রথম গ্রন্থরূপে ১৯১১তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৫। ১ পাবনায় ১১ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ইতিপূর্বে সুরাটে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে চরমপন্থীরা বিতাড়িত হন। পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনে দুদলের বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। চরমপন্থীরা অশ্বিনীকুমার দত্তকে সভাপতি করতে চেয়েছিল। নরমপন্থীরা নিরপেক্ষ রবীন্দ্রনাথকে মনোনীত করে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন উভয় পক্ষকে সম্মিলিত করে গঠনমূলক কর্মে প্রণোদিত করতে।

২ রামেন্দ্রসুন্দরের 'ধ্বনিবিচার' প্রবন্ধটি সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় (১৩১৪ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা) প্রকাশিত ও পরে 'শব্দকথা'য় (১৯১৭) সংকলিত হয়। 'শব্দকথা'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন এই বলে :

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে।... রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী— আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি, ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না।'

পত্র ১৬। ১ ১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্যালয় ভাড়াটে বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ২১ অগ্রহায়ণ গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের গৃহপ্রবেশ–উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন।[১]

---

[১] দ্রষ্টব্য পরিষৎ পরিচয় ১৩৪৬, পৃ ২৮।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে সম্মতি জানান।

২ খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন 'হুঙ্কার' নামে একটি কবিতার বই লিখে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। রাজদ্রোহমূলক কবিতা বলে বইটি সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এবং বাজেয়াপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত ছিল বলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত খুলনার আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয়। এই মামলায় হীরালাল সেনের দেড় বছরের জেল হয়েছিল।[১]

জাতীয় বিদ্যালয় উঠে গেলে রবীন্দ্রনাথ হীরালাল সেনকে ১৯১০-এর জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ দেন। 'কিন্তু বঙ্গীয় সরকারের কোপদৃষ্টি থাকায় শেষ পর্যন্ত কবি তাঁহাকে আশ্রমে রাখিতে পারিলেন না। ১৯১১-র শেষভাগে তাঁহাকে নিজ জমিদারিতে কবি কাজ দেন। সেখানে কার্যে নিযুক্ত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।[২]

পত্র ১৭। ১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নূতন গৃহপ্রবেশ-উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। ১৬-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের লিখিত রূপ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়-এ (পৃ ৫৩৬-৩৯) সংকলিত হয়েছে।

২ গৃহপ্রবেশ-উৎসব সভার দিনই (২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রষ্টব্য

---

[১] দ্রষ্টব্য চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, ১৩৯২, পৃ. ২৬-২৮।

[২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ২ (১৩৫৫), পৃ. ১৮৩।

পরিষৎ পরিচয়, পৃ. ৪৪। রবীন্দ্রনাথ এর কয়েকদিন পরেই পিতৃদেবের ছবি তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলছেন কেন বোঝা যায় না।

পত্র ১৮। ১ শব্দতত্ত্ব বইটির প্রকাশ ১৯০৯-এ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে। ১৯০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের গদ্য রচনা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শব্দতত্ত্ব মজুমদার লাইব্রেরি-প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ১৫-সংখ্যক গ্রন্থ। এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ছিলেন সুহাসচন্দ্র মজুমদার। ২ লালগোলার রাজা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য ঠিক কী ধরনের বদান্যতা করেছিলেন, জানা যায় না। যোগীন্দ্রনারায়ণ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দরের বৈবাহিক।

পত্র ১৯। ১ আসানসোলের চরণপুর অঞ্চল থেকে এই চিঠি লিখেছিলেন (২৬ আষাঢ় ১৩১৬) রাসবিহারী মণ্ডল। তাঁর চিঠির অপর পৃষ্ঠাতেই ১৯-সংখ্যক পত্রখানি লিখিত।

পত্রলেখক শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধীন মাইনিং ইন্সপেক্টর অব বেঙ্গল-এর একজন সহকারী। পাথুরে কয়লা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েও তিনি পরিভাষার অভাবে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত আছেন জেনে তিনি পত্রযোগে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩২৮ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় রাসবিহারী মণ্ডলের 'খনিবিদ্যার পরিভাষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এবং ওই সম্বন্ধে আলোচনা করেন অবিনাশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

২ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩১৩ সালের কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামে প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোনার তরী' কবিতার অস্পষ্টতা দোষের কথাই নানাভাবে বলেন। পরের সংখ্যার প্রবাসীতেই যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে লেখেন 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা। ১৩১৩ সালের আশ্বিনের 'সাহিত্য' পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন 'একটি পুরাতন মাঝির গান (সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা)— এটি 'সোনার তরী' কবিতার প্যারডি।

এই-সব সমালোচনা ও বিতর্কের কথা মনে করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার তরী কবিতার সম্পর্কে পরিহাসপূর্ণ মন্তব্য করেন।

৩ কাল্কা থেকে ফিরে কবি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন। তার পর তিনি চলে যান শিলাইদহে নির্জনবাসে। পূর্ববর্তী পত্রে (সংখ্যা ১৮) রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বই পাঠাবার নির্দেশ প্রকাশককে দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন।

পত্র ২০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রবন্ধ 'মায়াপুরী' পড়েন ২ আশ্বিন ১৩১৬। এই পত্রটি তার পূর্বে লিখিত। রামেন্দ্রসুন্দরের এই প্রবন্ধটি তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সংকলিত আছে।

পত্র ২১। ১ লালগোলার রাজাবাহাদুরের প্রসঙ্গ ১৮-সংখ্যক পত্রে দ্রষ্টব্য।

২ এই পত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র হয়ে রবীন্দ্রনাথেব বরোদায় যাওয়ার কথা আছে। বরোদায় মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মিলন হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৬-৮ কার্তিক। সেই সম্মিলনে সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যান নি। রবীন্দ্রজীবনীতে

উল্লিখিত আছে 'শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া কার্তিক মাসটা তথায় থাকিয়া অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় পুনরায় পিতাপুত্রে ভ্রমণে বাহির হইলেন।'[১] গৌরহরি সেনকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে রমেশচন্দ্র দত্ত মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে বরোদায় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষে তাঁকে দু-তিনখানা পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন 'যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অনুতপ্ত আছে।'[২]

পত্র ২২। ১ এই পত্রে তারিখ নেই। তবে পূর্বপত্রের অনুবৃত্তি বলে অনুমিত। আগের চিঠিতে পত্ররচনাস্থলরূপে শিলাইদহের উল্লেখ ছিল। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় এ-সময়ে পিতৃসহবাসে শিলাইদহে দিনযাপনের মনোরম বিবরণ আছে। প্রভাতকুমারের বিবরণে দেখা যায়, শিলাইদহে থাকতেই ২৭ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ একটি রাখীসংগীত রচনা করে শান্তিনিকেতনে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দেন।

পত্র ২৪। ১ রামেন্দ্রসুন্দরের ২৯ ভাদ্রের পত্রে তাঁর ডায়বেটিস রোগের আক্রমণের সরস উল্লেখের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য।

২ ১৭ আশ্বিন থেকে ছুটির কথা লিখলেও পূজাবকাশ আরম্ভ হয ১৯ আশ্বিন (৫ অক্টোবর ১৯১০) থেকে। ১৭ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ বিলাত-প্রবাসী অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন :

'আমাদের ছুটি আসন্ন হয়েছে। পর্শুদিন থেকে ছুটি আরম্ভ হবে। আজ ছেলেরা মিলে বিসর্জ্জন অভিনয় করবে— কাল বড়র দল প্রায়শ্চিত্ত করবে।... এবারে সকলে আমাকে বৈরাগী সাজবার জন্যে

---

[১] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২, ১৩৫৫, পৃ. ২১২।

[২] বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ. ৪৮।

নিতান্তই চেপে ধরেছে— রাজি হয়েছি— তুলনায় পাছে হটে যাই এ ভয় যে একেবারে মনে নেই তা বলতে পারিনে'। প্রায়শ্চিত্ত প্রথমবার অভিনীত হয় গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে— 'অজিতকুমার তখন ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।'

৩ রামেন্দ্রসুন্দর 'বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা', নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবালয়' নামক প্রতিষ্ঠানে ৭ আশ্বিন ১৩১৭ (২৪ সেপ্টেম্বর)। ওই প্রবন্ধটি পরে 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামে জিজ্ঞাসা গ্রন্থে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় ছিলেন, সুতরাং প্রবন্ধপাঠের আসরে তাঁর উপস্থিত থাকা খুবই সম্ভব।

পত্র ২৫। ১ কান্তকবি নামে পরিচিত রজনীকান্ত সেনেব মৃত্যুর উল্লেখ থেকে মনে হয় এই পত্র ১৩১৭ সালের ২৮-এ ভাদ্রের কয়েক দিনের মধ্যে লিখিত হয়। সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দর প্রয়াত কবির পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য সাহিত্য পরিষদের পক্ষে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার সম্ভাবনা চিন্তা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে জড়িত করার প্রস্তাব করেন। সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য। রজনীকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ইতিপূর্বেই ছিল। 'বাণী' 'কল্যাণী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা গীতিকার রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) ২৮ ভাদ্র ১৩১৭তে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যানসার রোগে মারা যান। মৃত্যুর তিন মাস আগে ২৮ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান। কী কঠিন সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি রোগযন্ত্রণা বহন করছেন, তা দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে যান। তখন রজনীকান্ত বাকশক্তিরহিত। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে

ফিরে গেলে রজনীকান্ত এই গানটি লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দেন —'আমার সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে দূর।'[১] রবীন্দ্রনাথ ১৬ আষাঢ় রজনীকান্তকে লেখেন :

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ-রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়।...

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই-সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোটো এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই, কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে

---

[১] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ২৯ জুন (১৫ আষাঢ়) তারিখে লেখা রজনীকান্তের পত্রে ১ আষাঢ়ে লেখা 'এই মুক্তপ্রাণের দৃপ্তবাসনা তৃপ্ত করিবে কে?' গানটি উদ‍্ধৃত হয়েছে।

ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত-বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য!

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেইদিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে তবে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যে-গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন— আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে— অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার জীবনসংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]

---

[১] নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 'কান্তকবি রজনীকান্ত' (১৯৬৮), পৃ. ১৬১-৬২।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'কান্তকবি রজনীকান্ত'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশও উদ্ধারযোগ্য :

রজনীকান্ত সেনের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় অতি সামান্যই ছিল। আমি কয়েকবার মাত্র তাঁহার গান তাঁহার মুখে শুনিয়াছি এবং রোগশয্যায় যখন ক্ষতকণ্ঠে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই স্বল্প পরিচয়ে তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে সে আমি তৎকালে তাঁহাকে পত্রদ্বারাই জানাইয়াছিলাম। সেই পত্র এই বর্তমান গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।...

ভূমিকার তারিখ শান্তিনিকেতন ৩১ আশ্বিন ১৩২৮।

পত্র ২৬। ১ হরিপ্রসাদ মিত্র আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির অবস্থাকালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে লেখা পত্র : "আজ তোমাদের একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল— তাঁর নাম হরিপ্রসাদ মিত্র— তিনি কর্নেল য়ুনিভার্সিটির ছাত্র। তাঁর সঙ্গে অনেক কথার আলোচনা হল। তোমাদের কথাও হল।" দ্র. দেশ শারদীয় ১৩৯৮, পৃ ৩০।

পত্র ২৭। ১ এই পত্র সাহিত্যপরিষদ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরকে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত। কিন্তু সেই বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে এই পত্র আলোচিত হওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। ১৩১৮, ৩১ বৈশাখ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সারদাচরণ মিত্র সভাপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সহকারী সভাপতি হন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন, রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত হয় নি বলেই পত্রটি নথিভুক্ত হয় নি এবং রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে। জগদীশচন্দ্র বসু ১৩২৩ সালে পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

২ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকায় ১৮৯৫ সাল থেকেই ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে আসছিলেন। ভারতীতে তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। এই গ্রন্থের সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (১৩০৫)। অক্ষয়কুমার-সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশের সম্ভাবনাকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে 'বাঙ্গলা ইতিহাসে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তক' বলে সংবর্ধনা করেন।

পত্র ২৯, ৩০। এই দুই পত্রে জন্মোৎসব পালনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ১৩১৮-র ২৫ বৈশাখ। এই উপলক্ষে 'ভক্তিপ্রণত আশ্রমবাসিবৃন্দ' শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমাধিপতি পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উৎসবে অর্ঘ্যাভিহরণ প্রদান করে। অর্ঘ্যাভিহরণে মঙ্গলগীতি, আবাহন, অর্ঘ্যাভিহরণ এবং শান্তি— এই চারটি নামে মন্ত্র সংকলিত ও উচ্চারিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৪ বৈশাখ, ১৩১৮-এ বিগত ১৩১৭-র পৌষ মাসে প্রকাশিত রাজা নাটকের অভিনয় হয়। এটি রাজা নাটকের দ্বিতীয়বারের অভিনয়ানুষ্ঠান। প্রথমবার

অভিনয় হয় ৫ চৈত্র, ১৩১৭। রবীন্দ্রনাথ পূর্বের মতো এতে ঠাকুরদার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই উপলক্ষে অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামক প্রবন্ধ পড়েন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উদ্‌যাপনের প্রায় নয় মাস পরে ১৪ মাঘ ১৩১৮ (২৮ জানুয়ারি ১৯১২)[১] কলকাতায় টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবিকে বিরাট আকারে সংবর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি থেকে বোঝা যায় এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও আয়োজন নয় মাস পূর্বে বৈশাখ মাস থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। স্মরণীয় এই যে কোনো সাহিত্যিককে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের ঘটনা এই প্রথম। এ-কথা তৎকালীন সংবাদপত্রের বিবরণে এবং অন্যত্র বিশেষ ভাবেই উল্লিখিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দি বেঙ্গলী’ পত্রিকায় (২৯ জানুয়ারি ১৯১২) এইদিনটিকে বলা হয়েছিল A Red Letter Day in Bengali Literature. এই পত্রিকায় সেদিনের কবিসংবর্ধনার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

নয়মাসব্যাপী আয়োজনের পরিকল্পনা এবং সূচনা কেমন করে হয়েছে, তার বিবরণ আছে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য’ গ্রন্থে। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করার পরিকল্পনা সর্বপ্রথম কয়েকজন তরুণ ভক্তদের মধ্যেই উদিত হয়। ‘আমাদের অনামিকা গৃহসভায় একদিন কথা উঠিল— কবি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিবেন, এই উপলক্ষে তাঁহার শুভ শতায়ু কামনা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন কল্পে একটি প্রকাশ্য সংবর্ধনা করিতে হইবে।’[২] একটি সভা ডাকা হল। তাতে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী,

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেকে একশো টাকা দিলেন। অতঃপর তাঁরা চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিপ্রায় জানালেন। চিত্তরঞ্জন প্রথমে একটি চেক পরে আর-একটি চেক দিলেন। আরো চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্র বাগচী নাটোরের মহারাজের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তিনিও 'সম্মানোচিত' সাহায্য করলেন। বহরমপুরে কলেজিয়েট স্কুলে একটি সভা আহ্বান করে তাঁরা তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে কাশিমবাজারের মহারাজা, লালগোলার মহারাজা, বৈকুণ্ঠনাথ সেন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে তাঁরা স্থির করেন রবীন্দ্রনাথের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রহণ করলেই ভালো হয়। সেজন্য পরিষদ-সম্পাদক বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে তাঁবা দেখা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর সাগ্রহে এতে সম্মতি দিলেন। তদনুযায়ী পরিষদ গৃহে তিনি একটি সভা আহ্বান কবেন তাতে উপস্থিত ছিলেন সারদাচরণ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ। উৎসব পালনের জন্য একটি অভ্যর্থনাসমিতি গঠিত হল, তাতে সদস্য হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সারদাচরণ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র কিশোর বাযচৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তাঁদের স্বাক্ষরে জনসাধারণের উদ্দেশে কবিসংবর্ধনা নামে নিবেদন পত্র প্রচারিত হয়। এই পত্রটির খসড়া করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত :

'আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন।

রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ; তিনি বহু বর্ষ নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সংবর্ধনা করা দেশবাসীর কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

'ইতিপূর্বে আমরা দেশের সাহিত্যিকগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই ; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটি হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটির সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

'রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য করিবেন।

'সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় কবিরা উদ্দেশ্যে কোনও লোকহিতকব স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

'সমিতির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে

সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে।

সমিতির সদস্যগণ

উপরে উল্লিখিত নয়জনের স্বাক্ষর[১]

প্রবাসীর ১৩১৮ বৈশাখ সংখ্যায় অর্থাৎ মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবের নয় মাস পূর্বেই এই বিজ্ঞপ্তিটি ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠান্তরে প্রকাশিত হয়। তাতে সদস্য হিসাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম অন্তর্ভূক্ত ছিল। তা ছাড়া সর্বশেষে একটি বাক্য ছিল 'সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৫৩ নং সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।' শান্তাদেবী লিখেছেন, 'জন্মোৎসবের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রামানন্দও (অন্তরালে) ছিলেন ; তবে যাঁহাদের নামে চিঠি বাহির হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে তিনি ছিলেন না।' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত সাহিত্যে (শ্রাবণ ১৩১৮) এ-বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল :

'রবীন্দ্রনাথেব 'সম্বর্ধনার' দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই বিবাহসভার 'হ্যাণ্ডবিলে'র মত স্তবরচনার সূচনা হইয়াছে। এক "প্রবাসীর অঙ্গেই স্তবপঞ্চক প্রকটিত দেখিতেছি"।'

রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার বিরোধিতা কারা করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। বেঙ্গলী পত্রিকায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসব সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছিল তাতে দ্বিজেন্দ্রলাল বায় বা সুরেশচন্দ্র

---

[১] *The Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement,* Saturday Sept. 13. 1941 — (Reprint 1986)-এর ১১৫ পৃষ্ঠায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে-লেখা বিজ্ঞপ্তিটির ফোটোচিত্র দেওয়া আছে।

সমাজপতির নাম নেই, যদিও তৎকালীন তরুণ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকদের নাম পাওয়া যায়। ২৯ জানুয়ারি ১৯১২ বেঙ্গলী পত্রিকায়, ১৩১৮-র ফাল্গুন সংখ্যার ভারতীতে টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ভারতীতে লেখা হয়েছিল :

'যাঁহারা পুরীতে সমুদ্র দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সাগরতরঙ্গ যখন বেলাভিমুখে ধাবিত হয় তখন কেমন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত স্থলাংশটুকু আচ্ছন্ন করে, প্লাবিত করে, তিরোহিত করে। এক একটা উত্তালতরঙ্গ উত্থিত হয় আর তখন এ পিঠের ও পিঠের কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেদিনকার সভার কার্য্যারম্ভকালে জনতরঙ্গ সেইরূপ উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছিল।'

বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র সভার উদবোধন করেন। তিনি তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। সেদিনের সভাতেও তিনিই সভাপতিত্ব করেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী -রচিত সংগীত 'বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভামাঝে গাওয়া হল দরবারী সুরে।' মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন।[১]

তারপরে ভাষণ দেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। এই বিবরণ প্রাসঙ্গিকবোধে কিয়দংশে উদ্ধৃত হল :

'নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ অর্ঘ্যদান করিতে উঠিলেন। অনেকদিন ইহাকে কোন সভাসমিতিতে দেখা যায় নাই।... তাই আজ তাঁহাকে অনপেক্ষিতভাবে বেদীর উপর অর্ঘ্যহস্তে দেখিয়া

---

[১] 'বেঙ্গলী' পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী উপনিষদ থেকে মন্ত্র পাঠ করেছিলেন পণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ আচার্য।

দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণসখা অর্জুনের ন্যায় নির্ভীক সত্যসন্ধী মহারাজ আজিকার কবিসূয় যজ্ঞে শিশুপালধর্মী যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল বড় নিপুণতার সহিত প্রথমে তাহাদের খবর লইলেন। সভামধ্যে একটু বৈচিত্র্যের ঢেউ খেলিয়া গেল। তিক্ত স্বাদের সম্ভাবনার আভাসটুকু দিয়া মধুস্বাদকে আরও তিনি ঘনীভূত করিয়া দিলেন। বক্তব্যের পরিশেষে মহারাজ কবিসখাকে অর্ঘ্যদান করিলেন।'

এর পরেই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় উপলক্ষে (১৮৮১) তিরিশ বৎসর পূর্বে যে কবিতা লিখেছিলেন 'উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর' সেটি পড়ে শোনালেন। তার পরেই পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নিম্নলিখিত সংবর্ধনাপত্রটি পাঠ করলেন।

অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
করকমলেষু

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নবশতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধ্বব্যামে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন;

মনীষিগণ স্বহস্তরচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসমুসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী-কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে আনয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃতকণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণদ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর

উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
বঙ্গাব্দ ১৩১৮ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৬ মাঘ সম্পাদক

কবি তার যথোপযুক্ত উত্তর-ভাষণ দান করেন।

১৩১৮ ফাল্গুনের প্রবাসীতেও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে 'রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা' নামে বেশ বড় একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাতে শেষে বলা হয় :

তাঁহার সংবর্ধনার জন্য বাঙ্গালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না। যাহা হইয়াছে তাহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ।'

টাউন হলের এই সভা ছাড়াও পরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ছাত্রসভ্যগণ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করে। আর-একদিন সংবর্ধনা কমিটির সভ্যগণ সান্ধ্যসম্মিলনে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে। দ্বিতীয় দিনের সভাতেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পড়েন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'জগৎ কবিসভায় মোরা তোমারি করি গর্ব।'

টাউন হলে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে এই অনুষ্ঠান করার জন্য সমালোচনা হয়। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর অনুষ্ঠানের সমর্থনে লেখেন :

১২ পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা
২০ মাঘ ১৩১৮

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। রবীন্দ্র-সংবর্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন-পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহুবৎসরের সাহিত্য সেবার উপলক্ষ করিয়া [পরিষৎ] দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা কবিয়া তাঁহার স্থান নির্দেশের বা পদবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্যসেবক ও সাহিত্য-অনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। বহুদিন পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেণ্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত

হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সেবার পরিষদের স্থাপনকর্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে তাঁহাকে সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ গ্রন্থ সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্বতন সাহিত্যরথীদিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করেন। বিদ্যাসাগব, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান নাই; কেননা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না— হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের তাদৃশ সামর্থ্য ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্মর মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ৺নবীনচন্দ্রের মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালীর দুই গালে চুন কালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছেন ও উহা পরিষৎ মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্তি স্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।[১]

---

[১] প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারীরা তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ মহাজনদের কাছে বন্ধক রেখেছিল। গ্রন্থসংগ্রহ নীলামের জন্য বিজ্ঞাপিত হলে লালগোলার রাজার দৃষ্টি তাতে আকৃষ্ট হয়। তিনি সেই বই কিনে পরিষৎকে দান করেন। পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরই নেপথ্যে উদ্যোগী হয়ে ওই সংগ্রহ পরিষদে আনাবার ব্যবস্থা করেন। দ্রষ্টব্য আশুতোষ বাজপেয়ী, রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা, পৃ. ১৪৯।

অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য পরিষৎ একটা অপূর্ব অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্য গণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সম্বর্ধনা কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। এই চাঁদা সর্বসাধরণের নিকট তোলা হয় নাই; তাঁহাদের নিজেরাই ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ অন্যূন সাত হাজার টাকা এই রূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী মাত্রই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবি-সংবর্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মফস্বলবাসীরা দূরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না; তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত বটে, কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা কেন যে এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন বুঝি না।...

আপনার কুশলপ্রার্থী
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্রনাথের এই সংবর্ধনার কিছুদিন পর তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তখন পত্রান্তরে (৫ অগ্রহায়ণ, ১৩২০) রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন : 'রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটিকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না; আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একেই ত কথা আছে বিলাতি প্রশংসাপত্র না দেখিলে আমাদের নিজেদের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে।...

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[1]

পত্র ৩১। ১ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৯ সালে (১৯০২ খৃ.) সংস্কৃতের শিক্ষক রূপে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে তিনি প্রথমে 'সংস্কৃত প্রবেশ' তিন

---

[1] আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর' বইয়ের পৃ. ১৫৩-৫৬তে উদ্ধৃত। পত্র দুটি পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

খণ্ড রচনা করেন। ১৩১২ সাল (১৯০৫) থেকে তিনি অভিধান প্রণয়নে রত হন। ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে তিনি আর্থিক অসংগতির জন্য কলকাতায় কাজ নেন। সে-সময় রবীন্দ্রনাথই কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীকে বলে হরিচরণের পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। তার পর শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে ১৩৩০ সালের ১১ মাঘ এই অভিধান সমাপ্ত করেন। শেষ চারবছর তাঁর বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে ষাট টাকা হয়েছিল।

কিন্তু এই সুবৃহৎ অভিধান মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যায় নি। অতএব গ্রন্থকার নিজ ব্যয়েই অভিধান ছাপতে আরম্ভ করেন। ১৩৩৯-এ এই অভিধানের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়।

হরিচরণ কলকাতায় আসার আগেই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে অভিধান বিষয়ে পত্র লিখেছেন।

পত্র ৩২। এই চিঠিখানি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা নয়। দেশ পত্রিকায় যে-সংখ্যানুক্রমে এটি মুদ্রিত হয়েছিল রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সেই অনুক্রমেই রক্ষিত আছে বলে পত্রটি যথাযথ মুদ্রিত হল।

পত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ায় বর্তমান সম্পাদক দেশের পত্র-সম্পাদক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উমাপ্রসাদ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানান এই পত্রটি কবি লেখেন গৌরহরি সেনকে। গৌরহরি সেন ছিলেন চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক। এই লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর দুজনেরই ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ভুলবশত বঙ্গবাণী ও দেশ পত্রিকায় চিঠিখানি সংযোজিত হয়।

পত্র ৩৩। ১ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রামেন্দ্রসুন্দরের ৩০ কার্তিক ১৩২০ পত্রের উত্তরে লিখিত। ‘কোলাহল ত বারণ হল’— এটি গীতিমাল্যের গান। গীতিমাল্য প্রকাশিত হয় ১৯১৪তে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। সুতরাং গানটি পূর্বেই রচিত হয়েছিল যদিও গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে গৃহীত হয় নি। এই গানের রচনাকাল ১৮ চৈত্র, ১৩১৮। কিন্তু ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে এই গানের অনুবাদ আছে No more noisy loud words from me, such is my master's will (No. 47)। রদেনস্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন, এটি তার দ্বিতীয় কবিতা। সেই পাণ্ডুলিপিতে বাংলা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ কবির স্বহস্তে লিখিত আছে। পাণ্ডুলিপিতে এবং মুদ্রিত পাঠে দুটি মাত্র শব্দের পার্থক্য আছে।

পত্র ৩৪। ১ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে কন্যা মীরা এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বুদ্ধগয়া ভ্রমণে যান। সেখান থেকে এলাহাবাদ আগ্রা দিল্লি প্রভৃতি নানা স্থানে ঘুরে শান্তিনিকেতনে ফেরেন নভেম্বরের প্রথম দিকে। শান্তিনিকেতনে ফিরেই দিন-দুয়ের মধ্যেই রওনা হয়ে যান দার্জিলিঙে, আবার ১২ নভেম্বর দার্জিলিঙ থেকে ফিরে আসেন কলকাতায়। আবার শান্তিনিকেতনে এলেন বটে কিন্তু ১৬ নভেম্বর রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন রামগড়ে। রামগড়ে কয়েকদিন থেকে আগ্রায় চলে আসেন, সেখান থেকে জয়পুরেও ঘুরে আসেন। আগ্রা থেকে আবার এলাহাবাদে চলে আসেন। শান্তিনিকেতনে আসেন

২২ ডিসেম্বর। এবার শান্তিনিকেতনে থাকাকালে এই পত্রটি লিখিত হয়।

পত্র ৩৫। ১ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালের মে মাসে আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। ওই বছরের এপ্রিল মাসে তিনি আমন্ত্রণ পান বলে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন। কিন্তু এই পত্র রচনার তারিখ থেকে মনে হয় এক বছর আগেই এ বিষয়ে কথাবার্তা চলছিল।

পত্র ৩৬। ১ সম্পূর্ণ শ্লোক :

কুভোজ্যেন দিনং নষ্টং
কুকলত্রেণ শর্বরী।
কুপুত্রেণ কুলং নষ্টং
তন্নষ্টং যন্ন দীযতে।।

২ রামেন্দ্রসুন্দরের কনিষ্ঠ সহোদর দুর্গাদাস ত্রিবেদী। ১৮৯২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে যোগ দেবার পর· দুর্গাদাসকে তিনি কলকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেন। দুর্গাদাসের পড়াশুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন এবং রিপন কলেজে। পরে দেশে বিষযকর্ম নিযে থাকতেন।

১৩২১ সালে সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওযা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ যে মানপত্র পাঠ করেন, তার উত্তরে রামন্দ্রেসুন্দরের ভাষণ দুর্গাদাসই পড়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেছেন সংবাদপত্রে এই

সংবাদ প্রকাশিত হলে রোগশয্যাশায়ী রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুর্গাদাস রামেন্দ্রসুন্দরের বাসনা রবীন্দ্রনাথকে জানান, তিনিও দুর্গাদাসের সঙ্গে বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন।

পত্র ৩৭। ১ ব্যোমকেশ মুস্তফী সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরেব সহযোগী। খ্যাতনামা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীব পুত্র। ব্যোমকেশের জন্ম ১৮৬৮তে। ১৮৯৯ থেকে ১৯১৬-এর পয়লা এপ্রিলে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক। পরিষদ পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল' (১৩০৩) এবং শেষ প্রবন্ধ 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লীলা' (১৩২১)। মধ্যে মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি লোকসাহিত্য এবং ব্যাকরণ-বিষয়ক বেশ-কিছু প্রবন্ধ ওই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফী -সম্পাদিত ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল পরিষদ প্রকাশ করে ১৩২১ সালে। ব্যোমকেশের মৃত্যুর পর পরিষদে ব্যোমকেশ মুস্তফী-স্বর্ণপদক প্রবর্তিত হয়।

পত্র ৩৮। ১ রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকা ঘুরে দেশে ফিবে আসেন ১৯১৭ সালেব ১৩ মার্চ। রামেন্দ্রসুন্দরের বন্ধুত্বপূর্ণ স্নিগ্ধ পত্র যে তাঁর কাছে 'মরুভূমির উৎসধারার মত' মনে হয়েছিল, তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে বিদেশে 'ন্যাশনালিজম' সম্পর্কিত তাঁর ভাষণ এদেশে কারো কারো কাছে ভালো লাগে নি। এ-সমস্ত সমালোচনা তাঁর কানে পৌঁছেছিল।

এই পত্রে কবি তাঁর মানসিক ক্লান্তি জ্ঞাপন করলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি অনতিবিলম্বে নতুন আদর্শে সবুজ পত্রে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

পত্র ৪০। ১ ১৩২৪ সালের পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী লেখেন ঋকার-তত্ত্ব। এই প্রবন্ধের উত্তরে বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য লিখলে শাস্ত্রীমহাশয় পুনশ্চ লেখেন " 'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর"। তিনটি একই সঙ্গে ওই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর তখন পত্রিকাধ্যক্ষ।

পত্র ৪১। ১ ৫ জানুযারি ১৯১৯ রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে রওনা হন। বাঙ্গালোরের নাট্যনিকেতনের আমন্ত্রণে সুরেন্দ্রনাথ করকে নিয়ে কবি যাত্রা করেন। বস্তুত এ যাত্রা নিছক ভ্রমণ ছিল না, বিভিন্ন স্থানে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। বাঙ্গালোরে কারুশিল্পের উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি প্রবন্ধ পড়েন The Message of the Forest। ২১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি ছিলেন উটকামাণ্ডের শৈলাবাসে। তার পর তিনি কোয়েম্বাটুর পালঘাট সালেম তিরুচিরপল্লী কুম্ভকোনম তাঞ্জোর মাদুরা মদনপল্লী হয়ে আবার বাঙ্গালোরে ফিরে আসেন। মহীশূরে মিথিক সোসাইটিতে ৮ মার্চ তিনি যে ভাষণ দেন তার বিষয ছিল Folk Religions of India। ১০, ১১, ১২ মার্চ মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত -প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল য়ুনিভারসিটিতে বক্তৃতার বিষয় ছিল Education, Message of the Forest এবং The Spirit of Popular Religion in India.

১৪ মার্চ ১৯১৯-এ তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় যাত্রা

করেন। প্রায় দুই মাস তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন।

২ রামেন্দ্রসুন্দরের ২৩ পৌষ ১৩২৫ তারিখের পত্রের উত্তরে লিখিত। এই পত্রে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাতাশ বৎসর বয়সের কন্যার মৃত্যুসংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। কন্যাটি ছয় মাসকাল দুঃসহ রোগযন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যু বরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ সমব্যথী হয়ে তাঁর নিজের কন্যাশোকের কথা জানিযেছেন। মাত্র দশ মাস আগে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (ডাকনাম বেলা) মৃত্যু হয় ১৬ মে ১৯১৮। মাধুরীলতার বিবাহ হয়েছিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীব সঙ্গে। মাধুরীলতাকে নিয়ে শরৎচন্দ্র পৃথক বাসায় কলকাতায় থাকতেন। অসুখের সময় ববীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাকে দেখতে যেতেন, মৃত্যুর দিন দ্বারের কাছে গিয়ে সংবাদ শুনে তাকে না দেখেই ফিরে আসেন। মৃত্যুর সময় তাঁব বয়স ছিল বত্রিশ বছব।

রবীন্দ্রনাথ বেলাকে খুবই ভালোবাসতেন। নানা চিঠিপত্রে তার উল্লেখ আছে। মাধুরীলতার সাহিত্যবচনাশক্তি ছিল। তাঁব কোনো কোনো গল্পে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন আছে। 'সৎপাত্র' নামক গল্পটি (বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথেব বেনামী বচনা বলেই মনে কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের নির্দেশে এ গল্পটি গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।[১]

---

[১] 'মাধুরীলতার গল্প' নামে তাঁর গল্পগুলি 'সৎপাত্র' সহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য 'মাধুরীলতাব গল্প' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮০)

কন্যার মৃত্যুর সাত মাস পর তিনি দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন কিন্তু জানুয়ারি মাসে যাত্রার পূর্বেই ডিসেম্বর মাসে তাঁর আরও দুই প্রিয়জনের মৃত্যু হয়— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ সুকেশী দেবী এবং রবীন্দ্র-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ : রামেন্দ্রসুন্দর-রবীন্দ্রনাথ

পত্র ১। এই পত্রখানি ১৩০৬ বঙ্গাব্দে লেখা বলে অনুমান করা হয়েছে। অনুমানের কারণ পত্রে উল্লিখিত প্রবন্ধ ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তার প্রকাশকাল। এর পূর্বেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৩০৬এ পত্রিকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ প্রার্থনা করেন। ১৩১০ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন; পরে ১৩২৪-এ আর-একবার হয়েছিলেন।

১ রবীন্দ্রনাথ সপ্তম বর্ষের (১৩০৭) পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন —দুটিই ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম, 'বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত', চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ'। দ্র. বাংলা শব্দতত্ত্ব।

২ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯) এ সময়ে বঙ্গবাসী এবং মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপক ছিলেন। বামেন্দ্রসুন্দরের সান্নিধ্যে তিনি প্রথম আসেন রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময়।ললিতকুমার ইংরেজি সাহিত্যে কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর পিতা নবীনচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষা লাভ করলেও পূর্বতন পুরুষ ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। ললিতকুমাব ইংরেজি, সংস্কৃত এবং বাংলা তিন ভাষাতেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

এখানে ললিতকুমারের যে পূর্বপ্রকাশিত আর-একটি প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে সেটা ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক কিনা বলা যায় না। পরিষৎ পত্রিকায় ইতিপূর্বে তাঁর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি।

পত্র ২। ১ 'কাহিনী' কাব্য ১৩০৬ ২৫ ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয় ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর দেবমাণিক্যকে।

২ রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন ১৩০৪-এর মাঘ মাসে। এর বিষয় তিনি পেয়েছেন মহাভারতের সভাপর্ব এবং উদ্যোগ-পর্ব থেকে। সভাপর্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্বে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে

তস্মাদয়ং সদবচনাৎ অজতাং কুলপাংসনঃ।

উদ্যোগ পর্বের অন্তর্গত ভগবদ্‌যান পর্বেও গান্ধারী দুর্যোধনকে নিন্দা করেছেন দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য

আপ্তমাপ্তং তথাপীদমধিনীতেন সর্বথা।
ত্বং দেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতাপ্রিয়ঃ।।

নিন্দা করলেও রবীন্দ্রনাথের গান্ধাবীব উক্তিতে যে মহৎ আদর্শের প্রকাশ হয়েছে, এই দুই স্থলে সে রকম নেই। রবীন্দ্রনাথ গান্ধাবীর বক্তব্যকে যেমন বিস্তৃত করেছেন ভানুমতী ও দ্রৌপদীর সঙ্গে সংলাপেও সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতা নিয়ে এসেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর 'গান্ধারীর আবেদন' পূর্বেই শুনেছিলেন বলবার তাৎপর্য এই যে ১৩০৪ সালের ১ ফাল্গুন (১৪ মার্চ ১৮৯৮) রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে পড়ে শোনান। রামেন্দসুন্দর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৩ রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে ১৮৮১তে রচিত ও অভিনীত হয়। অভিনীত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি। পরের দিনই ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধাবণী পত্রে অভিনয়ের সংবাদ বিস্তৃতভাবে মুদ্রিত হয়। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। তরুণ রামেন্দ্রসুন্দর

দর্শকের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু কাগজে এর বিবরণ পড়েছেন। কিন্তু বাল্মীকিপ্রতিভার উদ্ধৃতিসহ অভিনয়ের সংবাদ কোন্ কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল জানা যায় নি।

৪ 'ভাষা ও ছন্দ', ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫-এ প্রকাশিত।

৫ 'সতী' নামক গাথা কবিতা রচিত হয় ১৩০৪-এর ২০ কার্তিক। কবিতার শিরোনামে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকা ছিল 'মিস ম্যানিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেবের বচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।'

৬ কবিতার নাম 'নরকবাস', রচিত হয় ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৪। এই কাহিনী মহাভাবতের বনপর্বের।

৭ 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' রচিত হয ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪-এ। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'কথা' এবং 'কাহিনী' নামে রবীন্দ্রনাথের দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাট্যকাব্য গান্ধারীর আবেদন সতী নরকবাস লক্ষ্মীর পরীক্ষা ও কর্ণকুন্তী সংবাদের সঙ্গে ভাষা ও ছন্দ এবং পতিতাকে অন্তর্ভুক্ত কবে 'কাহিনী' কাব্য এবং গাথা কবিতাগুলি নিয়ে 'কথা' কাব্য। 'কথা' উৎসর্গ করেন জগদীশচন্দ্র বসুকে।

৮ চিত্রা কাব্যের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মণ' নামক কবিতা প্রকাশিত হয় সাধনায় ফাল্গুন ১৩০১ সালে। সত্যকাম-জবালার কাহিনী ছান্দোগ্য উপনিষদ চতুর্থ অধ্যায চতুর্থ খণ্ড থেকে গৃহীত।

৯ জগদীশচন্দ্র বসুর অনুবোধে কর্ণ চরিত্রের মহত্ত্ব ফোটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ১৫ ফাল্গুন ১৩০৬-এ এই কবিতা লেখেন। তখন 'কাহিনী' কাব্যের মুদ্রণ চলছিল। কবিতাটি তাতে সন্নিবিষ্ট হয়।

১০ পত্রসংখ্যা ১-এ 'বৈশাখের পত্রিকার জন্য আর একটি প্রবন্ধের ভিক্ষার্থী' উক্তিতেই দেখা যায়, একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পাঠালেও রামেন্দ্রসুন্দর আরো একটি প্রবন্ধ চান। বর্তমান চিঠিতে দ্বিতীয় প্রবন্ধের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বস্তুত— প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত' প্রকাশিত হওয়ার পর চতুর্থ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' মুদ্রিত হয়। পরবর্তী বৎসরে লেখেন 'বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত'।

পত্র .৩। ১ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতার পঙ্‌ক্তি। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনাকে দেশসেবার অঙ্গ হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বলেই 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতা থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন। স্মরণীয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে জেনারেল অ্যাসেমব্লির যে-সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পড়েন, সেই সভার শেষে দর্শকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন। চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে ওই সভা হয়, সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২ সঙ্গীতসমাজ অথবা ভারতসঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীত সমাজের স্থাপনের সূচনা কী ভাবে হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে তার বিবরণ দিয়েছেন :

'পুণায় সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থান কালে তথাকার 'গায়নসমাজ' দেখিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটি সভাস্থাপন করিতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা হয়। কলিকাতায় ফিরিয়া, তিনি 'গায়ন-সমাজের' আদর্শে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন। উদ্দেশ্য —বাঙ্গালাদেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গালার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন।

তদনুসারে শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত হইল। সকল সংবাদ পত্রেই এই অনুষ্ঠানপত্র এবং উক্ত সভার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হইল। দেশের অনেক সুধী এবং দেশহিতৈষী মহাত্মা এইরূপ একটি সমিতি বা সঙ্ঘের অভাব ও তন্নিবারণের আবশ্যকতা বুঝিলেন। সভাস্থাপনকল্পে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্য জ্যোতিবাবু ধনীদের দ্বারস্থ হইলেন।... সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল 'ভারত সঙ্গীত সমাজ'।

প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বসিত। সকল শ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। ... কিন্তু বাঙ্গালীর সমবেত কার্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে অনতিবিলম্বেই মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।'

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় –প্রণীত
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬), পৃ ২১৭-২১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে 'ভারতসঙ্গীত সমাজে'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। আগে ছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে, প্রতিষ্ঠাবর্ষ ২৭ জানুয়ারি ১৮৯৮। নতুন করে এর আরম্ভ হল ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' 'পুনর্বসন্ত' 'বসন্তলীলা' 'হিতে বিপরীত' 'অলীকবাবু' প্রভৃতি বহুবাব অভিনীত হয়েছিল।

সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সমকালীন বিভিন্ন চিঠিপত্রে তিনি এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটি সঙ্গীত সমাজে অভিনীত হয়। ১৯০০

সালের ১৬ ডিসেম্বর ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্যবর্মনের সংবর্ধনা উপলক্ষে অভিনীত হয় 'বিসর্জন'। রবীন্দ্রনাথ তাতে রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রামেন্দ্রসুন্দর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিসর্জন সঙ্গীতসমাজে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৯০০। তাতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি।[১]

৩ বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-১৮৯৯) দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (২০ আগস্ট ১৮৯৯) পূর্বে তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত হয়, গদ্যপ্রবন্ধের বই 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪), কাব্য 'মাধবী' (১৮৯৬) এবং 'শ্রাবণী' (১৮৯৭)। মৃত্যুর পর বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু ও জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংকলন করে ১৯০৭ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাবলি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেব সম্পাদনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর। এতে বিক্ষিপ্ত রচনা ছাড়া ইতিপূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিও ছিল। তৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থাবলি বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনার সংকলন নয়। দীর্ঘকাল পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ সম্পূর্ণতর রচনাবলি প্রকাশ করে ১৩৫৯ সালে। প্রথম গ্রন্থাবলির রামেন্দ্রসুন্দর-কৃত সমালোচনামূলক ভূমিকা প্রবন্ধটি তাঁব 'চরিতকথা'য় সংকলিত হয়।

বলেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন তাঁর সাহিত্যরচনা ছাড়াও

---

[১] প্রথম অনুষ্ঠানেব বিবরণ দিয়েছেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' (১৩৫৬) বইতে। যতীন্দ্রমোহন বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-দক্ষতায় অভিভূত হন।

ব্রাহ্মসমাজ গঠনে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনে সহায়তা প্রভৃতি উদ্যমে পূর্ণ। সাহিত্যসাধকচরিতমালায় তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য।

৪ এ আবেদন কিসের বলা যায় না। এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর, সাহিত্য পরিষদের মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটেছিল, সে বিষয় স্মরণ করার সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতাও অবশ্য স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজার ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই পরিষদ-হিতাকাঙ্ক্ষী রামেন্দ্রসুন্দর মহারাজার সাহায্য প্রার্থনায় পরিষদের কোনো আবেদন পাঠানোর কথা ভেবে থাকতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের যোগ বহু পূর্ব থেকেই। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় (১২৮৮) কাব্য পড়ে তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য অভিভূত হন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। সেই সূত্রে এই যোগ স্থাপিত হয়। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি উপন্যাস ও বিসর্জন নাটকের প্রাচীন কাহিনী বীরচন্দ্রের সৌজন্যেই সংগ্রহ করেন। বীরচন্দ্র কলকাতায় এলেই রবীন্দ্রনাথকে ডেকে নিতেন। বীরচন্দ্র ছিলেন সংগীতবিশারদ, রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তার উল্লেখ করেছেন। ১৩০৩-এ বীরচন্দ্রের মৃত্যু হলে রাধাকিশোর দেবমাণিক্য রাজ্যভার নেন। তিনিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলেছেন। রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথকে আগরতলায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে সংবর্ধনা জানান। জগদীশচন্দ্র বসু যখন বিলাতে গবেষণার জন্য অর্থের অভাব বোধ করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাধিপতির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাঁকে সাহায্য করেন। পরেও ত্রিপুরার রাজ্যপরিচালনার

আদর্শ, এবং পুত্রদের শিক্ষাদান সম্পর্কে মহারাজা রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।[1]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাহিনী' কাব্য ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেব মাণিক্যকেই উৎসর্গ করেন। মহারাজা কলকাতায় এলে তাঁর সম্মানার্থে বিসর্জন নাটকের অভিনয় হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে।

ত্রিপুরাধিপতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের কথা রামেন্দ্রসুন্দরের অবশ্য সুজ্ঞাত ছিল। রাধাকিশোরের সাহিত্যপ্রীতি ও বদান্যতার কথাও তিনি জানতেন। সেই সূত্রেই পরিষদের, আবেদনপত্র মহারাজার নিকট পাঠানোর কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই ত্রিপুরার মহারাজা কবি হেমচন্দ্রকে মাসিক ত্রিশ টাকা এবং নগদ দুশো টাকা সাহায্য করেন। হেমচন্দ্রের তখন দুঃস্থ অবস্থা। সে-সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য সহৃদয় দাতা তাঁকে সাহায্য করেন।[2] সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণীতে (২৫ আষাঢ় ১৩০৬) এই দানের জন্য ত্রিপুরার মহারাজকে এবং 'দান সংগ্রহে বিশেষ যত্ন' করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জানানো হয়।[3]

পত্র ৪। ১ দিঘাপতিয়ার জমিদার। শরৎকুমার রায় বিদ্যোৎসাহী দানশীল ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে শরৎকুমারের উদার ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যোৎসাহিতার ব্যক্তিগত স্মৃতি

---

[1] ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ এবং যোগাযোগের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা : ১৯৮৭।

[2] মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড, ১৩৩০, পৃ ২৪৫।

[3] প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ৪, ১৩৯৫, ২৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত।

রচনা করেছেন। শরৎকুমার সাহিত্যপরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৩০৭-এ তিনি পরিষদের অন্যতম ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩১৪, ১৩১৫ এবং ১৩১৬তে তিনি পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে আড়াই হাজার টাকা দান করেন।

শরৎকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বহুপূর্ব থেকেই। ছিন্নপত্রে কোনো কোনো পত্রে দিঘাপতিয়ার স্থান নির্দেশ আছে। শরৎকুমারও লিখেছেন, জলপথে যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। ২ রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৪-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫) ছিলেন সেকালের ব্রাহ্ম সমাজসেবী। সমাজোন্নতি সমিতি, সাধারণ পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার, শ্রমিকশিক্ষার নৈশ বিদ্যালয়, মুসলমান শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র, সেভিংস ব্যাঙ্ক, কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিশুবিদ্যালয় প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান তিনি সংগঠন করেন। 'ভারতশ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশ করেন, শ্রমিকদের কল্যাণে মহিলাদের জন্য প্রকাশ করেছিলেন 'অন্তঃপুর' (১৮৭৩)। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে হিন্দু খৃস্টান মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ধর্মশিক্ষার জন্য স্থাপন করেন দেবালয়। তাঁকে 'সেবাব্রত' উপাধি দেন নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ। 'শশিপদ ১৭ পৌষ [শুক্র 1 Jan 1909] একটি ট্রাস্টডীড সম্পন্ন করে সমিতির কার্যভার কয়েকজন ট্রাস্টীর হাতে সমর্পণ করেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হন সভাপতি। সমিতির মুখপত্র 'দেবালয়' বৈশাখ ১৩১৬ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।'[১]

---

[১] রবিজীবনী ৬, ১৯৯৩, পৃ ১৩

৩ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ৬-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪ শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) ছিলেন তিব্বতীভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮৭৯ এবং ১৮৮১ খৃস্টাব্দে তিনি তিব্বতে পুঁথিপত্র ও তথ্যাদি সংগ্রহে যান। তা ছাড়া চীন জাপান এবং শ্যামদেশেও যান। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৩১৯-এ তাঁর ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র অনুবাদ চারখণ্ডে প্রকাশিত হয় সাহিত্য পরিষদের ভারতশাস্ত্রপিটক গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে। এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ ছিল রামেন্দ্রসুন্দরেব 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' (১৩১৮)।

৫ ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২০ আগস্ট 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বর্তমান পরিষদভবনের ভূমি দান কবেন। পরিষদের পক্ষে পাঁচজন সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শবৎকুমার রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হলেন। ১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্যালয় ভাড়াটে বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে চলে আসে। বিভিন্ন বদান্য ব্যক্তিদের দানে এই বাড়ি তৈরি হয়। দ্রষ্টব্য পরিষৎ পরিচয় পৃ ২৫-২৬।

পত্র ৫। ১ সুইডিস কমিটি রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করেছে, এ-খবর কলকাতায় পৌঁছয় ১৪ নভেম্বর ১৯১৩-তে। এই দিন বিকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এই খবর পান। সান্ধ্য দৈনিক *Empire*-এ এই সংবাদ প্রচারিত হয় ১৪ নভেম্বর শুক্রবার : ২৮ কার্তিক। রামেন্দ্রসুন্দর ৩০ কার্তিক ১৩২০ এই চিঠি লেখেন।

পত্র ৬। ১ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান, রামেন্দ্রসুন্দর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গঙ্গাবক্ষে স্টিমারে বা নৌকায় ভ্রমণ করতে গিয়ে কালনার কাছে কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। এই চিঠি লেখার কয়েক দিন আগে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্বকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভবত তার পরেই তিনি ভ্রমণে যান।

২ 'আশুতোষ বাজপেয়ী তাঁব রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথায় রামেন্দ্রসুন্দরের পরোপকারিতার যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তার মধ্যে এই "বালক" ব্রজেন্দ্রের উল্লেখ ও পরিচয় রয়েছে। ব্রজেন্দ্রের তখন ন'বছর বয়স। মধুসূদন লেনে অনাথ অবস্থায় বালকটিকে ঘুবে বেডাতে দেখে রামেন্দ্রসুন্দরেব অন্তরে করুণা জাগে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, যশোহর জেলার বাঘডাঙ্গা গ্রামে তার বাড়ি। বিপদে পড়ে অসহায় অবস্থায় এখন পথে পথে ঘুরছে। রামেন্দ্রসুন্দর টাকা দিয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তার পডাশুনাব ব্যবস্থাদিও করেন ; কিছুকাল পরে ব্রজেন্দ্র বাড়ি থেকে চলে আসে, জানায তার যেরকম নিদারুণ দুঃস্থ অবস্থা তাতে পড়ার সুবিধা হচ্ছে না, যদি তাব কোনো চাকরি করিয়ে দিতে পারেন। রামেন্দ্রসুন্দব কবিকে অনুরোধ জানান তাঁর জমিদারীতে ব্রজেন্দ্রব চাকবিব ব্যবস্থাও হয়।'[১]

৩ রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্মকথা' ১ বৈশাখ ১৩২০ ইং ১৯১৩-তে প্রকাশিত হয়। বস্তুত ভূমিকার তারিখ এরকম থাকলেও আসলে বই প্রকাশিত হয় আরও পরে। ঠিক একবছর পর রামেন্দ্রসুন্দর এই পত্রটি লিখছেন। সংকলিত প্রবন্ধের নাম, মুক্তির পথ, বৈরাগ্য,

---

[১] দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৫, পৃ ৪০

জীবন ও ধর্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্মপ্রবৃত্তি, আচার, ধর্মের প্রমাণ, ধর্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতি-পূজা, ধর্মের জয়, যজ্ঞ।

রামেন্দ্রসুন্দরেব 'যজ্ঞে'র ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'জাতিভেদ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা বিবৃত করেছেন তাতে এর প্রমাণ আছে।

পত্র ৭। ১ জিজ্ঞাসার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৪-এ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৪তে (১৩২১)। নতুন সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধ সহ এই সংস্করণের প্রবন্ধ সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত প্রথম অধ্যায়, অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় অধ্যায়, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্যসমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুলপূজা।

রামেন্দ্রসুন্দর 'মায়াপুরী' প্রবন্ধটি পরিষদমন্দিরে পড়েন ১৩১৬, ২ আশ্বিন। ওই সভায় সভাপতি ছিলেন সারদাচরণ মিত্র। ববীন্দ্রনাথের লেখা ১৭. ৯. ১৯০৯-এর পত্রে (পত্র ২০) জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতে আগ্রহী এবং রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচ্য পত্রে জানা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হলেও বামেন্দ্রসুন্দরের কৃতজ্ঞতাবোধ অম্লান।

২ ১৯১৪, ৫ ভাদ্র ১৩২১-এ রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ থেকে তাঁকে অভিনন্দন ও সংবর্ধনাজ্ঞাপন করা হয়। তখন পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি পরিষদের পক্ষ থেকে রুপার পাতে খোদিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। পত্রখানি তাঁর দ্বারাই রচিত।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে বোলপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে চন্দন পরিয়ে দেন এবং স্বরচিত এবং স্বহস্তলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই অভিনন্দন পত্রটি সুপরিচিত।— সেটি যথাযথ উদধৃত হল :

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যেব মধ্যগগনে আরোহণ কবিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমাব ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্যপরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বাং প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামাহে

প্রিয়জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান কবি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি। বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি। ৫ই ভাদ্র ১৩২১।

পরিষদেব সংবর্ধনাব উত্তরে বামেন্দ্রসুন্দব প্রসঙ্গত বলেন :

'আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান ও সংবর্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের সহিত আমাব সেব্য-সেবক সম্পর্ক। এত কাল ধরিয়া আমি পবিষদেব পরিচর্যা করিয়াছি— একান্ত ভক্তের মত 'কায়েন মনসা বাচা' পরিচর্যা কবিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন ; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে কবিয়া থাকেন, তাহা আমি শ্লাঘ্য মনে করিব। পরিষদেব প্রসাদ আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম।'

—'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' (সাহিত্য-সাধকচরিতমালা) থেকে উদধৃত।

৩ সবুজপত্রে রামেন্দ্রসুন্দবের 'কর্মকথা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। তবে, অজিতকুমার চক্রবর্তী কর্মকথার সমালোচনা লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি তাঁর 'বাতায়ন' বইতে সংকলিত আছে। ভূমিকা থেকে জানা যায় প্রবন্ধটি ১৩১৮ থেকে ১৩২০

সালের মধ্যে লিখিত হয় এবং শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধপাঠসভায় পাঠিত হয়েছিল। 'পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু আমার প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই রচনাকালে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।'

পত্র ৮। ১ রামেন্দ্রসুন্দরের কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজা দেবীর মৃত্যু।

২ 'নগ্ন মূর্তি মরণের' এই বাক্যখণ্ডটি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'মৃত্যুর পরে' নামক কবিতায় আছে :

সকল অভ্যাস-ছাড়া
সর্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কন্যাকেও হারিয়েছেন। দ্রষ্টব্য রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৪১-সংখ্যক পত্র। রবীন্দ্রনাথের ওই পত্র রামেন্দ্রসুন্দরের বর্তমান পত্রের উত্তরে লিখিত।

৩ এব সঙ্গে তুলনীয় রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্ম-কথা'র অন্তর্গত 'ধর্মের জয়' প্রবন্ধের 'প্রাণিসমাজ ব্যাপ্ত করিয়া নিয়তির বশে যে ঘোর নির্দয় নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, সেই জীবন-সংগ্রামে এখন আমাদের পরাজয়। যাঁহারা আমাদের এই পরাজয়ে নিয়তির মঙ্গলহস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা সুখী। তাঁহাদের সেই সুখে আমার অধিকার নাই। আমি এই পরাজয় মাত্রই দেখিতে পাই; ভবিতব্য আমার নিকট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।' ধর্মের জয় প্রবন্ধের প্রকাশ মাঘ ১৩১০-এর সাহিত্য পত্রিকায়।

বিজ্ঞপ্তি

ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রগুলি প্রকাশ করেন। বর্তমান চিঠিপত্রের খণ্ডটি ওই মুদ্রিত পত্রের সংকলন। সর্বশেষের পত্রের (১৩ বৈশাখ ১৩৪১) হস্তলিখিত রূপ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

এ ছাড়া যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে যে পত্র লিখেছিলেন, সেটিও যদুনাথ ১৩৫২-র চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশ করেছিলেন। মূলপত্রটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় আছে। মুদ্রিতরূপের সঙ্গে তার কিছু অনৈক্য দেখা যায়। আমরা মূল পত্রের পাঠই অনুসরণ করেছি।

যদুনাথ পত্রগুলি যখন প্রকাশার্থ দেন, তখন তাতে কিছু স্বকৃত টীকা যোগ করেছিলেন। সেই টীকা আমাদের কাজে লেগেছে, যথাস্থানে তার উল্লেখও করা হয়েছে। ওই পত্রগুলির সঙ্গে যদুনাথ তাঁকে লেখা সি. এফ. অ্যান্ডরুজের কয়েকটি পত্রও সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। সেই পত্রও আমরা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছি।

মূল গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনটি রচনা যুক্ত হয়েছে। প্রথম, ১২-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত স্যার মাইকেল স্যাডলারের এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে মন্তব্য। এই দুষ্প্রাপ্য রিপোর্ট এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে যদুনাথের পূর্বোক্তপত্রের প্রতিলিপি। তৃতীয়, ১৮৯৪তে সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোগল্প লিখতে আরম্ভ করেন, তখন সেই গল্প সম্পর্কে যদুনাথের প্রবন্ধ A New Leaven in Bengal। এই প্রবন্ধ ১৩০১ বঙ্গাব্দের সুহৃদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই দুষ্প্রাপ্য রচনার একটি টাইপ কপি রবীন্দ্রভবনে পাওয়া গিয়েছে।

স্বীকৃতি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি সবই শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৮৫-র দেশ পত্রিকার সাহিত্যসংখ্যায় পত্রপরিচিতি-সহ প্রকাশ করেছিলেন। সে-সময় পত্রপ্রসঙ্গে তিনি যা লেখেন তার প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

'রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে যে-সব পত্রবিনিময় হয় তারই যতগুলি সন্ধান পাওয়া গেছে এইখানে মুদ্রিত হোল। আমাদের বাড়ি থেকে এক সময়ে (১৩২৮-১৩৩৪) 'বঙ্গবাণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোত। সেই পত্রিকায় ছাপানোর উদ্দেশ্যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয় শ্রীরমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ও রামেন্দ্রসুন্দরের পত্রাবলী সংগ্রহ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৪১টি পত্রের মধ্যে ২৬ খানি (এই প্রবন্ধে মুদ্রিত পত্রসংখ্যা— ১, ৫-২১, ২৪, ২৫, ২৯, ৩০, ৩২-৩৫) বঙ্গবাসী পত্রিকাব ষষ্ঠ বর্ষে (১৩০০-৩৪) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। সেগুলি এখানে পুনর্মুদ্রিত হোল। অবশিষ্ট ১৫খানি পত্রও সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

'উপবোক্ত ৪১খানি পত্রের মধ্যে ৫খানি চিঠি (৬, ১৮, ২৫, ৩৪, ৩৮ সংখ্যক) আশুতোষ বাজপেয়ী মহাশয়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর-জীবনকথা' গ্রন্থে (চৈত্র ১৩৩০) অংশত উদ্ধৃত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত পত্রগুলি ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে অনুলিপি আনিয়ে তাঁদের সহযোগিতায় সেগুলি প্রকাশিত হোল। এই পত্রগুলির মধ্যে পত্রসংখ্যক

৭ (৯ অগ্রহায়ণ ১৩২১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'রামেন্দ্র-রচনা সংগ্রহে' ছাপা হয়েছে।

'উভয়ের পত্রগুচ্ছের সংখ্যার তুলনায় অনুমান হয় যে রামেন্দ্রসুন্দরের অনেকগুলি চিঠি রক্ষিত হয় নি, অন্তত এখনো সন্ধান মেলে নি।

'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিতে তারিখ অথবা সাল দেওয়া নেই। রামেন্দ্রসুন্দরের একটি পত্রে (সংখ্যক ১) সাল নেই। ঐসব পত্রের বিষয়বস্তু অনুসারে আনুমানিক কাল নির্ণয় করে বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে।'

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পত্রগুলি সুচারুরূপেই সম্পাদনা করেন। আমরা পত্রের ধারাবাহিক ক্রম যথাযথ রক্ষা করেছি। রবীন্দ্রনাথের ৩২-সংখ্যক পত্র রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা নয় বলে আমাদের মনে হয়েছে। এ বিষয়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি আমাদের ধারণা সমর্থন করে পত্র দেন। পত্রসংখ্যার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই পত্রটি পূর্বোক্তক্রমেই উপযুক্ত টীকা সহ বিন্যস্ত হল। উমাপ্রসাদের রচিত পত্রপরিচিতি থেকে আমরা প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেছি। এজন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

চিঠিপত্রের বর্তমান খণ্ড সম্পাদনাকাল রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন গবেষণা-সহায়িকা ড. সাধনা মজুমদারের সহায়তা উল্লেখযোগ্য এবং গ্রন্থ-সম্পাদনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমার প্রাক্তন ছাত্র 'রবিজীবনী'কার শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহভুক্ত যদুনাথ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল পত্র শ্রীঅনাথনাথ দাসের সৌজন্যে মেলানো সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ একসময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্রের পরীক্ষক ছিলেন। সে সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজপত্র থেকে তথ্য উদ্ধারে সহায়তা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকর্মসচিব ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ।

দীর্ঘকাল ধরে সম্পাদনাকর্ম চলাকালীন রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার এবং অভিলেখাগারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনাকে ত্রুটিমুক্ত করবার কাজে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর বিশেষ অভিনিবেশের কথা এইসঙ্গে স্মরণীয়।

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১॥ পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২॥ জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩॥ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪॥ কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬॥ জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭॥ কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮॥ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯॥ হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০॥ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১১॥ অমিয় চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১২॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৩॥ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৪॥ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৫॥ যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৬॥ জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৭॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মীরা চৌধুরীকে লিখিত

ছিন্নপত্র ॥ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী ॥ ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে ॥ নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী ॥ শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

সকালে চায়ের টেবিলে

সপ্তদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ॥ সপ্তদশ খণ্ড

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরা চৌধুরীকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

প্রকাশ : মাঘ, ১৪০৪

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত

© বিশ্বভারতী ১৯৯৮

ISBN-81-7522-157-7 (V.17)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলকাতা ১৭

মুদ্রাকর শ্রীঅরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন । ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন । কলকাতা ৯

ভূমিকা

কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সুহৃদবর্গের অন্যতম ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি আছে।

ডাক্তার মৈত্র সার্জন বা শল্য চিকিৎসক হলেও সব রকমের রোগের চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন। বিশেষ পারদর্শী ছিলেন চক্ষুরোগের চিকিৎসায়। এজন্য তিনি মেয়ো হাসপাতালের বাইরে চক্ষু চিকিৎসার জন্য একটা নার্সিং হোমও করেছিলেন।

অনেকেই জানেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও একজন ভালো চিকিৎসক ছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। ছোটোখাটো রোগ ছাড়াও অনেকের অনেক কঠিন কঠিন অসুখও তিনি অনায়াসেই সারিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেসব রোগীর রোগকে নিজের চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে বলে ভাবতেন, সেইসব রোগীকে প্রায়ই ডাক্তার মৈত্রের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। রোগীদের পাঠাবার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের হাতে একটি করে চিঠি লিখে দিতেন। দ্বিজেনবাবু সেইসব চিঠি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই চিঠিগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের অপরের জন্য অত্যন্ত দরদি মনোভাবের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

অপর অনেকগুলি চিঠিতে দ্বিজেনবাবুর সমাজ সেবামূলক কাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার এবং রবীন্দ্রনাথেরও কাজে দ্বিজেনবাবুর সমর্থনের পরিচয় রয়েছে। কোনো কোনো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের খবরও আছে।

কথা ছিল, ১৯১২ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেনবাবু উভয়ে একসঙ্গে বিলাত যাবেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাত যেতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য শিলাইদহ যান। সেখানে গিয়ে অবসর সময়ে কীভাবে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি বইয়ের কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করতেন, তারপর সুস্থ হয়ে আবার কবে বিলাত গেলেন, সেখান থেকে কবে আমেরিকা যান—সেসব কথা এবং আরও নানা প্রসঙ্গে নানা কথা লেখা আছে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেনবাবু এক সঙ্গে বিলাত যেতে না পারলেও, ক'মাস পরে রবীন্দ্রনাথ যখন পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিলাত যান, তখন দ্বিজেনবাবু সেখানে কবির সঙ্গে মিলিত হন। এবং পরে কবি যখন আবার ইংলন্ড থেকে আমেরিকা যান, তখন দ্বিজেনবাবু কবির আমেরিকা যাত্রাপথে সঙ্গী হয়েছিলেন।

এই গ্রন্থে দ্বিজেনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরা চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিও দিয়েছি।

আর দিয়েছি, দ্বিজেনবাবু ও মীরা দেবীর অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা ক'টি এবং দ্বিজেনবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দিরা দেবীর বিবাহ উপলক্ষে লেখা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবিতাটিও।

চিঠি এবং চিঠির প্রসঙ্গ-কথা সবদিক থেকেই বইটিকে নির্ভুল ও তথ্য-সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। তবুও কোথাও যদি সামান্যতমও ত্রুটি থেকে থাকে, কোনো রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ তা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

দ্বিজেনবাবুকে লেখা চিঠি ইত্যাদি তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এবং মীরা দেবীকে লেখা চিঠি ও কবিতা তাঁর কাছেই পেয়েছি।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড. দিলীপকুমার সিংহ এবং শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীস্বপন মজুমদারের বিশেষ আগ্রহে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ থেকে বইটি প্রকাশিত হ'ল।

এঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

১.১.১৯৯৮ **গোপালচন্দ্র রায়**

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত

১

২৯ নভেম্বর ১৯০৬

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পায়ে অকস্মাৎ ক্ষত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, এইজন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিলে তাঁহার উপকার হইবে এবং যত্ন ও শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না নিশ্চয় জানি। এই কারণে তাঁহাকে মেয়ো হাঁসপাতালে আশ্রয় লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্বেও আপনার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি, এইজন্য পুনশ্চ আপনাকে আমার বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিলাম। ইনি অল্পেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন, বিশেষত এই পা লইয়া ইঁহাকে দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করিতে হইল বলিয়া ইনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার নিকট হইতে যত্ন ও আশ্বাস পাইলে ইঁহার মনে বল-সঞ্চার হইতে পারিবে এবং আরোগ্যও সহজ হইয়া উঠিবে, এই আশা করিয়া আপনার হস্তে ইঁহাকে সমর্পণ করিতেছি—ইঁহার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতনে প্রথম যুগের বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক। এঁরই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এখান থেকে

এন্ট্রান্স পাস করেন। মনোরঞ্জনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মনোরঞ্জনবাবু সে-সব নিয়ে 'স্মৃতি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের সব শেষে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি আছে।

মনোরঞ্জনবাবুর গ্রন্থে এই চিঠি থাকায় বোঝা যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে লেখা চিঠি মনোরঞ্জনবাবুর হাত দিয়ে দেবার জন্য দিলেও মনোরঞ্জনবাবু চিঠিটি নিয়ে দ্বিজেনবাবুর কাছে যান নি। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন।

২

২৭ এপ্রিল ১৯১০ জোড়াসাঁকো

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

পত্রবাহকের সহিত একটি অন্ধ ভদ্রলোককে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। ইনি সম্পূর্ণ নিঃসহায়। দৈবদুর্ব্বিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সেখান হইতে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া আপনাদের হাঁসপাতালে রাখিয়া যদি ইঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে এই হতভাগ্যের বিশেষ উপকার করা হইবে।

আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৮ মে ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার ভৃত্যটি আপনার চিকিৎসায় ও যত্নে সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—আপনি আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

পত্রবাহকটি আমার বাহন উমাচরণের দাদা—প্লীহা প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়গুলি বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ রোগী কি আপনাদের হাঁসপাতালে আশ্রয়যোগ্য?

কাল জামাইষষ্ঠীর খাওয়া হজম করিয়াছেন ত?

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এন্ট্রান্স পাস করেন। মনোরঞ্জনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মনোরঞ্জনবাবু সে-সব নিয়ে 'স্মৃতি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের সব শেষে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি আছে।

মনোরঞ্জনবাবুর গ্রন্থে এই চিঠি থাকায় বোঝা যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে লেখা চিঠি মনোরঞ্জনবাবুর হাত দিয়ে দেবার জন্য দিলেও মনোরঞ্জনবাবু চিঠিটি নিয়ে দ্বিজেনবাবুর কাছে যান নি। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন।

২

২৭ এপ্রিল ১৯১০ জোড়াসাঁকো

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

পত্রবাহকের সহিত একটি অন্ধ ভদ্রলোককে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। ইনি সম্পূর্ণ নিঃসহায়। দৈবদুর্ব্বিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সেখান হইতে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া আপনাদের হাঁসপাতালে রাখিয়া যদি ইঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে এই হতভাগ্যের বিশেষ উপকার করা হইবে।

আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৮ মে ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার ভৃত্যাটি আপনার চিকিৎসায় ও যত্নে সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—আপনি আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

পত্রবাহকটি আমার বাহন উমাচরণের দাদা—প্লীহা প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়গুলি বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ রোগী কি আপনাদের হাঁসপাতালে আশ্রয়যোগ্য?

কাল জামাইষষ্ঠীর খাওয়া হজম করিয়াছেন ত?

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২১ নভেম্বর ১৯১০ শিলাইদা

নদিয়া

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

পত্রবাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার আমাদের একজন দরিদ্র ভদ্র প্রজা। তাহার বালিকা কন্যাটির হাত ভাঙিয়া গিয়া স্থানীয় ডাক্তারের প্রসাদে ঠিক মত জোড়া লাগে নাই। ইহাকে আপনারই আশ্রয়ে পাঠাইতেছি। জানি আপনি যত্ন করিয়া দয়ার সহিত চিকিৎসা করিবেন। বালিকার পিতার ইচ্ছা রোগীর সঙ্গে সেও হাঁসপাতালের মধ্যে স্থান পায়। কারণ, তাহার কন্যার বয়স অল্প—সে একলা থাকিতে ভয় পাইবে—যদি নিয়মবিরুদ্ধ না হয়, তবে এ সম্বন্ধেও তাহাকে দয়া করিবেন। ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

৭ জুন ১৯১১ শিলাইদা

নদিয়া

ওঁ

প্রিয়বরেষু

পত্রবাহক ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণ—আপনার হাঁসপাতালে আশ্রয় দিতে পারিবেন? পাড়াগাঁয়ের ছেলে—কিছুদিন আমাদের বিদ্যালয়ে ফ্রি পড়িয়াছিল।

ছুটিতে শিলাইদহে যাপন করিতেছি। ছুটি অন্তে কলিকাতায় গিয়া আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। ইতি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

১৯ ডিসেম্বর ১৯১১ জোড়াসাঁকো

City line ত বেশ ভাল ঠেকিতেছে। ঠিক করিয়া ফেলিবেন। কাল ভোরে পদ্মায় চলিলাম। রাত্রে এগারোটার মধ্যে আসিলে আমাকে বিছানার বাহিরে পাইবেন।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেনবাবুকে লেখা এই চিঠিটুকুর একটা বিস্তৃত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস হ'ল—

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসী কলকাতায় টাউন হলে এক সুন্দর মনোরম ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়। সভার উদ্যোক্তারা সেই সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রবীন্দ্র-বিষয়ক বিভিন্ন রচনা নিয়ে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। ওই স্মারক গ্রন্থে 'রবীন্দ্র সংসর্গে' নামে একটি প্রবন্ধ দ্বিজেনবাবু লিখেছিলেন। তাতে তিনি লেখেন—

'১৯১২ সালের কথা—১৯ বৎসর পূর্বে। তখন আমি মেয়ো হস্পিটালের

রেসিডেন্ট সার্জন। গঙ্গার ধারেই হাসপাতাল। তার বিশাল ভবনের বিরাট ছাদের উপর কবির সঙ্গে মাঝে মাঝে গান আবৃত্তি ও আলোচনায় সঙ্গত্ খুব জম্‌তো। অনেকেই আসতেন। একদিন ছাদের কোণে বেদীতে বসে কবির সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কি ক'রে দেশকে গ'ড়ে তোলা যায়। কথায় কথায় সমবায় পদ্ধতির কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে তিনি ডেনমার্কের অপূর্ব সমবায় বিজ্ঞানমূলক সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা পাড়লেন। হঠাৎ বোধ হয় আমিই বলে বসলাম—একবার গিয়ে সাক্ষাৎভাবে দেখে আসলে হয় না! আর সেই যাত্রায় ইউরোপের অধুনাতম অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালীর একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে আসি।

কবি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—বেশ ত চল না এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। তার পরদিনই ছুটি পাবার সম্ভাবনা বুঝে নিয়ে City of Paris জাহাজে পাড়ি দেওয়া স্থির করলাম।'

দ্বিজেনবাবু যে লিখেছেন—City of Paris জাহাজে পাড়ি দেওয়া স্থির করলাম, এই স্থির করার আগে কলকাতার বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানির অফিসে গিয়ে জাহাজের ভাড়া ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে সেসব কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন-

Mayo Hospital
19.12.11

শ্রীচরণেষু

সময়াভাবে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা আপনার কন্যার খবর নিজে যাইয়া লইতে পারিলাম না। আশা করি তিনি ভাল আছেন।

আপনি কবে বোলপুর যাইবেন ? আমি আজ Nippon Yusen Kaisha-র অফিসে যাইয়া খবর লইলাম; তাহাদের 2nd class একেবারে পিছনে, 1st class from Colombo to Marseilles ই ৬৫০্; তাহার উপর India ও Europe এর railway fare যোগ করিলে মোট ৭০০্ বা ৮০০্ কেবল Single fare-এ পড়ে। আমার মনে হয় তাহার অপেক্ষা City Line এর 1st class ভাল হইবে—City of Paris (9000) নাকি 'Splendid boat', City of Lahore (7000) নূতন জাহাজও খুব up-to-date, তাদের Colombo to Marseilles ৫২৭৲ বা ৫৪০৲। আমরা কলিকাতা হইতে directও যাইতে পারি। 'Anchor' বা 'Bibby' অপেক্ষা City ভাল হইবেই। আপনার এ বিষয়ে অভিমত জানিতে পারিলে আমি যত শীঘ্র পারি berth reserve করিবার চেষ্টা করি।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

যদি আপনার অসুবিধা না হয় আমি আজ রাত্রে যাইয়া আপনার সহিত দেখা করিতে পারি—৯টা আন্দাজ রাত হইতে পারে।

দ্বিজেনবাবু এই চিঠিটি লিখে তাঁর অনুগত কারও হাত দিয়ে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুর চিঠি পড়ে সেই চিঠির উপরেই তাঁর বক্তব্য ওই কথা লিখে জানিয়ে পত্রবাহকের হাতে দিয়ে দেন।

৮

২৬ ডিসেম্বর ১৯১১ কলিকাতা

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল রাত্রে আসিয়াছি। আবার কখন কোথায় দৌড় মারি তাহার ঠিকানা নাই। ইতিমধ্যে আমাদের খেয়াতরীর খবরটি জানিয়া লইতে চাই। পাড়ি দিবার আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইল? ইতি ১০ই পৌষ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

একটা মৃদু রকমের গুজব শুনা যায় যে আপনি অবশেষে হয়ত সস্ত্রীক যাত্রা করিবেন। এই সুসংবাদ যদি সত্য হয় তবে আগে থাকিতে আমাদিগকে জানাইতে দোষ কি? সময় থাকিতে আমার একটু জানিবার প্রয়োজন আছে—কারণ, যদি আপনার স্ত্রী যান তবে বৌমাকেও সঙ্গে লইব এইরূপ কথা চলিতেছে। কাল মধ্যাহ্নের গাড়িতে বোলপুর যাত্রা করিব। ইতি রবিবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেনবাবু রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির কি উত্তর দিয়েছিলেন, সে চিঠি না পাওয়ায়, তা জানা গেল না। দ্বিজেনবাবু সস্ত্রীক যাবেন না, হয়তো এই কথাই জানিয়েছিলেন।

১০

১৫ জানুয়ারি ১৯১২

Patisarh
Atrai
N.B.S.R.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আর একটি দরিদ্র রোগীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। লোকটি নয় টাকা বেতনের কর্ম্মচারী কিন্তু বেচারার চোখ দুটির দাম নিশ্চয়ই তাহার চেয়ে অনেক বেশি। দেখিবেন, যদি কোনো উপায়ে ইহার দৃষ্টিকে উদ্ধার করিতে পারেন।

আমি এক দূর পল্লীগ্রামে অতি ছোট্ট নদীর এক প্রান্তে'[১] বোট লইয়া বসিয়া আছি। আপনারা ১২ই মাঘে আমার ঘাড়ে এক বক্তৃতার বোঝা ফেলিয়া দিয়াছেন—তার উপরে ১১ই মাঘের[২] দুই বেলা আছে—এদিকে আবার কাজকর্ম্মের উৎপাতও কামাই যাইতেছে না। কেমন করিয়া সকল দিক রক্ষা হইবে তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। ডাক্তার আচার্য[৩] জানিতে চাহিয়াছিলেন আমার বক্তৃতার বিষয়টি কি? আপনি বলিবেন বিষয়টি 'ধর্ম্মের অধিকার'।

এবার ৫, ৬ দিন কলকাতায় ছিলাম রোজ ভাবিতাম আপনাকে একবার দেখা দিয়া আসিব কিন্তু দুই পক্ষ এক জায়গায় উপস্থিত হইতে না পারিলে দেখা দেওয়া অসম্ভব হয়—আপনি ঘরে আছেন কিনা এ সন্দেহ কিছুতেই মিটিত না—তাই আপনাদের পথের গোরুর গাড়ির ব্যূহ ভেদ[৪] করিয়া যাত্রা করিতে সাহস হইত না। ইতি ১লা মাঘ ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] ১. উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলায় (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর অন্তর্ভুক্ত) পতিসরে ছিল রবীন্দ্রনাথদের জমিদারি। রবীন্দ্রনাথ এই সময় তাঁদের জমিদারি দেখাশুনা করতেন। পতিসর ছোটো নাগর নদীর তীরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত তাঁদের 'পদ্মা' বোটে করেই জমিদারিতে যাতায়াত করতেন।

[২] ২. ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের একটা উৎসবের দিন। ১২৩৬ সালের ১১ই মাঘ (ইং ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০) তারিখে ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবনের (৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে) দ্বারোদঘাটন হয়েছিল। তাই ওই দিন ব্রাহ্মদের 'মাঘোৎসব'।

৩. ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন।

৪. দ্বিজেনবাবু ছিলেন কলকাতায় বড়োবাজারে পোস্তায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন। পোস্তা বরাবরই মসলা ইত্যাদি দ্রব্যের পাইকারি দোকানের আড়ত। দূর দূর অঞ্চলের ছোটো ছোটো দোকানদাররা গরুর গাড়িতে করে এই পোস্তা থেকে ওই মসলা ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেত। এজন্য এখন এখানে যেমন ওই মসলা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য লরীর ভিড়, আগে ছিল গরুর গাড়ির ভিড়।

১১

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ জোড়াসাঁকো

ওঁ

কোনো প্রকারে আজ পর্য্যন্ত ছিলাম। কাল বুধবার মধ্যাহ্নের গাড়িতে বোলপুরে দৌড় দিতে হইবে। ফিরিয়া আসি তাহার পর সুযোগ ঘটিবে।[১]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] ৬.২.১২ তারিখে দ্বিজেনবাবু লোক মারফৎ রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিটি দিয়েছিলেন—

Mayo Hospital

Calcutta 6, Feb. 1912

শ্রীচরণেষু,

আপনি এখানে কি বোলপুরে জানি না। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি থাকিবেন? আমার দিদির ও বিজয়বাবুর বিশেষ ইচ্ছা যে আপনারা যদি একদিন—এর মধ্যে তাদের বাগানে (Zooতে) বাড়ীর সকলকে নিয়ে যান। একবার ত

সে রকম কথা হয়েছিল না? বৃহস্পতিবার বিকালে হলেই বেশ হয়। আশা করি সকলে ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
দ্বিজেন

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুর এই চিঠি পেয়ে তখন এই চিঠির উপরেই এক পাশে ওই কথা ক'টি লিখেছিলেন।

দ্বিজেনবাবুর চিঠির বিজয়বাবু হলেন বিজয়কৃষ্ণ বসু। তিনি ছিলেন দ্বিজেনবাবুর ভগ্নীপতি। বিজয়বাবু ওই সময় কলকাতার চিড়িয়াখানা বা জু গার্ডেনের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ছিলেন এবং সপরিবারে জু গার্ডেনে পাওয়া কোয়ার্টারে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ পরে কখনো বিজয়বাবুদের জু গার্ডেনের বাসায় গিয়েছিলেন কি না জানি না। তবে এই বিজয়বাবুর জু গার্ডেনের বাসা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই অন্য একটা কথা মনে আসছে। সেটা বলছি—

বিজয়বাবু যেমন ছিলেন দ্বিজেনবাবুর ভগ্নীপতি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের আর এক স্নেহভাজন ঐতিহাসিক ডক্টর কালিদাস নাগের ছিলেন মামা। কালিদাসবাবু ছাত্রজীবনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এম. এ. পাস করে কালিদাসবাবু একবার শান্তিনিকেতনে যান। শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার সময় কালিদাসবাবু কবিকে প্রণাম করতে গেলে, কবি বললেন—তোমার ঠিকানাটা কি? দিয়ে যাও তো। জেনে রাখা ভালো।

কালিদাসবাবু ওই সময় তাঁর মামার কাছে থাকতেন। তিনি মামার নাম ও তাঁর জু গার্ডেনের ঠিকানা বললেন। আরও বললেন—প্রয়োজন হলে মামার প্রযত্নেই আমাকে চিঠি দেবেন।

কয়েকদিন পরে কবির কাছ থেকে কালিদাসবাবুর নামে এক চিঠি এল। ঠিকানার ঘরে কবি লিখেছেন—Sri Kalidas Nag
C/o Bijoykrishna Bose
Zoo Garden
(Human Section)

১২

৭ মার্চ ১৯১২ শিলাইদা
নদিয়া

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

দেবলকে[১] আমার সঙ্গে লওয়াই স্থির করিয়াছি। Servants' class জিনিষটা কি রকম সন্ধান লইবেন। আশা করি এখনো জায়গা পাওয়া যাইবে। যদি জায়গা থাকে তবে হয়ত দুজন আমাদের সঙ্গে যাইতে পারে। আহার ব্যবহারের ব্যবস্থাটি কিরূপ একটু বিস্তারিতভাবে জানিয়া লওয়া ভাল—নহিলে সমুদ্রে লইয়া গিয়া দুটো ছেলেকে[২] একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া হইবে। যাত্রার সময় ত আসন্ন হইয়া আসিল—সঙ্কল্প ত স্থির আছে, ঘরের দিকে তাকাইয়া মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পরিতাপের উদয় হইতেছে না ত? দেখিবেন শেষ কালে একলা দ্বীপান্তরিত করিবেন না। আগামী সোমবারে চাটগাঁ মেলে সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. এই চিঠির দেবল হলেন তখনকার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান অবাঙালি ছাত্র। দেবল ছিলেন ধনীর সন্তান। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে সেখানে পড়াশুনা করবেন স্থির করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ তাঁর 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এই দেবল সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আমি [শান্তিনিকেতনে] যাবার দিন দুই তিন আগে এসেছিলেন একটি ছিপছিপে রোগা ধপধপে রঙের ছেলে। নাম তার নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। শুনেছিলাম তাঁর বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়,

মা ছিলেন ব্রহ্মদেশীয়, চমৎকার হাসিখুশি ছেলে ছিলেন তিনি। সিল্কের লুঙ্গির উপর বেঁটে কোট গায়ে দিয়ে মাথায় সিল্কের রুমাল বাঁধলে খুব মানানসই দেখাতো। বয়সে আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়ো ছিলেন, কিন্তু স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত ছেলেমানুষ। দেবলদা পড়তেন আমাদের এক ক্লাস উপরে।'

২. রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে দুটো ছেলে বলে দেবল ছাড়া আর এক জনের কথা বলেছেন, এই ছেলেটি কে তা ঠিক জানা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ত্রিপুরার মহারাজার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ কর্ণেল মহিম ঠাকুর বা মহিমচন্দ্র দেববর্মণেব পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ।

১৯ শে মার্চ রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা পণ্ড হওয়ায় তখন দেবল গিয়েছিলেন কি না সঠিক জানা যায় নি। তবে সোমেন্দ্র যান নি। ক'মাস পরে রবীন্দ্রনাথ যখন পুত্র, পুত্রবধূসহ লন্ডন যান সেবার তাঁদের সঙ্গে সোমেন্দ্রচন্দ্র গিয়েছিলেন। সোমেন্দ্র কবির সঙ্গে লন্ডন গিয়ে সেখান থেকে আমেরিকা যান এবং সেখানে পড়াশুনা করেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'১৬ই জুন [১৯১২] রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূসহ ডোভার হইয়া লন্ডন পৌঁছিলেন। ...তখন সেখানে ...কালীমোহন ঘোষ, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, অরবিন্দমোহন বসু, সুকুমার রায়চৌধুরী (তাতাবাবু), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (বুবা) প্রভৃতি কবির বিশেষ পরিচিত স্নেহের পাত্র—সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী।' রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড—৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ৩৮৭

প্রভাতবাবুর এই লেখা থেকে জানা যাচ্ছে—দেবল হয় দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে, নয়তো এরপরে রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ড যাওয়ার আগে—ইংলন্ডে গিয়েছিলেন।

'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে দ্বিজেনবাবুর লেখা 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়—বিলাত যাওয়ার জন্য জাহাজে রবীন্দ্রনাথের বাক্স পেটরা এসে গেলেও বাড়ি থেকে বেরোবার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর তখনকার বিলাত যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়।

দ্বিজেনবাবু তাঁর ওই প্রবন্ধে লিখেছেন—গোটা কেবিনে একা রাজত্ব করে তাঁর বাক্স পেটরা নিয়ে চললুম আমি একলা।

এবার রবীন্দ্রনাথের বাক্স পেটরা সঙ্গে নিয়ে জাহাজে দ্বিজেনবাবুর যাওয়ার কথাটা। বাক্স পেটরা নিয়ে দ্বিজেনবাবু কতদূর গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর

নিজের লেখা থেকে বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকেও কিছু জানা যায় না। তবে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের 'টেগোর বার্থ সেন্টিনারি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা আছে—

'... Suddenly falls ill on the night before his departure (March 1912) and has to postpone his visit, his luggage going as far as Madras.'

বাক্স পেটরা মাদ্রাজ পর্যন্তই গিয়েছিল। এ সম্পর্কে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তখনকার দুটি চিঠি পাওয়া গেছে। তা থেকেও জানা যায় কবির বাক্স পেটরা মাদ্রাজ পর্যন্তই গিয়েছিল। চিঠি দুটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

জোড়াসাঁকো
মঙ্গলবার

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ সকাল বেলায় বাবার যাবার সমস্ত ঠিক এমন কি কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হয়েছেন—এমন সময় এমনি একটি nervous attack হ'ল যে আর যেতে পারলেন না। কলকাতায় এসে অবধি যে রকম strainএর উপর দিয়ে যাচ্ছিল তাতে এ রকম একটা breakdown হওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। এত মাথা ঘোরা ও nausea যে সমস্ত দিন মাথা তুলতে পারেন নি—আর এর মধ্যে ভয়ানক weak হয়ে পড়েছেন। ডাক্তাররা প্রথমে আশঙ্কা করেছিলেন যে হয়ত brain attack করেছে—কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে তা নয়। বিকেলের দিকে ক্রমশ একটু সুস্থ হলেন। আমাকে সকালে ডাক্তার ডাকতে এত ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল যে আপনাকে গিয়ে ঘাটে খবর দিয়ে আসতেও সময় পাইনি। আপনি নিশ্চয়ই খুব disappointed হয়ে গেছেন। বাবার যাবার এখনও কিছুই স্থির করতে পারিনি। ডাক্তাররা বলেছেন অন্ততপক্ষে এক সপ্তাহ কিংবা ১৫ দিন perfect rest দরকার, তারপরে যাবার কথা ভাবা যেতে পারে। আমি সেই জন্যে আজ King Hamilton-দের ওখানে

গিয়ে বলে এসেছি ওঁর passageটা পরে অন্য কোনও জাহাজে transfer করে দিতে। সম্ভবত City of London জাহাজ যেটা এক মাস পরে ছাড়বে—সেটায় যেতে পারবেন। জিনিষপত্র ফেরৎ পাঠাবার জন্যে Captainকে টেলিগ্রাফ করিয়ে দিলুম। আপনি যদি একটু দেখে দেন যে ঠিক জিনিষগুলো দিচ্ছে কিনা তাহলে বাধিত হব। জিনিষগুলো মাদ্রাজ থেকে পার্শেলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে instruction দিয়েছি...।

ইতি—

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাকে একটা চিঠি মাদ্রাজে লিখেছি—কিন্তু সেটা যদি না পান তাই আর একখানা Colomboতে লিখছি।

বাবার আজ সকালে হঠাৎ nervous breakdown এর মতো হওয়াতে যেতে পারলেন না। ...ডাক্তাররা বলছেন এখন অন্তত কিছুদিন perfect rest দরকার ...

জিনিষগুলো ফেরৎ পাঠাবার জন্য কাপ্তেনকে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে—আপনি যদি এ বিষয় একটু দেখেশুনে পাঠিয়ে দেন ত বাধিত হব। আশা করি ভালো আছেন।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২১ মার্চ ১৯১২

শিলাইদা
নদিয়া

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার কপাল মন্দ—কপালের ভিতরে যে পদার্থটা আছে,

তারও গলদ আছে—নইলে ঠিক জাহাজে ওঠবার মুহূর্ত্তেই মাথা ঘুরে পড়লুম কেন? অনেক দিনের সঞ্চিত পাপের দণ্ড সেইদিনই প্রত্যুষে আমার একেবারে মাথার উপরে এসে পড়ল। রোগের প্রথম ধাক্কাটা তো এক রকম কেটে গেছে, এখন ডাক্তারের উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া নড়াচড়া প্রভৃতি সজীব প্রাণী মাত্রেরই যে সকল অধিকার আছে, আমার পক্ষে তা একেবারে নিষিদ্ধ। আপনাকে এই যে পত্র লিখচি এটা আইনবিরুদ্ধ হচ্চে; কিন্তু এমন করে আইন মেনে মরে থাকার চেয়ে আইন লঙ্ঘন করে মরা ভাল। অনেকদিন থেকে অনেক কল্পনা করেছিলুম, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে এমন প্রহসনের প্লট যে ঘনিয়ে আসছিল, তা স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি। সেদিন সকালে সহজে হার মানিনি—মাথা তোলবার চেষ্টা বারবার করেছিলুম, কিন্তু অদৃষ্ট বারবারই মাথা নত করে দিলেন। বিছানা থেকে কোনোমতে গাড়িতে গিয়ে উঠ্‌ব সেও ঘটল না।

যাক্—নিজেকে ত ফাঁকি দেওয়া গেলই, কিন্তু আপনাকে ফাঁকি দিলুম এই দুঃখই আমাকে সবচেয়ে বাজ্‌চে। এখন মনে হচ্চে আপনি একটা বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন—আমাকে নিয়ে খুব সম্ভব আপনাকে বিপদে পড়তে হ'ত। ঈশ্বর আপনার যাত্রাকে সর্ব্বতোভাবে শুভ করুন, সফল করুন, এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ৮ই চৈত্র ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ শিলাইদা
২ এপ্রিল ১৯১২ নদিয়া

ওঁ

প্রিয়বরেষু

রোগশয্যার বালিশে হেলান দিয়েই আপনাকে এডেনের ঠিকানায় একখানা পত্র লিখেছি, পেয়েছেন কিনা কে জানে! আজ লিখচি শিলাইদহে আমার তেতালার ঘরটিতে বসে। চারিদিকের খোলা জানলা দরজা দিয়ে অজস্র আলোয় আমার ঘর ভরে গিয়েছে—পাশে একটি পিরিচে বসন্তের বেল ফুলগুলি রাশীকৃত রয়েছে, তার গন্ধে আমার হৃদয়ের ভিতর পর্য্যন্ত যেন সুগন্ধ হয়ে উঠেছে।

এখনও মাথাটা কাজের যোগ্য হয়নি। কিন্তু একেবারে বেকার বসে থাকাও অল্প ক্ষমতার কাজ নয়—সেও পারিনি। সকাল বেলাতে খাতা ও পেন্সিল হাতে নিয়ে গুন্‌-গুন্‌ করে একটু আধটু কবিতা লিখি মাত্র—তার বেশি আর কিছু নয়। এখানে আসার পর থেকে রক্তপাতটা[1] একেবারেই বন্ধ আছে, তাতেই মনটা নিশ্চিন্ত বোধ করচি—নইলে কবিতার মৃদুমন্দ গুঞ্জনধ্বনিটুকুও নিশ্চয়[2] বন্ধ থাক্‌ত।

ইতিমধ্যে দুটো তিনটে ষ্টীমার যাত্রী নিয়ে নীল সমুদ্র পার হবে, আমার তাতে স্থান হবে না। আজকাল ভিড় বেশি। ভিড় যখন কমবে, তখন আমি আবার একদিন যাত্রা করব—এবারে আর সাথী কেউ থাকবে না। মনে একটা সান্ত্বনা এই আছে—ততদিনে আপনার আড়াই মাসের মেয়াদ[3] উত্তীর্ণ হয়ে যাবে—তখন আপনার ছুটির সঙ্গে আমার ছুটি ঠিক একসুরে মিলতে পারবে।

হয়তো মে মাসের ২২শে তারিখে City of Poona জাহাজে

ঠাঁই পাওয়া যাবে। কিন্তু নিশ্চয় জানিনে। যদি না পাই তবে জুনের আরম্ভে একটা কোনো বাহন জুট্‌বে। ততদিনে অনেকটা সেরে উঠ্‌ব আশা করচি। যা হোক্ আপনার প্রোগ্রামে আমার জন্যে একটু স্থান রাখবেন এবং সুরেনবাবুকে[৪] আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন—এবং বাংলা দেশের ছুটির দিনের এই বসন্তের হাওয়ার কথা স্মরণ করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বেন। ইতি ২০শে চৈত্র ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. এটা সম্ভবত কবির অর্শরোগের রক্তপাত। প্রভাতবাবু তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—‘ইতিমধ্যে কবির ‘শরীরটা কিছু বিগড়েছে’। ‘অর্শের রক্তপাত কিছুদিন থেকে বেড়েছে।’ এই রোগে বহু কাল হইতে তিনি ভুগিতেছেন। বিলাত আসার অন্যতম কারণ ছিল এই অর্শ চিকিৎসা।’

২. কবির এই চিঠির পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়—তিনি চিঠির একটা পাতায় এই ‘নিশ্চয়’ পর্যন্ত লিখে অপর পাতায় চিঠির বাকিটা লেখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওই অপর পাতার মাথার বাঁদিকের কোণটা ছিঁড়ে হারিয়ে যাওয়ায় তারপর পাওয়া যাচ্ছে—‘ াক্‌ত।’ মনে হচ্ছে ওই হারানো জায়গায় কবি লিখেছিলেন— বন্ধ থাকত বা স্তব্ধ থাকত। মূল না পাওয়ায় বন্ধ থাকত ই লিখলাম।

কবির এই চিঠি আগে ১৩৫৫ সালের শারদীয় দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেখানে চিঠির এই অংশের ‘এখানে আসার পর’ থেকে ওই ‘থাক্‌ত’ পর্যন্ত না ছেপে ওই জায়গায় ‘...’ দেওয়া আছে।

৩. দ্বিজেনবাবু তাঁর হাসপাতালে আড়াই মাসের ছুটি নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন।

৪. সুরেনবাবু দ্বিজেনবাবুর দাদা। তিনি তখন বিলাতে ছিলেন।

১৫

১৩ মে ১৯১২

শিলাইদা
নদিয়া

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আগামী ২৭শে মে তারিখে বম্বাই বন্দর হতে City of Glasgow জাহাজ বিলাত রওনা হবে, আমরা তার যাত্রী। অর্থাৎ আজ হতে ঠিক একমাস পরে য়ুরোপের মাটিতে পদার্পণ করব যদি তার মাঝখানেই সমুদ্র আমাকে দাবি না করে বসে। আমি নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু জল যখন বেঁকে দাঁড়ান তখন সে পরিচয় তিনি মানেন না।

বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবেন যাত্রী শব্দের পূর্বে বহুবচন প্রয়োগ করেছি। সেটা কেবলমাত্র গৌরবার্থে নয়। আমার সঙ্গে রথী ও বৌমা যাচ্চেন।[১] কিন্তু তাই বলে আপনাকে ছাড়চিনে—একমাসের আগাম নোটিস্ দিয়ে আপনাকে রিজার্ভ করে রাখচি।

এই পত্র আপনার হস্তগত হবার অনতিকাল পরেই যখন স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হব, তখন অধিক বাক্যব্যয় করব না, কিন্তু একটি কথা বলে রাখি, আপনি যে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন, সেখানে আমার mission আছে ঐটে ঠিক ডাক্তারোচিত ও বন্ধুর যোগ্য কথা হয়নি। মিশনের সঙ্কট থেকে যদি আমাকে না বাঁচাবেন তবে কোথায় আপনার সহৃদয়তা? ঈশ্বর বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে আমাকে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করেই সৃজন করেছেন, কিন্তু আপনারা আমাকে কেবলি কাজে জুড়ে দিয়ে তাঁর সেই অদ্ভুত সৃষ্টিটাকে পণ্ড করতে চান?

আপনাকে সেই বসন্তের দিনে এই তেতালার খোলাঘর থেকে পত্র লিখেছিলেম—এবারও সেই ঘরটি, কিন্তু আকাশে বাতাসে

সেই সুগন্ধ বাসন্তী মদিরার নেশার ঘোর আর নেই—আজ এখানে বসে বসে এক একদিন অপরাহ্ণে পশ্চিম দিগন্তে কালবৈশাখীর ষড়যন্ত্র দেখ্‌তে পাই। আজই সেই রকমের একটা আভাস পাচ্চি। কালীবর্ণ মেঘ কেশর ফুলিয়ে সূর্য্যাস্ত আভায় চক্ষু রাঙিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে—বহু দূর নদীর তীরে বালি উড়ে আকাশকে ফ্যাকাশে করে দিয়েছে—পাগল তার দরজা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে—এসে পড়ল বলে, আর দেরি নেই।

এবার ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মদিনে খুব ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিন শেষ হয়েছে। মনে মনে ভাবচি হয়তো জীবনে আর একটা যুগ শুরু হবে। ১৩০৫ শালের বর্ষ শেষের ঝড় এইখানেই দেখেছিলুম, তার পরেই জীবনের এক যুগান্তরে প্রবেশ করতে হয়েছিল। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩১৯

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, ১৯১২ মে ২৪)।

রবীন্দ্রনাথের এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবী ছাড়াও শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের তখনকার ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণও ছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—'আমাদের অভিভাবকত্বে শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র ওই একই জাহাজে রওনা হ'ল। তার গন্তব্য হাভার্ড—সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক। এ ছেলেটি একেবারে আনকোরা আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র, পশ্চিমী কায়দা কানুনে একান্ত অনভিজ্ঞ, একে নিয়ে আমাদের ভালো এক বিপদ হ'ল। আশ্রমে খালি পায়ে হাঁটা চলার অভ্যাস, সুতরাং জুতো মোজা এর কাছে অনাবশ্যক বাহুল্য, প্রায়ই একে দেখা যেত প্রথম শ্রেণীর ডকে খালি পায়ে চলাফেরা করছে।'

১৬

[১৭ জুন ১৯১২] লণ্ডন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

ছুটি মঞ্জুর। একটা মাস যাক্ তার পরে দেখা যাইবে। কাল লণ্ডনে পৌঁছিয়া আপততঃ একটা হোটেলে আশ্রয় লইয়াছি। কোথাও একটা বাসার সন্ধানে বাহির হইতে হইবে কারণ আমরা স্বভাবত হোটেলচারী জীব নহি। মনে করিতেছি, ইতিমধ্যে একবার Walesএ কোনো স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জায়গায় গিয়া আশ্রয় লইব। শরীরটাকে যদি একটু সারিয়া সুরিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সুবিধা হইবে। লণ্ডনের গোলকধাঁদার মধ্যে ঘুরপাক খাইবার সখ আমার নাই—হোটেলের জানলার ভিতর দিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া দেখি আর ভাবি এখানে আমার মত মানুষের স্থান কোথায়? যদি কোথাও থাকে তবে কবে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব? পৃথিবীতে অকেজো মানুষের উপযুক্ত জায়গা মেলা বড় কঠিন। যখন ছাত্র ছিলাম তখন লণ্ডনটা গায়ে ঠিক ফিট করিত, এখন বেজায় আঁট বোধ হইতেছে। কোথায় আমার খোলা মাঠ, কোথায় আমার আলোকভরা আকাশ!

কিন্তু আপনি এখন ডাক্তারি লেকচার শুনিতেছেন। অলস ব্যক্তির মনোবেদনা আপনি ঠিক বুঝিতে পারিবেন না, বিশেষত যখন এ বেদনার সঙ্গে শরীরতত্ত্বের কোনো অংশের কোনো যোগ নাই। অতএব আপাতত এখানকার পাতালপুরীর নলের ভিতর দিয়া একবার Rothenstein সাহেবের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব। কুকের কেয়ারে যদি পত্র লেখেন, তবে পাইব। একবার ভাবিয়াছিলাম আপনার বাসায় গিয়া হঠাৎ চমক লাগাইয়া দিব, কিন্তু সেটা নিশ্চয়

আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাস্থ্যকর হইবে না অতএব আপনার প্রতি দয়া করিয়া নিরস্ত হইলাম। ইতি তারিখটা মনে পড়িতেছে না। সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

[? জুন ১৯১২]

3 Villas on the Heath
Vale of Health
Hampstead
N.W.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সুরেন্দ্রবাবুর ঠিকানা আমি জানি না, নিশ্চয় তিনিও আমার ঠিকানা জানেন না, অথচ সাত সমুদ্র পার হইয়া এমন করিয়া পরস্পরের অগোচরে থাকিবার ত কোনো হেতু দেখি না। আপনি বলিয়াছিলেন, তিনি জুনের শেষ সপ্তাহেই এখানে আসিবেন—জুনের সব কটি সপ্তাহই ত শেষ হইয়া আসিল, অতএব আমাকে তাঁহার বা তাঁহাকে আমার সন্ধানটা বলিয়া দিবেন।

আমি যেখানে বাসা করিয়াছি, শহরের লোক সেখানে হাঁফ ছাড়িতে আসে। একটা ছোট বাড়ি লইয়াছি। ছয় সপ্তাহ মেয়াদ। ততদিনে আশা করি আপনার দুর্লভতা ঘুচিয়া যাইবে। এখন আপনি নিশ্চয়ই পরীক্ষার পাকের প্রায় কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—বেশি কিছু লিখিবেন না—কেবল ঠিকানাটা লিখিয়া পাঠাইবেন।

আমি এখানে নব পরিচয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া দ্রুতবেগে নিমন্ত্রণের চক্রে ঘুরিতেছি। এমনতর ঘুরপাক আমার অভ্যাস নাই। কিন্তু যে দেশে আসিয়াছি, এখানে স্থির হইয়া থাকার আশা করা বিড়ম্বনা ; অতএব নালিশ করিব না, কিন্তু Sea Sickness-এর মত আমার জনতা Sickness লাগিতেছে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

১৫ জুলাই ১৯১২

3 Villas on the Heath
Vale of Health
Hampstead

প্রিয়বরেষু

এই বুঝি! সমুদ্রের পূর্ব্বপারে আমি আপনাকে ফাঁকি দিয়াছি—আর সমুদ্রের পশ্চিমপারে আপনি বুঝি তাহার শোধ লইতে বসিয়াছেন। কিন্তু হীদেন দেশে আমি যদি আপনাকে আঘাত করিয়া থাকি, খৃষ্টান দেশে আপনি তাহার প্রতিঘাত করিবেন ইহাও ত ধর্ম্মসঙ্গত নহে। আপনি যে কেবল ফাঁকি দিতেছেন, তাহা নয়, তাহার উপর আবার লোভ দেখাইতেছেন। মনে জানেন আমি আপনার সঙ্গে জুটিতে পারিব না অথচ নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠাইয়া ভোজের খবরটা দেওয়া নিষ্ঠুর কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহাই হউক, মনে করিবেন না এ যাত্রায় আপনিই জিতিলেন। পাহাড় পর্ব্বত নদীসমুদ্র যত বড় জিনিষই হউক, মানুষের কাছে কেহই লাগে না। আমি এখানে আসিয়া মানুষের মধ্যে যে আনন্দ, শিক্ষা ও গৌরবলাভ করিয়াছি, এমন কোনোদিন আশা করি নাই ;

—যদি ইহা হইতে বঞ্চিত হইতাম, তবে এখানে আমার আসা একেবারে ব্যর্থ হইত। অতএব জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত আমি লণ্ডনের বেড়াজালে আটকা পড়িয়া গেছি। তাহার পর অগস্টের আরম্ভে এক সপ্তাহ Buxtonএ কাটাইবার কথা। সেখানে Mrs. Mann আছেন, তিনি ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের য়ুরোপীয় ওস্তাদ—এই অভূতপূর্ব্ব মিশ্রণের পরিচয় লইতে হইবে। তাহা ছাড়া সকলেই বলিতেছে, স্থানটি যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি সুন্দর। সেখানে সপ্তাহ কাটাইয়া এ দেশের আধুনিক পাশ্চাত্য ঋষি Edward Carpenter এর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য Holmerfieldএ যাইব। আশা ছিল, এই সমস্ত তীর্থযাত্রায় আপনার সঙ্গলাভ করিব—আশা এখনো ছাড়ি নাই—কিন্তু তাহা অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—এ অবস্থায় যদি সে রক্ষা পায় তবে সে কেবল ডাক্তারের কৃপাগুণে।

আপনার দাদার সঙ্গে দুই একদিন হইতে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিতেছে। বিবরণ বোধ করি তাঁহার কাছ হইতেই পাইবেন।

সমুদ্রের এপারে কোনো সুযোগে যদি দেখা ঘটে, তবে অন্য অন্য কথা হইবে, নতুবা কোনো একদিন সেই গঙ্গার ধারের ছাদের উপরে মোকাবিলায় কথাবার্ত্তা হইতে পারিবে। ইতি ৩১ আষাঢ় ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লন্ডনে কবির সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর আবার দেখা হয়েছিল। আর শুধু দেখা হওয়াই নয়, তিনি কবির সঙ্গে আমেরিকায়ও গিয়েছিলেন।

১৯

Illinois
U.S.A.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

এখানে এসে অবধি সূর্য্যের আলো, আকাশ, অবকাশ এবং বন্ধুসঙ্গ পাওয়া যাচ্চে, কিন্তু আপনার কোনো খবর পাওয়া যাচ্চে না—এর অর্থ কি? বোধ হয় প্রবাসের কামধেনুটিকে অহোরাত্র খুব কষে দোহন করে নিচ্চেন। আটলান্টিক ঝাঁকানি দিয়ে যেটুকু খালি করে দিয়েছে তার চতুর্গুণ আপনি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন এই আমি আশা করচি। আজ পর্য্যন্ত আমি এখানকার অধ্যাপক ব্রুকসের বাড়িতে অতিথি ভাবে দিন যাপন করচি। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চমৎকার লোক—আলাপ আলোচনা যত্ন আদর কিছুরই ত্রুটি হচ্ছে না। স্নানাহারের ব্যবস্থাও বেশ পর্যাপ্ত। এঁরা আপনার জন্যেও এখানে একটি ঘর সজ্জিত করে রেখেছিলেন—যদি আসতেন তাহলে হাঁসপাতালের অভাবে আপনাকে ব্যাকুল করত সন্দেহ নেই—কিন্তু ঘরের কষ্ট হত না। আমরা একটা আস্ত বাড়ি এক বছরের মত ভাড়া নিয়েছি। রথীও তার কলেজের অধ্যয়ন পদ্ধতি ঠিক করে নিয়েছে। বৌমা খুব আদরে আছেন—এখানে তাঁর সকল রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ভালই হবে। রথীর প্রতি এখানকার সকল অধ্যাপকেরই বিশেষ একটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আছে—সকলেই তাকে পেয়ে খুব খুসি হয়েছেন—এই কারণে এখানে রথী যে রকম অযাচিত আনুকূল্য পাবেন সে রকম আর কোথাও আশা করা যায় না। সংক্ষেপে আপনার সংবাদ দেবার জন্যে একটু সময় করে নেবেন। আমার অন্তরাত্মা

৩

এই ফাঁকা জায়গায় এসে একটু হাঁপ ছাড়বার সুযোগ পেয়েছে। ইতি ৫ নভেম্বর ১৯১২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ২৮ অক্টোবর ১৯১২ (১২ কার্তিক ১৩১৯) আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে পৌঁছিলেন; বিলাতে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দুইবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমেরিকায় এই প্রথম পদার্পণ।...

নিউইয়র্কে কয়েকদিন থাকিয়া তাঁহারা আর্বানা (ইলিনয়) যাত্রা করিলেন। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।'
—২য় খণ্ড—৪র্থ সংস্করণ

রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে পৌঁছে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে জানা যায়, তিনি ২৮শে নয় ২৭শে অক্টোবর নিউইয়র্কে পৌঁছেছিলেন। —দ্রঃ প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র, পৃঃ ৭৫২।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী আগেই আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যাবার সময়ে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর সঙ্গী হন।

রবীন্দ্রনাথের এ যাত্রার সঙ্গী ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থের অন্তর্গত তাঁর 'রবীন্দ্র সংসর্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন—'আমরা এক সঙ্গে আমেরিকা যাচ্ছি। নভেম্বর মাস। কবি ও আমি এক কেবিনে।'

এখানে দ্বিজেনবাবু যে লিখেছেন—নভেম্বর মাসে তাঁরা আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন, এটা ভুল। হবে অক্টোবর মাস।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে 'বাবার সঙ্গে বিদেশে আমেরিকায়' অধ্যায়ে লিখেছেন—'অক্টোবর মাসে আমরা রওনা হয়ে গেলাম আমেরিকার দিকে।'

৫০টি রাষ্ট্রের ইউনাইটেড্ স্টেট্স অব্ আমেরিকা বা ইউ. এস. এ.-র একটি রাষ্ট্র ইলিনয়। আর্বানা ইলিনয়ের একটি শহর।

রথীন্দ্রনাথের পরিচিত আর্বানা শহরে পিতার থাকার সুব্যবস্থা করার জন্যই সম্ভবত রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক আগেই আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন।

২০

508, W. High Street
Urbana,
Illinois, U.S.A.
13 Nov, 1912.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

চিঠিপত্র কিছু না পেয়ে আমি ভাবছিলুম আপনি তবে বুঝি এতক্ষণে মেয়ো হাঁসপাতালের পথে। যা হোক এখন তা হলে কিছুদিন এখানেই আপনার অবস্থান হবে। কিন্তু যদি মেয়ো ভ্রাতাদের[1] সন্ধানে আমাদের আঙিনার সামনে দিয়েই যান আর এখানে না আসেন তাহলে আমাদের প্রতি আপনার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ হবে না। একটুখানি না হয় বেঁকেই গেলেন। এখানে আপনার আদর-যত্ন আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হবে না—কেননা এখানেও সহৃদয় লোক আছে। Rothenstein আপনার জন্যে New Yorkএ Dr. Dunham এর নামে একটা চিঠি দিয়েছেন, সেটা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। Dr. Flexner এর চিঠিও পাঠাব—আমার ওতে কোনো প্রয়োজন দেখিনে—আমি এদেশে যতদূর সম্ভব চুপচাপ থাকতে চাই। লোকসঙ্গের আবর্ত্তে যথেষ্ট পাক খেয়েছি—এখন কিছুদিন নিভৃতের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসতে চাই—গভীর পরিপূর্ণতার জন্যে মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা বোধ হচ্চে—এই বেদনার সমাধান কবে হবে কিছুই জানিনে—নিজেকে নিয়ে কারবার করা আর আমার চল্‌চে না—একেবারে নিঃশেষে দেউলে হয়ে যেতে পারলে বেঁচে যাই। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ‘মেয়ো ভ্রাতা’দের—বিখ্যাত চিকিৎসকদ্বয়, চার্লি ও উইলি মেয়ো।

২১

508, W. High Street
Urbana, Illinois.
9 Dec. 1912

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনি আচ্ছা লোক! কোথায় ঘুরে বেড়ালেন আর কখন দৌড় দিলেন তার কোনো দিশে পাওয়া গেল না। এদিকে আপনার অভ্যর্থনার জন্যে একখণ্ড সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলি[১] অর্ঘ্য-স্বরূপ সাজিয়ে পথ চেয়ে বসেছিলুম—সমস্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। Fox Strangwaysকে লিখে দেব আপনাকে একখানা বই দেবার জন্যে। কিন্তু আপনি যে কোথায় থাকবেন তাও তো জানিনে। যা হোক্ এখন যে ঘাটে গিয়েছেন সেটা পাথুরেঘাটার কতকটা কাছে এই একটা সান্ত্বনার বিষয় দেখ্‌তে পাচ্চি। লণ্ডনের খবর কি? আমাদের সেই কাউণ্টের কি রকম অবস্থা? আশা করি এখনও বেঁচে আছেন, যদি থাকেন আমাদের নমস্কার জানাবেন—আমাদের বাড়িওয়ালীদেরও আমাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আমরা সম্ভবত মে কিম্বা জুনে লণ্ডনে ফিরব[২]—যদি জায়গা পাওয়া যায় তবে ওদের ঘরে গিয়েই উঠ্‌ব। আমার বক্তৃতার পালা এখনো শেষ হয়নি—চারটে পড়েছি, পঞ্চমটা লিখচি—হতে হতে অনেকগুলো জমে যাবে। এদিক ওদিক থেকে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পাওয়া যাচ্চে কিন্তু আপনি ত জানেন আমার পক্ষে একলা ঘুরে বেড়ানো কতদূর অসম্ভব—বাহন না হলে আমার একেবারেই চলে না। রথী এখানে পড়ায় লেগে গেছে তাকে নড়াতে চাইনে—বৌমারও এখানে বেশ চল্‌চে। রোটেনস্টাইনের সঙ্গে বোধ

করি দেখা হয়েছে—তাঁকে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাবেন—তাঁর বন্ধুত্ব আমি কোনোদিন ভুল্‌তে পারব না—সমুদ্র পার হয়ে এই আমি একটি মহার্ঘ্য রত্ন লাভ করেছি। ব্রজেন্দ্রবাবু কি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছেন? কোনো মতে তাঁকে ওখানে ধরে রাখতে পারলে আমাদের দেশের একটা মস্ত কাজ হত। আমি থাকলে হয়ত একটা কোনোরকম জোগাড় করতে পারতুম। নিউইয়র্কে আপনাকে একটা দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিলুম, সেটা বোধ হচ্চে আপনি পাননি।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১৯শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেনবাবু একসঙ্গে কলকাতা থেকে বিলাত যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাত্রার পূর্বমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেন নি। দ্বিজেনবাবু একাই যান। একথা আগে বলেছি।

অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চিকিৎসকরা তখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে উপদেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁদের জমিদারি পদ্মাতীরে শিলাইদহে যান। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, খেয়া প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ক বেশ কিছু কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে এবার পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে ১৯১২র ২৪শে মে কলকাতা থেকে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের ওই ইংরাজি অনুবাদের খাতাটিও সঙ্গে নেন।

লন্ডনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ১৯১১ খৃস্টাব্দে একবার ভারত ভ্রমণে এলে সেই সময় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামান্য পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে গিয়ে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন।

রোটেনস্টাইন ইংরাজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হন। এবং নিজের গৃহের নিকটেই রবীন্দ্রনাথের থাকার জন্য একটা বাসাও ঠিক করে দেন। এরপর তিনি ইংরাজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি টাইপ করে ওখানকার কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং পরে নিজের বাড়িতে তাঁদের আমন্ত্রণ করে ওই ইংরাজি গীতাঞ্জলির আলোচনার জন্য এক সভাও আহ্বান করেন। সেদিনের সভায় আইরিশ কবি উইলিয়ম বাটলার, ইয়েটস্, ইংরাজ কবি মেসফিল্ড্, আরনেস্ট রিহস, এজরা পাউন্ড, এভেলিন আন্ডারহিল, রবার্ট ট্রেভেলিন, কুমারী সিনক্লেয়ার, দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন কলেজের অধ্যাপক রেভারেন্ড সি. এফ. এন্ড্রুজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এন্ড্রুজ তখন কিছুদিন যাবৎ ভারতবাসী হলেও সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন। ওই সভায় রবীন্দ্রনাথ এবং রোটেনস্টাইন ত ছিলেনই, আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন বন্ধু পূর্বোক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলে দ্বিজেনবাবু কবির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর বাসায় যেতেন।

ইংরাজি গীতাঞ্জলি পড়ার ওই সভায় উপস্থিত সকলেই কবির রচনার অজস্র প্রশংসা করেন, বিশেষ করে কবি ইয়েটস্। তিনি পরে একসময় দ্বিজেনবাবুর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক কথা জেনেও নেন এবং ইংরাজি গীতাঞ্জলি গ্রন্থ আকারে বেরোবার আগে তিনি যে মুখবন্ধ লিখে দেন, তাতে সেই কথাও লেখেন। এ সম্পর্কে দ্বিজেনবাবু তাঁর 'রবীন্দ্র সংসর্গে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—'কবি ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথের কথা ভালো করে একটু জানবার জন্য আমাকে একদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্যন্ত কথাবার্তা হ'ল। তখন আদৌ বুঝতে পারি নি যে তার থেকে আমার কিছু কিছু কথা ইংরাজি গীতাঞ্জলির ভূমিকায় উদ্ধৃত করবেন। ইয়েটস্ই সাগ্রহে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওই পুস্তকের ইন্ট্রোডাকসান বা পরিচয় পত্র লেখেন।'

এরপর রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে আমেরিকায় যাত্রা করেন। সঙ্গে দ্বিজেনবাবুও যান। তাঁরা আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছান ২৭শে অক্টোবর (১৯১২)। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ছিলেন ছ মাস। দ্বিজেনবাবু অল্প কয়েকদিন আমেরিকায় বেড়িয়ে আবার ইংলন্ডে ফিরে আসেন এবং তার কিছুদিন পরেই দেশে চলে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় থাকাকালে ওই ১৯১২র নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি ইংরাজি গীতাঞ্জলি বা Song Offerings

ছেপে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থ বিক্রির ভার নেন ম্যাকমিলন কোম্পানি। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তখন ইংলন্ডে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক মহলে এর প্রচুর প্রশংসা হয়।

২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘পিতৃস্মৃতি’ গ্রন্থে ‘বাবার সঙ্গে বিদেশে—আমেরিকায়’ অধ্যায়ে লিখেছেন—১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমরা আমেরিকা থেকে [লন্ডনে] ফিরলাম।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্রজীবনী’ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং গ্রন্থে লিখেছেন—১৭ এপ্রিল ১৯১৩, লন্ডনে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় পাইলেন শিকাগোর মিসেস্ মুডির বাসায়।

২২

C/O. Messrs. Thomas Cook & Sons,
Ludgate Circus,
London.
22.5.13

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার সব চিঠিরই ত জবাব দিয়েছি তবু যে অভিযোগ করতে ছাড়েননি সেটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন। আমার একজন আত্মীয় আছেন তিনি মাসের মধ্যে বার দুই তিন হঠাৎ বিনা কারণে তাঁর চাকরকে সাধারণভাবে খুব ভর্ৎসনা করে নেন—কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ধমক খেলেই চাকরটা মনে করবে যে সব দোষ লুকিয়ে করেছি সেগুলো নিশ্চয়ই বাবুর কাছে ধরা পড়ে গেছে। কি জানি বন্ধুত্বের কোথায় কোন্ অপরাধ লুকিয়ে রয়ে গেছে এই মনে করে মাঝে মাঝে তাড়া দিলে হয়ত কাজে লাগ্‌তে পারে। আমার ত হঠাৎ মনে হয়েছিল, হবেও-বা, জবাব

দিতে হয়ত-বা ভুলেছি। কিন্তু ভেবে দেখলুম ওটা নিতান্তই ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ব্লাফ।

আমেরিকায় অধিকাংশ সময়টা অজ্ঞাতবাসে ছিলুম। শেষের দুটো মাস Wisconsin, Chicago, Boston প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা করতে বেরতে হয়েছে। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমেরিকানরা যখন তখন আইসক্রিম খাবেই এবং বক্তৃতা না শুনে ছাড়বে না—তাতে তাদের শরীর ও মনের হজম শক্তিটা একেবারে মাটি হয়ে যায়। দায়ে পড়ে বক্তৃতা করেছি হাততালিও পাওয়া গেছে—আমার বা তাদের ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি, লাভ হয়েছে কিনা সে হিসাব করবার সময় এখনো আসে নি। সেই বক্তৃতার পালা এখানেও আরম্ভ হয়েছে—প্রথমটা পড়া হয়ে গেছে—তাতে বোধ হচ্চে এগুলো মাঠে মারা যাবে না।

আপনার গীতাঞ্জলিখানা[১] এখনো হাতে আছে একেবারে হাতে তুলে দেওয়া যাবে, কি বলেন? নায়কে, বসুমতীতে আপনাকে মধুর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করচে না এতে আমার দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মনের মধ্যে কেমন অন্যায় রকমের একটা সুখ বোধ হচ্চে—মনে হচ্চে, যা হোক্ অপমানের একজন সরিক পাওয়া গেল।[২]

ইতিমধ্যে আয়র্লন্ডে ডাকঘরের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে—ইয়েটসের কাছ্ থেকে খবর পাওয়া গেল।

'The play was very successful with the house, which was quite enthusiastic. I think the performance was middling, the stage clothes worried the players and we had not quite as much time as we should have had for rehearsal but everything went very smoothly. Everyone I have met likes the play.'

এইটে আবার ভাল করে হবে। একদিন একটা সভায় চিত্রাঙ্গদার তর্জ্জমাটা পড়েছিলুম, সেটাও ত এদের বিশেষ ভাল লেগে গেছে।

যাই হোক্, মনের ভিতর দিকটাতে আরাম বোধ হচ্চে না—এই খ্যাতির শরশয্যায় শুয়ে খবর সেটা আমার কিছুতেই মনঃপূত হচ্চে না। বাইরের দিক থেকে প্রশংসা যা কিছু আসচে সে আমার বাইরের দেউড়ির দরোয়ানজির মেরজাইয়ের পকেটেই প্রবেশ করচে, ভিতরে আমার যে মানুষটি বসে আছে তার ভোগ এখনো এসে পৌঁছল না। তাই দেখচি দ্বারের বাইরে আবর্জ্জনা জমে উঠচে আর ঘরের ভিতরটাতে ফাঁক রয়ে গেল। ঘরের তদ্বিরে যাবার সময় পাব কখন তাই বসে বসে ভাবচি।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. দ্বিজেনবাবু দেশে ফেরার সময় এক খণ্ড ইংরাজি গীতাঞ্জলি ম্যাকমিলন কোম্পানি থেকে কিনে নিয়ে এলেও, রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসে নিজে তাঁকে এই গ্রন্থ এক খন্ড উপহার দিতে ইচ্ছা করেছিলেন।

২. কলকাতার সেকালের বিখ্যাত 'নায়ক' ও 'বসুমতী' পত্রিকা দুটির সম্পাদকরা ইংরাজি গীতাঞ্জলি আনিয়ে পড়েন এবং তাঁদের নিজ নিজ কাগজে ওই গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা লিখেও প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাতে বসেই কলকাতার বন্ধুদের কাছ থেকে নায়ক ও বসুমতীর বিরূপ সমালোচনার কথা জানতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় লন্ডন থেকে 'নায়ক' ও 'বসুমতীর' ওই সমালোচনার কথা নিয়ে দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। দ্বিজেনবাবু অবশ্য কলকাতায়

থেকে আগেই নায়ক ও বসুমতীর ওই সমালোচনা পড়েছিলেন এবং সেই সমালোচনার কাগজ দুটিও সংগ্রহ করে রাখেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের 'নায়ক' ও 'বসুমতী' আজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। দ্বিজেনবাবুর সংগৃহীত সেদিনের সেই নায়ক ও বসুমতীর সমালোচনার অংশ দুটি দ্বিজেনবাবুর পুত্র সত্যেনবাবুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। সেই সমালোচনা দুটি এখানে দিলাম। এতে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে প্রভূতভাবে সম্মানিত হলেও দেশের এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কাছে কিরূপ অসম্মানিত হয়েছিলেন।

এবার বসুমতী ও নায়ক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র সম্বন্ধে যে সমালোচনা বেরিয়েছিল, তার কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি। প্রথমে বসুমতীর লেখা—

'অত্যুক্তির পরাকাষ্ঠা
কবি রবীন্দ্রের বিলাতী কীর্তি

...ইয়েটস্ নামক যে নাতিপ্রসিদ্ধ আইরিশ কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজি তর্জমার ভূমিকা লিখিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি বাঙ্গলা ভাষা জানেন না এবং রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি তর্জমার পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল। কে পড়িতে দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। ওই তর্জমা পড়িলে উহা সরস বলিয়া ভাবিবার উপায় থাকে না। কিন্তু ইয়েটস্ লিখিয়াছেন যে, আমি এখানকার ভারতবাসীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, এই কবিতাগুলি বাঙ্গলা ভাষায় উত্তম ছন্দো-বন্ধে রচিত এবং উহার মাধুরী নাকি এমন চমৎকার যে তাহার ভাষান্তর করা চলে না। অর্থাৎ ভূমিকা লেখক পরের মুখে ঝাল খাইয়াছেন, এবং যে যাহা ধরিয়া পাকড়াইয়া বলাইয়া লইয়াছেন, ভদ্রতার খাতিরে তাহাই কিছু বলিয়া গিয়াছেন। ভূমিকার ঠিক গোড়াতেই দেখিতে পাই যে, একজন লন্ডন-প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বাঙ্গলার অশেষ গুণকীর্তন করিয়া ভূমিকা-লেখকের ভূমিকা লিখিবার উপাদান যোগাইয়াছেন। এই ডাক্তারটি যে ব্রাহ্ম তাহাও ওই ভূমিকা হইতেই অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ পাঠকদিগকে বলিতে হইবে না যে, এই ডাক্তারটি হইতেছেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম. বি.। ইঁহাকেই ইউরোপ যাত্রার সময়ে

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে করিয়া লইবেন বলিয়া সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। ডাক্তার মৈত্র ইয়েটস্‌কে ঠিক যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

আমি রোজই তাঁহার কবিতা পড়িয়া দুঃখ ভুলিয়া যাই।...

দেশে রবীন্দ্রনাথের মত কবি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। আমরা এ যুগকে রবীন্দ্রনাথের যুগ বলি। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের যত খ্যাতি, ইউরোপে কোনও কবির অদৃষ্টে তত খ্যাতি ঘটে নাই। —এই কবির গান গান্ধার হইতে ব্রহ্মদেশের ভিতরে পর্যন্ত গীত হয়।...

রবীন্দ্রনাথ খোকা বয়সে যে নাটক লিখিয়াছেন, কলিকাতায় এখনও তাহাই অভিনীত হয়।'

Yeats ভূমিকায় লিখেছিলেন—plays written when he was but little older are still played in Calcutta. বসুমতী-সম্পাদক ব্যঙ্গ করে little olderকে করেছেন, খোকা বয়স। আর ভূমিকার his songs are sung from the westকে করেছেন গান্ধার হইতে।

'বসুমতী' দ্বিজেনবাবু ছাড়া, ইয়েটস্-এর ভূমিকা লেখায় অপর এক সাহায্যকারী রবীন্দ্রভক্ত সম্বন্ধে লিখেছেন—'একজন বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতপস্যা এবং ব্রহ্মধ্যানের কথা। ধ্যানের এই সাক্ষ্যদানের কথার পর প্রত্যক্ষ সাক্ষীটি বলিয়াছেন যে, চতুর্দশ পুরুষ ধরিয়া রবীন্দ্রনাথদের বংশে কেবল অসাধারণ প্রতিভাই জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। ডাক্তার মৈত্রকে আমরা চিনি, কিন্তু এই সাক্ষীটি কে? ইনি রবীন্দ্রনাথের যে জয়ঢাকটি বহিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য জাহাজে কত মাশুল দিতে হইয়াছিল, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়।...'

ইয়েটস্ ভূমিকায় লিখেছিলেন for generations, সেইটাকেই বসুমতী ব্যঙ্গ করে লেখেন—চতুর্দশ পুরুষ।

এবার নায়কের সমালোচনা—

'রবির খেলা
স্তবের ডালা
পড় সবে শনিবারের পালা

গেল নম্বর বসুমতী রবিবাবুর বিলাতী কীর্তি ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। বিলাতে তাঁহার অভ্যর্থনা লইয়া তারের খবর পাঠানো, কাগজে প্রবন্ধ পাঠানো, সংক্ষেপত এই ছোটখাট 'হুজুগ' এখন জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। এতক্ষণে বোঝা গেল যে, ইহার আদি ও মূল দুই তিনজন রবিভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অজানিত একজন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁহাকে (বসুমতী কথাটি বেশ একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন) রবীন্দ্রবাবু বিলাতে সঙ্গে লইয়া যাইবার সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর ভক্তের জাহাজের মাশুল কত দিতে হইয়াছিল, তাহাও বসুমতী বক্রভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ডাক্তারেরা স্বাস্থ্য ও পীড়া সম্বন্ধেই সার্টিফিকেট দেয়। তাহার মূল্য কত জানি না। কিন্তু ডাক্তারেরা যে কবিত্ব ও ঋষিত্ব সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে পারে, ইহা পূর্বে জানিতাম না। এই ঠাকুর পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেবল ঋষি ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও বনের পশুপক্ষী আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গায়ে আসিয়া বসে। (তখন তাঁহারা সেগুলিকে ঋষির মত ধরিয়া আহার করেন কিনা সে বিষয়ে ডাক্তারবাবু কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই।) রবিবাবু প্রত্যুষে উঠিয়া দু ঘন্টা কাল ধরিয়া ধ্যান করেন এবং তিনি হিন্দু সাধু ও ঋষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—এরূপ সার্টিফিকেট যে সে দিতে পারে না। তাই বসুমতী জাহাজের মাশুলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

সার্টিফিকেটে চাকরি হয় জানিতাম। সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ঋষি হয় জানিতাম না। ঠাকুর বাড়ির একজন সার্টিফিকেটের জোরে চিত্রকর হইয়া গিয়াছেন। এখন রবিবাবু ডাক্তারের সার্টিফিকেটের জোরে কি না হইলেন! দেখিতেছি যে তিনজনে মনে করিলে ও চেষ্টা করিলে কি না করিতে পারে! 'পরিষৎ'কে তো গাধা বানাইতে পারেই, একজন গোবেচারি ইংরেজকে ভেড়া বানাইতে পারে। রবিবাবু এই সব পারিবারিক কথা কবিতা পুস্তকের ভূমিকায় ছাপাইয়াছেন! লজ্জা করে নাই? তিনি চিরদিনই ধৃষ্ট। ... শেষে বৃদ্ধ বয়সে নিজের কবিতার ইংরাজি তর্জমা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি লইয়া একখানা সার্টিফিকেটের জন্য বিলাতে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া এবং পারিবারিক কথা (সত্য হোক, মিথ্যা হোক) ও নিজের ঋষিত্ব সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিজের কবিতার বহির ভূমিকায় ছাপাইবেন—তাঁহার এই অন্ধভক্তের স্তবে তাঁহার যে এত অবনতি হইবে—তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। ...'

'নায়ক' যে পরিষৎ অর্থাৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে অযথা গাধা বানাবার কথা বলে বিদ্রূপ করেছিল, তার প্রসঙ্গটা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থ থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি—

'১৩১৮ সালের প্রবাসী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর পক্ষ হইতে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। কিন্তু কবির ভাগ্যদোষে বরাবরের ন্যায় এবারও একদল লোক জন্মোৎসবের বিরোধিতা ও কবিকে এই উদ্যোগের প্ররোচক বলিয়া সন্দেহ করিয়া নিন্দাবাদ রটাইতে শুরু করিল। রবীন্দ্রনাথ উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে শান্তিনিকেতন হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিলেন (২১ বৈশাখ) —'আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন।...' তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে, তাহা পড়িয়া বুঝিলাম, আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ লাভ করিলাম এই যে আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি।... (৪র্থ সং : পৃঃ ৩১৬)

২৩

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কলকাতায় এসেছি।
'নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার অবসর মত আসিয়ো।'

সোমবার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিটি পোস্টকার্ডে লেখা। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তারিখ না দিয়ে শুধু

সোমবার লিখলেও দেখেছি—পোস্টকার্ডে ডাকঘরের ছাপ আছে—Calcutta, 27 Oct '13— ঐ ২৭শে অক্টোবর সোমবারই ছিল।

এখানে এই তারিখটি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার আছে—

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—'১৫ অগ্রহায়ণ তিনি [রবীন্দ্রনাথ] কলিকাতায় গেলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার দুই দিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিয়াছিলেন (২২ আশ্বিন)। তার দেড় মাস পরে কলিকাতায় ফিরিলেন।'— ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৪৯

প্রভাতবাবু তাঁর ওই গ্রন্থের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন—'এই দু দিনের বিষম উপদ্রবে আজ আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। তাই আজই (২২ আশ্বিন) বিকেলের গাড়ীতে [বোলপুরে] পালাতে হচ্ছে। নইলে বাঁচব না।' —চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড

এখানে প্রভাতবাবুর লেখায় ২২ আশ্বিন ছিল ৮ অক্টোবর ১৯১৩, আর ১৫ অগ্রহায়ণ ছিল ১ ডিসেম্বব ১৯১৩।

প্রভাতবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে দেশে ফেরেন ২০ আশ্বিন বা ৬ অক্টোবর ১৯১৩। তার দুদিন পরে ২২ আশ্বিন বা ৮ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে যান। আবার কলকাতায় ফেরেন 'দেড় মাস পরে' ১৫ অগ্রহায়ণ বা ১ ডিসেম্বর।

প্রভাতবাবুর এ কথাগুলি ঠিক নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে দেশে ফেরেন ১৩ আশ্বিন বা ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার মহালয়ার দিন। ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত Rabindranath's Return লেখা থেকে জানা যায়—ঐ দিন রবীন্দ্রনাথ হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

কালিদাস নাগের ডায়রি থেকে জানা যায়, পূজার ছুটির আগে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কবি ঐদিনই সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে যান।

১৬ আশ্বিন বা ২ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের পূজার ছুটি আরম্ভ হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৩ আশ্বিন বা ৯ অক্টোবর কলকাতায় থেকে সুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে চিঠি লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৪ আশ্বিন বা ১০ অক্টোবর কলকাতায় থেকে বিহারীলাল গুপ্তকে চিঠি লিখেছিলেন। দ্রঃ দেশ ১৯৬৫, মে ৮, পৃ: ৩২

২৫ আশ্বিন বা ১১ অক্টোবর কলকাতায় থেকে কবি এন্ড্রুজকে চিঠি লিখেছিলেন। দ্রঃ Letters to a Friend. P. 38

রবীন্দ্রনাথ ২৬ আশ্বিন বা ১২ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে থেকে আমেরিকা প্রবাসী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণকে চিঠি লেখেন। —দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ: ৪৬৮

প্রভাতবাবু তাঁর গ্রন্থে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি উদ্ধৃত করতে গিয়ে ঐ চিঠির মধ্যে যে '(২২ আশ্বিন)' লিখেছেন, এটা তাঁর নিজের লেখা। রবীন্দ্রনাথের নয়। এমনকী রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠিতে কবে লেখা তার তারিখও নেই। এটা অন্য সময়কার লেখা অন্য চিঠি। ১৯১৩র অক্টোবরে বিলাত থেকে ফেরার সময়কার চিঠি নয়।

প্রভাতবাবু যে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে এসে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার দেড় মাস পরে সেখান থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ বা ১ ডিসেম্বর কলকাতায় এসেছিলেন, এটাও ঠিক নয়। কারণ, সীতা দেবী লিখেছেন—২৫শে নভেম্বর (১৯১৩) বিকালের দিকে কবি হঠাৎ আমাদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত। —পূণ্যস্মৃতি, পৃঃ ৬৬

আর দ্বিজেনবাবুকে লেখা এই চিঠি থেকেও দেখা যাচ্ছে—কবি ২৭শে অক্টোবর (১০ কার্তিক) কলকাতায় আছেন।

আলোচ্য চিঠিতে আমার দেখা পোস্ট অফিসের তারিখের ছাপকে ভুল বা সন্দেহজনক মনে করে কেউ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতবাবুর লেখাকেই সঠিক ভাবতে পারেন, এই ভেবেই এ নিয়ে এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করলাম।

২৪

[২৪ ফেব্রুয়ারি (?) ১৯১৪]

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু,

পত্র পাইলাম। সেদিন সত্যজ্ঞানবাবুকে[১] দেখিতে যাই নাই বলিয়া আপনি এবং মেনার্ড সাহেব[২] ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার স্বভাবে একটা গ্রন্থি আছে—একটা কেন অনেকগুলা, ইহাও তাহার মধ্যে একটি—আমি হাঁসপাতালের রোগীশালায় যাইতে একান্ত কষ্ট বোধ করি। একবার মনোরঞ্জনবাবুকে দেখিতে জেনেরাল হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছিল, তাহাতে অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়াছিলাম। সেখানে আমার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কারণ মনোরঞ্জনবাবু সেখানে আত্মীয় বান্ধবহীন ছিলেন এবং তাঁহাকে আমি কতকগুলি পড়িবার বই প্রভৃতি দিয়া আসিয়া ছিলাম। নতুবা নিরর্থক লৌকিকতা আমার আসে না। আমি একলা রোগীর শুশ্রূষা অনেক করিয়াছি এবং মৃত্যু আমার কাছে সুপরিচিত। কিন্তু যেখানে হাঁসপাতাল ঘরে বহু রোগীকে একঘরে রাখিয়া দেয়, সেখানে সেই দৃশ্য আমার কাছে কতই বেদনাজনক তাহা সহজে কেহ বুঝিবে না। এই কারণেই জেলখানায় আমি দর্শকরূপে যাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও ক্লেশ বোধ করি। স্কুলও আমার কাছে অনেকটা এই কারণেই কুৎসিত। মানুষের কষ্টের পশ্চাতে যেখানে আত্মীয়তার background নাই যেখানে কেবলমাত্র একটা ব্যবস্থার ঝাঁকার মধ্যে অনেকগুলা লোক একত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেখানকার অস্বাভাবিকতা আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াকর। অথচ সমাজ যখন জটিল হইয়া উঠে তখন এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আবশ্যক।

সুতরাং ইহার কল্যাণকরতা আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করি না—কিন্তু এরূপ জায়গায় আমার উপস্থিতি যথার্থই প্রয়োজনীয় না হইলে আমি যাইতে পারি না। আপনাদের ওখানে যখন আমি যাই তখন আমি আপনাদের এক তলার বড় ঘরটার আশে পাশে দৃষ্টিপাতমাত্র করিতে পারি না। মানুষের রোগ ও কষ্টের একটা আব্রু আছে, সেইটে ঘুচিয়া গেলে তাহার মত শোচনীয় আর কিছু নাই। বস্তুত এই দৃশ্যে আমার নিরতিশয় সঙ্কোচ হয়। কারণ ইহার মধ্যে একটি দৈন্য আছে—দায়ে পড়িয়া এটি মানুষকে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এ আমি চোখে দেখিতে পারি না। আমার এই সঙ্কোচকে আপনারা কবিত্ব বলিতে পারেন দুর্ব্বলতা বলিতে পারেন, কিন্তু ইহা আমার আছে, তাহা কবুল করিলাম। যদিচ কবুল করিলেই দোষের ক্ষালন হয় না, তবু কিছু লাঘব হয়—এ সম্বন্ধে আমি ঐটুকুর বেশি আশা করি না।

কিছু দিন নির্জ্জন চরে আরামে ছিলাম। আবার পাবনা সাহিত্য সম্মিলনে টানিয়া আনিয়াছে। আবার পদ্মার জলচর জীবদের প্রতিবেশী হইবার জন্য চলিলাম। তাহাদের গুণ এই, তাহারা আমাকে কবি বলিয়া কেয়ার করে না, অকবি বলিয়া গাল দেয় না—তাহারা আমাকে মানুষ মাত্র বলিয়া একঘরে করিয়া রাখে—তাহাতে নিরুপদ্রবে থাকিতে পারি। ইতি—তারিখ ঠিক জানি না। ফাল্গুন ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. সত্যজ্ঞানবাবু বা সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—

'১৩১৮ সালের চৈত্র শেষে বিধুশেখর ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া নিজগ্রাম মালদহের হরিশচন্দ্রপুরে প্রাচীন ভারতের আদর্শে গুরুগৃহ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে গেলেন। তাঁহার স্থলে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য আসিলেন এলাহাবাদ হইতে সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়—বিপত্নীক, সঙ্গে বিধবা কন্যা ও তাঁহার শিশুপুত্র সূর্য। শান্তিনিকেতন গুরুপল্লীর এক পাশে 'সূর্যির মা'র বাড়ি' এখনো আছে। সূর্য বহুকাল মৃত। তাহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী ও সন্তানাদির সংবাদ আজ অজ্ঞাত।'

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—'মেয়ো হাসপাতালে সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় নামে শান্তিনিকেতনের জনৈক শিক্ষক পীড়িত হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালের উপরতলার মজলিসে যাওয়া আসা করিতেন; কিন্তু কোনো দিন সত্যজ্ঞানকে দেখিতে যান নাই বলিয়া হাসপাতালের ইংরেজ অধ্যক্ষ ডাঃ মেনার্ড দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ মৈত্র এই কথাটি কবিকে জানান।' —২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৫৪।

কবি দ্বিজেনবাবুর কাছ থেকে এ সম্পর্কে চিঠি পেয়ে তখন শিলাইদহ থেকে দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

২৫

৮ অগস্ট ১৯১৪ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

রবিবার রাত্রে রাজধানীতে পদার্পণ করব। একবার দেখা সাক্ষাতের উদ্যোগ করবেন।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিতে পোস্টকার্ডে শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ছাপ আছে ৮ অগস্ট ১৯১৪।

২৬

[১২ নভেম্বর, ১৯১৩] ওঁ

প্রিয়বরেষু,

এই ত বেশ কথা। আপনার খোলা ছাত আছে, খোলা প্রাণ আছে, আমরাও আছি, এই ত সভার মত সভা। সমাজের ভিতরের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে কৌতুক করবার দরকার কি?।

তার পরে ঐ যে ব্রাহ্ম সমাজের সমস্ত বিরোধ টিরোধসুদ্ধ[১] সমস্ত সামগ্রীটাকে সিদ্ধিঘোঁটা করে একটা পিণ্ড পাকাবার ভার আমাকে দিতে চান আমার সে রকম শক্তির কি পরিচয় পেয়েছেন আমাকে বলেন ত? বাঁশির দ্বারা কোনদিন ঢেঁকির কাজ হয়েছে আপনি মানবের ইতিহাসে তার কোনো পরিচয় পেয়েছেন কি? যদি আমার কণ্ঠে সুর না ফুরিয়ে থাকে তবে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গান গাব আমার ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে আমার এই রকম একটা বোঝাপড়া আছে—তাতে যেটুকু কাজ বা অকাজ হতে পারে আমার দ্বারা তাই হবে—এইটুকুমাত্র যারা আমার কাছে আশা করে তারাই blessed, for they in wise shall be disappointed। আমি যেটুকু দলকে মানি সে হচ্চে সরস্বতীর শতদল। সম্প্রদায়ের দলাদলির মধ্যে রস কোথায় আছে আজো তার সন্ধান পাইনি—এই কারণে সেই কাঁটাবনকে আমি দূরে পরিহার করে চলি। —কিন্তু আপনি মেয়ো হাঁসপাতালে তলিয়ে আছেন, আর আমি আছি এই প্রান্তরে। এই বিচ্ছেদটি আমি মেটাবার জন্যে একান্ত উৎসুক একথা নিশ্চয় জানবেন। ইতি বুধবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৯১১ খৃস্টাব্দে আদমসুমারীর সময় ব্রাহ্মসমাজের একাংশ স্থির

করেন, তাঁরা লোকগণনাকালে নিজেদের ধর্ম 'ব্রাহ্ম' বলে লেখাবেন। অপরাংশ স্থির করেন 'হিন্দু' বলে লেখাবেন।

প্রথমোক্ত দলের অভিমত ছিল—'ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম, পৃথক ধর্ম—এখানে হিন্দু ছাড়া মুসলমান খৃস্টানরাও আশ্রয় পায়। এই ধর্ম বিশেষ কোনো ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ কোনো মহাপুরুষের বাণী কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হয় নাই। সকলের জন্য যখন ইহা উন্মুক্ত তখন ইহাকে হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু আখ্যা দেওয়া যায় না—ব্রাহ্ম ব্রাহ্মই।'

শেষোক্ত দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল—'আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন, তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম।'

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় 'আত্মপরিচয়' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতেও তিনি নিজের 'ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত মতই ব্যক্ত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধ তখনকার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে (বৈশাখ ১৮৩৪ শক বা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদি'তে এর বিরূপ সমালোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ পরের মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে 'হিন্দুব্রাহ্ম' নামে এক প্রবন্ধ লিখে 'তত্ত্বকৌমুদি'র সমালোচনার উত্তর দেন। এই নিয়ে তখন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটা দলাদলির মত সৃষ্টি হয়েছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্র ও তরুণরা রবীন্দ্রনাথের সমর্থক ছিলেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে এই ছাত্র ও তরুণরা রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি করবেন স্থির করেন। এই তরুণ দলের অন্যতম ছিলেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। দ্বিজেনবাবু তাঁদের অভিলাষের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালে, রবীন্দ্রনাথ তখন চিঠিতে দ্বিজেনবাবুকে এই কথা লিখেছিলেন।

২৭
২২ জুলাই ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আপনার স্পর্দ্ধা ত বড় কম নয় দেখছি! আপনি জগদ্বিখ্যাত লোকদের যখন তখন চিঠিপত্র লিখতে সাহস করেন। জগদ্বিখ্যাত লোকটি হয়ত আপনাকে কোনো একদিন মাপ করতেও পারেন যদি ইতিমধ্যে ঘন ঘন পত্রাদি লিখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন—আপনার একখানা পত্রের অপরাধ একশোখানা পত্র দিয়ে যদি মুছতে পারেন, তাহলেও জানবেন খুব অল্পের উপর নিষ্কৃতি পেলেন। আমাকে বাইরে থেকে দেখে আপনারা যতটা ভাল মানুষ মনে করেন ততটা নই এটা নিশ্চয় জানবেন। ইতি ৬ই শ্রাবণ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮
৭ আগষ্ট ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

দিন দুয়েকের মধ্যেই কলকাতায় যাব, তখন ঝুনুর[১] জন্যে বই দেব। তখন দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনারও সুযোগ নিশ্চয় হবে। সুইড রমণী এখানে এসেছিলেন—বোধ হচ্ছে খুসি হয়েই ফিরেছেন। একটি আমেরিকানের অভ্যুদয় হয়েছিল, তিনি পুনর্ব্বার আসবার জন্যে অভিলাষী।

ব্রজেন্দ্রবাবু[২] তাহলে ফিরেছেন। না ফিরলে হয়ত কোনো এক পক্ষের সেনাপতিত্বে[৩] তাঁকে পাকড়াও করত। কেন না যুদ্ধবিদ্যা বিস্তারিতভাবে তিনি যে জানেন না এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করা চাই। ইতি ২২ শ্রাবণ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ঝুনু হলেন সাহানা দেবী। ইনি দ্বিজেনবাবুর আত্মীয়া ছিলেন।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

৩. এই চিঠি লেখার ৩ দিন আগে ১৯শে শ্রাবণ ১৩২১, ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রজেনবাবু এর অনেক আগেই ইউরোপে গিয়েছিলেন।

২৯

হৈমন্তী
রামগড়
কুমায়ুন

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

হিমাচলের কোলে আছি ভাল। একটু বেশি পরিমাণে সুশীতল। আপনাদের মত দুচার জন বন্ধুবান্ধব থাকিলে সরগরম হইতে পারিত।

মুকুল আমাদের সঙ্গে আছে। তার একান্ত ইচ্ছা Ambulance দলে জুটিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে আমার সায় আছে। তাহার কারণ এইরূপ Adventureএর ভিতরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যদি ফিরিয়া আসে, তবে ও মানুষ হইয়া আসিবে। নহিলে ওর যেটুকু শক্তি আছে তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে। আমাদের দেশের লেখক ও আর্টিষ্টরা জীবন সমুদ্রের ঢেউ খায় না বলিয়া কেমন এক রকমের নির্জীব পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। য়ুরোপে সম্প্রতি যে

সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে ইহার মধ্যে আমাদের বহু সংখ্যক যুবকের এখনি চলিয়া যাওয়া উচিত। তাহা হইলে আমরা দেশের মধ্যে একদল মানুষ পাইব। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই অধ্যবসায়ে আমাদের যুবকদিগকে কেবল বাধাই দিয়া থাকি। একে ত তাহাদের নিজেরই মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সুবুদ্ধি আছে তাহার উপরে আবার আমাদের ঠাণ্ডা বুদ্ধি বাহির হইতে যোগ করিয়া কলিযুগের আর এক মনুসংহিতা রচনা করিতেছি। দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দেওয়া চাই—এইজন্য আমি কোনো যুবককে এই কাজে নিরস্ত করি না।

এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া মুকুলের জন্য কি করিতে হইবে, এই অভিযানের কি কি সর্ত্ত, কত দিনের মেয়াদ শীঘ্র জানাইবেন। মুকুলের বয়স ঊনিশ, অসম্ভবরূপে খাইতে পারে এবং তাহা আশ্চর্য্যরূপে হজম করিতেও পারে। ...ডাকের সময় যায় যায়—অতএব আজ এই পর্য্যন্ত।

কথাটা কাহাকেও বলিবেন না।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিটিতে চিঠি লেখার তারিখ নেই। আর যে খামের ভিতর চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, সেই খামটিও পাওয়া গেল না। পাওয়া গেলে খামের উপর ডাকঘরের স্ট্যাম্পের ছাপ দেখে তারিখটা অনুমান করা যেত। তবে চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, কবি রামগড় থেকে চিঠিটি লিখেছিলেন। কবির এই রামগড়ে অবস্থান প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ গ্রন্থে লিখেছেন—

‘খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া নৈনিতালের নিকট রামগড় নামক স্থানে এক সাহেবের ফলের বাগান ও বাড়ি রথীন্দ্রনাথ হঠাৎ কিনিয়া বসিলেন। ...রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা গ্রীষ্মকালে পিতা মাঝে মাঝে পাহাড়ে গিয়া বাস করেন।

...অচলায়তন অভিনয়ের পরদিন কবি কলিকাতায় যান এবং সেখান হইতে দুই-একদিনের মধ্যেই রামগড় যাত্রা করেন (মে ১৯১৪)। সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী। রথীন্দ্রনাথ তখন বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিবার পথে। বিদ্যালয় বন্ধ হইবার কয়েকদিন পূর্বে রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, নেপালী ছাত্র নরভূপরাও বদরিকাশ্রম দর্শনে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে ইঁহারা রামগড় হইয়া আসিলেন।...’ পৃঃ ৪৬৩

প্রভাতবাবু আরও লিখেছেন—কবি রামগড়ে কেনা ওই নতুন বাড়ির নাম দিয়েছিলেন ‘হৈমন্তী’।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে যে মুকুলের কথা আছে, তিনি হলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী—মুকুল দে। প্রভাতবাবু তাঁর গ্রন্থে কবির রামগড়ে অবস্থানের কথা লিখতে গিয়ে কোথাও এই ‘মুকুলের’ কথা উল্লেখ করেন নি। অথচ কবির চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, মুকুল তখন কবির কাছে রামগড়ে ছিলেন। অনুমান হয়, কবি পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় এই মুকুলও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

প্রভাতবাবু লিখেছেন—জুন মাসের মাঝামাঝি (১৯১৪) রবীন্দ্রনাথ সপরিজন রামগড় পাহাড় ত্যাগ করেন। —এখন বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪র মে অথবা জুন মাসে কোনো এক সময়ে দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল—৪ঠা অগস্ট ১৯১৪ থেকে ১১ই নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই যখন পরস্পর শত্রুতায় ও নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধিতে মগ্ন, সেই সময়ে ইংরাজ নিজেকে তৈরি রাখবার জন্য তার রাজ্য মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করছিল। ওই অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে মুকুলের যোগদানের আগ্রহ থাকায়, তখন এই নিয়েই রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

৩০

১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

সৃষ্টি যে ভাঙাগড়ার নৃত্য ভাঙনও যে সৃষ্টিরই অঙ্গ। আমার উপর দিয়ে কিছুকাল থেকে ভাঙার মার চলেছে বটে কিন্তু সে যে নতুনকে গড়ে তোলবার জন্যে সুতরাং এ মারকে মাথা পেতে নিতেই হবে। আমার জন্যে ভয় করবেন না।

আপনারা সব দল বেঁধে চলেছেন শুনে মনের মধ্যে পথের ডাক ডেকে উঠেছে—এক একবার মনে হচ্চে সব ফেলে দিয়ে আপনাদের সঙ্গে জুটে যাই—একবার পথের ধুলোয় রাঙা হয়ে ফিরে আসি। আবার ভাবচি, চুপ করে থাকি, দেখি ভিতরে কি কাণ্ডটা হচ্চে—গ্যাসগুলো জ্বলতে জ্বলতে কেমন করে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করে একবার দেখে নেওয়া যাক। তাছাড়া দেশ বিখ্যাত হবার মুস্কিল এই যে দেশের মধ্যে বেরবার জো নেই—অতএব আমার অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ পাণ্ডবদের মত কেবল এক বছরের নয়—এ চির জীবনের। আমাকে সঙ্গে নিলে আপনারাও আরাম পাবেন না—সমস্ত পথ কেবলি ভিড় ঠেলে চলতে হবে। এই সমস্ত চিন্তা করে শান্ত হয়ে বসে রইলুম। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক সুখের হোক। ইতি ৮ই আশ্বিন ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১
২৬ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আমার ছাত্র শ্রীমান হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারি শিখিবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু মেডিকাল কলেজে প্রবেশ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, এই জন্য আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি যদি কোনো সুযোগে ইহাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। ইতি ১২ই মাঘ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ শিলাইদা

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আমি যে একদিন হাটের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছি যে, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' সে কথাটা বুঝি কিছুতেই আপনারা কানে তুলবেন না? আপনি যাই বলুন আমি একটি অক্ষরও লিখতে পারব না—আমি এ কয়দিন ইস্কুল পালিয়েছি আমার Exercise books সমস্ত সহরে ফেলে এসেছি—আমি হিতসাধনে[১] মন দিতে পারব না। আমি ইস্কুল মাষ্টারকে ফাঁকি দেবই। সেদিন আমাকে মাচার উপরে দাঁড় করিয়ে দেবেন, ভাল মন্দ মুখ দিয়ে যা বেরয় তাই বলে খালাস হব—আমার বাক্য মানস সরোবর থেকে সাদা রাজহাঁসের মত আকাশে ছুটে চলবে—ছাপার কালীতে

কালো হয়ে দাঁড় কাকের মত ছাদের উপর দল বেঁধে পাড়ার কানে তালা ধরিয়ে দেবে না।

আপনাদের কার্য্যতালিকার মধ্যে আমাকে খুব একটুখানি ছোট স্থান দেবেন—কারণ আপনার ভালবাসার মধ্যে আমি যতটা জায়গা অধিকার করি না এ রকম সভামঞ্চে আমার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আপনার ডাক কোনো মতে এড়াতে পারলুম না বলেই ধরা দিলুম, কাজের ডাক আমার চিত্তে পৌঁছয় নি—কারণ, আমার মনিব আমার কাজ বরখাস্ত করে দিয়েছেন, এখন তাঁর খাষ মহলে তিনি আমাকে তলব করেছেন। একথা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু না করলে আমি নাচার।

ভেবেছিলুম রবিবার রাত্রে ছেড়ে সোমবার পৌঁছব কিন্তু.আমার ছুটির মেয়াদ থেকে দু-দুটো গোটা দিন আপনার সার্জ্জারির ছুরি চালিয়ে একেবারে গোড়া ঘেঁষে ছেঁটে ফেল্লেন? দয়ামায়া কিছুই নেই? জীবনে ছুটির দিন যে সব চেয়ে দুর্লভ। এ দিনগুলি যে আমার পক্ষে কি এবং কতখানি তা যদি বুঝতেন তাহলে এই ব্রাহ্মণকে আর কিছু দান না দিয়ে এই দিনগুলি দান করে অক্ষয় পুণ্যলাভ করতেন।

তাছাড়া বক্তৃতার সঙ্গে একটা কবিতা জুড়তে হবে এ আপনার কি রকম ফরমাস? এ বসন্তকালে কি এই রকমের ভয়ঙ্কর অসবর্ণ বিবাহ আপনারা ব্রাহ্মমতে পছন্দ করলেন? কিন্তু এ ঘটকের দ্বারা এমন অধর্ম্ম হবে না। আমার শক্তি নেই।

যে মানুষ সত্যই যা তাকে তাই বলে মেনে নিতে দোষ কি? যেখানে সে খাপ খায় না সেইখানে গোঁজামিল দিয়ে পৃথিবীতে যে কত অপকার্য্য হয়েছে তা কি একটা হিসেব রেখেছেন? আমাকে নিতান্তই একটা অপদার্থ কবি বলে স্বীকার করতে আপনার বাধা

হচ্ছে কিসের? চামেলি ফুলের ডাল দিয়ে কি রেলগাড়ির চাকা তৈরি হয়? যদি সময় পান তবে এইগুলো একটু চিন্তা করবেন—যদি সময় না পান এবং চিন্তা না করেন, তবে অন্তত আমি জাপানে চলে যাওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত কাজ মুলতবি রাখবেন।

যাই হোক বিদায় হে খোলা আকাশের কোলাকুলি, বিদায় হে বসন্ত বাতাসের সুগন্ধি চুম্বন, বিদায় হে নিভৃত পদ্মাতীরের কলমুখর চক্রবাক্ সভা—আমি যাব শনিবার দিন ছ'টার সময়, কলকাতার সভায় বক্তৃতা করব হাততালি নেব এবং তারপরে যা কপালে থাকে তা হবে। ভয় করবেন না—কবি বলে একেবারে নিতান্ত বেইমান নই—কথা দেব বলে আপনাকে কথা দিয়েছি, সেদিন কিছু কথা দিয়ে আসব[১] এটুকু স্থির, কিন্তু তার বেশি আর কিছু না। ইতি ২১ মাঘ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থ থেকে জানা যায়—

১২ মাঘ ১৩২১ (২৬ জানুয়ারি ১৯১৫) কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর আলোচনা সভা আহূত হয়েছিল। সভায় প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আলোচনার অবতারণা করেছিলেন।

পরে ১ ফাল্গুন (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্‌বোধন সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, সভায় রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তারই সারমর্ম 'কর্মযজ্ঞ' নামে পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। হিতসাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

৩৩

[১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬] শিলাইদা

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনারা দেশের উপকার করতে চান অথচ মানুষের প্রতি আপনাদের দয়ামায়া কিছুমাত্র নেই। আমার মরবার বয়স হয়েচে এখন আমাকে মারেন কেন—যমরাজের উপর বরাৎ দিলেই তাঁর কাজ তিনিই সুসম্পন্ন করবেন।

একটা জিনিস বার বার পরীক্ষা করে স্পষ্ট বুঝতে পেরেচি যে পাব্লিকের সামনে দাঁড়াবার মানুষ আমি নই। ওতে কেবল যে আমার মানসিক শক্তির অপব্যয় হয় তা নয় শারীরিক শক্তিরও। দশের কাজ যদি আমাকে করতে হয় সে দশের সংসর্গ বাঁচিয়ে। আমার আত্মরক্ষার একটি মাত্র উপায় আমি দেখতে পাচ্চি আপনাকে দূরে রক্ষা করা।

নিজের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিমান আছে তা মনে করবেন না, কিন্তু সে জন্যেই আমি বরাবর ঠকে এসেচি। এখন আর আমার বেশি সময় হাতে নেই এখন আর আমি নিজেকে মুঠো মুঠো করে ভিড়ের মধ্যে হরির লুঠ দিতে পারব না। এখন আমাকে একটুখানি পাশের দিকে নিরালায় সরে দাঁড়াতে হবে।

অতএব সভাপতি হবার মত[১] একে আমার সামর্থ্য নেই, তার উপরে আমার সাবধান হবার সময় হয়ে এসেচে। নিজের সীমানাটা এখন ঠিক করে নিয়ে তার মধ্যেই মাথা গুঁজে দিন কাটানোই হচ্চে এখন আমার পক্ষে সঙ্গত। আমি কোন রকম ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি কিছুতেই আর সইতে পারব না সুতরাং এখন আমাকে সভা বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। বারুণী স্নানের যোগে

এক একজন হতভাগ্য যেমন ভিড়ের ঠেলায় ডুব জলে গিয়ে মরে আমার সেই দশা হয়েচে। আমি অত্যন্ত সহজে নানা জনের চাপের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলুম, এখন দেখচি হাঁপিয়ে উঠেচি, যেমন করে পারি সরতে হবে।

সেই সরবার পণ যখন মনে আঁটচি ঠিক এমন সময়ে আপনার চিঠি পেয়ে ডরিয়ে উঠেচি—দোহাই আপনার, আমাকে ছুটি দিতেই হবে। আমাদের দেশে ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম হচ্চে এই যে, যে ব্যক্তি পড়ে গিয়েচে তাকে মারতে নেই। আমি পড়ে গিয়েছি। এখন সংসারের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আমাকে অন্য ক্ষেত্রে যেতে হবে।

হিতসাধনমণ্ডলীর যে কর্ত্তব্য তালিকা দিয়েছেন, সে আমি মনের সঙ্গে অনুমোদন করি। লেগে যান কাজে। যদি পরামর্শের প্রয়োজন হয় আমার কাছে গোপনে আস্‌বেন—সভার বাহিরে —যে ঋতুতে চুল পাকায় সে ঋতুর প্রধান ফসল হচ্চে পরামর্শ।

পদ্মার শুভ্রচরে বাস করচি। দেখ্‌চি এইখানেই আমাকে মানায় ভাল—একেবারে শাদায় শাদা। এখানে একদল হাঁস আছে—তারা নিজেরাই কলরব করে, আমাকে কোনোদিন কিছু বল্‌তে অনুরোধ করে না—সেই জন্যে তাদের সঙ্গে আমার বেশ বন্‌চে।

আজ শুক্ল পক্ষের চন্দ্রালোকে আকাশ উপচে পড়চে—এখন যদি কেরোসিন ল্যাম্পের হাতে ধরা দিই, তাহলে সেটা অত্যন্ত অবৈধ হবে অতএব এইখানে বিদায়। ইতি ২ ফাল্গুন

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সভ্যগণের এক সাধারণ সভায় রবীন্দ্রনাথ এই মণ্ডলীর অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন।

৩৪

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

টাকাটা[১] যাতে আপনার হাতে গিয়ে পড়ে সে জন্যে আজই গগনকে[২] চিঠি লিখে দিচ্ছি। বোধ হয় কোনো বাধা হবে না। তাঁরই হাতে ওটা জমে আছে—আপনিও একবার দরজায় ঠেলা মারবেন। কাল রাত্রে একটা চিঠি লিখেচি তাতে আমার কুশল সংবাদ বিস্তারিত পাবেন—আগামীতে আপনার কুশল জানিয়ে আমার চিন্তা দূর করবেন। ইতি ৩ ফাল্গুন ১৩২২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ বা বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর মুখপত্র ছিল—চলতি জগৎ। ১৯৭৭ এর ১লা মে তারিখের এই কাগজে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ' নামে একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

ছদ্মনামী লেখক দাঃ মুঃ তাঁর রচনার ভূমিকায় লেখেন—'১৯১৫ সালে বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের কথা ও রবীন্দ্রনাথের অবদান বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি। এই লেখার যাবতীয় উপাদান বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের পুরোনো নথি থেকে নেওয়া।'

এরপর লেখক তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—'১৯১৩ সালে বাঁকুড়ায় দামোদরের বন্যা হয়। ১৯১৪ সালের ভাদ্র মাসেই বর্ষা শেষ। ফসল ভাল হয় না। তাছাড়া ১৯১৫ সালে অনাবৃষ্টি। সব মিলে বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকা থেকেও একথা জানতে পারছি। সেখানে লেখা আছে—'বাঁকুড়া জেলায় লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬ শত ৭০। তন্মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়াছে।

১৯১৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বঙ্গবাণী পত্রিকা থেকে জানতে পারি, বাঁকুড়ার অনেক স্থানেই এখনও অন্নকষ্টের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল। বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ প্রভৃতি আর্তব্যক্তিগণের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার সেক্রেটারী ডাক্তার ডি. এন. মৈত্র বলিতেছেন—এ লীগ সপ্তাহে কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার আর্তব্যক্তিগণকে দান করিতেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে থাকার মানুষ নন। তিনিও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। বেঙ্গলী নামে একটি ইংরেজি কাগজ তখন বের হত। ঐ পত্রিকার ১৯১৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে অনেক কিছু জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালের ২৯শে ও ৩১শে জানুয়ারি 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করান। নিজেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। ২৯শে জানুয়ারি টিকিট বিক্রির আয় হয় ৬০০৮ টাকা। ৩১শে জানুয়ারি দুপুর বেলা নাটক অভিনয় হয়। ঐ দিন আয় হয় ১৯৪২ টাকা। এ ছাড়া তাঁরা 'ফাল্গুনী' নাটকের সংলাপও বিক্রি করেন। তার থেকে আয় হয় ২২২ টাকা। নাটক অভিনয়ের জন্য ১০৩০ টাকা খরচ হয়। এর যাবতীয় খরচা বহন করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৬ সালের ১৮ই মার্চ, ইংরাজি অমৃত বাজার পত্রিকায় ডাক্তার ডি. এন. মৈত্রকে কত দান করেন তার হিসাব একটি চিঠি মারফৎ দেন। তা থেকে জানতে পারি 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ ৭০০০ টাকা বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগকে দান করেন।'

২. গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ [সুরুল শ্রীনিকেতন]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনি বিষম ব্যস্ত আছেন জানি তবু একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার এই চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে নেবেন।

আগামী বৃহস্পতিবারে বারাকপুরে ভাইসরয়ের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সে নিমন্ত্রণে আমি যেতুম কারণ, লর্ড হার্ডিঞ্জের পরে আমার ভক্তি আছে।[১]

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার স্কন্ধে কবিতা ভর করেছেন। আমার আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই ধরেছে বসন্ত উৎসবের উপযোগী একটি ছোট নাটক রচনা করে দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছি এবং সুরুলের নির্জ্জন ঘরে লিখ্‌তে বসে গেছি।[২] গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন্ গুন্ করতে লেগে গেছে। ইতিমধ্যে বুধবারে যদি এখান থেকে বেরতে হয় এবং তার পরে আপনার রবিবার সারতে হয়, তাহলে আমার রসের যজ্ঞ ভঙ্গ হবে। আমার লেখাটার গোটা চার পাঁচ কটি ডাল বেরতেই তাকে একেবারে ছাগলে খাওয়ার মত দশা করবে। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হতে পারে কিন্তু কবির পক্ষে সেটা উপাদেয় নয়।

ভাইসরয়কে লিখে দিলুম আমি এখানকার কাজে আছি অতএব দুঃখের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার দুদিন পরেই কলকাতায় বক্তৃতা দিতে গেলে আর কিছু না হোক্ বেজায় রকম রূঢ়তা হবে।

অতএব আস্‌চে রবিবারে রবিকে বাদ দিতে হবে। লাফিয়ে উঠ্‌বেন না। কথাটা বুঝে দেখুন। আপনার এই কন্‌ফারেন্স একদিনে শেষ করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে সময়ও পাবেন না, সকল

কথা হজম করবারও উপায় থাক্‌বে না। তা ছাড়া এক সভায় সকল শ্রোতাকে ধরবে না।

সভাপতি একই থাক্‌বেন কিন্তু পালা অন্তত দুটো হোক্। প্রথম দিনের পালা সাঙ্গ করে সভাপতি আগামী সভার স্থান কাল বিষয় ও বক্তার তালিকার বিজ্ঞাপন দেবেন।

হিতকর্ম্মের তালিকা ত ছোট নয় এবং তার সাধনোপায়ও দীর্ঘ—যদি চায়ের টেবিলে খবরের কাগজ পড়বার মত করে সব কথাগুলোকে লঘুভাবে তাড়াহুড়ো করে সেরে দেন, তাহলে কোনো কাজই হবে না। অতএব যাঁরা কিছু কাজের কথা বল্‌বেন, তাঁদের বলবার ভাল রকম সময় দেবেন। তিনটে সভায় যদি না বলাতে পারেন, অন্তত দুটো সভায় বলাবেন।

এই আমার পরামর্শ। যদি গ্রাহ্য না হয় অর্থাৎ যদি নানা কারণে অসাধ্য হয়, তাহলে আমাকে এবারকার মত বর্জ্জন করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ, একদিকে আমাকে সরস্বতী তাগিদ করচেন, তার উপরে রাজলক্ষ্মীও পেয়াদা পাঠিয়েছেন—তার উপরে আবার ভারতলক্ষ্মীও যদি দরজা ঠেলাঠেলি করেন, তাহলে আমার আর আশা নেই। অতএব তিনটির মধ্যে প্রথমটিকেই মান্‌তে হচ্ছে—তাঁকে এড়ানো আমার পক্ষে সোজা নয়। তাঁর পদ্মাসনটি আমার হৃদয়ের মধ্য থেকে উঠে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে শতদল বিস্তার করে বসেছে। অতএব রইল বারাকপুর, রইল আপনার সভা। কবির অবস্থা এখন এমনতর যে ডাক্তারের আয়ত্তের বাইরে।

ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন—লর্ড হার্ডিঞ্জের পরে আমার ভক্তি আছে, তার কারণটা এই—

ভারতে অবস্থিত ইংরাজ রাজকর্মচারীদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য এন্ড্রুজ ১৯১৩ সালের ২৬শে মে সিমলায় এক সভা করেছিলেন। সেই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। সভায় এন্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সভাপতি লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই সভায় রবীন্দ্রনাথকে 'দি পোয়েট লরিয়েট অফ্ এশিয়া' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

এ কথা স্মরণযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল প্রাইজ পান নি। তিনি নোবেল প্রাইজ পান আরও কয়েক মাস পরে নভেম্বরে।

১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের এক বিশেষ অধিবেশনে লাটভবনে রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে ওই উপাধি দিতে গিয়েও সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজধানী দিল্লি থেকে এবার বাংলা সফরে এসে বারাকপুরে লাটবাগানে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ করার এই যে, সেকালে কারও পক্ষেই সুস্থ শরীরে কোনো অজুহাত দেখিয়ে বড়োলাটের আহ্বানকে উপেক্ষা করা এক অকল্পনীয় কাজ ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

২. কবির 'বসন্তোৎসব' নাটক রচনা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—'কবি এবার শান্তিনিকেতনে না থাকিয়া সুরুলের নূতন বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। বোধ হয়, আশ্রমের নানা প্রকার উত্তেজনা তাঁহার ভালো লাগিতেছে না। ...রচনা শেষ হয় ৪ মার্চ [১৯১৫]। পরদিন আশ্রমবাসীদের নিকট পড়িয়া শুনাইলেন। উহা তখন 'বসন্তোৎসব' নামেই পঠিত হয়।' —৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫০৩-৪

পরে কবি এই নাটকের নাম পরিবর্তন করে করেছিলেন—'ফাল্গুনী'।

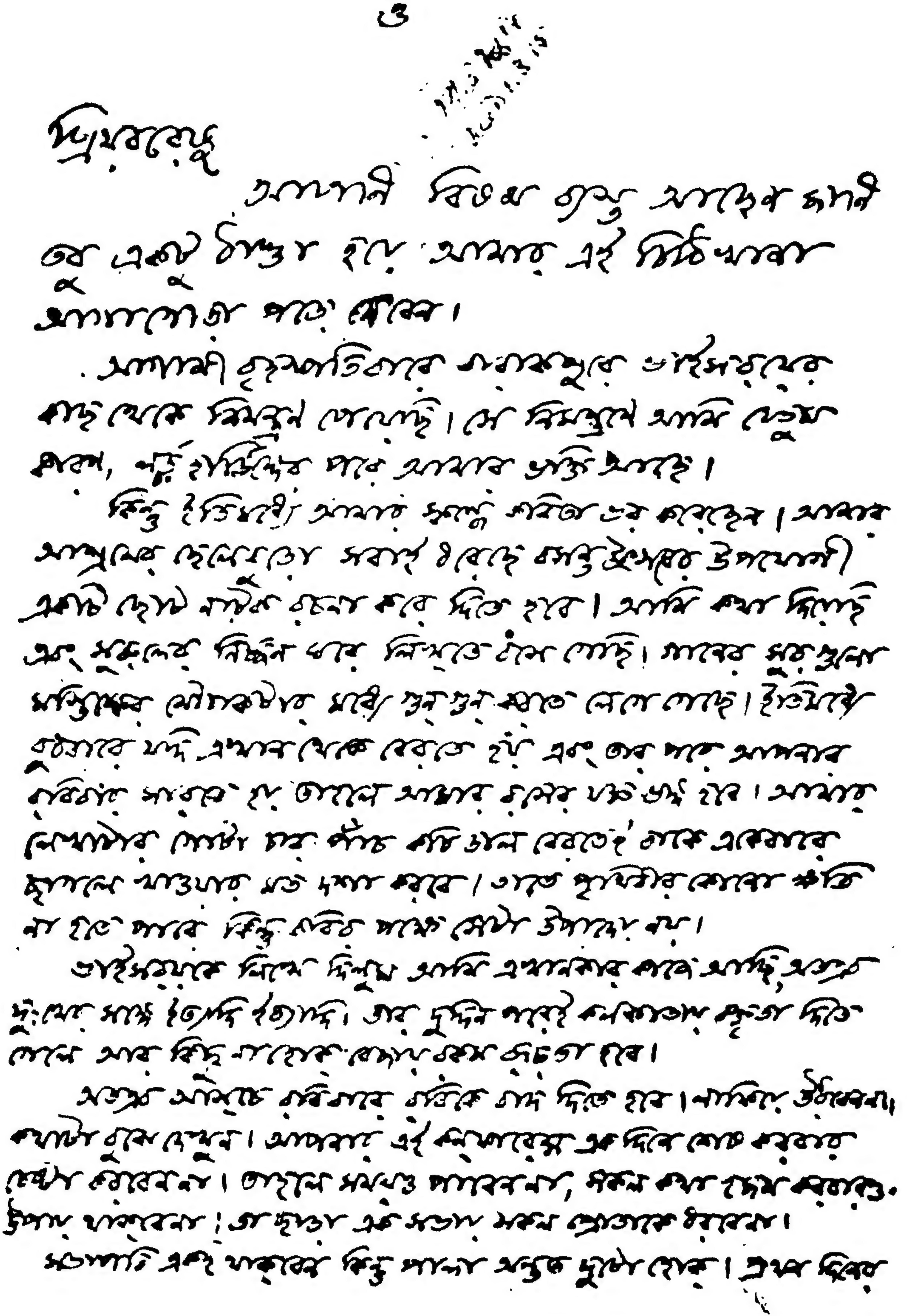

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] ওর একটু [illegible] হবে আমার এই চিঠিখানা আপনাদের সভাতে পৌঁছবে।

আগামী ক্রিসমাসতিথির বারাকপুরে ভাইসরয়ের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সে নিমন্ত্রণে আমি যেতুম কেননা, লর্ড হার্ডিঞ্জের পরে আমার ভক্তি আছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছেন। আমার আশ্রমের ছেলেদের সবাই ধরেছে বসন্ত উৎসবের উপযোগী একটি ছোট নাটক রচনা করে দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছি এবং সুরুলের নির্জন ঘরে লিখতে বসে গেছি। গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন্ গুন্ করতে লেগে গেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ যদি এখান থেকে বেরোতে হয় এবং তার পরে আবার নিমন্ত্রণ সারতে হয় তাহলে আমার রসের ঘট ভঙ্গ হবে। আমার লেখাটার পেটে চার পাঁচ টি ডিম বেরোতেই তাকে একেবারে [illegible] খাওয়ার মত দশা করবে। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হতে পারে কিন্তু নিজের পক্ষে সেটা উপাদেয় নয়।

ভাইসরয়কে লিখে দিলুম আমি এখানকার কাজে আছি, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার দুদিন পরেই কলকাতায় বক্তৃতা দিতে গেলে আর কিছু না হোক বেয়াদবি রকম দেখতে হবে।

অতএব আসছে রবিবারে আমাকে ছাড় দিতে হবে। [illegible] কথাটা বুঝে দেখুন। আপনারা এই লেকচারগুলো এক দিনে শেষ করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে সময়ও পাবেন না, সকল কথা ঠেসে দেবারও উপায় থাকবে না। তা ছাড়া এক সভায় সকল শ্রোতাকে টানবেন না।

সভাপতি একই থাকবেন কিন্তু পালা অনুসারে ছুটি হোক। প্রথম দিকের

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রথমাংশের প্রতিলিপি

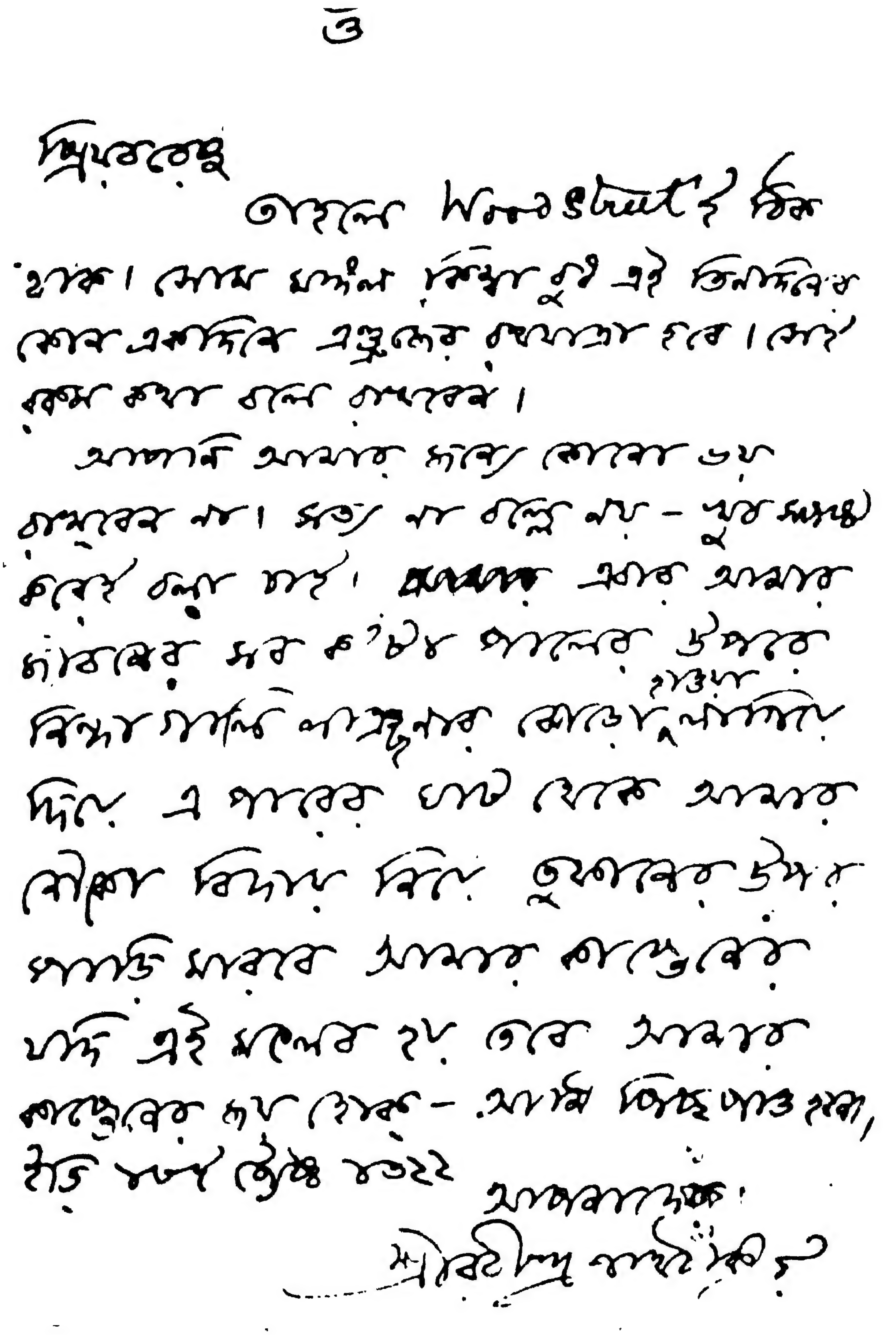

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তাহলে Wood Street-ই ঠিক থাক। সোম মঙ্গল কিম্বা বুধ এই তিনদিনের কোন একদিনে এণ্ড্রুজের অভ্যর্থনা হবে। সেই রকম কথা বলে রাখবেন।

আপনি আমার জন্যে কোনো ভয় রাখবেন না। সত্য না বল্লে নয় — খুব স্পষ্ট করেই বলা চাই। এবার আমার ভাবনার সব ক'টার পালের উপরে নিন্দা গালি লাঞ্ছনার ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে এ পারের ঘাট থেকে আমার নৌকো বিদায় দিলে। তুফানের উপর পাড়ি দেবার আমার কাপ্তেনের যদি এই মতলব হয় তবে আমার কাপ্তেনের জয় হোক — আমি নিশ্চিন্ত হলুম,

ইতি ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

আশীর্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি

৩৬
১ জুন ১৯১৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তাহলে Wood Streetই ঠিক থাক। সোম মঙ্গল কিম্বা বুধ এই তিনদিনের কোন একদিনে এণ্ড্রুজের রথযাত্রা হবে। সেই রকম কথা বলে রাখবেন।[1]

আপনি আমার জন্যে কোনো ভয় রাখ্‌বেন না। সত্য না বল্লে নয়—খুব স্পষ্ট করেই বলা চাই। এবার আমার জীবনের সব ক'টা পালের উপরে নিন্দা গালি লাঞ্ছনার ঝোড়ো হাওয়া[2] লাগিয়ে দিয়ে এ পারের ঘাট থেকে আমার নৌকো বিদায় নিয়ে তুফানের উপর পাড়ি মারবে আমার কাপ্তেনের যদি এই মৎলব হয় তবে আমার কাপ্তেনের জয় হোক্—আমি পিছ পাও হব না। ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৩২২ সালে গ্রীষ্মের ছুটির সময় এণ্ড্রুজ সাহেব সেবার শান্তিনিকেতনে এসে সেই রাত্রেই কলেরায় আক্রান্ত হন। তাঁর এই কলেরা রোগ সম্বন্ধে দ্বিজেনবাবু তাঁর 'রবীন্দ্র সংসর্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'দারুণ গ্রীষ্ম। শান্তিনিকেতনে তখন ছুটি। সকলে চলে গেছেন। কবি আছেন একলা, আর আছেন মিঃ এণ্ড্রুজ কলেরায় আক্রান্ত। বোলপুর যেতে রেলপথে পিপাসা নিবৃত্তি করতে গিয়ে, কাটা তরমুজ খাওয়াতেই নাকি কলেরার বীজ প্রবেশ করে।

তখনো আমি মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন। কবি আমাকে তার করলেন—এণ্ড্রুজ সাহেবের চিকিৎসার জন্যে। ...কবি নিজেই তাঁর

হোমিওপ্যাথিক বিদ্যাব চিকিৎসা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। শিউড়ির সিভিল সার্জন একবার এসেছিলেন মাত্র। যাই হোক্, গিয়ে দেখি রোগের বাঁক ফিরেছে, ভয় প্রায় কেটেছে। আমাকে বিশেষ আর কিছু করতে হল না।'

এরপর এন্ড্রুজ কলকাতায় উড স্ট্রিটের এক নার্সিং হোমে এসে ভর্তি হন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই দ্বিজেনবাবু এই নার্সিং হোম ঠিক করেন।

এন্ড্রুজ নার্সিং হোমে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ সেখানেও মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেতেন। এ সম্বন্ধে এন্ড্রুজ নিজেই লিখে গেছেন—'উড স্ট্রীটের খালি ঘরখানিতে যে আপনি আমায় দেখতে আসতেন... সে-সব দিনের স্মৃতিও অমূল্য সম্পদের মতো আমার মনের গভীরে সঞ্চিত আছে।'
— রবীন্দ্রনাথ-এন্ড্রুজ পত্রাবলী।

২. বঙ্গবাসী, নায়ক, বসুমতী ও সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে লেখা প্রকাশিত তো হোতই, তার উপর ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ (তখনও দেশবন্ধু হননি) 'নারায়ণ' পত্রিকা বার করলে তাতেও রবীন্দ্র-আক্রমণ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের উপর চিত্তরঞ্জনের তখনকার এই বিরূপ মনোভাবের কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—'চিত্তরঞ্জন বাংলাসাহিত্যে আপনার স্থান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। গত জ্যৈষ্ঠ (১৩২১) মাসে তিনি 'সাগরসংগীত' নামে এক কাব্যখণ্ড প্রকাশ করেন। বহু সহস্র অর্থ ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হয়, বাংলা ভাষায় এমন রূপ-বাহুল্যে কোনো গ্রন্থ বোধহয় ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, অরবিন্দ ঘোষের দ্বারা তাহার সুললিত অনুবাদ করাইলেন। 'সাগরসংগীত' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ ওই কাব্য সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। যে গ্রন্থ তাঁহার ভাল লাগিত না, সে সম্বন্ধে তিনি মৌনী থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের বিরূপতার উহা অন্যতম কারণ কি না জানি না।'

রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা সবুজপত্রে 'স্ত্রীর পত্র' নামে একটা গল্প লিখেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল সেই গল্পের জন্য রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে নারায়ণের প্রথম সংখ্যাতেই 'মৃণালের কথা' লেখেন। সেই রচনার প্রথমটা এইরূপ—

'ভগিনীর পত্র

মেজদাদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম। লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের নয়। তুমি রাগ কোরো না, তার বিদ্যে কত আমরা তো জানি। দেখছো নাকি, যে-সব গ্রন্থের কথা গেঁথে গেঁথে মেজ বউ এই চিঠিটা সাজিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজ বউর লেখা কিনা। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে তো তুমি বেশ জান। শুনছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠছে। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে আর কবিদের মতন বাবরি চুল রেখেছে। শুনছি রবি ঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। সেই হয়তো এই চিঠিটা লিখে দিয়েছে। লেখার খুব বাহাদুরি আছে। উনি পড়ে বল্লেন যে ঠিক যেন রবি ঠাকুরেরই মতন। তুমি কি জান? মেজ বউই আমায় লিখেছিল যে 'সঞ্জীবনী'তে স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা নাকি এই ছোঁড়াটারই লেখা। স্নেহলতার নাম জাল করে ছাপিয়েছেন। আমাদেরও পড়েই তাই মনে হয়েছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকার নাম মৃণাল এবং সে বাড়ির মেজ বউও। বিপিনচন্দ্র তাঁর রচনার নাম 'মৃণালের কথা' দিয়ে, তাতে মৃণালের চিঠির কথা নিয়েই লিখেছেন এবং তিনি তাঁর রচনায় মৃণালকে মেজ বউ হিসাবেও দেখিয়েছেন।

বিপিনচন্দ্র তাঁর 'মৃণালের কথা'য় যে স্নেহলতার উল্লেখ করেছেন, সে সময় স্নেহলতার আত্মহত্যা নিয়ে দেশে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র স্নেহলতাকে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা বলে লিখলেও, সুদূর ব্রহ্মদেশে বসে শরৎচন্দ্র কিন্তু স্নেহলতাকে শিক্ষিতা মনে করেই তখন তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন—'সেদিন স্নেহলতার আত্মবিসর্জনের কাহিনী সংবাদপত্রে পড়িয়াই মনে হইয়াছিল, ঠিক এমনি করুণ, এমনি স্বার্থত্যাগের চিত্র কিছুদিন পূর্বে গল্প সাহিত্যে পড়িয়াছিলাম। সে মেয়েটিও দরিদ্র পিতাকে দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। তাহারও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতেছিল

এবং পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না।' —মাতৃভাষা ও সাহিত্য—যমুনা, আষাঢ় ১৩২১।

বিপিনচন্দ্র পালের ন্যায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও তখন বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। ১২২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'সাহিত্য'য় রাধাকমলের 'সাহিত্য ও স্বদেশ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, পরের মাসে 'সবুজ পত্রে' রবীন্দ্রনাথ 'কবির কৈফিয়ৎ' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এর আগে ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, ওই সবুজ পত্রেই পরের মাঘ মাসে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামে প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতিবাদ করেছিলেন। সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ওই মাঘ সংখ্যাতেই 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' নামে তাঁর এক রচনায় রাধাকমলবাবুর লেখার উত্তর দিয়েছিলেন।

৩৭

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ শিলাইদা

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বিপদের কারণ। আমি বৃদ্ধ। আপনাদের সভা তরুণী, এ সভার পতিত্ব পদ গ্রহণের কাল আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো তাজা আছে এমন কোনো লোককে পাকড়াও করবেন।

তা ছাড়া, আমি সংসারে কেবল একজন কবি মাত্র, নিজের এই চৌহদ্দিটুকু সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে তারই মধ্যে শেষ কয়টা দিন কাটাতে চাই। আমার দ্বারা দেশের কাজ আদায়ের আশা একেবারে ছেড়ে দেবেন। আমি দূরে থাকলে দেশও আরামে থাক্‌বে, আমিও।

আমাকে স্থায়ী সভাপতি করতে চান। কিন্তু স্থায়িত্বের শেষ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েচি। যে জমি পদ্মার ভাঙনের মুখে তাকে

মৌরসী করে নিয়ে লাভ কি? আপনাদের সভার আশু বৈধব্য বাঁচিয়ে চলবেন।

বিচিত্রাকে খুব বেশি Seriously নেবেন না। ওটাকে কোনো রাজকীয় চতুর্দ্দোলার মত দশের ঘাড়ে চাপাব না। নিজেরা কোণে বসে যদি ওটাকে গড়ে তুলতে পারি ভালই, না পারি ত পড়ে থাক্‌বে, বিসর্জ্জনেরও খরচ লাগবে না। যখন বোলপুর বিদ্যালয় সৃষ্টি করেছিলুম একলাই করেছিলুম, এখনো প্রায় একলাই চালাচ্চি। বিচিত্রার জন্মোৎসবে বাহির থেকে দু চার জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম, দেখা গেল সেটা তাঁদের প্রতিও জুলুম, বিচিত্রার প্রতিও বিশেষ আনুকূল্য নয়। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল নাম নেবার যোগ্যতা লাভ করি নি, কিন্তু আমরা খাপছাড়ার দল। অতএব খাপের বাইরে যদি নিজের চেষ্টায় আশ্রয় জোটাতে পারি ত তবেই টিক্‌লুম, না পারি ত অন্তত আর কারো কোনো ক্ষতি করব না। 'এক্‌লা চল, এক্‌লা চল, এক্‌লা চলরে।'

এই শিলাইদহের ছাদের উপরকার ঘরে বসে এই একটি সঙ্কল্প মনের মধ্যে পাকা করে নিতে চেষ্টা করচি—সেটি হচ্চে এই, যিনি অযাচিত দিয়ে এসেচেন, তাঁরই পায়ের তলায় জোড়হাতে বসে থাক্‌ব—অঞ্জলির উপরে প্রসাদ যা এসে পড়বে সেইটিকেই সংসারের মধ্যে সত্য দান বলে মাথায় করে নেব—কারো উপর দাবী করব না। কারণ তা করতে গেলেই দানের মূল্যকে দাবীর পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করে দানের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে—সেইটেই অপরাধ, সুতরাং সেইখানেই দুঃখ।

ওরে ভীরু, তোমার পরে নাই ভুবনের ভার
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।

আজ রাত্রের গাড়িতে পিয়ার্সন[২] আস্‌বেন। তাঁকে নিয়ে বোটে করে ভেসে পড়ব। যদি পারি তাঁকে আমাদের পতিসরটা[৩] দেখিয়ে আনব।

রথী[৪] আজ কলকাতায় ফিরে গেলেন। গগনকে লিখেছি, আপনাদের হাতেই ফাল্গুনীর সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিতে। কোনো বাধা হবে বলে আশঙ্কা করি নে। রথীর সঙ্গে দেখা করে ঠিক করে নেবেন। যদি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন দলের হাতে দিলেই উপকার হয় তবে সে আপনারাই দেবেন। নিরন্নের পেটে অন্ন পৌঁছলেই টাকাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছবে—কোন্‌ নামধারী সম্প্রদায়ের হাত দিয়ে পৌঁচচ্চে সেটা কিছুই নয়। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩২২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. বিচিত্রা—জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথদের বাড়িতে স্থাপিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিলন কেন্দ্র।

২. পিয়ার্সন—উইলিয়ম উইনস্টন পিয়ার্সন ইংলন্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে ভবানীপুরে লন্ডন মিশন সোসাইটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ভাল বাংলা শিখেছিলেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজে যোগদান করেছিলেন।

৩. পতিসরটা—নদীয়া জেলার শিলাইদহের মতো রাজসাহী জেলার পতিসরেও ছিল রবীন্দ্রনাথদের জমিদারি।

৪. রথী—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৮
২৪ মার্চ ১৯১৬

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার রিপোর্টে আমার নাম আর যে-কোনো আকারে ও উপলক্ষ্যে ব্যবহার করুন পল্লির কাজটাকে বাদ দিবেন। আমার কাজকে আমি কোনোমতেই প্রচার করিতে চাই না—কারণ আমি পাব্লিকের কাছে সাহায্য চাইনা, খ্যাতিও চাই না, সুতরাং নিন্দাও না।

আমার কাজ আমার গোপন কাজ—এ কাজ যাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছি তিনিই তাহার রিপোর্ট গ্রহণ করিবেন। এই পল্লির কথা আপনি রিপোর্টে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

মিস দত্তও এখন পল্লির কাজে নাই। তিনি ত অগত্যা বিদ্যালয়ে পড়াইতেছেন সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে রিপোর্টের উক্তিটি খাপ খাইতেছে না।

আর কিছু বলিবার নাই। মোট কথাটা, যে কাজ আমার জীবনের সাধনা তাহাকে বাহিরের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ধরা আমার সাধনার প্রতিকূল—তাহাতে কাজেরও ক্ষতি হয়—নিজেরও। এইজন্যেই, আপনি বিরক্ত হইবেন জানিয়াও এই বিষয়ে আপনাকে সম্মতি দিতে পারিলাম না—কারণ বিষয়টি আমার পক্ষে বিশেষ গুরুতর। ইতি ১১ই চৈত্র ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিটি লেখার তারিখ ১৩২২ সালের ১১ই চৈত্র অর্থাৎ ১৯১৬-র ২৪শে মার্চ। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে পল্লীর কাজটাকে বাদ দিতে বললেও

তিনি এর এক বছর আগেই ১৯১৫র ২৮শে মার্চ হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় 'পল্লীর উন্নতি' নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে যাই বলুন, তিনি হিতসাধনমণ্ডলীর সহ-সভাপতি হয়েছিলেন এবং পরে ১৯২৪–৩০ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিও ছিলেন।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্‌বোধন সভা হয় ১৩২১ সালের ১লা ফাল্গুন। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বক্তা হিসাবে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম 'কর্মযজ্ঞ' নামে ১৩২১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হিতসাধন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের পর ওই ফাল্গুন মাসেরই শেষ দিকে হিতসাধনমণ্ডলীর আর এক সভা আহ্বান করেন এবং তাতে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ জানান। রবীন্দ্রনাথ ওই দিনের সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানালে দ্বিজেনবাবু সভার তারিখ বদলে চৈত্রের মাঝামাঝি, ২৮শে মার্চ করেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ওই দিনের সভায় এসেছিলেন এবং এসে যে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটা ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় 'পল্লীর উন্নতি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩৯

[১৯.৩.১৭]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বুঝতেই পারচেন কিং রকম ব্যাপার চল্‌চে। আলাপ আলোচনা আন্দোলনের আদি অন্ত নেই। এই প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে চুপ্‌চাপ করে বসে জগৎটাই বা কি জীবনটাই বা কেন ইত্যাদি

তত্ত্ব কথা চিন্তা করবার অবকাশ পাওয়া যাবে।

আপনি তাহলে আমার দরবারটা ভোলেন নি। আমি কালই বেন্ট্‌লি সাহেবকে[১] নিমন্ত্রণ করে পাঠাব। আপনারও সঙ্গে আসা চাই।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। দেখা হলে মোকাবিলায় কথাবার্ত্তা হবে।
ইতি সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] বেন্টলি সাহেব ছিলেন সেকালের বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা। তিনি ম্যালেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার মশক নিবারণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

৪০

[২১.৩.১৭] শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে অতিথিদের আশ্রয় দেবার মত আসবাবগুলি অধিকাংশই অন্তর্ধান করেছে। সেইজন্যে বেন্ট্‌লি সাহেবকে এখন হঠাৎ ডাকতে পারলুম না। শীঘ্র কিছু আসবাব সংগ্রহের চেষ্টায় রইলেম। আগামী কবে নাগাদ তাঁকে আনবার সুবিধা হবে আমাকে জানাবেন। ইতিমধ্যে আপনি যদি week endএ এক আধদিনের জন্যেও আসতে পারেন তাহলে সরেজমিনে ও মোকাবিলায় অনেক কথার আলোচনা হতে পারবে।

ক্ষুধিত চকোরের মত অপেক্ষা করে রইলুম—আর একটু হলেই "চাতকের মত" লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আপনার মুখশ্রী স্মরণ করে সংশোধন করে নিলুম। ইতি তারিখ জানিনে।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১
২৪ ডিসেম্বর ১৯১৭

ওঁ

প্রিয়বরেষু

'তোমার হল সুরু
আমার হল সারা।'

আপনি উদয়াচলে, আমি অস্তাচলে। আপনি কাজের মুখে আমি বিশ্রামের মুখে। তাই মিলনে কঠিন।

এখানে Dr. Harish Chandra নামক পশ্চিমের যুবক এসেছিলেন। Berlin University তে পড়ে ডিগ্রী নিয়ে ডেরাডুনে Laboratory খুলে খুব কসে কাজ করচেন। একটা Infant's artificial food বানিয়েচেন, সেটা যদি ভাল বোধ করেন ত বটকৃষ্ণকে বলে দিয়ে একটা সদ্গতি করে দেবেন। ইনি Starch থেকে চিনি করবার একটা method আবিষ্কার করেচেন, একজন খুব বড় ধনী তারই কারবার খুলতে প্রবৃত্ত। সুতরাং এর ভবিষ্যৎটা সোনার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। দেখতে শুনতে লোকটি ভালই। শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে চান। আপনাদের হিতসাধনমণ্ডলী ঘটকালি করেন কিনা জানিনে। কিন্তু কাজটা হিতবুদ্ধি থেকে করা যেতেও পারে—অন্তত কন্যার বাপের। তারপরে ভিন্ন প্রদেশের মিলন

সাধনও দেশহিতৈষীদের কাজ। অতএব একটু চিন্তা করে দেখবেন। আমার ঘরে একটি নাৎনী আছে, কিন্তু আমি শিশু বিবাহের বিরোধী তাই সেদিকে চেষ্টা করলুম না। আপনার পরিচিতাদের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে দেখবেন। ক্লান্ত আছি বলে কলকাতায় গেলুম না। ইতি ৯ই পৌষ ১৩২৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২
১ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

বন্ধুবরেষু

আমি নির্ব্বাসনের আনন্দে আছি—ইস্কুল মাস্টারি করচি, যদি কখনো এ অঞ্চলে আসেন ত দেখা পাবেন।

অন্নদা মজুমদার আমার এখানকার ছাত্র। তার lungs পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়েচে। দয়া করে একবার পরীক্ষা করে তার অভিভাবককে যথোচিত পরামর্শ দিবেন। ইতি ১৪ই আশ্বিন ১৩২৫

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩
১৪ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

সেই শান্তিনিকেতন প্যারাগ্রাফগুলি দীর্ঘকাল আপনার কাছে আছে। সেই কাপিটিতে আমার প্রয়োজন ঘটেচে। অতএব এক

কাজ করবেন—রথী কলকাতায় আছে, তার কাছে দেবেন। সে আসবার সময় নিয়ে আসবে অথবা যদি রেজেস্ট্রি ডাকে সোজা এইখানে পাঠিয়ে দেন তাহলে ভালই হয়।

আপনি বোধ হয় পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত আছেন। আমিও যে নিতান্ত কুঁড়েমি করে দিন কাটাচ্চি তা নয়—যদিও বিদ্যালয় বন্ধ আছে তবু কাজ চল্‌চে। ইতি ২৮শে কার্ত্তিক ১৩২৫

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪
২৯ ডিসেম্বর ১৯১৮

ওঁ

প্রিয়বরেষু

অজিতের[১] অবস্থার কথা শুনে মন বড় উদ্বিগ্ন হল। বুঝতে পারচি কোনও আশা নেই এবং এতক্ষণে হয়ত জীবন অবসান হয়ে গেছে। অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল—ও যদি চলে যায় ত একটা ফাঁক রেখে যাবে। আমার ঘরেও বিপদ খুব নিকটে এসেছিল। বৌমা[২] ন্যূমোনিয়ায় পড়েছিলেন—এক রাত্রি একদিন শ্বাসকষ্ট এমন হয়েছিল যে, ভেবেছিলুম রক্ষা বুঝি পাবেন না। আমার এখানে ডাক্তারের মধ্যে আমি এবং ক্ষিতিমোহনবাবু। Phosph দিয়ে ব্যামোটাকে ঠেকানো গেল—এদিকে সুহৃদ[৩] এসে পড়ল। কিন্তু তার ওষুধ ব্যবহার করতে হয়নি—কাল খুব একটা পেটের অসুখের উপসর্গ এর সঙ্গে দেখা দিয়েছিল, সেটা

Podophylhm সেরে গেছে। এখনো শ্বাসের ক্লেশ আছে, কিন্তু মন্দ লক্ষণ সব গেছে—জ্বরের তাপও যথেষ্ট কমেচে। সুহৃদ এখনো আছে, কলকাতা থেকে একজন Nurse আনাতে হয়েছে। এখানকার অন্য মেয়েরাও সকলেই প্রায় শয্যাগত হেমলতা বৌমা[৪], সুকেশী বৌমা[৫], Miss Terring[৬]। ইনফ্লুয়েঞ্জা কিন্তু সে তার ব্রহ্মাস্ত্র মারেনি। ছাত্ররা সৌভাগ্যক্রমে সকলেই ভাল আছে—তাদের সকলকেই রোজ পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাওয়াই—আমার বিশ্বাস সেই জন্য তাদের মধ্যে একটি Case-ও হয়নি, অথচ তারা অধিকাংশই সংক্রামকের কেন্দ্র থেকে এবং রোগগ্রস্ত পরিবার থেকে এসেচে। যা হোক্ অজিতের ফাঁড়াটা যদি কেটে যায় তাহলে বড় আনন্দিত হব। আপনার বাড়ির সব ভাল খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। ইতি
১৪ই পৌষ ১৩২৫

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে দিন এই চিঠি লেখেন, সেই দিনই (১৪ই পৌষ ১৩২৫) মাত্র ৩২ বছর বয়সে কলকাতায় মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জায় অজিতকুমারের মৃত্যু হয়।

২. বৌমা—প্রতিমা ঠাকুর।

৩. সুহৃদ—আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার সুহৃদ চৌধুরী।

৪. হেমলতা বৌমা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী।

৫. সুকেশী বৌমা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী। সেই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে ইনি মারা যান।

৬. Miss Terring—শান্তিনিকেতনে আগতা বিদেশিনী।

৪৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কলকাতায় এসেছি। একবার অবিলম্বে দেখা হওয়া নিতান্ত দরকার। রথী আমার রথসমেত রাঁচি গেছে, নইলে নিজেই যেতুম। আগামীকাল শুক্রবারে সায়াহ্নে দুইজন পাঞ্জাবি গাইয়ে গান গাইতে আসবে। যদি আসেন গানও শুনবেন, গল্পও হবে, তর্কও হতে পারবে এবং একটা মীমাংসা হওয়াও হয়ত অসম্ভব হবে না। ইতি বৃহস্পতিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আজ ভাবিয়া ছিলাম একবার দেখা করিয়া আসিব কিন্তু আজ এক সভা আছে সেখানে বক্তৃতা করিতে হইবে—হয়ত কিছু ঝগড়াঝাঁটিও চলিবে—তাই শক্তিটাকে জমাইয়া রাখিতে চাই। অথচ আপনার সঙ্গে দেখা না করিলে নয়। একবার রাত্রি ৮টার পর ১০টার মধ্যে দেখা হওয়া কি অসম্ভব হইবে? ইতি শনিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

[১৪ ? অগস্ট, ১৯১৭]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ সকালে অর্থাৎ এখনি আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথাকৈবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষকালে চিঠির আশ্রয় নিচ্চি।

ক'দিন থেকে ভিতরে ভিতরে বোধ করছিলুম শরীরটা ভেঙে পড়ল বলে। কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করছিল না। আর ক্লান্তিতে যেন মাটির দিকে টানছিল। আজ সকালবেলা সেই ক্লান্তির সঙ্গে মাথাঘোরা দেখা দিয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে সেটা সেরে গেছে কিন্তু মস্তিষ্কের ভিতরে কেমন যেন কুয়াশার মত এখনো ঘোর-ঘোর করে আছে। বুঝেচি না-পালালে আমার নিষ্কৃতি নেই। কালই আমি বোলপুরে যাচ্ছি। অতএব আজ সকালে বেলার ওখানে এবং বালিগঞ্জে আমার কাজ সেরে নিতে। ফিরে এসে দুপুরবেলা একটু বিছানায় পড়ে বিশ্রামের চেষ্টা দেখব, যদি সম্ভব হয়—তারপরে কখন্ C.M.S[১]এ যেতে হবে বলবেন। আপনি কি নিয়ে যাবেন? ওদের কলেজ কোথায় জানিনে। অর্থাৎ একবার গিয়েছিলুম কিন্তু দিক্ ভুলে গেছি। বেশিক্ষণ কথাবার্ত্তা কইতে পারব না। ১৫।২০ মিনিট থেকে চলে আসতে হবে। মনে হচ্চে অতলস্পর্শ ক্লান্তির মধ্যে ডুবেচি।

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] C.M.S.—তখনকার Calcutta Medical School. দ্বিজেনবাবু নিজে ডাক্তার ছিলেন, তাই ওই Calcutta Medical Schoolএর সঙ্গে তাঁর কোনো না কোনোরূপ যোগাযোগ ছিল।

তখন মেডিকেল কলেজ ও কারমাইকেল কলেজ নামে দুটি কলেজ এবং ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল, ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল ও ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল নামে তিনটি স্কুল ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিকেল কলেজ ও কারমাইকেল কলেজ থেকে পাস করে এম. বি. বা ব্যাচেলার অফ্ মেডিসিন ডিগ্রি পেতেন। পড়তে হ'ত ৫ বছর। আর ১ বছর থাকতে হ'ত শিক্ষানবিস। বাকি তিনটি মেডিকেল স্কুলে ৪ বছর পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিগ্রি পেতেন এল. এম. এফ. বা লাইসেনসিয়েট অফ মেডিকেল ফ্যাকালটি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন—ওদের কলেজ—আসলে এই মেডিকেল স্কুলগুলিও কলেজই। অন্তত ম্যাট্রিক পাস করে তবেই এই সব স্কুলে ভর্তি হতে হ'ত। এম. বি. পড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তত আই. এস-সি. পাস করতে হ'ত।

এখন কারমাইকেল কলেজের নাম হয়েছে কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাধাগোবিন্দ করের নামে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল হয়েছে বর্তমানে বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকারের নামে—নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ।

ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল হয়েছে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল এই ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে মিশে গেছে। শিয়ালদহ রেল স্টেশনের কিছুটা উত্তরে অবস্থিত ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলের বাড়িতে বর্তমানে হয়েছে E.S.I. Hospital.

৪৮

১৪ জুন ১৯২২

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ—

যদিও ইংরেজিতে লেখা তবুও আপনার চিঠিখানি পড়ে ভারি খুসি হলুম। শুধু যে আপনি উপবাসী রাশিয়ান বিদ্বজ্জনের[১] জন্যে দান করেচেন বলে আমার আনন্দ তা নয়, আমার উপরে যে দায় অর্পণ করা হয়েচে, সেই দায় সার্থক করবার কথাও নিশ্চয়

আপনার মনে ছিল। তাই মনে করে আমার আহ্লাদ হল। য়ুরোপ থেকে উপবাসের কান্না ভারতবর্ষের দ্বারে এসে পৌঁচেছে—এও ত বিধির বিপাকে সম্ভবপর হল—এখন কেবল আশা করচি আমাদের তরফে যেন কোন কার্পণ্য না হয়। কিছু কিছু করে টাকা এসে পৌঁচচ্ছে।

ঘোর বর্ষা নেমেছে—দুটো একটা করে গান জমে উঠচে। ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. বিশ্বভারতীর প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী বিংশ খণ্ডে 'রাশিয়ার চিঠি' আছে। এই খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে রাশিয়ার চিঠি প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হয়েছে—

'১৯২২ সালে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন রুশীয় মনস্বীদের সাহায্যের জন্য সর্বত্র যে আবেদন প্রচারিত হয়, তদনুরূপ আবেদন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. ভিনোগ্রাডফ এ দেশে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন এবং ওই পত্রের প্রারম্ভে লেখেন—

Oxford, May 19, 1922

When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a particularly grievous and pressing need—the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are threatened with destruction...

ওই গ্রন্থ-পরিচয় অংশে এ সম্পর্কে, তখনকার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটিও দেওয়া হয়েছে। প্রবাসীর সেই সংবাদটি এই—রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশসমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি অর্থ পাঠাইবেন, তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

এ সম্পর্কে ১৯২২ খৃস্টাব্দের ৭ই ও ২৭শে জুন তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংবাদ দুটিও পর পর এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফ রবীন্দ্রনাথের নিকট একখানা পত্রে জানাইয়াছেন যে, রুশের বহু মনীষী অন্নাভাবে মারা যাইতেছেন। তাঁহাদের রক্ষা জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহায্যার্থে একটি কমিটি গঠন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কেহ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে উহা বোলপুর রবীন্দ্রনাথের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

'রুশ মনীষী-সাহায্য ভাণ্ডার'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রুশ দেশীয় মনীষিগণের জন্য যে সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই পর্যন্ত আড়াই হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন টাকা তুলে রাশিয়ায় শুধু পাঠানোই নয়, শান্তিনিকেতনের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে আগত এক রুশ অধ্যাপকের এখানে চাকরিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর 'গুরুদেবের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে লিখেছেন—'রুশ অধ্যাপক বোরীশ স্বদেশে খোয়া ভেঙে পেট চালাতে হ'ত বলে ভারতে চলে এসে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নেন। তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গুরুদেব তাঁর কাজের জন্য এক শত টাকা বরাদ্দ করেন।' পৃঃ – ৯৫

রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত 'রুশ মনীষী-সাহায্য ভাণ্ডারে' ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র যেমন অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তেমনি অমল হোমও সাহায্য করেছিলেন। ওই অর্থ সাহায্য পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন অমলবাবুকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতে উল্লেখ করা টাকার অঙ্কটা বাদ দিয়ে ১৩৬৪ সালের কার্তিক-পৌষ

সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় অমলবাবু চিঠিটা ছাপিয়েছেন। চিঠি এই—

জুন ৮, ১৯২২

কল্যাণীয়েষু

রুশিয়ার উপবাসী বিদ্বজ্জনের সাহায্যার্থে তোমার দান... পেয়ে খুব খুসি হলুম। কমিটি বাঁধবার জন্যে শীঘ্রই কলকাতায় যাব—ইতিমধ্যে তুমি প্রমথ বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে রেখো। তিনি যদি প্রস্তুত থাকেন, তাহলে তাঁকেই সেক্রেটারির পদে বরণ করা যাবে। ভিনোগ্রাডফের পত্রের অধিকাংশ (আমার সম্বন্ধীয় প্রশংসাবাণী বাদে) খবরের কাগজে পাঠানো যাচ্ছে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিনোগ্রাডফ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। মনে হয়, ভিনোগ্রাডফ যখন কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই সময় তিনি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'কলেজের অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। ভিনোগ্রাডফের সঙ্গে প্রমথবাবুর এই পরিচয়ের জন্যই হয়ত রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তাঁর রুশ মনীষী-সাহায্য ভাণ্ডারে প্রমথবাবুকে সম্পাদক করার কথা লিখেছিলেন।

৪৯

আলিপুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি বোলপুরে আটকা পড়ে অবশেষে এখানে যখন আমার হাতে এসে পড়ল, তখন আপনার কাজ সম্পন্ন হয়ে চুকে গেছে। তাই আপনার অনুরোধ রাখতে পারলুম না।

এখানে সিংহের পিঞ্জরের পাশেই আমার কেদারার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে দুর্ব্বল শরীরের লালন করচি—আর সমস্ত কাজ বন্ধ। একে

বলে বাঁচবার লোভে মরে' থাকা। অথচ আমার বাঁচবারও লোভ নেই, মরবারও ভয় নেই। ইতি তারিখ জানিনে।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাতে বিলি চিঠি, চিঠি পাওয়ার তারিখ চিঠিতে লেখা আছে ১৯.৩.২৫

রবীন্দ্রনাথ এই সময় আলিপুর চিড়িয়াখানার পাশে আবহাওয়া অফিসে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাসায় ছিলেন। প্রশান্তবাবু তখন আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

৫০

Santiniketan
18.3.27

ওঁ

Spring Festival to-morrow Saturday evening earnestly requested your presence.

Rabindranath Tagore

এই লেখাটি একটি টেলিগ্রাম। দেখা যাচ্ছে, শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে ওই টেলিগ্রাফ করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে (২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭৪) লিখেছেন—

দোল পূর্ণিমার পরদিন (১৩৩৩ চৈত্র ৪। মার্চ ১৮) শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'[১] অভিনীত হয়। জনৈকা সূক্ষ্মদর্শী লিখিতেছেন, 'নৃত্যকে যেন দেবীরূপে নূতন আলোকে মণ্ডিত দেখিলাম। ...এত রূপ, এমন পবিত্র নীরন্ধ্র সৌরভ, এমন হৃদয় আলোকরা বিমল জ্যোতি কোথায় কোন গভীর গহ্বরে আড়ালে পড়েছিল।'[২]

প্রভাতবাবু তাঁর এই লেখায় 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র মাথায় ১ চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ওই ১ চিহ্নর জায়গায় লিখেছেন—১৩৩৩ চৈত্র ৩। ঋতুরঙ্গশালা। শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয়।

প্রভাতবাবুর এই লেখায় দেখছি, তিনি একবার বলছেন—চৈত্র ৪ বা ১৮ মার্চ ঋতুরঙ্গশালা অভিনয় হয়েছিল, আবার বলছেন—চৈত্র ৩ বা ১৭ মার্চে অভিনয় হয়েছিল।

প্রভাতবাবু তাঁর লেখায় জনৈকা সূক্ষ্মদর্শী লিখিতেছেন বলে ঐ লেখিকার লেখা উদ্ধৃত করে উদ্ধৃতির শেষে লেখার মাথায় ২ চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ওই ২ চিহ্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন—সাহানা দেবী, নৃত্য : বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃঃ ৫৬৫—৬৯।

প্রভাতবাবু এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় আরও লিখেছেন—

১৩৩৪ আষাঢ়। বিচিত্রা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আষাঢ়, পৃঃ ৯—৭০। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (সচিত্র : নন্দলাল বসু-কৃত)।

১৩৩৪ অগ্রহায়ণ ২২। জোড়াসাঁকোর বাটিতে 'ঋতুরঙ্গ' নামে অভিনীত। ৪৪ পৃষ্ঠা পুস্তিকা।

১৩৩৪ পৌষ। মাসিক বসুমতী 'ঋতুরঙ্গ' নামে প্রকাশিত।

১৩৩৮ আশ্বিন। বনবাণী, পৃঃ ৪৩—১৩২। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা বিচিত্রায় মুদ্রিত 'নটরাজ' ও মাসিক বসুমতীতে 'ঋতুরঙ্গ' একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হইয়া নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা নামে সংকলিত হয়। দ্র : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃঃ ১৯১—২৪৮। দ্র: গ্রন্থপরিচয় অংশ।

প্রভাতবাবু এখানে তাঁর লেখার শেষে দ্রঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃঃ ১৯১—২৪৮ লিখলেও ওটা আসলে—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃঃ ১৯১—২৪৮। ভুলক্রমে রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮-র জায়গায় রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ হয়েছে।

এই অষ্টাদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর নটরাজ বা নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা গ্রন্থের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে একটা ছোটো লেখা দেওয়া হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই লিখেছেন—'নৃত্য, গীত ও আবৃত্তিযোগে 'নটরাজ' দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথের এই লেখায় কিন্তু কোনো তারিখ কিংবা বারের উল্লেখ নেই।

পাঁজিতে আছে ৪ঠা চৈত্র বা ১৮ই মার্চ শুক্রবার ছিল দোল পূর্ণিমা। রবীন্দ্রনাথ ১৮ই তারিখের টেলিগ্রামে আগামীকাল শনিবার অভিনয় হবে বলায় পরিষ্কার জানা যাচ্ছে—৫ই চৈত্র বা ১৯শে মার্চ শনিবার অভিনয় হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ নটরাজ বা নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালার ভূমিকায় যে লিখেছেন—দোলপূর্ণিমার রাত্রে অভিনয় হয়েছিল, এটা ভুল।

আর প্রভাতবাবু একবার ৪ঠা মার্চ, আর একবার ৩রা মার্চ বললেও এর কোনোটাই ঠিক নয়। তবে তারিখের গোলমাল হলেও তিনি যে লিখেছেন—দোল পূর্ণিমার পরদিন অভিনয় হয়েছিল এটা ঠিক।

৫১

২৭ মার্চ ১৯২৭ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার অবস্থা তো দেখে গিয়েছিলেন—লোকজনের ভিড়ে, নানা গোলমালের মধ্যে। কোনোমতে তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন লিখে যথাসময়ে পাঠাতে পেরেছিলুম এ আমার পক্ষে কম নয়। কিন্তু আমাকে আর কর্ম্মে জড়াবেন না—যে কর্ম্মের বন্ধন স্বেচ্ছায় পরেচি সেই আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়েচে—আর আমি একটুও পারব না। মালঞ্চের মালাকর হবার প্রার্থনা আমার দেবীকে একদিন জানিয়েছিলুম—তিনি রাজি আছেন জানি কিন্তু অন্য দেবতারাও খাটিয়ে নিতে ছাড়বেন না। বয়স যখন অল্প ছিল তখন সব দিক রক্ষা করার ভরসা ছিল—তাই উপরি কাজে বরঞ্চ আনন্দই পেতুম—একদিকে বিশ্বকর্ম্মা একদিকে বীণাপাণি উভয়েরই দরবারে সেলাম ঠুকেচি। এখন মন হরতাল করে বসেচে—বিশ্বকর্ম্মার কারখানা ঘরের দিক মাড়াতে চায় না, তা বিশ্ববাসীরা তাকে যতই ধিক্কার দিক্। এ দিকে আয়ু অল্প, শক্তি সম্বলও তলায় এসে

ঠেকেচে—এখন আমার কাছে যদি দাবী করতেই হয়, তবে যে অংশে কিছু রস বাকি আছে সেই অংশ—মরা গাঙে যে দিকে স্রোত বয় না সেদিকে নৌকো বার করবার জন্যে দোহাই পাড়বেন না। পাঁকের উপর দিয়েও লগি ঠেলা চলে কিন্তু সেটা নেহাৎ শাস্তি, মজুরী পোষায় না। আমি বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মীদের কাউকে প্রণাম কাউকে আশীর্ব্বাদ করব কিন্তু আমার এ পার থেকে। ইতি ১৩ চৈত্র ১৩৩৩

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

২৬ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

সুহৃদবরেষু

বিশ্ববৈদ্য সম্মিলনীতে অভিনয় করতে সম্মত হয়েছিলুম, প্রস্তুতও হচ্ছিলুম। এমন সময় সংবাদ পেলুম এ বৎসর কলকাতা বিশেষ ভাবে রোগে আক্রান্ত। এমন অবস্থায় অনেকগুলি ছেলে মেয়ে আশ্রম থেকে সেই রোগের হাওয়ায় নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে উচিত হবে কিনা জানতে চাই। দায়িত্ব গুরুতর।

যাই হোক্ আমি কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় একবার দেখে শুনে বলে কয়ে আসব মনে করচি। তার উল্টো ঘটনা বোধ হয় অসম্ভব—অর্থাৎ এখানে আপনার আসা। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

ওঁ

বন্ধুবর

কাল আমার অবস্থা আপনি তো স্বচক্ষে দেখে গেছেন। তার পরে রাত্রে বিছানায় শুয়েও ক্লান্তি কিছুতে ছাড়তে চায় না। — আজ সকালে উঠেও বোঝা ঘাড়ে চেপে আছে। পর্শুও এই দশা হয়েছিল। আমার মুষ্কিল এই যে, বাইরে থেকে আমাকে দেখে আমার ভিতরকার ইন্‌সল্‌ভেন্সি ঠিক বোঝা যায় না। সবাই বলে, "আপনাকে তো বেশ সুস্থ দেখাচ্চে"—তার পরে নির্দ্দয়তা করতে তাদের আর সঙ্কোচ বোধ হয় না। এমনি করেই ক্রমশই আমার ক্ষতিটা এতটা জমে উঠেচে—ডেফিসিট পূরণ হতে না হতে ব্যয়ের অঙ্ক বেড়ে চলেচে। এমন কি, আমার বন্ধুরাও একথা বুঝেও বুঝতে চান না। তাঁদের প্রত্যেকের নিজের কাজ উদ্ধারের বেলায় আমার রিক্ত তহবিলে ভাগ বসাবার চেষ্টা করেন। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোজই মনের ভিতর ছট্‌ফটানি আসে, ইচ্ছা করে সুদূরে পালাই—সেটা সহজ নয় বলে পেরে উঠিনে।

আপনি যদি কোনো কাগজে ছোট একটু চিঠিতে আপনি কাল যা দেখেচেন এবং অনুভব করেচেন সেটা লিখে সকলকে জানান আমার প্রতি কিছুমাত্র জুলুম না করতে, তাহলে আমি জোর পাই। আমার কালকের কুকীর্ত্তির নজির আমার বিরুদ্ধে যাবে—এর পূর্ব্বে যাঁদের দাবী আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলুম তাঁরা আবার সচেতন হয়ে উঠ্‌বেন। বারবার অনুরোধ অস্বীকার করবার মতো মনের জোর আমার নেই বলেই এই দশা হয়েচে—সেই অভাবটা আপনি ডাক্তারের অধিকার খাটিয়ে পূরণ করে দেবেন। আজকাল এঘর থেকে ওঘরে যেতে কষ্ট হয়—থেকে থেকে পা ফুলে ওঠে—

এমন আধবাঁচা করে বাঁচতে আমার ধিক্কার বোধ হয়—ভয় হয় পাছে একদিন সম্পূর্ণ পরের উপর নিজের ভার চাপিয়ে সংসারের গলগ্রহ হয়ে জীবনটা কাটাতে হয়—তার মত অভিসম্পাৎ আর নেই। আপনার শরণাপন্ন হলুম। ইতি ৯ আগষ্ট ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪ বার্লিন

ওঁ

সাদর নমস্কার

ঘুরে ফিরে আপনার চিঠি কাল এসে পৌঁছেছে। আজ চলেছি মস্কৌ। আবার কিছুদিন পরে যেতে হবে আটলান্টিক পারে—তারপর পৌষ পার্ব্বণের দিন ফিরব দেশে।[1] আপাতত এই ত সঙ্কল্প। ঘুরপাক খেতে একটুও ভালো লাগে না, কিন্তু অদৃষ্ট ঘোরায়। মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে দেশে ফিরতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দেশে ত শান্তি নেই। রোজই বুঝতে পারি কাজের বয়স গেছে—এখন কর্ম্ম প্রবাহিনীর ওপারে যাবার সময়—কিন্তু কাজের জের মিট্‌তে চায় না। তাই আপিসের ছুটির ঘণ্টা পড়লেও ওভার-টাইম কাজ করতে হয়। আজ কিন্তু আর সময় নেই—তল্পী বাঁধতে হবে, অতএব নমস্কার। ইতি ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[1] কবি এ বারের বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে কলকাতা ত্যাগ করেন ১৯৩০-এর ২রা মার্চ। চেকোশ্লোভাকিয়া, ইংলন্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ঘুরে আবার জার্মানিতে আসেন। সেখান থেকে যান রাশিয়ার মস্কোয়। রাশিয়া থেকে জার্মানি হয়ে যান আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে ইংলন্ডে হয়ে দেশে ফেরেন ১৯৩২-এর জানুয়ারির শেষ দিকে।

৫৫ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রীতিনমস্কার

নববর্ষের সাদর অভিবাদন। আমার স্মরণ শক্তির পরে যদি দাবী করেন, তবে হতাশ হবেন। কবে কোন্ সায়াহ্নে আমার কণ্ঠের কোন্ গুঞ্জনধ্বনি গীতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেচে সে ইতিহাস উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসাধ্য। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩৩৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জীবন লভি'।

২৫শে বৈশাখ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩৮

The same Sun is newly born
in new lands
in a ring of endless dawns.

May 6, 1931 Rabindranath Tagore
Shantiniketan

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রর বাড়িতে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে সেই চিঠিগুলির মধ্যে উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরাজিতে লেখা ওই কার্ডটি পাই। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে এটি ছাপা একটি কার্ড। কবির ভক্তরা কবিকে দিয়ে লিখিয়ে তখন তাঁর এই জন্মদিনের কার্ডটি করেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে লিখেছেন—'শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখ (১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসব নিষ্পন্ন হইল। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র পরিচয় সভার উদ্যোগে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।'

আগে যেমন দেখেছি, শান্তিনিকেতনে ১৩৩৩ সালে Spring Festival দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন, এখানেও এমনও হতে পারে হয়ত রবীন্দ্রনাথই তাঁর জন্মোৎসবে যোগ দেবার জন্য বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে ওই কার্ড পাঠিয়েছিলেন। না হলে জন্মোৎসব সভার উদ্যোক্তারাই দ্বিজেনবাবুর কাছে ওই কার্ড পাঠিয়েছিলেন। শেষেরটাই ঠিক বলে মনে হয়। যাই হোক্, এই কার্ডে রবীন্দ্রনাথের বাংলা লেখাটা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসছে—

কলকাতার একটি অতি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন সংস্থা 'রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে' 'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে রবীন্দ্রনাথের উপর ১২৫ জন কবির লেখা ১২৫টি কবিতা আছে। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন—একজন নামকরা সাহিত্যিক।

আমার সংগ্রহে এই গ্রন্থ এক খণ্ড আছে। তাতে দেখছি—এই গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে' নামে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা বলে এই কবিতাটি ছাপা হয়েছে—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নবীন জীবন লভি'।

দেখা যাচ্ছে, এই লেখা আগে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথেরই কবিতা। তবে এই লেখায়, নূতন জীবন লভি' হয়েছে—নবীন জীবন লভি'।

সংকলক কীভাবে এই কবিতা বিভূতিবাবুর কবিতা বলে সংগ্রহ করলেন, এ সম্বন্ধে আমার অনুমান—স্বাক্ষর সংগ্রহকারীরা যেমন নিজেদের অটোগ্রাফের খাতায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাণী সংগ্রহ করে থাকেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কোনো এক সময়ে কোনো স্বাক্ষর সংগ্রহকারী বিভূতিবাবুর কাছে কিছু লেখা চাইলে তিনি রবীন্দ্রনাথের ওই দু লাইন কবিতা (তাও কি নূতন-এর জায়গায় নবীন লিখেছিলেন?) লিখে নিজের নাম তারিখ দিয়েছিলেন। আর হয়ত বিভূতিবাবু তাঁর ওই লেখার মাথায় আগে পরে উদ্ধৃতির '' চিহ্নও দিয়েছিলেন।

'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত' গ্রন্থের কবিতার সংকলক এ লেখা রবীন্দ্রনাথের লেখা না জেনে বিভূতিবাবুর লেখা বলে সংগ্রহ করেছিলেন।

তবে এটা ঠিক, এ কবিতা বিভূতিবাবুর লেখা নয়।

৫৭

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

নিমন্ত্রণটা ফাঁক দিতে ইচ্ছে তো হয় না। কিন্তু হিসেব করে দেখবেন ১৬ই কলকাতায় ফিরব—১৩ই শান্তিনিকেতনের ছুটি শেষ হয়েছে—দীর্ঘকাল কলকাতায় অপেক্ষা করার অপরাধ ও দুঃখ অসহ্য হবে, শান্তিনিকেতনে গিয়ে আবার ফিরে আসবার মতো নাড়ীর জোর নেই।

আমার বক্তব্য এই যে বরকন্যাকে নিয়ে আনন্দ করার পক্ষে শান্তিনিকেতন যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র এমন কলকাতা কখনোই নয়। চিন্তা করে দেখবেন।

আর একটা কথা, আপনার পত্রে জানলেম যে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরার বিবাহ উপলক্ষ্যে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন—এবং সেটা ছাপা হয়েচে—কিন্তু সংবাদটা সম্পূর্ণ সত্য কিনা সন্দেহ করি—ভাবীকালের প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও এ নিয়ে তর্ক তুলবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ কদাচ 'সোনা' শব্দের বানানকে মূর্দ্ধণ্যয়ে-র দ্বারা কণ্টকিত করেন না।[1] ইতি—১৫ই নভেম্বর ১৯৩১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে

লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ (৩ নভেম্বর) তাঁহার সুহৃৎ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা ইন্দিরার বিবাহ উপলক্ষে কবিতা লিখিয়া দেন।'

এই কবিতা 'মিলন' (শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে) নামে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতা রচনার স্থান কাল হিসাবে কবি কবিতার শেষে লিখেছিলেন—দার্জিলিং, ১৭ কার্তিক ১৩৩৮

দ্বিজেনবাবুর অনুরোধে কবি ইন্দিরার বিবাহের কিছুদিন আগেই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন। দ্বিজেনবাবু কন্যার বিবাহ সভায় ওই কবিতা বিতরণের জন্য ছাপিয়েও ছিলেন। দ্বিজেনবাবু কন্যার বিবাহে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাবার সময়, সেইসঙ্গে ছাপানো কবির এই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতার এক জায়গায় 'সোনা' বানান 'সোণা' হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ওই কথা লিখেছিলেন। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—

মিলন

শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ-উপলক্ষ্যে

সেদিন উষার নববীণাঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরপারে
পাখিদুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুর্জনের পাখায় ঠেকিল পাখা।

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
    মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথী,
    কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি—
    পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারিদিক হতে বিরাটের মহাবাণী
  শুনালো দোঁহারে ভাষার-অতীত কথা।

মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
    বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।
দোঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসি উঠে ধ্বনি—
    ‘প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।’
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এল তারি,
    এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি,
    পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে।

দার্জিলিং
১৭ কার্তিক ১৩৩৮

৫৮
২৬ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

স্ন্যাপ দুটোতে আনাড়ির পরিচয় আছে, গেল গেল করতে করতে উৎরিয়ে গেছে। ভালো লাগল।

কবিতাটাকে ভাষান্তর করবার শক্তি নেই—অতএব চেষ্টা না করাই সুবুদ্ধিসঙ্গত। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

Uttarayan
Santiniketan
Bengal.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিশ্বমানবিকতা ছাড়া আর কোনো নাম মনে আসচে না। ইতি। ১১ জানুয়ারি ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Dr. D.N. Maitra
4 Sambhunath Pandit Street
P.O. Elgin Road
Calcutta

৬০

House Boat
Padma

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার স্ত্রীকে স্নেহ করেছি, কতদিন আনন্দ পেয়েছি তাঁর আতিথ্য সম্ভোগ করে। সেদিন তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, অনেকদিন পরে তাঁর প্রসন্ন হাস্যমুখ দেখেছিলেম—সে কথা মনে পড়চে। জীবনপূর্ণ স্মৃতিকে মৃত্যুর ভূমিকার উপরে দেখতে মন বাধা পায়, যদিও আমার বয়সে মৃত্যুর সত্য দূরবর্তী নয়, অবাস্তবও নয়।

তোমার সম্বন্ধে জনশ্রুতি মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখবার দিন আমার আর নেই। জীবন নাট্যের লীলা বৈচিত্র্য যখন অত্যন্ত কাছে ছিল, তখন তার ঘাত প্রতিঘাত ছিল প্রবল। এখন পাদপ্রদীপের আলো নিবে আসচে—সেই শিখাগুলির ক্ষণিক আকর্ষণ থেকে বাহিরের তারার আলো আমাকে ডাকচে, অভিনয়ের পালা ভুলতে দেরি হবে না। কতো ভালো, কতো মন্দ ভেসে চলেচে রাত্রির মহাসমুদ্রের দিকে, পিছনে তার কোনো চিহ্ন থাকবে না। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৭।২।৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, টেলিগ্রাম প্রভৃতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দ্বিজেনবাবুর অনুরোধে তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতাও পাওয়া গেছে। সেই কবিতাটি হ'ল—

লিখব তোমার রঙীন পাতায় কোন্ বারতা?
রঙের তুলি পাব কোথা?
সে রং ত নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয় তলে
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা?
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা?

বন্ধু তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা?
নাই যে আমার ছলা-কলা।
সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠল বেজে,
একলা কেবল জানে সে যে মোর দেবতা।
কেমন করে করব বাহির মনের কথা?

১১ই আষাঢ়
১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন
বোলপুর

মীরা চৌধুরীকে লিখিত

এই অংশে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি মীরা চৌধুরীকে লেখা। মীরা দেবী ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

মীরা দেবীর ডাক নাম ছিল বাবলি। রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে বাবলি বলেই ডাকতেন।

মীরা দেবীর স্বামী প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী তখনকার অখণ্ড ভারতের একাউন্‌টেন্ট জেনারেল ছিলেন। মীরা দেবী তাঁর স্বামীর নিকট পেশোয়ারে থাকা কালে সেখানকার পীচ প্রভৃতি মেওয়া ফল রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মীরা দেবীকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সেই সব পীচ প্রভৃতি ফল পাওয়ার কথাও আছে।

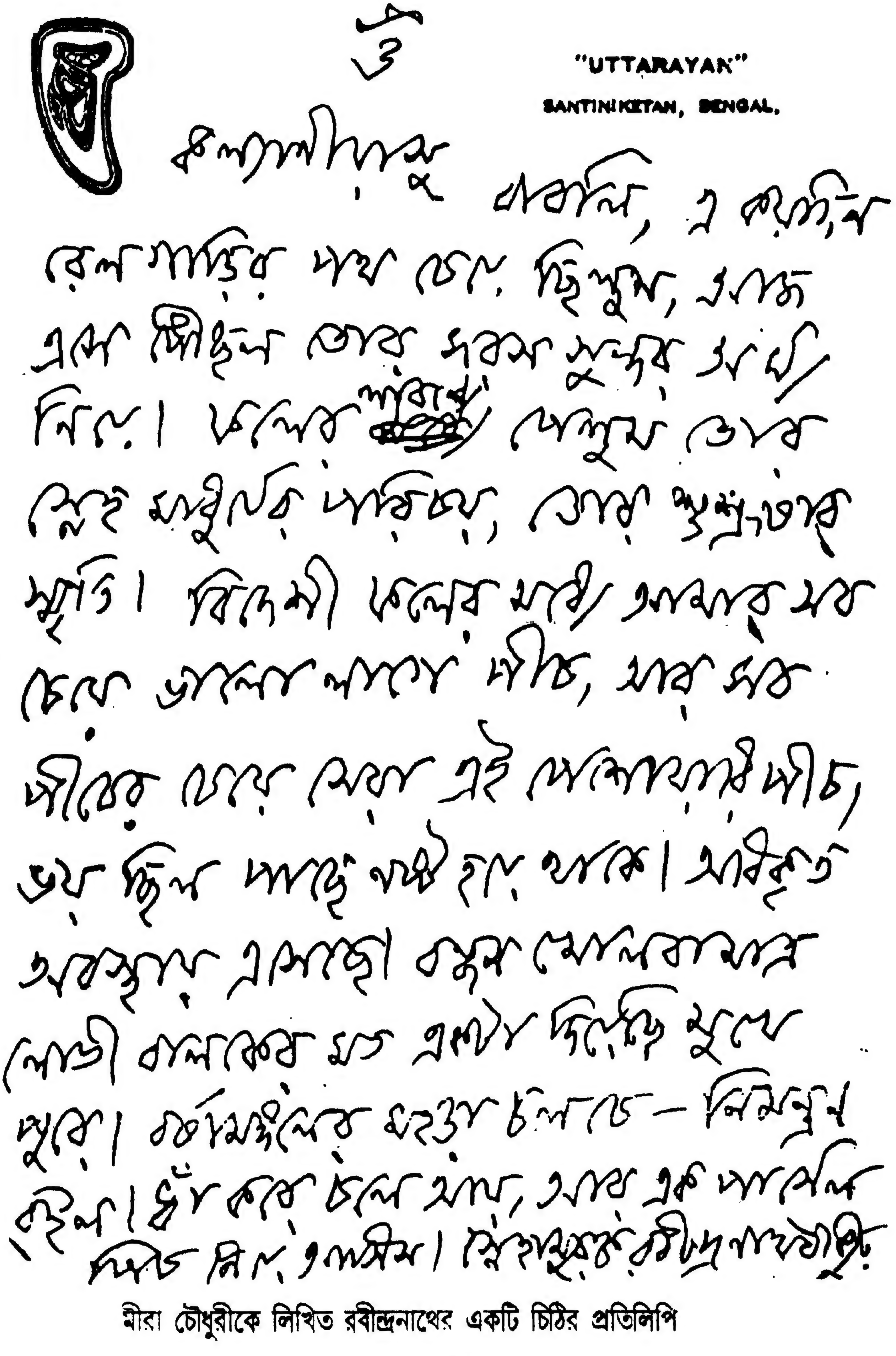

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

এতদিন, এ কয়দিন রেলগাড়ির পথ বেয়ে ছিলুম, এখন এসে পৌঁছল তোর সরস সুন্দর ডালি নিয়ে। ফলের পসরায় দেখলুম তোর স্নেহ মাধুর্যের পরিচয়, তোমার শুশ্রূষার স্মৃতি। বিদেশী ফলের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে পীচ, আর সব পীচের চেয়ে সেরা এই দেশোয়ালী পীচ, ভয় ছিল পাছে নষ্ট হয়ে থাকে। অবিকৃত অবস্থায় এসেছে। [illegible] [illegible] লোভী বালকের মত এখনি দিচ্ছি মুখে পুরে। কর্মমঙ্গলের মহোৎসব চলছে — নিমন্ত্রণ রইল। ছুটি করে চলে আয়, আর এক পার্সেল [illegible] [illegible], ৭ পৌষ। স্নেহানুরক্ত রবীন্দ্রনাথঠাকুর

মীরা চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি

১.

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাবলি, এ কয়দিন রেলগাড়ির পথ চেয়ে ছিলুম, আজ এসে পৌঁছল তোর সরস সুন্দর অর্ঘ্য নিয়ে। ফলের লাবণ্যে পেলুম তোর স্নেহ মাধুর্যের পরিচয়, তোর শুশ্রূষার স্মৃতি। বিদেশী ফলের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে পীচ, আর সব পীচের চেয়ে সেরা এই পেশোয়ারি পীচ। ভয় ছিল পাছে নষ্ট হয়ে থাকে। অবিকৃত অবস্থায় এসেছে। বন্ধন খোলবা মাত্র লোভী বালকের মত একটা দিয়েছি মুখে পুরে। বর্ষামঙ্গলের মহড়া[১] চলচে—নিমন্ত্রণ রইল। ধাঁ করে চলে আয়, আর এক পার্সেল পিচ নিয়ে আসিস।

স্নেহানুরক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড থেকে জানা যায়—১৩৪২ সাল থেকে শুরু করে ১৩৪৭ পর্যন্ত প্রতি বছরই বর্ষাঋতুতে বর্ষামঙ্গল উৎসব হয় শান্তিনিকেতনে। এবার কবির রচিত শেষ বর্ষা-সঙ্গীত 'এসো এসো ওগো শ্যামছায়া ঘন দিন।'

২.

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখান থেকে বিদায় নেবার সময় তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর নি আমি এই নালিশ করি—তুমি নালিশ জানাচ্চ আমি দেখা করিনি। ইতিহাসের এই গ্রন্থি কে মোচন করবে?

মায়ার খেলার নতুন গান রচনার ঘূর্ণি হাওয়ায় মন উড়ে বেড়াচ্চে[১]—সমাজ সংসারের কর্তব্য ক্ষেত্রে নেবে আসবার মতো অবকাশ নেই। তবু দু চার লাইন লিখে দিচ্চি, একটা নালিশ জমিয়ে রেখেছ পাছে আর একটা নালিশ বেড়ে যায় এই আমার আশঙ্কা, কিন্তু তাই বলে পেশোয়ারের নার্সিসস কুঞ্জবনে আমার দর্শন প্রত্যাশা কোরো না—জন্মেছিলুম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, অঙ্কটা কষে দেখো বয়স কত হোলো—তোমার বয়সের সঙ্গে অল্প একটু প্রভেদ আছে তার নিশ্চিত প্রমাণ পাবে। আশীর্বাদ জেনো। ইতি ১৬।১২।৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

[১] 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য ছিল। কবি এবার 'মায়ার খেলা'কে নৃত্যনাট্যরূপ দান করেন। এজন্য নতুন গানও রচনা করেন।

৩.

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাবলি, তুমি আমাকে যে মেওয়া পাঠিয়েছ তা যথাসময়ে পৌঁছিয়েছে এবং তার যথাযোগ্য ব্যবহার হচ্চে। দূর থেকে তোমার স্মৃতির প্রমাণ মাঝে মাঝে আমাকে পাঠাও সে খুব উপভোগ্য হয়। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৭।১১।৩৯

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪.

"UTTARAYAN"
ওঁ
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

তোমার নামে আমার কাছে বাদাম পেস্তা যা কিছু এসেছিল, তাকে আমি আদর করে নিয়েছি এবং উপভোগ করচি। কিন্তু সে তোমার মনের মতো হয়নি বলেছ—সেটা আমার পক্ষে ভালো খবর। তোমার মনের মতো নৈবেদ্যের জন্যে অপেক্ষা করা যাবে। পেশোয়ারে যখন ফিরে আসবে তখন তোমার দ্বিতীয় সংস্করণ উপহার তুমি স্বহস্তে সাজিয়ে পাঠাতে পারবে। ইতিমধ্যে যা পাওয়া গেছে তাতে কাজ চলে যাচ্ছে।

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১০।১২।৩৯

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫.

"UTTARAYAN"
ওঁ
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বাবলি বাদাম পেস্তা আখরোট সরগুজা তোর কল্যাণে প্রচুর এসেছে। বৎসরের আরম্ভে ভোগ আরম্ভ হোলো—আগামী নববর্ষের দিন আর একবার তাগিদ করা যাবে। মেওয়া যা এসেছে সেটা স্পৃহনীয় কিন্তু পেশোয়ার থেকে শীতের যে আমদানি হোলো তাতে শরীরটাকে কুণ্ঠিত করেছে। সূর্যদেব আরো একটুখানি তাপের বরাদ্দ করেন যদি তাহলে কাপড় চোপড়ের দলবাঁধা আক্রমণ থেকে রেহাই পাই। আমার আশীর্বাদ। ইতি ১৩।১।৪০

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.

"UTTARAYAN"
ওঁ
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বাবলি এতদিন পরে তোর পেশোয়ারের দয়া হয়েছে—হঠাৎ আজ অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। পিচগুলো একেবারে বাদশাহি চেহারার। স্বাদে গন্ধে তার আভিজাত্য প্রকাশ পায়। তাদের সঙ্গে পরিচয় কাল রাত্তির থেকেই শুরু হয়েছে।

এখানে আকাশ অত্যন্ত নির্মম। ধরণীর সঙ্গে যেন ঠাট্টা শুরু করেছে—মাঝে মাঝে বৃষ্টির ভঙ্গী করে—পৃথিবী যেই পাত পেড়ে বসে অমনি ভরা থালা নিয়ে দেয় দৌড়। রাগ ধরে অত্যন্ত কিন্তু কার উপরে রাগ করব ভেবে পাইনে। মাঝখানে একটা কোনো হিটলার যদি থাকত তাহলে তার কাছে হার মেনেও তাকে গাল দেওয়ার সুখ পাওয়া যেত। আমাদের বর্ষামঙ্গলের গান বাজনা তৈরি—বাসর ঘরের আসরে জ্বলবে বাতি, কিন্তু বর উপস্থিত নেই। ইতি ১১।৭।৪০

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭.

"UTTARAYAN"
ওঁ
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বাবলি, আমি ছোট ঘর এবং দরাজ হৃদয় ভালোবাসি। সুতরাং তোমার আতিথ্যে আমার কোনো দিকে কিছু অকুলান হোত না। কিন্তু শরীর অপটু, এদিকে অক্সফোর্ড থেকে সম্মানের অর্ঘ্য[১] গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্চে। তারপরে সমস্ত শীতঋতু বৎসরের শেষ পর্যন্ত কর্তব্যজালে বদ্ধ থাকতে হবে।

তোমার আমন্ত্রণকে উল্টিয়ে নিলে কী রকম হয়? শান্তিনিকেতনে এসে তুমি অনায়াসে আমাকে অভ্যর্থনা করতে পার। শ্যামলীতে তুমি যদি আসন গ্রহণ করো তাহলে সেইখানেই আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতে পারব। সৌভাগ্যক্রমে যদি পেশোয়ার থেকে তোমার পীচ এসে পড়ে তাহলে তোমার হাত থেকে প্রত্যক্ষ তা গ্রহণ করতে পারব। এবারে পাহাড়ে ভাল ছিলুম না, শারীরিক দুঃখ ভোগ করেছিলুম। এখন অবস্থা ভালো।

বর্ষা এবার কৃপণ, এখানকার আকাশে মেঘ আছে, বৃষ্টি পাঠিয়েছে তোমাদের দিগন্তে। ইতি ২৮ আষাঢ় ১৩৪৭

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. সাতই অগস্ট ১৯৪০ (বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৭) শান্তিনিকেতনে সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব্ লিটারেচার বা সাহিত্যাচার্য উপাধি দান করেছিলেন।

৮.

মীরা চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি মীরা দেবীর অনুরোধে তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পাওয়া গেছে।

এই কবিতা লেখার ইতিহাস হ'ল—১৯২৫ খৃস্টাব্দের জুন মাস। দেশবন্ধু তখন অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় দার্জিলিংয়ে বাস করছেন। ওই সময়ে মহাত্মা গান্ধী একদিন দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর বাড়িতে এসেছেন। মীরা চৌধুরী সেই সময় দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দেশবন্ধু মীরা দেবীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতেন। দেশবন্ধুর বাড়িতে গান্ধীজি

এসেছেন শুনে মীরা দেবীর খুব ইচ্ছা হ'ল, তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় গান্ধীজিকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেন। মীরা দেবী দেশবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেশবন্ধুকে তাঁর মনের কথা বললে, তিনি আবার সেকথা গান্ধীজিকে বললেন। গান্ধীজি শুনে বললেন—ও যদি অন্তত ছ-মাস চরকায় নিয়মিত সুতো কাটবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে ওর খাতায় আমি কিছু লিখে দিতে পারি।

দেশবন্ধু গান্ধীজির কথা মীরা দেবীকে শোনালে তিনি সুতো কাটবেন বলে সম্মতি জানালেন। তখন গান্ধীজি মীরা দেবীর খাতা নিয়ে তাতে এই কথাগুলি লিখে দিলেন।

Never make a promise
in haste. Having once made
it fulfil it at the cost of
your life.

7.6.25

এই লিখে গান্ধীজি তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটীতে নিজের নাম সহি করলেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে মীরা দেবী একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন সেখানে বাস করেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখে দেবার জন্য তাঁর সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তী মারফৎ অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন মীরা দেবীকে বলেছিলেন, তুমি তো এখানে আছ, খাতা রেখে যাও, কাল নিয়ে যেও।

মীরা দেবী খাতা রেখে এলে, রবীন্দ্রনাথ খাতা নিয়ে খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে গান্ধীজির লেখাটা পড়লেন।

ওই লেখা পড়েই তিনি মীরা দেবীর খাতায় প্রথমে বাংলায় এই কবিতা, পরে ইংরাজিতে এই কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন,—

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা শৃঙ্খলে
সাধ্য আছে কা'র!

সত্যের বন্ধন পরো, সে বন্ধন প্রেমমন্ত্র বলে
করো অলঙ্কার।
জীবন-বীণার তার অশিথিল শক্তি দিয়ে বাঁধো,
দিনেরাত্রে সুখে দুঃখে আলোয় আঁধারে তুমি সাধো
মৃত্যুহীন প্রাণের ঝঙ্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Surrender your pride to truth,
fling away your promise if it is found
to be wrong.

March 24, 1931 Rabindranath Tagore

সংশোধন

'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে'। এই বইয়ে ঐ প্রবন্ধের নাম কোথাও 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে' কোথাও 'রবীন্দ্র সংসর্গে' ছাপা হয়েছে। ঐ 'রবীন্দ্র-সংসর্গে' হবে 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে'।

মূল্য ৪৫.০০ টাকা
ISBN-81-7522-157-7 (V.17)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

সঞ্চয়িতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল ঘোষকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৫। যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৬। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মীরা চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৮। রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), ফণিভূষণ অধিকারী, সরযূবালা অধিকারী, যাদুমতি মুখোপাধ্যায়, আশা অধিকারী ও ভক্তি অধিকারীকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত. পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী। রাণু দেবীকে লিখিত

অষ্টাদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA-BHARATI
G-2442
LIBRARY

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ।। অষ্টাদশ খণ্ড

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), ফণিভূষণ অধিকারী
সরযূবালা অধিকারী, যাদুমতি মুখোপাধ্যায়, আশা অধিকারী
ও ভক্তি অধিকারীকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ: ২২ শ্রাবণ ১৪০৯

সম্পাদনা: শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল

© বিশ্বভারতী, ২০০২

ISBN-81-7522-222-0 (V.18)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

অক্ষর বিন্যাস বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা ১৭

মুদ্রক দি নিউ অরোরা প্রেস
১৫/১ মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট। কলকাতা ৯

বিষয়সূচী

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ৭
অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ৩৫০
সরযূবালা অধিকারী ও লেডি যাদুমতি মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ৩৭৫
আশা অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ৩৮৫
ভক্তি অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ৪০১

পরিশিষ্ট ১

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-র পত্রাবলী ৪০৭

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথ ও অনিলকুমার চন্দকে লিখিত আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-র পত্রাবলী ৫১৯

রবীন্দ্রনাথ ও অধিকারী পরিবার ৫২৫

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ ৫৪৩
রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫৪৩
ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬১১
সরযূবালা অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬১৭
লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬১৯
আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬১৯
ভক্তি অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬২১

পরিশিষ্ট ১

রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-র পত্র ৬২২

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথকে লেখা আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-র পত্র ৬৩৫

চিত্রসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ ও রাণু মুখোপাধ্যায় প্রবেশক

রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রের একটি পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি চিত্র ৯

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

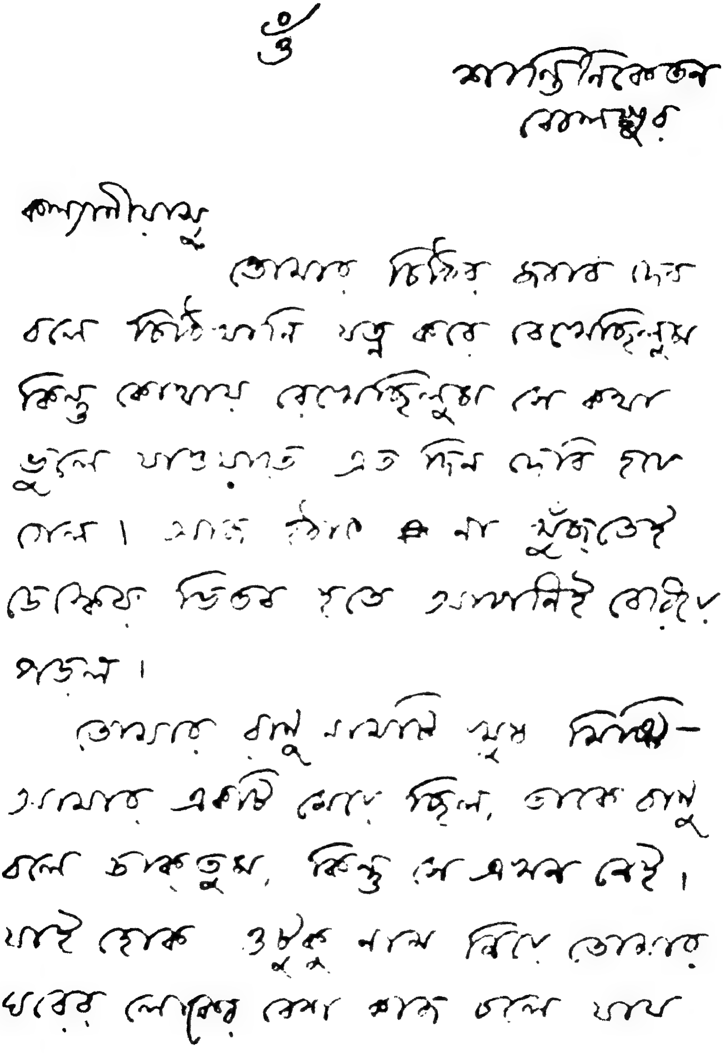

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্ন করে রেখেছিলুম কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এত দিন দেরি হয়ে গেল। এখনো তাকে না খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

তোমার রানু নামটি খুব মিষ্টি— আমার একটি মেয়ে ছিল, তাকে রানু বলে ডাকতুম, কিন্তু সে এখন নেই। যাই হোক ঐটুকু নাম দিয়ে তোমার ঘরের লোকদের বেশ কাজ চলে যায়

রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের
প্রথম পত্রের একটি পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিচিত্র

১

১৯ অগাস্ট ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির[১] জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্ন করে রেখেছিলুম কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এত দিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ না খুঁজ্‌তেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

তোমার রাণু নামটি খুব মিষ্টি— আমার একটি মেয়ে ছিল, তাকে রাণু বলে ডাক্‌তুম, কিন্তু সে এখন নেই।[২] যাই হোক্‌ ওটুকু নাম নিয়ে তোমার ঘরের লোকের বেশ কাজ চলে যায় কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখ্‌তে মুস্কিল ঘটে। অতএব লেফাফার উপরে তোমাকে কেবলমাত্র রাণু বলে অভিহিত করাতে যদি অসম্মান ঘটে থাকে তবে আমাকে দোষ দিতে পারবেনা। বাড়ীর ডাক নামে এবং ডাকঘরের ডাক নামে তফাৎ আছে যদি ভবিষ্যতে চিঠি লেখো তবে সে কথাটা মনে রেখো।

শেখরের[৩] কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার বিয়ে হত কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার ভুল হয়েছিল কিন্তু সে আর তার শোধরাবার উপায় নেই। যে খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সংকার হয়েছিল।

ক্ষুধিত পাষাণে[৪] ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে লোকটা বল্‌তে পারত আজ পর্য্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেলনা।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলবনা— হয়ত তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব— কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখ না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব বলে ইচ্ছা করেছিলুম কিন্তু এমন হতে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড় হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আস্‌তে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয় ত সব ভাল লাগ্‌বে না— তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে শুতে দেবে।

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৭

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোট ছিলুম— তখন আমি ঘন ঘন এবং বড় বড় চিঠি লিখ্‌তুম। তুমি যদি তার আগে জন্মাতে— যদি অনর্থক এত দেরী না করতে, তাহলে আমার চিঠির উত্তরের জন্যে একদিনও

সবুর করতে হতনা। আজ আর চিঠি লেখবার সময় পাই নে— সময় আমার একেবারে চূরমার হয়ে গেছে। কি করে হল বলি। মানুষের বদনাম হলেই শান্তি পায়, কিন্তু আমার হল তার উল্টো। হঠাৎ বিলেতে আমার সুনাম বেরল[১]। বোধ হয় খবরের কাগজে পড়েছ আজকাল এমন সব বড় বড় কামান বেরিয়েচে যার গোলা অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। সমুদ্রপার থেকে সেই রকম সব গোলা আমার সময়ের উপর এসে পড়চে। এই গোলাগুলি আসে চিঠির বেশ ধরে— কত যে তার ঠিকানা নেই। তাই আমার অবকাশ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখতুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখ্‌তে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল। তার পরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হয়ে গেছি। যত বেশি কাজ করতে হচ্চে ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্চে। তুমি যদি আমাদের কাছাকাছি কোথাও থাক্‌তে তাহলে গাড়িভাড়া করে ছুটে গিয়ে মোকাবিলায় তোমাকে জবাব দিয়ে আসতুম তবু কলম ধরতুম না। যখন আমার বয়স সাত, তখন থেকে কেবলি কলম চালিয়ে আসচি এখন ষাট বছরে পড়বার উদ্যোগ করচি, এখনও সেই কলম চলচে। এই জন্যে ঐ কলমটার উপরে আমার অত্যন্ত বিরক্ত ধরে গেছে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে বকে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন সুবিধে হত ত দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে না। সেটা তোমার ভাল লাগত কিনা বল্‌তে পারি নে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তারা কেউ তোমার কথার জবাব করেনা, তুমি যা বল তাই তারা চুপ করে শুনে যায়— আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই— অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যাকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার বড় মেয়ে[২] যখন ছোট ছিল তখন বকুনিতে তার সঙ্গে পারতুম না কিন্তু এখন সে বড় হয়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছে তার পর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে

আমার খুব ইচ্ছা রইল। একদিন হয়ত তোমাদের সহরে যাব। তুমি লিখেচ আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাক্‌তে বলে রাখি আমাকে দেখ্‌তে নারদ মুনির মত— মস্ত বড় পাকা দাড়ি। কিন্তু ভয় কোরো না, আমি তার মতই ঝগড়াটেও বটে কিন্তু ছোট মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভালমানুষটির মত থাকবার আমি খুব চেষ্টা করব— এমন কি, কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তার ঘটকালি করে দেব। ইতি ২১শে ভাদ্র, ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[সেপ্টেম্বর ১৯১৭]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, তোমার সঙ্গে আমার খুব ভাব হবে আমি বেশ বুঝতে পারচি। আমাকে তুমি সুন্দর বলেচ, এতে আমার খুব জাঁক হয়েচে।[১] কিন্তু আমাকে না দেখেই বলেচ বলে ভাবনাও হয়েচে। হয়ত যখন দেখ্‌বে তখন তোমার মত বদ্‌লে যাবে। না হয় বদ্‌লেই যাবে, কিন্তু বাড়িতে যে নিমন্ত্রণ করেচ সে ত আর ফিরিয়ে নিতে পারবেনা। এমন কি, যদি দেরি করেও যাই তাহলেও তুমি অস্বীকার করতে পারবেনা— তোমার চিঠিতে পাকা করে লেখা আছে— সে চিঠি আমি হারাচ্চি নে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিততে পারব না এ আমি আগে থাক্‌তে বলে রাখচি। তোমার মত বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য সাদা কাগজই সব সময়ে খুঁজে পাই নে। তোমাকে ত আগেই বলেচি, আমি কুঁড়ে, তার পরে, আমি ভারি এলোমেলো— কোথায় কি রাখি তার কোনো ঠিকানা পাই নে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। কেউ আমার দেখবার লোক নেই বলেই আমার এই বিপদ ঘটেচে। এই ত গেল চিঠির কাগজের কথা। তার পরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব— চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম অহঙ্কার বজায় থাক্‌বেনা। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁক্‌তে বসা আমার পক্ষে চল্‌বে না— প অক্ষরের পেটের নীচে খণ্ড ত জুড়েও সুবিধে করতে পারলুম না— সেটা এই রকম বিশ্রী দেখ্‌তে হল।

অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না— তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে থেমে যেতে হল— এবারকার মত তোমার হাঁসেরই জিৎ রইল। এই ত গেল ছবি, তার পরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্চে শেষ কালে তুমি রাগ করে আর কোনো গল্প লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে— কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২৩ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

তুমি দেরি করে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল কিন্তু রাগ করতে সাহস হয় না— কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে, দেরী করে চিঠির উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য করতে পার, আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যতরকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমার মত অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখ্‌তে হলে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই— চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মত শক্তি যদি তোমার না থাকে, দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তাহলে একদিন আমার সঙ্গে হয়ত বা তোমার ঝগড়া হতেও পারে— সেই কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু একথা আমি জোর করে বলচি যে, ঝগড়া যদি কোনোদিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘট্‌তে পারে কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যাই হোক আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে আমি খুব ভাল মানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম, রাগ করবার কারণ কি ঘটেচে সে আমি কিছুতে মনে রাখ্‌তে পারি নে। তুমি মনে কোরোনা কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেচি। কর্ত্তব্য করতেও ভুলি, ভুল সংশোধন করতেও ভুলি, সংশোধন করতে ভুলেচি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে

বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখতে চাও তাহলে তোমাকেও অনেক ভুলতে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা। কিন্তু একটা কারণে আমার বিস্মরণশক্তি সম্বন্ধে তোমার অবিশ্বাস হতে পারে— তোমার ঠিকানা[১] আমি ভুলি নি। না ভোলবার একটা কারণ এই যে, দুই তিনে যে পাঁচ (২+৩=৫) হয় এ কথাটা গুরুমশায়ের অনেক মার খেয়ে মনের মধ্যে বসে গেছে। আমার বিশ্বাস আর দশ বছর বাদে আমার বয়স যখন ৬৭ হবে তখনো ওটা ভুলবনা। আর অগস্ত্যাকুণ্ড মনে রাখা খুব সহজ। কেননা পুরাণে পড়েচি অগস্ত্য এক গণ্ডুষে সমুদ্র শুষে খেয়েছিলেন, সেই অগস্ত্য যে আজ কুণ্ড নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন সেটা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খুব মেলে। ওর মধ্যে একটু সান্ত্বনার কথা হচ্চে এই যে তোমাদের নম্বরটা নিতান্ত ছোট নয়।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল কি করে জিজ্ঞাসা করেচ। বোধহয় তার কারণ এই যে বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ করে শুনি, একটিও জবাব দিই নে। আমি এত বেশি শান্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ বলে গণ্যই করে না— আমাকে বোধহয় পাখীর অধম বলেই জানে— কেন না আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক্ ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না— যদি চল্‌ত তা হলে আমাকেই হার মানতে হত— কেননা ওদের ডানাভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে যে এত বড় চিঠি লিখ্‌লুম আমার ভয় হচ্চে পাছে বিশ্বাস না কর যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে— কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি— কাজ যদি না থাক্‌ত তাহলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চল্‌ত না। তোমার কাছে আমার অনেক দোষ ধরা পড়চে— আমি যে কাজ ফাঁকি দিয়ে থাকি এ কথাটাও ফাঁস হয়ে গেল। এ জন্য

তুমি যদি আমাকে তিরস্কার কর তাহলে ভবিষ্যতে তোমাকে খুব ছোট ছোট চিঠি লিখ্‌তে হবে, হয় ত তারও সময় পাবনা। অতএব আমাকে যদি শাসন করতে হয় তাহলে বুঝে সুঝে কোরো।

বেলা অনেক হয়ে গেচে— অনেক আগে স্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল— হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল— তাহলে আজ চল্লুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি ৬ [৫] কার্ত্তিক ১৩২৪[১]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

১৮ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা অনেকদিনের পুরাণো হয়ে গেচে বলে তাকে খাটাতে আর সাহস হয় না। এখনো সে চল্‌চে কিন্তু পুরাণো গরুর গাড়ির চাকা যেমন চল্‌তে চল্‌তে ক্যাঁ কোঁ করে কাঁদতে থাকে এরও সেই দশা। এ দেহটা কাজ করতে করতে অ্যাঁ ওঁ করচেই আর আমি তাকে ছুটি দিই নে বলে আমার উপর রাগ করচে। এই সকল কারণে, মন যখন চিঠির জবাব দিতে চায় মগজ তখন সাড়া দেয় না। কিন্তু তোমার মত ছোট মেয়ের সঙ্গে চিঠি লেখায় হার মান্‌ব এটা আমার সহ্য হয় না বলেই এখনো চিঠির জবাব পাচ্চ— কিন্তু মাঝে মাঝে লম্বা ফাঁক পড়ে যাচ্চে। তুমি জিজ্ঞাসা করেচ আমার এত কি কাজ। আমি তার একটা ফর্দ্দ দিই।

১। চিঠি
২। চিঠি
৩। চিঠি
৪। চিঠি
৫। চিঠি
৬। চিঠি
৭। চিঠি
৮। চিঠি
৯। চিঠি
১০। জানালার কাছে বসে থাকা
১১। জানালার কাছে বসে থাকা
১২। জানালার কাছে বসে থাকা
১৩। জানালার কাছে বসে থাকা
১৪। জানালার কাছে বসে থাকা
১৫। ছাতের উপর বসে থাকা
১৬। ছাতের উপর বসে থাকা
১৭। ছাতের উপর বসে থাকা
১৮। ছাতের উপর বসে থাকা
১৯। চিঠি ছাড়া অন্য কিছু লেখা
২০। সেই লেখা সংশোধন
২১। সেই লেখা পড়ে শোনানো
২২। সেই লেখা কাগজে মোড়া
২৩। সেই লেখা ডাকে পাঠানো
২৪। সেই লেখা ছাপার অক্ষরে পড়া
২৫। সেই লেখার সমালোচনা পড়া
২৬। আরো সমালোচনা পড়া
২৭। সেই লেখা সম্বন্ধে অনুতাপ করা

এই ত সাতাশ দফা ফর্দ্দ দিলুম।[১] শুনেচি তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে অঙ্ক কষ্‌তে পার। তুমি হয়ত হিসাব মিলিয়ে ঐ ২৭ থেকে ২টা রেখে ৭টা বাদ দিয়ে বল্‌বে আমি কেবল লিখি আর কুঁড়েমি করি। অর্থাৎ কাজ আর অকাজ এই দুটি মাত্র ভাগে আমার দিন বিভক্ত। আর এটাও তুমি নিশ্চয় সন্দেহ করবে, কাজের চেয়ে অকাজের অংশই বেশি— পৃথিবীতে যেমন স্থলের চেয়ে জল। কিন্তু আমার কুঁড়েমিটাকে তুমি যে তুচ্ছ বলে কাজের চেয়ে ছোট করে দেখ্‌বে এটা আমার সহ্য হবে না। রাত্রিতে পৃথিবী দেখা যায় না কিন্তু তবু পৃথিবীটা থাকে তেমনি আমার কুঁড়েমির মধ্যে আমার কাজটা অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু তবু সে থাকে। যা হোক্‌ এ সব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা তর্ক করার চেয়ে তর্ক না করাতে অনেক পরিশ্রম বাঁচে— এই পরিশ্রম বাঁচানোর উপায় বের করাই আমার এখনকার সর্ব্বপ্রধান ভাবনা।

আজ এই পর্য্যন্ত। নীচের ঘরে বিস্তর লোক এসে জমেচে— তাদের প্রধান কাজ হচ্চে আমাকে কাজ করতে না দেওয়া এবং কুঁড়েমি করতেও বাধা দেওয়া। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এত অল্পেতেই তুমি আড়ি করতে প্রস্তুত, এটা ত বড় ভয়ের কথা। বিশেষত আমার মত অক্ষম এবং কুঁড়ে এবং ঢিলে লোকের পক্ষে। আমার যদি তোমার বয়স থাক্‌ত তা হলে দেখ্‌তুম চিঠি লেখায় তুমি কেমন আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে। তা হলে উল্টে আমিই বেশ পেট ভরে মনের সুখে তোমার সঙ্গে আড়ি করতে পারতুম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের কথাটা একবার শোনো— তুমি জন্মাবার কয়েক বৎসর পরেই আমি পঞ্চাশ বছর পার হলুম— তাতেও একরকম চলে যাচ্ছিল, তারপরে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করবার কয়েক মাস পরেই আমার শরীর গেল বিগ্‌ড়ে। শরীরকে দোষ দিই নে— অনেকদিন ওকে অনেক খাটিয়েচি— যত বেতন দিয়েচি তার চেয়ে কাজ আদায় করেচি ঢের বেশি— সুতরাং আজ ও যখন কাজে জবাব দিতে চায় তখন ওকে দোষ দিই নে। দোষ আসলে তোমার। তুমি সেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেইচ তখন না হয় আর ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেই জন্মাতে। ঢিলেমি করে তুমিই করলে দেরি অথচ আড়ি করবার বেলায় তোমারই উৎসাহ। যাই হোক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, তোমার আড়ি বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করব। আড়িকে বড় ভয় করি।

ডাক্তার আমাকে বলেচে খুব ভাল মানুষের মত চুপচাপ করে পড়ে থাক্‌তে। কিন্তু মন যে দুরন্ত। কে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চুপ করিয়ে রাখ্‌বে বল দেখি? তোমার বয়সী এবং তোমার চেয়ে ছোট বয়সের বন্ধু যারা আমার আছে, যারা আমাকে গল্প করে শান্ত করিয়ে রাখ্‌তে পারত

তাদের কাউকে ত হাতের কাছে পাই নে। তুমি ত আছ কাশিতে— আবার, আর কেউ কেউ আছে একেবারে সমুদ্রের ও পারে। তোমার চেয়ে বড় বয়সের বন্ধু যারা আমার আছে তারা নিজেরা বিশেষ কিছু বল্‌তে চায় না, আমাকেই বলাতে চায়, আমার ডাক্তার এইসব লোকেদের সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে দিয়েচে। বলেচে ওরা যে দেশে আছে সে দেশ থেকে যেন বাসা উঠিয়ে চলে যাই। কোথায় যাই বল দেখি? তোমার ওখানে যাব মনে করি— কিন্তু যেতে হলে, শুধু কেবল মনে করা ছাড়াও আরো অনেক কিছু করতে হয়— এই জন্যেই পৃথিবীতে যেটুকু করা হয় তার চেয়ে করা হয় না অনেক বেশি। তোমার কাছে বসে গল্প শুন্‌ব সেটাও হয়ত আমার জীবনে সেই অসংখ্য না-হওয়ার ফর্দ্দের মধ্যে পড়ল। কিন্তু বলা যায় না— কোন্‌দিন হয়ত তোমাদের বাড়ির দরজায় দমাদ্দম ঘা মেরে চীৎকার করে বল্‌ব— "রাণু, রাণু, রবিবাবু এসেচে।" ইতি
৮ ফাল্গুন ১৩২৪

তোমার প্রাচীন বন্ধু
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭
১৫ এপ্রিল ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমাদের বইয়ে বোধহয় পড়ে থাক্‌বে, পাখীরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্চি সেই জাতের পাখী। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড়

করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করচি।[১] যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহলে বেরিয়ে পড়ব। পশ্চিম দিকের সমুদ্র পথ আজকাল সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না তলার দিকেই টানে[২]— পূর্ব্ব দিকের সমুদ্র পথ এখনো খোলা আছে— কোন্‌দিন হয়ত দেখ্‌ব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁচেছে। যাই হোক তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ যে ভুলেচি তা মনে কোরো না; তুমি আয়োজন ঠিক করে রেখো, আমি কেবল একবার পথের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ করে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম করে বস্‌ব— আমার জন্যে কিন্তু ছাতু কিম্বা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাট্‌নির বন্দোবস্ত করলে চল্‌বে না, তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভাল রাঁধে কিন্তু তুমি নিজে স্বহস্তে শুক্‌তনি থেকে আরম্ভ করে পায়স পর্য্যন্ত যদি রেঁধে না খাওয়াও তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই আমি— কি করব এখনো তা ঠিক করিনি— ভাব্‌ছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্ত্তেই আবার অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যাব— কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্‌ব কিনা একটু একটু সন্দেহ আছে সেই জন্যে এখন কিছু বল্লুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয় নি বুঝি? তাই বল! কেবলি পড়া মুখস্থ করেচ? আচ্ছা অন্তত এক বছর সময় দিলুম— এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহলে সেই কথা রইল। আপাতত আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেল্লা চাই। আমি খুব ভাল গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে— প্রধান প্রধান দরকারী জিনিসগুলো প্যাক করতে প্রায়ই ভুলে যাই— যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময়ে দেখি তাদের আনা হয় নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে হয়— কেন না বাক্সর মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়— আর বোঝা কম হওয়াতে রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিস না নিয়ে অদরকারী জিনিস

সঙ্গে নেবার আর একটা মস্ত সুবিধে হচ্চে এই যে, সেগুলো বারবার বের করাকরির দরকার হয় না— বেশ গোছানোই থেকে যায়— আর যদি হারিয়ে যায় কিম্বা চুরি যায় তাহলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিম্বা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখবার সময় নেই— কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। গাড়ি ফেল্ করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার আছে— কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না। অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট্ কিন্‌তে দৌড়লুম। ইতি ২ বৈশাখ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

১০ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

ইষ্টেশন থেকে ফিরে এসেচি।[১] স্নান হয়ে গেছে, খাওয়াও হয়ে গেছে। একটা বেজে গেল। তুমি আমাকে খাওয়ার পর শুতে বলে গেছ— বিছানা তৈরি আছে। শুতে যাবার আগে সেই আমার কোণের ডেস্কের সাম্‌নে বসে তোমাকে দু লাইন লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচি। ছেলেরা কে আমার ডেস্কের উপর দুটো কেয়াফুল রেখে গিয়েচে— আর, একটি ফুলের তোড়া দিয়ে গেচে হরিশ মালী।[২] আজ তাকে বারণ করে দিয়েছিলুম বলে সেই সাদা পাতা দিয়ে তোড়া সাজায় নি। লাল জবা এবং সাদা টগর ফুলে বেশ দেখ্‌তে হয়েচে। তোমরা গেছ চলে, আর এখান থেকে আমাদের হাওয়া নিয়ে গেছ— গাছের একটি পাতা নড়চে না— গরমে সমস্ত আকাশটা

যেন পৃথিবীর উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ধুঁকচে। অথচ রোদ্দুর নেই, আকাশ মেঘে ঢাকা,— জগৎটাকে মনে হচ্চে যেন জ্বরের রোগী, কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। তার পরে যেমন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তেমনি হয়ত বিকেলের দিকে বৃষ্টিবাদল হয়ে গরম কেটে যাবে। আমি কোথায় আছি কি করচি তা তুমি অনায়াসে কল্পনা করতে পারবে— কিন্তু এতক্ষণে গাড়ির মধ্যে তুমি যে কি করচ তা ঠিক চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি নে— তোমার চিঠি পেলে জান্‌তে পাব।[৩] আশা করচি লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে, গল্প করে, গাড়ির জান্‌লা থেকে পাহাড়গুলো দেখে তোমার দিন কেটে যাচ্চে। দেখ, তুমি আমাকে বলে দিয়েচ বলে আমি যথাসাধ্য খেয়েচি, শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করব কিন্তু ঘুম হবেনা, বিকেলে আজ কোনোমতেই চেঁচিয়ে বক্তৃতা করবনা— রাত্রে সকাল সকাল শুতে যাব। কিন্তু তুমি যদি বেশ করে খেয়ে দেয়ে মোটাসোটা হয়ে না ওঠ, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। যাবার আগে তোমাকে একটু গান শুনিয়ে দিয়ে শুতে যাই—

ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু—
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।"

ইতি ২৬ আষাঢ় ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেয়াফুলের কেশর চিঠির মধ্যে একটু একটু পাবে।

৯

১৪ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

মনে করেছিলুম কাল তোমার চিঠি পাব। কালই পাওয়া উচিত ছিল। পোষ্ট্ আপিসে কালই নিশ্চয় এসেছিল, কিন্তু পোষ্ট্‌মাষ্টারের অসুখ করেচে বলে পশ্চিমের ডাক কাল আমাদের দেয় নি আজ সকালে দিয়ে গেছে। তোমাদের পথের খবর জানবার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। আজ সকালে তোমার চিঠি[১] পেয়েই বুঝেছিলুম কার চিঠি। তখন কি করছিলুম সেই কথাটা আগে বলি। কাল রাত্তির যখন আড়াইটা তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে— তার পরে বরাবর বৃষ্টি চল্‌চেই— চারদিকের মাঠে জল বয়ে যাচ্চে, আকাশ জলে ঝাপ্‌সা, মেঘের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এমন ঘোর বাদলায় ক্লাস হওয়া অসম্ভব, তাই এই সুযোগে এণ্ড্রুজ সাহেব[২] তার খাতা নিয়ে সকালেই আমার কাছে হাজির, তাকে "ঘরে বাইরে" তর্জ্জমা করে যাচ্চি সে লিখে নিচ্চে।[৩] আমি যে-কোণে বসে লিখে থাকি সে-কোণ আজ অন্ধকার, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাঁট আস্‌চে, তাই আমার শোবার ঘরের পূব দিকের জান্‌লার কাছে বসে বকে যাচ্চি আর এণ্ড্রুজ একটা তাকিয়ার উপরে চড়ে বসে লিখ্‌চে এমন সময় ডাকের চিঠি এল। কাল তোমার চিঠি না পেয়ে ভাবছিলুম আজ সকালে চিঠি পাবনা, দুপুরের ডাকে পাব— তাই চিঠিগুলো না দেখেই পাশে ফেলে রেখে কাজ করতে লাগলুম.— কিন্তু একটু বাদেই মনটা উতলা হল— একবার লেফাফার উপর চোখ বুলিয়ে দেখ্‌তেই তোমার হাতের অক্ষর চোখে ঠেক্‌ল। এণ্ড্রুজকে বল্লুম, "একটু রোস, আমার চিঠি পড়ে নিই।" তোমার চিঠিখানি পড়লুম। রেলের পথে তোমার মন যে খারাপ হয়ে ছিল সেই পড়ে আমার বড় কষ্ট হল।

তুমি মনে কোরো না আমি বুঝতে পারি নি। সেই বুধবারের দিন[৪] যখন তোমার গাড়ি চল্‌ছিল, আর আমি যখন চুপটি করে আমার কোণে, এবং সন্ধ্যাবেলায় আমার ছাদে বসে ছিলুম তখন তোমার কষ্ট আমাকে বাজ্‌ছিল। আমি মনে মনে কেবল এই কামনা করছিলুম, যে বাদলের উপরে সূর্য্যের আলো পড়ে যেমন ইন্দ্রধনু তৈরি হয়, তেম্‌নি করে তোমার অশ্রুভরা কোমল হৃদয়ের উপরে স্বর্গের পবিত্র আলো পড়ুক, সৌন্দর্য্যের ছটায় তোমার জীবনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পূর্ণ হয়ে উঠুক্। যাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ ফুলের মত বিকশিত হয় এবং সমস্ত দুঃখ ফলের মত কল্যাণপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাঁরই আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনের সকল সুখ দুঃখকেই সৌন্দর্য্যে এবং মঙ্গলে সার্থক করে তুলুক্। আমি আমার জীবনকে তাঁরই কাজে উৎসর্গ করেছি— সেই উৎসর্গকে তিনি যে গ্রহণ করেচেন তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নানা ইসারায় জানিয়ে দেন— হঠাৎ তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেচ, তোমার উপরে আমার গভীর স্নেহ তাঁর সেই ইসারা। এই আমার পুরস্কার। এতে আমার কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভগবান তাঁর সেবককে খুসি হয়ে মাঝে মাঝে দেবতার অমৃত পান করিয়ে দেন— তাতে আমাদের শক্তি বেড়ে যায়, অবসাদ দূর হয়। সেই অমৃত তিনি তোমাকে দান করুন— তুমি নূতন শক্তিতে জীবনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাও— তোমার চারিদিককে আনন্দময় কর।

এণ্ড্রুজকে বল্লুম, আজ আর লেখা চল্‌বে না। তাকে বিদায় করে দিয়ে আমার সেই কোণ্‌টিতে ফিরে এসে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেছিলুম। ইতিমধ্যে বৃষ্টি ধরে গেল। তখন মনে পড়ল, কাল এক দল গুজরাটি অতিথি আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েচেন। সঙ্গে তাঁদের মেয়েরা আছেন, ছোট ছোট ছেলেও অনেকগুলি। তার মধ্যে চারটি ছেলেকে তাঁরা এখানে

ভর্ত্তি করে দিয়ে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাঁরা বেণুকুঞ্জ* পরিপূর্ণ করে আছেন। আমাকে তাঁদের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় আলোচনা করতে হয়েছিল। ভাগ্যে, তুমি কিম্বা শান্তি* সেখানে উপস্থিত ছিলেনা তাই “কে” এবং “কো” এবং “নে” এবং হুয়ী হৈ ও হুয়া হৈএর উপর দিয়ে নির্ম্মমভাবে আমার জাপানী চটিসমেত হু হু করে চলে গেলুম— ওঁরাও দেখলুম প্রসন্ন মনে সয়ে গেলেন, পুলিসে খবর দিতে ছুটলেন না। বোধ হয় ক'দিন তোমাদের কাছে সেইসব হিন্দী দোঁহা শুনে শুনে আমার অনেকটা উন্নতি হয়েছে— সেইজন্যে আজ এইসব ভারী ভারি [য] জোয়ান মাড়োয়ারীদের সঙ্গে আধঘণ্টাকাল অনর্গল হিন্দী বলেও একটা ফৌজদারী বাধ্‌ল না, শান্তিনিকেতনের শান্তি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। এমনি করে হিন্দী ভাষার উপরে ঘোরতর দৌরাত্ম্য করে যখন ফিরে আসচি এমন সময় এণ্ড্রুজ সাহেব আবার তার “ঘরে বাইরে” এবং খাতাপত্র হাতে আমার পিছন পিছন আমার ঘরে এসে হাজির হল। বেলা দুপুর পর্যন্ত তাকে সেই “ঘরে বাইরে” মুখে মুখে তর্জ্জমা করে যেতে হল। তার পরেও তার যাবার ইচ্ছা ছিলনা— আমি নেহাৎ জোর করে উঠে নাইতে চলে গেলুম। আজ নাইতে তাই অনেক বেলা হয়ে গেল। কিন্তু আজ যে রকম বাদলা, আজকের দিনে বেলার ঠিক পাওয়া যায় না। আকাশের ঘড়িতে সূর্য্যদেব কাঁটার মত পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সময় ভাগ করে চলেন— কিন্তু আজ সেই আকাশ-ঘড়ির ডালা বন্ধ— সেইজন্যে মনে হচ্চে যেন সময় চল্‌চেনা। আজ খাওয়ার পরে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এই চিঠি লেখা শেষ না করে আমি শুতে যাবনা— এতে তুমি যদি রাগও কর তাহলেও আমি মানবনা। আমি তোমার নিয়ম প্রায় সবই মেনে চল্‌চি। সেই অবধি আমি সভা করিনি— সকাল সকাল শুতে যাই। বিকেলে oat meal এর সঙ্গে মিলিয়ে একটু করে দুধও খেতে আরম্ভ করেচি। চুল নিজে নিজে যতটা পারি আঁচড়াই কিন্তু সে ভাল হয় না। এর মধ্যে একদিন কেবল ছেলেরা

আমার কাছে আমার কবিতার ব্যাখ্যা শুন্‌তে এসেছিল, তোমার কথা মনে করে আমি কেবল একটা কবিতা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলুম, সেও জোরে নয়; তারা আর একটা যখন শুন্‌তে চাইলে আমি তাদের কথা শুন্‌লুম না; তাই ত সেদিন আমি শ্রান্ত হইনি। আমি যেমন তোমার কথা শুনেচি, তোমাকেও তেমনি আমার কথা শুন্‌তে হবে। ভাল করে দুধ খেয়ে বিশ্রাম করে আগামী পূজোর ছুটির মধ্যে বেশ মোটা সোটা হয়ে (দিনুবাবুর[7] মত অতটা নয়) আস্‌তে হবে। তোমাকে শ্রীমতী রাণু যাতে না বলি এই তোমার ইচ্ছে— কিন্তু আমাকে যদি "প্রিয় রবিবাবু" বলে চিঠি লেখ তাহলে আমি তোমাকে শ্রীমতী রাণু দেবী পর্য্যন্ত বল্‌তে ছাড়ব না। তুমি আমাকে যদি রবিদাদা বল তাহলে আমার নালিশ থাক্‌বে না। তুমি তোমার এক সন্ন্যাসী দাদাকে বশ করেছিলে, এখন তাঁর পদটা তিনি আমার উপর দিয়ে গেছেন— তোমার সম্ভাষণে তুমি সে কথা যদি বিস্মৃত হও তাহলে চল্‌বে না। তুমি আমাকে বেশ বড় চিঠি লিখেচ, আমিও বড় চিঠি লিখ্‌লুম। তোমার কাছে অঙ্কে এবং ভূগোলে আমি পারব না, কিন্তু তাই বলে লেখায় তোমার কাছে যদি হার মানি তাহলে আমার নোবেল প্রাইজ ফিরিয়ে নেবে। আশাকে[8] শান্তিকে ভক্তিকে[9] আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো। তোমার বাব্‌জাকে[10] বোলো তাঁর শরীর কেমন থাকে আমাকে যেন জানান্ এবং পূজোর ছুটিতে কিম্বা তার পূর্ব্বেই আমাকে যেন দর্শন দেন, শুধু একলা নয় সে কথা তাঁকে না বল্লেও বুঝবেন। তুমি যেমন বৌমার[11] উপরে আমার ভার দিয়ে গেছ তেমনি ছুটি পর্য্যন্ত আমি তোমার মা'র[12] উপর তোমার ভার দিলুম, সেটা তিনি যেন মনে রাখেন; এবার যখন তিনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন তখন তোমাকে এবং আমাকে ওজন করে পরীক্ষায় বৌমা প্রথম হন কি তোমার মা প্রথম হন তার বিচার হবে। এই পরীক্ষায় বাংলাদেশের গৌরব বেশি কিম্বা কাশীর গৌরব বেশি আমাদের উভয়ের গুরুত্ব অনুসারে সেইটে স্থির হয়ে যাবে। এত

বড় দায়িত্ব যখন তোমার উপরে আছে তখন যত পার দুধ খেতে ছেড়ো না। আমার এমন অবস্থা হবে কে দিনবাবু কে রবিবাবু হঠাৎ চেনা শক্ত হবে। ইতি ৩০ আষাঢ় রবিবার। ১৩২৫

তোমার
রবিদাদা

১০
১৫ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

একটা রঙীন কাগজ জোগাড় করেচি। মনে কোরোনা বৌমা দিয়েচেন। তাঁকে যখন বলি, "মনে আছে ত রাণু তোমাকে রঙীন চিঠির কাগজ আনিয়ে দিতে বলে দিয়েচে," তিনি কেবল হাসেন। তুমি ত জানই এই রকম সব গম্ভীর কথা বল্‌তে গেলে তিনি কোনোমতেই গম্ভীরভাবে নেন না। ঐ জন্যে তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েচি। যাই হোক্ এই কাগজের রং যদি তোমার পছন্দ হয় তা হলে কিছুদিন চালাতে পারব। কিন্তু তোমার চিঠির কাগজের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না।

আমার জন্যে মন কেমন করতে দিয়োনা রাণু। আমি তোমার কথা কত ভাবি। তুমি সুখে থাক্‌বে, সকল রকমে তোমার কল্যাণ হবে এই ইচ্ছা আমার মনে জেগে আছে। আমার মন ত তোমার কাছেই আছে। আমার মধ্যে যা ভাল তাই তোমার ভাল কামনা করচে। যিনি অন্তর্যামী হয়ে নিয়ত তোমার অন্তরে আছেন— তিনিই আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদকে

এবং আনন্দকে তোমার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিচ্চেন।

পথের থেকে যে চিঠি লিখেছিলে সেটা কাল পেয়েছিলুম। তার উত্তর দিয়েচি। আজ যেটা কাশী থেকে লিখেচ[১] সেটাতে ছোট বউ গাবলোর বউ[২] প্রভৃতির মঙ্গল সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচি। তোমাদের কাশীতে গরম; এখানেও মন্দ গরম না। যদিও কাল খুব ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ রৌদ্রে সব শুকিয়ে গেছে।

এতক্ষণ দুপুর বেলায় তোমার পরামর্শমত খাবার পর অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে কাটিয়েচি। খানিকটা ঘুমিয়েচি খানিকটা বই পড়েচি। এমন সময় আমার ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজ্‌ল। অমনি ধড়ফড় উঠে পড়ে আমার সেই কোণে এসে তোমার চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। আজ আমার ডেস্কের উপরকার ফুলদানীতে কেবল কদম ফুল সাজিয়ে দিয়ে গেচে— আমি চেষ্টা করব তোমাকে তার একটা ছবি এঁকে দিতে। এর আগের চিঠিতে তুমি আমাকে যে সব ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলে তার জবাব দেওয়া হয়নি— ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্ এবার তার জবাব দিতে হবে।

একটা কথা তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই। তুমি বলেচ কেউ আমাকে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে সাতাশ বল্‌তে।[৩] আমার ভয় হয় পাছে লোকে সাতাশ শুন্‌তে সাতাশি শুনে বসে, আর সেইটেই সহজে বিশ্বাস করে বসে। সেইজন্যে, তুমি যদি রাজি থাক তাহলে আমি আর একটা বছর কমিয়ে বল্‌তে পারি। কেন না ছাব্বিশ বল্লে ওর থেকে আর কিছু ভুল করবার ভাবনা থাকেনা।

এইবার আমার বই লেখবার সময় এল। সেই সুভাকে[৪] নিয়ে পড়তে হবে। পিগ্‌মিদের গল্পটার থেকে লেখা শেষ করেচি।[৫] আমার সেই পঞ্চম ক্লাস মনে আছে ত? কেমন মজা? সেই সমরেশ[৬] জ্যোতিষ[৭] আভাসরা[৮] তেমনি করেই সবাই মিলে চীৎকার করে— রাস্তা থেকে তাদের গলা শুন্‌তে পাওয়া যায়। ঐ ক্লাসটা আমার বেশ লাগে। থার্ড ক্লাসের ছেলেরাও

ক্রমে ক্রমে একটু উন্নতি করচে। ইতি ৩১ আষাঢ় ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
রবিদাদা

১১
১৭ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আজ সকালে বুধবারের উপাসনা ছিল। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই তোমার চিঠি পেলুম। আমি ছোট চিঠি লিখেচি বলে তুমি নালিশ করেচ। কিন্তু একটা কথা তোমার ভেবে দেখা উচিত— তুমি বোলপুর ষ্টেশন থেকে বরাবর কাশী পর্য্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ধরে নতুন নতুন দৃশ্যের ভিতর দিয়ে নানা কথায় তোমার চিঠি ভরেচ— আর আমি বেচারা চুপ করে সেই একটি কোণে বসে এমন কি লিখ্‌তে পারি যা তুমি জাননা। আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত হচ্চে, শোবার ঘর থেকে কোণের ডেস্ক, কোণের ডেস্ক থেকে ক্লাস, ক্লাস থেকে নাবার ঘর, নাবার ঘর থেকে খাবার ঘর, খাবার ঘর থেকে শোবার ঘর, শোবার ঘর থেকে কোণ, কোণ থেকে ছাদ, ছাদ থেকে আবার শোবার ঘর। এ সমস্তই তোমার জানা। আজ এখন সকাল নটা বেজেচে। আমার সাম্‌নে ফুলদানীতে বেলফুল, জবাফুল এবং একরকম বিলিতি হল্‌দে ফুলে তোড়া বেঁধে দিয়েচে। লাল সাদা এবং হল্‌দেতে মিলে বেশ দেখতে হয়েচে। আমার ডান পাশের শেল্ফের উপর ছেলেরা একটা কেয়া ফুল রেখে দিয়েচে তারই গন্ধে আমার কোণ ভরে গিয়েচে।

আর লাবু[১], লাবুকে মনে আছে?— লাবু একটা ছোট রজনীগন্ধার মালা গেঁথে এনে দিয়েছে— সেটাও আমার ডেস্কের উপরে পড়ে আছে। পিঠের কাছে পশ্চিমের জান্‌লা খোলা আছে, সেইখান থেকে ঝুর ঝুর করে হাওয়া আস্‌চে। এই পশ্চিমের হাওয়া কোথা থেকে আস্‌চে বল ত রাণু? কাশী থেকে কি? কাশীতে এখন তোমাদের খুব গরম এবং গুমট— বোধ হয় কিচ্ছু হাওয়া নেই। কিন্তু তুমি যে মাঝে মাঝে আমার কথা ভাবচ তোমার সেই ভাবনার হাওয়া বোধ হয় আমার পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে ঢুকে আমাকে পাখা করচে।

তুমি এখন অল্প অল্প করে পড়চ, তিনবার করে দুধ খাচ্চ শুনে খুসি হলুম। বৌমার মত মোটা হওয়া চাই। আর যাই কর, হিন্দী দোঁহা মুখস্থ করা একেবারে ছেড়ে দিয়ো— সেই তোমাদের "ছল ছল ছৈল সুছাম" এম্‌নি শুক্‌নো, যে ওর পরে তিন বাটি দুধ খেয়েও কিছু সুবিধে হবেনা। বরঞ্চ তোমার লটিকে তোমার হিন্দী গুরুজির কাছে ভর্ত্তি করে দিয়ো। ওর গাল দুটো এত ফুলো, যে, দোঁহা আওড়াতে আওড়াতে যদি একটুখানি রোগা হয় তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। ভক্তিকে বোলো তার বন্ধুর দল মোটের উপর ভালই আছে, কেবল দিনু বাবুর কাল জ্বর হয়েছিল আজ কুইনীন্ খেয়ে চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছে। হাঁ, একটা কথা মনে রেখো— সন্ধ্যাবেলায় রোজ তোমাকে গান কিম্বা সেতার কিম্বা বীণা কিম্বা ঐ রকম কিছু একটা শিখ্‌তে হবে। বাব্‌জাকে বোলো একটা উপায় করে দিতে।[২]

ইতি ১লা শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১২

২১ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আজ একদিনে তোমার দুখানি চিঠি পেলুম। আজ অন্য অনেক দরকারী চিঠি জমেছিল, তার কতকগুলো লিখেচি আরও কতকগুলো লিখ্‌তে হবে— তারই মাঝখানে তোমাকে লিখে নিচ্চি, নইলে হয় ত আজকের ডাকে চিঠি যাবে না। তোমাদের ওখানে এবং এখানে ডাকওয়ালাদের সকলের প্রায় অসুখ হয়েচে, তাই ডাক যেতে আস্‌তে এত দেরি হয়। আমাদের ইস্কুলেও সেই জ্বর[1] এসে পড়েচে। কিন্তু অন্য জায়গার মত তেমন প্রবল নয়। অনেক ছেলেই এখন হাঁসপাতালে গেছে। আজ দুপুর বেলায় আর শুতে গেলুমনা— গেলে তুমি আজ আর আমার চিঠি পেতে না— কাজেই তোমার আর রাগ করবার জো নেই। কিন্তু একটা সুবিধে এই যে আজ তেমন গরম নয়। কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল— তখন নীচের সেই পূবদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম— আমার আর সব খাওয়া হয়ে গিয়ে যখন চিঁড়ে ভাজা খেতে আরম্ভ করেছি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে এই সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল— যদি আমি তোমাদের কাশীর কোনো হিন্দুস্থানী মেয়ে হতুম (সেই যার কুঁজ আছে আর যে নাইয়ের নীচে কাপড় পরে তার মত নয়) তাহলে কজ্‌রী গাইতে গাইতে সেই শিরীষ গাছের দোলাটাতে দুল্‌তে যেতুম। কিন্তু এণ্ড্রুজ কিম্বা আমি, আমাদের দুজনের কারো, হিন্দুস্থানী মেয়ের মত আকৃতি প্রকৃতি কিম্বা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কজরী গান জানে না,

আমিও যা জান্‌তুম ভুলে গেছি। তাই দুজনে মিলে উপরে আমার ছাদের সাম্‌নেকার বারান্দায় এসে বস্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘন বৃষ্টি নেমে এল— জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় করে বেড়াতে লাগ্‌ল— আমার ছাতের সাম্‌নেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধরে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগ্‌ল। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হয়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগ্‌তে আরম্ভ হল, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ পড়ল। আমার মনে হল বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের[২] বাসার দিকে ছেলেরা ছুট্‌চে। সেই বাড়িতেই বাজ পড়েছিল। তখন তাঁর বড় মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখ্‌তে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উড়তে আরম্ভ হয়েচে। তারা ত সব চালের উপর চড়ে জল জল করে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভরে ভরে এনে চালের আগুন নিবিয়ে ফেল্লে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ির কাউকে আঘাত লাগে নি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোসকা পড়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয় না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে করে করে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল, আর দূরের কূয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জল ভরা ঘড়া এনে উপস্থিত করতে লাগল। ওরা যদি না দেখ্‌ত এবং না এসে জুট্‌ত তা হলে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ড হত। এম্‌নি করে কাল অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়বাদল হয়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে— হয়তো আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি সুরু হবে। যাই হোক্ আজ তেমন গরম নেই বলে আজ দুপুর বেলায় বিশ্রাম না করলেও তেমন ক্লান্তি হবে না। বৌমা এখনো আমাকে রঙীন কাগজ আনিয়ে দেন নি তাই আমার সেই ছোট কাগজেই লিখ্‌চি। কিন্তু যাই বল

এঁকে তাই বলে ছোট কাগজ বলে না— এ ত লম্বায় প্রায় আমার সমান, আবার আমার অক্ষরগুলো ছোট ছোট, প্রায় ভক্তির মত। এ কাগজে আর জায়গা নেই অতএব আর একটা কাগজে একটা ছবি এঁকে দিই। আমার এ ছবির দাম কিন্তু পাঁচ ডলারের চেয়ে অনেক বেশি, তা আগে থাক্‌তে বলে রেখে দিলুম। ইতি ৫ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৩

[২৩ জুলাই ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ সকালে তোমার একখানি চিঠি পেলুম। তখনও আমি পড়াতে যাই নি। আমার সেই কোণে বসে বসে পাঠ তৈরি করছিলুম। তার আগেই আমার সকালের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কি কি খেয়েছিলুম, শুন্‌বে? একটা বড় ফজ্‌লি আম— সেটা একটা ছোটখাটো কুম্‌ড়ো বল্লেই হয়। তার পরে একটা ডিম এবং রুটি টোস্‌ট্‌। তার পরে তিনটে কলার সঙ্গে মেখে দু চামচ স্যানাটোজেন— তার পরে এক পেয়ালা দুধ। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আমার এই খাওয়ার সঙ্গে তোমার সকালের খাওয়ার তুলনা হয়? তুমি ত পাঁচটার সময় উঠেই স্কুলে দৌড়ও— কি খাও, কখন্‌ খাও, এবং কতটুকুই বা খাও? তবু আমার খাওয়া নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া কর? দেখ্‌চি তোমার ঝগড়াটে স্বভাব।[১] আমার ভারি ভয় হচ্চে পাছে আমার লটি[২] তোমার সঙ্গে থেকে তোমার মত মেজাজ পেয়ে বসে। এখন ত সে বেচারা ভালমানুষ, মুখে কথাটি নেই— হয় ত কোন্‌ দিন,

আমি তার মত গাল রং করি নে বলে আমার সঙ্গে আড়ি করতে যাবে। আমি নিতান্ত ভালোমানুষ, তোমাদের সঙ্গে দুধ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করে আমি কোনোদিন পেরে উঠবনা। বিশেষত তুমি আবার বেশ একটি দলের লোক পেয়েচ। আচ্ছা বৌমাকে জিজ্ঞাসা কোরো দেখি তিনি ক'সের করে দুধ রোজ খেয়ে থাকেন। তিনি যে আমার নামে তোমার কাছে লাগালাগি করেন, তিনি বলুন দেখি, তিনি কি আমাকে রঙীন চিঠির কাগজ আনিয়ে দিয়েচেন? চুল আঁচড়ানোর নিন্দা করা সহজ কিন্তু নিজে নিজে কি ভাল করে চুল আঁচড়ানো যায় সে কথাটাও ভেবে দেখা উচিত। যাক্ এই সব সামান্য কথা নিয়ে মাথা গরম করব না। তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখ্‌তে বলেচ কিন্তু বৌমা কি সহজে শেখাবেন? তাঁর নিজের বিদ্যা অত সহজে কি দিয়ে ফেল্‌বেন? তবু তুমি তাঁকে একবার চিঠিতে অনুরোধ করে দেখো, যদি তোমার কথা শোনেন। দেবল[৩] তোমার সেই মূর্ত্তি একটু আরম্ভ করেই মাদ্রাজে চলে গিয়েছিল। বেচারা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার সেই মাটির তালটা পড়ে আছে কিন্তু সজীব মানুষটি কোথায় পালিয়েচে। দেবল ভেবেছিল, তুমি থাক্‌বে, তোমার মূর্ত্তি শেষ করে দিয়ে কোনো একটা মন্দিরে তার প্রতিষ্ঠা করবে— এখন হতাশ হয়ে আবার মাদ্রাজে ফিরে যাবার উদ্যোগ করচে।— কাল সন্ধ্যাবেলায় এখানে ছোটখাট একটু ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি যত হয়েচে তার চেয়ে বাতাসের দমকা বেশি প্রবল ছিল। আজ দুপুর বেলা আবার খুব রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেচে। এই একটু আগেই ভাত খেয়ে উঠে এসেচি। এখনো শুতে যাই নি। তোমার বর্ষশেষ[৪] কবিতা ভাল লাগে লিখেচ, ওটা আমারো ভাল লাগে— ওটা তুমি সমস্তটা মুখস্ত বলতে পারলে বেশ হবে। সেদিন এখানকার ছেলেরা ছাতে আমার কাছে পুরীতে "সমুদ্রের প্রতি"[৫], আর "জীবনদেবতা"[৬] এই দুটো কবিতার মানে বুঝিয়ে নিয়ে গেচে। জীবন দেবতার মানে বোঝাতে অনেকক্ষণ লেগেছিল— ঠিক বুঝেচে কি না জানিনে। ছবি আর একটা

আঁকতে হবে? আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু খারাপ হলে হেসো না। ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৪

২৫ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

পর্শু তোমাকে ঝগড়াটে বলে নিন্দে করে চিঠি লিখেচি আর তুমি আজকের চিঠিতে তার প্রমাণ দিয়েচ। আমি যদি তোমার মত হতুম তাহলে শ্রীমতী রাণু সুন্দরী দেবী বলে তোমাকে আজ সম্ভাষণ করতে পারতুম, তাহলে তুমি জব্দ হতে। কিন্তু নিতান্ত ভালমানুষ বলে আমি তোমার পাল্‌টা জবাব দেবার চেষ্টা করি নি। একে ত সময় খুবই কম, তার পরে আমার বয়স হয়ে গেল— কিছু না হোক্ ত সাতাশের কম হবে না— আমার কি ঝগড়া করে সময় খরচ করার মত অবকাশ আছে। তোমার মত বয়স হলে কি জানি কি করতুম, হয় ত বা ভীষণ রাগের মাথায় শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীমতী বলে তোমার নামের গোড়ায় একেবারে পাঁচটা শ্রী বসিয়ে দিতুম— রাণুর বদলে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া নাম দিতুম— কিন্তু যতই রাগ করি নে কেন কখনই তোমার নামে ভুলেও চারটে শ্রী বসাতুম না। যাই হোক্ সকল কথাতেই দিনুবাবুর মত কিম্বা বৌমার মত হাস্‌লে চল্‌বে না, মাঝে মাঝে দুই একটা গম্ভীর কথাও বল্‌তে হবে। কেননা আমার

সঙ্গে তুমি ভাবই কর আর আড়িই কর আমি মানুষটা যা তা তোমাকে পুরোপুরি চিনে নিতে হবে। এটুকু জেনো আমার মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানটা খুবই গম্ভীর— তাকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তা হলে আমি যেখানে সত্য সেখানে তুমি আমাকে জান্‌তেই পারবেনা. আমি যে কেবল মাত্র ভাল করে চুল আঁচড়িয়ে লাল কাপড় পরিয়ে, তিন বাটি দুধ খাইয়ে, সকাল সকাল ঘুম পাড়িয়ে দেবার মানুষ, তা ঠিক নয়। তা যদি হত তাহলে বৌমা আমাকে এতদিনে সাজিয়ে গুজিয়ে তাঁর ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে হাওয়া খাইয়ে বেড়াতেন। কিন্তু বৌমা যে তা করেন না তার একটি মাত্র কারণ, তিনি আমাকে কেবল বাইরের দিক থেকে দেখেন নি— তিনি জানেন আমার মধ্যে একটি গম্ভীর মানুষ আছে। আমাকে আমার যে ঠাকুর এই পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন— আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে মানি, সব চেয়ে বড় বলে মানি— আমি জানি তিনি আমাকে তাঁরই কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েচেন— আমার সমস্ত হাসি ঠাট্টা গল্প গান সুখ দুঃখের মধ্যে এই কথাটি আমি ভুলি নে। যখনি ভুলি তখনি ছোট হয়ে যাই, তখনি দুঃখ পাই। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাত থেকে আমি আমার জীবনের সমস্ত দান গ্রহণ করতে চাই। আমি যে এখানে শিশুদের সেবা করি, তার কারণ, এদের সেবা করে আমি আমার ঠাকুরের যথার্থ পূজো করতে পারি— নইলে শুধু মন্ত্র পড়ে পূজো হয় না। এই যে আমার ঠাকুরঘরের আমি, এই যে পূজারি আমি, এই আমিই সত্য আমি। আমার এই ভিতরকার আমির সঙ্গে সংসারে যাদের সম্বন্ধ না হয় তারা আমার যত আত্মীয় হোক্ সে সম্বন্ধ সত্য হয় না— সেই জন্যে সে সম্বন্ধ দুদিনেই ভেঙ্গে যায়। তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আমার এই দিকের কথা হয় ত সম্পূর্ণ বুঝবে না, কিন্তু যখন তুমি আমার এত কাছে এসেছ তখন এই কথাটিকে তোমার বুঝতে চেষ্টা করতে হবে— নইলে আমাকে নিয়ে কেবল দুঃখ পেতে থাক্‌বে। আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি, সেই স্নেহ যদি

কেবলমাত্র তোমাকে আদর করে মিষ্টি কথা বলে পরিতৃপ্ত হয় তাহলে তোমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। আমার কাছ থেকে তোমাকে বড় কথা সত্য কথা শুন্‌তে হবে, ভাবতে হবে— আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এত সত্য হবে যে, আমার ঠাকুরের উপাসনা আমার ঠাকুরের কাজ তোমার চিন্তায় বাক্যে এবং আচরণে সার্থক হবে। তুমি যে অধীর হবে, অসহিষ্ণু হবে, তুমি যে কেবল নিজের চিন্তা নিয়ে থাক্‌বে, তোমার চারদিকের লোককে প্রাণপণে খুসি করবার চেষ্টা না করবে এ হলে আমার মনের সুরের সঙ্গে তোমার মনের সুরের মিল হবে না। তুমি যদি সবল চিত্ত নিয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে প্রসন্ন মুখে সংসারের কল্যাণের দ্বারা আমার ঠাকুরকে প্রত্যহ প্রণাম না করতে পার তাহলে সেটা আমাকে খুব কষ্ট দেবে এবং লজ্জা দেবে। ভালবেসে আমার কাছে যারা এসেচে আমি যদি তাদের সব দিক থেকে ভাল করে তুল্‌তে না পারি, তারা যদি মনে জোর না পায়, তারা যদি পবিত্র হয়ে আপনাকে ভুলে সকলের কল্যাণ করতে না শেখে তাহলে আমি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করি— ভয় হয় আমার ভিতরে বুঝি এমন কিছু অভাব ত্রুটি আছে যে জন্যে আমার কাছে এসে কেউ কোনো সত্যকার উপকার পায় না। আমি বড় আশা করে আছি যে, আমার মধ্যে যা কিছু ভালো এবং সত্য তাই দিয়ে আমি তোমার জীবনকে উন্নত উজ্জ্বল সুন্দর পবিত্র এবং সেবাপরায়ণ করে তুল্‌ব। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভার, বা দুঃখ, বা ক্ষুদ্রতা বা ব্যর্থতা আনি তাহলে আমার অনুতাপের সীমা থাক্‌বে না। অবশ্য সংসারে দুঃখ পেতেই হবে, এবং দুঃখের আগুনে আমাদের মনের পাপ পুড়ে গিয়ে আমরা বড় হই অতএব তুমি কখনো দুঃখ পাবে না এমন কথা মনে করতে পারি নে— কিন্তু সেই দুঃখকে খুব উদারভাবে বহন করতে পার, সেই দুঃখকে মাণিকের মত তোমার বুকের হার করে রাখ্‌তে পার সেই শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দিন্। সেই শক্তি মানুষ কি করে পায়? যত নিজেকে ভুল্‌তে পারে, যত সবাইকে

আপন করতে পারে, যত ক্ষুদ্র ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে তার মন মুক্ত হয়—যতই সকলের সঙ্গে আপন আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য ভাগ করে ভোগ করতে শেখে। তা যে না করতে পারে দুঃখ তাকে পুড়িয়ে মারে— সে সোনার মত উজ্জ্বল হয় না, তৃণের মত দগ্ধ হয়। পৃথিবীতে মানব জীবন নিয়ে এসেছি— কিছুদিনের মেয়াদ— সেই কয়েকটি বছরকে সুন্দর করে শুভ্র করে ঠাকুরের পায়ে নির্ম্মল ফুলের মত দিয়ে যেতে পারি এই কামনাকেই সব চেয়ে বড় করে রাখ। রাণু, তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভালবাস তাহলে আমার ভাল কাজে তোমার আনন্দ যেন হয়, আমি সকলকেই ভালবাসি এতেই যেন তোমার মন প্রসন্ন হয়, যারা আমার কাছে আস্‌বে তারা আমার কাছ থেকে যেন প্রীতির দান ও পূজার নির্ম্মাল্য নিয়ে যেতে পারে এই তোমার যেন কামনা হয়। আমাকে ছোট করে দেখো না, ছোট করতে চেয়ো না— তাহলেই, আমার সঙ্গ পেয়ে আমার স্নেহে আমার আশীর্ব্বাদে তুমিও বড় হয়ে উঠ্‌বে, তোমার মন তাহলে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হবে। আমি ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সব চেয়ে ভালবাসি— যাদের স্নেহ করি তাদের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যটি দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মনের তৃষ্ণা। মেয়েদের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যটি যখন দেখা যায় তখন তার আর তুলনা কোথাও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা যখন কেবল সংসারে জড়িয়ে থাকে, সব তাতেই কেবল আমার করে, নিজের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহৎলক্ষ্যকে আড়াল করে রাখে, যখন তারা বড় চেষ্টার বাধা, বড় তপস্যার বিঘ্ন হয়ে কেবল মাত্র লোকের মন ভোলানোকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে রাখে তখন বাইরে তাদের যতই সৌন্দর্য্য থাক্ সে সৌন্দর্য্য মায়া মাত্র, সে সৌন্দর্য্য সত্য নয়। আমি এই আশা করে আছি আমার কাছ থেকে তুমি এই কথাটি অন্তরের সঙ্গে বুঝে নেবে— তাহলেই তুমি আমাকে সত্য করে বুঝ্‌তে পারবে। আমাকে যদি সত্য করে বুঝতে না পার তাহলে আমাকে সত্য করে ভালবাস্‌তেও পারবে না— তাহলে

আমাকে তুমি তোমার খেলার পুতুল করে রাখ্‌তে চাইবে। কিন্তু আমার বিধাতা ত আমাকে পুতুল করে পাঠান নি— আমার কণ্ঠে তিনি গান দিয়েচেন, আমার হৃদয়ে তিনি প্রেম দিয়েচেন, আমার জীবনে তাঁর আদেশ আছে, আমার ললাটে তাঁর আশীর্ব্বাদ আছে, আমাকে তিনি সংসারের খেলায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে দিলেন না— আমাকে তিনি তাঁর কাজে ডেকেচেন— পৃথিবীময় তাঁর কাজে আমাকে ফিরতে হবে— সেইসব কাজে যারা আমার সহায় তারাই আমার আত্মীয় তারাই আমার বন্ধু, আমার ঠাকুর তাদেরই কাছে আমাকে চিরদিন রাখবেন। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৫
২৭ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোমার শেষ চিঠিটাতে তুমি ভয়ঙ্কর রাগ করেছিলে তাই আমি ঠিক করেছিলুম আমার সময় থাক্ আর না থাক্, তোমার চিঠি পাই আর না পাই তোমাকে আজ চিঠি লিখ্‌ব। কিন্তু রাগ করলে কি মানুষকে পুরস্কার দিতে হয়? পর্শু দিন আমি তোমাকে মস্ত বড় একটা গম্ভীর চিঠি লিখেচি— চার পাতা ভরিয়ে— কেননা তুমি আমাকে সকল রকমে যদি না জান তা হলে আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার ঠিক হবে কেন? আমাকে ভাল করে সত্য করে বুঝতে চেষ্টা কোরো, রাণু— যেখানে আমি সকল লোকের,

যেখানে আমি সংসারের কাজ করবার ক্ষেত্রে, সেখানে আমাকে যদি না চিন্‌তে পার তাহলে আমার কাছে এসেও আমার আসল কাছে আসা হবেনা। আবার আমি খুব ছোটও বটে, তোমাদের সমান বয়স; এমন কি তোমাদের চেয়ে ছোট,— তুমি আমাকে দেখ্‌বে শুন্‌বে খাওয়াবে পরাবে সাজাবে আমার সে বয়সও আছে। তাই সন্ধ্যাবেলায় মোড়ায় বসে তুমি যখন আমার কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলে যাও সে আমার খুব মিষ্টি লাগে। সন্ধ্যা আকাশের তারা ঈশ্বরের খুব বড় সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যায় ছাদে রাণুর মুখের কথাগুলি তার চেয়ে কম বড় নয়— ঐ তারার আলো যেমন কোটি কোটি যোজন দূরের থেকে আস্‌চে— তেমনি তোমার হাসি গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হয় যেন কত জন্ম জন্মান্তর থেকে তার ধারা সুধাস্রোতের মত বয়ে এসে আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে জম্‌চে। কিন্তু রাণু, ঈশ্বরের যে সব দান, খুব বড়, খুব সুন্দর, তার সম্বন্ধে আমাদের যেন কৃপণতা না থাকে— সামান্য টাকাকড়ি তালা বন্ধ করে পাহারা দিয়ে রাখবার কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আলোর মত, তা একজায়গায় জ্বাললে সে জায়গাকে ছাড়িয়ে চলে যায়। মাধুর্য্যের উৎস যখন আমাদের মনে একবার উৎসারিত হয় তখন আমাদের চারিদিককে তা মধুময় করে তোলে। তখন সেই ভালবাসায় আমরা সকলকেই বেশি করে ভালবাসি; তাতে আমাদের সহ্য করবার শক্তি বাড়ে, ত্যাগের শক্তি বাড়ে, কাজের শক্তি বাড়ে। আমার খুব দুঃখের সময়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে;— আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে সে আমার বড় মেয়ে, শিশু কালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি ; তার মত সুন্দর দেখ্‌তে মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্ত্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্ত্তেই তুমি আমার কাছে এলে— আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেবার সময় আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।[1] আমার কেবল নয়, সেদিন যে তোমাকে আমার

ঘরে আমার কোলের কাছে দেখেচে তারই ঐ কথা মনে হয়েচে। তাকে আমরা বেলা বলে ডাক্‌তুম, তার চেয়ে ছোট আর এক মেয়ে আমার ছিল তার নাম ছিল রাণু, সে অনেকদিন হল গেছে।[২] কিন্তু দুঃখের আঘাতে যে অবসাদ আসে তা নিয়ে ম্লান হতাশ্বাস হয়ে দিন কাটালে ত আমার চল্‌বে না। কেননা আমার উপরে যে কাজের ভার আছে ; তাই আমাকে দুঃখ ভোগ করে দুঃখের উপরে উঠ্‌তেই হবে। নিজের শোকের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এক মুহূর্ত্ত বৃথা কাটাবার হুকুম আমার নেই। সেই জন্যেই খুব বেদনার সময় তুমি যখন তোমার সরল এবং সরস জীবনটি নিয়ে খুব সহজে আমার কাছে এলে এবং এক মুহূর্ত্তে আমার স্নেহ অধিকার করলে তখন আমার জীবন আপন কাজে বল পেলে— আমি প্রসন্ন চিত্তে আমার ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলুম। কিন্তু তোমার প্রতি এই স্নেহে যদি আমাকে বল না দিয়ে দুর্ব্বল করত, আমাকে মুক্ত না করে বদ্ধ করত তাহলে আমার প্রভুর কাছে আমি তার কি জবাব দিতুম? আমি এই বিদ্যালয়ে যে সেবার মধ্যে তাঁর সেবার ভার নিয়েচি সে এবার আমার পক্ষে আগেকার চেয়ে আরো অনেক সহজ হয়েচে— আমার হৃদয়ের গ্রন্থি আরো অনেক আল্‌গা হয়েচে— তাই আমি দ্বিগুণ স্নেহে এবং আনন্দে এবার আমার বিদ্যালয়ের কাজে লেগেছি। তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে আমার ঠাকুর আমাকে আরো বেশি বল দিয়েচেন। তুমিও তেমনি বল পাও আমি কেবল এই কামনা করচি।— তোমার ভালবাসা তোমার চারদিকে সুন্দর হয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে ছড়িয়ে যাক্‌— তোমার মন ফুলের মত মাধুর্য্যে পবিত্রতায় পূর্ণ বিকশিত হয়ে তোমার চতুর্দ্দিককে আনন্দিত করে তুলুক্। নিজেকে অকারণে পীড়িত করো না এবং অন্যকে পীড়িত কোরোনা— নিজেকে নম্রতার রসে পরিপূর্ণ করে সেবার কাজে সুমধুর করে তোলো। আমি তোমাকে যখন পারব চিঠি লিখ্‌ব— কিন্তু চিঠি যদি লিখ্‌তে দেরি হয়, লিখ্‌তে যদি নাও পারি তাতেই বা এমন কি দুঃখ। তোমাকে যখন স্নেহ

করি তখন চিঠির চেয়েও আমার মন তোমার ঢের বেশি কাছে আছে— আমার আশীর্ব্বাদ তোমাকে নিয়ত সঙ্গ দিচ্চে। তোমাকে স্নেহ করি বলে আশা শান্তি ভক্তিকে যদি আমি স্নেহ করতে না পারতুম তাহলে তোমার প্রতি স্নেহ আমার পক্ষে বড় লজ্জার কারণ হত। তাদের আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। আজও কথায় কথায় চিঠিটা বড় হয়ে উঠল। কিন্তু আর সময় নেই, কাগজে জায়গাও বেশি নেই, তাই এইখানে শেষ করি। আজ ছবি আঁকব ভেবেছিলুম কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতে সময় ফুরিয়ে এল। ইতি ১১ই শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৬

২৮ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

যদিও তোমার চিঠি পাই নি তবু লিখ্‌চি, যখন দেনা পাওনার হিসাব করবে তখন এ কথাটা মনে রেখো। তুমি আজ কাল খুব পড়ায় লেগে গেছ কিন্তু আমি যে চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চল্‌চে। সকালে তুমি ত জানো সেই আমার তিন ক্লাসের পড়ানো আছে তার পরে স্নান করে খেয়ে, যে দিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি, তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্য্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি— কিন্তু এক একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুন্‌তে

আসে। তার পরে অন্ধকার হয়ে আসে— তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়— দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুন্‌তে পাই— তারা গান শেখে— তারপরে গান বন্ধ হয়ে যায়— তখন আদ্যবিভাগের[১] ছেলেদের ঘর থেকে হার্ম্মোনিয়ম এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠ্‌তে থাকে। —ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয় তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, কেবল ঝিঁঝির ডাক আর ব্যাঙের ডাক শোনা যায়— আর সমস্ত নিস্তব্ধ; রামানন্দ বাবুদের[১] ঘরের বারান্দা থেকে একটি লণ্ঠনের আলো দেখা যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চল্‌চে দেখ্‌তে পাই। তারপরে সে আলোও থাকে না— কেবলমাত্র আকাশ জোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুম পেয়ে আসে তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্ব্বদিকের দরজার সমুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে— দুটো একটা শালিখ পাখী উস্‌খুস্‌ করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফুটে ওঠে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটের সময় আদ্য বিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজ্‌তে থাকে— অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্ব্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি— সূর্য্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়— কেননা সাড়ে ছটার সময় আশ্রমের সমস্ত বালকবৃন্দ আমরা বিদ্যালয়ের সাম্‌নের মাঠে একত্র হই— একটি কোন গান হয়ে তারপরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাস নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শুনে ঠিক করে নিই— তারপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চলে যায়। এই ছেলেদের কাজ করতে আমার খুব ভাল লাগে। কেননা ওরা জানেনা যে, আমরা

ওদের জন্য যে কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্য্যের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারের কাছ থেকে যেমন করে দরদস্তুর করে জিনিস কিন্‌তে হয় তেমন করে নয়। এরা যখন বড় হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ করবে তখন হয়ত মনে পড়বে— এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। আর সেই সঙ্গে আমাদের কথাও মনে পড়বে। যদি এই স্মৃতিতে ওদের মনকে উদার করে, চরিত্রকে সবল করে, ওরা যদি এই বিশ্বজগৎকে এবং নিজের জীবনকে বড় করে দেখ্‌তে পারে তাহলেই আমার পুরস্কার হল— তাহলে ওদের সার্থক জীবনের মধ্যে আমার জীবনও সার্থক হল, ওদের পূজার মধ্যে আমার পূজা, ওদের প্রণামের মধ্যে আমার প্রণাম রয়ে গেল। ইতি ১২ শ্রাবণ ১৩২৫।

তোমার রবিদাদা

১৭

৩১ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

রাণু

আজ বুধবার। আজ সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যখন আমার সেই কোণের বিছানায় এসে বসেচি এমন সময় তোমার চিঠিখানি পেলুম। আমার মনে হল ঠিক সময়ই যেন তোমার চিঠি এল। এ চিঠি কাল এসে পৌঁছবার কথা ছিল বোধহয় পোষ্টমাষ্টারের কুঁড়েমিতে কাল পাইনি—

আজ উপাসনার পরে পেলুম, তাই আমার সেই সকাল বেলাকার উপাসনার সুরের সঙ্গে মিলিয়ে তোমার চিঠিখানি পড়লুম। তোমার চিঠি আমার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ল। আমার ভয় ছিল পাছে আমার বড় চিঠিটা ঠিক বুঝতে না পেরে তোমার মনে আঘাত লাগে। কিন্তু তুমি যে ঠিক বুঝতে পেরেচ এবং আমার সব কথা মনের মধ্যে নিতে পেরেচ এতে আমার খুব আনন্দ হয়েচে। তোমার জীবনটি প্রতিদিন মধুর হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে— তোমার জীবনের উপর তোমার ঠাকুরের আশীর্ব্বাদের অমৃত বর্ষিত হয়ে প্রতিদিন তোমাকে সুধাপূর্ণ করতে থাক্‌বে— সংসারকে তুমি সুন্দর করবে, সকলের তুমি কল্যাণ করবে, অপরাধীকে ক্ষমা করবে, দুর্ব্বলকে দয়া করবে, দুঃখ তাপ নৈরাশ্য সহ্য করবার শক্তি লাভ করবে এবং সমস্ত জীবন মনকে নম্র করে ঠাকুরকে প্রণাম করতে পারবে আমি একান্ত মনে এই কামনা করচি। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি— তোমার পক্ষে সেই ভালবাসা যেন সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়, যেন সকল দিক দিয়ে ভাল করে, নইলে আমার দুঃখের আর অন্ত থাক্‌বে না। আমার মধ্যে যেটুকু ভাল, যেটুকু সত্য সেইটুকু যদি তোমাকে দিতে পারি তাহলে সে আমারই লাভ— কেননা তাতে আমার ভাল আমার সত্য তোমার মধ্যে গিয়ে আরো বড় হয়ে যাবে তাতে তুমি আমাকে আমার ঠাকুরের সেবা করার কাজে সাহায্য করতে পারবে— আমার মধ্যে যা ছোট আছে, যা মন্দ আছে তা এম্‌নি করেই ক্ষয় হতে থাক্‌বে।

কাল আমার পঞ্চমবর্গের[১] ছেলেরা দুপুর বেলায় এসে ধরে পড়ল, তাদের খাওয়াতে হবে। দেখেচ আমার এই বাঁদরগুলো কি লোভী! তোমার কাশীর বাঁদরের চেয়ে এদের লোভ। সমরেশ হচ্চে ওদের সর্দ্দার। সেই আমার কাছে এসে দরখাস্ত করলে। আমি বল্লুম আচ্ছা বেশ। তাই সন্ধ্যাবেলায় আমার নীচের দক্ষিণের বারান্দায় বসে ওদের ভোজ হয়ে গেছে। ওদের ফরমাস ছিল লুচির। লুচি ডাল ছোকা চাট্‌নি যেমনি পাতে

পড়া অমনি কোথায় যে অদৃশ্য হতে লাগ্‌ল তার ঠিকানা পাওয়া গেল না— তার উপরে আম ছিল রসগোল্লা ছিল। ভাগিস্‌ সব শেষে বৃষ্টি এসে পড়ল, নইলে ওদের খাওয়া ফুরত না অথচ আমার খাবার ফুরিয়ে যেত। এই লোভী বাঁদরগুলোকে আমি খুব ভালবাসি। এরা ক্লাসে কি রকম চেঁচায় জান ত— এখনো সেই রকম চেঁচামেচি করে, সমস্ত শান্তিনিকেতন অশান্ত হয়ে ওঠে— আমার ক্লাসে ওরা মনে করে খেলা— এ ত পড়া নয়— আমি যেন ওদের খেলার সর্দ্দার। সত্যি আমি তাই— মনের ভিতরের দিকে আমার আর বয়স হল না— আমি সাতাশের চেয়েও কম— আমি জানি তাই তোমার ইচ্ছে করে আমাকে ছোট ছেলের মত সাজাতে, এবং যত্ন করতে, আদর করতে। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩২৫

শান্তিনিকেতন

তোমার রবিদাদা।

১৮
৩ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু

আজ দুপুর বেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে খানিকটা ঘুমচ্চি— খানিকটা জেগে আছি, খানিকটা চেয়ে চেয়ে আকাশ দেখ্‌চি এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মত সুন্দর হয়ে উঠেচে— আকাশে ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর [য] মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে,

আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্চে, তার মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজ্‌চে, আর বৃষ্টিতে ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলি থেকে বেজে ওঠা গানের মত সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষ বাবুর[১] বাড়ীর সাম্‌নেকার সবুজক্ষেত রৌদ্রে ঝল্‌মল্‌ করে উঠেচে, আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেছে ঠিক যেন একটি সোনালী সবুজ সাড়ির রাঙা পাড়ের মত। তোমরা যে অগস্ত্যকুণ্ডের মধ্যে রয়েচ সেখানে প্রকৃতিকে এত বড় করে বিচিত্র করে সুন্দর করে দেখ্‌তে পাও না। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব— তাই আমার জীবনের কতকালই নদীর নির্জ্জন চরে কাটিয়েচি। তারপরে কতদিন গেছে এখানকার নির্জ্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি বারান্দায় বসে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম,— রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাক্‌তুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়সির মত তাদের জানলা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি বল্‌ত, তাদের কথা শোনা যেত না কিন্তু তাদের মুখ চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয় কিন্তু কিছু দাবী করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মত করে বেঁধে ফেল্‌তে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না। মানুষের লোভ আছে, আসক্তি আছে, নানারকম প্রবৃত্তি আছে, এই সেজন্য সে কেবলি অধিকার স্থাপন করতে ব্যস্ত; অন্য মানুষকে সে নিজের ভোগের জন্যে প্রয়োজনের জন্যে বশ করে বাধ্য করে বন্দী করে রেখে দিতে চায়। এই জন্যে অধিকাংশ স্থলেই তার ভালবাসা মোহের ভিতর দিয়ে দুঃখের সৃষ্টি করে এবং দুঃখ পায়— কেবলি সে আপনার অংশের হিসাব করে, এবং চোখে চোখে আগ্‌লে রাখ্‌তে চায়, এতে

কল্যাণ হয় না— এতে মানুষের ভয়ানক ক্ষতি হয়, বিপদ ঘটে এবং শোক দুঃখের কারণ জন্মে। সকলের চেয়ে বড় ভালবাসা হচ্চে সেই, যাতে মানুষ মানুষকে নিজের দিকেই টানে না, বড়র দিকে অগ্রসর করে, মুক্তির দিকে সাহায্য করে, ভালোর দিকে প্রেরণ করে আনন্দিত হয়। এই ভালবাসা দূরে থেকেও নিকটে থাকে এবং নিকটে থেকেও আচ্ছন্ন করে না। এই ভালবাসাই ঈশ্বরের দয়ারূপে মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে আসে— এবং স্পর্শমণির মত আমাদের মধ্যে যা কিছু মন্দ আছে মলিন আছে তাকে উজ্জ্বল করে নির্ম্মল করে তোলে— এতে সংশয় নেই, ক্লান্তি নেই, গ্লানি নেই। সংসারের কল্যাণের জন্যে এই প্রেম তোমার মধ্যে বিকশিত হোক্ এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৯

৬ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

আজ তোমার চিঠি পাব ঠিক মনে করি নি। কিন্তু যখন ডেস্কে বসে লিখ্‌চি এমন সময় ডাক হরকরা সেই হিন্দী কাগজ, (যাতে বিজ্ঞাপন সুদ্ধ পদ্যে লেখা হয়) আর তোমার চিঠি দিয়ে গেল। শান্তি যদি কাছে থাক্‌ত তাহলে কাগজটা তার হাতে দিয়ে ফেলতুম। তাছাড়া, এই সঙ্গে একটা হিন্দী চিঠিও পেয়েচি সেটাও তাকে দেখিয়ে নেওয়া যেত। ইন্দোরে কে

একজন মহিলাশ্রম স্থাপন করেচে সেই সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চেয়েচে— একে ত মহিলাশ্রম, তাতে হিন্দীতে পরামর্শ— কি করা যায় বল দেখি? আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ করে প্রবল বেগে বর্ষণ চল্‌চে, সকালে কোনো মাষ্টার তাই ক্লাস নেননি। কিন্তু থার্ড ক্লাসের[১] ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পারলুম না— তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক পড়লে সমস্ত আল্‌গা হয়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ করে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠতে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়— আমার শোবার ঘরে ক্লাস হয়— ঘরে ছাঁট আস্‌তে লাগ্‌ল। সাসি বন্ধ করে পড়াতে লাগলুম— পাঠ শেষ হয়ে গেল কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না— এই বৃষ্টিতে ওদের ত ছেড়ে দিতেও পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধরে পড়ল, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখ আমার বয়স এখন সাতাশ বছর হয়েচে, এখন কি আমি ইচ্ছা করলেই অনর্গল গল্প বল্‌তে পারি? শেষ কালে আমি করলুম কি, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বল্লুম সেইটে একসপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ করে লিখে আন্‌তে। ওরা ত উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল— কিন্তু ওদের গল্প যে কি রকম হবে তা কল্পনা করে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হচ্চে না। যাক্‌গে, ওরা ত সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চলে গেল— আমি গেলুম স্নান করতে। স্নান করে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন ত কুঁড়েমি করে কাটাতে পারিনে। অন্যদিন হলে উঠে আমার তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ক্লাসের জন্যে পড়ার বই লিখ্‌তে বস্‌তুম— কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভাল লাগল না, তাই 'বিদায়-অভিশাপ' টা[২] ইংরেজিতে তর্জ্জমা[৩] করতে বসে গিয়েছিলুম। বেশ ভালই লাগছিল। পাতা দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেছে এমন সময় চিঠি হাতে করে ডাক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন কিছুক্ষণের জন্যে দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্চে। একটা সুবিধা

হয়েচে, "ঘরে বাইরে" প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন যেটুকু বাকি আছে তাতে বেশি কিছু লেখবার নেই— কাজেই এখন বুধবারে আমি পূরো ছুটি পাব। কিন্তু এভ্রুজের হাত থেকে ছুটি পেলেই কি আমার ছুটি আছে? বুধবারে আমার ক্লাস পড়ানো নেই বটে কিন্তু ক্লাসের পড়া তৈরি করা আছে, সুতরাং আমাকে আমার খাতাপত্র খুলে বস্‌তেই হবে। এক বৎসরের মত লেখা হয়ে গেলে তবে আমি ছুটি পাব। সে হতে অনেক দেরি— তত দিনে আমার বয়স অন্তত আটাশ হবেই— যদি না কোনোমতে, আমার সাতাশ্‌টাকে দম-না-দেওয়া ঘড়ির মত, একেবারে থামিয়ে রেখে দিতে পারি এখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরে রয়েচে। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হয়েচে অম্‌নি যেন কোনমতে ছুটতে ছুটতে শেষ ট্রেণটা ধরে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্চে না,— আর হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আমলকিবন কম্পান্বিত, তালবন মর্ম্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের ক্ষেত হিল্লোলিত, আর আমার জানলার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়্‌খড়ায়িত। ইতি ২১ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২০

[অগাস্ট ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এই মাত্র বল্‌তে কি বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হয়ে গেছে। সেই কোণ্‌টাতে তাকিয়া ঠেসান

দিয়ে বসেছিলেম। আর খানিকবাদে কাজে বস্‌তে হবে তাই রীতিমত বিছানায় শুইনি। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে— পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্ছাগুলোর মত মোটা মোটা কালো কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে— মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন শোনা যাচ্চে। সাম্‌নে সবুজ মাঠের উপরে মেঘলা দিনের ছায়া পড়েচে, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেছে। তোমাকে লিখ্‌তে লিখ্‌তে বৃষ্টি নেমে এল— বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তার পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায় বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপ্‌সা হয়ে এসেচে— বনলক্ষ্মী যেন তার পাৎলা ওড়নাটাকে মুখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়েচে। কটা বেজেচে ঠিক বল্‌তে পারিনে। আমার সাম্‌নের দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল, তাকে নির্ব্বাসিত করে দিয়েচি— ইদানীং তার ব্যবহার এমন হয়ে এসেছিল যে তাকে বিশ্বাস করবার জো ছিল না— সে চলতেও ভুল, বলতেও ভুল, তার পরামর্শ মত খেতে শুতে গিয়ে অনেকবার আমি ঠকেচি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে যে সংশোধন করা যেত না তা বল্‌তে পারিনে— কিন্তু সময়ের জন্য ঘড়ি; ঘড়ির জন্যে সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হচ্চে একটা দেড়টা হয়ে গেছে, আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাস পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজরাটি ছেলে এসেচে, কি করে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেব— বৌমা আর শৈল[1], ওদের দুপুর বেলা একঘন্টা করে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচে।

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেবের খুব অসুখ করেছিল। আমাদের ভাবনা হয়েছিল। একদিন ত রাত্রে তাঁর নিজের মনে হল তাঁর ওলাউঠো হয়েচে। সেই রাত্রি একটার সময় বর্দ্ধমানে ডাক্তার ডাক্‌তে লোক পাঠিয়ে দিলুম।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভাল হয়ে উঠ্‌লেন, যে ভোরের বেলায় আবার টেলিগ্রাফ করে ডাক্তার আসা বন্ধ করে দিলুম। তুমি ত জানই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে আমি ডাক্তারি করতে পারি। যাই হোক্ এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্ব্বের মতই চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা পরতেন সেটা আজকাল আর দেখ্‌তে পাইনে।

বৃষ্টি একটুখানি হয়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হয়েচে। কিন্তু পূবের দিকে খুব একটা ঘননীল মেঘ ভ্রূকুটি করে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েচে— এখনি বোধহয় বরুণ বাণ বর্ষণ করতে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে চারিদিকে অনেক নতুন গাছ লাগিয়েচি ভাল করে বৃষ্টি হলে ভালই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মত হয়েচে— রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা সুরু হয়ে গেছে। তোমরা গান বাজ্‌না শিখ্‌তে সুরু করেচ শুনে খুব খুসি হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই; কাগজও ফুরোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গি এলে ক্লাসে। [শ্রাবণ ১৩২৫]

তোমার রবিদাদা

২১

৯ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

তোমার চিঠিখানা কাল পাওয়া উচিত ছিল— কিন্তু ডাকঘরের বিভ্রাটে আজ সকালে পেলুম। পশ্চিম থেকে যে সব চিঠি আসে সে আমরা দুপুর

বেলায় পাই— তাই বোধ হচ্চে ডাকঘর কাল আমারি মত দুপুর বেলায় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুপুর বেলায় চিঠি পেলে সুবিধে হয় চিঠির জবাব দেওয়ার অনেকটা সময় পাওয়া যায়।

আজ সকালে আর একটু পরেই আমার ক্লাস বস্‌বে। কিন্তু আকাশ মেঘে অন্ধ হয়ে আছে। ছেলেরা প্রাণপণে প্রার্থনা করচে এখনি খুব যেন চেপে বৃষ্টি হয়, তাহলেই তাদের ক্লাস বন্ধ থাকে। কিন্তু বোধ হচ্চে বিধাতা আজ তাদের সঙ্গে কৌতুক করবেন, অর্থাৎ যেই তাদের ক্লাস হয়ে যাবে অম্‌নি খুব ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি আরম্ভ হবে। গেল চিঠিতে তোমাকে বিশ্বপ্রকৃতির কথা লিখেছিলুম। খুব যখন ছোট ছিলুম তখন থেকেই আমি, ঐ যে মহাকাশে আলোছায়ার রঙ্গ-ভূমিতে সৃষ্টির লীলা চল্‌চে, তাই দেখে দেখে মুগ্ধ হয়েচি। তখন ছেলেবেলায় ঠাকুরকে জানতুম না, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালবাসাতে আমার সুবিধা হয়েছিল। আমি তাই ঠাকুরের নাটমন্দিরের দিকে তাকাতে শিখেছিলুম। আমার আর এক সুবিধা হয়েছিল, আমার সেই ভালবাসার চর্চ্চা হয়েছিল যে ভালবাসায় মন আনন্দ পায় অথচ মুক্ত থাকে। সেই মুক্তি আমার মনকে টানে। আমি তাই বন্ধনে নিজেকে জড়াতে পারিনে। কেননা জড়াতে গেলেই বিশ্বের উপর এবং নিজের জীবনের উপর আমার অধিকার ছোট হয়ে আসে। মানুষকে আমি খুব একান্ত মনে ভালবাসতে পারি কিন্তু সে ভালবাসা যদি বন্ধন হয়, যদি আর সমস্তকে আচ্ছন্ন করে নিজেকেই সর্ব্বপ্রধান করে তোলে তাহলেই সে বন্ধন বারবার আমাকে ছিন্ন করতে হয়। বৃষ্টির জলকে গর্ত্ত কেটে জলাশয়ে ধরে রাখা যায় কিন্তু নদীর জলকে বাঁধ বেঁধে সম্পূর্ণ আট্‌কে ফেল্‌তে গেলে তার নদী-প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়— এই জন্যে সে বাঁধন টেঁকে না— একদিন না একদিন সে বাঁধ প্রবল বেগে বিদীর্ণ হয়ে যায়। এ সংসারে আমার জীবনকে চল্‌তে হবে সাম্‌নের দিকে, সকলের দিকে এবং অনন্ত সাগরের দিকে; আমার উপরে এই হুকুম— এই জন্য

আমার সমুখের পথ খোলা থাক্‌বেই। এই জন্যে পৃথিবীতে অনেক বাঁধন আমার সাম্‌নে এল কিন্তু যেই তারা পথ রোধ করতে চাইল অম্‌নি তারা টিঁকল না— সংসারে আমার কত বন্ধন যে ছিন্ন হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই। কেননা, আমার মধ্যে যে স্রোতের বেগ সে ত আমার নিজের বা আর কারো জিনিস নয়, এবং যে পথে আমাকে চল্‌তে হবে সে পথও আমার বা আর কারো নয়— আমার বিধাতার হুকুমকে যে-কেউ রোধ করতে যাবে তাকে হার মান্‌তে হবে। তাই চিরদিন আমার মনটা পথের পথিক— পান্থশালায় কখনো কখনো একরাত্রি দুরাত্রি থাকে আবার তাকে বেরতেই হয়— চুপ করে বসে বসে জিনিসপত্র গুছিয়ে বিছানাপত্র পেতে আদরে যত্নে আরামে নিজেকে বা আমাকে ভোগ করবার ছুটি তার নেই। দুর্ব্বল মন মাঝে মাঝে আরাম করতে চায় কিন্তু প্রবল আদেশ তাকে টেনে বের করে। এই জন্যে ঘর আমার নয়, সুখ আমার নয়, কোনো বিশেষ মানুষ আমার নয়। আমি তাঁরই যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের। এখনো তাঁর উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারিনি— এখনো “ঘরে আধা বাইরে আধা”[১]— কিন্তু সে আধা একদিন হয়ত ঘুচ্‌বে। কিন্তু মোটের উপরে আমি মুক্তিকে ভালবাসি, এবং যে ভালবাসা মুক্ত আমি সেই ভালবাসাকে বিধাতার দান বলে গ্রহণ করি। আমার ভালবাসাও যদি মানুষকে মুক্তি না দিয়ে তাকে কেবল আমার মধ্যেই বদ্ধ করে ফেলে তাহলে তাতে আমি দুঃখ পাই, লজ্জা বোধ করি। আমার ভালবাসায় মানুষকে বড় করে দেবে, সকল মানুষের করে তুলবে, সংসারের মঙ্গলকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করতে নিষ্ঠা দেবে, দুঃখ সহ্য করবার এবং আনন্দ বিতরণ করবার শক্তি দেবে এই আমি প্রার্থনা করি। ইতি ২৪ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২২

১২ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

কাল এখানে খুব ধুমধাম ছিল। কেন বল দেখি। ক্ষিতিমোহনবাবুর[১] বড় মেয়ে রেণুকার[২] কাল বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সভা হয়েছিল সন্তোষবাবুদের বাড়িতে। ছেলেরা কাল খুব করে ওঁদের বাড়ি সাজিয়ে দিয়েছিল। ফুলপাতার ত কথাই ছিল না— তার উপরে ঘরে বারান্দায় নানা রঙের চীনে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছিল— এইগুলো সব জাপান থেকে এসেছিল। বৌমা কদিন থেকে পিড়িতে আল্‌পনা দিচ্ছিলেন— বেশ দুটো হাঁস এঁকে দিয়েচেন। মেয়েরা সকাল থেকে হুলু দিতে শাঁখ বাজাতে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মুখে হুলুও বেরয় না শাঁখও বাজে না। যে রকম কাণ্ড দেখ্‌চি তাতে বোধ হচ্চে যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে পর জাপান থেকে হুলু দেবার কল তৈরি করিয়ে আনাতে হবে। তুমি হুলু দিতে পার? এই বেলা সময় থাকতে Miss Edgar এর[৩] কাছে শিখে নিয়ো। বিয়ের আগে রেণুকাকে বোধহয় বৌমা সাজিয়ে দিয়েছিলেন— লাল বেনারসীর শাড়ি পরিয়ে বেশ ভাল করে সাজিয়েছিলেন— সন্ধ্যাবেলায় আমাকে যখন প্রণাম করতে এল আমি ত হঠাৎ চিন্‌তেই পারিনি। রাত্রে মোটর গাড়িতে চড়িয়ে বরকে শান্তিনিকেতন থেকে সন্তোষবাবুর বাড়ি নিয়ে গেল। তার আগে খুব বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— ভয় হয়েছিল পাছে মোটরের চাকা কাদায় বসে যায়। আমি বিবাহ সভায় যাইনি— কেননা রাত্রি সাড়ে দশটায় বিয়ে আরম্ভ— আর শুন্‌লুম তিনটে রাতে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল। শুনে আমি বল্লুম— প্রজাপতয়ে নমঃ— এবং খুব দূরের থেকে। আজ বর রেণুকে

নিয়ে তিনটের গাড়িতে চড়ে একেবারে এক নিঃশ্বাসে বরিশালে চলে যাবে। তুমি বোধহয় জান, বরকে সমস্ত রাত্রি মন্ত্র পড়িয়ে উপোষ করিয়েও লোকের মন সন্তুষ্ট হয় না। তার উপরে নানা প্রকার ঠাট্টার উৎপাত আছে। পানের মধ্যে কুইনীন্ দিয়ে কাঁচা শাকে মস্‌লা মাখিয়ে নানারকম উগ্র রসিকতায় হতভাগ্যকে পীড়িত করবার চেষ্টা হয়েছিল। এই সমস্ত নিদারুণ কৌতুকে আমাদের কমল দেবী[০] সবচেয়ে উৎসাহী। কিন্তু বর সাবধানী— তাকে ঠকাতে পারেনি। তোমাদের জামাই বাবুকে তোমরা বোধহয় জব্দ করেছিলে। কিন্তু শুন্‌তে পাই শান্তিরা থিয়েটার করে তাঁর চিত্তবিনোদন করেছিল— এরকম রসিকতার প্রলোভন থাক্‌লে মানুষ দিনে তিন চার বার করে বিয়ে করতে রাজি হয়।— কালকের দিন পর্য্যন্ত খুব বৃষ্টি হয়ে আজ বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে তাই এখন খুব গুমট করেচে। খেয়ে এসেই তোমাকে লিখ্‌তে বসেছি। এখনি হয়ত বাসি-বিয়ের কোনো একটা সভায় আমার ডাক পড়বে তখন আর লেখবার সময় পাব না। আজ আবার আর এক উপদ্রব আছে। পেরুর (দক্ষিণ আমেরিকার) কন্সাল জেনেরাল আজ বিকেলের গাড়িতে আমাদের বিদ্যালয় দেখ্‌তে আস্‌বে। তাহলে আজ রাত্রে সে আর যাবে না— কাল কতক্ষণ থাক্‌বে কে জানে। কলকাতার মত জায়গায় মানুষ দেখা করতে এসে অল্পক্ষণের মধ্যে চলে যায়— এখানে তা হবার জো নেই। আমি এন্ড্রুজকে বলে দিয়েছি তাঁর ঘরেই তিনি ওকে স্থান দেবেন— কোনো মতে দুজনে ঝগড়া না করে একঘরে দুটো দিন কেটে যাবে। যাই হোক তিনি আসবার আগেই তোমার চিঠি রওনা করে দিয়ে একটু বিছানায় গড়াবার চেষ্টা করা যাবে— কেননা কাল পুরোপুরি ঘুম হয়নি— রাত্রে মাঝে মাঝে ঢাক্ ঢোল এবং ছেলেদের চীৎকার প্রায়ই চল্‌ছিল। ধোবাদের তিনটে গাধা মনে করেছিল তাদেরও বুঝি নিমন্ত্রণ আছে— তাই যথোচিত সমাদর হচ্চে না বলে মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠ্‌ছিল— সেটা ঠিক রসন চৌকির মত শোনাচ্ছিল না।

দুঃখের কথা কি বলব— এতবড় একটা বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু রসনচৌকি বাজ্‌ল না— কেবল রাত তিনটা পর্য্যন্ত মন্ত্র পড়াই হল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনচি বোধ হয় ডাক্‌তে আস্‌চে— কিন্তু বড় ঘুম পাচ্চে। ইতি ২৭ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৩

? ১৪ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ বুধবার। আজ হয়ত দুপুরের ডাকে তোমার চিঠি পেতেও পারি— নাও পেতে পারি। হাতে একটু সময় আছে তাই তোমার না-পাওয়া চিঠির জবাব লিখ্‌তে বসে গেলুম। ক দিন খুব বৃষ্টি বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্য্যের আলো নির্ম্মল হয়ে ফুটে উঠেছে— শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত পা ছুঁড়ে', চিৎ হয়ে শুয়ে', কলহাস্য করতে থাকে, তেমনি করে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠ্‌চে। এখন সকাল বেলা— স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, পাখীর ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হয়ে গেছে। তারপরে এতক্ষণ আমার জান্‌লার ধারের সেই কোণ্‌টিতে শুয়ে ছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ড্রুজ একবার এসে, আমি কি বলেছি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুশী হয়ে তিনি চলে গেছেন।

আমি কি বলেছিলুম জান? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে দেখ্‌তে পাই এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণু পরমাণুর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জান? যেমন একটি সহস্র তার-বাঁধা বীণাযন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খাঁটি তার, প্রত্যেকটি খুব খাঁটি হিসাব করে বাঁধা, অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ করে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্য্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না হয় সত্যই হল তাতে আমার কি! বীণার তার-বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কি করব? তেমনি এই জগতে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ অণু পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চল্‌চে এই কথাটা যত বড় কথাই হোক্ না কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সঙ্গীত চাই। সঙ্গীতটি যখন শুন্‌তে পাই তখনি ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই— তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সঙ্গীতও শুনেছি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকালবেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটি জল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিস দেখ্‌তে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি স্নিগ্ধতা সৌন্দর্য্য পবিত্রতা সে ত কেবল বস্তু নয়, সেই হচ্চে সকালের বীণাযন্ত্রের সঙ্গীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয়, পাখীর সঙ্গে মিলে, গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা, সেখানে সে বস্তুমাত্র— কিন্তু যেখানে বীণায় সঙ্গীত ওঠে সেখানে বীণারও পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন, সেই ওস্তাদজির আনন্দ গানের ভিতর দিয়ে আমাদের মনে আনন্দ দেয়, সৃষ্টির বীণা ত ওস্তাদজি বাজিয়ে চলেচেন কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে, তাহলে আমাদের হৃদয় বীণার ওস্তাদজিকে চিন্‌ব কি করে? তাঁর আনন্দরূপ দেখ্‌ব কি করে? না যদি দেখি তা হলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া বিবাদ, ঈর্ষা বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সঙ্গীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই,

আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদজিকেই দেখতে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দেয় না। তখন ওস্তাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখতে পাই। সেইটি দেখতে পাওয়াই মুক্তি। সেই জন্যই ত চিত্তবীণায় সত্যসুরে তার বাঁধতে চাই— সেই জন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ করতে চাই, চৈতন্যকে নির্ম্মল করে তুলতে চাই— সেই জন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে শুদ্ধ করতে চাই— তা হলেই আমার সুর বাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠ্‌বে। আমাদের প্রার্থনা হচ্চে এই:— "তব অমল পরশরস অন্তরে দাও।"[১] তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচ্চে আমাদের অন্তরের সঙ্গীত। তুমি ত জান আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে, দুখে, বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।[২]

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দী খবরের কাগজ রয়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্চ?[৩] ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম।[৪] তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখব। আমি ভেবেছিলুম তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখ্‌চি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে— তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান, আমার মত মূর্খ হলে চলবে না— নাম্‌তা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুললে কষ্ট পাবে— আমার এমন দুর্দ্দশা হয়েচে যে আমি, হাজার চেষ্টা করলেও কখনই একলা শান্তিনিকেতন থেকে Irkutok এ[৫] ঠিক পথ চিনে যেতে পারিনে। অতএব ছুটি ফুরোবার আগেই ইস্কুল ছেড়ে কোথাও যেতে হলে আমার শোচনীয় দৃষ্টান্ত মনে রেখো। আলমোড়ায় যদি যাও ওখানে বস্রিসা[৬] বলে আমাদের জানা লোক আছে, তাঁদের সঙ্গে হয় ত আলাপ হবে—

সেদিন তিনি আমাকে একটিন ভাল পাহাড়ে মধু পাঠিয়ে দিয়েচেন— এঁদের একটা বাড়ি ভাড়া করে আমরা ছিলুম— কিন্তু সে বাড়ি ক্যান্টনমেন্টের সীমানায়— এখন সেখানে বোধহয় সকলকে থাক্‌তে দেয় না। [?২৯ শ্রাবণ ১৩২৫]

তোমার রবিদাদা

২৪

১৮ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

তুমি কাশী থেকে দূরে গেছ সেই জন্যে তোমার চিঠি আসতে অনেক দেরি হবার কথা। কিন্তু তাই বলে তোমাকে দেরিতে চিঠি লিখে শাস্তি দেব কেন? তা ছাড়া, ঠিক হিসাব মিলিয়ে দেনাপাওনা করবার [দরকার] কি? যা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি দিতে পারলেই ত জিত। কি বল? অতএব আমার এই চিঠিখানার জিত রইল। তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্ছ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম।[১] তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কি যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণ পরিচয়

প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেচ— পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মত। সেখানকার ছোট ছোট পাহাড় গুলো, "কর, খল," "জল পড়ে, পাতা নড়ে", এর বেশি আর নয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগ্‌ল হিমালয় যত বড়ই হোক্ না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়? আসল কথা, পাহাড়টা থাকে থাকে উপরে উঠেচে বলে ডাণ্ডি করে চড়তে চড়তে তখন পর্ব্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে জিনিসটা খুব বড় আমরা একেবারে তার সমস্তটা ত দেখতে পাই নে— পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি— এমন কি, যে মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তারও সেই বড় বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাৎ জিনিসটা কল্পনায় যত বড়, প্রত্যক্ষে তত বড় নয়। অর্থাৎ বড় হলেও বড় দেখায় না। সেইজন্যেই যে বড় তার সঙ্গে ছোটর মিল হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের যে ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি তিনি যত বড় তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত তাহলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মত আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি— যতই উঠি না কেন তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না— বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে আপনার মধ্যে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন— কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চল্‌তে থাকে। তাই ত তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের কিছু ঠেকে না— তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন, এত উপরে চড়ে যান না যে তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েচ আমরা তার চেয়ে

ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে— তিনি যে আমাদের জন্যে সবই হতে পারেন তা নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের চল্‌তই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগ্‌ল আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া পাহাড়ের চেয়ে ভাল পাহাড় ঢের আছে। আল্‌মোড়া ভারি নেড়া পাহাড়— ওর গাছপালা নেই— আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার দৃশ্য তেমন ভাল করে দেখা যায় না। ইতি ১লা ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৫

২৫ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

চার পাঁচদিন তোমার চিঠি পাই নি আমিও তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারি নি। রাগ করে লিখি নি তা মনে কোরো না। কেননা, তোমার উপরে আমি রাগ করতে পারি নে, দ্বিতীয়ত আমি জানি কাশী থেকে আলমোড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে তার পরে সেখান থেকে চিঠি রওনা হয়ে এখানে এসে পৌঁছতে প্রায় দশ দিন দেরি হবার কথা। তোমার চিঠি না পেয়েও তোমাকে আমি লিখেছিলুম, সে এতদিনে তুমি নিশ্চয় পেয়েছ। আরো আমি লিখ্‌তে পারতুম কিন্তু আমার ক্লাসের কাজ এখন অনেক বেড়ে গেছে। সকালে যেমন পড়াতুম তেমনি পড়াই, তার পরে আবার দুপুর বেলায় খাওয়ার পরে এণ্ট্রেন্স ক্লাসের তর্জ্জমা করানোর ভার আমাকে নিতে হয়েচে।[১] তাতে

আমার অনেকটা সময় কেটে যায়— তার পরে আগে যেমন পরদিনের পাঠ আমাকে লিখে তৈরি করে রাখ্‌তে হত, এখন তাও করতে হয়। কাজেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার একটুও সময় নেই বল্‌তে পার। তুমি ভাবচ আমার পক্ষে এতটা কাজ করা কষ্টকর,— তা নয়। এ আমার ভালই লাগে। আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই এতে ওদের উপকার হয়। মা যেমন ছেলেদের খাইয়ে খুশি হন এ আমার তেমনি— আমি ওদের মনের খোরাক যত পারি যোগাচ্চি, এতে আমাকে খুসি রাখে। বিশেষত দেখি ওরা আমার কাছে এসে পড়তে ভালবাসে— আমি যদি ওদের ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে ওরা দুঃখিত হয়। এতকাল আমি থার্ড ক্লাসে ইংরেজি পড়িয়েছি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়াইনি সেইটে ওদের একটা খেদ ছিল— যেমনি শুন্‌লে ওদের আমি পড়াব অমনি ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেচে। কিন্তু বরাবর এমন করে সমস্তদিন পড়ালে চল্‌বে না— তাহলে আমার অন্য সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে— তাই ঠিক করেচি আর কোন একটি মাস্টারকে তৈরি করে নিয়ে তাঁর হাতে ক্লাস ছেড়ে দেব। তুমি যখন এম্‌, এ, পাশ করে তৈরি হয়ে উঠ্‌বে তখন তুমি এই কাজের ভার নিতে পারবে— কি বল? সেই দশটা বছর একরকম করে চালিয়ে দিতে পারব। তোমাকে ছেলেরা মান্‌বে ত? তাদের ঠিকমত শাসন করে রাখ্‌তে পার্‌বে? পঞ্চম বর্গের ছেলেরা আমার ক্লাসে কি রকম চেঁচামেচি গোলমাল করে তুমি ত দেখেইচ— তারা আমার ক্লাসে পড়া খেলা বলে মনে করে, আমাকে তাদের খেলার সঙ্গী বলে ঠিক করে রেখেচে। কেন এমন হয় বলত রাণু? ছোটরা কেউ আমাকে একটুও ভয় করে না— তারা আমাকে তাদের সমবয়সী বলে ঠিক করে রেখেচে। আমি যখন তোমাকে লিখেছিলুম যে, আমাকে তুমি নারদমুনির মত মনে করে হয়ত ভয় করবে, তখন আমি কত বড় ভুলই করেছিলুম— আমি যে ছ ফুট লম্বা মানুষ, এত বড় গোঁফ দাড়িওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার লোক,

আমাকে দেখে তোমার মুখশ্রী একটুও বিবর্ণ হল না— এসে যখন আমার হাত ধরলে তখন তোমার হাত একটুও কাঁপল না, অনায়াসে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলে, কণ্ঠস্বরে একটুও জড়িমা প্রকাশ হলনা— একি কাণ্ড বল দেখি? আমার নিজেরই এক এক সময় মনে হয় আমি হয় ত ছদ্মবেশী ছেলেমানুষ, তাই আমি বাইরে যতই বেশি বয়সের সাজ করিনা কেন, আমার ভিতরের ছেলেমানুষী ফস্ করে ধরা পড়ে যায়— বিশেষত ছেলেমানুষদের কাছে। আমার ফাল্গুনীতে[১] সেই কথাটাই লিখেচি— পৃথিবীতে বুড়োটাই ফাঁকি, সে একটা মুখস্ মাত্র— জলে স্থলে আকাশে যৌবন আর কিছুতেই মরে না— তাই আকাশের ললাটে বলির চিহ্ন নেই, তাই হাজার লক্ষ বৎসরের সমুদ্র আজো ছেলেমানুষের মত কলরোলে নৃত্য করচে, তাই পৃথিবীর শ্যামলতা চিরনবীন, তাই তারাগুলি সদ্যোজাত জ্যোতিঃশিশুগুলির মত অন্ধকারের কোল জুড়ে নীরবে পড়ে আছে। তুমি যে মনে করচ আজ আমার এই "সাতাশ" বছর বয়স থেকে আর পনেরো ষোলো বছর পরে কোনো একদিন আমি আটাশে পড়ব— আমি তা বিশ্বাস করি নে। আমি দেখ্‌চি বরাবর ঐ সাতাশেই আট্‌কে থাক্‌ব। কিন্তু আমার একটা ভাবনা আছে— তুমি যদি তখন হূহু করে বড় হয়ে উঠ্‌তে থাক তাহলে আমি কি করব? তুমি তখন হয়ত সবেগে আটাশ উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ পেরতে থাকবে, আর আমি কোনমতেই তোমার নাগাল পাব না— ঠিক যেন আমি ইস্টেশনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর তুমি রেলগাড়ির মত বাঁশি বাজিয়ে দিয়ে কোথায় ছুটবে ঠিকানাই পাব না।

তোমার নিশ্চয়ই হিমালয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় খুবই ভাল লাগ্‌চে। আমাকে দেখেই যেমন ছুটে এসেছিলে তেমনি করেই বোধহয় হিমালয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। হিমালয়ের কোলের কাছে ছোট ছোট যে সব ঝরনা কলকল করে ছুটে বেড়াচ্চে, তারা যেমন গিরিরাজের স্নেহের ধন, তুমিও বোধ হয় তেমনি তার আপনার জিনিস হয়ে উঠেচ। ওখানে ঠাণ্ডায়

তোমার শরীর নিশ্চয় ভাল হবে— আগেকার চেয়ে ক্ষিদে বেশি হবে— যতক্ষণ পার বাইরের হাওয়ায় দেবদারুবনের ছায়ায় বসে কাটিয়ে দেবে। ঘরের মধ্যে যত কম থাক্‌বে ততই ভাল। এ বৎসর পশ্চিমে বৃষ্টির অভাব ঘটেছে, অতএব পাহাড়ের উপরে বোধহয় এখনো বর্ষা নামে নি— তাহলে সমস্ত দিন বাইরে কাটাতে কোনো অসুবিধা হবে না। বড় চিঠি লিখেচি— কিন্তু আর সময়ও নেই জায়গাও নেই। ইতি ৮ই ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৬

২৮ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন ত আমার সময় থাকে না— তাই এখন খাওয়ার পরে লিখ্‌তে বসেচি। আর খানিক পরেই ম্যাট্রিক্‌ ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে তাদের খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে নিয়ম করে দিয়ে গিয়েছিলে আজ কাল সে আর পালন করা হয়ে ওঠে না— খাওয়ার পরে দুপুর বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি— সেই ডেস্কের সাম্‌নে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সে জন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার পড়লেই কাজ করতে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে— সেও আবার আপিসের কাজ— অর্থাৎ সেকাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি যে

ছেলেদের পড়াই সে ত দায়ে পড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়— অতএব এ রকম কাজ করতে পারা ত সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখতে পাই তখন মনটা উতলা হয়ে ওঠে। আমি যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর থেকে সুর বেরোয় তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হচ্চে বাণীর কাজ— সময়টাকে কর্ত্তব্য দিয়ে ভরাট করে একেবারে নিরেট করে দিলে বাণী চাপা পড়ে যায়। সেই জন্যেই আমাকে কেবল কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাক্‌তে হয়। কাজই হোক্‌, আর মানুষই হোক আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেল্লে আমার জীবন ব্যর্থ হতে থাকে। আমার মন ওড়বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধবার আয়োজন যতবার হয়েচে ততবারই সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে। হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবে আমার কাজকর্ম্মের দাঁড়খানা তার শিকল নিয়ে কোথায় পড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগ্‌ডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে একলা বসে গান জুড়ে দিয়েচি। তাই বল্‌চি দরজা জান্‌লার আড়াল থেকে ঐ নীলে সবুজে সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেম্‌নি দেখতে পাই অমনি আমার মন এই ডেস্কের ধার থেকে বলে ওঠে ঐখানেই ত আমার জায়গা— ঐ ফাঁকাটাকে যে আমার আনন্দ দিয়ে গান দিয়ে ভরে তুল্‌তে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা— সেইখানেই তার কাজ— কেউবা স্নান করচে, কেউবা জল তুল্‌চে, কেউবা বাসন মাজ্‌চে— কিন্তু আমি হচ্চি মেঘের মত; আমাকে ত মাটির ঘের দিলে চল্‌বে না— আমাকে বাঁধতে গেলে ত বাঁধা পড়ব না— আমাকে যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ করতে হবে। সব সময়েই যে বৃষ্টি ভরে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস স্বপ্নের মত সূর্য্যের আলোতে রাঙিয়ে উঠে কিছুই না করে

ঘুরে বেড়াই— কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু, উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেছে— এ জন্যে আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই ত বুঝ্লুম, কিন্তু কুঁড়েমি করি কখন্ বল ত? তুমি ত দেখেই গেছ কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মত দ্রুতগামী এবং মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন— কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে লাগামে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে— আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল আমি ভরপুর কুঁড়েমি করে কাটাই কিন্তু যে গ্রহের হাতে পড়েছি সে আমাকে কষে খাটিয়ে নিচ্চে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন খাটুনি এড়িয়ে ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জ্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম— কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার “সাতাশ” বছর বয়স হয়েচে তখন থেকেই কাজের জালে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরবার আর পথ পাইনে। নইলে আগেকার মত হলে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে কতক্ষণ লাগ্ত বল। তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ করচ একথা মনে করে ভাল লাগচে— তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপড়িতে রাগ-রক্ত হয়ে আমার হাতে এসে পৌঁচচ্চে।[1] সেখানকার ফুলে যে রক্তিমা দেখতে পাচ্চি— তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ করে আন্বে এই আশা করে আছি। আজ আর সময় নেই— অতএব ইতি। ১১ই ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৭

২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

অনেকদিন পরে আজ তোমার চিঠি পেলুম। তাতে ক্ষতি নেই, তুমি বেশ ভাল করে বিশ্রাম কর এবং ভাল করে সুস্থ সবল হয়ে ওঠ, এই আমি চাই। তোমাকে ত একদিন সেক্রেটারির কাজ করতে হবে— এখন থেকে তার জন্য বল সঞ্চয় কর। আমি তোমাদের বয়সে এত বেশি সুস্থ সবল ছিলুম যে নানা রকম চেষ্টা করেও একদিনের জন্যও শরীর খারাপ হত না— তাই রোজ ইস্কুলে যেতে হত। শরীর আমার এত বেশি ভাল ছিল বলেই এত দীর্ঘকাল ধরে আমি এত কাজ করতে পেরেছি। এখনো ত আমার কাজের অন্ত নেই। যাই হোক্, আমার যা সঞ্চয় আছে তাতেই আমার কাজ চলে যাচ্ছে— এবং যখন আর পনেরো ষোলো বছর পরে আমার বর্ত্তমান সাতাশ পেরিয়ে আটাশে পড়ব তখনো চলবে— কিন্তু তোমার শরীরে সেই সঞ্চয় নেই। শুধু এম, এ, পাস করলে কি হবে? শরীরে মনে খুব জোর থাকা চাই। অতএব বাইরে দেবদারু বনে বসে খুব হাওয়া খাবে এবং ঘরের মধ্যে এসে খুব দুধ খাবে। আমাকে যেতে বলেচ? কিন্তু আমাকে ত কেউ ছুটি দেবে না। আগেকার চেয়ে আমার বরঞ্চ আরো অনেক কাজ বেড়ে গেছে— সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেই লিখেচি। তোমার বাবজা তাঁর কলেজ থেকে ছুটি নিতে পেরেছিলেন— তার একটা মস্ত কারণ ছিল— অন্য লোকের কাছ থেকে তাঁকে ছুটি আদায় করতে হয়েছিল— আমার ছুটির দরবার যে আমার নিজের কাছে করতে হয়। সে যে ভয়ঙ্কর কড়া মনিব। আমি যদি পরের কাজে ভর্ত্তি হতে পারতুম তাহলে আমাকে এত বেশি খাট্‌তে হত না। আমার বোধ হয়, আমি যদি

সাতাশ টাকা মাইনেয় তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হতুম তাহলে ছুটির জন্যে আমাকে দরখাস্ত করতেই হত না— কাজ করবার জন্যেই করতে হত। তাই আমি স্থির করে রেখেচি তখন তোমার সেক্রেটারির পদের জন্য এখন থেকে দরবার করে রেখে দেব। তাহলে, আমি নিশ্চয় জানি আমার রঙীন কাপড়ের বরাদ্দ হয়ে যাবে, আর চুলের জন্যে ভাবতে হবেনা— বোধহয় সের পাঁচ ছয় দুধও রোজ বিনি পয়সায় পাব।— আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হচ্চে। এক একদিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারাগুলো বেঁকে একেবারে তীরের মত সীধে [য] ঘরের মধ্যে চলে আসে। এখানে গরম নেই বল্লেই হয়— আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ হয়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখিনি। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে থাকে ফুলে উঠেচে— ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মত। আমাদের বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরে উঠেচে। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েচি। সেগুলো যখন বড় হয়ে উঠ্‌বে তখন আমাদের আশ্রম আরো সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু এখানকার শুক্‌নো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে— আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এসব গাছে ফুল ধরা দেখ্‌তেই পাব না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে এস তাহলে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখ্‌তে পাবে। এ বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর— যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছপালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে, তেমনি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ পড়ে গেছে,— পড়াশুনো কাজকর্ম্ম যেন নতুন জোর পেয়েছে— সেই জন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তার পুরস্কার পেয়েছি। আমাদের আশ্রমলক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিদেশে

যাত্রা কাঁচিয়ে দিয়েছেন— খুব ভালই হয়েচে। আমি লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইংরেজিতে তর্জ্জমা' করেছি তা জান? এণ্ড্রুজ সেটা পড়ে খুব হেসেচেন, আর খুব লাফালাফি করেচেন। তোমরা শুনলে তোমাদেরও খুব ভাল লাগত। তাহলে এই ইংরেজি নাটকে তোমাকে একটা কিছু সাজান যেত। ইতি ১৬ ভাদ্র, ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৮

৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

এই মাত্র যখন বৌমার ইংরেজি লেখা সংশোধন করছিলুম এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। যেমনি তোমার চিঠি পাই অম্‌নি তখনি তার জবাব লিখে দিই। অন্য কাজকর্ম্মকে ততক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি। কাজ ফাঁকি দেওয়া আমার চিরদিনের স্বভাব কিনা সেই জন্যে ওতে আমার দুঃখ বোধ হয় না। আর তা ছাড়া নিশ্চয় জানি একটি ছোট মেয়ে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে আমার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে— সে কি কম গর্ব্বের কথা। আরো একটা ভরসার কথা আছে— এই চিঠির কাগজের দুটো পাতায় যা লিখব আমার পাঠক এবং সমালোচকটি তার একটুও নিন্দা করবেনা। কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন— মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আসচে— অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত মাঠ জলে ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌চে— থেকে থেকে অশান্ত বাতাস

সোঁ সোঁ করে হুহু করে আমাদের শালবাগানের ডালপালাগুলোর মধ্যে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়্‌চে— ঠিক যেন আকাশের অনেকদিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাক্‌ছে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে— আর তার মধ্যে দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মত। সব সুদ্ধ জলে স্থলে খুব একটা ক্ষ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হচ্চে যেন ছুটন্ত উচ্চৈশ্রবার [য] উপরে চড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্ত্তনাদ আর তার বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে— একটা রীতিমত ঝড়ের আয়োজন বলেই বোধ হচ্চে। আমার এই দোতলার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব যে ভাল আশ্রয় তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trenchএর মত— যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয় যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়— ভাল করে ঝড়টা দেখ্‌তেও পাচ্চি নে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভাল করে রক্ষাও পাচ্চিনে। সিঁড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ করতে হয়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ— অন্ধকার— কোথা থেকে বেঁকে চুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আস্‌চে— রুদ্রদেবের তাণ্ডব নৃত্যের এই ডমরুধ্বনির মধ্যে বসে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি।—

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে, যে তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক করে রেখেছ। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুন্‌তে পাব— কিন্তু আমার আসল নামটা যেন একেবারে চাপা না পড়ে যায়— কেননা ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি, তা ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে— এরপরে যারা আমার নামে কবিতা লিখ্‌বে তাদের অনেকটা কষ্ট বাঁচবে। এই জন্যে আমার মনে হয় নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের একটা কিছু কাজ করা উচিত। মনে কর তুমি যদি খুব গাইয়ে হয়ে উঠ্‌তে পার তাহলে প্রীতির সঙ্গে গীতি বেশ মিলে যাবে। কিন্তু আমি তোমার একটা নাম

ভেবে রেখেচি, পছন্দ হবে কিনা জানিনে। আগে তার একটু ইতিহাস বলে দিই। সার্ ওয়াল্টার স্কটের’ নাম বোধ হয় শুনেচ। একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। স্কট্‌কে সে ছোট ছেলের মত ইংরেজি দোঁহা শেখাত, আর না পারলে খুব ধম্‌কে দিত— দোঁহার দুটো লাইন তোমাকে লিখে দিচ্চি:—

"Wonery, twoery, tickery, seven;
Alibi, crackaby, ten and eleven;"

প্রায় সেই "ছল ছল ছৈল"র কাছাকাছি যায়। তারপরে সে খুব ভাল কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। Scott used to say that he was amazed at her power over him, saying to Mrs. Keith, "She's the most extra ordinary creature I ever met with, and her repeating of Shakespeare overpowers me!"—Mrs Keith হচ্চে ঐ মেয়েটির মা, স্কটের বন্ধু, যখনকার কথা বল্‌চি তখন মেয়েটি তোমার চেয়ে খুব অল্প একটু ছোট ছিল— সে ছিল সাত। তার ছবি দেখে একজন লেখক বর্ণনা করেচেন— "Fearless and full of love, passionate, wild, wilful, fancy's child. One cannot look at it without thinking of Wordsworth's lines:

O blessed vision, happy child!
Thou art so exquisitely wild,
I thought of thee with many fears,
Of what might be thy lot in future years."

স্কটের সঙ্গে তার যে রকম বন্ধুত্ব ছিল তার ইতিহাস সমস্তটা পড়ে আমার তোমাকে মনে পড়ে। তার নাম ছিল Marjorie Fleming। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, এবারে তোমার সঙ্গে দেখা হলেই তোমাকে মার্জরী বলে ডাক্‌ব— কিন্তু ভয় হল হঠাৎ শুনে পাছে তুমি রাগ করে বস, যদি

ভাব তোমাকে গাল দিচ্চি বা, তাই আগে থাক্‌তে নামের একটু ব্যাখ্যা করে দিলুম। রাণু নামটি যে আমার পছন্দ নয় তা নয়; তবে কি না দুই একটা বাড়তি নাম হাতে রাখা ভাল— কেননা মানুষের মেজাজ ত সব সময়ে এক রকম থাকে না, অথচ নামটা একই থাকে এটা অসঙ্গত কৃপণতা। যখন তুমি শান্ত থাক্‌বে তখন তোমাকে এক নামে ডাক্‌ব, আবার যখন তুমি দুষ্টু হবে তখন তোমাকে আর এক নামে ডাক্‌ব, এইরকম হওয়া উচিত। কি বল? আজ অনেকক্ষণ কাজকর্ম্ম ঠেকিয়ে রেখেচি কিন্তু আর নয়। এইখানে চিঠি বন্ধ করি একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি তুমি যে লাল ফুল পাঠিয়েচ ঐ লাল রং আমার ভাল লাগে। তাই জন্যে বল্‌ছিলুম এমন হিসাব করে দুধ খাবে যে, নভেম্বর মাসের মধ্যে তোমার গালে যেন ঐ রকম লাল ফুল ফুটে ওঠে। ইতি ২০ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৯

১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আজ সকালে তোমার চিঠি এই মাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার, এই জন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগে আমার ছুটি। তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বসবার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখ্‌ছিলুম তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁকডাক এবং

মাঠে বনে পাগ্‌লা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চলছিল— আজ সকালে তার কোনো চিহ্ন নেই। আজ শরৎকালের প্রসন্নমূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছে— শিবের জটা ছাপিয়ে যেমন গঙ্গা ঝরে পড়চে, আকাশ তেমনি আজ আলোকের নির্ম্মল ধারা ঢেলে দিয়েচে— পৃথিবী আজ যেন মাথা নত করে তার অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসিমুখে তার উপরে এসে দাঁড়িয়েচেন— জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠেচে। সেই পরিপূর্ণতায় চারিদিক শান্ত স্তব্ধ। অথচ গোলমাল যে কিছু নেই তা নয়— জাগ্রত প্রভাতের কাজকর্ম্মের কলধ্বনি উঠেচে— আমার ঠিক সাম্‌নেই দিনুবাবুর ঘরের দোতলায় রাজমিস্ত্রি এবং মজুরের দলে নানা রকম ডাক হাঁক এবং ঠুকঠাক লাগিয়ে দিয়েচে, দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্চে, পূব দিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইঁটের বোঝা নিয়ে আসচে তারই অনিচ্ছুক চাকার আর্ত্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জ্জনধ্বনির বিরাম নেই, তার উপরে, ঠিক আমার পিছনের জান্‌লার বাইরে সুধাকান্তর' ঘরের চালের উপরে বসে একদল চড়ুই পাখী কিচিমিচি কিচিমিচি করে কি যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে তার এক বর্ণ বোঝবার জো নেই,— প্রায় ন্যায় শাস্ত্রেরই তর্কের মত। কিন্তু তবু আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙতে পারচে না— গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যে সব ঝরনা ঝরে পড়চে তাতে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না এও ঠিক সেই রকম— একটি তপঃপ্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন করে এই সমস্ত ছোট ছোট শব্দের দল খেলা করে চলেচে— তাতে তপস্যার গভীরতা আরো বড় হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, নষ্ট হচ্চে না। শরতের বনতল যেমন নিঃশব্দে ঝরে পড়া শিউলি ফুলে আকীর্ণ হয়ে ওঠে, তেম্‌নি করেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ করচে।

তুমি লিখেচ, তোমার মা বলেন, আগের চাইতে তুমি ভাল হয়েচ। ভাল হওয়ার আসল মানে কি জান, নিজের চারদিকে আসক্ত হয়ে ঘুরে না বেড়ানো— বড় হওয়ার বড় রাস্তায় সাম্‌নের দিকে বেরিয়ে যাওয়া। আমরা যখন নিজের ইচ্ছা নিজের প্রবৃত্তি নিজের ভোগের আয়োজনে নিজেকে বাঁধি তখন অন্য সকলকেও বাঁধতে চেষ্টা করি— সেই নিরন্তর টানাটানিতে দুঃখ পাই দুঃখ দিই। কিন্তু আমাদের জীবনের এই লক্ষ্য হোক্ আমরা মুক্তি পাব, মুক্তি দেব। দেখ, মরুভূমিতে যে সব গাছ জন্মায় তা প্রায়ই কাঁটা গাছ। কেন বল দেখি? তার কারণ হচ্চে এই সেখানকার মাটিতে রস খুব কম— এই জন্য অনেক টানাটানি করে' গাছ যেটুকু খাদ্য পায় সেটুকু সম্বন্ধে তার সতর্কতা উগ্র হয়ে ওঠে। কোনো জন্তু এই গাছের একটুখানি ডালও যদি খেতে চায় তাহলে সেটুকু সে দিতে পারে না, কেননা সেটুকু তার অনেক কষ্টের তৈরি— এইজন্যে সে আগাগোড়া কণ্টকিত হয়ে থাকে। মানুষ সেই রকম নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই যখন নিজে থাকে তখন তার কৃপণতার অন্ত থাকে না, তখন সে ঈর্ষায় দ্বেষে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের সমস্ত কিছুকে নিজের মধ্যেই বেঁধে রাখবার জন্যেই রাত্রিদিন উৎকণ্ঠিত এবং উদগ্র হয়ে থাকে— তখনই সে চারদিককে কেবলি খোঁচা দিতে থাকে। কিন্তু যখনি সে জানে বড়র মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা,— এত বড়ই সে, যে, মৃত্যুর মধ্যেও তার অন্ত নেই; এত বড়ই সে, যে, সমস্ত দুঃখ শোক ক্ষতিকে অতিক্রম করে অসীমের দিকে সে চলেচে এবং অসীমের মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে আছে; সেই অনন্তের মধ্যেই তার সমস্ত প্রেমের সমস্ত আনন্দের উৎস,— তখন সে আর আপনার এটা ওটা, আপনার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ ইচ্ছা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়ায় না— সে কাঙালের মত চাই চাই করে না তখন সে আপনাকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে— কেননা, সেই ত্যাগ তার পক্ষে ক্ষতি নয়। যখনি বিরক্ত হই, রাগি, উদ্বিগ্ন হই, ঈর্ষান্বিত হই, দুঃখ পাই— তখনি একবার

আপনাকে আপনার চিরন্তনের মধ্যে অনুভব করতে হবে; জান্‌তে হবে; এই ছোট-আমি সত্য নয়; জান্‌তে হবে আমি বড় এবং বড়র সঙ্গে আমার চিরদিনের মিলন,— আমাকে যে আমার দীনতা, নিজের প্রবৃত্তি কিম্বা বাইরের কোনো উৎপাত পরাভূত করবে এ সত্য হতেই পারে না, এ একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র, এ সমস্ত কোথায় ভেসে চলে যাবে, কিন্তু থাক্‌বে আমার অন্তরে অনন্ত, বাহিরে অনন্ত, সেই পরম জ্যোতি, পরম প্রাণ, পরম প্রেম, পরম আনন্দ— সেই পরমানন্দের উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করে দেখ্‌লে জীবনের সমস্ত দুঃখ সুখ, সংসারের সমস্ত ভাঙাগড়া একটি লীলাসৌন্দর্য্যে মুক্তরূপে দেখা দেয়— তখন তাদের ভার চলে যায় অথচ তাদের রস থাকে। আমি তোমাকে যা বল্‌চি তার সমস্ত মানে হয় ত সম্পূর্ণ না বুঝতে পার কিন্তু তবু এই কথাই আসল বলবার কথা, তাই তোমাকে বল্‌চি, এবং এই কথা বোঝবার দিকে ক্রমে তোমার মন মুক্ত হতে থাক্‌বে, নির্ম্মল হতে থাক্‌বে, আনন্দিত হতে থাক্‌বে এই আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩০

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

আজ স্নানের পর খাবার টেবিলে এসে দেখি প্লেটের পাশে তোমার হাতের অক্ষরে লেখা চিঠি রয়েচে। আজ সকালে আমার তিন ক্লাসেরই

পড়ানো ছিল। আজকাল তৃতীয় বর্গে আমার ক্লাসের বাইরের বিস্তর ছাত্র জুটেচে, বউমা, হেমলতা[১], ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী[২], রামানন্দবাবুর মেয়েরা[৩], কালীমোহন[৪], সন্তোষ, নেপালবাবু[৫], এণ্ড্রুজ সাহেব ইত্যাদি। আজকাল ঐ বর্গের পাঠ বেশ একটু শক্ত হয়ে উঠেছে— অনেকটা কলেজ ক্লাসের মত। প্রতিদিনই অনেক বড় বড় ভাব এবং তত্ত্ব নিয়ে আমাকে আলোচনা কর্ত্তে হয়— আজ কাল শুধু কেবল ইংরেজি sentence তৈরি করা নিয়ে ওদের exercise করাই নে। তোমরা যখন ছিলে তার চেয়ে এখন ছেলেদের অনেক বেশি উন্নতি হয়েচে— ওরা ভারি ভারি ইংরেজি বাক্য তৈরি করতে এবং বুঝতে পারে, তাছাড়া অনেক বড় কথা ওরা বুঝতে পারে এবং তাতে আনন্দ পায়। সেইজন্যে ওদের পড়াতে আমার এত আনন্দ বোধ হয়। কোথায় পড়াই বল দেখি? কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবেনা। সেই লাইব্রেরি ঘরের[৬] বারান্দায় পড়ানো অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি— ছেলেদের গোলমালে শাস্ত্রীমশায়ের[৭] সেখানে লেখাপড়ার অসুবিধা হত। তাই অনেকদিন আমার দোতলার শোবার ঘরে ক্লাস নিতুম। কিন্তু এত বেশি ছাত্রছাত্রীর ভিড় হতে আরম্ভ হল যে, ঘরে বাইরে কোথাও আর ধরছিল না। জগদানন্দ বাবুর[৮] বাসার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ আছে— এই বটের ছায়াতলে গোল একটি চালা তুলেছি— লাইব্রেরি থেকে সেখানে আমার পাথরের আসন তুলে এনেছি— এখানে দরকার হলে আমার আসন ঘিরে একশো লোক বস্‌তে পারে। এই জায়গাটি বেশ সুন্দর দেখ্‌তে হয়েছে। ছেলেদের বলেচি, তারা নিজের হাতে এখানে আসবার রাস্তা তৈরি করে দেবে— আর চারিদিকে চান্‌কা তৈরি করে ফুলের গাছ লাগিয়ে দিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে। তুমি আমার ছাত্রী থাক্‌লে তোমাকেও এই কাজে হাত লাগাতে হত। এতদিন এখানে দিল্লির সেন্ট স্টীফেন কলেজের অধ্যক্ষ রুদ্র সাহেব[৯] ছিলেন, তিনি রোজ আমার ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গে বসে যেতেন— তাঁর খুব উৎসাহ ছিল—

প্রায় একমাস ছিলেন— পশুদিন তিনি চলে গেছেন।

গেল বুধবারে[১০] সকালে আমি মন্দিরে কি বলেছিলুম শুন্‌বে? আমি বলেছিলুম, মানুষের ছোট আর বড়, দুই আছে। সেই ছোট মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোট সংসার পেতেছে— সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো— সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্চে আর ক্ষয় হচ্চে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়টি জন্মমৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেছে— এই চলবার পথে তার কত সুখ দুঃখ, কত লাভ ক্ষতি ঝরে' পড়ে' মিলিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর দুটি আবর্ত্তন আছে ; একটি আহ্নিক [য], একটি বার্ষিক, একটি আবর্ত্তনে সে আপনাকেই ঘুরচে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করচে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্য্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখ্‌তে পায় যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা। কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জান্‌লে সূর্য্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোট আবর্ত্তনে নিজেকে ঘুরি— এ ঘোরাতেই জান্‌তে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা— কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি— এই জন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জান্‌তে থাক্‌লে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চল্‌তে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ চিরদিনকে প্রণাম করতে করতে চল্‌তে থাক্‌বে— আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ চিরদিনের চরণে সমর্পণ করতে করতে চল্‌বে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা বলে বসে যে, আমি

যা পাই যা আনি সব আমি নিজে জমাব, তা হলেই বিপদ বাধে। কেন না, তার জমাবার জায়গা কোথায়? তার মধ্যে এত-ধরবে কোথায়? তার এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তার সোনায় ভরা সকালটিকে এবং সোনায় ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মত আপন সূর্য্যপ্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেচে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ ভালবাসাকে চিরজীবনের চলবার পথে চিরজীবনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে— তা হলেই ছোট আমির সঙ্গে বড় আমির মিল হবে— তাহলেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে। আপনার দিকে সমস্ত টান্‌তে গেলেই সে টান টেঁকে না, সে বিদ্রোহে ছোট-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এই জন্য ছোট-আমি জোড়ে [য] হাতে প্রার্থনা করচে, নমস্তেহস্তু— বড়কে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩১

২১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম কিন্তু তখনি তার জবাব দেবার সময় পাই নি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন

বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখ্‌তে বসেছি— ডাক যাবার আগে শেষ করে ফেল্‌তে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই,— আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার সেই লেখবার কোণটা ত তুমি জান— সেটা হচ্চে পশ্চিমের বারান্দা— সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্য্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপর ঘা দিতে থাকে— সশরীরে ঢুকতে পায় না বটে কিন্তু তার প্রতাপ অনুভব করতে পারি। তুমি এখন যেখানে আছ সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেমনি ব্যবহার করুন তাঁর সঙ্গে আমার কখনই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি— গাজিপুরে[১] পশ্চিমের গরমেও আমি দুপুর বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করি নি। অনেকদিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েছি— সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে মগজের মধ্যে মনের মধ্যে প্রবেশ করচে। আমার সাম্‌নে পূর্ব্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে পড়চে, আর সবুজ ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে যেন কানে কানে কথা বল্‌চে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানাহানি কাটাকাটি হয়ে গেল, মানুষের ঘরে ঘরে কত সুখ দুঃখ কত মিলন বিচ্ছেদ কত যাওয়া আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের নীল আকাশের নির্ম্মল রৌদ্রটি এই শরতের সবুজ পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে আপন আসন অধিকার করেছে— কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্য্যের পরে এই রসপরিপূর্ণ নির্ম্মলতার উপরে কোনো আঘাত করতে পারে নি। সেই কথা যখন মনে করি তখন সাম্‌নের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগ যুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কি বলি তাই তুমি শুন্‌তে চেয়েচ। যা বলি তা আমার

ভাল মনে থাকে না। এন্ড্রুজ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তার ভাবখানা শুনে নেন তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে[১] বলেছিলুম, জগতে একটা খুব বড় শক্তি হচ্চে প্রাণ— অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোট কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি মুহূর্ত্তে বিপুল জড় বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই করেছিল আমাদের সুকুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই করে চলেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখ্‌লে দেখা যায় এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ, খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার এই বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃতদেহে সজীব দেহে বস্তু পিণ্ডের পরিমাণের তফাৎ নেই অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাৎ অপরিসীম। শুধু এই নয়, সজীবের বর্ত্তমান আবরণের মধ্যে তার প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ কি করে যে প্রচ্ছন্ন থাকে তাও ভেবে পাওয়া যায় না। ছোট বীজের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটর মধ্যে এই যে বড়র প্রকাশ এই হচ্চে আশ্চর্য্য। আরেক শক্তি হচ্চে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্ব্বল— চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে। কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্চে— অর্থাৎ সে যা সে তার চেয়ে অনেক বড়। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতিক্ষুদ্র এবং অতিবৃহৎ অতিনিকট এবং অতিদূরকে কেবলি অধিকার করচে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন সেও অপরিমেয়। একটি ছোট শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের শেকস্পীয়রের মন লুকিয়ে ছিল। বর্ব্বরতার যে মন পাঁচের বেশি গণনা করতে পারত না, তারি মধ্যে

আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধি লাভ করেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে যে আরো কি আশ্চর্য্য চরিতার্থতা লাভ করবে আজ আমরা তা কোনোমতে কল্পনাই করতে পারিনে। তা হলেই দেখা যাচ্চে আমাদের এই যে মন, যা একদিকে খুব ছোট খুব দুর্ব্বল দেখ্‌তে, আর একদিকে তার মধ্যে যে ভূমা আছে হিমালয়ের পর্ব্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোট দেহ ছোট মন ছোট সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা— অনেক সময়ে তাকে যেন দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেই জন্যেই ত একদিকে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা আমাদের রাগ বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্নবস্ত্র ও অন্য হাজার রকম বাসনার জিনিসের জন্যে দরবার করছে, সেই মুহূর্ত্তেই এই প্রবৃত্তির দাস এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেচে, অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড় চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে জোর যদি না থাক্‌ত তবে এত বড় কথা তার মুখ দিয়ে বেরত কেমন করে? এ কথার কোনো মানে সে বুঝত কি করে? আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্চে এই যে মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখ্‌চে শুন্‌চে ছুঁচ্চে খাওয়া পরা করচে তাকেই চরম সত্য বল্‌তে চাচ্চে না— যাকে চোখে দেখ্‌ল না, হাতে পেল না তাকেই বল্‌চে সত্য। তার একটি মাত্র কারণ, ছোটর মধ্যেই বড় আছেন। সেই বড়ই ছোটর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্চেন— তাই মানুষের আশার আর অন্ত নেই। এখন, প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্চে কি? নিজের কথায় চিন্তায় ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়ই সত্য— তা না করে যদি মানুষের ছোটটার উপরেই ঝোঁক দিই, যে সব বাসনা তার শিকল, তার গণ্ডী, যাতে তাকে খর্ব্ব করে আচ্ছন্ন করে রেখেচে তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই তাহলে

মানুষকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা যে অমর, আত্মা যে অভয়, আত্মা যে সমস্ত সুখ দুঃখ ক্ষতি লাভের চেয়ে বড়, অসীমের মধ্যে যে আত্মার আনন্দনিকেতন এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্চে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ— এই জন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড় জগতে জন্মেছি— আমরা ছোটখাটো এটা ওটা সেটা নিয়ে রেগে ভেবে কেঁদে মরতে আসি নি। ইতি ৪ঠা আশ্বিন পূর্ণিমা ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩২

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ, রবিদাদা না বলে আমাকে আর একটা কোন্ নামে সম্ভাষণ করতে পার? মহাভারতের সময়ে মানুষের এক এক জনের দশ বিশটা করে নাম থাক্‌ত, যার যেটা পছন্দ বেছে নিতে পারত, কিম্বা যে ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে লাগিয়ে দিলেই চল্‌ত। অর্জ্জুনের কত নাম যে ছিল তা অর্জ্জুনকে রোজ বোধ হয় নাম্‌তা মুখস্থ করার মত মুখস্থ করতে হত। আমার যে আকাশের মিতাটি আছেন তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দুটো একটা নাম ধার করে নিতে চাও তাহলে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নামকরণ করবে তখন আমার সম্মতি নিলে ভাল হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয় তখন কেউ আমার সম্মতি নেয় নি— কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি নামটা মন্দ

হয় নি— কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার "মার্ত্তণ্ড" নামটাই পছন্দ হয় তাহলে কিন্তু আমি আপত্তি করব। ভানু নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয় তবু ওটা আমি একদা নিজেই গ্রহণ করেছিলুম১— ওর আর একটুখানি সুবিধা আছে— ওটা "রাণুর" সঙ্গে মিলে যায়—

এক যে ছিল রাণু
তার দাদা ছিল ভানু।

আর এক হতে পারে, যদি "কবিদাদা" বল। নামটা ঠিক সঙ্গত হোক্ বা না হোক্ ওটা আমার নিজের নামের সঙ্গে মেলে—

এক যে ছিল রবি
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। প্রিয় কবিদাদা বল্‌লে চল্‌বে না। প্রথম কারণ হচ্চে এই যে, তোমার প্রিয় কবি যে কে তা আমি ঠিক জানি নে— খুব সম্ভব যে লোকটা সেই আশ্চর্য্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সেই হবে— তার সঙ্গে ছ অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারব এমন শক্তি বা আশা আমার নেই দ্বিতীয় কারণ হচ্চে এই যে, ইংরেজিতে প্রিয় বলে না এমন মানুষই নেই, সে অমানুষ হলেও তাকে বলে— এমন কি, সে যদি দোঁহা না লিখ্‌তে পারে তবুও। আমার মত হচ্চে এই যে, রাস্তাঘাটের সবাইকেই যদি প্রিয় বল্‌তে হবে এমন নিয়ম থাকে তবে দুই এক জায়গায় সে নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব, আমাকে যদি শুধু রবি দাদা বল তাহলে আমি রাগ করব না— এমন কি, যদি মার্ত্তণ্ড নামটাই তোমার পছন্দ হয়, তাহলে "প্রিয় মার্ত্তণ্ড দাদা" লিখো না— তাহলে বরঞ্চ লিখো, মার্ত্তণ্ড দাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু। যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি তাহলে আমাকে ঐ নামে ডাক্‌লেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েছে— শিউলি বন সাড়া দিয়েছে— মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্র ফুলের অসংখ্য

অনুপ্রাস— কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশজোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা— আমাদের লাল রাস্তার দুই ধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে করে পথিকদের শারদসঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্চে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ হিল্লোল বয়ে যাচ্চে। অন্তরে বাইরে ছুটি ছুটি ছুটি এই রব উঠেচে। ছুটিরও আর কেবল প্রায় দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ তোমাদের তখন শৈলপ্রবাস বোধহয় সাঙ্গ হবে। পার্ব্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাক্‌বে না। কিন্তু হিমালয়ের খবর আমরা রাখি নে— কৈলাসের ত নয়ই— আমরা ত এই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েচেন; গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে কিন্তু তাদের নন্দীভৃঙ্গীর মত কালো চেহারা নয়— তারাও শ্বেত কিরণের মালা পরেছে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েছে— ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নাই। ইতি ৬ই আশ্বিন ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৩

১ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

তোমাকে যদি "প্রিয় রাণু" লিখি তা হলে কি রকম শোনায়? তাহলে আমি জানি তুমি নিশ্চয় রাগ করবে— কেন রাগ করবে বল্‌ব? কেন না,

প্রিয় বিশেষণটাকে যদি চিঠি লেখবার একটা পাঠ করে তোলা যায় তা হলেই ওর সত্যকার মানেটা দৌড়ে পালায়। অথচ "প্রিয়" শব্দটার খুব একটা মস্ত মানে— অত বড় মানে যখন পালিয়ে যায় তখন শূন্য কথাটা ভয়ঙ্কর একটা ফাঁকির মত পরিহাস করে। প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম তখন তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" পড়ে ভারি মজা লেগেছিল। ভাবলুম রবিবাবু আমার প্রিয় হবে কেমন করে? যদি হত প্রিয় মিস্টার ট্যাগোর, তাহলে তেমন বেমানান হত না। কেননা রবিবাবু প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হতে পারে, এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরেও হতে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিস্টার ট্যাগোরের প্রিয় ছাড়া আর কিছু হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগড়াই থাক আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু তিন ক্লাস উঠে "রবিদাদা" হয়েচে, কিন্তু এখনো পত্রে তার প্রিয় খেতাব ঘুচল না। এই "প্রিয়" যদি ইংরেজি কায়দার প্রিয় হয় তাহলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে— আমিও আমার চিঠিতে তার শোধ তুলব তবে ছাড়ব। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলা মতে হয় তা হলে আপত্তি নেই বটে, তবু, যখন আমি রবিদাদা তখন ওটা বাদ দিলেও চলে— ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো, যেন যার ফাঁসি হয়েচে তাকে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই— আমি নিতান্তই সাদা রবিদাদা। কি বল? মাঝে মাঝে আমাকে তোমার সাজাবার সখ যায় বটে কিন্তু আমার কোনো সাজ নেই বলেই তুমি সাজিয়ে সখ মেটাতে পার।

তোমরা মুক্তেশ্বরে[১] গেছ শুনে খুসি হলুম। আমি ভ্রমণ করতে ভালবাসি— কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা করতে আরো ভাল লাগে। কেননা, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘণ্টা

বসে থাক্‌তে হয় না, ডাণ্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে।' তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখ্‌চ তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব করচি। আমি আমার এই খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম— ড্যালহৌসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাকতুম— এক একদিন, আমাদের বাড়ির খানিক নীচে এক দেবদারুবনে সকালে একলা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট— (তখন লম্বায় ছ ফুট ছিলুম না) তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড় মনে হত সে আর কি বলব। সেই সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি বলে মনে হত' কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্ব্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাব কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে, যে নিজের চলার ধূলোয় এবং নিজের রথের ছায়ায় জগৎটাকে বারো আনা ঢাকা পড়ে যায়— বাজে ভাবনার ঝাঁকের মধ্যে দিয়ে জগৎটা আর তেমন করে দেখা যায় না। তাই আজ তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ, মনে হচ্চে সে আমার সেই অল্পবয়সের পৃথিবীর পাহাড়— আমার সেই ৪৫। ৪৬ বৎসরের আগেকার আমি তোমার মনের মধ্যে দিয়ে তোমার চোখ নিয়ে সেই সেকালের গিরিঅরণ্যে আর একবার ঘুরে বেড়াচ্চে। আমরা পুরোণো হয়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ করে দিই না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হয়ে নূতন হয়ে চিরনূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চিরকালই বৃদ্ধ হতে হতে পৃথিবীতে বাস করত তাহলে বিধাতার এই পৃথিবী তাদের নস্যো, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের পাকা বুদ্ধির আওতায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের সৃষ্ট এই পৃথিবীকে চিন্‌তে পারতেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলি আসচে নবীন

চোখ নবীন স্পর্শ নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হচ্চে— তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জ্জনা দিনে দিনে বারে বারে ধুয়ে মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল করে রাখ্‌চে। অন্য মানুষদের সঙ্গে কবিদের তফাৎটা কি জান? বিধাতার নিজের হাতের তৈরি শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না— কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না, তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়— তাই চিরদিনই তারা ছোটদের সমবয়সী হয়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হয়ে গেছে তারা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারার চেয়ে বয়সে বড় হয়ে ওঠে— তারা হিমালয়ের চেয়ে বড় বয়সের— কিন্তু কবিরা সূর্য্য চন্দ্র তারার মত চিরদিনই কাঁচাবয়সী— হিমালয়ের মতই তারা সবুজ থাকে ছেলেমানুষীর ঝরনাধারা কোনো দিনই তাদের শুকোয় না। লোকালয়ে বিশ্বজগতের নবীনতার বার্ত্তা এবং সঙ্গীত চিরদিন তাজা রাখবার জন্যেই কবিদের দরকার— নইলে তারা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ হাস্যে সকৌতুকে চিরপ্রাচীন গিরির বুকে
ঝরে পড়ে চির-নূতন ঝর্‌না;
নৃত্য করে তালে তালে প্রবীণ বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল বর্ণা।
পুরাণো সেই শিবের প্রেমে নূতন হয়ে এল নেমে
দক্ষসুতা ধরি উমার অঙ্গ,
এম্‌নি করে সারাবেলা চল্‌চে লুকাচুরি খেলা
নূতন-পুরাতনের চির-রঙ্গ।

ইতি ১৪ই আশ্বিন ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩৪

[২ অক্টোবর ১৯১৮][১]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হল। এ নামে আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ ডাকে নি। আর-কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেব না। সিণ্ডারেলার গল্প জান ত? তার এক পাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগ্‌ল। আমার ভানু নামটা সেইরকম যদি কেউ ব্যবহার করতে যায় আমি তখনি বল্‌তে পারব— আচ্ছা আগে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ— যার নাম সুরবালা, সে বল্‌বে সুরো সুরু সুরি কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিল্‌বে না, যার নাম মাতঙ্গিনী সে বল্‌বে মাতু মাতি মাতো কিছুতেই মিল্‌বে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, খগেন্দ্রমোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারী সুবিধে হয়েচে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কানু বিলাসিনী।" তবে তাকে কি বলে ঠেকাব? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এল— পর্শু ছুটি।[২] তার পরে কি করব? তখন কেবল শিউলি বন, শিশির ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাক্‌বে— তারা ত আমার কাছে ইংরেজি শিখ্‌তে চায় না— তারা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাঠি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলব এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য্যকে মিলিয়ে নেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ না লাগ্‌লে পরে প্রকৃতি জাগ্‌বে কি করে? নীলাকাশের কিরণ কমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন গ্রহণ করেন— কিন্তু আমার চোখের আনন্দ দৃষ্টি না পড়লে পরে সে পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেচি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে— তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্ব জয় করব। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে ত পারি নে— সন্ধ্যা যখন আসে তখন ত কাজ বন্ধ হয়, তখন ত আর গাণ্ডীব তুল্‌তে পারি নে। তাই জীবনে জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্ত্তা— তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়— রক্তে ধরণী পঙ্কিল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তুমিকে মানলেই শান্তি। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও। মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে। কিন্তু সে যখন ভুলে যায় যে, এ কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহঙ্কার করে ভাবে আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব, তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট্ পালট করে জঞ্জাল জমিয়ে তোলে— অবশেষে এমন হয় যে মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না যে-কাজ মায়ের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসারস্থিতির সঙ্গে এই যে মিলিয়ে কাজ করা এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে— অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র রাখতে পারি— তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য— মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ করেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে যখন তাই সে করে তখন তার সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্ম্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্ত্তি হয়ে ওঠে— যে পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই— তাহলে প্রতিদিনই আমি তুমির ছন্দ মিলিয়ে চল্‌তে

হবে— সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখ্‌চ ত, মা আজ পশ্চিমের ঘরে কি রকম প্রলয়ের সম্মার্জ্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে করছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ, নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে— সে আমি তুমির ছন্দকে একেবারে মানে নি— কিছুদূর পর্য্যন্ত সে বেড়ে উঠ্‌ল— মনে করল সে বেড়েই চল্‌বে— এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ একমুহূর্ত্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন ১৩২৫ [১৫ আশ্বিন ১৩২৫]

তোমার ভানুদাদা

৩৫

৯ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, "প্রিয় রবিবাবুর" যে ব্যাখ্যা দিয়েছ[১] এর পরে তোমার সঙ্গে আমার আর ঝগড়া চল্‌তেই পারে না। মাঝে মাঝে ঝগড়া করবার একটা উপলক্ষ্য পেলে মনটা খুসি হয়ে ওঠে— কেননা নিশ্চয় জানি সে ঝগড়া বেশ ভাল রকম করেই মিটে যাবে। নইলে যেখানে জানি ঝগড়াটা সত্যিকার ঝগড়া সেখানে আমি বড় ঘেঁষি নে। তাই লোকের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক গাল খেয়েচি কিন্তু জবাব দিই নে। কেন না সেখানে জবাব দেওয়াই হার, সেখানে রাগ করাই লজ্জা। কিন্তু রাণুতে ভানুতে যখন ঝগড়া চলবে তখন আমি খুব কসে জবাব দেব, সহজে হার মান্‌ব না।

তখন কণ্ঠে আমাদের আওয়াজ যতই চড়তে থাক্‌বে মনে মনে রাণুও হাস্‌বে ভানুও হাস্‌বে কি বল? হাসাটা আমার স্বভাব— যার সঙ্গে আমার হাসি চলে না তার সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহার চলাই শক্ত। যমরাজ যখন সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দূত পাঠাবেন তখনো যেন তার সঙ্গে হেসে নিতে পারি। যিনি আমার আকাশের মিতা তিনিও কম হাসেন না— কিন্তু এক এক সময় তাঁর হাসি বড় প্রখর হয়ে ওঠে— মানুষের সর্দ্দি গর্ম্মি লাগে। আমার যখন বয়স অল্প ছিল তখন মাঝে মাঝে আমার হাসিও কম প্রখর হয়ে উঠ্‌ত না— সেই খর দাহনের ইতিহাস তখনকার কাগজপত্র ঘাঁট্‌লে খুঁজে পাবে।[২] কিন্তু এখন আমার সে দিন গেছে। তুমি যে ভানুটিকে পেয়েচ সে সন্ধ্যাবেলাকার ভানু— তার হাসি রঙিন কিন্তু উগ্র নয়, তার হাসি ভূতলকে স্নিগ্ধ চুম্বন করে আনন্দিত— তাকে দিগন্তের বনজঙ্গল আড়াল করে ফেলে, তাদের ডালপালার খোঁচা দিয়ে তার ললাটে আঁচড় কাট্‌তে চায়— কিন্তু সে ক্ষমা করে বিদায় নিতে চায়— আপনার শান্তির মধ্যে আপনি প্রচ্ছন্ন হওয়াই তার কামনা। একটা কথা তোমার চিঠির মধ্যে লিখেচ সেটা আমার কাছে খুব মজার লাগ্‌ল। তুমি লিখেচ যখন তুমি আমাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলে— যখন তুমি আমাকে চক্ষেও দেখ নি এবং আবিষ্কার কর নি যে আমার বয়স সাতাশ তখনো তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে। কেমন করে হল? বোধহয় পূর্ব্বজন্মে যে সব চিঠি লিখ্‌তে সে চিঠিটা তারই অনুবৃত্তি— তাই একদম লিখে দিয়েছিলে, প্রিয় রবিবাবু, কিছুই ভাবতে হয় নি। এক জন্মের সঙ্গে আর এক জন্ম দৈবাৎ এক এক সময় ঠিক জোড়া লেগে যায়— তখন এক পরিচ্ছেদের সঙ্গে আর এক পরিচ্ছেদের মিলে যেতে আর বিলম্ব হয় না। আমি হয়ত বা আমার সাতাশ বছর বয়সটাকে সেইখান থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেচি— কিন্তু সে কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আমার কুষ্ঠিটা আমার মাথা

খারাপ করে দিয়েচে। কিন্তু ইতিহাসে তারিখের ভুল এত আছে যে আমার ইতিহাসের তারিখেও ভুল থাকা খুবই সম্ভব।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেছে। ছেলেরা সব চলে গেছে— যেখানে ক্লাস নিতুম সেই বটতল একেবারে নিঃশব্দ— কেবল শালিখ পাখীগুলো বোধ হয় আমাকে ঠাট্টা করে' মাঝে মাঝে আমার পঞ্চমবর্গের ছাত্রদের মতই গোলমাল করে আমার ক্লাসের নকল করবার চেষ্টা করে। ভেবেছিলুম এইখানেই আমার সমস্ত ছুটিটা নিস্তব্ধ হয়ে কাটিয়ে দেব। কিন্তু সে হয়ে উঠ্‌লনা। একবার মাদ্রাজের দিকে আমাকে যেতেই হবে। হয়ত কাল পর্শুর মধ্যেই চলে যাব।° শরীরের জন্যে একটু জায়গা বদল করারও দরকার আছে। তা ছাড়া আশ্রমে থাক্‌লে আশ্রমে আসার সুখটা পাওয়া যায় না। আশ্রমে আসবার জন্যে মাঝে মাঝে আশ্রম থেকে যাওয়া দরকার। বেশি দেরী করব না— তোমরা দেওয়ালির সময় আস্‌বে এমন আশা আছে— আমি তার আগেই ফিরব। কিন্তু এই কদিন হয়ত চিঠিপত্র পাবে না। নাইবা পেলে। চিঠি পাওয়া অভ্যাস হয়ে যাওয়াটা কিছু না। চিঠি না পেয়েও তোমার ভানুদাদার সঙ্গে অনায়াসে তোমার কথাবার্তা চল্‌তে পারে। বাইরের জিনিস যারই উপর আমরা বেশি নির্ভর করতে যাই সেই আমাদের কিছু না কিছু দুঃখ এবং ফাঁকি দেয়ই। বাইরের জিনিস বড় বেশি নড়ে চড়ে, ভাঙে চোরে, হারায় ফুরোয়। সে আমাদের এড়াবার আগেই তাকে এড়িয়ে যাওয়াই সুবিধে। "বীণা বাজাও মম অন্তরে।" অন্তরে যখন বীণা বাজে তখন আর ভাবনা নেই— সে বীণা সাথের সাথী— আর সে বীণা বাজাবার যিনি ওস্তাদ তাঁকে তেমন করে ধরে রাখতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। সেই বীণা যাতে সব কোলাহল ঢেকে বাজতে থাকে আমি এইটেই সবচেয়ে কামনা করি— বীণাটিকে যখন বাইরের দিকে খুঁজে বেড়াই তখনি মুস্কিল। তখন তার ছেঁড়ে, তখন তুম্বি ভাঙে তখন সুর ঠিক থাকে না। আমার ওস্তাদজি আমার হৃদয়

থেকে আমার আশীর্বাদ ও আনন্দ নিয়ে তোমার চিত্তবীণাকে বাজিয়ে দিন। কোনো ডাকহরকরার কোনো দরকার না থাকুক্ এই আমি ইচ্ছা করি। ইতি ২২ আশ্বিন ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৬

৩ কার্তিক ১৩২৫

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, মাদ্রাজের দিকে যেদিন যাত্রা করেছিলুম সেদিন শনিবার এবং সপ্তমী,[১] অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মত দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বল্‌তে পারিনে আমার যাত্রার সময়, লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রদের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কি রকম আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচ্চে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। সেইজন্যে আমার ভ্রমণপথের হাজার মাইলের মধ্যে ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত আমি সবেগে সগর্ব্বে এগতে পেরেছিলুম কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এম্‌নি অ্যাজিটেশন করতে লাগ্‌লেন যে বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক সভায় কেবলমাত্র আমার যাত্রা সম্বন্ধেই যে বিচার হয়েছিল তা নয়— বেঙ্গল নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। যদি বল সে সভায় ত আমাদের খবরের কাগজের

কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হচ্চে এই যে, আইনকর্ত্তারা তাঁদের মন্ত্রণা সভায় কি আইন পাস করেচেন তা তাদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সব চেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মুহূর্ত্তে হাওড়া ষ্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই করে তাঁর তক্তর উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইলেক্‌ট্রিক পাখার চলচক্রগুঞ্জনমুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার করলেন তাঁরই বা কত আশ্বস্ততা। তার পরে কত গড়্‌গড়্‌, থড়্‌থড়্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, স্টেশনে স্টেশনে কত হাঁক ডাক, হাঁস ফাঁস, হন্‌ হন্‌, হট্‌ হট্‌— আমাদের গাড়ীর দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বনজঙ্গল নদীনালা গ্রাম সহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মত উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগল। এমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখন পিঠাপুরমে পৌঁছতে মাঝে কেবল একটা স্টেশনমাত্র আছে এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্রসভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুরনি, তার বাঁশির ডাক, তার ধূমোদগার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, স্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হয়ে রইল যে, "চরাচর মিদং সর্ব্বং" যে চঞ্চল এ কথাটা মিথ্যা বলে বোধ হল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্‌ ধক্‌ ধুক্‌ ধুক্‌ করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির, তারপরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠলুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মত। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন হে মাদ্রাজে যাচ্চ ত? সেখান

থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখবার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি," আমার মন সেই এঞ্জিনটার মত চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই, এঞ্জিন বিগড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন করে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগ্‌ড়লে সুবিধামত আর একটা মন পাই কোথা থেকে? সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে পড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে-শনিবার একদা তার কৌতুকহাস্য গোপন করে আমাকে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল, সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত করে তুললে। এই ত গেল আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয় যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র সভায় তোমার সম্বন্ধেও ত ভাল রেজোল্যুশন পাস হয়নি। আমরা সবাই নিশ্চয় স্থির করলুম গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আসবে কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগল। আমার বিশ্বাস কি জান, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তারা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয়, এই জন্যে বদনাম করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তারপরে দেখেচে আমার সঙ্গে আমার আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ বলে ঠিক করেছে। যাই হোক্, আমি ওদের কাছে হার মান্‌বার ছেলে নই। ওরা যা করবার করুক্ আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে— বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল করে, হৃদয়টাকে শান্ত কর, জীবনটাকে পূর্ণ কর— তারপরে লক্ষ্যকে উর্দ্ধে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে চলে

যাও— কল্যাণ লাভ কর এবং কল্যাণ দান কর— নিজের বাসনাকে উদ্দাম করে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক কর। ইতি ২০ অক্টোবর ১৯১৮

তোমার ভানুদাদা

৩৭

২৭ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমার ভ্রমণ শেষ হল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেচি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করা দরকার— কিন্তু দেখা গেল সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর সেইটে ভাল করে বুঝে দেখবার জন্যেই কেবল পরিবর্ত্তনের দরকার— কিন্তু আসল দরকার যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই যে মাঠ আমার চোখে পড়চে এর কি দেখবার রস ফুরিয়ে গেচে— আর এই যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তার কিরণ দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপানরত স্তব্ধ ভ্রমরের মত স্থান দিয়েচে এ কি কোনোকালে এর বৃন্ত থেকে ঝরে পড়বে? আসল কথা, মনটা অসাড় হলেই তাকে সাড় দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই, আমাদের সাধনা হওয়া উচিত কি করলে আমাদের মন অসাড় না হয়।— তা হলেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি কেবলি বাইরের জন্যে ছট্‌ফট্ করতে হয় না। আমাদের যা কিছু সব

চেয়ে বড় সম্পদ সব চেয়ে বড় আনন্দ তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তাহলে আমাদের ভারি মুষ্কিল। কেন না বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছ থেকে সেই ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে নিজেও অশান্ত হই, চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে প্রীতি যে কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ হই, বাইরের দিকে যে-কিছু জিনিস পাই নি, সেদিক থেকে যা-কিছু বাধা আস্‌চে, তারই ফর্দ্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খুঁৎ খুঁৎ করি, ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি, তাহলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর বাহিরকে আহত করে মাত্র। স্থির হব, প্রশান্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব, তাহলেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃত লোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্ব্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র করে চিত্তকে কাঙাল-বৃত্তিতে দীক্ষিত কোরো না— বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছু দান পেয়েছ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্রভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিতভাবে রক্ষা কর। শান্তি হচ্চে সত্য এবং আনন্দ উপলব্ধি করবার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা— সংসারের অনিবার্য্য আঘাতে ব্যাঘাতে ইচ্ছার অনিবার্য্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৮

৫ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির উপরেই তুমি লিখেচ "আপনি কি করচেন?"[১] আগে তার উত্তরটা লিখে দিই তার পরে অন্য কথা। সকাল বেলা থেকেই একটু একটু মেঘ করে আছে রোদ্দুর এক একবার ফুটে উঠ্‌চে আবার মিলিয়ে যাচ্চে— ঠিক যেন রোদ্দুর দেওয়ালির রাত্রে যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিল, তাই আজও সকাল বেলাতেও ঘুম পাচ্চে, এক একবার চোখ ঢুলে আস্‌চে আবার চম্‌কে উঠে ভান করচে যেন এক্‌টুও তার ঘুম পায় নি। আমার আকাশের ভানুদাদার ত এই অবস্থা। কিন্তু তোমার ভানুদাদা খুব সজাগ আছে। সে ব্যক্তি তার সেই কোণের ডেস্কে বসে খাতা খুলে তার বাংলা কবিতার নতুন ইংরেজি তর্জ্জমাগুলি[২] নিয়ে খুব কষে মাজা ঘষা করচে। হঠাৎ এত ব্যস্ততার কারণ হচ্চে এই যে, এই ইংরেজি তর্জ্জমাই আমার পশ্চিম সমুদ্রতীরে তীর্থযাত্রার পাথেয়। বাংলা কবিতার জোরেই— তোমাদের দরজায় গিয়ে দরজা খোলা পেয়েছি— ভানুদাদার দর্শনের জন্যে ছুটে এসেছে আমার বাঙালী রাণু এবং তার সব সভাসদ— আবার ঐ কবিতাগুলিকেই ইংরেজি করে নিয়ে রাজবাড়ির পশ্চিম মহলের সিংহ-দ্বারও পার হতে পেরেছি। যুদ্ধ থেমে গিয়েচে,[৩] পথ খোলসা হয়েচে, আনাগোনার সময় আবার কাছে আস্‌তে চল্‌ল, কাজেই আবার থলি ঝেড়ে দেখ্‌চি আমার তহবিলে কি আছে। হিসাব করে দেখা গেল যা আছে তাতে আমার বেশ চল্‌বে। একথা ত তোমার জানা আছে পূর্ব্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত ভানুর যাত্রাপথ— সেই প্রদক্ষিণ শেষ করতে না পারলে ত তার বিদায় মঞ্জুর হবে না— সেই

জন্যেই আজ সকাল বেলায় কোণে বসে বসে আমার পশ্চিমের পথ পরিষ্কার করতে লেগে গেছি।

তোমার বাবার চিঠিতেই খবর পেয়েছি, নানা ব্যাঘাতে এবার দেওয়ালির ছুটিতে তোমার আসা হল না।[8] আস্‌তে পারলে খুব খুসি হতুম সে কথা তুমি নিশ্চয় জান। কিন্তু আমার পণ এই যে, যেটা ইচ্ছা করি সেটা যখন না ঘটে তখন ধরে নিই আমার ঠাকুরের ইচ্ছাই ফল্‌ল। তাঁর ইচ্ছাকেই খুব সহজে গ্রহণ করবার জন্যে মনকে প্রস্তুত রেখে দিই। নিজের মুখরা ইচ্ছাটাকে নিয়ে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে, হাত পা নেড়ে, গলা চড়িয়ে, কোঁদল করতে আমার ভারি লজ্জা করে। নিজের ইচ্ছাটাকেই যেমন তেমন করে জয়ী করবার চেষ্টা করতে গিয়েই সংসারে যত অনর্থ ঘটে— এ কথা বেশ জানি অথচ মাঝে মাঝে ভুলে যাই। কিন্তু ভুললে চলবে না— ঐ ইচ্ছার দাসত্ব করিয়ে জীবনটাকে রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে হয়রান করে বেড়ানোর মত প্রাণের এমন অপব্যয় আর কিছু নেই। যা কাজ তা করব কিন্তু কুলি মজুরের মত ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার মজুরী দাবী করব না। ঠাকুরের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করতে চাই তবে তাঁর বন্ধুর মতই কাজ করতে হবে— বন্ধু ত খোরাকী চায় না, মাইনে চায় না। যদি কথায় কথায় বলতে থাকি আমার ইচ্ছা পূরণ করে দাও তাহলেই ত মজুরী চাওয়া হল। মজুর মাইনে দাবী করতে পারে কিন্তু প্রভুর সঙ্গে এক আসনের দাবী করতে পারে না ত। ঐ এক আসনের অংশের পরেই আমার লক্ষ্য। সেইজন্যে সংসারে ইচ্ছার দাবী নিষ্ফল হলে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই— সব সময়ে জোর থাকে না— কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। নিজের ইচ্ছার উপরে নিজে যদি কর্ত্তা হতে পারি তাহলেই বিশ্বের যিনি কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারি। নইলে দাসের দশা কোনোদিন ঘুচবে না; আর দাসের মুস্কিল এই যে, তাকে দরজার পাশে দূরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়। আমি পাশে বসবার নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় আছি—

আজ হোক্ বা কাল হোক্ বা দেরিতেই হোক। ইতি ১৯ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৯

৮ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কবে তোমার জন্মদিন[১] তোমার চিঠির মধ্যে তার তারিখের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার আবার এমনি দশা যে তারিখ সম্বন্ধে আমার কোনও হুঁষ থাকে না। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে মিরজুম্লা কবে জন্মেছিল এবং বৈরাম খাঁর প্রথম বিবাহ কবে হয় আমি তার কিছুই জানি নে, ইব্রাহিম লোডির মৃত্যুর তারিখ নিশ্চয়ই তুমি জান কিন্তু অনেক চিন্তা করেও সেটা আমার কিছুতেই মনে পড়চেনা। ভানু ঠাকুর বলে এক ব্যক্তির জন্মতারিখ কি ভাগ্যে বহুকষ্টে মনে আছে কিন্তু তার জীবনের অন্যান্য প্রধান ও অপ্রধান ঘটনার একটা তারিখও আমার মনে নেই—এমন কি, শ্রীমতী রাণুদেবী নাম্নী কাশীবাসিনী কুমারী কবে তাকে প্রথম পত্র লেখে সে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে মূঢ়ের মত নিরুত্তর হয়ে থাক্‌তে হবে, পত্রখানা দেখেও যে তার জবাব দেব সে পথও বন্ধ। কারণ, পত্রেও তার কোনও চিহ্ন [য] নেই। এমনি করে উক্ত ভানু ঠাকুরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্চে। ভেবে দেখ্‌লুম মীরজুম্লা এবং ইব্রাহিম লোডি সম্বন্ধে তারিখগুলো না জানা থাক্‌লেও আমার কাজ চলে যাবে

কিন্তু রাণুর জন্মতারিখটি সময়মত না পাওয়ায় তাকে সময়মত আমার আশীর্বাদ পাঠানো হল না। একখানা গীতপঞ্চাশিকা[১] পাঠিয়েছিলুম কিন্তু সেটা তোমার জন্মদিন লক্ষ্য করে নয়। পর্শুদিন চিঠিতে তোমার জন্মোৎসবের আভাস পেয়ে তখনই হাতের কাছে একখানা ওড়না ছিল সেইটে পাঠালুম। এই ওড়নাতে একটুখানি সোনালি আঁচ্‌লা এবং পাড় আছে— অম্বরের প্রান্তে সোনার রেখা দিয়ে অস্তোন্মুখ রবি ধরিত্রীর ললাটের কাছে যে আশীর্ব্বাদলিপিটি রেখে চলে যায় এই সোনালি পাড় দেওয়া ওড়নায় তোমাকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দেবে। মাথার উপর দিয়ে এই ওড়নাটি যখন পরবে তখন তোমার ভানুদাদার আশীর্ব্বাদের কিরণ-লেখা তোমার ললাট স্পর্শ করবে। এই কাপড়খানি একটি রূপক মাত্র— এ হারাতে পারে, ছিঁড়তে পারে, মলিন হতে পারে— কিন্তু আমার একান্ত কামনা এই যে, আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তোমাকে বেষ্টন করে তোমাকে সুন্দর করে তুলুক্, সংসারের সমস্ত ধূলিসংসর্গ হতে তোমাকে নির্ম্মল করে আবৃত করুক, তোমাকে সংযত করুক, সম্বৃত করুক, তোমাকে ধৈর্য্যে, বীর্য্যে, মাধুর্য্যে ও কল্যাণে ভূষিত করুক। অন্তরের মধ্যে মঙ্গলের যে একটি পবিত্র সুন্দর আদর্শ আছে, সেটিকে বাইরে কোনোখানে পবিত্র সুন্দর রূপে বিকশিত দেখ্‌তে ইচ্ছা করে— সেইজন্যে ভানুদাদা উৎসুক দৃষ্টিতে রাণুর দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে, দেখ্‌বে তার চিত্তটি প্রতিদিন শিশিরস্নাত পূজার ফুলটির মত ধীরে ধীরে আলোকের দিকে অসীমের দিকে ফুটে উঠে আপনার অন্তরের স্নিগ্ধ সৌগন্ধ্যকে উৎসর্গ করচে। ইতি ২২ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪০

১৮ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, যাবার সময় তুমি মন খারাপ করে' চোখের জল ফেলে চলে গিয়েচ তাই আমারও মনটা ব্যথিত আছে।[1] আজই ছোট্ট এই চিঠি তোমাকে লিখে পাঠাচ্চি— যেদিন কাশীতে পৌঁছবে তার পরদিনেই এটি তোমার হাতে গিয়ে পড়বে। এতক্ষণে তুমি রেলগাড়িতে ধক্‌ধক্‌ করতে করতে চলেচ, কত ষ্টেশন পার হয়ে চলে গিয়েচ— আমাদের এই লালমাটির, এই তাল গাছের দেশ হয়ত ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূব দিকের দরজার সামনে সেই মাঠে রৌদ্র ধূ ধূ করচে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চরে বেড়াচ্চে। এক একটা তালগাছ তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগ্‌লার মত দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড় চৌকিতে বসা হল না— খাওয়ার পর এণ্ড্রুজ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপরে নগেন বাবু[2] নামক এখানকার একজন মাষ্টার তাঁর এক মস্ত তর্জ্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আন্‌লেন— তাতেও অনেকটা সময় চলে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেছে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে বসে আছি— বই কাগজ খাতা দোয়াত কলম ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ— তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জ্জনা আছে যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে, কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুশকিল এই যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না, আর অনাবশ্যক জিনিস না খুজলেও [য] তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ-চাপা দিয়ে

জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। আর দশ বৎসর পরে রাণু যখন তার ভানুদাদার প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হয়ে আস্‌বে তখন এই সমস্ত জঞ্জালগুলোর সদ্‌গতি হতে পারবে। কি বল? কিন্তু ভানুদাদার যেমন নানা প্রকার দরকারী চিঠিপত্র বই পেন্সিল হারিয়ে যায় তেম্‌নি আবার তার নতুন তৈরি-করা গানের সুরও হারিয়ে যায়— প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ হবে আমার সেই সুরগুলিকে কুড়িয়ে ধরা [য] রাখা— অতএব তোমার সেই শিশু মহাভারতের সন্ন্যাস ধর্ম্ম বাদ দিয়ে কিছুদিন তোমাকে এস্‌রাজ যন্ত্রটা নিয়ে পড়তে হবে। ছড়ি টেনে টেনে যখন বেশ হাত দোরস্ত হয়ে আস্‌বে তখন তোমাকে আমার সুর-কুড়োনীর কাজে লাগিয়ে দেব। তখন গান তৈরি করে আমাকে আর হা-দিনু, জো-দিনু করে বেড়াতে হবেনা। কিন্তু মনে আছে, আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে— সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহানী", আর সেই "চম্‌কিলা" "সোনে কি তরহ", চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা°— তাছাড়া আর একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে, মন খারাপ কোরো না— লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল করে থাক্‌বে। সকলেই বল্‌বে রাণু এমন সোনে কি তরহ্‌ হাসি পেয়েচে কোন্‌ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন নন্দন বীণার ঝঙ্কার থেকে, কোন্‌ প্রভাত তারার আলোক থেকে, কোন সুরসুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্‌ মন্দাকিনীর চলোর্ম্মি-কল্লোল থেকে, কোন্‌— কিন্তু আর দরকার নেই এখনকার মত এই ক'টাতেই চলে যাবে— কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্নপ্রায়, অপরাহ্নের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হয়ে এসেচে।

তোমার ভানুদাদা

২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

৪১

[? ২৩ নভেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কাল তোমার চিঠি পেয়েচি। আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে খুসি মনে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়চ। যে তোমাকে দেখচে সেই মনে করচে চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশুমহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তারা জানেনা প্রায় দুশো ক্রোশ তফাৎ থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুসি পাঠিয়ে দিচ্চে— এত খুসি যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে বা রাগায় বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই যে গান গাই "বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মত স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে— মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হয়ে থাক্‌বে যে বাইরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলচি নে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া আসা কাঁদা হাসার অনেক উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড় কাউকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধরে রাখবার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা করচি। বাহিরের কাছে যখনই কাঙালপনা করতে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না— সে যতটুকু দেয় তার চেয়ে দাবী ঢের বেশি করে— সে এমন মহাজন, যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় করতে চায়। সে শাইলক্, সামান্য টাকা দেয়

কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তেমাংসে তার শোধ নেবার দাবী করে। তাই ইচ্ছে করি বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে শিকি পয়সা ধার নেব না। এই আমার মৎলবের কথাটা তোমার কাছে বলে রাখলুম— তোমার গণনা মতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মৎলব সিদ্ধি হয় তা হলে বেশ মজা হবে।— এখানকার খবর সব ভাল। সাহেব গেছে বাঁকিপুরে, দিনু কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মত খাট্‌চি। (কিন্তু ভূত যে খুব বেশি খাটে এ খ্যাতি তার কেন হল বল দেখি?)[১]

তোমার ভানুদাদা

৪২

২৫ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমেনি। সবাই মনে করে আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লবমর্ম্মরে থর্‌থর্ করে' কাঁপি, ভ্রমর গুঞ্জনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি— এ সব হল হিংসের কথা— তারা জাঁক করে বল্‌তে চায় যে, তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাত দিন করে' অপিসে যায় আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যবসা করে— তারা এত বড় ভয়ঙ্কর কাজের লোক! আপিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক্ আমি

কাজ করি কি না। আচ্ছা, তারা খুব কাজ করতে পারে আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না করতে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে? যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অম্‌নি তারা হয় ঘুমোয় নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কি করে যে সময় কাটাবে ভেবেই পায় না। আমার মত কবির সুবিধা এই যে যখন কাজ থাকে তখন রীতিমত কাজ করি, আবার যখন কাজ না থাকে তখন খুব কষে কাজ না করতে পারি— তার কাছে কোথায় লাগে তোমার বাব্‌জার কমিটি মীটিং! যখন কাজ না করার ভিড় পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা করে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে। তাই সেই নাটকটা[১] আর এক অক্ষরও লিখ্‌তে পারি নি— এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখ্‌তে যাই আর যদি তাতে গান বসাই[১] তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু মহাভারতেরই মত হয়ে উঠবে। চিঠিতে যে ছবি এঁকেচ খুব ভাল হয়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হচ্চে ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে বলে মনে হচ্চে না, ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় পড়ে গেছে, আর "গহনা ওয়হনা" "চুনরি উনরি"র কোনও ঠিকানা নেই— "কদু"র ভিতর থেকে যে "দুলহীন্‌" বেরিয়ে এসেছিল এ মেয়ে বোধ হয় সে নয়। এর নাম কি লিখে পাঠিয়ো। তোমাদের ছোট বউ কিম্বা গাব্‌লোর বউ নয় ত? এঁকে দেখ্‌তে সুন্দর বটে কিন্তু ভানুদাদার সঙ্গে যার নামের মিল আছে তার চুলের দশা ঐ রকম হলেও সে এর চেয়ে অনেক ভালো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪৩

৩ ডিসেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক্। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেছে। আজ থেকে ইস্কুল মাস্টারি ফের সুরু হল। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েছি। কিন্তু ছেলেরা সব আসে নি। খুব কম এসেচে। বোধ হয় ব্যামোর ভয়ে আস্‌চে না।— আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছেন জিজ্ঞাসা করেচ। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে ঘরে থাকি— তার সাম্‌নে এক লাল রাস্তা আছে— তার ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারত তৈরি হচ্চে— তারই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী[১] তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহনী শুনাতী হৈ। কিন্তু সেটা আমি আন্দাজে বল্‌চি। কিছুকাল থেকে তার কণ্ঠস্বরও শুনি নি, তাকে দেখ্‌তেও পাই নি— তাই আশঙ্কা হচ্চে সে হয় ত তার সেই রূপকথার "কদু"র মধ্যে ঢুকে পড়েচে। আজকাল বৌমার এক সখীকে প্রায়ই লাল রাস্তা পেরিয়ে এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী আনাগোনা করতে দেখি— তার নাম ননীবালা। যাই হোক্ পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাই নে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনো বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট করে কলম চালিয়ে দিন যাপন করচি— সামনেকার খাতাপত্রের বাইরে যে একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভাল করে চোখ তুলে যে দেখা সে আর দিনের আলো থাক্‌তে ঘটে উঠ্‌চে না। সন্ধ্যার পরে সেই নীচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়— সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হয়ে থাকে। কারণ আজকাল ফের আবার দুটি একটি করে গান জম্‌চে।[২] সন্ধ্যার পরে সেই

আমার কোণের বিছানায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদু মন্দস্বরে খাতা পেন্সিল হাতে গান করি, আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে— তুমি ভাবচ সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুন্‌তে আসেন— ঠিক তা নয়, সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট পতঙ্গ আস্‌তে থাকে— তাও যদি তারা আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আস্‌ত তাহলেও আমি মনে মনে একটু অহঙ্কার করতে পারতুম,— তারা আসে ঐ ডীট্‌জ্‌ লণ্ঠনের কেরোসীন আলোটা লক্ষ্য করে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক একবার— আন্দাজ করে বল দেখি কি শুন্‌তে পাই? তুমি ভাবচ নক্ষত্রলোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত ধ্বনি? তা নয়, একসঙ্গে ভোঁদা, দাজু, টম, রঞ্জু, এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার শব্দ। যদি তারা আমার এই গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ করত, তাহলেও বুঝতুম কবির গানে চতুষ্পদ পশুরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ— কিন্তু তা নয়, তারা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে স্বর্গমর্ত্ত্যকে চঞ্চল করে তোলে— কবির গানে তারা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক্, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন তবুও দুটো একটা করে গান জম্‌চে। আকাশের তারার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই নে— করলেও তারা জবাব দেবেনা— কিন্তু রাণুর সঙ্গে ঝগড়ার উপলক্ষ্য পেলে আমি ছাড়ব না— সে উপলক্ষ্যটি এই যে, আমার গান শোন্‌বার জন্যে রাণুর বাবজা কাশী কলকাতা প্রভৃতি বহু দূর দেশ ঘুরে এই শান্তিনিকেতনে এলেন আর তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী রাণু এলেন না কেন? শিশু মহাভারত আর চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের কাছে শ্রীযুক্ত ভানুদাদার গান আজ হার মান্‌ল এও কি সহ্য হয়? ঝগড়াটা চিঠির শেষ দিকটাতে আরম্ভ করেছি— বেশ ভাল করে হাত মুখ নাড়বার জায়গা পাচ্চিনে— হঠাৎ থামিয়ে দিতে হল। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪৪

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আজ দুপুর বেলা যখন খেতে বসেছি, এমন সময়ে— রোসো আগে বলে নিই কি খাচ্ছিলুম। খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি— কিন্তু মনে কোরো না তার সবটাই আমি খাচ্ছিলুম— রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ বলে ধরে নেও তাহলে আমার টুক্‌রোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড় হবে না, সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাট্‌নি— আর একটা তরকারিও ছিল। যা হোক্ বসে বসে রুটি চিবচ্চি এমন সময়ে— রোসো আগে বলে নিই রুটি ডাল চাট্‌নি এল কোথা থেকে? তুমি বোধ হয় জানো আমার এখানে প্রায় পঁচিশ জন গুজ্‌রাটি ছেলে আছে— আমাকে খাওয়াবে বলে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল।[১] তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেচি এমন সময়ে দেখি একটি গুজ্‌রাটি ছেলে থালা হাতে করে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক্, নীচের ঘরে টেবিলে বসে বসে রুটির টুক্‌রো ভাঙ্‌চি আর খাচ্চি, আর তার সঙ্গে একটু একটু করে চাট্‌নিও মুখে দিচ্চি এমন সময়ে— রোসো, আগে বলে নিই খাবার কি রকম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত গোছের ছিল— যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হত তাহলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠ্‌ত না, মজুর ডাক্‌তে হত। কিন্তু ছিঁড়তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়— আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল। ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না কিন্তু খেয়ে দেখা গেল যে, খেলে যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্চি ঠিক এমন সময়ে— রোসো, ওর মধ্যে একটা [কথা] বল্‌তে একেবারেই ভুলে

গেছি। দুটো পাঁপর ভাজাও ছিল। সে দুটো, আমি যাকে বলে থাকি সুশ্রাব্য— অর্থাৎ খেতে বেশ ভাল লাগে। শুনে তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হবে এবং আমাকে হয় ত মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে— এবং যখন আমি কাশীতে যাব তখন হয় ত সকালে বিকালে আমাকে চাট্‌নি দিয়ে কেবলি পাঁপর ভাজা খাওয়াবে— তবু সত্য গোপন করব না, দু খানা পাঁপর ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক্ সেই পাঁপর মচ্‌মচ্ শব্দে খাচ্চি এমন সময়ে— রোসো মনে করে দেখি সে সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাবচ তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপর ভাজা খাওয়া দেখে অবাক হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে টেবিলের এক কোণে বসে মনে মনে ঠাকুর দেবতার নাম করছিলেন, তা নয়— তিনি তখন কোথায় আমি জানি নে— আর কমল? সেও যে তখন কোথায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল তা আমি জানি নে। তাহলে দেখ্‌চি টেবিলে আমি একলা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হোক্ দুখানা পাঁপর ভাজার পরে প্রায় শিকি টুক্‌রো রুটির পৌনে চার আনা যখন শেষ করেছি— এমন সময়ে— হাঁ হাঁ একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি— আমি লিখেচি খাবার সময় কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা করছিল, যে, আমি যদি মানুষ হতুম তাহলে সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত ঐ রকম মুচ্‌মুচ্ মুচ্‌মুচ্ মুচ্‌মুচ্ করে কেবলি পাঁপর ভাজা খেতুম, ইতিহাসও পড়তুম না, ভূগোলও পড়তুম না— শিশুমহাভারত চারুপাঠের কোনো ধার ধারতুম না। যা হোক্ যখন দুখানা পাঁপর ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাট্‌নি খেয়েছি এমন সময়ে— কিন্তু ডালটা খাইনি— সেটা নারকোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল দিয়ে তৈরি করেছিল তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল— আর তরকারিটাও খাইনি— কেননা আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড় বেশি খাইনে— যাই হোক্ যখন রুটি এবং পাঁপর

ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়েচে এমন সময়ে ডাকহরকরা আমার হাতে কাশির ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল

ভানুদাদা

৪৫

১০ ডিসেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, দেরি করে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েছি, তুমি আমাকে এত বড় অপবাদ দেবে আর আমি তাই যে নীরবে সহ্য করে যাব এত বড় কাপুরুষ আমাকে পাও নি। কখ্‌খনো দেরী করি নি, এ আমি তোমার মুখের সাম্‌নে বল্‌ছি, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। দেরি করি নি, দেরি করি নি, দেরি করি নি— এই তিন বার খুব চেঁচিয়েই বলে রাখলুম— দেখি তুমি এর কি জবাব দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোষ্টমাষ্টারটি বুঝি ৩৮টি গুণের আধার। ভাল কথা মনে পড়ল, তোমাকে শেষ বারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরীকে বৌমা বিদায় করে দিয়েচেন। কি অন্যায় দেখ দেখি! তার অপরাধটা কি? না, সে যতটা কাজ করে তার চেয়ে কথা কয় ঢের বেশী। তাই যদি হয়, তা হলে তোমার ভানুদাদার কি গতি হবে বল ত রাণু। আমি ত জন্মকাল থেকে কেবল কথাই কয়ে আসচি,— তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ করেচে আমি তাও করি নি। বৌমা তাই রেগে মেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ করে দেন তাহলে আমার কি দশা

হবে? যাই হোক্ এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা করে কোনও লাভ নেই— সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে খবর দেওয়া যাবে। আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরু মা তোমাকে যে ছাঁদে বাংলা চিঠি লেখাতে চান আমাকে সেই ছাঁদে লিখ্‌লে চল্‌বে না— তা আমার নামের আগে শুধু না হয় একটা "শ্রী"ই দেবে— কিম্বা শ্রী নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠেচে— কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেত তা হলে আমার ভাবনা ছিল না, কথা একলা যদি না জোটাতে পারতুম তা হলে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুষ্কিল হচ্চে এই যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে। যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা কমে গেছে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে— তাই এখন

"ঘাটে বসে আছি আনমনা
যেতেছে বহিয়া সুসময়।"[১]

এদিকে রোজ আমার একটা করে নতুন গান বেড়েই চলেচে। গানের সুবিধে এই যে তার জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হয়ে গেল।[২] তুমি যদি দেরি করে আস তা হলে ততদিনে এত গান জমে উঠ্‌বে যে, শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ আর পড়া হবেনা— তোমার শিশু মহাভারত বৃদ্ধ মহাভারত হয়ে উঠ্‌বে তুমি হয় ত এম্ এ পাস করার সময় পাবে না।— শান্তি আমার বর্ণনা করে কি লিখবে শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি— এক দিন তোমাদের ওখানে যখন গিয়েছিলুম আমার কাপড় ছেঁড়া ছিল, সে কথা যেন না লিখে দেয়, তুমি একটু দেখে শুনে দিয়ো— তুমি যে রকম করে আমার চুল আঁচড়ে দিয়েছিলে তার যেন একটু ভাল রকম বর্ণনা থাকে— সে পাখা করতে করতে আমার চুল যে রকম এলোমেলো করে দিত সেটা যেন না লিখে বসে। আর আমার নাক চোখ প্রভৃতি সম্বন্ধে শান্তির

যদি কোনো ভুল ধারণা থাকে তা হলে তুমি সেটা সংশোধন করে দিয়ো। ইতি ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪৬

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তুমি ভাবচ মজা কেবল তোমাদেরই হয়েচে। তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েছ। কিন্তু অত সহজে আমাকে হার মানাতে পারচ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল? পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্তত দশ হাজার লোক ত হয়েই ছিল। তুমি লিখেছ একটি ছোট মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার করে তোমাদের সভা জমিয়ে তুলেছিল— আমাদের এখানকার মাঠে যা চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল? ছোট ছেলের কান্না, বড়দের হাঁকডাক, ডুগডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ্ কোঁচ্, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়ি বাজির সোঁ সাঁ, পটকার ফুট্‌ফাট্, পুলিস্ চৌকিদারের হৈ হৈ, হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড় হাট বসেছিল। তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে ভাজা ফুলুরি, চীনেবাদাম ভাজা, প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস বিক্রি

হল। এক এক পয়সা দিয়ে ছেলে মেয়েরা সব নাগর দোলায় দুল্‌ল, চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্জের[1] কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল— সেইখানে একেবার ঠেলাঠেলি ভিড়। তার পরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা[2] করেছিলেন— তাতে সিঙাড়া আলুর দমের দোকান বসিয়েছিলেন— একটা একটা আলুর দম এক এক পয়সায় বিক্রি হল— হেমলতা বৌমা লক্ষ্ণৌ থেকে ৪১ টাকায় অনেক জোড়া জুতো আনিয়েছিলেন তার সাইজ এত ছোট হয়েছিল যে কেউ কিন্‌তে চায় না— তিনি জোর করে যাকে পেলেন তার পকেটে গুঁজে দিলেন— সুকেশী বৌমা[3] চিনে বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক একটা দু আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল— তার খড়ের চাল, চারি দিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব স্থাপন করা আছে— সেটা কেউ কিন্‌তে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেচে, ভেবে দেখ কি রকম ভয়ানক মজা! ছোট মেয়েরা এক টুক্‌রো ন্যাকরা ছিঁড়ে তার চারদিকে পাড় সেলাই করে' আমার কাছে এনে বল্লে "এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে"— বলে সেটা আমার পকেটে পূরে দিলে— এমন ভয়ানক মজা! ওঁদের বাজারে এই রকম শ্রেণীর সব ভয়ানক ভয়ানক মজা হয়ে গেছে— তোমরা যে সব প্রাইজ পেয়েচ সে এর কাছে কোথায় লাগে! তার পরে মজা, মেলা যখন ভেঙে গেল সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক আমার শোবার ঘরের ঠিক সাম্‌নের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগ্‌ল, মজায় একটুও ঘুম হল না— নীচে যতগুলো কুকুর ছিল সবাই মিলে উর্দ্ধশ্বাসে চেঁচাতে লাগ্‌ল, এমন মজা! তার পরে কলকাতা [থেকে] অনেক মেয়ে তাঁদের ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের কারো কাশী কারো জ্বর— নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম গোলমাল কাশি সর্দ্দি অসুখবিসুখ আট আনায় রুমাল

বেচা প্রভৃতি হয় নি— অতএব আমারই জিৎ রইল। [পৌষ ১৩২৫]

তোমার ভানুদাদা

৪৭

৩ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

নাঃ, তোমার সঙ্গে পারলুমনা— হার মান্‌লুম। তুমি যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একবারে উল্টে কাৎ হয়ে পড়বে, এত বড় ভয়ঙ্কর মজা করবে এ কি করে জান্‌ব বল? তার পরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার এক্কা গাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চড়ে বসবে, এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক পাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে দেবে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড় করাবে— তারো উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁছে কান্না— কি মজা! যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদত তাহলেও বুঝতুম— কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের এক্কাগাড়িতে চড়ে, বিনা আয়াসে পরকে দিয়ে হারানো চটি জুতো খুঁজিয়ে নিয়ে— তার পরে কি না কান্না! একেই না বলে লঙ্কাকাণ্ডর পরেও আবার উত্তর কাণ্ড। তুমি লিখেছ আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম, আর হাত পা মাথা বুদ্ধি সুদ্ধি সমস্ত একেবার উল্টে পাল্টে যেত তাহলে তোমাদের মতই বাবারে মলুমরে করে চিৎকার করতুম এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবনা— নিশ্চয়ই পা দুটো

[উপরে] আর মাথাটা উপরে [নীচে] করে আমি তানানানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধরতুম

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নি সা—
(আমার) গাড়ির হল উল্টো মতি
কোথায় হবে আমার গতি
খুঁজে আমি না পাই দিশা
সারে গামা পাধা নি সা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উল্টে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখো।— ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাস্মার সামনে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব—

যদিও আঘাত গায়ে লাগে নি
তবুও করুণ সুরে
দিব আমি গান জুড়ে
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিনী
শুন সবে দিদিমণি, মামা,
সা রে সা রে সা রে গারে গা মা!

এই ত গেল মজার কথা। এইবার কাজের কথা। পর্শু,[১] চল্লুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনাপল্লিতে— ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি সুরু হবে— ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানে সুর বসিয়ে এস্রাজে অভ্যাস করে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু গাড়ি উল্টে দিয়ে নন্দীভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তাহলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে— আর যে ব্যক্তি তোমার এক পাটি চটি জুতো নিয়ে আস্‌বে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে মানে লয়ে চমৎকৃত করে দিতে পারবে।

ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরোলো নটে শাকটি মুড়োলো ইত্যাদি

তোমার ভানুদাদা
১৯ পৌষ
১৩২৫

৪৮

[২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯]

ওঁ

Wood National College
Madanapalle[১]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, ১লা ফেব্রুয়ারি তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেচ সেই চিঠি এক মাস ধরে দেশে বিদেশে আমাকে সন্ধান করতে করতে আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে আমাকে এসে ধরেচে। তুমি জিজ্ঞাসা করেচ কেন আমি তোমাকে ঠিকানা জানাই নি। কেন বল দেখি? দেখি তুমি কেমন আন্দাজ করতে পার। পাছে তোমাকে ঠিকানা জানালে তোমার চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছয়? তোমার চিঠির সঙ্গে আমি কি লুকোচুরি খেলা খেলতে বসেচি? কত ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, শিশু-মহাভারত পড়ে শেষ করে দিলে আর এই প্রশ্নটার জবাব দিতে পারলে না? আমি বুঝেচি, আসল ব্যাপার হচ্চে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার যে কোনো একটা ছুতো পেলে তুমি ছাড়তে চাও না। আমি ভালো মানুষ লোক; আমি ঝগড়াঝাটি একেবারেই ভালো বাসিনে— রাগাবার জন্যে তোমাকে আমি ঠিকানা লিখি

নি এ কথা একেবারেই সত্যি নয়। তবে কেন লিখি নি, যদি জিজ্ঞাসা কর তার একমাত্র উত্তর হচ্চে, যে হেতু আমার কোনো ঠিকানা নেই। আমি কখনো এ সহরে, কখনো সে সহরে, কখনো রেলগাড়িতে। সম্প্রতি আমার একমাত্র ঠিকানা হচ্চে ভারতবর্ষ। সেই ঠিকানাটা তোমাকে লিখি নি, তার কারণ হচ্চে আমি নিশ্চয় জানতুম তুমি সেটা জান। আর কিছুদিন পরে হয়ত শুন্‌বে তার চেয়ে বড় ঠিকানায় গিয়ে পৌঁচেছি, যেমন এসিয়া কিম্বা য়ুরোপ। আরো কিছুদিন পরে হয়ত শুন্‌বে যে— যাক্, ঐ ঠিকানা নিয়ে আর বকাবকি করবনা। তুমি যখন চান্সালার ভাইস্ চান্সালারের লেকচার শুনছিলে আমি তখন কি করছিলুম বল দেখি। আমিও লেকচার দিচ্ছিলুম। তোমার বাব্‌জা ভাইস্ চান্সালারের লেকচারের প্রশংসা করেচেন— আমার লেকচারের প্রশংসা তোমার কানে পৌঁছিয়ে দেয় এমন কোনো লোক আমার শ্রোতাদের মধ্যে ছিল না। তাই ভাবচি আমি নিজেই সে কাজটা সেরে রাখি। ~~সার রবীন্দ্রনাথ চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন খু ব চমৎকার~~[১] তাঁর বক্তৃতা শুনে শ্রোতার দল একেবারে— না, আর বলব না— তুমি ভাববে, তোমার ভানুদাদা ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী। কিন্তু তা বলবার জো নেই— পাছে নিজের প্রশংসা করতে হয় এই ভয়ে আমার কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না— আর গোড়ায় যে সত্য কথাটা লিখেছিলুম পাছে সে তোমার চোখে পড়ে তাই যত্ন করে কেটে দিয়েচি। আমার বিনয়গুণে নিশ্চয় তুমি খুব মুগ্ধ হয়েচ— নিজের প্রশংসা এমনতর সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে পৃথিবীতে এত বড় অসাধারণ সৌজন্যশালী ব্যক্তি কজন বা মেলে? ঢের ঢের চান্সালার ভাইস্ চান্সালার বক্তৃতা দিতে পারে— কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়েও যে মহানুভব ব্যক্তি সে সংবাদটা সম্পূর্ণ গোপন করে যেতে পারে সে লোকটি কে বল দেখি? ভাল করে একবার আন্দাজ করে দেখ। তোমার মাথায় যদি না আসে আমি বলে দিতে পারি সে কে। কিন্তু বল্লে পাছে নিজের

গুণগান করা হয় সেই ভয়ে আমি একেবারে নীরব হয়ে গেলুম। ইতি শিবরাত্রি ১৩২৫

তোমার শুভানুধ্যায়ী

ভানুদাদা।

৪৯

২৫ মার্চ ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, কাশী ত যাবই তা কপালে যা'ই থাক্। কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল দেবতাদের সঙ্গে আমার কিছুতেই বনিবনা হবে না— বাবা বিশ্বেশ্বর কি করবেন এখনও তার সংবাদ পাওয়া যায় নি— কিন্তু তোমার আকাশের ভানুদাদা তোমার মর্ত্ত্যের ভানুদাদার প্রতি খুব উষ্মা প্রকাশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন সে খবর তোমার চিঠি থেকেই পাওয়া গেল। তা হোক্ তিনি যতই গরম হোন্ না কেন, আমি উত্তেজিত হব না। তিনি যতই আমার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন, আমি ঠাণ্ডা হয়ে বসে হাত-পাখা সঞ্চালনের দ্বারা শান্তি রক্ষার চেষ্টা করতে থাক্‌ব। হাত-পাখার অধীশ্বরী শান্তি দেবীর প্রসন্নতা থেকে বঞ্চিত হবার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু পয়লা এপ্রিলের একজামিনেশ্যন! তাঁকে ঠেকায় কে? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের চেয়ে তাঁর প্রতাপ বেশি। রাণুর অধিকার সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আর রাণুর মর্ত্ত্য-ভানুদাদার সঙ্গে যখন বিরোধ বাধবে তখন আমাকে মাথা হেঁট করে হার মান্‌তেই হবে। অবশ্য, চেষ্টা করব সন্ধি করবার জন্যে— দেখ্‌ব একটা রফা নিষ্পত্তি করে তাঁর সঙ্গে ভাগ-বখ্‌রা চলে কি না। সর্ব্বনাশে

সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ— কিন্তু আমি ত পণ্ডিতঃ নই— আমি শিশু মহাভারত রচনা করতে অক্ষম— অতএব আশঙ্কা হচ্চে অর্দ্ধং-এর চেয়ে আরো অনেক বেশি এই অপণ্ডিতকে ত্যাগ করতে হবে। বারো আনা, তেরো আনা, চোদ্দ আনা,— কিন্তু আর বেশি নয়— দর করতে করতে শেষ কালে যদি সাড়ে পনেরো আনা পর্য্যন্ত ওঠে তা হলে কিন্তু— চোখ রাঙিয়ে লাভ কি— তা হলে কিন্তু তাও যথালাভ বলে মেনে নিতে হবে— তোমার বাবাকে লিখেছিলেম, যে, শনিবার গিয়ে পৌঁছব। সেটা ঘটবে না। আমার নিজের বারেই প্রভাতে গিয়ে উদয় হব— রবিবারে[১]— সেদিন তোমাদের ছুটি— ঝগড়া করবার এবং ঝগড়া মেটাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তার পরে তুমি এক্‌জামিন দেবে, আর আমি বক্তৃতা দেব[২]— তুমি পাবে লম্বা লম্বা মার্কা আর আমি— সে কথা বল্‌ব না, কারণ আমি নিরহঙ্কার— বিনয়ক্ষীরসাগর— নিরভিমানতায় জগতে আমার তুলনা নেই— তবে কি না উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বীঃ—

ইতি ১১ই চৈত্র ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৫০

৯ এপ্রিল ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণুকে ছোট্ট চিঠি লিখচি— কারণ ডাক্তার বলেচে শুয়ে থাক্‌তে[১]— শুয়ে শুয়ে চিঠি লেখা যায় না— তাই শোওয়া এবং বসার মধ্যে অল্পক্ষণের

জন্যে সন্ধি করে নিয়েচি— সেই সন্ধির সর্ত্ত এই যে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। তোমাকে আমার বলবার কথা হচ্চে এই, যে, তোমার ভানুদাদার জন্যে তোমার মনে যে লেশমাত্র কষ্ট হবে এইটেই তোমার ভানুদাদার পক্ষে খুব কষ্টের কথা। আমার আশীর্ব্বাদ তোমাকে শক্তি দেবে, কল্যাণ দেবে, আনন্দ দেবে, সমস্ত ছোট বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে বড়র কাছে আত্মোৎসর্গের জন্যে তোমার জীবনকে প্রস্তুত করবে, তোমার চিত্তকে নির্ম্মল করবে, তোমার ভক্তিকে সুন্দর করবে, তোমার কর্ম্মকে সত্য করবে এই আমি কামনা করচি। ঈশ্বর আমাকে তাঁরই বিশেষ কাজে পাঠিয়েছেন— তাঁরই হুকুমে আমার নিজের কোনো ভোগ সংসারের কোনো বন্ধন আমাকে আটক করতে পারবে না। আমি আমার সেই পথিকবন্ধুর পথের সঙ্গী। তুমি তোমার আঙিনায় খেলা করছিলে এমন সময় দৈবাৎ এই পথচলা পথিকের সঙ্গে দেখা হল, তার অন্তরের স্নেহ আশীর্ব্বাদ পেলে— এই ঘটনাটুকুতে তোমার জীবনের আঙিনায় মুক্তির হাওয়া খেলুক, তুমি আপনাকে ভোল— আমারও পথের উপরে মাধুর্য্যের সুগন্ধ আনুক্, আমিও আপনাকে ভুলি। শোক যাক্, অবসাদ যাক্, মোহ যাক্,— অন্তর বাহির সুপ্রসন্ন হোক্। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৫১

১৬ এপ্রিল ১৯১৯

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

এখন থেকে আমার ছোট চিঠির কাগজের দিন এসেচে। অনেক দিনের অনাবৃষ্টিতে এখানে কুয়োর জল কমে এসেচে, তাই আগেকার মত

নির্ভয়ে দেদার জল তুল্‌তে আর পারি নে— এখন দরকার বুঝে হিসাব করে ছোট পাত্রে জল তোলার ব্যবস্থা করতে হয়েচে— আমার চিঠি-লেখার কুয়োর জলও প্রায় তলায় এসে ঠেকেছে— তাই আমার পত্রের পাত্রগুলি আয়তনে ছোট হয়ে এসেচে। তোমাদের কাশীতে তিনটে বক্তৃতা করেছিলুম বলে তুমি আমাকে খুব ধম্‌কেচ— এই বুঝি তোমার কৃতজ্ঞতা? আমি আরো ভাব্‌লুম তোমার কাশীকে আমি খুব করে খুসি করে আসব— তাই তোমার জরির চাদর গলায় ঝুলিয়ে সার রবীন্দ্রনাথ তাঁর ~~চমৎকার বক্তৃতা শক্তির দ্বারা কাশীবাসী সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন~~[১] ভাঙা গলাকে আরো ভেঙে তাঁর সামান্য শক্তিতে যতটুকু পারলেন সেই মত সামান্যই কিছু বলে এলেন— আর যাই হোক্ তোমার কাশীর লোক বুঝলে মানুষটা নিতান্ত মুখচোরা নয়, পীড়াপীড়ি করলে দুই একটা কথা বল্‌তে পারে। এটা কি ভানুদাদার রাণুর পক্ষে খুসির কথা নয়? আচ্ছা বেশ, এবার যদি কাশীতে যাই তা হলে তোমার চাদর গলায় ঝোলাব কিন্তু কখ্‌খনো বক্তৃতা করব না। অন্তত যদি, বক্তৃতা করি তা হলে তিনটে করব না— চারটে পাঁচটা কিম্বা একটা দুটোর সীমা লঙ্ঘন করা হবেনা। তোমার ৩০শে চৈত্রের চিঠি আজ ৩রা বৈশাখে পেলুম, তাতে পয়লা বৈশাখে কোনো কাজ না করে শুয়ে থাকতে বলেচ— আজ থেকে ৩৬২ দিন পরে যদি মনে রাখ্‌তে পারি তাহলে আগামী ১লা বৈশাখে তোমার কথা পালন করবার চেষ্টা করব, কিন্তু এ বছরের ১লা বৈশাখে ফিরি কোন রাস্তা দিয়ে। এ তো তোমার grammarএর conjugation সাধা নয় যে past tenseএর দুই একটা অক্ষর বদ্‌লে তাকে present tense করে দেব? বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এবং বর্ষারম্ভের সকালে, আর গত কল্য বুধবারে আমি আমাদের মন্দিরের কাজ করেচি। এ সব দিন ডাক্তারের আমলের মধ্যে পড়ে না। একমাত্র শরীরের দিকেই তাকাব এ কথা ত সকল দিন বলা চলে না। কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে কোরো না আমাদের এখানকার

পাঁজিতে রোজই পয়লা বৈশাখ পড়চে। সমস্ত দিন শুয়ে শুয়েই ত প্রায় দিন কাট্‌চে— কিন্তু তোমাকে চিঠি লেখবার সময় উঠে বসি সেজন্যে যদি রাগ কর তাহলে সে হবে অকৃতজ্ঞতা নম্বর দুই। এণ্ড্রুজ সাহেব কিছু দিন থেকে এখানে নেই— কলকাতায় গেছে, হয় ত দিল্লি যাবে। আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে নিয়ো— ঈশ্বর তোমাদের শান্তি দিন, স্বাস্থ্য দিন, কল্যাণ দিন, তাঁর পুণ্যধারায় স্নান করিয়ে তোমাদের জীবনকে নির্ম্মল করুন। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫২
৭ মে ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু ইংরেজি মতে আজ আমার জন্মদিনের পরের দিন, বাংলা মতে আগের দিন। আমার আসল জন্মদিনে ইংরেজি তারিখ ছিল ৬ মে, বাংলা তারিখ ছিল ২৫শে বৈশাখ। তখনকার পঞ্জিকায় দুটিতে বেশ ভাবসাব করে একত্রেই থাকত। কিন্তু তার পরে আজকাল দেখি সেই ইংরেজি তারিখে বাংলা তারিখে ঝগড়া বেধে গেছে, তাদের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। এটা কি ভাল হচ্চে? যাই হোক তোমার রুমালটি বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই দুটো দিনের মাঝখানে এসে সেই ঝগড়াটে তারিখ দুটোকে সখ্যবন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেচে। সে চেষ্টা সফল হোক্ আর না হোক্ রুমালটি আমার

পকেটের ভিতরে দিব্যি গুছিয়ে বসেচে। জন্মদিনের সারাদিন এই রুমালটি আমার পকেটে রাখ্‌তে বলেচ— কিন্তু দেখ, তার পকেট-বাসের মেয়াদ অনেক বেড়ে গেল। কাল পরমান্ন খাব— সাজ সজ্জা করবারও চেষ্টা করব কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার না আছে বিদ্যা না আছে উপকরণ। বর্ত্তমানে যিনি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি[১], তিনি যদিচ কেম্‌ব্রিজ য়ুনিভার্সিটিতে ডিগ্রি পেয়েচেন কিন্তু চুল আঁচড়ে দিতে একেবারেই পারেন না। এই সব দেখে তাঁর উপরে আমার শ্রদ্ধা একেবারেই চলে গেছে। অতএব এখন থেকে ন বছর কয় মাস আমার সাজটা অসম্পন্নই থেকে যাবে। দশটা জন্মদিন বই ত নয়— সবুর সইবে। কিন্তু দেখো, কলেজে ডিগ্রি নিতে নিতে তুমি যেন চুল আঁচড়াবার বিদ্যা ভুলে গিয়ে এণ্ড্রুজ সাহেবের মত হয়ে যেয়ো না, এই চিঠি জুড়ে আমার আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ২৪ বৈশাখ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৩
১৮ মে ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল।[১] আমি ভাবছি তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কি করে? তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখি আমি বনান্তের অশথগাছ, কাজেই তোমার গানে আর মর্ম্মরে ঠিক সমকক্ষ হতে পারে না। এক জায়গায় তোমার

সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেছ হাওয়া বদল করতে আমিও এসেচি হাওয়া বদল করতে। তুমি গেছ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জান্‌লার ধারের লম্বা কেদারায়। তুমি ভাবচ অতটুকুতে আর বদল কি হল। খুব বদল। তোমাদের বিশ্বনাথের বাড়ি থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে হাওয়ায় ছিলুম এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তবে কিনা তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে। তুমি নিজে চলে চলে ভ্রমণ করচ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির, আর আমার সামনে যা-কিছু চল্‌চে তাদেরই চলায় আমার চলা। এই হচ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ— অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চল্‌তে হচ্চে না।[১] ঐ দেখ না, আজ রবিবার হাটবার, সাম্‌নে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেচে— আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বস্‌ল। ঐ চলেচে সাঁওতালের মেয়েরা, মাথায় খড়ের আঁটি। ঐ চলেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষবাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেচে ইস্টেশানের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে তা কিছুই জানিনে— একজনের হাতে ঝুল্‌চে এক থেলো হুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চড়ে বসেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আস্‌চে ভুবন ডাঙ্গার গ্রাম থেকে কলসী কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড় বৃষ্টির ভগ্ন পাইকের দল— অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া রকমের চেহারা। এরাই দেখ্‌ব আজ সন্ধ্যেবেলায় নীল লাল সোনালি বেগ্‌নি উর্দ্দি পরে কাল বৈশাখীর নকিবের মত গুরুগুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর পশ্চিম থেকে কুচ [কাওয়াজ][২] করে আস্‌তে থাক্‌বে— তখন আর এমনতর ভালমানুষী চেহারা থাক্‌বেনা।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ। এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখ পাখির দল। আরো অনেক রকমের পাখী জুটেচে— বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহূতের দল জমেচে— বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। আমার ঘরে কেউ নেই— অসুখ করে মীরা* তার ছেলে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় গেছেন। কমল হেমলতা গেছেন আত্মীয়ার বিয়ের নিমন্ত্রণে। আমার নামে কত নিমন্ত্রণ এল, কত চিঠি, কত টেলিগ্রাম, কিন্তু আমি অটল হয়ে বসে আছি। এণ্ড্রুজ সাহেবও নেই, তিনি দিল্লি সিমলা ঘুরে আমেদাবাদে গান্ধির* কাছে গেছেন। খবর পেলুম রাত্রে রথী* বৌমা এখানে আস্‌বেন— তাঁরা এতদিন শিলঙে ছিলেন। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৪

২২ মে ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে যে রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেছ। বেশি না হোক্ অন্তত দু তিন ডিগ্রির মতও ঠাণ্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পার তাহলে তোমাদেরও আরাম আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠালেও আপত্তি করব না, এমন কি, ভ্যালু পেয়েব্‌লেও রাজি আছি। আসল কথা, ক'দিন থেকে এখানে রীতিমত খোট্টাই ফেশানের

গরম পড়েছে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষার্ত্ত কুকুরের মত জিব বের করে হাঃ হাঃ করে হাঁপাচ্চে। আর এই দুপুর বেলাকার হাওয়া, এ যে কি রকম সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না— এই বল্‌লেই বুঝবে যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লক্‌লকে জরির সুতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুননি; দিকলক্ষ্মীরা পরেচেন, তাঁরা দেবতা বলেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্ত্যের ছেলে বলে খুব বুঝতে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে। এই দুপুরে দেখ্‌বে ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। কিন্তু আমার ঘরে সব দরজা জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হু হু করে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করে যাচ্চে। এম্‌নি তার ঘ্রাণ যে, ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপ্‌সা হয়ে আছে— কেমন যেন ঘোলা নীল— ঠিক যেন মূর্চ্ছিত মানুষের খোলা চোখটার মত। সকলেই থেকে থেকে বলে বলে উঠ্‌চে, "উঃ, আঃ, কি গরম!" আমি তাতে আপত্তি করে বল্‌চি গরম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে আবার ঐ তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিচ্চ কেন। যাই হোক্ আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হচ্চে না। তোমরা ত পাঞ্জাবে আছ— পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও।[1] এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে, কিন্তু আজো শিক্ষা শেষ হয়নি। আমাদের অনেক ভালো হতে হবে, আমাদের প্রেম পৃথিবীর সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে তবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৫

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারি নি। কলকাতায় এসেচি। কেন এসেচি হয় ত খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ— তখন বরাবরই আমার সার্-পদবী বাদ দিয়ে লেখ। আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড় লাটকে চিঠি লিখেচি যে আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে।[1] কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিই নি— তোমার নামের একটুও উল্লেখ করি নি— বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানা কথা লিখেচি। আমি বলেচি বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেচে— সেই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে, তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি। যাক্ এ সব কথা আর বল্তে ইচ্ছা করে না— অথচ অন্য কথাও ভাব্তে পারি নে। এত লোকে এত অন্যায় দুঃখ পাচ্চে যে, দূরে বসে বসে আরামে থাক্তে লজ্জা হয়— তাদের দুঃখের অংশ যদি আমি নিতে পারি তাহলেও তাদের দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়। ঐ দেখ, আবার ফের, ঘুরে ফিরে সেই একই কথা।

আমাদের ইস্কুল থেকে শান্তিনিকেতন[2] বলে একটি মাসিক পত্র বের হয়। প্রবাসী[3] তারই থেকে কিছু কিছু লেখা তুলে দিয়েচে— তোমাকে আমি সেই কাগজের গ্রাহক করে দেব। আমাদের শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাড়া আর কাউকে ঐ কাগজ দেওয়া হয় না। কিন্তু তুমি ত প্রায় একমাস

আমাদের ছাত্র হয়ে আমার কাছে পড়েছিলে, সেইজন্যে ঐ কাগজ পাবার দাবী তোমার আছে। কিন্তু তোমার বাবা যদি তার গ্রাহক না হন্ তাহলে তোমার কাগজ যেন তাঁকে পড়তে দিয়ো না। এরকম পড়তে দেওয়া আমাদের নিয়ম নেই— যে পড়তে দেবে তাকে একটাকা জরিমানা দিতে হবে। তোমাদের সোলনে আমাকে যেতে লিখেছ, কিন্তু সিম্‌লা সোলনের খুব কাছেই। যদি আমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যায় তাহলে সে দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না, তোমাকে দুই চক্ষের জল বর্ষণ করতে হবে। আমি ভীতু মানুষ, আমি রাজদ্বার থেকে দূরে থাকি। বর্ষা নামুক, তার পরে তোমরাও নববর্ষার স্নিগ্ধ ধারার মত পাহাড় থেকে আমাদের প্রান্তরে নেমে এস। ততদিনে আমার নূতন বাড়ি[৪] শেষ হয়ে যাবে, সেখানে তোমাদের সকলের কাছে আমার গৃহপ্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণ রইল। ইতি বাংলা তারিখ জানি নে। পয়লা জুন ১৯১৯

তোমার ভানুদাদা

৫৬

১৮ জুন ১৯১৯

৬

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

কাল ছিলুম কলকাতায় আজ বোলপুরে। এসে দেখি তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আর দেখি আকাশে ঘন ঘোর মেঘ— বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে কেবল আমি আসি নি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে— তার পরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই

এতক্ষণ পরে আমি দুপুর বেলায় যখন খেয়ে এসে বসলুম তখন বৃষ্টি সুরু করে দিয়েছে। পূবে হাওয়ার কি নৃত্য, জলধারার ওড়না উড়িয়ে দিয়েছে এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে! আর তার কলসঙ্গীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইল না। নববর্ষার জলস্থলের আনন্দ উৎসব যদি দেখ্‌তে চাও তাহলে এস আমাদের মাঠের ধারে— বস এই জানলাটিতে চুপ করে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখবার জো নেই— সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড— সমস্ত আকাশটা বুজে যায়— সৃষ্টিটা যেন সর্দ্দিতে কাশীতে জবুথবু হয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভাল লাগে না বলি— সেখানে গেলে মনে হয় আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্বা করে' দেওয়া হয়েচে— সে একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্ত্যবাসী মানুষ, সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই— সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মত শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত— সেইজন্যে বাংলা দেশের বড় বড় দিল্‌-দরাজ নদীর ধারে অবাধ [অবারিত][১] আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্ব্বতকে নমস্কার করি। যা হোক্‌ বর্ষা বিদায় হবার পূর্ব্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুসি হয়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ করে রাখ্‌ব— আর পাকা জাম, আর কেয়া ফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম— আর যদি পারি গোটাকতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরী কোরোনা, পর্ব্বত থেকে ঝরনা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুতপদে নেমে এস। ইতি আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে। ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৭

২৯ জুন ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

সোলনে খুব-যে বৃষ্টি হচ্চে কুয়াশা হচ্চে এতে আমি কেন খুসি হয়েচি বলব? আমি খুব জাঁক করে বল্‌তে পারব এখানে বৃষ্টি হচ্চে না কুয়াশা হচ্চে না। তুমি হয় ত উত্তরে বল্‌বে, তাহলে নিশ্চয় খুব গরম হচ্চে— সে কথাও বলবার জো নেই। দিব্বি ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে; আকাশে মেঘগুলো আমার দেখা-দেখি কুঁড়েমি শিখেচে,— যখন খেয়াল যায় একটু আধটু বর্ষণ করে মাত্র, তারপরে অষ্টপ্রহর আকাশের এ কোণে ও কোণে হেলান দিয়ে বসে থাকে। আমি যে ওদের অকর্ম্মণ্যতা নিয়ে একটু ভর্ৎসনা করব আমার সে জো নেই— নিজে প্রায় অষ্ট প্রহর পড়ে থাকি জানলার কাছে কেদারায় হেলান দিয়ে— কাজকর্ম্মের নামগন্ধ নেই। ওরা যেমন খাপছাড়া রকম করে একটু আধটু বৃষ্টি বর্ষণ করে আমিও তেমনি এক আধবার খাতাটা টেনে নিয়ে মাথায় যা আসে একটু আধটু লিখে ফেলি। এমনিতর নেহাৎ কুঁড়েমি করতে করতেও লেখা মন্দ জমে নি— প্রায় একখানা বইয়ের মত হয়ে এল। কবি মানুষের ঐ হচ্চে মজা, যে-সময়ে কুঁড়েমি জমে সেই সময়েই তাদের কাজ বেশি হয়। আর যে সময়ে ব্যস্ত থাকি সেই সময়ে সব কাজ নষ্ট হয়।— যাই হোক্ তোমাদের ওখানে খুব বৃষ্টি হোক্ খুব কুয়াশা হোক একেবারে তোমরা দলেবলে হুড়মুড় করে পর্ব্বত থেকে নেমে এস— নাম্‌তে নাম্‌তে একেবারে এই শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হও— তার পরে গল্প গান কবিতা ঝগড়া ভাব তর্ক বিতর্ক নিবিড় হয়ে উঠ্‌বে, আষাঢ়ের মেঘের মত। মনে কোরোনা এখানে তোমাদের সকলকে ধরবেনা। খুব হাত পা ছড়িয়ে ধরবে।

কিন্তু দেখ, তুমি যে আমাকে জুয়ো খেলা শেখাবে লিখেচ সেইটে শুনে আমার অভিভাবকেরা সকলেই বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেচেন। আমার এই সাতাশ বছর বয়সে আমি যদি জুয়োখেলা ধরি তাহলে পরিণামে আমার দশা কি হবে? দেখ আমি খুব ভাল ছেলে, তামাক খাই নে পান খাই নে, মুখে কথা নেই, নিতান্ত নিরীহ মানুষ, অত্যন্ত সজ্জন সচ্চরিত্র সদ্‌বিবেচক সদাশয় সদ্ভাবসম্পন্ন সৎকর্ম্মশীল— ভুলেও কখনো নিজের প্রশংসা করতে জানি নে, আমার স্বভাব তুমি যদি বিগ্‌ড়ে দাও তাহলে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হবে— আমার দেড়শো ছাত্র নিয়ে জানলার ধারে যদি জুয়ো খেলতে বসি তাহলে এখানে কেউ ছাত্র পাঠাবে না। কিম্বা এমন সব ছাত্র আস্‌বে যাদের বয়স আমারি মত সাতাঁশ বছর। আমি প্রতিজ্ঞা করচি কিছুতেই আমি জুয়ো খেলব না কোনোদিন না— তবে যদি হপ্তার মধ্যে পাঁচটা সাতটা দিন কেবল পাঁচটা সাতটা ঘণ্টা তোমার সঙ্গে খেলা যায় তাতে ক্ষতি হবেনা। ১৪ই আষাঢ় ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৮

১১ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড় লজ্জা পেলুম। কেন বলব? এর আগে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম— তার জবাব দেব-দেব

করচি এমন সময়ে তোমার এই চিঠি। আজ তোমার কাছে আমাকে হার মান্‌তে হল। আমি এত বড় লেখক, বড় বড় পাঁচ ভলুম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি, গান লিখেচি হাজার খানেক, মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখেচি কত তার সংখ্যা নেই, গল্প লিখেচি ঝুড়ি ঝুড়ি, নাটক লিখেচি কম নয়, তারপরে গদ্য বই যা জমেচে তাতে একখানা পুরো মালগাড়ির ট্রেন বোঝাই হতে পারে, তার পরে ইংরেজি বইও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গড়গড় শব্দে এগিয়ে চলেচে— এ হেন যে আমি— যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্ম্মা রচনালবণাম্বুধি, কিম্বা সাহিত্য অজগর, কিম্বা বাগক্ষৌহিনীনায়ক, কিম্বা রচনা-মহামহোপদ্রব, কিম্বা কাব্য “কলা”কল্পদ্রুম, কিম্বা ফস্ করে এখন মনে পড়চে না পরে ভেবে বল্‌ব— রাণুর মত একরত্তি মেয়ে ___. “সাতাশ” বছর বয়স হতে যাকে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর সাধনা করতে হবে, তারই কাছে পরাভব— 2 goals to nil। তার পরে আবার তুমি যে সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত’ লিখ্‌চ আমার এই ডেস্কে বসে তার সঙ্গে পাল্লা দিই কি করে? আজ সকালে তাই ভাবছিলুম, পারুলবনের সাম্‌নে দিয়ে যে রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকব— তার পরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেণটা চলে গেলে পর যদি তখনো হাতে [য] চলে তাহলে সেই মুহূর্ত্তে সেইখানে বসে তোমাকে যদি চিঠি লিখ্‌তে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পারব। এ সম্বন্ধে এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করি নি, এণ্ড্রুজ সাহেবকেও জানাই নি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হচ্চে ওঁরা হয়ত কেউ সম্মতি দেবেন না। তাছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগ্‌চে— মনে হচ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তাহলে হয় ত লেখা ঘটেই উঠ্‌বে না— আর যদি না ঘটে তাহলে অনন্তকালের মত ঐ দুখানা চিঠির জিৎ তোমার রয়েই যাবে। অতএব থাক্।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার একটাও ঘটেনি।

ঝড়বৃষ্টি অল্পস্বল্প হয়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাত ভাঙে নি। আমাদের কারো মাথায় যে সামান্য একটা বজ্র পড়বে তাও পড়ল না। বন্দুক নিয়ে ছোরা ছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হচ্চে কিন্তু আমাদের এমনি অদৃষ্ট মন্দ যে আজ পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করে আমাদের আশ্রমে তারা কিম্বা তাদের দূর সম্পর্কের কেউ পদার্পণ করলে না। না, না, ভুল বলচি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হল ঘটেছে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সাম্‌নে দিয়ে নির্জ্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘপথ বোলপুর স্টেশন পর্য্যন্ত চলে গেছে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত।[১] সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গীয় রমণী একাকিনী বাস করেন। তাঁর ডাক নাম মীরা। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী বেহারা গোয়ালা পাচক ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় এণ্ড্রুজ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন— সমস্ত বাড়িটাতে এছাড়া আর জনপ্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ করচেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারোটা— যখন কেবলমাত্র দশ বারোজন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম করচে এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ করলে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কি ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত করে তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে "ইস্কুল কোথায়?" অকস্মাৎ জাগরণে মীরা নাম্নী রমণীর ঘন ঘন হৃৎকম্প হতে লাগল— রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্‌লে, "ইস্কুল ঐ পশ্চিম দিকে।" তখন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, "হেডমাস্টারের ঘর কোথায়?" মীরা বল্‌লে, "জানি নে।" তার পরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। এই যুবক সেই ম্লান জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লিমুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্করবিকীর্ণ পথে আশ্রমকুক্কুরবৃন্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা করে কমলা নামধারিণী একটি একাকিনী রমণীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর

জনপ্রাণীও না। সেখানেও পূর্ব্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত দীপালোকিত সেই নির্জ্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। লোকটা মধ্যরাত্রে বহু দূর দেশ থেকে হেডমাস্টারকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কেন এখানে এল? তার সঙ্গে কিসের শত্রুতা? সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামীদূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কি আশঙ্কা বহন করে ঘুমিয়ে পড়ল? পরদিন প্রভাতে হেড্‌মাস্টারের হেড্ কি কোথাও পাওয়া পাবে [যাবে] তাঁরা আশা করেছিলেন?— তারপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন মীরা আমাকে বল্‌লে, "তাত, কাল মধ্যরাত্রে একটি অপরিচিত যুবক ইত্যাদি।" শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিত হবেন যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাই নি। এমন কি, আমি তরবারীও কোষোন্মুক্ত করলুম না— করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও তরবরী [য] ছিল না, থাকবার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান করতে বেরলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে "হেড মাষ্টার কোথায়" বলে অবলা রমণীর নিদ্রাভঙ্গ করেচে?— তার পরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল এখানে তার কোনো একটি আত্মীয় বালককে সে ভর্ত্তি করে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত।

এখানে আজকাল অধ্যয়ন অধ্যাপনার খুব ধুম পড়ে গেচে। পালি প্রাকৃত সংস্কৃত সিংহলী বাংলা ইংরেজি দর্শন কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কার ইত্যাদি চল্‌চে। ছবি ও গানও জমে উঠেচে। সন্ধ্যাবেলায় একদিন আমি বাংলা কাব্য আর একদিন ব্রাউনিঙের কাব্য আলোচনা করে সমবেত সুধীবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করে থাকি— সকাল বেলায় বালকদের ক্লাসও কিছু কিছু নিচ্চি। ইতমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমন্ত্রণসহ টেলিগ্রাম আস্‌চে। অনেক দ্বিধা করে করে শেষকালে ঠিক করেচি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সমুদ্র পাড়ি দেব। আমাকে হয় ত ওদের কিছু দরকার থাক্‌তে পারে।

তাছাড়া যে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েচি বিদায় নেবার পূর্ব্বে তাকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আসা উচিত। নইলে ক'দিনই বা এখানে থাকা আর কতটুকুই বা দেখা। ইতি ২৬ আষাঢ় ১৩২৬

ভানুদাদা

৫৯

[২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কয়দিন তোমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলুম। আজ তোমার বাবজার স্বহস্তের চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি আমার সেই পুরাতন কোণটিতে এসে ঢুকেচি। মীরা পিসি নেই, বৌমা নেই, কমলও নেই, থাকবার মধ্যে আছে সাধুচরণ।[১] জান ত তার ব্যবহার। তুমি না থাকাতে তাঁর দিবানিদ্রার মেয়াদ আরো অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমার উপায় কি বল দেখি। এখানে মাঠের মধ্যে কেবলমাত্র ঐ এক সাধুসঙ্গে আমার দিন কাট্‌বে কি করে? তাই ঠিক করেচি বিবাগী হয়ে একেবারে শিলং পাহাড়ে চলে যাব— সেখানে চাটগাঁ বিভাগের কমিশনার সাহেবের[২] বাগানবাড়িতে তপসাধন করব— অর্থাৎ, যদি শীত করে তবে আগুন জ্বেলে তারি পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকব, আর যদি ক্ষুধা পায় তবে রুটি মাখন বিস্কুট ভাত ডাল তরিতরকারী ফল ফুলুরি রসগোল্লা সন্দেশ জিলিবি কেক প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই খাব না, আর পানীয় দ্রব্যের মধ্যে কেবল মাত্র জল দুধ চা কফি লেবুর সরবৎ, আনারসের সরবৎ দইয়ের সরবৎ, এবং দু চার রকমের আইস্‌ক্রীম-মাত্র— একরকম শুকিয়ে থাকা আর

কি। এর থেকে বুঝতে পারবে কত বড় বৈরাগ্যের ভাব আমার মনে এসেচে। তা ছাড়া বিনয় চর্চ্চাও একেবারে ভুলি নি— অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে এমন আশ্চর্য্য নম্রতা অবলম্বন করেচি যে, ঘরে বাইরে যে আমাকে দেখ্‌চে সেই বিস্মিত হয়ে বল্‌চে, আহা তিনভুবনে এমনতর— যা বল্‌চে তা বল্‌তে গেলে বিনয় রক্ষা হয় না। অতএব চিঠির ও পিঠ সমস্তটা ফাঁক রেখে দিলুম— তাতেও কুলোয় কি না সন্দেহ।

আশা শান্তি কেমন থাকে আমাকে লিখো, আর আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তাদের সকলকে জানিয়ো। ইতি তারিখ জানিনে— আজ বোধ হচ্চে পঞ্চমী। ১৩২৬ [১২ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

৬০

[৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কাল তোমাকে চিঠি লিখেচি এমন সময়ে আজ তোমার চিঠি এসে উপস্থিত। যতদিন রাজধানী কলকাতায় ছিলুম ততদিন সময়টা ছিল কাজে কর্ম্মে লোকের ভিড়ে একেবারে নিরেট— সেখানকার পাথরে বাঁধানো রাস্তার মত— সে রাস্তায় আপিস গাড়ি ট্রামগাড়ি চলে কিন্তু কোনো একটু ফাঁকে বনফুল ফোটে না। তোমাকে চিঠি লেখা সেই বনফুল ফোটানো,— তার জন্যে অকেজো সময়ের পোড়ো জমি দরকার। আমার কপালে সেই পোড়ো জমি চাষার দলে মিলে সবাই প্রায় চষে ফেলে দিলে,— এই যে এখানে এসেচি, দেশ বিদেশের চিঠি জমেচে কত—

মাথা হেঁট করে সমস্ত দিন ধরে জবাব দিচ্চি। কেউবা আমাকে ইংরেজি কবিতা পাঠিয়েচে; আমাকে লিখ্‌তে হচ্চে, সে ইংরেজিও নয় কবিতাও নয়; কেউবা খান্দেশ থেকে আমার নিজের কবিতার মানে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েচে, আমাকে বিনয় সহকারে জানাতে হচ্চে, আমি কবিতা লিখ্‌তে পারি কিন্তু তার মানে বল্‌তে পারি নে; কেউবা লিখেচে, সে বই ছাপাতে চায় আমাকে তার ভূমিকা লিখে দিতে হবে, আমাকে লিখ্‌তে হচ্চে, বই যে ব্যক্তি লিখেচে তার পাপের দায় তারই, আমি কেন তার ভূমিকা লিখে খামকা সেই পাপের ভাগ মাথায় করব; এমন আরো কত তার সংখ্যা নেই।— আশা বুঝি বলেচে আমি তোমাকে ভুলে গেচি? আমি এ পর্য্যন্ত একটাও পাস্‌ করতে পারি নি কিনা, তার উপরে আবার কত নামতা ভুল করি সেও ত তুমি জান, তাই আশা ঠিক করে বসে আছে আমার স্মরণশক্তি কিছুই নেই,— আচ্ছা, মেনেই নেওয়া গেল আমার স্মরণ শক্তি নেই, কিন্তু তাই বলে বিস্মরণ শক্তিতে জগতে আমি অদ্বিতীয় এত বড় অহঙ্কারের কথাই বা কোন্‌ মুখে স্বীকার করব? আশা হয়ত ভাব্‌চে, তোমার চিঠি হাতে করে আমি বসে বসে চিন্তা করচি "রাণু? কে বল ত? Elizabeth the Great? না জাপানের রাণী কুসিকাওয়া? না চীনের মহারাণী চুংফুং ফা?" কোনো কিনারা করতে না পেরে পরম পণ্ডিত হরিচরণের কাছে গিয়ে উপস্থিত। "ওহে হরিচরণ, রাণু কে আমাকে বলে দিতে পার?" তিনি বলচেন "জানেন না? সেই যে রাণু পাগ্‌লী, খোলা চুল দুলিয়ে ছুটে ছুটে চলে?" হাঁ হাঁ, বটে বটে, একটু একটু আবছায়া আবছায়া মনে পড়চে— "সেই যে থাকে ডেরাইস্মাইল খাঁয়ে, না ময়ূরভঞ্জে, না ভিজাগাপাটামে, না কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীটে— সেই যে— কি রকম দেখ্‌তে বল ত?" ইতি শুক্লাষষ্ঠী কার্ত্তিক ১৩২৬ [১৩ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

৬১

[৯ অক্টোবর ১৯১৯]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমাকে পরে পরে দুদিন ধরে দুখানি চিঠি লিখ্‌লুম তার কোনো হিসেব পাওয়া গেলনা কেন? এতদিন নিশ্চয় পেয়েচ। কিন্তু আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ছুটির কয়দিন আশ্রমে নির্জ্জন বাস করব— কিন্তু আমার সেই মাঠের বাড়ি— যাকে আমি বলি রবির উত্তরায়ণ[১]— সেটা এখনও অতিথির অধিকারে। সুদীর্ঘকালেও তাঁকে বিচলিত করতে পারা গেল না— অবশেষে আমাকেই বিচলিত হতে হল। তার পরে এবার আশ্রমে প্রাক্তন ছাত্র অনেকে এসে জুটেচে। তারা ক্ষণে ক্ষণে আমাকে বেষ্টন করে ধরত। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল আমার ভাগ্যে ওখানে অবকাশ নেই। আমার জ্যোতিষ্ক মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ করতে পারেন না— তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিক্‌তে পারি নে— আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়— সেই জন্যেই আমি ছুটির দরবার করি— কেননা ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোকসমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি। অথচ ঠিক এই সময়েই উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোয়, রঙীন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্য্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় শিউলিফুলের গন্ধে ক্ষেত ভরে কাঁচা ধানের শ্যামলতায়, দিকে দিকে কাশমঞ্জরীর উল্লাসহাস্যহিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হয়ে উঠেছিল। ষ্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টান্‌ছিল। কিন্তু ষ্টেশনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজ্‌ল আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিটকারি দিয়ে পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে এল। রাত এগারোটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েচে।[২]

নৌকোয় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে— ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে, একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চল্‌ল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস্‌ করে পড়ে গেল— আমার সেই ঝোলাকাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথরাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছন গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছা করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করি নি— ভীষ্মজননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুল্‌লেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং পাহাড়ে যাত্রা করব। আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মত হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়েচে— আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত।

আমাকে এবার যখন চিঠি লিখ্‌বে কলকাতার ঠিকানায় লিখো— আমি যেখানে থাকি পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বেই পাঠিয়েচি— আবার পাঠালুম। আশা শান্তি ভক্তিকেও আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। পূর্ণিমা আশ্বিন ১৩২৬ [২২ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

---

১২ অক্টোবর ১৯১৯

ওঁ

Brookside
Shillong
Assam.

কল্যাণীয়াসু

রাণু কাল এসে পৌঁচেছি শিলঙ পর্ব্বতে। পথে কত যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে বোলপুর থেকে আসবার সময় মা গঙ্গা আমাকে

জল কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন? কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে রেলে চড়ে বসলুম। দুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটর গাড়ি গোহাটি [য] ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইচ্ছা ছিল সেই গাড়িটাতে করে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমল বোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার এবং আয়তনের, এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেচেন, আমাদের ভাগ্যদেবতা, তাঁকে টিকিট কিন্‌তে হয় নি। সান্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম, এমনি কসে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌ল যে, দেহের রস রক্ত যদি হত দই তাহলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসত। অর্দ্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। গৌহাটির নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে যখন খেয়া জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটর গাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে দেয়ে সেজে গুজে গুছিয়ে গাছিয়ে বসে আছি— গিয়ে শুনি ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেচে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারে নি। এদিকে বেলা দুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল, কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বাল্‌তি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল— স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেছে পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হল বটে কিন্তু নির্ম্মল হল বল্‌তে পারি নে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল। তা হোক্, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে নিলেন। কোথায় রাত্রি

যাপন করতে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চড়ে গৌহাটি সহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে বসেচেন, - তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষপাত করতেই সে বিকল হয়েচে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটর গাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্য্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা বল্‌লে "আজ কিছু করা অসম্ভব কাল চেষ্টা দেখা যাবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করলুম রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়? তারা বল্লে ডাকবাংলায়। ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি সেখানে লোকের ভিড়— একটিমাত্র ছোট ঘর খালি তাতে আমাদের পাঁচজনকে পূরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান করে অবশেষে গোয়ালন্দগামী ষ্টীমারঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি— রাতটা এই রকম দুঃখে কাট্‌ল। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর কোম্পানির একটি মোটর গাড়ি এসে আমাদের বহন করে পাহাড়ে নিয়ে যাবে। সে গাড়িখানা আর একজন আর এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল— সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি করে সেটা ঠিক করে এসেচেন— ভাড়া লাগ্‌বে একশো পঁচিশ টাকা— আমাদের সেই হাতী কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক্ পৌনে আটটার সময় গাড়ি এল— তখন বৃষ্টি থেমেচে। গাড়ি ত বায়ুবেগে চল্‌ল, কিছু দূরে গিয়ে দেখি, একখানা বড় মোটরের মালগাড়ি ভগ্নঅবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে— পূর্ব্বদিনে আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল— এই পর্য্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েচেন— জিনিস তাঁর মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চলে

গেছে। জিনিস রইল পড়ে, আমরা এগিয়ে চল্‌লুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হল। যা হোক্ শিলঙ পাহাড়ে এসে দেখি পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহবৈগুণো বাঁকে নি, চোরে নি, নড়ে যায় নি, আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটাতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য্য বোধ হল। এখনও পাহাড়টা ঠিক আছে, তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি কিন্তু আর বেশি লিখ্‌লে ডাক পাওয়া যাবেনা। অতএব ইতি কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩২৬

[২৫ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

৬৩

? অক্টোবর ১৯১৯

ওঁ

Brookside

Shillong

কল্যাণীয়াসু

আজ তোমার চিঠি পেলুম। বেশ একটু শীত পড়েচে— স্নানের ঘরে ঢোকবার সময় মনটা একটু পিছু হটবার চেষ্টা করবে— কিন্তু তাকে হট্‌তে দেব না— ঝপাঝপ্ মাথায় জল ঢালবই আর কাঁপতে কাঁপতে তোয়ালে দিয়ে গা মুছ্‌বই এ আমি তোমাকে লিখে দিলুম। সাধুচরণ আমার শোবার ঘর ঝাড়াঝুড়ি করচে তাকে আমি ডেকে মুক্তকণ্ঠে বলে দিয়েচি, "সাধু, শীঘ্র আমার নাবার জল ঠিক করে দে।" কথাটা যে কত বড় বীরত্বের তা তুমি কাশীতে বসে হাত পাখার বাতাস খেতে খেতে বুঝতেই পারবেনা। আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁছলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টি বাদলা কেটে

গিয়েচে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন। মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ রোদ পোহাচ্চে— তাদের এম্‌নি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা যে শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষণে লাগ্‌বে এমন মনেই হয় না। আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড় ঘর— নানা রকমের চৌকি টেবিল সোফা আরামকেদারায় আকীর্ণ— জানলাগুলো সমস্তই শাসির— তার ভিতর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইসারায় কথা বলবার চেষ্টা করচে। বাগানে ফুলগাছের চান্‌কায় কত রঙ বেরঙের ফুল যে ফুটেচে তার ঠিক নেই— কত চামেলি কত চন্দ্রমল্লিকা কত গোলাপ— আরো কত অজ্ঞাতকুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য্য ওঠবার আগেই রাস্তার দুই ধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করে বেড়াই— তারা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না— হাসাহাসি করে— বোধ হয় যেন তারা আমার "ভানুদাদা" নামটা জানে— আর জানে আমার বয়েস খুব অল্প— আর বোধ হয় যেন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার বৌমা কেন তোমাকে আমাদের মত নানা রঙের কাপড়ে সাজিয়ে বেড়াতে পাঠান না।" আমি আমার সেই শালের কাপড়টা পরে বেড়াই তার একটা রঙ আছে বটে— কিন্তু সে রঙটা যে কি বলা শক্ত— রঙ আর না-রঙের মাঝামাঝি। এই পর্য্যন্ত লিখেচি এমন সময়ে সাধু এসে খবর দিলে স্নানের জল তৈরি— অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নান যাত্রায় গমন করলেন। স্নান করে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল— কি খবর বল দেখি? আন্দাজ করে দেখ। নিজে যদি ভেবে না পাও আশাকে শান্তিকে জিজ্ঞাসা কর। খবর পাওয়া গেল যে রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত— শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক করা। আহার

সমাধা করে এই আস্‌চি— সুতরাং চিঠির ওভাগে পূর্ব্বাহ্ন [য] ছিল, এভাগে অপরাহ্ন [য] পড়েছে— এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করচে। সেই মোটা মেঘগুলো সাদা-কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মত এখনো অলস ভাবে স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে পড়ে আছে, পাখী ডাক্‌চে আর জানলার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আস্‌চে। ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় করে নিস্তব্ধ ভাবে জানলার কাছে যদি বস্‌তে পারতুম তাহলে খুসি হতুম— কিন্তু অনেক চিঠি লিখ্‌তে বাকি আছে অতএব গিরিশিখরে এই শরতের অপরাহ্ন [য] আমার চিঠি লিখেই কাট্‌বে। তুমি ছবি আঁকচ কি না লিখো, আর সেই এস্‌রাজের উপর তোমার ছড়ি চল্‌চে কি না তাও জান্‌তে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন ১৩২৬ (তারিখ ভুল করি নি— পাঁজি দেখে লিখেছি)

তোমার ভানুদাদা

৬৪

২৩ অক্টোবর ১৯১৯

Brookside

কল্যাণীয়াসু

আজ কার্ত্তিকী অমাবস্যা। আজ তোমার জন্মদিন। আশীর্ব্বাদ করি পুণ্য দীপোৎসবের দীপাবলীর মতই তোমার জীবনের দিনগুলি উজ্জ্বল হয়ে পবিত্র হয়ে দীপ্তি পাক্‌। অন্ধকার বিনাশ করবার জন্যেই তোমার জীবন উৎসর্গ-করা হোক্‌। আমাদের স্বার্থপরতার দিক্‌, ভোগপরায়ণ প্রবৃত্তির দিক্‌, অহমিকার দিক্‌ই হচ্চে অন্ধকারের দিক্‌, ঐ দিকেই পশুত্ব— ঐ

দিকেই ঈর্ষা দ্বেষ আত্মাভিমান, ঐ দিকেই যত দুঃখ যত গ্লানি। আমাদের ঋষিরা তাদের সাধনা থেকে যে একটি মহতী প্রার্থনা আমাদের দান করে গেছেন সেটি হচ্চে, তমসো [মা] জ্যোতির্গময়— অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও— অহঙ্কারের আবরণ থেকে আমার আত্মাকে মুক্ত কর। এই প্রার্থনা তোমার অন্তরের প্রার্থনা হোক্ এবং তোমাকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে প্রলোভন থেকে রক্ষা করুক। নিরাসক্ত হয়ে তোমার প্রেম বিশুদ্ধ হোক্, নিঃস্বার্থ হয়ে তোমার কর্ম্ম বিশুদ্ধ হোক্, আত্মনিবেদনের দ্বারা তোমার পূজা বিশুদ্ধ হোক্।

জন্মদিনে তোমাকে কিছু দেব বলে সন্ধান করছিলুম। সন্ধান করতে করতে তোমার জন্মদিন এসে পড়ল। এখনো আশা ছাড়ি নি— কিছু পাওয়া যাবে। উদ্দেশে আজই সেটা তোমাকে দিয়ে রেখে দিলুম— তার পরে সেটা তোমার হাতে পৌঁছতে যদি দেরি হয় তাতে ক্ষতি নেই।

এই চিঠি পাওয়ার পরে আপাতত এখানে আমাকে চিঠি না লিখে কলকাতার ঠিকানায় লিখো, যে পর্য্যন্ত না শান্তিনিকেতনে যাওয়ার খবর পাও। ইতি ৬ই কার্ত্তিক ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৬৫

১৪ নভেম্বর ১৯১৯

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু অনেক ঘুরে ফিরে কাল এখানে এসেছি।[১] এতদিনকার চিঠি জমে পর্ব্বত সমান হয়ে উঠেচে। কত কালে সব জবাব সারা হবে জানি নে।

এরি মধ্যে ফস্ করে তোমাকে দু চার লাইন লিখে দিচ্চি। শিলঙে থাকতেই তোমার জন্যে সেখানকার তৈরি একটা বস্ত্র খণ্ড কিনেছিলুম— পাঠাবার সুবিধা না হওয়াতে এতদিন পড়ে ছিল। এইবার এখান থেকে পাঠাচ্চি। এটা তোমার কি কাজে লাগ্‌বে জানি নে, হয় ত জামা তৈরি হতে পারবে, নয় ত মাথার পাগ্‌ড়ি, নয়ত কোমর বন্ধ, নয় ত টেবিলের ঢাকা, নয় ত হাব্‌লার মায়ের সাড়ি। যাই হোক্ এটা হারিয়ো না, এর পরে অনেক দিন বাদে, পঁয়তাল্লিশ কিম্বা ঊনসত্তর বছর পরে হঠাৎ ঐটে দেখে তোমার মনে পড়বে ভানুদাদা বলে কোনো একজন কোনো এক জায়গায় কোনো এককালে বর্ত্তমান ছিল;— হয়ত তার নাকের ডগাটা, কিম্বা পায়ের গোড়ালিটা কিম্বা কনুয়ের কোন্‌টা, কিম্বা কড়ে আঙুলের আগাটা খুব অল্প অল্প মনে আস্‌বে— স্পষ্ট মনে পড়বে না তার দাড়ি ছিল কি ছিল না, কিম্বা সে লম্বা কি বেঁটে, কিম্বা সে কালো কি গৌরবর্ণ, কিন্তু এটা হয়ত মনে পড়বে যে, সে সাতাশ বছর কিছুতেই পার হতে পারে নি, আর তাকে নামতার কোঠা জিজ্ঞাসা করলে সে বলত তিন-নাম পঁয়তাল্লিশ।

আজ মেঘ করে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়চে— এই শীতের বৃষ্টি বয়স্ক পুরুষের কান্নার মত— দেখ্‌লে রাগ ধরে। আজই আমার সেই মাঠের বাড়িতে[১] উঠে যাবার কথা আছে— কিন্তু এই রকম ছিচকাঁদুনে দিনে কোথাও নড়তে ইচ্ছা করে না। যদি কাল রোদ্দুর ওঠে তবেই যাব, নচেৎ আজ দিনুবাবুর সেই দোতলা ঘরে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে থাক্‌ব। সাধুচরণ এখনো আমার চা এনে দিলে না— নিশ্চয় সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্চে। ডিসেম্বরে যখন তুমি আস্‌বে তখন তাকে খুব বকে দিয়ো। ইতি? [২৮] কার্ত্তিক ১৩২৬।

ভানুদাদা

৬৬

১১ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল থেকে খুব ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েচে। সকালে নানা লেখা লিখ্‌তে হয়। সমস্ত দুপুর বেলায় চিঠির উত্তর। সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস। বাইরে একটু বেড়াতে যাবারও সময় পাইনে। একটা সুবিধা এই যে এক্ষন মাঠের মধ্যে যে জায়গায় বাসা নিয়েচি এখানে বসে বসেই বেড়ানো চলে। চারদিকেই খোলা আকাশ, খোলা মাঠ। কিন্তু চোখ দুটোকে ত লেখবার কাগজের থেকে ছুটি দেওয়া চাই নইলে সে কেবলি কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরে— মাটিতে মটর ছড়িয়ে দিলে পায়রা যে রকম মাথা হেঁট করে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে বেড়ায়। থেকে থেকে ইচ্ছে করে— উত্তরে হাওয়ায় আজকাল যেমন গাছের শুকনো পাতা সব উড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্চে তেমনি করেই সমস্ত কাগজপত্র আকাশে উড়িয়ে দিই— কাজকর্ম্ম সব বন্ধ করে দিয়ে বারান্দাটাতে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে দুটো চক্ষুকে নীল দিগন্তে বিবাগী করে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু কাজ আমার ঘাড়ে চড়ে ঝুঁটি ধরে বসেচে— তাকে যতই নাড়া দিই সেই ঝাঁকানি আমার নিজের ঘাড়েই পড়ে— শেষকালে বল্‌তে হয়, "আচ্ছা রে বাপু, আমার দুটি স্কন্ধ তোমাকেই উৎসর্গ করে দিলুম, তোমার গুরুভারে আমার মস্তক ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ুক আমার মেরুদণ্ড ধনুকের মত বেঁকে যাক্‌, আমার জীবনের দণ্ডপল মুহূর্ত্তগুলো জাঁতায় পেষা ময়দার মত চূর্ণ হয়ে গিয়ে বস্তাবন্দী আকারে কাজের হাটে চালান্‌ হতে থাক।" এই মাত্র তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমার দুটি ছাত্র[১] এসে উপস্থিত, ঘণ্টা খানেক ধরে তাদের ইংরেজি শেখালুম। তার পরে পুনশ্চ চিঠিতে হাত দিলুম। তোমার

বাব্‌জা লিখেচেন ২০শে তারিখে তাঁর ছুটি আরম্ভ। তাহলে তার পরে তোমাদের আসার সম্ভাবনা। ২৩শে ডিসেম্বরে ৭ই পৌষ। বাব্‌জাকে বোলো সেই দিনটা কাটিয়ে যেন ২৪শে ডিসেম্বরে আসেন। কেননা সেদিন পর্য্যন্ত ভয়ানক ভিড় হবার কথা, তোমাদের কষ্ট হবে, তোমার মায়ের ভাল লাগ্‌বে না।[২] সে সময়ে কলকাতা থেকে বিস্তর লোক আসবেন, তাঁদের নিয়ে আমাকে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হবে, তোমাদের কারো সঙ্গে কথা কবারও সময় পাব না। কলকাতার সেন্ট পল্‌স কলেজের প্রিন্সিপাল Dewick সাহেব[৩] কাল থেকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেচেন— কাল সকালে তিনি চলে যাবেন। তাঁর অভ্যর্থনাতেও আমাকে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েচে। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৬৭

২৬ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

BRAHMACHARYA-ASHRAM
SANTINIKETAN
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমাদের ৭ই পৌষ শেষ হয়ে গেল। তার পরেও আমাদের কিছুদিন ধরে নানা রকম কাণ্ড কারখানা চলেছিল, আজ থেকে আবার বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়েচে। আমবাগানে আজ অধ্যয়নের গুঞ্জনধ্বনি উঠেচে। আজ কাল আমাদের বিদ্যালয়ের সকল ক্লাসই আমবাগানে বসে।[১] আগেকার মত এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকেনা। দেখতে বেশ লাগে। এবার

তুমি যখন আস্‌বে দেখতে পাবে অনেক নতুন বাড়ি উঠ্‌চে। আমাদের ছুটির নিয়মও বদ্‌লে গেছে। এখন থেকে গ্রীষ্মের তিন মাস ছুটি হবে, পূজোর ছুটি থাকবে না।[১] দুবার ছুটিতে অনেক অসুবিধা। যাদের বাড়ি দূরে তাদের যাতায়াতের খরচও বেশি হয়, যাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া তারা ম্যালেরিয়ায় বোঝাই হয়ে আসে। এখানে তুমি যাদের সঙ্গে থার্ড গ্রুপে পড়তে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেচে। শ্রীমতী রেখা দেবী[২] 'সেই গৌরবে মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করে' মাথা উপরে তুলে বেড়াচ্চে— এইবার তারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রত্যন্তদেশে (frontier) এসে পৌঁছল। কিন্তু গণিতশাস্ত্রে রেখা দেবীর বিদ্যা প্রায় আমারই মত, সেইজন্য আজ সকালে মাধবীবিতানে জগদানন্দের ক্লাসে যখন তাকে দেখ্‌লুম তখন রেখার মুখে আনন্দের রেখামাত্র দেখা গেল না। আমার ইচ্ছা হল তাকে নামতার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, পাঁচ নাম কত হয়— আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি সে কখনই বল্‌তে পারত না যে, সাতাশ হয়— হয়ত ফস্‌ করে বলে ফেলত পঁয়তাল্লিশ। গোরার[৩] ক্লাসে যার দুর্গতি স্মরণ করে তোমার হাসি পেত সেই তোমার জাম-তলার প্রিয় সহচরী কল্যাণী[৪] এখানে নেই। সে আজকাল কলকাতায় পড়ে। জাম গাছে চড়বার যোগ্য মেয়ে আজকাল একটিও নেই— লাবী[৫] আছে, কিন্তু কিছুদিন থেকে তার শরীর অসুস্থ। দিনুর ঘরের সাম্‌নেকার গাছে কাঁচা পেয়ারাগুলো প্রায় পাকবার অবস্থা হয়েচে— এমন দুর্গতি! দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব, আমলকিগুলো গাছের তলায় ঝরে ঝরে পড়চে— গাছে উঠে পেড়ে নেয় এমন দুঃসাহসিকা আজ কোথায়?— বড় শীত পড়েচে— উত্তরে বাতাস সাঁই সাঁই করে এসে একেবারে কলিজার ভিতরে ঢুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্চে। কিন্তু স্নানের সময় এল, এখন শীতের হাওয়ার মধ্যে শীতের জল এসে জুট্‌বে— কিন্তু আমি পিছব না। ইতি ১০ পৌষ ১৩২৬

ভানুদাদা

৬৮

১৩ জানুয়ারি ১৯২০

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তুমি এত দেরীতে কেন আমার চিঠি পেয়েচ ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি তোমার চিঠি পেতে অনেক দেরী হল দেখে ভাবলুম হয় ত অমৃতসর কন্‌গ্রেসে[১] তোমাকে ডেলিগেট করেচে, কিম্বা হাওয়া জাহাজে কাপ্তেন রসের[২] সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েচ, কিম্বা হিমালয়ের পর্ব্বতশৃঙ্গে কোন্ পওহারী বাবার[৩] শিষ্য হয়ে মাটির নীচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ, কিম্বা লয়েড জর্জ্জের[৪] প্রাইভেট সেক্রেটারির সর্দ্দি হয়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চলে গিয়েচ। আমি পার্লামেন্টে লয়েড জর্জ্জকে টেলিগ্রাফ করতে যাচ্চি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। পড়ে দেখি তুমি বরুণার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হলেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য্য দেখ, কাল সন্ধে বেলায় আমারো প্রায় সেইরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাত্তির নটা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্চি এমন সময়ে— কি বল দেখি? আমার পড়বার ঘরে টেবিলের উপর— কি বল দেখি? কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নৌকোডুবি[৫] বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এক গল্পের বই। হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্য্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড় বিপদ ঘটবার কারণ হচ্চে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ[৬] ঐ বইটা তর্জ্জমা করবার অনুমতি নিয়েছিল। আবার সেদিন আর একজন ইংরেজ[৭] ঐটে তর্জ্জমা করতে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচে। তাতেই আমার দেখবার ইচ্ছে হল, ওটার মধ্যে ইংরেজের ভাল লাগার মত জিনিষ কি আছে।

কিন্তু সে ইচ্ছেটা রাত নটার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ, এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হতে রাত তিনটা বেজে গেল। তার মানে আমার পরমায়ু থেকে একটা রাতের বারোআনা" গেল চিরকালের মত হারিয়ে। আজ সকালবেলা আমার মুখচোখ দেখে এখানকার সি. আই. ডি পুলিস সন্দেহ করচে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাট্‌তে গিয়েছিলুম। তুমি ত কুয়োর মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছ, শুন্‌চি সে কুয়োয় অনেক জল ছিল। আমি কিন্তু সাম্‌লাতে পারলুম না— একেবারে ৩৬৮ পাতার ডুবজলের মধ্যে আমার আর টিকি পর্য্যন্ত দেখবার জো ছিল না। ঐ যে ডাক হরকরা আসচে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেছেন— আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্য্যবেক্ষণ করবেন বলে বোধ হচ্চে— যখন করবেন তখন হয়ত ঢুলব— আর তিনি তাঁর নোট্‌বুকে লিখে নিয়ে যাবেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধরে কেবল ঢোলেন। এমনি করেই জীবনচরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবনচরিতে এই কথা লিখ্‌বেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো— বোলো, আমার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে কিন্তু দিনের বেলায় আমার ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক্ তুমি লয়েড জর্জ্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ গ্রহণ কর নি এইটেতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

ইতি ২৮ পৌষ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৬৯

১৫ জানুয়ারি ১৯২০

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি তোমার বাব্‌জার জিম্বায় দিয়েছিলে তিনি ডাকে ফেল্‌তে দেরী করেচেন, এই জন্যে তোমার বাব্‌জাকে ক্ষমা করতে বলেচ। আচ্ছা তাঁকে ক্ষমা করলুম, কিন্তু তোমাকে ক্ষমা কবব কেন? তোমার বাব্‌জার হাতে কেন তুমি চিঠি দিয়েছিলে? তিনি হলেন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ, চিঠি একটা সত্যবস্তু কিনা এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ এখনো ঘোচে নি। তিনি শুধু চিঠি কেন ডাকঘরটাকেও মায়া বলে মনে করে বসে আছেন। তোমাকে বোধ হয় মায়া বলে স্থির করা তাঁর পক্ষে কঠিন, সেইজন্যেই একদা ব্যস্ত হয়ে চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়েচেন। তোমার বিরুদ্ধে আমার নালিশ হচ্চে এই যে কবিকে পত্র লেখবার সময় তুমি তত্ত্বজ্ঞানীকে তার বাহন কর কেন? এর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ যতক্ষণ না দেবে ততক্ষণ তোমাকে আমি ক্ষমা করবনা।— রাজা বলে আমার স্বরচিত একখানা নাটক[১] অভিনয়ের আয়োজন চল্‌চে। সেই নাটক আবার প্রায় আগাগোড়া নতুন করে লিখ্‌চি[২]— যত পারচি গান তার মধ্যে গুঁজে দিচ্চি।[৩] আমি স্বয়ং সাজব ঠাকুরদাদা। সাজের জন্যে বেশি কিছু ভাবতে হবে না; কারণ সংসার নাট্যে নেপথ্যবিধানের ভার যাঁর উপরে তিনি স্বহস্তে আমাকে সাজিয়ে রেখেচেন— পরচুলো প্রভৃতি কেনবার জন্যে এক পয়সা আমাকে খরচ করতে হবেনা। দুটি একটি নাৎনীকেও নাট্যমঞ্চে পাওয়া যাবে— সুতরাং আমি যে ঠাকুরদাদা, বাহির থেকেও তার সাক্ষীর অভাব হবেনা। অভিনয়টা কলকাতায় করতে হবে— সেই ফাল্গুন মাসের শেষে।[৪] এই সব ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত আছি।— আশা চষমা পরেচে শুনে মনে মনে

একটু খুসি হয়েচি— আমার চষমার উপর যদি কখনো সে কটাক্ষপাত করে তাহলে চষমার ভিতর দিয়েই তাকে করতে হবে।— আজকাল চষমা ভাঙার পালা আমার বন্ধ হয়েচে কিন্তু ঘড়ি ভাঙা সুরু হয়েচে। ঘড়ি অল্পকালের মধ্যে দুবার ভেঙেচি। দেশ ও কাল এই দুই পদার্থের মধ্যে জগতের যা কিছু আছে— যখন চষমা ভাঙছিলুম তখন সেই দেশের দৃষ্টি বিঘ্ন পাচ্ছিল, আজ কাল ঘড়ি যতই ভাঙচি ততই কালের দৃষ্টির ব্যাঘাত হচ্চে। চষমা ঘড়ি দুই ভেঙে ফেলে দৃষ্টিকে একেবারে দেশকালের অতীত করে দেওয়া যায় কি না তোমার বাবজাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো। ইতি ১ মাঘ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৭০

৬ মে ১৯২০

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু বোম্বাই প্রদেশ ঘুরে কলকাতায় এসেচি[1] কিন্তু এখনো আমার ভ্রমণের গ্রহ শান্ত হয় নি। বিলেতে যাচ্চি— ১৫ই মে তারিখে বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়বে, সেই জাহাজে যাত্রা করব— রথী বৌমাও সঙ্গে যাবেন।[2] মঞ্জুর[3] বাবা মঞ্জুকেও ঐ সঙ্গে শিক্ষার জন্যে, বিলাতে পাঠাবার ইচ্ছা করচেন যদি জাহাজে জায়গা পাওয়া যায় ত সেও যাবে। আগামী মঙ্গলবারে বোম্বাই মেলে বোম্বাই যাত্রা করব[4] যদি তোমরা বুধবারে মোগলসরাই স্টেশনে আসতে পার তা হলে দেখা হতে পারে। ইস্কুল

যখন খুল্‌বে তখন তুমি তোমার ক্লাসে যোগ দিয়ো, তোমার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক থাক্‌বে, মীরা পিসি[৫] তোমাকে খাওয়াবেন এবং ননী মাসি[৬] তোমাকে নাওয়াবেন, আর প্রমদাবাবু[৭] তোমাকে ইংরেজি পড়াবেন আর নন্দলালবাবু[৮] আঁকতে শেখাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি খুব সম্ভবত ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই ফিরে আস্‌ব।[৯] ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩২৬ [১৩২৭][১০]

তোমার ভানুদাদা

৭১

[* স্ট্রাসবুর্গ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২০][১]

রাণু

নানা দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। খুব ব্যস্ত। তোমাকে চিঠি লিখিনি বটে কিন্তু বৌমাকে জিজ্ঞাসা কোরো তোমার কথা প্রায় হয়— তুমি নিশ্চয় তা জান্‌তে পার। এখানকার অনেকেই তোমার খবর জানে। কবে দেশে ফিরব তার কোনো ঠিকানা নেই। আজ রাত্রে হল্যাণ্ডে যাব। তার পর কিছুদিন বাদে যাব আমেরিকায়। সেখানে বক্তৃতা সেরে আবার য়ুরোপে আস্‌তে হবে। তার পরে আসচে বছর ইস্কুল খুল্‌লে নতুন করে শান্তিনিকেতনে ভর্ত্তি হব। সমুদ্রপারে তোমার কাছে আমার আশীর্ব্বাদ চল্‌ল— সিন্ধুপারগামী পাখীটির মত। [৪ ভাদ্র ১৩২৭]

৭২

[* রটারডাম ১ অক্টোবর ১৯২০]

রাণু

হল্যাণ্ডে রটর্‌ডাম নামে এক নগরী আছে। সেইখানে বক্তৃতা দিতে এসেচি।[১] এখান থেকে আবার প্যারিসে যাব। তোমরা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ো। এবারে যখন দেশে ফিরব য়ুরোপের ভূগোলবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তুমি আমাকে হারিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু ৩x৪-এ ৪৫— এ আমার সংশোধন হবে না [১৫ আশ্বিন ১৩২৭]

---

২০ আশ্বিন ১৩২৭
[ব্রাসেল্‌স্‌]
৬ অক্টোবর
১৯২০

রটরডাম থেকে এন্টওয়ার্প[১], এন্টওয়ার্প থেকে ব্রাসেলে এসেচি। এখানে আজ রাত্তিরে বক্তৃতা দিতে হবে।[২] তার পরে যাব প্যারিস। সকাল হয়েচে, খুব শীত, কিন্তু আকাশের ভানুদাদা প্রসন্ন। হোটেলে খাবার টেবিলে বসে লিখচি। সামনে রুটি মাখন কফি, আশেপাশে অন্য টেবিলে অন্য লোকেরা বসে খাচ্চে আর কটাক্ষে আমাকে পর্য্যবেক্ষণ এবং মনে মনে পর্য্যালোচনা করচে।

আশীর্ব্বাদ।

৭৪

[* লন্ডন ১৪ অক্টোবর ১৯২০]

প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে এসেছি[১] লণ্ডন থেকে আগামী মঙ্গলবারে[২] উঠ্‌ব জাহাজে। সেই জাহাজ পাড়ি দেবে আমেরিকায়। তার পরে বক্তৃতা করতে করতে কোথা থেকে কোথায় ঘুরে বেড়াব তার কোনো ঠিকানা নেই তার পরে কবে দেশে ফিরব তাও অনিশ্চিত। [২৮ আশ্বিন ১৩২৭]

৭৫

[* লন্ডন ২০ অক্টোবর ১৯২০]

আজ এখনি **লণ্ডন** ছাড়চি।[১] কাল অতলান্তিক পাড়ি দেব। তার পরকার খবর সমুদ্রের ওপারে। আমার আশীর্ব্বাদ [৩ কার্তিক ১৩২৭]

৭৬

[* নিউইয়র্ক ৩০ অক্টোবর ১৯২০]

রাণু, ধরণীর ভানুদেব অতলান্তিকের পূর্ব্ব পার থেকে আজ পশ্চিম পারে অবতীর্ণ হয়েচে।[১] আকাশের ভানু তরণীর গবাক্ষ ভেদ করে স্মিত হাস্যে সেই লীলা অবলোকন করচে। পুরাণে সমুদ্র মন্থনের কথা শুনেছিলুম— সেই মথিত সমুদ্রের মূর্ত্তি কি, এবার তা মাঝে মাঝে দেখে নিয়েচি।[২] [১২ কার্তিক ১৩২৭]

৭৭

[* নিউ ইয়র্ক ৩০ নভেম্বর ১৯২০]

কোন দৈত্যপুরীতে এসেচি ছবি[১] দেখলেই বুঝতে পারবে। দেয়ালের গায়ে দরজার ফুকরগুলো গুণে দেখলেই বুঝবে বাড়িগুলো কয় তলা। সহরটা

শিং তুলে আকাশটাকে যেন গুঁতিয়ে মারবার চেষ্টা করচে। আর কি ভীড়। রাস্তা দিয়ে যেন পাগ্‌লামির বন্যা ছুটেচে। [১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৭]

৭৮

[* Yama Farms ২৭ ডিসেম্বর ১৯২০]

আ-মরি-ক্যা-হ্যায় নামে এক মহাদেশ আছে সেইখানে য়ম-পুরম্ নামে এক স্থানে নির্ব্বাসন যাপন করচি।[১] বনের মধ্যে কুটীর— চিত্রকূটের মত এক পাহাড়, তারই পদতলে নির্ঝরিণী বয়ে যাচ্চে। হনুমান যদি থাক্‌ত তার ল্যাজ আঁক্‌ড়ে ধরে এই মুহূর্ত্তে ভারত সমুদ্রপারে গিয়ে পৌঁছতুম। কিন্তু সেই বানরটাকে খুঁজে পাচ্চিনে। [১২ পৌষ ১৩২৭]

৭৯

[* নিউ ইয়র্ক ৬ জানুয়ারি ১৯২১]

আজ ২০শে পৌষ। কাশীতে শীত কেমন? যেমনই হোক এখানকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তোমাদের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের গোটা কয়েক টুক্‌রো এখানে যদি পাঠিয়ে দিতে পার তাহলে এখানকার জানুয়ারির আসর গরম করে তুল্‌তে পারি। [৪ জানুয়ারি ১৯২১]

৮০

[ফেব্রুয়ারি ১৯২১]

[টেক্‌সাস]

ছিলুম বাংলাদেশে— তমালতালীবনরাজি-বেষ্টিত নিভৃত নিকুঞ্জ কুটীরে— আর কোথায় এসেচি আমেরিকার পশ্চিমতম প্রান্তে টেক্‌সসে।[১] সহরে

সহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্চি। সেই আমার উত্তরায়ণের বারান্দায় আমার আরামকেদারা তার দুই শূন্য হাত শূন্যে প্রসারিত করে আমাকে ডাক দিচ্চে। সে ডাক শুন্‌তে পাচ্চি, সেই সঙ্গে এই ফাল্গুনমাসের শালবীথিকার নবকিশলয়দলের মর্ম্মরধ্বনি আমার হৃদয়ের মধ্যে বেজে উঠ্‌চে। কবে আবার সমুদ্রের পূর্ব্বঘাটে আমার তরী গিয়ে ভিড়বে সেই কথাই ভাবচি— এই বক্তৃতার ঘূর্ণী হাওয়ায় পাক খেয়ে বেড়াতে আর একটুও ভাল লাগচেনা। [ফাল্গুন ১৩২৭]

৮১

[এপ্রিল ১৯২১]

ও পাতায় যে পক্ষিরাজের ছবি দেখচ সেই পক্ষিরাজে চড়ে আমরা লণ্ডন থেকে সমুদ্র পার হয়ে প্যারিসে এসে পৌঁচেছি।[১] দু ঘন্টা সময় লেগেছিল। ভানুদেবতা এই মর্ত্ত্যভানুর আকাশলীলা দেখে সমস্ত গগনতল পূর্ণ করে হাস্য করেছিলেন— তিনি মনে করেছিলেন এতদিন পরে বুঝি তাঁর এক সঙ্গী জুটে গেল। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন প্যারিসে এসে আমার পক্ষিরাজের পক্ষ ভূমিতল স্পর্শ করল তখন থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে কেবলি বৃষ্টি পড়চে। আমি তাঁকে কি করে বোঝাব, মর্ত্ত্যের আকর্ষণ আমার পক্ষে এখনো প্রবল— যতই উধাও হয়ে যাই মাটির আহ্বান এড়াতে পারিনে অতএব মর্ত্ত্যের রবির সঙ্গে আকাশের রবির নিকট সম্বন্ধ কখনো ঘটবে কি না সন্দেহ, দূর থেকে তাঁর করস্পর্শ মাথায় করে নেব।

৮২

[১৮ জুন ১৯২১]

জিয়োগ্রাফিতে তোমার ক্লাসে নিশ্চয় তুমি প্রথম বিভাগে প্রথমা হয়ে উত্তীর্ণ হয়েচ কিন্তু আমি বাজি রাখ্‌তে পারি Czechoslovakia[১] সৌরজগতের

কোন্ গ্রহের কোন্ বিভাগ অধিকার করে তা তুমি কিছুই জান না,—এমন কি যদিও বল্‌তে সাহস হয় না তোমার বিদুষী দুই দিদি ফস্ করে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। তোমার পিতার সম্বন্ধে আমি কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি নে— তোমাদের যদি অভিরুচি হয় তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে পার। যা হোক্, এই চেকোস্লোভাকিয়া থেকে আমি পত্র লিখ্‌চি। কিন্তু এই পত্রলেখকটি যে কে তা বোধ হয় তুমি কিছুতেই অনুমান করতে পারবে না। যদি চ এ সম্বন্ধে বাজি রাখ্‌তে আমি ভরসা করচি নে। এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে আজ বক্তৃতা দিতে চলেচি।[২] হিন্দু য়ুনিভার্সিটিতে যে সভায় আমি বক্তৃতা দিয়েছিলুম[৩] সেখানকার চিত্র বোধ হয় তোমার মনে আছে। কিন্তু আজানুবিলম্বিত সেই আমার উত্তরচ্ছদটি নেই। সেটি বোধ হয় কোনো কাশী-অধিবাসিনী অপহরণ করে নিয়েচে। এই পত্র যে দিন তোমার হস্তগত হবে তার অনতিকাল পরেই পত্রলেখক তোমার দৃষ্টিগোচর হতে পারে যদি তুমি দৃষ্টিপথে এস। তোমরা সকলে মিলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর [৪ আষাঢ় ১৩২৮]

৮৩

[অগাস্ট ১৯২১]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তুমি আমার পরে রাগ করতে পার, আর ভানুদাদার শরীরে কি একটুও রাগ নেই? সেপ্টেম্বরে আমি অজন্তায় যাব[১] বলে তুমি যদি রাগ করতে পার, তাহলে সেপ্টেম্বরের আগে তুমি আস্‌চনা বলে আমি রাগ

করতে পারি নে? কিন্তু কাজ নেই, আমি বহু কষ্টে রাগ সম্বরণ করলুম। তুমিও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। তাহলে আর আড়ি না, তাহলে আবার আমাদের ভাব। আমি হার মানচি। মনে কর না কেন আমি জর্ম্মণী। Peace Conference এ[২] আমাদের সন্ধিপত্র লেখা হোক্। অবশ্য জর্ম্মনিকে দণ্ড দিতে হবে। জর্ম্মনি তার দণ্ড চল্লিশ বছর ধরে দেবে— অর্থাৎ যখন সম্ভব তখনি তোমার সঙ্গে তার দেখা করতে হবে— সেপ্টেম্বর না হয় ত অক্টোবর, অক্টোবর না হয় নবেম্বর, নবেম্বর না হয় ডিসেম্বর, ডিসেম্বর না হয় জানুয়ারি, জানুয়ারি না হয় ত ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি— যদি দৈবাৎ এক বছর না হয় ত অন্যবছর ভয়ানক কঠিন সর্ত্ত— তবু দেখ দেখি কত সহজে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হলুম। আমার এই চল্লিশ বছরের দেনা চল্লিশ বছরে যদি না কুলোয় তাহলে আরো চল্লিশ বছর মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে রাজি আছি।

আজকাল কি করচি জিজ্ঞাসা করেচ? বক্তৃতা দিচ্চি। আমি দিচ্ছি বক্তৃতা আর লোকে দিচ্চে গাল,— সুতরাং বুঝতেই পারচ কেমন আছি। কাল দেব একটা বক্তৃতা[৩] পর্শু কেমন থাকি সেই খবরটা নিয়ো। তার পর দিন শুক্রবার একটা বর্ষা উৎসবের কাজরী সভা হবে।[৪] বক্তৃতায় যাদের মন তেতে উঠবে— গানের বর্ষাধারা বর্ষণ করে তাদের মন ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করব। কিন্তু ঠাণ্ডা না হয়ে যদি গুমট[৫] হয় তাহলে কি করা যাবে বল দেখি?

ভানুদাদা

৮৪

১০ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমি এমন ভয়ঙ্কর রাগ করলুম আর তুমি সেটা একেবারে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিলে? মনে এতটুকুও ভয় হোল না। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের স্বরাজ এল বলে, আর দেরি নেই— নইলে বঙ্গরমণীর মনে এমন হঠাৎ সাহসের সঞ্চার হল কি করে? যা হোক্ এবারকার মত তোমার সঙ্গে সন্ধি করব বলেই মন স্থির করেচি। যথাসময়ে তুমি যদি আমাকে ধরতে পার তাহলে আমি ধরা দেব— ঠিক যখন টাইম টেব্‌ল্ হাতে নিয়ে রেলগাড়ির সময় বিচার করচি এমন সময়ে ছুটে এসেই একেবারে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেবে— আমি ভালমানুষটির মত চুপ করে বসে থাকব— কেবল যখন খাবার সময় আসবে সেই সময়ে ক্ষিধের জ্বালায় একটু চেঁচামেচি করব— তুমি যদি জান্‌লার ফাঁক দিয়ে আমাকে অতি যৎসামান্য কিছু খাবার গলিয়ে দাও, (যথা, কালিয়া পোলাও, কাবাব, কোর্ম্মা, আলুর দম, পটলের দোর্ম্মা, ডালপুরিয়া, কিস্‌মিসের চাট্‌নি, কচুরি, সিঙ্গারা, নিম্‌কি, আলুভাজা, রুইমাছের মুড়ো, ইলিষমাছের অম্বল, আর সামান্য কিছু মিষ্টি, যেমন, সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, সরভাজা, ছানার পায়েস, গজা, নারকেল নাড়ু, বাদামের বরফি, রাবড়ি এবং তা ছাড়া আর যা কিছু তোমার মনে আসে) তা হলেই আমি কোনোমতে সন্তুষ্ট চিত্তে দিনযাপন করব। আমার ভয় হচ্ছে উপরে যৎসামান্য আহারের যে ফর্দ্দটি দিলুম ওটাকেও পাছে তুমি ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দাও— তাহলে কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত রক্ষা হবে না; পুনর্বার যাকে বলা Casas belli[1] অর্থাৎ ঝগড়ার কারণ ঘট্‌বে। যাই হোক্ এ কথা তোমাকে জানিয়ে রাখচি তুমি যদি সময় বিচার করে এসে পড় এবং দুই হাত দিয়ে আমার

দ্বার আগ্‌লে দাঁড়াও তাহলে আমি পালাবার চেষ্টাও করবনা। এর থেকে বুঝতে পারবে আমার মত ভালোমানুষ লোক সংসারে অতি অল্পই আছে— যদিচ এ সব কথা নিজ মুখে বল্‌তে নেই। কিন্তু আমার মুস্কিল হয়েচে এই, অন্য লোকে আমার সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করে তোমার চিঠিতে তা উদ্ধৃত করতে প্রবৃত্তি হয় না— তাই দায়ে পড়ে নিজের কল্পনাশক্তি এবং রচনাশক্তি খাটাতে হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। কারণ, কাজ আছে— তা ছাড়া আকাশে ঘন মেঘ করেচে আমার কবিচিত্ত তাই উতলা হয়েচে— এমন অবস্থায় চুপ চাপ করে বসে থাকাই বিধেয়— কারণ গদ্য এখন কলম দিয়ে বেরতে চাচ্চে না। ইতি ২৫ ভাদ্র ১৩২৮

ভানুদাদা

বাব্‌জাকে বোলো
তিনি যদি অক্টোবরের
সুরুতেই আসেন
আমার দর্শন
পাবেন।

৮৫

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আজকাল তুমি ঠাট্টা বুঝতে আরম্ভ করে আমার উপরে জিতে যাবার চেষ্টা করচ— কিন্তু সেটি হবেনা। যেই আমি খাবারের ফর্দ্দ দিলুম অমনি

তুমি বলে বস্‌লে ওটা ঠাট্টা— আর যদি উল্‌টো হত, ফর্দ্দটা যদি তোমার নিজের ভোজের জন্যে হত তাহলে কিছুতেই ঠাট্টা বলে মনে করতে না। এমনতর নিজের সুবিধা বিচার করে তুমি যদি ঠাট্টা বুঝতে আরম্ভ কর তাহলে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা বন্ধ করতে হবে।

সামনে তোমার পরীক্ষা— এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে, তুমি এখন ভানুদাদার দিকে ফিরেও তাকাবে না— অ্যালজেব্রা নিয়ে পড়ে থাক্‌বে। তোমার ভয় হবে আমার কাছে থাক্‌লে পাছে তোমার নাম্‌তা ভুল হয়ে যায়, আর পাছে animal বানান করতে গিয়ে annie mull লিখে বস। এই কথা মনে করেই আমি উদাস হয়ে একেবারে অজান্তা [য] গুহার মধ্যে চলে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আট্‌কে রাখ্‌তে চাও তাহলে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমায় ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে। তুমি হঠাৎ এসে পিছন দিক থেকে আমার চোখ টিপে ধরতে চাও— আলজেব্রার [য] বইখানা হাতে থাক্‌লে কি করে চোখ টিপ্‌বে? আর যদি জিওমেট্রি হাতে নিয়ে আমার চোখ টিপে ধর তাহলে আইসসিলিস্‌ ট্রাইঅ্যাঙ্গ্‌লের খোঁচা লেগে আমার চষমা ভেঙে যাবে। দেখ এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করি নি— ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখলুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্চ আমি কোনোদিন পরীক্ষা দিই নি— এই জন্যে ভয়ে সম্ভ্রমে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরতে চাচ্চে না— আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি করচি

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন .১৩২৮

ভানুদাদা

৮৬

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তুমি যখন ছুটির আগেই আলজেব্রার ক্লাস ফেলে এখানে আস্‌তে চেয়েচ[1] তখন বুঝতে পারচি ভানুদাদার সঙ্গে তোমার খুব ভাব। যে লোক নামতা জানে না তাকে যে এখনো ভোলো নি এতে তোমার স্মরণশক্তিরও প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মনে বড় খট্‌কা লেগেচে। তুমি চিঠিতে লিখেচ আমি নিশ্চয়ই আশার চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিত? আশা তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তার ইংরেজি-জ্ঞানের প্রতি এত বড় অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভাল হয়েচে? সে যদি জান্‌তে পারে তাহলে তার মনে কত বড় আঘাত লাগবে একবার ভেবে দেখ দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো। আশার মত আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাশ করতে পারতুম তাহলে কি আজ এমন বেকার বসে থাক্‌তুম? তাহলে অন্তত পুলিসের দারোগাগিরি জোগাড় করতে পারতুম। চিরদিন ইস্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটা বছর বৃথা নষ্ট করলুম— এইজন্যে পাছে আমার কুদৃষ্টান্তে তোমাদের হঠাৎ বানান্‌ ভুলে পেয়ে বসে তাই ত সহর ছেড়ে তোমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মত যা হবার তা ত হল, আর-জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি ত অন্তত মাইনর ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়ব। কিছু না হোক্‌ অন্তত ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত অঙ্ক কষ্‌বই, আর ফার্স্ট, সেকেণ্ড দুটো রীডার্‌ যদি শেষ করতে পারি তাহলে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্‌টারি করতে পারব আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের

পোষ্ট মাষ্টারি পদটাও জোগাড় করে নেবার চেষ্টা করব— নেহাৎ না পাই যদি, তবে জমিদার বাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটারের কাজটা নিশ্চয় জুটবে। ইতি ৭ আশ্বিন ১৩২৮

ভানুদাদা

৮৭

২১ অক্টোবর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[১] আমাদের আশ্রম থেকে আজ সকালে কাশীধামে যাত্রা করেছেন। তিনি সদ্‌ব্রাহ্মণ ফুলের মুখটি। তাঁকে যত্নপূর্ব্বক আতিথ্য করে পুণ্য অর্জ্জন কোরো।

তুমি লিখেচ, তুমি এখানে থেকে কালো এবং রোগা হয়ে গেচ। এখানকার আবহাওয়ায় কালো রঙের প্রলেপ আছে। তোমার ভানুদাদার উজ্জ্বলতা এখানে অনেক পরিমাণে ম্লান হয়ে আসে, আমার সহস্র রশ্মির উপরে সাঁওতালি ছায়া পড়ে। তোমার কাশীর পাণ্ডাদের গৌরিমার কথা যখন শুনি তখন লোভ হয়। ইতিমধ্যে যদি পাণ্ডার পদ খালি হবার খবর পাও তাহলে আমি তার জন্যে উমেদারী করতে রাজি আছি। তুমি যে এখান থেকে রোগা হয়ে গেচ সে তোমার নিজগুণে। ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার অনেক শিক্ষা হয়েচে, এমন কি, চেকো-স্লোভাকিয়া মানচিত্রের কোন্ অংশে তাও তোমার অগোচর নেই, কিন্তু দেহরক্ষার পক্ষে আহার যে অত্যাবশ্যক এই তথ্যটি সম্বন্ধে তোমার ধারণা

অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। দুই একজন সতীর্থ হিন্দুস্থানী ছাত্রীর কাছ থেকে এই বিষয়ে উপদেশ নিতে পার— বিষয়টি গুরুতর, কারণ এতে গুরুত্ব লাভের সহায়তা করে। শুনেচি আহার সম্বন্ধে কাশীর পাণ্ডাদের ধারণাশক্তি অসামান্য— তাদের দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষে দুর্লভ হবে না।

আমার অবস্থা পূর্ব্বেরই মত। ডাকযোগে প্রচুর পত্রোদগম হচ্চে, কিন্তু তাতে ফল নেই। এ ছাড়া মাঝে মাঝে সকালে অকস্মাৎ কোথা থেকে গানের সুর এসে আমার মস্তিষ্ক অধিকার করে নিয়ে মৌচাকে মধুকরের মত গুঞ্জন করতে থাকে।[২]

কবিত্ব ছাড়া আমার আর এক ব্যবসায় আছে সে হচ্চে কবিরাজী। দুইয়েতেই রসায়ণের সম্পর্ক আছে কিন্তু সে এক জাতের নয়। সকাল বেলায় এক হাতে ওষুধের চর্ম্মপেটিকা আর এক হাতে ছাতা নিয়ে সন্তোষের ঘর থেকে আরম্ভ করে' সুকুমারের[৩] ঘর হয়ে প্রভাতকুমারের[৪] কুটীর পর্য্যন্ত রোগী দেখে বেড়াই। অশ্বিনীকুমারের কৃপায় এ পর্য্যন্ত কোন দুর্ঘটনা হয় নি। কিন্তু বুঝতে পারচ সময় আমার পক্ষে সুলভ নয়। ভবভূতি বলে গিয়েচেন, কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে অবসর কালের অভাবই নিরবধি হয়ে উঠেচে। সেইজন্যেই যদি "উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্মা" তাহলে তাঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখ্‌তেই হবে— কিন্তু একটা মুস্কিল, গান তৈরি আর কবিতা লেখা প্রাইভেট সেক্রেটারি দ্বারা হবার জো নেই— আর কবিরাজীতেও আশঙ্কার কারণ আছে। মনের এই উদ্বেগ জানিয়ে আজ পত্র সমাধা করি। ইতি
৪ কার্ত্তিক ১৩২৮

ভানুদাদা

৮৮

[? ২ নভেম্বর ১৯২১]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

এই মাত্র তোমার জন্মদিনের চিঠি পেলুম। প্রতি জন্মদিনে তুমি যেমন বয়সে বড় হচ্চ তেমনি যেন অন্তরের মধ্যেও বড় হতে থাক এই আমার আশীর্ব্বাদ। অন্তরের মধ্যে যতই আমরা বড় হতে থাকি ততই আমরা স্বার্থের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাই, ততই আমরা নিজের সুখ দুখের বাঁধন কাটিয়ে পরের জন্যে বাঁচতে শিখি। তোমার প্রেম তোমার আত্মসুখের কামনাকে দগ্ধ করে ফেলে বিশুদ্ধ দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠুক, তার আলোক তোমার জীবনকে সার্থক এবং সমস্ত সংসারকে আলোকিত করুক। গর্ভ থেকে যেমন আমাদের দেহের জন্ম তেমনি আমাদের অহঙ্কারের বেষ্টন থেকে আত্মার জন্ম— যে সব ইচ্ছা আমাদের নিজের দিকে টেনে রাখে সেই সব বন্ধন ছেদন করে তবে আত্মার নবজন্ম লাভ হয়। তোমার আত্মা তার বিকাশের সমস্ত বাধা দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে ছেদন করে মুক্তির জন্যে প্রস্তুত হতে থাক এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি বুধবার [? ১৬ কার্তিক ১৩২৮][১]

ভানুদাদা

৮১

৯ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]
২৩ কার্ত্তিক ১৩২৮

কল্যাণীয়াসু

পর পৃষ্ঠায় যে কবিতাটি আছে[১] সেটি যদি দৈবাৎ আশার চোখে পড়ে তাহলে নিশ্চয় কেড়ে নিয়ে তাদের কাগজে ছাপিয়ে দেবে এই আমার ভয়। তোমার একটা সুবিধা তুমি ইংরেজিতে কবিতা লেখনা, এই জন্য এই কবির কীর্ত্তির সম্বন্ধে তোমার ঈর্ষা জন্মাবে না। বলা যায় না, তুমি হয়ত এর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি নিয়ে কঠোর সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হবে— আর কেউ যে তোমার ভানুদাদার স্তবগান করবে এতে হয় ত তোমার মনে একটুখানি jaylussie[২] হতে পারে— সেটা হওয়াও nachiralle। আমি দেখেচি তুমি অন্যলোকের ingllish কিছুতেই পছন্দ কর না— বিশেষত তাদের espeling। তাই আমার ভয় হচ্চে তুমি হয়ত এই poate কে kriticisise করতে বস্‌বে, আর হয় ত বল্‌বে ও যা লিখেচে সে একেবারে piore dograil। দেখ রাণু। তুমি যেন বাংলায় poitree লিখতে চেষ্টা কোরো না— তাহলে আমার কবিতার তুমি folt finde করতে আরম্ভ করবে— আমার উপর তোমার আর কিছুই reshpekt থাক্‌বেনা। আমি নিজে কবিতা লিখি বটে কিন্তু আমার স্বভাব খুব humbull— আমি তাই মুক্তকণ্ঠে konfes করচি এই মাদ্রাজি কবির মত কবিতা আমি কিছুতেই লিখ্‌তে পারি নে— আজ অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি[৩] আসচেন— আবার Lord Kinnaird এর মেয়ে আসচে— কোথায় যে কাকে জায়গা দিই ভেবেই পাচ্চি নে। এখন থেকে আমার সময় আর কিছুই থাকবেনা। আজকাল শীতের উত্তর বায়ু বইতে আরম্ভ হয়ে এখানকার আশ্রমতরুর

পত্ররাজি চারিদিকে বিকীর্ণ হচ্চে— কিন্তু আমি নিরুত্তরবায়ুগ্রস্ত হয়ে বসে আছি আমার পত্র আর সহজে বিক্ষিপ্ত হতে চাইবে না।

ধীমু অন্নপূর্ণার আরতি দেখে এখানে ফিরে এসেচে— তোমাদের হাতের আতিথ্য পেয়ে সে বিশ্বেশ্বরকে বলে অন্নপূর্ণার দ্বারেই পূজা সমর্পণ করে এসেচে। এখন সে কেবল তোমাদের গুণগান করচে— বুঝতে পারচি ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করতে তোমাদের ত্রুটি হয় নি— মুখোপাধ্যায়ের মুখ তাই মিষ্ট বাণীতে পূর্ণ।

ভানুদাদা

১০

৬ জানুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমি নদীপথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম[১]— কাল রাত্রে ফিরে এসেচি— আজ সকালে দেখি এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তুমি জান আমি নদী ভালবাসি। কেন বল্‌ব? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি সে ডাঙা ত নড়ে না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে; তার একটা বাণী আছে; তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত চলাচলের ছন্দ মেলে; আমাদের মনে নিরন্তর যে চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে— এই জন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কত কাল নৌকোয় কাটিয়েচি; কোনো জনমানব আমার কাছেও থাকত না, পদ্মার চরের

উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌ত; আর প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল, তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি এটুকু জানতুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তারা রটাত না— এমন কি, আমার জয় পরাজয় নামক গল্পের নায়ক নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তারা লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করত না। যা হোক্, তে হি নো দিবসা গতাঃ। এখন বোলপুরের শুষ্কধূসর মাঠের মধ্যে বসে ইস্কুলমাষ্টারি করচি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কলকোলাহলকে ছাড়িয়ে গেচে। তুমি মনে কোরো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিশে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেচে, তার ঢেউ প্রতি মুহূর্ত্তে উঠ্‌চে, তার বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্চে; সে তার আপনার পথকে কাট্‌চে,[২] দুই তটকে গড়ে তুল্‌চে— সে কোন্ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেচে, দূর থেকে আমরা তার বার্ত্তার আভাস পাই মাত্র। আমি ছোট একটি নাটক লিখ্‌তে আরম্ভ করেচি।[৩] যদি শীঘ্র শেষ করতে পারি তাহলে হয় ত কলকাতায় তার অভিনয় দেব। কাশীতে আমার যাওয়ার সঙ্কল্প ত আমি ত্যাগ করিনি। তবে কিনা আমাদের মত লোক অনাহূত হয়ে কোথাও যেতে পারিনে— এই জন্যে হিন্দু য়ুনিভার্সিটি থেকে যথোপযুক্ত সাদর আমন্ত্রণের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছি,— আমাদের আদর অভ্যর্থনার যা যা দরকার— মাল্য চন্দন ধূপ দীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি— সমস্ত যেন প্রস্তুত থাকে— একটা রসনচৌকি যেন বাজে; আর আহারের ফর্দ্দটা এবারকার চিঠিতে দিলুম না, কেননা পূর্ব্বেকার একটা চিঠিতে সংক্ষেপে দিয়েছিলেম— অর্থাৎ সামান্যমত কালিয়া পোলাও কোপ্তা কোর্ম্মা কাবাব ঘণ্ট চচ্চড়ি ভাজা দই ক্ষীর লুচি সন্দেশ ইত্যাদি তাছাড়া পৌষমাসে পিঠা চাই। ইতি ২২শে পৌষ ১৩২৮

ভানুদাদা

৯১

১৮ জানুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আজ বুধবার— আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণ্‌টায় বসে তোমাকে লিখ্‌চি, মাঘের দুপুর বেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী বীথিকার মধ্যে দিনটা রমণীয় লাগ্‌চে। এই রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না— আমার সমস্ত মনটি, ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখীটির মত চুপ করে রোদ পোয়ায়। আজ উত্তরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হয়ে উঠেচে— শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধরেচে— একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝেমাঝে অকারণে আমার মাথার কাছে এসে গুনগুনিয়ে আবার বেরিয়ে চলে যাচ্চে— একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থ সন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের উপর ল্যাজ তুলে দুড় দুড় করে নেবে যাচ্চে,— এই শীতের মধ্যাহ্নে [য] যেন আজ কারো কিচ্ছু কাজ নেই। আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম— শেষ হয়ে গেছে— তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়— এর নাম পথ।[১] এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই— সে গল্পের কিচ্ছু এতে নেই— সুরমাকে এতে পাবেনা। তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছ— আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিয়োমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে এই ভয় আছে।

৪ঠা মাঘ ১৩২৮

ভানুদাদা

৯২

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

২৪ মাঘ ১৩২৮

রাণু,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি— কেমন আছ একটু লিখে দিয়ো। তুমি বোধ হয় পরীক্ষার পড়ায় খুবই ব্যস্ত আছো। আমি কিছু দিন একটা নাটক লেখা ও সেইটে পড়ে শোনানো নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলুম— সেটা সকলের ভালো লেগেচে, অভিনয় করতে বল্‌চে— কিন্তু রিহার্শাল জিনিষটা পরীক্ষার পড়ার চেয়ে খারাপ। আজ কলকাতায় যাচ্চি, সেখানে বন্ধুদের পড়ে শোনাবো।[১] তোমরা যদি এই সময় এখানে থাক্‌তে তাহলে শুন্‌তে পেতে— তাহলে তোমাকে একটা পার্ট্ দিতুম। সমস্ত বইয়ের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে আছে— তার নামটা হয়ত তোমার পছন্দ হবে না— তার নাম অম্বা। আজকাল আবার আমাকে বিশ্বভারতীর ক্লাস নিতে হচ্চে। Mathew Arnoldএর Essays পড়াতে হবে, আর Keats এর কবিতা। সন্ধ্যার সময় বলাকার কবিতা পড়ে বোঝাতুম, সেটা শেষ হয়ে গেছে— এবার ফিরে এসে য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে কিছু একটা ধরব।[২] মার্চ্চের আরম্ভে একবার হাইদ্রাবাদ, আর তার পরে নেপালে যাবার কথা আছে। তার আগে খবর দিয়ো তুমি কেমন আছ।

ভানুদাদা

৯৩

[ফেব্রুয়ারি ১৯২২]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

শরীর জিনিষটা দাম দিয়ে কিন্‌তে হয় নি বলে সেটা অনাদরের নয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করলেও চলে কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা ঠিকমত চলাটা দেহযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমি একটাও পাস করি নি কিন্তু হৃৎপিণ্ডটাকে পারৎপক্ষে কখনো রুদ্রতালে চল্‌তে দিই নে, তাতে অনেক সুবিধা পাই। তোমাকে পরামর্শ দিই যে আহার যখন করতেই হবে তখন পরিপাকের জন্যে যে সময়টা দিতে হবে সেটাকে সময়ের অপব্যয় বলে মনে করলে ভুল হয়; সংসারে থাকতে গেলে মাথা যখন খাটাতেই হবে তখন মাথাটাকে বিশ্রাম করতে দিতে কৃপণতা করা মূলধন খোওয়াবার পন্থা। দেহটা না হলে নয় অতএব দেহটা যে আছে এ কথা ভুলে যাওয়া একটা বিষম ভুল। আজ তুমি ছুটোছুটি করতে চাচ্চ আর তোমার দেহ জেদ ধরে বসে আছে যে সে দৌড়ে চল্‌বে না। এটা আর কিছুই নয় নন্‌কোঅপারেশন। তুমি অনেককাল তাকে অশ্রদ্ধা করেচ সে এখন তোমাকে বল্‌চে আড়ি। দেহরাজ্য শাসনের পক্ষে এ অবস্থাটা ভাল নয়, এ হচ্চে Civil disobedience।

আমার নাটকটা হাতে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। যাঁরা শুন্‌লেন তাঁরা ভালই বললেন কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল সময় এত অল্প যে এর মধ্যে স্টেজ বেঁধে সাজসজ্জা তৈরি করে অভিনয় হতে পারে না। অতএব আগামী বৎসরে কোনো এক সময়ে অভিনয়ের চেষ্টা করা যাবে, তাহলে তোমার পক্ষে অম্বা সাজা অসম্ভব হবে না। আমাকে সাজতে হবে বৈরাগী।[১]

তোমার ভানুদাদা

৯৪

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তুমি রোজ দুটো করে ডিম খেয়ে একটি মাত্র ক্লাসে পড়চ খবর পেয়েই খুসি হয়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। আমিও ঠিক দুটি করে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও পড়ি নে। সেইটেতেই আমার মুস্কিল বেধেচে, কেন না যদি আমার ক্লাস থাক্‌ত, যদি আমাকে নাম্‌তা মুখস্থ করতে হত তাহলে সব সময়েই আমার কাছে লোক আনাগোনা করতে পারত না— আমি বলতে পারতাম আমার সময় নেই, আমাকে এক্‌জামিন দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে— তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বক্‌টু থেকে কঞ্জিভেরাম থেকে কামস্কাট্‌কা থেকে মক্কা মদিনা মস্কট থেকে যখন তখন নানা লোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে বা পরামর্শ দিতে আসে না— তারা জানে যে মার্চ্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন দিতে হবে। আমি তাই এক একবার মনে করি আমিও ম্যাট্রিকুলেশন দেব— দিলে নিশ্চয়ই ফেল করব— ফেল করার সুবিধে এই যে ফি বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া যায় আর তাহলে ত্রিম্বক্‌টু থেকে নিজ্‌নিনবগরভ থেকে বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে সদাসর্ব্বদা লোক আসাটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। লেডি সাহেব আমার বন্ধু হয়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস করে দিয়েচেন এতে আমি মনে বড় দুঃখ পেয়েচি— একথা সত্য যে, আমি তারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি।[১] কিন্তু সেই স্বর্ণশতদলের পাপ্‌ড়িগুলি হচ্চে bank notes। সাধনায় বিশেষ যে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেচি তা মনেও কোরো না। তোমরা কামনা কোরো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন— কিন্তু কপালক্রমে আমার

পঞ্জিকায় অকাল পড়েচে— শুভলগ্ন আর আসেই না। তাই গান গাচ্চি—

ওগো হেমনলিনী
আমার দুখের কথা কারো কাছে বলিনি।
লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছ শতদলে
সে পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি?

ইতি ১০ ফাল্গুন ১৩২৮

তোমার ভানুদাদা

৯৫

১৪ মার্চ ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু, আমি ভেবেছিলুম প্রয়াগধামে মাথা মুড়োবার কথা চল্‌চে— তোমার অমন চুল সমস্ত পাণ্ডার হাতে কাটে [য] যাবে মনে করে পাণ্ডার উপরে মনে মনে খুব রাগ করে "কুন্তলকৃন্তন কাব্য" নাম দিয়ে একটা মহাকাব্য লিখব ঠিক করেছিলুম— আরম্ভ করেছিলুম:

কর্ত্তরী-চালনে রাণু চূড়া-শোভাকর
কেশজাল ফেলি যবে দিলা ভূমিপরে
অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ কেশধারিণীরে বরি তাঁর পদে
পাঠাইলা পুনরায় পাণ্ডা সন্নিধানে ইত্যাদি—

কিন্তু এমন সময়ে তোমার চিঠি পেয়ে আমার অমিত্রাক্ষরের ধ্যান ভঙ্গ হল। ভালই হল, কেন না আজ রাত্রেই কলকাতায় যাচ্চি[1]— জিনিষপত্র

গোছাতে হবে, সময় কিছুমাত্র নেই। কথা আছে সেখান থেকে নেপালে যাবার, কিন্তু না যাওয়া হতেও পারে[২]— যদি যাই পয়লা বৈশাখের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আশ্রমে ফিরব— অতএব যদি তোমরা পরীক্ষার জয়মাল্য পরে এখানে আস তবে যথাবিধি তোমাদের অভ্যর্থনা করতে পারব। সেই যে ছেলেটি তোমার কাছে এক্‌সেসাইজ করিয়ে নিতে চায় তাকে বরং সঙ্গে করে এনো। আমরা সকলে মিলে তাকে খুব করে এক্‌সেসাইজ করাতে পারব। কিন্তু আশাকে বোলো, আমাকে সে যেন তাড়া না লাগায়— আমি কোনরকম উৎপাত করব না। নেপালে যাবার রেলগাড়ি কাশির কাছ দিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নেই, কেননা তোমার কাছ থেকে এক্‌সেসাইজ বুঝে নেবার জরুরি দরকার তার ঘটে নি— এক্‌সেসাইজ করে করে সে হাঁপিয়ে উঠ্‌চে, থামতে পারলেই বাঁচে। কাল দোল পূর্ণিমা গেল— সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্নায় বসে গান বাজনা হয়ে গেল— খুব বীণা বেজেছিল, নতুন গান অনেক তৈরি হয়েচে— তার সুরগুলো নিশ্চয় তোমার খুব ভাল লাগত।[৩]
ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩২৮

ভানুদাদা

৯৬

৫ এপ্রিল ১৯২২

ওঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়াসু,

তুমি আমাকে চিঠি লিখেচ শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে, অর্থাৎ শিলাইদহে।[১] তুমি কখনো এখানে আস নি, সুতরাং জান্‌তে পারবে

না জায়গাটা কি রকম। বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মত, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌চে,— সেই তপ্ত নিঃশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে উঠ্‌চে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেচে, তাই চারিদিকে এত সরসতা,— আমাদের বাড়ির সামনে সিসু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্ম্মরধ্বনি শুনচি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েৎবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিকন পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্‌ করচে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুক্‌রো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠ্‌তে থাকে তখন সুপুরি গাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোট ছেলের হাত নাড়ার মত চাঁদা মামাকে টী দিয়ে যাবার ইসারা করে ডাক্‌তে থাকে। এখন চৈত্র মাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে,— ছাতের থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি চষা মাঠ দিকপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে' আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে অংশে বাব্‌লা বনের নীচে চাষ পড়ে নি, সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গোরুগুলো চরচে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াগুণ্ঠিত এক একটি পল্লী— সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝক্‌ঝকে পিতলের কলসী নিয়ে দুটি তিনটি করে সার বেঁধে বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চলেচে। আগে পদ্মা কাছে ছিল— এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে— আমার তেতলা ঘরের জান্‌লা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি। অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল— শিলাইদয়ে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত। রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুন্‌তে পেতেম। তার পরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাট্‌ল, কতবার

সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম— এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না; ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল,— সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের একটি নীলতর পাড়ের মত একটি বনরেখা দেখা যায়, সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপ্‌সা বাষ্পলেখাটির মত দেখ্‌তে পাচ্চি জানি ঐ আমার সেই পদ্মা, আজ আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়ে রয়েচে। এই ত মানুষের জীবন, ক্রমাগতই কাছের জিনিষ দূরে চলে যায়, জানা জিনিষ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, আর যে স্রোত বন্যার মত প্রাণমনকে প্লাবিত করেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মত জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেচে, ছ'টা বাজ্‌ল। অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা। দিনাবসানেও বাগানে পাখীর ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখ্‌চিনে। দুই কোকিলে কেবলি জবাব চল্‌চে, কেউ হার মান্‌তে চাচ্চে না— তা ছাড়া আরো অনেক পাখী ডাক্‌চে তাদের ডাক স্পষ্ট করে চেনা যায় না, সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেছে। অন্যদিনের মত বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছগুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখ্‌চি মেঘের পর্দ্দার আড়ালে রাত্রি যাপন করবে। আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে— ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি— এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ করে অষ্টমীর চাঁদ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা করেচে। ঐ চাঁদ হচ্চে আমার জন্মলগ্নের অধিপতি, আর আমার কাব্য প্রভৃতি স্থানের অধিপতি হচ্চে বৃহস্পতি।[২] আমি যখন ছাদে বসি তখন আমার বামে পূর্ব্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা।— এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হয়ে আস্‌চে— ঘরের মধ্যেকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চল্‌চেনা; বাইরে গিয়ে বসবার সময় হল।

তুমি আমার কাছে বড় চিঠি চেয়েছিলে; বড় চিঠিই লিখ্‌লুম। লিখ্‌তে পারলুম তার কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেব, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে— কলকাতায় রওনা হব। সেখানে ট্র্যাম আছে, মোটর আছে, ইলেক্‌ট্রিক পাখা আছে, বরফ আছে, সময় নেই। তার পরে বোলপুরে যাব,— সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেচে, আমবাগানে ফল ধরেচে, সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই। চিঠি জিনিষটি ছোট্ট, মালতী ফুলের মত, কিন্তু সেই চিঠি যে অবকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই অবকাশ মালতী লতারই মত বড়। আমাদের মত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তার থেকে যে সব পত্রোদ্গাম হয় সে ত পোষ্ট্‌ কার্ডের চেয়ে বড় হতে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র ১৩২৮

ভানুদাদা

৯৭

১৪ এপ্রিল ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজ বর্ষারম্ভের দিন। তোমরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের জীবন পবিত্র হোক্, চিত্ত নির্ম্মল হোক, হৃদয় সুন্দর হোক— সংসারে তোমাদের সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত লাভক্ষতি কল্যাণে পরিণত হোক্— তোমাদের চিন্তা বাক্য ও আচরণ কলুষমুক্ত হয়ে ভূমাকে প্রকাশ করুক।

আমি আবার শান্তিনিকেতনে এসেচি। পূর্ণ বেগে কাজ করবার মত জোর পাচ্চি নে— ক্লান্ত আছি। চেষ্টা করি বিশ্রাম করতে, কিন্তু ছিদ্রঘটকে

জলের মধ্যে রাখ্‌লে সে যেমন কেবলি ভরে ওঠে, আমার বিশ্রামের অবকাশকাল তেমনি এখানে কর্ম্মে এবং ভাবনায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভরে উঠ্‌তে থাকে।

পরীক্ষার উদ্বেগ থেকে তোমার মন মুক্ত হয়েচে এবং তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠেচে শুনে খুসি হলুম। এতদিনে আশার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেচে। পরীক্ষা জিনিষটার আদিই বা কি, মধ্যই বা কি, আর অন্তই বা কি, তা আমার জানা হল না। ফাঁকি দিয়ে এবারকার মত বিনা পরীক্ষায় একরকম উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। আর-জন্মে হয়ত তোমাদের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্ম লাভ করে পরীক্ষা দিতে দিতে পাকযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমস্ত জীর্ণ করে দিয়ে কায়াটাকে প্রায় ছায়া করে ফেলব। ইস্কুলে যেতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে এ কথা স্মরণ করলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার যদি জন্মাই তখন হয়ত আমারই নিজের বই পড়ে, মুখস্ত করে, তার নোট নিয়ে আমাকে একজামিন দিতে হবে— এই আশঙ্কায় আজকাল বই লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েচি। ইতি ১ বৈশাখ ১৩২৯

ভানুদাদা

৯৮

১৭ আষাঢ় ১৩২৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, এতদিনে তুমি কাশী পৌঁচেছ। পথের মধ্যে ভিড় পাওনি ত? এখন কেমন আছ লিখো। তোমরা যাবার পর দিন থেকেই বিদ্যালয়ের

কাজ রীতিমত আরম্ভ হয়ে গেছে।[১] রোজই কমিটি মীটিং এবং ক্লাসের কাজও চল্‌চে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মত কলরব করতে করতে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ করে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই। মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হয়ে উঠেচে— কুড়ুল নিয়ে ঠকাঠক গাছ কাটতে লেগে গেছে।[২] তারা আছে ভাল। এ দিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি সুরু হয়েচে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে মেঘগুলোকে কার্পেটের মত গুটিয়ে আকাশের এক পাশে জড় করা হয়েচে, আর বৃষ্টি-স্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তার পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা করে তুলেচে। আমি আমার সাম্‌নের খোলা জানলা দিয়ে ঐ শাল তাল শিরীষ মহুয়া ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্ন [য] ভোজন শেষ করে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আস্‌চে— দীর্ঘ ছুটির দুঃখদিনের পরে কাকগুলো ছেলেদের এঁটো শাল পাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরির পালের মত এসে পড়েচে, বাতাসটি মধুর হয়ে বইচে, জাম গাছের চিকন পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিলমিল করে উঠ্‌চে, পাটল রঙের দুটো গোরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীরমন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে— আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি আর ভাবচি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯ [১৯২২]

ভানুদাদা

৯৯

১৩ জুলাই ১৯২২

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু কলকাতা সহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে— মনে হয় যেন ইঁট কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বাদল নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌঁছয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাতে ছাতে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে— কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পূবে বাতাসে উড়ে পড়া জটা জাল। কথা হচ্চে এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মত কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।[১] কিন্তু যে গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি হয়েচে সে গান কি কলকাতা সহরের হাটে জমবে? এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মত বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধহয় বর্ষা নেমেচে— অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন গুন স্বরে গাইতে পারবে কখনো বা এসরাজে বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পরে আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেচে।[২] কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু তিন দিন হল কলকাতায় এসেচেন। আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ সহরে যেমন মানায়

না দিনু বাবুকেও তাই। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে। ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩২৯

ভানুদাদা

১০০

১৮ জুলাই ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি।[১] বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মত বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্য্যন্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠেছে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার ঘোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেচে— সমস্তটার উপর বাদল সায়াহ্নের [য] ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল— দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যাস্তের একটা ম্লান আভা। এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মত এসে পড়েচে। আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকো নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে,

কিন্তু হয় ত হয়ে উঠ্‌বে না— আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়— খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেকদিন বোলপুরের শুক্‌নো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি— এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালবাসি। আর ভালবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিল্, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়;— ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মত। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না। এই জলের উপর ছাড়া। আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব। মনে করে ভাল লাগ্‌চে না। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩২৯

ভানুদাদা

১০১

১৪ অগাস্ট [?২৫ জুলাই] ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, ঘুরে ফিরে[১] শেষকালে কাল্ এখানে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু স্থিতি খুব বেশি দিন নয়। কেননা, কলকাতায় "বর্ষামঙ্গল" হবে— তারই আয়োজন চল্‌চে। আগামী সোমবারের পরের সোমবারে দিন স্থির হয়েচে।[২] এখানে সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিনু খুব কষে গান শেখাতে লেগে গিয়েচে। তোমরা চলে যাবার পর নানা কাজের ব্যস্ততায় বেশি গান লেখবার সময় পাই নি। তবু গোটাকতক নতুন গান লেখা হয়েচে।[৩] কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলন বলে একটা সভা হয়েচে। এই সভায় কিছু দিন ধরে আমাকে

আসর জমাতে হয়েছিল।[৪] এখন থেকে এই সভার কাজ নিয়ে একবার কলকাতা একবার শান্তিনিকেতন খেয়া পারাপার করতে হবে। এই ব্যাপারে কলকাতার ছেলেদের খুব উৎসাহ দেখ্‌তে পাচ্চি। প্রায় একদিনের মধ্যেই আমাদের পাঁচশো মেম্বার হয়ে গেচে। পাঁচশোর বেশি লোক ধরাবার মত জায়গা আমাদের আর নেই তাই এখন আর বেশি সভ্য নিতে পারব না। এই সভায় সেদিন মুক্তধারা পড়েছিলুম— প্রথমে ওর ভিতরকার ভাবটা সকলকে ভাল করে বুঝিয়ে বলেছিলুম।[৫] তার পরে আমার পড়া শুনে সেদিন সকলের ভাল লেগেছিল। এর পরে একদিন বিসর্জ্জন অভিনয় হবার কথা চল্‌চে। কিন্তু অনবরত এই সমস্ত হাঙ্গামা নিয়ে থাক্‌তে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমাদের এদিকে কয়েকদিন খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে। এত বেশি যে সেদিন হঠাৎ রান্নাঘরের ছাত ভেঙে পড়ে গেচে। ভাগ্যে কারো কিছু হয়নি— কেবল একটা কুকুর চাপা পড়েছিল।[৬] ইতি ২৯ [?৯] শ্রাবণ ১৩২২ [১৩২৯]

ভানুদাদা

১০২

১৯ অগাস্ট ১৯২২

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল। তিন দিন হল।[১] শেষ দিনে আমার গলা গেল ভেঙে। তাতে ক্ষতি হয়নি— কেননা আমার উপর গান গাবার

ভার ছিল না— আমি কেবল মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করব কথা ছিল। প্রথম দুই দিন করেছিলুম। লোকের ভালই লেগেছিল। তৃতীয় দিনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়ে দেখি গলা দিয়ে আওয়াজ আর বেরয় না। কোনো রকম করে সেরে নিয়ে বসে পড়লুম। যাই হোক্ গানের সুখ্যাতি সকলেই করচে। বর্ষামঙ্গল গানের যে পোগ্রাম বাহির হয়েচে সেটা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি।[২] সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিষ পাঠাই। সেটা একখানি বই, তার নাম লিপিকা। এইগুলি একদা কথিকা নামে মাঝে মাঝে সবুজপত্রে বাহির হয়েছিল।[৩] এই বইদুটি তোমার বাবজার নামে পাঠালুম, তুমি অধিকার করে নিয়ো। আজ এই মাত্র দুপুর বেলাকার খাওয়া সেরে এসে বসেচি। এম্‌নি ভয়ানক ঘুম পাচ্চে সে আর কি বলব। লেখাগুলো বেঁকে চুরে যাচ্চে, মাথা ঢুলে ঢুলে পড়চে। আসলে শরীরটা ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েচে। ঠিক করেচি কাল ভোরের গাড়িতেই বোলপুরে পালিয়ে যাব। এবার ছুটির ঠিক আগেই কলকাতায় শারদোৎসব করব।[৪] তার জন্যে কসে রিহার্শাল দিতে হবে। আমি সাজব রাজা। কিন্তু মাঝখানে একবার ধাঁ করে বোম্বাই ঘুরে আস্‌তে হবে। ১লা সেপ্‌টেম্বরে রেলে চড়ব। সেখানে থেকে ফিরে এসে অভিনয় করা যাবে। এবার কাশীর সাহিত্য সম্মেলন আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েচেন, তাই বম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে পেরেচি। আজ এই পর্য্যন্ত

২ ভাদ্র ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৩

৩০ অগাস্ট ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যেই আমার কুটীরের সামনে উত্তর দিকের বারান্দায় বসেচি অমনি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁছল। এর আগে দুই একদিন খুব ঘন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল— আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে ভ্রূকুটি করে বসে আছে; এখনি তারা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ করবে বলে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু আজ প্রথম সকালে মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিল— আমি পূব দিকের বারান্দায় তখন বসেছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তার মুখোমুখি কথা চল্‌ছিল। মন যেদিন তার চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকাল বেলাটিই তার কাছে অপূর্ব্ব হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর ভাণ্ডারের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি সেদিন তার দান মুঠো ভরে দিয়ে থাকেন। পৃথিবী থেকে যাবার সময় এ কথা আমি বলে যেতে পারব যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েচি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বম্বাই যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলকাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা বস্‌বে[১]— আমাকে সাজ্‌তে হবে সন্ন্যাসী [য]। আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই অর্থসংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হোয়ো না, তোমাদের বারাণসীধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেচেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয় নি।

এল্‌মহার্স্ট[২] সাহেব এসেচেন, তাঁর কাছে শুন্‌লুম তুমিও নাকি আসক্তি

বন্ধন ছেদন করে' সন্ন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছ। সেই জন্যেই কি লজিক পড়া সুরু করেছ? কিন্তু লজিক জিনিষটা হচ্চে কাঁটা গাছের বেড়া, তাতে করে' মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্ব্বোধ গোরু বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে, কিন্তু আকাশ থেকে যে সব বর্ষণ হয়, রৌদ্রই বল, বৃষ্টিই বল, তার থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচ যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হলে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাক্‌তেই হার মেনে রাখচি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে; এক দলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চলতে হয়, কেননা তারা পায়ে হেঁটে চলে; আর এক দল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চলে যায়, উনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন; তারা এ পক্ষ ও পক্ষের বিরোধ খণ্ডন করতে করতে নিজের পথ খুঁজে মরে না— তারা এক কালে নিজেরই দুইপক্ষ বিস্তার করে' সেই পথ দিয়ে চলে' যায় যে-পথ হচ্চে রবি-কিরণের পথ। এই প্রসঙ্গে, এই পত্রলেখক কোন্‌ জাতের লোক তার একটু আভাসমাত্র যদি দিই তাহলে তুমি নিশ্চয়ই বলে বস্‌বে তিনি ভারি অহঙ্কারী। যারা লজিকের অহঙ্কার করে' তাল ঠুকে বেড়ায় তারাই নন্‌-লজিক্যালদের ব্যোমপথযাত্রার পক্ষবিধূননের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে মহিমা ত যুক্তির দ্বারা আত্মসমর্থনের অপেক্ষা করে না, সে আপন অচিহ্নিত [য] পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এ সম্বন্ধে তোমার বাবজাকে আমি সাক্ষী মান্‌চি। তিনিই বলুন রবির রথ শূন্যে ওড়ে কি না। রবির অশ্ব পায়ে পায়ে লজিকের ধূলো উড়িয়ে আকাশ অন্ধকার করে দেয় না। আজ এইখানেই ইতি।

১৩ই ভাদ্র ১৩২৯

তোমার ভানুদাদা

১০৪

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

তুমি যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেচ তাতে বুঝতে পারচি লজিক সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে তোমার উপকার হয়েচে। লজিক যেমনি পড়া হয়ে যায় অমনি তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না— যে-কলাপাতায় খাওয়া হয়ে যায় সে কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা হয়েচে সেটা ফেলবার জিনিষ নয়।

আমরা এবার দু'তিন দিন ধরে বর্ষামঙ্গল করেচি। তার ফল কি হয়েচে একবার দেখ। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ। কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুর রয়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে— থেকে থেকে ঝমাঝম্ বৃষ্টি হচ্চে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক্ হয়ে গেছি। এমন কি, শুন্‌তে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জোর তোমার সেই কাশী পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। সেখানেও বৃষ্টি চল্‌চে। বোধ হচ্চে আমরা যখন শারদোৎসব করব তার পর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। এই শারদোৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির করেচে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি[১] এসে একবার করে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়— ছোট ছেলেরা যে রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি— ছোট ছোট ছেলেগুলো পর্য্যন্ত হাসে— এত অপমান, সে আর কি বল্‌ব। যাই হোক যদি তুমি এবার শারদোৎসব দেখতে আস তাহলে বোধ হয় দেখ্‌বে ঠিক ঠিক মুখস্থ বলে যাচ্চি।

তোমার বাবজাকে শারদোৎসব দেখবার জন্যে আসতে বলে দিয়েচি। কিন্তু যেরকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাক্‌লে হয়। ঐ বিভূতি এল এইবার আমার পড়া দিই গে যাই। ১৮ ভাদ্র ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৫

১০ সেপ্টেম্বর ১৯২২

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্য্যন্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেচে— পা ফেলতে গেলে সাবধান হতে হয় পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই এম্‌নি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ কোন্‌দিকে তাকিয়ে চলি তার ঠিক নেই, ওরা যখন তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে' প্রণাম করে। কখন্ তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপ্‌টা করে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চলে যাব এই ভয়ে এই ক'দিন ধুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চলচি। মেয়ের দলও এবার নেহাৎ কম নয়— নুটু[১] থেকে আরম্ভ করে অতি সূক্ষ্ম অতি ক্ষুদ্র লতিকা[২] পর্য্যন্ত। ননীবালা[৩] তাদের দিনরাত সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে হয়রান্ হয়ে পড়চে। কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই— স্বয়ং এণ্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাবের আকালীদের নাকাল[৪] সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে চলে গেচে— লেডি সাহেবরা গেছেন বম্বাই— বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে— সুতরাং আমাকে ঠিকমত শাসনে

রাখ্‌তে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাতত যা' তা' বই পড়তে আরম্ভ করেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি করে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া পড়ে পড়ে ২৭ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কোন লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি, তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ ওটা হচ্চে ছুটির নাটক— ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির; রাজা ছুটি নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েচে পাঠশালা থেকে— তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র ইচ্ছে, "বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।" ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করচে কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ। তোমরা যখন ছুটি পাবে আমরা তখন বম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুটেচি। কিন্তু সে পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হচ্চে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তার পরে বম্বাই হয়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হয়ে মালাবার, মালাবার হয়ে সিংহল, সিংহল হয়ে পুনশ্চ বম্বাই, এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপরে চীৎ হয়ে পড়ব। তার পরেই আবার সুরু হবে সাতই পৌষের পালা— তার পরে আরো কত কি আছে তার ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখ্‌লেই কি ছুটি পাওয়া যায়? আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্ত্তের মধ্যে লাঠিমের মত ঘুরতে লাগলুম— অঙ্ক কষতে ঢিলেমি করলুম। আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান করতে করতে আহার নিদ্রা বন্ধ— ইংরেজি প্রবাদে এইরকম ব্যাপারকেই বলে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা

দিয়েচে— মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্ম্মল, মেঘ রঙীন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ,— এ হেনকালে অতলস্পর্শ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি— কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে— এই কথা স্মরণ করে' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৬

[২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২]

ওঁ

*SUMMER PALACE
MYSORE

কল্যাণীয়াসু,

ঘুরতে ঘুরতে মৈসুর রাজভবনে এসে পৌঁচেছি![১] কলকাতা থেকে গেছি পূণায়,[২] পূণা থেকে এসেছি মৈসূরে, এখান থেকে যাব মাদ্রাজে,[৩] মাদ্রাজ থেকে কৈম্বাটুর,[৪] সেখান থেকে অল্‌বে (ট্রাবাঙ্কারে),[৫] তার পর মাঙ্গালোর,[৬] তার পর সিংহল,[৭] তার পর সিন্ধু প্রদেশে,[৮] তার পর বোম্বাই,[৯] তার পর কোথায় সে আমার ভাগ্য বিধাতা জানেন। শুধু যদি ভ্রমণ হ'ত আমার খারাপ লাগত না, কিন্তু সভায় সভায় বক্তৃতার ঘূর্ণিহাওয়ার বেগে প্রাণপুরুষ উতলা হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয়, পথের মধ্যে সমস্ত বড় বড় স্টেশনে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে প্লাটফর্ম্মের উপরে ভিড় ক'রে বক্তৃতা করিয়েচে— অর্থাৎ ঠিক যে সব জায়গায় আহার করবার জন্যে পনেরো বা পঁচিশ মিনিট সময় দেয় সেইখানেই আমার রসনাকে আহারের পরিবর্ত্তে আলাপে প্রবৃত্ত করিয়েচে। এমনি করে ভূগোলের সঙ্গে ভূয়ো গোল মিশ্রিত

হয়ে আমার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেচে। এখন যে রাজপ্রাসাদে আছি এ অতি সুন্দর জায়গা— সমস্ত বাড়িটা আমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েচে; আমার সঙ্গে আছেন এণ্ড্রুজ, এল্‌ম্‌হর্স্ট্ আর অধ্যাপক লেভি আর তাঁর স্ত্রী। কাল সকালে এখানে এসেচি কাল বিকেলে আমার বক্তৃতা হয়ে গেচে, আজ সকালে নানাবিধ লোকসমাগম হবার উপক্রম হয়েচে, আজ বিকেলেই বেলা দুটোর গাড়িতে হুস্ করে চলে যাব। এখানে আর কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে খুসি হতুম। কাল সকালে মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছব—বিকেল থেকেই বক্তৃতা চক্রের আবর্ত্তন চল্‌তে থাক্‌বে।

তোমার গেল চিঠিতে এল্‌মহর্স্টকে তোমার ভালবাসা জানাতে বলেছিলে, আমি যথাসময়ে যথাবিধি তাঁকে তোমার প্রিয়সম্ভাষণ নিবেদন করেচি, তার থেকে এক কণামাত্রও গোপনে আমার নিজের জন্যে অপহরণ করিনি। এর থেকে আমার আশ্চর্য্য ঔদার্য্যের পরিচয় পাবে। তুমি যাই বল, আমি লোক ভাল।

রথী বৌমার কাশীতে যাবার কথা শুনে এসেছিলুম। মীরাও কিছুদিনের জন্যে সেখানে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের[১০] বাড়িতে গিয়ে থাক্‌বে ঠিক করেছিল,— যাওয়া হল কিনা কোনো খবর পাইনি। খবর পাবার উপায় নেই— আমি যে নিরুদ্দেশ। নবেম্বর মাসের শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে সমস্ত খবর জান্‌তে পাব। অতএব ভেবে দেখ, তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিত হয়ে— এর উত্তর পাবার আশা নেই। তাই আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্চি যে যদিচ লজিকে আমি কাঁচা, তবু আমি মানুষটি ভাল, এমন কি এল্‌ম্‌হর্স্টের চেয়ে মন্দ নই, তা তুমি আমাকে যাই মনে করনা কেন? ইতি তারিখ জানিনে, বোধ হয় বিজয়া দশমী। ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৭

[নভেম্বর ১৯২২]

ওঁ

বোম্বাই

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, রবির দক্ষিণায়নের পালা সমাধা হল, এবার উত্তরায়ণের অভিমুখে চলেচি। পথের মধ্যে দুই একদিনের মত কাশীধামে অবস্থান করব। সেই দুই একদিন হয়ত তোমার লজিকশাস্ত্রচর্চ্চায় কিছু ব্যাঘাত হবে— কারণ আমার মত নির্লজ্জিক মানুষ দুনিয়ায় নেই। আপাতত এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে এখনি সেখানে যেতে হবে— মোটর-সারথি দ্বারের কাছে ক্ষণে ক্ষণে অধীরভাবে শৃঙ্গধ্বনি করচে। যা হোক তোমাকে খবর দিয়ে রাখলুম— আতিথ্যের আয়োজনে যেন ত্রুটি না হয়। ইতি, অগ্রহায়ণের কোনও এক তারিখ, ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৮

২১ ডিসেম্বর ১৯২২

ওঁ

*SANTINIKETAN.
BEERBHUM. BENGAL

রাণু,

আমি কয়দিনের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখানে আমাদের বিশ্বভারতী সম্মিলনী আছে। অনেককাল অনুপস্থিতিবশত সেখানে

অনেকদিন আমার বক্তৃতাদি না হওয়াতে সভ্যেরা দুঃখিত ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ইংরেজ কবি ব্রাউনিঙের একটা নাটক তাদের শুনিয়ে এলুম।[১] আমি বইখানা ধরে আগাগোড়া বাংলায় তর্জ্জমা করে বলে গিয়েছিলুম। কাজটা নিতান্ত সোজা নয়, বিশেষত ব্রাউনিঙের মত কবির দুর্বোধ ও জটিল লেখা। শ্রোতাদের ভাল লেগেছিল। আমার কাজ এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েচে— আগে আমার কাজের ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনেই বদ্ধ ছিল এখন শান্তিনিকেতন আর কলকাতার মাঝখানে প্রায়ই আমাকে খেয়া দিতে হয়। তার পরে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের বাইরেও দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াবার ডাক পড়ে।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে দেখি তোমার চিঠি আমার ডেস্কের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তা ছাড়া আরো অনেক চিঠি এসে জমেচে— কোনোটা এদেশী কোনোটা বিদেশী। অনেক কাজ আছে যা শেষ করতে পারলেই তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্তু চিঠি জিনিসটা আজ শেষ করলেই আবার কাল এসে জমে— চিরজীবন এই রকমই চল্‌বে। কাল আসচে ৭ই পৌষ। চারদিকে ব্যস্ততার অন্ত নেই। এবার দুদিন ধরে মেলা চল্‌বে— যাত্রা, কীর্ত্তন, বায়োস্কোপ, আতসবাজি, কৃষিপ্রদর্শনী, শিল্পপ্রদর্শনী ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাপার আছে।[২] অতিথি সমাগম কম হবে না। এই নিয়ে দুদিন আমাকে বিষম ব্যস্ত থাকতে হবে। কদিন ধরে শীত পড়েচে খুব। হি হি করে উত্তর পশ্চিম থেকে হাওয়া দিচ্চে, আর আমলকির পাতাগুলো খসে খসে উড়ে উড়ে পড়চে। তোমাদের ওখানে নিশ্চয়ই এর চেয়ে অনেক বেশি শীত।— আচ্ছা রাণু একবার য়ুরোপে গিয়ে তোমার পড়ে শুনে আস্‌তে ইচ্ছে করে? তোমার যে রকম বুদ্ধি, যে রকম শেখবার শক্তি ও পড়বার নিষ্ঠা তাতে সেখান থেকে তুমি অনেক উন্নতি লাভ করতে পার। আমার অনেকবার মনে হয়েচে তোমাকে ফ্রান্সে পাঠালে তুমি নানা বিদ্যায় বিদুষী হয়ে

আসবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তাহলে চেষ্টা করে দেখি। ইতি ৬ই পৌষ ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৯

[২৫ ডিসেম্বর ১৯২২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

সে কি কথা রাণু? তোমার চিঠি পেয়েই ত আমি তখনি তার উত্তর দিয়েছিলুম, কেন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছল না তা ত বলতে পারি নে। আশা করি এ চিঠি তুমি পাবে। আমি কিছুকাল থেকে বিষম ব্যস্ত আছি। প্রথমত ৭ই পৌষের জন্যে কিছুদিন ধরে নানা লোকের ভিড়, নানা সভায় নানা বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপারে সমস্ত দিন আমার একটুমাত্র সময় ছিল না— তার উপরে এই সময়ে আমাদের বিশ্বভারতীর সেশন সুরু হচ্চে বলে নানারকমের হাঙ্গামের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। ৭ই পৌষ হয়ে গেলে আশা লীলাবতীকে নিয়ে তোমার বাবজা এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত তাদের ভাল করে দেখাই হয় নি। তার কারণ আমি অতিথি অভ্যাগতের আবর্ত্তের মধ্যে কেবলি পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্চি। তোমাকে এইটুকু চিঠি লিখ্‌তে আমাকে দশবার থাম্‌তে হয়েচে। শুনেচি মেয়েদের বোর্ডিঙের মধ্যে কোন একজায়গায় আশা স্থান পেয়েচে— আজ গিয়ে একবার দেখে আস্‌ব। তাদের রীতিমত পড়াশুনো আরম্ভ হবে জানুয়ারির আরম্ভ থেকে। এ কয়দিন ছুটি যাবে। তোমার বাবজা কাল গেছেন কলকাতায় তাঁর কাজে। আবার তিরিশ তারিখে তিনি ফিরে এসে

একদিন থেকেই স্বস্থানে ফিরে যাবেন। আজকাল আমার এখানে অনেক বিদেশীর আমদানি হয়েচে, শীঘ্রই আরো অনেকে আসবেন। আমাদের দিশী শিক্ষক যত, বিদেশী শিক্ষক তার প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে দাঁড়িয়েচে। নানা দেশের গুণী জ্ঞানী লোক এখানে আকৃষ্ট হয়ে আস্‌চে এতে আমার মনে খুব আনন্দ হয়। আসচে বুধবারে প্যালেস্টাইন থেকে একজন মেয়ে আস্‌বেন[১] তিনি জর্ম্মান, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা খুব ভাল জানেন। তিনি টলস্‌টয়ের মতে দীক্ষিত। মিস্ ক্রাম্‌রিশ[২] গেচে মাদ্রাজ অঞ্চলে, সেখানে দুই একমাস ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবে। এখানে শীত খুব পড়েচে, উত্তর এবং পশ্চিম থেকে হু হু করে হাওয়া বইচে আর আমাদের শালবনের পাতাগুলো হি হি করে কেঁপে উঠ্‌চে। আমি এই হাওয়ার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঘরের দরজা বন্ধ করে লিখ্‌চি। আজকাল এ বাড়িতে আমি একলাই থাকি, এণ্ড্রুজ এখন অন্য প্রদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। একলা থাকি বটে কিন্তু অতিথির ভিড় লেগেই আছে তার উপরে দেশ বিদেশের চিঠির বোঝা জম্‌চে আর আমি ক্রমাগতই তার জবাব লিখ্‌চি, বিশ্রামের অবকাশ একটুও পাই নে। ঐ বাজ্‌ল ঘণ্টা, এখনি একটা কমিটি বস্‌বে, আমি হচ্চি তার সভাপতি, সুতরাং আমার আর পালাবার জো নেই। প্রায় দুটো বাজ্‌ল। এইমাত্র খেয়ে উঠেচি— তার পরে বোধ হয় বিকেলে চা খাওয়া পর্য্যন্ত মীটিং চল্‌বে। পশুদিন এখানে বৈকুণ্ঠের খাতার অভিনয় হয়েছিল। দিনু সেজেছিল বৈকুণ্ঠ, বিশি[৩] সেজেছিল তিনকড়ি, বিভূতি সেজেছিল অবিনাশ, সবসুদ্ধ খুব যে ভাল [হয়েছিল] তা বলতে পারি নে। সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষস থেকে একটা অঙ্ক অভি[নীত হয়েছিল]।[৪] কলকাতায় আমাকে [নাটকগুলো] অভিনয় করবার জন্যে [বলা হচ্চে, কিন্তু] আমি যে তাতে উৎ[সাহ বোধ] করচি তা নয়। [১০ পৌষ ১৩২৯]

ভানুদাদা

১১০

[২৮ ডিসেম্বর ১৯২২]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

আজ সকালে শ্রীমতীকে নিয়ে লীলাবতী আমার এখানে এসেছিল। তোমার এই বন্ধুকে আমার বেশ ভালই লাগ্‌ল। ধ্রুবর[১] অসুখ বেড়ে উঠেচে টেলিগ্রাম এসেচে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েচে— হয়ত আজকালের মধ্যেই সে চলে যাবে। লীলাবতী আমাকে কিছু একটা কবিতা পড়ে শোনাতে বল্‌লে। আমি তাকে ইংরেজি গীতাঞ্জলি থেকে দুই একটা পড়ে শোনালুম। ওর ছোট বোনও ওর সঙ্গে আছে। তোমাদের ক্লাসের যে সুন্দর ছেলেটি গায়ে আতর মেখে বেড়ায় একবার ভেবেছিলুম তার কথা ওকে জিজ্ঞাসা করব— কিন্তু ভয় হল পাছে তুমি রাগ কর।

আমাদের এখানে এখনো খুব তীব্র শীতের হাওয়া বইচে— গায়ে দুটো তিনটে কাপড় পরেও হাড়ের মধ্যে শীত শীত করতে থাকে। আশা বল্‌লে কাশীর শীতের চেয়ে এখানে যে শীত কম তা নয়। আশা আজকাল পূরোপূরি বোর্ডিঙে আশ্রয় নিয়েচে— কি রকম লাগচে বুঝতে পারি নে— জিজ্ঞাসা করলে ত বলে বেশ ভাল আছি। খাওয়া দাওয়া ঠিকমত পরিমাণে হচ্চে কিনা বল্‌তে পারিনে। ওদের বোর্ডিঙে একটি নতুন ইহুদি মেয়ে[২] এসেচেন। তিনি লোকটি খুব ভালো— নানা বিষয় জানা আছে। নানা দেশেবিদেশে ঘুরেচেন। সম্প্রতি আসচেন প্যালেস্টাইন্‌ থেকে। একদল য়িহুদি তাদের পিতামহদের বাসভূমিতে ফিরে যেতে চাচ্চে— সেখানে থেকে তাদের নিজের সাহিত্য স্বাজাত্য শিল্প আত্মশক্তি জাগিয়ে তুল্‌বে। এই মেয়েটি সেই দলের। আমার লেখা প্রভৃতি পড়ে ভারতবর্ষে আসবার জন্যে উৎসুক হয়েছিল। পাসপোর্ট্‌ নিয়ে বিস্তর গোলমাল বেধেছিল। এখানে এসেই

এখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েচে। তা ছাড়া একজন রাশিয়ান অধ্যাপক[৩] আমাদের এখানকার কাজে যোগ দিয়েচেন। আজকাল রাশিয়ায় অনেক পণ্ডিত অনেক গুণী অন্নাভাবে মারা যাচ্চে, তাদের কথা বোধ হয় পূর্ব্বেই শুনেচ— ইনি সেই উপবাসীদের দলে। সোভিয়েট গবর্মেণ্টের তাড়া খেয়ে বম্বাই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বহুকষ্টে দিন চলছিল। এই লোকটি অনেকদিন পারস্য দেশে ছিলেন, পারসিক ভাষায় খুব পণ্ডিত। এখানে ইনি সেই ভাষা শেখাবার ভার নিয়েচেন। সম্প্রতি একজন ইংরেজও[৪] এসে জুটেচে— তার হাতে বিশ্বভারতীর বড় ছাত্রদের ইংরেজি সাহিত্য শেখাবার ভার দিয়েচি। এরা সব আপনি এসে জুটেচে। তুমি এবারে যখন এসে দেখ্‌বে সব তোমার নতুন ঠেক্‌বে। কেবল আমি আছি পুরোণো মানুষ, আমার পুরোনো [য] সেই কুটীরটির কোণের ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি। বেলা প্রায় আড়াইটা হয়— এইবার কমিটির সব লোক আসবে— অতএব ইতি ১৩ পৌষ ১৩২৯

ভানুদাদা

১১১
১৩ জানুয়ারি ১৯২৩

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

রাণু— কলকাতায় তোমার চিঠি পেলুম। কিছুদিন হল এসেচি। প্রথমে ছিলুম আলিপুরে, পশুশালার পাশেই[১] সেখানে অদূরে ছিলেন ভারত-রাজপ্রতিনিধি বড়লাটবাহাদুর[২]। এই সমস্ত পশুসিংহ ও নরসিংহদের পাড়ায় বেশিদিন টিকতে পারলুম না— পশুদিন থেকে এখানে আছি। শরীর যে

খুব ভাল আছে তা বলতে পারব না, অথচ এত বেশি খারাপ হয় নি যাতে অচল হয়ে ওঠে— এই কারণে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত করতেই হয়, তার পরে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতিরিক্ত যে সব কাজের ভিড় চারদিকে চেপে ধরে তাদের দূরে ঠেকিয়ে রাখবার উপযুক্ত কোনো ছুতো খুঁজে পাইনে। এই পর্য্যন্ত তোমাকে লিখেছি হেনকালে চীন দেশ থেকে একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বল্লেন, "চীনদেশে আপনাকে যেতেই হবে, সেখানকার যুবকেরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করচে।" অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই তিনমাস উত্তর চীন এবং দক্ষিণ চীন ভ্রমণ করবার জন্যে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করে তিনি চলে গেলেন। তারপরে এলেন Cinema কোম্পানির এক কর্ম্মচারী। আমার "রাজর্ষি" ওরা সিনেমাতে প্রকাশ করবার উদ্যোগ করেচে।° সেই উপলক্ষ্যে আমারও একখানা সিনেমা ছবি নিতে চায়। অনেক বক্তৃতার পর সে যখন চলে গেল— তখন এলেন এক ভদ্রলোক, তিনি ভারত মন্ত্রিসভায় সদস্যরূপে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, আমার কাছে ভোট দাবী করেন। তিনি যেতে না যেতে All India Musical Conference-এর উদ্যোগকর্ত্তারা এসে উপস্থিত। এই সভার কার্য্যপ্রণালী কি রকম হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আমার পরামর্শ নেওয়া তাঁদের অভিপ্রায়। সুদীর্ঘকাল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমার আহার প্রস্তুত শুনে তাঁরা চলে গেলেন। সেই আহারকালেও একজন আর্টিস্ট ভদ্রলোক বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য উপকরণ কার্য্যপ্রণালী তার আয়ব্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিলেন। আমার আহার শেষ হল তবু তাঁর প্রশ্ন হলনা। রাত্রি সাড়ে নটা পর্য্যন্ত বকাবকির পর তিনি বিদায় হলেন। আজ সকালে আবার তোমার চিঠি আরম্ভ করলুম। দুই তিন দিন থেকে এখানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কাল রাত্তিরে টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি হয়েচে। আজ সকালেও মেঘেতে কুয়াশাতে অন্ধকার, আকাশটা যেন কম্বলমুড়ি দিয়ে আছে। শীতের দিনে এ রকম বাদলা একটুও ভাল লাগেনা।

কাল আমি শান্তিনিকেতনে ফিরব। পশুদিন আমাদের গবর্নর লর্ড লিটন্* আমাদের বিদ্যালয় এবং সুরুল কৃষিক্ষেত্র দেখ্‌তে আস্‌বেন। সে একটা বিষম হাঙ্গামা। সুরুলে তিনি মধ্যাহ্নভোজন [য] করবেন, শান্তিনিকেতনে খাবেন চা। এই ব্যাপারে দুটো দিন যাবে। তার পরে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে টাকা তোলবার জন্যে কিছু একটা অভিনয় করবার প্রস্তাব হচ্চে।* শরীর ক্লান্ত, কিন্তু এ কাজটা ঠেলে রাখবার জো নেই, করতেই হবে।

তোমার বন্ধু লীলাবতীর বুঝি শান্তিনিকেতনের মানুষজন, শিক্ষাপ্রণালী কিছুই ভাল লাগে নি। তিনি কিছু দেখেচেন বলে ত বোধ হল না— সে সময়ে ত মেলার ব্যাপারে বিদ্যালয় বন্ধই ছিল। খোলা থাকলেও এখানকার উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিধি বোঝবার মত তাঁর বয়স ও শিক্ষা হয় নি।

আশাদের ক্লাস এখন আরম্ভ হয়ে গেছে।* কি রকম চল্‌চে ফিরে গিয়ে দেখ্‌তে পাব। সে বেচারার বোধ হয় খুব মন কেমন করে। বোর্ডিঙে তার খাওয়া দাওয়া কি রকম চল্‌চে তাও ত জানি নে। কোন অসুবিধা হলে সে যে আমাকে কিছু বল্‌বে এমন সম্ভাবনা নেই। তাই আমি তার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকি। ২৯ পৌষ ১৩২৯

ভানুদাদা

১১২

[জানুয়ারি ১৯২০]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু তোমার চিঠির ভাবে বোধ হল যে আমার চিঠি পাবার আগেই তুমি আমাকে লিখেচ। আমি ত সেদিন তোমাকে লিখেচি।

হঠাৎ কাল থেকে আমি কিছু অসুস্থ হয়ে পড়েচি। বোধ হয় যাকে আজকাল ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেচে—

উপরের ঐটুকু লিখে তার পরে শয্যাশায়ী হয়ে কাটিয়েচি। কাল এইভাবে দিন ও রাত কাটিয়ে আজ মধ্যাহ্নে [য] তোমার এ চিঠি শেষ করতে বসেচি।

কাল রাতে আশাদের শয়নশালায় এক চোর ঢুকে দুটো বাক্স চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা চোরকে দেখ্‌তে পেলে কিন্তু চোর তাতে বিচলিত হল না— ধীরে ধীরে বাক্স তুলে নিয়ে মৃদুমন্দগমনে চলে গেল। তার পর থেকে ওরা সকলেই খুব ভীত অবস্থায় আছে। ওরা যেরকম ঔদার্য্যের সঙ্গে চোরকে তার স্বকর্ত্তব্য সাধন করতে দিলে তাতে পরম সাধুব্যক্তিরও চুরি করতে উৎসাহ হতে পারে।

এখানে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে আবার ঠাণ্ডা পড়েচে। আজ সকালে কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন ছিল। আমি নিজে যেমন অসুস্থ তেমনি আমার মনে হচ্চে বাইরের আকাশটারও যেন অসুখ করেচে সে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। তোমাদের ওখানেও ত শুন্‌চি বৃষ্টিবাদলা এক চোট হয়ে গেছে। আজ আর বেশি নয় [মাঘ ১৩২৯]

ভানুদাদা

১১৩

১০ জানুয়ারি ১৯২৩

ঔঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু অনেকদিন আগে তোমাকে একখানি চিঠি লিখেছিলুম। তার উত্তর পাইনি। সম্প্রতি আশার কাছে শুন্‌লুম মাঝে অশোকের[১] খুব অসুখ করেছিল,

তার থেকে মনে হচ্চে তুমি হয় ত সেই উদ্বেগে লেখবার সময় পাওনি। আমারও আজকাল কাজের উৎপাত আগেকার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে নইলে তোমার চিঠি না পেলেও একখানা লিখে দিতুম। আশা খুব পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে রয়েচে তার পাঠ্যবিষয়ের আর অন্ত নেই। শুধু তাই নয়, বোর্ডিঙের যে কোন মেয়ে যে কোন বিষয়ে পিছিয়ে আছে আশাকে ধরলেই আশা তাকে পড়াবার ভার নেয়। [illegible] অসুখের কথা শুনে সেদিন বেচারা ভারি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

আমি ত আর কিছুদিন পরেই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। ক্ষিতিমোহনবাবু আমার সহযাত্রী। সাহেবকে পাঠিয়ে দিচ্চি বোম্বাই, সুতরাং আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন সমর্থ লোকের দরকার। ক্ষিতিবাবু খুব সমর্থ, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেও বেশ লাগে। কাশী লক্ষ্ণৌ হয়ে বোম্বাইয়ের পথ দিয়ে আমাকে করাচি যেতে হবে। সে কথা স্মরণ করলে এখন থেকেই মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে— আর ঘোরাঘুরি ভাল লাগেনা— বিশ্রাম করবার সুযোগ পেলে বাঁচি। তুমি ভাল আছ ত? ইতি ২৭ মাঘ ১৩২৯

ভানুদাদা

১১৪

[মার্চ ১৯২৩]

ওঁ

Mount Petit
Pedder Road
Bombay

রাণু তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। আমি মনেও করিনি আমার এই ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পারবে। কেননা তুমি ত আমার

ঠিকানা জান্‌তে না। যে ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখেচ সে সম্পূর্ণ তোমার বানানো। তবু যে যথাসময়ে চিঠি আমার কাছে পৌঁছল তার কারণ তোমার ভানুদাদা কোনো পোষ্ট আপিসের কাছে লুকোনো নেই। আমাকে কেউ কেউ শুধু ইণ্ডিয়া ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখেচে— তাও আমার হাতে এসে পৌঁচেচে। তোমরা ত সবাই এক রাস্তা দিয়ে এক দিকে চলে গেলে, আমি আর ক্ষিতিবাবু আর এক রাস্তা দিয়ে আর এক দিকে চলে গেলুম।[১] সেদিন আর তার পরের সমস্ত দিন রাস্তায় কেটে গেল। কি আর করব, পথের মধ্যে তিন চারটে গান তৈরি করে ফেল্লুম।[২] তুমি শুনলে হয় ত তোমার ভালো লাগ্‌ত। কিন্তু জানই ত আমার কি সে রকম গলা আছে যে তোমাকে গান শুনিয়ে খুসি করতে পারি। কিন্তু গলা না থাক্‌ সুর ত আছে— তাই মনে মনে অহঙ্কার করি যে আমি সুরলোকের কবি। সুরগুলো মাঝে মাঝে উতলা হয়ে আমার মাথার মধ্যে মৌমাছির ঝাঁকের মত পাখা তুলে গুন্‌গুনিয়ে বেড়ায়। রেলের রাস্তায় সেই গুঞ্জনে আমার মন ভরে গিয়েছিল। ক্ষিতিমোহন আমার কাণ্ড দেখে অবাক্‌— ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, ঝাঁকানিতে, গরমে, অনিদ্রায়, অনিয়মে দল পাকিয়ে যতই উৎপাত করতে থাক্‌ল, আমার গান থাম্‌তে চায় না— কোনোটা ভৈরবী, কোনোটা পূরবী, কোনোটা বেহাগ, কোনোটা বাউলের সুর। এবার যখন আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে যদি সুর মনে থাকে তাহলে তোমাকে শোনাব। যদি পছন্দ না হয় তাহলে সেটা প্রকাশ কোরো না— বোলো, মন্দ হয় নি। আমাকে এখান থেকে আবার সিন্ধুপ্রদেশে যেতে হবে।[৩] ঘুরে ঘুরে দেহ মন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে— আর ভাল লাগ্‌চেনা। যদি ইতিমধ্যে তোমাকে চিঠি লেখায় পেয়ে বসে তাহলে ও পাতের বোম্বাই ঠিকানায় লিখো— বোলো যে ভানুদাদার কথা মনে করে' তোমার মন বেশ খুসি হয়ে আছে। এখানকার কাজ সেরে আমার ফিরতে বোধ হয় চৈত্রমাস পেরিয়ে যাবে।

ভানুদাদা

১১৫

১ অগাস্ট ১৯২৩[১]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, কি করে যথাসময়ে তোমাকে এনে উপস্থিত করা যেতে পারে সেই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েচি। ক্ষিতিমোহনবাবু এসেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তিনি বল্লেন তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানে উপস্থিত এমন কেউ নেই যাঁর হাতে তোমার ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। তোমার বাবজাকে আজ টেলিগ্রাফ করা গেছে, দেখি কি উত্তর আসে। যদি ওখান থেকে আনবার লোক কেউ না থাকে তাহলে এণ্ড্রুজকে পাঠিয়ে দেব স্থির করেচি। এণ্ড্রুজের সঙ্গে তোমার ত ঝগড়া মিটে গেছে। বোধ হয় এই পথটুকু কোনোরকম বনিবনাও করে চলে আসতে পার। পথে যদি তোমার গাড়িতে সেই মোটা অসভ্য মেয়ের সঙ্গ আবার পাও তাহলে এণ্ড্রুজের গাড়িতে এসে চড়ে বোসো। অন্তত ১৯শে তারিখে তোমার এখানে এসে পৌঁছন দরকার। আমি ত একরকম সব ভুলে টুলে বসে আছি। ৭টা দিন ভাল করে রিহার্সাল না দিতে পারলে জিনিষটা মনের মত হবে না। দর্শকের দল এবার খুব ব্যগ্র হয়ে আছে— মনে করচে ভারি একটা কাণ্ড হবে। সেইজন্যে অভিনয়টাকে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ করে তোলবার ইচ্ছে আছে। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করে তোমাকে যে লুঠ করে[২] আনা যাচ্চে সেটাতে আমাদের মন একটুও প্রসন্ন নেই— কিন্তু এখন আর উপায় দেখি নে। তোমাদের অধ্যক্ষ ধ্রুবর[৩] কাছ থেকে যখন ছুটি আদায় করে নিয়েচ তখন আশা করচি ১৯শে তারিখে তোমার আসবার কোনো বাধা নেই। ঝুলন এবং মহরমের ছুটি[৪] কি তোমাদের নেই? তাহলে অভিনয়ের সময়ের অনেকটা সেই ছুটির মধ্যে

পড়বে— সুতরাং তোমার বাবজা হয় ত স্বয়ং তোমাকে সঙ্গে আন্‌তে পারেন। যাহোক্ শীঘ্রই ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তাহলে অলমতি বিস্তরেন। ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৬

৮ অগাস্ট ১৯২৩

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

সঙ্গীত চলে গিয়েচে যন্ত্র পড়ে রয়েচে। রথীকে বল্লুম এসরাজ সুবীরের[১] হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে। রথী কোনো জবাব করলে না। বোধ হয় তার ভাবখানা এই যে, যন্ত্রটা এইখানে বন্ধক রইল যতক্ষণ না সঙ্গীত স্বয়ং এসে ওটা খালাস করে না নিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে বোধ হয় সে নিজে তোমাকে লিখ্‌বে।— কিছুকাল ঘোর বাদ্‌লা করেছিল আজ কেটে গিয়ে রোদ্দুর উঠেচে। সমস্ত তেতালা আজকাল ফাঁকা। বৌমা পাশের ঘরে শোন্ বটে কিন্তু সমস্ত দিন তাঁরা নীচের ঘরে আড্ডা করেন। আমি একলা আমার সেই তাকিয়া রাজ্যে কল্পনার মেঘলোকে বিহার করি। যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন দুপুর বেলা এই তেতালার ঘরে দক্ষিণের দরজা খুলে দিয়ে একটা বাঁকা কৌচের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় নিজের মনটাকে নিয়ে কি খেলা করতুম জানিনে। দূর আকাশ থেকে চীলের ডাক শোনা যেত, আর পাশের গলি থেকে চুড়িওয়ালা সুর করে হাঁক দিত, শুনে মনটা উতলা হয়ে উঠ্‌ত। আজ সেই আমার ছেলেবেলার নিঃসঙ্গ

মধ্যাহ্নগুলোর [য] কথা মনে পড়চে।[২] তখন গান লেখবার মত শক্তি থাক্‌লে বড় বয়সের মতই লিখ্‌তুম "হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন মনে।" বাঁশির ফাঁক গানের সুরে বেজে ওঠে, আমার জীবনের ফাঁকগুলো কত গান দিয়েই যে বসে বসে ভরিয়েচি তার কি ঠিক আছে! কত গান কত সুর দিয়ে। এক এক সময়ে মনে হয় সুর সব ফুরিয়ে গেল বুঝি। তার পরে আবার হঠাৎ দেখি উৎস এখনো শূন্য হয়ে যায় নি। আবার কোথা থেকে সুর এসে জমা হয়, আবার দিনুর ভাণ্ডারে জমা করবার জন্যে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়।

তোমাকে অভিনয়ে পাঠাবার জন্যে তোমার বাব্‌জাকে লিখেচি। তুমি না এলে মুস্কিলে পড়তে হবে। মঞ্জুকে[৩] তৈরি করবার জন্যে গগনকে[৪] বলেছিলুম কিন্তু সে হয়ে উঠ্‌ল না। তুমি ত জান, তোমাকে ছাড়া গগনের আর কাউকে পছন্দ হয় না। সুবীরের বাবা আজ কাশীতে যাচ্চেন। তাঁর সঙ্গে যদি তোমাকে পাঠানো সম্ভব হয় তাহলে কোনো হাঙ্গাম থাকে না। নইলে আবার হপ্তাখানেক পরেই তোমাকে আনবার জন্যে আর কাউকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কেননা আবার কিছুদিন রিহার্সাল দিতে হবে। তোমার জন্যে হয়ত ভাবনা নেই, তোমার নিশ্চয় সব মনে আছে। কিন্তু তোমার ভানুদাদা যে কি রকম মেধাবী সে তোমার অগোচর নেই। আবার পাঁচ ছয় দিন ভালো করে রিহার্সাল না দিলে হয় ত বেশ বড় রকমের গলদ করে বস্‌ব।

আমার শরীর যে খুব ভালো আছে তা নয়। এখনো কিছুতে দুর্ব্বলতা যাচ্চে না— সেই জন্যে মনের মধ্যে কেমন একটা অবসাদ লেগে আছে।

আশাদিদির আর শান্তির শরীর ভাল নেই শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। ইতি
২৩ শ্রাবণ ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৭
৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তুমি জানতে চাও আমি কোথায় বসে লিখ্‌চি। যেখানে তুমি আমাকে দেখে গিয়েছিলে সেখানে নয়। সেই যেখানে আমার পাকা বাসস্থান, সেখানে কাল ফিরে এসেচি। আমার এই লেখবার ঘর তোমার পরিচিত কিন্তু তার আসবাবপত্রের বদল হয়ে গেচে। আমার সেই স্লেট বাঁধানো লেখবার টেবিলটা দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ থেকে সরে এসে উত্তর পশ্চিম কোণ আশ্রয় করেচে। সেই দক্ষিণ পূর্ব্ব দেয়ালের গায়ে মস্ত একটা তক্তপোষ পড়েচে। আমার ডানদিকের খোলা দরজা দিয়ে উত্তর দিকের মাঠ দেখ্‌তে পাচ্চি, ধূ ধূ করচে। আজ শরতের আগমনবার্ত্তা বহন করে’ প্রথম উত্তরের হাওয়া দিয়েচে। দুপুর বেলাকার রৌদ্রে সে হাওয়া অল্প একটু তেতে উঠেচে। দুপুর বেলাকার আহারস্বরূপ একটি রুটি তরকারী সহযোগে সেবা করে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। অল্প অল্প ঘুম পাচ্চে, কেননা সেই ক্লান্তি এখনো আমাকে ছাড়ে নি। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই— সমুখের রাস্তা দিয়ে ইঁট বোঝাই করা গোরুর গাড়ি ক্যাঁ কোঁ করতে করতে মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে চলেচে। আর দক্ষিণের বারান্দায় কয়েকজন ছুতোর মিস্ত্রি ঠুক্‌ঠাক্‌ খস্‌খস্‌ শব্দে এ বাড়ির জালনা [য] দরজার সংস্কার সাধন করতে লেগেচে। আকাশে বর্ষার মেঘের পর্দ্দা শতছিন্ন, তারি ফাঁক দিয়ে শরতের নবীন চেহারা আজ দেখা দিয়েছে। পূজোর ছুটির আভাস আজ আকাশে বাতাসে রোদের সোনায় সোনালি ও শিউলি ফুলের মৃদু গন্ধে আবিষ্ট হয়ে উঠেচে।

প্রবীণ ও বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত বোস তোমার অভিনয়ের জয়গান ক’রে ইংরেজি দৈনিক ডেলি নিউসে একটা পত্র লিখেচে।[১] পড়ে দেখো—

বাবজাকে দেখিয়ো, তিনি খুশি হবেন। প্রশংসার ছলে আমার কি রকম নিন্দা করেচে, তাও দেখো। বলেচে আমার অভিনয় কেউ যেন নকল করবার চেষ্টা না করে। অর্থাৎ ওটা খারাপ। অথচ মজা এই, যে-কয়জনে অভিনয় করেচে সকলে আমারই অভিনয়ের নকল করেচে— আমিই ত তাদের দেখিয়ে দিয়েচি— দিনুর রঘুপতি আমারই রঘুপতি অভিনয়ের প্রায় অবিকল নকল।

বেনোয়াকে নিয়ে এখনো আমার নন্দিনীর তর্জ্জমা করে চলেচি।[২] কাল সকালে বোধহয় শেষ হয়ে যাবে। তার পরে চীনযাত্রার জন্যে বক্তৃতা লিখতে বসতে হবে।— এন্ড্রুজের সঙ্গে ঝগড়া হয় নি ত? রাস্তায় কি রকম জমেছিল? খেতে দিয়েছিল ত? ইতি ২০ ভাদ্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৮

১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

ইংলিশম্যানে তোমার যে স্তবগান[১] তোমার কোনো ভক্ত করেচেন, তুমি ভাবচ সে আমি যথাসময়ে পড়ি নি। পড়েচি, এবং তোমাকে পাঠাব কিনা সে কথাও মনে মনে আলোচনা করেচি। কিন্তু যে হেতু নিশ্চয় জানতুম সেই লেখাটিও তোমার নয়নগোচর করবার জন্যে আগ্রহবান যুবকের অভাব হবেনা সেই জন্যে তোমার উপর ঐ পত্রাংশবৃষ্টি আর

করলুম না। কাগজে যা বেরিয়েচে তা ত বেরিয়েচে তার উপরে লোকমুখে বিসর্জ্জনের অভিনয় আলোচনা এখনো চল্‌চে। অধিকাংশ লোকের মত এই যে, এমন কাণ্ড তারা আর কখনো দেখে নি। আরো দশদিন যদি হত তাহলে দশদিনই ঘর ভরে' যেত। অনেক লোকেই জায়গা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। প্রশান্ত কয়েকদিন পূর্ব্বে এখানে এসেছিল। তার প্রস্তাব এই যে আগামী শীতের সময় আমি পর্য্যায়ক্রমে রঘুপতি, এবং গোবিন্দমাণিক্য সেজে অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলকে অভিভূত করে দিই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রশান্ত সেই সঙ্গে আমাকে অপর্ণা সাজ্‌তে অনুরোধ করে নি। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, প্রশান্তর মতে অপর্ণার অভিনয়ে তোমার সঙ্গে টক্কর দিতে পারি আমার এমন সাধ্য নেই। এতে আমি মনের মধ্যে কিছু দুঃখ বোধ করেচি। সেই দুঃখের খেদে আমি রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্য সেজে বাহাদুরী করতে কিছুতে সম্মত হলুম না। আমার ইচ্ছে সেই যক্ষপুরীর অভিনয়টা করে' অভিনয়ের আর একরকম ধারা দেখিয়ে দিই। তার উপযুক্ত দেশকালপাত্র কবে জুট্‌বে জানিনে।—উইন্টারনিট্‌জ্[২] আগামী ১৫ই তারিখে আশ্রম থেকে বিদায় নেবেন। তদুপলক্ষে বিশ্বভারতীর ছাত্ররা উত্তররামচরিতের একটা অংশ অভিনয় করবে।[৩] সীতা বাসন্তী তমসা প্রভৃতি সাজবার জন্যে এখন থেকে পুরোদমে দাড়ি গোঁফ কামানো চল্‌চে। এই ব্যাপার দেখে দীনু ভীষণ ক্ষাপা হয়ে উঠেচে, সে আকাশে তার দুই বাহু প্রক্ষেপ করে বল্‌চে—

ঘোর কলি এসেচে ঘনায়ে— ছিন্ন গুম্ফ
দন্ত ভরে নারী-কান্তি হসিবারে [য] চায়,
কাছা-কোঁচা সাড়িরূপে আস্ফালন করে!

এই মাত্র তাঁর দূতেরা আমার কাছে এসে তাঁর আক্ষেপোক্তি জানিয়ে গেল। আমারও মনে ক্ষোভ জন্মালো। এই সেদিন যে আমি রঙ্গমঞ্চপরে দাঁড়ায়েছি গর্ব্বভরে, সাথে লয়ে অভিনেত্রী সখী মোর। আমার মনে হল যেন তারই

কণ্ঠ আমাকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ভানুদাদা, এস যাই এ নাট্যমন্দির ছেড়ে।" আমি তার জবাবে বল্‌লুম, "যাব যাব, তাই যাব, হায় রাণু, তাই যেতে হবে!" আগামী কাল অভিনয়ের দিন; আমি ঠিক করেচি অভিনয় শেষ হয়ে গেলে উপস্থিত হয়ে ওদের উৎসাহ দেব। কারণ অভিনয়কালে উপস্থিত থাকলে উৎসাহ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে।

এণ্ড্রুজ সাহেব এসেছেন। খুব শীর্ণ দুর্ব্বল, প্রায় সমস্ত দিনই শয্যা আশ্রয় করে আছেন। বল্লেন যে, তোমার সঙ্গে পথে কিম্বা ঘরে কোথাও একটুও ঝগড়া হয়নি। জিজ্ঞাসা করলেন বর্দ্ধমানে খুব যে চমৎকার ডিনার খাইয়েছিলেন তার বিবরণ তোমার পত্রে আমাকে জ্ঞাপন করা হয়েচে কি না। আমি বল্‌লুম, হয়েচে বৈ কি! কিন্তু বিবরণটা যে কি রকম সেটা আমি বিস্তারিত করে বলি নি। বল্‌লে শান্তি ভঙ্গ হত। সেখানে তাঁকে তোমাদের বাড়ির সকলে যে খুবই যত্ন করেছিলেন সে কথা বারবার করে বল্‌লেন— শুনে তোমাদের ওখানে কোনো এক সময়ে রোগশয্যা আশ্রয় করবার সঙ্কল্প আমার মনে দৃঢ় হল। কোনো রোগ যদি না জোটাতে পারি ত মাথা ধরতে কতক্ষণ। সেটা ত থার্ম্মোমিটার কিম্বা স্টেথোস্কোপ দিয়ে ধরা পড়ে না। পেট কামড়ানো, মাথা ধরা প্রভৃতি বহুবিধ দুর্লক্ষ্য রোগের তালিকা বাল্যকাল থেকে আমার কণ্ঠস্থ আছে; শাস্ত্রে বলে কলিযুগে নামেই পরিত্রাণ, ঐ সকল রোগের নাম গ্রহণ করেই আমি কঠিন স্কুলবন্ধন থেকে ত্রাণ পেতুম, তার চেয়ে বেশি দূর যাবার দরকারই হত না। তোমরা মুক্তি পিপাসু নও, এই জন্যে এ সকল তত্ত্বে তোমাদের অধিকার হয় নি।

উইন্টারনিট্‌স সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কাশীতে যাবেন— তোমার বাব্‌জাকে বোলো তাঁর যেন উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয়। সেদিন তিনি Indian Literature as a World Literature নামক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, খুব ভাল লেগেছিল! তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তাঁকে বক্তৃতায় আমন্ত্রণ করা হয় তবে সেইটে তাঁকে বলতে বোলো।

আজ দীর্ঘ চিঠি লিখলুম। অন্য চিঠির দাবীতে এবার মন দেওয়া যাক্। ইতি ২৬ ভাদ্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৯

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

যদি প্রশংসা শুনে এখনো পেট ভরে না থাকে তাহলে প্রবর্ত্তক নামক মাসিকপত্রে তোমার অভিনয়ের যে সমালোচনা বেরিয়েচে[১] সেটা পড়ে দেখো। পড়ে' আমার মনে হল— শুধু তুই আর আমি, প্রশংসায় আর কেহ নাই!— এমন কি দিনুর রঘুপতিকে পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিয়েচে। তোমার সিংহাসনের পাশে যে আমাকেও স্থান দিয়েচে সে কম কথা নয়। প্রবর্ত্তক হয়ত তোমাদের হাতে না পড়তে পারে অতএব সমালোচনাটা কেটে পাঠিয়ে দিচ্চি।

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্য্যকলাপের একটুখানি scene বদ্‌লে গেছে। সেই বড় ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি। সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন তখন যে সে এসে বড় উৎপাত করত। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব্বকোণে, নাবার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখে গিয়েছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাঁধানো লেখবার টেবিলেই ঘরের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে গিয়েচে। কেবল আর একটি মাত্র চৌকি আছে— ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখি নি। এখন মধ্যাহ্ন [য]। কটা বেজেছে ঠিক বল্‌তে পারিনে—

কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাক্‌লেও যে ঠিক সময় পাওয়া যেত তা নয়— তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জানো। এইটুকু বলতে পারি— কিছুকাল পূর্ব্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারী সংযোগে আহার করে লিখ্‌তে বসেচি। রৌদ্র প্রখর, শরতের শাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে সেখানে স্ফীত হয়ে পড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখীর ডাক শুন্‌তে পাচ্চি, বামের রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে মন্দগমনে গোরুর গাড়ি চলেচে, আমার ডানদিকের দক্ষিণের জানলা দিয়ে কচিধানের ক্ষেতের প্রান্তে সুদূর তাল গাছের শার [য] দেখা যাচ্চে, তন্দ্রালয় ধরণীর দীর্ঘনিঃশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগ্‌চে। এরকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনাকারণে দিগন্ত পার হয়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুরবালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমশায়কে না বলে পালিয়ে এসেচে— আকাশের এ কোণ ও কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তারা উঁকি মারচে, হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হয়ে দৌড় মারবার মৎলব করচে। কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা— মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানলার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাকে, আর একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়— মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাব্‌তে হয়, দেবতার মত শরতের মেঘের উপর চড়ে মালতী-সুগন্ধী হাওয়ার হিল্লোলে বেণুবনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনাব্যয়ে ভ্রমণ করে বেড়াতে পারে না।

এ ঘরে বসে লিখ্‌চি পাশের ঘরে একটি উড়িষ্যাদেশবাসী অতিথি অপেক্ষা করে আছে। লোকটি এম্ এ পাস করা, নন্ কো অপরেশনের ধাক্কায় বেকার অবস্থায় ভাঁটার টানে ভেসে পড়েচে। আমার কাছ থেকে

হয়ত কোনো রকম সাহায্য বা উপদেশ চাইবে। সাহায্যের চেয়ে উপদেশ দেওয়া আমি পছন্দ করি। কিন্তু কেমন ঘুম পেয়ে আস্‌চে— উপদেশের মধ্যে জোর লাগাতে পারবো না। যাই হোক্ এ ঘরের পালা আজ এইখানেই শেষ করি। দেখা যাক্ আগন্তুক্‌টির অভিপ্রায় কি? ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১২০

২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

সেদিন তোমাকে লিখলুম যে, প্রবর্ত্তক থেকে বিসর্জ্জনের সমালোচনা তোমাকে পাঠাচ্চি। বলে পাঠাতে ভুলে গেলুম। ওটাই হল কবি মানুষের লক্ষণ— তুমি বল্‌বে ওটা ভাল লক্ষণ নয়— সে কথা মানি নে যারা সবই মনে রাখে তাদের স্মৃতিপটে বিষম ভিড় হয়— সেই ভিড়ে প্রধান অপ্রধানের ভেদ থাকে না। যারা বাজে জিনিষকে ভুল্‌তে জানে তারাই মনের মধ্যে আসল জিনিষকে যথোচিত জায়গা দিতে পারে। দিনের আকাশ তারাদের ,কথা ভুলে যায় বলেই ত সূর্য্যকে অভ্যর্থনা করা তার পক্ষে সম্ভব। অতএব, কবিরা অনেক নামক হ য ব র ল কে স্মরণ থেকে বাদ দেয় বলেই, যে-সব এক একাধিপত্য করবার অধিকারী তাদের সিংহাসনে বসাতে পারে। আমার এই কথাটির গভীর অর্থটি কি তা বরঞ্চ আশাদিদিকে জিজ্ঞাসা কোরো, সে অনেক শাস্ত্র, অনেক তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করেচে সে তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারবে। আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় বোঝাবার

চেষ্টা করতে পারতুম কিন্তু আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রথম ব্যস্ততা একটা কবিতা লেখা নিয়ে— বঙ্গবাণী নামক এক মাসিক পত্র আমার সম্মতি না নিয়েই বিজ্ঞাপন দিয়েচে যে আশ্বিনের বঙ্গবাণীতে আমার কবিতা বেরবে।[১] পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন সে ত্রেতাযুগে, সম্পাদকের সত্য পালনের জন্যে কবিকে কবিতা লিখ্‌তে হয় সে কলিযুগে। আজই লিখে না দিলে চল্‌বে না। কবিতা দেবী যে হেতু স্ত্রীজাতীয়া এই জন্যে তাঁর স্বভাবে ঈর্ষাগুণের প্রাবল্য আছে— তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি মনোযোগ করলে তিনি তাঁর পদ্মবনে গা ঢাকা দেন, সাঁতার দিয়েও তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। এ ছাড়া আরো অনেক কাজ জমে আছে। তোমাকে প্রবর্ত্তক পাঠাতে ভুলে গেলুম বলে বুদ্ধিপূর্ব্বক তোমার মাকে পাঠালুম— তাতে তুমিও খুসি হলে তোমার মাও খুসি হলেন। কবিদের লোকে নির্ব্বোধ বলে সে কথাটা মিথ্যে। আজ এই পর্য্যন্ত ইতি ৪ আশ্বিন ১৩৩০

ভানুদাদা

১২১

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

Observatory
Alipore, Calcutta

রাণু

তোমার চিঠির প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর যেন দিই এই বলে তুমি আমাকে অনুরোধ করেচ। তাই দেব। কিন্তু আসল কথা, চিঠির উত্তর আমি দিই নে, স্বয়ং চিঠি লিখি। আমার চিঠি স্বরাজের স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে চায়,

অন্যের চিঠির উপর নির্ভর করে না। তুমি ত জানই বিদেশের কলে-কাটা সুতোর দ্বারা কাপড় বুনে পরা পরতন্ত্রতা বলে আজকাল আমরা নিজের চরকায় সুতো কাট্‌তে বসেচি। স্বরাজপ্রাপ্তির সেই তত্ত্ব চিঠি লেখায় আমি বহুকাল থেকে ব্যবহার করে আস্‌চি। অন্য লোকে তার চিঠিতে যে প্রশ্নের সূত্র ধরিয়ে দেয় সেই সূত্রগুলিকে উত্তররূপে বুনে চিঠি লেখা আমার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মন অগ্রাহ্য করে।

হাঁ, কলকাতা থেকেই যাত্রা করব। যাত্রার শেষ গম্যস্থান হচ্চে কাঠিয়াবাড়। কোন্ পথ আশ্রয় করব সেইটে নিয়ে একটু দ্বিধা আছে। ভেবেছিলুম লক্ষ্ণৌ হয়ে যাব— সেখানে অতুল সেনকে[১] সেনানী করে[১] মামুদাবাদের রাজার[২] রাজকোষ আক্রমণ করব। গতবারে রাজা বিশ্বভারতীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা বিস্মৃত হতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। আমার স্মরণশক্তির সাহায্যে তাঁকে সচেতন করতে চাই। ইতিমধ্যে খবরের কাগজে পড়ে দেখলুম লক্ষ্ণৌ জলমগ্ন। সেখানে সেই বন্যার উপরে নিজের দুঃখের অশ্রুবর্ষণ করাটা সমীচীন হবে না।

আমার মনে হচ্চে আমার এই লক্ষ্ণৌ যাবার প্রস্তাব শুনে তোমার মনে একটা সন্দেহ উঠ্‌তেও পারে। তুমি নিশ্চয় ভাববে, লক্ষ্ণৌ যাবার পথপার্শ্বে একটি বালিকা অহোরাত্র একমনে লজিক অধ্যয়ন করে, তার পড়ার ব্যাঘাত করে যাবার এই একটা ভদ্র রকমের ছুতো আমি বের করেচি। ভানুদাদার পক্ষে এটা নেহাৎ অসঙ্গত নয়; সে ব্যক্তি নিজেও পড়াশুনো করে নি অন্য লোকের পড়াশুনোর প্রতিও তার শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু দেখ্‌চই ত, তোমার গ্রহ ভাল, লক্ষ্ণৌএর পথ সে বরুণ বাণ দিয়ে আট্‌কিয়েচে, লজিকে তুমি ফার্স্ট ডিবিশনেই পাস করবে তোমার ভয় নেই।— দিল্লি অথবা আগ্রার রেলপথ দিয়ে আমাকে যেতে হবে। প্রথমে যাবার কথা সিন্ধু প্রদেশে, করাচীতে, হায়দ্রাবাদে। তার পরে দশহরার উৎসব অতীত হলে যাব কাঠিয়াবাড়ে। তার পরে আমেদাবাদ বোম্বাই

হয়ে, ইন্দোর হয়ে স্বস্থানে ফিরে আসব এই রকম সঙ্কল্প। কিন্তু এখনো খুব পাকা রকম ঠিক হয় নি। জনশ্রুতি এই যে কাঠিয়াবাড়ের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে— এ অবস্থায় সেখানে ভিক্ষুসমাগম কোনো পক্ষেই প্রার্থনীয় না হতে পারে। সেখান থেকে যাঁরা আমাকে আহ্বান করেছিলেন তাঁদের পত্রের প্রতীক্ষা করচি, যদি ভরসা দেন ত যাব। “ঐ ত সম্মুখে পথ চলেছে সরল, চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে।” কিন্তু আমার ভাগ্যে পথ সরল নয়, শূন্য ভিক্ষাপাত্রের বোঝা অত্যন্ত দুর্ভর, আর “ভিখারিণী সখী মোর”— সে দুঃখের কথা আর বলে কাজ নেই। পথে পথে দ্বারে দ্বারে আর ঘুরে বেড়াতে পারি নে— যেমন দুঃখ, তেম্‌নি ক্লান্তি, তেম্‌নি গ্লানি। আমি যত বলি, “কাজ কি ঠাকুর, আমি যাহা আছি সেই ভাল,” আমার গ্রহ বলে “মুক্তি নাই, মুক্তি নাই কিছুতেই, চাঁদা তোরে আনিতেই হবে!” ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৩০

ভানুদাদা

১২২

[১০ অক্টোবর ১৯২৩]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু রাণু

আজ সন্ধেবেলায় ঘন মেঘ করে খুব এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হয়ে জমে আছে। প্রশান্ত আর রাণী[১] কোথায় চলে গেছে— বাড়িতে কেউ কোথাও নেই— আমি টেবিলের উপর ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে নানা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে, নানা

লেখায় কেটে গিয়েচে— এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে পাই নি— লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু কষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ করে গেছি। নিজেকে এ রকম করে খুঁচিয়ে কাজ করানো একেবারেই ভাল নয় জানি— তাতে কাজও যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্টির কর্ম্মস্থানে শনি আছে সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করে না— কষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনের বেলায় আবার নানা রকম কাজের পালা আরম্ভ হবে— তাই এখন চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এখন সন্ধে সাড়ে আটটা— তোমার ওখানে হয় ত তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে বসে গেছ। আজকাল আমাকে যে রকম দায়ে পড়ে খাট্‌তে হয় যদি তোমাদের বয়সে সেই রকম পরীক্ষার পড়ায় খাট্‌তুম তা হলে এতদিনে হয় ত আই, এ, পরীক্ষা পাসের তকমা পরে কন্যাকর্ত্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারতুম— তাহলে পণের টাকায় বিশ্বভারতীর থলি ভর্ত্তি করে দিনে দুপুরে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও লজ্জা বোধ হত না। আমার কলকাতার কাজ শেষ হয়ে এল পর্শু কিম্বা শনিবারে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব। সেখানে এতদিনে শরৎকালের রোদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধরেছে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হয়ে আছে। আজ বুধবার, আজ থেকে ছেলেরা সব হো হো করতে করতে বাড়িমুখো দৌড়েচে— কাল পর্শুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হয়ে যাবে।[2] এদিকে শুক্লপক্ষ এসে পড়ল। দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্ত্তি হয়ে উঠ্‌তে থাকবে। আমি বারান্দায় আরামকেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ করে বসব— চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির পরে আপন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় করে তুল্‌বে— ছাতিমতলায় ঝরে পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের এ কোণে ও কোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে— বেহাগ কিম্বা সিন্ধু কিম্বা

কানাড়া।— যাক্ সে সব কথা পরে হবে— আপাতত চিঠি বন্ধ করে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে যাই— যদি ক্লান্তির জন্যে চোখ বুজে আসে তাহলে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া করব না। [২৩ আশ্বিন ১৩৩০]

ভানুদাদা

১২৩

[?১৩ অক্টোবর ১৯২৩]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

তোমার বাবজার সেবা আর তাঁর কাজ নিয়ে তোমাকে খুব ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়— এখন তোমার কাছ থেকে নিয়মমত চিঠির জবাব আমি প্রত্যাশা করি নে অতএব কষ্ট করে লেখবার চেষ্টা কোরো না। আজ চিঠি না পেয়ে রোগীর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা বোধ করছিলুম, কিন্তু উৎকণ্ঠা নিরর্থক— কিছু ত করবার পথ নেই। এখানে আমার হাতেও রোগীর চিকিৎসা ভার পড়েচে। বিশ্বভারতীর একজন কর্ম্মচারী খুব কঠিন pleurisy রোগে সঙ্কট অবস্থায় পড়েচে— আমার ওষুধে তার উপকার হয়েচে বলে আমাকে সে ছাড়তে চায় না। অথচ জানি তাকে বাঁচানো প্রায় অসাধ্য। তাকে বিধান রায়[১] প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তার দেখচে— তারা হাসে— বলে রবিবাবুর এই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা রোগীর ইহকালের পক্ষে বিশেষ কাজে লাগবে না।

কাল সন্ধের সময় সেই নন্দিনী নাটকটার একটা পাঠ দিয়েছিলুম।[২]

অনেক বদল হয়ে গেচে। জান বোধ হয় এখন তার নাম হয়েচে রক্তকরবী। সবাই শুনে বল্‌লে, রাণু না হলে নন্দিনীর ভূমিকা আর কেউ করতে পারবেনা। তোমার উপরে সকলেরই পক্ষপাত। আমার কথাটা ত জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেছে, গোপন করবার চেষ্টা করা মিথ্যে। গগন স্পষ্টই কবুল করলেন, তোমাকে তাঁরও মনে লেগেচে, সে কথা তিনি ভুল্‌তে পারেন না। শুনে মনে পড়ল, যখন তুমি জোড়াসাঁকোয় থেকে বিসর্জ্জনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে সেই সব দিনের কথা,— আমি তখন নন্দিনী নাটকটার সংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত। তুমি তাতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টা করেচ— আমি তাতে প্রকাশ্য আপত্তি করেচি কিন্তু গোপনে কিছুই যে খুসি হই নি তা মনে কোরো না। কর্ত্তব্যের টান বলে একটা জিনিষ আছে কিন্তু কর্ত্তব্যের বাধার যে কোনো টান নেই এমন কথা জোরের সঙ্গে বল্‌তে গেলে অন্তর্য্যামী তার প্রতিবাদ করবেন। স্মৃতির চিত্রপটে সেই বাধার ছবিগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে জাগ্‌চে। বিসর্জ্জনের সেই রিহার্সাল্‌-পর্ব্বের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে আমার এই তেতলার ঘর ভরা আছে। ইতি [?২৬ আশ্বিন ১৩৩০]

তোমার ভানুদাদা

১২৪

২১ কার্ত্তিক ১৩৩০

ওঁ

[ধ্রাঙ্গধ্রা]

রাণু

তোমাকে য়ুরোপের ভূবৃত্তান্তে হার মানাতে পারিনি, চেকোস্লোভাকিয়ার বিবরণ পর্য্যন্ত তোমার জানা আছে কিন্তু ধ্রাঙ্গধ্রা' কোথায় আমাকে বল

দেখি। আধুনিক গানের মধ্যে যাকে "আমার দেশ" বলে সুর তান লয়ে গৌরব করে থাকি এ জায়গাটি তারই মধ্যে, কিন্তু রামকেলী কিম্বা ভৈরবী সুরে যদি এই শব্দটাকে বসাবার ভার আধুনিক কবির উপর পড়ে তাহলে নিশ্চয় তার কলম ভোঁতা হবে, তার তানপুরার তার ছিঁড়ে যাবে। এক হতে পারে পাখোয়াজের বোলের মধ্যে "তেরে কেটে মেরে কেটে ধ্রাঙ্গধ্রা।" যা হোক্ এই রকম সব দুর্ণামধারী জায়গায় কবিকে ঘুরে বেড়াতে হচ্চে। হয়রান হয়ে গেচি— যাকে তোমাদের হিন্দীতে বলে, থক্ গয়া। ধ্রার্ঙ্গধ্রা থেকে আজ রাত্তিরে যাব "মোরবি"[2] শব্দটা তেমন শ্রুতিকটু নয় বটে কিন্তু ওর অর্থটা একটুও ভাল নয়। "মোরবি" যারা নাম রেখেছিল তারা না হয় "বাঁচবি" নাম রাখত তাতে দোষ কি ছিল? তবে যদি বল নামকরণকারী ধ্যানযোগে আমার আজকালকার অবস্থা চিন্তা করেছিল, তাহলে বল্‌তেই হবে লোকটার অসাধারণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল। যে-জংসন দিয়ে মোরবিতে যেতে হয় তার নাম বাধা-বান (Wadhawan)।[3] পথিকদের এরকম করে আগে থাকতে ভয় দেখাবার কি দরকার ছিল? নামের মধ্যেও ত একটা ভদ্রতা থাকা উচিত— নামটা "বাধাহীন" হয়ে কাজে না হয় বাধাবান হ'ত? মনে কর আমার উপর যদি তোমার প্রীতি কিছুই না থাকে তাহলে কি নাম সই করবার বেলায় লিখ্‌বে অপ্রীতি? কিম্বা আমি ম্লান হয়ে পড়েচি বলেই কি ভানু না বলে' নিজেকে ভাণু বলব?

আমার এই চিঠি জবাব-নিরপেক্ষ চিঠি। আমি এখন অঠিক-ঠিকানী। পোষ্ট আফিসের হাত এড়িয়ে এড়িয়ে চলেচি, চিঠি সম্বন্ধে এখন আমি অপ্রতিগ্রহী; চিঠি দিতে পারব কিন্তু নিতে পারব না। এতএব তোমাকে এ চিঠি দান করেও অঋণী করে দিলুম। এখন তোমার চিঠি লেখার দায় অনেক বেড়ে গেচে— অতএব তোমার চিঠির ধারাকে দুই বেণীতে বিভক্ত করা সঙ্গত হবে না।

যে ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি সে ঘরের ছবি মনে আন্‌তে পারবেনা। রাজার অতিথিশালা, মস্ত ইমারত, কার্পেটমণ্ডিত পর্দ্দাবগুণ্ঠিত উন্নত ভিত্তিমান ঘর, গোলাপচিত্রিত ছিটের কাপড়ে ঢাকা মোটা মোটা আসবাবগুলো আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করচে। তারা নীরবে পরস্পরের প্রতি চোখ টিপা-টিপি করে বল্‌চে এই মানুষটার চেয়ে ঢের বড়বড় লোককে আমরা অভ্যর্থনা করেছি, যথা, স্বয়ং পুলিসের ইনস্পেক্টর সাহেব, বোম্বাই সহরের ইংরেজ জুয়েলার দোকানের মেজো আসিস্টান্ট সাহেব, ঘোড়-দৌড়ের জকি সাহেব, গ্র্যাণ্ড হোটেলের খানা-তদারককারী বাট্‌লার সাহেব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ঘরের একপ্রান্তে রজত-লেখ্যাধার শোভিত সুপ্রশস্ত সুচিক্কণ লেখবার টেবিলে বসে সঙ্কুচিত মনে লিখে যাচ্চি। মরিস্[*] আমার সঙ্গীরূপে এখানে এসেচে কিন্তু তার কুলমান সম্ভ্রম গড়ের-বাদ্যকার ফিরিঙ্গিকুলপুঙ্গবদের ঠিক সমান না হওয়াতে তাকে দূরে অন্য বাড়িতে বাসা দেওয়া হয়েচে। এই বহু কক্ষবিচিত্র প্রাসাদ সৌধে আমি একা; সঙ্গীর মধ্যে বনমালী[*] নামধারী আমার উংকলবাসী সেবক। সুতরাং আমার হাতে "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ" তা ছাড়া বিপুলা চ বাসা। কালযাপনের সাহায্যকল্পে মাঝে মাঝে এরা আমাকে উপলবন্ধুর দুর্গমপথে এখানকার মরুপ্রান্তরের মাঝখানে ঘুরিয়ে আনচে। গতকল্য মধ্যদিনের অসহ্য উত্তাপে আটঘণ্টাকাল বিচলিত দেহে অবিচলিত ধৈর্য্যে এই রকম রথযাত্রা করে এসেচি— সে রকম উংকটমন্থনে আলোড়নেও যখন প্রাণ পদার্থটা দেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আসেনি তখন বোধ হচ্চে আমার আয়ুটি নেহাৎ সদ্যঃপাতী নয়। কিন্তু বিশ্রামের জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেচে। ইতি ৭ নবেম্বর ১৯২৩

ভানুদাদা

১২৫

২৭ কার্ত্তিক ১৩৩০

ওঁ

[রাজকোট][1]

রাণু

তোমাকে একটা সুখবর দেবার জন্যে এই চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এল্‌ম্‌হর্স্ট এসে পৌঁচেচে। সে বম্বাই থেকেই কোনো এক জায়গায় দৌড় দেবার চেষ্টায় ছিল আমি তাকে ডাকিয়ে এনেচি। সে এখন আমার সঙ্গে ঘুরচে। কাল তাকে কথায় কথায় বল্‌ছিলুম রাণু বিসর্জ্জনে খুব ভাল অভিনয় করেছিল। পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাই নিয়ে আলোচনা করচে। শুনে এল্‌ম্‌হর্স্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, ভাগ্যি আমি ছিলুম না। থাকলে তার ভাগ্য নিয়ে কি মুস্কিল হত আমি ত কিছু বুঝতে পারলুম না। উমা যখন তপস্যা করেছিলেন তখন তিনি অপর্ণা হয়েছিলেন, তখন শিবের তিন নেত্রই তাঁর উপর পড়েছিল— কিন্তু তুমি যখন অভিনয় সাধনা করে অপর্ণা হল্লে তখন হাজার নেত্র তোমার উপর পড়ল, শিব অশিব কেউ বাদ যাচ্চেনা। তোমার সাধকদের মধ্যে ইদানীং কার কি দশা ঘটেচে তার হাল খবর কিছুকাল পাইনি, আরো কিছুকাল পাব না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারচি।[2] পুরাণে লিখচে গৌরী ভানুর দিকে তাকিয়ে তপস্যার উগ্রতা বাড়িয়ে তুলে অবশেষে সকলপ্রকার ভোগসামগ্রীর সঙ্গে গাছের পত্র পর্য্যন্ত যখন ত্যাগ করলেন তখন তিনি বরলাভ করতে পেরেছিলেন— তোমার তপস্যায় আমি ত দেখচি পত্রসংখ্যা বাড়চে বই কমচেনা— তাতে তোমার বরলাভের কোনো বাধা ঘটবেনা, এও স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্চে। অপর্ণার এই তপঃকাহিনী লেখবার জন্যে পুরাকালে এক কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন— বর্ত্তমান কালেও এক কবিকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে, কিন্তু এখনো তিনি অবাক্ হয়ে আছেন; হয়ত কোনদিন ছন্দে বন্ধে তাঁরও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হতে

পারে। আপাতত তাঁর দুটি একটি কথা সামান্য পত্রপুট পূর্ণ করে ডাকবাহন যোগে চলাচল করচে— কিন্তু যেখানে শ্রাবণের ধারায় পত্র বর্ষণ হচ্চে সেখানে এ পত্র লক্ষ্যগোচর না হতে পারে। ইতি ১৩ নবেম্বর ১৯২৩

ভানুদাদা

১২৬

[?২৮ নভেম্বর ১৯২৩][১]

ওঁ

LAL BUNGLOW
JAMNAGAR,
KATHIAWAR

রাণু

এখনো ঘুরচি। "রাজদ্বারে,"— যে রকম ক্লান্তি তাতে "শ্মশানে চ" দূর বোধ হয় না। এখানে আর দুই একটা জায়গা আছে তার পরে সিন্ধু, তার পরে বোম্বাই, তার পরে শান্তিনিকেতনে। ৭ই পৌষের কিছু আগেই হয়ত পৌঁছব। তার কিছুদিন পরেই চীন যাত্রার উদ্যোগ করতে হবে। সেখানে ডাকাতের দল আমাকে যদি কিছুদিন ধরে রেখে দেয় তাহলে সেই কটা দিন বিশ্রাম করবার সুযোগ হবে। আমার মুক্তির মূল্য তারা কত টাকা চাইবে বল্‌তে পারি নে— হয় ত লাখ দুই তিনের বেশি হবে না; সে টাকা আমার দেশের লোক সংগ্রহ করে দেয় কিনা আমার দেখবার সুবিধে হবে। না যদি দেয় ত মাথার পিছনে ঝুঁটি গজিয়ে একটা চীনে মেয়ে বিয়ে করে চৈনিক হয়ে আনন্দে কাটিয়ে দেব। এইরকম ঠিক করে রেখে দিয়েচি।

আমার ত বিশেষ খবর নেই— আমি মুসাফেরের মানুষ, চল্‌তে চল্‌তে সব খবর মুছে দিয়ে দিয়ে যাচ্চি। তুমি স্থির হয়ে আছ, তোমার চারদিকে প্রতিদিন নতুন খবর জমে উঠ্‌চে। তার কিছু কিছু বার্ত্তা হয়ত ফিরে গিয়ে পাব। পাব ত? তাও বলা যায় না। কিন্তু তোমার আধুনিক খবরের মধ্যে তীব্রতা যতই থাক খুব যে বৈচিত্র্য আছে তা বোধ হচ্চে না। বুঝ্‌তে পারচি ব্যাপারটা কি রকম চল্‌চে।

এবার ক্রিষ্টমাসের ছুটিতে তোমরা আশ্রমে আসচ ত? আরো অনেক অতিথি হয়ত আসবে। [১২ অগ্রহায়ণ ১৩৩০]

ভানুদাদা

১২৭

[২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩০]

ওঁ

[বোম্বাই]

রাণু

তুমি লিখেচ তোমার সব কথার জবাব দিতে। অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বসেচি— এবারে বোধহয় পুরো মার্ক্‌ পাব। তোমার প্রথম প্রশ্ন আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তার পরে আমেদাবাদে, তার পরে বরোদায়। আজ সকালে এসেচি বম্বাইয়ে।[১] এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বলে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তার মধ্যে তোমার দুখানা চিঠি— লেফাফার সর্ব্বাঙ্গে নানা প্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশি দিন থাকা হবে বলে বোধ হচ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্ত্তী। অতএব

দু চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং বঙ্গভূমিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। যাই হোক্ ক্রিস্টমাসের পূর্ব্বেই ফিরব। তোমার বাবজাকে লিখে দিয়েচি তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্য্যন্ত তোমার উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখলুম আর কোনো প্রশ্ন নেই। এল্‌ম্‌হর্স্ট আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে জ্বরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়ে ছিল। এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা[২]। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি।[৩] বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে— সব চেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ঙ্কর নই। দ্বিতীয় ভয় পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দূরবর্ত্তী দেশে তার অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয় রেলগাড়িতে বিদেশীর জনতাকে। তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা,— তাতে কথোপকথন উভয়পক্ষেই দুর্ব্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস এজন্যে বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি, তাহলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্ব্বাচন করতে পারে। আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোছাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাস্‌তে জানে, আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন যে, ঠাট্টা না করে বাঁচিনে। তাই, ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্ছে আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক্ ওকে বিদেশী হাওয়া বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার যে কত বড়

দায়িত্ব, সে ওকে না দেখ্‌লে ভাল করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী তার উপরে বনমালী, ভাবনার আর অন্ত নেই।

আমি বোধ হয় আর দুই তিনদিনের মধ্যেই রওনা হব। অতএব যদি চিঠি লেখ ত শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি বোধ হচ্চে ১০ই ডিসেম্বর [১৯২৩]।

ভানুদাদা

১২৮

[জানুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ সকালে তোমার পথের চিঠি পেয়েছিলুম, আবার আজ বিকেলেই তোমার ঘরের চিঠি পাওয়া গেল।[১] তোমাকে তার আগেই একটা লম্বা চিঠি লিখে ডাকে রওনা করে দিয়েচি।[২] প্রথমে ভেবেছিলুম ঐ একটা চিঠিতেই তোমার দুটো চিঠির জবাব সারা গেল। তার পরে ভাবলুম এই কয়দিন তুমি আমার চিঠির প্রত্যাশা করে ছিলে অথচ পাও নি— তার শোধ করবার উপলক্ষ্যে আর একটা চিঠি লিখে কাল পাঠালে তুমি খুসি হবে। কিন্তু আমার পত্রকে দৈনিক পত্রে পরিণত করতে পারব এমন আশা করে বোসো না। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো কখনো মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করেচি— আমার লেখনী, পত্র সম্বন্ধে সেই রকম বিলম্বিত ছন্দই পছন্দ করে থাকে। অর্থাৎ আমি ভয়ঙ্কর কুঁড়ে; কিন্তু ইচ্ছাশক্তি চালনার জোরে কুঁড়েমি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারতুম, কারণ এই জড়তা দীর্ঘসূত্রিতা আমারই

নিজের আত্মগত রিপু, এ'কে আমারই আত্মগত শক্তির দ্বারা হয়ত পরাস্ত করা অসম্ভব হত না— কিন্তু আমার গ্রহ বাইরে থেকে আমার স্কন্ধে যে কাজ চাপিয়েচেন তাকে টলাব কি উপায়ে? তুমি যাওয়ার পর দেশী বিদেশী কত রকম চিঠি লিখেচি তার সীমাসংখ্যা নেই— তার পরে মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা চেপে রয়েচে, সে হচ্চে চীনের বক্তৃতা। এখনো তার একছত্রও লেখা হয় নি— রোজ সন্ধের সময়ে মনকে বুঝিয়ে বলি, ঠাণ্ডা হও, উতলা হোয়ো না, কাল সকালেই লেখা সুরু করে দেব— কিন্তু আমার মন আমাকে তিন কুড়ি বছর ধরে দেখে এসেচে; সে আমাকে খুব ভাল রকম করেই চেনে; সেই জন্যে আমার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা পায় না— জানে যে আমি নানা অছিলা করে দিন পিছিয়ে দেব। ঠিক তাই ঘটে। রাত্রি অবসান হয়, প্রভাতের আলো দেখা দেয়— ভালোমানুষের মত ডেস্কে গিয়ে বসি কিন্তু চীনের লেকচারের পরিবর্ত্তে গান লিখ্‌তে বসে যাই। এমনি করে চারদিনে চারটে গান লিখেচি।'

এই চিঠি আমি বারান্দার সেই কোণের কেদারায় বসে লিখ্‌চি। যখন লিখ্‌তে সুরু করেছিলুম তখন সূর্য্য অস্ত যাব যাব করচে— ক্রমে ক্রমে লোকসমাগম হতে লাগ্‌ল— সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার হয়ে এল, চাঁদের আলোর মত দেখ্‌তে সেই ল্যাম্প জ্বেলে নিয়ে এসে জানলার কাছে রাখ্‌লে। লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। অবশেষে বনমালী এসে খবর দিলে খাবার এসেচে। খাওয়া শেষ করে সেই প্রদীপের আলোতে সেই কোণের কেদারায় বসে লিখচি— অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্চে, তাই পায়ের উপর একটা বালাপোষ দিয়ে গরম হবার চেষ্টায় আছি। আজই চিঠি শেষ করতে চাই কারণ কাল চীনের লেকচার সুরু করব বলে ঠিক করে আছি। আমাদের পাড়া এখন খালি হয়ে গেচে। তোমার সেই সিংহলবাসী ভক্তটি চলে গেচে— আমার প্রতিবেশী বুবুরাও' পলাতক, নলিনীরাও' চলে গেচে। পর্শু শুনেচি রথী বৌমাও কয়েকদিনের জন্যে

কলকাতায় যাবে। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে সৌম্য[৬] এসেছিল সেও বোধ হয় আজ চলে গেচে। এল্‌মহর্স্ট গেচে কলকাতায়, মিস্ গ্রীনও[৭] সেইখানে। মেয়েরা পদব্রজে ভ্রমণে বেরিয়েছিল সন্তোষ ছিল তাদের দলপতি। সাতদিন খুব পেট ভরে বেড়িয়ে আজ বিকেলে "আমাদের শান্তিনিকেতন" গাইতে গাইতে ফিরে এল।[৮]— আজ তবে এইখানে শেষ করি। রাত হয়েচে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসচে— পাড়ায় আর কারো বিশেষ সাড়া পাওয়া যাচ্চে না— মাঝে মাঝে কুকুর ডেকে উঠ্‌চে। তুমিও যাও শুতে, বই বন্ধ করে ফেল, এত রাত্রে লজিক মুখস্থ করতে হবেনা।

ভানুদাদা

আগামী বছরে আই এ পরীক্ষার জয়মাল্য পরে[১] বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করতে চাও। যদি তদুত্তরতর পদবীর প্রলোভন পরিহার করে এখানে আস্‌তে পার আমি খুসি হব। আজকাল আমি গঁদ দিয়ে লেফাফা জুড়ি, অতএব চিঠিতে উচ্ছিষ্টতা দোষ ঘটে না।

১২৯

[জানুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোমার দুখানা চিঠি যে দিন পেয়েচি সেইদিনই তোমাকে দুখানা[১] উত্তর দিয়েচি। আমি জানি চিঠি না পেলে তুমি কষ্ট পাবে, তাই দেরি করি নি। কাশী থেকে এখানে চিঠি যাতায়াতে নিতান্ত কম সময়

লাগে না। আমার বোধ হয় নাগোয়া কাশি সহর থেকে দূরে বলে সেখানে ডাক পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হয়। তোমার চিঠি আমার হাতে আস্‌তেও যথেষ্ট দেরি হয়েছিল। আজ বুধবারে তোমার যে চিঠি পেয়েচি সেটা তুমি রবিবারে লিখেছিলে। কিন্তু এক একবার এর চেয়েও দেরি হয়। যাই হোক্ এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমার দুখানা চিঠি পেয়েছ। হয় ত কাল ডাকেই সে খবর পাব। তুমি নিশ্চয় জেনো, রাণু, যে, তুমি একটুও দুঃখ পাও এ আমি ইচ্ছে করিনে— আমি একান্ত মনে ইচ্ছে করি তুমি সুখী হও, আমার সেই আন্তরিক ইচ্ছে তোমাকে সুখী করুক।

এখানে সেদিন জগদানন্দের বাড়িতে একটা ছোটো খাটো ডাকাতী হয়ে গেচে। ১২।১৩ জন লাঠি ছুরি নিয়ে তার বাড়ি লুঠ করেচে। যখন তারা বাক্স তোরঙ্গ ঘাঁটচে জগদানন্দ তখন তাদের অসাধু ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মৌখিক উপদেশ দিয়েচেন— তারা তাঁর উপদেশও শুনেচে জিনিষপত্রও সরিয়েচে— এখন পুলিস তাদের অসাধু ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করচে কিন্তু তাদের দর্শন পাওয়া যাচ্চে না। আমার ঘরে যদি ডাকাত আসে তবে আমার সব লেখা কাগজগুলোকে পাছে নোট্ মনে করে নিয়ে যায় আর তার পরে নেহাৎ তুচ্ছ বলে ফেলে দেয় এই আমার আশঙ্কা। সংস্কৃত শ্লোকে একটি ভীল মেয়ের বর্ণনা আছে— সে বনের মধ্যে একটা রক্তমাখা গজমুক্তা দেখে প্রথমে বদরীফল মনে করে আগ্রহে কুড়িয়ে নিয়েছিল, তার পরে হাতে নিয়ে মুক্তা দেখে অবজ্ঞা করে ফেলে দিয়েছিল— আমার সেই দশা হতে পারে।[২]

আজকাল সন্ধের সময়ে আমার ঘরে সব গানশিক্ষার্থীর দল এসে জমে— তারা রাত্রি আটটা ন'টা পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে নতুন গান শেখে।[৩] অনেকগুলো নতুন গান তৈরিও হয়েচে।[৪] তাই আজকাল সন্ধের পরে আমার পশ্চিম বারান্দার সেই কোণের কেদারায় বেশিক্ষণ বস্‌তে

পাইনে। বিকেলে চা খাওয়ার পর খানিকক্ষণ বসে সূর্য্যাস্ত দেখতে পাই। এখন আমার সেই কোণের ঘরে সেই স্লেটের টেবিলের উপরে বসে লিখ্‌চি। সকাল বেলায়, আকাশে অল্প অল্প মেঘ হয়েচে, শীত খুব তীব্র হয়েচে। মাঝে একদিন সমস্তদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়েছিল তাই বোধ হয় বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়েচে। তোমাদের ওখানে এবার কনভোকেশনে অনেক রাজসমাগম হবে। আমার নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু কাজ আছে বলে যাওয়া সম্ভবপর হবেনা।[৩] আমাকে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের দিকে ঢাকা অঞ্চলে যেতে হবে।

আমাদের এখানে ইংরেজি পড়াবার যে পার্সি অধ্যাপক[৪] এসেচেন তাঁর স্ত্রী বিষ্ণু দিগম্বরের[৫] ইস্কুলে সাত বছর গান শিক্ষা করেচেন। সেদিন তাঁকে গাওয়ালুম কিন্তু সাতবছর শিক্ষার উপযুক্ত আওয়াজ বের হল না। আশার একজন মাদ্রাজি মেয়ে বন্ধু এখানে চিত্রকলা শিখ্‌তে এসেছিলেন— কিন্তু প্রথম দিন থেকেই অশ্রুপাত হতে আরম্ভ হল, তৃতীয় দিনেই তিনি অন্তর্ধান করলেন। আসচে বছরে তুমি যখন এখানে পড়তে আস্‌বে তখন তুমি ত তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে না? আমি বৌমাকে বলে রেখেচি— তিনি তোমাকে তাঁর আপনার কাছে রেখে দেবেন— এখন আমি যে বাড়িতে থাকি, চাই কি, এইখানেই তুমি থাক্‌তে পারবে, আর আমার পশ্চিম বারান্দার কোণে সেই কেদারায় বসে রবির অস্তগমন দেখতে পাবে। আমার বই কাগজপত্র ও আসবাবে যাতে উই অথবা চোর না লাগে সেটা তোমাকে দেখ্‌তে হবে।

ভানুদাদা

১৩০

৯।১০ জানুয়ারি ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

এবারে ছোট্ট চিঠি লিখ্‌ব। কেননা শীঘ্রই চিঠির খনিসুদ্ধ তোমার ওখানে গিয়ে পৌঁছবে। শুধু বিশল্যকরণী নয় স্বয়ং গন্ধমাদন গিয়ে উপস্থিত হবে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বিদ্যুদ্বাহিনী বার্ত্তা তোমার কানে গিয়ে পৌঁচেছে যে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ভানুকে তার পূর্ব্ব দিক্‌প্রান্ত হতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্চে।[1] তুমি বোধ হয় পুরাণে পড়েচ ভানুর রথ হচ্চে একচক্র রথ। এই একচক্র রথেই তার দিন চলে। মর্ত্ত্যে এসেও ভানু আবিষ্কার করেচেন যে স্বর্ণময় একচক্র রথ না হলে তাঁর দিন চলে না। মাঝে মাঝে মর্ত্ত্যলোকের এই একচক্র ভেঙে গিয়ে তাঁর গতিবিধি অচল হয়ে ওঠে— তখন তিনি মনের দুঃখে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন। বর্ত্তমানে এই একচক্রের অভাবজনিত দুঃখে ভানুকে পীড়া দিচ্চে, তাঁর সকল কাজই খুঁড়িয়ে চল্‌চে, তাঁর রিক্ত কর দেখে দেবতারা লজ্জা বোধ করচেন— কারণ এ'তে তাঁর নাম রক্ষা হচ্চে না। সম্প্রতি কাশীর দিকে স্বর্ণচক্রের একটা আওয়াজ শোনা যাচ্চে, তাই লৌহচক্রযানে ভানু তদভিমুখে যেতে উৎসুক। এর থেকে মনে কোরো না ভানুর মনে আর কোনো চক্রান্ত নেই। কিন্তু মনের কথা অনুমানে বুঝে নিতে হবে। সোনার চাকার কথা ঘর্ঘর ধ্বনি করতে সঙ্কোচ বোধ করে না— কিন্তু চক্রবাকের বাণী অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন নদীপার থেকে কদাচিৎ শুন্‌তে পাওয়া যায়। ইতি বোধ হয় ২৩শে কিম্বা ২৪শে পৌষ ১৩৩০

ভানুদাদা

১৩১

১৬ মাঘ ১৩৩০

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

বুধবারে তোমাদের ওখান থেকে চলে এসেচি[১] আর আজ বুধবার। এই সাতদিন পরে তোমার চিঠি পেয়েচি— মনে করেছিলুম রাণু বৈরাগ্য-সাধন করচে, কঠিন তপস্যা। একবার ভেবেছিলুম তোমার তপস্যাভঙ্গ করব। তারপরে ভাবলুম, না, যে মানুষ মুক্তি চাচ্চে তাকে বাঁধনের দিকে একটুও টানব না। এমন সময় আজ এই বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলুম তোমার চিঠিখানা পথহারা হয়ে আমার সন্ধানে আলিপুর ঘুরে শান্তিনিকেতন পৌঁছল। তুমি ভেবেছিলে আমি কলকাতায়। খুব বেশি ভুল করনি। তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলি।

কাশি থেকে প্রথম আসা গেল মোগল সরাইয়ে। বৌমা স্টেশনে যেখানে যত রং-করা পুতুল দেখ্‌লেন পুপের[২] জন্যে কিন্‌তে বল্‌লেন। সঙ্গে কেবলমাত্র ৮২৫ টাকা ছিল। আমি ভাবলুম, পথে আমাদের জলযোগের মত টাকাও বাকি থাক্‌বেনা। পুতুলের দোকান সব যখন খালি হয়ে গেল তখন বৌমার চোখ পড়ল পেয়ারার ঝাঁকার পরে। বল্লেন কাশির পেয়ারা যদি শান্তিনিকেতনে না নিয়ে যাই তাহলে কাশিতে আসাই নিষ্ফল হল। এক ঝাঁকা শেষ হল। আরেক ঝাঁকাও শেষ হল। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে তৃতীয় ঝাঁকাটা বাকি রয়ে গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিন্‌টে সিটের মধ্যে একটা সীট্‌ পেয়ারার ভরে গেল। দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে আশা করে একটু কাঁচা গোছের পেয়ারা কেনা হয়েছিল, অথচ তাতে পাকা রংটি ধরেচে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে মনে ভাবলুম এ ত দেখি আমার রাণুরই মত— তার মধ্যে কোথাও বা কাঁচা, কোথাও বা শ্যামল, কোথাও

বা গৌর, কোথাও বা কঠিন, কোথাও বা কোমল। এই রকম চিন্তা করতে করতে দানাপুরে এসে উপস্থিত। এমন সময় দেখি এসিষ্টান্ট স্টেশন মাষ্টার মচ্‌মচ্‌ করতে করতে আমারই গাড়ির সামনে হাজির। ভাবলুম পেয়ারা ওজন করিয়ে মাশুল আদায় করবার প্রস্তাব করতে এসেচে। ইচ্ছা করল, কালিদাসের[৩] মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে কেদারা রাগিণীতে গান ধরি "সখি আমারি দুয়ারে কেন আসিল?" এমন সময়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "Are you Sir R. N. Tagore? সত্যের খাতিরে আমাকে কথাটা স্বীকার করতে হল। সে বল্লে, এ গাড়ীতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্চে, আমি তোমার খবর পেয়েই একটা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ি নতুন জুড়ে দিয়েচি, পাটনা জংসন স্টেশনে সেই গাড়ি দখল কোরো। পাছে ভদ্রলোক মনে মনে দুঃখিত হয় সেই জন্যে পাটনা জংসনে ফার্ষ্টক্লাসে রওয়ানা হলুম। পেয়ারাগুলোকে নানা ট্রাঙ্কের কোণে সন্নিবেশিত করা গেল। আমাদের লীলমণি হাতে কাঠের পুতুল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। বল্‌লে, "এটা ফেলে আসা হচ্চিল আমি এনেচি।" আমি বল্লুম "অনেক লোকসান বাঁচিয়েচ, কিন্তু হে লীলমণি, এর চেয়ে দামী জিনিষ ছিল সেগুলোর কি গতি হল?" সে বল্‌লে, "কুলীরা সব নিয়ে আস্‌চে।" আমি, এমন কি বৌমাও, লীলমণির এই আশ্চর্য্য বিবেচনা শক্তি ও সতর্কতা দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলুম। কিছুক্ষণ পরে বেচারা পুরাতত্ত্ববিদ্‌ কালিদাস তোরঙ্গ বালিশ বিছানা ঝুড়ি চুপড়ি পুঁটুলি বাক্স টিফিন ক্যারিয়র জলের কুঁজো ইত্যাদি উপকরণ বাহক কুলীদের পথপ্রদর্শক হয়ে এসে বল্‌লে, "আমি একলা এই প্রভূত অস্থাবর সম্পত্তির গুরুভার দায়িত্ব বহন করে হয়রাণ হয়ে পড়েচি— আমাদের লীলমণিকে কোথাও দেখা গেল না।" আমি তাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বল্‌লুম "তার জন্যে কিছুই উৎকণ্ঠিত হোয়ো না। সে পৌত্তলিক একখানি কাঠের পুঁতুলের তদারকে তার দেহমনপ্রাণ একান্ত উৎসর্গ করেছিল। সম্প্রতি সেই ভারমুক্ত হয়ে ভৃত্যাবাসের কাষ্ঠাসনে বিশ্রামের আনন্দ উপভোগ করচে।" লীলমণির

স্বভাব সম্বন্ধে তোমার মনে নিশ্চয়ই অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়েচে। তার পিতৃদত্ত নাম বনমালী। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে শোনা গেল তোমার পিতা তাকে নীলমণি বলে সম্ভাষণ করলেন। আমার মনে হল তোমার পিতৃদত্ত নামটি তার মুখচ্ছবির সঙ্গে সুন্দর খাপ খায়। সেই অবধি আপোষে আমাদের নিজেদের মধ্যে তাকে নীলমণি বলেই আখ্যা দিয়েচি। যাক্ কলকাতায় এসে পৌঁছন গেল। এসে দেখা গেল পরদিনেই এগারই মাঘ। আমি জন্মকালে ব্রাহ্ম ছিলুম। কিন্তু যেমন আমি কোনো ইস্কুলের পড়া স্বীকার করতে পারিনি তেমনি আমি কোনো ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বেড়ি মনকে পরাতে পারলুম না। সেই কারণে আমি সাম্প্রদায়িক উৎসবে যোগ দিতে পারিনে। স্থির করা গেল, জোড়াসাঁকোয় না থেকে আলিপুরে দুটো দিন অজ্ঞাতবাস যাপন করেই শান্তিনিকেতনে দৌড় মারব। প্রশান্তকে টেলিফোন করা গেল। প্রশান্ত বল্‌লে "তথাস্তু, আজ রাত্রে গিয়ে মোটর রথে করে আলিপুরে নিয়ে আসব।" বৌমার সঙ্কল্প হল তিনি সেই অপরাহ্ণেই তাঁর কাঠের পুতুল আর কাশীর পেয়ারার বৃহৎ ঝুড়ি নিয়ে বোলপুরে যাত্রা করবেন। আমাদের সম্পত্তি যা কিছু ছিল দুই ভাগ হল। এক ভাগ যাবে আশ্রমে, একভাগ যাবে আলিপুরে। এমন সময় কি হল সেকথা লিখ্‌তে গেলে কিছুতে আজকের ডাক পাওয়া যাবেনা। অথচ আমি নিশ্চয় জানি তুমি প্রতিদিন ডাকের অপেক্ষা করচ আর ভাবচ "ভানুদাদা নিষ্ঠুর কঠিন।" তাই অনতিবিলম্বে এই চিঠি রওনা করে দিচ্চি গল্পের অবশিষ্ট অংশ পরের কিস্তিতে সমাপ্য।" ইতি ৩০শে জানুয়ারী ১৯২৪।

এ চিঠি কবে পেলে ঠিক করে দেখো ত।

তোমার ভানুদাদা

১৩২

২১ মাঘ ১৩৩০

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু,

লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি মনকে শান্ত কর। তোমার জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। যে একটা জটিল জালের মধ্যে তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে, তার জন্যে অনেক পরিমাণে আমিই দায়ী বলে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। তোমার এই প্রথম বয়েস, এই সময়ে তোমার পড়াশুনো তোমার নিশ্চিন্ত হাসি উল্লাসের মাঝখানে এই সমস্ত উপদ্রব এনে তোমার সমস্ত জীবনকে এমন করে যে একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়ে দেওয়া গেল সেটাতেই আমাকে দুঃখ দিয়েচে।[1] তোমার উপর আমি কখনো এমন রাগ করতেই পারিনে যাতে তুমি স্থায়ীভাবে ব্যথা পেতে পার। আমার স্নেহ তুমি হারিয়েচ কল্পনা করে যে কষ্ট পাচ্চ তার কোনো মূল্য নেই। আমার যে-স্নেহ তুমি এমন করে টেনে নিয়েচ সে আমি কোনোদিন কিছুতেই প্রত্যাহরণ করতে পারিনে। আমার স্নেহে যদি তোমার কোনো সান্ত্বনা থাকে, তাতে যদি তোমার হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে পারে, তাহলে সে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভোগ কর— তার দ্বারা তুমি বল পাও, সুখ পাও, কল্যাণ পাও, এই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। আমার কক্ষপথে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একটি প্রাণের জ্যোতিষ্ক এসে পড়েচ, তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, তোমার মন কাঁচা, আমি কি তোমাকে রূঢ় ভাবে আঘাত করতে পারি? তোমার উপরে আমার বেদনাপূর্ণ স্নেহ সর্ব্বদা আপনি গিয়ে বিকীর্ণ হচ্চে। আমার জীবনের দায়িত্ব, কখন্ আমার অগোচরে, এবং জানিনে কার প্রেরণায় ক্রমশই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠচে— তার সমস্তটার সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ

যোগ হওয়া সম্ভবপর নয়, তুমি ছাড়া আর কারো যে যোগ আছে তাও নয়— ঐখানে বিধাতা আমাকে অনেকটা পরিমাণে একলা করে দিয়েচেন। কিন্তু তুমি হঠাৎ এসে আমার সেই জীবনের জটিলতার একান্তে যে-বাসাটি বেঁধেচ, তাতে আমাকে আনন্দ দিয়েচে। হয়ত আমার কর্ম্মে আমার সাধনায় এই জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই আমার বিধাতা এই রসটুকু আমাকে জুটিয়ে দিয়েচেন। আমার অনেক সহযোগী আছে যারা আমার কর্ম্মে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তুমি তা কর না; আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে তুমি হয়ত আমাকে সম্পূর্ণ বুঝতে এখনো পার না। কিন্তু জীবনের সেই লক্ষ্য যেখানেই থাক্ না, তুমি তোমার সরল প্রাণের অর্ঘ্যের দ্বারা আমার সেই জীবনকেই যা দিয়েচ তুমি কি মনে কর সে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক? তা যদি হ'ত তাহলে তুমি কখনই আমার কাছে আস্‌তে পেতে না। কেন না আমি জানি আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে দিয়ে তাঁর একটা কোনো বিশেষ কাজ আদায় করবেন বলেই শিশুকাল থেকে আমার জীবনকে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে নিচ্চেন। তাঁরি ডাকে আজ হঠাৎ তুমিও আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েচ। কি রকম অভাবনীয়রূপে এসেচ সে কথা মনে করলে আশ্চর্য্য হতে হয় না কি? আমার পক্ষে তুমি যে বন্ধন হয়ে আসবে এ কিছুতে হতেই পারে না, কেননা মুক্ত না থাক্‌লে, আমার মধ্যে যা সব চেয়ে বড় তাকে আমি ব্যক্ত করতে পারি নে, আর তা না করতে পারা আমার পক্ষে এক রকমের মৃত্যুরই মত। সেই জন্যেই তুমি আমার জীবনের প্রাঙ্গণে ফুল-ফোটা লতার মতই এসেচ, বেড়ার মত আস নি। তোমার সেই ফুলের গন্ধ আমার মনে লেগেচে। তারই আনন্দ আমার কাজের অনেক ক্লান্তি দূর করে, এবং অবকাশের মধ্যে গানের সুর লাগায়। আমি তোমাকে উপেক্ষা করে আমার জীবনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেচি এই কথা কল্পনা করে তুমি নিজেকে

কখনো অনর্থক ক্লিষ্ট কোরো না।

আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে আমি কলকাতায় এসেছিলুম। মনে হয়েছিল যেন কিছু কল বিগ্‌ড়েচে। আমি মেরামত-করা শরীর নিয়ে ব্যবহার করতে নিতান্তই নারাজ। এখানে এসে নীলরতন সরকারকে[২] দিয়ে দুদিন ধরে দেহটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলুম। তিনি বল্লেন, কল কোথাও কিছুই বিগ্‌ড়োয় নি; বল্লেন আমার নাড়ী যৌবনের নাড়ী। তবে আমি যে কথায় কথায় কেবলি ক্লান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়ি তার কারণ আমার দেহের শক্তি, বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ডের শক্তি, অতিরিক্ত খরচ করে দেহটাকে দেউলে করে আনচি— দেহযাত্রার পূর্ণ প্রয়োজনের জন্যে সর্ব্বদা যে পুঁজি হাতে রাখা উচিত অসাবধান হয়ে আমি সেটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছি। কিছুকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে আবার কিছু মূলধন সঞ্চয় করা বিশেষ আবশ্যক। যাই হোক্ একটা আশ্বাসের কথা এই যে, আমার দেহ মোটরগাড়ির পেট্রল অনেকখানি ফুরিয়ে এসেচে কিন্তু কল কোথাও ভাঙে নি, স্ক্রু কোথাও ঢিলে হয় নি। অতএব এখনো যতদিন দম সম্পূর্ণ ফুরিয়ে না যায় বসন্তের জয়গান করতে পারব।

কিন্তু তুমি এখন মনকে সুস্থির করে পড়াশুনায় লেগে যাও। পরীক্ষা-ফলের প্রতি উদাসীন হোয়ো না। আমি চীন থেকে ফিরে এসে[৩] তোমাকে প্রসন্ন প্রফুল্ল সুস্থ সবল দেখি যেন। ইতি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৩৩

২৮ মাঘ ১৩৩০

ওঁ

[শ্রীনিকেতন]

রাণু

তোমাকে কথা দিয়েচি যে তোমার চিঠি পেলে তোমাকে চিঠি লিখব—সজ্জনের বাক্য, শাস্ত্রে বলে, গজদন্তের মত, অর্থাৎ একবার যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে ভিতরে প্রত্যাহরণ করা যায় না। আজ সোমবার[১] অপরাহ্ণে তোমার পত্র বহুতর য়ুরোপাগত পত্রের সঙ্গে পাওয়া গেল,—হঠাৎ পত্রের পশ্চিম হাওয়ার ঝড় উপস্থিত হল, বারাণসী, অস্ট্রিয়া, জর্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংলন্ড, আমেরিকা থেকে চিঠি এসে আমার ডেস্ক ভরে দিলে। তুমি চিঠি পাঠিয়েচ ৯ই ফেব্রুয়ারিতে, আমি পেয়েচি ১১ই তারিখে। যদিচ আজি তার উত্তর লিখ্‌তে বস্‌লুম কিন্তু কালকের আগে ডাকে দেওয়া চল্‌বে না। তুমি পাবে বৃহস্পতিবারে। তুমি যে আমার দুটো পত্র একদিনে পেয়েছিলে তার মধ্যে আমার কোনো চাতুরী ছিল না, খুব সম্ভব প্রথম চিঠি যখন ডাকে দিয়েছিলুম তখন পোস্টের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে ঠাট্টায় পাছে তুমি ঠকো সেইজন্যে আজকাল এত বেশি সাবধান হয়েচ যে খুব সাদা কথাতেও তোমার সন্দেহ হয়। কোন্‌দিন হয়ত বলে বস্‌বে, "আপনি ভানুদাদা বলে আমার সঙ্গে চালাকী করেন, নিশ্চয় আপনি ভানুদাদা নন, নিশ্চয়ই আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে একজন বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার।" তখন আমি কি করে প্রমাণ করব যে, গ্রন্থকারটা হ'ল বাংলাদেশের পাঠকদের পরিচিত এক ভদ্রলোক, কিন্তু ভানুদাদা তাদের পরিচিত কেউ নয়; অতএব দুজনে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত প্রতিভা নিয়ে কিন্তু লোকটি মাটির মানুষ, অত্যন্ত বিনয়ী; আর ভানুদাদা আছেন যাঁকে নিয়ে তিনিও কোনো কোনো

মহলে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠ্‌চেন, সেই অহঙ্কারে এই ভানুদাদার আর মাটিতে পা পড়ে না। দুজনের প্রকৃতি আলাদা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়; আর ভানুদাদার বয়স সম্বন্ধে তর্ক আছে— অতএব লজিকশাস্ত্র যাঁরা সম্প্রতি অধ্যয়ন করতে সুরু করেচেন তাঁরা কখনই দুজনকে এক ব্যক্তি বলে সন্দেহ করতে পারেন না। আমি পরম্পরায় শুনেচি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতি বলে একখানি বই লিখেচেন, তার থেকে প্রমাণ হয় তাঁর জীবনও আছে স্মৃতিরও অভাব নেই; আর ভানুদাদাকে দুই একজন যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন উক্ত ভদ্রলোকের জীবন বলে পদার্থ ক্ষীণ পরিমাণে যদি বা থাকে স্মৃতি বলে কোনো বালাই নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সব গান রচনা করেন ভানুদাদা যদি সেগুলি তাঁর বিশেষ পরিচিত কোনো কোনো লোকের কাছে গাইতে চেষ্টা করেন তাহলে তার সুরও ভোলেন কথাও ভোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নাটক লেখেন ভানুদাদা তা অভিনয় করবার বেলায় সমস্ত গোলমাল করে' নিজের কথা বসিয়ে দিয়ে কোনো গতিকে কাজ সেরে দেন। কোনো কোনো রসিক লোকে সন্দেহ করে যে, ভানুদাদা গান ভুল করেন, নাটকের কথা উলটপালট করে দেন সেটা চিত্তবিক্ষেপের লক্ষণ— সেই চিত্তবিক্ষেপের কারণটি সঙ্গীতসভায় ও নাট্যমঞ্চে সশরীরে উপস্থিত থাকাতেই এইরকম দুর্গতি ঘটে। যা হোক্‌ জনশ্রুতি সবই যে বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

Elmhirst যখন কাশী দিগ্বিজয় করে আশ্রমে ফিরে এলেন তখন ভানুদাদা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সখে, রাণু নামধারিণী কাশীবাসিনী বালিকাকে কেমন দেখলে আমার কাছে প্রকাশ করে বল।" সাহেব বল্‌লেন, "বন্ধু she looked very happy." ভানুদাদা স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগ্‌ল, হঠাৎ এত happiness-এর কারণ কি ঘট্‌ল? দীর্ঘকাল ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "হে প্রিয়দর্শন, তাকে

কি কিছু কৃশ দেখ্‌লে? মুখ কি তার পাণ্ডুবর্ণ? সত্য বল, আমার কাছে গোপন কোরোনা।" সাহেব বললে, "উদ্বিগ্ন হোয়ো না, বন্ধু, সেই বরবর্ণিনীকে যেমন হৃষ্ট দেখ্‌লুম তেমনি পুষ্টও দেখা গেল, তবে কিনা তার মুখের বর্ণে যে পাণ্ডুরতার আভাস পাওয়া গেল সেটা নিশ্চয়ই কোনো প্রসাধনসামগ্রীর গুণে।" ভানুদাদা দীর্ঘতর কাল চিন্তা করে ও দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয় সুহৃৎ, সেই বালিকার প্রসাধনের উৎসাহ আজকাল কি কিছুমাত্র কমে নি?" সাহেব বললেন, "ভো বন্ধো, শুনে খুসি হবে, আমি যতক্ষণ ছিলেম, তার প্রসাধনপটুত্বের বৃদ্ধি বই হ্রাস ত দেখি নি।" ভানুদাদা ম্লানমুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করলে "আকাশের চাঁদকে দেখে তার কি কোনো প্রকার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে দেখেচ?" সাহেব বল্‌লে, "হে ধীমন্‌, তার চাঞ্চল্যের জন্যে আকাশের চাঁদের কোনো অপেক্ষা থাকে নি— নিকটবর্ত্তী কারণই যথেষ্ট।" তার পরে ভানুদাদা তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহ বোধ করলে না। বল্‌লে, "Good night!"

পূর্ব্বেই শুনেচ, রোজ সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের গান শেখাচ্চি। এত দিন প্রায় রোজই একটা না একটা নতুন গান চল্‌ছিল ইদানীং তাদের অনুরোধক্রমে পুরোণো গান ধরা গেছে। গত তিন দিন গানের বদলে তিনটে বড় বড় নতুন কবিতা লিখেচি।[১] তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠকেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেচে। তারা ভেবে রেখেছিল রবি ঠাকুরের কবিতার ডানা থেকে তার সব পালকগুলো ঝরে গিয়েচে, এখন সে কেবল গদ্যের চালে মাটির উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে, পদ্যের চালে মেঘলোকে উড়তে পারে না। কিন্তু রবি ঠাকুর অস্তাচলের ধারে এসেও তার ছটা বিস্তার করচে। তাতে রঙের ঘটার কৃপণতা নেই, বিচারকদের এই মত।

রাত হয়ে এল। আকাশে মেঘ করে রয়েচে— সন্ধেবেলায় এক চোট বৃষ্টি হয়েও গেচে— আবার হয় ত মাঝরাত্রে বৃষ্টি পড়বে— হু হু করে বাদলার ভিজে হাওয়া বইচে। সব নিঃশব্দ, কুকুরগুলো পর্য্যন্ত আজ ঘরের

মধ্যে আশ্রয় নিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে, বাইরের অন্ধকারে কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যাচ্চে। এর অনেক আগে শুতে যাওয়া উচিত ছিল— আমার দেহটা কিছুকাল থেকে আমাকে বল্‌চে ছুটি দাও ছুটি দাও। বহুকাল সে বিনা ওজরে আমার সেবা করেচে, এতদিন পরে তার ত্রুটি হতে আরম্ভ হয়েচে, সে জন্যে সে লজ্জিত— আপনার দৈন্য সে ঢাক্‌তে চায় কিন্তু নানা ছিদ্রে বেরিয়ে পড়ে। আজ আর তাকে তাগিদ্‌ করব না, বাতি নিবিয়ে দিই, শুতে যাই। কাল সকাল থেকে আমার অন্য কাজের তাগিদ আছে তাই রাত্রেই চিঠি সেরে রেখে দিচ্চি। ইতি ১০[১১] ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ভানুদাদা

১৩৪

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোমাকে ফী বারেই রাত্রে ছাড়া চিঠি লেখবার সময় পাই নে। কিন্তু সেটা উচিত বলে মনে করিনে। মনে কোরো না, আমি সামান্য বুদ্ধির লোক এত বড় কথাটা আমার মুখে শোভা পায় না। আমি নিজের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক মন্থন করে বল্‌চিনে— হাজার চেষ্টা করলেও বল্‌তে পারতুম না। কিন্তু পৃথিবীতে অধিকাংশ বড় বড় জ্ঞানী লোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন, যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্য্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য্য গবেষণা এবং যুক্তিনৈপুণ্য প্রয়োগ করে বলেচেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না

হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে আমাদের দর্শন মননশক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হলে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হয়ে আসে? গভীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোন উত্তর দেওয়া যায় না— কাজেই পরাস্ত হয়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তার সব ভাষ্য ঘেঁটে বলেচেন, যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা— ঘুম হলেই অনিদ্রা বলে' জগতে কোন পদার্থ থাক্‌তই না। এত বড় কথার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝতেই পারি না— আমাদের ত দিব্য দৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যানধারণা নিদিধ্যাসন করি নি— সেইজন্যে সংশয়কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক করে থাকি, যে, রাত্রে কয়েক ঘন্টা না ঘুমোলেই সেটাকে অনিদ্রা বলে' নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্তত বারো ঘন্টাই যে কেউ ঘুমোই নে সেটাকে ডাক্তারীশাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই ত অনিদ্রা বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্ব্বাচীন বলে হাস্য করেন, বলেন আজকালকার ছেলেরা দু'চার পাতা ইংরেজি পড়ে তর্ক করতে আসে, জানে না যে, "বিশ্বাসে মিলায় নিদ্রা তর্কে বহু দূর"। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না— কারণ, বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তর্ক যতই করতে থাকি নিদ্রা ততই চড়ে যায়; বিনা তর্কে তার হাতে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব, আজকের মত চিঠি বন্ধ করে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তা হলে কাল সকালে চিঠি লিখব। কিন্তু চিঠি যে লিখ্‌তেই হবে তার কি কোনো অনিবার্য্য কারণ আছে? কারণ না থাক্‌লে যখন কার্য্য হয় না তখন অবশ্যই আছে। শুনে হঠাৎ মনে হয় কারণটা আছে আমার বাইরে— দূরে কোনো একটি বালিকার মধ্যে, আমার চিঠি না পেলে তার দুঃখ হবে সেই দুঃখের মধ্যে। কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখা যায় কারণটা আমারই অহঙ্কারের মধ্যে। আমি চিঠি না লিখ্‌লে বালিকা দুঃখ পাবে এটা কল্পনা করার মধ্যে অহঙ্কার আছে বই কি। সেই অহঙ্কারে আমাকে খামকা চিঠি লিখ্‌তে প্রবৃত্ত করেচে এই ঘনান্ধকারা যামিনীতে, এই ঝিল্লিমুখরিতা,

শান্ত পথিকসঞ্চরা, নীরব বিহঙ্গ কলকাকলী, ক্বচিৎ শিবা-রুত মন্দ্রিতা, ক্বচিৎ "ভোঁদা"-কুক্কুর-ক্রন্দিতা নিশীথিনীতে। কলু ঘানিতে গোরু জুড়ে দিয়ে যখন তেল বের করে তখন তার চোখে ঠুলি দিয়ে দেয়— সেই ঠুলিতে অন্ধ হয়ে সে বিশ্বে নিজেকে ছাড়া আর কিছুকেই উপলব্ধি করতে পারে না— তখন সে নিজেকে নিয়ে কেবলি ঘুরতে থাকে আর কলু আদায় করে নেয় তার তেল। প্রকৃতি তেমনি আমাদের অহঙ্কারে অন্ধ করে সেই ঠুলির জোরে কেবলি খাটিয়ে মারেন— নইলে তাঁর কাজ চলে না। চিঠি লিখ্‌চি ত চিঠিই লিখ্‌চি! কেনরে বাপু, হয়েচে কি? অহঙ্কার! আচ্ছা না হয় অল্প একটুখানি লিখে শুতে যাও না— জো কি! বড় চিঠি লিখ্‌লে কেউ একজন খুসি হবে! অহঙ্কার, অহঙ্কার!— এত বড় নিঃসংশয়ে তুমি জান্‌লে কি করে' যে সে খুসি হবে? অহঙ্কার. অহঙ্কার! আমার চিঠির অপেক্ষায় ডাক-হরকরার পদধ্বনি গণনা করচে না, একি হতে পারে? অহঙ্কার, অহঙ্কার। নিশ্চয়ই সে "সচকিতনয়নং পশ্যতি পেয়াদা-পন্থনং"— অতএব লেখ, লেখ, থাক্‌ নিদ্রা, থাক্‌ আরাম। মায়া দিয়ে মায়ার জগতের বিস্তার হতে থাকে ; ভালো করে কিছুই জানি নে, কিছুই বুঝতে পারিনে ; আন্দাজের গোধূলির আলোতে কতই যে জাল বুনচি, আর সেই জালে ঘুরে ফিরে নিজেকে জড়াচ্চি। উজ্জ্বল আলোতে সুস্পষ্ট করে' সব কিছু দেখ্‌তে পেলে মানুষ অনেক স্বকপোল কল্পিত অনাবশ্যক তাগিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে— তখন বিশ্বশতদলের ঠিক যেখানটাতে মধুকোষ সেখানে পথ পেতে তার বিলম্ব হতে পারে না— আর তার পরে সে আপনার অহঙ্কার ভুলে সব ভুলে সেই সুধারসের মূল কেন্দ্রে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, শান্ত হয়, কৃতার্থ হয়।— এই দেখ, কি কাণ্ড! হাস্যরসের চঞ্চল স্রোত বেয়ে হঠাৎ তত্ত্বজ্ঞানের গম্ভীর গুহার মধ্যে প্রবেশ করবার উপক্রম করেচি। রাত্রে চিঠি লেখার ঐ ত দোষ! রাত্রিচর পাখীরা গম্ভীর পাখী, তারা গান গায় না, সে ত জান। রাত্রিচর চিন্তারাও কোন্‌ অন্ধকার নীড়ের ভিতর থেকে দেহধারী ছায়াদলের

মত বেরিয়ে এসে অন্ধকারতর অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখে পাখার ঝাপট দিয়ে চলে যায়। চিঠিপত্রের মধ্যে তাদের বাসা বাঁধতে দেওয়া কিছুতেই ভালো নয়। অতএব চিঠি বন্ধ করা যাক্, কেরোসিন্ প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক্, ঝপ্ করে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক্। শীত,— বেশ একটু রীতিমত শীত,— উত্তর পশ্চিমের দিক থেকে হিমেল হাওয়া বইচে। দেহটা বলে উঠ্চে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়— তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ করে' মোটা কম্বলটা মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো— অনন্যগতি আমি তোমার আজন্মকালের অনুগত, আর আমরণকালের সহচর— তাই বলেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে? দেখ্চ না, পা দুটো কি রকম ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে, আর মাথাটা হয়েচে গরম, বুঝ্চ না কি এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতিভঙ্গের লক্ষণ— এ সময়ে মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণ করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম্ম?" কায়ার এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন বলে' উঠ্চে, "ঠিক্, ঠিক্! একটুও অত্যুক্তি নেই।" ক্লান্ত দেহ এবং উদ্ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা করতে পারিনে— অতএব চল্লুম শুতে—

প্রভাত হয়েচে। তুমি আমাকে বড় চিঠি লিখ্তে অনুরোধ করেচ। সে অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাবসঙ্গত নয়, পল্লবিত করে' পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখিনে বলে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা করে থাকেন,— মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখ্তে পারি নে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী এবং তখন আমার চিঠি অগত্যা যথেষ্ট বিরল হয়ে আস্বে সেইজন্যে আগামী অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে বড় চিঠি লিখ্চি। সে অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব, এবং সেটা পূরণ করবার আর কোনো উপায় নেই এটা কল্পনা করচি নিছক অহঙ্কারের জোরে। কিন্তু অহঙ্কার

রিপুটার সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায় কাল রাত্রে লিখেচি, দ্বিতীয় অধ্যায় আজ দিনে লিখ্‌তে বস্‌লে সইতে পারবে না।— আসল কথাটা এই যে, এবার তুমি যে-চিঠিটা লিখেচ সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়— সেই জন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্ব্বে বড় চিঠি লিখ্‌চি। তুমি নাম্‌তায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার কর্ম্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তারবিদ্যায় কিছুতেই আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না। এই এক্‌টি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিৎ আছে সেইখানে তোমার অহঙ্কার খর্ব্ব করবার ইচ্ছা আমার মনে এল। কিন্তু দেখ্‌লুম অপর ব্যক্তির ইংরেজি চিঠি উদ্ধৃত করে তোমার চিঠির কলেবর পূরণ করেচ। এখানেও তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি সেইটে আজ প্রমাণ করব। যে চিঠির থেকে উদ্ধৃত করচি সেটা অপেক্ষাকৃত পুরাতন কালের— তার লেখক আমি নিজে— পিয়র্সনকে লিখেছিলুম।[১] তুমি যে যুবকের চিঠি থেকে তুলে দিয়েচ, এ চিঠিতে সে চিঠির রস পাবে না। কিন্তু যেহেতু এর বিষয়টা তোমার কাছে জগতের সকল বিষয়ের চেয়ে বেশি ঔৎসুক্যজনক সেইজন্যে বোধ হচ্চে এটাতেও তোমাকে কিছুপরিমাণে আমোদ দেবে।

I am very much amused to find in your letter how your vanity comes out when you describe your latest love adventure with a heroine of ten. But I feel sure that you will turn green with envy when you learn my own achievement in that direction. My sweetheart is a girl of eleven with a wonderful power of insight which has led her to discover in me the permanent dominance of the age 27. I had a suspicion of this myself, but waited for corroboration from a fresh mind unsophisticated. But once for all, the exploration has been done, the flag of possession properly hoisted, and my lost continent of the Eternal 27 has been recovered and captured by a brave little girl of eleven. Of all things for which I miss you so much this fact is one of the most important, for your rivalry would have greatly added to my triumph. I am certain that with all the tokens of your obvious youthfulness you would have found it hard to produce your runaway 27th year and lay claim to a youth which is at all durable. I hope Andrews will be able to give you a truthful account of this episode in my life in a more sober style than I can summon in my present state of exultation.

বাস্। আর নয়। কিন্তু এ চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে তখন থেকেই অহঙ্কারের সূত্রপাত হয়েচে। অবশেষে বোধ হয় দর্পহারী মধুসূদন আছেন— অহঙ্কার চূর্ণ হতে আর দেরি নেই। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩৩০

ভানুদাদা

১৩৫

[২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

আজ রবিবার। কাল শনিবারে তোমার চিঠি শান্তিনিকেতনে আমাকে খুঁজতে গিয়েছিল। যেখানে ডেস্কে বসে লিখে থাকি সেখানে একবার উঁকি মারলে, দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই। যেখানে বৌমার খাবার ঘরে খেতে

যাই সেখানে ঘুরে এল, দেখ্‌লে সেখানেও আমি নেই। লীলমণির কাছে খবর নিতে গেল। হাঁক দিল, লীল্‌মণি, লীল্‌মণি! কোথাও তার সাড়া পেল না। শেষ কালে খবর পেলে চিঠির মালেক কলকাতায় চলে এসেচে, আর সঙ্গে এসেচে তার সবেধন লীলমণি। তখন পোষ্ট্‌ব্যাগের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করলে আর জোড়াসাঁকোয় আমার দক্ষিণহস্তের উপর অবতরণ করলে। এক ম্যালেরিয়া নিবারিণী সভা হয়েচে তাদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করব বলে কিছুকাল পূর্ব্বে কথা দিয়েছিলেম। তাই দায়ে পড়ে এই ক্লান্ত রুগ্ন দেহ টেনে টেনে কলকাতায় এসেচি। ম্যালেরিয়া সভায় বক্তৃতা করে এসেচি[১] যে, ম্যালেরিয়া রোগটা ভাল জিনিষ নয়— ওর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়ে শ্রীমতী ম্যালেরিয়াকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করবার চেষ্টা করলে ও দেখ্‌তে দেখ্‌তে সর্ব্বাঙ্গিনী হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রেয়সীরা হৃৎকমলে স্থান গ্রহণ করে থাকেন কিন্তু শ্রীমতী ম্যালেরিয়া হচ্চেন যকৃৎবাসিনী, প্লীহাবিনোদিনী। কবিরা বলে থাকেন প্রেয়সীর আবির্ভাবে হৃদয়ে ঘন ঘন স্পন্দন উপজাত হয়, কিন্তু ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবে সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু স্পন্দিত হতে থাকে। অবশেষে অত্যন্ত তিক্ত উপায়ে তার বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে একবার মিলন হলে বারে বারে সে ফিরে ফিরে আসে। তাই আমি করুণকণ্ঠে সানুনয়ে সকলকে অনুরোধ করে বলেছিলেম, "ভদ্রমহিলাগণ এবং ভদ্রলোক সকল, ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে, সর্ব্বমানবের নামে আমি আপনাদের নিবেদন করচি, কদাচ আপনারা ম্যালেরিয়াকে প্রশ্রয় দেবেন না, আপনাদের প্লীহা ও যকৃতকে কদাচ তার চরণে উৎসর্গ করবেন না। আর যদি কখনো শোনেন মশা কানের কাছে মৃদুমন্দ গুঞ্জনধ্বনি করচে তবে তার সেই মায়ায় ভুলবেন না, যদি দেখেন সে আপনাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেচে তবে নির্ম্মমভাবে এক চপেটাঘাতে তাকে বিনাশ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য ডাক্তারাণ্ নিবোধত!" আমার সেই সারগর্ভ চিন্তাপূর্ণ

উপদেশ বাক্যে, আমার সেই জ্বালাময়ী বাগ্মিতায় সেই সভায় এমন অল্পবুদ্ধি, এমন জড়প্রাণ একজনও ছিল না ম্যালেরিয়ার অপকারিতায় যার কিছুমাত্র সংশয় ছিল। সকলেই বারবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "ধন্য সার্ রবীন্দ্রনাথ, ধন্য ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, ধন্য বিশ্ববরেণ্য কবি, ম্যালেরিয়া যে এমন সর্ব্বনাশিনী এ কথা এমন ওজোময়ী বিশদভাষায় আর কোনোদিন কারো কাছে শোনা যায় নি। আজ হতে আমরা সকলেই দৃঢ় সঙ্কল্প হলেম আর কোনোদিন ম্যালেরিয়ার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রাখবো না, আর মশা গায়ে বসলেই হয় তালবৃন্ত ব্যজনে তাকে দূরীকৃত করব, নয় বীরোচিত অধ্যবসায় সহকারে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে তাকে যমসদনে প্রেরণ করব।" আমার বক্তৃতার এই আশু ফল দেখে আমি বড়ই তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেচি। সভা থেকে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে চিৎপুর রোডের জনতার মাথার উপর দিয়ে আমার দেশজননীর যেন আশীর্ব্বাণী ট্রামের ঘর্ঘর নিনাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আমার কর্ণকুহরে বাজতে লাগ্‌ল— "বৎস, সার্থক তোমাকে জন্ম দিয়েচি।" আমারও মনে হতে লাগ্‌ল, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা এই যে সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরলা বঙ্গভূমিতে আমি এতদিন জীবন-যাপন করে এলুম, আজ তার ঋণ শোধ করতে পারলুম, আজ আমার ভাই বাঙ্গালীকে— যে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্যের বংশধর, যে বাঙালী সিংহলজয়ী বিজয়সিংহের বিজয়গৌরবমণ্ডিত, যে বাঙালী রঘুনন্দনের স্মৃতিভাষ্যের জটিল বটবৃক্ষচ্ছায়ায় লালিত সেই আমার ভাই বাঙ্গালীকে আজ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি যে ম্যালেরিয়া একটা রোগ, এবং যে-কেহ স্বাস্থ্য লাভ করতে ইচ্ছুক এই রোগের হাত থেকে তার পরিত্রাণ পাওয়া চাই।

আবার কাল শান্তিনিকেতনে ফিরব।[২] আগামী ১০ মার্চ্চে মঞ্জুর বিবাহ।[৩] সেই বিবাহে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। বোধহয় ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলকাতায় আসব, তারপরে ১৪ই মার্চ্চে চীনে যাত্রা করব। খুব বেশি উৎসাহ বোধ হচ্চে না, কেননা শরীর ভাল নেই। কিন্তু চীনের নিমন্ত্রণ

অস্বীকার করা চলবে না।

এতক্ষণ তোমার সঙ্গে হাসি তামাসা করেচি এখন একটু গম্ভীর হতে হবে। ইচ্ছে করেনা গম্ভীর হয়ে তোমার মনকে নাড়া দিতে— কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক বলেই তোমাকে বলচি। তোমার একটা কথা বিশেষ জানা উচিত যে তোমার সম্বন্ধে বুড়োদের[৪] বাড়িতে কুশ্রীরকম অপমানজনক কথাবার্ত্তা চল্‌চে। এমন একটা অবস্থায় এসে ঠেকেচে যে তোমার সঙ্গে বুড়োর বিবাহ কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। অথচ তুমি এখনো যদি বুড়োকে চিঠি লেখ তাহলে কেবল যে তোমারই আত্মসম্মানের হানি হবে তা নয় তোমার বাপ মায়ের প্রতি অবমাননা টেনে আনবে। আমি গোপনে বলচি তোমার সম্বন্ধে তোমার বাবাকে অপমান করতে বুড়োর বাড়ি থেকে আর একটু হলে চেষ্টা করা হচ্ছিল এ সত্ত্বেও যদি তুমি বুড়োকে চিঠি লিখ্‌তে না ছাড়ো তাহলে তাকেও তুমি বিপদে ফেল্‌বে, নিজেদেরও অপমানিত করবে, আর তা ছাড়া এতে আমারও খুব লাঞ্ছনা হবে। আমার সম্বন্ধেও ওদের বাড়িতে আলোচনা চল্‌চে তুমি যদি এখনো আত্মসংবরণ করতে না পার তাহলে আমার পক্ষেও গুরুতর লজ্জার কারণ হবে। অবশ্য জানি, আমি না বুঝে গোড়াতে প্রশ্রয় দিয়েচি— সেটা আমার গভীর বেদনা ও অনুশোচনার বিষয় হয়ে রয়েচে। অনেকটা পরিমাণে আমারই উৎসাহে যখন বুড়োর প্রতি তোমার হৃদয় আবদ্ধ হয়ে পড়েচে, তখন হঠাৎ সেদিক থেকে তোমার ভালোবাসা প্রত্যাহরণ করতে বল্‌লেই যে অমনি তখনি সেটা সুসাধ্য হবে এটা আশা করাই যায় না। কিন্তু ভালোবাসারও ত একটা আত্মসম্মান এবং একটা দায়িত্ব আছে। বুড়োকে যখন তুমি ভালোবাসো তখন বুড়োর কল্যাণের কথাও ত তোমার ভাবা উচিত।[৫]

[১২ ফাল্গুন ১৩৩০]

[স্বাক্ষরহীন। অসম্পূর্ণ?]

১৩৬

২ মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

সেই তেতলার কোণের ঘর, সেই নীচের বিছানা, সেই তাকিয়ার গিরিমালা, আর মাথার উপর সেই পাখা ভ্রাম্যমান, আর সেই ভানুদাদা the Mysterious। তফাতের মধ্যে এই যে, পাশ ফেরবার সময় এখন আর পাড়াসুদ্ধ লোক খবর পায় না। এমন কি কম্পিতচরণে চলেও বেড়াতে পারি। তাই বলে লম্বা চিঠির দাবী করলে রক্ষা করতে পারব না। এতদিন পরে আজ মাথার উপর জল ঢেলে স্নান করেচি— তবুও চল্‌তে যেমন পা টলে লিখ্‌তে পড়তেও তেমনি মাথাটা টলোমলো করে। তাই অধিকাংশ সময় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে কাটাই। মাঝে মাঝে গগন বাবু[১] এসে দেখা করে যান,— প্রায়ই একজন বিশেষ লোকের কথা তিনি আলোচনা করেন— আমার বিশ্বাস সেই আলোচনা করবার জন্যেই তিনি আসেন আমাকে দেখবার জন্যে না। তিনি উক্ত ব্যক্তির অনেক গুণ আবিষ্কার করেচেন— তার তালিকা যদি দিই পত্রে স্থান হবে না। তাঁর বড় দুঃখ যে এতবড় গুণীর অভিনয় জগতের লোক দেখতে পেলে না। আমি যতটা পারি তাঁকে সান্ত্বনা দিই। তোমার কোনো খবর কেন পেলুম না? সন্তোষ[১] একেবারে বোলপুরে ফিরেচে নইলে তার কাছ থেকে তোমার খবর আদায় করে নিতুম। ইতি ১৯ ফাল্গুন ১৩৩০

ভানুদাদা

১৩৭

৭ মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

কলকাতার ঠিকানায় লিখেচ বলে তোমার চিঠিখানি আজ এইমাত্র পেলুম। তোমাকে যে বেদনা দিয়েছিলুম তারি কান্নার চিঠি এতদিন পেয়ে আসচি। তুমি জাননা এতে আমাকে কত ব্যথিত করে তুলেছিল। আমার পরের চিঠি পেয়ে তোমার হৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা অনেকটা দূর হয়েচে এইটি জানবার জন্যে আমার মন অপেক্ষা করেছিল। সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় বইতে থাকে তখন তার সমস্ত অশ্রুরাশি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে— ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ থাকে ঢেউয়ের ভিতরকার সেই কান্না, তোমার এই চিঠির ভিতরেও তোমার ব্যথার সেই ঢেউ এখনো যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌চে। যাক্ সে ঝঞ্ঝা কেটে গেছে— এখন তোমার মনের উপর একটি প্রশান্ত প্রসন্নতা মেঘমুক্ত প্রভাত আলোর উপর বিকীর্ণ হোক। এতে তোমার ভালোই হবে রাণু— দুঃখের এই মন্থনের ভিতর দিয়ে নিজের অন্তরের গভীরতাকে তুমি উপলব্ধি করেচ— এ আর তুমি কখনো ভুল্‌তে পারবে না। কুমারসম্ভবের গল্প ত জান। জীবনকে হাল্কা করে' জীবনের চরম সাধনার জিনিষকে পাওয়া যায় না। গভীর দুঃখের তপস্যায় নিজের পরম পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করা যায়। এই দুঃখের আঘাত তোমাকে চিরদিনের মত উদ্বোধিত করুক, জীবনের উপরিতলের চঞ্চল ফেনিলতার ভিতর দিকে নিজের মধ্যেকার যা শ্রেষ্ঠ তাকেই লাভ কর। অনেকদিন আমি এই ভেবেচি, আমি ইচ্ছে করেচি, আমি তোমাকে আর কিছু দেবার অবকাশ যদি না পাই তবে যেন তোমার গভীরতম আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

চীনে যাবার দিন কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। ২৮শে মার্চ আমাদের

জাহাজ ছাড়বে। পথটা অনেকদূর পর্য্যন্ত খুব গরম হবে। তার পর যখন চীনের উত্তর অংশে যাব তখন আবার ঠাণ্ডা পাব। পথে সমুদ্রের উপর বেশ বিশ্রাম করতে পারব। ঢেউয়ের দোলায় আমাকে আজকাল আর দুঃখ দেয় না। প্রথম যখন সমুদ্রের পরিচয় পেয়েছিলুম তখন সেটা একবারেই সুখকর হয় নি। তিনদিন এত বেশি কষ্ট হয়েছিল যে যদি জাহাজ ডুবত তা হলে আমি উদ্বিগ্ন হতুম না। গেলবারে জাপানে যাবার সময় বঙ্গোপসাগরে প্রলয় ঝড়ের দোলা খেয়েও আমি কাতর হই নি। বাইরের দোলায় আমাকে কাবু করে না বটে কিন্তু ভিতরে যাত্রিদের গোলমাল, আর তাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা জটলা করে থাকা, আমার পক্ষে ভারি অসহ্য। সিঙ্গাপুর পর্যন্ত আমরা ইংরিজি জাহাজে যাব— অতএব ঐ ক'টা দিন ইংরেজের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করতেই হবে। ইংরেজের উপর আমার কোন রাগ নেই কিন্তু এসিয়ার গরম হাওয়ায় যাদের মেজাজ একেবারে পাকা রকমে গরম হয়ে গেচে তাদের কাছে গেলে সাত হাত দূর থেকেই গায়ে যেন কড়া আঁচ লাগ্‌তে থাকে। কিন্তু জাপানী জাহাজে ভারি আরাম। ওরা এত ভদ্র, আমাকে এত যত্ন করেছিল, এবারেও আমাকে ওদের জাহাজে নিয়ে যাবার জন্যে এত আগ্রহ করচে, যে ওদের জাহাজে আমি যেন মান্য অতিথির মত থাক্‌তে পাব। আরবারে জাহাজের কাপ্তেন আমাকে তার নিজের নাবার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল— ডেকের উপরে যেখানে যেমন করে খুসি বসে লেখাপড়া করতে পারতুম। ইংরেজের জাহাজে সে সম্ভাবনামাত্র নেই।

ক্রমে গরম পড়ে আসচে। ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতরটাতে বসন্তকালের ডাক এসে পৌঁচচ্ছে। এমন এই জোড়াসাঁকোর গলিতেও তার স্পর্শ যেন রক্তের মধ্যে নাড়া দিয়ে যায়। এখন কি চীনে যেতে একটুও ইচ্ছে করে? এই রোদ্দুরের রংটা আমার চোখেতে কি রকম নেশা লাগায়। চিরদিনই কি আমার এইরকমই চলবে? ছেলেবেলাতেই এই অপরূপের স্পর্শ যেরকম

উতলা করে দিত এখনো ঠিক তাই করে। সেইজন্যেই কোনোমতেই পাকা কাজের লোক হয়ে উঠ্‌তে পারলুম না— প্রকৃতির খেলার অঙ্গনেই আমার সময় কেটে গেল। এই জোড়াসাঁকোর গলিতেও দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনটে কবিতা লিখেচি।[৪] কাগজে ছাপা হলে কোনো সময় পড়ে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু যার কবিতা, তার নিজের মুখে শুন্‌লেই তবে ওর রসটা পূরোপূরি পাওয়া যায়। আমার মুষ্কিল এই যে, যে কবিতা নতুন লিখি তারই রস আমার কাছে তাজা থাকে, পুরোণো হলেই তার সুরটা আমার নিজেরই কাছে মোটা হয়ে আসে, আমি তাকে ঠিক সুরে পড়তে পারি নে।— আগামী রবিবারে কলকাতায় আমাকে একটা সভাপতির কাজ করতে হবে[৫]— তার পর দিন মঞ্জুর বিয়ে। তার পরে মঙ্গলবারে[৬] শান্তিনিকেতনে গিয়ে জাহাজ ছাড়বার [আগে] দুই একদিন পর্য্যন্ত চুপ করে বসে চীনের বক্তৃতা লিখব। ইতিমধ্যে তুমি মনকে ঠাণ্ডা করে বেশ ভালো করে পড়াশুনো করে নিয়ো রাণু। আজ আর দেরি করলে ডাক ধরতে পারা যাবেনা।

তোমার ভানুদাদা

১৩৮

[১১ মার্চ ১৯২৪]

*Rabindranath Tagore

[কলকাতা]

রাণু

কলকাতায় যখন শেষবার এসেছিলুম তখন তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছিলুম। আজ আবার শান্তিনিকেতনে যেতে হবে আজ একখানি লিখ্‌তে

বস্‌লুম। তোমার সঙ্গে কথা ছিল যে তোমার চিঠি পেলে তবে তার উত্তর দেব, আজ তার ব্যতিক্রম করা হল তার কারণ বলি। কথা ছিল আমাদের জাহাজ ২৭শে মার্চ্চে ছাড়বে— তার পরে হঠাৎ শোনা গেল ২১শে মার্চ্চে। অর্থাৎ আর প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে। এই কয়দিন আমার সময় খুব অল্পই থাক্‌বে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে চীনের জন্যে একটা লেকচার লিখ্‌তে। তা ছাড়া বিদায়ের পূর্ব্বে এই কয়দিন নানা রকম কাজের আর নানা রকমের লোকের ভিড় থাক্‌বে। সুবীর[১] এসেছে, তার কাছে শুন্‌লুম যে, তোমাদের পরীক্ষা আগামী ৩১শে তারিখে। নিশ্চয়ই এতদিন নানা গোলেমালে তোমার পড়াশোনার পক্ষে অন্তরে বাহিরে নানা রকম ক্ষতি হয়েচে। এই কয় সপ্তাহ বিনা বিঘ্নে, মনকে শান্ত রেখে পরীক্ষার জন্যে ভালরকম করে প্রস্তুত হতে পার এই হলেই ভাল হয়। আমাকে চিঠি লেখবার জন্যে তুমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হোয়ো না। যদি এর মধ্যে অল্প কিছু অবকাশ পাও এবং সহজেই লিখ্‌তে পার তা হলে ছোট্ট চিঠিতে তোমার যা কিছু মনের কথা বা গল্প বলবার আছে বল্‌তে পার। চিঠির আয়তন বড় হলেই যে বড় চিঠি তাকে বলে তা নয়। যে চিঠি সহজ স্বাভাবিক, যার ভিতর দিয়ে লেখকের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাওয়া যায়, যার ভিতরে মুখ চোখের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত যেন প্রকাশ পায় সেই চিঠিই চিঠি। আসল কথা যখন দূরের লোক চিঠির ভিতর দিয়ে সাম্‌নের লোক হয়ে দাঁড়ায় তখনি চিঠির কাজ হয়। কিন্তু যখন কেবল কথা শোনা যায় গলা শোনা যায় না, হাতের অক্ষরে দেখা যায় মুখের ভাব দেখা যায় না, তখন সে চিঠি মরা চিঠি। তোমার চিঠিতে তুমি ঠিক প্রকাশ পাও— তার কথা তোমাকে একটুও ছাপিয়ে ওঠে না। আমার চিঠি অনেক সময়েই কেবল রচনামাত্র। তার কারণ হচ্চে এই, আমি অনেক সময়েই কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করি। এই যে এতকাল ধরে লিখে এসেছি সব লেখাতেই কিছু না কিছু বিষয় আলোচনা করেচি। এই জন্যে কলম হাতে লিখ্‌তে বস্‌লেই

অভ্যাসক্রমে মানুষের চেয়ে বিষয়টাই বড় হয়ে ওঠে— তাতে করে চিঠিটা মারা যায়। সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের [চেয়ে] ভাল চিঠি লেখে, তার কারণ, মেয়েরা আপনাকে প্রকাশ করে, পুরুষরা চিন্তাকে প্রকাশ করে। তুমি যখন যা' তা' নিয়ে গল্প করে যাও শুন্‌তে বেশ ভাল লাগে, কেননা, সেই কথার ধারা তোমার প্রাণের ধারা। তোমার চিঠিও সেই রকম। তাই বল্‌ছিলুম, তুমি যতটুকু সহজেই লিখ্‌তে পার, তাই লিখো ; যখন আমার সঙ্গে অল্প একটু সময়ের জন্যে কথা কয়ে নিতে ইচ্ছে হবে তখন লিখো। পড়াশুনো ফেলে তাড়াতাড়ি করে লিখ্‌তে যেয়ো না, আর বেশি লিখ্‌তে হবে তাও মনে কোরো না।

কাল সন্ধের সময় মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গেল।[১] আজ সকালে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বিয়ের কিছুদিন আগে থাকতেই ওর কান্না সুরু হয়েচে। ওর কান্না দেখে বুঝতে পারি মেয়েদের পক্ষে প্রথম শ্বশুর বাড়ি যাওয়া বল্‌তে কতখানি বোঝায়। স্বামীর উপর কতখানি ভালোবাসা থাক্‌লে এই বন্ধন ছেদনটা সহজ হয় তা ঠিক বুঝতে পারা পুরুষদের পক্ষে শক্ত। মঞ্জুর এই কান্নাটা নিশ্চয়ই ক্ষিতীশের মনকে খুব বেদনা দিচ্চে, তবে মনে হয়ত সংশয় হচ্চে মঞ্জু তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে কি না। এই সংশয়ের উপর এই অনিশ্চয়ের উপরই মানুষের বড় বড় ট্রাজেডির পত্তন। আমরা জেনেশুনে যে সব দুঃখের সৃষ্টি করি তার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে পারি। কিন্তু কেই বা ঠিক করে অন্যের মন বুঝতে পারে, আর নিজের মনই বা নিশ্চিত বোঝে ক'জন। এই রকম আলো আঁধারে নিজের অগোচরেই যতরকম উৎপাতের সৃষ্টি হয়। আমি অনেকবার ভেবেচি মঞ্জু ক্ষিতীশকে ঠিক কতখানি ভালোবাসে? এ ত ভালোবাসার মরীচিকা নয়? মঞ্জুই কি তা ঠিক বল্‌তে পারে? উপস্থিতমত সে কি একটা মনে করে নিয়েছিল, তার পরে তার সত্যের পরীক্ষা ধীরে ধীরে হতে থাকবে। কিন্তু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, দুজন মানুষের মধ্যে যদি অত্যন্ত

বেশি পার্থক্য না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে সংসারবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনও পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। যখন পরস্পরের সুখ দুঃখ ও সাংসারিক ক্ষতিলাভকে একান্তভাবে অন্তরঙ্গভাবে আপন করে নিতেই হয় তখন তারই যোগসূত্র দু'জনকে ধীরে ধীরে এক করে' আনে। জীবনের সম্মিলন থেকেই হৃদয়ের সম্মিলন হতে থাকে। দুজনের সম্মিলিত জীবনের ঐক্যের ভিত্তির উপরেই সংসারের সৃষ্টি হয়। এই সংসারটিই হচ্চে মেয়েদের সৃষ্টিক্ষেত্র, এইখানেই তাদের সমস্ত শক্তি আপনাকে কল্যাণের মধ্যে সুন্দরের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে বলে এইখানে যে-মানুষকে মেয়ে আপনার একমাত্র অংশীরূপে পায় তার মূল্য আপনিই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। মঞ্জু আজও তার নিজের সংসারটিকে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে নি বলেই তার মা বাপের সংসার ত্যাগ করে যেতে তার এত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তার আপন জীবন দিয়ে তার সংসার সৃষ্টি করতে পারবে, সেই মুহূর্ত্তেই তার বাপমায়ের সংসার তার কাছে ছায়ার মত হয়ে যাবে।

এবারে এখনো তেমন গরম পড়ে নি। যদিও এখন বেলা দুটো, তবু হাওয়া তেতে ওঠে নি। বাতাসটি বেশ মিষ্টি হয়ে বইচে, বেশ লাগ্‌চে। তুমি ত আমার এখানকার শোবার ঘরটা জান। সেইখানে বসে লিখচি। সামনে আমার পশ্চিম দিক। গগনদের বাড়ির সাম্‌নেকার সেই নিম গাছটির পাতায় পাতায় রোদ্দুর ঝিলমিল করে উঠ্‌চে। এ কয়দিন বিয়ের গোলমালের অবসানে আজ ক্লান্তিতে সবাই ঘরে ঘরে ঘুমচ্চে— লালবাড়িটার সামনে বাঁশের উঁচু মাচা করে যে নহবৎখানা তৈরি হয়েছিল সেটা শূন্য এবং নিঃশব্দ পড়ে আছে— ছাদের উপর বাঁশের খুঁটির উপর পাল খাটিয়ে খাবার জায়গা করা হয়েছিল সে সমস্তই অত্যন্ত নিরর্থকভাবে খাড়া আছে, কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই, জলের জালা, উদ্বৃত্ত কলা পাতা, খুরি, উৎসবসজ্জার নানা ভগ্নাবশেষ, আবর্জ্জনা হয়ে চারদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। মিনু° শ্রীমতী° রেখা° প্রভৃতি মঞ্জুর সখীরা পাশের ঘরে বৌমা আর মীরার

সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত, পুপে তারও পরের ঘরটায় ঘুমচ্চে। কালকের ভোজের উচ্ছিষ্টের আকর্ষণে কাকের দল জড় হয়ে খুব কোলাহল বাধিয়ে দিয়েচে। শরীরটা অবসন্ন হয়ে আছে। কিন্তু এই শান্ত মধুর হাওয়ায় বেশ আরাম বোধ করচি। এইবার চিঠি বন্ধ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা উচিত হবে। কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুমোই নি। তুমি নিশ্চয়ই এখন তোমাদের কলেজে কোনো না কোনো লেকচারে মনোনিবেশ করে আছ— ঠিক এই সময়ে আমি যে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি একথা তোমার কল্পনা করবারও অবসর নেই। [২৮ ফাল্গুন ১৩৩০]

ভানুদাদা

কাল ভোরের
গাড়িতে
শান্তিনিকেতনে
যাত্রা করব।

১৩৯
১৩ মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আমাকে চীন থেকে যে নিমন্ত্রণপত্র[১] পাঠিয়েচে সে বোধহয় তুমি পড়ে দেখেচ। আমাকে ওরা কত আদর করে ডেকেচে আর আমার কাছে কত প্রত্যাশা করেচে। আমি তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণের যোগ্য কিনা জানি নে, কিন্তু স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি আমার উপর এই কাজেরই ভার

পড়েচে। আমাকে দেশে বিদেশে একটা বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে আমার উপরে সেই হুকুম। সে বাণী যে কার সে আমি অনেক সময়ে নিজেই ভেবে পাই নে। কেন না আমি ত ইচ্ছে করে ভেবে বল্‌তে পারি নে। যেমন দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে যে অরূপ আনন্দ ভেসে বেড়ায় সেই আনন্দটি কেমন করে হঠাৎ বসন্তের লতার মধ্যে রূপ ধরে ওঠে তেমনি আকাশপথে যে অশ্রুত বাণী চলাচল করচে কেমন করে আমার অগোচরে সে আমার কথার মধ্যে স্বরগ্রহণ করে। সেই কথা আমাকে শোনাতে হবে এই হ'ল আমার একমাত্র কাজ। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুবাবু[১] যখন আমাকে তিনটে বক্তৃতা[২] করতে বল্‌লেন আমি কিছুই ভেবে পাই নি আমি কি বল্‌ব। যখন সেনেট হলে গিয়ে দাঁড়ালুম দেখ্‌লুম অত বড় হল ঠাসাঠাসি ভর্ত্তি করি [য] লোক বাইরের বারান্দায় পর্য্যন্ত ভিড় করে দাঁড়িয়েচে। সবাই বলে চার পাঁচ হাজার শ্রোতা হয়েছিল। মনের মধ্যে ভয় হল, কিচ্ছুই ত তৈরি হয়ে আসি নি; এক টুক্‌রো কাগজে এক লাইনও নোট লেখা হয় নি। কিন্তু পালাবার পথ ত ছিল না। উঠে দাঁড়ালুম যেমন করে হোক বলতে আরম্ভ করলুম। দেখি বলবার কথা ত আপনিই জুটে যাচ্চে। সে সব কথা যেমন অন্যে শুনচে তেমনি আমি নিজেও শুনচি। সে ত আমারই বানিয়ে বলা কথা নয়। এর থেকে আমি এইটুকুমাত্র বুঝে নিয়েচি যে, আমি বাণীর বাহন— কাজেই এই বাণী ছড়িয়ে দেওয়াই আমার কাজ— আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেবে না, আমি একটা জায়গায় বসে থাক্‌তেও পারব না। কাজেই চীন আমাকে ডাক দিলে তখন আমাকে চীনে যেতেই হবে। অথচ আমি যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে' একটা পদার্থের দিকে তাকিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই সে ত বিশেষ কেউ একজন নয়। তাকেই যদি কিছু একটা বল্‌তে হত তাহলে সে নেহাৎ বোকার মত বল্‌ত। তার বিশেষ কিছু জানাশোনাও নেই। হয় ত, জানাশোনার বোঝাই দিয়ে যদি তার মনের সমস্ত ফাঁক ভরা থাকত, তাহলে তার মধ্যে দিয়ে

আকাশবাণীর ধারা বইত না। বাঁশির সমস্ত ফাঁকটা যদি সোনা দিয়ে বোজানো হয় তাহলে কি বাঁশি বাজে?

তোমাকে যে এই কথাটা আজ লিখ্‌চি তার মানে হচ্চে এই যে, আমি বল্‌তে চাই এতে তুমি আনন্দিত হও। তুমি বিধাতার উপরে ঈর্ষা কোরো না। বোলো না, তোমার ভানুদাদাকে যদি নিজের কাজে দেশে বিদেশে ঘুরিয়ে না বেড়াতেন তাহলে তুমি তাকে আরো অনেকটা সময় কাছে পেতে। কিন্তু সেই ফাঁকা ভানুদাদাকে কাছে পেয়েই বা লাভ কি। বিধাতার বরখাস্ত করা সেই ভানুদাদা ত নিতান্তই বাজে লোক। সে তোমাদের কারো পরিচয়েরই যোগ্য হত না। সেই দীপ্তিহীন বাজে লোকটাকে আমি জানি। সে হচ্চে সকালবেলাকার আলো-নেবানো বাতি— নিতান্ত নিরর্থক। যাকে চীন ডেকেচে, আমার মধ্যে তাকে দেখে তুমি খুসি হও, রাণু। চীন আমাকে না ডাক্‌লে বেশ হ'ত এমন কথা তুমি মনে মনেও বোলো না। আমাকে খর্ব্ব করে' তা'তে ত তোমার লাভ নেই— বরঞ্চ তাতে তোমার ভানুদাদার অনেকখানিই বাদ গেল বলে তোমার সেটা লোকসান। আমাকে পৃথিবীতে কেবল একমাত্র যদি তুমিই পেতে তা হলে ত তুমি ঠক্‌তে— কেন না পৃথিবীর সেই একঘরে' হতভাগার মূল্যই বা কি। তোমার কাছে থাকার দ্বারাই তুমি যে আমাকে বেশি পাবে সে তোমার ভুল। আমাকে জগতের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পাও যদি তাহলেই তুমি সব চেয়ে বেশি পাবে। আমি নিজে যখন কুঁড়েমি করে' আমার বারান্দার কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকি, তখন অনেক সময় নড়তে গা লাগে না— ইচ্ছে করে এই রকম প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, সেই ছোট আমিটা যে কত বড় অভাজন তা' আমি জানি— মনে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না জগতের বড় ক্ষেত্রে সে কিছুই করতে পারবে— ভয় হয় যে, এবার তার ফাঁকি ধরা পড়বে। তাই ইচ্ছে করে চুপ করে' নিজের কাছে নিজে পড়ে থাক্‌তে। কিন্তু হঠাৎ পেয়াদা এসে জোর করে

ক জনসভায় নিয়ে আসে— তখন নিজের মধ্যে পূর্ণকে দেখে বিস্মিত হই। তখন বলি, ফাঁকি ত দেখ্‌তে পাইনে, ভয় কিসের। নিজেকে সেই সার্থক করে দেখার আনন্দ খুব বড় জিনিষ— তাতেই জীবনের সব গ্লানি চলে যায়, ছোট আমিটার সব অপরাধ মোচন হয়। তুমি যদি ভানুদাদাকে ভালোবাসো তা হলে তার এই সার্থকতাকে তুমি অভিনন্দন কর— যাতে সে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে, ক্ষুদ্রতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে, অবসন্ন হয়ে না থাকে সেই কামনা কর। যে কর্ম্ম সত্যই আমার, সেই কর্ম্মেই আমার মুক্তি— সেই মুক্তির মধ্যে যখন আমি নিজেকে দেখি তখনই আমার জীবনের আকাশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে— আমার জীবনের সেই প্রসন্নতায় তোমার চিত্ত প্রসন্ন হোক্— আমার সঙ্গ পাওয়ার চেয়েও তাতে তুমি আমাকে অনেক বেশি করে পাও এই আমি কামনা করি।

অনেক রাত হল। ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩৩০

ভানুদাদা

১৪০

১৫ [১৬] মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তুমি হয় ত ভাবচ এতক্ষণে আমি কলকাতায়। কারণ জাহাজ ছাড়বার সময় কাছে আস্‌চে। কিন্তু এখনো আশ্রম আঁকড়ে আছি। পর্শু মঙ্গলবার বিকেলের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব।[1] ইতিমধ্যে এখানে বসে যতটা পারি চীনের লেকচার লেখবার ইচ্ছে আছে। তোমাদের সেই দোতলার

ঘরের জানলার কাছে বসে তার প্রথম কয়েকটা পাতা লিখেছিলুম। মনে আছে তোমাকে ঘর থেকে কতবার তাড়া করেচি। কিন্তু খুব বেশিবার নয়। কেবল চার পাতা মাত্র লিখেছিলুম— তার বেশি আর এগোতে দাও নি। তুমি যেমন, তেম্‌নি তোমার একটি জুড়ি আছে সে থাকে আমার মস্তিষ্কের ভিতরে— সেটি হচ্চে আমার কবিতা, আমার গান। সেও যখন জানে আমি চীনের লেকচার লিখতে বসেচি অমনি বন্ধ দরজা ঠেলে ডাক দেয়, "কবি!"— আমি বলি— "থাক্, এখন থাক্, ব্যস্ত আছি।" সে আবার বলে, "কবি, একবার দরজা খোলো, আমি একটুখানি থেকেই চলে যাব।" তখন দিই দরজাটা খুলে— তার পরেই সে আমার মনটি দখল করে বসে, আর গুন্‌গুন্ তার গুঞ্জন চল্‌তে থাকে। সে তার কথা রক্ষা করে, একখানা গান হতেই সে চলে যায়। কিন্তু চলে গেলে হবে কি, মাথার মধ্যে গুন্‌গুন্ থামতে চায় না— চীনের লেকচারটার আর উপায় থাকে না। আসল কথা, বসন্তের আরম্ভ কালে এই সব গম্ভীর কাজ করা বড় শক্ত। অন্য সময়ে যে পাগলটাকে ভদ্রতার ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন করে রাখি, এই সময়টা সে আর বাঁধন মান্‌তে চায় না। সে বলে আমি অত্যন্ত ভদ্রলোকটির মত আমার কর্ত্তব্য কাজ করব না, চিঠি পেলে চিঠির জবাব দেবনা, লোক দেখা করতে এলে মধুর স্মিত হাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করবনা, লীলমণি যখন এসে বল্‌বে স্নানের ঘরে গরম জল দিয়ে এসেচি তাকে তাড়া করে যাব। কিন্তু পাগলটাকে তার অজ্ঞাতবাস থেকে ছুটি দিয়ে একেবারে ছাড়া দিতে সাহস হয় না। তাহলে সভ্যলোকেরা অবাক্ হয়ে যাবে, বলবে, রবিঠাকুরের এই দশা? কাজেই জামার সব কটা বোতাম আঁটবার চেষ্টা করি, আর, কি কি উপায়ে মানুষের সদ্গতি হয় সেই সাধু প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে, খুব গম্ভীরভাবে তার সদ্‌যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়ে থাকি। এইগুলোই হচ্চে নিজের যথার্থ পরিচয় গোপন করা— কবিঠাকুরকে রবিঠাকুর করে প্রমাণ করা!

আজ নির্জ্জন মাঠের উপর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েচে। বেশ মধুর হাওয়াটি দিচ্চে। শালবীথিকায় ডালে ডালে শালের মঞ্জরী ধরেচে— চল্‌তে চল্‌তে এখানে ওখানে হঠাৎ তার গন্ধে চমক লাগিয়ে দেয়। যখন সমুদ্রে পাড়ি দিতে থাকব তখনি চাঁদ পূর্ণিমায় গিয়ে পৌঁছবে। নীল সাগরের উপর শুক্লরাত্রি খুব মধুর বটে— কিন্তু তবু, জ্যোৎস্না সেখানে যেন বিধবার মত। বড় বেশি নিরলঙ্কার, বড় বেশি নিঃসঙ্গ— সেখানে চাঁদ যেন তপস্বী শিবের ললাটের চাঁদের মত। গাছের ছায়াটি না হলে জ্যোৎস্নার ঠিক জুড়ি মেলে না। সেই যেন শ্যামের সঙ্গে রাধার মিলন।

মিস্ গ্রীন এবারে দেশে চলে যাচ্চে। আমাদের সঙ্গে চীন পর্য্যন্ত যাচ্চে। তার পরে যাবে আমেরিকায়। আজ তার বিদায়ের অনুষ্ঠান হ'ল।[২] লাইব্রেরি ঘরের বারান্দার পরে আলপনা কেটে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করিয়ে, দামী একটি ময়ূরকণ্ঠী সিল্কের শাড়ি অর্ঘ্য দিয়ে বেশ একটু ধুমধাম করা হল। মেয়েরা গাইলে, "ভরা থাক্ ভরা থাক্"[৩] ইত্যাদি। শেষে একটা গান গাওয়ানো হল, তার আরম্ভটা হচ্চে এই রকম—

"পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে'
জানিয়ে দে তাই সাহস করে।"[৪]

ওটা আর কিছু নয়, নিজের পরিচয়টা ঘোষণা করে দিলুম।

আজ বোধ হয় অন্য দিনের চেয়েও বেশি রাত হয়েচে। আমার মগজটা ভিজে স্পঞ্জের মত ঘুমে একেবারে অভিষিক্ত হয়ে আছে তাহলে এবার শুতে যাই। কিন্তু দেখেচি শুয়েও ক্লান্তির অবসাদটা যেতে চায় না— ক্লান্তি আমার মেরুদণ্ডটার উপর ভর করে দিন রাত আমার সঙ্গ নিয়েচে। হয় ত জাহাজে চড়ে সমুদ্রের হাওয়ায় তাকে বিসর্জ্জন দিতে পারব। ইতি ২ [৩] চৈত্র ১৩৩০[৫]

ভানুদাদা

১৪১

[২২ মার্চ ১৯২৪]

*BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION CO.
S. S. [ETHIOPIA]

ওঁ

রাণু

রেঙ্গুনে পৌঁছিয়ে এই চিঠি ডাকে দিতে পারব। এখন সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে চলেচি। কাল সকাল বেলায় গঙ্গার ঘাটে জাহাজে উঠ্‌লুম। তোমার বাবা ছিলেন আরো অনেক লোক আমাকে বিদায় করবার জন্যে ভিড় করেছিলেন। তার মধ্যে কিরণকে[১] অবলম্বন করে বুড়োও[২] এসেছিল। বোধ হয় তার বাবা তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

জাহাজ প্রায় নটার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোণো গঙ্গাতীর— এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কি গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধারে ধারে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন এ'কে আঁকড়ে ধরে— ছোট শিশু যেমন মা'কে ধরে। আমি জীবনের কত কাল যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েছি— মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে। ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহা-প্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেচে— আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেছি— সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেছে— আজ প্রখর মধ্যাহ্নের [য] কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করচি— আমার এই কর্ম্মের সঙ্গে পাখীর গান, নদীর কল্লোল, পাতার মর্ম্মর আপনার সুর যোগ করে দিতে পারচে না—

অন্যমনস্ক হয়ে আছি; নীলাকাশে অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিল্‌চে না, কর্ম্মশালার জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মত তেমন সম্পূর্ণ করে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না। মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই ত দেখ্‌চি, সেদিনকার লীলালোক থেকে আজকের দিনের কর্ম্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেচি। তবু সেদিনকার ভোরবেলার সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে' মনকে উতলা করে দেয়। কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম, তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, মনে পড়ে কি? এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আস্‌বে? এবারকার এই জীবনের এই ধরণীঃ সমস্ত "জননান্তর সৌহৃদানি?" কাল দোলপূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে আট্‌কে গিয়েছিল। তাই জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত আট্‌কা পড়ে ছিল। সমুদ্রে যদি দোল পূর্ণিমার আবির্ভাব হ'ত তা হলেই তার নাম সার্থক হত— তাহলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখ্‌তুম। আজ ভোরে উঠে দেখ্‌লুম জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেছে— "মধুর বহিছে বায়ু।" আজ শনিবার। সোমবারে শুন্‌চি রেঙ্গুনে পৌঁছব। সেখানে দিনদুয়েক সভাসমিতি অভ্যর্থনা মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেষ্টা করবে। তারপরে বোধহয় বুধবারে কোনো একসময়ে মুক্তি পাব। ইতি [৯] চৈত্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১৪২

[২৭ মার্চ ১৯২৪]

ওঁ

রেঙ্গুন

রাণু

আজ তিনদিন রেঙ্গুনে জাহাজ থেমে ছিল। তাই এখানকার জনসাধারণ হিড় হিড় করে' আমাকে ডাঙ্গায় টেনে আন্‌লে।[১] এরা সকলে মিলে রিসেপ্‌শন কমিটি বলে একটা পদার্থ সৃষ্টি করেচে। সেই পদার্থ আমার কানের কাছে জয় কবিরাজ রবীন্দ্রনাথ টাগো-ও-ও-ওর কী জয় বলে চেঁচাচ্চে, আমার গলায় মালা দিচ্চে, আমাকে গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া খাওয়াচ্চে, সহরের মাঝখানে একটা দোতলা বাড়ি ঠিক করে দিয়েচে, সেই বাড়িতে মানুষ আর মশা দিনরাত্রি ভন্‌ভন্‌ করচে। সেই পদার্থ আমাকে এক সভায় বিকেল চারটেয়, তার পরের সভায় সাড়ে পাঁচটায়, তারের [য] পরের সভায় সাতটায়, তার পরের ভোজে সাড়ে নটায় ঘুরপাক খাওয়াচ্চে। সেই পদার্থ আমাকে মাচার উপর চড়িয়ে বক্তৃতা করাচ্চে আর সভাপতিকে দিয়ে বলাচ্চে আমি একধারে কবি ঋষি তত্ত্বজ্ঞানী শিক্ষক স্বদেশপ্রেমিক ইত্যাদি ইত্যাদি— শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমে আমার বিশ্বাস হচ্চে যে, তারা যা বল্‌চে কথাটা সম্পূর্ণ আজগুবী নয়— নিশ্চয়ই সর্ব্বগুণ আমার মধ্যে মিলে আগুন হয়ে উঠেচে— এখন এর উপরে fire brigade লাগিয়ে দিয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করলে বাঁচি। আজ অপরাহ্ণ দুটোর পর কমিটি রাহুর পূর্ণগ্রাস থেকে রবি বেরিয়ে আস্‌বেন। আজ বৃহস্পতিবারে জাহাজ ছাড়বে বেলা চারটের সময়— জাহাজের ঘাটে পৌঁছতে হবে দুটোর মধ্যে। কমিটি নামক পদার্থ— শতশতকণ্ঠকলকল নিনাদকরালা— আমার পিছন পিছন গলা ভাঙতে ভাঙতে চল্‌বে "জয় কবি-ই রা-আজ রবীন্দ্রনাথ টাগো-ও-ও-ওর কী জয়!" রবীন্দ্রনাথ তখন মালার ভারে

লজ্জার ভারে ঘাড় হেঁট করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়বাহিতা ফিটন গাড়ির পরে নির্ব্বোধের মত বসে জনতাতরঙ্গবিক্ষুব্ধ অন্তরাত্মাকে সান্ত্বনা দেবার উপায় খুঁজে পাবে না।

যা হোক্ এ কয়দিন একমুহূর্ত্ত আমার শান্তি ছিল না, সময় ছিল না। কাল রাত্তির দুপুর পর্য্যন্ত হট্টগোলের অধিদেবতার আরতি করেচি। আজ ভোরের বেলা জনতা যখন তন্দ্রানিমগ্ন, যখন তার বহুসহস্রভুজৈঃধৃত খর করতালি নিস্তব্ধ, তখন সুখশয্যা ত্যাগ করে মাথায় জল ঢেলে ঢেলে দীপ্ত শিরার অভিষেক করলুম। তার পরে ভাবলুম সমুদ্রে পাড়ি দেবার পূর্ব্বে রাণুকে একখানা চিঠি লিখে যাই। এ চিঠি আমার পূর্ব্ব চিঠির এক সপ্তাহ পরে পাবে। এখান থেকে আর এক সপ্তাহ পরে পিনাঙের ঘাটে পৌঁছব। সেখান থেকে যে চিঠি ডাকে দেব, সে আরো এক সপ্তাহ পরে পাবে। তার পর সিঙ্গাপুর, তার পর হংকং, তার পর স্যাঙ্ঘাই। তার পরে ঘাটের থেকে বাটে উঠ্‌ব। রেলযান যোগে যাব পীকিনে। আজ হ'ল ২৭শে মার্চ্চ। আমার এ চিঠি যখন তুমি পাবে তখন তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেচে— নিশ্চয় অনুভব করতে পেরেচ যে তোমার পরীক্ষাপত্রীর মোটা মোটা মার্কাগুলি পয়লা বিভাগের ঘাটের অভিমুখে অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে দিয়ে পাড়ি দিয়েচে। আগামী শীতে যখন ফিরে যাব তখন দেখব তৃতীয় বার্ষিকের উচ্চ গগনে তোমার বিদ্যাজ্যোতিষ্ক অধিরোহন করেচে।

এখানে আমাকে নিয়ে যে মথন কাণ্ড চল্‌চে তার বিস্তারিত বিবরণ হয় ত খবরের কাগজে পাবে। তার আলোচনা করতে আমার আর রুচি হয় না। আমি ক্লান্ত। এখানে দুটি জিনিষ আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছে— কাল এখানকার চিনীয় (Chinese) সমাজ আমাকে যে অভ্যর্থনা করেছিল সে বেশ সংযত সুন্দর সরল সহৃদয়। আর পর্শু সন্ধ্যায় একটি ব্রহ্মানী মেয়ে আমাকে নাচ দেখিয়েছিল। তার নাচ ভারি মনোহর, ঠিক যেন পল্লবিত লতার উপরে কখনো পূর্ব্বদিক থেকে কখনো দক্ষিণ

দিক থেকে বাতাসের হিল্লোল লেগে তাকে লীলাচঞ্চল করছিল।— সূর্য্য উঠেচে— জনতাও শয্যাত্যাগ করেচে, তাদের পদধ্বনি দূর থেকে অনুভব করতে পারচি। ইতিমধ্যে কিঞ্চিত ফল ও মিষ্টান্ন ও এক পেয়ালা চা খাবার অভিপ্রায় করচি। তুমি নিশ্চয় এতক্ষণে প্রত্যূষের দিক্‌প্রান্তলগ্না চন্দ্রকলার মত শয্যাতলে বিলীনা। কারণ তোমাদের বারাণসীর আকাশে এখনো রাত্রির পালা শেষ হয় নি। [১৪ চৈত্র ১৩৩০]

তোমার ভানুদাদা

১৪৩

[২৮।২৯ মার্চ ১৯২৪]

ওঁ

*BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION CO. LTD
S. S. [Ethiopia]

রাণু

পিনাঙের ঘাট কাছে আসচে। বোধ হয় পর্শু দিন পৌঁছব। সমুদ্র অতি শান্ত, তরল নীলাকাশের মত স্থির। কেবল জাহাজের কলের হৃৎস্পন্দন ধক্‌ধক করচে। সূর্য্যের কিরণ প্রখর। আমার ক্যাবিন পশ্চিমধারে— এতক্ষণ সেখানে বসে লেকচার লিখ্‌ছিলুম। কি গরম! মনে হচ্ছিল সমস্ত ঘরটার যেন জ্বর হয়েচে। যেন একটা সর্ব্বব্যাপী মাথাধরার মধ্যে বসে আছি। শিলাইদহে পদ্মার ধারে বালির চরে গরমের তাতে বড় বড় ফুটিগুলোকে পেকে ফেটে যেতে দেখেছি। আমার মনে হচ্ছিল কাপড়ের অন্তরালে

আমার দেহখানা ক্রমেই পেকে উঠ্‌চে, আর খানিক বাদেই ফাট্‌তে আরম্ভ করবে।

উপরে চলে এসেছি। সিঁড়ির কাছে এক কোণে একটা চিঠি লেখবার ডেস্ক আর কাগজ কলমের ব্যবস্থা আছে। মনে করলুম রাণুর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। কিন্তু লিখে লিখে মাথাটা ক্লান্ত আর ঘেমে ঘেমে শরীরটা অবসন্ন গায়ে খানিকটা ওডিকলোন্‌ মেখে এসেচি কিন্তু তার গন্ধ তোমার বেনারসের পড়বার ঘরে পৌঁছবেনা। আজ বোধ হচ্চে আটাশে কিম্বা উনত্রিশে। এখন নিশ্চয় কলেজের ক্লাসে তোমাকে যেতে হয়না। ঘরে বসেই ত্রিকোণমিতি অভ্যাস করতে লেগে গেছ। এখানে এখন বেলা পাঁচটা— সেখানে হয় ত দুপুর কিম্বা একটা হবে। আমাদের সঙ্গে এই জাহাজে সেই বেহালার ওস্তাদ প্রেমিস্‌লাভ্‌ এবং তাঁর স্ত্রী যাচ্চেন। ওঁদের সঙ্গে আমাদের খুব জমেচে। আরও অনেক নরনারী আছে কিন্তু তারা যেন সমুদ্রের ওপারে আছে বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে সকালে বিকালে একটুখানি মাথা-নাড়ানাড়ি এবং গুড্‌ মর্ণিং গুড্‌ আফটারনুন্‌ চলে।

রেঙ্গুনে কয়দিন খুবই ধুমধাম গোলমাল হাততালি ইত্যাদি চলেছিল। আসবার আগের দিন একটি চীনের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার ইচ্ছে বিশ্বভারতীতে গিয়ে অন্তত একবছর থেকে আমার কাছে সাহিত্য অধ্যয়ন করে। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে সে আমার সঙ্গে এত ভাব করে নিলে যে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ঘাটে এসে দেখি, সেখানে সে উপস্থিত। জাহাজ ছিল মাঝনদীতে কিছু দূরে। একটা ছোট স্টীমারে সব যাত্রীদের সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েটিও সেই জাহাজে উঠে পড়ল। আমার হাত চেপে ধরে বল্লে, আপনি চলে যাচ্চেন, আমার কষ্ট হচ্চে,— ফিরে এলে যেন আপনাকে দেখ্‌তে পাই। যখন ছোট জাহাজ আমাদের জাহাজে এসে পৌঁছল, আমি বল্লুম, এবার

গুড বায়। সে আমার বুকের উপর এসে পড়ল— চারদিকে সব লোকজন, তার তাতে খেয়াল নেই, সবাই হাস্‌তে লাগ্‌ল। জাহাজে আমার ক্যাবিনে মুখ ধুয়ে যখন জিনিষপত্র গোচাচ্ছি সে তার একটি আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত। এল্‌ম্‌হর্স্টকে ডেকে বল্‌লে তুমি কবিকে খুব যত্ন কোরো, দেখো এঁর শরীর যেন কিছুতে ক্লান্ত এবং অসুস্থ না হয়। এল্‌ম্‌হর্স্ট্‌ বল্‌লে, আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না, আমার বদলে তুমি না হয় এসো। ও বল্‌লে আমার যদি যাবার কোনো সুবিধে থাকত আমি নিশ্চয় যেতুম, দেখ্‌তে আমি কত যত্ন করতুম। ব'লে দুই হাতে আমার হাত চেপে ধরে রইল। জাহাজ যখন ছাড়ে ছাড়ে তার আত্মীয় তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। তার পরে দূর থেকে রুমাল ওড়াতে ওড়াতে সেই ছোট জাহাজে করে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগ্‌লুম, আমার এ কি দশা! কেউ বা ভারতবর্ষে বলে, তুমি থাকো, যেয়ো না, কেউ বা বর্ম্মায় বলে, তুমি থাকে [য] যেয়ো না, কেউ বা হয় ত চীন দেশেও বল্‌বে। অথচ আমার যিনি কর্ণধার আমাকে একঘাট থেকে আরেক ঘাটে ভাসিয়ে নিয়েই চলেচেন, কোথাও আর থামতে দিলেন না— দূরের থেকে একটা রুমাল ওড়া দেখা যায়, আর চোখের কোণে দুয়েক ফোঁটা জল মুছতেও দেখ্‌তে পাই— যাই, ডেকের উপর এবার একটু হাওয়া খেয়ে আসিগে— সূর্য্য বোধ হয় এতক্ষণে নীলজলের মধ্যে সোনার ঘটে করে' দিবালোকের শেষ রশ্মিধারা নিঃশেষ করে ঢেলে দিচ্চেন।

তোমার ভানুদাদা

১৪৪

১৭ চৈত্র ১৩৩০

ওঁ

*P. K. NAMBYAR
ADVOCATE & SOLICITOR

3. UNION STREET
PENANG———192

S.S AND R.M.S.
—
TEL ADDRESS :
"NAMBYAR PENANG"

রাণু

আজ জাহাজ পেনাঙে এসে পৌঁছেচে। জাহাজে থাকতে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি আজই ডাকে রওনা হবে। সুতরাং এ চিঠি নিতান্তই বাহুল্য হবে তবু নিশ্চয়ই তুমি সে বাহুল্য সইতে পারবে। এ চিঠি এখান থেকে না পাঠিয়ে এর পরের ঘাট থেকে পাঠাব। পরের ঘাট কোথায় তার ভূগোলবৃত্তান্ত হয়ত তুমি না জানতে পার— অন্তত আমি ত জানতুম না। সে এখান থেকে আরও কিছু দক্ষিণে, তার নাম Port Sweatenham। জানিনে বানানটা ঠিক হল কিনা। সেখানে হয়ত পর্শু পৌঁছব। জাহাজ রেঙ্গুন ত্যাগ করে অবধি ক্রমাগত দক্ষিণের দিকে চলেচে। তাই ক্রমেই গরম বেড়ে উঠেচে। কাল পর্শু দুইরাত্রি ভালো ঘুমোতে পারি নি। আজ সকালে উঠে ভারি ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। আজই সকালে জাহাজ পিনাঙে এসে নোঙর ফেল্‌লে। এখানকার ভারতীয় ও চিনীয় অধিবাসীদের তরফে একদল লোক জাহাজে আমাকে গ্রেফতার করতে এল। নাবালে। বাস্‌ রে, কি কাণ্ড কি ভীড়। বোধ হয় পিনাঙের সহরে যত পুরুষ আছে সবাই সেখানে জমা হয়েছিল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে

বাজনদাররা শানাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে আকাশ তোলপাড় করতে লাগল। এক একদল করে অভ্যর্থনার দল এসে মোটা মোটা গড়ে' মালা আমার কাঁধে চাপাতে লাগ্‌ল। কাঁধে আর জায়গা ছিল না— কাঁধ ছাপিয়ে মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা পড়ে গেল— মালার ভারে আমার ত মাথা হেঁট। চষমা সামলানো দায়, নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন। বহুকষ্টে বিষম ভিড় ঠেলে মোটর গাড়িতে উঠে পড়লুম। কিন্তু মোটর চলে কি করে। হাজার হাজার লোক ডাইনে বাঁয়ে ঠেলাঠেলি বাধিয়ে দিয়েচে— তারা আমার পা ছুঁয়ে যাবে। তাদের তুফানের ভিতর দিয়ে মোটর অতিশয় ধীর গমনে চল্‌তে লাগ্‌ল। কোনোমতে একটা বাড়িতে এসে পৌঁচেছি।[১] আমার যারা সঙ্গী, যথা, এল্‌মহর্স্ট্‌, মিস্‌ গ্রীন, কালিদাস, নন্দলাল, ক্ষিতিবাবু সবাই দল বেঁধে গেছেন সহর ঘুরে আস্‌তে। বেশি কিছু দেখবার নেই। শুনেচি কোথায় এক চীনে মন্দির আছে, আর আছে একটা ঝরনা। আমি সম্পূর্ণ একলা। জানলার একদিক থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্চে, আর সামনেই আম বট কাঁঠাল তেঁতুল নারকেলের আন্দোলিত পাতাগুলির উপর সকালবেলার রোদ্দুর ঝল্‌মল্‌ করচে। ডানপাশের জানলার নীচে বড় রাস্তা। সেই রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে আমাকে দেখবার জন্যে। অনেকদিন পরে মাটির পৃথিবীর পরে আকাশের নীল, আর গাছের সবুজের উপর রোদ্দুরের সোনা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। মনে হচ্চে যেন নির্ব্বাসনের পর ঘরে ফিরে এসেচি। একটা জিনিষ আজও আমার কিছুতেই অভ্যেস হল না। কোনোকালেই হবে না। যখন ভিড় ঠেলাঠেলি করে' আমার পায়ের কাছে ভক্তির অর্ঘ্য আস্‌তে থাকে একেবারে যেন মুষলধারায় তখন আমি কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারিনে। এত অদ্ভুত অসঙ্গত মনে হয় যে কেমন যেন আমার মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবি আমাদের লোক কোনোমতে ভক্তি করতে পারলেই বাঁচে বলেই এমনতর অঘটন ঘটে— মুরগীকে পাথরের ডিম দিলেও সে তা দিতে বসে এও তেমনি। আমি মাঝে মাঝে আপত্তি করতে,

বাধা দিতে চেষ্টা করেচি— কিন্তু তাতে উল্টো ফল হয়— আমার বিনয় থেকে লোকের ভক্তি আরো বেড়ে যায়। মোটের উপর আমি ভেবে দেখেচি ভিড়ের জগৎ আমার জগৎ নয়। ভক্তি বল, খ্যাতি বল এতে আমাকে ঘূর্ণিঝড়ের মাঝখানকার পাখীর মত বড়ই ব্যাকুল করে' তোলে। ছোট ছিলুম যখন তখন আমার আত্মীয়েরা আমাকে চাকরদের জিম্মে করে দিয়ে একটি অতি ছোট্ট কোণে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিলেন। সেই কোণের আকাশটুকুকে আমি আমার নিজের মনের নানারঙের ভাবনা দিয়ে ভরে তুলেছিলুম, আমার সেই ভাবনাভরা আকাশটাই আমার নিজের সৃষ্টিক্ষেত্র। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেই আমার মন উতলা হয়ে ওঠে। আজ সকালে অনেকদিন পরে নীল আকাশের সবুজ সোনার মিলন দেখে আমার সেই অবকাশভরা কোণের কথা মনে পড়চে। তাই মন উতলা হয়েচে— আকাশের সমস্ত ফাঁকটা যেন ভৈরবী রাগিণীর করুণরসে একেবারে অশ্রুপ্লুত হয়ে রয়েচে। তার উপর শরীর ক্লান্ত আর ঘুম কেবলি থেকে থেকে চেতনার সমস্ত জানলা দরজার পর্দ্দা টেনে টেনে দিচ্চে। একটা কেদারায় হেলান দিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করিগে। ৩০শে মার্চ ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৪৫

[৩১ মার্চ ১৯২৪]

ওঁ

[Swellenham]

রাণু

আজ সকালে Swellenham বন্দরে জাহাজ পৌঁছল। এখানকার ভারতীয়গণ ধরে নিয়ে এলেন কুয়ালা লাম্‌পুর নামক সহরে। বন্দর থেকে

তিন মোটর গাড়ি বোঝাই করে বেরলুম। দুই ধারে কোথাও ঘন অরণ্য, কোথাও রবর গাছের চাষ, মাঝে মাঝে চিনেদের পাড়া, কোথাও বা মালয়দের গ্রাম। এত ঘন গাছপালা কোথাও দেখা যায় না। তার কারণ এখানে প্রায় সম্বৎসর বৃষ্টি হয়। ঘন সবুজ। নীল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। সেই মেঘের ছায়া এখানকার অরণ্যের ছায়ার সঙ্গে যেন মালাবদল ও গ্রন্থিবন্ধনের উৎসবের মত দেখাচ্ছিল— শ্যামল পৃথিবীর আকাশের মিলন। অপরাহ্নে এই নিবিড় ধূসর ছায়া খুব ভাল লাগছিল। অনেকদিন এমন মেঘের ঘটা দেখি নি। ভারতবর্ষ থেকে বেরবার আগে বহুকাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশ বৃষ্টির জন্যে শূন্যের দিকে তাকিয়ে তার শুষ্কতপ্ত দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু আকাশ যেন দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল। কোথাও মেঘের বা রসের লেশ ছিল [না]। কুমারসম্ভবের কথা মনে পড়্‌ছিল। আকাশ যেন শিবেরই মত রুদ্র তপস্যায় আত্মবিস্মৃত। তাঁর তৃতীয় নেত্রের আগুনের তাপ তখনো দিকে দিক [য] ঝলক দিচ্ছিল। আর পৃথিবীও গৌরীর মত তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল— আমাদের আশ্রমের গাছগুলোর পাতা প্রায় [হলুদ] হয়ে এসেছিল— পৃথিবী যেন অপর্ণা হবারই উদ্যোগ করছিল। জানিনে এতদিনে রুদ্রতাপতপ্ত তপস্বিনীর কঠোর সাধনা সফল হয়েচে কিনা। শেষ পর্য্যন্ত দেখে এসেছিলেম তাপের সঙ্গে তাপের সংঘাত। তাই এখানে যখন আকাশে ঘন ঘোর মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগ্‌ল তখন সেই বনভূমির মাঝখান দিয়ে সেই সমারোহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন ভরে উঠ্‌ছিল। যখন সহরের প্রায় কাছাকাছি এসেচি এমন সময় কি ঘোর বৃষ্টি। একেবারে অবিরল ধারা। এমন বৃষ্টি কতদিন দেখি নি। কি ভালো লাগ্‌ল বল্‌তে পারি নে। ভিজে গেলুম কিন্তু তাতে দুঃখ রইল না। তার পরে এই সহরে এসে পৌঁচেছি। এখনি আবার দুঘণ্টার মোটর রাস্তা ভেঙে আবার জাহাজে উঠ্‌তে চল্লুম। পর্শু সিঙ্গাপুরে পৌঁছব। তাড়াতাড়ি এই ঘনবর্ষণের খবরটা পাঠিয়ে দিচ্চি

তোমার ভানুদাদা

১৪৬

১৯ চৈত্র ১৩৩০

*BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION CO. LTD

রাণু

আজ হচ্চে ১লা এপ্রেল। জাহাজ চলেচে সিঙ্গাপুরের অভিমুখে। গত কাল গেছে ৩১শে মার্চ। কাল থেকে তোমার পরীক্ষা সুরু হয়েচে।[1] কত দিন চল্‌বে তা ঠিক জানিনে। আশা করি তোমার শরীর মন ভালোই আছে আর পরীক্ষায় তুমি জয়ী হয়ে আস্‌বে। আমার পরীক্ষা তোমার চেয়ে একটুও কম কঠিন নয়। আমি ঠিক পরীক্ষা প্রশ্নের জবাব লেখার মতই গড়গড় করে লিখে চলেচি। তুমি ত পরীক্ষাশালায় যথোচিত আরামে লিখ্‌তে পাও, আমি প্রায় সমস্ত দিন এই ক্যাবিনটার ভিতরে বিছানায় বসে লিখ্‌চি। সামনে একটা টেবিলও নেই। আর সকলে উপরে ডেকে আরাম কেদারায় বসে গল্পের বই হাতে নিয়ে চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে কখনো ঘুমোচ্চে কখনো বা পার্শ্ববর্ত্তিনীদের সঙ্গে মধুরালাপ করচে। আমার সে অবসরও নেই, সঙ্গিনীও নেই। জাহাজের ক্যাবিন বল্‌তে কি বোঝায় তুমি তা ঠিক জান না। জাহাজের গর্ভের মধ্যে একটা ছোট খাঁচা। সমুদ্রের দিকে একটা গোলাকার কাঁচের গবাক্ষ আছে। যখন তুফান বাড়াবাড়ি করতে থাকে তখন সেটা এঁটে বন্ধ করে দেয়। ছোট ঘর আমার বাক্সে তোরঙ্গে বোঝাই করা। দিনরাত কানের কাছে এঞ্জিনের ধুক্‌ধুক্ ধক্‌ধক্ শব্দ চল্‌চে। বেড়াল ছানা তার খেলার জিনিষের উপর যেমন ক্ষণে ক্ষণে তার থাবা দিয়ে ঠেলা দেয়— সমুদ্র ঠিক তেমনি ক্ষণে ক্ষণে কখনো জাহাজের বাম পাশে কখনো ডান পাশে থাবা মেরে ঠেলা দিচ্ছে, আর অমনি টলে পড়চি। পশ্চিমের রৌদ্রে ক্যাবিন তেতে উঠে রাত দশটা পর্যন্ত ভিতরের বাতাসটাকে অপ্রসন্ন করে রাখে। ভাগ্যে

একটা ইলেক্‌ট্রিক পাখা আছে, সেইটে দিন রাত মাথার উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরচে— আর আমি কোনোমতে কোলের উপর কাগজ আঁকড়ে ধরে লিখে চলেচি। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌চে, অক্ষরগুলো বেঁকেচুরে হেলে পড়চে, কোনোমতে ঘুমটাকে ঠেলে ফেলে কলম চালিয়ে যাচ্চি। তোমার পরীক্ষার কাগজ যদি এমন করে এমন জায়গায় লিখ্‌তে হত তাহলে প্রথম শ্রেণীতে পাস হতে কি না সন্দেহ। এত করে দুটো লেকচার শেষ হয়েচে। তৃতীয়টার অনেকখানি এগিয়েচে। সবসুদ্ধ ছটা লেকচার লিখ্‌তে হবে। অথচ আমার এতে কোনো দরকার ছিল না— বরঞ্চ আমার দরকার ছিল বিশ্রামের। সে জিনিষটা কবে পাব, কোথায় পাব আজ পর্য্যন্ত তার ঠিকানা হল না। যতবার ভাবি আর নয়, ততবার একটা না একটা তাগিদ আসে। কিন্তু আর ভাল লাগ্‌চে না। বারবার ইচ্ছে করচে, যে-নিরালা পৃথিবীতে বাঁশি হাতে একদিন এসেছিলুম সেইখানে আবার ফিরে যাই,— একটা জলের ধারা, একটা বালির চর, ওপারে সবুজ বনের ছায়া, উপরে নীলাকাশে সন্ধ্যার একটি তারা— মাঝে মাঝে গল্প করবার একজন লোক পাই ত ভালই, নিতান্ত না পাই ত আমার কল্পনা আছে, থেকে থেকে কলম নিয়ে বসে যাব— কখনো গল্প, কখনো কবিতা, কখনো যা তা বাজে কথা, কখনো বা এইরকম একখানা চিঠি— তার পরে গভীর রাত্রে নৌকোর খোলা জানলার কাছে বিছানার উপর আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, আর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে নদীর কলধ্বনি— কাল যখন ঘন মেঘের ছায়ায় ঘন বনের মাঝখান দিয়ে মোটর চল্‌ছিল তখন এই রকমের একটা ছুটির জন্যে মন ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছিল।

কাল সিঙ্গাপুরে জাহাজ পৌঁছলে এই চিঠি ডাকে দেব। পর্শু দিনেই এক জাপানী জাহাজে চড়ে চীনের অভিমুখে পাড়ি দিতে হবে। সিঙ্গাপুর থেকে হংকং যেতে কিছু সময় লাগ্‌বে। বোধ হয় একসপ্তাহ। অতএব এর

পরের চিঠি পেতে তোমার অনেক দেরি হবার কথা। কিন্তু গেল কয়দিন যথেষ্ট ঘন ঘন চিঠি লিখেচি— অতএব এই ফাঁকটা হয়ত তোমার পক্ষে অবকাশের মতই লাগ্‌বে। বেশি পেলে মানুষের যে পরিমাণে আশা বাড়ে সে পরিমাণে তৃপ্তি বাড়ে না। কম পেলে পাওয়ার আনন্দ তীব্র হয়। আমার রেঙ্গুনের চিঠি তুমি হয় ত তোমার পরীক্ষার মধ্যেই পেয়েছিলে। তখন মন দিয়ে পড়বার সময় পাও নি। যাই হোক যখন চীনে যাব তখন থেকে নিয়মিত চিঠি পাবার নানা ব্যাঘাত ঘটবে। সে জন্যে প্রস্তুত থেকো। তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব প্রতিশ্রুত ছিলুম। সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে আমি কিছুমাত্র কুঁড়েমি করি নি তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। অতএব এখন থেকে যখন চিঠি পাবে না তখন মনে জেনো সেটার কারণ দৈবদুর্য্যোগ— আমার অনিচ্ছা বা ক্লান্তি নয়। পেকিনে তোমার কোনো চিঠি পাব কিনা জানিনে কিন্তু সে জন্যে তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেই চিঠি লিখচি।

তোমার ভানুদাদা

১৪৭

২৩ চৈত্র ১৩৩০

*N.Y.K. LINE ওঁ

S. S. ...ATSUTA...MARU

রাণু

সিঙ্গাপুরে এসে আরেক জাহাজে চড়েচি। নাম দেখেই বুঝবে এ হচ্চে জাপানী জাহাজ।[1] এখানে আমার আদরের সীমা নেই। আমি যা চাই তাই

প্রস্তুত। কাপ্তেন বলে গেল, আমার যখন যা দরকার তাকে জানালেই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। সকালে চায়ের সঙ্গে অন্য যাত্রীরা যখন বরাদ্দমত কমলালেবু পায় আমি তখন আনারস দাবী করলে আনারস এসে হাজির। নিয়ম হচ্চে সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান সারতে হবে— সকলে তাড়াতাড়ি করে স্নান করে নেয়। আমি খবর পাঠিয়ে দিলুম সাড়ে এগারোটার সময় নাইব। তাই সই। একজন লোক অন্য কাজ ফেলে সেই সাড়ে এগারোটার সময় স্নানের ব্যবস্থা করবার জন্যে উপস্থিত থাকে। যেমনি খবর পেলে যে আমার ডেক চেয়ারের দুই হাতার উপর একটা কাঠের তক্তা পাতা থাকলে আমার লেখবার সুবিধে হয় অমনি জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকে তখনি একটা কাঠের তক্তা তৈরি করিয়ে দিলে। খ্যাতির উৎপাত অনেক আছে সত্য কিন্তু খ্যাতির কিছু কিছু সুবিধাও আছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। রেঙ্গুন পিনাং সিঙ্গাপুর যেখানে গিয়েচি সেখানেই ভিড়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হয়েচে বটে কিন্তু তেমনি আবার দেখাশোনা আহার আমোদ অযাচিত অবধারিতভাবে পাওয়া গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে অল্প খরচে তা পাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। নতুন জায়গায় নিজের পরিচয় দিতে অন্য লোকের অনেক সময় লাগে, আমি আগেভাগেই সে কাজটা সেরে রেখেছি। তাই যেখানে যাই, দেখি, পাত পাড়াই আছে। তোমাকে চিঠি লিখতে লিখ্‌তে ঘুম পেয়ে এসেছিল সে আমার হাতের লেখার টল্‌মলে ভাব দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে। হয় ত এম্‌নি ঢুল্‌তে ঢুলতেই লেখা শেষ পর্য্যন্ত চল্‌ত। এমন সময় অপরাহ্ণের রৌদ্র এসে আমাকে তাড়া লাগালে। পশ্চিমের ডেক থেকে পরের ডেকে আমার চৌকিটা টেনে আনতে হল। এ চৌকিটা তোমার খুব চেনা, পরিচয় দিলেই মনে পড়বে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার ঘরে সেই যে ঘাসের বুননি-করা মস্ত একটা চৌকি ছিল— মাঝে মাঝে আমার সান্নিধ্য লাভ করবার জন্যে যার হাতলের উপরে এসে তুমি বসতে, সেই বিরাট কেদারাটা আমার

সমুদ্রযাত্রার আসনের কাজ করচে। এটা নিতান্ত কম ভারি নয়। এটা ও ডেক থেকে এ ডেকে বহন করে আন্‌তে গিয়ে আমার চোখে যেটুকু ঘুম ছিল সমুদ্রপারে দৌড় মেরেচে। এ জাহাজটা যেমন বড় তেমনি এখানে যাত্রীর ভিড়ও খুব বেশি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনগুলোতে একটি বিছানাও ফাঁক নেই। আমি কেবল একটা পুরো ক্যাবিন একলা পেয়েচি। এক ক্যাবিনের মধ্যে দু তিনজন বেগানা লোক নিয়ে বাস করা আমার দ্বারা কোনমতেই সম্ভব নয়। অন্য জাহাজের চেয়ে এ জাহাজের ক্যাবিনটা অনেক ভাল। যাত্রীরা নানা জাতের। কেউ জর্ম্মন কেউ নরওয়েবাসী কেউ ইংরেজ— তার পরে চিনী জাপানী প্রভৃতি নানা দেশের নরনারীর জটলা হয়েচে। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় উপরের ডেকে গ্রামোফোন বাজিয়ে নাচ হয়। প্রথম দিন আমি ছিলুম। দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় একটুখানি নিরালা পাবার জন্যে আমি নীচের ডেকে একলা এসে বসেছিলুম। এমন সময় মিস্ গ্রীন্ এসে বল্‌লে, ওরা মনে করেচে ওদের নাচ দেখে আমি বিরক্ত হয়েচি— ওদের ইচ্ছে নয় যে আমাকে কোনো কারণে অস্থির করে। শুনে, আবার আমি উপরের ডেকে ওদের নৃত্যসভায় গিয়ে আসন নিলুম। এল্‌মহর্স্‌ট এখনো তার নাচবার সঙ্গিনী জোগাড় করতে পারে নি। তুমি থাক্‌লে নিশ্চয় তোমাকে নাচে টেনে নিত। শেষকালে নিরুপায় হয়ে একজন পুরুষকে নিয়েই ওকে নাচ জমাতে হয়েচে। সেই পুরুষটি হচ্চে কাঠিয়াবাড়ের লিম্‌ডির ছোট রাজকুমার।[২] ওদের দুজনের খুব ভাব। আজ রাত্রে ওদের চিত্রবেশী নাচ হবে। যাকে বলে Fancy dress ball। এল্‌মহর্স্‌টকে বলেচি ধুতি চাদর পরে বাঙালী সাজতে। কুমার তাঁর পাগ্‌ড়িপরা কুমার বেশেই আসবেন। মিস্ গ্রীনের ভাবনা নেই, সে সাড়ি থেকে আরম্ভ করে মালয় মেয়েদের বেশভূষা প্রভৃতি নানা জবড়জঙ্গ নানা জায়গা থেকে জোগাড় করে এনেছে। তারি মধ্যে একটা কিছু পরে' ও বোধ হয় সকলের উপর টেক্কা দেবে। দূর হোক্ গে আবার ঘুম পেয়ে

আস্‌চে। ঘুমের অপরাধ নেই। কাল রাত্তিরে শরীর ভাল ছিল না। যথেষ্ট ঘুম হয় নি। তার পরে উঠেচি ভোর সাড়ে তিনটের সময়। তার পরে আবার সমুদ্রের হাওয়াটি এসে মাথায় এসে লাগ্‌চে। এইবার চিঠি শেষ করে একবার কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজি আর ত কলম চলচেনা। ইতি ৫ই এপ্রেল ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৪৮

[১০ এপ্রিল ১৯২৪]

ওঁ

[Atsuta Maru]

রাণু

চলেছি সাঙ্ঘাইয়ের ঘাটে। আজ বৃহস্পতিবার— পর্শু শনিবার সকালে পৌঁছব।[১] তার পর থেকে কিছুকাল ডাঙার পালা চল্‌বে। হংকং বন্দরে নেবে দু দিন কাটিয়েচি। জায়গাটি ভাল, কিন্তু আকাশ ছিল অপ্রসন্ন, মেঘে কুয়াশায় বৃষ্টিতে অবগুণ্ঠিত। বাতাসের তাপ পূর্ব্বের চেয়ে হঠাৎ প্রায় ২০ ডিগ্রি নেবে গিয়েছিল— গরমের থেকে শীতে এসে পড়লুম একেবারে হুস্‌ করে,— স্বেদ থেকে কম্প, বিজ্‌লি পাখা থেকে বিলিতি কম্বল। যত উত্তরে যাব শীত আরো বাড়বে। সাঙ্ঘাইয়ের চেয়ে অনেক উত্তরে পিকিন— সেখানে এই বৈশাখ মাসে পশ্‌মি কাপড়ের বোঝা বইতে হবে।

জাহাজে এতদিন আমি একটি নির্জ্জন ডেক্‌-এর কোণে কোণার্ক হয়ে বিরাজ করছিলুম। সেই মোটা কেদারায় ঠেসান দিয়ে প্রায় সমস্ত দিন সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর সূর্য্যের আলো দেখেছি। Shelleyর একটা

কবিতার প্রথম চারটে লাইন মনে পড়ত— মনে মনে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতুম:

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright,
Blue isles and snowy mountains wear
The purple moon's transparent light.[২]

তার পরে ভাবতুম সেদিন শেলির কাছে সূর্য্যের আলো আর সমুদ্রের ঢেউ এই রকমই প্রত্যক্ষ ছিল— সে ত কেবল কবিতার লাইন ছিল না। সেদিন সেই জলস্থল আকাশের মধ্যে আমি কোথাও ছিলুম না— আর আজ সেই শেলি কোথায়? আবার একদিন আস্‌বে যখন আমি থাকব আমার কবিতার ছন্দের মধ্যে— আর কোনোখানেই না— সেদিন ঠিক এই রকমই সূর্য্যের আলো পড়বে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর। সেদিন যারা আমারই মত বসে তোমারই মত কোনো একজন মানুষকে চিঠি লিখ্‌চে তারা কি মনে ঠিক আনতে পারবে আমি তাদেরই মত সুখে দুঃখে অতখানিই সজীব ছিলুম?

যাক্‌ গে। আজ দিন চারেক থেকে কোণার্কের কোণের আকাশটুকু হারিয়ে গেছে। বাদলায় শীতে আমাকে তাড়া করে ক্যাবিনের ভিতর ঠেলে এনেচে। উপরে একটা সাধারণ বসবার ঘর আছে কিন্তু সে অত্যন্ত সাধারণ, চারদিকেই লোকচক্ষুর ঠেলা এসে লাগে। তাই এই ক্যাবিনে বিছানার উপর বসে লিখচি, বিশেষ আরামের অবস্থা নয়। রাতও হল— এগারোটা বেজে গেছে। এইমাত্র সাঙ্ঘাই থেকে একটা বে-তার বার্ত্তা আমার নামে এল— লিখচে Shanghai students send welcome।

উত্তর থেকে বাতাস এসে সমুদ্রে তুফান তুলেচে— জাহাজ দোদুল্যমান। আর বসে থাকা উচিত নয়। তোমাদের ওখানে বোধহয় এখন বেলা পাঁচটা, এবং গরম, এবং কোথাও কোনো দোলা লাগ্‌চে না, অতএব

আমার অবস্থা কল্পনাও করতে পারবে না। ইতি তোমার ভানুদাদা

১৪৯

২১ [২২] এপ্রিল ১৯২৪

ওঁ

[হংসনান্‌সু]

রাণু

পথে পথে বক্তৃতা দিতে দিতে আস্‌চি। আমি যেন দক্ষিণ পশ্চিমের হাওয়া— ভারতবর্ষ থেকে বসন্তের অভিবাদন ছড়িয়ে দিয়ে চলেচি। পর্শু গিয়েছিলুম ন্যান্‌কিঙে।[১] এই সহরের খবর নিশ্চয় তোমাদের ভূগোল বিবরণে পড়েচ। চীনের প্রাচীন রাজধানী। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাশালায় আমার সভা ছিল। প্রকাণ্ড ঘর। উপরে দেয়াল ঘিরে একটা গ্যালারি। বিষম ভীড়। তারস্বরে আমি যেই বক্তৃতা আরম্ভ করেচি, দু চারটে কথা বলেচি মাত্র এমন সময় ধড়াম করে একটা শব্দ; সভা কেঁপে উঠ্‌ল, সমস্ত লোক চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে পড়বার দরজার দিকে মুখ করেচে। আমি যে-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করচি ঠিক তারি মাথার উপরের গ্যালারি লোকের ভারে হঠাৎ বাঁধন ছাড়িয়ে চার পাঁচ ইঞ্চি নেবে পড়ল। ভেঙে পড়বার মত ভার। অতি অল্প একটুতে আট্‌কে গেল। যদি ভাঙত তাহলে সেই মুহূর্ত্তে আমারও কপাল ভাঙত। আমার মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি না হয়ে নরনারী বৃষ্টি হত। এল্‌ম্‌হর্স্টের মুখ বিবর্ণ; কালিদাস ব্যস্ত হয়ে আমাকে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। আমি নড়লুম না। হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলুম। যদি আমি ভয়ে ব্যস্ত হয়ে পালাবার পথ দেখতুম তাহলে সেই তিন হাজার লোক পালাবার ঠেলাঠেলিতে সর্ব্বনাশ কাণ্ড ঘটাত। আমি জোর করে কালিদাসকে থামিয়ে দিয়ে বক্তৃতা করে চললুম।

আশ্চর্য্য এই আমার এই বক্তৃতা সবাই বল্‌লে আমার সব চেয়ে ভালো বক্তৃতা হয়েছিল। এল্‌ম্‌হর্স্ট বেরিয়ে এসে বল্‌লে, তোমার শুভগ্রহ আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়েচে। যতক্ষণ আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলুম তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল, কখন্ ভেঙে পড়ে। আমার মনে পড়্‌ল সেই বিসর্জ্জন অভিনয়ের কথা— পিঠের দিকে অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে, আর আমি একটি ভয়ত্রস্তা বালিকার হাত চেপে ধরে অভিনয় করে যাচ্চি।[2] আমি সেদিন যদি পালাবার ভাব দেখাতুম তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই মহাকালীর কণ্ঠহারের জন্যে নরমুণ্ডের অভাব ঘটত না। ন্যান্‌কিঙের বক্তৃতা অভিনয় প্রভৃতি সেরে কাল সকাল বেলায় রেল গাড়িতে চড়লুম। আমাদের জন্যে স্পেশল গাড়ি ছিল, বেশ আরামের। সঙ্গে একদল ফৌজ আমাদের রক্ষার জন্যে বরাবর ছিল।

আজ ভোরবেলায় এসেচি— ৎসিনান্‌সু নগরে।[3] কিছুকাল পূর্ব্বে এই নগর জর্ম্মানির হাতে ছিল, তার পরে জাপানীর। এখন আবার চীনেরা ফিরে পেয়েচে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিকেলে সেখানে অভ্যর্থনা ও বক্তৃতা হবে। কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে আছি। বিকেলের হাঙ্গামের কথা মনে করে ভয় হচ্চে। আবার সেই ঠেলাঠেলি ভিড়, আবার সেই চিৎকার শব্দে বক্তৃতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত গোলমাল শেষ করে ফেলে কিছুকাল ষোলো আনা নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যে বিশ্রাম করতে পারলে আমি বাঁচি। কিন্তু আমার কর্ম্মস্থানে শনি— অতএব আমাকে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করাবেই। সুতরাং বিশ্রামের দরকার করে কোনো লাভ নেই, মঞ্জুর হবেনা।

কাল সকালে পিকিনে যাত্রা করব— সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছব।[4] চিঠি ত লিখে যাচ্চি পৌঁছবে কিনা জানিনে— চীনের ডাকঘরের উপরে খুব বেশি ভরসা কেউ রাখে না— কখনো চিঠি যায় কখনো যায় না, অদৃষ্টের খেলার মত, লেফাফায় তিন আনার স্ট্যাম্প্ বসিয়ে অনিশ্চিতকে ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা। ইতি ৮ [৯] বৈশাখ ১৩৩১

তোমার ভানুদাদা

১৫০

[২০ মে ১৯২৪]

ওঁ

[পিকিঙ]

রাণু

আজ প্রায় তিন সপ্তাহের উপর হল পীকিনে এসেচি। এসে অবধি লোকের, আর কাজের ভিড়ের অন্ত নেই। এই কয়দিনের মধ্যে অন্তত চল্লিশটা বক্তৃতা করেচি। কোনো কোনোবার দিনে তিনটে বক্তৃতাও হয়েচে। তার উপরে সমস্ত দিনই দেখাসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ লেগেই আছে। কোথাও নিরালায় বসে মন স্থির করে চিঠিপত্র লিখব তার অবসর পাই নি। আমি স্বভাবত কুঁড়ে মানুষ, এত বেশি কাজের চাপ, এত জনতার দাবী আমি সইতে পারি নি। তিমি মাছ বেচারাকে জলের মধ্যে ডুবে থাক্‌তে হয় কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ভেসে তাকে হু হু শব্দে হাঁপ ছেড়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়। আমিও যখন ভিড় সমুদ্রে একেবারে মগ্ন হয়ে থাকি তখন মাঝে মাঝে নির্জ্জন অবকাশের মধ্যে ভেসে উঠে খুব পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। এবার কিন্তু একটুও ফাঁক পাই নি। তার থেকে একটা কথা বুঝতে পারবে এখানকার লোকের কাছ থেকে ষোলো আনা সমাদর পেয়েছি। তুমি ত জানো বহু শতাব্দী আগে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ সন্যাসীরা [য] গিয়ে চীনে ধর্ম্ম বিতরণ করেছিল— তখন সেই হৃদয়বিনিময়সূত্রে চীনের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস ঘনিষ্ঠ যুক্ত হয়ে গিয়ে ছিল। এরা বল্‌চে এবার আমার আগমন উপলক্ষে আবার চীনভারতের যোগের নূতন ঐতিহাসিক অধ্যায় সুরু হল। শুনে সকল ক্লান্তি দূর হয়। যুদ্ধ বিগ্রহে রক্তপাতের রাঙা অক্ষরে মানুষের ইতিহাসের কত পরিচ্ছেদ লেখা হয়ে থাকে— কিন্তু হৃদয়যোগের নির্ম্মল বাণী ইতিহাসের যে পর্ব্বে লিখিত হয় সেইটে হচ্চে মহাপর্ব্ব। আর কিছুদিন

পরেই দেখতে পাবে চীন থেকে বিশ্বভারতীর ছাত্র শান্তিনিকেতনে চলেচে— ওখান থেকেও ছাত্র এবং আচার্য্য এখানে আসচে। আমাদের শাস্ত্রীমশায়কে[১] দু বছরের জন্যে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় পাঠিয়ে দেব স্বীকার করেছি— শুনে এরা উৎসাহ প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদ দিয়েচে। এখানকার একজন ছাত্র এমেরিকায় অধ্যয়নের জন্য ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিল সে তার ছাত্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে— সে স্থির করেচে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সংস্কৃত, পালি, বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করবে। এখন থেকেই দিনরাত সে ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে লেগে রয়েচে। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করেচে তার নিষ্ঠার অন্ত নেই, ব্যাকরণ তার হাতে সর্ব্বদাই আছে। ছোট ছোট সংস্কৃতবাক্য তৈরি করবার চেষ্টা করে। যেমন তার বুদ্ধি তেমনি অধ্যবসায়। গেল বারে কাশীতে যখন ছিলুম তখন বির্‌লা আমাদের আশ্রমে বিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন[২]— সেই টাকা দিয়ে ওখানে এসিয়াবাসী ছাত্র ও যাত্রীদের জন্যে বাড়ি তৈরি করতে বলে দিয়েচি। নইলে, এখন যে রকম স্থানাভাব তাদের কোথায় রাখব? তোমরা হলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র— দশ বিশ লাখ টাকার কম কোনো অঙ্ক মুখে উচ্চারণ করতে তোমাদের লজ্জা হয়। আমাদের গরীব আশ্রমে বিশ হাজার টাকার ধরমশালার প্রস্তাব শুনে বোধ হয় তোমাদের ভয়ঙ্কর এক চোট হাসি পাবে। তা হেসো কিন্তু জেনো উপকরণ প্রাচুর্য্য দিয়ে প্রাণবান জিনিষ তৈরি হয় না, অমৃত দিয়েই হয়। সেই অমৃত যদি আমাদের সাধনার মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের দারিদ্র্যের নগ্নতার থেকেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হবে। মেঘের আড়ম্বরে দিনের আলোক উজ্জ্বল হয় না— রিক্ত মেঘের উপকরণবিরলতার ভিতর দিয়েই সত্যের সূর্য্য আপন মহিমা বিস্তার করে। সেই মহিমার দিকেই আমরা লক্ষ্য রাখব।

আজ রাত্রে পিকিন ছেড়ে যাব।[৩] ভারতবর্ষ ছাড়ার পর আজ প্রথম তোমার চিঠি পেলুম। পিকিনে পৌঁছবার আগে পর্য্যন্ত খুব ব্যস্ততার মধ্যেও

তোমাকে আমি নিয়মিত চিঠি লিখে এসেচি। মনের ভিতর অল্প একটু আশা ছিল যে পিকিনে এসে হয়ত তোমাদের খবর পাওয়া যাবে। কালিদাস, ক্ষিতিবাবু, নন্দলাল দেশ থেকে চিঠি পায় আর আমাকে জিজ্ঞাসা করে বেনারসের কোনো চিঠি পেয়েচেন। আমি বলেচি যে, না, আমি চিঠির প্রত্যাশা করিনে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু ওদের কাছে আমার গুমর নষ্ট করতে চাই নি। বিশেষত যখন Elmhirst আমাকে জিজ্ঞাসা করত, Why no news from Benares আমি বল্‌তুম রাণু জানে আমাকে চিঠি লিখ্‌লে আমি পাব না। এ'কেই বলে অহঙ্কার। যাই হোক্‌ পীকিনে এসে ঠিক করলুম, অনেক চিঠি ত লিখেচি, এবার চিঠি না পেলে আর লিখব না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে এত দিন লিখি নি। তা ছাড়া সময় এত কম ছিল যে চিঠি লেখা দুঃসাধ্য হয়েছিল।

আজ বিশে মে তারিখ। ২৫শে বৈশাখের দিনে এখানে খুব ধুমধাম করে আমার জন্মোৎসব হয়ে গেল।[৩] দেশে ফিরে গিয়ে সে সব গল্প হবে। হয় ত কালিদাস ক্ষিতিবাবুরা তার সমস্ত বিবরণ পাঠিয়ে দিয়েচেন, হয়ত বা কোনো-না-কোন কাগজে ছাপা হয়ে গেচে। যাই হোক এখান থেকে আর একটা জায়গায় ভ্রমণ সেরে ৩১শে তারিখে সাঙ্ঘাই থেকে জাহাজ ধরে জাপানে যাত্রা করব। ৪ঠা জুনে কোবে পৌঁছব। চীন দেশের পালা এখনকার মত শেষ হল। জাপানে নিমন্ত্রণ পেয়েচি। সেখানে হয়ত জুনের শেষ পর্য্যন্ত কাট্‌বে। জাপানে না পৌঁছলে ঠিক বল্‌তে পারচিনে। সেখানেও অনেক কাজ করবার আছে। হয়ত বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে। তার পরে Indo-China, Siam এবং জাভা। তার পরে— ভারতবর্ষ।

আমি ফিরে গিয়ে তোমার বাব্‌জাকে বল্‌ব তোমাকে বিশ্বভারতীতে ভর্ত্তি করে দিতে। আশা বলেছিল তার পরীক্ষা শেষ হলে সে শান্তিনিকেতনে আসবে। তোমরা দুই বোনে এসে যদি থাক তা হলে খুসি হব। না হয় অশোক[৪] সুদ্ধ এসে ভর্ত্তি হবে। যাই হোক্‌ তুমি যদি ডিগ্রি পাবার মোহ

কাটিয়ে থাক তাহলে বিশ্বভারতীতে এলে তোমার উপকার হবে সন্দেহ নেই। তুমি মনে কোরো না তোমাকে বিশ্বভারতীর ছাত্রী করে নিতে আমার অনিচ্ছা আছে।

গত কয়দিন বক্তৃতা নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে দিন একেবারে ঠাসা [ছিল]। পর্শু শুতে রাত্রি সাড়ে দুপুর, কাল রাত্তির দুটো হয়েছিল। আজ কেবলি ঘুম পাচ্চে। অতএব এইখানেই শেষ করি। [৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১]

ইতি তোমার ভানুদাদা

১৫১

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

ওঁ

রাণু

ইয়াংসি নদীতে ভেসে চলেচি। সাঙ্ঘাইয়ের ঘাট অদূরে দেখা যাচ্চে। বোধ হয় আর আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছব। তার পরে আগামী ৩১শে তারিখে সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। জাপানে পৌঁছব ৪ঠা জুনে।[১]

নানা বক্তৃতা এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আদর সমাদরের আবর্ত্তের মধ্যে একটুও অবকাশ পাচ্চি নে। জীবনে এত খাটুনি খাটি নি, এত বক্তৃতা দিই নি, এত লেখা লিখি নি।

তোমার চিঠি হয়ত এক আধখানা সাঙ্ঘাইয়ে পৌঁছিয়ে পাব। কিন্তু এই চিঠি যখন পাবে তার পরে যদি আমাকে চিঠি লেখো তাহলে নিম্ন ঠিকানায় লিখবে:

C/o Dr. P. Sen
Tan Tok Seng Hospital
Singapur

জাহাজে [য] ঘাটে ঠেকল। আজ তবে আসি। ২৮ জুন ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৫২

[১৮ জুলাই ১৯২৪]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

স্টীমার পৌঁছতে একদিন দেরি হয়ে গেল। তাই কাল ১৭ই এসেচি।[১]

তোমাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলুম যে ঘাটে ঘাটে তোমাকে চিঠি লিখব। তাই লিখেও ছিলুম। তার পরে পিকিনে গিয়ে যখন তোমার কোনো চিঠি পেলুম না, তখন আমার আর লেখবার দায়িত্ব রইল না। এবার এত ব্যস্ত ছিলুম যে দেশে দুই একখানা ছাড়া কাউকে চিঠি লিখিই নি। কোনোমতে সময় করে তোমাকে লিখেছিলুম— এত অজস্র চিঠি পেয়ে তোমার বোধ হয় চিঠি পাবার ক্ষিদে মরে গিয়েছিল।

বৌমার কাছে আশা[২] আর তোমার পাস করার খবর পেয়েচি। শুনে খুসি হলুম।

আমি সেপ্টেম্বরেই আবার দূর দেশে যাত্রা করব[৩]— ফিরতে বোধ হয় দেরি হবে। তোমাদের কলেজে এখন কোনো ছুটি আছে কি না জানি নে। যদি থাকে, আর যদি তোমরা একবার আসতে পার তাহলে খুসি হব। নইলে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না। [২ শ্রাবণ ১৩৩১]

ভানুদাদা

১৫৩

[অগাস্ট ১৯২৪]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আসচে শনিবারে[১] কলকাতায় যাব সেই খবরটা দেবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখচি। আজ আমাদের এখানে একটা চা-সভা স্থাপন হবে তার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আছি। চীন দেশ থেকে চায়ের সরঞ্জাম এবং চা ও নানা রকম খাবার তারা এইজন্যে দিয়েচে তাই আমার এক চীনবন্ধুর নামে এই সভার প্রতিষ্ঠা হবে[২] সময় প্রায় হয়ে এল— একটা গান তৈরি করেচি সেটা এই উপলক্ষে গাইতে হবে।[৩]

তোমার ভানুদাদা

১৫৪

[?২১ অগাস্ট ১৯২৪]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

ধীরেনকে[১] যদি পাঠাই তোমাকে আনবার জন্যে তাহলে কি আস্‌তে পারবে? আমি বোধ হয় শীঘ্রই অর্থাৎ শনি রবিবারের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে যাব। যদি আসতে পার তাহলে সেখানেই তোমাকে নিয়ে আস্‌বে। এবার যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুসি হব— মোকাবিলায় সকল কথার আলোচনা হতে পারবে। আজ আর একটু

পরেই এণ্ড্রুজ সাহেব আসবে। যদি লোক পাঠালে তোমার আসা সম্ভব হয় তাহলে মাকে বোলো টেলিগ্রাফ করে দিতে। আজ বৃহস্পতি— কাল শুক্রবারে চিঠি পাবে। আমি বোধ হয় রবিবারে বোলপুরে যাব।[১] [?৫ ভাদ্র ১৩৩১]

তোমার ভানুদাদা

১৫৫

৪ আশ্বিন ১৩৩১

ওঁ

[মাদ্রাজ]

রাণু

এই মাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেছি।[১] আজ রাত্রে কলম্বো রওনা হব। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহমন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম। গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্চি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল— আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে— নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন পাত্রে প্রতিদিন নানারঙের অমৃতরস ঢেলে দিত— কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম। সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে। লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্ভ্রান্ত, তারই পথের ধূলায় তার চিত্ত ম্লান,— সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে

ফিরে যেতে চাচ্চে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে [য] সে কাজও অনেক করেছে ভুলও কম করেনি— আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই,— আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে রহস্যালোক থেকে এই মর্ত্ত্যালোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তিসরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে। আবার তার মধ্যে থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে। সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে— সেটা ত ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া, সেটা যে-মুহূর্ত্তে কুহেলিকার মত মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্ম্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এম্‌নি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্য্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেচে। আজ আমি চলেচি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে— যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকব তখন হয়ত আমার ভিতরকার কর্ম্মী আর সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরনা তলার বাঁশির বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিয়তই ডাকবে।— ডাকবে সেই নির্জ্জন নির্ম্মল নিভৃত ঝরনা তলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হচ্চে।— বল্‌চে সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি ; এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় নি— এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতর মহলে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই, যদিও আজ চলেচি পশ্চিম সমুদ্রের তীরে আমার মন খুঁজে বেড়াচ্চে আরেক তীরে সেই সকল-কাজ-ভোলা বালকটিকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে— এখন

সে কোথায় ঘুরে মরচে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, বলে ডাক পড়েচে। একজন কে তার গান শুনতে ভালবাসে, আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা— সেই ত শিশুকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তার পরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়চে

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪
ভানুদাদা

১৫৬
[২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪]

ওঁ

কলম্বো

রাণু

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হল সিংহলে এসেছি।[1] কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদ্‌লার মেঘ সকালবেলার সোনার আলো গণ্ডুষ ভরে' পান করেছে, কেবল তার তলানি ছায়াটুকু বাকি আছে। দেশে থাক্‌লে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালই লাগ্‌ত। ইচ্ছে করত কাজকর্ম্ম বন্ধ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা করে ছেড়ে দিই, কিম্বা হয়ত গুনগুন সুরে নতুন একটা গান ধরে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে বসতুম। কিন্তু এখানে মনটা বিবাগী, তার একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। "গানহারা মোর হৃদয়তলে"[2] এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্চ্ছার মত উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো দেবতার অভিনন্দনের মত বোধ হয়— আজ মনে হচ্ছে

যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। তাঁর বীণার থেকে যে বাণী পাথেয়স্বরূপ সংগ্রহ করে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়?

কলম্বোতে যে বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে,— ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে ঘরে বসে আছি তার জিনিষগুলো এত বেশি ফিটফাট্ যে, মনে হয় সেগুলো ব্যবহার করবার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বসবার শোবার আস্‌বাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মত, সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে সরে যায়। এই ধনীঘরের অতি পারিপাট্য, এও যেন একটা আবরণের মত। আমার সেই তেতলা ঘরের চেহারা মনে পড়ে ত? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না,— তার অপরিচ্ছন্নতাই যেন তার প্রসারিত বাহু, তার অভ্যর্থনা। সে ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকে ধরে। ভানুদাদার মত এতবড় মানুষটাকে ধরে, আর রাণুর মত অতটুকু মেয়েকেও ধরেছিল। মানুষকে ঠিকমত ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃতআকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম তখন পাশাপাশি আমার দুইরকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকার ছোট ঘরটি, আর একদিকে ছিল দিগন্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিঃশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদরের দরজা। তোমার জীবনে রাণু, যদি আমার মধ্যে সেই সদর দরজাটা খুঁজে পেতে, তাহলে খোলা আকাশের স্বাদ পেয়ে হয়ত খুসি হতে। তোমার অন্দরের দরজার অধিকার দাবী আমার ত চল্‌বে না— এমন কি, সেখানকার চাবিটা তোমার হাতেও নেই, যার হাতে আছে সে আপনি এসে প্রবেশ করবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি যা দিতে পারি তুমি যদি তা চাইতে পারতে

তাহলে বড় দরজাটা খোলা ছিল। কোনো মেয়েই আজ পর্য্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায় নি— যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম; কেন না মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা শক্তি। সেই চাওয়ার বেগেই পুরুষ নিজের গূঢ় সম্পদকে আবিষ্কার করে— আমার একটি আধুনিক কবিতায়[৪] আমি এই কথা বলেছি। বলেছি, শঙ্কর যখন তপস্যায় থাকেন তখন তাঁর নিজের পূর্ণতা আবৃত হয়ে থাকে। উমার প্রার্থনা তপস্যা রূপে তাঁকে আঘাত করে যখন জাগিয়ে দেয়, তখনি তিনি সুন্দর হয়ে, পূর্ণ হয়ে, চিরনবীন হয়ে বেরিয়ে আসেন। উমার এই তপস্যা না হলে তাঁর ত প্রকাশের ক্ষমতা নেই। কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেচি কোনো মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজো তা হল না— সেই জন্যেই আমার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয় নি। কি জানি আমার উমা কোন্ দেশে কোথায় আছে? হয়ত আর জন্মে সেই তপস্বিনীর দেখা পাব। ইতি
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

ভানুদাদা

১৫৭

২২ পৌষ ১৩৩১

ওঁ

GIVLIO
CESARE

কল্যাণীয়াসু

দক্ষিণ আমেরিকার বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েচি।[১] জাহাজ এখনো তারই কূলে কূলে চলেছে। আজ সকালে ব্রেজিলের এক সহরের সামনে

আমাদের জাহাজ এসে দাঁড়িয়েচে। আজ অর্দ্ধরাত্রে পৌঁছবে রিয়ো ডে জেনৈরোতে। তার পরে মাডেবা দ্বীপে, তার পরে বার্সেলোনা, তার পরে জেনোয়া। দেশ থেকে বহু দূরে ছিলুম, ডাক পৌঁছতে দেড় মাস লাগ্‌ত। এখন দেশের কাছের দিকে চলেচি বলে মন খুসি আছে। বুয়েনোস আইরেস থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু নানা চক্রান্তে কোনোমতেই ঘটে উঠ্‌ল না। এতদিনে হয়ত খবর পেয়ে থাক্‌বে এখানে আসবার পথে জাহাজে আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরে ছিল, আমাকে কিছু অতিরিক্ত কাবু করেছিল; একে ত জাহাজের ক্যাবিনে বদ্ধ হয়ে বাস করাই একটা রোগবিশেষ তার উপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা যেন ভূতের মত বুকের উপরে চেপে বসে ছিল— রাত্রে ঘুম ছিল না, দিনে শান্তি ছিল না। এই অবস্থায় একখানা খাতা হাতে করে কবিতা লেখা ছাড়া আমার আর কোনো সান্ত্বনা ছিল না। কত কবিতাই যে লিখেচি তার আর ঠিকানা নেই— খাতা ভরে গেছে।[১] অবশেষে জাহাজ ডাঙায় এসে পৌঁছল। আমার আসল নিমন্ত্রণ ছিল পেরুতে— আমাদের পথের খরচ তারাই জুগিয়েচে। ঠিক একশো বছর পূর্ব্বে পেরু স্পেনের রাজ্যপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল— তারই শতবার্ষিকী স্মরণোৎসব সভায় আমার নিমন্ত্রণ।[২] আর্জেন্টীন হয়ে তারই রাস্তা। মাঝখানে আণ্ডেস পাহাড়। তুমি জানো, আণ্ডেসের উচ্চতা হিমালয়ের ঠিক পরেই। এই আণ্ডেসের উপর দিয়ে রেলগাড়ির পথ— বোধ হয় ১৫০০০ ফিট উঁচু হবে; সেখানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পাহাড় পার হয়ে চিলি, সেখানে ভাল্‌পারেজো বন্দরে আবার জাহাজ অবলম্বন করে পাঁচ ছয় দিন পরে তবে পেরুতে পৌঁছনো যায়। কম কাণ্ড নয়। দশই ডিসেম্বর তারিখে ওদের উৎসব। আমরা আর্জেন্টীনে পৌঁছলুম, নভেম্বরের শেষের দিকে।[৩] অতএব আর বিলম্ব না করে পেরু যাবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কিন্তু শরীর বিগ্‌ড়ে আছে— বুকের পাঁজরের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা বাসা বেঁধে মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটাচ্চে। অতএব ডাকো ডাক্তার।

এখানকার সবচেয়ে যিনি বিখ্যাত ডাক্তার তিনি আমাকে ভাজায়মান (?) কই মাছের মত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ঠুকে টিপে পরীক্ষা করলেন, ঘড়ি বের করে নাড়ীর পদক্ষেপ গণনা করে দেখ্‌লেন— শেষকালে গম্ভীর মুখে বল্‌লেন দেহযন্ত্র বিকল হয় নি কিন্তু দুর্ব্বল হয়েচে অতএব এখন কিছুদিন এ'কে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য। তাছাড়া ওটাকে তাজা করে তোলবার জন্যে কিছু ওষুধও চাই। ডাক্তারের পরামর্শমত এখানকার একজন ধনী মহিলা সহরের থেকে দূরে একজায়গায় নদীর ধারে আমাদের জন্যে একটি বাগান বাড়ি খালি করে দিলেন।* এদিকে পেরু বলে পাঠালে, আচ্ছা ভাল, আমাদের উৎসবের দিনে নাই বা এলেন, বিশ্রাম করে শরীর সুস্থ করে নিয়ে তার পরে আসতে দোষ কি? খুব কষে কিছুদিন বিশ্রাম করে নিয়ে আবার ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো গেল— আবার এই দেহটার এ পিঠে ও পিঠে ঠোকাঠুকি, টেপাটুপি— আবার সেই পরামর্শ, আণ্ডেস্ পাহাড় লঙ্ঘন করবার মত আমার যোগ্যতা নেই। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তরীপ বেষ্টন করে সমুদ্রপথে যাবার প্রস্তাব করা গেল— ডাক্তার বল্লে, দক্ষিণ সমুদ্রে এত অত্যন্ত বেশি শীত যে ঠাণ্ডায় আমার হৃৎপিণ্ড একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে যাবে। অর্থাৎ পাহাড় পেরোতে গেলে হাঁপিয়ে মরব আর সমুদ্র পেরোতে গেলে কাঁপুনি ধরিয়ে মারবে। দুটোর মধ্যে কোনোটাই স্পৃহনীয় নয়। অতএব পলায়ন ছাড়া গতি নেই। জাহাজের সংবাদ নিয়ে জানা গেল, পর বৎসরে তৃতীয় জানুয়ারিতে আটলাণ্টিক পাড়ি দেবার জাহাজ পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস এর মধ্যে কিছু ষড়যন্ত্র ছিল। জাহাজ শীঘ্র পাওয়া গেলে আমাকে ধরে রাখবার মৎলব ব্যর্থ হত। আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হর্স্ট্‌ও নানা কারণে বিলম্ব করার পক্ষপাতী। অতএব সুদীর্ঘকাল বিনা প্রয়োজনে আমি বন্দী হয়ে রইলুম। পাখীর খাঁচা যদি খুব করে ঢাকা দেওয়া যায়, তাহলে অবিরাম গান গেয়ে সে আত্মবিনোদন করে। আমিও প্রতিদিন পায়ের শিকল নাড়া দিয়ে সেই তালে কবিতা লিখ্‌তে লাগ্‌লুম।

অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই তিন মাসে আমি বোধহয় ৬০ খানা কবিতা লিখেচি।[*] শুধু কলম চলেছিল তাও নয়, মুখও বন্ধ ছিল না। যদিও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া ডাক্তারের নিষেধ ছিল। তবু দলে দলে যারা আমার বাড়িতে আস্‌ত, তারা বক্তৃতা আদায় করে যেত। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সুদূর দেশে আমাকে প্রায় সকলেই জানে, সকলেই ভালোবাসে। আমার লেখার এত বিবিধ তর্জ্জমা ও আলোচনা আর কোথাও হয়েচে কিনা জানি নে। এখানে আমি সকলের ঘরের লোকের মত ছিলুম। আমাকে ভালো করে দেখবার অবকাশ এরা পায় নি, কিন্তু এদের দেশে আমি যে ছিলুম এতেই এরা খুসি। বিদেশের কাছে আমি যে রকম প্রচুর আদর পেয়েছি এমন আমি দেশের লোকের কাছে পাই নি। আমার এই চিঠি ইটালিতে পৌঁছিয়ে ডাকে দেব। সেখানে পৌঁছব, ১৯শে জানুয়ারিতে,[১] অর্থাৎ মাঘ মাসের কাছাকাছি। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯২৫

ভানুদাদা

১৫৮

২১ চৈত্র ১৩৩১

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তুমি যে-দুঃখ পেয়েছ তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালোই হবে; এর আঘাত একদিন কাটিয়ে উঠে সুস্থ হয়ে সুন্দর হ'য়ে তোমার সংসারের মধ্যে ঠিক আসনটি পেতে পারবে। তোমার নূতন জীবনের জন্যে তোমার বিধাতা কঠিন দুঃখের দাবী করেচেন। সেই মূল্য চুকিয়ে

দিয়ে যা লাভ করবে তাই তোমার পক্ষে খুব বড় জিনিষ হবে। তোমার মস্ত সৌভাগ্য এই যে, তোমাকে তিনি যা দিচ্চেন তা শস্তায় দিচ্চেন না। মূল্যবান জিনিষ শস্তায় পেলে তার ঋণ থেকেই যায়। তাতে ঠিক পাওয়া হয় না। তোমার মধ্যে যা অসত্য ছিল তাই আজ এমন করে অপমানিত হল— এই ত ভালো হল। আজ অগ্নিস্নানে পবিত্র হয়ে তুমি বিশুদ্ধ নির্ম্মলস্বরূপে তোমার সংসারে আত্মোৎসর্গের বেদী রচনা কর'। সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়ে আপনাকে তোমার ভগবানের কাছে প্রতিদিন পূজার নৈবেদ্যের মতো সমর্পণ করতে হবে— সত্য হতে না পারলে সে নৈবেদ্য তো দেবতা গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজের জিনিষকে নিজের হাতে শোধন করে নিচ্চেন— তাঁর হাতে দুঃখের এই অভিষেক তুমি মাথা পেতে স্বীকার করে নাও, তাতে তোমার মঙ্গল হবে।

ইতিমধ্যে বীরেন[১] এসেছিল। যতবার তার সঙ্গে আমার আলাপ হচ্চে ততবারই আমি খুসি হচ্চি। তার ক্ষমা তার প্রেম তোমার পক্ষে অমূল্য সম্পদ। নিজের মধ্যে একদিকে যেমন তুমি দৈন্যের গ্লানি ভোগ করেচ বাইরে থেকে আর একদিকে তেমনি দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করতে পেরেচ— এমন সার্থকতা তো সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেবল দুঃখই তো পেতে পারতে, কিন্তু তার চেয়ে আরো আক্ষেপের বিষয় হ'ত, যদি যা পাচ্চ তার মূল্য বোঝবার সুযোগ না পেতে। যদি আত্মাভিমান নিয়ে বিধাতার দানকে খর্ব্ব করতে।

বীরেনরা আরো দুটো চিঠি পেয়েছে। তাতে অপরপক্ষ ওদের অনেক শাসিয়ে লিখেছে।[২] কিন্তু তাতে কেবল তারা নিজেদেরই উত্তরোত্তর বেশি করে ঘৃণ্য করে' তুলচে। তোমার উপরে ওদের করুণা এবং স্নেহ আরো বেড়েই চলেচে। এই কথা মনে রেখে তুমি মনে সান্ত্বনা পেতে পারবে।

আমি আগামী বুধবারে শান্তিনিকেতনে যাব। সেখানে নববর্ষের উৎসব হবে— তার পরে ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মোৎসব। আমার নূতন বা

তৈরি শেষ হয়েচে। তোমরা যখন আস্‌বে তখন আমার সমস্ত চিঠি সঙ্গে করে এনো। সকলের ইচ্ছা সে চিঠিগুলি রক্ষা করা হয়— এখানে যত্ন করেই রাখা হবে।[৩] ইতি ৪ এপ্রেল ১৯২৫

ভানুদাদা

১৫৯

[?৫ এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তুই মনে করিস্‌নে[১] তোকে কেউ আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে পারে— বিশেষত যখন তোকে অপমান আর দুঃখ এমন করে আক্রমণ করেচে। এই সব নিয়ে আমার এই ভাঙা শরীরে আমি কি কম বেদনা পেয়েছি— এই সব ব্যাপারে কিছুতে আমাকে সুস্থ হতে দিচ্চে না। সব চুকে গেলে তবে বিশ্রাম এবং শান্তি পাব। যদি স্নেহ মনে না থাক্‌ত তাহলে ভর্ৎসনাও করতুম না।

কাল চিঠির যে উত্তর দিয়েছি আজ রবিবারে পাবি নে। সোমবারে এই দুখানা চিঠি একসঙ্গে তোর হাতে পড়বে। যদি মঙ্গলবারের ডাকে চিঠি এখানে দিস তাহলে পাব— নইলে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় জবাব লিখিস্। বুধবারে বিকেলে পাঁচটার গাড়িতে রওনা হব।

আজ শান্তা ও কালিদাসের এখানে নিমন্ত্রণ[২] আছে তারই উদ্যোগে ব্যস্ত আছি তাছাড়া শরীরও শ্রান্ত ২১ [২২] চৈত্র ১৩৩১

ভানুদাদা

১৬০

[? এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয়াসু

সেই প্রথমদিন তোর একখানি চিঠির পর আর চিঠি পাই নি। ডাকে মারা যাচ্চে— কিম্বা তোর অবকাশ হচ্চে না বুঝতে পারচি নে। তুই যদি এরকম অবস্থায় চিঠি না লিখিস তাহলেও আমি নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু চিঠিপত্র চুরি গেলে সেটা ভালো হয় না। চারুবাবু[১] এখানে এসেছিলেন আজ যাচ্চেন তাই তাঁর হাতে এই চিঠি তাড়াতাড়ি দিচ্চি। মীরার কাল সমস্ত রাত colic হয়েছিল তাই নিয়ে আজ সকালে ভারি ক্লান্ত হয়ে আছি— এ কয়দিন অত্যন্ত গরমও পড়েছে। কাল আশাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছি।[২]

আমার এখানে নতুন খবর বিশেষ কিছুই নেই। রথী বৌমা কলকাতায়।

ভানুদাদা

১৬১

[?এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিপত্র কিছু কিছু মারা যাচ্চে বুঝতে পারচি। তাই এ চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠালুম। অনেকদিন তোর চিঠি পাই নি, সে কথা তোকে কাল লিখেচি।

বিয়ের আগে তোরা কিছুদিন এখানে এসে থাকবি না ত কি। যখন তোদের সুবিধা হয় আসিস্। আমার পক্ষে এখন কোথাও যাওয়া অসম্ভব— নড়চড়া করতে গেলে তখনি বুঝতে পারি— হৃদ্‌যন্ত্রটা পাঁজরের ভিতরে একটা বোঝা হয়ে আছে।

সমস্ত দিন কেদারায় বসে কাটাই। কি ভাগ্যি এবারে গরম এখনো পড়ে নি। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়।

বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার বেলা চলে যায়। বেশ ভালোই লাগে। এই অসুখের ভিতর দিয়ে খুব বড় একটা মুক্তির ভাব সমস্ত ক্ষণ আমার মনের মধ্যে লেগেই আছে। দিনের আলো নিবে গেলে রাত্রের আকাশে সমস্ত জ্যোতিষ্কলোক যেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে— প্রাণের আলো ম্লান হয়ে এলে অমৃতলোকের আভাস তেমনি করেই মনের দৃষ্টির সাম্‌নে ফুটে ওঠে। যখন ছোট ছিলুম তখন বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মধ্যে আমার মুক্তির জায়গা ছিল— অনেককাল পরে অনেক পরিমাণে আমার সেইদিন যেন ফিরে এসেচে। সেইজন্যে আমার দুর্ব্বলতার বোঝা বুকে পিঠে বহন করেও মনে হচ্চে আমি ছুটি পেয়েছি।

ভানুদাদা

বীরেনের চিঠি পড়ে খুবই খুসি হয়েছি। বাঙালীর ঘরে এ রকম ছেলে প্রায় দেখা যায় না। ওর ভালোবাসা তোর পক্ষে কেবল সৌভাগ্য নয় সম্মান। আমার কামনা, তুই যেন কায়মনোবাক্যে এর যোগ্য হতে পারিস।

১৬২

[মে ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমাকে কাল জন্মদিনের বিবরণ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি।[১] কিন্তু আজকাল কেদারায় হেলান দিয়ে বসে থেকে থেকে এমন কুঁড়েমিতে পেয়েছে যে ভালো করে চিঠি লেখা কাকে বলে ভুলে গেছি। লেখা পড়া দুইই আজকাল বন্ধ আছে। প্রায় সমস্ত দিন খোলা আকাশের সামনেই পড়ে থাকি— সামনের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। সেটা ক্রমে বেশ ভালো লাগ্‌চে— অর্থাৎ আকাশটা যে শূন্য নয় তা বুঝতে পারচি। যখন ছোট ছিলুম তখন দিনের পর দিন এই আকাশ আমার মন ভুলিয়ে নিয়ে যেত— তারি ডাক শুনে আমি ইস্কুল পালিয়েছি। ইদানীং নানা প্রকারের হট্টগোলে এই ডাকটি আমার কাছে এসে পৌঁছত না। শরীর অসুস্থ হওয়াতে যেই কর্ম্মের দাবী কম হয়েচে অমনি নীলাকাশের বাঁশির স্বর সেইদিনকার মতই আবার আমার বুকের মাঝখানে এসে ছুটির নিমন্ত্রণ করে যাচ্চে। আমার উত্তরায়ণ ঘরের সাম্‌নেকার খোয়াইয়ের ধূসরবর্ণ নিস্তব্ধ তরঙ্গের পরপারের সুদূর তালগাছগুলি পশ্চিম দিগন্তের ভাষাহীন সঙ্কেতের মত অস্তাচলের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী কোন্ অনির্ব্বচনীয়ের দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্চে। এবারকার জন্মদিন সেই পথযাত্রীর জন্মদিন। আজ চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে মেঘমুক্ত আকাশের দীপ্ত আলোর নীচে এই পথিকই জন্মেছিল, বিদ্যার, ধনের, খ্যাতির তীর্থে যাবার জন্যে সে পর্‌ওয়ানা আনে নি— হাটের লোকে যা'কে অলক্ষ্য বলে জানে তাকেই লক্ষ্য করে সে যাত্রা আরম্ভ করেছিল। এবার পঁয়ষট্টি বছর বয়সের সুরুতে সেই অতি সাবেককালের কথাটা হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল। পথের সাথী

আমাকে বরণ করেচেন, আমার জন্যে ভোগ নয়, স্বার্থ নয়, কীর্ত্তি নয়, সঙ্গ নয়— একে একে বন্ধন ছিঁড়বে, ঘরের ভিৎ ভাঙবে, সঞ্চয় যাবে শূন্য হয়ে, ভিড়ের সভা হয়ে যাবে ফাঁক— তার পরে যখন সব চুকে বুকে যাবে তখন দেখ্‌তে পাব শূন্যতার পাত্রখানি রসে ভরে আছে।

ভানুদাদা

তোমার মাকে বোলো তাঁর
চিঠি পেয়েছিলুম।

১৬৩

১৫ মে ১৯২৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, উত্তরায়ণে যে বাড়িতে থাকতুম সেটা নতুন করে তৈরি হয়েচে।[১] মাঝের ঘরটার চারদিকে দরজা জানলা নেই, তার ছাদটা হয়েচে উঁচু আর পাকা। পশ্চিম দিকে কাঁকর-দেওয়া যে চাতাল আছে তার উত্তর কোণে একটা ছোট ঢাকা বারান্দার মত তৈরি হয়েচে। সকালে সেইখানে আমার কেদারা নিয়ে বসি। অনেকক্ষণ রোদ্দুর আসে না। সামনে আমার খোয়াই, আর সেটা ছাড়িয়ে দূরে সাঁওতাল পাড়া। বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত এইখানে আমার কেটে যায়,— তার পরে স্নান করতে যাই. স্নান করে খেয়ে মাঝের ঘরে বসি। সাম্‌নে উত্তর দিকের মাঠ, তার দূর প্রান্তে তালবন। মাঝখান দিয়ে ভুবনডাঙার রাস্তা চলে গেছে। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এইখানেই আমার দিন যায়। আজকাল প্রখর রৌদ্র— তপ্তবাতাস যেন তৃষ্ণাতুর পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাসের

মত। আমি ঘর বন্ধ করে এই তাপ এড়াতে চাই নে। আমি চেয়ে থাকি— আকাশে চীল উড়ে যায়; শালিখগুলো বারান্দায় এসে ঠোঁট দুটো খুলে হাঁপাতে থাকে, বুঝতে পারি আমার কাছে তারা জল ভিক্ষা করতে এসেচে— আমি তাদের জন্যে একটা হাঁড়িতে জল ভরে জলসত্র খুলেচি। বেলা যখন চারটে বাজে— সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ে' আমার একতলা ঘরটার মধ্যে তার দীর্ঘ করপ্রসারণ করে। তখন পূবদিকের বারান্দায় গিয়ে বসি, যথাসময়ে চা আসে। চা খাওয়া হলে পরে পূবদিকের কাঁকর বেছানো রাস্তায় আমার চৌকি পড়ে। তখন ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আসে আমার কাছে কবিতা. পড়বার জন্যে। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি— ছাত্রছাত্রীরা প্রায় কেউ নেই। মেয়েদের মধ্যে আসে লাবী[২] অমিতা[৩] গৌরী[৪], আর তাদের মায়েরা[৫]; ছেলে কেবল দু জন। আমার সেই বৈকালিক ক্লাস কেবল দুদিন আরম্ভ হয়েচে। Wordsworth[৬] থেকে পড়াতে সুরু করেছি, প্রথম দিন পড়িয়েছিলুম সেই হাইল্যাণ্ড মেয়েটির কবিতা[৭]— কাল পড়িয়েছি "She was a phantom of delight।" আমি এমন করে পড়াই যে, ওরা বোধ হয় কখনো ভুলতে পারবেনা। আমি যদি কবিতা ইত্যাদি বাজে জিনিষ লিখে সময় নষ্ট না করতুম তাহলে নিশ্চয়ই ইস্কুলমাস্টার হতে পারতুম। পড়ার ক্লাস হয়ে গেলে পর ক্রমে যখন সন্ধ্যা অন্ধকার নেমে আসে তখন আবার একদল আমার কাছে গান শিখ্‌তে আসে। এখন দিনু নেই— সে গেছে পুরীতে চলে, কাজেই গান শেখাবারও একমাত্র কর্ত্তা আমি। ভুল শেখাই কি ঠিক শেখাই তা অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু শিখিয়ে ত যাই। ক্রমে রাত্তির হয়ে আসে— মেয়েরা চলে যায়। সেই বাইরে বসেই রাত্রের খাওয়া খেয়ে নি। তার পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঐখানেই পড়ে থাকি। আমার জন্মদিনেই শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে গেছে। এখন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ভূমিকা হয় অন্ধকারে। কি গভীর নির্ম্মল স্বচ্ছ অন্ধকার!— অসংখ্য তারার সভায় প্রহরগুলি নিঃশব্দচরণে তাদের প্রণাম জানিয়ে জানিয়ে চলে যায়। আমি

কেদারায় হেলান দিয়ে কখনো ঘুমোই কখনো জাগি। আশ্রমের কুটীরে কুটীরে সব আলোগুলিই নিবে যায়, চারিদিক নিস্তব্ধ— আকাশে যেন শান্তনিঃশ্বাস শিবের তপস্যা ; নন্দী যেন অবারিত প্রান্তরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ঠোঁটের উপরে তর্জ্জনী তুলে। রাত একটা হয় কি দুটো হয় জানতে পারিনে— শোবার ঘরে উঠে গিয়ে মশারির মধ্যে প্রবেশ করি। দিনরাত্রির মধ্যে সেই আমার প্রথম বন্ধনদশা ; তার পরে ভোরের আলোর কাছ থেকে আবার মুক্তির আহ্বান আসে। তোকে ত আগেকার চিঠিতেই লিখেচি আমি আবার যেন আমার [ছেলে] বেলাকার যুগে এসে পৌঁচেছি, নিখিল তার আঁচলের মধ্যে আমাকে ঘিরে নিয়েচে। [তা]র নিশ্বাস আমার নগ্ন চিত্তের উপর এসে লাগ্‌চে। সত্তার সহজ স্রোতে গা-ভাসান দিয়ে চলেচি। বাইরের আকাশ পূর্ণ করে একটি বাণী আছে— "এই যে আমি"— সেই বাণী [...]' হয়ে উঠেচে; আমার মধ্যেও তারি সঙ্গে মেলে এমন একটি বাণী আছে, সেও হচ্চে— "এই যে আমি"— সেই বাণীই বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলে আজ আর-সব কথা ছাড়িয়ে উঠ্‌চে। এতদিন ছিল নানা প্রয়াস, [নানা] কাজ; অর্থাৎ তখন করাটাই আমার হওয়াকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। এখন সে সমস্ত সরে যেতে আমি যে হয়ে আছি এই সত্যটাই নিখিল-হওয়ার সত্যের মধ্যে ডুব দিয়েচে। [মে] মাসে য়ুরোপে যাওয়া ঠিক করেচি। মনের মধ্যে বারবার আশঙ্কা হচ্চে পাছে [...]র আমি ঢাকা পড়ি। কিন্তু আমার বিধাতা আমার জীবনপ্রবাহিণীকে পদ্মার চরে সৃষ্টি করেচেন। এর এক কূলে অনাবৃত নির্জ্জন চর, আর এক কূলে ছায়ালোকে [...] সজন লোকালয়। হওয়া এক কূলে গান ধরেচে, করা আর এক কূলে মৃদঙ্গে[তাল] দিচ্চে। শেষ পর্য্যন্ত কোনোটাকেই বাদ দেবার হুকুম নেই। সেইজন্যেই আমার জীবন [...] ত কঠিন— সুর মেলাতে গিয়ে তাল কাটলে নিষ্কৃতি নেই। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৪

১০ জুন ১৯২৫

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয়াসু

রাণু, প্রশান্তর[১] হাতে তোর একখানা চিঠি পাওয়া গেল। বোঝা গেল এখনো কালীর বোতল জোটে নি— তা ছাড়া আমার দফ্‌তর থেকে সেই যে চিঠিকাগজের বই সংগ্রহ করেছিলি তার প্রচুর ব্যয় হয়ে গিয়ে একখানাও বাকি নেই। যে হেতু তার সদ্ব্যয় হয়েছিল এই জন্যে আমি আপত্তি করতে চাইনে— কিন্তু আমি আগে থাকতে নোটিস্‌ দিয়ে রাখচি যে বিল্‌ পাঠাব।

আমার জীবনযাত্রা পূর্ব্ববৎ চল্‌চে। মাঝের খোলা ঘরেই মধ্যাহ্নকাল[য] কাটে— এক একদিন যখন প্রখর তাপে গায়ের রক্ত শুকিয়ে ভিতরে ভিতরে আমসত্বর মত হয়ে যায় তখনো রুদ্ধ ঘরের স্নিগ্ধছায়ার আশ্রয় নিই নে। আমি রবি, আমি আলোকপিপাসু।

প্রশান্ত সাম্‌নে বসে আমার প্রুফ নিয়ে বানান সম্বন্ধে তুমুল তর্ক করচে। আমি সে আলোচনাতে যোগ দিচ্চি অথচ চিঠিও লিখে যাচ্চি। কারণ ওরই হাতে এ চিঠি পাঠাব— গরীব মানুষ, চার পয়সার ডাকখরচ বাঁচাতে চাই। বড় দুঃসময় পড়েছে।

আমাকে তোরা বিবাহ নিমন্ত্রণে সশরীরে উপস্থিত দেখবি আশা করচি[স]— কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে আশা না করলে নৈরাশ্যের হাত থেকে রক্ষা পাবি। রেল গাড়িযোগে নড়াচড়া করা আমার পক্ষে বিভীষিকা। দূরে থেকে সমস্ত মন দিয়ে তোদের আশীর্ব্বাদ করব। আর যদি মিষ্টান্ন এখানে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিস তাহলে তোদের ভোজেও যোগ দিতে পারব।

চা এসেচে— প্রশান্ত যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেচে। কাজেই এইখানেই ক্ষান্ত হলুম। ইতি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৫
১৫ জুন ১৯২৫

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয়াসু

"আবার আহ্বান?" আমি ভাব্‌ছিলুম, হয় এতদিনে তুই নিজের ভাবী সংসারের ভূমিকা রচনা করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিস্ নয় কোনো মুখোস্-পরা গুণ্ডা পিস্তল হাতে করে অর্দ্ধরাত্রে তোকে ঝুলিতে পুরে মোটোর গাড়ির মধ্যে ফেলে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে হাঁকিয়ে ডেরা ইস্মায়েল খাঁতে মাটির নীচেকার একটা ঘরে কুলুপ বন্ধ করে রেখেছে, দরজায় খোলা তলোয়ার হাতে হাব্‌সির পাহারা বসে গেছে। সেখানে আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করবে বলে আশঙ্কা করি নি তাই এখানে আমার কেদারার উপরে কুশন পেতে বেশ গুছিয়ে বসেচি। যাই হোক্ তোর বিয়ের লগ্নে রবি কোন্ কক্ষে থাকবেন এখনো পঞ্জিকায় তার খবর পাকা হয় নি অতএব ও আলোচনা থাক্।

আমাদের এখানে মাঝে মাঝে ঘন ঘোর ঘটায় দিগন্ত অন্ধকার করে প্রান্তরে প্রান্তরে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব চল্‌চে। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ এসে পড়ল— এ সময়ে আমার মত কবির উচিত হচ্চে যথানিয়মে বিরহ যাপন করা। মেঘদূতের যক্ষের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে শুনেছি সে এই

সময়টাতে হয়েছিল, "কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ"— আমিও হয় ত হতে পারতেম কিন্তু কনক বলয়ের বিল্ শোধবার মত আমার সামর্থ্য নেই— তবে কিনা কিছুকাল থেকে প্রকোষ্ঠের পরিধি একটু যেন কমে আসচে। আর আর সব লক্ষণ ভালোই— আহার সেই রকম জল দিয়ে নেবু দিয়ে ভাত দিয়ে, নিদ্রার বারো আনাই শয্যার বাইরে তারালোকিত আকাশের নীচে— অন্যবিধ ভোগের যে ব্যবস্থা সেও অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং স্বল্পমাত্র, অর্থাৎ একটি ত্রিবার্ষিকী আছেন[১] তাঁর সঙ্গে যে রসালাপ করে থাকি সে গণ্ডার কিম্বা ভাল্লুকের জীবনচরিত নিয়ে— তাতে অলঙ্কারশাস্ত্র লিখিত প্রথম রসটির ছিটেফোঁটাও নেই।— এই পত্র আজ রাত্রে জগদানন্দবাবুর[১] হাত দিয়ে রওনা করে দেব— আশা করি কাল যথাসময়েই পাবি। ইতি

১ আষাঢ় ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৬

১৮ জুন ১৯২৫

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

রাণু

এই মাত্র তোর চিঠি পেলুম। লিখেছিস অনেকদিন আমার চিঠি পাস্ নি। এটা আমার উপরে উল্টো চাপ দেওয়া হল। যা হোক্ এ কথা নিয়ে ঝগড়া করতে চাই নে। তুই যদি আমাকে চিঠি লেখবার সময় না পাস সেটা ভালো লক্ষণ। আমি আশাকে জানিয়ে রেখেছি যে যদি তোকে অমাবস্যার বাদলা রাত্রে ইলেক্ট্রিক মশালের আলোকে দস্যুদল সুখশয্যা থেকে বলপূর্ব্বক আড়কোলা করে তুলে নিয়ে যায় তাহলে সেই খবরটা

যেন তার পরের দিন কাজকর্ম্ম ও আহারাদি সেরে আশা আমাকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করে। আজকাল আমি সংহিতা আলোচনা করে বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি সবই জেনে নিয়েচি।[১] এই রকম হরণ করে বিবাহকে ভগবান মনু অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকার করেন। এর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, কন্যাপক্ষে কোনো খরচপত্র লাগেনা; প্রণামী দেবার জন্যে ভালো বেনারসী সাড়ি কিন্‌তে হয় না— আর যাদের বলে ইতরে জনাঃ wedding present সম্বন্ধে তাদের চিন্তা ও চেষ্টার দরকার থাকে না। এই সকল কারণে সবদিক চিন্তা করে আমি এই প্রণালীর বিবাহটাকেই সমাজে প্রচলিত করবার জন্যে একটা সভা স্থাপন করব মনে করচি। কন্যাপণপীড়িত ভদ্র পরিবারের পক্ষে এটা খুবই উপাদেয় হবে। তোর বিবাহে যদি এই সাধুপ্রণালীর দৃষ্টান্ত কোনো তরুণ সমাজসংস্কারকে দেখাতে পারেন তাহলে তার সংবাদটা নিশ্চয়ই আশার কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ। ৪ আষাঢ় ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৭

২৭ জুন ১৯২৫

*Rabindranath Tagore

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু আশীর্ব্বাদসহ কিছু উপহার পাঠালুম।[১] তোর কোনো কাজে লাগ্‌বেনা জানি। কিন্তু আমার যা সব-চেয়ে দেবার জিনিষ তাই দিলুম।

হয়ত স্বরলিপির বইগুলো কখনো কখনো দরকার হতে পারে। এগুলো তোরা একবার দেখে তার পরে সার্ রাজেনের¹ ওখানে পাঠিয়ে দিস্— কারণ সেখানে ওঁর য়ুরোপীয় আমন্ত্রিতরা হয়ত এর মূল্য বুঝবে।

ইতি ১৩ আষাঢ় [১৩৩২]

ভানুদাদা

১৬৮

২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬

*RABINDRANATH TAGORE

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমার যতই বয়স বাড়চে ততই আমার ধৈর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য এতই বাড়চে যে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে আমি অবিচলিত থাকতে পারি, কেউ যদি সপ্তম সুরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাহলে নিতান্ত ভালোমানুষের মত নিরুত্তর থাকা আমার পক্ষে আজকাল দুঃসাধ্য নয়, কেউ যদি কেবলমাত্র গলার জোরে প্রমাণ করতে বসে যে আমার মত হৃদয়হীন নির্ম্মম মানুষ বিধাতার সৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত হয় নি, সুদূর ভবিষ্যতেও যে হবে এমন সম্ভাবনামাত্র নেই তাহলেও হাস্যমুখে সেই দুর্ব্বিষহ অপবাদবাক্য নির্ব্বাক হয়ে পরিপাক করতে পারি এমন অমানুষিক শক্তি আমার হয়েচে আজই এই পত্রেই তার প্রমাণ হাতে হাতে হবে, জগৎ বিস্মিত হয়ে উঠ্‌বে— কেবল একটি সন্দিগ্ধহৃদয়া পরদোষানুসন্ধানপরা বালিকা ছাড়া।

কলকাতায় পা দিয়েই কি রকম ভিড়ের আবর্ত্তে সম্পূর্ণ তলিয়ে গিয়েছিলুম নিশ্চয়ই তার বিবরণ তোর অগোচর নেই।[১] সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত বিষম গোলমালের মধ্যে এমনি আপাদমস্তক হারিয়ে গিয়েছিলুম নিজেকে নিজে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়েছিল। সম্মুখেই ছিল ৭ই পৌষের উৎসব— ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে তার নাগাল পাওয়া গেল। তার পরে গতকাল পর্য্যন্ত অতিথি অভ্যাগত ও নানা অনুষ্ঠানের চাপে আমাকে ঠেসে ধরে ছিল। আজ বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের মত চীৎ হয়ে পড়ে বিশ্রাম করচি— তবু লোকসমাগমের সম্পূর্ণ বিরাম নেই। আমার আধুনিক ইতিহাস এইরকম। এতেও যদি অবলা নারীর মনে দয়া না হয় তবে নিঃসন্দেহে তার হৃদয়— কথাটা শেষ করব না।— বীরেনকে আশীর্ব্বাদ জানাস আর তোর শ্বশুর শাশুরিকে আমার নমস্কার। ইতি ১২ পৌষ ১৩৩৩

ভানুদাদা

১৬৯

১৭ পৌষ ১৩৩৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

১ জানুয়ারি ১৯২৭

এতদিনের বহু
আনন্দপরিপূর্ণ
পুনরাবর্ত্তন।

কল্যাণীয়াসু

রাণু, ভেবেছিলুম প্রথম দিনের চিঠিতে খুব খানিকটা কোঁদল ক
নিয়ে মনের ঝাঁজ তোর কতকটা মিটে গেছে। এ যে দেখি একেবা

উল্টো— কথার টেম্পেরেচর ক্রমেই চড়ে যাচ্চে— প্রায় প্রলাপের ডিগ্রি পর্য্যন্ত এসে ঝাঁ ঝাঁ করচে। বয়স তোর যখন অল্প ছিল তখন দেখেচি খুব ঘোরঘনঘটায় ঝগড়া জমিয়ে তুলে বেশি ক্ষণ তার জের রাখতে পারতিস্ নে। দেখ্তে দেখ্তে বাদল কেটে গিয়ে প্রসন্ন হাস্যে আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ত। সেই ভরসাতেই তোর চিঠির চড়া সুরে তত বেশি ভয় পাই নি। এখন দেখ্তে পাচ্চি আবহাওয়া একেবারে বদ্লে গেছে। দুর্যোগ কিছুতে আর মিট্তে চায় না। এর কারণ কি এতক্ষণ তাই চিন্তা করছিলুম। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে আজকাল তুই খুব অতিরিক্ত পরিমাণে আদর পাচ্ছিস্। এটি বীরেনের কীর্ত্তি। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব তাতে তারও সুবিধা হবেনা, মাঝের থেকে আমাদের উপর পর্য্যন্ত এর ঝাপ্টা এসে লাগ্বে। তোর সাহস ত কম নয়! আমার মত এত বড় লোককেও খোঁটা দিতে শিখেছিস! এই সেদিন দেখলুম বেণী দুলিয়ে পুতুলখেলায় মেতেছে— আর আজ! বাস্রে, হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নেই, ছোটবড় ভেদ নেই— কি প্রচণ্ড মুখনাড়া! কলকাতায় গিয়ে মোকাবিলায় বোঝাপড়ার চেষ্টা করব ইতিমধ্যে মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করে নে— তার উপায় হচ্চে বীরেনের সঙ্গে খুব ঝগড়া করে একটা দামী রকমের নেকলেস আদায় করে নেওয়া। তার পরে যখন আমার আবির্ভাব হবে তখন মুখের কথা মধুর হয়ে আস্বে আর ওষ্ঠাধর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত হাসিতে ভরে যাবে, কোমল গান্ধার সুরে অভ্যর্থনা করবি, আসুন আসুন ভানুদাদা— বড় খুসি হলুম। ভানুদাদা

১৭০

১৬ এপ্রিল ১৯২৭

ওঁ

*SANTI-NIKETAN
BENGAL, INDIA

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠি ভারতের নানা প্রদেশ ঘুরে আজ ফিরে এল। আমিও কিছুদিন পূর্ব্বেই ফিরেছি।[1] তোর বাবা মার সঙ্গে পথেই দেখা হয়েছিল। আমি গার্ডন পার্টির কার্ড পেয়েছিলুম কিন্তু নিতান্তই ঢিলে মানুষ বলে উত্তর দিতে ভুলেচি। পার্টি প্রভৃতিতে প্রায়ই যাই নে, তাই এইরকম দুর্গতি ঘটে। কবি বদ্‌নাম থাকাতে লোকে অপরাধ ক্ষমা করে— ক্ষমা করে বলেই অপরাধ বেড়ে চলতে থাকে।

এবার গরমের সময় কোথায় থাকব এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয় নি— কিন্তু এটা স্থির যে শান্তিনিকেতনে থাকব না। এক একবার কথা উঠ্‌চে যে, শিলঙ পাহাড়ে যাব। সেখানে একজন[2] আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন। কিন্তু কারো বাড়িতে থাকতে গেলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে তাই দ্বিধা করচি। দিনু কমল কাল শিলঙের অভিমুখে চলে গেল। আমার শরীর বড়ই ক্লান্ত আছে বলে কোনো ভালো জায়গায় যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ করি— কিন্তু ক্লান্ত আছে বলেই নড়তে উৎসাহ বোধ করচি নে। আগামী ২৫শে বৈশাখে আমি ৬৭ বৎসরে পড়ব— সুতরাং বুঝ্‌তেই পারচিস্ ওপারের খুব কাছ ঘেঁষেই এসেচি— বায়ু পরিবর্ত্তনের পক্ষে আয়ু পরিবর্ত্তনের মত কিছুই নেই— সব ক্লান্তি সব বালাই এক নিশ্বাসেই চুকে যায়। রথী বৌমা কাল সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে টেলিফোন করলে পরস্পর সংবাদ বিনিময় করতে পারবি। কলকাতায় যখন যাব আমার যে বই তুই পড়তে চাস্ দেব। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৪

[স্বাক্ষরহীন]

১৭১

১০ মে ১৯২৭

[শিলঙ]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, শিলঙে এসে পৌঁচেছি।[১] কিন্তু এ আর এক শিলঙ। আগে যেখানে ছিলুম কেমন নিরিবিলি,— আসবাবপত্র ছিল না, ঘর দুয়ার অপরিপাটি কিন্তু কেমন খোলা— দু পা বাইরে গেলেই সেই নির্জ্জন রাস্তা, ঘন বনের ছায়া— একটু করে লিখচি আর সেই রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করে আসচি— দিনগুলোর মধ্যে কোথাও একটু ফাঁকা ছিলনা। এখন যেখানে আছি, ইংরেজের বাড়ি, ফিট্‌ফাট্, কার্পেট পাতা, চারদিকে পরদা টানা, ছিটের ঢাকা দেওয়া চৌকি, সোফা; পালিস করা মস্ত বড় ডিনার টেবিল ইত্যাদি ইত্যাদি— কিন্তু শিলঙ পাহাড় এখানে বোবা। একরকম লেবু আছে যার প্রায় সমস্তটাই খোসা, খুব মস্ত বড় কিন্তু ভিতরে শাঁস নেই বল্‌লেই হয়। এবারকার এ শিলঙটাকে সেইরকম মনে হচ্চে। একটা কোনো বই লেখবার ইচ্ছে আছে[২] কিন্তু এখনো মন বসাতে পারি নি। দু চার দিন সময় লাগ্‌বে। এদিকে বৃষ্টি দেখা দিয়েচে— খুব বেশি নয়— কিন্তু আমি সূর্য্যোপাসক, রোদ্দুর না হলে বাঁচিনে।

এখানে বোধ হচ্চে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আছি। তার পরে নেবে গিয়ে খুব সম্ভব সমুদ্রপারে কোথাও চলে যাব। তোর বাবার চিঠিতে দেখলুম তাঁরা সিম্‌লে পাহাড়ের দিকে যাচ্চেন— সুতরাং তাঁদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা হবার সম্ভাবনা নেই— তোদের সঙ্গেও বোধ করি তথৈবচ। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৪

ভানুদাদা

১৭২

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

Uplands
Shillong

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠি পেয়েচি, ভয় নেই— শুধু "India" ঠিকানায় লেখা চিঠিও আমি মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি— খ্যাতির এই রকম দুই একটা সুবিধা আছে; অসুবিধাও বিস্তর, নিরিবিলিতে থাকবার জো নেই। সর্ব্বদাই লোকসমাগম হচ্চে— আমাকে দেখবার জন্যে কৌতূহল— সার্কাসে যেমন সিংহ দেখ্‌তে আসা— তাতে সিংহের মন খারাপ হয়ে যায় কিন্তু দর্শকের মন খুসি থাকে। ভাবচি পাঁচ টাকা করে দর্শনীর টিকিট করব।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি মাঝে মাঝে রোদ্দুর— এইভাবে চল্‌চে। লিখ্‌তে যাই, ক্লান্তি আসে, কেদারায় ঠেস দিয়ে পড়ি, হঠাৎ আসে ভিজিটার— হাসিমুখে অভ্যর্থনা করি, বলি, চা খেয়ে যাবেন না? আবার একটু সময় পাই, একখানা বই নিয়ে বারান্দায় আরেকটা কেদারায় গিয়ে বসি, হঠাৎ আসে একদল ছাত্র। বলি, শিলঙ কেমন লাগচে? কোন্‌দিকে তোমাদের বাসা? তারা বড় কথা কয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, চলেও যায় না। খানিক বাদে আবার একটু সময় পাই— এবার ঘরে এসে সোফায় পা তুলি, হঠাৎ আসে খবরের কাগজের রিপোর্টার— বলে Dr. Tagore, what is your opinion about আর জায়গা নেই। ইতি ২০মে ১৯২৭

ভানুদাদা

১৭৩

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

ওঁ

[শিলঙ]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর এবারকার চিঠিতে একটুমাত্রও উত্তাপ না দেখে আশ্চর্য্য হলুম। বুঝতে পারচি দার্জ্জিলিঙের হাওয়াটা ঠাণ্ডা এবং সেটা তোর স্বাভাবিক উষ্ণ মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। তোর মাথাটাকে ঠিক মতো প্রকৃতিস্থ করতে গেলে কবিরাজী তেল প্রভৃতি হার মানবে— কিছুকাল একটা রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ওটাকে দিনরাত রেখে দেওয়া দরকার। আগামী গরমে যখন বেড়াতে যাবি গ্রীনল্যাণ্ড কিম্বা নর্থ পোলে যাস। আমার বিশেষ কোনো খবর নেই— তার কারণ একটা গল্প লিখতে বসেচি— সেই একটা খবরেই আমার আর সব খবর তাড়িয়ে রেখেচে। কোথাও বড়ো বেরোই নে বলে মোটর চাপা পড়ি নে, খদে প'ড়ে পা ভাঙে না, বৃষ্টিতে ভিজে ন্যুমেনিয়া হয় না, পথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে চায়ের নিমন্ত্রণ জোটে না— অর্থাৎ এমন কোনো মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে না যেটা বর্ণনা করে বল্‌লে ক্ষণকালের জন্যে লোকের আমোদ হতে পারে— এক কথায় ভারি uninteresting হয়ে আছি। ইতি ৩১শে মে ১৯২৭

ভানুদাদা

১৭৪

৪ চৈত্র ১৩৩৪

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

জ্বরে পড়ে ছিলুম— কাল থেকে ভালো আছি— কিন্তু শরীরটা খুব ক্লান্ত। তোকে দেখবার জন্যে ইচ্ছে করে— সেরে উঠলে যাব। কাল সকালে লর্ড সিংহের[১] শ্রাদ্ধসভায় একবার যেতে হবে— বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আজ তবে আসি। ইতি ১৭ মার্চ্চ ১৯২৮

ভানুদাদা

১৭৫

১৯ বৈশাখ ১৩৩৫

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কাল যাব ঠিক করেছিলুম পারব না— শরীর ক্লান্ত— Ultra-violate rays লাগাবার জন্যে সকালটা কেটে যাবে— পর্শু দশটার মধ্যে জাহাজে আমার আসবাবপত্র পাঠানো চাই— তাই নিয়ে বিষম ব্যস্ত থাকতে হবে।[১] এবারকার মতো কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিই— ফিরব অঘ্রাণে,— তখন এসে দেখা করব। এখন রইল আশীর্ব্বাদ। ইতি ২মে ১৯২৮

ভানুদাদা

১৭৬

৬ মে ১৯২৮

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত লোকের ও কাজের ভিড় থাকাতে ভাল ঘুম হয় নি— আজ সকালে খুবই ক্লান্ত ছিলুম। তার উপরে গোছানো এবং চিঠি লেখা। তার উপরে পুনশ্চ লোক সমাগম। এখন প্রায় দুটো বাজে— উচিত ছিল বিছানায় চিৎ হয়ে পড়া। কিন্তু সে সুযোগও ছিল না— এখনো ছোটখাটো নানাবিধ খুচরো কাজ চল্‌চে। কথা রাখতে পারলুম না বলে বড়ো খারাপ লাগ্‌চে— লক্ষ্মীটি কিছু মনে করিস্‌ নে।

আমি যে য়ুরোপে কোথায় গিয়ে উঠব তার কিছুই ঠিক নেই— একবার ভাবচি দক্ষিণ ফ্রান্সে একবার সুইজারল্যাণ্ডে, একবার হাঙ্গেরিতে। যেতে ইচ্ছে করছে না— কোথাও নির্জ্জন কোণে যদি পড়ে থাকতে পারতুম তাহলে বাঁচতুম। সে জিনিষটা খুব যে দামী তা নয়, তবুও দুর্লভ।

একান্ত মনে কামনা করি তুই যেন সুস্থ থাকতে পারিস। বীরেনকে আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৩৫

ভানুদাদা

১৭৭

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

ওঁ

*Srabasti
Colombo

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। এবারকার বিচিত্রাতে ভানুদাদার যে চিঠি বেরিয়েচে[১] সেটা আর একদিন এই কলম্বো থেকেই লিখেছিলুম য়ুরোপ যাত্রার মুখে। এবারো সেইখান থেকেই লিখ্‌চি কিন্তু যাত্রা বন্ধ হয়ে গেচে। কলকাতা থেকে আর এই কলম্বো পর্য্যন্ত বারেবারে আমার শরীর ভেঙে পড়ল, অবশেষে বিলেত থেকে চিঠি এল যে আগামী বছরের এপ্রিলে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। শরীরের এমন দশা হয়েচে এবারে কিছুতেই পারতুম না। এখন দেশে ফিরে গিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে কিছুকাল ডুব মারব— কারু সঙ্গে দেখা করবনা। চিঠিপত্র লিখব না— নিজের ধ্যান নিয়ে থাক্‌ব, অবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম করে শরীরটাকে খাড়া করে তুলব। এখান থেকে আর ৫।৬ দিনের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব— কলকাতায় পৌঁছতে জুনের শেষাশেষি।— গিয়ে তোদের কাছে বিদায় নিয়ে একেবারে গা-ঢাকা দেব। এ রকম ভাঙা শরীর নিয়ে বিদেশে বা পরের বাড়িতে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। এখানে এ কয়দিন বিছানায় পড়ে পড়েই দিন কাটাচ্ছি। আমাকে এখন চিঠি লিখিস্‌ নে, লিখ্‌লে সহজে পাব না— কারণ এখান থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে ওয়ালটেয়ারে[২] ঠিকানা বদল হবে। ইতি ৫ জুন ১৯২৮

ভানুদাদা

১৭৮

২০ জুলাই ১৯২৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার নড়াচড়া বন্ধ তাই কলকাতায় এসে তোদের ওখানে যেতে পারি নি। শান্তিনিকেতনে আসতে হলে স্টেশন ছাড়া গতি নেই তাই ঐ দুঃখটুকু স্বীকার করতে হয়— কিন্তু তাতে যথেষ্ট ক্লান্ত করে। নীলরতনবাবু[১] আমাকে দীর্ঘকাল একটা বিশেষ চিকিৎসায় রাখতে চান— তিনি আমার কাছে লোকজনের যাওয়া আসা, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি সবই বন্ধ করে দেবেন। কথা আছে দুচার দিনের মধ্যে সহরে গিয়ে সেই বন্ধন দশায় ধরা দেবার। কিন্তু এখানকার ভরা বর্ষার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ছেড়ে সেখানে যেতে ইচ্ছা করচেনা। দেখা যাক্ কপালে কি আছে।

কাল এখানে বর্ষা উৎসব হবে।[২] ছেলেমেয়েরা গান ইত্যাদি নানা কাণ্ড করবে। সবাই তাই নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কাল থেকে যে রকম ঝড়বৃষ্টির নাচন চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎসব করা সহজ হবে না।

তোর শরীর ভালো থাকুক এই কামনা করি— যদি আমার শারীরিক অবস্থা অনুকূল হয় তাহলে তোকে দেখে আসব— নইলে দূর থেকেই আশীর্ব্বাদ করব। ইতি ৪ শ্রাবণ ১৩৩৫

ভানুদাদা

১৭৯

১৬ শ্রাবণ ১৩৩৫

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কলকাতায় ডাক্তার হিড়হিড় করে টেনে এনেচে।[১] বলচে দেড়মাস তাদের হাতে নিয়ত থাকতে হবে। বসে আছি জোড়াসাঁকো বাড়ির এক কোণে— মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে গলি ভেসে যাচ্চে, বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তুই কেমন আছিস শোনবার জন্য উদ্বিগ্ন রইলুম। তোর মা ১০ই তারিখে আসবেন খবর পেলুম। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তোদের সকলের কথা জানতে পারব। ইতি ১ অগাস্ট ১৯২৮

ভানুদাদা

১৮০

১৭ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

আমি এইখানেই স্থির হয়ে আছি। ছুটিতে আপন বাঁধা আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও ছুটোছুটি করবার চেষ্টাতেই ছুটির অনেকখানি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চিরাভ্যস্ত আরাম কেদারার মতো রাঁচি হাজারিবাগ কোথাও

নেই। বৌমারা গেছেন রাঁচিতে— বোধ হয় মোটর রথে— জানিনে এতদিনে পৌঁচেছেন কি না। আমার পরামর্শ যদি শুনিস সেখান থেকে সোজা চলে আয় শান্তিনিকেতনে। এখানে শরৎকাল খুব সুন্দর। চারদিকের মাঠ সবুজ হয়ে উঠেছে, শিউলি গাছে ফুল ফোটানো অক্লান্ত। তোদের বাড়ির সবাই ছুটিতে এখানে আসবেন এমন একটা জনরব উঠেছিল। কিন্তু সেদিন আশার একখানা চিঠি পেলুম তাতে আছে তোর বাবা কলকাতার হাঁসপাতালে— বাকি সবাই কানপুরে শান্তির ওখানে। আশা লিখেচে ছুটির পরে সে এখানে আসবার সঙ্কল্প করেচে।

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। কিন্তু কাল থেকে বাদলার আবির্ভাব। আকাশ ভরে খুব মেঘ জমে আছে। আজ রাত্রে চাঁদের মুখ দেখা যাবে বলে আশা হচ্চে না। পৃথিবীতে তার অভাব যদি পূরণ করতে পারতুম তাহলে বিশেষ আক্ষেপের কারণ থাকতনা।

ইতি ৩১ আশ্বিন ১৩৩৬

তোর ভানুদাদা

১৮১

২৫ কার্তিক ১৩৩৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু কাজের তাগিদে হঠাৎ এখানে চলে আসতে হল। বীরেনকে লিখেছিলুম তোকে একদিন জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসতে। বীরেন রাজি হয়ে চিঠি লিখেছিল কিন্তু অদৃষ্টক্রমে ধরণীতে চাঁদ দেখা আমার ঘটল না।

বৌমা এখন আছেন জোড়াসাঁকোয়— এখন তাঁর হাঁপানির জন্যে ইলেকট্রিক চিকিৎসা চলচে, খবর পেলুম তাতে তাঁর উপকার হয়েচে।

শরৎকাল শেষ হয়ে এল— ফুলঝরানো কাজে শিউলি গাছ ক্লান্ত হয়ে এসেচে— এখন ছাতিমের ডালগুলো খুব উৎসাহিত— ছাতিম ফুলের তীব্র গন্ধে সন্ধ্যাবেলাকার বাতাস মাতাল হয়ে ওঠে। এখানকার তেতলা ঘরের ছাদে আমি একলা একটা কেদারায় বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে আছি— আকাশে শাদা শাদা মেঘ যাচ্চে ভেসে, আর কোথা থেকে সমস্ত দুপুর বেলা ঘুঘু ডাকচে।

একবার তোরা যুগলরূপে শান্তিনিকেতনে দেখা দিবি নে কি? অনেক বদল হয়েচে। ইতি ১১ নবেম্বর ১৯২৯

ভানুদাদা

১৮২

১০ ফাল্গুন ১৩৩৬

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

শিউলির পালা গেছে। উত্তরে হাওয়া দক্ষিণের দিকে মুখ ফেরালো। আমের বোল দেখা দিয়েচে, শালের বনে নবমঞ্জরীর সমারোহ, কাঞ্চনশাখা কুসুমাবনম্রা, কিন্তু রবি ঠাকুর পাড়ি দিতে চল্‌ল পশ্চিম সাগরের কূলে।[১]

কুশলে থাক এই আশীর্ব্বাদ রেখে গেলুম। ইতি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

ভানুদাদা

১৮৩

[৬? মে ১৯৩০]

ওঁ

[লন্ডন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর কুলপ্রদীপের[১] জন্ম বিবরণ পূর্ব্বেই শুনেছি। চিঠি লিখব স্থির করেছিলুম কিন্তু বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলচে এতদিন মুহূর্ত্তের জন্যে ছুটি পাই নি। অক্সফোর্ডের পালা শেষ হওয়াতে[২] এই অবকাশবিরল দেশে অল্প একটু ফাঁক পেয়েছি। দূরের থেকে নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ পাঠাচ্চি। তোরই মত আকার প্রকার হয়েচে শুনে অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি এই দুর্দ্দান্ত মানবকে সামলাবি কী করে। এখন থেকে মাথায় কবিরাজি তেল মাখাতে থাকিস্। দেশে ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করবার চেষ্টা করব। তোর ভানুদাদাকে সে মানবে কি না সন্দেহ করি— তার একাধিপত্যে কোথাও একটুমাত্র কম পড়লে বোধ হয় সে অনর্থপাত করবে। অত্যন্ত গোলমাল যদি দেখি তো হার মানব— দূরে দূরেই থাকব। তোর কন্যা[৩] যদি এখন থেকে ছড়া কাটতে আরম্ভ করে তাহলে একদিন এই প্রবীণ ছড়া-কাটিয়ের সঙ্গে নবীনার বিরোধ বাধবে। আমি তো এতদিন দেখে আসচি দেশে যে-কেউ ছড়া কাটতে আরম্ভ করেছে আমাকে গাল না দিয়ে জল গ্রহণ করেনা। তাই কিছু দিন থেকে ছড়া কাটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েচি। তার বদলে ছবি আঁকা ধরেছি। ভয়ে ভয়ে দেশের লোককে দেখাই নে— পাছে ছবি-আঁকিয়েদের মহলেও ভ্রূকুটির সৃষ্টি হয়। আজ এই পর্য্যন্ত। [জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭]

ভানুদাদা

১৮৪

১৩ আষাঢ় ১৩৩৭

ওঁ

[ডার্টিংটন হল, টটনেস]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। অচেনাদের দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই হঠাৎ আপন লোকদের একটু আভাস পেলেই সমস্ত মনটা সাড়া দিয়ে ওঠে। বিধাতা আমাকে পথিক করেই রেখেছেন, ঘরের ঘেরের মধ্যে ধরা দেবার সময় বা সঙ্গতি পেলেম না— কেবলি চল্‌তি পথের অব্যবস্থার ভিতর দিয়েই ক্ষণিক আশ্রয়ের জগতে আমার চলা ফেরা আদর অভ্যর্থনার অভাব ঘটে না, খ্যাতি কীর্ত্তি জমেছে ঢের কিন্তু মনের ভিতরকার ক্লান্তি কিছুতেই দূর হয় না। দূর আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় কিন্তু ঘরের সন্ধ্যাপ্রদীপ তার সাড়া দেয় না। সঙ্গী যারা আছে তারা চলনসই অর্থাৎ পথ চলবার যোগ্য— কেবলি যেমন-তেমন করে কাজ চলে যায়— এলোমেলো ছড়াছড়ির মধ্যে দিয়েই দিন কাটে। এমনি করেই এত দিন তো হয়ে গেল কিন্তু আজো সম্পূর্ণ অভ্যেস হল না।

কিছুদিন কাট্‌ল এখানে এল্‌ম্‌হর্স্টের বাড়িতে।[1] আবার তল্পী বাঁধচি। ডাক পড়েচে জর্ম্মনিতে। সঙ্গে আমার সহায় আছে আরিয়াম্‌,[2] তাকে হয় তো চিনিস্ নে— লঙ্কাদ্বীপে তার জন্ম, শান্তিনিকেতনে তার কর্ম্ম, আপাতত আমার সঙ্গে সঙ্গে তার গতি। একবার তোরঙ্গ বন্ধ করচে, একবার তোরঙ্গ খুলচে— একবার রেলগাড়িতে টেনে তুল্‌চে, একবার পরের বাড়িতে টেনে নামাচ্চে, কিছু হারায় ছড়ায় কিছু সংগ্রহ করে,— এ যেন, পাত্র নেই, ঘাটে ঘাটে অঞ্জলিতে জল খাওয়া। কিন্তু ভাগ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করা অন্যায়। অনাহূত যা পেয়েছি অল্প লোকেরই ভাগ্যে তা জোটে। বিশ্বাস হয় না যতটা পেয়েছি তার যোগ্যতা আমার মধ্যে আছে— বাঁধা মাইনে

আমার নেই, উপরি-পাওনাতেই তহবিল ভরে উঠ্‌চে— একবার এ দেশে, একবার সে দেশে, আমার জরিমানার পালাটা কেবল আমার স্বদেশেই।

দেশে ফিরব সেই পৌষ মাসে। তখন তোর সন্তান দুটিকে এবং সন্তান দুটির জননীকে দেখবার ইচ্ছে রইল।

ভানুদাদা
জুন ২৮শে
১৯৩০

১৮৫
২৯ মাঘ ১৩৩৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

এক বছর হয়ে গেল— আজ তোর চিঠি পেলুম। পাবার পূর্ব্বেই তোকে লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম এখানে আস্‌তে। এখানে আশা ভক্তি অশোক আছে— ওদের নিয়ে বেশ আছি। একবার কোনো একটা অবকাশে এক আধ দিনের জন্যেও কি আসতে পারিস নে? সপরিজনে এলেও তোদের আশ্রয় দিতে পারব। তোর খোকার সঙ্গে তাহলে আমার পরিচয় হয়ে যাবে।

ডাক্তার আমাকে নড়তে চড়তে পরিশ্রম করতে নিষেধ করে। কলকাতায় লোকের ভিড়ে সারা দিন এম্‌নি আমাকে উৎপাত করেছিল যে ক্লান্ত দেহে পরদিন সকালের ট্রেনেই আমি পালিয়ে এসেচি।[1] আমার শীঘ্র আর কলকাতায় যাবার আশা নেই। তোরা তো গরম পড়লেই দার্জ্জিলিঙে দৌড় দিবি— তোদের নাগাল পাওয়া শক্ত হবে।

এবারে আমেরিকায় একদিনের জন্যে ডাক্তার আমার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল।[১] আবার কিছু দিনের জন্যে মেয়াদ বেড়ে গেল— কতদিনের জন্যে ঠিক বলতে পারিনে কিন্তু খুব বেশি দিন হতেই পারে না। অতএব সুযোগ পেলে একবার দেখাশুনো করে যাবার চেষ্টা করিস।

এবারে প্যারিস বর্লিন কোপেনহেগেন বর্ম্মিংহ্যাম মস্কৌ প্রভৃতি নানা দেশে আমার ছবি খুব খ্যাতি লাভ করেচে সে কথা মনে রাখিস কেননা যদি কোনোদিন আমার ছবি তোর চোখে পড়ে সাবধানে সমালোচনা করিস— ভালো যদি না লাগে তাতে তোরই অখ্যাতি হবে। ইতি ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

তোর ভানুদাদা

১৮৬

১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। আমার শরীরের জন্যে বেশি কিছু ভাববার নেই। মোটের উপর ভালোই আছি। বাইরে গরম যথেষ্ট। কিন্তু রাতে খুব হাওয়া দেয়, সকালে ঠাণ্ডা থাকে।

তুই শুনে আশ্চর্য্য হবি, আমি খুব সম্ভব খুব শীঘ্র পারস্যে যাব— রাজার নিমন্ত্রণ পেয়েছি।[১] য়ুরোপ তো আগাগোড়া দেখা হয়েচে— এসিয়ার পূর্ব্ব দিকটার সঙ্গে পরিচয় মন্দ হয়নি— এবারে পারস্যটা হলে অনেকখানি পৃথিবী আয়ত্ত করা হবে।

ইতিমধ্যে এখানে জন্মোৎসবের একটা হাঙ্গামা আছে।[২] ভালো

লাগচেনা। রথীরা সবাই দার্জ্জিলিঙে। আমাকে ডাকাডাকি করে কিন্তু আমার দার্জ্জিলিঙ ভালো লাগেনা।[৩] জন্মোৎসবের পরে যদি কলকাতায় যাওয়া হয় তাহলে তোর সঙ্গে দেখা হবে।

আশা ভক্তি এখানে বেশ আনন্দে আছে— ওদের শরীরও ভালো আছে। ইতি ২৮ এপ্রেল ১৯৩১

ভানুদাদা

১৮৭

২২ আশ্বিন ১৩৩৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, যে ছেলে আমার ছবি তুলেছিল তার কাছ থেকে পেতে দেরি হোলো বলে তোর চিঠির উত্তর দেওয়াও পিছিয়ে গেল। ছবি দুটোর মধ্যে টুক্‌রো ছবিটা দার্জ্জিলিঙের তোলা।

কলকাতা থেকে এসেছিলুম আধমরা অবস্থায়। এখনো সম্পূর্ণ সজীব হয়ে উঠিনি। দিনটা প্রায় শয়ান অবস্থাতেই কাটে। মাঝে মাঝে এখানেও লোক সমাগম হয়। রাধিকা যেমন পায়ের শব্দ শুনলেই চমকে উঠতেন আমারও সেই দশা। দ্বার অবারিত, লোককে নিরস্ত করার উপযুক্ত মেজাজের অভাব সুতরাং ঘরের মধ্যেই চতুষ্পথের সৃষ্টি হয়েচে।

রীতিমত গরম চলচে। রথীরা দার্জ্জিলিং পালিয়েচে। সেখান থেকে আমাকে ডাকাডাকি করচে। এখানকার গরমের তাড়নাতেই বোধ হয় সেখানকার নিমন্ত্রণ সফল হবে।[১] ইতি ৯ অক্টোবর ১৯৩১

ভানুদাদা

১৮৮

২১ অক্টোবর ১৯৩১

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

রাণু, দার্জ্জিলিঙে এসে পড়েচি। ইচ্ছে ছিল না, দার্জ্জিলিং আমার ভালো লাগেনা। বিশেষত এই শরৎ কালে শান্তিনিকেতন ভারি সুন্দর। ছুটিতে সবাই চলে গেছে, শিশির-ছোঁওয়া বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের আকাশে পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছে, সোনার রঙে রঙীন দিগন্ত। চলে আসতে হোলো, এবার শরীরটা যেমন ক্লান্ত এমন আর কোনোদিন হয় নি— দেহ মনটা যেন প্রকাণ্ড একটা বোঝা হয়ে উঠেছে,— দু পা চলতে পারি নে, দু'লাইন লিখতে ইচ্ছে করেনা, সমস্ত কাজের দায় থেকে দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করে। এই কাজ পালানো মনটাকে নিয়ে কোথায় যে যাব তাই ভাবি। নানা প্রকার ছোটোখাটো দাবীর ভিড় এবং লোকের ভিড় আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলে। আমি যেন শনিগ্রহের মতো, আমার চারদিকে একটা চক্র চলেচে হাজার হাজার টুক্‌রো উপগ্রহের। যখন লোকে আমাকে চিনত না তখন ছিলেম ভালো, আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপন মনের লীলা নিয়ে ছিলেম আরামে, কোথাও বাধা ছিল না। আজ নানা লোকের নানা ফরমাসে কেবলি ঠোকর খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্চি। নালিষ [য] করে লাভ নেই— এই রকমই চলবে শেষ অধ্যায়ের শেষ ছত্র পর্য্যন্ত। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। বিজয়াদশমী ১৩৩৮ [৪ কার্ত্তিক ১৩৩৮]

ভানুদাদা

১৮৯

১১ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোর চিঠিখানি কলকাতা ঘুরে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল, ওদিকে ছবির হাটে[১] লোকের ভিড়ে আমার শরীর পড়ল ভেঙে। দৌড়ে পালিয়ে এলেম নিজের কোটরে। আবার আগামী ৪ঠা এপ্রিলে উড়ো জাহাজে চড়ে পারস্যে যেতে হবে।[২] ইতিমধ্যে শরীরটাকে সবল রাখবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই যথাসাধ্য চুপচাপ বসে আছি। রেলগাড়িটার সঙ্গে আমার একটু বনে না। এমন কি, কলকাতা থেকে এ পর্য্যন্ত আসতে প্রাণপুরুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়। কাশী পর্য্যন্ত যেতে হলে যবনিকা পতনের খুব কাছাকাছি পৌঁছবার আশঙ্কা ঘটে। নইলে তোদের ওখানে যাবার প্রলোভন খুবই প্রবল। যখন বয়স ২৭ ছিল তখন ভাবনা ছিল না, জোর ছিল দেহে মনে। এখন দেহটা হরতাল করে বসেচে। ইতি ২৭শে ফাল্গুন ১৩৩৮

ভানুদাদা

১৯০

[? জুন ১৯৩২]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

দোতলার এই জানলার কাছে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে আছি। এইখানেই বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়

কেটে যায়। শান্তিনিকেতনের এ জায়গাটা তোর চেনা নয়। তুই আমাকে এখানকার নানা বাসায় দেখেছিলি।— একে একে কত বাসাই বদল হল। শিলঙের সেই বাড়ি মনে পড়ে? জোড়াসাঁকোয় তেতলার সেই ঘর? শান্তিনিকেতনে কখনো এ কুটীরে কখনো ও কুটীরে। এখন এখানকার চেহারা আর একরকম। আগেকার চেয়ে সমারোহ অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু আগেকার সাদাসিধে সেই সংসারটা ছিল ভালো। যদি কোনো একদিন আর একবার শান্তিনিকেতনে এসে দেখে যাওয়া তোর পক্ষে সম্ভব হয় হয়তো তোর ভালো লাগ্‌বেনা। সেই সব চেনা জায়গাগুলোও এখন অচেনার মুখোষ পরে আছে। কেবল সেই আকাশ, সেই মাঠ, সেই রাঙা মাটির পথ তেমনই আছে। আর তোর ভানুদাদা? তখন যে পরিমাণ জায়গার মধ্যে তার কাজের এবং ভাবের বাসা বেঁধে ছিল তার চেয়ে অনেক ছড়িয়ে পড়েচে, সমুদ্রের এপারে ওপারে, দেশ থেকে দেশান্তর।

কিন্তু নিজেকে নিয়ে এতখানি ছড়াছড়ি আর ভালো লাগেনা। কাজ খাটো করে ছোট একখানি জায়গায় আসন পেতে বসতে ইচ্ছে করে— একটুখানি ছবি আঁকি, গান বাঁধি, বাগান করি, আর সঙ্গে, কিছু দেখাশুনো গল্প স্বল্প হাসি তামাসা। কিন্তু সে আর ঘটে উঠ্‌বেনা। একেবারে রাস্তার চৌমাথায় চৌকি পড়েচে— ঘোরতর হট্টগোলের মাঝখানেই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটবে।

এখানে দিনগুলো ভালোই যাচ্চে। আকাশে একদল অকেজো মেঘ কেবলি পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে অকারণে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্চে— দিনরাত হু হু করে বাতাস বইচে— চারদিক সবুজ— জ্যৈষ্ঠমাসের রুক্ষ চেহারা কোথাও নেই।

কলকাতায় যাবার মতো জোর এখনো পাই নি। যদি যাওয়া ঘটে নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে দেখাও ঘটবে। ইতি [? জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯]

ভানুদাদা

১৯১

[২৭ আশ্বিন ১৯৩৯][১]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েচি। এখানে এখন প্রায় নির্জ্জন। বৌমারা খড়দহে।[২] আমি বাসা নিয়েচি সেই কোণার্কে। এখানে তোর কথা কতবার মনে পড়ে। যদি আসতিস তবে দেখতিস সে বাড়িটা অনেক বদল হয়ে গেছে— তবুও সেদিনকার ছবি অলক্ষ্যে লুকিয়ে আছে এর মধ্যে।

ছুটির আকাশ সোনার রঙের রৌদ্রে এক একবার মনটাকে উদাস করে দেয়— টানে দূরের দিকে, বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে— কিন্তু কোথায় বা যাব— যেখানে যাব সেখান থেকেও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হবে। "আমি সুদূরের পিয়াসী" কিন্তু সেই সুদূর তো কোনো জায়গাতেই নিকট হবে না। তাই দূরের বাঁশরী শুনে যাত্রা করি মনে মনে, সে যাত্রার আর অবসান নেই।

শরৎকালটা প্রতিদিন সুন্দর হয়ে উঠ্‌চে। ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার সামনেকার ঐ বীথিকায় গাছের পাতাগুলো রৌদ্রে ঝিলমিল্‌ করে কাঁপচে, বসে বসে চেয়ে দেখি কুঁড়েমি করে কাটাই অথচ কাজের তাড়া আছে। য়ুনিভার্সিটিতে চাকরি জুটেচে, লেকচার লিখ্‌তে হবে[৩] মনে করলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাবার জন্যে যেমন মন ছটফট করত এখনো সেই দশা হয়েচে। কিন্তু পালানো তখনকার মতো এত সহজ নয়। এখন পালাই বাজে কাজ করে[৪]। যখন গম্ভীর লেকচার লেখা নিতান্ত উচিত তখন গল্প বানিয়ে লিখি। মনকে বলি আগে এইটে শেষ হোক তারপরে অন্যটাতে হাত দেব।

ঐ লেকচার দিতে যেতে হবে পূজোর ছুটির পরে।[৫] তখন যেন একবার তোর সঙ্গে দেখা হয়। সঙ্গে আনিস্ তোর খোকাকে, ভাব করবার চেষ্টা করব। আমার চেহারা দেখে হয়তো ভয় পাবে, তার মায়ের মতো অমন নির্ভয় প্রকৃতি হয়তো তার না হতেও পারে। ইতি ১৩ অক্টোবর ১৯৩৯

[১৩৩৯ : ১৯৩২]

ভানুদাদা

১৯২

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

ওঁ

•"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

রাণু, কাল অর্থাৎ ৯ই তারিখে প্রাতে কলকাতায় রওনা হচ্ছি। দশই কোনো সময়ে তোর খোকাকে কোলে করে যদি জোড়াসাঁকোয় আসতে পারিস খুব খুসি হব। ১১ই থেকে নানা এন্‌গেজ্‌মেণ্টের জালে জড়িয়ে পড়ব।

অনেকদিন দেখিনি তোদের। ৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

ভানুদাদা

১৯৩

১৫ মাঘ ১৩৩৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু তুই নিশ্চয় আসবি। ইতিমধ্যে আবার মন বদলাস নে। তোকে আমার কোণার্কের এক কোণে জায়গা দেব।[১] তোর ছেলেদের জন্যে দু সের দুধ দাবী করেছিস— আমি তিন সেরের বন্দোবস্ত করব কেননা এখানে এলে তাদের ক্ষিদে বাড়বে। অনেক বদল হয়েচে দেখতে পাবি কিন্তু আমার কিচ্ছু বদল হয় নি। ইতি ২৮ জানুয়ারি ১৯৩৩

ভানুদাদা

১৯৪

৩০ ফাল্গুন ১৩৩৯

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

রাণু

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। এখন তুই কল্পনা করতে পারবি কোথায় আমার দিন কাটে এবং কোথায় কাটে রাত। সেই কোণার্কের কোণে থাকি পড়ে'। লেখাপড়া করতে চেষ্টা করি, বাধা পাই পদে পদে। কাজ এসে পড়ে, লোকেরও উপদ্রব। বরানগরে থাকতে একটা গল্প[১] লিখতে সুরু করেছিলুম আরামে লেখা এগোচ্ছিল— চারদিকের গাছপালা বাগান আর

রাণীর[২] শুশ্রূষায় লেখার মধ্যে রস সঞ্চার করছিল। এখানে রৌদ্র করছে ঝাঁঝাঁ, গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে বাগানটা গরীবের মতো হয়ে আসচে। তা ছাড়া লোকের সঙ্গ আর কাজের তাগিদ বেড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়চে, গল্পটাকে কুনুয়ের ঠেলা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়েচে।

এবারে গরমের সময় এখানে থাকা যদি নিতান্ত দুঃসহ হয় তবে পূরীতে যাব মনে করচি। রথীরা দার্জ্জিলিং যাবে, সেখানে ওর শরীর ভালো থাকে। তোদের কোথায় গতি? বীরেন বলেছিল জার্ম্মাণী থেকে ফুলের, সব্‌জির, ভালো বীজ সস্তায় পাওয়া যায়, যদি ঠিকানা পাই তবে আমরাও আনিয়ে নিই এবং ফল ভোগ করি। ফল যদি বেশি ফলে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ কিছু অংশ তোদের দ্বারেও পৌঁছিয়ে দিতে পারি। ভেবে দেখিস। ইতি
১৪ মার্চ্চ ১৯৩৩

ভানুদাদা

১৯৫
১ ফাল্গুন ১৩৪০

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু এবার শান্তিনিকেতন থেকে হাবড়ার প্ল্যাটফর্‌মে এসে দেখলুম শরীরটা চল্‌তে চায় না, দশ পা চল্‌লেই বুকে পিঠে ব্যথা ধরে এ অবস্থায় তার প্রতি অনাবশ্যক জবরদস্তি আত্মঘাতের পন্থা। এখানে এসে দুই তিনটে বক্তৃতা করতে হয়েচে তাতেও ক্লান্তির বোঝা বাড়িয়ে তুলেচি।[১] এর উপরে আর চল্‌বেনা— কাশীতে যাওয়ার সঙ্কল্প ছাড়তে বাধ্য হতে হোলো।

সঞ্জীবরাওয়ের ঠিকানা জানলে এইখান থেকেই তাঁকে জানাতুম। অনিলের[২] উপর ভার দিয়েচি তাঁকে টেলিগ্রাফ করে দিতে— অনিল আছে শান্তিনিকেতনে। আশাকে বলিস্ তাঁকে অবিলম্বে যেন এই খবরটা জানিয়ে দেয়। তোকে দেখ্‌তে পাব বলেও যাবার ঔৎসুক্য ছিল কিন্তু যে হেতু এখনো দু চার বছর এই দেহটাকে ব্যবহার করতেই হবে তাই সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য মনে করি। প্রত্যেক বারের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে জমে উঠেছে তাই একেবারে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছাড়া আর কোনো কারণেই জীর্ণ দেহের পরে নির্ম্মম হতে পারবনা। তুই ফিরে আয় তার পরে যদি সুযোগ পাই দেখা হবে। ১লা মার্চ্চ দোলের দিন, সেদিন শান্তিনিকেতনে উৎসব হবে— যদি আসতে পারিস তো আসিস। তোরা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্ ইতি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

ভানুদাদা

১৯৬

২৫ ভাদ্র ১৩৪২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

অনেকদিন পরে তোর চিঠিখানি পেয়ে ভালো লাগল। বহুকাল তোকে দেখিনি।

শরীর মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়— শরীরের দোষ দিতে পারি নে— ৭৪ বৎসর তাকে নির্দ্দয়ভাবে খাটিয়েছি— আজও আমার উপরে লোকের দাবীর অন্ত নেই। সবাই নিজের নিজের প্রয়োজনকেই গুরুতর মনে করে—

অথচ আমার প্রয়োজনের কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। এইটে বাংলা দেশের বিশেষত্ব।

পূজোর ছুটির সময় কলকাতার দিকে যাব কি না খুবই সন্দেহ। প্রধান কারণ জীর্ণ দেহের বোঝা নিয়ে নড়তে চড়তে ইচ্ছে করেনা— দ্বিতীয়ত শরৎকালটা এখানে খুব সুন্দর— ছুটির সময় লোকের ভিড় কাজের দায় থাকবেনা তখন চুপচাপ করে কাটাতে পারব।

তোরা তখন বোধ হয় দার্জ্জিলিঙের দিকে ছুটবি। যদি এখানে [আসতে] পারতিস খুব খুসি হতুম। কিন্তু সম্ভাবনা বিরল। এখন এখানে অনেক বদল হয়েচে। বোধ হয় শুনে থাকবি একটা মাটির বাসা বেঁধেছি।[১] তার দেয়াল ছাদ সমস্তই মাটির। এইখানেই আমার শেষ আশ্রয়।

যদি কোনো উপলক্ষ্যে কলকাতায় যাওয়া ঘটে নিশ্চয় তোর সঙ্গে দেখা করব। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ভানুদাদা

১৯৭

১৭ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। দার্জ্জিলিঙে [য] তুই আছিস এ ছাড়া দার্জ্জিলিঙে যাবার আর কোনোই আকর্ষণ নেই। অথচ কোথাও যাওয়া দরকার, শরীরটা নেহাৎ বেমেরামৎ হয়ে পড়েচে। হয় তো শিলঙ নয় তো পুরীতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তুই প্রশ্ন করতে পারিস তাই যদি হোলো

তাহলে দার্জ্জিলিং কী অপরাধ করেচে। সহজ উত্তর এই, দার্জ্জিলিং যেতে খরচ আছে। অন্য দুটো জায়গায় হয় তো বিনাব্যয়ে কাটিয়ে আসতে পারি। বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথাটা সুগম্ভীরভাবে চিন্তনীয়।

নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে, শরীরটা নারাজ ছিল।[১] কিন্তু শরীরের সম্মতি নিয়ে কাজ করবার অবস্থা আমার নয়। শরীরের প্রতি দায়িত্বের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব আছে, তাকে উপেক্ষা করবার জো নেই। যত দিন প্রাণ আছে ছুটি মিলবে না, দেহটার প্রতি মমতা করবারও অবকাশ জুটবে না। বাইরের মনিবের কাছে ছুটি মেলে, ভিতরের মনিব আজও ছুটি মঞ্জুর করলেন না।

বুড়ির বিয়ের দিন[২] আগামী ১২ বৈশাখে— শান্তিনিকেতনেই। তারই উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে আছি। আয়োজনের উপলক্ষ্যে কয়েকদিন কলকাতায় ছিলুম, কাল রাত্রে এসেছি আশ্রমে। গরম নিশ্চয়ই— কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করে লাভ নেই— জন্মেছি গরম দেশে। কবিতা লেখবার সময় লিখতে হয়েছে, “সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে”— যত গরমই হোক কথাগুলো আর ফিরিয়ে নেবার জো নেই।

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪৩

ভানুদাদা

১৯৮
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

ওঁ

“UTTARAYAN”
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ হঠাৎ কাগজে পড়ে চম্‌কে উঠেছিলুম।[১] যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল দুর্ব্বলতায় ভুগছিলেন তবু মৃত্যু

সকল অবস্থাতেই অপ্রত্যাশিত।

এই শোকের দিনে তোদের সমস্ত পরিবারের জন্যে শান্তি ও সান্ত্বনা কামনা করি। ইতি ১৭মে ১৯৩৬

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৯

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

ওঁ

*"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.
[চন্দননগর]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এবারে কিছু দীর্ঘকাল ছিলুম বরানগরে,[১] তুই তখন দার্জ্জিলিং। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের কল্পনায় ভীত হয়ে নানা প্রকার ঠাণ্ডা জায়গার কথা ধ্যান করছিলুম। ডাক্তার বিধান রায়ের[২] সঙ্গে পরামর্শ চলেছিল শিলঙে যাবার। কিন্তু ভাগ্যে কোথাও যাই নি— এবার জ্যৈষ্ঠ মাস তার রুদ্রমূর্ত্তি লুকিয়েচে অকাল বর্ষার মেঘে। এখানে প্রায় ক্ষণে ক্ষণে চল্‌চে ঝোড়ো হাওয়া, আর মুষলধারে [য] বর্ষণ। আমি আজকাল বাস করি আমার নতুন মাটির ঘরে— এই বাসাটা তোর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যদি কখনো আসা সম্ভব হয় এটা দেখতে পাবি— ভালো লাগবে। কলকাতার দিকে হয় তো আমি যাব জুলাই মাসের কোনো এক সময়ে— তোকে জানাব টেলিফোন যোগে— অনেকদিন দেখা হয় নি— তোকে দেখতে ইচ্ছে

করে। কবে হয় তো দেখবার দিন হঠাৎ যাবে শেষ হয়ে। ইতি ১২ জুন ১৯৩৬

ভানুদাদা

২০০

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ওঁ

[আলমোরা]

রাণু

এই দুঃসহ গরমে তোকে কলকাতায় কাটাতে হোলো। যত চিঠি পেয়েছি ও দিক থেকে, সবগুলিতেই পালাই পালাই রব আছে। আমরা গোড়াতেই বেরিয়ে পড়েছি। পথটা গিয়েছে অত্যন্ত কষ্টে। বেরিলিতে ৭।৮ ঘণ্টা মশার কামড়ে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল, তার পরে সমস্ত দিন উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা রাস্তায় মোটরের ঝাঁকানি খেতে খেতে আধমরা হয়ে গম্যস্থানে পৌঁছই।[১] পাহাড়ের হাওয়ার গুণ এই ক্লান্তি সেরে নিতে দেরি হয় না। এখন দিনগুলো চলচে ভালোই। মাঝে ঝড় ও শিলবৃষ্টি হয়েছিল, এ রকম উৎপাতে আরামের স্বাদ বাড়ায়। পাহাড়ের পক্ষে শীতের মাত্রা এখন খুবই কম। তোরা যাচ্ছিস সমুদ্রপারে, ভালোই লাগবে— হঠাৎ একটা লড়াইয়ের মধ্যে আট্‌কা পড়ে যাস্‌নে যেন। ফিরে এলে দেখা হবে। ইতি ৩০ মে ১৯৩৭

ভানুদাদা

২০১

১০ শ্রাবণ ১৩৪৪

ওঁ

*"ST. MARKS"
ALMORA. U.P.

রাণু

তোর ছবিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি।[1] বেশ ভালো ছবি। তুই তো এখন উড়ে চলেছিস। এতদিনে ওড়ার পালা নিশ্চয় শেষ হয়েচে। কেমন লাগল? গা কেমন করেছিল কি? আমার কোনো কষ্টই হয় নি। যখন বেলুচিস্থানের মরুভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন আকাশযান অনেক উঁচুতে উঠেছিল— কেন না নিচের হাওয়া গরম হয়ে উঠে তোলাপাড়া করতে থাকে, তারও উপরে উঠলে শান্ত হাওয়া পাওয়া যায়। এত উপরের হাওয়ায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আমার কিছুই হয় নি দেখে ডাচ্ পাইলট ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।— কিছুকাল পাহাড়ে পাঠানো [কাটানো] গেল। পালা শেষ হয়ে এসেছে— পর্ত যাব নেবে— গোলমাল লোকজন কথাবার্ত্তা তর্কবিতর্কের আবর্ত্তে— গরমকে ভয় করি নে, কিন্তু মানুষের রচিত অশান্তি এখন আর একটুও ভালো লাগেনা, ভারতবর্ষে কোথাও ভালো রকম লুকিয়ে থাকবার জায়গা পাওয়া যায় না। মশা ম্যালেরিয়া মানুষ, হাজার রকমের অসুবিধে লেগেই আছে। তবু— লিখেছিলুম সার্থক জনম আমার ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাল চলেছি স্ববাসে।[2] তোরা ফিরে এলে দেখা হবে।

২৬। ৭। ৩৭

ভানুদাদা

২০২

[?১ অগাস্ট ১৯৩৮]

ওঁ

•"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠি অনেকদিন পরে পেয়ে খুসি হলুম। আমি আজ কাল চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সকল রকম উৎপাত থেকে ছুটি পাবার জন্যে পাব্‌লিকের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলুম।[১] কেউ যে সেটা মঞ্জুর করেচে এমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্চি নে। পাব্‌লিক বলতে রাণুকে বোঝায় না সে কথা মনে রাখিস্

আজকাল কোনো রকম কাজ করতে একটু ইচ্ছে করে না। মস্ত একটা অবকাশ ফাঁদতে যদি পারতুম তাহলে আমার কোনো নালিস থাকত না— সেই সঙ্গে এ কথা বলাও দরকার যে সেই অবকাশটাকে রসে ভর্ত্তি করতে পারে এমন মানুষেরও প্রয়োজন। কোনোমতে অবকাশ যদি বা জোটে মানুষ জোটে না— হাঁড়িটা হয় তো মেলে অন্ন মেলে না।

বেনারসে পূজোর ছুটিতে যাবি। আমার পূজো নেই, ছুটি নেই, বেনারস নেই। তখন কোথায় আমার অবস্থান ঠিক বল্‌তে পারি নে— খুব সম্ভব বক্তৃতা [দিতে] যাব অন্ধ্র য়ুনিভাসিটিতে।[২]

কিছুকাল খুব বৃষ্টিবাদল হয়ে গেছে— সম্প্রতি আকাশ পরিষ্কার— চারদিকে সবুজে সোনায় মিলন দেখচি।

ভানুদাদা

২০৩

১০ কার্তিক ১৩৪৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

এতদিন পরে অকৃত্রিম ঠাণ্ডা পড়েছে। সেও তিন ভাগে বিভক্ত। সকালে বেশ ঠাণ্ডা, দুপুর বেলায় গরম, সন্ধ্যা বেলায় ঠাণ্ডা হবার মুখে। ভাদ্রমাসটা এখন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভেগেছে। বৌমারা বোধ হয় ওখান থেকে শীতের তাড়া খেয়ে এবার নামবার উদ্যোগ করছেন। তিনি না থাকলে আমি থাকি অসহায়। ভাগ্যে দুই একটি নাৎনী আছে, তারাই নির্জন দিনে রসসঞ্চার করছে।

২৭। ১০। ৩৮

ভানুদাদা

২০৪

[? ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত এবং উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমাদের জগৎ থেকে তুই বহু দূরে গিয়ে পড়েছিস সেখানকার রুচি এবং আচার আমাদের থেকে এত অত্যন্ত পৃথক যে তার

ঘৃণ্যতাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি নে— মন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। তোকে ভালোবাসি ব'লেই আমার এই ধিক্কার এবং উদ্বেগ থেকে থেকে উদ্দাম হয়ে ওঠে। সবচেয়ে আমার এটাই অদ্ভুত লাগে যে বিদেশী মহলে এই রকম অশুচি উন্মত্ততা প্রচলিত আছে ব'লেই তুই এ'কে এত সহজে মেনে নিতে পেরেছিস।[১] আমাদের দেশের কোনো নিন্দনীয় আচরণকে তুই এমন হাসতে হাসতে স্বীকার করে নিতে পারতিস নে। নিজেকে তুই দিনে দিনে এমন করে অপমানিত করছিস এ আমার পক্ষে বড়ো দুঃখের আর তোর পক্ষে বড়ো দুর্গতির। আর কেউ হোলে আমি উদাসীন থাকতে পারতুম— কিন্তু তোর সম্বন্ধে আমার মন উদাসীন থাকতে পারে না— বিশেষত যখন বুঝতে পারছি তোর অভ্যাস প্রতিদিন নেশার মতো তোকে জড়িয়ে ধরছে এবং তুই বুঝতে পারছিস নে অভ্যস্ত পঙ্কিলতার হেয়তা। তোকে আমি এই নিয়ে দুঃখ দিয়েছি নিজে দুঃখ পেয়েছি এই কথা মনে রাখিস। ইতি [? ফাল্গুন ১৩৪৫]

ভানুদাদা

২০৫

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠি পেয়ে মন নিরুদ্বিগ্ন হোলো। বিলেতে Night Club-এর নানা রকম বিবরণ পূর্ব্বেই শুনেছিলুম— তার থেকেই বুঝেছিলুম এ জাতীয় প্রমোদভবনের হাওয়া বিশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ যাদের ধন আছে

অথচ যাদের উপভোগের রুচির মধ্যে সৌকুমার্য নেই এ সব জায়গা তাদেরই ভোগের নিকেতন। এখানে কেবল যে সময় নষ্ট হয় তা নয় সময় কলুষিত হতে থাকে, মনের অভ্যাস শুচিতা হারিয়ে ফেলে এবং সেজন্যে অনুশোচনা বোধ করে না। তুই বলচিস নেশায় নেশায় [য] তোকে ধরে নি— তাহলেই হোলো।[1]

সেদিন অভিনয়ের[2] মাঝখানে তোকে চলে আসতে হয়েছিল বলে আমি রাগ করেচি এমন অদ্ভুত ধারণা তোর কী করে হোলো। আমার মধ্যে কি তোর মতো ছেলেমানুষি আছে? তিলমাত্র আমি বিরক্ত হই নি— এ কথা নিশ্চিত মনে রাখিস্।

আশ্রমে আওয়াগড়ের রাজা[3] এসেছেন— তাঁকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ২৫।২।৩৯

ভানুদাদা

২০৬

২০ মাঘ ১৩৪৬

ওঁ

*“UTTARAYAN”
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

রাণু রাঁচিতে তোর নিমন্ত্রণ লোভনীয় কিন্তু গ্রহণ করা সহজ সাধ্য নয়। এখন থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নানা ব্যাপারে আমি জড়িত। এর মধ্যে ফাঁক দেখতে পাচ্চি নে। মন ছুটি পাবার ইচ্ছে করে কিন্তু অদৃষ্টের জাল জটিল। অবকাশ দৈবাৎ আসে, তার পরে অন্তর্ধান করে

দৈবাৎ, তার উপরে নির্ভর করতে পারি নে। অতএব আপাতত তোর নিমন্ত্রণটা মুলতবী রইল।

আমার শরীরটা যে বিশেষ কর্মক্ষম অবস্থায় আছে তা নয়, মনটা রয়েছে কর্মবিমুখ হয়ে, তবুও কাজের দাবি থামতে চায় না। তহবিল যখন ভর্তি ছিল তখন যারা অজস্র দান করে এসেছে শূন্য তহবিলের দিনে তাদের বদান্যতার প্রতিপত্তিটা একটা ট্র্যাজেডি। যাই হোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে শেষ পর্য্যন্ত চলবে— তার পরে রাস্তার মাঝখানটায় হঠাৎ বাস্— ইতি ৩।২।৪০

ভানুদাদা

২০৭

৩ শ্রাবণ ১৩৪৭

ওঁ

UTTARAYAN
১৯।৭।৪০

রাণু

তোর ঠাণ্ডা হাওয়ার দান এই গরমের দিনে কাজে লাগচে।[১] এই ঘরটার বাইরে সবাই হাঁস ফাঁস করচে তখন আমি শান্ত হয়ে প্রহর কাটাচ্চি। এ যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার দ্বীপ। একবার এসে হাওয়া খেয়ে যাস্। বহুৎ বহুৎ সেলাম

ভানুদাদা

২০৮

১৯ কার্ত্তিক ১৩৪৭

১৫। ১১। ৪০
জোড়াসাঁকো

রাণু
খুশি হলুম
আমার অনুচরগণ
নৃত্য করচে
তাঁদের মধ্যে
একজন একসঙ্গে
খাওয়ার পর
সকলে ধরে বেঁধে
নিরস্ত করলে
আজকের তার কী দশা হবে কী জানি
ভগবান তাকে রক্ষা করুন[১]
ভানুদাদা।

তোর দুষ্টু মেয়ে[২]
সুস্থ হয়ে
আবার চারদিকে
পূর্ব্ববৎ লাথি বর্ষণ
করতে থাকুক
এই প্রার্থনা করি

অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

১৫ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ

আপনারা যথাসময়ে পৌঁছিয়াছেন সে সংবাদ রাণুর চিঠিতেই পাইলাম।[১] আশা করি কাশীর গরমে এবং কর্ম্মের ক্লান্তিতে পুনরায় আপনার শরীর খারাপ হইবেনা। যথাসম্ভব সতর্ক থাকিবেন। আপনারা চলিয়া যাওয়ার পর আমাদের আনন্দধারা[য়] অনেকখানি ভাঁটা পড়িয়া গেছে। কেবল আমি নয় সকলেই তাহা অনুভব করিতেছেন। আর আমার ত কথাই নাই। আমার সেই ছাদটি এবং কোণটুকু বিমর্ষ হইয়া আছে। বিশেষত আমার চুলের অবস্থা এমন হইয়াছে যে আয়না দেখিলে আয়নার উপরে রাগ ধরে— আর আমার বয়স যে সাতাশ সে কথাটাও, ইতিহাসের বহুতর মিথ্যা তারিখের মত, আজকাল আমার মনে করিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূজার ছুটিতে রাণু আসিয়া যদি এ সম্বন্ধে আমার পরীক্ষা [নেয়] তবে হয় ত বা একেবারে ফেল করিব। [...] সে চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইতেছে অনেকগুলা বছর দুই তিন দিনের মধ্যেই পার হইয়া গেছে। পশুপতি[২] কলিকাতায় আসিতে সম্মত না হইলে আমি বিশেষ দুঃখিত হইবনা কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ সন্ধ্যাবেলা রাণুদের গান বাজনা শিখাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আনন্দ আমাদের সব চেয়ে বড় খাদ্য— এই খাদ্য ছোট ছেলে মেয়েদের বাড়িবার বয়সে যত বেশি আবশ্যক এমন বড় বয়সে নয়। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলাটায় আপনার নীড়ের শাবকদের জন্য এই গীতামৃত বরাদ্দ করিয়া দিবেন— সেই সময়টা কেন নীরবতার ভারে নিস্তব্ধ হইয়া না

থাকে। পশুপতিকে না পান যাহাকে হউক ধরিবেন, নিতান্তই গানের যদি ব্যবস্থা করিতে না পারেন, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির চেষ্টা করিবেন। ইতি ৩১ আষাঢ় ১৩২৫

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২৫ এপ্রিল ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

শরীরে আমার ক্লান্তি এসেচে। এই ক্লান্তির প্রয়োজন ছিল। নানা কর্ত্তব্যে নানা চিন্তায় জীবনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। আমাকে ভাবতে হবে আমাকে করতে হবে নইলে বিধাতার বিধান টিক্‌বে না এই মনে করে আমরা কেবল কাজটাকেই বড় করে দেখি আপনাকে খাটো করে নিই। তাই বিধাতা মাঝে মাঝে কানে ধরে আমাকে বিছানায় টেনে এনে বলেন, অত ভাব্‌তে হবে না তোমাকে, তুমি চুপ করে থাক।— এই চুপ করে থাকাটা যে কত বড় জিনিস তা বেশ বুঝতে পারচি। চুপ করে থাকতে পাই নে বলেই বিধাতার কত দান গ্রহণ করি নে তার ঠিক নেই; তিনি নিজে যা চোখের সাম্‌নে ধরেচেন তাকে দেখিনে, তিনি নিজে যা কানের কাছে বল্‌চেন তা মর্ম্মের মধ্যে নিই নে। আজ আমি দায়ে পড়ে কেদারা আশ্রয় করে জানলার কাছে পড়ে আছি তাই আলোয় ভরা সমস্ত নীলাকাশ আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েচে— আর তাই এতকাল পরে ঐ রাস্তার ধারের বটগাছটিকে ভাল করে চোখ তুলে দেখ্‌তে পেলুম।

আমি বোধ হয় ছুটির সময়ে এই জান্‌লাটার কাছেই চুপ করে পড়ে থাকব। কোনোখানে যাওয়া আমার ঘটবে না।[১] যাওয়া ব্যাপারটা যে একটা বাস্তব কাণ্ড, ওটা ত স্বপ্ন নয়। যেখানে আছি সেখানটা ত্যাগ করতে হয়, জিনিসপত্র বাঁধতে হয়, রেলগাড়ি চড়তে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি [।] তার পরে আবার কিছুদিন পরেই উল্টোরথের কাণ্ড। কাজের সময় যেখানে আছি ছুটির সময়ে সেইখানে থাকাটাই একটা যাত্রা— কেননা তখনি তার উপরে নূতন করে নজর পড়ে, তখনই কর্ম্মের স্টেশন পার হয়ে ছুটির স্টেশনে এসে পৌঁছন যায় অথচ পথখরচ লাগে না। মেয়েদের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন। ইতি ১২ বৈশাখ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৫ অক্টোবর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

আমাদের আশ্রমে মেয়েদের দেখবার জন্যে স্নেহলতা দেবী আসচেন। ইনি আমাদের সুপরিচিতা, বিদুষী, B. L. Gupta যিনি সিভিলিয়ান ছিলেন, তাঁরি মেয়ে। কিছুকাল থেকে ইনি লণ্ডন কলেজের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, শান্তি ও বিশ্রাম চান বলেই এখানে আস্‌চেন।[১] এঁর মত যোগ্য লোক এত সহজে পাব না। এই জন্যেই যাঁর কথা লিখেচেন তাঁকে এখন নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা।[২]

অধ্যাপক লেভির পত্র পেয়েচি। তিনি অগ্রহায়ণের আরম্ভে এখানে

পৌঁছে তাঁর ক্লাস নিতে সুরু করবেন।[৩] যদি তোমার কাশীবাসী ছাত্র এই চারমাসের জন্যে এখানে ছাত্ররূপে তাঁর ক্লাসে ভর্ত্তি হতে চান তার ব্যবস্থা করতে পারি। ব্যবসায়ীরা যাকে বিজ্ঞাপনে লিখে থাকে "সুবর্ণ সুযোগ" এও তাই। আপনার উচিত ঐ কয়মাস কাজে ছুটি নিয়ে এখানে ভর্ত্তি হওয়া। আশা[৪] যদি পাশ করবার প্রলোভনপাশে বাঁধা না পড়ত তাহলে তাকে ডাকতুম।

আজকাল আমাকে পত্রাতঙ্ক পেয়ে বসেচে— ডাক ঘরের পেয়াদাকে দূর থেকে দেখ্‌লেই আমার স্বেদ স্তম্ভ বেপথু প্রভৃতি নানা প্রকারের বিকার উপস্থিত হয়। অতএব এইখানে বিদায়গ্রহণ করি। ইতি ৮ কার্ত্তিক ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

লেভি সাহেব শীঘ্রই কাশীতে যাইবেন, তাঁহাকে সেখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখাইবেন— রাণুর সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিবেন।[১] আমার যাওয়া এ যাত্রায় ঘটিল না। নেপাল হইতে ফিরিবার পথে একবার যাইবার ইচ্ছা আছে।[২]

সুরেন্দ্রনাথকে[৩] পত্র লিখিয়া দিলাম।

রাণুর শরীর ভাল নাই শুনিয়া আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। বোধহয়

অজীর্ণই তাহার palpitation-এর কারণ— পরীক্ষার ভূতে পাইয়া বসিলে এই সমস্ত উপসর্গ ঘটে। ইক্ষুদণ্ডই জাঁতাকলে নিস্পেষণ করিতে হয়, পদ্মের মৃণাল নয়। পরীক্ষার চাপ মেয়েদের শরীরের পক্ষে খাটে না। ইতি ২৯ মাঘ ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

১৯ অগাস্ট ১৯২২

ওঁ

*Santiniketan
Beerbhum (Bengal)
1922.
[কলকাতা]

কল্যাণীয়েষু

এবার আর তোমাদের সম্মেলনে[1] আমার যাওয়া ঘট্‌ল না। সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই আমাকে বম্বাই যেতে হবে। তাই বলে' এ বৎসরে তোমাদের সভাধিবেশন ঠেকিয়ে রাখা উচিত হবে না। অতুলপ্রসাদ সেনকে[2] সভাপতি করতে বাধা কি?

বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল।[3] তার একখানি গানসংগ্রহ ও আমার নূতন প্রকাশিত "লিপিকা"[4] রাণুকে আজ পাঠিয়ে দিয়েচি— তাকে দিয়ো। আজ শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। ইতি ২ ভাদ্র ১৩২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল প্রত্যূষের গাড়িতে বোলপুরে যাব।

৬

নভেম্বর ১৯২২

ওঁ

[বোম্বাই]

কল্যাণীয়েষু

আগামী ৭ই ডিসেম্বরে এখান থেকে যাত্রা করে বারাণসী ধামে দুই একদিন অবসর গ্রহণ করব।[1] তার পরে মীরাদের নিয়ে আশ্রমে যাত্রা করতে হবে।[2] অধ্যাপক বিণ্টর্‌নিট্‌সকে[3] নিয়ে যাব মনে করেছিলুম কিন্তু সে সঙ্কল্প দূর করে একা যাওয়াই স্থির করেছি। এণ্ড্রুজ আরো কিছুদিন এখানে আমার ভিক্ষার ঝুলি বহন করে বেড়াবেন। আমার বাহন স্বরূপ সঙ্গে যাবে মরীচি।[4] ইতি অগ্রহায়ণ ১৩২৯

পথক্লান্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২১ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালে ডেস্কে বসে একটা নতুন গান নিয়ে তার উপর সুর চড়াচ্ছিলুম. এমন সময়ে হঠাৎ আমার চৌকির পিছনে রাণুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করলুম, বাড়ি থেকে পালিয়ে আস নি ত? সে বল্‌লে হাঁ পালিয়ে এসেচি, কিন্তু সম্মতি নিয়ে এবং সঙ্গিনী সহযোগে, অতএব পুলিসে খবর

দেবার দরকার হবে না। ওকে দেখে খুসি হলুম। কিন্তু ওকে আশার সঙ্গে কাশীতে ফিরিয়ে দেব না। আমরা দেরাদূনে যাচ্চি সেখানে ওকে নিয়ে যাব।[১] বলা বাহুল্য ওর নিজের তাতে অসম্মতি নেই, আমার প্রতি ওর “জননান্তর সৌহৃদানি”র দাবী আছে। তোমরা ত আশাকে প্রত্যাহরণ করে নিচ্চ, আবার কাশি স্টেশনে পৌঁছলে রাণুকেও যেন বিচ্ছিন্ন করে নিয়ো না। আশার আশা আমরা সম্পূর্ণ ছাড়ি নি। ও বলেচে মাঝে এক বৎসর এম এ পাস করবার জন্যে ও মেয়াদ নেবে তার পরে ওকে আমরা পেতে পারব। ও চলে গেলে আশা দিদির অভাবে এখানে ভারি একটা ফাঁক পড়বে। বিশ্বনাথের[২] মুখে ফোড়া হওয়াতে আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। কলকাতায় পাঠিয়ে অপারেশন করিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কাল বোধহয় ফিরে আসবে। দেরাদূন যাবার আগে তোমাদের সময়মত সংবাদ দেব। এখানে তাপ প্রতিদিন বেড়ে উঠ্‌চে। আমার শরীর এবার বড়ই ক্লান্ত। মনে হচ্চে আমার এপারের তীরে এইবার ভাঙন লেগেচে, প্রতিদিন ছোটখাটো ফাটল ধরবার পূর্ব্বেই খেয়ায় পাড়ি দিতে পারলে ভাল হয়— জীর্ণ হয়ে ধসে পড়তে আমার খুব আপত্তি। ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩০

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

[মার্চ ১৯২৪]

শীঘ্রই রাণুর বিবাহ দিয়ে সমস্যা সমাধানের[১] যে চিন্তা করচ আমার কাছে সেটা ভালো বলে ত ঠেকচে না, তাতে সামাজিক সমস্যার

VISVA-BHARATI

মীমাংসা হতেও পারে, কিন্তু রাণুর নিজের পক্ষে সেটা সুখকর কিম্বা কল্যাণকর হবে কিনা সেটাই বিশেষ করে ভাববার কথা। দুঃখ পাবার শক্তি ওর এত তীব্র যে ও যদি অস্থানে গিয়ে পড়ে তাহলে ভিতরে ভিতরে ও নিজেকে দগ্ধ করে মারবে। যতক্ষণ খুব নিশ্চিত করে না বুঝবে ততক্ষণ উপস্থিত সঙ্কট কোনমতে এড়াবার জন্য একটা ঠেকা দেবার চেষ্টা কোরো না। আমার বিশ্বাস, রাণুর মা রাণুর নিজের পক্ষের কথাটা তোমার চেয়ে ঠিক বুঝতে পারবেন। তিনি এ সম্বন্ধে কি ভাবছেন আমি জানতে ইচ্ছা করি। সুসঙ্গের সুহৃদ' রাণুর কথা আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। আমি তাকে উৎসাহ দিই নি। কেননা কি হলে রাণুর পক্ষে ঠিকটি হয় বা নিশ্চিত না জেনে কতকগুলো কথা জমিয়ে তুলতে আমার আর সাহস হয় না। আমার ত মনে হয় আরো কিছুদিন পড়াশোনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্ত্তমান এই সমস্ত জঞ্জালের চিহ্ন মুছে ফেলা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। তারপরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ শান্ত হলে ওর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা সহজ হবে। এখন ওর মনে আলোড়ন হচ্চে, সেটা আর কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই অনেকটা পরিমাণ ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। আমার যদি সময় থাকত রাণুর সঙ্গে আর রাণুর মার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে ভিতরকার অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার এবং রাণুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতুম। [ফাল্গুন ১৩৩০]

৭ ফাল্গুন ১৩৩১

ওঁ

[বোম্বাই]

কল্যাণীয়েষু

কাল বোম্বাই এসে পৌঁচেছি।[1] রাণুর বিবাহের সম্বন্ধের খবর পেয়ে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম। তার জন্যে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। নিশ্চয়ই পাত্রটি ভালই এবং তাকে যখন রাণুর পছন্দ হয়েচে তখন কোনো কথাই নেই। যতগুলি সম্ভাবনা ঘটেছিল তার মধ্যে এইটেই যে সব চেয়ে ভালো তা নিঃসন্দেহ। ওরা দুজনে সুখী হোক এবং সর্ব্বতোভাবে ওদের কল্যাণ হোক্ এই আমার কামনা।

দক্ষিণ আমেরিকায় যাবার পথে আমি বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। জাহাজে পড়ে পড়ে মনে হয়েছিল যাত্রা শেষ হ'ল বুঝি। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেচেন যে আমার দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্র যথেষ্ট বেগে কাজ করতে পারচে না, সেইজন্যে রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে চল্‌চে। শরীরে কোনো বিকলতা নেই কেবল প্রাণশক্তির দৈন্য।

কিন্তু সকলের কাছ থেকে এত আন্তরিক সমাদর পেয়েছি যে, ছেড়ে এত শীঘ্র যে আমাকে চলে আস্‌তে হল এ'তে আমি দুঃখ বোধ করচি। আমি বুঝতে পেরেছি আমার দেশে আমি বিশেষ কিছু কর্ত্তে পারি আমার তেমন সাধ্য নেই। যা করবার তা প্রাণপণেই করেছি, সফলতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ভুল। সেখানে আমাকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চাচ্চে, তার অর্থই হচ্চে সেখানেই বিধাতা আমাকে ডেকেচেন। জীবনের অপরাহ্ণ এসেচে, বেলা আর বেশি বাকি নেই— এখন এই শেষের প্রহর পশ্চিম দিগন্তকেই অবলম্বন করবার জন্যে আয়োজন হচ্চে। তাই আজই জাহাজ ঠিক করতে পাঠিয়েছি— আগামী ১৫ই এপ্রেলে ইটালি

যাত্রা করন।[২] সেখানকার সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলুন— রক্ষা করতে হবে।

জুন মাসে যদি রাণুর বিবাহ হয় তাহলে উপস্থিত থাক্‌তে পারব না— কিন্তু আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তাকে বেষ্টন করে থাক্‌বে।

রবিবার বোম্বাই মেলে শান্তিনিকেতন যাত্রা করব।[৩] রাত্রি তিনটের সময় কুড়ি মিনিটের জন্যে কাশী থেকে মোগলসরাইয়ে আসবার দুঃখ দিতে চাই নে।[৪] যদি ঈস্‌টারের ছুটি বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে দুই একদিনের জন্যেও আশ্রমে আসতে পার খুব খুসি হব। যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে য়ুরোপে যাবার পথে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করে' রাণুকে আশীর্ব্বাদ করে' যাব।

তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে কিন্তু পাই নি। তোমাদের খবর এতদিন পরে এই প্রথম জান্‌লুম। ইতি ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[?৮ এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়েষু

তোমার ব্রণ তোমাকে এখনো কষ্ট দিচ্চে শুনে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। ছুটি নিয়ে কিছুদিন কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে থাক্‌লে ভালো হত।

অনেক দিন পরে মোগলসরাইয়ে আশা ও রাণুর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুসি হলুম। রাণুর অনুরোধ, তার বিবাহের পূর্ব্বে যেন য়ুরোপে না যাই। তার অনুরোধ এড়ানো কঠিন। কিন্তু বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন কি অসম্ভব? শুনেছি পাত্রের ইচ্ছা ছিল নভেম্বরে বিবাহ হয়। যদি তদনুসারে দিন স্থির কর তাহলে আমি তার পূর্ব্বেই ফিরে আস্‌তে পারি। আমার য়ুরোপে যাবার তাড়া কিসের একটু খোলসা করে বলি।

আমার শরীর ভেঙে গেছে— ডাক্তারের মতে আমার প্রাণশক্তির ভাণ্ডার দেউলে। দেহের যন্ত্র ঠিক আছে কিন্তু তার কাজ চালাবার সম্বল ফুরিয়ে গেছে। অনেকদিন জড়ের মত পড়ে থেকে সেই শক্তি আবার সঞ্চয় করে নিতে তারা পরামর্শ দেয়। যাই হোক্ এটা বুঝতে পারচি যে, আমার যা কাজ বাকি খুব শীঘ্র তা সেরে নিতে হবে।— ভারতবর্ষে ৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল অকৃপণভাবে কর্ম্মসাধনা করে এসেচি। তার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তাহলে একদিন দেশ তা গ্রহণ করবে। অতএব রইল তা কালের হাতে, আমার তার জন্যে তাড়া নেই। তাড়া অসমাপ্ত কাজের জন্যেই, কেননা সময় সঙ্কীর্ণ। তোমরা হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারবে না, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, য়ুরোপে আমার কাজ আছে। আমার মেয়াদ ফুরোবার আগেই সে কাজ আমাকে সেরে যেতে হবে। তাই ঠিক করেছিলুম দুই মাস বিশ্রাম করে নিয়ে মে মাসের আরম্ভে সেখানে গিয়ে শীতের পূর্ব্বে ফিরে আসব— আগামী বৎসরের গ্রীষ্মে ফের গিয়ে ছয় মাস কাটিয়ে আসব। জাহাজের কাম্‌রা রিজার্ভ করাই আছে।

রাণুর বিবাহ যদি আমার যাত্রার আগে বা ফিরে আসার পরে হয় তাহলে সব সহজ হয়। কিম্বা যদি রাণু মত করে তাহলে রাণু ও বীরেনকে একত্র দেখে বিবাহের পূর্ব্বেই ওদের আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নিতে পারি। রাণু আমাকে সত্য করিয়ে নিয়েচে ওর বিবাহকালে আমাকে উপস্থিত থাক্‌তে হবে। যদি সত্য বা ত্রেতা যুগে জন্মাতুম তাহলে এবারকার পাঁজিতে

আষাঢ় মাসকে হয় এগিয়ে আনতুম নয় মে মাসকে পিছিয়ে দিতুম, কিন্তু কলিযুগে সত্য পালন সঙ্কটে বিশ্বনিয়মকে বিচলিত করা যায় না। যা হোক এ সম্বন্ধে তোমাদের পরামর্শের অপেক্ষায় রইলুম। আজ ডাক্তারকে দিয়ে দেহযন্ত্র পরীক্ষা করিয়ে কাল শান্তিনিকেতনে যাব।'

আশা আশ্বাস দিয়েছিল রাণুকে নিয়ে সে একবার শান্তিনিকেতনে আসবার চেষ্টা করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে খুব খুশি হব। এবার আমাকে স্থাণুর মত নিষ্কর্ম্ম হয়ে পড়ে থাকতে হবে— ওরা যদি আসতে পারে তবে আমার কর্ম্মহীন অবকাশের বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হবে। [?২৫ চৈত্র ১৩৩১]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৭ এপ্রিল ১৯২৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

মাঝে আলিপুরে নানাবিধ দুর্য্যোগে শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছিল। ডাক্তার তাই আমাকে তাঁদের চিকিৎসার বেষ্টনীতে খুব কড়া করে' রাখবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এখানে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উপাসনায় না এসে থাকতে পারলুম না। তাতে শরীরেও কিছু উপকার হয়েচে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারচি স্বাস্থ্যের জন্য অতি শীঘ্রই আমার য়ুরোপে যাওয়ার খুবই দরকার। যখন রাণুর বিবাহে বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা প্রবল হয়েছিল তখন আমার যাত্রার তারিখ পিছিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু সে বাধা এখন যখন সমূলে দূর হয়ে গেছে তখন আমার শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকা

অনাবশ্যক। বিশেষত আমার উপর নানা উপদ্রব চল্‌চেই, শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় সেটা বিশেষ পীড়াজনক। যতদিন এ দেশে থাকব আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। ১লা মে তারিখে জাহাজে ক্যাবিন ঠিক ছিল, সেটা ছেড়ে দিয়েছি— এই গরমের দিনে জাহাজে স্থান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন— ১৫ই মে-তে যাত্রার চেষ্টা করতে ইচ্ছা করি, কিন্তু হয় ত ক্যাবিন পাব না। তাহলে অন্তত ১লা জুনে ছাড়তে চাই— তার পরে থেকে দীর্ঘকাল মন্‌সুনের উৎপাত, সেই দোলায় সমুদ্রে যেতে আমার ডাক্তার হয়ত অনুমতি দেবেন না। য়ুরোপে আমার কাজও ঢের আছে— সেইজন্যে এখানে বৃথা বসে বসে শরীরটাতে ক্রমাগত ভাঙন ধরাতে আর ইচ্ছা করচে না। য়ুরোপের আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারব বলে খুবই আশা আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে বীরেনের বোনের কাছে শুনেছিলুম ২৮শে জুনে রাণুর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওদের অনেকের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে, রাণুকে ওরা খুব অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করে দেখে আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়েছি। বিশেষত রাণুর প্রতি বীরেনের মনের ভাব ও ব্যবহার দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। সন্দেহমাত্র নেই যে এর চরিত্রে অসামান্য ঔদার্য্য আছে এবং রাণুকে এর মত এমন বড় করে ভালোবাসতে আর কেউ পারে নি। মধ্যে শত্রুপক্ষ নানা বিঘ্ন ঘটিয়ে যে সব দুঃখ সৃষ্টি করেছিল তাতে শুভ ফলই ফলেছে, তাতে সকল পক্ষেরই যে উপকার করেছে এমন আর কিছুতেই হতে পারত না। সেই জন্য এখন আমি নিজের কাজে প্রবৃত্ত হবার আর কোনো বাধা দেখ্‌চিনে। কর্ত্তব্যে অনাবশ্যক শৈথিল্য করা আমার উচিত হবে না। তোমরা সকলেই আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ৪ বৈশাখ ১৩৩২

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[১৯২৫]

কল্যাণীয়েষু

ইটালি ঘুরে তোমার দুখানি চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছল।— রাণুর বিবাহ নিশ্চয়ই আমার বিচিত্রা বাড়িতেই হবে।[১] তোমরা ওখানে যতদিন খুসি থেকো— কারো তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ইতিমধ্যে বিচিত্রা আমরা চুনকাম করিয়ে পরিষ্কার করে রাখব। আমি ভেবে দেখ্‌লুম— রাণুর বিবাহের পূর্ব্বে ইটালি যাত্রা আমার দ্বারা সম্ভবপর হবে না— সুতরাং কন্যাকর্ত্তাদের দলে আমাকে যোগ দিতে হবে। এবারে পাহাড় প্রভৃতি কোথাও যাওয়ার মত আমার শরীরের অবস্থা নয়— গরমের সময় সম্ভবত কলকাতাতেই আমাকে থাক্‌তে হবে।— আপাততঃ এখানে একটা আরামকেদারা আশ্রয় করে' চুপচাপ পড়ে আছি। এখনো হেঁটে বেড়াবার অবস্থা হয় নি। তোমার শরীর ভালো ত?

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

আশা এখন এলাহাবাদের কর্ম্মে যোগ দিক।[১] তার যে শক্তি আছে তাতে সে সব জায়গাতেই আপন কর্ত্তব্যক্ষেত্র তৈরী করে নিতে পারবে। সেখানকার মেয়েরা ওর সঙ্গে থেকে প্রীতি ও উপকার দুইই পাবে। সেখানকার অপ্রশস্ত কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে ও হয়ত যথোচিত স্বাধীনতা

পাবে না কিন্তু সেই নিয়মের বন্ধন দুঃখ থেকে মেয়েদের ও অনেকটা বাঁচাতে পারবে।

১৪

বীরেন[১] সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আশা অনতিকালের মধ্যে আশ্রমে আসবে। বলা বাহুল্য খুব খুশী হয়েছিলাম। আজ তোমার পত্রে বোঝা গেল, আশা সুদূরপরাহত।

আশা যদি আমাদের আশ্রমে যোগ দিতে পারত আমরা খুব খুশী হতুম। তার জন্যে তাহলে আমরা একটা Fellowship ঠিক করে দিতে পারতুম। আমার আশঙ্কা হয় অশোককে[২] ছেড়ে আসা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে এবং অশোককে নিয়ে এলে তোমাদের পক্ষে সুখের হবে না।

১৫

ছুটির সময় আশ্রমে গুটিকয়েক ছাত্র ও শিক্ষক থাকেন— ঐ সময় তাঁদের নিয়ে আমার মন্দ জমে না। আশাকে বন্দী করে রাখতে চেষ্টা করব— কিন্তু অশোককে কাছে না পেলে আশার আশা নেই। অতএব অশোক সনাথ হয়ে তোমরা যদি আশ্রমে আসতে পারো তাহলে আমার নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাকে না।

১৬

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

[শান্তিনিকেতন]

আশ্রমে এসে[১] আশাকে দেখে মন প্রসন্ন হল, ভক্তি রোগশয্যা থেকে সম্প্রতি উঠেছে। দেখা হল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আলাপের সুবিধা এখনো হয় নি। আশা সমস্ত বিদ্যালয়ের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে আছে, দেখে আনন্দ হয়। চেষ্টা করব যাতে অতিশ্রমে নিজেকে পীড়িত না করে। চেষ্টা করে যথেষ্ট ফল পাওয়া যাবে বলে আশা হয় না। নিজেকে দেউলে না করে ও দান করতে পারে না। যাই হোক ওকে পেয়ে খুব একটা নির্ভর পেয়েছি। অশোককে দেখলাম দিদির স্নেহে পরিপুষ্ট শ্যামল রূপে বিরাজ করতে।[২] একটা কথা বলে রাখি তোমরা কন্যে দান করে পুণ্য কর্ম্ম করেছ। [১৯ মাঘ ১৩৩৭]

১৭

৩ মে ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এ চিঠিটা নিতান্তই তর্ক করবার জন্যে। এবং সে তর্কটা সম্পূর্ণ অহৈতুক। সুরেন[১] ও নুটুর[২] বিবাহ[৩] সম্বন্ধে তুমি যে মন্তব্য প্রকাশ করেচ সেইটেই এর বিষয়। বিবাহ কোন্ হিন্দুমতে হবে সেটা তুমি বুঝতে পারচনা।

তার প্রশস্ত উত্তর হচ্চে এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে যে হিন্দুমতে কায়স্থে বৈদ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে সেই মতে। অপূর্ব্ববঙ্গে এ বিবাহের প্রচলন নেই কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহকে এ অঞ্চলের লোক অবজ্ঞা করলেও অহৈতুক বলেন না, অতএব এ রকম বিবাহ একেবারে মূলতই অহিন্দু, যেমন অহিন্দু সগোত্রবিবাহ, একথা ঠিক নয়। যাই হোক্ এটা হোলো ফ্যাক্ট নিয়ে কথা এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু এক জায়গায় তুমি প্রিন্সিপল্ অর্থাৎ শ্রেয়ঃ পথের দোহাই দিয়েচ, সেখানে চুপ করে থাকা অন্যায়। শ্রেয়ঃ কথাটা মস্ত বড়ো কথা, উপনিষদ্ বলেন, শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরাঃ। তুমি বলেচ সমাজবিধি শ্রেয়ের বিধি। পত্রাংশ উদ্ধৃত করি :— বিবাহ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা অনুরাগের জিনিষ নয়, সেজন্যে তাকে সংযত করতে সমাজ বিধিনিয়মাদি করেচেন; কাজেই সমাজানুমোদিত একটা প্রচলিত পথে চলাই শ্রেয়ঃ। আহার সম্বন্ধেও বোধ হয় সে কথা খাটে; বৈজ্ঞানিক বিধিসঙ্গত স্বাস্থ্যকরতা বা স্বাভাবিক রসনাতৃপ্তির অনুগত স্বাদুতাকে সমাজ আহার সম্বন্ধে শ্রেয়ের পন্থা বলে গণ্য করে না,— তার বিশেষবিধি প্রাচীনকালীন প্রথা সঙ্গত, সে প্রথার অনুকূল যুক্তি নির্দ্দেশও অনাবশ্যক। শুধু তাই নয় সেই অন্ন কে রেঁধেছে বা কে এনেছে তার নির্ম্মলতা বা শোভনতার দিক থেকে নয়— অবিচারিত প্রথার দিক থেকে তার শ্রেয়স্করতা বিচার করাই সমাজের মতে বিহিত। এক্ষেত্রে অনুসংস্কারের দোহাই দিলে চুপ করে থাকব কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে স্তব্ধ থাকা কঠিন। সহবাসসম্মতি আইন পাস হবার পূর্ব্বে বালিকাবধূ সম্বন্ধে দুরাচার হিন্দুসমাজ স্বীকার করেছিল উক্ত আইনকে হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলে তুমুল আন্দোলন উঠেছিল। সেই রকম বিবাহ হিন্দুসমাজসম্মত একথা মানতে পারি কিন্তু তাই বলেই শ্রেয়স্কর একথা মানতে পারিনে। সমুদ্রপারে যাওয়া একদা সমাজে অবৈধ ছিল এখনো অনেক পরিমাণে আছে। একথা বলতে দোষ ছিল না যে, সমুদ্রপারে যাত্রা করলে হিন্দুসমাজে বর্জ্জনীয়

হবার কারণ ঘটত, কিন্তু সেই জন্যই সেটা শ্রেয় নয় এমন কথা বলা অন্যায় হত। যক্ষ্মারোগে পিতার মৃত্যু হলে সমাজ পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করে; যুক্তি এই যে— পূর্ব্বজন্মে পিতা পাপ করেছিলেন— দুর্ভাগা পিতার এই অপমান হিন্দুসমাজসম্মত কিন্তু সেটা শ্রেয়স্কর এমন কথা স্বীকার করলেও প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। সুরেন মানুষ হিসাবে অধিকাংশ সৎকুলীনের চেয়ে নির্ম্মলস্বভাব বুদ্ধিমান সহৃদয় ও প্রতিভাসম্পন্ন তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাৎ বিনা কারণে নিজের ও সুরেনের ধর্ম্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে এটা হিন্দুসমাজসম্মত তা মানি কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানিনে। সামাজিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক অসতীত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে— নুটু সমাজনির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দেয়— এটা একটা তথ্য মাত্র কিন্তু এটাকে শ্রেয় বলব কি করে? সংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অসুবিধার দোহাই দাও তার কোনো উত্তর নেই কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অস্ত্র সমাজের হাতে, বিধাতৃবিহিত মানবধর্ম্মকে অন্যায় নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, অক্ষমতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর বিধান মেনে নিতে পারি কিন্তু সমাজ-কর্ত্তৃক অনুমোদিত মূঢ়তা ও অধর্ম্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা চিরদিন আছি সমাজের বাইরে কিন্তু তবু অত্যাচার দেখলে উদাসীন থাকতে পারিনে, পরসমাজের ব্যূহে অনধিকার প্রবেশ করে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারিনে।

যাই হোক আমার এ চিঠি অহৈতুক তর্ক মাত্র— এর পিছনে কোনো তাগিদ নেই।

তোমার শরীরের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। আশা করি দুঃসহ চিকিৎসা-দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আমার সামনে আশু একটি দুর্ভোগ আছে, সে

হচ্চে আমার জন্মোৎসব।[৫] জন্মান্তরের দুষ্কৃতিজনিত এই জন্মের প্রখর রৌদ্রতাপ আমাকে অতিক্রম করে আমার বন্ধুবান্ধবদেরও তাপিত করবে এটা আমি অপরাধের বিষয় বলে মনে করচি— নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু স্নিগ্ধ জনেরা তাপকে তাপ বলে গণ্য করবেন না। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩৩৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এই মাত্র পত্রসহ মোরব্বার রসিদ পাওয়া গেল। দানের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতি হওয়াই মানবধর্ম্ম। দাক্ষিণ্য যাদের স্বাভাবিক তাদেরই স্মৃতিচ্যুতি ঘটে না।

আজ অপরাহ্নে কলকাতায় যাচ্চি। ইতিমধ্যে তোমার আমলক যদি করতলন্যস্ত হয় তাহোলে সমভিব্যাহারেই যাবে— নইলে ফিরে এসে আশীর্ব্বাদসহ ভোগ শুরু করব।

সেই বইটার ব্যবহার শেষ হোলে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো, অনেক পাঠেচ্ছু আছে। অমিয়চন্দ্র[১] বোধ করি অধ্যাপক উইন্টরনিট্‌স্‌কে শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ শ্লোকটির উল্লেখ করে আমাদের শাস্ত্রে শ্রেয়োনীতির সমর্থন জানিয়েছেন। অধ্যাপক তদুত্তরে প্রাচীন টীকাভাষ্যসহ বুঝিয়েছেন

এখানে শ্রেয়ঃ শব্দ বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক পন্থা হিসাবেই ব্যবহৃত। যে চারিত্রনীতি একান্ত মানবসমাজের হিতার্থে সেটা ওর লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ এসমস্ত উপদেশ ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনের পক্ষেই মুখ্যভাবে খাটে, লোকহিতের পক্ষে নয়। এর থেকে বোঝা যায় লোকহিতকেই চরম করে তার সাধনা আমাদের দেশে ছিল না, এইজন্যে সাধকেরা লোকহিতের প্রতি ঔদাসীন্য করে সমাজের অনেক অনিষ্টকে উপেক্ষা করেছেন। এমন কি, প্রত্যেক জনসম্প্রদায় আপন আপন আচারকে আপন সংস্কারের মধ্যে বদ্ধ করে সার্ব্বজনিক মানবশ্রেয়কে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত করতে পেরেছে এই কারণেই। আমাদের মুক্তি আত্মসন্তোগেরই বিরাট আদর্শ, জনসেবা তার নেপথ্যে পড়ে গেছে। একথা যদি যথার্থ হয় তবে সত্যের অনুরোধে তা স্বীকার করাই উচিত হবে। মিথ্যা আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয় এবং লজ্জাকর।

আশা করি তোমরা সপরিজনে ভালো আছ। রথী বৌমা শরীর শোধনের জন্যে গিয়েছেন গিরিডিতে। সেখানকার জলে অগ্নিবর্দ্ধন করে এমন একটা স্বতোবিরোধী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

এবারকার জলপ্লাবন তোমাদের আক্রমণ করে নি তো? আমার তিরোভাব ঘটবার পূর্ব্বেই একদা এখানে তোমাদের আবির্ভাব হবে এই প্রত্যাশায় রইলুম। ইতি ভাদ্র ২০, ১৩৪৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

২১ আশ্বিন ১৩৪৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার লেখাটি সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছি।[১] ভালো হয়েছে সন্দেহ মাত্র নেই। কোনো ধর্ম্মকেই শাস্ত্র বচনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। তার আত্মিক প্রাণ তার বাক্যদেহকে অতিক্রম করে আপন কাজ করে। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা অনেকদিন প্রবর্ত্তিত ছিল তার মূল প্রেরণা মহাপুরুষদের জীবনের গভীরে ছিল। যদি দেখা যায় আমাদের দেশের জলবায়ুতে তার উদ্যম মিইয়ে আসে সেটা প্রকৃতির ত্রুটি। পশ্চিম দেশে খৃষ্টধর্ম্মের উপদিষ্ট meekness ঐ প্রাকৃতিক কারণে ব্যবহারে পরিণত হোতে পদে পদে বাধা পায়, মূল ধর্ম্মের বাণী সত্ত্বেও। বিষয়টা জটিল— আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন বিচার করবার সময় বিচারকের নিজের সংস্কার তার মধ্যে গ্রন্থি পাকাতে থাকে।

দুই তিন দিনেই যাব কলকাতায়— যাত্রার দলের অধিকারী হয়ে।[২] তদুপলক্ষে রাণুর সঙ্গে দেখা হবে আশা করছি।

কয়দিন ধরে নিরন্তর দুর্য্যোগ চলেছিল। আজ প্রাতে দেবতার প্রসন্নমূর্ত্তি দেখা দিয়েছে। তোমাদের ওখানে আকাশের মেজাজ বোধ করি এমন ভ্রূকুটিকুটিল নয়।

সকলে মিলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ৭।১০।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১০ ফাল্গুন ১৩৪৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

তোমার কাছে আমার একটি সানুনয় নিবেদন আছে, ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে। আমাদের বিদ্যাভবনের গবেষণা বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার তোমাকে নিতেই হবে, দ্বিধা করতে পারবে না।[1] প্রস্তাবটা আবেদনের চেয়ে আদেশের মতো শোনাচ্চে— সেটার কারণ আগ্রহ। জুলাই মাস থেকে এই পদ গ্রহণ করা চাই। আগন্তুক ছাত্রদের জুলাই পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছি। কোনোমতে কাজ যদি আরম্ভ করতে না পারি তাহলে যাঁদের পরে আমাদের ভরসা তাঁরা সন্দিহান হবেন তাতে আমাদের ক্ষতি হবে।

গবেষণা বিভাগের দুটি চারটি ছাত্রদেরকে পথনির্দেশ ও পরিচালনা করা শ্রমসাধ্য কাজ নয়। তা ছাড়া যদি কখনো বিদ্যার্থী কেউ কেউ তোমার সহায়তা প্রার্থনা করে তুমি স্বভাবতই তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। বানপ্রস্থ আশ্রমের উপযোগী যেটুকু কাজ কর্তব্য বলেই গণ্য হয়েছে তার বেশি তোমাকে কিছু করতে হবে না। চিরদিন তোমরা কর্মসাধনা করে এসেছ একান্ত নৈষ্কর্ম্য তোমার পক্ষে যথার্থ বিশ্রাম হতে পারে না— আশী বছরের কাছে পৌঁছিয়েও তার প্রমাণ পাচ্চি। কিন্তু কর্মভারের যথোচিত লাঘব হবে।

এ কাজে যে বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে অর্থাৎ মাসিক একশত টাকা— সে তোমার পক্ষে যৎসামান্য। কিন্তু অর্থের পরিমাণ সম্মানের মাপকাঠি নয়।

গরীবের ঘরে অর্থের দৈন্য থাকতে পারে কিন্তু শ্রদ্ধার অভাব নেই একথা তোমাকে বলা বাহুল্য।

প্রতিকূলে মাথা নেড়ো না। ইতি ২২।২।৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ তুমি বোধ হয় জানো সম্পূর্ণ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষতা ক্ষিতিমোহন বাবুর হাতে— তাঁর সঙ্গে তোমাকে সহযোগিতা করতে হবে। তিনি তোমার সাহচর্য পেলে আনন্দিত হবেন।

সরযূবালা অধিকারী
ও
লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমাদের পালা সাঙ্গ হল। রাণু যাচ্চে এণ্ড্রুস সাহেবের সঙ্গে। মাঝে ওর ডেঙ্গু জ্বর হয়েছিল কিন্তু আমার বিশ্বাস আমারই ওষুধের গুণে তাড়াতাড়ি সেরে উঠ্‌ল। প্রথম দিনে অভিনয়ে যোগ দিতে পারেনি, বাকি তিনদিন গিয়েছিল।[১] ওর অভিনয়ের খুবই সুখ্যাতি হয়েছে, ওকে সাজেসজ্জায় খুব ভালই দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস এ রকম অভিনয় ওর পক্ষে একটা বড় শিক্ষা। এবার দীর্ঘকাল আমি কলকাতায় আবদ্ধ ছিলুম। কাল নিষ্কৃতি পেয়েচি, এখানে এসে আরাম পাওয়া গেল।[২] কিন্তু অনেকদিন রাণু আমাদের খুব কাছে কাছে ছিল, সে চলে যাচ্চে বলে আমাদের ফাঁকা ঠেকচে। শুধু আমার নয়, আমাদের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে গগন প্রভৃতি সবাই ওর অভাব অনুভব করবে; ওর হাসিতে গল্পে ও সমস্ত পাড়া জমিয়ে রেখেছিল। যা হোক্, এখন ওকে ওর কর্ত্তব্যের মধ্যে নিমগ্ন হতে হবে, আমারও কর্ত্তব্যের পালা আবার সুরু হল। আমাকে চীন দেশে যেতে হবে, তার জন্যে লেকচার তৈরি করা চাই, দুই একদিনের মধ্যেই স্থির হয়ে বসে লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হব।

আশাদিদির শরীর মাঝে খারাপ হয়েছিল, এখন ভালো আছে ত? আশাদিদি সমস্ত আশ্রমবালক বালিকার আশাদিদি হয়ে উঠেচে, তারা এখনো তাকে ভুল্‌তে পারে নি। তোমরা সকলে এখন আশা করি ভালো আছ। আমি একান্ত মনে তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। এবার ক্রিষ্টমাসের ছুটির সময় যদি এ দিকে আস তা হলে তোমাদের সঙ্গে চীনযাত্রার পূর্ব্বে দেখা হবে। পূজোর ছুটির সময় কাঠিওয়াড়ে যাব, সেখানে দু তিন মাস কাটবে,

যদি ফেরবার সময় পশ্চিমের রেলপথে ফিরি তাহলে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব। ইতি ১৭ই ভাদ্র ১৩৩০

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৩ [?১৫] মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমি কেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে রাণুর বাবাকে একটা টেলিগ্রামের তাড়নায় উত্তেজিত করে তুলেছিলুম তার বিবরণটা বোধ হয় রাণুর কাছ থেকে শুনেচ।[১] কাশীতে এত রকম বেরকমের মারীর দল তীর্থযাত্রা করে যে অকস্মাৎ একটা আশঙ্কা আমার মনকে আক্রমণ করেছিল। যা হোক্ সে সব চুকে গেছে।

কিন্তু শুধু ত মারী নয়, আরো অনেক ভাববার কথা আছে। আমি চীনে রওনা হবার পূর্ব্বে কিছু একটা মীমাংসার মত হয়ে গেলে কতকটা মাথা ঠাণ্ডা করে কয়েক মাসের মত দৌড় দিতে পারি। সুসঙ্গের সুহৃদের[২] কথা ইতিপূর্ব্বেই তোমাকে বলেচি। বেশ বুঝতে পারচি তার মনটা রাণুর জন্যে ব্যাকুল হয়েচে কিন্তু ওর মধ্যে খুব একটা ভদ্রোচিত সংযম আছে বলে ধৈর্য্য ধরে আছে। কেবল আমাকে দৈবাৎ দুয়েকটা বেফাঁস কথায় ধরা দিয়ে ফেলে। তার চিঠি তোমাকে পাঠাই। ছেলেটি সকলদিকে ভালো তার সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভালোকেই যে সব সময়ে ভালো লাগে এমন

কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। পৃথিবীতে সত্যকার ভালোবাসা দুর্লভ সে কথাও ভেবে দেখা চাই। ও রাণুকে ভালোবাস্‌বে সুতরাং ওকে ভুল বুঝবেনা— ওর মধ্যে যে দুর্দ্দামতা আছে তার সম্বন্ধেও অসহিষ্ণু হবে না। তা ছাড়া সুহৃদ আমাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে সুতরাং আমার সম্বন্ধে রাণুকে বোধ করি বেদনা দেবে না। মুষ্কিল এই যে রাণুর জীবনের মাঝখানে কেমন করে আমি একটা কেন্দ্র দখল করে বসে আছি, সুতরাং ওর যেখানেই গতি হোক্ আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলবে না। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেচে। সেই জটা যদি ছাড়ানো সম্ভব হত তাহলে সবই সোজা হ'ত। কিন্তু বেদনা পেতে ও যেরকম অসাধারণ রকম পটু তাতে ওকে কাঁদাতে আমার মন সরে না। ওকে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা দেবার পথ আমার হাতে নেই— তবে কি না আমার অন্দরের স্নেহ পাবার পক্ষে ওর কোনো ব্যাঘাত না হয় এই সম্ভাবনার কথাই আমি আশা করতে পারি। রাণুর জন্যে আমার মনে খুব একটা উৎকণ্ঠা আছে— সেইজন্যে একটি যথার্থ ভদ্রলোকের হাতে ওকে দিতে পারলে আমি সুখী হই। তোমাকে আমি সুহৃদের চিঠি এইজন্যে পাঠাচ্চি যে তুমি রাণুর সুখদুঃখের কথা ঠিকমত বিবেচনা করে দেখ্‌তে পারবে। আজ শনিবার।* আগামী শুক্রবারে জাহাজ ছাড়বে অতএব মঙ্গলবারে কলকাতায় পৌঁছতে হবে। যদি উত্তর দাও কলকাতার ঠিকানায় দিয়ো। ইতি ৩০ ফাল্গুন [?২ চৈত্র] ১৩৩০

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩ মার্চ ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

চিঠি পেয়ে বজ্রাহত হলুম। কিন্তু ভয় পেয়ো না। আমার যা সাধ্য তা করব। Lady Mukherjiকে আজই চিঠি লিখে দিলুম।[১] Sir Mukherjiকে[২] নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি। খুব সম্ভব দুজনেই এখানে আসবেন। রাণুকে বোলো বেশি উদ্বিগ্ন না হয়। সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে।
[১৯ ফাল্গুন ১৩৩১]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

মাননীয়াসু

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

কোনো এক গুপ্তনামা নিন্দুক রাণুর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া আপনাকে যে পত্র দিয়াছে রাণুর মা আজ তাহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।[১]

বিদেশ হইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াই সংবাদ পাইলাম আপনাদের ঘরে রাণুর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে।[২] শুনিয়া বড় আহ্লাদে রাণুকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া পত্র পাঠাইলাম শ্রীমান বীরেনকেও লিখিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় রাণুর মার চিঠি পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।

রাণুকে তাহার শিশুকাল হইতে জানি এবং একান্তমনে স্নেহ করি। ইহা জানি তাহার চরিত্র কলুষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার বয়সে বাঙালীর ঘরের মেয়েরা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজে লাভ করে তাহার তাহা একেবারেই ছিল না। সে এমনি শিশুর মত কাঁচা যে তাহার কথাবার্ত্তা ও আচরণ অনেক সময় হাস্যকর হইত। এইরূপ অদ্ভুত অনভিজ্ঞতাবশত লোক ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার কোনো ধারণা ছিল না। এই কারণে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। আমি তাহার জন্য এমন সৎপাত্র কামনা করিতেছিলাম যে তাহার একান্ত সরলতার যথার্থ মূল্য বুঝিবে এবং লৌকিকতার ত্রুটি ক্ষমা করিবে।

এমন সময়ে প্রফুল্লনাথের পুত্র পূর্ণেন্দু আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দৈবক্রমে রাণুকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। সগোত্রে বিবাহে তাহার পিতার সম্মতি হইবেনা আশঙ্কা করিয়া প্রথমে বাধা দিই। তখন প্রফুল্লনাথ কলিকাতায় ছিলেন না। পূর্ণেন্দু ও তাহার একজন গুরুস্থানীয় আত্মীয় আমাকে বারবার আশ্বাস দিলেন যে আপত্তি গুরুতর হইবে না এবং বিবাহ নিশ্চয়ই ঘটিবে।

পূর্ণেন্দু ছেলেটি ভাল, তাহার হাতে রাণু কষ্ট পাইবেনা নিশ্চয় ভাবিয়া আমি তাহাদের পরিচয়ে বাধা দিই নাই। কিন্তু পরিচয় বলিতে একবারমাত্র শান্তিনিকেতনে দেখা হইয়াছিল। রাণু তখন আমার কন্যা মীরা ও বউমার কাছে ছিল। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হওয়া তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আপনি আমার কন্যা বেলাকে জানিতেন। তাহার ছোটভাই শমী* বাঁচিয়া নাই। আমি অনেকবার ভাবিয়াছি যে, সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে রাণুর সঙ্গে নিশ্চয় তাহার বিবাহ দিতাম। তাহার কারণ রাণুর

মধ্যে অসামান্যতা আছে। বুদ্ধিতে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণতা— কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা তাহার মনের নিষ্কলুষ সরলতা। ঠিক এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নাই। এ কথা আমি আপনাকে জোর করিয়া বলিতে পারি রাণুর চরিত্রে কলঙ্কের রেখা মাত্র পড়ে নাই— যদি তাহার কোনো দোষ থাকে ত সে কেবল সমাজ ব্যবহারের— তাহা পাপ নহে তাহা অজ্ঞতা। এমন পাত্রী সহজে পাওয়া যাইবেনা ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

আমাদের দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারীদের বিবাহকালে গুপ্ত নিন্দাপ্রচার ইহার পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি, সুতরাং এই ঘটনায় বিস্মিত হই নাই। কিন্তু এমনতর মর্ম্মান্তিক অন্যায় নিষ্ঠুরতায় যাহাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহাদের মনের কুটিল গতি আজও বুঝিতে পারি না। যদি রাণুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আপনারা গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাহার ও তাহার পরিবারদের কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে।

আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ নতুবা নিশ্চয়ই আপনাদের সহিত দেখা করিয়া সকল কথার আলোচনা করিতাম। আমার নড়াচড়া বন্ধ। সার রাজেন্দ্রনাথ ও আপনি যদি শান্তিনিকেতন দেখার উপলক্ষ্যে একবার এখানে আসিতে পারেন তবে সর্ব্বতোভাবে খুসি হইব। বৌমাকে আপনি ত ঘরের মেয়ের মতই জানেন— আশা করি তাঁহার আতিথ্যে আপনার কোনো কষ্ট হইবে না।[৪] দুর্ব্বল শরীরে ভাল করিয়া লিখিতে পারিলাম না। ৩ মার্চ্চ ১৯২৫

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
২১ এপ্রিল ১৯২৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমার কেয়ারে রাণুর একটা চিঠি এসেছে।[১] আমার মনে হচ্চে বেনামী চিঠিতে তাকে কেউ ভয় দেখিয়ে লিখেচে। আমার চিঠির মধ্যে পাঠিয়ে দিলুম। বোধ হয় রাণুকে দেখাবার প্রয়োজন হবে না। যদি বুড়ো লিখে থাকে তাহলে যথাকর্ত্তব্য কোরো। ইতিমধ্যে বোধ করি রাজেন্দ্র মুখুজ্জেদের ওখানেও চিঠি যাচ্চে— জানি নে। আমাকে লিখ্‌লেও আমার হাতে পৌঁছবার পথ রাখি নি। বিবাহের পূর্ব্বে রাণুকে কোথায় রাখ্‌লে আন্দোলনের সৃষ্টি হবে না সেটা ভালো করে বিবেচনা করে দেখো। ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মে ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমি এখানে গোলমাল থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে এসে একটু ভালো বোধ করচি। এখনো চলতে ফিরতে হাঁপিয়ে উঠি— চৌকিতেই সমস্ত দিন আবদ্ধ হয়ে আছি।

একজিমা প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে ইন্‌জেক্‌শন একমাত্র চিকিৎসা। অতএব এ জন্যে রাণুর বাবার কলকাতায় কিম্বা এলাহাবাদে যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসক আছেন এমন জায়গায় যাওয়া উচিত।[১] আমার আশঙ্কা এই যে, কলকাতায় ওঁকে পেলে ওঁর উপর উৎপাত করবার চেষ্টা চল্‌বে। যদি বাধ্য হয়ে আসতে হয় তাহলে প্রশান্তর বাড়িতে থাকলে কতকটা নিরাপদে থাকতে পারবেন। গরমের সময় কার্সিয়াং কিম্বা দার্জ্জিলিঙে প্রায় সব বড় বড় চিকিৎসক গিয়ে থাকেন অতএব সেখানেও খুব সম্ভব সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সহজ হবে।

ডাক্তার আমাকে শিলং পাহাড়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু এখানে আমার নতুন বাড়িতে একরকম গুছিয়ে বসেছি কোথাও নড়তে ইচ্ছে করচেনা। য়ুরোপ যাত্রার পূর্ব্বে বৃথা নড়াচড়ার হাঙ্গাম করে আরো ক্লান্তি বাড়িয়ে তুলে কোনো ফল নেই। এখানে এখনো কিছুমাত্র গরম পড়ে নি বল্‌লেই হয়। এমন কি, রাত্রে গায়ে কাপড় দিতে হয়। প্রায় মাঝে মাঝে মেঘ করচে। আজ সকালে বৃষ্টি হয়ে গেচে— এখনো সূর্য্য দেখা দেয় নি— ঠাণ্ডা বাতাস বইচে। আমি সমস্ত দিনই প্রায় বাইরে খোলা হাওয়াতে থাকি। লেখাপড়া বেশি কিছু করিনে— আমার মনটা যেন এই আকাশ দিয়েই ভরে আছি।

শরীরের উপর বিরক্ত হয়ে আরেকবার সকাল সকাল য়ুরোপ বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু সেই ইচ্ছা চুকিয়ে দেওয়া গেল। রাণুর বিয়েটা হয়ে যাক্‌, তার পরে জুলাই কিম্বা অগষ্ট যখন হোক্‌ যাত্রা করা যাবে। তখন ভারতসমুদ্র বর্ষার হাওয়ায় বড় অশান্ত হয়। আশা করি আমাকে তা'তে বেশি দুঃখ দেবেনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশা অধিকারীকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

১৫ আশ্বিন ১৩৩৭

ওঁ

বার্লিন

কল্যাণীয়াসু

আশা, রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেচি এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েচে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধ কুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এককালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েচে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সাম্‌নে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত— সর্ব্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিষ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্ম্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করচে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি একদিকে মূঢ় আর এক দিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্চে প্রথা— পিতামহের আমলের চাকরের মতো, সে কাজ করে কম অথচ কর্ত্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চল্‌তে হলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চল্‌চে।

আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল অস্ত্রটা হোলো মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বল দান করেচে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই— তিনি লজ্জিত— যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ার কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েচে, দেখ্‌তে দেখতে [য] সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যা ভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েচে। একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্চে বলরাম।— ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে শতকরা ৯৯ জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্ব্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্ব্বাক। আজ দেখ্‌তে দেখতে [য] এদের ক্ষেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেচে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব— আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ হয়ে না ওঠে। এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্চে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেচি শিক্ষাকে জীবযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয় পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না। এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেচে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না— সর্ব্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার

ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকেনা। কতবার চেষ্টা করেচি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জান্‌তে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনো দিন জানতে চাইতে শেখে নি,— প্রথম থেকেই কেবলি বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে' ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে। আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজির ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করো কি? সে বল্‌লে, জানি নে।— এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বল্‌লুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কিনা আমাকে বলো। সে বল্‌লে আমি জানি নে। অর্থাৎ এ ছাত্র কোনো বিষয়ে স্বয়ং কিছু ইচ্ছা করবার চর্চ্চাই করে না— তাকে চালনা করা হয় সে চলে, আপন থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না। এ রকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু এর চেয়ে আরো একটুখানি শক্তরকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সে জন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলি অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কি বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এ রকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চল্‌চে, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে কাজের। সেইটে সেদিন দেখে

এসেচি। পায়োনির্স্ কম্যুন বলে' এ দেশে যে সব আশ্রম স্থাপিত হয়েচে তারি একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যে রকম ব্রতী বালক ব্রতী বালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্স্ দল কতকটা সেই ধরণের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দু'ধারে বালক বালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আস্তেই ওরা আমার চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে এসে বস্‌ল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেচে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবী করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচবৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াষা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সাম্‌নে একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয় যেন সর্ব্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তারই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে বল্‌লে, পরশ্রমজীবীরা (bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্য্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।

একটি মেয়ে বল্‌লে, "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য্য।"

আর একটি ছেলে বল্‌লে, "আমরা ভুল করতে পারি কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোট ছেলেমেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয় এবং তারা যেতে

পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চ্চা করে থাকি।"

এর থেকে বুঝতে পারবে এদের শিক্ষা কেবল পুঁথি পড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে' এরা তৈরি করে তুলচে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণরক্ষায় এদের গৌরব বোধ। আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেচি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবী করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারি একটি সম্পূর্ণরূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার— সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চ্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়— সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম। একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলা দেশে যেমন কদাচার এমন কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেচি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তাহলে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হোত। তিন নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনোমতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ্য না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি কিন্তু যে-জিনিষটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত

দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর— সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, "কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কি?"

একটি মেয়ে বল্‌লে, "আমাদের কোনো শাসন নেই কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি বল্‌লুম, "আর একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাকো? নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্ব্বাচন করো? শাস্তি দেবার বিধিই বা কি রকমের?"

একটি মেয়ে বল্‌লে— "বিচার সভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে বল্‌লে, "সেও দুঃখিত হয় আমরাও দুঃখিত হই, বাস্ চুকে যায়।"

আমি বল্‌লুম, "মনে করো কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্চে তা হলে তোমাদের উপরেও আর কারো কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে?"

ছেলেটি বল্‌লে, "তখন আমরা ভোট নিই— অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তাহলে তার উপরে আর কথা চলেনা।"

আমি বল্‌লুম, "কথা না চল্‌তে পারে কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশেই তার উপরে অন্যায় করচে তাহলে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি?"

একটি মেয়ে উঠে বল্‌লে, "তাহলে হয় তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই কিন্তু এ রকম ঘটনা কখনো ঘটে নি।"

আমি বল্‌লুম, "যে একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই

আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

ওদের কর্ত্তব্য কি প্রশ্ন করাতে বল্‌লে, "অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায় সম্মান চায় আমরা তার কিছুই চাইনে আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই, কি করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কি করে বুদ্ধিপূর্ব্বক করতে হয় এই সব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি। নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থান কথা বলি।"

তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বল্‌লে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্ত্তব্য। কেননা ঠিকমতো করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।"

একটি ছেলে বল্‌লে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তার পরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলো সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্চে এদের পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ব্যাপারটা হচ্চে এরা কঠিন পণ করেচে পাঁচবছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে এরা যন্ত্র-শক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বল্‌তে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না, এসিয়ার অনেকদূর পর্য্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে— সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য এসিয়ার অসিতচর্ম্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে বলে ভয় নেই ভাবনা নেই। এই কাজের জন্যে এদের প্রভূত টাকার দরকার— য়ুরোপীয় বড়োবাজারে এদের হুণ্ডি

চলে না— নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিন্‌চে, উৎপন্ন শস্য, পশু মাংস, ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্চে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েচে। এখনো দেড় বছর বাকী। অন্যদেশের মহাজনরা খুসি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা কলকারখানা অনেক নষ্টও করেচে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনী জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেছে, এখনো দু বছর বাকী।

সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মতো— নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী করে ক্রমে ক্রমে কি পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করচে। দেখাবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। কেননা যারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহুকষ্টে কাল কাটাচ্চে তাদের বোঝানো চাই অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ করে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে কষ্টকে বরণ করে নেয়। এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে, কোনো একদল লোক নয়, দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্যায় প্রবৃত্ত। এই সজীব সংবাদপত্র অন্য দেশের বিবরণও এইরকম করে প্রচার করে। মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম— প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করচি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে সুরুলে সজীব সংবাদপত্র চালাবার চেষ্টা করব।

(এই চিঠিগুলি যেন শান্তিনিকেতনের লোকে পড়তে পায়। তা ছাড়া প্রবাসীতে বের করারও প্রয়োজন আছে। প্রশান্ত' যদি ইচ্ছা করে এই চিঠিগুলি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করে বিশ্বভারতীতে' চালাতে পারে।)°

ওদের দৈনিক কার্য্যপদ্ধতি হচ্ছে এই রকম— সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পরে পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। ৮টার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্যে আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃত বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ণ, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্য্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়র্‌রা (পুরোযায়ী দল) কারখানা, হাঁসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়। পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে, মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখ্‌তে সিনেমা দেখ্‌তে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্ক সভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পাওনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চারদিক পরিষ্কার করে, ক্লাসপাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্ত্তি হবার বয়স ৭।৮, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়স ষোলো। এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্প দিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়— আর পড়ার সঙ্গে রূপ সৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে এরা বুঝি কেবলি কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েচে, গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলে তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয় কলায় এদের মতো ওস্তাদ

জগতে অল্পই আছে, পূর্ব্বতন কালে আমির ওম্‌রাওরাই সে সমস্ত ভোগ করে এসেচে— তখনকার দিনে যাদের পায়ে ছিল না জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধপেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুৎপাণ্ডাকে দিয়েচে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধূলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেচে তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না। আমি যেদিন অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টল্‌স্টয়ের রিসারেক্‌শন্‌। জিনিষটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। এংলো স্যাক্‌সন্‌ চাষী মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিষ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্তভাবে উপভোগ করচে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও। আর একটা উদাহরণ দিই। মস্কো সহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভীড়। অল্প কয় দিনে পাঁচহাজার লোক ছবি দেখেচে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না। রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক্‌ এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে একদা আমাদের ইঁদারা থেকে [জল তোলার জন্যে] একটা বায়ুচলচক্র যন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কূয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল কিন্তু যখন দেখ্‌লুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুল্‌তে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্কার জেগেছিল। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুৎ আলোর কারখানা, ক জন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে? অথচ এরা তো ভদ্র শ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে সেখানে কৌতূহল দুর্ব্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলোদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি— দেখে বিস্মিত হতে হয়— সেগুলো রীতিমতো ছবি— কারো নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্ম্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়ের প্রতি লক্ষ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়েচি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েচে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই— আমার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় তিরিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি— আরো দু চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে— বিশেষ এগোবে না তাও জানি— তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

আশা আর্যনায়কম্

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আশা, তোমরা দুজনে যদি আর একবার এখানে আসতে পারো তাহোলে খুব খুসি হব। যখন তোমরা এখান থেকে চলে গিয়েছিলে তখন আমি মনে স্থির করেছিলুম আর একদিন তোমাদের এখানেই ফিরে আসতে

হবে।[1] সেই দিনটি আজ যদি আসন্ন হয়ে থাকে তাহোলে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করব। রথী তোমাকে শ্রীনিকেতনের কর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছে। ওখানকার শিক্ষাকেন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলবার কর্ত্তৃত্ব অনেকটা হাতে পাবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৩ মে ১৯৩৮

শ্রীআশা দেবী
ওয়ার্দ্ধা

[মংপু]

কল্যাণীয়াসু,

ঠিক আমার কাছে কী চাচ্চ বুঝতে পারলুম না— কী বিষয়, কী ভাষা, কোন্ উদ্দেশ্য, কাদের লক্ষ্য করে।[1]

লিখ্‌তে এখন কষ্ট পাই, একটুতেই শরীরকে মনকে ক্লান্ত করে। সবচেয়ে অসুবিধে হয়েচে চোখ নিয়ে। দৃষ্টি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে— সেই জন্যে নিতান্ত জরুরি না থাকলে লিখ্‌তে মন যায় না। ভাষার ধারাও এখন বাধাগ্রস্ত। যদি পূর্ব লিখিত কোনো একটা রচনা থেকে তোমাদের কাজ চলা সম্ভব হয় তা হলেই ভালো। পুরোনো ঝুলি সন্ধান করা এখান থেকে অসাধ্য। এমন একদিন ছিল যখন কারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখি নি— এখন আলো কমে এসেছে, এখন দ্বারী [? দ্বারে] প্রার্থী এলে নিঃশেষিত

সম্বল হাৎড়ে বেড়াতে হয় তাতে ফল পাই কম, কষ্ট পাই যথেষ্ট এবং লজ্জাও বোধ হয়। মনে রেখো তোমরা অসময়ে এসেছ সেজন্যে আমি দোষী নই— এখন আমার ভাগ্য হয়েছে কৃপণ।

কিছু দিনের জন্যে গিরিরাজের আশ্রয় নিয়েছি।[২] ছুটিটা এইখানেই কাটাব। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তোমাদের আভাস পাই— মনে হচ্ছে কাজ ভালোই চল্‌চে। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

শ্রীআশা দেবী
ওয়ার্ধা

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আশা, তোমাদের সংসারের আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ এইমাত্র পেলুম।[১] এমন কোনো ভাষা নেই যা বাইরে থেকে এই দুঃখের সান্ত্বনা দিতে পারে। জানি তোমার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাই হবে তোমার ধৈর্যের অবলম্বন। যে যায় সে তো সুখদুঃখের অতীত লোকে চলে যায়, যারা থাকে সে তাদের কিছু দিয়ে যায়। সে হচ্ছে বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে মহৎ দুঃখের অভিজ্ঞতা। তাতে করে আসক্তির বন্ধনকে শিথিল করে দেয়। সংসারে এই শিক্ষাকে আমরা কঠিন দুঃখ দিয়ে

কিনি— দুঃখের সেই দান তোমার জীবনে সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ করি— আমাদের আর তো কিছুই বলবার নেই।

ইতি ৭।১২।৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভক্তি অধিকারীকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

১৯ ভাদ্র ১৩৩৭

ওঁ

বর্লিন

কল্যাণীয়াসু

ভক্তি, তুমি শান্তিনিকেতনে আমার কাজে এসে বসেচ শুনে কতো খুসি হয়েচি বল্‌তে পারি নে।[1] কত করবার আছে অথচ লোক কত কম, হৃদয় কত অসাড়। য়ুরোপে দেখ্‌তে পাই ডাক পড়লেই দলে দলে মানুষ এসে পৌঁছয়— কোনো কর্ম্মেই কোনো দিন কর্ম্মীর অভাব হয় না। আমাদের দেশে দূরে থেকে হাততালি দেয় অনেকে, কিন্তু হাতে হাত মেলাতে কেউ আসে না। এই জন্যেই কর্ম্মের ভার গুরুতর হয়ে ওঠে, মেরুদণ্ড ভেঙে পড়তে চায়। এই সময়ে তোমাদের মধ্যে থাকতে পারলে খুব খুসি হতুম কিন্তু আমার তো ছুটি নেই। ওখানকার কাজেই সমুদ্রের এক পার থেকে আর এক পারে আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। এবারে মনে সঙ্কল্প করে এসেচি মেয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে কিছু সম্বল করে নিয়ে যাব। ভারতবর্ষে যে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থা আছে তার পঙ্গুতা আমরা সবাই জানি। কিন্তু উপায় নেই। পেটের দায়ে ছেলেরা এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য— কিন্তু জীবিকার জন্যে শিক্ষা মেয়েদের তেমন অপরিহার্য্য হয় নি এইজন্যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিদ্যাদানের উৎকৃষ্ট প্রণালী মেয়েদের জন্যেই প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর; যদি করে তুলতে

পারি তবে এবারকার মতো এইটেই আমার শেষ সার্থকতা হবে। ভাব গতিক দেখে আশা হচ্ছে হয় তো ব্যর্থ হতে হবে না।

ভানুসিংহের পত্রাবলী[১] সেদিন আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। পড়তে পড়তে শান্তিনিকেতন আমার চারিদিকে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠ্‌ল। ভুলে গেলুম যে আছি পশ্চিম সমুদ্রের পারে। আমার কোনো লেখাতেই শান্তিনিকেতনের রূপ এমন রসপূর্ণ হয়ে জাগেনি। নিজের কীর্ত্তি নিয়ে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তবু সত্যের খাতিরে বল্‌তেই হচ্ছে এই চিঠিগুলির পরিধি দুই ডাকঘরের দুই কিনারার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়— আর, কালের যে সীমানা আমার আকস্মিক সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই কিছু দিনের জন্যে আবদ্ধ ছিল পত্রাবলী তাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। রাণুকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম বঙ্গবাণীর নিত্য ঠিকানায় সেগুলি পৌঁচেছে।

আশাদিদিকে আমার আশীর্ব্বাদ। হয় তো পৌঁছব পিঠেপার্ব্বণের মাসে, সেদিনের জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। ইতি ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৬ আশ্বিন ১৩৩৭

ওঁ

Williamstown
Massachusetts

কল্যাণীয়া

ভক্তি, তুমি এসেচ আমাদের আশ্রমে, ভারি খুসি হয়েচি। এই সময়ে আমি আছি বহুদূরে, একটুও ভালো লাগচে না। বর্ষার সমারোহ বনে বনে আকাশে আকাশে জমেছিল, কদম্ববন নতুন করে প্রফুল্ল হোলো। কিন্তু আমি নতুন গানের ডালি নিয়ে দাঁড়ালুম না। শারদোৎসবের সময় হয়েছে— শিউলিতলায় সৌন্দর্য্যের সদাব্রত, আকাশে শুভ্রমেঘের আলস্যমন্থরতা, বাতাসে হিমের আভাস, তালবনের শিখরে শিখরে আলোকের পরশপাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে। আমি শারদার কাছে সঙ্গীতের বায়না নিয়ে বসে আছি অথচ আসরে পৌঁছতে পারলুম না। আমার এক বছরের পার্ব্বণী সব বাদ পড়ে গেল। যদি হত পরের চাকরী, তাহলে চাকরী আটলান্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতেম, কিন্তু নিজের কাজে ছুটি মেলেনা— কড়া মনিব ভিতরে বসে আছে, তার চোখ এড়াব সাধ্য কি। তবুও দিনের পরে দিন যায়— এগিয়ে আসে খালাসের দিন— অবশেষে একদা রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে পৌঁছব শালবনের ছায়া-বীথিকায়। হতভাগা ভিক্ষুকের পথ ক্রমেই যেরকম লম্বা হয়ে চলেচে তাতে বোধ হচ্চে মাঘ মাসের আগে দেশে পৌঁছতে পারব না।[১] অর্থাৎ এখনো প্রায় আড়াই মাস আছে। প্রবাসের পঞ্জিকায় আড়াই মাসের ছন্দটা মন্দাক্রান্তা, হতাশ বিরহীর ছন্দ। এখন শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন, তোমরা কোথায় আছ কে জানে। জনশ্রুতি, তোমার বাবা চলেচেন চীনের মুলুকে। টিঁকতে পারবেন কী করে বুঝতে পারচিনে। এই

কি চীনদেশে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব আলোচনার সময়? আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে সেখানকার নামগুলোর অনুস্বার ছাড়া আর কিছু মিলবে না, যথা সিং, চুং, চ্যাং ইত্যাদি। ১৩ অক্টোবর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট ১

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-র পত্র রবীন্দ্রনাথকে

১

[জুলাই ১৯১৭][১]

[কাশী]

প্রিয় রবিবাবু

আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি কেবল ক্ষুধিত পাষাণটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সেই বুড়োটা যে ইরাণী বাঁদীর কথা বলছিল, সেই বাঁদীর গল্পটা বললনা কেন? শুনতে ভারী ইচ্ছে করে। আপনি লিখে দেবেন। হ্যা?

আচ্ছা জয়পরাজয় গল্পটার শেষে শেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। না? কিন্তু আমার দিদিরা বলে শেখর মরে গেল। আপনি লিখে দেবেন যে, শেখর বেঁচে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। কেমন? সত্যিই যদি শেখর মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার বড় দুঃখ হবে। আমার সব গল্পগুলোর মধ্যে মাষ্টারমশায়[২] গল্পটা ভাল লাগে। আমি আপনার গোরা, নৌকাডুবি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজর্ষি, বৌ ঠাকরুণ-এর হাট, গল্প সপ্তক সব পড়েছি। কোন কোন জায়গায় বুঝতে পারিনি কিন্তু খুব ভাল লাগে। আপনার কথা ও ছুটির পড়া থেকে আমি আর আমার ছোটবোন কবিতা মুখস্ত করি। চতুরঙ্গ ফাল্গুনি ও শান্তিনিকেতন সুরু করেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা, শারোদোৎসব এসবো পড়েছি। আমার আপনাকে দেখতে খু উ উ উ উ উ উব ইচ্ছে করে। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন কিন্তু। নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি যদি আসেন তবে আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব।

আমাদের পুতুলও দেখাব। ও পিঠএ আমাদের ঠিকানা লিখে দিয়েচি।
[? শ্রাবণ ১৩২৪]

রাণু।

235 Agast-kund
Benares city.

আমার চিঠির উত্তর শিগ্গির দেবেন।
নিশ্চয়।

২

[অগাস্ট ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু

আপনি এতদিন আমাকে চিঠি দেননি বলে খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি।[১] আমার ভাল নাম কি জানেন? প্রীতি। বেশ সুন্দর নাম না। ইস্কুলে সবাই আমাকে প্রীতি বলে ডাকে। কিন্তু আপনি আমাকে রাণু রাণু বলেই ডাকবেন। আপনার ও নামটা সুন্দর লাগে কিনা তাই বলচি। আমার আরো নাম আছে শুনবেন। রাণী রাজা বাবা। সব নাম গুলোই বেশ না? আপনি যে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম[২] বলে একটা সুন্দর লেকচার দিয়েছিলেন না, সেটা ভারতী আর প্রবাসী তে বেরিয়ে ছিল। মা বাবজা বাবু আশারা সেটা পড়ে বল্লেন যে খুব সুন্দর হয়েছে। আমিও তাই পড়তে গেলাম কিন্তু কিচ্ছুই বুঝতে পারলাম না। বোধহয় সেটা খুব শক্ত। কিছুদিন আগে আমার খুব অসুখ করেছিল। এখন ভাল আছি। আপনি নিশ্চয় একদিন আমাদের বাড়ী আসবেন আমরা

এ বাড়ী ছেড়ে যাবনা। এ বাড়ী আমাদের নিজের বাড়ী। ভাড়ার বাড়ী নয়। আপনি আসবার সময় আমাদের জানাবেন। আমি ইস্কুলের ছুটি নিয়ে আপনাকে ইষ্টিসানে আনতে যাব। এ চিঠির উত্তর শিগ্গির দেবেন যেন, হারিয়ে ফেলবেন না যেন। আমি কেমন সুন্দর ফুল আঁকা কাগজে চিঠি লিখচি। [ভাদ্র ১৩২৪]

রাণু।

আমাদের বাড়ীর ঠিকানা আবার লিখে দিচ্ছি।
235 Agast Kundo
Benaras City
আপনি আর গল্প লেখেন না কেন।

৩

[সেপ্টেম্বর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু

এবার আপনি ও বারের চাইতে শীঘ্র চিঠি দিয়েছেন।[১] খবরের কাগজের অনেক জায়গায় আপনার নাম থাকে, সেখানে আপনার নামের আগে স্যর লেখা থাকে। আবার কোন ২ জায়গায় কবি সম্রাটও লেখা থাকে। আপনি খুব ভাল কবিতা লিখতে পারেন কিনা, তাই। আপনাকে রোজ অনেক লোককে চিঠি লিখতে হয় বুঝি? কজন লোককে? ছি ২ আপনি কুঁড়ে। আমি কিন্তু কুঁড়ে নই। আমরা যদি আপনার বাড়ির কাছে থাকতাম ত বেশ হত। আমি রোজ আপনার কাছে গিয়ে গল্প শুনতাম। আমিও আপনাকে বলতাম। আপনাকে দেখে আমার একটু ভয় করবে না। আপনি ত খুব সুন্দর দেখতে। আপনি বুঝি ভাবেন আমি আপনার ফটো দেখিনি। তাতে ত আপনাকে খুব সুন্দর লাগে। আমাদের শোবার ঘরের মাঝখানে

আপনার একটা সুন্দর ফোটো আছে। মা আর একটা মাসিক পত্রতে আপনার একটা সুন্দর ফোটো পেয়েছিলেন সেটাও বাঁধিয়ে রেখেচেন। আপনি যদি নারদমুনির মত ঝগড়াটে হন তবে নিশ্চয় আপনি নারদমুনির মত গানও গাইতে পারেন, বীনাও বাজাতে পারেন। আপনার যখন সুবিধে হয়, তখন আমাদের বাড়িতে আসবেন। আসবেন কিন্তু। প্রত্যেক বারেই ত আপনি লেখেন আসব, কিন্তু আসেন না। আমি এবার কেমন বাসন্তি রঙের কাগজে চিঠি লিখ্‌চি। খামটাও বাসন্তি। মিসেস্‌ বেসেন্টএর ফর্ষ্ট অক্টোবারে জন্মদিন কিনা, তাই ওঁর গার্লস্‌-স্কুলের মেয়েরা লক্ষ্মীর পরিক্ষা অভিনয় করবে। আমার মা শেখাচ্ছেন। আশা ক্ষীরো, শান্তি রাণী কল্যাণী। জন্মাষ্টমীর দিন ওঁর ইস্কুলে বোর্ডিং হাউসের মেয়েরা তিনটী ছোট ২ ড্রামা করিয়াছিল। আমি দেখতে পাইনি। আমার খুব অসুখ করেছিল। আজকে সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে। বিকেলে এত বৃষ্টি হয়েছিল যে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমি আর ভক্তি ওদের অভিনয় দেখতে যাব। আমরা যে অন্য স্কুলে পড়ি। আমাদের ইস্কুলের নাম C. H. C. Girls school.[১] এবার আর বারের মত একটা মস্ত বড় চিঠি লিখবেন। ঠিকানা আর লিখে দেবনা। ভুলে যাবেন না। এবার তবে শুতে যাচ্ছি। [ভাদ্র ১৩২৪]

রাণু॥

মেয়েটার নাম মিনা
একহাথে হাঁসকে খাওয়াচ্ছে

আরএকটা হাত একটা
জিনিবে রেখেছে।

ছবিটা কেমন সুন্দর। আমি এঁকেচি।

আচ্ছা, কৃপা করে ঠিকানা লিখে দিচ্চি। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তবে আর লিখতে পারবেন না।

235 Agust kund.
Benares city.

৪

[১৫ অক্টোবর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু,

আমি এতদিন চিঠি দিইনি বলে রাগ করবেন না। আমার খুব অসুখ করেছিল কিন্তু এখন ভাল আছি। লক্ষীটী রাগ করবেন না। আজকে থেকে আমাদের পূজোর ছুটী সুরু হয়েছে। 31st Octoberএ খুলবে। আচ্ছা আপনার চিঠি লেখা ছাড়া আর কি কাজ। আর কোই গল্পও লেখেন না। ইস্কুলেও যাননা আমার আপনার চাইতে ঢের বেশী কাজ। সকালে নটা পর্য্যন্ত মাষ্টারমশায়ের কাছে পড়ি তারপর চারটে পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকি। ইস্কুল থেকে এসে পণ্ডিতজীর কাছে হিন্দী পড়ি। আর রাত্রে লেখা, টাস্ক করি। আপনাকে দেখে বিশ্রী বলবনা। ছবিতে তো আপনাকে সুন্দর করে আঁকে। আপনি নিশ্চয় ছবির চেয়ে বেশী সুন্দর। আমার বেশ একটী সুন্দর বন্ধু। না। আপনার বোধহয় কোন সুন্দর বন্ধু নেই। আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগবে। আপনাকে এসে কিন্তু আমাদের বাড়ীতে থাকতে হবে। আর কোথাও থাকতে পাবেন না। আচ্ছা আপনি পদ্মার উপর নদীতে নৌকায় থাকতেন না নদীর ধারে বাড়ীতে থাকতেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। আজকে যে সোমবার[১] তার আগের সোমবারে এখানে মিসেস্ এনি বেসেন্ট[২] এসেছিলেন। তিনি থিওসফিকল্ গার্লস্ স্কুলের যে নতুন বাড়ী তৈরী [য] হচ্ছে তার দরজা খুললেন। ভক্তি আগেই ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। শান্তি, আশা আগেই ওদের নতুন ইস্কুলে গিয়েছিল। আমার আর মার অসুখ করেছিল। কিন্তু তবুও আমরা দুজনে গেলাম। মিসেস্ এনি বেসেন্টএর সঙ্গে মিষ্টর্ ওয়াড়িয়া[৩] আর মিষ্টর আরেন্ডেল[৪]ও ছিলেন। অনেক ছেলে স্কাউট্ হয়েছিল। তারা সব হাতে প্রকাণ্ড ২ লাঠী নিয়েছিল। মিসেস্ বেসেন্ট বক্তৃতা দিলেন। আর কেমন মেয়েদের হাত তুলে আশীর্ব্বাদ

করলেন। ছি, ছি, আপনি হাঁস আঁকতে যানেন্ না। আমি কেমন আঁকতে পারি। এবার একটা গল্প লিখ্‌বেন। আপনার গল্প পড়তে বেশ লাগে।। ফিরে বারের চিঠিতে লিখবেন কিন্তু কবে আসবেন। আচ্ছা, আপনার হাঁসগুলোর সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব হল। তারা আপনাকে দেখে পালিয়ে যেতনা। তারা নিশ্চয় আমার হাঁসটার চেয়ে সুন্দর ছিলনা। তাদের মধ্যে সকলেই কি শাদা ধব্‌ধবে ছিল। এবারে ছবি আঁকলাম না। আর বারে এঁকে দেব। [২৯ আশ্বিন ১৩২৪]

রাণু।

কেমন মজা আপনার নামো র দিয়ে সুরু আমারও নাম র দিয়ে সুরু।

৫

[অক্টোবর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনি এবার বেশ বড় চিঠি দিয়েছেন।[১] আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনার ভয় নেই আমি আপনার সঙ্গে আড়ি করবনা। কিন্তু আপনাকে আমার সব চিঠির উত্তর দিতেই হবে। আমারও আপনার ঠিকানা পষ্ট মনে আছে। আপনি কখন হাঁসের বাচ্চা দেখেছেন। তাদের কোলে করেছেন। আপনি আমাকে আপনার একটা সুন্দর ফোটো দেবেন। সেটা যেন খুব ছোট্টো আর বাঁধান হয়। বাধানটাও যেন খুব চকচকে হয়। আপনি যখন আমাদের বাড়ী আসবেন, তখন আমার ফোটো দেখাব একটা আমাদের চার বোনের। আমি আর ভক্তি একটা চেয়ারে বসে। আর আশা শান্তি

চেয়ারের পেছনে দাড়িয়ে আছে আর একটা ফোটো বাব্‌জা আর আমরা। বাব্‌জা একটা চেয়ারে বসে। ভক্তি বাব্‌জার কোলে বসে। আমি আর শান্তি দুজনে দুপাশে। আশা চেয়ারের পেছনে। আমার একটা একলা ফোটো আছে। আপনি এলে সেইটেও দেখাব। যিনি তুলেছিলেন তিনি বল্লেন আমার দিকে তাকাও। আমার ভারী রাগ হল। তাই সেই ফোটোটাতে বোধ হচ্চে যেন আমি রেগে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি যে লিখেচেন আপনার সময় কম তো কি কাজ? এবারে লিখবেন যে কি কাজ![২] আপনি আমাকে ছোট চিঠি লিখতে পারেন না। এখানে পণ্ডিতজী[৩] এসেছিলেন। উনি কাশীতে এসে পর্য্যন্ত রোজ আমাদের বাড়ীতে আসতেন। কেবল চতুর্থীর দিন উপোষ করেছিলেন বলে আসেননি। আর একদিন ওঁর গঙ্গা নেয়ে অসুখ করেছিল তাই আসেননি। উনি আপনার প্রায় সব গানই জানেন। পণ্ডিতজী আপনাকে গুরুদেব বলেন। আপনার অনেক গল্পও করেন। উনি বলছিলেন, আপনাকে উনি পৃথিবীর মধ্যে বেশী ভাল বাসেন। উনি বেশ সুন্দর গান করিতে পারেন। আমি 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' এই গানটা শিখেছি। এই গানটা আমার সব চাইতে বেশী ভাল লাগে। উনি কিন্তু কিছুতেই জল খাবার খেতে চাইতেন না। আমরা ধরেবেঁধে খাওয়াতাম। পণ্ডিতজী এখন বোধহয় বোলপুরে। তাঁকে আমার নমস্কার দেবেন। আচ্ছা, আপনি আমাকে বেশী ভালবাসেন, না পণ্ডিতজীকে? যদি পণ্ডিতজীকে বেশী তবে আপনার সঙ্গে আড়ি। আচ্ছা আপনার নাইতে ভাল লাগে। আমার ভারী খারাপ লাগে। কিন্তু মা জোর করে নাইয়ে দিলেন। আপনি এখানে আসেননা কেন? শিগ্গির ২ আসবেন। আপনি ইচ্ছে করে দেরী করে আসেন। এবার আমি কি সুন্দর ছবি এঁকেছি। আপনাকেও আঁকতে হবে। আমি কি সুন্দর কাগজে প্রকাণ্ড চিঠি লিখেচি। আমার আপনার গান শুনতে খুব ইচ্ছে করে। আসবার সময় বলবেন। [কার্তিক ১৩২৪]

রাণু।

৬

[ডিসেম্বর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু,

অনেকদিন হোলো আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু দুটো কারনের জন্য উত্তর দেওয়া হইনি। প্রথম তো আপনি যেমন দেরী করে দিয়েছিলেন আমিও তেমনি দিচ্চি। দ্বিতিয় তোঁ আমার Half yearly এগজামিন হচ্চিল। এখন এগজামিন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বড় দিনের ছুটি হয়েছে। আমার ছুটি ভাল লাগেনা। আপনি তো আগের চিঠি কেবল লিষ্টেই ভরে দিয়েছিলেন।[১] প্রায় বলতে গেলে কোন কথাই লেখেন নি। আবার একটা কথা যেমন জানলায় বসে থাকা তিন চার বার করে কেন লিখেছেন। একবারেই তো অনেকক্ষণ বসে থাকেন না একবার ওঠেন আর একবার বসেন। এবারে নিশ্চয় খুব বড় চিঠি লিখবেন। আপনি লিখেছেন আমার সময় হয়না। কিন্তু আপনার ছিন্নপত্রয় তো সব বড় ২ চিঠি। আমাকে চিঠি দিতেই যেন সময় থাকেনা। তখন কি করে সময় পেতেন? আপনার বইটার নাম ছিন্নপত্র কেন? সে চিঠিগুলো কি সব ছেঁড়া? এবার আমার জন্মদিনে মা সাতটী গল্প[২] উপহার দিয়েছেন। হৈমন্তি আর শেষের রাত্রির শেষটা বড় দুঃখের। বানোয়ারীলাল নামটা ভারী বিচ্ছিরি। আপনি কোথায় এই রকম নামটা পেলেন। বোষ্টমীটা বাব্‌জা বড় ভাল বলেন। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিনা। আমার গল্পগুচ্ছটা একজন লোক নিয়ে গেছে। আর ফিরিয়ে দিচ্চেন না। আর আটটী গল্পও দিয়েছিলাম তাও দিচ্চেন না। এবার কিছু করে তাঁর কাছ থেকে সেগুলো পেতে হবে। আপনি কবে আসবেন। এখন কি আপনার খুব কাজ। কই আপনি তো ছবি আঁকেন নি। অনুসূয়া আশাকে লিখেছে যে আপনি খুব লম্বা আর সুন্দর। আমার লম্বা লোক বেশ ভাল লাগে। অনুসূয়া আশার একজন মরাঠী বন্ধু। আমি জানি আপনি

খুব সুন্দর গান করতে পারেন। যখন আসবেন তখন আপনাকে অনেক গান করতে হবে। শিগ্গির আসবেন কিন্তু। আমরা শুক্রবারে নৌকো করে গঙ্গার ওপারে গিয়েছিলাম। সেখানে বালির চড়া আছে। সেইটে প্রথমে পার করতে হয়। আর তার পেছনে কত ক্ষেত্ পেয়ারাগাছ বাগান আকের গাছ॥ আর দুটা কুঁওয় আছে।

আমরা বালির চড়া পার করবার সময় হয়েছিলাম বেদুয়িন। আর ছাতা গুলো হয়েছিল বর্শা। আর ক্ষেত গুলো হয়েছিল ওয়েসিস্। আমরা একটা কুঁওর কাছে বসে খেজুর খেলুম। ঠিক মরুভূমীর মত হয়েছিল, না? আমরা একটা কৃষকের কাছে আক্ কিনলাম। সে আমাদের নিজের বাড়ী নেমতন্ন করছিল। আর বলছিল গরুর দুধ আর নতুন আকের গুড় তৈরী করে খেতে দেবে। আমরা বললাম আর একদিন আসব। আমরা সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলাম। আপনি যখন আসবেন তখন আপনাকেও নিয়ে যাব। কিন্তু আপনি আসেন কই। [পৌষ ১৩২৪]

রাণু॥

আপনাকে লিখেছিলাম কোলকাতার ঠিকানা লিখতে তা লেখা হল না। আপনি ভারী দুষ্টু।

[ফেব্রুয়ারি ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনি এতদিন চিঠি দেন্নি বলে রাগ হয়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজে রয়েছে যে আপনি নাকি যে মোটরটাতে যাচ্ছিলেন, সেটা ভেঙে

গেছে।[১] আপনার লাগেনিত? তাই আপনাকে কৃপা করে চিঠি দিচ্চি। কেমন আছেন শিগ্গির লিখে পাঠাবেন। নিশ্চয়। তা নাহলে আড়ি॥ যদি ছবি আঁকতে কষ্ট হয় তো না হয় আঁকবেন না॥ [ফাল্গুন ১৩২৪]

রাণু

আপনি কল্‌কাতায় তো প্রায়ই থাকেন কিন্তু ওখানকার ঠিকানা কেন দেননা? আপনি ভারী দুষ্টু॥

৮

[? ফেব্রুয়ারি ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

আমি আপনাকে দুখানা চিঠি লিখেছি। কিন্তু আপনি একখানারও উত্তর দিলেন না। আমি কখনই এবার দিতাম না। কিন্তু আপনার অসুখ হয়েছে বলে কৃপা করে দিচ্চি। আপনি নিশ্চয় আমাকে ভালবাসেন না তাই চিঠি দেন না। যদি এবারও চিঠি না দেন তো আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি তো চিঠি, চিঠি অনেক লিখেছিলেন কিন্তু আমাকে তো একখানাও লেখেন না। আচ্ছা আপনার কি অসুখ করেছে? একখানা চিঠি লিখতেও কি পারেন না? আপনার অসুখএর সময় কি খুব কষ্ট হয়? আমি আপনার কাছে থাকলে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখতাম।[১] আপনি কোথায় আছেন? এবার আমায় নিশ্চয় চিঠি দেবেন। হ্যাঁ। [? ফাল্গুন ১৩২৪]

রাণু॥

[২৮ মার্চ ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

অনেক দিন হল আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু একটা কারণে উত্তর দিইনি। এতদিন আমার এগজামিন হচ্ছিল। সেটা স্কুলের yearly এগজামিন। আজ থেকে হোলির ছুটি সুরু হয়েছে।[১] তাই আজ উত্তর দিচ্ছি। দু সপ্তাহ পরে Govermentএর একটা এগজামিন দেব। বেশ মজা। আপনি বড় অসাবধান আমার চিঠি হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু আমি এতদিন জবাব দিইনি। কিন্তু চিঠিটা ত হারায়নি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার এগজামিন। তবুও আর একটা চিঠি দিতে পারলেন না। আমি বরং একবার দুটো পরে ২ দিয়েছিলাম। আপনার অসুখ করেছে, আজকাল তো আর কুড়ি ঘন্টা ধরে ছাতে কিম্বা জানলায় বসতে পাননা আর কেউ কাজ করতেও বলে না, তবে ইচ্ছে করলেই লিখতে পারেন। এবার আপনাকে প্রকাণ্ড অ অ অ অ অ অ একটা চিঠি লিখতে হবে।। আপনাকে আমাদের এই এগজামিন শেষ হলে নিশ্চয় আসতে হবে। আপনি চান যে কিছু করে যাতে না আসতে পারি। কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। আশার এগজামিন একুশ তারিখে শেষ হল। ভক্তির এগজামিন হোলির পরই সুরু হবে। আমি আজ একটা নতুন খেলা বার করেছি। আজ সকালে ওতে আমাতে সেইটে খেলেছি। সে খেলাটা খুব শক্ত। আপনি আশাদের ইস্কুলে 'গঙ্গা'র নামে একটা ফোটো পাঠাতে পারলেন আর আমাকে একটা দিতে পারলেন না। আপনি তো বড় দুষ্টু। আপনাকে আমাকে একটা খুব সুন্দর ফোটো দিতে হবে। সেটার যেন একটা সুন্দর ফ্রেম থাকে। আপনি গান গাইতে পারেন? আমাদের বাড়ী এসে আপনাকে অনেক গান গাইতে হবে। আপনি সবুজ পত্রয় তোতাকাহিনী[২] বলে যে

গল্পটা লিখেছেন, সেটার শেষটা বড় দুঃখর। শেষ্টা দুঃখের করলেন কেন। পাখীটা একমাস দুমাস কাগজ খেয়ে বেঁচেছিল কি করে। আপনি এবার একটা সুখের গল্প লিখবেন। [১৪ চৈত্র ১৩২৪]

রাণু।।

আজ হোলি কিনা, তাই আপনাকে একটু ফাগ পাঠাচ্চি। আপনি মুখে মাখবেন। আপনি সুন্দর কিনা তাই আপনাকে বেশ সুন্দর দেখাবে।।

১০

[এপ্রিল ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি।[১] আপনার কি হয়েছে। হটাৎ অস্টেলিয়াতেই বা যাচ্চেন কেন? আপনি নিশ্চয় ওখানের লোকদের বেশী ভাল বাসেন। কেননা তারা যেই ডাকল অমনি সেখানে গেলেন। আমি যে ডাক্‌চি তা আসাই হয়না। আপনি ভারী অকৃতঘ্ন। আবার লেখা হয়েছে যে রান্না শিখে নাও তারপর আসব। রান্নার দোহাই দেওয়া হয়েছে। আমাদের সব এগজামিন শেষ হয়ে গেছে। আজকাল কোনও পড়া নেই। আপনি এলে যে রান্না পারি করে দিতে পারি। আমরা বোধহয় শীঘ্রই কোথাও বাব্‌জার হাওয়া বদলের জন্য যাব। চার জায়গা ঠীক হয়েছে তার মধ্যে একটী যায়গায় যাওয়া হইবে। ডেরাডুন, ভীমতাল গিরিডি কিম্বা চুনার বেশ মজা লাগছে। আপনি বোধহয় পনের শোলো দিনের মধ্যেই রওনা হবেন। শান্তি দু তিন দিন হল সীঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে তাই ওর পায়ে খুব ব্যাথা হয়েছে। এখনও সোজা হয়ে শুতে পারেনা। এখানে আশাদের

ইস্কুলে National weekএ তিনটে থিয়েটার হয়েছিল। থিয়েটার গুলির মধ্যে একটী ছিল বাঙলা। সেটা আপনারই লেখা। তার নাম হচ্চে প্রকৃতির প্রতিশোধ। আর একটী ছিল হিন্দী। হিন্দীটীর নাম হরিশ্চন্দ্র। হিন্দী থিয়েটারএর দিনও আমরা গিয়েছিলাম। আর একদিন একটী মরাঠী প্লে হয়েছিল। এদিন আমরা যাইনি। এই National weekএ নানা রকমের অনেক জিনিষ বিক্রি করা হয়েছিল। আপনি চিঠি আমাদের বাড়ীর ঠিকানাতেই দেবেন। আমরা এমনতর বন্দোবস্ত কর্‌ব যাহাতে সব চিঠি আমাদের যেখানে যাওয়া হবে তার ঠিকানায় আসবে। [বৈশাখ ১৩২৫]

রাণু॥

১১

[মে ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

মা বাবজা কোল্‌কাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু পরশু ফিরে এসেছেন। আমরাও রবিবার[১] কল্‌কাতায় যাব। আর সোম্‌বারে সেখানে পৌঁছাব। বেশ মজা। আপনাকে কিন্তু কল্‌কাতায় কিছু দিন থাক্‌তে হবে। আপনার বেশ হয়েছে। যেমন আমার সঙ্গে না দেখা করে যাচ্ছিলেন তেমনি যাওয়া হল না। আপনি মঙ্গলবার দিন[২] সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয় আমাদের বাড়ী আস্‌বেন। নয়ত জন্মের মতন আড়ি। আমাদের বাড়ীর ঠিকানাও লিখে দেব। আপনি হেরে গেলেন ছি, ছি। কেননা আপনি এলেন্ না। আমি কেমন আগে

যাচ্ছি। আমার আপনাকে দেখতে বেশ লাগ্‌বে। সে চিঠিটার জবাব দেন্‌নি কেন? আপনাকে আমায় গান শোনাতেই হবে। [বৈশাখ ১৩২৫] রাণু।

ঠিকানা,
35 Lansdown road.
Vabanipur.

১২

[মে ১৯১৮]

[কলকাতা]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনি কেন আমাকে আগে চিঠি দেন্‌নি। আপনার নিশ্চয় আমাকে চিঠি লিখ্‌তে ভাল লাগে না। অন্য সবাইকে তো বেশ্ লেখা হয়। আমরা 4th Juneএ বিকেল বেলা বোলপুরে এসে পৌঁছুব। কোল্‌কাতা ভারী গরম হয়েছে। বোলপুরে বোধ হয় ঠাণ্ডা। আপনার সেখানে নিশ্চয় ভাল লাগে। আমরা যেদিন যাব আপনি সেদিন সেজে থাক্‌বেন্। আপনি পাহাড়ে যাননি বেশ মজা হয়েছে।[১] আর ভক্তির বন্ধু হেরে গেছে। কেন জানেন? সে প্রায় আসেই না। এবারে কেমন ছোট্ট চিঠি লিখেছি। [জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫]

রাণু।

১৩
[জুলাই ১৯১৮]

[শান্তিনিকেতন]

প্রিয় রবিবাবু

আজ কি আপনি গান্ধারীর [য] আবেদন পাঠ কর্‌বেন? কোথায় পাঠ কর্‌বেন্? আপনি জগৎবিখ্যাত কবিতাটী শোনালে আমি খুসী হব। আপনি প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বেন্। আমিও অভিসারটী বল্‌ব। শান্তিও বল্‌বে।[১] বল্‌বেন্।

[আষাঢ় ১৩২৫]

রাণু।

রবিবাবু সেজে[২] বল্‌বেন। যাতে ভাল দেখায়।

রাণু।

১৪
[১০-১১ জুলাই ১৯১৮]

[বোলপুর থেকে কাশীর পথে ট্রেনে][১]

প্রিয় রবিবাবু,

এখন গাড়ী চল্‌ছে। আমি খুব কাঁদছি। আপনার জন্যে খুব মন কেমন কর্‌ছে। আপনি বোধহয় এখন নাইছেন। এখন একটু ২ মেঘলা একটু ২ রোদ। দুটো ছোট ২ ইষ্টিবান পার হয়েছি। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে। এখন গাড়ী খালী। খুব কাঁপছে গাড়ী। এই এখনি একটা ছোট ইষ্টিবানে গাড়ী থাম্‌ল। এই আবার চল্‌ছে। আমার আবার খুব কান্না পাচ্ছে।

দুধারে জলে ভরা খেত আর মাঠ। খানিকক্ষণ পরে লিখছি। আপনার নাওয়া হয়ে গেছে কে চুল আঁচড়ে দেবে আপনাকে। একটা ইষ্টিষানে গাড়ী থেমেছে অনেক মেয়ে বউ দেখলাম। আমাদের গাড়ী খালী আছে।

আপনার এখন খাওয়া হয়ে গেছে। রোজ বিশ্রাম কর্‌বেন্। একটুও ভাল লাগ্‌ছেনা। চুপ করে বসে আছি। গাড়ী খুব নড়ছে।

রামপুরহাট। বেশী লোক নেই। কতকগুলি মেয়েমানুষ নথ পরে গেলেন। আমি চুপ করে বসে। সামনেই একটা ইঞ্জিন মালগাড়ীর ওপর। আপনি বোধহয় এখন বিশ্রাম কর্‌ছেন। নলহাটীতে গাড়ী থাম্‌ল। একজন খুব মোটা বাঙালী মেয়েমানুষ গাড়ী উঠ্‌লেন। বাব্‌জাদের গাড়ীতে।

চাৎরা। আপনি কি করছেন এখন এসময়। মন কেমন কর্‌ছে।

বাজগাঁও। হিন্দুস্থানী গ্রাম সুরু হল। বাড়ীর টাইলের ছাত্। লোক প্রায় উঠ্‌লই না। প্রায় মেঘ্‌লা। সবুজ মাঠ। আর জলে ভরা খেত। তার পেছনে জঙ্গল।

পাকুড়। এখানে নথ পরা মেয়েমানুষটী নাম্‌ল। এটা একটু বড় ইষ্টিসান। আর একজন নথ পরা মেয়ে মানুষ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। আমার সন্ধ্যেবেলা ভাল লাগ্‌বে না। আপনারও বোধহয় ভাল লাগবে না।

বারহাবরা। এটা বেশ বড়। অনেক লোক। কতকগুলি ক্রিশ্চান সাঁওতালী মেয়ে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। একপাশে একটা বড় পুকুর রয়েছে। তার চারিধার গাছে ঢাকা। খুব সুন্দর দেখতে। এখন মেঘলা। আমি এতক্ষণ আপনার কথাই ভাব্‌ছিলাম। দূরে একটু ২ সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। গাড়ী দুটো পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গেল।

তিন পাহাড়। এখানে একটা পাহাড়ের তলায় কেমন একটা হিন্দুস্থানী গ্রাম। এখন পাঁচটা বেজেছে। আপনার বোধহয় লেখাপড়া এখ্‌খুনি শেষ হল। যদি কিছু সভা হয় তো বেশী জোরে লেক্‌চার দেবেন না।

সাহেবগঞ্জ। এ ইষ্টিসানটা তো বেশ্ বড়। আমাদের সাম্‌নে টিকিট্

কলেক্টার দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে খুব হাঁসি পাচ্চে। এখনো আমাদের গাড়ীতে কেউ আসেনি। আমাদের গাড়ীর সামনে কল। সবাই জল খাচ্ছে। এখন আপনি বোধহয় খাচ্চেন। আজ সন্ধ্যেবেলা তো আমি আর আস্‌ব না আপনি বোধ হয় সভা কর্‌বেন। এবার যেদিন ছাতে বস্‌বেন্ সেদিন নিশ্চয় আপনার আমার জন্যে মন কেমন করবে। আপনি একলাটী চুপ করে বসে থাক্‌বেন।

কহলগ্রাম। এখানে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা রাত্তির ১।২টায় মোলপুর পৌঁছোবে। এখনো মেঘলা। দু ধারে উঁচু ২ ঘাস। খানিকক্ষণ আগে আমরা সব জল খাবার খেয়েছি। আমি অনেক খেয়েছি। আপনিও বেশী করে দুধ খাবেন।

গাড়ীতে কারোর সঙ্গে কথা হয়নি।

সবোরএ একটা কলেজ দেখ্‌লাম। তার পাশে মাঠে ছেলেরা খেল্‌ছে দেখ্‌লাম্।

ভাগলপুর। এ ইষ্টিসানটা খুব বড়। বাব্‌জা খাবার কিন্‌ছেন। একজন লোক সেজেগুজে গলায় মালা দিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আম কিনছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ক্রমে অন্ধকার হচ্চে। সব্বাই বলছেন এখন শান্তিনিকেতনের কথা মনে আসছে। এ সময়েই তো আমার সবচেয়ে বেশী আপনার জন্যে মন কেমন কোরবে। কাশীতে গিয়েও কোর্‌বে। একটা ছোট্ট টনেলের ভেতর গাড়ী গেল। এই বার জামালপুর আস্‌বে। কে জানে কেন হটাৎ বনে গাড়ী থামল আবার চল্‌ছে। অন্ধকার। এখন রাত ৮।৯, আপনি বোধ হয় ছাতে কিম্বা কোণের বিছানায় শুয়ে। জামালপুর। কাল এসময় আপনি গান গাইছিলেন। আমার এখানে ভাল লাগছে না। তাইত কাঁদছি। এবার শুতে যাচ্চি কিন্তু ঘুম হবে না।

রাত ২।১। রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হচ্চে। আমার ঘুম আস্‌ছেনা। আপনি এখন বোধহয় ঘুমুচ্ছেন। আরায় ভোরে গাড়ী পৌঁচেছে। অনেক ঘুমটা

পরা হিন্দুস্থানী মেয়ে নামল তারা সব কা কি, না নী নে এই সব বলে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। আমার গাড়ীতে একটুও ভাল লাগেনি। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে কর্ছে। এ চিঠিটা মোগলসরাএ ফেল্বো। কাশী গিয়ে কি হল আর এক্টাতে লিখ্ব। দেখুন আপনাকে কত বড় চিঠি দিলাম। আমাদের ঠিকানা

২৩৫ অগস্ত কুণ্ড। দেখ্বেন যেন ২৩৬, ৩২৫ কিম্বা ৫৩২ না হয়। আর অগস্ত কুণ্ডটাও যেন না ভুলে যান। কেমন বুঝলেন ত। চারপাতা হয়ে গেছে। আর আঁট্ছে না। [২৬-২৭ আষাঢ় ১৩২৫]

রাণু। দেবী নয়।

পুঃ সকাল বেলা ৯টা। এখন আপনি ছেলেদের পড়াচ্ছেন. আমার পড়তে ইচ্ছে কর্ছে।

১৫

১২ জুলাই ১৯১৮

[কাশী]

প্রিয় রবিবাবু,

কাল আপনাকে কেমন একটা চিঠি দিয়েছিলাম্।[১] সে চিঠিটা মোগলসরাইএ ডাকে দিয়েছি। কতবড় চিঠি লিখেছিলাম। আপনি যেন একটা ছোট্ট চিঠি দেবেন না। বাবু[২] ইষ্টিষানে আমাদের নিতে এসেছিলেন। বাড়ী এসে প্রথমেই লিলুকে[৩] দেখলাম্। এখানে খুব গরম। আজ ঘুম থেকে উঠেই আপনাকে চিঠি দিচ্ছি। আমি কি লক্ষ্মী। আজ আমি ইস্কুলে যাব কিন্তু শিগ্গিরই চলে আস্ব। প্রায় বল্তে গেলে পড়বই না। শুনুন, আপনি ভাল করে চুল টুল আঁচড়াবেন। কাপড়ও বেছে ২ পর্বেন। দিনরাত

লিখ্‌বেন না। দুপুরবেলা ঘুমুবেন। আর রাত্তিরে শিগ্গির ঘুমুতে যাবেন। বেশী জোরে কিচ্ছু পড়বেন্ না যেন বলে দিলাম্। আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমন করে। কাল সন্ধ্যেবেলা আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছিল। আপনি তখন কি করছিলেন? কিন্তু পূজোর ছুটীর সময় বেশ্ মজা হবে।[*] আপনি আজকালও কি তিন্‌টে ক্লাশ পড়ান্? আমার পড়তে যেতে খুব ইচ্ছে করে। সে খাতাগুলো আমি রেখে দিয়েছি। আজকাল কি গাছের তলায় পড়ান হয়? আমি কাল ভাব্‌ছিলাম আপনি কি কর্‌ছেন। বৌমা[*] ওখানেই আছেন না শিলাইদা গেছেন? অ্যানড্রুস্ কেমন আছেন? উনি নিশ্চয় আপনাকে খুব ঘরে বাইরে করান।[*] ওঁকে বল্‌বেন রাণু বলেছে যে ঘরে বাইরে যেন খুব কম করে করান হয়। আপনার কোনেতে আজকাল প্রায় কেউই আসেনা বোধহয়। হ্যাঁ শুনুন্ কেউ বয়েস জিজ্ঞেস করলে বল্‌বেন্ সাতাশ।[*] কাশীতে এখনো ঘরটর গোছানো হয়নি। আমার সব পুতুল বার করেছি। ছোটবউ[*] রোগা হয়ে গেছে। ওর গায়ে খুব ধূলো হয়েছে। গাব্‌লোর বউ[*] মোটা হয়েছে। সে খুব সেজে গুজে রয়েছে। ছোটবৌএর কতক্‌গুলো হার আর কাপড় হারিয়ে গেছে। লিলি, লটি, সোনালি, টগর, জুঁই গোলাপ[*] ভাল আছে। খানিকক্ষণ পরে ওদের নিয়ে থিয়েটার কর্‌ব। মন থেকে বানিয়ে। এবার আর ছবি আঁকলাম না।

কাল ট্রেন থেকে এসেই চতুরঙ্গ শেষ করেছি। আচ্ছা দামিনী বেশী সুন্দর ছিল না ননীবালা। আমার বোধহয় দামিনী। শচীশ নিশ্চয় ভাল ছিল। শ্রীবিলাস নামটা যেমন বিচ্ছিরি ও নিশ্চয় বিচ্ছিরি দেখ্‌তে ছিল। কেমন রঙ্গীন কাগজে চিঠি দিয়েছি। একটা বড় চিঠি লিখ্‌বেন। [২৮ আষাঢ় ১৩২৫]

রাণু॥

ঠিকানা ভুল্‌বেন্ না যেন। আগের চিঠিতে লিখেচি।
নম্বর হচ্ছে ২৩৫

রাণু॥

১৬

[জুলাই ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

পরশু আপনার চিঠি পেয়েছি। পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। ইস্কুল থেকে এসেই দেখি আপনার চিঠি রাখা রয়েছে। আপনি কেন বড় চিঠি লেখেন নি আমি আপনাকে কত বড় চিঠি দিয়েছি। আপনার চিঠিটা পড়েই সেই বাক্সটাতে রেখে দিয়েছি কাউকে দিইনি। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। মাঝে ২ কাঁদি। আমার যখন মন কেমন করে তখন আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন। এবার আপনি বেশ চিঠির সুরুতে রাণু লিখেছেন। আমি আজকাল রোজ দু তিন বার করে দুধ খাই। আপনাকেও খেতে হবে কিন্তু বলে দিলাম। অ্যানড্রুস্ সাহেব আমাকে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে লিখেছিলেন যে আপনি রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোন আর দিনেও শোন্। আপনি বেশ লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাক্বেন্, খুব কম পড়বেন্। আমি আজকাল ইস্কুলে একটুখানি পড়া করি। বেশী পড়িনা। আপনিও তাই অনেক পড়তে পাবেন না বলে দিলাম। সুভার গল্প নিশ্চয় এখনো শেষ হয়নি।[১] যেদিন শেষ হবে সেদিন আমায় তার করবেন্। হ্যাঁ। আমি এবার পূজার ছুটি হওয়ার আগেই যে সব আপনার বই পড়িনি সেগুলো পড়্ব। আমার চতুরঙ্গ, বলাকা আর ঘরে বাইরে হয়নি। তারমধ্যে বোলপুর থেকে এসেই চতুরঙ্গ পড়েছি। এইবার বলাকা পোড়্ব। তার পর ঘরে বাইরে পড়্ব। আমি ভাবি যে একদিন ট্রেনে করে বোলপুর গিয়ে ধীরে ২ চুপি আপনার সিঁড়ি দিয়ে উঠে হটাৎ আপনার কাছে যাব। আপনি তখন নিশ্চয় কোনে বসে লিখ্বেন। আমায় দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন তা হলে কি মজা হয়। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

দেখুন আমি কেমন ওড়না পরা মেয়ে করেছি এর নাম নীলা। বেশ সুন্দর হয়েছে। না? আপনাকেও আঁকতে হবে।

রাণু॥

১৭

[জুলাই ১৯১৮]

আমার প্রিয় রবিদাদা,

আমার কেন লিখেছি জানেন আপনি আমায় যে চিঠিটা দিয়েছিলেন সেইটে[তে] তোমার রবিদাদা লিখেছেন।' তাহলে তো আপনি আমার হয়ে গেলেন, তাই আমার লিখেছি। আমি কালও ইস্কুল থেকেই এসেই আপনার চিঠি পেলাম। ... চিঠিটা ... আর সব চাইতে ... হয়েছি। কেননা এ চিঠিটা আমার খুব [ভাল লা]গে। আর এ চিঠিটা সব চেয়ে বড়। তাই। [আমি] চিঠিটার সবটা বুঝতে পেরেছি। আপনার [জন্যে] আমার খুব মন কেমন করে। আপনারও নিশ্চয় করে। এখানে আজকাল খুব চাঁদের আলো হয়। আমি রোজ সন্ধ্যেবেলায় বিছানায় শুয়ে আপনার [কথা ভাবি] তখন আপনার জন্যে সব চেয়ে বেশী মন কেমন করে। কান্না পায়। মাঝে ২ ভক্তিকে গল্প বলি। শান্তিনিকেতনে আপনার ছাতে নিশ্চয় খুব আলো হয়। আপনি বুঝি তখন চুপ করে একলা বসে থাকেন? আমি থাকলে আপনাকে গল্প বলতাম। আপনি বেশ লক্ষ্মী। কথা শোনেন। কিন্তু বেশী করে দুধ খাবেন। কিন্তু আপনি কেন অত করে ঘরে বাইরে করেন। আমি অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে এক্ষুনি অত করে ঘরে বাইরে করাতে বারণ করে দিচ্ছি। উনি যেন ছুটীর দিন দু ঘন্টার বেশী না [ঘরে বাইরে করান]। আমিও আজকাল

দুধ খাই। ইস্কুলের বাঙলা আমি [পড়ি না]। বাড়ীতে বলাকা ঘরে বাইরে চয়নিকা পড়ি। যেটা [না] বুঝতে পারি আ[শা]কে জিজ্ঞাসা করি। পূজার ছুটির সময় যখন আপনার কাছে যাব তখন দেখ্‌বেন আপনার সব বই আমার পড়া হয়ে গেছে। আমি বাড়ীতে ইস্কুলের বই পড়িনা। তখন বেশ হবে। আশা এবার কলেজে পড়বে কিনা তাই শিম্লিরি বোর্ডিঙে যাবে। বাবুর খুব জ্বর হয়েছে। অজ্ঞানের মতন থাকেন। আর শুনুন একটা কুঁজো এত বিচ্ছিরি দেখ্‌তে হিন্দুস্থানী বুড়ী দিন রাত [পাখা] করে। আর শুনুন সে এত অসভ্য যে ... ... পরে। আর সে অসভ্য হিন্দি কথা ব[লে]। ... চাইতেও ঢের খারাপ।

আমি রোজ ইস্কুল থেকে এসে রঙ দিয়ে বৌমার মতন করে ছবি আঁকি। কিছুদিন পরে যখন আরো ভালো করে আঁক[তে] পারব তখন আপনার একটা [রঙ] দিয়ে ছবি এঁকে পাঠিয়ে দেব। আপনার কাপড়ের রঙ্‌ আঁকব লাল আর চুল কর্ল করে দেব। তার বয়স হবে সাতাশ। আপনি ছবিটা রেখে দেবেন। এবার আর একটা পাঠাচ্ছি। আপনিও একটা আঁকবেন। দেখ্‌ব কার্‌টা বেশী ভাল হয়। আপনি আমাদের যে আপ[না]র ফোটোটা দিয়েছেন সেটাকে আমি আদর করি। ছু[টি]র সময় গিয়ে আপনাকেও চুমু খাব। দেখুন আমি কি লক্ষ্মী। আপনাকে রবিদাদা লিখেছি। কিন্তু দিনুবাবুরাও যে আপনাকে রবিদাদা বলেন। আমি বাব্‌জার সঙ্গে পূজোর সময় নিশ্চয় আস্‌ব। তখন আপনাকে ক্লাসের পড়াও লিখ্‌তে হবেনা আর ... ... তখন অনেক গল্প ... ... যারা বিচ্ছিরি ... তাদের ... আপনাকে রোজ সাজিয়ে দেব। ... ... ওখানে খুব গরম। তাই ভারি কষ্ট। মা বাবুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ... ... [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু ॥

১৮

[জুলাই ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

কাল আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। অন্যদিন খুলে সকালে তার উত্তর দী কিন্তু আজ থেকে morning ইস্কুল ছিল। ভোর পাঁচটায় উঠেই ইস্কুলে গেছি। আর যখন ফিরে এলাম তখন ডাক চলে গেছে। তাই জন্যে দুপুর বেলা প্রায় বিকেলে লিখছি। আপনাকে আর ও কাগচে চিঠি দিতে হবেনা। ওর রঙটা বেশ কিন্তু কাগচ তো ছোট্ট। ওতে আর দিতে পাবেন না। আপনি ও রকম দুটোতে কেন দেন না। আপনার চিঠি লিখ্তে খুব বেশীক্ষণ লাগে না। আমি যে বুধবার দিন আপনি কি করছিলেন আমাদের যাবার দিন, তাই, ভাবছিলাম। আর শুনুন্ আপনি কেন আবার দুষ্টু হয়েছেন। বেশী দুষ্টুমি করলে আপনার সঙ্গে আড়ি করে দেব। বৌমা আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন যে আপনি খুব জোরে গান করেন, দুধ খেতে চান না আর ভাল করে চুল আঁচড়ান না। কেন আপনি এইসব করেন। আবার লিখেছেন দিনুবাবুর মতন মোটা হবেন।[১] আপনি যদি আরো দুষ্টুমি করেন তো আপনার সঙ্গে একেবারে আড়ি করে দেব। রবিদাদা বলব না আর, রবিবাবু বল্ব। তখন বেশ হবে। এই দেখুন, এক্ষুনি আমি দুধ খেলাম। প্রায় সবটা। আপনার চাইতে আমি ঢের লক্ষী আপনি লিখেছেন আমি দুধ খেলে আপনি খুসী হন কিন্তু আপনি কেন খান্ না। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। সন্ধ্যে বেলায় ভক্তি খেলা করে আমার কিন্তু ভাল লাগে না। আপনি নিশ্চয় সে সময় চেঁচিয়ে ২ গান করেন। আর করতে পাবেন না, সে সময় তারার গল্প ভাব্বেন। কেমন। আমি পূজোর সময় গিয়ে আপনাকে একটা তোড়া বেঁধে দেব। মালীর চাইতে তোড়াটা ঢের ভাল হবে।[২] আমিও একটা খুব সুন্দর মালা

আপনাকে গেঁথে দেব। আচ্ছা শুনুন্ আমি যখনি আপনার কথা ভাবি তখনি কি আপনার গায়ে হাওয়া লাগে?° কি ভাবে বুঝতে পারেন? সেই হাওয়া আপনার কেমন লাগে। দেখুন রোদ কমে গেছে বিকেল হয়েছে। লু বন্দ হয়েছে প্রায়। আপনি যে ছবিটা এঁকেছেন সেটা বেশ্ সুন্দর হয়েছে। সেটা কার? মঞ্জুলিকার। আপনি তো বেশ ছবি আঁকেন। শেখেন না কেন। আমি যে ছবিটা পাঠিয়েছি সেটা কেমন হয়েছে লিখ্‌বেন। দেখুন আমি আপনার চাইতে বড় চিঠি লিখেছি আর একটুও ধরে ২ লিখিনি। আজ কেমন একটা খাতা ছেঁড়া কাগচে চিঠি লিখ্‌ছি। কেমন হয়েছে। বুধবারে উপাসনার পর এ্যানড্রুস জ্বালাতন করেন নি। উনি যদি আপনাকে বেশী ঘরে বাইরে করান তো ওঁকে বল্‌বেন যে আমি আর কখনো ওঁর কাছে পড়ব না। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

১৯

[জুলাই ১৯১৮]

আমার রবিদাদা,

আজকাল কি মজা হয়েছে। প্রায় রোজই ইস্কুল থেকে এসে আপনার চিঠি পাই। আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। বাব্‌জার চিঠিও পড়েছি। আপনি আজকাল বেশ লক্ষী। যে দিনই চিঠি পান সে দিনই তার উত্তর দেন। কিন্তু ওখান থেকে চিঠি ফেল্‌লে এখানে তিন দিনের দিন এসে পৌঁছোয়। এত দেরী হয় কেন। যদি আপনার কাছে আমার চিঠি যায়, আমার কাছে আপনার চিঠি আসে আর দুজনের যদি পথে দেখা হয়ে যায়

আর আমাদের মতন খুব ভাব হয় ত কি মজা হয়। আপনি যে কাগচে চিঠি দিয়েছেন তার রঙ্‌টা বেশ্ কিন্তু ভারী ছোট্ট কাগচ। আপনার নিশ্চয় ছোট চিঠি দিতে ভাল লাগে। বড় চিঠি লিখ্‌বেন। আপনি তো চিঠি বেশ শিগ্গির লিখ্‌তে পারেন। আমার চাইতেও। বৌমা কে হাসতে বারণ কর্‌বেন। আর বল্‌বেন্ যে রাণু আপনাকে নিশ্চয় রঙীন কাগচ দিতে বলেচে। দিনুবাবুও বোধহয় আজকাল হাসেন। আজকাল তো আমি নেই তাই বোধহয় বলেন রবিদাদা হাঁসাচ্চে। ওদের অত হাসি পায় কেন? আপনি বেশ লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন। আর চুল মন দিয়ে আঁচড়াবেন্। আর বয়স ছাব্বিষ কর্‌বেন না। যারা সাতাশকে সাতাশী শোনে তাদের জন্যে আবার অন্য বয়স রাখ্‌তে হবে কেন।[১] আপনার বয়স সাতাশই থাক্‌বে। যারা ঐ রকম শুন্‌বে তাদের আমি খুব বকে দেব। আমি কাল রাত্তিরে আপনার একটী স্বপ্ন দেখেছি। তাতে আপনি আমার হাত ধরে একটা বারাণ্ডায় খুব জোরে জোরে বেড়াচ্ছিলেন। খুব প্রকাণ্ড লম্বা বারাণ্ডা। আমার বর্ষশেষ কবিতাটা খুব সুন্দর লাগে। সেটা প্রায় রোজ পড়ি। আমি সেটা এবার মুকুস্ত কর্‌ব। আপনি যে ছবিটা এঁকেছেন সেটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ছবিটা পেয়ে আমি খুসী হয়েছি। আর কদম্ ফুলও পেয়েছি। আপনি তো ছবিটা আগে পেন্সিল দিয়ে এঁকে তারপর তাতে কালী দিয়েচেন আমি তাই করি। আমি এবার একটা খুব সুন্দর কাগজে চিঠি দিচ্চি। তার রঙ্ লাল। আপনি লিখেছেন মন কেমন কোরোনা। তবুও আমার মন কেমন করে। আমার সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্‌লেই আপনার কথা মনে পড়ে। আপনার মন কি সত্যিসত্যিই আমার কাছে আছে। আর আপনি তলায় শুভানুধ্যায়ী রবিদাদা লিখ্‌বেন্ না তোমার রবিদাদা লিখ্‌বেন। আজ নিশ্চয় ইস্কুল থেকে এসে আপনার চিঠি পাব। রাণু॥

মা, বাব্‌জা, বাবু, আমি, আশা, শান্তি, ভক্তি সব আপনাকে ভক্তি পূর্ণ প্রণাম দিয়েছেন। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

২০

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়েছি। কাল। আপনি চিঠিতে লিখেছেন যে আমার চিঠি পান্‌নি। কিন্তু সেই রেগে চিঠি লেখার পর আমি আপনাকে আরো তিন্‌টে চিঠি দিয়েছি। এইটে নিয়ে চার্‌টের্‌ টা। দেখুন ডাক পিয়নরা কি দেরী করে চিঠি দেয়? ওদের শিগ্গির দেওয়া উচিত। চিঠি যদি খুব শিগ্গির যেত তো কি মজা হোত। আপনারও নিশ্চয় মজা লাগ্‌ত। আপনি এবারকার চিঠিতে শুধু সারাদিন কি করেন তাই লিখেছেন।[১] কিন্তু তবুও বেশ্‌ সুন্দর হয়েছে। আর আপনি আজকাল লক্ষী হয়েছেন। বেশ্‌ বড় বড় চিঠি লেখেন। আপনাকে আজকাল বুঝি morning ইস্কুলের মতন খুব ভোরে উঠতে হয়। আজকাল যে গান হয় সেই গান কি আপনিও গান? বেশী জোরে বল্‌বেন্‌ না। আমি ভাব্‌তাম যে এখানে পড়ার আগে কোন গান কেন হয়না কেন। কাশীর ইস্কুলে আগে থেকেই হত। আপনার কি কাশী আস্‌তে ইচ্ছে করে? আপনি কেন সব জিজ্ঞেসের জবাব দেননা।।।। দেবেন। আর আপনি যখন অত ভোরে ওঠেন তখন সকাল সকাল শুতে যাবেন। কেমন? আর সেই বিষয়ে ভাল হবেন। হ্যাঁ। আমি আজকাল এখানে আপনারই মতন ভোরে ঘুম থেকে উঠি। উঠেই তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কাপড় পড়ে ঠাকুর প্রণাম করে ইস্কুলে যাই। আর খাইও। ইস্কুল থেকে এগারোটার সময় বাড়ী আসি। এসে খেয়ে আপনাকেই আমি প্রায় চিঠি লিখি। কিম্বা গল্পের বই পড়ি। তারপর জিয়োমেট্রি অ্যাল্‌জেব্‌রা এইসব পড়া করি। আর সন্ধ্যেবেলা বাড়ীর বাইরে কিম্বা ছাতে চুপটী করে বসে থাকি। আপনার কথা ভাবি। আপনি তখন নিশ্চয় ছাতে একলা বসে থাকেন্‌। আর সব ভালো হবার কথা ভাবেন্‌। আমিও তাই ভাবি। মাঝে মাঝে। আর তারপর

ঠাকুর প্রণাম করে বাব্জার উপদেশ বলার পর এ জীবন পুন্য কর গানটা গাই। এর মানে সব বুঝ্তে পারি। তার পর শুতে যাই। কাশীতে আজকাল খুব গরম। আর গুমট্। তাই একবার্ বাইরে আস্তে হয় একবার্ ভেতরে। আর আমি আজকাল প্রায় একলা শুই। ভয় করেনা। আপনার কি করে। আমি আগের চাইতে ভাল হব। দেখ্বেন্।

আমি আজকাল ইস্কুলের কাজ সব লাল খাতায় করি। আপনি তো লাল রঙ্ ভালবাসেন। তাই বৌমা জামা বানিয়ে দেবেন। এই রঙের। আজ সন্ধ্যেবেলা থেকে পশুপতির কাছে গান, আর বাজ্না শিখ্তে হবে। আমার কিন্তু ওঁকে দেখে ভারী ভয় করে। আপনি এখন কি কর্ছেন? শুয়ে আছেন? রোজ শোবেন। ঘরে বাইরে দুপুরে কর্বেন্ না। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এখন খুব মেঘলা কালো।

রাণু॥

২১

[জুলাই ১৯১৮]

আপনার চিঠি পেয়েছি। খুব রাগ হয়েছে। আপনি কেন আমার চিঠি উত্তর সব চাইতে আগে লেখেন নি। মাঝে কেন লিখেছেন আর কেন আমার দুটো চিঠির উত্তর অত ছোট্ট লিখেছেন।[1] ওরকম কাগজে আপনি

আর লিখতে পাবেন না। আর আপনি কেন আমার দুটো চিঠি পাননি তার আগেই আশাদের চিঠি লিখেচেন। আপনার সঙ্গে আড়ি। কেমন বিচ্ছিরি কাগচে চিঠি লিখছি। আর রবিবাবু লিখেছি। আমারও না প্রিয়ও না রবিদাদাও না। বেশ হয়েছে। দেখ্‌বেন এবার আপনার কি হবে। আপনাকে আর কেউ চিঠি লিখবেনা। আপনি আজকাল নিশ্চয় এণ্ড্রুজকে বেশী ভালবাসেন।
[শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

আপনি ভারী দুষ্টু। সবচাইতে।
যদি এবার একটা খুব বড় চিঠি না রাণু।
দেন তো আড়ি করে দেব একেবারে। রাণু॥

২২
[জুলাই ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। আপনি কি যেই আমার চিঠি পেলেন অমনি তার উত্তর দিলেন। আমি এখুনি চারটের সময় আপনার চিঠি পেয়েই তার জবাব দিচ্চি। কাল ভোর পাঁচটায় আপনার চিঠি ইস্কুল যাবার আগেই আপনার চিঠি ডাকে দিতে দেব। আমাদের আজকাল খুব ভোরে ইস্কুল যেতে হয় খুব গরমের জন্যে। আমি বৌমাকে চিঠিতে লিখেছি যে আপনাকে একটা সুন্দর লাল জামা করে পরিয়ে দিতে যেদিন আমি আস্‌ব। আর বলেছি যে আপনার চুলের জট ছাড়িয়ে ভাল করে আঁচড়ে

পাউডার মাখিয়ে আর গালে হাল্কা করে রুজ মাখিয়ে দিতে। আপনি পূজো পর্য্যন্ত তো চুল কাটাবেন না তখন বেশ্ বড় চুল সুন্দর দেখতে হবে। কিন্তু তখন আপনি লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্বেন্। যাতে সুন্দর দেখায়। আর সেদিন কখনো ছেলেদের পড়া কর্তে পাবেন্ না। আর অন্য কিছু জিনিষ লিখ্তে পাবেন না। তাহলেই আপনি চুলের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে চুল খারাপ করে দেবেন। আপনি এবার থেকে রোজ আমায় একটা চিঠি দেবেন। কেন দেননা। আমার চিঠি না পেলেও দেবেন। মামা আমাদের জিয়োমেট্রীর ১৬টা অঙ্ক কসতে দিয়েছেন। আরো অনেক। আপনার চিঠি যখন পেলাম তখন জিয়োমেট্রী কস্ছিলাম্। কিন্তু যেই আপনার চিঠি পেলাম তক্ষুণি খাতা টাতা বন্ধ করে চিঠি লিখ্ছি। আর আপনি ও কাগচে চিঠি লিখ্বেন্ না। ভারী ছোট্ট কাগচ আগের মতন বড় কাগচে লিখ্বেন্।। নিশ্চয় বলে দিলাম। বৌমা দেখুন কিছুতেই বড় রঙীন কাগজ আনিয়ে দিচ্চেন না। আবার বল্লে বলেন এখানে রঙীন কাগচ পাওয়া যায়না। যখন কল্কাতায় যাব তখন কিনে দেব। ধরুন উনি যদি কল্কাতায় নাই যান্ তো। আপনি রথীবাবুকে আনিয়ে দিতে বল্বেন্। বৌমা তো ইচ্ছে কর্লেই পার্শেল কর্তে আনাতে পারেন। রথীবাবুকে পার্শেলে আনতে বল্বেন। যদি আপনার কথা শোনেন্। আপনি ছেলেদের যে কবিতা শুনিয়েছেন তা কি জোরে পড়েছেন। ওরা আবার কি অসভ্য আপনাকে দিয়ে দুটো পড়িয়েচে।[১] আপনি আর কখনো ওরা বল্লেও পড়্বেন্ না। আর চেঁচিয়ে তো পড়্তে পাবেনই না। বৌমা বারণ করেন নি। আপনি কি আজকাল সন্ধ্যে বেলা ছাতে একলা বসে থাকেন? আমার জন্যে কি মন কেমন করে। আমার কিন্তু করে। আপনার কি তখন ভাল লাগে? আমার লাগেনা।

আমি আজকাল ছবি আঁকিনা। এবার তাই ছবি আঁকিও নি। এবার আপনি ছবিতে কাকে এঁকেছেন। নিজেকে? আপনার চাইতে ছবিটা ঢের

বিচ্ছিরি হয়েছে। আপনি এবার লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন। কেমন? [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এ কাগচের রঙটা কেমন সুন্দর। আমি নিজে বেছেছি।

রাণু॥

২৩

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা

কাল দুপুরবেলা আপনার চিঠি পেয়েছি। আর যেই আপনার চিঠি পেলাম অমনি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল। কাল থেকে তাই এখানে বেশ্ ঠাণ্ডা হয়েছে। শান্তিনিকেতনেও কি বিষ্টি হয়েছে। আপনি সন্ধ্যেবেলায় কোথায় চুপটী করে বসে ছিলেন? কালও আপনি বেশ্ বড় চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সারা চিঠিটা অনেক বার পড়েছি। আমার খুব সুন্দর লেগেছে। আপনি তো বেশ্ সুন্দর চিঠি লিখ্‌তে পারেন। এদিকে আপনি তো ছোট প্রায় আমারিই মতন। আমাদের সেই লোহার বাক্সটাতে অনেক আপনার সব চিঠি রেখে দিয়েছি। আমি মাঝে মাঝে সেইগুলো পড়ি। আমি আপনার ওপর আর আড়ি করিনি। ভাব করেছি। এবার থেকে আর বেশী রাগ কর্‌বনা। আর আপনিও কিনা খুব লক্ষী হয়েছেন ঠাকুর যা বলেন তাই করেন, আর আমার চিঠি না পেয়েও বেশ্ আর একটা বড় চিঠি লিখেছেন তাই। আপনি ছোট্ট ছবি এঁকেছেন বলে আমার রাগ হয়নি।

আপনার ছবির চাইতে আমার চিঠি বেশী ভাল লাগে। আমি এবার থেকে ভাল হব আর ঠাকুর যা বল্‌বেন তাই কর্‌ব। তখন আপনি খুসী হবেন আর সকলেও? তখন আপনি আমার কথা শুন্‌বেন, আর লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন। আমি আপনাকে পুতুল ভাবিনা।[1] পুতুলের চাইতে ঢের ভাল ভাবি আর বেশী ভালবাসি। আর আজকাল আমার পুতুল নিয়ে খেল্‌তে ভাল লাগেনা। আমাদের শোবার ঘরে আপনার যে ফোটা [য] ছিল সেটা বদ্‌লে সেই যেটাতে আপনি নাম লিখে দিয়েছিলেন সেইটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইটে বেশী সুন্দর দেখ্‌তে তাই। আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। আমি আপনাকে চুমু দিচ্চি। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

আপনি এখন কি করছেন।

রাণু॥

আমাদের পূজোর ছুটী সাড়ে সাত সপ্তাহ পরে আরম্ভ হবে। মামা বলেছেন তখন বেশ্‌ মজা হবে। আবার আমি আপনাকে গল্প বল্‌ব। সব বল্‌ব যা হয়েছে। আর আপনি তারার গল্প ভেবে রাখবেন। কেমন।

প্রবাসীতে ছিন্নপত্র পড়েছি।[2] যাতে মনুর গল্প আছে। মনু কে? সে এখন কোথায়? আপনি সত্যি কি তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন? আপনার দুঃখ হয়েছে? মনু কত বড়?

রাণু।

২৪

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

এখন অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। আশা আলো জ্বেলে বসে পড়্‌চে। আর আমি সাম্‌নে বসে চিঠি লিখ্‌চি। আর দুপুর বেলা আপনার চিঠি পেয়েছি। তখন আমি অঙ্ক কস্‌ছিলাম্‌। আপনার চিঠি পেয়ে খাতা টাতা বন্ধ করে একটা ঘরে গিয়ে প্রথমে পড়্‌লাম্‌। আপ্‌নার এ চিঠিটা সব চাইতে বড় কিন্তু আমার কেমন লাগল। খুব সুন্দর। আমি প্রথমে চিঠি বুঝতে পারিনি। কিন্তু শেষে বুঝতে পার্‌লাম্‌। আপনি বলেছেন আমি বুঝতে ভাল করে পার্‌বনা। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি লিখেছেন আমি খুব ভাল হলে আপনি আমায় বেশী ভাল বাস্‌বেন। পূজোর সময় আপনি দেখ্‌বেন যে আমি ভাল হয়ে গেছি। আগের চাইতে। আমি যখন আপনার চিঠি টিঠি লিখে দেব তখন দেখ্‌বেন আমি ভাল হয়ে গেছি। আর আপনি আমায় রাণু সুন্দরী বল্‌তে পাবেন্‌ না।[১] বেশ্‌ হবে। তখন আমায় আপনি বৌমার মতন বেশী ভালবাস্‌বেন্‌। হ্যাঁ। আজ আমি সন্ধ্যেবেলা বর্ষশেষ কবিতাটা মুখুস্ত করছিলাম্‌। আমার এটা খুব শিগ্গির মুখুস্ত হয়ে যাবে। বেশ্‌ মজা হবে। আশা কাল বোর্ডিঙে যাবে। মন কেমন কর্‌ছে। এবার সবাই শুয়েছে। আমিও শুতে যাই। হ্যাঁ। আপনি বোধহয় এখন ছাতে চুপ্‌টী করে বসে আছেন আর ঠাকুরকে ভাব্‌ছেন। রাণু।

সকাল বেলা লিখ্‌ছি। আজ কিনা রবিবার তাই ইস্কুলে যাইনি। তাই সকাল বেলা চিঠি লিখ্‌ছি। এখন বেশ্‌ মেঘ্‌লা আমি আপনার চিঠি আবার পড়েছি। আপনি বুঝি ভাবেন আমি শুধু আপনার চুল আঁচড়াতেই ভালবাসি। আপনার চাইতে। তবে আপনিও বুঝ্‌তে পারেন নি। আমি আপনার চিঠি এবার

থেকে রোজ পড়্ব। আপনি কি যাকে ভালবাসেন তারাই খুব ভাল? আমিও তো ভাল হয়ে যাব।

রাণু॥

আপনি কি করে জান্‌তে পার্‌লেন আমি আপনাকে গম্ভীর বুঝ্‌তে পারি না।[১] আপনার উপাসনার সময় আমার আপনাকে খুব ভাল লাগ্‌ত। আপনি আপনার ঠাকুরের যে কাজ করেন আমিও সেই সব করব। আমিত আগেই বলেছি। আমিও আপনাকে সাহায্য কর্‌ব। তখন আপনাকে বেশী কাজ কর্‌তে হবেনা। আমি বেশীর ভাগ কাজ করে দেব। তখন আমি বেশী ভাল হব তাই ঠাকুরের পূজোও বেশী ভাল হবে। তখন বেশ্। আমি আর আপনার ওপর রাগ কর্‌ব না। ভাল হব কিনা তাই আর বৃহস্পতি বারে থেকে পশুপতির কাছে গান শিখ্‌ব। হ্যাঁ। পশুপতি বলেছে। আপনাকে আমি চুমু দিচ্চি। আপনার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করে। ভাবি। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

আপনি বেশী করে খাবেন। কেমন। লক্ষী হবেন।

রাণু॥

২৫

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনি বেশ্ সুন্দর চিঠি লেখেন। আর আপনি এবার বেশ্ সুন্দর কাগচে আর খামে চিঠি দিয়েছেন

তাই ভাল দেখাচ্ছে। আপনি উপাসনা থেকে এসেই বুঝি আমার চিঠি পেলেন।[১] তখনিই কি জবাব দিয়েছিলেন। এ্যান্‌ড্রুস্ ঘরে বাইরে করতে আসেন্ নি? আপনি বেশী কর্‌তে পাবেন না। আপনার উপাসনায় আমার যেতে ইচ্ছে করে। আপনি কি সেদিনও সেই লালরাস্তায় একলাটী বেড়াচ্ছিলেন। আপনি কি উপাসনার কথা ভাব্‌ছিলেন? আমি আজকাল ভাল হই। তাই আপনার বেশীর ভাগ কবিতা বুঝ্‌তে পারি আজকাল। আমি আজকাল শুধু একটু রাগ করি। তাই এ্যান্‌ড্রুস্ সাহেবকে চিঠি দিয়েছি। আমিও আপনাকে খুব ভালবাসি। আর দেখ্‌বেন্ তাই খুব ভাল হয়ে যাব। তখন আপনি দেখ্‌বেন্ আমি আপনাকে বেশী কাজ কর্‌তে দেবনা। আমি আপনার মতন ভাল করে কাজ করে দেব। আপনি তখন বুঝি খুসী হবেন? আপনি দেখ্‌বেন্? আপনি এখন কি কর্‌ছেন। ছেলেদের পড়াচ্ছেন বোধহয়।

রাণু॥

আপনি আজকাল লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন্। কেমন? আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। সন্ধ্যেবেলায় আপনার কথা ভাবি। আজ রবিবার। তাই সকালে চিঠি লিখ্‌ছি। আর morning ইস্কুল হবেনা এখানে খুব বৃষ্টি হয় তাই। আমার চুমু আপনাকে দিচ্চি। রাণু॥

শুনুন্ যেমন আপনার ইস্কুলের ছেলেরা তেমনি বাব্‌জার কলেজের ছেলেরা পৌষ পার্ব্বনের দিন পিঠে খেতে চেয়ে ছিল।[২] রাত্তিরে ত্রিশ চল্লিশ জন ছেলে খেতে এল। তারা খুব শিগ্গির যত পিঠে পরমোন্ন খেয়ে ফেল্‌ল। তারপর আমাদের যত খাবার ছিল সব খেল। তারপর লুচি তরকারী খেতে চাইল। তারা এত লুচি খেল যে সব ঘী শেষ হয়ে গেল। তখন আবার ঘী আনিয়ে লুচি দেওয়া হল। সব ফুরিয়ে গেলে সকাল

বেলার বাসী তরকারী আর অম্বল খেল কাড়াকাড়ী করে। সেদিন কি মজা হয়েছিল।

এক্ষুনি একজন স্ত্রীলোক এসেছিলেন্। তিনি খুব কাঁদছিলেন তার ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আজকাল আমাদের বাড়ী অনেক লোক আসেন। তাঁদের সব ছেলেদের ১৫/১৬ বছরের ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁরা খুব কাঁদেন। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

ভারী দুঃখ হয়। না?।

২৬

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু কাল কেন উত্তর দিইনি বলি। কাল আমার মাথা ধরেছিল। আপনি নিশ্চয় রাগ করেন নি। আর আপনি ভালও হয়েছেন। দুপুরে লক্ষী হয়ে শুয়ে থাকেন। আপনি যখন শুয়ে থাকেন তখনি বুঝি এইসব দেখেন। ওখানে তো বেশ্ দেখা যায় কিন্তু কাশীতে ওসব কিছুই দেখা যায়না। কিন্তু আমার দেখতে বেশ্ সুন্দর লাগে। আপনি কি চিঠি লিখেছিলেন এই সব দেখতে দেখতে। সেই দরজাটা থেকে যেটা ছাতের দিকে। আমি আপনার সেই চিঠিটা পড়েছি আর সুন্দর লেগেছে। আমি সকালে চিঠি লিখ্তে সুরু করেছিলাম কিন্তু ৯টা বেজে গেল। তাই খারাপ লাগ্‌ছিল এত। তাই শেষ করিনি। এখুনি ইস্কুল থেকে এসেই খেয়ে উত্তর দিচ্চি। আপনি আজকাল আমার চাইতে বেশী একটু

ভাল হয়েছেন। বেশ্ শিগ্গির উত্তর দেন কিন্তু আমি আপনার চাইতে বেশীক্ষন ইস্কুলে থাকি। আপনি কি বিশ্ব প্রকৃতিকে বেশী ভালবাসেন।[১] খুব। যদি বাসেন তাহলে ওর ভেতর নিশ্চয় আপনার ঠাকুর আছেন। আর আপনি তো বলেন ঠাকুরকে বেশী ভালবাস্তে চেষ্টা করেন। তবে নিশ্চয় বিশ্ব প্রকৃতিকেও কেবল চেষ্টা করেন। বোধ হয় বিশ্বপ্রকৃতি আপনাকে আমার চাইতে কম ভালবাসে। আমিও কোর্ব। কিন্তু এখানে ভাল করে দেখা যায়না। কিন্তু আমরা রোজ সন্ধ্যে বেলা ঠাকুরকে ডাকি। ঠাকুর প্রণাম হয়ে গেলে বাব্জা রোজ্ আপনার কথা বলেন। তবে নিশ্চয় আপনি ঠাকুরকে বেশী ভালবাসেন। আজকাল আশা বোর্ডিঙে গেছে তাই আমাদের সঙ্গে থাকেনা। আর বাব্জাও কলেজে যান্না। আপনি কাশীতে এক্টুখানি ছুটী নিয়ে আসুন্ না। আপনার আস্তে ইচ্ছে করেনা। আসুন্ না। আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। কিন্তু আজকাল প্রায় কাঁদিনা। আপনারও কি মন কেমন করে বিছানায় লুকিয়ে। এখানে আজকাল খুব বৃষ্টি হয় তাই ছাতে বসিনা।। আমি আজকাল ভাল হই। আপনিও হবেন ভাল। আর চুল ভাল করে আঁচড়াবেন। আমি ইস্কুলে যাবার সময় চুল বেঁধে যাই। এখনি বাঁধতে হবে। আজ আমাদের বাড়ী এখনি কতকগুলি অতিথি আস্বেন। আমি আপনাকে চুমু আর আদর দিচ্ছি।
[শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু।।

আপনি এখন কোণে বসে লিখ্ছেন।

রাণু।।

আমি স্বপ্ন দেখেছি যেন আপনার অসুখ করেছে। এখন কি সেরে গেছেন?

রাণু।।

২৭

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আমি কাল ইস্কুল থেকে এসেই আপনার চিঠি পেলাম কিন্তু বিকেল হতে না হতেই যিনি আমাদের গান শেখান এসে গেলেন। তাই সেই জন্যে কাল উত্তর দিইনি। আজ ইস্কুল থেকে এসেই দেখি আমার বিছানার ওপর আপনার চিঠি রাখা। কি মজা। তাই আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু চিঠি কাশী থেকে ওখানে যেতে ভারী দেরী লাগে। আর ডাকহরকরারা ওখানকার নিশ্চয় আপনাকে দেরীতেও চিঠি দেয়। ওরা ভারী দুষ্টু আর আপনিও। আপনি কখ্‌খনো চিঠি দেখে তার উত্তর দেননা। যা জিজ্ঞেস করি কেন তারও উত্তর দেননা। কেন। আপনি ভারী দুষ্টু।

আপনি যেমন লিখেছেন ওখানে খুব বৃষ্টি হয় তেমনি এখানেও হয়। কিন্তু আজ সারাদিন বিষ্টি হয়নি। তাই আজ একটু গরম। বিষ্টির দিন ইস্কুল যাবার সময় এত মজা হয়। মাঝে মাঝে কাপড়ও ভিজে যায়। আমি কিন্তু ইচ্ছে করে ভিজিনা আপনিও ভিজ্‌বেন না। না ত অসুখ হবে আর ভাল হবেন। এইবার সেই গানের মাষ্টার হির্‌লেকর আস্‌বেন। উনি আমাদের দুটো হিন্দী ভজন শিখিয়েছেন। একটা ভূপালী একটা ঝিঁঝোটী। নামটা কিছুতে মনে থাকেনা। উনি এমন মুখ করেন যে খুব হাসি পায়।

এখন সকাল। রাত্তির থেকেই খুব বিষ্টি হচ্ছে। আপনার গল্প কেন মনে আসেনা। শুনুন, আপনি একটা খুব বড় গল্প মনে করে রাখ্‌বেন্। আর আমায় তখন বল্‌বেন্ খন্। আপনার শিগ্গির ঘরে বাইরে শেষ হয়ে যাবে। বেশ্ হবে। আর বয়স সাতাশই থাকবে। বাড়াবেন না যেন। বেশী পড়া কর্‌বেননা যেন আমি আজকাল রাত্তিরে পড়িনা। কিন্তু দিনে সকাল বেলা থেকে পড়ি। আমি আজ্‌কাল ভাল হই। আপনি বিদায় অভিশাপ

বেশী করে কর্‌বেন না।[১] আর আপনি কি কোন নতুন কবিতা লিখেছেন।? আমি কাল রাত্তিরে, মামা একটা কবিতা পড়্‌তে বলেছিলেন সেই পড়্‌ছিলাম। তার নাম 'New Year's eve'. এই কবিতাটা এত দুঃখের যে কান্না আসে। অনেকটা বিদায় বলে কবিতার মতন। এটা মেয়ের একটী গল্প। সেটা পড়ে অনেক বার কান্না আস্‌ছিল তাই আশা বই নিয়ে নিল। আপনাকে চুমু দিচ্চি। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

২৮

[? অগাস্ট ১৯১৮]

... আর শুনুন আপনি অজানা গানটা[১] আমায় লিখে পাঠাবেন। আলাদা ও গানটা কিনা আমার সব চাইতে ভাল লাগে। তাই। আমার কল্পনা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আরো সব পড়্‌ব। আর আমি যাবার পর কি কোনো নতুন কবিতা লিখেছেন? যদি লিখে থাকেন তো বেশ হয়। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপনি একটা ছোটগল্প প্রবাসীর লিখ্‌বেন। তাতে একটা খুব সুন্দর নামের মেয়ে যেন থাকে। হ্যাঁ। [? শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এবার একটা মস্ত বড় চিঠি দেবেন।

রাণু॥

ওপিঠে ছবি আছে॥

২৯

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় দাদারবি,

কেমন আপনাকে দাদারবি লিখেছি। আমি আপনার অনেক নাম ভেবেছি।[১] পরে তখন বল্‌ব খন। আমি আপনার চিঠি পেয়েছি। আর আপনি আজকাল বেশ্‌ বড় চিঠি লেখেন। আর আপনি যে রকম লেখেন আমার বেশ্‌ ভাল লাগে। আপনার চিঠি অনেক বার পড়েছি। আপনি ডাকহরকরাদের বল্‌বেন চিঠি আপনাকে শিগ্গির দিতে। আমিও রোজ দেখি যখন ওরা আসে। ওরা ভারী দেরী করে। আপনি আবার বিশ্বপ্রকৃতির কথা লিখেছেন। আপনি কি যখন ছোট্ট ছিলেন দুপুর বেলা সেই জানলায় যেটা উত্তরদিকে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখ্‌তেন। আজকাল বেশীরভাগ বোধহয় মেঘই দেখ্‌তে পান। আপনি প্রত্যেক চিঠিতে ভাল হতে বলেন। কিন্তু আজকাল আমি আগের চাইতে ভাল হই। আমি আপনার মতন ভাল কাজ করব। আমি তো বলি। কিন্তু আপনি আমায় চিঠিতে ভাল হতে বল্‌বেন। আমার ভাল লাগে। আপনি বলেছেন আমি পান্থ।[২] আপনি কোন রাস্তা দিয়ে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন। আপনি কত কাছে গেছেন। আমিও তো সেই পথে যাচ্চি। কিছুদিন বাদেই আমি আপনার কাছে যাব। কি মজা হবে। আপনি ঠাকুরকে কত ভালবাসেন।। আর আপনি সেই জন্যেও ভাল হবেন। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। আজ সন্ধ্যেবেলা অনেক আপনার কথা মনে হচ্ছিল। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

অনেক সুন্দর এবার ছবি আঁকবেন। অনেক দিন আঁকেন নি॥ রাণু॥

মা, বাব্‌জা আমি আর ভক্তি বোধহয় আল্‌মোরায় যাব। বোধ হয়

বুধবারে। আশা আর শান্তি বোর্ডিঙে থাক্‌বে। তাহলে। সেখানে গিয়ে আপনাকে ঠিকানা বল্‌ব। চিঠি দেবেন। তাহলে। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এ চিঠির উত্তর দেবেন এই ঠিকানাতেই। এও ভুলে যাবেন না যেন।

রাণু॥

৩০

[অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

যখন আমি আপনার চিঠি পেলাম তখন তার পরদিনই আমরা চলে এলাম। সেইজন্যে চিঠি দিতে দেরী হয়ে গেছে। আপনি রাগ করবেন না। এখন আমরা আলমোরায়। এখানে কাশীর চাইতে বেশী ঠাণ্ডা। আমরা কাল সন্ধ্যেবেলা এখানে এসেছি। এখন সকাল। খুব রোদ হয়েছে। আমার সামনেই নানা রঙের ফুল রয়েছে। এখানে অনেক লাল ফুল আছে। যেখানে বসে আপনাকে চিঠি লিখছি তার সামনেই লিলি ফুলের পাতা ঝরে পড়েছে। আর ডাণ্ডিতে আসবার সময় ছোট্ট ২ অনেক লাল ফল দেখেছি। আপনাকে পাঠাব সেই ফল আর ফুল আপনি বলবেন যে সেই রকম লাল কি আপনার ভাল লাগে? সেই ফল তুলতে গিয়ে আমার হাতে কি জানি কি ফুটেছিল কিম্বা কাম্‌ড়েছিল। খুব লাগছিল। আমার নাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখনি আমাদের বাড়ীর সামনে ব্যাঁকা রাস্তায় নেপালীরা মার্চ্চ

কর্‌ছিল। মার্চ্চ হয়ে যাবার পর চেঁচিয়ে ২ কি সব বল্‌ছিল। এখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। আমাদের সামনের দেবদারু গাছ নড়্‌ছে আমাদের বাড়ীর সামনে পাহাড় দেখা যায়। কেবল এত দেবদারু গাছ না থাক্‌লে আরো স্পষ্ট দেখা যেত। আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। তাই আমি আপনার সব্‌ শেষের চিঠি সঙ্গে করে এনেছি। অন্য সব আনিনি আন্‌লে যে বাক্সয় ভাল কাগচ আছে সে বাক্স এখনো এসে পৌঁছোয় নি। আমি উলু দিতে জানি না কিন্তু সুনেছি।[১] আপনি কি উলু দিতে জানেন? না জানলে বেশ্‌ হয়। আর মামাও বোধহয় জানেন না। আপনি এখানে যদি আসেন তো বেশ্‌ হয়। দু তিন সপ্তাহ কেবল একটু ছুটী নেবেন। যদি আসেন তো আমি আপনাকে অনেক লাল ফুল এনে দেব। আর আপনাকে গল্প বলব। আর আপনিতো আরো এসেছেন রাস্তায় চেনেন। আসবার সময় রাস্তা কি সুন্দর। আল্‌মোরার কাছেই এত ভীষণ নদী আছে একটা যে তার কাছ দিয়ে যাবার সময় ভয় কর্‌ছিল। সে এত জোরে চল্‌ছে যে খুব দূর থেকে তার শব্দ শোনা যায়। আর কি সুন্দর পাহাড় দেখা যায়। আমি কাল সকালে দুষ্টুমি করে ছিলাম কিন্তু বিকেল থেকে আবার ভাল হয়েছি। মা বলেছেন।। আর আমি বেশী খেতে চেষ্টা করি। কাল সন্ধ্যেবেলা বাব্‌জা মা বলেছেন যে ভোরে উঠেই আপনার কথা ভাবতে। কিন্তু আজ ভোরে উঠেই ওম্‌নিই আপনার কথা মনে হয়েছে। আমি আপনার কথা সব সময় ভাবি।। এখন আমার সামনেই রোদ হয়েছে। এখনি আপনার একটা চিঠি কাশী থেকে ঘুরে এল। এ চিঠি যেদিনই আমরা কাশী ছেড়েছি সে দিনই দুপুরে আমাদের বাড়ী এসেছে। এর উত্তর আলাদা দেব। এবার থেকে আপনি এখানকার ঠিকানায় চিঠি দেবেন। ঠিকানা ভুল্‌বেন না যেন। আর দুষ্টুমি কর্‌লে রাগ কর্‌ব। আপনাকে আদর দিচ্চি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু।।

একরকম লাল ফুল।[১]

৩১

[অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

এটা আগে লিখেছি।

প্রিয় রবিদাদা,

আমি আপনাকে দুপুরে খাওয়ার পর চিঠি লিখ্ছি। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্চে। তাই অন্য দিনের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা। কেবল এখন রৌদ্রের ভেতরেই একটু একটু করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের সামনের পাহাড় মেঘে ঢেকে গেছে। আপনি যদি আসেন তো বেশ হয়। আমি কাল যখন আপনাকে চিঠি লিখ্ছি এমন সময় আপনার চিঠি পেলাম। আমি সে চিঠি শেষ করে তাতে ফুল দিয়ে তাকে বন্ধ করে আপনাকে পাঠালাম। তারপর আপনার সে চিঠি পড়লাম। আজও আমাদের বাড়ীর পেছুনদিকে একটা ঘাসে ঢাকা ঢালু রাস্তা দিয়ে ডাকপিয়ন এসে আমার হাথে চিঠি দিয়ে গেল তার থেকে আমি আমার চিঠি বেছে নিয়ে অন্য সব বাব্জাকে দিলাম। যে চিঠি কাশী থেকে ঘুরে এসেছে সে ভারী আশ্চর্য্য এসেছে। তাতে বাব্জার নাম লেখা ছিলনা শুধু ঠিকানা ছিল তবুও চিঠি আমাকে দিয়ে গেল। আপনি আজকাল খুব লক্ষী হয়েছেন। অনেক চিঠি লেখেন। আগের মতন অত ভুলে যাননা। আমারও আপনাকে চিঠি লিখ্তে বেশ ভাল লাগে। আর আপনি প্রায়ই উপাসনার দিন চিঠি লেখেন। আপনি যে 'বীণা বাজাও' গান বলেছেন তা কি আপনি রোজ সন্ধ্যেবেলা গান? অনেকক্ষণ ধরে? আপনি চিঠি পাওয়ার পর আবার লিখেছেন আমি ইস্কুল পালিএছি। কিন্তু আমি পালায় নি। কখ্খনো। যাকে হয় জিজ্ঞেস কর্বেন। আমি ছুটীও নিইনি। বাব্জা জোর করে একটা চিঠি পাঠালেন। চিঠি দেবার সময় এত লজ্জা করছিল। দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিলাম। আর আমি এখানে পড়ার

বইও নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখানে বেশী পড়িনা। আমি ভূগোলের বইও এনেছি। আর এখন এসিয়া পড়িনা Europe পড়ি। কিন্তু এসিয়ার রাস্তা ভুলিনি। আপনি যদি দূরে কোথাও যান তো আমায় বল্‌বেন আমি রাস্তা বলে দেব। কিন্তু Irkutskএ যাবেন না।[1] মরুভূমি পাহাড় সব পার কর্‌তে হয়। মাটীর ওপর দিয়ে গেলে। কিন্তু আপনিও বেশ্ ভাল। আপনি বেশ্ ঠাকুরের কাজ করেন। আমিও কোর্‌ব। কাল বাব্‌জা বদ্রী সার বাড়ী গিয়েছিলেন। বদ্রী সাও আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আজ যে চিঠি এসেছে তার উত্তর কাল দেব। আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

এখনো বেশীর ভাগ জিনিষ আসেনি তাই একটা বিচ্ছিরি কাগচে দিচ্চি। কাগজ এলে তাতে দেব। হ্যাঁ। আপনাকে একরকমের ফুলের পাতা দেব।

রাণু॥

৩২

[অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

এটা শেষে লিখেছি।

প্রিয় রবিদাদা,

আমি কাল আপনাকে একটা চিঠি লিখে রেখেছি আজ সেই চিঠি যা কাল এসেছিল তার উত্তর দিচ্চি। কিন্তু আপনি একেবারে জিতে যাননি। আপনি বেশী যে চিঠি লেখেন তার উত্তরও তো আমি দিই। সেইজন্যে

আপনি একেবারে জেতেন নি। আপনি যখন আলমোরায় থাক্‌তেন তখন যেমন ক্যান্টর্মেন্টে থাক্‌তেন আমরাও তেমনি ক্যান্টর্মেন্টে থাকি। কিন্তু এ বদ্রী সার বাড়ী নয় বদ্রী দত্তের বাড়ীর। আমাদের বাড়ীর সামনেই অনেক পাহাড় আছে কিন্তু তারও সামনে আমাদের বাড়ীতে এত দেবদারু গাছ যে পাহাড় টাহাড় কিছুই ভাল করে দেখা যায়না। বাড়ী থেকে একটু দূর গেলেই দেখা যায়। আজ আমরা সকালে বাব্‌জার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে সময় ভোর ছিল তাই সব পাহাড়েতে সূর্য্যের আলো লেগে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি অনেক পাহাড়ী ফুল আর পাতা তুলে ছিলাম। আপনাকে অনেক সুন্দর একটা রকমের পাতা দেব। আমিও এখানে আসবার আগে ভেবেছিলাম পাহাড় খুব উঁচু আর ডাণ্ডিওয়ালারা একেবারে পাহাড়ের গা দিয়ে যাবে। ওরা রাস্তা দিয়ে যায়। সে ত সবাই পারে। ওরা যদি সোজা পাহাড়ের গা দিয়ে যেত তো বেশ্‌ মজা লাগ্‌ত। আপনার সোজা গেলে কি ভাল লাগ্‌ত? যখন রামগড় আসবার সময় সেই সন্ধ্যেবেলা পাইনের বনের মধ্যে দিয়ে আস্‌তে হয় সে সময় সব চাইতে সুন্দর লাগে। তখন কি সুন্দর কুয়াশায় ভরে যায়। সেখানে একটা খুব ঠাণ্ডা জলের ঝরণা আছে। সে জলে শুধু আমি চুপি ২ একটু খানি পা ডুবিয়ে ছিলাম। আপনার কি সেখানটা সুন্দর লাগে। হিমালয় যদি আরো উঁচু হোত তো বেশ্‌ হত। আপনার কোন্‌ পাহাড় সব চাইতে বেশী ভাল লাগে। আপনি লিখেছেন আলমোরা ন্যাড়া[১] কিন্তু আমাদের বাড়ীর কাছে আর চারিধারে অনেক সুন্দর ফুলের আর অন্য বড় গাছ আছে। আপনি যদি আসেন তো বেশ্‌ হয়। আর আপনিও সুন্দর জায়গায় বসে উপাসনা করতে পারেন। আমি আপনাকে উপাসনার সময় ফুল এনে দেব আপনি ঠাকুরকে দেবেন। আপনি আসবেন। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

৩৩

[২৯ অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

আজ বেড়িয়ে এসেই দেখি পড়ার টেবিলে আপনার চিঠি রাখা। আমি ভেবেছিলাম যে আজ যদি আপনার চিঠি না আসে তো আপনাকে একটা চিঠি লিখ্‌ব আপনার চিঠি গুনে দেখেছিলাম সোমবারে আস্‌ত কিন্তু দুদিন দেরী হবার পরও এল না। আমার তাই একটু রাগ হয়েছিল সে কিন্তু একটু। আমি ভেবেছিলাম আপনার অসুখ করেছে। চিঠি যেতে কি দেরী হয়। এমন খারাপ লাগে। আপনাকে যেসব চিঠি লিখি তার সঙ্গে যে সব চিঠি ডাকে গেছে অন্য চিঠি যাদের লেখা হয়েছে তারা সব পেয়েছে। আপনি কেন পাননি? এখন দুপুরবেলা। খুব গরম হয়েছে আর খুব রোদ। এখানে বিকেলে প্রায় বৃষ্টি হয়। আর আমরা প্রায় সকালে বিকেলে বেড়াতে যাই। কিন্তু বেশী পড়া হয় না। এ সময় আপনি যদি আসেন তো বেশ্ হয় আর আপনারও নিশ্চয় ভাল লাগে। আমরা যে যায়গায় থাকি সেখানটা ন্যাড়াও নয়। বেশ্ দেবদারু গাছের ছাওয়ায় বস্‌বেন্। আমিত আপনার কাছে গিয়েছিলাম। আর পূজোর ছুটীর সময় তো আমি আবার আপনার কাছে যাব। তাই আপনিও আসুন্। আমার এখানকার পাহাড় বেশ সুন্দর লাগে। আসবার সময় রাস্তা সব চাইতে সুন্দর। এখানেতে আমাদের বাড়ীথেকে একটুখানি বেরুলেই অনেক পাহাড় দেখা যায়। পাহাড় থেকে যে সব ঝরনা বেরিয়েছে তারা কি জোরে দৌড়োয়। কিন্তু দূর থেকে সে নদী দেখলে কি শান্ত বোধহয়। আমার ডাণ্ডি থেকে নাম্‌তে খুব ইচ্ছে করছিল। আমি তিনচার জায়গায় নেমেওছি। একটা গ্রাম পাহাড়ের নীচেই সেই গ্রাম আমার খুব সুন্দর লেগেছিল। সেই গ্রামের যা নাম তার মানে

সোনালী। আপনি যদি দেখেন তো আপনারও নিশ্চয় খুব সুন্দর লাগে। আপনি যদি এমন সময় আসেন ছুটী নিয়ে। একটু। আসবেন্। আপনাকে আজকাল অনেক কাজ কর্তে হয়। আপনারও নিশ্চয় এ সব কাজ ঠাকুরের কাজ বলে ভাল লাগে। কিন্তু আপনি নিশ্চয় কম খান্। শেষে পূজোর সময় দেখ্বেন আমি কি মোটা হয়ে গেছি। আপনি যদি রোগা হন তো আমার আপনার উপুর খুব রাগ হবে। আপনাকে একটা গল্প ভেবে রেখেছি বল্ব কিন্তু তাহলে কখ্খনো বল্বনা। বেশ্ হবে। আমি তো আপনাকে আগের থেকেই বলেছি এম্ এ পাশ করে ছেলেদের পড়াব। আর আপনার চিঠি সব লিখে দেব। আপনি সব ভুলে যান্। দেখবেন তখন আপনারি মতন করে পড়াব। যদি আমি অনেক পড়া জান্তাম্ তো খুব শিগ্গির বেশ এম্ এ পাশ করতাম্। আপনি কেন লিখেছেন আমি কিম্ভূতকিমাকার। আপনি তো বেশ্ সুন্দর। আমার আপনাকে দেখে তাই জন্যে একটুও ভয় করেনি। আপনার কি আমার জন্যে মন কেমন করে। আজ এখানে জন্মাষ্টমী।[1] বিকেল বেলা মেলা হবে আজ সেই গুর্খা সৈন্যরা নিশ্চয় খুব মারামারী কর্বে। আপনাকে আমার চুমু দিচ্চি। [১২ ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

আমাদের জিনিষ এসে গেছে তাই কাগজ ভাল পেয়েছি আনিও তো বেশ্ বড় চিঠি লিখেছি।

রাণু॥

৩৪

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনি আমার চিঠি দেরীতে পান কিন্তু আমি আপনাকে কখ্‌খনো দেরীতে চিঠি দিইনা। প্রায় যে দিন পাই সেই দিনই তার উত্তর দী। আপনি বুঝি ভাবেন আমি আপনাকে চিঠি দিতে ভাল বাসিনা। শুধু মোটা হতেই চেষ্টা করি। কিন্তু না আমার আপনার চিঠি বেশ্‌ পেলে আনন্দ হয়। আপনি আমার চিঠি না পেলেও লিখ্‌বেন। আপনার নিশ্চয় আমাকে চিঠি লিখ্‌তে সব চাইতে বেশী ভাল লাগেনা। আমার আপনাকে লিখ্‌তে খুব ভাল লাগে। আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমন করে। আপনারও করে নিশ্চয়। এখানে থেকে আপনাকে তারা দেরীতে চিঠি দেয় কিন্তু আপনার কাছ থেকে ঠিক সময়ে আসে। আপনি মোটা হতে বলেছেন আর আমি হতে চেষ্টাও করি। আপনার কি মোটা হতে ইচ্ছে করে? এখানে অনেক দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে গরুর গন্ধ। তবুও আমি খাই। আজকাল আমি নিশ্চয় আপনার সমানই খাই। আর মা বলেন আমি আগের চাইতে ভালও হয়েছি। আমরা রোজ বেড়াতে যাই। এখানে এতদিন হাওয়া ছিলনা কিন্তু কাল থেকে একটু হাওয়া হয়েছে। আমরা রোজ এক ধারার ধারে এসে বসি। এখানে এত দেবদারু গাছ যে সব বাড়ীর নাম এই দিয়ে। আমি একটা দেবদারুর ফল তুলেছি সেটা বেশ বড়। সেই ধারার কাছেই পাইনের গাছ থেকে আমি দু তিন গুচ্ছ ছিঁড়েছিলাম। তার মজার পাতা চিঠিতে পাঠাব। এখানে অনেক রঙের পাহাড়ী ফুল আছে। কিন্তু গন্ধ নেই। আমরা বেড়িয়ে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করি। ঠাকুর প্রণামএর পর আপনাকেও করি প্রণাম? আপনি কি বুঝতে পারেন? আমি দেখবেন

আপনার সেক্রেটারী হব। আর রোগা না হলেই তো হোল। এখানে আজকাল একটুও ঠাণ্ডা নেই। খুব রৌদ্র হয়। আপনাদের ওখানে তো বেশ ঠাণ্ডা? আপনি কি আজকাল সেই নতুন বাড়ীতে থাকেন? আমি যখন যাব তখন আপনি কোন বাড়ীতে থাক্‌বেন? আপনার বাড়ীর চারিধারে কি সব ফুলের গাছ পুঁতেছেন?[১] এবারে সেই অন্য বাড়ীতে সাদা আর সবুজ পাতার গাছ পুঁতবেন না। মালীকে বলে দেবেন। আর আপনি এই বাড়ীর মত অনেক লাল ফুলের গাছ পুঁতবেন আপনার তো লালরঙ সব চাইতে ভাল লাগে।

আজ আপনারই সঙ্গে আশাদের চিঠি এসেছে। আশা আমাকে লিখেছে যে জন্মাষ্টমীর দিন ওদের থিয়েটার হয়েছিল। শান্তি নাকি দেবকী হত কিন্তু অনেক কাঁদবার ভয়ে হলনা। কৃষ্ণ চলে যাবার পর তাকে কিনা খুব কাঁদতে হয়। তাই ও গর্গ মুনি হয়েছিল। ছাই মেখে গেরুয়া কাপড় পরে, কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নাকি সংস্কৃততে বিবাহ রীতি ব্যাখ্যা করেছিল। আশার ঠিক ছিল নারদ মুনি হয়ে সেতার বাজাবে আর গান করবে। কিন্তু যে মেয়েটি বাসুদেব হত তার অসুখ কর্‌ল। থিয়েটার হবার ১ দিন আগে। তখন একদিনের মধ্যে ওকে পার্ট মুখুস্থ করতে হল। তারপর ও মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট, হাতে, আর গায়ে হল্‌দে জরীর জামা পোরে তোয়ালেকে কৃষ্ণ করে তাড়াতাড়ীতে সেই কৃষ্ণ হাতে কোরে যমুনা পার হল। একজন ছোট্ট মেয়েকে কর্‌বার্‌ কথা হয়েছিল কিন্তু সে হবার সময় খুব চেঁচাতে লাগ্‌ল। তার বাবা তাকে নিয়ে নিলেন। ও এমন মজার লিখেছে যে পড়ে খুব হাসি পায়। আপনাকে আদর দিচ্ছি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু ॥

৩৫

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

আজ বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌ছি এমন সময় ডাকপিয়ন এসে আপনার চিঠি দিয়ে গেল। আর সুবোধ বাবুর কাছ থেকে বাব্‌জার ওসুধও তার সঙ্গে দিয়ে গেল। আমি আপনাকে তাই বাব্‌জার ছোট্ট পড়ার টেবিলে বসে চিঠি দিচ্ছি। এখন দুপুর বেলা। একটুও হাওয়া নেই। আর রোদ নেই। আর আমার সামনেই দুটো লম্বা ২ দেবদারু গাছ রয়েছে। আর তার পেছনে একটুখানি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আপনারও এ জায়গাটা নিশ্চয় খুব সুন্দর লাগ্‌ত। এখানে তিনচার দিন থেকে একটু বেশী ঠাণ্ডা হয়েছে। সকালে তো খুব কুয়াশা হয়। কোন জিনিষই স্পষ্ট দেখা যায়না। সকালে বিছানা থেকেই দেখি সব দেবদারু গাছ অস্পষ্ট। কুয়াশার ভেতর দিয়ে যেতে এমন মজা লাগে। চুলে জলের ফোটা পড়ে চুল ভিজে যায়। আমাদের একটী ছোট্ট ইউরেশিয়ণ্‌ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। সে অনেকটা এণ্ড্রুজ সাহেবের মতন দেখ্‌তে। কেবল রঙ্‌ শাদা শাদা। উনি কি আমার চিঠি পেয়েছেন? দেখলেন? আমি আজকাল ওঁকেও চিঠি দি। কেমন, আমি কি আর ওঁকে হিংসে করি। আমি আপনার চিঠিও সবটা না বুঝতে পারলেও বেশ্‌ সুন্দর লাগে আর আমি বুঝতে চেষ্টাও করি। আজকাল আপনি ছেলেদের কদিন পুরোণো পড়া করতে দেন সপ্তাহের মধ্যে আপনি তাদের পুরোনো পড়ার দিন কি করেন? এবার থেকে সেই দিন আমায় চিঠি দেবেন। আমার কাছ থেকে চিঠি না পেলেও। আপনার লক্ষীর পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেছে।[1] আপনি কি এবার সেটা করবেন? আপনি নয় কল্যাণী নয় লক্ষী সাজ্‌বেন। ক্ষীরো সুকুমারবাবুকে হতে বল্‌বেন উনি বা

মোটা। আমরা এখানে বলাকা, চয়নিকা আর অন্য সব বইও এনেছি। আমি বলাকায় বেশীর ভাগ কবিতাই বুঝতে পারি। আর আমি আপনিই পড়ি। আপনি চয়নিকায় যে ভিরুতা[২] বলে কবিতা লিখেছেন না, তাতে সখি কাকে বলেছেন? যদি ঠাকুরকেই বলেন তো সখি কেন বলেছেন। আপনি আমায় উপাসনার দিন কেন চিঠি লেখেন না। আপনি ভারী দুষ্টু। সব জিনিষ ভুলে যান। আমি ভাবি আপনি দেবেন। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। আপনারও নিশ্চয় আমার জন্যে মন কেমন করে। আমি এবার November মাসে, দেওয়ালীর ছুটীতে যখন আপনার কাছে যাব তখন ছোট বৌকেও নিয়ে যাব। এখানকার পাহাড়ী মেয়েরা আর মেয়েমানুষেরা সবাই ছোটবৌরা যে সব পুঁথি আর মুক্তোর মালা পরে তাই পরে। দেখুন আপনি রবিদাদার চাইতে একটা ভাল নাম আমায় বেছে দিন। কিন্তু সে নাম সভ্য আর সুন্দর যেন হয়। রবিদাদা তো আপনাকে সবাই ই বলে। আপনাকে আমি আদর দিচ্ছি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

৩৬

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

শুনুন্, এমন মজা হয়েছে, যে দিনই আমি বেড়াতে যাই সেইদিনই আপনার চিঠি আসে। আপনার চিঠি কাল এসেছিল কিন্তু কেন উত্তর দিইনি জানেন? কাল আশাদের চিঠি দিয়েছিলাম তাই। কিন্তু আমার

আপনাকে চিঠি দিতে বেশ্ ভাল লাগে। আপনি রাগ কর্‌বেন না। আমার আপনার জন্যে মন কেমনও করে। আপনারও নিশ্চয় করে। আজকাল শান্তিনিকেতনে যেমন খুব বিষ্টি হয় তেমনি এখানেও রোজ বিষ্টি হয়। দুপুর বেলা। আজও তেমনি এখন হচ্ছে। কিন্তু জোরে নয়। আপনি কি কোণে বসে চিঠি লিখ্‌ছিলেন না সেই ছোট্ট ঘরে বসে। তখন যদি আমি থাক্‌তাম্ তো বেশ্ হত। কিন্তু মার্জ্জরী নামটা ভারী বিচ্ছিরি।[১] বোধ হয় বেরাল। আপনার নাম কেন ভাল লাগে। কিন্তু আমি আজকাল কখ্‌খনো দুষ্টু হইনা। দেখবেন আপনি আমি রাগ বেশী কর্‌ব না। আজ আবার চুল বাঁধতে হবে। কিন্তু মাকে জিজ্ঞেস কর্‌বেন। আমি বেশী গোলমাল কর্‌ব না। আপনারও চুল আঁচড়াবার সময় শান্ত হয়ে থাকা উচিত। আপনি কি কখন নন্দা পর্ব্বতে গেছেন।। এখান থেকে তা দেখা যায়। সে বরফ পড়েছে তাই শাদা হয়ে গেছে। ওখানে সব সময় বরফ পড়ে থাকে তাই শাদা বোধ হয়। এমন সুন্দর ঝক্‌মক্ করে। আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে। তার শিখর আকাশের সঙ্গে মিলে গেছে। আপনি তো রামগড়ে থাক্‌তেন। আপনার অনেক গানে লেখা আছে রামগড়। সেখান থেকে কি এই পাহাড় দেখা যায়। আমরা আস্‌বার সময় একরাত্তির ওখানে ছিলাম। সেদিন রাত্তিরে সেখানে খুব ঝড় আর বৃষ্টি হয়েছিল। সেখান থেকে কি এই সব শাদা পাহাড় দেখা যায়? আমি স্কটের ছবি দেখেছি কিন্তু সে তো বেশী সুন্দর দেখ্‌তে নয়। আপনার চাইতে ঢের বিচ্ছিরি।। দেখুন বিষ্টি এমন দুষ্টু থেমে গিয়েছিল কিন্তু আবার হচ্ছে। আপনি যদি থাকতেন তো বেশ্ হত। আপনাকে চুমু দিচ্চি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু।।

৩৭

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

কাল রাত্তির থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।। আজ সকালেও খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। একটু দূরের জিনিষও দেখা যাচ্ছিলনা। এমন সময়েতে ডাকহরকরা বিষ্টিতে ভিজ্‌তে ২ এসে অনেক চিঠি দিয়ে গেল। আপনার চিঠি তার হাথেই ছিল। অন্য চিঠি খুঁজছিল। আপনার চিঠির পেছুন দিক দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখন বাব্‌জার কাছে জিয়োমেট্রী কর্‌ছিলাম। আমার প্রথম চিঠিই আপনি কি দেরীতে পেয়েছেন। কিন্তু তবুও আপনি যে দিন পেয়েছেন চিঠি সে দিনই তার উত্তর দিয়েছেন। আপনি আগের মতন দু তিন মাস অন্তর উত্তর দেননা। আগে কেন অত চিঠির উত্তর দিতে ভুলে যেতেন? এরও উত্তর দিতে ভুলে যাবেন না যেন। আমিও তো আপনার চিঠি পেলেই তার উত্তর দি। আপনাকে আজকাল অনেক পড়াতে হয়। আর আপনি দুপুরবেলা ম্যাট্রিক্‌ক্লাশের ছেলেদের পড়ান। আপনি কি সন্ধ্যেবেলাও ছেলেদের নিয়ে কিছু করান? আপনি তবে একটুও ছুটী পান না। আপনি কখন পালাবেন? আপনার কি বাইরে আসতে ইচ্ছে করে? আপনার কি আমার কাছে আসতে ইচ্ছে করেনা? আমার কিন্তু আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করে। আপনার কবে সব চাইতে বেশী পালিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে করে? বোধহয় উপাসনার পর? এখান থেকেও নীল আর সোনালী পাহাড় দেখা যায়। ওখানে আপনি সারাদিন কি করেন? আমি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বেড়াতে যাই। কিন্তু এখানে এক্‌টুও শীত নেই। বেড়াবার সময় রাস্তা প্রায় কুয়াশায় ভরে থাকে। ঘাসের উপর দিয়ে যাবার সময় এত জল পড়ে। পাহাড়ের উঁচুভাগ প্রায় বর[ফ] মেঘে ঢাকা থাকে।

মাঝে ২ তারই ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে সোনালী দেখায়। আমার একজন পুতুলের নামও সোনালী। আর কাঠগুদাম থেকে আস্‌বার সময় সবুজ পাহাড় নীল দেখায়। কেমন মজা। আপনি সবচাইতে আগে কোন পাহাড়ে গিয়েছিলেন? আপনার নিশ্চয় খুব ভাল লাগছিল। আমারও বেশ ভাল লাগে। আমি এখানে বেশী পড়িনা। শুধু সকালে আর দুপুরে কিন্তু আজ আপনাকে বসে দুপুরেই চিঠি লিখ্‌ছি। এখন মেঘলা কিন্তু এখনি দেখ্‌বেন রোদ হয়েছে। বিকেল বেলা আবার বেড়াতে যাই। আবার রোদ হয়েছে। তখন আমরা যে জায়গায় বসি তার ঠিক সামনেই সূর্য্য অস্ত যায়। এমন সুন্দর দেখায়। যেমন আপনাদের ওখানে মেঘে রঙ হয় এখানেও তেম্‌নিই হয় তখন বাড়ী আস্‌তে সন্ধে হয়ে যায়। আশার তিনচার দিন পরেই জন্মদিন। কিন্তু এবারে আমরা থাক্‌বনা। তাই ওর নিশ্চয় দুঃখু হবে। কাল একটা প্রকাণ্ড খামে আমি আর ভক্তি ওকে অনেক পাহাড়ী ফুল আর ফার্ন পাঠিয়েছি। আপনাকে যে লাল ফুল দিয়েছিলাম তার রঙ কি আপনার ভাল লাগে। এবারে একটু দেব। সে রঙের ফুল অনেক আছে। আমি কিন্তু যতদিন না খুব মোটা হব ততদিন অত লাল হবনা।[১] আপনার জন্যে মন কেমন করে। [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

একটা মজার কথা শুনুন্। এবার আমরা নেই কিনা তাই আশার জন্মদিন শান্তিই কর্‌বে। ও ভারী গিন্নি কিনা তাই। ওই ওকে চুল আঁচড়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে চন্দন পরিয়ে মালা পরিয়ে নিশ্চয় সাজিয়ে দেবে। রাণু।

৩৮

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি যেদিন পেলাম সেদিন আমার অসুখ করেছিল, আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম আর মা, বাব্‌জা, ভক্তি সবাই মুক্তেশ্বরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমার ঠিক যেমন শান্তিনিকেতনে অসুখ করেছিল তেমনি করেছিল। একটু নড়লেই বমি আস্‌ত। আমি সিনা খেয়েছিলাম তাই অসুখ কোরেছিল। এত কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের সোমবারে মুক্তেশ্বরে যাওয়া ঠিক কিন্তু ডাণ্ডি পাওয়া গেলনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হল, শেষে একটার সময় খবর এল আজ ডাণ্ডি পাওয়া যাবেনা। আবার বিছানা, ট্রাঙ্ক সব খোলা হোল। সেইদিনই আমার অসুখ কোর্‌ল। মঙ্গলবারে[১] সকালে কিছুই গোছান হইনি এমন সময় ওরা এসে গেল। সেই সময়েই আপনার চিঠি এল। কিন্তু বলুন্‌ তখন কি কোরে উত্তর দি। তারপর সেদিনই ডাণ্ডিতে চড়ে আমরা সন্ধ্যেবেলা মুক্তেশ্বরে এলাম। আপনি কি কখন এখানে এসেছেন। এই জায়গা খুব উঁচু। সিমলের চাইতেও সাতশো ফীট উঁচু। এখানে আলমোরার চাইতে ঢের শীত। দু তীনটে মোটা জিনিষ গায় দিতে হয়। এখানে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা বারাণ্ডা আছে। সেই বারাণ্ডা থেকে তিনচার পা গেলেই খড়্‌ নেমে গেছে আর সামনেই পাহাড় দেখা যায়। এখানের সব পাহাড় ওক গাছে ভরা আর একটুও ন্যাড়া নয়। এখানে পাইন গাছ বেশী নেই। আমাদের বাড়ীর সামনেই এক লাইন বরফের পাহাড় দেখা যায়। সেগুলোর নীচের ভাগটা দেখা যায়না, কিন্তু তার শিখর দেখা যায়। বোধহয় সেই শিখরগুলো আকাশে ভাস্‌ছে। এসব পাহাড়ে খানিকটায় নীল ছায়া পড়ে আর খানিকটা চক্‌চক্‌ করে। আপনার কি

এখানে আস্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। আপনি আমায় পূর্ণিমার দিন চিঠি দিয়েছেন। আপনি যখন চিঠি দিয়েছেন তখন আমি আলমোরায়। সেই রাত্তিরে আমরা পাইনের বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই যার কথা আপনাকে লিখেছিলাম। যেখানে অনেক লাল ফুল আছে। মুক্তেশ্বরে, এখানে আমাদের বাড়ীতে অনেক লাল ফুলেরই রঙের মতন পালক আছে। সে এমন সুন্দর। আপনি কি সেদিন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন?

আপনার এবারকার উপাসনা বেশ্ ভাল হয়েছে।' আপনিও তো একদিন ছোট্ট ছিলেন তখন আপনারও বড় মন কোথায় ছিল? আপনি তখন কি ভাব্‌তেন? এখনও তো আপনি বেশী বড় নন্। কিছুদিন পরে তো আমার চাইতেও ছোট হবেন। আপনি কিন্তু সেক্সপিয়রএর চাইতে আমার ভাল লাগে। আমি মিল্‌টন আর সেক্সপিয়ার দু জনেরই জীবনি ইংরিজিতে পড়েছি। আর হ্যাম্‌লেট্ আর As you like it পড়েছি আর মিল্‌টনের সেই যাদুকরের গল্প পড়েছি।

আপনি কেমন আছেন? আমি বারণ কর্চ্ছিনা কিন্তু আপনি কাজ কোরে কোরে রোগা হোয়ে যেতে কখ্‌খনো পাবেন না। তাহলে কিন্তু রাগ করব॥
[আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

আমাদের ঠিকানা এইখানে লিখ্‌ছি। এই দেখে দেখে আমার চিঠির ঠিকানা লিখ্‌বেন।

C/o Mr. Ganguli.
Muktesor.
District, Nainital.

৩৯

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

আদরের ভানুদাদা,

আপনি যখন চিঠি লিখেছিলেন্ তখন জানতেন না যে আমরা মুক্তেশ্বরে। তাই আলমোরার ঠিকানায় চিঠি লিখেছেন। কিন্তু আমরা আলমোরা ছেড়ে এসেছি। তখন আমরা মুক্তেশ্বরে। আপনি আজ বাব্‌জাকে চিঠি লিখেছেন, তাতে এখানকার ঠিকানা দিয়েছেন। আপনি কি এখানে কখনো এসেছেন? আপনি লিখেছেন, আপনাদের গ্রামে বন্যা এসেছে। সে বন্যা কি বিষ্টি হয়ে হয়েছে না নদীর জল বেড়ে হয়েছে? সব প্রজারা কোথায় থাকে? আপনাদের সেই কোল্‌কাতার বাড়ীতে বোধহয়। আপনার তাদের জন্যে বুঝি খুব দুঃখু হয়? আমারও হয়। তারা আপনাকে বোধহয় চিঠি লেখে যে তাদের খুব কষ্ট হচ্চে। আমরা কাল এখানে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখানে এক ল্যাবরটারী আছে। সেখানে দেখুন সব গরু, খরগোশ, কুকুর এই সব মারা হয়। আবার তাদের ভেতর পিচ্‌কিরি কোরে অসুখ ঢোকান হয়। আমার এমন রাগ হয়। কিন্তু ভাল হয়েছি কিনা তাই রাগ করিনা। আপনারও দেখলে রাগ হোত। আর একটা খুব প্রকাণ্ড এঞ্জিন দেখেছি। সেটা একটা ঘরের মাঝখানে বসান। সে ঘরটা খুব গরম আর তার মেজেতে তেল গড়াচ্চে। এখানে আর একটা খুব উঁচু মন্দির আছে। সে মন্দির ঠিক আট হাজার ফীট উঁচু। বাব্‌জাকে ফেলে আমরা চড়েছিলাম। তার ওপরটা অনেকটা যে রকম পাহাড় আমি ভাবি। আর সেখানের মন্দির এমন মজার। ঠিক পুতুলের ঘরের মতন। আর ঘরের ভেতর একটী ভাঙা পাথর আছে। তার চারিধারে আলপোনা কাটা। আর সেখান থেকে চারিধার দেখা যায়। তার চাইতে উঁচু পাহাড় আর

নেই। সেখান থেকে নীচে তাকালে এমন ভয় করে। আপনার নিশ্চয় এখানে আস্‌তে ইচ্ছে করে। এখানে কেবল আলমোরার মতন অত ফুল নেই। কিন্তু আমরা একটা ফুলের বাগান করেছি। শুনুন্, আমি আপনার নাম কবিদাদা ভেবেই রেখেছিলাম। আর ভানু নামটাও বেশ। একটু মোটা মোটা বোধহয়। কিন্তু আমার বেশ্ সুন্দর লাগে। আর আর-কেউ আপনাকে ভানুদাদা বলে না। আর বেশ রাণুর সঙ্গে মেলে।[১] এইজন্যে সব চাইতে ভাল লাগে। আর যেদিন আপনি কোনো নতুন কবিতা লিখ্‌বেন সেদিন আপনাকে বল্‌ব কবিদাদা। হ্যাঁ? কিন্তু মার্কণ্ড নামটা ভারী বিচ্ছিরি। বোধহয় যেন কালো, রোগা, একজন মাথায় ঝুঁটি বাঁধা লোক শাঁপ দিচ্ছে। আপনারও নিশ্চয় ও নাম ভাল লাগেনা। আপনার তো ঠাকুরের সঙ্গে ভাব আছে। বল্‌বেন যে সূর্য্যের ও নাম বদ্‌লে দিতে।

আমাদের বাড়ীতে সেই যে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলী[২] আছে তাতে একটা আপনার ভানুসিংহের পদাবলী বলে বই আছে। আমি কিন্তু আপনাকে শুধু ভানুদাদা বল্‌ব। আর কবিদাদা নামটাও বেশ্। কিন্তু আপনার গুনের মধ্যে বুঝি শুধু কবি। আপনি তো সব বিষয়েই ভাল। আমি তো কাউকে আর প্রিয় লিখিনা শুধু আপনাকে লিখি যে লোকটা হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সে বুঝি আমার প্রিয় কবি, আমি তার কবিতা বেশী ভালবাসিনা। শুধু এগ্‌জামিন্ দেবার জন্যে পড়েছিলাম। পার্ব্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে আসবেন তখন আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এখানে থাক্‌ব। আবার পার্ব্বতী যেদিন বিশ্বনাথের কাছে চলে যাবেন, আমরাও সেদিন ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাব।[৩] আমরা বিজয়ার পরই চলে যাব। কি মজা। তারপর আমি আপনার কাছে যাব। আমার আদর জানবেন।
[আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

৪০

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

প্রিয় রবিদাদা,

আজ সকালে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলাম জানেন? আপনি নিশ্চয় জানেন না আমি যেমন আপনি কোথায় বসে পড়ান ছেলেদের বল্‌তে পার্‌তাম না আপনিও তেমনি পারবেন না। আমরা কান্টর্মেন্টে যে একটা পাইনের বন আছে সেইখানে গিয়েছিলাম। সে জায়গা খুব সুন্দর আর সেখানে বেশীরভাগ গাছই পাইন কিন্তু কতকগুলো ইউকালিপ্‌টাস্‌এরও গাছ আছে। আর তার কাছেই 'বিশ্বনাথ' বলে নদী আছে। সেই নদী এমন জোরে চল্‌ছে যে তার শব্দ দূর থেকে শোনা যায়। এখানকার সব নদীকেই দূর থেকে দেখ্‌লে শান্ত বোধহয় কিন্তু কাছে এলে বুঝতে পারা যায় এমন শব্দ করে। আলমোরার কাছেই সেই যে একটা ভীষণ নদীর কথা আপনাকে লিখেছিলাম সেই নদীকেও দূর থেকে দেখ্‌লে শান্ত বোধহয়। সেই পাইন বন কাল সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাবার সময় আবিস্কার করা হয়েছে। দূর থেকে দেখ্‌লে তাকে ভাল কোরে বোঝা যায়না। সেই বনের ভেতর দিয়ে একটা ঢালু রাস্তা অনেক ঘুরে আমাদের বাড়ীর কাছেরই একটা রাস্তায় এসে পড়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে নীচে নাম্‌বার সময় এমন মজার গড়িয়ে পড়া যায়। রাস্তার দুপাশে সুন্দর ২ লাল অনেক ফুল ছিল। আপনি বোধহয় যখন এসেছিলেন তখন এসব ফুল ছিলনা তাই আপনার ভাল লাগেনি। এবারে এলে আপনার নিশ্চয় ভাল লাগত। কিন্তু আপনি নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করেছেন এখানে আস্‌বেন না। কাল আবার সব পাহাড়ীদের কিসের পর্ব্ব ছিল। তাই চারিদিকের যত পাহাড় আছে, তাতে আবার যত গ্রাম আছে তাতে প্রত্যেকটাতে আগুন জ্বলছিল। বেশ্‌ সুন্দর দেখাচ্ছিল। বেড়িয়ে এসেই

দেখি আমার পড়ার ঘরে টেবিলের ওপর আপনার চিঠি রাখা রয়েছে। আর কারুর চিঠি আসেনি। এখানে আমার একটা আপনার সেই তেতলা ছোট্ট শোবার ঘরের মত একটা পড়ার ঘর আছে। সেই ঘরে একটা খুব বড় জান্‌লার সামনে একটা টেবিল পাতা আছে। সেই ঘরেই আমি বেশী থাকি। সেখানে ভক্তিরও পড়্‌বার চেয়ার আছে কিন্তু ও প্রায় আসেই না। আমি আপনাকে দুপুর বেলা চিঠি লিখ্‌ছি। আপনিও নিশ্চয় এবারের চিঠি দুপুরবেলাতেই লিখেছেন, একটুখানি তাড়াতাড়ী খেয়ে। আপনার আজকাল third ক্লাশের ছেলেদের পড়াতে নিশ্চয় খুব ভাল লাগে। আপনি তো প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ওদের কথা লেখেন। আজকালও কি ওরা আপনাকে ভয় করে। আপনি কি ওদের স্কট্‌ থেকে পড়ান্‌? সেদিন যে আমায় স্কটের বন্ধুর কথা লিখেছিলেন,[১] তার কথা কি আপনি ওদের পড়া খুঁজতে খুঁজতে পেয়েছিলেন? আপনি লিখেছেন ওদের কলেজের মত শক্ত পড়া। আপনি তাহলে তো অনেক পড়া জানেন। মামা আপনাকে তাহলে কখ্‌খনো আমাদের সঙ্গে পড়াতেন না। আর আপনি বেশ্‌ ভাল। ঠাকুরের কাজও করেন আর ঠাকুরকে ভালবাসেন। আমিও আপনার মতন ভাল হব। আমি তো আপনার কাছে থাক্‌তে চেয়েছিলাম আপনিই ভয় পেলেন। আমার আপনার কাছে পড়্‌তে বেশ্‌ ভাল লাগে। শুনুন, ফর্ষ্ট অক্টোবারে মিসেস বেসেন্টের জন্মদিন। তাই আশাদের ইস্কুলে ও সময় উৎসব হয়। এবার কলেজের মেয়েরা আপনার ডাকঘর ইংরিজিতে করবে। ওদের কলেজে আশাই সব চাইতে ছোট তাই ও অমল সাজ্‌বে। ওদের মিস্‌ ভীল এইটে করাবেন।

এন্ড্রুজ সাহেব শারোদোৎসব কি শিখিয়ে দিয়েছেন? আপনার ওটা কবে করাবেন?[২] এখানে আমি ছোটবৌকে, আর কোন পুতুলকে সঙ্গে আনিনি তাই একটা কাপড়ের পুতুল বানিয়েছি। তাকে এখানকার পাহাড়ীরা যে রকম কাপড় পরে সেই রকম কাপড় পরিয়েছি। এবার যখন আপনার

কাছে যাব তখন তাকে নিয়ে যাব। এণ্ড্রুজ সাহেবএর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বেশ হবে। তার নথ পরা নেই বেশ্ সভ্য করেছি। আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

৪১
[অক্টোবর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

রাণুর ভানুদাদা,

পর্শু থেকে আমার অসুখ হয়েছিল। তাই কাল সকালে বিছানায় শুয়ে ছিলাম, এমন সময় ভক্তি আপনার চিঠি এনে দিল। আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হোলাম। এবারে কিন্তু আপনি দেরীতে চিঠি দিয়েছেন। আজ আমি কাল্‌কের চাইতে ভাল আছি। আমি কালই আপনার চিঠির উত্তর দিতাম কিন্তু খুব দুর্ব্বল ছিলাম বলে মা বারণ করেছিলেন। কাল বিকেলে এখানে খুব মেঘ করে বিষ্টি হয়েছিল। আমি তখন বিছানায় কম্বল গায় দিয়ে শুয়েছিলাম। এমন সময় ছড়্‌ছড়্ কোরে ছোট ২ শিলা বিষ্টির সঙ্গে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভক্তি শিলা কুড়ুচ্ছিল। আমি কম্বল ছেড়ে দৌড়ে বাইরে গেলাম। গিয়ে দেখি সামনে ফুলের গাছ্‌এর তলায় ছোট ২ শিলা পড়েছে। আর বারাণ্ডায় এসে পড়ছে। মা কিন্তু দেখুন জোর কোরে ঘরে সেই বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তখন এমন রাগ হচ্ছিল যে কি বলি। তারপর মাকে অনেক বলে জানলার কাঁচ দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম্। তখন সামনের ফুলের গাছের তলা শাদা হোয়ে গেছে আর সব গাছ নুয়ে পড়্‌ছে। এমন সুন্দোর দেখাচ্ছিল।

আমি যখন আপনাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম তখন আপনি আমার কাছে নিতান্ত কেবল মাত্র রবিবাবুই বুঝি ছিলেন? তখনও আমি আপনাকে ভালবাস্‌তাম্‌। কিন্তু তখনকার চাইতে এখন বেশী ভাল-বাসি। আমি আপনাকে তো আর ইংরিজি কায়দায় প্রিয় লিখিনি। প্রিয়র বাঙ্‌লা মানে যা হয় তাই লিখেছি।[১] আমি আর কাউকে প্রিয় লিখিও না। আপনি তো কবিতায় অনেক প্রিয় লেখেন, আমি লিখলেই বুঝি যত দোষ। আমি প্রিয় যে চিঠি লেখ্‌বার পাঠ তা জানিও না। আপনাকে প্রিয় লাগে বলেই লিখি। আপনি ঠাকুরকে যেমন প্রিয় বলেন, আমিও আপনাকে তেমনি প্রিয় বলি। ডালহৌসী পাহাড় বুঝি খুব সুন্দর। ওখানে আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে। বক্রটা নামটা কি মজার। যেন মার্ত্তণ্ডর বোন। দেখুন পাহাড়ের গাছগুলো সত্যিই বড় হয়। দেখ্‌লে বড় ভয় করে। এখানে আমরা একটা জঙ্গলে বেড়াতে যাই। সেই জঙ্গলে এত ওক গাছ যে তার ভেতরটা অন্ধকার। সেখানে রাত্তিরে অনেক চিতাবাঘ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড stag আসে। এখানে রাত্তিরে বারাণ্ডায় বার হতে নেই। বাঘ আসে। আমরা বিকেলে সেই বনে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসি। তার সামনেটা খোলা, অনেক দূর দেখা যায়। সেই পাথরের সাম্‌নেটা খুব ঢালু। সেই ঢালু দিক্‌ দিয়ে ওঠা নামা খুব শক্ত। আমাতে ভক্তিতে সেখানে ওঠানামা খেলা করি। খুব মজা হয়। আপনি যদি আস্‌তেন তো আপনাকে নিয়েও খেলা কোর্‌তাম্‌। পাহাড় আমার বেশ্‌ ভাল লাগে। আপনার কেমন লাগে? আপনি আমার আদর জানবেন। আর চুমু॥ [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

ভানুদাদা।

৪২

[অক্টোবর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার চিঠি[1] পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। দেখুন এবার থেকে আমি আপনাকে ভানুদাদা বলেই ডাক্‌ব। আপনি সুরবালা খগেন্দ্রমোহিনী জগদম্বা এসব নাম কোথায় পেলেন? কি বিচ্ছিরি নাম? ওর চাইতে রাণু নামটা ঢের সুন্দর। কানু-বিলাসিনী নামটা বোধহয় আজকাল কারুর হয়না। আর শুনুন্ যদিই হয় তবুও সে আপনাকে অনেক চিঠি দিলেও আপনি তার উত্তর দেবেন না। হ্যা? দেখুন নামের অপভ্রংস করে মেলানো উচিত নয়। আর নাম থেকে খানিকটা কথা নিয়ে নেয়াও উচিত নয়? আপনার নাম মানে ধরে করা হয়েছে। নাম তো আর খারাপ করা হয়নি। আমারও তো দেখুন দুটো নাম। দুটোই আলাদা আলাদা। সেই নামেতেই ভানুর সঙ্গে মেলে। বেশ মজা না? আর অন্য কেউ থাক্‌লেও তো আপনি উত্তর দেবেন না। আপনাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় ছুটী সুরু হয়েছে। আমাদের কাশীর স্কুলেও সুরু হয়েছে। যদি আমি কাশী থাক্‌তাম্ তাহলে বোধহয় এখন আপনার কাছে যেতাম। আমাদের ইস্কুলে পোনেরো ষোলো দিন ছুটী হয়। কিন্তু এবারে যদি আপনার কাছে যাই তো বোধহয় পাঁচ ছ দিন থাক্‌ব। আমরা মুক্তেশ্বর থেকে এ বুধবারের পরের বুধবারে যাব। এখানে আজকাল বিকেল বেলায় খুব বৃষ্টি হয়, তাই খুব শীত হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় সব চাইতে শীত হয়। কাশীতে আশারা লিখেছে যে খুব গরম হয়েছে আর অসুখ হচ্ছে। আমাদের নিশ্চয় ওখানে গিয়ে খুব গরম হবে। আপনি কি কখোনো এখানে এসেছেন? আশাদের ইস্কুলে যে ডাকঘর হবে বলেছিলাম না, তা 1st Octoberএ হয়েছিল। আর আশা লিখেছে

যে ওরা খুব সুন্দর অ্যাক্ট্ করেছে। আর আপনি যে বিসর্জ্জন ইংরিজি ট্র্যান্স্লেশন করেছেন না তা boys’ ইস্কুলের ছেলেরা প্লে করেছিল। তাও নাকি বেশ্ সুন্দর হয়েছে। আপনাদের শারোদোৎসব কি করা হয়েছে? আপনি যে বলেছিলেন হবে। কেমন সুন্দর হয়েছে? আপনার বুধবারের উপাসনা বেশ্ সুন্দর হয়েছে। আপনি যেমন সুন্দর তেমনি আপনার মনও সুন্দর তাই আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বল্‌তে পারেন। না? আপনাকে আমার আদর দিচ্ছি। চুনুও [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

রাণুর ভানু॥

৪৩

[অক্টোবর ১৯১৮]

[কাশী, মুক্তেশ্বর থেকে ফিরে]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত[১] ভারী মজার আপনার যেমন অনেক ক্ষণ বসে থাক্‌তে হয়েছিল এঞ্জিনএর জন্যে আমাদেরও তেম্‌নি মুক্তেশ্বর থেকে কাঠগুদাম আস্‌বার সময় আপনারই মতন দেরী হয়েছিল। আমাদের ঠিক হয়েছিল যে প্রত্যেক ডাণ্ডীতে ছ জন কোরে লোক থাক্‌বে। মুক্তেশ্বরের সিমানায় আস্‌তেই বাব্‌জার ডাণ্ডী থেকে একজন লোক পালিয়ে গিয়ে মার ডাণ্ডীয়ালাদের সঙ্গে যেতে লাগ্‌ল। বাবজার ডাণ্ডি অনেক পেছনে ছিল। আমরা মুক্তেশ্বর থেকে দু মাইল দূরে একটা জায়গায় প্রায় দু ঘণ্টা বসে রইলাম। এমন সময়ে দেখি বাব্‌জা হেঁটে, আর দুটো ডাণ্ডীয়ালা

ডাণ্ডী কাঁধে কোরে আস্‌চে। বাব্‌জাকে নাকি ডাণ্ডীয়ালাগুলো আধ রাস্তায় ডাণ্ডীশুদ্ধু ফেলে পালিয়েছে। দুটো কেবল পালায়নি। তার পর আরো এক ঘন্টা বোসে থাকার পর আবার কতকগুলো ডাণ্ডীয়ালা এল আর তারপর নিয়ে গেল। খুব দেরী হোয়ে গিয়েছিল। রাস্তাতেই অন্ধকার হোয়ে গিয়েছিল। তার উপুর আবার রাস্তা এমন বিচ্ছিরি। রাত্তির বেলা একজায়গায় রাস্তা নেই। একটা পাহাড়ী নদী পার হোয়ে গেলে তবে রাস্তা। ডাণ্ডীয়ালারা সেই নদীর ওপর দিয়েই গেল। ওদের হাঁটু পর্য্যন্ত পা ভিজে গেল আমাদেরও কাপড়ে ছিটে লেগেছিল। কিন্তু ভারী মজা লাগ্‌ছিল। আপনার হলেও মজা লাগত। শেষে রাত নটার সময় ভীমতালে পৌঁছুলাম। আপনি কি কখনো ওখানে গ্যাছেন? ওখানে একটা খুব সুন্দর হ্রদ আছে। আর সেই হ্রদের চারিদিকে একটা প্লেন রাস্তা গ্যাছে। আমরা পরদিন সকালে ওখানে একটু বেড়িয়েছিলাম। তার পরেতে আমাদের আর কোনো দেরী হয়নি। আমরা এখন কাশীতে। আর আমি তো বেশ্ ভাল আছি আর মাকে জিজ্ঞেস কোর্‌বেন, আমি যতটা দুধ খেতে দেওয়া হয় সব খেয়ে ফেলি। কাশীতে বেশী গরম নেই কিন্তু এখানে অখুখ [য] হচ্চে। শান্তির অসুখ কোরেছে। আপনি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়েছেন। আপনার মন যদি ইঞ্জিনের মতন বেঁকে গিয়েছিল তো আমার মন কেন ধার কোর্‌লেন না॥

আপনি এখন কেমন আছেন? আপনি কি আশ্রমে গেছেন? আমি বোধহয় বাব্‌জার সঙ্গে দেওয়ালীর ছুটীতে আপনার কাছে যাব। তখন তো আপনার ছুটী থাকবে। না?

দেখুন, আমরা এবারও আলমোরায় যাবার রাস্তার মতন একটা পাইন বনের ভেতর দিয়ে এসেছিলাম। তখন সন্ধ্যে হোয়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশ দিয়েই একটা নদী গেছে। এই নদীকে আমাদের তিনবার পার হোতে হয়েছিল। আর এ প্রায় সারা রাস্তাই আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত এসেছিল। রাত্তির বেলা যে নদী পার কোরে ছিলাম তাও সেই নদীই।

কিন্তু বনের ভেতরে কেবল রাত্তিরে লণ্ঠন নিয়ে যেতে হয়েছিল। না ত খালী রাস্তায় খুব চাঁদ উঠেছিল। তাই নদী খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার খুব ভাল লাগ্‌ছিল। আপনারও খুব ভাল লাগ্‌ত। আমরা কিন্তু পৌঁছুলাম্। আপনার ভ্রমণ তো শেষ হোলো না। আপনাকে আদর দিচ্ছি। চুমুও।
[কার্তিক ১৩২৫]

রাণু॥

রাণুর।

ভানু।

৪৪

[৩ নভেম্বর ১৯১৮]

আপনি কি কোরছেন?[1]

আদরের ভানুদাদা,

আজ থেকে আমাদের ইস্কুলে ছুটী হোয়ে গেছে। আরো চারদ্দিন পরে ইস্কুল খুলবে। আমাদের ঠীক হোয়েছিল যে আজিই ট্রেণে চড়্‌ব। আর কাল আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছুব কিন্তু বাব্‌জার মীটিং সুরু হোয়ে গেল। এখনও বোধহয় একসপ্তাহ পর্য্যন্ত মীটিং হবে। তাই জন্যে দেখুন্ যাওয়া হোলো না। আপনার দুঃখু হচ্চে না? আমাদের প্রাইজ দু তিন সপ্তাহ পরেই হবে। সেইজন্যে এবারে ছুটীতে ইংরিজি, বাঙ্‌লা, সংস্কৃত কবিতা শ্লোক এইসব মুখুস্ত কোর্‌তে দিয়েছেন। আপনি হোলে কি কোর্‌তেন? আপনার আজকাল সারাদিন কি কাজ। আপনি কি করেন। আপনি আজকাল বোধহয় ছাতে বসেন। আজকাল কোনে বোসে বোসে

কি করেন। আপনি সেই নতুন বাড়ীতে কবে যাবেন? কাশীতে এখন শীত হোয়েছে। সকালে গরম জামা পরি। আপনি ওখানে গরম জামা পরেন? আজকাল কাশীতে খুব অসুখ হচ্ছে তাই বাবজাদের পনেরো দিন ছুটী হয়েছে। কিন্তু মীটিংএর জন্যে যাওয়া হচ্ছেনা। আরো অনেক দিন হবে। কিন্তু আমি নিশ্চয় আপনার কাছে যাব॥ কাল আমার জন্মদিন।[২] আমি কালও আপনাকে চিঠি লিখ্‌ব। আপনি কি সেখানে প্রদীপ জ্বালবেন? আমরা এখানে অনেক প্রদীপ জ্বাল্‌ব। আর আজ চোদ্দটা প্রদীপ জ্বাল্‌ব! কাল আমরা নৌকা কোরে গঙ্গায় বেড়াতে যাব। কাল সারা কাশীতে আলো জ্বলবে। আপনি যখন আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌চেন, তখন আমি নিশ্চয় ভাল হব। আমি তো ভাল হবার ইচ্ছাই করি। আপনার গীতপঞ্চাশিকা পড়েছি। সেই বৈয়ের গান তো আপনার মুখে শুনেছি। সবার সাথে চল্‌তে ছিল গানটা আপনাকে লিখে দিতে বলেছিলাম।[৩] আপনি যেমন লিখে দিলেন না তেম্‌নি আমি পেয়ে গেছি। কেমন? ওই গানটা আর তার সুর আমার খুব ভাল লাগে। আপনাকে আদর দিচ্ছি। [১৬ কার্তিক ১৩২৫]

রাণু।

৪৫

[১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার পলাতকা বলে যে বই আপনি আমায় পাঠিয়েছেন,[১] তা আমি এখুনি পেয়েছি আর খুব খুসী হয়েছি। আমি পড়্‌ছিলাম এমন সময় ডাকয়ালা এসে দিয়ে গেল। আমি বইটা খোলবার আগে ভাব্‌লাম্‌ যে

আপনি বাব্‌জাকে কি বই দিয়েছেন। আমি ওপরের মলাট ছুরী দিয়ে খুল্‌লাম্‌। খুলে দেখে আমার খুব আনন্দ হোলো। আপনি বেশ্‌ লক্ষী। কেমন আমার নাম লিখে দিয়েছেন। আমি খুব যত্ন কোরে রাখ্‌ব। আর আপনি ওতে যে সব ভুল আছে সব ঠিক কোরে দিয়েছেন। আমি বই এখনো ভাল কোরে পড়িনি কিনা, পড়্‌লে পর আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস্‌ কোরব। কেমন? বইয়ের ওপরের মলাটে আপনার নাম এত হাল্কা কালীতে লিখেছে কেন? আমি কাল আপনাকে চিঠি দিয়েছি। আমি পলাতকা পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনাকে আমি অনেক আদর আর চুমু দিচ্ছি। [১৩২৫]

রাণু॥

৪৬

[৫ নভেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার নাম কেমন ফুলের পাতার মধ্যে ঢেকে গেছে। আমি আপনার দুটো চিঠি পেয়েছি কিন্তু দেরীতে উত্তর দিয়েছি বোলে তো আর আপনি রাগ করেন নি। হ্যাঁ? আমি আপনাকে ইস্কুল থেকে এসে চিঠি দিচ্ছি। আজকাল আমাদের ইস্কুলে আড়াইটার সময়েই ছুটী হোয়ে যায়। শুধু পাঁচ পিরিয়ড হয়। আপনি যদি আমাদের ইস্কুলে এই সময় আস্‌তেন তো আপনার সুবিধেই হোত। মোটা দিদিমণি যে সময় ড্রয়িং করাতেন সেই পিরিয়েড্‌টা আজকাল আর হয়না 9th ডিসেম্বর থেকে আবার ছয় পিরিয়ড্‌ই হবে। কিন্তু আপনার এখন যা কাজ, আপনি কি কোরে ইস্কুলের পড়া কোর্‌বেন? কিন্তু আপনার নিশ্চয় এখানে আস্‌তে ইচ্ছে করে। আপনি আজকাল কাজ কোরে কোরে নিশ্চয় রোগা আ আ আ আ হোয়ে গেছেন। আমার আপনার

কাছে খুব যেতে ইচ্ছে করে। বাব্‌জা আবার কোল্‌কাতায় গেছেন ফিরে যাবার সময় বোধহয় একবার আপনার কাছে যাবেন।[১] এখানে আজ মিসেস্‌ বেসেন্ট আস্‌বেন। তাই নাকি আশারা থিয়োসফিকল্‌ সোসায়েটীটা খুব সাজিয়েছে। কাল রাত্তিরে আশা এসেছিল কিন্তু আজ সকালে চোলে গেছে। ওরা বল্‌ছিল যে কি মজা হবে। ইস্কুলের মেয়েরা একটা থিয়েটার কোর্‌বে। কাশীতে পরশু খুব আলো জ্বালা হোয়েছিল।[২] বোধহয় অন্য সব সহরেও জ্বালা হোয়েছিল। আপনি কি জ্বেলেছিলেন? আপনি লিখেছেন দিনুবাবু আর কমল্‌ আপনার বাড়ীর নীচের তলায় এসেছেন? তো বৌমা কোথায় গেলেন। হারিয়ে গেছেন? আর এণ্ড্রুস্‌ সাহেব বার বার চোলে কেন যান? আপনিও এবার কাশী চোলে আসুন না? আমি যে ছবিটা এঁকেছি সে কি নামের আমি এখনো তা ঠীক করিনি। আপনি একটা তার মঞ্জুলিকার মত সুন্দর নাম বেছে দেবেন। ও তো আপনার কাছেই রইল। ও গাব্‌লোর বৌ কিম্বা ছোট বৌ নয়। ছোটবৌরা ওর চাইতেও সুন্দর। আজকাল কাশীতে খুব ঠাণ্ডা। সকাল বেলা খুব মেঘলা থাকে। কিন্তু বিষ্টি হয়না। বোলপুরে আজকাল কত ঠাণ্ডা। কাশীর চাইতে নিশ্চয় কম? কিন্তু কাশীতে খুব অসুখ হচ্ছে। আমি আজকাল রোজ এস্রাজ বাজাই আর সারেগামা এই সব বেশ্‌ ভাল কোরে বাজাতে পারি। কাল রাত্তিরে এখানে খুব বিষ্টি হোয়েছিল তাই সারা সকাল মেঘলা ছিল কিন্তু এখন খুব রোদ। আপনি আজকাল হিন্দি নিশ্চয় ভুলে গেছেন। এবার যখন যাব তখন নিশ্চয় আপনি আবার সব ভুলে যাবেন। আমাদের বাঙ্‌লা বই আর একটা বেড়েছে কিন্তু সেটা ভাল বই। সেটা ব্যাকরণ। আপনি কাজের লোকেদের চাইতে ঢের ভালো আর আপনিও তো কতো ভালো কাজ করেন। আপনাকে আমার আদর দিচ্ছি। [১৯ কার্তিক ১৩২৫]

রাণু॥

৪৭

[২০ নভেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

কাল আমরা কাশীতে এসেছি। আমি কালই আপনাকে চিঠি দিতাম কিন্তু ডাক চলে গিয়েছিল তাই চিঠি দিইনি।[১] তাই আমি আজ সকালেই আপনাকে চিঠি দিচ্ছি। আপনিও নিশ্চয় আমায় চিঠি দিয়েছেন। যদি আমরা যেদিন চলে যাই সেই দিনই দিয়ে থাকেন তো আজ আপনার চিঠি নিশ্চয় পাব। আপনি এখন কি কর্‌ছেন? আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। আপনার কাছে আমার যেতে ইচ্ছে করে। রাস্তায় আমাদের গাড়ীতে একটুও ভীড় হয়নি। কিন্তু বোলপুর ইষ্টিষানে পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল। যেই আমাদের গাড়ী ইষ্টিষাণে পৌঁছুল অমনি গাড়ী এল। তখন তাই তাড়াতাড়ি কোরে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। টিকিট কেনবার সময় হলনা। শেষে রামপুরহাটে গিয়ে টিকিট কেনা হল। আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি। আপনার জন্যে আমার মন কেমন কর্‌ছিল। লিলু[২] আমাদের কাশীর ইষ্টিশানে নিতে এসেছিল। আশা বাড়ী নেই তাই আজ ওর সঙ্গে দেখা কোর্‌তে যাব। আপনি যে ছাতা আমায় দিয়েছিলেন সেই ছাতা আমি দেখিয়েছি। ছাতাটা বেশ্ সুন্দর, না? আজ আমাদের ইস্কুলের গাড়ীর গাড়োয়ান এসে বোলে গেল যে আমাদের ইস্কুল বাব্‌জাদের কলেজ খোলার সঙ্গেই খুলবে। কাশীতে বেশী ঠাণ্ডা নয়। বোলপুরের চাইতে গরম। আপনি কিন্তু ওখানে ঠাণ্ডা লাগাবেন্ না। আমার ট্রেণে একটুও খোঁপা খারাপ হয়নি। আর বোধহয় মাথা থেকে একটাও কাঁটা পড়ে যায়নি। মাকে খোঁপা দেখিয়েছি। মা বলেছেন যে খোঁপা খুব সুন্দর বাঁধা হয়েছে। সত্যি। আর শুনুন্ মা বলেছেন যে আমি, আমি একটু মোটা হয়েছি। আর আমি বলে দিয়েছি যে

আপনি রোগা হোয়ে গেছেন। কেমন। আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৪৮

[নভেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আমি যেদিনই কাশীতে এসেছি তার পরের দিনই আপনার চিঠি পেয়েছি।[১] আর আমি নিশ্চয় ভেবেছিলাম যে সেদিন আপনার চিঠি পাব। আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। আমাদের আজ ইস্কুল খোলবার কথা ছিল। তাই আমি দশটার মধ্যে তৈরী হোয়ে রইলুম, কিন্তু গাড়ী এলই না। তাই জানিনা যে কবে ইস্কুল খুলবে। বোধ হয় মামার অসুখ কোরেচে। গাড়োয়ান বোলে গিয়েছিল যে কখন ইস্কুল খুলবে তার ঠীক নেই। আপনাদের ইস্কুল তো ৩ ডিসেম্বরে খুলবে। আজ বাবজা এলাহাবাদে সকালেই চলে গেছেন। আজকাল বাবজা খুব কাজ করেন। আপনি আজকাল কত কাজ করেন? লক্ষীটী, আপনি বেশী কোরে খাবেন। আর আরো রোগা হোয়ে যাবেন না। আপনি এবারেতে আগের চাইতে রোগা হোয়ে গেছেন। হ্যাঁ। আপনি কি সেই নাটকটা শেষ কোরেছেন? আপনি আরো কটা গান তাতে দিয়েছেন?[২] আমি আজকাল শিশুমহাভারত প্রায় বোল্‌তে গেলে পড়িই না। আমাদের ইংরিজি বইটাতো ভালো, আমি সেইটা পড়ি। আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা এস্রাজ বাজাই। আমি এখানে এখনও একটাও গল্প লিখিনি। এখানে যে কোনো লোক নেই গল্প বল্‌বার। হিন্দুস্থানী

সেই দুটো গল্প আমি আপনাকে কাল পাঠিয়ে দেব। আমি আপনার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নিশ্চয় হব। তখন আমি আপনার সব জঞ্জাল পরিষ্কার কোরে দেব। আর আপনাকে এমন সুন্দর সাজিয়ে দেব যে আপনাকে পৃথিবীর [সব] চাইতে সুন্দর দেখাবে। আপনি চুল কাট্বেন না। আমি কাল স্বপ্ন দেখ্লাম্ যেন আপনি ট্রেনে কোরে বিলেত যাচ্ছেন। আর সেই ক্যারেজটা যেন বাড়ীর ঘরের মত। আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। আমি আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৪৯

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

এবারে আপনি এত দেরীতে কেন চিঠি দিয়েছেন? কিন্তু আমি রাগ করিনি আর আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। বাব্জা আপনার কাছ থেকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা আপনার কাছে আমার খুব যেতে ইচ্ছে কর্ছিল আর এখোনো করে। আর আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমনও করে। আর আমার শিশুমহাভারত আর চারুপাঠএর চাইতে আপনার গান ঢের ভাল লাগে। আপনি ভারি দুষ্টু। আপনি বুঝি ভাবেন আমি আপনাকে ভাল বাসিনা। কিন্তু আপনি কেন আমার কাছে এলেন না। যান্, আপনি ভারী দুষ্টু। আপনি যদি বিলেতে চলে যান্ তো আমি আপনার কাছে মার সঙ্গে যাব যদি বাব্জার ছুটী না হয়। তখনও বেশ্ মজা হবে। আজকাল আপনি রোজ সন্ধ্যেবেলা গান তৈরী করেন। আমি

যদি থাক্‌তাম তাহলে কিন্তু আপনার গান শুন্‌তাম আমি আপনাকে একটা গান বানাতে দেখেছি। আপনি আর কটা বানিয়েছেন? আপনার ইস্কুল খুলে গেছে কিন্তু আমার ইস্কুল পরশু খুল্‌বে। এতদিন শুধু তিনটী ক্লাস হচ্ছিল। আজকাল তিনটের সময় আমাদের ছুটী হয় কিন্তু পরশু থেকে চার্‌টের সময় হবে। আজকাল এখানে চার্‌টের্‌ সময়ই সব রোদ পড়ে যায়। সন্ধ্যের মতন দেখায়। আর আজকাল কাশীতে খুব ঠাণ্ডা। আজ তো খুব ঠাণ্ডা হয়েছে। অনেকটা মুক্তেশ্বরের ঠাণ্ডার মত। সকাল বেলা জল খুব ঠাণ্ডা থাকে। দেখুন গুরুমা ভারী বড় এক কম্‌পোসিস্‌ন্‌ চারুপাঠ থেকে লিখ্‌তে দিয়েছেন। কীটানুর বিষয়ে। সেটা আজ লিখ্‌তেই হবে। কাল দিতে হবে। কিন্তু সেই কম্‌পোজিসন এর চাইতে আমার আপনার গান ঢের ভাল লাগে। আর মামা বলেছেন এক সপ্তাহ অন্তর একটা কোরে বাঙ্‌লা চিঠি লিখ্‌তে হবে। সেই চিঠি ঠীক পুরোনো প্রথার হিন্দি চিঠির মত আপনি যদি আমাদের ইস্কুলে পড়েন তো তাই যদি কোর্‌তে হয়। কি হবে। আপনি বিলেতে চোলে গেলে আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমন কোর্‌বে। কিন্তু। শান্তিদের ইস্কুলের প্রিন্সিপাল ওকে একজন হোলিম্যান-এর বিষয়ে লিখতে বলেছেন। তাঁর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বর্ণনা কোর্‌তে হবে। তো শান্তি আপনার বর্ণনা কোর্‌বে বোলেছে।' আপনাকে ও নিশ্চয় সুন্দর বর্ণনা কোর্‌বে। কি বলুন। কি মজা। দেখুন সত্যি কিন্তু আমার আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করে। আপনাকে আদর দিচ্ছি। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৫০

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আমার হিস্ট্রি আর ভূগোল পড়া বন্দ হয়ে গেছে। আর পড়্বনা। দেখুন দিকিন্ বাব্জা কি দুষ্টু। আমি আজকাল বাড়ীতে বেশী পড়িনা আপনার চাইতে কাজ ঢের কম করি। সকালে বোধহয় এক ঘন্টা পড়ি। এবারে আপনার খামের ওপর লেখা বেশ্ সুন্দর হয়েছে। আমার চাইতেও ভাল। এবারে আমি আপনার মত লাইন না টেনে লিখ্ছি। শান্তি যে আপনার বিষয় প্রবন্ধ লিখেছিল সেটা পড়ে, ও বল্লে মিস্ ব্যানিং খুব সুন্দর হয়েছে বলেছেন। ও অন্য কোন সময়ের বিষয় বলেনি। কেবল আপনি যখন উপাসনার আগে ঘন্টা বাজান সেই সময়কার আপনিকে বর্ণনা করেছে। আর আপনাকে খুব সুন্দর করেছে। সুন্দর না কর্লে ওর সঙ্গে আমি আড়ি করে দিতাম। আমরা গুরুমাকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। চিঠির ভেতরে তাড়িত বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত বিষয়ে লিখ্তে হয়েছিল। কিন্তু সম্বোধনটা হিন্দির মত অত ভীষণ নয় ভাল। গুরুমা বলেছিলেন যে কল্যাণীয়াসু বলে সুরু কর্তে। দেখুন তবে আপনি এখানে আসুন না। কিন্তু আজ ইন্স্পেক্ট্রেস এসেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বচ্ছর আসেন। কালও আসবেন। বৌমা যদি আপনার খোরাকী বন্দ করে দেন্ তো আপনি আমার কাছে আস্বেন কেমন?[১] তখন বেশ্ মজা হবে। এবার আপনার চিঠি আস্বার দিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনার চিঠি আসবে। আমি সবাইকে বলে রেখেছিলাম যে আস্বে। তাই আপনার চিঠি খুব শিগ্গির এসেছে। আপনি ভারী দুষ্টু। কেবল আমাকেই দোষ দেন। আমি আপনার কাছে তো তিনবার গিয়েছি দেখা কর্বার জন্যে। একবার ইস্কুল অ্যাব্সেন্ট করেও গিয়েছি আর আপনিত একবারও এলেন না পড়ানো ছেড়ে। আর আপনি

তো চিঠি আমার চাইতে শিগ্গিরও লিখ্‌তে পারেন। কিন্তু এর আগের বারের চিঠি নিশ্চয় আমার কাছে দেরীতে এসেছিল। প্রতিজ্ঞা আজ কাশীর ওপর দিয়ে একটা এয়রোপ্লেন গেছে। ঠীক ওপর দিয়ে। আমি দেখ্‌তেই পাইনি। অনেক লোকে দেখেছে। সবাই বল্‌ছিল যে ঠীক চিলের মতন পাখা আর খুব শব্দ হচ্ছিল। তার ভেতর লোকও ছিল। আপনি কিন্তু সেইটেয় কোরে বিলেতে চলে যাবেন না যেন। ভারী হাওয়া। আপনার জন্যে আমার মন কেমন করে। আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৫১

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

প্রিয় ভানুদাদা,

কাল আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ হয়েছে। সেই যেটার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। সেই জন্যে বেশ্ মজা হয়েছে।[১] আমাদের প্রাইজের আগের কদিন শুধু রেসিটেশনই হোত। আমাদের ইংরিজিতে দু ক্লাশ নিয়ে হোয়েছিল। আমাদের ক্লাশ আর আমাদের নিচের ক্লাশ। দেখুন সেই কবিতায় কতক্‌গুলি মেয়ে আর কতকগুলি মাষ্টার্ চাই। তো মামা আমাদের ক্লাশের সব মেয়েকে মাষ্টার্ কোর্‌লেন। আর আমাদের চেয়ে যারা নীচু ক্লাশে পড়ে তাদের ছাত্র কোর্‌লেন। মেয়েরা এক এক জন কোরে বল্‌ছিল যে একটী নদী তাদের কি বলেছে। আর আমরা নদী যা বলেছে তার থেকে উপদেশ বার কোরে ২ তাদের বল্‌ছিলাম। ভক্তিদের আর তার নীচের ক্লাশের একটা ভারী মজার হোয়েছিল। ছটী মেয়েকে বেছে নেওয়া

হোয়েছিল। ছ জন ছটা রঙ হোয়েছিল। ভক্তি হোল্‌দে হোয়েছিল। আর সবাইকার মধ্যে কেউ লাল, কেউ নীল, কম্‌লানেবুর রঙের, সবুজে আর বেগুনি। যে যা রঙ্‌ হোয়েছিল সে সেই রঙেরই ফ্লাগ নিয়ে ছিল। আপনি যদি থাক্‌তেন তাহলে আপনি মামাকে বল্‌তেন আমি লাল হব। আর বৌমার কাছ থেকে একটা লাল কাপড় চেয়ে নিয়ে পর্‌তেন। কেমন? সমস্কৃত বল্‌বার সময় আমি একজন মন্ত্রিক ব্রাহ্মন হোয়েছিলাম। আরো সব অনেক রেসিটেশন হোয়েছিল। হিন্দুস্থানী দুজন মেয়ে হিন্দিতে সুর কোরে ২ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়েছিল। এমন মজার হোয়েছিল।

আমাদের প্রাইজ দিতে মিসেস্‌ পিম্‌ এসেছিলেন। তিনি এখানকার কলেক্টরএর স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে তার একজন বন্ধুও এসেছিলেন। আমি মিসেস্‌ পিম্‌কে একটা মালা পরালাম্‌ আর আরএকজন মেয়ে তাঁর বন্ধুকে। আমাদের যখন রেসিটেশন হচ্ছে এমন সময় একটী ছোট্ট মেয়ে আমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে তার বোনের কাছে গেল। গিয়ে ~~চিৎকার করে~~ কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। যত দিদিমণি, মামা সবাই দৌড়ে এসে তাকে যত থামাতে যায় সে ততই কাঁদে। শেষে তার বোন অনেক কোরে তাকে থামাল। কি মজা হোয়েছিল। দেখুন আমাকে আপনার পাঠসঞ্চয় বোলে একটী বই দিয়েছে। তাতে গল্পগুচ্ছের কতকগুলো গল্প আছে। আপনি ভাগ্যিস্‌ এ সময় আমাদের ইস্কুলে আসেন্‌ নি। না ত আপনাকে শুধু গিফ্‌ট দিত। একটা বল আর একটা টিনের খেলনা। তা নিয়ে কি খেলা কোর্‌তেন? আমি সংস্কৃততে ফর্ষ্ট হয়েছি বলে জানেন একটা স্পেশল প্রাইজ পাব। তার বই এখনো এসে পৌঁছোয় নি। আর একটা মেডেলও পাব। কি মজা॥ [পৌষ ১৩২৫]

রাণু॥

৫২

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

প্রিয় ভানুদাদা,

জানেন পরশু কি ভীষন জিনিষ হয়েছিল।[১] আপনি হোলে আপনিও চেঁচিয়ে ২ কাঁদ্‌তেন। সেদিন কি হোয়েছে যে দিদিমনিরা সব গাড়ীর পেছুনদিকে বসেছেন। আমরা মাঝখানে বসেছি। আর গাড়ীতে খুব ভীড়ও ছিল। রাস্তার প্রায় যখন মাঝখানে এসেছি এমন সময় গাড়ী উল্টে গেল। আমি একটী মেয়েকে আমি যে এগ্‌জামিনটা দিয়েছিনা তারই কথা বল্‌ছিলাম্‌। সে মেয়েটী এবচ্ছর এগ্‌জামিনটা দেবে। আর তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম। তারপর আমি তাকে প্রশ্ন টস্ন জিজ্ঞেস কর্‌বার পর একটা বই পড়্‌বার জন্যে যেই সেই বইটা খুলেছি অপনি [য] গাড়ীটা উল্টে গেল। পেছুন দিকে দিদিমনিরা বসেছিলেন কিনা তাই গাড়ীটা পেছন দিকে উল্টোলো। গরুটা পালিয়ে গেল। আর গাড়ীতে যত মেয়ে ছিল সবাই চিৎকার কোর্‌তে লাগ্‌ল। কেউ ওরে বাবারে বোলে কেউ মরে গেলুম বোলে আর বেশীর ভাগ শুধু [illegible] আ আ আ কোরে চেঁচাতে লাগ্‌ল। অনেক লোক, গাড়োয়ান সবাই মিলে গাড়ীটা টেনে তুল্‌লা [য]। নাম্‌বার জায়গাটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। একজন খুব বড় লোক আমাদের সবাইকে কোলে কোরে কোরে নামিয়ে দিল। দিদিমনিরা এ্যাকেবারে লাফিয়ে নেমে পড়্‌লেন। দিদিমনিরা বল্লেন কি কোরে ইস্কুলে যাই। শেষে হেঁটে যাওয়াই ঠীক হল। এমন সময় একজন বাব্‌জাদের কলেজের প্রফেসার একটা গাড়ী কোরে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের গাড়ীটা দিয়ে দিলেন আর নিজে হেঁটে চলে গেলেন। যত সব ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে আর একজন দিদিমনি সেই গাড়ীতে কোরে গেলেন। ভক্তি সেই গাড়ী গেল। আমরা একটুখানি হেঁটে গেছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক নিজের

এক্কায় চড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এক্কা থেকে নেমে গিয়ে নিজে হেঁটে যেতে লাগ্‌লেন। আমাকে আর আর দুটী মেয়েকে এক্কাটায় বসিয়ে দিলেন আমি পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম এমন সময় আমার পা থেকে জুতো পড়ে গেল। রাস্তাতে পড়ে গেল। আমি এক্কাটাকে থামতে বল্‌লাম। একপায়ে জুতো পরে যেতে ভারী খারাপ লাগ্‌ছিল। এমন সময় সেই ভাল লোকটী এসে আমার জুতো এনে দিলেন। ইস্কুলে গিয়ে আমরা খুব কাঁদতে লাগ্‌লাম। মামা ভাব্‌লেন আমাদের লেগেছে। মামা কতকগুলি মেয়েকে তখনি বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু যানেন আমি যাইনি। কেমন, কি ভীষণ জিনিষ হোয়েছিল। আপনি হোলেও ওরে বাবারে, আ আ ত কোরে চ্যাচাতেন। আপনি কখনো নিশ্চয় এমন জিনিষ দেখেন নি। দেখলে আপনি নিশ্চয় বোলতেনও। আপনার উৎসবে কখ্‌খনো এত মজা হয়নি। তাই নিশ্চয় আমি জিতে গেছি। আপনি হেরে গেছেন। কেমন মজা। [পৌষ ১৩২৫]

রাণু ॥

রাণুর ভানুদাদা ::

৫৩

[মার্চ ১৯১৯]

ভানুদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনি শিবরাত্রির দিন চিঠি দিয়েছেন।[১] সেদিন কাশীতে বাব্‌জার জন্মদিন ছিল। আমাদের ইস্কুলেও ছুটী ছিল। কিন্তু আপনার চিঠি কাশীতে খুব দেরীতে পৌঁছেছে। ঠীক এক

সপ্তাহ পরে। আপনি আমাকে লিখেছিলেন যে সারা জানুয়ারী মাস ঘুরে বেড়াবেন আর এদিকে তো এখনো পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। আপনি ভারী দুষ্টু। তার উপুর আবার লেক্চর দিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিজেই তো বলা হয় যে অ্যামেরিকায় যখন লেক্চার দিতেন তখন আপনার বুক ঢিলে হোয়ে গিয়েছিল। তবুও জেনেশুনে আবার লেক্চার্ দিচ্ছেন। আচ্ছা! আপনি আমাকে এত বোকা ভাবেন কেন? আপনি ভাবেন যে আপনি যে 'সার রবীন্দ্রনাথ চমৎকার বক্তৃতা [য] করেছিলেন, খূ-ব চমৎকার'টা কেটেছেন, আমি ভাব্ব যে সত্যিই ঢাক্বার জন্যে কেটেছেন। আপনি নিশ্চয় ইচ্ছে করে দেখাবার জন্যে কেটেছেন। আমি চিঠির দিকে তাকিয়েই বুঝ্তে পেরেছি। আর অত্যাশ্চর্য্য, অতিসুন্দর বক্তৃতা দিয়েও যে মহানুভব ব্যক্তি সে সংবাদটা সম্পূর্ণ গোপন করে যেতে পারে, সে তো আপনি লিখেই দিয়েছেন যে আমি। পড়েই তো বোঝা যায়। যান্ আপনি ভারি হাঁসান। আপনি আজকাল এত কম চিঠি কেন লেখেন। সারাদিনই তো আর লেক্চার দেননা। আর এত আর কি কাজ বেশী। আমারি বরং 1st Aprilএ এগ্জামিন সুরু হবে। তার উপুর আবার মঙ্গলবার থেকে বোধহয় morning ইস্কুল হবে। আজকাল তাই কত পড়া কর্তে হয়। আজকাল কাশীতে এত্ত গরম হয়েছে যে কি বলি। আপনি থাক্লে না জানি কি কোর্তেন। আমি আজকাল আমার স্কলার্শিপ পেয়েছি। কি মজা। আপনাকে কি কিনে দেব বলুন।[২] তা বলে কোন মণি চাইবেন না। সে কোথায় পাব বলুন। আপনি এবার গরমের ছুটীতে কোথায় থাক্বেন? যদি বিলেতে না থাক্তেন তো আমি আপনার কাছে যেতাম। [ফাল্গুন ১৩২৫]

রাণু॥

৫৪

[৯ এপ্রিল ১৯১৯]

ভানুদাদা,

কাল আপনি চলে যাবার পর[১] আমরা আর একটা ট্রেনে গিয়ে বস্‌লাম্। সেই ট্রেণটায় এত মাল ভরা হল যে সেই মালগুলো ভরাতে ভরাতে সন্ধ্যে হোয়ে গ্যাল। তারপর আমি বাব্‌জা আর যদুবাবু কাশী ইষ্টিষান থেকে একটা নৌকো কোরে দশাশ্বমেধ ঘাটে এলাম। সেইখান থেকে বাড়ী গেলাম। বাড়ীতে যখন পৌঁছুলাম, তখন রাত্তির হোয়ে গেছে। সেইজন্যে তখন আপনাকে চিঠি লিখিনি আজ তাই সকালে চিঠি লিখ্‌চি। আপনার গাড়ীতে বোধহয় খুব কষ্ট হবে। যা গরম। আপনি আর দু তিন দিন যদি এখানে থাক্‌তেন তো বেশ হোতো। আমাদের দুদিনের ছুটীও হয়েছে। সেখানে গিয়ে আপনি নিশ্চয় খুব কাজ কোর্‌বেন। ভোর বেলা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত আর একটা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত আর রাত্তিরবেলা রাত্তির বারোটায় শুতে যাবেন। কেমন। কিন্তু খবর্‌দার্ যদি তা করেন। সারাদিনে একঘন্টার বেশী যদি কাজ করেন তো আপনার সঙ্গে একেবারে আড়ি কোরে দেব। রাত্তির বেলা সকাল সকাল শুতে যাবেন আর দিনের ব্যালা বেশীর ভাগ সময় শুয়ে থাক্‌বেন, বিছানায়। বুঝলেন তো। এন্ড্রুজ্ সাহেবকে বোলে দেবেন যেন উনি কখ্‌খনো রাত্তির ব্যালা আপনার সঙ্গে গল্প কোর্‌তে না আসেন। তাহলে উনি আপনাকে মাঝরাত্তির পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখ্‌বেন। নিশ্চয় আপনি কাউকে পড়াবেন না যেন। পড়ালে হার্টে ভারি স্ট্রেইন লাগে। শুধু কাজের মধ্যে শোবেন, ঘুমুবেন আর খাবেন। আর আপনি রোগা থাক্‌তে পাবেন না। আমার তাহলে আপনার জন্যে বেশী মন কেমন করে॥ আমার স্কলারশিপের টাকা আরো পেয়েছি।[২] আমি ভেবেছিলাম যে কাল যাবার সময়ে সেগুলো নিয়ে যাব কিন্তু নিয়ে যেতে ভুলে গেলাম।

আমাদের ইস্কুল ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে বন্ধ হোয়ে যাবে। আপনি যদি বিলেতে যান্ তো আর এ্যাকবার নিশ্চয় আমাদের বাড়ীতে এসে থাক্বেন। এবারে এলে আমাদের বাড়ীতে থাক্বেন। [২৬ চৈত্র ১৩২৫]

রাণু ।।

৫৫
[১৩ এপ্রিল ১৯১৯]

ভানুদাদা,

আমি আপনার ছোট্ট চিঠি[1] পেয়ে একটুও রাগ করিনি। আপনার বোধহয় ওইটুকু চিঠি লিখ্তেই খুব কষ্ট হয়েছে। আপনি নিশ্চয় বিছানা থেকে উঠ্তেই পারেন না তাই বিছানায় শুয়ে থাক্তে হয়। কালই তো পয়লা বৈশাখ কিন্তু আপনি খবর্দার্ যদি একটুও কাজ করেন। অন্য দিনের মত শুয়ে থাক্বেন। যদি কেউ জ্বালাতন করে তো আমাকে লিখে দেবেন আমি তাকে খুব বকে দেব। আপনি কাশীতে এসে কেন তিনটে বক্তৃতা দিলেন আর আরো কত জায়গায় গান গাইলেন আর বক্তৃতা দিলেন। আপনি ইচ্ছে করেই তো নিজের শরীর খারাপ করেন। আপনার শরীর খারাপ বলেইতো আমার আপনার জন্যে বেশী মন কেমন করে। আবার লেখা হয়েছে যে আমি চাইনা যে আমার জন্যে তোমার মনে একটুও কষ্ট হবে। আবার আপনি যা কম খান। ওইটুকু খেলে কেউ মোটা হয় না। আপনি একটু খানি বেশী করে খাবেন। এণ্ড্রুজ্ সাহেবকে রাত্তির বেলা আপনার কাছে কিছুতে আস্তে দেবেন না। আমি রোজ ঠাকুর প্রণাম কর্বার সময় ভগবানকে আপনাকে সারিয়ে দিতে বলি। বাব্জা কোল্কাতায় গ্যাছেন কাল দুটোর সময়। রবিবারে ফিরে আস্বেন।

বাব্‌জাকে কোল্‌কাতা থেকে আরো অনেক সহরে ঘুর্‌তে হবে। বাব্‌জা বলেছেন যে যদি সময় হয় তাহলে নিশ্চয় আপনাকে দেখে যাবেন। আমাদের এগ্‌জামিন এখোনো শেষ হয়নি। ২৫ এপ্রেলের পরে ইস্কুল বন্ধ হবে। শান্তিদের এগ্‌জামিন কাল থেকে সুরু হবে। ওদের ভারী মজা হবে। রোজ সকাল ভোর থেকে বিকেল পর্য্যন্ত এগ্‌জামিন হবে আর রোজ ৩।৪ বিষয় কোরে হবে। তিন দিনের মধ্যে ওদের এগ্‌জামিন শেষ কোর্‌তে হবে। তাই শান্তিকে সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত বোর্ডিঙেই থাক্‌তে হবে আর খেতে হবে। ওদের ইস্কুল শুদ্ধ মেয়ের খুব রাগ হয়েছে। আপনি হলে কি কোর্‌তেন। কাশীতে আজকাল একটু লু বয়। আমার গর্ম্মীর ছুটীতে আপনার কাছে খুব যেতে ইচ্ছে করে। [৩০ চৈত্র ১৩২৫][২]

রাণু॥

ভানুদাদা
দিন রাত শুয়ে থাক্‌বেন। কাজ কর্‌বেন না আর
খুব খাবেন॥

রাণু॥

৫৬

[মে ১৯১৯]

আমার ভানুদাদা,

আমি আপনার জন্মদিনের জন্যে এক্‌টা রুমাল বানিয়েছি।[১] সেই রুমালটার সারাটাই আমি নিজেই বানিয়েছি। তাতে আপনার নামও

লিখেছি। আশাদের ইস্কুলে একটী পার্শী মেয়ে পড়ে। তার নাম হোমাই। আমি তার কাছে বানাতে শিখে এই রুমালটা বানিয়েছি। এইটে যদি আপনার জন্মদিনের দিন পৌঁছোয় তো কি মজা হয়। আর শুনুন্। এই রুমালটা নিশ্চয় আপনার জন্মদিনের সারাদিইন্ পকেটে কোরে রাখবেন। যদি না রাখেন তো আপনার সঙ্গে জন্মের মতন আড়ি। বুঝ্লেন। আপনার নিশ্চয় খুব আনন্দ হচ্ছে। জন্মদিন কিনা। আমি তো জন্মদিনে সারা দিনই লাফিয়ে বেড়াই। আপনি তা বলে লাফাবেন না যেন। বুকে বড় ষ্ট্রেন্ লাগ্‌বে। আমি যদি আপনার কাছে থাক্‌তাম্ তো আপনাকে এমন চমৎকার কোরে সাজিয়ে দিতাম। আপনি নিজের রূপ দেখে মুগ্ধ হোয়ে যেতেন। আপনাকে সাজিয়ে গুজিয়ে এক্‌টা চেয়ারে বসিয়ে দিতাম। আমি যখন্ আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারী হব তখন আপনাকে জন্মদিনের দিন পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর কোরে সাজিয়ে দেব। আর সেদিন মীরাকে বলে দেবেন পরমোন্ন কোর্‌তে। জন্মদিনের দিন পরমোন্ন না খেলে পাপ হয়। আমরা শিগ্গিরিই 'সোলানে' যাব। সেখানে গিয়ে আপনাকে আমি ঠিকানা দেবো। আমি বৈতালিক্' পেয়েছি আর খুব খুসী হয়েছি।
[বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু॥

আপ্‌নার জন্মদিনে আপনাকে প্রণাম কচ্ছি॥

রাণু॥

৫৭

[এপ্রিল ১৯১৯]

প্রিয় ভানুদাদা,

আজ থেকে আমাদের গরমের ছুটী সুরু হয়েছে। সাতই জুলাইএ ইস্কুল খুল্‌বে। কিন্তু মামা এক বচ্ছরের ছুটী নিয়ে চলে যাচ্ছেন। ওর শরীর বড় খারাপ হয়েছে। সে এক বচ্ছর আমাদের ইস্কুলে একজন বাঙালী প্রিন্‌সিপ্‌ল আস্‌বেন। মামা গরমের ছুটীতে কর্‌সিয়ংয়ে থাক্‌বেন। ওঁর ঠিকানা আমি চেয়ে নিয়েছি। আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ হোয়ে গেছে। সেইজন্যে আপনাকে চিঠি লিখিনি। অনেক রেশিটেশন মুখুস্ত কোর্‌তে হোতো। ইংরিজি মামা বেশ্ কম্ ২ কোরে দ্যান্। কিন্তু সংস্কৃততে গুরুমা বাব্বা। এত মুখুস্ত কোরতে দিয়েছিলেন। আমরা আগে থেকেই গুরুমাকে বলে রেখেছিলাম যে এবারে আমরা সংস্কৃততে কিছু কোর্‌বনা কিন্তু গুরুমা বল্‌লেন যে মামা বলেছেন যে তোমাদের সংস্কৃততে কিছু কোর্‌তেই হবে। তখন বলুন্ আর কি করি। তখন গুরুমা আট্‌টী মেয়েকে আট্‌টা লম্বা ২ পার্ট দিলেন। আমাকে কোর্‌লেন রাম। আমার আবার ৩।৪ পাতা লম্বা লেক্‌চার। আর সাতজনের মধ্যে কেউ কৌশ্যাল্যা. কেউ কৈকেয়ী কেউ সীতা, কেউ লক্ষ্মণ॥ সকলকারই ২।৩ পাতা বক্তৃতা। বাড়ী এসে খেয়েই তা মুখুস্ত কোরতে বস্‌লাম। দু তিনদিন পরেই প্রাইজ্। তাড়াতাড়ি আবার মুখুস্ত কোর্‌তে হবে। যেমন কোরে হোক্ তাড়াতাড়ি মুখুস্ত কোর্‌লাম। আশা বল্লে যে মামা কখ্‌খনো অতটা বল্‌তে দেবেন না। আর এত খারাপ শোনাত। সাত আট জন মেয়ে, প্রত্যেকে দুতিন পাতা সংস্কৃততে লেক্‌চার দিয়ে যাচ্ছে। প্রাইজের আগের দিন মামা শুন্‌লেন। শুনেই সেটা আর বল্‌তে দিলেন না। কি মজা হোলো। আমি 'পূজারিণী' কবিতাটা প্রাইজে বলেছিলাম॥ এবারে প্রবাসীতে একটা রেণু[১] বোলে কবিতা বেরিয়েছে।

সেই কবিতাটা ঠীক আপনার পলাতকার কবিতাগুলোর মত। আপনি যেখানে লিখেছেন বয়স ছিল আট, ও লোকটা লিখেছে বয়স ছিল কাঁচা। এমন দুষ্টু। নকল কোর্‌তে লজ্জাও করে না। তার নাম আবার এত বিচ্ছিরি। কৃষ্ণদয়াল। ওর বোধহয় ইচ্ছে ছিল যে নামটাও নকল করে। আপনি কেমন আছেন? আগের চাইতে কি ভাল আছেন? আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। আমি গরমের ছুটীতে সঞ্চয়[১] শেষ কোরবো। এরি মধ্যে ২০ কিম্বা পাঁচিশ পাতা পড়া হোয়ে গ্যাছে। আর সব বুঝ্‌তেও পারি। আমি আর শান্তি সংস্কৃত রামায়ণ পড়ি। [বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু॥

৫৮

[মে ১৯১৯]

[কাশী থেকে সোলনের পথে আলিগড়ে]

ভানুদাদা,

আমরা সোলন যাচ্ছি।[১] এখন আমরা মোগলসরাই ইষ্টিষানে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এখান থেকে ছাড়্‌বে। আমাদের এই গাড়ীতে একজন হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষ আছেন তার সঙ্গে তিনজন এমন সুন্দর দেখ্‌তে ছেলে। দু এক ষ্টেসন পরেই এঁরা নেমে যাবেন। ছেলেরা এমন চেঁচাচ্ছে যে তার মা তাদের মামার কাছে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমরা কাশী থেকে মোগলসরাই পর্য্যন্ত যে গাড়ীতে এসেছিলাম তাতে একজন কনে ছিল। আর তার সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী চাকরাণী। সেই কনে এত গয়না পরেছিল

যে কি বোল্‌বো। তার হাতে একটা কাজললতা ছিল, তাতে বনলতা লেখা ছিল। সে একটা গোলাপী বেনারসী পোরে ছিল। কিন্তু সে বড় অসভ্য কোরে ধুতি পোরে ছিল। যেই মোগল সরাইএ গাড়ী থাম্‌ল অম্‌নি তার চাকরাণী একজন লোক্‌কে দেখিয়ে বল্‌ল ও হচ্ছে একজন বরযাত্র ঘুম্‌টা দে আর সেই কনেটী এত্তটা ঘুম্‌টা দিল। তারা বাঁকীপুরে নাম্‌বে। তার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে চাকরাণীটা বল্ল সে ৫৫ টাকা স্কলারশিপ্‌ পায়। এখন বিকেল হয়েছে আর গাড়ী চল্‌ছে। আজ পূর্ণিমা তাই রাত্তিরে কেমন চাঁদের আলো হবে। খুব গরম হচ্ছে। গাড়ীটা যা নড়্‌ছে তাই লেখা এত বিচ্ছিরি হচ্ছে।

কাল চারটের সময় আমরা আলীগড়ে পৌঁছুব। সেখানে একদিন আমার মাসীমার বাড়ী থাক্‌ব। সেখানে মাসিমা কিন্তু নেই। আমার একজন মাস্তুত ভাই এক্‌লাআ সেখানে আছে। সেখান থেকে কাল্‌কায় যাব। জানেন, আমরা এক্‌টা প্রকাণ্ড টনেল পার হব। সেখানটা হচ্ছে অন্ধকার আর জল চোঁয়। কি মজা। সোলন্‌ থেকে সিম্‌লে খুব কাছে। এখন আমাদের দুপাশে খালি মাঠ আর মাঝে মাঝে চার পাঁচটা গাছ আর গ্রাম।

এখন অরোরা রোজ বোলে একটা ইষ্টিষাণে গাড়ী থেমেছে। এখানটায় অনেক গাছ। এখানে একটা গ্রাম দ্যাখা যাচ্ছে। এখন প্রায় সন্ধ্যে এখানে মাঠের ওপর সরু ২ রাস্তা দিয়ে কৃষকরা যাচ্ছে। এখন গাড়ী যাচ্ছে আর দু ধারে মাঠ। এখানে মাঠের ভেতর একটা দু তিন হাতের ছোট্ট নদী আর তার উপুর একটা ছোট্ট পুল। সেই পুলের উপুর দিয়ে লোক যাচ্ছে। আমারো যেতে ইচ্ছে কর্চ্চে। কেমন ছোটো পুল। আর একটা ছোট্ট নদী কিন্তু এটাতে পুল নেই।

খানিকক্ষণ পরে লিখ্‌ছি।

এখানে চারিধারে পাহাড় কিন্তু সেগুলোতে একটুও গাছ নেই।

এখানে অনেক খেজুর গাছ। এখানে চারিধারে পাহাড় ঘেরা। এখানকার

নাম চুনার। সেই মেয়েমানুষটী আমাদের গাড়ীর নেমে গেলেন। এখানে তাঁর মা থাকেন। দেখুন অন্ধকার হোয়ে এল। এখানে শুধু পাহাড়। এখন একটা ইষ্টিসান এল। এর নাম ডগমগপুর। কি মজার নাম। কিন্তু এখানে কেবল পাহাড় আর রাশি রাশি পাথর

ভানুদাদা, এখন রাত্তির হোয়ে গেছে। এমন চাঁদের আলো হয়েছে। ইঞ্জিনের আগুনের টুকরোগুলোকে আমি ভেবেছিলাম জোনাকি পোকা। শেষে মা বল্লেন্ যে ওগুলো আগুনের টুকরো।

এখন বিন্ধ্যাচল বোলে একটা ইস্টিসানে গাড়ী থেমেছে কিন্তু এখান থেকে পাহাড় তো দেখা যাচ্ছেনা। এখানে চারিদিকে গাছ আছে। এই ইষ্টিসানে অনেক লোক রয়েছে। এইবার এখান থেকে গাড়ী ছাড়্চে। অনেক লোক বাকী রোয়ে গ্যাল। বেচারারা কি কোর্‌বে যে। এইবার পাহাড় দ্যাখা যাচ্ছে। ওগুলো খুব নীচু। এখানে অনেক ছোট ছোট গাছ রয়েছে। এ পাহাড়গুলোও গাছে ভরা।

ভানুদাদা, এখন আমার বড় ঘুম পেয়েছে। শুচ্ছি।

আমাদের গাড়ীতে আর কেউ ওঠেনি। আপনি এখন কি কোর্‌ছেন। যদি শোন্ তাহলে আপনাকে খুব আদর কোর্‌বো আর আপনি লক্ষ্মী ছেলে হবেন। আপনার বরং এর আগেই শোয়া উচিৎ।

ঘুম ভেঙে গ্যাল। এক্ষুণি পুলের ওপর দিয়ে একটা নদী পার হোলাম্। সেই নদীর জলে এমন চমৎকার চাঁদের ছায়া পড়েছিল।

এক্ষুণি আমরা যমুনা নদী পার হলাম। এমন চমৎকার। অনেক নৌকো সেখানে বাঁধা ছিল। এখন গাড়ী এলাহাবাদ ইষ্টিসানে থেমেছে। আমাদের গাড়ীতে অনেক লোক এসেছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হায়দ্রাবাদবাসী। তারা এসেই কেউ বঙ্কেতে লাফ মেরে ঘুমুতে লাগ্ল কেউ নিজের ছেলেদের গড়ে গড়ে শুইয়ে দিল। ওরা কাল যাবে। আরো কতকগুলো ক্রীশ্চানও এসেছে। যা ভীড় হয়েছে।

এখন সকাল। কানপুর স্টেষানে ভীড় কমে গ্যাছে। তবুও কিছু লোক আছে। এখন খুব রোদ হয়েছে। খানিকক্ষণ পরেই এত গরম হবে। এখন গাড়ীর দুধারে শুধু জঙ্গল। আর ঠীক নদীর মত অনেক নহর। সেই নহরগুলো দুধারেও গাছ। এখন অম্বিয়াপুর বলে একটা জায়গায় গাড়ী থেমেছে। এর নাম অম্বিয়াপুর কেন জানেন্। এই জায়গায় অনেক আম গাছ আছে আর তাতে অনেএএক আম রয়েছে।

এখন সাম্হন্ বোলে একটা জায়গায় গাড়ী থেমেছে। এখানকার প্লাট্ফর্ম এত নিচুতে। লোকেরা সব এত কষ্ট কোরে উঠ্ছে।

ভানুদাদা, এক্ষুণি এটাবায় গাড়ী থেমেছিল। এই ইষ্টিসানটা বেশ্ বড়। শুনুন, আমাদের পাশে একটা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়ীটার ভেতরে সব বাঁচা মহিষ আর মহিষের বাচ্চা ছিল। তাদের সঙ্গে একজন লোকও ছিল। কি মজা।

আমরা যে সব গ্রাম দেখ্তে পাচ্ছি সেগুলো এমন আশ্চর্য্য। তাদের চারিধারে একটা উঁচু মাঠীর দেয়াল। আর সেই দেয়ালের ভেতরে গ্রাম।

এখন বোধহয় ১। বেজেছে। এত্তো গরম হয়েছে। গাড়ী তেতে উঠেছে। এক্ষুণি মাঠের ওপর ঘূর্ণী ধুলো উঠেছিল। সেটা আবার নড়্ছিল।

এক্ষুণি একটা খুব বড় স্টেশনে এসেছিলাম। তার নাম ভুলে গেছি। গাড়ী এত্ত গরম হয়েছে। আরো দুঘণ্টা পরে আলীগড় পৌঁছুব। বাবা, গাড়ীটা কী নড়্ছে

খানিকক্ষণ হোলো সেই হায়দ্রাবাদের লোকেরা চলে গেল। এবার খুব শিগ্গিরি আলিগড়ে পৌঁছুব॥

ভানুদাদা কাল আমরা আলিগড়ে পৌঁছেছি। আজ সকালে এখন আমরা আলিগড়ে। এখানে কাশীর চেয়ে সকালবেলা বেশী শীত করে। এখানে রাস্তাগুলো বেশ্ পরিষ্কার। এই বাড়ীর সামনেই গ্রান্ড ট্রঙ্ক্ রোড। কাল আমি আশা আর বাবু রাত্তিরবেলা অচলেশ্বরএর মন্দির আর তার পাশের

পুকুর দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। সে জায়গাটা এমন সুন্দর। সেই পুকুরের চারিধারে প্রকাণ্ড ২ গাছ রয়েছে আর পুকুর ঘোরবার সময়ে যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম্ সেটা এমন সরু আর ঠীক নদীর তীরে। কি মজা। কিন্তু সকালবেলা সেখানে অনেএএএএক বাঁদর আসে। কিন্তু তারা কাশীর বাঁদরের মতন চোরও নয়, দুষ্টুও নয়। আজ এখানে ভোরবেলা আমরা ছাতে শুয়ে আছি এমন সময় দেখি দলে দলে সব বাঁদর পুকুরে জল খেতে যাচ্ছে। এই বাড়ীর কাছে দুটো ট্যাঙ্ক্ আছে। আজ চারটের সময় আমরা আবার্ ট্রেণে চড়্‌ব আর কাল দশটার সময় সোলন পোঁছুব। জানেন আমি কাল উঁটের গাড়ী দেখেছি সেগুলো খুব উঁচু আর দোতলা হয়। আমি গীতিবীথিকা[১] আর ছবি পেয়েছি আর পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। সেই ছবিটার প্রথম পাতায় যা আঁকা সেটা নিশ্চয় সেই রুমালের ডিজাইন দেখে করেছেন। তার তলায় যা লেখা তা কে লিখেছে? [বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু॥

৫৯
[মে ১৯১৯]

[আলিগড় থেকে সোলন যাওয়ার পথে ট্রেনে]

ভানুদাদা,

গাড়ী যা নড়ছে। কি বিচ্ছিরি লেখা হচ্ছে। আমরা আলীগড় কখন পার হয়েছি। আমাদের গাড়ীতে শুধু একজন মেয়েমানুষ রয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই সিন্ধিয়াদের মতন অসভ্য নন। এখনো একটু ২ গরম।

আমার দুধারে জঙ্গল মাঠ রয়েছে। এখানে অনেক গাছ আছে।

ভানুদাদা এখন দুদিকে শুধু বন। এখনি দেখলাম মাঠের মাঝখানে একটা মেলা হচ্ছে। সেই মেলাতে লোকেরা নানা রঙের কাপড় পোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ীও ছিল। ট্রেণ দেখ্‌তে পেয়ে অনেক লোক দৌড়ে আমাদের কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল।

ভানুদাদা এখানে অনেক গরু ষাড় আর ঘোড়া আর বড় বড় পাখী রয়েছে।

চোলা। এই ইষ্টিসানে অনেক উট আর তার গাড়ী রয়েছে। আচ্ছা, চোলা মানে কি বলুন দিকিনি।

ভানুদাদা, এক্ষুণি একটা কেনালের ধারে পানা পুকুরে পদ্ম ফুটে রয়েছে গাজিয়াবাদে। এই ষ্টেসনটা খুব বড় অনেক লোক রয়েছে। এখানে আরও অনেক ট্রেণ রহেছে। ভাগ্গিস আমাদের গাড়ীতে কেউ আসেনি। আমাদের গাড়ীর মেয়েমানুষটী কেবল বরফ খাচ্চে। আপনি কি এখানে কখনো এসেছেন।

ভানুদাদা, একটা অন্ধকার ইষ্টিসানে গাড়ী থেমেছে। ইষ্টিসানটায় অনেক লোক। মারামারি ঠ্যালাঠ্যালি কোরছে। ছাত তার টিনের। আর একটা ভাঙা টিনের লণ্ঠন। একজন বেটাছেলে মোটা হিন্দুস্থানি আমাদের গাড়ীতে প্রায় উঠে এসেছিল। কিছুতেই যাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে চোলে গ্যাছে। গাড়ী খুব ধীরে ধীরে চোল্‌ছে। আর ইঞ্জিন থেকে এত ধুয়া বেরুচ্ছে যে আকাশও অন্ধকার হোয়ে গ্যাছে।

একটা উঁচু রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ীটা ধীরে ধীরে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কোরতে কোরতে যাচ্ছে। তার অনেক নীচে চাঁদের আলোয় একটা মাঠ ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌ছিল। ভক্তি এমন বোকা যে সেই মাঠ্‌টাকে বলছিল যমুনা। আমি ঠীক বুঝ্‌তে পেরেছিলাম যমুনার ওপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে। কিন্তু খুব ধীরে ২ গাড়ী যাচ্ছে। দিল্লির ফোর্টের ভেতর দিয়ে গাড়ী গ্যাল। সেই ফোর্টটা

এমন চমৎকার। তার চারিধারে ভিড় ছিল। এখন দিল্লী। এই ষ্টেযনটা খুব বড়। এখানে অনেক আলো আছে। একটা খুব বড় ঘড়ী রয়েছে।

ভানুদাদা, দিল্লী থেকে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। আমরা পনেরো মিনিটে দিল্লীর চাঁদনীচক্ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি এমন তাড়াতাড়ি হেঁটেছি। পার্কের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা সেটা এমন চমৎকার। গাছে ঢাকা আর মাঝে মাঝে পুকুর। এখানে সব রাস্তাতেই অনেক ইলেকট্রিক লাইট রয়েছে।

আমার ওখানে যাবার সময় এত ভয় কোরছিল যদি গাড়ীটা চোলে যেত তো কি হোতো? বাবা।

এখন অনেক রাত্তির হোয়েছে। প্রায় ১০টা। আমাদের এই গাড়ীটাতে আর কেউ ওঠেনি। এখন দুধারেতে খালী মাঠ আর মাঝে মাঝে গাছ। চাঁদের আলোতে সব স্পষ্ট দ্যাখা যাচ্ছে। আপনি এখন নিশ্চয় ঘুমুচ্ছেন কিম্বা ছাতের সেই ইজিচেয়ারটায় চুপ কোরে শুয়ে আছেন। আমার আপনার কাছে এখন যেতে ইচ্ছে কর্চ্ছে। আপনি বোধহয় একলাই বোসে আছেন।

ভানুদাদা, এখন অনেক রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেছে। খুব শীত কোরছে। ইঞ্জিনটা খুব শব্দ কর্চ্ছে।

এখন রাত্তির সাড়ে তিনটে। আমরা অম্বালায়। এতক্ষণ গাড়ীতে কেউ আসেনি। কিন্তু এক্ষুণি কতকগুলি পাঞ্জাবী মেয়েমানুষ উঠল। তাঁরা কঁসৌলি যাবেন। একজন সিম্‌লায়। এঁরা বেশী অসভ্য নন। কিন্তু সবাইকারি এ্যাক দুজন কোরে ছোট ছেলে আর এই ছেলেগুলো সবাই মিলে চীৎকার কোরছে।

ভানুদাদা, এখন সকাল হয়েছে। কাল্‌কার খুব কাছে এসে গেছে। দুধারে পাহাড় দ্যাখা যাচ্ছে। এখনো সূর্য্য ওঠেনি। চাঁদ মাঝে মাঝে পাহাড়ে ঢেকে যাচ্ছে। এদিকে সূর্য্য কাশীর পশ্চিম দিকে উঠ্‌বে। বোলপুরে যেদিকে সূর্য্য ওঠে এখানেও সেদিকেই।

কাল্‌কা। এখান থেকে গাড়ী কিছুতে ছাড়্‌ছে না। এই গাড়ীগুলো বেশ ছোটো ছোটো।

আমরা অনেকগুলো টনেল পার হয়েছি। কোনো কোনোটা এ্যাকেবারে অন্ধকার। এ্যাকটার দুধারে জল চুঁইছিল। এমন গা বমি বমি কোরছে। বোধ হোচ্ছে য্যান এক্ষুণি বমি হোয়ে যাবে। গাড়ীটা আবার এ্যাত নোড়্‌ছে।

ভানুদাদা, আজ ১০টার সময় এখানে পৌঁচেছি। এখন বিকেল। বাবা, এখানে কি শীত। মেঘলাই রোয়েছে।[১] আমি ২।৩ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। আমার বড় মাথা ব্যাথা কোরছে। এখানে পাহাড়ে খুব কম গাছ। এমন সুন্দর সুন্দর ঢালু বেড়াবার পাহাড় আছে। আপনি এখানে যদি আসেন তো নিশ্চয় এ্যাকেবারে সেরে যান্‌। [বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু॥

৬০

[মে ১৯১৯]

[সোলন]

আমার ভানুদাদা,

আপনার চিঠি যখন এল তখন আমি এস্রাজ্‌ বাজাচ্ছিলাম। এখানে আমার যে মাস্তুত ভাই আছেনো, তার নাম সুরেশদাদা, তার একটা নতূন এস্রাজ্‌ আছে। সে এস্রাজ্‌ বেশ বাজাতে পারে আমি তার কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিয়েছি। এই এস্রাজ্‌টা বড় বড়। কিছুতে ধর্‌তে পারিনা। এই এস্রাজ্‌টা আমার কাছেই থাকে। শুনুন, সেই এস্রাজ্‌টার যে বাক্স, তার যে চাবী সেটা হারিয়ে যাবে বোলে আমি একটা ফিতে দিয়ে গলায় বেঁধে রেখে ছিলাম। তার পরদিন যখন বাক্সটা খুল্‌তে গেলাম তখন মনেই ছিলনা

যে চাবীটা গলায় বেঁধে রেখেছি। সারা বাড়ী খুঁড়ে বেড়ালাম্ কোথাও পেলাম না। আমি ভাব্লাম বুঝি বাক্সটা আর খুল্তেই পার্ব্ব না। শেষে নাইবার সময় যখন সব জামা খুলে ফেলেছি এমন সময় দেখি যে চাবীটা হারিয়ে যায়নি। কি মজা।

জানেন্? যে পোষ্টম্যান্ চিঠিটা নিয়ে এল সে বুঝ্তে পারেনি যে ওটা আমার চিঠি। সে শান্তিকে জিজ্ঞেস্ কোর্ছিল যে আমায় এই চিঠির ঠিকানাটা পড়ে দাওতো। শান্তি দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে ওটা আমার চিঠি। ও তাই চিঠিটা তার কাছে থেকে নিয়ে নিল। এবার থেকে পোষ্টম্যানটা আর ভুল কোর্বে না। ও চিনে গ্যাছে কিনা।

সোলনে আমরা রোজ সকাল ব্যালা আর সন্ধ্যেব্যালা ব্যাড়াতে যাই। কেবল কাল আর আজ যাইনি। ক্যান জানেন্। কাল আশার আর শান্তির একটু জ্বর হোয়েছিল। আজ দুজনেই ভাল আছে। কাল সন্ধ্যেব্যালা থেকে আমার গলাতেও খুব ব্যাথা হোয়েছিল। আজ সেরে গ্যাছে। এখানে খুব কম গাছ। এ্যাক্কেবারে ন্যাড়া। আলমোরা এর চেয়ে ঢের ভাল। এখানে বিষ্টি হোলে খুব ঠাণ্ডা হয়। তাই যেদিন এখানে এসে পৌঁছেছিলাম সেদিন খুব ঠাণ্ডা ছিল। আর একটু রোদ হোলেই গরম হয়। আজকাল গরম হয়। একটু বিষ্টি হোলে বাঁচি। এখানে একজন বাঙালী আছেন। তাঁর নাম অবিনাশ বাবু। একদিন আমরা তাঁর বাড়ী ব্যাড়াতে গেছি। তাঁর যে স্ত্রী তিনি লেনু বোলে একজন চাকরকে ডাক্তে লাগ্লেন। আপনার বাবারোতো লেনু বোলে একজন পাঞ্জাবী চাকর্ ছিল।[১] জীবনস্মৃতিতে যে আছে। এও পাঞ্জাবী। আমি ভাবলাম সেই লেনুই।

দেখুন, এখানে ব্যাড়াবার সব্ চাইতে ভাল রাস্তাগুলোতেই যেতে দ্যায় না। বলে এটা ক্যান্টর্মেন্ট। কান্টমেন্ট তো ভারি। ১০।১২ জোন গোরা আছে। এমন রাগ হয়। আমি একদিন নিশ্চয় এ্যাক্লাই সেখানে যাব। দেখ্বো কি করে। আপনি আজকাল শান্তিনিকেতনে বুঝি এক্লাই

থাকেন? আপনার ভয় করে না? আমরা যদি শান্তিনিকেতনে এবার ছুটীতে যেতাম্ তো বেশ্ হোতো। আপনার আর এক্লা থাক্তে হোতোনা। আপনার জন্যে আমার মন কেম্নন্ করে। আপনি ক্যাম্নন্ আছেন? রাণু॥

শুনুন্, আমি ব্যাড়াতে ব্যাড়াতে হেঁটে এ্যাক্টা টনেল্ পার হয়েছি।
[জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬]

রাণু॥

৬১
[জুন ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

আপনার চিঠি যখন পেলাম তখন আমরা ইষ্টিসানে ছিলাম। সোলন থেকে তিন মাইল দূরে সোলন ব্রুয়ারী বোলে এ্যাক্টা জায়গা আছে। সেখানে ব্যাড়াতে যাবার জন্যে ইষ্টিসানে এসেছিলাম। সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। চিঠিটা পাছে হারিয়ে যায় সেইজন্যে আমি সেটা জামার মধ্যে পুরে রেখে ছিলাম। সেটা হারাওনি। আজকাল বোলপুরে বুঝি খুব গরম হয়েছে। এখানেও খুব গরম হোয়েছিল। একটু একটু কাশীর মোতোন। কেবল কাল দুপুর ব্যালা থেকে খুব জোরে জোরে হাওয়া বইছে আর কাল খুব মেঘলা হয়েছিল আর বিষ্টি পড়্ছিল। খুব শীত কোর্ছিল। আজ রোদ্ হোয়েছে কিন্তু বেশী গরম নয়। ওখানে তো খুব গরম। আপনি এখানে আসুন্ না। আপনার শরীরো তাহলে খুব ভাল হবে। আপনি ক্যামোন্ আছেন তা লেখেন না ক্যান। এখানে অনেক লোক

ব্যাড়াতে আসে এখানে আলমোরার মতন ব্যাড়াবার অনেক সোজা রাস্তা আছে। আপনার এখানে এলে ব্যাড়াতে যাবার সময় কোনো কষ্ট হবে না। আপনি আসুন না। কাশীর রাজা যেই ডাকলো অম্নি তো এলেন। আপনার জন্যে আমার খুব মন ক্যামন করে। পরশু ভক্তির জন্মদিন। ও রোজ ভোর ব্যালা ওঠে আর দিন গুনে। এখানে এ্যাক্টা টনেল্ আছে। এই টনেল্টা কাট্ রোডের এ্যাক্ পাশে। সেই টনেলের ওপরে আমরা কোনো কোনো দিন্ ব্যাড়াতে যাই। তাতে তিনটে টেলিগ্রাফ্ পোষ্ট আছে। সেই তিনটে পোষ্টে আমি ছুরি দিয়ে আপনার নাম লিখেছি। আমি আপনার নাম উর্দ্দুতে আর আরব ভাষাতেও লিখতে পারি। জানেন্ দেখুন্ লিখ্ছি।[১]

আপনি এর পরের চিঠিতে দেখ্বো ক্যামোন্ না দেখে এটা লিখ্তে পারেন? আচ্ছা বলুন্ দিকিন্ যে কোন্টা উর্দ্দু আর কোন্টা আরবি? আমি আমার নামো লিখ্তে পারি। দেখুন্ লিখছি।[১] আচ্ছা বলুন দিকিন্ কোন্ দিক্ থেকে এই লেখা সুরু কোর্তে হয়? বলুন্ দিকিন্। আমি কার কাছে এই লেখা লিখতে শিখেছি। আপনি কখ্খোনো জানেন না। কি মজা। আমি এখানেও বাঙ্লা সঞ্চয় পড়ি। আমি সব বুঝতেও পারি। আমার বইটা প্রায় শেষ হোয়ে গেছে। ইংরিজিতে আমি জন রস্কিন্এর[২] কিং অফ্ দি গোল্ডন রিভর পড়ি। বাবা সেটা এ্যামোন্ শক্ত। আমার সেটাও প্রায় শেষ হোয়ে গেছে. তার সবটাই প্রায় শক্ত কেবল শেষের দু তিন চ্যাপ্টার সহজ। বোধহয় রস্কিন্ ডিক্সনারিতে শেষে আর কথা পেলেনা। আপনি সে বইটা পোড়েছেন? আমার সব চাইতে ভাল লাগে...[৩] আর সব চাইতে খারাপ লাগে হ্যান্মকো। আমি কবিতার বই বাঙ্লাতে পড়ি খেয়া আর ইংরিজিতে টেনিসনের[৪] 'ইন মেমোরিয়ম্'[৫] পড়ি। আমি টিয়র্স্ [য] আইড্ল...[৬] কবিতাটী মুখুস্তো কোরছি। আমার গীত পঞ্চাশিকার সেই যে এ্যাকটা গান্ আছে 'এই কি তোমার খুসী আমায় তাই পরালে মালা, সুরের গন্ধ ঢালা' গানটা খুব ভাল লাগে। আমি মুখুস্ত কোর্বো। এর মানে

আমি সব বুঝ্‌তে পারি। এইবার আপনি নববর্ষর দিন যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন সেটা প্রবাসীর লোকেরা কোথায় পেলো। সেটা প্রবাসীতে ছেপেছে।" বাঙ্‌লাতে তো সর্টহ্যাণ্ড হয় না। জানিনা বাবা ওরা ক্যামোন কোরে পেলো। আপনি এ্যাতো বড়ো লেক্‌চার কেনো দিয়েছিলেন? তাইতো এ্যাতো অসুখ কোর্লো। কিন্তু লেক্‌চার্‌টা ভারী সুন্দর। আপনি 'পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হ'ল কেন জানি' গান্‌টা ক্যানো লিখেছেন? আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। যান্‌ আপনি বড় দুষ্টু।" ও গান্‌টা সবে বানিয়েছেন? ওর কি সুর বসিয়েছেন? [জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬]

রাণু॥

জানেন্‌, আমি সোলেনক্রুয়ারীতে নেক্‌ড়ে আর চিতাবাঘের বাসা দেখেছি। সেগুলো খুব উঁচু পাহাড়ে। আম্‌রা সেখানে উঠেছিলাম্‌। সেগুলো দেখ্‌তে অনেক্‌টা গুহার মোতো। কি মজা।

রাণু॥

৬২

[জুন ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

পরশু থেকে সোলনে খুব বিষ্টি হচ্ছে। পোরশুদিন বিকেল ব্যালা হঠাৎ এ্যাত জোরে বিষ্টি হোতে লাগল। সেইজন্যে পোর্‌শু থেকে এখানে খুব ঠাণ্ডা হোয়েছে। কাল সকালে উঠে দেখি যে বাইরে এ্যামোন্‌ কুয়াশা হোয়েছে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জান্‌লা দিয়ে ঘরের ভেতোরো কুয়াশা

ঢুক্‌ছিল। এমন সময় বাব্‌জা আমাকে আপনার চিঠিটা এনে দিলেন। এবার অনেকদিন পরে আপনি আমায় চিঠি দিলেন। আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। বাব্‌জা বোলেছেন যে আমাকে জুলাই মাসে বোধহয় আপনার কাছে নিয়ে যাবেন। বাব্‌জা যদি ছুটী না পান্‌ তো আমি এ্যাক্‌লাই আস্‌ব। আমি এ্যাক্‌লা যদি আসি তো আপ্‌নি কি করেন্‌? তাহলে বেশ্‌ মজা হয়। আমিও আপনাকে গল্প বোল্‌বোখোন্‌। কাল্‌ আমি, মা, আশা, ভক্তি, বাবু সবাই বরোগ বলে এ্যাক্‌টা জায়গায় ব্যাড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানটা খুব সুন্দোর আর পাইন গাছে ঢাকা। সেখানে এ্যাক্‌টা ঝর্‌ণা আছে সেটা ঠীক সেই জীবনস্মৃতির ঝরণার ছবিটার মতন। আমি সেই ঝরণাটাতে গা ধুয়ে ছিলাম। আম্‌রা ফের্‌বার সময় রেলের লাইন্‌ ধোরে এসেছিলাম। হেঁটে চার পাঁচটা টনেলও পার হয়েছি। এ্যাক্‌টা টনেল যখন পার হচ্ছি এ্যামোন্‌ সময় ট্রেনের whistle শুন্‌তে পেলাম। দৌড়ে টনেলটা পার যেই হোয়েছি ওম্‌নি ট্রেনটা টনেলে ঢুক্‌লো। আর একটু দেরী হোলেই টনেলটায় চাপা পোড়ে যেতাম। বাবা। আমরা যখন বাড়ী ফির্‌লাম তখন ৪টে বেজে গ্যাছে। কি মজা হোলো। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দু তিন দিন হোলো এ্যাক্‌টা প্রকাণ্ড ম্যালা হোয়ে গ্যাছে। আমি আপনাকে তার এ্যাক্‌টা ছবি দেব। সেই ম্যালার এক্‌দিন আগে থেকে জুয়া খ্যালা সুরু হোয়ে ছিল। আমাদের বাড়ীর ঠীক নীচেই এ্যাক্‌দল খেল্‌ছিল। তাদের খ্যালা দেখে আমিও জুয়া খেলা শিখে গেছি। আমি যদি বোলপুরে যাই, আপনার সঙ্গে খেল্‌বোখোন্‌। আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবোখোন্‌ খেল্‌তে।[1] ছ সাত্‌টা নাগর দোলাও এসেছিল। আমি চড়্‌তাম কিন্তু মা চড়্‌তে দিলেন না। অনেক লোকও এসেছিল। সেই ম্যালায় একজন লোক এক্‌টা অজগর সাঁপ নিয়ে এসেছিল। সে সাঁপটা আবার চোলে ব্যাড়াচ্ছিল। এখ্‌খুনি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ় মাসের শান্তিনিকেতন এলো। যেটা আমার না। তাতে আমার নাম্‌টা কে লিখেছে। আপনি তো লেখেন নি?

আমি আপনাকে চিঠি লিখে সেগুলো পোড়্‌বো। আপনি ক্যামোন আছেন? আমি গিয়ে যদি আপনাকে মোটা না দেখি তো আড়ি কোরে দেবো। [আষাঢ় ১৩২৬]

রাণু॥

ভানুদাদা, শুনুন্। এই বার প্রবাসীতে এ্যাক্‌টা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সেটা এ্যামোন্ মজার। আমার পোড়ে এমোন্ হাসি পেয়েছিল। আপনাকে সেটা কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 'সার রবীন্দ্রনাথের সার্ উপাধি'টা আবার বড় বড় কোরে লিখেছে যাতে লোকের চোখে পড়ে।

রাণু॥

আমি প্রবাসীতে বাতায়নিকের পত্রটা[১] পড়েছি। সারাটা। আমার খুব ভাল লেগেছে। বাব্‌জা আমরা পড়্‌বার আগেই একদিন নিজে পড়ে পরে মুখে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর প্রণামের পর। তাই আরো ভালো কোরে বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার কাল বৈশাখী কবিতাটা খুব ভাল লাগে। এবার প্রবাসীতে আপনার অনেক কবিতা বেরিয়েছে।[২] আমি সব পোড়েছি।

রাণু॥

৬৩

[জুলাই ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

আমি আর ভক্তি রোজ দুপুর ব্যালা খাবার পর থেকে বারাণ্ডায় বসে থাকি চিঠির জন্যে। কাল আমি বল্লাম আমার চিঠি আস্‌বে। ভক্তি বল্লে

ওর বন্ধুর চিঠি আস্‌বে। কিন্তু আমি জিতে গেলাম। ও আজও বল্‌ছিল যে ওর এ্যাক্‌টা চিঠি আস্‌বে। কিন্তু আজও ওর চিঠি এলোনা। এখানে আজকাল আবার গরম হোয়েছে। কিন্তু আমরা এখান থেকে ছ সাতদিন পরেই চোলে যাব। সোলন থেকে কাল্‌কা পর্য্যন্ত ট্রেনে চড়্‌তে হবে। তাই খুব ভয় করছে। এখানকার লোকেরা বলে যে নাম্‌বার সময় নাকি বেশী গা বমি বমি করে। বাবা। আমরা ফেরবার সময় দিল্লীতে একদিন থাক্‌ব আর মিরেটে এ্যাক্‌দিন থাক্‌ব। তারপর কাশী যাব। আপনি যদি বিলেতে যান্ তো যাবার আগে এক্‌বার কাশীতে নিশ্চয় আস্‌বেন। না ত আপনার সঙ্গে আড়ি। ভানুদাদা, আপনাকে বুঝি বৌমা বোকেছেন যে জুয়া খেল্‌তে পারেন না। বৌমাকে বোক্‌তে বারণ কোর্‌বেন। বলবেন যে আমি বৌমাকে নিয়েও খেল্‌বো। কিন্তু আপনি ভারী দুষ্টু। লিখেছেন যে আমি ভুলেও কখোনো নিজের প্রশংসা কর্‌তে জানিনে। এদিকে তার আগেই তো নিজের ৭।৮ লাইন ধোরে প্রশংসা কোরেছেন।[১] কিন্তু আপনি একটা বিষয়ে ভারী দুষ্টু। আপনি ভারী কম খান। আমি বরং আপনার চেয়ে বেশী খাই। আমি আজকাল রোজ শান্তিনিকেতন পড়ি। আমি আপনার অনেক নতুন গান তাতে পড়েছি। আমার শান্তিনিকেতন পড়্‌তে খুব ভাল লাগে। দেখুন, এক্ষুনি আবার এ্যামন্ মেঘলা হোয়ে গ্যাল। আপনি এখোন্ কি কোরছেন? সেদিন আমরা বরোগ ব্যাড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে এ্যাকটা ঝরণা বয়ে আমরা প্রায় এ্যাক্ মাইল গিয়েছিলাম্। সে ঝরণাটা এ্যামোন্ সুন্দোর্। আমার মাসীমা তাতে নাইলেন। আমারো নাইতে খুব ইচ্ছে কোর্‌ছিল। কিন্তু মা নাইতে দিলেন না। বোল্লেন অসুখ কোর্‌বে। আমরা সারা রাস্তা কাঁচা কাঁচা ডালিম খেয়েছিলাম। সে গুলো এ্যামোন্ সুন্দোর্ খেতে। আম্‌রা সেই জলে হাত মুখ ধুলাম। ঝরণাটার ওপোর এ্যামোন্ বড় বড় সব পাথর ছিল যে তার ওপোর কুড়ি পঁচিশ জন লোক বস্‌তে পারে। আমরা ঝরণাটার ধারে পন্‌চক্কি দেখেছিলাম। পন্‌চক্কিটার ধারে

্যাকটা খুব জোরে ঝরণা বইছিল। পনচক্কিটা এক্‌টা মাটীর কুটীরের ভেতোর ছল। সেইজন্যে কুটীরটা থর্‌ থর্‌ কোরে কাঁপছিল। ঠীক য্যান ভূমিকম্প হায়েছে। আপনি দেখ্‌লে অবাক্‌ হোয়ে যেতেন। [আষাঢ় ১৩২৬]

রাণু॥

৬৪

[জুলাই ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

শুনুন, কাল এ্যাক্‌টা খুব ভীষণ কাণ্ড হোয়েছে।[১] এমোন্‌ ভীষণ কাণ্ড যে কি বোল্‌বো। কি হোয়েছে আপনাকে আমি বল্‌ছি, শুনুন। ভয় পাবেন না য্যানো। কাল বাবু মিরেট যাচ্ছিলেন। সাড়ে ছটার গাড়ীতে। আমরা ভাব্‌লাম যে বরোগ পর্য্যন্ত বাবুর সঙ্গে ট্রেনে কোরে যাই। তারপর বরোগ থেকে হেঁটে সোলনে ফিরে আস্‌ব। আমাদের সাড়ে তিন মাইল হেঁটে যেতে হোতো। ট্রেন্‌টা পোনেরো ষোলো মিনিট দেরী কোরে এলো। তার পর ট্রেন্‌টা ছাড়্‌লো। তারপর এ্যাক্‌ ফরলং যেতে না যেতেই ট্রেন্‌টা আবার ফিরে এসে ষ্টেসনে থাম্‌ল। এঞ্জিনটা নাকি খারাপ হোয়ে গ্যাছে। এঞ্জিন্‌টা থেকে ঝর ঝর কোরে জল পড়্‌ছিল। ট্রেনে আধঘন্টা বোসেই আছি। শেষে নাম্‌বার বন্দোবস্ত হোচ্চে এমন সময় ট্রেনটা আবার ছাড়্‌ল। তারপর থেকে ট্রেন্‌টা বেশ্‌ চোল্‌তে লাগল। আবার খানিক দূর এসে ট্রেন্‌টা থাম্‌ল। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ থাক্‌ল না। চল্‌তে লাগ্‌ল। বরোগ

সোলন থেকে অনেক উঁচুতে। তাই ট্রেনটাকে অনেক চড়্তে হয়। তার পর থেকে ট্রেন্টা খালী চড়্তে লাগ্ল। সেই রাস্তাটা এ্যামোন্ ভীষণ। এ্যাক্পাশে গভীর খড্। ঠিক ট্রেন্টার নীচেই। আর আর এ্যাক্ পাশে উঁচু পাহাড়। ট্রেন্টা আবার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল এ্যামোন্ সোময় কি হোলো, এঞ্জিন্টায় জল কোমে গ্যালো। এঞ্জিনটা তাই গাড়ীটাকে আর টান্তে পার্ল না। আর রাস্তাটা ছিল ঢালু। গাড়ীটা তীরের মতন নেমে যেতে লাগ্ল। আমি ভেবে ছিলাম বুঝি মজা হচ্ছে। সে রাস্তাটাও ভীষণ। আর তারপর গাড়ীটা একটা বনের মাঝখানে সমতল জায়গায় এসে গাড়ীটা থাম্ল। সেখানে যেই গাড়ীটা থাম্ল, অম্নি যত লোক নেমে গ্যাল। কেউ কেউ আবার সেই বনের মধ্যে সারি সারি বোসে খেতে সুরু কোরে দিল। আমাদের সঙ্গে অনেক জিনিষ ছিল আর কোনো কুলি পাওয়া গ্যালোনা। তাই না বরোগে যেতে পারলাম না সোলনে ফিরে আসা যায়। সেখানে রাত্তির দশটা পর্য্যন্ত বোসে থাক্তে হোলো। তারপরে একটা এঞ্জিন সিম্লের থেকে এলো। এসে আমাদের ট্রেনটার পেছুনে লাগ্ল। তারপর ধীরে ২ বরোগ পৌঁছুল। তারপর বাবু সেই ট্রেন্টায় কোরে মিরেট গেলেন। বরোগে একজন বাঙালী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের ভাব আছে। সে ফলের দোকান করে। সে এখানেই থাকে। অনেক দিন থেকে। সে এখানে এ্যাক্জন্ পাহাড়ীকে বিয়ে কোরেছে। আম্রা তার কাছ থেকে একটা লণ্ঠন চেয়ে নিলুম। তার স্ত্রী আমাদের খানিকটা দূর পর্য্যন্ত আলো দ্যাখাবে বোল্লে। তার স্ত্রী বেশ্ ভাল। বল্লে যে তুমি আমার বাড়ী চল্না। তোমাদের আমি রুটী সেঁকে খেতে দেব। বাব্জা বোল্লেন যে আজ বাড়ী ফিরে যাই আর এক্দিন আস্বো। তারপর আম্রা অন্ধকারে যেতে লাগ্লাম্। রাস্তাটা আবার খুব উঁচু। শুধু চড়্তে হয়। বনের মধ্যে দিয়ে। তারপরে কার্টরোডে উঠ্লাম। সে রাস্তাটা ভালো কিন্তু চারিদিক্টা এ্যামোন্ ভীষণ। কালো কালো পাহাড় এ্যাকদিকে আর কালো খড্ এ্যাক্দিকে। পাহাড়ের

ড়ার গাছগুলো ঠীক এ্যাক্টা দৈত্যের মতন দ্যাখাচ্ছিল। সেদিন চাঁদের আলো থাক্তে পার্ত কিন্তু পাহাড়ে চাঁদটা প্রায় ঢেকে গিয়েছিল। একটু ানি দ্যাখা যাচ্ছিল। ভক্তি বেচারা কিছুতে যেতে পারছিলনা। ও বলছিল য আমি রাস্তায় শুয়ে পড়্ছি। আমারো এত ঘুম পেয়েছিল যে চোখ ন্ধ হোয়ে যাচ্ছিল। খানিকদূর গিয়ে যেই এক্টা পাথরের ওপোরে সেছি এ্যামোন্ সোময় মা রাস্তার ধারে এ্যাক্টা লোক্কে দেখ্লেন। স এমোন অস্বাভাবিক জায়গায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। তার নিশ্বাসও পড়্ছিল া। আমাদের এ্যামোন্ ভয় হোলো যে যদি ডাকাত হোতো। আমরা াড়াতাড়ি আর এ্যাক্ মাইল গেলাম। তখন আকাশে এ্যামোন্ মেঘ হায়েছে। আর সে জায়গায় সাঁপেরো খুব ভয়। এ্যামোন্ সোময় খুব জারে বিষ্টি হোতে লাগ্ল। তখন প্রায় বাড়ী এসে গিয়েছিলাম। আমি আর ভক্তি তো বাড়ী এসেই ঘুমিয়ে পোড়লাম। মাসীমাকেও আমাদের াড়ীতে থাক্তে হোলো। ওঁর বাড়ীর সাম্নে যাত্রা হচ্ছিল। তাই ভারী ভীড় হোয়েছিল। যাওয়া যাচ্ছিল না। রাস্তায় আমার বাব্জাকে দেখে ভারী হাসি পাচ্ছিল। বাব্জা এ্যাক্ কাঁধে ছাতা নিয়ে আর এ্যাক্ হাতে লাঠি আর এ্যাক হাতে বাতি নিয়ে গম্ভীর ভাবে যাচ্ছিলেন।

[আষাঢ় ১৩২৬]

রাণু ॥

৬৫

[নভেম্বর ১৯২৪]

C/O Prof. P. B. Adhikari
The Benares Hindu
University
সোমবার।

ভানুদাদা,

অনেকদিন আপনার কোনো চিঠি পাইনি— একমাসের উপর হল। আপনি সিলোন থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, মনে আছে কি ভানুদাদা? তাতে লিখেছিলেন যে আমাকে চিঠি লেখা বোধহয় আপনার পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। সেইজন্যেই বোধহয় চিঠি পাইনি। একবার শুন্‌লুম যে আপনি পোর্ট সেইডে এক সপ্তাহ থাকবেন তারপর জেরুজালেম যাবেন। গেছেন কি ভানুদাদা? তারপর আবার কাগজে একদিন দেখ্‌লুম যে আপনি ম্যাডিডি এ start করেছেন। পেরুতে শুনেছিলুম আপনি 10th Decএ যাবেন।[১] এ চিঠিখানা তবে পেরুতেই পাঠাই ভানুদাদা— আপনি রাগ করবেন না ভানুদাদা চিঠি আবার লিখ্‌ছি বলে। আপনি কেমন আছেন আর কোথায় আছেন এ খবরটুকুও কি খবরের কাগজে থেকে জান্‌তে হবে? খবরের কাগজও যে সব সময় পাই না। সুবীরদাদা[২] যখন কোল্‌কাতায় যায়, তাকে বলে দিয়েছিলুম যে আপনার কোনো খবর পেলে আমাকে পাঠাতে। সেদিন সে একটুখানি খবর পাঠিয়েছে যে আপনি পেরু যাবেন। ভানুদাদা, আপনার একটুখানি হাতের লেখা দেখ্‌তে আমার ভারী ইচ্ছে করে। আপনি যখন আমার চিঠি পাবেন তখন কত শত শত লোকের মাঝখানে আপনি। আমি আপনার কে ভানুদাদা যে আপনি তখন আমাকে মনে করবেন? আমি সে আশাও করিনা। কিন্তু যদি কোনোদিন রাত্তিরবেলা অন্ধকারে শুতে গিয়ে আমাকে একটীবারও মনে পড়ে ভানুদাদা তাহলে

এক লাইনের একটা ছোট্ট চিঠি দেবেন ভানুদাদা যে সেদিন আমাকে মনে হয়েছে আপনার। আমি আপনার কে ভানুদাদা? আমি আপনার বন্ধুও নই, আর কেউ জান্‌বেও না, ভানুদাদা। আমাকে পথের মাঝখান থেকে আপনি একদিন কুড়িয়ে নিয়েছিলেন, তারপর যেই আপনার একটু খারাপ লাগ্‌ল পথেই ফেলে দিয়ে গেলেন। ভানুদাদা— আমি কি বল্‌ব? ভালবাসার কি একটা দাবী নেই? ভানুদাদা, আপনি কি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারেন না? আমার যে ভারী কান্না পায় ভানুদাদা। ভানুদাদা, আমি ত বেশী কিছু অন্যায় করিনি। আমি Parisএ কিরকম কষ্ট পেয়ে আপনাকে চার পাঁচখানা চিঠি লিখেছি। ভানুদাদা— একটুও কি আপনাকে move কর্‌ল না? ভানুদাদা, আমি কতসময় ভাবি যে অভিমান করে আপনাকে চিঠি লিখ্‌ব না, কিন্তু কি রকম একলা, কি রকম বুকে কষ্ট হয় তাই আজ আবার লিখ্‌ছি। ভানুদাদা, দয়া করেও কি এক লাইন লেখা যায় না? ভানুদাদা, কোলকাতা থেকে ফিরে এসেই আমার জ্বর হয়েছিল। আপনার চিঠি কখানা সেই সময়ই পাই। ভানুদাদা, আমি এত দোষ করেছি যে আপনাকে আমি আর ভালবাস্‌তে পাব না? ভানুদাদা, আপনিই ত কতবার বলেছেন যে আমাদের সত্যিকারের বিয়ে হয়ে গেছে।[৫] তবে আপনি কি বলে আমাকে এমনভাবে অপমান করেছেন? আমাকে চিঠিতে আপনি যত খুসী বকুন না কিন্তু মাকে কেন লিখ্‌লেন? ভানুদাদা, আমি আপনাকে কি বল্‌ব, আমি সেই সময় গুলো সেই দুপুরবেলা সেই সন্ধ্যে সকাল, রাত্রি, সেই আপনার একেবারে কাছে বসে যখন গল্প কর্‌তুম, সেই সময়গুলো ভাব্‌তে পারি না। বুক টন্‌টন্‌ করতে থাকে— এত কষ্ট হয় কিন্তু তবু বারবার ভাব্‌তে ইচ্ছে করে। ভানুদাদা, সে সব হয়ত আপনার জীবনের একটী খেলার পালা কিন্তু আমার তা নয়। নয়, একেবারে নয়। এ যদি আমার জীবনে মিথ্যে হয় ভানুদাদা তাহলে পৃথিবীতে সত্য কাকে বল্‌ব? আমি একটুখানি ভাল হতেই আমরা আলীগড় গিয়েছিলুম, সেখানে গিয়েই আমার আবার

জ্বর আর কাশী হয়েছিল। আর তার সঙ্গে বমি হত। তারপর, সেখানে থেকে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলুম, পেয়েছিলেন কি? আমরা আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, ফতেপুর সীক্রী, আর আরো দুচার জায়গায় বেড়িয়ে কাল কাশী এসেছি। আপনি হয়ত শুনে খুসী হবেন। আজ কলেজ গিয়েছিলুম কিন্তু ভারী মাথা ব্যথা হয়েছিল তাই তাড়াতাড়ি চলে এলুম। ভানুদাদা, ভানুদাদা, আমাকে ভুলে যাবেন না। ভানুদাদা, আমাকে আর ভালবাস্‌বেন না? ভানুদাদা, আপনি যাই বলুন আমি কাউকে কিছুতেই ভালবাস্‌তে পারব না। আমি বুড়োদের* কোনো খবর জানি না। জানতে চাইও না। সেই আমাকে তার জন্যেই ত আবার আপনি অবধি আমাকে ভালবাসেন না। আমি ত আপনার পায়ে ছুঁয়ে বলেছি যে তাদের কোনো খবর নেবনা। আমি বিয়ে কর্‌ব না। কখনই, কখনই না তাকে সে আমার পায়ে ধরে সাধ্‌লেও না। ভানুদাদা, আমি যত ভেবে দেখি, দেখি যে সে কাপুরুষ— আমি তার সঙ্গে আর কোনো রকম কিচ্ছু সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই না। ভানুদাদা, আগে আমার বুড়োর উপর একটুও রাগ হত না কিন্তু এখন মনে হলে ঘৃণা হয়। আমি কাউকেই বিয়ে কর্‌ব না— আপনার সঙ্গে ত বিয়ে হয়ে গেছে। ভানুদাদা, আপনি হয়ত মান্‌বেন না কিন্তু আমি মানি। আপনি আমাকে নাই ভালবাসলেন। আপনি আমাকে নাই চিঠি দিলেন কিন্তু আমি ত মনে মনে জান্‌ব যে একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে সে আদর আমার মনকে ভরে দিয়েছিল সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুর নেই ভানুদাদা আপনারও না। নাই বা আপনি চিঠি দিলেন, আমি ত জান্‌ব মনে মনে যে একটা secret আছে যা আমি আর ভানুদাদা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সেই secretটুকুতে ত কারুর অধিকার নেই। ভানুদাদা, আপনাকে কত লোক ভালবাসে, কত লোক আপনাকে চায়, কত শত শত লোক একটীবার আপনাকে চোখের দেখা দেখ্‌বার জন্যে দূর দূর দেশ থেকে

আসে— আমি তাদের মাঝখানে কে ভানুদাদা? আমার এমন কোনো গুণ নেই যার জন্যে আপনার ভালবাসার যোগ্য হতে পারি। এমন রূপও নেই ভানুদাদা যে আপনাকে মুগ্ধ করতে পারি। ভানুদাদা, আমার চেয়ে কত শত শত সুন্দরী মেয়ে আপনার ভালবাসা চায় তবু ভানুদাদা আপনি আমাকে ভালবাসেননি। এখন যদি না ভালবাসেন তবে আমি কি বলব ভানুদাদা? আপনার জীবনে অনেক নূতনত্বের মধ্যে এ হয়ত একটা খেলা কিন্তু ভানুদাদা আমি যে আপনাকে ভারী ভালবাসি ভানুদাদা। আমার রূপ নেই গুণ নেই কিন্তু আমার মতন কেউ কখন আপনাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বে না। চাই না চাই না আমি প্রতিদান। একদিন ত পেয়েছিলুম একদিন ত আপনাকে ভালবাস্‌তে পেয়েছিলুম, ভানুদাদা, সে কথা ভাবতেই আমার এমন বুকে কষ্ট হয় কিন্তু তবু কেবলি বার বার ভাবতে ইচ্ছে করে। ভানুদাদা, মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। ভানুদাদা, আপনি আমাকে misunderstand করলেন বলে আর চিঠি দিলেন না এই কথা ভাব্‌তেও আমার কষ্ট হয়। ভানুদাদা, আপনি কি করে বুঝবেন? কিন্তু আমার এ কথা মনে হলেও এত একলা বোধ হয়। বোধহয় যেন এ পৃথিবীতে কেউ নেই যে আমাকে একটু sympathiseও করে। ভানুদাদা, আমি কখনই কাউকে বিয়ে কর্‌ব না। বুড়োকে কখনই কখনই না। সে যদি আমার পায়ে ধরে সাধে তবুও না। সে কাপুরুষ এক sentimental লোক। আমি আর তার সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ রাখতে চাই না। তার চিঠির কথা মনে হলে আমার এমন লজ্জা করে ভানুদাদা। সে সত্যি লোভী, true ভালবাসা কাকে বলে ওদের সমস্ত বাড়ী একত্র কর্‌লে বোধহয় কেউ বল্‌তে পারে না। ভানুদাদা, আপনি আমার জন্যে যা করেছেন আমাকে একসময় ভালবাসতেন বলেই করেছেন। ভানুদাদা, বুড়ো আমার পায়ে ধরে সাধ্‌লেও আমি ওকে বিয়ে করব না। ভগবান করেন ওর সঙ্গে যেন আমার এ জীবনে কখন না দেখা হয়। ও শনি। আপনার আর আমার জীবনের মাঝে এসেছিল— ভগবান করেন

আবার যেন যেখানে ছিল চলে যায়। ভানুদাদা, কার সাধ্য আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখে। আমি তাকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছিলুম, তার মধ্যে প্রায় অনেকগুলোই ও আমাকে ফিরত পাঠিয়েছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। ওর সমস্ত চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি। ওর চিহ্ন মুছে যাক্, ধুয়ে যাক্। ভানুদাদা, দোহাই আপনার, আমাকে কখন বিয়ে কর্‌তে বল্‌বেন না। আমি যেমন আছি থাক্‌ব। আপনি ছাড়া আমি কাউকে কখন ভালবাসতে পার্‌ব না। ভানুদাদা জানেন আমার মর্‌তেও ইচ্ছে করে আপনার বুকের কাছে। ভানুদাদা আমি যে কিরকম [করে?] চাই একটু আপনার হাতের লেখা দেখ্‌তে। ভানুদাদা আপনি একটু হাত দিয়ে ছুঁয়েও আমাকে একখানা কাগজ পাঠিয়ে দেবেন। ভানুদাদা, আমার মতন unfortunate বোধ হয় কেউ নেই এ পৃথিবীতে কেউ নেই। আপনার কতদিন কোনো খবর পাইনি। ভানুদাদা, আপনি আমাকে misunderstand করলেন আর এমন করে ফেলে চলে গেলেন যেন আমি একটা পথের কুকুর। একটুখানি চিঠি লিখে খবর অবধি জানালেন না। কেন, কেন আমি এমনি কি দোষ করেছি যে আপনি এক লাইনের চিঠি লিখ্‌তে আমাকে ঘৃণা করেন। আমি আপনাকে কখনই ঠকাইনি। সত্যি যদি না ভালবাস্‌তুম তাহলে আপনার খবর জান্‌বার আমার দরকার কি? ভানুদাদা— আপনার দুটী পায়ে ধরে বল্‌ছি— আমি কি রকম উৎসুক থাকি আপনার একটুখানিও খবর জান্‌তে। আমি এত কাঁদি আপনি কি এক্‌টুও বোঝেন না? ভানুদাদা, যদিই দোষ করে থাকি আপনি কি ক্ষমা কর্‌তে পারেননা? আপনি এতই নিষ্ঠুর? ভানুদাদা— আপনি না ভালবাসলে আমি বাঁচ্‌ব কি করে? ভানুদাদা— আমি আর কখনই কখনই অভিনয় কর্‌ব না। আমার অভিনয়ের কথা মনে হলে রাগ হয়। আমি আর কিছু চাইনা কেবল আপনার ভালবাসা। ভানুদাদা আমার ভারী মন কেমন করে। যদি সময় না পান্, আমাকে দয়া করে একলাইনও খবর দেবেন যে কেমন আছেন।

আমরা কাশীতে এসেছি। মা, বাবা সকলে ভাল আছে। শুন্‌ছি দিলীপ কুমার রায়* দু তিন [দিন] বাদে কাশীতে আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন। এখানে একটা science conference হবে তাতেও প্রশান্তবাবুরা অনেকে আস্‌বেন বোধহয় কোল্‌কাতা থেকে। আর শুনছি অমিয়বাবু এসে নাগোয়াতে কোথায় আছেন। এসেই জ্বর হয়েছে— বোধহয় ম্যালেরিয়া। ভানুদাদা, ভানুদাদা, দোহাই ভানুদাদা, আমি যে ভারী চাই আপনার একটুখানিও খবর জান্‌তে। ভানুদাদা— আমি জানি আমার রূপও নেই, গুণও নেই তবু ভানুদাদা আপনি আমাকে ভালবেসেছিলেন। এখন আপনি আমার মনের কথা একটুও ভাবলেনও না— ভানুদাদা আপনার ত ভুল্‌তে একটুও দেরী হল না। দেয়ালীর দিন আমার জন্মদিন ছিল। ভানুদাদা— আমার প্রণাম আপনাকে চিঠিতে পাঠাচ্ছি। ভানুদাদা, একলাইন চিঠিও কি পাব্‌না ভানুদাদা।

রাণু ॥

P.S. গবাদা* আমাকে ২।৩ খানা চিঠি আর ছবি দিয়েছিল। ভানুদাদা, আমি তখন বাধ্য হয়ে একটা ছোট্ট [চিঠি] দিয়েছি। তারপর গবাদা আবার দুটো ছবি পাঠিয়েছে। আমি আর লিখ্‌ব না ভাব্‌ছি। ভানুদাদা, আমি কখনই encourage কর্‌ব না— ইচ্ছেও নেই। ভানুদাদা, আমার ভারী মন খারাপ থাকে— একখানা চিঠি কি দেবেন না ভানুদাদা?

৬৬

[৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

*7, Harington Street
Calcutta
13.6.37

ভানুদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আপনাদের বিশ্বভারতীর যে monthly একটা খবর বেরয়[১]— তাতে আপনাদের আলমোরা বাসের সব খবর পেলুম।[২] আমরাও অনেকদিন আগে আলমোরায় গিয়েছিলুম— আপনার কি মনে আছে? আমার খুব ভাল লেগেছিল। আশা করি আপনার শরীরের উন্নতি হচ্ছে।

আমরা যাবার আগে আপনাকে প্রণাম পাঠাচ্ছি। Mooltanএ রওনা হচ্ছি 19th June এ। কোলকাতা থেকে 17th Blue trainএ ছাড়ছি। ছেলেদের[৩] রেখে যাচ্ছি বলে বড় মন কেমন করছে। হয়ত England থেকে America যেতে হবে। আমাদের Londonএর Office ঠিকানা হল চিঠি দিতে হলে

Messrs. T. A. Martin & Co.
Laurence Pountray Hill
Vestry House
London E. C. 4.

আমরা থাকব Dorchester Hotel এ। দেখুন— এত খবর দিলুম তার মানে আপনার চিঠি চাই।

আপনি বহুদিন আগে আমার ছবি চেয়েছিলেন— একটা পাঠাচ্ছি— কি জানি যদি ভুলে যান।

আমার অনেক ভালবাসা ও প্রণাম জানবেন।

ইতি আপনার
রাণু

৬৭

[৮ শ্রাবণ ১৩৪৭]

**7, Harington Street*
Calcutta
Park 464
24.7.40

ভানুদাদা,

আপনার দুলাইনের চিঠি পেয়েও কি আনন্দ হল যে কি বলব।[১] যখন কোলকাতায় আসবেন— আশা করি খবর পাব। কাউকে বলবেন যে একবার Phone করে আমাকে সব খবর দিয়ে দেবে।

আপনাকে একটু বিরক্ত করছি। একখানি ইংরাজী গীতাঞ্জলী পাঠালুম— যদি ইংরাজীতে আপনার নাম ও তারিখ সই করে দেন— এইমাসে বইখানি ফিরৎ পেলেই হল।[২] কষ্ট দিচ্ছি কিছু মনে করবেন না।

আশাকরি ভাল আছেন। কোলকাতা ভয়ানক গরম— 7th August আপনার কাছে যাবার ইচ্ছা রইল।

ইতি
আপনার স্নেহের রাণু

৬৮

[২১ শ্রাবণ ১৩৪৭]

7, Harington Street
Calcutta
Park 464
6.8.40 মঙ্গলবার।

ভানুদাদা—

কাল আপনি খুবই ব্যস্ত থাকবেন[১] তবু কালকের জন্য দুলাইন না লিখে থাকতে পারলুম না। আশাকরি সবই খুব সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হবে।

আমার ভাগ্যে যাওয়া নেই। গত দিন চারেক থেকে flu হয়ে শয্যাগত আছি। গলা ধরে গেছে এমন যে গলার জন্য electric treatment নিচ্ছি।

যাবার খুব ইচ্ছা ছিল।

আপনার autographed বই যথাসময়ে পেয়েছি। খুব সুন্দর হয়েছে। মহারাজা দারভাঙা ৭০০॥ টাকা দিয়ে বইখানি কিনেছে।[২]

আশা করি আপনি ভাল আছেন। আমার ভালবাসা জানবেন।

ইতি আপনার
রাণু

পরিশিষ্ট ২

আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-র পত্র রবীন্দ্রনাথ ও অনিলকুমার চন্দকে

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

১

১৬ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

বারাণসী : মঙ্গলবার।

শ্রীচরণকমলেষু,

কাল আপনার আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া আমরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বাবজা এখানে আসিয়া গরমে একটু ক্লিষ্ট হওয়া ভিন্ন বেশ ভালই আছেন। কিন্তু এখানে এমন অস্বাভাবিক দারুণ গরম পড়িয়াছে, ও সহরে কলেরা ও ডেঙ্গুজ্বর হইতেছে, যে তাঁহার জন্য আমরা বড়ই ভয় পাইতেছি। তিনি অগষ্ট মাসের প্রথম হইতে দুইমাস ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছেন্। বাবুর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে তবে এখনও বড় দুর্ব্বল আছেন্। আমরা আর সকলে ভাল আছি।

রাণু দিনে তিনবার দুধ খায় এবং স্কুলে যেটুকু পড়ে তাহা ব্যতীত কিছু পড়িতে দেওয়া হয়না; তবে সে অনেক জিদ করিয়া স্কুলে অ্যালজেব্রা ও জিয়োমেট্রীর ক্লাস লইয়াছে। দিনে স্কুল থাকিতে রাণু সারা সকাল চিঠি লিখিত, ও বিকালে যেদিন আপনার চিঠি পাইত সেদিন সারাবিকাল আপনার চিঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর নয় ত নানাদেশের রাজপুত্র রাজকন্যা ও পরীদের ছবি আঁকিত। আজকাল সকালে স্কুল, দুপুরে ছুটী; তাই সারাদুপুর রাণু যে পথ দিয়া ডাকহরকরা আসে সেই পথের ধারের জানলা খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আজ তিনচারদিন আপনার চিঠি না পাইয়া রাণু চুলবাঁধা ছবিআঁকা সব ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি রাণু অত্যন্ত বিষণ্ণ ও মনমরা হইয়া আছে। কাহারও সহিত বড় কথা কয়

না, খেলাধুলা ত একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া গিয়া ছাদে শুইয়া থাকে। সেজন্য মা বাবজাও তাহার শরীরের জন্য বড় চিন্তিত হইয়াছেন্।

আপনি আমাদের সকলকার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন্। ইতি,—
[৩২ আষাঢ় ১৩২৫][১]

আপনার স্নেহের
আশা।

২

২১ ডিসেম্বর ১৯৩৭

*অখিল ভারত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সমিতি

*বর্ধা (মধ্যপ্রান্ত)
তাং ৬ই পৌষ, ১৯৩৭।

শ্রীচরণেষু,

গুরুদেব, আপনি আমাদের উভয়ের পৌষোৎসবের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন্।

বহুদিন আপনাকে কোনও চিঠি লিখিনি। আপনি কিছুদিন পূর্ব্বে যখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন্[১], তখন একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে আপনার সেবা করবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু হয়ত কোনও সেবায় লাগবনা কেবল সেখানকার ভীড় বাড়াব এই আশঙ্কায় সে ইচ্ছা সম্বরণ করেছিলাম্।

ওয়ার্দ্ধায় যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্মেলন হয়েছিল তার পর রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রচেষ্টা চলছে সে সম্বন্ধে হয়ত গান্ধীজী কলকাতায় থাকতে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন্। আমাদের সমিতির কাজ যতদূর

অগ্রসর হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার কাছে পাঠালাম্, আপনার কখনও অবসর হলে একবার দেখবেন্।

আপনি আমাদের দুজনের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন্। ভবিষ্যতে যখন আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবে একবার গিয়ে আপনাকে দর্শন করে আসবার আশা মনে আছে।

ইতি

প্রণতা

আশা। আরিয়াম্।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অনিলকুমার চন্দকে লিখিত

* হিন্দু মহিলা মণ্ডল

Mahila Ashram
Wardha, C.P.
25/11/36

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের অনিল, তোমার পোষ্টকার্ড পেয়ে ভারী খুশী হ'লাম্। গুরুদেবের কাছে আমাদের কয়েকটী প্রার্থনা নেই একটী মাত্র প্রার্থনা।

তুমি ত জান এখানে আমরা দুজনে দুটী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ করছি। একটী বালকবিদ্যালয় ও একটী মহিলাশ্রম। দুটী প্রতিষ্ঠানে এতদিন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নামকরণ ও কার্য্যপদ্ধতি ছিল। উভয় প্রতিষ্ঠানেই এখন নামকরণ ও কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করবার প্রস্তাব চলছে।

আমি যে মণ্ডলীর সম্পাদিকার (এদেশে বলে মন্ত্রী) কাজ করছি, তার নাম এতদিন ছিল "হিন্দু মহিলামণ্ডল" ও উদ্দেশ্য ছিল 'হিন্দু মহিলাদের

নৈতিক, বৌদ্ধিক, ঔদ্যোগিক ... ইত্যাদি ইত্যাদি' শিক্ষা প্রদান করা।

মণ্ডলীর গত অধিবেশনে স্থির হয়েছে যে বর্ত্তমান constitution বদলে যে নূতন constitution করা হবে— তাতে উদ্দেশ্য রাখা হবে "জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নারীজাতিতে নবজাগৃতি ও আত্মপ্রত্যয় সম্পাদনে সহায়তা করা এবং তাঁদের সেবার জীবনের জন্য প্রস্তুত করা"।

(হেসোনা যেন— এখানে বড় বড় নেতারা এইরকম বড় বড় প্রস্তাব করে থাকেন্)

এই মণ্ডলীর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত রূপের জন্য গুরুদেবের নিকট একটী নূতন নাম প্রার্থনা করা হবে। গত অধিবেশনেই এই প্রস্তাব হয়েছিল। এবং সেই প্রস্তাবের একটী কপি আমি মল্লিকজীর হাতে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম্। পেয়েছ কি?

আগামী ২৯শে নভেম্বর আমাদের অধিবেশনের দিন। যদি সম্ভব হয় ত গুরুদেবের কাছ থেকে বালকবিদ্যালয়ের জন্য একটী ও মহিলামণ্ডলের জন্য একটী— দুটী নাম জিজ্ঞাসা করে আমাদের তারযোগে জানাতে পারবে কি?[১] তারের খরচ অবশ্য মহিলামণ্ডল দেবে।

ডিসেম্বর মাসে একবার কাশী যাব। যদি সম্ভব হয় সেখান থেকে একদিনের জন্য গিয়ে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব। আশা করি রাণীর[২] শরীর ভাল আছে। তোমরা দুজনে আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি [৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩]

আশাদিদি।

পুঃ। হিন্দী প্রস্তাবের আর একটা কপি এইসঙ্গে পাঠালাম্। আশাদিদি।

ফণিভূষণ অধিকারী (?-১৯৫০) নদীয়া জেলার টুঙ্গী গ্রামের বেণীমাধব অধিকারীর পুত্র। বেণীমাধব ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, টোল স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষাদানে তিনি জীবনের অনেকটা অংশ অতিবাহিত করেন। স্ত্রী-বিয়োগের পরে তিনি সন্ন্যাস নিলে তাঁর নাম হয় পরমহংস স্বামী যোগানন্দ। তাঁর এক শিষ্য কাশীতে খানিকটা জমি-সহ একটি বাড়ি তাঁকে দিয়েছিলেন। এই বাড়িতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত করেন।

বেণীমাধবের চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় ফণিভূষণ ছিলেন পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পরে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন নেপালের রাণাদের গৃহশিক্ষক হিসাবে। এর পরে তিনি দিল্লির হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষ ও দর্শনের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন ও ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর অ্যানি বেসান্টের আহ্বানে দিল্লির কাজ ছেড়ে ফণিভূষণ অল্প বেতনে কাশীর হিন্দু সেন্ট্রাল কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এর আগেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল চন্দননগরের হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সরযূবালার (? - ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭২) সঙ্গে। ১৯১৪ সালে বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হলে ফণিভূষণ সেখানে দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

সরযূবালার পিতা হরিমোহনও ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, সংগীতজ্ঞ ও বহুবিধ গুণের অধিকারী। জম্মুর রাজা রাম সিং-এর অধীনে তিনি কর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু রাজার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি চাকরি ত্যাগ করে লাহোরে চলে আসেন। তাঁর সাতটি সন্তানের মধ্যে কালীপ্রসন্ন (?-১২ নভেম্বর ১৯১৯) ছিলেন বহুবিধ গুণের অধিকারী। সাংবাদিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি

অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অনুরাগী এই মানুষটি পুত্র বিশ্বনাথকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করে দেন। কিছুকাল তিনি শান্তিনিকেতনে এসে বাসও করেছিলেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদ্যালয়ের কাজে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাশী হিন্দু বালিকা ও বালক বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করে তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা সম্ভব হয় নি। তাঁর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সরযূবালাকে ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ তারিখে যে চিঠিটি লেখেন, সেটি 'শোকাতুরার প্রতি' নামে পৌষ-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

সরযূবালার জীবনে তাঁর এই অগ্রজের প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রীতির দীক্ষা তিনি তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। লাহোরে থাকার সময়ে রাভি নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন। শৈশবেই সরযূবালা রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারতেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন সুগায়িকা, রবীন্দ্রসংগীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। অ্যানি বেসান্টের থিয়োসফিক্যাল স্কুলে তিনি অবৈতনিক সংগীতশিক্ষিকার কাজ করতেন।

ফণিভূষণও রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। এই অনুরাগেরই বশবর্তী হয়ে তিনি ১৯১০ সালে গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে কলকাতা থেকে কর্মস্থলে ফেরার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন ও তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিবাচক বিবরণ 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে অগ্রহায়ণ ১৩১৭-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে প্রকাশ করেন। তাঁদের বাড়িতে রবীন্দ্রচর্চার যে আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল, তার প্রভাব তাঁদের সন্তানদের উপরেও পড়েছে স্বাভাবিকভাবে।

ফণিভূষণ ও সরযূবালার পাঁচটি সন্তান। জ্যেষ্ঠা আশার জন্ম লাহোরে ১৯০৩ সালে (মৃত্যু : ৩০ জুন ১৯৭০), দ্বিতীয়া কন্যা শান্তির জন্ম ১৯০৪-এ দিল্লিতে, তৃতীয়া কন্যা প্রীতি বা রাণুর জন্ম ১৯০৬ সালে কাশীর

‘মিশ্রী পুকুরা’ নামক স্থানে (মৃত্যু : ১৫ মার্চ ২০০০), চতুর্থা কন্যা ভক্তি ১৯০৮-এ ও একমাত্র পুত্র অশোক ১৯১০ সালে কাশীতেই জন্মগ্রহণ করেন।

উপরে অধিকারী-পরিবারের যে বিবরণ দেওয়া হল, সেটি প্রায় সম্পূর্ণতই শ্রীসমর ভৌমিকের ‘রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য’ (১৪০৪) গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য অবলম্বন করে। তিনি লিখেছেন, ফণিভূষণের তৃতীয়া কন্যা প্রীতি বা রাণুর জন্ম ১৯০৬ খৃস্টাব্দে কাশীর ‘মিশ্রী পুকুরা’ নামক স্থানে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিজের পত্রের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি, রাণুর জন্ম হয়েছিল কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ কালীপুজোর দিনে। ওই বছর কার্তিকী অমাবস্যার তিথি ছিল ১ কার্তিক ১৩১৩ বৃহস্পতিবার ১৮ অক্টোবর ১৯০৬ তারিখে। সুতরাং এই তারিখটিকে রাণু বা প্রীতি অধিকারীর (পরবর্তীকালের লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়) জন্মতারিখ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে, রাণুর পরিবারে রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীতের চর্চা ছিল অত্যন্ত সজীব। ফলে অল্প বয়স থেকেই রাণু রবীন্দ্রনাথের যে বই হাতে পেয়েছেন আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছেন বুঝে বা না-বুঝে। তা ছাড়া তাঁদের বাড়িতে ‘প্রবাসী’, ‘ভারতী’ ও ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকা আসত, তাই নতুন লেখা পড়ারও সুযোগ ছিল তাঁর। তাঁর মা পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি কেটে বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন, তাই তাঁর চেহারার আদলও রাণুর অজানা ছিল না। এই-সবেরই পরিণতি শ্রাবণ ১৩২৪-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণুর প্রথম চিঠি। চিঠিটিতে তাঁর ঠিকানা ছিল, কিন্তু নিজের পোশাকি নাম ও পদবীর উল্লেখ ছিল না— প্রযত্নে বাবার নাম লেখার তো প্রশ্নই নেই। এইরূপ চিঠির উত্তর না-পাওয়াই স্বাভাবিক, তবু-যে জবাব দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যত্নসহকারে চিঠিটি রক্ষা করেছিলেন তার কারণ এর বিষয়বস্তু ও লেখিকার রচনার পদ্ধতি। রুল-টানা কাগজে মাত্রা দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দেখেই পত্রলেখিকার বয়স অনুমান

করা শক্ত নয় (তখনও তিনি এগারো বছর পূর্ণ করেন নি)। আর বিষয়বস্তু? এই বালিকা জানাচ্ছেন, তিনি সেই বয়সেই 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছাড়া গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলিই পড়ে বুঝতে পেরেছেন— তাঁর পড়া বইয়ের তালিকায় আছে গোরা, নৌকাডুবি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজর্ষি, বৌঠাকুরানীর হাট, গল্পসপ্তক (তাঁর মা যেটি জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন), ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা ও শারদোৎসব— কোনো-কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলেও তাঁর ভালো লেগেছিল। এ ছাড়া তিনি চতুরঙ্গ, ফাল্গুনী ও শান্তিনিকেতন পড়তে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু বুঝতে না পারায় পড়া বিশেষ এগোয় নি। উপরন্তু তিনি জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর ছোটো বোন 'কথা' ও 'ছুটির পড়া' থেকে কবিতা 'মুখস্থ' করেন। সুতরাং এমন একজন লেখককে দেখতে চাওয়া বা বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেদের শোবার ঘরে শুতে দেওয়া ও প্রিয় পুতুলগুলি দেখানোর প্রতিশ্রুতি দান করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। ক্ষুদ্র পাঠিকা কিন্তু শুধু প্রশংসামুখর নন, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে ইরাণী বাঁদীর কাহিনীকে অসম্পূর্ণ রাখা বা 'জয়পরাজয়' গল্পে রাজকন্যার সঙ্গে শেখরের বিয়ে না দিয়ে তাকে মেরে ফেলা যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঠিক কাজ হয় নি ও তার সংশোধন আবশ্যক, অনুরোধের ছদ্মবেশে এই পরোক্ষ সমালোচনাও তাঁর পত্রে আছে। তা ছাড়া আছে প্রায় জন্মগত আড়ি করে দেওয়ার ভয় দেখানো। কাজেই এমন একটা ও পরে আরও অনেক চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই বালিকা বন্ধুর সঙ্গে এক দীর্ঘকালস্থায়ী পত্রালাপে প্রবৃত্ত হবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাঁর শৈশব ও তারুণ্যের সজীবতাকে সারাজীবন রক্ষা করে যাওয়া, সেই কারণেই সাহিত্য ও কর্মে নিজের পুনরাবৃত্তি না করে তিনি সর্বদাই নূতন পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে পেরেছেন— তাই রাণু যখন তাঁর বয়সকে অপরিবর্তনীয় সাতাশ বছরে বেঁধে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে তাকে

শিরোধার্য করেন— শুধু রাণুকে লেখা চিঠিতে নয়, দেশ ও বিদেশের বহু সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর এই চিরন্তন সাতাশ বছর বয়সের কথা তিনি সগর্বে উল্লেখ করেছেন।

রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলিতে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ দেখা যায়— একটি রাণুর সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়ের পূর্ববর্তী ও অপরটি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরবর্তীকালের। তাঁর সব চিঠিই যে পাওয়া গেছে তা নয়, কিন্তু বর্তমান সংকলনের ২০৮টি চিঠির হিসাব নিলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৭টি রাণুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আগে লেখা— সময়কাল ১৯ অগাস্ট ১৯১৭ থেকে ১৫ এপ্রিল ১৯১৮ আট মাস, গড়ে মাসে একটিরও কম; সেক্ষেত্রে মাসাধিককাল শান্তিনিকেতনে একত্র বাসের পরে কেবলমাত্র জুলাই মাসে (১০-৩১ জুলাই ১৯১৮) লিখিত পত্রের সংখ্যা ৯টি। প্রথম পর্বের চিঠিগুলি নিতান্ত কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা— কিন্তু সাক্ষাৎপরিচয়ের পরে লেখা চিঠিগুলির সুরে গভীরতার স্পর্শ অনুভব করা যায়, কৌতুক সেখানেও আছে, কিন্তু স্নেহ ও কল্যাণকামনা তাদের অনেকটাই আর্দ্র করে তুলেছে।

এর কারণটি নিহিত আছে যে-অবস্থায় রাণুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, তার মধ্যে। রাণু তাঁর প্রায় প্রতিটি পত্রেই কাশীতে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানিয়েছেন, শেষে গঙ্গার পরপারে ভ্রমণের একটি বিবরণ দিয়ে প্রলোভন দেখিয়েছেন, 'আপনি যখন আসবেন তখন আপনাকেও নিয়ে যাব। কিন্তু আপনি আসেন কই।' শেষ পর্যন্ত রাণু নিজেই এলেন দেখা করতে। তাঁর পিতা ফণিভূষণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন বৈশাখ ১৩২৫-এর শেষে— ভবানীপুরের বাসার ঠিকানা দিয়ে রাণু দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দাবি জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যেন অবশ্যই আসেন, 'নয়ত জন্মের মতন আড়ি'। কিন্তু তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই এলেন ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ (১৫ মে ১৯১৮) সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভয় দেখিয়ে লিখেছিলেন, 'আমাকে দেখ্‌তে নারদ মুনির মত— মস্ত বড় পাকা

দাড়ি'— কিন্তু রাণু ভয় পান নি, পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন (২৫ অগাস্ট ১৯১৮), 'আমি যখন তোমাকে লিখেছিলুম যে, আমাকে তুমি নারদমুনির মত মনে করে হয়ত ভয় করবে, তখন আমি কত বড় ভুলই করেছিলুম— আমি যে ছ ফুট লম্বা মানুষ, এত বড় গোঁফ দাড়িওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার লোক, আমাকে দেখে তোমার মুখশ্রী একটুও বিবর্ণ হল না এসে যখন আমার হাত ধরলে তখন তোমার হাত একটুও কাঁপল না, অনায়াসে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে দিলে, কণ্ঠস্বরে একটুও জড়িমা প্রকাশ হলনা— একি কাণ্ড বল দেখি?' এর পরের দিনই তাঁকে একটি অত্যন্ত দুঃখের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, তাঁর প্রথম সন্তান মাধুরীলতা (বেলা) দীর্ঘদিন রোগে ভুগে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। এই পরম দুঃখের দিনে রাণুই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে এসেছেন। সেইদিনই বিকেলে তিনি রাণুদের ভবানীপুরের বাসায় উপস্থিত হয়েছেন এবং তার পরে যতদিন কলকাতায় ছিলেন প্রায়ই গেছেন তাঁদের বাড়ি। ২৭ জুলাই তাঁকে লিখেছেন, 'আমার খুব দুঃখের সময়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে;— আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে সে আমার বড় মেয়ে, শিশুকালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি; তার মত সুন্দর দেখ্‌তে মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্ত্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্ত্তেই তুমি আমার কাছে এলে— আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেববার সময় আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আমার কেবল নয়, সে দিন যে তোমাকে আমার ঘরে আমার কোলের কাছে দেখেচে তারই ঐকথা মনে হয়েচে। তাকে আমরা বেলা বলে ডাক্‌তুম, তার চেয়ে ছোট আর এক মেয়ে আমার ছিল তার নাম ছিল রাণু, সে অনেকদিন হল গেছে।' এই দুটি শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন রাণু অধিকারী— সাতান্ন বছরের পুরুষের কাছে এগারো বছরের বালিকা মেয়ের ভূমিকা নিতে পারেন না, তাই রাণুর সম্বোধন

'রবিবাবু'কে পরিবর্তিত করে 'রবিদাদা' সম্বোধনে পরিণত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হয়েছেন।

এরপরে রাণু রবীন্দ্রনাথের আরও কাছে এসেছেন শান্তিনিকেতনে গিয়ে মাসাধিককাল অবস্থান করে। ফণিভূষণের কলকাতার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথই তাঁদের শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেন। এ কথা বললে ভুল হবে না, রাণুর সান্নিধ্য পাওয়ার স্বার্থবুদ্ধিও তাঁর আমন্ত্রণের পিছনে কাজ করেছিল। এখানে রাণু তাঁকে দেখলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রের পটভূমিকায়, যদিও তখন গরমের ছুটি চলছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা না থাকলেও আশ্রমবাসী শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা ছিলেন। তাই লাবু, রেখা, কল্যাণী প্রভৃতিকে বন্ধু হিসেবে রাণু পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে থাকলেই তাঁকে ঘিরে অনাহূত সভা জমে উঠত— তাই গান, আবৃত্তি, ইংরেজি সাহিত্য পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের স্বাদও রাণু পেয়েছেন, নিজেও 'অভিসার' ইত্যাদি কবিতা আবৃত্তি করে তাতে অংশ নিয়েছেন। তাঁর নিজের আসরও ছিল। দেহলির ছাদে সন্ধ্যার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে তিনি হিন্দি দোঁহা, শিশুমহাভারত, রূপকথার গল্প প্রভৃতি শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছেন (২৭ জুলাই ১৯১৮), 'সন্ধ্যাবেলায় মোড়ায় বসে তুমি যখন আমার কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলে যাও সে আমার খুব মিষ্টি লাগে। সন্ধ্যা আকাশের তারা ঈশ্বরের খুব বড় সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যায় ছাদে রাণুর মুখের কথাগুলি তার চেয়ে কম বড় নয়— ঐ তারার আলো যেমন কোটি কোটি যোজন দূরের থেকে আস্‌চে— তেমনি তোমার হাসি গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হয় যেন কত জন্ম জন্মান্তর থেকে তার ধারা সুধাস্রোতের মত বয়ে এসে আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে জম্‌চে।'

কিন্তু রাণুর ভালোবাসায় যে অধিকারবোধের প্রকাশ তিনি দেখেছেন, তাকে তিনি ভয়ও পেয়েছেন। ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, কিন্তু ভালোবাসা যখন বন্ধনে পরিণত হওয়ার উপক্রম করেছে তখনই

সেই বন্ধন ছিন্ন করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। তরুণ বয়সের সঙ্গিনী, প্রেরণাদাত্রী নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী তাঁর জীবনে প্রথম নারীর ভালোবাসার আস্বাদ এনে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই ভালোবাসাই যখন তাঁর রুচির দাসত্ব করতে রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য করতে চেয়েছে, সেই ভালোবাসাই যখন 'রাহুর প্রেম'-এর মতো সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, তখন তাঁর মন বিদ্রোহ করেছে। এইভাবে রাণুও যখন তাঁকে একান্তভাবে নিজের করে চাইতে শুরু করলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন চিঠির পর চিঠিতে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন, লিখেছেন (২৫ জুলাই), 'আমি ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সব চেয়ে ভালবাসি— যাদের স্নেহ করি তাদের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যটি দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মনের তৃষ্ণা। মেয়েদের মনে এই সৌন্দর্য্যটি যখন দেখা যায় তখন তার আর তুলনা কোথাও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা যখন কেবল সংসারে জড়িয়ে থাকে, সব তা'তেই কেবল আমার আমার করে, নিজের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহৎ লক্ষ্যকে আড়াল করে রাখে, যখন তারা বড় চেষ্টার বাধা, বড় তপস্যার বিঘ্ন হয়ে কেবল মাত্র লোকের মন ভোলানোকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে রাখে তখন বাইরে তাদের যতই সৌন্দর্য্য থাক্ সে সৌন্দর্য্য মায়া মাত্র, সে সৌন্দর্য্য সত্য নয়।' রাণুর মতো ছোট্ট মেয়ের সম্পর্কে এইরূপ ভাবা অমূলক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রাণুর চিঠিগুলি পড়লে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার কারণটি বোঝা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথও চাইছিলেন রাণুকে কাছে রাখতে। প্রায়ই চিঠি লিখছিলেন, বিভিন্ন ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসার জন্য, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে ডিগ্রির মোহ ত্যাগ করে বিশ্বভারতীতে ভর্তি হওয়ার জন্য। ১৯২৩-এ গ্রীষ্মের ছুটিতে কোনো খবর না দিয়ে রাণু যখন হঠাৎ শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর পিতাকে জানালেন, 'আমরা দেরাদুনে যাচ্ছি সেখানে একে নিয়ে যাব।' দেরাদুনে যাওয়া হয় নি, তাঁকে

নিয়ে গেছেন শিলঙে ছুটি কাটাতে। রবীন্দ্রনাথ তখন 'রক্তকরবী' নাটক লিখছেন। নন্দিনী চরিত্র নাটকটির মূল তাৎপর্যেরই অন্তর্গত, সুতরাং এই চরিত্রের কল্পনায় রাণুর ভূমিকা অনুমান করা একটু অতিরেক বলেই মনে হয়, কিন্তু রাণুর সান্নিধ্য উক্ত চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অবশ্যই সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, রাণুকে নন্দিনীর ভূমিকা দিয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে। সেটি সম্ভব হয় নি, কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকে রাণুকে অপর্ণার ভূমিকা দিয়ে তিনি নিজে বাষট্টি বছর বয়সে যুবক জয়সিংহের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

এই ঘটনা রাণুর জীবনে এবং রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল। নাটকটির মহড়া চলার সময়ে রাণুকে অনেকদিন জোড়াসাঁকোয় থাকতে হয়। তাঁর বয়স তখন ষোলো বছর পূর্ণ হয়েছে, সেকালের মাপকাঠিতে তিনি তখন অবশ্যই বিবাহযোগ্যা। ফলে তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যে ও মিশুক স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবক তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়েছেন এবং জীবনের জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রাণু ফলাফল বিবেচনা না করেই তাদের মধ্যে কাউকে-কাউকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এইসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল ভাববার কোনো কারণ নেই। কিন্তু রাণুকে স্নেহবশত তিনি বালিকাই ভাবতেন, ফলে তাঁর দৈহিক পরিণতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন না থেকে বাক্যে ও ব্যবহারে কোনো-কোনো পাণিপ্রার্থীকে কিছুটা প্রশ্রয়ই দিয়েছেন, রাণুর সঙ্গেও অনেক কৌতুক করেছেন, প্রাপ্ত পত্রাবলীতে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। এমন-কি, কৌতুক করে নিজেকেও প্রণয়প্রার্থীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। যে-কোনো তরুণীই একে কৌতুক বলে মনে করবেন ও হেসে উড়িয়ে দেবেন— সেইটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সরল অনভিজ্ঞতায় রাণু তাকে বিশ্বাস করেছেন ও মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেয়েছেন ও কষ্ট দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন হলেন, তখন ঘটনার

দোলাচলে তিনি নিজেকে কতটা অসহায় মনে করেছেন ফণিভূষণ ও সরযূবালাকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠিতে তার আভাস পাওয়া যাবে। রাণুর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়প্রার্থীরা যখন কাশী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছেন, বেনামী চিঠি লিখে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা শুরু করেছেন, তখন রাণুর পিতামাতা সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে পারেন নি। তিনি ফণিভূষণকে লেখেন, 'শীঘ্রই রাণুর বিবাহ দিয়ে সমস্যা সমাধানের যে চিন্তা করচ আমার কাছে সেটা ভালো বলে ত ঠেকচে না, তাতে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হতেও পারে, কিন্তু রাণুর নিজের পক্ষে সেটা সুখকর কিম্বা কল্যাণকর হবে কিনা সেটাই বিশেষ করে ভাববার কথা। ...আমার ত মনে হয় আরো কিছুদিন পড়াশোনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্ত্তমান এই সমস্ত জঞ্জালের চিহ্ন মুছে ফেলা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। তারপরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ শান্ত হলে ওর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা সহজ হবে।' তিনি ফণিভূষণ ও সরযূবালাকে রাণুর অনুরাগী একটি যুবকের কথা ভেবে দেখতেও বলেছেন। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ সেরে ইটালি হয়ে দেশে ফিরেই যখন তিনি শুনলেন, সাহিত্যিকা অনুরূপা দেবীর দৌত্যে বিখ্যাত ধনী স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে তখন তা মেনে নিয়েছেন। তবে খুব প্রসন্ন মনে যে সম্মতি দেন নি তা বোঝা যায়, বিদেশযাত্রার আশু প্রয়োজনের প্রসঙ্গ তুলে রাণুর বিবাহে উপস্থিত থাকা নিয়ে দোলাচলতার কথা জানিয়ে। এর পরেও বিবাহটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। রাণুকে, রাণুর পিতামাতাকে, রবীন্দ্রনাথকে, এমন-কি রাণুর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে হতাশ প্রার্থীরা বেনামী চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করেছেন নিজেকে এই দুর্ঘটনার জন্য কিছুটা দায়ী ভেবে। তা সত্ত্বেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা

করেছেন এই সংকট কাটানোর জন্য— এমন-কি, রাণুর ভাবী শাশুড়ি লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে একটি দীর্ঘ চিঠিও লিখেছেন। শুভাকাঙ্ক্ষার আন্তরিক প্রয়াস ছাড়াও চিঠিটি উল্লেখযোগ্য রাণুর স্বভাবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ ও তাঁর প্রতি নিজের মনোভাবের অকপট প্রকাশের জন্য। রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

'রাণুকে তাহার শিশুকাল হইতে জানি এবং একান্তমনে স্নেহ করি। ইহা জানি তাহার চরিত্র কলুষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার বয়সে বাঙালীর ঘরের মেয়েরা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজে লাভ করে তাহার তাহা একেবারেই ছিল না। সে এমনি শিশুর মত কাঁচা যে তাহার কথাবার্ত্তা ও আচরণ অনেক সময় হাস্যকর হইত। এইরূপ অদ্ভুত অনভিজ্ঞতাবশত লোক ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার কোনো ধারণা ছিল না। এই কারণে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। আমি তাহার জন্য এমন সৎপাত্র কামনা করিতেছিলাম যে তাহার একান্ত সরলতার যথার্থ মূল্য বুঝিবে এবং লৌকিকতার ত্রুটি ক্ষমা করিবে।...

'আপনি আমার কন্যা বেলাকে জানিতেন। তাহার ছোটভাই শমী বাঁচিয়া নাই। আমি অনেকবার ভাবিয়াছি যে, সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে রাণুর সঙ্গে নিশ্চয় তাহার বিবাহ দিতাম। তাহার কারণ রাণুর মধ্যে অসামান্যতা আছে। বুদ্ধিতে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণতা— কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা তাহার মনের নিষ্কলুষ সরলতা। ঠিক এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নাই।...'

লেডি যাদুমতী ও স্যার রাজেনকে তিনি শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সমস্ত বিষয় মুখোমুখি আলোচনা করার জন্য। এই আলোচনা সংঘটিত হয়েছিল কি না জানা নেই, কিন্তু বিবাহ স্থির হতে বাধা হয় নি। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে থেকে বিবাহ দেবার জন্য ফণিভূষণের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত রাণুর শ্বশুরবাড়ি সেই প্রস্তাব অনুমোদন করে নি। এমন-কি, বিবাহের পূর্বে

ফণিভূষণ সপরিবারে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুর অবজারভেটরির বাসায় থাকলেও পাকাদেখার অনুষ্ঠান তাঁরা করেছিলেন নিজেদের বাড়িতে মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে, রাজকীয় ভোজের খরচ দিয়েছিলেন নিজেরাই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন, সামাজিক যে-সব অসুবিধা স্যার রাজেনদের ভোগ করতে হয়েছিল তার জন্য তাঁরা তাঁকেই দায়ী করেছেন। এই অবস্থায় তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন বিবাহানুষ্ঠানে যাবেন না, কিন্তু রাণু দুঃখ পেতে পারেন ভেবে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসেছেন, কিন্তু কী-ধরনের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তার বিবরণ পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'রোজনামচা বা দৈনিক লিপি'-তে।

বিবাহের পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে আসে। তার পরেও রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি চিঠি পাওয়া গেছে, কিন্তু তার আকারও যেমন ছোটো হয়ে এসেছে, আগেরকার চিঠির মাধুর্যও সেখানে অনুপস্থিত। একথা ঠিক, সংসার, সন্তান ও ধনী ইঙ্গবঙ্গ পরিবারের জীবনযাত্রা নিয়ে রাণু তখন অন্য জগতের অধিবাসিনী, রবীন্দ্রনাথও বার্ধক্যের ভারে পীড়িত— কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক যে অন্য মাত্রা লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

এই পর্বে রাণুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী আশা রবীন্দ্রনাথের অনেক কাছে এসেছেন। তাঁদের উভয়ের পত্র যা পাওয়া গেছে তা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু অন্তত ফণিভূষণকে লেখা পত্রে আশার প্রসঙ্গ যেটুকু আছে, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না এই বিদুষী কন্যাটিকে বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও কর্মী হিসেবে পেতে রবীন্দ্রনাথ খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চাপে আশা ও তাঁর স্বামী আরিয়ামকে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়, তাঁরা গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রমে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, যেন তাঁরা আবার বিশ্বভারতীর কাজে ফিরে আসেন— কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি।

রাণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী ভক্তিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও শিক্ষিকারূপে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁকে লেখা দুটি মাত্র পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সরযূবালাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে-পাঁচটি চিঠি ও তারই একটির অনুষঙ্গে লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি বর্তমান সংকলনে আছে, তার প্রথমটি ছাড়া সবগুলিই রাণুর বিবাহ-সংক্রান্ত।

ফণিভূষণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগও প্রধানত রাণুকে কেন্দ্র করেই। প্রথমে 'আপনি'র দূরত্ব থাকলেও ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়ে 'তুমি'তে পরিণত হয়েছে। রাণুর বিবাহের পরে অবশ্য তাঁর লেখা চিঠিতে অন্য প্রসঙ্গও এসেছে। কায়স্থ সুরেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে বৈদ্য রমা (নুটু) মজুমদারের প্রেমমূলক বিবাহ নিয়ে যে সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছিল, সেই বিষয়ে ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ফণিভূষণের অভিমত রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন। ফণিভূষণের উত্তর পাওয়া না গেলেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর থেকে বোঝা যায়, তিনি মানবিক অনুভূতির চেয়ে সামাজিক শাস্ত্রবিধি মেনে চলারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতামত ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে নি, কিন্তু পত্রটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফণিভূষণ অবসর নিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদ্যাভবনের কাজে আহ্বান করেন। ফণিভূষণ তাঁকে নিরাশ করেন নি।

চিঠিপত্র অষ্টাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণুর ৬৭টি এবং আশার ৩টি (ও অনিলকুমার চন্দকে লেখা ১টি) পত্রের মূল শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রাণুর ৬৫-সংখ্যক পত্রটির মূল ইংল্যান্ডের ডার্টিংটন হলের অভিলেখাগারে রক্ষিত, শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত তার ফোটো-প্রতিলিপি সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

৪ এপ্রিল ১৯২৫ শান্তিনিকেতনে নববর্ষ বা জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে

রবীন্দ্রনাথ রাণুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন, 'তোমরা যখন আস্‌বে তখন আমার সমস্ত চিঠি সঙ্গে করে এনো। সকলের ইচ্ছা সে চিঠিগুলি রক্ষা করা হয়— এখানে যত্ন করেই রাখা হবে।' রাণু মূলপত্র দেন নি, কিন্তু তখন পর্যন্ত লেখা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্রের প্রতিলিপি নিজের হাতে প্রস্তুত করে তাঁর হাতে তুলে দেন। কিন্তু এর পরেও আর-একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করানো হয়। এই দ্বিতীয় প্রতিলিপির খাতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক সম্পাদনা করেন। কিছু পত্র সম্পূর্ণ ও কিছু পত্রের অংশবিশেষ বর্জিত হয়, সর্বত্রই সম্বোধন ও স্বাক্ষর বাদ যায়, সামান্য কিছু সংশোধন ও সংযোজনও হয়েছে। বোঝা যায়, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কারকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। উক্ত পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৪ থেকে আষাঢ় ১৩৩৫ পর্যন্ত ১২টি সংখ্যায় ৫৯টি পত্র মুদ্রিত হয়ে 'পত্রধারা' পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে চৈত্র ১৩৩৬ (মার্চ-এপ্রিল ১৯৩০)-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'য় লেখেন:

'পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবন-যাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসি-তামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।'

বইটি যখন প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপে; ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে থাকার সময়ে বইটি হাতে পেয়ে ৮ অগাস্ট

১৯৩০ তিনি রানী মহলানবিশকে লেখেন: 'ইতিমধ্যে ভানুসিংহের পত্রাবলী নতুন ছাপা হয়ে পড়ল আমার হাতে এসে। শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরদেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়ছি বলে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম— কোথায় আছি।' আবার বার্লিন থেকে ৫ সেপ্টেম্বর রাণুর বোন ভক্তিকে লিখেছেন: 'ভানুসিংহের পত্রাবলী সেদিন আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। পড়তে পড়তে শান্তিনিকেতন আমার চারদিকে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠ্‌ল। ভুলে গেলুম যে আছি পশ্চিম সমুদ্রের পারে। আমার কোনো লেখাতেই শান্তিনিকেতনের রূপ এমন রসপূর্ণ হয়ে জাগেনি। নিজের কীর্ত্তি নিয়ে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তবু সত্যের খাতিরে বল্‌তেই হচ্চে এই চিঠিগুলির পরিধি দুই ডাকঘরের দুই কিনারার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়— আর, কালের যে সীমানা আমার আকস্মিক সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই কিছু দিনের জন্যে আবদ্ধ ছিল পত্রাবলী তাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। রাণুকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম বঙ্গবাণীর নিত্য ঠিকানায় সেগুলি পৌঁচেছে।'

এই খণ্ডে রাণুকে লেখা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র ৫৯টি চিঠির পূর্ণাঙ্গ পাঠের সঙ্গে প্রাপ্ত আরও ১৪৯টি চিঠি প্রকাশিত হল। অপ্রকাশিত চিঠির কয়েকটি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র নব পর্যায়ের তিনটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। রাণুর লেখা কয়েকটি চিঠিও উক্ত সংখ্যাগুলিতে মুদ্রিত হয়। কিছু চিঠি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্রীসমর ভৌমিকের লেখা 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' গ্রন্থে। ফণিভূষণ ও ভক্তি অধিকারীকে লেখা যথাক্রমে তিনটি ও একটি চিঠি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। মূল পত্র বা ফোটোকপির অভাবে এই চিঠিগুলির ক্ষেত্রে পত্রিকার পাঠই অনুসরণ করা হয়েছে। বাকি চিঠিগুলি কলকাতার অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্ট্‌স্-এ রক্ষিত মূল পত্র বা ফোটোকপির সঙ্গে

মেলানো হয়েছে। বানান ও ছেদচিহ্নের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধন না করে অবিকল মূল পাঠ অনুসৃত হয়েছে, কেবল বিশেষ কয়েকটি বানানের ত্রুটি '[য]' চিহ্ন-যোগে নির্দেশ করা হল।

বর্তমান খণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণুর চিঠিগুলি। তাঁর সমস্ত চিঠি রক্ষিত হয় নি, কিন্তু যেগুলি আছে নানা কারণে তাদের মূল্য অপরিসীম। রাণুর প্রথম দিকের কোনো চিঠিতেই তারিখ বা স্থানের স্বতন্ত্র উল্লেখ নেই। প্রথমে পত্রগুলিকে তিনটি স্থূল ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— রাণুর প্রাথমিক চিঠিগুলিতে সম্বোধন ছিল 'প্রিয় রবিবাবু', তার পরে সেটি পরিবর্তিত হয় 'প্রিয় রবিদাদা'য় এবং সবশেষে 'প্রিয় ভানুদাদা' বা 'ভানুদাদা' সম্বোধনে। এইরূপ তিনটি গুচ্ছে চিঠিগুলিকে ভাগ করে পত্রগুলির বিষয়বস্তু এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ও বিষয়ের সূত্র অবলম্বন করে সেগুলির কালানুক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে নির্ভুলতার দাবি করতে পারি না। আলাদা করে রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর চিঠি পড়ার আনন্দ তো আছেই, কিন্তু উভয়ের পত্র মিলিয়ে পড়লে একটি অতিরিক্ত রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ৭ অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখবার ক্ষমতা আছে।' ইন্দিরা দেবীর সেই সময়ে লেখা চিঠিগুলি পাওয়া যায় নি, সুতরাং তাঁর 'চিঠি লেখবার ক্ষমতা'র প্রমাণ যাচাই করবার সুযোগ নেই— কিন্তু রাণুর লেখা চিঠিগুলি পড়লে পাঠকের নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হবে না, কী গুণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বর্তমান সংকলনের অন্তর্গত অপূর্ব চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন। রাণু মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর এই চিঠিগুলি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই খণ্ড সংকলনে ও সম্পাদনায় আমি অনেকের কাছেই ঋণী। সর্বাধিক সহায়তা পাওয়া গেছে রবীন্দ্রভবনে আমার সহকর্মী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শ্রাবণী পালের কাছ থেকে। অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্ট্‌সে পাঠ মেলানোয় সাহায্য করেছেন অধ্যাপিকা ড. ভাস্বতী লাহিড়ী ও অধ্যাপক কুন্তল মিত্র। এই কাজে অ্যাকাডেমির অধিকর্তা শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত ও অবেক্ষক শ্রীঅমিতাভ দাস যে সৌজন্যপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন তা একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। প্রয়োজন বিশেষে শ্রীঅনাথনাথ দাসের সাহায্য পাওয়া গেছে। শ্রীশঙ্খ ঘোষ এই আনন্দদায়ক কাজের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করেছিলেন বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)কে লিখিত

পত্র ১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ১।

২ রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকা (১৮৯১-১৯০৩), ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বারো বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

৩ 'জয়পরাজয়' (প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', কার্তিক ১২৯৯) গল্পের নায়ক।

৪ 'ক্ষুধিত পাষাণ' (প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', শ্রাবণ ১৩০২)।

পত্র ২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২।

১ *Gitanjali (Song Offerings)* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হলে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি প্রচারিত হয়, পরের বৎসরে (নভেম্বর ১৯১৩) তিনি সুইডিশ অ্যাকাডেমি কর্তৃক নোবেল প্রাইজের সম্মানে ভূষিত হলে বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতির বিস্তার ঘটে।

২ জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮), ডাক নাম বেলা।

পত্র ৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৩।

পত্র ৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪।

১ রাণুর পিতা ফণিভূষণ অধিকারীর কাশীর বাড়ির ঠিকানা ছিল ২৩৫, অগস্ত্য কুণ্ড।

২ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বোলপুরে যান ৫ কার্তিক ১৩২৪ সোমবার ২২ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখ রাত্রে; সুতরাং চিঠির তারিখটি সঠিক নয়।

পত্র ৫।

১ হয়তো এই সাতাশ দফা ফর্দ দেখেই রাণু রবীন্দ্রনাথের বয়স সাতাশে বেঁধে দিয়েছিলেন।

পত্র ৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫।

১ ইংরেজ উপনিবেশ ফিজিতে চুক্তিদাস-প্রথার পীড়নে ভারতীয়রা যে

অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করছিল, তার অবসান ঘটানোর জন্য অ্যান্ড্রুজ ও পিয়র্সন সেখানে গিয়েছিলেন ১৯১৫ সালে। এর পরেও অ্যান্ড্রুজ আবার ফিজিতে যান ১৯১৭ সালে। এই যাত্রায় তিনি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সেখানকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-সফরের ব্যবস্থা করে আসেন। ভারতীয় তথা এশীয়দের সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়া গবর্মেন্ট যে অভিবাসন নীতি গ্রহণ করেছিল, তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও ঠিক করেন এই যাত্রাতেই তিনি পুনরায় জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ করে আসবেন। তিনি ইংরেজবিরোধী মনোভাব পোষণ করেন, কিছু-সংখ্যক অস্ট্রেলিয়াবাসী এইরূপ অভিযোগ করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সফর বাতিল করেন; আমেরিকা সফর বাতিল হয় ক্যালিফোর্নিয়ার হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নাম যুক্ত করায়।

২ তখন য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলছে এবং জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে অনেক ব্রিটিশ ও আমেরিকান জাহাজ ডুবে যায় এবং বহু প্রাণহানি ঘটে।

পত্র ৮।

১ রাণুর পিতা ফণিভূষণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন ও বিশ্রামের জন্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এসে মাসাধিককাল (৪ জুন-১০ জুলাই ১৯১৮) অবস্থান করেন। ১০ জুলাই কাশী রওনা হওয়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্টেশনে গিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দেন।

২ প্রাক্তন ডাকাত-সর্দার ও পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাহারাদার দ্বারী সর্দারের পুত্র হরিশ দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের বাগানে মালির কাজ করেন।

৩ রেলগাড়িতে বসে তাঁদের ভ্রমণের একটি দীর্ঘ বিবরণ রাণু রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠান। দ্র. রাণু অধিকারীর পত্র, সংখ্যা ১৪।

৪ রচনা: শান্তিনিকেতন, ২৩ চৈত্র ১৩২০ (৬ এপ্রিল ১৯১৪); গীতিমাল্য, ৮৭-সংখ্যক; গীতবিতান ১ম খণ্ড।

পত্র ৯।

১ দ্র. পত্র ৮, ৩-সংখ্যক টীকা।

২ Charles Freer Andrews (১৮৭১-১৯৪০), শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৩ 'ঘরে-বাইরে' বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২২-সংখ্যা 'সবুজ পত্র' মাসি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হওয়ার পরে ১৩২৩ (১৯১৬ খৃ.) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'At Home and Outside' নামে *The Modern Review* (January-December 1918) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় ও ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *The Home and the World* (1919) নামে। এই চিঠি ও রাণুকে লেখা অন্যান্য কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায়, অ্যান্ড্রুজের অনুলেখনে রবীন্দ্রনাথও মুখে মুখে উপন্যাসটির কিছু অংশ অনুবাদ করেন। তিনি ৫ নভেম্বর ১৯১৮ তারিখে লন্ডনে ম্যাকমিলান কোম্পানিকে সেই খবরটি জানিয়ে লেখেন: 'My nephew Surendranath has translated the latest novel of mine. ...A large part of it I have done myself and it has been carefully revised.' প্রকাশক অবশ্য বিজ্ঞপ্তিতে জানান: 'This story was translated by Mr. Surendranath Tagore and the translation was revised by the author.' রাণুকে লেখা চিঠি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে বলা যায়, প্রকাশক অসম্পূর্ণ তথ্য তাঁদের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেছিলেন।

৪ ২৬ আষাঢ় বুধবার (১০ জুলাই) দুপুরের গাড়িতে রাণু কাশী রওনা হন।

৫ বর্তমান গৌরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁশবনে ঘেরা একটি খড়ের আটচালা মাটির বাড়ি। এখানে বিভিন্ন সময়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকেই বাস করেছিলেন। পরে বাড়িটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেলে পুরোনো বাড়ির আদলে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

৬ শান্তি অধিকারী (গঙ্গোপাধ্যায়), রাণুর মধ্যমা ভগিনী, ইংরেজিতে

এম. এ.; রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়র কেশবলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়।

৭ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫), রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী'।

৮ আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্) (১৯০৩-৬৯), রাণুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী; পরে বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। সেখানকার অধ্যাপক এবং বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী ও সচিব ই. ডব্ল্যু. আরিয়াম (আর্যনায়কম্)-এর সঙ্গে বিবাহ হয়। পরে উভয়েই ওয়ার্ধায় গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হন।

৯ ভক্তি অধিকারী (প্যাটেল), রাণুর কনিষ্ঠা ভগিনী; গুজরাতি ব্যবসায়ী চিন্ময় প্যাটেলের সঙ্গে বিবাহ হয়।

১০ রাণুর পিতা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী (?-১৯৫০)

১১ রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯)।

১২ রাণুর মাতা সরযূবালা অধিকারী (?-১৯৭২)।

পত্র ১০।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ১৫।

২ রাণুর পুতুলদের নাম।

৩ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ১৫। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (চৈত্র ১৩৩৬)-তে একটি টীকা যোগ করেছেন : 'ভানু-সিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে, বালিকার এই স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।' (পত্র ৪২)

৪ 'সুভা' (প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', মাঘ ১২৯৯)। অনাথনাথ মিত্র-কৃত গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ সেপ্টেম্বর ১৯১০-সংখ্যা *The Modern Review*-তে মুদ্রিত হয়, পরে *Mashi and Other Stories* (১৯১৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই চিঠি থেকে স্পষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথ উক্ত অনুবাদটির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন কি না।

৫ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'অনুবাদ-চর্চা' (১৯১৮) পাঠ্যপুস্তকটি প্রস্তুত করছেন। এখানে সম্ভবত উক্ত গ্রন্থের ২৬-২৮ অনুচ্ছেদগুলির কথা

উল্লেখ করা হয়েছে।

৬-৮ বিদ্যালয়ের তৎকালীন পঞ্চম বর্গের ছাত্র সমরেশচন্দ্র সিংহ, জ্যোতিষচন্দ্র রায় ও আভাসচন্দ্র সেন।

পত্র ১১।

১ লাবু ক্ষিতিমোহন সেনের দ্বিতীয়া কন্যা মমতা (দাশগুপ্তা)-র (?১৯১১-৮৪) ডাক নাম।

২ রবীন্দ্রনাথ রাণুর পিতা ফণিভূষণকেও ৩১ আষাঢ়ের পত্রে লিখেছেন : 'আমার বিশেষ অনুরোধ সন্ধ্যাবেলা রাণুদের গান বাজনা শিখাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আনন্দ আমাদের সব চেয়ে বড় খাদ্য— এই খাদ্য ছোট ছেলে মেয়েদের বাড়িবার বয়সে যত বেশি আবশ্যক এমন বড় বয়সে নয়।' রাণুর জন্য কণ্ঠসংগীত, এস্রাজ ও সেতার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পত্র ১২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৬।

১ এই সময়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতেও ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয় বলে একে 'যুদ্ধজ্বর' বলা হত।

২ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯), বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণেতা।

পত্র ১৩।

১ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অনেকগুলি পত্রে দেখা গিয়েছিল।

২ রবীন্দ্রনাথ রাণুকে একটি পুতুল উপহার দিয়েছিলেন, তার নাম।

৩ নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও ভাস্কর। রবীন্দ্রনাথেরই অর্থসাহায্যে লন্ডনে গিয়ে ভাস্কর্যবিদ্যা শিখে আসেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন বা কলকাতায় উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান করতে না পেরে তিনি মাদ্রাজে চলে যান। তাঁর পরবর্তী জীবনের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

৪ 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত, '১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত।'

৫ 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত, রচনা : ১৭ চৈত্র ১২৯৯।

৬ 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত, রচনা : ২৯ মাঘ ১৩০২।

পত্র ১৫।

১ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (বেলা) ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয় ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ (১৬ মে ১৯১৮) সকালে। তার আগের দিন সন্ধ্যায় রাণুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে; রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Ranu, the little girl of eleven, with whom father has had such an interesting correspondence, came this evening with her family. She is such a bright girl. But she felt shy before such a company here. She asked father to go to see her tomorrow or the day after.' পরের দিন সকালে বেলার মৃত্যু হলে সেইদিন বিকালেই রবীন্দ্রনাথ ভবানীপুরে গিয়ে রাণুর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি কলকাতায় যতদিন ছিলেন, প্রায়ই ভবানীপুরে গিয়ে রাণুর সঙ্গে দেখা করতেন।

২ মধ্যমা কন্যা রেণুকা।

পত্র ১৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৭।

১ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উচ্চতম বিভাগ।

২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩), 'প্রবাসী' ও *The Modern Review* পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক— এই সময়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করছেন।

পত্র ১৭।

১ বর্তমান কালের ষষ্ঠ শ্রেণী।

পত্র ১৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৮।

১ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৪-১৯২৬), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম পাঁচ জন ছাত্রের অন্যতম, পরে আমৃত্যু এখানেই শিক্ষকতা ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন।

পত্র ১৯। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৯।

১ বর্তমান অষ্টম শ্রেণী।

২ প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', মাঘ ১৩০০; রচনা : ২৬ শ্রাবণ ১৩০০।

৩ 'Kacha and Devajani': *The Fugitive* [1921]।

পত্র ২০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১০।

১ শৈলবালা দেবী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী।

পত্র ২১।

১ 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে' গানের অংশ— 'নিজের হাতে নিজে বাঁধা ঘরে আধা বাইরে আধা'। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, গানটির রচনাকাল ২৪ শ্রাবণ ১৩২৫-এর পূর্ববর্তী।

পত্র ২২।

১ ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত।

২ রেণুকা দাশগুপ্তা, বরিশালের হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

৩ রাণুর বিদ্যালয়ের ইংরেজ শিক্ষিকা।

৪ দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা ঠাকুর, নাতবউ সম্পর্কের জন্য রবীন্দ্রনাথ এঁকে নিয়ে অনেক কৌতুক করতেন।

পত্র ২৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১১।

১ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত; প্রথম ছত্রের পূর্ণ পাঠ : 'তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।'

২ ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত।

৩ কিছুদিন থেকে রাণুর পিতা খুবই অসুস্থ ছিলেন, তাই বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে আলমোড়ায় যাবেন, রাণুর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেই খবর পেয়েছিলেন, দ্র. রাণুর পত্র ২৯।

৪ অসুস্থা কন্যা রেণুকার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে রবীন্দ্রনাথ আলমোড়ায় যান ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, অগাস্টের শেষ দিকে ফিরে আসেন।

৫ Irkutsk রাশিয়ার পূর্ব সাইবেরিয়ায় বৈকাল হ্রদের নিকটবর্তী একটি শহর। রবীন্দ্রনাথ রাণুর ভূগোল-জ্ঞান পরীক্ষার্থে এই শহরটির নাম করেছিলেন, কিন্তু রাণুকে ঠকাতে পারেন নি, দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৩১।

৬ আলমোড়ার Thomson House নামে যে বাড়িটিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তার মালিক বা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন লালা বদ্রি শাহ। রাণুর চিঠি থেকে জানা যায়, এঁর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল।

পত্র ২৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১২।

১ রবীন্দ্রনাথ উপনয়নের পরে বারো বৎসর বয়সে এপ্রিল ১৮৭৩-এ পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিমালয়ের ডালহৌসি পাহাড়ে গিয়ে সেখানকার বক্রোটা শিখরে মাসখানেক থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ২৫।

১ রবীন্দ্রনাথের 'অনুবাদ-চর্চা' গ্রন্থ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়'-মতে প্রকাশিত হয়েছিল '১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে)'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি পরের বৎসরে (১৯১৮ খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির অন্যতমা অনুবাদিকা প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী সেপ্টেম্বর ১৯১৮-এর বিবরণে লিখেছেন: 'এই সময়ে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের জন্য একটি তর্জমার বই তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজে নানা ইংরেজি মাসিক পত্র ও পুস্তক হইতে খানিকটা করিয়া জায়গা দাগ দিয়া দিতেন, আমাদের অনেকের উপর ভার ছিল সেগুলি সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা।' ('পুণ্যস্মৃতি', ১৩১৭, পৃ. ১৮৮)।

২ প্রথম প্রকাশ: 'সবুজ পত্র', চৈত্র ১৩২১, মাঘ ১৩২২ ('বৈরাগ্যসাধন'); ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (১৩২২) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

পত্র ২৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৩।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৩০। এই পত্রের সঙ্গে রাণু আলমোড়া পাহাড় থেকে একটি লাল রঙের ফুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পত্র ২৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৪।

১ রচনা : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪; প্রথম প্রকাশ : 'ভারতী', ফাল্গুন ১৩০৫, 'কাহিনী' (ফাল্গুন ১৩০৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

২ 'The Trial': *The Modern Review*, July 1920-সংখ্যায় মুদ্রিত।

পত্র ২৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৫।

১ Sir Walter Scott (1771-1832), স্কটিশ ঔপন্যাসিক, কবি, ঐতিহাসিক ও জীবনীকার। Marjorie Fleming-এর সঙ্গে স্কটের ঘনিষ্ঠতার কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত J. G. Lockhart-এর *Memoirs of the Life of Sir Walter Scott* [1836-38] নামক সাত খণ্ডে প্রকাশিত জীবনী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

পত্র ২৯। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৬।

১ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৬৯), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক।

পত্র ৩০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৭।

১ হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৩-১৯৬৭), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী। শান্তিনিকেতনে 'বড়োমা' অভিধায় খ্যাত। কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িত্রী।

২ কিরণবালা সেন, আশ্রমে 'ঠানদি' নামে অভিহিত হতেন।

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা শান্তা (১৮৯৩-১৯৮৪) ও সীতা (১৮৯৫-১৯৭৪) দেবী।

৪ কালীমোহন ঘোষ (১৮৮৪-১৯৪০), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক, পরে শ্রীনিকেতনের গ্রামপুনর্গঠনের কাজে যুক্ত হন।

৫ নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৭-১৯৪৪), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক।

৬ বর্তমানে পাঠভবনের অফিস।

৭ বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১৮৭৮-১৯৫৯), বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর বিশিষ্ট অধ্যাপক, বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে পরম পণ্ডিত।

৮ জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩), শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাপর্ব থেকে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক। সর্বসাধারণের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় অনেকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা।

৯ রেভারেন্ড সুশীলকুমার রুদ্র (১৮৬১-১৯২৫)।

১০ ২৫ ভাদ্র ১৩২৫ (১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)।

পত্র ৩১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৮।

১ ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে ভাদ্র ১২৯৫ (১৮৮৮) পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজিপুরে ছিলেন, 'মানসী' কাব্যের অনেকগুলি কবিতা এখানে লেখা।

২ ১ আশ্বিন ১৩২৫ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)।

পত্র ৩২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৯।

১ 'ভানুসিংহ' ছদ্মনাম গ্রহণ করে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন ('ভারতী', আশ্বিন ১২৮৪-জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, কবিতাগুলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে ১২৯০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' ('নবজীবন', শ্রাবণ ১২৯১) নামক একটি রসরচনাও লিখেছেন তিনি।

পত্র ৩৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২০।

১ আলমোড়ার নিকটবর্তী একটি শৈলশহর।

২ ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কন্যা রেণুকাকে নিয়ে আলমোড়া যাওয়ার সময়ে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই দুঃখজনক স্মৃতি স্মরণ করেছেন।

৩ দ্র. 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়, 'জীবনস্মৃতি'।

পত্র ৩৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২১।

১ এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেছি।' কিন্তু ১৬ আশ্বিন ১৩২৫ 'বুধবার' নয়, বৃহস্পতিবার। সেই কারণেই তারিখটি সংশোধিত হয়েছে।

২ ১৭ আশ্বিন শুক্রবার ৪ অক্টোবর ১৯১৮ মহালয়ার দিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পূজাবকাশ আরম্ভ হয়।

পত্র ৩৫।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৪১।

২ এই খর-দাহনের নমুনা 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী' প্রভৃতি কাব্যের কিছু কবিতায় ও সমসাময়িক প্রবন্ধাবলিতে পাওয়া যাবে।

৩ রবীন্দ্রনাথ এই দিনই কলকাতায় রওনা হন, এ যাত্রায় তাঁর মাদ্রাজ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি।

পত্র ৩৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২২।

১ ২৫ আশ্বিন ১৩২৫ (১২ অক্টোবর ১৯১৮)।

২ ২ কার্তিক ১৩২৫ (১৯ অক্টোবর ১৯১৮)।

পত্র ৩৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৩।

পত্র ৩৮।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৪৪।

২ সম্ভবত *The Fugitive* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনুবাদগুলি। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাত্রা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় শান্তিনিকেতন থেকে গ্রন্থটির একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'For private circulation'।

৩ প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৮ তারিখে।

৪ রাণুর পিতা আসতে না পারলেও দেওয়ালির ছুটিতে রাণু কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

পত্র ৩৯।

১ সম্ভবত ১৭ কার্তিক ১৩২৫ (৩ নভেম্বর ১৯১৮) কার্তিকী অমাবস্যায় রাণুর জন্মদিন পালিত হয়।

২ রবীন্দ্রনাথের ৫০টি গান স্বরলিপি-সহ 'গীতপঞ্চাশিকা' নামে আশ্বিন ১৩২৫-এ প্রকাশিত হয়। নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে মুদ্রিত এটিই প্রথম গ্রন্থ।

পত্র ৪০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৪।

১ স্বল্পকাল শান্তিনিকেতনে থেকে রাণু এইদিনই কাশীর উদ্দেশে রওনা হন।

২ নগেন্দ্রনাথ আইচ (১৮৭৮-১৯৫৬), বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

৩ রাণুর পাঠানো এই ধরণের দুটি রূপকথা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

পত্র ৪১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৫।

১ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এর পরে একটি ছত্র যোগ করেছেন : 'কথাটা সত্য হলে তো মরেও শান্তি নেই।'

পত্র ৪২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৬।

১ 'স্বর্গ-মর্ত', দ্র. 'সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২৫; 'লিপিকা' গ্রন্থে সংকলিত।

২ নাটিকাটিতে দুটি গান আছে : (১) 'মাটির প্রদীপখানি আছে', (২) 'পথিক হে, পথিক হে'।

পত্র ৪৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৭।

১ প্রতিমা দেবীর হিন্দুস্থানী পরিচারিকা।

২ এই গানগুলি 'বৈতালিক' (চৈত্র ১৩২৫) ও 'গীতিবীথিকা' (বৈশাখ ১৩২৬) গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৪৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৮।

১ এই সময়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অনেক গুজরাটি ছাত্র ভর্তি হন। নিরামিষ আহার ও অন্যান্য সংস্কারের কারণে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র গুজরাটি রান্নাঘর ও ভোজনশালার ব্যবস্থা করতে হয়।

পত্র ৪৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৯।

১ 'নৈবেদ্য' (১৩০৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গানের অংশ, সংখ্যা ২১।

২ এই গানগুলি 'গীতিবীথিকা'য় (বৈশাখ ১৩২৬) সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১১২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমে এই পনেরোটি গানের তালিকা সম্ভবত এইরূপ : ১। অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক; ২। আকাশ জুড়ে শুনিনু; ৩। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়; ৪। সে যে বাহির হল আমি জানি; ৫। তোমায় কিছু দেব বলে; ৬। আমি আছি তোমার সভার দুয়ার-দেশে; ৭। আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান; ৮। ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে; ৯। তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে; ১০। সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই; ১১। গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি; ১২। তোমার দ্বারে কেন আসি; ১৩। যে আমি ওই ভেসে চলে; ১৪। যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে; ১৫। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে।

পত্র ৪৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩০।

১ প্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক ও পালা-রচয়িতা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২)।

২ সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি'তে এই মেলার বর্ণনা দিয়েছেন : ৯ই পৌষে "মেয়েদের 'আনন্দবাজার' খুলিল। হট্টগোল হইল প্রচুর, জনসমাগমও শান্তিনিকেতনের পক্ষে বেশ ভালোই হইয়াছিল বলিতে হইবে। সন্ধ্যার সময়েই

জমিল সব-চেয়ে বেশি। আমরা দুই বোন এবং সুকেশী দেবী নিচুবাংলায় হেমলতা দেবীর ঘরের সামনে ব্লাউজ ফ্রক প্রভৃতির একটি দোকান খুলিয়াছিলাম। আশ্রমবাসী কয়েকজন যুবক আমাদের ক্রেতা জুটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, জিনিস বিক্রি হইল মন্দ নয়। ...বিকালে নিচুবাংলার ঘেরা উঠানে শামিয়ানা টাঙাইয়া খাবারের দোকান খোলা হইল। সুকেশী দেবীর বালক-ভৃত্য লক্ষ্মণের গলায় ঝুলানো মস্ত এক প্ল্যাকার্ডে 'শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন বউঠাকুরাণীর হাটে' লিখিয়া ছেলেটিকে আশ্রম ঘুরিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।"

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী সুকেশী দেবী। পৌষ উৎসবের অল্পদিন পরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান (১৮ পৌষ)।

পত্র ৪৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩১।

১ ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি ১৯১৯) কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরের দিন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে রওনা হন।

পত্র ৪৮।

১ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে এসে রবীন্দ্রনাথ মাদুরায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যোদ্ধার ও বিশ্রামের উদ্দেশ্যে মদনাপল্লীতে তিনি আইরিশ বন্ধু ও কবি জেম্‌স্‌ হেনরি কাজিন্‌সের (১৮৭৩-১৯৫৬) অতিথি হয়ে উড ন্যাশনাল কলেজের অতিথিশালায় অবস্থান করেন। পত্রটি সেখান থেকে লেখা। এইবারে বিভিন্ন শহরে তিনি 'The Message of the Forest', 'The Centre of Indian Culture' ও 'The Spirit of Popular Religion in India'-শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও অনেক বিদ্যানিকেতনে অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনান।

২ এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে কেটে দেন যাতে পড়তে কোনো অসুবিধা না হয়।

পত্র ৪৯।

১ ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) কলকাতায় গিয়ে কাশীর মহারাজার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৫ চৈত্র কাশী রওনা হন ও পরদিন রবিবারে সেখানে পৌঁছন।

২ রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি কাশীতে তিনটি বক্তৃতা করেন। তার মধ্যে দুটি বক্তৃতার নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায়। ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্রগণ একটি সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনপত্র দেন। ২৩ চৈত্র তিনি বারাণসী-শাখা সাহিত্য পরিষদে বক্তৃতা করেন দ্র. 'অর্চ্চনা', ফাল্গুন ১৩২৬। ১ এপ্রিল রাণুর পরীক্ষা শুরু হয়।

পত্র ৫০।

১ রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে ২ বৈশাখ ১৩২৬ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখেন: 'কাশী থেকে ফিরে এসে শরীর সুস্থ নেই। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার খানিকটা ছিন্ন অংশ এখনও শরীর থেকে বেরিয়ে পড়বার সুযোগ পাচ্চে না। ...যাই হোক্ যতটা পারি চুপচাপ করে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছি।'

পত্র ৫১।

১ বাক্যটি এমনভাবে কেটে দেওয়া যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়।

পত্র ৫২।

১ সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

পত্র ৫৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩২।

১ রাণুরা এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবার জন্য তখনকার পাঞ্জাব ও এখনকার হিমাচল প্রদেশের সোলন শৈলশহরে গিয়েছিলেন। তারই ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি লিখে পাঠান। দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৫৮।

২ ঠিক এই জাতীয় ভাবই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন সমকালে লেখা 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে।

৩ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ 'কাওয়াজ' শব্দটি যোগ করেছেন।

৪ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯), তাঁর পুত্র-কন্যা নীতীন্দ্রনাথ (১৯১১-৩২) ও নন্দিতা (১৯১৬-৬৭)।

৫ রাজনৈতিক নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)।

৬ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ (১৮৮৮-১৯৬১), পৌত্র

১৩২৫-এ মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে পীড়িতা পত্নী প্রতিমা দেবীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে শিলঙ পাহাড়ে গিয়ে কয়েকমাস কাটিয়ে আসেন।

পত্র ৫৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৩।

১ জেনারেল ডায়ারের সেনাবাহিনী পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে সরকারি হিসাবে ৩৭৯ জনকে নিহত ও ১২০০ জনকে আহত করে (৩০ চৈত্র ১৩২৫ : ১৩ এপ্রিল ১৯১৯)। সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে অন্যান্য শহরেও অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়। এরই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' বা 'স্যার' উপাধি ত্যাগের ইচ্ছা জানিয়ে ৩১ মে ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে একটি ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেন।

পত্র ৫৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৪।

১ ৫৪-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

২ বৈশাখ ১৩২৬ থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর মুখপত্র হিসেবে 'শান্তিনিকেতন' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রথম সংখ্যায় একটি ছাড়া সবগুলি রচনাই রবীন্দ্রনাথের লেখা।

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩০৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকায় 'কষ্টিপাথর'-শীর্ষক একটি বিভাগে অন্যান্য পত্রিকার বিশিষ্ট রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত হত। অনুরূপভাবে বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' থেকে 'গান', 'নববর্ষ', 'মৈসুরের কথা' ও 'বিশ্বভারতী' রচনাগুলি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪ এই সময়ে আশ্রম-সীমানার বাইরে উত্তর-পশ্চিমে মাঠের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খড়ের চালা দেওয়া একটি মাটির বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন।

পত্র ৫৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৫।

১ এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে যোগ করেন।

পত্র ৫৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৬।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৬৪।

২ রবীন্দ্রনাথের এককালীন বাসস্থান 'দেহলি'।

পত্র ৫৯।

১ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভৃত্য।

২ কিরণচন্দ্র দে, আই. সি. এস.।

পত্র ৬১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৭।

১ দ্র. ৫৫-সংখ্যক পত্র, টীকা ৪। এই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ সেই বাড়িটিকে 'উত্তরায়ণ' নামে অভিহিত করছেন। পরে বাড়িটির অনেক পরিবর্তন হয়ে 'কোণার্ক' নামে পরিচিত হয়েছে। এখন সমগ্র এলাকাটিকে 'উত্তরায়ণ' বলা হয়।

২ তখন হাওড়া-স্টেশনের কাছে গঙ্গা পার হওয়ার জন্য একটি পন্টুনব্রিজ ছিল, জোয়ারের সময়ে বড়ো জাহাজ যাওয়ার পথ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ব্রিজ খুলে দেওয়া হত।

৩ এই চিঠিটি পাওয়া যায় নি।

পত্র ৬২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৮।

পত্র ৬৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৯।

১ শিলং থেকে গৌহাটি, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২৭ কার্তিক ১৩২৬ (১৩ নভেম্বর ১৯১৯) তারিখে। এই তথ্য অবলম্বনে চিঠিটির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

২ দ্র. পত্র ৫৫, টীকা ৪ ও পত্র ৬১, টীকা ১।

পত্র ৬৬।

১ এই দুটি ছাত্র সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : 'আমি ও আমার সঙ্গী ব্রহ্মদেশীয় বিদ্যার্থী চলমায়কে বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্র বলিলেও বলা যায়। ...রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত আমাকে ও চলমায়কে পাঠ দিতেন। দুপুরবেলাতে ইংরেজি; তখন কেবল আমরা দুটিই থাকিতাম।' ('রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', ১৩৯৩, পৃ. ১২৩, ১২৮)

২ এই সময়ে রাণুদের শান্তিনিকেতনে আসা সম্ভব হয় নি।

৩ এঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই দিনই কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'St. Paul's-এর Principal সাহেব কাল থেকে আমাদের অতিথি। আমার এই মাঠের বাড়িতেই তাঁকে এনে রেখেচি। নইলে দূর থেকে দেখাশোনার বড় অসুবিধা হয়। আমার এই জায়গাটি তাঁর খুব ভালো লেগেচে। তিনি খুব অল্প দিন হল বিলেত থেকে এসেছেন— তাঁর শ্রদ্ধা এবং নম্রতা এখনো বেশ তাজা আছে।'

পত্র ৬৭।

১ এই বিষয়ে পৌষ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ 'সংবাদ' দেওয়া হয় : 'কিছুদিন হইতে বীথিকা গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এবং আম বাগানের মধ্যে আশ্রমের সমস্ত ক্লাশ বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যাপক মহাশয় নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে ক্লাশ লইয়া থাকেন। আম্রবীথির বেদীতলে সকাল বেলায় সমবেত সঙ্গীত হইয়া থাকে।' (পৃ. ১২)

২ চৈত্র ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ এই বিষয়ে লেখা হয়: 'এবার নানা কারণে গ্রীষ্মাবকাশ ১২ই চৈত্র হইতে আরম্ভ হইয়া ৩ মাস থাকিবে। আগামী পূজায় ছুটি মাত্র ৭ দিন দেওয়া হইবে।'

৩ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা, পরবর্তীকালে শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সহধর্মিণী (১৯০৭-৭৩)।

৪ প্রাক্তন ছাত্র ও তৎকালীন শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষ (১৮৯৩-১৯৪০)।

৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী।

৬ ক্ষিতিমোহন সেনের দ্বিতীয়া কন্যা মমতা (দাশগুপ্তা)।

পত্র ৬৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪০।

১ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশনের স্থান হিসেবে অমৃতসরকে নির্বাচন করা হয়। অধিবেশন চলে ২৭ ডিসেম্বর ১৯১৯ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু (১৮৬১-১৯৩১)।

২ James Clark Ross (1800-1862), ইংরেজ ভূপর্যটক, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চৌম্বকীয় উত্তর মেরু আবিষ্কার করেন। ১৮৩৯ সালে দক্ষিণ মেরুতেও অভিযান করেন।

৩ একজন বিখ্যাত সাধু, কথিত আছে তিনি মাটির তলায় বাস করে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবনধারণ করতেন।

৪ David Lloyd George (1863-1945), ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী (১৯১৬-১৯২২)।

৫ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ ১৩১০ থেকে আষাঢ় ১৩১২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়ে ভাদ্র ১৩১৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৬ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক James D. Anderson, I. C. S. (1852-1920)-এর আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ইংরেজিতে 'নৌকাডুবি' অনুবাদের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

৭ John Graham Drummond, I. C. S. (1884-1958)-ও 'নৌকাডুবি' অনুবাদ করতে চাইলে অ্যান্ডারসন তাঁর কৃত কয়েকটি পরিচ্ছেদের অনুবাদ ড্রামন্ডকে দিয়ে দেন। সমগ্র অনুবাদটি *The Wreck* [1921] নামে প্রকাশিত হয়।

৮ 'বারো আনা'র ঘুম' উদ্ধৃতি-চিহ্নাঙ্কিত অংশটি রবীন্দ্রনাথ পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে যোগ করেন।

পত্র ৬৯।

১ 'রাজা' নাটক রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ১৩১৭ সালের কার্তিক মাসে, এটি প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩১৭-তে।

২ এই সময়ে তিনি 'রাজা' নাটকটির সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করেন 'অরূপরতন' নামে, ভূমিকায় লেখেন : 'এই নাট্যরূপকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত'। অভিনয়পত্রীর আকারে মুদ্রিত নাটিকাটি মাঘ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

৩ 'রাজা' নাটকে ছিল ২৬টি গান, 'অরূপরতন'-এ আছে ৩৯টি— এদের মধ্যে ১১টি সাধারণ— বাকি ২৮টি নূতন গান (এদের মধ্যে ৮টি এই নাটকের জন্যই রচিত)।

৪ এই নাটিকার অভিনয় করা তখন সম্ভব হয় নি।

পত্র ৭০।

১ এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদ, গুজরাটের কয়েকটি শহর, বরোদা, পুনা, বোম্বাই প্রভৃতি সফর করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ৩ মে ১৯২০ (২০ বৈশাখ ১৩২৭)।

২ ১৫ মে (১ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী 'MERCA' জাহাজে ইংল্যান্ড অভিমুখে রওনা হন।

৩ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭২-১৯৪০) জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রীকে (১৯০৭-৮০) রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে নিয়ে যান ইংল্যান্ডে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতে। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি, ইতস্তত কয়েকটি বিদ্যালয়ে পড়ে মঞ্জুশ্রী তাঁদের সঙ্গেই দেশে ফিরে আসেন।

৪ ২৮ বৈশাখ (১১ মে) ভৃত্য সাধুচরণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই মেলে রওনা হন।

৫ কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী।

৬ ননীবালা রায় প্রতিমা দেবীর সংসার পরিচালনায় সাহায্য করতেন।

৭ প্রমদারঞ্জন ঘোষ (১৮৮৬-১৯৭৬), বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক।

৮ নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬), বিশিষ্ট শিল্পী, শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যাপক।

৯ রবীন্দ্রনাথের দেশে ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল, তিনি ১৬ জুলাই ১৯২১ (৩২ আষাঢ় ১৩২৮) বোম্বাইয়ে পৌঁছন।

১০ রবীন্দ্রনাথ ভুল করে '১৩২৬' লিখেছিলেন, হবে '১৩২৭' (১৯২০ খৃ.)।

পত্র ৭১।

১ পত্রটিতে ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ (Strasbourg) শহরের ডাকঘরের মোহর থাকলেও এটি প্যারিস থেকে লেখা। মোহরে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২০ তারিখ আছে, কিন্তু এটি রচনার তারিখ হল্যান্ড রওনা হবার দিন ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০ (২ আশ্বিন ১৩২৭)।

পত্র ৭২।

১ হল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ও অন্যতম প্রধান বন্দর রটারডামে

রবীন্দ্রনাথ আসেন ১ অক্টোবর ১৯২০, এইদিন সন্ধ্যায় তিনি এখানকার গির্জাঘরের বেদী থেকে 'The Meeting of the East and West'. প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

পত্র ৭৩।

১ বেলজিয়ামের বন্দর ও বাণিজ্য নগরী Antwerp-এ রবীন্দ্রনাথ ২ অক্টোবর ১৯২০ Royal Artistic Circle-এর উদ্যোগে 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

২ ৩ অক্টোবর বেলজিয়ামের রাজধানী Brussels-এ এসে পরদিন ৪ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ সেখানকার বিচারালয় Palais de Justice-এ 'The Meeting of the East and West' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সুতরাং তিনি পত্রে ৬ অক্টোবর ১৯২০ তারিখ দিলেও এটি বস্তুত ৪ অক্টোবরে লেখা।

পত্র ৭৪।

১ ফ্রান্স থেকেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করবেন বলে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু প্রতিমা দেবীর একটি অপারেশন হয়েছে খবর পেয়ে তিনি ১২ অক্টোবর লন্ডনে চলে আসেন।

২ 'মঙ্গলবার' অর্থাৎ ১৯ অক্টোবর তাঁর আমেরিকা রওনা হওয়া সম্ভব হয় নি। দ্র. পত্র ৭৫।

পত্র ৭৫।

১ ২১ অক্টোবর ১৯২০ বৃহস্পতিবার ডাচ-আমেরিকান জাহাজ 'Rotterdam'-এ রবীন্দ্রনাথ, পিয়র্সন ও কেদারনাথ দাশগুপ্ত আমেরিকা রওনা হন।

পত্র ৭৬।

১ ২৮ অক্টোবর ১৯২০ রাত্রে নিউ ইয়র্ক বন্দরে জাহাজ পৌঁছয়, কিন্তু তখনই পারে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি, পরদিন সকালে ডাক্তারি পরীক্ষার পরে জাহাজ থেকে নেমে রবীন্দ্রনাথ Hotel Algonquin-এ আশ্রয় নেন।

২ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'ত্রেতাযুগে তোদের সমুদ্রপারের যে কাহিনী শোনা গেছে তাতে জলস্পর্শ করতে হয়নি। এখন সেই পবিত্র ল্যাজ খসে' গিয়ে বিংশ শতাব্দীতে বায়ুযানের আকার ধারণ

করেছে— সেই অবধি বায়ুনন্দনের দর্পচূর্ণ হয়ে গেছে। যখন অতলান্তিকের চপেটাঘাতে আমাদের জাহাজ বিচলিত তখন এই কথা চিন্তা করছিলুম। যা হোক তলিয়ে না গিয়ে পেরিয়ে এসেচি।

পত্র ৭৭।

১ নিউ ইয়র্কের বহুতল বাড়িগুলির ছবি-ছাপা পিকচার-পোস্টকার্ডে চিঠিটি লেখা। য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে লিখিত সবগুলি চিঠিই বিভিন্ন ছবি-সংবলিত পিকচার-পোস্টকার্ডে লেখা, কোনোটিতেই স্বাক্ষর নেই।

পত্র ৭৮।

১ Mr. Seaman নামক এক ধনী ব্যক্তি নিউ ইয়র্কের কাছে Catskill Hill অঞ্চলে সুন্দর পাহাড়ী পরিবেশে Yama Farms নামে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সেখানে আমন্ত্রণ করতেন। বড়োদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে এসে একটি সপ্তাহ কাটিয়ে যান। এখানকার সৌন্দর্য, আতিথ্য ও সঙ্গ তাঁর ভালো লেগেছিল। দিনেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'জায়গাটি সুন্দর— শান্তরসাস্পদ। ...মনে মনে ভাবচি ভাগ্যবিধাতা আমার বনবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে হা হতোঽস্মি বলে দুঃখ করতুম না। বোধ করি নিয়ুইয়র্কের থেকে অযোধ্যা সহরের অনেক তফাৎ ছিল। নইলে রাম ফিরতেন না।'

পত্র ৮০।

১ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সফরের জন্য রবীন্দ্রনাথ ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ পর্যন্ত টেক্সাসের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ান।

পত্র ৮১।

১ ১৬ এপ্রিল ১৯২১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ইংল্যান্ড থেকে 'Goliath' নামক একটি ছোটো বিমানে প্যারিসে আসেন। এইটিই তাঁর প্রথম আকাশপথে ভ্রমণ। উক্ত বিমানের ছবি-ছাপা পিকচার-পোস্টকার্ডে তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন।

পত্র ৮২।

১ প্রথম মহাযুদ্ধে ১৯১৮ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্য য়ুরোপের বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও স্লোভাকিয়া অঞ্চলগুলি নিয়ে

একটি নূতন প্রজাতন্ত্র চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তৎকালে প্রচলিত ভূগোল গ্রন্থগুলিতে এই রাষ্ট্রের নাম না থাকার সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের একটি পত্র থেকে জানা যায়, রাণু এই নূতন রাষ্ট্রের নাম জানতেন।

২ ১৮ জুন ১৯২১ সকালে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে এসে রবীন্দ্রনাথ এইদিনই দুপুর এগারোটার সময়ে স্থানীয় চেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

৩ ১৬ জুলাই ১৯২১ রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পত্র ৮৩।

১ এই সময়ের একটি পত্র পাওয়া যায় নি যাতে রবীন্দ্রনাথ অজন্তা গুহা দেখতে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সমকালীন অন্য কোনো পত্রেও প্রসঙ্গটির উল্লেখ দেখা যায় না। অনেক পরে ১২ মাঘ তিনি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'মার্চ মাসের আরম্ভে হাইদ্রাবাদে রওনা হব। [স্যার আকবর] হাইদরী আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন— অজন্তা ও ইলোরায় নিয়ে যাবেন। নন্দলালরা সেখানে ছবি কপি করবার অনুমতি পেয়েচেন। সেইজন্যেই আমাকে যেতে হচ্চে— আমি যাব এই প্রলোভনেই হাইদ্রাবাদের কর্তৃপক্ষ এই বন্দোবস্তে রাজি হয়েচেন।' ('দেশ', ৮ পৌষ ১৩৬২, পৃ. ৫৬১-৬২) হয়তো এই আমন্ত্রণ এর আগেই জানানো হয়েছিল, যার কথা রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছিলেন।

২ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানি ও তুরস্কের পরাজয়ের পরে সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করার জন্য প্যারিসের অদূরে ভার্সাই নগরীতে যুদ্ধরত দেশগুলির যে বৈঠক হয়, সেটিই Peace Conference নামে পরিচিত। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির উপর বহুবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করা হয় ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৬৫০ কোটি পাউন্ড অর্থদণ্ড দেওয়া হয়, যা জার্মানিকে চল্লিশ বছর ধরে শোধ করতে হবে।

৩ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ২৯ অগাস্ট ১৯২১ সোমবার য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে প্রদত্ত 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক বক্তৃতাটির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে পত্রটি রচনার তারিখ হয় ১২ ভাদ্র ১৩২৮। (২৮ অগাস্ট ১৯২১)।

৪ ১৭-১৮ ভাদ্র ১৩২৮ (শুক্র-শনি ২-৩ সেপ্টেম্বর ১৯২১) জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের গান সহযোগে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হয়।

৫ কারও-কারও মন গুমটও হয়েছিল; গান্ধীজি-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী শান্তিনিকেতনে গিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের ধিক্কার দিয়ে আসেন; মাতুলকে জানান: 'দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্ত্তব্য এবং যে মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েচে।' (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭১-৭২)।

পত্র ৮৪।

১ Casus Belli— যুদ্ধের কারণ।

পত্র ৮৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪১।

১ রাণু এই সময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। মার্চ ১৯২২-এ এই পরীক্ষা হয়।

পত্র ৮৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪২।

১ পরবর্তী ৮৭-সংখ্যক পত্র থেকে জানা যায়, রাণু এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, কিন্তু সঠিক সময়টি নির্ধারণ করা যায় নি।

পত্র ৮৭।

১ শান্তিনিকেতনের ছাত্র, 'ধীমু' নামে বিশেষ পরিচিত।

২ তারিখ-যুক্ত পাণ্ডুলিপির অভাবে বলা শক্ত রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কোন গানগুলি রচনা করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' থেকে জানা যায়, অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতায় প্রাপ্ত 'শরৎ ১৩২৮' সময়-চিহ্নিত ১৪টি গান শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল, যেগুলি 'নবগীতিকা প্রথম খণ্ড' (১৩২৯) গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ ছাপা হয়।

৩ সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৪৮), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীনিকেতনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

৪ রবীন্দ্রজীবনী-কার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক (১৮৯২-১৯৮৫)। ইনি লিখেছেন, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুহৃৎকুমার ৮ নভেম্বর ১৯২১

দিনপঞ্জীতে লেখেন : "আমি অসুস্থ থাকায় এ কয়দিন গুরুদেবের কাছে যেতে পারিনি, তিনি আমাকে দুদিন দেখতে আসেন।" তাঁদের জননীও তখন পীড়িত, রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁদের গুরুপত্নীর বাসায় এসে খোঁজখবর নিতেন। দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০-২১

পত্র ৮৮।

১ এই বৎসর কার্তিকী অমাবস্যা ছিল ১৩ কার্তিক ১৩২৮ রবিবার ৩০ অক্টোবর ১৯২১; এর পরবর্তী 'বুধবার' ১৬ কার্তিক, এই হিসাবে পত্রটির তারিখ অনুমিত হয়েছে।

পত্র ৮৯।

১ B. S. Nanjumda Naidu নামক এক ব্যক্তি ৩১ অক্টোবর ১৯২১ চারটি স্তবকের রবীন্দ্র-প্রশস্তিমূলক একটি ইংরেজি কবিতা রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কাগজেরই অপর পৃষ্ঠায় পত্রটি লেখেন। কবিতার প্রথম স্তবকটি নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত হল:

Oh my beloved Gurudeva!
Thy name is spoken
Even in the corner of a town
As a laureate thou art considered
And as Kalidas thou art told
Thy love towards the humanity
Has found its utility.
Jai Jai Jai Gurudeva.

২ রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে প্রতিটি ইংরেজি শব্দ ভুল বানানে লিখেছেন।

৩ প্রসিদ্ধ ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ Sylvain Levi (1853-1935) বিশ্বভারতীর প্রথম য়ুরোপীয় অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন ২৩ কার্তিক ১৩২৮ বুধবার ৯ নভেম্বর ১৯২১ তারিখে।

পত্র ৯০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৫।

১ এই বিষয়ে ফাল্গুন ১৩২৮-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়: 'সাতই পৌষের বাৎসরিক উৎসবের পর জনকোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া পদ্মাবক্ষে কিছুকাল কাটাইবার নিমিত্ত গুরুদেব গত ১৩ই পৌষ শিলাইদা গিয়াছিলেন সপ্তাহকাল কাটাইয়া গত ২২শে পৌষ সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি নূতন নাট্য লিখিতে এতদিন প্রবৃত্ত ছিলেন।'

২ এই বাক্যাংশটি পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে 'আপনার পথ সে কাটছে'-রূপে পরিবর্তিত হয়।

৩ এই নাটকটি হল 'মুক্তধারা', বৈশাখ ১৩২৯-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে মুদ্রিত হওয়ার পরে আষাঢ় ১৩২৯-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৯১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৩।

১ 'মুক্তধারা' নাটকটির নামকরণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম করেছিলেন 'পথ'। আবার ২০ ফাল্গুন ১৩২৮ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখেন: "আমার নতুন নাটকটার নাম 'মুক্তধারা' নয়, 'পথমোচন'।" ('দেশ', ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২) 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ৬টি গান 'মুক্তধারা'য় গৃহীত হয়।

পত্র ৯২।

১ এই প্রসঙ্গে ফাল্গুন ১৩২৮-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়: 'সেটি সমাপ্ত হইলে ৩০শে পৌষ আশ্রমবাসীদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। সংশোধন ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় দুইবার পাঠ করিয়াছিলেন। তিন দিনের জন্য কলিকাতা গমন করিয়া বন্ধুদিগের নিকট নাট্যটি দুইদিন পড়িয়াছিলেন।'

২ উক্ত পত্রিকায় এই বিষয়ে লেখা হয়েছে: 'গুরুদেবের সন্ধ্যার ক্লাশ প্রায় নিয়মিত হইতেছে। বলাকা পাঠ শেষ হইলে লোক সাহিত্যের "ছেলে ভুলানো ছড়া" পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।' প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত-অনুলিখিত 'বলাকার' ব্যাখ্যা ও আলোচনার নোটটি দীর্ঘকাল ধরে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেনও যে অনুলিখন নিয়েছিলেন, সেগুলি 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ৯৩।

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সীতা দেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে কলকাতায় দুদিন 'মুক্তধারা' পাঠের বিবরণ দিয়েছেন: "ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। 'মুক্তধারা' পড়িয়া

শুনানো হইবে শুনিলাম। বিচিত্রার উপরের ঘরে তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেছিলেন, তাই পড়িবার স্থান স্থির হইল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি। সেইখানেই গেলাম। বসিবার ঘরে আমাদের বসাইয়া গগনবাবু বলিলেন, 'বসুন আপনারা, আরম্ভ হলেই খবর দেব।' অনেক পরে পড়া আরম্ভ হইল। পাঠান্তে নাটকটি অভিনয় করার কথা উঠিল। ...পরদিন আমাদের Social Fraternityর অধিবেশনে তাঁহাকে একবার পদধূলি দিতে অনুরোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ...মুক্তধারা নাটকটি আর-একবার পড়িয়া শুনাইলেন।" নাটকটি অবশ্য অভিনীত হয় নি।

পত্র ৯৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৪।

১ ২৯ মাঘ রবীন্দ্রনাথ ফণিভূষণকে লিখেছিলেন : 'লেভি সাহেব শীঘ্রই কাশীতে যাইবেন, তাঁহাকে সেখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখাইবেন— রাণুর সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিবেন।' সস্ত্রীক লেভি ১৮ ফেব্রুয়ারি (৫ ফাল্গুন) কাশীতে পৌঁছন। মাদাম লেভি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন : 'অধ্যাপক অধিকারী আমাদের সঙ্গে করে সব কিছু দেখাতে চাইলেন। কন্যা রাণুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন। কবির বর্ণনায় যার অপরূপ লাবণ্যের সঙ্গে মিশেছে হরিণীর স্বচ্ছন্দ চঞ্চলতা।' (নন্দদুলাল দে-অনূদিত 'মাদাম লেভির ডায়েরি', 'দেশ' ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪) এই আলাপের সূত্রেই লেভি হয়তো বলেছিলেন, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর স্বর্ণপদ্মের সন্ধানে আছেন।

পত্র ৯৫।

১ হিসাবের খাতা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী পরদিন ১ চৈত্র কলকাতায় গিয়েছিলেন।

২ লেভি-দম্পতি ও অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৮ মার্চ ১৯২২ নেপাল যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, তিনিও তাঁদের সঙ্গী হবেন। কিন্তু তাঁর যাওয়া হয় নি। মাদাম লেভি লিখেছেন : [গান্ধীজির কারাদণ্ড ঘোষিত হওয়ার আশঙ্কাজনিত] 'বর্তমান পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও যেতে পারেন না; যাওয়াও উচিত নয়। কয়েক সপ্তাহ নেপালে আটক থাকার ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নেতার অভাবে দেশ যদি তাঁর নেতৃত্ব চায়, তাঁর সাহায্য, উপদেশ বা নির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়, সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে [এসময়]

দেশের বাইরে থাকা আদৌ সমীচীন নয়।' ('দেশ', ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪) এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নেপাল-যাত্রা পরিত্যক্ত হয়।

৩ ১০ মার্চ ১৯২২ তারিখে গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদে বসন্তোৎসবের বিপুল আয়োজন পরিত্যক্ত হলেও ২৯ ফাল্গুন সোমবার ১৩ মার্চ দোলপূর্ণিমার রাত্রে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়। পিঠাপুরমের রাজার বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী (১৮৭৪-১৯৩১) তখন আশ্রমে ছিলেন, তিনি বীণা বাজিয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'রাতে রাতে আলোর শিখা', 'এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল', 'ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী', 'তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়', 'ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা' প্রভৃতি নূতন গান রচনা করেন, নিশ্চয়ই গানগুলি এই উৎসবে গীত হয়েছিল।

পত্র ৯৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৬।

১ ২৩ মার্চ ১৯২২ (৯ চৈত্র) রাত্রে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে রওনা হন।

২ এই বাক্যটি পত্রিকায় ও গ্রন্থে বর্জিত হয়।

৩ ৬ এপ্রিল (২৩ চৈত্র) সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা রওনা হয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৭ চৈত্র শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পত্র ৯৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৭।

১ ২৭ এপ্রিল ১৯২২ (১৪ বৈশাখ ১৩২৯) থেকে ২৬ জুন (১২ আষাঢ়) পর্যন্ত বিশ্বভারতী গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ থাকে, ২৮ জুন ক্লাশ আরম্ভ হয়। এই সময়ে রাণু বেশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করে ২৭ জুন কাশীতে ফিরে যান। আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয়েছে: 'কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয় সপরিবারে সমস্ত ছুটিই এখানে কাটাইয়াছেন।'

২ এই বিষয়ে শ্রাবণ-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয় : 'ছাত্রীনিবাসের কাছেই হাঁসপাতালের সম্মুখের অপরিষ্কার বাগানটি ছাত্রীরা নিজেদের হাতে বড় বড় গাছ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন— এখন সেই জমিতে তাঁহারা প্রত্যহ গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে আবর্জ্জনা পুঁতিয়া জমি যাহাতে উর্ব্বর হয় তাহার জন্য উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন— আশা করা যায় তাঁহাদের বাগান শীঘ্রই ফলে ফুলে শাক সবজীতে ভরিয়া উঠিবে।'

পত্র ৯৯। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৮।

১ ৩১ শ্রাবণ ১৩২৯ (১৬ অগাস্ট ১৯২২) কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরির হলে, ১৭ অগাস্ট (৩২ শ্রাবণ) কর্পোরেশন স্ট্রিটের ম্যাডান প্যালেস অব্ ভ্যারাইটিস্ হলে ও ১৯ অগাস্ট (২ ভাদ্র) হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটারে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানপত্রী থেকে জানা যায় ১৮টি গান এখানে পরিবেশিত হয়েছিল।

২ এই সময়ে রচিত যে-গানগুলির কথা জানা যায়, সেগুলি হল : 'আজ আকাশের মনের কথা', 'ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী', 'আসা-যাওয়ার মাঝখানে', 'একলা বসে একে একে অন্যমনে', ও 'শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা'।

পত্র ১০০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৯।

১ ১৫ জুলাই ১৯২২ (৩১ আষাঢ় ১৩২৯) রাত্রের ট্রেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারির সদর শহর পতিসর অভিমুখে রওনা হন। এইদিনই তিনি এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখেন: 'I am starting for Patishar tonight and shall be back before Thursday next.' রাণুকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি মঙ্গলবার ১৮ জুলাই রাত্রে রওনা হয়ে পরের দিন কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ১০১।

১ পতিসর ও কলকাতা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ ৮ শ্রাবণে (২৪ জুলাই) শান্তিনিকেতনে আসেন, সম্ভবত পত্রের তারিখটি হল ৯ শ্রাবণ।

২ উক্ত তারিখে অনুষ্ঠানটি হয় নি, দ্র. পত্র ৯৯, টীকা ১।

৩ দ্র. পত্র ৯৯, টীকা ২।

৪ কলকাতা থেকে দূরবর্তী শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কাজকর্মের সঙ্গে কলকাতাবাসী জনগণের যোগাযোগের সেতু রচনার জন্য বিশ্বভারতী সম্মিলনী (কোথাও-কোথাও বিশ্বভারতী বন্ধু-সভা নামেও উল্লিখিত) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৫ জুলাই ১৯২২ রামমোহন লাইব্রেরি হলে একটি প্রাথমিক বক্তৃতা দেন। এর পরে ২১ জুলাই তিনি সেখানেই 'মুক্তধারা' নাটক পাঠ করেন এবং ২৮ জুলাই এল্‌ম্‌হার্স্টের ও ১ অগাস্ট ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করেন।

৫ ২১ জুলাই (৫ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ রামমোহন লাইব্রেরি হলে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে তাঁর নূতন নাটক 'মুক্তধারা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই বিষয়ে ২৪ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় লিখিত হয়: 'প্রথমে তিনি নাটকের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলেন, এই নাটকখানাকে রূপক রূপে গ্রহণ না করিলে চলে। যে আন্দোলন স্রোতে দেশ আজ ওতপ্রোত, তাহাকে রূপকের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলা নাটকখানির উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য অত বড় একটা পারিপার্শ্বিক ঘটনার ছাপ উহাতে না থাকিয়াও পারে না। পথকে মুক্ত করা, মানবের মিলনের পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই যে সমস্ত সভ্যতার শেষ কথা, উহাই নাটকে বিশেষ ভাবে দেখানো হইয়াছে।' (শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা' ১ম, ১৯৯৩, পৃ. ১৫২)

৬ আষাঢ় ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়েছিল : 'এখানে আজকাল প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। এবার কালবৈশাখীর ঝড়ে আশ্রমের পাকশালার টিনের ছাদ অনেকটা উড়িয়া গিয়াছিল, এবার পাকা ছাদ হইতেছে।' ঘটনাটি নিশ্চয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘটেছিল, অথচ রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে লিখেছেন, যাতে এটিকে সমসাময়িক ঘটনা বলে মনে হয়।

পত্র ১০২।

১ দ্র. পত্র ৯৯, টীকা ১। ম্যাডান থিয়েটারে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৯ অগাস্ট) লেখে : 'এই উৎসবে বর্ষার প্রবর্তন, স্থিতি ও বিদায় সম্বন্ধে রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হয়। ...তিনজন সঙ্গীতজ্ঞ এসরাজ ও একজন মৃদঙ্গ বাদন করেন। ষ্টেজখানাও অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। মোটের উপর ১৬টি সঙ্গীত গীত হয়: ইহার মধ্যে অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যোগদান করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার স্বরচিত তিনটি কবিতাও আবৃত্তি করিয়াছিলেন।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৫) কবিতা তিনটি হল 'ঝুলন', 'বর্ষামঙ্গল' ও 'অবিনয়'।

অ্যালফ্রেড থিয়েটারের তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় (২১ অগাস্ট) লেখা হয়: 'গতবারে স্থানাভাবে অনেক লোককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এবার তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য এই অনুষ্ঠান। কিন্তু

এবারেও প্রশস্ত থিয়েটার হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ...কবি স্বয়ং বসিয়া সমস্ত উৎসব পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবার আবৃত্তি করিতে পারেন নাই। মাত্র একটি ছোট কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ বর্ষামঙ্গলের ১৮টি গান গাওয়া হইয়াছিল। ...শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত ...ও শ্রীমতী [অরুন্ধতী] চট্টোপাধ্যায় ...প্রত্যেকে ২টি করিয়া গান গাহিয়াছিলেন।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৫)

২ 'শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত' চার আনা দামের মলাট-সহ কুড়ি পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'বর্ষা-মঙ্গল ১৩২৯'। এতে ১৮টি গান আছে : 'দারুণ অগ্নিবাণে', 'এস এস হে তৃষ্ণার জল', 'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে', 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর', 'কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে', 'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে', 'আজ আকাশের মনের কথা', 'এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে', 'পূব সাগরের পার হতে', 'আজি বর্ষারাতের শেষে', 'শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার', 'বহুযুগের ওপার হতে', 'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা', 'একি গভীর বাণী এল', 'আমার হৃদয় আজি যায় যে ভেসে', 'ভোর হল যেই শ্রাবণ-শর্বরী', 'বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে' ও 'বাদল ধারা হল সারা'।

৩ 'লিপিকা'র রচনাগুলি কেবল 'কথিকা' নামে 'সবুজ পত্র'-তেই প্রকাশিত হয় নি— বিভিন্ন নামে 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি পত্রিকাতেও ছাপা হয়।

৪ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ অ্যালফ্রেড থিয়েটার ও ১৮ সেপ্টেম্বর ম্যাডান প্যালেস অব্ ভ্যারাইটিস্-এ 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়।

পত্র ১০৩।

১ পূর্ববর্তী ১০২-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'শারদোৎসব' অভিনয়ের আগে ১ সেপ্টেম্বর তিনি বোম্বাই রওনা হবেন— কিন্তু উক্ত অভিনয়ের জন্যই তাঁর যাওয়া হয় নি। এখানে তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অভিনয়ের কথা লিখেছেন, অভিনয়টি হয় ১৬ ও ১৮ সেপ্টেম্বর। এর পরেই ২০ সেপ্টেম্বর তিনি দক্ষিণ ভারত ও সিংহল যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সন্ন্যাসী-ছদ্মবেশী রাজা বিজয়াদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২ Leonard Knight Elmhirst (1893-1974), ইংরেজ কৃষিবিজ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আহ্বানে শ্রীনিকেতনের গ্রাম পুনর্গঠন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই পরিচালনায় ও তাঁর ভাবী পত্নী ডরোথির অর্থানুকূল্যে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ তারিখে শ্রীনিকেতনে Institute of Rural Reconstruction প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশীতে গিয়ে রাণুর সঙ্গে তাঁর এক অসমবয়সী বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে তাঁদের তিনজনের মধ্যে এক ত্রিকোণ প্রেমের অস্তিত্ব ঘোষণা করতেন।

পত্র ১০৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫১।

১ বিভূতিভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৭০), বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক।

পত্র ১০৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫২।

১ রমা মজুমদার (কর), সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী (১৯০৩-৩৫)।

২ লতিকা রায়, ননীবালা রায়ের একমাত্র কন্যা।

৩ ননীবালা রায় (১৮৯৫-১৯৮০), প্রতিমা দেবীর সহচরী।

৪ পাঞ্জাবের অধিকাংশ গুরুদ্বার হিন্দু মহান্তদের অধিকারে ছিল, শিখ আকালিরা তাঁদের নিজেদের ধর্মস্থানের উপর অধিকার দাবি করলে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। অ্যান্ড্রুজ এই ঘটনার তদন্তে পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন।

পত্র ১০৬।

১ পত্রটিতে তারিখ নেই, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সকালে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালোরে আগমন ও সেইদিন বিকালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার সংবাদ থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

২ এল্‌ম্‌হার্স্ট ও গৌরগোপাল ঘোষকে সঙ্গী করে রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে পুনার অভিমুখে যাত্রা করে ২১ সেপ্টেম্বর বিকালে সেখানে পৌঁছন।

৩ ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে বাঙ্গালোর ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজ ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে মাদ্রাজ পৌঁছন।

৪ ৩০ সেপ্টেম্বর রাত্রে মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে ১ অক্টোবর সকালে তাঁরা কৈম্বাটুরে উপস্থিত হন।

৫ ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের অল্‌বে (Alwaye) শহরে পৌঁছন।

৬ তাঁরা মাঙ্গালোরে পৌঁছন ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায়।

৭ মাঙ্গালোর থেকে ৭ অক্টোবর মাদ্রাজে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজ ৯ অক্টোবর সিংহল অভিমুখে রওনা হন ও ১০ অক্টোবর সেখানে পৌঁছন। সেখানে প্রায় এক মাস কাটিয়ে ৭ নভেম্বর ভারতে ফিরে তাঁরা ত্রিবান্দ্রমে যান।

৮ সিন্ধু প্রদেশে এবারে রবীন্দ্রনাথের যাওয়া হয় নি, তিনি বোম্বাই হয়ে আমেদাবাদে গিয়ে ৪ ডিসেম্বর ১৯২২ গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমের অধিবাসীদের কাছে ভাষণ দেন।

৯ ২৩ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইতে পৌঁছন।

১০ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র (১৮৮৭-১৯৩৮), ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। কাশীতে তাঁর যে বাসস্থান ছিল, মীরা দেবী সন্তানদের নিয়ে সেখানে কিছুদিন ছিলেন। বোম্বাই থেকে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পথে কয়েকদিন কাশীতে থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিয়ে আসেন।

পত্র ১০৭।

১ এই প্রসঙ্গে ৩০ নভেম্বর ১৯২২ রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে কাশীতে মীরা দেবীকে লেখেন: 'আমি ডিসেম্বরের ৭ই কিম্বা ৮ই তারিখে বোম্বাই থেকে তোদের ওখানে যাব— সেখানে দুই একদিন থেকেই তোদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাব।' দ্র. পত্র ১০৬, টীকা ১০।

পত্র ১০৮।

১। অনুষ্ঠানটির সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (১৬ ডিসেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত হয়: 'বিশ্বভারতী-সম্মিলনী:— সোমবার ইংরাজী ১৮ই ডিসেম্বর, বিকাল ৫॥ টার সময় রামমোহন লাইব্রেরী হলে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কবিতা পাঠ ও

আলোচনা করিবেন।' ('রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' ১ম, পৃ. ১৫৬) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন, তিনি 'দিনলিপি'তে লিখেছেন: 'সোমবার দিন যখন রামমোহন লাইব্রেরীতে নিয়ে যাচ্ছি গাড়ীতে বল্‌লেন যে, 'আমি ইচ্ছে করেই Luriaটা choose করেচি। ...Luriaর মধ্যে Browning একটা কথা বলে গেছেন যেটা আজকের দিনে বিশেষ করে' স্মরণ করা দরকার। ...আমার খুব বিশ্বাস Browning শুধু psychologyর দিক থেকে ইচ্ছা করেই Luriaর মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্বন্ধের কথা বলেছেন।' ('রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ৩২, পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৫৮)

২ পৌষ ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার 'আশ্রম-সংবাদ'-এ এই দুদিনের মেলার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

পত্র ১০৯।

১ এঁর সম্পর্কে মাঘ-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়: 'সম্প্রতি প্যালেষ্টাইন হইতে আশ্রমে মিস ফ্লাউম (Miss Flaum) নামধেয়া ইহুদি মহিলা আসিয়াছেন। ইঁহার জন্মভূমি রুসিয়ায়। ইনি ফরাসী, জার্মান, ইংরেজি, ইটালীয় প্রভৃতি সাতটি প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষিতা। কিছুকাল যুক্তরাজ্যস্থ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি এখানকার শিশুবিভাগের ছাত্রদিগকে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিখাইবার ভার লইয়াছেন। জার্মান ভাষা শিক্ষা দিবার ভারও ইনি লইয়াছেন। ইনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে বিশেষ উৎসুক। তাঁহার ইচ্ছা বাংলা শিখিয়া তিনি গুরুদেবের সমস্ত গ্রন্থ রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করিবেন।' Schlomith Frieda Flaum নামক এই বিদুষী মহিলার সঙ্গে ১৯২১ সালে নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। শান্তিনিকেতন দেখা ও এখানকার কাজে আত্মনিয়োগ করার বাসনায় রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে তিনি এখানে উপস্থিত হন।

২ Stella Kramrish (1895-1993) একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদি শিল্প-বিশেষজ্ঞা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। ইনি নৃত্যেও পারদর্শিনী ছিলেন।

৩ প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-৮৫), পড়াশোনা করেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও রসরচনায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক।

৪ 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হয় ৯ পৌষ রাত্রে।

পত্র ১১০।

১ আনন্দশঙ্কর ধ্রুব (১৮৫৯-১৯৪২), বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।

২ দ্র. পত্র ১০৯, টীকা ২।

৩ L. Bagdanov, এঁর সম্পর্কে পৌষ ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' -এ লেখা হয় : 'Mr. Bagdanov নামক একজন রুশীয় অধ্যাপক আসিয়াছেন। তিনি বহুপূর্ব্বে St. Petersburg বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব্য ও পারস্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এই দুই ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভের জন্য তিনি বহুকাল তুরস্ক ও পারস্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি আগমন করায় পারস্য ভাষার একটি ক্লাস খোলা হইয়াছে।' অর্থাভাবের কারণ দেখিয়ে ১৯৩০ সালের জুন মাসে এঁকে বিদায় দেওয়া হয়।

৪ Dr. Mark Collins (?-1933), এঁর সম্পর্কে অগ্রহায়ণ ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ সংবাদ দেওয়া হয় : 'সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কলিন্‌স্‌ কিছুদিন হইল আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি দুই তিন মাস এখানে থাকিয়া বিশ্বভারতীর কাজে সহায়তা করিবেন। ইনি ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত। কয়েক মাসের জন্য এলেও তিনি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন।

পত্র ১১১।

১ প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) আলিপুর অবজারভেটরির অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়ে সেখানকার কোয়ার্টারে বাস করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ মাঝেমাঝেই সেখানে গিয়ে থাকতেন, এটির অবস্থান আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন বা চিড়িয়াখানার পাশেই।

২ Lord Rufus Daniel Isaacs Reading (1860-1935) ১৯২১ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ভারতের গবর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় ছিলেন। কলকাতায় এলে ভাইসরয়রা আলিপুরের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বাস করতেন, যেটি এখন ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার।

৩ 'রাজর্ষি' উপন্যাস অবলম্বনে কোনো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

৪ Victor Alexander George Robert Lytton (1876-1947) ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বাংলার গবর্নর ছিলেন। লর্ড কারমাইকেলের সময় থেকেই বাংলার গবর্নরদের শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করা প্রথায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রথা মেনেই তিনি ১৬ জানুয়ারি ১৯২৩ (২ মাঘ ১৩২৯) এখানে আসেন। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ ১৩২৯-সংখ্যায় লেখা হয়েছে: 'কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার নূতন গভর্ণর লর্ড লিটন সুরুল কৃষিবিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে আসিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে আশ্রমেও আসিয়াছিলেন। শিশুদের থাকিবার ঘরটি [সন্তোষালয়] দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তারপর গুরুদেব ও অন্যান্য সকলের সহিত তিনি আমবাগানে চা পান করিয়াছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।'

৫ ২৫ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ (১৩ ও ১৫ ফাল্গুন ১৩২৯) প্রথম দিন ম্যাডান থিয়েটার ও দ্বিতীয় দিন য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে রবীন্দ্রনাথের নবরচিত 'বসন্ত' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। ৩ এপ্রিল ১৯২৩ 'বিশ্বভারতী-সম্মিলনী' শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংবাদ দেয়: 'গত ফেব্রুয়ারী মাসে বসন্তোৎসব উপলক্ষে মোট পাঁচ হাজার চারশত ছেচল্লিশ টাকা আট আনা উঠে। সম্মিলনীর নিয়মা-নুসারে শতকরা দশ টাকা সম্মিলনীর প্রাপ্য। সেই শুদ্ধ মোট খরচ এক হাজার নয়শত টাকা এক পয়সা। বাকী থাকে তিন হাজার পাঁচশত সাঁইত্রিশ টাকা সাত আনা তিন পয়সা, উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক হাজার সাতশত আটষট্টি টাকা এগার আনা সাড়ে তিন পয়সা উত্তরবঙ্গে বন্যা প্রপীড়িতদিগের দান করা হইল। অপর অর্দ্ধেক বিশ্বভারতী পাইবেন।'

৬ ফাল্গুন ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়েছে: 'শ্রীমতী তটিনী

দাস; শ্রীমতী শান্তা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশা অধিকারী বিশ্বভারতীর ছাত্রীরূপে আসিয়াছেন। আরো দুই তিন জন নূতন ছাত্রীও আসিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য 'নেবুকুঞ্জে' নূতন একটি ছাত্রীনিবাস খোলা হইয়াছে। শ্রীমতী আশা অধিকারী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আচার্য্য উইন্টারনিজের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন'।

পত্র ১১৩।

১ রাণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোক অধিকারী।

২ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ ক্ষিতিমোহন সেনকে সহযাত্রী করে রবীন্দ্রনাথ কাশী যাত্রা করেন। তিনি ১ মার্চ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন এবং ৩ ও ৪ মার্চ উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন।

পত্র ১১৪।

১ ফণিভূষণ রাণুকে সঙ্গে নিয়ে মোগলসরাই স্টেশন পর্যন্ত এসে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনকে লখ্‌নৌগামী ট্রেনে তুলে দিয়ে কাশী ফিরে যান।

২ রেলপথে লেখা এই গানগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা শক্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-রচিত 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' অনুসারে ১৯ ফাল্গুন ১৩২৯ (৩ মার্চ ১৯২৩) কাশীতে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'নাই বা এলে সময় যদি নাই' ও 'নাই যদি বা এলে তুমি' গান-দুটি লেখেন, এর পরে ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) 'লক্ষ্ণৌ-বোম্বাই পথে' তিনি লেখেন 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে' এবং ২৯ ফাল্গুন (১৩ মার্চ) আমেদাবাদে রচিত হয় 'তোমায় গান শোনাব' গানটি— এ ছাড়া অনুমিত হয় 'যুগে যুগে বুঝি আমায়', 'খেলার সাথী, বিদায়দ্বার খোলো' এবং 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া' গানগুলি ফাল্গুন মাসে রচিত হয়েছিল।

৩ সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে আমেদাবাদ হয়ে সিন্ধুপ্রদেশের করাচি শহরে পৌঁছন ১৮ মার্চ (৫ চৈত্র)। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২৭ চৈত্র (১০ এপ্রিল) তারিখে।

পত্র ১১৫।

পত্রটির একটি ভূমিকা আবশ্যক। গত বৎসের 'শারদোৎসব' অভিনয়ের

সাফল্যের পরে পরিকল্পনা নেওয়া হয় যে, বিশ্বভারতী সম্মিলনীর পক্ষ থেকে 'বিসর্জন' অভিনয় করা হবে। বর্তমান বৎসরে গ্রীষ্মাবকাশের শুরুতে কোনো খবর না দিয়ে রাণু শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলে রবীন্দ্রনাথ ৮ বৈশাখ ১৩৩০ (২১ এপ্রিল ১৯২৩) তাঁর পিতাকে লেখেন, তাঁকে নিয়ে তিনি দেরাদুনে যাবেন (দ্র. ফণিভূষণকে লেখা পত্র, সংখ্যা ৫), কিন্তু পরিবর্তে যান শিলঙে। সেখান থেকে কলকাতায় এসে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৭ আষাঢ় (২ জুলাই)। এখানেই 'বিসর্জন' অভিনয়ের মহড়া শুরু হয়। ২৭ আষাঢ় (১২ জুলাই) হিসাবের খাতায় 'শ্রীযুত এন্ড্রুজ সাহেব ও রাণুকে লইয়া গুরুদেবের কলিকাতা গমনের' সংবাদ পাওয়া যায়। কলকাতায় কিছুদিন রিহার্সলের পরে ২০ জুলাই *The Statesman* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয় যে, বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে ৩১ জুলাই মঙ্গলবার, ১ অগাস্ট বুধবার ও ৩ অগাস্ট শুক্রবার (১৫, ১৬ ও ১৮ শ্রাবণ) এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনীত হবে। টিকিট বিক্রয়ও আরম্ভ হয়। কিন্তু ৩১ জুলাই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় মুদ্রিত হয় : 'রবিবার সন্ধ্যাবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হঠাৎ জ্বর হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট দিনগুলিতে এম্পায়ার থিয়েটারে "বিসর্জ্জন" নাটকে অভিনয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে অভিনয় আপাতত স্থগিত রহিল। পুনরাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ যতশীঘ্র সম্ভব দেওয়া হইবে।' অতঃপর পুনরাভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করা হয় ২৫, ২৭ ও ২৮ অগাস্ট (৮, ১০ ও ১১ ভাদ্র) আগের কেনা টিকিটেই এই অভিনয় দেখা যাবে। আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৯ অগাস্ট) বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, বিশেষ অনুরোধে হ্রাসমূল্যে ৩০ অগাস্ট আর-একটি অভিনয় হবে— শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া' (১৯৯৫) গ্রন্থে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, অভিনয়টি হয় ১ সেপ্টেম্বর শনিবারে।

১ উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, পত্রের ১৬ শ্রাবণ ১৩৩০ (১ অগাস্ট) তারিখটি ঠিক নয়— হিসাবের খাতায় এইদিনে 'বধূমাতা ঠাকুরানী দঃ রাণুর গাড়িভাড়াদি' হিসাব থেকে বরং মনে হয়, অভিনয় আপাতত

বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাণু সম্ভবত এইদিনই কাশী চলে যান। তিনি তখন কাশীর কলেজে আই. এ. ক্লাসে পড়াশোনা করছিলেন।

২ দ্র. পত্র ১১০, টীকা ১।

৩ এই বৎসর মুহরম ও ঝুলনের তারিখ ছিল যথাক্রমে ৭ ও ৯ ভাদ্র (২৪ ও ২৭ অগাস্ট) শুক্র ও সোমবার।

পত্র ১১৬।

১ সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫-৫৩), রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২ দ্র. জীবনস্মৃতি, 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়।

৩ মঞ্জুশ্রী ঠাকুর (চট্টোপাধ্যায়), সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা (১৯০৭-৮০)।

৪ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮)।

পত্র ১১৭।

১ বিখ্যাত নট, নাট্যকার ও পরিচালক অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) বিসর্জন-এর প্রথম দিনের অভিনয় দেখে *The Indian Daily News* পত্রিকায় (৪ সেপ্টেম্বর) যে পত্র লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত হল:

'... Few actors know how to make their entrances and exits. Babu Dinendra Nath Tagore, as the high priest of the Holy Mother's temple, entered and, before he uttered a single word, we knew that the genius of an actor was in him. He looked the haughty Brahmin, proud of his paita, conscious of his authority, intriguing, designing, yet never losing his native dignity; no convention, no mannerism, no stiffness.

'Next comes the little lady in the character of Aparna, the beggar-girl. As everything on the stage must be counterfeit, a real Ranee was chosen to represent a beggar; the duckling glides in and out of the stage as if the boards were her play-pond; native in speech, artless in manners, how sweetly she laid her virgin cheek on the step-stone to caress her pet, her stolen and slain kid, the aching heart murmuring soft words soaked in tears.

'After the officers have preceeded comes the General, "The Rabindranath". Born great, he has achieved greatness and greatness courts him, too. The great poet is a great actor, almost a master of the technique of stage-craft. But, young aspirants to histronic fame, beware of the great master! As in poetry one must drink at the fountain of Rabindranath's mind as not simply borrow his words, so, on the stage, one should imbide the spirit of his acting and not imitate him in action, attitude, gesture of pose. They are all his own, and the copy-right is not to be infringed.

'In endowing Rabi Babu with a great mind, Providence seems to have prepared a special mould to cast the golden casket in which that mind was to find its home. There is, in the masculine frame of Rabindranath, such a judicious admixture of the feminine, that the product almost approaches the Divine. He sighs, murmurs, wails, kneels, claps his hands, draws on his long vowels and we feel that the woman peeps out without making effeminate the poetry of his presentation...'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করেন নি, অমৃতলাল শনিবারের অভিনয়ের কথা লিখেছেন— সেদিন অসুস্থতার জন্য অপর্ণার ভূমিকায় রাণু অভিনয় করতে পারেন নি, সেদিনকার অভিনেত্রী ছিলেন মঞ্জুশ্রী ঠাকুর!

২ Fernand Benoit সুইজারল্যান্ড থেকে আগত সুইশ-ফরাসি যুবক, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের জুরিখ ভ্রমণের সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগের প্রস্তাব করেন ও ১৯২২ সালের শুরুতেই বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়ে ফরাসি ও জার্মান ভাষা শিক্ষা

দেবার কাজে নিযুক্ত হন। 'রক্তকরবী'র ইংরেজি অনুবাদে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন, এই তথ্য রাণুকে লেখা বর্তমান পত্র ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবত ১৯২৪ সালের ১৮ জুলাই তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি অমিয় চক্রবর্তীর সাহায্যে যক্ষপুরী নাটকের ফরাসি অনুবাদ করার অনুমতি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কাজটি তিনি সম্ভবত সম্পন্ন করতে পারেন নি।

পত্র ১১৮।

১ *The Englishman* পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-সংখ্যায় শচীন সেনের 'Aparna in Visarjan/An Appreciation' শিরোনামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়: '...such a misty— vague and appealing character cannot be better exhibited as it was done in the Empire Theatre. Her art and skill is at once novel and marvellous. ...She can identify herself with the role in which she appears. That she is to feign and pretend is uppermost in her mind. The conception of the histrionic art is vitiated— so much so that she is drilled in the display of physical forms and movement which are often obnoxious— repulsive and inartistic. But the whole audience was all astonishment when it was discovered that the consummate histrionic art found expression in Aparna. She is stage free. She does not shrink, nor does she shirk. ...Her gratitude, her caress, her intense feeling of love were nicely exhibited in her choked voice, delightful movements, and self-surrender attitude. She was not tutored or drilled but had the fullfledged freedom. Her pathetic and passionate call of 'Joy Sh-i-ng' behind the screen hypnotised the whole audience. After the demise of 'Joyshing' her scattered steps and wild look were more eloquent than any speech. 'Aparna' with her deft art has elevated the Bengali stage, in sooth, the Bengalee nation.' (শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৬-৬৭)

২ Moriz Winternitz (1863-1937), অস্ট্রিয়ান ইহুদি প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ ভ্রমণের সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর আমন্ত্রণে ১৯২২ সালে এক বৎসরের জন্য অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন।

৩ এই প্রসঙ্গে আশ্বিন ১৩৩০-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয়: 'আচার্য্যের বিদায় গ্রহণোপলক্ষ্যে সন্ধ্যার উপাসনার পরে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকেরা কবি ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রথম তিন অঙ্ক অভিনয় করিয়া তাঁহাকে দেখান। তাহার পরদিন রাত্রিতে তাঁহার বিদায়সভা করা হয়। সভার প্রথমে আচার্য্যকে মাল্য ও চন্দনে অভিনন্দিত করা হয়। সেই সময় তাঁহাকে পট্ট বস্ত্র, উত্তরীয় ও একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেওয়া হয়। তাহার পর বেদমন্ত্র পাঠ করা হইলে পূজনীয় গুরুদেব, শাস্ত্রী মহাশয় ও বেনোয়া সাহেব তাঁহাদের বিদায় অভিনন্দন পাঠ করেন। তৎপর আচার্য্য সমবেত আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলেন। পরে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হইলে "জনগণ মন অধিনায়ক" গানটি গাওয়ার পর সভাভঙ্গ করা হয়।'

পত্র ১১৯।

১ ফরাসি চন্দননগর থেকে প্রকাশিত মতিলাল রায়-সম্পাদিত 'প্রবর্ত্তক' মাসিক পত্রের শ্রাবণ ১৩৩০-সংখ্যায় বিসর্জন-অভিনয়ের একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয়, তার প্রাসঙ্গিক অংশ শ্রীসমর ভৌমিকের 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' (১৪০৪) গ্রন্থ (পৃ. ৭৭-৮০) থেকে উদ্ধৃত হল:

'...অনাড়ম্বর দৃশ্যপটের সমক্ষে, তিনটি দিনের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে, এক অপূর্ব্ব রস মূর্ত্ত হইয়া অবিরাম গতিতে বহিয়া গেল—...

'এই রস ফুটাইয়া তুলিলেন নট-কবি রবীন্দ্রনাথ ও বালিকা অপর্ণা। অপর্ণা "সঞ্চারিণী দীপশিখার" মত অভিমান-তিমির সমাবৃত নাটকের ক্রূর ঘটনাবলীর উপর করুণ-কোমল আলোক বিকীরণ করিয়া অসত্য ও অকরুণার বিকট বাত্যার ফুৎকারে নিভিয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী

অপর্ণার ভূমিকায় স্বতঃউৎসারিত করুণার প্রস্রবণ, তাহার পদক্ষেপ নির্ভীক, তাহার অভিনয় সহজ, স্বৈর-বিহারিণী ভিখারিণীরই মত সহজ সরল সতেজ।

'আর রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ ভাব-বিপর্যায়ের মধ্যে, বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে পতিত তৃণখণ্ডের মত, বিক্ষুব্ধ, বিড়ম্বিত, বিপর্যাস্ত জয়সিংহের চরিত্র অভিনয়ে যে নিপুণতা, সূক্ষ্ম নাট্যকলার অভিব্যক্তির পরিচয় দিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, ...বিশেষতঃ যষ্টিপর বৃদ্ধ বিংশতি বর্ষের যুবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যে সজীবতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখাইলেন তাহা অসাধারণ। তাঁহার নেপথ্যও নিখুঁত।

'...রঘুপতি, রাজা ও নক্ষত্র ভূমিকায় পাত্র মনোনয়ন একেবারেই উপযুক্ত হয় নাই। রঘুপতির স্থূল দেহের সঙ্গে স্থূল inartistic কণ্ঠ মিলিয়া তাঁহার অভিনয়ের art-কে নিমজ্জিত করিয়া এক বিকট রসের সৃষ্টি করিতেছিল।...'

পত্র ১২০।

১ বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার কার্তিক ১৩৩০-সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ ৫ আশ্বিন 'যাত্রা' ('আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের') কবিতাটি লিখে দেন, দ্র. 'পূরবী'।

পত্র ১২১।

১ অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), প্রখ্যাত গীতিকার ও ব্যারিস্টার।

২ উত্তরপ্রদেশের সম্পন্ন জমিদার, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা।

পত্র ১২২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৫।

১ নির্মলকুমারী মহলানবিশ (১৯০০-১৯৮১), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী, ডাকনাম রানী। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আলিপুর অবজারভেটরিতে এঁদের অতিথি হয়ে ছিলেন।

২ এই উল্লেখ থেকেই পত্রটির তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে। ২২ আশ্বিন মঙ্গলবার (৯ অক্টোবর) ছিল মহালয়া, এর পরের দিন থেকেই ছাত্রেরা পূজাবকাশের জন্য বাড়ি রওনা হতে সুরু করে, যদিও আশ্বিন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয়েছে : 'আগামী ১২ই অক্টোবর [২৫ আশ্বিন]

শুক্রবার হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ই নভেম্বর [২৬ কার্তিক] সোমবার অবধি এই একমাস পূজাবকাশের জন্য আশ্রম বন্ধ থাকিবে।' পুজোর ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের কাঠিয়াবারে যাওয়ার কথা ছিল, তিনি সেই যাত্রা বাতিল করে ২৬ আশ্বিন শনিবার আশ্রমে ফিরে আসেন।

পত্র ১২৩।

১ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২), প্রখ্যাত চিকিৎসক ও রাজনীতিক। নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথেরও চিকিৎসা করেছেন।

২ এই প্রসঙ্গে ২৪ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন: 'নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলচ্চি— তাতে তার রং ফুটচে বলেই বোধ হচ্চে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানে পড়ে' গেলে বুঝতে পারব কোথাও তার ওজনের বেঠিক আছে কি না।' (চিঠিপত্র ১১, পত্র ২৬, পৃ. ৩৬) 'আত্মীয়সভা' জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পত্র ১২৪।

১ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সৌরাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ভ্রমণ করছিলেন রাজাদের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসাহায্য সংগ্রহের আশায়। ধ্রাঙ্গাধ্রা (Dhrangadhra)-র মহারাজা স্যার ঘনশ্যাম সিংজির আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। রাজা ২৫০০০ টাকা সাহায্য করেন।

২ মোরভি (Morvi) সৌরাষ্ট্রের আর-একটি দেশীয় রাজ্য। এখানকার ঠাকুর সাহেব লাখাধারাজি ওয়াদিা বাহাদুর ১০০০০ টাকা দান করেন।

৩ রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করার জন্য জংশন স্টেশনটির নামের বানানে একটু বদল ঘটিয়েছেন, এর প্রকৃত বানান 'Wadhwan'।

৪ হিরজিভাই পোস্তানজি মরিস, পার্শি যুবক, বিশ্বভারতীতে ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিতেন। বহুবার রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হন— তিনি আদর করে এঁকে 'মরীচি' নাম দিয়েছিলেন।

৫ বনমালী পারুই, এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সেবা করেন। প্রভুভৃত্যের সম্পর্কটি অত্যন্ত মধুর ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে

'নীলমণি', 'লীলমণি' প্রভৃতি বিচিত্র নামে সম্বোধন করতেন। এইরূপ নামকরণের ইতিহাসের জন্য দ্র. রবীন্দ্রনাথের ১৩১-সংখ্যক পত্র।

পত্র ১২৫।

১ পত্রটি দেশীয় রাজ্য রাজকোট থেকে লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে সেখানে গিয়েছিলেন বলার মতো তথ্য নেই, কিন্তু ৯ নভেম্বর তাঁর ভ্রমণসঙ্গী গৌরগোপাল ঘোষ বোম্বাই থেকে রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন যে, এল্‌ম্‌হার্স্টকে জাহাজ থেকে নামিয়ে পরদিন 'গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য Rajkot রওনা করে দিচ্ছি।' রবীন্দ্রনাথ ১২ নভেম্বর রাজকোটের দরবারকক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন।

২ রাণু যখন 'বিসর্জন' নাটকের মহলার জন্য জোড়াসাঁকোয় ছিলেন, তখন তাঁর রূপে ও মিশুক স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবক তাঁর প্রণয়প্রার্থী হয়ে ওঠেন। এর পরিণতি কি জটিল আকার নিতে পারে তা অনুমান করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুকময় স্বভাবের জন্য কিছু পরিমাণে এতে উৎসাহ দেন। কিন্তু তার পরিণাম রাণু ও তাঁর পরিবারের পক্ষে সুখকর হয় নি। এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে রাণুর সম্পর্ক নিয়েও অনুরূপ যে কৌতুক রবীন্দ্রনাথ করতেন, এল্‌ম্‌হার্স্ট তা সঠিক বুঝতে না পেরে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পরবর্তীকালে লেখা চিঠি বা ডায়েরিতে এমন-সব মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে।

পত্র ১২৬।

১ পত্রের তারিখটি অনুমিত। পৌষ ১৩৩০-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে লেখা হয়: 'গত ২৮শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ জামনগরে পৌঁছিয়াছেন। জামসাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বিশ্বভারতী ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা দান করিবেন।'

পত্র ১২৭।

১ রবীন্দ্রনাথ বস্তুত বোম্বাই পৌঁছন ৯ ডিসেম্বর রবিবার সকালে।

২ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষ, তাঁর ডাকনাম ছিল 'গোরা'।

৩ ঠিক জানা নেই, সম্ভবত কিছুকাল পূর্বে সাধুচরণের জীবনাবসান হয়।

পত্র ১২৮।

১ ১২৭-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে লিখেছিলেন, 'ক্রিস্টমাসের পূর্ব্বেই ফিরব। তোমার বাবজাকে লিখে দিয়েছি তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে', কিন্তু ১৫ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'কাশী ১৪ই ডিসেম্বর' তারিখ দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়: 'অদ্য রবীন্দ্রনাথ কাথিয়াবার হইতে এখানে আসিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন'— এর থেকে অনুমান করা যায়, রাণু হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি কাশী ফিরে যাওয়ার পথে ও সেখানে পৌঁছে যে দুটি চিঠি লেখেন, এখানে সেই দুটি চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি রক্ষিত হয় নি।

২ এই চিঠিটি পাওয়া যায় নি।

৩ এই গানগুলি সম্ভবত 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে,' 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে,' 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে' (১৬ পৌষ) ও 'আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা' (১৭ পৌষ)।

৪ সুবীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী পূর্ণিমা ঠাকুর (চৌধুরী), দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রী নলিনীর কন্যা— ডাকনাম বুবু।

৫ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, সুহৃৎনাথ চৌধুরীর স্ত্রী।

৬ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-৭৪), পিতা সুধীন্দ্রনাথ— সাম্যবাদী রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা, সুকণ্ঠের অধিকারী এই মনস্বী পুরুষ শেষ জীবনে রবীন্দ্রসংগীত ও সংস্কৃতির প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

৭ Gretechen Green, আমেরিকান সমাজসেবিকা, শ্রীনিকেতনে এল্‌ম্‌হার্স্টের পল্লীপুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করার জন্য তাঁর ভাবী পত্নী ডরোথী স্ট্রেট তাঁকে ভারতে পাঠান। তাঁর আত্মজীবনী *The Whole World and Company* [?1936] অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের অন্তরঙ্গ বিবরণে পূর্ণ।

৮ মাঘ ১৩৩০-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ এই বিষয়ে লেখা হয়: 'মেয়েরাও এইবার ছুটি উপভোগ করিতে ছাড়েন নাই। সন্তোষ বাবু ও অক্ষয় বাবুর নেতৃত্বে নারী বিভাগের ১২টি মেয়ে বক্রেশ্বর বেড়াইয়া আসিয়াছেন। আশ্রম

হইতে বক্রেশ্বর ৪০ মাইল। দলটি সর্ব্বশুদ্ধ বক্রেশ্বর যাওয়া আসাতে ৮০ মাইল বেড়াইয়া আসিয়াছেন।'

পত্র ১২৯।

১ আমরা একটি চিঠি পেয়েছি, সেটি হল ১২৮-সংখ্যক পত্র।

২ বেতালভট্ট-প্রণীত 'নীতিপ্রদীপ'-এ একটি শ্লোক আছে:

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাৎ ভিল্লসা পত্নী মুদা।
পাণীভ্যাবগুহ্য শুক্লকঠিনং তদ্‌বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ॥

রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'বাজে কথা' ('বিচিত্র প্রবন্ধ') প্রবন্ধে এই শ্লোকের ভাবানুবাদ করেছিলেন: 'সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল, যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।'

৩ এই প্রসঙ্গে ফাল্গুন-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়েছে: 'আজকাল বিনোদন পর্ব্বে পূজনীয় গুরুদেব গানের দলকে নূতন গান শিখাইতেছেন।'

৪ পূর্বোল্লিখিত চারটি গান ছাড়া পৌষ ১৩৩০-এ রচিত আর একটিমাত্র গানের সন্ধান পাওয়া যায়— 'আয় রে মোরা ফসল কাটি'।

৫ এই কথা লিখলেও রবীন্দ্রনাথ পরে মত পরিবর্তন করে কাশী যান, দ্র. পত্র ১৩০।

৬ জাহাঙ্গীর ভকিল, অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট— ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের লোভনীয় চাকরির সুযোগ ত্যাগ করে দেশের সেবা করার উদ্দেশ্যে স্ত্রী ও শিশুকন্যা নিয়ে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন।

৭ পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর (১৮৭২-১৯৩১) মহারাষ্ট্রীয় সংগীতজ্ঞ, 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' নামক সংগীত-শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা।

পত্র ১৩০।

১ এই বিষয়ে ১১ জানুয়ারি ১৯২৪ (২৬ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ কালিদাস

নাগকে লেখেন : 'হিন্দু য়ুনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশনে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। প্রথমে টেলিগ্রাফ করেছিলুম যাব না। মনে করেছিলুম আমার বদলে রথীরা গিয়ে বরোদার মহারাজাকে চেপে ধরবে। কিন্তু রথীরা দিল্লির সপ্তভূপতি-সঙ্গমে যাচ্চে— তারা যখন দিল্লিতে রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী ঠিক সেই সময়েই বরোদা বারাণসীতে। ...তাই রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাতে যেতে হবে। ...তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি সেখানে একটা লেকচার দেবে, সেটাতে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান তোমাকে নির্দেশ করতে হবে। বৃহস্পতিবার [১৭ জানুয়ারি] রাত্রে ছাড়ব রবিবার [২০ জানুয়ারি] রাত্রে প্রত্যাবর্তনের যাত্রা করব'। (চিঠিপত্র ১২, পৃ. ২৯১-৯২) ১৩১-সংখ্যক পত্র থেকে জানা যায় রবিবারে তাঁদের ফেরা হয় নি— প্রতিমা দেবী, কালিদাস নাগ ও কনমালীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৩ জানুয়ারি বুধবার বেনারস থেকে রওনা হন।

পত্র ১৩১।

১ দ্র. পত্র ১৩০ টীকা ১।

২ নন্দিনী লালা (১৯২১-৯৫), রবীন্দ্রানুরাগী এক গুজরাটি পরিবারের সন্তান। শান্তিনিকেতনে কিছুকাল অবস্থানের সময়ে তাঁর চিররুগ্ন মা সন্তানপালনে অসমর্থ দেখে নিঃসন্তান প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ তাঁকে দত্তক নেন। ডাক নাম পুপে।

৩ কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬), প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক পণ্ডিত, রবীন্দ্রানুরাগী এই মানুষটির দিনলিপি রবীন্দ্রজীবন-সংক্রান্ত তথ্যের মূল্যবান আকর।

৪ গল্পের পরবর্তী অংশ জানা যায় ক্যাশবইয়ের '১০ই মাঘ শ্রীযুত কর্ত্তামহাশয় ও শ্রীমতী বধূমাতা ঠাকুরাণীর কলিকাতা হইতে বোলপুর আগমন খরচ'-এর হিসাব থেকে, রবীন্দ্রনাথ আলিপুরে না গিয়ে প্রতিমা দেবীর সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পত্র ১৩২।

১ দ্র. পত্র ১২৫, টীকা ২। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে সরযূবালা অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২-সংখ্যক পত্রের টীকায়।

২ ডাঃ নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩), রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রখ্যাত চিকিৎসক।

৩ ২১ মার্চ ১৯২৪ (৮ চৈত্র ১৩৩০) 'ইথিওপিয়া' জাহাজে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চীন অভিমুখে রওনা হন ও ১৭ জুলাই (১ শ্রাবণ ১৩৩১) তারিখে 'সাদোমারু' জাহাজে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পত্র ১৩৩।

১ পত্রটিতে '১০ ফেব্রুয়ারি' তারিখ থাকলেও অভ্যন্তরীণ প্রমাণে জানা যায়, এটি সোমবার ১১ ফেব্রুয়ারি লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শ্রীনিকেতনে জাপানি দারুশিল্পী কিংতারো কাসাহারা-নির্মিত বৃক্ষাবাসে বাস করছিলেন।

২ 'পূরবী' (১৩৩২) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ভাঙা মন্দির' ও 'আগমনী' কবিতা দুটি মাঘ ১৩৩০ কাল-চিহ্নিত। তৃতীয় কবিতাটিকে শনাক্ত করা যায় নি।

পত্র ১৩৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৯।

১ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম বিদেশী শিক্ষকদের অন্যতম উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন (১৮৮১-১৯২৩) ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে ২৭ অগাস্ট ১৯১৮ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চার জন অল্পবয়সী বন্ধুর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন: 'One was a little girl of ten to whom I surrendered my heart.' তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ৬ অক্টোবর যে চিঠি লেখেন, তার থেকে উদ্ধৃত। মূল চিঠির (দ্র. *The Visva-Bharati Quarterly*, May-July 1943, pp. 53-54) ভাষার কিছু পরিবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

পত্র ১৩৫।

১ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ তারিখে কলকাতার অ্যালফ্রেড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি-রূপে যে ভাষণ দেন, সেটি জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, দ্র. 'পল্লীপ্রকৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৭শ খণ্ড।

২ পরের দিন শান্তিনিকেতনে ফেরা হয় নি, হিসাবের খাতা থেকে দেখা

যায়, ২৭ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কলকাতা থেকে আশ্রমে ফিরে আসেন।

৩ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জুশ্রী, দ্র. পত্র ১১৬, টীকা ৩।

৪ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের (১৮৮৭-১৯৩৮) পুত্র পূর্ণেন্দ্রনাথ, ডাকনাম 'বুড়ো'।

দ্র. পত্র ১৩২, টীকা ১।

৫ চিঠির শেষে স্বাক্ষর নেই, আরও পৃষ্ঠা ছিল কি না বলা যায় না।

পত্র ১৩৬।

১ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ক্যাশবহির একটি হিসাব থেকে জানা যায়, রাণু তাঁর মা সরযূবালার সঙ্গে এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই কলকাতায় যান। সন্তোষচন্দ্র তাঁদের কাশী পৌঁছে দিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পত্র ১৩৭।

১ বেশ কয়েকবার তারিখ পরিবর্তনের পরে ২১ মার্চ রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চীনের উদ্দেশে রওনা হন।

২ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন। এই যাত্রায় সমুদ্রপীড়ার আক্রমণে তাঁর বিপর্যস্ত অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) গ্রন্থটির প্রথম পত্রে।

৩ ৩ মে ১৯১৬ জাপানের উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করার দুদিন পরেই বঙ্গোপসাগরে প্রচণ্ড সাইক্লোনের কথা এখানে স্মরণ করা হয়েছে।

৪ সম্ভবত 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্গত 'উৎসবের দিন', 'গানের সাজি' ও 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতা তিনটি।

৫ ৯ মার্চ ১৯২৪ য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট হলে অধ্যাপক ও কবি মনোমোহন ঘোষের (১৮৬৯-১৯২৪) স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন।

৬ মঙ্গলবারের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ বুধবার ১২ মার্চ শান্তিনিকেতনে যান।

পত্র ১৩৮।

১ সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ ১০ মার্চ ১৯২৪ (২৭ ফাল্গুন ১৩৩০) সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে সুরেন্দ্রনাথের কন্যা মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে সুকিয়া স্ট্রিট-নিবাসী যামিনীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ক্ষিতীশপ্রসাদের বিবাহ হয়। চৈত্র-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় লেখা হয় : 'পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী হইতে নব-দম্পতীকে সময়োপযোগী একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে এদিন গগনেন্দ্রনাথের একটি ছবি অবলম্বনে 'সাত ভাই চম্পার মঙ্গল উপহার' কবিতাটি রচনা করেন, কবিতাটি পাঠান্তরে 'ওগো বধূ সুন্দরী' গানে পরিণত হয়।

৩ মালতী সেনগুপ্ত (চৌধুরী), স্নেহলতা গুপ্তের কন্যা মালতী এই সময়ে বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা করতেন, মঞ্জুশ্রীও সেখানে পড়তেন।

৪ শ্রীমতী হাতিসিং (১৯০৩-৭৮)। রবীন্দ্রানুরাগী পুরুষোত্তম ও লীলা হাতিসিং এর কন্যা ১৯২০-তে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। তাঁর মা কন্যার থাকার জন্য গোয়ালপাড়া যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি খড়ে ছাওয়া পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেন, রবীন্দ্রনাথ বাড়িটির নামকরণ করেন 'গুর্জরী'। নৃত্যপটিয়সী। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হয়।

৫ রেখা মজুমদার (গুপ্ত)।

পত্র ১৩৯।

১ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের 'লেকচার অ্যাসোসিয়েশন' রবীন্দ্রনাথকে চীনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। রাণু হয়তো চৈনিক কবি ও অধ্যাপক Hsu Tse Mon-র লেখা ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৩ তারিখের পত্রটি দেখেছিলেন।

২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)।

৩ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'হাজার টাকার সাম্মানিক বৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথকে 'রীডার'-পদে নিয়োগপত্র আসে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখে, শর্ত ছিল তাঁকে সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে

১, ২ ও ৩ মার্চ ১৯২৪ সেনেট হলে রবীন্দ্রনাথ তিনটি মৌখিক বক্তৃতা করেন, সেগুলির লিখিত রূপ যথাক্রমে 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি'। দ্র. 'সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ড।

পত্র ১৪০।

১ রবীন্দ্রনাথের হিসাব খাতায় তাঁর কলকাতা যাওয়ার তারিখ বুধবার ১৯ মার্চ (৬ চৈত্র)।

২ গ্রেচেন গ্রীন তাঁর আত্মজীবনীতে অনুষ্ঠানটির একটি বিবরণ দিয়েছেন : 'In front of the white columns of the library, an Eastern audience hall was set for the ceremony of Baroni (acceptance), performed for me because I am accepted in India. I stood before the Poet in the centre of a circle, seven women in scarlet saris circling round me to purify with water and with fire. They bore offerings on a petah (gift dish) of rice-grains and fruit, a red marriage sari and a wedding bracelet of carved iron. The Poet spoke words of welcome and gave me a crystal amulet, the girls sang songs of evening, and the full moon looked on.' গ্রেচেন দুটি বাংলা শব্দ 'বরণ' ও 'পাটা' একটু ভুল বানানে লিখেছেন।

৩ 'ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি', রচনা : ৪ বৈশাখ ১৩৩০।

৪ 'প্রবাহিণী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২)-র অন্তর্গত গানটির রচনা যে বহু পূর্ববর্তী, এই পত্র তার অন্যতম প্রমাণ।

৫ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পর্শু মঙ্গলবার' অর্থাৎ পত্রটি রবিবারে লেখা, কিন্তু ২ চৈত্র শনিবার ছিল।

পত্র ১৪১।

১ এঁর পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।

২ পূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র ১৪২।

১ জাহাজ ২৪ মার্চ সকালে রেঙ্গুনে পৌঁছলে বিরাট জনতা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানায়। একটি নামহীন সংবাদপত্র-কর্তিকায় দেখা যায় :

'When the poet and his party landed on the wharf, the poet was garlanded by Mr. J. A. K. Jamal and a handsome bouquet was handed over to him by a Burmese lady. ...This over, the Poet and his party were taken in motor cars to a well-furnished house in Bingandet Street where they will put up during their stay in Rangoon.'

পত্র ১৪৪।

১ রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সমর্থনে ৩১ মার্চের *Straits Echo* সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যায় : Rabindranath Tagore touched at Penang yesterday on his way to Singapore and China, and received a wonderful emotional welcome. ...No sooner had the S. S. Ethiopia cast anchor than a representative body of Indians headed by the Hon. P. K. Nambyar started for the ship. ...A party of Indian musicians played weird airs on their sharp-pitched instruments. After the great poet had stepped on to the gangway there was a rush to offer the usual floral tribute. ...At the centre of the Jetty Dr. Tagore was again stopped, and Mr. S. K. Pillay on behalf of the Kedah Indians, adored him with a song of Owydra in Tamil and sang the translation in English. ...With great difficulties that he was got into a car and drove away. ...The distinguished guest was driven to the residence of the Hon. Mr. P. K. Nambyar in Farquhar Street, where large crowds besieged him throughout the day.'

পত্র ১৪৫।

১ ১ এপ্রিলের *The Malaya Mail* পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করে : 'The Ethiopia, on which Dr. Tagore is travelling to Singapore on his way to China entered Port Sweetenham after 1 p.m. yesterday, ...were received by a few members of the Selanger Reception Committee, who brought him ashore, and then to Kualalumpur by motor car reaching the residence of Mr. R. D. Ramaswamy after 4 p.m. The news of Dr. Tagore's presence in town quickly got abroad, and quite a large number of people flocked to see him. ...He drove through the town in the company of Mr. H. N. Ferrers ...had dinner at the house of Dr. Sen, and left for Port Swettenham just before 7 p.m.'

পত্র ১৪৬।

১ রাণুর আই. এ. পরীক্ষা ৩১ মার্চ ১৯২৭ তারিখে শুরু হয়।

পত্র ১৪৭।

১ ইথিওপিয়া জাহাজে ২ এপ্রিল ১৯২৪ সকালে সিঙ্গাপুরে পৌঁছে সেইদিনই বিকেলে জাপানি জাহাজ আৎসুতা মারু-তে আরোহণ করে রবীন্দ্রনাথ চীনের উদ্দেশে রওনা হন।

২ কাথিয়াবাড়ের দেশীয় রাজ্য লিম্‌ডির রাজকুমার ঘনশ্যাম সিংজি, ইনি নিজ ব্যয়ে চীনভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন।

পত্র ১৪৮।

১ জাহাজ ১২ এপ্রিল ১৯২৪ শনিবার সকালে সাংহাই বন্দরে পৌঁছয়। সেপ্টেম্বর-সংখ্যা *The Modern Review*-তে কালিদাস নাগ 'Rabindranath Tagore's Visva-Bharati Mission' নামে যে-বিবরণ প্রকাশ করেন, তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'The N. Y. K. boat Atsuta Maru landed the party consisting of Dr. Rabindranath Tagore, Miss Green, Prof. L. K. Elmhirst, Prof. K. M. Sen, Prof. N. L. Bose and Dr. Kalidas Nag. ...Mr. Tsemon Hsu, a talented Chinese poet and interpreter of Dr. Tagore, came on board the ship to take charge of the party. He was accompanied by Mr. S. Y. Ch'u M. A., Dean of the National Institute of Self-Government, and other distinguished members of the Chinese community.

The Indian residents of Shanghai came to a man to honour their National poet. They greeted him with repeated cries of Bande Mataram and overwhelmed him with garlands and flowers. Dr. Tagore motored down to the Barlington Hotel.'

২ Percy Bysshe Shelly (1792-1822)-র 'Stanzas Written in Dejection, Near Naples'-শীর্ষক কবিতার প্রথম চারটি ছত্র।

পত্র ১৪৯।

১ বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ন্যানকিঙে গিয়েছিলেন ২০ এপ্রিল (৭ বৈশাখ) তারিখে, বক্তৃতাসভার যে-ঘটনা তিনি চিঠিতে বর্ণনা করেছেন তা ওইদিনই সংঘটিত হয়েছিল— তাই পত্রের প্রকৃত তারিখ হবে ৯ বৈশাখ ১৩৩১ (২২ এপ্রিল ১৯২৪)।

২ রাণু এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন 'ভানুসিংহ ঠাকুর: কিছু তথ্য' ('রবীন্দ্রবীক্ষা', ৩২শ সংকলন, পৌষ ১৪০৪)-শীর্ষক রচনায়: 'একবার সে কী কাণ্ড। বিসর্জন অভিনয় চলছে পুরোনো এমপায়ারে। হঠাৎ কি করে উপর থেকে আগুনের ফুলকি পড়ল। ভয় পেয়ে ছুট লাগিয়েছি গ্রিনরুমের দিকে। খপ করে হাত টেনে ধরলেন জয়-সিংহরূপী ভানুদাদা। পরিস্থিতি উপযোগী দু'একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে অবিচল অনর্গল সংলাপ চালিয়ে গেলেন তিনি।'

৩ Tsinansu শহরে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছন ২২ এপ্রিল সকালে, বিকেলে প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি হলে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জনাধিক্যে সভাটি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করতে হয়।

৪ রবীন্দ্রনাথ ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় পিকিঙে পৌঁছন।

পত্র ১৫০।

১ বিধুশেখর শাস্ত্রী।

২ রায় বাহাদুর বলদেব দাস বিরলা শান্তিনিকেতনে এশীয় ছাত্র ও অতিথিদের জন্য আবাস নির্মাণের উদ্দেশ্যে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। এই অর্থে হাসপাতালের পাশে 'পান্থশালা' নামক একটি গৃহ নির্মিত হয়।

৩ ২০ মে রাত্রে পিকিং ত্যাগ করে শান্‌সি প্রদেশের রাজধানী তাইয়ুয়ানফু নগরে যান।

৪ ২৫ বৈশাখ (৮ মে) পিকিঙে রবীন্দ্রনাথের ৬৩তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হয়। ক্রেসেন্ট মুন সোসাইটি নামক বুদ্ধিজীবীদের একটি সংস্থা পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'চু-চেন-তান' এই তিনটি চীনা অক্ষর-খোদিত একটি পাথরের ফলক রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হয়, যার অর্থ হল 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত' বা 'ভারতের রবীন্দ্র'। এর পরে *Chitra* অভিনীত হয়।

৫ রাণুর ভ্রাতা অশোক অধিকারী।

পত্র ১৫১।

১ রবীন্দ্রনাথ ৩০ মে সাংহাই ত্যাগ করে ২ জুন কোবে বন্দরে পৌঁছন।

পত্র ১৫২।

১ 'সাদোমারু' জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ১৩ জুলাই ১৯২৪ রেঙ্গুন ত্যাগ করে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন। সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছিল, জাহাজটি ১৬ জুলাই কলকাতায় পৌঁছবে। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির জন্য জাহাজটির গতি মন্থর হওয়ায় তাঁরা ১৭ জুলাই অপরাহ্ণে কলকাতায় পৌঁছন।

২ রাণুর দিদি আশা অধিকারী এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃততে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, রাণু প্রথম বিভাগে আই. এ. পরীক্ষা পাস করেন।

৩ রবীন্দ্রনাথ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ জাপানি জাহাজ 'হারানা মারু'তে পেরুর পথে য়ুরোপযাত্রা করেন।

পত্র ১৫৩।

১ সম্ভবত ২৪ শ্রাবণ (৯ অগাস্ট) শনিবার রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় যান।

২ কলকাতা যাত্রার দু'একদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সুসীম চা-চক্রের উদ্বোধন করেন। তাঁর চৈনিক বন্ধু, চীনে তাঁর দোভাষী Hsu Tse Mon-এর নামে এই সভার নামকরণ করা হয়।

৩ এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'হায় হায় হায় দিন চলি যায়' গানটি রচনা করেন।

পত্র ১৫৪।

১ সম্ভবত বীরেন্দ্রমোহন সেন (১৮৯৯-১৯৬৯), ক্ষিতিমোহন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

২ ৮ ভাদ্র (২৪ অগাস্ট) রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান, এই তথ্যের সূত্রে চিঠিটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে। রাণু ও তাঁর প্রণয়প্রার্থীদের নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে থাকতে পারেন। তা ছাড়া ৩০ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) অ্যালফ্রেড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ 'অরূপরতন' নাটকটি পাঠ করেন, রাণু তাতে রানী সুদর্শনার চরিত্রে মূকাভিনয় করেন। এই অভিনয়ের মহড়ার জন্যও তাঁকে নিয়ে আসার দরকার ছিল।

পত্র ১৫৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৪।

১ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ মেলে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পরের দিন মাদ্রাজে পৌঁছন। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, সুরেন্দ্রনাথ কর ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য তাঁর সহযাত্রী হন।

পত্র ১৫৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৮।

১ *Ceylon Observer* (23 Sep 1924) পত্রিকায় লেখা হয় : 'Dr. Rabindranath Tagore arrived in Colombo by the Talaimanner route and proceeded to "Sravasti", Cinamon Gardens, the residence of Dr. W. A. de Silva, where he remained during his stay in Colombo. ...He leaves for Europe to-morrow by the N. Y. K. "Haruna Maru".'

২ 'যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে' গানের সঞ্চারীর প্রথম ছত্র।

৩ দ্র. টীকা ১।

৪ দ্র. 'তপোভঙ্গ': পূরবী।

পত্র ১৫৭।

১ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাজ্যের বুয়েনোস আইরেস শহর থেকে 'জুলিয়ো সিজারে' নামক ইতালিয়ান জাহাজে ৪ জানুয়ারি ১৯২৫ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ইতালির উদ্দেশে রওনা হন।

২ 'হারানা-মারু' ও 'আন্ডেস' জাহাজে লিখিত কবিতার সংখ্যা ৩০টি।

৩ দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্র পেরু স্পেনের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয় ৯ ডিসেম্বর ১৮২৪ তারিখে। এই দিনটির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পেরু সরকার বিশ্বের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম।

৪ নভেম্বরের শেষে নয়, ৬ নভেম্বর ১৯২৪ 'আন্ডেস' জাহাজ আর্জেন্টিনা রাজ্যের বুয়েনোস আইরেস বন্দরে পৌঁছয় ও জাহাজঘাটে বিপুল সংবর্ধনা লাভের পরে তিনি ও তাঁর ভ্রমণসঙ্গী এল্‌ম্‌হার্স্ট প্লাজা হোটেলে আশ্রয় নেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ৭ নভেম্বরে লেখা 'অতীত কাল' ও 'বেদনার লীলা' কবিতাদ্বয়ের রচনাস্থল 'আণ্ডেস জাহাজ'-রূপে চিহ্নিত।

৫ জাহাজেই রবীন্দ্রনাথ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন ও তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা দেখা দেয়। চিকিৎসকেরা বিশ্রামের পরামর্শ দিলে রবীন্দ্রভক্ত বিদুষী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (১৮৯০-১৯৭৯) লা-প্লাটা নদীর ধারে সান ইসিদ্রো মালভূমির উপরে অবস্থিত 'মিরালরিও' নামক একটি সুরম্য বাগানবাড়ি ভাড়া করে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় দুমাস সেখানে আতিথ্য দান করেন।

৬ এই তিন মাসে লেখা মোট কবিতার সংখ্যা ৫৬টি, তার মধ্যে বুয়েনোস আইরেসে লেখা হয় ২৮টি কবিতা।

৭ 'জুলিয়ো সিজারে' জাহাজ ইতালির জেনোয়া বন্দরে পৌঁছয় ২১ জানুয়ারি ১৯২৫ (৮ মাঘ ১৩৩১) তারিখে।

পত্র ১৫৮।

১ বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৪-১৯৩৬) পুত্র বীরেন্দ্রনাথ (১৮৯৯-১৯৮২), এঁর সঙ্গেই রাণুর বিবাহ হয় ২৮ জুন ১৯২৫ তারিখে।

২ রাণুর হতাশ প্রণয়প্রার্থীরা তাঁর নামে নানা অপবাদ দিয়ে বহু বেনামী চিঠি রবীন্দ্রনাথকে, রাণুর পরিবারে ও তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে পাঠাচ্ছিলেন। এই সময়ে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির পূর্ণেন্দ্রনাথ (বুড়ো) প্রায়ই রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে বিরক্ত করছিলেন।

৩ রাণু মূলপত্রগুলি দেন নি, নিজেই প্রতিলিপি করে দেন, পরে

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আর-একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হয়। মূল পত্রগুলি তিনি কলকাতার অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্‌কে দান করেছেন।

পত্র ১৫৯।

১ এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম রাণুর প্রতি 'তুই' সর্বনাম প্রয়োগ করেন।

২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা ও কালিদাস নাগের অনতিকাল পরেই বিবাহ হয় (আশীর্বাদী কবিতার তারিখ ৯ বৈশাখ ১৩৩২). বিবাহানুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না বলে উভয়কে আগেই আহারে নিমন্ত্রণ করে আশীর্বাদ করেন।

পত্র ১৬০।

১ ? চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক।

২ চিঠিটি পাওয়া যায় নি।

পত্র ১৬২।

১ জন্মদিনের বিবরণ-সহ চিঠিটি পাওয়া যায় নি। এইদিন সকালে তিনি উত্তরায়ণের উত্তরে পথের ধারে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী গাছের পাঁচটি চারা অর্থাৎ পঞ্চবটী রোপণ করেন। সন্ধ্যায় কলাভবনে মেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করেন।

পত্র ১৬৩।

১ 'কোণার্ক' নামে অভিহিত বাড়িটির কথা এখানে বলা হয়েছে।

২ মমতা সেন (দাশগুপ্তা)।

৩ অমিতা সেন (১৯১২)। মমতা ও অমিতা দুজনেই ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা।

৪ গৌরী বসু (ভঞ্জ), নন্দলাল বসুর কন্যা।

৫ কিরণবালা সেন, ক্ষিতিমোহন সেনের পত্নী।

৬ সুধীরা বসু (?-১৯৬৮)।

৭ William Wordsworth (1770-1850)-এর 'To a Highland Girl' ও 'Poems of Imagination VIII'।

৮ পত্রটির কিছু অংশ পড়া যায় নি।

পত্র ১৬৪।

১ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

পত্র ১৬৫।

১ রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা নন্দিনী (পুপে)।

২ জগদানন্দ রায়। বিবাহের আয়োজনে রাণুরা এই সময়ে সপরিবারে কলকাতাতে অবস্থান করছিলেন।

পত্র ১৬৬।

১ রবীন্দ্রনাথের জার্মান বন্ধু দার্শনিক Hermann Keyserling (1880-1946) *The Book of Marriage* (1926) নামক প্রবন্ধ-সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি লেখা চাইলে তিনি 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' নামে ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৩২) প্রবন্ধটি প্রথমে বাংলায় লিখে পরে তার ইংরেজি অনুবাদ 'The Indian Ideal of Marriage' (*The Visva-Bharati Quarterly*, July-Sep. 1925) কাইজারলিংকে প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁকে ভারতীয় বিবাহ সম্পর্কে বহু শাস্ত্রবিধি চর্চা করতে হয়েছিল।

পত্র ১৬৭।

১ রাণুর বিবাহ হয় ২৮ জুন ১৯২৫ (১৪ আষাঢ় ১৩৩২) রবিবারে। তাঁর বিবাহে উপহার দেওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'রাণু লিখেছে তার ভাবী ননদেরা আমাদের কাছ থেকে কোনো একটা জবর wedding present-প্রত্যাশায় আছে। ও খুব ভয় পেয়ে গেছে— লিখ্‌ছে, "আমি কিছুই চাই নে কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমাকে যেন একটুও খোঁটা সইতে না হয়।" এখন ভাবচি ওকে যে বইগুলো দেব তার একটা ভালো আধার দিতে পারলে চোখ-ভরা গোছের চেহারা হত। ...বাংলা পদ্যগ্রন্থাবলীর মোটা কাগজের সংস্করণটাই যেন দেওয়া হয়— স্বরলিপি ও অন্যান্য সমস্ত ছোট বড় বই দিয়ে বোঝা ভারি করিস্‌। ম্যাকমিলানের সংস্করণ সমস্ত ইংরেজি বইও দিতে হবে— সেগুলো হয়ত বিশেষ করে না বাঁধালেও ক্ষতি হবে না। বাঁধাইয়ের কাপড় তোরাই পছন্দ করে দিস্‌, কিন্তু সময়মত যেন হয়ে যায়— ...যাবার জন্যে রাণু খুব চেঁচামেচি করে চিঠি লিখেচে— চেষ্টা করব এড়াতে। যদি যাই একেবারে দুই একদিন আগে যাব।'

('বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬) ১ আষাঢ় ১৩৩২ প্রশান্তচন্দ্রকেও লিখেছেন: 'রাণুর বিবাহে বাংলা বই রাণুকে ও ইংরেজি বই বীরেনকে দেওয়া ভাল। বাংলা বাসন্তী রঙ ও ইংরেজি purple (রাজকীয়) রঙে হলে কেমন হয়? ইংরেজি যদি না বাঁধাতে চাও তাহলে বিলিতি ম্যাক্‌মিলানের Edition দিলেই হবে। দুটো আলাদা সেট করে দুজনকে দিতে ইচ্ছে করি। গানের স্বরলিপিগুলোও উপহারের মধ্যে ধরে দিয়ো— কেননা যদি কোনোটার কিছুমাত্র ব্যবহার হয় ঐটেরই হবে।' ('দেশ', ১৩ আষাঢ় ১৩৮২, পত্র ৪৯) ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রোজনাম্‌চা বা দৈনিক লিপি'তে ('স্মৃতিসম্পুট, ২য় খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ. ২৩) লিখেছেন: 'রবিকা' তাঁর সব গ্রন্থাবলী একই ধরণে বেশ সুন্দর ছাপিয়ে সব বইয়ের ভিতরে স্বহস্তে আশীর্ব্বাদ লিখে একটা কাঁচের আলমারিসহ রাণুকে উপহার দিয়েছেন।'

এক সময়ে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে রাণুর বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু যখন বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি ভাড়া করে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়, তখন তিনি পুত্রকে লেখেন, বিবাহে উপস্থিত থাকা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন তিনি। শেষে রাণুর মনে যেন কষ্ট না হয় সেই ভেবে ২৫ জুন কলকাতায় এসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইন্দিরা দেবীর বালিগঞ্জের বাড়িতে ওঠেন। কিন্তু সেখানে টিকতে পারেন নি, ২৭ জুন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চলে যান। ইন্দিরা দেবী অভিমান করে তাঁর রোজনাম্‌চায় লিখেছেন: 'কায়ক্লেশে বৃহস্পতি শুক্র দু'দিন থেকে শনিবার সকালে একটু বেলা হতেই বাড়ি যাবার জন্যে এত অস্থির কেন-যে হয়ে পড়লেন তা এখন পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। সুরেনদের ওখানে সেদিন সকালে গিয়ে বলেছেন শুনলুম যে, মন বসছে না, একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারছেন না, ইত্যাদি। আমাদের বললেন যে, রথীদের উপর চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি যে-সব ভার দিয়েছেন তা সম্ভবত হচ্ছে না, ফোনে ঠিক বোঝানো যায় না, ইত্যাদি। ...আসলে আমার বিশ্বাস রাণুকে যা দেবেন তার কী হল জানবার জন্যে ব্যস্ত এবং সেদিন আবার এক সাইক্লোন হবার হুজুক উঠেছিল তার জন্যে ভীত হয়ে এই কাণ্ডটি করলেন। পরে শুনলুম, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি রাত দশটার সময় গাড়ি ক'রে রাণুর যৌতুক পাঠিয়েছিলেন।' ('স্মৃতিসম্পুট',

২য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪) আশীর্ব্বাদের পত্রটি এই কারণেই বিবাহের আগের দিনে লেখা। অবশ্য শ্রীসমর ভৌমিক লিখেছেন : 'বিবাহ বাসরে ...রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদ করতে এসে বিচ্ছিন্নতার ছেঁড়া তার যেন জুড়ে গেলেন সারা সন্ধ্যে আমোদ আহ্লাদ করে।' ('রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য', ১৫০-৫১)

২ রাণুর শ্বশুর স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পত্র ১৬৮।

১ য়ুরোপ-ভ্রমণান্তে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফেরেন ৫ পৌষ ১৩৩৩ (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬) তারিখে। পরের দিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁর অভ্যর্থনার বিবরণ প্রকাশিত হয় : 'গতকল্য সকাল বেলা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে সমবেত জনসঙ্ঘ তুমুল আনন্দধ্বনি সহকারে তাহাদের কবিকে বরণ করিয়া লয়। নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই এক বিশাল জনতা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া জড় হয়। ট্রেন আসিয়া থামামাত্র প্রিয় কবিকে দেখিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ...গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে কবিবরকে তুমুল জয়ধ্বনি ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। ...কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, অমল হোম, পি, কে, চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী, ললিতমোহন দাস, প্রভাতচন্দ্র সান্যাল, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বিশ্বভারতীর সদস্যবর্গ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া কবিকে মোটর গাড়ীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সমবেত বিরাট জনসঙ্ঘকে দর্শন দিবার জন্য কবিকে বহুক্ষণ গাড়ীর পা-দানীর উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কয়েক মিনিট পরে গাড়ী ধীরে ধীরে কবিবরের কলিকাতা বাসস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ...রাস্তার স্থানে স্থানে দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনসঙ্ঘকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মাঝে মাঝেই গাড়ী থামাইতে হয়।'

পত্র ১৭০।

১ ভরতপুর, আগ্রা, জয়পুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ ১১ এপ্রিল ১৯২৭ শান্তিনিকেতনে ফেরেন।

২ আমেদাবাদের বিশিষ্ট শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই।

পত্র ১৭১।

১ ২৩ বৈশাখ ১৩৩৪ (৬ মে ১৯২৭) অম্বালাল সারাভাইয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলং যাত্রা করেন। অম্বালাল সেখানে দুটি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন, Uplands নামক বাড়িটিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নেন।

২ এখানে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' পত্রিকার জন্য 'তিন পুরুষ' নামক একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, পরে তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'যোগাযোগ'।

পত্র ১৭৪।

১ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (জন্ম ১৮৬৩ খৃ.) ৫ মার্চ ১৯২৮ তারিখে পরলোকগমন করেন।

পত্র ১৭৫।

১ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচার দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে ৫ মে ১৯২৮ তারিখে কলকাতা থেকে 'সিটি অব্ ইয়র্ক' জাহাজে রবীন্দ্রনাথের কলম্বো রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। পরে মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ধরার জন্য তিনি ১১ মে মাদ্রাজ মেলে রওনা হন। এ যাত্রায় তাঁর য়ুরোপে যাওয়া হয় নি।

পত্র ১৭৭।

১ দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৮, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫-সংখ্যায় (পৃ. ৭৫৭-৫৮) মুদ্রিত হয়।

২ কলম্বো থেকে ১৪ জুন রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজে আসেন, কিন্তু ওয়ালটেয়ারের পরিবর্তে তিনি ১৫ জুন বাঙ্গালোরে গিয়ে দিন-দশেক ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আতিথ্য ভোগ করে ২৯ জুন কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ১৭৮।

১ ডাঃ নীলরতন সরকার রবীন্দ্রনাথের জন্য ডায়াথার্মিক চিকিৎসার সুপারিশ করেছিলেন।

২ ৫ শ্রাবণ ১৩৩৫ শান্তিনিকেতনে 'বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান' হয়। ৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-প্রবাসী প্রতিমা দেবীকে লেখেন :

'তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হোলো।...সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হোলো।...তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হোলো— আমি এই উপলক্ষে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম সেটা পড়লুম।' (চিঠিপত্র ৩য়, পৃ. ৬৪-৬৫, পত্র ২৮) উক্ত কবিতাগুলি হল 'বনবাণী' কাব্যের 'ক্ষিতি', 'অপ', 'তেজ', 'মরুৎ', 'ব্যোম' ও 'মাঙ্গলিক'। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর-পরিকল্পিত রূপসজ্জায় সভাস্থলে পাঁচ জন ছাত্র-শিক্ষক পঞ্চভূত সেজে উপবিষ্ট হন। সন্ধ্যায় বর্ষার গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'বলাই' গল্পটি পড়ে শোনান।

পত্র ১৭৯।

১ চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথ ২৮ জুলাই কলকাতায় আসেন।

পত্র ১৮২।

১ অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের উদ্দেশে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ কলকাতা ত্যাগ করেন।

পত্র ১৮৩।

১ রাণুর পুত্র রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২ ১৯, ২১ ও ২৬ মে ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে তিনটি বক্তৃতা দেন, প্রবন্ধগুলি কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে *The Religion of Man* (1930) নামে প্রকাশিত হয়।

৩ রাণুর প্রথমা কন্যা গীতা।

পত্র ১৮৪।

১ এল্‌ম্‌হার্স্ট ও তাঁর স্ত্রী ডরোথী শান্তিনিকেতনের আদলে ডেভনশায়ারের টট্‌নেসে ডার্টিংটন হল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে দেখা করা ও বিশ্রামের জন্য ৬ জুন সেখানে গিয়ে মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে আসেন।

২ E. W. Ariam (?1889-1967), সিংহলদেশীয় তামিল ক্রিশ্চান, পরে আর্যসমাজী মতে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'আর্যনায়কম্‌' পদবী গ্রহণ

করেন। রাণুর দিদি আশাকে বিবাহ করেন।

পত্র ১৮৫।

১ য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১ গভীর রাত্রে কলকাতায় ফিরে আসেন ও ২ ফেব্রুয়ারি সকালের ট্রেনেই শান্তিনিকেতনে রওনা হন।

২ আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে ১৯ অক্টোবর ১৯৩০ নিউ হ্যাভেনে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থতা এমন-কিছু গুরুতর ছিল না, কিন্তু আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি এমন প্রচার আরম্ভ করে যে, তাঁর পরবর্তী কার্যসূচির অনেকটাই বাতিল হয়ে যায়।

পত্র ১৮৬।

১ এই প্রসঙ্গে ১৯ মে ১৯৩১ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংবাদ দেয়: 'কিছুদিন পূর্ব্বে পারস্যের সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে পারস্যদেশে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্রাট সেই আমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিবর এই আমন্ত্রণ রক্ষা করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পারস্যের দূত ডাক্তার আলী বোম্বাইতে কবির যাত্রার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। ২১শে মে তারিখ যাত্রা করার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কবির ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে, সুতরাং যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।' এক বৎসর পরে ১১ এপ্রিল ১৯৩২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ পারস্যের উদ্দেশে আকাশপথে যাত্রা করেন।

২ এই বৎসর সমারোহ-সহকারে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮ শান্তিনিকেতনে যথারীতি জন্মোৎসব পালিত হলেও মূল সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩১।

৩ দার্জিলিং যেতে আপত্তি থাকলেও শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য সেখানে যান ২৭ মে তারিখে। জুলাই মাসের শুরুতে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ১৮৭।

১ গরমের তাড়নায় না হোক, লোকের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ ১৮ অক্টোবর দার্জিলিঙের উদ্দেশে রওনা হন।

পত্র ১৮৯।

১ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ চৌরঙ্গিতে কলকাতা আর্ট স্কুলে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী শুরু হয়, চলে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

২ দ্র. পত্র ১৮৬, টীকা ১। ৪ এপ্রিল যাওয়া হয় নি, রবীন্দ্রনাথ পারস্যযাত্রা করেন ১১ এপ্রিল সকালে।

পত্র ১৯১।

১ চিঠির তারিখটি অবশ্যই ভুল. উক্ত তারিখে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং জেলার মংপুতে অবস্থান করছেন। রবীন্দ্রনাথ '১৩৩৯' লিখতে গিয়ে '১৯৩৯' লিখেছেন।

২ রবীন্দ্রনাথ নিজেও ২৫ অক্টোবর ১৯৩২ (৮ কার্তিক ১৩৩৯) খড়দহে গিয়ে সেখানে পক্ষকাল অবস্থান করে ১০ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

৩ ১ অগাস্ট ১৯৩২ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করে।

৪ [?] ডিসেম্বর ১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসেবে সিনেট হলে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', দ্বিতীয় ভাষণটি দেন ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ তারিখে 'শিক্ষার বিকিরণ' নামে। দুটি ভাষণই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে, দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৮শ খণ্ড।

পত্র ১৯৩।

১ ১৯৪-সংখ্যক পত্র থেকে অনুমান করা যায়, রাণু সন্তানদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

পত্র ১৯৪।

১ বরানগরে 'শশিভূষণ ভিলা'য় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাসায় থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন।

২ প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী নির্মলকুমারী বা রানী মহলানবিশ।

পত্র ১৯৫।

১ ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ তারিখে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাহিত্যতত্ত্ব' শীর্ষক বক্তৃতা করেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্রপরিষদ'-এ ভাষণ দেন ও ১৩ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানির রজতজয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

২ অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬-৭৬), রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব।

পত্র ১৯৬।

১ 'শ্যামলী' নামক মাটির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ গৃহপ্রবেশ করেন ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ তারিখে।

পত্র ১৯৭।

১ 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' অভিনয়ের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লি ও মীরাট ভ্রমণ করেন।

২ এইদিন রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতার (ডাকনাম 'বুড়ি', ১৯১৬-৬৭) সঙ্গে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক কৃষ্ণ কৃপালনির (১৯০৭-৯২) বিবাহ হয়।

পত্র ১৯৮।

১ রাণুর শ্বশুর স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ১৫ মে ১৯৩৬ (১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) তারিখে (জন্ম ১৮৫৪ খৃ.)।

পত্র ১৯৯।

১ বরানগরে নয়, রবীন্দ্রনাথ এবার দীর্ঘদিন চন্দননগরে গঙ্গার তীরে কাটান, এই পত্রটি সেখান থেকেই লেখা।

২ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

পত্র ২০০।

১ ২৯ এপ্রিল ১৯৩৭ (১৬ বৈশাখ ১৩৪৪) রবীন্দ্রনাথ আলমোরা যাত্রা করেন। বেরিলি স্টেশনে সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

পত্র ২০১।

১ রাণু তাঁর ১৩ জুনের পত্রের সঙ্গে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন।

২ ২৭ জুন রবীন্দ্রনাথ রাণীক্ষেতের পথে আলমোরা ত্যাগ করেন।

পত্র ২০২।

এই চিঠির উপর কেউ '1/8/38' তারিখটি লিখে রেখেছেন।

১ ২৬ জুন ১৯৩৮ কালিম্পঙ থেকে রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি পাঠান : 'বন্ধুবর্গ ও জনসাধারণের সহিত পত্রব্যবহার ও তাঁহাদের অন্যান্য অনুরোধ রক্ষা আমার জীর্ণ শরীর মনের পক্ষে দুর্বহ হওয়াতে এই সমস্ত দায়িত্বভার হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য সকলের নিকট আমি সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আমার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আশা করি তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।' ২৮ জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর'-এ তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়।

২ পুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতনেই অবস্থান করেন।

পত্র ২০৩।

পত্রটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

পত্র ২০৪।

পত্রটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ ইঙ্গবঙ্গ যে ধনী সমাজে রাণুর বিবাহ হয়েছিল, সেখানে পার্টিতে গিয়ে নানাধরনের বিদেশি হল্লোড় খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথও তা জানতেন। 'বাঁশরি' (১৯৩৩) নাটকে তার একটি ছবিও তিনি এঁকেছেন। তবু পার্টিতে রাণুর আচরণ সম্পর্কে লোকমুখে কিছু বিরূপ কথা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে চিঠিটি লেখেন।

পত্র ২০৫।

১ ২০৩-সংখ্যক চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

২ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে শ্রী রঙ্গমঞ্চে ৭ ফেব্রুয়ারি 'শ্যামা' ও ৯ ফেব্রুয়ারি 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যগুলি অভিনীত হয়। এরই কোনো একটি অনুষ্ঠানে রাণু অভিনয়ের মধ্যপথে উঠে যান বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছেন ভেবে তিনি একটি চিঠি লেখেন। সম্ভবত এই ঘটনা স্মরণ করেই রাণু 'ভানুসিংহ ঠাকুর : কিছু তথ্য'-শীর্ষক স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'তাঁর কোনো পরিচিত লোক যদি কাজের তাড়ায় অভিনয়ের মাঝখানে উঠে যেতেন দর্শকের আসন ছেড়ে, নিদারুণ ভর্ৎসনা জুটত তাঁর ভাগ্যেও। বিয়ের পর স্বামীর কাজের তাড়ায় উঠতে গিয়ে এ-ভর্ৎসনা ভোগ করতে হয়েছে

আমাকেও।' ('রবীন্দ্রবীক্ষা', ৩২শ সংকলন, পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৬৬)

৩ সূর্যপাল সিং (? - ১২ জুন ১৯৭১), রবীন্দ্রভক্ত অযোধ্যার তালুকদার, বিশ্বভারতীর জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন।

পত্র ২০৭।

১ এই সময়ে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের জন্য রাণু একটি শীততাপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বা এয়ার-কন্ডিশনার উপহার দিয়েছিলেন।

পত্র ২০৮।

১ পত্রটির উপলক্ষ জানা যায় না। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সেবার জন্য তাঁর যে-সব ভক্ত অনুচর জোড়াসাঁকোয় ছিলেন, রাণু তাঁদের ভোজে নিমন্ত্রণ করেন।

২ রাণুর কনিষ্ঠা কন্যা নীতা।

ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

১ ফণিভূষণ কলকাতায় চিকিৎসা ও মাসাধিককাল শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম নিয়ে সপরিবারে ১০ জুলাই ১৯১৮ কাশীর পথে রওনা হন। রাণু ১০ ও ১১ জুলাই রেলপথে ভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে কাশী পৌঁছনোর সংবাদ জানান। দ্র. রাণুর পত্র ১৪।

২ পশুপতি সম্ভবত কাশীর কোনো সংগীতশিক্ষক।

পত্র ২।

১ দক্ষিণভারত ভ্রমণের সময়ে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার যে-আক্রমণে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, কাশীতে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে সেই দুর্বলতা অনেক বেড়ে যায়। সেই কারণেই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি প্রথমে শান্তিনিকেতনে ও পরে কলকাতাতেই ছিলেন, হাওয়া বদলের জন্যে কোনো শীতপ্রধান অঞ্চলে যান নি। অবশ্য এই সময়ে প্রতিমা দেবীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রথীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে শিলং পাহাড়ে ছিলেন।

পত্র ৩।

১ বিহারীলাল গুপ্ত (১৮৪৮-১৯১৬) ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি যখন কটকে ডিস্ট্রিক্ট জজের কাজ করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর কন্যা ললিতা, স্নেহলতা (লটি) ও চারুলতা (সিরিন) রবীন্দ্রনাথেরও খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন। কুমুদনাথ সেনের সঙ্গে ১৮৮৯ সালে যখন স্নেহলতার (১৮৭৪-১৯৬৭) বিবাহ হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'সুখে থাকো আর সুখী করো সবে' গানটি লিখে দেন। স্নেহলতা বিদুষী ছিলেন, ইংরেজি ভাষায় তিনি কয়েকটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৭ সালে স্বামীর অকালমৃত্যুর পরে তিনি কলকাতার লন্ডন মিশন কলেজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি তাঁর পুত্রকন্যাদের অনেককেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। শেষে তিনি যখন নিজেই বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিতে চাইলেন, ২৩ আশ্বিন ১৩২৮ (৯ অক্টোবর ১৯২১)-

এর পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন।

২ ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত একজন শিক্ষিতা মহিলার সন্ধান দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ফণিভূষণকে অনুরোধ করেছিলেন। ফণিভূষণ সন্ধান দিয়েছিলেন, কিন্তু স্নেহলতাকে এই কাজে পেয়ে তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

৩ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি ২৩ কার্তিক ১৩২৮ (৯ নভেম্বর ১৯২১) শান্তিনিকেতনে এসে কর্মভার গ্রহণ করেন।

৪ ফণিভূষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা আশা সংস্কৃতের ছাত্রী ছিলেন, এই সময়ে তিনি বি. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

পত্র ৪।

১ দ্র. রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯৪, টীকা ১।

২ দ্র. উক্ত পত্র ৯৫, টীকা ২। রবীন্দ্রনাথের নেপাল যাওয়া হয় নি।

৩ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র ৫।

১ উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।

২ অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), লখ্নৌ-প্রবাসী ব্যারিস্টার, কবি ও গীতিকার।

৩ দ্র. রাণুকে লেখা পত্র ৯৯, টীকা ১।

৪ অগাস্ট ১৯২২-এ 'লিপিকা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচনাগুলি ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৬।

১ দ্র. রাণুকে লেখা পত্র ১০৭।

২ দ্র. উক্ত পত্র ১০৬, টীকা ১০।

৩ প্রাচ্যবিদ্ Moriz Winternitz, দ্র. উক্ত পত্র ১১৮, টীকা ২।

৪ বিশ্বভারতীর পার্শি অধ্যাপক হিডজিভাই পেস্তনজি মরিস, দ্র. উক্ত পত্র ১২৪, টীকা ৪।

পত্র ৭।

১ দেরাদুনে যাওয়া হয় নি, পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে নিয়ে সপরিবারে এপ্রিলের শেষে শিলঙে গিয়ে প্রায় দু'মাস সেখানে অবস্থান করেন।

২ ফণিভূষণের শ্যালক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

পত্র ৮। পত্রাংশটি শ্রীসমর ভৌমিকের 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' (১৪০৪) গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত। মূল পত্র দেখার সুযোগ পাওয়া যায় নি। ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬-সংখ্যক পত্রাংশগুলিও উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১ রাণুর একাধিক প্রণয়প্রার্থী যে-গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলেন, সেই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফণিভূষণ রাণুর বিবাহ দিতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মত জিজ্ঞাসা করেন।

২ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজপরিবারের সুহৃদচন্দ্র সিংহ।

পত্র ৯।

১ দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ শেষে ইটালি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তারিখে বোম্বাই পৌঁছন।

২ এই তারিখে ইটালি যাত্রা সম্ভব হয় নি, ১৫ মে ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ইটালি রওনা হন।

৩ ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি বোম্বাই থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে রওনা হন।

৪ এই নিষেধ সত্ত্বেও রাণু ও আশা কাশী থেকে মোগলসরাই স্টেশনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন, দ্র. পত্র ১০।

পত্র ১০।

১ রবীন্দ্রনাথ ২৬ চৈত্র ১৩৩১ (৯ এপ্রিল ১৯২৫) তারিখে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন, হিসাবের খাতার এই তথ্য থেকে পত্রটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ১২।

১ জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে রাণুর বিবাহ হয় নি; বালিগঞ্জে একটি বড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাহটি হয়। অবশ্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ২৩ অগাস্ট ১৯২৫ তাঁর 'রোজনামচা বা দৈনিক লিপি'তে লিখেছেন: 'রাণুর বিয়েতে নিমন্ত্রিত, অতিথি, সহকারী, কর্মকর্তা, সবই বলতে গেলে জোড়াসাঁকো। সুবীর ক'দিনই দৌড়োদৌড়ি ক'রে খুব খেটেছে; পরিবেশন করেছে, সাজিয়েছে, ইত্যাদি। ...সবিতা ও প্রতিমা পিঁড়ে-আলপনা থেকে

ক'নে সাজানো প্রভৃতি সবই করেছে; ...বিয়ের আগে পরে আমাদের মেয়েরাই গান করলে।' ('স্মৃতিসম্পুট', ২য় খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ. ২২-২৩)

পত্র ১৩।

১ আশা অধিকারী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেখানেই তাঁর কর্মসংস্থান হয়।

পত্র ১৪।

১ রাণুর স্বামী বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২ ফণিভূষণের একমাত্র পুত্র অশোক অধিকারী।

পত্র ১৬।

১ য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ তারিখে।

২ এই সময়ে আশা বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী ভক্তিও বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হন। ভ্রাতা অশোক তখন শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করছিলেন।

পত্র ১৭।

১ বিশিষ্ট শিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯২-১৯৭০), বিশ্বভারতীর বহুবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২ রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা, অকালপ্রয়াতা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী (১৯০৩-৩৫)।

৩ সুরেন্দ্রনাথ ও রমা (নুটু) পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাতে সানন্দ সম্মতি দেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কায়স্থ ও নুটু বৈদ্য বলে তাঁর মা যুগলমোহিনী বিবাহের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আপত্তি করলে ২১ বৈশাখ ১৩৩৮ রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন: 'একটা সামাজিক সঙ্কটে তোমার শরণাপন্ন হলুম। ইতিহাসটি এই:— সুরেন এবং নুটু কোনো এক গ্রহচক্রে পরস্পরকে পছন্দ করেচে। নুটু বৈদ্য ঘরের মেয়ে সুরেন কায়স্থ ঘরের ছেলে। নুটুর মা হিন্দুসমাজের সনাতন বিধিবিধানে অবিচলিত নিষ্ঠাবতী। তাঁর মন শান্ত করবার জন্য

প্রমথনাথ তর্কভূষণ মশায়ের কাছ থেকে এক পত্রী সংগ্রহ করেচি। তিনি বলেচেন এরকম বিবাহ শাস্ত্রমতে এবং লোকাচারমতে বৈধ। এখন ঠেকেচে পুরোহিত নিয়ে। যদি সুরেন হিন্দুসমাজ থেকে তিরস্কৃত হবার মতো কোনো অপরাধ না করে থাকেন তাঁকে সে দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য হবে। যদি তোমরা আনুকূল্য না করো তবে অগত্যা অশাস্ত্রীয়ভাবে কার্য্যসমাধা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু হিন্দুসমাজে এমন করে ছিদ্র খনন করলে সমাজ কতদিন টিকবে? ...তুমি স্বয়ং যদি বন্ধুর প্রতি অনুকম্পা করে এই কাজটি সম্পন্ন করে দাও তো সব চেয়ে ভালো হয়। যদি কোনো অনিবার্য্য বিঘ্ন থাকে তবে তোমার কোনো সুহৃদকে এই কাজে নিয়োগ করে দিয়ো।' সুনীতিকুমার এই পত্রের কি উত্তর দিয়েছিলেন, জানা নেই— রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় পুরোহিতের কাজ করেন। আশ্রমে মূর্তি বা প্রতীক পূজা নিষিদ্ধ বলে আশ্রম-সীমানার বাইরে একটি খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়িতে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে বিবাহ দেওয়া হয়।

৪ দ্র. রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৮৬, টীকা ২।

পত্র ১৮। পত্রটি মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (পৃ. ১০৮-০৯) মুদ্রিত হয়।

১ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬), বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব।

পত্র ১৯। পত্রটি মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (পৃ. ১০৯-১০) মুদ্রিত হয়।

১ Dr. Albert Schweitzer-রচিত *Indian Thought and Its Development* গ্রন্থটির সমালোচনা করে ফণিভূষণ যে প্রবন্ধ লেখেন, সেটি *The Visva-Bharati Quarterly*-র Nov-Jan 1936-37 (pp. 81-90) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

২ রবীন্দ্রনাথ পরের দিন ৮ অক্টোবরেই কলকাতায় যান। ১০ ও ১১ অক্টোবর ১৯৩৬ আশুতোষ কলেজ হলে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা 'পরিশোধ' অভিনয় করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বার্ধে ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যাদি

পরিবেশন করেন, রবীন্দ্রনাথও চারটি কবিতা পাঠ করেছিলেন।

পত্র ২০।

১ ফণিভূষণ দ্বিধা করেন নি, July 1938-সংখ্যা *The Visva-Bharati News*-এ জানানো হয়: 'Phanibhusan Adhikari, M. A., till recently the Head of the Department of Indian Philosophy, Benares Hindu University, has joined our Vidya-Bhavana as Adhyapaka of Indian Philosophy.'

সরযূবালা অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

১ এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনীত হয় ২৫, ২৭ ২৮ অগাস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখগুলিতে। প্রথম দিন অসুস্থতার জন্য রাণু অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন নি; মঞ্জুশ্রী ঠাকুর অভিনয় করেন—পরবর্তী তিনটি অভিনয়ে রাণু উক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

২ রবীন্দ্রনাথ ১৬ ভাদ্র ১৩৩০ (২ সেপ্টেম্বর) কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন।

পত্র ২।

১ উক্ত অভিনয় উপলক্ষে রাণু যখন অনেকদিন জোড়াসাঁকোয় ছিলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্যে ও খোলামেলা ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবক তাঁর প্রণয়প্রার্থী হন। রাণুও তাঁদের কাউকে-কাউকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দেন। সকলের কথা জানা নেই, কিন্তু পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্র পূর্ণেন্দুনাথ (ডাক নাম বুড়ো) ও রাণুর মধ্যে বেশ-কিছু চিঠিপত্র আদানপ্রদান হতে থাকে। কেউ-কেউ কাশীতে বা শান্তিনিকেতনে গিয়ে রাণুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবারও চেষ্টা করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে এইসব প্রণয়প্রার্থীদের কৌতুকের দৃষ্টিতেই দেখছিলেন, কিছুটা তাঁদের নিয়ে মজাও করেছেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমেই বাড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছে দেখে তিনি তাঁর প্রযত্নে রাণুকে পাঠানো ও পূর্ণেন্দুকে পাঠানো রাণুর লেখা কয়েকটি চিঠি খুলে পড়েন এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুরের বাসায় থাকার সময়ে পূর্ণেন্দুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনা করেন। পূর্ণেন্দুনাথ রাণুকে বিয়ে করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন, কারণ সগোত্রে বিবাহ তাঁর পিতা প্রফুল্লনাথ কিছুতেই মেনে নেবেন না। পূর্ণেন্দুনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো গুরুজন-স্থানীয় আত্মীয়ও ছিলেন, তিনি ভরসা দেন প্রফুল্লনাথকে রাজি করানো কঠিন হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্বাস মেনে নিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা পূর্ণেন্দুর চারখানি ইংরেজি চিঠি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে, যাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের অমর্যাদাকর উক্তিসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করে চিঠিগুলি

ফেরৎ চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো চিঠিরই উত্তর দেন নি, রথীন্দ্রনাথের একটি চিঠির খসড়া থেকে জানা যায়, অসুস্থ পিতাকে বিব্রত না করার জন্য তিনি চিঠিগুলি তাঁকে দেখান নি। অতঃপর তিনি পূর্ণেন্দুর লেখা চিঠিগুলির প্রতিলিপি তাঁর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'তোমার পত্র ও তৎসহ প্রেরিত বুড়োর তিনখানি পত্র পাইয়াছি। বুড়োর পত্র কয়খানি পড়িয়া আমি বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি এবং বুড়োকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছি।' এই চিঠিগুলি সবই ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে লেখা, তখন রাণুর বিবাহ স্থির হয়ে যাওয়ার মুখে। সম্ভবত এই সময়েই রথীন্দ্রনাথকে সরযূবালা লেখেন:

'গুরুদেব রাণুর নামে যে চিঠিখানা তাঁর কেয়ারে এসেছিল আমায় পাঠিয়েছেন সেটা পড়ে কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো আবশ্যক বলে মনে করলুম। তারা রাণুকে অনেক রকম ভয় দেখিয়ে শেষে লিখেছে বিরেনের [য] সঙ্গে যাতে তার বিবাহ না হয় সে জন্য তারা এমন অনেক ভীষণ ২ চিঠি আবার লিখ্ছে বিরেন ও রাজেন্দ্রবাবুকে যা থেকে তার ভানুদাদা তাকে কিছুতে বাঁচাতে পারবেন না। বসুমতীর সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে তারা গুরুদেবের সমন্ধে [য] এমন এক চিঠি দিয়ে এসেছে যা পেয়ে সে খুব খুসী হয়েছে এবং সময়ে সেটা কাজে লাগাবে বলেছে।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি বুড়ো এবং কিরণ বাবু [এঁর পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি] মিলে লিখেছে এবং আগাগোড়া সমস্ত চিঠিই এদের লেখা। আমার বোধ হয় প্রসাদ দাস বাবুকে [এঁর পরিচয়ও উদ্ধার করা যায় নি] এ বিষয় জানান উচিত যাতে উনি এর কোন বিহিত করতে পারেন। কিরণ ও বুড়োকে শাসন করা তাঁর নিতান্ত কর্ত্তব্য।

'গুরুদেব এই অসুস্থ শরীরে আমাদের জন্য এত কষ্ট পাচ্ছেন এই দুঃখই আমাদের সব চেয়ে বড় দুঃখ। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য যদি শীঘ্র য়ুরোপ যাওয়া আপনি উচিত জ্ঞান করেন ত সেই ব্যবস্থাই করবেন আমাদের জন্য ভাববেন না তাঁর মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। তাঁর জীবনের চেয়ে আমাদের কাছে আর কিছু বেশী নয়।...'

২ সুহৃদচন্দ্র সিংহ।

৩ পত্রের তারিখ ৩০ ফাল্গুন ১৩৩০ বৃহস্পতিবার ছিল, সেইজন্য মনে হয় চিঠিটি শনিবার ২ চৈত্র তারিখে লেখা।

পত্র ৩।

১ বীরেন্দ্রনাথের মাতা লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়। তাঁকে লেখা চিঠিটি এই পত্রের পরেই মুদ্রিত হয়েছে।

২ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পত্র ৪।

১ দ্র. সরযূবালাকে লেখা পত্র ২, টীকা ১।

পত্র ৫।

১ দ্র. ফণিভূষণ অধিকারীকে লেখা পত্র ১০।

লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

১ দ্র. পত্র ২, টীকা ১-এ উদ্ধৃত রথীন্দ্রনাথকে লিখিত সরযূবালার পত্র।

২ দ্র. ফণিভূষণ অধিকারীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১০-সংখ্যক পত্র।

৩ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৮৯৬-১৯০৭)।

৪ এঁরা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন বলে জানা যায় না।

আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

পত্রটি 'রাশিয়ার শিক্ষাবিধি' নামে চৈত্র ১৩৩৭-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে মুদ্রিত ও পরে 'রাশিয়ার চিঠি' (২৫ বৈশাখ ১৩৩৮) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে মূল পত্র অবলম্বনে মুদ্রিত হল। পাঠকেরা দুটি পাঠ মিলিয়ে দেখলে সম্বোধন ও স্বাক্ষর ছাড়াও কিছু পার্থক্য দেখতে পাবেন।

১ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

২ *The Visva-Bharati Quarterly,* কিন্তু এই চিঠি লেখার সময়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত না। প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ সেই সময়ে কোনো

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। ডাঃ শশধর সিংহ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, কিন্তু ১৯৬০ সালের আগে সেটি ছাপা হয় নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, '১৯৩৬-৩৭ সালে আমেরিকার Unity নামক পত্রিকায় বসন্ত রায়-কর্তৃক রাশিয়ার চিঠি Russian Impressions নামে প্রকাশিত হয়।' (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য়, ১৩৯৭, পৃ. ৪২২)

৩ এই অংশটি স্বাভাবিকভাবেই উল্লিখিত পত্রিকায় ও গ্রন্থে ছাপা হয় নি।

পত্র ২। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ আশা ও আরিয়ামের বিবাহ হয় ১ বৈশাখ ১৩৪০ (১৪ এপ্রিল ১৯৩৩) তারিখে। এর কিছুকাল পরে উভয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে মাদ্রাজের আডিয়ারে অ্যানি বেসান্টের ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটিতে যোগ দেন। পত্রটির রচনাকাল নির্ণয় করা শক্ত। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ হতে পারে। অক্টোবর ১৯৩৪-এ আডিয়ারে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশা, আরিয়াম্ ও তাঁদের প্রথমা কন্যাকে (উষণা) দেখে এসেছিলেন।

পত্র ৩। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ আশার যে-চিঠিটির উত্তরে এই পত্রটি লিখিত, সেটি পাওয়া না যাওয়ায় প্রসঙ্গটি বোঝা যায় না।

২ গ্রীষ্মের সময়টি কাটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙে আসেন ২৫ এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখে। মৈত্রেয়ী দেবীর আহ্বানে তিনি ২১ মে মংপুতে আসেন। পত্রটি সেখান থেকে লেখা।

পত্র ৪। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ আরিয়াম ১৭ নভেম্বর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে জানান, তাঁর কন্যা উষণা কানের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ২৪ নভেম্বর পত্রে তাঁর আরোগ্য কামনা করেন। সম্ভবত এই রোগেই মেয়েটির জীবনাবসান হয়। পত্রটি সেই শোকসংবাদ পেয়ে লেখা।

ভক্তি অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

১ ২ মার্চ ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কিছুদিন পরে ভক্তি অধিকারী বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগের কাজে যোগ দেন।

২ ভক্তির দিদি রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংকলন 'ভানু-সিংহের পত্রাবলী' চৈত্র ১৩৩৬-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ২। পত্রটি মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (পৃ. ১১০) মুদ্রিত হয়েছিল।

১ বিদেশ ভ্রমণের পরে ১৯ মাঘ ১৩৩৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১) তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পরিশিষ্ট ১

রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-র পত্র

পত্র ১।

১ রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি পাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ৩ ভাদ্র ১৩২৪ তারিখে এর উত্তর দেন, সেইজন্য রাণুর পত্রের রচনাকাল শ্রাবণ ১৩২৪ (জুলাই ১৯১৭) অনুমান করা হয়েছে।

২ গল্পটি আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-কর্তৃক প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছ' ৫ম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১ (৩ ভাদ্র ১৩২৪)

২ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯ শ্রাবণ (৪ অগাস্ট ১৯১৭) রামমোহন লাইব্রেরিতে ও ১০ অগাস্ট অ্যালফ্রেড থিয়েটারে পাঠ করেন; ভাদ্র ১৩২৪-সংখ্যা 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'-তে মুদ্রিত হয়।

পত্র ৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২ (২১ ভাদ্র ১৩২৪)।

২ অ্যানি বেসান্ট-প্রতিষ্ঠিত Central Hindu Collegiate Girls' School।

পত্র ৪।

১ সোমবার (২৯ আশ্বিন ১৩২৪ : ১৫ অক্টোবর ১৯১৭) ছিল মহালয়া, এইদিন থেকে রাণুর স্কুলে পুজোর ছুটি শুরু হয়, এই তথ্য থেকে পত্রের তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

২ Annie Besant (1847-1933), মাদাম ব্লাভাটস্কির (১৮৩১-৯১) প্রভাবে থিয়োসফিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভারতে আসেন ও এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হন। মাদ্রাজের আডিয়ারে তিনি ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার চান্সেলার।

৩ B. P. Wadia, অ্যানি বেসান্টের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ও অল-ইন্ডিয়া হোমরুল লীগের সহযোগী।

৪ George S. Arundale (1878-1945), ইনিও অ্যানি বেসান্টের সহযোগী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হন। বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষতাও করেন।

পত্র ৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪ (৬ কার্তিক ১৩২৪)

২ রবীন্দ্রনাথ ৫-সংখ্যক পত্রে (২ অগ্রহায়ণ ১৩২৪) তাঁর কাজের ২৭ দফা ফর্দ দিয়েছেন।

৩ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃত ও সংগীত শিক্ষা দিতেন।

পত্র ৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫।

২ গ্রন্থটির নাম 'গল্পসপ্তক' (১৩২৩), 'সবুজ পত্র'-তে মুদ্রিত সাতটি গল্পের সংকলন : 'হালদার-গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি' এবং 'অপরিচিতা'।

পত্র ৭।

১ এমন কোনো সংবাদ আমাদের জানা নেই। পত্রটির সঠিক রচনাকাল অনুমান করা শক্ত।

পত্র ৮।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬ (৮ ফাল্গুন ১৩২৪)।

পত্র ৯।

১ দোলপূর্ণিমা ছিল ১৩ চৈত্র ১৩২৪ (২৭ মার্চ ১৯১৮), উত্তর ভারতে হোলি হয় তার পরের দিন, এই হিসাবে পত্রটির তারিখ অনুমিত হয়েছে।

২ 'তোতাকাহিনী' মাঘ ১৩২৪-সংখ্যা 'সবুজ পত্র'-তে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৭ (২ বৈশাখ ১৩২৫)।

পত্র ১১।

১ রবিবার ছিল ২৯ বৈশাখ ১৩২৫ (১২ মে ১৯১৮)।

২ কন্যার অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবার রাণুদের ভবানীপুরের বাসায় যেতে পারেন নি, ফণিভূষণ রাণুকে নিয়ে পরদিন ১৫ মে সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় আসেন। রথীন্দ্রনাথ এইদিন ডায়ারিতে লেখেন: 'Ranu, the little girl of eleven, with whom father has had such an interesting correspondence, came this evening with her family. She is such a bright girl. But she felt shy before such a company here. She asked father to go to see her tomorrow or the day after.' রবীন্দ্রনাথ পরের দিনই রাণুদের বাসায় যান।

পত্র ১২।

১ মাধুরীলতার অকালমৃত্যুতে ও আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোয় হিন্দু-ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যায়ভাবে তাঁর নাম যুক্ত করায় রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন, স্থান পরিবর্তনে তার উপশম হতে পারে ভেবে রথীন্দ্রনাথ তাঁকে দার্জিলিং জেলার তিনধরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন— কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করে তিনি ২৮ মে শান্তিনিকেতনে চলে যান। তাঁরই আমন্ত্রণে ফণিভূষণ সপরিবারে সেখানে যান ৪ জুন (২১ জ্যৈষ্ঠ) তারিখে।

পত্র ১৩।

১ আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটি থাকলেও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তাঁকে ঘিরে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেহলি বাড়ির ছাদে কবিতাপাঠ ইত্যাদি সভা জমে উঠত। রাণু এইরকমই একটি সভার কথা লিখেছেন।

২ শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে রাণু রবীন্দ্রনাথের চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা করতেন। পরবর্তী বহু পত্রে প্রসঙ্গটি আছে।

পত্র ১৪।

১ মাসাধিককাল শান্তিনিকেতনে থেকে ফণিভূষণ ২৬ আষাঢ় ১৩২৫ (১০ জুলাই ১৯১৮) দুপুরের ট্রেনে সপরিবারে কাশীর উদ্দেশে রওনা হন। রবীন্দ্রনাথ স্টেশনে গিয়ে তাঁদের বিদায় জানান। রাণু ট্রেনে বসে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে পরদিন সকালে চিঠিটি মোগলসরাই স্টেশনে ডাকে দেন।

পত্র ১৫।

১ দ্র. রাণুর ১৩-সংখ্যক পত্র।

২ রাণুদের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অনেকগুলি চিঠিতে এঁর উল্লেখ আছে।

৩ রাণুর অবাঙালি বান্ধবী লীলাবতী. ইনি ১৯২২ সালে পৌষ-মেলায় শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন, তাঁর ভালো লাগে নি, দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১০ ও ১১১।

৪ পুজোর ছুটিতে রাণুর আবার শান্তিনিকেতনে আসার কথা ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

৫ রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে রাণু তাঁর দেখাদেখি 'বৌমা' বলেই সম্বোধন করতেন, অন্যদেরও তিনি নাম ধরেই সম্বোধন করতেন, নিজের দিদিদেরও। প্রতিমা দেবীকে লেখা রাণুর একটিমাত্র চিঠি রক্ষিত হয়েছে, সেটি এখানে উদ্ধৃত হল:

প্রিয় বৌমা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনি আমায় বেশ্ বড় চিঠি দিয়েছেন। এবার আমায় শান্তির চাইতে বড় চিঠি দেবেন। আর খামে আমার নাম লিখ্বেন। আপনারা বুঝি এখনো শান্তিনিকেতনে আছেন? বেশ্ মজা লালী [য] জামা আপনি কি শেলাই করেন? জামাটা ননীবালাকে কর্তে দেবেন না।। নিজে খুব সুন্দর করে কর্বেন। যেদিন আমি আস্ব সে দিন আপনি চুল আঁচড়ে পাউডার মাখিয়ে খুব সুন্দর সাজিয়ে দেবেন যাতে আগের মতনই দেখায়। আর আপনি শিগ্গির ফুলকাটা রঙীন কাগজ খুব বড় ২ কিনে দেবেন। আপনি আজকাল আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে কেন যান্। আপনি রবিবাবু আর রথীবাবু বুঝি বেড়াতে যান। আপনি চিঠিতেও কেন রথীবাবুকে উনি লিখেছেন? আপনি কি আজকালও ছেলেদের ড্রয়িং

শেখান। আমি আজকাল আপনার মতন ছবি আঁকি আর পেন্ট করি। এবার হারিয়ে গেছিটা ছাপাতে দেবেন। ভারতবর্ষতে দেবেন না। আমাদের ভারতী প্রবাসী নতুন এসেছে। আমার সব পড়া হয়ে গেছে। আপনার হয়েছে? কাশীতে আজকাল খুব গরম কিন্তু এখন মেঘলা। এ মেঘেতে বিষ্টি হয়না। আমাদের আজকাল morning ইস্কুল তাই অনেক পড়তে হয়। আপনার ছবি আর রবিবাবুর ছবি আর উনির ছবি রেখে দিয়েছি। আপনি যে লিখেছিলেন আজকাল রবিবাবু কিচ্ছু খাননা তাই আমি ওঁকে একটা বকে চিঠি দিয়েছি। আজকালও বুঝি দুষ্টুমি করেন। আপনি কি কোনও নতুন ছবি এঁকেছেন? ওখানে একটা বাজ পড়েছিল না? আজকাল ওখানে কি বিষ্টি হয়? আর শুনুন আপনি এন্ড্রুজ্ সাহেবকে রবিবাবুকে ঘরে বাইরে করাচ্চেন দেখলেই খাতা কেড়ে নেবেন। আপনার জন্যে মন কেমন করে।

রাণু॥

৬ রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুবাদ করছিলেন ও অ্যান্ড্রুজ তা লিখে নিতেন। রাণুর ধারণা হয়েছিল, অ্যান্ড্রুজ তাঁকে এইভাবে কষ্ট দিতেন।

৭ এই চিঠিতেই রাণু রবীন্দ্রনাথের বয়স সাতাশ বছরে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

৮ রাণুর পুতুলদের নাম।

পত্র ১৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩ (৩১ আষাঢ় ১৩২৫)।

পত্র ১৭।

পত্রটি অত্যন্ত জীর্ণ, সেই কারণে অনেক অংশ পড়া যায় নি, সেই অংশগুলি তিনটি বিন্দু চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে; অনুমিত অংশগুলি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯ (৩০ আষাঢ় ১৩২৫)।

পত্র ১৮।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯ (৩০ আষাঢ় ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৮ (২৬ আষাঢ় ১৩২৫)।

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ (১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ১৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১০ (৩১ আষাঢ় ১৩২৫)।

পত্র ২০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ (১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২১।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১২ (৫ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩ (৭ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪ (৯ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ 'ছিন্ন পত্র' (কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী') কবিতাটি 'প্রবাসী'-তে নয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫-সংখ্যা 'সবুজ পত্র'-তে মুদ্রিত হয়, দ্র. 'পলাতকা'।

পত্র ২৪।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩ (৭ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪ (৯ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ (১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৭ (১৫ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৮ (১৮ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৭।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৯ (২১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৮।

চিঠিটির মাত্র শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে।

১ রাণু এখানে 'সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে'

গানটির কথা উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গানটি শুনেছিলেন—*সেক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, গানটি অন্তত ২৬ আষাঢ় ১৩২৫-এর আগে লেখা। গানটি 'গীতপঞ্চাশিকা' (আশ্বিন ১৩২৫) গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়।

পত্র ২৯।

১ রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গটি নিয়ে লেখেন তাঁর ২০ ভাদ্র ১৩২৫ তারিখের পত্রে (২৮-সংখ্যক)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২১ (২৪ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ৩০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২২ (২৭ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ এই ফুলের কথা আছে রবীন্দ্রনাথের ২৬-সংখ্যক (১১ ভাদ্র ১৩২৫) পত্রে।

পত্র ৩১।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৩ (? ২৯ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ৩২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৪ (১ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৩।

১ জন্মাষ্টমীর তারিখ ছিল ১২ ভাদ্র ১৩২৫ (২৯ অগাস্ট ১৯১৮)। এই তথ্য থেকে পত্রটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ৩৪।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৭ (১৬ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৭ (১৬ ভাদ্র ১৩২৫)।

২ 'ক্ষণিকা' কাব্যের অন্তর্গত 'ভীরুতা' কবিতা ('গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে')।

পত্র ৩৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮ (২০ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৭।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮ (২০ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৮।

১ ৭ আশ্বিন ১৩২৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮) মঙ্গলবারে রাণুরা মুক্তেশ্বরে যান।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩১ (৪ আশ্বিন পূর্ণিমা ১৩২৫)।

পত্র ৩৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩২ (৬ আশ্বিন ১৩২৫)। রাণু এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম 'ভানুদাদা' সম্বোধন করেছেন।

২ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (১৩০৩), বড়ো আকারের বই বলে এটি টালি-সংস্করণ নামে অভিহিত হয়।

৩ বিজয়া (২৮ আশ্বিন ১৩২৫ : ১৫ অক্টোবর ১৯১৮) রাণুরা মুক্তেশ্বর ত্যাগ করে কাশী রওনা হন।

পত্র ৪০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮ (২০ ভাদ্র ১৩২৫)।

২ সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি'-তে লিখেছেন, পুজোর ছুটির আগের দিন ১৬ আশ্বিন ১৩২৫ : ৩ অক্টোবর ১৯১৮ 'শারদোৎসব অভিনয় করার কথা ছিল কিন্তু দিনুবাবুর জ্বর হওয়ায় তাহা পণ্ড হইল, তাহার পরিবর্তে ছোট একটি সংস্কৃত নাটক এবং শারদোৎসবের ইংরেজি অনুবাদটি অভিনীত হইল।'

পত্র ৪১।

১ ৩৫-সংখ্যক পত্রে (২২ আশ্বিন ১৩২৫) রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দিয়েছেন।

পত্র ৪২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩৪ (১৬ আশ্বিন ১৩২৫)।

পত্র ৪৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩৬ (৩ কার্তিক ১৩২৫)। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ পিঠাপুরম যাওয়ার পথে এঞ্জিন বিভ্রাটের কাহিনী সরস করে বর্ণনা করেছিলেন।

পত্র ৪৪।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩৮ (১৯ কার্তিক ১৩২৫)।

২ ১৭ কার্তিক ১৩২৫ (৩ নভেম্বর ১৯১৮) কার্তিকী অমাবস্যা বা কালীপূজা ছিল। এইদিন রাণু বারো বৎসর পূর্ণ করেন। কিন্তু তাঁর চিঠিতে কোনো তারিখ না থাকায় রবীন্দ্রনাথ ৩৯-সংখ্যক পত্রে (২২ কার্তিক ১৩২৫) লেখেন, 'কবে তোমার জন্মদিন তোমার চিঠির মধ্যে তার তারিখের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।'

৩ দ্র. রাণুর পত্র ২৮।

পত্র ৪৫।

১ রবীন্দ্রনাথের পত্রে এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ না থাকাতে রাণুর এই চিঠিটির রচনাকাল নির্ণয় করা গেল না। 'পলাতকা' ১৩২৫ সালে (১৯১৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৪৬।

১ এই খবরে ঝগড়ার উপলক্ষ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ তারিখে (পত্র ৪৩) লেখেন, 'আমার গান শোন্‌বার জন্যে রাণুর বাবজা কাশী কলকাতা প্রভৃতি বহু দূর দেশ ঘুরে এই শান্তিনিকেতনে এলেন আর তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী রাণু এলেন না কেন?' রাণু ঝগড়া বাড়াবার সুযোগ তাঁকে দেন নি, কয়েকদিন পরেই তিনি স্কুল পালিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন।

২ কালীপুজো উপলক্ষে (১৭ কার্তিক) দীপাবলির আলো জ্বালানো হয়েছিল, এই সূত্র অবলম্বনে পত্রটির তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে।

পত্র ৪৭।

১ রাণু ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (২৮ নভেম্বর ১৯১৮) শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হয়ে পরের দিন কাশী পৌঁছন, পত্রের তারিখ এই সূত্রে অনুমান করা হয়েছে।

২ দ্র. রাণুর পত্র ১৫, টীকা ৩।

পত্র ৪৮।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪০ (২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪২ (৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫), টীকা ২।

পত্র ৪৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৫ (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫) ও রাণুর

পত্র ৫০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৫।

পত্র ৫১।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৬ [পৌষ ১৩২৫]।

পত্র ৫২।

১ রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দেন ১৯ পৌষ ১৩২৫ (পত্র ৪৭)।

পত্র ৫৩।

১ মদনাপল্লী থেকে 'শিবরাত্রি ১৩২৫' ১৬ ফাল্গুন ১৩২৫-এ লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র।

২ এই স্কলারশিপের টাকা সম্পর্কে শ্রাবণ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় লিখিত হয় : 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রীতিদেবী তাঁহার ছাত্রবৃত্তির ৩০ টাকা আমাদের আশ্রমে দান করিয়াছেন, সেই টাকা হইতে একটি ঘণ্টাপীঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঘণ্টার দোল-স্তম্ভটী সারনাথের প্রবেশদ্বারের আদর্শে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে।'

পত্র ৫৪।

১ কাশীর মহারাজের আমন্ত্রণে কাশীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে ২৫ চৈত্র ১৩২৫ (৮ এপ্রিল ১৯১৯) বোলপুরের উদ্দেশে রওনা হন। রাণু তাঁর পিতার সঙ্গে মোগলসরাই স্টেশনে এসে তাঁকে মেল ট্রেনে উঠিয়ে দেন। পত্রের তারিখটি এই সূত্রে অনুমিত।

২ দ্র. রাণুর পত্র ৫৩, টীকা ২।

পত্র ৫৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫০ (২৬ চৈত্র ১৩২৫)।

২ রবীন্দ্রনাথের ৫১-সংখ্যক পত্র (৩ বৈশাখ ১৩২৬) থেকে এই তারিখটি পাওয়া যায়।

পত্র ৫৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫২ (২৪ বৈশাখ ১৩২৬)।

২ স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রনাথের গানের বই 'বৈতালিক' চৈত্র ১৩২৫-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৫৭।

১ বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যায় মুদ্রিত কৃষ্ণদয়াল বসুর 'রেণু' কবিতা।

২ ১৯১২-১৩ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ড-আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন 'সঞ্চয়' ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৫৮।

১ কাশী থেকে শৈলশহর সোলনের উদ্দেশে রওনা হয়ে আলিগড় অভিমুখে যাওয়ার পথে লেখা রাণুর এই দীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্তের উত্তর পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের ৫৩-সংখ্যক পত্রে (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)।

২ স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রগীতির এই সংকলনটি বৈশাখ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৫৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫৪ (৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)।

পত্র ৬০।

১ দ্র. 'জীবনস্মৃতি', 'পিতৃদেব' অধ্যায়।

পত্র ৬১।

১ এইখানে রাণু উর্দু ও আরবি ভাষাতে কয়েকটি শব্দ লিখেছেন।

২ John Ruskin (1819-1900) ইংরেজ শিল্প সমালোচক।

৩ শব্দটি পড়া যায় নি।

৪ Lord Alfred Tennyson (1809-92), বিখ্যাত ইংরেজ কবি।

৫ *In Memoriam* (1850), প্রিয় বন্ধু Arthur Hallam-এর উদ্দেশে লিখিত স্মরণগাথা।

৬ 'Tears Idle Tears'।

৭ 'নববর্ষ' ভাষণটি বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ প্রকাশিত হওয়ার পরে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'প্রবাসী'-র 'কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৮ 'গান' শিরোনামে এই গানটি উক্ত দুটি পত্রিকার উল্লিখিত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রাণুর চিঠির ভাবে মনে হয়, তিনি গানটি তাঁর উদ্দেশে লেখা বলে মনে করেছেন। এইরকম কষ্টকল্পনা তিনি পরিণত বয়সে আরও কয়েকটি গানের ক্ষেত্রে করেছিলেন।

পত্র ৬২।

১ এই প্রসঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ১৪ আষাঢ় ১৩২৬-এর পত্রে (৫৭-সংখ্যক)।

২ আষাঢ় ১৩২৬-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে (পৃ. ২২১-৩৫) মুদ্রিত।

৩ উক্ত সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে অনেক কবিতা নয়, দুটি গান মুদ্রিত হয়েছিল— 'কাল-বৈশাখী' ('ঐ বুঝি কাল-বৈশাখী') ও 'গান' ('ঐ বুঝি মোর ভোরের পাখী')

পত্র ৬৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫৭ (১৪ আষাঢ় ১৩২৬)।

পত্র ৬৪।

১ বর্তমান চিঠিতে রাণু বরোগ বেড়াতে যাওয়ার যে 'বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত' লিখেছেন, সেটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছেন ২৬ আষাঢ় ১৩২৬-এর পত্রে (৫৮-সংখ্যক)।

পত্র ৬৫।

পত্রটি এল্‌ম্‌হার্স্ট প্রতিষ্ঠিত ডার্টিংটন হলের অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে। সেখান থেকে লন্ডনের শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত চিঠিটির একটি ফোটোকপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। পেরু যাওয়ার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন আর্জেণ্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরিসে অবস্থান করছেন, রাণুর পত্রটি সেই সময়ে লেখা। চিঠির শেষে, রবারস্ট্যাম্পে '23 DIC 1924' তারিখটি আছে— মনে হয়, এটি পত্রপ্রাপ্তির তারিখ। এল্‌ম্‌হার্স্ট এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ও সচিব ছিলেন। রাণুর সঙ্গে তাঁর হার্দ্য সম্পর্ক ছিল, হয়তো সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি তাঁকে উপহার দেন।

১ ১০ ডিসেম্বর ১৯২৪ পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী পালনের জন্য সেখানকার সরকার বিশ্বের বহু মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে

আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

২ সুধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ এই ধরনের উক্তি রবীন্দ্রনাথের কৌতুকের নিদর্শন, কিন্তু বালিকাস্বভাবা রাণু তাকে সত্য বলে ভুল করেছেন।

৪ পূর্ণেন্দুনাথ ঠাকুর।

৫ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০), সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র। সংগীতজ্ঞ গীতিকার, ভ্রমণবিলাসী সাহিত্যিক।

৬ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ব্রতীন্দ্রনাথ।

পত্র ৬৬।

১ *The Visva-Bharati News.*

২ উক্ত পত্রিকায় June 1937-সংখ্যায় সপরিজন রবীন্দ্রনাথের আলমোরা যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

৩ রাণুর পুত্র-কন্যা রমেন্দ্রনাথ ও গীতা।

পত্র ৬৭।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২০৭ (১৯ জুলাই ১৯৪০)।

২ পত্রের উপরে কেউ লিখে রাখেন : 'Regd. Bookpost পাঠানো হোলো 26/7/40'।

পত্র ৬৮।

১ ৭ অগাস্ট ১৯৪০ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি Sir Maurice Gwyer (1878-1952) রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি হয় শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে।

২ সম্ভবত অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্ট্স্-এর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত বইটি নীলাম করা হয়েছিল।

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথকে লেখা আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-র পত্র

পত্র ১।

এই পত্রের সঙ্গে রাণুর আঁকা দুটি রঙিন ছবি আছে, একটিতে লেখা 'চাঁদ বিবি— এই সেই ছবিটা', অপরটিতে কিছু লেখা নেই, জলের মধ্যে পদ্মফুলের উপর হাত ও পা-রাখা লক্ষ্মীর ছবি।

১ ২৭ আষাঢ় ১৩২৫ (১১ জুলাই ১৯১৮) ফণিভূষণ সপরিবারে কাশীতে ফিরে আসেন। তার পরের মঙ্গলবার ৩২ আষাঢ়— এই হিসাবে পত্রটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ২।

১ ২৫ ভাদ্র ১৩৪৪ (১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) তারিখে রবীন্দ্রনাথ ইরিসিপ্লাস রোগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়ে দুদিন সেই অবস্থায় ছিলেন।

অনিলকুমার চন্দকে লিখিত পত্র

১ এই অনুরোধের উত্তর চিঠির উপরে অন্যের হস্তাক্ষরে লেখা আছে: 'Replied (1) কিশোরকল্যাণ (2) নারী হিতব্রতিকা 2/12/36'।

২ অনিলকুমারের স্ত্রী রানী চন্দ (১৯১২-৯৭)।

সঞ্চয়িতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৫। যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৬। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মীরা চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৮। রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), ফণিভূষণ অধিকারী, সরযূবালা অধিকারী, যাদুমতি মুখোপাধ্যায়, আশা অধিকারী ও ভক্তি অধিকারীকে লিখিত।
চিঠিপত্র ১৯। সজনীকান্ত দাস, সুধারানী দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও উমারানী দাসকে লিখিত অটোগ্রাফ-কবিতা

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত, পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী। রাণু দেবীকে লিখিত

ঊনবিংশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VIS
389870 ✓
LIBRARY

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ॥ ঊনবিংশ খণ্ড

সজনীকান্ত দাস, সুধারানী দাসকে
লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও
উমারানী দাসকে লিখিত অটোগ্রাফ-কবিতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪১১

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীমতী সাগর মিত্র

© বিশ্বভারতী, ২০০৪

ISBN-81-7522-377-4 (V. 19)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক। অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

অক্ষর বিন্যাস। অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া
৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। কলকাতা ১২

মুদ্রক। অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া
৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। কলকাতা ১২

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত প্রসঙ্গ, বহুকাল অতিবাহিত হয়ে, আজও বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়।

ব্যঙ্গ-সুনিপুণ সমালোচক সম্পাদক হিসেবে সজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। শৈশব থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে জীবনের কোনো কাজই সম্পূর্ণ হত না সজনীকান্তের।

কিন্তু একসময় সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠী রবীন্দ্র-বিদূষণে শালীনতার সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করেছিলেন। এতে রবীন্দ্রনাথ মর্মান্তিক ভাবে আহত হন।

জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে অপরিসীম স্নেহবশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'রাবণ-ভক্ত'টির চিত্ত জয় করেছিলেন। জীবনের শেষ তিন বছর গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা অকৃত্রিম আন্তরিকতায় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

গুরু-শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উত্থান-পতনের ইতিহাস উন্মোচন করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহ পূর্বে দুটি গ্রন্থে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত দুই পক্ষের এই-সব চিঠিপত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণসহ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বইটি প্রকাশে রবীন্দ্র-অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং আগ্রহী পাঠকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' পর্যায়ভুক্ত বর্তমান খণ্ডটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন সজনীকান্ত দৌহিত্রী শ্রীমতী সাগর মিত্র। গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসুধেন্দু মণ্ডল ও কর্মীদের তৎপরতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

শান্তিনিকেতন
১৭ বৈশাখ ১৪১১

শ্রীসুজিতকুমার বসু
উপাচার্য। বিশ্বভারতী

বিষয়সূচী

সজনীকান্ত দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ১

সুধারানী দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫

উমারানী দাসকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ-কবিতা ৯

প্রসঙ্গ-কথা ১

- রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্রাবলী ৬৩
- রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত : পরিচয় ৯৪

পত্রধৃত প্রসঙ্গ

- সজনীকান্ত দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪১
- সুধারানী দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৮৪
- উমারানী দাসকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ-কবিতা ১৮৬

প্রসঙ্গ-কথা ২

- রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্র ১৮৯

সাময়িকপত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের সূচী :

- সজনীকান্ত দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ২০৩
- রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্র ২১২
- ‘আত্মস্মৃতি’তে উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্র যেগুলি সংগৃহীত হয় নি ২১৬

‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকা ২১৭
‘অলকা’য় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনার তালিকা ২২১
গ্রন্থসূচী ২২৩
সংকলয়িতার নিবেদন ২২৮

চিত্রসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

আলোকচিত্র

১. রবীন্দ্রনাথ প্রবেশক
২. রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত ও সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭
৩. সজনীকান্ত ৬৩
৪. রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭৬
৫. আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত ৯৪

পাণ্ডুলিপি চিত্র

১. "সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি"। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ৩০
২. "অবচেতনার অবদান সম্বন্ধে..."। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ৪১
৩. "আপনার সামান্য পাঁচ ছত্রের..."। সজনীকান্ত-লিখিত পত্র ৯১

সজনীকান্ত দাসকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

১
৪ মার্চ ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

গোরার কোন্ জায়গা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ[১] মনে পড়িতেছে না, বইখানিও হাতের কাছে নাই। যদি মধ্যাহ্ন কালের বর্ণনা হয় তবে ছায়ার দীর্ঘতা অসম্ভব বটে, যদি মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া থাকে তবে ছায়া দীর্ঘ হওয়ার বাধা নাই বিশেষত ঋতুবিশেষে।

তোমার কবিতাটি[২] পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
৯ মার্চ ১৯২৭

SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA

কল্যাণীয়েষু

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সর্‌চে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য[১] আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখ্‌তে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে

সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হ'তেও পারে। আলোচনা কর্তে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব[২] নিয়ে পড়তে হবে এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধূলো দিগ্‌দিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বল্‌বার বল্‌ব। ইতি ২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৩

শুভকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৪ নভেম্বর ১৯২৭

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহামহোপাধ্যায়ের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই— তাতে খুশি হই— কিন্তু তোমাদের 'শনিবারের চিঠি'র সমরাঙ্গণে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী[১] দেখলে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না— তারা অপরাধিনী হ'লেও। নারীদের প্রতি পুরুষস্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়— আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা, —কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক।

সিভিল, ক্রিমিন্যাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে "ছায়েবানুগতা", ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত ক'রে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তা হ'লে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়— মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো ব'লে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্ম্মিণীর সহধর্ম্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্ম্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা করে দেখো। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১৯ নভেম্বর ১৯২৭

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না।[১] নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তাহ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম— কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজ্‌ম দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি[২] সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে— কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টন্‌টনে হয়ে রয়েচে। যৌবনের

তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প বলেই সেই সঙ্কীর্ণ সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়– ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব না। অল্প কটা দিন আছে —শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হল সার্জিকাল ডিপার্টমেন্ট, আর আমার আরোগ্য-স্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫
১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

[6 Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta]

কল্যাণীয়েষু

আত্মশক্তিতে[১] কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ[২] প্রকাশ হয়েছিল সেটা তোমার লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করি নি। বাইরে থেকে চিঠি পাই। তার উত্তরে লিখি, যাঁদের আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করি তাঁরা আমার নিন্দাপ্রচারে আনন্দ বোধ করেন এত বার বার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি [য] যে ইহাতে আমি বিস্মিত হই না এবং একথা লইয়া আলোচনা করিতে আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নাই।

নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ-লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজে ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো এবং মোহিত মজুমদারের[৩] তাহা জানা আছে। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমাদের পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

মেঘনাদবধের সমালোচনা[৪] যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তাছাড়া তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম ও মহাত্মাজির সঙ্গে আমার যে দ্বন্দ্ব তাহা নৈতিক, তাহা কর্ত্তব্যের বিশেষ প্ররোচনায়। বঙ্কিমের কোনো গ্রন্থের সাহিত্যিক সমালোচনা যদি করিতাম তবে প্রধান ঝোঁক দিতাম তাঁহার গুণের উপর, ত্রুটির উপর নহে, কারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে। এইজন্যেই রাজসিংহের সমালোচনা করিয়াছিলাম।[৫]

এতকথা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তোমার কথা জানাইয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইল। ইতি ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শংসা পত্র

৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

Santiniketan, Feb. 13, 1928

I know Babu Sajanikanta Das and I can certify that he is an author whose mastery of Bengali language and knowledge of our literature is remarkable.

Rabindranath Tagore

৭
৪ মার্চ ১৯২৮

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপরে হিবর্ট লেকচার[১] এখনো লিখতে বসতে পারি নি ব'লে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে[২] তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে, যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্ম্মুখের মুখোষ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তা হ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই— চতুর্ম্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী

দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু [আয়ু] কতদিনের। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত এই পত্রের একটি নকল রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্ত দাসকে পাঠিয়েছিলেন।

৮
২৬ ডিসেম্বর ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মনে করেছিলুম তোমার খাতা থেকে আমার ছবিটাকে নির্বাসিত করব।[১] তুমি রক্ষা করতে অনুরোধ করচ, রইল ওটা।

সেদিন তোমার সঙ্গে যে কথার আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এইখানে বলে রাখি। তুমি বলেছিলে শনিবারের চিঠিতে যাঁরা আমার অবমাননা করেচেন তাঁরা আমার ভক্ত, কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা আমাকে আক্রমণ করে ক্ষোভ নিবৃত্তি করেচেন। কিছুকাল থেকেই এটা দেখেচি ব্যক্তিগত কারণ ঘটবার পূর্ব হতেই তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দ ভোগ করে এসেচেন। এটা দেখেচি যাঁরা কোনো দিন আমার লেখার কোনো গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে একছত্রও লেখেন নি তাঁরাই নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্র ভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেচেন। সকল লেখকের রচনাতেই

ভালোমন্দ দুইই থাকে কিন্তু ভালোটার সম্বন্ধে নীরব থেকে মন্দটাকেই দীর্ঘস্বরে ঘোষণা করার উৎসাহ শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়। মোটের উপর যাকে আমরা নিন্দার্হ বলে জানি তার সম্বন্ধেই এরকম আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এরকম ব্যবহারকে নিন্দা করা যায় না। কেন না সকলেই আমার রচনা বা চরিত্রকে প্রশংসনীয় বলে মনে করবে এরকম প্রত্যাশা করাও লজ্জার কথা। বাংলাদেশে আমার সম্বন্ধে এমন প্রত্যাশা করার হেতুই ঘটে নি। এঁরা কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন যে স্তাবকবৃন্দ আমাকে বেষ্টন করে সর্বদা যে স্তব-কোলাহল করে থাকেন তার দ্বারাই নিজের ত্রুটিবিচারে আমি অক্ষম। এঁরা নিজে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন না, যাঁরা থাকেন তাঁরা কী করেন সে সম্বন্ধে এঁদের অনভিজ্ঞ কল্পনা আমার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দেয়। কিছুকাল ধরে তুমি নিরন্তর আমার কাছে ছিলে, নিজের স্তব শোনবার আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস তোমার দ্বারা পরিতৃপ্ত করবার কোনো চেষ্টা করেচি কিনা তার সাক্ষ্য তুমিই দিতে পারো। আমার যতদূর মনে পড়ে যেখানে তোমার কোনো গুণ দেখেচি সেখানে তোমার গোচরে ও অগোচরে তোমার স্তব আমিই করেচি। আমার বক্তব্য এই যে অসঙ্কোচে যাঁরা আমার নিন্দা করতে আনন্দ পান তাঁদের সংখ্যা অনেক এবং আমি তাঁদের দোষ দেব না, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান একথা বলা চলবে না।

সময় এসেচে যখন এসব ব্যাপারকে শান্তভাবে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোকের কাছ থেকে আমি যা পাই তা আমার প্রাপ্য নয় এবং যা না পাই তাই আমার প্রাপ্য এই হিসেবনিকেশের নালিশ তুলে কিছু লাভ হয় না। মানরক্ষাও হয় না। কিন্তু অনাত্মভাবে সত্যটাকে জেনে রাখা দরকার। চিত্তরঞ্জন কিংবা মহাত্মাজিকে দেশের লোকে কদাচিৎ প্রতিবাদ করেচে, এমন কি নিন্দাও করেচে কিন্তু অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও গর্হিত

ভাষায় কুৎসিত ভাবে তাঁদের প্রতি অসম্মান করেননি— করতে পারলে আনন্দ পেতেন না তাও নয় কিন্তু সাহস করেন নি— কারণ তাঁরা জানেন দেশের লোক তা সহ্য করবে না। আমার সম্বন্ধে সে রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র কারণ নেই— অনেকেই আমার নিন্দায় প্রীত হন এবং বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার প্রকাশ্য অপমানে দেশের লোকের চিত্তে বেদনা লাগে না, সুতরাং আমার প্রতি যাঁরা কুৎসা প্রয়োগ করেন তাঁদের ক্ষতি বিপদ বা তিরস্কারের আশঙ্কা নেই। এক হিসাবে তাঁরা সমস্ত দেশের প্রতিনিধি-স্বরূপেই এ কাজ করে থাকেন। সুতরাং তারা উপলক্ষ্য মাত্র। যাঁরা আমার অন্ধ স্তাবক বলে কল্পিত, যাঁরা আমার সুহৃদ বলে গণ্য তাঁরা আমার এই অবমাননার কোনো প্রকাশ্য প্রতিকার করে থাকেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। বুঝতে পারি প্রকাশ্যে অপমান করতে অপর পক্ষের যত সাহস ও নৈপুণ্য এ পক্ষের তা নেই, তার প্রধান কারণ তাঁরা মনে মনে জানেন দেশের লোকের সহযোগিতার বল তাঁদের দিকে নয়। দেশের লোকের কাছে যে কোনো কারণে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন তাঁদের ভাগ্যে এরকম গ্লানি কোনো দেশে কখনোই ঘটে না— রাস্তার চৌমাথার মধ্যে এমন নির্যাতন নিঃসহায়ভাবে তাঁদের কখনোই ভোগ করতে হয় না। তাই বলচি এই ব্যাপারের মূল সত্যটাকে আমার জেনে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া দরকার— আর তার পরে চিত্তকে অবিচলিত রাখা আরো দরকার। সত্তরের কাছে এসে পৌঁছেচি —আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে, এখন মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কামনা করচি যে এই হতভাগ্য আমি নামক বাহিরের পদার্থটার সমস্ত বোঝা এবং লাঞ্ছনা থেকে ভিতরের আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেন ইহলোক থেকে বিদায় নিতে পারে।

এই উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে আর একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশ করাই আমার স্বধর্ম— প্রকাশের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করা আমার পক্ষে

ধর্মবিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতিতে এই প্রকাশের নানা ধারার উৎস আছে —তাদের যেটাকেই আমি অগ্রাহ্য করব সেটাতেই আমার খর্বতা ঘটবে। প্রকাশ আর ভোগ এক জিনিস নয়— প্রকাশের অভিমুখিতা বাইরের দিকে, বস্তুত সেটাতেই তার অবরোধ। আমার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তোমার মনে আপত্তি উঠেচে? কিন্তু নাটক রচনার মধ্যে যে প্রকাশ-চেষ্টা, অভিনয়ের মধ্যেও তাই। রচনার মধ্যেই যদি কলুষ থাকে সেটা নিন্দনীয়, অভিনয়ের মধ্যে যদি থাকে সেও নিন্দনীয়— কিন্তু অভিনয় ব্যাপারের মধ্যেই আত্মলাঘবতা আছে এ কথা আমি জানি নে। আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তোমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বাধায় তোমরা যে দোষ কল্পনা করচ তার দ্বারা আমার চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করলে নিজের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে। ইতি ১১ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিয়োগ পত্র

৯
২৫ জুলাই ১৯৩৮

6, Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta

I hereby appoint a Board consisting of Sjs. Sajanikanta Das, Hiron Kumar Sanyal, Nanda Gopal Sen Gupta, and

Kishori Mohan Santra with Sj. Charu Chandra Bhattacharjee as secretary to advise me in the selection of poems for the revised second edition of “বাংলা কাব্যপরিচয়”.[১] I hope they will kindly accept the office.

25.7.38 Rabindranath Tagore

১০
৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

“UTTARAYAN”
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

ভুলেই গিয়েছিলুম।[১] তোমার চিঠি পেয়ে আজ আমি কয়েক লাইন লিখে মেদিনীপুরে কালেক্টরকে[২] পাঠিয়ে দিয়েছি। মুক্তির উপায়[৩] থেকে বোধ হচ্ছে আমার মুক্তির উপায় নেই। আচ্ছা কপি করিয়ে পাঠিয়ে দেব। সুধাকান্ত রায় চৌধুরী[৪] বলচে পালিশ করে দেওয়া দরকার। আমার মন বলচে আর তো পারা যায় না। যারা জন্মায় কুঁড়ে হয়ে তারা মরে খাটতে খাটতে। ইতি ৬/৯/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

আমার দোষ নেই। কপি করিয়ে ঠিক করে রেখেছিলুম লেখাটা[1] —যাঁরা আমার পরিমণ্ডল, তাঁরা আরও কপি করানো কর্তব্য বোধ করলেন— যাঁরা কপি করেন তাঁরাও ক্ষিপ্রকারিতার জন্য বিখ্যাত নন। রেজেস্ট্রি ডাকে কাল রওনা হয়ে গেছে বলে অনুমান করি। লেখাটার মধ্যে সকলের চেয়ে ব্যবহার্য হচ্ছে আমার দস্তখৎ— সেইটের ছাপ দেখিয়ে ডুবো মাল যদি তোমরা চালাও বাজারে, তবে তার দায় তোমরা কবুল কোরো সাধারণের দরবারে।

ভূমিকায় পুষ্পমালার উপরে অগুরুবনদাহনের ব্রত আরোপ করেছি— সে অংশ তুলে দিয়ো[2]— লোকে ভাববে বইটা প্রপাগ্যাণ্ডা— সেটা সত্য নয়। এটা বিশুদ্ধ উচ্চহাস্য।

কাব্যপরিচয়ের পরিমার্জিত রূপের[3] জন্যে অপেক্ষা করে আছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আদিরসের বাহনটিকেও প্রয়োজন আছে। দিলীপকুমার[4] তাঁর কবিতার নির্বাচনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়েছি দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার নাম করি নি তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ইতি ১৫/৯/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

দুখণ্ড অলকা[১] পেয়েছি। বিতরণ হয়ে গেছে। এখন ছুটির সময় আর পাঠাতে হবে না। যদি কোনো কারণে পরে দরকার হয় জানাব। আশাকরি তোমার পাঠকদের মেজাজ বিগ্‌ড়িয়ে যায়নি।

কাব্যসঙ্কলন উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব[২] উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাকে ঠাণ্ডা করতে পার তো কোরো। এই বইয়ে সমর সেনের[৩] বিরহ তাকে বেজেছে। দিলীপ[৪] দুঃখিত। সুধীন্দ্র[৫] ক্ষাপা। তাদের কবিতা তাদের দিয়েই বাছাই করতে দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো। ইতি ২৮/৯/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩
৭ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

আমি পলাতকা। চলেছি পাহাড়ের দিকে। স্বভাব সঙ্গত অভ্যাসে ভুল করেছি— উল্টা বুঝেছি— গরম যখন দুঃসহ ছিল তখন শীতের সন্ধানে বেরব বলে মন স্থির করতে করতে ভাদ্দুরে গরমের ফ্রন্টিয়ারে এসে পড়েছি। আয়োজনটা যখন পাকা হয়েছে প্রয়োজনটা তখন পরিহাস করতে উদ্যত, কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে মন বদলাতে গেলে পরিচিত বর্গের পক্ষে সেটা কৌতুকজনক হবে জেনে দৃঢ়তার সঙ্গে জেদ বজায় রাখ্‌তে হোলো। কাল যাব কলকাতায় সোমবারে যাব কালিম্পঙ।[১]

কাব্যসাহিত্যকে আমি ইতিহাসের গণ্ডি দিতে চাইনি— আমার ও বুদ্ধি নেই। কবিতা যদি যেমন তেমন করে আসন নেয়, তাতে তার রসের ক্ষতি বা মর্যাদার হানি হয় না। ওদিকে আমি চিন্তাই করিনি। এর থেকে বুঝবে আমার সঙ্কলনকর্ম্মের অযোগ্যতা। কোনো কোনো কবি ফরমাস করেছেন এবারে যেন আমি ভালো কবিতা বাছাই করি অর্থাৎ তাঁদের মতের অনুসরণ করি। মত কি তা জানার সম্ভাবনা নেই, থাকলেও হয় তো মানার সম্ভাবনা আরো দুঃসাধ্য। কবি সম্প্রদায়ের মেজাজ আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু বোধ হচ্চে দেবা ন জানন্তি। যাই হোক এখন থেকে শত হস্তেন কবিনাম্। তোমার সাহস আছে— বয়সও অল্প, এই বিপদজনক অধ্যবসায় তোমাকেই সাজ্‌বে।

ফিরে আসি তার পরে মোকাবিলায় কাজের কথায় আলোচনা করব। ইতি ৭/১০/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
২১ অক্টোবর ১৯৩৮

[SANTINIKETAN, BENGAL]

কল্যাণীয়েষু,

মস্ত একটা ছিদ্র আছে আমার রচনার ঘটে। এক দিক থেকে যা ভর্তি হয় অন্য দিক থেকে তা নিষ্ক্রান্ত হতে বিলম্ব করে না। কিশোরকান্তর[১] অভিনন্দন পত্রখানা কবে পৌঁছেছে গিয়ে ‘পাঠশালায়’[২] তা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। বোধ হচ্ছে যেন নাচনের[৩] নামে হেমন্তবালা[৪] আমাকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন সেইটের সঙ্গে জড়িয়ে কবিতাটা তুমি ছাপতে ইচ্ছা করেছিলে— তা যদি হয় তাহলে সেই প্রসঙ্গে পূর্বপ্রকাশিত কবিতা আবার প্রকাশ করলে দোষ হবে না। আমি আজ নাচনের উদ্দেশে যে পত্রখানি লিখেছি সেটা ব্যবহার করলে চক্রটা সম্পূর্ণ হতে পারবে। যে পত্র বাহনরূপে তুমি এনেছিলে আমার কাছে সেই পত্রের উত্তরটিও তোমাকে পাঠাই, তুমি যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ো। কাগজে প্রকাশ করবার পক্ষে এটা যদি কটুস্বাদ হয়ে থাকে তবে চেপে যেয়ো।

বঙ্কিমের[৫] চিঠিখানি চমৎকার। কোনো এক অবকাশে কাজে লাগাতে পারব।

সাহিত্য পরিষদের জন্যে লেখা চেয়েছ।[৬] আমার পুরোনো লেখনীতে নতুন লেখা সরচে না। কী জীবনে কী রচনায় থামবার টর্মিনস লেখনী জোর করে পেরোতে গেলেই দুর্গতি ঘটায়।

'ভাষা পরিচয়ে'র'[৭] ভূমিকাটা তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু ঐ বইটার' পরে অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের।[৮] শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে যদি সম্মতি নিতে পারো তা হলে বাধা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে বোধ হয় আপত্তি হবে না।

কাব্যপরিচয় নিয়ে কবিদের মন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। চেম্বারলেনি[৯] পদ্ধতিতে কাটা ছেঁড়া করে এই হিটলারি সম্প্রদায়ের উষ্মা নিবারণ করতে যদি পার তা হলে আমার পরিত্রাণের উপায় হবে।

মুক্তির উপায় যখন তোমাকে দিয়েছিলুম আমার মন ছিল নিষ্কাম। যদি দক্ষিণা দিতে চাও আমার নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিলে পুণ্যলাভ করবে। ইতি ২১/১০/৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত ও সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫ নভেম্বর ১৯৩৮, শান্তিনিকেতন।
শম্ভু সাহা গৃহীত আলোকচিত্র শ্রীমতী উমারানী দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৫
২৭ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা[১] সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখে পাঠালুম।

পিওনের পদ পেয়ে পথের মধ্যে তুমি ডাক মেরেছ এ জন্যে হেমন্তবালার[২] কাছে তোমার জবাবদিহী, আমার কর্তব্য আমি করেছি।

সুনীতিকে[৩] সঙ্গে নিয়ে তুমি এখানে আসবার সংকল্প করেছ শুনে খুশি হলুম। ভাষা সম্বন্ধে আমার বইখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করচি। তাঁকে দেখিয়ে রাখব বলে অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলুম। তিনি ছিলেন প্রবাসে। ছাপা আরম্ভ হয়ে গেছে, তবু এখনো সময় উত্তীর্ণ হয়নি। তিনি এলে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারবেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাবলীতে ভুক্ত হবে। আনাড়ি হাতের ভুলচুক না থাকাই উচিত। তোমাদের যখন অবকাশ এসো। বেশি সঙ্গী এনো না, বিদ্যালয় খোলবার মুখে অভিভাবকদের ভিড় হবে। ইতি ২৭/১০/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন যাঁরা করেছেন তাঁদের প্রতি সাধুবাদ সাহিত্যিক সৌজন্যের প্রচলিত অলস রীতিরূপে প্রয়োগ করলে উদ্যোগীদের বঞ্চনা করা হবে। কেন না এই সকল গ্রন্থের যথোচিত গ্রাহক ও পাঠক থাকলে তাঁরা সাধুবাদের চেয়ে উপযুক্ত পরিমাণে যথার্থ মূল্য পেতেন। শুনেছি তার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় না। অথচ একথা মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যের পথরেখা অনেকখানি লুপ্ত হয়ে যেত যদি এই গ্রন্থগুলি উদ্ধারের চেষ্টা যথাকালে দেখা না দিত।

এই লেখাগুলিকে আমরা প্রাচীন ব'লেই গণ্য করি পঞ্জিকার তারিখ গণনা ক'রে নয়, এদের কালান্তরবর্তিতার সীমা-নির্ণয় ক'রে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ হয়েছে দূরকালে নয়, অন্যকালে। তখন বাংলা ভাষার ভূমিভাগে মাটি শক্ত হয়ে ওঠে নি, সাহিত্যের পথ হয় নি পাকা, তখন ভাবের ও চিন্তার চলাফিরা ছিল সংশয়িত গতিতে। ভাষা যে মনের ধাত্রী তখন সে মন আপন আশ্রয়ের শিথিলতাবশত সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারেনি। সেইজন্য সেই সকল গ্রন্থে প্রাচীনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। ইতিহাসে অনুরাগী যাঁদের মন তাঁরা এর রস পাবেন। আর যাঁদের ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নেই তাঁরা বর্তমানের সম্পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই দূরব্যাপী মনোযোগে ঔদাসীন্য অগভীর শিক্ষার লক্ষণ।

এত আশ্চর্য দ্রুতবেগে বাংলা সাহিত্যের বৃদ্ধি হয়েছে যে এর সময়ের পথে মাইলের পরিমাপচিহ্ন সিকিং মাইলের মাত্রাতেই দেওয়া সংগত। এ সাহিত্যে অল্পদূরে এগোলেই পিছনের দিকে দূরবীণ ধরার দরকার হয়ে পড়ে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যে সকল লেখক আধুনিক সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক তাঁদের রচনারও প্রথম অংশ বাংলাসাহিত্যের পূর্বাহ্নের [পূর্বাহ্ণের] পূর্বপ্রহরের অন্ধকারে অপরিস্ফুট।

সেই জন্যেই সময় থাকতে এই বেলা এই সাহিত্যের অগোচরপ্রায় প্রাগ্‌বিভাগকে গোচরে আনবার অধ্যবসায়কে উৎসাহ দেওয়া বাংলাদেশের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্য।

ইতি ২৭/১০/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

১৬
৩১ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

সর্বত্রই লেখা দিয়ে থাকি নিস্পৃহ ভাবে। পরিবর্তে মূল্য যদি পাই সম্মানের কথা বিচার করি নে। কেন না সে কথা বিচার করতে গেলে অহংকারকে প্রশ্রয় দেবার আশঙ্কা থাকে। কাজ কী! অলকা[১] থেকে যে পরিমাণ দক্ষিণা পেয়েছি সেটা সেই পরিমাণে কাজে লাগবে, ধন্যবাদ দিতে রাজি আছি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে। তোমরা[২] শনিবারে আসবে শুনে খুশি হলুম।

নাচনের[৩] চিঠিখানি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছ আশা করি। ইতি ৩১/১০/৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭
১১ নভেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

রঙ্গমঞ্চে মুক্তির উপায়ের মুক্তি সাধন ঘটল না।[১] প্রয়োগকুশল নটের অভাব।

কাব্যপরিচয়ের আদ্য এবং মাধ্যদের শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে —সুতরাং তাঁরা অশান্তি ঘটাবেন না। অন্ত্যরা ভয়াবহ। আমি শান্তিপ্রয়াসী, খর রসনার আস্ফালনে ভীত। সাহিত্যে অত্যন্ত যাঁরা প্রত্যন্ত দেশীয় তাঁরাও আমাকে ভয় করেন না। সেই জন্যেই অন্ত বর্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার তোমারই উপরে। তোমার চর্মে খর নখরের প্রখরতা প্রতিহত হবে জানি। কবির দল বরযাত্রদলের মতো, সংকলনকর্তা কন্যাকর্তার সমপর্যায়ের। মাথা-হেঁট করেও বোধ হয় তুষ্টিসাধন করতে হবে। তাই বলে মাথা ধূলোয় লুটিয়ো না। এই অনুষ্ঠানে হিটলার চেম্বারলনী পালার সাহিত্যিক রূপ দেখতে পাব আশা করচি। অর্থাৎ নিজের মানহানি করেও যতটা পারো সব দাবীই মেনে চলতে হবে না। কিন্তু তাঁরা যাঁদের চার্চহিল কুপার[২] বলে ত্যাজ্য করতে চান তর্জনের ভয়ে তাঁদের বর্জন করাটা অবৈধ হবে। এ গ্রন্থে রবাহূত অনাহূতদেরও যথাসম্ভব পাতপেড়ে দেবার আমি পক্ষপাতী। যাই হোক্ এবার যে লড়াই হবে আমি দূর থেকে তাই দেখব— তাতে কৌতুক আছে। ইতি ১১/১১/৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
[২৯ নভেম্বর ১৯৩৮]

> 'Silvroaks', Luker Road, Allahabad — এই ঠিকানা থেকে জনৈক মহিলার লেখা একখানি চিঠির উপরে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখে, সজনীকান্ত দাসকে মন্তব্য সহ চিঠিটি পাঠিয়ে দেন।

[শান্তিনিকেতন]

সজনীকান্ত,

কাব্য পরিচয়ের দ্বিতীয় দেহান্তর কাল কত দূরে। পত্রখানি তোমার দৃষ্টি[র] জন্য পাঠাই। তোমাদের কাজ শেষ হবে কিন্তু পত্রের পথ বন্ধ হবে না।

সুফিয়া হোসেনের[১] কবিতার বই সম্প্রতি হাতে পড়ল। বিশেষ সমাদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ

১৯
[৩০ নভেম্বর ১৯৩৮]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

আগামী সংস্করণ কাব্যপরিচয়ের জন্যে হেমলতা বৌমার[১] রচিত একটি কবিতার কপি পাঠালুম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেম

যেখানে ফুটিলে প্রেম, রহি সেইখানে
সুগন্ধে ভরিলে প্রাণ, আনন্দে আকুল
করিলে সবার চিত্ত, তব সমতুল
নাহি এ ধরায়। মৃত্যু হরি লয়ে যায়
লক্ষ লক্ষ প্রাণ, লুপ্ত করে তমসায়।
যেখানে ফুটিলে তুমি, রহি সেইখানে
মৃত্যুরে করিলে কোলে, আনন্দের দোলে
দিলে যে তাহারে দোলা; গুপ্তদ্বার খোল
অমৃতের, দীনমর্ত্য পায় তার স্বাদ।
প্রেম তব স্বর্ণকান্তি নিত্য শোভা পায়
আপন আসনে বসি শুভ্র সুষমায়।
মৃত্যু ও অমৃতমাঝে যা আছে বিচ্ছেদ
পূর্ণতার মাঝে তার ঘুচায়েছ ভেদ॥

২০
১১ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

[মংপু]

কল্যাণীয়েষু

পূজোর ছুটি এখানে কাটিয়ে তবে স্বস্থানে ফিরব। আমার রচনাপঞ্জী[১] সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাও কোরো কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাবার আশা রেখো না। আমার পঞ্জিকার তারিখ আন্দাজের

দ্বারা চালিত। তার কারণ আমার মনে ঘটনার পূর্বাপরতা বোধ তথ্যমূলক নয়, অনুভূতির স্পষ্টতা অনুসারে তারা আপনার পংক্তিগ্রহণ করে।

আমার শরীর সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা বোধ হয় তোমাদের ইচ্ছানুবর্তী। এ ঘর থেকে ও ঘর আমার পক্ষে বিদেশ— একে চলতে হয় সাবধানে, অভ্যস্ত নিয়ম আঁকড়ে ধরে— নতুন জায়গায় সেটা সহজসাধ্য হয় না, কষ্টকর হয়। মেদিনীপুর[১] যেতে হলে আমার পক্ষে একটা দৈহিক বিপ্লব হবে।

কলিকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। বস্তুত যথার্থ হিসাব মতে আমি অতীতের পর্যায়ভুক্ত, কোনোমতে বর্ত্তমানে আমার টিঁকে থাকা যাকে বলে এনাক্রনিজ্‌ম্ অর্থাৎ সময়লঙ্ঘন দোষ। ইতি ১১/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১
১৫ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

[মংপু, দার্জিলিং]

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে। তোমার পঞ্জীতে যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করেছ তার অধিকাংশ মনে আনতে পারচি নে অর্থাৎ এদের পক্ষে বা বিপক্ষে হলফ পড়ে সাক্ষ্য দেবার মত স্পষ্ট ধারণা আমার

নেই। অতএব তোমাদের তরফ থেকে আমার পঞ্জীতে এদের যদি স্থান দেও [য] উচ্ছেদ করবার মতো জোর আমার নেই। বাল্যলীলায় এরকম প্রলাপোক্তিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। অতএব তোমাদের প্রমাণগুলিকে অঙ্গীকার করে নেওয়া গেল। প্রথম লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে কবিতা লিখেছিলুম হিতৈষীদের সতর্কতা মান্য করে সেটা লোপ করে দেওয়া হয়েছিল। মনে আছে, কেউ কেউ সেটা হাতে লিখে প্রচার করে বেড়াতেন।

পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের সে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ[১] মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোন যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয়নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না। ঝান্সীর রাণী[২] ও সান্ত্বনা[৩] প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নেই। ইতি ১৫/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২
১৯ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

[মংপু, দার্জিলিং]

কল্যাণীয়েষু

এখান থেকে ৫ই নবেম্বর নাগাদ কলকাতায় ফেরবার সংকল্প করেছি। তখন তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় আলোচনা হবে।

হেমন্তকুমারীর লেখাটি[১] খুব ভাল লাগ্‌ল, রচনাটি সুনিপুণ এবং আধুনিক জবানীতে যাকে বলে "সাবলীল।" ইতি। ১৯/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩
২৬ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

৫ই নবেম্বর[১] এখান থেকে আমার যাত্রা সুনিশ্চিত। অদৃষ্ট অনিশ্চয়তার জাল ফেলে সে ধীবরবৃত্তি করেন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে সাহস করিনে। ইতি ২৬/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের রচনার তালিকা-সহ শংসা পত্র

২৪
২১ নভেম্বর ১৯৩৯

শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "অভিলাষ" তাঁহার অভিনব আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা এবং গান যে আমারি রচনা তা সজনীকান্তের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায়নি। হিন্দুমেলায় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি 'স্বপ্নময়ী'তে আত্মগোপন করেছিল সেটাও সজনীকান্তের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। সজনীকান্ত প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকাকৃত রচনাগুলি নিঃসংশয়রূপে আমার। কিন্তু পরবর্তী তালিকার রচনাগুলি সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারিনি। আমি সে দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য[1] ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর[2] ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখাই লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক বোধ করচি। এখানে বলা আবশ্যক শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো কোনো রচনায় আত্মসাৎ করেচেন বলে আমার সন্দেহ হচ্চে।

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১/১১/৩৯

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal
India

প্রথম তালিকা

১। “ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র” বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, [illegible], বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৩য় ভাগ, ১৭৯৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়।

২। “অভিলাষ” কবিতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৪র্থ ভাগ, অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শকাব্দ।

৩। “প্রকৃতির খেদ” কবিতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৯ম কল্প, ১ম ভাগ, আষাঢ়, ১৭৯৭ শকাব্দ।

৪। “ভারত” কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ।

৫। “হিমালয়” কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র।

৬। “আগমনী” কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন।

৭। ‘শারদজ্যোৎস্নায়” কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, কার্তিক।

৮। “ঝান্‌সীর রাণী” প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ।

৯। “সম্পাদকের বৈঠকে” অনুবাদ কবিতাগুলি, ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ ও ১২৮৫ আষাঢ়, ১২৮৬ কার্তিক, ১২৮৭ আশ্বিন।

১০। “সান্ত্বনা” প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, চৈত্র।

১১। “সামুদ্রিক জীব” বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ বৈশাখ

১২। “ইংরেজদিগের আদবকায়দা” প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ

১৩। "স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গলোস্যাকসন সাহিত্য" প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৫ শ্রাবণ।

১৪। "বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র।

১৫। "কবিতাপুস্তক" সমালোচনা, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ভাদ্র।

১৬। "পিত্রার্কা ও লরা" প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ভাদ্র

১৭। "গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ" প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক।

১৮। "নর্ম্যান জাতি ও অ্যাঙ্গলোনর্ম্যান সাহিত্য" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন ও ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ।

১৯। "চ্যাটার্টন— বালক কবি" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৬ বঙ্গাব্দ আষাঢ়।

২০। "ভাসিয়ে দে তরী"— গান, ভারতী ১২৮৬ বঙ্গাব্দ ভাদ্র।

২১। "বাঙ্গালী কবি নয়"— প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৭, ভাদ্র।

২২। "বাঙ্গালী কবি নয় কেন" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন।

২৩। "নিন্দাতত্ত্ব"— প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal
India

দ্বিতীয় তালিকা

১। “বঙ্গে সমাজ বিপ্লব” প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ।

২। “বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য” প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ

৩। ~~“ফেডিনাঁ তে লেসেভা এবং সুয়েজের খাল” প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়~~

৪। ~~“নিন্দাতত্ত্ব” প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন~~

৫। “সারদা-মঙ্গল” সমালোচনা, ভারতী ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, মাঘ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

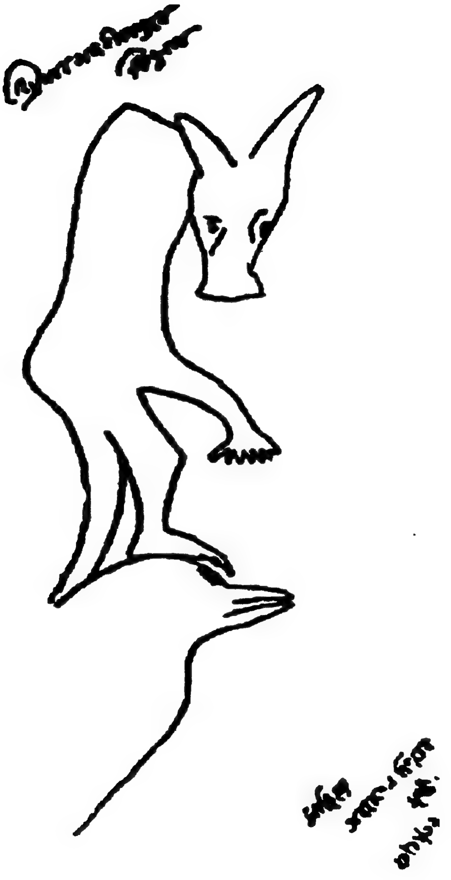

"সাহিত্য অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি"
রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কৌতুক চিত্র

২৫

অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারি এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হ'লেই আশাজনক হবে।

[অবচেতনার অবদান]

গল্‌দা চিংড়ি, তিংড়ি মিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল।
পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়
মাকড়শাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর
ল্যাজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়
সত্যিপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট।
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।

গরাণহাটায় সজনেডাঁটা
কিনছে পুলিশ সার্জন।
চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী
কাৎ হয়ে মরে চারজন।
পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
শর্ষে ক্ষেতের চাষী।
কাঁচা লঙ্কার ফোড়ন লাগায়
কুড়োন চাঁদের মাসি।
পটোলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুর্গিহাটার মিঞা।
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও কেঁয়াও কিঞা।
ঠনঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা।
মুখ ভেংচিয়ে হেডমাস্টার
মন্তুরে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইনফ্লুয়েঞ্জা।
বিরিঞ্চিদের খাতাঞ্চি[১] ঐ
চণ্ডীচরণ সেনজা।
শিলচরে হায় কিল চড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র।
হাজি মোল্লার দাঁড়ি মাল্লার
বাকি একজন মাত্র।

দাওয়াইখানায় সিঙারা বানায়,
  উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়।
কনেস্টেব্‌ল পেতেছে টেব্‌ল
  ক্ষুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরে পোকার লেগেছে মড়ক,
  তুবড়ি ছোটায় পঞ্চু।
ন্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর
  কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মীটিং,
  তুলো বের করা বালিশ।
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
  পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে,
  বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা।
ন্যাড়ানেড়ি দলে হরি হরি বলে,
  শেষ হ'ল রামযাত্রা॥

"পুনশ্চ" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯/১১/৩৯

১. 'ছড়া' গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ 'খাজাঞ্চি'
দ্র র-র ১৩ সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৮, পৃ. ১০৩-০৪।

২৬

নিজের রচনার আবর্জিত রচনা সম্পর্কে অভিমত

গাছতলায় শুক্‌নো পাতার নীচে ঝড়ে-পড়া কাঁচা পাকা ফল কিছু ন
কিছু পাওয়া যায়। আমার আবর্জ্জিত ছিন্ন পাতার মধ্য থেকে সে লেখা
টুক্‌রোগুলি আমার তরুণ বন্ধু[১] কুড়িয়ে পেয়েচেন মনে হচ্চে সেগু
সাহিত্যের ভোজে ব্যবহার করার বাধা নেই। তাই তিনি যখন ভাণ্ডা
তোলবার প্রস্তাব করলেন আমি সম্মতি দিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকু

২৭
৩০ নভেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

'UTTARAYAN
SANTINIKETAN, BENGA

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাছ থেকে তাড়া পাবার বহুপূর্ব্বেই অভিভাষণ[১] শে
করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

রচনাবলী সম্বন্ধে সমস্যা তোমার দফতরে জমে উঠচে। তা
নিয়ে পত্রযোগে কথা চালাচালি আমার পক্ষে বড়ো দুঃসাধ্য। সে
কারণে একটা প্রস্তাব আমার মাথায় এসেছে। তোমরা ঠি
করেছিলে সময় বাঁচাবার জন্য হাওড়ায় যান পরিবর্তন করা যাবে

আমি মনে করি তা না করে রচনাবলী প্রভৃতি নানা পরামর্শ মোকাবিলায় ঐ সময়ে চুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দেহটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকা আমার পক্ষে হয়ত শ্রেয় হতে পারে।

গানগুলো কালানুক্রম অনুসরণ করে মাঝে মাঝে দিলেই তো ভালো হয়। সেটাই বেশি উপভোগ্য হবে। পাঠান্তর গুলো তৃতীয় খণ্ড থেকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে রেখে ছাপানোই সঙ্গত হবে। এমন কি আমার মতে রাজা ও রাণী ও বিসর্জনের বর্জিত অংশ তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়াই উচিত।[৩] তাদের দর্শনপ্রাপ্তির জন্যে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা বিড়ম্বনা। ছোটোখাটো পাঠান্তর পাদটীকায় দিলে কি দোষ আছে? এই প্রণালীতেই পাঠকেরা যথার্থ উপকৃত হবে।

মানসীর 'শেষ উপহার' কবিতা যে ইংরেজি কবিতার ইঙ্গিত নিয়ে রচিত সেটা লোকেন পালিতের রচনা।[৪]

কোনো প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে যদি এখানে আসতে চাও যেদিন তোমার অবকাশ আসতে পারো।—আমার পক্ষে আজও যেমন কালও তেমন— সঙ্গে পাণ্ডা সুধাকান্তকে সংগ্রহ করে আনলে তোমার সুবিধা হবে। ইতি ৩০/১১/৩৯

রবীন্দ্রনাথ

২৮
১ ডিসেম্বর ১৯৩৯

‘বঙ্কিম রচনাবলী’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

[বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ)
সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - শ্রীসজনীকান্ত দাস]

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর[১] যে শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাকে বঙ্কিমের সাহিত্য কীর্তির বাণী-সৌধ বলা যেতে পারে। কী মুদ্রণ নৈপুণ্যে, কী ঐতিহাসিক বিচারে, কী তৎকালীন লোকমতের বিবৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি গৌরব রক্ষার এই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সমুজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। এজন্য এই ব্যাপারের কর্তৃপক্ষ ও সহায়কগণকে বাংলাদেশের হয়ে সাধুবাদ নিবেদন করি। ইতি ১/১২/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯
[৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯]

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

সুধাকান্তকে বাহন করে তুমি এখানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবে কথা ছিল। সে সম্বন্ধে তোমাদের উভয় পক্ষের কাছ থেকেই কোনো কথা পাওয়া গেল না। এদিকে কর্পোরেশন পথের মধ্যে থেকে আমাকে হরণ করে নেবেন[১] রব উঠেছে, প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করবেন সুধাকান্ত তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে এই ছিল কথা, মন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো খবর পাই নি। এটা বিজনেসলাইক নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের দর্শন দেবেন কি না তারও কোনো আভাস পাইনি। চিরু[২] তাঁর বাড়িতে আমাকে অতিথি রূপে পেতে চান, আমি একটি সম্পূর্ণ নিরালা বাড়ির দাবি জানিয়েছি। তুমি তো সেই রকম আশ্বাস দিয়েছিলে। এখন কি ব্যবস্থা পরিবর্তনের আশঙ্কা আছে না কি। তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় সব কথা পরিষ্কার হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তুমি যে সংস্কৃত শ্লোকের তর্জমা পাঠিয়েছ[৩] তার ভাষাটা আমার সেকালে ভাষারই মতো কিন্তু স্মৃতির নিশ্চিত সাক্ষ্য পাচ্চি নে। সেকালে তত্ত্ববোধিনীতে এ রকম কবিতা লিখিয়ে আর কেউ ছিল বলে মনে তো পড়ে না। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

৩০
৪ জানুয়ারি ১৯৪০

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

নাৎনির অতলস্পর্শ শুভোদ্বাহ্‌কর্ম্মনি কয়দিন হাবুডুবু খেয়েছি।[১] স্থির করেছিলুম এবার নৈষ্কর্ম্য সাধন করব— কিন্তু শনৈশ্চরের দয়ামায়া নেই, নানারকম দাবীর উল্কাবর্ষণ চলচে।

আজকাল আমার স্প্রিংভাঙা কলম নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, তবু কি এই পথেই অন্তিমকৃত্যের হলকর্ষণ চলবে, উত্তর গোষ্ঠের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না?

তোমার সময়মতো একবার এসো, বানানের মন্ত্রণাসভা বসানো যাবে।[২] রচনাবলী সম্বন্ধেও হয় তো পরামর্শের প্রয়োজন থাকতে পারে। সুধাকান্ত জ্বরে শয্যাগত।

চারুবাবুকে[৩] একবার জিজ্ঞাসা কোরো আমার যে সব ইংরেজি রচনা ম্যাকমিলানের স্বত্ববহির্ভূত সেগুলোকে তোমাদের প্রকাশ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া চলবে কি না। বাঙালির রচনা বলেই সেগুলি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয় এমনতরো জনশ্রুতি আছে।

মনোরমা সম্বন্ধে কয়েক লাইন সদ্য লিখে দিলুম[৪] ক্লান্ত অবকাশের "সাবলীল" আলস্যভরে। ইতি ৪/১/৪০

রবীন্দ্রনাথ

৩১
৫ জানুয়ারি ১৯৪০

[শান্তিনিকেতন]

[কল্যাণীয়েষু]

যখন মন্ত্রী অভিষেক[১] প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চিকয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলছি দাঁড়ও নয় শিকলও নয় পাখা মেলব অবাধ স্বরাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখরাঙানীর জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ-ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে। “আবেদন আর নিবেদনের থালাকে” তখনো আমি অশুচি ব'লে মেনেছি, এবং তৎকালীন কংগ্রেসের বিনম্র দীনতা আমার হাতে ভর্ৎসনা পেয়েচে। এই কথা প্রমাণের জন্য তখনকার সাংবাদিক দলিল থেকে দিনক্ষণ তারিখের উদ্ধারের ভার রইল তাঁদের পরে যাঁরা কাটা ফসলের পুরোনো ক্ষেতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহে সুদক্ষ।

৫/১/৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২
২০ জানুয়ারি ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

অবচেতনার অবদান সম্বন্ধে তোমাকে মুখে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তার কোনো আইনসঙ্গত দাম নেই। লেখনযোগে পাকা দলিলে দিতে পারি যদি এখানে ঝাড়্গাঁর[১] সংস্রব লাভ করি। অতএব সে জন্যে সবুর করতে হবে। যদি ফস্কে যায় তাহলে মন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠবে, অবচেতনা যাবে অচেতনে তলিয়ে।

অমিয়[২] ভাগলপুরে। আজ তাকে টেলিগ্রাফ করেছি আসতে। যথাসময়ের পূর্বেই যাতে যথোচিত উপায় করা হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে কিন্তু "বিজয়ায় সঞ্জয়" আশা করচি নে।[৩] আমাদের বোধ হচ্চে নৌকোডুবি হোলো, যদি হয় তাহলে সেটা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ক্ষতিপূরণের ভার তোমাদেরই নিতে হবে— এটা যে ঠিক দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ, লজ্জা নিবারণ কে করবে? ইতি ২০/১/৪০

রবীন্দ্রনাথ

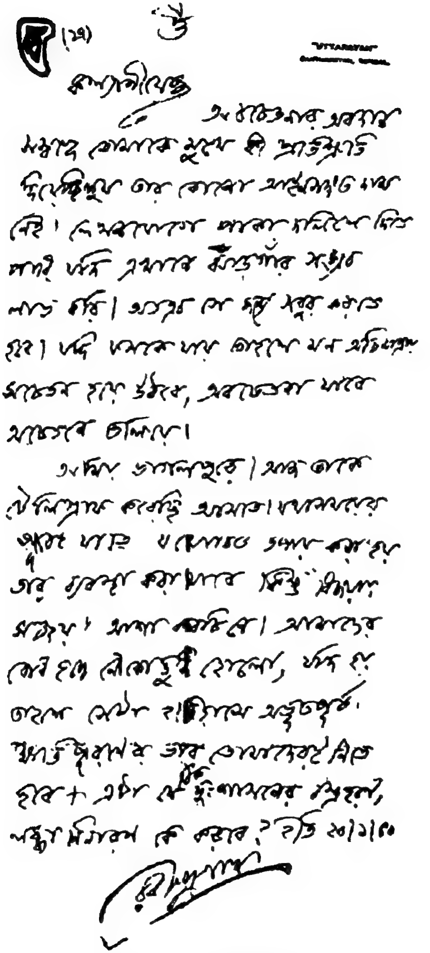

(২৭) ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

ও চাটুজ্জের প্রবন্ধ
সম্বন্ধে তোমাকে মুখে [illegible]
দিয়েছিলুম তার বেশি আর [illegible] কথা
নেই। [illegible]
[illegible]
[illegible]
হবে। যদি [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] আজ তাকে
টেলিগ্রাম করেছি আসতে। [illegible]
[illegible]
[illegible] কিন্তু [illegible]
[illegible]
[illegible]
তাহলে [illegible]
[illegible] তোমাদেরই [illegible]
হবে + [illegible]
[illegible] কি করবে? ইতি ১০/২/৪০

রবীন্দ্রনাথ

পত্র ৩২। পাণ্ডুলিপিচিত্র

৩৩

[১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

আগামী রবিবারে পুলিন[১] আসচেন রচনাবলী উপলক্ষ্যে। ঐ আলোচনা ক্ষেত্রে তোমার উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। আমি একাকী অসহায়— আমাকে যদি সাহায্য না কর আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

Santiniketan,
Bengal
India

Ref. No. ....   *Date :* ......২৮/২/৪০..,.... *193*

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ন খলু ন খলু বাণঃ
সন্নিপাত্যোয়মস্মিন্
মৃদুনি কবি শরীরে—

তোমরা জানো কোনো রকম পতিত্ব করবারই বয়স আমার নয়[১] —দোহাই তোমাদের, এই ধুলো-ওড়ানো ঝোড়ো দেশে কোনো উচ্চ চূড়ায় আমাকে চড়িয়ে দিয়ে মজা দেখো না। সভাপতিত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত কুলীন সাহিত্যিক বাংলাদেশে অনেক আছে— সম্মার্জনী থেকে আরম্ভ করে বরমাল্য পর্যন্ত সব তাঁদের সহ্য করবার অভ্যাস আছে, আমি ভীরু, দেহে মনে আমি দুর্বল— যে কটা দিন বেঁচে আছি আমি শান্তি চাই।

আপাতত চললুম বাঁকুড়ায়— চাণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যার কেন্দ্রস্থল[২] থেকে দূরে থাকব। ফিরে আসব চৌঠো[৩] নাগাদ— তারপরে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রইল

রবীন্দ্রনাথ

৩৫

৮ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

বাঁকুড়ায় যে রকম খাটতে হয়েছিল এমন কোথাও হয় নি। মাঝে মাঝে আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে ভয়ের কারণ ঘটেছিল কাউকে বলি নি, কর্তব্য করে গিয়েছি। আরম্ভে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলুম, অন্তে পারিশ্রমিক পাইনি বললেই হয়— আমাদের সঙ্গীত ভবনের নিরসন দশায় উদ্বিগ্ন হয়েছি।[১] এমন অবস্থায় ঝাড়গ্রামকে[২] ভুলতে পারছি নে। বলেছিলে দেখা করতে আসবে আলাপ আলোচনা করবে— আশু তার কোনো আশা আছে কিনা জানতে চাই। তোমার প্রাপ্য সম্বন্ধে বঞ্চিত করব না আমার প্রাপ্য যদি সুনিশ্চিত থাকে অবচেতন চিত্ত[৩] শব্দার্থ সম্বন্ধে হতবুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু পণ্য অর্ঘ সম্বন্ধে সজাগ।

ইতি ৮/৩/৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

১৮ মে ১৯৪০

ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

সজনী, প্রতিশ্রুত ছিলুম তোমাকে একটি ছড়া দেব, সেটা রক্ষে করলুম।[১] সর্ত ছিল তুমি ঝাড়গ্রাম ঝাড়া দিয়ে বিশ্বভারতীর হাতে কিছু দক্ষিণা এনে দেবে। প্রত্যক্ষভাবে সে শর্ত পূরণ হয়নি আশ্বাসের আকারে মনের সামনে রয়ে গেছে। প্রয়োজনের প্রখরতা বেড়ে যাচ্ছে— কিস্তিতে কিস্তিতে কিছু পাওয়া যায় কি? ভেবে দেখো সেটা সুবুদ্ধির কাজ হবে কিনা। শুনচি সুধাকান্ত ধূর্জটিল মুখরতার[২] বিরুদ্ধে তোমাকে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছে। এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা আছে। যদিও তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছি তবু লোকে বলবে আমি এই রচনার "পৃষ্ঠপোষক" এবং এই সূত্রে শনিগ্রহের সঙ্গে রবিগ্রহের দেনাপাওনা চলছে। তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ নিষ্কাম হয় এই আমার কামনা। তুমি ভেবে দেখো, এবং যেখানে আমার কোনো সমর্থন আছে সেটা বর্জন কোরো। ধূর্জটির লেখায় আমার একমাত্র বিরক্তির কারণ অমিয়র প্রতি তার ইস্কুলমাষ্টারির মুরুব্বিয়ানা। অভ্রভেদী অহমিকায় ধূর্জটি ভুলে গিয়েছে সাহিত্যে অমিয়[র] বৈদগ্ধ্য তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু রুচির ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা সহ্য করতেই হয়। যাই হোক আমাকে শান্তিতে থাকতে সাহায্য কোরো— বয়েস হয়ে গেছে। ইতি ১৮/৫/৪০

রবীন্দ্রনাথ

ছড়া

সুবলদাদা আনল টেনে আদম দিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
মনিব মিঞা, বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজেরে ডুগ্‌ডুগি,
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

রামছাগলের মোটা গলার ভ্যাভ্যা রবের ডাকে,
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে,
বাতাস জুড়ে ঘনঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্ত বাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান।
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি এটা গুজব মিথ্যে
এই নিয়ে সব কলেজ পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগ্‌ল ধাঁধা, রাগ্‌ল অপর পক্ষে,
বল্‌লে, “ফিজিক্স পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা, পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস্‌ যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ সে।”
এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইঁটপাটকেল ছোড়া,
হায়রে কারো ভাঙলো কপাল, কেউ বা হোলো খোঁড়া।

গোল দিঘি লাল দিঘি জুড়ে বীর পুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে এরেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুল বনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা আজগুবি হোক,— আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রাম ছাগলের ঘাড়ে।
ছেলেরা সব হাততালি দেয়, বাজেরে ডুগ্‌ডুগি,
গভীর জলে কাৎলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি॥

রবীন্দ্রনাথ

৩৭
৩ জুন ১৯৪০

ওঁ

[কালিম্পঙ]

কল্যাণীয়েষু

দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলুম। উত্তর পেয়ে যে উদ্বেগ কমল তা বলতে পারিনে। মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় তুমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলে। নিজের প্রতি এই অত্যাচার কী করে তোমার দ্বারা সম্ভব হোলো ভেবে পাইনে। চুপ করে থাক এখন কিছুদিন, এডিটরি রাজদণ্ড দাও আর কারও হাতে। আমার চিঠির উত্তর দিতে হয় দিয়ো মনে মনে। সাব-এডিটরকে বলে দিয়ো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুহৃজ্জনের কোনো লেখা ছাপিয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সরোবরের

তলার পাঁক ঘুলিয়ে দিয়ে ভারতীর পদ্মাসন যেন দুলিয়ে না দেয়। শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর এই কামনা করি। ইতি ৩/৬/৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

৩৮
[৬ জুন ১৯৪০]

ওঁ

[কালিম্পঙ]

কল্যাণীয়েষু

সকল বিষয়েই আমি আনাড়ি, অশিক্ষার উপরে কাজ চালিয়ে দিই, সব সময়ে ধরা পড়িনে। আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে, সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যামোকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম। যে ঐ চিকিৎসার মতে নেট্রাম সালফ ডায়াবিটিসের প্রধান ওষুধ। তুমি এক কাজ কোরো। বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির 'টুয়েল্‌ভ টিস্যু রেমেডিজ'[১] আনিয়ে নিয়ো, বলাইয়ের[২] সাহায্যে সেটা ঘাঁটিয়ে নিয়ো। বায়কেমিক ওষুধের গুণ এই যে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের মতো এ শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে, অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিনবার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাকিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা।

আমার মনের অবস্থা কর্মবিমুখ, আমার গ্রহ আমাকে খাটিয়ে নেয়, বাজে খাটুনিই বেশি। ইতি তারিখ পাঁজি দেখে ঠিক করে নিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ

৩৯

[২৯ জুন ১৯৪০][১]

ওঁ

[কালিম্পঙ]

কল্যাণীয়েষু

আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির পথে বালি চাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবনচরিতের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে যেতে পারবে। এ বিদ্যেটা সরস্বতীর এলেকায় নয়, এটা ধন্বন্তরীর মহলে,— যেখানে রস নেই রসায়ন আছে— সাইকোলজির নাড়ি যাঁরা টেপেন এখানকার নাড়ির খবর তাঁদের হাতে নেই। (বলাইয়ের প্রতি কটাক্ষ করচিনে— পদ্মগন্ধে আয়োডোফর্মের গন্ধ বেমালুম মিশে গেছে তাঁর নাসা রন্ধ্রে।)— যাক্ তোমার মাথাটাকে চাঙ্গা করবার জন্যে আমার বায়োকেমিক বিধান হচ্চে Kali Phos 6ˣ (কেলিফস)। পূর্বের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে, দিনে পাঁচটা বড়ি অন্তত তিনবার সেবনীয়। রবীন্দ্রনাথ

৪০
২৮ জুলাই ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

তোমার বায়োকেমিক বন্ধুর[১] উদ্দেশে একখানা প্রশস্তিপত্র লিখে পাঠালুম। এখানে তোমার যে বন্ধুটি[২] আমার সিংহদ্বার আগলিয়ে থাকেন— ইংরেজিতে লেখবার জন্যে তোমার হয়ে তিনি আমাকে তাগিদ জানালেন। গৌড়ীয় সাহিত্যমণ্ডলীর প্রতিনিধি আমি— এমন দুর্নীতির কাজ পারৎপক্ষে করিনে। আমার পক্ষে এর পরিণাম ভালো হবে না আমার কলমের মুখে এরকম বিধার্মিক কালী পড়াতে আমি লজ্জিত আছি। যদি এতে কারো কোনো উপকার হয় ভেবে এই অনাচার মেনে এলুম।

তোমার কাজের মহলে একটা ডাক্তারি খিড়কির দরোজা হঠাৎ খুলে গেল[৩]— এর জন্য দায়ী আমি। আশা করি কোনো পরিতাপের কারণ ঘটবে না। ভালো আছ বলে আন্দাজ করচি। চুপচাপ থাকাটা একটা খবর— ওটা আরো কিছুদিন বড়ো হেডলাইনে জাহির কোরো।

আমার দিন চলবে একঘেয়ে সুরে, অবন্ধুর পথে। ইতি
২৮/৭/৪০

রবীন্দ্রনাথ

৪১
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। তোমার বই দুটি পেয়েছি।[১] চোখ সুস্থ হলে পড়ব। কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হয়েছে। অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করচি।[২] যাবার মুখে কলকাতায় দেখা হতে পারবে। নইলে তুমি যদি এখানে এসো সেও একটা উপায় আছে। ইতি ১০/৯/৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২
২৮ মে ১৯৪১

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

২৮/৫/৪১

কল্যাণীয়েষু

সজনী, গল্পসল্প[১] তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ও রকম খুচরো গল্প সাধারণত কারো কানে পৌঁছয় না, কিছু

পাশ-কাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক মর্মটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্যের সমজদার বলে চেনা গেল।

তোমার শরীর অসুস্থ এর মধ্যে তুমি যে এই লেখায় মন দিতে পেরেছ এ খুব আশ্চর্যের বিষয়। তুমি রোগের হস্ত হোতে নিষ্কৃতি লাভ করো, আমি এই কামনা করি। ইতি

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩
৪ জুন ১৯৪১

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

সজনী, তুমি ক্ষণকালের জন্য এসে আমাদের খুশী করে দিয়ে গেছ।[1] তোমার যে রকম ভঙ্গুর অবস্থা তাতে আমি এ প্রত্যাশা করিনি। প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হোতে পারবে। আমি আজ অপেক্ষাকৃত কিছু ভালো আছি। তোমার মাড়ওয়ারী বন্ধুরা[2] খুশি হয়ে গেছেন, সেটা নানা কারণে আনন্দের বিষয়। এই বর্ষার দিনে তাতে সুধাকান্তের মনকে অন্তরে অন্তরে মুখরিত করে তুলেছে। আশা করি সদলবলে ঘরে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছ এবং গৃহিণীর ভর্ৎসনা দুঃসহ হয়নি। ইতি ৪/৬/৪১

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ

সুধারানী দাসকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১
১৬ মে ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পেয়েছি[১], তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই মাসের শেষভাগে আমি সিংহলে যাত্রা করব। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তখন সজনীকান্ত যদি কলকাতায় থাকেন তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে হয় তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন।

বৎসরের আরম্ভে নানা ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উমারানী দাসকে প্রদত্ত
রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ কবিতা

১
৬ নভেম্বর ১৯৩৮

“হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা।[১]
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে,
করিতে পারিনে সেবা।”

শিশির কহিল কাঁদিয়া,
“তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল,
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন
কেবলি অশ্রুজল।”

“আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।”—

শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
“ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি ;
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।”

হে উষা, নিঃশব্দে, এসো, আকাশের তিমির গুণ্ঠন[২]
করো উন্মোচন।
হে প্রাণ, অন্তরে থেকে মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও, জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি তামসের মোহ যবনিকা, হে আত্মন
করো উন্মোচন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬/১১/৩৮

সৌজন্যে : শ্রীমতী উমারানী দাসের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

প্রসঙ্গ কথা-১

সজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্রাবলী

১
৭ মার্চ ১৯২৭

১/১ য়ুরোপীয়ান এসাইলাম লেন
কলিকাতা
২৩ শে ফাল্গুন, ১৩৩৩

শ্রীচরণকমলেষু,
প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরণের লেখা চল্‌ছে[১], আপনি লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরণের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায় —কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এযাবৎকাল দেখে আস্‌ছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ ক'রে চলে না। কবিতা, Stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না; গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেম্‌নি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরণের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি প'ড়ে বাহ্‌বা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য ব'লে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে-সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত ব'লে প্রচার কর্‌বার

একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ব'লে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালি-কলমে' নজরুল ইস্‌লামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এসব লেখার দু'একটা প'ড়ে থাক্‌বেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠিতে'[২] এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবলপক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাংলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট ক'রে আস্‌ছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্যপথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত কর্‌ছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝ্‌তে পারিনা। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা ব'লে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যাথার্থ রূপ নেবার পূর্ব্বেই এই ধরণের লেখার মোহে প'ড়ে নষ্ট হ'তে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন।

আপনাকে আজ এই চিঠি লেখার একটি কারণ—(কার্ত্তিকের) ভারতীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধ "সাহিত্যে শুচিবিকার।" এই প্রবন্ধটিকে এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইতিমধ্যেই নজির স্বরূপ দাখিল করেছেন। সেই প্রবন্ধটি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আজ দশ বৎসর ধ'রে আপনার লেখা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে আপনি সাহিত্যে শ্লীলতার গণ্ডী পার হ'য়ে যাওয়ার পক্ষে নন। আপনার লেখার এমন কোনো জায়গা আমি দেখিনি যেখানে আপনার চিত্রিত চরিত্র সংযম হারিয়েছে। ঠিক যতটুকু পর্য্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী আপনি কখনও যাননি। অথচ যে-সব জিনিষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 'একরাত্রি', 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাইরে' এরা লিখলে কি ঘটত— ভাবতে সাহস হয় না।

নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্ভবত আপনি নিজে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' লিখেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'উমা' নামক উপন্যাসের সমালোচনায় তাতে লিখিত আছে —"সুনীতির হিসাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি না। বিনোদিনী ও যোগেশ্বর সম্বলিত যে চিত্র গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক নহে— এমন অবস্থায় এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।... কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা? তাই আবার পাঁচকড়িবাবুর ন্যায় ক্ষমতাশালী লেখকে করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য!... যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?"

এই চিঠির উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য যদি আমার হয় তা'হলে সেটি প্রকাশ কর্‌বার অনুমতি আমি আপনার কাছে চেয়ে রাখছি।

আপনার নিকট এভাবে জবাব দাবী কর্‌তে গিয়ে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে থাকি তা'হলে এই ভেবে ক্ষমা কর্‌বেন যে, আমি একা নই— আমার এই চিঠিতে আমি অন্ততঃ আমার পরিচিত কুড়ি বাইশ জন সাহিত্যসেবীর মনোভাব ব্যক্ত করেছি। ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষ্যা ব'লে হেলা পায়। আপনি কথা বল্‌লে আর যাই বলুক, ঈর্ষ্যার অপবাদ কেউ দেবে না।

আমার প্রণাম জানবেন।

প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

২

১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

The Modern Review
91, Upper Circular Road, Calcutta
13. 12. 1927

শ্রীচরণেষু,

সাপ্তাহিক আত্মশক্তির[1] কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ'[2] গীতি নাট্যখানির সমালোচনা লইয়া কিছুদিন যাবৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল, পরম্পরায় তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কিনা ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু

গত পরশু ও কাল শ্রীযুক্ত প্রশান্তবাবুর[০] সহিত দুই একটি কথাবার্ত্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক, নতুবা, আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

সমালোচনাটি শ্রীঅরসিক রায় এই বেনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। অরসিক রায় একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির গুপ্তনাম। সে আমার পরিচিত ও চাকরী সম্পর্কে 'আত্মশক্তি'র সহিত তাহার পরোক্ষ যোগ আছে। 'নটরাজে'র এই সমালোচনাটি উক্ত অরসিক রায়ের লেখা নহে। উহা আমার লেখা। আমার লিখিত প্রবন্ধের দুই একস্থল আমার অজ্ঞাতসারে বর্জ্জন করিয়া ও স্থল বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক মুদ্রাকর প্রমাদ সমেত উহা অরসিক রায়ের নামে বাহির হইয়াছিল। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি সেকারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম, ওই নামটিই ওই প্রবন্ধ সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি, বাংলাদেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না ; লেখকের কুলজী কোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্য-অনিসন্ধিৎসু [অনিসন্ধিৎস], গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই। কারণ, কোনো বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোল-কল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। আমার এই লেখাটির ভিতর আমার বা অপর কাহারো একটা উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মস্তিষ্কবান ব্যক্তিরা যে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব লেখাটির ইতিহাস আগাগোড়া আপনাকে শোনানো আবশ্যক।

আমি শুনিয়াছি, আপনি এই লেখাটির সম্পর্কে এক বা একাধিক পত্র পাইয়াছেন। তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে, আমি

শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের প্ররোচনায় ওই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। সেই চিঠিতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সাক্ষী মানা হইয়াছে। হয়ত অন্য চিঠিতে কিম্বা মৌখিক ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে, যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্ম্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকা ব্যবসায় ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হেতু শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিম্বা তাঁহার সম্পর্কিত কেহ আমাকে দিয়া ওই প্রবন্ধ লিখাইয়া বিচিত্রাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ গুজব ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া না থাকিলেও হয়ত অচির ভবিষ্যতে শুনিতে পাইবেন। সেইজন্য আপনাকে জানাইতেছি যে আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার— অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র অংশ বা প্রভাব নাই। যদি কেহ বলেন, আমি অন্যের প্ররোচনায় লিখিয়াছি তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। আমি নিজের তরফ হইতে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, বিগত পঞ্চদশ বর্ষকাল রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত পরিচিত থাকার দরুন আমি সাহিত্য বিষয়ে এই ধর্ম্মটুকু অর্জ্জন করিয়াছি যাহার প্রভাব সাহিত্যিক নীচতা ও হীনতা হইতে আমাকে বিরত করে অন্তত, ভাড়াটে সাহিত্যিক গুণ্ডা হইতে আমাকে বাধা দেয়।

'নটরাজে'র সমালোচনা লিখিয়া ও বেনামীতে যতবড় অপরাধই আমি করিয়া থাকি তাহার শাস্তি সম্পূর্ণ আমারই প্রাপ্য। যাঁহারা আমাকে অন্নদান করেন তাঁহারা পাপভাগী নহেন। ওই সমালোচনাটি সম্ভবত —আপনি এখনও পড়েন নাই ; যদি পড়িয়া থাকেন ও উহা আপনাকে বিন্দুমাত্রও ব্যথা দিয়া থাকে তজ্জন্য আমি আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবার দাবী রাখি। কিন্তু, আপনার বিরুদ্ধে আমারও নালিশ এই যে, বেনামী চিঠি পড়িয়া প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা যখন

আপনার হইয়াছিল তখন সর্ব্বাগ্রে আমার নিকট হইতেই তাহা জানা আপনার উচিত ছিল। আমি বোধহয় আপনার নিকট মিথ্যা বলিতাম না। বিশ্বভারতীর সম্পর্কিত কোনও একজন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, 'নটরাজে'র সমালোচনা বাহির হইবার পরও আমি যখন দুই দুইবার আপনার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন আপনার নিকট উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনও কথা বলি নাই কেন? কিন্তু আমার সহজ বুদ্ধি বলিতেছে যে, বলিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। উপযাচক হইয়াও কথা বলিতে গেলে আপনিই আমাকে 'অতিরসিক' সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিতেন। ওই প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম না। আমি নিজের মধ্যে সেই শক্তি অনুভব করি যাহা আমাকে সংসারে মাথা নীচু করিয়া অপরাধীর মত চলিতে দেয় না। আমি হয়ত ভুল করিতে পারি কিন্তু নীচতা যে দেখাই নাই এটুকু দয়া করিয়া বিশ্বাস করিবেন।

যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে মেঘনাদবধের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের তারতম্য ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন্‌কোঅপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য 'সত্যের আহ্বান' করিয়াছিলেন তিনিই যদি আজ লোকে স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চরবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দৈব দুর্ব্বিপাকে প্রবাসী ও শনিবারের চিঠির সহিত আমি যুক্ত বলিয়াই কি আমার নিজস্ব মতামত সমস্তই প্রবাসী ও শনিবারের চিঠির মতামত? আমি একেলা প্রবাসী অথবা শনিবারের চিঠি নহি। সৌভাগ্যের বিষয় নব পর্য্যায় শনিবারের চিঠি প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত

হইবার ঠিক দেড়মাস পূর্ব্বে 'নটরাজে'র সমালোচনাটি লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং মাসিক শনিবারের চিঠি[র] সহিত ইহার যে কোনো যোগ নাই তাহা প্রমাণ করিতে পারিব। আর প্রবাসীর বিষয়ে আমি এইটুকু বিশ্বাস করি যে প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়কে আপনি এত ভালো করিয়া জানেন যে প্রবাসীর সহিত এই প্রবন্ধের সম্পর্ক পাতাইয়া যে জনরবের সৃষ্টি হইতেছে তাহার কদর্য্যতাও আপনি বুঝিতে পারিবেন। বাংলাদেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন। আমার ভয় হয় পাছে যাঁহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকেন তাঁহাদের মতামতের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন।

'নটরাজ' গীতিনাট্য আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ওই মাসের শেষের দিকে আমার প্রবন্ধ লিখিত হয়। আমার পরিচিত কয়েকজন সাহিত্যরসিক বন্ধুকে উহা পড়িয়া শোনাই। তাঁহারা প্রবন্ধটিতে আপনার প্রতি কোনো অসম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ মনে করেন নাই। সুতরাং প্রবন্ধটি ছাপাইবার পক্ষে আমি কোনো বাধা দেখি না। প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার জন্য দুই এক জায়গায় চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই নাই। আমার এক বন্ধু শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহা আমার নিকট হইতে লইয়া অন্য কাহারও লেখা বলিয়া 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দেয়। 'কালিকলম' সম্পাদক মুরলীধর বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ে উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহারা প্রবন্ধটি সুলিখিত ও ছাপিবার উপযুক্ত এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু কালিকলম সম্পাদকের নিকট হইতে নানাকারণে আমি লোক পাঠাইয়া প্রবন্ধটি ফেরৎ লই। প্রবন্ধটি যে আমার লেখা তাহা তাঁহাদিগকে (কালিকলম) জানানো হয় নাই, তাঁহারা আঁচে বুঝিয়া থাকিবেন। ইহার পর প্রবন্ধটি পড়িয়া থাকে, আমি উহা প্রকাশের কোনো চেষ্টা করি নাই।

কিছুদিন পরে আমার পরিচিত উক্ত অরসিক রায় প্রবন্ধটি শুনিয়া বলে যে যদি আমি প্রবন্ধটি তাহার নামে (অর্থাৎ অরসিক রায় এই নামে) ছাপিতে অনুমতি দিই তাহা হইলে সে 'আত্মশক্তি'তে তাহা ছাপাইতে পারে। আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কোনো কারণ দেখি না। ফলে ৯ই ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ সংখ্যা 'আত্মশক্তি'তে প্রবন্ধটি বাহির হয়। নব পর্য্যায় শনিবারের চিঠি প্রথম সংখ্যা ১৩ ভাদ্র বাহির হয়।

ইহাই হইল প্রবন্ধ প্রকাশের ইতিহাস। ইহার মধ্যে কাহারো কোনো প্ররোচনা বা আমার নিজেরও কোনো 'মতলব' ছিল না। আমি এরূপই জানিতাম। এখন দেখিতেছি প্ররোচনা একের নহে, অনেকের ছিল এবং আমারও বহু 'মতলব' নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা আমি প্রবাসী অফিসে চাকুরী করিয়া ওরূপ প্রবন্ধ লিখিব কেন? শনিবারের চিঠির সহিতই বা যুক্ত থাকিব কেন?

আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহু বর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদেরও ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্ততঃ, আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ এবং এতকালের খোরাকও তিনিই জোগাইতেছেন। আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলেই আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অন্ততঃ সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।

আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

৩
৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫/২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা
৫. ৯. ৩৮

শ্রীচরণেষু,

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের পত্র অনুযায়ী আপনি যে স্বস্তিবচন লিখিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা এখনও পাই নাই[1]। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণন আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর [২৪ ভাদ্র ১৩৪৫] শনিবার প্রাতে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন। আপনার স্বস্তি-বচন সর্বাগ্রে পঠিত হইবে। আমরা শুক্রবার বৈকালে মেদিনীপুর রওয়ানা হইব ; আপনার লেখাটি যদি কাল-পরশুর মধ্যে পাঠাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। উহা বাঁধাইয়া স্মৃতি-মন্দিরে টাঙানো হইবে, সুতরাং বড় কাগজে বড় বড় অক্ষরে একটু বেশী লেখা আশা করিতেছি।

আর একটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা আপনাকে মুখে জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম। দূরে আসিয়া লোভ সামলাইতে পারিতেছি না। আশ্বিন মাস হইতে আমার সম্পাদনায় ‘অলকা’ নামে একটি মাসিক পত্র বাহির হইবে ; পত্রিকাটির আর্থিক দায়িত্ব সার এন. এন. সরকারের[2] এক পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের। এটিকে সিনেমা এবং পলিটিক্স বর্জ্জিতভাবে সম্পূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা করিবার ইচ্ছা আছে, ঠিক ‘অমনিবাস’ ধরণের পত্রিকাও হইবে না। আপনার ‘মুক্তির উপায়’ নাটিকাটি শুনিয়া অবধি উহা দিয়াই পত্রিকা সুরু করিবার অত্যন্ত লোভ হইয়াছে। আমি খুব মনোযোগের সহিত উহা শুনিয়াছি এবং

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আপনাকে বলিতেছি যে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম অথবা ওই জাতীয় কোনও প্রতিষ্ঠান সকল ত্রুটি ও শৈথিল্য সত্ত্বেও আপনার আক্রমণ গায়ে পাতিয়া লইয়া আন্দোলন করিবে না। আপনার রচনাটি অনাবিল হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া সাধারণভাবে গুরুগিরির বিরুদ্ধে একটা ইঙ্গিতমাত্র করে ; উহাতে কাঁটা বা ঝাল নাই। নাটিকাটির প্রকাশে আপনার বিরুদ্ধে কোনও দিক দিয়া ক্ষোভের উদয় হইবে না, ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি। বাঙালী পাঠক বা শ্রোতা হাসিবার অবকাশ বড় বেশী পায় না, এই নাটিকাটিতে আপনি দুতিন ঘণ্টার জন্য যে নির্ম্মল হাসির খোরাক জোগাইয়াছেন, অনির্দ্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যক্তিকে আঘাত হইতে বাঁচাইতে গিয়া বাঙালী জাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার আপনার নাই। উহার প্রকাশের দাবী আমি অকুণ্ঠিত মনে আপনাকে জানাইতেছি। ‘অলকা’কে যদি কৃপা করা সম্ভব হয়, আমি যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া ছাপিব এবং অন্যান্য কথা কিশোরীদার[৩] সহিত ঠিক করিয়া লইব। ইহার জন্য যদি আপনি প্রয়োজন বোধ করেন, আমি পুনরায় শান্তিনিকেতন যাইতে পারি।

‘মুক্তির উপায়’ যদি না হয় তাহা হইলে ‘অলকা’র প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার জন্য আপনার অন্য কোনও রচনা প্রার্থনা করিতেছি ; আশা করি বঞ্চিত হইব না। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে কাগজ বাহির করিতে হইবে, অবিলম্বে ছাপা সুরু করা আবশ্যক। আপনার একটা কথা না পাইলে আমি তাহা করিতে পারিতেছি না।

আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

৪
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
* ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

VISVA-BHARATI
210, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

Phone REGENT 537.

14. 9. 1938

শ্রীচরণেষু,

'মুক্তির উপায়' এখনও পাই নি, বড্ড ভাবিত আছি।

আজ আপনার নামে আমার 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে'র ২য় অংশ পাঠিয়েছি। আশাকরি, অবসর মত দেখবেন।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি
প্রঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

Dr. Rabindranath Tagore
Santiniketan P.O.
Bribhum
(E I Rly Loop)

৫

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫/২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা
২৬. ৯. ৩৮

শ্রীচরণেষু,

আজ দু কপি 'অলকা' আপনার নামে পাঠান হয়েছে। আর কয় কপি চাই আমাকে জানিয়ে দেবেন।

'বাংলা কাব্য পরিচয়ে'র কাজ আরম্ভ করেছি। একমেটে নির্বাচন হলেই একবার আপনাকে দেখিয়ে আসব[১]। আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা' ত্রৈমাসিকে[২] বুদ্ধদেব বাংলা কাব্য পরিচয়ের একটা আলোচনা করেছেন। ওতে আমাদের কিছু সাহায্য হবে।

আপনি কি সমস্ত ছুটিটাই বোলপুরে থাকবেন?

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

৬
৩০ অক্টোবর ১৯৩৮

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
৩০. ১০ ৩৮

শ্রীচরণেষু,

সুধীদার[১] নির্দ্দেশমত আমরা[২] আগামী শনিবার[৩] সন্ধ্যায় যাওয়াই স্থির করিয়াছি, রবিবার সকালে আপনার সহিত দেখা হইবে।

১৫০্ টাকার একটি চেক এই সঙ্গে পাঠাইলাম। 'অলকা'র যৎসামান্য মাসিক বরাদ্দ হইতে আপনার উপযুক্ত দক্ষিণা জোগাইতে পারিলাম না বলিয়া সঙ্কুচিত আছি।

আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত

পুঃ অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা হয়, বহুদিন রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে বহু প্রশ্নও মনে জমা হইয়া আছে কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য স্মরণ করিয়া সংযত হইতে হয়। এও এক দুর্ভাগ্য!

রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫ নভেম্বর ১৯৩৮, শান্তিনিকেতন।
শম্ভু সাহা গৃহীত আলোকচিত্র শ্রীমতী উমারানী দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৭
২ নভেম্বর ১৯৩৮

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

২/১১/৩৮

শ্রীচরণেষু,

নাচনের চিঠির নকল যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। আসলটা আমি ব্যবহার করছি।[১]

শনিবার বেলা বারোটায়[২] আমরা[৩] শান্তিনিকেতন পৌঁছব। সুনীতি বাবু[৪] নিগ্রো আর্ট সম্বন্ধে একটা সচিত্র বক্তৃতা ওখানকার ছেলেদের কাছে দিতে চান। স্লাইড প্রস্তুত আছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে আমি নন্দবাবুকে[৫] আজ চিঠি দিলাম।

আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি প্রঃ শ্রীসজনীকান্ত

৮
১০ নভেম্বর ১৯৩৮

VISVA-BHARATI BOOK-SHOP

Telephone
REGENT-537

210, CORNWALLIS STREET
CALCUTTA

১০. ১১. ৩৮

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে অসুস্থ দেখে এসেছি[১], খুব চিন্তিত আছি। আমি কাব্যপরিচয়ের মধ্যযুগ সম্পূর্ণ করে এনেছি, এবার আদিযুগ শেষ

হলেই কিশোরীদাকে[২] কপি দেব। রবীন্দ্রোত্তর যুগের একটা খসড়া নিয়ে আপনার ট্যাড়াসই নিয়ে আসব, ওখানে আমারও ভয় আছে আমি নিজে ওর মধ্যে আছি ব'লে[৩]। নিজেকে বাদ দিতে পারলে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম।

'মুক্তির উপায়' মঞ্চায়িত হবার আগে খবর পেলে যাব[৪], নাটকটির সঙ্গে পরোক্ষে আমি কেমন যেন জড়িয়ে গেছি।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণত সজনীকান্ত

৯
১৭ নভেম্বর ১৯৩৮

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
১৭. ১১ ৩৮

শ্রীচরণেষু,

কাল,[১] ঢাকা হইতে ফিরিয়া আপনার পত্র[২] পাইয়াছি। এবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার[৩] প্রথম প্রবন্ধ আপনার ভাষা পরিচয়ের ভূমিকা। প্রুফ পাঠাইলাম।[৪] সম্বোধনের জায়গাগুলি একটু বদল করিয়াছি বড় ছোট হইয়াছে। আর একটু বাড়ানো সম্ভব হইলে বড় ভাল হইত।

প্রুফটা শীঘ্র ফেরত পাইলে ভাল হয়।

আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণতঃ সজনীকান্ত

১০
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ফোন : বড়বাজার ৬৩৭
শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫/২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা
৩/১২/৩৮

শ্রীচরণেষু,

আপনার মার্জ্জিনাল-মন্তব্য[১] সমেত আপনার নিকট এলাহাবাদের কোনও পত্রলেখিকার পত্রের প্রথমাংশ হস্তগত হ'ল। 'কাব্য পরিচয়' সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানা রইল। তবে সুরেন্দ্রনাথ সেন[২], গুরুসদয় দত্ত[৩] হজম হবে না। 'ছোট-গল্প-পরিচয়' লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় বেশ ভালই হবে, তাতেও বিপদ কম নয়। সুফিয়া হোসেনের কবিতা দেখছি।[৪]

আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবারে[৫] আমাদের নির্ব্বাচন সমিতির দরবারে পেশ করে তাঁদের অনুমতি পেলে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিয়ে আপনাকে দেখিয়ে আসব।

'কাব্য-পরিচয়' ব্যাপারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছি, যারা সত্যিকার কবিতা লিখতে পারে না তারাই ক্ষেপেছে বেশী।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত

পুঃ আপনার ইংরেজীতে ছাপা সমস্ত চিঠিগুলো বিশেষ প্রয়োজনে আমার দরকার। অথচ কলকাতার বাজারে বা বিশ্বভারতীর অফিসে পেলাম না। কিছুদিনের জন্যে ওখান থেকে আনানো কি সম্ভব হবে?

কিশোরীদার[৬] মুখে শুনলাম মাসীমার[৭] কাছে লেখা আপনার চিঠি ছাপা হচ্ছে। আসলে চিঠির ওপর খুব বেশী অত্যাচার করবেন না, এই আমার অনুরোধ।

১১
১৩ অক্টোবর ১৯৩৯

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
১৩. ১০. ৩৯

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র[১] পেয়েছি। মেদিনীপুরের ব্যাপার[২] নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতেই কথা বল্‌ব।

কার্ত্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে[৩] "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" সুরু করেছি। আজ আপনাকে এক সংখ্যা পাঠিয়েছি। আপনি একবার পড়ে দেখবেন। যদি কোথাও কোনও অসঙ্গতি থাকে জানতে পারলে সংশোধন করব। ভারতী, বালক, প্রচার, নবজীবন, সাধনা, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, সবুজপত্র, প্রবাসী— এর প্রত্যেকটিতেই আপনার লেখা আছে, অথচ নাম নেই, সেগুলির তালিকা এক জায়গায় করাই আমাদের বড় কাজ। সুতরাং আপনার দেখাটার ওপর এত জোর দিচ্ছি।

আপনি কবে নাগাদ কলকাতা আসতে পারবেন জান্‌তে পারলে সেসময় আমি কলকাতায় থাকব।[৪]

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত

১২
[১৭ অক্টোবর ১৯৩৯]

Sanibarer Chithi

25/2 Mohan Bagan Row
Calcutta
[১৭. ১০ ৩৯]

[শ্রীচরণেষু]

সেই সময়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঘাঁটিয়া দেখিতেছি, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র"[১] নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম নয় কল্পে জ্যোতিষ-বিষয়ে অন্য কোন প্রবন্ধ নাই। ১৭৯৫ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আপনি আপনার পিতৃদেবের সহিত ড্যালহৌসি পাহাড়ে ছিলেন। সুতরাং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়া থাকিলে এই সুবৃহৎ প্রবন্ধই আপনার লিখিত প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ —'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫ তারিখে প্রকাশিত আপনার নামাঙ্কিত সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "হিন্দু মেলার উপহার" কবিতারও প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ইহা মুদ্রিত। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতেছি, ইহা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ কোনও প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তির লেখা— পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক বহু আঙ্কিক সিদ্ধান্তও ইহাতে আছে। তৎকালে অঙ্কে আপনি এতখানি পাকা থাকিলে পরবর্তীকলে কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিশ্চয়ই পাইতাম না।...

[সজনীকান্ত দাস]

১৩

২৯ নভেম্বর ১৯৩৯

Sanibarer Chithi

Phone : By 637
25/2 Mohanbagan Row
Calcutta

২৯ ১১. ৩৯

শ্রীচরণেষু,

আজ সকালে সুধাদার[1] সঙ্গে মেদিনীপুর যাওয়া নিয়ে কথা হল, আপনার ইচ্ছামত বন্দোবস্তই করা হচ্ছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে রাজা ও রাণী ও বিসর্জ্জনের পাঠভেদ দেওয়ার নির্দেশ[2] দিয়েছেন দেখলাম। রাজা ও রাণী প্রথম খণ্ডেই ছাপা হয়ে গেছে, বিসর্জ্জনের পাঠভেদ দিতে গেলে ২য় খণ্ড প্রকাশে দেরী হবে। সুতরাং এখণ্ডটিকে খণ্ডিত করে বের করতে হবে। ভবিষ্যতের খণ্ডগুলি যাতে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে বের হয় এখন থেকে তার আয়োজন করা উচিত। অনেক দিক ভেবে দেখবার আছে, যেমন গানগুলো কোন্ খণ্ডে কিভাবে দেওয়া উচিত[3] ; আপনার পরবর্ত্তী যে সব লেখা ভুলক্রমে বর্জ্জিত হয়েছে সেগুলি পরিশিষ্ট-খণ্ডে যাবে না মূল রচনাবলীতে যুক্ত হবে ইত্যাদি। আমার মনে হয়, আপনার সামনে সম্পাদক-সঙ্ঘের একবার মোকাবিলা হওয়া আবশ্যক এবং একটা পাকাপাকি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি খাড়া করে সেই অনুযায়ী তৃতীয় খণ্ড থেকে কাজ হওয়া উচিত। না হলে গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়ে চলতেই থাকবে। এই আলোচনা যথাসম্ভব শীঘ্র হলে ভাল হয়।

পরিশিষ্ট খণ্ডগুলির কাজ আমি করছি, কপি অনেকখানি প্রস্তুত হয়েছে।

আপনার আরও অনেকগুলি লেখা বের হয়েছে, সেগুলি এবং ভাণ্ডার বঙ্গদর্শন সাধনা প্রভৃতি পত্রিকাগুলি আপনাকে দেখিয়ে নেওয়া আবশ্যক। কোন্ দিন গেলে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না জান্‌তে পারলে আমি হাজির হব। ইতিমধ্যে একটি প্রশ্নের জবাব জানতে পারলে ভাল হত। মানসীর প্রথম সংস্করণের (২য় সংস্করণেরও) ভূমিকায় লেখা আছে...“শেষ উপহার” নামক কবিতাটি আমার কোনো বন্ধুর রচিত. এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছি। মূল কবিতাটি এইখানে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল— কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদূরপ্রবাসে থাকা প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না।” ভূমিকাটি লিখেছিলেন ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে। কবিতাটির প্রথম দুই লাইন এই—

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি

মূল কবিতাটি কার এবং ওটি কোথায় পাওয়া যেতে পারে জানতে পারলে ভাল হয়।[৪]

বিদ্যাসাগর. স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদঘাটন উৎসবে আপনার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার কথা বলেছিলাম, আপনি চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে দুই এক পংক্তি বলা যদি সম্ভব হয় তাহলে রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীনেদেরও কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটতে পারে।

পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে[৫] সামান্য কিছু লিখে দিলে আমরা তা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ করে ছাপতে পারি এবং দৈনিক কাগজেও তা প্রকাশ করে প্রচারের কিছু সুবিধা করতে পারি।

চৈতন্য লাইব্রেরির কর্ত্তৃপক্ষকে একটা চিঠি দেওয়ার কথা ছিল।

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রঃ সজনীকান্ত

১৪

৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯

Sanibarer Chithi

Phone : Bz 637
25/2 Mohanbagan Row
Calcutta

৫/১২/৩৯

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র[1] এবং আজ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী[2] সম্বন্ধে আপনার অভিমত পেলাম। হাওড়ায় গাড়ীতে রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্বন্ধে যে বৈঠকের কথা হয়েছিল কলকাতা করপোরেশনের খাদ্য এবং পোষ্টাই প্রদর্শনীর[3] ঠেলায় তা আর সম্ভব হবে না মনে হচ্ছে।

মেদিনীপুরে[4] আপনার অভিভাষণটি (আপনার অভিভাষণের পর) কর্ত্তৃপক্ষ ছাপার আকারে বিলি করতে চান ; ছাপবার ভার পড়েছে আমার ওপর সুতরাং সেটি অবিলম্বে পেলে আমি কাজ আরম্ভ করতে পারি।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি অনুবাদ কবিতা আছে, নকল করে পাঠালাম। এ সম্বন্ধে আপনার কি কিছু স্মরণ আছে?[5]

তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্ব্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকাশং।
হিণ্ডীরপাণ্ডবরুচিঃ শসলাঞ্ছনোঽয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবন মুজ্জিহীতে।

স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।

বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে।

তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি, সাগরে তরঙ্গতুলি,
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে।

পর্ব্বতকন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগনের গায়॥

গতবারের শনিবারের চিঠিতে "ফের্ডিনা ভেলেসেপ্ এবং সুয়েজের খাল" প্রবন্ধটি সংশয় চিহ্ন সমেত রবীন্দ্র রচনাপঞ্জীর তালিকায় প্রকাশ করেছিলাম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী' পুস্তকে ওটি স্থান পেয়েছে, সুতরাং সংশয় আর নাই।[৬]

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

আমি ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বোলপুর পৌঁছব।[৭]

টেলিগ্রাম

১৫
* ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯

Handed at Calcutta
(Office of Origin)

Date/Hour/Minute
14/12/50
Santiniketan

To Rabindranath

Reaching Bolpur this evening everything ready.[১]

Sajani

১৬
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

Sanibarer Chithi

Phone : BZ 637
25/2 Mohan Bagan Row
Calcutta
১০/১/৪০

শ্রীচরণেষু,

ইংরেজী স্বত্ববহির্ভূত রচনা সম্বন্ধে চারুবাবুর[১] সঙ্গে কথা হয়েছে, একটি ভ্যলুম করার বাসনা আমাদের সকলেরই আছে। লেখাগুলি সংগ্রহ করা আছে কি? কতটা জায়গা নেবে সেটা হিসেব করা দরকার।

রবিবার[২] সকালে যাওয়ার কোনও বাধা আছে কি না অনিলবাবুর[৩] কাছে জানতে চেয়েছি। অনুমতি পেলে বেলা ১২টায় পৌঁছব। মাত্র দেড় ঘণ্টা দুঘণ্টার কাজ আছে।

আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

'মনোরমা'[৪] সম্বন্ধে আপনার অভিমত মাঘের 'প্রবাসীতে' ছাপিয়ে দিয়েছি।

১৭
১৮ জানুয়ারি ১৯৪০

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
১৮/১/৪০

শ্রীচরণেষু

ডক্টর হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের[১] সঙ্গে কাল দেখা হয়েছে। তিনি বিশেষ করে আপনাকে জানাতে বললেন, এই ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ পদের জন্যে অমিয়বাবুর[২] একটি দরখাস্ত যেন নিশ্চয়ই ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছয়। তিনি মে মাসে অবসর গ্রহণ করবেন। তখনই লোক নেওয়া হবে। সিরাজ-উদ্দৌলা বিভাগ মিঃ জুহির নামক একজন সগোত্রীয়কে ঢোকাবার চেষ্টায় আছেন। তাঁর ডিগ্রী ইত্যাদি অমিয়বাবুর চাইতে অনেক

খাটো। তিনি নিজে (ডক্টর মুখোপাধ্যায়) নির্ব্বাচন সমিতিতে থাকবেন, শ্যামাপ্রসাদ[৩] বাবু[ও] আছেন। তিনি অমিয়বাবুকেই নির্ব্বাচন করবেন। আপনি যদি শ্যামাপ্রসাদবাবুকে এ বিষয়ে বলেন এবং কাউকে দিয়ে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষকে[৪] ধরাতে পারেন তাহলে তাঁর বিশ্বাস অমিয়বাবুর চাকরি হবে [।] ৩১শে জানুয়ারি দরখাস্ত পেশের শেষ দিন।

অবচেতন মনের আর একটি সচিত্র কবিতা আপনার কাছে পাওনা আছে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।[৫]

শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন[৬] কলকাতায় এসেছিলেন দেখা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বাংলার লাটবাহাদুর মেদিনীপুরে শুভ পদার্পণ করবেন, সেজন্যে তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। তিনিই সুকৌশলে লাট সাহেবকে ঝাড়গ্রাম রাজের[৭] স্কন্ধে চাপাচ্ছেন, সুতরাং তাঁরও অবস্থা সর্ব্বরকমে কাহিল। ও ভূত না নাম্‌লে ওঁদের বোলপুর-যাত্রা নিষ্ফল হবে।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

১৮
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
৩. ২. ৪০

শ্রীচরণেষু

আপনার সমন পাইলাম।[১] আপনাকে বিপন্ন করিবার বাসনা এতটুকুও নাই। পুলিনকে[২] ঠেকাইবার জন্য যথাসময়ে হাজির হইব।

পুলিন ও অমিয়বাবু[৩] সম্ভবতঃ কাল রবিবার[৪] সন্ধ্যার ট্রেনে পৌঁছিবেন ; আমার সকালের ট্রেনে অর্থাৎ বেলা ১২টায় পৌঁছিবার ইচ্ছা ; যদি কোনও কারণে ঐ ট্রেনে না যাওয়া হয়, সন্ধ্যায় সকলেই একসঙ্গে পৌঁছিব। সকালে গেলে একটু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব সেইজন্য সকালের ট্রেন ধরিবার চেষ্টা করিব।

আমার একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে। অমিয়বাবু চাকরীর জন্য দরখাস্ত দিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার রচনার একটু পাব্‌লিশিটি হইলে কাজে লাগিবে। আপনি যদি তাঁহার খসড়া[৫] ও একমুঠো[৬] র উপর কিছু লিখিয়া দেন তাহা হইলে উপকার হইবে।

অন্যান্য কথা সাক্ষাতে বলিব। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

পুঃ রুগ্ন [রুগ্‌ণ] সুধাকান্তদা'র সহিত টেলিফোনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি রঞ্জন রশ্মির কবলে পড়িয়াছেন।

১৯

১২ মার্চ ১৯৪০

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলকাতা
১২/৩/৪০

শ্রীচরণেষু,

আপনার সামান্য পাঁচ ছত্রের পত্র[১] আমাকে পীড়িত করিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার আশা পূর্ণ করিতে না পারিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আর কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। ম্যানেজার দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের[২] সহিত দেখা করিয়াছিলাম তিনি সম্পূর্ণ আশা দিয়াছেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হইতে একটু সময় লাগিবে একথাও বলিয়াছেন। যিনি এইসকল সমৎস্য দীঘির খবরদারিতে ছিলেন তিনিই শেষ মুহূর্তে বেড়াজাল ফেলিয়া বহু কাৎলাকে ঘায়েল করিয়া গেলেন ; খাবি খাইবার সময় নিশ্চয়ই দিতে হইবে।

ফুরসৎ পাইলেই হাজির হইতেছি[৩] ; ঢাকায় দুটি রেডিও-বক্তৃতা এবং রংপুরে ও বাঁকুড়ায় দুটি সভাপতিত্ব খাঁড়ার মতো মাথার উপর ঝুলিতেছে। বাঁকুড়ার যেরূপ পরিচয় পাইলাম তাহাতে নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি[৪], কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

আমার অবচেতনার প্রার্থনা[৫] এখন চাপা থাকে। মাছিতত্ত্ব[৬] পাইয়াছি এবং পাইয়া খুশী আছি। নিজেই সময়ে অসময়ে এত ভন্‌ভন্ করিয়াছি যে উহারই মধ্যে আত্মদর্শন করিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি।

প্রণাম জানিবেন।

ইতি সজনীকান্ত

[illegible]
২২/৭/৩০

শ্রীচরণেষু,

আপনার [illegible]

[illegible]

[illegible] এখন [illegible]

[illegible]

প্রণাম জানিবেন

[illegible]

২০
১৮ মার্চ ১৯৪০

মেদিনীপুর
১৮/৩/৪০

শ্রীচরণেষু,

মেদিনীপুর আসিয়াছি এবং ঝাড়গ্রামের[১] সহিত দেখা করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন। এ যুগের মানুষকে এবং বিশেষভাবে জমিদার শ্রেণীর মানুষকে যদি বিশ্বাস করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমরা আপাতত এই প্রতিশ্রুতিতেই নিশ্চিন্ত থ্যাকিতে পারি। তবে কথাবার্ত্তায় যে রূপ বুঝিলাম, উঁহাদের ইচ্ছা, আমরা তাঁহাদের নিকট কোনও একটা "definite proposal" উপস্থিত করি। আমি বোলপুর গিয়া অনিলবাবুর[২] সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে চিঠি লিখিব।

আমি আজই কলিকাতায় ফিরিতেছি, বৃহস্পতিবার[৩] রাত্রে ঢাকা যাইব এবং সোমবার[৪] সকালে সেখান হইতে ফিরিব, আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রঃ সজনীকান্ত

২১
২৮ জুন ১৯৪০

Sanibarer Chithi

Phone : Bz 637
25/2 Mohanbagan Row
Calcutta
২৮/৬/৪০

শ্রীচরণেষু,

আপনার ওষুধ[১] খেয়ে অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি— এখন মাথাটা মাঝে মাঝে খালি খালি ঠেকে, লিখতে পড়তে ইচ্ছে যায় না। এই উপসর্গটা দূর করবার জন্যে যদি একটা ওষুধ দেন ভাল হয়। ডিউয়িরᅟ[২] বইয়ের দাম ৯॥০ টাকা, কেনা সাধ্যের মধ্যে নয়।

কাগজে দেখলাম আপনি শীঘ্র নামছেন[৩]। কবে আসবেন যেন জানতে পারি। আপনার ওষুধের প্রত্যক্ষ ফল দেখলে আপনি খুসী হবেন।

শুনলাম আপনার শরীর আশানুরূপ ভাল যাচ্ছে না, শুনে চিন্তিত আছি।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রঃ সজনী

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পরিচয়

> "বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
> অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
> শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
> মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
> নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া আশ্রয়—
> অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?"

উদ্ধৃত অংশটি সজনীকান্ত দাসের "মর্ত্য হইতে বিদায়" কবিতা থেকে গৃহীত। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সালে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই কবিতাটি রচনা করেন। এবং কবিতাটি, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শোকসভায় পঠিত হয়।

বড়োই বিস্ময় জাগে যখন মনে পড়ে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'র কয়েকটি সংখ্যার কথা, যেখানে সজনীকান্তের 'শ্রীচরণেষু', 'হেঁয়ালি' ও 'ভ্রান্তি'র মতন কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত প্রসঙ্গ, এত বছর পরেও, আজও বাংলা সাহিত্যে একটি অতি-বিতর্কিত ও আলোচিত সমালোচনার বিষয়।

সজনীকান্ত দাস—জন্ম : বর্ধমানস্থ বেতালবন গ্রামে, মাতুলালয়ে ৯ ভাদ্র ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (২৫ অগস্ট, ১৯০১)। পিতা হরেন্দ্রলাল দাস ও মাতা তুঙ্গলতা দেবী।

ব্যঙ্গসুনিপুণ সমালোচক-সম্পাদক হিসেবে সজনীকান্ত বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দা'ঠাকুরের ভাষায় তিনি ছিলেন 'নিপাতনে সিদ্ধ'। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে রবীন্দ্রভক্ত।

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-জীবনের কোনো কাজই সজনীকান্তের সম্পূর্ণ হত না।

কিন্তু সজনীকান্ত একসময় রবীন্দ্র-বিদূষণে শালীনতার সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করেছিলেন। সারস্বত জীবনের উত্তরপর্বে রবীন্দ্রনাথ মর্মান্তিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন সজনীকান্তের কাছেই।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম স্নেহ বশে তাঁর এই 'রাবণ-ভক্ত'টির চিত্ত জয় করেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা অকৃত্রিম আন্তরিকতায় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

গুরুশিষ্যের এই ব্যক্তি-সম্পর্কের উত্থানপতনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা কতকগুলি পর্বে বিন্যাস্ত হয়েছে।

ক. শৈশবে ও কৈশোরে সজনীকান্তের চিন্তায়-মননে রবীন্দ্রনাথ :

সজনীকান্ত তখন বছর নয়-দশের বালক মাত্র, মালদহ জেলা ইস্কুলে পাঠরত, এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশে একদিন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলিত একখানি বই তাঁর হস্তগত হয়। গোড়া থেকে বইটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে পড়তে হঠাৎ একটি কবিতা চোখে পড়ে যায় সজনীকান্তের। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা—

"দিনের আলো নিবে এল, সূর্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।'

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন—'সামান্য একটি কবিতা, ধরন-ধারণ যে খুব অচেনা তা নয়, কথাগুলাও নূতন নয়— কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা নূতন রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল।

এ যেন একান্ত আমারই কথা। এমন করিয়া আমার মনের কথা এতদিন পর্যন্ত তো আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই! তলায় নাম

দেখিলাম— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুমন্ত্রের মত সেই নাম জপমন্ত্র হইল। কবিতাটিও মুখস্থ হইয়া গেল।” (‘আত্মস্মৃতি’, সুবর্ণরেখা সংস্করণ পৃ. ১২-১৩)

সজনীকান্ত বলেছেন, তাঁর জীবনের বাণীসাধনার এখানেই সূত্রপাত।

শৈশবে সজনীকান্ত তাঁর বড়দাদার কাছ থেকে যোগীন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত একখণ্ড ‘সরল কৃত্তিবাস’ * উপহার পেয়েছিলেন। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সরল কৃত্তিবাসের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার তিনি কবির লেখার সঙ্গে পরিচিত হলেন। এর পরবর্তীকালে সজনীকান্তের হস্তগত হয় ‘কথা ও কাহিনী’, যাকে তিনি অভিহিত করেছেন ‘বাল্যে শ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার’ বলে। বালক সজনীকান্তের কল্পনা-রাজ্য জুড়ে ছিল রামায়ণ ও মহাভারত। এ ছাড়া ছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলনগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের ‘কথা ও কাহিনী’ এবং ‘শিশু’।

স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে সজনীকান্ত বাঁকুড়া কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় রাজনৈতিক কারণে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েও বাঁকুড়ায় নির্বাসিত হলেন। বাঁকুড়া কলেজে, হস্টেল জীবনের কর্মসূচী বলতে সজনীকান্তের ছিল— খাওয়া-দাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, কিছুটা মোড়লি এবং সুর করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করা। পিতা হরেন্দ্রলাল পুত্রের সাহিত্যচর্চাকে একেবারেই প্রশ্রয় দিতে চান নি। অতএব ছাত্রাবস্থায় বই খরিদ করার মতন সংগতি সজনীকান্তের ছিল না। বাধ্য হয়ে সজনীকান্ত এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। সরকারি কাগজের খাতা বাঁধিয়ে সম্পূর্ণ বই নিজের হাতে নকল

---

* সরল কৃত্তিবাস অর্থাৎ কৃত্তিবাস-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ’, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

করেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের সতেরোখানি বই তিনি এইভাবে নকল করেছিলেন। এবং সেইসঙ্গে বইগুলি সজনীকান্তের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "কাব্য-কবিতা তো বটেই 'গোরার'র মতো বিপুলায়তন উপন্যাসেরও বহু অংশ পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারতেন।" ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৩)

১৯২৪ সালে সজনীকান্ত কিছুদিনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে সতেরোখানি তাঁর লেখা বই নকলের কথা জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরে বিস্মিত হন এবং বেশ কৌতুক বোধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—"নকলগুলি তখন পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল, আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন সে কথা পরে জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বহুমূল্য নকলগুলির কি দশা হইয়াছে তাহা আর জানিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত পরবর্তী যাবতীয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাকে বিনামূল্যে দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাতেই আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৩০)। বাঁকুড়া কলেজে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি বিশেষভাবে সজনীকান্তকে প্রভাবিত করে।

বাঁকুড়া কলেজে আই. এস্‌সি. পাঠ সমাপ্ত করে সজনীকান্ত ১৯২০ সালে কলিকাতাস্থ স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.এস্‌সি. ক্লাসে ভর্তি হলেন। প্রথম দিকে তিনি ডাফ্ হস্টেলে ছিলেন, পরবর্তীকালে

স্থানান্তরিত হলেন অগিলভি হস্টেলে।

সজনীকান্ত অগিলভি হস্টেলে থাকাকালীন শিবদাস রায়ের ব্যবস্থাপনায় ভাদ্র, ১৯২১, বোলপুর ভুবনডাঙার মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, শান্তিনিকেতন আশ্রম দল ও কলিকাতাস্থ অগিলভি হস্টেল দলের মধ্যে। তখন তরুণ সজনীকান্ত গোলরক্ষকের ভূমিকায় 'অগিল্‌ভি হস্টেল' দলভুক্ত ছিলেন। খেলার ফলাফল বর্ণনা করে সজনীকান্ত লিখেছেন—"খেলায় দুই গোলে হারিয়া ফিরিলাম বটে, কিন্তু জীবনের খেলায় সেই প্রথম গুরুদর্শনের দিন হইতেই যে-জিত হইল আজিও তাহার ফলভোগ করিতেছি।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৯)

সজনীকান্তের কলকাতায় প্রত্যাগমনের অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সদলবলে কলকাতায় আসেন— প্রধানত দুটি কারণে— কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে "সত্যের আহ্বান" পাঠ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথম 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব পালনে। সজনীকান্ত বর্ষামঙ্গলের অপূর্ব স্বপ্নময় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

অনতিবিলম্বে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১ (১৯ ভাদ্র ১৩২৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিতম বার্ষিক সংবর্ধনায় যোগ দেবার অবকাশ পেয়েছিলেন সজনীকান্ত। সেই রাত্রেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করে 'রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সজনীকান্তের স্বহস্তাক্ষরে হস্টেল ম্যাগাজিনভুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু এই পারমার্থিক কবিতাটি কবি সমীপে কীভাবে পৌঁছানো যায় এই নিয়ে সজনীকান্তের দুর্ভাবনা হয়। ওই বছরই ৭ই পৌষের উৎসবে সজনীকান্ত একাই শান্তিনিকেতন যান, উদ্দেশ্য তাঁর অর্ঘ্য কবির নিকট নিবেদন করা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে ফিরে আসতে হয় বিফল

হয়ে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় স্কুলজীবনে ‘গোরা’ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ স্বহস্তে নকল করবার সময় একটি বৈজ্ঞানিক ভুল তাঁর নজরে পড়েছিল, সজনীকান্তের ভাষায়, “মুদ্রাকরপ্রমাদ নয়, রবীন্দ্রনাথ সময়ের হিসাব না রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন।” (‘আত্মস্মৃতি’, সুবর্ণরেখা সংস্করণ পৃ. ৮১)

‘গোরা’র ষষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে ছিল,—“ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।”

‘মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে’ ছায়া দীর্ঘতর হতে পারে না— এই মর্মে তিনি কবিকে একটি পত্রযোগে সবিনয়ে তাই নিবেদন করেছিলেন সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত কবিতাটিও পাঠিয়েছিলেন। কবির উত্তর আসে ৫ মার্চ ১৯২২।

[দ্র. রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র সংখ্যা ১। সূত্র—১]

খ. ‘শনিগ্রহের মঙ্গল গ্রহ’

বি. এস্‌সি. পাঠ শেষ করে সজনীকান্ত প্রথমে গিয়েছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভের জন্য। কিন্তু দেড় মাস কাল সেখানে থেকে ভালো না লাগায় কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন এবং সেইসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে, সায়েন্স কলেজে পদার্থবিদ্যায় (তাপ) নিয়ে ভর্তি হলেন। স্নাতকোত্তর বিভাগে শেষ পরীক্ষার অব্যবহিতকাল পূর্বেই তাঁর সঙ্গে ‘শনিবারের চিঠি’র যোগানন্দ দাসের পরিচয় হয়— এবং তার পরেই তিনি পাকাপাকি ভাবে বিজ্ঞান সরস্বতীকে বিদায় দিলেন। এখানেই তাঁর কলেজী বিদ্যার সমাপ্তি ঘটে।

১৯২৪ সালের ২৬ জুলাই শনিবার (১০ শ্রাবণ, ১৩৩১) সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

অষ্টম সংখ্যায় সজনীকান্তের 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে 'আবাহন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

প্রথাগত পড়াশুনো অর্ধ পথে সমাপ্ত করে, সেইসঙ্গে অভিভাবকদেরও আর্থিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে, নিয়মিত ভাবে শুরু হল 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা। এই সময় তাঁর সম্বল ছিল দুটি টিউশনি থেকে আয় মাসিক ৪৫ টাকা। আত্মসম্মানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তন্মধ্যে একটিতে দিলেন ইস্তফা। ২৫ টাকা আয়, মেসের ঘর-ভাড়া চুকিয়ে দৈনিক ব্যয় অসাধ্য। অতএব ২৭নং বাদুড়বাগান লেনকেত বিদায় জানাতে হল। বাস্তুহারা সজনীকান্তকে এবার উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন কবি জীবনময় রায়। তিনিই সজনীকান্তকে নিয়ে গেলেন ১০নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, সেখানে বিশ্বভারতীর সদ্যস্থাপিত কার্যালয় ও গ্রন্থালয়। সেখানকার চারতলার একটি অব্যবহৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সজনীকান্তের আশ্রয় হয়।

বিশ্বভারতী কার্যালয়ের তৎকালীন কর্মসচিব কিশোরীমোহন সাঁতরা অসুস্থ থাকায়, বিশ্বভারতীর স্থানীয় কর্ণধার ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তাঁর অনুমতি ছাড়া সেখানে বসবাস সম্ভব নয়। কাজেই পরের দিনই জীবনময় রায় সজনীকান্তকে নিয়ে গেলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছে। এবং রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বিনিময়ে সেখানে থাকার অনুমতি পেলেন সজনীকান্ত। এখানে তাঁর প্রথম গ্রন্থসম্পাদনার কাজে হাতে-খড়ি হয়। ১২৯২ বঙ্গাব্দের 'বালক' থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ মিলিয়ে বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'রাজর্ষি (জানুয়ারি ১৯২৫) প্রকাশের কাজে জীবনময় রায়ের সহযোগিতায় তিনি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।

ইত্যবসরে একাদশ সংখ্যা শারদীয় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয় 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ'। যার শেষ কবিতা 'অসমছন্দ' তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিদ্রোহী কবিতা 'ব্যাঙ' প্রকাশিত হল।

একদিন গভীর রাতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ডেকে পাঠালেন সজনীকান্তকে— প্রশ্ন করেছিলেন : 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ' তোমার লেখা? সদর্থক উত্তর পেয়ে লেখার প্রশংসা করে বলেছিলেন, কিন্তু এসব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে বিশ্বভারতীর সেবায় পুরোপুরি লেগে গেলে কতকটা স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "সজনীকান্ত বিশ্বভারতীর সেবার চেয়ে শনিবারের চিঠির পরিচর্যাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, সুতরাং বিশ্বভারতীর আশ্রয় ত্যাগ করতে হল।" ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ২২)।

এবার তাঁর সহায় ও সঙ্গী হলেন যোগানন্দ দাস। অষ্টম সংখ্যা থেকেই সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র লেখক। কিন্তু সাতাশ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' ৯ ফাল্গুন ১৩৩১ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল। 'চিঠি'র পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সজনীকান্তের পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। এবং তাঁর এই আর্থিক সংকটের সময় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে, সজনীকান্তের জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

১৩৩১ অগ্রহায়ণ থেকে 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম-যাত্রার কাহিনী প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাঘ ১৩৩১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে তা বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ৫ ফাল্গুন ১৩৩১ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) দক্ষিণ আমেরিকা সফর সেরে দেশে ফিরেছিলেন। কবির দেশে প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীর সম্পাদকীয় তাগাদা শুরু হয়। এই সময় কবি

বলেছিলেন 'লেখা বীজাকারে তাঁর নোট বইতে আছে'... উপযুক্ত লেখক পেলে তিনি মুখে মুখে বলে তার সম্পূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম। প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ সজনীকান্তকে অনুলেখকের কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন। এই নিয়োগ ব্যবস্থার পশ্চাতে কিছু কারণ নিশ্চয় ছিল— প্রথমত সজনীকান্ত ১৯২১ থেকে কয়েকবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন, দ্বিতীয় কারণ, সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সভ্য হিসেবে নাম লিখিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ মহলে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছিলেন। তৃতীয় কারণ সজনীকান্ত বেশ কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলেখনের কাজটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

অনুলেখন দক্ষতার গুণেই সজনীকান্ত কবির কাছ থেকে শুনে শুনে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' লেখার গৌরব লাভ করেছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত মহলানবিশের অতিথি হয়ে, কলিকাতাস্থ আলিপুরের আবহাওয়া-দপ্তরের অধিবাসী। সজনীকান্তকেও এই কাজের জন্যে ওখানেই থাকতে হয়েছিল।

'যাত্রী' গ্রন্থের ১৩৫৩ কার্তিক সংস্করণে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সজনীকান্তের অনুলেখনের অংশ প্রায় অর্ধেক পৃ. ৯১-১৬৯। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' দুভাগে বিভক্ত— পূর্বার্ধের সময়-সীমা— ২৪ অক্টোবর ১৯২৪ থেকে ৭ অক্টোবর ১৯২৪। উত্তরার্ধ শুরু হয় তার চারমাস পর, সময়সীমা হল ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। সম্পূর্ণ উত্তরার্ধের অংশটুকু সজনীকান্তের অনুলিখন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সজনীকান্তের সমস্ত সংকটের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে সজনীকান্ত লিখেছেন —"শনি গ্রহের তিনি মঙ্গল গ্রহ।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৩১)

১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে সজনীকান্ত শান্তাদেবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন— রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে। ফিরে এসে একদিন কলিকাতাস্থ বিশ্বভারতী কার্যালয়ে গিয়ে জানতে পারলেন, রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্য-গ্রন্থ 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে। 'পূরবী' তিন ভাগে বিভক্ত—'পূরবী' অংশে হালী পুরাতন কবিতা, 'পথিক' অংশে নূতন ডায়রির কবিতা এবং 'সঞ্চিতা' অংশে হারাইয়া যাওয়া পুরাতন কবিতা। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন— "আধুনিক পুরাতন খুঁজিতে খুঁজিতে অতি পুরাতন অনেকগুলি কবিতাও আবিষ্কৃত হইল— অনেকগুলি স্বদেশী আমলের বিখ্যাত কবিতা যাহা এতাবৎকাল পরিত্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। আমার খাতায় নকল ছিল, আমিই সেগুলি সরবরাহ করিলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪৩)

গ. "শনিবারের চিঠি, আধুনিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ"

১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল'-এর প্রথম প্রকাশ। আধুনিক সাহিত্যের যে প্রবল জোয়ার দেখা দিয়েছিল—তারই কলধ্বনি শুরু হয় কল্লোলে। যদিও কল্লোল গোষ্ঠী বলতে বুঝতে হবে 'কালিকলম' 'ধূপছায়া', 'প্রগতি', 'উত্তরা' এবং কিছু পরবর্তীকালের 'পূর্বাশা'র লেখক গোষ্ঠীকেও। এঁরা ছিলেন এক নতুন ভাবধারায় যৌবনোচিত উদ্দামে উচ্ছ্বসিত মুক্তপ্রাণের সাহিত্য-রচনার স্রষ্টা। 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির' অনিবার্য পরিপূরক হল 'শনিবারের চিঠি'।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ (১৯২৪, ২৬ জুলাই) সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগানন্দ দাস ও কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র বেশ কয়েকটি সংখ্যায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতাকে ব্যঙ্গ করে কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র সংঘাতের সূত্রপাত হয় নজরুলকে কেন্দ্র করে।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' সাতাশ সংখ্যায় (৯ ফাল্গুন ১৩৩১) পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

পরবর্তী পর্যায় 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। অনিয়মিত কিছু সংখ্যা। প্রকাশের পর ১৩৩২-এর কার্তিক সংখ্যাতেই এই পর্যায় শেষ হয়।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি'র তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠে 'জুবিলি সংখ্যা', আষাঢ়ে 'বিরহ সংখ্যা' ও কার্তিকে 'ভোট সংখ্যা'। সমকালীন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয় 'বিরহ সংখ্যা'। এই সংখ্যাতে সজনীকান্ত লিখলেন 'Orion বা কালপুরুষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন একটি নাটক 'স্বর্গে Sensation ও একটি কবিতা 'বিরহ-বেদনা-বিশ্লেষণ'। 'শনিবারের চিঠি'তে পরবর্তীকালে অত্যাধুনিক সাহিত্য নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যে ঝড় উঠেছিল তার প্রথম কলধ্বনি যেন শোনা যায় ওই তিনটি রচনাতে।

'শনিবারের চিঠি' 'বিরহ সংখ্যা' প্রকাশের পাঁচ মাস পরে, পৌষ মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হল প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন। সেখানে অমল হোম "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধটি মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠে অমল হোম একেবারে মধুচক্রের মধ্যবিন্দুতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলেন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার জোয়ার এসেছিল তার পূর্বরঙ্গ রচিত হয় ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠে 'কল্লোল'-এ, বুদ্ধদেব

বসুর 'রজনী হল উতলা' গল্পে। পরের মাসে অর্থাৎ ১৩৩৩ আষাঢ়ের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-এর রচনা 'গাব আজ আনন্দের গান'। শ্রাবণের 'কল্লোল'এ যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক) লিখলেন 'পটলডাঙার পাঁচালি', ফাল্গুনের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' এবং ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ-এর 'কালিকলম'-এ নজরুলের 'মাধবীপ্রলাপ'। 'শনিবারের চিঠি'র বক্তব্যকে বহু রচনার মাধ্যমে স্পষ্টতর করেছেন 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামে মোহিতলাল মজুমদার। সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন তাঁদের অভিযোগ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ছিল না; তাঁদের অভিযোগ ছিল বিকৃত যৌনবোধের বিরুদ্ধে সজনীকান্ত ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ২৩ ফাল্গুন সাময়িক সাহিত্যের বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩ রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লেখেন "আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না।... সুসময় যদি আসে আমার যা বলবার বলব।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন— "এই সময়ে 'কবির মন ঋতুরঙ্গশালা'র মধ্যে ডুবিয়া আছে; তাই বোধহয় বিতর্কমূলক রচনায় মন গেল না।" ('রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ৩০৭)

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের ভাষ্য পাঠ করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ'-এ লিখেছেন ""রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।" হয়তো তাই! রসিকতার মর্ম বুঝে রবীন্দ্রনাথ অমল হোম ও সজনীকান্তকে সমর্থন করেই লিখলেন 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধটি। প্রচণ্ড বিতর্ক সৃষ্টিকারী এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিচিত্রা'য় শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে।

এই বিতর্কের প্রতিবাদ করে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় পরবর্তী সংখ্যার বিচিত্রায়। ১৩৩৪ ভাদ্র 'বিচিত্রা'য়

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখলেন 'সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা', ১৩৩৪ আশ্বিন 'বিচিত্রা'য় তার জবাবে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী লিখেছেন— "সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা বিচার"। তার পাল্টা জবাব দিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা বিচারের উত্তর'। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে লেখেন 'সাহিত্যের রীতিনীতি' প্রবন্ধটি— প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়।

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমস্তটা 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় নি। আধুনিক সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য রচিত হয় 'সাহিত্যে নবত্ব'। 'যাত্রীর ডায়ারি' শিরোনামায় ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 'বিচিত্রা'য় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখলেন 'কৈফিয়ৎ বা সাহিত্য-ধর্ম্মর সীমানা বিচারের উত্তর'।

এদিকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ৯ ভাদ্র নবপর্যায়ে মাসিক 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগানন্দ দাস ও সহকারী সম্পাদক সজনীকান্ত। এই পর্যায়েই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ হয় তীব্র।

রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ১৩৩৪, ২৩ পৌষ তারিখে লেখা এক পত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। পত্রখানি ১৩৩৪ মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

"শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে এই ক্ষমতাটা, আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে।"

"ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম

সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান— নব-নব হাস্যরসের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তি বিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।...” (‘আত্মস্মৃতি’, পৃ. ১৯২-৯৩)

এই সময় ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কর্মাধ্যক্ষ সজনীকান্ত।

এই চিঠিটি ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত হবার ফলে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত -সম্পাদিত ‘প্রগতি’ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘে প্রকাশিত হল একটি মন্তব্য। তার কিয়দংশ হল— “হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ‘শনিবারের চিঠি’তে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ পত্রিকায় তাঁহার এই চিঠিখানি কোনোদিন ছাপা হইবে এমন বিশ্বাস তাঁহার নিশ্চয় ছিল তাই তাঁহার ভাষা ঐ পত্রিকার সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া তদনুযায়ী অসংলগ্ন ও অসংযত হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে মজার কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ ‘শনিবারের চিঠি’র কুৎসিত ও জঘন্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে ‘আর্ট’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন! তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার নিকট হইতে আর্টের এহেন নবতন সংজ্ঞা পাইয়া আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।”

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের ‘কালিকলম’-এ বিরূপাক্ষ শর্মার ‘আর্টের আটচালা’ শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হল— “কবিগুরু ‘শনিবারের চিঠি’কে কোল দিয়েছেন। চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে কোল দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পতিতোদ্ধারের এমন প্রাণমাতান উদাহরণ আর বোধ করি পাওয়া যায় নি।”

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— “কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথকে ‘শনিবারের চিঠি’র ও ‘কল্লোল-কালিকলম’-

এর দুই দলের মধ্যে বুঝাপড়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত করাইলেন কয়েকজন অ-সাহিত্যিক— যাঁহাদের সহিত কোনো সাহিত্যগোষ্ঠীর সম্বন্ধ বা সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ে যাঁহাদের কোনো অবদান ছিল না। এই মধ্যস্থতায় প্রধান অংশগ্রহণ করিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দুই জন অধ্যাপক — প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও অপূর্বকুমার চন্দ।" (রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃ. ৩০৯)

জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ভবনে' বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে আধুনিক-সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়। ৪ চৈত্র ১৩৩৪ ও ৭ চৈত্র ১৩৩৪— এই দুই দিন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দিনের সভায় 'কল্লোল'-এর দল উপস্থিত ছিলেন ও 'শনিবারের চিঠি'র দল অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের বিবরণী ৬ চৈত্রের 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন— এই বিবরণী কল্লোল-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কারও লেখা হওয়াই সম্ভব। এই বিবরণী পড়ে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ৭ চৈত্র তিনি আবার সভা-আহ্বান করলেন। সেদিন সভার প্রারম্ভেই তিনি বললেন, "আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি।" (সাহিত্য-সমালোচনা, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)। তাই কবি দুই দিনের বক্তব্য স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে রাখেন। প্রথম দিনের বক্তব্য বৈশাখের (১৩৩৫) 'প্রবাসী'তে "সাহিত্যরূপ" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্য আলোচনার দ্বিতীয় দিনে দুই পক্ষই তাঁদের পাণ্ডাদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও উপস্থিতির তালিকায় ছিলেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অমল হোম, নীরদ চৌধুরী, সজনীকান্ত ও প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ও সাহিত্য রসিক।

দ্বিতীয় দিনের বক্তব্য ও বিবরণী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্যসমালোচনা' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ৪৯২-৫১২ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ দুটি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে আলোচনা-সভা উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বেশ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছিল। এই দিনে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শেষ হবার পর নানা জনে নানান প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং কবি সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনারীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইতিবাচক প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরে 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা সম্পর্কে বলেছিলেন— " 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্বও অত্যন্ত বেশি ;"।

ঘ. "রবীন্দ্র-বিদূষণে—শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত ১৩৩৪ আষাঢ় মাসিক 'বিচিত্রা' ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যায় (পৃ. ৯-৭০), রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' গীতিনাট্য কাব্য প্রকাশিত হয়। এই নটরাজ গীতিনাট্যকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-রসিক সমাজে প্রভূত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু সজনীকান্তের মতে— "ইহাতে সন্নিবিষ্ট বিচিত্র সুরের সুমধুর সঙ্গীতগুলি গান হইয়া কানের ভিতর দিয়া আমার মর্মে তখনও প্রবেশ করে নাই। 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায় নিতান্ত কবিতারূপে সেগুলিকে পড়িয়াছিলাম ; ভালো লাগে নাই শ্রুতিমধুরও ঠেকে নাই। মনে হইয়াছিল, ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ

এবং অক্ষম অনুকরণ, ছন্দ ও মিল শিথিল।... প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে 'নটরাজ' রবীন্দ্রপ্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪২)

এই মনের ভাবকে কেন্দ্র করে সজনীকান্ত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। '২৪/১ ঘোষ লেনের বাসায়' ও 'বিপিনবাবুর চায়ের দোকানের' বন্ধুমহলে বহুবার উদ্দীপনার সঙ্গে প্রবন্ধটি পঠিত হয়। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম সমঝদার ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সেন এসে সজনীকান্তকে বললেন— "তুই যখন ছাপবি না, ওটা আমার 'অরসিক রায়' বেনামে 'আত্মশক্তি'তে ছাপিয়ে দেব।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪২)। লেখকসুলভ মোহে সেদিন সজনীকান্ত 'না' বলতে পারেন নি। যথাসময়ে ভাদ্র মাসের ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ এবং আশ্বিনের ২৭ তারিখে পাঁচটি কিস্তিতে তারানাথ রায়-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'তে প্রবন্ধটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে সজনীকান্ত এতই নিরুৎসাহ ছিলেন যে তিনি প্রবন্ধের "কপি" পর্যন্ত সংগ্রহ করেন নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য লক্ষণীয় : "চিন্তালেশহীন অবোধ বালক ঢিলটি নিক্ষেপ করিয়াই খুশি ছিল, আম পড়িল কি পাখি মরিল— সে সম্বন্ধে ভাবিয়াও দেখে নাই। সে চকিত হইয়া উঠিল তখনই, যখন ঢিলটি ফিরিয়া তাহারই গায়ে আসিয়া লাগিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৬)

যথাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকারের সম্বন্ধে জানতে পারেন। গুরুশিষ্যের সংঘাতের 'ইহাই' সূত্রপাত।

পরবর্তী জীবনে এই প্রসঙ্গে সজনীকান্তের স্বীকারোক্তি লক্ষণীয় : "নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থকদের ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে আমাদের দলের একমাত্র ভরসা এবং আদর্শ স্বয়ং জনার্দনই সাময়িকভাবে 'শনিবারের চিঠি'কে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৫)

এমতাবস্থায় স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সজনীকান্তকে দুই দিন বিশ্বভারতী আপিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে সজনীকান্ত কাজটি ভালো করেন নি। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সজনীকান্ত প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে বলেছেন "আমার [সজনীকান্ত] গহন মনে কি কি গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম, নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম আমার [সজনীকান্ত] অসাবধানে ফেলা জল অনেক নীচ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। আমি সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সরাসরি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন সাব্যস্ত করিলাম। সোজাসুজি সামনে যাইবার সাহস হইল না, একখানি দীর্ঘ পত্রযোগে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৬-১৭)

সজনীকান্ত তখন প্রবাসীর কর্মচারী। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৭, বেলা তিনটে নাগাদ 'প্রবাসী' আপিসের পিওন-বুক ভুক্ত করে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি সুদীর্ঘ পত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন।

কবি তখন রবীন্দ্র-পরিষদের সংবর্ধনা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের অভিমুখে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। সজনীকান্তের সুদীর্ঘ পত্রটি এইসময় তাঁর হস্তগত হয়। চিঠিটি পড়ে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এবং বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই তৎক্ষণাৎ ডাকযোগে তাঁর উত্তরটি লিখে পাঠান।

সাধু চলিত ভাষার সংমিশ্রণ যা রবীন্দ্রনাথের সামান্য চিঠিপত্রেও বিরল। কিন্তু সেই দিন তিনি এত বেশি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন যে এই 'গুরু-চণ্ডালী দোষ' তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫)।

এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯২৮-এর প্রথমার্ধে 'কলিকাতা মহাকরণিকে' বাংলা অনুবাদক পদের জন্য প্রার্থী আহ্বান করে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী' আপিসে স্বল্প মাইনের চাকুরিরত। আত্মীয়-স্বজনের উদ্যোগে সজনীকান্তও উক্তপদের জন্য দরখাস্ত করতে উদ্যত হন। কিন্তু ওই পদের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্র আবশ্যক। সজনীকান্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিবেদন করা মাত্রই তাঁরা সুদীর্ঘ পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। এতৎসহ, পরিজনবর্গের পরামর্শ রবীন্দ্রনাথের 'কলম' হইতে সামান্য কিছু অবশ্যম্ভাবী। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪৬)

অতএব, 'নটরাজ' পর্বের পরেও লজ্জার মাথা খেয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি পথযোগে প্রশংসাপত্র প্রার্থনা করলেন। পত্রে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮-এর মধ্যে প্রশংসাপত্র সজনীকান্তের হস্তগত হওয়া চাই এই তথ্যও তিনি কবিকে জানিয়েছিলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ নিষ্পত্র চারছত্রের ইংরেজী রচনায় রবীন্দ্রনাথের সহিসংবলিত একটি শংসাপত্র ১৩/২/১৯২৮ তারিখে লিখিত, সজনীকান্তের হস্তগত হয়। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬)

কবির সহৃদয়তায় ও বদান্যতায় সজনীকান্ত 'মরমে মরিয়া' গেলেন। এবং স্থির করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের শংসাপত্রের অপমান ঘটতে দেবেন না। সুতরাং সেই শংসাপত্র অদ্যাবধি অপ্রেরিতই রইল।

নটরাজ পর্বের রেশ মিটতে-না-মিটতেই 'শনিবারের চিঠি'র দৃষ্টি পড়েছিল প্রমথ চৌধুরীর ওপর।

প্রমথ-বিদূষণের গোড়াপত্তন হল ১৩৩৫ সালের বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে। তৎকালীন সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বেনামীতে লিখলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী— পেন্সিল ড্রয়িং",— "তাঁহার

কালি-কলমের পেশা'র পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে"। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে তুমুল আন্দোলনের ও তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'শনিবারের চিঠি'র তৎকালীন মুদ্রাকর ও প্রকাশক সজনীকান্ত দাস লিখলেন "বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান"। এই প্রবন্ধে 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর যাবতীয় দুর্বলতা বিশ্লেষণ ও "প্যারডি" করে দেখালেন সজনীকান্ত। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্তের বিশ্বাস, যদিও "লেখাটিতে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও ইয়ার্কির অসম্মান ছিল", তথাপি "কাব্যহিসাবে 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর অসার্থকতা কথঞ্চিৎ প্রকট করিতে পারিয়াছিলাম"। প্রমথ চৌধুরী আদর্শে প্যারডি-পারংগম প্রবন্ধকারের দুইটি সনেট 'বালিগঞ্জ' ও 'বেগুন' ওই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল ও যার আঘাত আরো মর্মান্তিক হয়েছিল। ওই সংখ্যাতেই নীরদ চৌধুরী আরো মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন— "শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী— জের"।

কিন্তু জ্যৈষ্ঠেই এর সমাপ্তি হয় নি—এর জের চলেছিল আষাঢ় সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তেও। ওই সংখ্যাতে প্রমথবাবুর সংস্কৃত জ্ঞানের ওপর কটাক্ষ করে সজনীকান্ত একটি প্রবন্ধ লিখলেন, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের সাহায্যে— "পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী"— পূর্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। এই সম্বন্ধে সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেছেন—'হালকা ইয়ার্কি এবারে গভীর অসম্ভ্রম হইয়া উঠিল। ফলে আমরা আমাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক বহু বিদগ্ধজনের বিরাগভাজন হইলাম। রবীন্দ্রনাথ "নটরাজ" ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ ছিলেন। "প্রথম চৌধুরী" ব্যাপারে তাঁহার ক্ষুব্ধতা ক্রোধে পরিণত হইল।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৫৮)

'শনিবারের চিঠি'র প্রমথ-বিদূষণ রবীন্দ্রনাথকে অতিমাত্রায় বিচলিত করে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে শনিগোষ্ঠীর বিশেষ বিলম্ব হয় নি।

১৯॥৮

'শনিবারের চিঠি'র সে 'সম্মানের উপহার' অর্থাৎ 'কমপ্লিমেন্টারি কপি' পরবর্তী সংখ্যাটি তিনি স্বহস্তে "রিফিউজড্"—'অগ্রাহ্য' লিখে ফেরত পাঠালেন। প্রধানতম পৃষ্ঠপোষকের এই বিমুখতায় তৎকালীন 'চিঠি'-র গোষ্ঠী বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা শঙ্কিত হন নি। উপরন্তু তাঁরা আরো নির্ম্মমভাবে প্রমথ-বিদূষণে ব্রতী হয়েছিলেন।

১৩৩৪, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮), কলিকাতা সিটি কলেজ-সংলগ্ন রামমোহন ছাত্রাবাসে সরস্বতী-প্রতিমা স্থাপন করে পুজোর দাবিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের সংঘর্ষজনিত গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজও জড়িয়ে পড়েছিল। ক্ষিপ্ত ছাত্র সমাজকে শান্ত করবার জন্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সময়ে 'মডার্ন রিভিউ'এ রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র ও ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে —"সিটি-কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্রনাথের মতকে সমর্থন জানালেন। ১৩৩৫ আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্তের— "হিন্দু রিলিজিয়ন ইনসাল্‌টেড—(স্বপ্নদর্শন)", অশোক চট্টোপাধ্যায়ের —"এই কি হিন্দু-জাগরণ" এবং যোগানন্দ দাসের—'নায়মাত্মা চৌর্যেন বা লভ্যতে" প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৫ শ্রাবণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল সজনীকান্তের "ধর্ম্মরক্ষা"-শীর্ষক সচিত্র ব্যঙ্গ কবিতা। কবিতাটি মূলত রচিত হয়েছিল, 'সিটি কলেজে'কে কেন্দ্র করে অ্যালবার্ট হলে যে বিরাট সভা আয়োজিত হয়— তাকে ব্যঙ্গ করে।

শনিগোষ্ঠীর গহন মনে আশা ছিল সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত এই-সকল রচনা প্রকাশের মাধ্যমে প্রমথ-দূষণে-ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ কিছুটা শান্ত

হবেন। কিন্তু তাঁদের এই আশায় বাধা হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের খাস কলমচী অমিয় চক্রবর্তী। তাঁর রচিত "সাহিত্য ব্যবসায়" প্রকাশিত হল ১৩৩৫ শ্রাবণের 'বিচিত্রা'-য়। বলাবাহুল্য রচনাটি শনিগোষ্ঠীকে খোঁচা দিয়েই রচিত হয়েছিল। সজনীকান্তের ভাষায় "রবীন্দ্রনাথের কলমচীর খোঁচা খাইয়া আমাদের উত্তপ্ত মগজ উত্তপ্ততর হইয়া উঠিল ;"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৬৪)

ইতিমধ্যে 'সাহিত্য-ব্যবসায়' প্রবন্ধের রচয়িতা যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ —এই জনরব রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছল। ১৩৩৫ শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তে, "অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-ব্যবসায়' প্রবন্ধে দশ দফায় অমিয় চক্রবর্তীকে একরূপ 'নিকেশ' করে সর্বশেষে" লিখলেন—

"ভবিষ্যতে অমিয় বাবু কিছু লিখিলে, আমাদের অনুরোধ যেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষা অলঙ্কার ও ভাবের বৃথা অনুকরণের চেষ্টা না করেন।..." ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৬৪)

ওই সংখ্যাতেই মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন "অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ।

১৯২৯-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ জুলাই, (১৩৩৫ ফাল্গুন-১৩৩৬ আষাঢ়), চার মাস আটদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন। এবার তিনি কানাডা ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অল্পদিনের মধ্যে ১৩৩৬ আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত লিখলেন 'শ্রীচরণেষু' শীর্ষক একটি পত্রকবিতা। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে তাঁর এই অর্ঘ্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির চরণ স্পর্শ করে নি। উপরন্তু এইবার 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি চরম আঘাতটি এল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই।

'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী' প্রেসেই ছাপা হত। এই সময়ে হঠাৎ 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সজনীকান্তকে ডেকে পাঠালেন। ২২ আষাঢ়, ১৩৩৬ (৬ জুলাই, ১৯২৯) সজনীকান্ত 'প্রবাসী'-সম্পাদকের গৃহে উপস্থিত হলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে একটি পত্র সজনীকান্তের হাতে দিলেন— রবীন্দ্রনাথের লেখা। পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'-সম্পাদককে জানিয়েছেন— শনিবারের চিঠি 'প্রবাসী' প্রেসে ছাপা হলে তিনি আর কোনো ভাবেই 'প্রবাসী'র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

এই নিদারুণ কঠিন পত্রাঘাতে সজনীকান্ত এমনই অভিভূত হলেন যে বিশেষ কিছু না বলেই তিনি সম্পাদক মহাশয়কে বলেছিলেন "বেশ তাহাই হইবে 'শনিবারের চিঠি' অন্যত্র ছাপিব।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৩)

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সজনীকান্ত যে কী ভীষণ আত্মবিস্মৃত ও বিচলিত হয়েছিলেন তারই চিহ্নস্বরূপ শ্রাবণে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল 'হেঁয়ালি' কবিতা। পরবর্তী জীবনে সজনীকান্তের স্বীকারোক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন "এমন বর্বর কবিতা আমিও খুব বেশী লিখি নাই।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৩)

এই ভীষণ আঘাত রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করল। 'নটরাজ'-এর সমালোচনার গ্লানি মনে সঞ্চিতই ছিল, এই কবিতা প্রকাশের পর তা দ্বিগুণ হল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মধ্যবর্তী সেতু। একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভক্তি, অপরদিকে শনিগোষ্ঠীকে তিনি অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন 'শনিবারের চিঠি'র হয়ে দরবার করতে। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিও বিরূপ হলেন। ১১ পৌষ ১৩৩৬, রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে এই প্রসঙ্গে একটি পত্র লেখেন।

কিন্তু এই সময় কবি এত বেশিরকম বিচলিত ছিলেন যে চিঠিটির একটি নকল সজনীকান্তকে পাঠিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৮)

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে পরবর্তীকালে লিখেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ক্ষমা না করিলে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৪)

এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র মুমূর্ষু দশা। ১৩৩৬-এর কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয় ফাল্গুন মাসে। ওই সংখ্যায় সজনীকান্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির নাম 'ভ্রান্তি'।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন—"শ্রীচরণেষু" "হেঁয়ালি" ও "ভ্রান্তি"—১৩৩৬-এর আষাঢ়, শ্রাবণ ও কার্তিকে প্রকাশিত এই তিনটি কবিতা সজনীকান্তের মনের নিগূঢ় জটিলতাকেই শুধু প্রকাশ করছে না, কবিগুরু সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটিকেও উদঘাটিত করেছে।" ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১০২)

১৩০৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার পরে 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়। 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৫ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের পারস্য-যাত্রার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ক্লান্ত শরীর ও ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দার্জিলিঙে নিয়ে যান। সেখানে কবি মাসখানেক ছিলেন। এবং জুলাই মাসের গোড়াতেই শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন।

দার্জিলিঙে থাকাকালীন কবির সঙ্গে সেখানে নজরুল ইসলাম, নাট্যকার মন্মথ রায় ও শিল্পী অখিল নিয়োগী সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"নজরুল মুখপাত্র হইয়া একটা বড় রকমের দল লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে যান ; রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে পাইয়া খুবই খুশি, বহুক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনা হয়।" ('রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ৪০৩) এই আলোচনা বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'স্বদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল—

"কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোনো রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মতো ফুল সেজে থাকে। ...কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবনের নাম করা চলে— দেখতে সে বেশ সুশ্রী ; কিন্তু সেও ঠিক ওই কারণে সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।

"আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।"

'শনিবারের চিঠি'র প্রচ্ছদে একটি মুরগীর ছবি থাকত। অতএব 'সজনে গাছ' ও 'মুরগী' প্রসঙ্গ সজনীকান্তকে যে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করবে তা অবশ্যম্ভাবী।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্ত ও শনিগোষ্ঠীর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। 'প্রবাসী' প্রেস থেকে 'শনিবারের চিঠি'র মুদ্রণকার্য বন্ধ হওয়াতেও তাঁর রাগ পড়ে নি। উপরন্তু তাঁরই স্নেহধন্য পত্রিকা 'পরিচয়'কে 'শনিবারের চিঠি'-র দল নবপর্যায় প্রকাশিত হওয়ার কাল থেকে বিরোধিতা করছে। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ আরো ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর ছয়টি কবিতা ও দিলীপকুমার রায় তাঁর কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ আপন আপন মন্তব্য সহ রবীন্দ্রনাথকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কবির সেই কবিতাগুলি পড়ে ভালো লেগেছিল। এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাটুকুকে প্রবন্ধকারে রূপ দিলেন। প্রবন্ধটি 'নবীন কবি' শিরোনামে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি ইঙ্গিত ক'রে 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা ব্যবহার করলেন, এবং এইসঙ্গে লিখলেন, "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েচি।"

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন—। "আমাদের বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম। পূর্বের "সজনে ফুল" ও "মুরগী"র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া "সাহিত্যিক মোরগের" উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৪৫)

এই জ্বালার ফলে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি' মাঘ ১৩৩৮, 'জয়ন্তী'-সংখ্যায় শালীনতার সীমা শোচনীয়ভাবে লঙ্ঘন করেন। এই সংখ্যার গোড়ায়, মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি-বরণ' নামে একটি প্রশস্তি কবিতা ও সমাপ্তিতে সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে আরও একটি প্রশস্তি কবিতা ছাড়া প্রতিটি লেখাই তীব্র, তীক্ষ্ণ, উগ্র ব্যঙ্গ বিদূষণে পূর্ণ।

'জয়ন্তী' সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশের পূর্বে ১৩৩৮ অগ্রহায়ণে 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত লিখলেন 'জয়ন্তী' কবিতা। এই কবিতাটিও তীব্র-ব্যঙ্গবিদ্রূপে পরিপূর্ণ।

জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশের পরেও বহুদিন ধরে 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্র-বিদূষণ অব্যাহত ছিল। "সবচেয়ে ক্ষতি-কারক ছিল পত্রিকা-র প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে মোহিতলাল মজুমদারের

লেখাগুলি। গুরুগম্ভীর সমালোচনার নামে মোহিতলাল সুকৌশলে রবীন্দ্র-বিরোধিতা মাসের পর মাস চালিয়েছিলেন।" ("রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত", পৃ. ১১১)

এই বিদ্রূপের ফলাফল নিয়ে সজনীকান্তের মন্তব্য লক্ষণীয়— "আমাদের আহত ভক্তি ও অভিমানটাই যে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই সহজ কথাটা সাধারণ পাঠক তো বুঝিলই না, রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ব্যবধান দুস্তরতর হইয়া উঠিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৪৫)

ঙ। "রাজহংসের কবি সজনীকান্ত"

১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র-মাসে সজনীকান্তের 'রাজহংস' কাব্য-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দে রচিত 'রাজহংস'। 'রাজহংস' প্রকাশিত হওয়ার পরে সজনীকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ বিশীর অনুরোধে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি বই পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্র-বিদূষণের কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুদিনের ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও বন্ধুর অনুরোধকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি সজনীকান্তের পক্ষে।

এই সম্পর্কে সজনীকান্ত লিখেছেন—পুস্তক প্রেরণের সপ্তাহকাল মধ্যে তিনি [প্রমথনাথ বিশী] তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পত্রটি আমার নাকের উপর ধরিয়া প্রনাবিক হাসি হাসিলেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৬১)। পত্রটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :—

"২৯ এপ্রিল, ১৯৩৬

ওঁ

'Uttarayan'
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

অভিমত দিতে আমি একান্ত নারাজ— ভালোই বলি আর মন্দই বলি এতে দেশের দুর্ম্মুখকে জাগিয়ে তোলা হয়।...

তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে।..." ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৬২)

রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধীরচন্দ্র কর -লিখিত 'রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র জীবন' ('যুগান্তর' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫) শীর্ষক নিবন্ধে, তিনি সেই দিনের কথা লিপিবদ্ধ করেন। তারই কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—"১৩৪৩ সনের বৈশাখ। চলছে কবির 'পত্রপুট' কাব্যের পালা।... কবি তখন "কোণার্ক"-বাসী। "কোণার্ক" গৃহের বারান্দার সামনে যে শিমুল গাছটি আছে, তার তলায় বসেছেন কবি সকাল বেলার কাজে। খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাব্যোপহার ['রাজহংস'] এসে পৌঁছেছে হাতে, সেই ডাকেই। প্যাকেট থেকে বই খুলে উল্টেপাল্টে দেখলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি— এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।"

উত্তরকালে সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি'তে 'রাজহংস' সম্বন্ধে লিখেছেন —"রবীন্দ্রনাথের সেই প্রশংসা-দিয়া-কাড়িয়া-লওয়ার ব্যবস্থায় মনে কিঞ্চিৎ বেদনা মিশ্রিত গ্লানি অনুভব করিয়াছিলাম, ফলে 'রাজহংসে'র কোনও প্রশংসাপত্রই বাজারে দাখিল করি নাই।" তৎসত্ত্বেও 'প্রবাসী'তে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় -লিখিত প্রশস্তি ও অন্যান্য স্থানে

'রাজহংস' প্রভৃত প্রশংসিত হয়। কিন্তু সজনীকান্তের কাছে এই সকল প্রশংসার কোনোটিই রবীন্দ্রনাথের সেই "তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে"র বর্ম ভেদ করে তাঁর মর্মে প্রকাশ করতে পারে নি। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৬৫)

চ. কাব্য-পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

১৯৩৮, ১৩ জুন রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বাংলা-কাব্য পরিচয়' শীর্ষক বাংলা কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবিতার প্রাথমিক নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন, বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের তৎকালীন কর্মকর্তা কিশোরীমোহন সাঁতরা ও হিরণকুমার সান্যাল। তাঁদের সহকর্মীরূপে নিযুক্ত ছিলেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৭ সালে কবিতা সংগ্রহ ও নির্বাচনের কাজ হয়। এবং ১৯৩৮ সালে গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য শুরু হয় ও জুনের মাঝামাঝি সংকলনখানি প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং 'নন্দগোপাল সেনগুপ্ত' লিখেছিলেন পরিশিষ্ট।

এই কাব্য-সংকলনের প্রাথমিক স্তরে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল প্রভূত। প্রাথমিক নির্বাচনের পর কবি কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাঁর চূড়ান্ত মতামত দিতেন। আদিযুগের কবিদের নিয়ে কোনো অশান্তি না হলেও আধুনিক কালের কবিদের নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যে সংকলন, সেখানে সকলের প্রতি সমান সুবিচার যেমন অনিবার্য তেমনি সংকলনের মানও হতে হবে উচ্চদরের। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। পরিশিষ্ট লিখেছিলেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কবি সম্পাদকীয় কাটছাঁট করে তাকে মুদ্রণযোগ্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—"হেমচন্দ্র ও বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে কাব্য

পরিচয়ের পরিশিষ্টে তোমার অভিমত পড়ে প্রকাশক-সঙ্ঘ বিচলিত হয়েছেন। তাঁরা বলেন এতে বাঙালী পাঠক অশান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়বে...।"

এতৎসত্ত্বে শুধু পরিশিষ্টই নয়, রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকাটিও তীব্র বিদ্রূপ-সমালোচনায় আক্রান্ত হয়।

এই সব কারণে কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের ভিন্নরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সূচনায় সংযোজিত হয় 'নিবেদন'। 'নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"...অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর হোতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তাদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।

আধুনিক কবিতার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, সুতরাং তার সংগ্রহ ভাবী সংস্করণে পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করবে এই প্রত্যাশা সংকলন কর্তার মনে রইল।"

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে 'বাংলা কাব্য-পরিচয়'-এর যে কপিটি সংরক্ষিত রয়েছে তার উপর একটুকরো কাগজে সুধীরচন্দ্র করের স্বাক্ষরে লিখিত রয়েছে— "প্রথম সংস্করণেই প্রথমত এই বই একরকম ছাপা হয়ে বাজারে বেরিয়েছিল পরে সংশোধন হয়ে আবার নতুন করে বেরয়। এইখানাই সংশোধিত কপি" স্বাঃ সুধীরচন্দ্র কর ২৬-৭-৩৮।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খসড়ায় ব্যাপকভাবে আধুনিক কবিদের রচনা যোগ করেন। এই শেষের অংশ নিয়ে বইখানি প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব ও অন্যান্য সমালোচকেরা প্রধানতঃ নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। ("বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে" রবীন্দ্রচর্চা, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ. ৭৬-৮০)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ‘কবিতা’ পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-পরিচয় সম্পর্কে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—“এই সংকলন গ্রন্থের দায়িত্ব বৃহৎ, তা রবীন্দ্রনাথ না করলে কে আর করবে? গুরুদেবের কাছে আমাদের প্রার্থনা এই যে তিনি নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বাংলা কবিতার প্রামাণ্য সংকলন গ্রন্থ রচনা করুন। মন্দকে নির্মমভাবে বিতাড়িত ক’রে ও ভালোকে তেমনি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ ক’রে তিনি এমন একটি বই করুন যাতে বহু যুগ ধরে বাঙালী কবি ও পাঠকের বুদ্ধি বিকশিত ও রুচি গঠিত হতে পারে।” (“বাংলা কাব্য-পরিচয়”, কবিতা ত্রৈমাসিক, ১৩৪৫ আশ্বিন, পৃ. ৭৪)

সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত নব সংস্করণ কাব্য-পরিচয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় পঞ্চ-সদস্যের একটি সহায়ক পরিষৎ গঠিত হয়েছিল। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাড়া এই পরিষদের অন্য চারজন সদস্য হলেন— সজনীকান্ত দাস, হিরণকুমার সান্যাল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও কিশোরীমোহন সাঁতরা। সহায়ক পরিষদের সদস্য পঞ্চকের মধ্যে সজনীকান্তই একমাত্র নবাগত ছিলেন। নির্মমভাবে রবীন্দ্র-বিদূষণের পরেও সজনীকান্তকে কেন রবীন্দ্রনাথ এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন— এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই প্রত্যেকের মনে সংশয় জাগাবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন— “বই [কাব্য-পরিচয়] প্রকাশিত হবার অল্প পরেই যে সংকট, তখনই শুরু হয়েছিল সজনীকান্তের আসা-যাওয়া।” (‘উর্বশীর হাসি’, পৃ. ২৩)

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে সজনীকান্তের সঙ্গে বিশ্বভারতীর প্রকাশনালয়ের যোগসূত্রের সূচনাকাল ১৯২৪। এবং তখন থেকেই বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে সজনীকান্ত

বিশ্বভারতীর কলকাতাস্থ কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি'-তে রয়েছে—১৩৩২ এ 'পূরবী' প্রকাশকালে, সেই সময়ে সজনীকান্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে তাঁর পুরাতন সংগ্রহের ঝুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'হারিয়ে-যাওয়া' কবিতাগুলি সরবরাহ করোছলেন।

এ ছাড়া ১৯২০ সনে 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স'-এর যে পরিকল্পনা হয়েছিল, তার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সেই সময়েও সজনীকান্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে উপকরণ সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

কাব্য-পরিচয়ের কবিদের ঠিকানা সাগ্রহে তিনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন সে ঘটনার উল্লেখ কিশোরীমোহন সাঁতরার রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়, তবে তার সময়কাল বোধহয় ১৯৩৭।

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্য-পরিচয়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য অনেক বেশি নির্ভর করেছিলেন সজনীকান্তের ওপরে। প্রমাণস্বরূপ তাঁকে লেখা এলাহাবাদের কোনো আধুনিক মহিলার লিখিত পত্রের ওপর, রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য লিখে সজনীকান্তের মতামত চেয়েছিলেন— কবির মন্তব্যসহ মূল চিঠিটির অংশবিশেষ এখানে দেওয়া হল—"আমার মনে হয় "বাংলা কাব্য পরিচয়ে" অতুলপ্রসাদ সেন, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতির কবিতাও স্থান পেতে পারত। "বনফুল", কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা আরও কয়েকটি হ'লে বইটি বোধহয় আরও সুন্দর হোত। আপনার কবিতাগুলির মধ্যে "পুনশ্চের" "সাধারণ মেয়ে"টিকে দেখ্‌তে পাব আশা ছিল ; পরবর্তী সংস্করণে আশাকরি সে আশা পূর্ণ হবে। "কিনু গোয়ালার গলি" যে কত সুন্দর লেগেছে তা আপনাকে জানাতে পারলে ধন্য হতুম।

"লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা"র দ্বিতীয় বই কি হবে জানিনা। যদি এবার বাংলা গল্পের একটি সংকলন করা হয়, আশাকরি তা খুবই মনোজ্ঞ হবে। বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলিকে সঙ্ক্ষিপ্ত [সংক্ষিপ্ত] করে সঙ্কলন করলেও একটি খুব সুন্দর বই হয় যদিও তাতে মূল উপন্যাসগুলির সৌন্দর্য কিছু ক্ষুণ্ণ হতে পারে। উপস্থিত যদি বাংলা ছোটগল্পের একটি "পরিচয়" প্রকাশ করা হয় তাতে যে সকলের বিশেষ উপকার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" মূল চিঠির পাশে রবীন্দ্রনাথের "কী বলো তুমি?" এবং প্রথম প্যারার নামের তলায় লাইনগুলির বিশেষ ইঙ্গিত— বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

কাব্য-পরিচয় সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় তার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ বিস্তারিত ভাবেই এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে। তবে আবার অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের লেখায় ফিরে আসি— অধ্যাপক ঘোষ লিখেছেন—"এই দ্বিতীয় সংস্করণটি যদি ছাপা হতো শেষ পর্যন্ত, তাহলে স্পষ্টতই সেটা হতো সজনীকান্তের সংকলন, রবীন্দ্রনাথ হতেন শিখণ্ডী। এরই খবর নিশ্চয় ছড়িয়ে পড়েছিল গুজবের চেহারায়, যার নমুনা আমরা ধরতে পারি সমর সেনের স্মৃতিচারণে।" ('উর্বশীর হাসি', পৃ. ২৪)

সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত' আদ্যোপান্ত পাঠোদ্ধার করেছি। তিনি অবশ্যই লিখেছেন—"অনেকে হয়তো জানেন না যে তিরিশ দশকের শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার একটি সঙ্কলন বের করেন (জোর গুজব সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় ও পরামর্শে)।[১]" ('বাবু বৃত্তান্ত', পৃ. ২৭)

এইবার উক্ত গ্রন্থের ১নং পাদটীকাটি লক্ষণীয়— "১। প্রকৃত পক্ষে উক্ত সংকলনটির সম্পাদনায় সহযোগী ছিলেন শ্রীকাননবিহারী

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। শ্রীসজনীকান্ত দাশ ছিলেন না। এই সংকলনটির বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। আর তারই দায়িত্ব ছিল সজনীকান্ত দাশের উপর। কিন্তু ঐ সংস্করণ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।" ('বাবু বৃত্তান্ত', পৃ. ৭৫)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমর সেন -উল্লেখিত পৃ. ২৭-এর 'শ্রীসজনীকান্ত দাস' ও পৃ. ৭৫-এর 'শ্রীসজনীকান্ত দাশ' এক ব্যক্তি কি? সনাক্ত করা সম্ভব হল না। আমার দুর্ভাগ্যবশত সমর সেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাই এই প্রশ্ন বর্তমান পাঠকের কাছেই পেশ করলাম।

"সেটা হোতো সজনীকান্তের সংকলন" অধ্যাপক ঘোষের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমি রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করছি। রবীন্দ্রনাথ ১৭/৯/৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখছেন— "কাব্য পরিচয় সম্বন্ধে সজনীকে তাগিদ কোরো। একবার খসড়াটা আমার কাছে দাখিল কোরো। কারণ যখন আমার নাম থাকবে তখন দায়িত্ব আমার।" বাকিটা পাঠক বিচার করবেন।

ছ. রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রাবণ ভক্ত

সজনীকান্তের দীর্ঘ সাহিত্যজীবনকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম যুগে তাঁর মন্ত্র ছিল অশিববিনাশ। দ্বিতীয় যুগে তাঁর স্বপ্ন ছিল নবসৃষ্টি। তৃতীয় যুগে তাঁর লক্ষ্য হল ইতিহাসের অবলুপ্ত কক্ষের সত্যের সন্ধান। ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৫১)

'শনিবারের চিঠি'র জন্মের উষালগ্নে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁদের একমাত্র বলভরসা। কিন্তু তার পরবর্তী ইতিহাস বড়ো বিচিত্র।

১৩৩৪-এ 'নটরাজ' পর্ব ধরে এই গুরুদ্রোহ যাত্রার শুরু হয়। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে 'শনিবারের চিঠি' নবপর্যায় প্রকাশিত হয়। এবং তখন থেকে ১৩৪৫ অবধি দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলে তীব্র রবীন্দ্র-বিদূষণ পর্ব। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই পর্বকে 'গুরুদ্রোহ' শিরোনামে অভিহিত করেছেন। ১৩৪৫ থেকে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, সজনীকান্তের জীবনের শেষ চব্বিশ বছরকে বলা চলে রবীন্দ্রানুশীলন পর্ব। এই শেষের চব্বিশ বছরের মধ্যে প্রথম তিন বছর— অর্থাৎ ১৩৪৫-৪৮ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার শেষ তিনটি বছর গুরুশিষ্যের সম্পর্ক এক অদ্ভুত অন্তরঙ্গ গভীরতা লাভ করে। এবং পরবর্তী একুশ বছর অর্থাৎ ১৩৪৮-৬৮ সজনীকান্ত রবীন্দ্রচর্চায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।

কাব্য-সরস্বতীর হাত ধরে রবীন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে যখন স্থান পেয়েছিলেন সজনীকান্ত তখন থেকেই তিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুবই কাছের একজন। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে সজনীকান্ত লিখেছেন— "আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি তখন অনেকেরই বিক্ষুব্ধ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৭)

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন— 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের পুনর্মিলন যে সদাচার সম্মত সৌজন্যের স্তর পেরিয়ে সারস্বত ক্ষেত্রেও নিগূঢ় যোগাযোগ সৃষ্টি করেছিল তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ...এই গ্রন্থে একটিমাত্র সূত্র নির্দেশক পাদটীকা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ৫৪ পৃষ্ঠায় "পুরোনো বাংলা গদ্যের একটু নমুনা" উদ্ধৃত আছে। এই উদ্ধৃতির সূত্রনির্দেশ করা আছে পাদটীকায়। রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন, "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিত বাংলা গদ্যের প্রথম প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হোলো।" পরবর্তী পৃষ্ঠায় "ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল" তারও নমুনা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন "সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে"। ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৫৮)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে ২৮/৮/৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে একটি চিঠিতে লিখেছেন —"তোমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলুম। সজনীকে আমার একটা বিষয়ে দরকার ছিল— যে বইটি লিখচি তার জন্যে। বঙ্কিম যখন ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন সেই সময়কার একখণ্ড গদ্য, লাইন আট-দশ পাঠিয়ে দিয়ো। দেরি কোরো না, লেখা আট্কে আছে।"

সজনীকান্ত ছিলেন একদিকে নবযুগের কবি আবার বিগত যুগের গবেষক। সাহিত্যের অবলুপ্ত ইতিহাসের সত্যের অনুসন্ধান ও কালজয়ী সাহিত্য-পাঠকদের কীর্তিরক্ষা তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। তিনি ছিলেন সাহিত্যের উত্তর সাধক। বৈষ্ণব পদাবলীর একখানি প্রাচীন পুথিকে অবলম্বন করে সজনীকান্তের সাহিত্য গবেষণার সূত্রপাত। 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনার সময়ে সজনীকান্ত নিয়মিতভাবে গবেষণাকর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক ও সহযোগী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে কোনো কাজেই সজনীকান্তের সম্পূর্ণ হত না। ১৯৩৮-৩৯ সালে সজনীকান্ত পুরাতন সাময়িক পত্রিকা অর্থাৎ জ্ঞানাঙ্কুর, প্রতিবিম্ব, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের নামী ও বেনামী রচনাগুলির একটি সবিবরণী তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন এবং তা পত্রযোগে ১২ অক্টোবর ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথের

কাছে প্রেরণ করেছিলেন। কবি তখন মংপুবাসী। ওই তালিকাবদ্ধ রচনাগুলি যে একান্তভাবে 'কবির'ই তা স্বয়ং কবিকে দিয়েই যাচাই করে নেওয়া— এই ছিল সজনীকান্তের বাসনা। প্রসঙ্গত কবি-অনুমিত তালিকা ক্রমান্বয়ে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের (কার্তিক-চৈত্র) 'শনিবারের চিঠি'তে "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তা সজনীকান্তের রচিত 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে ২২ নবেম্ভর কলকাতার সংবাদপত্রে 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা' আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। আবিষ্কর্তার নাম সজনীকান্ত দাস।

২১ নবেম্বর ১৯৩৯ সজনীকান্তের জীবনের এক ঐতিহাসিক স্বর্ণসন্ধ্যা। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন— "রবীন্দ্ররচনার নষ্টোদ্ধার ছাড়াও সেদিন তাঁহাকে একখানি বই একটি চিঠি দেখাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দুইটি বস্তুই কলিকাতার ফুটপাথে সংগ্রহ করা। বইটি হইতেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া কবি বিহারীলালের গ্রন্থাবলী, বিহারীলালের স্বাক্ষর সম্বলিত। দাতা ও গ্রহীতার গৌরবেই বইখানির চরম গৌরব নহে। বালক রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়িয়াছিলেন এবং বইয়ের মার্জিনে বিভিন্ন মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।... চিঠিখানি পাইয়াছিলাম রবীন্দ্রগ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথের স্বব্যবহৃত মহর্ষির আত্মজীবনীর মধ্যে। প্রথম বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে যে কিশোরী রবীন্দ্রনাথকে ভাল ইংরেজী শিখাইতে বসিয়া নিজেই ভাল বাংলা শিখিয়াছিলেন ও সেই সময় 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) যিনি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে নলিনী নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছু গান ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, চিঠিটি ১৮৭৮ সনে তিনিই লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের

কোনো অগ্রজকে। তিনি বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ডাক্তার দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা অ্যানা। বস্তু দুইটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রায় আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং সেই সন্ধ্যাতেই স্বহস্তে একখানি ছবি, তাঁহার ব্যবহৃত একটি আলখাল্লা এবং 'তপতী' নাটকে অভিনয়কালে তৎকর্তৃক পরিহিত শিরস্ত্রাণটি আমাকে দান করিয়া ধন্য করেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৬)

শুধু 'অভিলাষ'ই নয় সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের আরেকটি অনামা বাল্যরচনা আবিষ্কার করেছিলেন— 'প্রকৃতির খেদ' নামক একটি দীর্ঘ কবিতা।

রচনাপঞ্জী আবিষ্কার সম্পর্কে সজনীকান্তের কৃতিত্বের একটি পাকা দলিল, রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৪)

এই নষ্টোদ্ধারের ফলে রবীন্দ্রনাথ এমনই খুশি হয়েছিলেন যে সজনীকান্ত অচিরাৎ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-র সম্পাদকমণ্ডলীভুক্ত হয়েছিলেন। অক্টোবর থেকে খণ্ডে খণ্ডে যা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। প্রথম খণ্ডে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র পূর্বে রচিত যাবতীয় কাব্য এবং বহু প্রবন্ধ চিঠিপত্র ইত্যাদি পরিত্যক্ত হওয়াতে, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা কবির কাছে আবেদন জানান যে তাঁর রচনার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তাঁর বাল্য ও কৈশোরের রচনাগুলিও গ্রন্থাবলীভুক্ত হওয়া আবশ্যক। কবি জোর গলায় বলেছিলেন যে তিনি ইতিহাসের ধারা মানেন না। অবশেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর 'অচলিত সংগ্রহ' অ্যাখ্যা দিয়ে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র কয়েকটি খণ্ড প্রকাশে অনুমতি দিলেন। 'অচলিত সংগ্রহ' প্রকাশে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। ১৯৪০ অক্টোবরে 'অচলিত সংগ্রহে' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'অচলিত সংগ্রহ' দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

রচনাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানেই সজনীকান্তের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন তার সাক্ষ্য মেলে রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের চিঠিপত্রের মধ্যে, এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

১৯৪০ জানুয়ারি মাসে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবিসকাশে উপস্থিত হলে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে বিশ্বভারতীর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানান। এবং এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীর বেতন-ভোগী অমিয় চক্রবর্তীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ বিষয়ে সাহায্য করতে বলেছিলেন। সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের এই অনুরোধে সাড়া দিতে পেরেছিলেন বলে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি আবার ঝাড়গ্রাম-রাজের আর্থিক আনুকূল্য না পাওয়ায় দুঃখিত ও সংকুচিত হয়েছিলেন।

১৯৪০-এর এপ্রিল মাসে, ১ বৈশাখ, ২৫ বৈশাখের উৎসবের পরে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ যাত্রার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন এবং কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে বরানগরে ছিলেন।

কলকাতার ফুটপাথে পুরোনো বই সংগ্রহের এক নেশা ছিল সজনীকান্তের। সেখানেই তিনি পেলেন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল কালেণ্ডর ১৯০৬-৮"। বইটির পরিশিষ্টে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রিত ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাংলা প্রশ্নপত্রের উপর লেখা রয়েছে—"Paper set by Babu Rabindranath Tagore"। রবীন্দ্রনাথকৃত এই প্রশ্নপত্র সম্পর্কে সজনীকান্তের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। কলকাতায় সেই সময় কবির কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সজনীকান্ত কবিসকাশে বই সমেত উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রশ্নপত্রের সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ সেদিন যা বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত

লিখেছেন— “স্বদেশী আমলে তাঁহার কর্মজীবন কিরূপ ছিল তাহা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের নৈষ্কর্ম্য[?] ও দুষ্কর্ম বাদের প্রভূত নিন্দা করিয়াছিলেন, ফলে সংবাদপত্রে প্রতিবাদ ও সমর্থনের বান ডাকিয়াছিল।” (‘আত্মস্মৃতি’, পৃ. ৫৪৭)। মূল সাক্ষাৎকার বৃত্তান্ত ১৩৪৭ সালের বৈশাখের ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সজনীকান্তের ‘রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে ‘কর্মী রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে তা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ১৯৪০ সালের এপ্রিলের শেষ ভাগে বাংলা ও বাংলার বাইরে মূল বাংলায় ও ইংরেজি অনুবাদে বহু দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ জুন, রবীন্দ্রনাথ এপ্রিলের শেষে কালিম্পঙ যাত্রাকালে শিয়ালদহ স্টেশনে সাক্ষাতের পর সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর আর যোগাযোগ হয়নি। এইসময় সজনীকান্ত মারাত্মক ভাবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় শয্যাগত। ১ জুন ১৯৪০ সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত অবগত করে একটি পত্র লেখেন। উত্তর আসে ৩ জুন ১৯৪০। উদ্‌বিগ্ন কবি সজনীকান্তের শীঘ্র আরোগ্য কামনা করে চিঠি লিখেছেন কালিম্পঙ থেকে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছ থেকে সজনীকান্ত জানতে পেরেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যাধি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানতে আগ্রহশীল। সজনীকান্ত তাঁর অসুখের ইতিহাস লিখে পত্রযোগে কবির কাছে পাঠালেন ও সেইমতো ‘ব্যবস্থাপত্র’ এল (৬ জুন ১৯৪০)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে, সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যামোকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম যে ঐ চিকিৎসার মতে নেট্রাম সাল্‌ফ ডায়াবেটিসের প্রধান ওষুধ।... অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে, অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিনবার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাকিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা।”

সজনীকান্ত বায়োকেমিক বিদ্যা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পারিবারিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফলও পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ২৮ জুন ১৯৪০ সজনীকান্তের লেখা একটি চিঠি পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবির উত্তর আসে [৩০ জুন ১৯৪০] তারিখে লেখা একটি চিঠিতে। কবি লিখেছেন— 'আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির বালিচাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবনচরিতের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে যেতে পারবে।...”

রবীন্দ্রনাথ ২৮ জুলাই ১৯৪০ শান্তিনিকেতন থেকে সজনীকান্তকে লিখেছেন— “... তোমার কাজের মহলে একটা ডাক্তারি খিড়কির দরোজা হঠাৎ খুলে গেল— এর জন্যে দায়ী আমি। আশা করি কোনো পরিতাপের কারণ ঘটবে না। ভাল আছ বলে আন্দাজ করছি। চুপচাপ থাকাটা একটা খবর— ওটা আরো কিছুদিন বড় হেডলাইনে জাহির কোরো।...”

ভাদ্র, ১৩৪৭, সজনীকান্তের দুটি বই প্রকাশিত হয়— 'কলিকাল' ও 'কেড়স ও স্যাণ্ডাল'। সদ্য প্রকাশিত বই দুটি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে ১০/৯/১৯৪০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—“শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। তোমার বই দুটি পেয়েছি।...অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করছি। যাবার মুখে কলকাতায় দেখা হতে পারবে।...”

এই চিঠি লেখার অব্যবহিতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন। সজনীকান্ত সেই সময় সাহিত্য-সভার সভাপতিত্বের দায়ে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তার যোগে জরুরি তলব আসে। তৎক্ষণাৎ ফিরে এসেছিলেন সজনীকান্ত। উত্তরকালে সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—

'...পরদিন ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে নয়টায় কলিকাতা পৌঁছিলাম। অপরাহ্নে[হ্ন] টেলিফোনে জোড়াসাঁকোয় খবর করিতেই সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান আসিল। বেলা চারিটায় পৌঁছিলাম, তাঁহাকে সুস্থ দেখাইতেছিল না, চোখ এবং কান খুবই খারাপ হইয়াছে, তবু দেখি প্রস্তুত হইয়া আছেন—তাঁহার সদ্য-লেখা "ল্যাবরেটরি" গল্প আমাকে পড়িয়া শুনাইবেন। আমি শঙ্কিত হইলাম, তাঁহার পরিজনদের কাছে কেমন একটা সঙ্কোচও বোধ হইতে লাগিল, তবু শুনিতে হইল। দেখিলাম, এই বয়সে অসুস্থ শরীরে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক নারী চরিত্র সোহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমার কথায় কবি ছেলেমানুষের মতো খুশী হইয়া উঠিলেন।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৫)

যদিও চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'অক্টোবরে পাহাড়ে পালাবার' কথা লিখেছিলেন কিন্তু বিকল দেহ ও চঞ্চল মনে তাঁর পক্ষে কলকাতায় থাকা সম্ভব হয়নি। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সমভিব্যাহারে কালিম্পঙের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। মাত্র সপ্তাহকাল অতিবাহিত হতে-না-হতেই প্রচণ্ড ইউরিমিয়ার প্রকোপে আক্রান্ত হয়ে কবিকে শয্যাগত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতায়। জোড়াসাঁকোর 'পাথরের ঘরে' একমাসের অধিককাল কবি জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে প্রায় আচ্ছন্নের মতো ছিলেন। ১৮ নবেম্বর ১৯৪০ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অবস্থাতেই কবি সৃষ্টি করলেন— 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'গল্পসল্প'।

সজনীকান্ত ১৯৪০ নবেম্বর থেকে ১৯৪১ মে এই ছয় মাস সভাসমিতি নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। তবু এরই মধ্যে ১৯৪১ জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে গিয়ে

কবিসকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন — '৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪১ একবার বোলপুর গিয়া কবিকে অনেকটা সুস্থই দেখিয়া আসিয়াছিলাম।'

এই প্রসঙ্গে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর "রবীন্দ্র দৈনিকী"তে ৭/১/৪১ তারিখে রচিত, লিখেছেন— "আজ সকালে "শনিবারের চিঠি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এবং শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া কবিকে প্রণাম করিতেই রবীন্দ্রনাথ সজনীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি এলে এ্যাকেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। আমি ভেবেছিলুম ধীরে সুস্থে আসবে। যাক, আশাকরি তোমাদের থাকার ব্যবস্থাদি ভালো রকমই হয়েছিল, কোনো রকম কষ্ট হয়নি"। সজনীবাবু বল্লেন "কিছু কষ্ট হয়নি, বেশ আরামেই ছিলেম। চিঠিতে যেই টের পেলুম আপনি আমার মৌন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন, অমনি চলে এলুম কিছুমাত্র বিলম্ব না করে, সেইজন্যই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন কতটা আসা হোলো"। এর পর রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে ঐ আলোচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে প্রশ্ন করেছিলেন— আচ্ছা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, আমার "ল্যাবরেটরি" গল্পটি তোমাদের কেমন লাগল, আমার মনে হয় এর ঠিক মর্মকথাটি হয়তো অনেকেই ধরতে পারেনি।" সজনীকান্ত উত্তরে বলেছিলেন— "তিনসঙ্গী গ্রন্থে আপনার এই ল্যাবরেটরি গল্পটি পুনরায় পড়েছি। আপনার এ গল্পটি সম্বন্ধে নিন্দে প্রশংসা সমভাবেই হচ্ছে। যাঁরা ভাল করে আপনার সাহিত্য পড়েননি সেই শ্রেণীর সেকেলে দল আপনার এ গল্পের ভয়ানক নিন্দে করেছেন। আর যাঁরা এটা নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছেন অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিকদের দল তাঁরাও এর বহিরঙ্গের চটকেই মুগ্ধ—শুধু মুগ্ধ তা নয়, তাঁদের এই মুগ্ধবোধকে নিজেদের সাহিত্যের অপসাধনায় ব্যবহার

করতে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন। আমাদের মনে হয় আপনি সোহিনীর মধ্যে যেটি রক্তমাংসের উপরের মানুষ তাকেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব, আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিই তাঁর স্বামীর ছিল পৌরুষময় শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। সোহিনীর মেয়ে সে পেয়েছিল মায়ের দেহ, যে দেহ বাসনায় জর্জরিত পায়নি মায়ের সেই নারী-চিত্ত, যেটা আদর্শ ও শক্তির প্রতীক, যার কাছে অধ্যাপক করেছিলেন মাথা নীচু, অধ্যাপকের বিশ্বাস ও মর্যাদাও রক্ষা করেছিল সোহিনী তার সেই অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই।” “লাবরেটরি” গল্পের এই মর্ম্মকথা খুব কম লোকই ধরতে পেরেছে, তোমরা ঠিক ধরেছ বলে রবীন্দ্রনাথ হাসলেন”।

প্রসঙ্গত ‘সাপ্তাহিক দেশ’ অষ্টম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১৩৪৭, ১৩ই মাঘ, সংখ্যায় পৃ. ৪৬৪, পুস্তক পরিচয় শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথের ‘তিনসঙ্গী’ গল্পের বইটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক সজনীকান্ত দাস।

১৩৪৮ বৈশাখে ‘গল্পসল্প’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। “গল্পসল্প” প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক খণ্ড বই সজনীকান্তকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতামত জানতে চেয়ে। প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যেও সজনীকান্ত বইটি পড়েছিলেন ও কবিকে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৮/৫/৪১ তারিখে লিখলেন— ‘সজনী, গল্পসল্প তোমার ভাল লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ওরকম খুচরো গল্প সাধারণত কারো কানে পৌঁছয় না, কিছু পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক মর্মটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্যের সমজদার বলে চেনা গেল।”

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এই সংবাদে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই সময় মারাত্মক ডায়াবেটিসে সজনীকান্ত নিজের অবস্থাও

খুবই সঙ্গিন। একা যাওয়ার ক্ষমতা নেই, ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে, দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, এবং গৃহিণীকে বলে গেলেন চন্দননগরে যাচ্ছি, ৩ জুন ১৯৪১ সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে সকালে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করলেন। উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— "কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, কি করিয়া আমাদের আদর-আপ্যায়ন করিবে তাহা লইয়া সচিব ও অনুচরদের বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। বৈকালের ট্রেনেই ফিরিয়া আসিলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৭)

পরের দিন ৪ জুন ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখলেন —"সজনী, তুমি ক্ষণকালের জন্যে এসে আমাদের খুশী করে দিয়ে গেছ। তোমার যে রকম ভঙ্গুর অবস্থা তাতে আমি এ প্রত্যাশা করিনি। প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হোতে পারবে।..."

সোয়া আট-মাস কাল শান্তিনিকেতনে কবি থেকেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্যে তাঁকে ৯ শ্রাবণ ১৩৪৮ কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে আসা হল।

পরের দিন ১০ শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২৬ জুন ১৯৪১, দুপুরে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী দূরভাষে সজনীকান্তকে বললেন— "যদি সজ্ঞানে কবিকে দেখতে চান এক্ষুণি আসুন।" সজনীকান্ত তখনই গেলেন জোড়াসাঁকোয়।

পরবর্তীকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— "সুধাকান্তদার সহিত আমি কবির কাছে উপস্থিত হইতেই সেবারতা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। আমি প্রণাম করিতেই বসিতে বলিলেন। নিজে হইতেই অবনীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন : ওর জন্মদিন উপলক্ষ্যে (৭ই অগস্ট) তোমরা ঘটা করে উৎসব ক'রো। দেশের রুচির হাওয়া ও

একলাই বদলে দিয়েছে— এত বড় প্রতিভা ওর। একটা বড় সম্মান ওর প্রাপ্য।

প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার মুখে বলিলাম আপনি শীগগির সুস্থ হয়ে উঠুন। তাঁহার মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল, কষ্টের সঙ্গে বলিলেন, সেটা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৮।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষের চারদিন সজনীকান্ত আরও অনেকের সঙ্গে কবির আশেপাশেই ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'র রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত হল সজনীকান্তের 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থখানি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গ্রন্থের স্বত্বার্জিত অর্থ কলিকাতাস্থ তৎকালীন রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রে দান করা হয়েছিল। সজনীকান্ত কবির প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন—তাঁর সারাজীবনের রবীন্দ্র-গবেষণার ফসল —'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি আজও রবীন্দ্র-গবেষকদের কাছে অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখের দাবি রাখে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের বহুকাল পরে ১৩৫৯, মাঘ সজনীকান্তের 'ভাব ও ছন্দ' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সজনীকান্তের মাইকেলবধ-কাব্য সংকলিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— "মাইকেলবধ-কাব্য" 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ "কবিতা-সংখ্যা"য় (ভাদ্র, ১৩৪৪) সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক মাইকেল-বধ উপলক্ষ্যে ইহা রচিত হইলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রচনাটিকে সপ্রশংস আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমাকে জানান, একবার

মাঘোৎসবে রচিত আমার কয়েকটি গান শুনিয়া পিতা আমাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের রাজার কাছে যদি এ দেশের সাহিত্যিকদের আদর থাকিত তাহা হইলে কবিকে তাহার পুরস্কার দিত ; রাজার দিক হইতে সে সম্ভাবনার অভাবে তিনিই সে কাজ করিলেন। মাইকেল-বধ কাব্যে তুমি যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছ তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল তোমাকে পুরস্কৃত করা ; সে সম্ভাবনাও যখন নাই, তখন পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় আমি ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তোমাকে পুরস্কার দিব। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় আশ্বাস সত্ত্বেও কবির জীবিতকালে ইহা প্রকাশ করা হয় নাই।" ('ভাব ও ছন্দ')

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ তিন বছরে সজনীকান্তের সঙ্গে কবির গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— 'বস্তুত পুনর্মিলনের গোড়ার দিকটায় তাঁহাকে কম উত্ত্যক্ত করি নাই। তিনি হাসিমুখে সমস্ত আবদার শুধু সহ্য করেন নাই, চরিতার্থ করিয়াছেন। ইহার পর, তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই সম্পর্ক অটুট ছিল। তাঁহার বহু শুভানুধ্যায়ী তাঁহাকে সাবধান ও সতর্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাকে যাঁহারা ঘোরতর অপছন্দ করিতেন তাঁহারা মৎসম্পর্কে মান অভিমান ও শাসনের ভয়ও দেখাইয়াছেন। তিনি নিজে সেই সকল গল্প আমাকে শুনাইয়াছেন কিন্তু কখনও বিচলিত হন নাই। তিনি কাহাকেও কাহাকেও এই কালে বলিয়াছিলেন, "সজনী আমার রাবণ-ভক্ত"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৯৪)

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

সজনীকান্ত দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র-১

১ 'গোরা'-র ষষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে ছিল,— "ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।"

"মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে" ছায়া "দীর্ঘতর" হতে পারে না। একটি সুচিন্তিত পত্রে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে সবিনয়ে তাই নিবেদন করেছিলেন।

সজনীকান্তের এই পত্র বিফলে যায় নি। 'গোরা' উপন্যাসের পরবর্তী সংস্করণে (১৩৩৪, চতুর্থ বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২৬ অধ্যায়, পৃ. ২৩৯), রবীন্দ্রনাথ "দীর্ঘতর"র স্থানে "খর্ব্ব" করেছিলেন। ('সংশোধিত এই বাক্যটি অবশ্য সজনীকান্তের উক্তিমতো "ষষ্ঠ অধ্যায়ে"য় নয়, এটি পাওয়া যাবে বর্তমান ২৬ সংখ্যক অধ্যায়ে।'— দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৮৭৮)।

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্তের উক্তি বিশেষ উল্লেখ্য— 'এই দীর্ঘতরকে খর্ব করা— ইহাই বাংলা-সাহিত্যে আমার সর্ব প্রথম কীর্তি, আধুনিক ভাষায় "অবদান"ও বলিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার জীবনে দীর্ঘতরকে খর্ব করার ইহাই শেষ নয়।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৮২)

২ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১ (১৯ ভাদ্র, ১৩২৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিতম বার্ষিক সংবর্ধনা সভায় যোগদানের অবকাশ পেয়েছিলেন সজনীকান্ত। সেই রাত্রেই রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করে সজনীকান্ত রচনা করেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি কবিতা। যার প্রথম ছত্র—"ওগো আঁধারের রবি"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৭৮)

পত্র-২

১ ১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দে বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নবীন ও তরুণ সাহিত্যগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল। যাঁদের সাহিত্যে আধুনিকতার প্রকাশ পেয়েছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারাকে অবলম্বন ক'রে। 'শনিবারের চিঠি' তৎকালীন সেই সব আধুনিক সাহিত্য ও তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে, এবং তাঁদের একান্ত বলভরসা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেও এই বিষয়ে তাঁদের আর্জি জানিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —" 'শনিবারের চিঠি' নামে এক সাপ্তাহিক প্রবাসী-পত্রিকার অন্যতম সহকারী-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী ও সম্পাদক কল্লোলাদি পত্রিকার রচনার মধ্যে অশ্লীলতাদুষ্ট অংশ চয়ন করিয়া 'মণিমুক্তা' নামে প্রকাশ করিতেন ; সাহিত্যে বে-আব্রুতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইহা তাঁহারা করিতেন সত্য, কিন্তু তাহার ফল হইত বিপরীত— বাংলা কথাসাহিত্যের সকল অশ্লীলাংশ পাঠকরা একস্থানে পাইয়া তাহা সাগ্রহে সম্ভোগ করিত।"

সজনীকান্ত ১৩৩৩ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯২৭ মার্চ)— কবির য়ুরোপ সফরের দুই মাসের মধ্যে সাময়িক সাহিত্যের বর্ণনা দিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠান। কবি তাহার উত্তরে লেখেন (২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩) এই পত্রটি।

এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আরো লিখেছেন— "এই সময়ে কবির মন 'ঋতুরঙ্গশালা'র মধ্যে ডুবিয়া আছে ; তাই বোধ হয় বিতর্কমূলক রচনায় মন গেল না।...

মালয় যাত্রার পূর্বে অনুরোধেই হউক বা কর্তব্যবোধেই হউক কবি 'সাহিত্যধর্ম' নামে প্রবন্ধ লিখিলেন।" (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩ : 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব', পৃ. ৩০৬-০৭)

২ 'বিচিত্রা' ১৩৩৪, শ্রাবণ, ১ম বর্ষ—১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃ. ১৭১-৭৫) রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ সাহিত্যদৃষ্টির স্বরূপ

নির্ণয় করে এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশের ফলে বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তারই ফলস্বরূপ 'বিচিত্রা'র পরবর্তী দুটি সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধের আত্মপ্রকাশ হয়। প্রথম প্রবন্ধটি হল 'নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত'র "সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা", 'বিচিত্রা' ১৩৩৪ ভাদ্র, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা (পৃ. ৩৮৩-৯০) ও দ্বিতীয় প্রবন্ধটি— 'দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগ্‌চী'র—"'সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"— বিচার', 'বিচিত্রা' ১৩৩৪ আশ্বিন, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা (পৃ. ৫৮৭-৬০৬)। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩ : 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব', পৃ. ৩০৮)

—এ বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১০২৪-২৭

পত্র-৩

১ রাধারাণী দেবী (১৯০৩-১৯৮৯)। অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে তাঁর রচিত পদ্য প্রথম প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায়। তিনি 'রাধারাণী দত্ত' নামে 'ভারতবর্ষ', 'উত্তরা', 'কল্লোল', 'ভারতী', পত্রিকায় লিখতেন।

রায় জলধর সেন বাহাদুর -সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ. ৯২০-৩৮), রাধারাণী দত্তের 'সাগর স্বপ্ন' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। তারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৩৪ কার্তিক সংখ্যায়, 'মণিমুক্তা' বিভাগে কিছু বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিয়ে তাঁর লাঞ্ছনা সাহিত্যের আঙিনা থেকে সামাজিক দেহলিতে গিয়ে পৌঁছয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিদ্রূপের বাণী বড়ো কঠিন ভাবে বাজে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শনিমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে শান্তিনিকেতন থেকে এই পত্রটি প্রেরণ করেন।

[বি. দ্র. এই পত্রটি সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাসের পুত্র রঞ্জনকুমার দাসের কাছে বর্তমান সংকলয়িতা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। উত্তরে রঞ্জন দাস

বলেছিলেন যে, 'তাঁরা মনে করেন এই চিঠিটি— রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠীকে লিখেছিলেন।']

পত্র-৪

১ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র উষালগ্নে, শনিগোষ্ঠীর সঙ্গে কল্লোল ও কল্লোল-অনুসারী অন্যান্য পত্রিকার, আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রবল বিরোধ বাধে। এই সম্পর্কে সজনীকান্ত লিখেছেন "আমরা কয়েকজন একক (অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, মোহিতলাল মজুমদার ও সজনীকান্ত দাস), 'শনিবারের চিঠি' একা— বিরুদ্ধ পক্ষে বড় বড় মহারথী, একুনে সাতাশটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। চারিদিকে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিয়াছিল ; সেকালের অতি আধুনিক ও আধুনিকত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা খুলিলেই ইহার পরিচয় মিলিবে।"

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে ছিলেন।

(দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৯০)

আধুনিক সাহিত্য-সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রার্থনা করে সজনীকান্ত তাঁকে আনুমানিক ১৩৩৪ কার্তিকে একটি পত্র লিখেছিলেন।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরটি জানান।

২ 'প্রবাসী' ২৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ (পৃ. ২১৫-২১৯), রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রীর ডায়ারি' শিরোনামে 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

পত্র-৫

১ তারানাথ রায় -সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি'।

২ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত ১৩৩৪ আষাঢ় মাসিক 'বিচিত্রা', ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় (পৃ. ৯-৭০), রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' গীতিনাট্য কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

সজনীকান্ত এই গীতিনাট্যের বিরূপ সমালোচনা করে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এবং তা 'অরসিক রায়' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক

‘আত্মশক্তি’র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের ৯, ১৬, ২৩, ৩০ তারিখে ও আশ্বিন মাসের ২৭ তারিখের সংখ্যায় পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। ‘শনিবারের চিঠি’র তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সজনীকান্তের সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকে মোহিতলাল মজুমদারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সমালোচনা সাহিত্য ও ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায়, সজনীকান্তকে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত, ‘ভারতী’ ১২৮৪, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। (দ্র. রবিজীবনী : ১, পৃ. ২৬৩-৬৬)

৫ কবিকৃত বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের সমালোচনাটি ১৩০০ চৈত্র সংখ্যার সাধনা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তা ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। (দ্র. রবিজীবনী ৩, পৃ. ২৯১)।

পত্র-৭

১ ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট লেকচারার মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯ মে ১৯৩০, অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম হিবার্ট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতামালার পরবর্তী দুই দিন হল ২১ ও ২৬ মে, ১৯৩০। এই ভাষণের বিষয় ছিল : ‘The Religion of Man’। কবির এই বক্তৃতা তৎকালীন ইংলন্ডে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

কিছুকাল পরে এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য ‘মানুষের ধর্ম’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃ. ৩১৬, ৩১৯, ৩৭১-৭৩)

২ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ‘শনিবারের চিঠি’ আধুনিক সাহিত্যকে বিদ্রূপ করে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ‘শনিবারের চিঠি’র পক্ষ থেকে বারংবার সজনীকান্ত পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে “সম্পূর্ণ দলাদলি নিরপেক্ষভাবে

চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১২৯) করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১৩৩৪ শ্রাবণ 'বিচিত্রা'র ১ম, বর্ষ ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সাহিত্য ধৰ্ম্ম' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বক্তব্য এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় নি। এই প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত পরেই তিনি পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ জাভা, সুমাত্রা, বালি, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন (যাত্রাকাল : ১২ জুলাই ১৯২৭—২৭ অক্টোবর ১৯২৭)।

২৩ অগস্ট ১৯২৭ জাভা থেকে বালি যাবার পথে প্লানসিউজ জাহাজে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধৰ্ম্ম'-এর পরিপূরক 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে 'যাত্রীর ডায়েরি' শিরোনামায় প্রকাশিত হলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী : ৩, 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব', পৃ. ৩০৪-০৭)।

পত্র-৮

১ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও জাতীয় অধ্যাপক। তিনি ছিলেন মধ্যবর্তী সেতু। একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভক্তি, অপরদিকে শনিগোষ্ঠীকে তিনি অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। ১৩৩৬ শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্র-বিদূষণে যখন অতিমাত্রায় মুখরিত হয়, সেই আঘাত রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে স্পর্শ করে। সুনীতিকুমার এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র হয়ে দরবার করতে। যার ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিও বিরূপ হলেন।

এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের লেখা সুনীতিকুমারকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু এই সময় কবি এত বেশি রকম বিচলিত ছিলেন যে চিঠিটির একটি নকল সজনীকান্তকে পাঠিয়েছিলেন।

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে পরবর্তীকালে লিখেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ক্ষমা না করিলে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৪)।

২ বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সফরকে কেন্দ্র করে সুনীতিকুমার কবিকে পত্রযোগে এই বিষয়ে তাঁর বিরূপ মতামত জানিয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সফরকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে যে পত্রাঘাত চলে তার ফলস্বরূপ তাঁদের মধ্যে ঈষৎ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৩৮ সালে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা-ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থটি সুনীতিকুমারকে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে, কবি ও সুনীতিকুমারের মধ্যে পুনর্মিলনের সূত্রযোজনা করেছিলেন।

(দ্র. ক) 'আত্মস্মৃতি' পৃ. ৫০২-৫০৩

খ) 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' পৃ. ১৬৭

গ) রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৫ ও ১৬

ঘ) রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্তের পত্র সংখ্যা-৬-এর সূত্র (২) ও (৩)। এবং পত্র সংখ্যা-৭-এর সূত্র (২) ও (৩)।

পত্র-৯

১ ১৩ জুন ১৯৩৮, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এর প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থটির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ ও অশান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অচিরাৎ, আর-একটি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ সংকলন প্রকাশ করবার বাসনা তিনি প্রকাশ করেন।

সংকলনটির সংস্কার ও নব সংস্করণের কাজে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে পঞ্চসদস্যের একটি সহায়ক পরিষদ গঠিত হয়। সজনীকান্ত এই পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এই নিয়োগপত্রটি তারই সাক্ষ্য।

পত্র-১০

১ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আসবেন মেদিনীপুরে, বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে। এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি প্রশস্তি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে

প্রার্থনা করেছিলেন সজনীকান্ত। ৫/৯/১৯৩৮ তারিখে সজনীকান্ত প্রার্থিত লেখাটিকে স্মরণ করে একটি স্মারক পত্র কবিকে প্রেরণ করেছিলেন। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিস্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র ৩)

২ তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেন, ছিলেন বিদ্যাসাগর স্মৃতি সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই উল্লেখিত প্রশস্তি কবিতা পাঠানোর কথা জানিয়েছেন। কবিতাটি স্মৃতিমন্দির প্রবেশ উৎসবের (৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) আমন্ত্রণপত্রে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

বিনয়রঞ্জন সেনকে প্রেরিত স্বস্তিবচন—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা-আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা।
হে বিদ্যাসাগর, পূর্বদিগন্তের বনে-উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি ;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে মহাক্ষণে *॥

* গ্রন্থে : শুভক্ষণে। অনুষ্ঠানে সজনীকান্ত কবিতাটি পাঠ করেন। (দ্র. 'পল্লী-শ্রী', (শ্যামলকৃষ্ণ দত্ত-সম্পাদিত, মেদিনীপুর) ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৫, পৃ ৬)

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ‘সাধনা’ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় ‘মুক্তির উপায়’ গল্প প্রথম প্রকাশ হয়।

‘মুক্তির উপায়’ গল্পটিকে পরে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। (দ্র. ‘রবিজীবনী’ ৩, পৃ. ২০৫)

এই নাটকটি সজনীকান্ত তাঁর সম্পাদিত ‘অলকা’ মাসিক পত্রিকার ১ম, বর্ষ ১ম, সংখ্যার প্রথম লেখা হিসেবে প্রকাশ করার বাসনা নিয়ে কবির কাছে সবিনয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘মুক্তির উপায়’ নাটকটি ‘অলকা’ ১ম, বর্ষ ১ম, সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪৫-এ (পৃ. ৫৭-৮৮) প্রকাশিত হয়।

৪ সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর (১৮৯৬-১৯৬৯) কবি হিসেবে খ্যাতি ছিল। জীবনের প্রায় ৫০ বছর শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর সেবায় নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন সহচর ও একান্ত সচিব ছিলেন।

সুধাকান্তকে উদ্দেশ করে একাধিক কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তন্মধ্যে ‘প্রহাসিনী’র অন্তর্গত মাত্র দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। (দ্র. প্রহাসিনী ৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪০৭)

পত্র-১১

১ ‘মুক্তির উপায়’ নাটকটি।

২ ‘মুক্তির উপায়’ নাটকটির ভূমিকায় রয়েছে— ‘পুষ্পমালা’ হৈমর দূরসম্পর্কের দিদি। সংস্কৃততে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার ‘একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের।’

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে কোনোভাবেই তাঁর উচ্চস্তরের রচনা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। এই মর্মে কবি কিশোরীমোহন সাঁতরাকে ১৭/৯/৩৮ তারিখে একটি চিঠিতে লেখেন—

“নাটকখানা ওকে [সজনীকান্তকে] পাঠিয়ে দিয়েছি। কবে ওদের কাগজ বেরবে জানিনে। জিনিষটা যে শ্রেষ্ঠদরের তা এখনো আমার মনে হয় না। বোধ হয় আমার সেক্রেটারির [সুধাকান্ত রায়চৌধুরী] দ্বিধা আছে —তাই ওটা অভিনয় সম্বন্ধে খুঁৎ খুঁৎ করচে।”

৩ দ্বিতীয় সংস্করণ 'কাব্য-পরিচয়'-এর যে খসড়া তৈরি করেছিলেন পঞ্চ পারিষদ তারই পরিমার্জিত রূপটি দেখতে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন।

১৭/৯/৩৮ তারিখে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছেন— “কাব্য-পরিচয় সম্বন্ধে সজনীকে তাগিদ কোরো। একবার খসড়াটা আমার কাছে দাখিল কোরো— কারণ যখন আমার নাম থাকবে তখন দায়িত্ব আমার।”

৪ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। প্রখ্যাত কবি, গায়ক, সুরকার ও লেখক। তিনি সঙ্গীতরত্নাকর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৩ জুন ১৯৩৮ তারিখে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনে কবিকৃত নির্বাচিত দিলীপ রায়ের কবিতাগুলি সম্পর্কে স্বয়ং রচয়িতা বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ২৯ জুন ১৯৩৮ কিশোরীমোহন সাঁতরা মংপুতে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন—“দিলীপ রায় সম্মতি দিয়েছেন; কিন্তু লিখেছেন 'Selection ভাল হয় নি কিন্তু, প্রায় কারুরই নয়'।” (দ্র: 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয়' দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৯, পৃ. ২২)

বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রথম সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে নানাবিধ অশান্তি শুরু হয়। ফলস্বরূপ পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের 'কাব্য-পরিচয়' নির্বাচন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনেক ক্ষেত্রেই বিরত করেন এবং সেইসব স্থানে পঞ্চসদস্যের পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করেন। সজনীকান্ত ছিলেন এই পরিষদের অন্যতম সদস্য কিন্তু তাঁর নামোল্লেখে দিলীপ রায় কিঞ্চিৎ বিচলিত হতে পারেন এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ দিলীপ রায়ের নিকট সজনীকান্তের নাম এক্ষেত্রে আর উল্লেখ করেন নি।

পত্র-১২

১ ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের আর্থিক উদ্যোগে ও সজনীকান্তের সম্পাদনায় 'অলকা' আত্মপ্রকাশ করে ১৩৪৫ আশ্বিনে।

২ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। বাংলা আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম কাণ্ডারী। আধুনিক যুগের কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। 'প্রগতি' ও 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের সম্পাদক।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' প্রথমবার প্রকাশিত হয় ১৩ জুন ১৯৩৮। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪, পৃ. ১৩৪-৩৫)

'বাংলা কাব্য-পরিচয়'-এর দ্বিতীয় খসড়ায়, রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে আধুনিক কবিদের রচনা সংযোজন করেছিলেন। এই শেষের পরিবর্তিত অংশ নিয়ে 'কাব্য-পরিচয়' পুনর্বার প্রকাশিত হলে, 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, ১৩৪৫ আশ্বিন সংখ্যার 'কবিতা' পত্রিকাতে সংকলনটির বিশেষভাবে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। (দ্র. 'বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে'— রবীন্দ্রচর্চা, ৩য় সংখ্যা ১৯৯৮)

তাঁর মতে—" 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে'র উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট, নির্বাচনের ভিত্তি অনুপস্থিত ; এমন কি গদ্যছন্দ বর্জন সম্বন্ধে একটিমাত্র উল্লিখিত নীতিরও ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না যে রবীন্দ্রনাথই এই বইয়ের সম্পাদক, হয়তো শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাঁর কেরানিদের উপর তিনি বড়ো বেশি নির্ভর করেছিলেন।" (দ্র. 'বাংলা কাব্য-পরিচয়'— 'কবিতা' ১৩৪৫ আশ্বিন, সংখ্যা—৭ পৃ. ৫৫-৭৫)।

৩ সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। প্রখ্যাত আধুনিক কবি। মূলত গদ্য কবিতার রচয়িতা। পিতা অরুণচন্দ্র সেন, শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' প্রকাশকালে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'সমর-সেন'-এর রচিত কবিতা সংকলনভুক্ত করেন নি। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কোনো-কোনো সমালোচক কবি সম্পাদিত সংকলনের বিদ্রূপও করেছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রূপ ছিল ভ্রান্তিমূলক। কারণ রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যপরিচয়'-এর ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন 'যে গদ্য কবিতা এই সংকলনে সম্পূর্ণ বর্জন করা হবে।' ("দ্রঃ 'বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে'— রবীন্দ্রচর্চা, ৩য় সংখ্যা ১৯১৮)।

'সমর সেন'-এর কবিতা নির্বাচিত না হওয়ায় বুদ্ধদেব বসু অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে লিখলেন—"গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ নেন নি ; না নেবার অধিকার তাঁর সম্পূর্ণই আছে। সেইজন্যে সমর সেন বাদ পড়েছেন। ১৯২৭-২৮-এর পরে অর্থাৎ কল্লোলের সময়ের পরে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নতুন শক্তির আবির্ভাব সমর সেনেই। খুব কম বাঙালী কবিতেই এত অল্প বয়সে এতখানি বুদ্ধির পরিণতি ও আঙ্গিকের উপর দখল পাওয়া গেছে। বাংলা গদ্যছন্দকে সমর সেন নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন ও করছেন। তাঁর প্রভাব এর মধ্যেই যথেষ্ট ব্যাপক, আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে প্রায় কোনো যুবকই তাঁকে অনুকরণ না ক'রে লিখতে পারেন না। সমর সেনের প্রভাব পাওয়া যায় এমন কবিতা 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে'ও আছে। সমর সেনকে নিতে হবে ব'লেই গদ্যছন্দকে স্বীকার করা অযৌক্তিক হত না, তবে রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য ছন্দকে নেনই নি, তখন ভুলক্রমেও কোনো গদ্যকবিতা যাতে ঢুকে না পড়ে সে বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য নিশ্চয়ই প্রখর ছিল। কিন্তু নিশিকান্তর 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তর' কেমন করে ঢুকলো? (দ্র. 'বাংলা কাব্য-পরিচয়', 'কবিতা', ১৩৪৫ আশ্বিন, সংখ্যা-৭, পৃ. ৭২)

৪ 'কাব্য-পরিচয়'এর নির্বাচন সম্বন্ধে যে দিলীপকুমার রায় দুঃখ পেয়েছিলেন তার ইঙ্গিত মেলে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি সুদীর্ঘ পত্র থেকে। 'কাব্য-পরিচয়'-এর সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপ রায়ের পত্র থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"কাব্য সংকলনের মতো কাজ বড় পরিশ্রমের কাজ— বহু নগণ্য লেখকের লেখা ঘেঁটে তবে নির্বাচন করতে হয়। আপনার লক্ষ কাজ —আপনি শ্রান্ত— কাজেই কেউ আপনার কাছে এতটা খাটুনির আশা করে না— কিন্তু যাঁরা নির্বাচন করেছেন তাঁদের bonafides সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করবার হেতু যথেষ্ট। তাঁরা আপনার সুনামকেও নিজের কাজে লাগালেন আর আপনি এতে প্রকাশ্য সম্মতি দিলেন এতেও আপনার বহু অকৃত্রিম ভক্ত ব্যথা পেয়েছেন। তারা হয়ত সবাই নগণ্য কিন্তু তবু তাদের বেদনারও কোনো মূল্য আপনার কাছে নেই— ভাবতে কি জানি

কেন প্রায় সেন্টিমেন্টাল গোছের ব্যথা লাগে। আরো দুঃখ এই যে এ সব কথা প্রকাশ্যে লেখার পথ নেই— যেহেতু অন্যকে লক্ষ্য করে বাণ ফেললেও সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং আপনি— যাঁর কাছে আমাদের ঋণ এত বেশি যে একটু ব্যথা দিতে মন চায় না। ইতি প্রণত দিলীপ।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্য-পরিচয়' দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৯, পৃ. ৩২)

৫ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১-১৯৬০। বিশিষ্ট আধুনিক কবি। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক। পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত দুটি কবিতা 'শ্রাবণ বন্যা' ও 'নবীন লেখনী'— এই দুটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ নবচেষ্টার পরিচয় হিসেবে কাব্য-পরিচয় সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের মতে তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাকে তিনি বর্জন করেছেন। তিনি এই মর্মে ১ জুন ১৯৩৮ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগকে তাঁর অভিযোগ একটি পত্রযোগে ব্যক্ত করেন। চিঠিটি হল—

"সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রমারফৎ জেনে গর্ববোধ করছি যে আমার দুটো কবিতা রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত কাব্যসঙ্কলনে স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সে-দুটোর মধ্যে 'শ্রাবণ বন্যা' (যার প্রথম লাইন : সঙ্কীর্ণ দিগন্তচক্র ; অবিলুপ্ত নিকট গগনে) নামক কবিতাটির পুনর্মুদ্রণে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেটার আরম্ভ : অধুনা আনীত নব অলিখিত, সেটা একেবারেই অচল। কারণ আমার লেখার অন্যত্র তার চেয়ে ভালো রচনা তো আছেই, যে বই থেকে ওটা নেওয়া, তাতেও ওটাই নিকৃষ্টতম। সুতরাং ওই কবিতাটি সঙ্কলন থেকে বাদ দিলে অনুগৃহীত হবো। ইতি ১ জুন ১৯৩৮।

বশংবদ
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্ভবত এই চিঠির সংবাদ রবীন্দ্রনাথের গোচরে আসে। এবং কালিম্পঙ থেকে ১০ জুন ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে লেখেন :—

"১০ জুন ১৯৩৮

ওঁ

Gouripur Lodge
Kalimpong
Phone Kal-10

কল্যাণীয়েষু

শুনলুম বাংলা কাব্যপরিচয়ে তোমার কবিতা ছাপানো ব্যাপারে তোমার মন উত্ত্যক্ত হয়েছে। বোধহয় অদ্ভুত শয্যাশরিকদের সান্নিধ্য তোমার ভালো লাগচেনা, বোধ হয় বাছাই কাজও পছন্দমাফিক হয় নি।...

ভাবী সংস্করণে ছাড়া সংশোধনের উপায় নেই তাই এবারকার মতো তোমাদের পরিচয়ে একটা কবিতার দ্বারা ক্ষতের উপর প্রলেপ দেবার চেষ্টা করা গেল। ইতি ১০/৬/৬৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

দ্র. চিঠিপত্র, ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪

উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ ১১ জুন ১৯৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রযোগে তাঁর অভিযোগ পুনরায় জানান। তার কিয়দংশ হল—

"'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এর সংশোধন আর সম্ভব নয় জেনে সত্যই মর্ম্মাহত হলুম। কিন্তু এ দুঃখবোধের জন্যে আমার শয্যা-শরিকেরা দায়ী নন।... 'তন্বী' বইখানায় এই রকম খারাপ কবিতা একাধিক আছে। কিন্তু তার মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট নিশ্চয় 'নবীন লেখনী'। তাই সেটার পুনর্মুদ্রণে আমার ঘোরতর আপত্তি।"

তিনি আরো লিখলেন— "আসলে এই সঙ্কলনের সঙ্গে আপনার নাম জড়িত না থাকলে সঙ্কলনকারের দায়িত্বহীনতা উপেক্ষা করা হয়তো শক্ত হতো না। কিন্তু ছাপার হরফে আপনি যার সম্পাদক, এমন বই অনাগত বাঙালী পাঠকেরও শ্রদ্ধা পাবে। তা না পেলেও এ-বই যখন

বিদ্যার্থীদের পাঠ্য, তখন এর সম্বন্ধে এতখানি অসতর্কতা শোচনীয়। এখানে আপনার ভাগ্যে অনুরূপ বিড়ম্বনা ঘটেছে জেনেও কোনো সান্ত্বনা নেই, ...”।

(দ্র. চিঠিপত্র ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ১০০-১০২)

রবীন্দ্রনাথ ১৬ জুন ১৯৩৮ কালিম্পঙ থেকে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখছেন— “সুধীন্দ্র যদি তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও সেই রকম শুদ্ধি অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর অভীপ্সিত কোনো কবিতা (যদি ঐ মাপে পাওয়া যায়) তা দিতে পারো। সমসাময়িক কবিদের নিয়ে এর চেয়ে আরো বিভ্রাট ঘটেনি এইই আমার আশ্চর্য ঠেকছে। কবি জাতটাই খুঁৎখুঁতে।”

“সুধীন্দ্রের নালিশের কথাটা বিচার কোরো”। এই মর্মে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে কবির এই উক্তি বিশেষ উল্লেখ্য।

দ্র. চিঠিপত্র (ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ৩৪২)

ভবিষ্যৎ সংস্করণের কাজে পুনরায় যাতে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয় সেই ভেবেই সজনীকান্তকে এই পত্রে কবির সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ লক্ষণীয়।

পত্র-১৩

১ অক্টোবর, ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের যে কালিম্পঙ যাবার একটা পরিকল্পনা ছিল তা তিনি ২৪/৮/৩৮ তারিখের একটি চিঠিতে ইন্দিরাদেবীকে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

শান্তিনিকেতন

UTTARAYAN
Santiniketan Bengal

“কল্যাণীয়াসু বিবি

...৩রা সেপ্টেম্বর নাগাদ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে—ততদিনে তোরা আসতে পারবি আশা করচি। তারপরে আমি কালিম্পঙ চলে যাব স্থির হয়েছে।...

২৪/৮/৩৮

রবিকাকা”

(দ্র. চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৭৫, পৃ. ১১৯)

অক্টোবর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ যাবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সেই সময়ের দৈনন্দিন কাগজ 'হিন্দু', 'স্টেট্সম্যান' ও 'যুগান্তর'-এর সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ অক্টোবরে (১৯৩৮) শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার দরুন ও শান্তিনিকেতনের পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যের গুণে তিনি আবার শান্তিনিকেতনেই প্রত্যাগমন করেছিলেন।

(সূত্র : শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

পত্র-১৪

১ কিশোরকান্ত বাগ্‌চী, হেমন্তবালা দেবীর কন্যা বাসন্তী বাগ্‌চী ও ডা. নিখিল বাগ্‌চীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২ কিশোরকান্তের জন্ম উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ৩০ জুলাই ১৯৩৮ যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তা 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসেবে স্থান পায়। যদিও ভ্রমবশত তার রচনা তারিখ '১৯/৮/৩৮' রূপে মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য কাব্যগ্রন্থে দুইটি পঙক্তির স্থান পরিবর্তন ও শেষ পঙ্‌ক্তির 'এই বুঝি দিল আনি' স্থলে "বুঝিবা দিতেছে আনি" পাঠ লক্ষণীয়। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৯৮-৫০০) সজনীকান্ত উক্ত কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'র জন্য কবি-সমীপে প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'কবিতাটি' তৎপূর্বেই নরেন্দ্র দেব -সম্পাদিত কিশোর পত্রিকা 'পাঠশালা'য় প্রকাশিত হয়ে যায়।

৩ কিশোরকান্তের ডাকনাম।

৪ হেমন্তবালা দেবী (১৮৯৪-১৯৭৬)। গৌরীপুর, ময়মনসিংহের দানবীর, শিল্পী, সংগীতানুরাগী জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভাগ্নে ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে হেমন্তবালার বিবাহ হয়।

তিনি জোনাকী, সত্যবাণী দেবী ছদ্মনামে লিখতেন। জীবনের পরম আধ্যাত্মিক সংকটে তাঁর 'কবিদাদা'র সঙ্গে যে পত্রালাপ শুরু করেন তার সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম।

'চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চরম মতবিরোধের চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন শনিচক্রের আক্রমণ, চরম-সীমা লঙ্ঘন করেছে, সেই সময়ে হেমন্তবালা দেবীর মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজনীকান্তের সন্ধিস্থাপনের প্রচেষ্টা, বঙ্গসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চিরস্মরণীয় ঘটনা।

৫ সজনীকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি সদ্য-আবিষ্কৃত পত্র, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অবগতির জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

৬ 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র জন্য সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্রযোগে একটি লেখা প্রার্থনা করেছিলেন।

৭ রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে লিখেছিলেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত তাঁর 'ভাষা পরিচয়'এর ভূমিকাটি তিনি পরিষদ পত্রিকার জন্য দিতে সম্মত। কিন্তু বইটির স্বত্বাধিকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

প্রসঙ্গত "(২৪ অক্টোবর ১৯৩৮, ৭ কার্তিক ১৩৪৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক পাঠ্যরূপে মনোনীত হইয়াছে।"
(দ্র. রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৯)

৮ রবীন্দ্রনাথের শর্ত ছিল, সজনীকান্ত যদি তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৫৩), নিকট 'ভাষা-পরিচয়'এর ভূমিকাটি পুনঃপ্রকাশের সম্মতি আদায় করতে পারেন তা হলে তা প্রকাশে আর কোনো বাধা হবে না।

প্রসঙ্গত "বাংলা 'ভাষা-পরিচয়ে'র ভূমিকা" প্রবন্ধাকারে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৯ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন-এর তোষণনীতি। তিনি হিট্‌লারকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে তোষণনীতি দ্বারা সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্য-পরিচয়'এর নির্বাচনকার্যে আধুনিক যুগের কবিদের শান্ত করতে চেম্বারলেনি পদ্ধতিকে অনুসরণ করার কথাও ভেবেছিলেন।

পত্র-১৫

১ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যদিও খুব বেশি পুরোনো নয় তথাপি যে সকল অতীতের গদ্য-গ্রন্থ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। এই অল্পকালের মধ্যেই তাদের অধিকাংশের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। যেমন : ১৭৪৩ সনে প্রকাশিত রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্য-গ্রন্থ—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' মানু এল্-দা-আস্‌সুম্পসাম্। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম গদ্য-গ্রন্থ, বাংলা হরফে মুদ্রিত, রাম রাম বসু-রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত বহু পরিশ্রম করে এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেন ও তাদের যথাযথ পাঠ মিলিয়ে, ভূমিকায় লেখকের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জীসহ গ্রন্থগুলি পুনঃপ্রকাশ করেন। এই প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা বলে অভিহিত হয়।

২৭ অক্টোবর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত লিখে দিয়েছিলেন। "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছেন।"—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ পৃং ২৫০। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃ. ১৫৯)

সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থমালার ১২ ও ১৩ সংখ্যক গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ১২—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৩৪৬, শ্রাবণ) ও ১৩ 'কথোপকথন' (১৩৪৯, বৈশাখ)।

২ নাতির (কিশোরকান্তের) জবানীতে দিদিমা (হেমন্তবালা দেবী) সম্বোধনী কবিতার উত্তর দিলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি সজনীকান্তের মারফত প্রেরিত হয়। কিন্তু উক্ত পত্র যথাসময়ে যথাস্থানে না আসায়, হেমন্তবালার নালিশে কবির এই উক্তি।

৩ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল 'বাংলা ভাষা পরিচয়' তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করবেন। এবং গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে সুনীতিকুমারকে দিয়ে তা "আগাগোড়া যাচাই" করে নেবেন। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩২৯)

কিন্তু একদিকে 'শনিবারের চিঠি'র হয়ে ওকালতি ও অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যসফরকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে যে পত্রাঘাত চলে তাতে তাঁদের সম্পর্কে অন্তরের গভীরে ছেদ পড়েছিল।

অবশেষে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ের কথা সুনীতিকুমারের কাছে নিবেদন করেন। তিনিও সানন্দে রবীন্দ্রনাথের উভয় বাসনা পূরণ করতে রাজি হন।

(দ্র : ক) সজনীকান্তের লেখা চিঠি, সংখ্যা—৬ ও ৭
খ) রবীন্দ্রনাথের ৮-সংখ্যক পত্রের সূত্র-২)

পত্র-১৬

১ আশ্বিন ১৩৪৫, 'অলকার'র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' প্রকাশিত হয়েছিল। তার দক্ষিণা রূপে কাঞ্চন মূল্য দেড়শত টাকার একটি চেক পত্রযোগে ৩০/১০/৩৮ তারিখে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-৬)

২ 'বাংলা ভাষা পরিচয়' সম্পর্কিত কাজে, রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নির্দেশানুযায়ী 'শনিবার' ৫ নবেম্বর, ১৯৩৮, সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শম্ভু সাহা ও সজনীকান্তের শান্তিনিকেতন যাবার দিন স্থির হয়েছিল।

৩ হেমন্তবালা দেবীর দৌহিত্র কিশোরকান্তের ডাকনাম 'নাচন'। নাচনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানির বাহক ছিলেন সজনীকান্ত।

পত্র-১৭

১ রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে অবলম্বন করে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তা 'দশচক্র' নামে সর্বপ্রথম ষ্টার থিয়েটারে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১০-এ অভিনীত হয়। (দ্র. 'সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৪০)

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'মুক্তির উপায়' গল্পটির নাট্যরূপ লেখেন। এবং তা 'অলকা' ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১৩৪৫ আশ্বিনে প্রকাশিত হয়।

নাট্যরূপ দেবার দুমাস পরে 'মুক্তির উপায়' নাটকটি মহড়া প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে একটি পত্রে

লিখেছেন—"আশ্রমে 'মুক্তির উপায়' অভিনয়েরও আয়োজন হচ্ছে।" তারিখ ৬ নবেম্বর ১৯৩৮।

কিন্তু ১১ নবেম্বর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখছেন "রঙ্গমঞ্চে...মুক্তিসাধন ঘটল না। প্রয়োগকুশল নটের অভাব।" (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ সূত্র ২)

২ জেম্‌স ফেনিমোর কুপার (১৭৮৯-১৮৫১) বিখ্যাত মার্কিন কবি। ভিক্টোরিয়ান যুগের সাহিত্যিক। মার্কিন মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পত্র-১৮

১ সুফিয়া হোসেন (সুফিয়া কামাল বেগম) ১৯১১-১৯৯৯। শৈশবে প্রথাগত শিক্ষালাভের সুযোগ না হলেও পরবর্তী জীবনে বিদ্রোহী করি নজরুলের শিষ্যা ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা, প্রতিবাদি বিশিষ্ট কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে খালাত ভাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৯২৫-এ 'তরুণ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বন্ধু' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭-এ 'কেয়ার কাঁটা' ও ১৯৩৮-এ 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। সম্ভবত পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সাঁঝের মায়া' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন।

পত্র-১৯

১ হেমলতা দেবী (১৮৭৩-১৯৬৭)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ হয় ২৩ এপ্রিল ১৮৯১। হেমলতা দেবী ছিলেন দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। (দ্র. 'রবিজীবনী' ৩, পৃ. ২০৬-০৭)

হেমলতা দেবী ছিলেন সুলেখিকা। তাঁর 'দেহলি' গ্রন্থের গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রটি লিখেছিলেন, তা 'দেহলি' গ্রন্থের প্রথমে মুদ্রিত হয়। পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল :—

"কল্যাণীয়াসু

তোমার ছোটো গল্পগুলি পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। কী মানবচরিত্রের কী তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের ছোটো বড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষে তোমার দৃষ্টি শক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্র প্রদর্শনী। তোমার গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষভাবে ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য। ইতি ৮ই চৈত্র ১৩৪৫"।

দ্র. 'দেহলি' প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৪৬)

তাঁর 'জ্যোতিঃ' কাব্যগ্রন্থে কবিতা ও গান সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে—"শ্রীমতী ইন্দিরী দেবী, পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বশুর মহাশয়, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বশুর মহাশয় ও প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কয়েকটি গানে সুরসংযোগ ও স্বরলিপি করিয়া দিয়াছেন।..." (দ্র. 'জ্যোতিঃ', (ভূমিকা— গ্রন্থকর্ত্রী)

শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বালকগণের কাছে তিনি 'বড়মা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পুরীতে বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রমে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

পত্র-২০

১ ১৯৩৫ জানুয়ারি, সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনার কাজে ইস্তফা দেবার পরে, পুরাতন নথিপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকা নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। সঙ্গী হিসেবে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনাগুলির একটি সুষ্ঠু পঞ্জী তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকাতে অনেক রচনাই 'নামহীন ও কল্পিত নামাঙ্কিত ছিল। তন্মধ্যে যে-সমস্ত রচনাগুলিকে সজনীকান্ত নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চিহ্নিত করেছিলেন সেই সমস্ত অনুমেয় রচনাগুলির 'সঠিক নির্ধারণ' করবার জন্যে

অক্টোবরের গোড়ার দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে মংপুতে একটি পত্রযোগে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

২ মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর স্মৃতি সৌধের নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্তির পথে। সমিতির কর্তাদের ঐকান্তিক বাসনা উক্ত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন যেন রবীন্দ্রনাথ করেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজনীকান্তের হৃদ্যতার কথা বহির্জগতে গোপন ছিল না। অতএব উক্ত সমিতির কর্তারা এইসূত্রে সজনীকান্তকে কবির কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।

পত্র-২১

১ আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন ১৮৬২-৬৩ পর্যন্ত। তিনি পুনরায় যুগ্মভাবে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন ১৮৭১-৭২। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী'-৪, পৃ. ৩২২)

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র' [?] শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ১৮৭৩ সালে মে-জুন মাসে অর্থাৎ ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র পরবর্তী ছয় সংখ্যা ধরে। সেই সময় দেখা যাচ্ছে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। তাঁর সম্পাদনার কাল ১৮৭২-৭৮।

প্রসঙ্গত এই রচনাটি সম্বন্ধে দ্বিমত আছে এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবিষয়ে চিঠিতে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

২ 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বছরে অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, পৃ. ২০০-০৬ ; রবীন্দ্রনাথের বাল্য বয়সের রচনা 'ঝান্‌সীর রাণী' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭, মে (১৩৬৪ বঙ্গাব্দে ২৫ বৈশাখ) বিশ্বভারতী এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। পরে ১৩৬২, ২২ শ্রাবণ প্রকাশিত 'ইতিহাস গ্রন্থে প্রবন্ধটি সংকলিত হয়। (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ. ২৩২)

''ঝান্‌সীর রাণী' রচনাটি 'ভ' স্বাক্ষরযুক্ত, যেটি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়বাহী। তা ছাড়া মালতী পুঁথি-র 32/১৭ খ পৃষ্ঠায় 'ঝান্সী রাণী'

শিরোনামে একটি গদ্য রচনা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে ভারতী-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মধ্যবর্তী অনেক অংশের বিষয় ও ভাষায় সাদৃশ্য আছে। 'মালতী পুঁথি'-তে প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ খসড়া সম্ভবত করা হয়নি।" (দ্র. 'রবিজীবনী'-১, পৃ. ২৭৬-৭৭)

৩ রবীন্দ্রনাথের 'সান্ত্বনা' প্রবন্ধটি 'ভারতী' ১২৮৪, চৈত্র সংখ্যায় পৃ. ৩৯৯-৪০১ প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রিংশ খণ্ডে 'বিবিধ' বিভাগে 'সান্ত্বনা' অন্তর্ভুক্ত হয়, (ফাল্গুন ১৪০৪), পৃ. ৩৮৭-৮৮।

পত্র-২২

১ ১৭ অক্টোবর ১৯৩৯ সজনীকান্ত মংপুতে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠিতে কবির জ্যোতিষবিষয়ক লেখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানান। সঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর একটি লেখাও পাঠিয়েছিলেন। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৪)

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—এই চিঠির "সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হেমন্তবালা দেবীর একটি লেখাও প্রেরিত হল।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৭৩)

কিন্তু ঐ সময়কার 'শনিবারের চিঠি'তে হেমন্তবালা দেবীর কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে পৃ. ৪৯৬-৯৭, জোনাকী দেবী ছদ্মনামে হেমন্তবালা দেবীর রচিত 'গদ্যকবিতা' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

পত্র-২৩

১ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তৃতীয়বার রবীন্দ্রনাথ মংপুতে গিয়েছিলেন। (দ্র. 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১০১)

রবীন্দ্রনাথ ২৫/১০/৩৯ তারিখে ইন্দিরাদেবীকে মংপু থেকে একটি পত্রে লেখেন—

"—৫ই নবেম্বর অবতরণ করব নিম্নভূমিতে। দু-চার দিন কলকাতায় যখন থাকবো দেখা হবে।...

রবিকাকা

কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, লিখেছেন, এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে প্রায় দুইমাস ছিলেন। সময়কাল— ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ৯ নবেম্বর ১৯৩৯। ও কলকাতায় দুইদিন বাসের পর ১১ নবেম্বর ১৯৩৯, কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী'-৪, পৃ. ২০৪)

পত্র-২৪

১ ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ ভারতী চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় পৃ. ৫৯-৬০ 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচায্য' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের 'দুদিন' কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কবিতাটি সন্ধ্যাসঙ্গীত ১/৩২-৩৩ সংকলিত হয়। (দ্র. রবিজীবনী ২, পৃ. ৬৭)

'দুদিন' কবিতাটির পূর্বকথনে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন— রবীন্দ্রনাথ প্রথম বার বিলাত থেকে বিদায়কালে "ডাঃ স্কটের বাড়িতেও এক শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা হল।" 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ, মিসেস স্কট্ ও তাঁর মধ্যে বিদায় সম্ভাষণের কথা উল্লেখ করলেও, স্কট কন্যাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। কিন্তু কবির প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মালতীপুঁথির 61/৩২ ক ও 62/৩২ খ পৃষ্ঠায় একটি অসম্পূর্ণ কবিতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—"যেটি এই বিদায় অবলম্বনে লেখা। ...বোঝা যায় অব্যবহিত বেদনার অভিঘাতে কবিতাটির সমগ্র ভাবরূপ মনের মধ্যে স্পষ্ট হওয়ার আগেই তিনি এটি লিখতে শুরু করেছিলেন।

...পরে কবিতাটি ভারতীর জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ [পৃ. ৫৯-৬০] সংখ্যায় আরও অনেকগুলি ছত্র ও পাঠান্তরসহ 'শ্রীদিকশূন্য ভট্টাচার্য্য' স্বাক্ষরে 'দুদিন' নামে মুদ্রিত হয়। ভারতী-তে সাধারণত রচয়িতার নাম মুদ্রিত হত না, তা-সত্ত্বেও 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য্য' নাম ব্যবহার কিছু তাৎপর্য বহন করে বলে মনে হয়—গভীর হৃদয়বেদনাকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াস এতে সুস্পষ্ট।" (দ্র. 'রবিজীবনী-২', পৃ. ৪৫)

২ 'সমালোচনী' পত্রিকাতে, রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর' ও 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর। অমরাবতী' ছদ্মনামে রচিত দুটি কবিতা ও চারটি

প্রবন্ধ পাওয়া যায়, রচনাগুলি হল—

১৩০৮, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ফাল্গুন, পৃ. ৮১-৮২। 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর। অমরাবতী', ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, কবিতাটির নাম 'আদর্শ কবিতা'।

১৩০৯, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২০৫-২১৪, 'রণরঙ্গিনী' 'আদর্শ উপসংহার *'। ("শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত * 'ফুলজানি' উপন্যাসের উপসংহার")। রচয়িতা 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

১৩০৯, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, পৃ. ৩০৪-০৬, একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'সম্পাদকের প্রতি'। রচয়িতার নাম ছিল 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।' অমরাবতী'।

১৩০৯, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, পৃ. ৪৭৩-৭৬, 'অনুস্বর ও বিসর্গ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারের নাম 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

১৩১০, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, পৃ. ২১-২৪, 'প্রস্তাব' শীর্ষক পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারের নাম— 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

১৩১১, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ ২২১-২৬, 'সমালোচনার ধারা' —পত্র-প্রবন্ধ— 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

পত্র-২৫

১ ২১ নভেম্বর ১৯৩৯, সজনীকান্তের জীবনে একটি স্মরণীয় সন্ধে —ঐদিন শান্তিনিকেতনে কবিসকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন সজনীকান্ত, তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত, কবির বালক বয়সের রচিত "অভিলাষ" কবিতা নিয়ে।

ঐদিন কবির রচিত কবিতা ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আরও অন্যান্য সামগ্রীও, সজনীকান্ত কবির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৬)

২১ নভেম্বর সন্ধেতে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে সজনীকান্তকে একটি কৌতুক রেখাচিত্র স্বহস্তে এঁকে দান করেছিলেন। চিত্রটিতে কবির মন্তব্য ছিল—"সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি"। চিত্রটির সঙ্গে "অবচেতনার

অবদান" শীর্ষক একটি ছড়াও রচনা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছড়াটির প্রথম ছত্র—

"গল্‌দা চিংড়ি তিংড়ি-মিংড়ি"। এই ছড়াটির সঙ্গে একটি মুখবন্ধ যুক্ত ছিল। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৫)

প্রসঙ্গত কৌতুক চিত্রসহ ছড়াটি 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কবিতাটির রচনাকাল বিষয়ে একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। " 'ছড়া' বইটির প্রথম প্রকাশকাল থেকে এখনও পর্যন্ত— এর শেষতম মুদ্রণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫) পর্যন্ত কবিতাটির তারিখ দেওয়া আছে '১৯ নভেম্বর ১৯৪০'। বিভিন্ন রচনাবলীতে (বর্তমান রচনাবলীতেও) ওই একই তারিখ মুদ্রিত আছে। কিন্তু কবিতাটির তারিখ ১৯ নভেম্বর ১৯৩৯। পাণ্ডুলিপিতে এই তারিখই দেখা যায়।" (দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৭৪)

পত্র-২৬

১ রচনাবলী সংস্করণের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ "প্রাক্ সন্ধ্যাসঙ্গীত যুগের" রচনাগুলিকে আমল দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু সজনীকান্তের মতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই রচনাবলীভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সজনীকান্ত এই মর্মে কবির বাল্য ও কৈশোরের রচনাগুলিকে রচনাবলীভুক্ত করবার অভিপ্রায় জানিয়ে তাঁর অনুমতির জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জোর গলায় বলেছিলেন—"সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি ইতিহাসের ধারা মানিনে।" 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন— "কবি শেষ পর্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয়-ধস্তাধস্তির পর "অচলিত সংগ্রহ" আখ্যা দিয়া "রচনাবলী"র কয়েকটি খণ্ড প্রকাশে অনুমতি দিলেন।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৭)

'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের ঝড়তি-পড়তি লেখা সংগ্রহ ও প্রকাশে তাঁহার যে আপত্তি ছিল না" উল্লেখিত দলিলটি তারই সাক্ষ্য। (দ্র. রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' বৈশাখ ১৩৬৭-৬৮)

পত্র-২৭

১ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯, মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানের জন্যে রচিত ভাষণ।

প্রসঙ্গত 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যায় পৃ. ৪৩৬-৪০ রবীন্দ্রনাথের পঠিত অভিভাষণটি প্রকাশিত হয়। অভিভাষণটির রচনাকাল—২৮/১১/৩৯

২ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে শান্তিনিকেতন থেকে রেলপথে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি বদলের কথা।

৩ রচনাবলী সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠকে সজনীকান্ত প্রস্তাব করেছিলেন —যে-সকল গ্রন্থে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিল, রচনাবলী মুদ্রণকালে তাদের পাঠান্তরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া প্রয়োজন। শান্তিনিকেতনে ২১ নবেম্বর ১৯৩৯, সাক্ষাৎকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে সজনীকান্ত তাঁর প্রস্তাবটি নিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ২৩ নভেম্বর ১৯৩৯ পত্রযোগে তৎকালীন রচনাবলী সম্পাদকমণ্ডলীর অধিনায়ক পুলিনবিহারী সেনকে জানান। পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল :—

"কল্যাণীয়েষু,

সজনীকান্তের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি যে রাজা ও রাণী ও বিসর্জনের পাঠান্তরগুলি দ্বিতীয় খণ্ডেরই পরিশিষ্ট ভাগে প্রকাশ করা কর্তব্য— নইলে তার উপযোগিতা ব্যর্থ হবে। ইতি ২৩/১১/৩৯

রবীন্দ্রনাথ"

(দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৮)

বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের এই মত অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। তাঁদের প্রধান অন্তরায় ছিল রচনাবলী প্রকাশে বিলম্বের সম্ভাবনা। সজনীকান্ত এই বিষয়ে সকলরকম সমস্যার কথা অবহিত করে পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৩)

৪ লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫-১৯১৫)। ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র।

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"লোকেন পালিত ছিলেন কবির আবাল্য বন্ধু। প্রথমবার বিলাতে তাঁহার সহিত যে পরিচয় হয় তা লোকেনের অকাল-মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত ও সমঝদার। ১৮৮৬ সালে তিনি সিবিল সার্ভিস পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন।" (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ. ২১৪-১৭)

বোম্বাই থেকে রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালে প্রথম বার বিলাত অভিমুখে যাত্রা করেন। (দ্র. রবিজীবনী-২ পৃ. ১৪)

'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে যে বিতর্কের ঝড় লোকেন্দ্রনাথ তুলেছিলেন তাতে তাঁর চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথের পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সজনীকান্ত ২৯ নবেম্বর ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্র যোগে জানতে চেয়েছিলেন—""মানসী'র ভূমিকায় 'শেষ উপহার' কবিতাটি যে ইংরেজি কবিতার ইঙ্গিতে রচিত, তার রচয়িতা কে?। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৩)

রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল লোকেন পালিত। কিন্তু মূল কবিতাটির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

পত্র-২৮

'বঙ্কিম রচনাবলী' (বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) সম্বন্ধে দু-এক ছত্র লিখে দেবার জন্যে, ২৯ নবেম্বর ১৯৩৯ তারিখে সজনীকান্ত পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রচনাবলী প্রচারের সুবিধার্থে কবির অভিমতটি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এবং সেইসঙ্গে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়, কবির কাছে জানিয়েছিলেন সজনীকান্ত। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৩)

১ ডিসেম্বর ১৯৩৯, তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমতটি লিখে পাঠিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রাম রাজকুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের সহায়তায় ও তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেনের উদ্যোগে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে ১৩৪৫ আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক দিবসে 'বঙ্কিম রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্কিম রচনাবলী' ইংরেজি ও বাংলা রচনায় সম্পূর্ণ হয় নয় খণ্ডে ১৩৪৮ সালের পৌষে।

পত্র-২৯

১ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ কলকাতা পৌরসভা -আয়োজিত 'খাদ্য ও পুষ্টি' প্রদর্শনার (Food and Nutrition Exhibition) উন্মোচন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছবার পর, মেদিনীপুরগামী ট্রেন ছাড়বার মধ্যবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবেন।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৯, শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনি, অনিলকুমার চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শচী রায়। প্রদর্শনীর পক্ষ থেকে কবিকে স্টেশনে স্বাগত জানান তৎকালীন কলকাতার মেয়র নিশীথ সেন, কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার।

রবীন্দ্রনাথ উৎসব ক্ষেত্রে "খাদ্য ও পুষ্টি" সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ পাঠ করেন। এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি', কলিকাতা পৌর পরিষদের অনুষ্ঠিত, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে পঠিত।" প্রবাসী, ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যায় পৃ. ৪১৮-১৯ প্রকাশিত হয়। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২০৯)

রচনাটির শেষ অনুচ্ছেদের আগে আরো একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ পাওয়ায় যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র (১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯) প্রতিবেদনে :

> "গত মহাযুদ্ধের পর যে ক্ষোভ আমি প্রকাশ করেছিলাম আজ তার পুনরুক্তি সময়োচিত হবে। আমি বলেছিলাম আমাদের দেশে সামরিক অবরোধ নেই, কিন্তু চিরদৈন্যের অবরোধে দেশের

অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরে আধপেটা খেয়ে আসছে তার উত্তরোত্তর সঞ্চিত পরিমাণের কথা ভালো করে ভাবি নি। আমরা যতটা খাই তাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেননা, শুধু কেবল নিশ্বাস নেওয়াকেই তো বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি, কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে চিরজীবন সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে থাকবার মতো আহার পায় না সেইটেই দুঃখ। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হতে যদি এর ফল দেখি, তা হলে দেখা যাবে আমাদের দেশে মজ্জায় কর্মোদ্যম দুর্বল হওয়াতে অধিক মূল্যে অল্প ফল পাই। অন্য দেশে একজন যে কাজ করে, আমাদের দেশে সে কাজে হয়তো চার জনের দরকার হয়। এতে কেবল কাজের পরিমাণ হ্রাস হয় তা নয়, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেননা, কাজের শক্তি থাকলে সে শক্তি খাটাতে আনন্দ পাই, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছা হয় না। কর্মসম্বন্ধে সেই সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুণ। য়ুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে আমাদের দেশের লোক কাজে শৈথিল্য করে, তাদের কেবলই পাহারা এবং শাসনের উপর রাখতে হয়। বংশানুক্রমে প্রভুদের নিজেদের দেহ সহজেই পুষ্ট বলে এ কথা তারা মনেই করতে পারে না যে এ দেশে কর্তব্য এড়াবার ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতই শরীর পোষণের অভাব হতে। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরছে এবং জীবন্মৃত হয়ে আছে তারও কারণ ওই, শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলবে না। কী করে আমরা বাঁচব এ কথা ভাববার নয়, কেননা, কোনোমতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। কী করে আমরা পুরোপুরি বাঁচব সেইটেই ভাববার কথা। কৃশতাবশত জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নেই বলে জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি করে ফাঁকি দিচ্ছি, কর্মসাধনায় সত্যপর হচ্ছি না। এতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক ও আন্তরিক যে লোকসান হচ্ছে, সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে কম কাজ হচ্ছে, কম ফসল ফলছে, কম বিঘ্ন কাটছে, প্রাণের স্রোতোবেগে মন্থরতা ঘটছে, অঙ্ক দিয়ে কি তার পরিমাণ পাওয়া যায়! শরীর মনের উপজাত যে

> অবসাদ, যে ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদের ধূলিসাৎ করে রেখেছে তার ভার কি সামান্য।"

এ-বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ক, ফাল্গুন ১৪০৬, পৃ. ১০১২-১৩।

২ চিরপ্রভা সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, মেদিনীপুরে সম্পূর্ণ কবির ইচ্ছাধীনে, স্বতন্ত্র একটি বাড়িতে তাঁকে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে সুষ্ঠুভাবে সকল ব্যবস্থাদির তদারকি করতে তাঁর একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্বেই মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সংবাদ দিলেন যে তৎকালীন জেলা-অধিকর্তার বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর (চিরপ্রভা সেন) তত্ত্বাবধানে কবির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে চিরপ্রভা সেনকে ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯, চিঠিতে লিখলেন—

"কল্যাণীয়াসু চির,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। কিছুদিন থেকেই মেদিনীপুরে যাবার আলোচনা চলছে। তোমাদের দূত সজনীকান্তের সঙ্গে এই কথা স্থির করেছি যে আমাকে একলা কোনো বাড়িতে যেন রেখে দেওয়া হয় —আমার অভ্যেস সম্পূর্ণ নিরালায় থাকা— এখানেও আমি একখানা বাড়িতে একলা থাকি। সজনী তাই বলেছিলেন— আমাকে স্বতন্ত্র বাড়িতে স্থান দেবেন, তাতে আমার অনেকটা ক্লান্তি দূর হবে। ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪/১২/৩৯"

(দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৯-৪০)

এক্ষেত্রে চিরপ্রভা সেনকে চিঠি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হলেন না। সেইসঙ্গে সজনীকান্তকেও ৬/১২/৩৯ তারিখে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

৩ '১৭৯৮ শকের মাঘ মাসের (৯ম কল্প, ২ ভাগ, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় একটি

ছোটো অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া মনে হয়।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য', পৃ. ২১২)

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের নামী-বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কারের গবেষক সজনীকান্ত ৫/১২/১৯৩৯ তারিখে পত্রযোগে এই সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। (দ্র. সজনীকান্তের চিঠি, সংখ্যা-১৪)

রবীন্দ্রনাথ ৬/১২/১৯৩৯ তারিখের পত্রে সজনীকান্তকে নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেননি। তবে ভাষাটা যে তাঁর সেকেলে ভাষার মতো, তা তিনি অস্বীকার করেন নি; তিনি লেখেন, "সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঠিক এই জাতীয় 'কবিতা লিখিয়ে' আর কেহ ছিল না।"

এই অনুবাদটি সম্পর্কে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—"তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়"—প্রথম পঙ্‌ক্তিযুক্ত ৮ ছত্রের এই অনুবাদ কবিতাটি 'রূপান্তর' [১৩৭২] গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২-তে 'রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অনুমিত' মন্তব্য সহ মুদ্রিত হয়েছে [পৃ. ১৯২-৯৩]। এখানে পঙ্‌ক্তিগুলি অন্যভাবে বিন্যস্ত হওয়ার জন্য কাব্যরূপটি অনেক বেশি স্পষ্ট।" (দ্র. রবিজীবনী-১, পৃ. ২৪৭)

পত্র-৩০

১ নাতনি অর্থাৎ নন্দিনী দেবী (১৯২১-১৯৯৫)। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা, ডাক নাম পুষু ও পুপে। নন্দিনী দেবী স্মৃতি থেকে লিখেছেন: "শুনেছি আমার বয়স যখন দশমাস সেই সময় আমার বাবা-মা আমাকে রথীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।...

যতদূর মনে পড়ে ১৯২২ সালে আমি কবিগুরুর পরিবারভুক্ত হই।" (দ্র. রবিজীবনী-৮, পৃ. ২৭৪-৭৫)

নন্দিনী দেবীর পিতা ছিলেন কচ্ছদেশীয় বণিক। নাম— চতুর্ভূজ দামোদর। ১৯২১ সালে সপরিবারে তাঁরা শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে আসেন। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২১৩)

১৯৩৯, ৩০ ডিসেম্বর (১৪ পৌষ ১৩৪৬) বম্বের অধুনা মুম্বই-এর অজিত সিং মোরারজী খাটাউ-এর সঙ্গে নন্দিনী দেবীর বিপুল সমারোহে বিবাহ হয়েছিল।

২ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাক্রমে ১৯৩৮ থেকে সজনীকান্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী পরিদর্শন মণ্ডলীর সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। বছরব্যাপী সেই সমস্ত রচনাবলী সংক্রান্ত কাজ অব্যাহত ছিল। সেইজন্যে সজনীকান্তের ডাক পড়েছিল বানানের মন্ত্রণাসভায়।

৩ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : ১৮৮৩-১৯৬১। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ১৯৩২-১৯৫৭ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে তাঁর ইংরেজি রচনাগুলি রচনাবলীতে যেন স্থান পায়। সেই প্রসঙ্গে তিনি এই চিঠিতে সজনীকান্তকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যে ম্যাকমিলানের স্বত্ববহির্ভূত ইংরেজি রচনাগুলিকে রচনাবলী সংস্করণের সময় অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৫)

কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তাঁর ইচ্ছা ফলবতী করতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অক্ষম হয়েছিলেন।

৪ ১৯৩৯-এর শেষার্ধে অমলাদেবী ছদ্মনামে, বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ললিতানন্দ গুপ্তের ‘মনোরমা’ নামে গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত, তাঁর বাল্যবন্ধুর গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্যটি এই পত্রটির সঙ্গে প্রেরণ করেন।

উল্লেখ্য কবির অভিমতটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হয়। (দ্র. ‘আত্মস্মৃতি’, পৃ. ৩৫৫)

পত্র-৩১

১ লর্ড ক্রস (Lord Richard Asseton Cross)-এর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে Indian Council’s Bill-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে উপলক্ষ করে কলকাতায় ২৬শে এপ্রিল ১৮৯০ (১৪ বৈশাখ, ১২৯৭), তিনটি প্রতিবাদ সভা আহূত হয়। একটি সভা হয় ‘দক্ষিণ শহরতলির চেতলা হাটে ও অপর দুটি আয়োজিত হয় উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীটের দুটি রঙ্গমঞ্চে। বিডন স্ট্রীটের একটি সভার সভাপতি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন।

অপর সভাটি হয় এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে। উক্ত সভায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি ১২৯৭ সালের বৈশাখে 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠে প্রবন্ধটি ২৪ পৃষ্ঠায় একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (দ্র. রবিজীবনী ৩, পৃ. ১৪৩-৪৪)

১৩৪৬ সালের পৌষ মাসে প্রবন্ধটি তখনকার সময়োপযোগী হবে মনে করে, সজনীকান্ত তা 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠি লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে অনুমতি পত্রটি লেখেন ৫ জানুয়ারি ১৯৪০।

'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি কবির অনুমতি পত্র সহ ১৩৪৬ মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে ১২শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় পৃ. ৪৭৫-৯৫ প্রকাশিত হয়।

এ-বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য প.ব. সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ (২৫ বৈশাখ ১৪০৮) পৃ. ১১৭৯-৮০।

পত্র-৩২

১ ১৯৪০, জানুয়ারি, সেই সময় বিশ্বভারতীর আর্থিক পরিস্থিতি শোচনীয় রূপ নিয়েছিল। কোনো দিক থেকে সহায়তা না পেলে পরিস্থিতির সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন বিশ্বভারতীর বেতনভোগী— পরিস্থিতি এমনই সঙ্গিন যে তাঁর বেতনের অর্থ-যোগানও বড়ো কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমতাবস্থায় ১০ জানুয়ারি, ১৯৪০ সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবি-সমীপে উপস্থিত হলে— রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই দুই বিষয়েই সচেতন করেন। ও ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছিলেন— "যদি যোগাযোগ ঘটাতে পার তোমাকে যে 'অবচেতনার অবদান' ছবিটি এঁকে দিয়েছি তার ওপর একটি কবিতা লিখে দেব।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৪৪)

কলকাতায় সজনীকান্ত দুই বিষয়েই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পূর্বকথামতন বিশ্বভারতীর তহবিলে অর্থের জন্য ঝাড়গ্রাম রাজকুমার

নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের নিকট দরবার করেছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঝাড়গ্রাম রাজকে ঝাড়গ্রামে বীরসিংহ ও মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারে অতিরিক্ত দোহন করা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'কে 'বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ' প্রকাশার্থ সদ্য সদ্য দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। এই সব কারণে, সেই সময় ঝাড়গ্রাম-রাজের আনুগত্য পাওয়া সম্ভব হয়নি বিশ্বভারতীর পক্ষে।

২ অমিয় চক্রবর্তী : ১৯০১-১৯৮৬। দেশে ও বিদেশের ইংরেজি সাহিত্যে ও তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব রূপে ছিলেন ১৯২৬-৩০ সাল পর্যন্ত। ১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ যাত্রাকালে ও ১৯৩২-এ পারস্য-ভ্রমণের সময়, তিনি কবির ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন।

বিশ্বভারতীর এই আর্থিক সংকটকালে (১৯৪০), সজনীকান্ত ঝাড়গ্রাম-রাজের আনুগত্য লাভে সফল না হলেও দ্বিতীয় বিষয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিয় চক্রবর্তীকে বহাল করবার জন্য সজনীকান্ত দরবার করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট। যদিও তিনি নানা কারণে অমিয় চক্রবর্তীর ওপর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না তথাপি রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন সজনীকান্ত। এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর দরখাস্তটি যেন ৩১ জানুয়ারি ১৯৪০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছয় এই অনুরোধ জানিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ১৮/১/৪০ তারিখে একটি চিঠি লেখেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৬)

৩ "তদাহং নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়"।—কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা জানবার জন্য দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র জয়ের কোনো আশা না থাকায় সঞ্জয়কে এই কথা বলেছিলেন। বিশ্বভারতীর এই সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ এতই বিপর্যস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, কোনো দিক থেকেই তিনি কোনোরকম আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। সেইজন্যই এই উক্তি করেছিলেন।

পত্র-৩৩

১ *পুলিনবিহারী সেন (১৯০৮-১৯৮৪)। খ্যাতনামা রবীন্দ্রবিশারদ্।* ১৩৩৫ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৯ থেকে তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে যোগদান করেছিলেন। বিস্মৃতপ্রায় রবীন্দ্ররচনার সূচী ও সংকলন, তাঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান, কিশোরীমোহন সাঁতরা অসুস্থ হওয়ায় তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেন। পত্রে "আগামী রবিবার"—অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ পুলিনবিহারী সেন শান্তিনিকেতনে আসবেন রচনাবলীকে উপলক্ষ করে। 'ঐ আলোচনা ক্ষেত্রে' সজনীকান্তের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত প্রয়োজন। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে জরুরি তলব করে ১/২/১৯৪০ তারিখে, বৃহস্পতিবার সজনীকান্তকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন— চিঠি প্রাপ্তির পরের দিনই অর্থাৎ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ শনিবার সজনীকান্ত কবি সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৫৬)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ৩/২/৪০ তারিখের চিঠিটি অন্যরূপ সাক্ষ্য দেয়। পত্রসূত্রে জানা যায় যে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, বেলা ১২টায় তাঁর শান্তিনিকেতনে যাওয়ার দিন স্থির হয়। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৮)

পত্র-৩৪

১ মার্চ ১৯৪০ অর্থাৎ ১৩৪৬-এর ফাল্গুনের গোড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবসর গ্রহণ করবেন। ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহে কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ-সভায় নতুন সভাপতির নাম প্রস্তাব করার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ কখনও পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন নি। পরিষদের সূত্রপাতের সময় থেকে পরবর্তী কয়েক বছর সহকারী সভাপতি ছিলেন (দ্র. ক) রবীন্দ্রজীবনী-২, পৃ. ২০১ ; ৪, পৃ. ৩১৯, খ) রবিজীবনী-৪, পৃ. ১৪-১৫, ২৬১-৬২, ৬ পৃ. ৩৯-৪০)

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক পরিস্থিতির জন্য সভাপতি রূপে তাঁকে পাওয়া তখন অসম্ভব জেনেও, পত্রযোগে সজনীকান্ত কবিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে প্রস্তাবটি জানিয়েছিলেন। এই চিঠিতে কবি তারই উত্তর দিয়েছেন।

২ ১৯৪০ সালে চণ্ডীদাসকে নিয়ে সেই সময় বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবিসকাশে উপস্থিত হলে—ওই দিন সেখানে বাঁকুড়া জেলার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে বাঁকুড়া জেলার সাহিত্য সম্মিলনী সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। তৎকালীন বাঁকুড়া জেলা অধিকর্তা ও বর্ধমানের অস্থায়ী কমিশনার ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক হীরালাল হালদারের পুত্র, সুধীন্দ্রকুমার হালদার (আই.সি.এস.)। তাঁর স্ত্রী, কলকাতায় বিখ্যাত চিকিৎসক প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কন্যা, উষা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহাস্পদা। এই হালদার দম্পতিই ছিলেন বাঁকুড়ার সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান উদ্যোগী। এবং এঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ ওই বয়সে বাঁকুড়ায় সাহিত্য-সভায় যোগদানে সম্মত হয়েছিলেন।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন :— "ইঁহাদের প্রার্থনা শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ সম্পৃক্ত ছিল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম এই সভার মূল উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাসকে প্রতিষ্ঠিত কর।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৪৫-৪৬)

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"বীরভৌমিক সজনীকান্ত অনুমান করলেন, বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়ে ছাতনাপন্থীরা তাঁর সমর্থন আদায়ের চক্রান্ত করেছেন। সজনীকান্ত অন্তরঙ্গ অবসরে এ বিষয়ে কবিকে সচেতন করিয়ে দিলেন।" তারই ইঙ্গিত রয়েছে 'চাণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যা'র মধ্যে। (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৯১)

৩ ৪ মার্চ, ১৯৪০।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "বাঁকুড়ায় কবি ছিলেন হিল্‌হাউস নামে একটি বাড়িতে (১-৩ মার্চ ১৯৪০ : ১৭-১৯ ফাল্গুন

১৩৪৬)।... তিন দিন বাঁকুড়ায় থাকিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে কলিকাতা হইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।” (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২১৯-২২০)

পত্র-৩৫

১ এই বছরে (১৯৪০), বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গিন। এই সংকটকালে, অবস্থার সামাল দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নানা দিকে সাহায্যের জন্যে অনুরোধ করেছেন। তন্মধ্যে সংগীত ভবনের ভগ্নপ্রায় অবস্থা কবিকে আরও বিচলিত ও উদ্‌বিগ্ন করেছে।

২ ঝাড়গ্রাম রাজ কুমারনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর, বাংলা দেশের বহু হিতকর কাজে ও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে, তাঁর দানের হাত সুপ্রসারিত করেছিলেন। বিশ্বভারতীর এই সংকট মুহূর্তে, তাই কবির মন বারংবার তার সংস্রব লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

৩ পূর্বে উল্লিখিত (পত্র ৩২) ‘অবচেতনের অবদান’ চিত্র বিষয়ে কবিতা বিষয়ে আশ্বাস। অপিচ পরবর্তী পত্র ৩৬ দ্রষ্টব্য।

পত্র-৩৬

১ ‘অবচেতনার অবদান’ শীর্ষক কৌতুক চিত্রের ওপর রবীন্দ্রনাথ একটি ছড়া রচনা করে সজনীকান্তকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন। যদিও তা ছিল শর্তসাপেক্ষ। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩০)

শান্তিনিকেতনের অসহ্য গরম থেকে নিষ্কৃতি পেতে রবীন্দ্রনাথ ২০ এপ্রিল ১৯৪০ কলকাতা থেকে কালিম্পঙ যাত্রা করেন।

কিন্তু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর কালিম্পঙে পৌঁছতে নির্ধারিত সময়ের কিছু বিলম্ব হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথ কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে মংপুতে এসেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন—“১৯৪০ এর ২১শে এপ্রিল কবি চতুর্থবার মংপু পৌঁছলেন।” (দ্র. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’, পৃ. ১৪৫)

মংপুতে এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ সতেরো দিন ছিলেন। এবং ৭ মে ১৯৪০ কালিম্পঙের ‘গৌরীপুর ভবন’ এ এসেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২৩১-৩২)

অপেক্ষাকৃত শীতল পরিবেশে পাহাড়ে কবির মন যথেষ্ট নরম হয়েছিল বলেই সজনীকান্তের অনুমান। সেই সময়ে প্রসন্নচিত্তে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেকার শর্তকে উপেক্ষা করে সজনীকান্তকে পত্রযোগে একটি ছড়া উপহার দিয়েছিলেন। ছড়াটির প্রথম ছত্র—

"সুবলদাদা আনল টেনে আদম দীঘির পাড়ে"।

অর্ধেক শর্ত অপূর্ণ থাকায় কবির এই উপহারে অতিমাত্রায় লজ্জা ও কুণ্ঠা বোধ করেন সজনীকান্ত এবং রথীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কবিতাটি অপ্রকাশিত থাকে।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ১৩৪৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম কবিতা হিসেবে কবির হাতের লেখার প্রতিলিপিতে ছড়াটি প্রকাশিত হয়।

"'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত কবিতাটি ছিল লেখাটির আদিরূপে। 'ছড়া' গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে প্রভেদ এখানে বেশ কিছু। সেগুলি এখানে দেওয়া হল—'হাঁচির পরে সারি সারি' থেকে পাখার মতো নড়ে' পর্যন্ত চারটি ছত্র সেখানে ছিল না। এ ছাড়াও ছিল না 'টেবিলেতে তুফান ওঠে' থেকে 'সমুখটা যায় পিছে' পর্যন্ত দশটি ছত্র। কিছু ছোটো খাটো প্রভেদ লক্ষণীয়—'বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে' ছিল—'মনিব মিঞা বাঁদরটাকে' ; 'রামছাগলের ভারী গলায়', ছিল 'রামছাগলের মোটা গলায়' ; 'অল্প কিছু লাগ্‌ল ধোঁকা'— 'অল্প কিছু লাগল ধাঁধা' ; 'বললে, পড়াশুনোয় কেবল' —'বললে, ফিজিক্স পড়ে কেবল' ; 'সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে' ছিল 'সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের'। এ ছাড়া শেষ দুটি ছত্রের পরিবতন অনেকটাই। পাণ্ডুলিপিতে এ দুই ছত্র ছিল :

ছেলেরা সব হাততালি দেয় বাজে রে ডুগডুগি
গভীর জলে কাৎলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি॥"

(দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৪০৮, ২৫ বৈশাখ, পৃ. ৪৭০)

২ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—১৮৯৪-১৯৬১। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক। সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ 'সুর ও

সঙ্গতি' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়। অপিচ 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
১৯৪০ 'পরিচয়' পত্রিকার, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের—"রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির তীব্র-প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী কালিম্পঙ থেকে "রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবসান" নামক একটি রচনা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশার্থ সজনীকান্তের নিকট পাঠিয়েছিলেন। রচনাটি ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'র প্রসঙ্গ কথায় প্রকাশিত হয়।

পত্র-৩৮

১ বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির 'টুয়েলভ টিসু রেমেডিজ' শীর্ষক বইটি বায়োকেমিক চিকিৎসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই।

২ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)—১৮৯৯-১৯৭৯)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। ১৯১৫ সালে তাঁর কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় 'বনফুল' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।

পেশায় ডাক্তার ও দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ভাগলপুরে তিনি প্যাথলজিস্ট রূপে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসকে একসময় বড়বাবু, মেজবাবু ও ছোটবাবু বলা হত— এই নামকরণের মধ্যে থেকেই বোঝা যায় তাঁদের আত্মিক হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের গভীরতা কীরূপ ছিল।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায় 'বনফুল' আক্ষরিক অর্থে অনুজ সজনীকান্তের কাছে সকল বিষয়েই ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। এককথায় সজনীকান্ত ছিলেন তাঁর পারিবারিক বন্ধু, অভিভাবক ও পরামর্শদাতা।

পত্র-৩৯

১ সজনীকান্তের ২৮/৬/৪০ তারিখে লেখা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের জবাবী চিঠির আনুমানিক তারিখ ২০/৬/৪০ আছে। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-২১)

'আত্মস্মৃতি' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' এই দুটি গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের লেখা এই চিঠির উল্লেখিত আনুমানিক তারিখ ২০/৬/৪০ রয়েছে।

কিন্তু দুটি চিঠির বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্রনাথের পত্রটির আনুমানিক তারিখ হয় ২৯ জুন ১৯৪০।

এছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরও একটি সংগত কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি লেখেন কালিম্পঙ থেকে এইবারে কবি ৩০ জুন ১৯৪০ কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। অতএব চিঠিটি ২৯ জুন তারিখে লিখিত হয়েছে এই আমাদের অনুমান।

পত্র-৪০

১ সজনীকান্তের বিশিষ্ট বন্ধু 'বীরেন মিত্র' বায়োকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ইংরেজিতে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পত্রযোগে একটি প্রশংসাপত্র সংগ্রহের দাবি জানিয়েছিলেন সজনীকান্ত।

২ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

৩ রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাধীনে থেকে সজনীকান্ত বায়োকেমিক চিকিৎসায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত কবির নির্দেশে বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির, 'টুয়েলভ টিসু রেমেডিজ' গ্রন্থটি তিনি কিনেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংখ্যা-২৯)

তদুপরি আরও দুই শত টাকা ব্যয়ে, বায়োকেমিক শাস্ত্র আয়ত্ত করতে অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন সজনীকান্ত। পারিবারিক ক্ষেত্রে এই বিদ্যা প্রয়োগে বিশেষ সুফল পেয়েছিলেন তিনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা উমারানীর সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা তিনি নিজেই বায়োকেমিক মতানুসারে করেছিলেন। চিঠিতে সেই সুখস্মৃতিকেই স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পত্র-৪১

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, সজনীকান্তের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি হাসির কাব্য গ্রন্থ 'কেড়্স ও স্যাণ্ডাল' ও অপরটি হাসির গল্পের

বই 'কলিকাল'। সদ্য প্রকাশিত বই দুখানি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কবির অভিমত জানার অভিপ্রায়ে।

২ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ "অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার" কথা লিখেছিলেন। কিন্তু বিকল দেহ ও মানসিক চঞ্চলতার কারণে কোনো ভাবেই আর কলকাতায় থাকতে না পেরে, সেপ্টেম্বরেই তিনি পর্বতাভিমুখে যাত্রা করেন।

শান্তিনিকেতনে সকলের বাধা অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসেন। সেখানে ডা. নীলরতন সরকার ও ডা. বিধানচন্দ্র রায় কবিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করেন। এবং রবীন্দ্রনাথের শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁরা তাঁকে পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করতে নিষেধ করেন। কিন্তু ডাক্তারদের সকল নিষেধ উপেক্ষা করে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, বৃহস্পতিবার রাত্রেই, সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ রওনা হয়েছিলেন। এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ নিদারুণ অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে সেখান থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। (দ্র. ক. রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃ. ২৪৯-২৫২ ; খ. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৮৭-২০০।)

পত্র-৪২

১ বৈশাখ, ১৩৪৮ 'গল্পসল্প' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃ. ২৬৯-৭১)

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—গল্পসল্প, "প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একখণ্ড সজনীকান্তের কাছে পাঠিয়ে কবি তাঁর মতামত চাইলেন। 'গল্পসল্প' সজনীকান্তের খুব ভাল লেগেছিল। দেশে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ২১৬)

সজনীকান্ত একটি পত্রযোগে কবিকে তাঁর এই গ্রন্থটি ভালোলাগার কথা জানান। রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে ২৮/৫/৪১ তারিখে এই চিঠিটি লেখেন।

পত্র-৪৩

১ সজনীকান্ত আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের পত্র [২৮/৫/৪১] পাইয়াই আমি কেন জানিনা, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। ...খবর পাইতেছিলাম, তিনি দিনে দিনে শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারিলাম না।" (দ্র. ক. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৪২, খ. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৭)

ডায়াবেটিসের প্রকোপে তখন শয্যাশায়ী অবস্থা সজনীকান্তের। বাড়ির বাইরে যাওয়া তখন ডাক্তারের নিষেধ। এমতাবস্থায় স্ত্রী সুধারানীকে চন্দননগরে যাচ্ছেন বলে ৩ জুন ১৯৪১ সকালের ট্রেনে, রবীন্দ্র-দর্শনকামী দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে, ঐদিনই বিকেলের ট্রেনে ফিরে এসেছিলেন।

ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নিয়ে সজনীকান্তের অপ্রত্যাশিত আগমনে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কীভাবে আদর আপ্যায়ন করবেন তাই নিয়ে সচিব ও অনুচরদের বিপন্ন করে তুলেছিলেন।

প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও সজনীকান্ত যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি আনন্দিত ও আহ্লাদিত হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য মেলে কবির লেখা পরের দিনের চিঠি থেকে।

সজনীকান্ত এই চিঠি প্রসঙ্গে তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথের, "সম্ভবত বাইরের লোককে লেখা এইটিই শেষ পত্র।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৭)

২ মাড়োয়ারী বন্ধুর একজনের নাম নেমী চাঁদ। সজনীকান্তের খুব অন্তরঙ্গ ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

সুধারানী দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র-১

১ সুধারানীর চিঠির প্রেক্ষাপটে সজনীকান্তের উক্তিটি বিশেষ উল্লেখ্য —বৈশাখ, ১৩৪১, "দীর্ঘ সাত বৎসর বিরতির পর প্রেক্ষাগৃহে প্রথম ঘণ্টা পড়িল"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪২৬)

বস্তুত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের শেষার্ধে হেমন্তবালা দেবী সজনীকান্তকে পত্রদূত করে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ভক্তকে গুরুর সন্নিকটে উপস্থাপন করা।

ইতিমধ্যে, ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে রামমোহন-তিরোভাবের শতবার্ষিক উপলক্ষে বর্ষকালব্যাপী রামমোহন স্মরণোৎসবের সূত্রপাত হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী' থেকে রামমোহন স্মরণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, "অপরাধ হইয়াছিল? সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্বের অছিলায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে রামমোহন দূষণ হইয়াছিল"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪২৪)। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সমোড়ক 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী' "রিফিউজড্" লিখে ফেরত পাঠালেন। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন "ফলে প্রায় বিগলিত বরফ আবার শক্ত হইয়া গেলেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪২৫)।

১৩৪০, পূজাবকাশের প্রাক্কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধ-বক্তৃতাটি সজনীকান্ত ১৩৪১ বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশ করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের একটি শর্ত ছিল; প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন চাই। যথাসময়ে অনুমতি প্রার্থনা করে সজনীকান্ত কবির কাছে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু বৈশাখের তিন তারিখেও অনুমোদন পত্র না পৌঁছনোয় গুদামজাত মুদ্রিত 'বঙ্গশ্রী' নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন সজনীকান্ত। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পত্র এল ৪ বৈশাখ ১৩৪১।

কিন্তু এইবারের বরফ গলিয়ে ছিলেন সজনীকান্তের সহধর্মিণী সুধারানী। ১৩৪১, নববর্ষে সুধারানী রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। যতদূর সম্ভব 'মাসীমা'— হেমন্তবালাদেবীর অনুপ্রেরণায়। ৩ বৈশাখ, ১৩৪১ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই উত্তরটি আসে।

উমারানী দাসকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ-কবিতা

অটোগ্রাফ-কবিতা-১

১ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উৎসর্গ'; ১২ সংখ্যক কবিতা

২ দ্র. 'স্ফুলিঙ্গ', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃ. ১১৬২

প্রসঙ্গ কথা-২

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্র

পত্র-১

১৩৩৪ ভাদ্র নবপর্যায়ে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ১ম সংখ্যায় প্রথম রচনা (পৃ. ১-৯), সজনীকান্ত দাসের রচিত 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে সজনীকান্ত বাংলা ভাষায় আধুনিকতার যে জোয়ার এসেছিল তারই বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে সংকলিত হয় তাঁর রবীন্দ্রনাথকে লেখা এই চিঠিটি ও তৎসহ কবির জবাবী চিঠি। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২)

পরবর্তীকালে গৌতম ভট্টাচার্য তাঁর 'শ্লীলতা-অশ্লীলতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পুনরায় প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত এই পত্রটি বিশ্বভারতীর অভিলেখাগারের সংগ্রহে না থাকায়, ১৩৩৪ ভাদ্র 'শনিবারের চিঠি' থেকে গৃহীত হয়েছে।

১ (দ্র. ক.) সজনীকান্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র সংখ্যক-২, সূত্র (১) এবং (২)।

খ. রবীন্দ্রনাথের পত্র সংখ্যা-৪, সূত্র-(১)।

২ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি' বিচ্ছিন্নভাবে তিনটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৫ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হয় 'জুবিলি সংখ্যা।'— হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। আষাঢ়ে প্রকাশিত হয় 'বিরহ সংখ্যা'— সমকালীন সাহিত্যকে বিদ্রূপ করে। এবং কার্তিকে 'ভোট সংখ্যা' নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

বিরহ সংখ্যায় (পৃ. ৩৩-৩৫) যোগানন্দ দাস 'শ্রীআলিঙ্গন হাতী' ছদ্মনামে লিখেছিলেন "স্পষ্টকবি" শীর্ষক একটি কবিতা।

ঐ সংখ্যাতে (পৃ. ১১-৩৩) সজনীকান্তের 'শ্রীকেবলরাম গাজনদার" ছদ্মনামে একটি নাটিকা—"Orion বা কালপুরুষ" প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই নাটিকাটি তাঁর 'মধু ও হুল' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

বিরহ সংখ্যাতে (পৃ. ৪৯-৬৪), অশোক চট্টোপাধ্যায় 'শুভগ্রহ' ছদ্মনামে লিখেছিলেন একটি দুই অঙ্কের নাটক "স্বর্গে Sensation!" এবং

'শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল' ছদ্মনামে 'বিরহ-বেদনা-বিশ্লেষণ' শীর্ষক একটি কবিতা।

সজনীকান্ত ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত তিনটি রচনাই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন —"শনিবারের চিঠিতে পরবর্তীকালে 'অত্যাধুনিক' সাহিত্য নিয়ে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বান ডেকেছিল এই রচনাত্রয়ে তারই প্রথম কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ৩৮-৪১)

পত্র-২

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ৫-সংখ্যক পত্রের সূত্র-১

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ৫-সংখ্যক পত্রের সূত্র-২

৩ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২)। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন বেশ-কিছুদিন। আবহাওয়া-তত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণায় তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী।

১৯২১-৩১ এই দশবছর তিনি রবীন্দ্রনাথের কর্মসচিব ছিলেন।

১৩৩৪ ভাদ্র ও আশ্বিনের 'সাপ্তাহিক আত্মশক্তি'তে অরসিক রায় ছদ্মনামে সজনীকান্তের রচিত 'নটরাজ' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে, তৎকালীন সমাজে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারিত হয়।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন—"অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র আন্দোলন তরুণদের সমর্থক রবীন্দ্র-পরিবেশভুক্ত কয়েকজন প্রধানকে আমাদের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন দুই অধ্যাপক—অপূর্বকুমার চন্দ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই দলে ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র অপরাধে রবীন্দ্রপৃষ্ঠপোষিত সদ্য-প্রকাশিত 'বিচিত্রা'র প্রতি পুরাতন 'প্রবাসী'তে ঈর্ষাদুষ্ট প্রমাণ করিবার চেষ্টাও গোপনে গোপনে চলিয়াছিল, অরসিক রায়ের 'নটরাজ' প্রবন্ধটিকে তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতে চেষ্টা করিলেন।" ('আত্মস্মৃতি', প. ২১৬)

অবশেষে "প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ পর পর দুদিন—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৫ পৌষ ও ২৬ পৌষ—সজনীকান্তকে ধরে বিশ্বভারতী আপিসে নিয়ে গেলেন।" (দ্র.—'নিপাতনে সিদ্ধ', পৃ. ৩১)

উল্লেখিত দিনের তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। কারণ প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সজনীকান্ত যে ঐতিহাসিক পত্রটি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন তার তারিখ ছিল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ বাংলায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ২৭ অগ্রহায়ণ।

পর পর দুদিন ১১/১২/১৯২৭ ও ১২/১২/১৯২৭ প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে গভীর আলোচনার মাধ্যমে সজনীকান্ত জানতে পারলেন যে তিনি কাজটি ভাল করেন নি ও রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম আমার অসাবধানে-ফেলা জল অনেক নীচ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। আমি সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সরাসরি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন সাব্যস্ত করিলাম। সোজাসুজি সামনে যাইবার সাহস হইল না, একখানি দীর্ঘ পত্রযোগে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৭)

পত্র-৩

চিঠির উপরাংশে বাঁদিকে লিখিত রয়েছে "গুরুদেবের কবিতা পাঠানো হোলো ৬/৯/৩৮।" (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১০)

১ বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখা যে স্বস্তিবচনটি সর্বাগ্রে পঠিত হবে বলে স্থির হয়েছিল। সেই সূত্রে এই স্মারক পত্রটি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন।

প্রসঙ্গত দীর্ঘ দশ বছর পাঁচ মাস পরে সজনীকান্ত ৫/৯/৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে এই পত্রটি লেখেন।

২ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার (কে. সি. এস. আই) ১৮৭৬-১৯৪৫। তিনি কলকাতা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী —ব্যারিস্টার ও অর্থবান। 'ভারতীয় কোম্পানী আইন' ও 'ভারতীয় বীমা আইন'-এর প্রবর্তক।

পত্র-৪

পত্রের মাথার উপরে বাঁদিকে লেখা রয়েছে—"গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ১৫/৯/৩৮।" (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১১)।

পত্র-৫

চিঠির উপরে বাঁ কোণে লেখা আছে "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ২৮/৯/৩৮"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১২)

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১১-সংখ্যক চিঠির সূত্র-৩

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১২-সংখ্যক চিঠির সূত্র-২

পত্র-৬

চিঠির উপরে বাঁদিকের কোণে লেখা আছে "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ৩১/১০/৩৮"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৬)

১ রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

২ সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শম্ভু সাহা ও সজনীকান্ত।

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১৬-সংখ্যক পত্রের সূত্র-২

পত্র-৭

মূল চিঠিটির নিম্নাংশে লাল কালি দিয়ে বড়ো করে "R" অক্ষরটি লেখা আছে।

১ ৩১/১০/৩৮ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নাচনের চিঠিটির যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছানো সংবাদ জানতে চেয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৬)

তারই উত্তরে সজনীকান্ত কবিকে পত্রযোগে লিখেছিলেন যে নাচনের চিঠির একটি নকল হেমন্তবালা দেবীর কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। এবং কবির লেখা আসল চিঠিটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশার্থে নিজের কাছে তিনি রেখেছিলেন।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশস্তি কবিতা, নাচনচন্দ্রের জবাব ও পরে কবির নিজের জবাব, সমগ্র রচনাটিকে একটি প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করে, তার নাম দিয়েছিলেন—"অতি আধুনিক ভাষা"। প্রবন্ধটি ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি লক্ষণীয় ; কবি লিখেছেন—

“আমার কাছে নাচনের চিঠি এসেছিল সজনীর দৌত্যে—উত্তর গেছে তাঁরই হাত দিয়ে—দূত যদি সে চিঠি লোপ করেন তবে সে নালিশ তোমরা মিটিয়ো—শনিবারের চিঠিতে ওটা বের হবে ভাবিনি—মনে করেছিলুম ওটা অলকায় বেরবে।” (দ্র. চিঠিপত্র নবম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২৪৬, পৃ. ৩৭৯)

২ আত্মস্মৃতিতে সজনীকান্ত লিখেছেন—“৫ই নবেম্বর শনিবার প্রাতঃকালের ট্রেনে আমরা বোলপুরে পৌঁছিলাম”। (দ্র. ‘আত্মস্মৃতি’, পৃ. ৫০৪)

এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে তাঁরা ভোরের ট্রেনে রওনা হয়ে বেলা বারোটায় শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেছিলেন।

৩ সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু সাহা ও সজনীকান্ত।

৪ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৫ নন্দলাল বসু : ১৮৮২-১৯৬৬। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। ১৯১৪ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে চিত্রশিক্ষার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন।

পত্র-৮

পত্রের উপরে লাল কালিতে “file” শব্দটি লেখা আছে। ও ডানদিকে মাথার উপরাংশে লেখা আছে “গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ১১/১১/৩৮”। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৭)

১ নবেম্বরের গোড়াতে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেছিলেন। ফিরে এসে এই চিঠিটি লেখেন।

২ কিশোরীমোহন সাঁতরা ১৮৯৩-১৯৪০। তৎকালীন বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

৩ কাব্য-পরিচয়ে ‘রবীন্দ্রোত্তর যুগে’র কবিদের কবিতা সংকলন সম্বন্ধে সজনীকান্ত নিজেও খুব বেশি মাত্রায় শঙ্কিত ছিলেন। কারণ তিনি স্বয়ং এই দলভুক্ত। সেই কারণে সমস্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য এই যুগের খসড়াটির ওপর প্রয়োজন কবির ‘ঢ্যাঁড়া সই’-এর।

প্রসঙ্গত কাব্য-পরিচয়ের আদি ও মধ্য-যুগের নির্বাচন কার্য সমাধানের পথে জেনেও রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বেগ ও অশান্তির পরিধি ছিল না। নানা দিক থেকে তরুণ কবির দলের—বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ, অনুরোধ ও নির্দেশে তাঁর অশান্তির মাত্রা ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করে। ১১ নভেম্বর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখলেন "কাব্য পরিচয়ের আদ্য ও মাধ্যদের শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁরা অশান্তি ঘটাবেন না। অন্ত্যরা ভয়াবহ।"

(দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৭)

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি সংখ্যক-১৭। সূত্র ১

পত্র-৯

১ ১৬ নবেম্বর, ১৯৩৮, সজনীকান্ত ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

২ এই চিঠিতে সজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের লেখা ১১/১১/৩৮ তারিখের চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়েছেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৭)

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্র সংখ্যা-১৪। সূত্র-৬

৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়, 'বাংলা ভাষা পরিচয়'এর ভূমিকাটি প্রকাশিত হবার পূর্বে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের জন্য প্রুফটি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। কারণ প্রয়োজনে কিছু রদবদল করতে হয়েছিল প্রবন্ধটিতে।

পত্র-১০

চিঠির উপরাংশে বাঁদিকে লাল কালিতে 'file' শব্দটি বড় করে লেখা রয়েছে।

১ ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসেই 'কাব্য-পরিচয়'এর পাণ্ডুলিপি প্রেসে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই সুবাদে কবির কাছ থেকে 'কাব্য-পরিচয়' সংক্রান্ত শেষ চিঠি আসে, ২৯/১১/৩৮ তারিখে লিখিত এলাহাবাদের একজন আধুনিক কবির একটি সুদীর্ঘ পত্রের প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথের "মার্জিনাল মন্তব্য সহ"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৮)।

২ সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহোদর। খ্যাতনামা কবি। 'হিন্দোল', 'তুষার', 'বৈকালী' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর কাব্যশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৯।

৩ গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২-১৯৪১। ১৯০৩ সালে বিলেত যাত্রা করেন ও তিনি ১৯০৫-এ আই.সি.এস. পাস করে কর্মজীবনের সূচনা করেন 'আরা' জেলায়। তিনি ছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, ৭/২/১৯৩২-এ ব্রতচারী প্রতিষ্ঠা করেন। কাউন্সিল অফ্ স্টেটের সরকার নির্বাচিত সদস্য থাকাকালীন গুরুসদয় দত্ত 'নিখিল ভারত লোকগীতি ও লোকনৃত্য সমিতি' গঠন করেন।

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১৮-সংখ্যক পত্রের সূত্র-১।

৫ 'কাব্য-পরিচয়' সংক্রান্ত কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। সেইসঙ্গে পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হচ্ছে। 'আগামী মঙ্গলবার' অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৮, সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নির্বাচন সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হলে। অনুমোদিত পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে আসবেন বলে চিঠিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সজনীকান্ত।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন : ২রা ডিসেম্বর ১৯৩৮, 'কাব্য-পরিচয়'-এর পাণ্ডুলিপি তিনি কিশোরীমোহন সাঁতরার কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ৩/১২/৩৮ তারিখের চিঠিটি অন্যরূপ সাক্ষ্য দেয়।

মনে হয় আত্মস্মৃতি রচনাকালে সজনীকান্তের ৩/১২/৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির কথা সম্পূর্ণ বিস্মরণ হয়। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫০৭)।

এ-বিষয়ে ২৩/১/৩৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা কিশোরীমোহন সাঁতরার চিঠি বিশেষ উল্লেখ্য—

"গত শুক্রবার [২০/১/৩৯] বাংলা কাব্য-পরিচয়ের শেষ মিটিং হয়ে গেছে। দুটি scheme তৈরী হয়েছে। এগুলি নিয়ে ২৭-২৮ জানুয়ারী সজনী ওখানে যাবে।" (দ্র. দেশ সাহিত্য সংখ্যা-১৩৮৯, পৃ. ২৪)

৬ কিশোরীমোহন সাঁতরা।

৭ বিশ্বভারতী প্রকাশনালয়ের তৎকালীন অধিনায়ক কিশোরমোহন সাঁতরার কাছে সজনীকান্ত জানতে পেরেছিলেন, "মাসীমা"—হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের "চিঠি ছাপা হচ্ছে"। কিন্তু এই চিঠি প্রকাশের

প্রস্তাবে সজনীকান্তের বিশেষ সমর্থন ছিল না। তাই তিনি এই পত্রযোগে চিঠির ওপর গ্রহণ-বর্জন-পরিবর্তন ঘটিয়ে অত্যাচারে বিরত হতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন।

পত্র-১১

চিঠির উপরাংশে বাঁদিকে কোণে লাল কালিতে "file" শব্দটি লেখা আছে।

চিঠির নীচে একটি নোট পাওয়া যায়— : "মৌখিক স্থির / মেদিনীপুর যাওয়ার কথা / ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কিম্বা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে / অর্থাৎ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ফিরে যাবার পর। স্বাক্ষরের SKRC / [Sudhakanta Roychowdhury?] পর তারিখ রয়েছে 10/11/39।

১ মংপু থেকে ১১/১০/৩৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ দিয়েছেন সজনীকান্ত। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২০)

২ মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা সমিতির ঐকান্তিক বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে উক্ত মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা। সজনীকান্তের উপর তাঁরা দায়িত্ব দিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথকে এই ক্ষেত্রে রাজি করিয়ে মেদিনীপুরে উপস্থিত করা অবধি। মংপু থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় নামলে, সজনীকান্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে এই সম্বন্ধে আলোচনার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন এই চিঠির মাধ্যমে।

৩ ১৩৪৬ কার্তিক, 'শনিবারের চিঠি'তে 'রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী'র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। তারই একটি কপি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠান, 'রচনাপঞ্জী' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানার অভিপ্রায়ে।

৪ সেই সময়ে সজনীকান্তের দপ্তরে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের নামী ও বেনামী রচনাকে কেন্দ্র করে নানাবিধ প্রশ্ন জমা হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে সজনীকান্ত নিজের প্রশ্নের মীমাংসা করার অভিপ্রায়ে পত্রশেষে জানতে চেয়েছেন যে কবি কবে নাগাদ কলকাতায় আসবেন।

পত্র-১২

এই পত্রটি বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারের সংগ্রহে নেই। পত্রটি 'আত্মস্মৃতি'তে প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের জন্যে এই পত্রটি 'আত্মস্মৃতি' থেকে গৃহীত হয়েছে। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৩-৩৪)

১ "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" রচনাটির বিষয়ে দ্রষ্টব্য—

ক) রবীন্দ্রনাথের পত্র-২১।

খ) 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ. ১৬৮-৭০।

গ) 'রবিজীবনী' ১, পৃ. ১৬৩-৬৫।

পত্র-১৩

পত্রের উপরে বাঁদিকে লেখা আছে, "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ৩০/১১/৩৯"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৭)

১ কলকাতায়, ২৯/১১/৩৯ তারিখের সকালে, সজনীকান্তের সঙ্গে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর, রবীন্দ্রনাথের মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরেব দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে "যাওয়া নিয়ে" আলোচনা হয়েছিল। এইক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতানুসারেই সকল রকম ব্যবস্থাদির আয়োজন করা হবে বলে, সজনীকান্ত কবিকে ২৯/১১/৩৯ তারিখে লেখা পত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৯। ঐ সূত্র-২)

২ ২৩/১১/৩৯ তারিখে: পত্রযোগে, রবীন্দ্রনাথ, তৎকালীন 'রচনাবলী মুদ্রণের অধিনায়ক' পুলিনবিহারী সেনকে রচনাবলীতে পাঠভেদ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের ২৭-সংখ্যক পত্রের সূত্র-৩)

সজনীকান্ত সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রযোগে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন'-এর পাঠভেদ সমেত মুদ্রণে কিছু প্রযুক্তিগত সুবিধে অসুবিধে সম্পর্কে তাঁর অভিমত রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন।

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্র সংখ্যা-২৭

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্র সংখ্যক-২৭। সূত্র-৪

৫ দ্র. বঙ্কিম রচনাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। পত্র-সংখ্যা-২৮

পত্র-১৪

চিঠির উপরে বাঁদিকে লেখা রয়েছে "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ৬/১২/৩৯"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৯)

১ ৩০/১১/৩৯ তারিখে সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৭)

২ ১/১২/৩৯ তারিখে লেখা বঙ্কিম রচনাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৮)

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা ২৯-সংখ্যক পত্র। সূত্র ২

৪ দ্র. সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংখ্যা-২৭। সূত্র-১

৫ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি, সংখ্যা। ২৯। সূত্র-৪

৬ দ্র. সজনীকান্তকে লিখিত দলিল ও তৎসংলগ্ন সজনীকান্ত কৃত-রচনার তালিকা, পত্র-সংখ্যা-২৪

৭ দ্র. সজনীকান্তের প্রেরিত টেলিগ্রাম—পত্র সংখ্যা-১৫

পত্র-১৫

১ উক্ত টেলিগ্রামটি সজনীকান্ত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯ এ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটনের দিবসের জন্য রবীন্দ্রনাথের যাত্রার আয়োজনের সমস্তরকম ব্যবস্থাদি করে ১৪ ডিসেম্বর সন্ধেতে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে পৌঁছবেন। টেলিগ্রামে এই বার্তাই ছিল।

'আত্মস্মৃতি'তে যদিও সজনীকান্ত ১৩ ডিসেম্বরে তাঁর শান্তিনিকেতনে রওনা হবার কথা লিখেছিলেন। তথাপি মনে হয় রচনাকালে তাঁর টেলিগ্রামের কথা স্মরণে ছিল না। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি' পৃ: ৫৪১)।

পত্র-১৬

চিঠির উপরে বাঁদিকে লালকালিতে 'R' অক্ষরটি লেখা আছে।

১ দ্র. সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংখ্যা-৩০। সূত্র-৩

২ পরবর্তী রবিবার-১৪ জানুয়ারি, ১৯৪০।

৩ অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬-১৯৭৬)। শান্তিনিকেতনে ১৯২১ সালে তিনি পড়াশুনো করতে এসেছিলেন। এবং ১৯৩৩ সাল থেকে অনিল চন্দ বিশ্বভারতীর দায়িত্ববাহী সমস্ত সভার সদস্য ছিলেন।

পরবর্তী ১৪/১/৪০, রবিবার প্রত্যূষে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের অভিলাষী হয়ে ১০/১/৪০ তারিখে অনিল চন্দকে একটি চিঠিতে লেখেন :

"প্রীতিভাজনেষু,

অনিলবাবু...

রচনাবলীর কাজের জন্যে আমার একবার তাঁর কাছে যাওয়া দরকার, কতগুলো জিনিষ দেখিয়ে নেবার আছে। বাংলা বানান সম্বন্ধে তিনি কিছু পরামর্শ করতে চান। রবিবার সকালে আটটার গাড়ীতে আমি যেতে চাই,...। আপনার অনুমতি পেলে রওয়ানা হব।...

ইতি—

শ্রীসজনীকান্ত দাস"

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির সংখ্যা ৩০, সূত্র-৪

পত্র-১৭

চিঠির উপরে বাঁদিকে লাল কালিতে 'important file' বলে একটি নোট পাওয়া যায়।

১ ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৬)। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ক্রীশ্চান পরিবারে জন্ম। ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই প্রথম ভারতীয়, পিএইচ.ডি. ডিগ্রিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন ও ১৯৩৬-৪০ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

তাঁরই নির্দেশে অমিয় চক্রবর্তীর দরখাস্তটি যেন ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা পড়ে কবিকে সেই তথ্য জানিয়েছিলেন সজনীকান্ত। এছাড়াও কিছু প্রয়োজনীয় গোপন তথ্যও ছিল এই চিঠিটিতে।

২ অমিয় চক্রবর্তী।

৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩)। ১৯৩৪ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

৪ প্রফুল্ল ঘোষ—(১৮৮৩-১৯৪৮)। পিতা ঈশানচন্দ্র ঘোষ। বিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯০৮ থেকে একাদিক্রমে ৩১ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৯-এ অবসর গ্রহণ করেন।

৫ সজনীকান্তকে রবীন্দ্রনাথ মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ‘অবচেতনার অবদান’ নামে যে ছবিটি এঁকে সমর্পণ করেছিলেন তাঁকে, তার উপর একটি কবিতা লিখে দেবেন। সজনীকান্ত এই পত্রযোগে কবির কাছে কবিতাটি প্রার্থনা করেছিলেন। এই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের উত্তর আসে ২০ জানুয়ারি, ১৯৪০।

(দ্র. ক) রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩২। সূত্র ১।

খ) ‘আত্মস্মৃতি’, পৃ. ৩৪৪।

গ) রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৭০।

৬ তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেন।

৭ ঝাড়গ্রাম রাজা কুমারনরসিংহ দেবমল্ল।

পত্র-১৮

১ ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে সজনীকান্তকে শান্তিনিকেতনে আসার জরুরি তলব করেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৩)

২ রচনাবলী প্রকাশনালয়ের অধিকর্তা কিশোরীমোহন সাঁতরা অসুস্থ হওয়ায়, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেন। রচনাবলী সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে—সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে পত্রযোগে ডেকে পাঠালেন বিশেষ প্রয়োজনে।

(দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ৩৩-সংখ্যক পত্রের সূত্র-১)

৩ পুলিনবিহারী সেন ও অমিয় চক্রবর্তী।

৪ পরবর্তী রবিবার ছিল—৪/২/১৯৪০ তারিখ।

৫ অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ ‘খসড়া’ ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ‘খসড়া’ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানান নি। কারণ এই ধরণের আধুনিক কবিতা তাঁর ভালো লাগে না সেটাই হয়তো প্রধান অন্তরায় ছিল না। এই মর্মে কবি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লেখেন—“খসড়া সম্বন্ধে লিখব ঠিক

করেছিলুম”—কিন্তু “ভয় হোলো পাছে বাংলা আধুনিকরা মনে করে আমি তাদেরই জয়ধ্বনি করছি।”

এর কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ, ‘নবযুগের কাব্য’ প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। (দ্র. ‘অমিয় চক্রবর্তী’, পৃ. ৩৫-৩৬)

৬ ‘খসড়া’ প্রকাশের একবছর পরে ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষে অমিয় চক্রবর্তীর ‘একমুঠো’ কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ‘একমুঠো’ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতা ও নবীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হল। (দ্র. ‘কবির চিঠি কবিকে’, পৃ. ১৭-১৯ ; ‘অমিয় চক্রবর্তী’, পৃ. ৩৫-৩৬)

পত্র-১৯

চিঠির নীচে লাল কালিতে ‘file’ শব্দটি লেখা আছে।

১ বাঁকুড়া থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ৮/৩/৪০ তারিখে সজনীকান্তকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সজনীকান্ত কবির এই চিঠিটি পড়ে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৫)

২ দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৫১)। প্রায় ২১ বছর ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ও রাজার অর্থানুকূল্যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হল, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ‘ঝাড়গ্রাম রাজগ্রন্থমালা তহবিল’ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়।

রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ঝাড়গ্রাম-রাজ ‘কুমার নরসিংহ মল্লদেব’এর কাছ থেকে কিছু আর্থিক আনুকূল্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর জন্যে এই প্রাপ্তিযোগে কিছু বিলম্বের সম্ভাবনাও তিনি সজনীকান্তকে জানিয়েছিলেন। সজনীকান্ত কবিকে চিঠিতে সেই সংবাদ জানিয়েছিলেন।

৩ রবীন্দ্রনাথ ৮/৩/৪০ তারিখের চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন—সজনীকান্ত কবে নাগাদ শান্তিনিকেতনে আসবেন। যদিও সেই সময় সভাপতিত্বের দায় ও বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকবেন তবু তিনি কবির কাছে

যেতে প্রতিশ্রুত।

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৫

৫ দ্র. সজনীকান্তের ১৭-সংখ্যক পত্রের সূত্র ৫

৬ 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ চৈত্র, ১২শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায়, রবীন্দ্রনাথের 'মাছি তত্ত্ব' কবিতাটি প্রকাশিত হয় (পৃ. ৭৭১-৭৪)। দ্র. 'প্রহাসিনী', রচনা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০।

পত্র-২০

১ ঝাড়গ্রামের রাজা কুমার নরসিংহ মল্লদেব।

২ অনিলকুমার চন্দ।

৩ পরবর্তী বৃহস্পতিবার—২১/৩/৪০।

৪ সোমবারে তারিখ ছিল—২৫/৩/৪০।

পত্র—২১

১ বায়োকেমিক মতে নেট্রাম সালফ ডায়বেটিসের প্রধান ওষুধ। রবীন্দ্রনাথের বায়োকেমিক মতে চিকিৎসার নির্দেশানুযায়ী, সজনীকান্তের ওই ওষুধে ভাল ফল হয়েছিল। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৮)

২ বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির বায়োকেমিক চিকিৎসার বই—'টুয়েলভ টিসু রেমেডিজ'।

৩ এইবার রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ অভিমুখে যাত্রা করেন ২০ এপ্রিল, ১৯৪০। কালিম্পঙ থেকে কবি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন আষাঢ়ের মাঝামাঝি—২৯ জুন, ১৯৪০। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪, পৃ. ২৩১-৩৯)

সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের সূচী : সজনীকান্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১	"গোরার কোন্ জায়গা হইতে উদ্ধৃত"	4/3/1922	২০ ফাল্গুন ১৩২৮	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০
২	"কঠিন আঘাতে একটা আঙুল"	9/3/1927	২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩	Santiniketan Bengal, India	শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৩৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৪৪
৩	"তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে"	14/11/1927	২৮ কার্তিক, ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১২৮ বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬০
৪	"দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে"	19/11/1927	৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬০ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১২৮ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৫৫

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
৫	"আত্মশক্তিতে কয়েক সংখ্যা ধরে"	13/12/1927	২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪	6, Dwarkanath Tagore Lane Calcutta	বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৬০ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৮৯
৬	"I know Babu SajaniKanta" (শংসাপত্র)	13/2/1928	৩০ মাঘ ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৬০
৭	"চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম"	4/3/1928	২০ ফাল্গুন, ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬০ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১২৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৬০
৮	"মনে করেছিলুম তোমার"	26/12/1929	১১ পৌষ, ১৩৩৬	—	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৩
৯	"I hereby appoint" (নিয়োগ পত্র)	25/7/1938	৯ শ্রাবণ, ১৩৪৫	—	রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬০

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১০	"ভুলেই গিয়েছিলুম।"	6/9/1938	২০ ভাদ্র, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬২
১১	"আমার দোষ নেই।"	15/9/1938	২৯ ভাদ্র, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬৩
১২	"দুখণ্ড অলকা পেয়েছি।"	28/9/1938	১১ আশ্বিন, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৫ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬৪
১৩	"আমি পলাতকা।"	7/10/1938	২০ আশ্বিন, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০. পৃ. ১৬৪
১৪	"মস্ত একটা ছিদ্র আছে"	21/10/1938	৪ কার্তিক, ১৩৪৫	Santiniketan, Bengal	'শনিবারের চিঠি', ১৩৬২ 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮৯ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৭

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১৫	"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"	27/10/1938	১০ কার্তিক, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	'শনিবারের চিঠি' অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬৭ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৭
১৬	"সর্বত্রই লেখা দিয়ে থাকি"	31/10/1938	১৪ কার্তিক, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ 'আত্মস্মৃতি', ১৯৯৬, পৃ. ৩২৯ 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', ১৩৮০, পৃ. ১৬৮
১৭	"রঙ্গমঞ্চে মুক্তির উপায়ের"	11/11/1938	২৫ কার্তিক, ১৩৪৫	শান্তিনিকেতন	'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩০ 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', ১৩৮০, পৃ. ১৬৯
১৮	"কাব্য-পরিচয় দ্বিতীয়"	29/11/1938	১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫	শান্তিনিকেতন	'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ 'আত্মস্মৃতি' ১৯৯৬, পৃ. ৩৩১ 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', ১৩৮০, পৃ. ১৭০

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১৯	“আগামী সংস্করণ কাব্য-পরিচয়”	30/11/1938	১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫	শান্তিনিকেতন	শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৮
২০	“পূজোর ছুটি এখানে কাটিয়ে”	11/10/1939	২৪ আশ্বিন, ১৩৪৬	মংপু	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৭ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০ পৃ. ১৭১
২১	“তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে”	15/10/1939	২৮ আশ্বিন, ১৩৪৬	মংপু, দার্জিলিং	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৮ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭২
২২	“এখান থেকে ৫ই নবেম্বর”	19/10/1939	২ কার্তিক, ১৩৪৬	মংপু, দার্জিলিং	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৩
২৩	“৫ই নবেম্বর এখান থেকে”	26/10/1939	৯ কার্তিক, ১৩৪৬	মংপু	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৫

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
২৪	"শ্রীমান সজনীকান্ত"	21/11/1939	৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫০ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৬ রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, ২০০১, পৃ. ৯৫
২৫	"সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি"	21/11/1939	৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬
২৬	"গাছতলায় শুকনো পাতার নীচে"	—	—	শান্তিনিকেতন	শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৭-৬৮
২৭	"তোমার কাছ থেকে তাড়া"	30/11/1939	১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫১ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৯ (আংশিক)
২৮	"শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" (অভিমত)	1/12/1939	১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
২৯	"সুধাকান্তকে বাহন করে"	6/12/1939	২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫২
৩০	"নাৎনীর অতলস্পর্শ"	4/1/1940	১৯ পৌষ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৫ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৮৫, (আংশিক)
৩১	"যখন মন্ত্রী অভিষেক"	5/1/1940	২০ পৌষ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, ২০০০, পৃ. ২১৪
৩২	"অবচেতনার অবদান"	20/1/1940	৬ মাঘ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৫ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৯০
৩৩	"আগামী রবিবারে"	1/2/1940	১৮ মাঘ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৮৬

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
৩৪	"ন খলু ন খলু"	28/2/1940	১৫ ফাল্গুন, ১৩৪৬	Santiniketan, Bengal India	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৮৬
৩৫	"বাঁকুড়ায় যে রকম খাটতে"	8/3/1940	২৪ ফাল্গুন, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৯২ (আংশিক)
৩৬	"সজনী প্রতিশ্রুত ছিলুম"	18/5/1940	৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৩
৩৭	"দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে"	3/6/1940	২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬০ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৭
৩৮	"সকল বিষয়েই আমি"	6/6/1940	২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬০ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৭

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
৩৯	“আমার ওষুধে ফল পেয়েছে।”	20/6/1940	৬ আষাঢ়, ১৩৪৭	কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬১ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৮
৪০	“তোমার বায়োকেমিক বন্ধুর”	28/7/1940	১২ শ্রাবণ, ১৩৪৭	‘Uttarayan’ Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬১ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৮
৪১	“শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত”	10/9/1940	২৫ ভাদ্র, ১৩৪৭	‘Uttarayan’ Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬২ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২১১
৪২	সজনী, গল্পসল্প তোমার”	28/5/1941	১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮	‘Uttarayan’ Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি ১৯৯৬, পৃ. ৩৬৩ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২১৬
৪৩	“সজনী তুমি ক্ষণকালের জন্যে”	4/6/1941	২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	‘Uttarayan’ Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২১৭

সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের সূচী :
রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্র

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
১	"সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ"	8/8/1926	২৩ ফাল্গুন, ১৩৩৩	১/১ য়ুরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা	শনিবারের চিঠি, ১৩৩৪, ভাদ্র, পৃ. ১-৯ কল্লোল যুগ, ১৩৯৫, পৃ. ১১৬-১৮
২	"সাপ্তাহিক আত্মশক্তির কয়েক সংখ্যা"	13/12/1927	২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪	91 Upper Circular Rd., Calcutta	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৩
৩	"মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট"	5/9/1938	১৯ ভাদ্র, ১৩৪৫	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৪	" 'মুক্তির উপায়' এখন পাইনি"	14/9/1938	২৮ ভাদ্র, ১৩৪৫	Visva-Bharati 210, Cornwallis Street Calcutta	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
৫	"আজ দুকপি 'অলকা' আপনার নামে"	26/9/1938	১ আশ্বিন, ১৩৪৫	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৬	"সুধাদার নির্দেশ মত আমরা আগামী শনিবার"	30/10/1938	১৩ কার্তিক, ১৩৪৫	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৭	"নাচনের চিঠির নকল"	2/11/1938	১৬ কার্তিক, ১৩৪৫	২৫/২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৮	"আপনাকে অসুস্থ দেখে এসেছি"	10/11/1938	২৪ কার্তিক, ১৩৪৫	Visva Bharati Book Shop 210, Cornwallis Street Calcutta	—
৯	"কাল ঢাকা হইতে ফিরিয়া"	17/11/1938	১ আগ্রহায়ণ, ১৩৪৫	২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
১০	“আপনার মার্জিনাল মন্তব্য”	3/12/1938	১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
১১	“আপনার পত্র পেয়েছি”	13/10/1939	২৬ আশ্বিন, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা	—
১২	“সেই সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”	17/10/1939	৩০ আশ্বিন, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা	—
১৩	“আজ সকালে সুধাদার সঙ্গে”	29/11/1939	১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—
১৪	“আপনার পত্র এবং”	5/12/1939	১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—
১৫	‘Telegram’	14/12/1939	২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	—	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
১৬	"ইংরেজী স্বত্ব বহির্ভূত"	10/1/1940	২৫ পৌষ, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—
১৭	"ডক্টর হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে"	18/1/1940	৪ মাঘ, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
১৮	"আপনার সমন পাইলাম"	3/2/1940	২০ মাঘ, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
১৯	"আপনার সামান্য পাঁচ ছত্রের পত্র"	12/3/1940	২৮ ফাল্গুন, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
২০	"মেদিনীপুর আসিয়াছি"	18/3/1940	৫ চৈত্র, ১৩৪৬	মেদিনীপুর	—
২১	"আপনার ওষুধ খেয়ে"	28/6/1940	১৪ আষাঢ়, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—

সজনীকান্তের চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লেখা যেগুলি পাওয়া যায় নি অথচ আত্মস্মৃতিতে চিঠি প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে।

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ	আনুমানিক স্থান	প্রেরিত স্থান
১	ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ ও তাহা সুনীতিকুমারকে উৎসর্গ	২৫/১০/৩৮	কলকাতা	শান্তিনিকেতন
২	মেদিনীপুরের বিষয় ও রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধার	৯/১০/১৯৩৯	কলকাতা	মংপু
৩	জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয় রচিত কবির লেখা সম্পর্কে	১২/১০/১৯৩৯	কলকাতা	মংপু
৪	সজনীদাসের স্বাস্থ্য সম্পর্কে	১/৬/১৯৪০	কলকাতা	কালিম্পঙ
৫	সজনীদাসের কুশল বিষয়ে	৩/৬/১৯৪০	কলকাতা	কালিম্পঙ
৬	গল্পসল্প সম্পর্কে	২৫/৫/৪১	কলকাতা	শান্তিনিকেতন

‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকা

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
১	১৩৩৪, মাঘ	বর্ষ ১, সংখ্যা ৬	রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত	চিঠি	৩৭৩	—
২	১৩৪৫, আষাঢ়	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৯	বঙ্কিমচন্দ্র	প্রবন্ধ	৪৫৯	—
৩	১৩৪৫, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১১, সংখ্যা ২	অতি আধুনিক ভাষা	ব্যঙ্গরচনা	১৫৩-৫৮	‘সপ্তপারবর্তী কবি’ ছদ্মনামে রচিত
৪	১৩৪৬, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ২	অবচেতনার অবদান	ব্যঙ্গ কবিতা	২৯৪-৯৭	সাহিত্যে অতি আধুনিকতাকে (ব্যঙ্গ করে কবিতাটি রচিত, সঙ্গে চিত্রও আছে।)
৫	১৩৪৬, পৌষ	বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৩	বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির	অভিভাষণ	৪৩৬-৪০	বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির প্রবেশ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত অভিভাষণ।

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
৬	১৩৪৬, মাঘ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪	মন্ত্রী অভিষেক	প্রবন্ধ	৪৭৫-৯৫	—
৭	১৩৪৬, ফাল্গুন	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৫	শেষ কথা	গল্প	৬২১-৫৫	৩০ অগ্রহায়ণ তারিখে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ছোটগল্প' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'শেষকথা' গল্পটি সেই গল্পেরই আদিরূপ। এই গল্পে-চিত্রিত রুচিরার চরিত্রটি সম্পাদকের অধিক লোভনীয় মনে হওয়ায় এটি তিনি প্রকাশ করেন।
৮	১৩৪৬, চৈত্র	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৬	মাছিতত্ত্ব	কবিতা	৭৭১-৭৭৪	—
৯	১৩৪৭, বৈশাখ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৭	ছিটে ফোঁটা	কবিতা	১-৩	—

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
১০	১৩৪৭, জ্যৈষ্ঠ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৮	বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র	প্রবন্ধ	১৬২-৬৩	—
১১	১৩৪৭, মাঘ	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৪	প্রশ্ন	কবিতা	৪৪৬	—
১২	১৩৪৮, ভাদ্র	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১১	ছড়া	ব্যঙ্গ কবিতা	৫৯৩	শনিবারের চিঠির জন্য লিখিত।
১৩	১৩৪৮, আশ্বিন	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১২	তবু মরিতে হবে	কবিতা	৮০৫	রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা
১৪	১৩৪৮, আশ্বিন	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১২	ক্ষণিকা	পত্র	৭৩৮-৪০	প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্র
১৫	১৩৪৮, আশ্বিন	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১২	যাবার দিন	ছোট কবিতা	৮৫৫	—
১৬	১৩৫০, বৈশাখ	বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৭	বিসর্জন	কবিতা	১	অমলা রায়চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত কবিতা

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
১৭	১৩৫১, মাঘ	বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৩	বাংলার নবযুগ : পরিশিষ্ট	প্রবন্ধ	১৮৩-৯৮, ২৩৫-৪০	—
১৮	১৩৫৩, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২	সুপ্রভাত	কবিতা	৮৫	—
১৯	১৩৫৩, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২	মহারাজ	কবিতা	১০০	—
২০	১৩৬৮, বৈশাখ	বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৭	করুণা	উপন্যাস	৯	ভারতী পত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশিত।

‘অলকা’য় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনার তালিকা

‘অলকা’ মাসিক পত্রিকা

পরিচালক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার / কার্য্যালয়—৭৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা / শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ৩৬/১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত।

সজনীকান্ত দাস ‘অলকা’ মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন আশ্বিন ১৩৪৫ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ পর্যন্ত, ‘অলকা’ ১ম বর্ষ ১-৯ম সংখ্যা পর্যন্ত। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা থেকে ‘অলকা’র নতুন কার্য্যালয়—‘হিমালয় হাউস’, ১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

‘অলকা’য় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনার তালিকা

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচয়িতার নাম
১	১৩৩৪, মাঘ	বর্ষ ১ সংখ্যা ১	মুক্তির উপায়	নাটক	৫৭	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২	১৩৪৫, কার্ত্তিক	বর্ষ ১ সংখ্যা ২	‘পত্রধারা’	গ্রন্থপরিচয়	১৭৮-১৮১	
	”	”	‘রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচি”	সম্পাদকীয়	১৯১	—

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচয়িতার নাম
৩	১৩৪৫, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১, সংখ্যা ৩	'চতুরঙ্গ'	গ্রন্থপরিচয়	২১৫-১৬	—
৪	১৩৪৫, পৌষ	বর্ষ ১ সংখ্যা ৪	'রবীন্দ্র-পরিচয়'	সচিত্র প্রবন্ধ	৩৬২-৭০	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী
	”	”	'পাশ্চাত্য ভ্রমণ'	গ্রন্থপরিচয়	৩৭৬-৭৭	—
৫	১৩৪৫, ফাল্গুন	বর্ষ ১ সংখ্যা ৬	'ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বাঙালীর দান'	সম্পাদকীয়	৫৭৪	—
৬	১৩৪৫, চৈত্র	বর্ষ ১ সংখ্যা ৭	'রবীন্দ্র-পরিচয়'	প্রবন্ধ	২৫-৩০	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

গ্রন্থসূচী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৯৫

ইন্দ্র মিত্র, 'নিপাতনে সিদ্ধ', চয়নিকা, কলকাতা, ১৯৯৩

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, "বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে", 'রবীন্দ্রচর্চা', সংখ্যা ৩, রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮

গৌতম ভট্টাচার্য, 'শ্লীলতা—অশ্লীলতা ও রবীন্দ্রনাথ', প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৬

জগদীশ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৮০

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, " 'সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা'-বিচার", 'বিচিত্রা', বর্ষ ১, খণ্ড ১, সংখ্যা ৪, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ. ৫৮৭-৬০৬

নরেশ গুহ -সম্পাদিত 'কবির চিঠি কবিকে'। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলী। প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৫

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, "সাহিত্য ধর্ম্মের সীমানা", 'বিচিত্রা', বর্ষ ১, খণ্ড ১, সংখ্যা-৩, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ. ৩৮৩-৯০

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্য-পরিচয়", 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৯, পৃ. ১৯-৩৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,	'রবীন্দ্রজীবনী'–১, ২, ৩, ৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭০, ১৯৬১, ১৯৬১, ১৯৬৪
প্রশান্তকুমার পাল,	'রবিজীবনী' ১-৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, ২০০২, ১৩৯৪, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৩৯৯, ১৪০৯, ১৪০৭
বুদ্ধদেব বসু,	"বাংলা কাব্য-পরিচয়", 'কবিতা', সংখ্যা-৭, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ৫৫-৭৫
মৈত্রেয়ী দেবী,	'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৯৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	"নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা", 'বিচিত্রা', বর্ষ-১, খণ্ড ১, সংখ্যা-১, আষাঢ় ১৩৩৪ পৃ. ৯-৭০। স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ফাল্গুন ১৩৮০
	"সাহিত্য ধর্ম্ম", 'বিচিত্রা', বর্ষ ১, খণ্ড ১, সংখ্যা-২, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ. ১৭১-৭৫। 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী, ১৩৪৩
	"সাহিত্যে নবত্ব", যাত্রীর ডায়েরি শিরোনামে প্রকাশিত, 'প্রবাসী', ২৭শ ভাগ, খণ্ড ২, সংখ্যা ২, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ২১৫-২১৯। দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী, ১৩৪৩

"সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র", শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৩৭৩

"মুক্তির উপায়", অলকা, বর্ষ ১, সংখ্যা-১, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ৬৭-৮৮। দ্রষ্টব্য 'মুক্তির উপায়', বিশ্বভারতী, ১৩৫৫।

—'সপ্তক পরবর্তী কবি' (ছদ্মনাম), 'অতি আধুনিক ভাষা', শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১১, সংখ্যা ২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃ. ১৫৩-৫৮। 'কবিতাটি মূল পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী এবং নাচনবাবাবু কিশোরকান্তকে 'দাদু' রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্দ্রসদনের অনুলিপি অনুসরণে মুদ্রিত।..." দ্র. চিঠিপত্র ৯, পাদটীকা, পৃ. ৪৫৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

"বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির', শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৪৬, পৃ. ৪৩৬-৪৪০। দ্রষ্টব্য চারিত্রপূজা।

"মন্ত্রী-অভিষেক', শনিবারের চিঠি, বর্ষ-১২ সংখ্যা-৪, মাঘ ১৩৪৬, পৃ. ৪৭৫-৯৫। দ্রষ্টব্য, অচলিত সংগ্রহ ২ ; বিশ্বভারতী, ১৯৬২

"মাছিতত্ত্ব", শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৬, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ. ৭৭১-৭৭৪। প্রহাসিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫২ পৌষ) বিশ্বভারতী।

"অবচেতনার অবদান"/ছড়া, শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১৩, সংখ্যা-১১, ভাদ্র-১৩৪৮ পৃ. ৫৯৩। দ্র. ছড়া, বিশ্বভারতী

'চিঠিপত্র-৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৫২, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ, ১৪০০

"চিঠিপত্র-৯", কানাই সামন্ত ও সনৎকুমার বাগচী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০০

"চিঠিপত্র-১২", ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা,১৯৮৬

"চিঠিপত্র-১৬", সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ ; ত্রিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ, পঞ্চদশ ক ও ষোড়শ খণ্ড, (গ্রন্থ-পরিচয়), ২৫ বৈশাখ ১৪০৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

রাধারানী দত্ত, 'সাগর স্বপ্ন', ভারতবর্ষ, বর্ষ ১৩, খণ্ড ২ সংখ্যা ৬, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পৃ. ৯২০-৩৮

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, 'সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯

শঙ্খ ঘোষ, "উর্বশীর হাসি", প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮১

সজনীকান্ত দাস,	"আধুনিক বাংলা সাহিত্য", 'শনিবারের চিঠি', নবপর্যায় বর্ষ ১, সংখ্যা-১, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ১-৯
	'আত্মস্মৃতি', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৮৪ ; নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬
	'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১
সমর সেন,	'বাবু-বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১
সুধীরচন্দ্র কর,	"রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্রজীবন", 'যুগান্তর', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫
সুমিতা চক্রবর্তী,	রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিচয়। সম্পাদনা ও তথ্য সংকলন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৩
সুমিতা ভট্টাচার্য,	'অমিয় চক্রবর্তী' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮
স্বপন মজুমদার,	রবীন্দ্র গ্রন্থসূচি, প্রথম খণ্ড/প্রথম পর্ব, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৩৯৫

সংকলয়িতার নিবেদন

পূর্বপ্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ, হেমন্তবালা দেবী ও সজনীকান্ত

১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় (১৯ জুন ১৯২৩) বীরভূমের রাইপুর গ্রাম নিবাসী ও কলকাতা প্রবাসী পশুপতিনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধারানীর সঙ্গে সজনীকান্তের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সজনীকান্তের এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা।

আমার (সংকলয়িতার) জন্মের বছর কয়েক আগেই মাতামহ সজনীকান্ত দাসের মৃত্যু হয়। দাদুকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। বয়স যখন অল্পই, একদিন বেলগাছিয়ার বাড়িতে (৫৭-এ, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড) আমার দিদিমা সুধারানী দাসের কাছে দাদুর হাতের লেখা একটি কবিতা চোখে পড়ে। কবিতাটির নাম মনে আছে—'নির্জীব কুমার ও নির্জীব কুমারীর বিয়ে'। দিদাকে কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে দিদা বলেছিলেন—"তখন বোনটি আমরা থাকতুম ২৮সি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে। তার পাশেই থাকতেন বাসন্তীরা। বাসন্তীর তখনও বিয়ে হয় নি। বাসন্তী আমার খুব বন্ধু ছিল। আমরা দুই বন্ধুতে পুতুল খেলতুম। আমার পুতুলের সঙ্গে বাসন্তীর পুতুলের বিয়ে হয়েছিল। বিশাল ধূমধাম। মাসিমা (হেমন্তবালা দেবী) অনেক রান্নার ব্যবস্থা করে অনেক ধরনের খাবারের আয়োজন করেছিলেন। রাজবাড়ির ব্যাপার—আমাদের তো তখন ভাই অত পয়সা ছিল না। তাই সেকালের রীতি অনুযায়ী তোমার দাদু আমাকে এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন।"

এর পরবর্তী ইতিহাস এই কবিতাটি হেমন্তবালা দেবীর দৃষ্টিগোচর হয়। এবং ক্রমশ তিনি সজনীকান্তকে নানান ধরনের সাহিত্য নিয়ে প্রশ্ন করতেন। আমার দাদু সেগুলির উত্তর দিতেন। এই ক্ষেত্রে

দূতের ভূমিকা পালন করতেন আমার দিদিমা। আজ বলতে দ্বিধা নেই একদিন দিদা হাসতে হাসতে আমাকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন "মাসীমা ও বাসন্তী দুজনেই চিরকুট দিয়ে তোমার দাদুর কাছে প্রশ্ন পাঠাতেন। মাঝে মাঝে তোমার দাদু এতে বিরক্ত হতেন খুব। আমি আবার তখন ঠাণ্ডা করতুম।" পরবর্তীকালে 'আত্মস্মৃতি'তে দাদু লিখেছেন— "গোড়ায় তাঁহাকে একজন স্নেহশীলা প্রতিবেশিনী মাত্র জ্ঞান করিয়াছিলাম ; কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে বুঝিতে পারিলাম, সহজ মধুর সম্পর্কও বিপদের কারণ হইতে পারে। মাতা হেমন্তবালা ও কন্যা বাসন্তী পরিচারিকাবাহিত চিরকুট মারফত আমার জবাব দাবি করিয়া গৃহিণীকে সাহিত্য-বিষয়ক এমন সব প্রশ্ন যখন-তখন করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, আবার বাড়ি বদল করিব কিনা সে ভাবনায়ও পড়িতে হইয়াছিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩২৯)

পরবর্তীকালে দাদুর উত্তরের গুণে মোহিত হয়েই স্নেহপরবশে 'মাসিমা' হেমন্তবালা দেবী দাদুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু চিঠি লিখেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ৯ দ্রষ্টব্য)। 'আত্মস্মৃতি'তে দাদু লিখেছেন— "তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতা অচিরকাল মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার উপাস্য রবীন্দ্রনাথ ও নবলব্ধ পুত্রের মনান্তর দুস্তর হইলেও দুরতিক্রম্য নয়।... এই ব্যবধান তাঁহাকে পীড়িত করিত এবং গোপনে গোপনে দেবতার ও ভক্তের পুনঃসংযোগ স্থাপনে তিনিই যে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়া ছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৩০) মনে আছে দিদার কাছে শুনেছিলাম হেমন্তবালা দেবী দাদু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে যে-কোনো উপায়ে শান্ত করতে সদা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি দাদুকে পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে)।

পারস্য-ভ্রমণ-শেষে রবীন্দ্রনাথ তখন দেশে ফিরেছেন, ৩ জুন ১৯৩২। ফিরে এসে কবি কিছুদিন খড়দহে গঙ্গার গা ঘেঁষে একটি প্রাসাদে বাস করছিলেন।

এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশে এহেন গর্হিত অপরাধ করেও তাঁদের ক্রোধ প্রশমিত হয় নি তখনও আরও বেশ-কিছু 'চিঠি'র সংখ্যাতে চলছে রবীন্দ্র-বিদূষণ পর্ব। এমতাবস্থায় হেমন্তবালা দেবীর কাছ থেকে হুকুম এল সজনীকান্তকে কবির কাছে তাঁর একটি চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৭৩-৭৫)।

দূত হিসেবে প্রেরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা সাক্ষাতের পর সজনীকান্তের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন— "শরতের মেঘের মতো হালকা মনে প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিলাম। এই সাক্ষাতের মধ্যে অপূর্ব বা অসাধারণ কিছুই ছিল না, অথচ আমি দূরবিসর্পিত নূতন পথের সন্ধান পাইলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৭৫)

হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতের মূলে আমার বড়ো মাসিমণি— শ্রীমতী উমারাণী দাস। দুই অসম পরিবারের মধ্যে মেলবন্ধনের সেতু রচনা করেছিলেন শিশু উমা। সেই সময় আমার মামু রঞ্জনকুমার দাস, আড়াই বছরের বালক। বলা বাহুল্য মামু ছিলেন দাদু-দিদিমার নয়নের মণি। কথা প্রসঙ্গে শুনেছিলাম একসময়ে বারীন ঘোষ দাদুর নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। আদরের বাহুল্য দেখে বারীন ঘোষ মামুকে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌' আখ্যা দিয়েছিলেন। মামুর দেখাশুনোর দায়িত্বে ছিলেন সরস্বতী নামা এক বৃদ্ধা এক-চক্ষু দাসী ও প্রবাসী প্রেসের হেড কম্পোজিটর মানিকচন্দ্র

দাস। অবহেলিত ছোট উমা সকলের অজ্ঞাতসারেই বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে প্রায়ই রাস্তায় চলে আসত। অন্তঃপুর থেকে *হেমন্তবালা* দেবীর দৃষ্টি ছিল সজাগ, তিনিই তখন ছোট্ট উমাকে নিজের বাড়িতে স্নেহবশে আবিষ্ট করতেন। ৫-এর সি থেকে খোঁজ পড়লে তখন দেখা যেত যে সে হেমন্তবালার পরম স্নেহে নানাবিধ খেলনা সামগ্রী নিয়ে আদর কুড়োচ্ছে। এই স্নেহ কর্তব্যের কথা হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছেন— "আমার বিজয়ার প্রণাম নেবেন। সাংসারিক খবরের মধ্যে আপনার ভালো লাগিবার মতো নেই কিছু।...

গৌরীপুরের টাকা পাইনি। পূজোর কাপড়ের বদলে দাম চেয়ে নিয়েছিলাম ২০্। উমাকে ফ্রক পাজামা, খোকনকে প্রথমে সেলার্স সুট দিই, সুধারানীর পছন্দ হয় নি। তারপরে তার পছন্দমত সুট বদলে পাঞ্জাবী কিনে দিয়েছি।"

....সুধারানীকে ডাকিয়েছিলাম, একখানা চণ্ডী চেয়েছিলাম তাদের কাছে চণ্ডী নেই, স্তবমালা এনেছে হাতে করে। স্তবমালা তো আমারও আছে। জামাই তখনই চণ্ডী আনতে চেয়েছেন দোকান থেকে। সুধাকে বললাম সেকি হয়, এত রোদ্দুরে দোকানে হেঁটে যাবেন? থাক্ আমি তো গঙ্গাস্নানে যাবই, তখন নিয়ে আসবো। উমা, খোকন ও সুধাকে বসিয়ে গল্প করতে লাগলাম। ছেলেমেয়েরা দেখছি পাকা জার্নালিস্ট হয়ে উঠেছে। প্রবাসী, মুকুল, সঙ্গীত বিজ্ঞান নিয়ে কাড়াকাড়ি ও কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করেছে।...."

সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন "শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা হেমন্তবালা দেবীই আমার নবভাগ্যোদয়ের শুকতারা।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩২৮)। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে হেমন্তবালা যে সবসময় রবীন্দ্রনাথকে সজনীকান্তের গতিবিধি

নিয়েও চিঠি লিখেতেন, তার একটি প্রমাণ স্বরূপ দলিল— এই তারিখহীন চিঠিটি— "শ্রীযুক্ত সজনী দাসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন। তাহলে আমাদের পাড়াও শ্রীমন্ত হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি।"

হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে সজনীকান্ত সম্পর্কে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। এবং চিঠিতে চিঠিতে আক্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ একটু অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন সে আলোচনা আমরা 'আত্মস্মৃতি' ও 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পেয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হোলো হেমন্তবালা দেবী কি সব সময়ই সজনীকান্তের গুণগান করতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে? একটি তারিখহীন চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—"সজনীবাবু যদি আপনার শত্রু না হতেন, তা হলে আমি অত্যন্ত সুখী হতাম। কিন্তু নিরুপায়। এবারের আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি'তে আপনার একটু খানি প্রশংসা (অনেকখানি নিন্দাও আছে অবশ্য) বেরিয়েছে, আপনি মহাত্মাজির প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে যা বলেছেন সেই জন্যে। কিন্তু গদ্য কবিতাকে "গবিতা" ও "ছবি"কে "ছবিতা" নাম দিয়ে সে সব ব্যঙ্গ, শান্তিনিকেতনকে "চল চপলায়তন" বলে যে সব কথা, ঐ গুলো আমার হজমও হয় না। আবার আপনিও সবলে ঐ গুলো অস্বীকার করে নিজের পথে চলতেই থাকবেন, প্রতীকার করবেন না। দুর্ভাগ্য দেখছি আর কারো নয়, একলা আমারি। কেউ এসব কথা আপনার কানেও তোলে না। আপনার স্বদেশী যুগের রূপটি আবার ক্ষণিকের তরে ফিরে এসেছে অনুমান করে এবারে আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি জানিয়েছেন সজনীবাবু "শনিবারের চিঠি"তে। সেই স্বদেশী যুগের সময়কার রবীন্দ্রনাথ তো আমাদেরও চিরবরেণ্য। আজকের সমস্ত বাঙ্গালীরই পরম সম্পদ ও অন্তরের দেবতা। সেই

রূপটি হারিয়ে এখন আপনি বিশ্বের হয়েছেন, হিন্দুনিন্দুক হয়েছেন, তাই না বাঙ্গালীর পছন্দ হচ্ছে না আপনাকে। ছাড়তেও পারছে না। কেন না, আর একটি রবীন্দ্রনাথ আজও সৃষ্টি হননি। তাই আঘাত দিচ্ছে আপনাকেই। ঐ আঘাত ক্বচিৎ আমার কলমেও আসে, তবুও আমি ছাড়া আর কেউ কিছু বললে সেটা কেন যে আমার বেদনার সৃষ্টি করে, তা বলতে পারি না।”

সজনীকান্ত ‘বঙ্গশ্রী’র সম্পাদক হয়েছিলেন মাঘ ১৩৩৯ থেকে পৌষ ১৩৪১ পর্যন্ত। ‘বঙ্গশ্রী’ও রবীন্দ্রনাথ রিফিউজড্ লিখে ফেরত পাঠান। সেই সময় আমার দিদিমা নববর্ষে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমার দিদা ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ। সম্ভবত হেমন্তবালা দেবীকে তিনিও অনেক সময় এই বিরোধের উপশম করার জন্য কিছু তদবির করতেন। এবং বোধহয় তারই আগ্রহাতিশয্যের ফলস্বরূপ তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথকে নববর্ষে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাটি ছিল অনেক বৃহৎ ও কঠিন। তিনিই চেষ্টা করতেন সর্বদা, অন্তঃপুরবাসিনীর কাছে দাদু সম্বন্ধে সুমন্ত্রণা দিয়ে প্রথমে তাঁর হৃদয়ে পাকা আসন গড়তে। তারই উদাহরণস্বরূপ হেমন্তবালা দেবীর আর-একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত হল— “সুধারাণী বললেন, সজনীবাবু সব চিঠি পড়ে খুশীই হয়েছেন, কিছু মনে করে নি। তিনি জানিয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত। তাঁর রবীন্দ্রনাথ প্রীতি অকৃত্রিম। সেই জন্যেই যা কিছুতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যহানি বা মর্য্যাদাহানি হয়, তার বিরুদ্ধে বড় লেখনী ধারণ করে থাকেন। তিনি আপনাকে একখানি চিঠি লিখবার জন্যে আমার অনুমতি চেয়েছেন।...

মনে হচ্ছে যেন আপনার চিঠিপত্র পড়ে একটু নরম হয়েছেন এবং আমিও পূর্বোক্তগুলির সম্বন্ধে তাঁর ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেছি।

আমার ইচ্ছা হয়, সজনীকান্তের সঙ্গে আপনার মতভেদ যদি বা থাকে, তা এমন তারা উগ্রভাবে দশজনের সামনে প্রকাশ না হোক এবং আপনার ঐ বিদ্রোহী ভক্তটিকে উদারভাবে আপনিও আত্মসাৎ করুন।”

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র ভূমিকায় লিখেছেন—"আমার জীবন যদি কোনদিন সম্যক ঐতিহাসিকের মর্যাদা লাভ করে, তখন তাহার কাহিনী রচনা করিবার ভার সমসাময়িক বা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের..."। ভাবী যুগের ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করতে যে কতখানি সক্ষম হয়েছি সে কথা বলা বড়ো কঠিন। তবে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এই প্রসঙ্গকে সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপ দেওয়ার একটি প্রয়াস করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আজও এই বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যথাযথ সম্পূর্ণ তথ্যের সরবরাহ না থাকায় কিছু অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গ্রন্থের জন্য বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুজিত কুমার বসু মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধেন্দু মণ্ডল মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত। তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দের জন্য রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এইসঙ্গে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই প্রসঙ্গে যাঁর কথা প্রথমেই মনে আসে তিনি শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়। যাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত উৎসাহ ও সাহচর্যে আজ এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে।

সুপ্রিয়াদির সূত্রেই শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আজ এই কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে প্রশান্তদার কাছেই আমার এই গ্রন্থরচনার হাতে-খড়ি হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত সাহায্য ও অভিজ্ঞ পরিচালনায় এই কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল।

শ্রীমতী আলপনা রায়, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবনের কর্মীবৃন্দের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে বলতে হয়— তিনি আশিসদা (শ্রীআশিসকুমার হাজরা)। শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা, শ্রীদিলীপ হাজরা, শ্রীতুষারকান্তি সিংহ, শ্রীমতী জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবন্ধুরাও আমাকে যথাসম্ভব যথোচিত উপকরণ ও তথ্য দিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার কৃতজ্ঞতা আমার পরিবারের সকল সদস্যের কাছে। বিশেষভাবে আমার মাতুল, রঞ্জনকুমার দাস, যাঁর আন্তরিক সাহায্য ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের চিঠি প্রকাশের অনুমতি পেয়ে, আজ এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হল।

আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা সজনীকান্ত দাসের চার কন্যা— শ্রীমতী উমারানী দাস, শ্রীমতী মীরা দত্ত, শ্রীমতী সোমা বসু এবং শ্রীমতী ইরা সিকদারকে— যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও পারিবারিক তথ্যসামগ্রীর যোগান গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করতে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছে। সজনীকান্ত দাসের দৌহিত্রী ড: ইন্দ্রাণী মজুমদারের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁর সুপরামর্শ ও তথ্য সরবরাহের জন্য।

সবশেষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রীসুবিমল লাহিড়ীকে। সুবিমলদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর স্নেহ ও মমতা দিয়ে এবং অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পাণ্ডুলিপি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার প্রয়াস করেছেন। তাঁর অপরিসীম পরিশ্রম ও বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য না করলে এই গ্রন্থের কাজটি সম্পূর্ণ হত না।

সাগর মিত্র

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃ। ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭।১৫	সাক্ষ্য	পাক্ষ্য [সাক্ষ্য]
৬৭।১৬	[অনিসন্ধিৎস]	[অনুসন্ধিৎসু]
৭২।০৩	স্বস্তিবচন	স্বস্তি-বচন
৮২।০১	Phone : By 637	Phone : Bz 637
৮২।০৭	এখণ্ডটিকে	এখণ্ডটিকেও
৯০।১৪	থাকে।	থাক।
১০০।১০	লেনকেত	লেনকে
১০২।১৩	প্রশান্ত	প্রশান্তচন্দ্র
১০৬।২৫	উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য
১০৮।২৫	সাহিত্যিক ও অধ্যাপক	সাহিত্যিক, অধ্যাপক
১০৯।০৪	গ্রন্থে	‘গ্রন্থে’ শব্দটি বর্জিত হবে
১১২।১২	পথযোগে	পত্রযোগে
১১৪।০১	সে	যে
১১৭।১১	লিখেছিলেন	লিখেছেন
১১৯।২৪	“সবচেয়ে ক্ষতি-কারক	সবচেয়ে ক্ষতিকারক
১২০।০২	রবীন্দ্র-বিরোধিতা	রবীন্দ্রবিরোধিতা
১২০।০২	চালিয়েছিলেন।”	চালিয়েছিলেন।
১২৯।২১	কাজেই	কাজই
১৩০।০৮	নবেম্বর	নভেম্বর
১৩০।১৮	মাজিনে	মার্জিনে
১৩১।২৪	সংগ্রহে	সংগ্রহ
১৩৪।০৬	খ্যাতির বালিচাপা	খ্যাতির পথে বালিচাপা
১৩৬।০৫	রচিত	‘রচিত’ শব্দটি বর্জিত হবে
১৩৭।১১	সংখ্যায়	‘সংখ্যায়’ শব্দটি বর্জিত হবে
১৩৭।২৫	সজনীকান্ত	সজনীকান্তের
১৩৮।০৬	করিবে	করিবেন
১৪০।০৫	মাইকেল-বধ কাব্যে	মাইকেলবধ-কাব্যে
১৪১।১১	“ষষ্ঠ অধ্যায়ে”য়	“ষষ্ঠ অধ্যায়ে”

পৃ। ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৯। ০৯	'অলকার'র	'অলকা'র
১৫২। ১৫	ঢুকলো?	ঢুকলো?"।
১৫৩। ২২	সেটার	যেটার
১৬০। ১০	করি	কবি
১৬১। ০৯	দ্র	(দ্র
১৬৪। ০৩	ও	'ও' শব্দটি বর্জিত হবে
১৬৯। ১০	প্রদর্শনার	প্রদর্শনীর
১৬৯।	পাওয়ায়	পাওয়া
১৭৬। ১৫	কবি সকাশে	কবিসকাশে
১৭৭। ২০	কর।"	করা।"
১৭৮। ০৯	কুমারনরসিংহ	কুমার নরসিংহ
১৭৮। ১৩	অবচেতনের অবদান	অবচেতনার অবদান
১৭৯। ০৭	রথীন্দ্রনাথের	রবীন্দ্রনাথের
১৭৯। ২১	পরিবতন	পরিবর্তন
১৮১। ০৭	থেকে	থেকে।
১৯০। ২৮	প	পৃ.
১৯৩। ১১	বেলা	বেলা
১৯৪। ০৮	সংখ্যক	সংখ্যা
১৯৫। ২৬	কিশোরমোহন	কিশোরীমোহন
২০০। ১১	রাজা কুমারনরসিংহ দেবমল্ল।	রাজ কুমার নরসিংহ মল্লদেব
২০০। ২৬	ধরণের	ধরনের
২১৩। ০৯	আগ্রহায়ণ	অগ্রহায়ণ
২২১। ০৯	রবীন্দ্ররচনা	রবীন্দ্র-রচনা
২২৫। ০৭	সপ্তক পরবর্তী কবি	সপ্তকপারবর্তী কবি
২২৫। ১১	নাচন বাবাবু	নাচনবাবু
২৩০। ১৮	উমারাণী	উমারানী
২৩১। ২৩	রায় চৌধুরীর	রায়চৌধুরীর
২৩২। ০১	লিখেতেন	লিখতেন
২৩২। ১৪	একটু খানি	একটুখানি
২৩৩। ০৮	রিফিউজড়	"রিফিউজড়"

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

T4
41
V1

338218

নির্ঘণ্ট

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭॥ কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১১॥ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের বিভিন্ন জনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

ছিন্নপত্র॥ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী॥ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী॥ শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী

প্রথম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৪৯, কার্তিক ১৩৫১
সংস্করণ বৈশাখ ১৪০০

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক
শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস । ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৬
শ্রীশিবনাথ পাল
প্রিন্টেক । ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলিকাতা ৪

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের বিভিন্ন পর্বে লিখিত অগণিত চিঠিপত্র প্রাচুর্যের দিক দিয়া রবীন্দ্র-রচনার একটি প্রধান অংশ ; কবির মানসলোকের অনেক মহলের রহস্যকুঞ্চিকা এই চিঠিপত্রের মধ্যেই গোপন আছে, এবং রবীন্দ্র-জীবনীসৌধ গঠনের অনেক উপকরণ এই পত্রধারার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই চিঠিপত্রের যতটা অংশ এ-পর্যন্ত গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে আবদ্ধ আছে।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ এই-সকল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া চিঠিপত্র নামে পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে, কবির জীবিতকালে, ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং পথে ও পথের প্রান্তে নামে তিন খণ্ড পত্রসংগ্রহ তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ; রচয়িতার চিরন্তন অধিকারবলে তিনি এই-সকল গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রের বহু-স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন। চিঠিপত্র নামে এখন যে-সকল পত্রসংগ্রহ বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে তাহাতে একান্ত অন্তরঙ্গ বা অবান্তর কোনো অংশ ভিন্ন পরিবর্জনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব না, এবং পাঠের কোনো পরিবর্তন করিব না ; বর্জিত অংশ যথারীতি চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহার মূল চিঠির বানান ও ক্ষুদ্রতম চিহ্নাদি পর্যন্ত অবিকল রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষকে লেখা চিঠি যথেষ্ট-সংখ্যক থাকিলে, পত্রে উল্লিখিত বা অনুমিত কালানুক্রমে সেগুলি একখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ডে সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত কবির ছত্রিশখানি চিঠি মুদ্রিত হইল। পত্নীর মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯) পর এই কয়খানি চিঠি কবির লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল, ও এতদিন সেগুলি তিনি রক্ষা

করিয়া আসিয়াছিলেন। সহধর্মিণীকে লিখিত কবির আর কোনো চিঠি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, সম্ভবত রক্ষিতও হয় নাই।

মৃণালিনী দেবীর লিখিত তিনখানি চিঠি আমরা পাইয়াছি, তাহাও গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল। কবিকে লিখিত তাঁহার কোনো চিঠি আমাদের সন্ধানগোচর হয় নাই।

চিঠিপত্রের বর্তমান খণ্ডের সম্পাদনায় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আগামী খণ্ডগুলির সম্পাদনায়ও তাঁহার আনুকূল্য পাইব, এই আশা করি এবং তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

শ্রীনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৪৯

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বর্তমান সংস্করণে মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠির তারিখ রবীন্দ্র-ভবনের সহায়তায় সংশোধন করা হইয়াছে; এবং পত্রগুলি তদনুযায়ী বিন্যস্ত হইয়াছে।

পূর্ববর্তী সংস্করণে মৃণালিনী দেবীর লিখিত তিনখানি পত্র মুদ্রিত হয়, বর্তমানে তাঁহার লেখা আরও পাঁচখানি পত্র সংযোজিত হইল; পত্রগুলি রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহে আছে।

এই সংস্করণে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আলোকচিত্র ও পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থশেষে মৃণালিনী-প্রসঙ্গ এই সংস্করণে নূতন সংযোজন।

১ মাঘ ১৩৭২

বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত মৃণালিনী দেবীর দুইখানি চিঠি, মৃণালিনী দেবীকে লিখিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভিজ্ঞা দেবী, নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত কয়েকটি পত্রাংশ সংযোজিত হইল।

মৃণালিনী দেবীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'মৃণালিনী দেবী' (২২ শ্রাবণ ১৩৮১) গ্রন্থ ও অন্য কতকগুলি প্রধান সূত্র অবলম্বনে, মৃণালিনী দেবী সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা বিস্তারিত পরিচয় বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

পুলিনবিহারী সেনের নির্দেশেই এই সংস্করণের কাজ শুরু হয়, তাঁর সহায়তার কথাই এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পরবর্তীকালে বিন্যাসে সহায়তা করেছেন শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীশঙ্খ ঘোষ এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী।

বৈশাখ ১৪০০

সূচীপত্র

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত ১

কবিজায়া মৃণালিনী দেবী -কর্তৃক লিখিত

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৭৩
- কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে ৭৪
- পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরীকে ৭৬
- ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে ৭৮
- সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী চারুবালা দেবীকে ৮২
- সুকুমার হালদারকে ৮৩

সংযোজন

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

- বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৭
- অভিজ্ঞা দেবী ৮৯
- নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৮
- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক ১০০

পরিশিষ্ট ১

মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১০৫

পরিশিষ্ট ২

মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে অমলা দাশের পত্র ইন্দিরা দেবীকে ১১৩

পরিশিষ্ট ৩

মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে অন্যান্যদের স্মৃতি এবং পত্র

- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৩
- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৩
- ইন্দিরা দেবী ১৩৪

- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬
- হেমলতা ঠাকুর ১৩৭
- ঊর্মিলা দেবী ১৪৮
- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৫
- মীরা দেবী ১৬৪
- অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৭
- যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৬৮
- সত্যরঞ্জন বসু ১৬৯
- প্রমথনাথ বিশী ১৭০

প্রসঙ্গকথা ১৭৩
জীবনপঞ্জী : মৃণালিনী দেবী ১৭৯
ব্যক্তি-পরিচয় ১৮২

চিত্রসূচী

আলোকচিত্র

- মৃণালিনী দেবী প্রবেশক
- মৃণালিনী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ
- রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী
- মৃণালিনী দেবী

পাণ্ডুলিপিচিত্র

- “দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি”
- মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র : ৪, ১৬
- চারুদেবীকে লিখিত মৃণালিনী দেবীর পত্র : ৫
- রবীন্দ্রনাথের বিবাহের আমন্ত্রণ-লিপি

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা-কটি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্রতারা,
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে ; বলেছিলে মনে
‘অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে।’
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে !
জগতের কারো নয় তবু তারা আছে !
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখে নি কি কেহ ?

— স্মরণ

২ পৌষ [১৩০৯]
বোলপুর

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা গুলি বহুযত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্র তারা
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,– বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে!
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে!
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ

২৫. পৌষ।
বোলপুর.

১

[সাহাজাদপুর । জানুয়ারি ১৮৯০]

ওঁ

ভাই ছোটবউ—

যেম্‌নি গাল দিয়েছি অম্‌নি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভালমান্‌ষির কাল নয়। কাকুতি মিনতি করলেই অম্‌নি নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন আর দুটো গালমন্দ দিলেই একবারে জল। এ’কেই ত বলে বাঙ্গাল। ছি, ছি, ছেলেটাকে পর্য্যন্ত বাঙ্গাল করে তুল্লে গা! আজ এতক্ষণ এক দল লোক উপস্থিত ছিল— তোমাদের চিঠি যখন এল তখন খুব কথাবার্ত্তা চল্‌চে চিঠিও খুল্‌তে পারিনে, উঠ্‌তেও পারিনে। একদল উকীল আর স্কুলের মাষ্টার এসেছিল। আমার বই স্কুলে চালাবার জন্য কথাবার্ত্তা কয়ে রেখেছি কেবল বই আর পাচ্চিনে। কই, আজও ত বই এসে পৌঁছল না। ভাল গেরোতেই ফেলেছ! রাজর্ষি যে-খানা আমার কাছে ছিল সেইটেই ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিয়েছি, নদিদির গল্পসল্পও দিয়েছি। আবার ইন্‌স্পেক্টরের গলা ভেঙ্গে গেছে বলে তাকে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধও দিয়েছি— এতে অনেক ফল হতে পারে— তার গলা ভাঙ্গা না সারলেও তবু মনটা প্রসন্ন থাক্‌বে। দেখ্‌চ, বসে বসে কত উপার্জ্জনের উপায় করচি! সকালে উঠেই বই লিখ্‌তে বসেছি তাতে কত টাকা হবে একবার ভেবে দেখ! ছাপাবার সমস্ত খরচ না উঠুক্ নিদেন দশ পঁচিশ টাকাও উঠ্‌বে। এইরকম উঠে পড়ে লাগ্‌লে তবে টাকা হয়! তোমরা ত কেবল

খরচ কর্ত্তে জান— এক পয়সা ঘরে আন্‌তে পার? কুঞ্জ লিখেছে জিনিষপত্র বিরাহিমপুরে পাঠিয়েছে সেখান থেকে বোধ হয় কাল এখানে এসে পৌঁছতে পারে। আমাদের সাহেব আস্‌বেন পর্শু দিন। সেদিন আমার কি শুভদিন! আমার কি আনন্দ! আমার সাহেব আস্‌বে আবার আমার মেমও আস্‌বে! হয়ত আমার ঘরে এসে খানা খেয়ে যাবে— নয়ত বল্‌বে— বাবু, আমার সময় নেই! আমার কত ভাগ্যি! প্রার্থনা করি, যেন তার সময় না থাকে। কিন্তু খাবার নাম শুন্‌লে যে সময়ের অভাব হবে এমন ত আমার আশা হয় না!— বেলি খোকার জন্যে এক একবার মনটা ভারি অস্থির বোধ হয়। বেলিকে আমার নাম করে দুটো “অড্” খেতে দিয়ো। আমি না থাক্‌লে সে বেচারা ত নানা রকম জিনিষ খেতে পায় না। খোকাকেও কোন রকম করে মনে করিয়ে দিয়ো। আমার পশমের ছবি দেখে সে আমাকে চিন্‌তে পারে এ শুনে আমি বড় খুসি হলুম না।— আশু যে বলেছিল সেই একশো টাকা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে— আবার টাকা চেয়েছে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

[২৯ অগস্ট ১৮৯০]

ওঁ

শ্যাম

শুক্রবার

ভাই ছোট বৌ—

আজ আমরা এডেন্ বলে এক জায়গায় পৌঁছব। অনেক দিন পরে ডাঙ্গা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে নাব্‌তে পারব না, পাছে সেখান থেকে কোন রকম ছোঁয়াচে ব্যামো নিয়ে আসি। এডেনে পৌঁছে আর একটা জাহাজে বদল করতে হবে, সেই একটা মহা হাঙ্গাম রয়েছে। এবারে সমুদ্রে আমার যে অসুখটা করেছিল সে আর কি বল্‌ব— তিন দিন ধরে যা' একটু কিছু মুখে দিয়েছি অম্‌নি তখনি বমি করে ফেলেচি— মাথা ঘুরে গা ঘুরে অস্থির— বিছানা ছেড়ে উঠিনি— কি করে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি। রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড়ো খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু আধটু আদর করলুম আর বল্লুম ছোট বৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম— বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি না। তার পরে বেলি খোকাকে হাম দিয়ে ফিরে চলে এলুম। যখন ব্যামো নিয়ে পড়ে ছিলুম তোমরা আমাকে মনে করতে কি? তোমাদের

কাছে ফেরবার জন্যে ভারি মন ছট্‌ফট্‌ করত। আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই— এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়বনা। আজ এক হপ্তা বাদে প্রথম স্নান করেছি। কিন্তু স্নান করে কোন সুখ নেই— সমুদ্রের নোনা জলে নেয়ে সমস্ত গা চট্‌চট্‌ করে— মাথার চুল গুলো একরকম বিশ্রি আটা হয়ে জটা পাকিয়ে যায়— গা কেমন করে। মনে করচি যতদিন না জাহাজ ছাড়ব আর স্নান করব না। ইউরোপে পৌঁছতে এখনো হপ্তাখানেক আছে— একবার সেইখানে পৌঁছে ডাঙ্গায় পা দিলে বাঁচি। এই দিন রাত্রি সমুদ্র আর ভাল লাগে না। আজকাল যদিও সমুদ্রটা বেশ ঠাণ্ডা হয়েচে, জাহাজ তেমন দুল্‌চে না, শরীরেও কোন অসুখ নেই— সমস্ত দিন জাহাজের ছাতের উপরে একটা মস্ত কেদারার উপরে পড়ে, হয় লোকেনের সঙ্গে গল্প করি, নয় ভাবি, নয় বই পড়ি। রাত্তিরেও ছাতের উপরে বিছানা করে শুই, পারৎপক্ষে ঘরের ভিতরে ঢুকিনে। ঘরের মধ্যে গেলেই গা কেমন করে ওঠে। কাল রাত্তিরে আবার হঠাৎ খুব বৃষ্টি এল— যেখানে বৃষ্টির ছাঁট নেই সেইখানে বিছানাটা টেনে নিয়ে যেতে হল। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত ক্রমাগতই বৃষ্টি চল্‌চে। কাল বেড়ে রোদ্দুর ছিল। আমাদের জাহাজে দুটো তিনটে ছোট ছোট মেয়ে আছে— তাদের মা মরে গেছে, বাপের সঙ্গে বিলেত যাচ্চে। বেচারাদের দেখে আমার বড় মায়া করে। তাদের বাপটা সর্ব্বদা তাদের কাছে কাছে নিয়ে বেড়াচ্চে— ভাল করে কাপড় চোপড় পরাতে পারেনা, জানে

না কি রকম করে কি করতে হয়। তারা বৃষ্টিতে বেড়াচ্চে, বাপ এসে বারণ করলে, তারা বল্লে আমাদের বৃষ্টিতে বেড়াতে বেশ লাগে— বাপটা একটু হাসে, বেশ আমোদে খেলা করচে দেখে বারণ করতে বোধ [হয়] মন সরে না। তাদের দেখে আমার নিজের বাচ্ছাদের মনে পড়ে। কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম— সে যেন ষ্টীমারে এসেচে— তাকে এমনি চমৎকার ভাল দেখাচ্চে সে আর কি বলব— দেশে ফেরবার সময় বাচ্ছাদের জন্যে কি রকম জিনিষ নিয়ে যাব বল দেখি। এ চিঠিটা পেয়েই যদি একটা উত্তর দাও তা হলে বোধ হয় ইংলণ্ডে থাক্‌তে থাক্‌তে পেতেও পারি। মনে রেখো মঙ্গলবার দিন বিলেতে চিঠি পাঠাবার দিন। বাচ্ছাদের আমার হয়ে অনেক হামি দিয়ো— আর তুমিও নিও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

['ম্যাসালিয়া' জাহাজ। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯০]

ওঁ

ভাই ছোট গিন্নি—

পর্শু তোমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি— আজ আবার আর একটা লিখ্‌চি— বোধ হয় এ দুটো চিঠি এক দিনেই পাবে— তাতে ক্ষতি কি? কাল আমরা ডাঙ্গায় পৌঁছব— তাই আজ তোমাকে লিখে রাখ্‌চি। আবার সেই ইংলণ্ডে পৌঁছে তোমাদের লেখবার সময় পাব। যদি যাতায়াতের গোলমালে

এর পরের হপ্তায় চিঠি ফাঁক যায় তা হলে কিছু মনে কোরোনা। জাহাজে চিঠি লেখা বিশেষ শক্ত নয়— কিন্তু ডাঙ্গায় উঠে যখন ঘুরে বেড়াব, কখন্ কোথায় থাক্ব তার ঠিকানা নেই— তখন দুই একটা চিঠি বাদ যেতেও পারে। আমরা, ধরতে গেলে পর্শু থেকে য়ুরোপে পৌঁচেছি। মাঝে মাঝে দূর থেকে য়ুরোপের ডাঙ্গা দেখ্তে পাওয়া যায়। আমাদের জাহাজটা এখন্ ডান দিকে গ্রীস্ আর বাঁ দিকে একটা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলেছে। দ্বীপটা খুব কাছে দেখাচ্চে— কতকগুলো পাহাড়, তার মাঝে মাঝে বাড়ি, এক জায়গায় খুব একটা মস্ত সহর— দূরবীন দিয়ে তার বাড়িগুলো বেশ স্পষ্ট দেখ্তে পেলুম —সমুদ্রের ঠিক ধারেই নীল পাহাড়ের কোলের মধ্যে শাদা সহরটি বেশ দেখাচ্চে। তোমার দেখ্তে ইচ্ছে করচেনা ছুটকি? তোমাকেও একদিন এই পথ দিয়ে আস্তে হবে তা জান? তা মনে করে তোমার খুসি হয় না? যা কখনো স্বপ্নেও মনে কর নি সেই সমস্ত দেখ্তে পাবে। দুদিন থেকে বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়ে আস্চে— খুব বেশি নয়— কিন্তু যখন ডেকে বসে থাকি, এবং জোরে বাতাস দেয় তখন একটু শীত-শীত করে। অল্পস্বল্প গরম কাপড় পরতে আরম্ভ করেছি। আজকাল রাত্তিরে "ডেকে" শোওয়াটাও ছেড়ে দিতে হয়েচে। জাহাজের ছাতে শুয়ে লোকেনের দাঁতের গোড়া ফুলে ভারি অস্থির করে তুলেছিল। আমরা যে সময়ে এসেছি নিতান্ত অল্প শীত পাব— দার্জিলিঙ্গে যেরকম শীত ছিল তার চেয়ে ঢের কম। ছাড়বার সময়-সময় একটু শীত হবে হয়ত। আমি অনেকগুলো

অদরকারী কাপড় চোপড় এবং সেই বালাপোষখানা মেজবোঠানের হাত দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি— সেগুলো পেয়েছ ত ? না পেয়ে থাক ত চেয়ে নিয়ো। সেগুলো একবার লক্ষ্মীর হাতে পড়লে সমস্ত মেজবোঠানের আলমারির মধ্যে প্রবেশ করবে। বেলির জন্যে আমি একটা কাপড় আর পাড় কিনে মেজবোঠানদের সঙ্গে পাঠিয়েছি— সেটা এতদিনে অবিশ্যি পেয়েছ— খুব টুক্‌টুকে লাল কাপড়— বোধ হয় বেলিবুড়িকে তাতে বেশ মানাবে— পাড়টাও বেশ নতুন রকমের— না ? মেজবোঠানও বেলির জন্যে তার একটা প্রাইজের কাপড় নিয়েচেন— নীলেতে শাদাতে— সেটাও বেলু রাণুকে বেশ মানাবে। সেটা যে রকমের ভাবুনে, নতুন কাপড় পেয়ে বোধহয় খুব খুসী হয়েচে। আমাকে কি সে মনে করে ? খোকাকে ফিরে গিয়ে কি রকম দেখ্‌ব কে জানে। ততদিনে সে বোধ হয় দুটো চারটে কথা কইতে পারবে। আমাকে নিশ্চয় চিন্‌তে পারবে না। হয়ত এমন ঘোর সাহেব হয়ে আস্‌ব তোমরাই চিন্‌তে পারবে না। আমার সেই আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল এখন সেরে গেছে— কিন্তু খুব দুটো গর্ত্ত হয়ে আছে— ভয়ানক কেটে গিয়েছিল। অনেক দিন বাদে কাল পর্শু দুদিন স্নান করেচি— আবার পর্শু দিন প্যারিসে পৌঁছে নাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেখেনে টার্কিষ্‌ বাথ্‌ বলে একরকম নাবার বন্দোবস্ত আছে তাতে খুব করে পরিষ্কার হওয়া যায়— বোধ হয় আমার "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে" তার বিষয় পড়েচ— যদি সময় পাই ত সেইখেনে নেয়ে

নেব মনে করচি। আমার শরীর এখন বেশ ভাল আছে—জাহাজে তিন বেলা যেরকম খাওয়া চলে তাতে বোধ হচ্চে আমি একটু মোটা হয়ে উঠেচি। আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখ্‌তে পাই ছোটবউ। গাড়িটা ত এখন্‌ তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলি পরকে ধার দিয়ো না। কাল রাত্তিরে আমাদের জাহাজের ছাতের উপর ষ্টেজ্‌ খাটিয়ে একটা অভিনয়ের মত হয়ে গেছে— নানা রকমের মজার কাণ্ড করেছিল— একটা মেয়ে বেড়ে নেচেছিল। তাই কাল শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ জাহাজে শেষ রাত্তির কাটাব। তোমাদের সকলকে হামি দিয়ে চিঠি বন্ধ করি।

রবি

৪

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯০

ওঁ ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৮৯০
প্যারিস

ভাই ছোট বৌ— আমরা ইফেল টাউয়ার বলে খুব একটা উঁচু লৌহস্তম্ভের উপর উঠে তোমাকে একটা চিঠি পাঠালুম। আজ ভোরে প্যারিসে এসেচি। লণ্ডনে গিয়ে চিঠি লিখ্‌ব। আজ এই পর্য্যন্ত। ছেলেদের জন্যে হামি।

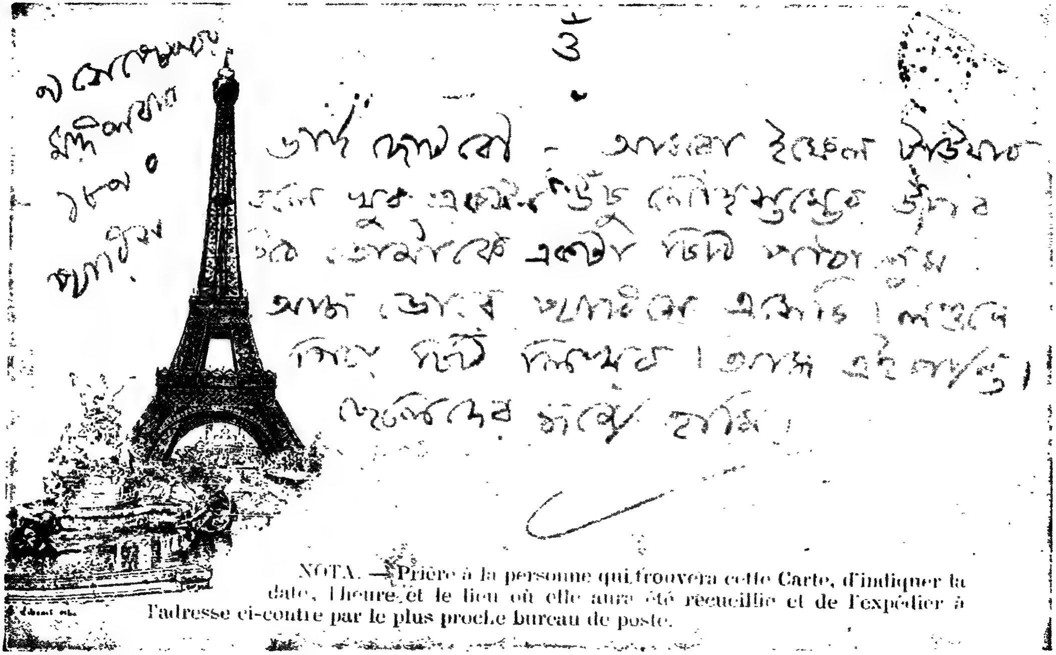

৩ সেপ্টেম্বর
[illegible]
১৯৩০
প্যারিস

ওঁ

ভাই অমিয় — অবশেষে হয়েছেন ছবিগুলো-
ওঁরা খুব [illegible] [illegible] ওঁদের
হবে প্যারিসকে একবার ছবি দেখাতে হয়
আজ [illegible] প্যারিসে এসেছি। কালকে
নিয়ে যাব বিলাতে। তারপর এই মাসের
দেশের দিকে যাত্রা।

NOTA. — Prière à la personne qui trouvera cette Carte, d'indiquer la date, l'heure et le lieu où elle aura été recueillie et de l'expédier à l'adresse ci-contre par le plus proche bureau de poste.

৫

[কালিগ্রাম। ডিসেম্বর ১৮৯০]

ওঁ

ভাই ছোটবউ—

আজ আমি কালিগ্রামে এসে পৌঁছলুম। তিনদিন লাগ্‌ল। অনেক রকম জায়গার মধ্যে দিয়ে আস্‌তে হয়েছে। প্রথমে বড় নদী— তার পরে ছোট নদী, দুধারে গাছ-পালা, চমৎকার দেখ্‌তে,— তারপরে নদী ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, নিতান্ত খালের মত, দুধারে উঁচু পাড়, ভারি বদ্ধ ঠেকে। তার পরে একজায়গায় ভয়ানক তোড়ে জল বেরিয়ে আস্‌চে ২০।২৫ লোকে ধরে আমাদের নৌকো টেনে নিয়ে এল। একটা মস্ত বিল আছে তার নাম চলন বিল। সেই বিলের থেকে জল নদীতে এসে পড়চে। তারপরে ঠেলে ঠুলে অনেক কষ্টে এবং অনেক বিপদ এড়িয়ে বিলের মধ্যে এসে পড়লুম— চারদিকে জল ধূ ধূ করচে, মাঝে মাঝে ঝোপঝাপ ঘাস জমি— একটা মস্ত মাঠে বর্ষার জল দাঁড়ালে যে রকম হয়— মাঝে মাঝে বোট মাটিতে ঠেকে যায়, প্রায় একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ধরে ঠেলাঠুলি করে তবে তাকে জলে ভাসাতে পারে।— ভয়ানক মশা। মোদ্দা কথাটা, এই বিলটা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি। তারপরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদী, মাঝে মাঝে বিল। এমনি করে ত এসে পৌঁচেছি। আবার এই রাস্তা দিয়ে যে বিরাহিমপুরে যেতে হবে সেটা আমার কিছুতেই মনঃপূত হচ্চে না। এখানকার নদীতে একেবারেই স্রোত নেই। শেওলা

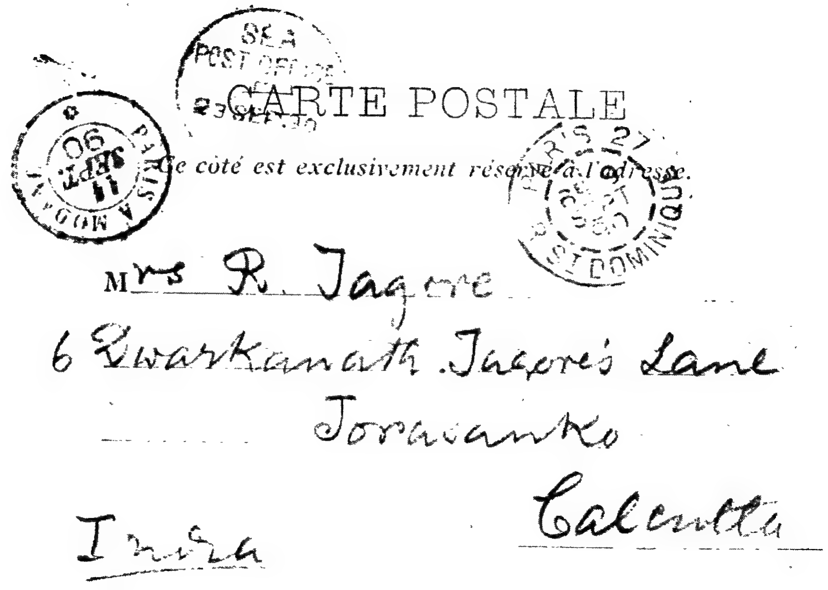

PARIS A MOD
11 SEPT 90

SEA POST OFFICE
23 SEP 90

CARTE POSTALE

Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.

RIS 27
ST DOMINIQUE

Mrs R. Tagore

6 Dwarkanath Tagore's Lane

Jorasanko

Calcutta

India

ভাস্‌চে, মাঝে মাঝে জঙ্গল হয়েছে— পাড়াগেঁয়ে পুকুরের যে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরকম গন্ধ— তা ছাড়া রাত্তিরে বোধ হয় যথেষ্ট মশা পাওয়া যাবে। নিতান্ত অসহ্য হলে এইখান থেকেই কলকাতায় পালাব। আমার মিষ্টি বেলুরাণুর চিঠি পেয়ে তখনি বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার জন্যে তার আবার মন কেমন করে— তার ত ঐ এক্‌টুখানি মন, তার আবার কি হবে? তাকে বোলো আমি তার জন্যে অনেক "অড্‌" আর জ্যাম্‌ নিয়ে যাব। কাল রাত্তিরে আমি খোকাকে স্বপ্ন দেখেছি— তাকে যেন আমি কোলে নিয়ে চট্‌কাচ্চি, বেশ লাগ্‌চে। সে কি এখন কথাবার্ত্তা বল্‌তে আরম্ভ করেছে— আমার ত মনে হচ্চে বেলা ওর বয়সে বিস্তর বোলচাল বের করেছিল। তোমাদের ওখেনে শীত নেই? আমাকে ত শীতে ভারি কাঁপিয়ে তুলেছে। কেবল কাল রাত্তিরে কোন্‌ একটা বদ্ধ জায়গায় নৌকো রেখেছিল, আর সমস্ত পর্দ্দা ফেলেছিল— তাই গরমে জেগে উঠেছিলুম— তার উপরে আবার কানের কাছে একদল লোক সেই এক্‌টা দুটো রাত্তিরে গান জুড়ে দিলে "কত নিদ্রা দিবে আর উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে।" প্রাণপ্রিয়ে যদি কাছাকাছির মধ্যে থাক্‌ত তা হলে বোধ হয় চেলা কাঠের বাড়ি পিটোত। মাঝিরা তাদের ধম্‌কে থামিয়ে দিলে, কিন্তু আমার মাথায় ক্রমাগতই ঐ লাইনটা ঘুরতে লাগল "উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে"— মাথার মধ্যে অসুখ কর্ত্তে লাগ্‌ল— শেষকালে পর্দ্দা উঠিয়ে জান্‌লা খুলে শেষ রাত্তিরে একটুখানি ঘুমোতে পাই। তাই আজ কেবল

ঘুম পাচ্চে। টিনের জিনিষ আর মদগুলো কেনই বা আমার জন্মদিন পর্য্যন্ত না থাক্‌বে! সমস্ত প্যাক করাই আছে, এখনো খোলাই হয়নি। তোমার ভাই কলকাতায় এসে কি রকম আছে। তার পড়াশুনোর কি কিছু ঠিক করচ? মাসকাবারী ক মাসের বেরোলো? আমি হয় ত দিন পনেরো বাদে এখান থেকে যেতে পারব— এখনো বল্‌তে পারিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[সাহাজাদপুর। ১৮৯১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ সকালে এ অঞ্চলের একজন প্রধান গণৎকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সমস্ত সকাল বেলাটা সে আমাকে জ্বালিয়ে গেছে— বেশ গুছিয়ে লিখ্‌তে বসেছিলুম বকে বকে আমাকে কিছুতেই লিখ্‌তে দিলে না। আমার রাশি এবং লগ্ন শুনে কি গুণে বল্লে জান? আমি সুবেশী, সুরূপ, রংটা শাদায় মেশানো শ্যামবর্ণ, খুব ফুট্‌ফুটে গৌর বর্ণ নয়।— আশ্চর্য্য! কি করে গুণে বল্‌তে পারলে বল দেখি? তার পরে বল্লে আমার সঞ্চয়ী বুদ্ধি আছে কিন্তু আমি সঞ্চয় করতে পারব না— খরচ অজস্র করব কিন্তু কৃপণতার অপবাদ হবে— মেজাজটা কিছু রাগী (এটা বোধ হয় আমার তখনকার মুখের ভাবখানা দেখে বলেছিল)। আমার ভার্য্যাটি বেশ ভাল।

আমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে— আমি যাদের উপকার করব তারাই আমার অপকার করবে। ষাট বাষট্টি বৎসরের বেশি বাঁচব না। যদিবা কোন মতে সে বয়স কাটাতে পারি তবু সত্তর কিছুতেই পেরতে পারব না। শুনে ত আমার ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। এই ত সব ব্যাপার। যা হোক তুমি তাই নিয়ে যেন বেশি ভেবো না। এখনো কিছু না হোক ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আমার সংসর্গ পেতে পারবে। ততদিনে সম্পূর্ণ বিরক্ত ধরে না গেলে বাঁচি। আমার ঠিকুজিটা সঙ্গে থাকলে তাকে দেখানো যেতে পারত। সেটা আবার প্রিয়বাবুর কাছে আছে। সে বল্লে বর্ত্তমানে আমার ভাল সময় চল্‌চে— বৃহস্পতির দশা— ফাল্গুন মাসে রাহুর দশা পড়বে। ভাল অবস্থা কাকে বলে তাত ঠিক বুঝতে পারিনে।

রবি

৭

[সাহাজাদপুর। জুন ১৮৯১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাহাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘেত্ত, সেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম তৎসম্বন্ধে কোন রকম উল্লেখমাত্র যে করলে না তার কারণ কি বল দেখি? আমি দেখ্‌চি অজস্র উপহার পেয়ে পেয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা বৃত্তিটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আস্‌চে।

প্রতি মাসে নিয়মিত পনেরো সের করে ঘি পাওয়া তোমার এমনি স্বাভাবিক মনে হয়ে গেছে যেন বিয়ের পূর্ব্বে থেকে তোমার সঙ্গে আমার এই রকম কথা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তোমার ভোলার মা আজকাল যখন শয্যাগত তখন এ ঘি বোধ হয় অনেক লোকের উপকারে লাগ্‌চে। ভালই ত। একটা সুবিধা, ভাল ঘি চুরি করে খেয়ে চাকরগুলোর অসুখ করবে না। আমার আম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এবারে মনে হল যেন দু জাতের আম ছিল, একরকমের আম খুব ভাল ছিল— অন্যটাও মন্দ নয় কিন্তু তেমন ভাল না। দুটো একটা পচেও গেছে। যাহোক ঠিক একটি হপ্তা ত চলে গেল। আমার আহার দেখে এখানকার লোকে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। আমি ভাত খাইনে শুনে এরা মনে করে যেন আমি অনাহারে তপস্যা করচি। আটার রুটি যে ভাতের চতুর্গুণ খাদ্য তা এদের কিছুতেই ধারণা হয় না। যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে সেই একবার করে আমার আহারের কথা তুলে আশ্চর্য্য প্রকাশ করে যায়। সাহাজাদপুরময় কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ভাত ছেড়ে দিয়েছি বলে সবাই আমাকে ভারি ধার্ম্মিক মনে করে— আমার কুষ্টিতে লেখা আছে কি না যে বিনা চেষ্টায় আমার যশ এবং আর দুই একটা জিনিষ হবে।

রবি

৮

[সাহাজাদপুর। ২০ জুন ১৮৯১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আমার প্রবাস ঠিক একমাস হল। আমি দেখেছি যদি কাজের ভীড় থাকে তা হলে আমি কোন মতে একমাস কাল বিদেশে কাটিয়ে দিতে পারি। তার পর থেকে বাড়ির দিকে মন টানতে থাকে।— কাল সন্ধের সময় এখানে বেশ একটু রীতিমত ঝড়ের মত হয়ে গেছে। বাতাসের গর্জ্জনে অনেকক্ষণ ঘুমোতে দেয়নি। তোমাদের ওখানেও বোধ হয় এ ঝড়টা হয়ে গেছে। কাল দিনের বেলাও খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। নদীর জলও অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। শস্যের ক্ষেত সমস্তই জলে ডুবে গেছে— জল আর একফুট বাড়লেই আমাদের বাগানের কাছে আসে। যেদিকে চেয়ে দেখি খানিকটা ডাঙ্গা খানিকটা জল। মেয়েরা আপনার বাড়ির সামনের জলেই বাসন মাজা এবং অন্যান্য নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করচে। সভ্যতার অনুরোধে শরীর যতখানি কাপড়ে আবৃত থাকা উচিত তার চেয়েও আঙুল চার পাঁচ উপরে কাপড় তুলে মেয়ে পুরুষ সকলেই রাস্তা দিয়ে চলেচে। গর্ম্মিকালে এখানে যেমন জলকষ্ট, বর্ষাকালে ঠিক তার উল্টো। আমাদের তেতালাতেও বোধ হয় বৃষ্টি হলে কতকটা এই রকমের দৃশ্যই দেখা যায়। বারান্দায় যে পরিমাণে জল দাঁড়ায় তাতে বোধ হয় অনায়াসে চৌকাঠের কাছে বসে স্নান বাসন-মাজা প্রভৃতি চলে যায়।

বর্ষাকালে যদি এই উপায় অবলম্বন কর তাহলে তোমার অনেকটা পরিশ্রম বেঁচে যায়। আজকাল তুমি দুবেলা খানিকটা করে ছাতে পায়চারি করে বেড়াচ্চ কি না আমাকে বল দেখি। এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ম পালন হচ্চে কি না, তাও জানাবে। আমার খুব সন্দেহ হচ্চে তুমি সেই কেদারাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটু একটু করে পা দোলাতে দোলাতে দিবি[্য] আরামে নভেল পড়চ। তোমার যে মাথা ধরত এখন কি রকম আছে?

রবি

৯

[সাহাজাদপুর]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ যদি বিরাহিমপুরের পেস্কার সেখানকার ফটিক মজুমদারের মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষের উকীল বক্তৃতায় আমাদের বিরুদ্ধে কি কি কথা বলেছে বিবৃত করে একখানি চিঠি না লিখ্‌ত তা হলে ডাকে আমার একখানিও চিঠি আস্‌ত না এবং আমি এতক্ষণ বসে বসে ভাবতুম আজ এখনো ডাক এল না বুঝি। তোমাদের মত এত অকৃতজ্ঞ আমি দেখিনি। পাছে তোমাদের চিঠি পেতে একদিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটে চিঠি

লিখেচি। কিন্তু আজ থেকে নিয়ম করলুম চিঠির উত্তর না পেলে আমি চিঠি লিখব না। এ রকম করে চিঠি লিখে লিখে কেবল তোমাদের অভ্যাস খারাপ করে দেওয়া হয়— এতে তোমাদের মনেও একটুখানি কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় না। তুমি যদি হপ্তায় নিয়মিত দুখানা করে চিঠিও লিখ্‌তে তা হলেও আমি যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করতুম। এখন আমার ক্রমশঃ বিশ্বাস হয়ে আস্‌চে তোমার কাছে আমার চিঠির কোন মূল্য নেই এবং তুমি আমাকে দু ছত্র চিঠি লিখ্‌তে কিছুমাত্র কেয়ার কর না। আমি মূর্খ কেন যে মনে করি তোমাকে রোজ চিঠি লিখ্‌লে তুমি হয়ত একটু খানি খুসি হবে এবং না লিখ্‌লে হয়ত চিন্তিত হতে পার, তা ভগবান্‌ জানেন। বোধ হয় ওটা একটা অহঙ্কার। কিন্তু এ গর্ব্বটুকু আর ত রাখতে পারলুম না। এখন থেকে বিসর্জ্জন দেওয়া যাক্‌। আজ সন্ধে বেলায় শ্রান্ত শরীরে বসে বসে এই রকম লিখ্‌লুম, আবার হয়ত কাল দিনের বেলায় অনুতাপ হবে, মনে হবে পৃথিবীতে পরের কাজ নিয়ে পরকে ভর্ৎসনা করার চেয়ে নিজের কাজ নিজে করে যাওয়াই ভাল। কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই পরের ত্রুটি নিয়ে খিটিমিটি করা আমার স্বভাব এবং তোমার অদৃষ্টক্রমে তোমাকে চিরজীবন এটা সহ্য করতে হবে। ভৎসনাটা প্রায় চেঁচিয়ে করি আর অনুতাপটা মনে মনে করি, কেউ শুন্‌তে পায় না।

রবি

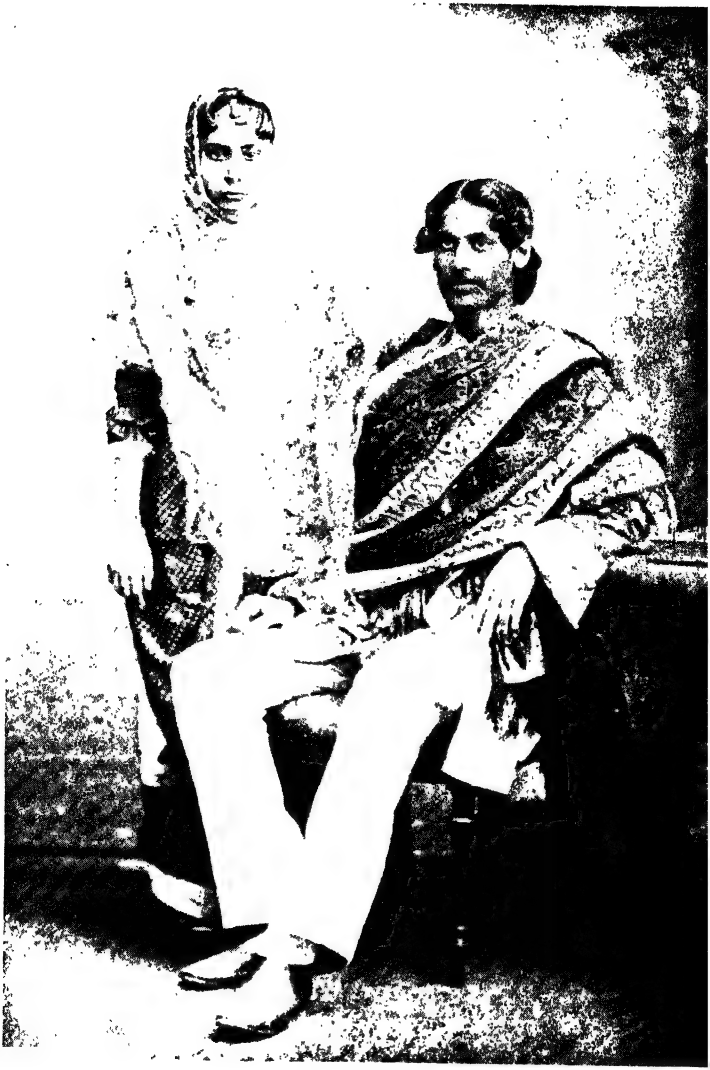

মৃণালিনী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী

ক্রোড়ে প্রথমা কন্যা বেলা

১০

[সাহাজাদপুর। ২৬ জুন ১৮৯২]

ওঁ

ভাই ছুটি—

এখানে কাল থেকে কেমন একটু ঝোড়ো রকমের হয়ে আস্‌চে— এলোমেলো বাতাস বচ্চে, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়চে, খুব মেঘ করে রয়েচে। গণৎকার যে বলেচে ২৭ জুন অর্থাৎ কাল একটা প্রলয় ঝড় হবার কথা, সেটা মনে একটু একটু বিশ্বাস হচ্চে। আমার ইচ্ছে করচে কালকের দিনটা তোমরা তেতালা থেকে নেবে এসে দোতলায় হলের ঘরে যাপন কর— কিন্তু আমার এ চিঠিটা তোমরা পর্শু পাবে— যদি সত্যিই কাল ঝড় হয় আমার এ পরামর্শ কোন কাজে লাগ্‌বে না। তেমন ঝড়ের উপক্রম দেখ্‌লে তোমরা কি আপনিই বুদ্ধি করে নীচে আস্‌বে না? যা হোক্‌, দৈবের উপর নির্ভর করে থাকা যাক্‌। তোমার কালকের একটা চিঠি পেয়ে আমার মন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে সত্য পথে চলি তা হলে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই— বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। একলা বসে বসে সঙ্কল্প করেছি আমি সেই রকম চেষ্টা করব— অবিচলিত ভাবে আপনার কর্ত্তব্য করে যাব— তার পরে যে যা বলে যে যা করে কিছুতেই তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হব না— কতদূর কৃতকার্য্য হতে পারব জানিনে। প্রতিদিন নিরলস

হয়ে নিজের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমাধা করলে এ রকম নিজের প্রতি এবং চারদিকের প্রতি অসন্তোষ জন্মাতে পায় না— যেখানেই পড়া যায় সেখানেই বেশ প্রফুল্ল সন্তুষ্টভাবে আপনার নিত্য কাজ করে কাটানো যেতে পারে। মনে যদি কোন কারণে একটা অসন্তোষ এসে পড়ে সেটাকে যতই পোষণ করবে ততই সে অন্যায় রূপে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে— সেটা যে কিছুই নয় এই রকম ভাব্‌তে চেষ্টা করা উচিত— তার যতটুকু প্রতিকার করা আমার সাধ্য তা অবশ্য করব— যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে এ ছাড়া যথার্থ সুখী হবার আর কোন উপায় নেই।— আমিও মনে করেছিলুম শিলাইদহের বাড়ি করবার ভার নীতুর উপর দেব। এবারে ফিরে গিয়ে তার একটা স্থির করা যাবে। তোমার বইয়ের লিষ্টের মধ্যে যতদূর মনে পড়চে দুখানা বই কম দেখ্‌চি— রামমোহন রায় এবং মন্ত্রী অভিষেক— প্রথমটা সমাজে পাওয়া যায় দ্বিতীয়টা তেতালাতেই পাবে। পদরত্নাবলীও দিতে পার।

রবি

রবিবার

১১

[শিলাইদহ। ২০ জুলাই ১৮৯২]

ওঁ

ভাই ছুটি—

আজ আর একটু হলেই আমার দফা নিকেশ হয়েছিল। তরীর সঙ্গে দেহতরী আর একটু হলেই ডুবেছিল। আজ সকালে পান্টি থেকে পাল তুলে আস্‌ছিলুম— গোরাই ব্রিজের নীচে এসে আমাদের বোটের মাস্তুল ব্রিজে আট্‌কে গেল— সে ভয়ানক ব্যাপার— একদিকে স্রোতে বোটকে ঠেল্‌চে আর এক দিকে মাস্তুল ব্রিজে বেধে গেছে— মড়মড় মড়মড় শব্দে মাস্তুল হেল্‌তে লাগ্‌ল একটা মহা সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম হল এমন সময় একটা খেয়া নৌকো এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল এবং বোটের কাছি নিয়ে দুজন মাল্লা জলে ঝাঁপিয়ে সাঁৎরে ডাঙ্গায় গিয়ে টান্‌তে লাগ্‌ল— ভাগ্যি সেই নৌকো এবং ডাঙ্গায় অনেক লোক সেই সময় উপস্থিত ছিল তাই আমরা উদ্ধার পেলুম, নইলে আমাদের বাঁচবার কোন উপায় ছিল না— ব্রিজের নীচে জলের তোড় খুব ভয়ানক— জানিনে, আমি সাঁৎরে উঠতে পারতুম কি না কিন্তু বোট নিশ্চয় ডুব্‌ত। এ যাত্রায় দু তিনবার এই রকম বিপদ ঘট্‌ল। পান্টিতে যেতে একবার বটগাছে বোটের মাস্তুল বেধে গিয়েছিল সেও কতকটা এই রকম বিপদ— কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তুল্‌তে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে গিয়েছিল আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মারা গিয়েছিল।— মাঝিরা বল্‌চে এবার অযাত্রা হয়েচে।— খুব

ঘন মেঘ করে এসেচে— সমস্ত নদী তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে— সুন্দর দেখ্‌তে হয়েচে— কিন্তু দেখ্‌বার সময় নেই— দুপুর বাজে— এইবেলা নাইতে যাই। বর্ষাকালে নদীতে ভ্রমণ না করলে নদীর শোভা দেখা যায় না— কিন্তু বর্ষাকালে জলে বেড়ানো প্রায় ঘটে ওঠে না। এবারে ত হল।— যাই নাইতে যাই।

রবি

১২

[শিলাইদহ। নদীপথে। ১৮৯২]

ওঁ

ভাই ছুটি—

আজ শিলাইদহ ছাড়বার আগেই তোমার চিঠিটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তোমরা আসচ এক হিসাবে আমার ভালোই হয়েচে, নইলে কলকাতায় ফিরতে আমার মন যেত না, এবং কলকাতায় ফিরেও আমার অসহ্য বোধ হত। তা ছাড়া আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই, সেইজন্যে তোমাদের কাছে পাবার জন্যে আমার প্রায়ই মনে মনে ইচ্ছে করত। কিন্তু আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুরে থাক্‌বে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধ্‌রে এবং শিখে এবং ভাল হয়ে আস্‌বে এই রকম আমি খুব আশা

করে ছিলুম। যাই হোক্ সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়। যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল। অসন্তোষকে মনের মধ্যে পালন কোরো না ছোট বৌ— ওতে মন্দ বই ভাল হয় না। প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট চিত্তে অথচ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে যেতে হবে— আমি নিজে ভারি অসন্তুষ্ট স্বভাব, সেই জন্যে আমি অনেক অনর্থক কষ্ট পাই— কিন্তু তোমাদের মনে অনেকখানি প্রফুল্লতা থাকা ভারি আবশ্যক। নইলে সংসার বড় অন্ধকার হয়ে আসে। যা চেষ্টা করবার তা যত দূর সাধ্য করব— কিন্তু তুমি মনে মনে অসুখী অসন্তুষ্ট হয়ে থেকো না ছুটি। জান ত ভাই আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব, আমার নিজেকে ঠাণ্ডা করতে যে কত সময় নির্জ্জনে বসে নিজেকে কত বোঝাতে হয় তা তুমি জান না— তুমি আমার সেই খুঁৎখুঁতে ভাবটা দূর করে দিয়ো, কিন্তু তুমি আবার তাতে যোগ দিয়ো না। যদি তোমরা ইতিমধ্যে ছেড়ে থাকো তা হলে ত এবার কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে— চেষ্টা করব উড়িষ্যায় যদি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। সে জায়গাটা ভারি স্বাস্থ্যকর। আমি বাবামশায়কে আমার ইচ্ছে কতকটা জানিয়ে রেখেচি তিনিও কতকটা বুঝেচেন— আর তুই একবার বল্লে কিছু ফল হতেও পারে— কিন্তু আগে থাকৃতে বেশি আশা করে বসো কিছু না। আমার মনে হচ্চে হতে করতে এ চিঠিটাও

তুমি সোলাপুর অঞ্চলে পাবে। আজ যাব কাল যাব করে নির্দ্দিষ্ট দিনের পরেও নিদেন তোমাদের দিন আষ্টেক দশ কেটে যাবে। দেখা যাক্। সমস্ত দিন বোট চল্‌চে— সন্ধে হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ত পাবনায় পৌঁছলুম না। সেখানে গিয়ে আবার ক্রোশ দেড়েক পাল্কীতে করে যেতে হবে।

রবি

সোমবার

১৩

[কটক হইতে পুরীর পথে

১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ এগারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরতে হবে। আজ রাত্তির পথের মধ্যে একটা ডাক বাঙ্গলায় কাটাতে হবে, তারপরে কাল বোধ হয় সন্ধের মধ্যে পুরীতে গিয়ে পৌঁছতে পারব। Mrs. Gupta এবং তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাচ্চেন, সে জন্যে তাঁদের বিস্তর জিনিষ পত্র বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেচে। বিহারীবাবু ত নানা রকম বন্দোবস্ত করতে করতে এই তিন চার দিন একেবারে ক্ষেপে যাবার যো হয়েচেন। Mrs. Gupta ভারি নিরুপায় গোছের

মেয়ে— তিনি কিছুই গুছিয়ে গাছিয়ে করেকর্ম্মে নিতে পারেন না— তিনি বেশ ঠাণ্ডা হয়ে চুপচাপ করে বসে থাকেন— বলেন, আমি পারিনে, আমার মাথায় কিছু আসে না। বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মত ধাত আছে দেখ্‌লুম। তিনি সকল বিষয়েই ভারি ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই যে ক দিনের জন্যে পুরীতে যাচ্চেন, মানুষ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে হলেও এত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেনা। কেবল তিনি আমার মত খুঁৎখুঁৎ খিট্‌খিট্‌ করেন না— সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে। সমস্ত খুব চুপচাপ প্রশান্ত ভাবে সহ্য করতে পারেন। এ রকম স্বামী আমার বোধ হয় পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। বিহারীবাবু ভারি গৃহস্থ প্রকৃতির লোক— ছেলে পুলেদের খুব ভালবাসেন, আমার দেখ্‌তে বেশ লাগে। আমাদের এমন যত্ন করেন— ঠিক যেন ঘরের লোকের মত— খুব যে বেশি আদর দেখিয়ে ব্যস্ত করে তোলা তা নয়— আমরা আমাদের ঘরে সমস্ত দিন যা-খুসী তাই করতে সময় পাই। যে যত্নটুকু করেন বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবে। কিচ্ছু বাড়াবাড়ি নেই। এমনকি বলুকেও অনেকটা বাগিয়ে আন্‌তে পেরেচেন— সে বেচারা যদিও এখনো ক্রমাগত মাথা নীচু করে লজ্জায় লাল হয়ে হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া ত একরকম বন্ধ করেচে। ওঁরা যা খেতে বলেন তাতেই মাথা নাড়ে। ভাগ্যি ওঁরা দুজনে মিলে অনেক পীড়াপীড়ী করেন তাই মুখে দুটি অন্ন ওঠে। নইলে এতদিনে শুকিয়ে যেত। পথের মধ্যে যদি দুদিন চিঠি লিখ্‌তে না পারি ত কিছু ভেবো

না, এবং এ কথা মনে রেখো যে কটক থেকে যত দিনে চিঠি পাও পুরি থেকে তার চেয়ে আরো দুদিন দেরি হয়— সে আরো দূরে। তা হলে তিন চারদিন চিঠি না পেতেও পার—

রবি

১৪

[শিলাইদহ। জুন-জুলাই ১৮৯৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল ডিকিন্সন্দের বাড়ি থেকে আবার তাগিদ্ দিয়ে আমার কাছে এক একশো বিরাশি টাকার বিল এবং চিঠি এসেছে। আবার আমাকে সত্যর শরণাপন্ন হতে হল। তা হলে তার কাছে আমার ন শো টাকার ধার থাক্‌ল। সে কি তোমাকে চার শো টাকা দিয়েছে? আমাকে ত এখনো সে সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি। আজকের বিবির চিঠিতে তোমাদের কতকটা বিবরণ পেলুম। সে লিখেছে তোমরা প্রায়ই সেখানে যাও— এবং আমার ক্ষুদ্রতম কন্যাটি মেজবোঠানের কোলে পড়ে পড়ে নানা বিধ অঙ্গভঙ্গী এবং অস্ফুট কলধ্বনি প্রকাশ করে থাকে। তাকে আমার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। আমি যদি আষাঢ় মাস মফস্বলে কাটিয়ে যাই তা হলে ততদিনে তার অনেক পরিবর্ত্তন এবং অনেক রকম নতুন বিদ্যে শিক্ষা হবে। বেলির সঙ্গে খোকা কি গান শিখ্‌চে না? তার গলা কি রকম

ফুট্‌চে ? কেবল সা রে গা মা না শিখিয়ে তার সঙ্গে একটা কিছু গান ধরানো ভাল— তা হলে ওদের শিখ্‌তে ভাল লাগ্‌বে— নইলে ক্রমেই বিরক্ত ধরে যাবে। মনে আছে ছেলেবেলায় যখন বিষ্ণুর কাছে গান শিখ্‌তুম তখন সা রে গা মা শিখ্‌তে ভারি বিরক্ত বোধ হত। যে দিন সে নতুন কোন গান শেখানো ধরাত সেই দিন ভারি খুসি হতুম। তুমিও তোমার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একত্র বসে সা রে গা মা সাধ্‌তে আরম্ভ করে দাও না— তার পরে বর্ষার দিনে আমি যখন ফিরে যাব তখন স্বামী স্ত্রীতে দুজনে মিলে বাদ্‌লায় খুব সঙ্গীতালোচনা করা যাবে। কি বল ? বিদ্যেভূষণ আজকাল তোমার কাজকর্ম্ম কি রকম করচে ? ইদানীং তাকে ধম্‌কে দেওয়ার পর কি তার স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে— বেচারার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে অনেক দিন পরে সম্মিলন হয়েছে সেটা মনে রেখো— তোমার মার খবর কি ?

রবি

১৫

[৭ জুলাই ১৮৯৩]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আহারান্তে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে তোমাকে একখানি চিঠি লিখেছি তারপরেও আবার খানিকক্ষণ ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে গড়াতে গড়াতে সাধনার কাজ করেছি। তারপরে যখন এখানকার

প্রধান কর্ম্মচারীরা বড় বড় কাগজের তাড়া নিয়ে এসে প্রণাম করে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন তখন আমার ঘুমের ঘোর আমার সুখের স্বপন একেবারে ছুটে গেল। একবার মনে মনে ভাবলুম, যদি এদের মধ্যে কেউ হঠাৎ সুর করে গেয়ে ওঠে—

“ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।”

তা হলে ও গানটা বোধ হয় মায়ার খেলার দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে একেবারে উঠিয়ে দিই। কিন্তু সে রকম সুর করে গান গাবার ভাব কারো দেখ্‌লুম না। দুই একজনের একটু খানি কাঁদুনির সুর ছিল কিন্তু তাদের বক্তব্য বিষয়টা ঘুমের ঘোর প্রেমের ডোর নিয়ে নয়— তারা বেতন বৃদ্ধি চায়। তাদের অনেকগুলি ছেলেপুলে, হজুরের শ্রীচরণ ছাড়া তাদের আর কোন ভরসা নেই, হজুর তাদের মাতা এবং পিতা। এ ছাড়া কতকগুলি সাবেক ইজারাদারের নামে বাকি খাজনার ডিক্রি করা হয়েচে তারা সুদ খরচা মাপ নিয়ে কিস্তিবন্দী করে টাকা দিতে চায় এবং তাদের দেনার মধ্যে যে সমস্ত ওজর আছে তারও একটা সদ্বিচার প্রার্থনা করে। এর মধ্যে করুণরস এবং অশ্রুজল যথেষ্ট আছে, অনেকে হয় ত বাড়ি ঘর দোর নিলেম করে সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছে কিন্তু এতে সুর বসিয়ে অপেরা হবার যো নেই— কিন্তু নলিন নয়নের কোণে একটুখানি ছল্‌ছল্‌ করে আসুক দেখি অমনি কবির কবিতা গাইয়ের গান বাজিয়ের বাজনা সমস্ত ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌বে, অমনি দর্শক শ্রোতা এবং পাঠকের বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভেসে যাবে। এম্‌নি এই সংসার।

সমুদ্রতীর এবং সমুদ্রতরঙ্গের উপর যখন কবিতা লিখ্‌চি তখন আর কাঠা বিঘের জ্ঞান থাকে না, তখন অনন্ত সমুদ্র অনন্ত তীর চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে। আর সেই সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট বাঙ্‌লা বানাতে যাও, তখন এঞ্জিনিয়র কণ্ট্রাক্টর এষ্টিমেট্‌ চিন্তা পরামর্শ— ধার এবং টোয়েল্‌ভ্‌ পার্সেণ্ট্‌ সুদ— তার উপরে আবার কবির স্ত্রীর পছন্দ হয়'না, লোক্‌সান বোধ হয়— স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠ্‌ল না দেখচি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক। এই রকম নানা চিন্তা করচি এবং খালের মধ্যে দিয়ে বোট টেনে নিয়ে যাচ্চে— আকাশে ঘননীল মেঘ করেচে— ভিজে বাদ্‌লার বাতাস দিয়েছে, সূর্য্য প্রায় অস্তমিত— পিঠে একখানি শাল চাপিয়ে যোড়াসাঁকোর ছাত আমার সেই দুটো লম্বা কেদারা এবং সাঁৎলাভাজার কথা এক একবার মনে করচি। সাঁৎলা ভাজা চুলোয় যাক্‌ রাত্রে রীতিমত আহার জুট্‌লে বাঁচি। গোফুর মিঞা নৌকোর পিছন দিকে একটা ছোট্ট উনুন জ্বালিয়ে কি একটা রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত আছে মাঝে মাঝে ঘিয়ে ভাজার চিড়বিড় চিড়বিড় শব্দ হচ্চে— এবং নাসারন্ধ্রে একটা সুস্বাদু গন্ধও আস্‌চে কিন্তু এক পস্‌লা বৃষ্টি এলেই সমস্ত মাটি। তোমাদের সকলকে আমার হামি।

রবি

শুক্রবার

১৬

[শিলাইদহ। জুন ১৮৯৮]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ ঢাকা থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। আমি তাহলে একবার শীঘ্র কালিগ্রামের কাজ সেরে কলকাতায় গিয়ে যথোচিত বন্দোবস্ত করে আসব। কিন্তু ভাই, তুমি অনর্থক মনকে পীড়িত কোরো না। শান্ত স্থির সন্তুষ্ট চিত্তে সমস্ত ঘটনাকে বরণ করে নেবার চেষ্টা কর। এই একমাত্র চেষ্টা আমি সর্ব্বদাই মনে বহন করি এবং জীবনে পরিণত করবার সাধনা করি। সব সময় সিদ্ধিলাভ করতে পারিনে— কিন্তু তোমরাও যদি মনের এই শান্তিটি রক্ষা করতে পারতে তাহলে বোধ হয় পরস্পরের চেষ্টায় সবল হয়ে আমিও সন্তোষের শান্তি লাভ করতে পারতুম। অবশ্য তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক অল্প, জীবনের সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অনেকটা সীমাবদ্ধ, এবং তোমার স্বভাব একহিসাবে আমার চেয়ে সহজেই শান্ত সংযত এবং ধৈর্য্যশীল। সেইজন্যে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ হতে মনকে একান্ত যত্নে রক্ষা করবার প্রয়োজন তোমার অনেক কম। কিন্তু সকলেরই জীবনে বড় বড় সঙ্কটের সময় কোন না কোন কালে আসেই— ধৈর্য্যের সাধনা, সন্তোষের অভ্যাস কাজে লাগেই। তখন মনে হয় প্রতিদিনের যে সকল ছোট খাট ক্ষতি ও বিঘ্ন, সামান্য আঘাত ও বেদনা নিয়ে আমরা মনকে নিয়তই ক্ষুণ্ন ও বিচলিত করে রেখেছি সে সব কিছুই

নয়। ভালবাস্‌ব এবং ভাল কর্‌ব— এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সুমিষ্ট প্রসন্নভাবে সাধন করব— এর উপরে যখন যা ঘটে ঘটুক্‌। জীবনও বেশি দিনের নয় এবং সুখদুঃখও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা— এ সব জিনিষকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই যদি না হয়, যদি দিনের পর দিন অসন্তোষে অশান্তিতে, অবস্থার ছোট ছোট প্রতিকূলতার সঙ্গে অহরহ সংঘর্ষেই জীবন কাটিয়ে দিই— তা হলে জীবন একেবারেই ব্যর্থ। বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম্ম— এই হল জীবনের সফলতা। যদি তুমি আপনাতে আপনি শান্তি পাও এবং চারদিককে সান্ত্বনা দান করতে পার, তাহলে তোমার জীবন সম্রাজ্ঞীর চেয়ে সার্থক। ভাই ছুটি— মনকে যথেচ্ছা খুঁৎখুঁৎ করতে দিলেই সে আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। আমাদের অধিকাংশ দুঃখই স্বেচ্ছাকৃত। আমি তোমাকে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দিতে বসেছি বলে তুমি আমার উপর রাগ কোরো না। তুমি জান না অন্তরের কি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমি এ কথাগুলি বল্‌চি। তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সহজ সহায়তার একটি সুদৃঢ় বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় হয়ে আসে, যাতে সেই নির্ম্মল শান্তি এবং সুখই সংসারের আর সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, যাতে তার কাছে প্রতিদিনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষুদ্র হয়ে যায়— আজ কাল এই আমার চোখের কাছে একটা প্রলোভনের মত

জাগ্রত হয়ে আছে। স্ত্রীপুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ— বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়— নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায়— সেইজন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসাবে সংসারের নির্জ্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে। মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই, যখনি তাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেখা যায়, যখনি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয় তখনি যথার্থ ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন কোন মোহ থাকে না, কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার কোন দরকার হয় না, মিলনে ও বিচ্ছেদে মত্ততার ঝড় বয়ে যায় না— কিন্তু দূরে নিকটে সম্পদে বিপদে অভাবে এবং ঐশ্বর্য্যে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্ম্মল আলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসায় মার্জ্জনা এবং দুঃখ স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই। আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক্‌, আমাদের চতুর্দ্দিক্‌ প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক্‌, আমাদের

সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক্, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্,— এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পারের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি। সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে এত উৎসুক হয়েছি— সেখানে কোনমতেই লাভক্ষতি আত্মপরকে ভোলবার যো নেই— সেখানে ছোটখাট বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে শেষ কালে জীবনের উদার উদ্দেশ্যকে সহস্র ভাগে খণ্ডীকৃত করতেই হবে। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না। এখানে এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা তত শক্ত নয়, যে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা।

তোমার রবি

প্রমথ সুরেন এবং প্রমথদের একটি গুজরাটী বন্ধু শিলাইদহে আছে।

একদিন তার থেকে তুমি এসেছ উষায়
আনন্দ সাথে। ভালবাসার মাধুর্য এবং
দুঃখ-দুর্দশার যে সুখ, উদ্দীপনা ও আত্ম-
দান তৃপ্তিতে যে সুখ সেই। আজকাল
আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই,
আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক,
আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং শ্রীময়
হোক, আমাদের সংসার যাত্রা আড়ম্বরশূন্য
এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের [illegible]
সমস্ত, [illegible] ঈর্ষা দ্বেষ নিঃস্বার্থ এবং
দেশের জন্য আমাদের মনের দেশ
প্রীতির হোক — এই [illegible] [illegible] ও
আমাদের এই আদর্শ থেকে দূরে যেন
ক্রমশঃ দূরে চলে যায় আমরা সুদিনে
শেষ পর্যন্ত সংসারের মঙ্গলের জন্য
এবং সংসার থেকে নিজের একান্ত নির্ভরশীল
হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে
পারি। সেই জন্যে আমি কামনা করি
সূর্যদেবতার পাদপদ্ম মন্দির থেকে তোমা-
দের দূরে নিভৃত শান্তিময় মাঝে নিয়ে
আসতে। এত উৎসুক হয়েছি — সেখানে
কোনমতেই লাভক্ষতি আত্মপরায়ণ তোমা-

১৭

[কলকাতা। ২৮ অগস্ট ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই ছুটি

নীতুরা পরের রোগদুঃখশোকতাপ সহ্য করতে পারে না— সে ওদের স্বভাব। সেজন্যে তুমি বিরক্ত হয়ে কি করবে। নবোঠানের এক ছেলে, সংসারের একমাত্র বন্ধন নষ্ট হয়েছে তবু তিনি টাকাকড়ি কেনাবেচা নিয়ে দিনরাত্রি যে রকম ব্যাপৃত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হয়ে গেছে — কিন্তু আমি মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য আলোচনা করে সেটা শান্তভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করচি— একএকসময় ধিক্কার হয় কিন্তু সেটা আমি কাটিয়ে উঠ্‌তে চাই। আমাদের বাইরে কে কি রকম ব্যবহার করচে সেটাকে নির্লিপ্তভাবে সুদূরভাবে দেখ্‌তে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শোকদুঃখ, বিরাগ অনুরাগ, ভাললাগা না লাগা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সংসারের কাজকর্ম্ম, সমস্তই আমাদের বাইরে ;— আমাদের যথার্থ “আমি” এর মধ্যে নেই— এই বাইরের জিনিষকে বাইরের মত করে দেখ্‌তে পারলে তবেই আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয়— সে খুব শক্ত বটে কিন্তু পদে পদে সেইটে মনে রেখে দেওয়া চাই। যখনি কাউকে খারাপ লাগে, যখনি কোন ঘটনায় মনে আঘাত পাওয়া যায় তখনি আপনাকে আপনার অমরত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া চাই। একদিন রাত্রে বৈঠকখানায় ঘুমচ্ছিলুম সেই

অবস্থায় আমার পায়ে বিছে কামড়ায়— যখন খুব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল আমি আমার সেই কষ্টকে, আমার দেহকে আমার আপনার থেকে বাইরের জিনিষ বলে অনুভব করতে চেষ্টা করলুম— ডাক্তার যেমন অন্য রোগীর রোগযন্ত্রণা দেখে, আমি তেমনি করে আমার পায়ের কষ্ট দেখ্তে লাগ্লুম— আশ্চর্য্য ফল হল— শরীরে কষ্ট হতে লাগ্ল অথচ সেটা আমার মনকে এত কম ক্লিষ্ট করলে যে আমি সেই যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমতে পারলুম। তার থেকে আমি যেন মুক্তির একটা নতুন পথ পেলুম। এখন আমি সুখদুঃখকে আমার বাইরের জিনিষ এই ক্ষণিক পৃথিবীর জিনিষ বলে অনেকসময় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি— তার মত শান্তি ও সান্ত্বনার উপায় আর নেই। কিন্তু বারম্বার পদে পদে এইটেকে মনে এনে সকল রকমের অসহিষ্ণুতা থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা চাই— মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়েও হতাশ হলে হবেনা— ক্ষণিক সংসারের দ্বারা অমর আত্মার শান্তিকে কোনমতেই নষ্ট হতে দিলে চল্বে না— কারণ, এমন লোকসান আর কিছুই নেই— এ যেন দুপয়সার জন্যে লাখটাকা খোয়ানো। গীতায় আছে— লোকে যাকে উদ্বেজিত করতে পারে না এবং লোককে যে উদ্বেজিত করে না— যে হর্ষ বিষাদ ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত সেই আমার প্রিয়।

কাল মঙ্গলবারে বলুর শ্রাদ্ধ। তার পরে কর্ম্ম শেষ করে যেতে এ সপ্তাহ নিশ্চয়ই চলে যাবে। এর আর কোন উপায় নেই। নগেন্দ্র ত ইতিমধ্যে তার যশোরের কাজ শেষ করে

ফিরে আস্‌তে পারে। কিন্তু যথাসম্ভব সত্বর ফিরে আসা চাই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রবি

১৮

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ আমার যাওয়া হয় নি সে খবর তুমি বেলার চিঠিতে পেয়েছ। বাড়িতে রয়ে গেলুম— ডাকের সময় ডাক এল— খান তিনেক চিঠি এল— অথচ তোমার চিঠি পাওয়া গেল না। যদিও আশা করিনি তবু মনে করেছিলুম যদি হিসাবের ভুল করে দৈবাৎ চিঠি লিখে থাক। দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি— দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে। জিনিষটি অল্প বলে তার দামও বেশী— ছুটো চারটে কথাকে সম্পূর্ণ হাতে পাওয়া যায়, তাকে ধরে রাখা যায়, তার মধ্যে যতটুকু যা আছে সেটা নিঃশেষ করে পাওয়া যেতে পারে। দেখাশোনার অনেক কথাবার্ত্তা ভেসে চলে যায়— যত খুসি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলেই তার প্রত্যেক কথাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না। বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র— তার মধ্যে একরকমের নিবিড়তা

গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার কি তাই মনে হয়না ?[১]

---

[১] এই চিঠির অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।

১৯

[কলকাতা। নবেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

তুমি করছ কি ? যদি নিজের দুর্ভাবনার কাছে তুমি এমন করে আত্মসমর্পণ কর তা হলে এ সংসারে তোমার কি গতি হবে বল দেখি ? বেঁচে থাক্‌তে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে— মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা ত নেই— শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।

নীতু ভাল আছে এবং ক্রমশই ভালর দিকে যাচ্চে। ক'দিন একজন ডাক্তার সমস্ত রাত আমাদের সঙ্গে থেকে ঔষধপত্র দিত— কাল তার দরকার ছিলনা বলে সে আসে নি— সুতরাং সমস্ত রাতটা একলা আমার ঘাড়েই পড়েছিল। এখন তার জ্বর ৯৯°, কাশী সরল, হাঁপানি অনেক কম, নাড়ী সবল, সুতরাং আশা করবার সময় এসেছে— কিন্তু যখন নিশ্চয় কোন কথা বলা যায় না তখন সকল অবস্থার জন্যে প্রস্তুত

থাকাই উচিত। আজ থেকে ডাক্তার কেবল দু বেলা আস্‌বেন। এ ক'দিন চারবার করে ডাক্‌তে হচ্ছিল তা ছাড়া রাত্রে একজন হাজির থাকত। তুমি কেবল শোকেই শ্রান্ত, আমি কর্ম্মে অবসন্ন। আমি আজকাল মৃত্যুর কোন মূর্ত্তিকেই তেমন ভয় করি নে কিন্তু তোমার জন্যে আমার ভাবনা হয়— তোমার মত অমন সর্ব্বসহায়বিহীন হতাশ্বাস গতাশ্রয় মন আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বলে বোধ হয়।

রবি

২০

[কলকাতা । ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

ছেলেদের জন্যে সর্ব্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয় ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল। ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হয়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে— ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র— ওদের সুখদুঃখ পাপপুণ্য কাজকর্ম্ম নিয়ে যে পথে অনন্তকাল ধরে চলে যাবে সে পথের উপর আমাদের কোন

কর্ত্তৃত্ব নেই— আমরা কেবল কর্ত্তব্য পালন করব কিন্তু তার ফলের জন্যে কাতরভাবে সস্পৃহভাবে অপেক্ষা করবনা,— ওরা যে রকম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে— আমরা সেজন্য মনে মনে কোনরকম অতিরিক্ত আশা রাখ্‌বনা। আমার ছেলের উপর আমার যে মমতা এবং সে সব চেয়ে ভাল হবে বলে আমার যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা সেটা অনেকটা অহঙ্কার থেকে হয়। আমার ছেলের সম্বন্ধে বেশি করে প্রত্যাশা করবার কোন অধিকার আমার নেই। কত লোকের ছেলে যে কত মন্দ অবস্থায় পড়ে, আমরা তার জন্যে কতটুকুই বা ব্যথিত হই? সংসারে চেষ্টা যে যতই করুক্ অবস্থা ভেদে তার ফল নানারকম ঘটে থাকে— সে কেউ নিবারণ করতে পারে না, অতএব আমরা কেবল কর্ত্তব্য করে যাব এইটুকুই আমাদের হাতে— ফলাফলের দ্বারা অকারণ নিজেকে উদ্বেজিত হতে দেব না। ভালমন্দ দুই অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার শক্তি অর্জ্জন করতে হবে— ক্রমাগত পদে পদে রাত্রিদিন এই অভ্যাসটি করতে হবে— যখনি মনটা বিকল হতে চাইবে তখনি আপনাকে সংযত স্বাধীন করে নিতে হবে, তখনি মনে আন্‌তে হবে সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ ফলাফল থেকে আমি পৃথক্— আমি একমাত্র এই সংসারের নই— আমার অতীতে যে অনন্তকাল ছিল সেখানে আমার সঙ্গে এই সংসারের কি যোগ ছিল, এবং আমার ভবিষ্যতে যে অনন্ত কাল পড়ে আছে সেখানেই বা এই সমস্ত সুখদুঃখ ভালমন্দ লাভ অলাভ কোথায়! যেখানে যে কয়দিন থাকি সেখানকার

কাজ কেবল সযত্নে সম্পন্ন করতে হবে—আর কিছুই আমাদের দেখবার দরকার নেই। সর্ব্বদা প্রসন্নতা রাখ্‌তে হবে, চারিদিকের সকলকে প্রসন্নতা দান করতে হবে—সকলে যাতে সুখী হয় এবং ভাল হয় আমি প্রফুল্লমুখে এবং অশ্রান্ত চিত্তে সেই চেষ্টা করব—তার পরে বিফল হই তাতে আমার কি ?—ভাল চেষ্টার দ্বারাতেই জীবন সার্থক হয়—ফল সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাতে। কেবল কর্ত্তব্য করেই প্রফুল্ল হতে হবে—ফল না পেয়েও প্রফুল্লতা রাখতে হবে—তার একমাত্র উপায় মনকে সর্ব্বপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে সর্ব্বদা মুক্ত করে রাখা।

রবি

২১

[কলকাতা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল ত তোমার চিঠি পাওয়া যায় নি। আজও তোমার চিঠি পাই নি মনে করে টেলিগ্রাফ করতে উদ্যত হয়েছিলুম। তার পরে স্নান করে বেরিয়ে এসে তোমার চিঠি পাওয়া গেল কিন্তু তাতে কাল চিঠি লেখনি এমন কোন খবর দেখলুমনা—ঠিক বোঝা গেল না।

কাল নগেন্দ্রকে প্রিয়বাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেইসঙ্গে আমাদেরও ছিল। কাল প্রায় ১টা থেকে রাত্রি সাড়ে

সাতটা পর্য্যন্ত রিহার্সাল ছিল, তার পরে প্রিয়বাবুর ওখানে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি আস্‌তে হল।

নীতু কাল রাত্রে ঘুমিয়েছে। তার লিভারের বেদনা প্রায় গেছে। জ্বর আজ ১০০°র কাছাকাছি আছে। লিভারটা পরীক্ষা করে ডাক্তার বল্‌চেন অনেক কমেচে।

আজ বিকালে আমাদের অভিনয়। ডাক্তার বেচারা দেখবার জন্য লুব্ধ হওয়াতে আজ তাকে একখানা টিকিট দিয়েছি—নগেন্দ্রও যাবে।—ডাক্তার ও নগেন্দ্র কাল সকালে চলে যাবে— নগেন্দ্রকে এখন এখানে রাখলে কাজের ক্ষতি হবে।

গিরিশঠাকুর এসেছিল। সে ইংরাজি বাংলা সব রকম বেশ ভাল রাঁধতে পারে—কিছু বেশি মাইনে নেবে কিন্তু কেউ এলে খাওয়াবার কোন ভাবনা থাক্‌বে না। তুমি কি বল?

এবারে আমি ফিরে গিয়েই চরে আড্ডা করব—সে তোমাদের খুব ভাল লাগ্‌বে আমি জানি। ইতিমধ্যে নীতু একটু সেরে উঠ্‌লে তাকে মধুপুরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তোমার মাকে ১৫ টাকা পাঠিয়ে দিতে যদুকে বলে দেব।

বিপিন অনেকটা সেরে উঠেছে— এখনো সে নুয়ে কাজ করতে পারে না— কিন্তু চল্‌তে ফিরতে পারচে। বেহারাটা দুই একদিনের মধ্যেই শিলাইদহে যেতে পারবে। তোমার নতুন ছোকরা চাকরটা কি রকম কাজের হয়েছে? আজ ত পয়লা— এখনো ৭ই পৌষের লেখায় হাত দিতে পারিনি বলে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কাল যেমন করে হোক্ লিখ্‌তে বস্‌তে হবে। × × ×

২২

[কলকাতা। ১৭ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

তোমার সন্ধ্যা বেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই? আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে? তোমার যা মনে এসেছিল আমাকে কেন লিখে পাঠালে না? তোমার শেষের দু চার দিনের চিঠিতে আমার যেন কেমন একটা খট্‌কা রয়ে গেছে। সেটা কি ঠিক analyze করে বল্‌তে পারিনে কিন্তু একটা কিসের আচ্ছাদন আছে। যাক্‌ গে! হৃদয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করাটা লাভজনক কাজ নয়। মোটামুটি সাদাসিধে ভাবে সব গ্রহণ করাই ভাল।

আজ নীতু ভাল আছে। অল্প জ্বর আছে— প্রতাপবাবু বলেন অমাবস্যাটা গেলে সেটা ছেড়ে যেতেও পারে। জ্বরটা গেলেই তাঁর মতে বিলম্ব না করে মধুপুরে পাঠিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাই ঠিক করেছি। লিভারের আয়তন এবং বেদনা অনেকটা কমে এসেছে।

কাল রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি আমার উপরে রাগ করে আছ এবং কি সব নিয়ে আমাকে বকৃচ। যখন স্বপ্ন বই নয় তখন সুস্বপ্ন দেখ্‌লেই হয়— সংসারে জাগ্রৎ অবস্থায় সত্যকার ঝঞ্ঝাট অনেক আছে— আবার মিথ্যাও যদি অলীক ঝঞ্ঝাট বহন করে আনে তাহলেত আর

পারা যায় না। সেই স্বপ্নের রেশ নিয়ে আজ সকালেও মনটা কি রকম খারাপ হয়ে ছিল। তার উপরে আজ সমস্ত সকাল ধরে লোকসমাগম হয়েছিল— ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা লিখ্‌ব তা আর লিখ্‌তে দিলে না। সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখ্‌তে পেরেছিলুম।

রবি

২৩

[কলকাতা। ২০ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

বড় হোক্‌ ছোট হোক্‌ ভাল হোক্‌ মন্দ হোক্‌ একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখনা কেন? ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারি খালি ঠেকে। আজ আবার বিশেষ করে তোমার চিঠির অপেক্ষা করছিলুম— রথী আস্‌বে কিনা তোমার আজকের সকালের চিঠিতে জান্‌তে পারব মনে করেছিলুম। যাই হোক্‌ চিঠি না পেলে কি রকম লাগে তোমাকে দেখাবার ইচ্ছা আছে। কাল বিকালে আমরা বোলপুরে চলে যাচ্চি অতএব এ চিঠির উত্তর তোমাকে আর লিখ্‌তে হবে না— একদিন ছুটি পাবে। রবিবার সকালে এসে আশা করি তোমার একখানা চিঠি পাওয়া যাবে। শনিবারে আমরা শান্তিনিকেতনে থাক্‌ব, সেদিন আমিও চিঠি লিখ্‌তে সময় পাব না।

নায়েবের ভাইয়ের খবর কি ? নীতুর লিভার আজ পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা সম্পূর্ণ কমে গেছে— এখন কেবল তার কাশি এবং জ্বরটা কমলেই তাকে মধুপুরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। জ্বর খুব অল্প অল্প করে কমচে— অমাবস্যা গেলে হয়ত ছাড়তে পারে।

তোমাদের বাগান এখন কি রকম ? কিছু ফসল পাচ্চ ? কড়াইসুটি কতদিনে ধরবে ? ইঁদারায় ফটিক রোজ ফট্‌কিরি দিচ্চে ত ? জল সাফ হচ্চে ? বামুন বাম্‌নীতে কি ভাবে চল্‌চে ? বিমলা সম্বন্ধে তোমার মত আমাকে শীঘ্র লিখো। ৭ই পৌষের লেখাটা নানা বাধার মধ্যে লিখ্‌চি এখনো শেষ হয় নি। এখন সেই লেখাটাতে হাত দিই গে যাই।

রবি

২৪

[কলকাতা। ২১ ডিসেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ একদিনে তোমার দুখানা চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবার অবসর নেই। কেবল × । আজ বোলপুর যেতে হবে। বাবামশায়কে আমার লেখা শোনালুম তিনি দুই একটা জায়গা বাড়াতে বল্লেন— এখনি তাই বস্‌তে হবে— আর ঘণ্টাখানেক মাত্র সময়

আছে। তাই মনের সঙ্গে হাসি দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পারলুম না। আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি বেশি কোন চেষ্টা কোরো না— আন্তরিক ভালবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাক্‌ত খুব ভাল হত— কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ত্ত নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার ত খুসি হই— আমি যা কিছু জান্‌তে চাই তোমাকেও তা জানাতে পারি— আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে খুব সুখের হয়। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়— তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করিনে— কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে— আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই— সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর— আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে। × × × × ×

রবি

২৫

[কলকাতা। জানুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি—

কাল যখন বাড়ি ফিরে এলুম তখন ঢংঢং করে দুপুর বেজে গেল। সকালে গান শেখাবার কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে নাটোরের বাড়িতে যাওয়া গেল— অমলার সন্ধানে। দেখি হেশ নাটোরের ছবি আঁকচে— রাণীর ছবিও খানিকটা আঁকা পড়ে আছে। অমলার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করা গেল— অমলা বল্লে যখন হাতে পেয়েছি তখন ছাড়ব কেন, আমাদের বাড়িতে যাবেন সেখানে গান সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আজ তিনটের সময় তাদের সেই বির্জ্জিতলার বাড়িতে গিয়ে মিষ্টান্ন ভোজন ও মিষ্ট কথার আলোচনা করতে হবে। ওখান থেকে সরলার সন্ধানে গেলুম— সরলা বাড়িতে নেই— তারকবাবু আর নদিদি— অনেকক্ষণ সরলার জন্যে অপেক্ষা করা গেল এলনা— নদিদি বল্লেন কাল সকালে এসে খেয়ো সেই সঙ্গে সরলাকে গান শিখিয়ে নিয়ো— তাতেই রাজি। তারকবাবু বল্লেন খাবার আগে আমার ওখানে যেয়ো পুরীর বাড়িসম্বন্ধে কথা আছে— তাই সই। আজ সকালে স্নান করে প্রথমে তারকবাবু, পরে নদিদি, পরে সুরেন, পরে অমলাকে সেরে বাড়ি এসে ১১ই মাঘের গান শিখিয়ে রাত্রে সঙ্গীতসমাজ সেরে ১২টার সময় নিদ্রার আয়োজন করতে হবে। ওদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— রাত্রে খুব এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে—

আবার হবার মত মেঘ জমে রয়েছে। শীতকালে আমি ত কখনো এমন মেঘ দেখি নি। তোমাদের ওখানেও সম্ভবতঃ এই রকম মেঘের আয়োজন হয়েছে—এই শীতকালের বাদল তোমাদের নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগ্‌চে—আমি ত সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে কাটাই, ভাল মন্দ লাগবার অবসরমাত্র পাই নে—বিকেলের দিকে যখন শরীরটা শ্রান্ত হয়ে আসে তখন স্বভাবতই তোমাদের দিকে মনটা চলে যায়—তখন গাড়ি হয় ত কলকাতার জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে ছুট্‌চে আর আমার সমস্ত চিন্তা শিলাইদহের ঘর কখানার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। কলকাতার রাস্তায় গাড়ির মধ্যে এবং দুপুর রাত্রে বিছানায় ঢুকে তোমাদের মনে করবার অবকাশ পাই—বাকী কেবল গোলমাল। আজ তোমার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আমাকে বেরতে হবে তাই সকালে উঠেই তোমাকে চিঠি লিখে নিচ্চি—চিঠি সেরেই স্নান করতে যাব—স্নান করেই দৌড়। সেদিন সত্যর ছেলেদের দেখলুম—বেশ ছোটখাট গোলগাল দেখতে হয়েছে—ভারি মজার রকম ধরণের। বড়দিদি এগারই মাঘের আগেই চলে আস্‌চেন—গগনরাও দশই মাঘে আস্‌বে আবার সমস্ত ভরপূর হয়ে উঠ্‌বে। ইলেক্ট্রীক আলোর তার গগনদের বাড়িতে আস্‌চে, ওদের হয়ে গেলেই অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের শূন্যঘরেও বিদ্যুতের আলো জ্বলতে সুরু হবে। আজ তবে অনেক হামি দিয়ে স্নান করতে যাই।

তোমার রবি

২৬

[কলকাতা। ১৯ জানুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি—

কাল সুরেনের ওখানে গিয়েছিলুম। সে একটু ভাল বোধ করচে—তাকে এখন প্রতাপ মজুমদার চিকিৎসা করচেন—কাল অমাবস্যা, তাই জ্বরটা বোধ হয় অমাবস্যা না কাট্‌লে কম্‌বেনা। মেজবোঠান কালও বেলা এবং রেণুকাকে আনাবার জন্যে বিশেষ করে বল্‌লেন—বিবির বাড়িতে ওদের রাখ্‌তে কোন অসুবিধা হবেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি কি বিবেচনা কর—ওরা এত করে আস্‌তে চাচ্চে—না আস্‌তে পারলে বড় নিরাশ হবে—তাই ওদের জন্যে মায়া হয়—নগেন্দ্রর সঙ্গে রাণী রথী বেলাকে একটা সেকেণ্ডক্লাস রিজার্ভ করে পাঠালে মন্দ হয় না—মঙ্গলবার ৯ই মাঘে আস্‌বে—১১ই মাঘ দেখে নীতুর সঙ্গে চলে যেতে পারে। মেজবোঠান জান্‌তে চান কোন্ ট্রেনে আস্‌বে—তাদের আনতে গাড়ি পাঠাবেন। যদি পাঠানই স্থির কর তাহলে টেলিগ্রাফ কোরো—না হলে জানব আস্‌বেনা। দুতিনদিনের জন্যে বেলা বিবিদের ওখানে থাক্‌লে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিনে। যাহোক্ তুমি যা ভাল বিবেচনা কর তাই কোরো। মেজবোঠান তোমাকে বল্‌তে বলে দিয়েছেন যে দাসী পাওয়া যাবে—বোধহয় শীঘ্র পাঠাতে পারবেন। শেলাই প্রভৃতি জানে এমন ভদ্ররকম ক্রিষ্টান্ দাসীও পাওয়া যেতে পারে—

চাও ত বলি— মাইনে টাকা আষ্টেক। আমার ত বোধ হয় এ-রকম দাসী হলে তোমার মন্দ হয় না। আমরা এবার বোটে গিয়ে থাক্‌ব— সেখানে চাকরের অভাব তুমি তেমন অনুভব করবে না— তপ্‌সি থাক্‌বে, অন্যান্য মাঝিও থাক্‌বে, তোমার ফটিক থাকবে পুঁটে থাক্‌বে, বিপিন থাক্‌বে, মেথর থাক্‌বে — অনায়াসে চলে যাবে— ল্যাম্পের ল্যাঠা নেই, জল তোলার হাঙ্গাম নেই, ঘর ঝাঁড় দেওয়ার ব্যাপার নেই— কেবল খাবে স্নান করবে, বেড়াবে এবং ঘুমবে। কালও রাত দুপুরের সময় এসেছি— সমস্ত দিন উৎপাত গেছে। আজ সকাল বেলায় এক চোট সাক্ষাৎকারীদের সমাগম এবং গান-শিক্ষার হাঙ্গাম শেষ করে আহারটি করেই তোমাকে লিখ্‌তে বসেছি— এখনি সঙ্গীতসমাজওয়ালারা তাদের রিহার্সালের জন্যে আমাকে ধরতে আসবে— সেখানে ৪টে পর্যন্ত চেঁচামেচি করে সুরেন[কে] দেখ্‌তে বালিগঞ্জে যাব— সেখান থেকে সরলাকে তুলে নিয়ে এসে গান শেখানর ব্যাপারে রাত নটা বেজে যাবে— তার পরে সঙ্গীতসমাজে আবার রিহার্সালে রাত দুপুর হয়ে যাবে। — চৈতন্য ভাগবত এনেছি— বিপিন একখানা মলিদা ও একটা রাগ্‌ এনেছে দেখেছি— মলিদা আনবার কি দরকার ছিল আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। নানা ব্যস্ততার মাঝখানে অল্প একটুখানি অবকাশে তোমাকে তাড়াতাড়ি করে লিখে ফেলতে হয় ভাল করে মন দিয়ে লিখতে পারিনে। × × × × × × ×

রবি

২৭

[এলাহাবাদ। ৩১ জানুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

আজ এলাহাবাদে এসে পৌঁচেছি। সুসি এবং তার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুসি যেতে রাজি হয়েচে, তার মাও সম্মতি দিয়েচেন। কলকাতা হয়ে শিলাইদহে যাওয়াই স্থির হল। যে রকম বাধা পাব মনে করেছিলুম তার কিছুই নয়। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই উভয়েই রাজি হল। পশু´ অর্থাৎ শনিবারে এখান থেকে ছাড়ব। ভাগ্যি সুরেন মোগলসরাই থেকে আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে ক'টা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।

কলকাতায় আমার শরীরটা ভারি খারাপ হয়ে এসেছিল। যাত্রার দিনে দশ গ্রেন কুইনীন খেয়ে বেরিয়েছিলুম— পথেই অনেকটা আরাম পেলুম— আজ আর শরীরে কোন গ্লানি নেই।

কাল রাত্রে গাড়ি ছেড়ে দিলে পর আলোগুলোর নীচে পর্দ্দা টেনে দিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া গেল— বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল— আমি গাড়িতে একলা ছিলুম— মনটা বড় একটি সুমিষ্ট মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল— তুমি তখন কোথায় কি করছিলে? ছাতে ছিলে, না ঘরে? কি ভাবছিলে, আমার হৃদয়টি জ্যোৎস্নারই মত স্নিগ্ধকোমলভাবে তোমাদের উপরে ব্যাপ্ত হয়েছিল— তার মধ্যে বাসনা বেদনার

তীব্রতা ছিলনা— কেবল একটি আনন্দ বিষাদমিশ্রিত সুমঙ্গল সুমধুর ভাব। × × × ×

রবি

২৮

[শিলাইদহ। জুন ? ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

কাল পুণ্যাহের গোলমালে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। পর্শুদিন বিকেলে শিলাইদহে এসে পৌঁছলুম। শূন্য বাড়ি হাঁ হাঁ করছে। মনে করেছিলুম অনেকদিন নানা গোলমালের পর একলা বাড়ি পেয়ে নির্জ্জনে আরাম বোধ করব। কিন্তু যেখানে বরাবর সকলে মিলে থাকা অভ্যাস, এবং একত্রবাসের নানাবিধ চিহ্ন বর্ত্তমান সেখানে একলা প্রবেশ করতে প্রথমটা কিছুতেই মন যায় না। বিশেষতঃ পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে যখন বাড়িতে এলুম তখন বাড়িতে কেউ সেবা করবার, খুসি হবার, আদর করবার লোক পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হল। পড়তে চেষ্টা করলুম পড়া হল না। বাগান প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে কেরোসিন্‌-জ্বালা শূন্য ঘর বেশি শূন্য মনে হতে লাগ্‌ল। দোতলার ঘরে গিয়ে আরো খালি বোধ হল। নীচে নেমে এসে আলো উস্কে দিয়ে আবার পড়বার চেষ্টা করলুম— সুবিধে করতে পারলুম না।

সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়লুম। দোতলার পশ্চিমের ঘরে আমি এবং পূর্ব্বের ঘরে রথী শুয়েছিল। রাত্রি রীতিমত ঠাণ্ডা —গায়ে মলিদা দিতে হয়েছিল। দিনেও যথেষ্ট ঠাণ্ডা। কাল বাজনাবাদ্য উপাসনা ইত্যাদি করে পুণ্যাহ হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কাছারিতে একদল কীর্ত্তনওয়ালা এসেছিল। তাদের কীর্ত্তন শুন্‌তে রাত এগারোটা হয়ে গেল।

তোমার শাকের ক্ষেত ভরে গেছে। কিন্তু ডাঁটা গাছ-গুলো বড্ড বেশি ঘন ঘন হওয়াতে বাড়তে পারচেনা। চালানের সঙ্গে তোমার শাক কিছু পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কুম্‌ড়ো অনেকগুলো পেড়ে রাখা হয়েছে। নীতু যে গোলাপ গাছ পাঠিয়েছিল সেগুলো ফুলে ভরে গেছে কিন্তু অধিকাংশই কাঠগোলাপ — তাকে ভয়ানক ফাঁকি দিয়েছে। রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুম্‌কো, মেদি খুব ফুট্‌চে। হাস্নু-ও-হানা ফুট্‌চে কিন্তু গন্ধ দিচ্চেনা, বোধ হয় বর্ষাকালে ফুলের গন্ধ থাকেনা।

দুটো চাবি পেয়েছি— কিন্তু আমার কর্পূর কাঠের দেরাজের চাবিটা দরকার। তার মধ্যে রথীর ঠিকুজি আছে সেইটের সঙ্গে মিলিয়ে রথীর কুষ্ঠি পরীক্ষা করতে দিতে হবে। সেটা চিঠি পেয়েই পাঠিয়ো।

নীতু কেমন আছে লিখো। প্রতাপবাবু রোজ দেখ্‌তে আস্‌চেন ত? যাতে ওষুধ নিয়মিত খাওয়া হয় দেখো।

পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সাম্‌নে আখের ক্ষেত খুব বেড়ে উঠেছে। চতুর্দ্দিকের মাঠ শেষ পর্য্যন্ত শস্যে

পরিপূর্ণ— কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নেই। সবাই জিজ্ঞাসা করচে মা কবে আস্‌বেন ? আমরা আস্‌বনা শুনে এখানকার আমলারা খুব দমে গিয়েছিল।

শরতের আর চিঠিপত্র এসেছে ? তার সম্বন্ধে আর কোন খবরবার্ত্তা আছে ? বেলা যেন তাকে ভাল করে চিঠিপত্র লেখে। কি পাঠ লিখ্‌তে হবে যদি ভেবে না পায় আমাদের চিরকেলে দস্তুরমত শ্রীচরণকমলেষু লিখ্‌লেই হয়— বাঁধাদস্তুরে গেলে ভাবনা থাকেনা। এখান থেকে কোন জিনিষ যদি দরকার থাকে লিখো। দই মাছ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। × × × × ×

রবি

২৯

[শিলাইদহ। জুন ? ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

পুণ্যাহের চালান আজ যাবে মনে করেছিলুম—কিন্তু আরো কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায় গেলনা। কাল যাবে। আমার আম ফুরিয়ে এসেছে। কিছু আম না পাঠিয়ে দিলে অসুবিধা হবে। খাওয়া দাওয়া আমাদের সাদাসিধে রকম চল্‌চে, তাতে শরীরটা বেশ ভাল আছে। বামুন ঠাকুর শিলাইদহের সুবিখ্যাত লালমোহন তৈরি করেছিল—

লোভ সত্ত্বেও আমি খাইনি—দেখ্‌ছি কোন রকম মিষ্টি না খেয়েই শরীরটা ভাল আছে—মিষ্টি খেলেই পাকযন্ত্র বিগ্‌ড়ে যায়। কুঞ্জ ঠাকুরকে ত আমি নিয়ে এলুম, তোমাদের আহারাদিটা কি রকম চল্‌চে? আমার এখানে কেবল মাত্র কুঞ্জ এবং ফটিকে বেশ শান্তভাবে কাজ চলে যাচ্ছে—বিপিনের জলদমন্দ্রকণ্ঠস্বর না থাকাতে শিলাইদহ দিব্যি নিস্তব্ধ হয়ে আছে—কাজ চল্‌চে অথচ কাজের আস্ফালন না থাকাতে বেশ আরাম বোধ হচ্চে—বিপিন থাকলে মনে হত অপরিমিত কাজের তাড়ায় সমস্ত সংসার যেন উৎখাত হয়ে রয়েছে, কোথাও কারো যেন হাঁপ ছাড়বার সময় নেই। আমার ইচ্ছে কোন কথাটি না কয়ে সমস্ত কাজ নিঃশব্দে নিয়মমত হয়ে যায়—আয়োজন বেশি না হয় অথচ সমস্ত বেশ সহজে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন এবং সুসম্পন্ন হয়—বেশ নিয়মে চলে অথচ অল্পে চলে এবং নিঃশব্দে চলে। একলা থাকার ঐ একটা সুখ আছে স্বীকার করতে হবে, চারদিকে প্রভূত চেষ্টার চিহ্ন এবং সরঞ্জামের ভিড় থাকে না—তাতে মনটা বেশ মুক্ত থাক্‌তে পায়। আমি আছি বলে পৃথিবীতে একটা হুলস্থূল কাণ্ড চল্‌চেনা এইটেতে বড় হাল্কা বোধ হয়—আজকাল আমার চারদিকে লোকজন হাঁসফাঁস তোলপাড় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করচে না বলে আমার অবসরকালকে খুব বৃহৎ খুব প্রশস্ত মনে হচ্চে। সকালে ঠিক সময়েই দুটি আম খাই, দুপুরবেলায় অন্ন, বিকেলেও দুটি আম এবং রাত্রে গরম লুচি ও ভাজা—

সাদাসিধে খাওয়া ও নিয়মমত খাওয়া বলে ক্ষুধা থাকে খেয়ে তৃপ্তি হয়— ঘড়ি ঘড়ি ওষুধ খেতে হয় না। কোন রকম করে জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আন্‌তে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না— জিনিষপত্রে গোলেমালে হাঙ্গামহুজ্জতে হিসেবপত্রেই সুখসন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে— আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। বহির্ব্যাপারের চেষ্টাকে লঘু করে দিয়ে মানসিক ব্যাপারের চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা। ছোটখাট ব্যাপারেই জীবনকে ভারগ্রস্ত করে ফেল্‌লে বড় বড় ব্যাপারকে ছেঁটে ফেল্‌তে হয়, সামান্য জিনিষেই সংসারের পথ জটিল হয়ে ওঠে এবং সকলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অহর্নিশি ফাঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে— সে ফাঁকা কেবল আকাশ বাতাস এবং আলোকের নয়-- সংসারের ফাঁকা, আয়োজন আস্‌বাবের ফাঁকা, চেষ্টা চিন্তা আড়ম্বরের ফাঁকা— খাওয়া পরা আচার ব্যবহার সমস্ত সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন— চারিদিকে বেশ সহজ শান্ত স্বল্পতা— ড্রয়িংরুম না, ডাইনিংরুম্ না, নবাবীও না— তক্তপোষ এবং ঢালা বিছানা— শান্তি এবং সন্তোষ— কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ না, স্পর্দ্ধা না— এই হলেই জীবন নিজেকে সফল করবার অবকাশ পায়। যাই নাইতে। × × × × × ×

রবি

৩০

[শিলাইদহ। জুন ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

পুণ্যাহের গোলমাল চুকে যাওয়ার পর থেকে আমি লেখায় হাত দিয়েছি। একবার কোন সুযোগে লেখার মধ্যে পড়তে পারলেই আমি যেন ডাঙ্গায় তোলা মাছ জলে গিয়ে পড়ি। এখন এখানকার নির্জ্জনতা আমাকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দান করেছে, সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি আমাকে আর স্পর্শ করতে পারচেনা, যারা আমার শত্রুতা করেছে তাদের আমি অতি সহজেই মার্জ্জনা করেছি। নির্জ্জনতায় তোমাদের পীড়া দেয় কেন তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারচি— আমার এই ভাব সম্ভোগের অংশ তোমাদের যদি দিতে পারতুম তা হলে আমি ভারি খুসি হতুম, কিন্তু এ জিনিষ কাউকে দান করা যায় না। কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মত শূন্যস্থানের মধ্যে এসে পড়ে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগ্‌বেনা— এবং তার পরে সয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা রুদ্ধ অধৈর্য্য থেকে যাবে। কিন্তু কি করি বল, কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে— সেই জন্যে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকি— সকলকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে অন্তঃকরণের শান্তি রক্ষা করে চল্‌তে পারি নে। তা ছাড়া সেখানে রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না—

সকলেই কি রকম উড়ুউড়ু করতে থাকে। কাজেই তোমাদের এই নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভাল জায়গা বেছে নিতে হয় ত পারব, কিন্তু কোনকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকতে পারবনা। সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে নিবিড় মেঘ জমে এসে বৃষ্টি আরম্ভ হল— আমার নীচের ঘরের চারিদিকের শাসি বন্ধ করে এই বর্ষণদৃশ্য উপভোগ করতে করতে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি। তোমাদের সেখানকার দোতলার ঘর থেকে এ রকম চমৎকার ব্যাপার দেখতে পেতে না। চারিদিকের সবুজ ক্ষেতের উপরে * * * স্নিগ্ধ তিমিরাচ্ছন্ন নবীন বর্ষা ভারি সুন্দর লাগ্‌চে।[১] বসে [বসে] মেঘদূতের উপর একটা প্রবন্ধ লিখ্‌চি। [এই] প্রবন্ধের উপর আজকের এই নিবিড় বর্ষার দিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখ্‌তে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজ ক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিষ করে রাখ্‌তে পারতুম তাহলে কেমন হত! আমার লেখায় অনেক রকম করে অনেক কথা বল্‌চি— কিন্তু কোথায় এই মেঘের আয়োজন, এই শাখার আন্দোলন, এই অবিরল ধারাপ্রপাত, এই আকাশপৃথিবীর মিলনালিঙ্গনের ছায়াবেষ্টন! কত সহজ! কি অনায়াসেই জলস্থল আকাশের উপর এই নির্জ্জন মাঠের নিভৃত বর্ষার

---

[১] ইহার পর কিয়দংশ বিনষ্ট।

দিনটি— এই কাজকর্ম্মছাড়া মেঘেঢাকা আষাঢ়ের রৌদ্রহীন মধ্যাহ্নটুকু ঘনিয়ে এসেছে— অথচ আমার সেই লেখার মধ্যে তার কোন চিহ্নই রাখ্তে পারলুম না— কেউ জান্তে পারবেনা কোন্‌দিন কোথায় বসে বসে সুদীর্ঘ অবসরের বেলায় লোকশূন্য বাড়িতে এই কথাগুলো আমি আপনমনে গাঁথছিলুম। খুব এক পস্‌লা বর্ষণ হয়ে থেমে এসেছে— এই বেলা চিঠি পাঠাবার উদ্যোগ করা যাক্। × × × × ×

রবি

৩১

[শিলাইদহ। ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

লরেন্স আজ সকালে এসে উপস্থিত। বোধ হয় ক'দিন কলকাতায় খুব মদ চালাচ্ছিল। আজ সকালেও আমার কাছ থেকে একটু হুইস্কি চেয়ে খেলে। ওর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ হয়। এ পর্য্যন্ত কোন চাকরীর যোগাড় করতে পারলেনা— ওর কি যে অবস্থা হবে বুঝতে পারচিনে। যখন বল্লে, I am so sorry to miss Mira, আমার মনটা আর্দ্র হল। ও হয়ত জানে আমি মীরাকে ভালবাসি সেইজন্যেই বিশেষ করে তার নাম করলে তবু আমার মনে লাগ্‌ল। হাজার হোক্ আজ সাড়ে তিন বৎসর আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছিল।

এইবারে সুবিধা পেয়ে কলকাতায় সুপ্রকাশরা ওকে খুব অপমান করে নিয়েছে। এখানে খুব গরম পড়েছে। শরীর আমার বেশ ভালই আছে কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুমতে পারিনে— অনেক রাত্রে জেগে উঠে জ্যোৎস্নায় বসে থাকি— হিম কিছুমাত্র নেই। কাল বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্ম্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে —আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। যদি অনেক রাত্রে এই ছাদের জ্যোৎস্নায় তুমি বস্‌তে তাহলে বোধ হয় আবার তোমার মন ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ত। আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠ্‌লে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়— আমি মনে মনে ভাবি আর একশো বৎসর না যেতেই আমাদের সুখদুঃখ এবং আত্মীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে— তা ছাড়া অনন্ত নক্ষত্রলোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্ত লোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়ষার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দেখ্‌তেও পাওয়া যায় না। × × ×

তোমার রবি

৩২

[মজঃফরপুর। ১৬ জুলাই ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবি ঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। রোজ সন্ধ্যা-বেলায় দলে দলে বাঙালিরা এই অদ্ভুত কৌতুক দেখবার জন্যে সমাগত হচ্চে— শরতের ঘরে আর জায়গা হয় না— মনে করচি ঢাকাইটা ছাড়তে হবে— নইলে লোকের আমদানি বন্ধ করা যাবে না। শরৎ ত ভীড় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তোমার কথা শুনে আমার এই দুর্গতি হল। তোমার বুদ্ধিতেই বেলার গয়না খোয়া গেছে। আমি তাই মনে স্থির করেছি তোমার বুদ্ধিতে আর চল্‌বনা— আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও লিখ্‌চে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। বোধ হয় শাস্ত্রকারদের স্ত্রীরা স্বামীদের জোর করে ঢাকাই ধুতি পরাত।

বেলা বোধ হচ্চে এখন বেশ স্থির হয়ে নিজের ঘরকন্নাটি জুড়ে নিয়ে বসেছে। গোছান গাছানর কাজে এখন ওর দিনকতক বেশ কাট্‌বে। ওর সেই সব শামুক শাঁখ প্রভৃতি বেরিয়েছে। যেখানে ওর বসবার ঘর স্থির হয়েছে সে ওর

পছন্দ হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় শরতে ওতে মিলে কুমারসম্ভব পড়া হবে এই রকম একটা কল্পনাও চল্‌চে। যদিও পড়াশুনো কি রকম অগ্রসর হবে সে সম্বন্ধে আমার খুব সন্দেহ আছে।

আজ রোদ উঠে চতুর্দ্দিক বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। প্রথম এসেই দিন দুই খুব মেঘলা এবং গুমট গেছে। নতুন জায়গায় এবং নতুন সংসারে প্রবেশের সময় এই রকম অন্ধকার এবং গুমটভাবে মনটাকে পীড়িত করে। সেইটে কেটে গিয়ে আজ সূর্য্যালোকে সমস্ত বেশ প্রসন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করেছে। একটা আশ্চর্য্য এই দেখচি এই বিবাহ ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদে প্রায় আরম্ভটায় গোলমাল এবং ব্যাঘাত —তার পরেই কেটেকুটে গিয়ে সমস্ত পরিষ্কার। গাড়ী রিজার্ভ করা নিয়ে কি রকম হল মনে আছে ত? বেরবার সময় কি ভয়ানক বৃষ্টি— যেতে যেতে পথেই সমস্ত চুকে গেল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওদের জীবনেও কোন বিঘ্ন বিপদ অশান্তি অনৈক্য স্থায়ী না হয়। শরৎকে যত দেখচি খুব ভাল লাগ্‌চে— ওর বাইরে কোন আড়ম্বর নেই— ওর যা কিছু সমস্ত মনে মনে। লজ্জা করে ও কিছু প্রকাশ করতে পারে না, তার থেকে ওর হৃদয়ের গভীরতা প্রমাণ হয়। বেলাকে ও খুব ভাল বাসে এবং বাসবে সন্দেহমাত্র নেই। এদিকে উপার্জ্জনশীল উদ্যমশীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিরলস, ওদিকে এলোমেলো, অসতর্ক, অসন্দিগ্ধ, টাকাকড়ি সম্বন্ধে অসাবধান— যেখানে সেখানে যা তা ফেলে রেখে দেয়, হারায়, কাউকে কিছুমাত্র সন্দেহ করে না। পুরুষমানুষের মত কাজের এবং পুরুষ-

মানুষের মত অগোছালো। এই জন্যেই ওকে বিশেষ করে আমার ভাল লাগে। [হৃষী] ঠিক উল্টো। তার সমস্ত গোনাগাঁথা, হিসেব করা—মেয়েমানুষের মত ছোটখাটোর প্রতি দৃষ্টি এবং লোকের প্রতি সন্দেহ—যত্ন আদর করতে কথাবার্ত্তা কইতে জানে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব। শরৎ সে রকম বাইরে দেখাতে পারে না তবু এখানকার সকলেই তাকে ভালবাসে—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে শরৎবাবুর মত পপ্যুলার লোক মজঃফরপুরে দ্বিতীয় নেই। মেয়েদের চোখে হৃষী যতই চটক্ লাগাক্, পুরুষোচিত ঔদার্য্য এবং আড়ম্বরহীন সরলতা ও আন্তরিক সহৃদয়তায় শরৎ হৃষীর চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। ঠিক আমার মনের মত এমন ছেলে আমি পেতুম না। ওকে মনে করতে পার বেশি গম্ভীর, কিন্তু তা নয়—ভিতরে ভিতরে ওর মধ্যে হাস্যরস আছে—বেলার সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে বেশ ঠাট্টাঠুট্টি চলে। এখনকার সভ্য ছেলেদের মত দেশকাল পাত্র বিচার না করে সকল অবস্থাতেই ছেব্‌লামি করে না। যাই হোক্ শরতের সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো—এমন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জামাই তুমি হাজার খুঁজলেও পেতে না। তা ছাড়া সংসারে ও প্রতিপত্তি লাভ করবে সেও নিশ্চয়। এখন, বেলা যদি নিজেকে আপনার স্বামীর যোগ্য স্ত্রী করে তুল্‌তে পারে তাহলেই আমি চরিতার্থ হতে পারি। অমাবস্যা হয়ে গেল। নীতুর জন্যে আমার মন চিন্তিত হয়ে আছে। এ চিঠির উত্তর আমাকে দিয়ো না—এখানে আমার চিঠিপত্র কাগজ বই প্রভৃতি পাঠাতে বারণ করে

দিয়ো। বোধ হয় আমি পশু রওনা হয়ে একবার বোলপুর দেখে আগামী সোমবারের মধ্যে বাড়ি পৌঁছব। আমার চিঠি আদি বোলপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ো।× × × × × × × ×

তোমার রবি

৩৩

[শান্তিনিকেতন। ২০ জুলাই ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

বেলাকে রেখে এলুম। তোমরা দূরে থেকে যতটা কল্পনা করচ ততটা নয়— বেলা সেখানে বেশ প্রসন্নমনেই আছে— নতুন জীবনযাত্রা তার যে বেশ ভালই লাগচে তার আর সন্দেহ নেই। এখন আমরা তার পক্ষে আর প্রয়োজনীয় নই। আমি ভেবে দেখ্‌লুম বিবাহের পরে অন্ততঃ কিছুকাল বাপমায়ের সংসর্গ থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার অবাধ অবসর মেয়েদের দরকার। বাপ মা এই মিলনের মাঝখানে থাক্‌লে তার ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, পিতৃপক্ষ এবং স্বামীপক্ষের অভ্যাস রুচি প্রভৃতি একরকম নয়, একটু আধ্‌টু তফাৎ হতেই হবে— সে স্থলে বাপ মা কাছে থাক্‌লে মেয়েরা তাদের পিতৃগৃহের অভ্যাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে সকল রকমে মিশে যেতে পারে না। দিতে যখন হবেই, তখন আবার হাতে রাখবার চেষ্টা করা কেন? এ স্থলে মেয়ের সুখ এবং মঙ্গলই দেখবার বিষয়— নিজেদের

সুখ দুঃখের দিকে তাকিয়ে পতিগৃহের বন্ধনের সঙ্গে আবার পিতৃগৃহের বন্ধন চাপাবার কি আবশ্যক ? বেলা বেশ সুখে আছে সেই কথা মনে করে তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ শান্ত করতে চেষ্টা কোরো। আমি নিশ্চয় বল্‌চি আমরা যদি বিবাহের পরেও ওদের দুজনকে নিয়ে ঘিরে বস্‌তুম তাহলে কখনই ভাল ফল হত না। দূরে আছে বলে আদরও চিরদিন সমান থাক্‌বে। পূজার সময় যখন ওরা আস্‌বে কিম্বা আমরা যখন ওদের ঘরে যাব তখন নিবিড় এবং নবীন আনন্দ ভোগ করব। সকল ভালবাসাতেই খানিকটা পরিমাণে বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার। পরস্পরকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করলে কখনই মঙ্গল হয় না। রাণীও যদি বিবাহ করে দূরে যায় তাহলে ওর ভালই হবে। অবশ্য প্রথম বছর দুই আমাদের কাছে থাক্‌বে—কিন্তু তার পরে বয়স হলেই ওকে সম্পূর্ণ ভাবেই দূরে পাঠান ওর মঙ্গলের জন্যই দরকার হবে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র—সেইজন্যই বিবাহের পর আমাদের মেয়েদের একটু দূরে যাওয়া বিশেষ দরকার। নইলে নূতন অবস্থার প্রত্যেক ছোটখাট খুঁটিনাটি অল্প অল্প পীড়ন করে' স্বামীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরকে শিথিল করে দিতে পারে। রাণীর যে রকম প্রকৃতি—বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ও শুধ্‌রে যাবে—আমাদের সঙ্গে নিকট যোগ থাক্‌লে ওর পূর্ব association যাবে না। তুমি নিজের কথা ভেবে দেখনা। আমি যদি তোমাকে বিবাহ

করে ফুলতলায় থাকতুম তাহলে তোমার স্বভাব ও ব্যবহার অন্য রকম হত। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে নিজের সুখ দুঃখ একেবারেই বিস্মৃত হওয়া উচিত। তারা আমাদের সুখের জন্য হয় নি। তাদের মঙ্গল এবং তাদের জীবনের সার্থকতাই আমাদের একমাত্র সুখ। কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত— সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত— কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল— আমি ওকে নিজে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম— দার্জ্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম— যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদয় হয়। কিন্তু সে সব কথা ও ত জানে না— না জানাই ভাল। বিনা কষ্টে ওর নতুন ঘরকন্নার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে ভক্তিতে প্রেমে স্নেহে সাংসারিক কর্ত্তব্যে পরিপূর্ণতা দান করুক্! আমরা যেন মনে কোন খেদ না রাখি!

আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এরকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূরে থেকে কল্পনা করা যায় না। আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদি-জননীর কোলে স্তনপান করচি। × × ×

তোমার—

৩৪

[কুষ্টিয়া। শিলাইদহের পথে। ১৯০১]

ওঁ

ভাই ছুটি

কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁচেছি। পৌঁছে একটা বিষয়ে বড় হতাশ্বাস হয়ে পড়েছি। এখানে শালাকে দেখলুম কিন্তু আমার শালাজটিকে দেখলুম না। তাকে গতকল্য কাশিতে তার মাতৃসন্নিধানে পাঠিয়ে দিয়ে কুষ্টিয়া নগরী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার খাট বিছানা তেমনি পড়ে রয়েছে, আলনায় তার অত্যন্ত ময়লা কাপড় ঝুল্‌চে— কিন্তু সে নেই। হায়!

তোমার মার বাতের মতো হয়ে কষ্ট পাচ্চেন। শিলাইদহে ভাল ছিলেন কুষ্টিয়ায় এসে তাঁকে বাতে ধরেছে। তোমাদের কিনুরামের প্রফুল্ল মুখ পুষ্ট শরীর দেখে তৃপ্তি লাভ করা গেল। সে আমার সঙ্গে কোন একটা বিষয়ে আলাপ করবার জন্যে বারম্বার ফিরে ফিরে আস্‌চে, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, কিন্তু আমাকে চিঠি লেখায় নিযুক্ত দেখে দুঃখিত মনে চলে যাচ্চে।

ষ্টীমারের অপেক্ষায় বসে আছি। বৈকালে শিলাইদহে চলে যাব।

কলকাতার নতুন বাড়িতে যে আলমারিতে বই আছে তার চাবি কার কাছে? তার থেকে গোটাকতক বই আমার দরকার।

কাল অর্দ্ধরাত্রে কল্‌কাতায় খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার যাত্রার আয়োজন আর কি। এখানে তিনচার দিন

বৃষ্টি নেই— রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে— গরম নিতান্ত মন্দ নয়। শিলাইদহে পৌঁছে হয় ত দেখ্‌ব— পাট পচার নিস্তব্ধ দুর্গন্ধে সেখানকার বাতাস পরিপূর্ণ।

ওল তোমার মাকে দিয়েছি। সত্যকেও দিয়ে এসেচি। মনীষারা এতদিনে নিশ্চয় বোলপুরে গেছে। তোমরা খুব ব্যস্ত আছ বোধ হয়। খুব বেড়াতে যাচ্চ কি? জগন্নাথ মনীষাদের হাত দিয়ে তোমাদের কাপড় চোপড় ফলমূলমিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।

আজ খাওয়াটা বড় গুরুতর হয়েছে। তোমার মা কোনোমতেই ছাড়লেন না— অনেকদিন পরে পীড়াপীড়ি করে মাছের ঝোল খাইয়ে দিলেন। মুখে কিন্তু তার স্বাদ আদবে ভাল লাগ্‌লনা। একটি ঠিকা ব্রাহ্মণ প্রত্যহ একটাকা বেতন দিয়ে সঙ্গে এনেছি। অল্প দিন থাক্‌ব তাই এত মাইনে দিয়ে আন্‌তে হল। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে বিপিনের হাতের রান্না কি বলে খাই বল!

রথীর পড়ার যাতে কিছুমাত্র অনিয়ম না হয় সেইটে তোমাকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। এইখানে × × পূর্ব্বক বিদায় হই।

তোমার রবি

৩৫

[কালিগ্রাম। ১৯০২]

ওঁ

ভাই ছুটি

পথে অনেক বিঘ্ন কাটিয়ে আজ এখানে এসে পৌঁচেছি। প্রথমে ত দিন দুয়েক উল্টো বাতাস বইতে লাগ্‌ল— তাতে বোটের পক্ষে নড়া-চড়া অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। মৃদু মন্থরগমনে চল্‌তে চল্‌তে বিলের মধ্যে পড়া গেল। জান ত বিল সমুদ্র-বিশেষ— চারিদিকে জল থৈ থৈ করচে মাঝে মাঝে ডোবা ধানের মাথা ভেসে আছে— মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম এক একটা ছোট দ্বীপের মত জলের উপর জেগে রয়েছে— গোরুগুলোর চরবার জায়গা নেই— মানুষগুলোর নড়বার স্থান নেই— ডোঙায় করে ডিঙিতে করে এগ্রামে ওগ্রামে যাতায়াত— তোমরা বোলপুরের মত জায়গায় থেকে এ রকম দৃশ্য কল্পনাই করতে পারবে না। চারিদিকে শেওলা কল্‌মীর দাম ভাস্‌চে— মাঝে মাঝে পদ্ম ও নাল— সেই সমস্ত মিশে এক রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্চে—জলে কালো কালো পানকৌড়ি— মাথার উপর মেছো চিল উড়ে বেড়াচ্চে। সন্ধ্যার সময় চারি দিকে যখন অকূল স্থির জল ধূ ধূ করে মনের ভিতরটা একরকম উদাস হয়ে যায়। সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের বৈচিত্র্য এবং জলের শব্দ আছে— এখানে তাও নেই —চারিদিক নিস্তব্ধ শূন্য ছবি— তারি মাঝখানে কেবল পালে

বোট চলবার কুল্‌কুল্‌ শব্দ। এরি উপরে যখন ক্ষীণ জ্যোৎস্না এসে পড়ে তখন মনে হয় যেন কোন্‌ একটা জনহীন মৃত্যুলোকের মধ্যে আছি। আমি বাতি নিবিয়ে দিয়ে জানলার কাছে কেদারা টেনে নিয়ে জ্যোৎস্নায় চুপচাপ্‌ করে বসে থাকি— এই বিশাল জলরাশির সমস্ত শান্তি আমার হৃদয়ের উপর আবিষ্ট হয়ে আসে। পর্শুদিন এই বিলের মধ্যে হঠাৎ পশ্চিমে ঘন মেঘ করে একটা ঝড় এসে পড়ল— বোটটা ভাগ্যক্রমে তখন একটা ধানের ক্ষেতের মধ্যে ছিল তাই তাড়াতাড়ি নোঙর ফেলে কোনমতে জলের তলার মাটি আঁকড়ে রইল। ঝড় ছেড়ে গেলে বোট ছেড়ে দিলুম— কিন্তু অদৃষ্ট এমনি খানিকটা গিয়েই আবার হঠাৎ ঝড়— সেবারেও দৈবক্রমে সুবিধার জায়গায় ছিলুম। নইলে বোট বাতাসে কোথায় ঠেলে নিয়ে ফেল্‌ত তার ঠিকানা নেই। এখানে এসেই খবর পেলুম আস্‌চে সোমবারেই আমাকে হাইকোর্টে হাজ্‌রি দিতে যেতে হবে— সুতরাং কালই আমাকে ছাড়তে হবে। কলকাতার শত সহস্র গোলমালের মধ্যে তোমাকে চিঠিপত্র লেখবার অবসর পাওয়া শক্ত তাই আজ এখানে বসেই তোমাকে লিখ্‌চি। এ ক'দিন জলের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে নিঃশব্দে বাস করে আমার শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। আমি বুঝেছি আমার হতভাগা ভাঙা শরীরটা শোধরাতে গেলে একলা জলের উপর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই। লিখ্‌তে লিখ্‌তে আবার একটা ঝড় এসে পড়ল— তপ্‌সী

নোঙর টানাটানি করে ভারি গোল বাধিয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে বোধ হয় তোমাদের খবর পাওয়া যাবে।

তোমার রবি

[শিলাইদহ। ১৯০২]

ওঁ

ভাই ছুটি

শিলাইদহে এসে মনটা কেমন ব্যাকুল হয়। যাকে ছেড়ে যেতে হবে তাকেই বেশি সুন্দর দেখায় এই আমাদের মোহ। শিলাইদহের সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ দুয়েরই স্মৃতি জড়িত— কিন্তু সুখটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। অথচ শিলাইদহ এখন তেমন ভাল অবস্থায় নেই। শিশিরে সমস্ত ভিজে রয়েছে, বেলা আটটা পর্য্যন্ত কুয়াশা, সন্ধ্যার পরে হিম— কুয়ো এবং পুকুর দুয়েরই জল যাচ্ছেতাই— চারদিকেই ম্যালেরিয়ার ধূম— আমরা ঠিক ['সময়ে'] শিলাইদহ ত্যাগ করেছি—নইলে ছেলেদের নিয়ে ব্যামো হয়ে বিপদে পড়তুম। বোলপুর এর চেয়ে ঢের বেশি নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু গোলাপ যে কত ফুট্‌চে তার সংখ্যা নেই। খুব বড় বড় ভাল ভাল গোলাপ। বাবলা ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। পুরাতন বন্ধু শিলাইদহ এই চিঠির সঙ্গে তোমাকে তার কয়েকটা বাব্‌লা পাঠাচ্ছে।

এখান থেকে মুগ কলাই গুড় বইয়ের বাক্স যা যা পাঠিয়েছে পেয়েছ ত ? মুগ কলাই প্রভৃতি সমস্ত স্কুলের জন্য। ছোলা হলে ছোলা পাঠাবে।

রথীকে আমি উচ্চতর জীবনের জন্য আমি প্রস্তুত করতে চাই— সুতরাং নিয়ম সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধন করতেই হবে— যতই দৃঢ়তার সঙ্গে লেশমাত্র লঙ্ঘন না করে সে নিজের ব্রত সাধন করবে ততই সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌বে। আমরা ত বাল্যকাল থেকে কেবল নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার দিকেই মন দিয়েছি— তার ফল হয়েছে বড় ideaর চেয়ে, পরমার্থের চেয়ে, মনুষ্যত্বের চেয়ে, এমন কি প্রেম এবং মঙ্গলের চেয়েও আমাদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাগুলোকেই আমরা বড় দেখি—কোনমতেই কারো জন্যেই কিছুর জন্যেই তাকে অল্পমাত্রও পরাস্ত হতে দিতে পারি নে— কাজের ক্ষতি করে ব্রত নষ্ট করে প্রিয়জনদের মনে গুরুতর আঘাত দিয়েও আমাদের অতি তুচ্ছ ইচ্ছাগুলোকে লেশমাত্র খর্ব্ব করতে পারিনে। নিজের ইচ্ছাকেই এইরূপ জয়ী হতে দেওয়া এটা বস্তুত নিজেকেই পরাস্ত করা, নিজের উচ্চতন মনুষ্যত্বকে নিজের দীনতার কাছে বলি দান দেওয়া—এতে যথার্থ সুখ নেই কেবল গর্ব্বমাত্র আছে। আমাদের যা হয়েছে বোধ হয় তার আর প্রতিকার নেই—এখন ছেলেদের নিজের হাত থেকে মঙ্গলের হাতে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চাই— তিনি এদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, ইচ্ছার তেজ, প্রবৃত্তির বেগ, দর্পের আকর্ষণ অপহরণ করে মঙ্গলের ভাবে এবং সুকঠিন বীর্য্যে

ভূষিত করে তুলুন্। এই আমার কামনা—আমরা আমাদের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছাকে কঠিনভাবে সংযত করে ঈশ্বরের নিগূঢ় ধর্ম্মনিয়মের যেন সহায়তা করি—পদেপদেই যেন তাকে প্রতিহত করে আপনার অভিমানকেই অহোরাত্রি জয়ী করবার চেষ্টা না করি। এতেও যদি নিষ্ফল হই তবে আমার সমস্ত জীবন নিষ্ফল হল বলে জান্‌ব।× ×

রবি

কবিজায়া মৃণালিনী দেবী -কর্তৃক লিখিত

১

[শিলাইদা]

তোমাদের ছবি পেয়েছি। তোমারটা খুব ভাল হয়েছে তোমার যত ছবি আছে সবচেয়ে এইটে ভাল হয়েছে। খোকারটা তোমার মতন ওত ভাল ওঠেনি একটু সাদা হয়ে গেছে। তোমার মতন বড় করে আর চুলটা ভাল করে আঁচড়ে নেয়া হলে বেশ হোত।

[শিলাইদা]

বাবুর্চি না পাঠালে আর চলে না। তাকে পত্রপাঠ পাঠিও। কাল সাহেব আর না পেরে একটা পাঁঠা আনতে বলেছিল, নীতু পাখী শিকার করার জন্য অস্থির আমি থামিয়ে রেখেছি। সত্যি খাওয়া দাওয়া অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে একে রোজ মুর্‌গী তাতে নেহালের হাতের। সেই সঙ্গে সস্‌ ডেনিল ইত্যাদি বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করে যা যা দরকার পাঠিও। এখানে রাই ছাড়া আর কিছু নেই। পুডিং রোজ খাওয়া যায় না দু-একটা বোতলের ফল দাও তো বেশ হয়। লাহোরিণীর চাকরটাকেও সেই সঙ্গে পাঠিও পুটের অসুখ করেছে এবার আমাকে রীতিমত বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু তাকে সেই গুল কড়ার করিয়ে পাঠিও।

১-২ সংখ্যক পত্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত। বালিকা মাধুরীলতার পত্রে ধৃত।

৩

[১৯০২ ?]

ওঁ

বেলা

এতদিন পরে কাল তোমাকে কুলের আচার পাঠাতে পেরেছি। সুরেন বাড়ি ফিরে গেছে, তার কি এখন বেশীদিন থাকবার যো আছে। তার শাশুড়ি বলে দিয়েছেন রোজ তাঁদের বাড়ি যেতে। সুরেনের বৌয়ের ডাক নাম হচ্ছে "সতী", তোলা নাম "শতদল"। এবারে এনট্রেন্স পরীক্ষা দিয়েছে এখনও জানা যায় নি পাস হয়েছে কি না। মেয়েটি ধীর, শান্ত, ভাল মানুষ ও বুদ্ধিমতী। দেখতে খুব সুন্দরী নয় মাঝামাঝি। আমাদের বেয়ানটি হবে ভাল, বেশী বয়স নয় তা ছাড়া ভাল মানুষ এবং বেশ ধার্ম্মিক। বেয়ানকে আগেই জানতুম, W. C. বাঁড়ুয্যের ভাগ্নী। সুরেনের বিয়েতে যদি আমরা যাই তাহলে তোমাকে আনাবার ইচ্ছে আছে, যদি তোমাদের না আপত্তি থাকে। নঠাকুরঝি এখনও এখানে আছেন দুচার দিনের মধ্যে যাবেন। রাণীকে তিনি লিখতে ও বাজাতে শেখাচ্ছেন। তোমার ভাশুরের অন্যত্র থাকা কি ঠিক হোল ? আজ উনি খাবার পর হঠাৎ বলে উঠলেন যে "চল তোমাতে আমাতে বেলাদের একবার দেখে আসি।" ইস্কুল নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন, নিজেই পড়াতে আরম্ভ করেছেন। রথীর জন্যে একটা ভাল ঘোড়া কিনেছি, সে তাতে চড়তে বড় সাহস করে না। মিস্ পারসেন আমাদের

কাছে কাজের জন্যে ফের উমেদারী করছে কিন্তু আমাদের স্থানাভাব তানইলে রাখা যেত। তোমাকে যে টেবিল ঢাকা দিয়েছে আমি ভুলে রেখে এসেছি, তবু তুমি একটু তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখ।

৪

[মে ১৮৯৩]

ওঁ

বাবা মহাশয়—

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনাদের যদি আসা মত হয় তা হলে আষাঢ় মাস থেকে এখানে আসবেন—এ মাসটা সেইখানেই থাকবেন। আমরা সব ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখবেন। বাবামহাশয়ের জন্যে কচু আর নেবু যদি পারেন তাহলে পাঠিয়ে দেবেন। দিদিমাকে বলবেন যে রবিবার দিন অরুর একটী মেয়ে হয়েছে তারা সকলে ভাল আছে। আর তাঁকে বলবেন যে এখানে আসতে তিনি ওখানে থাকলে সেরে উঠতে পারবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন।

মৃণালিনী

৫

ওঁ

বাবা মহাশয়,

নগেন্দ্রর চিঠি পেয়েছি। আমাদের এখানে আজ তিন চারদিন থেকে দিনরাত ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের ওখানেও কি বিষ্টি হচ্ছে? আমরা সকলে ভাল আছি। আপনারা কেমন আছেন লিখবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

মৃণালিনী

পুঃ এর মধ্যে যদি কোন লোক আসে তো তার সঙ্গে কচু ও কলম্বানেবু পাঠিয়ে দেবেন কিংবা ডাকে পাঠিয়ে দেবেন— অনেক দিন থেকে বাবামহাশয় কচুর কথা বলেছেন। দিদিমার জন্যে একটা চিঠি দিলুম তাঁকে পড়ে শুনিও।

ওঁ

বাবামহাশয়—

আপনার চিঠি পেলুম। আতু দিদির অবস্থা শুনে বড় দুঃখিত হলুম— তিনি কেমন আছেন লিখবেন— তিনি মরবার আগে তাঁকে একবার দেখতে পেলুম না— সেইটে ভারি দুঃখের বিষয়— আপনার যতটা সাধ্য তাঁর সেবা করবেন— তিনি আপনাদের অনেক করেছেন— আমরা সব ভাল আছি— আতুদিদিমাকে আমার প্রণাম জানাবেন।

মৃণালিনী

৪-৬ সংখ্যক পত্র মৃণালিনী দেবীর পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরীকে লিখিত

সত্য

আগেকার যে পঞ্চাশটাকা আমার নামে সরকারীতে হাওলাত আছে আর সে দিন যে চল্লিশটাকা নিয়েছি এই নব্বুই টাকা এ মাসে কেটে নিওনা। আগামী মাসে কেটে নিও। এমাসে কেটে নিলে আমার খরচ চলা অসম্ভব।

মৃণালিনী

মাসকাবারী কবে বেরোবে? আমার টাকাটা আজকেই দিতে বলে দিও— আমার কাছে মোটে টাকা নেই।

কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

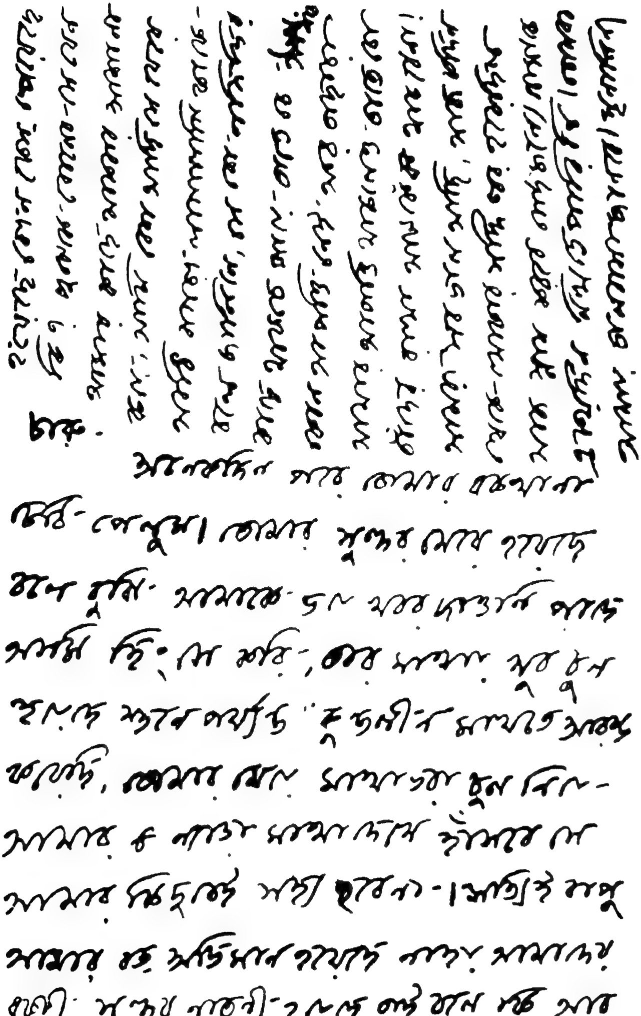

৮

[১৮৯৮]

ওঁ

চারু

অনেকদিন পরে তোমার একখানা চিঠি পেলুম। তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি পাছে আমি হিংসে করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্য্যন্ত “কুন্তলীন” মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথা ভরা চুল নিয়ে— আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাঁসবে সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যিই বাপু আমার বড় অভিমান হয়েছে নাহয় আমাদের একটি সুন্দর নাতনী হয়েছে তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়, তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখছি আমার একচোট্ ঝগড়া করতে হবে, রমার সঙ্গে আমার ভাব আছে সেইজন্যে রমার চেয়ে তাকে কেউ সুন্দর বল্লে আমার ভাল লাগে না,— নিশ্চয়ই রমারও সেজন্য মনে মনে একটু রাগ হয়। যাই হোক্ বাপু লোকে বলছে এই মেয়েই সুন্দর হয়েছে রমার আর আমার মত তা নয়, এখন তোমার কি মনে হয় তা লিখো। রমা তার বোনকে নিয়ে কি করে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করে সে কি সারাদিনই তাকে নিয়ে থাকে? তোমার চিঠিতে কোন খবর পাবার যো নেই— এবারে লিখো— রমা কি করে কি বলে কেমন আছে সব লিখো— আর ছোট মেয়েটির কথাও সব লিখো— যদিও তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করেছি তবুও সে কি

করে, কেমন হয়েছে, কি রকম আছে, দুষ্টু কি শান্ত সব লিখো, তাকে আমি অনেক দিন দেখতে পাব না বলেই তো তার সঙ্গে ঝগড়া করছি। সেজ বউরা কেমন আছে তাদের কোন খবর জানিনে যদি খবর পেয়ে থাকো তো লিখো। শুনছি নরুরা শীগ্‌গির কাশী যাবে— তোমার দেখছি তাহলে বড় একলা মনে হবে বাড়ীর মধ্যে তাহলে তুমি আর নদিদি, সেজদিদিরা তো আলাদা মহলেই থাকেন। তোমার বোন্ তরু এসেছিল কি? তোমার কাছে এখন কে দাসী আছে? প্রসবের সময় কষ্ট পাওনি তো? এখন কী রকম আছ? তোমাদের প্রত্যেক খবর দিও— তুমি জাননা আমার কতটা জানতে ইচ্ছে করে। তুমি যে দই খেতে চেয়েছ সেটী তো এখন হবে না—তুমি দই খাবে আর আমার নাতনীটী কাশতে আরম্ভ করবে, সে হবে না। যখন সে দুধ খাবে না তখন বোলো অনেক দই পাঠিয়ে দেব, উনি বলছিলেন "তা পাঠিয়ে দাওনা—সুধী খেতে পারবে" আমার বাপু সে পছন্দ হোল না, ছেলে খাবে বউ খাবে না— সে কি হয়। বিশেষতঃ তুমিই আমাদের লক্ষ্মী বউ— সব বউদের মুখ উজ্জ্বল করেছ, আজকাল তোমার ছাড়া আর তো কারো সুন্দর ছেলে মেয়ে হয় না। একটি কাজ কোরো ভুলো না— সত্যকে বলে রেখো যখন কেউ লোক আসবে কিংবা যদি নতুন ঠাকুর আসেন তোমাকে বলে যেন— তুমি রমা রাণীর আর খুকুমণীর দুজনকার দুটো গায়ের মাপ অবিশ্যি করে পাঠিয়ে দিও, খুকীর [উপরের] দিকে খোলা হবে কি বন্ধ হবে তাও বলে

দিও। কি এককাজ কোরো যদি বালিগঞ্জের দরজি যায় তার কাছে দিও, বোলো যে আমার দরজি যেদিন আসবে তার কাছে দিতে, কিন্তু ছোট কি বড় কিছু যদি বদলাবার থাকে আমাকে লিখে দিও। রমার মল কি তৈয়েরী হয়েছে? যদি তৈয়েরী হয়ে থাকে কত মজুরী লাগল— বোলো পাঠিয়ে দেব আমি তখন তাড়াতাড়িতে দিতে পারিনি, যদি না হয়ে থাকে তো তাড়া দিয়ে করিয়ে দিও। সুধীর কি খবর? হাইকোর্টে যায়? এখন কি তার প্রাকটিস্ করবার সময় হয়েছে কোন কেস্ পেয়েছে কি? পুটেকে বোলো সে যেন আমার কাছে থাকবার আশা না করে, আমি বেশ আছি সে যেয়ে অবধি ঝগড়া লাগালাগি কাকে বলে জানিনে, সে তো নদিদির কাছে থাকতে পারে তাতে তো আমার কোন আপত্তি নেই আর তা ছাড়া আমার আপত্তি থাকলেও তাতে তো তাঁদের রাখা আটকে থাকবে না। আমরা সব ভাল আছি, আজ কদিন থেকে খোকার সর্দ্দি জ্বর হয়েছিল আজ স্নান করবে সেইজন্যে তোমাকে এ ক'দিন লিখতে পারিনি। তোমরা আমার ভালবাসা জানবে।

মৃণালিনী

[১৮৯৮]

ওঁ

চারু,

তোমার চিঠি ও রমার কাপড় পেয়েছি। কিন্তু এ কয়দিন গোলমালে উত্তর দেওয়া হয়নি, কাল বলু যাচ্ছে এখন সন্ধে হয়েছে তাড়াতাড়ি এইটুকু লিখছি। রমারাণীর কাপড় পেলুম আর আমার ভাগ্যদোষে এই সময়েই দরজি অসুখ করে বাড়ী গেছে আর একটা দরজি পাঠাতে বলেছি দেখি কি হয়, আমার ইচ্ছে করে রমারাণী আমার কাপড় পরে বলবে দিদিমা দিয়েছে সেইটে বড় শুনতে ইচ্ছে হয়। তার জন্যে একটা লাল ঝাপলা দিলুম তাকে এইটে পরলে বেশ টুকটুকে দেখাবে সেই মনে করলে আমার খুব আনন্দ হয়। ছোটরাণীর জন্যে তাঁর পূজনীয় ছোটকাকামহাশয় তাঁর নিজের দুটি কাপড় পাঠালেন। আমি তার জন্যে কিছু পাঠাতে পারলুম না বলে বড় দুঃখু হচ্ছে দরজিটা এলে বাঁচি। তোমার জন্যে দুখানা আমশত্ত পাঠালুম দুধ দিয়ে খেও এতে কোন অসুখ করবে না। আর এক রকম চাল পাঠালুম এর একদিন দুধে দিয়ে পরমান্ন করে খেও বেশ হয়—সেরখানেক দুধে দু-চামচ তিন চামচ দিলে ঠিক হবে আগে জল দিয়ে সিদ্ধ করতে বোলো সেই সময়ে খুব নাড়ে যেন। আজ আসি। বড় ও ছোট রাণীকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবে। আমশত্ত দুখানা রোদ্দুরে দিও।

৮-৯ সংখ্যক পত্র কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী চারুবালা দেবীকে লিখিত

১০

[শান্তিনিকেতন। ১৮৯০]

ওঁ

সুকুমার

সন্দেশ, মোররব্বা, বাতাসা পেয়েছি, বাতাসা দেখে আমরা সকলে অবাক্ হয়েছি, এত বড় বাতাসা কখন দেখিনি। সন্দেশ আমাদের বেশ লাগল, মোরব্বা নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে। আমাদের এখানে খাবার বন্দবস্ত তো জানই মাছ মাংস খাবার যো নেই এ রকম অবস্থায় এ রকম সব উপহার পেলে কি রকম খুসী হবার কথা সে বলা বাহুল্য। সুশীলা, সুধী, কৃতী, দিনু, নলিনী এখানে আছে, আমাদের দলটি বেশ জমেছে। আমরা মনে করছিলুম যে তুমি হয়ত এদিক্ দিয়ে একবার হয়ে যেতে পার। আমরা তোমাকে চিঠি লিখব মনে করছিলুম তোমার ওখানে যাবার জন্যে, কিন্তু শেষকালে দেখলুম ছেলেদের রেখে যেতে সুবিধে নেই।

মৃণালিনী

কবির ভাগিনেয়ী সুপ্রভা দেবীর স্বামী সুকুমার হালদারকে লিখিত

সংযোজন

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
পত্রাবলী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত

ওঁ

কাকী মা

এবার ত তাহলে তোমাদের মেলা চুকে গেল। কিন্তু আমরা এখনও চোকাতে পারলুম না। কথা ছিল শুধু একটি সাবালক ডেপুটি আসবেন, কিন্তু অদৃষ্টগুণে রবিকাকা যাকে আসতে বলেন তারই একটি করে 'আধখানা' এবং গুটি দুই তিন 'গুঁড়ো' জুটে যায়। শুনচি, ডেপুটি সাহেব পূর্ণাঙ্গে এবং কাচ্ছা বাচ্ছা সমেত আমাদের এখানে এসে উদিত হবেন। ইতিপূর্ব্বে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একবার আমদানি হয়েছিল তার বৃত্তান্ত অবগত আছ, এবারে ডেপুটি কাহিনী শুন্‌তে পাচ্ছ। কাকীমার আসা উচিত ছিল। দেখ দিকি তারা এসে যখন তোমাকে খুঁজবে তখন আমরা কি জবাব দেব। প্রজ্ঞা অভিদের আজ থেকে মুখস্ত করান হচ্ছে ডেপুটিনীকে কি বলবে কইবে। প্রথম প্রশ্ন, তোমার নাম কি গা? তা'পর স্বামীর নাম কি? এর উত্তর শুনবে দিনের উল্টো— সে বেচারী ত নাম ধরতে পারবে না। তৃতীয় প্রশ্ন, তাঁর বেতন কত? তা'পর চতুর্থ পঞ্চম, আহা উহু ওমা ঘরের লোক ইত্যাদি যেমন দরকার হবে তাই বুঝে। এই ত ব্যাপার। কেবল তুমি নেই বলে বড় জম্‌ছে না। প্রতিবারে কাকীমা লোকজনের ভার পরের কাঁধে চাপিয়ে তা'পরে খালি ছাঁকা খবরের আরামটা উপভোগ করা বড় অন্যায় কিন্তু। ডেপুটি যখন বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করবে তখন ডেপুটিনী কি উত্তর দেবে বেচারা?

এদিকে এই, ওদিকে কলকাতা থেকেও নানা কথা শুনতে

হচ্ছে। রবিকাকা কারও কাছ থেকে তাড়া খেয়ে কৈফিয়ৎ লিখছেন। সাধনা সম্পাদক অধম আমার প্রতি লেগেছেন— কিন্তু আমি বিশ্বস্তসূত্রে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনলুম তাতে অনেকটা ঠাণ্ডা আছি। এইবেলা দিন থাকতে কাকামা একটা কিছু বিহিত বিধান কর। যদিও মধ্যম-নারায়ণের দরকার হয় তা' লিখলেই হবে— এখানে একজন বেশ ভাল কবিরাজ আছে। নীদ্দা যে সত্ পরামর্শ দিয়েছিলেন তা শুনলুম। হাজার হোক্ জ্যেষ্ঠ কিনা— আঁচে বুঝে নিয়েছিলেন বোধ হয়। তাঁর উপদেশ মেনে চল্লে সম্পাদক মশায়ের এ দুর্দ্দৈব ঘট্‌তো না।

মাঝে থেকে যশ আর জ্ঞান দুই ভাই তাড়া খেয়ে এল। জ্ঞানচন্দ্র ত খুব রসিকতা করেছিলেন, তাড়ার বেশি যে খান নি এই ভাগ্যি। বেচারা যশকে দোষ দেওয়া যায় না। ওর কি মাথার ঠিক ছিল? ড্রপসিন ফেলে লোকের হাত ভেঙ্গে দেবে তাতে আর আশ্চর্য্যি কি। নীদ্দার কাজ নিদ্দারই পোষায়— তাঁর হাত পেকে এলো। ছেলেমানুষদের দিয়ে ওসব করা কেন?

কলকাতায় শুনছি কাকীমা গরম পড়েছে। এখানে কাল থেকে আবার শীত পড়েছে। আমরা গরম পড়লে বেঁচে যাই— সবাই হাঁ করে আছি। আজকাল দুপুর বেলায় খুব হাওয়া দেয়—আর নদী তোলপাড় করে। কিন্তু এমনি বালি ওড়ে যে নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না।

একটা নতুন খবর দিয়ে রাখি শোন। রবিকাকা সেদিন হঠাৎ টের পেলেন যে, তিনি পার্লামেন্টের সম্পাদক ছিলেন। খবরটা আগে জানতে?

আজ কি বৌঠানরা আসছেন ? রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার কি করছেন। বেলির মধ্যে মধ্যে বড় বড় চিঠি আসে শুনতে পাই।

ডেপুটিরা চলে গেলে এখানকার বিস্তারিত বিবরণ পাবে কাকীমা।

বলু

অভিজ্ঞা দেবী -লিখিত

১.

ওঁ

শিলাইদা

৪ঠা ফাল্গুন সোমবার

ভাই কাকী মা

মেয়েরা তোমাদের কাছে কেন যে তুষ্ট হয় তা বলতে পারি নে।

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। কিন্তু তুমি আমার নামে বড় বদনাম তুলে দিয়েছ যে তোমার আমি নিন্দে করি। আমি কখনও নিন্দে করতে পারি কাকীমা ? তোমার নিন্দে করি কি প্রশংসা করি সে কথা বোলতাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে। [আমি সাক্ষী হতে পারবো না] আমাকে এতটুকু বিশ্বাস হোলো না ? এত কি খারাপ যে নিন্দে ছাড়া থাকি নে ? চিঠিতে লিখলুমনা বলে মনটা··· । বড় মজার লোক··· এখানে আমাকে খুব অস্থির করে তোলেন আবার তার উপর তুমি লাগলে তো আমি পেরে উঠব না। আমি পাগল হয়ে যাব। [আগে থেকেই

অনেকটা]। তুমি ভাই আমার চিঠিটা কেবল বাজে কথা দিয়ে পুরিয়ে দিয়েছো। [সাধে !] সখি সমিতিতে কে কি সাজবে তা আমার শুনে কি দরকার বল। আমার তো এবারে সাজতে হবে না তাহলেই হোলো। আমি খুব বাঁচন বেঁচে গেছি। এই বয়সে এক্‌টিং করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। সুইদা বেচারার ভারি কষ্ট তিনি সবে ইনফ্লুয়েন্‌জা থেকে উঠেছেন। তাঁর কত ভার পড়েছে। একদিকে সাধনার ভার সখিসমিতির··· । তিন দিন খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে প্রম্‌ট করা ষ্টেজ ম্যানেজ করা ভয়ানক হয়ে উঠবে। বোধহয় তিনি পেরে উঠবেন না [খুব পারবেন] আমার তো বাপু ভারি মায়া করে। তুমি বোলতাকে লক্ষ্মী ছেলে বলেছ ! কে না বোলতাকে লক্ষ্মী ছেলে বলে— সকলেই বলে। তুমিও বল আমরাও বলি। বোলতা দুবেলা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যান্‌। তুমি আরবারে এসে যে চরের উপর পথ হারিয়েছিলে আমরাও তার উপর এখন বেড়াতে যাই। সেবারে তোমার সঙ্গে শশাংক ছিল। বোলতা বলেন তোমাকে নিয়ে তিনি অস্থির হোয়ে পড়েছিলেন। [অসাক্ষাতে নিন্দে নয় ?] তুমি যেখানে যেখানে কাটি পুঁতেছিল [সেখানটা] দেখলুম। সেই সব কাটির চিহ্ন [আর তোমার] জুতোর খুরের চিহ্ন দেখে রবিকাকা বলে উঠলেন আমার এই সব চিহ্ন দেখে বড় কান্না পাচ্ছে। আমি [বল্লুম] আর কেঁদনা আর কেঁদনা ছোলা ভাজা দেবো বলে অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলুম। তবে চুপ করেন। রবিকাকা আজ থেকে ঘি খেতে আরম্ভ করেছেন। বড় লক্ষ্মী। [না হয়ে করেন কি ? পারলে তো ?] কিছু পেড়াপীড়ি করতে হয় নি। যেমন শুনেছেন তোমার হুকুম অমনি

কিন্তু ধরেছেন। এখানকার নায়েব আমাদের বেল কাঁঠাল ইত্যাদি সব খাবার জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে। রবিকাকা সেগুল তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন। তার সঙ্গে কতকগুল পেয় [ারা] আর পাবদা মাছ সোদ্দার জন্য দেবেন। পাবদা মাছ আমার খুব ভাল লাগে। রোজ পাবদা মাছ আসছে। আজ তবে এই পর্য্যন্তই থাক। বেলা কেমন আছে লিখো। প্রণাম করে আসি তবে। ইতি—

তোমার স্নেহের অ

পত্রমধ্যে [ ] বন্ধনীবদ্ধ কথাগুলি 'বোল্‌তা' ওরফে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত মন্তব্য।

২.

ওঁ

মঙ্গলবার

কাকিমা ভাই,

এমনি করে কি মানুষকে চিঠি লিখতে হয়। একখানা কাগজ পাও নি? ছেড়া আধ খানা পাতে লিখেছ। আমাকে লিখলে আমি কিছু মনে করলুম না। আর একজনকে লিখলে বোধ হয় তোমার চিঠি পছন্দো করতো না রেগে ছিঁড়ে ফেলতো। আমরা বিদেশে আছি কাগজ কলমের অভাব হয়। তোমাদের কিসের অভাব বলো? মনে করলেই কাগজ কলম পেতে পার। এবারে সুইদাও আমাকে এক ছেঁড়া কাগজে চিঠি লিখেছেন। আমি তাঁর উপর এবার বড় রাগ করেছি।

তুমি ভাই রবিকাকাকে চিঠি লেখ না কেন বল দেখি। একদিন চিঠি না পেলে রবিকাকা ভেবে অস্থির হন। তোমাকে তিনি রোজ একখানা করে চিঠি লেখেন আর তুমি কিনা মনে পড়লে তবে লিখবে। বড় অন্যায়। বেচারা রবিকাকা সব সহ্য করে থাকেন। কাউকে কিছু বলেন না। আমার বাপু বড় মায়া করে। রোজ সন্ধ্যা বেলায় আমাদের কাছে কত দুঃখু করেন। কাকিমা তুমি অনায়াসে একখানা করে রোজ সকালে কিম্বা রাত্তিতে বসে চিঠি লিখতে পার। এ তো পাঁচ মিনিটের কাজ এটুকু সময়ও কি পাও না? তুমি লিখেছ "আমি এখন কাজের লোক হয়ে পড়েছি" একেই কি কাজের লোক বলে? এটাও একটা মস্ত কাজ তা তুমি জান? সকল কাজ ছেড়ে আগে তোমার একাজ করা উচিৎ। এটা তোমার কর্ত্তব্য কাজ। কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করতে নেই। রবিকাকা দুদিন উপরি উপরি তোমার চিঠি পেয়ে ভারি খুসীতে আছেন। তিনি খুসীতে আছেন দেখলে আমাদের বেশ মনটা খুসী হয়। খুসীর চোটে নাচ গান করেন। দেখতো কাকিমা এরকম শুনতে তোমার ভাল লাগে না? রবিকাকা বলেন আমি রোজ চিঠি লিখে মরি আর একজন লোক বিদেশে আছে কেমন আছে তার কেউ খবর নেন না। ভারত উদ্ধার করতে যান কিন্তু আমার দশা যে কি হচ্ছে তার দিকে একবার চেয়েও দেখেন না? সত্যি বলছি রবিকাকা যখন এইসব বলেন তখন তোমার উপর আমার ভারি রাগ হয়। তোমার ভাই একটুও দয়ামায়া নেই তা বলছি। যাকগে ওসব কথা। আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি নে। এবার থেকে কিন্তু রোজ রোজ রবিকাকাকে চিঠি লিখো।

কাকিমা, আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে না। বোলতার কথাই বিশ্বাস কর। কিন্তু আমি বাপু সত্যি কথা বলছি শোন। আমি বোলতাকে চিঠি দেখালুম, তিনি বল্লেন আমি এর মাঝে মাঝে টীকে করি দাও। আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলুম না। তবে একজন মানুষ নেহাৎ পেড়াপীড়ি করলে আর কি করি বল। লিখতে দিলুম, আর বল্লুম কিছু বানিয়ে লিখো না। তিনি বল্লেন তবে আর কি হল বেশ একটু মজা হবে সেই তো ভাল। কাকিমা কি লেখেন দেখা যাবে। বলে তিনি বানিয়ে লিখে দিলেন। আমি জানতুম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। বোলতার লেখাটুকু দেখেই বিশ্বাস করবে ভেবেই আমি তাঁকে লিখতে বারণ করেছিলুম। আমি সত্যি কথা বল্লেও আমার কথা বিশ্বাস হয় না। তা বাপু বিশ্বাস করবার দরকার নাই। আমার কপাল মন্দ তার আর কি করব বল। কেউ বিশ্বাস করেন না কেউ চিঠি লেখেন না ইত্যাদি।

বোলতার রুমাল রোজ ভিজে থাকে বটে। আমি জানতুম না যে তিনি কাঁদেন। তোমার চিঠিতে দেখলুম, এবার থেকে তাঁকে নানা কথা বলে, পাখী দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখবো। আজ তোমার চিঠিটা যখন বোলতাকে শোনাচ্ছিলাম তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি চোখদুটো জলে পুরে এসেছে। দেখে তাড়াতাড়ি চিঠিটা মুড়ে ফেল্লুম। রবিকাকার বাদাম ছাড়িয়ে দিতে হয়। এখন সময় হয়েছে, কাজ সেরে ঘুরে এসে আবার লিখতে বসবো।

ভাই কাজ কর্ম সারা হল সন্ধ্যেও হয়ে এল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

বোলতারা বেড়াতে যাবেন। আমি আজ বেড়াতে যাব না। কি করি একলা বসে তাই তোমাকে চিঠি লিখছি।

আমরা রোজ সন্ধ্যে বেলায় বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এসে বড় বোটে আড্ডা করি। কোন কোন দিন গান বাজনা হয়। কাকিমা ভাই তুমি এলে বেশ হোতো।

দু-তিন দিন হোলো ছোট বোটের সঙ্গে সমস্ত দিন আমাদের কোন সম্পর্ক থাকে না কেবল রাত্তিরে যা আমরা শুতে যাই। সে বেচারা একলা চরের ধারে পড়ে থাকে। বোলতাতে মেজদিতে ছোট বোটটা ভারি পছন্দ করেন। আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি বড় বোটটা বেশ পছন্দ করি। এখন মেজদিরা সারাদিন বড় বোটে থাকেন। পদে এসেছেন। এখন বলতে হয়েছে বড় বোটটা ভাল।

রবিকাকা বলছেন এখানে বেশ আছি কলকাতায় যাব না। বছরখানেক থাকলেও থাকতে পারি। আমরা গিয়ে তোমাদের কত বদল দেখবো। তোমরাও আমাদের অনেক বদল দেখবে।

সুইদার হাতে পড়ে এবারে সখি সমিতির আচ্ছা অবস্থা হয়েছিল। আচ্ছা ছেলেমানুষি কাণ্ড যাহোক। একজন বড় না থাকলে কি চলে। অন্যবারে রবিকাকা থাকতেন কোন গোলমাল হোতো না। সখি সমিতি কি রকম হলো সব লিখো। আমরা একখানা বিবাহ উৎসব পেয়েছি। রকিকাকা যেরকম করেন হাঁসতে হাঁসতে দম আটকে যাবার যোগাড় হয়। তুমি থাকলে কিছুতেই না হেঁসে থাকতে পারতে না।

আজকাল গরম পড়েছে। শীত এক পা দুই পা করে সরে

যাচ্ছেন। একেবারে গরম পড়লে বেশ হয় দরজা খুলে দিয়ে শোয়া যায়। চরের উপর চৌকি পেতে বসে গল্প সল্প করা যায়, বেশ লাগে। বোলতা আজ আবার আমার চিঠি পড়ে দু একটা কথা লিখতে চাইলেন, কিন্তু আজ আর আমার দিতে সাহস হলো না। সে কেবল তোমার জন্যই কাকিমা। আর ভাই লিখতে পারছিনে। এবারে খাবার দাবারের উপায় দেখি গে। আমারও মনটা সেই দিকেই ছুটছে। তবে ভাই আজ আসি। বেলারা কেমন আছে লিখো। প্রণাম ইতি

তোমার স্নেহের অভি

৩.

ওঁ

শিলাইদা
মঙ্গলবার

ভাই কাকিমা,

সকলের চিঠিতে কেন আমাকে দুষ্টু মেয়ে বলেছ? তোমার কাছে কি দুষ্টুমি করেছি বল? যদি কিছু করে থাকি তার জন্য মাফ চাচ্ছি বাপু।··· এরকম জানলে কখনও লিখতুম না। তুমি ভাই আমাকে এ পর্যন্ত দুষ্টু ছাড়া লক্ষ্মী বল্লে না। সকলেই তোমার কাছে লক্ষ্মী আমি বেচারা কি দোষ করলুম।··· নরু বৌঠানকে বলো আমি ভাল ভাল অনেক গান শিখেছি। নরু বৌঠান শুনে একেবারে গলে যাবেন। বোলতা আজকাল দিনরাত গান গাচ্ছেন। বেড়াতে খেতে শুতে বসতে। গান গাইতে গাইতে

দেখি তাঁর দুই চক্ষু জলে ভেসে যায়। আমরা জিগেস করলে কিছু বলেন না। আজও পর্য্যন্ত আমরা বোলতার মনের ভাব তো কিছু বুঝতে পারলুম না।··· কিন্তু আমার বড় কষ্ট হয়। কাকীমা আমি রবি কাকার কাছে অনেক গান শিখেছি।··· বাস্তবিক বলছি তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমি রবিকাকাকে প্রায় বলি কাকিমা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। রবিকাকা শুনে খুব খুসী হন।

রবিকাকা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন বলছি শোন। বল্লে তোমার বোধহয় কারোর উপর হিংসে হবে। ওসব কথা গোপন করে রাখা কিছু না। কি বল ভাই বলে ফেলাই ভালো। কর্ত্তা দাদামশায় বিয়ে দেবেন। রবিকাকা কিছুতেই বিয়ে করবেন না। কর্ত্তাদাদা-মশায় ছাড়বেন না। কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। যেমনি বিয়ে হবে অমনি রবিকাকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যাক্ তুমি বেঁচে গেলে। তোমাকে আর সতীনের ঘর করতে হল না।··· মাঝে মাঝে দুই একটা সতীন হলে তোমার বোধহয় ক্ষতি হবে না। মেয়েটি দেখতে শুনে [শুনতে] কিন্তু বেশ ছিল। তবু ভাই রবিকাকা তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারেন না। দেখতো তোমাকে কত ভালবাসেন।

তুমি রবিকাকাকে রোজ চিঠি লিখবে বলে লিখলে কৈ? রবিকাকা এ দুদিন তোমার চিঠি পান নি। আজ আবার কত দুঃখু করছিলেন। তুমি ভাই লিখেছিলে বলু কাঁদলে তাকে সান্ত্বনা দিস। আমি কত বুঝিয়ে বলি কিছুতেই বোঝেন না। আর কোনো খবর নেই। ইতি

স্নেহের অভি

ভাই কাকিমা,

আমরা আজ শিলাইদা এসে পৌঁছেছি। পদ্মার সঙ্গে অনেকক্ষণ খেলাধূলা করে তবে আসা গেছে। তুমি বোধ হয় পদ্মার সঙ্গে খেলা করাটা শুনে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এবিষয়ে বোলতার কাছ থেকে খবর নিতে পার। দুপুর বেলাটা এইরকম খেলাতেই কেটে গেল, তারপরে শিলাইদাতে এসে রবিকাকা কাছারিতে গেলেন আর আমরা ছোট বোটটা নিয়ে উল্টো পারে এসে তিনজন বেড়াতে গেলুম। তোমার বিষয় কত কথা হলো। খানিকটা বেড়িয়ে বাড়ী ফেরা গেল। বাড়ীতে এসেই একটা··· হল সেটা··· ভাই আমি তোমাকে চিঠিতে লিখতে পারবো না বাড়ীতে গিয়ে বলা যাবে। তুমি আমার চিঠি পেয়ে একটু আশ্চর্যি হয়ে যাবে— না? তুমি কখন মনেও করনি যে আমি আবার তোমাকে চিঠি লিখবো। নিশ্চয়ই বোধ হয় বল যে অভি যে কুঁড়ে সে আবার কাউকে চিঠি লিখবে। তোমাদের এই বিশ্বাসটা মন থেকে তাড়িয়ো না। তাড়ালে আমার পক্ষে কিছু অসুবিধে হ'তে পারে। যাক্‌গে ওসব কথা— এখন লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছি কি না বল। দু'তিন দিন হল আমি বিবিকে বোলতার চিঠির ভিতর একটু লিখেছিলুম। একটা বড় চিঠি পাব মনে করে বসে আছি তো কি হয় কি জানি যাঁদের কখন চিঠি লিখিনি তাদের প্রথমে চিঠি লিখতে বড় লজ্জা করে। সুইদাকে প্রথম চিঠি তখনও অনেক কষ্টে চোখনাক বুজে লেখা গিয়েছিল। সুইদা এখন কেমন

আছেন ? বেশ সেরে উঠেছেন তো ? নরু বৌঠান মুরাদাবাদ থেকে ফিরে এসেছেন ? আর কি লিখবো ভাই— দশটা বেজে গেছে সকলে শুতে গেছেন। আমিও তবে শুতে যাই। বাড়ির সকলে কেমন আছেন সব খবর লিখো। আজ তো আমরা মায়েদের কাছ থেকে একখানাও চিঠি পাই নি। তবে আর কি— সকলকে আমার প্রণাম দিও। বেলাকে আমার ভালবাসা দিও। আর তোমাকেও এইখানে প্রণাম করি। তবে আজ আসি ভাই। ইতি

তোমাদের স্নেহের অভি

নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত

ওঁ

সোমবার

কাকীমা,

অনেকদিন পরে আজ তোমার একখানা চিঠি পেয়ে কি পর্য্যন্ত যে খুসী হলুম তা বলতে পারি না— আমি অনেকদিন তোমাদের চিঠি লেখবার চেষ্টা করতুম কিন্তু কোন মতে পেরে উঠতুম না, লিখতে গেলে হাত কাঁপে, তার সাক্ষী এই লেখা দেখলেই বুঝতে পারবে। এখন আমার কোন অসুখ নেই, পায়ে ব্যথা সেরে গিয়েছে শুধু একটু জোর পেলেই হয়। লাঠি ধোরে একটু আধটু বেড়াতে পারি। তোমাদের ওখানে যাবার এখন কিছু ঠিক করি নি, রবিকাকার সঙ্গে যেতে পারি কিম্বা তার আগেও যেতে পারি কিন্তু আমি ভাবছি তোমাদের কোন অসুবিধা হবে কি না, আর কোন বিষয়

নয় ঘরেতে কি কুলবে ? একবার আমার সবাইকে দেখে আসবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তারপর চাই কি কাশী কি আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারি। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এ রকম আশা আমার মোটেই ছিল না যাহোক কোন রকম কোরে এ যাত্রা বোধ হয় পার পেয়ে গেলুম। রবিকাকা না এলে তো আর কোন কথাই ছিল না। তুমি, বেলা, রাণী আমাকে কিছুদিন আগে যে চিঠি লিখেছিলে তার একখানাও পড়তে পারি নি তখন অক্ষরগুলো কিছুই দেখতে পেতুম না— তবে মাঝে একদিন [কি একরকম] ঝোঁকে সেগুলো খোঁজ করেছিলুম। আর আমার এখানে এক দণ্ড থাকতে ইচ্ছে হোচ্ছে না। বড় পিসীমার বোধ হয় অসুবিধা হয়— এখন কোথায় যাই— সেইটে একবার ঠিক করতে পারলে হয়— তোমাদের ওখানে প্রথম যাব। তারপর কোথায় যাই ? শমী-বাবুকে দেখবার জন্যেও আমার মন বড়ই ব্যাকুল হোয়েচে, তার দুষ্টুমি কতটা এগিয়েচে ? c/o-র খবর কি ? জগদীশদা কি তাঁর ভাইপোর পদ পেয়েছেন ? আজ আর পারচিনা। জায়গাও নেই। ভরসা করি তোমাদের খবরাখবর দিতে দেরী করবে না।

নীতু

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত

১. ওঁ

বুধবার

শ্রীচরণেষু,

মা, তোমার চিঠি কাল পেলুম। নিতুদাদার কাছে প্রায়ই যাই। বোলপুর থেকে তেল, কদমা, খেলনা কিনে এনেছি। ওল পেলুম না। আজ সার্কাস দেখতে যাব। কাল বিসর্জ্জন হবে। কাল দেখতে যাব বলে আজ সেটা পড়ে রাখলুম। শুক্রবারে সব জিনিষ কিনতে যাব। শনিবারে বিবিদিদির জন্মদিন। বেলা যদি কিছু দেয় ও শীঘ্র পাঠিয়ে দিক্। নীদ্দার কাল রাত্তিরে ঘাম হয়ে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। আজ সকালে ১০০। অন্যদিন ১০১ হয়। প্রতাপবাবুই দেখছেন। আজ সুহৃৎকে দিয়ে examine করবার কথা ছিল। তিনি এখন আসেননি। সাহেব কাল যাবে। সুশী বোঠান চিঠি লেখেন্না কেন? তাঁর উকুন হয়েছে বলে বোধ হয় খুব ব্যস্ত থাকেন তাই লেখা হয় না। আমরা সব ভাল। তোমরা কেমন আছ লিখ? ইতি

রথী

২.

ওঁ

Monteagle Villa.
18 November 1896
Tuesday

মা

আমি ভাইফোঁটা পেয়েছি।···

বেলা তার সঙ্গে একটা চিঠি লিখেছে, আর তাতে লিখেছে যে যেদিন আমি কাপড় পাব তার পরের দিন খাবার পাঠাবে কিন্তু আমি ত পাই নি। তোমার চিঠি অনেকদিন পরেও পেলুম না। আমাদের কলকাতায় যেতে আর বেশী দেরী নেই— এই পাঁচদিন আছে। এখানে আজকাল বরফ পড়ে— ঠিক নুনের মত ছোট গুঁড়ি? আর খুব ঠাণ্ডা। তুমি বলেছিলে যে আমাকে ঘাসের মধ্যে একরকম ফুল পাওয়া যায় সেইগুল আমি আনতে চেয়েছিলুম ত প্রতিভাদিদি বল্লেন ওগুল রেলগাড়িতে আনতে গেলে সব ফুলের পাতাগুল উড়ে যাবে, তাই বলে এক রকম ঘাসের ফুল নিয়ে যাচ্ছি। আমি তবে এইখানেই শেষ করি।

ইতি

রথী

৩.

ওঁ

কলিকাতা

শুক্রবার

শ্রীচরণেষু

মা, কাল রাত্তিরে এখানে এসে পৌঁছিয়েছি। গাড়ি খালি ছিল নৈহাটি পর্যন্ত তারপরে একটা গোরা জুটেছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্যক্রমে সাহেবের বন্ধু ছিল। নীদ্দার কাশী কাল খুব কম ছিল। কর্ত্তাদাদামহাশয়ের কাছে গিয়েছিলুম। আজ বোলপুর যাচ্ছি। একটু মুস্কিল হবে যে পুল ১টা থেকে ৪টে পর্য্যন্ত খোলা থাকবে, ষ্টিমারে পার হতে হবে। ন মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১২টা টাকা যে দিয়েছিলে তার ১০ টাকা ১৫ আনা রেল ও ষ্টিমার খরচ হয়েছে। ১ টাকা ১ আনা বাকি আছে। বাড়ির সবাই ভাল আছেন। তোমরা কেমন আছ লিখ?

ইতি

রথী

পরিশিষ্ট ১

মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ

১. ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণ স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্ম্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।··· ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০, পৃ. ১০-১১

২.

···তোমার পত্রখানি পাইয়া আমার হৃদয় স্নিগ্ধ হইল। তুমি অল্পদিন এখানে থাকিয়াই তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছ। তাঁহার স্বভাব মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি তোমাকে আপন সন্তানের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। এখানকার বিদ্যালয়ে তুমি আসিবে এবং তাঁহার যত্ন শুশ্রূষার অধীনে থাকিবে ইহার জন্য তিনি ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার কাছে থাকিলে কখনো মাতার অভাব একমুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিতে পারিতে না ইহা নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেইশোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না— তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

তোমার কল্যাণ-কামনা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে— তুমি সকল বাধা বিপত্তি সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো ; স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের জন্য আপনার জীবনকে প্রস্তুত করিয়া তোল ইহাই আমি একান্ত চিত্তে কামনা করি। (১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)

সত্যরঞ্জন বসুকে লিখিত

দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', পৃ. ৮৭

৩.

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু,

ঈশ্বর আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন— এক্ষণে আমাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার দ্বারে আমার এই প্রার্থনা যে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটি ছাত্রের ব্যয়ভার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অধিক নহে, বৎসরে ১৮০ টাকা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যদি এই টাকাটি দেন তবে তাহা আমার পরলোকগতা পত্নীর মৃত্যুবার্ষিক মঙ্গলদান বলিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব এবং তাহাতে ঈশ্বর আপনারও কল্যাণ করিবেন।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে লিখিত

দ্র. সজনীকান্ত দাস, 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' (১৩৯৫), পৃ. ৯৩

৪.

ওঁ

১০ অগস্ট ১৯০৩

বন্ধু

আপনি বুঝি আমার পাঠিকাকেও খাটিয়ে নিচ্চেন ? তিনি যে দুটি নাম দিয়েছেন সে ঠিকই হয়েছে কিন্তু তাঁর নালিশ সম্বন্ধে আমার তরফে

দুটি একটি কথা বল্‌বার আছে। আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে— তার একটি প্রধান কারণ এই— যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকা-জন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাসে থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল— খুকীর চিত্ত তার কাছে এত সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে— খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ, সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী— তখন খুকী ছিল না— মাতৃ-শয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিল— সেই জন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্য্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত রঙে রঙিয়ে ওঠে— সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেল্‌চে— তাকে নিবারণ করতে পারিনে।·· ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩১০

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত
'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮, পৃ. ৪৬

৫.

ওঁ

(অগ্রহায়ণ ১৩০৯ ? । নভেম্বর ১৯০২ ?)

বন্ধুবরেষু

ঈশ্বর আমার শোককে নিষ্ফল করিবেন না। তিনি আমার পরম ক্ষতিকেও সার্থক করিবেন তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছি। তিনি আমাকে আমার শিক্ষালয়ের এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিলেন।···

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত
'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮, পৃ. ৪২

৬. ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

…বহুদিন পূর্ব্বে একদিন নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা ছিল প্রতিদিন তাঁকে একটা কিছু সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ খাওয়াব। মীরার মা ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যে— তিনি খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। কিন্তু নতুন খাদ্য উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি। সেই সকল অপূর্ব্ব ভোজ্যের বিবরণসহ তালিকা আমার স্ত্রীর খাতায় ছিল। সেই খাতা আমার বড় মেয়ের হাতে পড়ে। এখন তারা দুজনেই অন্তর্হিত। আমার একটা মহৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হ'ল। রূপকার রবীন্দ্রনাথের নাম টিকতেও পারে, সূপকার রবীন্দ্রনাথকে কেউ জানবে না।… ইতি ৫ নভেম্বর ১৯৩১

দাদা

হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯, পৃ. ১১২

৭. ওঁ

কল্যাণীয়াসু

…একদা পদ্মার চরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র কিছুকাল আমার অতিথি ছিলেন— প্রতিদিন তাঁর জন্যে নূতন একটা করে ভোজ্য আমি উদ্ভাবন করেছি— সেটা প্রস্তুত করবার ভার ছিল যাঁর পরে তাঁরও কিছু কৃতিত্ব তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এসব তিনি লিখে রেখেছিলেন খাতায়, সেই খাতা দখল করেছিল আমার বড়ো মেয়ে— সেও নেই, খাতাও অদৃশ্য—

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ খাদ্য নিরবধি, তার উপায় রইল না, অথচ রইল কতকগুলো কবিতা। ইতি ২২ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯, পৃ. ২১১

৮. ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সহিত আমার অনেকটা পরিচয় হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেইজন্য সঙ্কোচ পরিহারপূর্বক আপনার কাছে একটি ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইলাম। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কয়েকটি দরিদ্র বালককে বিনা বেতনে পড়াইয়া থাকি। তাহাদের ব্যয়ভার আমরা বান্ধবদের মধ্যে পরস্পর ভাগ করিয়া লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। একটি বালকের ভার আপনি যদি গ্রহণ করেন তবে উপকৃত হইব। হিসাব করিয়া দেখা গেছে প্রত্যেক বালকের খাইখরচের জন্য মাসে প্রায় ১৫৲ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ১৮০ টাকা লাগে। প্রতি বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে এই ১৮০ টাকা বার্ষিক দান পাইবার জন্য আমি সুহৃদগণের দ্বারে সমাগত। আপনাকে বলিতে সঙ্কোচ করিব না আমার পরলোকগত পত্নীর কল্যাণকামনার সঙ্গে আমি এই ভিক্ষাব্রত জড়িত করিয়াছি।

আর একটি কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমার বিদ্যালয়ের সঙ্গে আপনার যোগ আমি কামনা করি। আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইবে না। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত
'রবীন্দ্রভাবনা', এপ্রিল ১৯৮১, পৃ. ৬৫

পরিশিষ্ট ২

মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে
অমলা দাশের পত্র : ইন্দিরা দেবীকে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী অমলা দাশ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী ছিলেন তাঁহার প্রিয়সখী। সংগীতপ্রিয় অমলা দাশ তাঁহার সুকণ্ঠের জন্য কবির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আগ্রহের সহিত নিজের গান শিখাইয়াছিলেন; এই রকম অনেকগুলি গান তিনি রেকর্ডে গাহিয়া রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম মহিলা শিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা' (১৯৭২) গ্রন্থে ২১টি রেকর্ডের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

মৃণালিনী দেবীর সহিত অমলা দাশের সখীত্বের সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহার ভগিনী ঊর্মিলা দেবী তাঁহার 'কবিপ্রিয়া' স্মৃতিকথায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও তাহা বিধৃত আছে, পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬৮), সংকলিত ভাগিনেয়ী সাহানা দেবীর 'কবির সংস্পর্শে' হইতে তাহা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্‌ধৃত হইল:

'কবিপত্নীর সঙ্গেই ছিল মাসিমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তাঁকে কাকীমা বলে ডাকতেন। এই দুই সখীর একত্র অন্তরঙ্গ ভাবে গল্পালাপাদির একটি চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গানে, গানটি হচ্ছে—

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছে করে তোদের মতো মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোণে বসে কানাকানি,
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই।

এ গানটির কথা মাসিমার মুখেই শুনেছি, আর গানটিও তাঁকে অনেকবার গাইতে শুনেছি।'

১.

[* * মধুপুর। ২৩ নভ. ১৯০২]
শনিবার

ভাই বিবি,

আজ মামা এখানে এসেছিলেন তাঁর কাছে শুনলুম তুমি লিখেছ কাকীমার[১] অবস্থা খুব খারাপ। এতদূর থেকে খুঁটিনাটি ভাল খবরে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া বড় শক্ত। মনটা আজ এত খারাপ হয়েছে কি আর বলব। আমার চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার আগে কি হয়েছে ভগবান জানেন। আমি কাছে থেকে ২ দিনও কিছু করতে পারলুম না এ দুঃখ রাখ্‌বার স্থান নাই। সংসারে আমার বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। কাকীমার মত বন্ধু আমার আর নাই, আর হবার সম্ভাবনাও নাই। কোন রকমে মনে কষ্ট হ'লে, কোন অশান্তি হ'লে দৌড়ে যাবার স্থান আর দ্বিতীয় নাই। তুমি জান না বিবি, বাপ মায়ের সঙ্গে রাগ করে কতবার কতদিন কাকীমার কাছে গিয়ে থেকেছি। এমন সম্পূর্ণ শান্তিতে ও নিবিবাদে আর কারু সঙ্গে কখনও কাটাই নি। কাকীমার উপর যে আমার কতটা আব্দার ও জুলুম চলত কি আর বলব। হতে পারে আমি মিথ্যা অমঙ্গল চিন্তা করছি, ভগবান করুন তাই যেন হয়। দিন রাত বড় ব্যস্ত হ'য়ে থাকি। বেলা, রাণীর কাছে চিঠি লিখ্‌তে সাহস হয় না, তাই তোমার কাছে লিখ্‌ছি, যদি বিশেষ অসুবিধা না হয় ২ লাইন করে তুমি যদি লিখে দাও বড়ই উপকার হয়। আর বিশেষ কি লিখব আমরা সকলে এক রকম ভালই আছি। চিঠির উত্তর শিগগির দিয়ো। আজ তবে আসি। ইতি—

অমলা

---

[১] মৃণালিনী দেবী

২.

[*মধুপুর। ২৬ নভ. ১৯০২]

মধুপুর।
বুধবার।

ভাই বিবি,

তোমার চিঠি কাল পেয়েছি। যদিও যথেষ্ট প্রস্তুত ছিলুম তবু প্রথম ৩ লাইন পড়ে থম্‌কে রইলুম। যে দিন শেষ দেখে এলুম সে দিনই আমার অন্তরাত্মা ডেকে বলেছি জ্ঞান আর ফিরবে না, তোমাদেরও সে কথা অনেকবার বলেছি। সকলেই দেখ্‌ত, আমিও দেখতুম আমার কেন খারাপ লাগত জানিনে। যাক্‌, যা আশঙ্কা করে বুক কেঁপে উঠ্‌ত সেটা হ'য়ে গেছে। কাল তোমার চিঠি পাবার পর থেকে কি ভাবে দিন রাত কাটাচ্ছি ভগবান জানেন। আমার এ বেদনা বুঝবার লোক কেউ নেই যদি স্বর্গগত আত্মার আমাদের সঙ্গে কোন সংশ্রব থাকে যদি বোঝবার ক্ষমতা থাকে তা হলে তিনি বুঝবেন। শমী আমার বড় আদরের— কাকীমা বলতেন, “শমীর উপর তোমার অনেক দাবী আছে— বড় হ'লে তাকে বুঝিয়ে দেব।”

ইচ্ছে করছে দৌড়ে বেলা শমীদের কাছে যাই। ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে তাঁর অনেক স্নেহ ভালবাসা ভোগ করেছি, চোখের জলটাও ওদের সঙ্গে ফেলতে পারলে অনেক আরাম করত। বহুদিন তাঁর সঙ্গ ছেড়েছি, কত দুরে দুরে থেকেছি তবু মনে করতুম আমার একটা আশ্রয় আছে নির্ভর করবার লোক আছে। কথাটা বড় অস্বাভাবিক শোনায় আমি তাঁর কে?— কিন্তু তবু কি আশ্রয় ছিল কেমন করে বুঝিয়ে বলব। এবারে বোলপুরে গিয়ে আমাকে লিখেছিলেন ‘অমলা, আমার আশ্রম একবার দেখে যেয়ো।” আমি বলেছিলুম “দেখব বই কি, আপনার আশ্রমে আমার জন্য একটু স্থান রাখবেন কি? যদি কোন দিন অন্য কোন খানে স্থান না পাই, আপনার কাছে যাব।” তিনি লিখেছিলেন, “তুমি কখন বিশ্বাস কর আমার কাছে

তোমার স্থান হবে না ?" চিরকাল ভাবতুম.বাপ মায়ের অভাবে যদি অন্ত কোথাও আশ্রয় না পাই, আপনা ভাইও যদি স্থান না দেয় একমাত্র আশ্রয় আমার আছে যেখানে গেলে ফিরব না। এমনই নির্ভর। বিবি, আমার সে মহাআশ্রয় ভেঙ্গে গেছে। কোনও কারণে কোন অশান্তি মনে এলে, কোন কষ্ট পেলে, দৌড়ে কাকীমার কাছে যেতে ইচ্ছে করত, যে সময় তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি সে সব দিনের কথা মনে হ'ত। তাঁর কাছে যাওয়া দূরে থাক্— একখানা চিঠি লিখে কত সান্ত্বনা পেতুম। এখন আর কারু কাছে যাবার নেই। জোড়াসাঁকোর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচল। আমার গাড়ির শব্দ শুনে কে আর সিঁড়ির কাছে হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়াবেন। তিনি এসেছেন খবর পেয়ে সেই দিনই না গেলে কি অভিমানই করতেন, আমি যে এবার তাকে কি অবস্থায় ফেলে এলুম জানতে পারলে কত অভিমান করতেন। মাঘ মাস আসছে, ১১ই মাঘের সব আমোদ-আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে। সেবার কাকীমাকে ১১ই মাঘে আনেন নি বলে রবিকাকার উপর ভয়ানক [রাগ] করেছিলুম বল্লুম এমন জানলে আমি গান করতে[১] রাজি হতুম না। বিবি, এবার রাগ করেও ১১ই মাঘে আনতে পারব না। মনে যা আসছে পাগলের মত বকে যাচ্ছি। কিন্তু যখন ভাবি আমার কি তুচ্ছ কষ্ট— দশ দিনে নয় দশ বছরে ভুলে যাব— বেলা শমী ওদের যে অভাব হ'ল তা কি কোন দিন ঘুচবে ? ওদের কথা ভাবলে নিজের কষ্ট অতি সামান্য মনে হয়। রবিকাকার কথা ভাবতেই পারি নে ; কি সুখের সংসার যে ভেঙ্গেছে। অনেকে ভাবত রবিকাকার বড় দুর্ভাগ্য এমন অযোগ্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হয়। তিনি যে কি ছিলেন খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে কারু জানবার সম্ভাবনা ছিল না। রবিকাকা কি রকম স্ত্রী পেয়েছিলেন, এতদিন তো অনেক বুঝেছেন এখন আরও পদে পদে বুঝবেন। যাদের কোন কায নেই জীবনের কোন উদ্দেশ্য

---

[১] দ্র. পত্রসংখ্যা ২৫, পৃ. ৪৪

নেই যাদের মৃত্যুতে কারু কোন ক্ষতি নেই এরকম লোক যেখানে সেখানে পড়ে আছে। আমাদের মত অসার অপদার্থ, কর্ম্মহীন জীবন নিয়ে পড়ে আছি আর সংসারের সার রত্ন চলে গেলেন। এ অবিচার কেন কে বলবে? একটা সংসার ছারখার করে কয়েকটি শিশুকে অসহায় মাতৃহীন করে কি মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল জানি নে, তবু ভাবতে গেলে বলি "তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" হয়ত বা এ সংসারে থাকতে গেলে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হ'ত— তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন সব দুঃখ কষ্টের হাত এড়িয়ে সব সুখ সম্পদের মধ্যে থেকেই যেখানে দুঃখ নেই শোক নেই সেই অমৃত লোকে গেছেন। তাঁর মত লোকেরই উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই। আজ যে গভীর বেদনা অনুভব করছি ক্রমে সেটা কমে আসবে, সব বুঝেও থেকে থেকে মন হু হু শব্দে কেঁদে ওঠে। এখানে এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করছে না। নানা কাযকর্ম্মে ডুবে আছি। সবই করছি কিন্তু হাতে বশ নেই পায়ে জোর নেই মনে হচ্ছে এক দিকটা শূন্য হয়ে গেছে। রবিকাকা, মীরা শমী ওদের বিষণ্ণ চেহারা আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাল রাত্তিরে স্বপ্নে দেখেছি রবিকাকা বলছেন "অমলা তুমি মীরা শমীর কাছে আসবে না?" রবিকাকার সে উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি কিছুতেই ভুলতে পারছি নে।

যিনি অভাব ঘটান তিনিই শান্তি আনেন, এখন একমাত্র ভরসা ভগবানের করুণা। যে অসহায় শিশুদের আশ্রয় গেছে, প্রার্থনা করি ভগবানের অজস্র করুণা তাদের উপর বর্ষিত হউক। মাতৃহীনদের মাতা হ'য়ে তিনি সর্ব্বদা নিরাপদে রাখুন। তোমার, আমার কোন সাধ্য নাই। রবিকাকা এখন কোথায় কি ভাবে আছেন লিখো। বেলা রথী ওদের সকলের খবর দিয়ো। বিবি, তোমাদের চিঠি পেলে অনেকটা ভাল লাগবে, কেউ আমার কষ্ট বোঝবার নেই বলে আরও বেশী কষ্ট হচ্ছে। বেলার কাছে চিঠি লিখতে সাহস হচ্ছে না। কত কথা একটু একটু করে সারাদিন মনে হচ্ছে, কি আর বলব, দূরে আছি বলে আরও বেশী ছটফট করছি।

যাক্, যার উপায় নেই ভেবে আর কি করব। তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে রইলুম আজ তবে আসি।

ইতি—

অমলা

৩. ওঁ [*মধুপুর। ৪ ডিসে. ১৯০২]

বৃহস্পতিবার

ভাই বিবি,

তোমার চিঠিখানা পেয়েছি। ছেলেদের খবর পাবার জন্য মনটা খুবই ব্যাকুল ছিল। রবিকাকার চিঠি একখানা পেয়েছি। খুব সংক্ষেপে ঘটনাটা। আমাকে জানিয়েছেন ও লিখেছেন ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে অনেক বার আমাকে মনে করেছিলেন। ছেলেদের কথা বিশেষ কিছুই লেখেন নি। আমাকে মনে করে যে চিঠি লিখেছেন সেইটেই যথেষ্ট মনে করি। চিঠিখানা পড়ে তাঁর মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারলুম। যে আংটীর কথা লিখেছ সেটা বেশ মনে আছে। শমী হবার এক বৎসর আগে শিলাইদহ ওঁদের সঙ্গে যেবার ছিলুম একদিন রাত্তিরে বোটের জানলার ধারে বসে আমার হাত থেকে খুলে কাকীমাকে পরিয়ে দিয়েছিলুম। ওই আংটীর সঙ্গে আমার অনেক কথা গাঁথা আছে। যখনি অনেকদিন পরে দেখা হ'ত আমাকে আংটী দেখিয়ে বলতেন "এই দেখ তোমার আংটী একদিনও হাত থেকে খুলিনি" শেষ পর্যন্ত হাতে আংটী ছিল। কাকীমার সঙ্গে যে কি সম্বন্ধ ছিল কোন দিন ভাল করে বুঝতে পারি নি। এক হিসাবে বন্ধু ছিলেন— তেমন বন্ধু আর কখন হয় নি হবেও না, অন্যদিকে মায়ের মত ভক্তি করতুম। বয়সে ছোট ছিলেন বটে কিন্তু একদিনের জন্য তা মনে হয় নি। তাঁকে যে ভালবাসতুম, তিনি বেঁচে থাকতে কোন দিন বুঝতে পারি নি — এখন সেটা

শতগুণে বেড়ে উঠেছে প্রতিদিন তিল তিল করে তাঁর স্নেহ যত্ন যা কিছু পেয়েছি সব এক সঙ্গে বুকের উপর চেপে ধরছে। খেতে হয় খাচ্ছি— কতকগুলি কর্তব্য আছে করছি। যত বেশী কাযকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি তত ভাল মনে করে— সারাদিন কোন না কোন একটা কায নিয়ে আছি অবসরের সময়টা বড়ই পীড়ন করে। এমন lonely লাগে কি আর বলব। ছেলেদের দেখবার জন্য মনটা খুবই ছট্‌ফট্‌ করে। এখান থেকে ফিরে যেতে যেতে তারা কলকাতায় থাক্‌বে কি না, থাক্‌লেই বা যোড়াসাঁকো কি করে যাব। দুদিন দেরী হ'লে খবর পাঠিয়ে ডেকে নেবার লোক আর নেই। রাণীর জন্য আমার ভারি ভাবনা হয়েছে। একে তো ওর শরীর অত্যন্ত খারাপ তার পরে এই শোকটা সব চেয়ে ওরই বেশী লাগবে। ও মেয়ে, ভারি সহজে কাতর হ'য়ে পড়ে। একবার একটা পাখী পুষেছিল সে পাখীটা মারা গেলে যে কাতর হয়েছিল। কাউকে কিছু বলত না গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে অস্থির হ'ত ওর স্বভাব ভারি চাপা। বেলার ঘর সংসার হয়েছে, স্বামী ও তার আত্মীয়দের জন্য একটা টান হ'য়েছে, শাশুড়ি আছে মায়ের অভাব কিছু পূরণ করবে। মীরা ও শমী ছোট অভাব অনুভব করবার ক্ষমতা তাদের এখনও ভাল করে হয়নি। রথী হাজার হলেও ছেলে— লেখাপড়া নিয়ে নানা কথায় নানা কাজে ভুলে থাকবার অবসর আছে। আমার বোধ হয় রাণীর সব চেয়ে কষ্ট হবে। বালিগঞ্জে থাকাতে আদৎ ঘটনাটা ভাল করে বুঝতে পারছে না। যোড়াসাঁকো গেলে ওর বেশী কষ্ট হবে। রবিকাকা একবার বলেছিলেন, আমরা বোলপুর যদি যেতুম তা হ'লে মীরাকে ও শমীকে আমার সঙ্গে দিতেন। আমি অবিশ্যি কিছু বলতে পারি নে আমার নিজের বাড়ি হ'লে রাণীকে জোর করে নিয়ে আস্‌তুম। এখানে যে রকম খোলা মাঠের হাওয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এ রকম কোন যায়গায় এলে খুব অল্প সময়ে ওর শরীর শুধরে যায়। কথাটা অসঙ্গত মনে হ'লে তুমি কিছু বোলো না। একবার মীরাকে দেবার কথা বলেছিলেন বলেই সাহস করে তোমার

কাছে লিখলুম। বেলাদের বড় বোন থাকলে তার যে কর্তব্য হ'ত আমি সেই কর্তব্যগুলি আমার মনে করি। কিন্তু মনে করলে কি হবে, আমি স্বাধীন নই ক্ষমতা কিছুই নেই, যদি সামান্য কাজেও আসি সেটা খুবই সুখের মনে করব। কাকীমার কাছে অনেক কারণে ঋণী ছিলুম সে সব ঋণ ইহজীবনে শোধ করতে পারব না। বিবি, তোমাকে কি লিখব বল, সারা দিন যত কথা মনে হয় সব লিখ্‌তে গেলে পাগল মনে করবে। কাকীমার সবরকম চেহারা মনে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে— শেষ যে চেহারা দেখে এসেছি মনে হচ্ছে ফিরে গিয়ে ঠিক তেমনি দেখব, সেই জন্যই যেন মনটা ফিরে যাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে। তার পরে রবিকাকার একটা বিষণ্ণ মুখের সঙ্গে সঙ্গে যা মনে পড়ে সেটা অসহ্য। আর কখনও দেখতে পাব না এটা কিছুতেই সহ্য হয় না। এতদিন তো আর একসঙ্গে থাকতুম না? রোজ একখানা করে চিঠিও লিখতুম না, তবু একটা ভরসা থাকত কোন দিন আসবেন কলকাতায় দেখা হবে। যাক্‌ ওসব কথা ভেবে কোন ফল নেই, তবু মন মানে না তাই থেকে থেকে বলি। সকলেরই জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছে; আপশোষ এই যাদের গেলে কোন হানি নেই তারাই পড়ে থাকে। এবারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে মৃত্যুই আমাদের শেষ নয় আরও উচ্চতর স্থান আছে, সে স্থানের উপযুক্ত না হ'লে লোক এ সংসার থেকে বিদায় নিতে পারে না। সেই জন্যে বেছে বেছে লোক যায়। তা নইলে কাকীমার জীবনের শেষ হবার সময় তো হয়নি? এত শীগ্‌গির তাঁর শেষ হবার কি কারণ? আমার মনে হয় এ সংসারের সম্পূর্ণতা পেলে সেই অদৃশ্য লোকের উপযুক্ত হয়— সেই সম্পূর্ণতা তিনি খুব অল্প সময়ে পেয়েছেন— নূতন জীবন নিয়ে উচ্চতর লোকে চলে গেছেন। আমাদের সঙ্গে কোন সংস্রব আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার সর্বদাই মনে হয় যাঁরা আগে গেছেন তাঁরা আমাকে এবং আমার সব কায সর্বদাই দেখছেন, আমাদের দেখবার কোন উপায় নেই। আমার মৃত্যুর পরে তাঁদের দেখা পাব কিনা জানি না কারণ

কে জানে কোথায় কি পাপ করেছি, তাঁদের কাছে যাবার উপযুক্ত হ'তে পারব কিনা। তোমাকে হয়ত অনেক কথা বলে বিরক্ত করছি। কাছে থাকলে কথায় যে আলোচনা হ'তে পারত, চিঠিতে সেইটে চালাচ্ছি। কি বক্‌ছি নিজেও জানিনে। আজকাল মাথায় এত কথা এক সঙ্গে আসে মাঝে মাঝে মাথাটা ভয়ানক শ্রান্ত মনে হয়। কাকীমার জন্য কিন্তু দুঃখ করতে ইচ্ছা হয় না। কারণ তিনি যেখানেই থাকুন সম্পূর্ণ শান্তিতে আছেন এই বিশ্বাস, কষ্ট শুধু যারা আছেন তাঁদের জন্য, রবিকাকার এমন সুখের এমন শান্তির ঘর ভেঙ্গেছে এই দুঃখ, এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই। তুমি লিখ্‌তে বলেছ তাই যা মনে আসছে তাই লিখ্‌ছি তা নইলে দ্বিতীয় লোক নাই যাকে ধরে দুটো কথা বলি। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। আজ তবে আসি। রাণী কি রকম থাকে লিখো। মহারাণী খোকা খুকী ভালই আছে। আশা করি তোমরা ভাল আছ।

ইতি—

অমলা

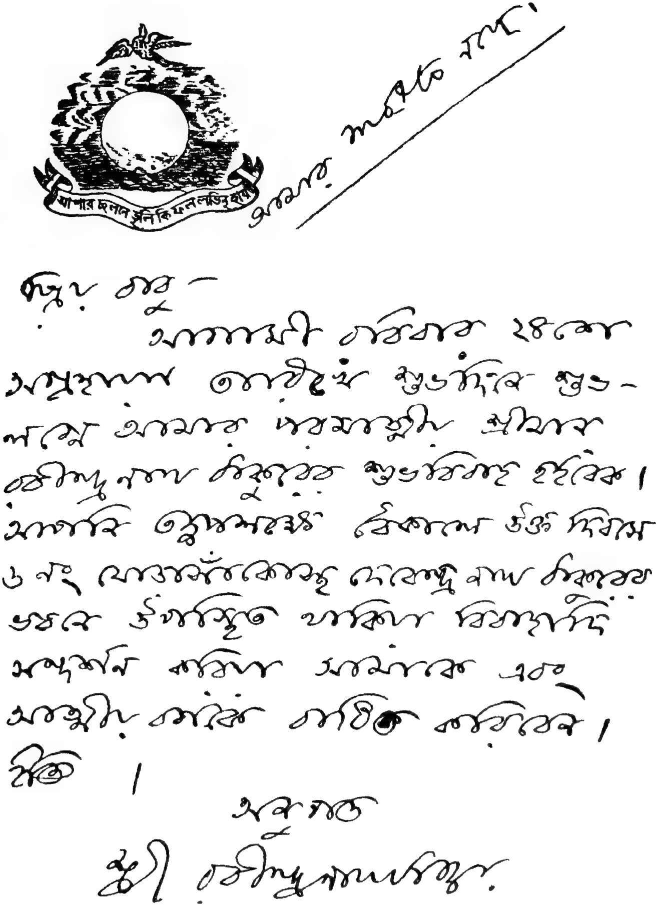

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়

অবশ্য [illegible] চাই।

প্রিয় বন্ধু —

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬ নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমন্ত্রণলিপি

পরিশিষ্ট ৩

মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে অন্যান্যদের স্মৃতি এবং পত্র

মৃণালিনী দেবী তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনে, সেবাপরতা ও সহৃদয় ব্যবহারের গুণে, আত্মীয়-বান্ধবগণের চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন। অন্তরালবাসিনী সংসারকর্মে নিবিষ্টা এই নারী স্নেহমমতায় ও সেবায় কবিহৃদয়কেও একান্তভাবে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; পত্নী-বিয়োগের পরে লিখিত 'স্মরণ' কাব্যের কবিতাগুলিতে এবং 'উৎসর্গ' প্রভৃতি গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় সেই শোকগাথা গভীর চিত্তবেদনার অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। মৃণালিনী দেবীর স্নেহসিক্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ হইতে সেগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ বর্তমান পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

১. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শর্বরী গিয়াছে চলি। দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতিক্ষিছে রবির উদয়।
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিসিয়া তারে
‘অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক
স্থবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মত্রজার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।’

‘যৌতুক কি ‘কৌতুক’-এর শেষাংশ।
‘ভারতী’, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, পৃ ৬৪

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খুলনা জিলার দক্ষিণডিহি গ্রামের শুকদেবের বংশধর বেণীমাধব রায়চৌধুরীর প্রথম সন্তান ভবতারিণী (মৃণালিনী)। তাঁহার জন্মবর্ষ ১২৮০ সাল।··· খেলাঘরে ঘরকন্নার সময় মৃণালিনীর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ করিতেন, ইহা সঙ্গিনীদের উপর তাঁহার কর্তৃত্বের সখীসুলভ অধিকার, ইহাতে কর্তৃত্বের সহজাত তাপ-চাপ ছিল না, সখীসুলভ প্রণয়প্রবণতায় ইহা সুস্নিগ্ধ কোমল সহনীয়; সঙ্গিনীরা তাই সখীর নির্দেশ মানিত, খেলা ও চলিত সখীভাবে অবিরোধে।···

দক্ষিণডিহি গ্রামে এমন-কি গ্রামের চতুর্দিকে ক্রোশের মধ্যেও উচ্চ-শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামে একটি প্রাইমারি পাঠশালা ছিল, এই

পাঠশালায় মৃণালিনীর বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত অবাধে পড়াশুনা চলিয়াছিল। কিন্তু সমাজে নিন্দার ভয়ে সুদূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই; কাজেই বাংলা লেখাপড়ার সাধ ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এইখানেই মিটাইতে হইয়াছিল।...

১২৯০ সালে চব্বিশে অগ্রহায়ণ রবিবারে রবীন্দ্রনাথের সহিত মৃণালিনী দেবীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ চতুর্বিংশতিবর্ষীয় যুবক, মৃণালিনী দেবীর বয়স একাদশ বর্ষ। বিবাহে ঘটকালি করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাতুল ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যাসুন্দরী। প্রচলিত প্রথানুসারে কন্যার পিতা তাঁহার বাড়িতে বর লইয়া বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে মহর্ষি তাহাকে জানাইয়াছিলেন, কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে। এই প্রস্তাব স্বীকৃত হইলে মহর্ষি দক্ষিণডিহির বাড়িতে নানাবিধ খেলনা বসনভূষণাদি কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সদানন্দ মহর্ষির কথানুসারে গ্রামে নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া কন্যার ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা বোধ হয় 'কন্যার আশীর্বাদ' বা 'পাকা দেখা'র সামাজিক বিধি। বিবাহে মহর্ষির যে বংশ-গোত্রের বিবেচনা ছিল, এ বিবাহে তাহার ব্যভিচার হয় নাই। সমৃদ্ধি ও বিদ্যাবত্তায় রায়চৌধুরীবংশ ঠাকুরপরিবারের সমতুল না হইলেও এই বৈবাহিক সম্বন্ধে মহর্ষিদেবের মতদ্বৈধ ছিল না। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ব্রহ্মোৎসব-দালানে কুলপ্রথানুসারে পরিণয়োৎসব শুভসম্পন্ন হয়। নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত মহর্ষি সমাজেতে কনিষ্ঠ পুত্রের শেষ সামাজিক কার্য নিষ্পন্ন করেন।

পিতৃগৃহে কন্যার নাম ছিল 'ভবতারিণী', রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সংগতি রক্ষা না হওয়ায় বিবাহের পরে পরিবর্তিত নাম হইল 'মৃণালিনী'। রবি-মৃণালিনীর প্রণয়-সম্বন্ধ কবিকল্পিত, চিরপ্রসিদ্ধ; তাই মনে হয়, এই

নাম কবিকৃত কবিকল্পনাজাত। মতান্তরে, কবির প্রিয় ‘নলিনী’ নামের ইহা প্রতিশব্দ। যাহাই হউক, ‘ভবতারিণী’ বধূজীবনে ‘মৃণালিনী’ নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। ‘বৈষ্ণব কবিতা’য় কবি যে ‘ধরার সঙ্গিনী’র চিত্র বর্ণনার নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার কল্পনামাত্র নহে, ইহা বাস্তবিকের অনুভূতি অনুস্যূত পরিণাম; কবির সেই চিত্রগত বর্ণ কবিপত্নীর সাংসারিক জীবনে নানাবিষয়িনী শক্তিতে মূর্ত ও সার্থক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে।

পিতৃগৃহে মৃণালিনী দেবীর বিদ্যাশিক্ষার যে ক্ষুদ্রতম পরিধি তাহা ঠাকুরপরিবারের বধূগণের ও কন্যাদিগের বিদ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। প্রতিভাবান সুশিক্ষিত কবির অনুরূপ স্ত্রীরত্ন লাভ বিরল হইলেও একান্ত বিরল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সৌভাগ্যমূলক ভবিতব্যতা সর্বত্র অবাধ; তাই মহর্ষির এই পরিণয়ে অসম্মতির কোনো কারণ ছিল না; কবিও পিতৃদেবের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু সহধর্মিণীকে অন্বর্থ সহধর্মিণী করিবার নিমিত্ত কবি নববধূর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, এমন-কি বালিকা বধূকে লরেটো হাউসে পড়িবার অনুমতি দিলেন।

এই সময়ে নগেন্দ্রনাথ দিদির কাছে আসিয়া একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়িতেন। অবসরক্রমে দিদি পড়া বলিয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন। কখনো কখনো নগেন্দ্রনাথ দুই-একটি ইংরেজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন; দিদি অর্থ বলিয়া দিয়া পাঠ বুঝাইয়া দিতেন।

পত্নীর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই কবি নিরস্ত হইতে পারেন নাই। রামায়ণাদির সংস্কৃত সহজ শ্লোকের অর্থগ্রহণ যাহাতে অনায়াসে হয় তিনি সেই উদ্দেশ্যেই পত্নীকে মোটামুটিভাবে কিছু সংস্কৃত শিখাইবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। কবির নির্দেশানুসারে বিদ্যারত্ন রামায়ণের গল্পাংশের শ্লোকের বাংলায় ব্যাখ্যা করিতেন, ছাত্রী সেই ব্যাখ্যা

শুনিয়া তাহার বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপে রামায়ণের গল্পাংশের অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল।

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির শ্লোক গদ্যাংশ কখনো কখনো ব্যাখ্যা ও সরল বাংলায় অনুবাদ করিয়া কাকিমাকে বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে অনুবাদের সাহায্যে ও বলেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়, শ্লোকের আবৃত্তি শ্রবণে মৃণালিনী দেবীর সংস্কৃত-অর্থবোধে বেশ-কিছু পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভবনে মায়ের স্বহস্তে পেন্সিলে লিখিত একখানি খাতা দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, খাতাখানি মায়ের লিখিত রামায়ণের সেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। খাতা খুলিয়া দেখিলাম ইহা রামায়ণের অনুবাদ-পাণ্ডুলিপি নহে, মহাভারত মনুসংহিতা ঈশোপনিষৎ কঠোপনিষৎ প্রভৃতির অনুবাদ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।...

কবি এখন সম্পূর্ণ গৃহস্থ না হইলেও গৃহী হইয়াছেন বলা যায়। বিবাহের পর তিনি পৈতৃক প্রাসাদে নির্ধারিত প্রকোষ্ঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; তখন ঠাকুরপরিবার সুবিপুল— মহর্ষির পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী কন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির স্থান সুবিশাল ত্রিতল অট্টালিকায়ও যথেষ্ট হইত না।

কাব্যময় জীবন উপভোগ করায় কবির পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। একবার তিনি ইচ্ছা করিলেন, গাজিপুরে কোনো নিভৃত নিবাসে বাস করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভোগে কবিজীবন সফল করিবেন। এই অভিপ্রায়ে ১২৯৪ সালের শেষভাগে তিনি গাজিপুরে যাওয়া স্থির করিলেন। এই সিদ্ধান্তের অজুহাতে তিনি লিখিয়াছেন— "বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।... শুনেছিলুম, গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত।... তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।"

এখন রবীন্দ্রনাথের পরিবার ক্ষুদ্র— পত্নী মৃণালিনী দেবী, শিশুকন্যা বেলা। এই সংসার লইয়া কবি গাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহার দূর-সম্পর্কিত আত্মীয় আফিম-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী গগনচন্দ্র রায় বাস করিতেন। তাঁহার সাহায্যে কবির সুখস্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী ব্যবস্থা সমস্তই সহজেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

সপরিবারে গাজিপুরে বাস সাংসারিক কবিজীবনের প্রথম ও প্রধান পর্ব। আপনার সংসারে স্বামীকে আপনার মতো করিয়া পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ত্রীমাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। বৃহৎ ঠাকুরপরিবারের মধ্যে বাসে কবিপত্নীর সে অভিলাষ এ পর্যন্ত অপূর্ণই ছিল। গাজিপুর-বাসে পৃথক্ সাংসারিক জীবনের সূত্রপাতে তাহা এই প্রথম কার্যে পরিণত হইল; পক্ষান্তরে যৌবনের পরিপূর্ণতায় কবিও এখন প্রথম পাইলেন পত্নীকে ধরার সঙ্গিনীরূপে— প্রণয়িনীরূপে 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে, গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।'···

মৃণালিনী দেবী যখন শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে বাস করিতেন, সেই সময়ে মুলা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ দুরবস্থা নিবেদন করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিল— "মাইজী, একটি চাকরি দিয়া আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি সপরিবারে মারা পড়িব।" দরিদ্রের করুণ প্রার্থনায় মাইজীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন না, পক্ষান্তরে অপেক্ষা করাও তখন সম্ভব হইল না। কুঠিবাড়ির দরোয়ানের কার্যে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে তিনি মুলা সিংকে নিযুক্ত করিলেন। দরিদ্রের দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান হইল।

মুলা সিং-এর দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমনই পরিপুষ্ট সুগঠিত। দেহের অনুপাতে দুবেলায় চার সের আটা সে খাইতে পারিত। একমাস চাকরির পরে সে দেখিল, তাহার স্বল্প বেতন ভূরিভোজনে নিঃশেষ হইয়াছে। বাড়িতে

কিছুই পাঠাইতে পারিল না, বড়োই বিষণ্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে ইহা মৃণালিনী দেবীর কর্ণগোচর হইলে তিনি মুলা সিংকে ডাকিয়া বিষাদের কারণ শুনিতে চাহিলেন, সেও অকপটে সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইল; ব্যথিত হইয়া মাইজী সেইদিন অবধি প্রত্যহ সংসারের ভাণ্ডার হইতে চার সের আটা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বেতন বৃদ্ধি হইল, কিন্তু আটার ব্যবস্থা পূর্ববৎই রহিল।

এই সময় মৃণালিনী দেবী কুঠিবাড়িতে একটি শাক-সবজির বাগান করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ছিল। অবসরমত সময়ে সময়ে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া বাগানের কাজকর্মও তিনি করিতেন। যে-সকল এস্টেটের কর্মচারী সপরিবারে বাস করিতেন তাঁহাদের বাসায় এই বাগানের শাক-সবজি তরকারি তিনি পাঠাইয়া দিতেন। অল্পবেতনভোগী আমলা-দিগের জন্য সরকারি ব্যয়ে একটি মেস করিয়া সরকারি তহবিল হইতে ঠাকুর চাকরের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই মেসেও বাগানের শাক-সবজি তরকারি সপ্তাহে দুইবার পাঠাইতেন।

মৃণালিনী দেবী যেদিন শিলাইদহ হইতে চলিয়া আসেন সেদিন ঠাকুর চাকর ও আমলাদের বিষাদের সীমা ছিল না, বিশেষত মাইজীর বিদায়ে মুলা সিং-এর কী কান্না! সে যে মাইজীর করুণায় অপার দুঃখের পার পাইয়াছিল! এ যে তাহার পক্ষে বিজয়াদশমীর দিন। বিষাদমলিন সকলকে কাছে আনিয়া মাইজী স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—"শান্ত হও, আমি আবার আসব, তোমাদের কি কখনো ভুলতে পারি।" সস্নেহ প্রবোধবাক্যে সকলে কিছু আশ্বস্ত হইল। স্নেহের ইহাই মোহিনী শক্তি!

মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী মহর্ষির পুত্রবধূগণের কাকিমা। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকিতেন না, বির্জিতলায় একটি বাড়িতে যাবজ্জীবন বাস করিয়াছিলেন। মহর্ষিদেব এই বাড়ি তাঁহাকে দিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

করিতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিতেন, বউমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-সালাপ আমোদ-সামোদ করিয়া চলিয়া যাইতেন, বউমাদের সনির্বন্ধ চেষ্টায়ও কখনও জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। পরম আত্মীয়গণের সহিত ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার আপাতত বিশেষ বিস্ময়জনক। কিন্তু কার্যমাত্রের কারণ থাকে, ইহারও গূঢ় কারণ ছিল। মহর্ষিদেব ভ্রাতৃবধূর মাসহারা এক হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কোনো উপায়ে বধূমাতার প্রাণনাশ করিতে পারিলে মাসহারা দিতে হইবে না, এই অমূলক সন্দেহ ত্রিপুরাসুন্দরীর মনে দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে মহর্ষির চরিত্রে এইরূপ অভাবনীয় সন্দিগ্ধ মনোবৃত্তি স্ত্রীস্বভাবসুলভ পাত্রাপাত্রের বিচারশক্তির অভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। যাহা হউক কাকিমার তাদৃশ আচরণের মূলে এই সন্দেহ সুদৃঢ়ই ছিল। মহর্ষির সদর খাজাঞ্চি প্রতিমাসে মাসহারা দিতে যাইতেন; তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, কাকিমা হাজার টাকার একখানি নোটই পছন্দ করিতেন, তাহাও বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইতেন।

একবার কাকিমা জোড়াসাঁকোয় আসিলে মৃণালিনী দেবী না-ছোড় হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন; বলিলেন, "কাকিমা, আপনি বারবার আসেন যান, একবারও কিছুই খান না; আমি নিজেই মিষ্টান্ন তৈরি করেছি, তা আজ খেতেই হবে।" বউমার এই অভাবনীয় সনির্বন্ধ আবদারে কাকিমা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, নানা উপায়ে বউমাকে নিরস্ত করার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু বউমার আবদার এড়াইতে পারিলেন না। কাকিমার নিমরাজ ভাব বুঝিয়া সুচতুর বউমা কালবিলম্ব করিলেন না, তখনই বড়ো পাত্রে ভরা নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া কাকিমার হাতে দিলেন; বউমার এইরূপ ক্ষিপ্র আয়োজনে কাকিমার আর 'না-না' বলিবার উপায় রহিল না। অনন্যোপায় হইয়া পাত্র লইয়া উপবিষ্ট বধূদিগকে মিষ্টান্ন কিছু কিছু পরিবেশন করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলেন। মিষ্টান্নে যদি কিছু প্রাণনাশক মিশ্রিত

থাকে সকলেরই তাহা অনিষ্টকর হইবে— পরিবেশনে কাকিমার এই সন্দেহমূলক অভিপ্রায় গূঢ় ছিল, তৎক্ষণাৎ বউমারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সংকল্পভঞ্জন হইল, সন্দেহভঞ্জন হয় নাই। সন্দেহ দুরতিক্রম্য।

বলেন্দ্রনাথের বিবাহে জননী প্রফুল্লময়ী দেবী ছোট জায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন— "বলুর বিবাহে খুব ঘটা হইয়াছিল।··· আমার ছোট জা মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকম ভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালবাসিতেন। মনটা খুব সরল ছিল, সেইজন্য বাড়ির সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসিতেন।"

পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার্থ গৃহবিদ্যালয়ের পত্তন করিয়া কবি যখন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া মৃণালিনী দেবী কর্মচারীদিগের জন্য জমিদারি কাছারিতে পাঠাইয়া দিতেন। কখনো কোনো কোনো বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া কুঠিবাড়িতে খাওয়াইতেন। স্বভাব অব্যভিচারী।

বন্ধুবান্ধব লইয়া খাওয়াদাওয়ার আমোদ কবির স্বভাবে ছিল বড় কম না। একদিন প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে কবি মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক তিনি যে কেবল পত্নীকে এ কথা বলিতে ভুলিয়াছিলেন তাহা নয়, মধ্যাহ্নভোজনকালে তাঁহারও এ কথা স্মরণ হয় নাই। যথাকালে পরিবারবর্গের সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হইল। ভোজনান্তে কবি নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধুর নিমন্ত্রণরক্ষার্থ নিয়ন্ত্রিত প্রিয়নাথ কবির বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিবামাত্র আপনার বিষম ভ্রমের কথা কবির মনে হইল। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া পত্নীকে নিমন্ত্রিত বন্ধুর উপস্থিতি জানাইলেন। স্থিরবুদ্ধি কবিপত্নী বন্ধুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রন্ধনকুশল ক্ষিপ্র হস্তে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন এবং ভোজনপাত্রে সাজাইয়া বন্ধুকে ভোজনগৃহে আনিবার জন্য কবিকে সংবাদ দিলেন। বন্ধুর

সহিত ভোজনগৃহে আসিয়া কবি দেখিলেন, পাত্র পূর্ণ, ভোজ্যের কোনো অংশেই ত্রুটি হয় নাই, সবই প্রস্তুত। দেখিয়াই কবি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া গৃহিণীপনার সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন। বন্ধু ভোজন করিলেন। নিপুণ গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তায় গৃহীর নিমন্ত্রণ-বিভ্রাট ধরা পড়িল না, গৃহিণীর ইহাই দক্ষতা। কবি বলিয়াছেন— 'সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা।'

বন্ধুসংখ্যা অল্প হইলেও কবির গৃহে বন্ধুসমাগম অল্প হইত না। এইরূপ ভ্রান্তিমূলক নিমন্ত্রণ-বিভ্রাট কবির এই একবারই মাত্র নহে; কবির ভাব বুঝিয়াই মৃণালিনী দেবী নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, বন্ধুসমাগমে আর খাদ্য-বিভ্রাট ঘটিত না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কবির প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই আসিতেন, সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে 'কাকিমা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে' এই আবদার করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিতেন। কাকিমা অপ্রস্তুত থাকিতেন না, সস্নেহ বাক্যে পাত্র-ভরা খাদ্যে চিত্তরঞ্জনের চিত্তরঞ্জন করিতেন। এই স্নেহের দৃশ্য বড়োই মধুর!

কবি ও লোকেন্দ্রনাথ একই সময়ে বিলাতে মর্লি সাহেবের ছাত্র ছিলেন, সহপাঠিত্বে তাই উভয়ের সৌহৃদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির সঙ্গে দেখা করিতে লোকেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসিতেন, সুহৃৎ-পত্নী যথোচিত সমাদরে আতিথ্য করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

উদার স্বভাব পক্ষপাতহীন। বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ কাকিমার কাছে থাকিতেই ভালোবাসিতেন; তাঁহাদের প্রতি কাকিমারও পুত্রবৎ স্নেহ ছিল। অকৃত্রিম স্নেহ এমনই মনোমোহন।

সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে মৃণালিনী দেবীর নৈপুণ্য ছিল স্বাভাবিক। পূজার সময়ে (?) সত্যেন্দ্রনাথের পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটক একবার অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের নারায়ণীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন মৃণালিনী দেবী। পূর্বে তিনি কখনো অভিনয় করেন নাই। নারায়ণীর ভূমিকা নাকি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় লিখিয়াছেন— থিয়েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রীরা পার্কস্ট্রীটের বাড়ির অভিনয় দেখিয়া যায়, এবং কয়েক দিন পরে এমারেল্‌ডে যে অভিনয় হয় তাহাতে অভিনেত্রীরা ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের ঢং আশ্চর্যরূপে অনুকরণ করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠে বিদ্যালাভের বেদনা কবির মনে সততই জাগরূক ছিল। শিক্ষায় গতানুগতিকতার অনুবর্তনে তাঁহার কিছুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। আদর্শ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ তাই স্বীয় আদর্শে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়া শান্তিনিকেতনে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে আদর্শ বিদ্যালয়— ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। শিলাইদহে যে আদর্শে কবি গৃহবিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এই আশ্রম তাহারই পূর্ণ পরিণত প্রতিষ্ঠান। মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের দিন ৭ই পৌষ, আশ্রমপ্রতিষ্ঠা-হেতু কবিবরেরও জীবনেতিহাসের স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার সময় কবির বিশেষ অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন। পুরী-স্থিত পাকা বাড়ি এই সময়ে তিনি আশ্রম-রক্ষণার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন। অলংকার বিক্রয় করিয়া মৃণালিনী দেবী বিদ্যালয়ের পরিচালনায় কবির সহায়তা করিয়াছিলেন। সংকল্প সাধনার ব্যবসায় মহতেরই প্রকৃতিসিদ্ধ।···

আশ্রমের কার্যে কবির সহধর্মিণী সহকর্মিণী হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ছাত্রগণের করণীয় সকল বিষয় তত্ত্বাবধান তিনি অবশ্যকর্তব্য মনে করিতেন। পাছে বালকগণের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়াই তিনি তাহাদের খাওয়ার ও জলখাবারের ভার নিজের হাতেই লইয়াছিলেন ও দেখিয়াশুনিয়া খাওয়াইতেন। এই অপত্যনির্বিশেষ স্নেহ তাঁহাকে বালকগণের মাতৃস্থানীয়া করিয়া রাখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে এক আত্মীয়ের নিকটে শুনিয়াছিলাম—"আশ্রমের অধ্যাপকগণ ও বালকেরা যে প্রকার সুখে বাস করেন বাবুদের ভাগ্যেও তাহা সম্ভব হয় না। রথীন্দ্রনাথের

মনস্বিনী জননী প্রতিদিনই আশ্রমবাসীদের জন্য নিজের অভিমত নানা আহার্যের ব্যবস্থা করেন, কোনো বিষয়েই ত্রুটি হয় না।"

ভ্রাতৃভাব শিষ্টাচার সংযম নিয়মনিষ্ঠা বিলাসবর্জন প্রভৃতি আশ্রমের আদর্শভূত সদ্‌গুণে বালকগণকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়া গড়িয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করার নিমিত্ত মৃণালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার তীব্র আঘাত তাঁহার অনভ্যস্ত শরীরবন্ধ সহ্য করিতে পারিল না, ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ দেখা দিল এবং ক্রমে সাংঘাতিক রোগে পরিণত হইল। চিকিৎসার্থে তিনি কলিকাতায় নীত হইলেন ; সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় মারাত্মক রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না ; সাংঘাতিক আক্রমণে আশ্রমজননীর জীবিতকাল ক্রমে নিঃশেষ হইল।

'ধরার সঙ্গিনী'র সঙ্গ সাঙ্গ হইল! শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতায় সাজানো সোনার সংসার ভাঙিয়া গেল— গৃহস্থতার অবসান হইল।

প্রায় দুই মাস মৃণালিনী দেবী শয্যাশায়িনী ছিলেন। রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবি এই দীর্ঘকাল পীড়িত পত্নীর যেরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা কদাচিৎ কোনো সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর ভাগ্যে সম্ভব হয়। অর্থ-বিনিময়ে সেবাকারিণীর অসদ্ভাব তখন না হইলেও, তাদৃশ ব্যবস্থায় পাছে কোনো ত্রুটিতে রোগিণীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, এই সন্দেহেই জীবনান্ত পর্যন্ত কবি পত্নীর সেবাশুশ্রূষা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক পাখা তখন ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিণীর রোগ-জ্বালা প্রশমিত করিয়াছিলেন। পতি-পত্নীর প্রণয়বন্ধনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জীবনান্ত পর্যন্ত কবির এই অক্লান্ত সেবা।

১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ রবিবারে নিশীথসময়ে মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করেন। পত্নীর জীবিতাবসানের পরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া কবি একাকী ছাদে চলিয়া যান ; সমস্ত রাত্রি ছাদেই কাটিয়া যায়। পুত্র-বধূর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মহর্ষি বলিয়াছিলেন— "রবির জন্য চিন্তা করি না,

সে লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যই দুঃখ হয়।”

মৃণালিনী দেবী যখন শয্যাগত, সেই সময়ে তাঁহার পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সপত্নী হইলেও মৃণালিনী দেবীর প্রতি আপন পিসিমার মতোই তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। সেই সময় ভাইঝি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— “পিসিমা, আমি শয্যাগত, ছেলে-মেয়েদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই, তাদের ভার নিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।” পিসিমা ভাইঝির কথা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি সংসারে থাকিয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনে কবির নূতন বাড়িতে সংসারের ভার লইয়া তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি। মীরা শমী তখন শিশু।

পত্নীর পরলোকগমনে কবির প্রণয়প্রবণ হৃদয়ে বিচ্ছেদবেদনা যে নিদারুণ আঘাত দিয়াছিল, পত্নীস্মরণে রচিত ‘স্মরণ’-এর সন্তাপময়ী ভাষার কবিতায় পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তাহা অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে।

“মৃণালিনী দেবী”
‘কবির কথা’, ১৩৬১, পৃ. ৬৪

৩. ইন্দিরা দেবী

পারিবারিক স্মৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই পরিবার পত্তন বা বিয়ের কথা তুলতে হয়। যশোর জেলা সেকালে ছিল ঠাকুরবংশের ভবিষ্যৎ গৃহিণীদের প্রধান আকর। কারণ সে দেশে ছিল পিরালী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। শুনেছি সেখানকার মেয়েদের রূপেরও সুখ্যাতি ছিল, যদিও

পুরনো দাসী পাঠিয়ে তাদের স্বচ্ছন্দে নির্বাচন করে আনা হত। পূর্বপ্রথানুসারে রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা, তার মানে মা আর নতুনকাকিমা, জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য আমরা দুই ভাইবোনেও সে-যাত্রায় বাদ পড়ি নি। যশোরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি। সেখানেই আমরা সদলবলে আশ্রয় নিলুম। সেই বোধ হয় আমার জীবনে প্রথম গ্রাম দেখা। পরেও এ বিষয়ে খুব বেশি অভিজ্ঞতা হয় নি। একটি বড়ো আঙিনার চারি দিকে চারটি আলাদা ঘর নিয়ে বাড়িটি তৈরি।··· যদিও এই বউ-পরিচয়ের দলে আমরা থাকতুম না, তা হলেও শুনেছি যে তাঁরা দক্ষিণডিহি চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামে যেখানেই একটু বিবাহযোগ্যা মেয়ের খোঁজ পেতেন সেখানেই সন্ধান করতে যেতেন। কিন্তু বোধ হয় তখন যশোরে সুন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছিল, কারণ এত খোঁজ করেও বউঠাকুরানীরা মনের মতো কনে খুঁজে পেলেন না। আবার নিতান্ত বালিকা হলেও তো চলবে না। তাই অবশেষে তাঁরা জোড়াসাঁকোর কাছারির একজন কর্মচারী বেণী রায় মশায়ের অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কন্যাকেই মনোনীত করলেন। তাঁর বাপের বাড়ির নাম ছিল ভবতারিণী, শ্বশুরবাড়ি এসে তাঁর নাম বদলে মৃণালিনী রাখা হল, বোধ হয় বরের নামের সঙ্গে মিলিয়ে। রূপে না হলেও গুণে তিনি পরবর্তী জীবনে শ্বশুর বাড়ির সকলকে আপন করতে পেরেছিলেন, এ কথা সেকালের অনেকেই জানেন।

এই যশোরযাত্রার যে বীজ বপন করা হয় সেটির ফল ফলে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। রবিকা'র বয়স যখন বছর-বাইশেক হবে, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের কারোয়ার বন্দরে ছিলেন। সেখানে থাকতেই বিয়ের জন্যে বাড়ি থেকে তাঁর ডাক পড়ে।···

কাকিমার কথা আগেই বলেছি যে, তিনি স্নেহমমতাময় আমুদে মিশুক প্রকৃতির গুণে পরিবারের সকলকে সহজেই আপন করতে পেরে-

ছিলেন। আমার মনে হয় যশোরের মেয়েরাই সাধারণভাবে এই গুণগুলির অধিকারিণী ছিলেন। বিশেষত, রাঁধাবাড়া সম্বন্ধে কাকিমার খুব শখ ছিল। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরাতেও তা সংক্রামিত হয়েছে। শুনেছি, শান্তিনিকেতনে থাকার সময় আশ্রমের ছেলেদের জন্য আগুন-তাতে রেঁধে রেঁধেই কাকিমার শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়। আর শুনেছি রবিকা'র জমিদারি পরিদর্শনের জন্য শিলাইদহের কুঠিতে থাকা কালে নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি যখন তাঁদের অতিথি হতেন তখন আর কোনোরকম মিষ্টান্ন না পেয়ে কাকিমা এমন সুন্দর গাজরের হালুয়া তৈরি করতেন যে তাতেই তাঁরা পরিতুষ্ট হয়ে যেতেন।

'রবীন্দ্রস্মৃতি', ১৩৮০, পৃ. ৫৪-৫৬

৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিকাকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন 'বিয়ে করো—বিয়ে করো এবারে', রবিকাকা রাজী হন না, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে থাকেন। শেষে তাঁকে তো সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজী করালেন। রথীর মা যশোরের মেয়ে। তোমরা জানো ওঁর নাম মৃণালিনী, তা বিয়ের পরে দেওয়া নাম। আগের নাম কী একটা সুন্দরী না তারিণী দিয়ে ছিল, মা তাই বলে ডাকতেন। সেকেলে বেশ নামটি ছিল, কেন যে বদল হল। খুব সম্ভব, যতদূর এখন বুঝি, রবিকাকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মৃণালিনী নাম রাখা হয়েছিল।

গায়েহলুদ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও বাড়ির কোনো ছেলের গায়েহলুদ হয়ে গেলেই এ বাড়িতে তাকে নেমন্তন্ন করে প্রথম আইবুড়োভাত খাওয়ানো হত। তার পর এ-বাড়ি ও-বাড়ি চলত কয়দিন ধরে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন। মা গায়েহলুদের পরে রবিকাকাকে

আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে যশোরের মেয়ে, তায় রথীর মা মার সম্পর্কের বোন। খুব ধুমধামে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন, উপরে আমার বড়োপিসিমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে— বিরাট আয়োজন। পিসিমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দোৗড়দার শাল গায়ে, লাল কি সবুজ রঙের মনে নেই, তবে খুব জমকালো রঙচঙের। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা, তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লীর বাদশা। তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি, পিসিমারা জিজ্ঞেস করছেন, কী রে, বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে, কেমন হবে বউ, ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন, আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই। সে মূর্তি তোমরা আর দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না বললে—ওই আমরাই যা দেখে নিয়েছি।

'ঘরোয়া', ১৩৭৭, পৃ. ১০৬-০৭

৫. হেমলতা ঠাকুর

১

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় শীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে। দিন-তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০। বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে। বিয়ে করতে যেতে হয় নি তাঁকে শ্বশুরবাড়ি। পরিবারের বড়ো ছেলের ও ছোটো ছেলের বিয়ে বাপ-মা'রা ঘটা করে দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রথম কাজ ও শেষ কাজ বলে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের শেষ পুত্র। মা নাই— আড়ম্বরে উদাসীন পিতা তখন হিমালয়বাসী। বিয়েতে ঘটা করে কে। ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়াভাবে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ধুমধামের সম্পর্ক ছিল না তার মধ্যে। পারিবারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি— যার যখন

বিয়ে হত সেইখানি ছিল বরসজ্জার উপকরণ। নিজেরই বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে— স্ত্রী-আচারের সরঞ্জাম যেখানে সাজানো। বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানো রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপর। নতুন কাকিমার আত্মীয়া যাঁকে সবাই ডাকতেন 'বড় গাঙ্গুলির স্ত্রী' বলে— রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন তিনি। তাঁর পরনে ছিল একখানি কালো রঙের বেনারসী জরির ডুরে।

বিয়ের সময় কাকিমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা, শহুরে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে···কত বড় আশ্চর্য মানুষ, কাকে তিনি পেলেন, এর কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল— শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদানস্থলে। বাড়ির অবিবাহিত বড়ো মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমিও জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। দালানের এক ধারে বসবার জায়গা ছিল আমাদের। দেখলুম সেখানে বসে স্বচক্ষে কাকিমার সম্প্রদান।

সম্প্রদানের পর বরকনে এসে বাসরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের বউ এলে তার থাকবার জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল আগে থেকেই। বাসর বসলো সেই ঘরেই। বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ভাঁড়-কুলো খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হল ভাঁড়-খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোটো কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠলেন,

ওকি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড়খেলা? ভাঁড়গুলো সব উল্টে-পাল্টে দিচ্ছিস কেন?

রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি— নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় নি। তাই তাঁর লজ্জা সংকোচের কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

জানো না কাকিমা— সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে— কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ বাক্‌সিদ্ধ মানুষ, কথায় তাঁকে হারাতে পারবে না কেউ। তাঁর কাকিমা আবার বললেন,

তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে, তুই এমন গাইয়ে থাকতে?

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন কী চমৎকার ছিল, সে যারা না শুনেছে বুঝতে পারবে না। আমরা যে কানে শুনেছি সে আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। এখন সবই হারিয়ে গেছে, তবু যা পেয়েছি তাই রেখেছি মনে ধরে।

বাসরে গান জুড়ে দিলেন—

আ মরি লাবণ্যময়ী
কে ও স্থির সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে
মার্জিত বদনখানি!
নেহারিয়া রূপ হায়,
আঁখি না ফিরিতে চায়,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী
কে রূপসী নাহি জানি।

দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো। ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন গেয়েছিলেন—সেটা আমার স্মরণ নাই। সেদিনকার পালা ওখানেই শেষ।

কাকিমা প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন— মাত্র ১ বৎসরের বড়ো আমার থেকে। তাই তাঁর সাথে আমাদের বেশ ভাব জমেছিল পরে। নানারকম ছেলেমানুষি গল্প হত খুব। নতুন কাকিমার এক বোনঝি নীরজা থাকতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, তিনিও আমাদের গল্পের দলের একজন। কাকিমার

বিবাহের তিন মাস পরে আরেকটি ঘটনা না বলে পারছি না। ন'পিসিমার প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ। গায়েহলুদে দুপুরে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছি। মধ্যাহ্নভোজনে বসতে প্রায় একটা বেজে গেল। খেয়ে উঠতে দুটো। সেই সময়ে কলকাতা মিউজিয়মে প্রদর্শনী খুলেছে নূতন। সেই প্রথম কলকাতায় প্রদর্শনীর প্রচলন। তিনটের সময় প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে সকলে প্রস্তুত, আমরাও বাড়ি ফেরবার মুখে। মেজো কাকিমার সঙ্গে কাকিমাও যাবেন প্রদর্শনীতে। বাসন্তী রঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাজ করা পাড় বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কথায় বলে বিয়ের জল গায়ে পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে। সেই রোগা কাকিমা দিব্যি দোহারা হয়ে উঠেছেন তখন। রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে জুটলেন সেই সময় সেইখানে হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে খেতে খেতে। কাকিমাকে সুসজ্জিত বেশে দেখে দুষ্টুমি করে গান জুড়ে দিলেন তাঁকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে—

হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও,
আধো নয়নে সখি, চাও চাও!

এমন চড়া সুরে ধরেছেন যে জোর পৌঁছে যায় সবার কানে—

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে,
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে।
হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও,
আধো নয়নে সখি, চাও চাও—
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে।

"রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর"
'সমকালীন', বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ৯-২১

২

সংগীতের সুরসাধনায় ও কাব্যের ছন্দযোজনায় কবি যেমন বাঁধা পথ অনুসরণ করে চলেন নাই, সংসার-পরিচালনায়ও তেমনি সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বাঁধা পথ ধরে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে চলতে দিতে চান নাই। কবিপত্নী ছেলেদের দামি পোশাক পরাতে গেলে কবি বোঝাতেন, বড়োমানুষির আওতায় থাকলে ছেলে মানুষ হয় না, অভ্যাসে তার গলদ জমে ওঠে অনেক। তোমার সন্তানরা খুব ভালো করে যাতে মানুষ হয় তারই চেষ্টা করছি। শুনে কবিপত্নী খুশি হতেন, গৌরব অনুভব করতেন, কিন্তু মনে মনে লুকিয়ে থাকত ছেলেদের সুন্দর সুন্দর দামি পোশাকে সাজাবার সাধ। আশপাশের মানুষদের কাছে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ত দু-এক কথায়। তবে কার্যত তিনি স্বামীর আদর্শই অনুসরণ করে চলতেন।

সাধারণ লোকদের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য কবি আগ্রহ প্রকাশ করতেন খুব— না পারলে মনে কষ্ট পেতেন ও খেদ করতেন। নিজেকে ভেঙে গড়তে চাইতেন তাদের মতো অভ্যাসে অভ্যস্ত করার জন্য। বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন বলে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরি-বাড়ির এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেক দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে— এক সঙ্গে একই খাদ্য।

কবিপত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড়ো ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ বেশেই থাকতে ভালোবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা করে তুলেছিল।

বিলাস বর্জন, উপকরণ বর্জন একমাত্র বুলি ছিল সে সময় কবির মুখে। মেয়েদের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রূপসৃষ্টি, চোখ-ধাঁধানো রঙ-বেরঙের প্রজাপতি প্যাটার্নের সাজসজ্জা ও অলংকারবহুলতার আড়ম্বরের প্রতি ধিক্কার

দিতেন কবি প্রতি কথায়, বলতেন— অসভ্য দেশের মানুষরাই মুখ 'চিত্তির' করে। মুখে রঙ মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে চায়?

আমাদের ধরাধরিতে একদিন কবিপত্নী কানে দুটি দুল ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন, হঠাৎ কবি এসে পড়েন সেই সময় ঘরে, কবির প্রবেশমাত্র লজ্জা পেয়ে তিনি দুই কানে দুই হাত চাপা দিলেন। টানাটানি করে আমরা হাত নামাতে পারলাম না কিছুতেই। তিনি এত কম গহনা ব্যবহার করতেন যে দুটি বীরবৌলি কানে পরেই লজ্জা পেলেন খুব বেশি। সমবয়সী বৌদের সাজতে বলবেন কিন্তু নিজে সাজবেন না এই ছিল তাঁর ভাব। 'বড়ো বড়ো ভাসুরপো ভাগ্নেরা চারি দিকে ঘুরছে— আমি আবার সাজব কি'— তাঁর নিজের মুখের কথা।

কবি, পিতার শেষ সন্তান বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ও সমবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাঁর কয়েকজন।

কবিপত্নী একবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে— লজ্জার কথা! তোমাদের চমৎকার রুচি! কবিপত্নী সে বোতাম ভেঙে ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চার বার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে। কবির পছন্দ সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র— বুঝতে সময় লাগে।

বিদ্যালয়-সূচনার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাবেক বড়ো কুঠিটিতে কবির পরিবার ও আমরা একত্র বাস করেছি অনেক সময়। গৃহস্থালির ভার থাকত কবিপত্নীর, তাঁকে গৃহকর্মে সাহায্য করার ভার আমার। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার আমার স্বামীর। খাওয়া হত চমৎকার, কবিপত্নীর রান্নার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতের বিরাম ছিল না একদিনও। কবি থেকে থেকে পত্নীকে বলতেন, "নীচে বসে লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই সুজি, চিনি চিঁড়ে

ময়দা, মিষ্টি তৈরি হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব।" আমার স্বামীর নাম করে বলতেন, "সে তো কখনো 'না' বলবে না। যত চাইবে ততই দেবে। তার মতো কর্তা ও তোমার মতো গিন্নী হলেই হয়েছে আর কি, দু-দিনে ফতুর।" কবিপত্নী ভাসুরপুত্রের (আমার স্বামীর) নাম করে বলতেন, "সে সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করে সুখ, তোমার এদিকে নজর দেওয়া কেন।"

কবিপত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরি করতেন নিজের হাতে। চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তাঁর হাতের একবার যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা আর ভোলেন নাই। নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথ রায় কবিপত্নীর হাতের তৈরি দইয়ের মালপোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের শখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর শখ বাড়িয়ে দিত বেশি। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস করেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি শখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব করে বলতেন, "দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।" তিনি চটে গিয়ে বলতেন, "তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।"

সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি, কবি নিজের ইচ্ছায় ভর করেই চলেছেন। জন্ম হতে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই-সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের

ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন ; কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব বলেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন এ কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট করে। ঘরের মানুষ— যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা। স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা অনেক সময় কবি-পত্নীকে বলতাম, "বলুন-না কাকিমা কাকামহাশয়কে বলকারক খাদ্য কিছু খেতে।" কবিপত্নী বলতেন, "তোমরা চেনো না, বললে জেদ আরো বাড়বে ; না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তার পরে নিজেই শিখবেন—কারো শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ নন।"

কবি বহু বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর ঘরে যখন কবি নিরামিষভোজী, এমন-কি সময়ে সময়ে অন্নত্যাগ করে শুধু ছোলা ভিজানো, মুগডাল ভিজানো খেয়ে দিন কাটান, তখন কার্যসূত্রে মাঝে মাঝে কবিকে পতিসরে যেতে হত। কবির শাশুড়ী ঠাকুরানী তখন নিজগ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্গত ফুলতলা ছেড়ে পুত্রের কর্মস্থান পতিসরে বাস করতেন। তিনি স্বহস্তে মাছের ব্যঞ্জনাদি রান্না করে জামাতার পাতে দিলে কবি 'না' বলতেন না। কন্যা নাই, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে নিজের ইচ্ছা সেখানে কবি খর্ব করতেন। সঙ্গের ভৃত্য উমাচরণ ফিরে এসে আমাদের কাছে গল্প করত, "এখানে বাবুমশায় খাওয়া নিয়ে এত গোলমাল করেন, পতিসরে কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুন যা দেন তাই খান ; একটি কথা বলেন না— শাশুড়ী কিনা!"

ভৃত্যরা খুশি মনে সহজভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালোবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।

শান্তিনিকেতন কুঠির দোতলায় একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে কবি চা খেতে বসেছেন, ঘরে ভালো মিষ্টি কাকামহাশয়ের জন্যে তৈরি করা হোক

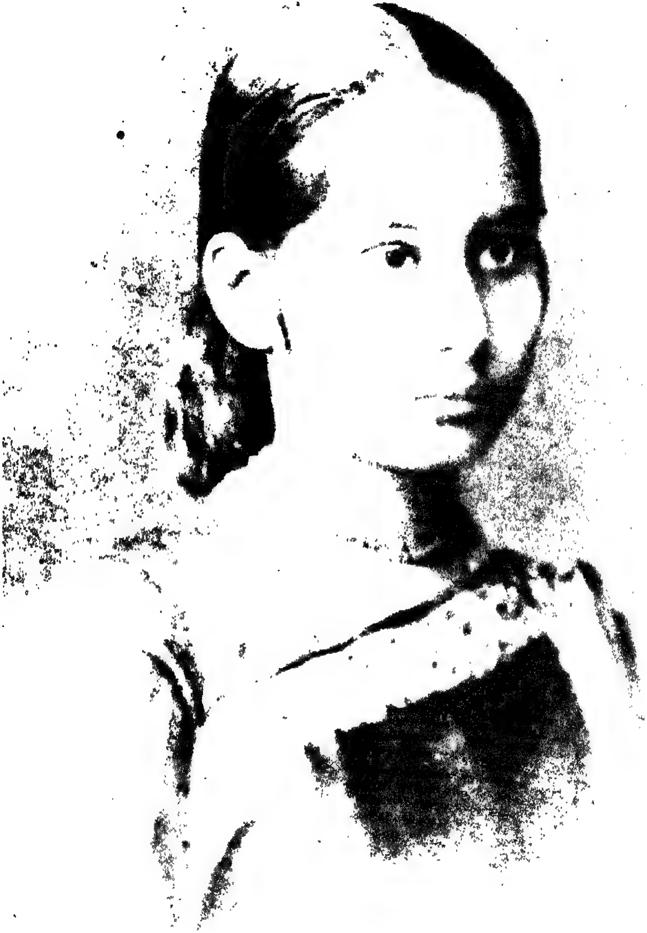

মৃণালিনী দেবী

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত চিত্র। পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

approved.
One dozen required
R Tagore

বলায় কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, "ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নাই।" বুঝলুম কাকিমার হাতের মিষ্টির কথা মনে পড়ে তাঁকে ব্যথা দিল। অন্তরের ব্যথা খুব চেপে রাখেন কবি, কেমন করে সেদিন কথাটুকু মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল।

এইবার উপকরণ-বর্জনের পালা। সংসার-সরঞ্জাম সব-কিছু ফেলে চলো যে-পথে কবি চলেন সেই পথে কবির সঙ্গে। সংসার-সঙ্গিনীর প্রতি এই ছিল তাঁর আর-এক দিকের আর-এক ভাবের কথা।

উপকরণের বোঝা বয়ে চলা সম্বন্ধে কবির মনে গভীর বিরাগ ছিল গোড়া থেকে। মনের চেতনা যাঁদের সূক্ষ্ম, উপকরণের ভার তাঁরা সইতে পারেন না, দুঃখ পান তাই নিয়ে। ঘরছাড়া কবি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে গেছেন কয়েকবার। যাত্রাকালে কবির মুখে এক কথা— উপকরণ আবর্জনা ফেলে যাও, ওদের সঙ্গের সাথী কোরো না। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস— বঁটি, কাটারি, কুরুনি, বারকোশ, কড়া, খুন্তি, হাতার বোঝাটি সঙ্গে যাচ্ছে দেখলেই কবি হুলুস্থুল বাধাতেন। চটেমটে বলতেন, "এ-সব জঞ্জাল জড়ো করা কেন ?" যেন দুখানি বস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোতে পারলেই ভালো হয় কবির মতে।

পথযাত্রায় গৃহস্থালি সরঞ্জাম দু-একটি বেশি সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের ঝোঁক, পুরুষদের দৃষ্টিতে যেগুলি অনাবশ্যক ঠেকে। বোঝা বাড়াও কেন, পুরুষদের কথা। সময়কালে অভাবে ঠেকতে না হয়, মেয়েদের ভাব। প্রায় সকল বাড়ির মেয়েই যাত্রাকালে বাবুদের লুকিয়ে ব্যবহার্য দু-একটি জিনিস সঙ্গে নিয়ে থাকেন। কবির সংসারেও তার ব্যতিক্রম হত না, কবিপত্নীও কতকগুলি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। কৌতুক করে আমাদের কাছে আড়ালে বলতেন, "দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কী করে ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো কবির কম নয়, তখন আনো মালপো,

আনো মিঠাই, ভাজো শিঙাড়া, ভাজো নিমকি, কচুরি, তাও আবার কম হলে চলবে না, পাত্র বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হলে জিনিস আসবে কোথা থেকে সে কথা বলে কে।"

কবি আদর্শের টানে নানা সময়ে নানা ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলতে মনে কোনো দ্বিধা রাখতেন না। আদর্শপ্রবণতা তাঁকে কোথায় কখন কোন্ সংকটে জড়িয়ে ফেলে, এ ভাবনা কবিপত্নীর মনে থাকত। কবি ও কবির পরিবার অভিন্ন; কবি বিপন্ন হলে পরিবারটিরও বিপন্ন-হওয়া স্বাভাবিক।

স্বামী-সন্তানের দেহমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ রাখা পত্নী ও জননীর স্বাভাবিক ধর্ম। সকল জননী, পত্নীর মনে এই আদর্শ জাগ্রত। সংরক্ষণের পথেই এই আদর্শের গতি। পুরুষ ছড়ায়, নারী কুড়ায়, বাঁচায়। ঘরে বাইরে পুরুষ ও নারীর এই আদর্শ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিরহস্যের এক বিশেষ অধ্যায়।

কবির মুখে 'ফেলো ফেলো ছাড়ো ছাড়ো' শুনে কবিপত্নী বলতেন, ঘরকন্না ফেঁদে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করতে গেলে, এক কথায় ফকির সাজা চলে না। পতি-পত্নীর মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান থাকা সম্ভব নয়। একের ভাবে অন্যের যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবির ভাব কবিপত্নী অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেন নাই।

শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ শিক্ষালয় গঠনের যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিণী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরির ভাব নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হতেই বিদ্যালয়ের জননী কবিপত্নীর আয়ু হল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও।

প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন ; ভাড়া-করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের, সাধ্বী নারীমাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্তরূপে। তখন ইলেকট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নি দেশে। হাতপাখা হাতে ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে ; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।

মায়ের বাড়াবাড়ি রোগের সময় ছেলেগুলিকে রেখে গিয়েছিলেন কবি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। আচ্ছন্ন অবস্থায় কবিপত্নী অনেকবার বলতেন, "আমাকে বলেন ঘুমাও ঘুমাও, শমীকে রেখে এলেন বিদ্যালয়ে, আমি কি ঘুমাতে পারি তাকে ছেড়ে! বোঝেন না সেটা!" জননীর শেষ সন্তান শমী তখন শিশু। ছেলেদের সে সময় যত্নে ও সাবধানে রাখার পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান, কবি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর ছায়া তাদের মনে ঘনিয়ে আসবে সেটা যেন কবি সইতে পারতেন না।

সন্তানস্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না, প্রথম সন্তানের সম্যক্ যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো, কবি সব করতেন নিজের হাতে। এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।

সন ১৩০৯ সালে ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩ নবেম্বর, ১৯০২) রবিবার, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ১১ মাস পরে, মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে কবিপত্নী পরলোক গমন করেন, আমি সেদিন অসুস্থ, শয্যাশায়ী। নিজে সে সময়ে যেতে পারি নি ; রাত্রে আমার স্বামী এসে বললেন, "খুড়ির মৃত্যু হয়েছে, কাকামশাই একলা ছাদে চলে গেছেন, বারণ করেছেন

কাউকে কাছে যেতে।" প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারি করে কাটিয়েছেন শোনা গেল। কবির পিতা মহর্ষিদেব তখন জীবিত। পুত্রের পত্নীবিয়োগের সংবাদে তিনি বলেন, "রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোটো ছেলে-মেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।" ভাগ্যবতী কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা পরিবেষ্টিত সাজানো সংসার ফেলে গেলেন— কবির সংসার গেল ভেঙে। সেই থেকে নিজের ভাঙা সংসার টেনে নিয়ে চলে আসছেন কবি এ পর্যন্ত। অসংখ্য ভাঙাচোরার বোঝা বুকে নিয়ে কবির সেই ভাঙা সংসার আজ বিশ্বভারতীর বিরাট্ পর্বে হতে চলেছে পরিসমাপ্ত।

"সংসারী রবীন্দ্রনাথ"
'প্রবাসী', পৌষ ১৩৬৪, পৃ. ৩০২-০৭

৬. ঊর্মিলা দেবী

আমার দিদি প্রায়ই জোড়াসাঁকোয় যেতেন, কখনো একসঙ্গে দু-তিন মাসও থেকেছেন। আমার ভারি হিংসে হত, কিন্তু কিছু বলার সাহস ছিল না। তাই তিনি যেদিন বললেন "যাবি আমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয়?" সেদিন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম। কতকালের অভীপ্সিত দিন আজ। আমি যাব ঠাকুরবাড়ি! সে-বাড়ির কত কথা কত গল্প যে শুনেছি তার ঠিক নেই। সে-বাড়ির মেয়ে-বউরা অপ্সরার মতো দেখতে, তাঁরা দুধ দিয়ে স্নান করেন, ক্ষীর সর ছানা বেটে রূপটান মাখেন— কত গয়না, কত কাপড় যে আটপৌরে পরেন তার ঠিক নেই! সে-বাড়ি যাব, তাঁদের-সব দেখব, আবার সঙ্গিনীদের কাছে গল্প করব! আর চাই কী! সবচেয়ে বড়ো কথা

কবিপ্রিয়াকে দেখব। সেদিনের কথাটি এখনো বেশ মনে আছে। দিদি যাঁর কাছে আমায় নিয়ে গিয়ে বললেন "কাকিমা, এটি আমার ছোটবোন", যিনি আদর করে আমায় কাছে টেনে নিয়ে বললেন "তোমার নাম কী?" তিনি নিতান্তই সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরে বসেছিলেন। গায়ে গয়নাও তেমন দেখলুম না। সাহস করে মুখের দিকে চাইলাম— এই কবিপ্রিয়া! রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, সেরকম তো ভালো দেখতে নন। আবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি এক অপরূপ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা যেন ঢল ঢল করছে, আর একটা মাতৃত্বের আভায় যেন মুখখানা উজ্জ্বল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। তার পর প্রায়ই সে-বাড়ি গিয়েছি, দিদির সঙ্গে থেকেছিও কখনো কখনো। ক্রমেই বুঝতে লাগলাম তিনি খুবই অসাধারণ নারী। যে মাতৃত্বের আভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাই দিয়ে যেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়— আত্মীয় স্বজন দাসী-চাকর সকলকেই আপন করে রেখেছিলেন। সাজগোজ বেশি কখনো করতেন না। কবিবর মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠ সন্তান— ভাইপো-ভাইঝিরা কেউ সমবয়সী, কেউ-বা অল্পই ছোটো; কিন্তু কবিপ্রিয়া এই সম্বন্ধের গুরুত্বটা যেন বেশ বুঝতেন। তিনি 'কাকিমা'; 'মামিমা', বড়ো বড়ো ছেলে-মেয়ে-বউদের সামনে আবার সাজ গোজ করবেন কী— এমনি যেন ভাবটা। রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড়ো তৃপ্তি পেতেন। আমার দাদা যখনই যেতেন, সিঁড়ি থেকেই বলতে-বলতে উঠতেন "কাকিমা, আজ কিন্তু এটা খাব", "আজ কিন্তু ওটা খাব"; তক্ষুনি রান্নাঘরে গিয়ে সেটা তৈরি করতে বসতেন। কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চ কণ্ঠে "ছোটোবউ ছোটোবউ" করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। আমার ভারি মজা লাগত শুনে, তাই বোধ হয় আজও মনে আছে।

কবি অত্যন্ত ভোজনরসিক ছিলেন। খাওয়াটা যে শুধু পেট ভরাবার জন্য নয়, তাতেও যে শিল্পীমনের যথেষ্ট খোরাক আছে, তা তাঁর খাওয়া

দেখলেই বোঝা যেত। তিনি ভোজনপ্রিয় ছিলেন না, ভোজনরসিক ছিলেন, আমার মেজদিদিও রন্ধনপটু ছিলেন, কবিকে তিনি অনেক রকম খাবার করে খাওয়াতেন। একদিন তিনি একরকম মিষ্টি করেছিলেন, আমাদের বাঙাল দেশে তাকে বলে এলোঝেলো। কবি সেটা খেয়ে খুব খুশি হলেন ও তার নাম জানতে চাইলেন। নাম শুনে তিনি নাক সিঁটকে বললেন, "এই সুন্দর জিনিসের এই নাম? আমি এর নাম দিলাম 'পরিবন্ধ'।" সেই থেকে ঐ নাম আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

তখনকার দিনে তিনি গান রচনা করতেন একেবারে সুর কথা একসঙ্গে। বড়ো বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যেই শেষ হল অমনি চিৎকার আরম্ভ করলেন, "অমলা, ও অমলা, শীগগির এসে শিখে নাও, এক্ষুনি ভুলে যাব কিন্তু।" কবিপ্রিয়া হাসতেন খুব, "এমন মানুষ আর কখনো দেখেছ অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়?" কবি অমনি বলতেন, "অসাধারণ মানুষদের সবই অসাধারণ হয়, ছোটোবউ— চিনলে না তো!" আমার দিদির সঙ্গে কবিপ্রিয়ার খুব ভাব ছিল। দুজনে গল্প আরম্ভ করলে আর শেষ হত না। কবি নিজে এ নিয়ে খুব কৌতুক করতেন। একদিন হয়েছে কি, কবি তাঁর ঘরে টেবিলে বসে লেখাপড়া করছেন আর শোবার ঘরে তাঁদের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কবিপ্রিয়া আর আমার দিদি খুব গল্প করছেন। এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে, কবি কখন যে এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন কেউ টের পাননি। হঠাৎ মাথার কাছ থেকে বলে উঠলেন, "আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আমার ঘুম পায় না?" যেমন কথা কানে গেছে দিদি তো বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট উঠিপড়ি করে। কবি তখন খুব হাসছেন আর বলছেন, "অমলা, ও অমলা, অত ছুটো না, পড়ে যাবে যে!" আর পড়ে যাবে। একেবারে ছুটে এসে বিছানায় মুখ লুকিয়ে পড়ে আছেন। সকালবেলা দেখা হতে কবি একটু একটু হাসছেন আর বলছেন, "অত লজ্জা পাবার কী হল তোমার? আমি তো বেশ উপভোগ করছিলাম ব্যাপারটা।"

এ-সব কথা কিছু-কিছু আমার প্রত্যক্ষ, কিছুটা আমার দিদির কাছে শোনা।…

কবিপ্রিয়ার মধ্যে একটা জিনিস খুব উজ্জ্বল হয়ে ছিল, আর সেটা তাঁর জীবনপথের আলো হয়ে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। সেটি শ্বশুরের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছি, "বাবামশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না।" কবির সঙ্গে তর্ক করেছেন এভাবে, "বাবামশায় এটা পছন্দ করেন না, এটা আমি করব না।" কিংবা, "বাবামশায় থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে?" এটা যেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মহর্ষিদেবের সন্তানদের মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন কনিষ্ঠটি। এই পুত্রবধূটির প্রতিও তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। আর প্রগাঢ় স্নেহ ছিল রথীর প্রতি। রথীর রঙ ময়লা এটা কিছুতে মহর্ষি স্বীকার করতেন না। বলতেন, "তোমরা কী যে বল, রথী তো রবির চেয়ে ফরশা।" এ নিয়ে তাঁর সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস না পেলেও আড়ালে বেশ হাসাহাসি হত।

কবিপ্রিয়ার কিন্তু কবির উপর অখণ্ড প্রতাপ ছিল। কবি তাঁকে বেশ ভয় করতেন। তাঁর অভিমানও প্রবল ছিল, আর সে-অভিমান ভাঙতে কবিকে বেশ বেগ পেতে হত। কিন্তু এঁটে উঠতে পারতেন না তিনি তাঁর মেজ মেয়েটিকে। রানী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিল। কি যে এক সন্ন্যাসিনীর মন নিয়ে এসে জন্মেছিল ঐশ্বর্যের মধ্যে! বিধাতার অনেক অদ্ভুত খেয়ালই বোঝা যায় না তো! খুব যে সুন্দর দেখতে ছিল তা নয়, কিন্তু চোখদুটির মধ্যে এমন একটি ভাব ছিল যে তা থেকে চোখ ফেরানো যেত না। শিশুকাল থেকে তার সাজগোজ ভালো লাগত না, চুল বাঁধা তো একটা বিরক্তিজনক ব্যাপার ছিল। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও তার ঔদাসীন্যের অন্ত ছিল না। মাছমাংস খাওয়ার স্পৃহামাত্র ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল প্রচণ্ড। সে যখন এক দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াত তখন কারো সাধ্য ছিল না

তাকে দিয়ে কিছু করায়। এজন্য শাসন সে যথেষ্ট পেত। তার মা তো একেবারে অস্থির হয়ে পড়তেন এক-এক সময়ে— "কী যে ছিষ্টিছাড়া মেয়ে জন্মেছে, আর পারি নে, বাপু।" এক-এক সময়ে বলতেন। রানী কিন্তু বকুনি শাসন শাস্তি সবেতেই অচল অটল। কবি কিন্তু তাঁর এই মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন, তাকে বুঝতেনও হয়তো। লেগে যেত কবিপ্রিয়ার সঙ্গে আমার দিদির সঙ্গে রানীকে নিয়ে। তিনি বলতেন, 'কাকিমা, আপনারা কেউ ওকে বোঝেন না! ওর মধ্যে যে একটা মহাপ্রাণ আছে তা আপনারা দেখেন না।" রানী যখন খোলা ছাতে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াত, চুলগুলো তার বাতাসে নাচত মনে হত একটি তেজী ঘোড়া যেন মুক্তির আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রানী সম্বন্ধে দুটো ঘটনা খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে। নীতুবাবু রানীকে বড্ড ভালোবাসতেন, তার প্রত্যেক জন্মদিনে বেশ দামি দামি উপহার এনে দিতেন। একবার রানীর জন্মদিনে আমরাও গিয়েছি। 'লেড্‌ল'র বাড়ি থেকে একটা বাক্স এল নীতুবাবুর উপহার নিয়ে। বাক্স থেকে বেরোল এক বহুমূল্য ফ্রক, লেস ফ্রিল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সিল্কের ফ্রক। ফ্রকের বাহার দেখে সকলেই খুব খুশি, সকলেই খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। রানীকে ডেকে সেই ফ্রক তার গায়ে চড়ানো হল। সে হতভম্ব হয়ে আয়নার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একবার লেসগুলোতে হাত দেয় আর মুখ বাঁকায়, একবার ফ্রিলগুলো তুলে তুলে দেখে আর মুখ বাঁকায়। একটু পরে পটপট করে লেসগুলো ফ্রিলগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্রকটা টেনে গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে তো হুলস্থূল। তার মা আমার দিদিকে ডেকে বললেন, "ও অমলা, দেখে যাও তোমার অসাধারণ বোনটির কাণ্ড। আমি এখন নীতুকে মুখ দেখাব কী করে?"—ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমার দিদি তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে কৌচে বসলেন। সে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে রইল। একটু পরে দিদি বললেন,

"রানী, কাজটা ভালো কর নি ভাই। তোমার মা দুঃখ পেয়েছেন, তোমার নীত্‌দা শুনলে কত দুঃখ পাবেন।" সে মুখ তুলল, বিষণ্ণ দুটি চোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "অমলাদি, ওরা জানে আমি এ-সব ভালোবাসি নে, এ-সব পরতে আমার কষ্ট হয়, তবু কেন আমায় ওরা জোর করে পরায়?"

আর একবার মহাল থেকে মাছ এসেছে, সবাই ছুটে দেখতে গেছে। দুটো প্রকাণ্ড কাতলা মাছ তখনো একটু-একটু খাবি খাচ্ছে। সবাই নানা-রকম জল্পনা-কল্পনা করছে, মাছ দিয়ে কী-কী রান্না হবে। রানীও এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল, "ও মা, মা গো, ঐ মাছ তোমরা খাবে? ওরা যে এখনো বেঁচে আছে।" বলে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ছুটে পাশের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কী তার কান্না!

একদিন কবি এসে বললেন, "ছোটোবউ, রানীর বিয়ে ঠিক করে এলুম, মাঝে মাত্র তিনটি দিন আছে, তার পরদিন বিয়ে।" কবিপ্রিয়া অবাক হয়ে বললেন, "তুমি বল কি গো? এরই মধ্যে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে?" কবি বললেন, "ছেলেটিকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে ছোটোবউ, যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি মিষ্টি অমায়িক স্বভাব। রানীটা যে জেদী মেয়ে, ওর বর একটু ভালোমানুষ-গোছের না হলে চলবে কেন? আর সত্যেন বিয়ের দুদিন পরেই বিলেত চলে যাবে। সে ফিরতে ফিরতে রানী বেশ বড় হয়ে উঠবে।" কবিপ্রিয়া বললেন, "এই তিন দিনের মধ্যে সব জোগাড় কী করে হবে?" "হবে হবে, সব হবে, কলকাতা শহরে নাকি কিছু আটকায়? শুধু তুমি একটু প্রসন্ন মনে কাজে লেগে যাও তো, ছোটোবউ, সব ঠিক হয়ে যাবে।" হলও তাই। তবে রানীর বিয়েতে সমারোহ বেশী কিছু হল না। রানী কিন্তু এ বন্ধনটা খুব খুশি মনে নিতে পারল না, তার ভুরু একটু কুঁচকেই রইল। বিয়ের পরই বর বিদায় হবে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হল। বিয়ের সব কাজেই সে লক্ষ্মী মেয়ের মতো মাথা নিচু করে রইল।...

এক কথায় কত কথা এসে গেল তার ঠিক নেই। যাক, আমার মনে হয়, কবিপ্রিয়া যদি অকালে না চলে যেতেন তবে কবির শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত সকল দিক দিয়ে। ছেলেরা ঘর ছেড়ে এসে ঘর পেত, মাতৃস্নেহ পেত, রোগে সেবাযত্ন পেত, আর সুখে-দুঃখে সহানুভূতি পেত। কবি যে এ অভাবে কত অসহায় হয়েছিলেন তা তাঁর কথায় একদিন আমি বুঝেছিলুম। যখন আমার ছেলেকে রাখতে আমি শান্তিনিকেতনে যাই তখন আমায় বলেছিলেন, "তোমাদের ছেলেরা যে যত্নে মানুষ, এখানে কি থাকতে পারবে? এখানে অনেক কষ্ট। আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে-বিষয়ে আমায় অসহায় করে রেখে গেছেন।" তার দীর্ঘদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তখনো সে-অভাব তিনি বোধ করছেন।

কবিপ্রিয়া স্বর্গতা হবার অনেকদিন পর কী একটা কারণে কবির সংসারে একটা ক্ষণিক বিপ্লব ঘটে। তখন একদিন তিনি আমার মেজদিদিকে বলেছিলেন, "দেখো, অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে-কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।"

"কবিপ্রিয়া"

'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পৃ. ৪৪-৪৯

৭. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে— মা ছিলেন তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে। সেইজন্য ছেলেবেলার কথা মনে করতে গেলে মায়ের কথাই বেশি মনে পড়ে। তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাঁর সংসার ছিল সুবৃহৎ। বাড়ির ছোটোবউ হলে কি হয়, জোড়া-সাঁকো-বাড়ির তিনিই প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। কাকিমার কাছে সকলেই ছুটে আসত তাদের সুখদুঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের সুখে সুখী। তাঁকে কোনোদিন কর্তৃত্ব করতে হয় নি, ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন। সেইজন্য ছোটোরা যেমন তাঁকে ভালোবাসত, বড়োরা তেমনি স্নেহ করতেন। সকলের মধ্যে বলুদাদা তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মা কখনো ইস্কুলে লেখাপড়া শেখেন নি— বাবার কাছেই যা শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকেই বলুদাদা সাহিত্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে যখন যে-কোনো বই পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে না শোনালে তাঁর তৃপ্তি হত না। বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল। বলুদাদা আমাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো খুব স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন আমার বালকবয়সের আদর্শ পুরুষ। সব সময়েই তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরতুম। মা স্নান করিয়ে দিতেন, কিন্তু প্রসাধন করতে যেতুম বলুদাদার কাছে।…

আমাদের তেতলার ঘরের সামনে মস্তবড়ো ছাদ। তার মাঝখানটা আবার উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো— যেন বাড়ির খোলা বৈঠকখানা। সমস্তদিন ধরে এখানে চলত ছেলেমেয়েদের হুটোপাটি— তাদের শিশুকণ্ঠের কলরব মুখরিত করে রাখত চার পাশ। রোদ পড়ে গেলেই চাকররা জাজিম তাকিয়া পেতে দিয়ে যেত মাঝখানে উঁচু জায়গাটায়। মেয়েদের তখন

সেখানে মজলিস বসত। চা-পান তখন চলন হয় নি। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন, ঘরে যেদিন যা তৈরি করতেন সকলকে তাই বিতরণ করতেন। গ্রীষ্মকালে সেইসঙ্গে থাকত আমপোড়া শরবত।…

বাবাদের 'খামখেয়ালী সভা' যখন আরম্ভ হয় তখন আমি একটু বড়ো হয়েছি। তাই এই বৈঠকের বিষয় স্পষ্ট মনে আছে। এই সভার কোনো নিয়ম-কানুন ছিল না। পনেরো-কুড়িজন বন্ধুবান্ধব[১] মিলে এই সভা। বাবা ও বলুদাদার উৎসাহে এর প্রতিষ্ঠা হয়। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার কোনো নিয়ম না থাকলেও, লেখক কবি শিল্পী সংগীতজ্ঞ ও অভিনেতাদের নিয়েই সভা গঠিত হয়।… সভার প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— প্রতি মাসে এক-একজন সভ্য পালা করে তাঁর বাড়িতে অন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। সেদিন সেখানেই বৈঠক বসত। যদিও আহারের প্রচুর আয়োজন থাকত— কিন্তু সেটা উপলক্ষ মাত্র। কবিতা বা গল্প পড়া, ছোটোখাটো অভিনয় ও গানবাজনা করা এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

…বাবার যেবার নিমন্ত্রণ করার পালা পড়ল, বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। মাকে ফরমাস দিলেন খাওয়ানোর সম্পূর্ণ নতুন রকম ব্যবস্থা করতে হবে। মামুলী কিছুই থাকবে না, প্রত্যেকটি পদের বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। ফরমাস করেই নিশ্চিন্ত হলেন না, নতুন ধরনের রান্না কী করে রাঁধতে হবে তাও বলে দিতে লাগলেন। মা বিপদে পড়লেন। তিনি প্রতিবাদ না করে নিজের মতে ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বাবা মনে করতেন, খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র, রান্না ভালো হলেই হল না— খাবার পাত্র, পরিবেশনের প্রণালী, ঘর সাজানো সবই সুন্দর হওয়া চাই। যেখানে খাওয়ানো হবে

---

[১] নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রিয়নাথ সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ, অক্ষয় চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, সন্তোষের প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি।

তার পরিবেশে শিল্পীর হাতের পরিচয় থাকা চাই। মা রান্নার কথা ভাবতে লাগলেন, অন্যরা সাজানোর দিকে মন দিলেন।…

১৮৯৭ সালে বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়।… সেই সময়ে সেবার নাটোরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল। নাটোরের মহারাজা নিমন্ত্রণকর্তা— আমাদের বাড়ির সকলকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে। পুরুষরা সকলেই নাটোরে চলে গেলেন। তার দুদিন বাদেই ভূমিকম্পে কলকাতা শহর তোলপাড় করে দিল। অনেক বাড়ি পড়ল, মানুষও মারা গেল। নীচে নামবার সময় ছাদ থেকে টালি ভেঙে মা'র মাথায় পড়ল। একতলায় একটা ঘরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হল। নিজের আঘাতের যন্ত্রণা অপেক্ষা দুশ্চিন্তা তাঁর বেশি হল। বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই— নাটোরে তাঁদের কী হচ্ছে খবর নেবার উপায় নেই। রেলপথ বন্ধ, টেলিগ্রাম-যাতায়াত বন্ধ।…

বাবা মনে করতেন— রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু ছেলেদের পড়ে শোনানো যায় বা তাদের হাতে পড়তে দেওয়া যায় এমন কোনো বই তখন ছিল না। ভাষার বিশেষ পরিবর্তন করে, প্রক্ষিপ্ত ও অবান্তর ঘটনা বাদ দিয়ে মূল গল্প দুটি অটুট রেখে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করার আগ্রহ তাঁর এই সময়ে দেখা গেল। রামায়ণ সংক্ষিপ্ত করার ভার দিলেন মাকে আর মহাভারত সুরেনদাদাকে। তাঁকে বললেন কালীপ্রসন্ন সিংহের তর্জমা অবলম্বন করে সংক্ষিপ্ত করতে। রামায়ণ সম্বন্ধে কিন্তু মাকে বললেন মূল সংস্কৃত থেকে সংক্ষেপ করে তর্জমা করতে। পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে মা আগাগোড়া রামায়ণ পড়ে নিয়ে তর্জমা করতে লাগলেন। প্রয়োজনমতো বাবা পরিবর্তন বা সংশোধন করে দিতেন। একটি বাঁধানো খাতাতে কপি করে রেখেছিলেন— তার থেকে মাঝে মাঝে আমাদের পড়ে শোনাতেন। মৃত্যুর পূর্বে মা এ কাজটি সম্পূর্ণ

করে যেতে পারেন নি, তবে অল্পই বাকি ছিল। দুঃখের বিষয়, বাবার মৃত্যুর পর যখন তাঁর সমস্ত কাগজপত্র রবীন্দ্রসদনে দেওয়া হল তখন এই খাতাটি পাওয়া গেল না।

…শিলাইদহে থাকতে বাবা আমাদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে যেমন নজর দিয়েছিলেন, অন্য দিকে মা চেষ্টা করতেন আমাদের সবরকম ঘরকন্নার কাজ শেখাতে। তাঁর প্রণালী ছিল বেশ নতুন রকমের। রবিবার দিন তিনি চাকরবামুন সকলকে ছুটি দিতেন। সংসারের সমস্ত কাজ আমাদের করতে হত। রান্নার কাজে আমার খুব উৎসাহ বোধ হত— রান্না কেমন হল, তা বোঝবার জন্য রাঁধুনির মাঝে মাঝে চেখে দেখার স্বাধীনতায় কেউ তো বাধা দিতে পারে না।

…লেখার ফাঁকে ফাঁকে যখন বাবাকে গান পেয়ে বসত— অমলাদিদিকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। দিনের বেলায় অমলাদিদি মায়ের সঙ্গে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মুখরোচক নানারকম ঢাকাই-রান্নাতে তাঁর হাতযশ ছিল— মা তাঁর কাছ থেকে সেই-সব রান্না শিখে নিতেন। আর মা শেখাতেন তাঁকে যশোহর অঞ্চলের নিরামিষ ব্যঞ্জন রাঁধার পদ্ধতি। সন্ধে হলেই, অন্য-সব কাজ ফেলে গান শোনবার জন্য সবাই সমবেত হতেন। মাঝিরা জলিবোটটা বজরার গায়ে বেঁধে দিয়ে যেত। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে জানলা দিয়ে টপকে সেই বোটটাতে গিয়ে বসতুম। সুরেনদাদার হাতে এসরাজ থাকত। জলিবোট খুলে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলে রাখা হত। তারপর শুরু হত গান— পালা করে বাবা ও অমলাদিদি গানের পর গান গাইতে থাকতেন। আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত অবারিত জলরাশি, গানের সুরগুলি তার উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে গিয়ে কোন্ সুদূরে যেন মিলিয়ে যেত, আবার ওপারের গাছপালার ধাক্কা খেয়ে তার মৃদু প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে ফিরে আসত। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে চারি দিক নিঝুম হয়ে আসত। নৌকা চলাচল তখন বন্ধ। বোটের

গায়ে থেকে-থেকে ঢেউগুলি এসে লাগছে এবং কুলুকুলু শব্দ করে স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে নদীর জল কোথাও কোথাও ঝিকিমিকি করে ওঠে। কখনো দু-একটা জেলে-ডিঙিতে মাঝিরা ভাটিয়ালি সুরে দাঁড় ফেলার তালে তালে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। গানের আসর ভাঙবার আগেই আমি মার কোলে ঘুমিয়ে পড়তুম।

…বাবা সমস্তদিন ধরে লিখতেন তাঁর ঘরে— সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ— মা বারণ করে দিয়েছিলেন। লেখার ঝোঁক যখন বেশি চাপত তখন খাওয়া-দাওয়া এক-রকম ছেড়ে দিতেন। মা খুব রাগারাগি করতেন কিন্তু তাতে কোনো ফল হত না। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে : বাবা তখন সরলাদিদির উপর 'ভারতী'র সম্পাদনভার ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁর ভার লাঘব বিশেষ-কিছু হল না। লেখার জন্য তাঁর উপর দাবি সমানই থেকে গেল। প্রতিমাসেই সরলাদিদির কাছ থেকে তাগিদের চিঠি আসে। সরলাদিদি ভারতীর জন্য বাবাকে একটা প্রহসন লিখে দিতে বলেন কিন্তু বাবার সময় আর হয় না। এদিকে বড়ো লেখা না হলে সরলাদিদির চলে না, তাই তিনি গত্যন্তর না দেখে তাঁর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন যে, পরের মাস থেকে ভারতীতে নিয়মিত রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রহসন বেরোবে। ভারতীর পক্ষ থেকে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে বাবাকে বিজ্ঞাপনের খবরটাও জানিয়ে দিলেন। চিঠি পেয়ে বাবা প্রথমটা একটু বিরক্ত হন। কিন্তু সরলাদিদিকে বিপদগ্রস্ত করতে পারেন না, কাজেই অবিলম্বে লেখায় হাত দিলেন। 'আমি লিখতে যাচ্ছি— খাবার জন্য আমাকে ডাকাডাকি কোরো না', এই বলে তিনি লিখতে বসে গেলেন। খেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে সমস্ত দিন ধরে লিখতে লাগলেন। মা মাঝে মাঝে ফলের রস বা শরবত তাঁর টেবিলে রেখে আসতেন। যখনই এই প্রহসনের মাসিক কিস্তি পাঠাবার সময় হত, বাবা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে লেখায় ডুবে যেতেন।

একবার এরকম একটা মাসিক কিস্তি লেখা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, বাবা মাকে বললেন, 'আমার গল্পটা লেখা শেষ হয়ে গেছে, আমাকে এখনি কলকাতায় যেতে হবে।' এই কথা শুনে মা কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। তিনি জানতেন, কোনো লেখা শেষ হলে সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সেটা যতক্ষণ না পড়ে শোনাচ্ছেন— বাবা স্বস্তি বোধ করতেন না। এই অভ্যাস তাঁর বরাবর থেকে গিয়েছিল। গল্পটার তখন নাম দিলেন— 'চিরকুমার সভা'। পরে এটা পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে। এই নামটি বোধ হয় বাবার বিশেষ পছন্দ হয়নি। উপন্যাসটি যখন নাটকে পরিবর্তিত হল তখন তার নাম 'চিরকুমার সভা'ই রইল।

লেখার খাতা নিয়ে বাবা চলে গেলেন কলকাতায়। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম ও তার উপর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সেবার এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তেতলার ঘরে উঠতে সিঁড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পর খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর আর স্বাধীনতা রইল না, মায়ের ব্যবস্থাই তাঁকে মেনে চলতে হত।

...ইস্কুলের বোর্ডিঙে আমি থাকব— মায়ের সেটা ভালো লাগত না। বিশেষভাবে তাঁর খারাপ লাগত ইস্কুলের রান্নাঘরের বামুনদের বিশ্রী রান্না আমাকে খেতে হচ্ছে মনে করে। কিন্তু বাবার বিশেষ ইচ্ছে আমি অন্যান্য ছেলেদের মতো বোর্ডিঙে থাকি, তাই তিনি কোনো আপত্তি কখনো প্রকাশ করেন নি। বুধবার ছুটির দিন মা মনের আক্ষেপ মেটাতে চেষ্টা করতেন। বাড়িতে তিনি সেদিন নিজে রান্না করতেন— আমার সঙ্গে বোর্ডিঙের সব ছেলেরাই খেতে আসত। এই নিয়মিত খাওয়াতে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি হত না— বেশি ভালো লাগত যখন দল বেঁধে অসময়ে এসে মায়ের ভাঁড়ার ঘর লুট করে নিতে যেতুম। তিনি পরে জানতে পেলেও আমাদের কিছু বলতেন না।

শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাসের জন্য পৃথক্‌ বাড়ি তখন ছিল না,

আমরা থাকতুম আশ্রমের অতিথিশালার দোতলায়। রান্নাবাড়ি ছিল দূরে। মা রান্না করতে ভালোবাসতেন, তাই দোতলার বারান্দার এক কোণে তিনি উনুন পেতে নিয়েছিলেন। ছুটির দিন নিজের হাতে রেঁধে আমাদের খাওয়াতেন। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন। আমরা জানতুম, জালের আলমারিতে যথেষ্ট লোভনীয় জিনিস সর্বদাই মজুত থাকত— সেই অক্ষয় ভাণ্ডারে সময়ে অসময়ে সহপাঠীদের নিয়ে এসে দৌরাত্ম্য করতে ত্রুটি করতুম না। বাবার ফরমাশমত নানারকম নতুন ধরনের মিষ্টি মাকে প্রায়ই তৈরি করতে হত। সাধারণ গজার একটি নতুন সংস্করণ একবার তৈরি হল, তার নাম দেওয়া হল 'পরিবন্ধ'। এটা খেতে ভালো, দেখতেও ভালো। তখনকার দিনে অনেক বাড়িতেই এটা বেশ চলন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন বাবা যখন মাকে মানকচুর জিলিপি করতে বললেন, মা হেসে খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু তৈরি করে দেখেন এটাও উতরে গেল। সাধারণ জিলিপির চেয়ে খেতে আরো ভালো হল। বাবার এইরকম নিত্য নতুন ফরমাশ চলত, মা-ও উৎসাহের সঙ্গে সেইমত করতে চেষ্টা করতেন।

কলকাতায় মা আত্মীয়স্বজনের স্নেহবন্ধনের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবারের পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালোবাসত, জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা তাঁর পক্ষে আনন্দকর হয় নি। অস্থায়িভাবে অতিথিশালার কয়েকটা ঘরে বাস করতে হল, সেখানে গুছিয়ে সংসার পাতার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে সেটা যতই কষ্টকর হোক তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ইস্কুলের কাজে বাবাকে প্রফুল্লচিত্তে সহযোগিতা করতে লাগলেন। তার জন্য তাঁকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েকগাছা

চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা-কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল তা আগেই তিনি বেচে দিয়েছিলেন। যে বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তাঁর সাময়িক শখের জিনিস ছিল না। বহুদিন ধরে যে-শিক্ষার আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে কল্পনার আকারে ছিল তাকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তিনি কেবল আদর্শবাদী ছিলেন না, আদর্শকে রূপায়িত না করতে পারলে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, যতই তা কঠিন হোক-না কেন, তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই ত্যাগ স্বীকারে মা তাঁর অংশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের আত্মীয়েরা মাকে এইজন্য ভর্ৎসনা করতেন, বাবাকে তো তাঁরা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মনে করতেন। বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে, আর মা যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁকে, বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস থাকার পর মায়ের শরীর খারাপ হতে থাকল। যখন নিতান্তই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। বাবা তখন কলকাতায়, দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথকে লিখলেন মাকে নিয়ে কলকাতায় আসতে। বোলপুর থেকে কলকাতায় মাকে নিয়ে সেই যে যাওয়া— আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে একটি সামান্য কারণে। মা শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পাশে বসে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দেখছি— কত তালগাছের শ্রেণী, কত বুনো খেজুরের ঝোপ, কত বাঁশঝাড়ে ঘেরা গ্রামের পর গ্রাম, কখনো চোখে পড়ল মস্তবড়ো মহিষের পিঠে নির্ভয়ে বসে আছে এক বাচ্চা ছেলে— এই-সব গ্রাম্য দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো চলে যাচ্ছে।

একসময়ে নজরে পড়ল জনশূন্য মাঠের মাঝে ভাঙা পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর— তার যেটুকু জল আছে, ঢেকে গেছে অসংখ্য শাদা পদ্মফুলে। দেখে এত ভালো লাগল, মাকে ডেকে দেখালুম। তার পর কত বছর গেছে, প্রতিবারই বোলপুর কলকাতা যাতায়াতের সময় সেই পদ্মপুকুর দেখার চেষ্টা করি। কেবল দেখতে পাই— পুকুরে জল নেই, মাটি ভরে মাঠের সঙ্গে পুকুর সমান হয়ে গেছে, পদ্ম সেখানে আর ফোটে না।

কলকাতায় এসে মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা কী অসুখ ধরতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে লাগলেন। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা— প্রতাপ মজুমদার, ডি. এন. রায় প্রভৃতি সর্বদাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমন-কি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ব্যবস্থা দিতেন। এঁদের চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও মা সুস্থ হলেন না। আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয় নি।

মৃত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, নিস্তব্ধ, নিঝুম; কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনি বুঝতে পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড়। বাবা

সকলের সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলুম। একমাস ধরে তিনি অহোরাত্র মার সেবা করেছেন, নার্স রাখতে দেন নি, শ্রান্তিতে শরীর মন ভেঙে পড়ার কথা। তার উপর শোক। যখন সকলে চলে গেল, বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্বদা ব্যবহৃত চটিজুতো জোড়াটি আমার হাতে দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।' এই দুটি কথা বলেই নীরবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মায়ের সেই চটি এখন রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে চলে এলুম। বাবা বিদ্যালয়ের কাজে আরো যেন মন ঢেলে দিলেন। কাজের ফাঁকে নিভৃতে বসে শোকদগ্ধ হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করলেন গুটিকতক কবিতায়— যা বই আকারে পরে বেরিয়েছিল 'স্মরণ' নাম দিয়ে।

'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩), পৃ. ৭৯-৮২

৮. মীরা দেবী

মাকে আমার স্পষ্ট মনে না থাকলেও আবছায়া-মতো মনে পড়ে। খানিকটা হয়তো বাস্তবে ও কল্পনায় মিশে গেছে, যেটুকু মনে আছে তাই বলছি।

মায়ের সুনাম ছিল রান্নার। বাবা তাঁকে দিয়ে নানারকম রান্না ও শরবতের পরীক্ষা করাতে ভালোবাসতেন। এক সময় বাবা শিলাইদায় পদ্মার চরে আমাদের নিয়ে 'পদ্মা' নামে বজরাতে ছিলেন। তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রায়ই শিলাইদায় যেতেন। তাঁরা পদ্মার উপর বোটে থাকতে খুব ভালোবাসতেন।

আমাদের দুটি বজরা ছিল, তাই তাঁরা গেলে কোনো অসুবিধা হত না। একটি বোটের নাম আগেই উল্লেখ করেছি, অপরটির নাম ছিল 'আত্রাই'। আমাদের আর-একটি পরগনাতে আত্রাই নদী ছিল, তার থেকে আত্রাই নামকরণ করা হয়েছিল।

মনে পড়ছে আচার্য জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে খুব ভালোবাসতেন। পদ্মার চরে বালির মধ্যে গর্ত করে কচ্ছপ ডিম পেড়ে রেখে যেত। বালির উপর তাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে যে লোকে ধরে ফেলত তারা কোথায় ডিম পেড়ে গেছে— বেচারিরা কী করে আর বুঝবে? কচ্ছপের ডিম জগদীশবাবুর এত প্রিয় ছিল যে কলকাতায় যাবার সময় অনেকগুলো করে ডিম নিয়ে যেতেন।

জগদীশচন্দ্র ও জগদিন্দ্রনাথ যখন শিলাইদায় যেতেন, বাবা তখন মাকে দিয়ে নূতন রান্না করাতেন। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে তাঁরা খুব খুশি হতেন। পরে বড়ো হয়ে তাঁদের মুখে মায়ের রান্নার প্রশংসা অনেক শুনেছি। মায়ের যে শুধু রান্নার সুনাম ছিল তা নয় তাঁর ভাগ্‌নে ভাগ্‌নিরা, ভাশুরপো ও তাদের বউরা সকলে তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আমার এক পিসতুতো বোন দুঃখ করে আমার কাছে বলেছিলেন যে মামি গিয়ে মামাবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে।

শিলাইদা থেকে আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলুম। সেখানে অতিথিশালায় ছিলুম। সেখানকার একটা ছবি মনে পড়ে— সরু এক ফালি বারান্দায় একটা তোলা উনুন নিয়ে মা বসে রান্না করছেন আর তাঁর পিসিমা রাজলক্ষ্মী-দিদিমা তরকারি কুটতে কুটতে গল্প করছেন।

আর-একটা ছবি মনে পড়ে— শান্তিনিকেতন-বাড়ির দোতলার গাড়ি-বারান্দার ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, মার হাতে একটা ইংরেজি নভেল, তার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিদিমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন। গল্প শোনবার লোভে কোনো কোনো সময় তাঁদের গল্পের আসরে গিয়ে

বসতুম। তাই বার বার শুনতে শুনতে বইটার একটি মেয়ের নাম কী করে যে মনের মধ্যে গাঁথা থেকে গেছে খুবই আশ্চর্য লাগে। আমার তখন ইস্টলিনের রোমান্সে আকৃষ্ট হবার বয়স নয়। তবু বোধ হয়, মার গল্প বলার ধরনে ও তাঁর কণ্ঠস্বরে যে বেদনা ফুটে উঠত তাতে আমার শিশুমনে একটা ছাপ রেখে গিয়েছিল। তাই বার্‌বারা নামটা মনে রয়ে গেল।

কিছুদিন পরে মার অসুখ করলে তাঁকে কলকাতায় আনা হল। এখন যেটাকে বিচিত্রা বলা হয়, আমরা ঐখানে থাকতুম। তখন আমরা ঐ বাড়িকে হয় লালবাড়ি নয় নতুন বাড়ি বলতুম। লালবাড়ির ঘরের একটু বিশেষত্ব ছিল। এক ধারে দেয়াল অবধি মস্ত বড়ো আলমারি প্রায় ছাত-সমান উঁচু। আলমারির কাচের পাল্লায় টুকটুকে লাল রঙের শালু আঁটা। আর-এক ধারে একটু ফাঁক ছিল, সেখানে পাতলা কাঠের দরজা, তার মাথার উপর এবং নীচের দিকে ফাঁকা। অনেক সময় রেস্তোরাঁয় এরকম দরজা দেখা যায়। হাত দিয়ে ঠেলা দিলে খুলে গিয়ে তখনি আবার বন্ধ হয়ে যেত। একটা বড়ো ঘরকে এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনটি ঘরে পরিণত করা হয়েছিল। একটা ঘরে আমরা থাকতুম। সব চেয়ে শেষের পশ্চিমের ঘরে মাকে রাখা হল নিরিবিলি হবে বলে। আমাদের বাড়ির সামনে গগনদাদাদের বিরাট অট্টালিকা থাকাতে নতুন বাড়ির কোনো ঘরে হাওয়া খেলত না। সে বাড়িতে তখন বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না, তাই একমাত্র তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করা ছাড়া গতি ছিল না। ঐ বাতাসহীন ঘরে অসুস্থ শরীরে মা না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু বড়োবউঠান হেমলতা দেবীর কাছে শুনেছি যে বাবা মার পাশে বসে সারা রাত তালপাখা নিয়ে বাতাস করতেন।

'স্মৃতিকথা', ১৩৯৩, পৃ. ১৬-১৮

৯. অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শমীর সহিত দিন কাটিত বলিয়াই হয়ত আমার জীবনে আমি আর এক জনের স্নেহের পরিচয় অত্যন্ত সহজে পাইয়াছিলাম। আজও মনে পড়ে, এক দিন সকালে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া, শমী, আমি ও আমাদের মাষ্টার-মহাশয় জগদানন্দবাবু ক্রিকেট খেলায় মত্ত ছিলাম, এমন সময়ে মাঠের পথে দুইটি ভদ্রমহিলাকে যাইতে দেখিলাম। পরে জানিয়েছিলাম, তাঁহারা শমীর মা ও পিসিমা। শমী ব্যাট ফেলিয়া তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। আমি বল কুড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম, শমীর পশ্চাতে পশ্চাতে আমিও ছুটিলাম। কেন যে ছুটিয়াছিলাম তাহা আজও বলিতে পারি না— বোধ হয়, শমী যাহা করিত তাহাই আমারও করিতে ভাল লাগিত বলিয়া যাহা হউক, আমি কতক দূর মাত্র ছুটিয়া গিয়াছি, দেখিলাম, শমী তাহার পিসিমার কাছে পৌছাইয়া গিয়াছে ও তাহার পিসিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতেছেন। আমার গতি থামিয়া গেল, আমি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলাম। মনে হইল, আমি কেন ছুটিয়া যাইতেছি, আমাকে কোলে বা বুকে লইবার এখানে তো কেহ নাই। কতক্ষণ হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। তার পরই অনুভব করিলাম, শমীর মা আমার কাছে আসিয়া আমাকে তাঁহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন আমার পক্ষে আর শান্ত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমার দুই চক্ষু দিয়া যে অশ্রুধারার বর্ষণ হইয়াছিল, তাহার ফলে শমীর মা আমারও মা হইয়া গেলেন। তাঁর সেদিনকার প্রাতর্ভ্রমণের ব্যাঘাত ঘটিল, আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজ গৃহে ফিরিলেন। সেদিন প্রায় সমস্তক্ষণই আমি তাঁহার কাছে কাছে ছিলাম এবং পরে তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তার পর হইতে তাঁহার কাছে আমি প্রায়ই যাইতাম, তাঁহার শয়ন-ঘরে ঘুমাইতাম। শমীর মা ত শুধু আমার মা ছিলেন না, আমরা যে তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া

জানিতাম। তিনি কত সময়ে আশ্রমের রান্নাঘরে আসিয়া আমাদের জন্যও কত কি যে রান্না করিতেন। মনে পড়ে, সে-সময়ে আমরা আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতাম ও কখন তিনি আমাদের ডাকিবেন ও খাইতে দিবেন তাহার জন্য অধীর হইয়া থাকিতাম।

"শান্তিনিকেতনের স্মৃতি"
'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ. ৫৭১-৭২

১০. যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

…একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিলে আশ্রমের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ধীরেনের মুখে শুনিয়াছিলাম আশ্রমে এক বার তাহার জ্বর হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর পত্নী সেই সংবাদ শুনিয়া ধীরেনকে ছাত্রবাস হইতে নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন। জ্বরটা তিন-চারি দিন ছিল, সে-সময় তাহাকে দুধ ও জল-সাবু খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। দশ বৎসরের বালক জলসাগু খাইতে আপত্তি করিলে রবীন্দ্রবাবুর পত্নী তাহাকে কাছে বসাইয়া পিঠে হাত বুঝাইতে বুলাইতে 'লক্ষ্মী আমার, যাদু আমার, এইটুকু খেয়ে ফেল, তাহলে তোমার জ্বর ভাল হয়ে যাবে" প্রভৃতি বলিয়া সাগুখাওয়াইতেন। আশ্রমে কোন বালকের পীড়া হইলে তিনি রোগীকে উপরে আপনার কাছে আনাইয়া স্বয়ং তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পরবর্তী কালে দেখিয়াছি, ধীরেন যখনই কবি-পত্নীর কথা বলিত, তখনই তাহার নয়নযুগল সজল হইয়া উঠিত।

"বিশ্বভারতীর অঙ্কুর"
'প্রবাসী', মাঘ ১৩৪৬, পৃ. ৫১০

১১. সত্যরঞ্জন বসু

...শিলাইদহ হইতে বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে আসিলেন সপরিবারে। কবি-গৃহিণী মৃণালিনী দেবী নিজে রন্ধন করিয়া অন্যকে খাওয়াইতে বড়োই ভালোবাসিতেন। বড়ো ছেলে রথীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ছেলেদের সঙ্গে থাকে, খায়। তাই তিনি বিদ্যালয়ের সকল ছেলের জন্যই রোজ বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শরীর যখন খুবই খারাপ হইয়া পড়িল কবি সকলকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন।

'ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি'
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', পৃ. ৮৬

ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিলেন, "সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা— অনুভূতিও।" কবি-গৃহিণীর যত্ন ও আদর তিনি ভুলিতে পারেন না। কতরকম রান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন যেন নিজের ছেলেটি। কবিও মাঝে মাঝে ফরমাইশ দিতেন নানারকম তরকারীর। আরও চমৎকার, 'রান্নার পদ্ধতিও বাৎলাইয়া দিতেন, কবি, গৃহিণীকে— বলিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। কি আনন্দে নিরঙ্কুশভাবে শিলাইদহের দিনগুলি তিনি কাটাইয়াছেন তাহারই স্মৃতি আজ তাঁহাকে মোহিত করে। বিশেষ করিয়া স্বল্প মৃদুভাষী কবি-গৃহিণীর আপন-করা ব্যবহারে তিনি পরিবারের একজন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

'ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি'
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', পৃ. ৭৮

··· কবি-গৃহিণী উনত্রিশ বৎসরে দেহত্যাগ করিলেন ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সনে। গৃহলক্ষ্মীর তিরোধান সত্ত্বেও কবির কাব্যলক্ষ্মীর সেবা অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির অসাধারণত্বের পরিচয় বিস্ময়মুগ্ধ করে। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর কবির কাছে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে চিঠি লিখিলেন। কবি-গৃহিণীর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল— বিশেষ করিয়া, শিলাইদহে সেই কয়েক দিন অবস্থানের। তিনি বলিলেন, "কী তাঁর স্নেহ, কী তাঁর আপন করে নেওয়ার ব্যস্ততা— আমাদের মিথ্যা আভিজাত্যের মুখোস দূর হয়ে গেল তাঁর স্নেহাঞ্চল আবরণে। তাঁর অভাব আমি নিবিড়ভাবে আজ অনুভব করছি।" কবি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করার পর···

অপিচ দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ১০৫-০৬

১২. প্রমথনাথ বিশী

এই বিদ্যালয়কে পরিবারাশ্রম বলা যাইতে পারে। ছাত্রত্ব এখানকার ছাত্রদের রূপ নয়, এখানে তাহারা প্রধানত বালক বালিকা। নিজেদের পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া আশ্রম-পরিবারের অন্তর্গত হইয়া পড়িতে তাহারা যেন পারে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। শান্তিনিকেতনের একেবারে প্রথম আমলে বিদ্যালয়টি তাঁহার নিজের পরিবারের অন্তর্গত ছিল বলিলেও হয়। তাঁহার পত্নী বালকদের জননী-স্থানীয়া ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের পুত্রদের ও অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে বাসাহারে কোনো প্রভেদ ছিল না, শিক্ষকেরাও এই পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্নীবিয়োগের পরে ও ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধিতে এই পরিবার ভাবটি কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু এই পরিবার-চৈতন্যই শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এখানে কবিপত্নী সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের জ্যোতির প্রভাবে এই মহীয়সী মহিলার প্রভা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, শান্তিনিকেতন-স্থাপনে তিনি যেমন সর্বতোভাব নিজের সাহচর্য, শক্তি, এমন-কি, অনটনের দিনে অলঙ্কারগুলি পর্যন্ত দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, সংসারে তাহা একান্ত বিরল। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাসের পাতায় ইঁহাদের স্মৃতি স্নেহের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। কবিপত্নী জীবিত থাকিলে বিদ্যালয়-পরিবারটি নিশ্চয় আরো সুপিনদ্ধ হইয়া উঠিত।

'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', পৃ. ১৪১-৪২

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে এবং ব্যক্তিগত আলাপনে কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো-বা পরোক্ষে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজ বিবাহ উপলক্ষে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি যে স্বহস্তলিখিত নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন, কৌতুকে পরিহাসে তাহা বিশিষ্ট ও সমুজ্জ্বল। পত্রটি বর্তমান গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্র তিনি প্রিয়নাথ সেন ব্যতীত আরো কোনো কোনো বন্ধুকে পাঠাইয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর নিম্নোদ্ধৃত রচনা হইতে তাহা জানা যায়—

I was present at Rabindranath's marriage. He sent me a characteristic invitation in which he wrote that his intimate relative Rabindranath Tagore was to be married —"আমার পরম আত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবে।" The marriage took place in Rabindranath's own house and was a very quiet affair, only a few friends being present.

—Nagendranath Gupta, "Some Celebrities",
The Modern Review, May 1927, p. 543.

অধিক বয়সে কথোপকথনচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিবাহপ্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (১৩) গ্রন্থ হইতে তাহা সংকলিত হইল।

"আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বললুম, 'তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই।' তাঁরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাই নি।[১] আমি

---

[১] এ বিষয়ে ইন্দিরা দেবী তাঁহার 'স্মৃতিকথা'য় লিখিয়াছেন, "রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা··· জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন।" দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ১৩৫

বলেছিলুম, আমি কোথাও যাব না, এখানেই বিয়ে হবে। বিয়ে জোড়াসাঁকোতে হয়েছিল।"

"সে কি, আপনি বিয়ে করতেও যশোর যান নি?"

"কেন যাব? আমার একটা মান নেই?"

"ভীষণ অহংকার!"

"তা হোক, তাঁরা তোমাদের মত আধুনিকা তো ছিলেন না, এসেছিলেন তো!"

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ-আলোচনায় স্বভাবত বিমুখ হইলেও, শেষ বয়সে কালিম্পঙ-এ মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে আলাপনে বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গে কখনো কখনো পারিবারিক প্রসঙ্গ ও পত্নী মৃণালিনী দেবীর কথা স্মরণ করিয়াছেন; মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' হইতে তাহার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি এখানে সংকলন করা গেল :

"...এই যে বিশ্বভারতী এত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, আমার অবর্তমানে এর আর মূল্য কি কিছুই থাকবে না? এর পিছনে যে কী পরিশ্রম আছে তা তো জান না— কী দুঃখের সে-সব দিন গেছে যখন ছোটোবৌর গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। চারিদিকে ঋণ বেড়ে চলেছে, ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে যোগাড় করেছি, কেউ ছেলে তো দেবেই না— গাড়ি ভাড়া করে অন্যকে বারণ করে আসবে। এই রকম সাহায্যই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি। আর তখন চলেছে একটির পর একটি মৃত্যুশোক, সে দুঃখের ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকে জানে উনি শৌখীন বড়োলোক। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়েছিলুম, আমার সংসারে কিছুমাত্র বাবুয়ানা ছিল না। ছোটোবৌকেও অনেক ভার সইতে হয়েছে, জানি সে কথা তিনি মনে করতেন না।"

মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন— "শারীরিক মানসিক যে দুঃখগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত, সে সম্বন্ধে তিনি চিরদিন নীরব থাকতেন। তাঁর মুখে তাঁর

পারিবারিক জীবনের কথা খুব কমই শোনা যেত। তবে ইদানীং মাঝে মাঝে বলতেন। বিশেষ করে যে সময়ে শান্তিনিকেতন শুরু করেছিলেন সেই সময়ের কথা বলতে বলতে যেন তিনি সেই তীব্র দুঃখের সম্মুখীন হ'য়ে থেমে যেতেন। তিনি তো সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং অন্যান্য কবিদের মত খেয়াল খুশির উদ্দাম মুক্তিতে জীবন ভাসিয়ে দেননি। সাধারণ গৃহস্থের মত সংসারের ভারও তাঁকে পুরোদমেই বইতে হয়েছে। বলতেন, "তোমাদের এখনকার মত আমরা এত বড়মানুষ ছিলাম না। এখন তো তোমাদের দেখি কিছুতেই কুলোয় না। আমার বরাদ্দ ছিল ২০০৲ কী ২৫০৲। তাই এনে ছোটবৌকে দিয়ে দিতুম, ব্যস্। তিনি যা খুশি করতেন, সংসার চালাতেন। আমার সেদিকে কখনো কিছু ভাবতে হ'ত না।

…প্রত্যেকের সমস্ত ব্যবস্থা, পড়ান, বিবাহ, এমন-কি তিনটি সন্তানের মৃত্যুর দুঃখও একলাই বহন করতে হয়েছে। বেলার বিবাহ তাঁর [মৃণালিনীর] মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল। সবই করেছি কিন্তু জালে জড়াইনি। দূরের থেকে করেছি। ছেলেদের মানুষ করা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সে করেছি, কিন্তু সে যেন একটা intellectual task, সেটা বুদ্ধি বিচার বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মত ভাবেই। রথীদের পড়াতে গিয়েই তো শান্তিনিকেতনের শুরু হ'ল। তখন অবশ্য তিনি ছিলেন এবং যোগও দিয়েছিলেন আমার কাজে। এখনকার ছেলেমেয়েদের মত আমরা অত খুঁতখুঁতে ছিলুম না। আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয়নি তো, তাতে কিছুই এসে যায়নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। বিশেষ ক'রে ইদানীং, অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ হয়েছিল আমার কাজ করবার। কিন্তু সে তো হ'ল না— অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হ'ল।…

…তিনি চলে গেলেন তখন আমার এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন শুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মত

চেপে রয়েছে, কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখদুঃখকে কেন্দ্র ক'রে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়। মেজো মেয়ে মৃত্যুশয্যায় আলমোড়ায়। তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হ'ত শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া আসা ছুটোছুটি চলছেই। তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হ'ত জানো, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে··· ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়,··· সে তো আর যাকে তাকে হয় না। যখন জীবনের এই যুদ্ধ চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠছে, মেয়ে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সেইটেই সব চেয়ে কষ্ট হ'ত যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা [যায়]···"

মৃণালিনী দেবী যখন মৃত্যুশয্যায়, আসন্ন আঘাতের উদ্‌বেগে ও শঙ্কায় কবিচিত্ত ভিতরে ভিতরে মথিত ও উদ্‌বেল। অসাধারণ সংযম ও পৌরুষ কিভাবে রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করিয়াছেন তাহার চিত্র পাওয়া যায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী -লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে, প্রাসঙ্গিক অংশ তাহা হইতে সংকলিত হইল :

"এইবারে কবির ব্যক্তিগত উদারতা ও অন্তরের দিক্‌টা, সে সময় যেমন দেখিয়াছি, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। প্রতিভার মত সেদিকটাও আমার হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল। কবির পত্নী-বিয়োগের দিন ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার গৃহে উপস্থিত ছিলাম। আসন্নমৃত্যু রোগীর বাড়ী, সহসা একবার উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া আসা আমাদের বাঙ্গালী জাতির বিচারে শিষ্টাচার-সঙ্গত নয়। তাহার উপর, কবির সহিত আমার তখন যে সম্বন্ধ, তাহাতে রোগিণীর ঐ অবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া আসা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। সমস্ত সকাল বেলাটাই সেখানে বসিয়া সময়োচিত নানা কথাই মনে আসিতেছিল। চিরপুরাতন হইলেও এই কথাই ভাবিতেছিলাম

যে, মানুষ যত বড়ই হউক, নিয়তির হাত হইতে অব্যাহতির কোন উপায় নাই ; রোগ-শোকের কাছে বৃহৎ ক্ষুদ্র বা ভাল-মন্দের ভিন্ন বিচার নাই। ঐ সময় নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন।…

…কবি মাঝে মাঝে নীচে আসিতেছিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য মহারাজকে দু'টী একটি কথা বলিয়া বা ডাক্তার আসিলে, তাঁহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার সেদিনকার মূর্ত্তিটি আমার মনে আছে। বাক্‌বিরল গম্ভীর মুখশ্রী সংযম-কঠিন চেষ্টায় যেন আত্মসংবরণ করিয়া রাখিয়াছে। চোখে অশ্রু নাই। নাসিকায় দীর্ঘশ্বাস নাই ; ঈষৎ আরক্ত মুখমণ্ডলে অবৃষ্টিসংরম্ভ আসন্ন আষাঢ়েরই যেন স্তম্ভিত পূর্ব্বাভাস। ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ স্মিতভাব, রোদনেরই যাহা অব্যক্ত রূপান্তর। বিকার-চাঞ্চল্যহীন সেই মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইতেছিল, কি দুঃসহ বেদনাই না জানি তাহার অন্তরালে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। বেলা বারোটার সময় কবিও উপরে গেলেন, মহারাজও আমাকে আমার বাসায় নামাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।”

মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যুর পর সেই দুঃখাভিঘাত কবি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যায় সেই সময়ে দীনেশচন্দ্র সেন এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লিখিত তাঁহার দুইখানি অন্তরঙ্গ পত্রে ; ‘চিঠিপত্র ১০’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা’ (১৩৬৮) গ্রন্থ হইতে তাহা বর্তমান গ্রন্থে (পৃ ১০৫-০৬) সংকলিত হইয়াছে।

শিশু কাব্যের অধিকাংশ কবিতা খোকার উদ্দেশে রচিত। কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনকালে, সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনের পত্নী এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন তাহাতেও মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি উদ্‌ভাসিত। প্রাসঙ্গিক-বোধে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র কার্তিক ১৩৪৯ সংখ্যা (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮, পৃ ৪৬) হইতে পত্রটি এই গ্রন্থে (পৃ ১০৬-০৭) সংকলিত হইয়াছে।

ঠাকুরবাড়ির বধূ, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী প্রফুল্লময়ী দেবী, 'প্রবাসী' পত্রের বৈশাখ ১৩৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত "আমাদের কথা"য় সংসার-পরায়ণা গৃহবধূ মৃণালিনী দেবীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

[বলুর] বিবাহে [১৮৯৫] খুবই ঘটা হইয়াছিল।··· আমার ছোটো জা মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকমভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে লইয়া নানারকম আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালোবাসিতেন। মনটি খুব সরল ছিল, সেইজন্য বাড়ির সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসিতেন।

—প্রফুল্লময়ী দেবী, "আমাদের কথা", 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩৭

মন্মথনাথ ঘোষ মৃণালিনী দেবীর অভিনয়ের যে উল্লেখ করিয়াছেন ("কবি-পত্নী", 'মৃণালিনী দেবী', পৃ ১৭) নাট্যস্মৃতি প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী -লিখিত তাহার বিবরণ এ প্রসঙ্গে সংকলনযোগ্য :

'রাজা ও রানী' নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অভিনয়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

···বাড়িটি [বির্জিতলা] জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম, 'রাজা ও রানী'র অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এইরকম—

বিক্রম	রবিকাকা
সুমিত্রা	মা [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী]
দেবদত্ত	বাবা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
নারায়ণী	কাকিমা [মৃণালিনী দেবী]

—ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, 'রবীন্দ্রস্মৃতি'।

জীবনপঞ্জী

মৃণালিনী দেবী

১২৮০ ফাল্গুন। ১৮৭৪ মার্চ ॥ জন্ম : খুলনা জেলার দক্ষিণডিহির ফুলতলা গ্রামে। পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরী। মাতা দাক্ষায়ণী দেবী।

(?) ১২৮৭। ১৮৮০ ॥ শিক্ষারম্ভ : গ্রামের পাঠশালায়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত পড়াশুনা।

১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪। ১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯ ॥ বিবাহ : দশ বৎসর বয়সে, বাইশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের সহিত। জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে শুভকার্য সম্পন্ন হয়।

১২৯০ ফাল্গুন ১৯। ১৮৮৪ মার্চ ১ ॥ ইংরেজি শিক্ষা : মহর্ষির আদেশে ইংরেজি শিক্ষার জন্য নববধূকে লরেটো হাউসে স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি করার ব্যবস্থা।

১২৯১ বৈশাখ-চৈত্র। ১৮৮৪-৮৫ ॥ এক বৎসর কাল লরেটোতে শিক্ষা লাভ।

(?) ১২৯২ বৈশাখ-চৈত্র। ১৮৮৫-৮৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে মহর্ষিভবনে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা।

১২৯৩ কার্তিক ৯। ১৮৮৬ অক্টোবর ২৫ ॥ প্রথম সন্তান বেলা বা মাধুরীলতার জন্ম।

(?) ১২৯৩। ১৮৮৭ ॥ স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখিসমিতি' ও 'শিল্পমেলা'র কর্ত্রীসভার 'সখী'রূপে নির্বাচিতা।

(?) ১২৯৪ চৈত্র। ১৮৮৮ মার্চ-এপ্রিল ॥ স্বামী ও শিশুকন্যাসহ গাজিপুরে গমন ও বাস। এখানে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ থেকে আষাঢ় এই তিন মাসে 'মানসী'র ২৮টি কবিতা রচনা করেন।

১২৯৫ অগ্রহায়ণ ১৩। ১৮৮৮ নবেম্বর ২৭ ॥ দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথের জন্ম।

(?) ১২৯৬ পূজার ছুটি। ১৮৮৯ অক্টোবর-নবেম্বর ॥ কবির সদ্য-প্রকাশিত 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয়ে মৃণালিনী দেবীর 'নারায়ণী'র ভূমিকায় সার্থক অভিনয় (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে)।

১২৯৬ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৯ নবেম্বর-ডিসেম্বর ॥ স্বামী ও পুত্রকন্যা সহ শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে 'পদ্মা' বোটে বাস।

১২৯৭ মাঘ ১১। ১৮৯১ জানুয়ারি ২৩॥ তৃতীয় সন্তান রানী বা রেনুকার জন্ম।

১২৯৮ গ্রীষ্মকাল। ১৮৯১ এপ্রিল-মে ॥ স্বামী ও সন্তানগণ সহ প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন ও 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির (আদি বাড়ি) দোতলায় বাস।

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯১ মে-জুন ॥ শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা গমন।

১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ১৮৯২ ॥ দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১২৯৯ অগ্রহায়ণ ৩। ১৮৯২ নবেম্বর ১৭ ॥ শিশুসন্তানদের ও কুমারী ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে সোলাপুরে জ্ঞানদানন্দিনীর নিকট গমন।

১২৯৯ পৌষ ২৯। ১৮৯৩ জানুয়ারি ১২ ॥ চতুর্থ সন্তান মীরা দেবীর জন্ম।

১৩০১ অগ্রহায়ণ ২৮। ১৮৯৪ ডিসেম্বর ১৩ ॥ পঞ্চম ও সর্বশেষ সন্তান শমীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৩০৪ কার্তিক-পৌষ। ১৮৯৭-৯৮ ॥ তৃতীয়বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৬ ভাদ্র-১৩০৭ চৈত্র। ১৮৯৯-১৯০১ ॥ শিলাইদহে বাস।

১৩০৮ বৈশাখ। ১৯০১ এপ্রিল-মে ॥ চতুর্থবার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৮ আষাঢ় ১। ১৯০১ জুন ১৫ ॥ বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত প্রথম কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার বিবাহ। বিবাহের পূর্বে ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহর্ষি বরকে দশ হাজার পাঁচ টাকা যৌতুক দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

১৩০৮ শ্রাবণ ২৪। ১৯০১ আগস্ট ৯ ॥ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত দ্বিতীয় কন্যা রানী বা রেণুকার এগারো বৎসর ছয় মাস বয়সে বিবাহ। মহর্ষি বরকে যৌতুক স্বরূপ চারটি মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

১৩০৮ ভাদ্র। ১৯০১ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ॥ পঞ্চমবার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৮ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯০১ ॥ ষষ্ঠবার শান্তিনিকেতনে আগমন ও বসবাস।

১৩০৮ চৈত্র। ১৯০২ মার্চ-এপ্রিল ॥ সপ্তম ও সর্বশেষবার শান্তিনিকেতনে আগমন ও বাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ।

১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২ জুন-জুলাই ॥ শান্তিনিকেতনে রোগাক্রান্ত।

(?) ১৩০৯ ভাদ্র ২৭। ১৯০২ সেপ্টেম্বর ১২ ॥ চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় স্থানান্তরিত।

১৩০৯ অগ্রহায়ণ ৭। ১৯০২ নবেম্বর ২৩ ॥ জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে দেহাবসান।

ব্যক্তি-পরিচয়

অমলা : চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী
অরু : অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র
আদ্যদিদি : আদ্যাসুন্দরী দেবী, রথীন্দ্রনাথের মাতা সারদাদেবীর পিসিমা
আমাদের সাহেব : পাবনা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট
আশু : আশুতোষ চৌধুরী, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর স্বামী
কর্তাদাদামশায় : দেবেন্দ্রনাথ
কুঞ্জ : কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী
কৃতী : কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র
ক্ষুদ্রতমা কন্যা : তৃতীয়া কন্যা মীরা
খোকা : জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ
গগন : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গুজরাটী বন্ধু : সম্ভবত সুরাটের ধনী ব্যবসায়ী কালাভাই লালুভাই দোশে
গোফুর মিঞা : বাবুর্চি
ছোটকাকামশায় : শমীন্দ্রনাথ
জগদানন্দ : জগদানন্দ রায়
জগদীশদা : সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মাতুল
জগন্নাথ : পুরাতন কর্মচারী
ডাক্তার : সম্ভবত শিলাইদহের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার যদু মুখোপাধ্যায়
তারকবাবু : তারকনাথ পালিত
দিনু : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র
নগেন্দ্র : রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
ন ঠাকুরঝি : স্বর্ণকুমারী দেবী
ন দিদি, রবীন্দ্রনাথের পত্রে : স্বর্ণকুমারী দেবী

ন দিদি, মৃণালিনীদেবীর পত্রে : প্রফুল্লময়ী দেবী, বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
ন বোঠান : পূর্বোক্ত প্রফুল্লময়ী দেবী
নরু : সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী নরেন্দ্রবালা দেবী
নলিনী : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী
নাটোর : জগদিন্দ্রনাথ রায়
নীতু, নীদ্দা : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুটে : ভৃত্য
প্রজ্ঞা : প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
প্রতাপবাবু : ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
প্রমথ : প্রমথ চৌধুরী
প্রিয়বাবু : প্রিয়নাথ সেন
ফটিক মজুমদার : কুমারখালির বিখ্যাত ধনী
ফুলচাঁদ : কবির পদ্মাবোটের মাঝি
ফুলতলা : খুলনায় মৃণালিনী দেবীর পিত্রালয়
বড়দিদি, বড়পিসিমা : সৌদামিনী দেবী
বলু, বোলতা : রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ
বাবামশায় : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বেভূষণ : সম্ভবত গৃহভৃত্য
বিপিন : কবির পুরাতন ভৃত্য
বিবি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
বিষ্ণু : গায়ক ও শিক্ষক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়
বিহারীবাবু : বিহারীলাল গুপ্ত
বেলা বা বেলি : কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী
মণীষা : হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
মিস্ পারসেন : শিলাইদহে গৃহশিক্ষয়িত্রী

মীরা : কবির কনিষ্ঠা কন্যা
মেজদি : প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
মেজবোঠান : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
যদু : খাজাঞ্চি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রমা : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
রানী বা রেণুকা : কবির দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা দেবী
লক্ষ্মী : জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিচারিকা
লরেন্স : উইলিয়ম লরেন্স, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের শিক্ষক
লাহোরিনী : অক্ষয়কুমার চৌধুরীর স্ত্রী লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরানী
লোকেন : লোকেন্দ্রনাথ পালিত
শমী : শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎ : জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী
শশাঙ্ক : মৃণালিনীদেবীর আয়া
সত্য, সোদ্দা : রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সরলা : ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরানী
সুইদা, সুধী : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র
সুবোধ : সুবোধচন্দ্র মজুমদার
সুরেন : সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র
সুশীলা : ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
সুসি : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সাহানা দেবী
সেজদিদি : নীপময়ী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
সেজবৌ : নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
হেমলতা দেবী : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
হেশ : চিত্রকর শশীকুমার হেশ
হৃষী : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ সহোদর
Mrs Gupta : বিহারীলাল গুপ্তর পত্নী সৌদামিনী দেবী